৯ম বর্ষ ৪র্থ খণ্ড

৩৯শ সংখ্যা মূল্য ৪০ পয়সা

Friday, 6th February, 1970 শুক্রবার, ২৩শে মাঘ, ১৩৭৬ **40 Paise**

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীপুলক মণ্ডল

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর ধারাবাহিক আত্মস্মৃতি 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' রচনাটির ২৩ জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত অংশটিতে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে। সবিনয়ে বলব, এ আলোচনার প্রকৃতি আমাদের ব্যথিত করেছে।

আত্মস্মৃতিতে অন্যান্যদের সম্পর্কে কথা থাকবেই। এবং নাট্যাচার্য সম্পর্কে আলোচনা করবার অধিকার নটসূর্যেরই সব চাইতে বেশি—একথা আমরা মানি। কিন্তু একী আলোচনা! কবে শিশিরকুমার আমেরিকায় গিয়েছিলেন, তার আগেই কোন আমেরিকান পত্রিকা কেমন মন্তব্য করেছিল তারই দুর্লভ সংগ্রহ, সঙ্গে কারা গিয়েছিলেন জাহাজে, কারা গিয়েছিলেন প্লেনে চেপে, কদিন সময় লেগেছিল, কে ঠকিয়ে নিয়েছিল তাঁদের, তারপর 'চুপি চুপি' তাঁরা কবে গা ঢাকা দিয়ে ফিরে এলেন স্বদেশে—তাই দেখে 'একের কলঙ্কের কালি অন্যের গালে এসে' লাগল —এই সব বিবরণে ভরা। হতে পারে এ সবই সত্য। কিন্তু তারপর এত বছরেও আর কোনো নাট্যসংস্থা বিদেশে গিয়েছেন বা গিয়ে সুবিধে করতে পেরেছেন—সেরকম খবরও তো বিশেষ চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও আমেরিকার কোনো কোনো কাগজ কখনও কখনও তীব্র সমালোচনা করেছে শুনেছি, তাতে কি রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর দেশের মুখে চুনকালি পড়েছিল? আর এ প্রসঙ্গে উদয়শঙ্করই বা এলেন কেন? এ কী রকম তুলনা? উদয়শঙ্কর খুব হিসেবী—এ খ্যাতি কি উদয়শঙ্করই মেনে নেবেন? অশ্রুজলে কি তাঁর অনেক সাধের সাধনা বিড়ম্বিত হয়ে যায় নি? উদয়শঙ্কর দেশের মুখ যতটা উজ্জ্বল করেছেন, শিশিরকুমার কি তার চাইতে কম করেছেন? বর্তমান কালের পাঠক যাঁরা শিশিরকুমারের অভিনয় দেখেন নি, (এবং সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য নন,) তাঁরা এ আলোচনা পড়ে শিশিরকুমার সম্বন্ধে কী ধারণা করবেন? এ দেশের সাংস্কৃতিক সীমানা কি শিশিরকুমারকে বাদ দিয়ে কল্পনা করা যায়? দুঃখের সঙ্গে বলব, নটসূর্যের দীর্ঘ আলোচনায় কোথাও এ আভাস পাইনি আমরা।

তাছাড়া খুব হিসেবী ও ব্যবসায়ী বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়াটাই শিল্পীর একটা প্রধান গুণ নয়। হিসেবজ্ঞানে অনেকে কিংবদন্তীর নায়কের খ্যাতি পেয়েছেন, কিন্তু সেই গুণটি তাঁদের শিল্পপ্রসঙ্গে কেউ উল্লেখ করে না—প্রশংসা করে নয়, নিন্দে করেও নয়।

সকলেই স্বীকার করবেন আত্মস্মৃতির নিঃসন্দেহে সাহিত্যমূল্য থাকা চাই এবং বলাই বাহুল্য, সেই সাহিত্যমূল্য অনেকটাই নির্ভর করে সমকালীন ব্যক্তিদের সম্পর্কে অকুণ্ঠ ঔদার্যের ওপর। বাংলা সাহিত্যে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

জীবিত অভিনেতাদের মধ্যে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে এতবড় পরিপূর্ণ প্রতিভাধর অভিনেতা কজন আছেন জানি না। দুর্লভ তথ্যে পরিপূর্ণ তাঁর রচনা। তাঁর পাণ্ডিত্যও তর্কের ঊর্ধ্বে। তাঁর রচনায় শিশিরকুমারের যথার্থ অ্যাপ্রিসিয়েশন পেলে আমরা আনন্দিত হব—কারণ এ কাজে নটসূর্যই যোগ্যতম।

সুমঙ্গল সেন
অধ্যাপক, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং কলেজ, আগরতলা।

নজরুলের সঙ্গে কারাগারে

আপনাদের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'অমৃতে'র নিয়মিত পাঠক। শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর লেখা 'নজরুলের সঙ্গে কারাগারে' ধারাবাহিক রচনাটি পড়ে খুবই আনন্দ পাচ্ছি। তিনি তাঁর দলিলচিত্রগুলো যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে প্রতিটি পাঠক-পাঠিকাই তাঁর প্রশংসা না করে পারবেন না।

নজরুলের সম্বন্ধে আমরা (আজকের যুবক-যুবতীরা) অনেক কিছুই জানি না। সেই অনেক কিছুকে জানবার সুযোগ একমাত্র শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয়ের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় সম্পাদকমহাশয় ও শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয়কে নমস্কার জানিয়ে আমার চিঠির বক্তব্য শেষ করলাম।

কল্যাণরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-৩৪

শাদা চোখে

অমৃতে 'শাদাচোখের' লেখক শ্রীসমদর্শীকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও ভাষ্য হৃদয়গ্রাহী। একাধিক পত্র-পত্রিকা পড়ি; সবগুলিরই রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও ভাষ্যের সঙ্গে আমি পরিচিত। উপলব্ধি করি, অমৃতের 'শাদাচোখের' রচনাগুলি নিজ বৈশিষ্ট্যগুণে সমৃদ্ধ। অন্য রচনার মধ্যে দেখি—কেমন যেন একটা ধোঁয়াটে চিন্তার প্রকাশ; মতামতের স্পষ্টতা নেই, তাও আবার অনেক ক্ষেত্রে দলীয় পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। কিন্তু অমৃতের 'শাদাচোখের' রচনার মধ্যে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা মননশীলতার স্বাদ পাই। ভারতবর্ষের রাজনীতি এখন একটা অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে চলেছে। দেশের সমগ্র রাজনৈতিক চিত্রটি জনমনে হতাশা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। কে 'খাঁটি' কে 'মেকী'—সেটা বিচার করতে গিয়ে মানুষ আজ বিভ্রান্ত। 'আশার আলো' ঠিক কোন দিক থেকে আসবে, তা বুঝে ওঠা কঠিন। এ অবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চিন্তাধারা ও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পাঠকদের সঠিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেন সমদর্শী। ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে পক্ষপাতহীন জ্ঞান গণতন্ত্রকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। 'শাদাচোখের' লেখক এবং 'অমৃত' এ ব্যাপারে পাঠকদের প্রতি তাঁদের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। আশা করবো, আপনারা আপনাদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী অপরিবর্তিত রাখতে সক্ষম হবেন—আজকের এই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের দিনে এটা খুব সহজ কাজ নয়।

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-৯

'ক্রন্দসী' কলকাতা

গত ৩রা পৌষের সাপ্তাহিক 'অমৃতে'তে শ্রবণক প্রশ্ন করেছেন "কলকাতা ক্রন্দসী হবে কোন অর্থে"। ক্রন্দসী শব্দের অর্থ 'চলন্তিকা' দেখেই তিনি ক্ষান্ত হয়ে সমালোচনা শুরু করেছেন। আশুতোষ দেবের "নূতন বাঙ্গালা অভিধান" অথবা সুবল মিত্রের "আদর্শ বাঙ্গালা অভিধান" অথবা অনিলচন্দ্র ঘোষের "ব্যবহারিক শব্দকোষ" দেখলেই "ক্রন্দসী"র অন্য অর্থ পাওয়া যেত। 'চলন্তিকা' বাংলার অতি ক্ষুদ্র অভিধান, তার উপর নির্ভর করে পরচ্ছিদ্রান্বেষণ সমর্থনযোগ্য নয়। নেতিমূলক সমালোচনা বেশী করলে বোধ হয় ঐরকম হয়। নজরুল ইসলামের কবিতায় "কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে" ঐরকম প্রয়োগ আছে। কাজেই 'ক্রন্দসী'র মানে খুঁজতে বেদের সাহায্য না নিয়ে বাংলা কবিতা অনুসন্ধান করলেই ভাল হত।

সুশীলকুমার সেন,
কলকাতা—২৬।

ছোট পত্রিকা প্রসঙ্গে

'অমৃতে' ছোট পত্রিকা সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রকাশ হ'তে দেখলাম। এর সঙ্গে আমিও কিছু নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপিত করতে চাই। বাংলা দেশে এবং বাংলা দেশের বাইরে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা কম নয়। কিন্তু প্রকাশ যতই হোক না কেন, অকাল-মৃত্যু হয় অধিকাংশ পত্র-পত্রিকার। এর অন্যান্য কারণের সঙ্গে আর একটা কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত লেখকের তুলনায় নবীন লেখক লেখিকার সংখ্যা বেশী। এবং এই উৎসাহী নবীনেরাই (লেখার মান হয়ত উন্নত নয়) ছোট পত্রিকা প্রকাশের একটি বিশেষ কারণ। নবীনেরাই প্রথমে এগিয়ে আসেন এই সমস্ত ছোট পত্রিকাকে সাহায্য করতে। কিন্তু বিনিময়ে তাঁরা পান কি? পত্রিকাগুলো দাঁড়িয়ে গেলে তা প্রায় ক্ষেত্রেই একটি গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যায়। এবং প্রায়ই তখন নতুন লেখক লেখিকার লেখা এঁরা প্রকাশ করেন না। ফলে, নবীনেরা নিরুৎসাহিত হন।

আমার তাই মনে হয়, ছোট পত্রিকাগুলোকে সব সময় নবীনদের নিয়েই চালানো উচিত। এবং সম্মিলিতভাবে এই-সব নবীনদের জন্য কিছু করা যায় কিনা তার জন্যও সচেষ্ট হওয়া দরকার। এ না হলে প্রথমে যতোই জৌলুশ দেখা যায়, ছোট পত্রিকা বেশীদিন টিঁকে থাকতে পারে না।

অশ্বিনী মন্ডল
কলিকাতা-২০

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

আপনারা সাহিত্যিকের চোখে দেশের সমস্যার কথা প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করছেন। জানি না তার মধ্যে মাথা গলালে 'নোসি পার্কার' বলবেন কিনা। তা হোক তবু দুটো কথা বলবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে যতগুলো লেখা বেরিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী দাগ কেটেছে শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর লেখা। তাঁর সার কথা, 'পার্টির জন্যে দেশ নয়, দেশের জন্যে পার্টি।'

আমি সিনিক নই, বরং আশাবাদী। তবু বলব, বাস্তবে উল্টোটা হয়। পার্টি আগে, তারপর দেশ। পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র এ কথা তুললে নৈয়ায়িকেরা তর্ক জুড়ে দিত। কিন্তু দেশ ও পার্টির গোলযোগে সে তর্কের ক্ষেত্র নেই।

বিলেতেও একই ইতিহাস। রাজনৈতিক কর্ণধারদের মনোভাব—দেশ চুলোয় যাক, গদি টিকিয়ে রাখতে পারলেই হল। তাই সবার এক প্রেসক্রিপশন। নির্বাচনের আগে দিলদরিয়া হয়ে খরচ কর। প্রাচুর্যে ভরিয়ে দাও দেশ। দু'হাতে ভোট কুড়োতে পারবে। নির্বাচনের বৈতরণী পার হলে কেল্লা ফতে। পাঁচ বছরের মত মৌরুসী-পাট্টা করে বসা যাবে। তখন বসাও ক্রেডিট স্কুইজ। বেকারের সংখ্যা মাথাচাড়া দিয়ে হিমালয় ছাড়িয়ে যাক। ট্যাক্সের জ্বালায় সবাই নাস্তানাবুদ হোক, কুছ পরোয়া নেই।

কি লেবার পার্টি কি কনসারভেটিভ, সবাই সমান। ভাবছি কি বলে সুষ্ঠু পরিচয় দেব। তারা তুখোড় খেলোয়াড়। যে ডালে বসে সেই ডাল কাটতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। তারা জানে ভোটারের স্মরণশক্তি মোটেই দীর্ঘস্থায়ী নয়। নির্বাচনের আগে 'বুম' আনতে পারলেই হল। এদেশ কল-কারখানায় ঠাসা। সরকারী বদান্যতা বাড়ালে উৎপাদনের জন্যে প্রাচুর্য আনা সম্ভব। এ অ্যাফ্লুয়েন্ট সমাজ—ঘরে ঘরে টেলিভিশন, ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ, মোটর গাড়ি। আমাদের দেশে অবশ্য দুমুঠো খেয়ে বাঁচতে পারলে লোকে বর্তে যায়।

বিপ্লব কথাটা দিয়েই শুরু করি। শব্দটাকে চিরদিন শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছি। শিল্পবিপ্লব কৃষিবিপ্লব যুগান্তকারী। কলকারখানা উন্নত হয়, দেশ ফলে-ফুলে ভরে যায়। তার চেয়ে আনন্দের কি আছে? কিন্তু বিপ্লব বলতে যদি ট্রাম-বাস পোড়ান বা রেললাইন ওপড়ান বোঝায়, জানি না সে বিপ্লবে দেশ কতখানি এগোয়। কার দুঃখ তাতে ঘোচে, কার অর্থনৈতিক সুরাহা হয়? কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক নেতাকে এই সব ধ্বংসাত্মক কাজের নিন্দা করতে শুনিনি।

ধর্মঘটের কথায় আসি। অনেকের মতে তা নাকি শ্রমিকের জয়যাত্রার সোপান। এ কথা সত্যি, ধর্মঘট হল গণতান্ত্রিক অধিকার। এবং শ্রমিক সংগঠনের ফলে তাদের সুদিন এসেছে। তবু ভেবে দেখতে বলি।

বিলেতে লাল ঝান্ডা ওড়ায় না। তবে ধর্মঘটীদের জয়জয়াকার। সরকারী হোক বা বেসরকারী হোক, ধর্মঘট করতে পারলেই হাতে নাতে ফল। তার কারণও আছে এদেশে শিল্পের প্রসার এত বেশী আজ চাকরি গেলে কাল অন্য চাকরি মিলবে। এক কাজ ছেড়ে অন্য লাইনে চাকরি পেতেও অসুবিধে হয় না। তাছাড়া বেকার হয়ে থাকলে ভাতা আছে। ন্যাশনাল অ্যাসিসটেন্স আছে। খাওয়া থাকার অসুবিধে হয় না। আর শিল্পপতিরা তো বোঁচকা-বুচকি বেঁধে দেশ ছেড়ে পালাতে পারে না। সুতরাং এ দেশটা শ্রমিকের স্বর্গরাজ্য।

কিন্তু বাংলা দেশের কথা ভাবুন। একটা চাকরি খালি হলে দশজন ছুটে আসে। আজ চাকরি গেলে কবে সুদিনের মুখ দেখা যাবে বলা যায় না। যারা টাকার গদি আঁকড়ে বসে আছে, তারা ভাববে কি দরকার হাঙ্গামা হুজ্জোতের মধ্যে এত টাকা ঢেলে। ভারতে কারখানা গড়বার উপযোগী আরও অনেক শহর আছে। গন্ডগোলের গন্ধ পেলেই কলকাতার কারখানায় কুলুপ লাগাও। নতুন কারখানা খোল ভারতের শান্ত-শিষ্ট কোন শহরে।

অবশ্য দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা ভেবেই একথা বলছি। তবে দেশবাসী যদি কমিউনিজম বা বিরোধীপক্ষবিহীন প্রথায় সমস্যার সমাধানের কথা ভাবেন, সে এক ভিন্ন তর্ক। তবে বলব কমিউনিস্ট দেশে ধর্মঘট অজানা। তারা ভাল করে জানে শৃংখলা না থাকলে দেশের উন্নতি হয় না।

দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দুজনেই আমাকে দাঁতের কামড় বসিয়েছে। আরও জানি ভুরি ভুরি লোক আছেন যাঁরা বিজ্ঞানের চর্চায় কলেজ জীবন কাটিয়ে কেরানির চাকরি পেলে বর্তে যান। এ শিক্ষার অপমান, মনুষ্যত্বের অপমান। মানুষ ফলে ফ্রাসট্রেটেড হয়। তখন ধ্বংসটাই মূলমন্ত্র হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দেশের পক্ষে তা কি মঙ্গলকর। সুধীজনকে বিচার করে দেখতে বলি।

আমার ধারণা, বিপ্লব মানে ধ্বংস নয়, বিপ্লব হল নবজাগরণ। যেমন শিল্পবিপ্লব, কৃষিবিপ্লব। যাতে খাদ্য বাড়বে, কল-কারখানার সংখ্যা বাড়বে, উৎপাদন বাড়বে। তার জন্যে চাই টাকা, শান্তি, শৃংখলা। এ একদিনে হয় না। তবে সেই পথে এগোন চাই।

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য
রেডব্রিজ, এসেক্স,
ইংলন্ড।

১৯৭০ সালের প্রথম মাসের শেষ দিনের কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাতে বসে যুক্তফ্রন্টের অন্তিম মুহূর্তের কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। মনে হচ্ছে, হয়ত আজই নতুবা ফেব্রুয়ারীর ৫ তারিখের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে কিছু অঘটন ঘটবে। হয়ত মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি পদত্যাগ করবেন, নয়ত স্বরাষ্ট্র দপ্তর কেড়ে নেবেন। তবে শেষোক্ত অ্যাকশানের সম্ভাবনাই প্রবল।

এ দুই ঘটনার একটাও যদি না ঘটে বুঝবেন নিতান্ত গদীর মায়া কাটাতে পারে নি বলেই নৈতিক, আত্মিক তথা কার্যক্রমের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত যুক্তফ্রন্ট মুমূর্ষুর মত শয্যাশায়ী হয়ে তাঁদেরই প্রিয় জনগণের কাঁধে বোঝার মত পড়ে আছে। ৩০শে জানুয়ারীর মধ্যরাত্রির ঘটনা ও পর্দার আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে যে রাজনীতির খেল চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রন্ট যুক্ত হয়ে গণকল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারবে এ ধারণা পোষণ করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

জনসাধারণের বিপুল ভোটাধিক্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনে যেদিন জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট সগৌরবে লালদীঘির দপ্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছিল সেদিন যেমন ছিল এক ব্রাহ্মমুহূর্ত, আজও তেমনি এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। কারণ, যদি যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে এবং নতুনভাবে সংহত হয়ে কোন নতুন সরকার গঠিত হয় তবে যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে ভারতবর্ষে এক নয়া রাজনীতির আসর জমে উঠছিল তা আবার অতলে তলিয়ে যাবে। অন্য এক নয়া রাজনৈতিক সংহতি গড়ে উঠবে তাঁদেরই নিয়ে যাঁরা ইদানীং প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত হয়ে আসছিলেন। যবনিকার অন্তরালে তার গৌরচন্দ্রিকা সম্পূর্ণও হয়ে গেছে। শুধু মধুমিলনের শুভ মুহূর্তই বাকী।

কেন যুক্তফ্রন্টের এমন দশা হল তার নেপথ্য ঘটনা দেশবাসীর জানবার অধিকার আছে। ছেলে যতই দুষ্ট বা অকর্মণ্য হোক না কেন কোনদিনই সে পিতামাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় না। তেমনি যুক্তফ্রন্টের শত দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বাংলার জনতা যে ফ্রন্টকে ভালবাসে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ জনসাধারণের ঐকান্তিক ঔৎসুক্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। বহুদিন থেকেই ফ্রন্ট নেতাদের দৈনন্দিন কোন্দলের ফিরিস্তি ছাড়া জনতার কাছে আর কিছুই কার্যত পরিবেশন করা হয় নি। যা মঙ্গলকর্ম হয়েছে বলে দাবী করা হয় তা ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের ঐক্যমতের ফল নয়। ঘটনার আবর্তে পড়ে যা হয়ে গেছে তা থেকেই জনতার একাংশ যা কিছু লাভ করতে পেরেছে। জনতার সার্বিক কল্যাণের জন্যে কোনো কাজে এখনো বস্তুতপক্ষে ফ্রন্ট সরকার এগিয়ে আসতে পারে নি। বেঁচে থাকলেও পারবে না। কারণ ৩২-দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা সত্ত্বেও রূপায়ণের পদ্ধতিগত প্রশ্নে আদর্শগত পার্থক্য ভীষণভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আর এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ভুলে গিয়ে একাত্ম হয়ে কাজ করার মত মানসিকতার এতটুকুও এখন অবশিষ্ট নেই। পরিস্থিতি কজে কাজেই খুবই জটিল।

মুখ্যত দলীয় প্রভাব বিস্তারের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে যে শরিকী সংঘর্ষের উদ্ভব হয়েছিল তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুধু নির্যাতীত অংশীদারদের মনকে বিষিয়ে দিয়েছে এমন নয়, অধিকন্তু তার অশুভ ছায়া প্রশাসনিক যন্ত্রকেও বিকল করে দিয়েছে। বর্তমানে এমন একটি ক্ষেত্রও অবশিষ্ট নেই যেখানে শরিকদের মিলন-মন্দির গড়ে উঠতে পারে। বরঞ্চ বিরোধের ক্ষেত্র এত সম্প্রসারিত ও তীব্র হয়ে উঠেছে যে বেশীর ভাগ অংশীদারই পুরোপুরি-ভাবে যুধ্যমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কার্যত এতদিনে ভিন্ন না হওয়ার কারণ হচ্ছে গদী গেলে দলীয় শক্তি খর্ব হয়ে "প্রফুল্ল ঘোষ" হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু তার পরিমাপ করা আজ অবধি সম্ভব হয় নি।

অনেকে বলছেন, দিল্লীর সবুজ সংকেত আসে নি বলেই কোনো অঘটন এখানে ঘটতে পারছে না। তাঁদের ধারণা, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে সরকারের একটি রাজনৈতিক রূপ না নিলে এবং সর্বোপরি পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশনের সফল সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে এক মন্ত্রীর ভাষায় "এ খেলতা খেচাং" চলবে। যুক্তফ্রন্টও চলবে। অন্তত বর্তমানে যেভাবে চলছে আপাতত তার ব্যতিক্রম ঘটবে না।

কিন্তু আসল ঘটনা কি? মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপে বিক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট অনেক অংশীদার তলে তলে এই অসহনীয় অবস্থার কিভাবে অবসান করা যায় তার জন্যে একটি পরিকল্পনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, রাজনীতির মারপ্যাঁচের মাধ্যমে ক্রমেই এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে জনসাধারণ থেকে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের বিচ্ছিন্ন করা যায়, এবং সেই শুভকার্য যখনই সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করা যাবে তখনই আঘাত হানতে হবে। আর ইতিমধ্যে শিবির সংহত করার কাজ সুনিপুণ হাতে সমাধা করতে হবে। বাংলা কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলন তারই প্রথম পদক্ষেপ। বাংলা কংগ্রেস নেতারা সব সময়ই, ঘটনার গতি দেখে মনে হয়, এ আশ্বাসই পেয়ে এসেছেন যে এগিয়ে গেলে পেছনে শক্তির অভাব ঘটবে না।

গুণীরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে এই নাটকীয় পরিস্থিতির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে—একদিকে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি আর অন্যদিকে বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই ও ফরওয়ার্ড ব্লক-এর ত্রিশক্তি। অন্যান্য শরিকরা এই দ্বৈরথ যুদ্ধের পেছনে মদৎ দেন নি এমন নয়। সুবিধামত সমর্থন ও বিরোধিতা করে অবস্থাকে অসহনীয় করে তুলতে তাঁরা অনেকেই অনেকখানি সাহায্য করেছেন। কেউ কেউ এমনও বলেছেন, স্বরাষ্ট্র পুলিশ দপ্তরের সঙ্গে কমিটি জুড়ে দিয়ে খবরদারি করার প্রশ্ন আসলে একটা অছিলা মাত্র। কারণ, তাঁরা বলছেন, অন্য শিবির জানে এটা একটি অবমাননাকর শর্ত। এবং এ অবস্থা মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি কখনো মেনে নিতে পারে না। তাঁরা হয়ত মরণকে শরম অপেক্ষা শ্রেয়ঃ মনে করে বেরিয়ে যেতে পারেন। যদি তাঁরা বেরিয়ে যান তবে নিজেরা নিজেদেরই বিচ্ছিন্ন করে ফেলবেন। অতএব, অন্য কারো ঝুঁকি নেওয়ার প্রশ্ন আসবে না। কিন্তু মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দলও বুদ্ধি ধরে। শত প্ররোচনা সত্ত্বেও তাঁরা কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে মন্ত্রিসভা বা ফ্রন্ট থেকে কোনক্রমেই তাঁরা বেরিয়ে যাবেন না। ফলে, যে অঘোষিত কায়দার লড়াই চলছিল তা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব করল। ত্রিশক্তির একজন অর্থাৎ ফরওয়ার্ড ব্লক নতুন প্রস্তাব নিয়ে এসে বললেন বহুমতে যা ঠিক হবে ফ্রন্টের শরিকদের সকলকেই তা মেনে নিতে হবে। কিন্তু আবার বাধ সাধলেন মার্কসবাদী দল। তাঁরা বললেন এ সমাধানের পথও অসহ্য।

এহেন অনিশ্চয়তার মধ্যেও ফ্রন্টের আয়ু শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না। শেষে মরীয়া হয়ে বাংলা কংগ্রেস সহযোগীদের জানিয়ে দিয়েছিল আর নয়। আমরা আমাদের ইচ্ছামত পথে এগিয়ে যাব। কিন্তু শেষ চেষ্টা হিসাবেই বোধ হয় ৩০শে জানুয়ারীর মাঝ রাতে সেই থানাভিত্তিক কমিটি গঠনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই ফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ বিরোধ চরম আকার ধারণ করল। বাংলা কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট পার্টি,

ফরওয়ার্ড ব্লক, এস এস পি, পি এস, পি, গুর্খা লীগ ও বলশেভিক পার্টি একযোগে বলল, এখনই সেই থানাভিত্তিক কমিটি গঠিত হওয়া দরকার। তীব্র বিরোধিতা এল "মার্কসবাদীদের" তরফ থেকে। তাঁরা বললেন, এ জিনিস কখনো করতে দেওয়া হবে না। তাঁদের পক্ষে আর এস পি, লোক সেবক সঙ্ঘ, ওয়ার্কার্স পার্টি, আর সি পি আই ও মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক দাঁড়িয়ে পড়লেন। তবে এ সমর্থনের মধ্যে একটি 'কিন্তু' আছে। সেটা হচ্ছে, আর এস, পি ও লোকসেবক সঙ্ঘ দলের প্রতিনিধিরা বললেন "এ অবস্থায় এখনি ঐ ধরনের কমিটি গঠন করা উচিত হবে না।" কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ভূমিকা হচ্ছে এস ইউ সি দলের। আগে একটি সারকুলার চিঠি দিয়ে তাঁরা মন্তব্য করেছেন যে, যে-কোন দল থেকে ডিপার্টমেণ্ট নিয়ে নেওয়ার পক্ষে তাঁদের দিক থেকে কোনো বাধা নেই। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল সেই এস ইউ সি একেবারে তৃতীয়পক্ষ সেজে গেল। অথচ ২৯শে জানুয়ারীতেও ত্রিশক্তির গোপন বৈঠকে তাঁরা হাজির ছিলেন, এবং যতদূর জানা যায়, এস এস পি প্রতিনিধিকে সেই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয় নি এস ইউ সির বিরোধিতার ফলেই। তাঁরা নাকি বলেছিলেন, এস এস পি আসলে সমস্ত গোপন খবর মার্কসবাদীদের দপ্তরে পৌঁছে দেবে। অর্থাৎ এস এস পি এই শক্তিজোটে থাকবেন কিনা সে সম্পর্কে তাঁরা সন্দেহ পোষণ করছিলেন। কিন্তু সেই বৈঠকে কি হয়েছিল? বাংলা কংগ্রেস প্রতিনিধি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, আর এক মুহূর্তও নয়। আপনারা আসবেন ত আসুন, নাহয় আমরা চললুম। আলোচনায় উপস্থিত বাংলা কংগ্রেস প্রতিনিধি নাকি বলেছিলেন, ৩০শে জানুয়ারীর ফ্রণ্টের বৈঠকে গিয়ে আর কোন লাভ হবে না। এখন নিজের পথ দেখাই ভাল। কিন্তু অন্যরা নাকি বলেছেন, একাকী কিছু করে লাভ হবে না। তাতে রাজনৈতিক হারিকিরিই করা হবে মাত্র। বরঞ্চ ফ্রণ্টের সভায় আসুন, সেখানে একটা ফয়সালা করে দেওয়া হবে। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতেই বাংলা কংগ্রেস ফ্রণ্ট মিটিং-এ এসেছিল। কিন্তু ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে, পরিস্থিতি আর এক ধাপ এগিয়েছে সন্দেহ নেই, তবে "একশান" করার জন্যে সাহস জোগাবার শক্তি অন্তত কম্যুনিস্ট পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের আপাতত নেই। একজন বাংলা কংগ্রেস সদস্য নাকি সখেদে বলেছেন, ঐ দুই দল আমাদের গাছে তুলে দিয়ে এখন মই কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

থানা-কমিটি গঠনের প্রস্তাবে যে ভোটাভুটি হল, সেখানে দল হিসাবে ত্রিশক্তি জয়ী হলেও বিধানসভার সংখ্যার বিচারে তাঁরা মাইনরিটি। কাজেই মিনিফ্রণ্ট হোক আর যাই হোক, ফ্রণ্টের ২১৮ জন সদস্যের মধ্যে বেশীর ভাগের সমর্থন না পেলে মিনিফ্রণ্ট করে আঙুল পোড়াতে অনেকেই রাজী নন। দুই কংগ্রেস—আদি ও নব—যদি নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে তবে সেক্ষেত্রে "মিনি-ফ্রণ্ট"ওয়ালাদের দেখাতে হবে যে ফ্রণ্টের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আছে। অতএব, তাঁরা যা করছেন তা ঠিক।

এই "সংখ্যাগরিষ্ঠের" মারপ্যাঁচে যাতে ত্রিশক্তি শো-ডাউন না করতে পারেন তার জন্য মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ৩০শে জানুয়ারীর রাত্রিতে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাঁদের বাহিনী সজ্জিত রেখেছিলেন। আর তাঁদের অন্যতম নেতা শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার অগ্নিস্রাবী ভাষণে সৈন্য সামন্তকে যে কোন অবস্থায় সম্মুখীন হওয়ার জন্য নির্দেশনামা দিচ্ছিলেন। ফ্রণ্টের সভায় আলোচনা পরিকল্পিত পথে ভাল-ভাবেই অগ্রসর হচ্ছিল। এবং যতদূর খবর পাওয়া গিয়েছিল, এক সময় উপপ্রধানমন্ত্রী পুলিশ মারফৎ হরেকৃষ্ণ বাবুকে খবরও পাঠিয়েছিলেন, এখন আর দরকার নেই, সভা ভঙ্গ করে চলে যান। কিন্তু হঠাৎ সভা ভাঙার মতো নাটকীয় অবস্থা জমে

ওঠার মূলে ছিল একটি প্রস্তাব। সেই প্রস্তাব হচ্ছে ২৫শে জানুয়ারী ফ্রন্টের সভায় শরিকী কোঁদল নিরসনের জন্যে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তা অমান্য করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বামপন্থী কম্যুনিস্ট-দের ছাত্র সংস্থাকে নিন্দা করা। বামপন্থী কম্যুনিস্টরা নাকি সাধারণভাবে নিন্দা প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু যখনি তাঁদের ছাত্র-সংস্থার নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তখনই তাঁরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছেন। বলেছেন, ঐ সভার কোন সিদ্ধান্তের সঙ্গেই তাঁদের যোগাযোগ রইল না। বাংলা কংগ্রেসের সুশীল ধাড়াও বেরিয়ে এসে বলেছেন, তাঁরাও কোন সিদ্ধান্ত মানেন না। নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করবার স্বাধীনতা তাদের রইল।

শ্রীধাড়ার ক্রুদ্ধ হওয়ার সঙ্গত কারণ বর্তমান। কারণ শ্রীধাড়াকে শো-ডাউন হয়ে যাবে এ আশ্বাস দিয়েই সভায় আসতে রাজী করানো হয়েছিল। কিন্তু শো-ডাউন ত দূরের কথা তিনটি সমস্যাকেই সমাধানের কোন বাস্তব রূপ না দিয়ে চতুরতার সঙ্গে মার্কসবাদী দল আরও সময় আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল। আর যাঁদের নিয়ে বাংলা কংগ্রেস এগিয়ে যাচ্ছিল, তাঁরা অনেকেই হঠাৎ বিবেকবান হয়ে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করলেন। তবে হিংসার নিন্দায় যিনি বা যাঁরা প্রস্তাব রচনা করছিলেন তাঁদের মুন্সীয়ানা আছে বলতে হবে বই কি? ঐ প্রস্তাবের জন্যেই বাংলা কংগ্রেস পুরোপুরি একাকীত্ববোধ করতে পারে নি। যাই হোক, সহগামীদের মনোভাব তাঁদের কাছে যে একটা বিরাট প্রশ্ন নিয়ে দেখা দিয়েছে এটা সন্দেহাতীত।

এমতাবস্থায় বাংলা কংগ্রেস কি করতে পারে? প্রথমত মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ইস্তফা দিয়ে সংকট সৃষ্টি। আর দ্বিতীয়ত শ্রীজ্যোতি বসুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর কেড়ে নিয়ে আরও গভীর সঙ্কটের আবর্তে ফ্রন্ট সরকারকে ঠেলে দেওয়া। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ইস্তফা দিয়ে যদি শ্রীমুখার্জি সরে যান, তবে অনেকের মতে বাংলা কংগ্রেস রাজনৈতিক হারিকিরিই করবে। কারণ সে অবস্থায় তার বর্তমান সহগামীরাও মার্কসবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গঠন করে ফেলতে পারেন। রাজনীতিতে সবই সম্ভব। শ্রীমুখার্জির অনেক ভক্ত তাঁকে এ সম্ভাবনা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ওয়াকিবহাল করেছেন বলে জানা গেছে। তাই শ্রীমুখার্জি, রাজনৈতিক মহলের ধারণা, দ্বিতীয় পন্থাই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করছেন। কারণ স্বরাষ্ট্র দপ্তর কেড়ে নিলে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির মন্ত্রিসভা ত্যাগ করে যাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকবে না। এবং সে অবস্থায় কটি দল মার্কসবাদীদের অনুগামী হবে সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর অনুগামী হলেও একই শিবিরে না থেকে নিরপেক্ষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই। ইতিমধ্যেই সে সম্পর্কে আভাষও পাওয়া গেছে। আর এস পি ও লোক সেবক সঙ্ঘ বলেই ফেলেছেন, বর্তমান রূপ না থাকলে সেই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে তাঁরা কোন শিবিরে যোগ দেবেন না। কার্যক্রম দেখে সমর্থন জানাবেন বা প্রত্যাহার করবেন। আর বাংলা কংগ্রেসের সহযাত্রী বলে যাঁরা পরিচিত তাঁরা মন্ত্রিসভা ছেড়ে যাবেন এমন আশংকা কম। দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয়। তাঁরা বাংলা কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে সাহায্য করে নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ মার্কসবাদীদের উপর সমর্পণ করবেন না, বা অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলবেন না। আর ফরওয়ার্ড ব্লক তখন চাপে পড়েই এদিকে থাকবে। যতই ফ্রন্ট রক্ষার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করুন না কেন কর্মীরা ইতিমধ্যেই চঞ্চল হয়ে পড়েছেন। কারণ ফ্রন্টের 'স্বাদ' তাঁরাই পাচ্ছেন বেশী, নেতারা নয়।

শ্রীমুখার্জিকে এই দ্বিতীয় পন্থা গ্রহণে বিরত রাখবার জন্যেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আর্জি পেশ করতে শ্রীসুন্দরায়া ও শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় দিল্লির দরবারে হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের চিঠিতেও যে কথা তাঁরা বলেছেন তাতেও এই বক্তব্যই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে তাঁরা যখন শ্রীমতী গান্ধীকে গদীতে আসীন থাকতে সাহায্য করতে প্রস্তুত তখন শ্রীমতী গান্ধীই বা বিনিময়ে পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের গদীতে থাকতে সাহায্য করবেন না। ইন্দিরাজীর কংগ্রেসের বিধানসভা সদস্যদের সমর্থন না পেলে শ্রীঅজয় মুখার্জি কোন কার্যক্রমই গ্রহণ করতে পারবেন না। কাজেই তাঁদের পক্ষে এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে ক্ষমতা থেকে একেবারে সরে যেতে হবে। নয়তো কেঁচে গণ্ডূষ করেই কালাতিপাত করতে হবে। ইন্দিরাজী কি আশ্বাস দিয়েছেন জানি না। তবে এঁরা তো বলেছেন, আসলে ইন্দিরাজীকে প্রগতিশীল বলে মেনে নিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত। যদি ইন্দিরাজী কাউকে সাহায্য করতে এগিয়ে যান তখনই প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি যুক্তফ্রন্ট ভাঙার চক্রান্ত করছেন বলে মার্কসবাদীরা চীৎকার করে উঠবেন? ওদিকে শ্রীঅচ্যুত মেনন বলেছেন, যদি ইন্দিরাজীকেই আপনারা সমর্থন করতে পারেন তবে আমাকে করতে দোষ কি? আমি ত একজন স্বীকৃত বামপন্থী, এবং তদুপরি পরীক্ষিত কম্যুনিস্ট।

কিন্তু দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদেরও বক্তব্য বিচিত্র! ইন্দিরাজীর সঙ্গে কোয়ালিশন করতে রাজী আছেন, অথচ পশ্চিমবঙ্গে তাঁর দলের লোকদের সাহায্য নিলেই নাকি জনসাধারণ আর আস্থা রাখবে না। জনসাধারণকে এত নির্বোধ ভাববার কি কারণ সেটাই বোঝা দায় হয়ে উঠেছে।

এইসব দেখেশুনে প্রশ্ন হতে পারে, এ হেন জঘন্য পরিবেশের সৃষ্টি করে লাভ কি? যদি মনে করেন সি পি এম-এর সঙ্গে একমুহূর্তেও চলা যায় না তবে এখনি চূড়ান্ত ফয়সালা করবার জন্য ময়দানে নামুন। নয়তো যেভাবে চলছে এভাবে মারপিট করুন কাজও চালিয়ে যান। ত্রাহি ত্রাহি রব তুলে জনসাধারণকে আর প্রতিনিয়ত বিরত করবেন না। এতে কোনো কোনো পার্টির হয়তো মঙ্গল হতে পারে, কিন্তু অগণিত মানুষের একটুকুও কল্যাণ হচ্ছে না। জনমঙ্গলের এ অক্ষমতা ইতিহাস ক্ষমা করবে কি!

—সমদর্শী

রাজনীতির অনিশ্চিত গতির মধ্য দিয়ে আমাদের সাধারণতন্ত্রের বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে সন্ত ফতে সিং ১লা ফেব্রুয়ারী আত্মাহুতির সংকল্প নিয়ে তাঁর বহু-বিঘোষিত অনশন আরম্ভ করেছেন এবং পাঞ্জাব হরিয়ানা বিরোধের সম্ভবত চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেন্দ্র তাঁদের চণ্ডীগড় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন, যদিও তা উভয়পক্ষের মনোজয় করতে পারবে কিনা তা এখনো অজ্ঞাত। পশ্চিমবঙ্গবাসীরা সাম্প্রতিককালে রাজনীতিকদের দ্বায়ুযুদ্ধে অতিমাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলেও, সি-পি-এম পোলিটব্যুরোর বৈঠকের প্রাক-মুহূর্তে সুন্দরায়া ও জ্যোতি বসুর আকস্মিক দিল্লী উপস্থিতি ও ইন্দিরা গান্ধী সমেত কেন্দ্রীয় কর্তাব্যক্তিদের সংগে আলোচনায় বিস্মিত না হয়ে পারেনি, এবং সংবাদপত্রের ভাষ্য ও আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনার আশ্রয় নিয়েছে মাত্র। উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজনৈতিক দলগুলোর দাবী ও পাল্টা দাবী এখনো সোচ্চার, যদিও ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপেই অনিশ্চিতের গর্ভে।

চণ্ডীগড় পাঞ্জাব পাবে

সন্তর আত্মাহুতির আলটিমেটাম সামনে রেখে কেন্দ্র শেষ পর্যন্ত চণ্ডীগড় সম্পর্কে তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাঞ্জাব চণ্ডীগড় পাবে বটে কিন্তু এর জন্য তাদের মূল্যও কম দিতে হবে না। হরিয়ানা চণ্ডীগড় অর্জনে অসমর্থ হলেও তার বদলে পাঞ্জাবের তুলনায় তুলাচাষ সমৃদ্ধ ফাজিলকা তহশীলের প্রায় একশ চৌদ্দটি গ্রাম পাবে, যার অধিবাসীরা মূলত হিন্দীভাষী। এছাড়া, হরিয়ানাকে দেওয়া হবে মোট কুড়ি কোটি টাকা নতুন রাজধানী গড়ে তোলার জন্য। হরিয়ানাকে যে টাকাটা দেওয়া হবে তর ১০ কোটি টাকা অনুদান এবং বাকী টাকা ঋণ। চণ্ডীগড় এখন থেকে পাঁচ বছরকাল কেন্দ্রশাসিত এলাকা রূপে থাকবে এবং এই সময়কালে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা—উভয় রাজ্যেরই রাজধানী চণ্ডীগড়ে থাকবে। অবশ্য হরিয়ানা যদি ইচ্ছা করে তাহলে এর আগেই তাদের রাজধানী অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে পারবে। ফাজিলকার যে গ্রামগুলো হরিয়ানাকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তা অবশ্য এখনই দেওয়া হবে না। তার কারণ, হরিয়ানার ওপরও পাঞ্জাবের দাবী আছে ৪৫০টি গ্রামের। কেন্দ্র কর্তৃক নিয়োজিত একটি কমিশন পাঞ্জাব ও হরিয়ানার দাবী ও পাল্টা দাবী সমগ্রভাবে বিবেচনা করার পরই প্রাপ্য গ্রামগুলো হরিয়ানাকে হস্তান্তরিত করা হবে।

কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত অবশ্য উভয়-পক্ষকে সন্তুষ্ট এবং সন্তকে তাঁর বিঘোষিত সংকল্প থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে কিনা তা এখনো স্পষ্ট নয়।

তবু কেন্দ্রের দুর্বল নীতিই যে ভারতীয় রাজ্যগুলির রাজনীতিকে এই বিভেদপন্থী আবর্তের সম্মুখীন করেছে সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। রামুলুর আত্মদান মাদ্রাজ থেকে অন্ধ্রকে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু অন্ধ্রের সমস্যার যে সমাধান হয়নি তেলেঙ্গানা-বাসীদের বর্তমান আন্দোলনই তার প্রমাণ। ভারত-পাকিস্থান বিভাগের পরও পাঞ্জাব একাধিকবার বিভক্ত হয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষীদের আকাংখা মেটেনি। পূর্বাঞ্চলেও নাগাল্যাণ্ড এবং মেঘালয় মঞ্জুরের পর কেন্দ্র এখন মণিপুরের দাবী নিয়ে বিব্রত। এবং একথা সুনিশ্চিত যে কেন্দ্র ক্রমাগত এই দাবীর কাছে যতো আত্ম-সমর্পণ করে চলবে ততোই রাজ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষীরা নিজেদের আন্দোলনের পথ আরো প্রশস্ত মনে করবে। সেই জন্য শুধু চণ্ডীগড়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নয়, এই প্রসংগে কেন্দ্রের এমন একটা সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট নীতি ও ব্যবস্থা ঘোষিত হওয়া উচিত ছিল, যাতে বিভিন্ন রাজ্যে সংখ্যালঘুদের পূর্ণ অধিকার রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই বিভেদপন্থী রাজনীতির সমাধি রচনা সম্ভব হয়।

ফ্রন্ট বনাম ৩২ দফা

সাধারণতন্ত্র দিবসের পূর্ব রাত্রে যুক্ত-ফ্রন্টের বৈঠকে তিনটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বটে, কিন্তু কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নারকেলডাঙ্গা ও সর্বশেষ পশ্চিম দিনাজপুরের ব্যাপক হাঙ্গামা ও নরহত্যা প্রমাণ করেছে যে ফ্রন্টের শরিকগণ এখনো সম্মুখ সমরে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের অভিপ্রায় রাখেন না। রাজ্যপাল ধাওয়ান তাঁর সাধারণতন্ত্র দিবসের বেতার ভাষণেও ফ্রন্টের এই আভ্যন্তরীণ সংঘাতে নৈরাশ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, কোয়ালিশন সরকারের শরিকদলগুলোর মধ্যে যদি আদর্শগত এতো পার্থক্য থাকে তাহলে ৩২ দফা কার্যসূচীকে বাস্তবে রূপদান কিভাবে সম্ভব?

কিন্তু ফ্রন্টের অস্তিত্বই যে ক্ষেত্রে প্রতিদিন বিপন্ন সেখানে ৩২ দফা কর্মসূচীর প্রসঙ্গ অর্থহীন। সুশীল ধাড়া দিল্লীতে কথা-প্রসঙ্গে বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গেও কেরলের মতো সি-পি-এম ও কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে মিনিফ্রন্ট গঠন সম্ভব। জ্যোতিবাবু বলেছেন যে যুক্তফ্রন্ট থাকে কিনা তা তিনি বলতে পারেন না। এতো অনিশ্চয়তার মধ্যে কোনো সরকার যদি বা দৈবপ্রভাবে আত্মরক্ষা করতে পারে তবু তার দ্বারা যে কোন কর্মসূচী রূপান্তর সম্ভব একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। ফ্রন্টভুক্ত দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ এখনো চলছে, কোন্ কর্মসূচীকে রূপদানের জন্য তা অবশ্য শুধু তাঁরাই বলতে পারেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ রাজ্যের সর্বত্র যে বিচিত্র দৃশ্য দেখছে তার জন্যই তারা ফ্রন্টকে শাসন-ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল কিনা, সে বিষয়ে আজ প্রশ্ন উঠতে পারে। ফ্রন্ট-শাসনে আসার পর পশ্চিমবঙ্গে আবার নতুন করে জমি ও মিউনিসিপ্যাল এলাকায় রাস্তার দুপাশ দখলের অভিযান শুরু হয়েছে, কলকাতা ও শহরতলীর বহু অঞ্চলে দুর্বৃত্তদের প্রকোপে অধিবাসীরা সন্ত্রস্ত, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, নরহত্যা নিত্যকার ব্যাপার। অজয় মুখার্জি বলছেন, প্রতিদিন তাঁর কাছে মফস্বল থেকে দশ-বারোখানা করে চিঠি আসে রাজনৈতিক দলগুলোর হাত থেকে রক্ষার জন্য তাঁর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে, এবং এইসব চিঠির শতকরা ৯৮ ভাগেই অভিযোগ সি-পি-এম-এর বিরুদ্ধে।

রাজ্যের রাজনীতির এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে সুন্দরায়া ও জ্যোতি বসুর
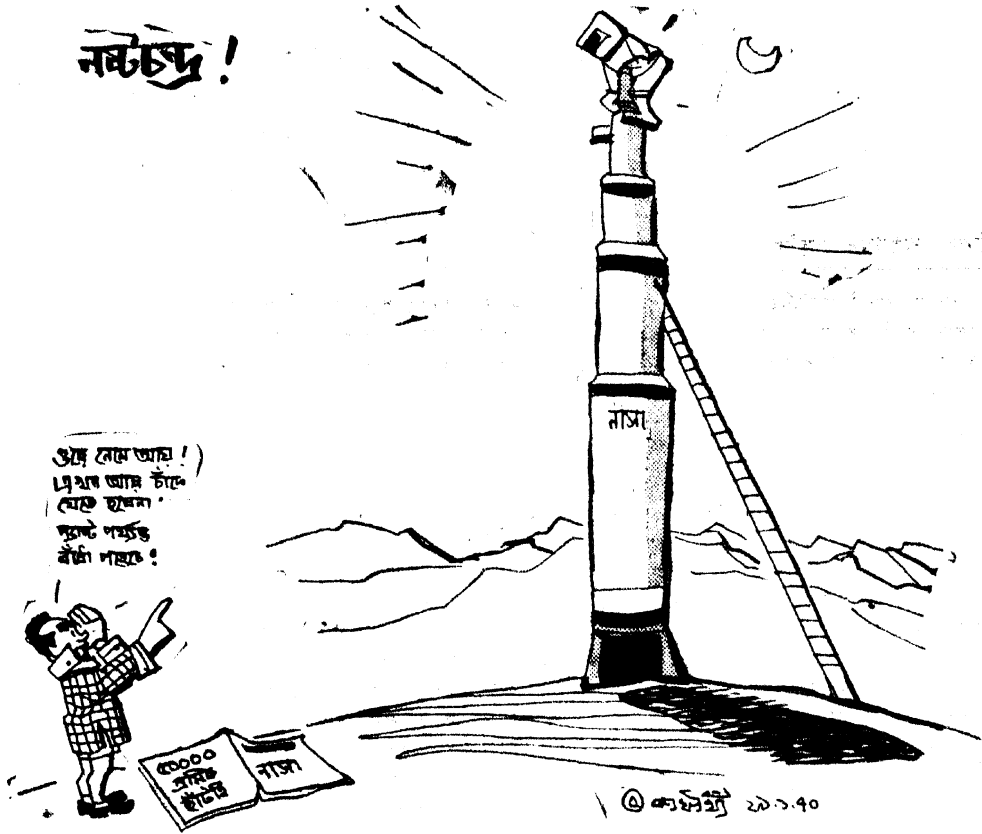
আকস্মিক দিল্লী-যাত্রা এবং ইন্দিরা গান্ধী, চাবন, জগজীবন রাম প্রভৃতির সঙ্গে দ্রুত আলোচনা করে ফিরে আসা পর্যবেক্ষক মহলে প্রচুর জল্পনা-কল্পনা ও অনুমানের খোরাক জুগিয়েছে।

জ্যোতিবাবু অবশ্য সাংবাদিকদের বলেছেন যে, রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনার জন্যই তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, শাসনগত কোনো সমস্যার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তবু পর্যবেক্ষকদের ধারণা যে পশ্চিমবঙ্গের ফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শাসক-গোষ্ঠীর প্রকৃত অভিপ্রায় কি, কলকাতায় সি-পি-এম পোলিটব্যুরোর আসন্ন অধিবেশনের প্রাক্কালে সেই সম্পর্কে আভাস সংগ্রহই ছিলো তাঁদের দিল্লী যাত্রার আসল উদ্দেশ্য। সুশীল ধাড়ার দিল্লী সফর এবং মিনি-ফ্রন্টের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে মন্তব্যের ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে এইরকম একটা বোঝা-পড়াও বোধহয় প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। মার্কসবাদী নেতারা নাকি এই আশ্বাস পেয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতাদের মনে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করার অভিসন্ধি নেই। অপরপক্ষে, পার্লা-মেন্টে সি-পি-এম কি শর্তে ইন্দিরা সরকারকে সমর্থন করতে পারে তাও নাকি তাঁরা জানিয়ে দিয়ে এসেছেন। পোলিট-ব্যুরোর অধিবেশনের প্রাক্কালে বোধহয় উভয় প্রশ্নেরই মীমাংসা প্রয়োজন ছিল।

বিহারে আসর সরগরম

বিহারে রাজ্যপাল নিত্যানন্দ কানুনগো অসুস্থ বলে বিধানসভায় দুই কংগ্রেস দলের নেতা হরিহর সিং বা দারোগা রায় কাউকেই সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকতে পারেননি। ইতি-মধ্যে উভয় পক্ষেরই প্রস্তুতি চলছে। বিধান-সভায় সিণ্ডিকেটপন্থী কংগ্রেস দল, জন-সংঘ, স্বতন্ত্র ও এস এস পি-র মধ্যে সম্প্রতি এক সমঝোতা হয়েছে এবং এদের নবগঠিত সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতৃপদে নির্বাচিত করা হয়েছে এস এস পি-র রামানন্দ তেওয়ারীকে। অবশ্য দারোগা রায়ও পিছিয়ে নেই। তিনি বলেছেন যে, বিধানসভায় তাঁর কংগ্রেস দলে সমর্থক বেড়ে এখন ৭৭-এ দাঁড়িয়েছে। হাল ঝাড়খণ্ড দলের সমর্থনও তাঁরা পেয়েছেন।

আরব-ইস্রায়েল

ফ্রান্সের শারবুর্গ বন্দর থেকে পাঁচ-খানা গানবোট ইস্রায়েলে সরে পড়ার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যে আরব-ইস্রায়েল বিরোধে নতুন করে যে তীব্রতা দেখা দিয়েছিল তা এখন সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ নিয়েছে এবং ইস্রায়েলী বিমানগুলো গত ৭ই জানুয়ারী থেকে এপর্যন্ত সাতবার মিশরী এলাকায় বোমাবর্ষণ করে এসেছে। এবং এই নতুন সংঘাতের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট নিকসন ঘোষণা করেছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে ইস্রায়েল-বিরোধী শক্তির অস্ত্র সামর্থ্য বৃদ্ধি পেলে আমেরিকাও ইস্রায়েলকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে।

নিকসনের এই ঘোষণার পৃষ্ঠে রয়েছে ফ্রান্স কর্তৃক লিবিয়াকে ১০০খানা উন্নত ধরনের বিমান বিক্রয়ের সংবাদ, যা, প্রেসিডেন্টের ধারণা সুনিশ্চিতভাবেই ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হবে।

নিকসন অবশ্য তাঁর ঘোষণায় মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্ররপ্তানীর ব্যাপারে সংযম অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষের অবকাশ-সৃষ্টির জন্য আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার উদ্বৃত্ত অস্ত্রশিল্প যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে এশিয়া ও আফ্রিকার অস্ত্রের বাজারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ থাকে তাহলে আপোষের সুযোগ কোথায়?

স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ

মহাত্মা গান্ধী শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি তাঁরই স্বদেশবাসী এক সাম্প্রদায়িকতাবাদীর হাতে। সেই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য প্রতি বৎসর ৩০ জানুয়ারি শহীদ দিবস পালিত হয় সারা দেশে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা আত্মদান করেছেন তাঁদের প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতার ঋণ কখনো শোধ হবে না। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে দিল্লি ও করাচীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে গিয়েছিল। তারা এমনিতে যায়নি কিংবা সদিচ্ছাবশত তারা এ দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। ভারতবর্ষের গণ-আন্দোলনের তীব্রতা দেখে ভীত হয়েই সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তি এই উপমহাদেশ থেকে তাদের সাম্রাজ্য গুটিয়ে প্রস্থান করেছিল।

প্রত্যেক স্বাধীন দেশেরই অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল তার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা। ইতিহাস থেকেই আমরা শিক্ষালাভ করি এবং ইতিহাসই আমাদের দেয় আগামী দিনের নির্দেশ। বৃটিশ শাসকরা আড়াই শো বছরের শাসনে স্বাধীনতা সংগ্রামকে দমন করবার জন্য কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বহুবার। বাংলাদেশেই এই আন্দোলন হয়ে ওঠে প্রবল। তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। এই আন্দোলনের মুখ্যধারায় ছিলেন বাংলার বিপ্লবীরা যাঁরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মারফত সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। স্বদেশী যুগের এই সংগ্রামে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা আমাদের নমস্য। তাঁদের ব্যর্থতার কথা আমরা জানি। কিন্তু তাঁদের আত্মদানের আকৃতি এবং দেশকে পরশাসন থেকে মুক্ত করার জন্য যে-আগ্রহ তার কোনো তুলনা নেই। গান্ধীজী এসে কংগ্রেসকে দিলেন গণ-সংগঠনের রূপ। আলোচনার বৈঠক থেকে কংগ্রেসকে রূপান্তরিত করলেন একটি সংগ্রামী গণ-সংগঠনে।

গান্ধীজী অহিংস পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। গণ-সত্যাগ্রহ, অসহযোগ, কর-বর্জন আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি ভারতের গণশক্তিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর এই দান অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে যাঁরা দেশকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন তাঁদের দানও অসামান্য। এমন কি গান্ধীজীর ডাকে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে যে ভারত ছাড় আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে তার প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে তিনি না থাকলেও, সেই আন্দোলন অহিংস ছিল না। বলা প্রয়োজন যে, সেই আন্দোলনের ব্যাপকতা ভারতে বৃটিশ শক্তির ভিত্তি ধরে টান দিয়েছিল। সুতরাং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই দুই ধারার আন্দোলনেরই যথাযোগ্য স্বীকৃতি থাকা উচিত।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে আরেকটি স্মরণীয় নাম সুভাষচন্দ্র বসু, যিনি পরবর্তীকালে নেতাজী নামে দেশে ও বিদেশে নন্দিত। সুভাষচন্দ্রের কর্মপন্থার সংগে গান্ধী-নেতৃত্বের অনুগামী কংগ্রেসের মিল ছিল না। তার ফলে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল গড়েছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লক। দেশের মুক্তি কামনায় অধীর হয়ে সুভাষচন্দ্র শেষ পর্যন্ত দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বাইরে। তিনি গড়েছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। সম্প্রতি কলকাতায় বিপ্লবীদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শনীতে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর পার্টির নবমূল্যায়ন সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সুভাষচন্দ্রকে জাপানের চর বলে তাঁরা আগে যে অভিযোগ করতেন তা সম্পূর্ণ ভুল। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদান অসামান্য। জাপানীদের সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের কোনো মোহ ছিল না। তিনি তাদের বৃটিশ-বিরোধিতাকেই নিজের দেশের স্বাধীনতা লাভের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতকে মুক্ত করতে পারেনি সত্য কিন্তু তার প্রেরণায় ভারতে ঘটেছিল নৌ বিদ্রোহ এবং সর্বত্র এক অত্যাশ্চর্য গণ-জাগরণ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারত ত্যাগের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ। একটি নিরস্ত্র জাতিকে সামরিক অভ্যুত্থানের দীক্ষা দিয়েছিলেন তিনিই। তিনি মহত্তম দেশপ্রেমিকদের একজন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কমিউনিস্টদের এই পুনর্মূল্যায়ন ও ত্রুটি স্বীকার দেশের রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের একটি বিরোধ ও বিভ্রান্তি দূর করতে সাহায্য করবে। এখন প্রয়োজন তথ্যানুগ দৃষ্টিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা। দুঃখের বিষয় এখনও যথাযথভাবে সেই ইতিহাস রচিত হয়নি। বিপ্লববাদ এবং গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন এবং সুভাষচন্দ্রের অবদান নিয়ে ঐতিহাসিক বিচারের প্রয়োজন আজ সর্বাধিক। এতদিন যে ইতিহাস রচিত হয়েছে তার মধ্যে সকল ধারার প্রতি সমদৃষ্টি দেখানো হয়নি বলে অভিযোগ শোনা যায়। এখন সরকারের উচিত গোটা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখানো। আজকের যুগের তরুণ যাঁরা তাঁরা অন্যান্য দেশের বিপ্লবের ইতিহাস যত মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন, আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসও তেমনিভাবে তাঁদের পড়া দরকার। নিজের দেশের প্রতি ভালবাসা এবং নিজেদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি গৌরব বোধই আমাদের নতুন কর্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। শহীদ দিবসে তাই হবে সত্যিকারের দেশাত্মবোধের উপাসনা। তা হলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে, শত শহীদের আত্মদান ব্যর্থ হয়নি।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

একালের মধ্যেই তো সবাই বাস করি। পেছনে সেকাল, সামনে আগামীকাল। পেছনেও তাকাই, সামনেও নজর রাখি। এই তিন মিলেই একাল। নইলে বোধহয় তাকে ঠিক চেনা যায় না। বুঝতে পারি সবাই খুব একটা অস্থিরতার মধ্য দিয়ে পার হচ্ছে সময়। তার অসুখ যেমন আছে, নিত্যনতুন চমকেরও অন্ত নেই। খুব একটা বিস্তারিত সময়ের মাঝেই ধরা আছে একালের সময় ও সমাজ। তার মস্ত কারণ, আমার মনে হয় এই যে, মানুষের কীর্তি ও অকীর্তির সব খবর নিমিষে জানা হয়ে যায়। খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয় না। একে আধুনিক প্রয়োগ-বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়, তথ্যের বিস্ফোরণ বা ইনফরমেশন এক্সপ্লোশান। তার ফলে আমাদের কাছে শয়তান ও সন্তের খবর পৌঁছুতে বিলম্ব হয় না। একালের এই ব্যাপক বিস্তৃতি মনে রেখেই আজকের সমাজকে বিচার করতে হবে।

যাই বলুক না সমালোচকরা, মানব-সভ্যতার এ হল শ্রেষ্ঠ সময়, এবং দুঃসময়ও। এই স্ব-বিরোধী কালে বাস করে কোনো লেখকের পক্ষেই বলা সম্ভব নয়, সমাজের ছন্নছাড়া বাউন্ডুলেপনাটুকু বাদ দিয়ে শুধু তার ক্ষীরটুকু আমি গ্রহণ করব। তার ভাল ও মন্দ, সু এবং কু, আবাহন ও বিসর্জন সবটাই নিতে হচ্ছে আমাদের। এ থেকে কোনো মুক্তি নেই। এ যেন সেই প্রাকৃত উক্তির মতো, পালাবার পথ নাই, যম আছে পিছে।

তাই তো দেখি হিরোসিমা-হন্তারক মার্কিন পাইলটের স্থান হল পাগলা গারদে এবং চন্দ্র জয় করে এসেও মাইক কলিনসকে ভিয়েতনামে গণহত্যার সাফাই গাইবার জন্য চাকরী নিতে হয় নিকসন অ্যাডমিনিস্ট্রে-শনের প্রচার দপ্তরে। এটম বোমাই ফেলো আর চাঁদে গিয়েই লাফালাফি করো বাপু, ছাড়াছাড়ি নেই। আমাদের থাকতে হবে এই প্রাচীনা, প্রবীণা, জরতী বা যুবতী পৃথিবীতেই। ভালবাসা ও ঘৃণার পবিত্রতা নিয়ে।

আমরা এই সনাতন ভারতবর্ষের প্রায়-নিশ্চল সমাজে বাস করেও মানুষের এই কীর্তিকাণ্ডের খবর ও তাবৎ নতুন চিন্তার খবর নিমেষে পেয়ে যাই। অস্থিরতার এ-ও একটা কারণ। কিন্তু আমাদের অসুখ এই আধুনিকতার জন্যে নয়। প্রত্যাশার বঞ্চনা থেকেই এর উৎপত্তি বলে মনে করি। এখনো আমাদের সমাজের আদি সমস্যা, ডাল-ভাতের সমস্যা মেটেনি। স্বচ্ছলতা কাকে বলে

আমাদের দেশে শতকরা নব্বুইজন তা জানেই না। কিন্তু তাদের কাছেও খবর পৌঁছুতে শুরু করেছে। সবটাই বিধিলিপি নয়, এই দুর্ভাগ্যের জন্যে মানুষই দায়ী, এ-ধরনের সংবাদ বিস্তর ছড়াচ্ছে। খবরের কাগজে, রেডিয়োতে, জনসভায়, দেয়ালপত্রে, মুখে মুখে সর্বত্র। তথ্যের এই বিস্ফোরণই দুনিয়ার তাবৎ প্রাচীন ও অনড় সমাজে কম্পন তুলে দিয়েছে। আমাদের দেশের সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। এই অসুখ সারাবার জন্যেই অস্থিরতা।

সুতরাং হোয়াট ইজ টু বি ডান? কী করতে হবে, এই হল প্রশ্ন। লেখকরা কী শুধু নিজেদের কাঁদুনি গাইবেন। বলবেন, নেতি নেতি। না না, এ নয়, অন্য কিছু। বলবেন, এ-সমাজ তো চাইনি। আমার মনে হয় তা বলবার অধিকার নেই লেখকদের। যদি কেউ পাল্টা প্রশ্ন করেন, তুমি কী করেছো আমাদের জন্য। আমরা অবুঝ ছিলুম, আমরা অন্ধ ছিলুম। তুমি আমাদের বোধশক্তি জাগাওনি কেন? আমাদের চোখ ফোটাওনি কেন? কী উত্তর দেব? বলব, আমরা আইডিয়ার মানুষ। আইডিয়া দিয়েই তো সমাজ পাল্টায়, অস্ত্রের জোরে নয়। আমরা আইডিয়াকে ভাষায় রূপ দিয়েছি, কবিতার ছন্দে, উপন্যাসের চরিত্রে, রঙে ও রেখার বাহুবন্ধনে। তোমরা তা দেখোনি কেন, শোনোনি কেন, গ্রহণ করোনি কেন? হা হতোস্মি! এ হল নিজেকে নিজে চোখ ঠারানো।

শুধু আমরা নই, সব দেশের সব লেখকই এ-কথা বলতে পারেন। কিন্তু তাতে কোনো মীমাংসা হয় না। ভাল ভাল কথা, ভাল ভাল চিন্তাকে সব দেশের সমাজ-নিয়ামকরাই সব সময়ে উচ্চারণ করেন। কিন্তু প্রথম সুযোগেই সেই সুভাষিতাবলীকে বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতাবান মানুষ তার হিংস্রতাকে আশ্রয় করে। এই আদিম পাপ আর এই দুঃখ থেকে কোনো দেশের সমাজই মুক্ত হতে পারেনি। কোথাও কম, কোথাও বেশি। সর্বত্রই এই দুঃখ। এই দুঃখ আগে ছিল বিধিলিপির মতো, অসহায় মানুষ তাকে মেনে নিত জীবনযাপনের অনিবার্য-তায়। আজকের যুগে এসে মানুষ ভাবতে শিখেছে, এ বিধিলিপি নয়, একেও খণ্ডন করা যায়। তাই যে দুঃখ দেয় এবং যে দুঃখ পায়—উভয়েরই গায়ে তাপ লাগছে। বাতাস বইতে শুরু করেছে। হয়তো বা অগ্নিকাণ্ড সমাসন্ন।

উত্তপ্ত হচ্ছি আমরাও। মানুষের মুখে প্রতিবাদের ভাষা আগে শোনাত অবাধ্যতার মতো। এখন তাকে সামাজিক ব্যাধি বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এই যা তফাৎ। এই তফাৎটুকু লেখকরা ধরতে পারলেই ব্যাধি সারাবার ওষুধ পেতে কষ্ট হবে না।

তরুণদের বিষয়ে অনেককে নিতান্ত হতাশ হতে দেখি। তরুণদের মধ্যে সব সময়েই বিদ্রোহের আগুন থাকে। সমাজ যদি স্থাবির না হয়, তারুণ্যকে তার প্রাপ্য দিতেই হবে। ইয়োরোপ, আমেরিকায় সুখী স্বচ্ছল সমাজেও তো আজ তারুণ্যের বিক্ষোভ দিগন্ত ছুঁয়েছে। তাদের কি ভাত-কাপড়ের অভাব? না। এ-বিক্ষোভ একালের চিন্তার। যে-চিন্তায় বিপ্লব এনেছে নিত্যনতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে আর প্রযুক্তিবিদ্যার চমকপ্রদ বাহাদুরিতে। ইয়োরোপের ছেলেরা তো সাফ বলে দিয়েছে, ‘তোমরা বুড়োরা কুড়ি বছরের তফাতে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ বাধালে। বলেছিলে, গণতন্ত্র বাঁচবে, মানুষ বাঁচবে। বলেছিলে, লেট আস হ্যাভ পিস ইন আওয়ার টাইম। হলো না যে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আরেকটা সর্বনাশা কাণ্ড যে তোমরা বাধাবে না, তার গ্যারান্টি কি?’ সুতরাং—।

আমেরিকার তরুণরা ভিয়েতনামের যুদ্ধে ড্র্যাফটেড হবার ভয়ে অনেকে কানাডায় বা ইয়োরোপে পাড়ি দিয়েছিল।

কিন্তু ক'জন? নিজের দেশ ছেড়ে, ঘর ছেড়ে এলিয়েনের জীবনযাপন করব কেন? সুতরাং—বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের এটাই হল মূল। দোষ তাই শুধু একালের ছোকরা-দের নয়। দোষ পাকামাথা বুড়োদেরও, যারা সমাজকে নিজেদের কব্জায় রাখতে গিয়ে বোমার পাহাড় মজুত করছে, মিলিটারি দিচ্ছে লেলিয়ে আর মাঝে মাঝে যাদুকরের ভেল্কি দেখাবার মতো করে হাউই ছুঁড়ে দিচ্ছে চাঁদে, মঙ্গলে বা শুক্রগ্রহে।

আমাদের তরুণেরা কি তা দেখছে না, বুঝছে না? পৃথিবী আজ ছোট। যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি, আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি। এতো কবির কথা, স্পষ্ট কথা। তবে এক এক সমাজে বিক্ষোভের চেহারা এক এক রকম। আমরা তো অনেক-দিন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের নীতিবাক্য ঘাড় কাৎ করে মেনে নিয়েছি। সুবোধ ও সুশীল গোপালের সংখ্যাই ছিল বেশি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মতো নিষ্পাপ নির্মল না হলে কি নীতিবাক্য পালনের নির্দেশ দেবার অধিকার জন্মায়? তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুরা যখন পরীক্ষার নম্বর দেবার বেলায় কারচুপি করেন, পক্ষপাতিত্ব করেন, তখন আর 'গুরুজনকে সর্বদা মান্য করিবে' এই নীতির দোহাই দেওয়া চলে না। দেবতাদের কাদায় তৈরি পা বেরিয়ে পড়ছে, দেখা যাচ্ছে তাঁদের শরীরের খড় আর মাটি। কী আশ্চর্য ও'রাও পুতুল!

শতাব্দীর শেষ তিন দশকে সভ্যতা নতুন মোড় নিচ্ছে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। পুকুরভরা মাছ, গোয়ালভরা গোরু ইত্যাদি স্মৃতি নিয়ে অনেকে আক্ষেপ করেন। তখনকার মানুষ ভাল ছিল, শান্ত ছিল, সুখী ছিল। কিন্তু এ-কথা তাঁরা মনে করেন না সেই স্বর্ণযুগেই হয়েছিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। এই সেদিনও পঞ্চাশের বাংলায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক নিকেশ। শায়েস্তা খাঁর আমলে জলের দরে চাল পাওয়া যেত। কিন্তু সে-চাল যারা উৎপাদন করত, তাদের কী দশা, অর্থনীতির ছাত্ররা তা বলতে পারবেন। কিন্তু আজ তা হবার জো নেই। এখন বিহারে খরা হলে দুনিয়াশুদ্ধ টনক নড়ে। বিআফ্রায় শিশু মরলে খৃস্টান-বিবেক পড়ি কি মরি করে সেখানে গুঁড়ো দুধ আর ভিটামিনের বড়ি পাঠায়। কারণ, সবার গায়েই তাপ লাগছে, আমাদেরও।

সুতরাং হতাশ হতে চাইনে। আরও দুঃখ আছে, আরও কান্না আছে। তবুও হতাশ হবার সময় নয়। এই যুগটাই অ-গুনের চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছে। এমন নিখিল জাগরণের যুগও আর আসেনি। সাহিত্যিককে তার দর্শক হলেই কর্তব্য শেষ হয় না। আরও প্রত্যাশা আছে তার কাছে, সমাজের, মানুষের, সময়ের।

জেনারেশন গ্যাপ বলে কথা এ-যুগের সমাজতাত্ত্বিকরা চালু করেছেন। আগের প্রজন্মের মানুষের সঙ্গে এ-প্রজন্মের তরুণের চিন্তার ফারাক। সব যুগেই তা ছিল, তলিয়ে দেখবার মন ছিল না। এ-যুগে তা ভীষণভাবে দরজায় কড়া নাড়ছে। দরজা খুললে যে-আগন্তুককে দেখি সে কি অপরি-চিত, না আমাদেরই স্বপ্ন-বিনষ্ট মুখের প্রতিচ্ছবি? তাকে চিনতে হবে। বিরক্তি দিয়ে নয়, অমনোযোগী তাচ্ছিল্যে নয়, অনুদার-তায় নয়। যেহেতু ওরাই আগামী শতক পর্যন্ত থাকবে এ-যুগের সমস্ত উত্তরা-ধিকারের বোঝা বহন করে।

তাই কবিতা বা গল্প বা উপন্যাসে আজকের যুগের কথা বলতে হবে আগামী যুগকে সুস্থির রাখবার জন্য। এ-যুগের ভাল-মন্দ সবকিছুকে গ্রহণ করেই তা সম্ভব। হোক তা ছন্নছাড়া, অগোছালো, বাউণ্ডুলে, হিপিপনায় আক্রান্ত, তবু একে নিয়েই এগুতে হবে লেখককে। যেহেতু লেখকরা শুধু সেকালের নয়, একালের এবং আগামীকালেরও। আমরা যে এ-যুগকে বর্জন করতে চাইনি, অপাংক্তেয় করে রাখতে চাইনি, তাকে অস্থিরতার মধ্যে দিতে চেয়েছি স্থিতি, গতির মধ্যে আনতে চেয়েছি সামঞ্জস্য, এ-কথা বুঝতে দিতে হবে। তাহলেই দেখব এ-কালকে যতটা জাহান্নামের পড়শী বলে মনে হয়, আসলে তা নয়। সেখানেও ফুল ফোটে এবং প্রতি অন্ধকার রাত্রির পর হয় সূর্যোদয়। সাহিত্যিকের কাজ হল সেই সূর্যোদয়ের খবরটুকু এনে দেওয়া। অন্ধকারকে অস্বীকার করে নয়, তার ভেতর দিয়ে রাত্রি পার হয়ে।

সুতরাং একালেই আমরা বাঁচি। এবং সেকালের কল্পিত জৌলুস থেকে হাত-ছাড়া, আগামীকালের জন্যই হাত বাড়াই।
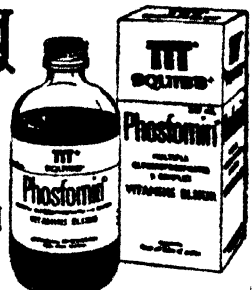
অন্ধকার আকাশে তারাগুলো জ্বলছে ম্লান দীপ্তিতে। গঙ্গার দুদিকের আলো-গুলো জ্বলে উঠেছে। ঝাঁকড়া বটগাছ-এর নীচে গঙ্গার জলে আঁধার নেমেছে। সেই অন্ধকার-এর বুকে দোল খায় কয়েকটা তারার ঝিকিমিকি আলো। নির্মল আর লতিকা চুপ করে বসে আছে , দুজনে ওই অন্ধকার-এর অতলে হারিয়ে গেছে। লতিকার হাতখানা ওর হাতে। লতিকা আজ বেপরোয়া। অনেকগুলো বছর সে অপেক্ষা করে আছে—দুজনে অপেক্ষা করে আছে দুজনের জন্য।

লতিকা বলে—তোমার সঙ্গে বনবাসেই চলে যাবো নির্মল। মা-বাবার যা খুশী করুক। আমি ওদের কথা মানবো না।

নির্মল ওর দিকে চেয়ে থাকে। ডাগর দুটো চোখে তারার আলোর ঝিলিক। ও যেন ক্ষণিকের জন্য বেপরোয়া—বাঁধনহারা হয়ে যেতে চায়। মেয়েরা কোথায় এমনি বেপরোয়া আর দুর্দম। বাঁধন ছেঁড়ার দুর্বার সাহস জাগে তাদের মনে। এ ভালোবাসা—না ব্যাকুলতা তা জানে না নির্মল।

নির্মলের মনে তবু সেই দ্বিধা আর ভাবনা। লতিকার নরম নিটোল দুটো হাত যেন ওকে নিঃশেষে নিজের কাছে টেনে নিতে চায়—ব্যাকুলভাবে তাকে কাছে পেতে চায়। লতিকার কবোষ্ণ দেহের স্পর্শ ওর শিরায় শিরায় চঞ্চল রক্তস্রোতকে প্রাণবন্ত কামনা-মুখর করে তোলে। সব দ্বিধাকে যেন প্রচণ্ড আঘাতে টুকরো টুকরো করে দিতে চায়। অন্ধকার-এর নরম চেতনাহীনতার অতলে ও হারিয়ে যাবে।

চমকে ওঠে নির্মল। রাত হয়ে গেছে। হঠাৎ তার সামনে কঠিন বাস্তব ছবিটা ফুটে ওঠে। কোথায় সেই গঙ্গার তীরে আলোর আভাস—লঞ্চের শব্দ—পথহারা নৌকার নিরুদ্দেশ যাত্রা আর কোথায় বা লতিকা! হুগলীর সেই গঙ্গার তীর থেকে লতিকার সান্নিধ্য থেকে সে পড়ে রয়েছে বহুদূরে বাংলার শেষ সীমান্ত দকমা-রেঞ্জের পাশেই অযোধ্যা পর্বতশীর্ষের ফরেস্ট অফিসে। রাতের হিমেল হাওয়া শালবনের বনে মাতন এসেছে, একটানা বাতাস সুর তোলে পাইন বনে—শিহর জাগায় ইউক্যালিপটাস গাছের বিরল পাতায়। চাঁদের আলো পিছলে পড়ে শিশির-ভেজা চন্দন গাছের বিরল পাতায়, ভিজে বাতাসে তার ক্ষীণ সুবাস কি বেদনা-

ময় স্মৃতির অস্তিত্বের মত মিশিয়ে আছে। লতিকার কথা মনে পড়ে। একটা রাতজাগা পাখী মাঝে মাঝে বনের দিক থেকে ডাকছে। দূরে দিগন্তে আঁধার নামা পাহাড় উপত্যকায় ঘুমের আবেশ জড়ানো।

এই তার জগৎ। লতিকার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। সেই রাতে লতিকার আহবানে সারা মনে ঝড় উঠেছিল কিন্তু সাড়া দিতে পারেনি নির্মল। তার চাকরী এই বনে বনে ঘোরা। বিট অফিসার থেকে এখনও প্রমোশন পায়নি, তাই সভ্য-জগতের ধারে কাছে কোন আধাগ্রাম শহরে থাকার অধিকার তার নেই। পড়ে থাকতে হয় দুর্গম বনে; লতিকাকে এই বনবাসে আনতে চায়নি সে। একমাত্র আশা, সে রেঞ্জ-অফিসার হবে—মাইনে বাড়বে, বাংলো পাবে কোন সভ্যজগতের ধারে কাছে, সেদিন লতিকাকে আনবে তার সেই ঘরে। দুজনের ভালোবাসায় তারা গড়ে তুলবে তাদের স্বপ্ননীড়। তার রেকর্ড ভালোই। হয়তো প্রমোশন পাবে খুব শীগ্‌গীর।

লতিকার ডাগর দুচোখের চাহনি—সেই স্পর্শটুকু তার সব চেতনাকে স্নিগ্ধ চন্দনসুবাসমদির বাতাসের মত ঘিরে রেখেছে। তার ভালবাসার এই চেতনাটুকু তার কাছে অরণ্যের এই কঠিন বিপদসঙ্কুল নির্বাসনের জীবনকেও আশ্বাসময় করে রেখেছে। অযোধ্যা পাহাড়ের এই জীবন থেকে সে মুক্তির দিন গোনে।

তবু এই নির্বাসন তাকে সেদিন বেদনাই দিয়েছিল। পুরুলিয়া ছাড়িয়ে আরও কয়েকটা স্টেশন, রুক্ষ প্রান্তর—শূন্যে রিক্ত বন্ধ্যা-প্রান্তরের বুকে দু-একটা শাল-মহুয়ার গাছ দাঁড়িয়ে ধুঁকছে, একদিকের দিগন্তে মাথা তুলেছে নীল ছায়াচ্ছন্ন পাহাড়শ্রেণী, একটানা সীমা-প্রাচীর এর আভাস নিয়ে। মাঝে মাঝে ওর মাথা টপকে দু-একটা চূড়া বিপজ্জনকভাবে আশমানে মাথা তুলেছে। জনহীন ছোট স্টেশন থেকে নেমে আরও আঠারো মাইল সরু একটু পথের আস্তেটুকু গিয়ে ফুরিয়ে গেছে ওই পাহাড়শ্রেণীর গহন অরণ্যে। ছোট্ট একটু গ্রাম—হাটও বসে—শালবনের ধারে হাসপাতালের ব্যর্থ একটু অনুকরণও আছে। এইখানে তাদের রেঞ্জ অফিস। দিনান্তে দু-একটা বাস পুরুলিয়া শহরের খবর নিয়ে আসে। আবার অন্ধকার নামার আগেই তারা ফিরে যায়। রেঞ্জ অফিসার হতে পারলে এমনি একটু লোকালয়ের ধারেও থাকতে পারতো সে। লতিকা খুশী হতো ওই বন-পাহাড়ের প্রশান্তির মাঝে।

কিন্তু সে-সব স্বপ্নই।...এখান থেকে আর সাত মাইল দুর্গম পাহাড় আর ঘন বন-রাস্তা পার হয়ে উঠতে হবে তাকে আড়াই হাজার ফিট উপরে। নির্মলের প্রথম দিন সেই পথের ছবিটা কেমন যন্ত্রণাদায়ক বলেই বোধ হয়েছিল। আর নির্মলের কাছে বারবার মনে হয়েছিল প্রমোশন তাকে পেতেই হবে। সভ্যজগতে সে ফিরে যাবে—সবকিছু ফিরে পাবে সে। লতিকা থাকবে তার জীবনে। তবু বারবার মনের গভীরে যন্ত্রণাটাই গভীরতর হয়ে উঠেছিল। রেঞ্জ অফিস থেকে রেঞ্জ-অফিসার-এর সঙ্গে দেখা করে কাগজপত্র নিয়ে তাকে আসতে হবে পাহাড়ের উপর নোতুন অফিসে। পথের ধারে সবুজ সেগুন গাছ-ঘেরা রেঞ্জ অফিস আর বাংলোটা দেখে চমকে উঠেছিল নির্মল। পিছনের একটু বন-রেখার পরই সোজা উঠে গেছে উঁচু পাহাড়-শ্রেণী। কয়েকটা ময়ূরে কলরব করছে। ওদের গলায় পেখমে চিকচিক করছে বর্ণ-বৈচিত্র্য নিয়ে দিনের রোদ।

কার হাসির শব্দে চমকে উঠেছিল নির্মল। লতিকা এসেছে বনবাংলোয়, নির্মল প্রমোশন পেয়েছে। তারা দুজনে এই অরণ্যছায়ার নিভৃতে একটি শান্তিনীড় রচনা করেছে। পাখীগুলো কলরব করে, দুটো হরিণ আনমনে তার দিকে বড় বড় কালো চোখের চাহনি মেলে চেয়ে আছে। কার ডাকে ফিরে চাইল।

—স্যার।

নির্মল চমকে ওঠে। নাঃ, স্বপ্নই দেখছিল সে। তার জীবনের সেই আকাঙ্ক্ষিত পূর্ণতা আসেনি আজও। সারা মনের অপূর্ব কামনা উদগ্র হয়ে ছায়ামূর্তি'র রূপ ধরে তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল। এক বেদনার কালো ছায়া নামে তার সারা মনে। লতিকা আসেনি, তাকে আজও যেন হাত-ছানি দিয়ে সেই চাওয়ার স্নিগ্ধতাটুকু বার বার ডাকে আর বেদনায় ভরে তোলে সারা মন।

গহন বনের সুরু হয়েছে একটু পথ পার হয়েই। পাকানো কঠিন চেহারা ওই গার্ডটার। পরনে খাকি পোশাক, না কাচার জন্য আরও ময়লা দেখায়, বনের সবুজে মিশে গেছে। অবলীলাক্রমে পাকদণ্ডির সরু পথ বেয়ে উঠে চলেছে।

গহন বন, সারা পাহাড়-শ্রেণীর বুকে জুড়ে সর্বাঙ্গ ছেয়ে ঘন বনের গভীর আলিঙ্গন। বড় বড় শাল—আসান—পিয়াশাল—কোথায় সেগুন গাছগুলো উঠেছে। ওদের শাখার কাণ্ডে জড়ানো রকমারী লতা, কোনটায় ফুল ফুটেছে, কোনটা ওই গাছগুলোকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে আবেশে গাঢ়তর হয়ে দিনের এতটুকু আলোর প্রবেশপথ রুদ্ধ করেছে, নীচের কুমারী মৃত্তিকায় এনেছে আরণ্যক স্তব্ধতা। চড়াই ঠেলে উঠছে নির্মল—এ-পথের যেন শেষ নেই। ওই পথটা তাকে লতিকার কাছ থেকে সভ্যজগৎ থেকে দূরে—আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে চলেছে। ক্লান্তি আসে—সোয়েটার-এর নীচে ঘাম ঝরছে। স্তব্ধ বনভূমির মাঝে বারবার শব্দ ওঠে। বাড়ছে সেই শব্দটা।

একটা জলপ্রপাতই বলা যায়। কালো-সাদা রঙীন পাথরের কঠিন স্তরগুলো ধুয়ে ধুয়ে ঝকঝকে হয়ে উঠেছে, গতিপথে ওই জলধারা বাধামুক্ত হয়ে অনেক নীচে লাফিয়ে পড়েছে কি দুর্বার আনন্দে। হারিয়ে গেছে সেই চঞ্চল জলস্রোত বনের গভীরে। এমনি করে হারিয়ে যাবার মাঝে প্রচণ্ড আনন্দ আর উন্মাদনা আছে। লতিকার কথা মনে পড়ে।

সেও যেন এমনি দুর্বার চঞ্চল একটি জলস্রোত, তাতে আছে তৃষ্ণার শান্তি—প্রাণের আশ্বাস আর মুক্তির দুর্বার প্রবাহ। সেও চেয়েছিল তার সবকিছু অতীতকে পিছনে ফেলে এমনি কোন অনিশ্চিতের অন্ধকার অতলে হারিয়ে যেতে, নির্মলকে সেই হারিয়ে যাবার আনন্দলোকে সে ডাক দিয়েছিল। কিন্তু সাড়া দিতে পারেনি নির্মল। লতিকা বাধামুক্ত—দুর্বার আর সে স্থির ওই বনপর্বতের মত মৌন স্তব্ধ। তার মনে এই রহস্যের সংবাদ ছিল নিজেরই অজানা।

সবকিছু যেন ভুলে গেছে নির্মল। সেই

সভ্যজগতের ছবি—চুঁচড়ার গঙ্গার তীরে ছায়া-নামা সন্ধ্যা—লতিকার বড় বড় দু-চোখের চাহনি সব তার কাছে আজ হারিয়ে গেছে। এখনও সেসব কিছু পাবার দাবী তার নেই। তাকে আরও বড় হতে হবে।

লতিকা আসবে তার জীবনে। সে সার্থক হবে এই তার একমাত্র স্বপ্ন আর সাধনা।

—স্যর! গার্ডের ডাকে থমকে দাঁড়াল ওরা। এখানে বন অনেক গভীর পাথুরে মাটি ভিজে স্যাঁতসেঁতে। সরু পায়ে-চলা পথে নেমেছে আবছা অন্ধকার। বনের মাঝে চলা-ফেরা করে তারা। ওদের কান একটু বেশী তীক্ষ্ণ সজাগ চোখের দৃষ্টিও সজাগ আর সাবধানী। কারা যেন পাতার আড়ালে খস্-খস্ করে সরে যাচ্ছে। ঠিক সরে চলে যাচ্ছে না আক্রমণ করার জন্য তৈরী হচ্ছে তা বোঝা যায় না। নির্মল বনে-বনে ঘোরে। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ও সজাগ হয়ে ওঠে। বাঘ নয়—তাহলে বাতাসে ভেসে আসত বোটকা গন্ধ। ভালুক হলে এতো সময় দিত না, কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত তীরবেগে এসে আক্রমণ করতো, কুলি আর গার্ড দুজনে এদিক-ওদিকে চাইছে। ওদের ভয় গণেশঠাকুরকে। বুনো হাতীকে ওরা বলে গণেশঠাকুর, ওরাই বনের জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান আর বলশালী। এসব পাহাড় বনে বুনো হাতীর পালও আছে। বনের আড়ালে পাতার ফাঁকে-ফাঁকে দেখা যায় কজন মানুষকে। ওরা এদের দেখে সরে গেল। বনের একটু গভীরে পড়ে আছে কয়েকটা গাছের গুঁড়ি। ওরা চোরা কাটাই-এর দল। ওরা বাঘের চেয়ে হিংস্র আর লোভী, সাপের চেয়েও ক্রুর। চমকে উঠেছে নির্মল। এ বনে যে ওদের আধিপত্য প্রবল সেটা সে অনুমান করে নিয়েছে।

গার্ডও বলে—এসব উৎপাত এখানের বনে বেশ আছে স্যর। ব্যাটা খুঁজে-খুঁজে দামী গাছগুলোই কাটবে। পিয়াশাল, সেগুন, আবলুস, রোজউড এই সব দামী কাঠের দিকে ওদের নজর। দেখুন না কত বড় রোজউড গাছটাকে কেটেছে।

গম্ভীর হয়ে ওঠে নির্মল। এসব তার এলাকা। সবুজ পাতাভরা গাছটা ছিটকে পড়ে আছে। দামী গাছ। নির্মল বলে—কাল লোক-জন এনে ওটাকে তুলে নিয়ে যাবে, সরকারে জমা হবে।

গার্ড তবু ইতঃস্তত করে, ওদের মুখের গ্রাস স্যর।

—চুরি-করা মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিলে দোষ নেই। কালই তুলে নিয়ে যাবে এসব কাঠ।

ওরা জায়গটায় একটা নিশানা দিয়ে উঠে আসছে চড়াই বেয়ে ফরেস্ট-কলোনীর দিকে। চড়াই ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে, সামনেই সেই অধিত্যকা পাহাড়ের মাথার উপরটায় বন নেই, দূরে এদিক-ওদিকে আবার পাহাড় মাথা তুলছে। সামনের ঢেউ-খেলানো মুক্ত প্রান্তরে সোনা ধানের ক্ষেত—কোথায় মোষগুলো চরছে, ওদের গলার কাঠের ঘণ্টা বাজে ঘড়-ড়-ড়। সামনেই কাঁটাতারের বেড়াঘেরা বনবাংলো আর ওদের বাসাগুলো, কয়েকজন গার্ড আর চৌকিদার নিয়ে তার আস্তানা। নির্মল সেই দিকে চেয়ে থাকে। এই তার আবাস আর কাজ বলতে বনরাজ্যের পাহারাদারী করা।

নিজের কাছেই কথাটা কেমন অবিশ্বাস্য বলেই বোধ হয়। খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মত ব্যাপার। গহন বনরাজ্য, হাতী, বাঘ, ভালুক, বনশুয়োর, ময়াল সাপ এসব তো আছেই; বনের প্রাণীরা বোধ হয় খাকি রঙকে চেনে—তাদের তাই এড়িয়ে চলে। তারই মাঝে ঘুরতে হবে বনে-বনে নির্মলকে। এ রাজ্যের সেই-ই রক্ষক। এই ভাবটাই বোধ হয় বনের ওই গাছগুলোর প্রতি গভীর মমতা আনে—ভালোবাসার স্বাদ আনে। এই বনপ্রকৃতিকে সে আপনার বলে জানে তাই বনে-বনে সে ঘুরে-ফিরে অনুভব করে রূপের গভীরে কোন অধরা চিরসুন্দরী প্রকৃতিকে—তার সঙ্গে সে যেন মিশিয়ে আছে। এ যেন সেই লতিকার অনুভূতির মতই তার সারা মনে আবেশময় স্নিগ্ধ একটু আনন্দ জাগায়।

এই রূপজগতের গভীরে মাঝে-মাঝে হারিয়ে যেতে চায় নির্মল, কোথায় ঘন শাল মহুয়া পিয়াশাল বনে ফুল ফুটেছে। পাতায়-পাতায় হলুদের গাঢ় আবেশ, ময়ূরের দল ডানা ঝাপটিয়ে বনরাজ্য সরব করে তোলে তারই গহনে পাথরে পাথরে নাচের লহরা তুলে বয়ে যায় কোন ঝর্ণা; নির্মল মাঝে-মাঝে এমনি ঠাঁইয়ে এসে থমকে দাঁড়ায়, এই জগতে এসে লতিকার কথাই মনে পড়ে, শহরের মেয়ে লতিকা, ঘিঞ্জি পুরোনো একটা গলির মধ্যে তাদের বড় বাড়ীখানা, পথে শুধু ধুলো আর আস্তাকুড়ের আবর্জনা, ফাঁকা জায়গায় দু-চারটে গাছ-গাছালি মাথা তুলেছে,—সামনেই গঙ্গার বিস্তার। এতটুকু মুক্তির আস্বাদ তাও গঙ্গার তীরে জমেছে থিক-থিকে পলি, লতিকা এছাড়া আর কিছুই দেখে নি, এতো সুন্দর ঠাঁইয়ে এলে লতিকা খুব খুশী হতো, পাহাড় সে দেখে নি—গভীর বনের সৌন্দর্যও তার কাছে অজানা, রহস্য তার কাছে অচেনা। তবু সে সুন্দর। নির্মলের মনে হয় লতিকাও তার কাছে এই বনরাজ্যের মতই রূপবতী-অধরা। সে তার মনের সব শূন্যতা জুড়ে এনেছে স্বপ্নের শ্যামলিমা, সেই অনুভূতি নানা বর্ণে বর্ণময়, স্নিগ্ধতার স্বাদে সে প্রশান্ত।

ভালোবাসার এই স্বাদটুকু তার কাঙাল মনের সব কিছুকে কাণায়-কাণায় ভরে দিয়েছে। এই তার জগৎ। এখানে তার সব ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ প্রাণময় হয়ে ওঠে।

লতিকার অস্তিত্বের সুন্দর উষ্ণ অনুভূতি আর স্পর্শটুকু এই প্রকৃতির বুকে মিশিয়ে আছে।

খট্ খট্ খট্ কঠিন শব্দটা পাহাড় বনের সীমানায় ঘা খেয়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলেছে। সেদিন বনের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে থমকে দাঁড়াল নির্মল। এ শব্দ তাদের খুব চেনা। বনের গভীরে কোথায় চোরা গাছ কাটাই হচ্ছে। কোন সুন্দর ছায়াঘন বনস্পতির বুকে ওদের লোভী হাত আক্রমণ হেনেছে, নিষ্ঠুর আক্রমণ। সেই গাছটা বনভূমির বুকে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার বেদনা নিয়ে ধরাশায়ী হবে —ফুরিয়ে যাবে তার সব স্নিগ্ধতা আর পূর্ণতার সম্ভাবনা। লোভী দস্যুর দল ওকে কেটে টুকরো করে এই বনরাজ্য থেকে নিয়ে যাবে। বনভূমির বুকে ঘটবে সবুজ প্রকৃতির ক্ষণিক অপমৃত্যু।

বনের উপর এই অত্যাচারটাকে নির্মল ঠিক সহ্য করতে পারে না। ওরা বনস্পতির মৃত্যু ঘটায়, কুমারী মৃত্তিকাকে বনের সবুজ আলিঙ্গন থেকে ছিনিয়ে এনে ধারাল লাঙলের ফলায় ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে তার দেহ। মানুষের লোভী থাবাটা এখানেও এসে পড়েছে ঠাঁই-ঠাঁই।

শব্দটা উঠছে দূরে। নির্মল গার্ডদের বলে—যাবে ওদিকে?

গার্ডের বিশেষ ইচ্ছে নেই ওই গোল-মালের মধ্যে যেতে। তাছাড়া অনেক দূরে ওই কাটাই হচ্ছে। ওরা জানে ওই অঞ্চলের বনে একা কেউ যায় না, চোরাকাটাই-এর দল সেখানে হানা দেয় তৈরী হয়ে। বাধা দিলে বিপদ আছে। তাই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে তারা—অনেক দূরের পথ স্যর। তাছাড়া বৈকাল হয়ে গেছে ওদিকে যাওয়া ঠিক হবে না। বরং কাল সকালে গিয়ে তুলে আনবো।

ওরা ঠিক রাজী নয়। নির্মল চুপ করে কি ভাবছে। শুনেছে একটা নাম—সেই লোকটাই নাকি এখানের একজন পাণ্ডা। নির্মলের সতেজ যৌবনভরা দেহটা কঠিন হয়ে ওঠে। তার এতদিনের চাকরীতে সুনাম একটা আছে। সুন্দরবনের নোনাগাঙ বেয়ে সে অনেক চোরাকাটাইয়ের নৌকা ধরেছে, অনেকবারই মুখোমুখি হয়েছে অমনি হিংস্র দলের সামনে। তবু ভয় পায় নি সে। অনেক চোরাকাটাই বন্ধ করেছে, সেই জনাই এখানে দিয়েছে তাকে কর্তারা। এসব সে বন্ধ করবে। হঠাৎ লতিকার ডাগর সেই চাহান মনে পড়ে। তার পথ চেয়ে সে প্রতীক্ষায় আছে। তাকে আরও বড় হতে হবে, রেঞ্জ অফিসারের পদে প্রমোশন পাবে সে। তার লতিকাকে ঘিরে স্বপ্নটুকু সার্থক হবে, তার অন্তরের সবুজটুকু সুন্দরতর হয়ে উঠবে—বনের সবুজের সঙ্গে। সেটাকে সে ফুরিয়ে যেতে দেবে না। এই অপমৃত্যু সে বন্ধ করবেই।

কি ভাবছে সে। বন থেকে বের হয়ে চড়াই-এর উপরই কয়েকঘর সাঁওতাল আদি-বাসীদের বসতি, আবার চারি পাশে মাথা তুলেছে পাহাড়গুলো—সর্বাঙ্গে তাদের বনের ঘন আলিঙ্গন। রতন মাঝির ঘরটা এক-নজরেই চেনা যায়। তকতকে করে নিকোনো, দেওয়ালে নানা রঙ করা। দরজাগুলো সে মিস্ত্রী দিয়ে শহর থেকে তৈরী করিয়ে এনেছে। পাকা সেগুন কাঠের পাল্লায় কালো রোজউড কাঠের বাতাবন্দী করা। গোয়াল-ঘরেও অনেকগুলো তাজা মোষ গরু, বসতির মধ্যে সে সঙ্গতিপন্ন, গোলায় মকাই ধান বাজরা, দাওয়াতে খড়ের বড় জড়ানো চঞ্চল-এর পুঁড়ো।

রতন মাঝি শুধু এই বস্তির মাঝেই নয়—পাহাড় বনের এদিক-ওদিকে ছড়ানো

অনেক বস্তির আদিবাসীদের তুলনায় বেশ অবস্থাপন্ন, জমি-জমাও করেছে।

তার এক সম্পর্কীয় মামার কাছে পুরুলিয়া থেকে লেখাপড়া করতে গিয়েছিল।

লেখাপড়া তার বিশেষ হয় নি। কিন্তু সভ্য জগতে বেশ কিছুদিন বাস করার ফলে তাদের ভালোটুকু গ্রহণ করতে না পারুক, খারাপটা সহজেই গ্রহণ করেছিল। রতন দু-চারটে ইংরাজীও বলতে পারে, শহরের মানুষদের লোভ আর লালসাটাকে সে চিনেছিল। মনে-মনে সেও তৈরী হয়ে উঠেছিল। আর তার জন্যই মন থেকে বিবেক নীতিবোধ সব কিছুকেই স্রেফ ঝেড়ে ফেলতে পেরেছিল। সভ্য জগতের মানুষকে ঠকাতে সে পারে নি। তাই রতন হেমব্রম ফিরে এসেছিল নিজের এই বন-পর্বতের সীমানার ছোট্ট ডুংরিতে। এইখানেই সে ওই সহজ সাধারণ মানুষগুলোকে নিজের হাতে এনেছিল তাদের অভাবের সুযোগ নিয়ে, সামান্য টাকা-পয়সা—না হয় দু-চার কুনকো ধান মকাই এর বিনিময়ে রতন এইখানেই বিকি-কিনির হাট জমিয়েছে।

লোকগুলো দেখেছে রতনের এলেম। রতন মাঝে-মাঝে শহরে যায়—দু-একবার চোরাকাটাইয়ের ব্যাপারে এরাও ধরা পড়ে কোর্টে গেছে, রতনই তাদের ছাড়িয়ে এনেছে।

গ্রাম বস্তের অনেকেই তাই মনে [illegible]। [illegible] বাধ্য হয়েছে, [illegible] অনেক এলেম-দার। [illegible] অনেকেই তাই সমীহ করে চলে।

অবশ্য রতনই [illegible] একটা জানিয়েছে —এখানে ওদেরও [illegible] আছে। অভাব পড়লেই তারা বনে চলে যায়, শহরের করাত-কলের মালিকও রতনকে খাতির করে। বনের অন্ধকারে [illegible] দামী কাঠগুলো [illegible] আছে। সেগুন-আমলকী-শাল-নিম রোজউড পিয়াশাল অনেক দামী গাছের সন্ধান ওরা রাখে।

রতন প্রকাশ্যে এসব ব্যাপারে নেই। সে প্রকাশ্যে এদের দাবী-দাওয়ার আবেদন নিয়ে যায় শহরে, নীচের হাটতলায় মিটিং করে। সে সাবধানী চতুর কৌশলী। আর মনের অতলে সাপের চেয়ে ক্রুর—এ বনের বাঘের চেয়েও হিংস্র।

তার নজর সব দিকেই। নতুন বিট অফিসার ছোকরাকে দেখেছে সে। গার্ডদের দু-একজনকে হাত করেছে, আজ বন থেকে ওদের বের হয়ে এইদিকে আসতে দেখে এগিয়ে যায় রতন।

—নমস্কার স্যার। রতন শহরে থেকে শহুরে কায়দায় নমস্কার করতে শিখেছে। পরনে একটা ধুতি আর নতুন গেঞ্জির উপর হাফসার্ট। নির্মল দেখছে লোকটাকে। মনে হয় ওপাশের জঙ্গল দিয়ে কে নীচের দিকে চলে গেল। রতন তাড়াতাড়ি একটা খাটিয়া বের করে দেয়—বসুন স্যার। একটু চা করতে বলি? অবশ্য চা এরা কেউ খায় না—আমার এসব জোগাড় থাকে। শহর থেকে যা হয় নীচের ব্লক অফিস থানা থেকে বাবুরা আসেন কিনা। তাহলে ডিম সেদ্ধ আর চা আনি?

নির্মল লোকটিকে দেখছে, লম্বা সিটকে চেহারা। মুখে কপালে একটা কাটার লম্বা দাগ ওর গালটাকে বিশ্রী করে তুলেছে, ওর চাহনিতে কি কুটিলতা। ওই মুখ আর চাহনিতেই মনে হয় নির্মলের লোকটা ঠিক এখানের আর সকলের মত সোজা নয়।

নির্মল জবাব দেয় না। এমনি এসেছিলাম আপনাদের বস্তিতে। কথাগুলো জানাতে দু-চারজন লোক এতক্ষণে সাহস পেয়ে ঝুপড়ি থেকে বের হয়ে আসে। রতনকে দেখে তারা ভরসা পেয়েছে। নির্মল কথাগুলো ওদের জানাবার চেষ্টা করে। বন বিভাগ এখানে রাস্তাঘাট করছে নতুন বন তৈরী করবে—পাইন ভাইন ইউক্যালিপটাস চন্দন বন এসব করছে। বেশ কিছু লোকের কাজের সংস্থান হবে। তাছাড়া দু-একটা ঝর্ণায় আড় বাঁধ দিয়ে জলাধারও গড়বে। এই বনভূমিকে সুন্দর করে তুলবে, লোকের রুজিরোজগারের উপায় হবে। এ বনভূমিকে তারা বাঁচাতে চায়।

—কায় কাম দে কেনে তালে কে যাবেক তুদের কাট চুরি করতে? দুটো-পাঁচটা ট্যাকার জন্যে চোর হতে নাই যাবো। তুরা কায কাম দে।

রতনের কথাগুলো ঠিক ভাল লাগে না। দেখছে রতন বন বিভাগের বাবুদের এই সহযোগিতার মনোভাব তার নিজের স্বার্থের পরিপন্থী। তার নিজের বস্তির লোকজন আশপাশের জঙ্গলের দু-চারটে বস্তির মানুষগুলোও বন বিভাগের কাজ করতে যায়। দিনের শেষে যা মজুরি পায় তাই নিয়ে খুশী মনে বাড়ি ফেরে তারা। মদ খায় আকণ্ঠ, মাদল বাঁশীর সুর ওঠে। ওদের জীবনে অভাব বোধ অতিসামান্য। মাঠে ধান মকাই বাজরা গুন্দলু কিছু হয়, তারপর আছে বনের ফলপাকড়। তাই নিয়েই ওদের দিন চলে যায়। সামান্য কিছু বাড়তি পেলে তো কথাই নেই।

রতন তবু হাল ছাড়ে নি। ওদের বোঝাবার চেষ্টা করে।

—সারাদিন পাথর কেটে পাবি দু টাকা, আর বসে দুটো গাছ কাটিদে চালান কার দিব শহরে, দিনকে পাবি দশ টাকা; কুনটি বেশী হল হে?

কিন্তু তারা ওই চুরি করতে নারাজ। রতন কি ভাবছে। তার কাছে এই অর্থের লোভটাও কম নয়, সে জানে পাহাড় সীমানার বাইরেও অনেক ধূর্ত লোভী মানুষ আছে, তারা এই সুযোগ হারাবে না। শহরের করাতকলের মালিকও সেদিন তাকে তাগাদা দিয়েছিল ভালো কাঠের জন্য। রতন জানে গভীর বনের মধ্যে কোথায় আছে ভালো সোজা দামী সেগুন পিয়াশাল রোজউড গাছগুলো। মনে-মনে কঠিন হয়ে উঠেছে রতন—তার লোভী মনটা আরও অনেক কিছু পেতে চায়।

নির্মল মনে-মনে খুশী হয়েছে। ডি-এফ-ও সাহেবও তার কাজে খুশী হয়েছেন। তার প্রমোশনের জন্য রেকমণ্ড করবেন বলেছেন। বন বিভাগের নানা কাজ শুরু হয়েছে। আর দেখছে নির্মল লোকগুলো কাজ পেলে চুরি করবে না। সেও উদ্যোগী হয়ে এই বন জগৎকে সুন্দরতর করে তোলবার চেষ্টা করছে। পাইন চন্দন আর ইউক্যালিপটাসের বন গড়ে উঠছে। ওদের সবুজ পাতায় সকালের সোনা রোদ চিক চিক করে। অড়হরের ক্ষেতও তৈরী হয়েছে। লম্বা লতায় লতায় সবুজ লকলকে ঘন পাতার নীচে থলো থলো আঙুরগুলো ঝুলেছে, ক্রমশ সবুজ থেকে লালচে হয়ে ওঠে ওগুলো। পাকতে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সুন্দর সবুজ হয়ে উঠেছে নতুন এই বনরাজ্য। ওরা পাহাড় বনের মধ্য দিয়ে নতুন রাস্তা তৈরী করছে। জিপ উঠবে সভ্য জগৎ থেকে মানুষ আসবে এখানে—দু-চার দিন বিশ্রাম নিয়ে যাবে, দেখে যাবে শান্ত সবুজ সুন্দর এই জগৎটাকে। বনবাংলো গড়ে উঠছে। পাকা বাড়ী তৈরী হচ্ছে আরও। লোকগুলোও
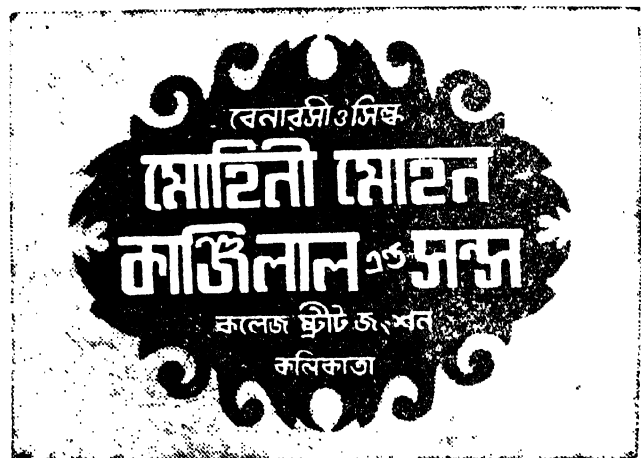
যেন খুশী হয়েছে। শান্তি নেমে আসে এই জগতে। চোরাকাটাই নেই। গোলমাল নেই।

নির্মলের মনে হয়, এইবার প্রমোশন পাবে সে নীচের কোন রেঞ্জ অফিসে। শুনেছে তাকে নাকি আসদাতেই পোস্টিং করা হবে। লতিকাকেও জানিয়েছে সেই কথা। মনে-মনে ভাবে নির্মল—এবার আর লতিকার বাবার অমত থাকবে না। লতিকাকে নিয়ে আসবে ওই ঘিঞ্জি ভাঙা শহরের নোংরা পরিবেশ থেকে মুক্ত সবুজের রাজ্যে।

প্রতিদিনের ডাকের পথ চেয়ে থাকে সে। সভ্য জগতের সঙ্গে যোগাযোগ সেই নীচেকার ছোট পোস্ট অফিস মারফৎ। সপ্তাহে দুদিন হাটবার, এখান থেকে দুর্গম বন-পাহাড় পার হয়ে লোক যায় জিনিসপত্র-আনাজও কিছু-কিছু আসে, সেই এনেছে আজ চিঠিখানা।

অন্ধকারের পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে সন্ধ্যা নামছে বন-পাহাড়ে। বাতাসের শব্দ মুখর হয়ে ওঠে। এক পাল ময়ূর ডেকে ফিরছে বনের দিকে, তাদের ডাকের সঙ্গে মিশেছে হরিণের ডাক। শন-শন হাওয়া হাঁকে জমাট আঁধারনামা শালবনে, এ অরণ্যে যেন মানুষের কোন বসত নেই, এ শুধু রহস্যময়ী প্রকৃতির রাজ্য; রাতের আদিম তমসায় জেগে ওঠে মাদনা-কদম-মাঠাবুরুর অশরীরী আত্মা, বাতাসে সেই রহস্যময় ফিসফিসানি। কোথায় বাঘের গর্জন শোনা যায়, কাঁপছে বনভূমি—বাঘের মৌটিং সিজন—বাঘিনীকে ডেকে-ডেকে ফিরছে সে। মহুয়া ফুল ফুটেছে বনে, পাকা কুলের মিষ্টি মদির সুবাস ওঠে বাতাসে। ভালুকগুলো বের হয়ে এসেছে বন থেকে।

বনের সীমানা ছাড়িয়ে পাহাড় নদী পার হয়ে নির্মলের মন হারিয়ে গেছে আলো-জ্বলা চুঁচুড়া শহরের একটি বাড়িতে। বাগানের নারকেল সুপারী গাছে চাঁদের আলো আর বাতাসের মাতামাতি শুরু হয়েছে সেখানে, লতিকার চিঠিখানা বার-বার পড়ে; সে জানিয়েছে তার মা আর অপেক্ষা করবে না। বাবাও উঠে-পড়ে লেগেছেন তার বিয়ের জন্য। কারা তাকে এসে দেখে গেছে, বোধ হয় সেই মানুষ-গুলোর তার দেহটাকে পছন্দও হয়েছে।

নির্মলের বুকের মাঝে একটা শূন্যতা জাগে, সে যেন পাহাড়ের একটা অতল খাদের সামনে এসে পড়েছে, সামনেই তার বিরাট গহ্বর নিবিড় অন্ধকার। লতিকার মুখখানা মনে পড়ে। সেজেগুজে চোখে কাজলের কালো রেখা টেনে মনোহারিণী বেশে সে এসে অন্য পুরুষের দরবারে আবেদন জানাচ্ছে। এ তারই চরম পরাজয় আর অক্ষমতা। এই অপমানের হাত থেকে লতিকাকে সে রেহাই দিতে পারে নি। লতিকাকে সাজলে খুব সুন্দর দেখায়, রূপ যৌবন দুটোই তার আছে। সেও জানে সেই যৌবনকে আরও মোহময়ী করে তুলতে। ঠোঁটের গোলাপী আবেশ — চিবুকের দীর্ঘ খাঁজটুকু তার মুখের আদলকে আরও সুন্দর করে তোলে। লতিকার দেহের ছন্দ তার সেই লাস্য নির্মলের মনে হিল্লোল তুলেছে বার-বার। ওই দেহটার ওপর তারই দাবী। শুধু দেহ নয়—লতিকার মনের উপরও তার নিবিড় অধিকার। আর সেটাকে মেনে নিয়েছে লতিকা। তাই এই ব্যাপারে লতিকার মনও বিষিয়ে উঠেছে। সে জানিয়েছে খুব শীঘ্র যদি নির্মল এর প্রতিকার করতে না পারে — অন্য কাউকে মেনে নেবার এই অপমানের চেয়ে সে নিজেই নিজেকে শেষ করে দেবার কথাটাই যুক্তিযুক্ত বলে ভাববে। আর তাই-ই করবে সে। তিল-তিল করে এই অপমান সইবে না।

নির্মলের সামনে অতীতের একটা ছবি ভেসে ওঠে। তাদের পাড়ার খুশীদি কেন জানে না গঙ্গায় ডুবে মরেছিল। সুন্দর মেয়েটা—ছেলেবেলায় নির্মলকে সেও খুব ভালোবাসত। সেই খুশীদির জীবনে কি সর্বনাশ এসেছিল, তাই নিজেকে সেও শেষ করে দিয়েছিল। শান্ত সুন্দর স্তব্ধ সেই প্রাণহীন মূর্তিটার ছবি আজও নির্মলের মনে সজীব হয়ে আছে। অনেকেই কি সব বলাবলি করেছিল। কিন্তু নির্মলের কৈশোর সেই কথাগুলো মানতে চায় নি। খুশীদির জন্য তার দু চোখ বেয়ে জল নেমেছিল, মৃত্যুকে সেই তার প্রথম দেখা; লতিকার মুখখানা মনে পড়ে। ও খুশীদির চেয়েও সুন্দর। এমনি সুন্দরের সর্বনাশ ঘটতে সে দেবে না। নির্মলের জীবনে ওই সবচেয়ে বড় সম্পদ, সেটা তার কাছে চিরকালের জন্যই সত্য হয়ে থাকবে। ভয় হয়। বনের বসন্তকে দেখেছে। দেখেছে তার ফুলে ফোটার উৎসব—সুবাস মদির স্পর্শকে অনুভব করেছে। দু দিনের এই বৈভবের পরই আসে গ্রীষ্মের দাবদাহ রুক্ষতার অগ্নিজ্বালায় সবুজ সুন্দরী পৃথিবী নিঃশেষ হয়ে যায়। আসে চিরন্তন ব্যর্থতার জ্বালা। এটাকে তার জীবনে সে আসতে দেবে না। লতিকা আনবে তার কাছে চিরবসন্তের মাধুর্য। যদিও সে রয়েছে অনেক দূরে—তবু তার মনের জগতে সে কাছাকাছি, এই নির্বাসনকে মেনে নেবার সাহস আর আনন্দ এনেছে সে। তার জীবনের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ব্যর্থ মুহূর্ত-গুলোকে কি সার্থকতায় ভরে রেখেছে, এই স্বপ্নস্বাদ নিয়েই তার স্বর্গ রচনা।

রাত হয়ে গেছে। এলোমেলো হাওয়া কাঁপে বনে-বনে। বোধ হয় পাহাড়ের কালো মাথা ছেয়ে মেঘ নামছে, তারাগুলো ঢেকে গেছে নিবিড় অন্ধকারে, নীরবতার মাঝে হঠাৎ একটা ভীত ত্রস্ত শব্দ ওঠে, কোন হরিণ বোধ হয় পালাবার চেষ্টা করছে অস্ফুট গর্জন শোনা যায়, চাপা গর্জনে সেই হরিণের ক্ষীণ আর্তনাদ ডুবে যায়। বোধহয় একটা বাঘ আদিম লালসা আর হিংস্রতা নিয়ে হরিণীর উপর লাফ দিয়ে পড়েছে, তার ধারাল নখ আর বলিষ্ঠ থাবার প্রচণ্ড আঘাতে ওর নরম দেহটাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, নরম কুমারী মাটিতে চুঁইয়ে পড়ছে তাজা রক্ত।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে নির্মল। তার মনে হয় ওই আদিম হিংস্রতা এই বনে নয় সভ্য জগতেও আছে। লতিকার কালো দুটো চোখের ভীত ত্রস্ত চাহনি মনে পড়ে, ওকে ঘিরেও তেমনি কোন নিষ্ঠুর আক্রমণ আর অপমৃত্যুর বিভীষিকা গড়ে উঠেছে, সব হারিয়ে যাবে—পরাজিত হবে লতিকা ওদের হাতে, নির্মল তাকে বাঁচার আশ্বাস দিতে পারবে না।

একথাটা ভাবতে পারে না সে। নির্মল বিশ্বাস করে সে আর লতিকা দুজনে আসবে কোন সবুজ রাজ্যে শহরের ধারে বনের সীমানার কোন বাংলোতে। লতিকাকে সে ওদের আক্রমণের হাত থেকে ছিনিয়ে আনবে।

আর কটা দিন। সামনের সপ্তাহেই তার হুকুম আসবে। রাত কত জানে না। আকাশ ছেয়ে মেঘ জমেছে। মনে হয় পাহাড়গুলো মাথা তুলেছে আসমানে, মাঝে-মাঝে বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ চাবুক সাপটে কে গর্জাচ্ছে। সেই গর্জন আকাশ-বাতাসে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে। কালবৈশাখীর মাতন শুরু হয়েছে — শেষ হয়ে এল বনভূমিতে বসন্তের মিলনকাব্য; শুরু হয়েছে ধ্বংসের বিভীষিকা নিয়ে রুদ্রদেবতার আবির্ভাবের সূচনা। বনের গাছ-গাছালির ঝুঁটি ধরে কোন অদৃশ্য দৈত্য যেন প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিচ্ছে—বৃষ্টি নামে। ধারাস্নানে প্লাবিত হয়ে ওঠে বনের পথ, পাকদণ্ডীর খাত বেয়ে নামছে গৈরিক জলধারা। সারা বনের জন্তু-জানোয়ারগুলো আতঙ্কিত এই বিশৃঙ্খলতার মাঝে যেন মেতে উঠেছে। বনের রূপ বদলে যায়। সুন্দরী বনভূমি পরিণত হয় বিভীষিকার রাজ্যে। ছোট্ট ছোট্ট বন-বসতের প্রাণীগুলোও এই সর্বনাশে যেন আঁতকে উঠেছে।

এত দিন চুপ করে থাকার পর আবার শুরু হয় সেই উপদ্রব। বনের বুক থেকে দামী-দামী সেগুন মেহগিনি পিয়া-শাল শাল রোজউড গাছগুলো কেটে নিয়ে চলেছে। এবার এই আক্রমণ আগেকার মত দলছুট মানুষের নয়। কারা যেন ইচ্ছে করেই এই লুণ্ঠনপর্ব শুরু করেছে। বেছে-বেছে সুন্দর দামী গাছগুলোকে কেটে নিয়ে চলেছে, ওদের ধারাল কুঠারের ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে চলেছে বনরাজ্য, অসহায় সুন্দরী প্রকৃতির বুকে ওরা এই নির্মম হত্যাপর্ব চালিয়েছে।

উপর মহল অবধি খবর পৌঁছে যায়। ওঁরা টের পান শহরের বনাতকলে কোন অদৃশ্য পথে আসছে দামী দামী লগ—কাঠ। কর্তারাও এই দিকে নজর দেন। এ যেন কোন দলবদ্ধ মানুষের কাজ।

চমকে ওঠে নির্মল। তার সামনে প্রমোশন, অর্ডারও হয়ে গেছে। ঝালদার মত শহরে পোস্টিং হয়েছে তার। রিলিভ করার লোক এলেই সে চলে যাবে। দিন গুনছে কবে সে গিয়ে পৌঁছবে চুঁচুড়ায়, লতিকার মত আছে—দুজনে তারা সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস রাখে। তারা ঘর বাঁধবে ওদের সেই শহর ছেড়ে দিয়ে অনেকদূরে। লতিকাকেও চিঠি দিয়েছে—তৈরী থাকতে। নির্মল এইবার ওর কাছে ফিরে যাবে।

হঠাৎ কর্তাদের নজরে পড়েছে এই কাণ্ডটা। তাঁরাও এসেছেন এখানের বনে।

নির্মলকেও তাঁরা বেশ কঠিনভাবেই জানিয়ে যান, হাজার হাজার টাকার এই

গাছ চুরির ব্যাপারে তারও হাত আছে। নইলে এভাবে এ-কাজ হয় না।

যদি সাতদিনের মধ্যে এর কোন সুরাহা না হয়, তাকে এখান থেকে রিলিভ করা হবে না আর প্রমোশন নাকচ করার কথাও ভাববেন তাঁরা।

—স্যর। নির্মল মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছে।

বন-রাজ্যকে সে ওদের থেকে অনেক বেশী নিবিড় করে চেনে, ভালবাসে। বনের এই রূপজগতে সে মিশিয়ে আছে। তার কাছে এই বনস্পতির মৃত্যু ওদের চেয়ে অনেক বেদনাদায়ক। তাছাড়া ওই জঘন্য ইঙ্গিতটাকে সে মেনে নেবে না।

কিন্তু কর্তাদের কাছে একজন সামান্য বিট অফিসারের কোন কথাই অচল। তার বনভূমিকে দিনরাতের রূপ-বৈচিত্র্যের মাঝে ভালোবাসার—তাকে আপন করে নেবার কথা তাঁদের কাছে অবিশ্বাস্য। এর জীবনে নিজের জীবনের সব অনুভূতিগুলোকে মেশানো যায়—এ-কথা তাঁরা শহরে বসে অনুভব করতে পারবেন না।

নির্মল চুপ করে থাকে। ও'রা চলে গেছেন। নির্মলের সামনে ওই মেঘভাঙ্গা এতটুকু রৌদ্রসিক্ত বনভূমি করুণ বেদনার্ত-রূপে ফুটে ওঠে। ও যেন লতিকার মতই ডাগর বেদনাহত ব্যাকুল অসহায় চাহনি মেলে চেয়ে আছে তার দিকে। দিকে দিকে তাদের অপমান আর লুণ্ঠন করার আয়োজন চলেছে। অন্তরালে দুর্বার হয়ে উঠেছে সেই দানবের দল! নির্মল কঠিন হয়ে ওঠে। সেই বেদনাটা তার মনে দৃঢ়তার কাঠিন্য আনে। ওই লুণ্ঠনকারীদের সে হটিয়ে দেবে, দরকার হয় তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সে বাধা দেবে। ছিনিয়ে নিয়ে আসবে লতিকাকে এই শান্ত বনসীমান্তে—বনের বুকে নামবে আরণ্যক প্রশান্তির শান্ত ছায়া। নির্মল মনে মনে আজ কঠিন হয়ে উঠেছে কি শপথ নিয়ে।

কালো মেঘগুলো আকাশের বুকে ঠেলে উঠেছে পাহাড়ের মাথা টপকে, বনে বনে ঘন ছায়া নামে। বাতাসও যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। বনের অতলে আঁধার নামছে—ঝড় উঠবে—বৃষ্টির অঝোর ধারাস্নানে ভরে উঠবে বনভূমির বুক। কোথায় ময়ূরগুলো ডাকছে—গাছের ডালে ওদের রঙ্গীন পেখমে লেগেছে কালো মেঘের ছায়া-আলো।

—ঠক্ ঠক্ ঠক্! স্তব্ধ বনরাজ্যে কুঠারের কঠিন আঘাতটা কি বেদনার আভাস আনে। নিষ্ঠুর লোভী মানুষগুলোর কুঠারের আঘাতে ছিটকে পড়ছে পুরোনো সেগুন মেহগিনি গাছগুলো, কাণ্ড থেকে যেন তাজা রক্তের মত রস বের হচ্ছে—বাতাসে বাতাসে ওঠে ছিটকে-পড়া নিহত বনস্পতির শেষনিশ্বাস, ওরা নোতুন উৎসাহে আবার আঘাত হানছে সামনের পিয়াশাল গাছে।

রতন মাঝি এবার তৈরী হয়েই আক্রমণ হেনেছে। বনের নিরীহ লোক এরা নয়। সমতলের গ্রামবসত থেকে ওদের এনেছে, বনের প্রতি যাদের মায়া-মমতা বিন্দুমাত্র নেই, মানুষের প্রতিও যারা নির্মম, সেই লুণ্ঠন-কারীদের সে এনেছে সভ্য মানুষের জগৎ থেকে, শহরের ধনী করাতকল মালিক যুগিয়েছে সাহস আর রসদ।

গুঁড়িগুলোকে ওরা সাফ করে কেটে টুকরো করছে। ওদের কুঠারের শব্দ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে বনপাহাড়ে।

থমকে দাঁড়াল নির্মল। এতদিন ধরে সে এদেরই খুঁজেছে। তার সামনে লতিকার সুন্দর মুখখানা ভেসে ওঠে, তার জীবনে লতিকার অ.সার পথে বাধার সৃষ্টি করেছে ওরাই। মনে হয়, ওরা গাছই কাটছে না—সবুজকে হত্যা করছে না বনভূমির বুকে, তার জীবন থেকে ওরা লতিকার সবুজ প্রীতিপূর্ণ অস্তিত্বটুকুকে নিঃশেষ করে দেবার চক্রান্ত করেছে। ওরা মুছে ফেলতে চায় বনের স্নিগ্ধতা—তার পূর্ণতা। নির্মল কঠিন হয়ে উঠেছে। হাতের বন্দুকটাকে শক্ত মুঠিতে ধরেছে সে।

—স্যর। কয়েকজন গার্ড তাকে বাধা দেয়। ওরা স্থানীয় লোক। জানে ওই চোরাকাটাই-এর লোকদের কথা। তারা বনের পশুদের চেয়েও নির্মম আর হিংস্র। ওরা বাধা দেয়।

—ওদিকে যাবেন না স্যর। ওরাও ছাড়বে না। তার চেয়ে আরও লোকজন এনে ওদের মোকাবিলা করা যাবে। মাল নিয়ে যেতে পারবে না আজ।

নির্মলের সারা মনে আজ প্রদীপ্ত জ্বালা। আজ সে ওদের বাধা দেবে—দরকার হয় গুলিই চালাবে। বলে সে—তোমরা আমার সঙ্গে এসো। কোনো ভয় নেই। নিজের কঠিন কণ্ঠস্বর নির্মলের কাছে আজ অচেনা বলে বোধহয়।

গহন অরণ্য। বড় বড় গাছগুলোর মাথায় মেঘভাঙ্গা একটুকু রোদের ঝিকি-মিকি, লতাগুলো নিবিড় আলিঙ্গনে তাদের জড়িয়ে রেখেছে কি ভালবাসায়, হলুদ সোনালী ফুলফোটা বনরাজ্য, ভ্রমরের গুন-গুন সুর ওঠে—মৌমাছিরা উড়ছে বাতাসে। বনের ভিজে বাতাসে কুটি—কাঠমল্লিকা ফুলের মিষ্টি সুবাসমাখানো, কে যেন মুঠো মুঠো রঙ্গীন ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে বাতাসে। এক-পাল প্রজাপতির ঝাঁকের মধ্যে ওরা হারিয়ে গেছে, ওদের গালে মুখে প্রজাপতির রঙ্গীন ডানার ফুলগন্ধমাখা আলতো ছোঁয়া লাগে—প্রজাপতিগুলোও মানুষের সাড়া পেয়ে সরে যাচ্ছে।

বনের গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ওদের। কয়েকটা সেগুন গাছ পড়ে আছে নিহত নায়কের মত—ওরা দামী রেডউড গাছে কুড়ুল চালাচ্ছে। ওদের আশপাশে পড়ে আছে উৎখাত গাছগুলো, শিকড়ে তাদের মাটির স্পর্শ তখনও ফাটা গুঁড়ি থেকে চুঁইয়ে পড়ছে সতেজ গাছের প্রাণ-বিন্দু যেন কয়েকটা বুনোপশু শিকার-পর্ব শেষ করে ধারাল নখ-দাঁত বিস্তার করে আহার-পর্ব সারছে।

—খবরদার। গর্জে ওঠে রতনের হিংস্র কণ্ঠস্বর। ওর দুটো চোখে যেন ধক্ ধক্ করে আগুন জ্বলছে। লোকগুলো বনের গভীরে নির্মল আরও কজনকে দেখে গর্জে ওঠে মত্ত হুংকারে—যেন একপাল নেকড়ে গর্জন করছে ধারাল দাঁত বের করে—মুখে-চোখে ওদের বীভৎস লালসার ছাপ।

—স্যর। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে একজন গার্ড। বাতাসে হিস্ হিস্ শব্দ করে একটা তীক্ষ্ণধার সড়কী তীরবেগে পাশ দিয়ে বের হয়ে গিয়ে একটা গাছে গিঁথে গেল, গতিবেগে রুদ্ধ সড়কিটা তখনও কাঁপছে। নির্মল গুলি করেছে—শান্ত স্তব্ধ বনরাজ্যে সেই প্রচণ্ড শব্দটা ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে।

লতিকার সুন্দর মিনতিব্যাকুল চোখের চাহনি মনে পড়ে, তোমার জন্যই পথ চেয়ে আছি—জানিয়েছে তাকে লতিকা। নিটোল লাবণ্যভরা দুটো হাত দিয়ে সে দূরে থেকে ডাকছে নির্মলকে। বাতাসে ওঠে ওর মিষ্টি হাসির শব্দ। প্রচণ্ড মেঘগর্জনের হুঙ্কারে সেই শব্দটা যেন হারিয়ে যেতে চায়, নির্মলের কাছে তবু সেইটাই বড় হয়ে ওঠে। ফুলের গন্ধমেশা প্রজাপতিওড়া বনে বনে কে ডাকছে তাকে।

—লতিকা। লতু!...

তার চোখের সামনে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে লতিকার সুন্দর হাসিভরা মুখখানা। আকাশী রং-এর শাড়ি পরনে, কপালে কুম-কুমের টিপ—দুচোখে কাজলরেখা—সেজেছে আজ লতিকা। ওকে ডাকছে—নির্মলের স্বপ্ন সফল হয়েছে। ওর ডাকে এগিয়ে যাবে সে। অধরা বনরাজ্যের রূপময়ী সেই নারী আজ তার হাতে ধরা দিয়েছে—নিজেকে তার কবোষ্ণ আলিঙ্গনে সঁপে দেয় নির্মল। আজ সে শান্ত—তৃপ্ত।

লোভী রতন মাঝির সব লালসাকে সে চিরদিনে জন্য স্তব্ধ করে দিয়েছে। বন-ভূমিকে বাঁচিয়েছে ওই লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে। কিন্তু ওদের নির্মম আঘাতে বিট অফিসার নির্মল বোসও প্রাণ দিয়েছে। তরুণ বিট অফিসার আর সভ্য জগতে ফিরে আসেনি। বনের রহস্যময় রূপ-জগতে সে হারিয়ে গেছে—ফেরারী হয়ে গেছে। আর ফেরেনি।

মামুলি—সাধারণ ঘটনা। এমন ব্যাপার প্রায়ই ঘটে। বিট অফিসার নির্মল বোসের মৃত্যুও তেমনি। তার অন্তরালের নিবিড় বেদনার কাহিনী বনের রূপসাগরে কবে হারিয়ে গেছে।

লতিকার কাছেও এর দাম কিছু ছিল না। সে তখন অন্যের ঘরণী। ওর বাবা-মা বেশ ধুমধাম করেই শ্রীরামপুরের কোন ধনীর একমাত্র ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। গাড়ি-বাড়ি-ফ্রিজ সবই আছে তাদের।

অন্ধকার বনপর্বতের বুকে কে অনেক রঙীন স্বপ্ন দেখেছিল তাকে কেন্দ্র করে, লতিকা তা জানবার প্রয়োজন বোধ করেনি।

নির্মল তার জীবন থেকে অনেক দিন আগেই হারিয়ে গেছে—

চারিপাশে অগণিত কৃতী মানুষের ভিড় দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। খুলনায় এত কৃতী মানুষ ছিল না। ছোট শহর। দু' দুটো চওড়া নদীর বুক থেকে উঠে আসা শীতল বাতাসে উচ্চাশার নাম-গন্ধ ছিল না। ভিড় নেই, ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সির প্রশ্নই ছিল না। সাইকেল রিক্সা, সাইকেল, আর দুখানি করে শক্ত সবল পা, যানবাহনের মধ্যে এই তো ছিল সম্বল মানুষের। খান কয়েক গাড়ী নিশ্চয়ই ছিল। ছিল এক্সিকিউটিভ ইনজিনিয়ার ভুবন মুখুজ্যের অনবরত ধোয়ামোছা ছোট্ট একটা গেরস্থ অস্টিন। গ্যারেজেই থাকত সারাদিন। কেউ কোনদিনও ইনজিনিয়ার সাহেবকে গাড়ীতে চড়তে দেখেছে বলে তো মনে পড়ে না। পায়ে হেঁটেই রূপসা পাড়ের বাংলো থেকে কয়লাঘাটা অফিসে যাতায়াত করতেন। আর জমিদারদের ছিল বিশাল একখানা হুডখোলা গাড়ি। বীরুদা, নরুদারা কি শনিবার কলকাতা থেকে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আসতেন। পায়ে দড়ি বাঁধা জোড়া মুরগী আর পাতলা কাগজে মোড়া সাদা পাউরুটি নিয়ে মোটরে করে হুস করে উধাও হতেন দক্ষিণে নদীর ধারে তাঁদের জমিদারীর গাঁয়ে। সঙ্গে যেত ঢোঙওয়ালা একটা কলের গান। এতেই না কি দারুণ স্ফূর্তি হত।

অথচ কত মুঠো মুঠো টাকা এই শহরের অলিতে গলিতে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিয়েও বুঝতে পারলাম না মজাটা কোথায়? টাকা হলেই তো মজা হয়। মদ মেয়েছেলে সব জোটে। তবু কেন খোয়ারী ভাঙা অবসাদে, ক্লান্তিতে ঘাড়টা ঝুলে পড়ে চিবুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় চওড়া বুকের পাটাখানা। যত ক্লান্তই হই থামলে চলবে না। আরো কমপক্ষে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর বাঁচতে হবে। আর বাঁচতে হবে সব ঠাটবাট বজায় রেখেই। গাড়ি, বাড়ী, সাহেবী স্কুলে ছেলের পড়ার খরচ, স্ত্রীর ষাট পঁয়ষট্টি টাকা দামের চুলের খোঁপা, ফ্রীজ, সেলার—সব রেখে যদি কেটে পড়তে পারি তবেই শান্তি। উঃ কি শান্তির পথই দেখিয়েছিলে বলাইদা।

এখন হাঁটতে পর্যন্ত কষ্ট হয়। পেটে মাংস থলথল করে, নুইতে পারি না। অথচ এই তো সেদিনও, আটত্রিশ সালে, সেই সেবার যেবার তুমি কলকাতায় প্রথম আমাদের বাসায় এলে। মা, বাবা, ছোট ছোট ভাই বোনের সঙ্গে সেবারই কলকাতায় পালিয়ে এসেছি। এ সেই ম্যাট্রিক দিলাম। কাকা বহু বছর এ বঙ্গের বাসিন্দা। কাকীমা নাকি 'ঘটি', বাড়ীতে আলোচনা হত, তাই জীবন চাটুজ্যের আপন সহোদর সারাটা জীবন মধ্যমগ্রামের এ পাশে মধ্যরে-বাড়ীর গাঁয়ে স্কুলমাস্টারী করে গেলেন। ভাগ্যিস ছিলেন। নইলে যা আন্দাজে পড়েছিলাম তাতে পরীক্ষাটা দেওয়াই আর হতো না। হবে কি? যা কায়দা শিখিয়ে গেলে। একেবারে লা জবাব হো......!

হো হো করে তোমার মত অত সুন্দর বুকখোলা হাসি কোনদিনও কাউকে আর হাসতে দেখলাম না। চেহারাতে তো তুমি রাজপুত্তুর। এখন একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে কেমন হয়েছে ঐ চেহারাখানা। অনেকদিন, হ্যাঁ তা বছর চৌদ্দ-পনেরো তোমায় দেখিনি। সেই যে খেলা শিখিয়ে দিয়ে বোম্বাইতে গিয়ে ফ্ল্যাট কিনলে, আর তো এদিক হও নি। অশীশা এতদিন কি আর বোম্বাইতে আছ? তোমার যা চাকরী—ধাঃ, তোমার আবার চাকরী কি? জুয়াচুরিই তো তোমার পেশা। ঐ পেশায় অ্যাড্রেস না থাকাই ভাল। আমি একটা অ্যাড্রেস জুটিয়ে যা ঝামেলায় পড়েছি।

আজ তোমায় গাল দিচ্ছি অথচ খুলনায় কলকাতায় সবার মুখে শুধু তোমার নাম, তোমাদের নাম। বড় মাসীর সব কটা ছেলে না কি দারুণ কৃতী। এখন বুঝি, কৃতিত্ব আসলে জমানো চর্বির দলা। না-গরম না-ঠাণ্ডায় রাখ, ঠিক দলদলে হয়ে থাকবে।

নইলে পৌষ সংক্রান্তির শীতে মেজদা, মানে তোমার মেজভাই মন্মথদা, শওড়ার খুলে ঠাণ্ডা জলে ঘণ্টাখানেক ধরে স্নান সেরে চীনে লুঙ্গীতে কোঁচানো গরদে পুরুত ঠাকুর হয়ে পুজোয় বসে সাতসকালে। গঙ্গাজলে চুবোনো দাড়ি কামানো মেঙে পেট্রোরালিস মেজর চিরে ফোটা কয়েক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ রক্ত শুকনো আম কয়েক বেলপাতার অক্ষরে পটে আঁকা দেবীর পাদ-পদ্মে নিবেদন করে সে কি মা মা বলে বাড়ী ফাটানো চীৎকার। নইলে যে সব ফাঁস হয়ে যাবে। ফাঁস হয়ে যাবে নিউ আলিপুরের দোতলা, লেক টাউনের চকচকে তেতলার গোপন খবরটুকু। তিনশো পঁচিশ হাজার টাকা জেকলে জমাদারের চাকরী করে বাড়ী হাঁকাও কি করে হে? আর সেজদা যে দিনরাত গলের তলায় ডিউক বক্স ঝুলিয়ে গম্ভীর মুখে বক্তৃতা দেদা ভাল করে পড়। পাশ করতে হবে। দেখিস তো মেসোমশায়ের শরীর মন দুই ভেঙে গেছে। তুই না দাঁড়ালে বুড়ো বাড়ি, ছোট ছোট ভাই বোনদের কে দেখবে?

এমনি কত মানাই পাকাই। তুমি যে সেজদা, যখন প্রাতঃস্মরণীয় বলাইদার আপন কনিষ্ঠ সহোদর, আমার থেকে দশটা বছর আগে এই থার্ডক্লাশ ওয়ার্সেস্ট অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে শিবপুরের একটা ডিগ্রী জুটিয়ে রেলকোম্পানীকে ফাঁকি করে দিলে, তার হিসাব কেউ নিয়েছে কখনো?

অথচ ঠিক সেই সময়ে এই দেশটা গড়ে ওঠার কথা। সোস্যালিজম, ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, অপারেশন হায়দরাবাদ, দেশের মাটি তখন কি সম্ভাবনাময়, কি সুন্দর! আমি, আমরা, আমার মত লক্ষ লক্ষ ছেলে ঐ মাটিতে বীজ হয়ে ঢুকব, জন্ম নেবে মিলিয়ন মিলিয়ন সুন্দর স্বপ্নের মত মানুষ। দেশটার চেহারা যাবে পাল্টে। তার বদলে তুমি বলাইদা, তোমার মেজ ও সেজ দুই কৃতী ভাই, তোমরা সব ছবি হয়ে বুকের দরজা জুড়ে রইলে। মানুষ হতে হলে নাকি তোমাদের মতই হতে হবে। যদি জীবন চট্টোপাধ্যায় মাস্টার শাখানেক মাইলের রেলগাড়িতে একেবারে গুড়ো গুড়ো হয়ে পৌঁছেছিলেন। নিশ্চিন্ত ছকবাঁধা জীবনটা নদগাঁর ওপারে ফেলে এসে চুয়াল্ল বছর বয়সে আর নতুন করে কিছু গড়তে পারেন নি। পারেন নি নদীবাবাও। খুলনায় যাঁরা কখনোই কোন অবস্থাতেও বলেন নি যে ভুবন মুখুজ্যে বা বীরুদা কি নীরুদা হতে হবে, যাঁরা বলতেন লেখাপড়া কর, চরিত্রবান হ, মানুষ হ, তাঁরাই কলকাতায় এসে কেমন বদলে গেলেন। বললেন : বলাই, মন্মথর মত ছেলে হয় না, কেষ্ট তো হীরের টুকরো। অথচ

জীবনলাল, জগদানন্দ ও অনু

তখন কত জানা বাকী। কত করা বাকী। কত হওয়া বাকী। সব বাকী শিকেয় রেখে ফাঁকির রাস্তা চিনিয়ে দিলে বলাইদা।

মনে আছে কলকাতায় এসে তুমি উঠেছিলে সবচেয়ে বড় হোটেলটার দুশো তিন নম্বর ঘরে। তখনো তুমি গাড়ী কেনো নি। ভাড়া করা প্রাইভেট কারে চেপে চৌরঙ্গীর নামী দর্জির কাটা স্যুটে ঝলমলাই হয়ে দামী সিগারেটের প্যাকেট হাতে যখন টালিগঞ্জের বাসায় এসে বাবাকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলে—মেসোমশায়, কেমন আছেন? সেই মুহূর্তে আমরা সবাই ধরে নিলাম, তুমিই আলাদীন। শেয়ালদা স্টেশনে যখন হাজার মানুষ উগরে দিয়ে ট্রেনগুলো আবার ফিরে যাচ্ছে নতুন মানুষের খোঁজে বর্ডারে, তখন ঐ পূর্বপারের ছেলে হয়েও তুমি স্বচ্ছন্দ বিলাসের ছাইটুকু আঙুলের তুড়িতে উড়িয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছ।

সবাই জানত তুমি কোনো বিদেশী কোম্পানীর সেলসম্যান। দারুণ উদ্যমী, পরিশ্রমী। মাথায় ঘাম পায়ে ফেলে দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজের বাজার থেকে কোম্পানী ও নিজের জন্য মুঠো মুঠো টাকা রোজগার করছ। এক সপ্তাহই কিন্তু আমি তোমার রিয়েল ব্যবসাটার কথা জেনে গিয়েছিলাম।

ভবানীপুরের সরকার জুয়েলারী হাউসের ঘটনাটা মনে আছে? তুমি অনেক বড় ঘড়েল। তোমার মার্কেট সারা দেশে ছড়ানো। আমি তো চুনোপুটি। সি-এম-পি-ও-র গ্রেটার কালকাটার মধ্যেই ব্যবসাটা চালাচ্ছি। একটু বাইরে গেলেই বেশ দুপয়সা আয় হয়। কিন্তু আর ইচ্ছা করে না। সেই সতেরো বছর বয়স থেকে এই সাঁইত্রিশ পর্যন্ত একটানা বিশ বছর কারবার চালাচ্ছি। এবার একটু রেস্ট দরকার।

এই বয়সেই সবার প্রমোশন হয়। চাকুরেদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড মোটা হয়। প্রফেশনালদের কোমরে চর্বি জমে। আর আমার আঙুলগুলো ফল্স মনিঅর্ডারের ফাঁকা ঘরগুলো ভর্তি করতে গিয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

অথচ বিশ বছর আগে কত সহজেই তোমার সাগরেদ বনেছিলুম। টালিগঞ্জের বাসায় এক টুকরী আপেল, ন্যাসপাতি আর মার জন্য একটা লালপেড়ে মিলের শাড়ি নিয়ে গিয়ে সবাইকে যে কি খুশী করেছিলে তা আর কি বলব। আমি বাড়ী ছিলাম না। সবে কলেজে ভর্তি হয়েছি। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। দুপুরে প্রফেসর অমুক উইল নট টেক হিজ ক্লাসেস টু ডে নোটিশটা বোর্ডে ঝুলতে দেখে আমরা পার্কে গিয়ে বসলাম। নতুন বন্ধুদের

বোলচাল সহ্য না হওয়ায় বাড়ী চলে এলুম। এসে দেখি তোমার ভিনি, ভিডি, ভিসি কমপ্লিট। মা বললেন প্রণাম কর। করলাম। আর তুমি স্মার্টলি হাতল ভাঙা ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে বললে : গদা না? মা বললেন : হ্যাঁ, এবারই ও ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে, বলাই। গদা অনেক লেটার পেয়েছে।

হায় মা। কেন সেদিন মিথ্যার লোভটুকু সামলাতে পারলে না। আসলে তো তিন মার্কের জন্য লেটার মিস করেছি। কিন্তু দেখ, ছোটখাট একটা দুটো প্রিয় মিথ্যে কেমন নির্বাক করে দেয় মানুষকে। আমি 'না' বলতে পারলুম না। আর বলাইদা তুমি? তুমি যে কতবড় সেলসম্যান সেদিনই তার প্রমাণ রেখে গেলে। নিজের বিষয় একটি কথাও না। শুধু আমাদের চেহারার, স্বাস্থ্যের, লেখাপড়ার প্রশংসা করলে। আমাদের খুলনার বাসায় কবে কখন কি কি খেয়েছিলে, সেই সব গপ্পো। এতেই আমরা ফ্ল্যাট হয়ে গেলুম। আমার ছোট ছোট বাঙাল ভাই বোনগুলোর চোখে তুমি যেন সেদিন রূপকথার রাজপুত্র। আর আমার কাছে? স্যুট বুট পরা টার্জন। না পারে এমন কাজ নেই—তোমার কথাই তোমার অস্তিত্ব।

সারাটা দুপুর হৈ হৈ করে কাটিয়ে সন্ধ্যা বেলায় গ্যাসজ্বলা রাস্তায় উনোনের ধোঁয়া মেঘ হয়ে জমে ওঠার আগেই কেমন টুক করে গাড়িতে গা এলিয়ে চলে গেলে। শুধু যাওয়ার আগে বলে গেলে, তুই একবার আসিস আমার হোটেলে। দামী সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে রঙীন কলমে তোমার হোটেলের ঠিকানা, ডিরেকশন আর স্যুট নাম্বার লিখে দিয়ে গেলে। না কি ইচ্ছা করেই ঐ আধ-ভর্তি প্যাকেটটা সেদিন উপহার দিয়েছিলে আমায়।

তুমিই সিগারেট খাওয়াতে শেখালে। তুমিই আমায় রেস্ত গস্ত করার উপায় শেখালে। খুলনার তৈরি মাইনটিন থার্টি এইটের কাটা প্যান্ট যা জীবন চট্টোপাধ্যায় পার্টিশনের আগে পর্যন্ত খাটিইস্টিতে মাঞ্জা করে অফিস যেতেন, সেটি পরে, আমাদেরই আশ্রিত খুড়তুতো দাদা কানুর একটা ফুলস্লীভ সার্ট চাপিয়ে দিন দুই বাদে হোটেলে তোমার সঙ্গে দেখা করলুম। যাওয়ার আগে ফোন করতে বলেছিলে। তোমার না কি ভীষণ কাজের চাপ। তুমি খুব থাকো?

কার্পেট কথাটা বইয়ে পড়া ছিল। খুলনার বীরুদাদের বাড়ীতেও দেখিনি। তাই অতটা পথ হোটেলের দামী কার্পেট স্যাণ্ডেল মাড়িয়ে মাড়িয়ে যেতে কেমন ভয়, লজ্জা, বিচ্ছিরি লাগছিল। লিফটে জীবনে ঐ প্রথম চড়া। তারপর সারাটা জীবনই তো লিফটের দোলনায় ভাসছি। যেদিন দড়ি-দড়া ছিঁড়ে পড়বে? পড়লে পড়ুক। চারটে ব্যাঙ্কে স্ত্রীর নামে যে টাকা রেখে গেলাম, শহরতলিতে দোতলা বাড়ী, নতুন কেনা মোটর—ঠিক মত বজায় রাখলে ওদের হেসে খেলে চলে যাবে।

চলুক না চলুক বয়ে যায় আমার। আমি কে? আমার পরিচয় কি? সিপ্রা মানে তোমার ভ্রাতৃবধূ জানে যে স্বামীরত্ন একজন সেলসম্যান। হিল্লী-দিল্লী নয়। কলকাতার আশপাশেই কোম্পানীর কাজে দিনরাত ঘুরতে হয়। মা বাবাও তাই জানতেন। ছোট ছোট ভাই বোনগুলো—দূরে ওরা আর ছোট কোথায়? ছোট রমাটাই এখন দুটি বাচ্চার মা।

যা হোক ব্যবসাটা চালিয়ে যেতে পারলে তো কোনো কথাই নেই। আর দাদা, আমার কত চিঠির 'পরম শ্রদ্ধেয়' 'পরম পূজনীয়' 'ভক্তিভাজন' ও শুধু বলাইদা, তোমার হাতে তৈরী চ্যালা আমি—সহজে মারা পড়ব না নিশ্চয়ই। গুরুর নাম বজায় রাখবই। কত যত্ন করে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তাই তো আজ রাসেল অ্যাণ্ড কিং কোম্পানীর চীফ সেলসম্যানের খোলসটা গায়ে সেঁটে দিব্যি দুপয়সা করে খাচ্ছি।

করে খাচ্ছি ঠিকই। তবু ভয় করে। সেই ভয়ের কথাটাই তোমায় বলব দাদা। সেদিন কিন্তু তোমার ঘরের হাটকরে খোলা দরজাটা দিয়ে ঢুকতে ভয় করেনি। কিন্তু ঢুকেই চমকে গিয়েছিলাম। বাবা-মার আদর্শ পুত্র, মা-মাসীদের আদরের ব্যাচিলর পরম আদরে শেফালিকে আদর করছিলে। কত সামান্য সময়ে সামান্য কথায় যে তুমি সিচুয়েশন ম্যানেজ কর দাদা, সত্যি তোমার তুলনা একমাত্র তুমিই।

মুহূর্তে দূর সম্পর্কের মাসতুতো ছোট ভাই হয়ে গেল তোমার আপন শালা। আর ঐ শেফালি যাকে নিয়ে আমিও পরে বেশ কয়েকবার ঘুরে বেড়িয়েছি, হয়ে গেল তোমার বিয়ে করা বউ। যেন কতবড় একটা ফান। চটপট রেডিমেড প্যান্ট সার্টে আমার বাঙাল বাঙাল চেহারাটার খোলস পাল্টে দিলে। তারপর তোমার কথায় 'নয়া সার্কাস' দেখাতে নিয়ে গেলে ভবানীপুরে জুয়েলারী হাউসে।

মাত্র আধঘন্টায় তুমি দাদা যে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করলে, নিজে তার অন্যতম অংশীদার না হলে আজও বিশ্বাস করতাম না। সেই ভাড়া করা গাড়ীটা যখন দোকানের সামনে আস্তে এসে দাঁড়াল, সেলাম ঠুকে দরজা খুলে দিল উর্দি পরা ড্রাইভার তখন তোমার ঐ সুন্দর মাকাল মাকাল সাজানো বডিটা দেখে কে বলবে না যে তুমি সত্যিকারের একজন রইস। তারপর সাদা দুধে-ধোয়ানো জর্জেট কচি আপেলের মত নরম উঠতি ছুকরি শেফালি তোমার পাশে। আর আমি তো তোমারই দূর সম্পর্কের ভাই। খুড়ি তখন তো শালা।

পান এল, লেমনেড এল, কোকা-কোলার তখন এত চল ছিল না কলকাতায়। পান পড়ে রইল। অল্প হাতে একটা লেমনেডের বোতল নাড়াচাড়া করতে করতে তুমি আর শেফালি কেমন চমৎকার সদ্য-বিবাহিতের মত হাজার টাকার গয়নার অর্ডার দিয়ে দিলে। তারপর নোটে বোঝাই কোটের ইনসাইডের পকেট থেকে বার করে দুখানি বড় নোট ক্যাশিয়ারের কাউন্টারে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—এবার আমি তোমার সার্কাসে ইন করছি। ট্র্যাপিজের খেলায় এতক্ষণ তোমরা দুজনে দুলছিলে, এবার হল তিনজন) আমি কলকাতায় থাকব না মাস দুই, (তোমার জেলজ্বালী, গোজ-পশ্চাতে কোন খরচ নেই) বাইরে যাচ্ছি। যা-হোক তার জন্য ভাববেন না। আমি অর্ডারের টাকা পাঠিয়ে দেব। যদি কিছু এক্সেস হয়, তবে সেই টাকা আর গয়নাকটি আমার শালা অজন বোসকে দিয়ে দেবেন।

এক কথায় আমি শ্রী জে এন চট্টোপাধ্যায় সান অব শ্রীজীবন চট্টোপাধ্যায় যাকে ক্লাসে স্যার ইচ্ছা করে রোল কলের সময় আলাদা করে ডাকেন জগদানন্দ, বন্ধুরা বলে জগদা আর বাড়ীতে বলে গদা, কেমন চমৎকার কুলীন ব্রাহ্মণ থেকে হয়ে গেলাম কুলীন কায়স্থ। আবার বাড়ীর ঠিকানা হল রাস-বিহারী অ্যাভিন্যু।

দু সপ্তাহ পার হোল না, কলেজে একদিন একটা লোক এসে চিঠি ধরিয়ে দিয়ে কেটে পড়ল। ছোট্ট চিঠি, তোমারই লেখা—স্নেহের গদা, মল রোডে। কালই নিজে গিয়া লইয়া আসিবা। সঙ্গে শ দেড়েক টাকাও ওরা তোমাকে দিয়া দিবে। টাকা ও মাল লইয়া রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর যে ঠিকানা তোমায় পূর্বে জানাইয়াছিলাম সেখানে অজিত বক্সীর কাছে দিয়া আসিবা। আমি বর্তমানে বড় ব্যস্ত। কলকাতায় এখন আসিতে পারিব না। তুমি আমার আশীর্বাদ লও। মেসোমশাই ও মাসীমাকে আমার প্রণাম জানাইও। ইতি, তোমারি বলাইদা।

পুঃ অজিতবাবু তোমাকে পঞ্চাশটি টাকা দিবেন। আশা করি আমাদের অ্যাড-ভেঞ্চার কাহিনী নিশ্চয়ই গোপন রাখিয়াছ।

সত্যি বলাইদা, তোমাকে প্রণাম করতে ইচ্ছে করে। জুয়াচুরীর ব্যবসা সংক্রান্ত জরুরী গোপন নোটেও মেসো, মাসীমাকে প্রণাম জানাতে ভোলনি। কি ঠান্ডা মাথা!

দোকানে গেলাম পরদিন। শুনলাম, দুটি খেপে তুমি পাঁচশো করে হাজার টাকার মণিঅর্ডার পাঠিয়েছ। জমা ছিল দুশ। মোট বারোশ। গয়নার দাম পড়ল এক হাজার ছেচল্লিশ টাকা দশ আনা। গয়নার বাক্স ও টাকা নিয়ে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতে অজিতবাবুর কাছে জমা দিয়ে পঞ্চাশটি টাকাও পেয়ে গেলাম।

পঞ্চাশ টাকায় নতুন করে সম্পূর্ণ অজানা এক জগতে প্রবেশের পাসপোর্ট পেলাম। এর আগে এত টাকা কোনদিন পাইনি। কলেজে ভর্তির সময় এর অর্ধেক টাকায় নাম উঠেছিল রেজেস্ট্রিতে।

যাক সেসব কথা। আটচল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন, এই সাত-আট বছরে কত ঘাটা-আঘাটায় তোমার মানোয়ারী জাহাজের সঙ্গে গাদা বোটের মত ঘুরে ঘুরে ফিরেছি। পড়াশোনা মাথায় উঠেছে। বদলে শিখেছি তোমার গোপন আয়ের সোনা-বাঁধানো পথ। সেই পথে আমার মত অনেককেই আজকাল ঘুরতে দেখি। বোধহয় সেদিন তুমিই ছিলে একেশ্বর।

ব্যাপারটা জলের মত সোজা। রিস্ক আছে ঠিকই। তবে রিস্ক নেই তো শুধু দারিদ্র্যের, দুঃখের। সুখে থাকতে হলে রিস্ক তো নিতেই হবে। প্রত্যেক পোস্ট অফিসে পোস্ট মাস্টারের হেফাজতে মনিঅর্ডারের জন্য গোটা চারেক স্ট্যাম্প থাকে। স্ট্যাম্প-গুলো ব্যবহার করবেন শুধু পোস্ট মাস্টার। আর কেউ নন। স্ট্যাম্পগুলো স্টীলের তৈরী। স্ট্যাম্পের কালি হিসাবে বেলজিয়ান ব্ল্যাক ইংক ব্যবহার করা হয়।

একটা স্ট্যাম্পে লেখা থাকে অডিট অফিসের নাম। আর একটিতে থাকে ইস্যু অফিসের। আর দুটির একটিতে তারিখ ও অপরটিতে ইস্যু অফিসের পোস্ট মাস্টারের নিজস্ব সই। নিয়ম, স্ট্যাম্পগুলো থাকবে পোস্ট মাস্টারের নিজস্ব হেপাজতে। কিন্তু বোধহয় কোন পোস্ট অফিসেই পোস্ট মাস্টার কাজের চাপে সবগুলি পোস্টাল বিধি-বিধান মেনে চলেন না, চলতে পারেন না। তাই দেখা যায়, প্রায় প্রতি অফিসেই স্ট্যাম্পগুলো পোস্ট মাস্টারের হয়ে ব্যবহার করেন প্যাকাররা।

বলাইদা, তুমি ধুরন্ধর লোক। তুমি সেলসম্যান। না, কোনো কোম্পানীর মাল কোনদিন বেচোনি, বেচেছো, তোমার নিজস্ব আইডিয়া। মানুষের দারিদ্র্যের জ্বালা। তুমি কিনতে সস্তায়, অতি সস্তায়। বিহার, উড়িষ্যা, আসামের বিভিন্ন পোস্ট অফিসের প্যাকারদের মধ্যে কম করে জনা বিশেক লোক নিয়মিত তোমার কাছ থেকে ষাট-সত্তর টাকা মাসোহারা পেতেন। তুমি তাঁদের দিয়েই ব্ল্যাংক মণিঅর্ডারে প্রয়োজনীয় ছাপগুলো মারিয়ে নিতে।

তারপর পূর্ব-ভারতের বিভিন্ন বড় শহরের বুকে শুরু হোত তোমার লীলা-খেলা। প্রতি শহরেই তোমার লোকজন, অজিতবাবু ও গদার সেট সর্বদাই মজুত থাকে। তারপর হাজির হও জুয়েলারী শপে। মণি মুক্তার সওদা তুমি করো না। কেনো শুধু সোনার গয়না, ভারত সরকারের টাকায়।

ভারত সরকারের টাকা? কী, চমকে উঠছ? তোমার গোপন ব্যবসার সূত্র ফাঁস করে দিচ্ছি বলে। কিন্তু চমকাবার কি আছে? আসল কথাই তো বলিনি এখনো?

গয়নার অর্ডার দিয়ে সামান্য কিছু টাকা অ্যাডভান্স কর। চেহারায় তুমি বনেদি খদ্দের। তোমার গাড়ী, তোমার চেহারা, তোমার বোলচাল, তোমার কায়দা করে দামী সিগারেটের প্যাকেট ধরায়, সব কিছুতেই মেড ইন ইউ এস এ-র লেবেল আঁটা। সন্দেহ করবে কে? তোমায় ধরতে পারে না পোস্টাল ইনসপেক্টার বা পুলিশ। ধরা পড়ে দোকানদাররা। নাকালের একশেষ হতে হয়। ততদিনে তুমি সকলের নাগালের বাইরে।

বিহারের যে পোস্ট অফিস থেকে বোগাস মনিঅর্ডারে টাকা পাঠালে, সেই অফিসের প্যাকারদের মধ্যে তোমার নিজস্ব লোক আছে। তাই আর দশটা মনিঅর্ডারের বান্ডিলের সঙ্গে সবার অগোচরে একসময় তোমার মনিঅর্ডারটিও চলে আসে কলকাতা, কটক, ভুবনেশ্বর, পাটনা, গৌহাটি বা শিলংয়ে। রেলওয়ে মেল সার্ভিসেও তোমার লোক বসে আছে। তাঁরাই পাঠিয়ে দেবে, বিনিময়ে মাস গেলে পঞ্চাশ ষাট টাকা তাদের হাতে চলে আসে।

এখন সবাই জানে, প্রতি মনিঅর্ডার ফর্মের তিনটি অংশ আছে। তলার সরু স্লীপটি বিট পোস্টম্যান ছিঁড়ে দিয়ে যায় প্রাপককে। মাঝের অংশটি চলে যাবে প্রেরকের ঠিকানায় ইস্যু অফিস মারফৎ। এদিকে প্রত্যেক ইস্যু পোস্টঅফিস থেকেই প্রতিদিন মনিঅর্ডার ইস্যু লিস্ট পাঠানো হয় অডিট অফিসে। সেই সঙ্গে যে পোস্ট অফিস পেমেন্ট দিচ্ছে, সেখানকার মনি-অর্ডার পেড লিস্টও নিয়মিত জমা পড়ে।

পূর্ব ভারতের পোস্টাল অডিট অফি-সটির ঠিকানা সাধারণে জানে না, জানার কথাও নয়। কিন্তু কলকাতায় ডালহৌসী স্কোয়ারে জি পি ও-র ধারে লাল বাড়ীটা তুমি তো ভাল করেই জানো। আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, মণিপুর, ত্রিপুরা, পশ্চিম-বঙ্গের হাজার হাজার বড় ছোট পোস্টঅফিস থেকে প্রতিদিন মনিঅর্ডার ইস্যু লিস্ট ও পেড লিস্টের কপি এসে এই অফিসে জমা হয়। জমা হয় প্রতিটি মনিঅর্ডার ফর্মের ওপরের বড় অংশটি, যেটি পোস্টঅফিসের ভাষায় পরিচিত পেড ভাউচার নামে। পেড ভাউচারের সঙ্গে ইস্যু লিস্ট ও পেড লিস্ট মিলিয়ে গলদটুকু আবিষ্কার করতে করতেই ছ' মাস। তখন তুমিই বা কোথায় তোমার অজিত বক্সী, শেফালি বা শেফালির ভাইরাই বা কোথায়? মাঝখান থেকে হেনস্থা হন দোকানদাররা, পোস্টম্যান ও পোস্টমাস্টাররা।

প্রসেসটা নভেল সন্দেহ নেই। কিন্তু দাদা এত পুকুর চুরি করেছ যে আমার মত চুনোপুঁটির খাবি খাচ্ছে এখন। আগে ছ'শ টাকা পর্যন্ত মনিঅর্ডার পাঠানো যেত, এখন সেটা বাড়িয়ে গভর্ণমেন্ট হাজার টাকা করেছে। কিন্তু দুশো টাকার বেশী হলেই প্রতিটি মনিঅর্ডার হায়ার ভ্যালু লিস্টে উঠছে। চেকিংয়ের কড়াকড়ি খুব। তাছাড়া খেলা তো শুধু তুমি আমি নই। তোমার ও তোমার মত গুরুদেব অজস্র চেলার গোটা দেশটা আজ ভরে গেছে। এই তো সেদিন শুনলাম খুচুড়াঙ্গা, শ্যামবাজার, দমদম, বিডন স্ট্রীট ও কাশীপুরে বেশ কয়েকটা এরকম বোগাস মনিঅর্ডার কেস ধরা পড়েছে।

না, থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাছারিকে ভয় পাই না, ও সব ট্রিকস জানা আছে। বোটা তো নির্ভেজাল মিছরির দানা, গালে পুরে রেখেছি। কিন্তু তবু, আমার একমাত্র আমি, সে তো বড় হয়ে উঠছে। এবার ক্লাস নাইন না টেনে উঠেছে। কি সুন্দর পবিত্র নিষ্পাপ মুখ। নিজেরই সন্দেহ হয়, ঐ দুটি লাল ঠোঁট, কালো কালো গম্ভীর চোখ, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একমাথা চুলওয়ালা ছেলেটা কি আমার? সর্বদাই কেমন অন্যমনা গম্ভীর। সারাদিন বইয়ে মুখ গুঁজে থাকে। ও মুখ খুললেই আজকাল ভয় পাই। ওর সামনে দাঁড়াতে আজকাল লজ্জা হয়। এত করেও বলাইদা আমি তোমার মত হতে পারলাম না। উপদেশ-টুপদেশ কেন জানি টাকরায় আটকে যায়। অথচ দেখ তোমার মত অত-খানি কৃতী না হলেও, কিছুটা তো বটেই। বিশ বছরে কৃতিত্বের সিঁড়িগুলি ধাপে ধাপে পেরিয়ে এসে আজ দেখছি সবটাই ফাঁকি। কৃতিত্বই আমাদের গ্রাস করেছে। তাই আজ আর জীবনলাল বা ননীবালার মত জগদানন্দ তাঁর ছেলেকে বলতে পারে না : তবু মানুষ হ।

—সন্দীপন

স্বাধীনতার সন্ধানে সুভাষচন্দ্র

সুভাষচন্দ্রের ৭৩তম জন্মোৎসব মহা-সমারোহে বাংলায় এবং ভারতের অন্য কোন কোন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হল। প্রতি-কৃতি বা মূর্তিতে মাল্যদান, কুচকাওয়াজ, বক্তৃতা এবং কৌমী সঙ্গীতের ছকবাঁধা কার্যসূচীর ব্যতিক্রম হয় নি। সুভাষচন্দ্রের স্মৃতি জাতির অন্তরে চিরজাগ্রত, তাঁর যাঁরা সহযোগী তাঁদের অনেকে আজও জীবিত। আর শুধু ভারতের নয় ভারতের বাইরেও সুভাষচন্দ্রের ত্যাগ, সততা, সাহসিকতা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের প্রতি অনুরক্ত দেশী ও বিদেশী মানুষের অভাব নেই। সাউথ ইস্ট এশিয়া, জাপান এবং জার্মানীর দুই অংশে যাঁরা সাম্প্রতিককালে সফর করে এসেছেন তাঁরা সুভাষচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি সেই সব দেশের মানুষদের মধ্যে যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা লক্ষ্য করেছেন তাতে বিস্মিত হয়েছেন। নেতাজীর জীবন ও কর্ম প্রসঙ্গে জাপানে চারখানি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি লিখে-ছেন সমকালীন ইতিহাসের একজন মার্কিন অধ্যাপক। ওয়েস্ট জার্মানী এবং জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক-এ সুভাষচন্দ্রের কিছু সংখ্যক প্রাক্তন সহকর্মী জার্মানী অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্রের কর্মধারা বিষয়ে গবেষণা করছেন, সুভাষচন্দ্র প্রায় দু বছর জার্মানীতে ছিলেন। বন শহরে একজন ভারতীয় একজন জার্মান এবং একজন জাপানীর সমবেত চেষ্টায় নেতাজীর এক-খানি জীবনীগ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই অনুপাতে ভারতবর্ষে, নেতাজীর স্বদেশে উল্লেখযোগ্য কোন কিছু করা হয়েছে বলা যায় না। আমরা নেতাজী জীবিত কি মৃত, এবং তিনি উপযুক্ত মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করবেন এই জাতীয় নানা উদ্ভট চিন্তায় কালহরণ করছি। নেতাজীর যে ভাবমূর্তি দেশের মানুষের মনে আছে তাকে বিকৃত করার মানুষেরও অভাব নেই, দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক কুটচক্রীরা সে বিষয়ে সদাসচেষ্ট।

এই মুহূর্তে নেতাজীর একটি যুক্তি ও তথ্যসমৃদ্ধ জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন বিখ্যাত সাংবাদিক এন জি যোগ। শ্রীযুক্ত যোগ একদা বোম্বে ক্রনিকলের সম্পাদক ছিলেন এবং পরে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সম্পাদনা করেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক' এবং 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন্ডিয়া' বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে।

নেতাজীর এই আলোচ্য জীবনী-গ্রন্থটির নাম—'ইন ফ্রীডমস কে য়েস্ট'। নেতাজী সম্পর্কে তাঁর স্বদেশে দুই জাতীয় উচ্ছ্বাস দেখা যায়—হয় হিরো-ওয়ার্সিপের মন্ত্রমুগ্ধ ভক্তিবিহ্বলতা নয়ত নেতাজীর জীবনদর্শনের ভুল ব্যাখ্যা ও বিদ্বিষ্ট মন্তব্য। তথ্যনির্ভর যুক্তিসংগত আলোচনার মাধ্যমে নেতাজীর জীবনালোচনার প্রয়াস বেশী হয়নি। তথাপি নেতাজী তাঁর দেশ-বাসীর চিত্তে সদাজাগ্রত হয়ে একটি জ্বলন্ত পাবকের মত বহ্নিমান—এই গ্রন্থের লেখক যোগ নেতাজীর জীবনের যে আলোচনা করে-ছেন তা ভক্তিরসাশ্রিত নয়, যুক্তি ও তথ্যের প্রয়োগে তিনি তাঁর মতকে সমর্থিত করার জন্য বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ ও দলিলের সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

ফরমোসার রাজধানীতে ১৯৪৫-এ নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয় এবং নানারূপ তথ্য-প্রমাণে তিনি যে নিহত হয়ে-ছেন এই সিদ্ধান্ত অনেকে, বিশেষত জাপানীরা মেনে নিয়েছেন। তথাপি অনেকের ধারণা তিনি রাশিয়ায় বন্দী হয়েছেন, চীন দেশের জেনারেল হয়েছেন, পরিশেষে সন্ন্যাসী। খেবর বলতেন নেতাজী সিনকিয়াং শহরে আছেন এবং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে বলে-ছেন যে, তাঁর সঙ্গে রীতিমত পত্রালাপ হয়ে থাকে। কয়েক বছর আগে একজন এম-পি বলেন যে, নেহরুজীর মৃত্যুর সময় নেতাজীর মত দেখতে একজন ব্যক্তি নেহরুর শেষকৃত্যে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছে সেই ব্যক্তির ফটোগ্রাফ আছে। উত্তমচাঁদ ১৯৪১-এ নাকি সারদানন্দজীকে দেখেছেন হুবহু নেতাজীর মত দেখতে। ১৯৬২-তে সুভাষ-বাদী জনতা পরিষদ সারদানন্দজীকে সুভাষ-চন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন বলেছেন। সেই স্বামীজী কিন্তু বার-বার এই ধারণার প্রতিবাদ করেছেন।

এই গ্রন্থের লেখক কিন্তু সিদ্ধান্ত করেছেন নেতাজী জীবিত নেই, তাঁর মত ব্যক্তি হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারেন না, তা ছাড়া তাঁর যা বয়স সেই বয়সে তাঁর স্বদেশ-বাসীর কাছে ফিরে আসাটাই স্বাভাবিক, তা ছাড়া স্ত্রী বা কন্যার সঙ্গেই বা তাঁর যোগা-যোগ ছিন্ন কেন? তাই তিনি মনে করে নিয়েছেন যে, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর দেহাবসান ঘটেছে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি পরলোকগত মানুষের জীবনের মূল্যায়ণ হিসাবে এই জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে বত্রিশটি পরিচ্ছেদ আছে এবং প্রতিটি পরিচ্ছেদে নেতাজীর বাল্যজীবন থেকে শুরু করে বিভিন্ন কালের উল্লেখ্য ঘটনার বিশদ আলোচনা আছে যথা: ঈশ্বর সন্ধানী শিশু, কলেজ থেকে বহিষ্কার, আই সি এস পদ ত্যাগ, সি আর দাশের শিষ্য। প্রধান কর্মাধ্যক্ষ পৌর প্রতিষ্ঠান, মান্দালয়ের বন্দী, যুবনেতা ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ইত্যাদি।

আশা করি বাঙালীমাত্রেই নেতাজীর প্রথম দিককার সমস্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত। নেতাজীর পলায়ন থেকে বিমান দুর্ঘটনার কাল পর্যন্ত যে ইতিহাস সেই ইতিহাস সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত।

বর্তমান আলোচনায় সুভাষচন্দ্রের পলায়ন, বিদেশে সুভাষচন্দ্র, এশিয়ায় নূতন কণ্ঠস্বর, দিল্লী চলো, স্বাধীনতাই তাঁর শেষ কথা প্রভৃতি পরিচ্ছেদ এবং সুভাষচন্দ্র কি ফ্যাসিস্ত, নেহরু ও বোস, এবং বোস ও গান্ধী — এই পরিচ্ছেদগুলির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব।

সুভাষচন্দ্র ১৬ জানুয়ারী ১৯৪৫-এ গৃহত্যাগ করেন। ঐ দিন তাঁর সঙ্গে মুকুন্দলাল সরকার পাঁচ ঘণ্টা আলাপ করেন, হয়ত তিনি পরিকল্পনার আভাষ পেয়েছিলেন। এই তারিখের মধ্য রাত্রে সুভাষচন্দ্র গৃহত্যাগ করেন। শিশির বসু লিখেছেন—'আমরা ঠিক ১৭ জানুয়ারীর চন্দ্র শনিবার রাত্রে গৃহত্যাগ করি। নেতাজীর অঙ্গে ছিল উত্তর ভারতীয় মুসলিমের পোশাক।' নেতাজীর শেষ কথা—

"I am off: You go back".

সুভাষচন্দ্রের এই পলায়ন সংবাদ ২৬ জানুয়ারীর পূর্বে প্রকাশিত হয় নি। এর পর একটি বছর সমগ্র ব্যাপারটি রহস্যাচ্ছন্ন

ছিল, এক বছরে জার্মান রেডিওয়ে সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল। সুভাষচন্দ্র কিন্তু রাশিয়ায় যেতে চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—

"My absolute preference is for Moscow. Only it will be easier to go to Moscow from Berlin or Rome than here. And then there is another vital consideration. The Russian Ambassador here has refused to help me and the Russian Government has refused me passage through their country. It is quite possible they may not be wanting me and may not countenance my stay in their country. At the Russian Legation, in Berlin or Rome, I will find out if they can arrange to send me to Moscow. It they refuse, I will be forced to stay on in the Axis countries".

এর পরে সুভাষচন্দ্র বলেছেন—

"To-day, Russia is the only country which can help to liberate India. No othed country will help us. This is why I do not want to go anywhere else but to Moscow".

কিন্তু এমনই অদৃষ্টের পরিহাস যে, রাশিয়া সেদিন মুখ ফিরিয়েছিল এবং সুভাষচন্দ্রকে স্বদেশের মুক্তির প্রয়োজনে 'এ্যাক্সিস কান্ট্রিজ'-এর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে।

সুভাষচন্দ্রকে অনন্যোপায় হয়ে এ্যাকসিসচক্রের সহায়তা নিতে হয়েছে এবং বার্লিন ও পরে জাপানে কিভাবে আই-এন-এ গঠিত হয়েছে সেকথা আজ আর অজানা নেই। এই পরিচ্ছেদের নাম 'এ নিউ ডন ইন এশিয়া'—

এই নতুন যুগের ভোরে সুভাষচন্দ্র শপথ গ্রহণ করেন—

"In the name of God, I take this sacred oath that to liberate India and 38 cores of my countrymen, I Subhas Chondra Bose will continue this sacred War of freedom till the last breath of my life..."

এই প্রতিজ্ঞা সুভাষচন্দ্র শেষ পর্যন্ত পূরণ করেছেন। সুভাষচন্দ্রের অস্থায়ী সরকার নয়টি রাষ্ট্রের স্বীকৃতিলাভ করেছিল এবং ব্যবস্থাপকসভায় জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো ঘোষণা করেন—

"Japan was determined to support the Provisional Government of Free India consistently in the future, and to put forth her utmost efforts for the Independence and emancipation of India".

এর পর যুদ্ধের গতি অন্য পথে চালিত হয়েছে, সুভাষচন্দ্রকে অতিশয় সংকটময় অবস্থায় সংগ্রাম করতে হয়েছে। ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ তারিখে সুভাষচন্দ্র আহ্বান জানিয়েছেন—

"Blood is calling to blood. Arise! We have no time to lose. Take up your arms. There in the front of you is the road our pioneers have built. We shall march along that road—"

সুভাষচন্দ্র সেদিন দিল্লীতে মার্চ করে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন—

"The road to Delhi is the road to' freedom. On to Delhi!"

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে জোয়ানরা সেদিন মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে অবলীলাক্রমে প্রাণ দিয়েছে। বিদেশী ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্রকে বিফল মনে হলেও সুভাষচন্দ্র সাফল্য অর্জন করেছেন এবং তাঁর আঘাতেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন সম্ভব হয়েছে। মাইকেল এডওয়ার্ডসের এই উক্তি উপেক্ষণীয় নয়।

এন জি যোগের গ্রন্থটি তথ্যসমৃদ্ধ। এর জন্য তিনি অনেক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থটির বিস্তারিত আলোচনা সীমিত স্থানের জন্য সম্ভব নয় বলে আমরা দুঃখিত। 'সুভাষচন্দ্র কি ফ্যাসিস্ত'। 'গান্ধী ও সুভাষ' ও 'নেহরু ও সুভাষ'—গ্রন্থের এই পরিচ্ছেদগুলি বিশেষ মূল্যবান।

—অভয়ংকর

IN FREEDOM'S QUEST: By N G JOG, Published by ORIENTLONGMANS! CALCUTTA, Prict 25 Rupees only.

সাহিত্যের খবর

উড়িষ্যা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী হলেও সমকালীন উড়িষ্যার সাহিত্য ও শিল্পের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। একারণে, আমাদের একালের অনেক বুদ্ধিজীবীর ধারণা, বুঝি উড়িষ্যায় নতুন সাহিত্য আন্দোলনের কোন প্রভাব নেই। ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। বরং বলা যায়, ইদানিং উড়িষ্যার সাহিত্যে একটা নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। এখন উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রান্তে সৃষ্টি হয়েছে নানা সাহিত্যিক গোষ্ঠী। প্রতিটি গোষ্ঠীর মধ্যেই চলছে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা। এরকম একটা সুস্থ সাহিত্যিক প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ লক্ষ্য করলাম গত ২৫-২৭ জানুয়ারী গঞ্জাম জেলার বহরমপুরে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ ওড়িয়া যুব লেখক সম্মেলনে।'

উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় শতাধিক তরুণ যুব লেখক, কবি ও সমালোচক এসেছিলেন এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য। এসেছিলেন উড়িষ্যার প্রতিষ্ঠিত কবি, নাট্যকার এবং সম্পাদকরা। আর উড়িষ্যার বাইরে থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক। বিকেলে 'কলা-পরিষদ' ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন কবি পি পাল। তিনি তাঁর ভাষণে সমকালীন ভারতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। সভাপতিত্ব করেন কবি ব্রজনাথ রথ। পূর্ণানন্দ দানি সম্পাদকীয় বিবৃতি পাঠ করেন। সকলকে ধন্যবাদ জানান যুগ্ম সম্পাদক সদাশিব দাস এবং অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক বসন্তকুমার পানিগ্রাহি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরেই বসে নাট্যশাখার অধিবেশন। বিষয় ছিল—'আমার দৃষ্টিতে আজকের নাটক।' প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উড়িষ্যার প্রখ্যাত নাট্যকার মনোরঞ্জন দাস। তিনি তাঁর ভাষণে বাংলাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় নবনাট্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন নাট্যকার রামচন্দ্র মিশ্র। বর্তমান ভারতীয় নাটক, বিশেষ করে ওড়িয়া নাটকের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন নিমাইচন্দ্র পট্টনায়ক, হরিহর মিশ্র, অশ্বিনী রথ প্রমুখ।

নাট্য শাখার পর আরম্ভ হয় গল্প শাখার অধিবেশন। এই অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলার আশিস সান্যাল। তিনি প্রথমেই এই ধরনের সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে ছোট গল্পের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন—'আমরা এখনও আমাদের সাহিত্যের মান প্রতীচ্য সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় নির্ধারন করি। তাই বিগত দুই শতকের ভারতীয় ছোটগল্প অনুধাবন করলে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রতীচ্যের অন্ধ অনুকরণ বা অনুসরণ। অনুবাদ করলে প্রায়শই বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। যাদের গল্পে আমাদের দেশের মানুষ বা মাটির স্পর্শ আছে, তারাই মৌলিক গল্প রচনায় সার্থক হচ্ছেন।' তিনি অনুকরণ বা অনুসরণের পথ ত্যাগ করে মৌলিক গল্প রচনা করে বিশ্বসাহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার জন্য যুব লেখকদের আবেদন জানান। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ব্রজনাথ রথ। তর্কেবিতর্কে এই অধিবেশনটি খুবই সার্থক হয়ে ওঠে। আলোচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রফুল্লকুমার ত্রিপাঠি; কে সি জেনা; প্রমোদ পাণ্ডা,

উমেশচন্দ্র পাঠি, প্রশান্ত পট্টনায়ক, উপেন্দ্র নায়ক ও আরো কয়েকজন।

২৬ তারিখ বসেছিল কবিতা শাখার অধিবেশন। বিষয় ছিল—'আমার দৃষ্টিতে আজকের কবিতা।' উদ্বোধন করেন উড়িষ্যার একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শচী রাউত রায়। তিনি বলেন, কবিরা স্বয়ম্ভু নন। তাই দৃশ্যমান বস্তু জগতের আলো অন্ধকার তাঁদের মনেও ঝংকার তোলে। তাই সোস্যাল কমিটমেন্ট কবির থাকতে হবেই।' তিনি প্রসঙ্গত কবিতায় দুর্বোধ্যতা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন কবি গোষ্ঠীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতীশ নন্দী। তিনি বলেন—'আন্দোলনের জন্য আন্দোলন একালের ভারতীয় কবিতার একটা ফ্যাসন হয়ে গেছে। কিন্তু দেখা গেছে, শুধু সাহিত্যিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা সাহিত্য-কর্মে মনোনিবেশ করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই কিছুদিন পরে কবিতার জগৎ থেকে বিদায় নেন।' প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন যে, 'কল্লোল' একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর নাম, সাহিত্য আন্দোলনের নাম নয়। হিন্দি কবি স্বদেশ ভারতী, তেলুগু কবি নিখিলেশ্বরও সাম্প্রতিক কাব্য আন্দোলনের উপর আলোচনা করেন। বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন সদাশিব দাস, প্রমোদকর মহান্তি প্রমুখ। প্রমোদ মহান্তি বলেন—'প্রায় ত্রিশ বছর আগে অন্নদাশঙ্কর রায় যা বলেছিলেন, অর্থাৎ ওড়িয়া কাব্য জগতের প্রেক্ষাপট ম্রিয়মাণ,—এখনও সে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।' অন্যান্য বক্তারা শ্রীমহান্তির বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। বিকেলের অধিবেশনের বিষয় ছিল 'একালের সাহিত্য পত্র-পত্রিকা।' এতে পৌরোহিত্য করেন রাধানাথ রথ। সন্ধ্যায় বসেছিল কবিতা পাঠের আসর।

এই সম্মেলনে আর যে সব বিশিষ্ট ওড়িয়া লেখক যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার সুরেন্দ্র মহান্তি, কবি সীতাকান্ত মহাপাত্র, সৌভাগ্য মিশ্র, বিবেক জেনা, সমালোচক কৈলাশ লেংকা, সত্য মহাপাত্র প্রমুখ বিশেষ উল্লেখ্য। এই সম্মেলনে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, আমরা ওড়িয়া সাহিত্য সম্বন্ধে জানি বা না জানি, ওড়িয়া লেখক-দের অধিকাংশই বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ খবর রাখেন। কয়েকজন ওড়িয়া লেখক, এখন বাংলা দেশে কে কেমন লিখছে, এ নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করলেন, ঠিক যেভাবে একটা কফি হাউসে বা সাহিত্য সভায় আমরা আলোচনা করে থাকি। আর একটা খবর পেলাম, পূর্বাঞ্চলীয় সাহিত্য সম্মেলনের জন্য ওড়িয়া যুব লেখকরা অগ্রণী হয়েছে। কৈলাশ লেংকাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করে একটি কমিটিও গঠিত হয়েছে। আগামী ১৫ ও ১৬ মে পুরীতে এই সম্মেলন হবে। বাংলা, আসাম ও বিহারের কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক এতে যোগ দেবেন বলে জানা গেছে। আশা করি, এভাবেই ভারতীয় লেখকরা একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে পারবেন।

পাভেল ভেজাইনভ বুলগেরিয়ার অন্যতম ঔপন্যাসিক। তাঁর উপন্যাসে বুল-গেরিয়ার বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। সম্প্রতি 'নীল প্রজাপতি' নামে তাঁর একটি বই বেরিয়েছে। এই বইটি আসলে চারটি 'সাইন্স ফিকসনে'র সংকলন। কিছুদিন আগে 'বুলগেরিয়ান লিটারেচার' নামক পত্রিকায় এই সম্পর্কে পাভেলের একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। অনেকে 'সাইন্স ফিকসন' বিচারে একটা স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করেন। কিন্তু পাভেল সেই প্রবন্ধে লিখেছিলেন—'তাঁর মতে 'সাইন্স ফিকসন' অন্য পদ্ধতিতে সমালোচনা করা উচিত নয়। যথার্থ সাহিত্য যে মানদণ্ডে বিচার করা হয়, সাইন্স ফিকসনেকেও সেই মানদণ্ডেই বিচার করা উচিত।' অর্থাৎ সাইন্স ফিকসনও যে সাহিত্য এবং এই ধরনের উপন্যাস বা গল্পের যে একটা সাহিত্যিক মর্যাদা আছে, তা অনস্বীকার্য। পাভেলের এই গ্রন্থে তা পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে। গ্রন্থের প্রথম গল্পটির নাম 'শরৎ মধ্যাহ্নে একটি রাস্তায়।' গল্পটির মধ্যে এক ধরনের একটা অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তিনি দেখিয়েছেন সভ্যতা আমাদের সময়ের চেয়ে অভিজ্ঞ। অন্যান্য গল্পগুলিতেও বিজ্ঞানের সঙ্গে মানবিক সহানুভূতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

আলবেয়ার কামুর রচনাবলী খুবই সুসংবদ্ধ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। রচনাসচেতন মনের প্রয়াস বলে তাঁর একটি লেখার সঙ্গে অন্য একটি লেখার ক্রমপরিণতি সহজেই অনুভব করা যায়। উপন্যাসে তাঁর যে চিন্তা প্রতিফলিত, সেই সময়ে লেখা প্রবন্ধগুলিতেও তার অনুরণন দেখা যায়। সম্প্রতি কামুর প্রবন্ধাবলীর একটি ইংরেজি অনুবাদ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এতে রয়েছে কামুর তিনটি প্রবন্ধ বইয়ের অনুবাদ এবং বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যে সব সমালোচনা বা প্রবন্ধ লিখেছেন, তার সংকলন। প্রবন্ধ গ্রন্থ তিনটি হল—'দি রঙ সাইড এণ্ড দি রাইট সাইড' (১৯৩৭), 'নুপিটলস' (১৯৩৮) এবং 'সামার' (১৯৫৪)। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে কামুর জীবন দর্শনের একটা দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি যদিও ফরাসী সাহিত্যের উত্তরাধিকারের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, তবু কখনও ফরাসীদেশকে তাঁর রচনার পটভূমি হিসেবে মেনে নিতে পারেন নি। যদিও জাতিতে তিনি ছিলেন এবং স্পেনীয় ও ফরাসী রক্ত ওঁর দেহে সঞ্চারিত ছিল, তবু আফ্রিকার যে উত্তর উপকূলে তিনি বাস করতেন, তাকেই শ্রদ্ধা করতেন জন্ম-ভূমি হিসেবে। এই কারণেই আলজেরিয়ার যুদ্ধ তাঁর মনে এত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে-ছিল। তিনি আরও বলিষ্ঠভাবে কেন আলজেরিয়ার যুদ্ধকে সমর্থন করছেন না, এই নিয়ে তাঁকে অনেক সমালোচনা করা হয়েছিল। এখানেই ছিল তাঁর দুর্বলতা। তিনি মনে-প্রাণে ঔপনিবেশিকতার বিরোধী হলেও এমন কোন পথ গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন, যা তাঁকে চির-দিনের মত নির্বাসনে রাখবে। 'দি রঙ সাইড এণ্ড দি রাইট সাইড' গ্রন্থে তিনি বলেছেন—'জীবনের প্রতি হতাশা না থাকলে কখনও ভালবাসাও হতে পারে না।' তাঁর 'দি স্ট্রেঞ্জার' উপন্যাসেও এই কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ঐ উপন্যাসের নায়ক এক রূপসী বান্ধবীর সঙ্গে সমুদ্র স্নানে গিয়েও পৃথিবীর সহজাত কয়েকটি ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন থাকে। কামুর সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠকদের কাছে এই অনূদিত গ্রন্থটি বিশেষ সমাদর লাভ করবে বলে আশা করা যায়, গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন ফিলিপ থাডি এবং মূল ফরাসী ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন এ্যালেন সি কেনেডি।

মৈথিলি সাহিত্যে জীবকান্ত এখন একটি উল্লেখযোগ্য নাম। কবি, গল্পকার এবং প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি নিজেকে একটি বিশিষ্ট স্থানে অধিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি রাজ-কমল চৌধুরীর ধারায় লেখেন। রাজকমল চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও ছিল খুব। তাঁর লেখা 'দু কুজেসকা বাত' উপন্যাসটিই তাঁর খ্যাতির অন্যতম কারণ। জীবনকে যেভাবে দেখেছেন, ঠিক সেই-ভাবেই তার বর্ণনা দিতে চেয়েছেন লেখক। কাহিনী অংশ গড়ে উঠেছে দুটি ছাত্রের দারিদ্র্য এবং সেই সঙ্গে যৌন জীবনকে কেন্দ্র করে। কিন্তু কাহিনী যাই হোক, লেখার গুণে উপন্যাসটি মৈথিলি সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট উপন্যাসের স্বীকৃতি পেয়েছে। জীবকান্তের ছোটগল্প এবং কবিতাও একালের মৈথিলি সাহিত্যের অন্যতম আকর্ষণ।

কবিতার মিনি বই

বাংলায় মিনি পত্র-পত্রিকার খবরের মতোই সম্প্রতি মস্কো থেকে এ পি এন সোভিয়েত কবিতার মিনি বই-এর খবর দিয়েছে। তুর্কমেনিয়ার আশখাবাদে একজন শিল্পী পর পর কবিতার মিনি বই প্রকাশ করে চলেছেন। এঁর নাম হল ভ্যালেন্তিন কোগানিন। ইনি একজন গ্রাফিক শিল্পী। প্রথমে তিনি বার করেন তুর্কমেন সাহিত্যের স্মরণীয় কবি মাহতুম কুলির কাব্যের একটি মিনি সংস্করণ। এ বইটির আকার একটা দেশলাই বাক্সের মতো। কবিতার পাঠের সঙ্গে শিল্পী ছবি এঁকে ধাতুর পাতের ওপর প্রথমে এনগ্রেভ করে নেন, পরে তা থেকে বহু কপি বই ছাপা হয়। সম্প্রতি এই শিল্পী প্রকাশ করেছেন মিনি-সংস্করণে মায়াকভস্কির কাব্য। বইটির আকার ৩×২·৫ মিলিমিটার। স্বভাবতই, এ বই থেকে কবিতা পড়তে গেলে আতস কাঁচের সাহায্য লাগবে। প্রকাশিত আরও একটি মিনি-সংস্করণ কাব্য হল তুর্কমেন কবিতার সংকলন, ২০ জন কবির কবিতা ও ১৩টি চিত্রাংকন এতে রয়েছে। আকার ৩×২·৫ সেন্টিমিটার। ইউএনইনের বিখ্যাত কবি ডায়াস শেভচেন্কোর 'অনুজা' কাব্যটির মিনি সংস্করণ এর থেকে ছোট,— ১·৫ বর্গ সেন্টিমিটার।

নতুন বই

প্রফেসর ঃ যোশেফ মুন্ডশশেরি। নিলীনা আব্রাহাম অনূদিত। মাটির কুটিরে— মিহাইল সাদোভেয়ানু। অমিতা রায় অনূদিত। প্রকাশক ঃ সাহিত্য আকাদামি, ফিরোজ শাহ রোড, নিউ দিল্লী—১। দাম যথাক্রমে চার টাকা পঞ্চাশ এবং তিন টাকা পঞ্চাশ।

মালয়ালম সাহিত্য সম্পর্কে বাঙালী পাঠকের ধারণা খুব সামান্যই। তার সবচেয়ে বড় কারণ অবশ্য ভাষার পাঁচিল। নিছক সাহিত্য পাঠের অভিলাষে এ পাঁচিল লঙ্ঘনের উৎসাহ স্বভাবত সুলভ নয়। সে কারণেই সাহিত্য আকাদমির ভূমিকা এক্ষেত্রে অভিনন্দনযোগ্য। সেই সঙ্গে তার দায়িত্বও বিরাট। প্রফেসর উপন্যাসটির লেখক শ্রীযোশেফ মুন্ডশশেরি একজন সমালোচকরূপেই মালয়ালম সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু তিনি যে উপন্যাস রচনাতেও সিদ্ধহস্ত, তার প্রমাণ 'প্রফেসর' এবং এর জনপ্রিয়তা। এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। স্থানীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের এক দরিদ্র শিক্ষাব্রতী এর নায়ক। মানুষ এবং আদর্শবান চরিত্র হিসেবে তার টিকে থাকবার কঠিন সংগ্রাম এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রের আনাচে-কানাচে কাহিনীটি উপন্যাসটি পূর্ণ। সেই সঙ্গে লেখক লেখনীর এবং সামাজিক পটভূমিও এত উজ্জ্বল ও স্পষ্ট যে পাঠক অভিভূত না হয়ে পারেন না। স্বভাবত খৃষ্টীয় সামাজিক সমস্যার পাশাপাশি বেসরকারী কলেজের হৃদয়হীন অব্যবস্থার চিত্র লেখক এঁকেছেন। পড়তে-পড়তে ভৌগোলিক-সামাজিক দূরত্ব ডিঙিয়ে নিঃসঙ্গ প্রফেসর গোপাল একজন বাঙালী দরিদ্র শিক্ষাব্রতী হয়ে ওঠেন এবং এখানেই এ উপন্যাসের সার্থকতা। শ্রীমুন্ডশশেরি যে একজন সমাজসচেতন এবং আদর্শবাদী লেখক, তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন। অনুবাদ মোটামুটি সচ্ছন্দ। প্রচ্ছদটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুন্দর।

মাটির কুটিরে প্রখ্যাত রুমানিয়ান লেখক মিহাইল সাদোভেয়ানুর 'বোর্দেইএনী' উপন্যাসের অনুবাদ। রুমানিয়ার বৈচিত্র্যময় পল্লীপ্রকৃতি ও মাটির কাছাকাছি-থাকা মানুষের কাহিনী এতে বিধৃত। সভ্য-জগতের অনেক দূরে এক অনাবাদী জলা-ভূমি—যেখানে আইন নেই, আছে শুধু বর্বর জমিদারী শাসন এবং মালিকানা। অথচ রুজিরোজগারের টানে সেখানে ছুটে আসে সব বুভুক্ষু মানুষ। দাস হয়ে জমিদারের ক্ষেতে ফসলের কাজে খাটে। পশুর মত গাদাগাদি খোঁয়াড়ে বাস করে। উন্মূল হতভাগ্য এই সব মানুষ প্রচণ্ড তুষারঝড় আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে যে ফসল তোলে, তার মালিক জমিদার। এবং এই দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও তারা নারীকে ভালবাসে, ঘর বাঁধে, জীবনের গান গাইতে চেষ্টা করে। নিংসা এই উপন্যাসের নায়ক। সে একদিন বুভুক্ষাতাড়িত হয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। নাস্তাসা নামে এক বুড়ো চাষী তাকে কাজ জুটিয়ে দেয়। নাস্তাসার মেয়ে মারিওলিসাকে সে ভালবেসে ফেলে। নিংসা সুদর্শন প্রকৃতির যুবক। জমিদারের কর্মাধ্যক্ষ দুর্নীতির বাসিলোপোলোকে সে ছেড়ে কথা বলে না। অথচ একদিন প্রচণ্ড তুষারঝড়ের মধ্যে দেখা গেল সৎ নির্ভীক যুবক নিংসার প্রাণ বাঁচাল সেই বাসিলোপোলই! এখানেই লেখকের মানুষ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় স্পষ্ট। উপন্যাসটি বাঙালী পাঠকের কাছে এক আশ্চর্য উপহার। রুমানিয়ান চাষীদের সঙ্গে বাংলা দেশের চাষী একাত্ম হয়ে ওঠে বারবার একই আদিম জীবনসংগ্রাম, কর্মনিষ্ঠা, সরলতা, প্রেম, কামনা-বাসনা। অনুবাদ প্রাঞ্জল সন্দেহ নেই। প্রচ্ছদও রুচিসম্মত এবং নিরাভরণ। সাহিত্য আকাদমি নিঃসন্দেহে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

●

হেরাই ঃ (উপন্যাস)—শৈলেন রায়। বাক-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯। দাম ঃ নয় টাকা।

পুরনো কলকাতার জীবন নিয়ে উপন্যাসটির সূত্রপাত। সামাজিক জীবনে তখন ক্রান্তিকাল। ভাঙা-গড়ার খেলা চলছে বাংলা তথা কলকাতার সমাজে। জমিদারী আভিজাত্যের অবক্ষয়ের আলোয় জেগে উঠছে ইংরেজীশিক্ষিত নতুন সম্প্রদায়। এই সময় ও পটভূমিকার আশ্রয়ে উপন্যাসটির চরিত্রগুলি রূপ নিয়েছে। নায়ক মহিম চৌধুরী বিলাসে বেপরোয়া সন্তান। তার মাতুল ইংরেজীশিক্ষিত বিদ্বজ্জন মানুষ। এই উভয় ধারার প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় তাঁর চিন্তাধারা ও আচরণ প্রতিফলিত।

লেখক শ্রীশৈলেন রায় ঐ একই বিষয় নিয়ে হয়ত একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে ফেলতে পারতেন। লেখক কিন্তু কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করে সময়োপযোগী ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাঁর গতিশীল ও আকর্ষণীয় উপস্থাপনার বিবিধ আবহে উপন্যাসটি সুখপাঠ্য। মাঝে-মাঝে সন্দেহ জাগে লেখকের আবেগ ও ভালোবাসায়। সে কৈশোর বয়স থেকে বিভিন্ন বয়সী কয়েকটি মেয়ের সান্নিধ্যে এসেছে। তাদের মধ্যে এক-জন তার স্ত্রী হয়েছে পরবর্তীকালে। অন্য একজনের সঙ্গে বিবাহ অসম্ভব জেনেও দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

উপন্যাসটির ভাষা চমৎকার, কাহিনী চিত্তাকর্ষী। মাঝে-মাঝে অজস্র ছোটগল্পের উপস্থিতি পাঠককে বিস্মিত করে। চরিত্র ও বিষয়ের উপযোগী সংলাপ ব্যবহারে লেখকের কৃতিত্ব লক্ষণীয়।

●

ধানসিঁড়ি ঃ (২য় সংকলন) — ১৩৭৬ ঃ সম্পাদক—সুভাষরঞ্জন বসু। সহযোগী সম্পাদক—অমলকৃষ্ণ বসু ও পিনাকী-প্রসাদ ধর। প্রকাশনা দপ্তর—২।১১ গান্ধী কলোনী, পোঃ রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা—৪০। দাম উল্লেখ নেই।

দীর্ঘ এক বছর পরে ধানসিঁড়ি দ্বিতীয় সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় সেবাব্রত চৌধুরীর 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য' নামক প্রবন্ধটি সুলিখিত। জ্যোতি-র্ময় চট্টোপাধ্যায় কাওয়াবাতা ইয়াসুনারীর 'হাউস অব দি স্লিপিং বিউটিস' এই সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক অনুবাদ করছেন। বাসব বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত লিখেছেন—দুটি নতুন স্বাদের গল্প। কয়েকটি কবিতা লিখেছেন রাজেশ্বর হাজরা, সুভাষরঞ্জন বসু, পিনাকী-প্রসাদ ধর, সঞ্জিতা দাশ, অরুণেশরঞ্জন চট্টো-পাধ্যায়, রমা ভট্টাচার্য। রিলকের একটি কবিতা অনুবাদ করেছেন ভাস্কর গুপ্ত। সম্পাদকীয়তে লেখা আছে—'গত সংখ্যার প্রতিশ্রুতির পর এর কোন প্রয়োজন ছিল কিনা এ প্রশ্নটি স্বাভাবিক।' এই মন্তব্যটুকুর অর্থ বোধ হয় গত সংখ্যায় নিম্নমানের রচনা ছিল, এই সংখ্যায় কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হয়েছেন রচনার মান নির্ণয়ে। এ সংখ্যাটি পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

●

হিমবন্ত ঃ (ইংরাজী মাসিক বুলেটিন) —সম্পাদক ঃ কমলকুমার গুহ। প্রকাশক হিমালয়ান ফেডারেশন। ৬ বালীগঞ্জ টেরেস। কলকাতা—১৯। দাম প্রতি সংখ্যা ১৫ পয়সা মাত্র।

কলকাতার হিমালয়ান ফেডারেশন পর্বতারোহণ উৎসাহীদের একটি উল্লেখ-যোগ্য প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র 'হিমবন্ত'। এই পত্রিকাটি 'বুলেটিন' জাতীয়। প্রতিটি সংখ্যায় অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হিমালয় আরোহণ সম্পর্কীয় তথ্যাবলী থাকে। গত ডিসেম্বর মাস থেকে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'দি হিমালয়াস্ ঃ ইন্ডিয়াস আর্ধাজ অ্যান্ড

হেভেনলি হেরিটেজ' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য আচার্য সুনীতিকুমারের এই প্রবন্ধটির মূল্য অসীম। এই প্রবন্ধে তাঁর সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় আর পাওয়া যায় অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান। 'টুরিজম ইন ইন্ডিয়া' আরেকটি মূল্যবান প্রবন্ধ। ম উন্টেইয়ারীং নিউজ এবং ইউনিট নিউজ পর্বতারোহীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্যে পরিপূর্ণ। পত্রিকাটি সুমুদ্রিত এবং সুসম্পাদিত।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

শুকসারী (শীত সংখ্যা ১৩৭৬)—সম্পাদক মিহির আচার্য। ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা—১৪। দাম ঃ এক টাকা।

দু বছর ধরে নিয়মিত বেরোচ্ছে শুকসারী। ছোটগল্পের পত্রিকা হিসেবে সুনামও পেয়েছে পাঠকমহলে। এর প্রায় প্রতিটি সংখ্যাই কোন-না-কোন কারণে 'বিশেষ সংখ্যা'। দেশী-বিদেশী সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা ছোটগল্পের সাম্প্রতিক ছবিটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন সম্পাদক। এ সংখ্যার গোড়াতেই ছাপা হয়েছে গত বছরে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখকের নাম। প্রথম প্রবন্ধ চন্ডী মন্ডলের 'তরুণ লেখকের চোখে শারদীয় গল্প'। হাইনরিষ বোল-এর একটা গল্পের অনুবাদ ছাপা হয়েছে। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন হিমাংশু রায়, অলককুমার চৌধুরী, রমেন চক্রবর্তী, পরিমল গুপ্ত, উৎপলকুমার গুহ, অ্যালান মার্শাল, মনোতোষ সরকার, পল্লব সেনগুপ্ত ও গৌতম গুহ। সাহিত্যপাঠকের কাছে পত্রিকাটির অধিকতর প্রচার কাম্য।

অনুবাদ কী ?

'অনুবাদ মাছিমারা ভাষান্তকরণমাত্র নয়, অনুবাদ হল গিয়ে ব্যাখ্যা। অনুবাদ খবর জানায় না, মতামত দেয়; কোনো শিল্পকৃতির উপর এ হঠাৎ-হঠাৎ আলো-ছায়ার ঝলকানি লাগায়।' সোভিয়েত সাহিত্যের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অনুবাদক সম্মেলনে বিশিষ্ট সোভিয়েত কবি সোমিয়ন কিরসানোফ এই মন্তব্য করেন।

সোভিয়েত লেখক সংঘের উদ্যোগে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয় মস্কোয়। ইয়োরোপ, এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার অন্ততপক্ষে ত্রিশটি দেশের লেখকরা এতে যোগ দেন। সোভিয়েতের এবং আগন্তুক ভিন্নদেশী লেখক-অনুবাদকদের মধ্যে সাহিত্যের অনুবাদ সম্পর্কিত নানা সমস্যার আলোচনাই ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

প্রথম দিনের অধিবেশনে বিগত কয়েক বছরের রুশদেশী গদ্য-পদ্য বিষয়ে দুটি বিস্তারিত বিবরণী উপস্থাপিত হয়। পরের অধিবেশনগুলি হরেক আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। এর মধ্যে কয়েকটি অধিবেশন আধুনিক সোভিয়েত সাহিত্যের ভাষা ও রচনাশৈলীর নানা সমস্যা নিয়ে পরস্পর মত-বিনিময়ে ব্যয় হয়। সুপরিচিত সোভিয়েত ভাষাবিদরা এক্ষেত্রে নতুন বিকাশ ও মূল ধারাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন।

অপর একটি অধিবেশনের সূত্রপাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের এলিসবার অ্যানানিয়াশভিলি ও মোজগোলিয়ার পিপলস রিপাবলিকের বাজারিন দাশতসেরিন গদ্য ও কবিতা উভয় সাহিত্যকৃতির 'অনুবাদ-যোগ্যতা' বিষয়ে প্রচলিত মতটি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পর সেটিকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। এলিসবার অ্যানানিয়াশভিলি জানান যে তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে পূর্বোক্ত মতটি যে বারে বারে খণ্ডিত হয়েছে তা বলতে পারেন। তিনি আরও বলেন, সোভিয়েতের অনুবাদের ভাষান্তরকর্ম ইতিমধ্যে বহুবার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং অতি সম্প্রতি রুশভাষায় মহাকবি দান্তের রচনাবলী অনুবাদের জন্যে সোভিয়েতের জনৈক কবি ইতালির একটি পুরস্কার অর্জন করেছেন। বাজারিন দাশতসেরিন জানান তাঁর দেশে বিভিন্ন দেশের সাহিত্য-কর্মের তর্জমা ব্যাপক হারে হয়ে চলেছে।

বিদেশী সাহিত্যকীর্তি যে সম্পূর্ণ অনুবাদযোগ্য এ বিষয়ে সমর্থন জানিয়ে আরও যেসব বক্তা বলেন তাঁদের মধ্যে ইতালির শলাভ ভাষাবিদ ও অনুবাদক অধ্যাপক এরিদানো বাজ্জারেলাল, বুলগারিয়ার লেখক নাইদেন ভাইলচেফ, জার্মান ভাষায় কবিতা অনুবাদে বিশেষজ্ঞ পূর্ব জর্মানীর হিউগো হিউপার্ট ও ফ্রান্সের লিয় রোবেল উল্লেখযোগ্য।

এরপর কয়েকদিন ধরে 'গোল টেবিল'-এর চারপাশে অনুবাদকর্মের সম্ভাব্য নানা রীতি-পদ্ধতি ও ধরনধারন নিয়ে তুমুল বিতর্ক জমে ওঠে।

এরই মধ্যে সেমিয়ন কিরসানেফ একদিন বক্তৃতা দেন। তিনি আরও বলেন, 'নিছক সংবাদের তর্জমা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ব্যাখ্যা পর্যন্ত নানা জাতের অনুবাদকর্মের দরকার আছে। এদের প্রত্যেকেরই অস্তিত্বের অধিকার আছে।' অবশ্য এই সংগে শেষোক্ত ধরনের অনুবাদের প্রতিই যে তাঁর পক্ষপাতিত্ব তা তিনি গোপন করেননি।

কিরসানোফের সংগে অন্য সকলেই যে একমত হলেন, তা অবশ্য নয়। অনেকে বললেন, অনুবাদককে মূল রচনার প্রতি, তার কথাবস্তু ও আঙ্গিককে একেবারে অদ্বৈত সত্তা ধরে নিয়ে তার প্রতি, সর্বপ্রকারে অনুগত থাকতে হবে। এ প্রসংগে লেনিনগ্রাদের অধ্যাপক ইয়েফিম এত্‌কিনদ আন্না আখমাতোভার একটি ছোট্ট কবিতার মূল ও জার্মান ভাষা দুটি পড়ে শোনান। এই তুলনামূলক পাঠের ফলে দেখা গেল, অনুবাদক তর্জমায় কবিতার অন্ত্যমিল বর্জন করায় মূলের কাব্যিক সারবস্তুটুকুই বর্জিত হয়েছে। আবার, ওই সংগে উইয়েসবাডেনে প্রকাশিত তাখমাতোভার অপর কয়েকটি কবিতার অনুবাদ থেকে দেখালেন যে এর ঠিক বিপরীত কারণে শেষোক্ত কবিতাগুলি ক্ষুন্ন হয়েছে। সেক্ষেত্রে অনুবাদক কাব্যবস্তুকে উপেক্ষা করে কবিতার শরীরের দিকে অতিরিক্ত মনোযোগী হওয়ায় অঘটন ঘটেছে।

সম্মেলনে ইংরেজ অনুবাদক অ্যান্টনি প্যাটম্যান বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানান যে তর্জমার সময়ে প্রাথমিক কাজটি হল, মূল রচনার লেখকের রচনাশৈলীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি কী তাই খুঁজে বের করা। তিনি বললেন, ওই মুখ্য ব্যাপারটিকে ঠিকমতো প্রতিফলিত করার জন্যে অপরাপর গৌণ বিষয়কে বর্জন করতে হবে।

সোভিয়েত আজারবাইজানের মির্জা ইব্রাহিমফ স্বীয় অভিজ্ঞতার বিশাল ভাণ্ডার উন্মোচিত করে প্রমাণে সচেষ্ট হন যে, কথাবস্তু ও রচনারীতি উভয় দিক থেকেই যথাযথ ও যথোপযুক্ত অনুবাদকর্মের যোগান দেওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। এছাড়া আরও বহু বক্তা অনুবাদের যথাযথ রূপ ও বিশ্বস্ত অনুবাদ বলতে কী বোঝায়, কীভাবেই তা অর্জন করা সম্ভব, ইত্যাকার নানা সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহিত্য অনুবাদ কাউন্সিলের সভানেত্রী ইভগেনিয়া কালাশনিকোভা সঠিকভাবেই নির্দেশ করলেন যে অনুবাদের ক্ষেত্রে যথাযথ রূপ ও সাহিত্যসৌন্দর্যকে দুই পরস্পরবিরোধী ব্যাপার বলে গণ্য করা উচিত হবে না। তাঁর মতে অনুবাদকের দায়িত্ব হল, বিদেশী ভাষায় লেখা সাহিত্যকর্মকে নিজ ভাষায় পুনর্সৃষ্টি করা এবং এই পুনর্নির্মাণের কাজে মূল রচনার আঙ্গিক ও কথাবস্তুর ঐক্য সর্বপ্রকারে রক্ষা করা।

শেষে পোলান্ডের জাইগমুন্ট স্টোবেরস্কি সাধারণভাবে অনুবাদকর্মের ব্যাপকরীতির উচ্চপ্রশংসা করেন এবং আবেগের সংগে বলেন, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও বিশ্ব-সংস্কৃতির বিকাশে অনুবাদের ভূমিকা যথার্থই মহনীয়।

বইকুণ্ঠের খাতা

ব্যক্তিত্বের বিপর্যয় ও একালের একটি উপন্যাস

অন্যতম প্রিয় লেখক হলেও মাঝখানে দু-তিন বছর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা বেশী পড়িনি। মানে পড়া হয়ে ওঠেনি। বছরখানেক ধরে আবার পড়ছি। মনে হচ্ছে তিনি পাল্টে যাচ্ছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসের সুর এবং স্বাদ দুই-ই পালটে যাচ্ছে। বাস্তবের মাটিতেই হাঁটছেন। চোখে স্বপ্নের বিষাদ এবং উজ্জ্বলতা। যুক্তি আর মেধাকে ছাপিয়ে উঠেছে হৃদয়। শব্দের ব্যবহারে অনেক সতর্ক, শাণিত ও প্রখর। যন্ত্রণায় অস্থির, কম্পিত এবং নিদ্রাহীন। আবরণ উন্মোচন করছেন একেকটি স্বপ্নের, যার অন্য নাম স্মৃতি, যা ছিল এককালে বাস্তব, সেই জগতের আলোকে জেগে উঠছেন তিনি। হৃদয় দিয়ে শুনেছি সেই জাগরণের সংবাদ। অন্যভাবে বলা যায়, আমি স্বতন্ত্রভাবে তাঁকে উপলব্ধি করছি।

অমৃতে ধারাবাহিক বেরোচ্ছিল 'আলোকপর্ণা।' শারদীয়ায় লিখলেন 'কাচের দরজা।' প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয় উপন্যাসটি আকারে ছোট। 'আলোকপর্ণা'র জনপ্রিয়তা দেখেছি প্রকাশের সময়। পাঠকের মনোযোগকে প্রায় প্রতিক্ষণ নিজের দিকে ধরে রাখতে পেরেছিলেন নারায়ণবাবু। 'কাচের দরজা' পড়ে আমি বিস্মিত এবং মুগ্ধ হয়েছিলাম। জনৈক শক্তিমান তরুণ সাহিত্যিকের মতে, 'কাচের দরজা' নারায়ণবাবুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এবং ঊনসত্তরের শারদীয়ায় এর চাইতে ভালো উপন্যাস আর একটিও বেরোয়নি।

তাঁর প্রথম গল্প 'নিশীথের মায়া' আমি পড়িনি। বেরিয়েছিল পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দেশ' পত্রিকায়। সে সময়ে তাঁর প্রিয় লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। জীবনের প্রতি ভালোবাসা, মাটি ও মানুষের প্রতি গভীর আগ্রহ এবং শিল্পীর সহজাত নিরাসক্তি তাঁর প্রায় সমস্ত রচনার অবয়ব নির্মাণের সাধারণ উপাদান। জীবনদৃষ্টির দিক থেকে তিনি ছদ্ম-রোম্যান্টিক নন, জন্ম রোম্যান্টিক এবং আশাবাদী। গত বছর শারদীয়া 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত 'দেবদাস ও তিতির' গল্পটির আলোচনা প্রসঙ্গে নারায়ণবাবু বলেন, 'একবার একটা তিতির আমার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। তখন ছিলাম বৈঠকখানার বাড়ীতে। শহরে তিতির থাকার কথা নয়। বোধহয়, কেউ নিয়ে এসেছিল। উড়ে এসে আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। তাকে আমি পোষ মানাতে চেয়েছিলাম। পারিনি। লোহার খাঁচায় মাথা ঠুকে মরেছে। এই বাস্তব ঘটনা থেকেই গল্পটি লেখা। আমরা বসে বসে মার খাচ্ছি। ও হার মানেনি।'
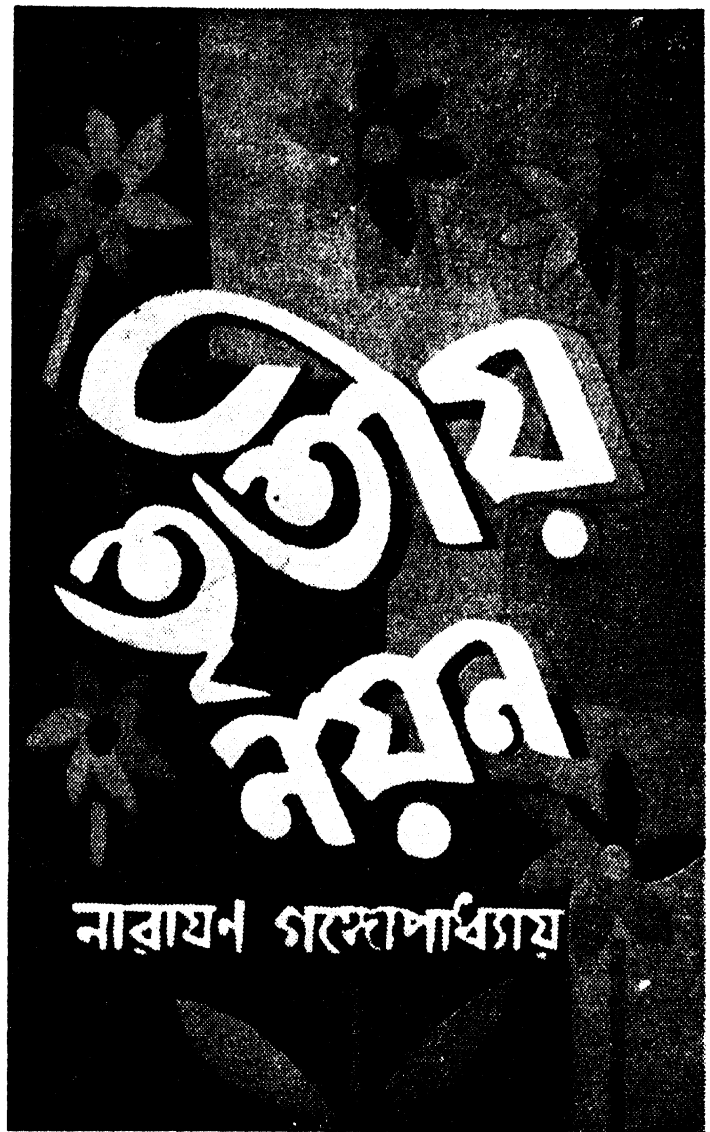
এই যন্ত্রণাই তাঁকে অনেক প্রখর, দীপ্তিমান, এবং কখনো কখনো বিষণ্ণ করেছে। জটিল মানবমনের স্বারোদ্ঘাটনেও তিনি এখানে সুনিপুণ। ভাষারীতিতে তার প্রতিফলন ঘটেছে স্বাভাবিক কারণেই।

তা ছাড়া নারায়ণবাবু সতর্ক শিল্পী। বিষয়-উপযোগী কাহিনীর কাঠামো নির্মাণে সব সময়ই তৎপর। এটা লক্ষ্য করেছি যেমন গল্পের ক্ষেত্রে, তেমনি উপন্যাসের ক্ষেত্রে। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাস 'তৃতীয় নয়ন', যা আমি এখানে আলোচনা করছি, আঙ্গিক প্রকরণে আলাদা রকমের। এ উপন্যাসের চারটে অংশ। প্রতিটি অংশের নাম আলাদা। যথা—একঃ ইন্দিরার রাত; দুইঃ ধীরাজের সকাল; তিনঃ ভূপেশের সন্ধ্যা; চারঃ ধারোয়া নদীর ধারেঃ ধীরাজঃ ভোর। অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আবর্তিত হয়েছে তিনটি মানুষের অতীত-বর্তমান। সকলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইন্দিরা। ইন্দিরাই এখানে প্রধান। সে প্রকাশিত হয়েছে নিজের এবং ধীরাজ-ভূপেশের মধ্য দিয়ে।

উপন্যাসটির শুরুতেই ইন্দিরার স্বগতোক্তিঃ 'বুঝতে পারছি, আজও আমার

ঘুম আসবে না। সেই কলকাতার এক-একটা অসহ্য রাত্রির মতো আমি বারে বারে এপাশ ওপাশ করব, মাথার বালিশ বারে বারে উল্টে নেব— মিনিটখানেক ঘাড়ের কাছটা একটু ঠান্ডা মনে হবে, হবে, তারপরেই যেন আগুন ছুটতে থাকবে বালিশের তুলো থেকে।...এই ইন-সমনিয়াটা কয়েক মাস ধরেই ছিল না। কিন্তু এই নতুন জায়গায় এসে, এই অন-ভ্যাসের বিছানায় সারা রাত আমাকে জেগে থাকতে হবে।...এই বাড়ির গেটের সামনে যে ইউক্যালিপটাসের গাছ দুটো রয়েছে, বিকেলেও এক জোড়া দোয়েলকে ওড়াউড়ি করতে দেখেছি তাদের ওপর। হয়তো যন্ত্রণাভরা জেগে-থাকা রাতটা আমার শেষ হলে, ওদের ডাকেই ভোরবেলায় আমার মৃত্যুর মতো আচ্ছন্নতা ঘনিয়ে আসবে।... ঘুমের ওষুধটা সঙ্গে থাকলে কাজ দিত।... ছোট ছোট পাখির ডিমের মতো গড়নের—ঘন নীল রঙের এই ট্যাবলেটগুলোকে আশ্চর্য ভালো লাগে আমার। ওদের রঙে সমুদ্র আছে, আকাশ আছে।...মরবার কথা এখন আমি ভাবছি না, আরো অনেক—অনেকদিন বেঁচে থাকব।...বেঁচে থাকব এই জন্যেই যে আকাশ-আলো-বৃষ্টি-গান— এরা এখনো আমার কাছে ফুরিয়ে যায়নি।...আমার স্বামীর জীবনে আমি এভাবেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমার কাছ থেকে তাঁর কিছু পাবার নেই, কিন্তু আমার সেবা করে, চিকিৎসা করিয়ে, আমার ভাবনা ভেবে তাঁকে খুশি হতে দেখেছি। তিনি পণ্ডিত মানুষ...কোনো নতুন চিন্তা যখন তাঁর মনে আসে, চোখ জ্বলজ্বল করে—আমি যার কিছুই প্রায় বুঝতে পারি না, সেই সব কথা আমাকে বোঝাতে বোঝাতে যখন তিনি এত বড় হয়ে যান যে, মনে হয় ঘরে মধ্যে তাঁকে আর ধরছে না...'

দাম্পত্য-জীবনের পুরো ছবিটাই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই সব পংক্তির উচ্চারণে। দুই ভিন্ন মানসিকতার সহাবস্থান এখানে নীরব এবং যন্ত্রণাময়। রাত্রি জাগরণের মধ্যেও 'এক জোড়া দোয়েলের ওড়াউড়ি', ঘুমের ট্যাবলেটে সমুদ্র আর আকাশের রঙ এবং সবশেষে সেই বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা ও যন্ত্রণা। স্বামীর পাণ্ডিত্য ও বিশালতার পাশে নিজের তুচ্ছতা ইন্দিরাকে সুখী করেনি। নাকি তার অসুখ একান্তভাবে তারই নিজস্ব জটিলতার দ্বিতীয় সৃষ্টি।

নারায়ণবাবুকে যেন অনেকটা স্পর্শ করা যায় ইন্দিরার মধ্য দিয়ে। হয়তো সম্পূর্ণ নয়, আংশিক। তবু তো নারায়ণ-বাবুরই যন্ত্রণা। নারায়ণবাবু বলেন : 'এক-জন ঔপন্যাসিক নিজেকে প্রজেক্ট করেন বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে তাঁর প্রকাশ। 'তৃতীয় নয়নে' আমি নিজেকে প্রজেক্ট করেছি তিনভাবে।"

বেখাপ্পা প্রশ্ন করে বসলাম হঠাৎ : "আপনার অনেকগুলি লেখাতেই লক্ষ্য করেছি রাতের ছবি এবং নৈশজাগরণের ক্লান্তি। ইন্দিরা তো ইনসমনিয়ার রোগী। আপনি ওই একই অসুখে ভুগছেন না তো?"

—"ভুগছি। মাঝে মাঝে সারারাত ঘুমোতে পারি না। আমি ইনসমনিয়ার রোগী। আমার লেখায় কমবেশী এই রাত্রিজাগরণের কথা আছে। লিখতে লিখতে দেড়টা-দুটো বেজে যেতো। স্লিপিং ট্যাবলেট থাকতো মাথার ধারে। একটা খাবার কথা। কখনো দুটো-তিনটে খেতাম। তবু ঘুম হতো না। কান পেতে শুনতাম, ট্রেনের বাঁশির শব্দ, এঞ্জিনের আওয়াজ, গাড়ি শান্টিংয়ের শব্দ। তবে কলকাতা কখনো সম্পূর্ণ নীরব হয় না। বেশী রাতে শুনতাম, দূরের গঙ্গা থেকে স্টিমার আর জাহাজের ভোঁ, কুকুরের ডাক, মোটর গাড়ীর চলাচল, হাইড্রেন্টের জলের একটানা কলকল শব্দ।"

ইন্দিরার মুখ দিয়ে তিনি নিজের কথাই বলেছেন : "কলকাতা ঘুমোয়, তবু সম্পূর্ণ ঘুমোয় না—যেন সারারাত সে ঘুমের ঘোরে নিজের সঙ্গে কথা বলে।"

জিজ্ঞেস করলাম : আপনাকে কি সফিস্টিকেটেড বলা যায়? আপনি কতটা শহরবাসী? মানে, শহর আপনার মানসিক-তাকে কতটা অধিকার করে আছে?

সহজ, সুস্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন নারায়ণবাবু : আমি উত্তর বাংলায় কাটিয়েছি বেশ কয়েক বছর। গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি গণ-নাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে। গান গাইতে পারতাম না। মাঝে মাঝে আই পি টি এ-র জন্যে লিখেছি। তখন থেকেই উত্তর বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়। আসলে, আমি বরিশালের মানুষ। পড়াশোনা করেছি পূর্ববাংলায়। গ্রামের প্রতি সেজন্যেই আমার একটা দুর্বলতা আছে। আমার লেখায় এখন সেই সারল্য নেই। জীবনে জটিলতা বেড়েছে। এককালে গ্রামের মানুষ হলেও এখন শহর-বাসী। গ্রাম আমার থেকে অনেক দূরে। ফলে মাটি, মানুষ এবং প্রকৃতি আমার কাছে স্মৃতির মতো। শহর থেকে গ্রামের দিকে তাকানো। মনে হয়, এটা আমার বিদেশী বই পড়ার ফল। মানসিকতায় সম্পূর্ণ না হলেও আচরণে এবং অভি-ব্যক্তিতে নিশ্চয়ই সফিস্টিকেটেড হয়ে গেছি।

উপন্যাসটির নাম 'তৃতীয় নয়ন' কেন? আপনি কি অন্য কোনো নামের কথা ভেবে-ছিলেন?

—উপন্যাসটি বেরিয়েছিল প্রথম একটি শারদীয়া সংখ্যায়। নাম ছিল 'ত্রিনয়ন'। কিন্তু বই আকারে বেরোবার আগে বিজ্ঞাপন দেখলাম ও নামে আরেকটা বই লিখেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ। ফলে নাম পাল্টালাম। ছাপা হবার পর মনে পড়ল 'তৃতীয় নয়ন' নামে অচিন্ত্যবাবুর একটা বই আছে। তখন আর পরিবর্তনের উপায় ছিল না।

সিগ্রেট ধরিয়ে বললেন : এমন ঘটনা ঘটেছে আগেও। নাম-বিভ্রাটে পড়েছি আরো কয়েকটি বইয়ের ক্ষেত্রে। প্রথম যে-নামে লিখেছি, প্রকাশের সময় সে-নাম রাখতে পারিনি। কেউ না কেউ সে-নামে অন্য বই প্রকাশ করে ফেলেছেন আমার আগে। সেজন্যেই 'আবির্ভাব' হয়েছে 'পদ্মপাতা দিয়ে'। 'বৃষ্টি নামল' বেরিয়েছে 'দুরেমেদুর' নামে। বছর কয়েক আগে জনৈক প্রকাশক আমার একটা গল্প-সংকলনের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কাগজে। নাম দিয়েছিলেন 'কনে দেখা আলো'। কিন্তু বই বেরোবার আগেই দেখলাম ও-নামে বাণী রায়ের একটা বই বেরিয়ে গেছে।

এ-উপন্যাসের তৃতীয় নয়নটি কার?

—বোধহয় ধীরাজের।

আপনার আর কোনো উপন্যাসের সঙ্গে কি তৃতীয় নয়নের মিল আছে?

—কিছুটা মিল পাবেন দু'-একটা উপন্যাসের। শারদীয়া যুগান্তরে লিখেছিলাম 'পাতাল কন্যা'। প্রায় একই ধারায় লিখেছি 'নির্জন শিখর' এবং 'কাচের দরজা'।

লক্ষ্য করেছি স্মৃতিচারণা আপনার ইদানীংকার লেখার মধ্যে বড্ড বেশী। ঘটনা বলেন ফ্ল্যাশ-ব্যাকে। এর কারণ কি?

বোধহয় এরকম একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না নারায়ণবাবু। বললেন, তাই নাকি?

একটু ভেবে বললেন : আমি সাধারণত কাহিনীকে ছোট ফ্রেমে বেঁধে নিই। সেজন্যেই হয়তো মাঝে মাঝে পেছনের কথা বলতে হয়। এছাড়া আর উপায় কি? আয়তন ছোট হলে ফাঁকে ফাঁকে পেছনের কথা বলে নিতে হয়।

তারপর যেন আত্মবিশ্লেষণের ভঙ্গিতে বললেন : "প্রথম জীবনে কবিতা লিখেছি। বড় কাগজে ছাপা হয়েছে আমার কবিতা। এরপর এসেছি গল্পে। কবিতায় যেমন বেশী বলার উপায় নেই, গল্পেও অনেকটা তাই। বেশি কথা বলানো আর কথা কমানোর অভ্যাস করে যেতে হয়। উপন্যাসে অনেক বেশী বলা যায়। কাহিনীর পক্ষে যা এসেন-শিয়াল আমি তাই বলি। সেজন্যেই আমার উপন্যাসগুলিও ছোট আকারের।"

মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে 'তৃতীয় নয়নে'র কোনো গরমিল আছে কি প্রকাশিত অবস্থায়?

—না, বিশেষ কিছু নেই। আমি এক ঝোঁকে লিখে যাই। কারেকশনও বেশী করতে পারি না। দু'-এক জায়গায় দু'-একটা লাইনের অদল-বদল হয়তো করতে হয়। সেও একটা মামুলী ব্যাপার। তাছাড়া সারা বছরে আমি এমন কিছু লিখি না। পুজোর সময়টায় দু'-একটা উপন্যাস আর গোটা চার-পাঁচ গল্প লিখি। অন্য সময়ে থাকি চুপচাপ। অধ্যাপনা, খাতা দেখা, প্রশ্ন করা—এসব করি।

বোধহয় বিতর্ক এড়াবার জন্যে বললেন : "আসলে আমি গল্পকার। ছোট গল্প লিখতেই ভালোবাসি। একবার উপেন গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন, গল্প লিখছো। পরে উপন্যাস লিখতে পারবে, না। বাংলা সাহিত্যে সেটা ছিল ছোটগল্পের যুগ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুনর্জন্ম হয়েছিল ছোটগল্পের মধ্যে। যখন মানিক-বাবু ভালো উপন্যাস লিখতে পারছিলেন না, তখনো অসাধারণ ছোটগল্প লিখছেন অনেকগুলি। প্রেমেনদাও জাত ছোটগল্প-কার।"

এখন কি লিখছেন?

—দোল-সংখ্যা আনন্দবাজারের জন্য একটা গল্প। 'মঞ্জরী'তে একটা ছোট্ট উপন্যাস লিখব বলে কথা দিয়েছি।

কথায় কথায় বর্তমান রাজনীতি, সমাজ ও সময় নিয়ে আলোচনা হলো। আজকের পরিবেশ সম্পর্কে তাঁর গভীর উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করলাম। দক্ষিণের চেয়ে উত্তর কলকাতার পরিবেশটাই যেন তাঁর বেশী পছন্দ। বললেন: সেবার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য পথে পথে ঘুরেছি, বস্তিতে গিয়েছি। উত্তর কলকাতায় প্রাণের সাড়া পেয়েছি, দক্ষিণ কলকাতায় পাইনি।

সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গে বললেন: কিছুতেই ভাবতে পারছি না যে বেকেটের নাটকের মতো আমরা গোদোকে সন্ধান করছি। মানুষ, সংগ্রাম, জীবন—এসব বেসিক জিনিসগুলির প্রতি আমার গভীর বিশ্বাস আছে। গোর্কি বলতেন, 'লেখার আগে নিজের দেশ দেখে এসো।' আমরা শহরে বসে শহুরে মানুষের কথা লিখছি। কিন্তু পাঠক গ্রামের কথাও জানতে চায়। আমি আমি সেজন্যেই লিখেছি এবার 'লক্ষ্মীর পা' নামে একটা গল্প। প্রফুল্ল রায় অমৃতে লিখেছেন 'কেয়াপাতার নৌকা'। পাঠক উপন্যাসটিকে নিয়েছে। আন্তরিকতা নিয়ে লিখলে গ্রামের মানুষও সাহিত্যের বিষয়। কেবল শহর নিয়ে একটা পুরো দেশের সাহিত্য হয় না। তবে, প্রশ্ন জাগে গুণময় মান্নার 'লখীন্দর দিগার' আর ক'জন পাঠক পড়লো? সত্যিকারের কৃষকজীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ গ্রামের ছেলে। গ্রামের সজীবতা নিয়ে এসেছিল। শহরের ফাঁদে পা দিয়ে ভুল করেছে। এভাবে সাহিত্য হয় না।

অবশেষে, নিরুত্তাপ ক্ষোভের সঙ্গে বললেন: আমাদের সমস্ত লেখা দিয়ে একদিন উনুনে ধরানো হবে। আমি মহৎও নই, বৃহৎও নই। আমি শিক্ষক আই অ্যাম প্রাউড অব মাই টিচিং। কাজের মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকতে চাই। কিছু কিছু প্রেমের গল্প লিখেছি। হয়তো সেগুলি থাকবে। গোর্কিও বিশুদ্ধ প্রেমের গল্প লিখেছেন। এরেণবুর্গের প্রেমের গল্পগুলি তো এখনো টিকে আছে।

আবার 'তৃতীয় নয়ন' প্রসঙ্গে ফিরে এলাম। বললাম: এ-উপন্যাসটি সম্পর্কে বলুন। কি উদ্দেশ্যে লিখেছেন?

—কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে লিখিনি। শারদীয়া সংখ্যার চাহিদা মেটানো উপলক্ষ্য। আমার অধিকাংশ লেখাই লিখেছি পুজোর সময়। আগে থেকে ফর্মের কথাও ভাবিনি। বক্তব্যের প্রয়োজনে কাঠামোটি তৈরী করে নিতে হয়েছে। সম্ভবত সারা বছর অন্য বিষয়ে ব্যস্ত থাকি বলে বড় উপন্যাস লিখতে পারি না। টেনেটুনে আয়তন বাড়ানো আমার পছন্দও হয় না। কিছুকাল আগে আমি জনৈক জনপ্রিয় লেখকের একটা ঢাউস-মার্কা উপন্যাস পড়েছিলাম। দু'খণ্ডে বেরিয়েছে। পড়ার পর মনে হয়েছে, দু'শ আড়াইশ' পৃষ্ঠার মধ্যে বইটি শেষ করা যেতো।

আপনার অধিকাংশ লেখাতেই দেখছি একটা রাজনৈতিক চরিত্রের সন্ধান মেলে। আপনি কি রাজনীতি নিয়ে ভাবছেন?

—বাংলাদেশের বিপ্লবীদের প্রতি আমার দুর্বলতা আছে। তাঁদের ত্যাগ ও দেশপ্রেম আমাকে মুগ্ধ করেছিল। নিজেও বিপ্লবী আন্দোলনে মেতে উঠেছিলাম। কলেজে পড়ার সময় জেলে গিয়েছিলাম ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিয়ে।

'কাচের দরজা' উপন্যাসটির উল্লেখ করে বললেন, ওতে একটা রাজনৈতিক চরিত্র আছে। পার্টির চেয়ে দেশ-ই তার কাছে বড়। এ-উপন্যাসের অন্য দুইটি তরুণ চরিত্র যখন গভীর মানসিক সংকটের মুখোমুখি, অস্তিত্বের জটিলতায় আচ্ছন্ন—তখন সেই মানুষটিই সিগ্রেটের ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে-আসা ঘরে ঢুকে অ্যাশট্রের মধ্যে জল ঢেলে দিয়েছেন অবলীলাক্রমে। আসলে, ঐ জ্বলন্ত সিগ্রেট ও তার ধোঁয়াকে আমি ব্যবহার করেছি প্রতীক হিসেবে। তৃতীয় নয়নের ভূপেশ এমনি একটা চরিত্র—আদর্শবাদী, খাঁটি মানুষ। এককালে রাজনীতি করতো পূর্ববঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে নবাগত। এসে দেখলো, সবই কেমন যেন পালটে গেছে। এখনকার রাজনীতির ধরণধারণ আলাদা। সে এই নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। 'তৃতীয় নয়ন' শেষ হয়েছে ভূপেশের মৃত্যুতে।

উপসংহারে নারায়ণবাবু আশাবাদী। ধীরাজ হাত ধরেছে ইরার। তার ভাষায়: "আমি ইরার হাত ধরলুম। এখনো শক্ত, এখনো শীতল। এখনো মৃত্যুর অনুভব স্তব্ধ আছে সেখানে। তবু আমার মনে হল, একটা রক্তস্পন্দন হয়তো বইতে শুরু করবে সেখানে—দেরী নেই, খুব দেরী হবে না আর।"

ইন্দিরা-ধীরাজের সম্পর্কটাই কি এ-উপন্যাসের প্রধান কথা নয়?

—ইন্দিরা এক্সট্রোভার্ট আর ধীরাজ ইনট্রোভার্ট। ইন্দিরার বাল্যকৈশোর কেটেছে প্রকৃতি ও পরিবেশের স্বাধীনতায়। তাকে বুঝে উঠতে পারেনি ধীরাজ। সে নিজের ভাবনাতেই আবদ্ধ। কারো দিকে চোখ মেলে তাকাবার অবকাশ পায়নি। ধীরাজের পাণ্ডিত্য ও প্রখর ব্যক্তিত্ব ইন্দিরার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে, তাকে তুচ্ছ করে দিয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয়, স্ত্রী সম্পর্কে ধীরাজের দৃষ্টিভঙ্গি কতো কনট্রাডিকটারী। সে স্বাধীন ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস করে কিন্তু নিজের স্ত্রীর ব্যক্তিত্বে অবিশ্বাসী। এখানেই ধীরাজের ট্র্যাজেডী। পাণ্ডিত্য তাকে প্রখর করেছে। অথচ যা বিশ্বাস করে নিজের জীবনে তা সত্য নয়। ইন্দিরা-ধীরাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ভূপেশ। সে এক্সট্রোভার্ট, ইনট্রোভার্ট—দুই-ই।

—গ্রন্থদর্শী

স্বপ্নচারিতা

দুই

স্বপ্নচারিতা —ইংরেজীতে 'সমনমবুলিজম, 'ফিউগ।' কথাগুলোর সঙ্গে সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। দুএকটা স্বপ্নচারিতার ঘটনা অনেকেরই জানা আছে। মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে এই রোগ-অবস্থার গুরুত্ব অসীম। এই রোগ-উপসর্গকে কেন্দ্র করে গত একশ বছর ধরে নানা দেশের সিকিয়াট্রিস্টরা (মনরোগচিকিৎসক) অনেক পর্যালোচনা করেছেন। অনেক অনুপম তত্ত্ব হাজির করেছেন। স্বপ্নচারিতার রহস্যময়তাকে সাধারণ মানুষ 'ভূতে পাওয়া', 'ভর হওয়া' ইত্যাদি মনে করে গির্জা মন্দির রোজাফকিরের শরণাপন্ন হয়েছে। স্বপ্নচারীর অদ্ভুত আচারব্যবহার দেখে দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে তত্ত্ব তৈরী করেছেন, কেউ বা এ থেকে জন্মান্তরবাদের তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। আমার আলোচ্য রোগী শ্রীঘটকের মনের কথা পরিবেশন করার আগে স্বপ্নচারিতার আরো দুএকটা কেস অতি সংক্ষেপে বিবৃত করব। পাঠকদের পক্ষে ঘটকের মানসক্রিয়া বোঝার সুবিধা হবে।

লণ্ডনের এক পাদ্রী ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে গিয়ে আর ফিরলেন না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান মিলল না। কয়েক বছর পরে মেলবোর্ণের এক বস্তিতে তাঁকে পাওয়া গেল। তখন ভিক্ষাবৃত্তি তাঁর উপজীবিকা। এ কবছরের কোনো ঘটনাই তাঁর মনে নেই। ব্যাঙ্ক থেকে তোলা টাকার সন্ধানও মিলল। কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার পর কি ঘটেছিল কিছুতেই তাঁর মনে এল না। ফ্রান্সের এক ইঞ্জিনীয়ারের চাকরি যাবার পর তাঁকে বেশ কিছুদিন ভাবিত দেখা গেল। এই সময় তাঁর এক বন্ধু এক ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে পড়ে, নিজের টাকাপয়সা ইঞ্জিনীয়ারের কাছে গচ্ছিত রাখেন। টাকার পরিমাণ বেশ মোটা রকমের। এর কয়েকদিন পরেই ইঞ্জিনীয়ার বাড়ী ছেড়ে উধাও। টাকাগুলো তিনি নিয়ে গেছেন। স্বভাবত সন্দেহ হল অভাবের মানুষ বন্ধুর টাকার লোভ সামলাতে পারে নি। তাঁর স্ত্রী ত আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে মনে করলেন যে স্বামীর কোনো বান্ধবীও এর মধ্যে জড়িত আছেন। কিছুদিন পরে সমুদ্রউপকূলের কোনো শহরের এক কাফে থেকে ভদ্রলোকের চিঠি এল। সব সন্দেহের নিরসন হল। ঘুম ভাঙার পর নিজেকে সেই কাফেতে দেখে তিনি চমকে উঠেছেন। কি করে এখানে হাজির হলেন জানেন না। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বাবদ যতটা খরচ হয়েছে ততটা ছাড়া গচ্ছিত টাকার সবটাই তার কাছে পাওয়া গেল।

কেস দুটোর বিশদ বিবরণী পড়লেই সকলেই বুঝবেন যে টাকার লোভে এঁরা কেউ মতলব করে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন নি। দুইজনই দীর্ঘস্থায়ী স্বপ্নচারিতা বা ফিউগে ভুগছিলেন। নামকরা চিকিৎসকরা এই কেস দুটো নিয়ে অনেকদিন মাথা ঘামিয়েছেন। তখনও মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের সভায় আসন পায় নি। সিকিয়াট্রি চিকিৎসক সমাজে অপাঙক্তেয়। মনের রোগ পাদ্রীপুরুতদের আওতায় কাজেই এ নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় শিক্ষিত মানুষের ঔৎসুক্য ছিল না। দুই ভদ্রলোকই স্বপ্নচারিতায় আবিষ্ট হবার কিছুদিন আগে থেকেই ঘটনাচক্রে বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। নানা কারণে উদ্বেগ অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন। পাদ্রীসাহেব যাজনক্রিয়ায় মন বসাতে পারছিলেন না। ইঞ্জিনীয়ার বেকারিত্বের চাপে ও অর্থাভাবে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। অসুস্থ হয়ে স্মৃতিভ্রংশ অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দেবার আগে থেকেই দেশটি সম্বন্ধে পাদ্রীর মনে দুর্বলতা ছিল। অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের অভিলাষ অনেকদিন ধরে মনে মনে পোষণ করতেন। ইঞ্জিনীয়ার কার্য উপলক্ষে দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্রতীরের শহরগুলিতে আরেকবার গিয়েছিলেন। জীবনের অনেক আনন্দমুখর দিনের স্মৃতি ঐ শহরগুলোর সঙ্গে জড়িত ছিল। দুজনেই আনন্দহীন বর্তমান থেকে আনন্দময় জগতে পালাতে চেয়েছিলেন। পলায়নী মনোবৃত্তি বিশেষ মানসিক অবস্থায় কার্যকরী হল। এই বিশেষ অবস্থাকে ডাক্তারীশাস্ত্রে বলা হয় state of dissociation বা বিসঙ্গ অবস্থা। ঘটকের উপসর্গ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বিসঙ্গের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করব।

এ দুটো হল দীর্ঘস্থায়ী স্বপ্নচারিতার বা ফিউগের দৃষ্টান্ত। বয়স্ক পাঠক পল্লীগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে 'ভূতে পাওয়া', 'ভর হওয়ার কিছু কিছু ঘটনা বলতে পারবেন নিশ্চয়ই। সেগুলোও এই ফিউগের সমগোত্রীয়। এই মহানগরীতে বসে, এই চন্দ্রবিজয়ের যুগেও ভূত-পাওয়া রোগীর সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি। তাবিজমাদুলী, রোজা-ফকির, ঝাড়ফুক, বাবার থানে হত্যা, ইত্যাদি রুটিন নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় হতাশ হয়ে আত্মীয়স্বজন কোনো কোনো সময়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হন। এঁদের কথায় পরে আসব। খবরের কাগজের 'হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ কলমে প্রায়ই দেখা যায় বিশেষ ধরণের বিজ্ঞাপন। গত ১৬ই জানুয়ারী থেকে বৈদ্যনাথকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। পরণে নীল রঙের প্যাণ্ট, হাফ সার্ট ও স্যাণ্ডেল। নাকের ডানদিকে একটি তিল, কপালের বাঁদিকে কাটা দাগ। যদি কেহ...... ইত্যাদি। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ফিউগের কেস-থাকে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। ছেলেমেয়ে চুরি করে বিশেষ উদ্দেশ্যে বেচে দেবার অনেক ঘটনা আমরা জানি, সুসংগঠিত দুর্বৃত্তদের এ একটা বড়দরের কারবার। কিন্তু এ খবর কম লোকেই রাখেন যে ছেলেধরা খবর কাল্পনিক। সম্মোহিত করে বা কপালে শিকড় ছুঁইয়ে ছেলেটিকে কোলকাতা থেকে কালিকট নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ধরণের গল্প অনেক শোনা যায়। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে ছেলেটি হয়ত স্বপ্নচারিত অবস্থায় কালিকট পৌঁছেছে। সেখানে পৌঁছে ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকের মত তার ফিউগ অবস্থা কেটে গেছে। যে সহৃদয় ভদ্রলোক স্মৃতিভ্রংশ অবস্থায় তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তিনিই হয়ত ছেলেধরা অপবাদে নাস্তানাবুদ হয়েছেন।

এইবার স্বল্পস্থায়ী স্বপ্নচারিতার দুএকটা দৃষ্টান্ত বলছি। একজন স্টকব্রোকার তার অনেকদিন অব্যবহৃত একটা আলমারির থেকে কতকগুলো কবিতার পাণ্ডুলিপি দেখে চমকে যান। কাগজগুলো তার লেটারপ্যাড থেকে নেওয়া, কিন্তু হাতের লেখাটা তাঁর নয়। এ কবিতাগুলো কোথা থেকে এল। এর লেখক কে? স্টকব্রোকারের লাইব্রেরীটি বেশ বড়, পত্রপত্রিকায় ঠাসা। অন্যান্য বইএর সঙ্গে কবিতার বইও তিনি কিনেছেন। কিন্তু স্কুল জীবনের পর কোনোদিন কবিতা পড়েছেন বলে মনে পড়ে না। ধনীর লাইব্রেরী রাখা প্রেস্টিজের ব্যাপার। বই কেনা হয় প্রতি মাসে কিন্তু পাতা কাটা হয় খুব কম বইয়ের। সপ্তাহখানেক পরে খোপ খুলে ব্রোকার ভদ্রলোক ত হতভম্ব। আরো দুটো নতুন কবিতা, তাঁরই চিঠি লেখার কাগজে। পুলিশে খবর দেওয়া হল। লাইব্রেরী ঘরের দরজা-জানলা মজবুত, ভেতর

থেকে বন্ধ থাকে, বাইরের লোক আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। জিনিসপত্র কিছু গেছে বলেও মনে হল না। আর ঐ আলমারির চাবি মালিকের নিজের হেপাজতে থাকে। কালেভদ্রে তিনি লাইব্রেরীতে এসে ঐ আলমারিটা খোলেন। ব্যাপারটা খুবই জটিল রহস্যে ভরা। তাঁর এটর্ণী বন্ধু, কি জানি কেন, পরিবারের চিকিৎসককে খবর দিলেন। তিনি সব দেখেশুনে নিয়ে এলেন একজন মনরোগ-বিশেষজ্ঞকে কিছুদিন ধরে স্টকব্রোকারের ঘুম হচ্ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে একটু উত্তেজনার ভাব দেখা দিয়েছিল। সেই সূত্রে এই মনরোগ-বিশেষজ্ঞকে একবার আসতে হয়েছিল। তাই যোগাযোগটা স্থাপিত হল অতি সহজেই। কয়েকদিনের তদন্তের ফলে সাব্যস্ত হল কবিতাগুলো ঐ স্টকব্রোকারের স্বহস্তলিখিত। স্বমানস উদ্ভূত। তিনি ত অবাক। অবাক হবারই কথা। ঐ কবিতালেখার কথা স্বাভাবিক অবস্থায় মনে আসবার কথা নয় স্বপ্নচারিতার মধ্যে কবিতাগুলো লেখা হয়েছে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে নটার সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। নিশুতি রাতে ঘুম ভাঙার পর সিঁড়ির আলো না জ্বালিয়ে তিনি নিঃশব্দে লাইব্রেরীতে প্রবেশ করতেন। ৪০।৫০ মিনিট ধরে কবিতা লিখতেন। কবিতাটা আলমারিতে রেখে চাবি লাগিয়ে দরজা বন্ধ করে নিজের বিছানায় ফিরে আসতেন। একঘন্টা কবির ভূমিকায় অভিনয় করে আবার ঘুমিয়ে পড়তেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি আবার সেই গদ্যময় স্টকব্রোকার। ভদ্রলোকের মানসিক উপসর্গগুলি অতিরিক্ত খাটুনি ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার দরুণ ঘটেছিল। ঐ সময়ে শেয়ারের বাজার খুব তেজী, কারবার বেশ জোরালো। শৈশবস্মৃতিমন্থন ক'রে জানা গেল পিতৃতাড়নায় অনেকটা বাধ্য হয়ে তিনি পৈতৃকব্যবসায় —ঐ শেয়ার-বাজারে প্রবেশ করেছিলেন। শৈশব-কৈশোরে কবি হবার স্বপ্ন নাকি দেখতেন। শেয়ার মার্কেটে ঢুকে অনেকটা অভিমান করেই তিনি কাব্যচর্চা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কবিতার বইয়ের পাতা গত বিশ বছরের মধ্যে একদিনও খোলেননি। শেয়ার বাজারের সফলতা যখন প্রতিষ্ঠিত, তখন অন্যজীবন তাঁকে হাতছানি দিল। রাত্রে উঠে স্বপ্নচারী স্টকব্রোকার লাইব্রেরীতে ঢুকে আধুনিক কবিতা পড়া শুরু করলেন। লাইব্রেরীর কাব্যগ্রন্থগুলি খুলে দেখা গেল সেগুলো কেউ বেশ মনোযোগ সহকারে পড়েছে. অনেকগুলো পংক্তির পাশে মন্তব্যও লেখা আছে। হাতের লেখা কিন্তু অন্য লোকের। স্কুলের কোনো ছেলের লেখা মনে হয়। স্টকব্রোকারের শৈশবের কোন লেখার নমুনা পাওয়া গেলে হয়ত দেখা যেত সেই ছাঁদের সঙ্গে মিল আছে। আবার নাও থাকতে পারে। কেননা অনেকক্ষেত্রে মূলব্যক্তির সঙ্গে স্বপ্নচারীর আচারব্যবহার, হাবভাব, কথাবলার বা হাতের লেখার ধরণ কোনকিছুরই মিল থাকে না। এটা হচ্ছে recurrent somnambulism বা আবৃত্তিশীল স্বপ্নচারিতার নিদর্শন। স্বল্পস্থায়ী স্বপ্নচারী অবস্থা ও ব্যক্তির মৌলিক অবস্থা, নিয়ম করে পরিবর্তিত হতে থাকে। 'নিশির ডাক' শুনে দরজা খুলে কবরখানায় গিয়ে প্রেমিকের কবরের পাশে আত্মহত্যা করার একটি ঘটনা আমি জানি।

'নিশির ডাক'-এর এমনি কাহিনী সবদেশেই প্রচলিত। এগুলো আরো জটিল ধরণের নিদর্শন। গল্পে নাটকেও স্বপ্নচারিতার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লেখক নাট্যকার সেগুলোকে বিশ্বাস্য রূপ দিতে পারেন না। স্বপ্ন দেখা আর স্বপ্নচারিতাকে অনেক সময়েই সমগোত্রীয় মনে করে গোলমাল বাধান। স্বপ্নের কথা অনেকখানিই মনে থাকে, স্বপ্নচারিতার অবস্থার কোনো কথা বা ঘটনা মনে থাকে না। লেডি ম্যাকবেথের স্বপ্নচারিতার বিবরণে শেকসপীয়রের কৃতিত্ব অসাধারণ, কিন্তু স্মৃতিভ্রংশ সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন কিনা ঠিক বোঝা যায় না।

স্বপ্নচারিতা সম্পর্কে এই মুখবন্ধের পর ঘটকের সঙ্গে এবার আমরা ঘোড়-দৌড়ের মাঠে ঢুকব, তাঁর কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করব, তাঁর চিত্তলোকে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে সচেষ্ট হব। সেইজন্য এই ভূমিকার অবতারণা।

—অলোকিক
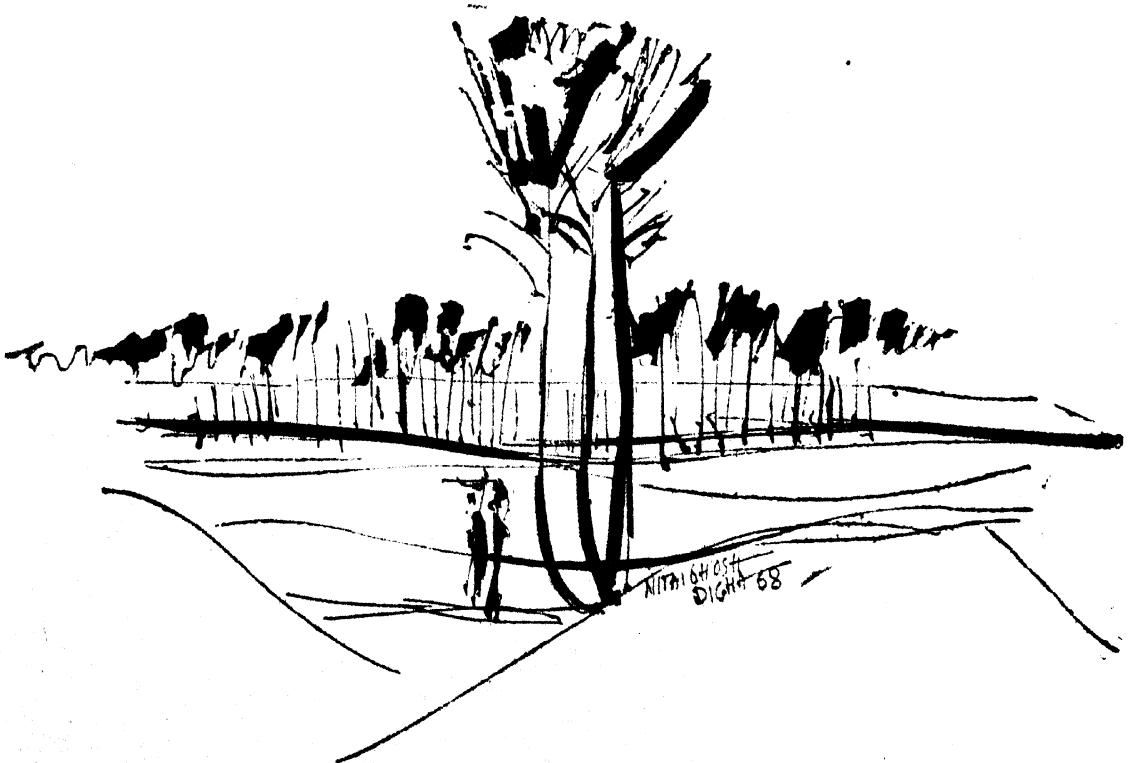
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্টার থিয়েটারের পক্ষে এই বছরটি খুবই অশুভ। অনুরূপা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস পোষ্যপুত্রের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অপরেশ মুখোপাধ্যায়। স্টারে পোষ্যপুত্রে নাটকে শ্যামাকান্ত চরিত্রে অভিনয় করতেন দানীবাবু। শ্যামাকান্ত চরিত্রে দানীবাবুর অভিনয় হয়েছিল অপূর্ব। কিন্তু দানীবাবু এই সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই অসুস্থতা তাঁর মৃত্যুর কারণ। কিছুদিন রোগভোগের পর নভেম্বর মাসে দানীবাবু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের জনক গিরিশচন্দ্রের উত্তরসাধক দানীবাবুর মৃত্যুতে বাংলা মঞ্চের যে ক্ষতি হলো, তা পূরণ হবার নয়।

দানীবাবুর মরদেহ নিয়ে যে শোকযাত্রা হয়েছিল তা অভূতপূর্ব। এই শোকযাত্রায় বাংলার অভিনেতা, অভিনেত্রী, নাট্যকার থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষেরাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু আমি শোকযাত্রায় অংশ নিতে পারিনি। যখনই খবর পেলাম, তখনই দানীবাবুকে শেষ দর্শনের আশায় একেবারে শ্মশানঘাটে এসে পৌঁছলাম। দেখলাম, দানীবাবুর মরদেহ তখন চিতাশয্যায় শায়িত। চোখের সামনেই তদানীন্তন স্টার রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার নশ্বরদেহ ভস্মীভূত হয়ে গেল।

গিরিশ যুগের শেষ দীপশিখাটি নিবে গেল। অবসান ঘটলো একটি যুগের।

ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের 'বড়বৌ' নাটক অভিনীত হয়েছিল ২৪ ডিসেম্বর, আর রবীন মৈত্রের মানময়ী গার্লস স্কুল নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল ৩০ ডিসেম্বর। এই আমার সে বছরের শেষ অভিনয়।

এবারে চিত্রজগতের কথা বলি। এই বছরেই ম্যাডান কোম্পানীর 'বিষ্ণুমায়া' চিত্রে আমি অভিনয় করি। বিষ্ণুমায়াতে আমি কংস চরিত্রে রূপদান করেছিলাম। এই ছবিই হলো কানন দেবীর দ্বিতীয় সবাক ছবি।

ম্যাডানের আর একটি ছবি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই বছরেই মুক্তিলাভ করে। কৃষ্ণকান্তের উইলে আমি কৃষ্ণকান্তের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম।

কতো সহজে নিঃশব্দে ফুরিয়ে গেল ১৯৩২ সাল। তবু ডায়েরীর পৃষ্ঠায় সে বছরটিকে ধরে রেখেছি।

১৯৩৩ সাল এসে গেল। মার্চ মাস পর্যন্ত 'দেবযানী' 'পুরোহিত' এবং অন্যান্য পুরনো বই চলতে লাগল বটে মিনার্ভায় কিন্তু এখানকার পরিবেশ আর ভালো লাগছিল না—অন্য কোন একটা জায়গায় যাবার জন্যে মনটা ছটফট করছিল। এই সময় সুযোগও জুটে গেল একটা। একদিন থিয়েটারে এলেন অনাথ কবিরাজমশায়। অনাথবাবুর কবিরাজ হিসাবে নাম ছিল—কিন্তু নাট্যরসিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল আরও বেশী। সমস্ত থিয়েটারেই ছিল তাঁর অবারিত দ্বার। তিনি এসেছিলেন স্টার থিয়েটারের অন্যতম ডিরেকটার কুমারকৃষ্ণ মিত্রের দূত হয়ে। তিনি এসে একথা-সে-কথার পর প্রস্তাবটা করেই ফেললেন—'দেখুন দানীবাবু মারা গেছেন—মনোরঞ্জনবাবু ঠিক হাউস টানতে পারছেন না। স্টারে 'পোষ্যপুত্র'টা একেবারে মার খাচ্ছে। আপনি চলে আসুন না এখানে। আপনি শ্যামাকান্তটা করুন। তাহলে বইটাও আবার দাঁড়ায় আর থিয়েটারও বাঁচে।'

আমি এতক্ষণে অনাথবাবুর আমার কাছে আসার হেতুটা বুঝলাম। আমি বললাম—যেতে আমার আপত্তি নেই—তবে কণ্ট্রাকটা আমি আর আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে করব না।

ব্যগ্রভাবে অনাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তবে কার সঙ্গে করবেন?

—কুমারবাবুর সঙ্গে। আর্ট থিয়েটার আজ আছে, কাল নেই—আমি ও লিমিটেড কোম্পানীর সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করব না। ওসব রিস্কের মধ্যে আমি নেই মশায়।

—আচ্ছা বেশ তো—সেসব ব্যাপারের জন্যে আটকাবে না—

আমি বাধা দিয়ে বললাম—আর একটা কথা—

—বলুন, বলুন—

আমি তখন বললুম—ওঁদের সঙ্গে 'কেসে' আমার যে টাকাটা খরচ হয়েছিল, সেটাও ফেরৎ দিতে হবে।

অনাথবাবু তখন বললেন : সেসব ঠিক হয়ে যাবে—আপনি ওখানে একদিন গিয়ে সব কথাবার্তা বলে নিন।

—বেশ, যাবো। বলে একটা দিন স্থির করলাম।

এদিকে রঙমহল থেকেও আহ্বান এসেছিল। শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিকমশায় আমার সঙ্গে দেখা করে ওখানে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। আমি এটা-ওটা বলে এড়িয়ে গেলাম। কোনো কথা দিলাম না।

এদিকে বিখ্যাত অ্যাটর্ণী শ্রীপতি চৌধুরী ছিলেন উপেনবাবুর বিশেষ বন্ধু। প্রায়ই আসতেন তিনি থিয়েটারে। এসে আমার ঘরে আসতেন, গল্পগুজব করতেন।

একদিন তিনি এসেছেন। সেদিন তিনি এসেছেন—এসে দেখেন যে, আমার সেদিন থিয়েটার নেই, অন্য প্লে আছে—আমি আমার ঘরে বসে কি একটা সাময়িক পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিলাম। শ্রীপতিবাবু ঘরে ঢুকে বললেন—আরে ঘরে একা-একা বসে কি করছেন—চলুন, গিয়ে থিয়েটার দেখা যাক।

আমাকে একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে গেলেন ওপরের একটা বক্সে। ওখানে বসে থিয়েটার দেখতে দেখতেই কথাটা পাড়লেন তিনি।

—শুনলাম, আপনি নাকি মিনার্ভা ছেড়ে দিচ্ছেন?

—আমি বললাম—কণ্ট্রাক্টের মেয়াদ তো আমার ফুরিয়ে এল, আর মাসখানেক মাত্র আছে। এর মধ্যে একটা বন্দোবস্ত করতে হবে তো।

শ্রীপতিবাবু বললেন—অত ঝামেলায় কি দরকার? আপনি এখানেই থেকে যান না।

—এখানে?

—হ্যাঁ এখানে। দেখুন থিয়েটারের অবস্থা তো দেখছেন—একদম চলছে না। এ-অবস্থায় আপনি যদি চলে যান, তাহলে উপেনবাবুর খুবই ক্ষতি হবে।

আসলে আমার মিনার্ভার পরিবেশটা ভাল লাগছিল না—অন্য কোথাও যাবার জন্যে মনটা খুব উতলা হয়েছিল—কিন্তু সেটা না বলে আমি এ-প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে বললাম—দেখি ভেবেচিন্তে কি করা যায়!

উপেনবাবুও একদিন আমাকে ডেকে বললেন—থিয়েটারের যা অবস্থা তাতে মাইনেটা যদি কিছু কম নেন, তাহলে ভাল হয়।

আমি বললাম—বলেন কি? লোকে চাকরী করলে মাইনে বাড়ে আর আমার এখানে মাইনে কমে যাবে? এটা কি করে সম্ভব?

সংগ্রাম ও শান্তিতে নায়ক অহীন্দ্র চৌধুরী

উপেনবাবু একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, বললেন—দেখুন, যা ভাল বোঝেন, করুন।

একদিন অনাথবাবু আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন স্টারের অন্যতম ডিরেক্টার কুমারকৃষ্ণ মিত্রের কাছে। তিনি আমার সমস্ত দাবী মেনে নিলেন। টাকা-পয়সার জন্যে আর কারো কাছে যেতে হবে না—চুক্তিতে এ-কথাও লেখা হলো। এছাড়া মিনার্ভায় যে-টাকা পেতুম, এখানেও তাই পাবো। তাছাড়া কেসের দরুণ ৮০০্ টাকা আমি ফেরৎ পাবো।

স্টারের চুক্তিপত্রে সই করে আমি শেষবারের মতো মিনার্ভার হয়ে দু' সপ্তাহের জন্যে আসানসোল ও ধানবাদ সফরে গেলাম। কিন্তু ফিরে এলুম দল-বলের আসার আগেই। কেননা নীহারবালার সম্মান-রজনী উপলক্ষে 'গৈরিক পতাকা'য় আমার ঔরংজীবের ভূমিকায় অভিনয় করার কথা ছিল।

আর আমি মিনার্ভার শিল্পী নই। কলকাতায় ফিরেই স্টারে পোষ্যপুত্র নাটকে শ্যামাকান্তর ভূমিকায় অভিনয় শুরু করলাম। এই ভূমিকাটি করতেন দানীবাবু। তাঁর অভিনয় ছিল অপূর্ব। তারপর মনোরঞ্জনবাবু নামতেন এই ভূমিকায়। কিন্তু তাঁর অভিনয় তেমন উচ্চাঙ্গের হয়নি। এবারে আমি—শ্যামাকান্ত চরিত্রটিকে নতুনভাবে রূপ দিলাম বটে, তবু মনে হতো দানীবাবুর সেই অভিনয়ের কাছে আমার অভিনয় পেঁছতে পারেনি। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি, আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। দর্শকদের খুশিই করেছিল আমার অভিনয়।

এরপরে স্টারে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'মন্দির প্রবেশ' অভিনীত হতে লাগলো। হরিজন সমস্যা নিয়ে লেখা নাটক। নাটকের রসিক চরিত্রটি ছিল আমার, আর লোকনাথের ভূমিকা ছিল মনোরঞ্জনবাবুর।

এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য অভিনয় স্টার ও নাট্যমন্দিরের শিল্পীদের একত্রে 'ষোড়শী' অভিনয়। এই অভিনয়ে জীবানন্দ ছিলেন শিশির ভাদুড়ি, আর আমি ছিলাম এককড়ি।

রবীন্দ্রনাথের বৈকুণ্ঠের খাতাও এই সময় স্টারে অভিনীত হয়েছিল। নাটকে বৈকুণ্ঠের চরিত্রে রূপদান করেছিলাম আমি।

এর পরের নাটকের নাম ছিল 'অভিমানিনী'। শিশিরবাবু ছিলেন প্রধান ভূমিকায়। কিন্তু এ-নাটকে আমি অভিনয় করিনি।

এই সময়ে 'আর্ট থিয়েটারে' একটা অঘটন ঘটলো। রায়বাহাদুর সুখলাল কারনানীর কাছে ঋণ করেছিল আর্ট থিয়েটার লিঃ, তারই দায়ে ডিক্রি পেলেন রায়বাহাদুর কারনানী। সলিসিটর কান্তিভূষণ চট্টোপাধ্যায় অফিসিয়াল রিসিভার নিযুক্ত হলেন। রিসিভার ছিলেন শিশিরবাবুর ব্যক্তিগত বন্ধু।

যাই হোক স্টারের দখল নিলেন শ্রীকারনানী। অভিনয় বন্ধ হলো সাময়িকভাবে। আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের পোশাক, সিন ও অন্যান্য আসবাব যা স্টারে ছিল, স্টার কর্তৃপক্ষ কিনে নিলেন সিনগুলো, আর পোশাকগুলো কিনে নিলেন এক নাম-করা পোশাক বিক্রেতা।

এই সময়ের দুটি দুঃসংবাদের কথা বলি। প্রথমটি হলো বিখ্যাত অভিনেত্রী কৃষ্ণভামিনীর মৃত্যু, আর একটি হলো থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাওয়া। থিয়েটার বন্ধ হতে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসলো। আমি তো প্রথমেই গেলাম অপরেশবাবুর কাছে। অসুস্থ অপরেশবাবু বললেন, আমি কি বলবো বলুন, আপনি কুমারবাবুকে গিয়ে বলুন।

কুমারবাবুর কাছে যেতে তিনি বললেন, লিমিটেড কোম্পানীর ব্যাপার, আমি কি করতে পারি বলুন?

আমরা চুপ করে থাকলেও ঝাড়ুদার, জমাদার, দারোয়ান এরা তো চুপ করে থাকবে না। তারা শেষপর্যন্ত কুমারবাবুর গাড়ি আটকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলো। তাদের কথা, আমাদের মাইনের ব্যবস্থা করুন।

কুমারবাবু বললেন, ঠিক আছে—তোমরা কয়েকজন আমার বাড়িতে এসো। আমি দেখছি কি করতে পারি।

কুমারবাবু তাঁর কথা রেখেছিলেন। এই সব অধস্তন কর্মীদের বেতনের ব্যবস্থা করেছিলেনও। কিন্তু শিল্পী ও অন্যান্য কলাকুশলীদের কোন ব্যবস্থাই হলো না।

এই সময়ে শিশিরবাবু আমন্ত্রণ পেলেন চুঁচুড়ায়। কয়েকটি অভিনয় সেখানে হবে। আমিও গেলাম শিশিরবাবুদের সঙ্গে। সেখানে অভিনয় হয়েছিল চারদিন। দুদিন অভিনয় করে আমাকে ফিরতে হলো কলকাতায়। কেননা, 'চাঁদসদাগর' ছবির শুটিং ছিল।

এদিকেও একটা ব্যবস্থা হলো। শিশিরবাবু রিসিভারের কাছ থেকে স্টার থিয়েটার লীজ নিলেন নাট্যমন্দিরের নামে। জুলাই মাসেই মঞ্চস্থ করলেন 'বিরাজ বৌ'। তারপর ২৭শে সেপ্টেম্বর আরম্ভ হলো 'রমা'।

এর পর ২৪শে নভেম্বর শচীন সেনগুপ্তের 'দেশের দাবী'। তারপরের নাটক ছিল 'বিজয়া'। মাঝখানে সত্যেন গুপ্তের 'খ্যামা' নামে একটি নাটক অভিনীত হলেও, সেটা তেমন চলেনি।

একটা না-বলা ঘটনার কথা বলি। মিনার্ভা ছাড়ার কিছুদিন আগে ঘটনাটা ঘটেছিল।

তখনকার দিনে থিয়েটার জগতে চণ্ডী-বাবুর নামটা অপরিচিত ছিল না। চণ্ডী-বাবুর একটি ছাপাখানা ছিল, নাম 'ফাইন আর্ট প্রিণ্টিং'। কিন্তু থিয়েটার মহলে ছিল তাঁর অবাধ যাতায়াত।

চণ্ডীবাবুর কী ইচ্ছে হলো, তিনি একবার থিয়েটারের 'নাইট' কিনলেন। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের নিয়ে সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন করলেন মিনার্ভায়। নাটক হলো 'প্রফুল্ল'। চণ্ডীবাবু যোগেশের জন্যে শিশির-বাবুকে ধরলেন, আর আমার কাছে গেলেন রমেশের জন্যে।

বললাম—আপত্তি নেই—তবে আমাকে পাঁচশ' টাকা দিতে হবে।

চণ্ডীবাবু আমার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, সে কি মশায়—আপনাকে এতো টাকা দিতে হবে!

আমি বললাম—হাঁ। এর কমে আমি কোনমতেই স্টেজে নামতে পারবো না।

চণ্ডীবাবু মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন : ঠিক আছে, আমি উপেনবাবুকে গিয়ে বলি তাহলে।

উপেনবাবু বললেন : টাকাটা কিন্তু আমায় দিয়ে যাবেন—কারণ, অহীনবাবু তো আমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ।

এই কথা শুনে আমি বললুম : এটা তো উপেনবাবুর মিনার্ভার কোন 'শো' নয় যে টাকাটা আমি ছেড়ে দেব। অপরের ব্যবস্থাপনায় যখন শো—তখন টাকা ছাড়া করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শেষপর্যন্ত অনেক বাক্-বিতণ্ডার পর চণ্ডীবাবুকে টাকা দিতে হল। এবং আমাকে এ-অভিনয়ে অনুমতি দেবার ব্যাপারে উপেনবাবু চণ্ডীবাবুকে বেশ একটু চাপ দিলেন। অর্থাৎ মিনার্ভা থিয়েটারে পোস্টার হ্যাণ্ডবিল ইত্যাদি চণ্ডীবাবুর প্রেসেই ছাপা হত। তার দরুণ কিছু বিলের টাকা চণ্ডী-বাবুর প্রাপ্য ছিল। উপেনবাবুর সম্মতি আদায় করতে চণ্ডীবাবুকে কিছু টাকা ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

'প্রফুল্ল'র সম্মিলিত অভিনয়ে সমস্ত হাউসে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। তার ওপর টিকিটের হার বর্ধিত হয়েছিল। ঠিক যে কত টাকার টিকিট বিক্রী হয়েছিল, তা জিজ্ঞেস করেও জানতে পারিনি বা ইচ্ছে করেই উদ্যোক্তারা আমায় জানতে দেননি। যদি ভবিষ্যতে এর থেকে বেশী টাকার দাবী করি।

বিরাট বিরাট পোস্টার পড়েছিল রাস্তায়—বেশ মনে আছে পোস্টারে লেখা ছিল : নাট্যাচার্য ও [illegible] সম্মিলিত অভিনয়। শিশিরবাবুর সঙ্গে এই আমার প্রথম অভিনয়।

সিরাজদ্দৌল্লা নাটকে গোলাম হোসেনের রূপসজ্জায় অহীন্দ্র চৌধুরী

এর কিছুদিন পরে জন্মাষ্টমীর সময় শিশিরবাবু কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারের স্টেজ (বর্তমান শ্রী সিনেমা) ভাড়া নিয়ে এক রাত্রি অভিনয়ের বন্দোবস্ত করলেন। স্থির হলো, 'মন্ত্রশক্তি'। শিশিরবাবু আমাকে বললেন : আমি ভাবছি 'মৃগাঙ্ক'টা করব, তুমি বরং 'রমাবল্লভ'টা কর।

আমি বললাম : আচ্ছা তাই হবে।

এই নাটকের এইরকম সমাবেশ আরও একবার হয়েছিল—অনেক দিন পরে শ্রীরঙ্গমে।

যাক, এবার আমরা আবার একটু আগের কথায় ফিরে আসি।

স্টার থিয়েটারের তো এই অবস্থা—শিশিরবাবুরা ওখানে আসর জাঁকিয়ে বসলেন। আমি এখন কি করি! আমার সঙ্গে তো কুমারবাবুর কন্ট্রাক্ট এখনও চালু আছে। ঠিক সেই সময় নাট্যনিকেতন কর্তৃপক্ষ অনুরূপা দেবীর 'মা' মঞ্চস্থ করার আয়োজন করছেন। কুমারবাবু একদিন আমাকে বললেন : 'মা'-তে অরবিন্দর চরিত্রটি করার জন্য প্রবোধবাবুরা আপনাকে চায়—আপনি করবেন, না কি কোনও আপত্তি আছে ?

আমি বললাম : আপত্তি কেন থাকবে ? তবে টাকাকড়ির ব্যাপারটা আপনার সঙ্গেই যেমন ছিল তেমন থাকবে।

—মানে ?

—মানে হল এই যে, আমার প্রাপ্য টাকা আমি আপনার কাছ থেকেই নেব—আপনি ওদের কাছ থেকে আদায় করে নেবেন। প্রবোধবাবুর কাছে আমি টাকাকড়ি কিছু চাইব না।

এতে উনি একটু ভেবে বললেন : ঠিক আছে, তাই হবে। আমি হপ্তা-হপ্তা ব্যবস্থা করে নেব টাকা নেবার। যে হপ্তায় টাকা পাব না, সে-হপ্তায় আপনাকে আমি একটা চিঠি দেব মঞ্চে নামতে নিষেধ করে। আপনি নামবেন না। ব্যস, ফুরিয়ে গেল।

এদিকে প্রবোধবাবুর ইচ্ছে ছিল ওঁর সঙ্গে সরাসরি চুক্তি করার—কিন্তু আমি তা করিনি। কুমারবাবুর কাছ থেকেই আমি হপ্তায়-হপ্তায় টাকা নিতাম।

'মা'-র নাট্যরূপ দেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ভূমিকালিপি ছিল এইরকম—অরবিন্দ — আমি, ব্রজরানী — নীহারবালা, নিতাই — নির্মলেন্দু লাহিড়ী, অজিত — সরযূবালা, শরৎশশী — চারুশীলা, মৃত্যুঞ্জয় — মনোরঞ্জন, দুর্গাসুন্দরী — কুসুমকুমারী প্রভৃতি। 'মা'-র প্রথম অভিনয়-রজনী হল ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩।

এই সময় হিন্দি শেখার ঝোঁক হল খুব। আমি একজন হিন্দি-শিক্ষক নিযুক্ত করলাম—তাঁর নাম ছিল পণ্ডিত শুক্ল। তিনি রোজ সকালবেলায় আসতেন এবং এসে কিছুক্ষণ বসে থেকে ফিরে যেতেন। কারণ ব্যাপারটা হল অধিক রাত্রি পর্যন্ত থিয়েটার করে খুব সকালে ওঠা হয়ে উঠত না। সেইজন্যে পণ্ডিতজী প্রায়ই বিরক্ত হয়ে বলতেন : তোমার দ্বারা কিছু হবে না। যাই হোক, কোনোদিন পড়া হয়, কোনোদিন হয় না—এইভাবেই আমার হিন্দি শিক্ষা চলতে লাগল।

শ্রীভারতলক্ষ্মী স্টুডিও সেই সময় খোলবার তোড়জোড় হচ্ছে। একদিন পরিচালক শ্রীপ্রফুল্ল রায় আমার ডালিমতলার বাড়ীতে এলেন—এসে বললেন : আমি ভারতলক্ষ্মীর হয়ে 'চাঁদসদাগর' ছবি করছি, —তোমাকে 'চাঁদ' করতে হবে।

স্টুডিও কি রকম হচ্ছে জিজ্ঞেস করতে উনি বললেন : আমি কাল আসব—এসে নিয়ে যাব তোমাকে স্টুডিও দেখাতে।

প্রফুল্ল ঠিক সময়েই এল—আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল ভারতলক্ষ্মীতে। ভারতলক্ষ্মীর সত্ত্বাধিকারী বাবুলাল চোখানীর সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। আমি যখন ম্যাডানে ছবি করতুম, তখন থেকে আলাপ। শেষের দিকে কয়েকটি ছবিতে উনি টাকা দিয়েছিলেন। অনেক সময় ম্যাডানের ডিরেক্টার জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় শ্যুটিং-এর আগে আমাকে সঙ্গে করে চোরবাগান (বাবুলাল-জীর বাড়ী) হয়ে, সেখানে টাকাকড়ি নিয়ে তবে স্টুডিও যেতেন শ্যুটিং করতে।

বাবুলালজীর দক্ষিণ হস্ত এবং ভারত-লক্ষ্মীর ম্যানেজার বৈজুবাবুর সঙ্গে নতুন করে আলাপ হল। অবশ্য এর আগেও আলাপ হয়েছিল ঘনশ্যামদাস চোখানীর মারফতে। এই ঘনশ্যামবাবু ছিলেন খুব সৌখিন ব্যক্তি, যাকে চলতি ভাষায় বলা হয় 'কাপ্তেন'. প্রায়ই মিনার্ভা থিয়েটারে আসতেন। মিনার্ভায় উপেনবাবুকে কিছু টাকাও দিয়েছিলেন। তিনিই আমাকে বৈজু-বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।

(ক্রমশঃ)

অসমীয়া জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যে
জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা

—বীণা মিত্র

অসমীয়া জাতীয় জীবন ও সাহিত্যের ইতিহাসে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার যে একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে তা অনস্বীকার্য। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী জ্যোতিপ্রসাদের আবির্ভাবে গতানুগতিকতার অবসাদে নির্জীব ও নিশ্চল অসমীয়া সাহিত্য সজীব ও গতিশীল হয়ে জাতীয় জীবনকে একদিন সঞ্জীবিত করে তুলেছিল। দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যে, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, চিন্তাধারার ব্যাপকতায় গীতিমাধুর্যে, শব্দসম্পদে সর্বোপরি নিখুঁত অসমীয়া রূপে জ্যোতিপ্রসাদের রচনাবলী অসমীয়া সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

জ্যোতিপ্রসাদের জন্মস্থান আসামের ডিব্রুগড়ে তামোলবারী চাবাগানে। তাঁর বাবা ছিলেন চাবাগানের মালিক সঙ্গীতজ্ঞ পরমানন্দ আগরওয়ালা। পিতামহ ছিলেন স্বনামধন্য হরিবিলাস আগরওয়ালা। আগরওয়ালা পরিবারের আদি বাসভূমি ছিল রাজস্থান, কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরে আসামে বসবাস করে বৈবাহিক ও সাংস্কৃতিক সূত্রে তাঁরা অসমীয়ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। আসামের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এই পরিবারের দানও সামান্য নয়। হরিবিলাস আগরওয়ালা কীর্তন, নামঘোষা, গুণমালা, বরগীত, দশম ইত্যাদি প্রাচীন পুঁথি মুদ্রিত ও প্রকাশ করে আসামে সর্বপ্রথম প্রাচীন সাহিত্য প্রচারের প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাঁর পুত্র ছিলেন আধুনিক অসমীয়া কবিতার স্রষ্টা চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, যাঁর সহযোগিতায় লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া "জোনাকী" পত্রিকা পরিচালনা করে অসমীয়া সাহিত্যে নবজীবনের সূচনা করেছিলেন। সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চার পরিবেশে পরিবর্ধিত জ্যোতিপ্রসাদ কিশোর বয়সেই তাঁর সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন 'শোণিতকুঁওরী' নাটক রচনা করে। এই নাটকেই অসমীয়া নাট্যসাহিত্যে নবযুগ প্রবর্তন। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার আয়োজিত সর্বভারতীয় নাট্য মহোৎসবে 'শোণিতকুঁওরী' শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারের কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। এই নাটকে রচিত সঙ্গীত আধুনিক অসমীয়া সঙ্গীতেরও জন্মদান করে।

জ্যোতিপ্রসাদের বিশিষ্টতা এই যে, তিনি একাধারে ছিলেন কবি, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ চলচ্চিত্র স্রষ্টা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা। তিনি একদিকে যেমন গীতিকবিতা রচনা করে কাব্যজগতে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গেছেন অপরদিকে তেমনি দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করে দেশবাসীকে স্বদেশ প্রেমে উদ্দীপ্ত করে স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করে গেছেন। জাগ্রত স্বদেশানুরাগ, ওজস্বিতা, গীতিমাধুর্য ও অপূর্ব শব্দচয়ন নৈপুণ্যে তাঁর কবিতা বিশিষ্টতা লাভ করেছে। নাট্যকাররূপে তিনি আঙ্গিকের নতুনত্বে, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, দৃষ্টিভঙ্গীর স্বকীয়তায় ও সংলাপের মাধুর্যে নাট্যজগতে যুগান্তর এনেছিলেন। ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রথম আবির্ভাবের যুগে নিজস্ব স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করে আসামে চলচ্চিত্র নির্মাণের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় সর্বস্বান্ত হয়েও তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে দুঃখ কষ্ট নির্যাতন ভোগ ও কারাবরণ করে তিনি স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধাও অর্জন করেছিলেন। এভাবে নবনাট্যের প্রতিষ্ঠাতারূপে আধুনিক সঙ্গীতের জনকরূপে, গীতি কবি রূপে, চলচ্চিত্র স্রষ্টারূপে ও দেশপ্রেমিকরূপে তিনি আসামের জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে গেছেন।

দেশকালের সংকীর্ণ সীমারেখা জ্যোতিপ্রসাদের উদার শিল্পী মনকে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি তাই তিনি "গ্রামের গণ্ডিতে থেকেও আমি বিশ্বনাগরিক"। এই বিশ্বজনীনতাই ছিল তাঁর জীবনদর্শন। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধ করেই তিনি বলেছিলেন "আমিই স্বদেশ। আমিই বিদেশ। আমিই নানাদেশ।" সেজন্য বিশ্বের হাটে যেখানে যে বস্তু তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল তাকেই সযত্নে আহরণ করে এনে স্বদেশের সাংস্কৃতিক মণিভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। "সাত মহাদেশ। সাতবার ঘুরে ফিরে। জ্ঞানের মাণিক মুকুতা আনিব। অঞ্জলি ভরে ভরে।" সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি মহান পৃথিবী সৃষ্টির কল্পনা তিনি করেছিলেন—"করিতে হইবে পৃথিবী আলোকময়/জ্ঞান বিজ্ঞানের নানাধর্মের/নানা আদর্শের নানা বিভেদের/করিতে হইবে মহান সমন্বয়।" সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, ভাষা, বর্ণ ও আরও কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ দ্বন্দ্বে বিচ্ছিন্ন ভারতবাসীর সম্মুখে এই মহান সমন্বয়ের বাণী যথার্থভাবে বাঁচবার পথেরই নিশানা।

জ্যোতিপ্রসাদের এই সমন্বয় সাধনার বাণী বাস্তবে রূপায়িত হয়ে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব আনে। শিক্ষিত নাগরিক সমাজে অনাদৃত ও অপাংক্তেয় আইনাম, বিয়নাম, বিহুনাম, বনগীত প্রভৃতি লোকসঙ্গীতের সঙ্গে ভারতীয় রাগসঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সংমিশ্রণে অথচ মূল অসমীয়া রূপটি অক্ষুণ্ন রেখে তিনি আধুনিক অসমীয়া সংগীত সৃষ্টি করেন। খাঁটি অসমীয়া গ্রাম্য বাদ্যযন্ত্র—খোল, তাল, পেপা, নেগেরা, দবা, বরকাঁহ ইত্যাদির সঙ্গে ভারতীয় সেতার, এসরাজ ও বিদেশী অর্গান, পিয়ানো মিলিয়ে ঐকতান বাদ্যও প্রবর্তন করেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট—"আধুনিক সভ্যতার গতিপথ লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, এই ত্রিবেণী সঙ্গম হওয়াই শ্রেয়।" নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেও যে সমন্বয়ের গুণে সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধতর করা যায় বিভিন্ন দিকে তিনি তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন রেখে গেছেন।

তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কেবল লোকসঙ্গীত নয় অনাদৃত লোকশিল্পও আভিজাত্যে উন্নীত হয়। শিল্পগুণে কত সাধারণ বস্তুও যে কত আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তা তিনি দেখিয়ে গেছেন।

নাটকের ক্ষেত্রে জ্যোতিপ্রসাদের দান অসামান্য। 'শোণিতকুঁওরী', 'কারেঙর লিগিরী", "লভিতা" প্রভৃতি নাটক অসমীয়া নাট্য সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'শোণিতকুঁওরী' কবিকল্পনায়, শব্দমাধুর্যে, সুরের মায়াজালে স্বপ্নলোকের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আহোম যুগের পটভূমিকায় রচিত "কারেঙর লিগিরী" একটি দুঃসাহসিক সৃষ্টি। চিরাচরিত সামাজিক মূল্যমান এখানে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। যুগযুগান্তর সঞ্চিত সংস্কার ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে মিথ্যা

আভিজাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে চির বিদ্রোহী শিল্পী মনের অপূর্ব অভিব্যক্তি ঘটেছে এই নাটকে। তাই অনাপূর্বা পত্নীকে পূর্ব প্রণয়ীর সঙ্গে মিলিত হতে দেবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়, রাজপ্রাসাদের পরিচারিকাকে রাণীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার দুঃসাহসিক ইচ্ছায়, ঐশ্বর্যের ব্যর্থতা প্রদর্শনে জ্যোতিপ্রসাদের প্রখর ব্যক্তিত্ব এখানে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিফলিত। বুদ্ধিদীপ্ত বলিষ্ঠ সংলাপে, চরিত্র চিত্রণের সার্থকতায় ও নাটকীয় কলাকৌশলে এই নাটকটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। "লভিতা" নাটক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। দেশাত্মবোধই এই নাটকের মূল সুর। এই নাটকের ভূমিকায় জ্যোতিপ্রসাদ বলেছেন যে, এতে নায়ক-নায়িকারূপে কোন চরিত্র নেই। সমগ্রভাবে অসমীয়া জনসাধারণই এর নায়ক। এতে অসমীয়া যুবক যুবতীর চরিত্রের সবলতা ও দুর্বলতার চিত্র অঙ্কিত করে, জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে যাতে তারা নিজেদের স্বরূপ উপলব্ধি করে ভবিষ্যতের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য শক্তি অর্জনে সমর্থ হয় তার প্রয়াস করা হয়েছে। গতানুগতিক নাটকীয় কলা কৌশল এখানে অনুপস্থিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জ্যোতিপ্রসাদের নাটকেই সর্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে বিশদ নির্দেশ এবং বিভিন্ন দৃশ্যের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা যায়।

জ্যোতিপ্রসাদের শিল্পীসত্তা জীবন সংগ্রামে কখনও পশ্চাৎপদ হয়নি। তিনি বিশ্বাস করতেন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই, আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়েই সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। "ব্যাঘাত আসুক নব নব, আঘাত খেয়ে অচল রব/বক্ষে আমার দুঃখের তব বাজবে জয়ডংক।' সেজন্য তিনি শত্রুকেও প্রণতি জানিয়ে বলেছেন—"হে আমার শত্রু, তোমাকে প্রণতি জানাই, তোমার ও আমার সংঘাতের মধ্য দিয়েই তো আমার জীবনে সুন্দর প্রকাশিত হবে। প্রতিটি সংঘাতে নূতন শক্তি অর্জন করব।"

তাঁর সংগ্রামমুখর জীবনের ইতিহাস এখানে উল্লেখযোগ্য। কিশোর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পূর্বেই তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে থাকাকালে পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও শিল্পকলায় আকৃষ্ট হন। জার্মানীতে বোম্বে টকীজের প্রতিষ্ঠাতা হিমাংশু রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের ফলে তিনি চলচ্চিত্র শিল্পে আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন এবং চলচ্চিত্রের আঙ্গিক সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন। এই অভিজ্ঞতার ফলেই পরবর্তীকালে তাঁর ভোলাগুরি চাবাগানে চিত্রবন স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করে প্রথম অসমীয়া সবাক চিত্র জয়মতী নির্মাণ করেন।

১৯৩০ সালে বিদেশ থেকে ফিরে এসে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করে অসমীয়া জনসাধারণকে স্বাধীনতার বেদীতে আত্মদানে অনুপ্রাণিত করে তোলেন। "লুইত পারের তরুণ মোরা / মৃত্যুরে নাকি ডরি" "বজ্রকণ্ঠে বিশ্বকে শোনা সত্যের জয়গান। বুকের শোণিতে ধুয়ে দেরে আজি ভারতের অপমান" অথবা "সাজরে তরুণ সাজরে সবে / তোর তপ্ত রুধির ঢালি জননীরে। শক্তি দিতে যে হবে" ইত্যাদি সঙ্গীত বিশেষ একটি কালের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হলেও আজ তা দেশকালোত্তীর্ণ সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণ কালেও এই সঙ্গীতগুলো আসামের সর্বত্র গীত হয়েছে।

কারাবাসকালে তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এই আশংকায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য মুক্তির আবেদন জানাতে বলা হলে আত্মমর্যাদা সচেতন জ্যোতিপ্রসাদ তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আগস্ট বিপ্লবেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। আত্মগোপন করে সংগ্রাম চালাবার সময় অসুস্থ শরীরে অশেষ কষ্টভোগ করেন কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেন নি। সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদ উভয়ের ধ্বংসই ছিল তাঁর কাম্য কারণ তাঁর মতে —"সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদ এই দুটিই পৃথিবীর ইতিহাসে সংস্কৃতির ছদ্মবেশধারী দুষ্কৃতির পূর্ণ রূপ।"

স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে নারীর ভূমিকা সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন সেজন্য "লুইত পারের" তরুণের সঙ্গে "লুইত পারের রণরঙ্গিনী স্বদেশ মুক্তিব্রতা" নারীদের কথাও বিস্মৃত হন নি। "লভিতা" নাটকের নায়িকা লভিতা অসমীয়া নারীর সাহস, শক্তি ও দেশপ্রীতির মূর্তরূপ। অন্তরে দেশপ্রেমের অনির্বাণ শিখা জ্বালিয়ে ব্যক্তিগত সুখ-সম্পদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে জীবন পণ করে সে সমস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। অবশেষে জাতীয় পতাকার নীচে মৃত্যুবরণ করবার সময় সে তার শেষ ইচ্ছা জানিয়েছিল "যাবার সময় আমার আসাম মায়ের মাটির একটি ফোঁটা আমার কপালে পরিয়ে দাও—আমার দেশের মাটির ফোঁটা।" এই জ্বলন্ত দেশপ্রেমই ছিল জ্যোতিপ্রসাদের জীবনের মূল প্রেরণা।

কেবলমাত্র পরাধীনতার গ্লানির বিরুদ্ধে নয় যুগ-যুগান্তর সঞ্চিত সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধেও তিনি দৃপ্ত প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং এই পুঞ্জীভূত আবর্জনারাশি পরিষ্কার করে সমাজকে শুচি-শুভ্র করে তোলবার জন্য প্রলয়কে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কারেঙের লিগিরী'র নায়ক প্রগতিবাদের প্রতীক জ্যোতিপ্রসাদের মানসপুত্র সুন্দরকুমার তাঁর অন্তরের সেই আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করেছিল, "প্রলয় আসে তো আসুক, আজ প্রলয়েরই প্রয়োজন। বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত সামাজিক আবর্জনা ধুয়ে মুছে সমাজকে নির্মল ও পবিত্র করবার জন্য প্রলয়ের অতি প্রয়োজন; তাই আমি প্রলয়কে স্বাগত জানাই।" প্রলয়ের পরে নবজাত পবিত্র নির্মল পৃথিবী হবে চির আনন্দের লীলাভূমি; শান্তি, প্রীতি ও মৈত্রীর বাসভূমি। এই পৃথিবীই হবে শিল্পীর পৃথিবী—মানুষের পৃথিবী। কবির তাই একান্ত কামনা ছিল, "কবিতে যে হবে সারা জগতেরে। অমৃত আনন্দময়।" হিংসায় উন্মত্ত, দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে এর চেয়ে মহৎ কামনা আর কিছু আছে কি?
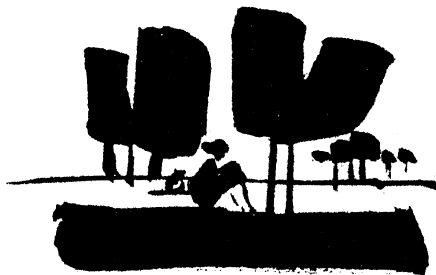
(১৩)

চৌরী বস্তিতে ভাল দুর্গাপুজো হয়। রুমাণ্ডি থেকে জঙ্গলে জঙ্গলে একটা রাস্তা লাতেহার গিয়ে পৌঁছেছে। লাতেহার থেকে চৌরী। জীপেও সে পথে অত্যন্ত কষ্ট করে যেতে হয়। সুমিত্রাবৌদি ফিরে এসেছেন। ঘোষদা অষ্টমী পুজোর দিন ভোরবেলা বৌদিকে নিয়ে রুমাণ্ডিতে এলেন। যশোয়ন্তকে খবর পাঠিয়েছিলেন বৌদি। যশোয়ন্তও এসে হাজির হল। কোলকাতা থেকে বৌদি আমার এবং যশোয়ন্তের জন্যে ধুতি ও তসরের পাঞ্জাবী বানিয়ে এনেছেন। বললেন, পর শিগ্‌গির। চান করে পরো—আজ অঞ্জলি দিতে যাব চৌরীতে। চাঁদোয়া-চৌরী।

যশোয়ন্ত সম্বন্ধে আমার কাছে ঘোষদা যতই বুলি কপচান না কেন বৌদির কাছে একেবারে চুপ। ঘোষদা যে স্ত্রৈণ, তার জন্যেই নয়। সুমিত্রাবৌদির এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যে উনি যা করছেন তা যে খারাপ কখনো হতে পারে, তা কারো পক্ষে মনে করাই অসম্ভব ছিল।

আমি আর যশোয়ন্ত জগাই-মাধাই দুই ভাইয়ের মত চান করে ধুতি পাঞ্জাবী পারলাম। যশোয়ন্ত বলল, আরে ইয়ার মায়ে চন্দনে নেহী শেকতা ধোতী পেহেনকে।

বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু যশোয়ন্তকে। কাপালিক কাপালিক। ঋজু অর্জুন গাছের মত শরীর। মাথায় লাল সিঁদুরের ফোঁটা। বৌদি পরিয়ে দিয়েছিলেন। গতকালের ডাল্টনগঞ্জের পুজোর সিঁদুর। সকালে আমরা শুধু এক কাপ করে চা খেলাম। বৌদির নির্জলা উপবাস। অঞ্জলির আগে পর্যন্ত।

যশোয়ন্ত ধুতি হাঁটুর উপর তুলে জীপের স্টীয়ারিং-এ বসলো। জীপ ছাড়ার আগে আমার বন্দুকটা নিয়ে পেছনের সিটে আমার ও ঘোষদার মধ্যে দিল। বৌদি সামনে বসলেন।

আমাকে যশোয়ন্ত আগে থাকতে বারণ করেছিল যে ঘোষদা বৌদিকে সেদিনের সেই গুলির ঘটনা যেন না বলি।

ঘোষদা যশোয়ন্তকে বললেন, অঞ্জলি দিতে যাচ্ছ আবার বন্দুক কিসের? মার কাছে যাচ্ছ তাও কি একটু শান্ত সভ্য হয়ে যেতে পার না? যশোয়ন্ত ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, আজ যে মহাষ্টমী ঘোষদা—মা যে শক্তিদায়িনী। আজ যে বীরের দিন—। মার কাছে যাচ্ছি বলেই ত বন্দুকটা নিলাম।

ভারী চমৎকার অঞ্জলি দিলাম চৌরীতে। অন্য এক কাগজ কোম্পানির ফরেস্ট অফিসার মিহিরবাবু ঐখানেই থাকেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। অঞ্জলির পর তাঁর বাড়িতে চা-জলখাবার না খাইয়ে ছাড়লেন না। ভারী ভাল লাগল এই পুজোর পরিবেশ। এই পুজো—অনাড়ম্বর আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। কোলকাতার অ্যামপ্লিফায়ারের কর্কশ চীৎকার নেই—বিকারগ্রস্ত ও নাক্কারজনক কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি নেই। এখানে মা দশভুজা নিজের মহিমায় স্মিতহাস্যে ভক্তবৃন্দের সামনে আসীন।

লাতেহারে এসে কাছারীর সামনে পণ্ডিতের দোকানে একপ্রস্থ মিষ্টি খাওয়া হল। তারপর আবার রুমাণ্ডি। পথে সুমিত্রাবৌদি বললেন, ফিরে হয়ত দেখব মারিয়ানা এসে গেছে। ওকে আনতে গেছে ড্রাইভার অনেকক্ষণ।

বৌদি লুচি ভাজলেন। সকালের জলখাবার। সঙ্গে আলুর তরকারী ও আচার—এবং প্রসাদী সন্দেশ। আলু এই রুমাণ্ডিতে একটি দুষ্প্রাপ্য জিনিস। আলুর তরকারী একটা অতিবড় মুখরোচক খাওয়া এখানে। বাইরে বসে আমরা গল্প করতে করতে খেলাম।

রীতিমত শীত পড়ে গেছে। কোলকাতার ডিসেম্বরের শীতের চেয়েও বেশী। সবসময়ই প্রায় গরম জামা গায়ে পরে থাকতে হয়। রোদে বসে থাকতে ভারী আরাম।

রোজ পেছনের কুয়োতলায় অন্তর্বাস পরে বসে রামধানীয়াকে দিয়ে সর্বাঙ্গে কাড়ুয়া তেল মর্দন করাই—তারপর ঝপ্‌-ঝপিয়ে বালতি বালতি ঠাণ্ডা কুয়োর জল ঢেলে দেয় রামধানীয়া ঐখানেই। কী আরাম যে লাগে, কি বলব। প্রথম প্রথম অমন বাইরে বসে খালি গায়ে তেল মাখতে লজ্জা করত—লজ্জার চেয়েও বড় কথা সংস্কারে বাধত। খালি গায়ে বাইরে খোলা আকাশের নিচে ফুরফুরে হাওয়া লাগলে, গায়ে সুড়-সুড়ি লাগত। রোদ পড়লে গা চিড়-বিড় করত। যশোয়ন্তই বলে বলে এবং সবসময় আমার পেছনে লেগে লেগে খোলা জায়গায় চান করার অভ্যাস করিয়েছে।

যশোয়ন্ত ধমক দিয়ে বলেছে, তুমি কি মেয়েমানুষ? লোকের সামনে অথবা উদোম জায়গায় গা খুলতে পারো না! যশোয়ন্ত নিজে নির্বিকার। চওড়া পাথরের মতো বুকে একরাশ কোঁকড়া চুল—সরু কোমর—দীর্ঘ গ্রীবা—মাথাভরা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—সযত্নে বর্ধিত পাকানো গোঁফ—পা থেকে মাথা অবধি কোথাও কোনো খুঁত নেই। পুরুষের সংজ্ঞা যেন। ওর সংস্কারের বালাই নেই—তাছাড়া অমন চেহারাতে ওকে সবকিছু করাই মানায়।

যশোয়ন্তই বলছিল, কুটকুতে যাবে শিকারে। কুটকু ব্লকে চিফ-কনসার্ভেটর বাইরের কাউকে বড়একটা শিকার-টিকার করতে দেন না। যশোয়ন্ত পারমিট বের করবে ডিসেম্বরে। তখন মারিয়ানার বন্ধু সুগত শিকারে আসবেন। তাই মারিয়ানার অনুরোধে যশোয়ন্ত ঐ সময় ঐ শিকারের বন্দোবস্ত করেছে।

মারিয়ানার কথা আলোচনা হচ্ছে। এমন সময় মারিয়ানা এসে পৌঁছল।

সে এসেই ফিসফিস করে শুকনো মুখে আমার কানে কানে শুধালো, কোনো চিঠি পেয়েছেন আমার, আমার একটা বইয়ের মধ্যে?

আমি যেন ভাল করে জানিই না, এমনি ভান করে বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখেছিলাম বটে—তাতে যেন আপনারই নাম লেখা ছিল। থাকলে সেই বইয়ের মধ্যেই আছে। যেখানে ছিল। মারিয়ানা অস্বস্তিভরা চোখে বলল, আছে?

ওর চোখ দেখে বুঝতে পারলাম ও আমার মুখ দেখে বুঝতে চাইছে চিঠি দুটি আমি পড়েছি কিনা। আমি পাকা জোচ্চোরের মত বললাম, ভয় নেই। চিঠি পড়িনি আমি। পরের চিঠি পড়ার কোনো

অসভ্য নেই। মনে হোল, বিশ্বাসও করল কথাটা। তারপর আমাদের কাছে না বসে সুমিতাবৌদির কাছে যাবার ছুতোয় আমার ঘরের টেবিল হাতড়ে চিঠি দুটো বের করল নিশ্চয়ই বইটার মধ্যে থেকেই; তারপর মানসচক্ষে দেখতে পেলাম ওর হাতব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল।

বেশ কাটল অষ্টমীর দিনটা। হাসি গান, হৈ-হুল্লোড়, তাসখেলা, দাবা খেলা, কোনো খেলাই বাকি রইল না।

সন্ধ্যে নামতে না নামতেই বেশ হিম পড়তে লাগল। রামধানীয়াকে ডেকে যশোয়ন্ত বড় বড় শালই গাছের গুঁড়ি এনে বাঙলোর হাতায় আমলকী গাছের গোড়ায় আগুন ধরাল। আমরা সকলে আগুনের চারপাশে বসলাম গোল হয়ে।

আমাদের পীড়াপীড়িতে সুমিতাবৌদি গান শোনাতে রাজী হোলেন। কিন্তু গান শুরু করার আগেই বাঙলোর গেট দিয়ে গ্রামের একটা কুকুর প্রাণপণে দৌড়ে ভিতরে ঢুকল, এবং পেছন পেছন আর একটি কুকুর তাকে তার চেয়ে জোরে ধাওয়া করে ঢুকল। এবং দুজনেই আমাদের থেকে প্রায় পঁচাত্তর গজ দূর দিয়ে কোণাকুনিভাবে হাতাটাকে পেরিয়ে কাঁটাতারের বেড়া টপকে আবার বাঙলোর বাইরে জংগলে চলে গেল।

যশোয়ন্তকে দেখলাম উঠে দাঁড়িয়েছে।

কুকুর দুটো অদৃশ্য হতেই বলল, শালা'র ত বড় সাহস।

ঘোষদা শুধোলেন, কোন্ শালার?

যশোয়ন্ত বলল, চিতাটার। একেবারে ভরসন্ধ্যায় বাঙলোর সীমানায় ঢুকে কুকুর তাড়ায়।

আমরা সমস্বরে বললাম, পেছনেরটা চিতা নাকি? যশোয়ন্ত বলল, তা নয় ত কি? দৌড়নোর ঢঙ দেখে বোঝা যায় না? চিতার চাল আলাদা।

চিতা আর কুকুরের উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গেটের কাছে দেহাতী চাদরে মাথা ঢাকা একটি মূর্তি এসে দাঁড়াল। শরীরের গড়ন দেখে মনে হল চেনা চেনা। এমন সময়, চিতাটা যেমনি করে কুকুরটাকে তেড়ে গিয়েছিল প্রায় ওমনি করে যশোয়ন্ত লোকটার দিকে ধেয়ে গেল এবং তাকে ধাওয়া করতে দেখেই লোকটাও ঊর্ধ্বশ্বাসে সুহাগী গ্রামের দিকে দৌড়োলো।

কিন্তু যশোয়ন্ত ঘোসের সঙ্গে দৌড়ে পারে এমন লোক এ তল্লাটে বেশী নেই। একটু গিয়েই যশোয়ন্ত মোড়ের মাথায় লোকটাকে ধরে ফেলল, তারপর চাদর মোড়া অবস্থায়ই তাকে রাস্তার ধুলোয় ফেলে সমানে লাথি কিল চড় ঘুষি মারতে লাগল। লোকটির আর্তস্বর শবতের রাতের বন-পাহাড় মথিত করে তুলল। গলার স্বর শুনে মনে হল এ টাবড়ের ছেলে আশোয়া। কিন্তু হঠাৎ যশোয়ন্ত এমন করে মারছে কেন? আমি দৌড়ে গেলাম কিন্তু ফলে দু-একটা ঘুষি খেলাম মাত্র, তাকে থামাই আমার এমন সাধ্য কি!

এমন সময় সুমিতাবৌদি এসে যশোয়ন্তকে প্রায় আক্ষরিকভাবে জড়িয়ে ধরলেন এবং সেই ফাঁকে আশোয়া মাটি থেকে উঠে চাদরটা কুড়িয়ে নিয়ে অলিম্পিক স্প্রিন্টারের গতিতে সুহাগী বস্তির দিকে পালাল।

সুমিতাবৌদি বললেন, লোকটাকে অমন করে মারছিলে কেন?

যশোয়ন্তকে খুব উত্তেজিত দেখাল। ও বলল, বলব না। কারণ ছিল বলেই মারছিলাম। আমাকে কিছু না বললেও, বুঝলাম সেদিনের সেই গুলি-ঘটিত ব্যাপারে ওরও কোনো হাত ছিল। ও হয়ত জগদীশ পাণ্ডেদের ইনফর্মার।

জুম্মান রাতে পোলাও রেঁধেছিল। পোলাও এবং পাঁঠার মাংসর লাব্বা। সঙ্গে ভক্কর। রাইতা বানিয়েছিলেন বৌদি। জুম্মান সত্যি সত্যিই অনেক পদ রাঁধতে জানে। খাসীরই যে কত পদ রাঁধে তার ইয়ত্তা নেই। চাঁব, চৌরী, লাব্বা, পায়া, কোর্মা, কাবাব, কলিজা, কবুরো শরীরের বিভিন্ন অংশ দিয়ে বিভিন্ন রান্না।

এই খাওয়ার ব্যাপারে স্থানীয় লোক-দের মধ্যে নানারকম সংস্কার আছে। আমার বন্দুক কেনার পরে পরেই একটি বুড়ো ট্রাক ড্রাইভার। (যার সঙ্গে আমার জানা-শোনা ছিল) এসে একদিন আমাকে বলল, হুজোর আপ কভি ভাল মারনেসে উসকা কবুরো মুঝে দিজিয়েগা। গোস্তাকী মাফ কিজিয়েগা হুজোর।' অর্থাৎ আমি যদি কখনো ভাল্লুক মারি তাহলে ভাল্লুকের শরীরের এক বিশেষ অংশ যেন তাকে দিই।

এ কেমন বেয়াদবি আবদার? আবদার শুনে বুঝলাম না, রাগ করব কি করব না।

জুম্মান দেখি মুখ নীচু করে আছে। আমার মনে হল, ও হাসি চাপার চেষ্টা করছে। আমার সামনে হেসে ফেললে বেয়াদবি হবে বলে আপ্রাণ হাসি চাপার চেষ্টা করছে।

লোকটা চলে যেতে, আমি জুম্মানকে ডেকে শুধোলাম, লোকটি এমন অনুরোধ কেন করল? ভাল্লুকের কবুরো কি কোনো ওষুধে লাগে? জুম্মান মাথা নীচু করেই বলল, না হুজোর, ভাল্লুকের কবুরো খেলে কমজোরী মানুষও একদম মস্ত হয়। এই ড্রাইভারের বয়স বাষট্টি—কিন্তু ছ'মাস হল তৃতীয় পক্ষের বউ ঘরে এনেছে। বউয়ের বয়স পঁচিশ।

সেদিন মনস্থ করেছিলাম একটা নিদারুণ পরোপকার করার জন্যেও আমার অন্ততঃ একটি ভাল্লুক মারা দরকার।

আমরা খেতে বসলাম। এখনো ফায়ার-প্লেসে আগুন লাগে না। সুমিতাবৌদি বলছিলেন, নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারির শেষ অবধি ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাতে হবে—নইলে অত্যন্ত কষ্ট পেতে হবে শীতে।

যশোয়ন্ত বলল, তোমাদের নীরেট মাথা বলে সারা ঘর গরম করার জন্যে মণ মণ কাঠ পোড়াও। তার চেয়ে আমার মত দু আউন্স ওরল্ড ফিনিস পেটে ঢালো, সারা রাত পেটের মধ্যে ফায়ারপ্লেস নিয়ে বেড়াও—'রাত আমার পড়ে, শীত আমার ঝি, হুইস্কী সোডা পেটে আছে করবে আমার কি?' সুমিতাবৌদি ওকে বড় বড় চোখ করে ধমকে বললেন, তোমাকে কতদিন বলেছি যে তুমি আমাদের সামনে তোমার মদ খাওয়া নিয়ে বাহাদুরী করবে না নির্লজ্জের ত। আবার তুমি অমন করছ। সুমিতাবৌদির বকুনি খেয়ে যশোয়ন্ত যেন হঠাৎ নিভে গেল।

আমার ঘরে সুমিতাবৌদি আর মারিয়ানা শুলেন। আর আমার পাশের ঘরে তিনটে পাশাপাশি কেনা নেয়ারের চৌপায়াতে আমি, যশোয়ন্ত আর ঘোষদা।

শুয়ে শুয়ে বাবুর্চিখানায় প্যান্ট্রিতে জুম্মানের কাচের বাসন ধোয়ার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। রামধানীয়া রোজকার মতো কেরোসিনের কুপী জ্বালিয়ে দড়ির চৌপায়ায় বসে তুলসীদাস পড়ছে গুন-গুন করে। 'সকল পদারথ হ্যায় জগমাহী, কর্ম-হীন নর পাওয়াত নাহী।'

এই সব শব্দ, এই সব ঘুমপাড়ানী সুরে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে চিতাবাঘ, কোটরা, কি চিতল হরিণের ডাক শুনে সুহাগী বস্তির কুকুরগুলো কেঁউ কেঁউ করে ডেকে উঠছে। এ পর্যন্ত কোনো রাতে বড় বাঘের ডাক শুনিনি। তবে লোকে বলে, নভেম্বর ও মে মাসে বাঘেদের মিলনকালে এখানে সে ডাক প্রায়ই শোনা যায়।

পাশের ঘর থেকে সুমিতাবৌদি ও মারিয়ানার ফিসফিস করে মেয়েলি গল্পের গুঞ্জরণ শুনতে পাচ্ছি। পাশ ফেরার শব্দ। চুড়ির রিনরিন।

বাতেলোর হাওয়ায় শুকনো পাতার উপর গাছের পাতা থেকে টুপটাপিয়ে শিশির পড়ছে, তার শব্দ পেলাম। কখন যে চেতন থেকে অবচেতন এবং সেখান থেকে সুপ্ত চেতন হয়েছি জানি না।

সে রাতে বোধহয় বেশী খাওয়া হয়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে, কেমন দমবন্ধ দমবন্ধ লাগছে। বুক থেকে কম্বলটাকে সরালাম। চোখটা মেললাম। চেয়ে দেখি, আমার ঘরের দরজাটা খোলা। যশোয়ন্ত বাইরের বারান্দায় কম্বলমুড়ি দিয়ে ঠান্ডার মধ্যে ইজিচেয়ারে বসে আছে একা-একা। ওরও নিশ্চয়ই শারীরিক অস্বস্তি হচ্ছে বোধহয়।

সদ্য ঘুম-ভাঙা শরীরে এমন একটা আমেজ যে ওর সঙ্গে কথা বলে সেই আমেজটা নষ্ট করতে মন চাইছে না। শুয়ে শুয়ে বাইরের তারা-ভরা আকাশ দেখতে পাচ্ছি। রাত কত তা জানি না। অষ্টমীর চাঁদ উঠেছে এক ফালি। পান্ডুর শিশির ভেজা জ্যোৎস্নায় বারান্দাটা ভিজে রয়েছে। একটা খাপু পাখি ডাকছে সুহাগী নদীর দিক থেকে। খাপু খাপু-খাপু-খাপু-খাপু-খাপু...। আর ঝিঁঝিঁর একটানা গান।

দেখলাম যশোয়ন্ত কম্বলের পাটটা খুলে ভাল করে জড়ালো কম্বলটাকে।

যে ঘরে মেয়েরা শুয়েছিলেন, হঠাৎ সে ঘরের বাইরের দিকের দরজাটা খোলার একটা আওয়াজ পেলাম খুট করে। দুটি ঘরের মাঝে যে দরজা, সেটি বৌদিরা শোবার সময় ভেতর থেকে বন্ধ করেই দিয়েছিলেন। ঘোষদার নাক এখন বেশ জোরে ডাকছে। ফাঁরর্-ফ্‌র্-ফোঁস-ফাঁফর-ফাঁরর্।

সুমিতাবৌদির ভারী, চাপা-গলা শুনতে পেলাম। এই, তুমি এই ঠান্ডায় এখানে বসে আছ যে? যশোয়ন্ত জবাব না দিয়ে বলল, আপনি এত রাতে বাইরে বেরুলেন যে একা? ভয় করল না?

আমার ভয় করে না। তাছাড়া তোমার কাছে থাকলে তো করেই না।

যশোয়ন্ত বলল, বসুন। শুধু চাদর নিয়ে বাইরে এসেছেন? যান কম্বলটা নিয়ে আসুন।

আমার ঠান্ডা লাগবে না। তোমার কম্বল থেকে আমাকে একটু ভাগ দাও না? দেবে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যশোয়ন্ত দূরে বসে বলল, আচ্ছা আপনার কথা আমি সবসময় শুনি, আপনি আমার কোনো কথা কোনো সময়ে শোনেন না কেন? বলতে পারেন?

সুমিতাবৌদি যশোয়ন্তের পাশের চেয়ারটায় বসলেন। কম্বলের কোণাটা নিয়ে গায়ে দিলেন। বললেন, তাই বুঝি? শুনি না? কখনোই শুনি না? আচ্ছা, নাই যদি বা শুনি তাহলে আমার কথা তুমি শোনো কেন? আমি ত তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে, এমন কথা বলিনি?

যশোয়ন্ত আবার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর বলল, আপনাকে ভালবাসি বলে শুনি।

আমাকে কেন ভালবাস?
জানি না।

আমার কাছে তুমি কিছু কি চাও?
যশোয়ন্ত বলল, জানি না।

তুমি একটা আস্ত পাগল।
না। আমি পাগল নই।
তবে তুমি কি?
জানি না।

এ রকম কর কেন? আমার বুঝি কষ্ট হয় না?

হয় না। আপনার কিছুই হয় না। আপনি অদ্ভুত।

বেশ। তাহলে তাই। আমার প্রতি অবিচার কোরো না যশোয়ন্ত।

ঠিক আছে।

তারপর আবার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলো দুজনে।

দূরগুম দূরগুম করে একটা পেঁচা ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। সায়ান্ধকার থেকে অন্ধকারে।

হঠাৎ সুমিতাবৌদি যশোয়ন্তের মাথার একরাশ চুল হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিয়ে ওর গালের সঙ্গে গাল ছুঁইয়ে বসে রইলেন। আমার সেই সায়ান্ধকারেও মনে হলো যশোয়ন্তের সারা শরীরে যেন কেমন একটা শিহরণ খেলে যেতে লাগল। যশোয়ন্ত, বৌদির হাত দুখানি একটানে নিয়ে নিজের হাতে মুঠি করে ধরলো। তারপর হাতের তেলো দুটি ওর ঠোঁটে কয়েকবার ঘষলো। প্রায় পাঁচ মিনিট যশোয়ন্তের হাতে সুমিতাবৌদির হাত দুটি ধরে রাখল যশোয়ন্ত। মনে হল আর কখনো ছাড়বে না।

কেউ কোনো কথা বলল না। হঠাৎ সুমিতাবৌদি বললেন, এই তুমি কাঁদছ?— এই বোকা—তুমি কাঁদছ? ছি-ছি-ছি, কি বোকা। তুমি কাঁদছ?— এই বলতে বলতে বৌদির গলার স্বরও কান্নায় বুজে এল। বৌদি যশোয়ন্তের মুঠো থেকে হাত দুখানি ছাড়িয়ে আবার যশোয়ন্তের মুখটি দুহাতে ধরে বললেন, তুমি খুব ভাল যশোয়ন্ত, তুমি খুব ভাল।

তারপর অনেকক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসে রইল। বৌদি বললেন, আমি কি করব যশোয়ন্ত। আমি পারি না। লোকটার জন্যে মায়া হয়। যাও ঘরে যাও। তারপর প্রায় জোর করে বৌদি যশোয়ন্তকে ঘরে ঠেলে পাঠালেন। এবং নিজে গিয়ে দুয়ার দিলেন।

যশোয়ন্ত এসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

পাছে আমি জেগে আছি জানতে পারে ও, তাই তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেললাম।

যশোয়ন্তের মত ছেলেও কাঁদে। এবং এমনভাবে কাঁদে; ভাবা যায় না।

এখানে আমার পর থেকে কত কি শিখলাম, দেখলাম। আমার জীবন কোনো-দিনও বৈচিত্র্যময় ছিল না। সাহিত্যে অনেকানেক নায়ক-নায়িকার দেখা পেয়েছি—পড়েছি। কিন্তু কখনো আগে বুঝতে পারিনি যে নায়ক-নায়িকারা দূরের কি কল্পনার লোক নয়, তারা সকলেই আমাদের চেনা লোক। যাদের আমরা চোখ দিয়ে ছুঁই, হাত দিয়ে পরশ করি প্রতিনিয়ত যাদের অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি।

(ক্রমশ)

নেপথ্যের পথে

'রেট্না হাউস—পুণা'

সত্যব্রত দে

পার্ক স্ট্রীট-চৌরঙ্গীর মোড়ে লাল আলোর সংকেতে ট্যাকসীটা দাঁড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফুটপাত থেকে নেবে এসে গোঁপ-দাড়িওয়ালা একটা লোক জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে কিছু ভিক্ষে চাইলো। বিরক্তি-ভরে ওর দিকে তাকাতেই কেমন যেন চমকে গেলাম। দাড়ি-গোঁপের অন্তরালে ঐ চোখ দুটো যেন আমার খুবেই চেনা-চেনা। ব্যাগ থেকে পয়সা দেবার বিলম্বিত ছলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে স্মরণ করবার চেষ্টা করতে লাগলাম ওকে কোথায় দেখেছি। অজানতেই হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো 'আবদুল!'

ভূত দেখার মত লোকটা চমকে উঠে পলকে একবার আমার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে এক লাফে ফুটপাতে উঠে চৌরঙ্গীর দিকে হন হন করে হাঁটতে শুরু করলে। গাড়ীর দরজা খুলে লোকটার পিছু নেবার উপক্রম করতেই সবুজ আলোর সংকেতে গাড়ীগুলো হঠাৎ আবার চলতে শুরু করলো। ক্রসিংয়ের এপারে এসে গাড়ীটা দাঁড় করিয়ে আমি ছুটে এলাম লোকটার উদ্দেশে। কিন্তু বৃথাই। সে ততক্ষণে জনতার ভিড়ে কোথায় মিলিয়ে গেছে। মনটা ভীষণ বিষন্ন হয়ে গেল। আবদুলকে হাতের কাছে পেয়েও হারালাম। কতদিন ওকে খুঁজেছি। সুদীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছর পর অপ্রত্যাশিতভাবে চকিতে তার দেখা পেয়েও ধরার সুযোগ পেলাম না। আবদুলও যে আমাকে চিনতে পেরেছে সেটা তার পালানোর বহর দেখেই বোঝা গেল। আর এটুকুও অনুমান করতে অসুবিধা হোল না যে এ অঞ্চলে সে আর দেখা তো দেবেই না, এমন কি কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়াটাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। যে কারণে খোঁজা সে প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত রয়ে গেল। হয়ত ভবিষ্যতেও তাই থাকবে।

ভারাক্রান্ত মনে ট্যাক্সীতে ফিরে এলাম, ট্যাক্সী-ড্রাইভার সহানুভূতি জানাতে জানাতে আপন মনেই বকে চললো। আজকাল বাড়ীতে চাকর-বাকর রাখাই দায়। চুরি করে পালাবেই। বাধা দিলে খুন করতেও দ্বিধা করে না।

ওর কথাগুলো আবছা-আবছা আমার কানে এলেও তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ প্রথমত ওর ধারণাটাই ভুল। আর দ্বিতীয়ত মনটা তখন আমার পঁচিশ বছর আগেকার দিনে পিছিয়ে গিয়ে এক অমীমাংসিত প্রশ্নের কথা ভাবছিল।

লাহোর থেকে আমরা বিমানবাহিনীর অফিসার ক্যাডেটরা চলেছি পুণার দিকে। বোম্বে থেকে আবার পুণার গাড়ী ধরতে হবে। বম্বে সেণ্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছাবার পর জানতে পারলাম আপাততঃ আমাদের বোম্বেতে থাকতে হবে যতদিন না দিল্লী এয়ার হেডকোয়ার্টার্স থেকে পাকাপাকি নির্দেশ আসে। অভিজাত পল্লীর দোতলা বাড়ীর সদর দরজায় নাম লেখা আছে—"ফ্লাওয়ার মীড্—৯ নম্বর ওয়ার্ডেন রোড"। ছবির মত সুন্দর সাজানো বাড়ীটা। প্রত্যেক ঘরে চারজন করে ছেলে। আমার রুমমেট হোলো কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র মাইকেল ব্রেইক ওরফে মিকি এলাহাবাদ হাইকোর্টের জাস্টিস নরিস ক্লার্কের পুত্র নোবল্ ক্লার্ক ওরফে নবি আর নীলগিরি হিলসের এক কফি প্ল্যাণ্টার্সের পুত্র হেনরীক টিউ।

খেলাধুলো আর বহুবিধ দুষ্টুমির ডিপো হিসেবে আমাদের ঘরটা খ্যাতি বা কুখ্যাতির সেরা হয়ে দাঁড়াল। ক্যাম্পে যা কিছুই ঘটুক না কেন সন্দেহ বা দোষের বিড়ম্বনা প্রথমে আমাদেরই বরাদ্দ ছিল।

শনিবার বেলা একটায় ছুটি। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে থাকা চলে। তবে রোববার রাত বারোটার ভেতর ফিরতেই হবে। একতলায় একটা বড় হলঘর আছে। সপ্তাহে অন্যান্য দিনে সেটা লাউঞ্জ আর শনিবার ও রোববার রাত্রে নাচঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ক্যাম্পের কড়া নিয়ম। মেয়ে বন্ধু ঐ দুটো দিন সাদরে গৃহীত হলেও, হলঘর ছেড়ে শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া চলবে না।

বোম্বে থাকার আনন্দ আমাদের মাস-খানেকের বেশী সইলো না। হঠাৎ একদিন অফিসার কমাণ্ডিং হুকুম দিলেন পাততাড়ি গোটাও, যেতে হবে পুণা। মনের দুঃখ মনে রেখে এক সকালে ডেকান কুইনে চেপে দু ঘণ্টার ভেতর পুণায় এসে হাজির হলাম। মনে প্রাণে সবাই আশা করেছিলাম যে বোম্বের মত হয়ত শহরেই আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু সমস্ত শহরটা অতিক্রম করে, একটা নদীর ওপরের কজওয়ে পার হয়ে গাড়ীগুলো যখন আবার সোজা চলতে শুরু করলো, তখন বোবার মতন এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন ভাষা কারো মুখে ছিল না। হঠাৎ রাস্তার ধারে একটা সাইনবোর্ড নজরে পড়লো—"অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী, কিকী"। এবারে খানিককটা আঁচ করা গেল। কিছুদূর আরো আসার পরে আবার একটা সাইনবোর্ড 'ইয়ারোজ সেণ্ট্রাল জেল' বাংলায় যার নাম যারবেদা। মাইল দুই আরো চলার পর অপ্রত্যাশিতভাবে গাড়ী-গুলো একটা বিরাট পরিধিওয়ালা বাড়ীর সীমানায় ঢুকে পড়লো। রাস্তার গায়ে একটা প্রস্তরফলকে আবছা আবছা অক্ষরে দেখা যাচ্ছে—'রেটোনা হাউস—পুণা'। চারিদিকে কাঁটালতা আগাছার জঙ্গল আর বড় বড় পুরোন গাছ মিলিয়ে দিনের বেলাতেই কেমন যেন একটা রোমাঞ্চকর ভীতির সৃষ্টি করেছে। ছোট্ট একটা পাহাড়ী টিলার উপর তেতলা একটা বাড়ীরবারান্দায় এসে আমাদের গাড়ীগুলো থামলো। সেখান থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে একটা আউট হাউস। বাড়ীটাকে ঘষেমেজে সভ্য করে তোলার চেষ্টা তখনও চলছে। দেখেই বোঝা যায় যে নিশ্চয়ই অনেকদিন থেকে খালি পড়েছিল। নেহাৎ সামরিক প্রয়োজনে আজ তাকে মনে পড়েছে।

নীচের তলার মাঝখানে একটা বেশ বড় হলঘর। সেটাকে ঘিরে তিনপাশে বড় বড় ছ'খানা ঘর। অন্যপাশের সমস্তটা জুড়ে টানা লম্বা একটা করিডর। করিডরের শেষপ্রান্তে উপরে যাতায়াতের জন্যে একটা অটোমেটিক লিফ্ট। ঠিক হলো নীচে আর দোতলায় ছেলেরা থাকবে আর তেতলায় অফিসাররা। শিক্ষাকেন্দ্রের সমস্ত অফিসার এবং এন-সি-ও'রা ছিল রয়েল এয়ার ফোর্সের লোক। লটারীতে আমাদের চারজনের ভাগে পড়লো নীচের তলায় করিডরের শেষপ্রান্তে লিফ্টের কাছাকাছি ঘরটা।

জায়গাটা খুবই নির্জন। ঘন কাঁটাগাছের জঙ্গল ভেদ করে দূরে দূরে এখানে ওখানে দু-একটা বাড়ী দেখা যায়। আমাদের বাড়ীটার অপর দিকে রাস্তার ওধারে জেল-খানার মত উঁচু প্রাচীর দেওয়া বিরাট সীমানা জুড়ে দুর্গের ছাঁদে একটা বিশাল প্রাসাদ। রাস্তা থেকে তার ভেতরে কিছুই

দেখা যায় না। সেটি হচ্ছে 'আগা খান প্যালেস'। এরি মধ্যে কেমন করে জানি না কেউ একজন আবিষ্কার করে ফেলেছে যে বর্তমানে ওই বাড়ীতে গান্ধীজীকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সঙ্গে আছেন কস্তুরা-বাই আর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই। সকাল বিকেল বাড়ীর সামনে মাঠে ও'রা বেড়াতে বেরোন। অমনি ছেলেদের ভেতর ঠিক হয়ে গেল, অফিসাররা যেন জানতে বা বুঝতে না পারেন, এভাবে তিনচারজন করে ছাদে উঠে ও'দের দর্শন পাবার চেষ্টা করবে। প্ল্যানমাফিক প্রথম প্রথম সব ঠিকই চলছিল কিন্তু সকাল-বিকেল বাড়ীর ছাদে ওঠার অহেতুক উৎসাহ অফিসারদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করলো। আবিষ্কার করতে ও'দের বেশী দেরী হলো না উৎসাহের বিষয়বস্তুটা কি। সেদিন থেকে ছেলেদের শুধু ছাদে নয় এমন কি তেতলাতেও বিনা অনুমতিতে আসা নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

রুটিন-মাফিক ক্লাস আবার শুরু হয়েছে। রোজ সকালে বেলা আটটা থেকে নটা এই এক ঘণ্টা আমাদের প্যারেড করতে হোত। একদিন মারচ্ করতে করতে আমাদের কয়েকজনের একটি দল বাড়ীর সীমান্তে এক নির্জন কোণে এসে হাজির হয়েছে। হঠাৎ কাঁটাজঙ্গলের ঝোপ থেকে থেকে একটা লোক লাফিয়ে এসে আমাদের গতিরোধ করে দাঁড়াল। এই অস্বাভাবিক আবির্ভাবে সবাই কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই লোকটা চীৎকার করে উঠলো—"আমিই—আমিই খুন করেছি। শাস্তি যদি দিতে হয় আমাকে দিন।" বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পিছনে ফিরে হঠাৎ—"পুলিশ! পুলিশ!" চীৎকার করতে করতে দৌড়ে কাঁটাজঙ্গলের ভেতর কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল।

দিন দুই পর একদিন লোকটাকে দেখি আউট হাউস যেখানে আমাদের বেয়ারাদের বাসস্থান ছিল, সেখানে একটা গাছের তলায় বসে আছে।

লোকটার প্রতি অকারণেই আমার একটা ভয়মিশ্রিত কৌতূহল জেগে উঠলো। বেয়ারাদের কাছে শুনলাম লোকটার নাম আবদুল। একদিন সে এ বাড়ীতে ড্রাইভার ছিল। থেকে থেকে কোথায় উধাও হয়ে যায় আবার হঠাৎ একদিন ফিরেও আসে। সাধারণত কথাবার্তা বিশেষ কিছু বলে না। শুধু মাঝে মাঝে আপন মনে বলে ওঠে —"বিশ্বাস করুন—আমি—আমিই খুন করেছি। শাস্তি যদি দিতে হয় সে আমাকে দিন।" এর বেশী কোন কথাই তার মুখ থেকে বেরোয় না। লোকটা হাসলে বদ্ধ-পাগল। তবে ক্ষতিকারক বা বিপজ্জনক নয় বলে যখনই ও আসে, ওরা তাকে কিছু খেতেটেতে দেয়। ইচ্ছে হলে খায় আর না হলে খায় না। চুপচাপ বোবার মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু ঐ বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। এর পেছনে ঘটনা হয়ত কিছু একটা থাকতে পারে—কিন্তু পাগলের কাছ থেকে তা' জানার কোন উপায় নেই। তাছাড়া মাথাব্যথাও নেই কারোর। দিন রাত শুধু মদে ডুবে থাকে। অবিশ্যি এটাও দেখা গেছে যে যতই বেশী খায় ততই যেন ও স্বাভাবিক ও সুস্থ হয়ে ওঠে। বেশ কয়েকবার ওর মদের দাম জুগিয়ে আমরা চেষ্টা করেছিলাম কিছু গোপন রহস্য বার করা যায় কিনা। কিন্তু কোন ফল হয়নি।

দিন চারেক পর প্রথম শনিবার এলো। বেলা একটায় ছুটি। অনেকেই তখনই বেরিয়ে পড়লো শহরের দিকে। আমরা চারজন বেরুলাম পাঁচটার পর। নদীর বুকের সেই কজওয়েটি পার হয়ে এলেই ডানদিকে একটি বাগান—নাম তার বান্ধ গার্ডেন।

বেশ সুন্দর সাজানো-গোছানো শহর। খানিকটা হেঁটেবেড়িয়ে, একটা হোটেলে ডিনার খেয়ে, রাত নটার শোতে সিনেমা দেখে যখন বাড়ী ফিরলাম তখন রাত দেড়টা। বিছানায় শোয়া মাত্রই ঘুম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ আমাদের ঘরের কাছেই কোথায় যেন একটা বিকট চীৎকারের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল, প্রথমটায় ভেবেছিলাম হয়ত ক্লান্তিজনিত স্বপ্ন। কিন্তু করিডর দিয়ে লোকের ছুটোছুটি আর ঘরে ঘরে আলো জ্বালার ধুম সে সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিল। প্রায় একসঙ্গেই তিনজনেই লাফিয়ে উঠে-ছিলাম। দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি নীচের তলায় ওপর তলায় সর্বত্রই হৈচৈ ছুটোছুটি। সবাই বলছে একটি মেয়েলী গলার বিকট চীৎকার শুনতে পেয়েছে। কিন্তু কোথায়? এখানে এত রাত্রে মেয়ে আসবে কোথা থেকে? অনেক অফিসারও ইতিমধ্যে ওপর থেকে নিচে নেমে এসেছেন। এত রাতে মেয়ের উপস্থিতি অপ্রত্যাশিত হলেও অস্বাভাবিক নয়—এ সন্দেহটা তখন অনেকের মনেই প্রবল হয়ে উঠেছে। তাই তন্নতন্ন করে চারদিক খোঁজা হল। কিন্তু অপরাধীকে পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত প্রায় সবারই ধারণা হল যে নিশ্চয়ই ছেলেদের ভেতর কেউ বা কারা অন্যান্যদের চমকে দেবার জন্যে এই কাণ্ডটি করেছে। কে হতে পারে? অফিসার আর ছেলেদের চোখ-মুখের অবস্থা দেখে অনুমান করতে অসুবিধা হলো না যে সন্দেহটা আমাদেরই ঘরের ওপর। কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না যে এ কাজ আমরা করিনি।

এমন সময়ে তেতলায় বেশ একটা উত্তেজনা। সবাই সিঁড়ি বেয়ে উপরে ছুটলো। এসে দেখি কয়েকজন অফিসার এবং কমান্ডিং অফিসার মিলে আমাদের বেতারশিক্ষক ফ্লাইট লেঃ ডেভিসকে ধরাধরি করে অজ্ঞান অবস্থায় লিফ্ট থেকে বার করছেন। শুনলাম নিচের তলায় এত রাত্রে গণ্ডগোল শুনে ও'রা ছেলে-দের তিরস্কার করবার উদ্দেশ্যে নিচে আসবার জন্যে লিফটের বোতাম টিপেছিলেন লিফটটা চট করে দোতলা আর তেতলার মাঝামাঝি কোন জায়গা থেকে উপরে উঠে এলো। লিফ্টের দরজা খুলে উপরে লাইট জ্বালাতেই দেখেন এক কোণায় ডেভিস অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। ডেভিসের চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতেই মিনিট তিন চার বাদে তাঁর জ্ঞান ফিরলো। ভীতি-মাখানো চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—'মেয়েটি—মেয়েটি কোথায়?' কোন মেয়ে? এত রাতে এখানে মেয়ে আসবে কোথা থেকে? ডেভিস কিন্তু বার বার জোর দিয়ে বলতে লাগলেন যে মেয়েটিকে তিনি দেখেছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। —"আবোল তাবোল বাজে কথা না বলে কি হয়েছিল তোমার তাই বল"—প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠলেন কমান্ডিং অফিসার।

ডেভিসের আবার মদপ্রীতির খ্যাতি আছে। মরিয়া হয়ে ডেভিস বললেন, 'কিকী' ক্লাবে বসে যথেষ্ট পরিমাণে মদ খেয়েছি—এ কথা ঠিক। বেশ নেশাও হয়েছিল হয়ত একথাও ঠিক—কিন্তু জ্ঞান হারাবার মত মোটেই নয় একথাও নিশ্চিত। রাত প্রায় আড়াইটে নাগাদ ফিরে আসি। করিডরের সব বাতিই নেভানো ছিল শুধু একটা শূন্য পাওয়ারের নীল ডিমলাইট ছাড়া। আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। করিডর দিয়ে লিফটের দিকে এগুচ্ছি হঠাৎ নজরে পড়লে সাত আট হাত ব্যবধানে আমার আগে আগে গাউনপরা একজন সুন্দরী মেমসাহেব লিফটের দিকে চলেছে। আমার সন্দেহ হল যে নিশ্চয়ই মেয়েটি কোন গোপন অভিসারে চলেছে। এত রাতে যে মেয়ে এভাবে পুরুষদের ক্যাম্পে একলা আসতে পারে তার সঙ্গে একটু আধটু ফার্ষ্টি-নষ্টি করতে দোষ কি? পা টিপে টিপে মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে আমিও লিফটে ঢুকে পড়লাম। মেয়েটি লিফ্টে ঢুকে আলো না জ্বালিয়েই উপরে উঠবার জন্যে বোতাম টিপে ধরলো। এই আলো না জ্বালার ভেতর আমি একটা প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ের আভাষ পেলাম। লিফটটা ততক্ষণে দোতলা আর তেতলার মাঝবরাবর এসেছে। আর থাকতে না পেরে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম। সেই মুহূর্তেই মেয়েটি এমন একটা বীভৎস চীৎকার করে উঠলো যেন মনে হলো কেউ ওর গলা টিপে ধরেছে। তারপর কি হলো আর কিছু আমার মনে পড়ছে না।'

ইতিমধ্যে অনেকেই অনেক কষ্টে হাসি চাপবার চেষ্টা করছিল। গম্ভীরভাবে সব-কিছু শুনবার পর কমান্ডিং অফিসার বললেন—"আচ্ছা ডেভিস! সত্যি করে বলতো ক্লাবে বসে ক' বোতল খেয়েছে?' এতক্ষণ ধরে যে হাসিটা সকলের দম বন্ধ হয়েছিল—এবারে সেটা সোডার বোতলের ছিপি খোলার রূপ পেলো। ডেভিস তখন আমতা আমতা করে বললো—"কি জানি বাবা। হয়তো তা হতেও পারে!"

আবার সারা সপ্তাহ কেটে শনিবার এসেছে। আজ আমি মিকিদের সঙ্গে বেরুলাম না। পুণায় তখন বেশ কিছু বাঙালী সরকারী কর্মচারী ছিলেন বিশেষ করে আবহাওয়া অবজারভেটারীতে। সরকারী এবং স্থানীয় বেসরকারী বাঙালী-দের মিলিত প্রচেষ্টায় পুণায় বেঙ্গলী ক্লাব বলে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। আজ সেখানে (স্বর্গত) বিখ্যাত গীতিকার, গায়ক এবং সুরকার হিমাংশু দত্ত সুরসাগরের একটি

গানের আসরে নিমন্ত্রণ। সন্ধের পর সেখানে হাজির হলাম।

ফিরে যখন এলাম তখন প্রায় রাত দুটো। ওরা তিনজন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সবে তন্দ্রার মত এসেছে এমন সময় হঠাৎ নারীকণ্ঠের সেই বীভৎস চীৎকার। যেন মৃত্যুমুখী কোন নারীর শেষ আর্তনাদ! ধরমড় করে উঠে আলো জ্বালাতেই দেখি ওরাও উঠে বসেছে। ইতিমধ্যে আবার সেই ছোটাছুটি—হৈচৈ—খোঁজাখুঁজি। এর ভেতর কে একজন লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। লিফ্‌টটা তখন ওপরে। সেটাকে নিচে নাবিয়ে আনার জন্যে বোতাম টিপলো। লিফটটা নেবে আসতেই দরজা খুলে আলো জ্বালবার পরমুহূর্তেই ভয়ে সে চীৎকার করে উঠলো। ঠিক ডেভিসের মতই লিফটের এককোণায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন আমাদের গ্রাউন্ড ইনস্ট্রাক্টার ফ্লাইট লেঃ গ্রাহাম। ছেলেরা ধরাধরি করে ওঁকে বাইরে নিয়ে এলো। ওপর থেকে অফিসাররাও প্রায় সবাই ততক্ষণে এসে গেছেন। জ্ঞান ফেরার পর তিনিও ঘটনার যে বিবরণ দিলেন সেটি ডেভিসের কাহিনীর মতই হুবহু। যে কারণেই হোক আজ আর কারো মুখে হাসি নেই। কমাণ্ডিং অফিসারের মুখ গুরু-গম্ভীর। একটু পরেই ছেলেদের লক্ষ্য করে বললেন—"আগামীকাল তোমাদের সবাইর ক্যাম্পের বাইরে যাওয়া নিষেধ ব্রেকফাস্টের পর সবাই হলঘরে জমায়েত হবে। আমার কিছু কথা বলার আছে।"

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের পর সবাই হলঘরে এসে হাজির। কমাণ্ডিং অফিসার এসে কোন ভূমিকা না করেই বললেন—সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে এমন কি প্র্যাকটিকেল তামাসারও। তোমাদের এটা বোঝা উচিত যে এ ধরনের তামাসা থেকে যেকোন মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটা অসম্ভব নয়। আমি এ সম্বন্ধে নিশ্চিত যে তোমাদের মধ্যে কেউ বা কারা এ ধরনের মর্মান্তিক ও বিপজ্জনক রসিকতায় মেতে উঠেছ। যা হোক, অপরাধী যেই হোক সে যেন সাহস করে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতে এ ধরনের তামাসা আর করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। আশা করি সে সাহস তোমাদের আছে। আমি জানতে চাই লোকটি কে?'

কেউ এগিয়ে এলো না। তখন কমাণ্ডিং অফিসার বললেন—"বেশ! তাহলে তোমাদের ভেতর কেউ অপরাধী নও? আচ্ছা, তোমরা যে যার ঘরে গিয়ে নিজের নিজের বিছানার পাশে দাঁড়াও। অফিসাররা তোমাদের জিনিসপত্র তল্লাসী করে দেখবেন। দেখা যাক এ সম্বন্ধে কোন হদিস পাওয়া যায় কিনা।"

আমরা যে যার ঘরে ফিরে গেলাম। টিউ কিছু একটা বলতে গিয়েই যেন থেমে গেল। ওর চোখ-মুখের অবস্থা দেখে আমরা নিজেরাই কেমন যেন নার্ভাস হয়ে পড়লাম। ওর কাছ থেকে কিছু শোনার সুযোগ হবার আগেই দেখি দুজন অফিসার আমাদের ঘরে ঢুকে পড়েছেন। একে একে আমাদের তিনজনের জিনিসপত্র তল্লাস হয়ে গেল। এবারে টিউর পালা। ও যেন পাথর হয়ে গিয়েছে। আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না টিউ কেন এমন করছে। স্যুটকেস খুলে একজন অফিসার যখন তার ভেতর থেকে মেয়েদের একটা নতুন গাউন আর হালফ্যাসানের ব্রা বার করলো—তখন অফিসারদের চাইতে আমরাই বোধকরি বেশী অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের বোকা বোকা মুখগুলির দিকে একবার তাকিয়ে মুচকি হেসে ওঁরা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। টিউ তখনও বোবা হয়ে আছে। বার কয়েক বেশ জোরে ঝাকুনি দেবার পর ও যেন নিজেকে ফিরে পেল। অনেক কষ্টে ওর কাছ থেকে গাউন আর ব্রায়ের রহস্য বার করা গেল। লণ্ডনে থাকতে ওর সঙ্গে মরিণ ডানলপ বলে একটি মেয়ের বেশ হৃদ্যতা হয়। মেয়েটির জন্মদিনে উপহার দেবে বলে কিনে রেখেছিল। ভেবেছিল শনিবারে এসে উপহারগুলি দিয়ে যাবে। তার ফল এমন দাঁড়াবে কে জানে।

একটু পরেই টিউর ডাক পড়লো। করুণ চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে টিউ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মিনিট পাঁচেক পর ফিরে এসে বললো—আমার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না। শাস্তি দিয়েছেন পুরো ব্যাটেল ড্রেস পরে রাইফেল নিয়ে দু ঘণ্টা ফ্যাগ খাটতে হবে। তাও সহ্য করতে পারতাম কিন্তু প্রিয়া মরিণের জন্যে এত টাকা খরচ করে যে উপহার কিনেছি সেগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছেন—এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।'

আবার শনিবার এসেছে। চারজনেই যখন ফিরলাম তখন ঘড়িতে দেড়টা। ঘুম আসতে দেরী হয়নি। হঠাৎ সমস্ত বাড়ী কাঁপিয়ে সেই মর্মভেদী আর্তচীৎকার আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পর পর দুটি রিভল-বারের গুলীর আওয়াজ। আবার সেই ছুটোছুটি আলো-জ্বালাজ্বালি। কিন্তু আমরা ঠিক করলাম ঘরের দরজাও খুলবো না—বাইরেও যাব না। যা হবার তা হোকগে। কিন্তু আমাদের বন্ধ দরজায় করাঘাতের আধিক্য শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রতিজ্ঞাচ্যুত করলো। বাইরে এসে দেখি এবারকার নায়ক স্বয়ং কমাণ্ডিং অফিসার। রিভলবার হাতে লিফটের ভেতর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। মেডিকেল অফিসার এসে জ্ঞান ফেরালেন ঘোলাটে চোখদুটো এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছে। তারপর প্রশ্ন করলেন—"মেয়েটি কি বেঁচে আছে?" সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। মেয়ে কোথায় এখানে? —আশ্চর্য আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না এটা কি করে সম্ভব!' তারপর তিনি যে ঘটনাটা বললেন, সেটা হচ্ছে এই যে সেদিন পুপোষ্ক অফিসার্স ক্লাবে তাঁর ডিনার পার্টি ছিল। ফিরলেন যখন তখন ঘড়িতে আড়াইটা। ডিমলাইটের আবছা অন্ধকারে করিডর দিয়ে তিনি যখন লিফটের দিকে আসছিলেন তখন হঠাৎ দেখতে পেলেন তাঁর সাত আট হাত আগে গাউনপরা সুন্দরী একটি তরুণী লিফটের দিকে চলেছে। হাতে-নাতে এবারে অপরাধীকে ধরতে পেরেছেন এই আশায় তিনি মেয়েটিকে থামতে আদেশ দিলেন। তার আদেশ শোনা দূরে থাক এমন কি ভ্রুক্ষেপও করলো না। সে তার ওপর মনে উদ্ধত অবহেলায় লিফটের দুয়ার খুলে ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও লিফটে ঢুকে পড়লেন সামনাসামনি মোকা-বিলা করবেন এই আশায়। মেয়েটি আলো না জ্বালিয়েই লিফটের সুইচ টিপে ধরেছে। তিনি মেয়েটিকে বার বার প্রশ্ন করতে লাগলেন কেন সে বেআইনীভাবে এত রাতে ক্যাম্পের ভেতর ঢুকেছে? তাকে কে আসতে বলেছে? সে যাচ্ছেই বা কোথায় কিন্তু মেয়েটি নির্বিকার—নিরুত্তর। কথার জবাব দেওয়ার কোন প্রয়োজনই মনে করছে না। লিফটটি ততক্ষণে দোতলা আর তেতলার মাঝামাঝি জায়গায় এসেছে এমন সময় সেই আলো-অন্ধকারে তিনি দেখতে পেলেন লিফটের অন্য এক কোণ থেকে একটি লোক ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মেয়েটির গলা টিপে ধরেছে। মেয়েটি প্রাণপণ চীৎকার করে উঠলো। তাকে আততায়ীর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তিনি সেই লোকটিকে লক্ষ্য করে পর পর দুটি গুলি চালিয়েছেন। আশ্চর্য—কেউ কোথাও নেই—এটা কি করে সম্ভব!

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে কমাণ্ডার অফিসার হুকুম দিলেন কেউ যেন আজ আর ক্যাম্পের বাইরে না যায়।

একটু পরেই বেরিয়ে গেলেন তিনি আর রেজাল্ট বাবোটা নাগাদ। এসেই জরুরী তলব সবাই যেন তক্ষুনি যে যার জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয়। লাঞ্চের পরেই এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে। এতক্ষণ পর্যন্ত যে সন্দেহটা সবাইর মনে জল্পনা-কল্পনা হয়ে ছিল, এবারে সেটা বহু বর্ণে গন্ধে রূপান্তরিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

চারটে নাগাদ আবার আমরা রওনা হলাম পুণার দিকে। গাড়ীগুলো সদর দরজা পার হয়ে রাস্তায় পড়বার আগেই হঠাৎ কাঁটাগাছের এক ঝোপ থেকে সেই পাগলটা লাফিয়ে পড়ে গাড়ীর গতিরোধ করে চীৎকার করে উঠলো—"আমি—আমিই খুন করেছি। শাস্তি যদি দিতে হয় আমাকে দিন।" এতদিন পর্যন্ত যাকে দেখলে, যার কথা শুনলে পাগল আর পাগলামি বলে মনে হতো—ঠিক এই মুহূর্তে মনে হলো এর কথাগুলি সত্যি হলেও হতে পারে। কেন জানি না আর কোন কারণও খুঁজে পাইনি আজও—কেন সেদিন সেই মুহূর্ত থেকে একটা অদ্ভুত নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল যে যেমন করেই হোক রেটনা হাউসের রহস্য আমাকে জানতেই হবে।

নদীর বুকের সেই কজওয়েটা পার হয়ে এপারে এলাম। ডানদিকে বান্ধ গার্ডেন আর বাঁ পাশে একটা বিরাট সদ্য-নির্মিত প্রাসাদ। সেই গাড়ীটার ভেতরই আমাদের গাড়ী ঢুকলো। বাড়ীটার নাম 'পার্শী অরফেনেজ বিল্ডিং'। বোম্বের বিত্তশালী

পার্শীরা তৈরী করেছিলেন তাঁদের সমাজের অনাথ ছেলে-মেয়েদের বাসস্থান হিসেবে। সামরিক প্রয়োজনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভেতর রিকুইজিশান হয়ে গেল বাড়ীটা।

রেটনা হাউস আমার জীবনের শান্তি কেড়ে নিয়েছে। বন্ধু-বান্ধব, খেলাধুলো, বিশ্রাম কিছুই আর ভাল লাগছে না। শনিবার হলেই কেমন যেন একটা অদৃশ্য শক্তি আমাকে টেনে নিয়ে যায় ঐ বাড়ীতে। একলা ঐ ধরনের বাড়ীতে আসাটার ভেতর যে ভয় ও বিপদের সম্ভাবনা থাকতে পারে, সে-কথাটা একবারও আমার মনে হয়নি। বরঞ্চ যেন মনে হতো, রোমাঞ্চকর কোন এক গোপন অভিসারে চলেছি।

রেটনা হাউসের দরজা-জানালা সব বন্ধ। আউট হাউসেও কোন জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। আবদুলকেই আমার প্রয়োজন অথচ তার দেখা পাচ্ছি না। কাছাকাছি একমাত্র আগা খান প্যালেস ছাড়া দ্বিতীয় কোন বাড়ীতে বিশেষ কোন লোকজনের চিহ্নও দেখা যেতো না। আগা খান প্যালেসের চারিদিকেই পুলিশ প্রহরা। সেখানকার কোন লোকের কাছে কিছু জিগ্যেস করতে যাওয়াটা বিশেষ বিপজ্জনক। একদিন হাঁটতে হাঁটতে আগা খান প্যালেসের শেষ সীমানায় একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে অপ্রত্যাশিতভাবে আবদুলকে পেয়ে গেলাম। সে তখন দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়া করছে। সুযোগটা বোধ করি ভগবান জুটিয়ে দিলেন। মধ্যস্থতা করার ছলে দোকানদারকে বললাম—

—'আবদুল আমার পুরোন বন্ধু। বড় ভাল লোক। ওর সঙ্গে কেন শুধু শুধু ঝগড়া লাগিয়েছ। তোমার কি বলার আছে আমাকে বল।'

—'দেখুন না সাহেব। ধারে মদের বোতল চাইছে। এর আগের দু' বোতলের দাম এখনও বাকি। টাকা না দিলে দোষ মা বলাতে খাপ্পা হয়ে গেছে। আমি গরীব মানুষ......।'

—'তোমার কত পাওনা?'

—'আড়াই টাকা।'

—'আগের আড়াই টাকা আর এখন একটার জন্যে পাঁচ সিকে এর থেকে কেটে নাও'—বলে আমি একটা পাঁচ টাকার নোট দোকানদারের দিকে এগিয়ে দিলাম। আড়চোখে দেখছি আবদুল যেন আমাকে নীক্ষতে মাপছে। কিছুটা দ্বিধা আর কিছুটা সন্দেহ তার মনে আসাটা অস্বাভাবিক নয়। আমি তার দিকে একবারও তাকালাম না। ইতিমধ্যে দোকানদার গোপন জায়গা থেকে একটা বোতল নিয়ে এসে আবদুলকে দিতে গেল কিন্তু সে তখনও নিশ্চল হয়ে একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তখন দোকানদারের হাত থেকে বোতলটা নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে ধরলাম। কয়েকটা সেকেণ্ড, তারপরেই বোতলটাকে নিয়ে হনহন করে রেটনা হাউসের দিকে চলতে থাকলো। আজকে আর আবদুলের পেছনে যাওয়াটা ঠিক হবে না সেই মনে হলো। আর একদিন দেখা যাবে।

অসহ্য অধীর প্রতীক্ষায় আমার সারা সপ্তাহটা কাটে। যতই শনিবার এগিয়ে আসে, ততই যেন কেমন আমি অস্বাভাবিক হয়ে পড়ি। বন্ধুরা সব বলতে আরম্ভ করেছে রেটনা হাউসের ভূতটা নাকি আমার ঘাড়ে চেপেছে। অস্বীকার করার উপায় নেই—কেননা, নিজেই সেটা বেশ ভালভাবে উপলব্ধি করেছি।

এমনিভাবে আরো তিনটি শনিবার কেটে গেছে। আবদুলকে অনেক সহজ করে নিয়ে এসেছি। নিচের সেই হলঘরেই একটা ভাঙা খাটের উপর বসতাম দুজনে। কিন্তু তিন-চার ঘণ্টার ভেতর বোধ করি তিন-চারটে কথাও আমাদের মধ্যে হতো না। সন্ধে হলে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিত। নির্জন নিস্তব্ধ পরিবেশে দিনের পর দিন নীরবে বসে থেকে বোধ করি দুজনে দুজনকে পরীক্ষা করে চলেছি—কে আগে নিজেকে প্রকাশ করে—ধরা দেয়।

হঠাৎ কেন খেয়াল হলো নিজেই বলতে পারবো না, সেই শনিবারে ক্যাম্পের ক্যান্টিন থেকে একটা বড় বোতল হুইস্কি নিয়ে রেটনা হাউসের দিকে রওনা হলাম। বাড়ীর দরজার সামনে নবি, মিকি আর টিউ শহরে যাবার উদ্দেশ্যে ট্যাক্সির আশায় অপেক্ষা করছিল। হুইস্কির বোতল হাতে আমাকে দেখে তাদের বিস্ময়ের অন্ত রইলো না। রসিকতা করে বললো—'হ্যাভ ইউ মেট মিসেস্ রেটনা? হাউ ইজ সি লাইক?—আর্লি লাক বয়? হ্যাভিং এ নাইস টাইম?'

—'নট ইয়েট। বাট আই এক্সপেক্ট টু মিট হার টু-নাইট।'

—'উই আর শিওর ইউ ওন্ট ফরগেট ইউর ওল্ড চামস্ হোয়েন ইউ মেইক সাম প্রোগ্রেস উইথ হার।'

—'ওঃ শিওর আই ওন্ট। প্রোভাইডেড দি লেডি ইজ উইলিং।'

'দ্যাটস এ প্রমিস বয়?'

—'য়্যা—প্রমিস।'

রেটনা হাউসে যখন পৌঁছালাম তখন অস্তগামী সূর্যের রক্তিম রঙে সমস্ত বাড়ীটা লাল হয়ে উঠেছে। দরজা-জানালা সমস্ত তেমনি বন্ধ, এমনকি নিচের হলেরও। বারকয়েক দরজার কড়াটা নেড়ে কোন সাড়া না পেয়ে ফিরবো কিনা ভাবছি এমন সময়ে দরজা খুলে ঢুলু ঢুলু চোখে আবদুল এসে দাঁড়াল। ওর চেহারা দেখে মনে হলো আজকে যেন ও যে-কারণেই হোক বিশেষভাবে উত্তেজিত। ঘরে খালি বোতলের সংখ্যা দেখে অনুমান করতে অসুবিধা হলো না যে আজ সকাল থেকেই ওর বিরাম নেই। কোন কথা না বলে একটা ভাঙা চেয়ারের ওপর বোতলটা রেখে খাটের এক পাশে গিয়ে বসলাম। আড়চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে আবার হাতের গ্লাসের দিকে মন দিল। ওর সবকিছুর ভেতর যেন আজ একটা অস্বাভাবিক সুর। মনটা হয় অনেক দূরে আর তা না হলে মদের নেশায় অপ্রকৃতিস্থ। আজকের দিনটাও বোধহয় বৃথা গেল। চলে গেলে কেমন হয় ভাবছি এমন সময়ে বাইরে ভীষণ ঘনঘটা করে মেঘের আস্ফালন। কয়েক মিনিটের ভেতর মুষলধারায় বৃষ্টি আর বাতাসের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। অগত্যা আর কি করি থাকতেই হলো। বোবার মত নিঃশব্দে দুটি লোক বসে। যেন কেউ কাউকে চিনি না এবং আলাপও নেই। বাইরে আজ যেন বৃষ্টি আর বাতাস মিলে প্রলয় নাচনের সম্মিলিত অনুষ্ঠান চলছে।

এক সময়ে বৃষ্টি থামলো। যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। বোবার মত যে লোকটা শুধু নীরবে এতক্ষণ ধরে মদ গিলে যাচ্ছিল সে হঠাৎ কথা বলে উঠলো—'বসুন। এত রাতে কেমন করে ফিরবেন?' ঘড়ির কথা এতক্ষণ খেয়ালই হয়নি। তাকিয়ে দেখি বারোটা।

—'ফিরতে হবেই। দেখি যদি কোন গাড়ী পাওয়া যায় আর তা না হলে হেঁটেই ফিরতে হবে।'

—এই বৃষ্টি-বাদলার দিনে এত রাতে এ-পথে কোন গাড়ী পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আর এ-জঙ্গলের পথে এত রাতে পায়ে হেঁটে ফেরার চেষ্টার ভেতর সাহস থাকলেও, যুক্তি নেই।'

—'তাই বলে একটা বোবা লোকের সামনে বসে রাত কাটাবার ইচ্ছেও আমার নেই।' আমার কথার ঝাঁঝটা বোধ করি একটু তীব্রই হয়েছিল। চকিতে সে আমার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে বললো—'যে-কথাটা শোনার জন্যে দিনের পর দিন আপনি সাহস করে এ-বাড়ীতে এসেছেন—আমার কাছ থেকে কিছু শোনবার আশায় দিনের পর দিন আমাকে ঘুষ দিয়েছেন—সেটা যদি না জানতে পারেন, তাহলে

আপনার এত পরিশ্রমের মজুরী পোষাবে কেন?' আশ্চর্য! এ যেন পাগলা আবদুল নয়—সম্পূর্ণ একটা ভিন্নলোক। এ তো রীতিমত সুস্থ স্বাভাবিক ও যুক্তিবাদী।

মনে পড়ে গেল সেই চা-ওয়ালাটা একদিন বলেছিল—'যে পরিমাণ খেলে লোকে মাতাল হয়, আবদুল সেখান থেকে ধীর, স্থির, সুস্থ হয়ে ওঠে।' কথাটা দেখলাম মিথ্যে নয়। আজ হয়ত সে-সুযোগ এসেছে। বিনা বাক্যব্যয়ে আবার বসে পড়লাম।

বেশ কিছুটা নীরবে কেটে গেল। গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে আমাকে প্রশ্ন করলো—'এ অহেতুক কৌতূহল কেন?'

—'সংসারে অনেক 'কেন' আছে যাকে সহজভাবে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না বা তার কোন কারণও খুঁজে পাওয়া যায় না। তখ্য বাধ্য হয়েই বলতে হয়—'এমনিই'।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো আর তারপরেই হাতের গ্লাসটা সজোরে ঘরের দেওয়ালের গায়ে ছুঁড়ে মারলো। মাঝরাত্তিরে ঐ গ্লাস ভাঙার শব্দ বুকফাটা আর্তনাদের মত বন্ধ ঘরের দেওয়াল থেকে দেওয়ালে কেঁদে ফিরতে লাগলো। আমি অচল অনড়।

উঠে দাঁড়াল আবদুল। এদিক থেকে ওদিক গভীর চিন্তামগ্ন মনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছি সংগ্রাম চলছে ওর মনে। তারপর এক সময়ে বিনা-ভূমিকায় শুরু করলো তার কাহিনী ঃ

'প্রথম যেদিন এ-বাড়ীতে আসি, তখন আমার বয়েস তের। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে নিজের আপনজনের মত স্থান দিয়েছিলেন। একটু বড় হলে নিজের হাতে আমাকে মোটর চালাতে শিখিয়েছিলেন। তখন থেকেই আমি তাঁর ড্রাইভার। আমার মনিব মিঃ কে এল রেট্‌না ছিলেন একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। দেশের চাইতে বিদেশেই তাঁর খ্যাতি ছিল ব্যাপক। কিন্তু আমাদের কাছে মানুষ হিসেবে ছিলেন আরো বড়। উদার মন। শিক্ষা-দীক্ষা, শান্ত, ধীর, ভদ্র ব্যবহার সব মিলিয়ে এমন মানুষের দেখা কদাচিৎ মেলে। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি কিন্তু অবিবাহিত। প্রচুর বিত্ত ছিল কিন্তু গৃহিণী ছিল না। দেশে-বিদেশে অনেক সুন্দরী মেয়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন কিন্তু জীবনের এই একটা দিকের কথা তিনি একরকম ভুলেই গিয়েছিলেন। ছবি আঁকতেই ডুবে থাকতেন দিনরাত। ছবি আঁকাই ছিল তাঁর ধ্যান, তাঁর সাধনা। শহর এলাকা ছেড়ে নির্জন জঙ্গলে এই বাড়ীকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন সাধনার ক্ষেত্র হিসেবে। গৃহিণীবিহীন এ-সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়েছিল আমার উপর।

প্রতি বছর তিন-চার মাসের জন্যে ইউরোপ, আমেরিকায় যাওয়া ছাড়া তাঁর জীবনে অন্য কোন বৈচিত্র্য ছিল না। একদিন প্যারিস থেকে এক চিত্র-প্রদর্শনীতে বিচারকের জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি প্যারিস যাত্রা করলেন। সেই প্রদর্শনীতে তেইশ-চব্বিশ বছরের অপূর্ব সুন্দরী এক ফরাসী তরুণীর সঙ্গে তাঁর আকস্মিক হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। এতদিন ধরে যে প্রাকৃতিক কামনাকে জীবন থেকে নির্বাসিত করে রেখেছিলেন, সে বোধ করি সুযোগ পেয়ে উপযুক্ত প্রতিশোধ নিল। তাঁকে বিয়ে করে রেট্‌না সাহেব ফিরে এলেন একদিন। এতবড় বাড়ীতে দ্বিতীয় লোক ছিল না কেউ। এমন দেবতুল্য মনিবের ঘরে গৃহিণীর অভাব আমাদের সকলেরই মনোবেদনার কারণ ছিল। এতদিন পরে যাহোক দেশীয় না হলেও, একজন যে গৃহকর্ত্রী এসেছেন, এতেই আমরা সকলে আনন্দিত হয়ে মেমসাহেবকে সাদরে গ্রহণ করেছিলাম।

রেটনা সাহেব আগেকার মতই যথারীতি আবার ছবি আঁকায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন। মেমসাহেব রইলেন বাড়ী আর বাগান নিয়ে। রেটনা হাউসের নিরুদ্রব জীবনযাত্রায় এতটুকুও তারতম্য ঘটলো না।

মাস তিনেক বাদে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে কিংকী ইউরোপীয়ান ক্লাব থেকে এলো বড়দিনের নিমন্ত্রণ। স্বামী স্ত্রী দুজনকেই যাবার অনুরোধ। প্রথমটায় একটু অবাক হলেও শেষপর্যন্ত গেলেন দুজনেই। গাড়ী চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম আমিই। অনেক সাহেব-মেমের ভিড়ে প্রথমটায় একটু অসুবিধা হলেও শেষ পর্যন্ত সবাইর সঙ্গে মেতে উঠতে মিসেস রেটনার খুব দেরী হলো না। অকারণে বেশী রাত জাগা রেটনা সাহেব মোটেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু অনেকদিন পর স্ত্রীকে আনন্দে মাততে দেখে তিনি তাঁকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার জন্যে বিব্রত করালেন না। আমার ঘুম ভাঙিয়ে দুজনে যখন গাড়ীতে এসে বসলেন তখন ভোর হতে বিশেষ দেরী নেই। দুজনের ভেতর যে কথাবার্তা হচ্ছিল তার টুকরো টুকরো কিছু আমার কানেও এসে পৌঁছাচ্ছিল—

ডার্লিং! ক্লাবের প্রেসিডেন্টের স্ত্রী মিসেস ওয়াটসন ওঁদের ক্লাবের সভ্যা হতে অনুরোধ করেছেন—কি করা যায় বলতো?'

অসুবিধের তো কোন কারণ দেখছি না। বরঞ্চ আমার তো মনে হচ্ছে ভালই হবে। কেননা বিকেলে খানিকটা সময় ক্লাবে এসে দশজনের সঙ্গে গল্প-গুজব করে কাটিয়ে গেলে—তোমার মনটা ভালই থাকবে।

—কিন্তু...।

—আমার জন্যে ভেবো না। এমনিতেই বেশী হৈ-চৈ আমার ভাল লাগে না। আবদুল তোমার সঙ্গে থাকলে আমি নিশ্চিন্তবোধ করবো।

—আমি যেতে পারি একটা সর্তে। তুমি যেন আবার একলা একলা ডিনার খেয়ে নিও না।

—সে কি হয় কখনও? তুমি ফিরে এলেই একসঙ্গে বসবো।

প্রথম প্রথম শুধু শনিবার আর রবিবার যেতেন। পরে সে মাত্রা বেড়ে গিয়ে প্রায় প্রতিদিনে দাঁড়াল। তবে তাতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। কারণ মিসেস রেটনা রাত আটটার ভেতর অবশ্যই ফিরে আসতেন আর তারপর দুজনে মিলে ডিনারে বসতেন।

একদিন বিলেত থেকে সদ্যআগত বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের এক তরুণ সামরিক অফিসার লেঃ এডমন্ড বার্কের সঙ্গে মিসেস রেটনার আলাপ হয় ক্লাবে। ধীরে ধীরে সে আলাপ হৃদ্যতায় পরিণত হলেও সেটা তখনও আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়নি বা এর ফলে মিসেস রেটনার জীবনযাত্রায়ও কোন বৈচিত্র্য দেখা দেয়নি। এমনি ভাবে প্রায় সাত-আট মাস কেটে গেল। মিঃ রেটনার বিদেশ যাত্রার সময় হয়ে এসেছে। সেটাকে আরো নিশ্চিত করলো প্যারিস প্রদর্শনীতে বিচারকের জন্যে আমন্ত্রণ। রেটনা সাহেব শুভসংবাদটি জানিয়ে স্ত্রীকে বললেন—'তাহলে ডার্লিং এক ঢিলে দুই পাখিই মারা যাবে কি বল? আমার বিচারক সাজাটাও হবে আর তোমারও এতদিন পরে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ হবে। মাস চারেক সময় খুব কম নয়।'

ভেবেছিলেন মিসেস রেটনা এতদিন পরে আবার একবার প্যারিস যাবার সুযোগে আনন্দিতই হবেন। কিন্তু তাঁর বিস্ময়ের অন্ত রইলো না যখন মিসেস রেটনা বললেন—'এই তো সেদিন এলাম প্যারিস থেকে। এত তাড়াতাড়ি সেখানে যাবার ইচ্ছে আমার নেই। তাছাড়া পুণা আমার বেশ ভালই লাগছে। এ যাত্রায় তুমি বরঞ্চ একলাই ঘুরে এসো। প্রথমটায় একটু বিস্মিত হলেও স্ত্রীর কথায় আন্তরিকভাবেই খুশী হয়েছিলেন। মিসেস রেটনা ও আমি ব্যালার্ড পিয়েরে সাহেবকে জাহাজে তুলে দিলাম। বিদায় জানাবার সময়ে একটু রসিকতা করে স্বামীকে বলেছিলেন—'দেখো আবার যেন কোন সুন্দরীকে বিয়ে করে হাজির হয়ো না।'

এতবড় বাড়ীতে মিসেস রেটনার একমাত্র সঙ্গী তাঁর ব্যক্তিগত পরিচারিকা গোয়ানিজ মেয়ে ব্রিটো। সে থাকতো নিচের তলায় একটি ঘরে। চাকর-বাকর ও আমি থাকতাম ঐ আউট হাউসে। প্রতিদিন বিকেলে মিসেস রেটনাকে নিয়ে ক্লাবে যাওয়া আমার কাজ। আগেকার মতই ডিনারের সময়ে তিনি বাড়ী ফিরে আসতেন।

কদিন থেকে তিনি নিজেই গাড়ী নিয়ে বেরোতে আরম্ভ করলেন। আমাকে তাঁর প্রয়োজন হতো না। মাঝে মাঝে একটু-আধটু দেরীও হতে লাগলো বাড়ী ফিরতে। আমাকে ব্রিটোকে ও অন্যান্য চাকরদের বলেছিলেন যে তাঁর ফিরতে দেরী হলে কেউ যেন তাঁর জন্যে অপেক্ষা না করে। মাসখানেক পর এক শনিবার তিনি আর বেরোলেন না। ব্রিটোকে ডেকে বললেন—'আজ আমার এখানে একজন ভদ্রলোক ডিনার খাবেন। রান্নাটা যেন যত্ন নিয়ে করা হয়।'

সন্ধ্যের পর অতিথি এসে হাজির। আমি সবিস্ময়ে দেখলাম তিনি হচ্ছেন মিঃ বার্ক। আটটা নাগাদ ডিনার সার্ভ হলো। রাত দশটা নাগাদ মিঃ বার্ক চলে গেলেন। পরের দিন রোববার তিনি বিকেলের চা আর রাত্রের ডিনার খেয়ে যখন ফিরলেন তখনও দশটার বেশী হয়নি। আপত্তিজনক নিশ্চয়ই নয়।

ক'দিন ধরে লক্ষ্য করছি মেমসাহেব আর বেরুচ্ছেন না বটে তবে মিঃ বার্ক প্রতিদিনই আসতে শুরু করেছেন এবং তাঁর সময় কাটাবার মাত্রাটাও যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে শনিবার রাত্রে দুটো-আড়াইটার আগে যাওয়াই হয়ে ওঠে না। দুজনের সম্পর্কটা নিয়ে চাকরবাকরদের ভেতর মৃদু গুঞ্জন আমার কানে এসে পেঁছুতে বেশী দেরী হলো না। তেতলার শোবার ঘরে আলো জ্বালা-নেভা যে একটা অস্বস্তিকর সন্দেহের উদ্রেক করবে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না। মালিকের বিশ্বস্ত অনুগত ভৃত্য হিসেবে সবাই আমাকে সমীহ করে চলতো তাই আলোচনাটা একটু চাপা সুরেই হতো। কিন্তু না দেখা না বোঝার ভান করে আর কতদিন চালাবো। নিজের মালিকের স্ত্রীর প্রতি এ ধরনের সন্দেহ নিজের কাছেই অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। চোখের সামনে দিনের পর দিন অশালীন ব্যবহারের মাত্রাটা বেড়েই চলেছে। নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় আর থাকাটা আমার মনে হলো মনিবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, তাই সন্দেহটা সত্যি না মিথ্যে পরখ করবার জন্যে পরিচারিকা রিটোকে সরাসরি প্রশ্ন করে বসলাম। কিন্তু তার কাছ থেকে বিশেষ কিছুই জানতে পারলাম না কারণ ডিনারের পর তার উপরে যাওয়া নিষেধ।

এক অসহ্য যন্ত্রণায় আমার দিন কাটতে লাগলো। পাগলের মত শুধু নিজের হাত নিজে কামড়ানো ছাড়া আর কিছুই করার রইলো না আমার। অথচ মনিব ফিরে এলে তাঁকে কি জবাবদিহি করবো—এ দুশ্চিন্তা আমার আহার নিদ্রা শান্তি সব কেড়ে নিল।

অধীর প্রতীক্ষায় মনিবের ফিরে আসার দিন গুনছি। ইতিমধ্যে আরো কিছুদিন কেটে গেল।

এক শনিবার সাহেব এলেন বেলা চারটে নাগাদ। বেশ মনে আছে সেদিনও ছিল আজকের মতই ১৬ জুলাই। ঠিক করলাম নিজের চোখেই আজ সবকিছু সন্দেহভঞ্জন করে নেবো। সবাইর অলক্ষ্যে নিচেরতলার একটি ঘরে লুকিয়ে রইলাম। বেইমানির বিবরণ আর নাইবা শুনলেন। লজ্জায় ঘৃণায় সেদিন আমার মাথায় যেন খুন চেপে গেল।

সাহেব যখন বেরিয়ে গেলেন তখন রাত আড়াইটে হবে। মিসেস রেটনা সাহেবকে দরজায় বিদায় দিয়ে ধীরে ধীরে করিডরের প্রান্তে লিফটের দিকে চললেন। করিডরে তখন শুধু একটা শূন্য পাওয়ারের ডিমলাইট। মিসেস রেটনা লিফটে ঢুকে আলো না জ্বালিয়েই সুইচ টিপে ধরলেন। দোতলা আর তেতলার মাঝামাঝি লিফটটা যখন এসেছে তখন ওপরের বারান্দার বাতির একটা আবছা আলোর রেশ লিফটের ভেতর এসে পড়েছিল। আর সেই প্রায় অন্ধকার আলোতে মিসেস রেটনা দেখলেন একটা লোক তাঁর গলা টিপে ধরবার জন্যে দুহাত বাড়িয়েছে। ভয়ে তিনি প্রাণপণ চীৎকার করে উঠলেন। কিন্তু সেই তাঁর শেষ চীৎকার।

নিশুতি রাত্রে ঐ মর্মভেদী আর্তনাদে শুধু রিটোই নয়, এমন কি আউট হাউসে চাকর-বাকররাও চমকে জেগে উঠেছিল। রিটোর চীৎকারে আর তার কাছ থেকে সব শুনতে পেয়ে সবাই যে যা হাতের কাছ পেলো তাই নিয়ে ছুটে এলো। মেমসাহেবকে ডাকতে ডাকতে উপরের দিকে ছুটলো। কোথাও মেমসাহেবের পাত্তা নেই। বোধ করি কারো খেয়াল হলো লিফটটাতো দেখা হয়নি। উঁকি মেরে দেখে লিফটটা দোতলা আর তেতলার মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। বোতাম টিপে সেটিকে উপরে নিয়ে এসে দরজা খুলে আলো জ্বালতেই বিস্মিত আতঙ্কে সবাই চীৎকার করে উঠলো।

অজ্ঞান মিসেস রেটনার দেহটিকে কোলের উপর নিয়ে নির্বিকার উদাসীনতায় বসে আছেন মিঃ রেটনা আর একপাশে দাঁড়িয়ে আমি।

চাকরবাকররা এগিয়ে এলো ধরাধরি করে তোলবার জন্যে। কিন্তু মালিক সবাইকে নিবৃত্ত করলেন। নিজেই কোলে করে সে অচৈতন্য দেহ শোবার ঘরে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সাদা চাদরে ঢেকে দিলেন দেহটা।

একটু পরেই ফোন করলেন যাদবেদা থানায়। পুলিশ অফিসারকে জানালেন—'অফিসার! আমি রেটনা বলছি। এইমাত্র আমি আমার স্ত্রীকে গলা টিপে খুন করেছি। আপনারা উপযুক্ত ব্যবস্থা করলে বাধিত হব।' আমি বাধা দিতে গিয়েছিলাম কিন্তু আমার কোন কথাই শুনলেন না।

সেই অন্ধকারের ভেতরই আমি প্রাণপণ ছুটতে লাগলাম পুণার দিকে। মিঃ রেটনার বন্ধুদের অন্যতম মিঃ আধারকার একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার। তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে সব কথা তাঁকে জানালাম। মিঃ আধারকার তখুনিই নিজেই গাড়ী নিয়ে রেটনা হাউসের দিকে রওনা হলেন। আমরা যখন এসে পৌঁছালাম ততক্ষণে পুলিশ মিসেস রেটনার মৃতদেহ ও মিঃ রেটনাকে নিয়ে থানায় চলে এসেছে। থানায় এসে অফিসারের সঙ্গে দেখা করলেন। সমস্ত ঘটনাটা অনুমান করে নিতে অফিসারের বেশী অসুবিধা হয়নি। পরোক্ষভাবে এমন আভাসও দিয়েছিলেন যে তাঁর দিক থেকে যতটা সহযোগিতা করা সম্ভব তিনি তা করবেন।

ব্যারিস্টার সাহেব মিঃ রেটনাকে অনেক করে বোঝাতে চেয়েছিলেন তাঁর স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নিতে। বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মিঃ রেটনা যে ভারতে ফিরে এসেছেন সেকথাটা দুচারজন আপন লোক ছাড়া কেউ জানে না। সেটা গোপন রাখার জন্যে কিছু দিন গা ঢাকা দিলেই যথেষ্ট। কারণ তখন এ কথা প্রমাণ করা অসম্ভব হবে না যে মিঃ রেটনার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেউ মিসেস রেটনাকে খুন করেছে। কিন্তু মিঃ রেটনা সেকথা কানেই তুললেন না।

পুলিশ এগিয়ে এল কর্তব্য পালন করতে। পুণা কোর্টে স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে মিঃ রেটনার বিচার আরম্ভ হোল।

কোনরকম আত্মপক্ষ সমর্থন করা দূরে থাকুক এমন কি ব্যারিস্টারবন্ধুকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন যেন কোনরকম আইনের সাহায্য নেওয়া না হয়। তবুও চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি আধারকার সাহেব। কিন্তু তাঁর সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। বিচারপতি জজসাহেবের কাছে প্রথম সুযোগেই তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করে বললেন—"ধর্মাবতার। আমি আমার স্ত্রীকে নিজের হাতে গলা টিপে খুন করেছি। কেন করেছি অনুগ্রহ করে সে কথা আর আমাকে জিগ্যেস করবেন না। আমি খুনী অপরাধী। চরম শাস্তিই আমি আপনার কাছে ভিক্ষা করেছি।"

সমস্ত ঘটনাটা জজসাহেবের পক্ষে অনুমান করা নিশ্চয়ই কঠিন হয়নি। বোধহয় তাই কিছুদিন সময় তিনি আধারকার সাহেবকে পরোক্ষভাবে দিয়েছিলেন যদি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় রেটনা সাহেবকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করার। কিন্তু রেটনা সাহেব এক তিলও প্রতিজ্ঞাচ্যুত হলেন না।

অগত্যা কারোর আর কিছু করার রইলো না। আইনের চোখে তিনি খুনী। চরম,

শাস্তিই তাঁর প্রাপ্য। তবুও শেষ পর্যন্ত সকলের আশা ছিল যে বিচারপতি হয়ত চরম শাস্তি নাও দিতে পারেন। কিন্তু সে আর হোল না।

আপীল করবার সুযোগের সঙ্গে ফাঁসির আদেশও দিলেন। আমার পক্ষে তখন আর সহ্য করা সম্ভব হোল না সমস্ত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে দৌড়ে বিচারপতির পদতলে উপুড় হয়ে পড়ে বললাম—"হুজুর! রেটনা সাহেব নির্দোষ। উনি খুন করেন নি—করেছি আমি। যা কিছু শাস্তি সে শুধু আমারই প্রাপ্য আর কারো নয়।"

আকস্মিক এই পরিস্থিতিতে তিনি প্রথমটায় একটু বিচলিত হলেও নিজেকে সামলে নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন—"তুমি? তুমি কেন খুন করতে গেলে?'

—'বেইমানির শাস্তি দিতে।'

এমন সময়ে এক তীব্র আকাশফাটা বজ্রকণ্ঠের আওয়াজ আমার কানে এলো, 'আবদুল! এত বড় সাহস তোমার? আমার সামনে আমার স্ত্রীর সম্পর্কে কুৎসিত ইঙ্গিত করবার মত সাহস তুমি কোথায় পেলে?'

জোঁকের মুখে লবণের ছিটে পড়ার মত একদম চুপসে গেলাম আমি। সামান্য কথা বলার মত শক্তিও যেন আমার এক মুহূর্তে কোথায় উবে গেল। বেশ বুঝতে পারছিলাম বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে একবার জজ-সাহেবের দিকে আর একবার রেটনা সাহেবের দিকে তাকানো ছাড়া আর কিছুই আমি করতে পারিনি। তারি মাঝে কানে এলো রেটনা সাহেব বলছেন—"ধর্মাবতার! আবদুল আমার বিশ্বস্ত অনুগত ভৃত্য। আমাকে বাঁচাবার চেষ্টায় সে নিজেকে অপরাধী বলে জাহির করছে। ওর সব কথাই সম্পূর্ণ মিথ্যে।"

—"আবদুল! তুমি যে স্বীকারোক্তি দিচ্ছ—এ যদি মিথ্যে হয় তাহলে আদালতকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টার অপরাধে তোমার গুরুতর শাস্তি হবে। তোমাকে আমি শেষ সুযোগ দিতে চাই। খুব ভেবেচিন্তে বল তোমার ঐ কথাগুলোর ভেতর কোন সত্যি আছে কিনা।"

প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম কিছু একটা বলবার আশায়। কিন্তু কিছুতেই পারলাম না। আমার মনে হলো যেন পৃথিবীটা ঘুরছে আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিকে। তারপর আমার কি হোল মনে নেই। জ্ঞান যখন ফিরলো তখন দেখি পুলিশ প্রহরায় হাসপাতালে শুয়ে আছি।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললো—"রেটনা সাহেব চরম শাস্তিই পেলেন। একদিন ভোর রাতে পুণা সেন্ট্রাল জেলে তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল।'

বেশ খানিকটা নীরবতার ভেতর কাটলো। হঠাৎ দুহাত দিয়ে নিজের মুখটা ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অভিমানী ছোট-ছেলের মত কাঁদিতে কাঁদিতে বললো—"বাবুজী! পারলুম না—পারলুম না তাঁকে বাঁচাতে কেউ বিশ্বাস করলো না।"

'—না আবদুল, সে বিশ্বাস আমি নিজেও করতে পারলুম না। তুমি তোমার মনিবকে খুব বেশী ভালবাসতে। তাই তাঁর অপরাধকে নিজের ঘাড়ে তুলে নেবার চেষ্টা করেছিলে।'

হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠলো—"কি? আমি মিথ্যে কথা বলছি? খুন না করে কেউ কি বলে খুন করেছি। বুদ্ধু আর কাকে বলে।"

—"না—খুন তুমি করোনি। তবে মনে হয় তোমার যোগ ছিল এইটুকু যে" আমার কথাটার মাঝপথে হঠাৎ তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে এক ফুঁয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললো—"চুপ! ঐ-ঐ আসছে বেইমানরা।"

প্রথমটায় বুঝতে না পেরে বিস্মিত হয়ে ছিলাম একথা নিশ্চিত। কিন্তু পরক্ষণেই শুনতে পেলাম করিডর দিয়ে দুজোড়া জুতোর শব্দ চলেছে সদর দরজার দিকে। তারপর যেন এ শব্দও কানে এলো সদর দরজা বন্ধ হলো। এবারে একজোড়া মেয়েলি জুতো চলেছে আমার লিফটের দিকে। পায়ের শব্দটা যখন আমাদের ছাড়িয়ে একটু দূরে গেল আবদুল ফিস্‌ফিস্ করে বললো—"বাবুজী, আপনি চুপ করে এখানে বসে থাকুন আমি আসছি।"

বলেই ঘরের দরজা খুলে করিডর দিয়ে এগিয়ে গেল।

শুনেছিলাম মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে নাকি মৃত্যু সম্বন্ধে কোন ভয় বা অনুভূতি থাকে না। এমনিধারা একটা শীতল অনুভূতি শুধু আমার দেহকে নয় মনটাকেও অসাড় করে দিল। কলের পুতুলের মত প্রাণহীন নড়নচড়ন নিজের কাছেই ভয়ের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। আমি পাথরের মত নিশ্চল নিঃসাড়। হঠাৎ রাত্রির আঁধারের বুক চিরে সেই নারীকণ্ঠের মর্মান্তিক আর্তনাদ আর পরমুহূর্তেই সেই করিডর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আবদুল চীৎকার করে চলেছে—"আমি—আমিই খুন করেছি।" দালানটা পেরিয়ে ওর কণ্ঠস্বর যেন দূরে থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

এই অন্ধকারের ভেতর ভূতুড়ে বাড়ীতে একলা পড়ে থাকার ভীতিপ্রদ সম্ভাবনাই বোধকরি আমার দেহমনে চেতনার সঞ্চার করেছিল। হলঘরের দরজাটা কোনরকমে খুঁজে নিয়ে সেই অন্ধকারের ভেতর আমিও বড় রাস্তা লক্ষ্য করে প্রাণপণ ছুটতে লাগলাম। কতক্ষণ ছুটেছি জানিনা তবে যখন থামলুম তখন বান্ধ গার্ডেনের আলোগুলি সামনে জ্বলজ্বল করে ভাসছে।

এর পরে অনেকদিন চেষ্টা করেছি আবদুলের দেখা পেতে কিন্তু ও যেন কোথায় উধাও হয়ে গেল।

আজও প্রতি শনিবার রাত আড়াইটার সময়ে নারীকণ্ঠের সেই তীব্র মর্মান্তিক আর্তনাদ শোনা যায়। লিফটটাও তেমনি দোতলা আর তেতলার মাঝখানে স্তব্ধ হয়ে যায়। রেটনা হাউস অনেকদিন থেকেই খালি পড়েছিল। জরুরী সামরিক প্রয়োজনে সেটা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল আমাদেরই জন্যে। আর আজও বোধকরি আমারই রেটনা হাউসের শেষ বাসিন্দা।
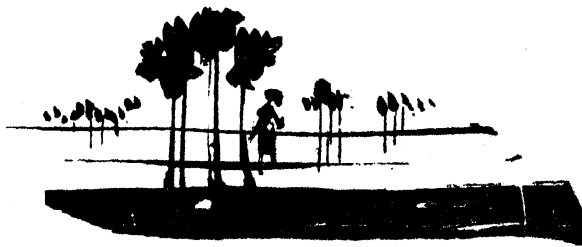
পরলোকে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মাকস্ বোর্ন

নোবেল পুরস্কারবিজয়ী প্রখ্যাত জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক মাকস বোর্ন গত ৫ জানুয়ারি গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসালয়ে দীর্ঘকাল অসুস্থতার পর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি ১৮৮২ সালে জার্মেনীতে জন্ম গ্রহণ করেন।

বোর্ন ১৯১৪ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯২১ সালে গটিনজেন বিশ্ববিদ্যায়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকপদে যোগদান করেন। তাঁর এই অধ্যাপকপদে নির্বাচনের ফলে জার্মানীতে পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরমাণু পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি।

তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাকস্ বোর্ন একটি বিশেষ স্মরণীয় নাম। বোর্ন তাঁর গবেষণাজীবনের সূচনায় পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে বহু লোকের ভীড় দেখে তিনি তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের দিকে মন ফেরান। ১৯১২ সালে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের প্রস্তাবক্রমে আপেক্ষিক তাপের কোয়ান্টাম তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি গবেষণা করেন। ১৯২২ সালে কেলাস-পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। ১৯২৬ সালে তিনি পরমাণুতত্ত্বের যে ভৌতিক ব্যাখ্যা দেন, তাঁর সেই মূল্যবান অবদান সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর আগে আর কেউ এই জটিল বিষয়টির বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। পরমাণু-সংঘর্ষের অন্তর্নিহিত পদ্ধতির উদাহরণ সহযোগে তিনি তাঁর উদ্ভাবিত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন যে, নতুন কোয়ান্টাম তত্ত্বে প্রকৃতির একটি সংখ্যায়নিক বিবরণ পাওয়া যায়। তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি মেলে বিলম্বে ১৯৫৪ সালে, যখন বিশিষ্ট জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক ওয়াল্টার বোথের সঙ্গে যৌথভাবে তাঁকে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মাকস্ বোর্ন ছিলেন ইহুদী এবং জার্মেনীতে হিটলারের ইহুদী-দলননীতির শিকার তাঁকেও হতে হয়। ১৯৩৩ সালে তিনি জার্মেনী ছেড়ে বৃটেনে পালিয়ে যান এবং ১৯৩৯ সালে বৃটেনের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তারপর এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেন এবং ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। সেই বছর তিনি অবসর গ্রহণ করে জার্মেনীতে ফিরে আসেন। শেষজীবনে তিনি গটিনজেন বিশ্ববিদালয়ের সংগে যুক্ত ছিলেন।

অধ্যাপক বোর্ন পদার্থ বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে ২০টি গ্রন্থ রচনা করেছেন।
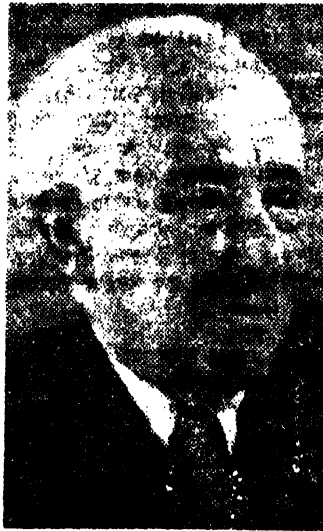
মার্কস বোর্ন

তার মধ্যে 'আইনস্টাইনস্ থিওরী অফ রিলেটিভিটি' এবং 'দি রেস্টলেশ ইউনিভার্স' গ্রন্থ দুখানি আমাদের বিশেষ পরিচিত (বর্তমানে এই দুখানি গ্রন্থের পেপারব্যাক সংস্করণ এ দেশে পাওয়া যাচ্ছে)। বর্তমানে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে এমন কোন প্রসংগ খুব কমই আছে, যা কোন না কোনভাবে অধ্যাপক বোর্নের উদ্ভাবিত তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত হয় নি বা তাঁর আগেকার গবেষণার সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

সেলাই ও জোড়বিহীন পোশাক

বর্তমানে আমরা যেসব জামা-পোশাক পরিধান করে থাকি, তার বিভিন্ন অংশ সেলাই করে জুড়ে সম্পূর্ণ পোশাক তৈরী করা হয়। কিন্তু সেলাইবিহীন পোশাকের বিষয় বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরে মাথা ঘামাচ্ছেন।

আমরা জানি, সেলাই কলে একটি ছুঁচ থাকে এবং তার সাহায্যে পোশাকের বিভিন্ন অংশ জোড়া হয়। কোন কোন বিজ্ঞানী ছুঁচের পরিবর্তে আরও উন্নততর পদ্ধতির বিষয় চিন্তা করছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শ্রুতিপারের শব্দের (আলট্রাসোনিকস্) সাহায্যে পোশাকের বিভিন্ন অংশ জোড়া যেতে পারে। কিন্তু এটাও সম্পূর্ণ সেলাইবিহীন পোশাক নয়। উন্নত প্রকারের গাঁদের সাহায্যে পোশাকের বিভিন্ন অংশ জুড়ে পোশাক তৈরী করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যদিও জোড় লাগানোর প্রশ্ন রয়েছে, তবে এটা ঠিক প্রচলিত ধরনের জোড় লাগানো নয়।

পোশাকের বিভিন্ন অংশ জোড়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বাতিল করে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। যাঁরা পারমাণবিক শিল্পে কাজ করেন, তাঁদের তেজস্ক্রিয় পদার্থের হাত রক্ষা পাবার জন্যে সম্পূর্ণ জোড়বিহীন পোশাক পরতে হয়। কারণ জোড়লাগানো পোশাক পরলে জোড়ের ফাঁকে ফাঁকে যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ জমে তা ধুয়ে ফেলা মুশকিল।

এ কারণে বিজ্ঞানীরা বর্তমানে সম্পূর্ণ জোড়বিহীন পোশাক উদ্ভাবনের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। মস্কোর অল ইউনিয়ন রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল আন্ড লাইট ইন্ডাস্ট্রি ইঞ্জিনীয়ারিং-এর একদল বিজ্ঞানী এবিষয়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁরা যে অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, তা হচ্ছে ছাঁচে ঢেলে পোশাক তৈরী করা। ব্যাপারটা হলো উত্তপ্ত ধাতব ছাঁচে একটি অতিকায় অণুর উপাদান (নাইলন ইত্যাদি যা দিয়ে পোশাক তৈরী হবে) স্প্রে করা হয়। সার্ট, পাঞ্জাবী, হাতের দস্তানা বা মাথার টুপি—যে রকম পোশাক তৈরী করতে হবে সেই অনুযায়ী ছাঁচ তৈরী করা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এই পদ্ধতিতে টুপির ওপরের দিক বা হুড তৈরী করা খুব সহজ। বোনা বস্ত্রখণ্ড ও অতিকায় অণু উপাদানের গুঁড়োর মিশ্রণ 'কৃত্রিম' তন্তুদেশসমেত একটি আধারে পূর্ণ করা হয়। তারপর তন্তুদেশ থেকে আধারের মধ্যে সংনমিত বায়ু সঞ্চালিত করা হয়। তার ফলে একটি 'ফ্যাব্রিক' স্তরের সৃষ্টি হয়। উত্তপ্ত ধাতব ছাঁচটি এই স্তরের মধ্যে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে ডোবানো

হয় এবং এর উপরিভাগে নির্মীয়মান টুপির ছাদ বা চূড় গড়ে ওঠে। কারণ বস্ত্রখণ্ডের সঙ্গে অতিকায় অণু উপাদানের গুঁড়ো অংশ উত্তপ্ত পৃষ্ঠদেশে আটকে যায়।

ছাঁচে ঢেলে পোশাক তৈরীর আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে চাপের সাহায্যে ছিদ্রমুখে পোশাক তৈরীর উপাদান নিষ্ক্রমণ করা। প্রথমে পোশাক তৈরীর উপাদান (অতিকায় অণুঘটিত) উত্তপ্ত করে গলিয়ে নেওয়া হয় এবং সেই গলিত উত্তপ্ত উপাদান ছিদ্রমুখে বিভিন্ন আকারের ছাঁচে নিষ্ক্রমণ করা হয়। এই পদ্ধতিকে ছাঁচে ঢেলে পোশাক তৈরী করা বলা যায়। ছাঁচে ঢেলে পোশাক তৈরী করা বলতে সব ক্ষেত্রে কিন্তু উত্তপ্ত উপাদান ঢালাই করা বোঝায় না। অতিকায় অণু উপাদানের দ্রবণ বা ফেনার সাহায্যেও পোশাক 'ঢালাই' করা যেতে পারে। এই দ্রবণ বা ফেনা ছিদ্রমুখে নিষ্ক্রান্ত হবার পর যখন ছাঁচের মধ্যে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয় তখন নির্দিষ্ট আকারের পোশাক তৈরী হয়ে যায়। এই ছাঁচে ঢেলে পোশাক তৈরী করার বিষয়ে মস্কোর তন্তুজ ইনস্টিটিউটে এখন ব্যাপক গবেষণা চলছে।

কল্যাণকর কাজে পরমাণু শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি

আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার বৎসরান্তিক পর্যালোচনায় সম্প্রতি বলা হয়েছে, ১৯৬৯ সালে ভেষজ, খাদ্য উৎপাদন, কীট নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং শ্রমশিল্পে পরমাণু শক্তি ও পারমাণবিক প্রয়োগবিদ্যা কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া গেছে। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার প্রধান দপ্তর ভিয়েনায় এবং বিভিন্ন দেশে তার শাখা-দপ্তর আছে।

তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রয়োগ করে ৮০ রকম নতুন ধরনের শস্য উৎপাদন করা হয়েছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সে সব শস্য নিয়ে এখন চাষাবাদ করা হচ্ছে। এই নতুন জাতের শস্যগুলি আরও অধিক ব্যাধিনিরোধক, আরও বেশি শৈত্য ও তাপ সহ্য করতে পারে। এগুলি উচ্চ-পরিমাণ প্রোটিনসমৃদ্ধ এবং প্রচুর ফলনক্ষম।

ফসলবিনষ্টকারী কীটপতঙ্গকে নির্জীব করে নিয়ন্ত্রণে করার পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত। পরমাণু শক্তির সাহায্যে এই পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। খাদ্য উৎপাদনে রাসায়নিক দ্রব্যের ফলাফল অনুসন্ধান এবং খাদ্যদ্রব্যে প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্যে গবেষণা করা হচ্ছে।

ভেষজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। ছোটখাটো গবেষণাগারে সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরমাণু শক্তির প্রয়োগকৌশল সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। রোগচিকিৎসায় এবং গবেষণায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বিশেষ আগ্রহী বলে সংস্থার সমীক্ষায় জানা গেছে। গত বছর ক্যানসার এবং রক্তসংক্রান্ত ব্যাধিতে বিশেষ করে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার গবেষণা চালিত হচ্ছে বিভিন্ন পদ্ধতির জন্যে উচ্চ শক্তি বিকিরণ এবং ত্বরয়কের ব্যবহার সম্পর্কে। বিশেষত উদ্ভিজ্জ প্লাস্টিকস্, কংক্রীট, রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদন পদ্ধতিতে পরমাণুই শক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে গবেষণা চলছে।

১৯৬৯ সালের শেষে সারা বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন দেশে ১০৫টি পরমাণু বিদ্যুৎ চুল্লী চালু হয়েছে। আমাদের দেশে তারাপুরের চুল্লীটি তার মধ্যে অন্যতম। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার বিবরণীতে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, ১৯৭৫ সালের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ ১০ হাজার মেগাওয়াট পরিমাণ পরমাণু-বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হবে এবং ১৯৮০ সালের মধ্যে পরমাণু-বিদ্যুৎ শক্তি ৩ লক্ষ মেগাওয়াট পরিমাণকেও ছাড়িয়ে যাবে।

১০২টি জাতির সম্মিলিত এই আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা গত বছর গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৮ লক্ষ ডলার ব্যয় করেছে। তার দুই-তৃতীয়াংশ ব্যয়িত হয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলির গবেষণাগারে এবং তার অধিকাংশ হয়েছে অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যৌথ প্রকল্পে। এ ছাড়া ৪৬টি উন্নয়নশীল জাতিকে এক লক্ষ ডলার পরিমাণ কারিগরী সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ৫৩টি দেশে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার বিশেষজ্ঞরা কাজে সহযোগিতা করেছেন এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা কাজে ৩০০ জনকে ফেলোশিপ দেওয়া হয়েছে।

কৃত্রিম মানুষ 'অসকার'

পথে নিরাপত্তারক্ষার পরীক্ষায় কৃত্রিম মানুষ

যানবাহনবহুল বড় বড় শহরের পথে নানা দুর্ঘটনা ঘটে থাকে এবং তাতে অনেক সময় পথচারী বা গাড়ির চালক বা যাত্রীদের প্রাণহানি হয়ে থাকে। মোটর গাড়ির দুর্ঘটনায় পতিত চালক বা যাত্রীদের দেহে সংঘর্ষের ফলে কি প্রতিক্রিয়া ঘটে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানের জন্যে পশ্চিম জার্মেনীর ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিভাগে একটি অভিনব 'কৃত্রিম' মানুষ বা পুতুল উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'অসকার হিউম্যানাস'। অসকারের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হুবহু মানুষের মতো। তার দেহের চামড়া এমন যে আঘাতের ফলে দেহ কেটে গেলে তা থেকে 'রক্ত' পড়ে। তার কৃত্রিম মাংসপেশীও মানুষের দেহাভ্যন্তরের মাংসপেশীর অনুরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। গবেষণার উদ্দেশ্যে সংঘটিত ইচ্ছাকৃত দুর্ঘটনায় দেখা যায়, রক্ত-মাংসের মানুষ চালক দুর্ঘটনার ফলে যেরকম আঘাত পায় অসকারও অনুরূপ আঘাত পেয়েছে। এইভাবে দুর্ঘটনার ফলাফল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে মোটরগাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনায় উন্নতি বিধান করা যেতে পারে যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে। চিকিৎসাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ লুফ বলেছেন, মোটরগাড়ির দুর্ঘটনায় মানুষের দেহে সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া অনুসন্ধানের জন্যে কৃত্রিম মানুষ অসকারের সঙ্গে বানর নিয়েও পরীক্ষা চালানো হবে। তার ফলে একটা তুলনামূলক বিচারের সুবিধা হবে।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ধকারের মুখ

দেবল দেববর্মা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাস্তা দিয়ে একটা লোক হে'টে যাচ্ছিল। বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা। লম্বাও অনেকখানি। পরনে পাতলুন। গায়ে একটা ঢিলে-ঢালা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি। মুখে ফ্রেঞ্চ দাড়ি। লোকটার ডান হাতখানা ভেঙেছে মনে হয়। কাঁধের সঙ্গে একটা কাপড় বে'ধে হাতখানা তাই ঝুলিয়ে রেখেছে।

এক খাদ গলা নামিয়ে সুব্রত বলল,—'একে চেনেন রাজীবদা?

বিদ্যুৎগতিতে রাজীবের দৃষ্টি গিয়ে লোকটার উপর পড়ল। বলল,—'চিনতে তো পারছি না সুব্রত। ও কে?'

—'কলেজের প্রফেসর। এর কাছেই মিসেস রায় টুইশানী পড়তেন।'

—'হুম।' রাজীব ভ্রু কুঁচকে বলল,—'এর নামই অনিমেষ দত্ত। কিন্তু ওর হাত ভাঙল কখন?'

(১৪)

গালে হাত রেখে গম্ভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলেন নরেশবাবু। চাঁদবদনকেও কলকাতা যাবার জন্য খুবই ব্যস্ত মনে হল। সুটকেসের ডালাটা খুলে সে টুকিটাকি জিনিসপত্র রাখছিল। জামাকাপড়গুলি আগেই কখন প্যাক করেছে। এখন শুধু ভরতে বাকি।

দরজার সামনে রাজীবকে দেখেই নরেশবাবু কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন। সুব্রত পিছনে দাঁড়িয়েছিল। তার পরনে পুলিশের সাজপোশাক। ধরাচূড়া বা থানার ও-সির ইউনিফর্ম।

ওদের দেখতে পেয়ে চাঁদবদন সাদর অভ্যর্থনা করল। 'আইয়ে ইন্সপেকটর সাব, আইয়ে হুজুর। হামি তো হোটেলে ফিরেই নরেশবাবুকে সব কুছ বাতালম, তব ভি উনকা ঠিক বিশোয়াস হয় না।' কথা শেষ করে সে একটু বিপন্ন ভঙ্গিতে তাকাল।

ঘরের এদিকে ওদিকে দু'খানা চেয়ার ছড়ানো। সুটকেস ফেলে রেখে চাঁদবদন

চেয়ার দুটো তুলে আনল। বলল, 'কুরসী পর বসুন হুজুর।'

রাজীব চেয়ারে বসে বলল, 'চাঁদবদনবাবু, আপনি একটু বাইরে থেকে আসুন। নরেশবাবুর সঙ্গে আমরা কিছু কথা বলব।'

সম্ভবত চাঁদবদনও তা আন্দাজ করেছিল। তার মত নরেশবাবুকেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এবং তখন ঘরের মধ্যে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি কেউই চাইবে না।

চাঁদবদন তাই বলল,—'হাম এখনই যাচ্ছি হুজুর।' কথা শেষ করে সে আর একটুও দেরি করল না। দ্রুতহাতে সুটকেসের ডালা বন্ধ করল। জুতোটা পায়ে গলিয়ে চাঁদবদন বেরিয়ে গেল। যাবার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে যেতেও ভুলল না।

সুব্রত নরেশবাবুকে দেখছিল। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে, কিংবা দু-পাঁচ বছর কমও হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো নয়। মাথার চুল কম। গায়ের রঙ পরিষ্কার। ভাইঝির সঙ্গে মুখের খানিকটা সাদৃশ্য আছে।

রাজীব বলল,—'সব কথা নিশ্চয় শুনেছেন?'

নরেশবাবু কোনো উত্তর দিলেন না। এতক্ষণ শূন্যদৃষ্টি মেলে জানালার বাইরে তাকিয়েছিলেন। এবার মুখ নামিয়ে ঘরের মেঝের দিকে চাইলেন। কেউ দেখলে ভাববে নরেশবাবুর মনে এখন চিন্তার ধোঁয়াটে আকাশ। পোষা জন্তু-জানোয়ারকে আদর করার মত ভঙ্গিতে সেই ভাবনাটিকে তিনি সযত্নে নাড়াচাড়া করছেন।

মিনিটখানেক পরে তিনি বললেন,—'ইন্সপেকটরবাবু, চাঁদবদন যা বলল, তা সত্যি? নীপা আত্মহত্যা করেনি?' একটা কঠিন এবং দুরারোগ্য অসুখ হয়েছে জেনেও মানুষ যেমন দুর্বল অসহায় মুখে চিকিৎসককে প্রশ্ন করে, নরেশবাবুর কথাগুলিও তেমনি শোনাল।

রাজীব ঈষৎ হাসল। বলল,—'সত্যি বৈকি। দিবালোকের মত সত্যি।' একটু হেসে সে ফের বলল,—'আপনার ভাইঝি আত্মহত্যা করেনি। পরশুদিন রাত্রে তাকে হত্যা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে হেভি ডোজে মরফিন ইনজেকশন পুশ্ করা হয়েছিল। এবং তার ফলেই মিসেস রায়ের মৃত্যু ঘটে।'

কথাটা শোনার পরই নরেশবাবুর মুখখানা শক্ত হয়ে এল। একটা কটু ভাষা জিভের ডগায় আসার ঠিক পূর্বমুহূর্তে মুখটা যেমন কঠিন হয়ে আসে, নরেশবাবুকে তেমনি দেখাল।

ঘৃণায় মুখ কুঁচকে তিনি বললেন,—'জামাইটা এমন শয়তান। মন কষাকষি হয়েছিল জানি। দুজনের বিচ্ছেদও হত। কিন্তু তাই বলে মেয়েটাকে ছুঁচ ফুটিয়ে মারল।'

রাজীব একটু এগিয়ে বসল। 'আপনার তাহলে ডাক্তার রায়কেই খুনী বলে সন্দেহ হয়?'

—'অবাক করলেন মশায়!' নরেশবাবু বাঁকা হেসে বললেন,—'এমন কেসে আবার সন্দেহ কিসের? এই খুন আর কার পক্ষে করা সম্ভব বলুন? জোর করে মেয়েটাকে ইনজেকশন দিয়ে মেরেছে। হয়ত শরীর-টরীর ভাল ছিল না। সেই কথা জামাইকে কখন বলে থাকবে। রাত্তিরে নিশ্চয় ও একবার এসেছিল। তারপর স্ত্রীর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে শয়তানই ওকে ইনজেকশন দিতে চাইল। ডাক্তার স্বামী,—ইনজেকশন দেব বললে অসুস্থ স্ত্রীর পক্ষে আপত্তি করা অসম্ভব।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নরেশবাবু ফের বললেন,—'মেয়েটা বেচারী। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে এই ইনজেকশন নেওয়াই ওর কাল হবে।'

রাজীব খুশী হয়ে বলল,—'আপনি যা ভাবছেন রহস্যের কিনারা সম্ভবত ওই পথেই হবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছে নরেশবাবু। স্ত্রীকে হেভি ডোজে মরফিন ইনজেকশন দিয়ে উনি মেরে ফেলতে চাইলেন কেন? ফর হোয়াট? তাহলে ধরে নিতে হয় যে মিসেস রায় বেঁচে থেকে ওর পথের কাঁটা হয়েছিলেন।'

—'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি।' নরেশবাবু মাথার চুলে একবার দ্রুত হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন। 'আপনি মোটিভের প্রশ্ন তুলেছেন। অম্বর কেন ওকে খুন করল? নিজের বউকে ইনজেকশন দিয়ে হত্যা করবার ওর কি প্রয়োজন হয়েছিল? কিন্তু এর উত্তর তো এক কথায় হয় না ইন্সপেকটরবাবু।'

—'আমি জানি।' রাজীব হেসে বলল। এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব হয় না। আর সেজন্যই তো আপনার কাছে ছুটে এলাম। সবচেয়ে বেশী কথা তো এখানেই শুনতে পাব আশা করছি।'

—'তার মানে? সবচেয়ে বেশী কথা আমার কাছে কেন?'

রাজীব আগের মতই হাসল। বলল,—'আমাদের পুঁথিপত্রে কি লিখেছে জানেন? যে খুন হল, হত্যার রহস্য তার জীবনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। মেয়েপুরুষে আলাদা বাছবিচার করার প্রয়োজন নেই। সর্বপ্রথমে মৃতের জীবনটা ভালো করে জানবার চেষ্টা করতে হবে। যত বিস্তৃতভাবে জানা যায়, তদন্তের পক্ষে ততই ভালো। আসলে কি জানেন? ঠাণ্ডা মাথায় খুন মানেই হল একটি আদ্যোপান্ত পরিকল্পনা। প্রথমে বীজের সৃষ্টি,...তারপর বীজ থেকে চারাগাছ এবং সবশেষে পূর্ণ বিষবৃক্ষ। আর তখনই ক্লাইম্যাকস — হত্যাকাণ্ড ঘটে। যে খুন হল, আপনি তার কাকা। ছোটবেলা থেকে ওকে দেখেছেন। ভাইঝির জীবনের কথা আপনার চেয়ে কে বেশী বলবে?'

নরেশবাবু একটু চিন্তা করে প্রসন্ন হলেন। 'তা অবশ্য ঠিক। আপনি যা জানতে চান, আমি যতদূর পারি বলব। কিন্তু বেশ কয়েক বছর হল নীপার বিয়ে হয়েছে। ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগও কম। কাজেই ওদের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে খুব বেশী আমি বলতে পারব না। অবশ্য—'

রাজীব তাড়াতাড়ি বলল,—'অবশ্য বলে থামলেন কেন? যা মনে এসেছে তা বলে ফেলাই ভালো। কথার মধ্যে অমন হোঁচট খেলে কিন্তু সবটুকু জানা হবে না।'

নরেশবাবু একবার রাজীবের মুখের দিকে তাকালেন। গলা নামিয়ে বললেন,—'একটা ব্যাপার আমি জানতে পেরেছি ইন্সপেকটরবাবু। নীপা আর অম্বরের দাম্পত্যজীবন সুখের ছিল না। বেঁচে থাকলে গতকালই ভাইঝি আমার সঙ্গে কলকাতা যেত। খুব সম্ভব আর কোনোদিনই স্বামীর ঘরে ফিরত না।'

—'বলেন কি?' স্ত্রী-পুরুষের এই গোপন কাহিনী শুনে সে গ্রাম্যলোকের মতই কৌতূহল প্রকাশ করল। উৎসাহে রাজীব একটা সিগারেট ধরাল। নরেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল,—'আপনার চলবে নাকি?'

—'আমি বিড়ি-সিগারেট খাইনে।' নরেশবাবু আলগোছে কথাটা বললেন।

'সরি।' সিগারেটে একটা টান দিয়ে রাজীব ভক্তজনের মত নরেশবাবুর মুখের দিকে তাকাল। একটু হেসে বলল,—'তারপর, কি যেন বলছিলেন আপনি?'

—'বলছি মশায়।' নরেশবাবু বার দুই কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে শুরু করলেন,—'আমি আর চাঁদবদন কেন পলাশপুরে এসেছিলাম তা নিশ্চয় শুনেছেন?'

ঘাড় কাত করে রাজীব বলল,—'কিছু কিছু শুনেছি।'

—'আমার ভাইঝির বাড়িটা চাঁদবদন কিনতে রাজি। মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে দরদাম, কথাবার্তা বলবার জন্য ওকে এখানে নিয়ে আসি। পরশুদিন বিকেলে আমি নীপার কাছে আর একবার যাই। কথা ছিল স্বামী-স্ত্রী মিলে যুক্তি করে সন্ধ্যাবেলায় আমাদের জানাবে। পঞ্চাশ হাজার টাকায় ওরা চাঁদবদনকে বাড়ি বেচবে কিনা, তাই বলবে।'

রাজীব বলল,—'আপনি যখন পৌঁছলেন, ওঁরা দুজনেই তখন বাড়িতে ছিলেন তো?'

—'হ্যাঁ, তা ছিল। দুজনকেই বাড়িতে পেলাম। কিন্তু আমি যাবার পরই অম্বর ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেল। আমাকে বলে গেল পরে সে দেখা করবে।'

—'যা জানতে গিয়েছিলেন, ভাইঝির সঙ্গে সে বিষয়ে কথা হল নিশ্চয়?'

—'হল বৈকি। নীপা আমাকে বলল, বাড়ি বিক্রী করতে তারা রাজি। দরদাম যা ঠিক হয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট। কেবল একটি কথা। ওরা বেশীদিন অপেক্ষা করতে পারবে না। সামনের সপ্তাহে দলিল রেজেস্ট্রী হলে সব থেকে ভালো হয়।'

—'শুনে আপনি নিশ্চয় খুশী হলেন?' রাজীব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

নরেশবাবু হেসে বললেন,—'তা একটু খুশী হলাম। সাফল্যে কে না আনন্দ পায় বলুন? কিন্তু ব্যাপারটা আমার কেমন ঠেকল মশায়। ওদের এত তাড়াহুড়ো কিসের? জামাইয়ের হঠাৎ কি মোটা টাকার প্রয়োজন হল?'

মুখে আমি বললাম, দেরি করবার কোনো দরকার হবে না। চাঁদবদন টাকা নিয়ে তৈরী। তোরা যেদিন বলবি, সেইদিনই রেজেষ্ট্রী হতে পারে।'

রাজীব কোনো মন্তব্য না করে কথা শুনছিল।

নরেশবাবু ফের বললেন,—'আমার কথা শেষ হতেই নীপা বলল, কালই সে কলকাতা যাবে। আট-দশ দিন সেখানেই থাকবে। কিংবা তার বেশীও হতে পারে। কলকাতায় তার কিছু কাজ আছে। আমি শুধোলাম, জামাইও সঙ্গে যাবে নাকি? ও হেসে বলল, —'না, না। ডাক্তারের ছুটি কোথায়? এখন লোক নেই বলে নাইট-ডিউটি দিতে হচ্ছে। কলকাতা যাব বললে রুগীরা তেড়ে আসবে না? নীপার কথা শুনে আমার মনে একটা খটকা লাগল মশায়। জামাইকে একলা ফেলে আট-দশ দিনের জন্য মেয়ে কেন কলকাতা যাচ্ছে? আবার বলল, তার চেয়ে বেশীদিনও কলকাতায় থাকতে হতে পারে। যাই হোক, ও নিয়ে আমি আর মাথা ঘামালাম না। স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার। ওরাই ভালো বুঝবে। কিন্তু তারপরই নীপা আমাকে একটা কথা বলল মশায়।'

—'কি কথা বলুন তো?' রাজীব উটের মত গলা বাড়িয়ে দিল।

—'নীপা বলল,—তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে কাকা। সে সব কথা কলকাতায় গিয়ে হবে। শুনলে তুমি হয়ত রাগই করবে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে আগে জানিয়ে রাখি। আমার আর ফেরার পথ নেই। আমি চমকে উঠে বললাম,—আপনার কি বলা দিকি তোর? নরেশবাবু একমুহূর্ত থামলেন। শুকনো ঠোঁটের উপর জিভটা একবার আলতোভাবে বুলিয়ে নিয়ে ফের শুরু করলেন,—ভাইঝি কিছু ভাঙল না মশায়। ওর মুখে আমি একটা নিম্প্রভ হাসি দেখলাম। কিন্তু সেও অল্পক্ষণের জন্য। হঠাৎ ওর মুখখানা আবার উজ্জ্বল হল। আমাকে বলল, কাকা, কলকাতায় গিয়ে তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব দেখাবে। খবরটা শুনে তুমি একেবারে আকাশ থেকে পড়বে। আমার দুটি আর ছেলে-মেয়েদের নাম করে বলল—ওদের কিন্তু এখন কিছু বল না। তাহলে আমাকে বিরক্ত করে মারবে। নীপার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। মেয়েদের সঙ্গে তাল রাখা দায়। ওদের কল্পনার আকাশটা বড়,—চিত্রবিচিত্র। নানা রঙের খেলা। মেঘের প্রাসাদকে ওরা রাজপ্রাসাদ ভেবে আনন্দ পায় মশায়—'

রাজীব বলল,—'কিন্তু উভয়ের দাম্পত্য সম্পর্কে একটা চরম বিপর্যয় ঘটতে যাচ্ছিল, এমন কথা কি করে ভাবলেন?'

বাধা দিয়ে নরেশবাবু বললেন,—'একটু ধৈর্য ধরুন ইন্সপেকটরবাবু। এতক্ষণ তো ভাইঝির কথাই শোনালাম। এবার জামাইয়ের বক্তব্যটা আপনার সামনে রাখি। দুটো যোগ করে দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে শুধু চিড় খায়নি। একটা মস্ত ফাটল তৈরি হয়েছিল। সত্যি বলতে কি, নীপা কলকাতা চলে যাবার পরই ওদের সম্পর্কের ইতি হত।'

রাজীব একটু অবাক হয়ে বলল,—'আপনার সঙ্গে ডাক্তার রায়ের ফের দেখা হল কখন?'

নরেশবাবু বললেন,—'খানিক পরেই দেখা হল জামাইয়ের সঙ্গে। নীপার বাড়ি থেকে আর একটু আগে উঠতে পারলে ওকে হোটেলেই পেতাম। কিন্তু হঠাৎ বাড়ির উঠোনে একটা ঢিল এসে পড়ল। তাই নিয়ে হৈ-চৈ, চেঁচামেচি। আগেও নাকি দু-তিনবার ঢিল পড়েছে। এই নিয়ে দেরি হল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি হোটেলের দিকে রওনা হলাম। কাছাকাছি আসতেই দেখি বাবাজীবন অজন্তা হোটেলের দরজা থেকে বেরিয়ে পথে নামছেন। আমি খুব অবাক হলাম মশায়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অম্বর হোটেলে এল কেন? ও কি আমাকেই খুঁজছিল? কিন্তু আমি তো ওর বাড়িতেই বসে। তাহলে? একটু এগিয়ে ওকে কথাটা শুধোলাম। শুনে অম্বর বলল, সে চাঁদবদনের কাছে এসেছিল। ওর সঙ্গেই তার প্রয়োজন ছিল। আমি তাকিয়ে দেখলাম জামাইয়ের মুখখানা বেশ গম্ভীর। চোখ দুটো কুঁচকে ছোট। ভুরুদুটো অনেক কাছাকাছি। হঠাৎ কোনো ব্যাপারে ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। সামনে দিয়ে একটা রিকশ যাচ্ছিল। অম্বর সেটিতে উঠে পড়ল। আমাকে বলল,—আজ রাত্তিরে আপনি কি একবার আসতে পারবেন? আমি বললাম, কেন পারব না? কখন যাব বল? ও একটু ভেবে নিয়ে বলল, —রাত আটটার পর। কিন্তু বাড়িতে নয়। হাসপাতালে যেন আমি তার সঙ্গে দেখা করি।'

সুব্রত তন্ময় হয়ে কথা শুনছিল। সে হঠাৎ বলল, 'তারপর?'

নরেশবাবু সুব্রতের দিকে এক পলক তাকালেন শুধু। বললেন—'হোটেলে ফিরে চাঁদবদনকে আমি চেপে ধরলাম। অম্বর কি দরকারে তার কাছে এসেছিল? বার দুই-তিন গাঁই-গুঁই করে চাঁদবদন আমার কাছে মুখ খুলল। শুনে আমি অবাক হলাম মশায়। লোকটা এত চাপা! সমস্ত দিন ধরে এই ব্যাপারটা পেটের মধ্যে হজম করে রেখেছে? আমার কাছে ভাঙেনি।'

রাজীব হেসে বলল,—'ও ব্যাপারটা আমরাও শুনেছি। চাঁদবদনবাবু অবশ্য বলতে চান নি। কিন্তু ভয়-টয় দেখিয়ে আমরা ওকে বলতে বাধ্য করি।'

নরেশবাবুকে হঠাৎ কেমন নিষ্প্রভ দেখাল। বিদ্যুৎ সরবরাহের গণ্ডগোলের ফলে মাঝে মধ্যে বাতিগুলো যেমন টিমটিমে অনুজ্জ্বল হয়, তেমনি একটা শুকনো ঢোক গিলে তিনি বললেন,—'ও, কথাটা আপনারা শুনেছেন তাহলে?'

—'হ্যাঁ।' রাজীব একটু হাসল। 'কিন্তু আপনি হাসপাতালে গেলেন কখন?'

—'রাত আটটার সময়।' নরেশবাবু সহজভাবে বললেন,—'আমি যেতেই অম্বর একটা ঘরে নিয়ে গেল। দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে আমাকে সে বসতে বলল। ওর হাবভাব, রকমসকম আমার ভাল লাগেনি মশায়। আমি কেবলি ভাবছি, ও কি বলতে চায়? এত গোপনীয়তা বা কেন? মিনিট-খানেক পরে অম্বর বলল, নীপা আপনার সঙ্গে কলকাতা যেতে চায়। এ কথা শুনেছেন তো? আমি মাথা হেলিয়ে বললাম, সন্ধ্যের সময় আমাকে বলছিল বটে। আট-দশ দিন গিয়ে থাকবে। তার বেশীও হতে পারে। আমার উত্তর শুনে জামাই ব্যঙ্গ করে হাসল। বলল,—আট-দশ দিন নয়। তার চেয়ে অনেক বেশী। আট-দশ বছর বললেও কম করে বলা হবে। আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম—ব্যাপার কি অম্বর? এমন হেঁয়ালি করে কথা বলছ কেন? আমার কথা শুনে ও গম্ভীর হল। বলল,—হ্যাঁ। আর ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় করে লাভ নেই। কথাটা আপনাকে স্পষ্টই জানাচ্ছি। আপনার ভাইঝির মিছিমিছি বিয়ে দিয়েছিলেন কেন? তার মন ঘরসংসারে নেই,—আছে সিনেমা-থিয়েটারে। এখানকার ক্লাবের নাটকের সে হিরোইন। পাঁচটা পুরুষের সঙ্গে মাখামাখি, দহরম-মহরম। এখন থিয়েটার ছেড়ে সিনেমার দিকে ঝুঁকেছে। রুপালি পর্দায় ঠাঁই পাওয়া তো সৌভাগ্যের কথা। সেই গরবে আপনার ভাইঝির আর মাটিতে পা পড়ছে না। আমি অবাক হয়ে বললাম,—তুমি কি বলছ অম্বর? নীপা বিপথে গেলে তুমিই তো তাকে পথ দেখাবে। স্ত্রীকে শুধরে নেওয়াই তো স্বামীর কাজ। তুমি ওকে বুঝিয়ে বল।'

রাজীব বলল,—'এইসব কথা আলোচনার সময় ডাক্তার রায়কে নিশ্চয় খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল?'

—'বিলক্ষণ। কথা বলবার সময় অম্বর ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিল। আমার বক্তব্য শুনে বড় বড় চোখ করে অনেকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পরে বলল,—ওসব কথা ছেড়ে দিন। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ক্ষান্ত করার মত দিনকাল আর নেই। এখন সবাই স্বাধীন,—যে যার পথে চলবে। একটু থেমে সে ফের বলল,—একটা কথা আপনাকে বলতে আমার সংকোচ হয়। নীপার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ঘরের বউ হলে কি হবে? আপনার ভাইঝির পুরুষ-বন্ধু অনেক। দু-একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশ গভীর। লোকের চোখে দৃষ্টিকটু এবং আপত্তিকর। আমি কোনো

জবাব দিতে পারলাম না মশায়। একটু আগেই চাঁদবদনের কাছে যা শুনেছি, জামাইয়ের মুখে তারই প্রতিধ্বনি। সুতরাং চুপ করে থাকাই শ্রেয় ভাবলাম।'

কখন সিগারেটটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। রাজীব খেয়াল করেনি। দগ্ধ অংশটুকু জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে সে বলল,—'বাকিটুকু শেষ করুন নরেশবাবু।'

—'আর বাকি কিছু নেই।' নরেশবাবু নড়েচড়ে বসলেন।

—'আমি বুঝতে পারলাম ইন্সপেকটর-বাবু, তলে তলে ব্যাপারটা অনেকদূরে গড়িয়েছে। যে জমির উপর ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে আছে, তার নীচেটা ফোঁপরা। সন্দেহের ইঁদুরে মাটি কুরে কুরে মস্ত সুড়ঙ্গ বানিয়েছে। আমি আর দেরি না করে উঠে পড়লাম। একবার ভাবলাম, নীপার কাছে যাই। ওকে বোঝালে যদি কোনো ফল হয়। কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেরোবার মিনিট কয়েক পরই জোর বৃষ্টি নামল। বড় বড় ফোঁটা। একটা বাড়ির ঝুল-বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে কোনোমতে রক্ষে। রাত দশটা নাগাদ জল একটু কমলে পর একটা রিকশ করে হোটেলে ফিরি।'

হাতের আঙুলগুলি জড়ো করে নিবিষ্ট মনে রাজীব কিছু চিন্তা করল। পরে চিরুনির দাঁড়া বুলোনোর মত মাথার চুলে বাঁ হাতের আঙুলগুলি রাখল। মুখ তুলে রাজীব বলল,—'নরেশবাবু, আপনার কথা তো শেষ হল। এবার আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন।'

—'বিলক্ষণ। বলুন কি প্রশ্ন আছে?'

হাতের আঙুলগুলি চুলের মধ্য দিয়ে ঘাড়ের কাছে নেমে এল। রাজীব প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা, আপনার ভাইঝির সিনেমা-থিয়েটারে বরাবরই খুব ঝোঁক ছিল, তাই না? বিয়ের আগেও তো অভিনয়-টভিনয় করেছেন?'

নরেশবাবু একটু ভেবে বললেন,—'বিয়ের আগে ও কলকাতায় বছর দুই মোটে ছিল। আমার দাদা তখন বেঁচে। তিনি খুব রাশভারী লোক ছিলেন। ছেলেমেয়েরা খুব ভয় করত বাপকে। সিনেমা-টিনেমা যাওয়ার রেওয়াজ কম ছিল। বাড়ি থেকে মেয়েদের হুট-হাট বেরোনো উনি পছন্দ করতেন না। তবে কথাটা আমিও শুনেছি। কলকাতায় নীপা একটা অ্যামেচার নাট্যগোষ্ঠীতে যাতায়াত করত। কলেজে যাবার নাম করে কিংবা বন্ধুদের বাড়ি যাবার অছিলায় সেখানে গিয়ে জুটত। অবশ্য এত সব কথা কেউ জানত না। হঠাৎ একদিন একটা উড়ো চিঠি এল বাড়িতে। তাতেই সব কথা লেখা ছিল। মেয়েকে না সামলে নিলে ওর বিপদ হতে পারে। আমার মনে আছে নীপাকে আমরা খুব ধমকে ছিলাম। চিঠির কথা দাদাকে আর কেউ ভয়ে জানায় নি।'

রাজীবকে কৌতূহলী মনে হল। সে বলল,—'নরেশবাবু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। কিছু মনে করবেন না। আচ্ছা, কলকাতায় থাকতে আপনার ভাইঝির কোনো লভ-অ্যাফেয়ার হয়েছিল বলে জানেন?'

—'লভ-অ্যাফেয়ার মানে প্রেম-ট্রেম তো?' নরেশবাবু ভ্রূ কুঁচকে রইলেন। 'বলতে পারব না মশায়। যদি হয়েও থাকে, তা আমাদের কারো জানা নেই। কলকাতার সঙ্গে মফস্বলের তো ঐ তফাৎ। দরজার বাইরে পা দিলেই তুমি অচেনা মানুষ। কোথায় কি করে বেড়াচ্ছ, কে জানছে? তবে একটা ব্যাপার আমি জানি। আপনাকে বলতে পারি।' সুব্রতের দিকে তাকিয়ে নরেশবাবু হঠাৎ চিন্তিত হলেন।

রজীব তাড়াতাড়ি বলল,—'থামলেন কেন? ওর সামনে আপনি সব কথা বলতে পারেন।'

সুব্রতের মুখের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে নরেশবাবু বললেন,—'ব্যাপারটা কিন্তু আমরা এতদিন চেপে রেখেছিলাম। কাউকে জানাইনি,—বলিনি। এমন কি অম্বরকেও না।' গলার স্বর একটু নামিয়ে তিনি ফের বললেন,—'দাদা তখন কলকাতায় ছিলেন না। নর্থ বেঙ্গলে গোকুলনগর বলে একটা জায়গায় বদলি হয়েছিলেন। নীপার বয়স তখন পনের-ষোলর বেশী নয়। কিন্তু ছোট থেকেই ওর বাড়ন্ত গড়ন। এখনকার চেয়ে তখন ওকে আরো বেশী সুন্দর দেখাত। কিন্তু বলব কি মশায়, হঠাৎ দুম করে মেয়ে একদিন বাড়ি থেকে নিখোঁজ হল। গোকুলনগর ছোট জায়গা। খবরটা ঠিক ঢেঁড়রা পেটানর মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। শহরে আর কারো জানতে বাকি রইল না যে সাবডেপুটিবাবুর মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। পুরো তিন দিন মেয়ের খোঁজ পাওয়া গেল না। চতুর্থ দিনে নীপা মাইল ছয়-সাত দূরের একটা রেল-স্টেশনে ধরা পড়ল। তিন দিন দাদা ঘর থেকে বেরোন নি। ওকে যেদিন পাওয়া গেল, সেদিনই রাত্রে দাদা গোকুলনগর ছেড়ে চলে এলেন। আর কোনোদিন যান নি।'

রাজীব শুধোল,—'কিন্তু আপনার ভাইঝি বাড়ি থেকে পালাল কেন?'

—'কেন আবার? লভ অ্যাফেয়ার মশায়, —লভ।'

নরেশবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন,—'তলে তলে ভাইঝি যে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। সেই ছোকরার সঙ্গে ঘর বাঁধবে বলেই বাড়ি থেকে পালিয়েছিল।'

রাজীব হেসে বলল,—'তাই বলুন। কিন্তু ছেলেটাকে আপনি চিনতেন? ওর নাম জানেন?'

—'ওকে চিনতাম বৈকি।' নরেশবাবু অনায়াসে বললেন। 'ছোকরা কলেজের সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ত। দাদার বাড়িতে মাঝে মাঝে এসেছে। ওর নাম বীরেন। জাতে ময়রা। গোকুলনগরে ওর বাপ পীতাম্বর মোদকের একটা মিষ্টির দোকান ছিল।' একটু থেমে নরেশবাবু ফের বললেন,—'কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার মশায়। মাস চারেক আগে ওর সঙ্গে আমার কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে দেখা হয়েছিল। বীরেন আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। কুশল জিজ্ঞাসা করল। দাদা মারা গেছেন শুনে খুব দুঃখ করল। এখন নীপা কোথায় আছে তাও জানতে চাইল।'

—'আপনি সব কথা নিশ্চয় বললেন?'

—'তা বলেছি।' নরেশবাবু একটু ইতস্তত করে জানালেন। 'তবে ছেলেটা এখন পালটে গেছে মশায়। আগের সে চেহারা, বাবুগিরি কোনোটাই নেই। শুনলাম কলকাতায় হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছে—'

—'বীরেন মোদক কোথায় থাকে জানেন?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও বলেছিল বটে। গোল-দিঘির পিছনে নিতাইহরি কবিরাজ লেনের একটা মেসে থাকে। প্রবাসী মেস নাম।' নরেশবাবু একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরে হাসলেন।

●

শ্রাবণের শান্ত দুপুর। ক্লান্ত সুরে কোথায় ঘুঘুপাখি ডাকছে। চনচনে রোদ্দুর চারপাশে। সূর্য এখন মাথার উপরে। ঘড়িতে প্রায় একটা বাজে।

জীপের শব্দ শুনেই অম্বর নেমে বাইরে বেরিয়ে এল। অনুমান করতে ওর মনে চিন্তার রেখা জমেছিল। এখন আরোহীদের দেখে মুখটা শুকোল, দৃষ্টি সংকুচিত হল।

রজীব বলল,—'আপনাকে আবার একটু বিরক্ত করলাম ডাক্তার রায়। যদি অনুমতি দেন তো মিসেস রায়ের প্রেসক্রিপশনগুলি আমরা একটু দেখতে পারি।'

—'প্রেসক্রিপশন দেখবেন মানে, বাড়ী সার্চ করবেন তো?'

'ঠিক সার্চ নয়। এমনি একটু দেখব আর কি।' রজীব হেসে ব্যাপারটা সহজ করতে চাইল। 'কি করব বলুন? এইমাত্র আপনার শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে দেখা করে আসছি। তিনি আবার জামাইকেই সন্দেহ করছেন।'

—'সন্দেহ করছেন আমাকে? কিন্তু কেন?'

—'কেন আবার? আপনি ডাক্তার—বেশী মরফিন দিলে ঘুম আর ভাঙে না এ-কথা বোঝেন। ইনজেকশান দিতে পারেন।'

অম্বর ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল। বলল,—'ইন্সপেকটরবাবু একটা কথা বলতে পারি?'

—স্বচ্ছন্দে—

সন্দেহ কিন্তু আমিও করতে জানি। ইনজেকশন দিতে আমার খুড়শ্বশুরও পারেন। পরশুদিন সকালেই উনি তা বলেছেন। চাঁদবদনবাবুকে জিজ্ঞাসা করবেন। তাছাড়া,—' অম্বর এক সেকেন্ড থামল। পরে একটা কঠিন ধাঁধা বলার মত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল,—'নীপার অবর্তমানে কলকাতার বাড়িটা কে পাবে বলতে পারেন?'

—'কেন, আপনি?'

অম্বর মাথা নাড়ল। —'উহুঁ, হল না মিঃ সান্যাল। আমি যতদূর জানি ও সম্পত্তিটা এখন উনিই পাবেন। মারা যাবার আগে শ্বশুরমশায় একখানা উইল করে গিয়েছিলেন। সেখানা অ্যাটর্নির ঘরে আছে বলে শুনেছি।—'

পাঁচ মিনিটেই তল্লাসীর কাজ শেষ। রাজীব যখন জীপে উঠল তখন তার হাতে একখানা ডায়েরি গোছের বই, একটা লেটার প্যাড। টুকিটাকি কয়েকটা কাগজ।

সুব্রত হেসে বলল,—'অত যত্ন করে ওগুলো কি নিয়ে চললেন রাজীবদা?'

ডায়েরি বইটা দেখিয়ে রাজীব বলল,—'এতে কি আছে জানো সুব্রত?'

—'কি? গুপ্তধনের নকশা, না কোনো রহস্যলিপি?'

—'তার চেয়েও ইনটারেস্টিং।' চোখ মটকে রাজীব বলল। 'চিত্রতারকার গোপন কাহিনী।'

(চলবে)

তৃষ্ণা থেকে তৃষ্ণার পেছনে ॥

হেনা হালদার

জলের সঙ্গে কী যে সংযোগ জানি না
জল দেখলেই কেন রক্তের গহনে জাগে
দুরন্ত উল্লাসময় তীব্র আলোড়ন.........
দেখি স্বচ্ছ পালিশ আয়নায়
ছায়া ফেলে অবিকল দ্রাক্ষালতা, সোনার অপেল।

নদী-খাল-বিল-ঝর্ণা চতুরঙ্গী ছলায় কলায়
আমাকে জড়িয়ে ধরে
চতুর্দিক থেকে।
মেঘ ডাকে......বৃষ্টি আসে......প্রমত্ত কোটালে
রক্ত মাতে
ঢেউ ওঠে, তোলপাড় জোয়ারে জোয়ারে
ভেসে যাই। স্নানের ঘরের বাথটব
টলমল বেসামাল নৌকার মতন।

শাওয়ার-ঝর্ণার নীচে
তোমাকেও ফিরে পাই। তুমি
যেন জল-ছবি হয়ে উঠে আসো
হাতের তালুতে।
শফরী-লীলায় রঙ্গে ধাওয়া কর
তৃষ্ণা থেকে তৃষ্ণার পেছনে
জলে-জল বাঁধার খেলায়।

সনাক্তকরণে কোন প্রয়োজন নেই ॥

দীপেন রায়

প্রশ্ন তুলে দ্যাখো পাবে,—ভাঙা ঘটে পুনর্বার
না যদি উত্তর মেলে চলে যেও সটান্ দক্ষিণে।
কে কার ঘরের কাছে
অবিরত প্রার্থনার মত
নিরুপদ্রবে জাগে অনন্ত সময়!
সনাক্তকরণের কোন প্রয়োজন নেই,
অদ্যাবধি পৃথিবীর নতুন শহরে
প'টোর দক্ষিণ হস্ত সর্বদাই কারুকৃতিময়।

বুকের ভেতরে চলছে সমাপ্তীকরণের খেলা,
খেয়া ঘাট পারাপারে সহস্র মানুষ
যাবে সকলেই শহরের নতুন কংক্রিটে,
যেখানে নগর প'টো বিশাল ভূমির
আকাশ টাঙানো মুক্তি শতাব্দীর সনাক্তকরণে
ব্যাপিত বিশাল শুধু একাকার রঙ ও রেখায়
জ্বলন্ত অঙ্গার তুলি হাতে করে দীর্ঘ প্রহরীর
জেগে আছে আলোয় বাতাসে।

॥ ৯ ॥

প্রাণপ্রিয় পুত্রের অকালমৃত্যু কাজীকে উদ্বেলিত করেছিল। তবু সামলে নিয়েছিলেন প্রমীলার মুখের দিকে চেয়ে। কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল যেদিন প্রমীলা শয্যা নিলেন। কাজীর চাইতেও দারিদ্র্যের শত অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন এই মেয়েটি। বসবাসের নিশ্চয়তা ছিল না। অনিশ্চিত ছিল খাদ্যের ব্যবস্থা। রোগ ছিল। ছিল না হবার দুর্ভোগ। কিন্তু সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো প্রমীলা সেবা দিয়ে, হাসি দিয়ে, অন্তরের চির উষ্ণ প্রেম দিয়ে কাজীকে আগলে রেখেছিলেন।

রুগ্ন প্রমীলার উপশমের জন্যই হয়তো পাগল জীবন কাজীকে অস্থির করেছিল সত্যকথা। কিন্তু কাজীর আধ্যাত্মিক পিপাসা স্ত্রীর চিকিৎসাক্ষেত্রেও বিভ্রাট ঘটিয়েছিল। ধর্মবিশ্বাসী বন্ধু একজন ছিলেন তাঁর সঙ্গী। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা অপেক্ষা অলৌকিকতায় তাঁর বিশ্বাসী ছিলেন কিনা জানি না,—কাজীকে এই অতীন্দ্রিয় জগতের উপর আস্থা রেখে চলতে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিতে প্ররোচিত কম করেননি। এবং সর্বোপরি ছিল গুরুবোধ।

আধ্যাত্মিকতা ও কুসংস্কারের সম্পর্ক ও নৈকট্য অঙ্গাঙ্গী হয়তো নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার আড়ালে যে কুসংস্কার স্থান করে নেয় অক্লেশে, তাতেও সংশয় নেই। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে কারবার। সাধারণ রক্তমাংসের মানুষে কোনদিনই তার থৈ পেল না। লোকচক্ষুর অগোচরে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ বাঁচিয়ে এই অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড সাধারণ মানুষকে কতখানি শান্তি ও স্বস্তি দিয়েছে, তার হিসেব নেই, কিন্তু মাদকতা, সম্মোহন, আর প্রতারণার সুড়ঙ্গপথে যে অগণিত অকল্যাণ ও বিভ্রান্তি অবলীলায় স্থান করে নিল, তারও অবধি নেই।

কাজী এই পথের অভিসারী। মাতাল। একদিকে প্রিয়তমা পত্নীর অসহায় পঙ্গু-জীবন, তার জন্য উৎকণ্ঠা, অর্থাভাব, অন্যদিকে দোদুল্যমান চিত্তের নানা উপসর্গ। কাজীর জীবনে এইবার সত্যিই আঁধার ঘনিয়ে এল। সাধ কামনা উচ্চাভিলাষের সমাধি তিনি নিজের হাতে রচনা করেছিলেন। জীবনের উপসংহার কি তাঁর জীবদ্দশাতেই দেখা দেবে? নিজের পরিণতি তাঁকে কি এনে দেবে ভয়ংকর বিভ্রান্তি?

জীবন-যুদ্ধে কাজী পরাজিত। পরাজয়ের দুঃসহ গ্লানি উপচে পড়ে তাঁর কথায়, আচরণে মনে। সবই নিঃশেষ হয়ে গেছে। গান গেছে, কাব্য গেছে, হাসির গমক স্তব্ধ হতে বাকি নেই। কলকণ্ঠ প্রায় নীরব।

শুধু টিকে থাকল দুর্বোধ্য আত্ম-সম্মোহন। সাংসারিক জীবনের তুচ্ছ ভালো-মন্দ, নাম-যশ-খ্যাতি, অর্থ-সম্পদের ঊর্ধ্বে এক অনির্বচনীয় কুয়াশা তাঁর জীবনে গাঢ় হয়ে উঠল। "সাহিত্যের কোন কুঞ্জে আজ আর আমার কোন গণ্ডীবাঁধি নেই, আজ আমি নীড়-ভ্রষ্ট।"

সৈনিক-কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল সেদিন এক মর্মান্তিক গাথা : যদি আর বাঁশী না বাজে, আমি কবি বলে বলছিনে,—আমি আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি, আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন। বিশ্বাস করুন আমি কবি হতে আসিনি। আমি নেতা হতে আসিনি, আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম—প্রেম পেতে এসেছিলাম—সে প্রেম পেলাম না বলে এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরকালের জন্য বিদায় নিলাম।"

জীবনের অন্তিম মুহূর্ত কি সত্যই ঘনিয়ে এল? অভিমানী কবি বাঙালী জাতিকে, বাংলা দেশকে, বাংলা ভাষাকে ভালোবেসেছিলেন সমগ্র সত্তা দিয়ে। বাঙালী তাঁর অভিপ্রেত সাড়া দেয়নি। তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি। অপূর্ণ তৃষ্ণা আর বেদনার হতাশা তাঁকে ঠেলে দিয়েছে দূরে থেকে দূরান্তরে। বিয়োগ-বিধুর কবি-সত্তা ডুকরে কেঁদে ওঠে। ঝরে পড়ে অনুপম চক্ষুর ধারাস্রোত। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে : 'পূর্ণত্বের তৃষ্ণা নিয়ে একটি অশান্ত তরুণ এই ধরায় এসেছিল, অপূর্ণতার বেদনায় তারই বিগত-আত্মা স্বপ্নে কেঁদে গেল..."

১৯৪০-এর জুলাই আবার কারাগারে। মুক্তি পেলাম ১৯৪১-এর আগস্ট মাসে। আমি তখন বাংলা অ্যাসেমব্লির মেম্বার। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই অনিশ্চিত। সবই ঝিমধরা। অ্যাসেমব্লির চার দেয়াল ঘিরে যা-কিছু বাদ ও বিতণ্ডা ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী। উপলক্ষ্য কী ছিল আজ আর মনে নেই। ফজলুল আমাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করে বসলেন। রাত্রিবেলা আহারের ব্যবস্থা। অ্যাসেমব্লির লবিতে।

সারাদিন বাক্যের ফুলঝুরি ছুটিয়ে রাত্রিবেলার নেমন্তন্ন খুব বেশি আকর্ষণীয় কারো মনেই হয়নি। অনেকেই ঘরের টানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। আমিও। লবির শেষ প্রান্তে দেখা আফজলের সঙ্গে। অ্যাসেম্-ব্লির সেক্রেটারি। সুদর্শন ও অমায়িক এই ভদ্রলোকটিকে আমার খুবই ভালো লাগত। প্রথম থেকেই। উনিও আমাকে যথেষ্ট সমাদর ও প্রীতি দেখাতেন।

প্রথম দিনের কথাটা মনে পড়ছে। শপথ-বাক্য গ্রহণ করবার দিন। একে একে শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। ছাপানো বাঁধা বুলি। ইংরেজীতে। পালা এল আমার। এগিয়ে গেলাম। কাগজখানা হাতে নিয়েই আমি বলে উঠেছিলাম,—"ইংরেজী ভাষায় শপথ আমি করবো না।"

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলেন আফজল আমার দিকে। ক্ষণকাল চুপ করে

থেকে বলেছিলেন,—'বাংলায় বলবার কোন বন্দোবস্ত তো নেই।'

'সেই যে, তা জানি। কিন্তু করতে হবে।'

"কিন্তু এখুনি কী করে সম্ভব?"

"মোটেই অসম্ভব নয়। সরকারী অনু-বাদককে ডেকে পাঠান। আমি অপেক্ষা করবো।'

প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হয়ে-ছিল। বাঙলায় শপথ নিয়েছিলাম। সেই থেকে সৌহার্দ্যের সূচনা। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি খুব অনুরাগ ছিল। কিন্তু চর্চার অবকাশ পাননি। নিভৃতে দুজন আলোচনা করতাম। পেশায় ছিলেন তিনি ব্যারিস্টার। কিন্তু সেসব ছেড়ে দিয়ে সরকারী চাকুরি নিয়েছেন। মনে ব্যথা ছিল। এইসব আলোচনার ফাঁকেই উঠেছিল কাজীর কথা। কাজীর কারা-কাহিনী শুনতেন তন্ময় হয়ে। কাজীকে আফজল ভালোবাসতেন।

আমাকে দেখেই দ্রুতপায়ে আফজল এগিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন,—আপনার বন্ধুও আজ আসছেন।'

"বন্ধু?"

'হ্যাঁ। কাজী সাহেব। একটু আগে আমাকে ফোন করতে বলেছিলেন হক সাহেব।'

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। উনি এলেন বলে। আমাকে বললেন দেরি হবে না।'

থেকে গিয়েছিলাম। কত দীর্ঘদিন কাজীকে দেখিনি। এক যুগ। সেই ১৯২৬। তারপর কত জলই না বয়ে গেছে গঙ্গার বুক বেয়ে। কত কারাদণ্ড। নির্বাসন আটক জীবন। কাজীর কথা ভাবিনি। সময় ছিল না ভাববার। নিমেষে গোটা অতীত রূপ ধরে ফুটে উঠল। আলিপুর, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর।

মাঝে মাঝে কানে আসত কাজীর কথা। কচিৎ কখনো কবিতা চোখে পড়েছে। গান শুনেছি গ্রামোফোনে। বছরখানেক আগে ফজলুল হক কাগজ বের করেছিলেন নব-যুগ। কাজীকে নিযুক্ত করেছিলেন সম্পাদক। কাজীর প্রথম জীবনেও আর একবার 'নবযুগ' বের করেছিলেন হক সাহেব। তখনও কাজীই ছিলেন 'নবযুগের' বিশেষ আকর্ষণ। মুজাফ্ফর অহমদ ও কাজী ছিলেন যুগ্ম-সম্পাদক।

কাজী সাংবাদিক। কাজী কবি। সঙ্গীত-মুখর কাজী।। আজকে কাজী?

শুনেছিলাম, কাজী যোগী হয়েছেন আমার অনেকদিনের চেনা কাজীকে খুঁজে পেলাম না।

চেনা কলকণ্ঠ কানে এল। কাজী।

দুজন দুজনের দিকে চেয়েছিলাম। তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। কিন্তু মুহূর্তের জন্য।

পেছন থেকে কে একজন অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠেছিল,—'পাগলটাও এসেছে দেখ ছ।'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন লোকটিকে। কিন্তু তার পূর্বেই কাজী আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন লবির এক প্রান্তে।

দুজন বসে পড়েছিলাম। পাশাপাশি। ফিসফিস করে বলছিলেন কাজী,—রেডিও শোনেন তো? রেডিও? সুভাষের কণ্ঠ শোনেন নি?'

"শুনেছি।'

'শুনেছেন?'—দুহাতে জড়িয়ে ধরে-ছিলেন আমাকে। আবেগে কাজী কাঁপছিলেন থর-থর করে।

কাঁধের জড়ানো হাতখানা মুক্ত করে আমার হাত ধরে কাজী বলেছিলেন—'লিখবো। এমন কবিতা লিখবো, যা কেউ লেখেনি কখনো।'

আমি তাকিয়ে ছিলাম ওঁর চোখের দিকে।

চোখের তারা দুটো জ্বল্‌জ্বল্ করছিল।

'সুভাষ। সুভাষ। শুধুই সুভাষ নয়,—ও সুবাসও। ওর গন্ধে মাতাল হবে একদিন সারা দেশ।'

ঝপ করে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। উঠে দাঁড়িয়েছিলেন কাজী।

এর পরই ছুটে বেরিয়ে গেলেন বাইরে। অদৃশ্য হয়ে গেলেন অন্ধকারের বুকে।

অকস্মাৎ আমার দুচোখ বেয়ে ধারা নেমে এল। পাগল। সত্যি পাগল।

(শেষ)
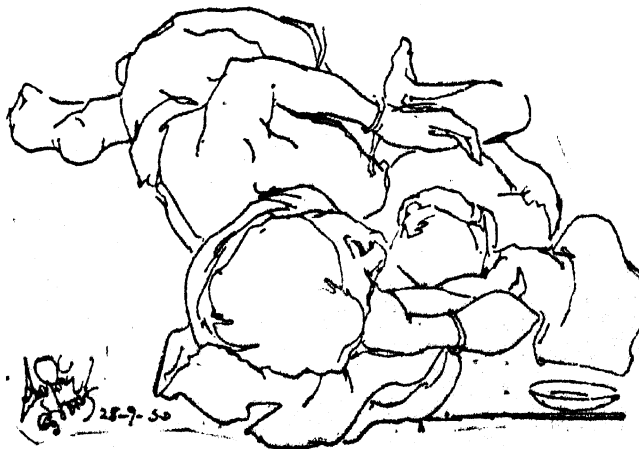
ঘুমের মধ্যেই বিনতার ঠোঁটদুটো অল্প অল্প কাঁপছিল। হাত-দুটোকে বুকের সামনে জড় করে গুটিশুটি হয়ে ঘুমোচ্ছিল বিনতা। হাঁটু মুড়িয়ে গুটানো পা-দুটো পেটের সঙ্গে চেপে ধরেছিল। মাথাটা বালিশ থেকে গড়িয়ে কাঁধের ওপরে হেলে পড়েছিল। রুক্ষ চুলের এলো-খোঁপাটা ঘাড়ের ওপরে ভেঙ্গে পড়ে অনাবৃত কাঁধ এবং পিঠের ঊর্ধ্বাংশটা ঢেকে দিয়েছিল। হঠাৎ ওর গলা থেকে কয়েকবার মৃদু খুক খুক কাশির শব্দ উঠল। কম্পমান ঠোঁট-দুটো কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেল। তারপর অস্পষ্ট জড়ানো গলায় বিড়-বিড় কথা আর সেই সঙ্গে ঠোঁট-দুটোর নড়াচড়ার ফাঁকে ফাঁকে পানের রসের হালকা ছোপ-ধরা দুপাটি উজ্জ্বল সাজানো দাঁত এবং টুকটুকে লাল জিবটার ডগা দৃশ্যমান হতে লাগল। বুকের সামনে জড়-করা হাত-দুটো সামনের দিকে প্রসারিত হল। বালিশটাকে দুহাত দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে আলিঙ্গনের ভঙ্গীতে চেপে ধরল বিনতা। মুখটা বালিশের মধ্যে ডুবে গেল। অনাবৃত ঘামে-ভেজা পিঠের মাঝ-বরাবর পিচ্ছিল খাদের মত একটা রেখা চিহ্ন ফুটে উঠল। আর সেই খাদের পিচ্ছিল পথ ধরে একটা সরু ঘামের রেখা নামতে লাগল কাঁধ-ঢাকা এলো-চুলের আড়াল থেকে। ঘরের মধ্যে এখন আর কোন শব্দ নেই। বিনতার মুখেও আর কোন বিড়-বিড় কথার শব্দ নেই।

পাশের কোন বাড়ীতে যেন খুব জোরে রেডিও খুলে দিল। ভোরের মাঙ্গলিক সানাই-এর সুর আছড়ে পড়ল নিস্তব্ধ ঘরের বাতাসে। বিনতার কুণ্ডলী-পাকানো ঘুমন্ত দেহটা বেশ কয়েকবার নড়ে-চড়ে উঠেই চিৎ হয়ে গেল। বাঁ-হাতটা মাথার পিছনে উঠে এল। ডান হাতটা শিথিল ভঙ্গীতে পড়ে রইল বিছানার ওপরে। বালিশটা আলিঙ্গন-মুক্ত হয়ে বুকের ওপর থেকে একপাশে গড়িয়ে পড়ল। গুটানো

পা-দুটো লম্বা হয়ে আড়া-আড়ি ছড়িয়ে গেল। মাঝ রাতে ভ্যাপসা গরমে বিনতা কখন যেন ব্লাউজটা গা-থেকে খুলে ফেলে শাড়ির আঁচলটা বুকের ওপরে টেনে দিয়েছিল। ঘুমের মধ্যে একসময় আঁচলটা বুক থেকে খসে পড়েছে। বন্ধ জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে একটা সরল আলোর রেখা বর্শার ফলার মত বিঁধে গেল বিনতার দু-চোখের ওপরে। সেই মৃদু আলের আভা ছড়িয়ে পড়ল বুকের ওপরে। বাঁ-হাতটা মাথার পিছন থেকে নেমে এসে বুকের ওপরে আলতো ভাবে পড়ে রইল।

ঘুম ভেঙে গেল বিনতার। চোখ মেলে চাইতেই আঁচল-খসা বুকের ওপরে দৃষ্টি পড়ল। সঙ্গে সংগে এক আশ্চর্য লজ্জা ঘিরে ধরল বিনতাকে। ত্রস্ত হাতে বুকের ওপরে আঁচলটা টেনে দিল। অথচ ঘরের মধ্যে বিনতা এখন সম্পূর্ণ একা। রোজই ভোরের আলো না ফুটতেই বার দরজার কড়া নাড়ে তোলা-ঝি। আজও নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম ঘটেনি। সাত-সকালেই বাসি কাজ সেরে দিয়ে চলে গিয়েছে, তোলা ঝি। রোজকার মত আজও নিশ্চয়ই মা ঘুম থেকে জেগে দুর্গা দুর্গা বলতে বলতে বার-দরজা খুলে দিয়ে ঝি-এর পিছু পিছু ঘুরে বেড়িয়েছেন আর কাজের খুঁৎ ধরে বেশ-কিছুক্ষণ গজর-গজর করেছেন। তারপর স্নান সেরে ঠাকুরঘরের পাট চুকিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছেন।

তবুও লজ্জায় লাল হয়ে উঠল বিনতা। এতক্ষণ এক আশ্চর্য, মধুর স্বপ্ন দেখছিল বিনতা। সেই স্বপ্নের ঘোরেই ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। আর জেগে উঠেই আঁচল-খসা বুকের ওপরে মৃদু আলোর স্পর্শে আবার যেন সেই স্বপ্নের মানুষটার অশরীরী দু-হাতের আলিঙ্গনে ধরা পড়ে গিয়েছে। উত্তেজনায় বিনতার সারা দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। কপালে, গালে, গলায় ফুটে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম। নাকের পাটা, কানের লতি সব যেন আগুনে পুড়ে ঝলসে যেতে লাগল। আপন মনেই বিড় বিড় করে কি সব কথা বলতে লাগল। কম্পমান দেহটা কি যেন এক অজানা সুখে ক্রমশঃই আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল। মধুর আলস্যে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল বিনতার শিথিল, অবশ দেহ।

সানাইএর চড়া সুরে ভৈরবীর আলাপ জমে উঠেছে। বিনতার বুকের মধ্যে থর থর করে কাঁপতে লাগল এক ভীরু প্রত্যাশা। ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। বিনতার স্বপ্নও কি সত্যি হবে? ভাবতেই বুকের মধ্যে ছলকে উঠল এক আশ্চর্য সুখ। দুরন্ত ঢেউএর দোলা জাগল রক্তের সমুদ্রে। যেন কোন্ এক দূরাগত মন্দিরের ঘণ্টা-ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল শিরায় শিরায়। বুকের মধ্যে ছলকে ওঠা সুখটা থির থির করে কাঁপতে লাগল ভোরের সেই আশ্চর্য স্বপ্নের দৃশ্যপট হয়ে। আবার স্বপ্নের জগতে হারিয়ে গেল বিনতা।

বধূবেশে শুয়ে আছে বিনতা। চওড়া সিঁথিতে দগদগে সিঁদুরের রেখা। কপাল গাল-চিবুকে সব সিঁথির সিঁদুরে মাখামাখি। শাদা ফেনারমত জোড়াখাটের নরম গদীর বিছানায় ডুবে গিয়েছে বিনতার শিথিল এলায়িত শরীর। চারপাশে অজস্র ফুলের ছড়াছড়ি। দলিত ফুলের পাপড়ির গন্ধে ভুরভুর করছে ঘরের বাতাস। খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার রুপালী আলো ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছে বিনতার সারা দেহে—সিঁথির সিঁদুরে, ঘাড়ের নীচে ভেঙে-পড়া খোঁপা, টকটকে লাল বেনারসী শাড়ি, ব্লাউজের সোনালী জরির গায়ে। চিক্ চিক্ করে জ্বলছে অজস্র রুপোর গুঁড়ো। বিনতার মুখের ওপরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে আরও একটি মুখ। মাথায় একরাশ অগোছাল চুল, পুরু চশমার আড়ালে দুটি মুগ্ধ চোখ, সূক্ষ্ম দাড়ির রেখায় নীলাভ ফর্সা গাল, আধ-খোলা দুটি ঠোঁটের ফাঁকে ঝিলিক-দেওয়া অভ্র দাঁতের হাসি—সব মিলিয়ে সেই স্বপ্নের মুখটা বিনতার কতদিনের চেনা মুখটা আস্তে আস্তে নেমে এলো বিনতার ঠোঁটের ওপরে। মাথার এলো-মেলো অগোছাল চুলগুলো বিনতার মুখের ওপরে খুলে পড়ে কপালে-গালে সুড়-সুড়ি দিতে লাগল। তারপর অস্ফুট কাঁপা-কাঁপা গলায় শুরু হল এক আশ্চর্য ভালবাসার মন্ত্রোচ্চারণ।

বিনু তুমি তো জানো না, কি যন্ত্রণায় আমি রাতের পর রাত ছুটে বেড়িয়েছি, লন্ডনের পথে পথে। বিনু আজ আমাকে মুক্তি দাও সেই নিঃসঙ্গতার অসহ্য যন্ত্রণা থেকে।

বিনতাকে দুহাতের আলিঙ্গনে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল সেই মুগ্ধ অস্থির পুরুষ।

চোখ দুটো বন্ধ করে এক আশ্চর্য মুহূর্তের প্রতীক্ষা করতে লাগল বিনতা। আধ-খোলা ঠোঁট-দুটি মৃদু মৃদু কাঁপতে লাগল। শুরু হল এক দুরন্ত ভালবাসার খেলা। বিনতার সারা দেহে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল এক বিচিত্র হোমাগ্নি। ধূপের সৌরভে ভরে গেল ঘরের বাতাস। বিনতার দেহটা যেন মোমের মত গলে গলে একসময় হারিয়ে গেল গলিত মোমের স্রোতে। আর দুটি প্রস্ফুটিত রক্তগোলাপ সেই মোমের স্রোতে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ পাক খেয়ে তলিয়ে গেল।

রেডিওতে সানাই-এর সুর থেমে গেল। যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল বিনতা। চোখ খুলতেই দেখল—বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে অনেকগুলো সরল আলোর রেখা ওপাশের ছাদ আর দেওয়াল-বরাবর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অজস্র ধূলিকণা রুপোর গুঁড়োর মত চিক্‌চিক করে জ্বলছে সেই আলোর রেখাগুলোর গায়ে। বিনতার মনটা খুশীতে ভরে উঠল। বাইরে নিশ্চয়ই প্রচুর রোদ উঠেছে। তবুও যেন নিশ্চিন্ত হতে পারল না বিনতা। কাল বিকালেও বৃষ্টি মাথায় করে বাড়ী ফিরেছে বিনতা। রাতে শুতে যাওয়ার আগেও আকাশের দিকে চেয়ে ভরসা পায়নি। আকাশ জুড়ে ঘন-কালো মেঘ-পাহাড়গুলো যেন সব প্রাগৈতি-হাসিক জীবের মত ঘাপটি মেরে বসে ছিল। ভয়ে জানালা বন্ধ করে দিয়েছিল বিনতা। আজ তাই আলোর সৌভাগ্যকে যেন বিশ্বাস করতে চাইল না। উপুড় হয়ে দু-হাতের কনুইতে ভর দিয়ে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ছিটকিনিটা খুব জোরে নীচের দিকে নামিয়ে দিয়ে দুটো পাল্লাই সজোরে দুপাশে ঠেলে দিল। খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে ঝলমলে রোদ্দুর ঢেউ-এর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল বিনতার দু-চোখের পাতায়। এত ঝাঁঝাল রোদ্দুরে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। বিনতার চোখ দুটো আপনা হতেই বন্ধ হয়ে এসেছিল। বিনতা ডান হাতের তালু দিয়ে চোখ দুটো আড়াল করল। তারপর আবার চোখ খুলতেই দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে এলো। চোখের ওপরে ভেসে উঠল এক টুকরো বৃষ্টিধোয়া স্বচ্ছ নীল আকাশ। ঠিক যেন ময়ূরের গলার মত ঘন নীল আকাশের রঙ। কি সুন্দর উজ্জ্বল রোদ্দুরের সকাল। অথচ কাল রাতেও বিনতা ভাবতেই পারেনি সকালে ঘুম ভাঙতেই এমন এক নিমেঘ নীল আকাশের ছবি ফুটে উঠবে চোখের ওপরে। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ ধুয়ে-মুছে তপ্ত রোদ্দুরের রঙ ফুটে উঠেছে। ঘন-নীল আকাশের এধারে-ওধারে কয়েক চিলতে পাতলা তুলোটে রঙের মেঘ ভাসছে। চিল-গুলো এর মধ্যেই আকাশের অনেক ওপরে উঠে গিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। নীল আকাশের গায়ে ঘূর্ণায়মান চিলগুলোকে দেখে মনে হল যেন স্বপ্নের মানুষটার নীলাভ মুখে ছোট ছোট কালো তিলের বিন্দু ফুটে উঠেছে। রোদ্দুরের ঝাঁঝ দেখে মনে হয় বেলা অনেক বেড়েছে। কিন্তু নাঃ, ঘড়ির কাঁটা এখনও সাড়ে ছটার ওধারে যায়নি। সবে সানাই-এর সুর থেমেছে। বিনতা আশ্বস্ত হল। হাতে এখনও অনেক সময়। আজ অনেক আগেই ঘুম ভেঙেছে বিনতার।

রোজই আটটা চল্লিশের শাটল্ বাস ধরে বিনতা। আটটা না বাজতেই মেয়েদের লাইনটাও বেশ লম্বা হয়ে যায়। তবে দেরী হলেও ভয় থাকে না বিনতার। ওরা দশটা মেয়ের একটা পুরো দল এক ঝাঁক পাখীর মত কলকাকলী তুলে যেন পাখা মেলে দেয়

বাসের মধ্যে। বিনতা জানে বন্ধুরা কৌশলে ওর জন্যে একটা সীটের ব্যবস্থা রাখবেই। রোজই দেরী হয় বিনতার। কিছুদিন ধরেই রাতে ভাল ঘুম হয় না ওর। আজ ভোরের স্বপ্নে যে মানুষটা বিনতার বুকের মধ্যে এক ভীরু প্রত্যাশার জন্ম দিয়ে মিলিয়ে গেল সেই অবুঝ দুরন্ত একটা পুরুষ—সুনন্দ রায় যার নাম বিনতার বুকের ওপরে নিঃসঙ্গতার ভারী পাথরটা চাপিয়ে দিয়ে বিলাতে পাড়ি দিয়েছে পাঁচ বছর আগে। আর এই পাঁচটা বছর বিনতা শুধুই ক্লান্ত পায়ে হেঁটে হেঁটে নিঃসঙ্গ দিনগুলোর পথ-পরিক্রমার যন্ত্রণায় আরও ক্লান্ত, আরও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। দুহাত দিয়ে সময়ের ঢেউগুলোকে ঠেলে ঠেলে এই নিঃসঙ্গ প্রতীক্ষার পারাবারের তীরে পেীছাতে চেয়েছে বিনতা।

সেই মহালগ্নের প্রতীক্ষায় বিনিদ্র রাতগুলো ক্লান্ত আর অবসন্নতায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। মাসখানেক আগে সুনন্দর চিঠিতে ওর দেশে ফেরার খবর পেয়ে সেই আবার অস্থির প্রতীক্ষার ভার যেন আরও অসহ্য হয়ে উঠেছে। দিন পনের আগে আবার চিঠি দিয়েছে সুনন্দ। প্লেনে সোজা বোম্বাইতে নামবে। সেখানে চাকরী-বাকরীর ব্যাপারে কি সব কথা-বার্তা বলে কলকাতার ট্রেন ধরবে। সুনন্দর চিঠি পাওয়ার পর থেকেই বিনতার চোখ থেকে ঘুম চলে গিয়েছে বললেই হয়। বিনিদ্র রাতগুলোতে সুনন্দকে ঘিরে নানা দুর্ভাবনা আর উদ্বেগ যেন দৈত্যের মত চেপে বসে বুকের ওপরে। কয়েকদিন আগে কাগজে একটা প্লেন অ্যাকসিডেণ্টের খবর দেখে অফিসের মধ্যেই বিনতার মাথা ঘুরে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি বাথরুমের মধ্যে ঢুকে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল।

পরশুদিন খবরটা টেলিগ্রামে পেয়েছে বিনতা। আজ বিকেলেই হাওড়ায় পেীছাচ্ছে সুনন্দ। চারটে বাইশের বোম্বে মেল ইন করবে হাওড়া স্টেশনে। এই নির্মল উজ্জ্বল সকালে নির্মেঘ বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশের দিকে চেয়ে বিনতার মনটা পাখীর পালকের মত হাল্কা হয়ে গেল। আঃ কি আনন্দ। মুক্তি। মুক্তি। নিঃসঙ্গ প্রতীক্ষার ভারী পাথরটা বুক থেকে নেমে গিয়েছে। আজ আর অফিসে কোন কাজ নয়। আজ বিনতার যা কিছু কাজ—যা কিছু ব্যস্ততা সব সুনন্দকে ঘিরে। বাইরে রোদের তেজ বাড়ছে। রোদ্দুরে চাঁপা ফুলের রঙ ক্রমশই তামাটে হয়ে উঠছে। হাতে এখনও অনেক সময়। এখনও খবরই শুরু হয়নি রেডিওতে। আরও একটু শুয়ে থেকে সকালের মধুর আলস্যটুকু ভোগ করতে চাইল বিনতা।

আজ তো অন্যদিনের মত তড়ি-ঘড়ি করে অফিসে ছুটতে চলবে না। নিজেকে সুনন্দর মনের মত করে সাজাবে বিনতা। স্নান-প্রসাধনে অনেক সময় যাবে। অন্যদিন-গুলোর মত কালও অনেক রাতে ঘুম এসেছিল বিনতার চোখে। অথচ আজ কত সকালে ঘুম ভেঙে গিয়েছে। অন্য দিন-গুলোতে এখনও ঘুমিয়েই থাকে বিনতা।

বেশ বেলা করে ঘুম থেকে জেগে দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাথরুমে ঢোকার আগেই বাংলা খবর শুরু হয়ে যায় রেডিওতে। চুল না ভিজিয়ে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে খুব দ্রুত হাতে মুখে ক্রিম ঘষে হাল্কা পাউডার বুলিয়ে যখন ও শাড়ির প্লিটগুলোকে পাটে পাটে সাজাতে থাকে—আটটার ভোঁ বাজতে শুরু করে কাছেই কোন একটা মিলে। ব্যাক্-বাটন্ ব্লাউজের বোতাম লাগানোর দারুন ঝামেলা। হাত দুটোকে পিঠের দিকে যথেষ্ট টেনে এনেও মাঝ বরাবর নাগাল পাওয়া যায় না। রান্নাঘরে মায়ের কাছে ছুটে যায় বিনতা। মায়ের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে পড়ে অস্থির গলায় বলে—উঃ মা, বড্ড দেরী হয়ে গেল। শিগ্গির বোতামগুলো লাগিয়ে দাও। আজ বোধহয় বাসটাই ধরতে পারব না।

মা তাড়াতাড়ি হলুদ-মাখা হাত দুটো নিজের কাপড়ে মুছে খুব সন্তর্পণে আলগা-হাতে পিঠ-বোতামের হুকগুলো আটকে দিতে দিতে ব্যাজার-মুখে বলেন—আজকাল কি যে সব ছাই-পাঁশ ফ্যাশান উঠেছে তোদের। ব্লাউজের বোতাম যে পিঠের দিকে হয়—বাবার কালেও কখনও শুনিনি।

মায়ের কথা শুনে নিজের মনেই হাসে বিনতা। সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দর কথা মনে পড়ে যায়। সুনন্দই তো ব্যাক-বাটন ব্লাউজ পরার জন্য জিদ্ ধরেছিল। বিয়ের পরে বিনতার ব্লাউজের বোতাম লাগানো নাকি সুনন্দর নিত্যদিনের কাজ হবে। কি যে সব অদ্ভুত সখ লোকটার। কিন্তু সুনন্দর কথা ভাবারও সময় থাকে না বিনতার। আটটা্ বাসটা ধরতে না পারলে অফিস যাওয়াই বরবাদ। ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাতগুলোকে থালার ওপরে ছিটিয়ে ছিটিয়ে যা পারে নাকে-মুখে গুঁজে বিনতা বাস স্টপের দিকে ছোটে। বাসের সিঁড়ির মুখটা ততক্ষণে এয়ারটাইট কৌটার মত সীল করে দিয়েছে অফিসযাত্রী মানুষ-গুলো। বিনতা কোনরকমে ঠেলেঠুলে শরীরটাকে সিঁধিয়ে দেয় বাসের মধ্যে। তারপর নিজেকে ভিড়ের মানুষগুলোর হাতেই ছেড়ে দেয়। ওরা বিনতার দেহটাকে রবারের বলের মত লোফালুফি করতে করতে এক সময় ছুঁড়ে দেয় বন্ধুদের মাঝে। বিনতা নিজের সীটে বসে ঘামে-ভেজা গাল-গলা-কপালে জোরে জোরে রুমাল ঘষতে থাকে।

অথচ আজ সকালে ছটা বাজতেই বিনতার ঘুম ভেঙে গেছে। কাল রাতেও ঘুম আসতে দেরী হয়েছিল। পুলিশ ফাঁড়িতে রাত দুটোর পেটা-ঘণ্টার শব্দ শুনেছে বিনতা। তারপর শেষ রাতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। কঘণ্টাই বা ঘুমিয়েছে। অথচ শরীরে এতটুকুও ক্লান্তি কিংবা অবসন্নতার ভাব নেই।

শরীর ঝরঝরে হাল্কা। পাখীর মত উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে নির্মেঘ নীল আকাশে। সুনন্দর ফিরে আসার দিনটা যে এমন উজ্জ্বল হবে, এমন ঝলমলে রোদ্দুরের সকাল হবে, নির্মেঘ নীল আকাশের ছবি হয়ে দেখা দেবে বিনতা কি কাল রাতেও ভাবতে পেরেছিল।

সুনন্দ লিখেছে—বিনতা নাকি ওকে হাওড়া স্টেশনে দেখে চিনতেই পারবে না। লোকটা চিরদিনই এমন সব বোকা বোকা কথা বলে। বিলাত যাওয়ার আগে আরও পাঁচটা বছরের ইতিহাস কি ভুলে গেল সুনন্দ রায়? কত আশ্চর্য ছুটির দুপুরের রৌদ্র-ছায়ার মায়ায় দূর-গ্রামের পথে পথে, বনে-প্রান্তরে হাত-ধরাধরি করে হেঁটেছে বিনতা আর সুনন্দ। বিকালের ছায়া ঘন হয়ে এসেছে ঝুরি-নামা বটগাছের নীচে। বিনতার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছে সুনন্দ। বিনতা সুনন্দর চুলে বিলি কাটতে কাটতে গুন গুন করে গান ধরেছে। এক সময় বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। পূর্ণিমার চাঁদ রূপোলী জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে পথে-প্রান্তরে, গাছ-গাছালির মাথায় মাথায়। সেই রূপোলী আলোর পথ চিনে চিনে ওরা বাড়ীর পথে হাঁটা দিয়েছে। সেই ঘুঘু-ডাকা রোদ্দুরের দুপুর, নদীর জলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শিরশির করে কাঁপা ছায়াছন্ন বিকাল, আর রূপোলী জ্যোৎস্নার আলো-ঝরা নরম মোমের হাতের ফ্রেমে সুনন্দর ছবিটাকে বাঁধিয়ে বুকের মধ্যে ধরে রেখেছে বিনতা। বিনতা কি ভুলতে পারে সেই মানুষটার চেহারা। কাল রাতেও তো সুনন্দর সেই সযত্ন-সঞ্চিত ছবিটা বুকের মধ্যে থেকে বার করে নিয়ে এসে বার বার চোখের সামনে মেলে ধরেছে। আর মাঝে মাঝেই থমথমে আকাশে জলভরা কালো মেঘের পুঞ্জের দিকে চেয়ে ওর বুকের মধ্যে ভয় ধরেছে। সকাল থেকেই যদি আবার ঝমঝম বৃষ্টি শুরু হয়। ওকে যে হাওড়া স্টেশনেই পেীছাতেই হবে। যদি তুমুল বৃষ্টিতে পথ-ঘাট ভেসে যায়। যদি ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি কিছুই না মেলে। শেষ পর্যন্ত বালিশটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল বিনতা।

কদিন ধরেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ছিল। বৃষ্টি কখনওই খুব জোরে পড়েনি।

কিন্তু ঘোলাটে আকাশে টিপটিপ গ‌ুঁড়িগ‌ুঁড়ি বৃষ্টির বিরাম ছিল না। সারাদিন ধরে মেঘের পাহাড়গুলোতে গুরু গুরু ডাক উঠেছে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকিয়েছে। কিন্তু মেঘের পাহাড়গুলো কখনওই ফুলে-ফেঁপে ভেঙে-পড়ে পথ-ঘাট ভাসিয়ে দেয়নি অবিশ্রাম বর্ষণে। স্যাঁৎসেতে দিনগুলোতে পচা ভ্যাপসা গরমে বুকের মধ্যে হাঁপ ধরেছে। বিনতা বিষন্ন চোখে আকাশের দিকে চেয়েছে আর ভেবেছে বৃষ্টি কি আর থামবেই না। কাল যখন বিনতা অফিসে বার হয়েছিল বৃষ্টি একেবারেই থেমে গিয়েছিল। কিন্তু আকাশে মেঘ ছিল। তবুও বিনতার মনে একটা ক্ষীণ প্রত্যাশা জেগেছিল হয়তো বা বৃষ্টির দিনগুলোর শেষই হল। বেলা বাড়লে মেঘ কেটে গিয়ে হয়তো রোদ উঠবে। অফিসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিনতা বার বার আকাশের দিকে চোখ তুলেছে। কিন্তু বেলা যতই বেড়েছে আরও ঘন হয়ে থরে থরে জল-ভরা কালো মেঘের পুঞ্জগুলো পাহাড়ের মত মাথা তুলে উঠেছে আকাশ জুড়ে। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ফাইলে মুখ গুঁজেছে বিনতা।

বিকালে অফিস থেকে বার হয়েই বিনতা দেখল—আবার গ‌ুঁড়ি গ‌ুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কিন্তু বাসের বাইরে মুখ বাড়িয়ে ভয়ে বিনতার বুকে কাঁপন ধরল। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো যেন ওর বুকের মধ্যেই আছড়ে পড়ে হাহাকার করে উঠেছিল।

বড় রাস্তার ওপরে বাস থেকে নেমে মিনিট পাঁচেক হেঁটে একটা গলির মুখে ঢুকেই কয়েকটা বাড়ি ছাড়িয়ে বিনতাদের উঠান-দেওয়া সাবেকী বাড়ী। বিনতা বাস-স্টপে নেমে খুব জোর-পায়ে হেঁটে এই দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে চেয়েছিল।

হঠাৎ আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। বিনতা বড় রাস্তার ওপরেই একটা জাহাজ-প্যাটার্নের বাড়ীর গাড়ি-বারান্দার নীচে আশ্রয় নিল। রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। শুধু কয়েকটা বাচ্চা ছেলে বৃষ্টি-ধোয়া ঝকঝকে পীচের রাস্তার ওপরে মাতামাতি করছিল। মাঝে মাঝে দু-একটা ট্যাক্সি কিংবা লরী দু পাশে জল ছিটিয়ে খুব জোরে ছুটে যাচ্ছিল। হঠাৎ বিনতার চোখে এক আশ্চর্য দৃশ্য ধরা পড়ল। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো পীচ-বাঁধানো রাস্তার ওপরে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোট ছোট কাঁচ-রঙা পাখীর মত ঝাঁকে ঝাঁকে পাখা মেলে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। এক অদ্ভুত বাসনা জেগেছিল বিনতার মনে। যদি ও কাঁচ-রঙা পাখীগুলোর মতই সুনন্দর কাছে উড়ে পালিয়ে যেতে পারত! আপন মনেই হেসে উঠেছিল বিনতা। কি অসম্ভব কল্পনা। আর ধৈর্য রাখতে পারেনি বিনতা। তুমুল বৃষ্টি মাথায় করে বাড়ীর পথে হাঁটা দিয়েছিল।

রেডিওতে আবহাওয়ার ঘোষণা শেষ হল। এখনই বাংলা খবর শুরু হবে। বিনতা ধড়মড় করে উঠে বসল। ছোট্ট একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর খাট থেকে নেমে পড়ল। আজ বাথরুমে অনেক সময় যাবে। মাথায় শ্যাম্পু করে ভিজে চুল শুকিয়ে কান ঢেকে খোঁপা বাঁধবে বিনতা। আজ আর অন্যদিনের মত সাধারণ সাবান ঘষবে না গায়ে। একটা দামী সাবান আগেই কিনে রেখেছে বিনতা। বিনতার মনে পড়ল ওর শরীরের সৌগন্ধ নিয়ে কি পাগলামীটাই না করত সুনন্দ। আজ সারা দেহে সাবানের সৌগন্ধ ছড়িয়ে সুনন্দর সামনে দাঁড়াবে বিনতা। জাফরান রঙের শিল্কের শাড়ি আর ম্যাচকরা হালকা রঙের শ্লিভলেস ব্লাউজটা ও আগেই আলাদা করে রেখেছে। কপালে ঐ একই রঙের একটা বড়সড় কুমকুমের টিপ দেবে। সুনন্দ সোনার গহনা মোটেই পছন্দ করে না। জন্মদিনে সুনন্দর উপহার দেওয়া মুক্তোর মালাটা, দু কানে মুক্তোর ফুল, অনামিকায় মুক্তো-বসানো আংটি—এই হালকা সাজেই সুনন্দর চোখে অনবদ্য হয়ে উঠবে বিনতা।

সেল্ফ থেকে সাবানটা হাতে তুলে নিয়ে নাকের সামনে ধরে খুব জোরে নিঃশ্বাস টানল বিনতা। বাথরুমে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়েই ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অনেকদিন পরে যেন নিজেকে স্পষ্ট চোখে দেখল বিনতা। আয়নার ওপরে এক স্তিমিত যৌবনের ছবি ফুটে উঠেছে। অনাবশ্যক মেদের ভারে কিছুটা শিথিল এবং অবনত সেই নারীদেহের স্তিমিত যৌবনের ছবিটা যে তার নিজেরই—বিনতা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইল না। খুব সতর্ক-চোখে নিজের শরীরটাকে মেপে-জুপে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল। খুব জোরে শাড়ির আঁচলটা কোমরের সঙ্গে পেঁচিয়ে ধরল। পেঁচানো শাড়ির আঁচলের ওপর দিয়ে ঈষৎ মেদস্ফীত পেটটা স্পষ্টই চোখে ধরা পড়ল। বিনতার মনটা খারাপ হয়ে গেল। সারা দেহে মেদের ভার নেমেছে। পাঁচ বছর আগেকার সেই ছিপছিপে মাপা শরীরের দৃঢ় বাঁধন বেশ কিছুটা শিথিল হয়ে এসেছে। ব্লাউজের হাতা-দুটো আর কামড়ে ধরে না পরিমিত মেদ আর মাংসে দৃঢ় সুডৌল দুটি হাতের বন্ধন। এই পাঁচ বছরে বিনতার সারা দেহে বয়সের ঢল নেমেছে। আয়নার খুব কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে এলো বিনতা। ভারী গাল-দুটো চিবুকের সঙ্গে মিশে বেশ কয়েকটা মেদের ভাঁজ সৃষ্টি করেছে। মুখের সেই পান-পাতার ছাঁদটা হারিয়ে গিয়েছে। চোখের নীচে কোঁচকানো চামড়া আর সূক্ষ্ম কালির রেখা বিনিদ্র রাতগুলোর ভারাক্রান্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে দিচ্ছে। চোখের তারা দুটো আর আগের মত উজ্জ্বল মনে হয় না। ধূসর চোখের তারায় নিষ্প্রভতার ছায়া নেমেছে। কত বয়স হল ওর? ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই অঘ্রাণে ও তিরিশ পেরিয়ে যাবে। আয়নার ওপরে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে আশ্বস্ত হল বিনতা। নাঃ এখনও ও বুড়িয়ে যায়নি। বয়সের ছাপ তো শরীরে পড়বেই। সুনন্দই কি আর আগের মত ওর সামনে দাঁড়িয়ে ঝকঝকে চোখের দৃষ্টি তুলে চাইতে পারবে?

বিনতা আর দাঁড়াল না। বাথরুমের দিকে পা বাড়াল।

বাড়ী থেকে বেরোতে বেশ দেরী হয়ে গেল বিনতার। ভিজে চুল শুকিয়ে খোঁপা বাঁধতেই অনেক সময় লাগল। প্রসাধনের সূক্ষ্ম কারুকার্যগুলো শেষ করতে আটটার ভোঁ বেজে গেল। অতএব বিনতা যা আশংকা করেছিল—তাই হল। আটটা চল্লিশের শাটল বাসটা আর ধরতে পারল না। বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে বিনতা ভেবে পাচ্ছিল না—কি করবে। ক'দিন অবিরাম বৃষ্টিপাতের শেষে আজ নটা না বাজতেই চড়া রোদ্দুরে ঘাম ঝরতে শুরু করেছে। ব্লাউজের নীচে বুকে-পিঠে ঘামের রেখা-গুলো কুলকুল করে নামছে। কপালে-গালে-গলায় বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। বিনতা হাত-ব্যাগ থেকে রুমালটা বার করে খুব আলগা হাতে মুখ মুছল। সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দর কথা মনে পড়ল। রুমালটা বার করে একবার মুখ মুছলেই হল। ছোঁ মেরে রুমালটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নাকের সামনে ধরে খুব জোরে নিঃশ্বাস টেনে সুনন্দ আদুরে গলায় বলত—বিনু, তোমার রুমালে এমন একটা ভালবাসা ভালবাসা গন্ধ আছে নাকের সামনে ধরলে বুকটা কেমন যেন উথাল-পাথাল করতে থাকে।

তারপর গালটা বিনতার মুখের সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলত—লক্ষ্মী মেয়ে, একটু ভালবাসা দাও।

রাস্তার ওপরে লোকজনের মাঝে অসভ্য লোকটার কথা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে উঠত বিনতা।

একটা বাস স্টপে এসে দাঁড়াল। ভীড় দেখে আঁৎকে উঠল বিনতা। বাসটা যেন মানুষের শরীর দিয়ে তৈরী। এই ভীড়ের বাসে ওঠার কথা ভাবাই যায় না। ঘেমে-নেয়ে একশেষ হতে হবে। এত সাধের প্রসাধন সব ধুয়ে-মুছে মুখটাকে আরও বুড়োটে করে তুলবে।

হঠাৎ একটা খালি ট্যাক্সি দেখে বিনতার একটা হাত ওপরে উঠে গেল। ট্যাক্সিতে উঠে বসে মুখটা জানলার বাইরে বাড়িয়ে দিল। খুব জোরে ট্যাক্সি ছুটছে। রাস্তায় এখনও জল-কাদা জমে আছে। চলন্ত ট্যাক্সির চাকার জল-কাদা ছিটকে দুপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। পথচারী মানুষগুলো জামা-কাপড় সামলাতে গিয়ে ক্রুদ্ধ চোখের এমন ভঙ্গী করছে যেন ট্যাক্সিটাকে গিলে খাবে।

ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল বিনতা। একটা কড়কড়ে নোতুন দশ-টাকার নোট উঠে এলো বিনতার হাতে।

কতদিন পরে ট্যাক্সিতে উঠেছে বিনতা। পাঁচ-বছর আগে সুনন্দ সেই যে বিলাত চলে গিয়েছে—তারপর বিনতা জীবন থেকে সব আনন্দকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণা বয়ে বেড়িয়েছে। সিনেমা থিয়েটার, বন্ধু-বান্ধব, সব কিছু জীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে গিয়েছে। অথচ সুনন্দর সঙ্গে ওর দিনগুলো কি বিপুল আনন্দ আর উচ্ছলতার বৈচিত্র্যে ভরে উঠেছিল। বিনতা যেন এক মুক্তপক্ষ পাখীর মত সুনন্দর ভালবাসার অসীম আকাশে পাখা মেলে দিয়েছিল। এমন অদ্ভুত মানুষ বিনতা কোনদিন দেখেনি। কখনও এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকতে চাইত না সুনন্দ। বলত—জানো বিনু, আমার কোথাও থেমে যেতে ইচ্ছে করে না। শুধুই ছুটে যেতে ইচ্ছা করে দুরন্ত দুর্গম গতিতে। আমার সঙ্গে ছুটতে ছুটতে হয়তো একদিন তুমি হাঁপিয়ে পড়বে।

বিনতা সত্যিই মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে যেত। অফিস থেকে বেড়াতে সুনন্দর পাশা-পাশি হাঁটতে হাঁটতে একসময় পায়ের গোড়ালী দুটো টন্-টন্ করত। বুকের মধ্যে হাঁপ ধরত। কখনও ময়দানের কাঁচা নরম ঘাসের ওপরে পা ফেলে ফেলে, কখনও বা রেড-রোড কিংবা গঙ্গার ধার ধরে জোরে পায়ে হাঁটত সুনন্দ। ওর নাগাল ধরতে গিয়ে বিনতা হাঁপিয়ে যেত। বলত—সুনু, আমি আর হাঁটতে পারছি না। একটু বসবে?

সুনন্দর বড় পায়ের গতিও হয়তো তখন মন্থর হয়ে এসেছে। হঠাৎ একটা চলন্ত খালি ট্যাক্সিকে থামিয়ে বিনতার হাত ধরে টেনে নিত। রেড-রোড ধরে, গঙ্গার ধার দিয়ে ট্যাক্সি ছুটত উদ্দাম গতিতে। চারিদিকে দূরে দূরে ফাঁকায় ছুটেই চলত। মিটারের অংকটা বাড়তে বাড়তে একটা ভয়ংকর সংখ্যায় এসে দাঁড়াত। বিনতা প্রায় কেঁদে উঠত—এই, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? রোজ রোজ এই গাড়ি খরচ করতে গায়ে বাধে না?

সুনন্দর ওর কাছে ঘন হয়ে এসে ওর ঘাড়ে মুখটা গুঁজে দিয়ে বলত—ওঃ বাবা! বৌ না হতেই এত শাসন! নাঃ, তোমাকে বৌ করা চলবে না দেখছি।

বিনতা ঠোঁট উল্টিয়ে বলত—বয়েই গ্যাছে তোমার বৌ হতে।

সুনন্দ হা-হা করে হেসে উঠত। ড্রাইভারটা হঠাৎ চমকে উঠে পিছন ফিরে চেয়েই জোর পায়ে এক্সিলেটারটা চেপে ধরত। ধরত।

সুনন্দ ফিস্-ফিস্ করে বলত—বিনু, আমরা তো এখনও ঘর বাঁধিনি। এই ট্যাক্সিই এখন আমাদের ঘর—বাড়ী। মানুষের চোখের আড়ালে তোমাকে কাছে পাওয়ার জন্যেই আমি এই নির্জন ট্যাক্সির দ্বীপে আশ্রয় নিই। আগে তোমাকে ঘরে তুলি—আর ট্যাক্সিতে চড়ে বাজে পয়সা নষ্ট করব না। ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে হেঁটে বেড়াব ময়দানের নরম ঘাসে। গঙ্গার ধারে ধারে ঠান্ডা ঝিরঝিরে বাতাসের দোলায়।

ছুটির দিনগুলোতেও কি শান্তি ছিল। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে সুনন্দকে জোর করে দুপুরের শো-তে সিনেমায় ধরে নিয়ে যেত বিনতা। কারণ বিনতা জানত—সন্ধ্যেবেলা কিছুতেই সিনেমা হলে বসিয়ে রাখা যাবে না সুনন্দকে। কিন্তু সিনেমা হলে বসে ছটফট করত সুনন্দ। অন্ধকারেই বিনতার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস্-ফিস করে বলত—বিনু, চল হল থেকে বেরিয়ে পড়ি। আমার বসে থাকতে একটুও ভাল লাগছে না।

শেষ পর্যন্ত অন্ধকারেই সুনন্দর পিছু পিছু হল থেকে বার হয়ে পড়ত বিনতা। কোন একটা দূরের বাসে উঠে বসত ওরা। দুটো কিংবা তিনটে বাস বদল করে কোন একটা নাম-না-জানা দূরের গ্রামে পৌঁছাত। সারাটা দুপুর আর বিকেল মাঠে মাঠে, বনে বনে ঘুরে বেড়াত। পাকা ফসল আর বুনো ফুলের গন্ধে যেন মাতাল হয়ে উঠত সুনন্দ। বাচ্চা ছেলের মত ছুটে ছুটে প্রজাপতি ধরত। প্রজাপতির পাখার রং লাগত ওর হাতে। সেই রঙমাখা হাত বুলিয়ে দিত বিনতার মুখে, গালে। হাতের মধ্যে প্রজাপতির পাখা দুটো ফরফর করে কাঁপত। প্রজাপতিটাকে উড়িয়ে দিয়ে সুনন্দ বলত—বনের প্রজাপতি বনে যা। তোর সব রঙ আমি চুরি করে নিয়েছি। তারপর কাঁচপোকা ধরে বিনতার কপালে কাঁচপোকার টিপ পরিয়ে দিত।

সেই সব অসংখ্য নাম-না-জানা গ্রাম, আর ছায়াঢাকা বন-প্রান্তরের স্বপ্ন বুকের মধ্যে সযত্নে ধরে রেখেছে বিনতা। আর এই পাঁচ বছরে বিনতার সেই স্বপ্নের রঙ এতটুকুও বিবর্ণ হয়ে যায়নি। মাঝে মাঝে যখন ক্লান্তি আর নিঃসঙ্গতা অসহ্য হয়ে উঠেছে—ছুটির দিনে ধারে কাছে কোন একটা গ্রামে গিয়ে একা একাই মাঠে মাঠে, বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছে। ছুটে ছুটে শুধু হয়রানই হয়েছে। একটা প্রজাপতিও ধরতে পারেনি। একটা কাঁচপোকাও চোখে পড়েনি। সুনন্দর সঙ্গে ওরাও যেন কোথায় হারিয়ে গেছে।

বিনতা খুব জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। ট্যাক্সিটা রেড-রোডের ওপর দিয়ে ছুটেছে। ঠান্ডা ফুরফুরে হাওয়া পাখীর ঝাঁকের মত ওর গায়ের ওপরে লুটোপুটি খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। চোখদুটো বুজিয়ে পিছনের গদীতে হেলান দিয়ে গা এলিয়ে দিল বিনতা।

অফিসে যেতেই সবাই হৈ-হৈ করে উঠল। নমিতা, অঞ্জলি, আরতি—সবাই ওকে ঘিরে ধরল। 'কি রে, আজ যে একেবারে বধূবেশ ব্যাপার কি?' 'ওঃ তোকে আজ যা সুন্দর লাগছে না—একেবারে পারফেক্ট ম্যাচ!' 'শেষ পর্যন্ত কার প্রেম মঞ্জুর, সেই ফরচুনেট ভদ্রলোক কে-রে' ইত্যাদি বন্ধুদের এলোমেলো প্রশ্নের উত্তরে নীরবে মিটিমিটি হাসল বিনতা।

হঠাৎ সামনের দিকে দৃষ্টি পড়ল বিনতার। সুদীপ্ত সেন আজও ওর দিকে বিষন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বিনতার চোখের ওপরে চোখ পড়তেই দৃষ্টি নামিয়ে নিল। বিনতা ভুরু কোঁচকাতে গিয়েও থেমে গেল।

আজ কেমন যেন ...
জন্যে। আজ ও কারও সঙ্গে ঝগড়া করবে না। কাউকে ব্যথা দেবে না। আজ সবাইকে ক্ষমা করবে বিনতা। সবাইকে ভালবাসবে।

আড়চোখে সুদীপ্ত সেনের দিকে চাইল বিনতা। সুদীপ্ত সেনের দু-চোখে কি গভীর বেদনার ছায়া। কিন্তু কি করবে বিনতা? মানুষটা যদি নিজের দোষেই কষ্ট পায়—তবে বিনতার কি করার আছে? কিন্তু লোকটার জন্যে আজ এত মায়া হচ্ছে কেন? কে জানে—আজ হয়তো ও সবাইকে সুখী দেখতে চাইছে।

ঘড়ির দিকে চাইল বিনতা। মাত্র সাড়ে দশটা বেজেছে। ওঃ, এখনও পাঁচ ঘন্টা অফিসে বসে থাকতে হবে।

কিন্তু আজ কোন কাজই করতে ভাল লাগছে না। ফাইলগুলোকে হাত দিয়ে ছুঁতেও ইচ্ছে করছে না। পাঁচ বছরে আজ এই প্রথম কাজে ফাঁকি দেবে বিনতা। পাশের টেবিলে আরতি একমনে একটা চাউস উপন্যাস পড়ছে। আরতিটা এক নম্বরের ফাঁকিবাজ। নতুন বিয়ে হয়েছে ওর। রোজ অফিসে এসেই বরকে বসিয়ে বসিয়ে ফোন করে। এ-টেবিলে ও-টেবিলে বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। প্রায়ই দুপুরের দিকে অফিস থেকে পালায়। বিনতার ইচ্ছা হল—আজ ও আরতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজে ফাঁকী দেবে। আরতির টেবিলে এগিয়ে গেল বিনতা। আরতি বই থেকে চোখ তুলে বলল—কি-রে, আজ যে বড় হাত গুটিয়ে বসে আছিস? ব্যাপার কি? এমন সাজের ঘটা, ঘন-ঘন ঘড়ির দিকে চাওয়া, অফিসে এসেই এমন উড়ু উড়ু ভাব—ব্যাপারটা কেমন যেন কিন্তু কিন্তু মনে হচ্ছে।

আরতি চোখ টিপে হাসল।

বিনতা কপট ক্রোধের ভান করে বলল—যাঃ ফাজলামি করিসনে।

একটা বই-টই থাকে তো দে। আজ আর একঘেয়ে ফাইলে মুখ গুঁজে নয়া পয়সার হিসেব করতে ভাল লাগছে না।

আরতি মুচকি হেসে ড্রয়ার থেকে একটা ঝকঝকে মলাটের বই বার করে বিনতার হাতে দিল।

বিনতা নিজের টেবিলে ফিরে এসে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বইটা খুলেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সারা বইটা জুড়ে কি সব বিশ্রী ছবি, আর আজে-বাজে গল্প। বইটা বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ একটা

প্রবন্ধের হেড-লাইনের ওপরে দৃষ্টি পড়ল —দাম্পত্য জীবনের সুখের উপায়। বিনতার চোখ-দুটো আট্‌কে গেল। দারুণ উত্তেজনায় পড়তে লাগল প্রবন্ধটা। চোখের ওপরে এক সুখী দম্পতির ছবি ভেসে উঠল। সুনন্দ আর বিনতা নামে সেই সুখী দম্পতির জন্যে কত সুখের উপকরণ ছড়িয়ে আছে সংসারে। তন্ময় হয়ে পাতার পর পাতা ওল্টাচ্ছিল বিনতা।

হঠাৎ চমকে উঠল—দিদিমণি, আপনার চিঠি।

সেই অতি পরিচিত টানা-টানা অক্ষরে বিনতার নাম লেখা খামের ওপরে। বিনতা মনে মনে হাসল—সুনন্দটা আজও ছেলে-মানুষ রয়ে গেল। এর আগে তিনটে চিঠিতেই সেই একই কথা লিখেছে—বিনু, আমি আসছি। হাওড়া ষ্টেশনে তোমার দেখা পাব তো?

বিনতাও ওকে চিঠি দিয়ে বার বার সেই একই কথা লিখেছে—সু, আমি হাওড়া ষ্টেশনে ঠিক সময় তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকব। ট্রেন থেকে নেমেই তুমি তোমার বিনুকে দেখতে পাবে।

তবুও লোকটার ভয় যায় না। সারাটা জীবনই আগলে রাখতে হবে ওই অবুঝ লোকটাকে। কখন যে কি করে বসে —মোটেই বিশ্বাস নেই ওকে।

খামটা হাতে নিয়ে মগ্ন হয়ে বসে রইল। নঃ এবার আর হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। একেবারে বেঁধে ফেলতে হবে সুনন্দকে। সুনন্দ নাকি খুব মোটা মাইনের বড়-সড় চাকরী নিয়ে দেশে ফিরছে। বিয়ের পরেই চাকরী ছেড়ে দেবে বিনতা। সুনন্দকে ও খুব ভাল করেই জানে। বিয়েটা ওর কাছে একটা স্বপ্ন—আর সেই স্বপ্ন শুধু বিনতাকে ঘিরেই নয়। বিয়ের তিন বছরের মধ্যেই একটা ছেলে আর মেয়ে ওর চাইই চাই। অনেক-দিন আগেই সেই দৃঢ় প্রত্যাশা জানিয়ে রেখেছে বিনতাকে। বিয়ের পরে সুনন্দ নিশ্চয়ই জিদ্‌ ধরবে—চাকরী ছেড়ে দাও। ছেলে-মেয়েদের মানুষ করার জন্যে প্রস্তুত হও। বিনতা কিন্তু সুনন্দকে অবাক করে দিয়ে আগেই চাকরী ছেড়ে দেবে।

সুনন্দ আর দুটো ফুটফুটে কচি বাচ্চাকে নিয়ে একটা ভরা সংসারের মুগ্ধ কল্পনায় বিনতার বুকের মধ্যে ছলাৎ করে উঠল এক আশ্চর্য অনাস্বাদিত সুখ।

সুদৃশ্য এয়ার-লেটারের মুখটা জোর-হাতের টানে ছিঁড়ে ফেলতে গিয়েও থেমে গেল বিনতা। বেশ কিছুটা সময় নিয়ে খুব সন্তর্পণে খামের আঠা-লাগানো মুখটা খুলে ফেলল। তারপর ভিতরের ভাঁজ করা চিঠির কাগজটা বার করে চোখের সামনে মেলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঘুরে উঠল। চোখের ওপরে টানা-হাতের লেখা কালো অক্ষরগুলো যেন নড়ে-চড়ে বেড়াতে লাগল।

বিনু, আমাকে ক্ষমা কর। অনেক চেষ্টা করেও লজ্জায় সত্যি কথাটা লিখতে পারি নি। মেম-বৌ নিয়ে দেশে ফিরছি। উপায় ছিল না। যদি কোনদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়—সব কথা জানাব। জানি তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করতে পারবে না। তবুও বিবেকের দংশনে অস্থির হয়ে সত্যি কথাটা না জানিয়ে পারলাম না।

শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে যেন একটা উত্তপ্ত গলিত সীসার প্রবাহ নামছে। চোখের ওপরে একটা কালো পর্দা নেমে আসছে। টেবিলে মাথাটা রেখে দুহাত দিয়ে চেয়ারের হাতল দুটো চেপে ধরল বিনতা।

খেয়ালই নেই বিনতার—চোখের জলে কখন যেন ধুয়ে-মুছে হারিয়ে গিয়েছে প্রসাধিত মুখের সূক্ষ্ম কারুকার্যগুলো।

টেবিলে মুখ গুঁজে বেশ কিছুক্ষণ কাঁদল বিনতা। তারপর আবার মুখটা তুলে জল-ভরা ঝাপসা চোখের ওপরে চিঠিটা মেলে ধরল—বিনু, তুমি দারুণ দুঃখ পাবে জানি। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমিও সুখী নই। এ বিয়ে আমি চাই নি। তবু উপায় ছিল না।

আমার এ দুঃখের সান্ত্বনা কোথায় পাব—বলতে পার? বিনু। ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর।

হঠাৎ বিনতার বুক থেকে যেন একটা হাসির ফোয়ারা উপচে উঠতে চাইল। মানুষের প্রবঞ্চনার কত বিচিত্র কৌশল? আর জীবনটাই বা কি এক মজার খেলা? একটু আগেই তো ওর চোখের জল বাধা মানছিল না। আর এখন? সুনন্দর রসিকতায় কি দারুণ হাসি পাচ্ছে। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছা করছে। সারাটা জীবন ধরে বুঝি এমনই হাসি-কান্নার রোদ-ছায়ার খেলা চলবে।

সোজা হয়ে বসল বিনতা। টেবিলে অনেক কাজ জমে আছে। খুব দেরীই হবে ওর সব কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরতে আজ। একবার বাথরুমে যেতে হবে। চোখ-মুখ ধুয়ে-মুছে শান্ত মনে টেবিলে এসে বসবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বিনতা। সামনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই অবাক হয়ে দেখল—সুদীপ্ত সেন ওর দিকে এক-দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ওর চোখের ওপর চোখ পড়লেও দৃষ্টি নামাল না। অনেকদিন পরে স্পষ্ট চোখে দেখল সুদীপ্ত সেন নামে সেই মৌন বিষণ্ণ মানুষটাকে। আশ্চর্য। সেই একই ছবি। মাথায় একরাশ এলোমেলো চুল, ফর্সা গালে নীলাভ সূক্ষ্ম দাড়ির রেখা। পুরু-চশমার আড়ালে গভীর কালো দুটি চোখের তারা। শুধু বিষণ্ণতার ছায়ায় ম্লান চোখের দৃষ্টি।

বিনতার মাথার মধ্যে সব যেন গোল-মাল হয়ে গেল। বুকের মধ্যে একটা আশ্চর্য মায়া থর থর করে কেঁপে উঠল। একটা চাপা কান্না দলা পাকিয়ে গলার কাছে এসে আট্‌কে গেল। কি অসহায় একটা মানুষ নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় বসে আছে। মৌন আহত প্রেমের নীরব ভাষা ফুটে উঠেছে দুটি বিষণ্ণ চোখের তারায়। বোধহয় বছর দুয়েক আগেই হবে। একদিন সাহস করে এগিয়ে এসেছিল সুদীপ্ত সেন। বিনতাকে স্পষ্ট ভাষায় প্রেম-নিবেদন করেছিল। সেদিন বিনতা দারুণ আঘাত দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল সুদীপ্ত সেনকে। তারপর আর কোনদিন একটা কথাও বলে নি আহত অভিমানী মানুষটা। দিনের পর দিন শুধু বিষণ্ণ বোবা দৃষ্টিতে বিনতার দিকে চেয়ে নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় বসে থেকেছে। আর বিনতার চোখের ওপরে চোখ পড়লেই চোখ নামিয়ে নিয়েছে।

আজ অনেকদিন পরে স্পষ্ট চোখের সোজা, সহজ দৃষ্টিতে সুদীপ্ত সেনের দিকে চেয়ে গলার কাছে দলা-পাকানো কান্নাটা চোখের জল হয়ে ঝরে পড়ল।

বিনতার দু-চোখে জল টল্‌ টল্‌ করছে। কিন্তু [illegible] মুখে ছড়িয়ে [illegible] [illegible] হাসি। সেই হাসি [illegible] চোখের জল দিয়ে আকর্ষণ [illegible] সুদীপ্ত সেনকে। [illegible] সুদীপ্ত সেনের নিজের [illegible] চোখে বিদ্যুতের চমক [illegible] দিয়ে উঠল।

[illegible] ছুটির পরে [illegible] [illegible] মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিনতা আর সুদীপ্ত সেন এক আশ্চর্য সুখের প্রত্যাশায় মগ্ন হয়ে রইল।

ময়দানের নরম ঘাসে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ওরা এক সময় ক্লান্ত হয়ে মুখোমুখি বসে পড়ল। বিকেলের ছায়া গভীর হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নামল। [illegible] আকাশে ধাপে ধাপে ধরে মেঘ জমেছিল। খেয়ালই করেনি কখন [illegible] আকাশ জুড়ে জল-ভরা মেঘের দলগুলো মাথা উঁচু করে উঠেছে।

তারপর অকস্মাৎই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। আর সেই অলৌকিক বৃষ্টি-ঝরা সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখোমুখি বসে বিনতা আর সুদীপ্ত যেন পরস্পরের চোখে এক আশ্চর্য পার্থিব আলো জ্বালিয়ে দিল।

সেই আলোর নাম ভালবাসা।

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

আকাশবাণী অনেকদিন থেকে আবার নতুন করে হিন্দী প্রচারে উঠেপড়ে লেগেছেন। কিন্তু সেই হিন্দীর রূপ কী হবে তা নিয়ে আকাশবাণীর ভিতরেই মতভেদ আছে। বাইরেও আছে।

হিন্দী প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৪৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর রবিবার অহিন্দীভাষী অঞ্চলের বেতার কেন্দ্রগুলিতে হিন্দী-শিক্ষার আসর শুরু হয়েছিল। সপ্তাহে পাঁচদিন এই আসর বসত। ১৯৪৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর রবিবার থেকে আরম্ভ যে সপ্তাহ সেই সপ্তাহের "ইণ্ডিয়ান লিসনার" পত্রিকায় এক বিজ্ঞপ্তিতে এই আসরের কথা প্রথম জানানো হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, গত সপ্তাহ থেকে হিন্দী শিক্ষার আসর শুরু হয়েছে।

আসর বসত সকালে, মিনিট কুড়ি মতো। অনেকগুলি পাঠমালা তৈরি করে প্রত্যেক কেন্দ্র থেকে আঞ্চলিক ভাষায় সেগুলি প্রচারিত হতে লাগল। কিন্তু কয়েক বছর পরে আকাশবাণী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, এই শিক্ষায় ব্যাকরণের উপর খুব বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে বলে তা সার্থক হতে পারছে না, এবং বেতারের পক্ষে সরাসরি পদ্ধতি গ্রহণ করাই ভালো। এরপর অনুষ্ঠানটিকে নতুন করে ঢেলে সাজা হ'ল, শিক্ষক আর ছাত্রের মধ্যে কথোপকথনের আকারে শিক্ষা দেওয়া হতে লাগল।

চীনা আক্রমণের সময় জরুরী অবস্থা ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত এই ভাবে হিন্দীশিক্ষার আসর চলে আসছিল। জরুরী অবস্থায় আসরটি তুলে দিয়ে "জরুরী অনুষ্ঠানের" জন্য সময় করে নেওয়া হ'ল। জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের পর আবার এই আসর শুরু হয়েছে, এবং পূর্ণোদ্যমে চলছে।

কিন্তু এই অনুষ্ঠানটিকে কখনই শ্রোতাদের কাছে গ্রহণীয় আকারে হাজির করা হয় নি—এখনও হচ্ছে না। আসলে এবিষয়ে গভীরভাবে চেষ্টাই হয়নি কখনও। একটা সম্পূর্ণ পরিকল্পনা-বিহীন সিলেবাস তৈরি করে সম্পূর্ণ সেকেলে পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া শিক্ষাতত্ত্ব ও রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এই আসর কতজন শ্রোতা শুনছেন, তাঁদের প্রতিক্রিয়া কী, বক্তব্য কী তা জানার জন্য কখনও কোনো সমীক্ষা পর্যন্ত চালানো হয়নি—অথচ আকাশবাণীতে লিসনার্স রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট বলে একটা বিভাগ আছে। বি-বি-সি'র বেতার মারফৎ ইংরেজী শিক্ষা দেবার অভিজ্ঞতা হাতের কাছেই ছিল, তা-ও আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ কখনও কাজে লাগান নি। আকাশবাণীর এই হিন্দীশিক্ষার আসর অনেকের কাছে একটা বিরক্তিকর জিনিস হয়ে আছে।

কিন্তু তার চেয়েও বড়ো সমস্যা—স্বয়ং হিন্দীওয়ালাদের কাছেই—হিন্দী নিউজ বুলেটিনে ব্যবহৃত হিন্দীর রূপ নিয়ে, এবং এই সমস্যা প্রায় একেবারে গোড়া থেকেই আছে। গোড়ায় এই বুলেটিনগুলিকে হিন্দুস্তানী নিউজ বুলেটিন বলা হ'ত। উত্তর ভারতের বেতার কেন্দ্রগুলিতে ভারতীয় ভাষায় প্রচারিত অধিকাংশ অনুষ্ঠানই ছিল উর্দুতে শুধু কথ্য ভাষায় কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হ'ত হিন্দীতে। অর্থাৎ ইংরেজীর অনুকরণে রচিত অনুষ্ঠানের "সিংহভাগ" ছিল উর্দুর। এবং তাই হিন্দী লেখক ও অন্যদের, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশের, অভিযোগ ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু এই অনুষ্ঠানগুলিকে হিন্দী বা উর্দু কিছুই বলা হ'ত না, বলা হ'ত হিন্দুস্তানী। তবে কার্যক্ষেত্রে উর্দুর দিকেই টান ছিল বেশি।

১৯৪৯ সালের শেষদিকে সংবাদের গোড়া থেকে "হিন্দুস্তানী" শব্দটি বাদ দেওয়া হ'ল। ১৯৪৯ সালের ২৭শে নভেম্বর রবিবার যে সপ্তাহের শুরু সেই সপ্তাহের "ইণ্ডিয়ান লিসনার" পত্রিকায় প্রথম "নিউজ ইন হিন্দুস্তানী"র জায়গায় "নিউজ ইন হিন্দী" দেখা গেল। এই পরিবর্তনের কোনো কারণ ঐ পত্রিকাটিতে অথবা অন্য কোথাও দেওয়া হয়নি। এ থেকে কেউ কেউ অনুমান করেছেন, আকাশবাণীর হিন্দী-নীতি আধা-গোপনভাবে স্থির হয়েছে।

এই পরিবর্তনের পর সংবাদের ভাষার প্রকৃতিও বদলে গেল, এবং সংস্কৃত-বহুল হিন্দী ব্যবহৃত হতে লাগল। যুক্তি দেখানো হ'ল, শ্রোতারা যদি হিন্দী নিউজ বুলেটিনের ভাষা না-ও বোঝেন, শুনতে শুনতে শিখে নেবেন। তখনকার বেতারমন্ত্রী ডঃ বি ভি কেশকরের নীতি ছিল এটা। প্রধানমন্ত্রী নেহরু কিন্তু এই নীতি মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি অভিযোগ করেছিলেন, আকাশবাণীর হিন্দী নিউজ বুলেটিনে তাঁর হিন্দী ভাষণ যে ভাষায় প্রচার করা হয় তা তিনি বুঝতে পারেন না। ইতিমধ্যে উর্দুতে পৃথক্ নিউজ বুলেটিন প্রচারের ব্যবস্থাও হয়েছে। ১৯৪৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর রবিবার যে সপ্তাহের শুরু সেই সপ্তাহের "ইণ্ডিয়ান লিসনার" পত্রিকায় প্রথম উর্দু নিউজ বুলেটিনের উল্লেখ দেখা গেল।

শ্রী পি এম লাদ ছিলেন একজন বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত। ১৯৫৪ সালে তিনি তথ্য ও বেতার দপ্তরের সচিবের কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ এবং মন সংস্কারমুক্ত। তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন, সংবাদ প্রচারে ভাষার গোঁড়ামি থাকা উচিত নয়, এবং নিউজ বুলেটিনের উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের কাছে সর্বসাধারণের বোধ্য ভাষায় খবর পৌঁছে দেওয়া। এবং তাঁর সময় থেকেই হিন্দী নিউজ বুলেটিনে ভাষা-সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। ডঃ কেশকর যেসব হিন্দী লেখক ও পণ্ডিতকে আকাশবাণীতে উপদেষ্টা ও প্রযোজক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন তাঁদের আমল না দিয়ে এই আন্দোলনকে সমর্থন জানাবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা হ'ল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শ্রীলাদ অকস্মাৎ পরলোকে যাত্রা করলেন, এবং এই নতুন নীতিকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কেউ রইলেন না। তবে মাঝে মাঝে প্রধানমন্ত্রীর খোঁচায় কিছুটা করে বেগ সঞ্চারিত হ'ত।

এর অল্পকাল পরে ১৯৬২ সালের নির্বাচনে ডঃ কেশকর পরাজিত হলে ডঃ গোপাল রেড্ডী বেতারমন্ত্রী হলেন। তিনি বললেন, আকাশবাণীর হিন্দী নিউজ বুলেটিনে যে ভাষা ব্যবহার করা হয় তা হিন্দীভাষী অঞ্চলেরই বিরাটসংখ্যক শ্রোতা বুঝতে পারেন না। হিন্দী বুলেটিনে প্রচলিত উর্দু শব্দ পরিহার করা ঠিক নয়, বরং দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তে প্রচলিত উর্দু শব্দই বেশি করে ব্যবহার করা উচিত। এবং ভাষার এই সরলীকরণ কেবল হিন্দীর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না,

উর্দুর ক্ষেত্রেও তা গ্রহণ করতে হবে। —অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দী আর উর্দুকে কাছাকাছি আনা। বেতারের পক্ষে এই উদ্দেশ্য খুবই যুক্তিযুক্ত।

ডঃ রেড্ডী ১৯৬২ সালের জুন মাসে আকাশবাণীর হিন্দী ও উর্দু প্রযোজক ও সহকারী প্রযোজকদের এক বৈঠকে আহ্বান করে তাঁর নীতি ব্যাখ্যা করলেন, এবং কীভাবে ভাষার সরলীকরণ করা যায় তা নিয়ে পরে আলোচনাও হয়। এই আলোচনার পরে তাঁর ধারা অনুসারে আদর্শ হিন্দী ও উর্দু নিউজ বুলেটিন নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পরীক্ষাও হয়েছিল। ১৯৬২ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখে রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, ১লা জুলাই থেকে এই পরীক্ষামূলক বুলেটিন প্রবর্তিত হয়েছে।

প্রযোজক ও সহকারী প্রযোজকদের সঙ্গে আলোচনা ও পরের সিদ্ধান্তগুলি সরকারীভাবে প্রকাশ করা না হলেও সংবাদপত্রে তা পাচার হয়ে গিয়েছিল, এবং ডঃ কেশকারের আমলে আকাশবাণীর যেসব গোঁড়া হিন্দীপ্রেমীকে নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁরা তা দেখে ক্ষেপে উঠেছিলেন। তাঁদের "হিন্দী বিপন্ন" স্লোগানে উত্তর প্রদেশ ও বিহার থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাও সামিল হয়েছিলেন।

১৯৬২ সালে সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে ডঃ রেড্ডীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হ'ল, তিনি হিন্দীর উর্দুকরণে সচেষ্ট হয়েছেন এবং বিগত দশ বছরে আকাশবাণী যে হিন্দী-নীতি অনুসরণ করে চলেছেন তা উলটে দিতে চাইছেন। যুক্তি দেখানো হ'ল, হিন্দী বুলেটিনে যদি সংস্কৃতানুগ শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে সারা দেশের লোক তা বুঝতে পারবেন, কারণ আঞ্চলিক ভাষাগুলি হিন্দীর সঙ্গে একই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

ডঃ রেড্ডী প্রবলভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরুও তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এলেন। জুন মাসের শেষ দিকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী জানালেন, ডঃ রেড্ডী বেতারমন্ত্রী হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করার পর তিনিই তাঁকে আকাশবাণীর হিন্দী নিউজ বুলেটিনের ভাষার প্রশ্নটি পরীক্ষা করে দেখতে বলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এমন কথাও বলেছিলেন যে, ডঃ কেশকরের হিন্দী-নীতি তিনি সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন নি।

কবি দিনকর এবং মামা ওয়ারেরকরের মতো লোকেরা (আকাশবাণীর উপর যাঁদের প্রভূত প্রভাব ছিল) হিন্দী ভাষার প্রশ্নে ডঃ রেড্ডীকে সমর্থন করেন নি। দিল্লী প্রাদেশিক হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন "হিন্দীর সরলীকরণের অজুহাতে" আকাশবাণীর হিন্দী-নীতি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিবাদ জানাবার জন্য এক লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযানে নেমেছিলেন। তার আগে তিনজন বিশিষ্ট হিন্দী লেখক (তাঁদের মধ্যে দুজন আকাশবাণীর ভূতপূর্ব প্রযোজক) শ্রীভগবতীচরণ বর্মা, শ্রীঅমৃতলাল ও শ্রীযশপাল লক্ষ্ণৌয়ে এক বিবৃতিতে হিন্দী লেখকদের কাছে হিন্দীর মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আকাশবাণীর সঙ্গে তাঁদের সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করতে প্রস্তুত থাকতে আবেদন জানিয়েছিলেন।

অবশ্য সেই সঙ্গে আপসের চেষ্টাও চলছিল। কংগ্রেস সংসদীয় দল এই মর্মে শ্রীনেহরুর একটি মৌখিক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন যে, আকাশবাণীতে ব্যবহৃত হিন্দী যতদূর সম্ভব সরল হবে, কিন্তু তাই বলে হিন্দীর সহজাত সৃজনী ক্ষমতা ব্যাহত হয় এমন কিছু করা হবে না। এর অব্যবহিত পরে ১১ জন সংসদ সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হল এবং তাঁরা হিন্দী সম্পর্কে যে ভীতির উদ্রেক হয়েছিল তা অনেকখানি দূর করে দিলেন। সংসদ সদস্যদের হিন্দী কমিটির পরে রাজ্যপালের পদ থেকে সদ্য অবসর গ্রহণ করা শ্রী শ্রীপ্রকাশের নেতৃত্বে পণ্ডিত আর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল।

ঠিক এই সময় সংঘটিত হল চীনা আক্রমণ, এবং বিরোধমূলক সমস্ত বিষয় চাপা দিয়ে রাখা হল। তারপর এল সেই বহুবিতর্কিত "ভোয়া" (ভি-ও-এ অর্থাৎ ভয়েস অভ্ অ্যামেরিকার-)-র ব্যাপার এবং ডঃ রেড্ডীর স্থলে বেতারমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হলেন শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ।

শ্রীসিংহকে বেতারমন্ত্রী হিসাবে পেয়ে সংসদে শক্তিশালী হিন্দীওয়ালারা আশ্বস্ত হলেন এবং আকাশবাণীর ভাষানীতি আবার একটা রূপান্তরের পথে পা বাড়াল। কিন্তু তার হিন্দী নিউজ বুলেটিনের ভাষা দেশের সর্বসাধারণের কাছে বোধ্য কিনা সে প্রশ্ন অমীমাংসিতই রয়ে গেল।]

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

১৮ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে মজদুরমণ্ডলীর আসরে "সুখচাঁদ" নামে একটি গল্প পড়ে শোনালেন শ্রীরণজিৎকুমার সেন। মজদুরমণ্ডলীর আসরের উপযোগী গল্প—শিল্পভিত্তিক। মন্দ লাগল না, যদিও গল্পের আঙ্গিক অতি সাধারণ। গল্পের আগে ও পরে শ্রীসেনের নামের দু-রকম উচ্চারণ শোনা গেল—আগে রোণজিৎকুমার সেন ও পরে রণোজিৎকুমার সেন। কোনটা ঠিক?

এইদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শ্রীভবনে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে হবিবপুরের অধিবাসীদের সঙ্গে আকাশবাণী প্রতিনিধির একটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান প্রচারিত হল। ভালোই লাগল। হবিবপুরের লোকেরা পরিবার পরিকল্পনাকে কীভাবে নিয়েছেন, সেখানকার ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী আর সমাজসেবিকারা কীভাবে পরিবার পরিকল্পনার সুজ করছেন তার একটা স্পষ্ট চিত্র পাওয়া গেল। তবে প্রশ্ন করায় আকাশবাণী প্রতিনিধি সর্বত্র মুন্সিয়ানা দেখাতে পারেন নি। তাঁর অনেক প্রশ্ন বড়ো জলো ও নিরর্থক মনে হয়েছে।

২১শে জানুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় গল্পদাদুর আসরে নেতাজীর ছেলেবেলার গল্প বললেন শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি)। ছেলেদের উপযোগী করে বললেন—যাতে তারা উৎসাহ পায়, উদ্দীপিত হয়। গল্প বলার সুন্দর একটা মেজাজ ছিল তাঁর মধ্যে।

এইদিন রাত ৮টায় সাহিত্যবাসরে স্বরচিত গল্প পড়লেন শ্রীসুভাষ সমাজদার। গোড়ায় মনে হয়েছিল প্রচারগন্ধী গল্প, কিন্তু শেষে রূপ গেল পালটে। একজন বিদেশী বিদ্যার্থিনীর চোখে ভারতবর্ষের আত্মিক রূপটা ফুটে উঠেছে এই গল্পে। একজন মার্কিন মহিলা এদেশে এসেছেন গবেষণা করতে। এদেশের বাঁধ আর অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ প্রবল। দামোদরের তিলাইয়া আর হীরাকুদ দেখার পর তিনি গেলেন এইসব বাঁধ দেশের সাধারণ মানুষের মনে কতখানি রেখাপাত করেছে তা দেখতে। তা দেখতে গিয়ে তিনি এক নতুন রূপ দেখলেন। দেশের মানুষ বাঁধ সম্বন্ধে উদাসীন, দারিদ্র্যকে গায়ে না মেখে তারা পালাপার্বণ আর ব্রত নিয়ে একটা পরম পরিতৃপ্তির জগতে বাস করছে। ঐশ্বর্যের উপকরণের মধ্যে তাদের পরিচয় নেই, তাদের পরিচয় এইখানে, এই বিশ্বাসের মধ্যে, দুঃখকে দুঃখ বলে মনে না করে মাটিকে আশ্রয় করে থাকার মধ্যে।

গল্পের বিষয়বস্তুতে যেমন চলতি রীতির কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা গেছে তেমনি তার আঙ্গিকেও কিছুটা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

—শ্রবণক

অফিসপাড়া ঘুরে

অফিসপাড়ায় একদিন নেমন্তন্ন ছিল। কোন বিশেষ দোকানে নয়। এমনকি কোন বিশেষ বস্তুও নয়। অফিস কর্মী এক বন্ধু নেমন্তন্ন করেছিল। ফুটপাথে ঘুরে ঘুরে খাবার নেমন্তন্ন। সেখানে নাকি সব রকম খাবারই পাওয়া যায়। অফিসপাড়ার অনেকেই ওদের খদ্দের। রীতিমত ভিড় জমে যায়, শুনেছি। অনেক কাছ-দূরে থেকে ওরা খাবার নিয়ে আসে। কয়েকজন মহিলাও এদের মধ্যে আছে। সবই খুব উৎসাহব্যঞ্জক। বন্ধুর প্রস্তাবটা সরাসরি গ্রহণ করে ফেলি। তারপর সুযোগ-সুবিধা মতো একদিন পা চালাই অফিসপাড়ার উদ্দেশ্যে।

এ এক বিচিত্র জায়গা। অফিস নিস্তব্ধ। পাড়া সরগরম। টিফিনের ঘন্টা বেজেছে। অধিকাংশই এখন রাস্তায়। বন্ধু আমাকে ঘোরাতে শুরু করলো। এ জায়গা থেকে সে জায়গা। এক জটলা থেকে আর এক জটলা। শুধু খদ্দের। বিক্রেতাকে দেখাই যাচ্ছে না। বিক্রীত বস্তু তো নয়ই। কিন্তু ভিড় যতই হোক আর একসঙ্গে হাজার হাতই বাড়াক, আমার বন্ধু ঠিক ঠিক খাবার পেয়ে যাচ্ছে। মনের আনন্দে খেয়ে বেড়াচ্ছি। এ যেন এক স্বতন্ত্র জগত। যার স্বাদ থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত ছিলাম। অফিসপাড়ার এ রূপ আমার কাছে অজ্ঞাতই ছিল। হঠাৎ আবিষ্কারের নেশায় আমি মশগুল।

শুধু খাবারের ব্যাপারেই নয় বন্ধুটির কথা আর একটি ক্ষেত্রেও সত্যি। অনেক মহিলা খাবার নিয়ে এসেছে। খাওয়ার শেষে বাদাম ভাজা। তারপর পান। সবই মহিলাদের কাছ থেকে খাওয়া যায়। আমার বন্ধুটি ঘুরে ঘুরে সব মহিলা বিক্রেতাদের কাছ থেকেই খাবার নিচ্ছিল। আর খাওয়ার আগে তাদের সম্বন্ধে দু'চার কথা রিলে করে যাচ্ছিল।

ওদের প্রায় সবাই এসেছে কলকাতার বাইরে থেকে। কাছে-দূরের সবরকমই আছে। আগে অফিসপাড়ায় খাবার বেচতে মহিলা দেখা যেত না। গত কয়েক বছরে এরা খাবার বেচতে শুরু করেছে তাই নয় সংখ্যায়ও বেশ বেড়েছে। এ সব মহিলাদের অধিকাংশই কাজ করে স্বামী-স্ত্রীতে। আজকালকার রেওয়াজ এদেরও স্পর্শ করেছে। একার আয়ে সংসার চলে না। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকেও হাত লাগাতে হয়। সেই তাগিদেই এদের কেউ কেউ খাবারের বোঝা নিয়ে অফিসপাড়ায় এসেছে। আবার কেউ কেউ এসেছে নিরুপায় হয়ে। কারো স্বামী অসুস্থ, কেউ বিধবা। আয় নেই। সংসার অচল। বাধ্য হয়ে সহজ আয়ের পথ বেছে নিতে হয়েছে। খাবারের পশরা নিয়ে অফিসপাড়া আশ্রয় করেছে।

এদের সকলেরই ঘরে ছেলেপুলে আছে। সেই ছেলেপুলের দেখাশোনার দায়িত্ব অনেকখানিই অনিশ্চিত। চাকুরি-জীবী মহিলাদের মতই এদেরও অবস্থা। ভাগ্যের হাতে ছেলেপুলের ভবিষ্যত ভাসিয়ে দিয়ে এরা বেরিয়ে এসেছে পেটের তাগিদে। সর্বত্র আজ একই অবস্থা। এই চিন্তা মাথায় ঘোরাফেরা করতে করতে নজর পড়লো অদূরবর্তী এক মহিলার প্রতি। বাদাম ভর্তি ছোট ছোট ঠোঙা সাজিয়ে বসেছে। বেশ বয়স হয়েছে। পায়ে পায়ে কাছে যাই। দশ পয়সায় এক ঠোঙা কিনে ফেলি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাদাম চিবুই আর কথা বলি। হিন্দুস্থানী। চোস্ত বাংলায় কথা বলে যাচ্ছে। না বললে বুঝতেই পারতাম না। অনেকদিন ধরেই এখানে বাদাম বেচছে। কথায় কথায় জানালো, আয় তেমন হয় না। কোনমতে চলে যায়। সংসারে প্রাণী বলতে দুজন। বুড়ি আর একটি বছর দশেকের নাতি। সেও একটা চায়ের দোকানে কাজ করে কিছু তুলে দেয় ঠাকুমার হাতে। এরপর বৃদ্ধা অতীত হাতড়ায়।

তার জোয়ান এখানকারই একটি অফিসে চাকরি করতো। ছেলে রোজগার করতো। বৌ সংসার করতো। আর বুড়ি নাতি নিয়ে হাসি-ঠাট্টায় মেতে থাকতো। হঠাৎ কোনখান দিয়ে কি হয়ে গেল। দু'দিনের ব্যবধানে ছেলে আর ছেলের বৌ সংসারের বাঁধন কাটলো। বুড়ি নাতির হাত ধরে অনেক কেঁদেছে। বিরাট পৃথিবীতে তার আপন বলতে একমাত্র এই নাতি। অনেকদিন বুড়ি আচ্ছন্ন হয়েছিল। তারপর শোকের প্রথম রেশ কেটে যাওয়ার পরই পেটের চিন্তা মাথা চাড়া দিয়েছে। কিন্তু করার মতো কিছুই নেই। অবশেষে এক পড়শীর পরামর্শে বাদাম ভাজা বিক্রি করছে। ছেলের অফিসের সামনেই।

পান-সিগারেটের দোকান। ফটো : অমৃত

এতক্ষণ মনযোগ দিয়ে বুড়ির কথা শুনছিলাম। কোন দিকে খেয়াল ছিল না। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। কথা বন্ধ হতেই সম্বিত ফিরে পেলাম। তাকিয়ে দেখি বুড়ির চোখে জল। নিজেকে কিরকম অপ্রস্তুত মনে হলো। এরকমভাবে পুরনো ব্যথায় গভীর হয়ে বাজবে বুঝতে পারিনি। কোনরকমে পায়ে পায়ে পালিয়ে আসি। আত্মরক্ষার তাগিদে।

অফিসে বসে এই পাড়ায় কত মেয়ে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত তা সঠিক জানা নেই। তবে সেই সংখ্যাটা যে বিরাট হবে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবু সৌভাগ্য মানতে হবে, তাদের অফিসে ঠাঁই হয়েছে। এরকম সুতীব্র লড়াই-এর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়নি। অফিসপাড়ার ফুটপাথে যে লড়াই চলছে সেখানে শুধু পুরুষদেরই ছিল একচেটিয়া আধিপত্য। ঘরের মেয়েরা কোনদিন ভাবেনিও যে পেটের প্রয়োজনে তাদের এখানে আসতে হতে পারে। ডাক অবশ্য অনেকদিনই পৌছে গিয়েছিল। সংকোচ কাটতে যা সময় গেছে। তারপরই এ'রা দল বেঁধে নেমে এসেছে।

ইতিমধ্যে টিফিন খাওয়ার শেষ হয়েছে। বন্ধু বিদায় নিয়েছে। আমার কিন্তু অফিসপাড়া ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। এর মোহে জড়িয়ে পড়েছি। আর একা একা ঘোরাই সুবিধা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যায়। তাই বন্ধুকে আটকে রাখিনি। অনেকটা উদ্দেশ্যবিহীন অথচ উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঘুরতে শুরু করি।

চাকরি আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের বিরাট সম্পদ। এর জন্য মারামারি, লাঠা-লাঠি। একটা চাকরি পেলে আমাদের সমস্যা মিটুক আর না মিটুক মুখে বিজয়ীর দৃপ্ত হাসিটুকু ফোটে। যেন এবার অসাধ্য সাধন করতে পারি। অথচ একটু পরেই আবিষ্কার করি তেল আনতে পান্তা ফুরোয়। তবু চাকরিই ভরসা। অর্থ নেই, সম্পদ নেই। ব্যবসা করার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই।

এমনি নানা চিন্তা নিয়ে ফুটপাথ ভাঙছি। হঠাৎ দেখি বিরাট এক কলেস্ট্রাম টাঙিয়ে একটি মেয়ে লটারির টিকিট বিক্রি করছে। কতই বা আর বয়স হবে! একটু দাঁড়াই। লোকজন আসছে, যাচ্ছে। টিকিট বিক্রিও হচ্ছে। মেয়েটি সকলকে দেখাচ্ছে তার কাছ থেকে টিকিট কিনে কে কোন প্রাইজ পেয়েছে। এখানে একটু হাসি পেল। লটারিটাই তো ভাগ্যের ব্যাপার। কার কাছ থেকে টিকিট কিনে কে প্রাইজ পাবে তার কোন স্থিরতা নেই। তবু এই সার্টিফিকেটটুকু প্রয়োজন। এতে দশজন লোকের আকর্ষণ বাড়ে। ভাগ্য পরীক্ষা করতে এসে আর এক অন্ধের বিড়ম্বনা। আমরা সবাই তাই।

অনেকের মত মেয়েটিও লেখাপড়া শিখে চাকরির স্বপ্ন দেখতো। কিন্তু চাকরি চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না। অনেক চেষ্টা করে, অনেককে ধরে করেও মেয়েটির চাকরির ভাগ্য খোলেনি। অবশেষে লটারির টিকিট নিয়ে বসেছে অফিসপাড়ায়। প্রথমে মূলধন তেমন ছিল না। আস্তে আস্তে বেড়েছে। ব্যবসা গোড়া থেকেই ভাল চলছে। এখন নানা রাজ্যের টিকিট বেশ কিছুসংখ্যক তার কাছে বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। ক্রেতারাও ভেবেচিন্তে, বাছাবাছি করে টিকিট কিনে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে।

এ ব্যাপারে সে বন্ধুবান্ধবদের কাছে যতটা না উৎসাহ পেয়েছে তার চেয়ে বেশি উৎসাহিত হয়েছে অফিসপাড়ায় আর এক মহিলাকে লটারির টিকিট নিয়ে বসতে দেখে। এই ভদ্রমহিলা অনেকটা নিরুপায় হয়ে এবং জেদের বশেই এই পথ বেছে নিয়েছে। বলতে গেলে তিনিই এই মেয়েটির পথপ্রদর্শক।

পা বাড়াই।

আজকাল আর চাকরির দুর্লভতায় দিনে লটারির টিকিট অবশ্য আমাদের জীবন নির্বাহের অনেকটা হদিশ দিয়েছে। এই ব্যবসায় অনেকে ইতিমধ্যে বেশ সুরাহা করে নিয়েছে। এমনও একজনকে বলতে শুনেছি, চাকরির চেয়ে এখানে আয় অনেক বেশি। কিন্তু তাঁরা সবাই পুরুষ। মেয়েরা যে এ লাইনে আসতে শুরু করেছে তা তখনো জানতাম না। পথে-ঘাটে, চেনা-শোনা যাকে দেখি সবাই পুরুষ। তাই অফিসপাড়ায় সংকোচের ঊর্ধ্বে উঠে এই মেয়েটিকে লটারির টিকিট বেচতে দেখে প্রত্যাশার মনটা উজ্জ্বল হলো। আর সেই ভদ্রমহিলা তো আছেনই। তবু তাঁর বয়স হয়েছে। কিন্তু এই মেয়েটি তো ওঠেনি। তাই দুঃসাহসে ভর করে ফুট-

লটারীর টিকিট বিক্রি করছেন অনীতা দেব। ফটো : অমৃত

পাশে এসে উঠেছে লটারির টিকিট নিয়ে। আজকের জীবনে এ এক নতুন দিক।

চিন্তার রেশ কাটতে না কাটতেই দেখি আর এক ভদ্রমহিলার কাছে পৌঁছে গেছি। ইনিও লটারির টিকিট নিয়ে বসেছেন। অনেকরকম টিকিট। প্রয়োজন যেমন ব্যবসা করার উদ্দেশ্যেও তেমনি। আর ব্যবসা করতে হলে অফিসপাড়াই ভাল। তিনি আশা রাখেন, ভবিষ্যতে হয়তো এখানে একটা ঘরের ব্যবস্থাও করতে পারবেন। আর তখন ফুটপাথ থেকে ব্যবসা তুলে উপরে আসবেন ঘরে। ভদ্রমহিলার চোখে-মুখে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ভাব। জীবন সংগ্রামের কঠিন ভূমিকায় উত্তীর্ণ তিনি হবেনই। তার মধ্যে কোন বিষাদ নেই।

অফিস ছুটির সময় হয়ে এসেছে। তাই বন্ধুর উদ্দেশ্যে পা চালাই। একসঙ্গে ফিরবো। সেখানে পৌঁছে দেখি দুটি মেয়ে টেবিলে টেবিলে ঘুরে লটারির টিকিট বিক্রি করছে। আমি তো অবাক। লটারির টিকিট তাহলে অনেককেই ভাগ্যের নির্দেশ দিয়েছে। আর আমরাও সেই নির্দেশ শুনেছি ঠিক ঠিক। বন্ধুর সঙ্গে দেখা না করেই আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসি। আজকের সম্পদে ভরপুর হয়ে একা একা যেতেই ভালো লাগবে।

বিরাট অভিজ্ঞতা। যেখানে জীবন-ধারণের পথ সেখানেই আমরা। ও'রা দুঃখ-কষ্টের যাত্রী কিন্তু নতুন পথের দিশারী।

—প্রমীলা

চিত্র সমালোচনা

শোভা চিত্র নিবেদিত, এম জি অনন্ত-রাজিয়া প্রযোজিত এবং সলিল চৌধুরী লিখিত, সুরারোপিত ও পরিচালিত 'পিঞ্জরে-কে-পঞ্ছী' ছবি দর্শকদের আর একবার করে বলতে চেয়েছে, মানুষ একবার বা দুবার অপরাধ করলেই চিরদিনের জন্যে মন্দ হয়ে যায় না, সং সংসর্গে মন্দ স্বভাবের লোকও ভালো হয়ে যেতে পারে এবং ধনী লোকেরা অর্থের জোরে নিজেদের অপরাধের বোঝা গরীবের স্কন্ধে নিক্ষেপ করে নিশ্চিন্ত হতে পারে।

চলচ্চিত্র শুধুই প্রমোদোপকরণ নয়, এতে শিক্ষণীয়ও কিছু থাকা উচিত, ছবি করতে বসে যাঁরা এই সং চিন্তা করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের ধন্যবাদার্হ। 'পিঞ্জরে-কে-পঞ্ছী' প্রমোদের পরিমাণকে যতদূর সম্ভব কম রেখে কাহিনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয়-বস্তু আহরণের পথকে প্রশস্ততর করে রেখেছে বলে এর নির্মাতারা আমাদের কাছ থেকে অশেষ ধন্যবাদ দাবি করতে পারেন। বিশেষ করে হিন্দী চলচ্চিত্রজগতে যে-কালে উদ্দেশ্যহীনভাবে সস্তা নাচগান ভাঁড়ামো-রক্তারক্তি ও যৌনআবেদনপূর্ণ রঙীন ছবির ছড়াছড়ি, সেই সময়ে অথ-প্রেমঘটিত বিষয়কে সম্পূর্ণ পরিহার করে সজ্জনের সংস্পর্শে অসতের নিখাদ সোনায় পরিণত হওয়ার কাহিনী অবলম্বনে একটি সাদা-কালো ছবি তৈরী করা নিঃসন্দেহে একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা।

পুলিশ হেফাজত থেকে পালানো এক-জোড়া জেলকয়েদী—যাদের একজন খুনী এবং অপরজন পকেটমার—দৈবক্রমে একজন সহৃদয়া নারীর সান্নিধ্যে এসে অন্যায়ের পথ থেকে ক্রমে কি করে সংপথের পথিক হয়ে উঠল, সেই কাহিনীই বিধৃত হয়েছে 'পিঞ্জর-কে-পঞ্ছী' ছবিটিতে। কিন্তু তারা যে সং হয়ে উঠেছে, এ-কথা অপরে জানবার আগেই খুনী ব্যক্তিটি হল পুলিশের গুলিতে নিহত এবং জানবার পরেও পকেটমারকে হাতকড়ি পরিয়ে পুলিশ-ভ্যানে করে নিয়ে যেতে দেখা গেল—নিশ্চয়ই তার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে আসবার অপরাধের বিচারের জন্যে।

কিন্তু এই কাহিনীটির বিস্তারের জন্যে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত যে সমস্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে, তার অধি-কাংশই বিশ্বাসযোগ্য নয়। পুলিশভ্যান থেকে কয়েদী দুটির পালিয়ে যাওয়া, খালি-বাড়ীর তালা ভেঙে ঢোকবার পরেও তাদেরই নয়া ভাড়াটে বলে বাড়ীওলার মেনে নেওয়া, আফিসের চোরাই চালান নিয়ে যাওয়ার অপরাধে পুলিশের অপরাধীকে ছেড়ে লরী-ড্রাইভারকে সাজা দেওয়া ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি ঘটনাকেই আদৌ বিশ্বাসযোগ্য-ভাবে উপস্থাপিত করবার কোনো প্রয়াসই দেখা যায় না। ফলে কাহিনীটির মাধ্যমে যে বক্তব্যগুলিকে রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে, সেগুলি দর্শকমনে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

অভিনয়ে বলরাজ সাহনী (ইয়াকেম খাঁ-খুনী), মেহমুদ (লালু-পকেটমার), মীনাকুমারী (মিসেস শর্মা), অভি ভট্টা-চার্য (মিস্টার শর্মা), অসিত সেন (বাড়ী-ওয়ালা), কেষ্ট মুখুজ্যে (অন্যতম কয়েদী ও নাপিত) প্রভৃতি নিজ-নিজ ভূমিকায় সুযোগমত নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নি।

ছবির কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সাদা-কালো ফোটোগ্রাফীতে কমল বসু ও তাঁর সহকর্মীরা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ছবিটির গতিকে যতদূর সম্ভব দ্রুত রেখেছেন সম্পাদকরূপে হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সহকারীরা। ছবির চারখানি গানের সুরে কিন্তু সলিল চৌধুরীর খ্যাতি অনুযায়ী অভিনবত্বের সন্ধান পাওয়া গেল না; মাত্র ওরই মধ্যে 'নীচ কাম উঁচা নাম' গানখানি জন-প্রিয়তা লাভের সম্ভাবনাপূর্ণ।

'পিঞ্জরে-কে-পঞ্ছী' হিন্দী চলচ্চিত্র-জগতে অবিসংবাদীভাবে একটি বক্তব্যবান ছবি করবার সাধু প্রয়াস বলে চিহ্নিত হবে।

এখানে পিঞ্জর/অপর্ণা সেন এবং উত্তমকুমার

প্রেক্ষাগৃহ

মঞ্চাভিনয়

লেনিনের ডাক

মহামতি লেনিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই দেশের রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের জাতীয়-করণ করেছিলেন সাম্যবাদের আদর্শকে জনতার মনের মধ্যে পৌঁছে দেবার শক্তি-শালী হাতিয়াররূপে ব্যবহার করবার জন্যে। উৎপল দত্তের নেতৃত্বে লিটল থিয়েটার গ্রুপও আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে যাতে সাম্যবাদী বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়, সেই চেষ্টাই চালিয়ে আসছেন ক্রমাগত মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে তাঁর অভিনীত নাটকগুলির মাধ্যমে। 'অঙ্গার' নাটকে যার শুরু,

'ফেরারী ফৌজ', 'কল্লোল' 'তীর' 'উত্তর ভিয়েৎনাম'-এর সিঁড়িপথ বেয়ে বর্তমানে অভিনীত 'লেনিনের ডাক'-এ তার একই চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখে এসেছি।

নভেম্বর বিপ্লবের প্রস্তুতিস্বরূপ লেনিন যেসব কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং সেগুলির রূপায়ণের পথে তাঁকে যেসব বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, ১৯১৮-র জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী সেইসব ঘটনার ভিত্তিতেই শ্রীদত্ত এই 'লেনিনের ডাক' নাটকটি রচনা করেছেন। অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে কি করে রুখে দাঁড়াতে হয়, বিপ্লবের নেতৃবৃন্দের জীবনযাত্রা কেমন হওয়া উচিত, কিভাবে তারা ক্ষেতের চাষী ও কারখানার মেহনতী মানুষকে উদ্বুদ্ধ এবং ঐক্যবদ্ধ করবে—এইসব কথা ছড়িয়ে আছে নাটকটির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, ছত্রে-ছত্রে। রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের সূচনার জন্যে জুলুমবাজদের বিরুদ্ধে জুলুম চালাতে হবে, ধনিকের দলকে শোষিতেরা গুলি করবে, পেশাদার সৈন্যা-

নান্দীকারের তিন পয়সার পালা নাটকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং কেয়া চক্রবর্তী। ফটো : অমৃত

ধ্যক্ষীরা অকর্মণ্য—ওদের পরিবর্তে কৃষক-শ্রমিক গঠিত লালফৌজ ও গেরিলাবাহিনী ঢের বেশী শক্তিশালী, কৃষক-শ্রমিকের হাতে অস্ত্র সরবরাহ করতে হবে— কারণ যার হাতে অস্ত্র, সেই জমি, ফসল, রাষ্ট্র কেড়ে নিতে পারে, জুলুমবাজদের, জোতদারদের হত্যা করতেই হবে, কারণ, জাতির দেহের গ্যাংগ্রীনকে অস্ত্র করে বাদ দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন, সন্তান যখন জন্ম নেয়, তখন যেমন দেহ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়, জাতিরও নবজন্মের সময়ে তেমনই রক্তের প্লাবন বওয়া বিচিত্র নয়, ধর্মের চেয়ে ক্ষুধার শক্তি বেশী, ইত্যাদি আপ্তবাক্য দ্বারা সমস্ত নাটকটি সমাকীর্ণ।

নিঃসন্দেহে উৎপল দত্ত একজন শক্তিশালী নাট্যকার। কাজেই গণবিপ্লবের জন্যে মহামতি লেনিনের প্রস্তুতি ও তাঁর আহ্বানে নগণ্য এক 'চিরস্কায়া গ্রামে' প্রৌঢ়া আকুলিনার নেতৃত্বে গণ-জাগরণের ঘটনাকে অত্যন্ত আবেদনপূর্ণ সুসংবদ্ধভাবে গ্রথিত করা তাঁর পক্ষে আদৌ কঠিন হয় নি।

সামগ্রিক অভিনয়ে লিটল থিয়েটার গ্রুপের যে-সুনাম, তা আলোচ্য নাটকাভিনয়েও অক্ষুণ্ণ আছে। ওরই মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন-এর ভূমিকায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাণবন্ত অভিনয়, আকুলিনা বেশে শোভা সেনের অগ্নিগর্ভ দীপ্ত অভিনয়, ধর্মধ্বজী ভণ্ড আফানাসির বিচিত্র রূপসজ্জায় উৎপল দত্তের সিরিও-কমিক অভিব্যক্তি, দারিণার ভূমিকায় জয়া ভট্টাচার্যের গ্রাম্য-মেয়ের প্রেম-ব্যাকুলতা ও শেষে প্রেমিকের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়সংকল্পতা, লিদিয়া ফাতিয়েভা বেশে রমা গুহের লেনিনের একান্ত ভক্ত ও কর্তব্যনিষ্ঠতার অভিনয় এবং ডাক্তার ভরেভুস্কির ভূমিকায় মৃণাল ঘোষের দরদী অভিনয়।

নাটকটির মঞ্চ-উপস্থাপনা, পরিচ্ছদ ও রূপসজ্জা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। নাটকটির দৃশ্য পরিবর্তনের সময়ে এবং আবহ-সঙ্গীত রূপে ব্যবহার করা হয়েছে রুশীয় গান, লোক ও মার্গ কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত। বাংলা নাটকে—তার কাহিনী যে-দেশেরই হোক না কেন—খাঁটি বিদেশী সঙ্গীতের ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। শেকস্‌পীয়ারের 'হ্যামলেট' ডেনমার্কের ঘটনা অবলম্বনে রচিত। কৈ, শেকস্‌পীয়ার তো তাঁর নাটকে ডেনমার্কের সঙ্গীত ব্যবহার করেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' নাটকের গান তো বাংলা-ভাষাতেই রচিত—রাজপুতনার ভাষায় নয়। আকিরা কুরসাওয়া পরিচালিত 'থ্রোন অব ব্লাড' হ্যামলেটের জাপানী সংস্করণ; তাতে না আছে ইংরজী সঙ্গীত, না আছে ডেনমার্কীয় সঙ্গীত। 'লেনিনের ডাক' নাটকের ঘটনোপযোগী কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত রচনা করা কি এতই দুরূহ? চিরস্কায়া গ্রামের প্রান্তে ট্রেন থামিয়ে কর্নেল বুলবার দলকে হত্যা করার দৃশ্যটি শব্দ ও ছায়াপ্রয়োগের ব্যর্থতায় আশানুরূপভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে নি।

মহামতি লেনিন-এর জন্ম-শত-বার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে তাঁর কর্মমুখর জীবনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় অবলম্বনে রচিত এবং অভিনীত 'লেনিনের ডাক' অবশ্যই সার্থক।

নান্দীকরের নতুন নাটক

তিন পয়সার পালা

'তিন পয়সার পালা' নাটক, পালা ও চলচ্চিত্র আঙ্গিকের সমন্বয়ে দর্শকদের চমৎকৃত করবার মত। নাট্যপ্রযোজনায় মহান জার্মান নাট্যকার বেরটোল্ট ব্রেখট যে-নতুন দিগন্তের দিশারী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তারই অনুগামী। এই নাটক ব্রেখটের 'দি থ্রি পেনি অপেরা' অবলম্বনে লেখা। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুণ হল এই যে, তিনি একে একেবারে বাংলা দেশের মাটিতে বসিয়ে স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। কাহিনীর পোশাক বদলের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি যে চরিত্রগুলো দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন তারা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই কলকাতাকেই বেছে নিয়েছিল নিজেদের রঙ্গভূমিরূপে। সিপাহী বিদ্রোহ সবে শেষ হয়েছে। ভ্রষ্টাচারী পুলিশের সঙ্গে যোগসাজসে সমাজ-বিরোধী ডাকাত মহীন্দ্র দোর্দণ্ড প্রতাপে অন্যায়-অবিচার করে চলেছে শহরের বুকে। ডাকাতিকে সে নিয়েছিল ব্যবসারূপে। তাতে রক্ত-ঝরানোর চেয়ে সোজা ছিল রাহাজানি, বলাৎকার, অপহরণ এবং অনাবিধ কুকর্ম। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছিল ভিক্ষুক ব্যবসায়ী যতীন্দ্র পাল। এও তার ব্যবসা। মানুষের দয়াধর্মকে এই ব্যক্তি নিজের ঐহিক মোক্ষের কাজে লাগিয়েছিল বেশ দক্ষতার সঙ্গেই। এদের সহ-অবস্থানে কোন বিঘ্ন হবার কথা ছিল না, যদি ডাকাত মহীন্দ্র ম্যাসেলিয়ায় না আসত ভণ্ড যতীন্দ্রের কন্যা পারুলবালাকে। এর ফলেই মহীন্দ্রের দুর্দিন এবং শেষ পর্যন্ত যতীন্দ্রের দ্বারাই মহীন্দ্র ধরা পড়ল এবং আদেশ হল তার ফাঁসির। কিন্তু ডাকাতি যাদের ব্যবসা তাদের ব্যবসার চেহারা বদল হয়, তারা মরে না। তাই মহীন্দ্রও অলৌকিকভাবে (কারণ তার ত্রাণকর্তা এলেন 'অর্ধেক দেবতা তুমি অর্ধেক পুলিশ' বেশ ধরে) রক্ষা পেল। মহীন্দ্ররা এখনও আছে এবং সমাজে তাদের ব্যবসাও চলছে। এই হল পালার বিষয়বস্তু। একে সঙ্গীত, নৃত্য ও কবিতার সহযোগে উপভোগ্য করে তুলেছেন পরিচালক।

পালাগানসহযোগে নাটকের প্রস্তাবনা থেকেই শুরু এর চমক। নাটককে যথাসম্ভব বাস্তবের কাছাকাছি আনাই ব্রেখটীয় প্রযোজনার বৈশিষ্ট্য। অজিতেশবাবু তাকে বাংলা পালা নাটকের ছাঁচে ফেলে অপূর্ব পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিটি দৃশ্যের ঘোষণাপত্র পরিবেশনেও আছে নতুনত্ব এবং স্বাভাবিক হবার প্রয়াস। দর্শকদের সঙ্গে নিয়ে নাটকাভিনয়ের এই প্রচেষ্টা তাঁর 'তিন পয়সার পালা'কে প্রয়োগনৈপুণ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে প্রতিষ্ঠিত করবে সহজেই। নাটকে বহু পাত্রপাত্রী। ডিটেলের দিকেও প্রযোজকের সতর্ক নজরের পরিচয় পাওয়া যায়। টিম-ওয়ার্কই এ পালার প্রধান গুণ। গানের সুর, কথা এবং পাত্রপাত্রীর রূপ-সজ্জায় উনিশ শতকীয় বণিকী কলকাতার অবক্ষয়ী কালচারের ছাপটি সুন্দর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

মঞ্চাভিনয়াংশে মহীন্দ্ররূপী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শকদের ঘৃণার চেয়ে কৌতূহলই আকর্ষণ করেন বেশী। কারণ মহীন্দ্র তার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন। সে দুর্দান্ত, নিষ্ঠুর কিন্তু ভণ্ড নয়। ললনাপ্রিয় মহীন্দ্রর কাছে মেয়েরা সহজেই ধরা দেয়। সুতরাং সেদিক থেকেও সে পাপবোধে আক্রান্ত হয় না। কারণ জীবন নিয়ে সে জুয়া খেলে। অজিতেশবাবু এই চরিত্রটিকে তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়নৈপুণ্যে খুবই আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। মহীন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনীত চরিত্র হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভিক্ষুকব্যবসায়ী যতীন্দ্রের ভূমিকায় অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দখলে কায়দার বাচনভঙ্গিতে চরিত্রটির ভণ্ডামী খুব সুন্দর ফুটিয়েছেন। তাঁর অভিনয়-দক্ষতা প্রশংসনীয়। মালতীর ভূমিকায় লতিকা বসুও অপূর্ব। পারুলবালা ও লতুর ভূমিকায় কেয়া চক্রবর্তী ও সীমন্তিনী দাস ভালোভাবেই প্রাণসঞ্চার করেছেন তাঁদের অভিনীত চরিত্র দুটিতে। পতিতা জ্যোৎস্নার ভূমিকায় মঞ্জু ভট্টাচার্যের অভিনয়নৈপুণ্য মনে রাখার মত। পুলিশের বড়কর্তা বাঘা কেষ্টর ভূমিকায় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত তাঁর চরিত্রকে সুন্দর ফুটিয়েছেন। নাটকের সংলাপে কৌতুক সৃষ্টির প্রচেষ্টা অনেক আছে এবং তার গুণে মাঝে-মাঝেই নাটকটির দুরন্ত গতিস্রোত উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠেছে। সমাজ-বাস্তবতাকে ভিত্তি করে রচিত এই নাটকে সেকালের দর্পণে আমরা একালেরও মুখ দেখি। এখানেই তিন পয়সার পালার সার্থকতা। ব্রেখটও এভাবেই দেশ-দেশান্তরে মানুষের চেতনাকে শাণিত করেন। 'নান্দীকার' সে পথে অত্যন্ত প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন। —সাংবাদিক

বিবিধ সংবাদ

আমাদের বাল্যকালে বড়দিনের সময়ে সার্কাসের তাঁবু পড়ত গড়ের মাঠে, যাকে আজকাল বলা হয় ময়দান। বোসের সার্কাস, হিপোড্রোম সার্কাস, হার্মিনস্টোন সার্কাস। —ট্রাপিজের খেলা, টাইট রোপের খেলা, প্যারারেল বার, রোমান রিং, ব্যালান্সিং-এর খেলা, সাইকেলের খেলা, বানর-ভালুক-বাঘ-সিংহের খেলা—ঘণ্টা তিনেক ধরে নানা ধরনের উত্তেজক ও রোমহর্ষক খেলার মধ্যে মাঝেমাঝে ক্লাউনের আবির্ভাব ছেলেবুড়ো, পুরুষ-স্ত্রী নির্বিশেষে সকল দর্শককে আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত করে রাখত। এল ইয়োরোপীয় মহাসমর; তার ছায়াপাত ঘটল কলকাতাবাসীর জীবনে। গড়ের মাঠে সার্কাস বা বায়োস্কোপের (আজকাল বায়োস্কোপের নব-নামকরণ হয়েছে সিনেমা) তাঁবু পড়া বন্ধ হয়ে গেল। ১৯১৮র ১১ নভেম্বর যুদ্ধ-সমাপ্তি ঘটলেও কি কারণে জানি না গড়ের মাঠে কোনো রকম তাঁবু পড়া চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল। ১৯২০ থেকে ১৯৩৬-১৯৩৭ পর্যন্ত কলকাতায় শীতকালে সার্কাস এসেছে বটে, কিন্তু তাদের তাঁবু পড়েছে এখন যেখানে দেশবন্ধু পার্ক, সেই-খানে, অথবা মেছে বাজারের মার্কাস স্কোয়ারে কিংবা পার্কসার্কাস ময়দানে। সেই সময়ে আমরা দেখেছি, আগাসী সার্কাস, কার্লেকার সার্কাস, এশিয়ান সার্কাস, কমলা সার্কাস, এবং জর্মানীর কার্ল হেগেনবেক-এর সার্কাস। এই সময়েই আমরা দেখি, রাম-মূর্তি, ভীমভবানী প্রভৃতির দৈহিক শক্তি-জ্ঞাপক বুকের ওপর দিয়ে হাতী বা লোক-ভর্তি গরুরগাড়ী যাওয়া। এবং লোহার চেনের সাহায্যে এক, দুই বা তিনটি মোটর-গাড়ীর গতি প্রতিরোধ করা। এছাড় মোটর-

শ্যামায় জ্যোৎস্না দাস

সাইকেল বা গাড়ীর শূন্যে দিয়ে লম্ফন বা লোহার খাঁচায় দুটি মোটরসাইকেলের দ্রুত-গতিতে পরিবেষ্টন প্রভৃতিও দেখা যায় এই সময়েই। হেগেনবেকের সার্কাসে সীলমাছের বল-ব্যালান্সিং দর্শকদের চমকিত করেছিল। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত কালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আবার সার্কাস বন্ধ থাকে। কিন্তু তারপরে যখন সার্কাস এল, তখন তার তাঁবু পড়ল হাওড়া ময়দান বা ব্রীজ অ্যাপ্রোচে; সেতু পেরিয়ে কলকাতায় আসার আর তার অধিকার রইল না। এরই মধ্যে রাশিয়ান বা চেকোশ্লোভাকিয়ান সার্কাস দলের ছেলেমেয়েরা আমাদের ট্রাপিজের খেলা দেখানো ছাড়াও 'প্লাস্টিক স্কেচ' দেখিয়ে চমকিত করে গেল। কিন্তু শিগগিরই দেখলুম, আমাদের দেশের বাঙালী কেরলীয় মেয়েরা 'প্লাস্টিক স্কেচ' খেলায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে।

ভারত স্বাধীন হবার পরে আবার কলকাতায় সার্কাস দেখানো শুরু হয়েছে কিন্তু গড়ের মাঠের প্রশস্ত ময়দানে আর তাদের তাঁবু পড়তে পায় না, তাদের তাঁবু পড়ে টালাপার্কে, মার্কাস স্কোয়ারে বা পার্কসার্কাস ময়দানে। অথচ গড়ের মাঠের বিভিন্ন অংশে প্রায়ই নানা ধরনের প্রদর্শনী বা এক্‌জিবিসন হয়ে থাকে; এমন কি কয়েক বছর আগে 'আইস রেভ্যু'-এর খেলাও দেখানো হয়েছিল। যাদের ওপর গড়ের মাঠে প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থার জন্য অনুমতি দেবার অধিকার আছে, তাঁদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা, সার্কাসের মতো নির্দোষ প্রমোদ অনুষ্ঠান ওখানে হতে দেবার পথে বাধা কোথায়?

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান সার্কাস ফেডারেশনের (প্রায় কুড়ি-বাইশটি ভারতীয় সার্কাসের কেন্দ্রীয় সংস্থা) কর্তৃপক্ষ কলকাতার সার্কাসের প্রদর্শনী অনুষ্ঠান সংক্রান্ত নানা অসুবিধার কথা সাংবাদিকদের কাছে বিবৃত করেছিলেন। তাঁদের বিবৃতি থেকে জানা যায়, কোনো সার্কাস কর্তৃপক্ষ কলকাতা কর্পোরেশনের অধীন কোনো স্থানে—সে মার্কাস স্কেয়ারই হোক বা টালা কিংবা পার্কসার্কাসের ময়দানই হোক—তাঁবু ফেলবার জন্যে সরাসরি কর্পোরেশনের কাছ থেকে লাইসেন্স পান না। ঐ সব জায়গা নাকি আগে থাকতেই দালাল শ্রেণীর জীব-দের দ্বারা লাইসেন্স নামক অনুমতিপত্র মারফত অধিকৃত হয়ে থাকে। সার্কাস মালিক এই দালালদের কাছ থেকে ঐসব জায়গা বন্দোবস্ত নিতে হয় বিক্রয়ের ৪০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ ভাগ অংশ তাদের দেবার চুক্তি করে। এই ব্যবস্থাই নাকি বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে। কথাটা যে সত্যি তা কবুল করেছেন জেমিনী এবং ইন্টার-ন্যাশনাল সার্কাসের কর্তৃপক্ষ। কর্পোরেশ-নের যে বিভাগ এই লাইসেন্স ইস্যু করেন, তাঁরা কি বলেন? সত্যিই কি তাঁরা দালাল-দের হাতে লাইসেন্স তুলে দেন?

এঁদের দ্বিতীয় অভিযোগ প্রমোদ-কর সম্পর্কে। সত্যি কথা বলতে কি, সার্কাসের মতো সর্বজনের পক্ষে নির্দোষতম এই প্রমোদ অনুষ্ঠানের ওপর প্রমোদ-কর ধার্য করার কোনো যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যায় না। সোভিয়েত রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি সোস্যালিস্ট দেশে সার্কাসকে সর-কার থেকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করবার ব্যবস্থা আছে সার্কাসের উন্নতির জন্যে। এখানেও কর গ্রহণের পরিবর্তে সাহায্য-ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনীয়তা আছে এই সার্কাস-জগতকে আন্তর্জাতিক পট-ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। আশার কথা ইতিমধ্যেই অন্ধ্র, কেরল, মহারাষ্ট্র,

মহীশূর, গুজরাট, তামিলনাড়ু, গোয়া, দিল্লী প্রশাসন প্রভৃতি রাজ্য সার্কাসকে প্রমোদ-কর মুক্ত করেছেন এবং ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক সকল রাজ্য সরকারকে ভারতীয় সার্কাসের ক্রিয়াকলাপকে যথাসম্ভব উৎসাহিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা দেখতে চাই, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় সার্কাস উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করুক।

পশ্চিমবঙ্গ কাগজ ব্যবসায়ী প্রমোদ সমিতি কর্তৃক 'উল্কা' সম্প্রতি রঙমহল মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। দলগত ও একক অভিনয়ে শিল্পীরা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। পরিচালক শ্রীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ কৃতিত্ব যে তিনি নাটকের গতি কোথাও ব্যাহত হতে দেন নি। নাটকের দুটি মুখ্য চরিত্র 'রাজীবনাথ' ও 'অরুণাংশু'র ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীবিজন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরতন দাঁ প্রাণবন্ত অভিনয় করে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পান। ডাঃ সুহৃৎ সরকার-রূপী শ্রীপূর্ণো শীলের অভিনয়ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'সুব্রতের' ভূমিকায় শ্রীঅনিল দাস, 'ভূপের' ভূমিকায় শ্রীগোপাল দাঁ, 'দাদুর' ভূমিকায় শ্রীরামরঞ্জন সিংহ, 'সুবীরের' ভূমিকায় শ্রীপূর্ণেন্দু সুর, 'কমলেশের' ভূমিকায় শ্রীদীনেশ সাহা, 'লিংফু'র ভূমিকায় শ্রীতুলসী মুখোপাধ্যায় ও 'নিরঞ্জানন্দে'র ভূমিকায় শ্রীসন্তোষ শীলের অভিনয়ও চরিত্রোপযোগী সুন্দর হয়। শ্রীদিলীপ দত্তের 'গণেন' নিন্দনীয়। স্ত্রীচরিত্রে দীপালী চৌধুরী, রেবা সেনগুপ্তা ও অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

নয়াদিল্লীর রফি মার্গে মবলংকার থিয়েটারে সম্প্রতি পি সি সরকার তাঁর দলবল নিয়ে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করছেন। প্রথমে ঠিক হয়েছিল এক সপ্তাহ প্রদর্শন চলবে, কিন্তু দর্শকদের দাবীতে এখন ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী চলছে পাঁচ সপ্তাহের ওপর। ২৭ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি স্বয়ং ইন্দ্রজাল প্রদর্শনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মঞ্চে গিয়ে শ্রীসরকারকে একটি পুষ্পস্তবক উপহার দেন।

সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠান 'মঞ্চলেখা' গেল ৩০ জানুয়ারী সন্ধ্যায় 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকা সম্পাদক ও 'মঞ্চলেখা' সম্পাদক শৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তাঁরই বাসগৃহে প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায়কে সঙ্গীত-নাটক আকাদমীর পুরস্কার প্রাপ্তির জন্যে সম্মানিত করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কুমার বিশ্বনাথ রায়। উদ্বোধন করেন 'যুগান্তর' বার্তা-সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন বসু এবং প্রধান অতিথির ভাষণ দেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। নাট্যকার শ্রীরায়ের নাট্যপ্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত, কুমারেশ ঘোষ প্রভৃতি। উত্তরে শ্রীরায় অনুষ্ঠাতাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দেন। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কার্টুনিস্ট রেবতীভূষণের হস্তলিখিত ও তাঁরই দ্বারা সুচিত্রিত মানপত্র শ্রীরায়কে উপহার দেওয়া হয়। সভায় নৃত্য-গীতাদি এবং জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

গত ছাব্বিশে জানুয়ারী হাওড়ার নতুন সাংস্কৃতিক সংস্থা 'দি হাউস অফ্ আর্টস' তাদের প্রথম বছরের মিলনোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। উৎসবে সভাপতিত্ব করেন সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল কবিগুরুর 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের মঞ্চায়ন। অনুষ্ঠান শুরুতে দুটি ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করে আলো দাস ও মালা দাস। পরে অনুষ্ঠিত হয় 'শ্যামা'। নৃত্য ও গীত উভয়দিকেই যথেষ্ট দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দেয় সংস্থার সভ্যরা। প্রধান তিনটি চরিত্র শ্যামা, বজ্রসেন ও উত্তীয়ের সংগীতে অংশ নেন যথাক্রমে পল্টুরাণী দাস, মুরারী বসু ও প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। এঁরা প্রত্যেকেই নাট্যমুহূর্তগুলি তৈরী করতে যথেষ্ট যত্নবান হন। বিশেষভাবে প্রতাপ চন্দ্রের 'মোর জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া' ও মুরারী বসুর 'কি আনন্দ কি আনন্দ' গান দুটির দৃশ্য মনে রাখার মত। নৃত্যে ঐ তিনটি ভূমিকায় ছিলেন শিখা রায়, জ্যোৎস্না দাস ও স্বপ্না চট্টোপাধ্যায়। প্রতিটি গানের সঙ্গে এঁদের নৃত্যভঙ্গিমাও চোখে লাগে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন কুমার অজয়, স্বপ্না চ্যাটার্জি, আলো দাশ, মিতালী দে, মালা দাস, মুক্তিলেখা মুখোপাধ্যায়, সংঘমিত্রা দাস। 'শ্যামা'র এই সফল প্রযোজনার পেছনে অবশ্যই সঙ্গীতপরিচালক সুনীলকুমার দলুই ও নৃত্যপরিচালক কুমার অজয়ের নাম উল্লেখ করতেই হয়। এঁদের যুগ্ম সহযোগিতা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

উত্তর কলকাতার অন্যতম নাট্য-সংস্থা "মন্দিরা" আগামী ৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার বেলা আড়াইটেয় বিশ্বরূপা মঞ্চে তাঁদের নতুন নাটক অমর গঙ্গোপাধ্যায় রচিত "অন্ধকারের আয়না" অভিনয় করবেন। রহস্য-কাহিনীর পটভূমিকায় এটি একটি সমাজসচেতন বক্তব্যমূলক নাটক। নির্দেশনায় আছেন ভবেন্দু ভট্টাচার্য। আবহরচনায়—গৌতম মিত্র ও শ্রীকাশীনাথ। শিল্পীগোষ্ঠীতে আছেন হিমাদ্রি চ্যাটার্জি, কল্যাণ বসু, অজিত মুখার্জি, এনায়েৎ পীর, মোহন ঘোষ, সতু ঘোষাল, তপন মুখার্জি, রবি দাশগুপ্ত, অশোক চ্যাটার্জি, মন্দিরা দাস, মঞ্জুলা মুখার্জি।

উদয় সংঘ (মাহেশ, হুগলী) আয়োজিত ২য় পর্ব পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতার ফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। উৎকর্ষ, উপস্থাপনা, প্রয়োগকলা এবং আংশিক কলাকৌশলের বিচারে যেসব সংস্থা কৃতিত্বের অধিকারী, সেগুলো হল — নান্দনিক, কলকাতা (রজনীগন্ধা), বলাকা, রিষড়া (ঋণী) এবং বেদুইন, কলকাতা (পুরাতন ভৃত্য)। ব্যক্তিগত কৃতিত্বে যাঁরা নৈপুণ্য দেখালেন তাঁরা হলেন — শ্রীরণজিৎ দত্ত (শ্রেষ্ঠ পরিচালক)। শ্রীভীমাচরণ চট্টোপাধ্যায় (শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রথম), শ্রীঅমর ভট্টাচার্য (শ্রেষ্ঠ অভিনেতা দ্বিতীয়), শ্রীপ্রবীরকুমার ঘোষাল (শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তৃতীয়), শ্রীমতী শিপ্রা সাহা (শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রথম), শ্রীমতী শিবাণী ভট্টাচার্য (শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী দ্বিতীয়) এবং শ্রীপার্থ ভট্টাচার্য (শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা)।

গ্রামোফোন কোম্পানীর সম্বর্ধনা সভায় প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর মেনন, পি এন রডি, নির্মলকুমার ঘোষ (এন কে জি), আলি আকবর খাঁ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মাধুরী মুখোপাধ্যায়।

গ্রামোফোন কোম্পানীর উৎসব

গ্রামোফোন কোম্পানীর আমন্ত্রণে গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে পৌঁছে আজব দেশে এলিসের মত তাজ্জব বনে গেলাম। প্রবেশ পথের প্রতিটি বাঁক, করিডরের সজ্জাবৈভবে বিদেশী আবহাওয়ার চমক। কিন্তু ব্যাঙ্কোয়েট হলে পৌঁছে মনে হল সাগরপারের দেশ থেকে যেন আবার বাংলা দেশের মাটিতে পৌঁছলাম।

শিল্পশ্রী-মণ্ডিত সুসজ্জিত ছোট প্যাণ্ডেল যেন পূজো-মণ্ডপে রূপান্তরিত হয়েছে। মাঝখানে দেবী দুর্গার সোনালী রংয়ের দশভুজা মূর্তি—তার সামনে সাজান গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রতীক ছোট ছোট্ট সিলভার ডিস্ক এবং তারই সামনে সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর মূর্তি। ঐ ছখানি রেকর্ড এবার পূজোর হিট সং-এর ছজন শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, লতা মঙ্গেশকার, আশা ভোঁসলে এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে গ্রামোফোন কোম্পানীর তরফ থেকে উপহার দেওয়া হল এবং সরস্বতী মূর্তিটি উপহার দিয়ে অভিনন্দন জানান হয় এবারের শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়করূপে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী মান্না দেকে। ই এম আই ফরেন সার্ভিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ পি এন রডির হাত থেকে শিল্পীরা উপহার গ্রহণ করলেন তুমুল করতালি উচ্ছাস-মুখরতায়। লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, শ্যামল মিত্র অবশ্য উপস্থিত ছিলেন না। তাঁদের হয়ে উপহার গ্রহণ করেন যথাক্রমে গ্রামোফোন কোম্পানীর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভাস্কর মেনন, রেকর্ডিং ম্যানেজার এ সি সেন। উৎসবে উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে সাংবাদিক মহল ত ছিলেনই। এ ছাড়া ছিলেন গ্রামোফোন কোম্পানীর শিল্পীরা। কয়েক মুহূর্তের জন্যও ওস্তাদ আলি আকবরের উপস্থিতি এক অনাবিল আনন্দের কলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে, শিল্পীমহল, সাংবাদিক সকলে বেশ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এই অমায়িক, নিরহংকার শিল্পীর সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলতে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের তখন সদ্য-পিতৃবিয়োগের কারণে অশৌচাবস্থা। তবু মুহূর্তকালের জন্য এসে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন। সকলের নীরব সশ্রদ্ধ দৃষ্টির অভিনন্দন গ্রহণ করে। গ্রামোফোন কোম্পানীর পুরস্কার কতখানি শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি গ্রহণ করেছেন এই উপস্থিতিই তার প্রমাণ। হেমন্তবাবুর হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন সন্তোষ সেনগুপ্ত।

অনুষ্ঠান শুরু হয় শ্রীভাস্কর মেননের ভাষণ দিয়ে। শ্রীমেনন মান্না দে উপহারপ্রাপ্ত অন্যান্য শিল্পী এবং গ্রামোফোন কোম্পানীর অন্যান্য কৃতী শিল্পীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন—এই সব প্রতিভাদীপ্ত শিল্পীদের কণ্ঠ সারা পৃথিবীর রসিকমহলের দরবারে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়ে তিনি গর্ব অনুভব করছেন। আজ গ্রামোফোন কোম্পানী শিল্পীদের অবদান শুধুমাত্র ভারতেই সীমিত নেই। তাঁরা এখন সারা বিশ্বের। এই সত্য অনুভব করার মধ্যেও একটা বিশেষ আনন্দ আছে এবং সেই আনন্দ প্রকাশ করবার তাগিদেই এই উৎসবের অবতারণা। মান্না দে'কে অভিনন্দন জ্ঞাপনকালে গ্রামোফোন কোম্পানীর তরফ থেকে তিনি সগর্বে জানান যে, শ্রীদে'র সঙ্গে কোম্পানীর মধুর সম্পর্ক শুধু আজকের নয়—দীর্ঘ দুই পুরুষব্যাপী প্রলম্বিত। 'কৃষ্ণচন্দ্র দে'র ভক্তিমূলক গান ফিল্ম-সং এবং অন্যান্য গান গ্রামোফোন কোম্পানীর লং-প্লেয়িং ডিস্কে সযত্নে রক্ষিত আছে। এবং তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসাধক ও ভ্রাতুষ্পুত্র মান্না দে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বিচিত্র অবদানে গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গীতের ডালি ভরে দিয়েছেন। আধুনিক গান ছাড়াও ভক্তিমূলক গান, রাগপ্রধান, রবীন্দ্র-সঙ্গীতেও তিনি আপন সুনাম বজায় রেখেছেন। এছাড়া ফিল্মের গান ত আছেই। এসব গান যাতে বিদেশেও সমাদৃত হয় গ্রামোফোন কোম্পানীর তরফ থেকে সে প্রচেষ্টাও করা হবে। শ্রীমেননের পর সুশীল চক্রবর্তী তাঁর আনন্দ ও শ্রদ্ধা জানান শিল্পী ও অতিথিবৃন্দের কাছে। সাংবাদিক মহলের তরফ থেকে শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ এবং শ্রীনির্মলকুমার ঘোষকে (এন কে জি) কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানালে হয়। শ্রীভঞ্জ মান্না দের উপযুক্ত সাঙ্গীতিক পটভূমিকার প্রতি যথাযোগ্য আলোকপাত করেন। শ্রীঘোষ তাঁর সরস এবং কৌতুকদীপ্ত ভাষণে উৎসবের উদ্যোক্তা শ্রীমেননের সঙ্গীতজগতের জন্য অনলস পরিশ্রম ও অকৃপণ অবদানের উল্লেখ করে বলেন—কর্মব্যস্ত বাস্তব জীবনের ধূলি-ধূসরতার আবরণ সরিয়ে দুর্লভ কয়েকটি নিরালা মুহূর্তকে সুধারসে ভরিয়ে তুলে আমাদের মনকে এক আনন্দ-লোকে পৌঁছে দেবার মহৎ কাজে ইনি ব্রতী এবং সেই জন্যই রসিকমহলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। মান্না দের কর্মক্ষেত্র প্রধানত বোম্বেতেই বিস্তৃত এবং সেখানে প্রতিষ্ঠালাভ করলেও তিনি যে বাংলারই সম্পদ সে সত্য সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত করেছেন শ্রীমেনন ও গ্রামোফোন কোম্পানী।

প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও টি পি রায়চৌধুরী আনন্দের সঙ্গে সাংবাদিকমহলকে জানান যে আগামী বসন্তে বন্দনার রেকর্ড প্রস্তুত এবং এবারের একটি বিশেষ উপহার হোল উমা বসু ই পি কেডকৃত চারখানি গানের সংকলন এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের একটি লং-প্লেয়িং রেকর্ড।

অতিথিদের কোম্পানীর তরফ থেকে ধন্যবাদ জানান শ্রী এ সি সেন (রেকর্ডিং ম্যানেজার) ও ভি কে দুবে (এ আর দুবে) আপ্যায়িত করেন টি পি রায়চৌধুরী, প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সেনগুপ্ত, সন্তোষ দে, মিঃ বাসু এবং মিঃ সিং। প্রসেনজিৎ দে কর্মান্তরে কলকাতার বাইরে থাকায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি। এই সর্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন কাজী সব্যসাচী এবং তাঁর রং-ঢালা কণ্ঠস্বরকে উপযুক্ত কাজে লাগাতে তিনি কোন কার্পণ্য করেন নি।

—চিত্রাঙ্গদা

বারবাটি স্টেডিয়ামের সাততলা বাড়ি-ঘর, পাশেই প্যাভিলিয়ন

খেলার কথা

দেখলে হিংসা হয় !

অজয় বসু
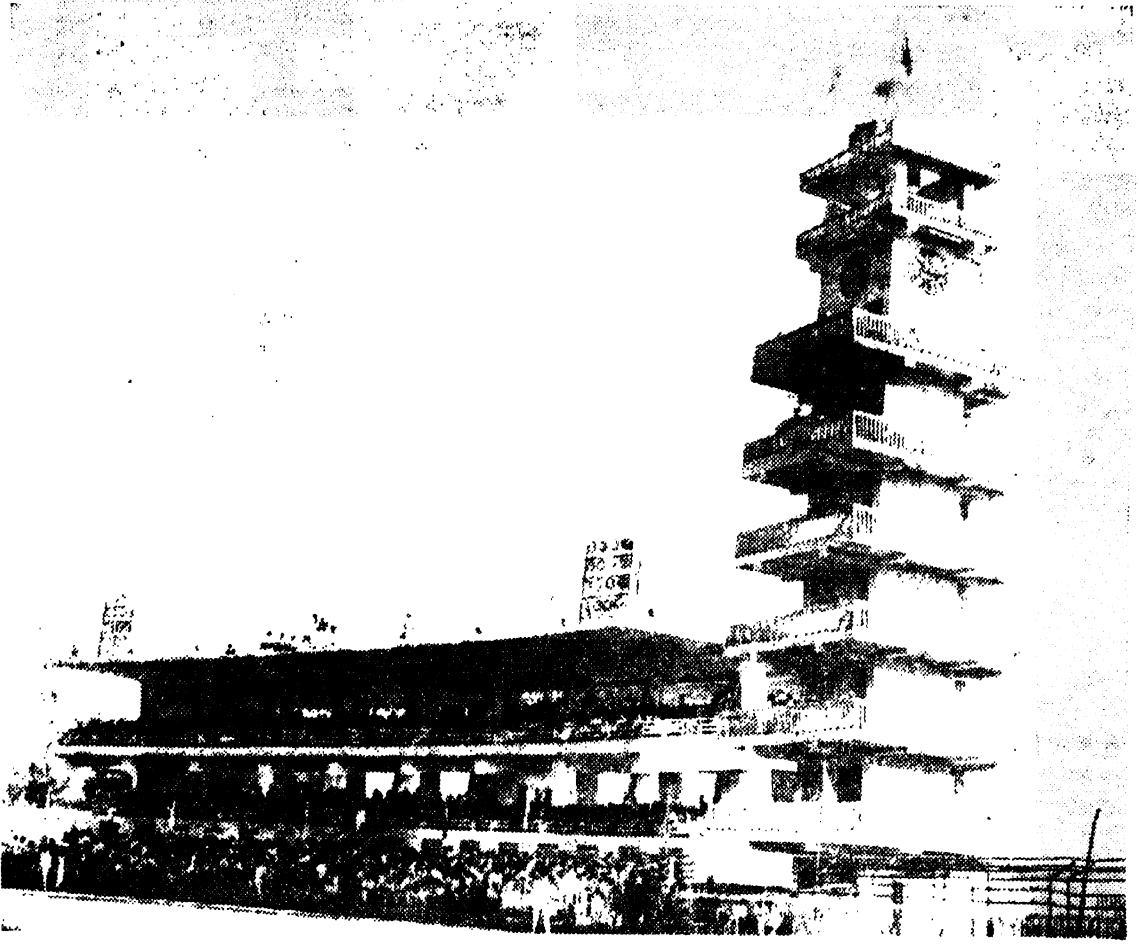
বারবাটি স্টেডিয়ামটি দেখলে হিংসে হয়! সেই সংগে নিজেদের কপাল চাপড়াতে সাধ জাগে। ছোট্ট শহর কটক যা গড়তে পেরেছে, মহানগরী কলকাতার তা নাগালের বাইরে রয়ে গেল। অথচ খেলাধুলো ঘিরে কলকাতায় হাঁকডাকের অন্ত নেই। আঞ্চলিক, জাতীয়, মায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ের। ক্রীড়ানুষ্ঠানের আসর কলকাতাতে তো নিত্যই বসছে। হাজার হাজার দর্শক মাঠে মাঠে হাজিরা দিচ্ছেন। অঢেল টাকা পয়সা এ হাত থেকে ও হাতে ফিরছে। এই সুবাদে মোটা টাকা সরকারের ভাঁড়ারেও জমা পড়ছে। কলকাতায় স্টেডিয়ামের প্রয়োজন প্রতি মুহূর্তেই অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু সে প্রয়োজন মেটাতে তেমন বড়সড় স্টেডিয়াম আর হোলো কই? দেখতে দেখতে অনেককাল অতিক্রান্ত হলো। কিন্তু এতোদিনেও কলকাতার কপাল ফিরলো না!

কলকাতার অনুষ্ঠানে কটকের প্রয়োজন সামান্যই। কারণ, খেলাধুলোর আবেদন ও আকর্ষণ ওড়িষ্যার ওই অঞ্চলের জনজীবনে তেমন ব্যাপকভাবে এখনও ছড়াতে পারে নি, যেমন ছড়িয়ে রয়েছে কলকাতার নগরজীবনে। তবু কটকে একটি স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হয়েছে। যাঁরা গড়েছেন তাঁদের আশা এই যে স্টেডিয়ামটি হাতের সামনে পেয়ে কটকের যুবগোষ্ঠী হয়তো একদিন খেলাধুলো নিয়ে মেতে ওঠার প্রেরণা পাবেন।

বারবাটি ছোট্ট স্টেডিয়াম। কিন্তু সুন্দর। যেন এক নিপুণ শিল্পীর তুলির টানে সাজানো। সারা মাঠ জুড়ে সবুজ ঘাসের মখমল পাতা। এককালে কলকাতার ইডেনের যে সজীব শ্যামলিমা আমাদের চোখে স্নিগ্ধতার কাজল বুলিয়ে দিতো এবং যার অভাবে আজকাল হতশ্রী ইডেনকে দেখলেই আমাদের হাহাকার করে উঠতে হয়, সেই শ্রীমণ্ডিত রূপেই আজ বারবাটির মাঠ রূপবতী।

মাঠের ধারেই ফুল-শয্যা। ফুটন্ত ফুলের রংদার কেয়ারি বৃত্তাকারে সাজানো। তার ওপাশ থেকে সার সার গ্যালারি উঠে গিয়েছে। গ্যালারির সমস্ত [illegible]

আচ্ছাদিত। নিশ্চিন্তে বসে খেলা দেখায় কোনো অসুবিধে নেই। বৃষ্টিতে ভিজতে হয় না। রোদে পুড়তেও নয়।

পাকা গ্যালারি গড়ার সময়েও শিল্পীর শরণাপন্ন হতে হয়েছে। একই ধরণের গ্যালারিতে মাঠের আদ্যোপান্ত ঘিরে রাখা হলে পাছে দর্শকদের একঘেয়েমী জাগে তাই এক একটি গ্যালারির পাশে মাপসই অথচ সুদৃশ্য ভবন বানানো হয়েছে। ক্লাব হাউস, গেট হাউস, প্যাভিলিয়ন, এই সব ভবনের বারান্দাতেও পাতা চেয়ারে বসার জায়গা আছে। এবং অভ্যন্তরে কক্ষক্রীড়ার উপযোগী ব্যবস্থাও রয়েছে। তাছাড়া আরও রয়েছে সাততলা এক ঘড়িঘর। জাতীয় ক্রীড়া উপলক্ষে এই ঘড়িঘরেই অনির্বাণ পূতশিখা রাখা হয়েছিল এবং রাত্রে ঘড়িঘরের গলায় দোলানো হয়েছিল রং বেরংয়ের আলোর মালা।

সব মিলিয়ে বারবাটি স্টেডিয়াম আধুনিক স্থাপত্যকলার এক রুচিস্নিগ্ধ নিদর্শন। এর চেয়ে বড় ও প্রশস্ত স্টেডিয়াম অন্য দেশে নিশ্চয়ই অনেক আছে। কিন্তু এমন সুদৃশ্য এবং সর্বাঙ্গ ছাদে ঢাকা ক্রীড়াঙ্গন অন্য দেশেও খুব বেশি নেই। তাছাড়া অমন ঘন সবুজের সমারোহই বা অন্য দেশ পাবে কোথা থেকে। যে মাটি এমন সবুজের উৎস সে যে পুণ্য ভারতভূমিই।

বারবাটি ওড়িষ্যার গর্ব। ভারতেরও গর্বের ধন।

ওই অঞ্চলে পুরানো আমলে একটি কেল্লা ছিল। ১৭৪৭ খৃস্টাব্দে এই দুর্গ মারাঠাদের হাতে চলে যায়। ১৮০৩ খৃস্টাব্দে ইংরেজ তা অধিকার করে নেয়। কেল্লার সামনে পরিখা। পরিখাটি আজও আছে। কিন্তু দুর্গটি ভেঙে গিয়েছে। সামান্য ধ্বংসাবশেষ তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উঠেছে একালের মনোরম ক্রীড়াঙ্গন। যা ধ্বসে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে তারও ওপর ভর রেখেই একালের নয়নাভিরাম কাঠামোটি গড়ে উঠেছে। পুরানো কাঠামো হারিয়ে ফেলার শোক নতুনকালের ঐশ্বর্য ভুলিয়ে দিতে পেরেছে।

সবচেয়ে বড়কথা, বারবাটি স্টেডিয়াম নির্মিত হয়েছে পুরোপুরি বেসরকারী কর্মোদ্যমেই। জমি দিয়ে এবং নেপথ্যে থেকে ওড়িষ্যা সরকার পরোক্ষে সাহায্য করলেও ওড়িষ্যা ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পরিকল্পনারই প্রত্যক্ষ ফল এই স্টেডিয়াম। প্রায় বিশ বছরের চেষ্টায় ওড়িষ্যা ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ শেষ করতে পেরেছেন।

এই বিশ বছরে খরচ পড়েছে প্রায় পচাত্তর লক্ষ টাকা। বারবাটি র‍্যাফেল বা লটারির মাধ্যমে এই টাকা সংগৃহীত হয় এবং আরও বাড়তি টাকা ওড়িষ্যা ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের তহবিলে জমা পড়ে। তবে লটারি আরম্ভ হয়েছিল কাজে হাত দেবার অনেক পরে। বিশেষ কোনো পুঁজি যখন ছিল না তখনই ওড়িষ্যা ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁদের সাহস ও কর্মোদ্যগ, দুই-ই আদর্শস্থানীয় ওঁরা অন্যদের সামনে এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছেন। আর্থিক সঙ্গতি থাক বা না থাক্, কাজ করার ইচ্ছেটাই বড়। সে ইচ্ছে থাকলে টাকা-পয়সার অনটনের বাধা জয় করা যায় ওড়িষ্যা ওলিম্পক অ্যাসোসিয়েশন তা বুঝিয়ে ছেড়েছেন।

ওড়িষ্যা ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে কলকাতা কি সত্যিকারের শিক্ষা পেতে পারে না? কলকাতায় স্টেডিয়াম হবে, একথা তো আমরা প্রায় চল্লিশ বছর ধরে শুনে আসছি। ইংরেজ আমল থেকে যুক্তফ্রন্টের যুগ পর্যন্ত সরকারী-বেসরকারী রঙিন আশ্বাস ও গালভরা প্রতিশ্রুতি শুনতে শুনতে আমাদের কানে তালা ধরে গেল। কিন্তু প্রস্তাবিত বড় স্টেডিয়াম গড়ায় একখানি ইঁটও আজ পর্যন্ত যোগাড় করা গেল না। কেন?

এই কেনর উত্তর দিবালোকের মতো স্পষ্ট। আসলে স্টেডিয়াম গড়ায় কলকাতার ইচ্ছে ও আন্তরিকতা নেই। থাকলে কলকাতা ওড়িষ্যা ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মতো একটি উপায় খুঁজে বার করতো নিশ্চয়ই। তবে শুধু ইচ্ছে, আন্তরিকতার অভাবই বুঝি সব নয়, কলকাতার হৃদয় বলেও বুঝি কিছু নেই। এই স্টেডিয়ামের অভাবে জনসাধারণ ভুগছে, টিকিটের চোরাকারবার প্রশ্রয় পাচ্ছে, এমনকি ছ-ছজন তরুণের তাজা রক্তে মাঠে ঢোকার প্রবেশ পথও ভিজে যাচ্ছে। তবুও কলকাতা জাগছে না। সর্বনেশে দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পরক্ষণেই স্টেডিয়াম, স্টেডিয়াম বলে কিছুটা সোরগোল উঠেছিল। কিন্তু তারপরই সেই সাবেকী নিস্তব্ধতা ও নিষ্ক্রিয়তা।

বারবাটিকে দেখেই কি কলকাতা তার লজ্জা নিবারণে প্রেরণা পাবে না? পশ্চিম বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রী জাতীয় ক্রীড়ার সময় স্বচক্ষে বারবাটিকে দেখার পর সেই পুরানো আশ্বাসকে মুখের কথায় চাঙ্গা করে তুলতে চেয়েছেন বটে। কিন্তু না আঁচালে কি কলকাতা বড়সড় স্টেডিয়াম পাবে বলে বিশ্বাস করতে পারবে?
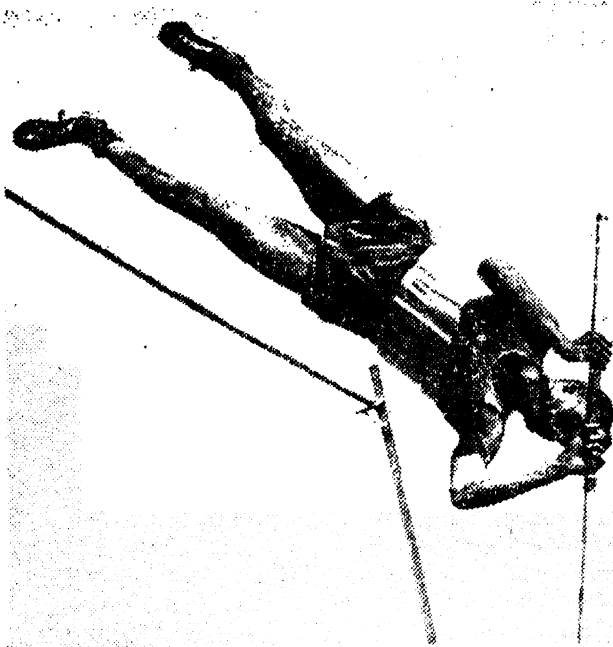
বারবাটি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়ায় উত্তর প্রদেশের আর এল পান্ডে ৪·১০ মিটার উচ্চতা অতিক্রম করছেন।

দর্শক

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা

আগামী মে মাস থেকে মেক্সিকোতে ৯ম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার (জুলে রিমে কাপ) আসর বসছে। প্রথমে ১৬টি দেশকে নিয়ে লীগ প্রথায় খেলা হবে। লীগ পর্যায়ের খেলা ৪টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গ্রুপে খেলবে চারটি করে দেশ এবং প্রতি গ্রুপের লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দলকে নিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনাল খেলার তালিকা তৈরী হয়েছে। কোয়ার্টার-ফাইনাল থেকেই নকআউট পর্যায়ের খেলা সুরু।

লীগ, কোয়ার্টার-ফাইনাল এবং সেমি-ফাইনাল খেলার তালিকা নীচে দেওয়া হল:

লীগ খেলার তালিকা

গ্রুপ ১ঃ রাশিয়া, মেক্সিকো, বেলজিয়াম এবং এল সালভেডর

জুলে রিমে কাপ

কটকের বারবাটি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ২৪তম জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে পুরুষদের সটপুটে প্রথম স্থান অধিকারী এবং নতুন রেকর্ড স্রষ্টা (১৭ মিটার দূরত্ব) যোগীন্দর সিং (সার্ভিসেস) তাঁর সমর্থকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে দণ্ডায়মান।

গ্রুপ ২ঃ উরুগুয়ে, ইতালী, সুইডেন এবং ইসরাইল

গ্রুপ ৩ ঃ রুমানিয়া, ইংল্যান্ড, চেকোশ্লো-ভাকিয়া এবং ব্রেজিল।

গ্রুপ ৪ ঃ পেরু, পশ্চিম জার্মানী, বুল-গেরিয়া এবং মরক্কো।

কোয়ার্টার ফাইনাল

(ক) ২নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান বনাম ১নং গ্রুপের রানার্স-আপ।

(খ) ১নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান বনাম ২নং গ্রুপের রানার্স-আপ।

(গ) ৩নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান বনাম ৪নং গ্রুপের রানার্স-আপ।

(ঘ) ৪নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান বনাম ৩নং গ্রুপের রানার্স-আপ।

সেমি-ফাইনাল

বিজয়ী 'খ' বনাম বিজয়ী 'ঘ'
বিজয়ী 'ক' বনাম বিজয়ী 'গ'

লীগ খেলার তালিকা পেয়ে অনেক দেশ যেমন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে তেমনি অনেকের মাথায় দুশ্চিন্তার বোঝা ভারী হয়েছে। গতবারের জুলে রিমে কাপ বিজয়ী **ইংল্যান্ড খেলবে ৩নং গ্রুপে।** সেখানে তাদের **প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রেজিল,** চেকোশ্লোভাকিয়া এবং রুমানিয়া। ইংল্যান্ড গত বছরের ল্যাটিন আমেরিকান সফরে **১-২ গোলে ব্রেজিলের কাছে হেরেছিল।** এ পর্যন্ত ব্রেজিলের বিপক্ষে ইংল্যান্ড সাতবার খেলে মাত্র একবার জিতেছে। বিশ্ব ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতায় **এই দুই দেশের গত দুবারের খেলার ফলাফল—১৯৫৮ সালে সুইডেনে গোল-শূন্য অবস্থায় খেলা ড্র এবং ১৯৬২ সালে** চিলিতে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় ব্রেজিলের ৩-১ গোলে জয়। সুতরাং মানসিক দিক থেকে ব্রেজিল সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। বিশ্ব ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতায় রুমানিয়া কিম্বা চেকোশ্লোভাকিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ড কখনও খেলেনি। ইংল্যান্ড ৩নং গ্রুপে রানার্স-আপ হলে মোটেই অখুশী হবে না—অবস্থাটা এখন এরকমই দাঁড়িয়েছে। লণ্ডনের বাজীর ব্যবসায়ীরা দরের তালিকায় ব্রেজিলকেই ভাবী চ্যাম্পিয়ান হিসাবে অগ্রাধিকার দিয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রেখেছে ইংল্যান্ডকে।

অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা

প্রথম টেস্ট খেলা

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ৩৮২ রান (এডি বার্লো ১২৭ এবং আলি বেচার ৫৭ রান। ম্যালেট ১২৬ রানে ৫ উইকেট)

ও ২৩২ রান (জি পোলক ৫০ রান। কনোলী ৪৭ রানে ৫ এবং গ্লিসন ৭০ রানে ৪ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া ঃ ১৬৪ **রান** (ওয়ালটার্স ৭৩ রান। পিটার পোলক ২০ রানে ৪ উইকেট)

ও ২৮০ রান (লেরী ৮৩ এবং রেডপাথ নট আউট ৪৭ রান। প্রোকটার ৪৭ রানে ৪ এবং চেভেলিয়ার ৬৮ রানে ৩ উইকেট)

কেপটাউনে অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম বেসরকারী টেস্ট খেলায় **দক্ষিণ আফ্রিকা** সফরকারী **অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট** দল ১৭০ রানে পরাজিত হয়েছে।
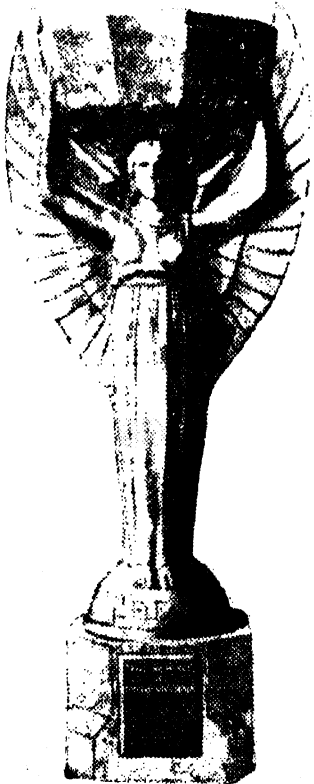
দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে এই জয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস মাত্র ১৬৪ রানের মাথায় শেষ হলে দক্ষিণ আফ্রিকা ২১৮ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৬ উইকেটের বিনিময়ে ১৭৯ রান সংগ্রহ করে ৩৯৭ রানে এগিয়ে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক আলী বিচার অস্ট্রেলিয়াকে ফলো-অন করতে বাধ্য করেন নি।

চতুর্থ দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংস ২৩২ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলার বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ১৮১ রান সংগ্রহ করে। খেলার এই অবস্থায় তারা দক্ষিণ আফ্রিকার থেকে ২৬৯ রানের পিছনে ছিল। এদিকে হাতে জমা ছিল ৫টা উইকেট এবং একদিনের পুরো খেলা।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের তিন ঘন্টা আগে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ২৮০ রানের মাথায় শেষ হলে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৭০ রানে জয়ী হয়।

ভিজি ক্রিকেট ট্রফি

উত্তরাঞ্চল : ৭২ রান (আর শুক্লা ২৫ রান। প্রলয় চেল ৩৫ রানে ৭ এবং দিলীপ দোসী ৭ রানে ৩ উইকেট) ও ১৩৩ রান (ভি লাম্বা ৭৫ রান। দিলীপ দোসী ১৮ রানে ৬ এবং এস মুখার্জি ১৯ রানে ২ উইকেট)

পূর্বাঞ্চল : ২২৬ রান (পি চেল ৬০ এবং সুব্রত মুখার্জি ৫৬ রান। শুক্লা ৬৩ রানে ৪ এবং মদনলাল ৬৬ রানে ৪ উইকেট)

রাইপুরের ইউনিভার্সিটি স্টেডিয়ামে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে পূর্বাঞ্চল দল এক ইনিংস এবং ২১ রানে উত্তরাঞ্চল দলকে পরাজিত করে ভিজি ট্রফি জয়ী হয়েছে। চারদিনের বরাদ্দ খেলা দ্বিতীয় দিনেই শেষ হয়ে যায়।

প্রথম দিনে লাঞ্চের আগেই উত্তরাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ৭২ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলার বাকি সময় পূর্বাঞ্চল দল ৭ উইকেটের বিনিময়ে ১৮৪ রান সংগ্রহ করে ১১২ রানে এগিয়ে যায়। পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংসের খেলায় চেল এবং অধিনায়ক সুব্রত মুখার্জির ৫ম উইকেটের জুটিতে ৭৬ রান সংগৃহীত হয়েছিল। প্রথম ইনিংসের খেলায় উত্তরাঞ্চল দলকে কাহিল অবস্থায় ফেলেছিল প্রধানতঃ চেলের বোলিং (৩৫ রানে ৭ উইকেট)। দ্বিতীয় দিনে পূর্বাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস লাঞ্চের এক ঘন্টা আগে ২২৬ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ১৫৪ রানে এগিয়ে যায়। উত্তরাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ১৩৩ রানের মাথায় শেষ হলে পূর্বাঞ্চল দল এক ইনিংস এবং ২১ রানে জয়ী হয়।

মাইকেল ফেরিরা (মহারাষ্ট্র) জাতীয় বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ান

সেমি-ফাইনালে পূর্বাঞ্চল দল ১১৭ রানে পশ্চিমাঞ্চল দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে উত্তরাঞ্চল দল ৩৮ রানে দক্ষিণাঞ্চল দলকে পরাজিত করে ফাইনালে পূর্বাঞ্চল দলের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল।

জাতীয় বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতা

কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে আয়োজিত ১৯৬৯ সালের জাতীয় বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতার ফাইনালে মহারাষ্ট্রের মাইকেল ফেরীরা ৩৩০৭—৩০৫৭ পয়েন্টে গতবারের জাতীয় বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ান সতীশ মোহনকে (গুজরাট) পরাজিত করেছেন। ফেরীরার পক্ষে এই প্রথম জাতীয় বিলিয়ার্ডস খেতাব জয়। গত ৯ বছরের চেষ্টায় তিনি ৩বার ফাইনাল উঠেছিলেন।

জাতীয় স্নুকার চ্যাম্পিয়ানসীপ

কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে আয়োজিত ১৯৬৯ সালের জাতীয় স্নুকার প্রতিযোগিতার ফাইনালে মহারাষ্ট্রের ১নং খেলোয়াড় শ্যাম শ্রফ রেলওয়ের ২নং খেলোয়াড় অরবিন্দ শাভুরকে পরাজিত করে চতুর্থবার জাতীয় স্নুকার খেতাব পেলেন। তিনি ইতিপূর্বে জাতীয় স্নুকার প্রতিযোগিতায় খেতাব পেয়েছেন ১৯৬৪, ১৯৬৫ এবং ১৯৬৭ সালে। ১৯৬৬ সালের ফাইনালে তিনি পরাজিত হন এবং ১৯৬৮ সালের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন নি। শ্রফ ১৯৬৯ সালের জাতীয় স্নুকার খেতাব জয়ের সূত্রে স্কটল্যান্ডে আসন্ন বিশ্ব অপেশাদার স্নুকার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করেছেন।
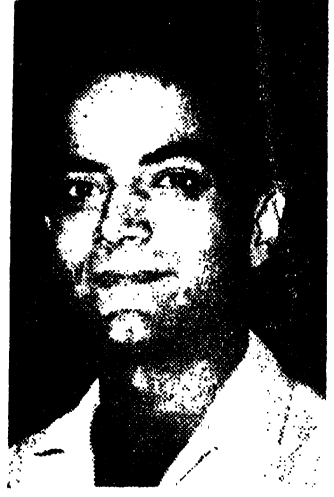
শ্যাম শ্রফ (মহারাষ্ট্র) জাতীয় স্নুকার চ্যাম্পিয়ান

অস্ট্রেলিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৭০ সালের অস্ট্রেলিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন আমেরিকার নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার অ্যাস এবং মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব অস্ট্রেলিয়ার শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট। এখানে উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে নিগ্রো খেলোয়াড়ের পক্ষে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয় এই প্রথম এবং প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের যোগ্যতার বাছাই তালিকায় অ্যাসের স্থান ছিল চতুর্থ। শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (কুমারী জীবনে স্মিথ) এই নিয়ে আলোচ্য প্রতিযোগিতায় ৯বার মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেলেন।

হুগলী জেলা রাইফেল স্যুটিং প্রতিযোগিতা

হুগলী জেলা ৬ষ্ঠ বার্ষিক রাইফেল স্যুটিং প্রতিযোগিতায় কলকাতার তিনটি আঞ্চলিক রাইফেল স্যুটিং সংস্থা (নর্থ, সাউথ এবং সেন্ট্রাল), শ্রীরামপুর, হুগলী, বৈদ্যবাটি শেওড়াফুলি, কৃষ্ণনগর, কালনা, পুলিশ, হোমগার্ড এবং এন সি সির প্রায় ১০৩জন লক্ষ্যাবিদ অংশগ্রহণ করেছিলেন। চারদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান অমিতাভ চ্যাটার্জী ২৬টি পদক (স্বর্ণ১৮, রৌপ্য৭ ও ব্রোঞ্জ১) জয়ের সূত্রে এবারও চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। তাঁর পরই পদক জয়ের তালিকায় সৌমেনকান্তি সেন এবং গীতা রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সৌমেনকান্তি সেনের সংগৃহীত পদকের সংখ্যা ১৬টি (স্বর্ণ১৩, এবং ব্রোঞ্জ৩) এবং গীতা রায়ের ৯টি (স্বর্ণ১, রৌপ্য৪ ও ব্রোঞ্জ৪)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ
২য় খণ্ড

২৭শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 14th Nov. 1969 শুক্রবার, ২৮শে কার্তিক, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৮৪	চিঠিপত্র		
৮৬	সাদা চোখে		—শ্রীসমদর্শী
৮৮	দেশেবিদেশে		
৯০	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফী খাঁ
৯১	সম্পাদকীয়		
৯২	সাহিত্যিকের চোখে		—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৪	টান	(গল্প)	—শ্রীচিত্রা সেনগুপ্ত
১০৩	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ংকর
১০৭	বইকুণ্ঠের খাতা		—বিশেষ প্রতিনিধি
১০৯	অন্ধকারের মুখ	(উপন্যাস)	—শ্রীদেবল দেববর্মা
১১৪	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৬	তাঞ্জাম	(উপন্যাস)	—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
১১৯	মানুষগড়ার ইতিকথা		—শ্রীসন্ধিৎসু
১২৮	নক্ষত্র-নিলীন অন্ধকার	(কবিতা)	—শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়
১২৮	শূন্য উদ্যানের মতো	(কবিতা)	—শ্রীজয়শ্রী চক্রবর্তী
১২৫	ডিপ্লোম্যাট		—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
১২৯	নিজেরে হারায়ে খুঁজি	(স্মৃতিচিত্রণ)	—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
১৩৪	মাছ	(গল্প)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
১৩৭	রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা	চিত্রকল্পনা	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
		রূপায়ণে	—শ্রীচিত্র সেন
১৩৮	কুইজ		
১৩৯	কোয়েলের কাছে	(উপন্যাস)	—শ্রীবুদ্ধদেব গুহ
১৪৩	অংগনা		—শ্রীপ্রমীলা
১৪৪	বেতারশ্রুতি		—শ্রীশ্রবণক
১৪৬	নাট্যসাধা মন্মথ রায়		—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়
১৪৯	বিতর্কিত আলোচনা		—শ্রীদেবব্রত দে
১৫০	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
১৫৫	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
১৫৭	চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে		—শ্রীঅজয় বসু
১৫৮	খেলাধুলো		—শ্রীদর্শক
১৬০	দাবার আসর		—শ্রীগজানন্দ বোড়ে

প্রচ্ছদ : শ্রীমানব বড়ুয়া

সাদা চোখে

রাজনীতিতে অনেক সময় অভাবনীয় অসংস্থ ঘটনা ঘটে। যতই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, কোথাও যেন একটু কিন্তু থেকে যায়। ফলে, ঘটনার পরিণতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে একেবারে যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। মানুষের কর্মকাণ্ডের মধ্যে মানসিকতার প্রতিফলন নিশ্চয়ই থাকে কিন্তু মনের পুরো চিত্র তাতেও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না। ঠিক বাংলা কংগ্রেসের জন্ম-সন্ধিক্ষণেও একথা পুরোপুরিভাবে আলোকপ্রাপ্ত হয়নি সেদিন যখন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামীরা কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়ে বা কংগ্রেস ত্যাগ করে নতুন দল গড়েছিলেন। বাংলা কংগ্রেস তাঁদের সেই শুভ জন্মলগ্নেও পরিষ্কার করে বলতে পারে নি কি আদর্শ নিয়ে তাঁরা রাজনীতির সমুদ্রে পাড়ি জমাবেন। শুধু আবছা আবছা গান্ধীবাদের কথা বলেই বাংলা কংগ্রেস পথ চলা শুরু করেছিল। আর অস্ত্র হিসেবে সঙ্গে ছিল নিদারুণ কংগ্রেস বিদ্বেষ বা শ্রীঅতুল্য ঘোষ চালিত গোষ্ঠীচক্রের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও আপোষহীন সংগ্রামের শপথ।

কংগ্রেস নেতৃত্বের অবমাননা ও লাঞ্ছনার প্রতিশোধ শ্রীঅজয় মুখার্জি ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পরই নিয়েছিলেন। কংগ্রেসকে শুধু গদীচ্যুত করেছিলেন তা নয়—কংগ্রেস দলের মধ্যে সেদিন যে ভাঙনের সূত্রপাত করেছিলেন, কালে তা সম্পূর্ণ হয়েছে। অন্তর্দলীয় কোন্দলে জর্জরিত কংগ্রেস এখন প্রায় ভগ্নপ্রায়। একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার বংশের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ার পর যেমনটি ঘটে কংগ্রেসেরও বর্তমানে প্রায় সেই দশা হয়েছে। যা হোক বাংলা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কি, মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময়ও তা পরিষ্কারভাবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়নি। চৌদ্দ শরিকের সঙ্গে সমঝোতা করে সেদিনও বাংলা কংগ্রেস নেতৃত্ব শুধু একথায় প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে কংগ্রেসের দিন ফুরিয়ে গেছে। তার বিকল্প হচ্ছে ফ্রন্ট এবং এই যুক্তফ্রন্টই হতাশাগ্রস্ত পশ্চিমবাংলার জনজীবনে নতুন আশার আলো জ্বালাতে পারবে।

বাংলা কংগ্রেসের জন্মলগ্নের পর থেকে দলের কোন রাজনৈতিক সম্মেলন হয়নি। যে অস্বচ্ছ ভাবধারা বাংলা কংগ্রেসের কর্মীদের মনে উঁকিঝুঁকি মারছিল তা গত ১ ও ২ নভেম্বরের বাঁকুড়া সম্মেলনের পরও যথাযথ পরিষ্কার হয়নি। কারণ বাঁকুড়া সম্মেলনে কিছু প্রস্তাব পাশ করা হলেও কোন রাজনৈতিক বক্তব্য সেখানে সংযোজিত ছিল না যাতে বাংলা কংগ্রেসের বাস্তব রাজনৈতিক অবয়ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

তবে শ্রীঅজয় মুখার্জির দেড় ঘণ্টাব্যাপী প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা কেউ যদি শুনে থাকেন তবে নিশ্চয় তিনি বলবেন বাংলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক মত ও পথ এই ভাষণ থেকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা গেছে। শ্রীমুখার্জি তাঁর দীর্ঘ ভাষণে গান্ধীবাদের সঙ্গে অন্যান্য মতবাদের পার্থক্য কোথায়, সেকথা বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে বোধ হয় এই প্রথম অন্যান্য আদর্শকে প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ করলেন। শ্রীমুখার্জি বাঁকুড়ার সেই বিরাট জনসভায় দৃঢ়তার সঙ্গে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে মার্কসবাদ লেনিনবাদ বর্তমান দুনিয়ার রোগ সারাতে সম্পূর্ণ অক্ষম। শুধু তাই নয় যে বাংলা কংগ্রেস সম্মেলনে বিশেষ করে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপের সমালোচনা তীব্র আকার ধারণ করেছিল, শ্রীমুখার্জি কিন্তু তাঁর জনসভার ভাষণে সাধারণভাবেই কম্যুনিস্ট আদর্শের বিরুদ্ধে একটি প্রত্যয়পূর্ণ সংগ্রাম ঘোষণা করলেন। সেখানে বাম-ডানের পার্থক্য টেনে এনে শ্রীমুখার্জি কোন চাতুর্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি।

গান্ধীবাদ ভাল কি খারাপ তার গুণাগুণ বিচার করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বক্তব্য হচ্ছে—বাংলা কংগ্রেস রাজনৈতিক দল হিসেবে নিজেকে এতদিন চিহ্নিত করে আসলেও দলের সঠিক রাজনৈতিক বক্তব্য ও কর্মধারা কি তা কোনদিন সুস্পষ্টভাবে জনসমক্ষে উপস্থিত করা হয় নি। আগেই বলেছি হাজার বক্তৃতা করলেও ফাঁক একটু থেকে যায়। কাজেই মানসিকতার সম্যক চিত্র পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। সেদিন শ্রীমুখার্জির অন্যান্য যুক্তফ্রন্ট শরিকদের প্রতি এই আদর্শগত আক্রমণ সত্যিই অভাবনীয়। দলের সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনের বক্তৃতা করছিলেন বলে হয়ত এই বক্তব্যের একটা অর্থ খুঁজে বার করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে শ্রীমুখার্জি ও পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের কর্ণধার এবং সর্বোপরি মুখ্যমন্ত্রী। এই দায়িত্বপূর্ণ পদগুলি অলংকৃত করবার মাধ্যমে গত আট মাসে তাঁর যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর ভাষণের সুর বিশ্লেষণ করলে মনে হয় তাঁকে গান্ধীবাদের প্রতি আরও অধিকতর আস্থাশীল করে তুলেছে। আগস্ট বিপ্লবের নায়ক তমলুকের সেই বিখ্যাত 'দাদাবাবু' যখন '৪২ সালের সেই বীরত্বপূর্ণ কাহিনীগুলি রোমন্থন করে মানুষের অসম সাহস ও দেবত্ব লাভের ছবি আঁকছিলেন তখন বাঁকুড়ার শীতের আমেজমাখা সন্ধ্যায় সেই বিস্তৃত ময়দানে বিপুল নরনারী স্পন্দনহীন চিত্তে তন্ময় হয়ে উঠেছিল। শ্রীমুখার্জি কোনদিন এমনিতর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেছেন কিনা কিম্বা আদৌ করতে পারেন কিনা সমদর্শীর তা জানা নেই।

শ্রীঅজয় মুখার্জির এই ভাষণে ছিল কম্যুনিস্ট আদর্শের বিফলতার কথা। রুশ-চীন সীমান্তবিরোধের ঘটনা উল্লেখ করে বলেছিলেন, যাঁরা আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নে সোচ্চার হয়ে ওঠেন সেই দুই কম্যুনিস্ট দেশ নিজেদের সীমানা সম্বন্ধে কি নির্লজ্জভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সমস্ত বক্তব্যের পেছনে শ্রীমুখার্জির যে চাপা ক্ষোভের আভাস ছিল তা পশ্চিমবাংলার শরিকী লড়াই-এর মর্মান্তিক পরিণতি। ব্যঙ্গ করে সেদিন শ্রীমুখার্জি বলেছিলেন—কি বাম, কি ডান দুই কম্যুনিস্ট দলই সগর্বে বলেন তাঁরা শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাসী। অতএব তাঁদের একমাত্র শত্রু ধনিক-শ্রেণী। আর এই ধনিক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াই চলছে চলবে। সেই একই ব্যঙ্গ-ব্যঞ্জক কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত করতালি ধ্বনির মধ্যে শ্রীমুখার্জি জিজ্ঞাসা করেন—অদ্যাবধি কজন মালিক পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্টদের ধর্মযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন? গরীব মানুষগুলোকে মেরেই শ্রেণী-সংগ্রাম করা হচ্ছে। সোনারপুরের তিনটি চাষীর মৃত্যুর ঘটনা শ্রীমুখার্জি উল্লেখ করেন।

এই সমস্ত বক্তব্য পেশ করার পটভূমিকায় শ্রীমুখার্জির মনে এ কথাও বারবার হয়ত নাড়া দিচ্ছিল এই নরহত্যার রাজনীতিকে রুখতেই হবে। তাই বোধ হয় বার বার শ্রীমুখার্জি গান্ধীবাদের আদর্শের আলোচনা করে আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধ করবার দুর্জয় সংকল্প কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। যাহোক, সেদিন শরিকী সংঘর্ষে কাতর মুখ্যমন্ত্রীর যে বেদনাহত মনের পরিচয় বাঁকুড়াবাসী পেয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে শ্রীঅজয় মুখার্জি আর একবার পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করবেন। এবং তারই পটভূমিকা হিসাবে তিনি পুরোপুরিভাবে আদর্শগত লড়াই-এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন মাত্র।

শ্রীমুখার্জির বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শ্রীসুশীল ধাড়ার ভাষণের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করা গেছে। শ্রীধাড়া সরাসরি প্রশ্ন

উত্থাপন করে বলেছেন, যদি গরীবের গৃহদাহ, নারীর অবমাননা আর লুঠ-তরাজ বিপ্লব হয় তবে সেই 'বিপ্লব রুখব'। শ্রীধাড়ার মধ্যেও ছিল অসম্ভব আত্মবিশ্বাস আর তেজোদৃপ্ত শৌর্যের বহিঃপ্রকাশ। ৬০ বৎসর বয়স্ক শ্রীধাড়ার বক্তৃতা সেদিন যেন ঠিক আগস্ট বিপ্লবে বিদ্যুৎ বাহিনীর সর্বাধিনায়কের রণ-হুংকারের মতই শোনাচ্ছিল। বাংলা কংগ্রেস ফ্রন্টে থেকেও এক নতুন পথের নিশানা দিল।

যদিও বা বাংলা কংগ্রেসের সম্মেলন থেকে একটি কোন সুস্পষ্ট চিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। কিন্তু নেতাদের ভাষণ থেকে ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদের সঙ্গে মত ও পথের পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে। সম্মেলন হিসাবে বাংলা কংগ্রেসের সাফল্য মূল্যায়ন করলে জমার খাতায় হয়ত কিছু লেখা যাবে না। কারণ, সম্মেলনে প্রতিনিধিদের আলোচনা থেকে এই কথা বোঝা গেছে যে তাঁদের অনেকের মধ্যে হয়ত আন্তরিকতার অভাব নেই কিম্বা দেশমঙ্গল করবার অকৃত্রিম বাসনারও সীমাহীন আকুলতা রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় অভাব যেটা পরিলক্ষিত হয়েছে তা হচ্ছে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব। মত ও পথ সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং চলমান সমাজের বাস্তব মূল্যায়ন ও তার পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় কর্তব্য নির্ধারণের আগ্রহ। অনেক সময়েই প্রত্যক্ষ করা গেছে একটা কিছু করার জন্য অত্যধিক বিচলিত। কিন্তু তা কোন পথে সাকার হয়ে ওঠে সেই নিশানা অজ্ঞাতেই থাকে। এদিক থেকে চিন্তা করলে বাংলা কংগ্রেস সম্মেলন মোটেই সাফল্যলাভ করেনি। তবে 'অন্যায়ের' বিরুদ্ধে লড়তে হবে এই একটি প্রশ্নেই একটি ঐক্যসূত্র গড়ে উঠেছে। কিন্তু সংগঠনের পারিপাট্য না থাকার ফলে এই সদিচ্ছাকেও যে কতদূর ফলপ্রসূ করা যাবে সেই সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়ে গেছে।

বাংলা কংগ্রেস সম্মেলনের সমীক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের উপর এর কি ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব পড়বে তার একটি সঠিক মূল্যায়ন করা। কেরালায় যুক্তফ্রন্টের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর এই বাংলায় যুক্তফ্রন্টের কি দশা ঘটতে পারে কিম্বা ফ্রন্টের আর রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন খুঁটিয়ে দেখার জন্যই বাংলা কংগ্রেস সম্মেলনের উপর রঞ্জনরশ্মি ফেলবার উপযোগিতা উক্ত সম্মেলন থেকে পাওয়া গেছে। শেষ চেষ্টা করবার উদ্দেশ্যে বাংলা কংগ্রেস সত্যাগ্রহের হুমকি দিয়েছে। যদি এর ফলও শুভ না হয়, আর শরিকী সংঘর্ষ অবাধে চলতে থাকে আর শ্রেণী লড়াইয়ের নামে গরীব মেহনতী মানুষের খুন ঝরে তবে এ-যুক্তফ্রন্ট রেখে আর লাভ কি। তবু শ্রীঅজয় মুখার্জি কখন ও কোন্ সময় কিভাবে যুক্তফ্রন্টের অবসান ঘটাবেন সেই ইঙ্গিত দেননি নতুবা প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে সে-কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন নি।

অবশ্য এ-কথা ঠিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মাধ্যমে এই কঠোর সত্যটিকে রূপ দেবার চেষ্টা করেননি। সোজাসুজিভাবে বক্তব্য রেখে বলেছেন একদিকে সাধারণ চাষী-মজুর মরবে আর আমরা বসে ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করে যাবো—এ চলবে না। এর ব্যতিক্রম ঘটাতেই হবে।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে-রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তন হচ্ছে তার দিকে যে শ্রীমুখার্জির দৃষ্টিভঙ্গী নিবদ্ধ নেই এমন নয়। তিনি কংগ্রেসের দুটি বিবদমান গোষ্ঠীকে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীলদের লড়াই বলে অভিহিত করেছেন এবং এ-কথা বারে বারে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন বিরোধী শক্তিগুলির বিশেষ করে বামপন্থীদের এই সংকটকালে একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শ্রীমুখার্জির এই সলজ্জ ভাষাকে আরও সুন্দররূপে সেদিনের জনসভায় ব্যক্ত করেছিলেন বাংলা কংগ্রেস এম-পি শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত। শ্রীসামন্ত বলেছিলেন নয়াদিল্লীর ঘটনার দিকে অঙ্গুলিসংকেত করে—কেন্দ্রেও চার-পাঁচটি দল মিলে ফ্রন্ট গঠন করে সরকার চালাবার সম্ভাবনা ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে। এবং এই কথা বলেই আবেগজড়িত কণ্ঠে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের দুর্দশার ইতিহাস বর্ণনা করলেন শ্রীসামন্ত। বক্তৃতার সারাংশ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে তথাকথিত বামপন্থী দলগুলি নিজেদের সর্বভারতীয় বলে দাবী করলেও আসলে তাঁরা এখনও প্রদেশভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে তাদের দৃষ্টি সম্প্রসারিত করতে পারেনি। অর্থাৎ শ্রীসামন্ত বলতে চেয়েছেন যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার মত এ সমস্ত দলগুলির ক্ষমতা নেই। কূপমণ্ডূকই এদের মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বক্তব্যটা রূঢ় হলেও সর্বাংশে যে সত্য দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহই তার সাক্ষ্য বহন করে।

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের বর্তমান অচল অবস্থা এই হতাশাকে আরও বাস্তব করে তোলে। যুক্তফ্রন্টের নেতারা অনেকবার সগর্বে এ-কথা বলেছেন যে তাঁরা এই গাঙ্গেয় অঞ্চল থেকে এমনি এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করবেন যে তার প্রভাব সারা

ভারতের উপর এক সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। অবশ্য তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়নি। তাঁরা অদ্যাবধি যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন সারা ভারতব্যাপীই প্রগতিকামী ও পরিবর্তনকামী মানুষ আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা আর আছে কি?

দৈনন্দিন একে অপরের কুৎসা রটানো ও ঠিকুজী উদ্ধার করা ছাড়া শরিকদের যেন আর কোন কাজই নেই। আবার কখন কখনও গোঁসা করে ফ্রন্ট কি কম কাজ করেছে—এ-প্রশ্ন উত্থাপিত করে বাহাদুরী নেওয়ার চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু আসলে ফ্রন্ট যা করেছে, তা হচ্ছে এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি। প্রতি মুহূর্তেই কখন ফ্রন্ট ভাঙবে বা সরকার গদিচ্যুত হবে এর মানসিকতা সৃষ্টি করা। কিন্তু যেহেতু সকল শরিকই প্রগতিশীল তাই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে এক-একবার সমর্থনের মধ্যেই তাঁদের অটুট ঐক্যের আভাষ মেলে। নতুবা নয়। আবার কখনও কখনও ৩২ দফা কর্মসূচী রূপায়ণ করতে হবে বলে হুঙ্কার দিয়ে ফ্রন্টের লোকেরা তাঁদের একত্র-অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করে থাকেন। তা না হলে কারো বোঝবার সাধ্য নেই যে, ফ্রন্ট জীবিত কি মৃত।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

জয়ন্ত নেহরু

কংগ্রেসে দুই শিবিরের দ্বন্দ্ব

গত সপ্তাহের গোড়ার দিকে কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যগুলোর কর্ণধারেরা প্রধানত নিজেদের আত্মরক্ষার তাগিদে সিণ্ডিকেট ও ইন্দিরাপন্থীদের মধ্যে আপোষের জন্য যে চেষ্টা শুরু করেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধীর কাছে নিজলিঙ্গাপ্পার সম্ভবত অবিবেচনা-প্রসূত এবং নিশ্চয়ই অসংযত পত্রাকৃতি চার্জসীট তার অকালসমাধি রচনা করেছিল। মুখ্যমন্ত্রীরা যখন নিজ নিজ ভাগ্যকে সম্বল করে আশাভঙ্গ হয়ে স্ব স্ব রাজ্যে ফিরে গিয়েছেন এবং সিণ্ডিকেট ও ইন্দিরা-পন্থীদের মধ্যে ভাঙন প্রায় সুনিশ্চিত, তখন উভয় শিবিরের মধ্যে আপোষের আর একটা নতুন চেষ্টা শুরু হয়েছে দিল্লীতে যাতে মুখ্যভূমিকা নিয়েছেন মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন্দ্র পাতিল এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কেরলী সদস্য কে সি আব্রাহাম এবং এই প্রচেষ্টার প্রাথমিক সাফল্য হিসাবে তাঁরা কংগ্রেস সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে একটি মাধ্যাহ্নিক ভোজ-বৈঠকে মিলিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

যে ক্ষেত্রে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মিলিত আপোষ-চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে সে ক্ষেত্রে বীরেন্দ্র পাতিলের প্রায় একক চেষ্টার সার্থকতার সম্ভাবনা কতখানি উজ্জ্বল, তা শুরুতেই বলা সম্ভব নয়। হয়তো এই লেখা যখন ছাপার অক্ষরে পাঠকের সামনে হাজির হবে, তখন আপোষ-চেষ্টা অনেকখানি এগিয়ে যাবে, অথবা হয়তো মোটেই এগোবে না। তবু একথা অনস্বীকার্য যে, ১৭ই নভেম্বর পার্লামেন্টের যে অধিবেশন আরম্ভ হচ্ছে, তার আগে অন্তত যদি একটা জোড়াতালি-মারা সাময়িক আপোষ না হয়, তাহলে পার্লামেন্টে উভয়পক্ষে যে কোনো দিন, যে-কোনো আকারে শক্তির পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী। তেমনি শক্তির পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী সংগঠনের মধ্যে যদি এ-আই-সি-সি'র ২২শে নভেম্বরের তলবী সভার নোটিশ ইতিমধ্যে প্রত্যাহৃত না হয়। দু' পক্ষের ভিন্নমার্গিতা যদি পাকাপাকি হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা যেমন সংগঠনকে দ্বিখণ্ডিত করবে, তেমনি কেন্দ্র থেকে শুরু করে যেসব রাজ্যে কংগ্রেসী সরকার বিদ্যমান, সেগুলোকেও দ্বিখণ্ডিত করবে। এই আপাত সমস্যা ও সংকট-সম্ভাবনাগুলো নিশ্চয়ই উভয় শিবিরকে আপোষের জন্যও উদ্বিগ্ন করছে। আপোষের চেষ্টায় যে প্রশ্নগুলো অবিলম্বে উঠবে, তা মোটামুটিভাবে সকলেরই অনুমেয়। নিজলিঙ্গাপ্পা চাইবেন যে শুধু নতুন কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের জন্য রিকুইজিশন যেহেতু তার প্রতি অনাস্থা-সূচক, সেহেতু তার পরিবর্তে সমগ্র সংগঠনে নতুনভাবে নির্বাচনের প্রস্তাব করা হলে তিনি তাতে আপত্তি করবেন না। অপর পক্ষে, ইন্দিরাপন্থীরা দাবী করবেন যে, সুব্রহ্মণ্যম, ফকরুদ্দিন আলি আহমদ ও শঙ্কর-দয়াল শর্মাকে ওয়ার্কিং কমিটিতে আবার ফিরিয়ে নিতে হবে। এর পাল্টা দাবী হিসেবে সিণ্ডিকেটপন্থীরা চাইবেন যে ইন্দিরা যাঁদের মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দিয়েছেন (মোরারজীর পুনর্নিয়োগের জন্য পীড়াপীড়ি নাও করা হতে পারে), তাঁদের আবার ফিরিয়ে নিতে হবে।

কিন্তু এই প্রশ্নগুলো নিতান্ত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। সামনের সংকটকে এড়াবার জন্য যদি এগুলো নিয়ে একটা আপোষ সম্ভবও হয়, তাহলেও আদর্শগত পার্থক্য অন্তর্হিত হবে না। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস অনেকগুলো রাজ্য হারিয়েছে, কেন্দ্রেও তার সংখ্যা-শক্তি আগের তুলনায় খর্ব হয়েছে। এই শক্তিক্ষয়ের মূলে যেমন রয়েছে একদিকে কংগ্রেসের সংগঠন ও সরকারের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, তেমনি রয়েছে বিরোধী দলগুলোর সাময়িক বোঝাপড়ার মাধ্যমে কংগ্রেস-বিরোধী

চোরাবালি!
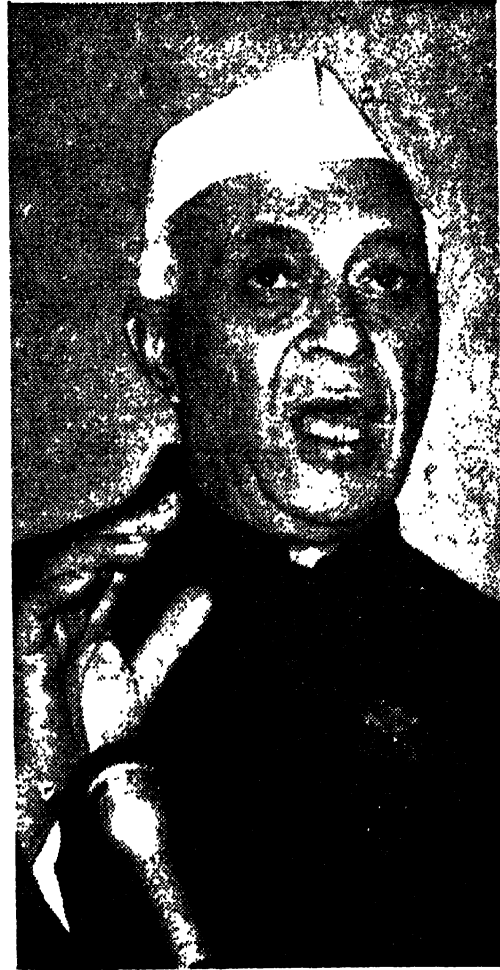
একই প্লাটফর্মে সমাবেশ এবং জনগণের সামনে নবোদ্যমে নতুন কতকগুলো প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবির্ভাব (যদিও কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের দু' দুবারের শাসনেই প্রতিপন্ন হয়েছে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ও পালন এক নয় এবং অন্যান্য রাজ্যেও অকংগ্রেসী সরকারগুলো নিজেদের ভাবমূর্তি জনগণের সামনে এমনভাবে খাড়া করতে পারেনি যা তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত করতে পারে)। তবুও বামপন্থী ও কংগ্রেস-ত্যাগী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে মোকাবেলার জন্য দেশবাসীর সামনে কংগ্রেসকেও যে নতুন 'ইমেজ' নিয়ে হাজির হতে হবে একথা কংগ্রেসের মধ্যে একটা বিরাট গোষ্ঠী ১৯৭২ সালের সাধারণ নির্বাচনের সাফল্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলে যুক্তিসঙ্গতভাবেই মনে করেন। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গতভাবেই তাঁরা মনে করেন যে কংগ্রেসের সংগঠন ও সরকারের মধ্যে যাঁরা সিণ্ডিকেটপন্থীরূপে পরিচিত, সংগঠন যে কোনভাবেই হোক অনেকাংশে তাঁদের করায়ত্ত থাকলেও, জনগণের আস্থা আজ তাঁদের ওপর অতিমাত্রায় ক্ষয়িষ্ণু। একথা আজ অনস্বীকার্য যে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় সরকারী আয়ত্তে এনে ইন্দিরা গান্ধী জনগণের সামনে কংগ্রেসের যে নতুন বৈষয়িক লক্ষ্যের ছবি তুলে ধরেছেন তা সমাজবাদের পথে কংগ্রেসের এক দৃঢ় পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছে। ইন্দিরাপন্থীরা মনে করেন যে বৈষয়িক নীতির নতুন দিকনির্দেশেই শুধু '৭২ সালের নির্বাচনে বামপন্থীদের সঙ্গে মোকাবেলায় তাঁদের নামতে সমর্থ করতে পারে। এই নতুন চিন্তার সঙ্গে সিণ্ডিকেটপন্থীদের চিন্তার মধ্যে পার্থক্য এতো গভীর যে উভয় গোষ্ঠীর পক্ষে একই লক্ষ্য ও আদর্শের প্লাটফর্মে এসে মিলিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। উভয় গোষ্ঠীর চিন্তা ও লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য যে কতোখানি, ওয়ার্কিং কমিটির বিগত অধিবেশনে গৃহীত ঐকপ্রস্তাবের ব্যর্থতাই তার সবচেয়ে জাজ্বল্য প্রমাণ।

জঙ্গী শাসনের প্রথম মর্যাদাহানি

পূর্ব পাকিস্থানের রাজধানী ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে সম্প্রতি বাঙালী ও অবাঙালী মুসলমানদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে গেলো, তা নতুন বা আকস্মিক না হলেও, ইয়াহিয়া খাঁর জঙ্গী শাসনের আমলে এই প্রথম বলে এর একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। গত বছরের শেষভাগে এই ধরনের হাঙ্গামা ও অরাজকতার পরিণতিতেই আয়ুবী শাসনের পতন ঘটে। এবারকার সংঘর্ষ নাকি ভাষার প্রশ্ন নিয়ে। পূর্ব পাকিস্থানী অবাঙালী মুসলমানদের দাবী যে ভোটার তালিকাভুক্তির আবেদনপত্র বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায়ও মুদ্রিত করতে হবে। বাঙালীদের পক্ষ থেকে দেখা দিয়েছে এর বিরোধিতা। গত কদিনের সংঘর্ষে সরকারী হিসেবে ১১ জন (বেসরকারী হিসেবে অনেক বেশী) মারা গেছে এবং কার্ফু, জঙ্গী আইন প্রভৃতি কড়াভাবে চালু করেও শান্তিরক্ষায় বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে।

উভয় পাকিস্থান ধর্মের দিক দিয়ে এক হলেও স্বার্থের দিক থেকে এক নয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারী অফিস এবং সৈন্যবাহিনীতে চাকুরীর ব্যাপারে পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে বাঙালী মুসলমানদের ক্ষোভ দীর্ঘদিন ধরে ধূমায়িত হচ্ছে। এর উপর পূর্ব পাকিস্থানের রাজনীতি ও অর্থনীতিতেও যদি পশ্চিম পাকিস্থানীদের প্রভাব প্রসারিত হয়, তাহলে বাঙালী মুসলমানদের ক্ষোভ ও বিদ্বেষ স্বভাবতই আরো তীব্র হয়ে উঠবে। এই বিক্ষোভ যে দীর্ঘকাল জঙ্গী শাসনের আইনকানুনের গণ্ডীর মধ্যে সীমিত থাকবে না, বর্তমান ঘটনার মধ্য দিয়ে হয়তো তারি ছায়াপাত হচ্ছে।

৭-১১-৬৯।

গান্ধীবাদীদের কর্তব্য

গান্ধীবাদী নেতা খান আবদুল গফফর্‌ খান আমেদাবাদ ও গুজরাটের বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনবার যে প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছেন তা সকল শান্তিকামী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছেই আশার আলোক নিয়ে এসেছে। গান্ধীজী তাঁর নিজের জীবনে এই চেষ্টাই করে গেছেন। যখন দেশের অন্যান্য নেতারা দিল্লীতে স্বাধীনতা উৎসব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, ১৯৪৭ সালের আগস্টের সেই দিনে বিভক্ত ভারতের বেদনা বুকে নিয়ে গান্ধীজী চলে গিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের নোয়াখালিতে, দাঙ্গা-দুর্গতদের মনে সাহস ও সান্ত্বনা দেবার জন্য। খান আবদুল গফফর্‌ খানও আজ সমস্ত আদর-অভ্যর্থনার আড়ম্বর বর্জন করে গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথে পরিভ্রমণ করছেন দাঙ্গা-দুর্গতদের মধ্যে।

ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় বাদশা খান গভীর মনোবেদনা পেয়েছেন। তিনি যে-ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বাধীন, অবিভক্ত, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভারত তিনি দেখতে পাননি। বাইশ বছরের স্বাধীনতায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিদেশী শাসকরা চলে গেছে। দিল্লীতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হয়েছে। কিন্তু স্বরাজ বলতে গান্ধীজী এবং বাদশা খান যে স্বাধীন সুখী সমাজের স্বপ্ন দেখতেন তা এখনও আমাদের অনায়ত্ত। বাদশা খাঁর মনোবেদনার এইটিই কারণ। তিনি বারবার এই কথা বলছেন যে, ভারতে হিন্দু মুসলমান এবং অন্যান্য সকল সম্প্রদায়কে একসঙ্গে বাস করতে হবে। সংখ্যালঘুদেরও বুঝতে হবে যে, এইটিই তাদের দেশ। যত চক্রান্তই হোক না কেন, সাম্প্রদায়িক মত্ততায় আক্রান্ত মানুষকে বাঁচাবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে সৎ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, আদর্শবাদী মানুষকে। সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হবে তাদেরই।

আচার্য বিনোবা ভাবে, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ সর্বোদয় নেতার সঙ্গে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পর বাদশা খাঁ বলেছেন যে প্রকৃত গান্ধীবাদীদের উচিত সরকারে যোগ দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কলুষমুক্ত করা। এ বিষয়ে বিনোবাজী এবং জয়প্রকাশের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয়নি। বিনোবাজী এবং জয়প্রকাশ মনে করেন যে, প্রকৃত গান্ধীবাদীদের কাজ সরকারী ক্ষমতা-চক্রের বাইরে দেশের জনগণের মধ্যে। সরকারে যোগ দিতে গেলেই তাঁদের কোনো রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এবং রাজনৈতিক দলগুলির আচার-আচরণ সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। সুতরাং সেখানে গেলে গান্ধীবাদীরাও দুর্নীতির দুষ্টচক্রে পড়ে অসহায় হয়ে পড়বেন। বাদশা খাঁর ধারণা অন্যরকম। তিনি মনে করেন, প্রকৃত গান্ধীবাদীরা রাষ্ট্রক্ষমতাকে লোক-কল্যাণের কাজে ব্যবহার করছেন না বলেই স্বার্থপর মতলববাজ লোকেরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে দেশের অনিষ্ট করছে। আজকের যুগে নিছক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। সমাজের সর্বস্তরে রাষ্ট্র তার প্রভাব বিস্তার করেছে। সুতরাং রাষ্ট্রযন্ত্রকেও ব্যবহার করতে হবে সমাজের কল্যাণের জন্য। সর্বোদয় নেতারা বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন বলে বাদশা খাঁকে বলেছেন।

আজ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকালে আশার আলোক দেখা যায় না। বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কংগ্রেস আজ ভাঙনের মুখে। গান্ধীজী স্বাধীনতালাভের মুখে বলেছিলেন কংগ্রেসকে ভেঙে দিয়ে লোকসেবক সংঘে পরিণত করতে। যে-দল ছিল জাতীয়তার প্রতীক তাকে নিছক একটি দলে পরিণত করে কংগ্রেসের প্রতি এবং দেশের যে সুবিচার করা হয়নি, আজকের দলাদলি এবং পারস্পরিক দোষারোপই তার প্রমাণ। এখনও সম্পূর্ণ নিরাশ হবার কারণ নেই। দেশে সৎ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক এখনও আছেন। তাঁদের কাজে লাগাতে হবে। ভারতের রাজনৈতিক জীবনে মতবিরোধ এবং পারস্পরিক বৈরিতার ফলে সমাজজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন আজ ব্যাহত। সাম্প্রদায়িক, ভাষাভিত্তিক, প্রাদেশিক সব রকম বিরোধে সমাজ ক্ষতবিক্ষত। ভারতকে এক রাষ্ট্রকাঠামোতে ধরে রাখা যাবে না, তা নিয়েই দেখা দিয়েছে কত সংশয়। এ সময়ে কি সৎ, নিঃস্বার্থ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক চুপ করে থাকতে পারে? বাদশা খান সেজন্যেই বলেছেন, গান্ধীবাদীদের আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। কীভাবে তা নেওয়া সম্ভব সে চিন্তা করুন নেতারা। এক সময়ে এঁদের অনেকেই সরকারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাঁরা ফিরে গেছেন গঠনকর্মে। কিন্তু তাতে কি তাঁরা সমাজের পচন রোধ করতে পারছেন? পারছেন কি দুঃখীর অশ্রু মোছাতে? আজ সকলকেই বিষয়টি নতুনভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। দেশের আজ বড় দুঃসময়।

নৈতিক দলগুলির মধ্যে। সব্যসাচী এবং রাজেনের মধ্যে হানাহানির কল্পনা তাঁর ছিল না। কিন্তু আমাদের কর্মফলে তা সুরু হয়েছে। এবং মন যেন বলতে চাচ্ছে, যে জীবন-ক্ষেত্র সততার একনিষ্ঠতার নিঃস্বার্থপরতার সমন্বিত কৃষিকর্মে আনন্দ ও সুখের রস ও পুষ্টিময় সোনার ফসল ফলাতে পারত, তা পারল না।

আমার গণদেবতা পঞ্চগ্রামে সাধারণ গ্রামজীবনের সংগ্রামের কাহিনীর শেষে নায়ক দেবু ঘোষ করেছিল ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। "দেবু স্বর্ণকে বলিয়া চলিয়াছে তাহার নিজের কথা পঞ্চগ্রামের কথা, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। সত্যযুগের আমন্ত্রণ নূতন ভঙ্গিতে নূতন ভাষায় নূতন আশায় নূতন পরিবেশে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যভরা ধর্মের সংসার।

পঞ্চগ্রামের প্রতিটি সংসার ন্যায়ের সংসার। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা, অভাব নাই অন্নবস্ত্র ঔষধপথ্য, আরোগ্য স্বাস্থ্য শক্তি সাহস অভয় শিক্ষা দিয়া পরিপূর্ণে উজ্জ্বলে। আনন্দে সুখের শান্তিতে স্নিগ্ধ।

নূতন করিয়া গড়িবে ঘর-দুয়ার পথ-ঘাট গ্রাম ক্ষেত। ঝকঝকে বাড়ীগুলি অবারিত আলোয় উজ্জ্বল উষ্ণ। মুক্ত বাতাসের প্রবাহে নির্মল স্নিগ্ধ। সুন্দর সুগঠিত পথগুলি চলিবে......। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে। সেই পথ ধরিয়া চলিবে পঞ্চগ্রামের মানুষ। শত-গ্রাম, সহস্রগ্রামের মানুষ।

আশ্বিন মাস, আউস ধান পাকিয়াছে। দেবুর মনে পড়িল সার্বজনীন পূজার কথা, কৃষক সমিতির কথা। সে কথা শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। ... কত কাজ, কত কত কাজ, কত কাজ!"

এই ছিল আমার কল্পনা। আমার দেশ আমার দেশের মানুষ এখানে এসে পৌঁছুবে। কিন্তু—। কিন্তু কি?—

দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। হয়েছেও অনেক কিছু। কিন্তু পথ-ঘাট, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষায়তন অনেক গড়েছে, কিন্তু দেশ রক্তাক্ত, বিদ্বেষে জর্জর, হিংসায় ক্লিষ্ট। আক্রোশে রুদ্র। শিক্ষা, জ্ঞান মানুষকে প্রেমে প্রীতিতে উদার করেনি, দলবাদ ও মতবাদের কলহে হত্যাকান্ড থেকে অগ্নিকান্ড চলেছে অবাধে। এর প্রমাণ এই মুহূর্তে দেবার প্রয়োজন নেই। প্রতিজনে অনুভব করছেন।

আরও আছে। আজ শিক্ষার মধ্যে নীতিবাদের স্থান নেই। সকল নীতিবাদ বিসর্জিত। স্বেচ্ছাচার আজ সারা সমাজ-দেহের সকল রক্তকে বিষাক্ত করে তুলেছে। বিষবীজাণুগুলি রক্তধারার মধ্যে বিপুল উল্লাসে উল্লসিত।

আরও আছে। সর্ব শেষ কথা এবং সর্বাধিক সত্য কথা। সে সত্য এই যে, অতীতকালের যে ছদ্মবেশী অন্যায়গুলি মানুষের মনে ও সমাজের দেহে বাসা বেঁধে ছিল, তারা আজও আছে। রয়েছে। তারা নির্মূল হয়নি। এবং আজও আমরাই তাকে প্রশ্রয় দিয়ে পোষণ করে রেখেছি। পুরানো অন্যায় আজও রয়েছে বলে, নূতন ন্যায় আজও মেঘান্তরালবর্তী সূর্যের মত প্রকাশিত হতে পারছে না।

আমরা সাহিত্যিকেরাও সেই রূঢ় সত্যকে যেন প্রকাশ করতে সক্ষম হচ্ছি না।

এমনটা যে ঘটতে পারে বা ঘটা সম্ভব তখন কেউই ভাবতে পারে নি। অন্তত এই মফস্বল শহরের সরকারী হাসপাতালে এমনটা আর কখনও ঘটেনি আগে। কোন মা যে তার সদ্যজাত সন্তানকে পরিত্যাগ করে উধাও হয়ে যেতে পারে, ভাবা সম্ভবও নয়। পারলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আগে ভাগেই সতর্ক হতেন। কিন্তু আশ্চর্য সেই অভাবনীয় ঘটনা ঘটে যাবার পর হাসপাতালের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে চাপা গুঞ্জন সোচ্চার হয়ে উঠল...বাইশ নম্বর বেডের প্রসূতির চাল চলন দেখে নাকী অনেকের মনেই এমনি একটা সন্দেহের জমাট মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল।

আরো অবাক কথা যে নার্সরা অনিন্দিতাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছে, এ ক'দিন সমানে সেবা করেছে, প্রসব বেদনায় অভয় দিয়েছে সান্ত্বনা দিয়েছে অথচ যাদের মনে মেয়েটি সম্পর্কে ঘুণাক্ষরেও কোন রকম সন্দেহ দেখা দেয় নি, এখন হাসপাতালের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে চাপা গুঞ্জন মুখর হয়ে ওঠার পর তাদের মনেও কেমন একটা সন্দেহের ছায়া নিবিড় হয়ে উঠছে। মনে মনে অনিন্দিতার চাল চলন কথাবার্তাকে পর্যালোচনা করে যেন নতুন নতুন ইঙ্গিত উপলব্ধি করতে পারে নার্সরা। যেমন, প্রসব বেদনার সময় যেমন করে কাঁদত অনিন্দিতা পরেও তেমনি একগুচ্ছ শ্বেত করবীর মত সদ্যজাত মেয়েটিকে বুকে চেপে কান্নায় ফুলে ফুলে উঠত।

আশ্চর্য তখন এ দুটোর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা খুঁজে পায়নি ওরা। কিন্তু এখন খতিয়ে ভাবতে বসে সুজাতা মীনাক্ষী, শাকিলা মন্দিরা সিসিলিয়ার মনে হচ্ছে...কেমন যেন একটা বেসুরো ঝঙ্কার লুকিয়ে ছিল ধীর লয়ে আলাপের গভীরে। শুধু তাই নয়, রোজই ভিজিটিং আওয়ার্সে সুদর্শন যে যুবকটি অনিন্দিতার সঙ্গে দেখা করতে আসত তার চাল চলনেও যেন এখন কিছুটা অস্বাভাবিকতা খুঁজে পাচ্ছে নার্সরা। সত্যি একগুচ্ছ শ্বেত করবীর মত মেয়ে—যাকে দেখলেই আদর করার জন্যে ওদের হাত নিসপিস করে অথচ একদিনের জন্যেও লোকটিকে শিশুর দিকে মনোসংযোগ করতে দেখেছে, কেউ মনে করতে পারছে না। এসেই অনিন্দিতার সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ত। দেখে মনে হত যেন আগের দিনের অসমাপ্ত জরুরী আলোচনাটাকে আজ শেষ করার সঙ্কল্প নিয়ে দেখা করতে আসত লোকটি। ভিজিটিং আওয়ার্সের সবটাই দুজনের নিবিড় কথা বার্তার মধ্যেই কেটে যেত।

সন্দেহের সমস্ত আকাশ জুড়ে এমনি অসংখ্য হাল্কা মেঘের আনা-গোনায় ভরে উঠেছে সকলের মন প্রাণ।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রীতিমত বিরত। এমনিতেই জনসাধারণ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নানান গাফিলতি আর দুর্নীতির অভি-যোগে খড়্গহস্ত। তার ওপর অনিন্দিতার অন্তর্ধানকে কেন্দ্র করে নানান গুজব যে রকম বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে সারা শহরময়, তাতে আরেকপ্রস্থ তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তাদের। বিশেষ করে হাসপাতালের সাধারণ কর্মচারিদের মনে যখন আগে ভাগেই সন্দেহের মেঘ উঁকি দিয়েছিল তখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক কোন রহস্যজনক কারণে স্বয়ং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিষ্ক্রিয় ছিল!

হয়তো সেই কারণেই অনিন্দিতাকে কেন্দ্র করে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মুখরোচক

আলোচনাকে কর্তৃপক্ষ জরুরী ফতোয়া জারি করে স্তব্ধ করে দিতে চাইলেন। অবশ্য রুগীদের মুখ বন্ধ করা সম্ভব নয়। বরং তাদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন ক্রমেই আরো সোচ্চার হয়ে উঠল। হাসপাতাল কর্মচারিরা প্রকাশ্যে মুখ বন্ধ করল বটে কিন্তু নিভৃত কানাকানি আর ফিসফিসানিতে হাসপাতালের বাতাস ভারি হয়ে উঠল।

তার মধ্যে প্রাথমিক তদন্ত সেরে গেলেন পুলিশের ও-সি। ডি-এম-ও ডাঃ বাসু নিজেই থানার ও-সিকে তদন্তে সাহায্য করতে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ফিমেল ওয়ার্ডের বাইশ নম্বর বেডের কাছে। ডাঃ বাসুর নির্দেশ মত কয়েকজন নার্স প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বেডের কাছে। সমস্ত ওয়ার্ডটাই অধীর আগ্রহে নিশ্চুপ হয়ে উঠল। সবারই নির্বাক উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল বাইশ নম্বর বেডের জননী পরিত্যক্ত অসহায় শিশুটির দিকে।

অথচ যাকে কেন্দ্র করে সমস্ত হাসপাতাল আজ তোলপাড় হয়ে উঠেছে সেই ছোট্ট করবী কিন্তু ধবধবে সাদা চাদর ঢাকা বিছানার একপাশে পরম নিশ্চিন্তে নির্ভরতায় অকাতরে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এ জন্মের মত জন্মদাত্রীর সঙ্গে যে ওর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এই নিষ্ঠুর সত্যটা অজানাই রয়ে গেছে ওর কাছে। এখনো সে জননীর দেহের উত্তাপটুকুর আমেজ জড়িয়ে আছে নব কিশলয়ের মত ওর তুলতুলে শরীরের রক্তে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এখনো সমস্ত বিছানা জুড়ে অনিন্দিতার অসংখ্য স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। দেখে মনে হয়, অনিন্দিতা যেন ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে বিছানার মত কোথাও গেছে। মাথার একটা কাঁটা আলগা খোঁপার বাঁধন খসে পড়ে রয়েছে ওর সিঁদুর মাখা মাথার বালিশের ওপর। কয়েকটা ফিতে একসঙ্গে জড়ো করা রয়েছে বালিশের একপাশে। আর দুপুরে যে মাসিক পত্রিকাটা পড়ছিল অনিন্দিতা সেটাও এখনো তেমনি খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে বিছানায়। মাঝে মাঝে কেবল দমকা হাওয়ায় ফর্ ফর্ শব্দ করে উড়ে যাচ্ছে পাতাগুলো।

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ করবীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন থানার ও-সি। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওঁর আবেগ মথিত অন্তঃস্থল থেকে। তারপর সামান্য কয়েকটা প্রশ্ন সেরে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন। অবশ্য এখুনি মন্তব্য করার কিছু নেই। তবু ফিমেল ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগে বলে গেলেন—আইনের কথাটা আপনাদের জানিয়ে রাখা প্রয়োজন বলেই বলছি ডাঃ বাসু, যে কোন দাবী-দাওয়াহীন বেওয়ারিশ শিশু মাত্রেরই রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রই তার অভিভাবক।

কিন্তু যে শিশুর জীবন সম্বন্ধেই সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে...রাষ্ট্র সেখানে নিছক আইনের মর্যাদা রাখতে গিয়ে শিশু ঘাতকের ভূমিকা নিতে পারে না। তবে এ শিশুর জীবন সম্বন্ধে রাষ্ট্র যেদিন নিঃসংশয় হতে পারবে সেইদিনই আইনের মর্যাদা রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে রাষ্ট্র। আপাতত এর বেশী আর কিছু বলার নেই আমার।

বলেই আর দাঁড়ালেন না ও-সি। ডাঃ বাসুর সঙ্গে ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু ও-সির কথাগুলো অনেকক্ষণ ফিমেল ওয়ার্ডের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে ভেসে বেড়াল। সামান্য কয়েকটা কথা মাত্র—কিন্তু কী অপরিসীম প্রতিক্রিয়া শব্দগুলোর। অনিন্দিতাকে কেন্দ্র করে কিছুক্ষণ আগের মুখরোচক আলোচনা ভুলে গিয়ে প্রত্যেকের হৃদয়কে গভীর আবেগে ভারাক্রান্ত করে তুলল। করবীর প্রতি মমতায় ভরে উঠল মন প্রাণ। করুণাময় ঈশ্বরের কাছে, মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে নীরবে প্রার্থনা করল...আজকের জননী পরিত্যক্ত অসহায় ছোট্ট করবীর জীবন অনাগত ভবিষ্যতে দিনের জন্যে নিশ্চিন্ত হোক নির্ভয় হোক। দীর্ঘায়ু হোক, সুন্দর হোক ওর জীবন।

এ অনেকদিন আগের ঘটনা। ঠিক পাঁচ বছর আগের ঘটনা। সেদিনের ছোট করবীর পাঁচ পূর্ণ হল আজ। অবশ্য ওর বয়স সম্বন্ধে মাথা ব্যথা ছিল না কারো। কিম্বা ওর অভিশপ্ত জন্মের ইতিবৃত্তের মত বয়সটা আজও বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে থাকত যদি ও-সির সেদিনের আইনের সংজ্ঞাটা করবীকে এ জীবনে আরেকবার অনাথ করে তোলার ষড়যন্ত্রে না মেতে উঠত। করবীর জীবন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতেই নার্সদের বুক থেকে ওকে জোর করে ছিনিয়ে নেবার জন্যে হাত বাড়াল রাষ্ট্রের আইন।

স্বভাবতই এবারও হাসপাতালের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে চাপা বিক্ষোভ গুঞ্জন তুলল...এ অন্যায়। এতদিন কোথায় ছিল রাষ্ট্র, তার আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণ। প্রাণ থাকতে নার্সরা করবীকে রাষ্ট্রের হেপাজতে ছেড়ে দিতে পারবে না। সেদিন নিশ্চিত মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে যারা বাঁচিয়ে তুলতে পেরেছে অসহায় শিশুটিকে তারা করবীর অনাগত ভবিষ্যতকেও নিশ্চিন্ত করে তুলতে পারবে।

আইনের সংজ্ঞায় শুধু পাঁচ বছর লেখা হল করবীর। সরকারী রেজিস্টারে তার বেশী আর কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। তার অবকাশও নেই। তা না থাক কিন্তু লোক চক্ষুর অলক্ষ্যে তিলে তিলে গড়ে ওঠা পাঁচ বছরের করবীর জীবনের প্রতিটি দিনের ইতিহাস এই মফস্বল শহরের হাসপাতালের বাতাসে জড়িয়ে আছে। জানা অজানা অসংখ্য কর্মচারী হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালবাসায়, মমতায় লেখা হয়ে রয়েছে সে ইতিহাসের গোপন কথা।

ছোট্ট করবীর জীবনের ইতিহাসে বড় বিচিত্র, বড় করুণ, হ্যাঁ, করবীই নাম

রেখেছিল নার্সরা। একগুচ্ছ শ্বেত করবীর মত মেয়ের উপযুক্ত নাম। পাঁচ বছর আগে থানার ও-সি যেদিন আইনের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করে শুনিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন সকলেই বিশেষ করে নার্সরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল গভীর আশংকায়। ও-সি করবীর জীবন সম্পর্কেই আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। আশংকাটা অমূলক নয়। নিষ্ঠুর নিশ্চিত মৃত্যু যেন ছোট্ট করবীর তিনদিনের জীবনটাকে ছোঁ মেরে তুলে নেবার জন্যে অলক্ষ্যে ওৎ পেতে রয়েছে চারিদিকে। আশ্চর্য, যেন জীবন নয়, মৃত্যুর বিভীষিকাকে পেছনে ফেলে রেখে উধাও হয়ে গেছে অনিন্দিতা।

তাই বোধহয় ডি-এম-ওর সঙ্গে থানার ও-সি ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ বাইশ নম্বর বেডকে ঘিরে থাকা নার্সরা হতভম্বের মত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এক একবার তরুণী হৃদয়গুলো ইস্পাত কঠোর হয়ে উঠছে। পরক্ষণেই চরম অনিশ্চয়তার দোলায় দুলে উঠছে...বাঁচাতে পারবে তো করবীকে না নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে সঁপে দিতে হবে!

আশ্চর্য, সেই তখন থেকে কেমন যেন বেহুঁসের মত ঘুমোচ্ছে করবী। পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল সকলে। সুজাতাই প্রথম বিহ্বলতা কাটিয়ে এগিয়ে এসে ওর পাখির মত নরম বুকে কান পাতল। না, আশংকার কিছু নেই। অতি ধীর ছন্দবদ্ধ শব্দ তুলে ধুক্-ধুক্ করে বেজে চলেছে ওর হৃদস্পন্দন।

সুজাতার পেছন পেছন মীনাক্ষী, মন্দিরা, সিসিলিয়া, শাকিলাও ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এল। সুজাতা আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সকলে একসঙ্গে উদ্বেগে ভেঙে পড়ল—কিরে সুজাতা? বিটিং ঠিক আছে দেখলি? ডাক্তার আচার্যকে ডেকে আনব নাকী একবার?

—দূর কিছু নয়, আমি মিথ্যে ভয় পেয়েছিলাম। হার্ট ঠিক আছে। সুজাতা একটু থেমে বলল, কিন্তু তখন থেকে কেমন বেহুঁসের মত ঘুমোচ্ছে দেখছিস? একটুও নড়ছে না তো?

এবার মন্দিরাও ঝুঁকে পড়ল করবীর বুকের ওপর। তারপর অতি সন্তর্পণে তোয়ালে সরিয়ে পেটটা আলতো করে ছুঁয়ে দেখল। হ্যাঁ যা আশংকা করেছে তাই। আবার তোয়ালেটা ওর গায়ে ভাল করে চাপা দিয়ে বলল আহা রে, অনেকক্ষণ না খেয়ে বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন কী করি বলত? এক চামচ গ্লুকোজ ওয়াটার খাইয়ে দেব নাকী?

অ্যাংলো মেয়ে সিসিলিয়া। কিন্তু করবীর জীবনের সঙ্গে আশ্চর্য একটি মিল আছে ওর। নিজের মার মুখটাকে কোনদিন মনে করতে পারে না। তার জায়গায় ভেসে ওঠে অনাথ আশ্রমের সিস্টারদের মুখ-গুলো। আর ওরই মত একদল অনাথ ছেলেমেয়ে। কোন্ বিস্মৃত অতীতে জন্মগত একটা পরিচয় হয়তো ছিল সিসিলিয়ার। কিন্তু আজ আর কোন একটি বিশেষ জাতের মেয়ে ও নয়। সিসিলিয়া সকলেরই। জাত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত একটি সামান্য জীবন মাত্র।

—তোরা সর তো! বলে সকলকে হটিয়ে দিয়ে করবীকে দুহাতে তুলে নিল সিসিলিয়া। তারপর সন্ধানী চোখে অনেকক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে পেসেন্ট-দের মধ্যে কী খুঁজে বেড়াল।

সুজাতা ব্যাপারটা আন্দাজ করে ফিসফিসিয়ে বলে উঠল—দি আইডিয়া। ঠিক ভেবেছিস তো সিসি তুই! দাঁড়া আমি দেখে আসি আগে। বলেই এ বেড সে বেড ঘুরে এসে দাঁড়াল দু নম্বর বেডের প্রসূতি বিনতাদির কাছে। একেবারে অপরিচিতা কাউকে এমন অনুরোধ করতে সংকোচ হয়। কিন্তু বিনতাদির কাছে তো সংকোচের কোন কারণ নেই। পূর্ব পরিচয় না থাক কিন্তু এ কদিনে এই হাসি খুসি মেয়েটির সঙ্গে নার্সদের রীতিমত প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বাড়ী ফিরে গিয়ে সকলকে একদিন নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাবে আগে ভাগেই জানিয়ে রেখেছে বিনতাদি। যার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা সম্ভবত এ অনুরোধটা সে এড়াতে পারবে না ভেবেই সুজাতা বলতে পারল—ও বিনতাদি, একটা কথা বলব ভাই? কিছু মনে করবেন না তো বলুন? মানে...বাচ্চাটা...অনেকক্ষণ না খেয়ে পড়ে থেকে কেমন যেন নির্জীব হয়ে গেছে।

বিনতা এতক্ষণ লক্ষ করছিল সবই। শুধু বিনতা একা নয় থানার ও-সি তদন্ত করতে আসার সময় থেকেই প্রতিটি বেডের পেসেন্ট রুদ্ধনিঃশ্বাসে সেদিকে তাকিয়েছিল। না বোঝার কিছু নেই বিনতার। বিশেষ করে সিসিলিয়ার ও চোখের ভাষা পড়ে নিতে অসুবিধে হয় না কোন মায়ের।

সুজাতাকে মুখ ফুটে বলতেও হল না কথাটা। তার আগেই বিনতা হেসে বলল—বুঝেছি। তা এত সংকোচ কেন ভাই! নিয়ে এস ওকে। তারপর একটু চুপ করে বলল, আহা, কী কপাল মেয়েটার। ফেলে গেল, না প্রাণে মেরে রেখে গেল। মা না রাক্ষুসী! এখুনি তাই ও বেডের চারুদিকে বলছিলাম আগে যা করেছিস...করেছিস। কিন্তু মা হয়ে ফেলে পালালি কী করে রে! না কোথাও গিয়ে শান্তি পাবি...।

বিনতার বাকী কথাগুলো আর শোনার ধৈর্য রইল না সুজাতার। মুখটা নিমেষে খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সিসিলিয়া ওর দিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকেই গলা বাড়িয়ে ডেকে উঠল—এই সিসি, তাড়াতাড়ি নিয়ে আয় ওকে! তারপর গলা নামিয়ে বিনতাকে বলল—আমি বরং আপনার বাচ্চাটাকে সামলাচ্ছি বিনতাদি! ভয় নেই কাঁদবে না আমার কাছে। বলেই করবীর জন্যে জায়গা করে দিতে বিনতার বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে করিডোরের দিকে চলে গেল।

শুধু একবারই নয়, অনেকবারই বিনতার কাছে করবীকে শুইয়ে দিয়ে গেল নার্সরা। আবার খাওয়া হয়ে গেলেই বিনতার বাচ্চার জায়গা খালি করে দিতে করবীকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয় ওর বিছানায়।

শুধু এই একটা অক্ষমতা ছাড়া আর সবই আছে নার্সদের। করবীকে বাঁচিয়ে রাখার দুরন্ত প্রয়াসের মাঝে কোথাও একটুকু ফাঁক রাখেনি ওরা। করবীর জন্যে আলাদা একটা ছোট খাট পাতা হয়েছে ফিমেল ওয়ার্ডের এক পাশে। প্রসূতিদের সেবার সঙ্গে ওর সুশ্রূষাও চলে সমানে। তারই মধ্যে একদল নার্স ডিউটি শেষ করে ফিরে যাচ্ছে হোস্টেলে। তার জায়গায় নতুন দল আসছে ডিউটি বুঝে নিতে। যে দল যখনই আসুক করবীর চার্জটা বুঝে নেয় আগে ভাগে।

—কতক্ষণ আগে খাইয়েছিস রে ওকে মিনু? তোরা আজ টেম্পারেচার নিয়েছিস না আমরা নেব।

পাছে তাড়াতাড়ির মধ্যে চার্জ বোঝাতে কোন ভুল থেকে যায়, বিশেষ করে জ্বর তোলার সময়, তাই একটা রোস্টার তৈরী করেই রেখেছিল মীনাক্ষী! সেটা লিলির হাতে দিয়ে বলল—এটা দেখলেই সব বুঝতে পারবি। তবু শুনে নে মন দিয়ে, বলে দিচ্ছি...রাতে নটায় লাস্ট দুধ খাইয়েছি। আরো রাতে যদি নেহাৎ খিদে পায়, বুঝতে পারিস আর কিন্তু দুধ দিস নি, বুঝলি! বরং এক আউন্সের মত গ্লুকোজ ওয়াটার দিস। ওর ফিডিং বটল, বাশ ট্যাংগেল সব রেডি করা আছে। আর শোন, এইমাত্র ওর টেম্পারেচার চেক করলাম—জ্বর নেই। তবু মিডনাইটে আর একবার চেক করিস। যদি টেম্পারেচার ওঠে তা হলেই শুধু ওষুধটা তিন ড্রপ করে চালিয়ে যেতে বলেছেন ডাঃ আচার্য, নচেৎ নয়। ভুল করিস না যেন লিলি। আর সবচেয়ে দরকারি কথাটা মন দিয়ে শুনে নে রোস্টারেও বড় বড় করে লিখে রেখেছি—ঘন্টায় ঘন্টায় ওর বেডটা চেক করবি। ভিজে বিছানায় বেশিক্ষণ শুয়ে থাকলেই কিন্তু জ্বরটা বাড়বে মনে রাখিস।

আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিল মীনাক্ষী। কিন্তু হঠাৎ লিলির হাতে কাগজের প্যাকেটের দিকে নজর পড়তেই থেমে পড়ে জিজ্ঞেস করল—তোর হাতে ওটা কী রে লিলি? সেবার সেই শাড়িটা বুঝি? দেখি দেখি কেমন শাড়ি...

লিলির মুখে অপ্রস্তুতের হাসি ফুটে উঠল—ধুস্ তা নয়। কথা বলতে বলতে একদম ভুলেই গেছি তোকে দেখাতে। বলেই কাগজের মোড়কটা খুলতে শুরু করে দিয়ে বলে চলল—জানিস মিনু আজ বিকেলে একবার বাজারের দিকে গিয়েছিলাম। এমনিই গিয়েছিলাম বেড়াতে। সব ব্লাউজগুলো একসঙ্গে ছিঁড়তে শুরু করেছে...তাই নিজের জন্যে ছিট কিনতে গিয়ে দেখি...এই সুন্দর ফ্রকগুলো টাঙান রয়েছে দোকানে। কিন্তু হলে কী হবে! মা-মণি আমাদের এতই লম্বা-চওড়া মহিলা

...মাপ্‌সই জামা পেলে তবে তো? বলেই উচ্চকিত কৌতুকের হাসিতে ফেটে পড়ল লিলি। মীনাক্ষীও হেসে উঠল—তা যা বলেছিস।

কথা বলতে বলতে প্যাকেটটা খুলে ফেলে সুন্দর দুটো ফ্রক বার করল লিলি—সাইজ যাই হোক...সে আমি হাতে মুড়ে-টুড়ে ঠিক করে দেব। দেখ তো মিনু ভাল মানাবে তো ওকে! তোর পছন্দ তো? এর চেয়ে ভাল আর কিছু পেলামই না ভাই ওখানের দোকানগুলো যেন কী...সবই বড়দের। বাচ্চারা যেন মানুষই নয়।

মীনাক্ষী সাগ্রহে জামাদুটো টেনে নিল লিলির হাত থেকে। তারপর খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে এক মুখ হেসে বলল—লাল ফুল জামাটা কী সুন্দর রে। যা মানাবে না ওকে! কোন দোকান থেকে পেলি বলতো? তুই যা হোক ভাল পেয়েছিস। আর ঠিকই বলেছিস তুই...সত্যি দোকানগুলো যেন কী। আমি সেদিন এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে হয়রান হয়ে গিয়ে শেষপর্যন্ত ঐ জ্যালজেলে জামাটা...

লিলি চলে গেল ফিমেল ওয়ার্ডের দিকে। আর মীনাক্ষী হন হন করে এগিয়ে চলল করিডর দিয়ে। রাত এখন নটা। দিনমানের সেই কর্মব্যস্ত হাসপাতাল এখন বিস্ময়করভাবে শান্ত, স্তব্ধ। নেই যন্ত্রণা-কাতর রুগীদের আর্ত চিৎকার, নেই ডাকা-ডাকি, অগণিত মানুষের ব্যস্তসমস্ত

চলাফেরা। এখন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে পেসেণ্টরা নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে।

হাসপাতালের কাছেই নার্স হোস্টেল। এমন কিছু দূরে নয় জায়গাটা। হাসপাতাল আর হোস্টেলের মধ্যে কেবল মাঠটার ব্যবধান। এখন অন্ধকার, তায় ফাঁকা; তাই রাতে দল বেঁধে যাতায়াত করতেই অভ্যস্ত ওরা। লিলির সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেরী না করে ফেললে ভয় ছিল না মোটেই। মন্দিরা, কণিকা, সুচন্দ্রাদের সঙ্গেই ফিরে যেতে পারত।

এ-করিডোর ছেড়ে ওদিকের করিডোরে পা দিতেই পুরো দলটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওর। মীনাক্ষীর জন্যে অপেক্ষা করছিল ওরা, আর নতুন যে-দলটা ডিউটিতে আসছিল, তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

—বারে, বেশ তো তোরা। আমি ওদিকে লিলিকে চার্জ বুঝিয়ে দিতে ব্যস্ত আর তোরা এদিকে ভোঁ ভাঁ।

এ-কথার কোন উত্তর না দিয়ে কণিকা তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল—হ্যাঁরে মিনু, বিকেলে কত জ্বর উঠেছিল রে ওর? আলোকে তাই বলছিলাম...

—আমি সব লিলিকে বুঝিয়ে দিয়েছি বুঝলি আলো। তোরা শুধু খেয়াল রাখিস ভিজে বিছানায় যেন পড়ে না থাকে। ডাঃ আচার্য বলেছেন, লাঙসে সর্দি বসেছে নতুন করে ঠাণ্ডা লাগলে কিন্তু আর বাঁচানো যাবে না।

করবী প্রসঙ্গে আরো কিছুক্ষণ উপদেশ নির্দেশ চলল দু' দলের মধ্যে। তারপর যে যার গন্তব্যস্থলের দিকে পা বাড়াল।

এখন একা করবীই নার্সদের কথাবার্তার অনেকটা দখল করে বসে আছে। কী এক দুর্বোধ্য কারণে গত রাতে অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে সারা হয়েছে করবী, সকাল হতে না হতেই সে-ঘটনাটা রীতিমত উদ্বিগ্ন করে তোলে সব নার্সদের। কার গাফিলতিতে মশারীর মধ্যে মশা ঢুকে পড়ে করবীর সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন এঁকে রেখে গেছে তাই নিয়ে নিজেদের ওপর দোষারোপ চলে সারাদিন। কেন ঠিক সময়মত করবীর ফ্রক তোয়ালে চাদর মশারী কেচে দিয়ে যায় না কৈফিয়ৎ আর শাসানিতে অস্থির করে তোলে ধোপাকে।

আগে কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবকাশ পেলেই নার্সরা অফিস-ঘরে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প রসিকতা করে সময় কাটাত। সবাই প্রায় সমবয়সী তরুণী। প্রাণোচ্ছল হুড়োহুড়ি লেগেই আছে। এখনও তাই। তবে আড্ডাটা অফিস-ঘর থেকে সরে এসেছে ফিমেল ওয়ার্ডের মধ্যে। করবীর বিছানার চারপাশে টুল পেতে বসে নার্সরা। খোস গল্পের সঙ্গে সঙ্গেই হাত চলে ওদের। কেউ ময়লা ফ্রকটা বদলে দেয়, কেউ অতি সাবধানে ঘুমন্ত করবীর চুলে আলতো করে চিরুনি চালিয়ে আঁচড়ে দেয় চুলগুলো। কেউ বা কাজলের রেখা টেনে দেয় ওর দুটো অবোধ ডাগর চোখের কোলে।

দিন দিন বড় হচ্ছে করবী! ওজন বাড়ছে দুষ্টুমী শিখছে দেখে আনন্দের সীমা থাকে না নার্সদের। আগে ওর চোখের দৃষ্টি ছিল না, এখন মানুষ দেখলেই কল কল করে ওঠে। কাজল পরাতে গেলেই দুষ্টুমী করে নিজের ছোট্ট হাতের ঝাপটায় সরিয়ে দেয় হাতটা। শুধু তাই নয়—নার্সরা কপট ধমক দিয়ে উঠলেই দ্বিগুণ উৎসাহে ফোকলা মুখে খিল খিল করে হেসে ওঠে।

এদের চোখে করবী যেন এক পরম বিস্ময়। মাত্র তিনমাস বয়স ওর। কিন্তু দেখে মনে হয় পাঁচ-ছ' মাসের মেয়ে। শুধু দেহে নয়, দুষ্টুমীতেও তাই। টুপি পরে ওর কাছে আসার উপায় নেই কারো। করবী এমন হাত-পা ছুঁড়ে আব্দার জুড়ে বসে তাড়াতাড়ি টুপিটা ওর হাতে না দিয়ে নিস্তার থাকে না। এমন কী চীফ মেট্রন বীণাপাণির মত গোমড়ামুখো মেয়েরও রেহাই নেই। আজ পর্যন্ত যাকে হাসতে দেখেনি নার্সরা—তিনিও করবীর দুষ্টুমীতে ইদানীং একটু একটু হাসতে শুরু করেছেন।

মাঝে মাঝে ওয়ার্ডে রাউণ্ড দিতে আসেন বীণাপাণিদি। কার কী অভিযোগ আছে, কোন পেসেণ্ট কষ্ট পাচ্ছে, কাকে সময়মত বেডপ্যান দেওয়া হয়নি [illegible] তদারক করেন। নার্সরা সে-সময়টা [illegible] হয়ে থাকে। ফাঁকি [illegible] উপায় নেই বীণাদিকে। [illegible] খুঁতগুলো চোখে পড়বেই। অবশ্য সকলের সামনে কিছু বলেন না কাউকে। আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে [illegible] ছাড়েন।

বীণাপাণিকে [illegible] পেছন থেকে করবীর খাটের কাছে এসে দাঁড়াতে দেখলেই [illegible] নার্সরা। এখানে সকলকে একসঙ্গে [illegible] [illegible] —এখানে কী হচ্ছে [illegible]? ওদিকে যে [illegible] কে দেখবে? [illegible] বেডপ্যান দেওয়া হয়নি কেন?

সেই বীণাদির [illegible] নিয়েছে করবী। ইদানীং করবীর চারদিকে ভিড় করে নার্সদের [illegible] মোটেই [illegible] করেন না। বরং নরম গলায় বলেন—[illegible] একেবারে [illegible] [illegible] নেই। [illegible] হয়েছে? ওটা সময়মত [illegible] ভাল না।

বলেই করবীর ওপর অনেকটা ঝুঁকে পড়ে ওর চিবুকটা সাবধানে নেড়ে দিয়ে হেসে উঠলেন—দেখেছি গো দেখেছি! অত হাত-পা নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে না আমার। একটু যে কাজের কথা বলব... তারও উপায় নেই, না? একটু আগে অমন চিল-চিৎকার করে কাঁদছিলে যে বড়। উঁহু ...ওটা আর নয়, দিন দিন যত দুষ্টুমী শিখছ তুমি? রোজ রোজ আব্দার। এবার মার খাবে কিন্তু...

কিন্তু যা হাত-পা ছুঁড়ছে করবী তাড়াতাড়ি মাথা থেকে টুপিটা খুলে ওর হাতে না দিয়েও নিস্কৃতি নেই বীণাপাণির।

বীণাদি কিন্তু ঠিকই বলেছেন...দিন দিন দুষ্টুমী শিখছে করবী। নিত্যনতুন দুষ্টুমী আয়ত্ত করে চলেছে। আজ এক নতুন খেলা শিখেছে। বীণাদির টুপিটা ওর হাতে দিতেই সেটা খাটের রেলিং টপকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই খিল খিল করে হেসে ওঠে।

বীণাদি রীতিমত অবাক। প্রথমটা কেমন সন্দেহ জেগেছিল মনে—তাই আরো কয়েকবার নিজেই টুপিটা কুড়িয়ে করবীর হাতে গুঁজে দিলেন। কিন্তু না, আর কোন সন্দেহ নেই। টুপিটা হাতে পেয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফোকলা দাঁতে হেসে সারা হচ্ছে। নিজে একা দেখে তৃপ্তি নেই বীণাদির। সকলকে ডেকে দেখাতে ইচ্ছে করছে। উঃ, কী ভীষণ দুষ্টু হয়েছে যে মেয়েটা।

হঠাৎ ওদিক দিয়ে সিস্টারকে যেতে দেখে সব ভুলে খুশি খুশি গলায় ডেকে উঠলেন—সিস্টার দ্যাখ দ্যাখ...কী দুষ্টু হয়েছে তোমাদের মেয়ে। টুপিটা নিচ্ছে আর ফেলে দিচ্ছে বার বার।

শুধু একা বীণাপাণি নয়, এ-হাসপাতালের সব কর্মচারীই...করবীর সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই বলে...তোমাদের মেয়ে। ডি-এম-ও বলেন—সুজাতা, তোমাদের মেয়েকে তো আজ একবারও দেখলাম না। শরীর খারাপ হয়নি তো ওর? দুধোপদ ধোপাও বলে...এসব হল হাসপাতালের জিনিস। আর এগুলো হল আপনাদের মেয়ের জামা কাপড়। আলাদা করে কেচেছি।

নার্সরা শুধু হাসে মনে মনে। কথাটা শুনতেও ভাল লাগে ওদের। কেমন একটা অহঙ্কারের গর্ব অনুভব করে—করবীকে বাঁচিয়ে তোলার পেছনে বহু বিনিদ্র রাত্রির উদ্বেগ, কষ্ট পরিশ্রম বৃথাই যায়নি ওদের।

এক বছর বয়সে প্রথম মা শব্দটা উচ্চারণ করতে শিখল করবী। শুধু মা। সকলেই করবীর মা। কী ভেবে যে সকলকে মা বলে ডাকে...ওই জানে। কখনো মনে হয় সব নার্সদের পোশাক একরকম তাই কোন প্রভেদ ধরা পড়ে না ওর চোখে। আবার কখনো মনে হয় তা নয়, ও ঠিকই চিনেছে। ওর প্রতি ভালবাসা মমতার এতটুকু হেরফের নেই নার্সদের হৃদয়ে। সবাই সমান ভালবাসে ওকে। করবীর জীবনে নার্স মাত্রেই করুণাময়ী জননী। যার যতটুকু সামর্থ্য, তাই দিয়ে জুগিয়ে চলেছে ওর প্রাত্যহিক প্রয়োজন। ভাগাভাগি করে কেউ জুতো, কেউ মোজা, কেউ ফ্রক, আবার কেউ বা বেবীফুড সবই কিনে আনছে। কোন জিনিসের অভাব রাখেনি ওরা। আসলে করবী ওদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে! ওকে ছেড়ে কেউ থাকতে পারে না। এমনকি দু'দিনের জন্যে ছুটিতে বাড়ি গেলে মন কেমন করে ওদের। হাসপাতালে ফিরেই

নার্সদের সঙ্গ ছাড়তে চায় না করবী। নার্সরা ঘরে ঘরে পেসেন্টদের তদারকী করে বেড়ায়— পেছন থেকে এপ্রনটা ছোট্ট মুঠোয় আঁকড়ে ধরে ঘ্যান ঘ্যান করতে করতে ঘুরে বেড়ায় ওদের পেছন পেছন... মা ঘুম...মা কোলে...মা ভয়...।

টেম্পারেচার চার্ট থেকে মুখ না তুলেই শাকিলা বিরত গলায় ধমক দেয়—আবার তুমি দুষ্টুমি করছ তো? বলেছি না কাজের সময় বিরক্ত করবে না! যাও, লক্ষ্মীমেয়ের মত তোমার খাটে শুয়ে থাক। এক্ষুনি মা আসবে। খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যাবে তোমায়।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। এক বেড থেকে অন্য বেডে এগিয়ে চলেছে শাকিলা, করবীও চলেছে পেছন পেছন—মা ঘুম... মা কোলে

দূত্তোর! কেবল ঘ্যান ঘ্যান মেয়ের। শাকিলা এবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়েই পেছন ফিরে কপট রাগের ভান করে ধমকালে। —ঘুম তো আমি কী করবরে পাজি মেয়ে! দেখছিস না কাজ করছি...যাও শোও গিয়ে নিজের বিছানায়।

আচমকা মার কাছে ধমক খেয়ে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে করবী। পরমুহূর্তেই অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে।

অগত্যা হাতের কাজ ফেলে রেখেই ওকে কোলে তুলে নিতে হয় শাকিলাকে—ইস্ আবার কান্না দেখ না মেয়ের। সাত সন্ধেতে ঘুম পেয়েছে না হাতি। কেবল দুষ্টুমি! চলো আগে তোমার ব্যবস্থা করি, তারপর অন্য কাজ। বলেই ওকে নিয়ে চলল নিজের হোস্টেলে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুবেলাই ভাত খেতে শিখেছে করবী। আগে হাসপাতালের পেসেন্টদের সঙ্গে করবীর ভাতও আসত। কিন্তু সেটা মনঃপুত হয়নি নার্সদের। ইদানীং তাই করবীর খাবার ওদের হোস্টেলেই তৈরী হয়। খাবার সময় হলে শুধু কেউ না কেউ এসে খাইয়ে নিয়ে আসে ওকে।

সমস্ত রাতটা অঘোরে ঘুমোয় করবী। ফিমেল ওয়ার্ডের একপাশে পাতা ওর নির্দিষ্ট মশারির ঢাকা ছোট্ট খাটে শুয়ে এক ঘুমেই কাটিয়ে দেয় রাতটা। তখন আর কাউকে বিরক্ত করে না ও। কাউকেই বিব্রত হতে হয় না ওর জন্যে। কোনদিন যদি ভুল হয়ে যায় নার্সদের—সারারাত ভিজে বিছানায় পড়ে থাকে। কখনো বা প্রচণ্ড শীতের রাতে গা থেকে কম্বলটা সরে যাওয়ায় সারারাত বিছানায় কুঁকড়ে শুয়ে কাটিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, অনিচ্ছাকৃত ভাবে কিছু অনাদর কিম্বা অবহেলা যে না হয়েছে তা নয়। হওয়াই স্বাভাবিক। গা সওয়া উপসর্গ সম্পর্কে যেমন নিয়মিত পরিচর্যার আর উৎসাহ থাকে না মানুষের মনে, তেমনি করবীর সম্বন্ধেও মাঝে মাঝে উৎসাহের জোয়ারে ভাটার টান ধরবে আশ্চর্য কী!

তবু কালকেতুর মত দিন দিন বড় হয়ে উঠছে করবী। স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে। বড় লক্ষ্মী, বড় সুন্দর হয়ে উঠছে দিন দিন। শুধু নার্স মহলে নয়, সমস্ত হাসপাতাল কর্মীদের কাছেই করবী বড় ভালবাসার সামগ্রী। সবাই ওর আপনজন। নতুন ডি এম ও ডাক্তার সেনাপতির মত রাশভারি মানুষ থেকে শুরু করে ডাক্তার কম্পাউন্ডার ড্রেসার সুইপার...সকলের হৃদয় জয় করে নিয়েছে ছোট্ট করবী!

কখনো ডাক্তার সেনাপতির ঘরে হানা দিচ্ছে করবী, কখনো অপারেশন থিয়েটারে উদয় হচ্ছে, কখনো ডিস্পেন্সারিতে ঢুকে পড়ে শিশি বোতল ঘাঁটছে। সর্বত্রই অবাধ গতিবিধি করবীর। ওর ছোটখাটো দৌরাত্ম্যকে হাসিমুখে সহ্য করছে সবাই।

হেড সুইপার লালা হরিজন ওর নাম দিয়েছে করবী মেমসাব। শুধু তাই নয়, ওর চালচলন দেখে লালা প্রথম থেকেই ভবিষ্যতবাণী করে আসছে...করবী মেমসাব বড় হয়ে নিশ্চয়ই হাসপাতালের ডি এম ও হবে। হয়তো সেই প্রত্যাশায় এখন থেকেই তোয়াক্কা করে চলে হাসপাতালের ভাবী ডি এম ও কে। যখনই দেখা হয় করবীর সঙ্গে তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলে রেখে নাটকীয় ভঙ্গিতে আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ জানায় ওকে...সেলাম মেমসাব।

সেদিন করবী সকালে কঞ্চি হাতে গাছ থেকে ফুল পাড়তে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাধা পেয়ে লালা বুড়োর রোজ রোজ হেয়াকীর প্রত্যুত্তর দিতে নিমেষে ওর হাতের কঞ্চিটা আন্দোলিত হয়ে উঠল—আবাল, আবাল দুষ্টুমি কাচ্ছিস পাজী তুই! দেখাব... আমাল মাকে বলে দেব?

আচমকা মার খেয়ে লালা যন্ত্রণার ভান করে তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে উঠল—আরে বাপ্পস্। মর গেরে হাম। মেমসাব মুঝে এতনা মার ডালা হে...বলতে বলতে হাতে বালতিটা নিয়ে ছুটে পালাল লালা। ওর মারের আঘাতে লালার দুরবস্থা দেখে করবী মহাউল্লাসে হাসতে লাগল।

অনেকদিন আগে বীণাপাণিদি যেদিন এই হাসপাতাল থেকে বদলী হয়ে চলে যান, সেদিন তাঁর বিদায়কালীন বক্তৃতা ছিল সংক্ষিপ্ত। হৃদয়ের আবেগ ছিল সংযত। তবু নিতান্ত ছোটখাট আচরণের মধ্যে দিয়েই করবীর প্রতি তাঁর মায়া মমতা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু করবীর জীবনে সেদিনের সেই অনাড়ম্বর বিদায় অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সমস্ত নার্সদের মনের গভীরে সেদিনই বোধহয় বিদায়ের বিষন্ন সুর বেজে উঠেছিল। বীণাদির মত একদিন হাসপাতাল ছেড়ে, করবীকে ছেড়ে সকলকেই একে একে চলে যেতে হবে ভেবে মন প্রাণ গভীর বিষাদে ভরে উঠেছিল।

দীর্ঘদিন পর আচমকা একঝলক দমকা হাওয়ায় ভুলে থাকা সেই বিষণ্ণ সুরটা আবার ভেসে এল নার্সদের কানে। আশ্চর্য কান্নাও শাকিলা ভাবতে পারেনি, এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবে ওকে। বিকেলে চিঠিটা পাবার পরই ভারাক্রান্ত মন নিয়ে হোস্টেলে ফিরে এল শাকিলা। তালা খুলে ঘরে ঢুকে, খোলা জানলা দিয়ে অন্যমনস্কের মত দূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। ভিজিটিং আওয়ারের শেষে মাঠের ওপর দিয়ে ধীরে সুস্থে ফিরে চলেছে পেসেন্টদের আত্মীয়স্বজনেরা। দূরে বড় রাস্তায় সাইকেল রিক্সা বাস লরীর স্রোত ছুটে চলেছে। দিন শেষের অলসমন্থরতাকে হঠাৎ হঠাৎ সচকিত করে মোটরের হর্ণ বেজে উঠছে। এক ঝাঁক সাদা বক দুই ডানা মেলে মাঠের বকুল গাছটাকে প্রদক্ষিণ করে উড়ে গেল নিজেদের আস্তানার দিকে। কিন্তু আজ কোন দিকেই হুঁস নেই শাকিলার। কেবল করবীর চিন্তাটা অধিকার করে এসেছে ওর সমস্ত মনপ্রাণ। আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় থেকে থেকে হু হু করে কেঁদে উঠছে ওর বুকের ভেতরটা।

অনেকদিন পর বীণাদির সেদিনের সেই বিদায়কালীন ভাষণটাই যেন আজ হৃদয়ের অকৃত্রিম আবেগ দিয়ে বড় করুণ বড় মর্মস্পর্শী করে ফুটিয়ে তুলল শাকিলা। দুচোখে অবাধ্য অশ্রুর স্রোত, কণ্ঠস্বরে দুরন্ত আবেগ যেন উত্তাল হয়ে উঠছে। কথা বলতে গেলেই থর থর করে কেঁপে উঠছে ওর পাতলা ঠোঁট দুটো। তাই বক্তৃতার মধ্যে নিজেও ঠোঁট কামড়ে ধরে থেমে পড়ছিল বার বার। বলছিল, আজ

আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু আমি জানি যত দূরেই যাই না কেন, যেখানেই থাকি আমার মন প্রাণ পড়ে থাকবে আপনাদেরই মধ্যে। করবীকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে শান্তি পাব না আমি তাও জানি, আমি যেন এখনো ভাবতে পারছি না, আজকের ছোট্ট করবী একদিন বড় হবে, অথচ ওর জীবনে আমার দেওয়া আশ্বাসের কোন মূল্য থাকবে না। আর, কোন দুশ্চিন্তাই ওর জন্যে আমার থাকবে না!...আমি ওর জীবন থেকে চিরদিনের মত হারিয়ে যেতে বসেছি এই নিষ্ঠুর সত্যটা আপনারা আমায় বিদায় সম্বর্ধনার মধ্যে দিয়েই জানিয়ে দিলেন...।

শাকিলা চলে গেল, কিন্তু বিদায় ক্ষণের সেই বিষন্ন সুর স্তব্ধ হল না। এ হাসপাতালে অনেকেরই পাঁচ বছরের কার্যকাল অতিক্রান্ত হতে চলল। শাকিলার পর কণিকা, মন্দিরা, আলো, সুজাতার পালা এল। তারপর এল আরো কয়েকজনের বদলীর নির্দেশ। এ চাকরীর এই নিয়ম। কোথাও কেউ স্থায়ী নয়। একে একে চলে যাচ্ছে অনেকেই। করবীরও জীবন থেকে একে একে মায়ের স্থানগুলো চিরদিনের মত শূন্যতার গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে। সে স্থান পূর্ণ করতে এগিয়ে আসছে নতুনের দল। তারাও ভালবাসে করবীকে। কিন্তু তারা ওর মা নয়...মাসী। সম্ভবত বার বার মাকে হারিয়ে ফেলার বেদনাকে দূরে সরিয়ে রাখতে নতুন কাউকে আর মা বলে ভুল করতে চায় না করবী। নতুন নার্স সুলেখা,
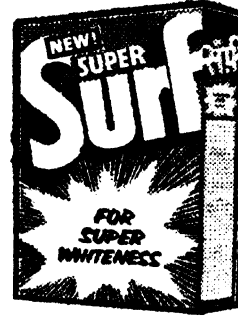
প্রীতি, সুধীরা, অলোকা সবাই করবীর মাসী।

এখন মা শুধু সিসিলিয়া। করবীর জীবনে শিবরাত্রির সলতের মত এখনো টিম টিম করে জ্বলে চলেছে। কিন্তু তাই বা আর কতদিন? যে কোনদিন সিসিলিয়ার বদলীর নির্দেশও এসে পড়তে পারে আশ্চর্য কী?

করবীও যেন কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে উঠছে দিন দিন। আগের মত আর ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে দুরন্তপনা করে বেড়ায় না। কাউকে বিরক্ত করতে চায় না। একা একাই খেলে বেড়ায় মাঠে। কখনো বা আনমনা দৃষ্টিতে চুপচাপ হাসপাতালের সিঁড়িতে বসে তাকিয়ে থাকে দূরের দিকে। আবার কখনো নিঃশব্দে সিসিলিয়ার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে—ওমা, আমার সেই মা কোথায় চলে গেছে ...বলো না?

সিসিলিয়া হাতের কাজ ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি ওকে কোলে তুলে নিয়ে বাইরে চলে এসে আদর করে—কোন্ মা বলতো? সুজাতা...শাকিলা...মন্দিরা?

উত্তর দিতে পারে না করবী। কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে অনেকক্ষণ অপলক তাকিয়ে থাকে সিসিলিয়ার মুখের দিকে। সম্ভবত কোন মাকেই আলাদা করতে পারে না। ওর জীবনে সকলেই কল্যাণময়ী জননী। কিন্তু তারা সব একে একে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে বুঝে উঠতে পারে না করবী।

হঠাৎ তার মধ্যেই বিদায়ের সেই করুণ বিষণ্ন সুরটা যেন আর্তনাদ করে উঠল সিসিলিয়ার কানে। শুধু সিসিলিয়াই নয় সমস্ত হাসপাতাল কর্মচারীদের কাছেই সরকারী ইস্তাহারের নির্মম নির্দেশ এসে পৌঁছল...'এখন থেকে করবী রাষ্ট্রের সম্পত্তি। দাবীদাওয়াহীন বেওয়ারিশ শিশু মাত্রেরই অভিভাবক—রাষ্ট্র। সরকারী হিসেব মত আজ পাঁচ বছর পূর্ণ হল করবীর। তাই রাষ্ট্র তার আইনের মর্যাদা রক্ষার্থে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন অতি সত্বর করবীকে যেন রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করা হয়।'

আশ্চর্য আজ যে করবীর বয়স পাঁচ পূর্ণ হল—এ তথ্যটা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই বিস্মৃত হয়েছিলেন। আজ থেকে করবী আর তাদের নয়। রাষ্ট্রই তার অভিভাবক। হাসপাতালের অসংখ্য কর্মচারীদের এত ভালবাসা মমতা দিয়ে তিলে তিলে গড়ে ওঠা করবীর ওপর আর কোন অধিকার নেই তাদের।

সিসিলিয়ার দুচোখে আগুন ঝিলিক দিয়ে উঠল—অসম্ভব। এ আইন অন্যায়। করবী তাদেরই। যদি একদিন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ওর জীবনকে ছিনিয়ে এনে থাকতে পারে ওরা তো করবীর অনাগত জীবনকেও নিশ্চিন্ত করে তুলতে পারবে।

শুধু সাধারণ কর্মচারীই নয়, ডাক্তাররা পর্যন্ত নার্সদের বিক্ষোভের সামিল হলেন। এমন কী ডাঃ সেনাপতিও তাদের সঙ্গে একমত। কারণ তিনি নিজেও করবীর প্রতি মমতায় ভালবাসায় জড়িয়ে ফেলেছেন নিজেকে। করবী চলে যাবে হাসপাতাল থেকে, আর কোনদিন করবী গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করে থাকবে না তার জন্যে ভাবতেও যেন কষ্ট হয় ডাঃ সেনাপতির। কিন্তু বড় নিরুপায় তিনি। একদিকে তাঁর হৃদয়াবেগ অপরদিকে রাষ্ট্রের আইনের ঝক্কি সামলাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন। তবু কোনরকমে আইনের প্রয়োগকে ঠেকিয়ে চলেছেন। অবশ্য প্রত্যাশার কিছু নেই উপায়ও কিছু নেই। আজ না হোক, একদিন তো যেতেই হবে ওকে।

সিসিলিয়াকেও সেকথা বোঝাতে চেষ্টা করেন ডাঃ সেনাপতি। সিসিলিয়া শুধু তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীই নয়, তাঁর মেয়ের মত। ছোট্ট করবী যেন এই অসমবয়সী দুটি হৃদয়ের মাঝে স্নেহের সেতুবন্ধ গড়ে তুলেছে। সেদিক দিয়েও সিসিলিয়ার প্রতি তাঁর দাবি গড়ে উঠেছে অলক্ষ্যে। তাই ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেন ডাক্তার সেনাপতি—এতো একরকম ভালই হল সিসি। একে একে সকলেই তো চলে যাচ্ছে এখান থেকে। তুমিও যাবে একদিন। আজ যারা আছে তারাও সকলেই চলে যাবে কোন না কোনদিন। আমাকেও চলে যেতে হবে। শুধু তাই নয়—সমস্ত অবস্থাটাই যে কোনদিন আমূলে বদলে যাবে না কে বলতে পারে। একটু ভেবে দেখ...সেদিন কে দেখবে করবীকে। তোমাদের মত এত দরদ দিয়ে কে সর্বক্ষণ আগলে বেড়াবে ওকে। তারচেয়ে রাষ্ট্রের হেপাজতে মানুষ হওয়া মন্দ কী সিসি? আর কিছু না হোক সেখানে অন্তত ওর ভবিষ্যতটা নিরাপদ হবে।

অবশ্য একদিনেই রাজি করান যায়নি সিসিলিয়াকে। বেশ কয়েকদিন সময় লেগেছিল। অবশেষে সেই দিনটিও এসে পড়ল একদিন।

আজ করবীর হাসপাতাল থেকে বিদায় নেবার দিন। বিকেলে পুলিশ কর্তৃপক্ষের হাতে সঁপে দিতে হবে ওকে। তাই তার আগেই হোস্টেলে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে করবীকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাল নার্সরা। হাসপাতালের কর্মচারী নয় করবী তাই অন্যান্যদের মত হাসপাতালের পক্ষ থেকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানো গেল না ওকে।

হাসপাতালের সমস্ত কর্মচারীরা নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন হোস্টেলের উন্মুক্ত উঠোনে। সকলেই বড় চুপচাপ। বড় গম্ভীর। বসার কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি—সেজন্যে অবশ্য অনুযোগও নেই কারো। মাত্র দুটো চেয়ার পাতা হয়েছে সভার কেন্দ্রস্থলে। একটিতে ডাঃ সেনাপতি বসেছেন, অপরটিতে করবী। বাকী সকলেই ওদের পেছনে এসে দাঁড়ালেন। নার্সদের ইচ্ছে অনুযায়ী করবীকে নিয়ে ছবি তোলার ব্যবস্থা হয়েছে।

নতুন সুন্দর একটা ফ্রক পরে করবীকে আজ যেন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। গলায় দুলছে প্রকাণ্ড একটা গোড়ের মালা। আজও ওর মুখে সেই অনাবিল সুন্দর মিষ্টি হাসি লেগে আছে। আরেকটু পরেই যে আবার ওর জীবনে মস্ত একটি পরিবর্তন ঘটতে চলেছে তার কিছুই জানে না বলে হয়তো জুতো মোজা পরা পা দুটো পরম নির্বিকারভাবে দুলিয়ে চলেছে।

সিসিলিয়া দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে, কিন্তু দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল করবীর দিকে। ডাঃ সেনাপতি আগেভাগেই বুঝিয়ে রেখেছিলেন ওকে, সন্তানকে বিদায় দেবার সময়, চোখের জল ফেলতে নেই মায়েদের। তাতে অকল্যাণ হয় সন্তানের। হৃদয়ে যাই থাক, যত জ্বালা যন্ত্রণাই থাক, তবু বাইরে হাসিমুখ বজায় রাখতে হবে।

হঠাৎ কী কারণে এত জোরে হেসে উঠল সিসিলিয়া—সকলেই চমকে মুখ ফেরালেন ওর দিকে। কেবল করবী তখনও তেমনি একাগ্রচিত্তে অপলক তাকিয়ে রয়েছে কালো কাপড়ে ঢাকা ক্যামেরাটার দিকে। একবারও ফিরে তাকাল না ওর দিকে।

শুধু তাই নয়, ছবি তোলার পর সকলের নিবিড় ভালবাসা আর আদরটুকুও পরম প্রশান্তচিত্তে গ্রহণ করল করবী। এবার ওর উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে পুলিশ ভ্যানটার ওপর কিম্বা লাল টুপি কনস্টেবলের হাতের ব্যাটনটাতেই ওর আগ্রহ বেশী বোঝা গেল না। সিসিলিয়া ওর হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ আর আবেগকে উজাড় করে চুম্বন এঁকে দিল করবীর ছোট্ট কপালে...বোধহয় বুঝতেই পারল না ও। কী দেখছে ওদিকে এত মন দিয়ে ওই কানে। আশ্চর্য, পুলিশ ইন্সপেক্টরের হাত ধরে গাড়িতেও উঠে বসল করবী। তারপর .....

কিন্তু না...পুলিশ ভ্যানটা হঠাৎ গর্জে উঠে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করতেই তাড়াতাড়ি চারিদিকে সন্ত্রস্ত চোখে তাকাল করবী। একী! ক্রমেই এগিয়ে চলেছে ও, আর পেছিয়ে চলেছে মা আর মাসীরা। কিন্তু এরা কারা। কাদের সঙ্গে একা একা বসে রয়েছে ও। ওর হাতটাই বা এত জোরে ধরে রয়েছে কেন লাল টুপি পরা অচেনা লোকটা।

হঠাৎ অসহায় সঙ্গীন কন্ঠের আর্তচিৎকার সচকিত করে তুলল আকাশ বাতাস সবাইকে ...মা মাসী আমাকে এরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওমা আমি যাব না...আমি মরে যাব ...আমি মরে......

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আমাদের বয়স যখন দশের নীচে, তখনকার একটি স্মরণীয় ঘটনা সহসা মনে এল। বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার রায় বেরিয়েছে মাত্র ক'দিন আগে। কোনো একটি দৈনিকপত্র সেদিন ভাওয়ালের কুমারের এই জয়লাভে পুলকিত হয়ে সন্দেশ বিতরণ করেছিলেন। তুমুল উত্তেজনা। এমন এক সময় ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার অন্যতম বিচারক জাস্টিস লজ আমাদের কর্মস্থলে এসেছিলেন তাঁর বার্ষিক পরিদর্শনে। হাতের কাছে এমন একজনকে পেয়ে আমাদের একজন সহকর্মী অর্বাচীনের মত তাঁকে প্রশ্ন করে বসল—আপনি ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলায় পৃথক রায় দিলেন কেন? এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জাস্টিস লজ বিশ্বাস করেননি যে সন্ন্যাসীই প্রকৃত কুমার, তাই তিনি পৃথক মত প্রকাশ করেন। আমাদের সহকর্মীর দুঃসাহসে আমরা শঙ্কিত হলাম, কিন্তু জাস্টিস লজ স্মিতহাস্যে বললেন—আমি বিশ্বাস করি না উনিই কুমার। আমাদের সেই বন্ধু বলল—কিন্তু আমাদের সাক্ষী সমাজের হালচাল হয়ত আপনার তেমন জানা নেই। জাস্টিস লজ বলেছিলেন—আমি অনেকদিন এসেছি এই দেশে, আর এই সন্ন্যাসীর আবির্ভাব কালে আমি সেই অঞ্চলেই ছিলাম, আই স্টিল বিলিভ হি ইজ এ্যান ইমপস্টার। (আমি এখনও বিশ্বাস করি উনি প্রতারক)।

সেদিন আমাদের মন জাস্টিস লজের এই মন্তব্য নির্বিচারে গ্রহণ করতে রাজী হয়নি, কিন্তু আজ দীর্ঘদিনের ব্যবধানে অনেক কুয়াশা অন্তর্হিত হওয়ার পর মনে হয় এই বিখ্যাত মামলাটি সম্পর্কে নব মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে।

এই কাহিনী নিয়ে অনেক আইনজ্ঞ ব্যক্তি দীর্ঘকাল চুলচেরা বিচার করেছেন, মুখরোচক কাহিনী বা কেচ্ছা হিসাবেও প্রচার হয়েছে। শ্রীমতী তারা আলী বেগ সম্প্রতি ইংরেজীতে এই কাহিনীকে উপজীব্য করে এক উপাদেয় উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর লিখনভঙ্গী মনোহর তিনি এক মানবিক ইতিহাস বিধৃত করেছেন তাঁর সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থ মুন এ্যাণ্ড রাহুতে। এ কাহিনী সত্যভিত্তিক হলেও উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চকর।

শ্রীমতী বেগ এই গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন—

"এই কাহিনী অবশ্য রচিত হয়েছে প্রচুর তথ্য ও দলিলের ভিত্তিতে তবু এর সঙ্গে বিজড়িত আছে আমার শৈশব-স্মৃতি, অতীতের অনেক উৎসব আর অনুষ্ঠান যা অধুনা প্রায় লুপ্ত। যে দেশকে আমি বালিকা বয়সে ভালোবাসতাম, যার দৃশ্যপট এবং ভারতীয় জীবন-ধারা আমার মানসপটে চিত্রিত, সাম্প্রতিক রাজনীতি অর্থনীতি, প্রগতি আর শিক্ষানীতি সেসব বস্তুকেই অতীতের সামগ্রী করে ফেলেছে।

তাঁতের মাকুর মত এই উপন্যাস প্রকৃত কথার ভিত্তিতে বোনা; কারণ, আমার নিজের আত্মীয়বর্গ এই মামলায় সাক্ষী দিয়েছেন। আমার মনে আছে আমাদের দেশ আর সন্ন্যাসীকে; ঢাকা শহরে সেই

রাহুগ্রস্ত শশী

স্থূলদেহ মানুষটি ছিলেন সেদিনের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বস্তু।"

শ্রীমতী বেগ সেই বালিকা বয়সে প্রায় ছয় বছর ধরে এই মামলার বিবরণ শুনেছেন দুই পক্ষের উকীলদের মুখে, এঁরা ছিলেন তাঁর পিতৃবন্ধু। প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ্রীমতী বেগের পিতার কাছে তাঁরা আসতেন এবং সেদিন আদালতে যা ঘটেছে তাই আলোচনা করতেন; এই ছিল তাঁদের বিশ্রাম্ভালাপ। তাঁর মনে মনে রাণী বিভাবতী সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল, অতিশয় গভীর ও চতুরা অথচ কোমল এবং মধুরা। যে সব উকীলরা তাঁকে সমর্থন করতেন তাঁরা বিশেষভাবে রাণীর প্রশংসা করতেন; এই ভাবে রাণী বিভাবতী দেবীর একটা ভাব-মূর্তি তাঁর মনে গাঁথা ছিল। একটি কুমারী কিভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছেন পূর্ণ-যৌবনা নারীত্বে আর বুদ্ধি এবং বিবেচনায় তিনি হয়ে উঠেছেন এমনই বিচক্ষণ যে, বাঘা-বাঘা উকীল-ব্যারিস্টারের তিনি সমতুল।

এই আশ্চর্য রমণীর সঙ্গে লেখিকার প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটল ১৯৬০-এ তখন বিভাবতীর বয়স প্রায় সত্তরের কোঠায়। লেখিকা লিখছেন—

> "It was something of a shock, therefore, when I met her myself in Calcutta — in 1960. I found a woman who was essentially womanly, delicate and lovely still though nearly seventy, with an upright feminine quality I had not expected."

রাণী বিভাবতীকে অসহ্য মানসিক ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছে সারাজীবন ধরে। ধনী পরিবারের এক মূর্খ অপদার্থ লম্পট চরিত্র স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সেই স্বামীও মারা গেলেন অল্পবয়সে। তারপর তিনি বা তাঁর নকল আবির্ভূত হলেন স্বামীত্বের দাবী নিয়ে। দীর্ঘস্থায়ী মামলা-মোকদ্দমা চলল, নীচের আদালত থেকে প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত, এবং সর্বত্র নবাগত কুমারই জয়যুক্ত হয়েছেন। কুমার রমেন্দ্র-নারায়ণ এর পর অন্য বিবাহ করেছেন এবং প্রিভি কাউন্সিলের রায় বেরোবার দুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্রীমতী বেগ কাহিনীর আরম্ভ ও শেষ করেছেন বিভাবতীর সঙ্গে তাঁর যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে তাই দিয়ে। লেখিকা বলেছেন যে, রাণী বিভাবতীর সঙ্গে তাঁর যেসব কথাবার্তা হয়েছে এবং তিনি যেসব তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন তার ওপর ভিত্তি করে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছেন। লেখিকা বলেছেন—

> "She asked me to tell her story and I have told it here with all the material that there was. As to the truth, who knows what the truth was finally?"

আজ তাই ঘটনা থেকে অনেক দূরে এসে দাঁড়িয়ে সত্যই এই প্রশ্ন মনে জাগে—সত্য কি? সত্যই কি সন্ন্যাসী প্রকৃত কুমার, বিচারপতিরা যা চুল চিরে বিচার করে স্থির করেছেন। বা রাণী বিভাবতীই সত্য বলেছেন, তাঁর স্বামী হিসাবে তিনি এই সন্ন্যাসীকে গ্রহণ করতে পারেননি, তার জন্য তাঁকে অশেষ মানসিক ক্লেশ স্বীকার করতে হয়েছে, আত্মীয়-পরিজনের বিরোধিতা, সমকালীন সংবাদপত্রের টিটকারি। সবই তিনি নীরবে সহ্য করেছেন। তাঁর দিকটা আমরা মানবিক মাপকাঠিতে ত বিচার করিনি। শ্রীমতী বেগ সেই কাজটুকু সম্পন্ন করেছেন অশেষ নিষ্ঠায় ও পরিশ্রমে।

ভাওয়াল রাজ-এস্টেটের দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণের দার্জিলিং-এ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখে মৃত্যু হয়। সেই রাত্রে স্থানীয় শ্মশানে তাঁর মরদেহ দাহ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, শ্মশানে সহসা প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি সুরু হয়। দাহ-কারীরা সাময়িকভাবে অন্যত্র আশ্রয় নেয়, দেহটি পড়ে থাকে। তারপর একটু শান্ত আবহাওয়া হতেই ফিরে এসে দেখে দেহটি নেই। পরে অবশ্য দেহ নাকি খুঁজে পাওয়া যায় এবং তাকে ভস্মীভূত করা হয়। সন্ন্যাসীর বক্তব্য এই যে, তাঁকে সেই অবস্থায় ফেলে রাখার সময় নাগা সন্ন্যাসীরা তাঁর পরিচর্যা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন, এবং তিনদিন পরে তিনি জ্ঞানলাভ করেন। সন্ন্যাসীদের সঙ্গেই তিনি সর্বত্র ঘুরেছেন এবং ঢাকায় ফেরার এক বছর আগে নেপালের ব্রহ্মছত্র নামক জায়গায় তিনি দলত্যাগ করে নানা পথে ঘুরে ঢাকায় আসেন।

মৃত্যুর বারো বছরকাল পরে ঢাকার বাকল্যান্ড বাঁধে কুমারকে বসে থাকতে দেখা যায় আর সবাই তাঁকে কুমার বলে স্বীকার করে গ্রহণ করে।

শ্রীমতী বেগ এই গ্রন্থে বিভাবতীর জীবনের ট্রাজেডিটাকেই ফুটিয়ে তোলার দিকে বেশী মন দিয়েছেন। বিভাবতী তাঁকে অনুরোধ করেন "tell the truth for me."
আর লেখিকা সেই অনুরোধ পালনে অবহেলা করেননি।

স্বামীর মৃত্যুর পর নিঃসন্তান বিভাবতী থাকতেন তাঁর ভাই রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে। একদিন তাঁরা একটি চিঠি পেলেন, চিঠিটি ১৯২১-এর ৫ই মে তারিখে জয়দেবপুর—ঢাকা থেকে লিখেছেন আশুতোষ দাশগুপ্ত। তিনি লিখেছেন—

"শ্রীচরণকমলেষু,—

ভাওয়ালে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে যার তুলনা নাটক-নভেলে নেই। একজন সাধু বুদ্ধবাবু এবং অন্য অনেকের বাড়িতে এসেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন—"আমিই দ্বিতীয় কুমার—আমার নাম রমেন্দ্রনারায়ণ রায়।" তিনি দাসীর নাম অলকা তাও বলেছেন।

প্রজারা দুই লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে সম্পত্তি দখল নেবে। প্রতিদিন পাঁচ ছয় হাজার লোক সাধুকে দর্শন করতে আসে, কেউ কেউ নজরানাও আনে, আর সমগ্র নর-নারীর মনে দৃঢ় ধারণা যে ইনিই দ্বিতীয় কুমার—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই ব্যাপার নিয়ে মহা হৈ-চৈ চলছে—অতিশয় উদ্বেগের মধ্যে দিনাতিপাত করছি।
—ইতি বিনীত আশুতোষ দাশগুপ্ত।"

এই রাজ-এস্টেটের ম্যানেজার নীডহ্যামও অনুরূপ একটি পত্র লিখলেন কালেকটরকে আর তার অনুলিপি পাঠালেন রাণী বিভাবতীকে।

রাণী ত' বিপদে পড়লেন। যে স্বামী মৃত অবস্থায় অনেকক্ষণ তাঁর ক্রোড়ে ছিলেন তিনি আবার নতুন হয়ে এলেন কি করে। কি করা যায়। উকীলের সঙ্গে পরামর্শ চলছে এমন সময় মামলা রুজু করলেন নবাগত কুমার নিজে। একদিন বিভাবতীকে আদালতে হাজির হতে হল, তিনি সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বললেন—রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র আমার স্বামী ছিলেন। অনেক দিন আগে দার্জিলিং-এ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মধ্যরাত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রতিপক্ষের উকীল তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করেন—এই লোকটিকে ভালো করে দেখুন। বলুন ইনি কে?

বিভাবতী বেশ ভালো করে দেখলেন লোকটির দিকে কিঞ্চিৎ ঘৃণাভরে। দেখলেন তার মোটা নাক, পাতলা উৎসুক চোখ। এই মুখে সেই উচ্ছৃঙ্খল দৃষ্টি নেই, সেই নীল চোখের মধ্যে উদ্ধত ভঙ্গী নেই। এই চোখদুটিকে ভয় করতেন বিভাবতী। না, এই মুখের মধ্যে এমন কোনো চিহ্ন নেই যাতে এঁকে সেই ব্যক্তি বলা যায়। নাক, মুখ, চোখ কান, মুখের ভাব কোনোকিছুই যে মেলে না তাঁর সঙ্গে।

কেউ দেখছে দাঁত, চোখ, কেউ নাক। বিভাবতীর মত সামগ্রিকভাবে আর কেউ ত' দেখছে না—চোখ যা দেখে মনে তার প্রতিধ্বনি জাগে। বিভাবতী দেখলেন এ এক অজ্ঞাত-পরিচয় মানুষ। এর মুখে ক্লেশের ছাপ আছে, আর কিছু নেই। তাহলে ইনি কে?

'জাস্টিস ইন হেভেন' নামক পরিচ্ছেদে যেখানে আদালতের বিবরণ আছে তা অতিশয় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বিচারপতি স্থির করলেন সন্ন্যাসীই কুমার। তাঁর মতে—

> "It has satisfied every possible test."

রাণী বিভাবতী কিন্তু আদালতের রায় মেনে নিতে পারলেন না। হাইকোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিল সন্ন্যাসীর স্বপক্ষেই রায় দিলেন, তবু বিভাবতী অটল। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীমতী বেগকে বলেছেন—এ জগতে বিচার নেই, তবে স্বর্গে এখনও ন্যায়বিচার আছে। প্রিভি কাউন্সিলের রায় প্রকাশের দুদিন পরেই কুমার (সন্ন্যাসী) রমেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়।

শ্রীমতী বেগের এই বাস্তবভিত্তিক উপন্যাস একালের এক স্মরণীয় গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত হবে।

—অভয়ঙ্কর

MOON AND RAHU (Novel) By MRS. TARA ALI BEG: Published by ASIA PUBLISHING — Bombay — Price Rs. 25/- only.

সাহিত্যের খবর

মনুষ্যত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে চিরকালই বাংলার কবি, লেখক ও বুদ্ধিজীবী সমাজ প্রতিবাদ করে এসেছেন। সাম্প্রদায়িকতাকেও তাই তাঁরা আক্রমণ করেছেন কঠোর ভাবে। রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মবোধ' কবিতায় ধর্মের নামে মনুষ্যত্বের অবমাননার প্রতি চরম ধিক্কার জানিয়েছেন। নজরুল একাধিক কবিতায় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মনুষ্যত্বের জয়গান গেয়েছেন। সম্প্রতি যখন দেশের চতুর্দিকে ধর্মের নামে দুষ্কৃতকারীরা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে চলেছে, তখন আবার এগিয়ে এসেছেন কবি, লেখক এবং বুদ্ধিজীবী সমাজ।

গত মঙ্গলবার, ৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের উদ্যোগে কবি, লেখক এবং বুদ্ধিজীবীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর সূচনা নজরুলের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গানটি দিয়ে। গাইলেন কল্যাণী কাজী ও সাথীরা। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী ভাষণ দেন উর্দু লেখক পত্রিকার সম্পাদক এস এ মালিহাবাদী। সভাপতির ভাষণে অন্নদাশংকর রায় বলেন: "ভারতবর্ষে আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন জাতীয় সংহতি। যাঁরা মনে করেন, ভারত শুধু হিন্দুদের তাঁরা দেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছেন।"

প্রধান অতিথির ভাষণে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন—"সাম্প্রদায়িকতা এখন সমাজদেহে ক্যান্সারের মত হয়ে উঠেছে। যে কোন ভাবে একে দূর করতেই হবে।" তিনি সমাধানের সূত্র হিসেবে বলেন, 'এই দুর্নীতিকে 'ধর্ম না' আন্দোলনের দ্বারাই একমাত্র প্রতিরোধ করা যেতে পারে।' দেশে যেভাবে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মনোজ বসু বলেন, 'যদি এখনই এই সাম্প্রদায়িকতা রোধ না করা যায়, তাহলে দেশে গৃহযুদ্ধ দেখা দেবে।' দক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন—"যারা দাঙ্গা করে, তারা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। তারা খুনী। তাদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতেই হবে।"

মণীন্দ্র রায় এই সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন, সাম্প্রদায়িকতা কাদের কাঁদায়। যারা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে, বাংলার কবিসমাজ সর্বদাই তাদের নিন্দায় সোচ্চার। কৃষ্ণ ধর বলেন, "শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই সাম্প্রদায়িকতা থাকে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সাম্প্রদায়িকতা নেই।" তরুণ সান্যাল বলেন যে কেবল বিবেকের কশাঘাত করলেই হবে না, কবি লেখকদের সক্রিয় ভাবেও এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। পাঠ্য পুস্তকে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী রচনা বেশি করে দেবার জন্য তিনি দাবী জানান। গণেশ বসু বলেন, "সাম্প্রদায়িকতা সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি। সুতরাং তার হাত থেকে মুক্তি না পেলে সাম্প্রদায়িকতা থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে না।" শান্তিময় রায় দাঙ্গার সময়ে আমেদাবাদে যা ঘটেছিল, তার দুই-একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন আশিস সান্যাল। প্রস্তাবে সম্প্রতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িকতা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। যে দাঙ্গাবাজরা ধর্মের নামে শান্তিকামী মানুষকে ভ্রাতৃহত্যায় প্ররোচিত করে, তাদের উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থহীন নিন্দাজ্ঞাপন করা হয়। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন শ্যাম নিগম ও সামসুজ্জমান।

অনুষ্ঠানের শেষে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী কবিতা পাঠের আসর বসে। কবিতা পাঠ করেন অন্নদাশংকর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, শান্তিকুমার ঘোষ, অমল ভৌমিক, বরুণ মজুমদার, ফিরোজ চৌধুরী, এস এ মালিক, রাজ আজিম, নজরুল হোসেন, হাসান আমান, ইকবাল কৃষণ ও আরো অনেকে। নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করেন কাজী সব্যসাচী এবং রবীন্দ্রনাথের 'ধর্মবোধ' কবিতাটি আবৃত্তি করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

এ সপ্তাহের আর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ হল কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রাচ্যতত্ত্ব সম্মেলন। গত ২৯—৩১ অক্টোবর, পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রাচ্যতত্ত্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবারের সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন পুণার ভাণ্ডারকর ইন্সটিটিউটের ডাঃ পি এল বৈদ্য।

মোট ১৭টি শাখায় বিভক্ত করে প্রায় ৫৫০টি মৌলিক গবেষণাপত্র এতে পাঠ করা হয়। বিভিন্ন শাখায় যাঁরা সভাপতিত্ব করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ফাদার এ এইচ এস্টেলার (বৈদিক তত্ত্ব), জগন্নাথ অগ্রবাল (ধ্রুপদী সংস্কৃত), আতাউর রহমান (মুসলমান সংস্কৃতি), পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত (ইতিহাস), এস এম আর নাইডু (দ্রাবিড় তত্ত্ব), জে এম জেটলি (দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব), বিশ্বনাথ ব্যানার্জি (পালি ও বৌদ্ধধর্ম), এস কে সরস্বতী (প্রত্নবিদ্যা ও চারুকলা), হীরালাল জৈন (প্রাকৃত ও জৈনধর্ম), হরনাম সিংহান (আরবী ও পারসী তত্ত্ব), শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (পণ্ডিত পরিষদ), বুদ্ধ প্রকাশ (দক্ষিণ পূর্ব এশীয় তত্ত্ব), চন্দ্রভানু গুপ্ত (ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব), হীরালাল চোপরা (পশ্চিম এশীয় তত্ত্ব)। এবার বিদেশ থেকেও কয়েকজন পণ্ডিত যোগ দিয়েছিলেন। এঁরা হলেন ডঃ এস পোটোবেংবেন (রাশিয়া) এবং ডঃ দশন জবাভিতেল (চেকোশ্লোভাকিয়া) এবারের সম্মেলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এস এস ধাবন। এই উপলক্ষে যে প্রদর্শনীটির ব্যবস্থা করা হয়, তার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায়। সম্মেলনের আগামী অধিবেশন বসবে উজ্জয়িনীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭১ সালে। আগামী বছরের জন্য মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ডঃ ডি সি সরকার।

বই-পাড়ায়

পুজোর বন্ধের পর বই পাড়ার জনবহুল রাস্তাগুলো খাঁ-খাঁ করছে। রাস্তায় গোনা-গুনতি লোক, কেনাবেচা নেই বললেই চলে। বছর চারেক ধরে বইয়ের বাজারে এই মন্দাভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অবশ্য এই খারাপ বাজার কাটিয়ে ওঠার জন্যে প্রকাশকদের চেষ্টার ঘাটতি নেই। পাঠকদের চাহিদাকে সামনে রেখে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য বই বেরিয়ে চলেছে।

চার-পাঁচ বছর আগে কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশের বিশেষ ধুম পড়েছিল। অনেক খ্যাত-অখ্যাত লেখকই তখন কোমর বেঁধে ঢাউস-ঢাউস বই লিখতে ব্যস্ত ছিলেন। এখন ঐতিহাসিকের বাজার স্তিমিত। বাজার দখল করে রেখেছে তথাকথিত রাজনৈতিক উপন্যাস। সুযোগ-সন্ধানী লেখকরা এখন কলম বাগিয়ে একএক লাফে কখনও আলজিরিয়া, কখনও কিউবা কিম্বা ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছে সেখানকার অকথিত বিপ্লব কাহিনী (সঙ্গে পরিমাণ মত রোমান্স মিশিয়ে) পাঠকদের সামনে উপস্থিত করছেন। এতে বাংলা সাহিত্য কতখানি উপকৃত হচ্ছে তা জানি না, তবে প্রকাশকদের ঘরে এ বাবদে দু পয়সা আসছে। হালের প্রকাশিত সব রাজনৈতিক গ্রন্থকে ওই এক দলে ফেললে নিশ্চয়ই ভুল করা হবে। কয়েকজন নির্ভীক সাংবাদিক-সাহিত্যিকের হাত থেকে হাতে-গোনা যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই বেরিয়েছে তাদের মূল্য নেহাৎ কম নয়।

এমত অবস্থায় যুগের হাওয়ায় না ভেসে কলেজ স্ট্রীটের এক সম্ভ্রান্ত প্রকাশক পরশুরামের গ্রন্থমালা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের এই শুভপ্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এ প্রসঙ্গে আরও এক প্রকাশনালয়ের নাম করতে হয়। তাঁরা বাংলা দেশের বিশিষ্ট কবিদের শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন।

'বাংলা সাহিত্যে ভালো লেখা কখনও ফেলা যায় না'—এ কথা আর একবার প্রমাণ করলেন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী পাঠকেরা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইয়ের তাঁর জীবিতকালে বিশেষ কাটতি ছিল না। আজ তাঁর মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পর এই মরা বাজারে তিনি একজন টপ সেলার।

—গ্রন্থবিদ

মৌচাক জয়ন্তী সংখ্যা— সুপ্রিয় সরকার সম্পাদিত। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম আট টাকা।

বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যে মৌচাকের অবদান স্মরণযোগ্য। ১৩২৭ সালের বৈশাখে মৌচাকের আত্মপ্রকাশ ঘটে। নামকরণ করেছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতাটি তাঁরই রচনা। সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার মাত্র দু' বছর আগে লোকান্তরিত হয়েছেন।

বাংলা শিশু-সাহিত্যের আবির্ভাব উনিশ শতকে। এর আগে রূপকথা আর লোককথা নিয়েই ছিল শিশুসাহিত্যের জগৎ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর পন্ডিতেরা

বিভিন্ন বিষয়ে সরলপাঠ্য বই লিখতে থাকেন। স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর শিশু বা বালকদের জন্য অনেক বই বেরোয়। তারপর ঘটে দিগ্‌দর্শন পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। বিদ্যাসাগরের রচনা এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' শিশু বা কিশোর সাহিত্যের সমৃদ্ধ করে। এর মধ্যে দেশে লেখাপড়ার প্রসার ঘটেছে। বালকবন্ধু, সখা, বালক, সাথী, সখা ও সাথী, ধ্রুব, মুকুল, শিশু সন্দেশ প্রভৃতি পত্রিকা শিশুসাহিত্যের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। সেই সঙ্গে অসংখ্য বইও প্রকাশিত হোতে থাকে। এই সমস্ত পত্রিকা যে সাহিত্যের এই বিভাগটিকে পুষ্ট করেছে এবং খ্যাতনামা বহু শিশু-সাহিত্যিকের আবির্ভাবের পথকে সুগম করেছে, তা অনেকেরই জানা। মৌচাকেরও এ ঐতিহ্য রয়েছে। তার পঞ্চান্ন বছরের ইতিহাস একথাই প্রমাণ করে। অসংখ্য লেখক এই পত্রিকায় লিখেছেন। পরবর্তীকালে তাঁদের অনেকেই সাহিত্যে সুনামের অধিকারী হয়েছেন। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যখের ধন' আর সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'লালকুঠি' বেরিয়েছিল মৌচাকে। কিশোর সাহিত্যে দুটিই উল্লেখযোগ্য বই। এ রকম আরো বহু নিদর্শন আছে। সব থেকে উল্লেখযোগ্য সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকারের অবদানের কথা। বিশিষ্ট ও অখ্যাত লেখকদের রচনার স্থান দিয়ে সাহিত্যের এই বিভাগটির সমৃদ্ধির পথকে তিনি প্রশস্ত করে গেছেন। প্রধানত যাঁরা বড়দের জন্য লেখেন তাঁদের দিয়েও তিনি ছোটোদের জন্য লিখিয়েছেন।

জয়ন্তীবর্ষ উপলক্ষে মৌচাকের এই বিশেষ সংখ্যাটি যেমন সুসম্পাদিত তেমনি লোভনীয়। পঞ্চাশ বছরে প্রকাশিত রচনার নির্বাচিত সংকলন করা হয়েছে। নির্বাচনে বর্তমান সম্পাদক শ্রীসুপ্রিয় সরকার দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। যাঁদের লেখা আছে :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জসীমউদ্দিন, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নজরুল ইসলাম, সুনির্মল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, জগদীশ গুপ্ত, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রেম চন্দ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, তুষারকান্তি ঘোষ, শবরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জওহরলাল নেহরু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবির, ভবানী ভট্টাচার্য, সুধীরচন্দ্র সরকার, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, ভবানী মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শিবরাম চক্রবর্তী, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবী, নরেন্দ্র দেব, সৈয়দ মুজতবা আলী, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অসিতকুমার হালদার, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, অচিন্ত দত্ত, হরপ্রসাদ মিত্র, সুশীল রায়, মণীন্দ্র রায়, গোপাল ভৌমিক, প্রবোধকুমার সান্যাল, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়-চৌধুরী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, বিশু মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, ধীরেন্দ্রলাল ধর, ইন্দিরা দেবী এবং আরো অনেকের। বড় আকারের এই জয়ন্তী সংখ্যাটি মনোরম প্রচ্ছদ এবং বহু আলোকচিত্রে সমৃদ্ধ। ছাপা সুন্দর।

একটি প্রেমের মৃত্যু— [উপন্যাস]— দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ।। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতা-৩৭ ।। দাম : চার টাকা ।।

প্রত্যেক মানুষের মনে কিছু শাশ্বত অভিপ্রায় আছে, যার সঙ্গে যুক্ত হতে চায় সকলেই। পৃথিবীর যাবতীয় নশ্বরতার মধ্যে সেই মোহময়ী ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত মানুষকে আশাবাদী করে তোলে। দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একটি প্রেমের মৃত্যু' নিঃসন্দেহে সে আকাঙ্ক্ষার অসঙ্কোচ প্রকাশ। এ উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্র দীপা, বিমান, প্রবীর, গৌরী, মীনাক্ষী ইত্যাদি। কেউ আদর্শবাদী, কেউ নয়। আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক জীবনজিজ্ঞাসার সঙ্গে মানবতাবাদী জাতীয়-চেতনার একটা বিরোধ ও মিলনের আভাসও আছে কিছুটা। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন ও প্রেমই উপন্যাসটির মুখ্য প্রতিবাদ্য বিষয়। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা তথা ভারতে অনতি-অতীত সমাজ ও রাজনীতিক জীবনের এই সুন্দর উপন্যাসচিত্রটি উপহার দেবার জন্যে পাঠক সমাজের সপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করবেন। চরিত্রচিত্রণ, কাহিনী নির্মাণ ও সংলাপ ব্যবহারে কিছুটা সংযত হলে উপন্যাসটি আরো শিল্প-সম্মোহিত হতো বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

কালি ও কলম (তৃতীয় বর্ষ। ১ম সংখ্যা) —সম্পাদক : বিমল মিত্র। ১১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা ১২। দাম —পঁচাত্তর পয়সা।

বর্তমান সংখ্যায় 'হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভা ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটিতে শ্রীমন্মথনাথ জানা প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে লেখাটির মর্যাদাবৃদ্ধি করেছেন। আরও লিখেছেন প্রসূনকুমার মণ্ডল, আশুতোষ ভট্টাচার্য, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, সবিতা চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন দাস, প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি মুখোপাধ্যায়, বিরাজ মিত্র, দেবনারায়ণ গুপ্ত, গৌর শান্ডিল্য এবং সুকন্যা ত্রিবেদী।

অনাদিন (শ্রাবণ ১৩৭৬)—সম্পাদক : অর্দ্ধেন্দু সান্যাল, শিশির ভট্টাচার্য ও অমল ভৌমিক।। ৫৩ বিধান পল্লী কলকাতা-৩২।। দাম : এক টাকা।

কবি ও কবিতা বিষয়ক নতুন ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'অনাদিন'-এর দ্বিতীয় সংখ্যাটি সুদৃশ্য প্রচ্ছদ, সুন্দর ছাপার জন্য অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। কবিতা লিখেছেন অর্দ্ধেন্দু সান্যাল, শংকর দাশগুপ্ত, উদয়ন ভট্টাচার্য, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, বিবেকেশ্বর সামন্ত, জীবন সরকার, তুলসী মুখোপাধ্যায়, শিশির ভট্টাচার্য প্রমুখ কয়েকজন কবি। অমল ভৌমিক লিখেছেন 'এই দশকের কবিতা' নামে একটি আলোচনা। দুটো সমালোচনা লিখেছেন দুজন কবি।

বই প্রকাশের অন্তরালে—(১)

'গায়ের রঙ যতই ফর্সা হোক, ভেতরে তেজ না থাকলে মানুষ সুন্দর হয় না'— কয়েকদিন আগে বলেছিলেন জনৈক বাইন্ডার। আজন্ম একটি দপ্তরীখানার মালিক। নিজেও কাজ করেন সময়ে, অসময়ে। বেশ বয়স হয়েছে। একটু পূর্ববঙ্গীয় টানে কথা বলেন। মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি। অনবরত ছুঁচ-সুতোর দিকে নজর রাখতে গিয়ে চোখের দৃষ্টি কেমন যেন বাঁকা-বাঁকা।

বললেন : বুঝলেন না? কভারে রঙ-বেরঙের ছবি তো ছাপলেন, মোটা কাগজ দিলেন, লাইনো হরফে ছাপালেন বই-পত্তর অনেকগুলো টাকা দিয়ে। তাতেই কি সব? মজবুত বাঁধাই না হলে সব মাটি। বুঝলেন আমার কথা? বই নাড়াচাড়া করলেই যদি সেলাই খুলে যায়, পাতা বেরিয়ে পড়ে—তা হলে কি লাভ? একটু শক্তপোক্ত বাঁধাই চাই, মজবুত বাঁধাই। তবেই না বইয়ের আয়ু বাড়বে। বুঝলেন না?

কথার ফাঁকে-ফাঁকে একেকবার 'বুঝলেন না' বলেন। ওটা ওঁর মুদ্রাদোষ। দুটি চোখে রহস্যময় হাসি আর অদ্ভুত জিজ্ঞাসা। নিরবচ্ছিন্ন সংলাপ। শব্দের উচ্চারণে আঞ্চলিকতার প্রভাব বেশি। মাঝে মাঝে স্বরধ্বনির আগম-নিগম লক্ষ্য করা যায় প্রতিমুহূর্তে। কিন্তু নিঃসন্দেহে ওপার-পারের ভাষা বলেই ভুল হয়।

বললেন : বুঝলেন না, আমরা হলুম কুমোরটুলির কুমোর। বাঁশ, খড়, মাটি, রঙ দিয়ে ওরা লক্ষ্মী-সরস্বতী বানায়, দুর্গা-ঠাকুর তৈরী করে। কিন্তু সকলেই একরকম নয়। কারো মূর্তি ভালো হয়, কারো হয় না। কিন্তু কেউ কি ওদের কথা ভাবে? বাইন্ডারদেরও সেই দশা। আমরা ছাপা ফর্মা আর নানা রঙের কভার দিয়ে বইয়ের প্রতিমা বানাই। বুঝলেন না!

আমি এই বৃদ্ধপ্রায় মুসলমান দপ্তরীর কাছ থেকে এমন অসম্ভব উক্তি কখনোই আশা করি নি। পরণে সস্তা লুঙি, গায়ে ময়লা পাঞ্জাবি। অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি ঘরের ভেতর বসে কথা হচ্ছিল আলো জেলে। যতক্ষণ কাজ হয় ততক্ষণ আলো জ্বালাই থাকে। খুপরির মতো দুটো ঘরে কাজ করে যাচ্ছে পনেরো-কুড়িজন। কেউ ফর্মা ভাঁজছে, কেউ সেলাই করছে, কেউ লেই দিয়ে কভার মুড়ছে, কেউ-বা কাটিং মেসিনে কেটে নিচ্ছে বড় বড় কাগজ। কেন জানি না কুমোরটুলির দৃশ্যটাই ভেসে উঠল চোখের সামনে।

বললাম : আপনার প্রতিমার উপমাটা কিন্তু বেশ হয়েছে। কিন্তু ওঁদের সঙ্গে আপনাদের পার্থক্যটাও তো কম নয়! ওঁরা কাঁচা মাটি আর রঙ নিয়ে কাজ করেন। অনেক কিছু অদল-বদল করার উপায় আছে ওঁদের। আপনারা কি সেরকম পারেন?

—না। ওদের মতো স্বাধীনতা আমাদের নেই, কিছুটা আছে। ওঁরাও ফরমায়েসী কাজ করেন—আমরাও করি। খদ্দেররা ওঁদের বলেন : ঠাকুরের মুখটা যেন ভালো হয়, কার্তিক কিম্বা অসুরের ভঙ্গিটা দুর্ধর্ষ হওয়া চাই। প্রকাশকরা আমাদেরও প্রায় সেরকম কথাই বলেন : ফিনিশিং ভালো হওয়া চাই, পুট যেন টেরা-বাঁকা না হয়, কিম্বা পুস্তানির কাগজ ভালো দিতে হবে—ইত্যাদি। বুঝলেন না, আসল কথাটা হলো, চোখ। অনেকদিন কাজ করতে-করতে দপ্তরীর চোখ খুলে যায়—কেমন লেই কোন কাগজে লাগাতে হবে—ঘন, না পাতলা। অনেকে ফুল কিম্বা হাফ রেক্সিনে বই বাঁধাই করতে বলেন। কেউ বা বলেন কাপড়ে বাঁধাই করতে। চোখ না থাকলে কোন কাগজের সঙ্গে কি রঙের কাপড় বা রেক্সিন দিতে হবে তা ঠিক করা যায় না। বুঝলেন না, চোখ-ই সব। চোখ-ই সব।

কয়েকবার দাড়িতে হাত বুলোলেন ভদ্রলোক। মনে হলো, তৃপ্তিবোধ করছেন।

—চা খাবেন?

সম্মতি দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সেলাই করার মধ্যেও কোনো আর্ট আছে নাকি?

—আছে, আছে। বুঝলেন না, আসল কথা হলো অভিজ্ঞতা। ওটাই আর্ট। ওটাই সৌন্দর্য। মির্জাপুরে, বৈঠকখানায় তো অনেক দপ্তরী আছে। সকলের বাঁধাই কি ভালো? আমি সেলাই বাঁধাই করি—পাতা না ছিঁড়লে কখনো তার সেলাই খুলবে না। কেবল কম সময়ে বেশী বই বাঁধাই করলেই তো হল না। একটু সময় দিয়ে বাঁধাই করতে হয়। বই হাতে নিয়ে আপনিও বলবেন : হাঁ, বাঁধাইয়ের মতো বাঁধাই হয়েছে। বাঁধাই শক্ত হলে বই নেতিয়ে পড়ে না, টাটকা ঘোড়ার মতো তেজী থাকে। এটাই আর্ট, বুঝলেন না, ওটাই আর্ট। নজর ঠিক না থাকলে সেলাই ঠিক হয় না। মন ঠিক না থাকলে নজর ঠিক থাকে না।

নিজের কথায় নিজেই মশগুল হয়ে ছিলেন তিনি। বললেন : ফর্মা ভাঁজ করাও একটা আর্ট। কত রকমের সাইজের কাগজ, কত রকম মেজারের ছাপা। ১৮ এম, ২২ এম, ২৪ এম, ২৬ এম, ২৮ এম, ৩৬ এম। ফুলস্কেপ, ডবল ক্রাউন, ডিমাই, ডবল ডিমাই সাইজের কাগজ। একটু অসতর্ক হলেই কাগজের ভাঁজ, পৃষ্ঠাসংখ্যা ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে। তাতে বইয়ের সৌন্দর্য নষ্ট হয়, ভুল বাঁধাই হয়। মিছিল তোলাও একটা আর্ট। বুঝলেন না? সারি-সারি সৈন্যের মতো এক, দুই, তিন, চার... ফর্মা ধরে অনেকগুলো ভাঁজ-করা ফর্মা সাজিয়ে নিয়ে বসে দপ্তরী। তারপর, বুঝলেন কিনা, একেক ফর্মার একেকটি ভাঁজ-করা শীট পর-পর সাজিয়ে একটা পুরো বইয়ের ফর্মাকে একত্র করে ফেলে দপ্তরী। একেই বলে মিছিল তোলা। একেকটা বই যেন একেক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য আর কি! বুঝলেন না?

এসব খবর অনেকেই জানেন। যাঁরা বইয়ের লাইনে ঘোরাঘুরি করেন, পত্র-পত্রিকা বের করেন — তাঁদের কাছেও হয়তো খুব নতুন কথা নয়। কিন্তু এমনভাবে, একজন দপ্তরীর দৃষ্টি দিয়ে কখনো উপলব্ধি করেন না। এই উপলব্ধির মাঝে কোনো ফাঁকি নেই—আন্তরিকতা আছে। তাঁর রসিকতাও অন্তসারশূন্য নয়, জীবনদৃষ্টিতে সজীব।

বললাম : এই ব্যবসা ছেড়ে দিলে আপনার মনের অবস্থা কেমন হবে?

—কেন? ছেড়ে দিতে হবে কেন? বলেই যেন আঁতকে উঠলেন তিনি,—ছোট বয়স থেকে এ ব্যবসা করে আসছি। কখনো ছাড়ার কথা ভাবি নি। আমার বাবাও দপ্তরী ছিলেন। আমিও তাই হয়েছি। লেখাপড়া বেশী করি নি। বাংলা-ইংরেজী অক্ষর-গুলো চিনি। দেখে-দেখে হিন্দীও খানিকটা শিখেছি। জানেন, কাগজের গন্ধ আমার খুব ভালো লাগে। জেলেরা যেমন মাছের গন্ধ পছন্দ করে, তেমনি আমি ভালোবাসি কাগজের গন্ধ। স্তূপেকরা এই হাজার হাজার ফর্মার মধ্যে বসে থেকে কেমন আনন্দ পাই তা বলে বোঝাতে পারবো না। এ ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে আমি দুদিনও স্থির হয়ে থাকতে পারবো না।

আমি যেন বই প্রকাশের এক গোপন জগতে প্রবেশ করেছি। লোকচক্ষুর অন্ত-রালে এই জগৎ। তার খবর জানেন না পাঠক, জানেন না লেখক। প্রকাশকের সঙ্গে তার যোগাযোগ প্রত্যক্ষ।

চা-বিস্কুট এল।

ভদ্রলোক বললেন : চলুন, আমার গো-ডাউন দেখাবো। বাংলার কতো বিখ্যাত-বিখ্যাত লেখকের বই জমা হয়ে আছে এখানে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর। আলো না জ্বাললে দিনের বেলাতেও অমাবস্যা রাতের মতো মনে হয়। অসংখ্য বইয়ের ফর্মা একের পর এক স্তূপাকারে পড়ে আছে। কোনটা নতুন, কোনটা পুরনো। গ্যামাক্সিন পাউ-ডারের গন্ধে ঘর ভ্যাপসা হয়ে আছে। আরো কি যেন একটা ওষুধের গন্ধ পেলাম। ইঁদুর, উই, আরশুলা, পোকা-মাকড়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সতর্কতার অভাব নেই।

ভদ্রলোক ধুলো পায়ে একটা ছাপা ফর্মার ওপর পা দিয়ে আরেকটা উঁচু স্তূপের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন : ওগুলো বিদ্যাসাগরের ফর্মা। বিদ্যাসাগরের রচনাবলী বাঁধাই করি আমরা। শরৎচন্দ্রের অনেকগুলো বইয়ের ফর্মা পড়ে আছে এখনো।

কেমন মমতা হলো আমার। অদ্ভুত, হতচ্ছাড়া, ময়লাপড়া, পায়ে মাড়ানো এই সব বইয়ের দশা ও দুর্দশা দেখে। বাঁধাই হলে

নাকি এগুলোই আবার দেখতে একটা কুশ্রী লাগবে না। কি অদ্ভুত, রহস্যময় এই পরিবেশ!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি যেন স্বগতোক্তি করলেন : সেবার দাঙ্গার সময়ে ভারি দুঃখ হয়েছিল আমার। কত বই যে দপ্তরীখানায় পুড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তিন, চার, পাঁচ বছর আগেকার ছাপা ফর্মা আমরা যখের মতো আগলে রেখেছিলাম বুকের আড়াল করে। কত মূল্যবান বই। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কোনোদিন আর সেসব হয়তো ছাপাই হবে না। শুনেছি, প্রকাশকদের কেউ কেউ সামান্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। তাতে কি মনের জ্বালা মেটে? ভাবুন তো কি দুঃখের কথা! প্রকাশকরা বই ছাপেন, আমরা বাঁধাই করি। এত কষ্ট হওয়া আমাদের উচিত নয়। তবু কষ্ট পাই—মায়া হয়। সব লেখার মানে বুঝি না। লেখকদের পরিশ্রমের কথাটা ভাবি। এসব পড়েই তো মানুষ শিক্ষিত হয়, নতুনভাবে ভাবতে শেখে। নানা জায়গায় যখন এই সব কাণ্ড ঘটতে থাকে, তখন বার-বার মনে হতো যেন কেউ আমারই গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

এই প্রথম লক্ষ্য করলাম, তিনি তাঁর অতিপ্রিয় মুদ্রাদোষটি উচ্চারণ করতে ভুলে যাচ্ছেন। এমন কি দাড়িতে হাত বুলোচ্ছেন না। চোখে-মুখে বেদনার আভাস পরিস্ফুট। প্রসঙ্গটার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বললাম, ঐ যে আকার-প্রকারের কথা বলছিলেন না? সেটা খুলে বলুন। তার মধ্য দিয়ে আপনাদের দক্ষতা এবং রুচিবোধ কিভাবে কাজ করে?

আবার সেই পুরনো প্রশ্ন? — জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে বললেন ভদ্রলোক, প্রকাশকদের চাহিদা, ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুসারে বইয়ের আকার-প্রকার পালটায়। ধরুন, কেউ এক অড-সাইজের বই পছন্দ করেন। ডবল ডিমাই কাগজের প্রচলিত ভাঁজকে উপেক্ষা করে তিনি হয়তো একটায় চব্বিশটা ছাপলেন। বুঝলেন না? সাধারণত কি হয়? — ডবল ডিমাই একটায় ষোলটা কিম্বা আটটা সাইজের বই। এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো। বইয়ের সাইজ ছোট—বেশ একটু পকেট-বুক সংস্করণের মতো। বটতলার বই, লিরিক কবিতার সংকলন, প্রেমের কবিতার বই—সাধারণত এরকম হয়ে থাকে। কেউ-বা ছাপেন ডবল ক্রাউন একটায় দশটা কিম্বা বারোটা সাইজের বই। দেখতে না ডবল ফুলস্কেপ, না ডবল ক্রাউন — একটা অদ্ভুত ধরনের বই। বোর্ডে বাঁধাই হলে—নতুন মাপে আমাদের বোর্ড কাটতে হয়। ফর্মা ভাঁজাইয়ের সময়ও সতর্ক থাকতে হয়। ভাবছেন কাজটা হয়তো খুবই বিরক্তিকর?—তা কিন্তু নয়। এজন্যে পরিশ্রম হয় বেশী আনন্দও পাই। মানুষের কত সখ, কত অদ্ভুত রকমের ইচ্ছাই না আমাদের পূরণ করতে হয়!

যেন একটা জরুরী কথা মনে পড়ে গেছে—সেরকম দ্রুততার সঙ্গে বললেন, আমরা কেবল বই-ই বাঁধাই করি না, অন্যান্য কাজও করি। গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কবিতার বই ছাড়াও লেজার বই, হাজিরা খাতা, ক্যাসবুক প্রভৃতি বাঁধাই করি। সেগুলোর পদ্ধতি একটু আলাদা রকমের। পয়সা বেশী পাই ওসব কাজে। তৃপ্তিও পাই। কোনো কোনো বইতে সোনালি অক্ষরে নাম ছাপিয়ে দিতে হয়। কোথাও নামের বদলে একটি কিম্বা দুটি সোনালি রেখার ছাপ দিয়ে দিতে হয়। দেখতে ভালোই লাগে। লাল, কালো, খয়েরী কিম্বা ঘন-আকাশী রঙে রেকসিনে সোনা-রূপা রঙের লেখা কিম্বা দাগগুলো বেশ জ্বলজ্বল করতে থাকে।

আবার সেই পুরনো উপমাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, আমরা হলাম কারিগর। মির্জাপুর-বৈঠকখানা আমাদের প্রতিমা তৈরীর কারখানা। আমরা বিক্রী করি না। কলেজ স্ট্রীটের দোকানদাররা সেসব প্রতিমা সাজিয়ে বসে থাকে—বিজ্ঞাপন দেয়, ব্যবসা করে। কখনো লাভ হয়—কখনো লোকসান। ওদের বাড়-বাড়ন্ত হলেই আমাদের লাভ—আমাদের তৃপ্তি।

কোন্ সময়টা আপনারা ব্যস্ত থাকেন সবচাইতে বেশী? কুমোরটুলিতে কিন্তু প্রতিমা তৈরীর একটা মরশুম আছে—জানেন তো?

—জানি। আমাদেরও মরশুম আছে। তবে ওঁদের মতো নয়। সরস্বতী পুজো তো কোনদিন বন্ধ হয় না। ও যে জ্ঞানের পুজো। আপনারা শিক্ষিত মানুষ সেসব বুঝবেন। সারা বছরই আমাদের কমবেশী ব্যস্ততা থাকে। বুঝলেন না? কখনো গল্প-উপন্যাস, কখনো স্কুল-কলেজের বই। গল্প-উপন্যাসে খুব তাড়া থাকে না। কিন্তু ইস্কুল-পাঠ্য বইতে সবুর সয় না প্রকাশকদের। ফর্মা ছাপা শেষ হবার আগেই তাগাদা শুরু হয়ে যায় : আমার বইটা কিন্তু আজ রাত্তিরেই একশো চাই—কাল সকালে শ-দুই দিতে হবে। কেউ বা এসে তাগাদা দেন : সার্বিমাপটর বই। কালকে লাস্ট ডেট। না দিলে হবে না। কেউ বা নিজেই ফর্মা ভাঁজ করতে লেগে যান। আমার হাসি পায়। তখন সারারাত জেগে আমাদের কাজ করতে হয়। নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকে না। ওঁদের চাহিদাটাই আকস্মিক। কেউ এসে বলেন : হঠাৎ এক হাজার বইয়ের অর্ডার পেয়ে গেলাম। পরশু দিতে হবে। আমরা না বলতে পারি না। ইস্কুল-কলেজের প্রকাশকরা ব্যবসা করেন দু-তিন মাস। ধার-দেনা শোধ করেন এ-সময়ে। আমরা টাকা পাই। কখনো কখনো গোলমাল বাধে। তাই নিয়ে অশান্তিও হয়। আমরা বই আটকে রাখতে চাই না। ব্যবসা না হলে ওঁরাই বা আমাদের টাকা দেবেন কোত্থেকে?

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, অনেকক্ষণ বকবক করলাম। আরেক কাপ চা খান।

এবং সম্মতির অপেক্ষা না করেই অর্ডার দিয়ে বললেন, পুজোর আগে পুজো সংখ্যা বেরোবার সময় আমরা কিছুটা ব্যস্ত থাকি। হঠাৎ কোন ছোটখাট পত্রিকা আমাদের বেঁধে দিতে হয় রাত জেগে। সম্পাদকরাই সাধারণত সেসব পত্রিকার প্রকাশক এবং মালিক। ছাপাও এমন কিছু বেশী নয়। পাঁচশো, সাতশো, হাজার। হ্যাঁ, তবে সিনেমা, যৌন-সংক্রান্ত পত্রিকাগুলি ছাপা হয় একটু বেশী পরিমাণে। এ-ধরনের হঠাৎ-ব্যস্ততা আমাদের সারা বছরের ব্যাপার।

তারপর, একটু স্মিত, সুন্দর হেসে বললেন : সবচাইতে মজা হয়, নতুন কোনো গল্প-কবিতার বই বেরোলে। কবিরা গাঁটের পয়সায় বই ছাপেন দু-তিন ফর্মার। প্রকাশক হিসেবে কখনো কোনো নাম-করা সংস্থা কিংবা বন্ধুবান্ধবের নাম ছাপা হয়। উদভ্রান্ত, উসকো-খুসকো চুল, ডাগর চোখ—কোনো যুবক এসে হয়তো বললেন : একটা কবিতার বই বেঁধে দিতে হবে। আমার বেশ লাগে ওঁদের আগ্রহ উৎসাহ দেখে। তিন-চারশো কবিতার বই একসঙ্গেই বেঁধে দিতে হয়। অনেক সময় অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে যান, বাঁধাই কিন্তু ভালো করতে হবে। কেউ-বা কখনো পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে বলেন, আজ দুশ' নিয়ে গেলাম। বাকি বই বেঁধে রাখুন। কাল-পরশু নিয়ে যাব। কখনো বাঁধাই করি, কখনো করি না। জানি, হয়তো দ্বিতীয়বার আর সেসব বই নিতে কখনো কেউ আসবে না। গল্প-কবিতার বই আর কজন কেনে বলুন। ওঁদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। ব্যবসার জন্যে তো কেউ কবিতার বই বের করে না। কেউ-বা পরে ধরাধরি করেন, টাকা নেই। কিছু কমসম করুন। বইগুলি নিয়ে যাই, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিলি করি।

থেমে বললেন : ওঁদের চোখে স্বপ্ন আছে। দেখে কেমন আনন্দ হয়। ইচ্ছে করে ওরা কখনো ঠকায় না। টাকা মারে না। হয়তো বহু কষ্টেসৃষ্টে ছাপার খরচা জোগাড় করেছিলেন, বাঁধাইয়ের খরচায় টানাটানি পড়েছে।

আমি এমন সহানুভূতিসম্পন্ন দপ্তরী দ্বিতীয়টি দেখিনি। প্রতারিত হয়েও কখনো তাকে একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করেননি তিনি। বই প্রকাশের নেপথ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতি মুহূর্তে দেখছেন লেখক, প্রকাশক ও পাঠক-সমাজকে। অথচ কেউ তাঁকে বড় একটা দেখেন না। সাহিত্যের তুমুল ঝড়ঝঞ্ঝার সময়েও নির্বাক, উদাসীন, নির্বিকার। তাঁর কোনো ভাষা নেই, সংলাপ নেই, অথচ গ্রন্থনির্মাণের অন্যতম প্রযোজক তিনি।

ফেরবার মুখে দেখলাম, দপ্তরীরা সেলাই করছে—জুস সেলাই, স্টিচ বাইন্ডিং, লাচারি বাইন্ডিং ইত্যাদি। ছুঁচ-সুতোর ওঠানামা চলছে হাতের সঙ্গে সঙ্গে। যেন নৃত্যরত দুটো হাত বিভিন্ন মুদ্রার কৌশল দেখাচ্ছে। শক্ত, মজবুত বাঁধাইয়ের অন্তরালে খেলা করছে দক্ষ কারিগরের চোখ—দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ও সাফল্যের ইতিহাস। কেউ তার খবর রাখেন না—না লেখক, না পাঠক। —বিশেষ প্রতিনিধি

আগের ঘটনা

[পর পর কয়েক রাতই ঢিল পড়ছে বাড়ির উঠোনে। এ নিয়ে নীপার ভয়ের অন্ত নেই। অম্বরও চাইছে এই ঢিল-পড়ার রহস্য উদ্ঘাটন করতে।

সেদিন রাতেও ঢিল পড়ল। নীপাকে বাড়িতে রেখেই সরকারী ডাক্তার অম্বর ছুটল থানায়। ফিরেও এল এক সময়]

(তিন)

স্টেশনে নীলাদ্রি দাঁড়িয়ে। চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের একেবারে প্রান্তে টগরফুলের একটা গাছ আছে। তারই নীচে নীলাদ্রি অপেক্ষা করছিল।

শিমুলপুর বড় স্টেশন-এ—জংশন, ফিরিওলা, হকারদের অবিরত আনাগোনা। বেশ কয়েকটা প্ল্যাটফর্ম। লোকজন, মানুষের ভিড়। সদাসর্বদা প্রবাহমান যাত্রী-স্রোত।

পলাশপুর এখান থেকে দূরে নয়। মাইল দশ-বারো পথ। শিমুলপুর থেকে একটা লাইন পলাশপুরের উপর দিয়ে অন্য দিকে গেছে। লোকাল ট্রেনে স্বাচ্ছন্দে শিমুলপুর থেকে পলাশপুরে যাওয়া চলে। কিন্তু যাত্রীদের ট্রেনের দিকে নজর কম। শিমুলপুরে নেমে সকলেই বাসের জন্য ছোটে। পলাশপুর আর শিমুলপুরের মধ্যে ঘন ঘন বাসের সংযোগ। টাউন বাস,—বড় জোর পৌনে এক ঘন্টার রাস্তা। কয়েকটা দ্রুতগতি বাসও আছে। সেগুলি দূর-দূরান্ত থেকে আসে। শিমুলপুর ছেড়ে আর কোথাও থামবে না। সোজা পলাশপুরে যাবে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নীলাদ্রি বলল—'এত দেরি করলে কেন? ভাগ্যিস ট্রেন আধ ঘন্টা লেট। নইলে স্টেশনে এসে পস্তাতে হত।'

কোমরে গোঁজা রুমালটা হাতে নিয়ে নীপা মুখ মুছল। দুপুরে বেজায় গরম। শরীরটা ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছে জামাটা পিঠের সঙ্গে লেপটে আছে। ভ্যাপসা গরমে সকলেরই প্রায় এই অবস্থা। হয়ত সন্ধ্যের দিকে কিংবা রাতে বৃষ্টি নামবে।

মুখ মোছা শেষ করে নীপা বলল—'দেরি আমার জন্যে নয় মশায়। শহরে ঢোকবার আগে লেভেল ক্রশিংটার কাছে বাসটা পঁচিশ মিনিট রইল। শেষে একটা মালগাড়ি পেরোবার পর আবার বাস ছাড়ল। নইলে কোন্‌কালে পৌঁছে যেতাম।' একটু থেমে নীপা ফের বলল—'আমার কিন্তু টিকিট করা হয়নি।'

কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে নীলাদ্রি জবাব দিল—'চিন্তা ক'রো না। টিকিট আমি করে রেখেছি।'

অন্যবারেও নীলাদ্রিই টিকিট কেটে রাখে। ব্যাপারটা জানা। তবু আশ্বাস পেয়ে নীপা একটু হাসল। বলল—'যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু এখানে বসবার জায়গা কই? দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে নাকি? যা গরম বাবা—'

'ওয়েটিং রুমে যেতে চাও?'

এদিক-ওদিক চেয়ে নীপা মাথা নাড়ল। 'দরকার নেই, চেনা-জানা লোকের সঙ্গে দেখা হতে পারে। পলাশপুরের কত লোকই তো শিমুলপুরে আসছে। বরং এদিকটাই ভালো, বেশ নির্জন।'

প্লাটফর্মের উপর নীপা কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়াল। নীলাদ্রি সেই টগরগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগল। পিছন ফিরে একবার দেখল নীপা। নীলাদ্রি কি যেন চিন্তা করছে। কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে ওকে। হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এল নীপা। স্টেশনের প্লাটফর্মে নীলাদ্রির কাছ থেকে একটু দূরে থাকাই ভালো। পরিচয়ের গণ্ডীটা নিত্যদিন বাড়ছে। কত লোক তাকে জানে। কলেজের ছেলেমেয়েরা তো একনজরে চিনবে। টাউন ক্লাবের থিয়েটারে হিরোইনের পার্ট নেবার পর থেকেই নীপা আরো বেশী পপুলার। শহরের ছেলেমেয়েরা, মা-মেয়ে অনেকেই তার সম্বন্ধে কৌতূহলী।

সাপের মত হিস-হিস শব্দ তুলে এক্সপ্রেস ট্রেন স্টেশনে ঢুকল।

নীলাদ্রি পিছন থেকে বলল—'সামনের দিকে একটু এগিয়ে চল। ফার্স্ট ক্লাস কামরাগুলো ঠিক মাঝখানে থাকে।'

ভ্রূ-শাসন করে নীপা তাকাল। 'ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটতে তোমাকে কে বলল? মিছিমিছি খরচ। বিয়ে না করলে পুরুষ-মানুষগুলো এমনি বেহিসেবী হয়।'

নীলাদ্রি হাসতে হাসতে বলল। 'আগে তো গাড়িতে ওঠ। হিসেব-নিকেশ পরে করবে।'

একটু এগিয়েই একটা প্রথম শ্রেণীর কামরা পাওয়া গেল। ছোট কামরা,—দু-তিনজন যাত্রী শিমুলপুরে নামল। নীলাদ্রি আর নীপা ছাড়া আর কেউ উঠল না।

মিনিট পনের থেমে ট্রেনটা আবার গতি নিল। শিমুলপুরের পর আর কোনো স্টেশনে গাড়ি থামবে না। এক্সপ্রেস ট্রেন সোজা ছুটবে। ঘন্টা দুই ফুরোবার আগেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার কথা।

কামরাতে আর একজন মোটে যাত্রী। লোকটা গুজরাতি কিংবা মাড়োয়ারীও হতে পারে। বয়স পঞ্চাশের ওপর। ভাবলেশহীন দৃষ্টি। নিশ্চয় কোনো কারবার-টারবার আছে ওর। মুখ দেখেই একথা হলপ করে বলা চলে।

গলা নামিয়ে নীলাদ্রি বলল—'এ ব্যাটা নেমে গেলে কামরাটা ঠিক খর হত, তাই না?'

ট্রেনের জানালা দিয়ে নীপা ঘর-বাড়ি, মাঠ, লোকজন দেখছিল। দূরে, বহুদূরে দিগন্তের নীল বনরেখা।

মুখ না ফিরিয়েই সে বলল—'তা হত। কিন্তু ও থাকলেই বা ক্ষতি কিসের? আমাদের কোনো ডিসটার্ব করছে না।'

নীলাদ্রি বলল—'ঠিক সাতটায় অনুষ্ঠান শুরু হবে। তুমি সাড়ে ছটার মধ্যে আসতে পারবে তো?'

'—দেখি, এখনও তো পৌঁছলামই না।'

—'তোমার কাকার বাড়িতেই তো উঠবে?'

—'আর কোথায় উঠব?' নীপা অল্প একটু হাসল। বলল—কলকাতায় আমার নিকটআত্মীয়-স্বজন আর কেউ নেই। তাছাড়া কাকার সঙ্গে আমার একটু দরকারও আছে।'

সেই গুজরাতি লোকটা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে। সম্ভবত তাদের সম্বন্ধে ওর কোনো উৎসাহ নেই। আড়চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে নীলাদ্রি একটু সরে বসল।

নীপার কাছ ঘেঁষে। তারপর ওর বাঁ-হাতের আঙুলগুলি নিজের করতলে টেনে আনল নীলাদ্রি। আলতোভাবে চাপ দিল।

কৌশলে চোখ ঘুরিয়ে কামরার অন্য যাত্রীটিকে দেখল নীপা। লোকটা নির্বিকার। একজোড়া যুবক-যুবতীর ফিস-ফিস কথাবার্তা, ঘন সন্নিবদ্ধ হয়ে বসা, হাতে হাত রেখে মিলনের ভঙ্গি, সব কিছুতেই ও রীতিমত উদাসীন। মনে মনে একটু আহত হল নীপা। তার মত একজন সুন্দরীর উপস্থিতিতেও ওর কোন চাঞ্চল্য নেই। একবারের জন্যও লোকটা তেরছা নয়নে তার দিকে তাকায়নি। একসময় নীপাকে বেশ হতাশ দেখাল।

গাঢ়স্বরে নীলাদ্রি বলল—'আমার সেই কথাটা ভেবেছ নীপা?'

কথা মানে একটা প্ল্যান—ফাঁদও বলা যায়। কিন্তু নীপা কোন উত্তর দিল না।

নীলাদ্রি আবার বলল—'লুকিয়ে-চুরিয়ে এভাবে কতদিন চলবে? শেষ পর্যন্ত আমরা না ধরা পড়ে যাই। তার চেয়ে—'

কথাটা নীপাও জানে। শহরটা ছোট। মানুষজনের চাল-চলন গতিবিধির উপর অনেকের গোয়েন্দা-নজর। বিশেষ করে মেয়েদের পিছনে ছেলে-ছোকরার অভাব নেই। তলে তলে কে কোথায় স্পাইগিরি করছে কেউ জানতে পারবে না। একবার জানাজানি হলে আর রক্ষে নেই। সমস্ত শহরে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। ছাত্রী আর মাস্টারের এই রসালো কেচ্ছা-কাহিনী মেয়ে-পুরুষের মুখে মুখে চাউর হবে।

অন্যদিকে তাকিয়ে নীপা বলল—'ওভাবে পালিয়ে যেতে আমার মন সায় দিচ্ছে না। ধর, ও যদি মামলা করে। সে খুব বিশ্রী ব্যাপার হবে।'

—'মামলা?'

—'বারে! ও তো স্বচ্ছন্দে অভিযোগ করতে পারে?' মুচকি হেসে নীপা বলল—'তুমি ওর বউকে ফুসলিয়ে বের করেছ। কিংবা ব্যভিচারের মামলাও তো হয়, তাই না?'

একটু চিন্তা করে নীলাদ্রি বলল—'মামলা হতে পারে। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে মামলা করবে, তাদের পাচ্ছে কোথায়? তারা তখন হাজার মাইল দূরে, চট করে কি আমাদের নাগাল পাবে?'

নীপা হেসে বলল—'দিল্লীর সেই চাকরিটা এখনও তোমার হাতে?'

—'এখনও আছে, এই মাসটা থাকবে, তারপর অবশ্য অ্যাপয়েন্টমেন্টটা বাতিল হয়ে যাবে।' নীলাদ্রি ধীরে ধীরে বলল।

ভ্রূ কুঁচকে নীপা কিছু ভাবল। 'আর কটা দিন থাক নীলাদ্রি। একটু সময় দাও আমাকে।' কয়েক সেকেন্ড পরে সে আবার বলল—'ভীষণ দোটানা। অম্বরের সঙ্গে সমস্ত জীবন কাটানো যে কোন মেয়ের পক্ষেই অসম্ভব। বিশেষ করে যদি তার জীবনে অন্য কোন অবলম্বন না থাকে।'

—'বেশী ভাবলেই কিন্তু মুস্কিল নীপা।' নীলাদ্রি মাস্টারি শুরু করল। 'খুব তলিয়ে চিন্তা করতে গেলেই খেই হারিয়ে ফেলবে। সব ব্যাপারে কি অঙ্ক কষে এগোনো যায়?'

নীপা একটু হাসল। নীলাদ্রির সুবিধে,—তার পিছন দিকে না তাকালেও চলে। কিন্তু নীপার একটা পিছুটান আছে। ঘর-সংসার, একজন স্বামী। সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে নীলাদ্রির সঙ্গে স্রোতে ভাসতে পারা কি সম্ভব?

গাড়িতে বসে দেবরাজকে মনে পড়ল নীপার। ভারী মিষ্টি আর সুন্দর চেহারা ওর। একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া কুচকুচে কালো চুল। সাহেব-সুবোর মত ফর্সা গায়ের রঙ। আয়ত কালো চোখ। চোখাচোখি হলেই, তার বুকের ভিতরটা কেমন শির-শির করে। বয়স কম হলে ওর প্রেমে নীপা হাবুডুবু খেত। নেহাৎ সে পোড়-খাওয়া, অভিজ্ঞ। নইলে দেবরাজের

সংস্পর্শে এসে তার আকর্ষণমুক্ত হয়ে থাকা যে কোন মেয়ের পক্ষেই খুব কঠিন।

নীপার বড় বড় চোখের দিকে তাকিয়ে অত কি ভাবে দেবরাজ, সে জানে দেবরাজ কিছু বলতে চায় তাকে। কিন্তু কি বলতে চায়? কোন কথা—

দেবরাজ আবার আসবে। ওর সেই বন্ধুকে নিয়ে। কি যেন নাম ভদ্রলোকের? অবিনাশ সমাদ্দার। কেমন খ্যাবড়া-গোঁফের চিত্র—ঠিক যেন অসুর।

কিন্তু অবিনাশকে নীপা কি জবাব দেবে? ফিল্মের নায়িকা হতে সে রাজি? কনট্রাক্ট ফর্ম এগিয়ে দিলে নীপা তাতে খসখস করে সই করবে। অথচ অমলের কাছে এখনও কথাটা সে তোলেনি। স্বামীকে বলা মিছে। নীপা তা জানে। ঘরের বৌকে ফিল্মে নামতে দিতে অমল কিছুতেই রাজি হবে না। জেদাজেদি করলে বিপরীত ফল। হয়ত কুরুক্ষেত্র করে ছাড়বে। সামান্য টাউন ক্লাবের থিয়েটার করা নিয়ে বাড়িতে তুলকালাম কাণ্ড। শেষে অবশ্য স্বামীর সম্পূর্ণ অমতেই নীপা নাটকে যোগ দিয়েছে।

ওর মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল নীলাদ্রি। সে বলল—'তোমাকে বেশ অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে নীপা। মনে হচ্ছে কি যেন ভাবছ।'

চট করে ঘাড় নেড়ে নীপা বলল, 'ওমা! ভাবব আবার কি? এমনি অনেকগুলো কথা মনে এল, তাই।'

নীলাদ্রি ওকে সহজ হোতে দেখল। 'আমাদের কথা চিন্তা করে তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ নীপা। কেউ টের কিছু পাবে না। বউ পালিয়ে গেলে ভদ্রলোক কি মামলা করতে ছোটে?'

কথা শুনে নীপা ফিক করে হাসল, 'আমায় বলতে হয়, না বলে? তুমি কেমন করে জানলে—'

—'ও আমি জানি।' নীলাদ্রি হেসে বলল, 'ঘরের বউ হল খাঁচার ময়না। উড়ে গেলে বুকে বাজে ঠিকই। শূন্য খাঁচার দিকে তাকালে মনটাও শূন্য হয়ে আসে। কিন্তু তার বেশী নয়। দু-চারদিন পর সব সয়ে যায়। তাই বলে ঘরের কেলেঙ্কারী নিয়ে কি কোর্ট-কাছারি করা চলে?'

হঠাৎ কামরার সেই গুজরাটি লোকটি নড়েচড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নীলাদ্রি একটু সরে বসল। নীপা ফিস ফিস করে বলল—'তুমি অমন ভয় পাচ্ছ কেন? ও আমাদের স্বামী-স্ত্রী বলেই ধরে নিয়েছে। সুতরাং আমাদের সম্পর্কও নিবিড়।'

আসন ছেড়ে লোকটি উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ওদের দিকে ফিরেও তাকাল না। সামনে দিয়ে হেঁটে সোজা বাথরুমে ঢুকল।

বিদ্রূপ করে নীপা বলল,—'তুমি ভারী ভীতু। লোকটা উঠে দাঁড়াতেই অমন আড়ষ্ট হয়ে সরে গেলে কেন?'

—'আমি ভীতু?' নীলাদ্রি একবার শুধু বলল। পরমুহূর্তেই সে একটা কাণ্ড করে বসল। সবলে নীপাকে টেনে আনল নিজের বুকের কাছে। নির্লজ্জের মত ওর ঠোঁটে, গালে, গলার নরম শাদা চামড়ায় এবং বুকের অনাবৃত অংশে কয়েকবার চুমু খেল।

অসহায় পাখির ডানা ঝটপটানির মত নীপা আত্মরক্ষার অক্ষম চেষ্টা করল। বিরক্তি প্রকাশ করে বলল—'কি হচ্ছে? ছেড়ে দাও শিগগির।'

নীলাদ্রি অবশ্য তখনই ছেড়ে দিল তাকে। বলল—'এবার, হয়েছে তো?'

চোখ পাকিয়ে নীপা বলল—'এই জন্যই বুঝি ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট কিনেছিলে? এতক্ষণে আমি বুঝতেই পারিনি।'

কোনো জবাব দিল না নীলাদ্রি। ঈষৎ হেসে একটা সিগারেট ধরিয়ে সে আয়েস করে টানতে লাগল।

বাইরে সহজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠে অপরাহ্নের ঘন ছায়া, বৃষ্টির জলে ধোয়া আকাশের রঙ উজ্জ্বল নীল। রেল লাইনের দুপাশে ধানের ক্ষেত। সবুজ ধানের চারা হিলহিল করে দুলছে।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন এল। প্ল্যাটফর্মের উপর লাল জামা পরা কুলির দল টেলিগ্রামের পোস্টের মত সমান দূরত্বে দাঁড়িয়ে।

গাড়ি থেকে নেমে নীলাদ্রি বলল—'সাড়ে চারটে বাজল। তাড়াতাড়ি চল, ট্যাক্সির জন্য আবার হা-পিত্যেশ করে লাইন দিতে না হয়।'

ভাগ্য ভালো। স্টেশন থেকে বেরিয়েই খালি ট্যাক্সি পাওয়া গেল। নীপা বলল—'আমাকে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিতে হবে না। গোলদীঘির কাছে নামিয়ে দিলেই চলবে। ওটুকু পথ আমি হেঁটে যেতে পারব।'

নীলাদ্রি হাসল। ওকে ভীতু বললে কি হবে? ভয় নীপার মনেও কিছু কম নেই। নীলাদ্রির সঙ্গে একই ট্রেনে এসেছে, এই কথাটি সম্ভবত সে গোপন রাখতে চায়। অরপালি লেনের বাড়ির দরজায় গিয়ে নামলে ব্যাপারটা জানাজানি হবার আশঙ্কা আছে।

কলেজ স্ট্রীটে নেমে নীপা বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। অপরাহ্নের ফুরফুরে তাজা বাতাস। ফুটপাতের ধারে জামা-কাপড়, খেলনা-পাতি এবং নানা পণ্যের পসরা সাজিয়ে দোকানীরা বসে। কেউ কেনাকাটা করছে, কেউ বা পথে যেতে যেতে বস্তুগুলি চোখে দেখছে। চটুল হাসিতে সমস্ত পথটা ভরিয়ে দিয়ে দু-তিনটি যুবতী মেয়ে কফি-হাউসের দিকে হেঁটে গেল। ফুটপাতের উল্টোদিকে একটা চোঙা প্যান্ট পরা ছেলে বাস-স্টপে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েগুলোর খিল-খিল হাসি শুনে সে আপত্তিকর একটা মন্তব্য করল।

নীপার কিছু কেনা-কাটা করবার ছিল। কিন্তু হাতে সময় নেই। সকালে নটার এক্সপ্রেসটা ধরার ইচ্ছে তার। নীলাদ্রিও ওই ট্রেনে যাবে। তাছাড়া কাল রবিবার, দোকান-পাট বন্ধ। কেনাকাটা সারতে এই বিকেলটুকু সম্বল। কিন্তু এখনই বা হাতে সময় কই তার? সাতটায় ফাংশন। অন্তত সাড়ে ছটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে না পারলে সময়ে হাজির হওয়া কঠিন।

ফুটপাতটা পেরোলেই বাঁ-দিকে একটা বড় দোকান। নীপা ভাবল ওখানেই একবার চক্কর দিয়ে যাবে। দু-চারটে দরকারী জিনিসের সওদা সেরে বাড়িতে ঢুকবে। উত্তর দিক থেকে দ্রুতগতি একটা দোতলা বাস আসছিল। নীপা থমকে দাঁড়াল। বাসটা চলে গেলে সে রাস্তা অতিক্রম করবে। হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে ডান দিকে তাকিয়ে নীপা অবাক হল। খানিকটা দূরে এক ভদ্রলোক অন্যমনস্কের মত দাঁড়িয়ে। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, হাতে ফোলিও ব্যাগ। মুখে পরিচিত ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। প্রফেসর অনিমেষ দত্ত সম্ভবত কারো জন্য অপেক্ষা করছেন। নীপার মনে পড়ল আজ কলেজে অধ্যাপক দত্তকে সে দেখে নি। হয়ত সকালেই কোনো ট্রেন ধরে উনি কলকাতায় এসেছেন।

হুড়মুড় করে দোতলা বাসটা প্রায় তার সামনেই থামল। দু-তিনজন নামল, কেউ কেউ উঠল। বাস থেকে নেমে একটা লোক এদিক-ওদিক চেয়ে কাকে যেন খুঁজল। নীপা স্থির দৃষ্টিতে দেখছিল। লোকটা ধীরে ধীরে পা ফেলে অনিমেষ দত্তের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

নীপার চোখ দুটো বিস্ময়ে বড় বড় দেখাল। অনিমেষ দত্তের সঙ্গে এই লোকটার আলাপ পরিচয় আছে নাকি? কে জানে, হবেও বা। দুনিয়াতে জানা-শুনো হতে বাধা কোথায়? নীপা অবাক হয়ে ভাবছিল। এমন একটা খবর সে এতদিন রাখে নি।

ঘরে ঢুকতেই কাকা সমাদর করে বললেন,—'এসে গিয়েছিস খুব ভাল হয়েছে। আমি ভাবছিলাম নিজেই একবার পলাশপুর যাব।'

একগাল হেসে নীপা বলল—'হঠাৎ আসতে হল কাকা। সন্ধ্যায় একটা ফাংশন আছে। আমাদের কলেজের তিন-চারজন ছেলেমেয়ে এসেছি। সাতটায় ফাংশন শুরু।'

—'বেশ তো। ফাংশন শুনে আয়।' অভিভাবকের মত কাকা অনুমতি দিলেন। বললেন—'রাত্তিরে কথা হবে'খন।'

কাকী সংসারেই এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল। এবার বেরিয়ে এসে বলল—'বেশ আছিস নীপা। কেমন ঝাড়া হাত-পা। কোলে-কাঁখে একটা থাকলে বুঝতিস কি বিষম জ্বালা। হাত-পা একেবারে বাঁধা।' কাকী মুখটা বিকৃত করে সম্ভবত নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিল।

●

বেশ জমজমাট বার্ষিকী উৎসব। ফুলের মালা দিয়ে সাজানো গেট। লাল-রঙা কাপড়ের উপর উদয়ন নাট্যগোষ্ঠীর নাম বড় বড় অক্ষরে লেখা।

হলে ঢুকবার আগেই মনোহরদার সঙ্গে দেখা। মনোহর বরাট—উদয়নের কর্ণধার।

নীপা হেসে বলল—'ভালো আছেন মনোহরদা?'

মনোহর সোল্লাসে প্রায় চিৎকার করে উঠল। 'আরে, নীপা এসেছ নাকি? তোমার কথা নীলাদ্রির কাছে শুনি। আবার কলেজে ভর্তি হয়েছ তাও জেনেছি।'

—'আপনি দেখছি আমার সব খবরই রাখেন।' নীপা ধীরে ধীরে বলল।

মনোহর শব্দ করে হাসল। 'আমি সব খবর রাখি তোমার। ভালো করে বি-এ পাশ করতে পারলে এম-এ পড়তে কলকাতায় আসবে, তাও জানি। তখন কিন্তু উদয়নে আবার ফিরে এসো। তোমার পার্টস ছিল নীপা। হয়ত এ লাইনে নাম করতে।'

নীপা চুপ করে শুনল। কোনো কথা বলল না।

অনুষ্ঠান শেষ হবার খানিক আগেই নীলাদ্রি ওকে খুঁজে বার করল। ফিস-ফিস করে বলল—'পালিয়ে যেও না একা। যাবার পথে আমি তোমাকে কলেজ স্ট্রীটে নামিয়ে দেব'খন।'

'কি দরকার?' নীপা ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।

—'আমার দরকার আছে।' নীলাদ্রি দাবি জানাল।

অনুষ্ঠান শেষ হতেই নীপা বেরিয়ে পড়ল। পিছু পিছু নীলাদ্রিও। অত রাতে খালি গাড়ি পাওয়া সহজ। হাত বাড়িয়ে নীলাদ্রি একটা ট্যাক্সিকে থামাল।

গাড়িতে উঠে নীপা বলল—'কি দরকার ছিল তোমার বললে না?'

নীলাদ্রি হেসে ফেলল। 'কাল কোন ট্রেনে যাচ্ছ?'

—'দেখি, এখনও ঠিক করিনি।' নীপা ঠোঁট টিপে রহস্য করল।

—'রঙ্গ রাখ।' নীলাদ্রি বলল। 'আর তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না আমার। সকালের এক্সপ্রেসটাতেই যাচ্ছ তো? দুটোর সময় আবার ফুল রিহার্সাল।'

—'এক্সপ্রেসটাতেই যাব বলেই ভেবেছি। তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে? প্লাটফর্মে—'

—'উঁহু' নীলাদ্রি ঘাড় নাড়ল। 'স্টেশনে বইয়ের দোকানটার কাছে থাকব আমি। তুমি সাড়ে আটটার মধ্যে এসো।'

বাড়িতে কাকার সঙ্গে কথা বলল নীপা। অবিনাশ কবিরাজ লেনের বাড়িটা বিক্রি করতে তার আপত্তি নেই। পুরোনো বাড়ি। রঙচটা নোনাধরা দেওয়াল। কতদিন চুনকাম হয়নি। ঝোঁকের মাথায় বাবা বাড়িটা কিনেছিলেন এখন হুট করে বেচা দায়। ভাড়াটেদের একপাল ছেলেমেয়ে দিনমানে সারাক্ষণ নরক গুলজার করে রেখেছে।

কাকা বললেন—'একজন খদ্দের পেয়েছি বাড়ির। লোকটা ভালো। ব্যবসাপাতি করে দু' পয়সা কামিয়েছে।'

—'কি রকম দাম দিতে চায়?' নীপা জানতে চাইল।

—'হাজার পঞ্চাশেক পর্যন্ত উঠতে পারে। বাড়ি তো ছোট। তারপর অতগুলি ভাড়াটে। ওগুলিকে তাড়াতে কম-সে-কম হাজার দশ টাকা করকরে বেরিয়ে যাবে। তাও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।'

একটু ভেবে নীপা বলল—'আমার তেমন আপত্তি নেই কাকা। তুমি একবার পলাশপুরে চলো না। ওর সঙ্গে একটু কথা বলবে। কাল যাবে আমার সঙ্গে?'

—'কাল?' কাকা চিন্তা করে জবাব দিলেন। 'কাল তো হয় না। আমি মঙ্গলবার যেতে পারি তোর ওখানে। বিকেলের দিকে রওনা হলে সন্ধ্যের পর পৌঁছে যাব—। বলিস তো চন্দ্রবদনকে সঙ্গে নিয়ে যাই।'

—'সে তুমি যা ভাল বুঝবে', নীপা খুশী মনে বলল।

—'তিনজনে মিলে যা হয় করা যাবে। তুমি মঙ্গলবার তাহলে এসো, কেমন?'

গভীর রাতে স্বামী-স্ত্রী কথাবার্তা হল।

কাকী বলল—'বাড়ি বিক্রি হলে সেই চাঁদবদন লোকটা তোমাকে কত টাকা দেবে?'

—'সে খোঁজে তোমার দরকার কি?' কাকা দাঁত খিঁচিয়ে জবাব দিলেন।

—'আহা, বলই না। আমি কি পাঁচ-জনকে বলে বেড়াচ্ছি?'

—'দশ হাজার।' কাকা দাঁতে দাঁত চিপে উচ্চারণ করলেন।

—'মোটে?' কাকী ঠোঁট উল্টিয়ে মনের বিরক্তি প্রকাশ করল।

'গোটা বাড়িটাও তো আমাদের হতে পারত।'

—'চুপ আর একটি কথাও নয়। মনে রেখ, মেয়েটা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। ভাঙা দেওয়ালেরও কান আছে।'

স্টেশনে নীলাদ্রি এল পৌনে নটার সময়। ছটফটে ব্যস্তভাব, ঘামে জবজবে মুখ। অপরাধীর মত সে বলল—'ভীষণ দেরি হয়ে গেল আমার। তুমি কতক্ষণ এসেছ?'

—'সওয়া আটটায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে। আর দু-এক মিনিট পরেই গাড়িতে উঠে যেতাম।'

—'ভেরি সরি।' নীলাদ্রি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'পথের মধ্যে গাড়ি ব্রেকডাউন হলো। আর কোন ট্যাক্সিও পেলাম না। অনেক কসরৎ করে একটা বাসের হাতল ধরে এসেছি।'

—'খুব হয়েছে। আর কৈফিয়তে কাজ নেই।' নীপা পরিহাস করল।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে নীলাদ্রি বলল—'এখনও কিন্তু টিকিট কাটা হয় নি, একটু দাঁড়াও চট করে দুটো টিকিট করে আনি।'

বাধা দিয়ে নীপা বলল—'থাক, আর ব্যস্ত হতে হবে না।

—'সত্যি?' নীলাদ্রি মুখ উজ্জ্বল করে বলল।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে খুঁজে বের করল নীপা। হলদে রঙের দুখানি টিকিট। এক-নজরে তাকিয়ে নীলাদ্রি বলল,—'ইস! থার্ড ক্লাস কাটলে নাকি?'

নীপার চোখে দুষ্টু হাসি। সে বলল—'কেমন মশায়? আসার সময় ভীষণ জ্বালাতন করেছ। এবার ঠিক জব্দ করেছি তোমাকে।'...

শিমুলপুর স্টেশনে ঠিক সময়ে গাড়ি এল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নীপা সময় দেখল। এগারোটা প্রায় বাজে। পলাশপুরে পৌঁছতে বারোটা তো নির্ঘাত।

নীলাদ্রি বলল,—'একটা ট্যাকসি করি চল। মিনিট পনের কুড়ির মধ্যে পৌঁছে যাব তাহলে।'

—'পাগল হয়েছ নাকি?' নীলা প্রায় শাসন করল ওকে, 'দুজনকে একই ট্যাকসিতে ফিরতে দেখলে আর কলেজে পড়াতে পারবে?' একটু থেমে নীপা বলল,—'প্ল্যাট-ফর্মে পা দিয়ে আমি কিন্তু তোমাকে আর চিনতেও চাইব না।'

কিন্তু গাড়ি থেকে নেমেই নীপাকে থমকে দাঁড়াতে হল। আচমকা শিরে সর্পা-ঘাত। প্লাটফর্মে পাথরের মূর্তির মত অম্বর দাঁড়িয়ে। আড়চোখে দেখল নীপা নীলাদ্রি ঠিক পিছনে। তার ছোট ব্যাগটা নীলাদ্রির হাতে—

নীপা বুঝতে পারল অবস্থাটা আদৌ স্বাভাবিক নয়। চোখ-মুখে হাতে-নাতে ধরা পড়া চোরের মত। এখন কথা বলতে গেলে তার গলার স্বর কাঁপা কাঁপা শোনাবে।

কয়েকটি মৌন মুহূর্ত নিঃশেষ হল।

অস্বস্তিকর অবস্থাটা অম্বরই দূর করল। নীপার দিকে তাকিয়ে সে বলল,—'শিমুলপুরে একটা কলে এসেছিলাম। মনে হল, এই ট্রেনটায় তুমি আসবে। তাই প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ালাম।'

এবার নীপা সহজভাবে কথা বলল, 'মানে আমিও খুব অবাক হয়েছি তোমাকে দেখে। হঠাৎ শিমুলপুরে তুমি এলে কেন? ভাবলাম এই ট্রেনেই কোথাও যাবে বুঝি—'

নীলাদ্রির হাত থেকে স্ত্রীর ব্যাগটা নিল অম্বর। বলল,—'আপনার সঙ্গে পরিচয় অবশ্য আমার নেই। কিন্তু শহরে আপনাকে অনেকবার দেখেছি।'

নীপা ঈষৎ হাসল। 'এর পরিচয় আমার আগেই দেওয়া উচিত ছিল। ইনি নীলাদ্রি সেন,—আমাদের কলেজে বাংলা পড়ান। আর টাউন ক্লাবের যে থিয়েটার হচ্ছে উনি তার ডিরেক্টর।'

অম্বর হাত তুলে নমস্কার করল। মুখে বলল,—'ভারী খুশী হলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করে। একদিন আসবেন,—গল্পগুজব করা যাবে।'

বাড়ি ফেরার খানিক পরেই দুঃখহরণ

বলল,—'বৌদি, কাল দুজন ভদ্দরলোক এসেছিলেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

—'কখন বল দিকি?' নীপা জানতে চাইল।

—'সন্ধের পর।'

—'কি রকম দেখতে বলতো?' নীপা চিন্তিত মুখে তাকাল।

দুঃখহরণ সোজাসুজি বলল,—'একজন ফর্সাপানা, বেশ সোন্দর। আর একজন দেখতে ভালো নয়।

এদিক ওদিক তাকিয়ে নীপা বলল,—'তোর বাবুকে বলেছিস?'

—'হুই! বাবুকে বলতে হবেক কেন? তারা তো বাবুর সঙ্গেই কথাবার্তা বলল।'

নীপার মুখের উপর একটা ছায়া পড়ল। চোখ দুটি ছোট হয়ে এল, কপালে চিন্তার রেখা এখন, অনেক কিছু ভাবছে নীপা। আশ্চর্য। অম্বর তো একথা তাকে একবারও বলল না।

পা টিপে টিপে বৈঠকখানা ঘরের দরজার কাছে নীপা এল। ফুলফোর্সে পাখা ঘুরিয়ে অম্বর বসে। মুখে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। সেও কিছু ভাবছে,—কপালে চিন্তার ছোট ছোট রেখা।
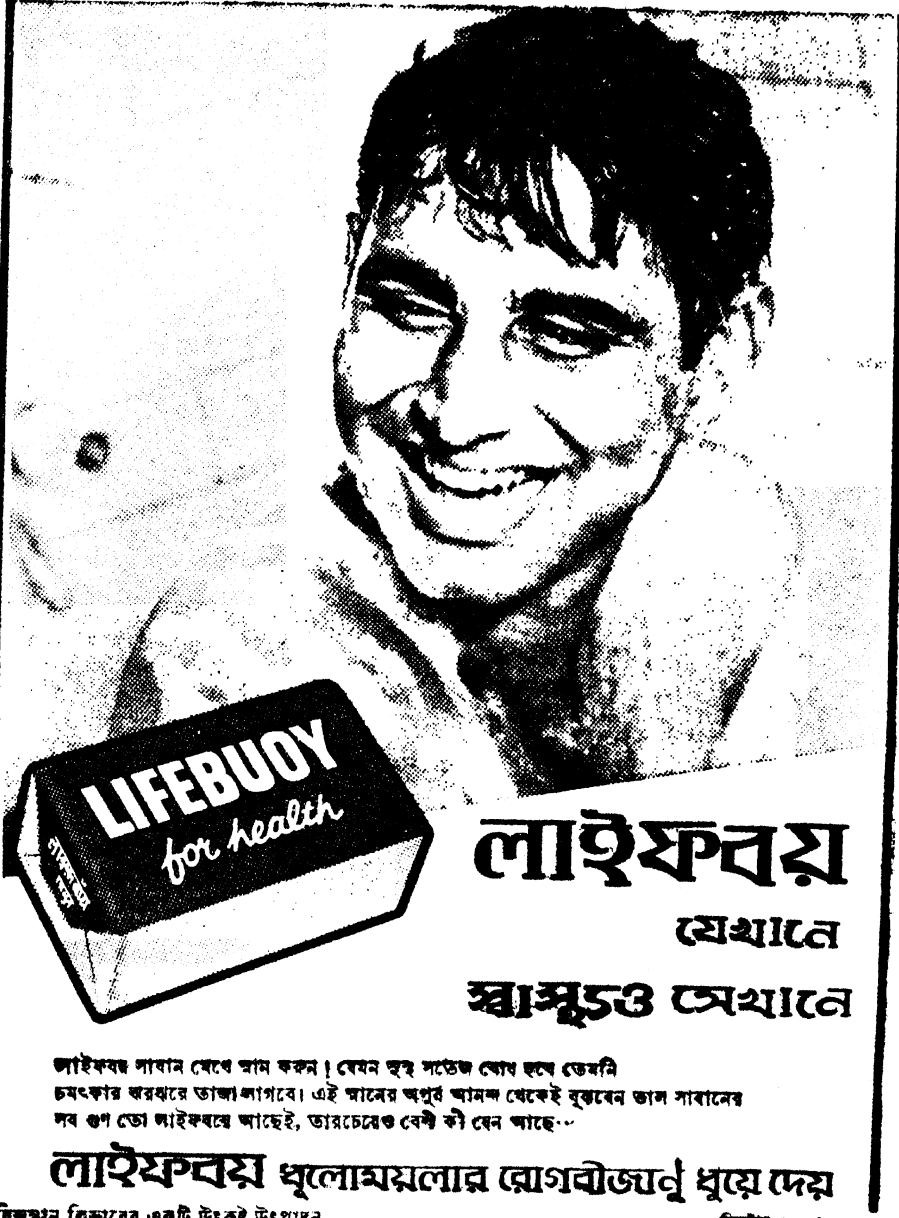
স্বামীর চাউনিটা কেমন যেন,—একটা সন্দেহকুটিল দৃষ্টি।

ঘরে ঢুকতে সাহস হল না নীপার। তার মুখটা শুধু শুকনো এখন।

বুকের ভিতরটা ঢিপ-ঢিপ করছে।

(ক্রমশঃ)
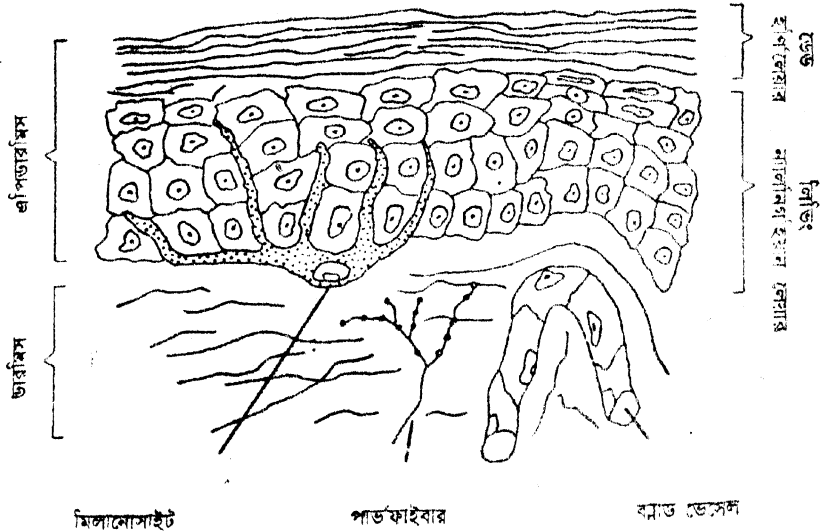
ত্বক ও সূর্যকিরণ

আমাদের জীবনের সঙ্গে সূর্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সূর্যের কাছ থেকে উপযুক্ত পরিমাণ তাপ (যা খুব বেশি নয় এবং খুব কমও নয়) না পেলে পৃথিবীতে আমাদের জীবন রক্ষা সম্ভব হত না। দিনের বেলায় আমাদের দেহের ওপর যে সূর্যকিরণ পড়ে তার প্রভাব উপকারক বলে একটা ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু মানুষের দেহত্বকের ওপর সূর্যকিরণের প্রভাব, বিশেষত যাদের দেহত্বক শাদা। (যেমন পাশ্চাত্ত্য দেশের অধিবাসীরা)— উপকারক তো নয়ই বরং বিশেষ অপকারক বলে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেছে।

আমরা জানি, সূর্য থেকে তাপ ও আলোকশক্তি বিকিরণের আকারে পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়। এই সমস্ত শক্তির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কয়েক শত মিটার (বেতার-তরঙ্গ) থেকে কয়েক লক্ষ গুণ হ্রস্বতর (গামা-রশ্মি) হয়ে থাকে। সূর্যকিরণের সবটাই আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় না, কারণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আসার সময় তার অনেকখানি শোষিত হয়ে যায়। বেতার-তরঙ্গের একটা ক্ষীণ অংশ পৃথিবীতে পৌঁছয় (যা বেতার জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ)। কিন্তু আরেকটা অংশ যা আলো (দৃশ্য ও অদৃশ্য) ও তাপের আকারে আসে তা প্রাণীদের দেহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

সূর্যকিরণের বর্ণালীতে আমরা পাই, মাঝখানে দৃশ্য আলো এবং তার দুপাশে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি বা বেগুনীপারের আলো ও ইনফ্রারেড বা লাল-উজানি আলো। আমাদের দেহত্বকের ওপর দৃশ্য আলোর প্রভাব অপকারক নয় এবং বেতার-তরঙ্গ কোনরকম প্রভাবই বিস্তার করে না। অদৃশ্য বেগুনীপারের আলোরই প্রভাব হচ্ছে অপকারক। লাল-উজানি বিকিরণ দেহত্বককে কিছু পরিমাণে উত্তপ্ত করে, কারণ ত্বকের মধ্যে এই রশ্মি অনুপ্রবেশ করতে পারে। দেহপেশী ও গ্রন্থিতে এই রশ্মি প্রবেশ করে উপকার করে। সূর্য-কিরণের এই উপকারক প্রভাব ইনফ্রারেড বাতির (যা দৃশ্য আলো ও বেগুনীপারের আলো থেকে মুক্ত) সাহায্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে, দেহত্বকের ওপর আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির প্রভাব হচ্ছে ক্ষতিকারক। কিন্তু একটা দিকে এই রশ্মি মানুষের উপকার করে থাকে। এই রশ্মি দেহত্বকের একটি রাসায়নিক পদার্থকে ভিটামিন-ডিতে পরিণত করে। আমরা জানি, আমাদের দেহাস্থির স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যে এই ভিটামিন-ডি একান্ত প্রয়োজনীয়। এই ভিটামিনের অভাবে রিকেট রোগ দেখা দেয়। আগে যখন ভিটামিনের বিষয় জানা যায় নি তখন রিকেটগ্রস্ত রোগীদের সূর্যকরোজ্জ্বল জায়গায় পাঠিয়ে নিরাময় করা হত। কিন্তু এখন মাছের যকৃতের তেল (যা ভিটামিন-ডিতে বিশেষ-ভাবে সমৃদ্ধ) যেমন কডলিভার অয়েল, খাইয়ে এই রোগ নিরাময় করা যায়।

দেহত্বকের ওপর আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির যে ক্ষতিকারক প্রভাব আছে তা প্রতিহত করার ব্যবস্থা আমাদের ত্বকেই আছে। কিন্তু সূর্যকিরণের এই অপকারক রশ্মি দেহের ওপর সরাসরি পড়লে তাতে সৌর-দহন বা 'সান-বার্ন' দেখা দেয়। এই দহনের প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় না বটে, কয়েক ঘণ্টা পরে তা প্রকাশ পায়। কোন উত্তপ্ত জিনিসের দ্বারা ত্বক পুড়ে গেলে যে দহন-প্রতিক্রিয়া হয়, তা থেকে সৌরদহনের কিছুটা পার্থক্য আছে। উত্তপ্ত জিনিসে ত্বক পুড়লে সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গাটা লাল হয়ে ওঠে। কিন্তু আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি দেহত্বকের উপরিভাগের ঠিক নীচের স্তরের ক্ষতিসাধন করে এবং সেখানে একটি রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করে যা টিস্যু বা দেহকলার গভীরে রক্তবহা নালীতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সৌর বিকিরণের দ্বারা দেহত্বক যখন ভীষণভাবে পুড়ে যায়, তখন ফোসকা দেখা দেয়। পরে এই ফোসকার তলায় নতুন চামড়া জন্মায় এবং ফোসকাটি খসে পড়ে যায়। যখন দেহ-ত্বকের বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে এই ধরনের

তীব্র দহন হয়, তখন খুব যন্ত্রণা হয় এবং এমন কি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও হতে পারে।

যাদের দেহত্বক শাদা তাদের দেহ দুটি বিক্রিয়ার দ্বারা সূর্যকিরণের এই অপকারক প্রভাব অনেকখানি কমিয়ে আনে। একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে দেহত্বকের কৃষ্ণীকরণ (ডাকিং)। দেহত্বকের নিচের স্তরে মেলানো সাইটস কোষের দ্বারা কৃষ্ণীকরণ সম্পাদিত হয়ে থাকে। এই কোষগুলি একরকম কৃষ্ণ রঞ্জক (পিগমেন্ট) উৎপাদন করে, তার নাম মেলানিন। নিগ্রো প্রভৃতি কৃষ্ণকায় জাতির মধ্যে জন্মসূত্রে এই মেলানিন নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় প্রতিরোধক বিক্রিয়া হচ্ছে বহিঃত্বকের ঘনীভবন। এই প্রতিরোধক স্তর মৃত কোষের দ্বারা গঠিত এবং কেরাটিন নামে একটি প্রোটিনে সমৃদ্ধ। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির অধিকারক প্রভাব শোষণ করে নেয় এই কেরাটিন। অনবরত সূর্য-কিরণে উন্মুক্ত দেহে কেরাটিন স্তর ঘনীভূত হয়ে ত্বক কঠিন হয়ে যায়। যারা উন্মুক্ত সূর্যকিরণে চাষাবাদ করে ও মাছ ধরে সেই চাষী ও ধীবরদের দেহত্বক তাই কঠিন হতে দেখা যায়।

এগুলি হল সূর্যকিরণ দেহত্বকের ওপর স্বল্পকাল পড়লে তার প্রতিক্রিয়া। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী সূর্যকিরণের প্রতিক্রিয়া হয় আরও মারাত্মক। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ত্বকের জীর্ণতা। প্রাকৃতিক নিয়মে বয়স বাড়ার সঙ্গে আমাদের দেহত্বকের সংকোচন শক্তি ও তার স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায়। কিন্তু সূর্যকিরণ দেহত্বকের দীর্ঘ সময় পড়লে ত্বকের জীর্ণতা বৃদ্ধি পায়।

ত্বকের জীর্ণতা কেন ঘটে তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে স্থিতিস্থাপক টিস্যু বা কলার সঙ্গে এই ব্যাপারটি সম্ভবত জড়িত। এই স্থিতিস্থাপক টিস্যু ত্বকের নিচের স্তরে ডারমিসে থাকে। এই টিস্যু ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা করে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে এবং সূর্যকিরণে বেশি-ক্ষণ থাকলে এই টিস্যু বৃদ্ধি পায়।

এই স্থিতিস্থাপক টিস্যু গঠনের কারণ কি তা এখনও ঠিক বোঝা যায়নি। আমরা জানি আমাদের দেহত্বকের স্থিতিস্থাপকতা ও দৃঢ়তার মূলে আছে কোলাজেন নামে একটি প্রোটিন। দেখা গেছে বয়স বাড়ার সঙ্গে এবং সূর্যকিরণে দীর্ঘ সময় থাকলে কোলাজেনের পরিমাণ কমে যায়। ত্রিশোর্ধ্বের দেহে কোলাজেনের এক-চতুর্থাংশ দরকারী কিন্তু প্রত্যেক ১০ বছরে এই পরিমাণ কমে আসে এক-দশমাংশ। সূর্যকিরণে দীর্ঘক্ষণ থাকলে কোলাজেনের পরিমাণ আরও কমে যায়। তবে কোলাজেনের অভাবটাই যে দেহত্বকের জীর্ণতার একমাত্র কারণ তা বলা যায় না এর সঙ্গে আরও অনেক কারণ জড়িত আছে।

এক ধরনের ক্যান্সার দীর্ঘকাল সূর্য-কিরণের মধ্যে থাকলে হয়। দেখা গেছে যারা উন্মুক্ত আবহাওয়ায় কাজ করে কিংবা যারা সূর্যকিরণোজ্জ্বল দেশে বাস করে তাদের মধ্যে এই ত্বকের ক্যান্সার-এর প্রাদুর্ভাব বেশি। ব্রিটেন ও স্ক্যান্ডেনেভিয়ার চেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে এই ক্যান্সার বেশি দেখা যায়। তবে কৃষ্ণকায় লোকদের মধ্যে এই ক্যান্সার কদাচিৎ দেখা যায়। এর কারণ বোধহয় কৃষ্ণকায় লোকদের দেহত্বকে যে মেলানিন থাকে তা এই ক্যান্সার প্রতিরোধ করে।

মানুষের দেহত্বকের ওপর সূর্যকিরণের প্রতিক্রিয়া কিভাবে ঘটে তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এখনও জানা যায়নি। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এবিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করছেন। তবে ইতিমধ্যে যতটুকু জানা গেছে তাতে একটা বিষয় পরিষ্কার, দেহত্বকের ওপর সূর্য-কিরণের প্রতিক্রিয়া স্পষ্টত অপকারক। বর্তমানে বহু শ্বেতকায় লোক সূর্যস্নানের দরুন নানা দৈহিক অসুবিধার সম্মুখীন হন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাক্ষ্য-প্রমাণে তাঁদের এটুকু পরামর্শ দেওয়া যায়, উন্মুক্ত সূর্যকিরণে ত্বক না পুড়িয়ে কৃত্রিম উপায়ে ত্বক রঞ্জিত করলে তারা সুফল পাবেন বেশি।

চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণের দ্বিতীয় অভিযান

গত জুলাই মাসে অ্যাপোলো-১১ অভিযানে মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং এবং এডউইন অলড্রিনের চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম অবতরণের পর ঘোষণা করা হয়, আগামী ১৪ নভেম্বর অ্যাপোলো-১২ মহাকাশচারী-ত্রয় চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণের দ্বিতীয় অভিযানে যাত্রা করবেন। এবারের অভি-যাত্রীত্রয় হচ্ছেন চার্লস কনরাড, রিচার্ড গর্ডন এবং অ্যালান বীন। এবারের মূল-যানের নাম দেওয়া হয়েছে 'ইয়াংকি ক্লিপার' এবং চন্দ্রযানের নামকরণ হয়েছে 'ইন-ট্রেপিড'।

মহাকাশচারী কনরাড এবং বীন ১৯ নভেম্বর তাঁদের চন্দ্রযানে করে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করবেন। মহাকাশচারী গর্ডন তখন মূল যানে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করতে থাকবেন। ১৯৬৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যাত্রী-বিহনে মহাকাশযান সার্ভেয়ার-৩ টেলিভিশন ক্যামেরা সমেত চন্দ্রপৃষ্ঠের ঝটিকা সমুদ্রের কাছে যেখানে অবতরণ করে, সেখান থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে এক ফালি মসৃণ জমির ওপরে চন্দ্রযান ইনট্রেপিড অবতরণ করবে। চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ নিখুঁত করবার জন্যে কনরাড চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০০ মিটার ঊর্ধ্বে থাকতে চন্দ্রযানকে হাতে নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং ভালভাবে দেখেশুনে ও কম্পিউটারের সাহায্যে তথ্যাদি পর্যালোচনা করে সার্ভে-য়ারের যতটা সম্ভব কাছে নামবেন। কনরাড এবং বীন চন্দ্রপৃষ্ঠে ৩২ ঘন্টা অবস্থান করবেন। এক বিশেষ ধরনের কাঁচির দ্বারা সার্ভেয়ারের টেলিভিশন ক্যামেরাটি কেটে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হবে পরীক্ষার জন্যে। এই পরীক্ষার ফলে জানা যাবে, ৩১ মাস চন্দ্রপৃষ্ঠে একেবারে খোলা [illegible] আবহাওয়ার মধ্যে থেকে এর কতটা ক্ষয় হয়েছে।

অ্যাপোলো-১২ অভিযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে চন্দ্রের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তথ্য সন্ধানের জন্যে পাঁচটি যন্ত্র স্থাপন এবং চন্দ্রের মৃত্তিকা ও শিলা সংগ্রহ। চন্দ্রপৃষ্ঠে দুবার পদচারণার দ্বারা এই কাজ হবে। প্রতিবার ৩-৫ ঘন্টা করে পদচারণা করা হবে। চন্দ্রশিলা সংগ্রহের ওপর এই অভিযানে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। দুটি বাক্সে করে ২০ কিলোগ্রাম ওজনের চন্দ্রশিলা ও মৃত্তিকা পৃথিবীতে নিয়ে আসা হবে।

এবারের অভিযানে মহাকাশচারীরা রঙীন ছবি প্রচারের একটি টেলিভিশন ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। এর সাহায্যে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে চন্দ্রাভি-যানের রঙীন ছবি দেখানো সম্ভব হবে। অ্যাপোলো-১১ অভিযানে শাদা-কালো রঙের টেলিভিশনের যে ছবি পাঠানো হয়ে-ছিল তাতে আবছা ভাব ছিল। এবারের অভিযানে টেলিভিশনের ছবিতে সে আবছা ভাব থাকবে না।

চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রত্যাবর্তন করে দুজন মহাকাশচারী মূলযানে আরোহণ করার পর চন্দ্রযানটি পরিত্যাগ করা হবে। চন্দ্রযানটি যখন চন্দ্রপৃষ্ঠে আছড়ে পড়বে, মহাকাশ-চারীরা তখন তার ছবি তুলবেন। চন্দ্রযানটি যখন পড়ে যাবে, দূরবীনের সাহায্যে তার ওপর নজর রাখা হবে এবং পতনের বিভিন্ন পর্যায়ের রঙীন ছবি তোলা হবে।

যাত্রীবিহীন চন্দ্রযানটি অবতরণ স্থানের কাছেই আছড়ে পড়বে। তার ফলে চন্দ্রপৃষ্ঠে যে কম্পনের সৃষ্টি হবে তা মহা-কাশচারীদের রেখে আসা সিসমোমিটার যন্ত্রে ধরা পড়বে। এই সিসমোমিটার ছাড়া সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত তেজস্ক্রিয় কণা সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী যন্ত্র, চন্দ্রলোকে বিদ্যুৎক্ষেত্রের অস্তিত্ব সন্ধানী যন্ত্র, মানুষ ও চন্দ্রযানের চন্দ্রপৃষ্ঠের অবতরণের ফলে চন্দ্রপৃষ্ঠের অবস্থা সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী যন্ত্র এবং চন্দ্রে চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব-সন্ধানী যন্ত্র মহাকাশচারীরা সেখানে স্থাপন করে আসবেন।

মহাকাশচারী দুজন চন্দ্রপৃষ্ঠে যে ৩২ ঘন্টা অতিবাহিত করবেন তার বেশির ভাগ সময় ব্যয়িত হবে ভবিষ্যতে চন্দ্রে অবতরণের স্থান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে আলোকচিত্র তোলায়। বিশেষ করে ১৯৭০-৭১ সালের অভিযানের জন্যে তিনটি এলাকার আলোক-চিত্র গ্রহণ করা হবে।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঞ্জাম

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিজপদ লোকটা একটু বোকা-গোছের। একে 'বোলবোলা'ও — বলে মাথায় তুলে দিয়েছে, তায় পেটে খানিকটে গেচে, দ্বিজপদর মনের কপাট একেবারে খুলে গেল। এর মধ্যে একদিন মদের শপথ নিয়ে স্যাঙাত পাতিয়ে ফেলেচে শিবনাথ, দ্বিজপদ তার হাতটা ধরে বললে—আর কেউ হলে সে ভিড়িয়ে দিত, কিন্তু স্যাঙাতের এতবড় সর্বনাশটা করাতে পারবে না। তবে কতবড় মহাপুরুষ, কি করতে এসেচে, তা আর কেউ না জানুক, দ্বিজপদর তো জানতে বাকি নেই।

এর পরেই একে একে সব কথা বেরিয়ে এল।—সেবারেও এই বাবাজীই ছেল—দামোদর চৌধুরীকে ঐরকম বিরাগী করিয়ে এনে মিত্যুঞ্জয়কে ওনার মেয়ে সুধার সঙ্গে ধনঞ্জয়ের বিয়ের কথা তুলতে বলে। পেরায় পাকিয়েই এনেছিল। শেষ পঞ্চত্ব বেঁচে যাওয়ায় তার ওপর ঐরকম মার, এবার ধনঞ্জয় ডেকে পাঠাতে এই নতুন মতলব ক'রে এসেচে। ঐ কোন্ আঁস্তাকুড়ের মেয়েটার সঙ্গে চৌধুরীমশায়ের বিধবা-বিয়ে দেবে। এবারেও পেরায় ভিজিয়ে এনেছেল চৌধুরীমশাইকে—শুধু কথাটা পাড়তে বাকি, এমন সময় জানাজানি হ'য়ে যেতে, আবার নাকি পেঁচিয়ে গেচে।

তোর বাবা যেন কিছুই জানে না, এইভাবে জিজ্ঞেস করলে—'জানাজানিটে হোল কি ক'রে? দ্বিজপদ বললে—তা তো জানে না। একদিন ধনঞ্জয়ের খাস কামরায় রয়েচে দুজনে, ধনঞ্জয় আর বাবাজী—দ্বিজপদকে তো বাইরে মোতায়েন থাকতে হয়, কখন্ কি কাজে ডাক পড়ে—একটু তফাতে গিয়েছেল, একটা কাজেই, এসে আবার দরজার কাচে দাঁড়াতেই কানে গেল, বাবাজী একটু নীচু গলায় বলচে—'যখন হয়েই গেচে জানাজানি, এটা ছেড়েই দাও। আমি আর এক মতলব ঠের করেচি—নির্ঘাৎ লাগিয়ে দেবো—কোথায় যায় ও-ব্যাটা দেখবো—কোন আপশোষ থাকতে দেব না তোমার।'

এর পরেই নাকি তোর বাবার হাতটা চেপে ধরে হঠাৎ হুহু করে কেঁদে ওঠে দ্বিজপদ, বলে এবার আমার মাথার ওপর খাঁড়া তুলেচে স্যাঙাৎ। রাজায় রাজায় লড়াই, আমি উলুখড়, মাঝখান থেকে মারা যাই, আমার জাতকুল সব যাবে, কি করব—কোথায় যাব—জমিদারের খাদ্য, তার সঙ্গে হারামজাদা মিলেচে।' কেঁদেই চলল। তোর বাবা। রাজার চেষ্টা করেও এখনও কিছু ঠের ক'রতে পারেনি।'

এই পঞ্চত্ব ব'লে দিদিমণি বললে—'মরুকগে, আর ভাবতে পারিনে স্বরূপে। কি ক'রে কার জাতকুল যাচ্চে, তার মধ্যে আমি মাথা গলাতে যাই কেন? আমার ভাবনা ছিল তোর জামাইবাবুকে নিয়ে, অযথা জড়িয়ে প'ড়ে বদনাম না হয়। আর মনটা বড় খারাপ হয়েছিল দিদির জন্যে, ঐ চৌধুরী গিন্নীর, আহা, কী সব্বনাশটাই না হ'তে যাচ্ছিল বেচারির। দুজনেই বেঁচে গেচে, আর আমি ভাবি না। এরপর কার কি হচ্ছে, যার হচ্ছে সে বুঝবে। তুই এবার কিছু খেয়ে নিয়ে যা, টগরকে ব'লে দিচ্চি। একবার কাকীমার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। কাজ নেই, কম্ম নেই, খালি এইসব নিয়ে বসে থাকা। তোর জামাইবাবু, কাল এসে পড়লে যেন বাঁচা যায়।'...একবার কলকেটা দা'ঠাকুর, যদি কিছু থাকে।"

কলকেটা তুলে নিতে আমি বললাম—"কিন্তু তোমার তাঞ্জাম কোথায় স্বরূপ? এ তো একটার পর একটা জট খুলতেই সময় কেটে যাচ্ছে।"

স্বরূপ একটু হাসল, বলল—"তাঞ্জাম এবার এসে পড়লেন এই যে, ময়ূরপঙ্খী সাজে সেজে আট বেয়ারার কাঁধে উঠচেন। কথায় বলে লাখ কথা শেষ না হ'লে বিয়ে হয় না, আপনার গিয়ে, পেরায় শেষ হ'য়ে এল বৈকি লাখ কথা।"

কয়েকটা টানের পর একটি নাতনীকে ডেকে বললে—"একটু বড় ক'রে সেজে আন এবার, তাইতেই হয়ে যাবে।"

নিজেও হাঁটু দুটোয় হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়ে বলল—"দাঁড়ান, একটু দেখেও আসি, আপনার আবার বেলা দেরি না ক'রে দেয়।"

একটু পরে কলকেটা নিজেই হাতে ক'রে নিয়ে এসে আমার হুঁকোর মাথায় বসিয়ে দিয়ে আবার কাঁথা-কাতা নিয়ে শুরু করল—

"এর পর দিনকতক অসুখে ভুগলুম আমি; আমার ওপর দিয়েও তো গেল খানিকটা ধকল মন্দ নয়। আর, না ব'ললে অধম্মও হবে, দিদিমণির বিয়ের পর থেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ইদিকে কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা, বেশ একটু আয়েসীও হ'য়ে পড়েচি দা'ঠাকুর, সেরে উঠে ওনার কাছে পেরায় দিন আষ্টেক-দশেক পরে গেনু।

দিদিমণি একলাই ছেল ওপারের ছাতে। তাখন মেয়েদের উল বোনার রেওয়াজটা নতুন উঠেচে, তাও একেবারে ঐরকম বড়লোকেদের ঘরে ফ্যাসান হিসেবে। হুগলী থেকে একজন মেমসাহেব হপ্তায় দু'দিন এসে দিদিমণি আরও দু'তিন ঘরে শিকো দিয়ে যেত। আজ এসে এই একটু আগে চ'লে গেচে, তাকে বিদেয় দিয়ে উল আর বোনার কাটি নিয়ে বসেচে, আমি গিয়ে পৌঁছুনু। দিদিমণি মাথা নীচু ক'রে বুনছেল, চোখ তুলে দেখে নিয়ে বললে—'এসেচিস্? বোস্। অনেক কথা আচে। খুব একচোট ভুগলি, না? কাহিল হ'য়ে গেচিস্।' তখুনি আবার মুখটা নীচু ক'রে নিয়ে হাত চালাতে চালাতে ঠোঁটে একটু হাসি টিপে বললে—'তা কবে দিন ঠিক হোল?'

আর সব দিনের হিসেবে ভাবগতিকটে একটু যেন প্রেথক। আমি একটু আশ্চায্য হয়েই সুধোলুম—"কিসের দিন ঠিক গো দিদিমণি?'

একটা কার্পেটের ওপর বসে বুনছেল, উল-কাটি সব রেখে দিয়ে, আশ্চায্য হয়েই বললে—'ওমা, কথাটেই বলতে শুনেতুম, যার বিয়ে তার হুঁস নেই, পাড়া-পড়শির ঘুম নেই—তা সেটা যে সত্যিই এমনভাবে ফলবে কে জানত?—

তোর যে বিয়ে ছোঁড়া, সত্যিসত্যিই, তা তুই কিছুই জানিস নে?'

সঙ্গে সঙ্গে আমি কিছু বলবার আগেই—আজ্ঞে রীতিমত ধোঁকায় পড়ে গিচি তো—কিছু বলবার আগেই গ্রামভারি হয়ে গিয়ে বললে—'হ্যাঁরে, একটা কথা ঠিক ক'রে বলতো। দেখচি, তোর কাচে লুকিয়েই রেখেচে—ও ঘর যদি দেয়ই বিয়ে—দেবেই, জানি আমি—তা যদি দেয়ই, তুই ওজর-আপত্তি করবিনে?—এই তো সিদিন বৌটা গেল, বছরও পোরেনি এখনও—রাজি হয়ে যাবি?'

বললু—সে তো খুব ভাগ্যবতী ছেলো, কপালে সিঁদুর নিয়ে সগ্গে চলে গেচে।'

দিদিমণি মুখটা একটু কুঁচকে বললে—'মর পোড়ার-মুখো! বলতে একটু বাধল না মুখে দ্যাখো!—তা এমন পাষণ্ড সোয়ামীর হাত থেকে নিষ্কিতি পেয়ে সগ্গেই গেচে বটে সে। তোরা সব ব্যাটাছেলেই সমান, একা তোকে দুষি কেন? নইলে ইন্দির মজাতে তার অমন ইন্দির, তবুও আবার একটা পাপ ঢোকাতে চায় ঘরে? কী, না, বিধবা-বিয়ে করে হিন্দুধম্ম রিক্ষে করচি। মুড়ো ঝাঁটা এমন রিক্ষেম্মের মাথায়।...যাক্, আমার এখন বাজে কথা নিয়ে থাকলে চলবে না স্বরূপ। তুই এলি বটে অনেকদিন পরে— করেচিস ভালোই, শুনেছিলাম তোর অসুখের কথা, মনটা বড় খারাপ হয়েছেল কিন্তু এক এমন সময়, বেশিক্ষণ বসাতে পারব না তোকে।

তোর জামাইবাবু এই মাস্তোর ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে যাবার আগে বলে গেল এক্ষুনি ফিরবে। ওদের যে ক'দিন থেকে জোর মিটিন চলছে, কাকাবাবুর বাড়িতে; ও, কাকাবাবু, মাসীমা, তোর বাবা, আজ নাকি তোর শ্বশুরেরও আসবার কথা আছে।'

সুধোলুম—'কিসের মিটিন্ গা?' আর আমার শ্বশুরটা কে?'

বললে—'টুকিসান কথার মাঁঝাখানে, সব কথা খুঁটিয়ে বলবার সময় নেই আমার, তোর জামাইবাবু য্যাখন না এসে পড়ে। সাঁটে বলে যাচ্ছি, শুনে যা। বিধবা-বিয়ের হুজুগটা চলল না, দেখে ভণ্ড বাবাজী আরও সাংঘাতিক মতলব বের করেচে একটা—সিদিনকে দ্বিজপদ বললে না? তারপর সিদিনকে দ্বিজপদ যে কথাটা বলতে চাইলে না—সেই সাংঘাতিক মতলবটা যে কি, সেটাও বের ক'রে নিয়েচে চালাকি ক'রে তোর বাবা ঐ খাঁটি মদ খাইয়ে আর কি। তুই তো দামোদর চৌধুরী মশাইয়ের ছেলে অনন্ত-নারায়ণকে দেখেছিস্। দেখনিনে কেন? তবে কম আসে বাড়িতে, হুগলীতে বোর্ডিংয়ে থেকে পড়া-শুনা করে। বাপ নিজে যাতই নেশা করুক, ছেলের ভালো তো চাইবেই, পাছে বাপের দেখে তার পথ ধরে তাই এই ব্যবস্থা। বোর্ডিং-এর খুব কড়াকড়ি, ছুটি-ছাটা নেই। সেই ছেলের বিয়ে হচ্ছে ধনঞ্জয়ের শালীর সঙ্গে, ধনঞ্জয়ের বাড়ি থেকেই। কেন, কি বিত্তান্ত, সে অনেক কথা, আমায় সাঁটেই বলে যেতে হচ্চে—বেশ খানিকটে সময় গোড়ায় তোর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতেই যে কেটে গেল। রাগ তো ধরেই, এই সিদিন বউটা মরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আবার রাজী!'

আমার মুখে দিয়ে বেরিয়ে গেল—'আমারও বিয়েটা অনন্তনারানের সঙ্গে একদিনেই হবে তাহলে?

রাগতে গিয়ে হেসে ফেললে দিদিমণি। চড় তুলে বললে—'দূর হ' অলপ্পেয়ে, লজ্জা সরম বলেও একটা জিনিস থাকে মানুষের! শোন, একেবারে টুকটিনি। কী যে বলছিলুম দিলে ভুলিয়ে হ্যাঁ, সেই অনন্তর বিয়ে দিচ্চে নিজের শালীর সঙ্গে ধনঞ্জয়, চৌধুরীমশাইকে একরকম রাজী করে ফেলেচে, লাট সাহেবের সময়টা পেরিয়ে গেলেই উনি তোড়জোড় করবেন বলেচেন। ঐ একটি ছেলে, তেমনি ঘটা করবেন তো। বলবি, ওনার নিজের বিধবা বিয়ের কি হোল—সেই মেয়েটার সঙ্গে, যাকে নিজের মাসতুতো বোন বলে যাচ্ছেন ধনঞ্জয়। সেখেনেও হাতে রেখেচে ধনঞ্জয়কে। জানা-জানির কথা অবিশ্যি বলেনি, বলেচে ছেলের বিয়েটা হয়ে গেলে ওটাও দিয়ে দেবে; নৈলে দেখায়ও খারাপ। ছেলেও উপযুক্ত হয়ে আসছে, বোঝবার ক্ষ্যামতা হচ্চে। ছেলেটা, তা, তোর বয়সী হবে বৈকি, ভালো করে নেকাপড়া শিখচে। ওদের হেডমাস্টার নাকি খাস বিলিতি সায়েব।

এদিকে এই। আমার তাড়াতাড়িতে বোধহয় গোলমাল হয়ে যাচ্চে, বেশ সাজিয়ে বলতে পারছিনে। তবে, মোদ্দা কথাটা এই, এখন পর্য্যন্ত যা টের পেলুম তোর জামাই-বাবুর কাছ থেকে। তারপর আজকে আরও জোর মিটিন একেবারে সেই বিলেতের পার্লামেন্টের মতন। কি হয় একটু পরেই টের পাব, কাল বরং আসিস আবার। হ্যাঁ, তোরও বিয়ে সেইদিনেই বৈকি, নইলে আর রগড়টা কি? "হ্যাঁ এই দেখ, আসোল কথাটাই ভুলে বসে আচি তাড়াহুড়োর মধ্যে! তোর কথা। তোর জামাইবাবু পই-পই করে বলে দিতে বলেচে তোকে। আর কিছু নয়, তোকে যেমন যেমন করতে বলবে শুধু করে যাবি মুখ বুজে; কেন, কি বিত্তান্ত, কিছু নয়। তোর আবার সব খুঁটিয়ে জানার রোগ আচে কিনা। ওরা সবাই ছকে রেখেচে, তোর কাজ স্রেফ দাগা বুলিয়ে যাওয়া। মানে, যেমন যেমন বলবে মুখ বুজে করে যাওয়া।'

চাকরকে বোধহয় খবর দেওয়ার কথা ছেল, এসে বললে—'কত্তা এসে গেচেন মা, সেরেস্তায় কি একটু কাজ আচে, সেরে এখুনি আসচেন।'

দিদিমণি আমায় বললে—'ঐ নে, যা বলছিলুম, আমি উঠি। কাল পারিস তো আসবি আবার। ঠাকুরকে বলা আচে, খেয়ে যাবি।'

একটি ছেলে এসে উপস্থিত হল বাড়ির দিক থেকে। বয়স তেরো-চোদ্দ, এই রকম, চোখ দুটো টানাটানা, গায়ের রঙ ওদের জাতের হিসাবে বেশ মাজাই, হাড়কাট মোটা, বুকটা একটু চিতোন।

এদিকে একটু যেন লাজুক। স্বরূপকে বলল—'দাদু, মা জিগ্যেস করতে বললে, ওনার চান-টান হয়ে গেচে? নৈলে ওনার বাসা থেকে কাপড়-গামছা, নেসব যেয়ে।'

আমি তাকেই বললাম—'না বাবা, আমি চান সেরেই এসেচি সকালে। তোমায় যেতে হবে না।'

ও চলে গেলে স্বরূপ বললে—'সুদাম। আমার নাতি। বড় ছেলের প্রথম ছেলে ইটি। ওপরে চারটি বুন।'

বললাম—'আপনার চেহারার আদল পেয়েচে যেন অনেকটা।'

একটু আত্মপ্রসাদের জন্য স্বরূপ বলল—'বলে তাই অনেকে, ছেলেবেলায় নাকি আমিও অনেকটা ঐরকমই ছেলুম। যারা দেখেচে তারা বলে। তবে তাদের আর আচেই বা ক'জন? আমিই শুধু মার্কণ্ডের পেরমাই নিয়ে বসে আচি। বলে, তবে আমাদের কালে এত আর্শি দেখবার ঘটা ছেল না তো; কি করে বলি কেমনটা ছেলুম? অনেকটা এই রকম ছেল বটে। তাহলে আর একটা কথা এইখেনে বলে রাখি না, আপনার মিলিয়ে বুঝতে সুবিধে হবে। য্যাখনকার কথা হচ্চে ত্যাখন আমি তো কতকটা এই রকম। নয় কি?'

বললাম—'হ্যাঁ, তাইতো হবে। হোল বেশ যোগাযোগটি ও এসে পড়ায়। সে বয়সের তোমার চেহারার একটা আন্দাজ পাওয়া গেল।

স্বরূপ বলল—'তা যোগাযোগের কথা যদি কইলেন তো আর একটা কথা শুনিয়ে রাখি। সুদোরও বিয়ে দিচ্চি এই সামনের অঘ্রাণে। আপনাকে কিন্তুক আসতে হবে।'

বললাম—'বহু দূরের পাল্লা। কথা দিতে পারছিনে স্বরূপ, তবে চেষ্টা করব। কিন্তু একটু সকাল-সকাল বিয়ে দিচ্চ নাকি?'

স্বরূপ মুখটা একটু হেঁট করে নিয়ে তখুনি আবার তুলে বলল—'তা হচ্চে একটু সকাল-সকাল বৈকি আজকালকার হিসেবে। না হলেই ছেল ভালো, তবে ঐ একটা সাদ নাকি দাঠাকুর—'নাৎ-বৌটার মুখ দেখে যাওয়া, আর তো হয়ে এল—ওপরের ঐ সে তো...'

আমি তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নেওয়ার জন্যে বললাম—'বলছিলুম, চেষ্টা তো করবই স্বরূপ, যদি না আসতে পারি, আশীর্বাদ করে যাচ্চি, আবার ওর ঠাকুরমার মতন একটিকে এনে সংসারে বসাক।'

একটু ভুল করেই বসলাম আবার। স্বরূপ এবার আরও বেশি করেই যেন ঘাড়টা নামিয়ে নিল। বলল—'হ্যাঁ, তাই বলুন, তাই বলুন—তাই বলুন দাঠাকুর—বামুনের মুখের কথা...'

এবার কি করে সামলাব ভাবচি, ও নিজেই চোখ দুটো কাপড়ের খুঁটে মুছে, বাতা-বাঁখারি তুলে নিয়ে বসল। একটু দেরি হোলই, তারপর একটু ডালাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার শুরু করল—

'তার পরদিন বিকেলে বেশ একটু সময় হাতে রেখে গেছলুম দাঠাকুর। আমার তো অবস্থা সঙ্গীনই—রাজার ছেলের সঙ্গে এক-দিনে বিয়ে—হয়তো একসঙ্গেই—আবার কি একটা রগোড়েরও কথা বললে দিদিমণি আঁকুপাঁকু করচি শোনবার জন্যে, পেট ফুলচে। পথ চেয়েই ছেল বলতে গেলে, যেতে মিটিনে যা-যা কথা হয়েছেল সব বললে। বলে এও বললে যে দামোদর চৌধুরীমশাই, যে নাকি ত্যাখন পর্য্যন্ত কোন কথাই জানত না, নিশ্চিন্তে ওদের ফাঁদের মধ্যে পা দিলে যাচ্ছেন। প্রেথমে পায়ের পাতা, তারপরে হাঁটু, তারপরে ঊরু পর্য্যন্ত সবটাই—তাকে আর না জানালে তো চলে না। জানালও যে তা একজনে নয়। সকালে যাখন চৌধুরীমশাই খানিকটে প্রকৃতিস্থির হয়ে জমিদারীর কাগজ-পত্তোর একটু দ্যাখে সেই সময় কাকাবাবুর খাস কামরায় লোক গিয়ে তানাকে ডেকে নিয়ে এল। আগেই সব রিহের্সাল দেওয়া ছেল, কাকাবাবুই অবিশ্যি সইয়ে সইয়ে বললে সব—গোড়ায় কুসমীর ওনাদের দমবাজী থেকে শেষ অবধি এনাদের যা সাব্যস্ত হয়েচে কালকের মিটিনে। বললে সব উনিই, তবে রইল এনারাও, ঘরের মধ্যে; জামাই-বাবু, রেজঠাকরুণ, বাইরে আমার বাবা আর রায়মশায়ের সেই খাস কামরার নফর দ্বিজপদ। যদি প্রেয়োজন হয় এঁরা দুজনেও বলবেন, ওনাদের দুজনকেও দোরের পাশ থেকে ভেতরে ডেকে নেওয়া হবে।

প্রয়োজন অবিশ্যি, দামোদর চোধুরো যদি নিজের গোঁ ধরে, এনারা যা বলচে বাতিল করে দেয়। কাকাবাবু যা বললে, তার মধ্যে একটু চাপা হুমকির ভাবও যে না ছেল এমন নয়। মসনে গেরামেরই মর্যাদার কথা তো, তাছাড়া সবার সঙ্গে সবার দূরের হোক, কাচের হোক, রক্তের হোক, পাতানো হোক একটা করে সম্বন্ধও রয়েছে একটু ইসারা দিয়ে গেল কাকাবাবু যে, অপমানটা একা দামোদর চৌধুরীরই নয়। টুঁ-শব্দটি না করে সবটুকু শুনে গেল চৌধুরীমশাই, শুধু বাবা বলে—আজ্ঞে, দরজার আড়াল থেকে নজর তো রেখেই যাচ্ছেল—বাবা বলে, মুখটা চৌধুরীমশায়ের রাঙা হতে হতে এইবার যেন রক্ত ফেটে বেরুবে। শেষ হলে কাকাবাবু সুদোলে 'কি রকম শুনলে? কিছু বললে না যে? চৌধুরীমশাই বললে—'আজ্ঞে, আপনারা যা ঠিক করেছেন সবাই মিলে, বিশেষ করে তার মধ্যে আপনি রয়েচেন, বলবার কি আর আচে?'

কাকাবাবু বললে, 'তা হলে রাজি তো, যেমন যেমন ঠিক করেচি?' না, 'ঐ তো বললুম, আপনি য্যাখন রয়েচেন এর মধ্যে।' উনি বললে—'তাহলে কিন্তু রাগের মাথায় এখন কিছু করতে যেও না। প্রেকাশ পেয়ে গেলে সব নষ্ট হয়ে যাবে!'

সায়েব-বাড়ির গদি আঁটা চেয়ারে বসে ছেল দামোদর চৌধুরীমশাই, হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে, দুহাতে কাকাবাবুর পা-দুটো চেপে ধরলে, বললে—'আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি গাল্লচি কাকা, বিয়ে শেষ না হয়ে যাওয়া পজ্জন্ত আমি দাঁতে-দাঁত চেপে থাকব, কিন্তু তারপর আর আমায় বাধা দেবেন না আপনি।'

কাকাবাবু ওনাকে তুলে বসিয়ে বললে—'তারপরে কুসমীকে নিয়ে তোমার হয়তো কিছু করবারই থাকবে না দামোদর। মসনেত ইজ্জত তোমার একার ইজ্জত নয়। বড্ড বাড়াবাড়ি লাগিয়েচে মিত্যুঞ্জয়ের ব্যাটা। পালক গজিয়েচে ওর!'

গলাটা যেন খন-খন করে উঠল কাকাবাবুর।

সবটা শেষ করে দিদিমণি বললে—'আবার বাধল একটা রে স্বরূপে। আমার বিয়ের পর মসনে যেন জুড়িয়ে গেছল। তবে সে ছেল একটা কেঁপন আর গেঁজেলকে নিয়ে, এবার একেবারে রাজায় রাজায়।

আজ তার জামাইবাবু নেই। হয়তো এই সব ধান্দাতে ঘুরে বেড়াচ্চে। আমি হুকুম চেয়ে রেখেচি, একবার চৌধুরী-মশায়ের বাড়ি যাব। আহা, চৌধুরীগিন্নীর শুধু পাগল হতে বাকি ছেল রে। অবিশ্যি মাসীমা এখেন থেকে গিয়ে সব বলেচেই, তবু একবার যাব। তুইও চল না, শিবনাথ তো রয়েচেই, তার সঙ্গেই ওদিক দিয়ে বাড়ি চলে যাবি। বোস তাহলে, আমি একটু ঠিকঠাক হয়ে নিই। তুই বরং পাল্কী ঠিক রাখতে বলে আয়, দেরি হবে না আমার।'

দিদিমণি চলে গেল। ওদিককার কথা তাহলে আগে সবটুকু শেষ করে নিই, তারপর আপনার তাঞ্জামের কথা এসে পড়চে দাঠাকুর।

পাল্কীর পাশে পাশে দিদিমণির সঙ্গে গিয়ে কয়েকবারই নজরে পড়ে গেল চৌধুরীমশাই। একরকম ওনাকেই দেখবার জন্যে আমার যাওয়া তো অবিশ্যি, আড়াল থেকেই উঁকি মেরে দেখা। একেবারে চুপ-চাপ, কাউকে ডেকে কোন কথা বলা নয়। গিয়েই বৈঠকখানার বারান্দায় সেই যে একটা আরামকেদারায় গড়গড়ার নলটি হাতে বসে থাকতে দেখেছিনু, সেইভাবে একঠায় বসে আচে, ভারি গালপাট্টা—সুদ্দু মুখটা থমথমে হয়ে রয়েচে। কেউ গিয়ে যে একটা কথা জিজ্ঞেস করবে তার ভরসা পাচ্চে না। শুধু বাবা গিয়ে মাঝে মাঝে গড়গড়ার ছিলিমটা পালটে দিয়ে আসচে; কোন কথা নয়! সমস্ত দেউড়িতে, মায় সেরেস্তা—তোষাখানা নিয়ে যেন কি হয় কি হয় ভাব; কোনখানে একটু টুঁ শব্দ নেই। একবার বাবাকে ডেকে নায়েবমশাই সুদোলে—কি ব্যাপার বল দিকিন শিবনাথ। দেখচি, রায়চৌধুরীদের দশ-আনী তরফ থেকে ঘুরে এসে ইস্তক কত্তার এই ভাব। হয়েচে কি? তুমি তো ছিলে।' বাবা বললে—'আমিই কি কিছু জানি? সেখেনে বৈঠকখানা থেকে বেইরে ইস্তক এই রকম যেন চাপা রাগে ফুলচে চৌধুরীমশাই। কোন প্রেকারে প্রাণটি হাতে করে ছিলিমটা পালটে দিয়ে চলে আসচি, একটা শেষ হতে না হতে।'

সন্ধ্যে পজ্জান্ত ঐরকম একভাবে বসে থেকে চৌধুরীমশাই ভেতরে নিজের ঘরে চলে গেল। এরপর য্যাখন ওনাকে দেখনু, খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় যেয়ে উঠেচে। এরপরই বাবার ডিউটি শেষ। এই সময় শেষ এক গেলাস চড়িয়ে নেয় চৌধুরীমশাই। বাবা একটা তেপাইয়ের ওপর সেটা তোয়ের রেখে গড়গড়াটা নীচে বসিয়ে সটকা হাতে তুলে দাঁইড়ো থাকে একটু, যদি কিছু হুকুম থাকে।

আর কারুর থাকা মানা সেখেনে। 'তবে আমি তো সব ঘাঁতঘোঁত জানতুম, জায়গা করেই নিতুম আড়াল-আবডাল দিয়ে। একটা সুবিধে, ওনার ঘরটা আবার চক-মেলানো ভেতর বাড়ি থেকে একটু প্রেথক ছেল।

বাবা সব ঠিকঠাক করে দিয়ে গেলাসটা হাতে তুলে দেবে, চৌধুরীমশাই বললে—'কাল তোর ছেলেটাকে একবার নিয়ে আসবি, দেখব তাকে।' বাবা বললে—'আজ্ঞে সে এসেচে এই খানিক আগে, তার মার কি একটা ব্যথা উঠেচে, তাড়াতাড়িতে ঠিক বুঝতে পারলুম না; ডাকতে এয়েচে।'

বললে—'ডাক তাকে।'

বাবা য্যাতক্ষণ বেইরে আসবে, আমি ত্যাতক্ষণ পা টিপে-টিপে ভেতরে বাড়ির সদর দরজায়। সঙ্গে করে নিয়ে গেল। পথে যে মুচ্ছো গেলুম না কেন তাই ভাবি এখন। বাবা নিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে বললে—'এই আপনার নফর, হুজুরে হাজির হয়েচে।'

আমায় বললে—'গড় কর।'

আমি হেঁট হয়ে জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে, পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিনু, উনি বললে 'থাক, হয়েচে। নাম কি তোর?'

বললু নাম। উনি আপাদ-মস্তক আমায় দেখে নিয়ে, 'হুঁ'—করে একটা শব্দ করে বাবাকে বললে—'যেতে বল।'

আমি যেয়ে আবার অন্ধকারের মধ্যে সেই জায়গাটিতে এসে দাঁড়ানু। দেখনু, বাবা গেলাসটি বাড়িয়ে ধরতে চৌধুরীমশাই হাত না বাড়িয়ে চোখ পাকিয়ে বাবার পানে চেয়ে বললে—'তা এত কান্ড হয়ে গেল, সে শালা ধনা আমার সমানে বাঁদর নাচিয়ে যাচ্ছে, তুই হারামজাদা জানিস, কিন্তু কৈ, বলিসনি তো একবারও? ভেবেছিস কি?'

—খুব গলা ছেড়ে না হলেও খানিকটে জোরেই ঘরটা গমগম করে উঠল। বাবা যেন তোয়েরই ছেল, বললে—'আজ্ঞে, বেশ পষ্টা-পষ্টই, পাশ থেকে তো শুনেচি, দেখেচিও কিছু কিছু। বললে—'বললেই তো বিল্দে-পত্তোর শুটিয়ে বিদেয় করে দিতে। তাখন সামলাতো কে এসে? সেবারেও বাঁচালে, এই হারামজাদাই সমলেচে, এবারেও সমলোতে সে-ই।'

আমি একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলাম—'বললে মুখের ওপর?'

স্বরূপে বললে—'খানিকটে মরিয়া হয়েই অবিশ্যি বললে। তবে বলত বৈকি কখনও কখনও হঠাৎ অসৈরণ হলে। চৌধুরী-মশায়ের বাবার চাকর, ছেলেবেলায় খেলিয়েচে, ঘুরিয়েচে। তাছাড়া সিদিনের যা ব্যাপার—পেছনে রয়েচেও তো সবাই; কাকাবাবু, বৌঠাকুরুণ, বয়েসে একটু ছোট হলেও, জামাইবাবু, ভরসা রয়েচে বাবার। আমি ভয়ে সিঁটকে রয়েচি, হয় বুঝি এক কান্ড রাত-দুপুরে কিন্তু না; গোখরোর ফোঁসের মাথায় রোজা যেন মন্তর পড়া ধুলো ছুঁড়ে মারলে দাঠাকুর। বাবা ধরেই ছেল গেলাসটা, নিয়ে একটা চুমুক দিয়ে শুধু বললে—'একার কিছু হলেটলে বলবি, লুকুবিনে।'

আজ্ঞে, একেবারে ঠান্ডা গলায়, আর সে মানুষই নয়। বাবা, সটকটাও বাড়িয়ে ধরেছিল, গেলাসটা শেষ করে ওনার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সটকটা নিয়ে বললে—'যা। চলে। এমন তো বলে চলে গেলেই তো পারতিস।'

কথা তো অনেক, কিন্তু দম ফুরিয়ে এসেছে। দেন দেখি একটু।'

(ক্রমশঃ)
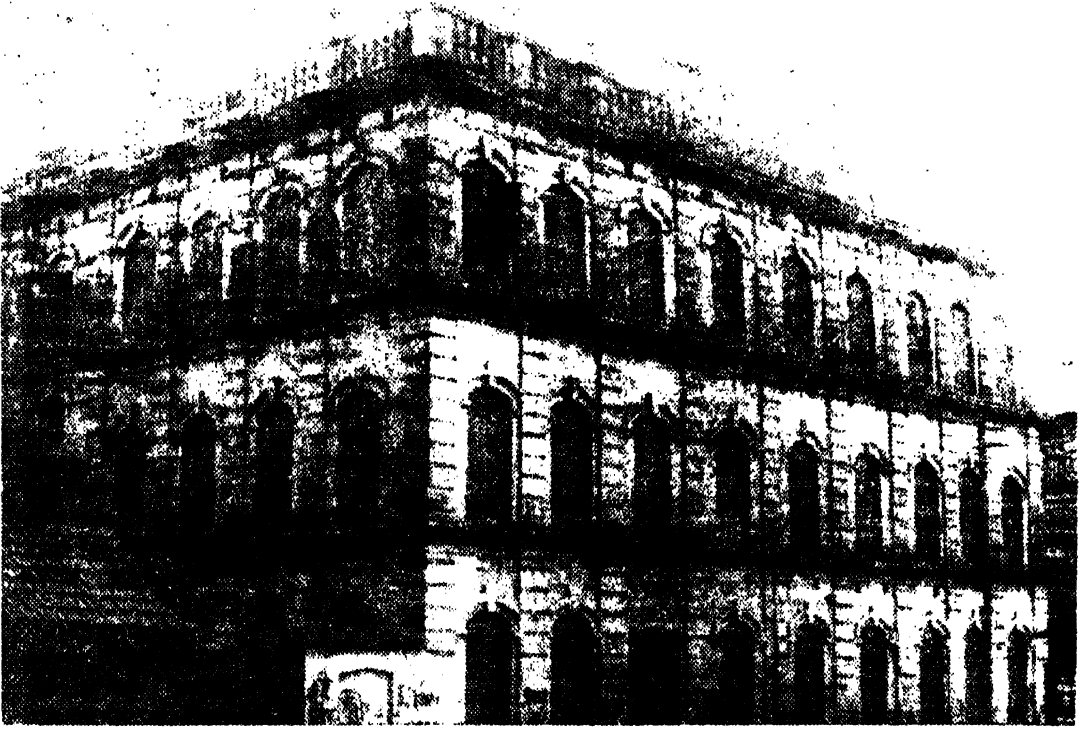
[illegible] হয় নি। কি একটা কাজে সেদিন দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলেছি। দুপুরের ফাঁকা ট্রাম। লেডিজ সীটের পেছনে লম্বা ফাঁকা সীটের কোণে জুৎসই করে বসে নিত্যসঙ্গী ফাইলটার ওপরের মলাট সরিয়ে সদ্যলেখা একটি স্কুলের ইতিবৃত্তে চোখ বুলোচ্ছিলাম। সবে ট্রাম তখন জগুবাবুর বাজার ছাড়িয়েছে। হঠাৎ কানে এল: আপনিই সন্দেশসু? মানুষগড়ার ইতিকথা লিখছেন? চমকে উঠলাম। কি ব্যাপার, ছেলেটি জানল কি করে? ও হরি! লেখার ওপরেই তো নিজের হাতে লেখা প্রায় আঠারো পয়েন্ট হেডিং—জানবার আর অসুবিধে কি? তাড়াতাড়ি ফাইলটা বন্ধ করে নড়েচড়ে উঠতেই আবার সবজান্তা তৃপ্তিময় মুখে প্রশ্ন করে বসল: আমাদের স্কুল নিয়ে লিখবেন না? লিখব, কিন্তু কোনটি তোমার স্কুল? আশ্বস্ত কিশোর এবার প্রশ্ন ছেড়ে সহজ অথচ গর্বিত সুরে বলল—মিত্র ইনস্টিটিউশন, ভবানীপুর।

মনে মনে অনেক ভেবেছি কেন শুধু স্কুলের নামোচ্চারণ করতে গিয়েই শ্যামবর্ণ কিশোরটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল? গর্বের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল? এ কি শুধু কোন বিশেষ স্কুলের প্রতি ভালোবাসা না সব কিশোরই সমানভাবে নিজের স্কুলকে যে ভালোবাসে তারই স্পষ্ট স্বীকৃতি? মনে তো হয় আমার প্রথম অনুমানই ঠিক। সামান্য অভিজ্ঞতায় দেখেছি সব স্কুলের সব ছাত্রের মুখ কিন্তু নিজ স্কুল প্রসঙ্গে সমানভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না। ভালো তো আমরা বাড়ির পোষা বিড়ালটাকেও বাসি আর যে স্কুলে শৈশব ও যৌবনের মাঝের সবচেয়ে সুন্দর বছরগুলি কাটে তাকে কি না ভালোবেসে পারা যায়? তবু যে স্কুলকে কেন্দ্র করে এত গর্ব, তার কারণ নিশ্চয়ই স্কুলের অতীত ইতিহাস—যে ইতিহাসের গর্ভে জন্মে ঘটমান বর্তমান, যা আহ্বান জানায় ভবিষ্যতের। সবাই ভালোবাসে শ্রদ্ধা করে সেই ইতিহাসকে। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সবাই। সচেতনভাবে অভিভাবকরা চান ঐ ইতিহাসেরই পংক্তিভুক্ত করতে তার সন্তানকে। তাই বাড়ির পাশের লাগোয়া স্কুলে ছেলেকে না দিয়ে অনেক দূরের নামী স্কুলে ছেলেকে পাঠান। কেন? ছেলে শৃঙ্খলাপরায়ণ হবে, ভাল রেজাল্ট করবে, ভাল চাকরী পেয়ে মানুষ হয়ে উঠবে। কিন্তু যারা কাদার তালগুলো ছেনেছেন, ছেঁচে করে, গোল পাকিয়ে প্রয়োজনীয় ছাঁচে ফেলে গড়ে তোলেন জ্যান্ত বিগ্রহ সেই নিত্য-অভাবী শিক্ষকগোষ্ঠীর কথা কজন মনে রাখেন? ছেলে পাশ করে বেরিয়ে গেলে অভিভাবক বড়জোর স্কুলের কথা মনে রাখেন। তাঁদের চোখে ভাসে হয়ত একটা বিশাল বিল্ডিং বা সবুজ ঘাসে ছাওয়া খেলার মাঠ। কিন্তু কারিগরদের কথা কি মনে পড়ে? হয়তো পড়ে হয়তো মনে পড়ে না। ছাত্ররা কিন্তু ভোলে না সেই মানুষগুলোর কথা। আমার বক্তব্য যে আদৌ মিথ্যে নয় তা মিত্র স্কুল দিয়েই যাচাই হয়ে যাবে। ত্রিশ, চল্লিশ, কি পঞ্চাশের যুগে যাঁরা পড়েছেন এই স্কুলে তাঁদের জিজ্ঞাসা করুন পিতামাতার পরেই কার বা কাদের কাছে তাঁদের ঋণ সবচেয়ে বেশী? দেখবেন নিশ্চয়ই নির্দ্বিধায় উত্তর আসছে—কেন? হরিদাসবাবু, মুকুন্দবাবু, জানকীবাবু, কেশববাবু, কালিদাসবাবু, পঞ্চাননবাবু, সতীশবাবু, হৃষিকেশবাবু, বীরেনবাবু, শচীনবাবু, প্রফুল্লবাবু।

আমি তো সাম্প্রতিক অতীত বা সামান্য দূরবর্তী অতীতের কথাই বললাম। তারো আগে যে অতীতের কথা আজ আমাদের কাছে ধূসর হয়ে এসেছে অথচ জীবিত অতি পুরাতন ছাত্রদের মনের পাতায় যা আজো সমুজ্জ্বল উজ্জ্বল সেই অসামান্য কৃতী ছাত্রগোষ্ঠীর কাছে প্রশ্ন

মিত্র ইনস্টিটিউশন (ব্রানচ)

রাখুন—কাদের কথা মনে আছে আপনাদের বলুন দেখি? ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য সুধীররঞ্জন দাস, বা সংসদ সদস্য খ্যাতনামা আইনজীবী নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা স্যার আশুতোষের ছেলে জাস্টিস রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেই যদি এই প্রশ্ন করা যায়? তাহলে জবাবে নিশ্চয়ই তাঁরা বলবেন তাঁদের প্রাক্তন হেড মাস্টারমশাই সতীশচন্দ্র বসু, শিক্ষক মণীন্দ্রকুমার রায়, সুরথনাথ মৈত্র, দুলালচন্দ্র সরকার, উপেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের কথা। আর কারো কথা নয়? আর কার কথা? কেন বিশ্বেশ্বর মিত্র। মিত্রমশাইকে ভুললে চলবে কি করে? মধ্য কলকাতার মিত্র, মেন ও ভবানীপুরের ব্রাঞ্চ দুটিরই যে প্রতিষ্ঠাতা তিনি। সে আজ কতকাল আগের কথা।

১৯০৪ সাল। দমদমের কে এক বিশ্বেশ্বর মিত্র বেনেটোলায় একটা স্কুল খুলেছেন। নিজে সেক্রেটারী, প্রেসিডেন্ট উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। সতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হেডমাস্টার। স্কুলটা খুলেছেন ১৮৯৮ সালে। তখন ছিল এটা-একটা পাঠশালা। গত ছ বছরে পাঠশালা নাকি রীতিমত একটা মডার্ন স্কুল হয়ে উঠেছে। তাই বিশ্বেশ্বর ও সতীশকুমার ইউনিভার্সিটির কাছে আবেদন জানিয়েছেন—আমাদের স্কুলটিকে হাইস্কুলের রেকগনিশন দেওয়া হোক। রেকগনিশন তো আর চাট্টিখানি কথা নয়, যে চাইলেই মিলবে। তার জন্য যথারীতি ইনস্পেকশন হওয়া দরকার যে স্কুলটি রেকগনিশন পাওয়ার উপযুক্ত কিনা? তাই ইনস্পেকশনে এলেন ইউনিভার্সিটির খোদকর্তা ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার আলেকজাণ্ডার পেডলার ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। স্কুল দেখে দুজনেই বেজায় খুশী। বিশেষ করে আশুতোষ। যখন তিনি শুনলেন বিশ্বেশ্বর তাঁর ছেলে নির্মলচন্দ্রের পড়াশোনা যাতে ভালভাবে হয় একমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই এই স্কুল তৈরী করেছেন তখন বিনীতভাবে মিত্রমশাইকে অনুরোধ জানালেন—আপনি তো নিজের ছেলের জন্য এমন সুন্দর স্কুল তৈরী করেছেন, আমার ছেলেদের জন্যও একটি গড়ে দিন। আশুতোষ থাকেন ভবানীপুরে, মিত্রমশায়ের স্কুল বেনেটোলায়। এখনকার মত সে যুগে এপাড়া-ওপাড়ায় যাতায়াতের এত সুবিধা ছিল না। বিশ্বেশ্বর সে কথা তুললেন। আরো বললেন—দেখুন আমার এই স্কুল এখনো ঠিকমত গড়ে ওঠেনি। এখুনি আবার আর একটি স্কুল গড়ে তোলার দায়িত্ব নেওয়া কি সম্ভব? সব অসম্ভবজয়ী আশুতোষ বললেন—পারলে, আপনিই পারবেন। আপনার হাতে আছে সোনারকাঠি। তার ছোঁয়ায় সবই সম্ভব হবে।

আর অনুরোধ ঠেলতে পারেন নি বিশ্বেশ্বর। শুধু একটি কথা তিনি আশুতোষের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিলেন—দেখবেন ভবানীপুরের সব নামী পরিবারের ছেলেরাই যেন এ স্কুলে পড়তে আসে। আশুতোষ এক কথার মানুষ, ইতিহাসই তার প্রমাণ। মিত্র ইনস্টিটিউশন, ব্রাঞ্চের যাত্রা শুরু হোল ৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫।

ভবানীপুরের কাঁসারীপাড়ায় একটা একতলা ভাড়াবাড়িতে দশ-বারোটি ছাত্র নিয়ে স্কুল শুরু হল। স্কুল চালানোর জন্য গঠিত হল একটি ম্যানেজিং কমিটি। কমিটির প্রেসিডেন্ট হলেন, স্বয়ং স্যার আশুতোষ। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ল' কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বিরাজমোহন মজুমদার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, শরৎচন্দ্র ঘোষ, হরিমোহন মুস্তাফি, মিত্র মেন-এর হেডমাস্টার সতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সেক্রেটারী বিশ্বেশ্বর মিত্র। অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারী স্কুলের হেডমাস্টার সতীশচন্দ্র বসু।

চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চির কোন বালাই ছিল না। মাদুর বা চাটাই বিছিয়ে ছেলেরা বসত। মাস্টারমশাইরা পড়াতেন। স্কুলের আর্থিক সামর্থ্য যাই হোক না কেন আশুতোষ বা বিশ্বেশ্বর স্কুলের ব্যাপারে কখনো কোন কার্পণ্য করেন নি। সেই পাঁচ সালে যখন মাত্র দশ-বারোটি ছেলে নিয়ে স্কুল শুরু হল তখনি প্রায় জনা পাঁচেক শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। শুরু থেকেই চড়া রেটে টিউশন ফি ধার্য হয়। মিত্র মেনের মত ব্রাঞ্চেও বিশ্বেশ্বর সেই পাঁচ-ছয় সালে উঁচু-নীচু সব ক্লাসেই ঢালাও চার টাকা বেতন ধার্য করেছিলেন। ফি যত চড়াই হোক না কেন, ছাত্রবেতনের টাকায় স্কুলের খরচ-খরচা মেটে না। ঘাটতি মেটাতেন আশুতোষ, বিশ্বেশ্বর ও ভবানীপুরের বনেদী বহু পরিবারের কর্তারা।

আশুতোষ, বিশ্বেশ্বর ঘাটতি মেটাবেন এটা তো স্বাভাবিক। তাই বলে অন্যেরা কেন? কারণটা খুবই স্পষ্ট—দক্ষিণে বিশেষ করে ভবানীপুর তল্লাটে যে তত্তদিনে চাউর হয়ে গেছে স্যার আশুতোষের স্কুলের কথা। বছর বছর ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে। সংখ্যাস্ফীতির ব্যাপারে ভবানীপুরের যে সব নামী পরিবারের সক্রিয় সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ঘোষ (স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ), মিত্র (স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র), মুখার্জী (স্যার আশুতোষ মুখার্জী), চক্রবর্তী (দ্বারিকানাথ চক্রবর্তী), চাটুজ্যে (ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়), মজুমদার (বিরাজমোহন মজুমদার), লাহিড়ী ও সেন ফ্যামিলী। ছেলেদের যখন পড়াতেই পাঠিয়েছেন তখন স্কুলের আপদে-বিপদে পাশে এসে দাঁড়াতে হবে বৈকি। এতো আর তৈরী স্কুল নয়। তারাই তো গড়ে তুলেছেন এই স্কুল।

মিত্র স্কুলের গোড়ার বছরগুলি এদেশের ইতিহাসে এক আশ্চর্য বিপ্লবী অধ্যায় নামে খ্যাত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ তখন হিন্দু-মুসলমানের মিলিত মিছিলের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে গাইছেন স্বদেশী সঙ্গীত। অতিবৃদ্ধ আনন্দমোহন বসু রোগশয্যার শায়িত অবস্থায় আসছেন জনসমুদ্রের অন্তরবেদনাকে মুখর করে তুলতে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ উঠেপড়ে লেগেছেন কার্জনের ফ্যাক্টকে আনসেটলড করবেন বলে। অরবিন্দ-বারীন্দ্রের যৌথ সাধনায় বাংলার ঘরে ঘরে তখন বিপ্লবের বীজ বপনের কাজ হয়েছে শুরু। দেশব্যাপী সেই অশান্ত ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে কাঁসারীপাড়ায় একতলা বাড়িতে সুধীরঞ্জন, নির্মলচন্দ্ররা তখন সতীশবাবু, মণীন্দ্রবাবু, হরিদাসবাবুদের মত শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগোষ্ঠীর পায়ের কাছে বসে জীবনগড়ার প্রাথমিক পাঠের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। দেখতে দেখতে এসে গেল ১৯১২ সাল। গোটা বাংলাকে ভাঙতে না পেরে চতুর ইংরেজ বাংলার গোটা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্যাটার্নের মূলে অঘাত হানল চোরাপথে—রাজধানী কলকাতা থেকে সরে গেল দিল্লীতে। ঠিক তার আগের বছর ১ সেপ্টেম্বর স্কুল পেল হাইস্কুলের স্থায়ী রেকগনিশন। সেই বছরই স্কুলের প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে বসল।

রেকগনিশন মিলেছে। স্কুলও বেড়েছে আয়তনে। কাঁসারীপাড়ার একতলায় আর জায়গা হয় না। বিশ্বেশ্বর সব জানালেন আশুতোষকে। এবার একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। সবার আগে দরকার একটা বড় বাড়ি। নিজস্ব হলে ভাল হয়। নিদেনপক্ষে বড়সড় একটা ভাড়াবাড়ি। নিজস্ব বাড়ি গড়ার সামর্থ্য তখন কোথায় স্কুলের। তাই আশুতোষ ভবানীপুরের বিখ্যাত সিভিল কন্ট্রাকটর মিত্রদের (না, এঁদের সঙ্গে বিশ্বেশ্বর মিত্রের কোন সম্পর্ক নেই) অনুরোধ জানালেন—স্কুলের জন্য একটা বড় বাড়ি বানিয়ে দিন। স্কুল মাসে মাসে ভাড়া দিয়ে যাবে।

সে এক আশ্চর্য যুগ। যখন ধনী-মানুষেরা এ জাতীয় অনুরোধ রাখতে জানতেন। উত্তর কলকাতায় শ্যামপুকুরে প্রায় এই সময়েই জোড়াবাগানের বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের চারুশীলা দেবী গুরুর (বালানন্দ ব্রহ্মচারী) নির্দেশে, টাউন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কালীপ্রসন্নর অনুরোধে বানিয়ে দিয়েছিলেন স্কুলের বর্তমান চারতলা বাড়িটি। স্যার আশুতোষের অনুরোধে ভবানীপুরের মিত্ররাও হরিশ পার্কের গায়ে বলরাম বসু ঘাট রোড ও হরিশ মুখার্জী রোডের ক্রসিংয়ে ১৬এ বলরাম বসু ঘাট রোডে বানিয়ে দিলেন তিনতলা বর্তমান বাড়িটি। ভাড়া ঠিক হল মাসে তিনশ টাকা।

এই সেই বিখ্যাত বাড়ী। যে বাড়ীর প্রতিটি ঘর, প্রতিটি চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ বহন করছে স্মরণীয় অতীতের স্বাক্ষর। ইংরাজী বর্ণমালার বিংশতিতম বর্ণটির সঙ্গে আকৃতিগত মিল এই বাড়ীটির। হেডমাস্টারমশায়ের ঘর, টিচার্স রুম ইত্যাদি বাদ

দিলে তিনটি তলা মিলিয়ে থানবোল ঘর আছে ক্লাসের উপযোগী। এই সব করেই গত পঞ্চাশ বছরে রচিত হয়েছে স্কুলের গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়ের ইতিহাস।

এই ইতিহাসের প্রাথমিক রচয়িতাদের শুধুমাত্র নামের তালিকা আগে পেশ করেছি। তাঁদের যত্ন ও সাধনার ফসল যখন ঘরে উঠতে লাগল তখন সারা শহরে ছড়িয়ে গেল স্কুলের সুনাম। আর নাম ছড়াবে নাই বা কেন? পাশের হার গড়ে ফি বছরই শতকরা নব্বইয়ের কোঠায় বাঁধা। আর স্কলারশিপ? ১৯১২ থেকে ১৯৩০ এই উনিশ বছরে মোট আটাশটি স্কলারশিপ জুটেছে স্কুলের ভাগ্যে। যাঁরা এই সময়ে স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সুধীরঞ্জন ও নির্মলচন্দ্রের কথা আগেই বলেছি। এ'দেরই সমসময়ে ও পরবর্তী যুগে স্কুলের ছাত্র ছিলেন আশুতোষের ছেলেরা—রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ ও উমাপ্রসাদ। আশুতোষের ছেলেদের মত ম্যানেজিং কমিটির অন্যতম সদস্য আশুতোষ পরবর্তী অধ্যায়ে স্কুলের প্রেসিডেন্ট বিরাজমোহনের দুই কৃতী পুত্র অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন মজুমদার ও বর্তমানে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর হীরেন্দ্রমোহন মজুমদার ছিলেন মিত্র ইনস্টিটিউশনেরই ছাত্র। বিগের যুগের স্কুলের অ্যাটেন্ডান্স রেজিস্টার ঘাঁটলে আরো দুটি নাম মিলবে—এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জী ও জেনারেল জয়ন্তনাথ

চৌধুরী (যদিও এঁরা অল্প কিছুদিন পড়েছেন এই স্কুলে)। এ সময়েরই অন্যতম খ্যাতিমান ছাত্র কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি হিমাংশুকুমার বসু। এই মিত্র স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য।

স্কুলের স্থায়ী আস্তানা, সুনাম—সবই দেখে গেছেন প্রতিষ্ঠাতারা। ১৯১৬ সালে মারা যান বিশ্বেশ্বর। আট বছর বাদে আশুতোষও নিলেন চিরবিদায়। বিশ্বেশ্বরের অবর্তমানে স্কুলের সেক্রেটারী হলেন তাঁরই ছেলে, পরবর্তীকালে মিত্র মেনের স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষক নির্মলচন্দ্র মিত্র। আশুতোষের জায়গায় প্রেসিডেন্ট হলেন বিরাজমোহন মজুমদার। সতীশবাবু তখনো স্কুলের হেডমাস্টার। শুরু থেকে একটানা প্রায় পঁচিশ বছর হেডমাস্টার হিসেবে তিনি এই স্কুলের সেবা করে গেছেন। যাঁদের সক্রিয় সহযোগিতায় একদিন এই স্কুল গড়ার মহান ব্রত পালনে এগিয়ে এসেছিলেন সেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলীর তালিকায় পরবর্তী সময়ে আরো বহু নাম যুক্ত হয়েছে। এসেছেন মুকুন্দপদ রায়, স্বনামধন্য অঙ্কবিদ কেশবচন্দ্র নাগ, প্রখ্যাত ভৌগোলিক কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী, খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত জানকীনাথ শাস্ত্রী, হর্ষনাথ রায়চৌধুরী, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ললিতমোহন ভট্টাচার্য, শ্রীশচন্দ্র সেন, স্মরজিৎ দত্ত, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, প্রখ্যাত ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রমুখ। দেবীপ্রসাদ পঁচিশ-ছাব্বিশ থেকে একত্রিশ-বত্রিশ সাল পর্যন্ত সাত বছর ছিলেন মিত্র স্কুলের ড্রয়িং টিচার।

এই যে বেঞ্চিটা দেখছেন এই বেঞ্চিতে ঠিক এই কোনটিতে একটানা প্রায় পঁচিশ বছর বসে গেছেন কবিশেখর। এইখানে বসতেন পঞ্চাননবাবু। শুনেছি দেবীপ্রসাদও বসতেন ঐ বেঞ্চিটায়। টেবিলের উপর থাকত তাঁর স্তূপীকৃত সিগারেট। মুহুর্মুহু খেতেন ও খাওয়াতেন সহকর্মীদের। ঘুরে ঘুরে স্কুলের মেন বিল্ডিংয়ের প্রতিটি ঘর, প্রতিটি অতীত ঐতিহ্যের স্মারকের সঙ্গে আমায় পরিচিত করাচ্ছিলেন স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী। আজ থেকে চৌত্রিশ বছর আগে ছাব্বিশ বছরের যে যুবক শিক্ষকতা বৃত্তি জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়ে এই স্কুলে প্রবেশ করেছিলেন আজ তাঁরই বয়স প্রায় ষাট—স্কুলের থেকে মোটে চার বছরের ছোট। গত চার যুগের ইতিহাস এঁর নখদর্পণে। আজ এঁরই ছাত্ররা বিচারালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের উচ্চতম পদে প্রতিষ্ঠিত। অথচ নিজের প্রাক্তন সিনিয়র সহকর্মীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রদ্ধায় যেন এই কর্মশিক্ষকের মাথা বারবার নত হয়ে আসছিল।

পঁয়ত্রিশ সালে প্রফুল্লবাবু মিত্র স্কুলে জয়েন করেন। তার বছর পাঁচেক আগে সতীশবাবুর জায়গায় হরিদাস বল হয়েছেন প্রধান শিক্ষক। ঠিক ঐ সময়েই বাড়িশা স্কুল ছেড়ে কবিশেখর কালিদাস রায় এসেছেন মিত্র স্কুলে। বিশ ও তিরিশের যুগে কালিদাসবাবুরই সমসময়ে আরো যে সব খ্যাতনামা শিক্ষক এই স্কুলে এসেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এ দুটি নাম—বাংলার নীতীন্দ্রনাথ রায়, অঙ্কের বীরেন্দ্রনাথ রায়। বিশ দশকের শেষ থেকে পঞ্চাশের শুরু পর্যন্ত সে গেছে এক আশ্চর্য যুগ। যখন ছেলেদের অঙ্ক শেখাতেন কেশব নাগ, বীরেন রায় ও বীরেন চক্রবর্তী। বাংলা পড়াতেন কবিশেখর ও নীতীনবাবু। সংস্কৃত পড়াচ্ছেন জানকীনাথ শাস্ত্রী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য ও শিবশঙ্কর শাস্ত্রী। মুকুন্দপদ রায় ও তারক চ্যাটার্জী পড়াতেন ইংরাজী। এই সব মহান শিক্ষকের মন্ত্রোচ্চারণে একদিন এই গৃহ যজ্ঞস্থলীর মত পূত ও পবিত্র হয়ে উঠেছিল। তাঁরা সবাই বসতেন ও এখনো তাঁদের কেউ কেউ বসছেন এই ঘরে—গড়গড় করে বলে চলেন প্রফুল্লবাবু। আর আমি হরিশ মুখার্জী রোডের উপর মিত্র স্কুলের মেন বিল্ডিংয়ের দোতলায় পশ্চিমমুখী এই ঘরটির মাঝে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি ঘরটার কোন বৈশিষ্ট্য আছে কিনা যে ঘরে আধুনিক বাংলাদেশের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগোষ্ঠী এক সময় বসতেন।

না, কোন বৈশিষ্ট্যই নেই। বিলাসের সামান্যতম উপকরণ একখানা ইজিচেয়ারও চোখে পড়েনি। চারধারে আলমারি বোঝাই বই। মাঝে দুটি টেবিল, খান সাতেক বেঞ্চি ও কয়েকটা চেয়ার, আসবাব বলতে তো এই। আর দক্ষিণের দেয়ালে প্রতিষ্ঠাতা আশুতোষ ও বিশ্বেশ্বরের পেন্টিং। তাঁদের ছবির তলায় একটি দেয়ালঘড়ি। বাস এই হল মিত্র স্কুলের টিচার্স রুম।

উঁহু, ঠিক হল না। একটা কথা বলা হয় নি। অতীতের মত আজো টিচার্স-রুমের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে স্কুলের ক্যাশ কাউন্টারে ছেলেদের মাইনে নেওয়া হয়। এই ক্লাসরুমের মত একফালি ঘরে, যার একটা অংশ জুড়ে স্কুলের ক্যাশ কাউন্টার, কত শত জটিল প্রশ্নের কুট তর্কজাল নিমেষে ছিন্নভিন্ন হয়েছে মনীষী শিক্ষকদের অসামান্য মেধা ও সতর্কতায়। এই ঘরেই রচিত হয়েছে স্কুলের নিত্য নব রূপায়ণের কত মহামূল্য নক্সা। যার ফলে আমরা পেয়েছি কলকাতা হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতি সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়, অনাথ গুপ্ত ও চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের মত কৃতী ছাত্রদের। পেয়েছি প্রেসিডেন্সী কলেজের অর্থনীতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক তাপস মজুমদার ও অর্থনীতিবিদ অর্জুন সেনগুপ্তকে। এইখানে এই স্কুলেরই ছাত্র সিদ্ধার্থশংকর রায়, বিজ্ঞানী ডঃ রণেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, কলকাতা ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের অধ্যাপক ডঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক উদয়শংকর গাঙ্গুলী। এঁদেরই ছাত্র আজ মৌলানা আজাদ কলেজের অধ্যক্ষ উমারঞ্জন বর্মন ও শিবপুর বি ই কলেজের হিউম্যানিটিজের অধ্যাপক ডঃ শোভনলাল মুখোপাধ্যায়। প্রখ্যাত গায়ক হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, সমরেশ রায়, রজেন্দ্রনাথ সেন ও অভিনেতা বিকাশ রায় মিত্র স্কুলেরই ছাত্র। অথচ মাঝশতকের পড়ন্ত বিকেলে দূরে পশ্চিমে আদি গঙ্গার অপর পারে অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান রশ্মিরেখার স্পর্শে প্রাণহীন চেয়ার, টেবিল বেঞ্চ শুধু মূক হয়ে রইল—জানে সবই, বলে না কিছুই।

আস্তে আস্তে সেই ঘর ছেড়ে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। তাকিয়ে দেখি স্কুলবাড়ির দু পাশের দুটি ডানার মাঝখানে সবটা জুড়ে উঠোন। উঠোনের এক পাশে জিমনাসিয়ামের অস্তিত্ব সগর্বে ঘোষণা করে দাঁড়িয়ে আছে একটা প্যারালাল বার। প্রফুল্লবাবু ঘোরানো বারান্দা দিয়ে আমায় নিয়ে চললেন স্কুলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। সেই সঙ্গে পুরানো ইতিবৃত্ত কথন চলল কখনো ধীর লয়ে কখনো ঝড়ের বেগে। হরিদাসবাবু প্রায় দেড় যুগ ছিলেন এই স্কুলের হেডমাস্টার। এই দেড় যুগে মিত্র স্কুলের আটত্রিশটি ছেলে পেয়েছে স্কলারশিপ। এক পঁয়ত্রিশ সালেই ম্যাট্রিকে ফার্স্ট, সেকেণ্ড, থার্ড ও নাইনথ প্লেস দখল করেছে মিত্রের ছাত্ররা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার মুখোমুখি হরিদাসবাবুর জায়গায় হেডমাস্টার হলেন মুকুন্দবাবু। মুকুন্দপদ রায় প্রায় আট বছর ছিলেন মিত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এই আট বছরে স্কুল মোট আঠাশটি স্কলারশিপ পেয়েছে। এর মধ্যে স্ট্যাণ্ড করেছে অনেকেই। আটচল্লিশ সালে এঁদেরই ছাত্র উদয়শংকর গাঙ্গুলী ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছিলেন।

তিপ্পান্ন সালে রিটায়ার করলেন মুকুন্দবাবু। তাঁর শূন্যআসন পূর্ণ করলেন কেশবচন্দ্র নাগ। কেশববাবুর আমলেই ১৯৫৮ সালে হাইস্কুল রূপান্তরিত হল উচ্চতর মাধ্যমিকে। গোড়ায় সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজ দুটি স্ট্রীম নিয়ে চালু হয় হায়ার সেকেণ্ডারী। একষট্টিতে খোলা হল কমার্স সেকশন। উচ্চতর মাধ্যমিকের প্রয়োজনেই সাতান্ন-আটান্ন সালে মেন বিল্ডিংয়ের উত্তরে হরিশ পার্কের পেছনে উঠেছে নিজস্ব চারতলা বিল্ডিং। ১২ কেদার বোস লেনের এই নতুন বিল্ডিংয়ের তেরো কাঠা জায়গা বহুদিন ধরে ভবানীপুর ব্যাঙ্কের কাছে বাঁধা পড়ে ছিল। স্কুল ব্যাঙ্কের কাছ থেকে জায়গাটুকু কিনে নিয়ে সেখানেই তুলেছে নিজস্ব আস্তানা। নতুন বিল্ডিংয়ে বসে হায়ার সেকেণ্ডারীর ক্লাস। মেন বিল্ডিংয়ে বসে ক্লাস ফাইভ টু এইটের ক্লাস। মেন বিল্ডিংয়ের জন্য আজো স্কুল ভাড়া গুনে চলেছে। আটান্ন বছরে যেখানে প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে স্কুলের এই বসতভিটের ভাড়া কিন্তু মিত্ররা দ্বিগুণের বেশী বাড়ান নি।

একটু থামলেন প্রফুল্লবাবু। মেন বিল্ডিংয়ের দোতলা-বারান্দার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দাঁড়িয়ে বললেন, ঐ আমাদের নিউ বিল্ডিং। তাকিয়ে দেখি কালো চশমার লেন্স দুটি ছাড়িয়ে নতুন বিল্ডিংয়ের শীর্ষদেশ ছুঁয়ে অনেক অনেক দূরে চলে গেছে প্রবীণ শিক্ষকের চোখদুটি। ঐ বিল্ডিংয়ে ক্লাস নেওয়া শুরু হয়েছে ঊনষাট্টি সালে। তার পরের বছর কেশববাবু রিটায়ার করলেন দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর শিক্ষকতা করার পর। প্রায় বছর আটেক কেশববাবু ছিলেন মিত্র স্কুলের হেডমাস্টার। এই আট বছরে শুধু ফার্স্ট ও সেকেন্ড গ্রেড স্কলারসিপ পেয়েছে বাইশজন; নজন করেছে স্ট্যান্ড। হরিদাসবাবু থেকে কেশববাবু, মাঝের তিরিশটি বছরে গড়ে শতকরা নব্বইটি ছেলে পাস করেছে ম্যাট্রিকে ও স্কুল ফাইনালে। অ্যাভারেজের দিক থেকে বর্তমানের রেজাল্ট কিন্তু অতীতের উজ্জ্বল রেকর্ডকেও ম্লান করে দিয়েছে। হায়ার সেকেন্ডারীর গত ন বছরে (১৯৬১ থেকে ১৯৬৯) গড়ে শতকরা পঁচানব্বইয়েরও বেশী পরীক্ষার্থী-ছাত্র পাশ করেছে মিত্র স্কুলের। মনে রাখা দরকার তিনটি স্ট্রীম মিলিয়ে ফি বছরই সোয়াশোরও বেশী ছাত্র সেন্ট আপ হয়। সাতষট্টিতে সায়েন্স ও কমার্স দুটি শাখাতেই ফার্স্ট হয়েছিল এই স্কুলেরই ছাত্র। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সমানভাবেই এই স্কুল উজ্জ্বল ফলাফলের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে। কেশববাবুর রিটায়ারমেন্টের পরও এর কোন অন্যথা হয় নি।

আর হয় নি বলেই প্রফুল্লবাবু হিমসিম খাচ্ছেন ছাত্রভর্তির অনুরোধ ঠেকাতে। গ্র্যান্ট-ইন-এডের আওতায় পড়েছে বলে স্কুলের আজ হাজার ছাত্রের অধিক অ্যাডমিশন দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তবু কি গার্জেনরা শোনেন। সবাই চান ভাল স্কুলে ছেলেকে পড়াতে। তাই দক্ষিণের প্রায় সব পাড়া থেকেই অভিভাবকরা ছোটেন মিত্র স্কুলে—কিন্তু কজনের অনুরোধ রাখবেন প্রফুল্লবাবু। সাউথের অন্যান্য অনেক স্কুলের তুলনায় বেতন হার চড়া (ক্লাস ফাইভ টু এইট বারো টাকা ও নাইন টু ইলেভেন ফ্ল্যাট রেটে তেরো টাকা) হওয়া সত্ত্বেও আজ প্রায় সাড়ে নশো ছাত্র পড়ছে এই স্কুলে। তবু স্কুল সরকারী সাহায্য না নিয়ে পারে নি। কারণ তেতাল্লিশজন শিক্ষককে এইডেড স্কীম অনুযায়ী বেতন দেওয়ার ক্ষমতা নেই স্কুলের। তাই এই বছর থেকে স্কুল ঘাটতি-ভিত্তিক সরকারী অনুদান নিতে শুরু করেছে।

সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রচেষ্টায় দুটি মানুষের ইচ্ছায় আজ থেকে চৌষট্টি বছর আগে কাঁসারীপাড়ার একটি একতলা বাড়িতে যে স্কুল জন্মলাভ করেছিল, আজ তাই হয়ে উঠেছে এদেশের অন্যতম সেরা স্কুল। কাঁসারীপাড়ার আস্তানা কবে কোন দিন ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের রোড রোলারের তলায় গুঁড়িয়ে গেছে, কে তার হদিস রাখে। তার জায়গায় প্রায় হাজার ছাত্র ও শিক্ষকের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু-দুটো বিশাল বাড়ি। স্কুল আজ আর্থিক দিক থেকেও নিরাপদ। তাই বলে কি সব প্রয়োজন মিটেছে? অন্তত প্রফুল্লবাবু নিশ্চয়ই তা বলবেন না। কারণ তাঁর ছেলেদের খেলার উপযোগী কোন মাঠ নেই। এই মাঠের অভাব কি মেন বিল্ডিংয়ের ছোট্ট ফালি উঠোনটুকু ও পাশের ন্যাড়া বেঞ্চি-কুঞ্জকন্টকিত হরিশ পার্কে সম্ভব? যা নেই, যা এখুনি করা সম্ভব নয় সে বিষয়ে আক্ষেপ করে লাভ কি? কিন্তু এখুনি যে সমস্যাটি মিটিয়ে ফেলা যায়, সামান্য ইচ্ছা থাকলে, সে বিষয়ে মিত্র স্কুলের আবেদন আমি পৌঁছে দিতে চাই কর্পোরেশনের কাছে — দয়া করে এই স্কুলটিকে আপনারা অশুচি মুক্ত করুন। গোটা ভবানীপুরে কি আর জায়গা নেই যে, কর্পোরেশনের ল্যাট্রিন মিত্র স্কুলের নিউ বিল্ডিংয়ে ঢুকবার পথেই রাখতে হবে? স্কুলের তরফ থেকে কতবার কত আবেদন গেছে কর্পোরেশনের কাছে। কেশববাবু, প্রফুল্লবাবুদের আবেদনের কি কোন দামই নেই? এতকথা বলতাম না যদি নিজের চোখে না দেখতাম ছেলেদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কত ক্ষতিকর এই ব্যবস্থা। বাংলা দেশের শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং যে স্কুলটিকে এদেশের অন্যতম অগ্রণী বিদ্যালয় বলে মনে করেন, আশা করব তার স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব পালনে কর্পোরেশন সচেষ্ট হবেন। কারণ এই স্কুলেই পড়ছে আপনার আমার ঘরের ছেলেরা। এই স্কুল গড়েছেন আশুতোষ ও বিশ্বেশ্বর। গত চৌষট্টি বছরে শত-শত কৃতী ছাত্র উপহার দিয়েছে এই স্কুল। তার প্রতি নিশ্চয়ই আমাদের সকলেরই কিছু কর্তব্য থাকা উচিত।
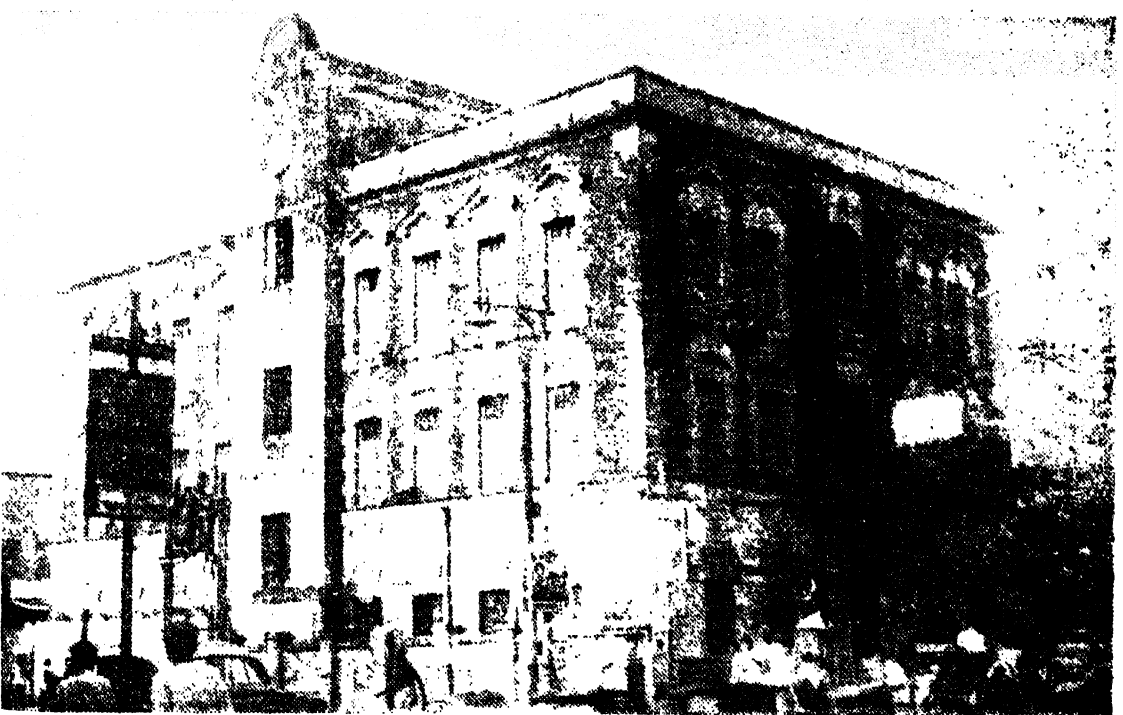
—দীপেন্দু

পরের সংখ্যায়: গোসাবা আর আর আই ভাইস্কুল।

টাউন স্কুল

নক্ষত্র-নিলীন অন্ধকার ॥

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

নৈঃশব্দ্যে তুমি তো বন্ধ্যা, নৈঃশব্দ্যে তুমি তো ক্ষমাহীন,
তবে, আমি প্রতিটি নবীন
বৃক্ষের পল্লব ছুঁই ; প্রতিটি লতায় প্রসারণ,
আবর্তন করি নিরীক্ষণ।

শব্দে যারা উচ্চারিত, শব্দে যারা সমুদ্রগামিনী
রক্তের উচ্ছ্বাসে আমি চিনি—
নৈঃশব্দ্যে গভীর মৌনে ভয়াবহ প্রতিমা তোমার—
নক্ষত্র-নিলীন অন্ধকার।

শান্ত বলয়ের বুকে প্রতিহত তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে
প্রসারিত আমি বৃক্ষে, ঘাসে।
বুক-ভরা অন্ধকার ঢালো তুমি অথৈ পাথার,
তবু সেথা সান্ত্বনা আমার।

প্রতি পর্বে যে উদ্ভাস, প্রতি লগ্নে স্পন্দিত নীলিমা,
আভাসিত তোমার মহিমা।
জীবন তো করধৃত আমলক, মৃত্যুর তটিনী,
নৈঃশব্দ্যে তোমাকে আমি চিনি।

শূন্য উদ্যানের মতো ॥

জয়শ্রী চক্রবর্তী

জীবনটা কি ওই ফুলদানীর
বাসি ফুলের মত
সৌরভহীন বন্ধ্যা ?
কবে কোন দিন, হয়তো বা এসেছিল
ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যানের মত
মূল্যবান কয়েকটি সন্ধ্যা !

হয়তো বা মনে হবে—
সে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা নয়।
মিশর পিরামিডের হাজার বছর
স্বপ্নের আরকে ভেজানো
'মমির' মত এই মন।
রাতের স্বপ্নে ওরা, সোনার পাখী
নীল পাখনায় ওড়া আকাশের বাঁশী

তারপর,
এই শীতকালের ঘুম ভাঙা সকালে
জীবনটা নিতান্ত বাসি
ফুলদানীর ওই শুকনো ফুলের মত।

নিমাই ভট্টাচার্য

(নয়)

মেয়েদের বিয়ে ঠিক হবার পর আইবুড়ো ভাত খাওয়ান হয় আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু ও প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে। ইংরেজীতে যাকে বলে ফেয়ার ওয়েল ডিনার আর কি। ডিপ্লোম্যাটদের আগমন ও নির্গমন উপলক্ষে অনেকটা আইবুড়ো ভাত অর্থাৎ নেমন্তন্ন খাওয়াবার প্রথা আছে। সহকর্মী ছাড়াও অন্যান্য মিশনের বন্ধুদের বাড়ীতে খেতে হয় ও খাওয়াতে হয়। সমস্ত দেশের ফরেন সার্ভিসেই এই প্রথা। ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসও কোন ব্যতিক্রম নয়। সিনিয়র, জুনিয়র—কোন লেভেলেই নয়।

আমাদের দেশের আই-এ-এস বা আই-পি-এস অফিসারদের মধ্যে এসব সৌজন্যের বালাই নেই। ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টরা বদলী হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ও'দের সহকর্মীরা খুশী হন। সুতরাং ফেয়ার ওয়েল ডিনারের প্রশ্ন নেই। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বিতাড়িত বা পদত্যাগী মন্ত্রীকে বা কলকাতার বিদায়ী পুলিশ কমিশনারকে কেউ ভালবেসে ফেয়ার ওয়েল ডিনার খাইয়েছেন বলে আজও শোনা যায়নি। আর যত ত্রুটি-বিচ্যুতিই থাক, ফরেন সার্ভিসে এই সৌজন্যের দৈন্য নেই। অ্যাম্বাসেডরকে রি-কল বা তাঁর চাকরির মেয়াদ শেষ হলেও সৌজন্যমূলক ফেয়ারওয়েল ডিনারের ব্যবস্থা হয়।

শ'ছয়েক টাকায় যাঁরা ফরেন সার্ভিসে নতুন জীবন শুরু করেন, প্রথম ফরেন পোস্টিং-এর সময় তো ফেয়ারওয়েল ডিনারের ঠেলায় তাঁদের প্রাণান্তকর অবস্থা হয়। কৈ বাত নেই! তবুও নিদেন পক্ষে শত খানেক নেমন্তন্ন খেতে হয়, খাওয়াতে হয়। ছ'মাসের মাইনে অ্যাডভান্স নিয়েও তাল সামলান যায় না। হাই স্ট্যাণ্ডার্ড ও এইসব সৌজন্য রক্ষা করতে অনেক তরুণ আই-এফ-এস'কেই দেনায় ডুবে থাকতে হয়। পরে অবশ্য ক্যামেরা-বাইনোকুলার ট্রান-জিস্টার-টেপ রেকর্ডার বিক্রী করে অবস্থা বেশ পাল্টে যায়।

নিউইয়র্ক ত্যাগের আগে তরুণকেও ফেয়ারওয়েল ডিনার খেতে হলো, খাওয়াতে হলো। আসা-যাওয়ার নিত্য খেলাঘর হচ্ছে ডিপ্লোম্যাটিক মিশনের চাকরি। এখানে যেন কিছুই নিত্য নয়, সবই অনিত্য। তবুও মানুষ তো। তরুণের মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। একটু কষ্ট করেই মুখে হাসি ফুটিয়ে সবার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করে প্লেনে চড়ল।

প্লেনটা আকাশে উড়তেই তরুণের মন ভাসতে ভাসতে মুহূর্তের মধ্যে চলে গেল লণ্ডনে। মনে পড়ল বন্দনার কথা, বিকাশের কথা।

ইচ্ছা ছিল নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বন্দনার বিয়ে দেবে। হয়নি। ইউনাইটেড নেশনস'এ তখন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ছুটি নেওয়া অসম্ভব ছিল। তবুও তরুণের অমতে কিছুই হয়নি। বন্দনা চিঠি লিখেছিল, দাদা, খবরের কাগজ দেখেই বুঝতে পারছি কি নিদারুণ ব্যস্ততার মধ্যে তোমার দিন কাটছে। সারা রাত্রি কিভাবে তোমরা মিটিং কর, কনফারেন্স কর, আমি ভেবে পাই না। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তুমি ভুলতে পার না আমার কথা। তোমার চিঠিতে দু-তিন রকমের বল-পেন ও কালি দেখেই বুঝি একসঙ্গে একটা চিঠি লেখারও সময় তোমার নেই।...তোমার কথা মত এবার নিশ্চয়ই আমি বিয়ে করব। তবে টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করার জন্য বা কলাতলায় হলুদ মাখার জন্য কয়েক হাজার টাকা ব্যয় করে কলকাতা যাওয়া কি সম্ভব? নাকি উচিত?

পরের চিঠিতে বন্দনা লিখল, বিকাশকে তো তুমি ভালভাবেই চেন, জান। আমাদের হাই কমিশনেই তো কাজ করে। সুতরাং তোমাকে আর কি বলব! সারাদিন অফিস করে রিজেন্ট স্ট্রীট পলিটেকনিকে অ্যাকাউন্টেন্সী পড়ে বেশ ভালভাবে পাশ করেছে। মনে হয় এবার একটা ভাল চাকরি পাবে।

বন্দনা জানত সব কথা খুলে না লিখলে দাদার অনুমতি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই চিঠির শেষে লিখেছিল, ভগবানের নামে শপথ করে বলতে পারি লুকিয়ে-চুরিয়ে ভালবাসার খেলা আমরা খেলিনি। যে অধিকার পাবার নয়, সে অধিকার ও চাইনি, আমিও নিইনি। তবে মনে হয় আমার মত দুঃখী মেয়েকে ও প্রাণ দিয়ে সুখী করতে চেষ্টা করবে।

ওসব কথা ভাবতে ভাবতে আপন মনেই হেসে উঠল তরুণ। প্লেনের জানলা দিয়ে একবার নীচের দিকে তাকাল, দেখতে পেল না সীমাহারা অ্যাটলান্টিক। কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেল বন্দনা আর বিকাশকে। রান্না-বান্না শেষ করে সাজা-গোজা হয়ে গেছে। সিঁথিতে, কপালে টকটকে লাল সিন্দুর পরাও হয়ে গেছে। বিকাশকে বকাবকি করছে, তোমার নড়তে-চড়তে বছর কাবার হবার উপক্রম। গিয়ে দেখব দাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে...।

বিকাশ মজা করার জন্য বলছে, তোমার দাদা হলে কি হয়! আমার তো শালা। অত খাতির করার কি আছে?

বন্দনা নিশ্চয়ই চুপ করে সহ্য করছে না।...ভুলে যেও না দাদার জন্যই আমাকে পেয়েছ। আর যত মাতব্বরী তো আমার সামনে। দাদাকে দেখলে তো ব্যস!

মহাকাশের কোলে ভাসতে ভাসতে কত কথাই মনে পড়ে।

নিউইয়র্ক থেকে বার্লিনে যাবার পথে সরকারীভাবে তিন দিন লণ্ডনে স্টপ-ওভার করা যাবে। শপিং-এর জন্য। বিচিত্র ভারত সরকারের নিয়মাবলী! ইংরেজ চলে গেছে। লাল কেল্লায় তেরঙ্গা উড়ছে কিন্তু লণ্ডন আজও স্বর্গ! দিল্লী থেকে আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, ঘানা যেতে হলেও ভায়া লণ্ডন! শপিং-এর জন্য লণ্ডনে স্টপ-ওভারের কথা ভাবলে অনেকেই হাসবেন। বণ্ড স্ট্রীট—অক্সফোর্ড স্ট্রীটে কিছু রেডি-মেড জামা-কাপড় ছাড়া লণ্ডনে আর কিছু কেনার নেই। আই-সি-এসদের পলিটিক্যাল বাইবেলে বোধকরি লণ্ডন ছাড়া আর কোন জায়গার উল্লেখ নেই।

লণ্ডনে শপিং করার মতলব নেই তরুণের। তিন দিন ছুটি নিয়ে লণ্ডনে ছ'দিন কাটাবে বলে ঠিক করেছে। বন্দনা-বিকাশদের সঙ্গে কদিন কাটাবার পর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে একটু দেখা-সাক্ষাৎ করবে। বন্ধু-বান্ধবদের জানিয়েছে, লণ্ডন হয়ে বার্লিন যাচ্ছে; জানায়নি করে লণ্ডন পৌঁছচ্ছে। বন্দনাকেই শুধু একটা কেবল পাঠিয়েছে, রিচিং লণ্ডন এ-আই ফ্লাইট ফাইভ-জিরো-ওয়ান ফ্রাইডে।

এয়ার ইণ্ডিয়ার বোয়িং প্রায় বিদ্যুত-গতিতে ছুটে চলেছে লণ্ডনের দিকে। তবুও যেন তরুণের আর ধৈর্য ধরে না। ধৈর্যের সঙ্গে বোয়িং-এর প্রতিযোগিতা চলতে চলতেই হঠাৎ কানে এলো, মে আই হ্যাভ ইওর অ্যাটেনশন প্লীস! উই উইল বী ল্যাণ্ডিং অ্যাট লণ্ডন হিথরো এয়ার-পোর্ট ইন এ ফিউ মিনিটস ফ্রম নাউ। ক্লাইণ্ডলি ফ্যাসেন ইওর সীট বেল্ট অ্যাণ্ড...!

প্লেন থেকে বেরিয়ে টার্মিনাল বিল্ডিং'এ ঢুকতে গিয়েই উপরের দিকে ভিজিটার্স গ্যালারী না দেখে পারল না তরুণ। হ্যাঁ,

ঠিক যা আশা করেছিল। বন্দনা আর বিকাশ আনন্দে উচ্ছ্বাসে হাত নাড়ছিল। পরম পরিতৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল ওদের দুজনের সারা মুখে।

বেশ লাগল তরুণের। মনটা যেন মুহূর্তের জন্য উড়ে গেল। কাছের মানুষের ভালবাসা পাওয়া সম্ভব হলো না জীবনে। রিক্ত নিঃস্ব হয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিল। ইন্দ্রাণী-বিহীন জীবনে কোনদিন মুহূর্তের জন্য শান্তি পাবে, ভাবতে পারেনি। ইন্দ্রাণীর ব্যথা আজও আছে, একই রকম আছে। বুড়ী গঙ্গার পাড়ে যাকে নিয়ে প্রথম যৌবনের দিনগুলিতে জীবন-সূর্যের ইঙ্গিত দেখেছিল, আজও তাকে নিয়েই ভবিষ্যত জীবনের স্বপ্ন দেখে। জীবনের এত বড় ট্রাজেডীর মধ্যেও তৃপ্তি আছে, আনন্দ আছে তরুণের জীবনে। আছে বন্দনা, আরো কত কে!

প্রথম দুটো দিন হোবর্ণের ওদের ফ্ল্যাটের বাইরেই বেরুতে পারল না তরুণ। অতবার বলল, চলো বেড়িয়ে আসি। মার্বেল আর্চের পাশে বসে একটু গল্প-গুজব করে পিকাডিলীতে খাওয়া-দাওয়া করি।

বন্দনা বলল, মার্বেল আর্চ আর লণ্ডন স্ট্রীট দেখে কি হবে বল? তাছাড়া বাইরে যাবে কেন? আমার রান্না কি তোমার ভাল লাগছে না?

এ কথার কি জবাব দেবে তরুণ। কিছু বলে না। শুধু মুখ টিপে টিপে হাসে।

বিকাশ দুদিন অফিসে যায়নি। অফিসে এখন ভীষণ কাজের চাপ। তাই আর ছুটি পায়নি। বন্দনা তো দশ দিনের ছুটি নিয়ে বসে আছে।

সেদিন দুপুরে লাঞ্চের পর তরুণ আর বন্দনা গল্প করছিল। আমেরিকার কথা, ইউনাইটেড নেশনস'এর কথা। কখনও আবার ব্যক্তিগত, পারিবারিক। সাধারণ, মামুলী কথাবার্তা বলতে বলতে হঠাৎ বন্দনা উত্তেজিত হয়ে বলল, আচ্ছা দাদা, তুমি মনসুর আলি বলে কাউকে চেন?

তরুণ একটু চিন্তিত হয়ে জানতে চাইল, কোন মনসুর আলি?

'উনি বললেন, তুমি নাকি ঢাকাতে ওদেরই বাড়ীর কাছে...।

এবার তরুণ নিজেই চঞ্চল হয়ে উঠল। জানতে চাইল, চোখ দুটো কটা-কটা

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

খুব হাসাতে পারে?

ঠিক ধরেছ।

আর শুয়ে থাকতে পারে না এবার উঠে বসে। 'কোথায় দেখা হলো হতচ্ছাড়ার সঙ্গে?'

বন্দনা বড় খুশী হলো। একটু যেন আশার আলো দেখল। তরুণ কোনদিন তাকে ইন্দ্রাণীর কথা বলেনি। বলবার সম্পর্ক নয়। তাছাড়া তরুণ জানে নিজের মান, মর্যাদা, সম্ভ্রম রক্ষা করে অপরের সঙ্গে মিশতে। প্রত্যক্ষভাবে কিছু না শুনলেও বন্দনা অনুমান করতে পেরেছিল। তাছাড়া ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে বুঝতে পেরেছিল তরুণ এই দুনিয়ায় ঐ এক-জনকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। মনসুর আলির সঙ্গে আলাপ করার পর আরো অনেক কিছু জানতে পারল।

তরুণের কথায় বন্দনাও তাই একটু চঞ্চল না হয়ে পারে না। বলল, এবার আমাদের নববর্ষের ফাংশানে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। কথায় কথায় তোমার কথা উঠল।

"হতচ্ছাড়া হঠাৎ আমার কথা জিজ্ঞাসা করল?'

'আমাদের পাশেই মিঃ সরকার বলে ঢাকার এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। মিঃ আলি ওকে তোমার নাম করে বলছিলেন যে তোমরা নাকি একই পাড়ায় থাকতে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। শুধু এক পাড়ায় নয়, একই স্কুলে একই সঙ্গে পড়তাম।'

'তাই নাকি?'

'তবে কি? ওকে তো আমরা কোনদিন মনসুর আলি বলতাম না।'

'তবে?'

'বলতাম মুসুর। ভারী মজার ছেলে। ওকে মুসুর বললেই ও বলতো, কি বলছ বশুর?'

হঠাৎ হাসিতে তরুণের সারা মুখটা ভরে উঠল। জানলা দিয়ে দৃষ্টিটা লণ্ডনের খোলাটে আকাশের কোলে নিয়ে গেল কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পেল সেই ফেলে আসা অতীতের দিনগুলো।

পেটুক মনসুরকে নিয়ে কি মজাটাই না ওরা করত! তবে হ্যাঁ, যে কাজ আর কোন ছেলেকে দিয়ে করানো সম্ভব হতো না, মনসুর হাসতে হাসতে সে কাজ করে দিতে পারত। তরুণের মা তাই তো মনসুরকে খুব ভালবাসতেন। রমনার বিলাস উকিলের মেয়ের বিয়ের সময় মনসুর না থাকলে কি কাণ্ডটাই হতো। শেষ রাত্তিরে লগ্ন। বিলাসবাবুর সঙ্গে কি তর্কাতর্কি হওয়ায় নাপিত চলে গেল। লগ্ন বয়ে যায় অথচ নাপিতের পাত্তা নেই। হঠাৎ মনসুর ঐ নাপিতেরই ষোল-সতের বছরের ছেলেকে হাজির করে মহা অপমানের হাত

থেকে রক্ষা করল সবাইকে। সেই মনসুর লণ্ডনে এসেছিল?

'উনি তো এখন রেডিও পাকিস্থানে আছেন। বি-বি-সি'তে কি একটা ট্রেনিং নিতে এসেছিলেন।'

'ও জানল কেমন করে আমি লণ্ডনে ছিলাম?'

'তা তো জানি না। হয়ত কোন পাকিস্থানী ডিপ্লোম্যাটের কাছে তোমার কথা শুনেছেন।'

কথাবার্তা চলতে থাকে। একটু দ্বিধা, একটু সংকোচবোধ করে বন্দনা। তবুও আর চুপ করে থাকতে পারে না।

'আচ্ছা দাদা, তোমাদের ওখানে কোন চিকাটোলা বলে...?'

'চিকাটোলা নয়, টিকাটুলি।'

'মিঃ আলি ঐ টিকাটুলির এক রায় বাড়ীর কথাও বলছিলেন।'

টিকাটুলির রায় বাড়ী শুনতেই যেন, তরুণের হৃদপিণ্ডটা স্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়াল। ঘাবড়ে গিয়ে সারা মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে শুধু জানতে চাইল, রায় বাড়ীর কথা কি বলল?

'বিশেষ কিছু না। তবে খুব দুঃখ করলেন দাঙ্গায় ওদের সর্বনাশ হবার জন্য। আর বললেন, ও বাড়ীর মেয়ে ইন্দ্রাণী নাকি—!

দু দুটো ভুরুকে কুঁচকে উঠল, গলার স্বরটা কেঁপে উঠল তরুণের। 'কি? কি হয়েছিল ইন্দ্রাণীর? মারা গিয়েছে তো?'

বন্দনা তরুণের হাত দুটো চেপে ধরে বলল, 'না, না, দাদা উনি বেঁচে আছেন।'

'কি বললে বন্দনা?'

'উনি মারা যাননি।'

তরুণ আপন মনে বার বার আবৃত্তি করল, 'ইন্দ্রাণী বেঁচে আছে—?'

মাথাটা নীচু করে কত কি ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন হারিয়ে গেল তরুণ। হয়ত মত্ত দুর্যোগের রাতে মহাসাগরের মধ্যে দিগভ্রান্ত নাবিকের মত কোথায় যেন দূরে একটু আলোর ইঙ্গিত পেল।

কয়েকটা মিনিট কেউই কথা বলতে পারল না। শেষে বন্দনাই বলল, 'হ্যাঁ দাদা, উনি বেঁচে আছেন। তুমি একবার ঢাকায় বদলী হয়ে যাও না!'

মুখটা তুলে মাথাটা নাড়াতে নাড়াতে তরুণ বলল, 'না, না, বন্দনা, ঢাকায় আমি যাব না। ওখানে গিয়ে আমি টিকতে পারব না।'

"তুমি একটু চেষ্টা করলে ওকে খুঁজে বার করতে পারবে।'

তরুণ একটা বিরাট দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। 'ওর খোঁজ করা বড় কঠিন।'

'তুমি মনসুর আলি সাহেবকে একটা চিঠি দাও না।'

'না না, তা হয় না।'

'কেন হয় না?'

'ফরেন সার্ভিসের লোক হয়ে পাকিস্থান গভর্ণমেন্ট অফিসারকে চিঠিপত্র দেওয়া ঠিক নয়।'

খবরটা এত অপ্রত্যাশিত যে স্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা ছিল না তরুণের। বন্দনাই কি যেন ভেবে বলল, 'এক কাজ কর না দাদা। করাচীতে তোমাদের হাই-কমিশনে কাউকে বলো না মনসুর আলি সাহেবের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করতে।

বন্দনার প্রস্তাবে তরুণ যেন বাস্তব জ্ঞান ফিরে পায়। হ্যাঁ ঠিক বলেছ। মনসুর কি করাচীতেই পোস্টেড?'

'তাই তো বলেছিলেন।'

একটু চুপচাপ থাকে দুজনে। বন্দনাই আবার বলে, 'আচ্ছা দাদা, তুমি একবার ঢাকায় তোমাদের ডেপুটি হাই-কমিশনের কাউকে বলো না ঐ টিকাটুলিতে খোঁজ-খবর নিতে। হয়ত কেউ না কেউ খবরটা জানতেও পারেন।'

চাপা গলায় তরুণ বলে, 'হ্যাঁ, তাও নিতে পারি।'

বন্দনার কিছু কেনাকাটার ছিল। তাই এবার উঠে পড়ল।

'কোথায় চললে?'

'এই একটু দোকানে যাব।'

'কেন?'

'আজ তিনদিন তো বাড়ীর বাইরে যাই না। কিছু কেনাকাটা—!'

হাসি-খুশীভরা তরুণ বলল, 'আর দোকান যেতে হবে না। বিকাশ এলে আমরা তিনজনেই বেরিয়ে পড়ব, বাইরেই খাওয়া-দাওয়া করব।'

অনেকদিন পর হঠাৎ একটু আশার আলো দেখা পাবার পর তরুণের মনটা খুশীতে ঝলমল করে উঠেছিল। বন্দনা তাই আর বাধা দিতে পারল না। 'ঠিক আছে। আজ খুব মজা করা যাবে। তুমি একটু বসো, আমি এক্ষুনি আসছি।'

'কিছু আনতে হবে?'

'হ্যাঁ দাদা, একটু কফি আনতে হবে।'

'না, না, আর দোকানে যেতে হবে না। তার চাইতে আমি বিকাশকে ফোন করে দিচ্ছি যে আমরাই আসছি, ও যেন ওয়েট করে।'

'একটু কফি খেয়ে বেরুবে না?'

'কি দরকার? বেরিয়ে পড়ি। তারপর তিনজনে একসঙ্গে কোথাও কফি খেয়ে নেব।'

গুরু-গম্ভীর ধীর-স্থির তরুণ হঠাৎ যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। অনেক দিনের জমাট বাঁধা বরফ যেন প্রভাতী সূর্যের রাঙা আলোয় একটু একটু করে নরম হতে শুরু করল।

রাত্রে শোবার পর বন্দনা বিকাশকে বলল, 'খবরটা শোনার পর থেকে দাদা কেমন পাল্টে গেছেন দেখেছ?'

'হ্যাঁ। দুনিয়ায় তো আর কেউ নেই। সুতরাং খবরটা শোনার পর আনন্দ হওয়া তো স্বাভাবিক।'

'ওরা দুজনে যেদিন মিলতে পারবে, সেদিন কি হবে বলো তো!'

বিকাশ মজা করে বলে, 'আমরা যেদিন প্রথম মিলেছিলাম, সেদিনকার আনন্দের চাইতে বেশী কিছু হবে কি?'

বিকাশকে ছোট্ট একটা চড় মেরে বন্দনা বলল, 'তোমার মত অসভ্য ছাড়া একথা আর কে বলবে?'

আর মাত্র একটা দিন। তরুণ সারাদিন ঘোরাঘুরি করে পুরানো সহকর্মী-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে এলো। টুক-টাক কিছু কাজকর্ম ছিল; তাও সেরে ফেললো।

রাত্রে বন্দনা নিজে হাতে রান্না করে খাওয়াল। তারপর বেশ খানিকটা গল্প-গুজব করে সবাই শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়েই এয়ারপোর্ট রওনা দিল। যথারীতি বন্দনার চোখ দুটো ছলছল করছিল। তরুণ সান্ত্বনা দিয়ে বলল, এবার আর দুঃখ কি? বছরে একবার তোমরাও যেতে পারবে, আমিও আসতে পারব। বি-ই-এ'র প্লেনে তরুণ রওনা হলো বার্লিন।

কলকাতার বৌবাজার-বৈঠকখানার সঙ্গে মাসীহারী-সাদার্ণ এভিন্যুর আশ্চর্য পার্থক্য থাকলেও তুলনা হতে পারে, কিন্তু লণ্ডনের সঙ্গে বার্লিনের তুলনা? অসম্ভব, অবাস্তব, অকল্পনীয়। বরানগর-কাশীপুরের পুরোনো জমিদার বাড়ীর গেটে সিমেন্টের সিংহ মূর্তি দেখে শিশুদের কৌতূহল জাগতে পারে, সহায়-সম্বলহীন অধস্তন কর্মচারীদের ভক্তি বা ভয় হতে পারে কিন্তু বৃহত্তর সমাজের কাছে আজ সে কৌতুকের উপকরণ মাত্র। ঐসব জমিদার বাড়ীর ঐতিহ্য থাকলেও ওদের দারিদ্র্য কারুর দৃষ্টি এড়াবে না। লণ্ডন যেন ঐ কাশীপুর-বরানগরের জমিদার বাড়ীগুলির বৃহত্তর সংস্করণ মাত্র। তাই তো লণ্ডনের সঙ্গে বার্লিনের কোন তুলনাই হয় না।

শুধু লণ্ডন কেন, নিউইয়র্কের সঙ্গেও বার্লিনের কোন তুলনা হয় না। পৃথিবীর সব চাইতে ধনীর দেশ আমেরিকা। নিউইয়র্ক তার মাথার মণি—শো উইন্ডো। তবুও সেখানকার ডাউন টাউনের মানুষের দারিদ্র্য, জৌলুসভরা টাইমস স্কোয়ারে ভিখারী দেখলে চমকে উঠতে হয়! কেন বেকারী? আমেরিকার কত অজস্র নাগরিক আজও অন্ন-বস্ত্রের জন্য হাহাকার করছে।

তাইতো বার্লিনের সঙ্গে নিউইয়র্কেরও তুলনা হয় না, হতে পারে না। বার্লিনে বেকার? ভিখারী? নিশ্চয়ই মানুষটা উন্মাদ। তা না হলে এখানে কেউ বেকার থাকে না, ভিখারী হয় না।

এসব তরুণ আগেই জানত। পোস্টিং না হলেও আসা-যাওয়া করতে হয়েছে কয়েকবার। সেই বার্লিনে চলেছে তরুণ।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যাক ওসব কথা। মনোমোহনের মত অত চওড়া স্টেজ সারা কলকাতায় আর ছিল না বললেই হয়। স্টেজের ওপনিংটা ছিল বিরাট। স্টেজের ভিতরটাও ছিল বেশ বড়, অভিনয় করতে কোন কষ্ট হত না। কিন্তু ছিল বড় নোংরা। স্টারের মত পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন নয়। আজকের সুসংস্কৃত শীতাতপনিয়ন্ত্রিত স্টারের কথা বলছি না—আমরা যে সময় অভিনয় করেছি, তখনও স্টার ছিল ঝকঝকে-তকতকে।

মনোমোহনে ঢুকতাম পিছন দিক দিয়ে, ঢুকেই পড়ত শিবালয় — নটরাজ শিবকে প্রণাম করে আমরা সাজঘরে যেতাম।

সন্ধ্যার সময় আমাদের রিহার্সাল চলে নিয়মিত। ওদিকে মনোমোহনবাবুদের পাশা খেলাও রীতিমত চলে। কালীবাবু ধুতি পরতেন কিন্তু কাজের সময়, অর্থাৎ সিন পেন্টিংয়ের সময়ই একটা কালো প্যান্ট পরে নিতেন। নিয়ে নিজেই তুলি ধরে কাজ শুরু করে দিতেন। এটা যে শুধু উনিই করতেন তা নয়, সে যুগের প্রায় সকলেই এই-ভাবে কাজ করতেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করাতেন এবং দরকার হলে নিজেও কাজ করতেন।

সন্ধ্যার পর একে একে সবাই আসতেন। প্রবোধবাবু আসতেন দিনে দুবার—সকালে আর বিকেলে। অপরেশবাবুর লেখা তখনও একেবারে শেষ হয় নি, তাই উনি যেদিন আসতেন, সেদিন সকাল-সকাল চলে যেতেন। উনি এলেও মহলা চলতো, না এলেও চলতো। রাত বারোটার আগে কোন-দিন মহলা শেষ করতাম না। কস্টিউমের ব্যাপারে প্রবোধবাবু বিভিন্ন ডিজাইন নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কালী-বাবুকে ডেকে বলতেন : 'রাবণের মুকুট এমন হওয়া চাই, কাপড়ের পাড় এ-রকম। কালীবাবু, যেখান থেকে পারেন এই সব জিনিস যোগাড় করে দিন।'

কাপড় পরানোর ধরণটা আমরা নিয়ে-ছিলাম রবি বর্মার ছবি দেখে। আমার ড্রেসার মণিই একমাত্র পারত গুছিয়ে পরিয়ে দিতে। অতো বড়ো বারো হাত কাপড় সামলে পরাও মুস্কিল। মেকাপের ঘরটা ছোট বলে বাইরে এসে পরতে হোত।

ইতিমধ্যে অপরেশবাবুর লেখা শেষ হল, আমাদের আয়োজন সম্পূর্ণ হল। অপরেশবাবু পাঁজি দেখে শুভদিন স্থির করলেন ১লা জুলাই ১৮২৭ (১৬ই আষাঢ় শুক্রবার ১৩৩৪) ঐদিন 'শ্রীরামচন্দ্রের'ও প্রথম আবির্ভাব হবে। স্টার ও মনোমোহনের দুই থিয়েটারের বিজ্ঞাপন একসঙ্গে বেরুলে সমস্ত শিল্পীদের নাম দিয়ে। 'শ্রীরামচন্দ্রের' ভূমিকালিপি হলো—রাবণ ও দশরথ—আমি, রামচন্দ্র দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ—ইন্দু মুখোপাধ্যায়, কৈকেয়ী—সুশীলা-সুন্দরী, সীতা — সুশীলাবালা (ছোট), শবরী ও রাজলক্ষ্মী—আশ্চর্যময়ী, রাজা জনক—কনকনারায়ণ ভূপ, বিভীষণ—নরেন্দ্র-চন্দ্র ঘোষ (গোর), ইন্দ্রজিৎ — জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, পরশুরাম—দুর্গাপ্রসন্ন বসু, মারীচ—তুলসী চক্রবর্তী, মন্দোদরী—রাণী-সুন্দরী, নাবিক — মৃণালকান্তি ঘোষ। নাবিকের গান ছিল—'সোনা দিয়ে ভোলাবে কী, আমি তাতে ভুলবো না—আর, ঠাকুর কী আর বলো বলা যে যায়'।

বইটির লেখা খুব জমাট। প্রত্যেকটি দৃশ্যই চমৎকার জমে যেত। পাকা লোক সব, অভিনয়ও সকলে করতেন চমৎকার। দশরথ হওয়া বৃদ্ধ হওয়া উচিত, আমি ততোধিক বৃদ্ধ করতাম, 'রাবণ' চরিত্রের বিপরীতার্থক চিত্রায়ণ হিসাবে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য যেখানে শেষ হচ্ছে তার কথা বলি। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে চেয়ে নিয়ে তাড়কা বধ করতে রওনা হলেন, আর শূন্যমঞ্চে উচ্চ সিংহাসন থেকে মূর্ছিত দশরথ সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে এসে পড়লেন—নিষ্পন্দ নিথর। সংলাপটা ছিল—'ওরে নয়নের মণি, রামচন্দ্র, মণিহারা বাঁচিব কেমনে?'

এর পরে দ্বিতীয় অঙ্কের সম্ভবত শেষ দৃশ্যের মাঝামাঝি জায়গায় কৈকেয়ীকে বরদানের পর উন্মাদের মত দশরথ বেরিয়ে গেলেন অন্তঃপুর থেকে। দশরথের পুরো ভূমিকাটাই লোকে খুব নিয়েছিল—বিশেষ করে এই দুটি দৃশ্য। এর পরেই তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে এল 'রাবণ'—দণ্ডকারণ্যে মারীচের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঢুকছে—

> 'সম্বন্ধে মাতুল তুমি মম অভিহিতকারী
> তাই কহি মিনতি করিয়ে তোমা,
> নহে অন্য কেহ হলে,
> এতক্ষণে
> নিভাতেম রোভবহ্নি শোণিতে তাহারে।'

হাঁটা-চলা (ইংরাজী যাকে বলে গেইট) সেটা খুব ভারিক্কী অর্থাৎ হেভি হতো। ভারী পদবিক্ষেপে মঞ্চের কাঠ পর্যন্ত দুলে উঠত। বড়ো বড়ো চুল, মাথায় মুকুট, পাকানো গোঁফ, চোখ দুটো ভাঁটার মত, কপালে লাল বক্ররেখা। এই ছিল ত্রিভুবন-বিজয়ী রক্ষরাজ রাবণের রূপসজ্জা। লোকে অবাক বিস্ময়ে দেখতো। প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই রাবণ দর্শকদের মনে গভীর দাগ কেটে ফেলল। বুঝলাম আর ভয় নেই—অভিনেতা তার নিজের স্থান করে নিয়েছে এখন নাটক 'ফেল' না করলেই হলো। তার বাক্য ও কার্যাবলী চরিত্রানুগ হলেই সাফল্য অনিবার্য।

হলোও তাই। দর্শক নিলো। দশরথ ও রাবণ দুটি চরিত্রই দর্শকদের মনে গভীর ছাপ রেখে দিল। আমি চরিত্র দুটির জন্য সাংঘাতিক খেটেছিলাম। খুব ভয় ছিল আমার রাবণের জন্য—যদি দর্শক অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ না করে তাহলে তো আমারও ভবিষ্যৎ অন্ধকার। রাবণ যেখানে সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাবে সে 'সিন'টার জন্যে সুশীলার ভয়ের অন্ত ছিল না। মেয়েটা একটু ভীতু আর লাজুক। ভয়-ভয়-করা চোখ দুটো নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলত — কী হবে সীতাহরণের সিনটা? যদি না পারি?

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলতাম—খুব পারবে, ভয় কী?

নীহারের কথা বলতাম—তার নিষ্ঠার কথা বলতাম। পরে তাকে উৎসাহ দিয়ে বলতাম—আমার সিনে আমার সঙ্গে অভিনয় করতে কোন মেয়েই কোনদিন কোন অসুবিধেয় পড়ে নি। বা পড়ে-টড়ে গিয়ে আঘাতও পাই নি। তুমি কেন ভয় পাচ্ছ মিছিমিছি? এসো, এই সিনটা রিহার্সাল করে দেখিয়ে দিচ্ছি—দেখবে, কোন ভয় নেই।

ঐ দিনে ওকে কি কি করতে হবে সব বুঝিয়ে দিলাম, বললাম—তুমি কুটির থেকে বেরিয়ে আমাকে ভিক্ষা দিতে আসছ তো? চোখ নীচু করে থাকবে, সীতা কখনো পর-পুরুষের দিকে তাকাবে না। চোখ নীচু করেই ভিক্ষা ফেলে দেবে আমার ঝুলিতে। আমি তখন করবো কী, একটু নীচু হবো মুহূর্তের জন্য। বাঁ হাতটা পেতে দেবো, যাতে ঠিক চেয়ারের মতো তুমি বসতে পারো। বসলে, আমি ঠিক ভর রাখতে পারবো। আমি ডান হাত দিয়ে বেষ্টন করে তোমার বাঁ হাতটা ধরবো। মুখ তোমার ফেরানো থাকবে দর্শকের দিকে, ডান হাতখানা তোমার

খোলা, চুলের রাশি ঝুলে থাকবে, তুমি চিৎকার করবে। আর আমি ঐ অবস্থায় তোমাকে নিয়ে ছুটে 'উইংগস' দিয়ে বেরিয়ে যাবো বুঝলে?

সে মাথা নেড়ে জানালো—বুঝেছে।

তখন আমি বললাম: আসলে তোমাকে কিছুই করতে হবে না, আমি ঠিক করিয়ে নেবো। এসো দেখিয়ে দিই।

(ছয়)

দুর্গা ছিল 'ডেয়ার-ডেভিল' প্রকৃতির। নাটকের শেষ দৃশ্যের আগের দৃশ্যে রাম ও রাবণের যুদ্ধ ছিল, পরিণতি রাবণের মৃত্যু। তার সঙ্গে প্রতি রাত্রেই রুটিন-মাফিক তরবারি যুদ্ধ করি। একদিন হয়েছে কি হয় আমারই মারার জোর হয়ে থাকবে আর নয় দুর্গারই তরবারি জীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকবে, ওর তরবারি একেবারে মাঝখান থেকে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। ওর বাঁ হাতটা কেটে গিয়ে গল-গল করে রক্ত বেরতে লাগল। সেটা কোনমতে সামলে নিলাম বটে, কিন্তু অন্যদিনের মত তত আকর্ষণীয় হলো না।

স্টেজ থেকে ভিতরে এসে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম—কি হলো?

দুর্গা ক্ষতস্থানটা ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে হাসিমুখে রহস্য করেই বললে—ও কিছু নয়। যুদ্ধ করলাম ডান হাতে, কাটলো বাঁ হাত।

বইতে ছিল, যুদ্ধ করতে-করতে উভয়ের প্রস্থান—কিন্তু আমরা ঠিক তা না করে যুদ্ধও দেখাতাম, রাবণের মৃত্যুও দেখাতাম। আমরা এইভাবে মহলা দিয়েছিলাম—যুদ্ধ করতে-করতে আমি স্টেজের ডানদিকে আসব—দর্শকদের দৃষ্টিতে বাঁ দিক অবশ্য। তারপর তরবারিটা শূলে বেঁধাবার মতো করে সোজা আমার বুকে বিঁধিয়ে দেবার অভিনয় করবে দুর্গা। আমি তৎক্ষণাৎ ওটা আমার বাঁ বগলের তলা দিয়ে চেপে নিয়েই একটু বেঁকে দর্শকের দিকে মাথা করে একেবারে দেহটা ধনুকের মতো বেঁকিয়ে আর্চ হয়ে যাবো। দর্শক দেখবে তরবারিটা আমার বুকে আমূলে বিদ্ধ হয়ে আছে আর গল-গল করে রক্ত পড়ছে। এই অবস্থায় আমার মাথাটা স্টেজ থেকে মাত্র হাত-খানেক উঁচুতে থাকবে। কিছুক্ষণ এইভাবে থেকে পাছায় ভর থেকে দুম করে পড়বো—এভাবে পড়লে এফেক্টও হবে। আর আমার লাগবেও না।

আমাদের রিহার্সাল মতোই দুর্গা করত। আগে জিমন্যাস্টিক করতাম, তাই আর্চ হতে কোন অসুবিধে হত না। এই অভিনয়ে সেটা কাজে লেগে গেল। যুদ্ধের দৃশ্য, তাই বর্ম পরতাম। আর বাঁ বগলের তলায়, বুকের বাম পাঁজরে আর বাহুতে স্পঞ্জের প্যাড পরতাম। স্পঞ্জে লাল রঙ থাকতো। হাত ফাঁক করে যুদ্ধ করতাম, তাই বগলে চাপ পড়তো না এবং স্পঞ্জ থেকে রঙও পড়তো না। তরোয়াল বগলে নেবার পরই প্রাণপণে চাপ দিতাম আর গল-গল করে রক্ত বেরতো। দৃশ্যটা এত বাস্তব হতো যে দর্শকেরা আঁতকে উঠতো—এমন কি থিয়েটারের অনেক ডিরেক্টারও ভয় পেতেন।

এই দৃশ্যটায় খুবই নাম হলো—এর পরই একটা শর্ট কার্টেন তারপরই সীতার অগ্নি-পরীক্ষা।

অভিনয় দেখলেন স্টারের সব ডিরেক্টারবৃন্দ, নাট্যকার অপরেশবাবুও দেখলেন, প্রত্যেকেই খুব সুখ্যাতি করলেন। সকলেই বললেন—চমৎকার প্রোডাকশন। এ বই চলবে, লোকে নেবে। বলতে বাধা নেই—ওঁদের ভবিষ্যদ্বাণী সফলও হয়েছিল।

প্রথম অভিনয় হলো ১লা জুলাই—সেদিন ছিল শুক্রবার। শুক্র, শনি ও রবিবার পর-পর তিন দিন হলো। প্রত্যেক দিনই হাউস ফুল—ন স্থানং তিলধারণম্। এর পর হল ৯ ও ১০ জুলাই—দর্শকদের ভিড় সমানই রইল। ১৩ জুলাই বুধবার আমাদের থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ দিয়ে বসলেন 'সাজাহান'। তারপর ১৬ ও ১৭ আবার 'শ্রীরামচন্দ্র'।

স্টার ও মনোমোহনের সম্মিলিত শিল্পীবৃন্দ মিলে অভিনয় কি রকম হলো—সেটা এবার একটু বলছি। আমি করলাম সাজাহান দানীবাবু করলেন আওরংজেব, দিলদার আশ্চর্যময়ী, দিলদার তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, জাহানারা রাণীসুন্দরী, দুর্গাদাস এদিন সাজাহানে কিছু ভূমিকা নেয় নি—ও গিয়েছিল স্টারে 'শোধবোধ'-এ সতীশ করতে।

স্টার থেকে দানীবাবু যেমনি এলেন মনোমোহনে 'ঔরঙ্গজেব' করতে, তেমনি তার পরদিন বৃহস্পতিবার আমরা আবার গেলুম স্টারে 'চন্দ্রগুপ্ত' করতে। ভূমিকা-লিপি ছিল এইরকম-চাণক্য—দানীবাবু, চন্দ্রগুপ্ত—দুর্গাদাস, নরেশ মিত্র—কাত্যায়ন, আমি—সেলুকাস, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়—আন্টিগোনাস, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়—নন্দ, বড়ো সুশীলা—মুরা, আশ্চর্যময়ী—ছায়া, সরস্বতী—হেলেন।

যাই হোক, শনি, রবিবার মনোমোহনে 'শ্রীরামচন্দ্র' দুরন্তভাবে চলতে লাগল—আবার বুধ, বৃহস্পতিবার দুই থিয়েটারের শিল্পীবৃন্দই পর্যায়ক্রমে দুটো থিয়েটারের নানা ভূমিকায় অভিনয় চালিয়ে যেতে লাগলাম। চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, রাজসিংহ—এই সব নাটকই হত অধিকাংশ দিন। কোন-কোন দিন আমার কোন ভূমিকা থাকত না সেদিন ছুটি পেতাম। কিন্তু ছুটিতেও বাড়ীতে বসে থাকতে পারতুম না—চলে আসতুম থিয়েটারে, অন্যের অভিনয় দেখি আর গল্প-গুজব করি। শিল্পীদের দিক দিয়ে স্টার তখন রীতিমত জমজমাট।

আমার এই দীর্ঘ দিনের ... কালে স্টারে কি নাটক হয়েছিল তা জানার কথা নয়। কিন্তু সে-সময়ের প্রচার পত্রিকার ফাইল ও অন্যান্য কাগজ থেকে স্টার থিয়েটারের অনুষ্ঠান সংগ্রহ করেছিলাম। সেই অনুষ্ঠান এখানে উপস্থিত প্রকাশ করলাম।

সেই যে ১৯২৩ সালের ৯ই ... আমি স্টারে অভিনয় 'সাজাহান' উপস্থাপিত করলাম, তারপরেই দল স্টারের জলপাইগুড়ি সফরে। সেখানে একদিন থেকে আসামের ... হয়ে চলে এলাম কলকাতায়। এমনই দৌড়ে নিয়ে কলকাতার থেকে হারিয়ে গেলাম।

জলপাইগুড়ি থেকে স্টারের দলকে ফিরে এসে আরম্ভ করলো 'চণ্ডীদাস' 'কর্ণার্জুন'। বলা বাহুল্য আমার ভূমিকা অন্য লোকে করতো। যে রাধিকাবাবু, কোন-দিন এক রাতে একাধিক নাটকে অভিনয় করতেন না, আমার অনুপস্থিতিতে তাঁকেও তা করতে হতো।

১৪ই এপ্রিল স্টারে বৃদ্ধ অমৃতলাল বসুকে নিয়ে 'তরুবালা' মঞ্চস্থ করলো। অমৃতলাল তাঁর অরিজিনাল রোল নেহারী খুড়োই করতেন। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন তিনকড়িদা, রাধিকানন্দ, দুর্গাদাস, সুশীলা (বড়ো এবং ছোট), নীহারবালা প্রভৃতি।

রাজসিংহে আমার জায়গায় অভিনয় করতেন প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। অথচ বিজ্ঞাপনে আমারই নাম থাকতো। নোটিশ পাওয়ার পরেও আমার নাম কেন বিজ্ঞাপনে দেওয়া হয়, বুঝতে পারি নি। মনে হয়, কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন আমার এ নোটিশ সাময়িক মান-অভিমানের ব্যাপার। দু-চার দিন বাদেই আমি অভিনয়ে যোগ দেব, হয়তো এই আশাই ওঁদের ছিল।

বিজ্ঞাপনে আমার নাম, আর অভিনয়ের বেলায় প্রফুল্ল সেনগুপ্ত—দর্শকরা এতে খুশি হলো না। অনেক সময় টিকিটের মূল্য ফেরৎ দিতে হতো। কেননা, অহীন্দ্র চৌধুরীর নামে বিজ্ঞাপন দিয়ে অন্যকে দিয়ে অভিনয় করানো, এটা কোনমতেই বরদাস্ত করা যায় না। তাই বলে একথা বলবো না, প্রফুল্ল সেনগুপ্ত বাজে অভিনয় করতেন। আমার তো মনে হয় প্রফুল্ল সেনগুপ্ত রাজসিংহের ঔরঙ্গজীব চরিত্রে ভালোই অভিনয় করতেন।

আমার নামে বিজ্ঞাপন প্রচারের পিছনে কর্তৃপক্ষের অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে আমার ধারণা হলো। হয়তো আমার নামে মামলা দায়ের করার অনুকূলে অবস্থা ওঁরা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

যাই হোক, এইরকম অবস্থার মধ্যে স্টারে 'রাজসিংহ', 'তরুবালা', 'অযোধ্যার বেগম' অভিনীত হলো। তারাসুন্দরী স্টারে এলে তাঁকে অযোধ্যার বেগমের নামভূমিকায় অভিনয় করানো হলো ৫ই মে। ৬ই মে 'কপালকুণ্ডলা' নাটকে ঐ তারাসুন্দরী অভিনয় করলেন মতিবিবির ভূমিকায়। ১০ই মে স্টারে অভিনীত হলো রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'। বড়ো সুশীলা নেমেছিলেন নামভূমিকায়, আর অর্জুন সেজেছিলেন রাধিকানন্দ। ইতিমধ্যে দানীবাবু ফিরে এলেন সুস্থ হয়ে, এসেই নামলেন 'প্রফুল্লে' যোগেশ হয়ে। রমেশ করলেন রাধিকানন্দ। 'চিরকুমার সভায়' আমি করতাম চন্দ্রবাবুর ভূমিকা — রাধিকানন্দকে সে ভূমিকাটিও করতে হলো। ২৬শে মে 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'চিরকুমার সভা' দুটি-ই হলো একসঙ্গে। এই সব থেকে বোঝা যায় রাধিকাবাবুর খাটুনি কতখানি বেড়ে গিয়েছিল। ২রা জুনে 'চন্দ্রশেখর' করেছিলেন। বিজ্ঞাপনে নাম ছিল শুধু নাম-ভূমিকায় তারাসুন্দরীর—আর কারুরই নাম ছিল না।

১লা জুন থেকে ওঁরা মনোমোহনের লীজ নিয়েছিলেন, তার বিজ্ঞপ্তি বেরলো ৩রা জুনে। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার, 'মিত্র থিয়েটার' উঠে গেল যে মাসের মাঝামাঝি, বাইরে থেকে আমি কিছুই জানতে পারিনি। দুঃখ লাগলো—এত করেও শেষপর্যন্ত 'মিত্র' দাঁড়াতে পারলো না! তার কারণ ইদানিং ওঁরা যে সমস্ত অভিনয় করেছিলেন, তার একটাও জমাতে পারেননি। ক্রমাগত লোকসানে ও'দের মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। তার ওপর আমাকে যে বাইরে বাইরে ঘোরাতে হচ্ছে—তারও খরচ আছে। এসব ছাড়াও ও'রা কতকগুলি মামলাতেও জড়িয়ে পড়েছিলেন—একটি অবশ্য স্টারেরই উসকে দেওয়া। এক সময় 'মিত্র' 'জনা' খুললেন, আর অমনি স্টার নোটিশ দিয়ে দাবী করলেন রয়্যালটি বাবদ আড়াইশো টাকা।

ব্যাপারটা হলো এই যে, নাট্যমন্দিরের সঙ্গে ঐ 'জনা' নিয়ে যখন একটু বাদানুবাদ হয়েছিল, তখন স্টার দানীবাবুর কাছ থেকে 'জনা'র নাট্যস্বত্ব কিনে নিয়েছিলেন। দানীবাবু ছিলেন সাদাসিধে প্রকৃতির লোক, রয়্যালটির টাকাপয়সা নিয়ে বারবার তাগাদা দেওয়াটা উনি পছন্দ করতেন না। তাই 'স্টার' একসঙ্গে কতকগুলো থোক টাকা দেওয়ায় 'জনা'র মঞ্চস্বত্ব এ'দেরই দিয়ে দিয়েছিলেন। এ-খবরটা ছিল মিত্রদের অজ্ঞাত, তাই তাঁরা বিপদে পড়লেন। শুধু রয়্যালটির টাকাই নয়, 'জনা'র প্রোডাকসানের জন্য যেসব খরচপত্র হয়েছিল, তা জলে গেল এবং 'জনা'র অভিনয়ও বন্ধ করে দিতে হল।

তারাসুন্দরীর ছেলে মানিকলাল ছিল ওখানে স্টেজ-ম্যানেজার। তার কমাসের মাইনে বাকি পড়েছিল বলে স্টারের দেখাদেখি সেও দিল এক মামলা ঠুকে। অমৃতলাল বসু ওখানে অভিনয় করেছিলেন কিছুদিন, নাট্যাচার্যও ছিলেন। ও'র 'সাগরিকা' নাটক হবার কথা ছিল—সে-নাটকও হল না—তিনিও টাকার দাবী করে এক কেস জুড়ে দিলেন। শেষপর্যন্ত এমন হল যে মানিকলাল মনোমোহনের পোষাক-আশাক ক্রোক করালে, আর স্টার ক্রোক করালেন ও'দের হারমোনিয়ামটি। এটা সেই পুরনো যুগের মিনার্ভার হারমোনিয়াম—বেশ বড়ো এবং আওয়াজটি ছিল ভারী সুন্দর। 'মিত্র' যে এ-জিনিসটি মিনার্ভা থেকে কিভাবে পেয়েছিল, তা অবশ্য জানা নেই আমার। স্টার এটিকে নিয়ে মনোমোহনেই রাখলেন।

বড়ো বড়ো অভিনেতা, যেমন নির্মলেন্দু প্রভৃতি, এ'দের নিশ্চয়ই কিছু দিতে হয়েছিল, নইলে ও'রা কাজ করবেন কেন? তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী—এ'দেরও মাহিনা বাবদ বেশ কিছু বাকি ছিল, কিন্তু এ'রা আদালতের দরজায় যাননি, এমনই কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর পাওনা ছিল ক্ষেত্রমোহন মিত্রের। তাঁকে সবাই মিত্রসাহেব বলে ডাকতেন। একেবারে শেষ অবস্থায় ইনি যোগদান করেছিলেন এ-থিয়েটারে এবং বহু পুরনো বই—রানী দুর্গাবতী থেকে অহল্যাবাঈ পর্যন্ত নাটকে অভিনয় করেছেন। তাড়াতাড়িতে এসব বই ভাল করে মহলা দেবার সময় পাওয়া যেত না তারই মধ্যে যতটুকু পারতেন দেখাতেন ক্ষেত্র মিত্রমশাই। কিন্তু এত চেষ্টা করেও শেষরক্ষা করা গেল না। দর্শকের সংখ্যা যত কমতে লাগল, পাওনাদারদের সংখ্যা তত বাড়তে লাগল। ফলে একদিন সত্যই 'মিত্র' থিয়েটার উঠে গেল।

আমি তখন শুটিং করছি চরখেরীতে, কিছুই জানতে পারিনি। সবথেকে চিত্তাকর্ষক ঘটনা যেটা এসে জানতে পারলাম কাগজপত্র ঘেঁটে, সেটা হাইকোর্ট আমাকে নিয়ে ও'দের মামলার বিবরণ। স্টার থিয়েটারে ও'দের একটা খবরের কাগজের 'কাটিং-বই' ছিল। এতে ও'দের সম্বন্ধে যখন যা-কিছু বেরতো সব কেটে আঠা দিয়ে সাঁটা থাকতো। এর পরে যখন স্টারে এসে যোগদান করলাম, তখন আমি খুব ভালো করে সেই 'কাটিং'-বইটি উল্টেপাল্টে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাই থেকেই আমি বিবরণগুলি নিয়ে আপনাদের কাছে পেশ করছি। ৮ই এপ্রিল স্টার ইনজাংশন জারী করলেন আর ৯ই 'বেঙ্গলী' প্রভৃতি কাগজ মহাউৎসাহে খবরগুলো ছাপতে লাগলো—Sensation of the Season'— Injunction against Actor প্রভৃতি শিরোনামা দিয়ে অমৃতবাজার দিলে 'Suit against stage-artiste!' 'নায়ক' হেডিং দিলে 'চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ'। ভাগ্যিস আমি তখন কলকাতায় ছিলাম না, নইলে লোকজনকে খুঁটিনাটির বিষয় কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ বেরিয়ে যেতো। মামলার বিবরণ দেবার আগে একটা খবর দিয়ে রাখি—সেটা আমার অনুপস্থিতির সময় ঘটেছিল। সেটা হল দুর্গাদাসের পিতৃবিয়োগ। দুর্গাদাসের পিতার নাম ছিল তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ছিলেন দক্ষিণ গড়িয়ার জমিদার। সেজন্য স্টার থেকে দুর্গাও কিছুদিন অনুপস্থিত ছিল।

এইবার একটু মামলার কথায় আসি—পাঠকদের কাছে এটা খুব খারাপ লাগবে না বলেই মনে হয়। মামলা উঠেছিল হাইকোর্টে জাস্টিস গ্রেগরীর কোর্টে। আমাকে আটকে রাখবার জন্যে আর্ট থিয়েটার ইনজাংশন প্রার্থনা করে 'এগেনস্ট এনি আদার কোম্পানি'। বাদীর পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার বি সি ঘোষ। এই মামলা সম্পর্কে 'নায়ক' পত্রিকা ৯ই এপ্রিল ১৯২৭ তারিখে যে-বিবরণ প্রকাশ করে, সেটা পড়লেই পাঠকবৃন্দ ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। 'বেঙ্গলী', 'অমৃতবাজার'ও ঐ একই রকম ছেপেছিল : ১৯২৪ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের চুক্তিতে লিখিত শর্ত অনুযায়ী ১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল, ১৯২৪) তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্য কার্য করিতে চুক্তি করেন। ঐ চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন অর্থাৎ ১৯২৫ সালের আগস্ট মাসে শিশিরকুমার বসু ও

শিশিরকুমার মিত্রের প্ররোচনায় প্রতিবাদী উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া মিনার্ভা থিয়েটারের সহিত এক চুক্তি করেন যে ১৯২৫ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে তিনি উক্ত থিয়েটারে অভিনয় করিবেন। তখন বাদিগণ অহীন্দ্র চৌধুরী ও উপেন্দ্রনাথ মিত্রের বিরুদ্ধে ইনজাংশন প্রার্থনা করেন, যাহাতে উক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী চুক্তি ভঙ্গ করিয়া মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে না পারেন। অহীন্দ্রবাবু আদালতে স্বীকার করেন, তিনি চুক্তিভঙ্গ করিয়াছেন। সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিবাদী স্টার থিয়েটারে যোগ দিতে স্বীকৃত হন এবং আরও তিন বৎসরের জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হন। ১৯২৭ সালের ১৬ই মার্চ প্রতিবাদী পুনরায় নোটিশ দেন—তিনি আর স্টারে অভিনয় করিবেন না এবং অভিনয়-তারিখে অনুপস্থিতও হন। সেজন্য বাদিগণ পুনরায় ইনজাংশন প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন। বিচারক ইস্টারের ছুটি পর্যন্ত ইনজাংশন মঞ্জুর করিয়াছেন। (নায়ক—৯।৪।২৭)

এই বিবৃতিতেই কাগজের কার্যকলাপ শেষ হলো না। বরং পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন কাগজ যেসব টিকা-টিপ্পনী কাটতে লাগল তা আমার পক্ষে মর্মান্তিক হলেও, পাঠকদের নিশ্চয়ই খুব মুখরোচক লেগেছিল। ও-পক্ষের কাগজগুলো আমাকে 'অকৃতজ্ঞ' বলে গালাগাল পর্যন্ত দিতে ছাড়েনি। তাদের ভাষা হল—'যারা তুললো, তাদেরই বিরুদ্ধে অকৃতজ্ঞতা?' এর প্রতিবাদে বিপক্ষ দল লিখলো—'তাহলে কোর্টে গিয়ে এত কান্না কেন? একজন গেছে, আরেকজনকে তোলো!' আর যারা নিরপেক্ষ অর্থাৎ কোনো দলেরই নয়, তারা লিখলো, 'মামলার রায় না বেরুনো পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করা উচিত নয়।' কেউ লিখলে—'কী ব্যাপার তা অহীন্দ্রবাবুর কাছ থেকেই শুনতে চাই।' ও-পক্ষের কোনো পত্রিকায় বেরুলো—'অখ্যাত অজ্ঞাত এক ব্যক্তিকে তুলে ধরা হোল, আজ নাম হয়েছে, কিন্তু ভাবা উচিত কতো

পাবলিসিটির খরচা করা হয়েছিল ও'র পিছনে। এই কি নীতি? তা-ও কলালক্ষ্মীর পূজারী নাট্যমন্দিরে গেলে বুঝতুম। অভিজাত থিয়েটার দুটোই তো আছে—'আর্ট থিয়েটার আর নাট্যমন্দির। তা নয় 'মিত্র'—ছি-ছি।' কেউ লিখলে—যাবার সময় বিবাদ-মামলা কেন? হাসিমুখে গেলেই তো হয়। যেন আমিই বিবাদ-মামলা বাধিয়েছি। আর হাসিমুখে কি সব সময় যাওয়া যায়? মালিকপক্ষ কি সব সময় খোলা মনে সম্মতি দিতে চায়! মালিকপক্ষ মানেই তো ধনী—তাঁদের মধ্যে অধিকাংশরই, মন অহংকার আর আত্মম্ভরিতায় ভরা—তাঁরা যদি কাউকে ধরে রাখতে মনস্থ করেন, তাহলে কি সত্যি সত্যি হাসিমুখে প্রীতির সম্বন্ধ বজায় রেখে সম্পর্ক ত্যাগ করা যায়?

আমাদের অবস্থা হল অনেকটা চা-বাগানের কুলির মতো। কনট্রাক্ট চলছে তো চলছেই। মাইনের আর হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। স্টারে তখন পাচ্ছিলাম তিনশো টাকা মাসে, আর এ'রা দিতে চাইলেন মাসে সাড়ে চারশো টাকা আর বছরে চার হাজার টাকা বোনাস। এতে কি লোভ হয় না? একটা জিনিস কেউ বুঝতে পারে না যে, একবার যখন মুক্তির কামনা জাগে, তখন তাকে চেপে রাখা খুব শক্ত, অর্থ, যশ কিছুরই সাধ্য নেই তাকে আটকে রাখা। এতে যে সব সময় ফল শুভ হয় তা নয়, অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্তের ফলে শিল্পী মারাও পড়ে।

সেবারও যখন স্টার ছেড়ে যাই-যাই করেছিলাম, তখন লিখিত কোনো চুক্তি ছিল না। তাই যখন অধিক অর্থপ্রাপ্তির আশায় মিনার্ভায় যোগ দিলাম চুক্তিপত্রে সই করে, তখনই ও'রা ইনজাংশন জারী করলেন। অবশ্য শেষপর্যন্ত আদালতে যেতে হয়নি। আপোষ-নিষ্পত্তি হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছবু ও'দের মিষ্টি কথায় ভুলে গেলাম, বাঁধন কাটতে গিয়েও কাটা হোল না। সেই সুযোগে ও'রা লিখিত চুক্তি করে নিলেন। এটা যে ও'রা এইভাবে প্রয়োগ করবেন, সেটা তখন ভাবিনি। যদিও ভাবা উচিত ছিল। অল্পবয়েস, মানুষকে অবিশ্বাস করার কথা মনে আসত না—সকলকেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতাম। তারপর সেখানে ঘা পড়লেই ক্রমশ মানুষ ধীরে ধীরে সংশয়বাদী আর সন্দিগ্ধপরায়ণ হয়ে ওঠে।

কাউকে কিছু বলি না—কাগজের 'কাটিং'গুলো পড়ি আর মনটা খারাপ হয়ে যায়। 'শিশির' পত্রিকায় (২৩শে এপ্রিল, ১৯২৭) একটি ব্যঙ্গ-কবিতা (ছড়া বলাই ভালো) বেরুলো—

"বাবুরা করেছে পণ করিব থ্যাটার
সামাল সামাল সবে রক্ষা নাহি আর।...
রবীন্দ্র-শরৎ আছে প্রয়োজন হলে
কালান্তক নাটকেতে মাথা যাবে টলে।
চাই কিন্তু একজন যুগ অবতার,
ওর ল্যাজ ধরে রই নদী হবে পার।
অবতার ছিল আগে শিশির ভাদুড়ী
বিবাগী হইয়া এবে হয়েছে আনাড়ী।
অহীন্দ্র অভদ্র বড়ো—কুছ কাম নাই—
যেহেতু করিছে শুধু 'পালাই পালাই'।"

যাই হোক, মামলার বিবরণে আবার ফিরে যাই। পরবর্তী শুনানীর দিনে হাকিম বদল হলো। গ্রেগরীর কোর্টে অন্য কেস ছিল বলে আমার মামলা জাস্টিস কস্টেলোর কোর্টে হয়েছিল। এখানে মিত্র থিয়েটারের পক্ষে ব্যারিস্টার দাঁড়িয়েছিলেন মিঃ এস এন ব্যানার্জি। কস্টেলোসাহেব কেসের সবটা শুনে যা বলেছিলেন, সেটা 'ফরোয়ার্ড' আর 'বেঙ্গলী' কাগজে ২৭শে এপ্রিল বেরিয়েছিল

'His Lordship observed that he could not see any good in taking a horse to the pond that was determined not to drink."

শুনানী অবশ্য মুলতুবী ছিল সেদিন। পরবর্তী দিন কেস উঠলো ঐ কস্টেলোরই কোর্টে ১০ই মে তারিখে। আর্ট থিয়েটারের পক্ষে ছিলেন সেদিন শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সরকার (পরে 'স্যর' হয়েছিলেন, নিউ থিয়েটার্স চিত্র-প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্রীবীরেন সরকারের বাবা), ও মিঃ বি সি ঘোষ। এদিনও শুনানী মুলতুবী ছিল। পরের দিন কেস উঠলো জাস্টিস গ্রেগরীর কোর্টে। এদিন শ্রী এন এন সরকার অন্যত্র কেস থাকাতে এলেন না, তাঁর জায়গায় এলেন মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমস। মিঃ বি সি ঘোষ তো ছিলেনই। ঐদিন কেসটার শুনানী হলো, যাকে বলে 'ইন ক্যামেরা', বিচারপতির চেম্বারে—রুদ্ধদ্বার-কক্ষে। মিঃ বি সি ঘোষ প্রস্তাব করলেন—'গত মামলায় অহীন্দ্র চৌধুরীর এফিডেভিটটা পড়া হোক।'

এ-পক্ষের ব্যারিস্টার মিঃ এস এন ব্যানার্জি বলে উঠলেন : 'আপত্তি। তিন বছর আগেকার এফিডেভিট এ-মামলায় কেন?'

গ্রেগরী বললেন — "তবু পড়ো—শুনবো।"

বি সি ঘোষ পড়লেন—অহীন্দ্রের এগ্রিমেন্টটা মিনার্ভা থিয়েটারের সঙ্গে

"Had been procured from him after he had been given to drink and was under the influence of liquor."

অতএব সেই এগ্রিমেন্টটা 'ইনঅপারেটিভ অ্যান্ড ইনভ্যালিড'।

পড়তে পড়তে চমকে উঠলাম। বেশ মনে আছে, প্রবোধবাবুর উপদেশে স্টেটমেন্টে সই দিয়েছিলাম অত্যন্ত ভালো মনে। কিন্তু সেটা যে এইভাবে মামলায় ও'রা ব্যবহার করবেন, আর সেটা যে কাগজে কাগজে এইরকম কদর্যভাবে ছড়িয়ে পড়বে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। 'মদ খাইয়ে লিখিয়ে নিয়েছে'—এ-কথাটা অভিনেতাদের সম্পর্কে মন্তব্য করে লোককে বোঝানো খুবই সহজ ছিল। কারণ, তখন অভিনেতারা

প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর মদ্যপান করতেন, আর তখনকার দিনে অভিনেতাদের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে লোকের ধারণা আদৌ ভাল ছিল না। আর তাছাড়া খ্যাতি-মান ব্যক্তি সম্বন্ধে লোকের সাধারণতই কৌতূহল বেশী—তাঁদের সম্বন্ধে একটা সামান্য টুকরো খবরও কাগজে বেরোয়, তবে তাকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু রঙ চড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে এই খ্যাতিমান ব্যক্তিটি যদি অভিনেতা হন, তাহলে তো আর কথাই নেই।

যাই হোক. আমাদের ব্যারিস্টার এস এন ব্যানার্জি বললেন—এ-যুক্তিতে ইনজাংশন দেওয়া উচিত হয়নি। এফিডেভিটটা ইনভ্যালিড হয় কী করে? এতে আমার মক্কেলদের ওপর অবিচার করা হয়।

এ-কথায় গ্রেগরী পড়লেন একটু বিপদে। তিনি বললেন—'তাহলে মামলার নিষ্পত্তিই হয়ে যাক। ইনজাংশন আবার কেন? অহীন্দ্র দু' দলেই প্লে করবো না—এইরকম কথা বলুক না কেন? আপত্তি কী?'

ল্যাংফোর্ড বললেন, 'অল্প কয়েকদিনের জন্যে হলে আপত্তি নেই। মামলার নিষ্পত্তির জন্যেই অপেক্ষা করবো। রায় না বেরুনো পর্যন্ত অভিনয় করবে না—এ আন্ডারটেকিং দিতে পারে আমার মক্কেল।'

ব্যানার্জি মন্তব্য করলেন, যেমন করেই হোক, মক্কেলকে অভিনয় করতে দেবে না, অভিনয়-জগৎ থেকে সরিয়ে রাখবে, এটাই হচ্ছে আসল কথা।

ল্যাংফোর্ড বললেন, 'আমার কথার অমন কদর্থ করলে আমি উইথড্র করছি আমার কথা।'

ব্যানার্জি জবাব দিতে উঠলেন। কিন্তু সেদিন সেই সময় কোর্ট বন্ধ হয়ে গেল।

পরের দিন অর্থাৎ ১২ই মে, মিঃ ব্যানার্জি কোর্টে বললেন—মামলাটা একজ-পিডাইট করা হোক, ততদিন অহীন্দ্র প্লে করবে না।

এর তিন সপ্তাহ পরে শুনানীর দিন স্থির করা হবে কথা হলো। কিন্তু সে তিন সপ্তাহ আর এলো না। মামলার অন্য কোনো শুনানী হলো না, কাগজে কাগজে আর কোনো বিবরণ নেই। মামলার যে কী হল আমি আর জানতে পারলাম না, যেটুকু জানলাম, সেটুকু হলো, স্টার মনোমোহন নিলে, আমিও এসে পড়লাম সেখানে, আর 'জনা'র রয়্যাল্টি প্রভৃতি মামলা নিয়ে শেষ-পর্যন্ত মিত্র থিয়েটার উঠেই গেল।

বিবরণ এইটুকুই দিলাম। সমস্ত বিবরণী খুঁটিয়ে পড়া শেষ করে আমারই ভয়ানক লজ্জা করতে লাগল। যেসব সহকর্মী রীতি-মত আমাকে খোসামোদ করে চলতো, আমাকে সমীহ করতো, আমি যাদের বন্ধু-ভাবে মনে করতাম—তারা এফিডেভিট করে অম্লানবদনে বেমালুম আমার নামে যেসব জঘন্য মন্তব্য করেছে, তা পড়তে পড়তে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। এত বিশ্রী এবং ক্লেদাক্ত সেইসব কথা যে লিখতেও লজ্জা করে। এক জায়গায় দেখি আমার বাবাকে পর্যন্ত টানা হয়েছে। ভাবতে লাগলাম এসব খবর তো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার সম্বন্ধে সকলের কি ধারণা হয়েছে কে জানে। আর শুধু দেশের মধ্যেই বা বলি কেন—আমার এক জাহাজী বন্ধু ছিল —সে জাহাজে 'পার্সার'-এর কাজ করত। সে একবার কলকাতা এসে আমার সঙ্গে দেখা করে কথায় কথায় বললে আমার এই মামলার খবর সে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বসে পড়েছে। অসম্ভব কিছু নয়, ইংরিজী, বাংলা সব কাগজেই ফলাও করে ছাপা হয়েছিল ঐ বিবরণ। আইন-আদালতের কলমে লোকের কেচ্ছা-কাহিনী পড়বার আগ্রহ খুব বেশী—এ জিনিসটা এখনও যেমন আছে, আগেও তেমনি ছিল। 'রয়টারে'র কৃপায় খুব ফলাও করে না হলে মোটামুটি খবরটা তাই আমার পার্সার বন্ধুটি অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বসে কাগজে পড়েছিলেন।

আসল কথা, এসব পড়তে পড়তে আমার চোখের সামনে দিয়ে যেন একটা অন্ধকার পর্দা উঠে গিয়েছিল। আমি সবার থেকে নিজেকে আলাদা করে নিতে যা ভাবতে পারিনি কোনোদিনই। কিন্তু এই মামলায় আমার অতি-পরিচিত ব্যক্তিদের এইসব জঘন্য উক্তি, যার মধ্যে সত্যের লেশ-মাত্র নেই, আমার মন আপনা থেকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। আগে যেমন সবাইকে অতিসহজে বিশ্বাস করতাম, এখন আর তা করতে পারি না। সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলাম, সতর্ক হয়ে উঠলাম থিয়েটারের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ সম্পর্কে।

এর পর দেখা দিল আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া। লোকের সঙ্গে মিশি কম, কথা বলি কম। 'শ্রীরামচন্দ্র' করি মনোমোহনে, স্টারেও যখন যা প্রয়োজন হয়, করি—কিন্তু সবার সঙ্গে আর তেমন প্রাণখুলে মিশতে পারি না।

ব্যাপারটা চোখে পড়ল অনেকেরই। কেউ কেউ এসে জিজ্ঞাসা করলে—'কি হয়েছে?' এরকম চুপচাপ কেন?'

সংক্ষেপে বলি—'এমনিই—ও কিছু নয়।'

(ক্রমশঃ)

খেতে বসেছে ঠিক তখন গন্ধ ভেসে এল। সদানন্দ দেখল খোকা নখ দিয়ে রুটির ওপর আঁচড় কাটছে। নত মুখ। ছোট্ট থালায় চারখানা রুটি। মুসুরির ডাল আর খানিকটা আলুভাজা।

আবার সেই গন্ধ এবং খোকার মুখ আরও নত। সদানন্দ প্রায় চিৎকার করে বলল, সুধা, দরোজাটা বন্ধ করে দাও! এই খোকা, খাচ্ছিস না কেন?

দরোজা বন্ধ করলেও গন্ধ টের পাওয়া যায়। সুধার মুখ কালো। রুটির ওপর নখ দিয়ে আঁচড় কাটছে খোকা। এ-সব দেখে সদানন্দের ইচ্ছে করল খাওয়া ফেলে উঠে যায়। একটা বিড়ি ধরিয়ে রাস্তায় কিছুক্ষণ পায়চারী করলে মনটা খানিকটা হাল্কা হতে পারে।

—কী গন্ধ! সুধা নাক দিয়ে গন্ধ টানতে টানতে বলে, জান এ একেবারে খাঁটি ইলিশ। তোমার ঐ চন্দন ইলিশ বা খোকা ইলিশ নয়। গঙ্গার ইলিশ। নইলে এমন সুন্দর গন্ধ...। হ্যাঁগা, ক'টাকা কিলো বলতো?

—দশ টাকা। সদানন্দের মুখ খুব গম্ভীর দেখায়। সে নীরবে সুধার বিস্ফারিত মুখে দেখল। ধমক খেয়ে খোকা রুটি ছিঁড়ে মুখে দিচ্ছে। ম্লান মুখ। ওই মুখের দিকে তাকিয়ে সদানন্দের চোখে জল আসার উপক্রম। খাবে কী, চোখের সামনে সব ঝাপসা।

সদানন্দ উঠে পড়ল। সুধা লক্ষ্য করল সদানন্দের থালায় দু'খানা রুটি পড়ে আছে। বাটিতে ডাল। পাতের কোণায় আলুভাজা।

—ওকি, উঠছো কেন! আমার মাথার দিব্যি সব খেয়ে যাও!

সদানন্দ নীরবে উঠে যায়। মুখ ধুয়ে কাঁধে গেঞ্জী ফেলে সোজা বাইরে এল। ওই

ছোট্ট ঘরে বেশিক্ষণ থাকলে দম আটকে আসে। ওই ঘরের ভাড়াই মাসে তিরিশ টাকা। বিড়ি ধরিয়ে সদানন্দ গলির রাস্তায় পায়চারী করতে থাকে।

দেশে জমিজমা ছিল। বাপ-মায়ের এক ছেলে। বামুনের ছেলে। খাওয়া-পরার অভাব ছিল না। বড় হয়ে সদানন্দ পুরুত-গিরি করে জীবিকানির্বাহ করবে, সবার কাছে এই ছিল স্বাভাবিক। তারপর সব ওলটপালট হয়ে গেল। জীবনের চাকা গেল ঘুরে। কবে বাবা-মা মরেধরে সাফ। দেশের জীবন এখন স্বপ্নের মত মনে হয় সদানন্দের কাছে!

এখন সে সরকারী কর্মচারী। পড়াশুনো করতে পারেনি। বাবুর চাকরি পায়নি। বরং বাবুদের নানারকম হুকুম তামিল করে সে। বেয়ারার চাকরি। প্রথম প্রথম মনে বড় ব্যথা পেত। বামুনের ছেলে হয়ে কিনা বাবুদের এঁটো গ্লাস ধুতে হয়। এছাড়াও হরেক রকমের কাজ। পান-বিড়ি-সিগারেট আনা থেকে মাছ ধরার খাবারও তাকে জোগাড় করে দিতে হয়। সদানন্দের চোখে জল এসে যেত। সেও ভদ্রলোকের ছেলে। রীতিমত বামুনের ছেলে। দেশটা দুভাগ হয়ে গেল। বাবা-মা মারা গেল। লেখাপড়া শেখেনি। নইলে খাওয়াপড়ার কোন অভাব ছিল না।

দূর দূর! সদানন্দ রেগে বিড়িটা ফেলে দিল। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বর্ষাকালে যা দুর্ভোগ, রবারের জুতোটা ফুটো হয়ে গেছে। নতুন জুতো কিনতে হবে। সুধার একটা আটপৌরে শাড়ির একান্তই দরকার। কতদিন ধরেই ঘ্যানঘ্যান করছে। খোকার চার মাসের ইস্কুলের মাইনে বাকী। তারপরে দুধ, মুদির দোকান, ধোপার দোকান, তেমনি বাড়িভাড়া এসব ভাবতে ভাবতে সদানন্দের মাথা ঝিমঝিম করে উঠল।

ঘরে ঢোকার আগে সদানন্দ থমকে দাঁড়াল। পাশের ঘরে ওরা খেতে বসেছে। কলকল করে হাসছে সব। মতিবাবুর গলার স্বর শুনতে পেল সে। ব্যাটা, এক নম্বরের জোচ্চোর! পয়সার গরম আর কি। রোজই নাকের ডগার ওপর দিয়ে ইলিশ মাছ নিয়ে বাড়িতে ঢোকে। কদিন তো ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে হকারী। লোকজনকে ডেকে ডেকে বাজে মাল গছিয়ে দিল। হুঁ! তাতেই এত দেমাক! দুটো পয়সার মুখ দেখেছিস, অমনি ধরাকে সরা জ্ঞান!

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে দরোজা বন্ধ করল সদানন্দ। ওই এক দোষ সুধার। বিয়ের পর থেকে দেখে আসছে। রাগ হলে খাওয়া বন্ধ। কথা বন্ধ। সদানন্দ ঘরের মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। পঁচিশ পাওয়ারের লাইটে আর কত আলো হবে। মশারি খাটিয়ে ওরা শুয়ে পড়েছে। ঘরের এদিক-ওদিক সে তাকাল। সুধা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে। দিনরাত স্বামী আর ছেলেকে বকুনির বিরাম নেই। পা ধুয়ে আস, উঁহু জুতো পায়ে ঘরে ঢুকবে না। ইত্যাদি।

মশারি অল্প তুলে সদানন্দ ওদের দেখল। খোকা নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। তার পাশে সুধা চিত হয়ে শুয়ে। দু' চোখ বোজা। মনে মনে সদানন্দ হাসল। অস্পষ্ট আলোয় সুধার ফর্সা মুখ, শরীরের ঢেউ দেখল। খোকার বয়স সাত। বিয়ের তিন বছরের মাথায় এসেছে। তারপর থেকে আর ছেলেপুলে হয়নি। সুধা খুব সাবধান। গায়ে হাত দেবার জো নেই। হুঁ, সদানন্দের চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এল! তেমন আর খেতে পরতে পারে কই। একটু দুধ-মাছ পেটে পড়লে সুধার গা বেয়ে তেল গড়িয়ে পড়ত। যেমন গায়ের রঙ, তেমন নাক চোখ মুখ। সুধার শরীরে সদানন্দের দু' চোখ ঘুরতে থাকে।

পা ধরে নাড়া দিতে গিয়ে বিপদ বাধাল সদানন্দ। সুধা এক লাফে বিছানা থেকে নেমে এল। বড় বড় দু' চোখে জল টলমল করছে। কাঁধ ছাপিয়ে খোলা চুল। আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। ফুলে ফুলে উঠছে বুক।

—পা ধরলে কেন? সুধা উপুড় হয়ে সদানন্দের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সদানন্দ টের পেল ওর দু'পা জলে ভিজে যাচ্ছে। সে দু' হাত দিয়ে সুধাকে টেনে নিল বুকের ভিতর।

—চুপ চুপ! সদানন্দ সুধার পিঠে হাত বুলোয়, খোকা জেগে যাবে। আচ্ছা বাব্বা! আমার অন্যায় হয়েছে—আর কোনদিন তোমার পায়ে হাত দেব না। এই নাও, চোখ মুছে ফেল। এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। এবার একটু হেসে কথা বল।

দু'হাতে দিয়ে সদানন্দকে সরিয়ে সুধা জানালার সামনে এসে দাঁড়াল।

—খেলে না কেন? সদানন্দ সুধার পাশে দাঁড়াল। আমার সামনে বসে তোমাকে খেতে হবে। বলে সে সুধার হাত ধরে টানল।

—ছেড়ে দাও! ফুঁসে উঠল সুধা, তুমি শুয়ে পড়গে। আমি খাব না।

—কী হয়েছে? সদানন্দ একটু বিরক্ত হল। প্রতিবার সুধার এই জেদ ভাল লাগে না। তারও খাওয়া হয়নি ভালভাবে। সে একটু মৃদু হাসল। হুঁ, আমি কিছু বুঝি না। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে একটা বাজ পড়ল কোথায় যেন। সুধা ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরল সদানন্দকে।

কাঁসের খাওয়াদাওয়া। সদানন্দ সুধাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল। বাইরে জোরে বৃষ্টি পড়ছে। সমস্ত শরীরে সে উত্তেজনা টের পেল। সুধাও কাঁপছে অল্প।

—চল শুয়ে পড়ি।

—না না না। সুধা ছটফট করে উঠল। সদানন্দকে দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে সরিয়ে দিল।

—কী হল? সদানন্দ সুধার দিকে ঝুঁকিয়ে থাকে যায়। মুখ টিপে হাসছে সুধা। দু'হাত দিয়ে চুল ঠিক করছে।

শাড়ি ঠিকঠাক করে সুধা বলল, খেতে বস। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও খাব।

রুটি ছিঁড়ে সদানন্দ ডালে ভিজিয়ে মুখে দেয়। আড়চোখে সুধাকে দেখতে থাকে। মনে মনে রেগে যায়। ওভাবে দূরে সরিয়ে দেওয়া...এখনও শরীরে মৃদু কাঁপুনি সে টের পেল। সুধার এসব বাড়াবাড়ি, না, আর ছেলেপুলে যেন না হয়। এই অভাবের সংসারে বছর বছর...। ওই একটাই ছেলে। ওকে ভালভাবে মানুষ করতে পারলে শান্তি। খোকা বড় হয়ে মস্তবড় চাকরী করবে। অনেক টাকা রোজগার করবে। নাথ, তুমি অমন আমার পিছন পিছন হ্যাংলার মত ঘুরঘুর কোর না!

—আর একখানা রুটি দেব? সুধা একগাল হেসে বলে, জান খোকা বলছিল, বাবা রোজ বলে কাল ইলিশ মাছ আনবে—কই একদিনও তো আনলো না। তা কাল তুমি মাইনে পাবে। ছোট্ট একটা মাছ এনো। তবে গঙ্গার ইলিশ হওয়া চাই। মতিবাবু তো দেখি প্রায়ই ইলিশ মাছ আনে। আনবে না কেন। ও তো আর চাকরী নয়। গোনা-গুনতি মাইনে। এক পয়সা উপরি নেই। ব্যবসা করে যারা, তারাই খেয়ে পরে সুখে আছে।

আরও অনেক কিছু বলত সুধা। সদানন্দের ধমক খেয়ে ওর মুখ কালো হয়ে যায়।

—কিছু বললেই তো মেজাজ দেখাও। আমার সঙ্গে হেসে আজকাল দুটো কথা পর্যন্ত বলতে চাও না। ওদিকে তো অফিসের ছুঁড়িগুলোর সঙ্গে সারাদিন...!

—সুধা! সদানন্দ ক্ষেপে যায়, ফের একটা কথা বললে...।

—কী করবে? মারবে? মেরে ফেল আমাকে। বলতে বলতে সুধা থালায় ঢকঢক করে জল ঢেলে উঠে পড়ল। সদানন্দ ঠেলে থালা দূরে সরিয়ে দিল। খাওয়ার নিকুচি করেছি!

ঘর অন্ধকার। সদানন্দ ছটফট করতে থাকে। বাইরে সবেগে বৃষ্টি পড়ছে। খুব রেগে গেলে সুধা আলাদা বিছানা করে শোয়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। হুঁ, তুমি আমাকে কী ভেবেছো সুধা। আমি কিছু বুঝি না। খোকা ইলিশ মাছ খেতে চায়। এদিকে তো দেখছি তোমার জিভের স্বাদ খোকার চেয়ে কম নয়। যেভাবে নাক দিয়ে গন্ধ টানছিলে...ছি ছি! তোমার লজ্জা নেই। স্বামীর জন্যে দরদ নেই। সব সময় একধরনের অসন্তুষ্টিভাব।

না, আজ সে নীচে নামবে না। সদানন্দ ঘুমোবার চেষ্টা করল। এপাশ ওপাশ করল অনেকবার। বেশ ঠান্ডা পড়েছে। গাঢ় ঘুম হওয়া উচিত। বরাবর সুধাকে জড়িয়ে ঘুমোবার অভ্যাস। আজ পাশে কেউ নেই। ঘুম হবে কেন!

ধুত্তোরি! সদানন্দ মশারি তুলে বাইরে এল। দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ধরাবার সময় দেখল সুধা জানালার সামনে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। নীরবে সে বিড়ি টানতে থাকে। শালার বিড়িও তেমনি। বারবার নিভে যাবে। সব জোচ্চর! মানুষকে কিভাবে ঠকাবে সেই ফন্দীফিকির খুঁজছে।

—সুধা! ফিসফিস করে ডাকল সদানন্দ। পরপর কয়েকবার। সাড়াই দিচ্ছে না সুধা। চোখের সামনে এসব বেশিক্ষণ দেখা যায় না। বুকটা কেমন খালি খালি লাগছে। সদানন্দ নিঃশব্দে সুধার পাশে এসে দাঁড়াল। একটা হাত রাখল সুধার কাঁধে।

তারপর পাখীর মত সুধা অনেকক্ষণ ডানা ঝাপটাতে লাগল। ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে নিজেকে আত্মসমর্পণ করল। সদানন্দের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে কাঁদল অনেকক্ষণ।

সকালে অফিস যাওয়ার সময় খোকা কাছে এসে দাঁড়াল। সদানন্দ খেয়েদেয়ে একটা বিড়ি ধরিয়েছে। ঘরে কাঁচা সোনা রোদ। খোকার মুখে রোদ্দুরের রঙ লেগে ঝকঝক করছে। গৌরবর্ণ। কচি মুখে ঈষৎ লজ্জার আভাষ। মায়ের মত মুখের চেহারা ছেলেটার।

—কী আনতে হবে বল খোকা?

—ইলিশ মাছ। বলে খোকা আর দাঁড়াল না। পালিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। সদানন্দ দেখল সুধার মুখ গম্ভীর। সকাল থেকেই মুখ ভার। পাঁচ কথা বললে একটা কথার জবাব দিয়েছে।

ন্যাকড়া দিয়ে জুতোর গর্ত ঢাকবার চেষ্টা করেছে। একটু হাঁটার পর সদানন্দ টের পেল পায়ে কাঁকর বিঁধছে। তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছে না সে। মনের মধ্যে বেশ খুশি খুশি ভাব। সে কল্পনা করতে লাগল সন্ধ্যাবেলা তার হাতে একটা আস্ত ইলিশ মাছ দেখে সুধা আর খোকার মুখ কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। খোকা বলবে, মা সরষে পাতুড়ি কর। মুড়োর কাঁটা দিয়ে সোনামুগ ডাল—চমৎকার হবে!

অফিসে সারাদিন [illegible] মধ্যে কাটে সদানন্দের। অনেক সময় রাগ হয়। প্রায় দশ বছর হল এখানে কাজ করছে। অনেকে তাকে দাদা ডাকে। বিশেষ করে ছোকরা কেরানীরা। সদানন্দকে না হলে চলে না। মুখ বুজে কাজ করে যায়। সবাইকে খুশি করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

দিদিমণিরাও ওকেই পছন্দ করে বেশি। অন্য বেয়ারা যারা আছে, বিশেষ করে ছোকরা তপন, ওর মেজাজ বিশেষ সুবিধের নয়। আজকাল আবার কিসব হয়েছে। ইউনিয়ন। চাঁদা দিতে হয় প্রতি মাসে। মিছিল বেরোলে সঙ্গে থাকতে হয়। চিৎকার করে দিতে হয় স্লোগান।

—তুমি এমন কাজ করতে যাও কেন সদুদা? তপন কটমট করে তাকায়, তেল দিয়ে লাভ হবে না কিছু। ওই বাবুদের চেয়ারে কোনদিন তুমি বসতে পারবে না।

রাগ করিস কেন ভাই। সব সময় হাসিমুখে কথা বলে সদানন্দ। অল্প বয়স। মাথা গরম। শোন তপন। এই নে ধর। আজ পরোটা বানিয়ে দিয়েছে তোর বৌদি। আমাদের বাড়ি একদিন চলে আয়। হুঁ, গরীবের বাড়ি যাবি কেন!

কেউ গালাগালি করলেও সদানন্দ হাসিমুখে থাকে। শুধু একটা জিনিস সে এখনও ত্যাগ করতে পারেনি। এখনও সে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে জাতবিচার করে চলে। যখন বুড়ো বেয়ারা, জাতে কৈবর্ত, বনমালী টিফিনের বাক্সো খুলে রুটি সদানন্দের দিকে এগিয়ে ধরে—সদানন্দের মুখের রঙ পাল্টে যায়. সে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। বলে, আমার যে পেট খারাপ। এই দ্যাখ না, চিঁড়ে এনেছি।

মাইনে পেয়ে সদানন্দ বড়বাবুকে বলে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। আজ সে ট্রামে উঠল। নইলে হেঁটেই বাড়ি ফেরে। কী ভিড়! সদানন্দ ট্যাঁকে টাকা গুঁজে রেখেছে। একবার হাত দিয়ে দেখে [illegible] করল। চোখের সামনে ভাসছে খোকার মুখ।

চোখের সামনে আরও অনেকের মুখ ভাসছে। সব পাওনাদার। মনে মনে হিসেব করে দেখেছে সদানন্দ। বেশি ভাবলে মাথা ঘোরে। এর ওপর আছে ধার। আসল দেওয়া দূরে থাক, সুদ বাড়ছে দিনদিন। এর মধ্যে ইলিশ মাছের স্থান নেই। দশ টাকা কিলো ইলিশ মাছ খাওয়া রীতিমত ক্রাইম—তপন জোর গলায় বলে। ছোকরা একটা পাশ করেছে। তাই অমন চাটাং চাটাং কথা!

লোকের ধাক্কা খেতে খেতে সদানন্দ এগোয়। মাঝে মাঝে চারদিক থেকে লোক ভিড় করছে। সে মাঝে মাঝে ট্যাঁকে হাত দিয়ে দেখে টাকা ঠিক আছে কিনা। এক হাতে থলি। রোজই ভিড় হয়। আজ এক তারিখ। বাবুদের পকেট গরম। [illegible] জিনিসপত্রের দামও বেড়ে যাবে আজ।

সদানন্দের চোখের পলক পড়ে না। অনেক ঠেলেঠুলে সে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। রুপোর মত ঝকঝক করছে ইলিশের সারি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। জোরালো আলোয় ইলিশগুলো যেন ঝলমল করে হাসছে। সদানন্দ ঝুঁকে দেখে মাঝারি সাইজের একটা পছন্দ করল। এটা ওজন কর তো বাপু। সদানন্দ গজগজ করতে থাকে। সেই কখন থেকে বলছি—কোনো শুনছো না। কেন, আমি কী খদ্দের নই? দু'হাত দিয়ে সদানন্দ মাছ ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটাকে টেনে একপাশে সরাল।

—কত বললে? সদানন্দ দু'চোখ কপালে তুলল, বার টাকা! বল কি! দশ টাকা হবে না?

—কেন ঝামেলা করছেন দাদা! সদানন্দের হাত থেকে জেলে মাছ কেড়ে নেবার চেষ্টা করল।

ভীষণ রেগে যায় সদানন্দ। সে জেলের হাত থেকে মাছ ছিনিয়ে থলের মধ্যে পুরে বলে, ঠিক আছে—বার টাকাই দিচ্ছি। মেজাজ দেখাচ্ছ কেন! এ্যাঁ, কী ভেবেছো?

ট্যাঁকে হাত দিয়ে সদানন্দ চিৎকার করে উঠল, আমার টাকা। টাকা নেই!

তারপর আর একটা প্রচন্ড চিৎকার। সদানন্দ চোখের সামনে অন্ধকার দেখল। জ্ঞান হারাবার আগে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল ছোট বড় নানা সাইজের রুপোলী ইলিশ।

রমেশ দত্তের

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

চিত্রকল্পনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে- চিত্রসেন

আপনার জীবন কি খুব নীরস?

রুটিনমত অভ্যাস গড়ে তোলা ভালই, তাতে কাজের দক্ষতা বাড়তে পারে। কিন্তু কখনও কখনও রুটিনের বাইরে কাজ করলে কাজের ধারা আরও ভাল হয়ে ওঠার যে-সম্ভাবনা আছে, সেদিকে যেন অন্ধ হয়ে না থাকি আমরা।

বৈচিত্র্যই জীবনের আনন্দ; জীবনে নানারকম অভিজ্ঞতা সকলেরই দরকার। নীচের টেস্ট যদি আপনি নিজেকে যাচাই করবার জন্যে ব্যবহার করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন, আপনার মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব সৃষ্টি করে জীবনকে নীরস করে ফেলছেন কতখানি।

প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' জবাব দিয়ে চলুন। সবশেষে পাতার নীচে সঠিক জবাব হিসাব করবার নির্দেশ দেওয়া আছে, তাই দেখে অনায়াসে বুঝে নিতে পারবেন, আপনার কি করণীয়।

১। আপনি কি কখনও আপনার কাজ বদলে ফেলার কথা ভাবেন?

২। আপনি কি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীরভাবে আগ্রহবোধ করেন?

৩। এমন কি কখনও ঘটে, যখন আপনি সাধারণ বুদ্ধি অর্থাৎ আপনার কমন-সেন্সকে কাজে লাগান এবং পুরনো দিনের খুঁটিনাটি সংস্কার কিংবা ভব্যতার রীতি-নীতি অগ্রাহ্য করেন?

৪। আপনি কি সবসময় কাজকর্মের নতুন নতুন আরও ভাল পন্থা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেন?

৫। সব ধরনের সব শ্রেণীর লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে, কথাবার্তা বলতে আপনি কি পছন্দ করেন?

৬। আপনি কি বিভিন্ন খবরের কাগজ পড়েন, বিভিন্ন ধরনের মতামত জানবার জন্যে?

৭। আপনি কি কখনও লোকজনকে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে কোন উপহার দিয়ে থাকেন?

৮। শিল্পকলা গানবাজনা পোষাক-পরিচ্ছদের আধুনিক হালফ্যাশনকে আপনি কি বোঝবার আন্তরিক চেষ্টা করেন?

৯। আপনি কি বেশ সহজেই নতুন বন্ধু পেয়ে থাকেন?

১০। দৈনন্দিন নিয়মমাফিক কাজে যদি কোন গোলমাল হয়, তাহলে কি আপনি তা মানিয়ে নিতে পারেন?

১১। আপনি কি প্রতিদিন সন্ধ্যায় রেডিও শুনতে বসেন?

১২। আপনি কি বাড়ীতে ফার্নিচার ছবি ইত্যাদি নতুনভাবে সাজানো অপছন্দ করেন?

১৩। আপনি কি রোজই মোটামুটি একই সময়ে শুতে যান এবং ঘুম থেকে ওঠেন?

১৪। আপনি কি প্রতি বছর একই ছুটিতে একই জায়গায় গিয়ে অবসর কাটিয়ে আসেন?

১৫। আপনি কি আপনার পোষাকের কাটছাঁট খুব কম বদলান?

১৬। আপনি কি সবসময়েই কাজে বা দোকানে যেতে একই পথ ধরে চলেন?

১৭। আপনি কি নিজের জীবনটাকে দুঃসহ বোধ করেন?

১৮। পাঁচ বছর আগে আপনার যেসব মতবাদ ছিল, আজও কি প্রায় তাই আছে?

১৯। সাধারণত যেসব খাবার খেয়ে থাকেন, তার থেকে অন্য ধরনের খাবার খেতে আপনি কি পছন্দ করেন না?

২০। নতুন কোন কিছু শেখার বয়স আপনি অনেকদিন আগে পেরিয়ে এসেছেন বলে কি মনে করেন?

●

এবার হিসাব করে দেখুন।

প্রথম ১০টি প্রশ্নের উত্তরে যদি 'হ্যাঁ' জবাব দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি প্রতিটি উত্তরে ৫ পয়েন্ট করে পাবেন। আর, যদি ১১নং থেকে ২০নং প্রশ্নগুলিতে 'না' জবাব দিয়ে থাকেন, তাহলেও আপনি প্রতিটি জবাবে ৫ পয়েন্ট হিসাবে পাবেন।

কেউ যদি মোট ৭০ পয়েন্ট পান, তাহলে তাঁকে চমৎকার সজীব চটপটে মানুষই বলতে হবে। ৫০ থেকে ৭০-এর মধ্যে যিনি পাবেন, তিনি মন্দ নন। কিন্তু ৫০ পয়েন্টের কম পেলে নিশ্চিত বুঝতে হবে, তাঁর জীবনে নীরস আবহাওয়া জমতে শুরু করেছে।

যদি কেউ ৫০ পয়েন্টের কম পেয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে নতুন নতুন আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। নতুন নতুন লোকের সঙ্গে ভাব জমাবার জন্যে এগিয়ে যেতে হবে। নতুন কাজের খেয়াল-খেলা, হবি সখ ইত্যাদি নিয়ে মেতে পড়তে হবে, কিংবা নতুন কোন সংঘ-সমিতি সংগঠনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হবে।

●

পাঁচজনের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে আটকে রাখলে কখনই সুখী হওয়া যায় না। সামাজিক জীবনের বৈচিত্র্য মানুষের সুখ, শান্তি, আনন্দ ও তৃপ্তি জোগায়, সেকথা ভুললে চলবে না।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যত বাড়বে, বৈচিত্র্যের স্বাদ ততই চমৎকার হবে।

দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি কাটানোর ব্যাপারে কেবল যে নানা মানুষের সঙ্গে মেলামেশা দরকার, তাই নয়—নিজের গন্ডীর মধ্যেও কাজকর্ম জিনিসপত্র খাওয়া-দাওয়া পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে অনেক রকম বৈচিত্র্য আমরা নিজেরাই একটু চেষ্টায় নিয়ে আসতে পারি।

প্রতিদিন যেভাবে সময় ধরে কাজ করে চলেন, ভাল না লাগলে মাঝে মাঝে সময় অদলবদল করে নেবেন। তাতে দেখবেন, কাজের কোনও গোলমালই হবে না। মনকে জোর করে কোনও বাঁধা রুটিনের মধ্যে ফেলে রাখলে ক্ষুব্ধ হয়েই সব কাজ করতে হয়।

অনেক সময় ব্যর্থতার আঘাতে জীবনের সমস্ত আশা-ভরসা হারিয়ে গতানুগতিক-ভাবে অনেককেই দিনগত পাপক্ষয় করতে দেখা যায়। তাঁদের প্রতি মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ : একবার যাচাই করে ফেলুন ব্যর্থতা কিসে এবং কেন? যদি দেখেন সেই ব্যর্থতার শূন্যস্থান পূরণ করা সম্ভব নয়, তাহলে তার পরিপূরক অন্য কিছু আপনাকে অবিলম্বে খুঁজে নিতেই হবে। সবকিছুরই পরিপূরক আছে—সঠিক হারানো জিনিসটি না পাওয়া গেলেও তার মতই একটা-না-একটা কিছু নিয়ে জীবনের বৈচিত্র্য-মাধুর্য বজায় রাখা যায়।

জীবনটাকে নীরস বলে মনে হলে অগ্রাহ্য করে থাকবেন না। তা থেকে বিষাদ মনোরোগ সৃষ্টি হতে পারে। ওপরে যা বলা হল, সেই মত যদি করতে না পারেন, কিংবা করা সত্ত্বেও জীবন নীরস মনে হয়, তাহলে মনের ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

[দুই]

সকাল দশটা বাজতে না বাজতেই দরজা জানালা বন্ধ। বাইরে 'লু' বইছে। ঝড়ের মত আওয়াজ। হলুদ বনে বনে একটা অভিমানের মত রুক্ষ, প্রচন্ড, হাওয়াটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমস্ত প্রকৃতি থেকে একটা ঝাঁঝ বেরোচ্ছে। তীব্র, তীক্ষ্ন ঝাঁঝ। সুন্দরী সৌন্দর্যের গর্বের মত। অসহ্য।

জুম্মানকে বর্ধমানের কোন এক লোক নাকি বলে শিখিয়েছিলেন, যে গরম কালে, কলাইয়ের ডাল, পোস্তর তরকারী এবং খোড়া খেলে শরীর ভাল থাকে। তার সঙ্গে কাঁচা আম বাটা নয়ত পাতলা করে ঝোল। অতএব যত গরম পড়ছে, আমার শরীর ততই স্নিগ্ধ হচ্ছে কিন্তু মন যেন ততই বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। শুধু কলাইয়ের ডাল আর খোড়া খেয়ে কতদিন কাটানো যায়।

কাজ যা সব ভোরে ভোরে। দশটার মধ্যে। খুব ভোরে উঠি। কোলকাতায় কোন দিন ভাবতেও পারিনি যে এত ভোরে আমি নিয়মিত উঠতে পারবো। অবশ্য রাতে শুতেও বেশী দেরী হয় না। ভোরের পাখী ডাকাডাকি করার আগেই উঠি। তখনো শুকতারা দেখা যায়, দিগন্তের কাছে, রুমান্ডি পাহাড়ের মাথায় সবুজ সতেজ দপ্ দপ্ করে। শুক্লপক্ষ হলে ভোরে উঠে চাঁদটাকেও দেখা যায়। সারারাত অত বড় নীল আকাশে সাঁতার কেটে চাঁদ ক্লান্ত হয়ে কখন ঘুমোবে সেই আশায় স্থির হয়ে থাকে দিগন্তরেখার উপরে।

হাত-মুখ ধুয়ে বাংলোর হাতায় পায়চারী করি। কোনো কোনো দিন বা ইজিচেয়ারে বসে চুপ করে ভাবি।

এই সময়টা বোধহয় ভাববারই সময়। নির্দিষ্ট মনে কোনও বিশিষ্ট চিন্তাকে বা কোনও বিশেষ জনকে ভাববার সময়। ভাবতে ভাবতে পায়চারী করতে করতে সূর্যটাকে পাহাড় বেয়ে উঠতে দেখি।

সমস্ত জঙ্গল পাখিদের কলকাকলিতে ভরে যায়। টিয়ার ঝাঁক ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ করতে করতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়। ময়ূর ডাকে। [illegible] টিটি টিটি টিটি করতে থাকে [illegible] থেকে। তাছাড়া কত অনামা পাখি, কত অচেনা সুর।

অনেকদিন সূর্য ওঠবার আগেই চা-জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। সঙ্গে 'টাবড়' থাকে। 'টাবড়' আমার মুন্সী; হেল্পার। কোম্পানীরই লোক। অনেকদিনের পুরোনো ও অভিজ্ঞ। ওর বাস নীচের গ্রাম সুহাগীতে। টাবড়ের চেহারা কিছু লম্বা চওড়া নয়। বেঁটে-খাটোই। কিন্তু দেখলেই মনে হয় শক্তিতে ভরপুর। মাথার চুলগুলো পেকে সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু মুখের কি শরীরের অন্য কোথায়ও পেশীতে একটুও টান ধরেনি। মালকোঁচা বাঁধা কাপড়, কাঁধের ওপর শুইয়ে রাখা চকচকে ধারালো টাঙী।

পাকদন্ডী পথ বেয়ে সুগন্ধি বনে বনে তিন মাইল চার মাইল হেঁটে যেতে কিছু মনেই হয় না। বুঝতেই পাই না।

যেখানে 'কুপ' কাটা হচ্ছে সেখানে পৌঁছতাম।

ও'রাও, খরিওয়ার, চেরো, সমস্ত কুলিই টাঙী হাতে সেখানে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে ততক্ষণে। তাদের টাঙী চালানোর ঠকাঠক শব্দে, কাজ করতে করতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলায় সারা জঙ্গল গম্-গম্ করতো। তেওয়ারীবাবুদের কর্মচারী রমেনবাবু কাজ দেখাশোনা করতেন। আমরা দুজন ঘুরে ঘুরে কাজ দেখতাম। টাবড় ঘুরে ঘুরে সর্দারী করত। গরম এখন খুব বেশী, তাই কাজ যা হবার তা সকালে এবং শেষ-বিকেলে হতো।

ইতিমধ্যে কয়েকবার ঘোষদা আর তাঁর স্ত্রী সুমিতা বৌদি এসেছিলেন; আমি কেমন আছি সেই খোঁজখবর নিতে।

ঘোষদার সঙ্গে সুমিতা বৌদিকে মোটেই মানায় না। এই বেমানানের কোনও সঙ্গত কারণ আছে বলে জানা নেই। কিন্তু কেন যেন মনে হয় মানায় না। দুজনের সম্পর্কের মাঝে কেমন যেন একটা অদৃশ্য বিপরীতমুখী ভাব বর্তমান; সেটা প্রমাণ করা মুশকিল কিন্তু বোঝা আদৌ অসুবিধা নয়।

ঘোষদা খুব কৃপণগোছের, হিসেবী পান-খাওয়া মানুষ। একটি ভালো চাকরী আর সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে জীবনে আরও যে কিছু চাইবার আছে বা ছিল সে-কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। এবং কখনো অন্য কেউ মনে করিয়ে দিলে কিংবা অন্য কোনও প্রসঙ্গে সেই বিষয় উঠলে তিনি ব্যথা পান না; বিব্রত হন না; বরং ক্রুদ্ধ হন। একটু ভীতু ভীতু আমুদে, অতিসাধারণ একজন কৃতী এবং গৃহী মানুষ।

সুমিতা বৌদি কিন্তু একেবারে উল্টো। রীতিমত অসাধারণ। ভালো গান গাইতে পারেন, ক্লাসিকাল, ছবিও আঁকেন অদ্ভুত সুন্দর। ও'র চেহারায় এমন একটি বুদ্ধিমত্তার প্রসাধন, এমন একটি নারীসুলভ সৌকুমার্য ও অবলা ভাব যে তা গুছিয়ে বলা যায় না। মানে ও'র কথায়, চোখের তারায়, ও'র ব্যবহারে, এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, ও'র চেয়ে বেশী নারীত্ব আমি এর আগে কোন নারীতে দেখিনি।

আমি নিজেকে শুধিয়েছি। বারবার শুধিয়েছি। জঙ্গলে পাহাড়ে আছি এবং সে কারণে ভদ্রমহিলাদের মুখ না দেখার দরুন বাঁশ-বনে শেয়াল-রানীর মত সুমিতা বৌদিকেও বোধহয় সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা বলে ভ্রম করছি। কিন্তু এ সুন্দরী-অসুন্দরীর কথা নয়। সুমিতাবৌদির মত কমনীয়ভাবে হাসতে, কথা বলতে, এমনকি ঝগড়া করতেও আমি কোনদিন কোনও মেয়েকে দেখিনি।

ভারী ভালো লাগত। এই নিয়ে সুমিতাবৌদি আর ঘোষদা প্রায় তিনবার এলেন রুমান্ডিতে আমার খোঁজ-খবর নিতে। ছুটির দিনে সকালে জীপ নিয়ে চলে আসতেন। সারাদিন কাটিয়ে যেতেন। যেদিন ও'রা আসতেন, ভারী ভাল কাটত দিনটা আমার। আমি যে এই রুমান্ডিতে পড়ে আছি তা মনেই হত না। ভাল ভাল বাঙালী-ফর্দের রান্না হত, আনন্দ করে খাওয়া হত। তারপর প্রচুর আড্ডা। মাঝে মাঝে যশোবন্ত আসত। কিন্তু বুঝতাম যে ঘোষদা যশোবন্তকে বিশেষ পছন্দ করেন না। এবং ঘোষদা-বৌদি যেদিন এখানে আসেন, সেদিন যে যশোবন্ত এখানে আসে, তা উনি বিশেষ চান না।

যশোবন্তের নামে দিনে দিনে অবশ্য অনেক কিছু শুনি। অনেকের কাছে। যা সব শুনি, তার সব কথা ভাল নয়, এবং কিছু কিছু ত এত বেশী খারাপ যে বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয় না।

এখানকার লোকেরা বলে যশোবন্ত পাঁড় মাতাল। খুনীও বটে। কত যে পুরুষ আর নারী ওর শিকার হয়েছে তা লেখা-জোখা নেই। অবশ্য এসব কথা যাচাই করে দেখার মত সুযোগ আমার আসে নি। হয়ত-বা ইচ্ছেও নেই। কারণ যাদের কাছে এসব কথা শুনেছি তারা কিন্তু কেউ বলে নি যে যশোবন্ত লোকটা খারাপ। ওদের মুখ দেখে যা বুঝেছি তা হচ্ছে, যশোবন্ত-বাবুর পক্ষে অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। ওর পক্ষে সব কিছুই করা সম্ভব।

সুমিতা বৌদি যে যশোবন্তকে তেমন অপছন্দ করেন তা কিন্তু মনে হয় না। তিনি ঠিক আমার সঙ্গেও যতটুকু হেসে কথা বলেন, যশোবন্তের সঙ্গেও তেমনি। যশো-

বস্তু যে ভয় পাবার মত কিছু তা ওঁর মুখ-চোখ দেখলে মোটেই বোঝা যায় না। বরঞ্চ উনি যশোবন্তের সঙ্গে, যশোবন্তের সর্বশেষ মারা বাঘটার দৈর্ঘ্য নিয়ে আলোচনা করেন, যশোবন্তের হাজারীবাগ জেলায় এবার ফসল কেমন হলো না হলো, এই সব নিয়ে আলোচনা করেন।

যশোবন্তও বৌদি বলতে পাগল। বৌদির জন্যে জান কবুল করতে রাজী। ও যে কার জন্যে জান না কবুল করে জানি না।

আজকে সুমিতা বৌদি আর ঘোষদা প্রায় সূর্য ওঠার আগে-আগেই এসে হাজির।

বৌদি বললেন : 'আজকে সুহাগীর ছায়ায় আমরা পিকনিক করবো। যশোবন্তও আসবে। খুব মজা হবে।'

ঘোষদা বললেন, 'যশোবন্ত না আসা পর্যন্ত নদীতে যাওয়া হবে না। কোনও একটা আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া এইভাবে 'নেচার' করার আমি ঘোরতর বিপক্ষে।

তখন ঠিক হলো তাই হবে। এখানেই চা খেয়ে নেব সকালের মত। তারপর যশোবন্ত এলে সকলে মিলে নীচে গিয়ে সুহাগীর বালিতে কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় বসে 'চড়ুইভাতি' হবে।

বাঙলোয় বসে রসিয়ে-রসিয়ে চা খাওয়া হলো। যখন সূর্য বেশ উপরে উঠল, তখনো যশোবন্তের পাত্তা নেই। সাব্যস্ত হলো রামধানিয়ার কাঁধে রসদ ও বাসনপত্র দিয়ে আমরা নেমেই যাই। যশোবন্ত এলে পাঠিয়ে দেবে 'জুম্মান'।

ঘোষদার জীপে করে যাওয়া হলো।

সুহাগী নদী সেই পাহাড়ী পথকে পারে মাড়িয়ে হাসতে-হাসতে নীচু 'কজওয়েরে' নীচ দিয়ে কোয়েলের দিকে চলে গেছে। জীপ থামতেই চিঁহি-চিঁহি আওয়াজ কানে এলো। তাজ্জব বনে দেখলাম যশোবন্তের ঘোড়া বাঁধা আছে একটি পলাশ গাছের সঙ্গে।

নদীরেখা ধরে এগোতেই দেখি, নদীর বাঁকে ওর সেই প্রিয় বড় ছায়া-শীতল পাথরের পাশে উবু হয়ে বসে বড় বড় নুড়ি দিয়ে যশোবন্ত উনুন বানাচ্ছে। আমাদের সাড়া পেয়ে তেড়ে-ফুঁড়ে বলল, 'বেশ লোক যা হোক। প্রায় একটা ঘন্টা হলো এসে বসে আছি—না দানা, না পানি।'

সুমিতা বৌদি কলকল করে উঠলেন, 'বাজে বোকো না, তোমাকে কে সোজা এখানে আসতে বলেছিল? যা উনুন বানিয়েছ তাতে বাঁদরের পিণ্ডিও রান্না হবে না। সরো সরো দেখি উনুনটা ধরাতে পারি কিনা।'

ঘোষদা শশব্যস্তে বললেন, 'কই? যশোবন্ত তোমার বন্দুক কই? এই রকমভাবে জঙ্গলে মেয়েছেলে নিয়ে আন-আর্মড অবস্থায় কখনোই আসা উচিত নয়। বাঘ আছে, ভাল্লুক আছে, হাতী তো আছেই, তার উপর বাগেচম্পা থেকে মাঝে-মাঝেই বাইসনের দল চলে আসে, বলা যায় কিছু?

যশোবন্ত চুপ করে কি ভাবল একটুক্ষণ তারপর হেঁটে গিয়ে ওর ঘোড়ার জিনের সঙ্গে সমান্তরালে বাঁধা একটি গুপ্তীযন্ত্রের মত যন্ত্র বের করে আনল। কাছে এসে গাছে ঠেস দিয়ে রেখে বলল, 'এই হলো ত? এবার বাইসন এলেও মজা বুঝবে। এ বন্দুক নয়। ফোর-ফিফটি-ফোর হাণ্ড্রেড ডবল ব্যারেল রাইফেল।'

বৌদি কেটলিটা উনুনে চড়াতে-চড়াতে বললেন, 'তার মানে? একসঙ্গে সাড়ে চারশো-পাঁচশো গুলি বেরোয়?'

যশোবন্ত হতাশ হবার ভঙ্গিতে পাহাড়ের উপর বসে পড়ে বলল, 'হোপলেশ। সাচমুচ বৌদি। হোপলেশ।' তারপর হাত নেড়ে বলল, 'চারশো-পাঁচশো' গুলি বেরোয় না, এটা রাইফেলের ক্যালিবার।'

বৌদি ঘাড় ফিরিয়ে হাসলেন, বললেন, 'ওঃ তাই বলো। তা রাইফেলের মালিকের ক্যালিবার কত?'

যশোবন্ত এবার হেসে ফেলে বলল, 'তার ক্যালিবার বুঝনেওয়ালা লোকও আজ পর্যন্ত এই পালামৌর জঙ্গলে দেখলাম না একজনও। তাই সে আলোচনা করা বৃথা।'

জুম্মানের কাছে শুনেছি, যশোবন্ত অত্যন্ত 'রাইস আদমীর ছেলে'। ওদের ছোট-খাট জমিদারীর মত আছে সীমারিয়া আর টুটিলাওয়ার মাঝামাঝি। মুখে ও যাই বলুক, বাঙলাটা খুব ভালো বললেও ওরা আসলে বিহারীই হয়ে গেছে। বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। ওদের জমিদারীর মাসিক আয় নাকি প্রায় হাজার দুয়েক টাকা। অথচ এই অল্প টাকার মাইনেতে এই জঙ্গলে ও পড়ে আছে আজ কত বছর। এই কাজটা বোধহয় ওর পেশা নয়, নেশা। বেহেতেরীন শিকারী নাকি ও। সারা বছর এইখানেই পড়ে থাকে; বছরে কোনও সময় যায় বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করতে। বেশীদিন থাকে না, পাছে ধরে বিয়ে দিয়ে দেয়। যশোবন্ত প্রায়ই আমাকে বলে, যে বিয়ে-করা পুরুষ মানুষ আর ভরপেট মহুয়া-খাওয়া মাদী শম্বর নাকি সমগোত্রীয় চলচ্ছক্তিহীন জানোয়ার।

হঠাৎ ঘোষদা বললেন, 'এই গরমে যে কোনও ভদ্রলোক চড়ুইভাতি করে এই প্রথম দেখলাম।'

যশোবন্ত বলল, 'তাও যা বললেন 'ভদ্রলোক'। মাঝে মাঝে এমনি বলবেন। নইলে আমরা যে ভদ্রলোক এ কথাটা এক আমরা এবং জঙ্গলের জানোয়াররা ছাড়া আর কেউ তো স্বীকার করে না। মাঝে মাঝে কথাটা শুনতে ভালো লাগে।'

ঘোষদা উত্তরে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

বৌদি ধমকে বললেন, 'তোমরা এখানে কি করতে এসেছ? চড়ুইভাতি করতে না ঝগড়া করতে?'

যশোবন্ত উলটো ধমক দিয়ে বলল, 'দুটোই করতে।'

গরম যদিও আছে প্রচণ্ড। তবু কেন জানি...এ গরমে একটু কষ্ট হয় না। কারণ এ গরমে ঘাম হয় না মোটে। শুকনো গরম। খুব বেশী হলে মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করে। তবে এই গরমে বেশী হাঁটা-চলা করলে 'লু' লেগে যাবার সম্ভাবনা এবং তা থেকে অনেক সময় পঞ্চত্বপ্রাপ্তিও ঘটে। তবু কলকাতার ভ্যাপসা-পচা গরম থেকে এ গরম অনেক ভালো। মনে হয় মনের মধ্যেও যতটুকু ভেজা স্যাঁতসেঁতে ভাব থাকে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে দেয় নিশ্চিহ্ন করে। মনটা যেন তাজা, হাল্কা, সজীব সুগন্ধে ভরে ওঠে।

আর্দ্রতা যতো কম থাকে মনে, ততোই ভালো।

সুমিতা বৌদি আমায় বললেন, 'কি হোল এমন গোমড়ামুখো কেন?' বললাম ভাষাটা কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারছি না।

বৌদি সপ্রতিভ ভাষায় হেসে বললেন, 'এ একটা সমস্যা নয়। আগে একটি 'ক্যা' পরে একটা 'বা'। তাহলেই ফিফটি পারসেন্ট হিন্দি-নবীশ হয়ে গেলে। বাদবাকী ফিফটি পারসেন্ট থাকতে থাকতে হবে। ভাষা এমনি শেখা যায় না। ভাষা শিখতে কান চাই। তোমার চার পাশে যতলোক কথা বলছে, তাদের উচ্চারণ তাদের বাচনভঙ্গী এবং তারা কোন জিনিসটিকে কি বলে, কোন অনুভূতি কি-ভাবে ব্যক্ত করে, এইটে বুদ্ধিমানের মত নজর করলে যে কোন ভাষা শেখাই সহজ।'

যশোবন্ত বলে উঠল, 'জব্বর বলেছেন যা হোক। এই করেই আমি মুরগী-তিতির আর শম্বরের ভাষা আয়ত্ত করেছি।'

বৌদি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আর 'ঘাড়ফরাসী' ভাষা? সেটা আয়ত্ত করো নি?'

দাঁতে একটা ঘাস কাটতে কাটতে দুষ্টু যশোবন্ত বলল, 'এ জঙ্গলে ঘোড়-ফরাস বেশী নেই। তাই তাদের সঙ্গে কথোপকথন হয় নি।'

বৌদি পুরনো কথার সুতো ধরে বললেন, 'তবে যা বলছিলাম, পালামৌর হিন্দি শিখতে হলে 'ক্যা' আর 'বা'। প্রথমে এই দিয়েই আরম্ভ করতে হবে।'

যশোবন্ত আমার দিকে ফিরে বলল, 'তাহলে আরম্ভ হোক। বলো দেখি ভায়া 'কী সুন্দর সূর্যোদয়'। হিন্দিতে কি হবে?' একটা ব্রেনওয়েভ এসে গেল, বললাম, 'কা বঢ়িয়া সনরাইজ বা।'

বৌদি, ঘোষদা আর যশোবন্ত একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'সাবাস, সাবাস। হবে তোমার হবে।'

দেখতে দেখতে দুপুর হলো। আমরা খেতে বসেছি, এমন সময় নদীর পাশ থেকে কি একটা জানোয়ার আমাদের ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়ে ডেকে উঠলো। ডাকটা অনেকটা অ্যালসেসিয়ান কুকুরের ডাকের মত। ঘোষদা চমকে বললেন, কি ও! মিথ্যা কথা বলব না, আমিও ভয় পেয়েছিলাম।

যশোবন্ত হাসতে লাগল, বলল, কোটরা হরিণ ঘোষদা। আমার ধারণা ছিল না যে এদ্দিন জঙ্গলে থেকেও আপনি কোটরার ডাক শোনেন নি।

ঘোষদা সামলে নিয়ে বললেন, শুনেব না

কেন? না শোনার কি আছে? তবে খেতে বসার সময় এসব বিপত্তি আমার ভালো লাগে না।

আমি শুধোলাম, কোটরা কি?

যশোবন্ত বলল, কোটরা এক রকমের হরিণ। ছাগলের মত দেখতে। ছাগলের চেয়ে বড়ও হয়। ইংরাজীতে বলে Barking deer. অতটুকু জানোয়ার যে অত জোরে আর অত কর্কশ স্বরে ডাকতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। জঙ্গলের মধ্যে কোনও রকম অস্বাভাবিকতা, বাঘের চলা-ফেরার বা শিকারীর পদার্পণের খবর ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জঙ্গলে জানান দিয়ে দেয়। সে দিক দিয়ে শিকারীদের কাছে এই জানোয়ার বন্ধু বিশেষ।

আমি শুধোলাম, 'এই জঙ্গলে কি কি জানোয়ার আছে?'

যশোবন্ত বলল, অনেক রকম জানোয়ার আছে। সে সব কি মুখে বলে শেখানো যায়; সব ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে। দাঁড়াও না। তোমাকে আমার চেলা বানাবো।

ঘোষদা ধমক দিয়ে বললেন, 'থাক। তুমি নিজে ডাকাইত। দয়া করে ওকে আর চেলা বানিও না। নিজে তো গোল্লায় গেছ, এই ছেলেটিকে আর দলে টেনো না।'

একথা শুনে যশোবন্ত হাসি হাসি মুখে ঘোষদার দিকে তাকালো। কথা বলল না।

দেখতে-দেখতে বিকেল গড়িয়ে এলো। রোদের তেজ কমে গেল। হাওয়াতে মহুয়ার গন্ধ ভেসে আসছে। সুহাগী নদীর শেষ বালুরেখায় দু-পাশের গাছের ছায়াগুলো দীর্ঘতর হয়ে এলো।

বেশ কাটলো দিনটা। একরকম সুন্দর শান্ত দিন সব সময় আসে না। এসব দিন মনে রাখবার মত। অথচ কোনও বিরাট ঘটনা ঘটে নি। কোনও চিৎকৃত সভার আয়োজন হয় নি।

ঘোষদা ও সুমিতা বৌদি আর বাংলো অবধি এলেন না। সোজা জীপে ডালটনগঞ্জের দিকে বেরিয়ে গেলেন। যশোবন্ত ওর ঘোড়ায় চেপে আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে বাংলোয় ফিরল।

সময় কেটে গেল কিছুটা। যশোবন্ত গিয়েছে চান করতে। আমি একা।

চান করে টাটকা হয়ে যশোবন্ত এসে বসল ইজিচেয়ারে, তারপর হাঁক ছাড়লো 'এ রামধনিয়া ঠাণ্ডাই লাও।' অমনি রামধনিয়া যথারীতি সিদ্ধি, পেস্তা, বাদাম ও ভয়সা দুধ দিয়ে বানানো ঠাণ্ডাই শ্বেত-পাথরের গেলাসে করে এনে দিল। যশোবন্ত খুব রসিয়ে-রসিয়ে খেল।

যশোবন্ত বলল, 'লালসাহেব আজ ঘোষদা মে মুঝে বিলকুল খরাব বানা দিয়া। মগর জানতে হো মাঁইজী গালীব নে কেয়া কহা থা?'

কেন জানি না, আমার মনে হলো আজ যশোবন্ত মেজাজে আছে। আজকে হয়তো ও নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলে ফেলবে, যা ও অন্যদিন হয়তো কোনক্রমে বলতো না।

আমি ওকে খুঁচিয়ে দিয়ে বললাম, 'এমনি এমনি কেউ কাউকে খারাপ বলে না নিশ্চয়ই।'

যশোবন্ত একবার মুখের দিকে তাকালো। বলল, দোষ-গুণ জানি না। আমি যা, আমি তা। লুকোচুরি আমি পছন্দ করি না। আমি যা 'সেই আমাকে' যদি কেউ ভালবাসে, কাছে ডাকে, তাকেই আমি দোস্ত বলি, অন্যকে বলি না, অন্যের জন্যে আমি পরোয়াও করি না। আমি মদ খাই। কিন্তু আমি মাতাল নই। যখন ইচ্ছে হয় খাই। কেউ আমাকে 'কাহার'দের মতো রাস্তায় মদ খেয়ে মাতলামি করতে দেখে নি। মদ খাওয়া ছাড়াও আমি এমন অনেক কিছু করি যা শুনলে তোমাদের মতো ভালোছেলেরা আঁতকে উঠবে।

আমি বললাম, 'কিন্তু যশোবন্ত তোমার মত ছেলে মদ খাবে কেন?'

যশোবন্ত আমাকে চোখ রাঙিয়ে বলল, 'তোমার মতো ছেলে বলছ কেন? আমি কি তোমাদের মতো মাখনবাবু নাকি? মদ খাই, খেতে ভাল লাগে বলে। দিল খুশ হো যাতা হ্যায়। তাই খাই।'

'কিন্তু তোমার কি এমন দুঃখ, যার জন্যে তোমাকে এমন ভাবে নষ্ট হয়ে যেতে হবে?'

যশোবন্ত খুব একচোট হাসলো। কেঁপে-কেঁপে তারপর বলল, 'যে সব লোক দুঃখ ভোলার দোহাই দিয়ে মদ খায় সেগুলো মানুষ নয়। আমি মদ খাই কোন দুঃখ ভোলার জন্যে নয়। কারণ কোনও দুঃখ আমার নেই। মদ খাই খেতে ভালো লাগে বলে। খেয়ে নেশা হয় বলে। খেয়ে দিল খুশ হয় বলে। কোনো শালার বাবার পয়সায় খাই না। নিজের পয়সায় খাই। খেতে ভালো লাগে বলে খাই। বেশ করি।'

'তারপর বুঝলে লালসাহেব, যেদিন ইচ্ছা হয় 'লালতি'র কাছে যাই। আগে রুকমনিয়ার কাছেও যেতাম। সে তো মরে যাবে শিগগিরি। সেও এক ইতিহাস। লালতির কাছে যাই কিন্তু কিনি পয়সায় যাই না। নিজের পয়সা খরচ করতে হয়।'

আমি বললাম, 'থাক তোমার এই বীরত্বের কাহিনী আমাকে আর নাই-বা শোনালে। অসুবিধা এই, যে তুমি যা বাহাদুরি বলে বিশ্বাস করেছ তা থেকে তোমাকে নড়ানো আমার ক্ষমতার বাইরে। মনে হয় চেষ্টা করাও বৃথা।'

যশোবন্ত আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'চেষ্টা করো না লালসাহেব। আমাদের বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হলে আমি যা আমাকে তাই থাকতে দিও। যদি কোনও দিন নিজেকে বদলাই ত' এমনিই বদলাব, নিজেকে বদলানো প্রয়োজন বলে বদলাব, নিজে যখন মন থেকে সেই পরিবর্তন কামনা না করব, ততদিন পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই, যা আমাকে বদলায়। তুমি বৃথা চেষ্টা করো না।'

আমি বললাম, 'রুকমানিয়া না কার কথা বললে। ঘোষদার কাছে শুনেছি তার জীবন নাকি ইতিহাস? বল না যশোবন্ত, কি সে ইতিহাস? আর কে সে রুকমানিয়া?'

সেই অন্ধকারে ওর তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে যশোবন্ত আমাকে নিঃশব্দে চিরে-চিরে দেখল কিছুক্ষণ; তারপর হায়নার মত বুক কাঁপিয়ে হেসে উঠল। বলল, 'একেবারে হুবহু।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'হুবহু কি?'

'হুবহু শহুরে লোক। কৌতূহলী, বিশেষ করে কোনও নিন্দার বিষয় হলে। পরনিন্দা আর পরচর্চা, এই তো করে, কি বল? তোমার শহুরে লোকেরা?'

তারপর নিজেই বলল, 'রুকমানিয়ার গল্প তুমি শুনতে চাও তো শোনাব। তবে সে আজ নয়। সময় লাগবে। অন্যদিন হবে। অনেক বড় গল্প। লালসাহেব, শুধু রুকমানিয়া কেন? এই যশোবন্তের কাছে কুড়ি-কুড়ি গল্প আছে। এক-একটা দিনই এক-একটা গল্প।'

আরো কিছুক্ষণ পর যশোবন্ত উঠল বলল, 'অব চলে ইধার।'

বললাম, 'এই অমাবস্যার অন্ধকারে জঙ্গলের পথে যাবে? আঁকাবাঁকা রাস্তা মোটে দেখা যাচ্ছে না, যাবে কি করে? থেকে যাও না আজ।'

যশোবন্ত বলল, 'আরে ঠিক যাব। এইটুকু মজা লাগে এমনি অন্ধকারে ঘোড়া চালিয়ে। ডাইনে-বাঁয়ে দেখার কিছু নেই। সব অন্ধকারে কালো-কালো। শুধু আঁকাবাঁকা উঁচু-নীচু রাস্তাটাকে মনে হয় একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ। অথচ সেইটুকু দেখা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।'

'অন্ধকারে চাইলেই চারপাশ থেকে অন্ধকার মুখে-চোখে ঝাপটা মারে। ঘোড়ার ওপর সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আস্তে-আস্তে মহুয়ার গন্ধ নাকে নিয়ে খোয়াব দেখতে-দেখতে চলে যাই; দেখি কখন আইহার পৌঁছে গেছি। তোমাকেও ঘোড়ায় চড়া শেখাব, দাঁড়াও না।'

বললাম, 'হাঁ, তুমি তো আমাকে সব কিছুই শেখাচ্ছ।'

যশোবন্ত ঘোড়ায় উঠতে-উঠতে বলল, 'দেখো না, ঠিক শেখাব।'

ঘোড়াকে হাত দিয়ে গলার কাছে একটু চাপ দিয়ে যশোবন্ত বলল, 'চল ভয়ংকর।'

অবাক হয়ে বললাম, 'ভয়ংকর কি? ঘোড়ার নাম ভয়ংকর?' ও বলল, 'এই রকম ভয়াবহ জায়গায় নিজে ভয়ংকর না হলে বাঁচবে নাকি? শালা হাতীকে বড় ভয় পায়।'

খট খট খটা খট করে যশোবন্তের ভয়ংকর ভয়াবহ অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

(ক্রমশ)

নানা প্রসঙ্গ

উঁচু উঁচু চিমনী। অ্যাপ্রোন পরে মই বেয়ে মেয়েরা সেই চিমনী রঙ করছে। এ-দৃশ্য হালফিল দুনিয়ার নতুন না হলেও, পুরোপুরি পুরোন নয়। এ-কাজে কোনদিন মেয়েরা এগিয়ে আসেনি ইতিপূর্বে। বলতে গেলে এগুলো ছিল পুরুষের একচেটিয়া। কিন্তু সে মনোপলির অবসান হয়েছে। এক-চেটিয়া বলে কথাটাই আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। নকল দাঁত তৈরীর কারখানায় মেয়েরা এখন গভীর মনোযোগে কাজ করে। নকল দাঁত তৈরী করে। এখানেও একদিন মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল না। রুদ্ধ দুয়ার আজ খুলে গেছে। আজ সব কাজে মেয়েরা হাত লাগাচ্ছে।

এতো গেল ডাঙার কথা। জলেও মেয়েরা পিছিয়ে নেই। নাবিক থেকে ক্যাপ্টেন সবই তারা। তাদের হাতেই জাহাজের নাবিক্য। ঢেউয়ের ঝুঁটি শক্ত মুঠোয় ধরে জাহাজ চালাচ্ছে। একদিন তো জাহাজে মেয়েরা ছিল নিতান্তই অপাংক্তেয়। সেদিন জাহাজে উঠতে মেয়েদের কথা শুনলেও আঁতকে উঠতেন। আজ আর তো হবার উপায় নেই। অসংখ্য যাত্রী মহিলা ক্যাপ্টেন নির্দ্বিধায় জাহাজে সমুদ্র-যাত্রা করছেন একান্ত নির্ভয়ে এবং নিশ্চিন্ত বিলাসে।

জলে-স্থলে মেয়েরা প্রায় সব কাজেই হাত লাগিয়েছে। অন্তরীক্ষও বাদ নেই। জলের আগেই সেখানে তাদের হাজিরা হয়ে গেছে। দেশে দেশে মেয়েরা বিমানচালনায় পুরুষকে পাল্লা দিয়ে চলেছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মহিলা পাইলটের সংখ্যা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। সে-তুলনায় আমাদের দেশে তেমন কিছু একটা করে উঠতে পারেনি। জনা-তিনেক মহিলা পাইলট এবং প্যারাসুটার নিয়ে আমাদের জল্পনা এবং গর্ব। এভাবেই মহিলাদের বিশ্বজোড়া অগ্রগতিতে আমরা সামিল। এই তো বছর-তিনেক আগে একজন বৃটিশ মহিলা এরোপ্লেনে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন পৃথিবী প্রদক্ষিণের আকাঙ্ক্ষায়। বিমানে তিনি একা। অনেক দেশ ঘুরতে ঘুরতে কল-কাতার মাটিও ছুঁয়ে গেলেন। এরকম ঘটনাও এখন সহজ ঘটছে। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় এক নিঃশ্বাসে যেদিন আটলান্টিক পার হলেন, সেদিন ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল। এতদিন পুরুষরা এ-কৃতিত্ব একাই আঁকড়ে ছিল। দিন বদল হয়েছে। পালাগানও তাই নতুন। এ-পালার সূত্রধার মহিলা।

এতদিন পর্বতের নাম আমরা দূরে থেকেই শুনতাম। কখনো কখনো ছবিতে দেখতাম বরফে ঢাকা পড়ে আছে হিমালয় বা আল্পস। এই পর্যন্তই। অন্য কোন বাসনার উদয় হয়তো হতো না। হলেও তুষারের শীতলতায় তা হিম হয়ে যেতো। পাহাড়ে পাহাড়ে আমরা নেচে বেড়াবো, গিরিশৃঙ্গ জাপটে ধরবো, শিখরে শিখরে বিজয়পতাকা গাঁথবো—এত কথা নিশ্চয়ই একসঙ্গে আমরা কল্পনায়ও আনতে পারতাম না। এমনকি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নেও নয়। এত বড়ো স্বপ্ন দেখার স্পর্ধাই ছিল না। কিন্তু সব স্বপ্নই দুঃস্বপ্ন নয়। পর্বতে পর্বতে এখন আমাদের বিজয়-যাত্রা প্রায় মহোৎসবের সমান। রন্টি, বড়া শিগারির পর আমাদের মেয়েরা এখন আল্পস অভিযানের কথা চিন্তা করে। পশ্চিমের মেয়েদের মতো হয়তো এ-চিন্তাও ওদের বাস্তবায়িত হবে।

পাহাড়ে চড়ার নেশা এ-দেশের মেয়েদের পেয়ে বসেছে। পর্বত আরোহণকালে ত্রিশূল গিরিবর্ত্মে প্রাণ হারিয়েছেন অনিমা সেন। এই আত্মাহুতি ব্যর্থ হতে দেওয়া যায় না। তাই শিখর থেকে শিখরে উড়িয়ে দেওয়া চাই মানুষের বিজয়চিহ্ন—এঁকে দেওয়া চাই নারী-পদচিহ্ন। বাংলা থেকে শুরু করে গুজরাট সর্বত্র মেয়েরা বেরিয়ে পড়েছে পর্বতশৃঙ্গ জয়ের নেশায়। সাহসে এরা দুর্জয়, বুকে বল ওদের অসীম। সংকল্পে এরা স্থিরসংকল্প। জয় ওদের হবেই।

আবার যদি রাশিয়ার দিকে তাকাই বিস্ময়ে অবাক মানতে হয়। তরতর করে ওদেশের মেয়েরা এগিয়ে চলেছে। বিশ্ব নারী-প্রগতি আন্দোলনের মুখ্য প্রবক্তা এ-দেশের নারীসমাজ। সেখানকার কলকার-খানা থেকে রাষ্ট্রশাসন সর্বত্র ওরা আছে। এমন কতগুলি পদও আছে যেখানে ওদের একচ্ছত্র আধিপত্য। এমনকি মহাকাশে রুশ-ললনা নিজের কৃতিত্বে অভিযান চালিয়ে এসেছে। ওরা পৃথিবীর নারীজাতির বন্ধন-মুক্তি এবং প্রগতির পথপ্রদর্শকস্বরূপ।

আমাদের দেশে প্রায় বিনা আয়াসে আমরা অর্জন করেছি পুরুষের সমান অধিকার। আমাদের সংবিধান নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছে নারীর বিরাট ভূমিকা। কিন্তু পশ্চিমের অনেক দেশেই এই অধিকার আদায় করতে দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছে। আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানী সেই তালিকায় পড়ে। নতুন পৃথিবীতে সম্ভাবনার অগ্রদূতের দাবী নিয়ে যারা হাজির তারাও অনেক পিছিয়ে ছিল এ-ব্যাপারে। এখন অবশ্য সকলের সমান অধিকার। জার্মানীর নারীকুলকে একদা অনেক ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। সমসাময়িক কার্টুনিস্টরা তাদের সমানাধিকারের প্রচেষ্টাকে ক্ষমা করেননি। আজকে বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁরা লজ্জা পেতেন। তাঁরা বেঁচে নেই। তাঁদের কার্টুন নিয়ে আজ আমরা হাসি-তামাশা করি—অনাবিল আনন্দে মেতে উঠি। মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে যাই। ভাববার চেষ্টা করি, দুঃখের তিমিররাত্রি পেরিয়ে যে নতুন দিন আমরা নিয়ে এসেছি, তার জন্য কি কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে। আবার আজকের দুর্মদ অগ্রগতি দেখে সেদিনের জন্য কোন ক্ষোভ থাকে না। দুঃখ পেয়েছি বলেই হয়তো সাফল্য এত বেশি।

●

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মহিলাদের স্বাভাবিক অধিকার স্বীকারে কোন দ্বিরুক্তি হয়নি। আর ওদের অগ্রগতিও সকলের পক্ষে চমক সৃষ্টি করেছে। শুধু নভশ্চর নয়, কয়েক হাজার মহিলা পাইলট রাশিয়ার গর্বের ধন।

রাষ্ট্র-পরিচালনায় মহিলাদের কৃতিত্ব ঐতিহাসিক সত্য। তবে এ-যুগ স্বতন্ত্র। জমানার বদল হয়েছে। আজ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি রাষ্ট্রের পরিচালক। ভারতের মতো সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। সিংহলে ছিলেন শ্রীমতী বন্দরনায়েক এবং পাকিস্তানে আয়ুবের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ফাতিমা জিন্না। এ হোল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ। এছাড়া দেশ শাসনে মহিলার ভূমিকা আজ বিরাট। সেটা যে-কোন দেশের পার্লামেন্টের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। স্বাভাবিকভাবেই মন্ত্রী পর্যায়েও তারা কৃতিত্বের সঙ্গে শাসনকার্যে অংশ নিচ্ছে।

দেশে দেশে স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে মহিলার নিয়োগও চলেছে বেশ কিছুদিন। এ-ক্ষেত্রে আমরাই সম্ভবত পথিকৃৎ। সম্প্রতি আফ্রিকান দেশগুলিও মহিলা রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যস্ত। রক্ষণশীল গ্রেট ব্রিটেনও এসম্বন্ধে ভাবছে। আমেরিকা ইতিমধ্যেই কয়েকটি দেশে মহিলা রাষ্ট্রদূত নিয়োগও করেছে। অন্যান্য কয়েকটি দেশও আছে। তবু অনেকেই এখনো পেছিয়ে আছে।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম মহিলা সভানেত্রী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী। এবার নির্বাচিত হয়েছেন লাইবেরিয়ার মিস অ্যাঞ্জি এলিজাবেথ ব্রুকস। এভাবেই বিশ্বের নারীসমাজের জয়যাত্রা ছড়িয়ে পড়ছে দিক থেকে দিগন্তরে।

সম্প্রতি নারী এবং শিশু কল্যাণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ছ'জন নারী প্রতিনিধি গিয়েছিলেন পশ্চিম জার্মানী। সেদেশের নানা জায়গা তাঁরা ঘোরেন। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর মহিলাদের প্রগতিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা মন্তব্য করেন, দিনে দিনে এঁরা সুন্দর এবং স্বাধীন হচ্ছেন। আজকের জার্মান রমণীকুলের এ-সম্মান নিশ্চয়ই প্রাপ্য। সারা বিশ্ব জুড়ে যে নারী-প্রগতির ঢেউ বয়ে চলেছে তাঁরা তাতেই মদত জোগাচ্ছেন। কৃতিত্ব সকলেরই।

—প্রমীলা

বেতার-সম্প্রচারের গোড়ার দিকে সঙ্গীতশিল্পীরা আর সঙ্গীতপ্রেমীরা বেতারে সঙ্গীত প্রচারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা এর বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁরা কিছুতেই বেতারে সঙ্গীত প্রচার মেনে নিতে চান নি। এই পরিকল্পনাকে তাঁরা "জঘন্য পরিকল্পনা" বলেছিলেন— 'abominable contrivance'

তাঁদের এই বিরোধিতা ও আপত্তির কারণ বোঝা যায়। তখন বেতারের শিশুকাল—বেতার-সম্প্রচারের যন্ত্রপাতি শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হতে পারে নি, বেতার-সম্প্রচারের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম পরীক্ষার স্তরে, মাইক্রোফোনগুলি আজকের তুলনায় আদিম যুগের, স্টুডিওগুলির 'অ্যাকুস্টিক ট্রিটমেন্ট'ও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। কাজেই বেতারে প্রচারিত সঙ্গীতের আসল রূপটাই তখন যেত পালটে। বেতারে কখনই সঙ্গীত তার নিজস্ব রূপে ধরা দিত না। প্রকৃতপক্ষে, বেতার-কেন্দ্রে স্টুডিওর ভিতরে মাইক্রোফোনের সামনে উপবিষ্ট শিল্পীর কাছ থেকে গৃহাভ্যন্তরে শ্রোতার সামনে স্থাপিত রেডিওসেট পর্যন্ত সমগ্র সম্প্রচার-পদ্ধতিটাই ছিল বিবর্তনের স্তরে। তাই সঙ্গীতের আসল রূপ বিকৃত হয়ে যেত, যে রূপে সঙ্গীত পরিবেশিত হত, শ্রোতার কাছে সেই রূপে পৌঁছুত না। শ্রোতারা অভিযোগ করতেন, কখনও কখনও শিল্পীদেরও দোষ দিতেন।

তাই বেতার-সম্প্রচারের গোড়ার দিকে বেতারে সঙ্গীত প্রচারে সঙ্গীতশিল্পী আর সঙ্গীতপ্রেমীদের বিরক্তি আর উষ্মা বিস্ময়কর নয়।

বিস্ময়কর হচ্ছে, অধিকাংশ দেশেই বেতারের প্রতি এই বৈরিতা বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, বেতারে সঙ্গীত প্রচারের প্রতি বৈরী মনোভাব কাটিয়ে তুলতে বেশ সময় লেগেছিল। বৃটেনে বেতার-সম্প্রচারের ছ বছর পরেও স্যর টমাস বীচাম ১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসের 'মিউজিক্যাল টাইমস' পত্রিকায় বেতারে সঙ্গীত প্রচারের তীব্র নিন্দা করে লিখেছিলেন :

Ever since the beginning of the present century there has been committed against the unfortunate art of music every imaginable sin. But all previous crimes and stupidities pale before this latest attack on its fair name the broadcasting of it by means of wireless......The performance of music through this or any other kindred contrivance cannot be other than a ludicrous caricature ... If the wireless authorities are permitted to carry on their devilish work, in ten years, time the concert halls will be deserted.

["The B.B.C. From Within", Lord Simon, published by Victor Gollanz Ltd., London (1953), p. 108.]

কিন্তু দশ কেন, চল্লিশ বছর পরেও কনসার্ট হলগুলি পরিত্যক্ত হয় নি। তার কারণ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। টেকনিক্যাল আর এঞ্জিনীয়ারিং উন্নতি বেতার-সম্প্রচারকে তার শৈশবাবস্থা থেকে পূর্ণ যৌবনে নিয়ে এসেছে। বেতার এখন সঙ্গীত প্রচারের একটা 'আদর্শ মাধ্যম'। বেতারকেন্দ্রের স্টুডিওর ভিতরে মাইক্রোফোনের সামনে শিল্পীরা যা পরিবেশন করেন, তা এখন আশ্চর্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে খাঁটি রূপে শ্রোতাদের রেডিও-রিসিভার থেকে নির্গত হয়।

প্রত্যেক বেতারসংস্থায় সঙ্গীত প্রচার এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যে কোনো বেতারসংস্থার সম্প্রচারকালের অর্ধেকেরও বেশি সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ থাকে।...... আমাদের আকাশবাণীতেও।

১৯৬০ সালে আকাশবাণীর অনুষ্ঠানের মোট সম্প্রচার-কাল ছিল ১,০৮,২৫৬ ঘণ্টা ১৪ মিনিট (বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান ছাড়া, বিবিধ ভারতী এই বছর তার সমগ্র অনুষ্ঠানের জন্য সময় নিয়েছে মোট ৭,১২৩ ঘণ্টা)। এই ১,০৮,২৫৬ ঘণ্টা ১৪ মিনিটের মধ্যে সঙ্গীতের জন্য বরাদ্দ ছিল ৫০,৯৮১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট—অর্থাৎ সাধারণভাবে মোট সম্প্রচার-কালের ৪৭·০৬ শতাংশ। ১৯৬১ সালে আকাশবাণীর মোট সম্প্রচার-সময় ছিল ১,১৭,২৬৫ ঘণ্টা, তার মধ্যে বিবিধ ভারতী নিয়েছে ৭,৯৩১ ঘণ্টা। বাকি ১,০৯,৩৩৪ ঘণ্টার মধ্যে সঙ্গীত পেয়েছে (২,১০৭ ঘণ্টা পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত-সহ) ৫১,১৮৪ ঘণ্টা—অর্থাৎ মোট সময়ের ৪৬·৭ শতাংশ। এছাড়া শিশু, মহিলা, পল্লীবাসী, শিল্প-শ্রমিক, উপজাতীয় মানুষ, সশস্ত্র বাহিনীর লোক প্রভৃতির জন্য যেসব পৃথক পৃথক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, ১৯৬১ সালে তার পরিমাণ ছিল মোট অনুষ্ঠানের ২১·১৪ শতাংশ। এইসব পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানের প্রায় অর্ধেকই সঙ্গীত। সুতরাং ১৯৬১ সালে আকাশবাণী মোট অনুষ্ঠানের শতকরা ৫৫ থেকে ৬০ ভাগ প্রচার করেছে সঙ্গীত। ১৯৬১ সালের পর আরও কয়েকটি বছর কেটে গেছে। কিন্তু সঙ্গীতের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি—বরং বেড়েছে বলা চলে।

বেড়েছে কলকাতা কেন্দ্রেও। কলকাতা কেন্দ্রেও যন্ত্রপাতি আর সাজসরঞ্জাম শৈশবাবস্থা থেকে যৌবনে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তবু, আমার মনে হয়, বেতার-সম্প্রচারের গোড়ার যুগের মতো আজকের যুগেও সঙ্গীতশিল্পী আর সঙ্গীতশ্রোতাদের কলকাতা বেতারে সঙ্গীত প্রচারের বিরোধিতা করা উচিত। আগে যান্ত্রিক ত্রুটি ও কারিগরি অসম্পূর্ণতার জন্য বেতারে সঙ্গীত বিকৃত হয়ে যেত বলে বিরোধিতা করা হত, এখন যান্ত্রিক গোলযোগ ও 'মৌখিক' ত্রুটির জন্য বেতারে সঙ্গীত প্রচার ব্যাহত হয় বলে বিরোধিতা করা উচিত।

এখন কখন যে যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবে, কখন যে অযান্ত্রিক ত্রুটির জন্য রেকর্ড একই জায়গায় ঘুরপাক খেয়ে বার বার একই কলি শোনাতে থাকবে, কখন যে 'মৌখিক' ত্রুটির জন্য গান অসমাপ্ত রেখে কেটে দেওয়া হবে তা কেউ জানে না। আজকাল এমন একটা দিনও বোধ হয় যায় না, যেদিন অন্ততঃ পাঁচ থেকে দশ বার অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন না ঘটে। নাটক, নকশা, কথিকা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনেক সময় সামান্য সময়ের বিচ্ছেদের জন্য বিশেষ অসুবিধা হয়তো হয় না—কল্পনা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই বিঘ্ন অসহ্য—শিল্পীদের পক্ষেও যেমন, শ্রোতাদের পক্ষেও তেমনি। তাই কলকাতা বেতারে সঙ্গীত প্রচারের বিরুদ্ধে শিল্পী ও শ্রোতাদের একযোগে তীব্র আপত্তি জানানো উচিত।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

১৬ অকটোবর সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে ও রাত ১০টা ১৫ মিনিটে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনালেন শ্রীমতী আরতি সেন। সুন্দর গলা, কিন্তু কেন যে তিনি গানগুলি কৃত্রিম উচ্চারণে, আড়ষ্ট স্বরে গাইলেন, বোঝা গেল না। তিনি যদি খোলা গলায়, স্বাভাবিক উচ্চারণে গাইতেন তাহলে গানগুলি অনেক শ্রুতিমধুর হ'ত। (ঘোষিকা আবার সকালের অনুষ্ঠানের শেষ গানটি শেষ না হতেই কেটে দিয়েছিলেন)।...একশ্রেণীর শিল্পীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে কৃত্রিম ও বিকৃত উচ্চারণ শোনা যাচ্ছে তা খুবই পরিতাপজনক।

১৭ অকটোবর বেলা সাড়ে ১২টায় শ্রীসন্তোষকুমার সেনগুপ্তের রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানের শেষ রেকর্ডটি অসমাপ্ত রেখে কেটে দেওয়া হয়েছিল।

ঐদিন রাত ১০টা ১৫ মিনিটে প্রচারিত ইংরেজী নিউজ রীলের বিষয় ছিল: কলকাতা মেলা, মহাজাতি সদনে নিউ প্রভাস অপেরার যাত্রা 'পাগল ঠাকুর', কলামন্দিরে মৈমনসিং গীতিকার 'মলুয়া' পালা, শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়ের দুর্গা-প্রকৃতি বর্ণনা, কলকাতা ইয়ুথ কয়ারের লোকগীতি ও গ্রামীণ গীতি সংস্থার লোকনৃত্যনাট্য। অনুষ্ঠানটি বেশ সপ্রাণ ও মনোজ্ঞ হয়েছিল। প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু গ্রামীণ গীতি সংস্থার ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের চেয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের নামের তালিকা প্রচারেই যেন রেডিওর অনুষ্ঠান-প্রণেতার আগ্রহ ছিল বেশি। একের পর এক এত নাম শোনানো হয়েছে যে, এক সময় সন্দেহ জেগেছিল, শেষ হবে কিনা। সেই তুলনায় তাঁদের লোকনৃত্যনাট্য শোনানো হয়েছে অত্যন্ত কম।

১৯ অকটোবর সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শিশুমহলে অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল'—এর বেতার-রূপ বেশ লাগল। তাষকার ছিলেন শ্রীপার্থ ঘোষ, আর প্রযোজনায় শ্রীমতী মেনকা ঠাকুর।

২০ অকটোবর সকাল ৯টা ৫ মিনিটে গ্রামোফোন রেকর্ডে শ্রীতন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান ছিল। প্রথম রেকর্ডটি একস্থানে কয়েক পাক ঘুরে থেমে গেল, তারপর আবার চলতে শুরু করল, তারপর গান ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে বন্ধ হয়ে গেল, তারপর আবার চলল। ঘোষক ঘোষণা করলেন, "অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় গানটি শোনানো সম্ভব হ'ল না, সেজন্য আমরা দুঃখিত।"—আমরাও। কিন্তু এ দুঃখের অবসান হবে কবে?

এইদিন বেলা ১টা ৫০ মিনিটে মহিলামহলে "রবীন্দ্রকাব্য পাঠ" এই পর্যায়ে "অভিসার" কবিতাটির আবৃত্তি বেশ লাগল। কিন্তু ঐ শব্দঝঙ্কারগুলো কি অপরিহার্য ছিল? শব্দসহযোগে আবৃত্তির জন্য শুনতে অবশ্য ভালো লেগেছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের শিরোনামটার একটুখানি পরিবর্তন দরকার ছিল।...সব শেষের অনুষ্ঠান ছিল গ্র্যামোফোন রেকর্ডে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের রবীন্দ্রসঙ্গীত। গানটি শেষ পর্যন্ত শোনানো হয় নি, আগেই কেটে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু না কাটলেও চলত, যদি গানটির পরে কিছুক্ষণ সব চুপচাপ রেখে বৃথা সময় নষ্ট করা না হ'ত আর সিগনেচার টিউন একটু কমানো হ'ত।

এইদিন রাত ৯টা ৩০ মিনিটে বিজয়া উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল, পরিবেশন করেছেন শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য ও তাঁর সহশিল্পিবৃন্দ। বিজয়ার গানগুলি ভালোই লেগেছে, কিন্তু গ্রন্থনায় খুশি হওয়া যায় নি। গ্রন্থনার জন্য আরও স্বচ্ছ ও দরদী কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন ছিল।

২৪শে অকটোবর রাত ১০টায় দুর্গাপুজো সম্পর্কে সংবাদপরিক্রমাটি সুলিখিত ও সুপঠিত। ভাষা যেমন সুন্দর, পড়ার মধ্যেও তেমনি মাধুর্য ছিল।...গতানুগতিক সংবাদ পরিক্রমার বাইরে ছিল এটি।

২৬শে অকটোবর বেলা ১টায় "রূপ ও রঙের" আসরে কৌতুক নকশা ছিল শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত "লজ্জাবতী"।

"লজ্জাবতী"র লজ্জা নেই, "কৌতুক নকশা"য় কৌতুক নেই—এ বড়ো বেদনাদায়ক। একটি ছেলে পণ করেছিল, লজ্জাবতী মেয়ে ছাড়া বিয়ে করবে না। কিন্তু লজ্জাবতী মেয়ে আর পাওয়া যায় না, তাই তার বিয়েও হয় না। হঠাৎ এক বিয়েবাড়িতে একটি মেয়েকে দেখে তাকে তার খুব লজ্জাবতী মনে হ'ল, বলে-কয়ে তাকে বিয়ে করে ফেলল। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রে দেখা গেল অমন নির্লজ্জ মেয়ে আর হয় না।

কাহিনীর কোথাও সূক্ষ্ম কৌতুক পাওয়া যায় নি। অতি পুরাতন, অতি শ্রুত একটি কাহিনীর রূপান্তর মাত্র। নাটকের লক্ষণাক্রান্ত নয় মোটেই। রসসিক্তও না। অভিনয়ও অনেকটাই কৃত্রিম।

২৯ অকটোবর সকাল ৮টায় লোকগীতি শোনালেন শ্রীগৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। ভালো লাগল।

৩১ অকটোবর সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা খবর গোড়ার দিকে অন্ততঃ সাড়ে চার মিনিট শোনা যায় নি, কিন্তু 'দুঃখের ঘোষণা'য় মাত্র তিন মিনিট বলা হয়েছে। সত্যি কথাটা বলায় দোষ ছিল কী?

পরে ৮টার লোকগীতিও যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য অবাধে শোনা যায় নি। বেলা ১২টা ৫০ মিনিটে দিল্লীর বাংলা খবরের গোড়াটাও অশ্রুত রয়ে গেছে। —শ্রবণক

নাট্যসাধক মন্মথ রায়

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

"এক বুক কাদা ভেঙে পথ চ'লে এক-দীঘি পদ্ম দেখলে দুচোখে আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দুচোখ পুরে পান করেছি আপনার লেখায়.........'সেমিরেমিস' প'ড়ে কী যে আনন্দ পেয়েছি তা বলে উঠতে পারছি নে।......'সেমিরেমিসে' আমি যেন তলিয়ে গেছি। এতবড় সৃষ্টি! আমায় আর কারুর কোন লেখা এত বিচলিত করে নি।" লিখেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম ১৩৩২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল থেকে প্রকাশিত বার্ষিক পত্র "বাসন্তিকা"তে নবীন নাট্যকার মন্মথ রায় রচিত 'সেমিরেমিস' নাটকটি পাঠ করে। অ্যাসিরিয়ার রাজা নাইনাস-এর জীবনের ঘটনা অবলম্বনে নাটকটি লিখিত হয়েছিল।

অবশ্য এর আগেই কলকাতার নাট্যরসিক জনসাধারণের মন্মথ রায় নামটির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। ১৯২৩-এর বড়দিনের ডালি হিসেবে আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেড শ্রীরায় রচিত একাঙ্ককা "মুক্তির ডাক" স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম একটি একাঙ্ককা অভিনয় হ'ল। নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। শ্রীচৌধুরী এই একাঙ্ককা সম্পর্কে বলেছেন, "যখন হর্ণিম্যান ও গ্লাসগোর রেপার্টরী থিয়েটারের হাতে পাশ্চাত্য একাঙ্ককা সাহিত্যের নব নব রূপ পরিগ্রহ ক'রে চলেছিল, ঠিক সেই সময়েই বাঙলা সাহিত্যেও এর অনুপ্রবেশ হয়। ১৯২৩ সালে মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক' এই পথের প্রধান পথিকৃৎ।" 'মুক্তির ডাক' নাট্যরচনা হিসেবে যে কতখানি সার্থকতা লাভ করেছিল, তা সে-যুগের বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক, 'সবুজপত্র'-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর লেখা থেকেই অনুমান করতে পারা যায়। তিনি লিখেছেন, "'মুক্তির ডাক' আমার খুব ভাল লেগেছে।...নাটকখানির মহাগুণ এই যে এখানি যথার্থই একখানি ড্রামা। বাঙলা সাহিত্যে নাটক একরকম নেই বললেই হয়। আশা করি আমাদের সাহিত্যের এ অভাবে (আপনি) পূর্ণ করবেন।"

অথচ প্রাজ্ঞ প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে যখন এতখানি প্রশংসা তাঁর ওপর বর্ষিত হ'ল, তখন মন্মথ রায়ের বয়স কতই বা! মাত্র তেইশ বছর; সবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ পাশ করেছেন এবং তখনও তিনি আইনের ছাত্র। অবশ্য নাটক লিখতে তিনি শুরু করেন ১৯১৯ সালে, যখন তিনি কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয় কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে "বঙ্গে মুসলমান" নামে তাঁর লেখা এই প্রথম নাটকটি তাঁর বাল্য ও কৈশোরের বাসস্থান বালুরঘাটের এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক ক্লাব দ্বারা অভিনীত হয়। শ্রীরায় যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ ক্লাশের ছাত্র, তখন ১৯২২ সালে তিনি রাজতরঙ্গিনী থেকে কাশ্মীররাজ জয়াদিত্যের বাঙলায় আগমন এবং এক বঙ্গদেশীয় নর্তকীর সঙ্গে তাঁর প্রেমকাহিনীকে উপজীব্য ক'রে তাঁর দ্বিতীয় নাটক "দেবদাসী" রচনা করেন। এই নাটকখানি ঢাকা জগন্নাথ হল ড্রামাটিক অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক ১৯২৩-এর নভেম্বর মাসে অর্থাৎ তাঁর তৃতীয় নাটক "মুক্তির ডাক"-এর স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবার মাসখানেক আগে মঞ্চস্থ হয় ঢাকাতে।

শ্রীরায়ের একাঙ্ককা "মুক্তির ডাক" অভিনীত হবার প্রায় চার বছর পরে তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটক "চাঁদ সদাগর" নাট্যরসিক দর্শকসাধারণের সামনে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপিত হয় প্রবোধচন্দ্র গুহ পরিচালিত 'মনোমোহন থিয়েটারে' ১৯২৭ সালে। এই সময় থেকে শুরু ক'রে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি প্রায় প্রতি বছরই একখানি ক'রে নাটক আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন : দেবাসুর (স্টার, ১৯২৮), শ্রীবৎস (স্টার, ১৯২৯) মহুয়া (মনোমোহন, ১৯২৯), কারাগার (মনোমোহন, ১৯৩০), সাবিত্রী (নাট্যনিকেতন, ১৯৩১), অশোক (রঙমহল, ১৯৩৩), খনা (নাট্যনিকেতন, ১৯৩৫), সতী (নাট্যনিকেতন, ১৯৩৭), বিদ্যুৎপর্ণা (সি-এ-পি দ্বারা ফার্স্ট এম্পায়ারে ১৯৩৭), রাজনটী (সি-এ-পি এম্পায়ার, ১৯৩৭), রূপকথা (সি-এ-পি, ফার্স্ট এম্পায়ার, ৯১৩৮) এবং মীরকাশিম (নাট্যনিকেতন, ১৯৩৮)।

এইখানে ওপরে একটি বন্ধনীর মধ্যে 'সি-এ-পি দ্বারা ফার্স্ট এম্পায়ারে' কথাকটিকে একটু বিশদভাবে বলার প্রয়োজন আছে। বিখ্যাত মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের প্রযোজক-পরিচালক, অধুনা পরলোকগত মধু বসু ১৯২৮ সালে অভিজাত বংশীয় তরুণ-তরুণীদের নিয়ে 'ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্স' নাম দিয়ে একটি সৌখীন নাট্য-সংস্থা গড়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে যখন এই সংস্থা মাত্র জনহিতকর কার্যের জন্যে সাহায্যঅনুষ্ঠানের মধ্যেই নিজেদের কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ না রেখে একটি পেশাদারী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠল, তখন শ্রীবসু সংস্থাটির নাম পরিবর্তন ক'রে রাখলেন : ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স। মজা এই যে, এই পরিবর্তনের ফলে এঁদের সংক্ষিপ্ত নামটির—যে-নামে সংস্থাটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, সেই সি-এ-পি নামটির কোনো পরিবর্তন হ'ল না। মন্মথ রায় এই সি-এ-পি সংস্থা তথা এর প্রতিষ্ঠাতা-প্রযোজক-পরিচালক মধু বসুর সান্নিধ্যে আসেন ১৯৩৭ সালে। প্রথমে সি-এ-পি তাঁর ১৯৩১ সালের রচনা 'সাবিত্রী' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। এর পরে শ্রীবসু তাঁকে দিয়ে পর পর তিনখানি নতুন নাটক রচনা করিয়ে নেন : বিদ্যুৎপর্ণা, রাজনটী ও রূপকথা। শুধু তাই নয়। একটি ইংরিজী ছবির কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে মধু বসু শ্রীরায়কে দিয়ে একটি চিত্র-কাহিনীও রচনা করিয়ে নেন এই সময়ে। এবং "অভিনয়" ছবির এই চিত্র-কাহিনী রচনাই শ্রীরায়ের জীবনপথে একটি নতুন বাঁকের সৃষ্টি করে। তাই দেখা যায়, ১৯৩৮-এর পর থেকেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে শ্রীরায়ের নাট্যকার হিসেবে যোগসূত্রটি যথেষ্ট শিথিল হয়ে যায়।

১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারীর শেষাশেষি শ্রীরায় মধু বসুর সঙ্গে বোম্বাই যান সাগর মুভীটোনে শ্রীবসু যে-দোভাষী (বাঙলা ও হিন্দী) ছবি করবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হন, সেই "কুমকুম দি ড্যান্সার"-এর গল্পটি ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিক চিমনভাই দেশাইকে শোনাবার জন্যে। কয়েকদিনের মধ্যে কলকাতায় ফিরে আসবার পরেই যখন মধু বসু সদলবলে বোম্বাই রওনা হলেন, তখন শ্রীরায়কেও সেখানে আবার যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে হ'ল "কুমকুম"-এর চিত্রনাট্য রচনার কাজ সম্পাদনার্থে।

এই "কুমকুম"-এর কাহিনীই সম্ভবত ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রথম সোস্যালিজম-এর সূচনা করে। ধনিক ও শ্রমিকে যে সংঘর্ষ, ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে গণ-স্বার্থের যে-বিরোধ, তারই মর্মান্তিক প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছিল এই ছবির মাধ্যমে।

এরপর ১৯৪০-এ হ'ল ওয়াদিয়া মুভীটোনের পতাকাতলে দ্বিভাষী চিত্র "রাজনর্তকী"; বাঙলা ও হিন্দী নাম রইল "রাজনর্তকী" এবং ইংরেজী সংস্করণের নাম হ'ল "কোর্ট ড্যান্সার"। এটি তাঁর মঞ্চনাটক "রাজনটী"রই চিত্রসংস্করণ। এরও চিত্রনাট্য ও সংলাপ লেখবার জন্যে শ্রীরায়কে

বোম্বাইয়ে থাকতে হয়েছিল বেশ কয়েক-মাস। ১৯৪১-এ শ্রীরায় লিখলেন নিউ থিয়েটার্স-এর দোভাষী চিত্র "মীনাক্ষী"র কাহিনী ও চিত্রনাট্য। পরের বছরই লেখা হ'ল এম পি প্রোডাকসন্স-এর জন্যে "হাসপাতাল" যার নাম পরে হয়েছিল "যোগাযোগ"। অবশ্য ছবিটির হিন্দী সংস্করণের নাম ছিল : হসপিটাল।

তখন এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে সোচ্চারে ধ্বনিত হচ্ছে যুদ্ধের রণহুংকার। মিত্রশক্তি ক্ষুদে জাপানী সৈন্যবাহিনীর অমিত আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করছে। রেঙ্গুন জাপানীদের অধিকারে চলে গেছে। ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে কলকাতার বহু বাসিন্দাই শহর ছেড়ে নিরাপদস্থানে চলে যাচ্ছিলেন। শ্রীরায়ও তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে তাঁর ভগিনীর বাসস্থান রায়গঞ্জে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই অনিশ্চিত পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও শ্রীরায় সাধনা বসুর অনুরোধে অমর পিকচার্স-এর জন্যে লিখলেন "পয়গাম" ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য। এটা ১৯৪২-৪৩ সালের ঘটনা। রায়গঞ্জ ছেড়ে শ্রীরায় সপরিবারে এলেন কৃষ্ণনগরে বাসবাস করতে ১৯৪৪ সালে। এখানে ১৯৪৫-এর শেষ শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে ১৯৪৬-এর গোড়াতেই তিনি ফিরলেন আবার কলকাতা মহানগরীতে।

স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর সরকারী প্রচার দপ্তরে প্রোডাকসান অফিসারের পদে নিযুক্ত করলেন মন্মথ রায়কে। শ্রীরায় হলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন গেজেটেড অফিসার। এই পদে তিনি ছিলেন ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে শ্রীরায় কমবেশী একশোখানি তথ্যচিত্র পরিচালনা করেন। এর মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামের জীবনচিত্র এবং "টোটো পাড়ায় ঘুরে এলুম" নামে আদিবাসী সংক্রান্ত চিত্রটি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল।

সরকারী কাজে স্থিতনিষ্ঠ হবার পরে শ্রীরায় আবার নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন ১৯৫১-৫২ সাল থেকে। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর কৌতুকনাটি "মমতাময়ী হাসপাতাল"। ১৯৫৩-তে একজন শিল্পীর মর্মান্তিক জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত "জীবনটাই নাটক" মিনার্ভা মঞ্চে রাসবিহারী সরকার দ্বারা প্রযোজিত হয়। এবং ঐ সালেই বহুরূপী সম্প্রদায় দ্বারা অভিনীত হয় সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রমিকজীবনের পটভূমিকায় রচিত "ধর্মঘট" নাটক। একটি মধ্যবিত্ত চাষী পরিবারকে ঘিরে ১৮৫৭র সিপাহী বিদ্রোহের আমল থেকে ১৯৪৭-এর স্বাধীনতালাভের দিন পর্যন্ত দেশের মুক্তি-আন্দোলনের রক্তক্ষরা কাহিনীটিকে শ্রীরায় তাঁর "মহাভারতী" নামে যে পূর্ণাঙ্গ নাটকটির মাধ্যমে রূপায়িত করেন, সেটি প্রথমে কংগ্রেস সাহিত্যসংঘ দ্বারা অভিনীত হয় ১৯৫৩ সালে। পর বৎসর কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেস সদস্যদের সামনে নাটকখানি অভিনয় করেন একটি শিল্পিগোষ্ঠী। এই শিল্পিগোষ্ঠীই পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখারূপে গণ্য হয়ে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করে। এই লোকরঞ্জন শাখার উপদেষ্টা ও প্রশাসন-আধিকারিক নিযুক্ত হন যথাক্রমে শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক ও শ্রীমন্মথ রায়। ১৯৫৭ সালে নতুন দিল্লীতে ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের স্মরণে যে শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাতে এই "মহাভারতী" হিন্দী ভাষায় অনূদিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের লোকরঞ্জন শাখা দ্বারা অভিনীত হয় সমবেত দর্শকবৃন্দের প্রশংসাধ্বনির মধ্যে। এরই মধ্যে শ্রীরায় ১৯৫৫ সালে মেট্রো সিনেমাতে মুক্তিপ্রাপ্ত অশোক ফিল্ম নিবেদিত "চিত্রাঙ্গদা" ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেন।

শ্রীরায় এর পরে রচনা করেন "মরা হাতী লাখ টাকা" (১৯৫৮) ও "কোটিপতি নিরুদ্দেশ" (১৯৫৯) নামে দুখানি কৌতুক রসে ভরা ব্যঙ্গাত্মক নাটক। নবতর আদর্শবাদকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে ১৮৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহকে উপজীব্য করে লেখা তাঁর "সাঁওতাল বিদ্রোহ" নাটকটি ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। গোপাল দেবের রাজত্বকালে যখন বাংলা দেশে মাৎস্যন্যায়ের জয়জয়কার, তখন প্রজাদের নির্বাচনে প্রথম রাজার প্রতিষ্ঠা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনার যুগোপযোগিতাকে মনে রেখে শ্রীরায় "অমৃত অতীত" নামে যে-নাটক রচনা করেছিলেন, তাও "গন্ধর্ব" সম্প্রদায় দ্বারা এই ১৯৬০ সালেই অভিনীত হয়। এরই মাঝে তিনি রচনা করেছেন 'রঘু ডাকাত', কুমারীর মাতৃত্বসমস্যা অবলম্বনে 'বন্দিতা' এবং কল্পনামূলক 'উর্বশী নিরুদ্দেশ'। এই সময়েই তিনি তপন সিংহ পরিচালিত "ক্ষুধিত পাষাণ"-এর চিত্রনাট্য লিখে "উল্টোরথ" পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৬২তে ভারতের পূর্বোত্তরে অবস্থিত নেফা অঞ্চলে চীনা অনুপ্রবেশ ঘটলে সমগ্র ভারতবাসী একতাবদ্ধ হয়ে সরকারের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এর প্রতিরোধের জন্যে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরায় রচিত "জোয়ান" ও "স্বর্ণকীট" নামে দেশপ্রেমাত্মক নাটিকা দুখানি যথাক্রমে বিশ্বরূপা ও স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। এর আগে ১৯৫৯ সালে তিনি "মহাপ্রেম" নামে যে দেশাত্মবোধক নাটকখানি রচনা করেন, সেখানিও এই সময়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে অভিনীত হয়েছিল।

মন্মথ রায় স্বাধীন ভারতে ক্রমবর্ধমান সমাজবিরোধী অন্যায়, চোরাকারবারী, কালোবাজারী, ধনিকের শোষণনীতি, শাসনব্যবস্থার ত্রুটি প্রভৃতির প্রতি কোনোদিনই [illegible] পারেন নি। এমন কি যখন তিনি প্রোডাকসান অফিসাররূপে সরকারী চাকরীতে অধিষ্ঠিত, তখনও সরকারী দোষত্রুটি দেখিয়ে নাটক রচনা করতে তিনি পশ্চাদপদ হননি। এরই ফলে একসময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগীয় অধিকর্তা যখন তাঁকে চিঠি লিখে জানান যে, তাঁর কোনো রচনা প্রকাশ করবার আগে তাঁকে সরকারী অনুমতি নিতে হবে, তিনি তখনই কালবিলম্ব না ক'রে ঐ কাজে ইস্তফা দেন। কিন্তু তখনকার স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী কিরণ-

শঙ্কর রায় শ্রীরায়কে পত্রযোগে (নং ১৭২৫ এম্-ও) জানান, "পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে না পারায় দুঃখিত। শ্রীরায় তাঁর সরকারী কার্য বজায় রেখে তাঁর ইচ্ছামত সাহিত্য বা শিল্পকর্ম করতে পারেন।" শ্রীরায়ও খুশীমনে তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার ক'রে নিরঙ্কুশভাবে তাঁর সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করেন।

১৯৫৮য় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে শ্রীরায় ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত তিন বছরের জন্যে আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্রে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কীয় প্রচার-পরিচালকরূপে নিযুক্ত ছিলেন।

সমাজবিরোধী মজুতদারী ও কালো-বাজারীর বিরুদ্ধে তিনি "দুই আঙিনা, এক আকাশ" নামে যে নাটক লেখেন, সেটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা দ্বারা ১৯৬৩-৬৪ সালে বহু স্থানে অভিনীত হয়। ১৯৬৪তে বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর লেখা "মহা উদ্বোধন" নাটক-খানিও ঐ লোকরঞ্জন শাখাই অভিনয় করেন। এরই পরে তিনি রচনা করেন "বন্যা" নাটকটি। বন্যার ফলে চতুর্দিকে জলবেষ্টিত একটি স্কুলবাড়ীতে জড়ো হওয়া কতকগুলি লোকের বিচিত্র বহুমুখী চরিত্রচিত্রণে অসামান্য মুন্সীয়ানা তিনি দেখিয়েছেন এই নাটকটিতে। পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয় মধ্যবিত্ত সমাজ, কৃষিজীবন এবং প্রশাসনে গলদপূর্ণ জনজীবন অবলম্বনে যথাক্রমে রচিত 'পথেবিপথে', 'চাষীর প্রেম' এবং 'আজব দেশ'। এই তিনখানি নাটক সম্পর্কে স্বাধীনতা লিখেছিলেন, "কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ এসব নাটকে কোথাও নেই, আছে চেতনার স্বতস্ফূর্ত জাগরণ।" বিখ্যাত প্রযোজক - পরিচালক - অভিনেতা উৎপল দত্ত শ্রীরায়ের 'আজব দেশ' পাঠ করে বলেছিলেন, "কোনো তুলনা নেই। অন্তত এদেশের নাট্যসাহিত্যে নেই।" বিপ্লবী রুশ কবি শেভচেঙ্কোর জীবনী অবলম্বনে ১৯৬৫ সালে তিনি "তারাস শেভচেঙ্কো" নামে বিশ্বশান্তির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে যে-নাটক রচনা করেন, সেটি তাঁকে ১৯৬৭ সালে এনে দেয় "সোভিয়েতল্যান্ড-নেহেরু" প্রথম পুরস্কার। এ ছাড়া ১৯৬৮-র জুন মাসে তিনি সম্মানিত অতিথিরূপে রাশিয়া পরিভ্রমণের সুযোগ পান। বর্তমান ১৯৬৯ সালে শ্রীরায় নাদির শাহের জীবনী অবলম্বনে প্রথম যাত্রা-নাটক "দিগ্বিজয়" রচনা করেন। এতে তিনি নাদির শাহকে বঞ্চিত, পদদলিত, অত্যাচারিত জনগণের বিদ্রোহী আত্মারূপে চিত্রিত করেছেন। তাঁর অধুনাতম নাটক "লালন ফকির" মাত্র একুশ দিনের চেষ্টায় ২ অক্টোবর তারিখে সমাপ্ত করে তিনি "রূপকার" গোষ্ঠীর সবিতাব্রত দত্তের হাতে তুলে দিয়েছেন অভিনয়ের জন্যে।

এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে নাট্যসাধকের জীবনে ১৯২৩-এ রচিত তাঁর প্রথম একাঙ্কিকা "মুক্তির ডাক"-এর পরে কল্লোল, সবুজপত্র, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বিচিত্রা, অমৃত প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি আজ পর্যন্ত সত্তরেরও বেশী একাঙ্কিকা রচনা করেছেন বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে। এগুলির অধিকাংশই মাঝে মাঝে একত্রে গ্রথিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে একাঙ্কিকা (১৯৫৫), নব একাঙ্কিকা (১৯৫৮), ফকিরের পাথর (১৯৫৯), বিচিত্র একাঙ্ক (১৯৬১), ছোটদের একাঙ্ক (১৯৫৬) প্রভৃতি নামে।

পৌরাণিকই হোক, ঐতিহাসিকই হোক বা ময়মনসিংহ গীতিকা, রাজতরঙ্গিনী কিংবা অন্য কোথাও থেকে কোনো কাহিনী অবলম্বন করেই হোক, মন্মথ রায় রচিত প্রতিটি নাটকে একটি বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হতে দেখা যায়। চিরাচরিত সংস্কারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে বিদ্রোহ ঘোষণা করা তাঁর লেখনীর ধর্ম। তাই দেখি তিনি 'দেবাসুর' নাটকে বৈদিক কাহিনীর ভিত্তিতে লাঞ্ছিত নিপীড়িতদের বিক্ষোভাগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করেছেন, 'কারাগার' নাটকের মাধ্যমে জাতিকে স্বাধীনতাসংগ্রামে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন যে, ব্রিটিশ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় সদস্য ডাবলু বি প্রেন্টিস-এর চোখেও পৌরাণিকের আবরণে এর বিদ্রোহাত্মক রূপটি ধরা পড়ে যায় এবং তাঁরই আদেশক্রমে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেন। শ্রীরায়ের "মীরকাশিম" নাটক সম্পর্কে 'হুগোলদর' বলেছিলেন "'মীরকাশিম' নাটকে মাতৃ-সঙ্গীতনীর মন্ত্র রহিয়াছে।" এর ওপর তাঁর প্রতিটি নাটকের মধ্যে আছে স্বাস্থ্যসাধনকারী রোমাঞ্চকর ঘটনার সঙ্গে নাটকীয় চরিত্র-গুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। প্রতিটি নাটকের মধ্যে তাঁর সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রত্যক্ষ না করে উপায় নেই। বঞ্চিত নিপীড়িত মানবাত্মার জয়গান করেছেন তিনি সর্বত্র। সামাজিক রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর লেখনীকে খড়্গের ন্যায় চালিত করেছেন। জীবনের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে উদাসীন থেকে নাটককে শুধু কল্পলোকে বিচরণ করাবেন, এ মতকে তিনি ঘৃণার সঙ্গে পরিহার করে চলেন। তিনি বলেন, রোম যখন পুড়ছে, তখন আমরা শুধু বাঁশী বাজাব, এ হতে পারে না। নাট্যকার কোনো মতেই তাঁর সামাজিক দায়িত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না। গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্দ্র প্রভৃতি অনুসৃত নাট্যরচনা-শৈলীর সঙ্গে চরিত্রসৃষ্টি বিষয়ে আধুনিক যুগমানসের বিপ্লবী চিন্তাধারাকে আশ্চর্য-ভাবে মেলাতে পেরেছেন বলেই মন্মথ রায় আজ আধুনিক নাট্যকারদের পুরোভাগে নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

এবং সেই কারণেই ভারত সরকার প্রতি-ষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সঙ্গীত-নাটক-আকাদামী তাঁকে কেন্দ্রীয় সঙ্গীত-নাটক-আকাদামী তাঁকে ১৯৬৯ সালে শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে পুরস্কৃত করেছেন। ১৯০০ সালের ১৬ জুন তারিখে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার গালা গ্রামে এই সার্থক নাট্যসাধকের জন্ম হয়।

বিতর্কিত আলোচনা

ভারতীয় সেন্সরশিপের চোরাবালি

'সেন্সর' কথাটার উৎপত্তি হয় রোমে। রোমান সাম্রাজ্যের সুবর্ণযুগে বহুবিধ প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী দেখা দিল মানসিক ও দৈহিক বিভ্রান্তি। অচিরেই সেটা জাতিগত সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে খুব বেশী দেরী হলো না। শঙ্কিত হয়ে কর্তৃপক্ষ তখন সামাজিক ও ব্যক্তিগত নৈতিক মান রক্ষার উপায় ভাবতে লাগলেন।

এ সময়ে রোম শহরে একজন অত্যন্ত গোঁড়া নীতিবাদী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন—নাম তাঁর 'সেন্সর'। উপযুক্ত লোক বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ জাতির নৈতিক শুচিতা রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করেন। অনেক ভেবেচিন্তে নৈতিক শুচিতার মানদণ্ড হিসেবে সেন্সর সাহেব যে রীতি-নীতির প্রবর্তন করেন পরবর্তীকালে তাই পৃথিবীব্যাপী দেশে দেশে মানদণ্ড হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে। এই রীতি-নীতির সৃষ্টিকারী সেন্সর সাহেবের নাম থেকেই এর নাম 'সেন্সর প্রথা' হিসেবে ইতিহাসে চিরকালের জন্যে বিখ্যাত হয়ে রইলো। নৈতিক শুচিতার এই মানদণ্ড তখন যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল—আজ এত শতাব্দী পরেও তার বিন্দুমাত্র কমতি হওয়া দূরে থাক বরঞ্চ যেন বেড়েই চলেছে। বলা বাহুল্য সেই আলোড়নের ঢেউ সাতসমুদ্দুর পেরিয়ে এসে ভারতেও একদিন প্রবেশ করলো। তারপর থেকে সেই মানদণ্ডের পক্ষে বিপক্ষে অজস্র সমালোচনার ধারা আজও অব্যাহতগতিতে চলেছে। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আরো তীব্রতর হয়ে উঠছে।

সেন্সর প্রথার কার্যকরী ক্ষেত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় বিস্তৃত। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতির বা দেশের নিরাপত্তা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে একক বা গোষ্ঠীগতভাবে নৈতিক শুচিতা রক্ষা করা। এই উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করা হয় আইনের মাধ্যমে। এই আইনের সীমারেখা বহু বিস্তৃত। এর অধিকারবলে কর্তৃপক্ষ প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, প্রদর্শিত অথবা অপ্রদর্শিত যে কোন বিষয়বস্তুকে দেশের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করলে বিনা যুক্তিতে বা কোন কারণ না দেখিয়ে সেটিকে নিষিদ্ধ করে দিতে পারেন। সেন্সর প্রথার রাজনৈতিক দিকটা এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু নয়, আমরা আলোচনা করতে চাই বর্তমান ভারতীয় সেন্সর পদ্ধতির সামাজিক নৈতিক শুচিতা রক্ষার প্রয়াস ও সিনেমা কোন পথে চলছে সেই বিষয়ে। ভারতীয় জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রের মতই এই ক্ষেত্রেও কর্তৃপক্ষের দ্বিধাগ্রস্ত, দ্বিধাবিভক্ত, শঙ্কিত ও অসহায় মনোভাব বিশেষ পরিস্ফুট। কোন একটা বিশেষ নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা পথ ধরে এগবোর গতি বা পন্থা সেন্সর কর্তৃপক্ষের আছে বলে মনেই হয় না। তাই বিভিন্ন পরিস্থিতি বা নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হলেই দিশাহারা হয়ে গিয়ে উপযুক্ত বিধান দিতে অসমর্থ হয়ে পড়েন। তাই 'সেন্সর' কথাটা আজ রীতিমত একটা ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি এর উদ্দেশ্য, কি তার লক্ষ্য আর কি এর কাজ এ প্রশ্নের উত্তর মেলা ভার।

ভারতীয় ছবি বিশেষ করে হিন্দী ছবিগুলির বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের যে কুৎসিত বিকৃত রুচির অভিব্যক্তি দেখা যায় সে সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত সেন্সরশিপ কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা বা প্রতিবিধান অবলম্বন করতে পারেন নি। হিন্দী ছবির পোস্টারে যে ধরণের অসামাজিক যৌন আবেদন পরিলক্ষিত হয় তাও নিঃসন্দেহ ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী। তা সত্ত্বেও সে সম্বন্ধে সেন্সরশিপ একেবারেই কালাবোবা সেজে আছেন। এই পরিস্থিতি কতটা ইচ্ছাকৃত আর কতটা ঘটেছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। এই স্ববিরত ভারতীয় ছবির বেলাতেও যেমন বিদেশী ছবির ক্ষেত্রেও তেমনি দেখা যায়। বরং বিদেশী ছবির ব্যাপারেই যেন গা-ছাড়া ভাবটা বেশী।

একথা আমাদের মানতেই হবে যে প্রত্যেকটা দেশ বা জাতির নীতিবোধের একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে। ইউরোপ বা আমেরিকার নরনারীর ভেতর যে সম্পর্ক সহজলভ্য এবং স্বীকৃত, ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে তার বেশীর ভাগই অসামাজিক। এহেন পরিস্থিতিতে যে সমস্ত যৌন আবেদনমূলক ছবি ভারতে প্রদর্শিত হয় সে সম্বন্ধে সেন্সর বোর্ডের দৃষ্টিভঙ্গী কতদূর ভারতীয় নীতিবোধের মান রক্ষা করে চলে। সেটা গবেষণার বিষয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে একটা, আধটা কাট-ছাট করে সন্দেহজনক ছবিও প্রদর্শিত হবার অনুমতি পেয়েছে। তা সত্ত্বেও যেটুকু দেখানো হয় সেটুকু ভারতীয় দৃষ্টিতে যথেষ্ট আপত্তিকর। তাই প্রশ্ন জাগে, যে যৌন আবেদন বা অসামাজিক দৃশ্য সেন্সরশিপ ভারতীয় ছবিতে অনুমোদন করেন না সে সব দৃশ্য বিদেশী ছবিতে প্রচুর পরিমাণেই দেখা যায় কেন? নৈতিকতার ক্ষেত্রে সেন্সরশিপের এই দুমুখো নীতি নিঃসন্দেহে আজ সকলের পক্ষেই ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছে।

বর্তমানে কলকাতার একটি প্রেক্ষাগৃহে 'দি চেস্টিটি বেল্ট' নামে একটি যৌন আবেদনমূলক ছবি দেখান হচ্ছে। 'চেস্টিটি বেল্ট' কথাটার ভেতরেই একটা যৌন আবেদন আছে যেটা অল্পবয়স্ক যুবক যুবতীদের কাছে আগ্রহের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইউরোপে 'ক্রুসেড' নামে যে ধর্মযুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল সেটা ইতিহাস। সে সময়ে যে সমস্ত সৈন্য, সেনাপতি এবং নাইটরা ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবার জন্যে যোগ দিয়ে বিদেশ যাত্রা করতেন, তাঁরা তাঁদের অবর্তমানে নিজেদের পত্নীদের বিপথগামী হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবার জন্যে তাঁদের নিম্নাঙ্গদেশের বেশ খানিকটা বেল্ট দিয়ে আটকে দিয়ে যেতেন। অনেক সময়েই নাকি এর ফল উল্টোরকমই ঘটত। কেননা এ ধরনের অপমানকে সহ্য করে নেবার চাইতে মহিলারা স্বামীর প্রতি প্রতিহিংসা গ্রহণ করবার উপায় বার করতে খুব বেশী দেরী করতেন না।

'দি চেস্টিটি বেল্ট' ছবিটিতেও সেই ব্যাপারই ঘটতে যাচ্ছিল। এর নায়ক-নায়িকা স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ভেতরেও যে যৌন সম্পর্ক তারও নির্লজ্জ প্রকাশ নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। এই ছবিটিতে এমন অনেক দৃশ্য আছে যা নিশ্চয়ই ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে অমার্জনীয়। যেমন, নিদ্রিত স্বামীকে যৌনভাবে উত্তেজিত করবার জন্যে স্বামীর হাতকে টেনে নিয়ে এসে নিজের স্তনদেশে চেপে ধরে রাখা, বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন ভঙ্গীতে নগ্নদেহের প্রকাশ। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বামী-স্ত্রীর এই সহজ সরল সম্পর্ক নগ্নভাবে প্রদর্শিত হওয়া নিশ্চয়ই সহনীয় নয়। সেন্সরশিপের দায়িত্ব যদি অসামাজিক দৃশ্যের প্রতি নজর রাখা হয়, তাহলে এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। বিদেশী ছবির বেলায় ব্যতিক্রমটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের আপত্তি এইখানেই। সেন্সরশিপ ভারতীয় ও অভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে দুমুখো নীতি কেন অবলম্বন করবেন? হয় তাঁদের একটি নীতি মেনে চলতে হবে, আর তা না হলে স্বেচ্ছা নির্বাসনে যেতে হবে।

—দেবব্রত দে

চন্দন আউর বিজলী চিত্রে
পদ্মিনী ও সঞ্জীবকুমার

প্রেক্ষাগৃহ

বক্তব্য জ্বলন্ত বাস্তব, কিন্তু কাহিনী রচনা অতি অবাস্তব

বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারে অনূঢ়া কন্যার বিবাহ আজও পর্যন্ত একটি কঠিনতম সমস্যাই হয়ে রয়েছে। ঘটক প্রমুখের মাধ্যমে কথাবার্তা পাকা করে মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে কমপক্ষে যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা শতকরা দশ-জনেরও বাপ-মায়ের আছে কিনা সন্দেহ। সেই কারণে অধিকাংশ জনক-জননীই অন্য পথ বেছে নিয়েছেন তাঁদের কন্যাবিবাহের সমস্যার সমাধানের জন্য। তাঁরা কন্যাকে যথাসাধ্য কষ্টস্বীকার করে শিক্ষিত করে তোলেন এবং শিক্ষা সমাপনান্তে তাকে স্কুলমাস্টারী নার্সগিরি, টাইপিস্ট, সেলসগার্লগিরি বা কোনো অফিস-অ্যাসিস্ট্যান্টগিরির কাজে লাগিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। মেয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ছাত্রী অবস্থাতেই হোক বা উপার্জনরত অবস্থাতেই হোক, পাত্র-হিসেবে-অপছন্দ-নয়, এমন ছেলের সঙ্গে যদি মিশতে শুরু করে, তাহলে তাঁরা—বিশেষ করে মেয়ের মা—অখুশী হওয়ার পরিবর্তে মনে মনে স্বস্তিই অনুভব করেন এই ভেবে যে, মেয়েটার যা-হোক-একটা হিল্লে হবার কিনারা দেখা দিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা উৎকণ্ঠাও দেখা দেয় : 'মাছটা ঠিকভাবে টোপ গিলবে ত, না শেষ পর্যন্ত বঁড়শি ছিঁড়ে পালাবে?' বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ের কোনো বাঞ্ছিত যুবকের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে মেয়ের মা কিংবা মা-বাপের মনকে যে প্রশ্নগুলি সব সময়েই বিব্রত করে, সেগুলি হচ্ছে : মেয়ে তার মনের মানুষ নির্বাচনে ভুল করেনি ত' এবং মেলামেশা করতে গিয়ে মেয়ে সংযমের বাঁধ বেঁধে একটা সীমারেখা মেনে চলতে পারবে ত'? মেয়ের জ্ঞানগম্যি সম্বন্ধে যদি তেমন আস্থা না থাকে, তাহলে মেয়ের মা মেয়েকে প্রতিনিয়তই সাবধান করে দিতে ভোলেন না। কিন্তু প্রতিদিনের জগতে বহু সাবধানতা সত্ত্বেও বিপদ ঘটে অহরহই। প্রায়ই দেখা যায়, যাকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়েছিল, সেই শিবতুল্য যুবকটি মেয়েটির আত্মহারা প্রেম-বিহ্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে কুমারী মাতৃত্বের অবাঞ্ছিত পথে এগিয়ে দিয়ে স্বচ্ছন্দে সরে পড়েছে। এই অবস্থায় মধ্যবিত্ত পরিবারটি যে-সমূহ বিপদের সম্মুখীন হয়, তা' সাধারণভাবে অকল্পনীয়। যার বুকে মাথা রেখে জীবনভোর নিশ্চিন্ত নির্ভরতার কথা অনুভব করেছিল, তার হৃদয়হীন শঠতায় বিদীর্ণবক্ষ মেয়েটি অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের লজ্জা লুকোবার জন্যে প্রায়ই আত্মহত্যা করে সকল সমস্যার সমাধান করতে চায়। মা নিজের পরোক্ষ দায়িত্বের

কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সবকিছুর জন্যেই মেয়েকে করেন পুরো অপরাধী এবং সংবিৎ-হারা হয়ে মেয়েকে গাল দেন, 'মুখ পোড়িয়ে এসে ছাড়লি; পোড়ারমুখী, তুই মর।' বাপ হয়ে এসব দেখেশুনে হয়ে যান পাথর; মেয়েকে বলেন, 'তোর মুখ দেখব না; তুই যেখানে খুশী চলে যা।' আর প্রতিবাসীরা দেন ধিক্কার, কেউ বা মুখ টিপে হাসেন। হয়ত শেষপর্যন্ত অনেক চিৎকারের পরে সংগোপনে ভ্রূণহত্যা ঘটিয়ে মেয়েটিকে পাপের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তা না হয়, যদি মেয়েটি কুমারী অবস্থায় সন্তানের জন্ম দিতে বাধ্য হয়, তাহলে ঐ মেয়ে ও নবজাতক সারাজীবনের জন্যে যে-সমস্যার সম্মুখীন হয়, তার সুষ্ঠু সমাধান আজও আমাদের সমাজে হয়নি।

এতগুলি কথা বলতে হল জয়া চিত্র-এর প্রথম নিবেদন "মায়া" চিত্রটি সম্পর্কে কোনো কিছু বলবার আগে। কারণ ছবি-খানির যা বক্তব্য, সে হচ্ছে আজকের দিনে বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের এই জ্বলন্ত সমস্যাকে ঘিরেই। কিন্তু এই অতিকঠিন সমস্যাকে উপলক্ষ করে যে-কাহিনীর জাল বিস্তার করা হয়েছে, তা আগাগোড়া অবাস্তব, ত্রুটিপূর্ণ এবং সময়ে সময়ে হাস্যোদ্রেককারী। স্বামী বিবেকানন্দ, রামমোহন, বিদ্যাসাগরের আদর্শে উদ্বুদ্ধ আদর্শবাদী স্কুলশিক্ষক' জিতেনবাবু ছাত্রদের মানুষ করা দূরে থাকুক, নিজের মেয়ে মায়াকে পর্যন্ত ঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারেন নি; নইলে তাঁর প্রাক্তন ছাত্র ও তাঁর স্কুলের বর্তমান সভাপতি নলিনী রায়কে দেখা মাত্র সে উচ্ছল, লালায়িত হয়ে ওঠে কেন? জিতেনবাবু তাঁর ছাত্র এবং স্কুল-সভাপতি নলিনীর চরিত্র সম্বন্ধে কোনোই খোঁজখবর রাখেন না, এটা কি সম্ভব? একজন আদর্শ শিক্ষকের মেয়ে নিজেকে অত সহজে হারিয়ে ফেলল কেন? আদর্শবাদী শিক্ষক যুবক দেবাশিস যেটুকু ভূমিকার তাতে কারুর ক্ষতি নেই, কিন্তু কাহিনীকারের প্রয়োজনমত সে নাটকীয় মুহূর্তে আবির্ভূত হবে, এইটিতেই আমাদের আপত্তি। নলিনী দ্বারা পরিত্যক্ত হবার পরে মায়া সহসা নিরুদ্দেশের জন্যে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে পা বাড়ায় ট্যাক্সি-ড্রাইভার দেবাশিসের করুণা উদ্রেকের জন্যেই কি? অনেক, অনেক প্রশ্ন করা যায় এই অতি-অবাস্তব কাহিনীটির প্রত্যেকটি পরিস্থিতি সম্পর্কে। অথচ কত জীবন্ত কাহিনীই না রচিত হতে পারত এই জ্বলন্ত বাস্তব সমস্যাটিকে অবলম্বন করে! জীবনে যা-কিছু ঘটে, তাই যথাযথভাবে গ্রথিত করলেই গ্রহণযোগ্য নাটক বা চিত্রনাট্য হয়ে ওঠে না, এই সত্যটি সম্ভবত নির্মাতা সর্বজ্ঞের জানা নেই।

এই অবাস্তব কাহিনীতে যতখানি উত্তাপের সঞ্চার করা যায়, তা করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন অধিকাংশ শিল্পীই। বিশেষ করে নায়িকা মায়ার ভূমিকায় সুস্মিতা সান্যাল পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাবপ্রকাশের দ্বারা নিজের নাট্যনৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন সুযোগ পাওয়া মাত্রই। ব্যর্থ প্রণয়িনী রূপসী বেশে শিখা ভট্টাচার্য অল্পের জন্য হলেও দর্শকদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। দেবাশিসের ভূমিকায় অজয় গাঙ্গুলী চিত্র-নাট্যকারের ত্রুটির জন্যে ছবির প্রথম দিকে বিশেষ কিছু করতে না পারলেও ছবির শেষভাগে বেশ হৃদয়গ্রাহী অভিনয় করেছেন। নলিনী রায় বেশে শ্যামল ঘোষাল একটি পুরোপুরি ভিলেনকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় অসিতবরণ (জিতেনবাবু), অপর্ণা দেবী (মায়ার মা সাধনা), সতীন্দ্র ভট্টাচার্য (অজয়), চিত্রা মণ্ডল (মায়ার বান্ধবী), সীতা মুখোপাধ্যায় (দেবুর বাড়ীওয়ালী), সুব্রত সেন (সাহিত্যিক-দার্শনিক) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মোটের উপর প্রশংসনীয়। নায়িকা সুস্মিতা সান্যালের ক্লোজ-আপগুলি নেওয়া বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ননী দাস। সম্পাদনা দ্বারা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির টেম্পো সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখা হয়েছে। ছবির কোনো কোনো স্থানে আবহসৃষ্টির জন্যে সমবেত কণ্ঠসঙ্গীতের ব্যবহার প্রশংসনীয়। কিন্তু গানগুলির প্রয়োগ বা সুরসংযোজনায় বিশেষ কোনো সার্থকতা লক্ষ্য করা গেল না।

হিংসার রাজ্যে অহিংসাব্রতীর জীবন আলেখ্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হিংসার তাণ্ডবলীলা রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল। তিনি লিখেছিলেন, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব। তবু তিনি হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আটম বোমা নিক্ষেপের বর্বরতার কথা শোনেননি। ভাগ্যে তিনি আজ বেঁচে নেই। নইলে স্বাধীন ভারতে তাঁর নিজ বাসভূমি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে হিংসার বীভৎস মূর্তি দেখে বিমূঢ় হতেন। আজকের পৃথিবীতে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অহিংস আদর্শ নিশ্চয়ই অচল। অথচ প্রকৃত অহিংসা যারা শত্রুভয়ে বন্দুক হাতে করে প্রাণরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়, তাদের জন্যে নয়; যারা প্রকৃত সাহসী, শত্রুর উদ্যত বন্দুকের সামনে বুক
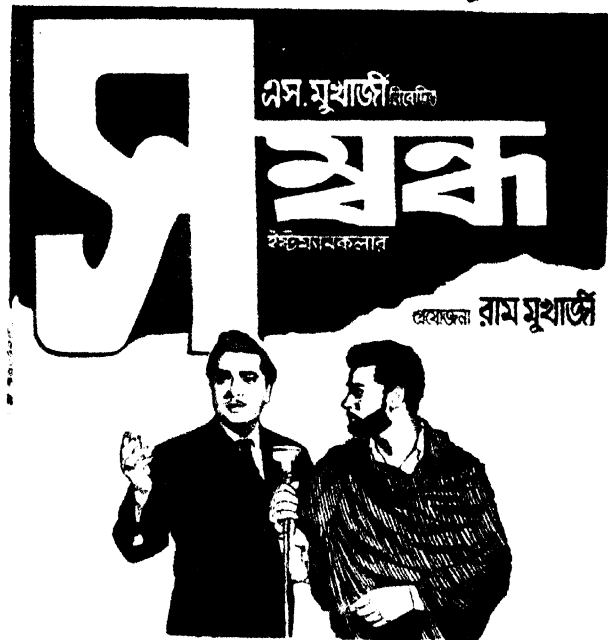
ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারে, তাদেরই জন্যে।—অন্তত এই কথাই বুঝেছি সম্প্রতি ম্যাকসমুলার ভবনে প্রদর্শিত মহাত্মা গান্ধীর জীবন সম্পর্কিত বিরাট তথ্যচিত্রটি দেখে। বিঠলভাই কে জাভেরীকৃত এই তেত্রিশ রীলে সম্পূর্ণ চিত্রটিতে আমাদের সুবিস্তৃত ভারতভূমিতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর বাল্যকাল থেকে শুরু করে প্রয়াগসংগমে তাঁর চিতাভস্ম বিসর্জন পর্যন্ত সকল ঘটনা ফোটোগ্রাফ, স্কেচ, মানচিত্র, অ্যানিমেশন (চলন্ত অঙ্কন), নির্বাক ও সবাকচিত্র-সহযোগে গ্রথিত করা হয়েছে। শ্রীজাভেরী এই বিরাট কার্যসম্পাদনে যে অসামান্য ধৈর্য, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমসহকারে এই জাতির জনকের জীবনীসংক্রান্ত সকলরকম দলিল দেশবিদেশ থেকে সংগ্রহ করেছেন, তাতে মাত্র তাঁর অজস্র প্রশংসা করাই যথেষ্ট হবে না, ভারতবাসী হিসেবে তাঁর প্রতি আমরা আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। লবণ সত্যাগ্রহে তাঁর ডান্ডি যাত্রা, গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর যোগদান, নোয়াখালি ও বিহারে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন, তাঁর অন্তিম যাত্রা প্রভৃতি ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যথার্থই একটি সৌভাগ্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা। মাত্র তাঁর মুখের ক্লোজ-আপ অফ বেশীবার ব্যবহার করা আমাদের চোখে বিশদৃশ ঠেকেছে।

স্টুডিও থেকে

বিশেষ করে বাংলা ছবিতে এখন সস্তা প্রেম ভালোবাসার চাইতে জীবনের অন্যান্য জটিল সমস্যা ও বিভিন্ন দিকে হাত বাড়ানোর প্রবণতা দেখা দেয়েছে। এতদিন যাবৎ সেই খাড়া-বড়ি-থোড় আর থোড়-বড়ি খাড়ারই পুনরাবৃত্তি চলে আসছিল। মাত্র কয়েকজন পরিচালক অন্য পথে পা বাড়াতেন। মানুষের জীবনে প্রেম বা ভালোবাসার একটা বিশেষ প্রয়োজন ও স্থান আছে অনস্বীকার্য। কিন্তু আজকের জীবনে তার চাইতে আরও কিছু বেশী গুরুত্বপূর্ণ সংকট ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে মানুষকে—তাও নিতান্তই বেঁচে থাকবার জন্য। যেটাকে এড়িয়ে গিয়ে জীবনকে শুধু 'প্রেমময়' করে তুললে আসল সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়াই হয়। এবং সেটা পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচায়ক নিঃসন্দেহে।

কাজেই বাংলা দেশের অনেক পরিচালকই যে পথ বদলে নতুন পথে পা বাড়িয়েছেন এটা যেমন প্রশংসনীয় তেমনি এ কাজ দায়িত্ববহুলও বটে। তবে আশা এই টালিগঞ্জ থেকেই 'ছিন্নমূল' তৈরী হয়েছিল, তৈরী হয়েছিল 'পথের পাঁচালী', 'কোমল গান্ধার', 'কাঞ্চন জঙ্ঘা'। তৈরী হচ্ছে 'অপরিচিত', 'দিবা-রাত্রির কাব্য', 'অরণ্যের দিন-রাত্রি', 'এপার-ওপার'। কাজেই এখানে আশা করা যায় নতুন কিছু হবে।

আজকের দিনে সিনেমাকে যখন এন্টারটেইনমেন্ট মাস্ মিডিয়া ছাড়াও নতুন দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে তখন ছবিতে এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিশ্চয়ই করা প্রয়োজন। সলিল দত্ত, বিমল ভৌমিক, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এ কাজের জন্য ধন্যবাদ পাবেন। শুধু শুকনো ধন্যবাদের কথাই বা বলি কেন, বক্স অফিসেও এ'রা যথেষ্ট সাড়া পাবেন। 'অপরিচিত' বহুদিন আগেই শেষ হয়ে পড়ে আছে। শ্রীদত্ত এখন করছেন 'কলঙ্কিত নায়ক'। এ ছবিতেও সেই যুগযন্ত্রণা, মানসিক সংকট ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে। যাই হোক, বাংলা ছবিতে এ নতুন হাওয়া যদি চিত্র ব্যবসায়ে নতুন কোন দিক খুলে দেয় ক্ষতি কি? কারণ সিনেমা তৈরী কাজটা তো একদিকে যেমন শিল্প অন্যদিকে তেমনি ব্যবসাও। ব্যবসা ছেড়ে শুধু শিল্প একা দাঁড়াতে পারে না। সুতরাং দু নৌকোয় পা দিয়ে টাল সামলাতে সামলাতে এগোতে হবে। একটু বেচাল হলেই একেবারে শেষ।

●

কিশোরকুমার।

দশ বছর আগের মতো নাকি এ নাম আর সোরগোল তোলে না এখন বোম্বাইয়ে। কি বাংলা কি হিন্দী সব ছবিতেই ও'র জনপ্রিয়তা ছিল কিন্তু সবার ওপরে। 'লুকোচুরি'র পর কলকাতা ছেড়ে পাকাপাকিভাবে বাসা বাঁধলেন বোম্বাইয়ে। তাই কলকাতার পাট চুকল। কাহিনীকার চিত্রনাট্যকার, সংলাপ-রচয়িতা, পরিচালক, সঙ্গীত-পরিচালক, গায়ক, নায়ক কিশোরকুমার 'দূর গগন কি ছাঁওমে' তৈরী করলেন সেখানে। বক্স অফিসের জয়টিকাও ছবির কপালে লেগেছিল।

কিন্তু কি জানি কি কারণে তবুও তাঁকে খুব বেশী একটা পর্দায় দেখা যায় নি গত কয়েক বছর। বোম্বাইয়ে কিশোরকুমারের জনপ্রিয়তা কতটুকু বেড়েছে বা কমেছে জানি না তবে বাংলা দেশে কিশোরকুমার এখনও 'লুকোচুরি' বা 'দুষ্ট প্রজাপতির' কিশোরকুমারই আছেন। সব বিষয়ে সমান দক্ষ এমন দ্বিতীয় মানুষ বর্তমান চিত্র-জগতে নেই।

প্রায় এগার বছর বাদে আবার কিশোর-

ছো-ডান্স অব বেংগল চিত্রে রাম-রাবণ যুদ্ধে রাবণ

কুমার ফিরে আসছেন বাংলা ছবির কাজে। (ওঁর 'লুকোচুরি' মুক্তি পেয়েছিল সম্ভবত উনিশশো আটান্ন সালের সাতাশে জুন।) নতুন যে ছবির কাজ শুরু করছেন তা হল 'প্রেম-বিদ্রোহী'। কিশোরকুমার নিজে ছাড়া বাংলা দেশের প্রায় সব [illegible] থাকছেন এ ছবিতে। [illegible] সম্ভবত অপর্ণা সেন নায়িকা [illegible] অভিনয় করছেন। রবি ঘোষ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় আর [illegible] দুটি বাংলা চিত্র জগতে [illegible] হিসাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। [illegible] নিজের কিশোরকুমারের নাম নতুন করে [illegible] [illegible] কিশোরকুমারের [illegible] কিছু পাওয়া যায়। বাংলা দেশ সেই শিল্পী কিশোরকুমারকে স্বাগত জানাই নতুন কিছু পাবার আশায়।

মঞ্চাভিনয়

বাংলা দেশের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে শংকরের 'চৌরংগী' একটি অতিপরিচিত নাম। এই জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ অনেকবার পরিবেশিত হয়ে নাট্যানুরাগীকে আকৃষ্ট করেছে। সম্প্রতি শিপিং কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা 'স্টারে' বিধায়ক ভট্টাচার্য কর্তৃক নাট্যরূপায়িত 'চৌরংগী' পরিবেশন করেছেন। প্রথমেই বলে রাখি প্রযোজনা আমাদের প্রত্যাশার সীমা একেবারেই স্পর্শ করতে পারে নি।

সমাজের ওপরতলার মানুষের ব্যভিচারের অন্তঃসারশূন্য জীবনের সঙ্গে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের বিরোধই হোল 'চৌরংগী' নাটকের মূল কথা। [illegible] ঐশ্বর্যময়ী, [illegible] চৌরংগীর অন্যতম আকর্ষণ [illegible] আবর্তিত হয়েছে সব নাটকীয় সংঘাত। নাটকটি মঞ্চে পরি-[illegible] আলোয় তুলে ধরতে গেলে [illegible] যে গভীরতা শিল্পীদের [illegible] প্রযোজনা বা সেদিনের মঞ্চরূপায়ণে [illegible] বেশী ছিল বলে মনে হয় না। তাছাড়া [illegible] অভিনেতা অলোক মুখার্জীর নাট্য-নির্দেশনায় কোনরকম স্বাতন্ত্র্য আনতে পারেনি প্রযোজনায়। সমস্ত নাটকে যে [illegible] চোখে পড়েছে তা যে শ্রীমুখার্জীর [illegible] নাটক নির্দেশনায় কেমন করে সম্ভব হোল তা আমরা ভেবে পাই না।

অভিনয়ের দিক দিয়ে তিন-চারজন ছাড়া আর কেউই চরিত্রের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারেন নি। হোটেল রিসেপশনিস্ট 'স্যাটা বোসে'র সূক্ষ্ম চরিত্রকে মোটামুটি প্রাণবন্ত করে তুলেছেন রবীন চক্রবর্তী। 'ফোকলা চ্যাটার্জী' ও 'আগরওয়ালা'র ভূমিকায় শম্ভুনাথ দত্ত ও গৌর ঘোষের অভিনয় উপস্থিত প্রায় সবাইকেই তৃপ্তি দিয়েছে। শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মিসেস' পাকড়াশীও মন্দ নয়। শংকর চরিত্রের গভীরতা অমল বোসের অভিনয়ে এতটুকু মূর্ত হয়ে উঠতে পারে নি। শিল্পী ও 'শংকরে'র মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান আমাদের ব্যথা দিয়েছে। 'করবী' চরিত্রে হিমানী গাঙ্গুলীর অভিনয় একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে বলবো; বিকাশ বিশ্বাসও 'অনিন্দে'র ভূমিকায় নিজেকে কোনমতেই মানিয়ে নিতে পারেন নি। অন্য কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশ নেন—রাসবিহারী মিত্র, মণিমোহন গোস্বামী, দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী, অলোকময় মুখার্জী, উৎপল কর, সুপর্ণা চ্যাটার্জী, রাধা ভট্টাচার্য।

কলকাতার প্রখ্যাত নবীন নাট্যসংস্থা নাট্যায়ন আসছে ২০ নভেম্বর সন্ধ্যায় মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে দুটি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করছে। নাটক দুটি হল অনিল দে রচিত 'কণ্ঠনালী পোড়ে না' ও ভাস্কর মুখোপাধ্যায় রচিত 'দ্বিতীয় বিশ্ব'।

গিরিশ নাট্য সংসদ কোলকাতার একটি প্রখ্যাত সৌখীন নাট্য সংস্থা। এ'রা 'বাঁশের কেল্লা' নাটকটি গত ২ নভেম্বর দমদম সি. আই. টি বিল্ডিংসএ যেরূপ সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তা সত্যই মনে রাখার মত। প্রত্যেক শিল্পী যেন একই সুরে একই মনে বাঁধা পড়েছেন নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত প্রতিটি দৃশ্যকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। চব্বিশ পরগণা জেলার হায়দারপুরে গ্রামের চাষী তিতুমীরের বৃটিশ শক্তির সঙ্গে আমরণ সংগ্রামের অনবদ্য কাহিনী এ নাটকে রূপ পেয়েছে। এধরনের সুন্দর অভিনয় সচরাচর চোখে পড়ে না। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়,

সম্বন্ধ/দেব মুখার্জি এবং সুলোচনা

পুরেন পাল, বিমান সরকার, কেষ্ট সিংহ, গৌর পাল, শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত দাস, সুরেশ ঘোষ, সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্দিরা দাস, দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা সরকার ও নিখিল দাস। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়।

শারদোৎসব উপলক্ষে যাত্রিক সংঘ দুটি নাটক মঞ্চস্থ করে। মহাষ্টমীর দিন মঞ্চস্থ করে নন্দগোপাল রায়চৌধুরীর 'খুনী কবে?' ও মহানবমীর দিন মঞ্চস্থ হয় অপ্রকুমারের 'আগন্তুক'। শিল্পীরা নাটক দুটির মূল বক্তব্য যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হন এবং অনেকাংশে সাফল্যলাভ করেন। অজিত দে দুটি নাটকের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রে প্রাণস্পর্শী অভিনয় করেন। অনিল হাজরার সর্দার সুন্দর ও স্বাভাবিক। রাজেন দাস, দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায়, উদয়শঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও অমর দেব অভিনয় সুন্দর। এ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেন কাঞ্চন সান্যাল, রঞ্জিত দাস, হারাধন চক্রবর্তী, অমিতাভ চক্রবর্তী, অসীম পাল, রঞ্জিত দে ও অরূপ দে। বিমল ভট্টাচার্যের ভূয়সী প্রশংসার দাবী রাখে। নাটক দুটি পরিচালনা করেন 'শ্রীনির্দেশক'।

১৫ নভেম্বর রবীন্দ্রসদনে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের সভ্যারা 'দেবলাদেবী' নাটকের অভিনয় করবেন। অভিনয়াংশে অংশ নেবেন ঃ মীনা সেন, ইন্দুলা রায়চৌধুরী, মাধুরী সেন, প্রণতা ভট্টাচার্য, আরতি চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী রায় এবং আরো কয়েকজন।

নন্দীপাড়া যুবকবৃন্দের পরিচালনায় এবং ইউনাইটেড স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় শ্যামপুকুর রজত-জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে রামদুলালতলা শঙ্কর মঠ প্রাঙ্গণে 'পথিক' নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের আলোড়নসৃষ্টিকারী মাক্সিম গোর্কির 'মা' নাট্যরূপ বিষ্ণু চক্রবর্তী মঞ্চস্থ করবেন আগামী ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। নাট্যনির্দেশনায় জ্যোতিপ্রকাশ।

মহামতি লেনিনএর জন্মশতবার্ষিকীর শ্রদ্ধায় তরুণ অপেরা নিবেদিত 'লেনিন' আগামী ২৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় বিশ্বরূপায় অভিনয় করবেন দলের শিল্পীরা। শহর কলকাতায় এ পালার এটি দ্বিতীয় অভিনয়।

আশ্রমেরকের শিল্পীরা সম্প্রতি বিশ্বরূপা থিয়েটারে বিমল মিত্রের সাহেব বিবি গোলাম উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেছেন। নাট্যরূপ দিয়েছেন তাপস সেন এবং নির্দেশনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ

কৃষ্ণলীলা চিত্রের দৃশ্য

করেন সুব্রত মুখার্জী। সামগ্রিক অভিনয় দর্শকদের সত্যিই মুগ্ধ করে এবং এবিষয়ে শিপ্রা সাহা, যূথিকা ভট্টাচার্য, নন্দলাল চৌধুরী, জগবন্ধু রায়ের কৃতিত্বই অধিক।

বিবিধ সংবাদ

৭ থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত জ্যোতি সিনেমায় যে আধুনিক জার্মান চলচ্চিত্র প্রদর্শনী উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাতে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটীজ অব ইণ্ডিয়া, কনসুলেট জেনারাল অব দি ফেডারাল রিপাবলিক অব জার্মানী, ক্যালকাটা এবং ম্যাকসমুলার ভবন, ক্যালকাটার সম্মিলিত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই চলচ্চিত্রোৎসব মাত্র স্থানীয় ফিল্ম ক্লাব ও সিনে সোসাইটীগুলির সভ্যবৃন্দকে আধুনিক জার্মানীর নবীনতম চলচ্চিত্র পরিচালকদের দ্বারা নির্মিত সাতখানি কাহিনীচিত্র দেখবার সুযোগ দিচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী প্রায় বিশ বছর ধরে জার্মান চলচ্চিত্রজগতে যেসব বাস্তবতাবোধহীন [illegible] যুবকবৃন্দ দেশের সমস্যার প্রতি উদাসীন ছবি তৈরী হচ্ছিল, তা দেখে জার্মান যুবকবৃন্দ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তাদের [illegible] ১৯৬২তে [illegible] ওবারহাউসেন এ অনুষ্ঠিত অষ্টম [illegible] চলচ্চিত্রোৎসবে। এইখানে চলচ্চিত্র নির্মাতারা [illegible] সমস্যারূপে অভিহিত করে কয়েকজন চলচ্চিত্রনির্মাতা [illegible] সম্মিলিতভাবে এক ইস্তাহার প্রকাশ করেন এবং এঁদের মধ্যে [illegible] সরকারের [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] করেন এবং ফলে ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত [illegible] যে ছবিগুলি নির্মাণ করেছেন এবং [illegible] করেছেন, [illegible] ছবিগুলি [illegible] প্রথম ছবি ও [illegible] সবচেয়ে বিখ্যাত [illegible] রূপেরা একখানি [illegible] বর্তমান উৎসবে প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবিগুলি সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, এদের মাধ্যমে বর্তমানের জার্মানী স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। গেল ৯ নভেম্বর এই উৎসবের উদ্বোধন করেছেন সত্যজিৎ রায়।

বিজয়া মহোৎসব উপলক্ষে 'রূপদক্ষ' নাট্যগোষ্ঠী গত ৯ নভেম্বর এক প্রীতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে। দক্ষিণ কলকাতার বহু তরুণ সঙ্গীতশিল্পী, শিল্পী, নাট্যকার, নাট্য পরিচালক, সাংবাদিক ঐদিন সন্ধ্যায় ছোট্ট ঘরোয়া অনুষ্ঠানে মিলিত হয়েছিলেন। সর্বশ্রী সীমা গুপ্তা, সুকন্যা গুহরায়, শুভঙ্কর ঘোষ, গৌতম মুখোপাধ্যায়, অমিয় ভট্টাচার্য, অশোক চক্রবর্তী, চুনিলাল মুখোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর, অশোক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সঙ্গীতে ও আবৃত্তিতে উপস্থিত সকলকে আনন্দ দান করেন। **অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্থার সম্পাদক শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায়।**

পদ্মশ্রী শরণরাণী

জলসা

ভারতীয় সংগীত গুরুমুখী

বিদ্যা শরণরাণী

"আমরা গুণী শিল্পীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শন করি, তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে [illegible] নির্মাণ করি, অথচ [illegible] তাঁদের [illegible] যে গুরু পরম্পরায় [illegible] প্রতিষ্ঠিত হয় তবে [illegible] সাধনার [illegible] হয় এবং [illegible] বিদ্যার আশীর্বাদপুষ্ট [illegible] নিভৃতে সাধনা [illegible] সৃজনশীলতাকে [illegible] পারে" প্রাচ্য হোটেলে এক ঘরোয়া সাংবাদিক সম্মেলনে "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত" সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন সুবিখ্যাত মহিলা সরোদশিল্পী পদ্মশ্রী শরণরাণী।

এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য সম্বন্ধে সাংবাদিক মহল থেকে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে শ্রীমতী শরণরাণী বলেন, "পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, ভারতভূষণ ইত্যাদি সম্মানে শিল্পীদের ভূষিত করার অধুনাপ্রথা অবশ্যই এই ক্ষেত্রে অগ্রগতির লক্ষণ। কিন্তু এইখানেই কেন থেমে থাকবে? সাহিত্যিক, এবং বিভিন্ন বিষয়ের শিল্পীদের নামে কেন রাস্তা তৈরী হয় না? রাজপথে অথবা অন্যান্য সাংস্কৃতিক মিলনমেলায় কেন বড়ে গোলাম আলি, ওঙ্কারনাথ, আলাউদ্দীন খাঁ ও ফিরাজ খাঁর প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয় না? আমরা ত কেউ তানসেন, বৈজুবাওয়াকে দেখিনি, আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, আলি আকবর এঁরাই যে আমাদের সময়ের তানসেন। ওঙ্কারনাথ, বড়ে গোলাম আজ নেই। কিন্তু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব ত আছেন—তাঁকে বুঝতে দিন তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার গভীরতা কতখানি।" আবেগভরে বললেন তরুণ শিল্পী।

"ভারতীয় সঙ্গীতের" গৌরবময় ঐতিহ্যধারা অব্যাহত রাখার প্রসঙ্গে শরণরাণী বলেন, "নানান সঙ্গীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকার আর্থিক এবং অন্যান্য নানাভাবে সাহায্য করছেন এটা অত্যন্ত আশার কথা সন্দেহ নেই।

কিন্তু একটা কথা ভুললে চলবে না ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র **গুরুমুখী বিদ্যা।** গুরু-শিষ্যের শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্বন্ধ-বন্ধনেই এর সংরক্ষণ সম্ভব। আমাদের এই ভারতে কত গুণী প্রাজ্ঞ শিল্পী সঙ্গীতজ্ঞ আছেন- অভাবে-অনাহারে যাঁরা দীনদরিদ্রের মত দিন কাটাচ্ছেন। সরকারের উচিত প্রতিষ্ঠানগুলির মত তাঁদেরও অকুন্ঠ অর্থসাহায্য করা যাতে তাঁদের পক্ষে আশ্রমজীবনের আদর্শে ত্যাগ, তিতিক্ষা, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা দিয়ে একনিষ্ঠচিত্তে শিষ্যদের সাধনার মত করে সঙ্গীতবিদ্যাকে আয়ত্ত করতে শেখানো সম্ভব হয়।"

"এ যুগে কি তা সম্ভব?" জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্ন।

"কেন নয়? মাইহারে বাবাই (আলাউদ্দিন খাঁ) ত আমাদের এইভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। সকাল থেকে শুরু করে রাত্রে শোবার আগে অবধি কম করে ১০।১২ ঘন্টা বিভিন্ন রাগে হাত সাধতে হোতো। এতটুকু গলতি হলে বাবা ক্ষমা করতেন না—নিজের ছেলেকেও না। মনে আছে একবার একটা তান তুলতে দেরী হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে বাবার নিষ্ঠুরতম তিরস্কার 'তোমরা না কনফারেন্সের বড় বড় শিল্পী? এটুকু পার না? একটা পাঁচ বছরের শিশুও ত এ পারে!'

আমি মাথা নীচু করে কান্না চাপবার চেষ্টা করছি কিন্তু সরোদের তার বেয়ে টপ্‌টপ্‌ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। মা (আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের স্ত্রী) এসে বললেন, 'মেয়েটাকে এমন যাচ্ছেতাই করে বকো ও যে খাওয়া-দাওয়া সব ছেড়ে দিয়েছে। জান? তুমি ওকে মেরে ফেলবে নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে বাবার শিশুর মত কান্না আর বিলাপ—'আমি পশু, মা আমায় শাস্তি দাও'—এমনি আরো কত কথা। আমি বাবার পা ছুঁয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। কারণ এইভাবে বেশীক্ষণ চললে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়বেন। সে রাত্রে বাবা নিজে সামনে বসিয়ে কত যত্ন করে আমায় খাইয়েছেন। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ ত এই। এ বস্তু ব্যবসায়িক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে। এবং এছাড়া সত্যিকারের শিক্ষা সম্ভব নয়। বাবার অমন সরল মন দেবোপম নির্মল চরিত্রের আদর্শ সামনে থাকাটাও কম কথা নয় ত।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং সংগীত-শিক্ষার এক সুসম মিলন ও সামঞ্জস্য ঘটেছে যে স্বল্প কয়েকজন শিল্পীর জীবনে শ্রীমতী শরণরাণী তাঁদেরই একজন। গুরু আলাউদ্দিন ও আলি আকবর খাঁর কাছে ব্যাপক শিক্ষা এবং একনিষ্ঠ রেওয়াজ ও সংগীতধ্যানের ফলশ্রুতি তাঁর যন্ত্রের ওপর দখল, কল্পনা-সমৃদ্ধ রাগ পরিবেশনা এবং শুদ্ধ, সুন্দর রূপ বিশ্লেষণ।

শরণরাণী সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখ-যোগ্য সংবাদ হোল এই ঃ যন্ত্রী শরণরাণীর সঙ্গীতজীবন শুরু হয় নৃত্যশিল্পী-রূপে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করবার আগে তিনি অচ্ছন মহারাজের কাছে কত্থক নৃত্য এবং অন্যান্য গুরুদের কাছে কথাকলি, মণিপুরী ও ভারতনাট্যম শিক্ষা করেন এবং একক নৃত্য নৃত্যনাট্যে রীতিমত খ্যাতি অর্জন করেছেন।

কিন্তু সার্থকতার চরম মুহূর্তে পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের আপত্তি থাকায় নৃত্য ছেড়ে তাঁকে যন্ত্রশিল্পে আত্মনিয়োগ করার কথা ভাবতে হোলো।

"আমার তখন জেদ চাপল এমন এক যন্ত্রকে আমি গ্রহণ করব যা মেয়েরা সাধারণত শেখে না। ছোটবেলা থেকে গম্ভীর ও মর্যাদামণ্ডিত নাদনাজানা এক যন্ত্রের আওয়াজে আমার শ্রুতি যেন ভরে থাকত। একদিন আমার ভাই কোথা থেকে একটা পুরোন সরোদ নিয়ে এল যার একটিমাত্র তার। আমি তাতে তানপুরা, সেতারের তার লাগিয়ে একটা সিক দিয়ে আওয়াজ সৃষ্টি করে বাজাতে শুরু করি। এইভাবে নিজের মত করে একরকম বাজাতাম। এর অনেক পরে আলি আকবর খাঁ সাহেব এবং তারও পরে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে গুরুরূপে পাবার সৌভাগ্য হয়েছে। সরোদ যার যন্ত্র আলি আকবর অথবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে গুরু-রূপে গ্রহণ না করে তার গতি আছে? জ্ঞাতসারে না হোক অজ্ঞাতসারেও ও এঁদের প্রভাব বাজনায় আসবেই।"

"আপনি ত বহুবার সাগরপারের দেশে সাংস্কৃতিক দূতরূপে গেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতের কোন রূপটি ওদের টানে বলে আপনার ধারণা?" প্রশ্ন করি।

"ওদের সঙ্গীত ত স্বরলিপিবদ্ধ তান-বিস্তার পরিধিও স্বাভাবিক নিয়মেই সীমিত। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের নিজস্ব দৃঢ়বদ্ধ নিয়মকানুন থাকা সত্ত্বেও শিল্পীর নিজস্ব কল্পনা ও ভাবনা বিস্তারের সুবিস্তৃত অবকাশ আছে। এই সৃজনশীল বিস্তার ওদের মুগ্ধ করে। এর উপর ভারতীয় সঙ্গীতের অন্তর্মুখী দর্শন অধ্যাত্মসম্পদ ও শুদ্ধতার দীপ্তি ত আছেই।

ভারতীয় সঙ্গীত, ঋষিদের সাধনালব্ধ ঐশ্বর্য। এ সঙ্গীত উচ্চাঙ্গ এবং অন্তহীন. এর বিন্দুমাত্রও আয়ত্ত করে যথাযথ প্রকাশ করতে হলে দেহ ও মনের সংযম, নিয়ম, ধ্যান ও চিত্তশুদ্ধি প্রয়োজন কারণ এ হোলো দেবতার সম্পদ। **ভারতীয় শিল্পীদের এ সত্য সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা উচিত।** মিঃ বাকিলওয়ালা শরণরাণীর স্বামী তাঁর সঙ্গীতসাধনার সমস্ত সহায়। ১৯৬৮ সালের ৩০ এপ্রিল পণ্ডিত বিজয়-লক্ষ্মী তাঁকে শরণরাণী ফেলিসিটেশন অ্যালবাম নামে গ্রন্থ দিয়ে পুরস্কৃত করেন শিল্পীর সঙ্গীতসাধনার ৩১ বছর পূর্তি উপলক্ষে। দিল্লী নিবাসীরা শরণরাণী অভিনন্দন সমিতি [illegible] এক [illegible] সভায় [illegible] এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সুসজ্জিত এই বিরাট গ্রন্থে সঙ্গীতজগতে শিল্পীর [illegible] বাল্যজীবনের সচিত্র বিবরণ, ভারত ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিরাট সঙ্গীতজ্ঞ শিল্পী, গায়ক, বাদ্যশিল্পী [illegible] নীতিবিদ, আমেরিকা, [illegible] জার্মানী, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডের [illegible] প্রতিনিধি, [illegible] অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের হাই-কমিশনার [illegible] এবং বিশ্ববিখ্যাত [illegible] সঙ্গে শরণরাণীর বহু মূল্যবান ছবি [illegible] এই গ্রন্থের আর এক সম্পদ হোল 'সরোদ' এর উপর শরণরাণী লিখিত এক [illegible] মূলক প্রবন্ধ যা সাংস্কৃতিক মূল্যেও অপরিসীম।

বিলম্বিত লয়ের সঙ্গীত গ্রহণে সঙ্গীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ, বাহাদুর খাঁ ও অন্যান্য শিল্পী।

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে ডাঃ ললিত মিত্র সেনিগুপ্ত (কলি-৪) গীতাঞ্জলি সঙ্গীত শিক্ষায়তনের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে সমবেত সঙ্গীত উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করছেন। মাইকের সামনে শ্রীমতী শান্তা সাহাকে গান করতে দেখা যাচ্ছে।

●

ভারতখণ্ড কলেজ অফ মিউজিকের উদ্যোগে চতুর্থ বার্ষিক নিখিল ভারত ভাতখণ্ডে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি-যোগিতার বিষয়সূচীতে ভারতীয় কণ্ঠ-সঙ্গীত ও গীটার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদনপত্র গৃহীত হবে। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ স্বপন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, ভাতখণ্ডে কলেজ অফ মিউজিক, ১০।৭৩ চারু এভিনিউ, কলিকাতা-৩৩।

—চিত্রাঙ্গদা

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে!

অজয় বসু

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে!

কথাটা শুধু কথার কথাই নয়, কাজে-কর্মেও যে বেদবাক্যেরই সমান তাই বোঝাতেই যেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বিলম্বিত তৎপরতা দেখিয়েছেন। নিউজিল্যান্ড দল যখন ভারত সফরে এলো, তখন ক্রিকেট বোর্ডের ঘুম ভাঙলো না। তারপর আড়মোড়া ভেঙে ক্রিকেট বোর্ড ভারতীয় খেলোয়াড়দের জন্যে অনুশীলনী শিক্ষা-শিবিরের ব্যবস্থা করলেন। নিউজিল্যান্ড দলের সফর আরম্ভের আগে এইরকম একটি শিবির বসালে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো?

এ প্রশ্নের জবাব মিলবে না। তবে একথা জানি যে, নিউজিল্যান্ডের সফরের আগে এমন একটি শিক্ষা-শিবির বসানোর প্রয়োজন ছিল যেমন বেশি, তেমনি এমন এক শিক্ষা-শিবিরের পরিণতি ঘিরে সম্ভাবনাও ছিল উজ্জ্বল।

প্রয়োজনের কথাটাই বলে নি।

গ্রাহাম ডাউলিংয়ের নেতৃত্বে নিউজিল্যান্ড দল ইংলন্ড ঘুরে যেদিন ভারতে এসে পড়ে, সেদিন সারা দেশে বর্ষা বিরাজমান। ভারতের কোনো অঞ্চলেই ক্রিকেট মরশুম শুরু হয়নি। ইংলন্ডে একটানা খেলার সুযোগ পেয়ে নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড়েরা ক্রিকেট পুরোপুরি সড়গড়। আর ভারতীয় খেলোয়াড়দের কপালে অনভ্যাসের টিপ্ জ্বলজ্বল করছে। অথচ এই পরিস্থিতিতেই ভারত-নিউজিল্যান্ডকে পরস্পরের মুখোমুখি হতে হলো। এর পরিণাম যে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ছোট শরিক নিউজিল্যান্ড অতীতে কোনোদিন কোনো টেস্টে ভারতকে হারাতে না পারলেও এবার একটি টেস্টে জিতলো এবং তেমনি ঐতিহাসিক [illegible] নিউজিল্যান্ডের দলই ভারতের মাটি থেকে রাবারটি ছিনিয়ে নিতে পারলো না।

নিবেদন আমাদের অনুশীলনের কথা বলে ভারতীয় বোর্ড যদি নিউজিল্যান্ডের দলের সফরের আগেই অনুরূপ [illegible] শিক্ষা-শিবির বসিয়ে দিতেন ও পারতেন, তাহলে দর্শক প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে সম্মুখ সমরে ভারতকে এতোটা নাকেহাল হতে হতো না।

ক্রিকেট অনুশীলন ও প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নেই একথা জেনেও ভারতীয় বোর্ড আগে অনুশীলন শিবিরের ব্যবস্থা না করায় বোর্ডের অদূরদর্শিতার যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে শুধু শুধু নামডাকের ঢাক তুলেই ভারতীয় খেলোয়াড়েরা সে পরিচয়ের ঊর্ধ্বে নিজেদের তুলে ধরতে পারেননি। পারার কথাও নয়।

নামে কি যায় আসে!

নামডাক তখনই সাচ্চা হয়ে দাঁড়ায় যদি আসল সম্পত্তিতে ভেজাল না মিশে থাকে। স্বীকার করতেই হবে যে, সেই সম্পত্তিতে এবার দস্তুরমতো টান পড়েছিল, যেহেতু ভারতীয়রা অনুশীলনে রপ্ত ছিলেন না। বিনা অনুশীলনে ভারতীয় স্পিন বোলাররা যে বাহুবলের নমুনা রেখেছিলেন, তা পঞ্চমুখে প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু ব্যাটসম্যানদের প্রায় সবাই বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছেন।

নিউজিল্যান্ডের আক্রমণের মুখে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা পর্যন্ত যাঁরা করতে পারেননি, তাঁদের দলভারী করেছেন কিন্তু সিনিয়ার ব্যাটসম্যানেরাই। নবাগতদের ঘিরে মস্তো আশা দানা বাঁধেনি কখনো। তবু সময় সময়, বিক্ষিপ্ত লগ্নে তাঁদের কেউ কেউ তবু যেটুকু অনমনীয়তার নজির গড়তে পেরেছেন, সিনিয়ার ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের কীর্তি-কৃতিত্ব ততোটুকুও নয়। এই দৃষ্টান্তেই বোঝা যায় যে, স্রেফ নামডাকের মোহেই ভারতীয় দল ভুগছিল। সিনিয়ার ব্যাটসম্যানেরা ভেবেছিলেন যে, তাঁদের নামের ঘায়েই প্রতিপক্ষ মূর্ছা যাবে আর ক্রিকেট বোর্ড ধরে নিয়েছিলেন যে, সিনিয়ারদের এই ধারণাই বুঝি অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হবে। কিন্তু কাজের বেলায় দু পক্ষের ধারণাই নিতান্তই মিথ্যে বলে গিয়েছে।

সিনিয়ার ক্রিকেটারদের আচরণবিধি সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা যায়। প্রশ্নটি আমিই তুলছি না, অনেক আগেই এই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে, নাগপুরে ভারত-নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্টের সময়। এই প্রশ্ন জুয়াখেলা, অতিরিক্ত মদ্যপান, অধিক রাত্রি যাপন এবং অবাঞ্ছিতদের সঙ্গদানের অভিযোগ রয়েছে। এইসব অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে সিনিয়ার ভারতীয় ক্রিকেটারদের ক্রীড়ামানের অবনতির কারণ সম্পর্কে আরও নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে।

অশোভন আচরণের জন্যে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত চলছে। বস্তুতই এ সম্পর্কে পাকাপাকি কিছু বলার সময় এখনও আসেনি। তবে এই জাতীয় অশোভন আচরণে কোনো কোনো ভারতীয় ক্রিকেটারের জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কারণ, এ বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা রীতিমতো তিক্ত।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের কলকাতা সফরের সময় ভারতীয় দলের হোটেলে অথবা তাঁদের সহ খেলোয়াড়দের সান্নিধ্য ছাড়াও শহরের আর এক নামকরা হোটেলে উঁকি মেরে স্বচক্ষে যে সব [illegible] দেখেছি সেগুলির উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কারণ, মানহানির মামলা উঠতে পারে। তবে সেইসব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের ওঠা অভিযোগগুলিকে নিতান্ত বাজে ও ভিত্তিহীন বলে মনে নাও করা যেতে পারে।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সর্বশেষ ইংলন্ড সফরকালেও ইংলন্ড প্রবাসী ছাত্ররাও কোনো কোনো খেলোয়াড়ের অশোভন আচরণের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিযোগ তুলেছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিগত সফরকালে এবং তারপর ভারতীয় দলের ইংলন্ড সফরের সময় যে সব অভিযোগ উঠেছিল, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড তার তদন্ত করেননি। অনুরূপ অভিযোগের ভিত্তিতে এবারে তদন্তের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে বলে আবার বলতে হয় যে, এক্ষেত্রেও ভারতীয় বোর্ডের বুদ্ধি বাড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে চোর পালিয়ে যাবার পরই।

১৯৬৬-৬৭ মরশুমে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত করা হলে অভিযুক্ত খেলোয়াড়েরা সম্বিৎ ফিরে পেতেন এবং একই কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে কেউই সাহস পেতেন না। কিন্তু তা করা হয়নি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সবটোটি আলগা করে ছেড়ে রেখে তথাকথিত অভিযুক্ত খেলোয়াড়দের দুঃসাহস বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রশাসনিক কাজে এ এক অমার্জনীয় দুর্বলতা। বিড়ালের বা পলামার বয়দের গায়ে হাত দেবার সাহস যদি ক্রিকেট বোর্ডের না থাকে, তাহলে এই সংস্থার পরিচালনাধীনে ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির কোনো আশাই নেই। বরং উত্তরোত্তর আরও নেমে যাবার আশঙ্কাই বেশি।

বারবার ঠেকে শেখার সংকল্প এবার ক্রিকেট বোর্ড খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্তে হাত দিয়েছে এবং আত্মতুষ্টির খোলস ছেড়ে সম্ভাব্য টেস্ট খেলোয়াড়দের অনুশীলনের জন্যে শিক্ষা-শিবির বসিয়েছে দেখে কিছুটা আশ্বস্তবোধ করা যায়। হয়তো এর ফলে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়দের চরিত্র সংশোধনের ও মেজাজের সঙ্গে বিন্যাসের পথ পরিষ্কার হবে এবং অপ্রস্তুতির জের কাটিয়ে ওঠার সুবিধা পাবে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা।

তা যদি পারে, তাহলে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ভাল খেলা ভারতের পক্ষে অসাধ্য হবে না। তবে ঠিক ঠিক হিসেবে অস্ট্রেলিয়া অনেক শক্তিধর। ব্যাটিং পেস বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে তাদের সামর্থ্য সাথে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা প্রসন্ন-বেদী-বাধবেন, এই ত্রয়ীর মিলিত শক্তির আছে কিনা তাও ভাবনার বিষয়।

বর্ষা সায়াহ্নে ভারতীয় স্পিনাররা যে অনুকূল উইকেট হাতের সামনে পেয়েছিলেন, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলার সময় সেই জাতীয় উইকেট পাওয়ার সম্ভাবনা তেমন নয়। কাজেই ভারতীয় স্পিনারদের সমস্যা থেকেই থাকবে। পক্ষান্তরে ব্যাটসম্যানেরা পাবেন জমাটবাঁধা মাটিতে বিছানো শক্ত শানানো পিচ। এই পিচের অনুকূল পরিস্থিতিকে ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা যদি কিছুটা কাজে লাগাতে পারেন তবেই মঙ্গল। তবেই হয়তো দ্বি-পাক্ষিক খেলা খেলার মতোই হয়ে উঠতে পারবে, তা ফলাফল যাই হোক না কেন।

মনে হয়, এই বিশ্বাসেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বিলম্বে বুদ্ধি বেড়েছে।

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়া

প্রথম টেস্ট খেলা

ভারতবর্ষ : ২৭১ রান (পতৌদি ৯৫ এবং অশোক মানকাদ ৭৪ রান। ম্যাকেঞ্জি ৬৯ রানে ৫ এবং গিলসন ৫২ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৩৭ রান (ওয়াদেকার ৪৬ রান। গিলসন ৫৬ রানে ৪ এবং কনোলী ২০ রানে ৩ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ৩৪৫ রান (স্টাকপোল ১০৩ এবং রেডপাথ ৭৭ রান। প্রসন্ন ১২১ রানে ৫, বেদী ৭৯ রানে ৩ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৬৭ রানে ২ উইকেট)

ও ৬৭ রান (২ উইকেটে)

বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে আয়োজিত অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষের প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়ী হয়ে ১৯৬৯ সালের টেস্ট সিরিজে ১-০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষের মধ্যে এই নিয়ে যে ২১টি টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল দাঁড়াল—অস্ট্রেলিয়ার জয় ১৪, ভারতবর্ষের জয় ২ এবং ড্র ৫।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের ৪টে উইকেট পড়ে ২০২ রান দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের গোড়াপত্তন মোটেই সুবিধার হয়নি। ৩১ রানের মাথায় ১ম, ৬০ রানের মাথায় ২য় এবং ৬২ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে যায়। দলের এই বিপর্যয়ের মুখে ৪র্থ উইকেটের জুটি অশোক মানকাদ এবং অধিনায়ক পতৌদির নবাব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে দলের ১৪৬ রান যোগ করেন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট খেলায় চতুর্থ উইকেট জুটির এই ১৪৬ রান নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ৪র্থ উইকেট জুটির পূর্ব রেকর্ড রান ছিল ১২৮ (পতৌদি এবং সুনীল বিসবনের ৩য় টেস্ট, ১৯৬৮)। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ৭৪ (৩ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১৪৮ (৩ উইকেটে)। চা-পানের সময় পতৌদি এবং মানকাদ উভয়েই ৪৯ রান করে নট আউট ছিলেন। ভারতবর্ষের ব্যাটিংয়ে চরম আঘাত করেছিলেন গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি। তিনি তাঁর ৫ম এবং ৬ষ্ঠ ওভারের মাত্র ৭টি বলে এই তিনজনকে আউট করেন—সারদেশাই, ইঞ্জিনিয়ার এবং বোরদে। মানকাদ মোট ২৫৯ মিনিট খেলে ৭৪ রান (বাউন্ডারী ৭) করেন। পতৌদি ৭৩ রান এবং ওয়াদেকার ১ রান করে প্রথম দিনের খেলায় অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের পর অল্প সময়ের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ২৭১ রানের মাথায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস নামিয়ে দেয়। এইদিন ভারতবর্ষের বাকি ৬টা উইকেটে ৬৯ রান উঠেছিল। শেষ ১০ম উইকেট জুটি বেদী এবং প্রসন্ন ১৯ রান যোগ করেছিলেন। অধিনায়ক পতৌদি মাত্র ৫ রানের জন্যে সেঞ্চুরী হাতছাড়া করেন। খেলার বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ৯৩ রান সংগ্রহ করে। তখন খেলার অবস্থা দাঁড়ায়, ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের ২৭১ রানের থেকে অস্ট্রেলিয়া ১৭৮ রানের পিছনে এবং ৯টা উইকেট পড়তে বাকি।

হানিফ মহম্মদ

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের আরও ৬টা উইকেট খুইয়ে ২২৯ রান যোগ করে। খেলার শেষে তাদের রান দাঁড়ায় ৩২২ (৭ উইকেটে)। খেলার এই অবস্থায় তারা তিনটে উইকেট হাতে রেখে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের ২৭১ রানের থেকে ৫১ রানে এগিয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার ওপনিং ব্যাটসম্যান কিথ স্টাকপোল সেঞ্চুরী করেন (১০৩ রান)। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। ৪র্থ উইকেট জুটি ডগ ওয়ালটার্স এবং আয়ান রেডপাথ দলের ১১৮ রান যোগ করে অস্ট্রেলিয়াকে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের রান ছাড়িয়ে যেতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। খেলার শেষ ৬৫ মিনিটে অস্ট্রেলিয়ার ৪টে উইকেট পড়েছিল।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩৪৫ রানের মাথায় শেষ হলে তারা মাত্র ৭৪ রানে অগ্রগামী হয়। ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতেও শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। তাদের মাত্র ৫৯ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায় এবং খেলার শেষে ১২৫ রান দাঁড়ায় ৯ উইকেট পড়ে।

চতুর্থ দিনে খেলার শেষ দিকে আম্পায়ার শ্রীশম্ভু পানের একটি সিদ্ধান্ত ঘিরে মাঠে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গেছে। ভেঙ্কটরাঘবন সম্পর্কে আম্পায়ারের 'কট বিহাইন্ড' সিদ্ধান্তে দর্শকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে খেলার মাঠের মধ্যে ইঁট, চেয়ার, ঠাণ্ডা জলের বোতল নিক্ষেপ করতে থাকেন। মাঠের বিভিন্ন অঞ্চলে আগুনও জ্বলে উঠে। আগুনের ধোঁয়াতে দর্শকদের পক্ষে খেলা দেখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁরা নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই ঘটনার দরুন খেলা কয়েক বারই সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে অস্ট্রেলিয়াকে জয়লাভের জন্যে বেশী সময় অপেক্ষা করতে হয়নি। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ১৩৭ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিন ভারতবর্ষ মাত্র ৩৫ মিনিট ব্যাট করেছিল। খেলার বাকি ২৩৮ মিনিটে জয়লাভের জন্যে ৬৪ রান তুলতে হবে এই হিসাব রেখে অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং ২ উইকেটের বিনিময়ে উক্ত রান তুলে তারা ৮ উইকেটে জয়ী হয়। লাঞ্চের পর অস্ট্রেলিয়াকে প্রয়োজনীয় রান তুলতে ১৫ মিনিট খেলতে হয়েছিল।

সুব্রত গুহের কি অপরাধ ছিল? [illegible] তা না হলে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলায় তিনি ভারতীয় টেস্ট দলে স্থান পেয়েও খেলা আরম্ভের প্রাক্কালে দল থেকে বাদ পড়েন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এরকম নজির খুবই বিরল। প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভের দুদিন আগে (অর্থাৎ ২রা নভেম্বর) ভারতীয় টেস্ট দলের মনোনীত খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়। কিন্তু খেলা আরম্ভের প্রাক্কালে পিচ পরীক্ষা করে সুব্রতকে বাদ দিয়ে ভেঙ্কটরাঘবনকে দলভুক্ত করা হয়েছিল। এই পরিবর্তন সম্পর্কে খেলোয়াড় মনোনয়ন কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীবিজয় মার্চেন্ট এক বিবৃতিতে বলেছেন, ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামের ক্রিকেট পিচ দেখে তিনিই এই পরিবর্তন এবং সুব্রত গুহও দলের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিবর্তন অনুমোদন করায় শ্রীমার্চেন্ট তাঁর আত্মত্যাগ, দেশাত্মবোধ এবং খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু দেশের লোক পিচ সম্পর্কে খেলোয়াড় মনোনয়ন কমিটির সভ্যদের নাড়িজ্ঞানের দৌড় দেখে তাজ্জব হয়েছেন। বিদেশের পিচ নয়, স্বদেশের মাটিতে তৈরী পিচ এবং এই পিচ নিশ্চয় খেলার আগের দিন তৈরী হয়নি। তাছাড়া ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে এই প্রথম ক্রিকেট খেলা হচ্ছে না। সুতরাং একমাত্র খেলা আরম্ভের প্রাক্কালেই যাঁরা পিচের দোষগুণ ধরতে পারেন তাঁরা কি রকম পণ্ডিত? তাঁদের হাতে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যত কি খুব উজ্জ্বল?

অস্ট্রেলিয়ান ঃ ৩৪০ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। লরী ৮৯, স্ট্যাকপোল ৭১ এবং ওয়ালটার্স নটআউট ৬৮ রান। পাই ৬১ রানে ২ উইকেট)

ও ১৫০ রান (২ উইকেটে। চ্যাপেল নট-আউট ৮৪ রান)

পশ্চিমাঞ্চল ঃ ৩৪৪ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বোরদে নটআউট ১১৩, সারদেশাই ৮০ এবং ইন্দ্রজিৎ সিংজী নটআউট ৪৬ রান। ম্যাকেঞ্জি ৫৩ রানে ৪ উইকেট)

পুণায় অস্ট্রেলিয়ান দল বনাম পশ্চিমাঞ্চল দলের তিনদিনব্যাপী খেলাটি অমীমাংসিত থেকে গেছে।

প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ান দল ৫ উইকেটের বিনিময়ে ২৫৪ রান সংগ্রহ করে। প্রথম উইকেটের জুটিতে স্ট্যাকপোল এবং লরী দলের ১২৮ রান তুলেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ৩৪০ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় অস্ট্রেলিয়ান দল [illegible] প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা [illegible] খেলার শেষে পশ্চিমাঞ্চল দল ৬৬ [illegible] খেলার পর। এরা দ্রুতগতিতে রান [illegible] ১০১ মিনিটে ১০০ রান। [illegible]

[illegible]

নিউজিল্যাণ্ড বনাম পাকিস্থান

পাকিস্তান ঃ ১১৮ রান (মুস্তাক মহম্মদ ২৩ রান। হাওয়ার্থ ৩৬ রানে ৩ এবং পোলার্ড ২৭ রানে ৩ উইকেট)

ও ২০৮ রান (সাফকাত রানা ৯৫ রান। কানিংহাম ২৭ রানে ৩ উইকেট)

নিউজিল্যাণ্ড ঃ ২৪১ রান (বুস মারে ৯০ এবং ব্রায়ান হেস্টিংস নটআউট ৮০ রান। পারভিজ সাজ্জাদ ৭ উইকেট)

ও ৮২ রান (৫ উইকেটে। বর্জেস নট-আউট ২৯ রান। নাজির ১৯ রানে ৩ উইকেট)

লাহোরে নিউজিল্যাণ্ড বনাম পাকিস্তানের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় নিউজিল্যাণ্ড ৫ উইকেটে পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে। এখানে উল্লেখ্য, পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় নিউজিল্যাণ্ডের এই প্রথম জয়। এই জয়লাভের ফলে পাকিস্তানের বিপক্ষে বর্তমান সিরিজে

উত্তর শহরতলী জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের পরিচালনায় ২২শে অকটোবর থেকে ৪ঠা নভেম্বর পর্যন্ত দিল্লী, আগ্রা ফতেপুরসিক্রী, সেকেন্দ্রাবাদ, মথুরা ও বৃন্দাবনে আয়োজিত নবম বার্ষিক শিশুদের মুক্তবায়ু ভ্রমণ শিবিরে বাংলাদেশের ৯০ জন ছেলেমেয়ে যোগদান করে। ছবিতে শিবির সম্পাদিকা শ্রীবুদ্ধ গাঙ্গুলী ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় শ্রী ভি ভি গিরিকে শিশুদের পরিদর্শনকালে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করছেন।

নিউজিল্যাণ্ড ১-০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে। আর মাত্র একটী টেস্ট খেলা বাকি।

প্রথম দিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ১১৮ রানের মাথায় পড়ে গেলে নিউজিল্যাণ্ড বাকি সময়ের খেলায় ১ উইকেট খুইয়ে ৫২ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিনে নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৪১ রানের মাথায় শেষ হলে এরা ১২৩ রানে অগ্রগামী হয়। নিউজিল্যাণ্ড তাদের প্রাধান্য আরও সুদৃঢ় করতে পারতো যদি না তাদের শেষ ৬টা উইকেট মাত্র ২৭ রানে পড়ে না যেত। নিউজিল্যাণ্ডের এই নাটকীয় বিপর্যয়ের মূলে ছিলেন লেফট আর্ম স্পিন বোলার পারভিজ সাজ্জাদ। তাঁর বোলিংয়ে নিউজিল্যাণ্ডের সাতজন খেলোয়াড় আউট হন। এঁদের মধ্যে ৬ জন খেলোয়াড় সাজ্জাদের ১৯ ওভারের খেলায় মাত্র ২০ রানের বিনিময়ে খেলা থেকে বিদায় নেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় নিউজিল্যাণ্ডের মারে (৯০ রান) এবং হেস্টিংস নট আউট ৮০ রান) ব্যাটিংয়ে এবং পাকিস্তানের পারভিজ সাজ্জাদ বোলিংয়ে উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের বাকি ৪০ মিনিটের খেলায় পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ১৭ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় দিনে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২০২ (৮ উইকেটে)। সাফাকত রাণা ৯৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। সাফাকত রাণার দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুনই পাকিস্তানের শোচনীয় অবস্থার উন্নতি হয়। মাত্র ৮৫ রানের মাথায় তাদের ৫ম উইকেট পড়েছিল। খেলার এই অবস্থায় নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের রানের থেকে পাকিস্তান ৬২ রানের পিছনে ছিল। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল, পাকিস্তান ৭৫ রানে অগ্রগামী হয়েছে এবং তাদের হাতে জমা আছে দ্বিতীয় ইনিংসের মাত্র ২টো উইকেট। অপরদিকে নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের পুরো খেলা বাকি।

চতুর্থ অর্থাৎ খেলার শেষদিনে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ২০৮ রানের মাথায় শেষ হয়। তারা বাকি দুটো উইকেটে মাত্র ৬ রান সংগ্রহ করেছিল। সাফাকত রাণা ৫ রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। খেলায় জয়লাভের জন্যে নিউজিল্যাণ্ডের ৮২ রানের প্রয়োজন ছিল। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনা থেকেই কিছু বিপর্যয় দেখা দেয়। মাত্র ২৯ রানের মাথায় তাদের ৩য় উইকেট পড়ে। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮২ রান তুলতে নিউজিল্যাণ্ড ৫টা উইকেট খুইয়েছিল।

হানিফ মহম্মদের অবসর

পাকিস্তানের বিশ্ববিখ্যাত টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হানিফ মহম্মদ তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত সরকারীভাবে ঘোষণা করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি পাকিস্তানের পক্ষে ১৯ বছর ধরে খেলেছি, এখন আমার বিদায় নেওয়ার পালা।' অনেকের ধারণা, নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে

দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় তাঁকে দলভুক্ত না করায় তিনি অপমানিত বোধ করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯ বছরের মধ্যে হানিফ মহম্মদ এই প্রথম পাকিস্তান দল থেকে বাদ পড়লেন। ১৯ বছরে তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে ঃ খেলা ৫৫, মোট রান ৩,৯১০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৩৭ এবং সেঞ্চুরী ১২। ১৯৫৭-৫৮ সালের সফরে ব্রিজটাউনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিনি ৯৯৯ মিনিট উইকেটে থেকে টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক সময় ব্যাট করার যে বিশ্ব রেকর্ড করেন তা আজও অক্ষুণ্ন আছে। তাছাড়া প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের এক ইনিংসের খেলায় তাঁর ৪৯৯ রান (বিপক্ষে ভাওয়ালপুর, করাচি, ১৯৫৮-৫৯) আজও বিশ্ব রেকর্ড হিসাবে গণ্য। তিনি বিশ্ববিশ্রুত ডন ব্র্যাডম্যানের বিশ্ব রেকর্ড (নটআউট ৪৫২ রান, বিপক্ষে কুইন্সল্যান্ড, সিডনি, (১৯২৯-৩০), ভেঙ্গে দেন।

পাকিস্তানের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় একমাত্র হানিফই এই তিনটি রেকর্ড করার গৌরব লাভ করেছেন ঃ একটি খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী (১১১ ও ১০৪ রান, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ঢাকা, ১৯৬১-৬২), টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক মোট রান (৬২৮ রান এবং এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৩৭, বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৫৭-৫৮) এবং এক ইনিংসে তিন শতাধিক রান (৩৩৭ রান, বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ব্রিজটাউন, ১৯৫৭-৫৮)।

বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতা

লন্ডনের ভিকটোরিয়া হলে সম্প্রতি যে বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতা হল তাতে ইংল্যান্ডের জ্যাক কার্নেহম চাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছেন। লীগ তালিকায় ২য় স্থান পেয়েছেন ভারতবর্ষের ২নং খেলোয়াড় মাইকেল ফেরেইরা। ভারতবর্ষের ১নং খেলোয়াড় সতীশ সোহন তালিকায় পেয়েছেন ৭ম স্থান। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ১১জন খেলোয়াড় লীগ প্রথায় খেলেছিলেন। চ্যাম্পিয়ান জ্যাক কার্নেহমের ১০টি খেলার ফলাফল দাঁড়ায় ঃ জয় ৯ এবং পরাজয় ১। ভারতবর্ষের ২নং খেলোয়াড় মাইকেল ফেরেইরা ৬৪৮ পয়েন্টে জ্যাক কার্নেহমকে পরাজিত করে অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পরিচয় দেন। মাইকেল ফেরেইরা তাঁর শেষ খেলায় স্বদেশের সতীশ সোহনের কাছে ৬১৭ পয়েন্টে পরাজিত হলে কার্নেহমের পক্ষে খেতাব জয়ের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ্য, ভারতবর্ষের বিশ্ববিশ্রুত বিলিয়ার্ডস খেলোয়াড় উইলসন জোন্স বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতায় দু'বার (১৯৫৮ ও ১৯৬৪) খেতাব জয় এবং দু'বার (১৯৬০ ও ১৯৬২) দ্বিতীয় স্থান লাভের সূত্রে আন্তর্জাতিক বিলিয়ার্ডস মানচিত্রে ভারতবর্ষের নাম প্রথম উৎকীর্ণ করেছেন।

দাবার আসর

দুই গজের মাৎ

সামান্য অভ্যাস করলে দুই গজের মাৎ সহজেই আয়ত্ত করতে পারবেন। নীচের কয়েকটি সাধারণ সূত্র জেনে রাখুন।

(১) দুটি গজকে পাশাপাশি বসিয়ে বিপক্ষের রাজার ঘর প্রভূত পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া যায়। বিপক্ষ রাজা ছকের মাঝের দিকে না থেকে কোন প্রান্তের দিকে থাকলে প্রথমেই গজদুটিকে সুবিধাজনক জায়গায় বসিয়ে বিপক্ষের রাজার গতি যথাসম্ভব সীমিত করে দিন। তারপর স্বপক্ষের রাজাকে এগিয়ে নিয়ে আসুন।

(২) বিপক্ষ রাজা ছকের মাঝের দিকে থাকলে প্রথমে স্বপক্ষ রাজাকে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার কাছাকাছি নিয়ে আসুন এবং তারপর দুই গজের সহযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘর কমিয়ে দিন।

(৩) সবসময় মনে রাখবেন, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাকে ঘর কমিয়ে কমিয়ে ছকের চারটি কোণের কোন এক কোণে নিয়ে যেতে হবে, কারণ একেবারে কোণে না নিয়ে গেলে বিপক্ষকে মাৎ করা যাবে না। ছকের শেষ ফাইলে বা র‍্যাঙ্কে অনেক সময় মাৎ হতে পারে যদি বিপক্ষ ভুল চাল দেয়, কিন্তু বিপক্ষকে ভুল করতে আপনি বাধ্য করতে পারেন না।

(৪) যে কোণে আপনি মাৎ করতে যাচ্ছেন। সেই কোণের ঘরটি থেকে ঘোড়ার ১টি চালের দূরত্বে অথবা পাশাপাশি ১ঘর দূরত্বে আপনার রাজাকে বসাতে হবে। কিন্তু কোণের ঘর থেকে কোণাকুণি ১ ঘর দূরত্বে আপনার রাজাকে বসালে মাৎ হবে না। সুতরাং সেই বুঝে রাজার চাল দেবেন।

যেমন ধরুন আপনি সাদার পক্ষ নিয়ে খেলছেন এবং আপনার রাজানৌকা ৮ ঘরটিতে কালো রাজাকে মাৎ করবেন। তাহলে রাজানৌকা ৬, রাজাঘোড়া ৬,

কালো
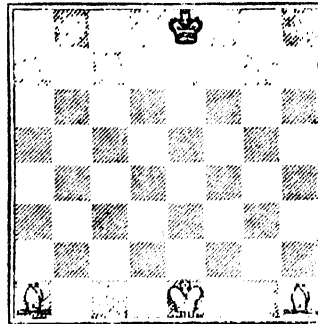
সাদা

রাজাগজ ৭, এবং রাজাগজ ৮ এই ৪টি ঘরের কোন একটিতে সাদা রাজাকে আনতে হবে। সাদা রাজা, রাজাগজ ৬ ঘরে থাকলে কালো রাজাকে মাৎ করা যাবে না। অন্যান্য কোণেও সাদা রাজাকে অনুরূপ ঘরে বসাতে হবে।

(৫) চালমাৎ না হয়ে যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। গজ দিয়ে অনর্থক কিস্তি দেবেন না। এমনভাবে গজ চালুন যাতে বিপক্ষ রাজার ঘর কমে যায়।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। চিত্রে দেখুন—সাদা রাজা আছে ১ ঘরে, ১টি গজ আছে মন্ত্রীনৌকা ১ ঘরে এবং অপরটি আছে রাজানৌকা ১ ঘরে। কালোর রাজা আছে কালোর রাজা ১ ঘরে। এইবার দেখুন কিভাবে কালোর রাজাকে কোণে নিয়ে গিয়ে মাৎ করা হচ্ছে।

(১) গজ—মন্ত্রী ৫ ঃ রাজা—রাজা ২ (২) গজ—রাজা ৫ ঃ রাজা—মন্ত্রী ২ (৩) রাজা—রাজা ২ ঃ রাজা—রাজা ২ (৪) রাজা—রাজা ৩ ঃ রাজা—মন্ত্রী ২ (৫) রাজা—রাজা ৪ ঃ রাজা—রাজা ২ (৬) রাজা—গজ ৫ ঃ রাজা—মন্ত্রী ২ (৭) গজ—গজ ৬ ঃ রাজা—মন্ত্রী ১ (৮) গজ—রাজা ৬ ঃ রাজা—রাজা ১ (৯) গজ—মন্ত্রী গজ ৭ ঃ রাজা—গজ ১ (১০) গজ—মন্ত্রী ৭ ঃ রাজা—ঘোড়া ১ (১১) রাজা—ঘোড়া ৬ ঃ রাজা—নৌকা ১ (১২) গজ—মন্ত্রী ৬ ঃ রাজা—ঘোড়া ১ (১৩) গজ—রাজা ৬ কিস্তি ঃ রাজা—নৌকা ১ (১৪) গজ—রাজা ৫ কিস্তিমাৎ। অথবা (১১)...রাজা—গজ ১ (১২) গজ—মন্ত্রী ৬ কিস্তি ঃ রাজা—ঘোড়া ১ (১৩) গজ—রাজা ৬ কিস্তি ঃ রাজা—নৌকা ১ (১৪) গজ—রাজা ৫ কিস্তিমাৎ।

যদি (৭)...রাজা রাজা ১ (৮) গজ—রাজা ৬ ঃ রাজা—মন্ত্রী ১ (৯) গজ—মন্ত্রী ৬ ঃ রাজা—রাজা ১ (১০) গজ—মন্ত্রী গজ ৭ ঃ রাজা—গজ ১ (১১) গজ—রাজা ৭ ঃ রাজা—ঘোড়া ১ (১২) রাজা—ঘোড়া ৬ ইত্যাদি।

—গজানন্দ বোড়ে

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সহযোগিতার জন্য

আপনি আমাদের দেশী ব্র্যাণ্ডের সিগারেট খান, ওটা ভাল বলেই এবং আপনার অন্তরেরও তাতে সায় রয়েছে। নানাভাবের সূক্ষ্ম চাপ ও নিরুৎসাহ করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আপনি যেটা একবার বেছে নিয়েছেন সেইটেই ধরে রেখেছেন গর্বের সঙ্গে এবং আপনার বিচারবিবেচনার ফলে।

আপনি চতুর প্রচারের ঘটায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন নি এবং এটা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরে গেছেন যে, ভারতে প্রস্তুত সিগারেট অথচ যাকে ভুল করে বিদেশী সিগারেট বলেই মনে হয়—সেগুলির দাম বেশী বলেই সত্যি-সত্যি গুণেও সেরা হয়ে ওঠে না। আর, তাছাড়া একথাও আপনি নিঃসন্দিগ্ধভাবেই জানেন যে ভারতে সেরা সিগারেট তৈরী করবার মতন জনবল, অর্থ ও কাঁচামাল পর্য্যাপ্তই রয়েছে এবং সত্যিকারের দেশী সিগারেটই এখানে তৈরী হতে পারে যাতে ভারতের অতি প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রাও বহুপরিমাণে বাঁচান যেতে পারে।

আপনার এই আদর্শের ওপর এবং আপনার অনুকারী ক্রমবর্দ্ধমান বহুসংখ্যক ধূমপায়ী যাঁরা দেশী সিগারেটই খান, তাঁদেরই ওপর নির্ভর করে দেশের এই শিশু সিগারেট শিল্পের ভবিষ্যৎ।

আমাদের দিক থেকে আমরা আপনাদের সেবায় পূর্ণভাবে নিয়োজিত এবং দেশীয় শিল্পের **উন্নতিই আমাদের স্থির লক্ষ্য।**

গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিমিটেড
বোম্বাই-৫৬

ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম

GT.61.BNG　　Greens' Advtg.

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১ 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২ প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩ রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২ ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

৯ম বর্ষ
২য় খণ্ড

২৮শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 21st Nov., 1969. শুক্রবার ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীনিতাই ঘোষ

খ্যাঁদা

সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকায় আমি একজন নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকায় প্রকাশিত ছোট গল্পগুলি আমি সাগ্রহে পড়ি। তবে বেশীর ভাগ গল্পই হয় গতানুগতিক, নতুনত্ব কমই পাই। তবে দু-একটি পড়ে মনে হয় কিছু একটা পড়লাম। গতানুগতিকতা বর্জিত এই গল্পগুলির নতুনত্ব আমাকে মুগ্ধ করে।

গত ২১ কার্তিকের 'অমৃতে' প্রকাশিত নিখিল সেনের খ্যাঁদা গল্পটি পড়লাম। বাস্তবের পটভূমিকায় এ ধরনের গল্পের জন্য প্রথমেই লেখক ও সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই। বিষয়বস্তুর নতুনত্ব ও লেখকের রচনাভঙ্গি গল্পটিকে একটি উৎকৃষ্ট ছোট গল্পে পরিণত করেছে। কাহিনীর সূচনা হয়েছে একভাবে এবং পরিণতি হয়েছে অন্যভাবে। পকেটমার খ্যাঁদার জীবন যে একটা ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শেষ হবে এটা অচিন্তনীয়। গল্পের চমৎকারিত্ব এখানে। খ্যাঁদার মানসিক পরিবর্তন হয়েছে অদ্ভুতভাবে। গতানুগতিক পথে চলতে চলতে গল্পের গতি ফিরেছে হঠাৎ অন্যদিকে। কতগুলি মুহূর্তকে খুব ভাল লাগে। যখন দেখি খ্যাঁদা চকচকে জুতো মোজা পরা একটা ছেলেকে দেখে তার ডাস্টবিনে পাওয়া জুতো জোড়া ছুড়ে ফেলে দিল তখন মুগ্ধ হই। লেখকের খুঁটিনাটি ব্যাপারে দৃষ্টি আছে।

গল্পের পরিণতি করুণ, তবে নাটকীয়। নাটকীয়তাই গল্পের রস ভঙ্গ করেছে। ওস্তাদের সঙ্গে খ্যাঁদার বিবাদ বড় গতানুগতিক। এটা অনাবশ্যক। তবে গল্পের বিস্তারের জন্যে হয়তো এর প্রয়োজন আছে।

এ ধরনের গল্প 'অমৃতে' আরও দেখতে পাব এই আশাই রাখি।

অমরনাথ মিত্র
দণ্ডীরহাট, ২৪ পরগণা।

'হারেম' প্রসঙ্গে

আমি আপনাদের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক অমৃতের একজন নিয়মিত পাঠক। সাম্প্রতিককালের সাহিত্য পত্রিকার মর্যাদা বোধ করি বর্তমানে অমৃতই পেতে পারে। এর প্রতিটি রচনাই উপভোগ্য। অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে আপনারা নতুন নতুন প্রতিভাকে সকলের সামনে তুলে ধরেন এবং তাঁদের প্রতিভার বিকাশে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

গত ২১ কার্তিক সংখ্যা 'অমৃত' পত্রিকায় শৈলেন রায়-এর লেখা 'হারেম' নামক যে ছোট গল্পটি প্রকাশ করেছেন তার জন্য আপনাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই। 'হারেমে'র মধ্যে ছোট গল্পের পুরো স্বাদ পেয়েছি। যার প্রথম লাইনটি পড়লেই গল্পটি পড়তে ইচ্ছে করবে আর শুরু করলেই শেষ করতে হবে—এই না হলে আবার ছোট গল্প! শৈলেনবাবুর লেখায় বাচালতা নেই। অত্যধিক উচ্ছ্বাস কিংবা চটুলতাও নেই। দুটি অতি সাধারণ হৃদয়কে তিনি যেভাবে পরিস্ফুট করেছেন—যে কোন পাঠক অতীব নিষ্ঠা সহকারে তা উপলব্ধি করতে পারবেন। লেখকের কল্পনাশক্তির প্রশংসা করি এবং তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। শৈলেনবাবুকে আরও অনুরোধ করব, নিয়মিত ছোট গল্প লিখতে। আমাদের দেশে রব উঠেছে আজকাল নাকি আর সাহিত্যিক তেমন উঠছে না। যাঁরা এরকম মনে করেন তাঁদের দেখিয়ে দিন এখনও ছোট গল্পে বাঙালীর নিজস্ব খ্যাতি অব্যাহত আছে।

তুষারকান্তি গোস্বামী
কলকাতা-২০।

আসামের কারুশিল্প : লেখকের কৈফিয়ৎ

আসামে কারুশিল্প প্রবন্ধে 'মেখরা' কথাটির ব্যবহারে জনৈক পাঠক আপত্তি জানিয়েছেন। এর উত্তরে জানাই যে আমি আমাদের সরকারের বিভিন্ন অফিসার, শিলচর-কাটাখাল প্রভৃতি অঞ্চলের এবং পশ্চিমবাংলার বাঙ্গালী শীতল পাটির শিল্পীদের অনেকের সংগে কথা বলে দেখেছি যে তাঁরাও 'মেখরা' কথাটি ব্যবহার করে থাকেন।

আশীষ বসু
কলকাতা-১৯।

বেতারশ্রুতি

আমি আপনার অমৃতের একজন স্থানীয় গ্রাহক, নিয়মিত পাঠক এবং ভক্ত। লক্ষ্য করেছি অমৃতকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধশালী করতে আপনাদের শুভ প্রচেষ্টা। ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের বাইরেও অমৃতের অগণিত গুণগ্রাহী পাঠক-পাঠিকা যে বর্তমান তা বোধহয় নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এই পাঠক-পাঠিকারা (যাঁদের মধ্যে আমি একজন) অমৃতের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা না হোক, স্ব-স্ব রুচি অনুযায়ী অনেকগুলি পৃষ্ঠাই পড়ে থাকেন। লেখকেরা যেমন নিজেদের মনোভাব পাঠক-পাঠিকাদের মনোগ্রাহী করবার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রকাশ করে থাকেন, তেমনি পাঠক-পাঠিকাদেরও অনেকেরই মনে সেগুলি পড়ে কিছু না কিছু ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যা প্রকাশ করবার জন্য তাঁরা ব্যগ্রতা অনুভব করে থাকেন। চিঠিপত্র বিভাগটি প্রচলন করে তাঁদেরকে যে সুযোগসুবিধা দিয়েছেন তজ্জন্য আপনারা অকৃত্রিম ধন্যবাদাই। প্রকাশিত চিঠিপত্রগুলি যে সাহিত্য জগতের একটা ক্ষুদ্র অংশ, তা বললে মনে হয় অত্যুক্তি হবে না।

বেতারশ্রুতি প্রসঙ্গে শ্রীশামসুল হক ও শ্রবণক মহাশয়দের সাম্প্রতিক ভক্তি ও প্রত্যুত্তর পাঠ করে কৌতুকমিশ্রিত আনন্দ ও ব্যথা অনুভব করলাম। চিঠিতের কথাবের বৃথা আলোচনায় সংক্ষেপে দু একটি কথা বলতে চাই। উভয় ভদ্রলোকই যথাক্রমে একযুগ বা কিছু কম একযুগ আগে স্কুল-কলেজ শেষ করে বসে আছেন। এই পত্র লেখক তাঁদের চেয়ে অন্তত আরও তিন যুগ আগে কলেজ থেকে ফিরে এসেছে। অতএব শ্যাম-খুড়োর দলে হয়ে এই প্যাঁচতোর লড়াইয়ে নাক গলান একটা দুঃসাহস হলেও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় যখন উভয়েই কলেজ শেষ করে বসে আছেন, তখন স্কুল কথাটিরও উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল কি? শুধু অশুদ্ধ উবন শ্বশুর ইংরেজীতে যাকে বলে ফাদার-ইন-ল। হন যত শীঘ্রই খান বা সন্তুষ্টভাবে ব্যক্ত করুন না কেন আমরা একটু জ্ঞান হওয়া থেকেই শুনে বা বুঝে আসছি পতি বা পত্নীর পিতাই শ্বশুর মহাশয় বলে অভিহিত হন আর তাঁর পত্নী শাশুড়ী ঠাকুরাণী হয়ে থাকেন। অনেকেই শীঘ্র খান আবার অনেকেই সন্তুষ্টভাবে ব্যক্ত করে থাকেন, কিন্তু তাঁরা যে শ্বশুর নামে অভিহিত হতে আপত্তি করবেন, না তাঁদের তা করা উচিত নয় একথা কোনও অভিধানে লেখা আছে কি? বধূ বা জামাতার উৎপত্তি বা ব্যুৎপত্তি জনিত গঠন যাই হোক না তাঁদের যথাক্রমে বৌ, জামাই বলেই জানব। এবং তাতে কোনও ত্রুটির সম্ভাবনা দেখা দেবে কি? 'ফলশ্রুতি' শব্দটির অর্থ তাঁরা যাই বলুন বা অভিধানে যাই লেখা থাকুক না কেন, তার প্রকৃত বোধগম্য অর্থ কোনো বিষয়, বস্তু বা ঘটনার পরিণতি সম্বন্ধে যে সত্য বা মিথ্যা, বিশ্বাস্য বা অবিশ্বাস্য গুজব শোনা যায়, তাই নয় কি? আর অগ্রসর হবার প্রয়োজন মনে করি না। তবে শ্রীহক ও শ্রবণক মহাশয়দের কাছে এইটুকুই নিবেদন করব যে ভাবীতাকে আমরা বহুদিন আগেই করে দিয়ে বসেছি। তাই শব্দের ব্যাকরণগত

ব্যুৎপত্তি ও জটিল অর্থাদির দিকে না গিয়ে প্রচলিত শব্দসমূহের সহজ ও সরলতম বোধগম্যতার আরও যাতে উত্তরোত্তর সুষ্ঠু পরিবেশন হয় সেদিকে সম্যক সচেতন সচেষ্ট হওয়া। একদিকে নানাপ্রকার মনোহারী বিলাস-সম্ভার এবং আপাত-দৃষ্টিতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতা, আর অন্যদিকে যখন আচার ও নীতিভ্রষ্টতা, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, গৃহাভাব, দুশ্চরিত্রতা, অজ্ঞানতা, নিরক্ষরতা, ভ্রাতৃত্ববোধহীনতা ইত্যাদি ইত্যাদি কতপ্রকারের ভ্রষ্টতা, প্রগতি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ছদ্মবেশে দেশকে অকূলে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, তখন ঐ অতীতকে কবরমুক্ত করে পুনর্জীবিত করা সুসাধ্য বা সম্ভবপর হবে কি?

নিরাপদ চট্টোপাধ্যায়
কোডরমা, রাঁচি।

'বইকুণ্ঠের খাতা'

৫ নভেম্বর অমৃতে বিশেষ প্রতিনিধি লিখিত 'বৈকুণ্ঠের খাতা' শিরোনামে শারদীয়া সাহিত্যের হিসেব-নিকেশ সম্পর্কে বহু জায়গায় আমি ভিন্ন মত পোষণ করি।

লেখক বলেছেন, ছোটখাটো পত্র-পত্রিকার প্রতিটিতেই লেখকদের একটি লেখা অন্ততঃ দুতিনটি কাগজে মুদ্রিত হয়েছে একই সময়ে। কখনো সম্পাদকের জ্ঞাতসারে কখনো অজ্ঞাতসারে। আমার মনে হয় সম্পাদকেরা নন লেখকেরা শব্দটি ব্যবহার করা উচিত ছিল। এবং সাধারণত মফস্বলী পত্রিকাতেই তা সম্ভব।

দৈনিক পত্রিকার শারদীয়া প্রকাশ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এগুলো পাঠ্য-সাহিত্যের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক এবং প্রচার প্রভাবের দিক থেকেও জনসাধারণের উপর এঁদের আধিপত্য সর্বাধিক। আমার মনে হয় দ্বিতীয়টির জন্যই প্রথমটি সম্ভব। ঠিক সেই কারণেই এগুলোকে বড় কাগজ বলা হয়। লেখকরাও তাঁদের প্রকাশের সুপ্রচারের জন্য এই সব পত্রিকায় লিখতে বিশেষ আগ্রহী। অবশ্য টাকার প্রশ্নটাও আছে পরোক্ষভাবে। অপর পক্ষে ব্যবসায়িক কাগজগুলোও সু-লেখককে পুরোপুরি কাজে লাগান। ব্যাপারটা কিছুটা পরিপূরক, আর প্রায় সব সাহিত্যিকই সুরুতে এবং অনেকে চিরকালই লিটল ম্যাগাজিনে (অন্য অর্থে লিটারারি ম্যাগাজিন) লেখেন। সুতরাং পরবর্তীকালে কমার্শিয়াল কাগজের সম্পাদকরা এঁদের আশ্রয় দেবে, এ কথাটা ভ্রান্ত এবং অশ্রদ্ধাজনক।

লিটল ম্যাগাজিনের শ্রেণী নির্ণয়ে ছোট গল্পের দুটি পত্রিকার উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল শুকেসারী এবং একালীন। শুকেসারী ছাড়াও শুধুমাত্র ছোট গল্পের আরও ৪।৫টি পত্রিকা আছে। একালীন এই শ্রেণীর পত্রিকার মধ্যে পড়ে না।

অজয় মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-৫০

বিবিধ প্রসঙ্গে

আপনার অমৃত পত্রিকার ২৪শ সংখ্যা পড়ে বিশেষভাবে তৃপ্তি পেলাম। আমি অমৃতের নিয়মিত পাঠক হলেও সব গল্প প্রবন্ধাদি পড়বার মত সময় না পেলেও সবটা একবার দেখে যাই। কয়েকমাস যাবৎ 'মানুষ-গড়ার ইতিকথা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। আমি প্রথম কতকগুলি স্কুলের ইতিকথা পড়েছিলাম, সবই বেশ তথ্য-সমৃদ্ধ লেখা। সকলের পক্ষে সবগুলি পড়বার আগ্রহ না থাকলেও বাংলা দেশের বিশিষ্ট কতকগুলি স্কুলের ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য সংকলিত হয়ে চলেছে—একটা বড় কাজের গোড়াপত্তন হয়ে চলেছে। বৈকুণ্ঠের খাতাও পড়ে যাচ্ছি, এবারে বাংলা নাটক সম্বন্ধে আলোচনা সুখপাঠ্য। অন্নদাশঙ্করের রায়ের গান্ধী প্রবন্ধও চলেছে, মূল্যবান প্রবন্ধ নিঃসন্দেহে। এবার-কার আর দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গর্কী ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক হিসাবে বাংলা-দেশে সুপরিচিত; কিন্তু তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমন চিন্তা আলোচনা করেছেন এবং লিখেছেন, সেটা আমি জানতাম না। হয়তো অনেকে জানতেন না। সে হিসাবে এটি একটি মূল্যবান প্রবন্ধ। সবচেয়ে আমি বেশী মূল্যবান মনে করি লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সম্বন্ধে প্রবন্ধটি। চিত্রকর হিসাবে লিওনার্দোর কথা অনেকেরই জানা আছে, 'মোনা লিসা' এবং অন্যান্য চিত্রের প্রতিলিপিও আমাদের পত্রিকাদিতে অনেকেই দেখেছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভা যে ছিল সর্বতোমুখী ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁকে লিওনার্দো দা ভিঞ্চিকে যুগন্ধর পুরুষ বলে উল্লেখ করেছেন—এ পরিচয় তত সর্বজনপরিচিত নয়। বর্তমান প্রবন্ধে সেই যুগন্ধর পুরুষের প্রতিভার অনেক দিকের পরিচয় নিয়ে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ হয়েছে। আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প উপন্যাসের আগ্রহী পাঠকের সংখ্যা অপরিমিত। তার উপরে বিশিষ্ট প্রবন্ধাদির জন্য আগ্রহ বোধ করেন এমন পাঠকও আছেন। আপনার পত্রিকায় বিদেশের সকল দেশেরই যে কোনও ক্ষেত্রে বিশিষ্ট প্রতিভা-শালী ব্যক্তিদের পরিচয় জানাতে পারলে ভাল হয়।

সত্যভূষণ সেন,
গৌহাটি১১, আসাম।

খেলা প্রসঙ্গে

আমরা আপনার বহুল প্রচারিত অমৃতের নিয়মিত পাঠক, আপনার পত্রিকার মাধ্যমে আমরা অজয় বসু কমল ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নিকট সদ্যসমাপ্ত নিউ-জিল্যান্ডের সঙ্গে ভারতে তিনটি টেস্টের সব কয়টিরই পর্যালোচনা করার জন্য অনুরোধ জানাই। কেন ভারতে আজ খেলার এই দুর্দিন এর কি কোন প্রতিকার নেই? খেলায় হারার সঙ্গে সঙ্গেই খেলোয়াড়দের মুখে শুনতে পাই পিচ খারাপ। প্রথম সারির ব্যাটসম্যানেরা সারাজীবন খেলেও যদি পিচের অবস্থা বুঝতে না পারেন তবে এইরূপ বাজে খেলার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার নষ্ট করার কোন সার্থকতা আছে বলে আমাদের মনে হয় না। ফিল্ডিং-এর ত্রুটিবিচ্যুতির বিষয় কিছু না বলাই ভাল। প্রথম শ্রেণীর খেলায় এইরূপ হওয়ার কোন অজুহাত আছে বলে আমাদের মনে হয় না।

ভারতের ফাস্ট বোলার নেই এ কথা সব সময়ই শুনি। কিন্তু হায়দ্রাবাদ টেস্টের খবর শুনে মনে হয় ভারতের ব্যাটসম্যান নেই তাই ভারতের ৮৯ রাণ তুলতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে। আমাদের মনে হয় বোলারের অভাব নেই, আছে ভাল পরি-চালকের অভাব, আছে সংযমের অভাব, আছে ফিল্ডিং-এর ত্রুটিবিচ্যুতি। আমাদের মনে হয়, নবাবের মত নরম মানুষকে দিয়ে খেলা পরিচালনা না করাই ভাল। নবাবকে শুধু ব্যাটসম্যান হিসাবে দলে রাখলে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভাল ফল পাওয়া যাবে। অবশেষে ক্রিকেট কর্মকর্তাদের কয়েকটি অনুরোধ করে এই চিঠি শেষ করি। (১) ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং-এর দিকে ভালভাবে নজর দেওয়া। (২) ক্যাপ্টেনকে আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া এইগুলো মনে রেখে এখন থেকে অনুশীলন করলে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলায় ভাল ফল পাওয়া যাবে বলে আমাদের মনে হয়। প্রসন্ন এবং বেদীর মত বোলার থাকলে ভারতের বোলিং দুর্বল হবে বলে মনে হয়না। তারপর "আবিদ" "রাঘবন" থেকেও সাহায্য পাওয়া যাবে।

অজিত পাঠক, কমল পাঠক,
সুব্রত পাঠক, 'আদর্শ' কলোনী
গৌহাটি—১১

সাদা চোখে

"চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, অতএব আমাদের জয় সুনিশ্চিত"—এই শ্লোগান কলকাতা ও শহরতলীর দেওয়ালে সুনিপুণ হাতে লিখে চলেছেন ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) সভ্য ও সমর্থকরা। শুধু এই নয়, আরও রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় তাঁদের অন্যান্য শ্লোগানের মধ্যে ও'রা বলছেন ডেবরায়, গোপীবল্লভপুরে শ্রীকাকুলামে, এমন কি বিহার, উত্তরপ্রদেশ ইস্তেক পুরুলিয়ারও কোন প্রত্যন্ত গ্রামে কৃষক গেরিলাদের হাতে খুন হচ্ছেন জোতদার, জমিদার প্রভৃতি সমাজের শোষকশ্রেণীর প্রতিভূরা। শ্রীকাকুলামের এক গ্রামে কর্তিত জমিদারের ছিন্ন মুন্ড দরজার সামনে ঝুলিয়ে দিয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা প্রমাণ করতে চাইছেন, আদর্শের সঙ্গে কোন প্রকার সমঝোতা চলে না। তাঁদের 'কৃষিবিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে হলে' নরাধমদের মুন্ড শিকার করতে হবে। ফলে শোষক শ্রেণীর মধ্যে আতঙ্ক ও ত্রাসের সৃষ্টি হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে শোষিত কৃষকশ্রেণী ও তাঁদের অগ্রণী মুক্তি-যোদ্ধা গেরিলাদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়বোধ লৌহকঠিন হয়ে উঠবে।"

সত্যিই ডেবরায় খুন হয়েছে ও হচ্ছে। গোপীবল্লভপুরেও হত্যা চলছে। একজন, দুজন করে জোতদার হত্যা করে নিশ্চয় জোতদারদের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাবে এতে আর সন্দেহ নেই। এই অনুপাতে খুন করে যেতে পারলে জোতদারহীন হয়ে পড়বে দেশটা, এ বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। আর জোতদারহীন হয়ে গেলেই সব জমির মালিক অবলীলাক্রমেই কিষাণরা হয়ে যাবে একথাও সত্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তারপর জোতদার শ্রেণী মুছে গেলেই কিষাণরাও সাফল্যের আনন্দে শহর ঘেরার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হয়ত পারবেন বলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা মনে করছেন। তাঁদের বক্তব্য থেকে আরও মনে হয় ডেবরা, গোপীবল্লভপুর ও উড়িষ্যার কিছু অঞ্চল দিয়ে শ্রীকাকুলামের সঙ্গে যে বিপ্লবীদের 'করিডোর' রচিত হচ্ছে, তাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে এমন ক্ষমতা আত্মকলহে প্রবৃত্ত রাজ্য সরকারগুলির নেই। আবার কেন্দ্রীয় সরকারও ততোধিক দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব এবং সর্বোপরি দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেস এই বিপ্লবী কর্মকান্ডকে স্তিমিত করে দিতে পারবে না বলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের একান্ত বিশ্বাস। কাজেই কৃষকরা যদি গেরিলাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে আঘাতের পর আঘাত হানতে পারেন, তবে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

নকসালপন্থীরা নিজেরাই একতাবদ্ধ নন এটুকুই মাত্র জোতদারদের ভরসার কথা। ইতিমধ্যেই নকসালবাদীদের বন্ধু, দার্শনিক ও নেতা শ্রীচারু মজুমদার শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত এমন সমস্ত কর্মীদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, শ্রমিক সংগঠনে ব্যস্ত থাকবার মত সময় এখন নেই। আর বর্তমান অবস্থায় শ্রমিকরা বিপ্লবের সঠিক হাতিয়ারও নয়। তাঁর মতে, যখন পুরোপুরিভাবে জোটবদ্ধ হয়ে গেরিলাযুদ্ধ মারফৎ সামন্ততন্ত্র ও জোতদারতন্ত্রকে খতম করে দিয়ে শহর ঘেরাও-এর উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসবে, তখন শ্রমিকশ্রেণীর কিছু ভূমিকা থাকবে। শ্রীমজুমদারের সঙ্গে কলকাতার যাঁরা বিখ্যাত নকসালবাদী নেতা, তাঁদের অনেকেই একমত হতে পারেন নি। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে তাঁরা তাঁদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, যাতে সময়মত বিপ্লবী কিষাণদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শহর দখলের সংগ্রামে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীও পিছিয়ে না থাকে। এক কথায় শ্রমিকশ্রেণীকে সেই আকাঙ্ক্ষিত শুভ মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত রাখার উদ্দেশ্যেই সংগঠিত করার প্রয়াস চলছে।

নামে নকসালবাদী হলেও কিন্তু সকলেই এখন বলছেন ডেবরা, গোপীবল্লভপুর ও শ্রীকাকুলামের পথ—আমাদের পথ। নকসালবাড়ীর লাল আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার পোস্টার অবশ্য আর দেওয়ালে দেখা যায় না। রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা বলছেন, নকসালবাড়ীর কথা আর উল্লেখের প্রয়োজন নেই। কারণ ইতিপূর্বেই নকসালবাড়ী মুক্ত এলাকা হয়ে আছে। তাই বর্তমানে যে সমস্ত নয়া মুক্ত এলাকা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সেদিকেই জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। তাঁদের মত ও পথ কতটুকু কার্যকর হবে সেই প্রশ্নের গহন অরণ্যে প্রবেশ না করে বলা যায়, বক্তব্য তাঁদের খুবই পরিষ্কার। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কিনা ইতিহাস তা প্রমাণ করবে। তাঁরা মাও সে তুং-এর ভাষায় পার্লামেন্টকে 'শুয়রের খোঁয়াড়' বলে থাকেন। তাই নির্বাচন থেকে তাঁরা দূরে সরে আছেন। নির্বাচন ও বিপ্লব একসঙ্গে চলতে পারে না বলে তাঁদের বিশ্বাস। তাই কিষাণকে সংগঠিত করে শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মহড়া নিচ্ছেন মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা। বিভিন্ন জায়গায় হত্যাকান্ডের ফলে আইন-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হচ্ছে বলে তাঁরা মনে করেন না। কারণ, আইনের ব্যাখ্যা তাঁদের কাছে অন্যরকম। বর্তমানের আইন তাঁদের মতে শোষকশ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখার রক্ষাকবচ মাত্র। কাজেই অ্যাডভেঞ্চারিজম বলা হোক কিম্বা হঠকারিতা আখ্যা দেওয়া হোক, বা যে কোন রাজনৈতিক পরিভাষায় তাঁদের দোষারোপ করা হোক না কেন, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তাঁদের সংকল্পে অটুট। তাঁদের ধারণা ভারতের বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা 'কৃষিবিপ্লবের' উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। কাজেই কালক্ষেপণ না করে বিপ্লবী কর্মকান্ডে ঝাঁপিয়ে পড়াই হচ্ছে একান্ত কর্তব্য। তাই তাঁরা যুক্তফ্রন্টে বিশ্বাস করেন না। সিন্ডিকেট প্রতিক্রিয়াশীল না ইন্দিরাপন্থীরা প্রগতিবাদী এই সব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নন। প্রোগ্রাম ও আদর্শ একে অপরের পরিপূরক এই সিদ্ধান্তকে কলুষিত করে অন্য কোন কৌশলের মারফৎ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতে চেষ্টা করেন না তাঁরা। তাঁদের রাজনৈতিক ভূগোলের সুবিধামত পরিবর্তন ঘটাতেও তাঁরা নারাজ। এবং সেইজন্য তাঁদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে অন্য কোন বিচ্যুতির পূর্বাভাষ নেই। সোজা কথায় চীনের চেয়ারম্যানকে নিজেদের চেয়ারম্যান স্বীকার করে নিয়ে বিপ্লবের পথে সদর্প পদচারণা শুরু করেছেন এবং শ্রীকাকুলাম, গোপীবল্লভপুর ও ডেবরার পথে এগিয়ে চলেছেন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কম্যুনিস্টরা। ভিন্ন আদর্শ বজায় রেখে সুবিধাবাদের উস্কানি দিয়ে তথাকথিত নিম্নতম কর্মসূচীতে নকসালবাদীরা আস্থাবান নন। নির্বাচনের পূর্বে এক-শ্রেণীর কংগ্রেসীরাও একথা বলেছিলেন। যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকের আদর্শগত তফাৎ থাকা সত্ত্বেও গদীর লোভেই যে বিভিন্ন বামপন্থীদল একত্রিত হয়েছিলেন, সেই সম্পর্কে হুঁশিয়ারী দিয়ে কংগ্রেস নেতারা বলেছিলেন, আখেরে ফ্রন্ট ভেঙে পড়তে বাধ্য এবং ফ্রন্টের কর্মসূচী শিকেয় তোলা থাকবে। কথাটির সত্যতা সম্বন্ধে তখন সন্দেহ থাকলেও বর্তমানে তা অনেকাংশে সত্য হতে চলেছে।

বর্তমানে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে যে মনোমালিন্য দেখা যাচ্ছে, তা পুরোপুরিভাবেই আদর্শগত চিন্তাধারার বিভিন্নতা থেকেই এসেছে। কর্মসূচীতে সহমত হলেও ফ্রন্টের শরিকদল কার্যকর পন্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের attitede and approach' কি হবে, সে বিষয়ে কোন সমঝোতা করেন

নি। এটা সত্য যে, সরকারী প্রশাসনের মধ্যে যে কর্মসূচীকে কার্যকর করার প্রচেষ্টা চলতে পারে মাত্র, তবে তা পরিপূর্ণ সার্থকতা আনতে পারে না। কাজেই জনতার শক্তিকে অর্গলমুক্ত করে দুর্বার গতিতে সামাজিক ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটাবার চেষ্টা করলেই আদর্শগত দ্বন্দ্ব যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, সে কথা সুনিশ্চিত। অবশ্য একথা ঠিক যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজবাদের স্থাপনার কথা শরিক দলের অনেকেই বিশ্বাস না করলেও কর্মপন্থার মধ্যে এই আপাত বিশ্বাস পুরোপুরিভাবে কাজ করছে। কাজেই এক একটি দলের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। সাধারণ কর্মী ও নেতৃত্বের মধ্যে চিন্তার পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠছে।

নকসালবাদীরা যুক্তফ্রন্টের শরিক দুই কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন দলকে আসামীর কাঠগড়ায় বিশেষ দাঁড় করাতে চান না। এর কারণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিপ্লবের কথা বললেও দুই কম্যুনিস্ট পার্টি বাম ও ডান নির্বাচনকে বর্জন করতে চাইছেন না। কেরালায় বামপন্থী কম্যুনিস্টদের বাদ দিয়ে সরকার গঠনের পরই বামপন্থী কম্যুনিস্টরা নির্বাচন দাবী করেছেন। নকসালবাদীরা বলেন, যেখানেই নির্বাচনের ব্যূহচক্রে কম্যুনিস্টরা পা দিয়েছেন, সেখানেই তাঁরা শোধনবাদী হয়ে পড়েছেন। বাম কম্যুনিস্টরাও তাই নয়া-শোধনবাদী বলে নকসালপন্থীদের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছেন। জ্যোতিশ্বাবু মনে করেই নকসালপন্থীরা দুই কম্যুনিস্ট পার্টির উপর ক্ষেপে গেছেন বেশী। কম্যুনিস্ট আন্দোলনের একদা কেন্দ্রবিন্দু সোভিয়েতকেও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে চিহ্নিত করে নকসালপন্থীরা বিপ্লবের খরচের খাতায় তাঁদের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর সেই সোভিয়েতের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে যুক্ত দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদের নকসালবাদীরা প্রতিবিপ্লবী আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না। অন্যদিকে বামপন্থী কম্যুনিস্টরা নাকি যাঁদের সঙ্গে এখন কোন আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের আদৌ সম্পর্ক নেই—ডানপন্থীদের কায়দায় কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিপন্থী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এটা একটা আদর্শগত বিচ্যুতি বলে নকসালবাদীরা মনে করেন। অথচ দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম বাংলায় শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হচ্ছে বলে ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকরা যেখানে ভীত হয়ে পড়ছেন, বাম কম্যুনিস্টরা সেখানে নাকি আত্মপ্রসাদ অনুভব করছেন। একদিকে ইন্দিরাজীকে সমর্থন আর অন্যদিকে শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের ভিত্তিভূমি রচিত হচ্ছে বলে রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রচার করা হচ্ছে। নকসালবাদীরা এই দুই পরস্পর-বিরোধী বক্তব্যকে পরিষদীয় গণতন্ত্রের অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই মনে করেন। এবং এই রাজনৈতিক ডামাডোল চলতে থাকলে মার্কস-বাদী-লেনিনবাদী পথে বিপ্লব হতে পারে না বলেই তাঁদের বিশ্বাস। পরিষদীয় গণ-তন্ত্রের ফাঁসে আটকা পড়লে বুর্জোয়া

স্টাইলে একজন জোতদারকে খুন করা হলেই খুনের মামলা রুজু করে বিপ্লবীদের ধরতে হবে। এবং সেই রাস্তায় যাওয়া ছাড়া পরিত্রাণ নেই। আজকে যদি ডেবরা-গোপীবল্লভপুরে জোতদার খতম করার জন্য নকসালবাদীদের গ্রেপ্তার করতে হয়, তবে কানু সান্যাল বা জঙ্গল সাঁওতালের মুক্তির প্রশ্ন উঠেছিল কি করে? নকসালবাদীরাই এই প্রশ্ন করেন। নকসালবাড়ীর আন্দোলন যদি গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়ে থাকে, তবে ডেবরা ও গোপীবল্লভপুরের আন্দোলন গণতান্ত্রিক নয় কেন? নকসালবাড়ীতেও খুন হয়েছিল, এখানেও খুন হচ্ছে। যদি ঐ সমস্ত এলাকা শোষিত মানুষের সমর্থন না থাকত তবে কলকাতা থেকে কয়েকজন বিপ্লবী গিয়ে কি জোতদার খুন করে আসতে পারত, জনসমর্থন আছে বলেই এইসব কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। আর যে কর্মকান্ডের পেছনে গণসমর্থন থাকবে তাকেই গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলে মেনে নিতে হবে। না মানলেই ইতিহাসের আস্তাকুড়ে স্থান। এই হচ্ছে নকসালবাদীদের উত্তর।

বাম কম্যুনিস্টরা সব সময়েই বলে থাকেন নকসালবাদীদের রাজনৈতিক উপায়ে জনতা থেকে আলাদা করতে হবে। অর্থাৎ তাঁদের রাজনৈতিক মত ও পথ বিপ্লবের পরিপন্থী একথা গণমানসে গ্রথিত করে দিতে পারলেই জনতা থেকে ও'রা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। ফলে হঠকারিতার পথে এগিয়ে যেতে সাহস পাবেন না। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, পরিষদীয় গণতন্ত্রে যে 'ত্রুটি' আছে সেই বক্তব্য অনেক তরুণ কম্যুনিস্টদের চোখ খুলে দিচ্ছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে পশ্চিমবঙ্গে কোন বুনিয়াদী পরিবর্তন ত দূরের কথা, আলতোভাবেও দুষ্টক্ষতগুলোকে স্পর্শ করতে পারছে না। নানা ধরনের কেলেঙ্কারীতে সমাজ আরও ছেয়ে যাচ্ছে। কাজেই তরুণ কম্যুনিস্টদের মধ্যে ক্রমেই এ ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে, বিপ্লবের আগুনে পরিশোধিত না হলে এই সমস্ত অসামাজিক কেলেঙ্কারী সমাজের মধ্যে থেকেই যাবে। কেউ তা দূর করতে পারবে না।

কাজেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও তাঁদের সমগোত্রীয়রা সকলেই অবিচ্ছিন্ন আস্থা নিয়ে বিপ্লবের কথাই বলছেন। প্রগতিশীল মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন না। আর তরুণ কম্যুনিস্টদের মধ্যে এর যে প্রচন্ড আবেদন আছে, তাও নকসালবাদীদের শক্তিসঞ্চয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট। অবশ্য, বাম কম্যুনিস্টরা দাবী করতে পারেন যে, তাঁদের কার্যক্রমই ক্রমশঃ মানুষকে পরিষদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারাতে সাহায্য করছে। সুতরাং বিপ্লব যখন তাঁদেরও কাম্য তখন যে কোন দলের মধ্যে দিয়ে বিপ্লব সংঘটিত হলেই হল, কে তার সহায়ক ইতিহাসই তা বিচার করবে।

কিন্তু বিশৃঙ্খলা থেকে বিপ্লব না এসে প্রতিক্রিয়ার শক্তিও জোরদার হতে পারে, এ বিষয়ে কে কতোদূরে সচেতন বলা মুশকিল।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত

চন্দ্রভান গুপ্ত যদিও তাঁর আপোষ প্রচেষ্টায় এখনো হাল ছাড়েন নি, তবুও একথা আজ প্রশ্নাতীত সত্য যে, রাষ্ট্রপতি পদের জন্য সঞ্জীব রেড্ডির মনোনয়নকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের সিণ্ডিকেটপন্থী ও ইন্দিরা-সমর্থকদের মধ্যে যে বিরোধ বাইরের আলোয় আত্মপ্রকাশ করেছিল, ইন্দিরার কংগ্রেস সদস্য পদ খারিজের সঙ্গে সেই বিরোধ ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে। কংগ্রেস আজ সত্যই দ্বিধাবিভক্ত। কংগ্রেসের এই দ্বিধাবিভাগ কেন্দ্রীয় সংগঠন ও পার্লামেন্টারী দলকে কিভাবে খণ্ডিত করবে তার একটা আভাস ইতিমধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে উঠলেও, রাজ্য সংগঠনগুলোর ওপর তার প্রভাব কিভাবে প্রসারিত হবে, ইন্দিরা পন্থীদের আহূত এ আই সি সি'র বৈঠক বসার আগে তা বলা সম্ভব নয়। তেমনি রাজ্য বিধানসভাগুলোয় কংগ্রেসগোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে এই বিভেদ-রেখা কিভাবে অগ্রসর হবে তাও বলা সম্ভব নয় বিধানসভাগুলোর অধিবেশনের আগে। ওয়ার্কিং কমিটিতে শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তা উপস্থিত এগারোজনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বলে দাবী করা হলেও, চন্দ্রভান গুপ্ত এবং আব্রাহামের সমর্থন সম্পর্কে সন্দেহের কারণ আছে। এবং এই সন্দেহ সত্য হলে ইন্দিরার বিরুদ্ধে গৃহীত সিদ্ধান্ত ওয়ার্কিং কমিটির পূর্ণ সদস্য-সংখ্যার (একুশ) পরিপ্রেক্ষিতে 'মাইনরিটি ডিসিসন' বলা যেতে পারে। অপর পক্ষে, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর ইন্দিরাপন্থীদের আহূত কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের সভায় ৩৩০ জন সদস্য উপস্থিত থেকে শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের নিন্দা করেছেন। পার্লামেন্টারী দলের সভায় গৃহীত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন স্বয়ং চাবন যার ফলে এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং প্রস্তাব উত্থাপনকালে চাবন যে তিক্ত ও কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন তাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। তিনি বলেছেন যে, 'এটা শুধু দলের নেত্রীর প্রতি আমাদের লোকদেখানো আস্থা নয় এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে প্রতিপন্ন হচ্ছে যে 'আসল কংগ্রেস' এসে তাদের নেতাদের পিছনে দাঁড়িয়েছে এবং জনগণের কাছে তারা যে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ তা পালনের সংকল্প প্রকাশ করেছে। চাবন বলেন, আমাদের 'জনকয়েক বন্ধু' যে নিজেদেরই সংগঠনরূপে জাহির করছেন এটা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।'

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে ইন্দিরার সদস্যপদ খারিজের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলকে অবশ্য নতুন নেতা নির্বাচনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং দলের উপনেতা সিণ্ডিকেটপন্থী এস এন মিশ্র তদনুযায়ী ইন্দিরা-আহূত ১৩ই তারিখের সভা বাতিল করে দিয়ে সোমবার পার্লামেন্টের অধিবেশন বসার আগে দলের একটা বিশেষ সভা আহ্বানের যথারীতি নোটিশ প্রেরণ করেন। তৎসত্ত্বেও ইন্দিরা গান্ধীর সভায় ৩৩০ জন সদস্য উপস্থিত থেকে প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং দিল্লীতে অনুপস্থিত আরো ৫০ জন সদস্য নাকি সমর্থনসূচক বার্তা পাঠিয়েছেন। অপর পক্ষে, সিণ্ডিকেটপন্থী এম-পিদেরও গতকাল মোরারজীর বৈঠকখানায় এক ঘরোয়া বৈঠক বসে যাতে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা নাকি ৬২ জনের বেশী নয়। রবিবার এদের যে প্রকাশ্য বৈঠক বসবে তাতে হয়তো উভয় পক্ষের সংখ্যাশক্তির আরো সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাবে।

ইন্দিরাপন্থীরা এম-পিদের যে সমর্থনের দাবী করেছেন তার মধ্যে কিছুটা অতি-রঞ্জনের অভিযোগ যদি আংশিকভাবে সত্যও হয় তাহলেও এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, কংগ্রেসী এম-পিদের মধ্যে ইন্দিরা পন্থীদের সংখ্যা সিণ্ডিকেট সমর্থকদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। কিন্তু এই সমর্থন কোন্ পক্ষে প্রকৃত কতখানি তা পার্লামেন্টের অধিবেশন বসার আগে বলা সম্ভব নয়, তবে পার্লামেন্ট বসবার সঙ্গে সঙ্গেই যে চিত্র পরিষ্কার হয়ে উঠবে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। সিণ্ডিকেট-পন্থীরা তাদের রবিবারের বৈঠকে নতুন দলনেতা নির্বাচন করবেন সেকথা প্রায় অবধারিত। কিন্তু সংসদীয় রীতি অনুযায়ী শ্রীগান্ধীর নেত্রীত্বাধীন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই আসল কংগ্রেস দলরূপে পার্লামেন্টের পরিচিত থাকবেন। ফলে সিণ্ডিকেটপন্থী দলের বিরোধী দলেই আসন গ্রহণ করতে হবে।

ইন্দিরা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই চৌদ্দটি অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ পড়েছে। হয়তো পার্লামেন্টের অধিবেশন বসার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দিরা সরকার তাদের প্রতি আস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাব তুলে এগুলোর সমাধি রচনা করতে পারেন। কিন্তু এই সকল প্রস্তাবে সরকারী বিরোধীপক্ষের পিছনে অন্যান্য দলগুলোর কি রকম সমাবেশ হয় তার ওপরই বর্তমান সরকারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। লোকসভার ভোটেরই আসল গুরুত্ব। ইন্দিরাপন্থীদের ধারণা লোকসভায় কংগ্রেসী সদস্যদের মধ্যে উর্ধ্বপক্ষে ষাটজন সিণ্ডিকেটের দিকে ভিড়তে পারে। তাঁদের হিসাবে আশি জন পর্যন্ত কংগ্রেস সদস্যও যদি সিণ্ডিকেটের দিকে যায় তাহলেও সরকারের পতন ঘটবে না। লোকসভায় সদস্য-সংখ্যা মোট ৫২২, এর মধ্যে চারটি আসন শূন্য আছে। বিভিন্ন দলের সংখ্যাশক্তি এই রকম : কংগ্রেস—২৮২, স্বতন্ত্র-৪২, জনসংঘ-৩১, ডি এম কে-২৫, সি পি আই-২৪, সি পি আই মার্কসিস্ট-১৯, পি এস পি ১৭, এস এস পি ১৭, বি কে ডি ১১, নির্দল-৫০। ইন্দিরাপন্থীরা সিণ্ডিকেট সমর্থক সদস্যদের পক্ষে জনসংঘ ও স্বতন্ত্র এবং কিছু সংখ্যক নির্দল সদস্যদের ভোট পড়বে ধরে নিয়ে হিসেব করেছেন যে তৎসত্ত্বেও ডি এম কে'র ২৫ জন, নির্দলদের মধ্যে ৩০ জন এবং বিকেডির কিয়দংশের সমর্থন নিয়ে তাঁরা টিঁকে থাকবেন। উভয় কম্যুনিষ্ট পার্টি পূর্ব থেকেই ইন্দিরা সরকারকে গদীচ্যুত করার চেষ্টার বিরুদ্ধে তাদের শক্তি প্রয়োগ করবে বলে ঘোষণা করলেও, তাদের ভোটের ওপর যদি শ্রীমতী গান্ধীর আত্মরক্ষা নির্ভর করে তাহলে ইন্দিরা সমর্থকদল একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হবেন, কারণ সিণ্ডিকেটপন্থীরা এটাকে ইন্দিরার বিরুদ্ধে প্রচারের বড় সুযোগ বলে গ্রহণ করবেন। পি এস পি এবং এস এস পি পার্লামেন্টের এই পরিবর্তিত অবস্থায় তাঁদের দলের নীতি নির্ধারণের জন্য অচিরেই মিলিত হচ্ছেন। এই বৈঠকের পর তাঁদের সমর্থন কোন্ দিকে তার আভাস পাওয়া যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর শিবির থেকে স্বতন্ত্র ও জনসংঘ সদস্যদের মধ্যেও কয়েকজন সদস্যের সমর্থনের আশা প্রকাশ করা হয়েছে। পার্লামেন্ট না বসা পর্যন্ত এই দল ভাঙগা ও গড়ার নতুন চিত্র স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়।

কেন্দ্রের এই দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেস ও অকংগ্রেস সরকার-শাসিত রাজ্যগুলির ওপরও অনিবার্যভাবেই প্রভাব বিস্তার করবে তবে সেই প্রভাব কতখানি দূরপ্রসারী হবে তা এখনই বলা যায় না। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ভারতের ১৭টি রাজ্যের মধ্যে ৯টির ওপর প্রভাব হারিয়েছিল। এরপর আবার অকংগ্রেসী সরকারগুলোর মধ্যে

অন্তর্বিরোধের ফলে কয়েকটি রাজ্য কংগ্রেসের কর্তৃত্বে ফিরে এসেছে। কংগ্রেসে নতুন দল ভাঙাভাঙির ফলে কংগ্রেস-শাসিত কয়েকটি রাজ্য যেমন সংকটের সম্মুখীন হতে পারে তেমনি অকংগ্রেসী দলগুলো থেকেও পূর্বতন কিছু কংগ্রেসীর কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন এবং ফলে অকংগ্রেসী জোটগুলোর পুনর্বিন্যাস অসম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকদের সভায় এক বিপ্লবী কংগ্রেসের অভ্যুদয়ের আভাস দেওয়া হয়েছে। চাবন একেই 'আসল কংগ্রেস' রূপে আখ্যা দিয়েছেন। একথা মনে করা অন্যায় নয় যে, সিন্ডিকেটপন্থীদের সরে যাওয়ার ফলে কংগ্রেস দেশবাসীর দৃষ্টিতে এক নতুন 'ইমেজ' বা ভাবমূর্তি লাভ করবে। এই ভাবমূর্তি দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা পূরণে কতখানি সহায়ক হবে তার ওপরই তার সার্থকতা ও কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে।

সংগঠনের মধ্যে এই ভাঙন কোন্ দলকে বেশী শক্তিশালী করবে তা ইন্দিরাপন্থীদের আহূত এ আই সি সি'র অধিবেশন বসবার আগে বলা অসম্ভব। ইন্দিরাপন্থীদের দাবী অনুযায়ী তলবী সভার দাবীতে তাঁরা এ আই সি সি'র গরিষ্ঠাংশ সদস্যের স্বাক্ষর ও সমর্থন পেয়েছেন। মনে হয়, ইন্দিরা-সমর্থকদের এই দাবীতে যদি সন্দেহ থাকতো তাহলে সিন্ডিকেট গোষ্ঠী তলবী সভার দাবী বিধিবহির্ভূত বলে ঘোষণা না করে সেখানেই তাঁদের শক্তির ও প্রভাবের স্বাক্ষর রাখবার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেন। ২২ নভেম্বর হয়তো এই চিত্র পরিষ্কার হবে এবং সংগঠনের ওপর সিন্ডিকেটের প্রভাব কতখানি তার একটা আভাস পাওয়া যাবে।

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত জনমনের ওপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে দিল্লীতে বুধবার ও বৃহস্পতিবারের ঘটনাবলী থেকেই তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঐ দুদিন ইন্দিরার সমর্থনে বিরাট বিক্ষোভ হয় এবং পুলিশের মতে, সিন্ডিকেপন্থী তারকেশ্বরী সিংহকে জন-নিগ্রহ থেকে রক্ষার জন্যই সাময়িকভাবে গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অবশ্য তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই দল ভাঙাভাঙির ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আরো কিছু পরিবর্তনও সম্ভব। ইতিমধ্যেই শ্রমমন্ত্রী জয়সুখলাল হাথী মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং ইস্পাতমন্ত্রী সি এম পুনাচারও পদত্যাগের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আবার সিন্ডিকেটপন্থীরূপে পরিচিত এবং দলের পূর্বতন উপনেতা নিরূপম রাও এবং কিছুদিন আগে মন্ত্রিসভা থেকে অপসৃত জগন্নাথ পাহাড়িয়াকে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকদের সভায় দেখা যায়। পার্লামেন্টারী পার্টির কর্মকর্তারাও প্রায় সকলেই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১৪ই নভেম্বর রাত্রেই মার্কিণ অ্যাপোলো ১২ দ্বিতীয় চন্দ্র অভিযানে যাত্রা করছে, যদি কোনো 'অনিবার্য' কারণে শেষ মুহূর্তে তার যাত্রা বিলম্বিত না হয়। এই বছরের ২১ জুলাই অ্যাপোলো-১১র দুজন যাত্রী নীল আর্মস্ট্রং ও এডুইন অলড্রিন পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে প্রথম গ্রহান্তরে পদার্পণ করে বিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করেন। সেবার তাঁরা চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রায় ২২ ঘণ্টা ছিলেন।

অ্যাপোলো আবার চাঁদে যাচ্ছে

এবারকার অভিযাত্রী চার্লস কনরাড ও আলান বীন এর প্রায় দেড়গুণ সময় চন্দ্রে অবস্থান করে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রপাতি স্থাপন করবেন এবং আগের তুলনায় চন্দ্র থেকে অনেক বেশী উপলখণ্ড সংগ্রহ করবেন। নতুন অভিযাত্রীরা যেখানে এবার নামবেন তাকে বিগত শতাব্দীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 'ঝটিকা সমুদ্র' নামে অভিহিত করেছিলেন, কারণ দূরবীনের দৃষ্টিতে এই অঞ্চলটি তাদের কাছে ঝঞ্ঝাময় বলে মনে হয়েছিল। আসলে এই অঞ্চলটি সমতল এবং নিস্তরঙ্গ সমুদ্র অঞ্চলের অনুরূপ। ক' মাস আগে অভিযাত্রীরা চন্দ্রের যে নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে অবতরণ করেছিলেন তার থেকে এই স্থানের দূরত্ব ৮৩০ মাইল। চাঁদে যাঁরা নামবেন তাঁদের অপর সহযাত্রী রিচার্ড গর্ডন ঐ সময় মূলযানের চালকরূপে চন্দ্র আবর্তন করতে থাকবেন।

চন্দ্রের উৎস, গঠন-প্রকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে পৃথিবীর ভূ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে সকল মতামত বিদ্যমান আছে, চন্দ্র অভিযানের এই সকল পর্যায়গুলো তার যাথার্থ্য নিরূপণে বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে এবং ১৯৭২ সাল পর্যন্ত চন্দ্রপৃষ্ঠে এই রকম আরো সাতটি অভিযান চালানো হবে বলে মার্কিণ মহাকাশ বিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন। এবং আশা করা যায় এই সকল অভিযান মানুষের কাছে অন্যান্য অনেক গ্রহের দ্বারও ভবিষ্যতে উন্মুক্ত করবে।

১৩-১১ ৬৯

কংগ্রেসের নতুন অধ্যায়

জওহরলাল নেহরুর ৮০তম জন্মদিনের প্রাক্কালেই নেহরু-কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সিণ্ডিকেটের ন'জন গোষ্ঠিনেতা কংগ্রেস থেকে 'বহিষ্কার' করার নির্দেশ দিয়ে গান্ধী-নেহরুর আদর্শের সঙ্গে তাঁদের চরম বিরোধিতার প্রমাণ দিয়েছেন। গান্ধীজীর শতবার্ষিকী বৎসরে এবং নেহরুজীর জন্মদিনের প্রাক্কালে দীর্ঘ সংগ্রামের ঐতিহ্যপূর্ণ কংগ্রেস মুষ্টিমেয় চক্রান্তকারীদের দ্বারা এমনভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এই গোষ্ঠি-নেতারা কোনোদিনই গান্ধী-নেহরুর আদর্শের প্রতি আস্থাবান ছিলেন না। তাঁরা কংগ্রেসকে ব্যবহার করেছেন নিজেদের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্য। সম্পদে, বিত্তে ও ক্ষমতায় আজ তাঁরা এত দাম্ভিক হয়ে পড়েছেন যে, শ্রীমতী গান্ধীকে 'বিতাড়নের' নির্দেশ দিতে ওঁদের এতটুকু হাত কাঁপল না। কংগ্রেস সংগঠনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ পদদলিত করে সিণ্ডিকেট যে-সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার অযৌক্তিকতা সুস্পষ্ট। কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যরা এই স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত মেনে নেবে না। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি পার্টি ইতিমধ্যেই বিপুল ভোটে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জানিয়েছে।

সিণ্ডিকেটের গোষ্ঠি-নেতারা অনেক দিন থেকেই শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর সহযোগীদের প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক নীতি বানচাল করবার জন্য চেষ্টা করে আসছেন। শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার মুখ দিয়ে ফরিদাবাদ অধিবেশনে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ও নির্বোধ সমালোচনা প্রকাশ করে তাঁরা তখনই শ্রীমতী গান্ধীর নীতির প্রতি বিরূপতা দেখিয়েছিলেন। সিণ্ডিকেটের প্রধান সমর্থক স্বতন্ত্র ও জনসংঘ। একটি দল ঘোরতর সমাজবাদ-বিদ্বেষী, অন্য দল সামন্ততন্ত্র ও হিন্দু রক্ষণশীলতার পৃষ্ঠপোষক। এদের সমর্থনে সিণ্ডিকেটগোষ্ঠি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে রাষ্ট্রপতির পদে বসিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরাকে দাবাতে চেয়েছিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরার পাশে কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রগতিশীল দলের সমর্থন অকুণ্ঠ হওয়ায় তাদের সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেই পরাজয়ের অপমান তাঁরা ভুলতে পারেননি। তাই ঐক্য প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেও তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে গদিচ্যুত করার জন্য এই জঘন্য ষড়যন্ত্র করছিলেন।

পার্লামেণ্টারি পার্টির আস্থাভোটের পর এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সিণ্ডিকেটগোষ্ঠি কংগ্রেসে নিতান্ত মাইনরিটি। কিন্তু তাঁরা হাল ছাড়বেন না। পার্লামেণ্টের বর্তমান অধিবেশনে তাঁরা স্বতন্ত্র, জনসংঘের হাত দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে নানাভাবে বিব্রত করবার জন্য ষড়যন্ত্র করবে। লোকসভায় কংগ্রেসের মেজরিটি সামান্য। সিণ্ডিকেটপন্থীরা অনাস্থা প্রস্তাবের সময়ে শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে। কিন্তু তাতেও শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। কারণ, সমাজবাদী প্রগতিশীল বামপন্থী দলের অনেক সদস্য এই আদর্শের লড়াইয়ে শ্রীমতী গান্ধীর পাশে এসে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অবশ্য এই সমর্থন সব সময়েই নিঃশর্ত থাকবে না। শ্রীমতী গান্ধী কীভাবে কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক কার্যসূচী রূপায়ণের কাজে হাত দেন, জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে তিনি কীভাবে এগোবেন, তার ওপর অন্যান্য দলের সমর্থন নির্ভর করবে। অন্যদিকে স্বতন্ত্র, জনসংঘ ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দল, সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের একটি অংশ শ্রীমতী গান্ধীকে সরাবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করবে না। তাদের মুখে এখনই সমালোচনা শোনা যাচ্ছে যে, শ্রীমতী গান্ধী কমিউনিস্টদের দিকে ঝুঁকেছেন। জওহরলাল নেহরুকেও এই সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। যখনই তিনি জনকল্যাণের কথা বলেছেন, সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন, তখনই তিনি কমিউনিস্ট বলে চিহ্নিত হয়েছেন। এটা হল প্রগতিবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীলদের পুরনো বুলি। সমাজতন্ত্র শুধু কমিউনিস্টদের আদর্শ নয়। আজ পাশ্চাত্যের ধনবাদী দেশেও জনকল্যাণের জন্য যে-সমস্ত বৈপ্লবিক কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে তার শতাংশও আমরা নিতে পারিনি। কেন? কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশন থেকে শুরু করে নেহরুর জীবদ্দশায় ভুবনেশ্বর অধিবেশন পর্যন্ত বারবার কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক সংকল্পের কথা ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস সংগঠনে দখলকারী রক্ষণশীল গোষ্ঠির বিরোধিতায় তা কার্যে পরিণত করা যায়নি, আংশিকভাবে তা করা হয়েছে মাত্র। এজন্য নেহরু নিজে অনেক আক্ষেপ করে গেছেন।

আজ নেহরু-কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা সাহসের সঙ্গে কংগ্রেসের এই বকেয়া গোষ্ঠিচক্রের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেসকে তিনি নতুন নেতৃত্ব দিতে চান। যাঁরা তাঁকে 'বহিষ্কার' করেছেন তাঁরা নয়, তিনি এবং তাঁর সমর্থনে যে-অগণিত কংগ্রেসসেবী এগিয়ে এসেছেন, তাঁরাই কংগ্রেসের আদর্শ ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য ইতিহাসের নির্দেশে আজ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দায়িত্ব নেবেন। দেশব্যাপী যে-জাগরণ ও যে-উৎসাহ আজ শ্রীমতী ইন্দিরাকে ঘিরে দেখা দিয়েছে, তার সফল পরিণতি হবে কংগ্রেসের নবজন্মে, তার আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে। এই হল আজ ইতিহাসের অভ্রান্ত নির্দেশ।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে ॥

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

কবে যেন অন্যমনে হাঁটি :
পায়ে পায়ে স্মৃতিশষ্পভূমি
ভগ্নস্তূপে ইতিহাস-পার
ধুলো গন্ধ আলো নকশাবোনা
অন্ধকার সিংহদ্বার ঠেলে
চলে যাই হস্তিনা-প্রাসাদে—
দরদালান গবাক্ষ অলিন্দ
কক্ষ-কক্ষান্তর বীণাধ্বনি
নূপুর-ভ্রূভঙ্গ চিনে চিনে
অভ্যন্তর আরো অভ্যন্তরে

কই রাজা ধৃতরাষ্ট্র…খুঁজি…
শূন্য ঘর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
মনুষ্যত্ব স্বধর্ম বিবেক
দ্বাররক্ষী দৃপ্ত পদক্ষেপে
শূন্য ঘর ধৃতরাষ্ট্র কই
বাৎসল্য যে-ঘরে বামাচারী
লালায়িত ঈর্ষার আসঙ্গে
দিগ্বিদিক মৃদঙ্গ যে-মন
অবুঝ অধীর অন্ধ জৈব
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে?

আচম্বিতে চমকে উঠে : এ কি
সুদুঃসহ চর্যাচর্যশেষে
আমারও তো স্বপ্নের প্রাসাদে
প্রতীক্ষিত কল্প-সিংহাসন,
এদিকে আমারই ঘরে চুপি—

চুপি সিঁধ কেটে গুপ্ত লোভ
সুগুপ্ত অসূয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা
মরীয়া মোহের চোরাপথে
শতপুত্র আমাকেই চায়—
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে।

কুরুক্ষেত্র তাই রাত্রিদিন
হৃদয় আমার কুরুক্ষেত্র
যোদ্ধৃস্বপ্ন কাড়া ও নাকাড়া
তূরীভেরী সাধ উচ্চৈঃশ্রবা
প্রতিপক্ষে পরাজয় আমি
ক্ষিপ্র দুই শব্দভেদী বাণ
চৈতন্য ও চিত্ত যুযুধান
ফল, আত্মগ্লানি শবদেহ
ফল, আত্মহনন শ্মশান—
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র আমি বন্দী
পথ দাও হস্তিনা-প্রাসাদ
দরদালান গবাক্ষ অলিন্দ
কক্ষ-কক্ষান্তর যাও ছুঁয়ে
অভ্যন্তর কোন্‌দিকে সদর
আমার অন্ধত্ব থেকে আমি
পালাতে পালাতে, এই আমি
আমাকে ছাড়াতে দিই অন্ধ
অস্তিত্বের সিংহদ্বারে ঘা—

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে।।

বন মহোৎসবে ॥

হেনা হালদার

এ-বর্ষাও চলে গেল। আমার বাগানে
সম্ভব হল না শ্যাম সতেজ বৃক্ষতা।
অনুর্বর বন্ধ্যা মাঠে হাহাকার দিগন্তবিসারী।
সব পরিকল্পনার নক্সাগুলি
এবারো নিষ্ফল। ইচ্ছা আশা প্রতীক্ষারা
সমস্ত বাতিল। দূরান্তর থেকে আনা
ক্যাটালগ, যন্ত্রপাতি বৈজ্ঞানিক সার
বৃথা সব। এ-বছরও বর্ষা চলে গেল।
আমার একটিও চারা হল না রোপিত
বনমহোৎসবে। দেখি আগাছা-কণ্টকে
ফুল-ফল ফসলের ছবি।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমস্যা

মনোজ বসু

মহাযুদ্ধের কিছুকাল পরে বিধ্বস্ত ইয়োরোপ দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছিল। দশটা বিশটা তরুণের সামান্য সংস্পর্শেও এসেছিলাম। চোখের ও মনের দীপ্তি কণামাত্র কারো অবশেষ নেই। হতাশা নিদারুণ। কপাল গুণে লড়াই থেকে বেঁচে এসেছে—কিন্তু বেঁচে থাকায় যা দুর্ভোগ, মরণে সে তুলনায় বিস্তর সোয়াস্তি। তাছাড়া লড়াই আবার জমে উঠতেই বা কতক্ষণ? তৈরি মাল—ফ্রন্টে ঠেলবে তাদেরই সকলের আগে! এক যুদ্ধ থেকে অন্য যুদ্ধে উত্তরণের মধ্যে অনিশ্চিত আয়ুষ্কাল, যেমন ইচ্ছে অতএব ভোগ করে নিই। জীবন সম্পর্কে কোন রকম মমত্ববোধ নেই। আদর্শের কথা তাদের কাছে অর্থহীন হাস্যকর বুলির কপচানি।

আমাদের অবস্থাও আজ প্রায় তেমনি। শান্ত সুস্থ নিরুদ্বিগ্ন কোন স্তরে কাউকে দেখতে পাইনে। পদে পদে সমস্যা—কোন একটিরও সমাধান যে অদূরবর্তী সে প্রত্যয় হারিয়ে ফেলেছি। পড়াশুনো সাংঘাতিক রকম ব্যয়বহুল। সেই কষ্টের পড়াশুনো সারা করে এসে দেখা যাবে চতুর্দিকের সবগুলো দরজা অবরুদ্ধ। আলোর কণিকামাত্র নেই, বেকার অবস্থায় ভিখারির বেহদ্দ হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোই সার। হেন অবস্থায় মহাজনের সুভাষিতাবলী কানে ঢোকার কথা নয়। অব্যবস্থার সমাজে যা সমস্ত স্বাভাবিক, তাই ঘটে যাচ্ছে—সত্যনিষ্ঠা সদাচার চারিত্রিক বলিষ্ঠতা দুর্লভ হচ্ছে দিনকে দিন।

সমস্যাজর্জর দরিদ্র দেশকে সবাই হেনস্থা করে, শক্তিমানে ঘাড়ে চেপে বসতে চায়। এক শত্রু ইংরেজের শাসনে অস্থির হয়েছিলাম, কত দিকে কত শক্তি আজকে প্রভাব খাটানোর চোরাগোপ্তা ফিকিরে আছে, তার অবধি নেই। পুতুলনাচের মতন অলক্ষ্য থেকে তার তারা সুতো টানে। স্বাধীনতার কী মনোরম ছবিই না আবাল্য মনে মনে লালন করে এসেছি। কত ছেলে হাসতে হাসতে প্রাণ দিলেন—আমাদেরই সুহৃৎ কতজনা! দু-চোখ ভরে তাঁদের আত্মনিবেদন দেখেছি। যো-সো করে ইংরেজ তাড়ানো হলেই সর্বসুখ করতলগত—চিন্তা-ভাবনার তখন মোটামুটি এই চেহারা ছিল।

এ হেন স্বাধীনতার বাইশ বাইশটা বছর কাটিয়ে এলাম। একটি সমস্যারও সুরাহা হয়নি এতাবৎ, অসুখ অশান্তি বরঞ্চ বিস্তর বেড়েছে। যত দিন যাচ্ছে, শোচনীয় দশাটা বেশি প্রকট হয়ে পড়ছে। ভুলের পর ভুল। রাজনীতির ভিতরে ধর্মের নিশান—বিষবৃক্ষ তখনই পোঁতা হয়ে গেল। লীগের সঙ্গে ১৯১৬ অব্দের প্যাক্ট, খেলাফত নিয়ে ১৯২০ অব্দের মাতামাতি (জিন্নাহর তখন এ বাবদে ঘোরতর আপত্তি), ১৯৩২ অব্দের না-গ্রহণ, না-বর্জন নীতি (চোখে দেখছিনে বাবা, কানেও কিছু শুনতে পাইনে—হায় রে হায়, ভন্ডামি আর কাকে বলে!) ইত্যাকার বারিনিষেকে সযত্নে বিষবৃক্ষের প্রবর্ধন হয়ে এসেছে। পরিণামে দেশখন্ডন—কীটদষ্ট খন্ডিত স্বাধীনতা।

নাকি উপায় ছিল না—খন্ডন বিনে নির্ঘাৎ সিবিল-ওয়ার ঘটত। সিবিল-ওয়ার নাকি ভয়ানক কান্ড—হাঙ্গামা, রক্তপাত হয়, মানুষ মরে। তোবা, তোবা! মানুষের ঘাড়ে কোপ এড়ানোর ছলে অতএব দেশের ঘাড়ে কোপ। ল্যাজা আর মুড়ো ছিটকে পড়ল দুদিকে—এক ভারতবর্ষ কেটে ভারত আর পাকিস্তান, আমাদের এক বাংলা কেটে দুই বাংলা। কৃত্রিম বর্ডার হাজার হাজার মাইল জুড়ে।

দেশের সম্পদের মোটা অংশ নিয়ে ঢালছি বর্ডার প্রতিরক্ষায়, অস্ত্র কিনে কিনে ডাই করছি। সাধারণের সুখ-সুবিধার ব্যাপারে তখন আর টাকা থাকে না। এপারের বাংলা ও-পারের বাংলা উভয়ত্র এই এক জিনিস।

গন্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্—সমস্যা যা আছে, তাই যেন যথেষ্ট নয়—বিরোধের নতুন ক্ষেত্রের পত্তন হয়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে। পনেরটি ভাষাগোষ্ঠির মন-কষাকষি, কখনো সখনো ধুন্দুমার। ও-পারের বাংলায় আক্রমণ প্রতিহত করে বঙ্গভাষা বিজয়-পতাকা ওড়াচ্ছে, আর সেই বঙ্গভাষা থরথর কাঁপছে এপারে—ঘাড়ধাক্কা খেয়ে দ্বিতীয় তৃতীয় অথবা চতুর্থ সারিতে কখন গিয়ে নেমে দাঁড়াতে হয়। দুই বাংলার মধ্যে ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আছে, তারই উপর মুগুরের ঘা।

খদ চার্চিল সাহেব গোড়ার আমলেই হিসাব করেছিলেন, দাঙ্গায় অন্তত ছয় লক্ষ মানুষ মরেছে। এক গন্ডা সিভিল-ওয়ারে এতদূর হত কিনা সন্দেহ। আর, দাঙ্গা ছাড়াও যারা উৎসন্ন হয়ে গেল, তাদের হিসাব কে নিতে যাচ্ছে। নিশ্চিন্ত নিরপরাধ ঘরগৃহস্থালী লাখে লাখে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। মরে গেছে, আর বেঁচে থেকেও বিস্তরজন মরার অধিক দুঃখভোগ করেছে। আশ্রয় ও উদরান্নের জন্য বউ-ছেলেপুলের হাত ধরে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত হয়তো জলায় জঙ্গলে একটুকু চালা তুলে নিয়েছে। পুরানো বনেদি বাসিন্দাদের মনে মনে ঘৃণা উদ্বাস্তু নামধেয় এই সম্প্রদায়ের উপর, দুষ্কর্মের দায় বেশির ভাগ এদেরই উপর চাপে। একথাও সত্যি, অন্যায় ব্যবস্থায় সর্বস্বহারা হয়ে যাদের পথে নামতে হয়েছে, অবচেতন মনে তাদের আক্রোশ জমে থাকে। এই থেকে অপরাধ প্রবণতার উৎপত্তি নিতান্ত অসম্ভব নয়।

অসুখ অশান্তি আর নীতিহীনতা দেখে শিউরে ওঠেন বিজ্ঞজনেরা। একটা বোমা বানানোর বাবদে সেকালের স্বদেশি-দাদাদের কত কসরৎ করতে দেখেছি, বোমা এযুগের কুটির-শিল্প। মানুষের প্রাণের মূল্য ইঁদুর-আরশুলোর মতো—বুকে ছুরি বসালেই হল। কাগজ খুলে নিত্যদিন চোখে পড়ে। ছেলেপুলেদের দোষী করে কি হবে—অবশ্যম্ভাবী ফল। বিষবৃক্ষে অমৃত-ফল ফলে না। বরঞ্চ আত্মানুসন্ধান করে দেখুন। তালিতুলি দিয়ে সামলানোর দিন আর নেই। ভ্রান্ত নেতৃত্ব, ভন্ড নেতৃত্ব, লোভী নেতৃত্ব আবর্জনাস্তূপে চিরবিশ্রাম নিনগে। ইতিহাসের লিখন দেখে আতঙ্ক জাগে, তবু কামনা করি এঁদের মহাযাত্রা শান্তিময় হয় যেন।

আপন কথা একটু বলি। অস্তাচলের সামনে দাঁড়িয়ে এখন আর লজ্জাসঙ্কোচ কিসের! স্বাধীনতা সংগ্রামের মাঝে কলম হাতে আমি পাশে পাশে ছিলাম। বিপ্লবীদের ছবি 'ভুলি নাই' লিখেছি। 'বাঁশের কেল্লা', 'সৈনিক' 'আগস্ট ১৯৪২' ইত্যাদি সংগ্রামের নানা পর্যায়ের কাহিনী। দেশের মানুষ উদ্বুদ্ধ হবেন বলেই 'নূতন প্রভাত' ও 'রাখিবন্ধন' নাটকের রচনা। স্বাধীনতা লাভের পর মহোল্লাসে লিখলাম 'নবীন যাত্রা'। বৃথা, বৃথা! আমার পিতৃপিতামহের ভূমি, আমার চিরকালের পড়শি-আত্মীয়দের যেখানে বসবাস, আমার বাল্য-কৈশোর-যৌবনের সহস্র স্মৃতিতে যা অনুরঞ্জিত, সেখানকার গাছ-গাছালি কোথায় কোনটা আছে মুখস্থর মতন আজও বলে যেতে পারি, আজকের ভিন্ন রাজ্য সেখানে প্রবেশের অধিকার নেই আমার। কোন্ অপরাধে এই নির্বাসন, প্রশ্ন করছি। ক্ষীণ সান্ত্বনা একটুকু কুড়িয়ে মনকে প্রবোধ দিতাম: আমাদের ভাগ্যে যাই হোক, সাম্প্রদায়িক হিংসাটা ক্ষীয়মাণ সুনিশ্চিত। এই উনিশ'শ ভারতেই আমেদাবাদ ও রুগুণদল দেখে সে প্রত্যাশাও ঘুচে গেছে। অবসাদে কলম আর চলতে চায় না।
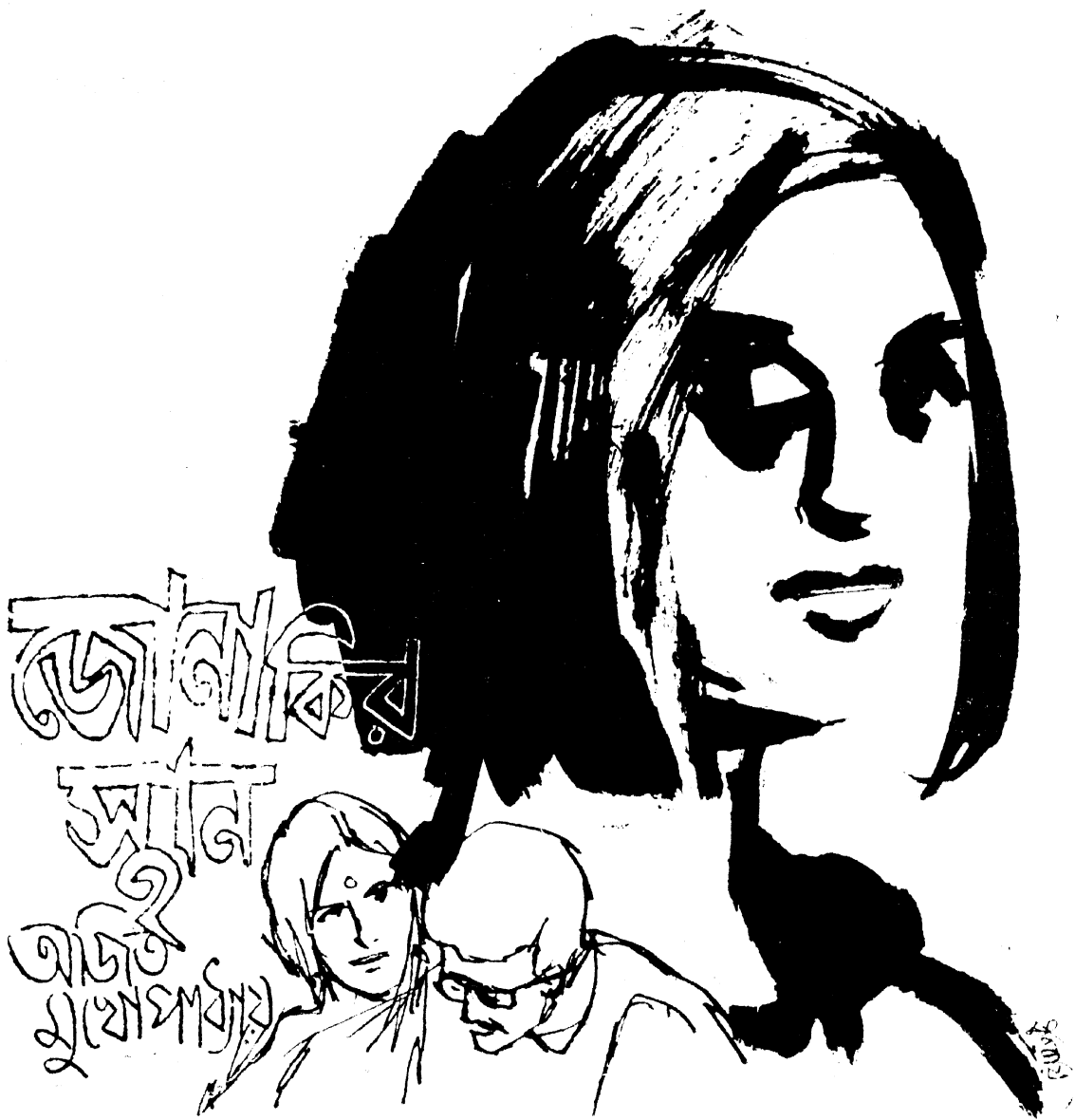
সে পৃথিবীতে এসেছে অবাঞ্ছিতভাবে। মা ও বাবা কেউই চায়নি জুনু জন্ম নিক। বুবু ছেলে এবং সে চার বছর পেরিয়ে গেছে ; আর তাদের দরকার নেই। দয়া এবং সেবক বুবুর জন্মের পর চার বছর...দীর্ঘ চার বছর আধুনিকতম বিজ্ঞানের খবর রেখেছে। দুজন মানুষের যতটা সাধ্য, তত সাবধানী থেকেছে...এই চার বছরে তাদের কতবার মনে হয়েছে, আজ বিজ্ঞান দূরে থাক, আজ তারা চূড়ান্ত স্বাভাবিক প্রথায় রাত কাটাবে, আর যে সামান্যতম বিরক্তিও সহ্য করা যায় না...কিন্তু বাস্তবতা স্মরণ করে তারা নিজেদের জ্বালিয়ে পুড়িয়েও সহজ সুখ থেকে বঞ্চিত করেছে...ভুল করেও আবেগের নির্দেশে পা দেয়নি।

দয়া এবং সেবক ভাবতেও পারল না, নিয়তি কোন ছিদ্র দিয়ে দয়ার শরীরে আসন দখল করে বসল। আর ওরা দুজনেই হাহাকার করে উঠল। তিনজনই যে সংসারে গুরুতর ভার...তিনজনের সংসার টানাই যেখানে অসম্ভব সেখানে চতুর্থজনের স্থায়ী বসবাসের সম্ভাবনাতে দয়া ও সেবক দুজনেই রেগে উঠল। দয়া সেবককে দিনরাত রূঢ় কথা শোনাতে লাগল...বে-আক্কেলে লোক, চিরকালই কাচা খোলা, একটু সাবধান হবে ত!

সেবক তার সাবধানতার যতপ্রকার বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য ছিল সমস্তই পেশ করল দয়ার সামনে।

বৃথা।

দয়া গর্ভেই জুনুকে হত্যা করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করল, একদিন ঠিকা-ঝির পরামর্শে একদলা হিং খেয়ে বমি-টমি করে কেলেংকারি কাণ্ড বাধাল...শরীর আগুনের মত গরম হয়ে গেল...সেবক ভয়ে ডাক্তার ডাকতে যেতে পারে না...সেদিন যে কীভাবে গেছে জানে একমাত্র সেবক আর দয়া।

কিন্তু বৃথা।

জুনু মরল না।

জুনুর জন্মের আগে সেবক নিঃস্ব। না তার ক্ষমতা আছে দয়াকে নিয়ে গিয়ে কোনো প্রবীণ ডাক্তারকে দেখায়, না তার সময় আছে, দুজনে মিলে হাসপাতালের আউটডোরে ধন্না লাগায়। কিন্তু জুনুর এমনি মন্দ কপালের জোর সে জন্ম নিল

বেশ নামকরা হাসপাতালেই। সেবক ও দয়া কেউ ভাবেনি জনু জন্মাবে কোনোকালে... ভাবতে চায়নি...সেজন্য সত্যি সত্যি জনু যখন ভূমিষ্ঠ হবে তখন দয়ার দিকে তাকিয়েও যে অনেক কিছু আছে ব্যবস্থা করার, সে সব দুজনেই চিন্তা করেনি... তারা দুজনেই জনুর জন্মের কারণ এবং গর্ভাবস্থায় জনুকে চিরকালের মত ঘুম পাড়িয়ে দেবার ভাবনাতেই জর্জরিত ছিল। লেবার পেন উঠতে দয়া সেবককে সকালে নোটিশ দিল...সেবক সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভেবে চলল, কী করা যায়...সে দিন তার পকেট শূন্য...একটি টাকা পর্যন্ত নেই...কর্পোরেশনের ধাত্রীরা আসে বিনি পয়সায়, তাও জানে না সে...কারণ বুবু হয়েছে গ্রামের বাড়িতে...বুবুর জন্মাবার সময় যা কিছু ঝক্কি পুইয়েছে সেবকের মা...সুতরাং শিশুর জন্মের ঝামেলা সম্বন্ধে সেবক, যাকে বলে একেবারে অজ্ঞ। সে দয়ার লেবার-পেন শুনেই সারাদিন চোখে সর্ষে ফুল দেখল...পরিচিতজনের কাছে টাকা ধার করতে ছুটল...তিনজনের মধ্যে দুজনকে পেলই না...তৃতীয়জন সাবধানে জানাল, আজ মাসের শেষ সপ্তাহ, অতএব ...অগত্যা বা ধাত্রী ডেকে বাড়িতে আনার চিন্তা পরিত্যাগ করে ফেরার সময় মনে পড়ল, এক বন্ধুর পরামর্শ।

রাত দশটার সময় দয়াকে সঙ্গে নিয়ে সেই নামকরা হাসপাতালে গেল সেবক। কাছেই হাসপাতালটা...ছ আনা রিক্সা ভাড়া...

সোজা এমার্জেন্সী ওয়ার্ড।

কর্তব্যরত ডাক্তার কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করলেন, কার্ড?

কাঁচুমাচু সেবক বলল, সোজা গ্রাম থেকে আসছি বুঝতেই পারিনি...

কার্ড না থাকলে যে আমাদের কী অসুবিধের পড়তে হয় সেতো আপনারা জানেন না...কণ্ঠ তো নয় যেন হাত থেকে হঠাৎ পড়ে যাওয়া কাঁসার থালার আর্তনাদ।

বোকা বোকা মুখে সেবক নিরুত্তর... দয়াকে ভিতরে নিয়ে চলে যায় স্টাফ ভদ্র-মহিলা। সেবক সই-সাবুদ করে ফিরে আসে...

হেঁটে বাসায় ফিরে আসে সেবক... চারতলার ফ্ল্যাট...অন্ধকার ছাতে আলসের ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি খায়... কী এক ঝড় কাটল সারাদিন, ধাতস্থ হবার চেষ্টা করে...এখন জনুরাণী রাত দশটা বেজে তিরিশ মিনিটে নামকরা হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ হল সগর্বে সোৎসাহে...

এক-একবার দয়া ও সেবক দুজনে ভাবে, কেন তারা হাসপাতালে গিয়েছিল... কেন তারা নির্বিকার থাকতে পারেনি। এই বাসাতেই জনু হত, ডেকে নিয়ে আসত কোনো হাতুড়ে দাই-টাইকে...কত গরীবের ছেলে জন্মাচ্ছে রাস্তার পাশে...তাদের যা অবস্থা, তাতে তাদের ছেলের জন্ম নেবার কথা রাস্তারই পাশে!

আর, জনুরাণীর শরীর দেখে কেউই বলবে না, এ মেয়ের স্বাস্থ্য রাস্তায় জন্মানো কোনো ছেলে-মেয়ের চাইতে ভালো...

জন্মের পরে জনু সেবক ও দয়াকে আরও বিব্রত, আরও দুঃখিত করল... কয়েকখানি চুলের মত সরু সরু হাত... খেতে-টেতে পারে না...চার পাঁচদিন পরে ক্রমশই নেতিয়ে পড়ল জনু।

সেবক ভাবে, এবারে সে কী করবে?

এ ক'দিন চলেছে বুবুর কৌটো লুকিয়ে ভেঙে। বুবু জানলে, সে নিজের কপাল ঠুকবে দেয়ালে...বড় বদরাগী হয়েছে ছেলেটা, বুবুর ধারণা, মা ও বাবা তার কোনো ইচ্ছেই চরিতার্থ করেন না...অথচ অনায়াসেই বুবুকে খুশী করতে পারেন তাঁরা। বুবুর সামান্যতম সখ-আহ্লাদ পূর্ণ না করার জন্য সে এ পৃথিবীর প্রতি প্রচণ্ড নির্মম হয়ে উঠেছে...সে কারুর কথা শোনে না...শাসন মানে না...ভীষণ জেদী হয়ে যাচ্ছে।

বুবু যদি জানে তার কৌটো ভেঙেছেন তার বাবা, তাহলে সে যে কী ভাঙবে বলা যায় না।

আর, বুবুর কৌটোর সম্পদও এ-কয়-দিনে নিঃশেষ।

এখন জোনাকীর যা অবস্থা আজই ডাক্তার ডাকা উচিত, আর একটি দিনও দেরী করা ঠিক না

প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা আসছে যাচ্ছে, তারা ঘন ঘন উপদেশ দিচ্ছে, ডাক্তার ডেকে আনতে।

দয়াও বারবার বলছে।

শেষে সেবক ধৈর্য হারিয়ে জানিয়ে দিল, ও মরুক এ-ই তো চেয়েছিলে! এখন ডাক্তার ডাকতে বলছ কেন?

পাণ্ডুর হয়ে গেছে দয়া...যে রিকেট-আক্রান্ত মেয়ে প্রসব করে তার শরীর-স্বাস্থ্য কি স্বাভাবিক হতে পারে? দয়ার শরীরও খুব কাহিল...সাতাশ বছরের দয়ার শরীরে ঈর্ষণীয় যৌবন ছিল, আঠাশ পেরোতেই দয়ার শরীরের অবস্থা ঝোড়ো কাকের মত...অবশ্য দয়া বেশ ফর্সা...জোনাকীও মায়ের রঙ পেয়েছে কিছুটা...

দয়া কেঁদে ফেলল, কয়েক মিনিট বাদে রেগে উঠল...বিকেলের আলো এসে পড়েছে দয়ার দেহে...পাণ্ডুর রোদ্দুর...রোদটা যেন দয়ার কাছ থেকে রঙ ধার করছে...জনুকে কোলে নিয়ে দয়া খাটে বসে আছে...বারবার সে তার মেয়েকে খাওয়াবার চেষ্টা করছে... মেয়ে খাচ্ছে না...তখন সেবক অমন কথা বলায় দয়া তার দুই কান থেকে সরু সরু দুটি দুল খুলে দিয়ে চাপা স্বরে বলল, ছি-ছি! বাপগুলো কী চামার হয়।

সেবক দুল দুটো বিক্রি করে ডাক্তার ডাকতে ছুটল। সে কি সত্যি সত্যি চায়, বিনা চিকিৎসায় মেয়েটা মরুক।

তার কি মেয়েটার প্রতি এখনো কোনো মায়া জন্মায়নি?

হয়তো সে এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, সে কোনটা চায়। তার মেয়ে বাঁচুক অথবা মরুক। হয়তো সে চায় না জোনাকী মরুক। সে পিতা...তাকে তার সন্তান-সন্ততিদের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হবে বৈকি!

কিন্তু সেবক বুঝতে পারছে, মেয়েটা এখনো তার মন কাড়েনি...

ছেলেদের সঙ্গে মায়েদের সম্পর্ক শারীরিক...সেখানে মায়াটা সন্তানের জন্মের দশ মাস আগে থেকে অঙ্কুরিত হচ্ছে...

হঠাৎ ওইভাবে রূঢ় বাক্য শোনানোর জন্য সেবক মনে মনে রাস্তায় অনুতাপ করল।

ডাক্তার এসে জনুকে দেখে গেল।

যাবার সময় সেবকের আড়ালে এক-তলার প্রতিবেশী সেনগুপ্তদের বাসায় ঢুকে ডাক্তার কী সব সাবধান-বাণী আউড়ে গেল। সেনগুপ্তরা সেবকদের বড় ঘনিষ্ঠ এবং উপকারী। ওদের পরিচয়েই ডাক্তার এসেছে ...হাতে পয়সা না থাকলে ধারও চলতে পারে।

সেনগুপ্তদের স্বাতী পরদিন সকালে ছুটল ডাক্তারের চেম্বারে...জরুরী কাজে সেবককে বেরুতে হয়েছে।

স্বাতীকে ডাক্তার প্রশ্ন করল, ওষুধ-গুলো ঠিক খাওয়ানো হয়েছিল?

হ্যাঁ।

বেঁচে আছে তো?

হাসল স্বাতী। ওষুধ নিয়ে এল।

প্রখ্যাত প্রবীণ ডাক্তারের ধারণা পাল্টে দিয়ে জোনাকী ধীরে ধীরে বেঁচে উঠল। প্রথম দিনই ডাক্তার সেনগুপ্তদের বাসায় বলে গিয়েছিল, কী চিকিৎসা করব! রাত পোয়াবে কিনা সন্দেহ!

চার বছরে জোনাকীর গায়ে দৈনিক একপো দুধ খাওয়ার ফলে কিছুটা মাংস লেগেছে, তাতেই ওকে ফুটফুটে দেখায়। দয়ার সেলাই করা লাল ফ্রকটি পরে যখন জোনাকীর টিপ-কপালে কুমকুমের টিপ পরানো হয়, তখন তাকে যে দেখে সেই ছোঁ মেরে কোলে তুলে নেয়। উপরন্তু জোনাকীর কলকলানি কথা। মুখে যেন ওর খই ফুটছে সর্বদা...

আর, মেয়েটি হয়েছে বুবুর বিপরীত। কোনো জেদাজেদি নেই...রূঢ়তা নেই... খাওয়ালে খাবে, নইলে বাবার খালি দেশ-লাইয়ের খোল সিগারেটের প্যাকেট ছেঁড়া ন্যাকড়া নিয়ে আপন মনে খেলবে...

ঝগড়া করতে পারে না, মারামারি তো প্রশ্নাতীত।

হয়তো মেয়েটি দুর্বল বলে কোথাও তার অধিকার নিয়ে আবদার করার উত্তে-জনাই বোধ করে না। বাবা-মায়ের কাছে তার আবদারের সংখ্যাটা এতই কম যে তার যে-কোনো আবদার কারুর পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভব।

বেলা আটটায় ঘুম থেকে উঠে সেবক খাটে বসে নতুন বাসায় কাজ করছে...দীর্ঘ-দিন বাসা ভাড়া বাকি পড়ে যাবার দায়ে সেবকরা আদালতে কেসে হেরে গিয়ে উৎখাত হয়ে এসেছে...আধা-শহর জায়গাটা খোলামেলা...অনেক ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে, বিক্রির জন্য নতুন নতুন বাড়ি করার জন্য...কিছু কিছু গাছপালা দেখতে পাওয়া যায়...বেশ কটা পুকুর জায়গাটা সব মিলিয়ে মন্দের ভালো...

জোনাকী বাবার কাছে ঘুরঘুর করছে যতক্ষণ বাবা ঘরে থাকবে, ততক্ষণ সে খেলা-টেলা ছেড়ে দিয়ে বাবার পিছু পিছু ঘুরবে...বাবা হয়তো পিঠ চাপড়ে দেবে... বড়জোর দু-চারটে চুমু খাবে...কোলে নেবার সময় কোথায়...সেবকের সারাদিনই কাজ আর কাজ...

মাথা না তুলেই সেবক বলল, এখন যাও...বিরক্ত কোর না।

তবু দাঁড়িয়ে থাকল জোনাকী। বাবার গম্ভীর গলার শাসন সে খুবই বোঝে... এবারে তাকে যেতেই হবে, কেবল সে যে কথা বলতে এসেছিল সেটি বলে ফেলতে পারলেই সে চলে যাবে...

সেবক কথাটি বোঝে, বলে নরম গলায় কালকেও সব দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আজ ঠিক নিয়ে আসব...

রোজ রোজ মিথ্যে কথা বোল না বাবা...

মিথ্যে কথা! হেসে ফেলে সেবক...

হ্যাঁ...মিথ্যে কথা আসলে তুমি আমার বই আনতে ভুলে গেছ।

ভোলেনি সেবক...জোনাকীর জন্যে একটি রং-চংয়ে ভালো বই আনবে ভেবেছে ...তার সামান্য দামটুকু তার পকেটে থাকে না...আর জোনাকীর পড়ার খুব নেশা।

দয়া বা সেবক কারুরই অবসর নেই তাকে নিয়ে বসায়। কিন্তু মেয়েটা রোজ বুবুর শ্লেট পেনসিল নিয়ে টানাটানি করবে। বুবু ওকে নির্মমভাবে মারবে...তবু জোনাকী বুবুর পাশে এক দৃষ্টিতে চুপচাপ বসে রইবে, কখন দাদা তাকে একটিবারের জন্যেও শ্লেট পেন্সিলটা দেয়।

আজ ঠিক নিয়ে আসব। যাও...এখন যাও...সেবক আবার কাজে ডুবে গেল।

কখন জোনাকী চলে গেছে, জানে না সেবক।

দয়া রান্নাঘরে...দয়া সারাদিন ভূতের মত খাটে...ঠাকুর-চাকর-ধোপা ও ঝি চার-জনের কাজ করে দয়া...তার সময় বড় কম...যতটুকু সময় পায়, তাতে তার হাত-পায়ের খিল কাটে না, শরীরের ব্যথা মরে না। দয়ার কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ...

রান্নাঘর থেকে কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল...সেবকের কাজে ব্যাঘাত হওয়ায় সে ছুটে গেল...

এত চাঁচামেচি করলে আমাকে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে...সংসার চলবে না...সেবক নিচু স্বরে বলল ধীরে ধীরে... রাগটা স্পষ্টই বোঝা গেল।

তোমার মেয়েকে নিয়ে যাও...দয়া ঘর্মাক্ত দেহে জোনাকীকে দুহাতে ধরে তুলে রান্নাঘর থেকে বাইরের উঠোনে এনে নামিয়ে দিল...সময়ে খেতে না পেলে তো আমার মাথা কাটবে! হাঁপাতে হাঁপাতে দয়া বলল।

জোনাকীর হাতে এক দলা আটা. সে বাবার জন্যে রুটি বেলবে...অনেক বারণ করেছে দয়া, শোনেনি জোনাকী। একটা বাটিতে আটা নিয়ে জল ঢালতে গিয়ে রান্না-ঘরটা জলে ভাসিয়ে দিয়েছে জোনাকী. এখন দয়া কোথায় বসে রান্না করবে...দয়ার কান্না পাচ্ছে. এই সকাল থেকে তাকে জলে জলে কাজ করতে হলে, নিশ্চয় অসুখ করবে; তখন তো সংসার অচল! আর সেবক এমন অকর্মণ্য, একগ্লাস জল পর্যন্ত গড়িয়ে খেতে পারে না...

জোনাকীর পিঠে হাত বুলিয়ে রাগ সংযত করে সেবক বলল, তুমি উঠোনে খেল না মা...

আমার খেলনা কোথায়? সপ্রতিভ কণ্ঠে প্রশ্ন করল জোনাকী।

ওই যে অত দেশলাই, সিগারেটের বাক্স রয়েছে।

রোজ রোজ কি এগুলো নিয়ে খেলতে ভালো লাগে...বলতে বলতে জোনাকী ঢাকা বারান্দায় চলে গেল...ঘুঁটের ড্রামের পাশে বসে দেশলাই-সিগারেটের পরিত্যক্ত খোলা-গুলি মেলে দিল।

প্রশ্ন করতে পারে জোনাকী, কিন্তু সে বাপ-মার অবাধ্য হতে পারে না। কয়েক মিনিট বড় জোর আধঘন্টার মধ্যেই জোনাকীর তীব্র কান্নার শব্দ শুনেও সেবক তার কাজ করতে লাগল...

বারান্দায় কী হচ্ছে—রান্নাঘর থেকে দয়া ও শোবার ঘর থেকে সেবক দুজনেই বুঝতে পারছে...বুবু চেঁচাচ্ছিল...মা মা... জনু আমার খাতা—স্কুলের খাতা নষ্ট করে দিল...

দাদা কোথায় উঠে গিয়েছিল, এক মিনিটের জন্য...জোনাকীর পড়ার অদম্য স্পৃহাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তখন। সে খেলার জায়গা থেকে নিঃশব্দে উঠে গেছে বুবুর পড়ার সতরঞ্চির উপর। সদ্য শেখা অ জোনাকী লিখেছে বুবুর স্কুলের অঙ্ক খাতার তিনটি পৃষ্ঠায়। বুবু ফিরে এসে দেখেই জোনাকীর পিঠে উল্টো মুঠির কিল বসিয়েছে।

কাঁদতে কাঁদতে জোনাকী একবার মায়ের কাছে একবার বাবার কাছে কিছুক্ষণ করে দাঁড়িয়ে থেকে সরে এসেছে বাড়ির পিছন দিকে। ওখানে তিন হাত বাই সাত হাত কাঁকর মেশানো জমির ফালিতে বাড়ি-ওলার তরকারি চাষ এবং একটি গোলাপ ফুলের গাছ...বাগানের চারদিকে অক্ষম বেড়া দেওয়া...বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জোনাকী কাঁদল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে... পাশের বাড়ির বউটি জোনাকীকে ডেকে কান্নার কারণ শুধোল। জোনাকী সাড়া দিল না...বউটি জোনাকীকে ওদের বাড়ি যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাল...জোনাকী তথাপি নির্বাক! বউটি সরে গেল জানলা থেকে...

কিছুক্ষণ বাড়ি চুপচাপ...জোনাকী বারান্দা দিবখন্ডকারী টিনটা বাজাচ্ছে... ওদিকে বাড়িওয়ালা বুড়ো, ওকালতি করেন...সকালে তার মক্কেল আসে কচিৎ কিন্তু দলিল লেখার কাজ থাকে প্রত্যহ। জোনাকী ভাঙা কাঠের টুকরো দিয়ে টিন বাজাচ্ছিল...এপাশে বারান্দায় বুবু স্কুলের পড়া করছে...কে জানে হয়তো বুবুর পড়ায় বিরক্তি উৎপাদন করাই জোনাকীর উদ্দেশ্য, অথবা গত রাত্রিতে যে এ-পাড়ায় বিয়ে-বাড়ির বাজনা শুনেছে, সেটাই নকল করার শিশু-সুলভ চেষ্টা! উকিলবাবু হাঁক ছাড়লেন...কে-রে! কে টিন বাজায়!

ওই বুড়োকে বিশেষ ভয় করে না জোনাকী...কিন্তু বকুনিকে তার বড় ভয়। সে ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়িউলি বুড়ির রান্নাঘরে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দয়াকে বুড়ির খ্যানখেনে ভাষা শুনে উঠে আসতে হল বুড়ির কাছে...বুড়ি তখনো বলে চলেছে... এই জোনারে লইয়া পারুম না...অ জোনার মা, মাইয়ারে এটু ধরন লাগে...মাঝে মাঝে মাইয়ারে না ধইরলে কি চলে?

দয়া জোনাকীর কান ধরে টেনে নিয়ে এসে উঠোনে ছেড়ে দিয়েই নিজের কাজে চলে গেল...তার কি এখন এক মুহূর্ত নষ্ট করার উপায় আছে!

দেশলাইয়ের খোলগুলি জুড়ে জোনাকী একটি রেলগাড়ি বানাতে লাগল। উঠোনের এক প্রান্তে শাকসব্জির বাগানের পাশে। বেলা বাড়ছে, কখন তার গায়ে রোদ এসে পড়েছে জোনাকী জানে না, সে একমনে খেলে চলেছে। রোদে ঘেমে চলেছে। দয়া কুয়াতে জল আনতে বেরিয়ে দ্যাখে জোনাকীর মুখ লাল।

জল তুলতে তুলতে দয়া চেঁচাল, এ্যাই ছায়ায় যা, ছায়ায়, রোদ লাগছে দেখতে পাচ্ছিস না...?

জোনাকী হাসল ম্লান রক্তাভ মুখে।

দয়া চলে গেল রান্নাঘরে...আর সে জোনাকীকে দেখতে পাচ্ছে না...রান্নাঘর থেকেই শোবার ঘরে কথা ছুঁড়ল দয়া, মেয়েটাকে একটু কাছে ডাকতে পার না?

সেবক কথা ছুঁড়ল কাজের মধ্যে থেকে, আমার সময় নেই...তুমিও তো ওকে ডেকে কাছে বসাতে পার...

আমি পারব না, আমি দেখব না...এটা তোমার ডিউটি—ওকে দেখা।
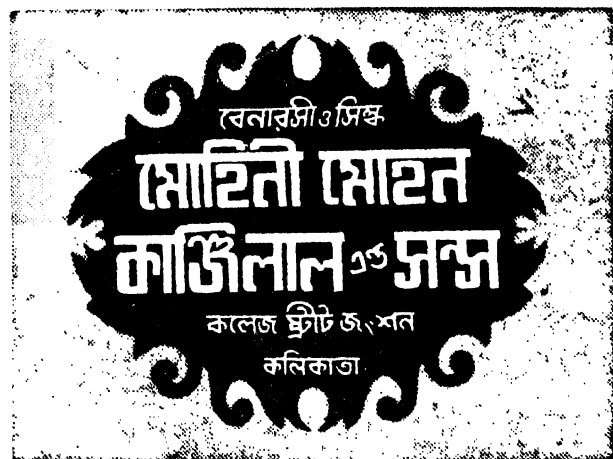
জোনাকীর জন্মের একমাত্র কারণ নাকি সেবক...দয়ার এটা দৃঢ়মূল ধারণা...জোনাকীর প্রতি সেজন্য দয়ার কোনো কর্তব্য নেই। যা কিছু কর্তব্য সবই সেবকের। এই নিয়ে তাদের দুজনের মধ্যে কুৎসিত কলহ হয়েছে অনেকবার। কোনো সমাধা হয়নি, কেবল একজন অপরকে দোষী সাব্যস্ত করতেই বদ্ধপরিকর।

উকিলবাবু আহারপর্ব শেষ করে মুখ ধুতে যান বাগানের দিকে...তখন একবার বাগানের তদারকিটাও হয়ে যায়...এক যাত্রায় দু-কাজ। মুখ ধুতে গিয়ে উকিলবাবু গোলাপ ফুলটি গাছে দেখতে না পেয়ে বজ্রনাদ করে ওঠেন...দয়া ও সেবককে হাতের কাজ ফেলে ছুটে আসতে হয়। সদ্য ফোটা গোলাপ ফুলটি উকিলবাবু সকালে দেখেছেন। সেটি গেল কোথায়! এ নিশ্চয় বুবু বা জোনাকীর কাজ। উকিলবাবুর একটি দুষ্টু নাতি এ বাড়িতেই বাস করে। তার সাতখুন মাপ। সে যদি নিয়ে থাকে তাহলেও বুড়োবুড়ি স্বীকার করবে না। ফুল নিয়ে বাড়িতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল...জোনাকী কোথায়? বুবু বাথরুমে স্নান করছে। সে নেয়নি, উকিলবাবুর নাতি বসুদেব কোথায়? দুজনকেই পাওয়া গেল উকিলবাবুর রান্নাঘরের পাশে টালির ছোট ঘরে। এবং অবশিষ্ট গোলাপ ফুলটিও। জোনাকী বলল, বাসু তাকে বলেছে সে তুলে এনেছে...বাসুদেব তার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। ফলে দয়া ও সেবক দুজনের মার সহ্য করতে না পেরে জোনাকী সভয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

এবার জোনাকীকে চার হাত বাই সাত হাত ঢাকা বারান্দায় এনে ফেলে দিয়ে চলে গেল দুজনে...সেবক এবং দয়া।

এক ফাঁকে দয়া শোবার ঘরে এসে অবিন্যস্ত চুলে বলল, আমিই তো আস্তে আস্তে মারছিলাম...আবার তুমি মারতে গেলে কেন।

অনুতপ্ত কণ্ঠে সেবক স্বীকার করল তার মারটা অচিন্তনীয় জোরে হয়ে গেছে।

রান্নাঘরে যাবার পথে জোনাকীকে বলল দয়া, যিশুদের বাড়ি গিয়ে খেল না...

পাশের বাড়ির যে বউটি সকালে জোনাকীকে ডাকছিল সেই যিশুর মা...যিশুর একটি বোন হয়েছে...এখন মাস তিনেকের...জোনাকী বোনটিকে খুবই ভালবাসে...বোনটির নাকের সর্দি পর্যন্ত নিজের হাতে মুছে দেয় জোনাকী। কিন্তু যিশুটা জোনাকীকে যখন তখন মার-ধোর করে, সেজন্য আজকাল ওদের বাড়িও যেতে চায় না...নইলে, জোনাকী সারাদিন বোনের কাছে চুপচাপ বসে থাকতে পারত। দয়া এ সমস্ত জানে তবু কী ভেবে বলল।

জোনাকী ফোঁপাচ্ছে তখনও, ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, না...ওদের বাড়ি আমি যাব না বাবা!

চলে গেল দয়া নিজের কাজে। বুবু স্কুল গেল খেয়ে-দেয়ে।

জোনাকী সদর দরজা খোলা পেয়ে রাস্তায় নামল...সে রাস্তা ধরে একা কখনো কোথাও যায় নি...তবে দৌড় বড় জোর যিশুদের বাড়ি এবং সেটাও একেবারে এ বাড়ির গায়ে। জোনাকী রাস্তা...মানে গলি ধরে হাঁটতে শুরু করল তখনো সে ফোঁপাচ্ছে ...এই রাস্তা ধরে সে মায়েদের সঙ্গে বাবার হাত ধরে বড়মাসির বাড়ি বেড়াতে গেছে...সে বড়মাসির বাড়ি যাবার উদ্দেশ্যেই হয়তো বেরিয়েছে...হয়তো উদ্দেশ্যটা তার মনেই খুব স্পষ্ট নয়। অফিসযাত্রীদের কিছু-কিছু বাকি ছুটছেন...ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজ যাচ্ছে...আকাশে হঠাৎ মেঘ করেছে...পুকুরটা ফাঁকা...পুকুরের পাশে রোজ সকালে সরু প্যান্টপরা যুবকেরা গজল্লা করে। আজকের তাদের একজনকেও দেখা যাচ্ছে না। গলিটা গিয়ে পড়েছে যে বড় রাস্তায় সে দিকে কোলাহল শুনতে পেল জোনাকী...হঠাৎ কিছু লোক বা ছেলেমেয়ে, যারা কাজে যাচ্ছিল, তাদের কেউ কেউ বিপরীত দিকে কেউ কেউ এলোমেলো ছুটে পালাচ্ছে। বোমা ফাটার মত শব্দ হচ্ছে...সোডার বোতল ফাটছে...ইঁট-পাটকেলও ছুটছে সাঁই-সাঁই শব্দ করে...জোনাকী বেড়াতে বেরিয়ে মজা পেয়ে গেল। সে ঝগড়া দেখতে এগিয়ে চলল।

যুদ্ধ হয়তো সর্বদাই সব সময় চলছে...কোথাও সশব্দে কোথাও নিঃশব্দে...কখনো প্রকাশ্যে কখনো গোপনে। জোনাকী সেই যুদ্ধের মধ্যে থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার কৌশল শেখে নি...শেখার বয়সও হয় নি...বয়স হলে হয়তো সহজাত বোধে শিখে ফেলবে।

ছাত থেকে লোকেরা মজা দেখছে...অলসেয় আলসেয় নরনারীদের কৌতূহল...

মোড়ের মাথায় এক যুবককে উন্মুক্ত ঝকঝকে ছোরা হাতে দাপাদাপি করতে দেখা গেল, সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করছে...শেষ পর্যন্ত সে যখন দেখল প্রতিদ্বন্দ্বীরা তার বা তাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না তখন তারা 'হুয়া হুয়া হুয়া' বলে একসঙ্গে চিৎকার করে তেড়ে ছুটে এল। এবং একজনকে ফেলে দিল ...তার শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে...আহত বা নিহত লোকের বাকি দল ছুটে পালাতে লাগল...জোনাকীর দিকে ছুটে আসছে...তখন বিজয়ী দল ইঁট-পাটকেল এবং সোডার বোতল চালাচ্ছে সমানে...

সেবক ও দয়ার কানে যুদ্ধের কোলাহল পৌঁছেছে প্রায় আধ ঘন্টা পরে...যখন বিধ্বস্ত পরাজিত দল ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে প্রাণ বাঁচাতে। সেবক ও দয়া জানলায় এসে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা জানার চেষ্টা করল... বুঝতে পারল না জোনাকী কোথায়...ও তো কখনো বাইরে বেরোয় না।

রাস্তায় বেরিয়ে স্বল্পপরিচিত অপরিচিত লোকেদের প্রশ্ন করে করে এগিয়ে গেল সেবক...কিছু দূর যাবার পরেই সবাই তাকে এগোতে বারণ করল...গলির বাঁকে মুখে বারণের প্রত্যক্ষ চেহারা দেখল। দুম-দাম সোডার বোতল ফাটছে...বলা যায় না হাতবোমাও ছুঁড়তে পারে। পরাজিতরা পালিয়েছে...কিন্তু দুপাশের বাড়ি থেকে চিৎকার...কে যে কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না...

সেবক বাঁকটা পেরিয়ে গিয়ে গলির প্রান্তে নজর দিল।

জোনাকী হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে উপুড় হয়ে, দুহাত মাথার উপর দিয়ে মেলে দিয়েছে...তার উপর দিয়ে শূন্যে ছুটে চলেছে ইঁট-পাটকেল এবং সোডার বোতল এবং এতক্ষণ চলছিল হয়তো।

ছুটে গিয়ে ওকে বুকে তুলে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে এল।

জোনাকীর বুক ছড়ে গেছে...কপাল কেটে গেছে...বেশ রক্ত ঝরছে। সে কার পায়ের ধাক্কায় পড়ে গিয়েছিল...তারপর ও যেভাবে পড়েছিল সেই একইভাবে থেকেছে... ভয়ে সে উঠতে পারে নি কত কেঁদেছে জোনাকী...

বাবা তাকে বুকে চেপে ধরেছে বলে জোনাকী তার শরীরের নিদারুণ যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে বারবার ফুঁপে উঠছে—। আর সজোরে সে তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরছে সেবক গালে রক্তের স্পর্শ টের পাচ্ছে...সে শাসিয়ে উঠছে, বাড়ি চল্...মজা দেখাচ্ছি, কী যে বিশ্রীভাবে কেটেছে এই গত আধ ঘন্টা!

কোলে চেপে জোনাকী বাড়ি এসে আর নামতে চায় না। সে কিছুতেই নামবে না। শেষে সেবক রেগে গিয়ে এক ঝাঁকুনি দিয়ে নামিয়ে দিল...দয়া শুশ্রূষার জন্য ছোটাছুটি করছে...সেবক চোখ পাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে জোনাকীকে মারতে গিয়ে ওর রক্ত ভেজা চোখমুখ দেখে থেমে গেল... শুধু বলল, আর কখনো বাইরে গেছ তো পা খোঁড়া করে দেব। বুঝলে?

দয়াও উৎকণ্ঠার চূড়ান্ত অবস্থায় ছিল যতক্ষণ সেবক জোনাকীকে খুঁজে আনতে গিয়ে দেরি করছিল।

দয়াও চোখ রাঙাল...দাঁত-মুখ খিঁচোল।

চোখের জল ও রক্ত মুছতে মুছতে একবার বাবা একবার মায়ের ক্রুদ্ধ চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে জোনাকী খুবই শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল, আমি কোথায় খেলব?

সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পটভূমিকার কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন।

১৮২৪-১৮৭৩ মাইকেল মধুসূদনের কাল। গ্রন্থারম্ভের প্রথম পরিচ্ছেদে মাইকেল প্রসঙ্গ বিধৃত হয়েছে। লেখক বলেছেন—মাইকেলের জীবনী আলোচনা না করে তাঁর কবি-প্রতিভা বিচার করা নিরর্থক। সুতরাং মাইকেলের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনের তিনি পরিচয় দিয়েছেন। ইংরাজী শিক্ষার তিনি প্রথম ফল—ডিরোজিয়োর বৈপ্লবিক প্রভাব তাঁকে স্পর্শ করেছিল। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের ছিলেন গুরু, সচিব, সখা। হিন্দু কলেজের ছাত্রাবস্থায় ইংরাজীতে কবিতা লিখে মাইকেল যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। সাহিত্যে তখন বায়রনের প্রভাব। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মাইকেল খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তার পর তিনি শিবপুরে বিশপ কলেজে যোগদান করেন। মাদ্রাজে ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে তাঁর 'ক্যাপটিভ লেডী' প্রকাশিত হয়।

এর পরবর্তীকাল মধুসূদনের জীবনের এক স্মরণীয় পর্ব। এইকালে তিনি যেসব বাংলা কবিতা রচনা করেন, তা উত্তরকালে তাঁকে সেই কালের শ্রেষ্ঠতম কবির প্রতিষ্ঠা দান করে। ১৮৫৬-তে তিনি কলকাতায় দোভাষীর কাজ নিয়ে এলেন। এর পর ১৮৫৮ থেকে ১৮৬২-র মধ্যে তিনি শর্মিষ্ঠা (১৮৫৮), পদ্মাবতী (১৮৫৯), তিলোত্তমা সম্ভব (১৮৬০), মেঘনাদ বধ (১৮৬১), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১), ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১), বীরাঙ্গনা (১৮৬২), প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থাবলী রচনা করেন। মাইকেলের কবি-জীবনে এই কালটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৬২-তে মধুসূদনের এই বিদেশ-গমনে তাঁর অনেকদিনের আশা পূর্ণ হয় বটে, তবে তাঁর জীবনের পরবর্তী শোচনীয় অধ্যায় এই বিলাতগমনের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ ফল। লেখক ভারতচন্দ্রের কালকে বলেছেন বাংলা সাহিত্যের শীত ঋতু, এবং বাংলা-সাহিত্যের বসন্তের আগমন ঘটেছে মাইকেলের আবির্ভাবে। মধ্যবর্তী কালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এসেছেন। লেখক বলেছেন, মাইকেল মাটির কুটির থেকে বঙ্গ-কাব্য-সাহিত্যকে প্রাসাদে স্থাপিত করেছেন এবং রঙ্গলাল যে নব-যুগের উদ্‌গাতা, মধুসূদনে সেই যুগের পরিপূর্তি।

মধুসূদনের কাব্য-ভাবনায় পাশ্চাত্ত্য-প্রভাব নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে পাওয়া গেছে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস।

মধুসূদনের পর এসেছেন হেমচন্দ্র (১৮৩৮-১৯০৪), হেমচন্দ্রের জীবনে দারিদ্র্যের প্রচণ্ড কষাঘাত। মিলিটারি হিসাব অফিসের এক এ পাশ করা কেরানী হেমচন্দ্র পরে (১৮৫৯) আইন পাশ করেন। দিন-কতক জুনিয়র মুন্সেফও ছিলেন। কিন্তু আরো দূরে বদলী হওয়ার নির্দেশে তিনি চাকরী ছেড়ে দেন। উকীলের স্বাধীন ব্যবসায় ব্রতী হয়ে হেমচন্দ্র কাব্য-সাধনায় মন ঢেলে দিলেন। যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র তখন হেমচন্দ্র লিখেছিলেন 'চিন্তা-তরঙ্গিনী'—১৮৬০ থেকে ১৮৮২ খৃস্টাব্দে মধ্যে তাঁর চিন্তাতরঙ্গিনী, বীরবাহু কাব্য, ভারত-বিষয়ক কবিতা, বৃত্রসংহার, আশা-কানন ও দশমহাবিদ্যা প্রকাশিত হয়।

জীবনসায়াহ্নে কবি প্রবল দারিদ্র্যে জর্জরিত হয়ে পড়েন, চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়। হেমচন্দ্রের কবিতায় বায়রনের প্রভাব ছিল। চিন্তা-তরঙ্গিনীর কবিতায় বায়রণের ম্যানফ্রেডের ছাপ আছে। এই বিষয়ে লেখক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। লেখকের মতে 'বৃত্রসংহার' ছায়াময়ীর চেয়ে অধিকতর শিল্পসঙ্গত। হেমচন্দ্র মিলটন, কীটস প্রভৃতি কবিবৃন্দের দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে লেখক তার সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে নবীনচন্দ্রের কাব্য-ভাবনা আলোচিত হয়েছে। এছাড়া পরিশিষ্টাংশে 'নবীনচন্দ্রের কাব্যজগৎ' নামে লেখকের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি সংযোজিত করা হয়েছে। নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধে' বাইরনের 'চাইলড্‌ হেরলডে'র প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। পলাশীর যুদ্ধ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর পর রঙ্গমতী, রৈবতক (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩), অমিতাভ (১৮৯৫), প্রভাস (১৮৯৩), ভানুমতী (১৯০০)।

বাংলা কাব্য-সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র অনেকটা অবহেলিত। লেখক নবীনচন্দ্র সম্পর্কে যে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন, তা নিঃসন্দেহে উত্তরসূরীদের কাছে মূল্যবান বিবেচিত হবে।

এই গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিচ্ছেদ বিহারীলাল প্রসঙ্গে। বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পর্কে আলোচনা যথোপযুক্ত নয়, তাই এই গ্রন্থের লেখক যেভাবে তাঁর কাব্য-ভাবনার বিশ্লেষণ করেছেন তা মূল্যবান। বিহারীলাল ঊনবিংশ শতকের বাংলা কাব্য-ভাবনায় যে এক বিশিষ্ট পথচিহ্ন, সেকথা অনস্বীকার্য। লেখক বলেছেন বিহারীলাল যথেষ্ট পড়াশোনা করেছেন। বসুমতী সংস্করণ বিহারীলাল গ্রন্থাবলীতে রসময় লাহা কবির যে জীবনকথা লিখেছেন এই গ্রন্থের লেখক সেই নিবন্ধ থেকে অনেক সাহায্য গ্রহণ করেছেন। বিহারীলালের কবিতায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাব কিভাবে এসেছে লেখক তার সুন্দর যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ করেছেন। এই গ্রন্থটির নূতন সংস্করণ সম্পাদনা করেছেন ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত।

বলা বাহুল্য—এই গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের ফলে দীর্ঘদিনের একটি অভাব পূরণ হল।

—অভয়ঙ্কর

STUDIES IN WESTERN INFLUENCE ON NINETEENTH CENTURY — BENGALI POETRY (1857-1887) By Harendramohan Das Gupta Published by SEMUSHI — 42-/A, SARAT BOSE ROAD, CALCUTTA-20. Price — Rupees Fifteen only.

সাহিত্যের খবর

সারা বাংলা সাহিত্যমেলার ষষ্ঠ অধিবেশন এবার বসেছিল নবদ্বীপে গত ৯ নভেম্বর সকাল ৮টায়। এবারের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কথা-সাহিত্যিক শ্রীবিমল কর। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন কবি ও সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। তিনি বলেন, 'মেলা বলতে আমরা বুঝি মিলন ক্ষেত্রকে।' তিনি প্রসঙ্গত উল্লেখ করেন যে, সাহিত্য হচ্ছে সমাজের প্রতিচ্ছবি। অন্ধকার থেকে উত্তরণের নির্দেশ দান তাই সাহিত্যিকদের কাজ। শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য কার্যবিবরণী পাঠ করেন। আগামী বছরের জন্য শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুকে সভাপতি; শ্রীবিমল কর ও শ্রীঅজয় হোমকে সহ-সভাপতি; শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে সম্পাদক নির্বাচিত করে একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। সভাপতির ভাষণে শ্রীবিমল কর বলেন,—'প্রত্যেক মানুষের একটা আদর্শ থাকা ভাল। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাই মানুষকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়।' বেলা দুটায় বঙ্গবাণী শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। তিনি সাহিত্য দীপাবলীর অনুষ্ঠানেও পৌরোহিত্য করেন। এই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেন সর্বশ্রী মাধুরী বসু, চিত্রা দেবী ও সাধনা দেবী। প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেন সর্বশ্রী মুকুন্দলাল গোস্বামী, কাজী শামসুজ্জোহা, নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, পূর্ণেন্দু সেন, পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও আরো অনেকে।

গত ৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় ভবানীকাল সাহিত্য বাসরের বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আলোচনায় যোগদান করেন শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ গ্রহণ করেন বনফুল, শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ প্রমুখ।

গ্রীসের প্রখ্যাত কবি ও ঔপন্যাসিক নিকোস কাজানৎজাকিস মারা গিয়েছেন বেশ কিছুদিন আগে। সম্প্রতি তাঁর বিধবা পত্নী হেলেন কাজানৎজাকিস লেখকের অপ্রকাশিত রচনা এবং চিঠিপত্রের একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন। বইটি নিয়ে ইউরোপে এত হৈ-চৈ শুরু হয়েছে যে এর মধ্যেই কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় এর অনুবাদ হয়ে গেছে। বইটির নাম 'দি ডিসিডেন্ট'। এই সব চিঠিপত্রে লেখক এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে যখন পরিভ্রমণ করছিলেন, তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংবাদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তিনি রুশ বিপ্লবের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই চিঠিগুলিতে রয়েছে সেই সময়ের বাস্তব বর্ণনা।

নেহরু পুরস্কার

কবি শ্রীবিষ্ণু দে

বাংলা দেশের প্রথম সারির কবি বিষ্ণু দে এবার সোভিয়েত দেশের নেহরু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তাঁর এই সম্মানে আমরা আনন্দিত। অনাগত ভবিষ্যতে তিনি নব নব সৃষ্টির ঐশ্বর্যে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করুন এই আশার সংগে আমরা তাঁর নীরোগ দীর্ঘজীবন কামনা করি।

তাছাড়া স্পেনের গৃহযুদ্ধ এবং দুই বিশ্বযুদ্ধকেও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এইসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তাঁর চিঠিগুলি এক অপরিসীম মর্যাদা লাভ করেছে। তিনি শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছিলেন পুরোমাত্রায় নাস্তিক। এই কারণে ১৯৫৭ সালে যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখন গ্রীসের চার্চ কোন আনুষ্ঠানিক শেষকৃত্য সম্পাদনে অস্বীকার করেন। তখন তাঁর অনুগতরা এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু এখন সেই সমাধিক্ষেত্রটিই হয়ে উঠেছে গ্রীসের অন্যতম দর্শনীয় তীর্থস্থান। সম্প্রতি এক জার্মান পত্রিকায় এই সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যায়, প্রায় প্রতিদিনই শতাধিক পর্যটক এই সমাধিক্ষেত্রে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে। লেখকের প্রতি, এই সম্মান প্রদর্শনের ইতিহাস সত্যই বিরল।

লেখক কিভাবে লেখেন—এ প্রশ্ন বরাবরই পাঠকের মনে হয়। কত প্রশ্নই না মনকে দ্বিধাজড়িত করে। সম্প্রতি ইংরেজিতে 'আফটারওয়ার্ডস' নামে এরকম একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৪ জন সমকালীন ঔপন্যাসিকের নিজের কোন একটি উপন্যাসের উপর কেমন করে লিখলাম—এ পর্যায়ে ১৪টি রচনা সংকলিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক হলেন—এন্টনী বার্জেস, রবার্ট কিসন, মার্ক হ্যারিস, ম্যারী রিনাল্ট, উইলিয়ম গাস্‌স, রেনোল্ড প্রাইস, জর্জ পি এলিয়ট, ট্রুম্যান ক্যাপোটে, রস ম্যাকডোনাল্ড, জন ফাউলস, ভনস কেউরজেলি এবং নর্মান মেইলার। এঁদের প্রত্যেকের জবানবন্দী বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। যেমন ধরুন, বার্জেস বলছেন,—'কোন একটা বিষয় নিয়ে লিখতে বসে যখন ভাবছি, তখন সবটাই কেমন যেন রহস্যময় হয়ে ওঠে।' মার্ক হ্যারিসের মতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেষ পর্যন্ত উপন্যাসকে আক্রমণ করে। ১৯৪৪ সালে তিনি ছিলেন সৈন্যবাহিনীতে। সেই সময়ে তাঁর মনের যে প্রতিক্রিয়া তারই পরিণাম হল, 'ট্রামপেট টু দি ওয়ার্ল্ড' উপন্যাসটি। অথচ উপন্যাসটির কাহিনী রচিত হয়েছে একটি নিগ্রো পরিবারকে নিয়ে। ট্রুম্যান ক্যাপোটে তাঁর উপন্যাস 'আদার ভয়েসেস, আদার রুমস' সম্বন্ধে বেশ মজার কথা বলেছেন। তখন তিনি আলবামার এক ফার্মে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি ছিলেন। সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরিয়ে একটা নির্জন বনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এই সময়েই উপন্যাসটির খসড়া তাঁর মনে আসে, লাইক এ লড্, সানটেইণ্ড স্ট্রেক অব লাইটনিং' দাপাদাপি করতে শুরু করে দেয়। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসেন এবং উপন্যাসটি লিখতে আরম্ভ করে দেন। গ্রন্থে এরকম সকলেরই জবানবন্দী রয়েছে। বইটি সম্পাদনা করেছেন টমাস ম্যাককরম্যাক।

আগামী ২২শে নভেম্বর হতে ১২ দিনের জন্য পত্র-পত্রিকা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি। উত্তরবাংলা তথা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এই প্রদর্শনীর অন্তর্ভূত। কুচবিহার মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক আয়োজিত রাসমেলার মাঠে উক্ত পত্রিকা প্রদর্শনী জনসাধারণের পাঠের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রকাশিত পত্রিকার দু' কপি যথাসম্ভব শীঘ্র সম্পাদক, 'ত্রিবৃত্ত প্রদর্শনী সংস্থা' দেবকুটির, ১, ত্রিবৃত্ত সরণি কুচবিহার—এই ঠিকানায় পাঠাতে পারেন।

দেশদেশের জলখাবার —পারুল সেনগুপ্ত। প্রকাশক : সৌরীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৮৪, এন বি ব্লক-ই। নিউ আলিপুর। কলকাতা-৫৩। দাম ছয় টাকা।

বাঙালী ভোজনবিলাসী নামে পরিচিত ছিল এক সময়। আজ যদিও বাঙালীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, আর্থিক দৈন্য এবং দেশ-বিভাগ জাতির জীবনকে করেছে নানাদিক থেকে বিভ্রান্ত। তবুও বাংলাদেশের মুখরোচক খাবার বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। শ্রীমতী পারুল সেনগুপ্তর 'দেশদেশের জলখাবার' বাঙালীর রসনা-প্রবৃত্তিকে আরও বাড়িয়ে দেবে। এর আগে এই ধরনের বই চোখে পড়েছে। কিন্তু বর্তমান বইখানিতে অনেক অভিনবত্ব চোখে পড়বে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বহু বিচিত্র জলখাবার তৈরির পদ্ধতি বইটিতে সংকলিত হয়েছে। কেবলমাত্র জলখাবার বা হালকা জলযোগের ওপরে এই ধরনের বই বিশেষ চোখে পড়েনি। এই উদ্যমের পেছনে লেখিকার যে নিষ্ঠা, সাধনা ও ধৈর্যের স্বাক্ষর পাওয়া যায় তা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য।

শ্রীমতী সেনগুপ্ত গতানুগতিকভাবে বইটি লেখেননি। বাস্তবোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রান্নার প্রণালীগুলি তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে তাঁর মৌলিকত্বের পরিচয় স্পষ্ট। এই ধরনের বই-এ সাধারণত রান্নার উপকরণ ও প্রকরণ বর্ণনার যথেষ্ট অস্পষ্টতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। ফলে নতুন ও অনভিজ্ঞ গৃহিণীরা প্রণালীগুলি ঠিকভাবে অনুকরণ করতে পারেন না। শ্রীমতী সেনগুপ্ত কেবলমাত্র চামচ ও পেয়ালার সাহায্যে মাপ-নির্দেশককে এবং ছবির সাহায্যে মাপের সংকেত দিয়ে গৃহিণীর রান্নার কাজ সহজ করে দিয়েছেন। শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবী যথার্থই বলেছেন, "ভাষার স্বচ্ছতায় ও পরিমাপলিপির স্বচ্ছন্দতায় শিখে নিতে আদৌ অসুবিধা হয় না।" বাস্তবের দিকে তাকিয়ে লেখিকা খাবারের নির্বাচন করেছেন। খাবারগুলি প্রত্যেকটি সস্তা, পুষ্টিকর। নোনতা ও মিষ্টি নানাধরনের দেড়শ' জলখাবারের বিচিত্র সংগ্রহ সহজবোধ্য ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বইখানি ভাল কাগজে ছাপা। বাঁধাই সুন্দর। প্রচ্ছদ মনোরম। ভেতরের ছবিগুলি সুঅলংকৃত। সব মিলিয়ে লেখিকার সুরুচির পরিচয়

স্পষ্ট। চিত্তাকর্ষক বিষয় এবং মনোরম প্রচ্ছদের জন্য বইখানি বিবাহ, জন্মদিন এবং বিশেষ অনুষ্ঠানে উপহার হিসাবে বিবেচিত হবে। তাছাড়া আধুনিক গৃহিণীর ব্যস্ততাময় জীবনে এই ধরনের বিজ্ঞানসম্মত ও ব্যবহারিক ভিত্তিতে লেখা রান্নার বই-এর প্রয়োজন ছিল। বইখানি তার যোগ্য মর্যাদা লাভ করে লেখিকার প্রচেষ্টাকে সার্থক করবে বলেই বিশ্বাস। আশা করি লেখিকা ভবিষ্যতেও বাঙালী গৃহিণীদের জন্য আরও নতুন নতুন উপহার নিয়ে উপস্থিত হবেন।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা **হরিপদ চক্রবর্তী। চিন্ময়ী স্মৃতি, এম আই জি হাউসিং এস্টেট, হাউস ২২, সোদপুর, ২৪ পরগণা (নর্থ)। দাম : দু' টাকা।**

পুজারী সংস্কৃতে মন্ত্রোচ্চারণ করেন আর পুণ্যার্থী তোতাপাখির মতো তা পুনরাবৃত্তি করেন। মন্ত্রের অর্থ সব সময়ে হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণ মানুষজনের পক্ষে সম্ভব হয় না। সাধারণের এই অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী দনুজদলনী মহামায়ার পুজো-আরাধনা সম্পর্কে এই বইটি সহজ ভাষায় লিখেছেন একাদশটি অধ্যায়ে ভাগ করে—বোধন থেকে শুরু করে বিজয়া উৎসব পর্যন্ত। পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র, দেবী বিষ্ণুমায়ার স্তব এবং নারায়ণী স্তোত্র বাংলা অক্ষরে লিপিবদ্ধ হওয়ায় এবং তার সঙ্গে সরল বাংলায় সঠিক অর্থ থাকায় বইখানি সাধারণ মানুষের ও ধর্মার্থী নরনারীর কাছে বিশেষভাবে আদৃত হবে। তবে একটা কথা—মুদ্রণপ্রমাদে ভরা বাষট্টি পৃষ্ঠার এই ছোট্ট বইটার দাম দু' টাকা—বড় বেশি নয় কি?

গণেশ সেনের কবিতা **(কাব্য-সংকলন)—গণেশ সেন। বিশ্বমন্দির প্রকাশনী, ৪৪এ, ক্লাইভ কলোনী, দমদম, কলকাতা—২৮। তিন টাকা।**

কোনো তরুণ কবির কবিতা-সংকলনের এমন ফ্ল্যাট নামকরণ ইদানীংকালে আর হয়েছে কিনা সন্দেহ। সংকলিত কবিতাগুলির দুটো ভাগ—'মেঘ বৃষ্টি কেতকী' ও 'দারুলিপি-মৃত-যাদুঘর'। কবি লিখেছেন : 'কবিতা লেখা আমার কাছে আকস্মিক দুর্ঘটনার মত। আত্মহত্যার নামান্তর। কবিতা বলতে আমি বুঝি আকণ্ঠ দুঃখের সঙ্গে ব্যক্তিগত কথোপকথন।' কবিতায় কবির আধুনিক মেজাজ হৃদয়কে স্পর্শ করে। প্রচ্ছদ মন্দ নয়, অঙ্গসজ্জা দৃষ্টিকটু। উৎসর্গপত্র এমনভাবে না ছাপলে ভালো হতো। আমাদের বিশ্বাস, ভবিষ্যতে গণেশ সেন ভালো কবিতা লিখবেন।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

অন্যমনে (শরৎ সংখ্যা, ১৩৭৬)—সম্পাদক : সুজন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশিসকুমার সান্যাল। ১৭এম, ইস্ট রোড, কলকাতা-৩২। মূল্য : দু টাকা।

নতুন পত্রিকা। কিন্তু সম্পাদকীয় প্রয়াসে আন্তরিকতা ও আভিজাত্য আছে। পাশ্চিমশেলী কাগজ না করে কবিতা ও কবিতা-বিষয়ক রচনায় সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন সম্পাদকদ্বয়। বাংলাদেশের নবীন-প্রবীণ কবিদের কাছে ওঁরা কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। কবিমানস ও কাব্যচিন্তা প্রসঙ্গে। নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দিয়েছেন বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশংকর রায়, বুদ্ধদেব বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ অনেকেই। কবিতা লিখেছেন অরুণ মিত্র, মণীশ ঘটক, মণীন্দ্র রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, গণেশ বসু, তুলসী মুখোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, লোকনাথ ভট্টাচার্য, কবিতা সিংহ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। পত্রিকাটির প্রচ্ছদ, ছাপা রুচিসম্মত।

রেখালেখা (পঞ্চদশ বর্ষ, ১৯৬৯) : সোদপুর উচ্চতর মাধ্যমিক **বহুমুখী বিদ্যালয়** মুখপত্র। **সম্পাদক : চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়** ও অন্যান্য।

কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় চল্লিশটি নামী স্কুলের ম্যাগাজিন দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। রেখা ও লেখা সবদিক থেকেই অতুলনীয় মনে হয়েছে। সোদপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ের মুখপত্র 'রেখালেখা'। সম্পাদনার মুন্সিয়ানা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সব লেখার মধ্যে বিশেষ করে ক্লাস এইট-বি সেকশনের বিমলেন্দু নাথ-এর 'একটি দৃশ্য' কবিতাটি উল্লেখের দাবী রাখে। বিমলেন্দু অকবি নন।

পরলোকে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

সুরসিক ও লেখক, রবীন্দ্রনাথের একান্ত-সচিব শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী পঁচাত্তর বছর বয়সে ১২ নভেম্বর শান্তিনিকেতনে পরলোকগমন করেছেন। বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর। দীনবন্ধু এনড্রুজের বন্ধু সুধাকান্তের বহু রচনা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। তাঁর একখানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।

বই পাড়ায়

অন্যান্য বারের মত এবারও পুজোর আগে কলেজ স্ট্রীটে নানা ধরনের পুজো-সংখ্যার ভিড় শব্দহীন বইয়ের বাজারে কিছুটা সাড়া জাগিয়েছিল। এ-বছর কম করে শ'-খানেক নতুন পত্রিকার মুখ দেখা গেল। এদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি বেশ উচ্চাঙ্গের। আর বাদবাকি যারা সংখ্যাগুরু, তাদের লক্ষ্য ছিল যৌন সুড়সুড়ির বদলে টু-পাইস ঘরে তোলা। তবে সুখের বিষয় এদের এ-কুপ্রচেষ্টায় বাংলাদেশের পাঠকরা তেমন সাড়া দেননি। পুজোর পর এখন ওই পত্রিকাগুলো ফুটপাতে সের দরে বিকোচ্ছে!

কল্লোল যুগ এবং তার কাছাকাছি সমসাময়িক কালের লেখকরা বিগত কয়েক দশক জুড়ে নির্বিবাদে রাজত্ব চালিয়ে আসছিলেন। তাঁদের এই নিরঙ্কুশ আধিপত্যের যুগে নতুন কেউই যেন দাঁড়াতে পারছিলেন না। সাহিত্যাকাশে নতুন তারকার অভাবে সমালোচকরা গেল গেল রব তুললেন। কিন্তু ওই পর্যন্ত। রব তোলা অবধিই ছিল তাঁদের কর্তব্যের সীমা। নতুন মুখ আনার চেষ্টা কোনোদিকেই খুব একটা সুযোগ পায়নি। কিন্তু সম্প্রতি অন্য হাওয়া বইছে। বাংলা সাহিত্যের ধমনীতে কিছুটা তাজা রক্তের সঞ্চালন করলেন দু-একটি প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক। তাই আজকের সাহিত্যজগতে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, নিমাই ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব গুহ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ নবীন লেখক বিশেষ পরিচিত।

বইপাড়ার খবর, অনেক তরুণ লেখকের লেখাই কিছুকাল পর বই আকারে প্রকাশ পাবে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'জোয়ার' 'হাসনুহানা' 'তৃণভূমি', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদেশিনী', বুদ্ধদেব গুহর 'কোয়েলের কাছে', নিমাই ভট্টাচার্যের 'ডিপ্লোম্যাট', দেবল দেববর্মার 'অন্ধকারের মুখ', মতি নন্দীর "দ্বাদশ ব্যক্তি' প্রভৃতি।

বই প্রকাশের অন্তরালে (২)

পুরনো একটা উপমা দিয়ে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, শ্রীঅজিত রায়। ছোটখাটো একটা দপ্তরীখানার মালিক। জন দশেক লোক কাজ করে তাঁর দপ্তরীখানায়। বললেন : প্রদীপের নিচে যেমন অন্ধকার, তেমনি এক অন্ধকারের মধ্যে বসবাস করি। কলেজ স্ট্রীটের সুদৃশ্য বই, আর শো-কেসের প্রচ্ছদসৌন্দর্য দেখে আমাদের কথা অনুমান করতে পারবেন না। চিরটা কালই আমরা উপেক্ষিত রয়ে গেলাম।

বললাম : এ আক্ষেপ কেন? দপ্তরী-খানার ব্যবসা করে অনেকেই তো বিস্তর টাকা-পয়সা কামিয়েছেন বলে শুনেছি। তাই কি সত্যি নয়?

—প্রশ্নটা লাভ-লোকসানের নয়, মর্যাদার। ছোটবেলায় লেখাপড়া শিখেছিলাম। স্কুল-কলেজে গিয়েছি। কিন্তু কাউকেই বোঝাতে পারি না ব্যবসা করে মানুষ জীবনধারণের জন্য। রাইটার্স বিল্ডিংসের একজন কনিষ্ঠ কেরানী পর্যন্ত মুচকি হাসেন, আপনি বুঝি বাইন্ডার? কি ধরনের বই বাঁধাই করেন?

দুঃখ প্রকাশ করে বললেন : শুনলেই গা জ্বলে যায়। অপমান বোধ করি। আমাদের কোনো সামাজিক মর্যাদা নেই। না শ্রমিকের, না মালিকের। আসলে আমরা তো কুলির সর্দারের মতো। লোক খাটাই। ছাপানো কাগজ মলাটের খাপে পুরি মাত্র। যাদের খাটাই, তারাও প্রাণপাত করে খাটে। যতক্ষণ গা-গতর আছে, ততক্ষণ পয়সা পায়। তাও সামান্য। আমরা বেশী দিতে পারি কই?

প্রায় অনুরূপ কথাই শুনেছিলাম, ইস্ট এন্ড ট্রেডার্স-এর মালিক শ্রীশচীন্দ্রনাথ সাহার মুখে। বই ও দপ্তরীপাড়া ছাড়িয়ে কেশব সেন স্ট্রীটের একটা পুরনো তিনতলা বাড়িতে তাঁর কারখানা। মাঝারি ধরনের কারবার। লোক খাটে পঁয়তিরিশ থেকে চল্লিশ জন। লেখাপড়া-জানা শিক্ষিত ভদ্রলোক। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি।

বললেন : বাঙালি বাইন্ডারদের কোনো অ্যারিস্টোক্র্যাসি নেই। কেউ পোঁছে না। কেউ ভাবে না। আমরা অপাংক্তেয়। 'দপ্তরী' কথাটাই কেমন যেন। আমরা হীনমন্যতায় ভুগি। এককালে খুব শিক্ষিত লোক এ ব্যবসায়ে এগিয়ে আসতেন না। এমন দিনও গেছে প্রকাশকের দোকানে বই ডেলিভারি দিতে গিয়ে দপ্তরীকে হয়তো অন্য ফরমাস খাটতে হয়েছে। আজকাল আর কেউ তেমন ব্যবহার করেন না। কিন্তু মানমর্যাদা কতোটুকু বেড়েছে বলা শক্ত।

আপনাদের কি কোনো অ্যাসোসিয়েশন নেই? সঙ্ঘবদ্ধ হবারও তো একটা মূল্য আছে?

—আমরা একটা সমিতি করেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম : 'বঙ্গীয় পুস্তক গ্রন্থন ব্যবসায়ী সমিতি'। অফিস ছিল ৬৪নং বৈঠকখানা রোডে। তার প্রথম সম্মেলন হয় ১৩৬২ সালে। অর্থাৎ আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে। স্থাপিত হয়েছিল তারও দু বছর আগে—১৩৬০ সালে। এখনো সেই সমিতি আছে। কিন্তু সে কাগজে কলমে। ১০১ নং বৈঠকখানা রোডে গেলেই দেখতে পাবেন একটা আলমারি ভর্তি কাগজপত্র। কার্যত আমরা নিঃসঙ্গ এবং সঙ্ঘহীন।

কেন আপনাদের সমিতি জোরদার হতে পারছে না, বলুন তো?

—প্রথম কারণ, পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব। দ্বিতীয়ত, সমিতি করে আমরা অনেক প্রস্তাব নিয়েছি, কাজে পরিণত করতে পারিনি। কয়েকটা সম্মেলন আর সিদ্ধান্ত নেবার বাইরে কিছুই এগোয়নি। ফলে, যা হবার তাই হয়েছে। সমিতি করেও কোনো উপকার হলো না আমাদের।

প্রতিযোগিতার ভাবটা কি কমানো যায় না?

—যায় হয়তো। কিন্তু কে এগিয়ে আসে? কেউ সমিতির নির্দেশ অমান্য করলে, তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হয়। সেই সময়ে কেউ অপ্রিয় হতে চাননি। তার ওপরে আমাদের ব্যবসাটা হলো কটেজ ইন্ডাস্ট্রির মতো। সিজনাল কাজকারবার। স্কুল-কলেজের মরশুমে মোটামুটি চলে যায়। বাকি সারাবছর ঢিমে তেতালা। ঠুকঠাক কাজ হয়। টাকার আমদানি হয় না। মাইনে করে সারা বছর দপ্তরী রাখবে কে?

কদ্দিন আগে এই কারখানা খুলেছেন?

—১৯৩৮ সালে। প্রায় একত্রিশ বছর আগের কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়টা দেখেছি। তখন বইপাড়ার এত জৌলুস ছিল না। বিশেষ করে, যুদ্ধের সময় তো দারুণ মন্দা ছিল। পরে, কিছুটা ভালো হয়েছে। এ লাইনে তখন হিন্দু দপ্তরী কমই ছিলেন। আমি ঠিক দপ্তরীপাড়ার কারবারী নই! মির্জাপুর স্ট্রীট, বৈঠকখানা, পাটোয়ার বাগান হলো আদি দপ্তরীখানার এলাকা। এখন অবশ্য, তার সীমানা বেড়েছে। কলেজ স্ট্রীটের আশেপাশে, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের কাছাকাছি প্রায় সব জায়গাতেই কমবেশী দপ্তরীখানা আছে।

কোন্ শ্রেণীর লোক সাধারণত দপ্তরীর কাজ করেন? তাঁদের সামাজিক ও আর্থিক মান কোন স্তরের?

—যাঁরা অন্য আর কোনো কাজ পান না, তাঁরাই দপ্তরীখানায় কাজ করতে আসেন। আর্থিক দিক থেকে তাঁরা সকলেই অসহায়। কোনো সরকারী বেসরকারী অফিসে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী কিংবা পিয়নের কাজ পেলেও কেউ দপ্তরীখানায় কাজ করতে আসেন না। দাঙ্গাহাঙ্গামা ও দেশভাগের পর মুসলমান দপ্তরীদের প্রায় অনেকেই পাকিস্তানে চলে গেছেন। এখন তাঁদের জায়গা নিয়েছে রিফিউজি ছেলে-মেয়েরা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, হুগলী, মেদিনীপুরের কিছু কিছু লোক এখনো দপ্তরীর কাজ করতে আসেন। তাঁদের কোনো শ্রেণীভাগ করা যায় না। সকলেই খুব গরীব।

মেয়েরা এ কাজের সঙ্গে কিভাবে যুক্ত হন বুঝলাম না। খুলে বলুন। ওঁরা কি ছেলেদের মতো ম্যানুয়েল লেবার করতে পারেন?

—আগে মেয়েরা এ ব্যবসায়ে বিশেষ আসতে চাইতেন না। এখন কাজ করেন। কেউ ফর্মা ভাঁজেন, কেউ মেলাই করেন। অনেকে বাড়ীতে ফর্মা নিয়ে যান। সাংসারিক কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে ফুরণে কাজ করেন। আজকাল অবশ্য দু-চারজন মেয়ে এসেছেন এ লাইনে। তাঁরা বেশ হার্ড ওয়ার্ক করেন। কাটিং, স্টিচিং-এ পর্যন্ত পিছপা হন না। সোশ্যাল স্ট্যাটাস-এর দিক থেকে তাঁরা প্রায় সকলেই বস্তির বাসিন্দা।

এই সমিতি হবার আগে-পরে কি আপনারা কখনো সংঘবদ্ধ হবার প্রেরণা বোধ করেননি?

—করেছিলাম। এ সমিতি হবার প্রায় বছর দশেক আগে একটা চেষ্টা চালিয়েছিলেন কয়েকজন। কিন্তু দু' একটা অধিবেশন হবার পর আর সে সমিতি টিকে থাকতে পারেনি। ১৯৫০ সালে দাঙ্গার পর আমরা একটা সমিতি করেছিলাম। তাও বছর খানেকের বেশী টেকেনি। ১৯৫৪ সালে একটা 'অ্যাড-হক কমিটি' করে আমরা মহল্লায় মহল্লায় প্রচার শুরু করলাম। একটা প্রচারপত্রও বিলি করা হলো। তাতে আবেদন করা হয় : 'সমস্ত ব্যবসায়ীদেরই একটা নিজস্ব সমস্যা আছে। আমরাও প্রতিনিয়ত বাড়ীভাড়া, দ্রব্যমূল্য, অনাদায়, শ্রমিক-সমস্যা, প্রতিযোগিতা, জীবনযাত্রার মান, প্রভৃতি বহুবিধ সমস্যা দ্বারা নির্যাতিত হইতেছি। এইরূপে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিচিতির মধ্য দিয়া এই সমস্যাসমূহ আলোচিত হইতে পারে। আলোচনার সফলে সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধানও পাওয়া যাইতে পারে। সর্বোপরি, পরস্পরের সৌহার্দ্য স্থাপন করিয়া সমস্যাসমূহ সম্মুখে রাখিয়া একত্রে পরস্পরের সাহায্যে দাঁড়াইতে পারি।'

শচীনবাবু বললেন : এত হাঁকডাক সত্ত্বেও সেই সমিতি দীর্ঘকাল তার উৎসাহ ও উদ্দীপনা বজায় রাখতে পারল না। এখনকার অবস্থাটা তো বললাম, কোনো-রকমে নাম বাঁচিয়ে টিকে আছে। আশা করা যায়, নতুন করে আবার সকলেই মাথা-চাড়া দিয়ে উঠবে। অন্তত গত কয়েক মাসের কার্যকলাপে তার আভাস আছে।

কলকাতায় দপ্তরীর সংখ্যা কত? মানে কত লোক বই-বাঁধাইয়ের কাজ করে জীবিকানির্বাহ করেন?

—বর্তমানের হিসেব সঠিক জানি না। আনুমানিক ২০ হাজার কিংবা তারো বেশি। অনেকে এ কাজ করে চার-পাঁচ জনের একেকটা পরিবার চালান। ধরে নিতে পারেন, প্রায় এক লাখ লোক বেঁচে আছেন দপ্তরীখানার কাজের ওপরে।

সাধারণত কতক্ষণ কাজ হয়?

—দৈনিক আট ঘণ্টা। অবশ্য সব জায়গায় নয়। ছোটখাট দপ্তরীখানাগুলির মালিক নিজেও কাজ করেন। তাঁদের কোনো সময়ের ঠিক নেই। আমি সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কাজ করাই। আমার এখানে কর্মচারীরা পেন্সন, বোনাস সবই পায়। অধিকাংশ জায়গাতেই পায় না।

এখন তো সরকার এবং বোর্ড বহু বই ছাপছেন? সেসব বাঁধাই করেন কারা?

—আমরাই বাঁধাই করি। তবে সরাসরি নয়, প্রেসের মাধ্যমে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে আমরা আবেদন করেছিলাম, আমাদের অর্ডার দিন, আমরাই ডেলিভারী দেব। তাতে কোনো ফল হয়নি। কংগ্রেস আমল থেকেই এ ব্যবস্থা চলে আসছে। বড় বড় প্রেস সাধারণত কিশলয়, প্রকৃতি পরিচয়, পি-কক রিডার প্রভৃতি বই ছাপার অর্ডার পায়। তারাই বাঁধাই করে দেবার দায়িত্ব নেয়। আমরা ওদের কাছ থেকে পাই, সরকারী হারের অর্দ্ধেক বা তারই কাছাকাছি। মাঝ-খান থেকে প্রেস একটা মোটা টাকা নিয়ে নেয়। তবু আমরা বাঁধাই করি, সামান্য লাভও যে করি না তা নয়। গো-ডাউনে জমা করে রাখতে হয় না। দপ্তরীদের কম পয়সা দিতে বাধ্য হই। সাধারণভাবে পাবলিশারদের কাজে তো বটেই—সরকারী কাজের জন্যেও। ভাবুন তো, ওদের জীবনের মানোন্নয়ন হবে কি করে?

সেজন্যে নিজেরা সংঘটিত হোন দপ্তরীদেরও সংগঠিত করুন। এছাড়া আর উপায় কি? বড় ধরনের মালিকানা কি গ্রন্থন ব্যবসায়ে জড়িত নেই?

—না নেই। দপ্তরীখানার অধিকাংশ মালিকই নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। মধ্যবিত্ত বা ধনী শ্রেণীর কেউ এ ব্যবসায়ে নামতে চান না। ভবিষ্যতে এ ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত হলে, আমরা চাকরী করবো। কি হবে দপ্তরী-খানার মালিক সেজে।

বর্তমানে আপনারা যেসব সমস্যা বোধ করছেন, তার প্রতিকারের উপায় কি?

—১৩৬২ সালে যা ভেবেছিলাম, তাই আমাদের আজকেরও প্রতিকারের একমাত্র উপায়। তখন আমরা বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করে, নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা বিসর্জন দিতে প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে অনুরোধ করেছিলাম। এবং প্রস্তাব নিয়েছিলাম :

(১) পড়তা হিসেবে কাজের ন্যায্য দাম দিতে হবে।

(২) শ্রমিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক দিয়ে দক্ষ কারিগর তৈরী করতে হবে কিংবা বাইরে থেকে নিয়োগ করতে হবে।

(৩) প্রকাশকদের কাছ থেকে যথাসময়ে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং অনাদায় বন্ধের উপায় বের করতে হবে।

(৪) বর্ধিত বাড়ীভাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে অনির্দিষ্টকাল ছাপা কাগজ গুদামে রাখতে হলে তার জন্য গুদামভাড়া দিতে হবে।

(৫) অনিবার্য কারণে ছাপা ফর্মা নষ্ট হলে তার দাম বাবদ ক্ষতিপূরণ নেওয়ার অধিকার প্রকাশকদের থাকবে না। ইত্যাদি।

এসব প্রস্তাবকে কার্যকরী করার একটা পরিকল্পনাও আমরা নিয়েছিলাম। তবে, তা পরিকল্পনার স্তর পেরিয়ে বাস্তবে সম্ভব হয়ে উঠল না।

বিদেশে এ শিল্পের অবস্থা কি?

—য়ুরোপ-আমেরিকার তুলনায় আমরা মধ্যযুগে আছি। আমাদের দেশে গ্রন্থন একটা কুটীর শিল্প। বিদেশে তা নেই। যন্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে নানাদিক থেকে। ফোল্ডিং, স্টিচিং কেজ তৈরী প্রায় সব ব্যাপারেই যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। তাতে প্রোডাকশনও ভালো হচ্ছে। কোনোদিন প্রতিযোগিতায় এলে আমরা হটে যাবো। মাড়োয়ারী ক্রমশ এ ব্যবসায়ের দিকে মনো-যোগ দিচ্ছেন। বছর চৌদ্দ পনেরো আগে আমরা একটা পত্রিকা প্রকাশ করে-ছিলাম। তার নাম 'গ্রন্থন শিল্প'। আমা-দের সমিতির মুখপত্র হিসেবেই বেরোত পত্রিকাটি। তাতে গ্রন্থনের নানা দিক সম্পর্কে সুন্দর সুন্দর আলোচনা থাকতো। তাছাড়া থাকতো গ্রন্থনশিল্পের সঙ্গে যুক্ত যাঁরা, তাঁদের খবরাখবর ও সমস্যার ওপরে প্রবন্ধ-নিবন্ধ। বছর দেড়েক চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের সমিতি থেকে উন্নত প্রণালীর গ্রন্থনের কাজ শেখাবার জন্যে একটা বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। তাও শেষপর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি।

শচীনবাবু আমাকে একটা পুস্তিকা দিলেন। বঙ্গীয় পুস্তক-গ্রন্থন ব্যবসায়ী সমিতির দ্বিতীয় বর্ষের বার্ষিক বিবরণী। তাতে দেখেছিলাম বিভিন্ন প্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরীখানার সংখ্যা হবে প্রায় দুশো। নেহাৎ উপেক্ষা করার ব্যাপার নয়।

—বিশেষ প্রতিনিধি

(দশ)

বাংলা ও পাঞ্জাবের মত জার্মানীও দু টুকরো হয়েছে কিন্তু কলকাতা বা লাহোরের মত বার্লিন আর সেই আগের মত নেই। একটা নয়, দুটো নয়, চার চারটে টুকরো হয়েছে বার্লিন—বৃটিশ সেকটর, ফ্রেঞ্চ সেকটর, আমেরিকান সেকটর ও রাশিয়ান সেকটর। অ্যালায়েড ফোর্সেস-এর তিনটি সেকটর নিয়েই আজকের পশ্চিম বার্লিন ও রাশিয়ান সেকটর হচ্ছে পূর্ব বার্লিন। পশ্চিম বার্লিন বাহ্যত ও কার্যত মুক্ত হলেও আইনত আজও ইংরেজ-ফরাসী-আমেরিকার অধীন। শহরটাকে চক্কর দিতে গিয়ে বার বার নজরে পড়বে, ইউ আর লিভিং বৃটিশ সেকটর, ইউ আর এন্টারিং ফ্রেঞ্চ সেকটর অথবা আমেরিকান সেকটর।

বিচিত্র ও বিরাট শহর হচ্ছে বার্লিন। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বার বার এর উল্লেখ। আয়তনে পূর্ব বার্লিনের চাইতে পশ্চিম বার্লিন কিছুটা বড়। দুটি বার্লিন একত্রে ওয়াশিংটনের সাড়ে তিনগুণ। আজকের পশ্চিম বার্লিনের শুধু আমেরিকান সেকটরই প্যারিসের চাইতে বড়।

দুটি জার্মানী, দুটি বার্লিন দিন-রাত্রির মত সত্য হলেও ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে শুধু পশ্চিম জার্মানীর। পশ্চিম বার্লিনে আছে কনসাল জেনারেলের অফিস। সেই কনসাল জেনারেল অফিসে পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের প্রধান হতে চলেছে তরুণ।

সাধারণত কনসাল জেনারেলের অফিসের দুটি কাজ। কনসুলার ও কমার্শিয়াল। অর্থাৎ পাশপোর্ট-ভিসা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করা। কোন কোন ক্ষেত্রে এর সঙ্গে থাকে প্রচার বিভাগ। বার্লিন যদি সানফ্রান্সিসকো'র মত একটা বিরাট শহর ও ব্যবসা কেন্দ্র হতো, তাহলে ঐ দুটি-তিনটিই কনসাল জেনারেল অফিসের কাজ হতো। কিন্তু বার্লিন আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্র-বিন্দু। পৃথিবীর দুটি বিবাদমান শক্তি এখানে মুখোমুখি। তাইতো শুধু পাশপোর্ট-ভিসা আর এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের কাজই নয়, কনসাল জেনারেলের অফিসে কূটনৈতিক বিভাগটি অন্যতম প্রধান অংশ। তরুণ সেই গুরুত্বপূর্ণ পলিটিক্যাল ডিভিশনের প্রধান হতে চলেছে।

পূর্ব জার্মানীতে ভারতীয় কূটনৈতিক মিশন নেই, পূর্ব বার্লিনে নেই আমাদের দূতাবাস বা কনসাল-জেনারেল। বিশ্বের অন্যতম প্রধান শিল্পসমৃদ্ধ দেশ পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে ভারতের শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক। তাইতো আছে ট্রেড মিশন।

দ্বিধাবিভক্ত বাংলার বাঙালীর কাছে দ্বিখণ্ডিত বার্লিনের কাহিনী হাসির খোরাক জোগাবে। পশ্চিম বার্লিন পশ্চিম জার্মানীর অন্তর্গত নয়। তবে রাজধানী বনের চাইতে পশ্চিম জার্মানীর অনেক বেশী সরকারী কর্মচারী পশ্চিম বার্লিনে কাজ করেন। বার্লিন দু টুকরো হলেও মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্ম একইভাবে চলছিল। মাটির উপরের রেল 'এস-বান' চালাত পূর্ব জার্মানী, মাটির তলার রেল 'ইউ-বান' চালাত পশ্চিম জার্মানী। প্রায় পঞ্চাশ হাজার পূর্ব বার্লিনবাসী প্রতিদিন চাকরি করতে আসত পশ্চিমে, বেশ কয়েক হাজার পশ্চিমের বাসিন্দাও নিত্য যায় পূর্বে চাকরি করতে।

বার্লিনের মজার কাহিনী আরো আছে। পশ্চিম বার্লিন থেকে যে বাইশ জন ডেপুটি বনে প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁদের একজন তো পূর্ব বার্লিনেই থাকতেন। ভাবতে পারেন খুলনা বা বরিশালে বাস করে, কলকাতা থেকে নির্বাচিত হয়ে দিল্লীর পার্লামেন্টের সদস্য হওয়া? কলকাতার মত পূর্ব জার্মানীর থিয়েটারের মান বেশ উঁচু। পশ্চিম বার্লিনের বনেদী ও ধনী বা থিয়েটার রসিকের দল তাই রোজ সন্ধ্যায় পূর্ব বার্লিনে গিয়ে থিয়েটার দেখেন। আবার আমেরিকান খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিন পড়ার জন্য আমেরিকান প্রচার দপ্তরের পৃথিবীর বৃহত্তম লাইব্রেরী—পশ্চিম বার্লিনের ইউ, এস, আই, এতে পূর্ব বার্লিনের হাজার হাজার কর্মী নিত্য আসেন।

এই বার্লিনে—পশ্চিম বার্লিনে এলো তরুণ। পশ্চিম বার্লিনের টেমপেলহফ্ এয়ারপোর্টটি একেবারে শহরের মধ্যে। কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মত না হলেও পার্ক সার্কাস আর কি! এয়ারপোর্টটিও বেশ অভিনব। মাঠের মধ্যে রাণ-ওয়ের ধারে বা টার্মিন্যাল বিল্ডিং থেকে মাইলখানেক দূরে প্লেনে ওঠা-নামা করতে হয় না। প্লেন একেবারে টার্মিন্যাল বিল্ডিং-এর বিরাট হল ঘরের মধ্যে থামে। প্লেনে ওঠা-নামার সময় এয়ার হোস্টেসের কৃত্রিম হাসি দেখার আগে বা পরে রোদ-জল-ঝড় সহ্য করতে হয় না যাত্রীদের। *

কনসাল জেনারেল একটু জরুরী কাজে আটকে থাকায় নিজে এয়ারপোর্ট যেতে পারেন নি তরুণকে অভ্যর্থনা জানাতে। সহকর্মী মিঃ ডাডলানি ও মিঃ দিবাকরকে পাঠিয়েছিলেন।

তরুণ বলল, আপনারা দুজনে কেন কষ্ট করলেন? আই অ্যাম সরি, আমার জন্য আপনাদের বেশ কষ্ট হলো।

মিঃ দিবাকর বললেন, কি যে বলেন স্যার! আপনাদের দেখাশুনা করা ছাড়া আমাদের আর কি কাজ?

মিঃ সুরী শুধু বললেন, দ্যাটস্ রাইট স্যার।

হান্সা কোয়ার্টারে তরুণের ফ্ল্যাট ঠিক করা ছিল। দিবাকর আর সুরী ফ্ল্যাটের সব কিছু দেখিয়ে দেবার পর বললেন, স্যার, আপনি একবার সি-জি'র (কনসাল জেনারেল) ওয়াইফকে টেলিফোন করুন।

'কেন? এনি থিং স্পেশ্যাল?'

'সি-জি বার বার করে বলেছেন।'

তরুণ হাসে। দিবাকর আর সুরী মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

তরুণ বলল, টেলিফোন করার দরকার নেই। আপনারা কাইন্ডলি মিসেস ট্যান্ডনকে বলে দিন আমি একটু পরেই আসছি।

দিবাকর আর সুরী বিদায় নিলেন। বলে গেলেন, একটু পরেই গাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি, স্যার।

'দ্যাটস অল রাইট।'

ওঁরা বিদায় নেবার পর তরুণ একটু ঘুরে ফিরে ফ্ল্যাটটা দেখল। ছোট্ট ফ্ল্যাট। ছোট্ট ফ্ল্যাটই সে চেয়েছিল। একটা বড় লিভিং রুম, একটা মাঝারি সাইজের বেডরুম, ছোট্ট একটা স্টাডি আর কিচেন, টয়লেট ইত্যাদি। এ ছাড়া দুটি বারান্দা—একটি ছোট, একটি বড়। বড়টি লিভিং রুমের সঙ্গে, ছোটটি বেড রুমের সঙ্গে। দুটি বারান্দাতেই অ্যালুমিনিয়াম ডেক-চেয়ার রয়েছে। হান্সা কোয়ার্টারের অ্যাপার্টমেন্টে ত্রুটি কিছু নেই। ফার্নিচার, বিছানা-পত্তর, লাইট স্ট্যান্ড—সব কিছুই ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করছে।

পৃথিবীর কিছু কিছু দেশ আছে যেখানে শিল্পীর সঙ্গে শিল্পের সমন্বয় হয়েছে। মুষ্টিমেয় এই কটি দেশে সব কিছুতেই একটা শিল্পীসুলভ মনোবৃত্তি, রুচির পরিচয় পাওয়া যাবে। রাইফেল সব দেশেই তৈরী হচ্ছে। আমেরিকা-রাশিয়া থেকে শুরু করে আমাদের ইছাপুর-

---

* দুটি বার্লিনের কথা ১৯৬১ সালে 'বার্লিন প্রাচীর' ওঠার আগেকার পটভূমিকায় লেখা। এই রচনার ঘটনাকালও তখনকার।

কাশীপুরে পর্যন্ত। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়াই একমাত্র দেশ যে দেশের রাইফেলেও চমৎকার শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যাবে। লোহার তৈরী পুল তো সব দেশেই আছে। কলকাতা-লন্ডন-নিউইয়র্কেও। কিন্তু প্যারিসের ঐ প্রাণহীন লোহার পুলগুলির মধ্যেও সমগ্র ফরাসী জাতির যে শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়, তা আর কোথাও পাওয়া যাবে না। জাপান, জার্মানীও অনুরূপ। সব কিছুতেই প্রয়োজনের সঙ্গে রুচির সমন্বয়।

পৃথিবীর বহু শহরে-নগরে আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট দেখা যাবে, কিন্তু বার্লিনের হান্সা কোয়ার্টারের অ্যাপার্টমেন্টে কি যেন একটু অতিরিক্ত পাওয়া যাবে। এই অতিরিক্ত পাওয়াটুকুই এক একটা জাতির বৈশিষ্ট্য। রাশিয়া রকেটের সঙ্গে সঙ্গে বলশয় থিয়েটার আর ব্যালেরিনার জন্য বিখ্যাত। জাপান শুধু ইলেকট্রনিকসে নয়, চমৎকার পুতুল তৈরী করে পৃথিবীকে চমকে দিয়েছে। সুইস মেশিনারী-ঘড়ির মত সুইস চকোলেটও সবার প্রিয়। বার্লিনেও বড় বড় কলকারখানার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত বার্লিন ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে চার পাশ দেখতে বেশ লাগছিল তরুণের। দূরের রেডিও টাওয়ারের দিকে নজর পড়তেই মনে পড়ল ফিলহারমনিক ও সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার কথা। নিউইয়র্কে গত বছরই শুনেছিল হার্বার্ট ভন্ কারাজানের পরিচালনায় বার্লিন ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রা। মনে পড়ল আরো অনেক কথা—।

রমনার মজুমদার বাড়ীর বিনয়বাবু বি-এ ফেল করার পর বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলেন। অনেক খোঁজ খবর করেও ফল হলো না। ফটো দিয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তবুও বিনয়বাবুর কোন সন্ধান দিতে পারেন নি। পারবে কোথা থেকে। খবরের কাগজে যখন বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে তখন উনি আরব সাগরের মাঝ দরিয়ায় ভেসে চলেছেন।

দেখতে দেখতে বছরের পর বছর কেটে গেল। ঢাকার লোক প্রায় ভুলে গেল বিনয় মজুমদারের কথা। ওয়াড়ীর মাঠে, বুড়ীগঙ্গার পাড়ের জটলাতেও বিনয় মজুমদারকে নিয়ে আলাপ-আলোচনাও ক্রমে ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। ইন্দ্রাণী ভুলতে পারল না তার বিনেকাকুকে। ভুলবে কেমন করে? ও যে বিনেকাকুর কোলে চড়ে প্রায়ই বেড়াতে যেত, লজেন্স খেতো। বিনেকাকু যে ওর সব আব্দার হাসিমুখে বরদাস্ত করতেন। বড় হবার পরও বিনেকাকুর দেওয়া পুতুলগুলো বেশ যত্নে সাজিয়ে রেখেছিল ইন্দ্রাণী।

দীর্ঘদিন পরে অকস্মাৎ বিনেকাকু ফিরে এলেন ঢাকা। রমনা, ওয়াড়ী, বুড়ীগঙ্গার পাড়ে আবার চাঞ্চল্য দেখা দিল। দীর্ঘদিন জার্মানীতে থেকে অদৃষ্ট পাল্টেছেন, অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছেন জীবনে। যুদ্ধ শুরু হবার পর প্রায় বাধ্য হয়ে সুইডেনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর বিনয়বাবু এলেন না আর মাতৃভূমিকে দেখতে।

বিনেকাকুর কাছে যেতে ইন্দ্রাণীর দ্বিধা সঙ্কোচ হচ্ছিল। তরুণ কিছু না বলে কলেজে যাবার পথে বিনেকাকুর ওখানে গিয়েছিল।

'কাকু, আমার নাম তরুণ। আপনি হয়ত ভুলে গেছেন।'

'তোমার বাবার নাম কি?'

'কানাই মিত্র।'

'ঐ টাকশালবাড়ীর কানাইদার ছেলে তুমি?'

তরুণ হাসতে হাসতে বলেছিল, 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।'

বিনয়বাবু আদর করে কাছে টেনে নিয়েছিলেন তরুণকে। অনেক কথাবার্তার পর তরুণ ইন্দ্রাণীর কথা বলেছিল।

'ঐ যে ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটা। যে আমাকে বিনেকাকু বলত?'

'হ্যাঁ।'

বিনয়বাবু একটু যেন উদাস হলেন। হারিয়ে যাওয়া অতীতের ভিড়ের মধ্যে মনটাকে নিয়ে গেলেন। একটু পরে বললেন, ও কি এখনও সেই রকম আদুরে আছে?

তরুণ কি জবাব দেবে? চুপ করে থাকে। বিনয়বাবু আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, জান তরুণ, প্রথম প্রথম বিদেশে গিয়ে ছোট্ট বাচ্চাদের টফি খেতে দেখলেই মনে পড়ত ওর কথা। বড় ইচ্ছে হতো ওর একটা ছবি কাছে রাখি কিন্তু তা আর হয়নি।

তরুণ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন কাকু?'

বিনয়বাবু হেসে বললেন, 'বাড়ী থেকে যে পালিয়ে গিয়েছিলাম, তাই ঢাকার কাউকেই চিঠি দিতে পারতাম না।'

ইন্দ্রাণীকে আসতে হয়নি, বিনয়বাবুই গিয়েছিলেন। পকেট ভর্তি টফি নিতে ভুলে যাননি।

বার্লিনের হান্সা কোয়ার্টারের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তরুণের সে সব কথা পরিষ্কার মনে পড়ল। আর মনে পড়ল বিনুকাকা শেষে বলেছিলেন, ঢাকায় থেকে ইলিশ আর রসগোল্লা খেয়ে কিছু হবে না। একদিন চুপ করে পালিয়ে জার্মানী যাও, বার্লিনে এসো।

তাই সেই বিনেকাকা জার্মান নাগরিক হয়েই বার্লিনে থাকেন বলেই তরুণ জানত। ঠিক করল খুঁজে বের করতেই হবে সেই পরম শুভাকাঙ্ক্ষীকে।

বিনেকাকার কথা মনে হতেই ইন্দ্রাণীর স্মৃতিটা একটু বেশী সচেতন হয়ে পড়ল মনের মধ্যে। এই ওপারের ব্যালকনির ডেক চেয়ারে বসে যদি ইন্দ্রাণী গুণ গুণ করে গান—

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

'তরুণ মিত্র?'

'হ্যাঁ। আমি তরুণ বলছি।... নমস্কার মিঃ টান্ডন, হাউ আর ইউ?'

'আই অ্যাম সরি, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই এয়ারপোর্টে যেতে পারলাম না।'

'না, না, তাতে কি হয়েছে......'

আর দেরী করতে পারল না।

টান্ডন সাহেব সরকারী চাকুরী থেকে প্রায় বিদায় নিতে চলেছেন। বার্লিনই তাঁর লাস্ট পোস্টিং। ফরেন সার্ভিসের অনেক অফিসারই টান্ডন সাহেবের অধীনে কোন না কোন সময়ে কাজ করেছেন। তরুণও করেছে। মিসেস টান্ডনকে ভাবীজি সম্বোধনে ফরেন সার্ভিসের জুনিয়র অফিসাররা তাঁকে মাতৃতুল্য সম্মান দেন। কেউ একটু সম্মান দিলে, কেউ একটু মর্যাদা দিলে মিসেস টান্ডন কমলার অতিরিক্ত না করে শান্তি পান না।

এর অবশ্য একটা কারণ আছে। টান্ডন সাহেব কর্মজীবন শুরু করেন অধ্যাপনা করে। কনিষ্ঠদের আজো তাই স্নেহজ্ঞান করেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে ধরল, জামেন ভাবীজি, ইউনাইটেড নেশনস্

ছাড়তে মনটা বড় খারাপ লাগছিল। কিন্তু যেই মনে পড়ল আপনার রান্নার কথা, তখন আর এক মুহূর্তেও নিউইয়র্ক থাকতে মন চাইল না।

ভাবীজি বললেন, এবার তো তোমাদের ট্যান্ডন সাহেব রিটায়ার করছেন। আর তো আমি তোমাদের রান্না করে দিতে পারব না। এবার বিয়ে কর, ওকে রান্না-বান্না শিখিয়ে আমিও রিটায়ার করি।

'তাহলে আর এ জন্মে হলো না ভাবীজি।'

'ওসব বাজে কথা ছাড়। ফরেন সার্ভিসে থেকে আজও ইন্দ্রাণীকে খুঁজে বের করতে পারলে না?'

ফরেন সার্ভিসের কথা বাইরে না ছড়ালেও গোপন থাকে না। ভাল, মন্দ, কোন খবরই না। সুধীর আগরওয়াল দিল্লীতে থাকার সময় সবাইকে চমকে দিল। ড্রিঙ্ক তো দূরের কথা, পান-সিগারেটও খেত না। মঙ্গলবার শুধু উপবাসই করত না, আরউইন রোডের হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে অফিসে এসে সবাইকে প্রসাদ দিত। সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে কোট-প্যান্ট ছেড়ে ধুতি-চাদর পরে পুজো করত ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

যাঁরা ফরেন অফিসে কাজ করেও ফরেন যেতেন না, বা যেতে পারতেন না, তাঁরা বাহবা দিতেন। কিন্তু যাঁরা বহু ঘাটে জল খেয়ে এসেছেন, তাঁরা মন্তব্য করতেন, প্রথম ওভারেই ক্লিন বোল্ড হয়ে যাবে। আই এফ এস সুধীর আগরওয়ালাকে তাই ঠাট্টা করে অনেকেই বলত আই জি বি এস —ইন্ডিয়ান গুড বয় সার্ভিস।

আগরওয়ালের প্রথম ফরেন পোস্টিং হলো ম্যানিলায়। বিকৃত পশ্চিম, বিস্মৃত পূর্বের মিলনভূমি ফিলিপাইন। ট্রান্সফার অ্যান্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট বোর্ডের সিদ্ধান্ত জেনেই অনেকেই মুচকি হেসেছিলেন। দু'চারজন অনভিজ্ঞ প্রবীণ প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, ইফ ইউ পিপুল ডোন্ট স্পয়েল হিম, আগরওয়াল ঠিক থাকবে।

বিদেশ যাত্রার আগে সুধীর ছুটি নিয়ে বাবা-মা'কে দেখার জন্য শুধু কানপুরেই গেল না, হরিদ্বার আর বেনারসও গেল। নিয়ে এলো নির্মাল্য, গঙ্গাজল আর অসংখ্য দেবদেবীর ফটো। কনটপ্লেসে শপিং করবার আগে চাঁদনী চক থেকে ডজন ডজন ভাল ধূপ কাঠি কিনল। অন্যান্য সহকর্মীদের মত সেই সঙ্গে কিনল রেকর্ড। তবে বিলায়েৎ খাঁ-রবিশঙ্করের সেতার বা লতা মুঙ্গেশকারের লাইট মডার্ণ সঙ্গস্ নয়। কিনল যূথিকা রায়, শুভলক্ষ্মীর ভজন।

শুভদিনে শুভক্ষণে সুধীর আগরওয়াল রওনা হলো সিঙ্গাপুর এন রুট টু ম্যানিলা। বিদায় জানাতে আরো অনেকের সঙ্গে ইন্ডিয়ান গুড বয় সার্ভিসের মহেশ মিশ্রও গিয়েছিল। মিশ্র বার বার করে আগরওয়ালকে বলেছিল, ডোন্ট হেসিটেট, যা কিছু দরকার আমাকে লিখো। আমি পাঠিয়ে দেব।

ম্যানিলায় পৌঁছেই আগরওয়াল বহু সহকর্মীকে চিঠি দিল। মিশ্রকে লিখল, তোমাদের সবাইকে ছেড়ে এসে বড় নিঃসঙ্গ বোধ করছি। তবে আমার পরম সৌভাগ্য মিঃ ডুরাইস্বামীর ছোট্ট ফ্ল্যাটটা আমাকে দেওয়া হয়েছে। মোটামুটি সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছি। দু'একজন সহকর্মী আমাকে বেশ সাহায্য করছেন। তবে সন্ধ্যার পর নিজের ঘরে বসেই কাটিয়ে দিচ্ছি। সারা শহরটা যেন হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তুমি তো জান আমার ওসব ভাল লাগে না। তাই শুধু পড়াশুনা করছি।

আর কারুর কাছে না হোক, মিশ্রের কাছে প্রতি সপ্তাহে ম্যানিলা থেকে চিঠি আসত। কখনও লিখত, ভাই আরো দু'চারটে ভাল ভাল ভজন বা ক্ল্যাসিক্যাল গানের রেকর্ড পাঠিয়ে দাও। আবার লিখত, বইপত্তর যা এনেছিলাম তা যে কতবার করে পড়লাম, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এখানে আমার মনের মত বই পাওয়া অসম্ভব। তাই তুমি যদি একটু কষ্ট করে ভারতীয় বিদ্যা ভবনের কয়েকটা বই পাঠাও তবে বড় ভাল হয়।

আরো কত কি লিখত আগরওয়াল।... এদের ন্যাশনাল মিউজিয়াম দেখলাম। সত্যি দেখবার মত অনেক কিছু আছে। কয়েক শতাব্দীর অস্ত্রশস্ত্রের যে কালেকশন আছে, শুধু তাকে নিয়েই পৃথিবীর এদিককার মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস লেখা সম্ভব। আর আছে পোশাক-এর কালেকশন। এক কথায় অপূর্ব। মানব সভ্যতার প্রগতির অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে তার পোশাক। মানুষের সৃজনী শক্তি কি সুন্দরভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে, তার মধ্যে যে ছন্দ আছে, আনন্দ-আত্মতৃপ্তি আছে, তা এদের ন্যাশনাল মিউজিয়ামের পোশাকের কালেকশন দেখলে বেশ অনুভব করা যায়। আমাদের দেশে কত বিচিত্র ধরনের পোশাক ব্যবহার হয়েছে ও হচ্ছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এসব পোশাকের কোন সংগ্রহশালা নেই।

নিঃসঙ্গ আগরওয়াল সন্ধ্যাবেলায় হয় পড়াশুনা করত, নয়ত চিঠিপত্র লিখত। লিখত সহকর্মীদের কথা, শহরের কথা।......দিনের বেলা সবই যেন ক্যাজুয়াল। কাজকর্ম, পোশাক-আষাক, সব কিছু। একটা সর্ট স্লিভের সার্ট পরেও ফরেন মিনিস্টারের কাছে যাওয়া যাবে। কাজকর্ম সবাই করছে, তবে মনটা পড়ে সন্ধ্যার দিকে। রাত্রির নেশাতেই দিনের বেলা যা কিছু করা সম্ভব আর কি! শুধু হোটেল, রেস্তোরাঁ, নাইট ক্লাবে নয়, জনে জনের বাড়ীতেও রসের মজলিশ বসে। মানুষগুলো হঠাৎ চলে যায় যুগ যুগ পিছনে। আদিম মানুষের মত সে হিংস্র হয়ে ওঠে—নারীপুরুষ সবাই।......এই যে আমাদেরই সহকর্মী মিঃ চাড্ডা! কি ভাবেই জীবন কাটাচ্ছেন। রোজ সন্ধ্যায় কোথা থেকে যে একটা মেয়েকে শিকার করে নিজের ফ্ল্যাটে আনে, ভাবলেও অবাক লাগে, ঘেন্না করে।

ফরেন সার্ভিসের সর্বত্র ছড়িয়েছিল আগরওয়ালের অভিজ্ঞতার কাহিনী। পরে যখন ওর চিঠিপত্র আসা কমতে থাকল, সে খবরও মুখে মুখে, ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের কৃপায় অথবা ডিপ্লোম্যাটদের নিত্য আনাগোনার ফলে ছড়িয়ে পড়ত পৃথিবীর প্রায় সব ইন্ডিয়ান মিশনেই।

কয়েক মাসের মধ্যেই আরো অনেক কাহিনী ছড়িয়েছিল।

ম্যানিলা থেকে যাঁরা অন্যত্র বদলী হতেন, তাঁরা জানতেন আগরওয়ালের বিবর্তনের ইতিহাস। দেবদেবীর ভজন-পুজন শেষ হয়ে গেছে। মদ খেয়ে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা ছুকরীদের নিয়ে বেলেল্লাপনা করবার সময় বহুদিন আগেই ভেঙে চুরমার করেছে। এখন আর আগরওয়াল 'জাঙ্গল বার' নাইট ক্লাবে বসে ধেনো মদের মত ফিলিপাইনের তালের রসের তৈরী 'তুবা' মদ খেতে খেতে গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে গল্প করে খুশী হয় না। শিকার জোগাড় করেই নিজের অ্যাপার্টমেন্টে!

তরুণের কাহিনীও ছড়িয়েছিল ফরেন সার্ভিসের সর্বস্তরে। মিসেস ট্যান্ডনও জানতেন ইন্দ্রাণী-হারা তরুণের দীর্ঘনিশ্বাসের কথা। তাইতো ইন্দ্রাণীর বিষয়ে প্রশ্ন করতেই তরুণের নীরবতা দেখে ভাবীজি বললেন, ঠিক হ্যায়। তোমাদের মত ইনকম্পিটেন্ট ডিপ্লোম্যাটকে দিয়ে কিছু হবে না। এবার আমিই দেখি কি করতে পারি।'

তরুণ কিছু না বলে বিদায় নিল। [illegible]

ভেষজবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী
ডঃ আলফ্রেড হারশে

ভেষজবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী
ডঃ সালভাডর লুরিয়া

ভেষজবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী
ডঃ ম্যাক্স ডেলব্রুক

ভেষজবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

এবছর (১৯৬৯) ভেষজবিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্বে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে তিনজন মার্কিন বিজ্ঞানীকে যৌথভাবে। তাঁরা হলেন পাসাডেনার ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিট্যুট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক মাকস্ ডেলব্রুক, ওয়াশিংটনের কার্ণেগী ইনস্টিট্যুটের ডঃ আলফ্রেড হারশে এবং ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিট্যুট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক সালভাডর লুরিয়া। অধ্যাপক ডেলব্রুক হচ্ছেন জন্মসূত্রে জার্মাণ এবং অধ্যাপক লুরিয়া হচ্ছেন ইতালীয়। বর্তমানে এই তিনজন জীব-বিজ্ঞানীই হচ্ছেন মার্কিণ নাগরিক। অধ্যাপক ডেলব্রুকের বর্তমান বয়স ৬৩, অধ্যাপক হারশের ৬০ এবং অধ্যাপক লুরিয়ার ৫৭ বছর।

এই নিয়ে পর পর চার বছর ভেষজবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হলো মার্কিণ বিজ্ঞানীদের। ডিনামাইট আবিষ্কর্তা আলফ্রেড নোবেল প্রবর্তিত নোবেল পুরস্কারের ৬৭ বছরের ইতিহাসে মার্কিণ বিজ্ঞানীরা এপর্যন্ত ৩৫ বার ভেষজবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

প্রতি বছর ভেষজবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করেন স্টকহোমের রয়েল ক্যারোলীন ইনস্টিট্যুটের চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিভাগ। যে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে এই তিনজন জীব-বিজ্ঞানীকে এবার নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে, সে প্রসঙ্গে ইনস্টিট্যুট বলেছেন : ভাইরাসের জন্মগত গঠন ও প্রতিরূপায়ণ পদ্ধতি সংক্রান্ত তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, বিশেষত ব্যাকটিরিয়োফেজ সংক্রান্ত অনন্য গবেষণা, আধুনিক আণবিক জীব-বিজ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে। ব্যাকটিরিয়োফেজ হচ্ছে একরকম ভাইরাস যা সাধারণ কোষ অপেক্ষা ব্যাকটিরিয়াকেই আক্রমণ করে বেশি। এ ক্ষেত্রে এই তিনজন জীব-বিজ্ঞানীর যে অবদান তা ছাড়া আধুনিক কালের বিরাট অগ্রগতি সম্ভব হত না।

শিশু পক্ষাঘাত, বসন্ত, হাম, মামস্, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সাধারণ সর্দি, পীতজ্বর ইত্যাদি যেসব রোগ ভাইরাসের আক্রমণে হয়ে থাকে তা প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণের জন্যে বর্তমানে যে ভ্যাকসিন বা টিকা ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে তা ভেষজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিরাট অগ্রগতি। জীবদেহে টিস্যু বা কলা এবং অঙ্গের বিকাশ বৃদ্ধি ও কার্যক্রম যেসব পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলি এবং জীবের বংশগতি পদ্ধতি ভালোভাবে অনুধাবনের পক্ষে এই তিনজন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার পরোক্ষভাবে বিশেষ সাহায্য করেছে। এর ফলে জীবনের মূল রহস্য এবং আধুনিক ক্যানসার-ভাইরাস গবেষণার পথ প্রশস্ত হয়েছে। ইতিমধ্যেই শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের কয়েকরকম লিউকেমিয়া রোগের ভেষজ-নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে এবং শিশুদের জন্মগত ত্রুটি-বিচ্যুতি রোধের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

১৯৪০ সাল নাগাদ এই তিনজন জীব-বিজ্ঞানী স্বতন্ত্রভাবে ব্যাকটিরিয়োফেজ সম্পর্কে গবেষণায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁরা এমন একটি জীবন্ত তন্ত্রের সন্ধান করছিলেন যার সাহায্যে জীবনের মূল পদ্ধতি এবং প্রজনন যতদূর সম্ভব সহজভাবে অনুধাবন করা যায়। তাঁরা ক্ষুদ্রতম জীবন্ত বস্তু একটি ভাইরাস নিয়ে গবেষণা চালান। এই ভাইরাসটি কেবলমাত্র ডি-এন-এ এবং একটি প্রোটিন আবরণ দিয়ে গঠিত। এই বিশেষ শ্রেণীর ভাইরাস সহজেই ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করে এবং তার প্রজনন পদ্ধতি অধিকার করে ভাইরাসরূপে অগণিত ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৪০ সালের আগে জীব-বিজ্ঞানীরা একক জীবন্ত কোষে জীবন-রহস্য অনুধাবনের চেষ্টা করতেন। কিন্তু এই বিষয়টি ছিল অত্যন্ত জটিল। কারণ জীবকোষের নিউক্লিয়াসের বাইরে আছে বহু অংশবিশেষ, যা হচ্ছে জীবন-পদ্ধতি, প্রজনন ও বংশানুক্রমের ধারক।

অধ্যাপক ডেলব্রুক, ডঃ হারশে এবং অধ্যাপক লুরিয়া সুকঠিন পরিমাপ-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন এবং ব্যাকটিরিয়োফেজ বিষয়টিকে যথার্থ বিজ্ঞান হিসাবে গড়ে তুলেছেন। তাঁরা ভাইরাসের প্রতিরূপায়ণে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন এবং এই পদ্ধতির বিভিন্ন স্তর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণে সক্ষম হয়েছেন। একক ব্যাকটিরিয়াতে কি ঘটে তা তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং উন্নততর সংখ্যায়নিক পদ্ধতিতে তাঁদের ফলাফল বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা একাধিক মৌলিক আবিষ্কারের দ্বারা আধুনিক ভেষজ বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেছেন।

জীবন-রহস্য এবং জন্মসূত্র সংক্রান্ত গবেষণার ওপরই কয়েক বছর ধরে ভেষজবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। এ থেকে বিষয়টির অশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। এইসব গবেষণাই হয়তো একদিন কৃত্রিম উপায়ে জীবন সৃষ্টির পথ মানুষের কাছে খুলে দেবে।

জীবাণুর সন্ধানে রাসায়নিক 'রেডার'

আমরা জানি, মহাকাশে কোন বস্তুর অবস্থিতি, অন্ধকার বা কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়-পর্বত বা উপত্যকার হদিশ রেডার যন্ত্রের সাহায্যে পাওয়া যায়। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-তত্ত্ব সমীক্ষা দপ্তরের একদল বিজ্ঞানী এমন এক অভিনব রাসায়নিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, যা জলে জীবাণুর সন্ধানে বিশেষ সহায়ক। অকারণে হ্রদ বা দীঘির জল কেন শুকিয়ে যায়, পলিমাটি পড়ে কেন সেচের কাজ ব্যাহত হয়, জলের নিচে কেনই বা বালিয়াড়ির সৃষ্টি হয়, কিংবা কোন কোন জলাশয় থেকে এমন রোগ ছড়ায় বা ঐ অঞ্চলেই সীমিত থাকে—এইসব রহস্য উদ্ঘাটনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এই পদ্ধতির মাধ্যমে।

এই পদ্ধতির নাম নিউট্রন অ্যাকটিভেশন অ্যানালিসিস। রেডারের সঙ্গে তুলনা করে এই পদ্ধতিকে 'রাসায়নিক রেডার' বলেও অভিহিত করা যায়। রেডার যেমন অন্ধকার বা কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়-পর্বত বা উপত্যকার হদিশ দেয়, তেমনি এই নিউট্রন অ্যাকটিভেশন অ্যানালিসিস পদ্ধতি জলের মধ্যে মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বা উপকারী কোন বস্তুর লেশমাত্র অবস্থিতির সন্ধান দেয়। প্রচলিত রেডার থেকে অতি উচ্চ স্পন্দনবিশিষ্ট বেতার তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়, আর নিউট্রন অ্যাকটিভেশন পদ্ধতিতে নিঃসৃত হয় নিউট্রন স্রোত। এই নিউট্রনের স্রোত বা গোলা সংশ্লিষ্ট গবেষণার বিষয়-বস্তু পদার্থটির নিউক্লিয়াসে বা পরমাণুর কেন্দ্রীকে গিয়ে আটকে যায়। নিউট্রন গোলার আঘাতে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীন থেকে গামা রশ্মি (রঞ্জন রশ্মির অনুরূপ) নির্গত হয় এবং এই রশ্মি বিকিরণই হল সেই বস্তুর অবস্থিতির নির্দেশ। যতটা গামা রশ্মি নির্গত হবে তা থেকে বোঝা যাবে, জলে সেই বস্তুটি কি পরিমাণে আছে।

এই রাসায়নিক 'রেডার' পদ্ধতি বর্তমানে নানা গবেষণায় সুফল দিচ্ছে। যেমন : (১) নদী বা কুয়ার জলে কি পরিমাণে আর্সেনিক, পারদ বা সেলেনিয়াম আছে তা এই পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়। অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মনে করেন, এই সকল পদার্থের সামান্যতম অবস্থিতি জল দূষিত করে এবং সেই অঞ্চলে রোগ-অসুখের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। (২) জলে কোবাল্ট ইত্যাদি পুষ্টিকর পদার্থ সামান্যতম পরিমাণে (কয়েকশত কোটি ভাগ জলে কয়েক ভাগ মাত্র) আছে কিনা, তা এই পদ্ধতির মাধ্যমে নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে। (৩) বিশেষ বিশেষ মৌলিক পদার্থের অবস্থিতির সঙ্গে হ্রদ বা দীঘির জল শুকিয়ে যা মজে যাবার কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা এই পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা বিশেষ সুবিধাজনক। অনেক তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকলে শ্যাওলা খুব বেড়ে গিয়ে হ্রদ বুজিয়ে দেয়, আবার কোন কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের ফলে আগাছার খুব বাড় হয় জলের মধ্যে। নিউট্রন অ্যাকটিভেশন অ্যানালিসিসের মাধ্যমে এসব ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভূমিকা নির্ণয় করা যায়। (৪) পলিমাটির প্রকোপে নদী-নালা বুজে আসে, সেচের কাজ ব্যাহত হয়, জলের নিচে বালিয়াড়ির সৃষ্টি হয়। এই রাসায়নিক রেডার পদ্ধতির সাহায্যে সেই পলিমাটির উৎস খুঁজে বার করা যাবে। আর এই উৎস নির্ণয় করতে পারলে ভূমির অবক্ষয় রোধ করে পলিমাটির বিপদও দূর করা যাবে।

'নেচার' পত্রিকার শতবার্ষিকী

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞান-পত্রিকা 'নেচার'-এর সম্প্রতি শতবর্ষ পূর্তি হয়েছে। ১৮৬৯ সালের ৪ নভেম্বর ব্রিটেনে এই পত্রিকাটির প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। স্যর নরম্যান লকইয়ার নামে জনৈক রাজ-কর্মচারীর মাথায় প্রথম এই পত্রিকাটি প্রকাশের চিন্তা উদয় হয়। লকইয়ার উপলব্ধি করেছিলেন, বিজ্ঞানীদের ভাব বিনিময়ের কোন মুখপত্র না থাকায় তাঁদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্যে তিনি একটি বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন। তাঁর এই উদ্যোগে উনবিংশ শতাব্দীর বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানী সমর্থন জানান। লন্ডনের বিশিষ্ট পুস্তক-প্রকাশক ম্যাকমিলান এই বিজ্ঞান-পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৮৬৯ সালের ৪ নভেম্বর থেকে নিয়মিত ভাবে এই সাপ্তাহিক বিজ্ঞান-পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে আসছে। সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মধ্যে ভাব-বিনিময় এবং বিজ্ঞানানুরাগীদের কাছে বিজ্ঞানের তথ্য ও সংবাদ প্রচারে এই পত্রিকাটি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

এই পত্রিকার প্রচার-সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি ব্রিটেনের বাইরে এবং পত্রিকার ইতিহাসের প্রথমাবধি এই পত্রিকাতে গবেষকদের গবেষণার নিবন্ধ পত্রাকারে প্রকাশিত হয়ে আসছে। বিশ্বের তরুণ গবেষকরা 'নেচার'-এর পাতায় তাঁদের গবেষণা পত্রের প্রকাশকে সৌভাগ্য বলে মনে করে থাকেন।

যান্ত্রিক উড্ডয়ন, তেজস্ক্রিয়া, চিত্র-প্রচারের জন্যে ক্যাথোড-রে টিউব, নিউট্রনের আবিষ্কার, পেনিসিলিনের সংশ্লেষণ, প্রজনসূত্রের রহস্য-উদ্ঘাটন এবং আরও বহু চাঞ্চল্যকর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সংবাদ 'নেচার' পত্রিকার পাতাতেই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। বিশ্বের বিজ্ঞানী, গবেষক এবং বিজ্ঞানানুরাগীদের কাছে 'নেচার' পত্রিকার শতবর্ষ পূর্তি তাই বিশেষ আনন্দের বিষয়।

মেনিনজাইটিজ রোগের টিকা

যে সমস্ত মারাত্মক রোগ প্রতিরোধের উপায় বিজ্ঞানীরা আজও উদ্ভাবন করতে পারেন নি তাদের মধ্যে অন্যতম মেনিনজাইটিজ। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের এই সংক্রামক ব্যাধি প্রায়ই মারাত্মক হয়ে থাকে। এই মারাত্মক রোগটি প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা বিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকে করে আসছেন। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একদল বিজ্ঞানী এ বিষয়ে দীর্ঘকাল গবেষণার পর জানিয়েছেন, জীবাণুবাহিত মেনিনজাইটিজ রোগের টিকা পরীক্ষামূলক ভাবে প্রয়োগ করে 'বিশেষ ফল' পাওয়া গেছে। তাঁরা আরও জানিয়েছেন, 'রুবেলা' নামে জার্মাণ হাম এবং ভাইরাসবাহিত দুরকম হেপাটাইটিজ বা যকৃতের প্রদাহজনিত রোগের টিকা আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও অনেকখানি অগ্রসর হওয়া গেছে। তবে হেপাটাইটিজ রোগের টিকা এখনও পরীক্ষামূলক অবস্থায় রয়েছে। মেনিনজাইটিজ রোগের টিকার কার্যকারিতা সুপ্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ একটি মারাত্মক রোগ প্রতিরোধের পথ খুঁজে পাবে।

●

বাছুরের থাইমাস গ্রন্থি থেকে যে মৌলিক প্রোটিন পাওয়া যায়, তার নাম 'হিস্টন'। প্রাণীদেহে এই 'হিস্টন' ব্যবহার কোরে দেখা গেছে দেহের প্রতিরোধ শক্তির প্রতিক্রিয়া দুর্বল হয়ে যায়। সংযোজনের আগে দেহে 'হিস্টন' ঢুকিয়ে দিয়ে দেহ সেই অন্যের অংগকে পরিত্যাগ করার চেষ্টা করে না। তাছাড়া 'হিস্টন' দেহের সংক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা নষ্ট করে না। এতাবৎ ইঁদুরের ওপর 'হিস্টন' ব্যবহার করা হচ্ছিল, এবার মানুষের ওপর পরীক্ষা হবে।

কলকাতার কিশোর বালকের হৃদ্‌যন্ত্রে সাফল্যজনক অস্ত্রোপচার

কলকাতার সেন্ট লরেন্স স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র সব্যসাচী বসু-মল্লিক কয়েক মাস আগে বুকের অস্ত্রোপচারের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেবোরা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। গত ২৭ আগস্ট বৃহত্তর ফিলাডেলফিয়া এলাকার বিশিষ্ট হৃদ্‌রোগ-চিকিৎসকদের সহযোগিতায় নিউ জার্সির ব্রাউনস্ হিলসে অবস্থিত ডেবোরা হাসপাতালে ফিলাডেলফিয়ার হ্যানিম্যান মেডিক্যাল কলেজের থোরাসিক সার্জারি বা বক্ষদেশের শল্যচিকিৎসা বিভাগের প্রধান ডঃ হেনরী নিকলস্ সাফল্যের সংগে সব্যসাচীর হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার করেন। হাসপাতালের জনৈক মুখপাত্র বলেছেন, সব্যসাচী এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই জীবনযাপন করতে পারবে।

ডেবোরা হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ কোনো-রকম পারিশ্রমিক না নিয়ে এই চিকিৎসা করেন। সব্যসাচীর বাবাও ঐ হাসপাতালে অতিথি হিসাবে ছিলেন। সব্যসাচীর বাবা ডাঃ এ কে বসু-মল্লিক এবং মা ডাঃ মল্লিকা বসু-মল্লিক উভয়েই চিকিৎসক। সব্যসাচী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তার বাবার সংগে আমেরিকা থেকে সম্প্রতি কলকাতায় ফিরে এসেছে।

—প্রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আগের ঘটনা

[কিছুদিন ধরেই ঢিল পড়ত। রাতে।

সেদিন যখন নীপা ফিরে এল কলেজ থেকে সন্ধ্যে ঘনিয়েছে। বাড়ির চাকর দুঃখহরণ ছুটিতে। স্বামী অম্বরও ঘরে নেই। নীপা বিস্মিত। চিন্তিতও বটে।

ভাবছিল পুরনো দিনের কথা। নীলাদ্রির সঙ্গে কেমন করে তার পরিচয় হল। সুন্দরী নীপার কাছে প্রস্তাব এলো সিনেমায় অভিনয়ের। ওদিকে প্রাক্তন(?) প্রেমিক নীলাদ্রির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে। রাত। ঘরে অম্বর আর নীপা।

বাইরে শনশনে বাতাস। প্রেতাত্মার হাহাকার যেন।]

— চার —

রিহার্সাল দেবার ঘরটা ছোট নয়—বড়ই। মেয়ে-পুরুষে ভর্তি। ফুল-রিহার্সাল বলে সকলেই প্রায় এসেছে। শুধু নাটকের কুশীলবরাই নয়, আগন্তুকদের মধ্যে তাদের অনুরাগী বন্ধুজনের সংখ্যাও অনেক। মশা-মাছির ভনভনানির মত একটা চাপা গুঞ্জন সারাক্ষণ উঠছে। মাঝে মাঝে তা কলরব হচ্ছে, কখনও হৈ-হট্টগোলের আকার নিচ্ছে। সেতারের রিণরিণে মিষ্টি বাজনার মত মেয়েদের খিলখিল হাসি, জানালা দিয়ে ভেসে আসছে।

ক্লাব ঘরের বারান্দার এক কোণে দেবরাজ দাঁড়িয়ে। ছাই রঙের প্যাণ্ট আর চাঁপাফুল রঙের হাওয়াই শার্ট ওর গায়ে। হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট. আঙুলের টোকা দিয়ে ছাই ঝেড়ে দেবরাজ সিগারেটটা মুখে নিল। ঘরের মধ্যে হৈ-চৈ, চেঁচামেচি: ভিড় বাঁচিয়ে নিরিবিলি একটু দম নিতে বারান্দার কোণটাকেই আশ্রয় করেছে বেচারী।

ওর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই নীপা একটু হাসল। ইঙ্গিতে দেবরাজ ওকে ডাকল। রিহার্সাল ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল,—'ওখানে গিয়ে কোন লাভ নেই,—ওয়ান রুম ম্যান', সে ঈষৎ হাসল।

রসিকতার অর্থ বুঝতে নীপার দেরি হল, 'কি বললেন যেন? ওয়ান রুম ম্যান—ওহো!' এবার নীপা হেসে ফেলল, 'একঘরে মানুষ, তাই বলুন!'

দেবরাজ সিগারেটে আর একটি টান দিয়ে সেটি অনাবশ্যক বস্তুর মত ফেলে দিল। নাক-মুখ দিয়ে কিছু ধোঁয়া বেরুল। গলা কেসে সহজ হতে চাইল দেবরাজ। বলল,—'কাল বাড়িতে ছিলেন না, কোথায় গিয়েছিলেন?'

—'কলকাতায়', নীপা ছোট্ট উত্তর দিল।

'আমরা কাল সন্ধেয় গিয়েছিলাম আপনার ওখানে। উনি বলেছেন নিশ্চয়?'

উনি অর্থাৎ নীপার স্বামী। কথাটা তার বোধগম্য হল।

দেবরাজ বলল,—'কাল আপনার কর্তার সঙ্গে আলাপ করে এলাম। ভীষণ গম্ভীর ভদ্রলোক, কথাবার্তা কম বলেন। আমার তো রীতিমত ভয় করছিল।'

—'তাই বুঝি?' নীপা কৌতুক অনুভব করল।

—'অবিনাশ নিজেই বকবক করল। পাঁচ রকম আলোচনা জুড়তে ও একটি ওস্তাদ।' গলা খাটো করে দেবরাজ শেষে বলল,—'ওর নতুন বইয়ে আপনাকে নায়িকা করতে চায় সে কথাও হয়েছে।'

নীপাকে কৌতূহলী দেখাল। কিন্তু বাহ্যিকভাবে সে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। শুধু হেসে বলল,—'আপনারা তো সাঙ্ঘাতিক লোক। আমাকে বলেই নিশ্চিন্ত মন। যেন কর্তার কাছে অনুমতি চেয়ে এলেন!'

—অনুমতি অবশ্য এখনও পাইনি, দেবরাজ স্বীকার করল। 'তবে অবিনাশ নাছোড়বান্দা লোক। ও যখন একবার ধরেছে, রাজী না করিয়ে ছাড়বে না। দরকার হলে হাতে-পায়ে ধরেও মত আদায় করবে।'

—'কি সর্বনাশ!' নীপা ছদ্ম আতঙ্ক প্রকাশ করল। 'এমন মানুষের পাল্লায় পড়লাম নাকি? একে তো কিছুতেই এড়ানো যাবে না।'

পিছনে পায়ের শব্দ। নীপা মুখ ফিরিয়ে তাকাল। অন্য কেউ নয়—চৌতি। সম্ভবত তাদের খোঁজ করতেই ও রিহার্সাল-ঘর থেকে বেরিয়েছে।

চৌতির সাজগোজ খুব। পরনে হাল্কা সবুজ রঙের একটা শাড়ি। গায়ে ম্যাচ-করা জামা। স্লিভলেস বলে সুগোল দুটি ভুজ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গলায় ওর সেই পেণ্ডেন্টওলা সোনার হারটা পরেনি চৌতি। সবুজ পাথরের একটা মালা গলায় ঝুলছে। কানেও সবুজ রঙের পাথর বসানো দুল। রীতিমত আকর্ষক বেশবাস।

ওদের দুজনকে নিরিবিলি গল্প করতে দেখে চৌতির মুখভাব বদলাল। ভ্রূ কুঁচকে সে তাকাল। অপ্রসন্ন দৃষ্টি। মুখের উপর অলক্ষ্যে একটা প্রশ্নের চিহ্ন কখন আঁকা হয়ে গেছে।

ঠোঁট উল্টিয়ে চৌতি একটা বিচিত্র ভঙ্গি করল। 'ও বাবা! নায়ক-নায়িকা দুটিতে এইখানে!'

নীপা হেসে বলল,—'রিহার্সাল শুরু হচ্ছে নাকি?'

চৌতির দু' চোখে জ্বালা। ওর মুখভাবে একটা আহত ভঙ্গি প্রকাশ পেল। শক্ত মুখ করে চৌতি বলল,—'তবু ভালো। রিহার্সালের কথা মনে পড়ল নীপাদির। আমি ভাবলাম এখানেই দাঁড়িয়ে নাটকের সংলাপ বলছিলে।'

দেবরাজ হেসে বলল,—'চৌতি ভীষণ চটে গেছে মিসেস রায়। একেবারে কালনাগিনীর মূর্তি!'

নীপা রীতিমত বিরক্ত হয়েছিল। তাই খোঁচা দেবার এমন একটা মোক্ষম সুযোগ সে ছাড়ল না। তির্যক চোখে চৌতির দিকে তাকিয়ে নীপা বলল,—'এ আপনার ভারী অন্যায় দেবরাজবাবু। চৌতি এমন কিছু কালো নয় যে, ওকে আপনি কালনাগিনীর সঙ্গে তুলনা করবেন।'

চৌতি প্রায় ফুঁসছিল। রিহার্সালে আসার আগে প্রসাধনে তার অনেকখানি সময় গেছে। মুখের উপর দু-তিন পোঁচ স্নো-পাউডারের চিহ্ন স্পষ্ট। পুরোনো বাসনকে মেজেঘষে চকচকে, ঝকঝকে করে তোলার মত তার রূপচর্চায় নিষ্ঠার অভাব ছিল না। কিন্তু নীপার কাটা কাটা মন্তব্য তার মুখখানা কালো করে তুলল। ধরা গলায় চৌতি বলল,—'রূপের অত দেমাক ভালো নয় নীপাদি। মেয়েমানুষের রূপই তার সর্বনাশ ডেকে আনে।'

নীপা বিজয়িনীর মত খিলখিল করে হেসে উঠল। জলতরঙ্গের টুংটাং বাজনার মত হাসি। বলল,—'চৌতি আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে কিন্তু, আপনি সাক্ষী রইলেন দেবরাজবাবু।'

চৌতির কাঁদ-কাঁদ মুখ। গলার স্বর প্রায় ভিজে। তবু আঘাত করতে সে শেষ চেষ্টা করল। 'শহরশুদ্ধ লোক সবাই জানে নীপাদি। রূপের গরবে তোমার কাউকে মনে ধরে না। এমনকি স্বামীকেও নয়।'

দেবরাজ বাধা দিয়ে বলল,—'কি সব বকছ চৌতি। তোমার মাথা খারাপ হল নাকি?'

চৌতির কথা নীপা গায়ে মাখল না। আগের মতই সশব্দে হেসে উঠল। গরবিনী নায়িকার মত হেলেদুলে বলল,—'চললাম দেবরাজবাবু। কালনাগিনীকে আপনিই সামলান।'

*　　*　　*

অবিনাশ এসে পৌঁছল আরো খানিকটা পর। রোদ লেগে মুখটা বেশ কালো দেখাচ্ছে। চোখটাও সামান্য লাল। রিহার্সাল তখন পুরোদমে চলছে। মাঝে পর পর দুটো সিন দেবরাজ অনাবশ্যক। সে একপাশে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখছিল।

অবিনাশ ওকে ইশারা করে ডাকল।

ঘর থেকে বেরিয়ে দেবরাজ বলল,—'কতক্ষণ এসেছ? এত দেরি হল কেন?'

ওকে টানতে টানতে নিয়ে গেল অবিনাশ। কোণের দিকের ঘরটা বেশ নিরিবিলি। সুইচ টিপে পাখাটা চালু করে দিয়ে অবিনাশ বসল।

দেবরাজ ছটফট করছিল। সে বলল,—'পরের সিনেই কিন্তু আমার পার্ট। কথাবার্তা চটপট সেরে ফেল।'

অবিনাশ মুচকি হাসল। চোখ নাচিয়ে বলল,—'মাইরি কার্তিক, পরের সিনটা আমি জানি। নায়িকাকে বুকে টেনে নিতে হবে, তাই বুঝি আর তর সইছে না?' হি-হি করে হাসল অবিনাশ।

—'বাজে কথা রাখ।' দেবরাজ মৃদু আপত্তি করল।

—'বেশ তো, কাজের কথাই বলছি বাবা।' অবিনাশ খলনায়কের মত একটা চোখ ছোট করল। 'সব খবর নিয়ে এসেছি ইয়ার। মেয়েটাকে বাগানো কিছু কঠিন নয়। বিশেষ করে তোমার মত কন্দর্পের পক্ষে।'

—'কি খবর পেয়েছ?'

ধারেকাছে কেউ ছিল না। তবু অবিনাশ সতর্ক হল। গলা খাটো করে বলল,—'মেয়েটা একখানি চীজ্। ডুবে ডুবে জল খেতে ওস্তাদ। তোমাদের নাটকের ডিরেক্টর নীলাদ্রির সঙ্গে ওর গোপন পিরীত। কলেজের প্রফেসর হবার আগে ছোকরা নিশ্চয় ওর নাগর ছিল।'

—'সে সন্দেহ কিন্তু আমার হয়েছে।' দেবরাজ ফিস ফিস করে বলল।

—'আরো শোনো।' অবিনাশ তার গোপন সংবাদের থলি উজাড় করতে চাইল। 'গিন্নীকে থিয়েটারে নামতে দিতে অম্বর রায় মত দেয়নি। একদিন রাত্তিরে স্বামী-

স্ত্রীতে প্রায় মারমার-কাটকাট হবার জোগাড়। চিৎকার, চেঁচামেচি—লোকজন ছুটে আসে এমন অবস্থা। স্বামীর আপত্তি মেয়েটা কিন্তু গ্রাহ্য করল না। প্রেমের টান গ্রহের টান। নায়িকার রোলে সে নামবে, কারো আপত্তি শুনবে না। এ-কথা নীপা রায় জোর করে বলল। রেগেমেগে অম্বর রায় ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সমস্ত রাত বাড়ি ফেরেনি।'

—'এসব খবর কোথা থেকে পেলে মাইরি?'

অবিনাশের মুখটা আত্মপ্রসাদে উজ্জ্বল দেখাল। সে বলল,—'খবর আরো দিতে পারি। কিন্তু তোমার সময় হবে তো?' রিহার্সাল-ঘরের দিকে তাকিয়ে অবিনাশ কি যেন ইঙ্গিত করল।

—'হবে, হবে!' দেবরাজের চোখদুটো উৎসাহে জ্বলজ্বল করছিল। 'তুমি একটু সংক্ষেপে বলে যাও।'

অবিনাশ বলল,—'ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভাব-ভালবাসা বলতে নেই। নিত্যদিন কলহ, খিটিমিটি। পাঁচ-ছ' বছরের উপর ঘর করছে দুজনে। কিন্তু ছেলেপুলে হয়নি। মনের শূন্যতা দূর করতে নীপা রায় অবলম্বন খুঁজছে। কলেজে ঢুকেছে, থিয়েটার করছে। মনে হয় ফিল্মে নামতেও তার আপত্তি নেই।'

—'সত্যি?' দেবরাজ উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল। 'তাহলে একটা চান্স নিতে হয় অবিনাশ।'

—'নিশ্চয়। আমার মনে হয় মেয়েটা তোমার সম্বন্ধে ইনটারেস্টেড।'

—'কেমন করে বুঝলে?'

অবিনাশ একটু হাসল। বলল,—'ওটা সিকস্থ সেন্সের ব্যাপার। কিন্তু আমার অনুমান খুব সম্ভব অভ্রান্ত। আমি সেদিনও লক্ষ্য করেছি, আজও দেখলাম। নীপা রায় তোমার মুখের উপর ঘন ঘন চোখ বুলোচ্ছিল। কেমন ইতি-উতি চাউনি। তুমি কথা বললেই ও নিবিষ্ট হয়ে ওঠে। কিছুই আমার নজর এড়ায়নি।'

একটু সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে দেবরাজ বলল, —'আজ রিহার্সাল শুরু হবার আগে মিসেস রায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করলাম। ওই আড়াল মত জায়গাটায় আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু চৈতি এসে হঠাৎ এমন হৈ-চৈ শুরু করল, মিসেস রায় কি ভাবলেন কে জানে।'

দেবরাজের পিঠে একটা ছোট চাপড় মারল অবিনাশ। প্রায় চেঁচিয়ে বলল,— 'সাবাস ভিরো। এই না হলে দেবরাজ।' পরে গলা খাটো করে সে যোগ করল—'গল্প-গুজবের মধ্যে এক-আধটু প্রেম-ট্রেমও তো হল দেখছি?'

দেবরাজ ঈষৎ হাসল, 'চৈতিটা এমন হিংসুটে মেয়ে জানো? গায়ে পড়ে মিসেস রায়ের সঙ্গে প্রায় ঝগড়া করে গেল।'

—'আহা-হা!' অবিনাশ জিভের সাহায্যে একটা চুকচুক শব্দ করল। 'চৈতি মানে সেই কালো মেয়েটি তো? তা হিংসে একটু হতেই পারে ব্রাদার। আমার তো মনে হয় চৈতিও তোমার পিছনেই ঘুরঘুর করছে। তাই ওর এত গা জ্বালা, কিন্তু নীপা রায়ের জন্য এত দুর্ভাবনা তো ভাল নয় দেবরাজ।' অবিনাশ অর্থপূর্ণ হাসল।

বারান্দায় হাল্কা চটির শব্দ পাওয়া গেল।

দেবরাজ যা ভেবেছিল ঠিক তাই। চৈতি আবার তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু এখন ওর প্রসন্ন মুখ। মেঘমুক্ত নীল আকাশের মত উজ্জ্বল হাসি।

একগাল হেসে চৈতি বলল, 'ও বাবা! তুমি এইখানে দেবরাজদা। আমি এদিকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ।' হঠাৎ অবিনাশের দিকে চোখ পড়তেই চৈতি চুপ করল।

দেবরাজ হেসে বলল, 'ইনি কে জানো চৈতি? সিনেমার ডিরেক্টর, ইচ্ছে করলে তোমাকে ওর বইতে প্লে-ব্যাক করার সুযোগ দিতে পারেন। কিংবা কোন রোলে,—'

চৈতি লজ্জা পেল। ওর কানের কাছটা বেগুনি দেখাল। 'আমি কি তেমন ভাল গাইতে পারি, যে ফিল্মে গাইব? ওসব অন্যদের জন্য।' লাজুক মেয়ের মত সে হাসল।

অবিনাশ সান্ত্বনা দিল। 'গলা তো আপনার খারাপ নয়, বরং বেশ ভালোই। রেডিওতে কেন চেষ্টা করছেন না,'

—'কে চেষ্টা করবে বলুন। একা মেয়ে-ছেলে তো কলকাতায় গিয়ে যোগাযোগ করতে পারি না। এই মহাপ্রভুকে কতদিন খোসা-মোদ করেছি। কিন্তু ইনি নির্বিকার।' দেব-রাজের দিকে লক্ষ করে চৈতি একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করল।

অবিনাশ হাসল। মেয়েটা প্রেমে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। দেবরাজ যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে ওর ডুব জল। পৌঁছতে না পেরে চৈতি শূন্যে হাত-পা ছুঁড়ছে।

দেবরাজ বলল, 'তুমি অপেক্ষা কর অবিনাশ। ডিরেকটর সাহেব এত্তেলা পাঠিয়েছেন। না গেলেই বিপত্তি।'

দেবরাজ চলে গেলেও চৈতি কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল। অবিনাশ ব্যাপারটা বুঝল। মেয়েটা তার কাছে তদ্বির করতে চায়। হয়তো আব্দারও।

নিরিবিলি ঘরে চৈতিকে একলা পেয়ে অবিনাশের মনে দুষ্টুবুদ্ধি জন্মাল। মেয়েটার সঙ্গে একটু ফষ্টি-নষ্টি করবার ইচ্ছে হল তার। এক নজরে ওকে দেখল অবিনাশ। রংটা কালো হলেও ওর ছিরি-ছাঁদ মন্দ নয়। চোখ দুটি বড়, জোড়া ভ্রূ। ঠোঁট পাতলা, টিয়াপাখির ঠোঁটের মত বঙ্কিম নাসিকা। উজ্জ্বল মুখ বলে চেহারার একটা চটকও আছে। মিথ্যে দেব-রাজের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে মেয়েটা। চোখের সামনে নীপারাণী থাকতে দেবরাজ ও দিকে ফিরেও চাইবে না।

অবিনাশ বলল, রেডিওতে গান করবার ইচ্ছে আছে আপনার?'

'কেন থাকবে না?' চৈতি ফিক করে হাসল। 'দিন না একটা চান্স জোগাড় করে। আমি শুনেছি তদ্বির-তদারক করবার লোক না থাকলে ওখানে সুবিধে হয় না।'

অবিনাশ ঠোঁটের ফাঁকে হাসল। ভরসা দিয়ে বলল, 'সে ভাবনা আমার। আপনি নিজেকে তৈরি করুন। খুব শিগ্‌গির অডি-শনের একটা ব্যবস্থা হবে।'

চৈতি খুশিতে ডগমগ। জোয়ারের মুখে ভরা নৌকোর মত চঞ্চল। চোখের একটা ভঙ্গি করে সে বলল, 'সত্যি বলছেন তো?' প্রগলভ যুবকের মত অবিনাশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিল, 'ইয়েস ম্যাডাম।'

চৈতির চোখের দিকে তাকিয়ে অবি-নাশের নেশা লাগছিল। মেয়েটা মরা মাছের মত ঠাণ্ডা বা শক্ত নয়। বরং একটু বেশী জীবন্ত। ছলাকলা জানে। ওর সঙ্গে খেলে সুখ। নীপার মত সুন্দরী না হলেও মেয়েটার মধ্যে লাইফ আছে। অবিনাশ তাই চায়।

চৈতির মুখের দিকে তাকিয়ে অবিনাশ প্রশ্ন করল, 'মিসেস রায়ের অভিনয় আপনার কেমন লাগছে?'

'ছাই অভিনয় হচ্ছে নীপাদির' চৈতি বিরক্তি প্রকাশ করল। 'অবশ্য আপনাদের কেমন লাগছে কে জানে।'

অবিনাশ চিন্তা করতে চেষ্টা করল। 'দেখুন, আমারও খুব একটা ভাল লাগছে না। তবে আমি মাত্র একদিন অভিনয় দেখেছি।' সে আড়চোখে চৈতির দিকে তাকাল।

—'নীপাদির বড্ড গুমোর, বুঝলেন? একটু সুন্দরী বলে মাটিতে পা পড়ে না। কিন্তু বাঙলাদেশে কি সুন্দরীর কিছু অভাব আছে? তবে শুধু রূপের গরব নয়, নীপাদির মনেও বিষ।'

—'সে আবার কি?' অবিনাশ কৌতূহল প্রকাশ করল।

এদিক ওদিক তাকিয়ে চৈতি একটু সাব-ধান হতে চাইল। চিন্তিতমুখে বলল, 'রিহার্সালের শুরু থেকে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করছি। দেবরাজের উপর নীপাদির নজর পড়েছে, কি কাণ্ড দেখুন? —তুমি ঘরের বউ, না হয় দশজনের সঙ্গে থিয়েটার করছ। তাই বলে সুন্দর পুরুষ দেখলেই তাকে নজরবন্দী করতে চাইবে।'

নজরবন্দী কথাটা শুনেই অবিনাশের হাসি পেল। হি-হি করে হেসে সে বলল, 'নীপাদেবী মন্তর-টন্তর জানেন নাকি? দেবরাজকে উনি বশ করে ফেলেছেন বলে আপনার মনে হয়?'

—'কি জানি। তবে নীপাদি একটা সাঙ্ঘাতিক মেয়ে। ওর ফাঁদে পা দিলে আর নিস্তার নেই।' চৈতি মন্তব্য করল।

ঘরের বাইরে ভারী পায়ের শব্দ শুনে অবিনাশ তাকাল। মস্তান গোছের এক ছোকরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। এক মাথা চুল, কানের লতি পর্যন্ত জুলপীর বাহার। চোখ দুটি ঈষৎ লাল। মণিবন্ধে চওড়া কালো ব্যান্ড লাগানো ঘড়ি।

ওকে দেখে চৈতি সহাস্যে বলল,— 'কেয়া খবর হরিপ্রকাশ? রিহার্সাল দেখতে ভালো লাগল না।'

অবিনাশ বুঝতে পারল লোকটা অবাঙালী। চৈতির সঙ্গে জানাশুনো এবং সেই সুবাদেই টাউন ক্লাবে নাটকের মহলা শুনতে এসেছে। কিন্তু তার দিকে ছোকরা অমন কটমট করে তাকিয়ে কেন?

হরিপ্রকাশ সম্ভবতঃ বাংলা বোঝে এবং মোটামুটি বলতেও পারে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে বলল,—'হামি যাই। রাতমে ফিন ডিউটি আছে।'

চৈতি হাত বাড়িয়ে ওকে থামাল। 'দাঁড়াও আমিও যাব তোমার সঙ্গে। নীলাদ্রি-বাবু বলেছেন আজ শুধু অভিনয়। গান-টান হবে না।'

অবিনাশের দিকে ফিরে চৈতি হাত তুলে নমস্কার করল।

'পরে নিশ্চয় আমাদের দেখা হবে।' অবিনাশ হাসতে হাসতে বলল।

সে ভেবেছিল রাস্তা পর্যন্ত চৈতিকে এগিয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু হরিপ্রকাশ ওর পাশে হাঁটছে। ছোকরার চওড়া কাঁধ, বেশ ভারী পা আর শক্ত দুটি হাত। একটু আগে ছোকরা তার দিকে কটমট করে তাকিয়েছিল। অবিনাশ আর পা বাড়াতে সাহস করল না।

• •

সাড়ে পাঁচটার কাছাকাছি হতেই নীপা উঠল। রিহর্সালও এবার ফুরোতে চলল। শেষের কটা দৃশ্যে নীপার ভূমিকা নেই। নাটকের প্রায় মাঝামাঝি তার অভিনয়ের ইতি—।

নীলাদ্রির দিকে একটু ঝুঁকে নীপা ফিস ফিস করে বলল। রিহার্সালের মাঝখানে উঠে যেতে হলে ডিরেক্টারের অনুমতি নেওয়া নিয়ম। নীলাদ্রি মাথা হেলিয়ে সম্মতি দিতেই নীপা উঠল।

বারান্দাটা ফাঁকা। রিহার্সাল দেখতে

যারা এসেছিল তাদের অনেকে চলে গেছে। যারা যায়নি তারা এখনও ভিড় করে নাটকের মহড়া দেখছে। শেষ হবার আগে আর কেউ উঠবে বলে নীপার মনে হল না।

বারান্দা থেকে নামলেই গালিচার মত সবুজ মাঠ। বর্ষার জলহাওয়া পেয়ে আগাছার জঙ্গল, এখানে সেখানে গজিয়ে উঠেছে। বিকেলের আকাশ ফটফটে নীল। মুখ উঁচু করে নীপা দেখল, বেলা প্রায় গেছে। সূর্য ডুবতে আর বাকী নেই। দূরে একটা তেঁতুল গাছের মগডালে পাত্রের তলানির মত এক চটকা রোদ্দুর।

নীপা দ্রুত পায়ে হাঁটছিল। ভয় পেলে মানুষ যেমন জোরে হাঁটে, সে তেমনি লম্বা পা ফেলে তাড়াতাড়ি যাবার চেষ্টা করল। উৎকট সেই ভয় এবং চিন্তাটা এখন তার মনের মধ্যে ঈশান কোণের মেঘের মত জোর কদমে বাড়ছে। ছেলেবেলায় ভূতের গল্প শুনলে ঠিক এমনি অবস্থা হত। কয়েকদিন ধরে একটা ভয়ভাবনা তার মনে ফুলত, ফাঁপত। দিনমানে সে ডাকাবুকো। কোনো ভয়ডর ছিল না। কিন্তু সন্ধ্যে হবার সময় তার বুকটা কেঁপে উঠত। গল্পের সেই ভূত-প্রেতগুলো অন্ধকারে জন্ম নিত। মনের মধ্যে ভয়টা চেপে বসত, কিছুতেই সরত না। আজও নীপার অবস্থাটা তেমনি। সারাদিন সে বেশ ছিল। ভয়ভাবনা বা দুশ্চিন্তার ছায়ামাত্র নেই। কিন্তু বিকেল ফুরিয়ে আসছে দেখেই তার মনের মধ্যে সেই অস্বস্তিটা সদ্য-ফোটা একটা ব্যথার মত টনটন করে উঠল।

বাড়িতে ঢুকে নীপা একমুহূর্তও দেরি করল না। অম্বর এখনও হাসপাতাল থেকে ফেরেনি। দুঃখহরণ এইমাত্র কয়লা ভেঙে উনুনে আঁচ দেবার উদ্যোগ করছে।

নীপাকে দেখে সে বলল,—'দিদিমণি, চা খাবেন নাকি? এক কাপ জল বসিয়ে দিই স্টোভটায়।'

—'চা করবার এখন দরকার নেই।' নীপা মাথা নেড়ে জবাব দিল। 'আমি আবার বেরুব একটু। আধ ঘণ্টাটাক পরে ফিরছি। তুই তত-ক্ষণ আঁচ দিয়ে অন্য কাজগুলো সেরে রাখ।'

আলমারীর চাবি ঘুরিয়ে নীপা ওর ক্যাশ-বাক্সটা বের করল। পাঁচ-সাতটা খোপ আছে বাক্সটায়। দু-তিনটে খোপে তার কিছু গয়নাগাটি, একটা খোপে উজ্জ্বল চকচকে সিকি, আধুলি এবং কয়েকটা রুপোর টাকা। একদিকে বাণ্ডিল করে রাখা কতকগুলি নোট। নীপা গুনে গুনে দেড়শ টাকা তুলে তার ব্যাগে ভরল। বাক্সটা বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে নীপা কিছু ভাবল। রক্তচোষা জোঁকের মত লোকটা ফি মাসে তার কাছ থেকে একগাদা টাকা নিয়ে যাচ্ছে। শত্রুর কাছে মুখ বুজে মার খেয়ে মানুষ যেমন গালিগালাজ, অভিসম্পাত করে, নীপা তেমনি মনে মনে লোকটার সর্বনাশ কামনা করল।

নদীটা শহরের পিছন দিকে। নীপাদের বাড়ি থেকে দূরে নয়,—বড় জোর পাঁচ মিনিটের পথ। এদিকটা নির্জন, লোকজন কম। একটা পুকুরের পাড় বেয়ে রাস্তাটা নীচে নেমেছে। তারপরই রেলের একটা লেভেল-ক্রসিং। সেটা পেরোলেই দুপাশে ঝোপঝাড়, চেনা-অচেনা গাছপালা। কিছু দূরে একটা রাইস মিলের চিমনি থেকে কালো ধোঁয়া উড়ছে। অনেকটা পিঠের উপর ছড়ানো মেয়েদের এলোচুলের মত ধোঁয়াটা বাতাসে ভাসছে।

নির্দিষ্ট সেই গাছটার নীচে এসে নীপা আশ্চর্য হল। কেউ কোথাও নেই। কিন্তু মানুষটার তো এখানেই অপেক্ষা করার কথা। তবে কি সে অন্য কাজে আটকা পড়ল?

গাছের নীচে প্রায় অন্ধকার। চারপাশ নির্জন, নিস্তব্ধ। একটা পাতা নড়ার শব্দও কানে এল না। অনেক কষ্টে নীপা তার হাত-ঘড়ি দেখল। সাড়ে ছটার মত। আর কতক্ষণ সে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে? অন্ধকারে ভূতের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা কি কোনো মেয়ের পক্ষে সম্ভব?

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন তার কোমরটা জড়িয়ে ধরল। নীপার গলা থেকে হুইসিলের কাঁপা আর্তনাদের মত একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর বেরোতেই তার কানের কাছে সে বলল,—'ভয় পেয়ো না, আমি।' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুটি তপ্ত ওষ্ঠ তার ঘাড়ের কাছের নরম চামড়াটা স্পর্শ করল। নীপা বুঝতে পারল, লোকটা তাকে চুমু খেতে চায়।

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলল,—'এসব কি হচ্ছে? তোমার যা প্রয়োজন তাই নিয়ে বিদেয় হও—'

হি-হি করে লোকটা হাসল। বলল,—'মেজাজ দেখিও না মাইরি। আমি শালা এমনিতে ভালোমানুষ। কিন্তু মেজাজ দেখালেই বাপের কু-পুত্তুর।' একটু থেমে লোকটা বলল—'টাকাটা গুনেছ তো?'

নীপা ভয় পেয়েছিল। কিন্তু লোকটাকে তা জানতে দিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে সে বলল,—'কিন্তু এভাবে ফি-মাসে টাকা জোগানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঘুষ দিয়ে তোমার মুখ বন্ধ রাখতে আমি পারব না। তোমার যা ইচ্ছে হয় কর—'

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে নীপা টাকাগুলো বের করল। পুরো দেড়'শ টাকা। হাত বাড়িয়ে লোকটা তাই নিল। সেগুলি পকেটে ভরে বলল, —'এক থোকে যদি আমাকে কিছু টাকা দাও, তাহলে তোমার কাছে আর নাও আসতে পারি।'

—'তোমাকে বিশ্বাস কি? এর আগেও তো কত টাকা নিয়েছ। প্রতিবারেই তোমার এক কথা,—সামনের মাস থেকে আর নয়। কিন্তু আবার সেই উৎপাত।' নীপা সন্দিগ্ধচোখে তাকাল।

লোকটা রাগল না, বরং হাসল। বলল,—'আর একবার না হয় পরীক্ষা করে দেখ।'

—'কত টাকা চাই?' নীপা নাক উঁচু করে প্রশ্ন করল।

—'জ্যাকসন লেনে একটা দোকানঘর বিক্রী হবে। এক বন্ধুর সঙ্গে ভাগে কারবার করব ভাবছি। কিন্তু হাজার দুই টাকার কমে অংশীদার হওয়া যাবে না।'

—'দু হাজার? অত টাকা আমি কোথায় পাব—' চোখ দুটো প্রায় কপালে উঠল তার।

লোকটা দৃঢ়কণ্ঠে বলল,—'তুমি সরকারী ডাক্তারের বউ। দু হাজার টাকা তোমার কাছে বেশী, একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে?'

নীপা হতাশ ভঙ্গি করল। 'অসম্ভব। দু হাজার টাকা বের করা আমার কম্মো নয়।' নীপা স্পষ্ট জানাল।

কথা বলতে বলতে ওর সঙ্গেই নীপা হাঁটছিল। বেশ ঘুটঘুটে, গা-ছমছম করা অন্ধকার। পাশে একটা মানুষ থাকলে তবু খানিকটা সাহস। নির্জন অন্ধকার পথে একলা মেয়েমানুষের বিপদ হতে কতক্ষণ?

লেভেল ক্রশিংটার কাছে আসতেই শক্তিশালী একটা টর্চের আলো তার মুখে পড়ল। ভয় পেয়ে নীপা প্রায় চেঁচিয়ে বলল, —'কে ওখানে? মুখের উপর টর্চের আলো ফেলছেন কেন? আচ্ছা অসভ্য লোক তো—' টর্চ নিভিয়ে সে এগিয়ে এল। মানুষটাকে দেখে নীপা লজ্জা এবং বিস্ময়ে থ। অন্য কেউ নয়,—প্রফেসর অনিমেষ দত্ত।

জিভ কামড়ে নীপা বলল,—'স্যর, আপনি?'

একটা অস্বস্তিকর বেকায়দা অবস্থা। সম্ভবত প্রফেসর দত্ত তা বুঝতে পেরেই ব্যস্ত হয়ে বললেন—'এদিকে এসেছিলাম একটু দরকারে। রাইস মিলে কিছু টাকা দিতে বাকী ছিল। আচ্ছা চলি এখন।' প্রফেসর দত্ত টর্চের আলো ফেলে লেভেল-ক্রশিংটা পেরোলেন। পুব দিকের রাস্তা ধরে আলোটা শহরের দিকে এগোল।

অন্ধকারের মধ্যেও নীপা লক্ষ্য করল। প্রফেসর দত্তের মুখটা কেমন যেন,—ভ্যাবা-চাকা, বিচলিত ভঙ্গি। সন্ধ্যার নির্জন অন্ধকারে তার ছাত্রীকে একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে আবিষ্কার করে অনিমেষ দত্ত কি নিজেকেই অপরাধী মনে করলেন? কিন্তু তাদের দেখে অমন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কেন? লজ্জা পেয়ে ভদ্রলোক কি পালিয়ে গিয়ে হাঁফ ছাড়লেন?

মাথা তুলে সঙ্গীকে নীপা বলল, —'উনি আমাদের কলেজের প্রফেসর। কি ভাবলেন কে জানে। তুমি তো চেনো—'

লোকটা কখন সিগারেট ধরিয়েছে। লম্বা একটা টান দিয়ে সে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—'চিনি বৈকি,—বিলক্ষণ চিনি। কিন্তু তোমাকে দেখে মাস্টারমশায় অমন বমকে পালালেন কেন?'

(চলবে)

মানুষগড়ার ইতিকথা

মাত্র সাতষট্টি দিন আগের ব্যাপার। তারিখটি ভুলিনি—১৪ সেপ্টেম্বর। ভোরবেলাই রওনা হলাম। যাদবপুর থেকে ক্যানিং, চার বগি বা আট বগির বড় ট্রেনে বড়জোর একঘন্টা। স্টেশনেই দেখা হোল রমাপদর সঙ্গে। রমাপদ দাস স্কুলের ল্যাবরেটরী অ্যাসিস্ট্যান্ট। হেড মাস্টারমশাই আগেই বলেছিলেন ক্যানিংয়ে লোক থাকবে। এসব কথাবার্তা হয়েছিল সতেরোই আগস্ট। দেখলাম একমাসের ব্যবধানেও মনোরঞ্জনবাবু ভোলেন নি কিছুই। রোগা, ছিপছিপে রমাপদ হাত বাড়িয়ে হাতের বোঝাটা টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল : কোন লঞ্চে যাবেন? সাড়ে নটার না বারোটারটায়? তিনঘন্টা ক্যানিংয়ে কাটিয়ে কি লাভ? তাই বললাম—হাতের কাছে যেটা আছে তাতেই যাব। তারপর পনেরো মিনিটের ক্রস কান্ট্রি রেসে রেকর্ড সময় রক্ষা করে যখন লঞ্চঘাটায় পৌঁছলাম দেখি জোরে জোরে ঘন্টা বাজছে—টিং টিং টিং...। ছাড়বার দেরী নেই আর। ঘন্টার আওয়াজ ঘাট ছাড়িয়ে সরু বাঁধের ওপর দিয়ে দূরে বহুদূরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মোট মাথায় ব্যাপারীরা সরু পিচ্ছিল বাঁধের ওপর রোপওয়াকের খেল দেখাতে দেখাতে ছুটে আসছে। এই লঞ্চ মিস করলে আবার সেই বারোটায়। কেউ যাবে নারায়ণতলা বা রাঙাবেলিয়া, সোনাখালি, কেউ বা গোলাবাড়ি, সন্দেশখালি, কেউ যাবে বাসন্তী, হোগলডুগরী, পাঠানখালি। কেউ কেউ যাবে চন্ডীপুর, সূর্যপুর বা মসজিদবাটি। আর আমি যাব গোসাবা। টিং টিং টিং টিং......বেশ জোরে জোরে বাজছে ঘন্টা। হঠাৎ জল চিরে শব্দ উঠল ভট, ভট ভট ভট......লঞ্চ ছেড়েছে। প্রথমে সামান্য ব্যাক করে তারপর আড়াআড়ি মুখ ঘুরিয়ে লঞ্চ ছুটে চলল গোসাবার দিকে—স্যর ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটনের গোসাবা।

সময় জেনে নিয়েছি—প্রায় তিনঘন্টা লাগবে। সময়টা কাজে লাগাতে খুলে বসলুম মনোরঞ্জনবাবুর দেওয়া একটি চটি বই। মলাটে বড় বড় হরফে লেখা "মহাপ্রাণ স্যর ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটন" তলায় ক্ষুদে হরফে ঠিকানা দেওয়া হয়েছে—"স্যর ড্যানিয়েল হ্যামিলটন এস্টেট, গোসাবা, ২৪ পরগণা।" লেখক শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য, এস্টেটেরই প্রাক্তন কর্মচারী। 'স্কটল্যান্ডের পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরে স্কটল্যান্ডের অন্তর্গত আরান...নামে একটি ছোট দ্বীপ আছে। এই আরান দ্বীপে অবস্থিত হেলেনবার্গ সহরে ম্যাকিনন পরিবারের বাস। এই পরিবারটি ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা বিশেষভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তৃত।.. ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটন এই সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৬০ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর ৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জন ম্যাকিনন হ্যামিলটন।"

ছেলেবেলাতেই বাবা-মাকে হারান ড্যানিয়েল। মাত্র বারো বছর বয়সে পারিবারিক কোম্পানীর স্কটল্যান্ড অফিসে ডেসপ্যাচ ক্লার্ক হিসাবে জয়েন করেন। স্কুল-কলেজ ইউনিভার্সিটির ছকবাঁধা এডুকেশন তিনি পান নি। ক্লার্কের কাজের ফাঁকে ফাঁকে নাইট স্কুলে পড়েছেন যাতে প্রকৃত শিক্ষার মহাসড়কে একদিন নিজেই পা ফেলে হাঁটতে পারেন।......দেখতে দেখতে আটটি বছর কেটে গেল। কোম্পানী ড্যানিয়েলের কাজে খুশী হয়ে তাঁকে বোম্বে অফিসের ইনচার্জ করে পাঠাল ভারতবর্ষে, ১৮৮০ সাল। তারপর কেটে গেছে আঠাশ বছর। এই আঠাশ বছরে ডেসপ্যাচ ক্লার্ক হয়ে উঠেছেন এই বিশাল কোম্পানীর সিনিয়র পার্টনার। বার কয়েক হয়েছেন চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট। বড়লাটের শাসন পরিষদেরও তিনি সদস্য হয়েছিলেন। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে ইংরাজ সরকার তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন।

এর ঠিক তিন বছর আগের কথা। তেইশটি বছর কেটে গেছে তাঁর এদেশে। এদেশের অসহনীয় দুঃখ দারিদ্র্যের স্পষ্ট ছবি বার বার তাঁর মনে ছাপ ফেলে গেছে। দেশ দেখে বেড়ানো ছিল তাঁর মস্ত নেশা। এই নেশাই তাঁকে বার বার ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে টেনে নিয়ে গেছে। জাত ব্যবসায়ী স্কচেরও প্রাণ কেঁদে উঠেছে এক সুমহান ঐতিহ্যের অপমৃত্যুতে। বার বার নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন—কেন পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যদেশের আজ এই দশা। শেষ পর্যন্ত আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেয়েছেন রাজর্ষি অশোকের শিলালিপিতে—"মহৎ ও ক্ষুদ্র সকলেই যেন চেষ্টাবান হয়।" এই চেষ্টার অভাবেই ভারত আজ দীন হীন। ভারতাত্মার জাগরণ সম্ভব শুধু মহৎ ও ক্ষুদ্রের চেষ্টার সমন্বয়ের দ্বারা। সমবেত চেষ্টার ভিত্তির ওপর অশোকের অনুশাসন অনুযায়ী নতুন ভারত গড়ে তোলা সম্ভব—আর কোন পথ নেই। কৃষি প্রধান ভারতকে বাঁচাতে হলে সবার আগে দরকার

গোসাবা আর আর আই হাইস্কুল

তার মুমূর্ষু গ্রামগুলিকে জাগিয়ে তোলা। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের আরাম দ্বীপের স্কচ সাহেব তাই সরকারের কাছে আবেদন জানালেন—আমাকে তোমরা এক-টুকরো জমি দাও, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। আবেদন মঞ্জুর হোল। পোর্ট ক্যানিং থেকে জলপথে আঠাশ মাইল দক্ষিণে সুন্দরবনে গোসাবা দ্বীপটি চল্লিশ বছরের লীজে ড্যানিয়েলের হাতে তুলে দিলেন সরকার, ১৯০৩ সাল।

সমুদ্রের নোনাজল অসংখ্য খালপথে অকটোপাসের মত জড়িয়ে আছে গোসাবা আর তার সংলগ্ন রাঙাবেলিয়া ও সাত-জেলিয়া দ্বীপ তিনটিকে। দ্বীপময় অরণ্যের রাজা তখন দক্ষিণ রায়, দক্ষিণ-বঙ্গের আরাধ্যদেবতা আমাদের চিরপরিচিত রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর। মানুষজন বলতে কেউ নেই। শুধু মাঝে মাঝে কাঠুরে, মউয়ালী আর শিকারীরা আসে কাঠ, মধু ও হরিণের মাংসের লোভে। যোগাযোগের একমাত্র ব্যবস্থা নৌকা। লঞ্চটঞ্চ তখন কোথায়। শুরু হোল এক আশ্চর্য এক্সপেরিমেন্ট, যা কিনা আধুনিক কালে কোন ভারতীয় করেন নি। করেছেন এদেশে ইংরেজী শিক্ষার আদি প্রবর্তন ডেভিড হেয়ার-এরই জাতভাই ড্যানিয়েল হ্যামিলটন।

শুরু হয়ে গেল কাজ। সবার আগে বনকেটে মানুষের বসতি গড়ে তুলতে হবে। নদী ও খালের ধারে ধারে দিতে হবে বাঁধ, কাটতে হবে জঙ্গল। করবে কারা? লোক কৈ? আশে পাশে কোথাও তখন নেই কোন জনবসতি। যা বা দু-চার ঘর আছে, কেউ চায় না আসতে। যেচে কে বাঘের মুখে প্রাণ হারাতে চায়? এককোঁটা খাওয়ার জল নেই। রোগে পড়লে এককোঁটা ওষুধ যে পাবে তার পর্যন্ত উপায় নেই। কি দরকার, সাহেবের শখ হয়েছে, সাহেবই মেটাক। ড্যানিয়েল কিন্তু মোটেও দমলেন না। অনেক কষ্টে প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে যোগাড় করলেন প্রথম দল উপ-নিবেশকারীদের। সরকারের সঙ্গে যোগা-যোগ করে দীর্ঘমেয়াদী অপরাধীদের মুক্তির বিনিময়ে নিয়ে গেলেন গোসাবায়। শুরু হয়ে গেল বাঁধ বাঁধা ও জঙ্গল কাটার কাজ। ছ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ফসল ফলাতে শুরু করল। দশ হাজার বিঘা জমির জঙ্গল সাফসুতরো হয়ে আবাদযোগ্য হয়ে উঠেছে। যে জঙ্গলে ছ বছর আগেও কোন জনপ্রাণী ছিল না সেখানে লোকসংখ্যা দাঁড়াল ন'শ। তবু কেউ আসতে চায় না। বোঝে না সাধারণ মানুষ সাহেবের উদ্দেশ্য। তারা মহাজনের খেরোখাতায় সর্বস্ব জমা করে নিঃস্ব হয়ে সারাটা জীবন খেটে মরবে তবু যাবে না গোসাবার উদার আকাশ ছোঁয়া সদা জঙ্গল-হাসিল উদার মাঠে লাঙল ঠেলতে। ড্যানিয়েল একটুও হতাশ হলেন না। কোনদিনই বা কোন বৈজ্ঞানিক তাঁর প্রাথমিক পথ-পরিক্রমায় হতাশ হয়েছেন? শুরু হোল দ্বিতীয় কিস্তির কাজ।

আবাদী জমিতে মানুষ যাতে খাবার জলটুকু পায় তাই গাঁয়ে গাঁয়ে পুকুর কাটালেন সাহেব। অসুখে রোগে বিনা চিকিৎসায় যাতে বেঘোরে প্রাণ না হারায় তাই খুললেন দাতব্য চিকিৎসালয়। আর এ অঞ্চলে কেউ যা কোনোদিন শোনে নি, সেই স্কুল খুললেন একটি। অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল—চাষীর ছেলে যেখানে লেখা-পড়া শিখবে, সুস্থ জীবনযাপনের গোড়ার পরিচয়টুকু যাতে পায় তারই আয়োজন। কোন পয়সা লাগবে না। সব খরচ এস্টেটের। এসব ১৯১০ সালের কথা।

দেখতে দেখতে গাঁয়ে গাঁয়ে প্রাইমারী স্কুল খোলা শুরু হোল। প্রতিটি স্কুলের খরচ-খরচার দায়িত্ব নিল এস্টেট। দিনের বেলায় চাষীর ছেলে যে স্কুলে পড়ে রাতে সেখানেই চাষী স্বয়ং শিক্ষালাভের প্রথম সুযোগ পেল। দিন ও রাত্রি দুবেলাই সমানে স্কুল চলতে লাগল।

স্কুলের শিক্ষা যাতে চর্চার অভাবে হেলায় নষ্ট না হয় তাই ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার খুলে দিলেন ড্যানিয়েল। শুধু স্কুল ও লাইব্রেরী খুলেই ক্ষান্ত হন নি সাহেব। তিনি জানতেন গরীব স্কুল-টিচারদের ওপরেই নির্ভর করছে তাঁর পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের সম্ভাবনা। কারণ তাঁরাই শিক্ষার বীজ বুনে চলেছেন। একদিন চষা খেতে ফসল ফলবেই। সেদিন যদি চাষীর কানে বলা যায় মহৎ ও ক্ষুদ্রের যৌথ চেষ্টার কথা, সমবায়ের কথা, সহ-যোগিতার কথা তাহলে আর তারা মুখ ফেরাতে পারবে না। কারণ শিক্ষাই তাদের সমবায়ের সার্থকতার প্রকৃত রূপটির সঙ্গে পরিচয় ঘটাবে। তাই নিয়মিত বেতন ছাড়াও "প্রাথমিক শিক্ষকগণের জীবনযাত্রা নির্বাহ ভালভাবে যাতে হয় এবং তাঁদের কোন রকম অভাব না হয়, সেজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংলগ্ন তিন বিঘা জমি প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে দান করা হলো। এ জমি হলো ছাত্র-ছাত্রীদের কৃষি পাঠশালার মত। এখানে তারা হাতে-কলমে শিখতে পায় কৃষির কাজ। তদুপরি শিক্ষকদের স্বতন্ত্রভাবে দিলেন দশ বিঘা জমির উপস্বত্ব।"

শুধু তাই নয় প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ ঠিকমত চলছে কিনা তা দেখাশোনার জন্য কলকাতার সেন্ট মার্গারেট স্কুলের জিম হোয়াইটকে সাহেব নিয়ে এলেন গোসাবায়। তাঁর থাকার জন্য লঞ্চঘাটার কাছেই একটা একতলা ছোট বাড়ি বানানো হোল। গোসাবার সবার পরিচিত এই বাড়িটিই জিম হোয়াইটের বাড়ি। অপভ্রংশ হোয়াইট হাউস।

একটানা তিনঘণ্টা ধরে লঞ্চের ভট ভট আওয়াজে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিলাম। টেরই পাই নি কখন পৌঁছে গেছি। রূপদার ডাকে চমকে উঠে বই বন্ধ করলাম। লঞ্চ চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। মট মড়ম চড়ম মট কিছু। তার মানে এবার তুমি ওঠ। বই বন্ধ করে, ব্যাগ ধরে কাঠের সরু পাটাতনে নদী ও লঞ্চের সামান্য গ্যাপটুকু পার হয়ে জেটি ছাড়িয়ে পা দাও মাটিতে। যে মাটির প্রতিটি কণায় জড়িয়ে আছে শুধু একটি মানুষের স্মৃতি —স্যার ড্যানিয়েল ম্যাক্কিনন হ্যামিলটন।

জেটির মুখেতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন করুণাবাবু। করুণানিধান মুখোপাধ্যায়। মুর্শিদাবাদের এই মানুষটিই আজ হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট। পাতলা, ছিপ-ছিপে মানুষটির পরনে ধুতি, পাঞ্জাবী, পাম্পশু। খোঁচা খোঁচা চুলে, খাড়া নাক মুখ চোখে এক আশ্চর্য দৃঢ়তার আভাষ। পরে পেয়েছি মানুষটির খাঁটিত্বের আর এক পরিচয়। সে কথা পরে বলা যাবে।

লঞ্চঘাটা থেকে শুরু হল আবার অতীত পরিক্রমা। ঐ তো দূরে একতলা ছোট বাড়িটি—হোয়াইট হাউস। মিস হোয়াইট দশ বছর ছিলেন এই দ্বীপে, ১৯১০ থেকে ১৯২০। এই দশ বছরে কত পরিবর্তন এসেছে এই উপনিবেশে। পোস্ট অফিস বসেছে। চ্যারিটেবল ডিসপেনসারীর রূপান্তর ঘটেছে—এস্টেটের খরচে বিনা ব্যয়ে ডাক্তার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা করে চলেছেন। চাষাবাদের সুবিধার জন্য উন্নতজাতের গবাদি পশু এস্টেট বাইরে থেকে কিনে এনে সস্তায় চাষীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। খোলা হয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় তেল, ডাল, নুনের জন্য সমবায় ভান্ডার। মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচার থেকে চাষীদের রক্ষার জন্য তাঁদের নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে খোলা হয়েছে কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও ব্যাঙ্ক। হাজার হাজার বিঘা নতুন জমিতে শুরু হয়েছে চাষাবাদ। লোকসংখ্যা বেড়েছে প্রচুর। ১৯২০ সালের সেনসাসে দেখা গেল ছাব্বিশ হাজার বিঘা জমি নোনাজল ও জঙ্গল থেকে উদ্ধার পেয়ে সোনার ফসলে ভরে গেছে। পাঁচ হাজার মানুষ এই জমিতে তাদের ভাগ্য সমর্পণ করেছে।

পরিবর্তনের চাকা গড়িয়ে চলে। লঞ্চঘাটা ছেড়ে গোসাবাহাটের মধ্য দিয়ে করুণাবাবুর সঙ্গে আমি এগিয়ে চলি স্কুলের দিকে। রাস্তার ডানদিকে পড়ল বিখ্যাত সেই বাংলো বাড়ি, যে বাড়িতে স্যার ও লেডি হ্যামিলটন বহু শীত কাটিয়ে গেছেন। বাংলো ছাড়িয়ে শ দুই গজ উজিয়ে রাস্তার ডানহাতেই পড়ল গোসাবা এস্টেটের প্রাণকেন্দ্র—দোতলা কাছারি বাড়ি। এই বাড়িতে বসেই স্যার ড্যানিয়েলের সুযোগ্য সহকারী সুধাংশু-ভূষণ মজুমদার চার যুগেরও বেশী সময় ধরে গোসাবার বিবর্তিত ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এই বাড়িতেই ছিল কো-অপারেটিভ সোসাইটি, সমবায় ভান্ডার, ধর্মগোলা, চ্যারিটেবল ডিসপেন-সারী, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ও চৌদ্দটি প্রাইমারী, দুটি জুনিয়ার হাই ও একটি

হাইস্কুল ও রুরাল রিকনসট্রাকশন ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর।

বড় হুড়মুড় করে এগিয়ে যাচ্ছি। আর একটু আস্তে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কথা তো আগেই বলেছি। এম-ই স্কুল কবে হোল? কেন গোসাবা মিডল ইংলিশ স্কুল খোলা হয়েছে ১৯২৩ সালে। তখন অবিশ্যি মিস হোয়াইট আর নেই। তার জায়গায় এসেছেন ম্যাকেঞ্জি সাহেব। ম্যাকেঞ্জি সাহেবের চেষ্টায়, সার ড্যানিয়েলের উৎসাহে ও সুধাংশুবাবুর পরামর্শে গড়ে উঠল এ অঞ্চলের প্রথম মিডল ইংলিশ স্কুল। ধীরে ধীরে শিক্ষার যে প্যাটার্ণের কথা স্যার ড্যানিয়েল মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন তাই শতদল পদ্মের মত বিকশিত হোতে শুরু করেছে। প্রথমে হোল প্রাইমারী স্কুল, তারপর মিডল ইংলিশ। এবার সাহেবের হ্যাট থেকে কি বেরোয় দেখা যাক।

পথেই দেখা হোল মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গে। করুণাবাবুকে লঞ্চঘাটায় পাঠিয়ে স্কুলে সহকর্মীদের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন। দেরী দেখে নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন। পথে কোন কষ্ট হয় নি তো? মাস্টারমশায়ের প্রশ্নের মধ্যেই উদ্বেগ ফুটে ওঠে। আজ্ঞে না, বিন্দুমাত্র না—চলুন স্কুলে যাওয়া যাক।

পৌঁছে গেলাম স্কুলে। কাছারিবাড়ি ছাড়িয়ে কয়েক শ গজ উত্তরে রাস্তার ধারেই গোসাবা আর, আর, আই হাইস্কুল। ডানহাতে স্কুল। বাঁ হাতে হোস্টেল। এই স্কুল, এই হোস্টেল, এই স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষক সব কিছুর সঙ্গে সূক্ষ্ম স্মৃতিকণার মত জড়িয়ে আছেন সার ড্যানিয়েল। গোসাবা এস্টেটের অন্য আর সব প্রসঙ্গ থাক, শুধু স্কুলের কথাই বলি। এম-ই স্কুল স্থাপনের ঠিক দশটি বছর পরেই হ্যাট থেকে বেরুল সাহেবের সবচেয়ে সাধের পরিকল্পনা—পল্লী সংগঠন।

"সার ড্যানিয়েল এ দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে গলদ সম্পর্কে সর্বদা অবহিত ছিলেন," লিখেছেন কালীপদবাবু, "যে শিক্ষা মানুষকে স্বাধীনবৃত্তি গ্রহণে এবং গৃহস্থ জীবনের পক্ষে উপযুক্ত মানসিকতা সৃষ্টি করে না—সে শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে দেশে কতকগুলি শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি করে। স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে সহায়ক হয় এমনতর শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে দেশে প্রচলিত হয়, সেজন্য তিনি সর্বদা যত্নশীল ছিলেন।... তিনি মনে করতেন যে, একজন যুবক নিজের খাদ্য উৎপাদন করতে পারে। নিজের পরণের বস্ত্র প্রস্তুত করতে পারে এবং নিজের বসবাসের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করতে পারে— এইভাবে সে নিজের জীবনযাত্রাকে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করার শিল্প আয়ত্ত করতে পারে। ঠিক এইভাবে একটি যুবকদল সামবায়িক প্রণালীতে ক্রমে কৃষি ও কুটির-শিল্পের মাধ্যমে এই স্বাধীন জীবিকা, স্বাবলম্বন বৃত্তির শিক্ষাকে আয়ত্ত করে নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে।" এই উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হোল গোসাবা রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ইনস্টিটিউট, ১৯৩২ সাল। ইনস্টিটিউটের একতলা বাড়িটি তৈরী হতে প্রায় দু বছর সময় লেগেছিল। বাড়ি উঠতেই চৌত্রিশ সাল থেকে কাজ শুরু হোল। "এখান থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের আই-এল-এ (আর্ট অব ইনডিপেনডেনট লাইভলিহুড), অর্থাৎ স্বাধীন জীবিকা-বৃত্তি উপাধি দেওয়ার ব্যবস্থা হোল।... ডেনমার্কের পল্লী শিক্ষা ব্যবস্থার মত সমবায়ের নীতির ভিত্তিতে শিক্ষারীতি সার ড্যানিয়েল এখানেই প্রথম প্রবর্তন করেন।"

এই স্কুলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সারা ভারতের বহু নামী পুরুষকেই স্যার ড্যানিয়েল আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আসার কথা ছিল। পারেন নি বলে প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাদেব দেশাইকে পাঠিয়েছিলেন। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ড্যানিয়েলের নিয়মিত পত্রালাপ চলত। একবার রবীন্দ্রনাথ, সম্ভবত উনত্রিশ সালে, তাঁর আমন্ত্রণে গোসাবায় এসেছিলেন। গোসাবা এস্টেটের জনকল্যাণমূলক আদর্শই তাঁকে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ করেছিল বলে শোনা যায়। থাক সে সব কথা। এতদিনে ড্যানিয়েলের স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠেছে। যে আদর্শপল্লী মহৎ ও ক্ষুদ্রের যৌথ চেষ্টায় গড়ে তোলবার সাধনায় তিনি মগ্ন ছিলেন তা সাফল্য অর্জন করতে চলেছে। গাঁয়ের লোক সমবায়ের সার্থকতা উপলব্ধি করেছে, অনুভব করেছে স্বাধীন বৃত্তি গ্রহণের উপযোগিতা, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আদর্শগ্রাম গঠনের ধ্রুবকেন্দ্র—রুরাল রিকনসট্রাকশন" ইনস্টিটিউট।

শুধু পল্লীবাসীদের দিকেই স্যর ড্যানিয়েলের নজর ছিল না। সমপরিমাণ দৃষ্টি ছিল এস্টেটের বেতনভোগী শত শত কর্মচারীদের সুখ-সুবিধার ওপর। লক্ষ্য করেছিলেন এস্টেটের কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই গোসাবায়। মিডল ইংলিশ স্টেজের পর আরো পড়াশোনা করতে হোলে তাদের যেতে হয়। গোসাবা থেকে দূরে সহরে যেখানে হাইস্কুল আছে। তাই সে অভাবটুকু দূর করার জন্য ইনস্টিটিউটের আওতায় একটি হাইস্কুল খোলার আয়োজন করলেন, ১৯৩৮ সাল। এম-ই স্কুল বিকশিত হোল হাইস্কুলে, যেমন অতীতে প্রাইমারীরই রূপান্তর ঘটেছিল মিডল ইংলিশ স্কুলে।

পরের বছর নভেম্বরে স্যর ড্যানিয়েলের এদেশে আসার কথা। ১৯০৪ সালে কোম্পানীর কাজ থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে গেলেও ফি বছরই শীতে তিনি আসতেন তাঁর গোসাবায়। এবার পারলেন না। কারণ জগৎজুড়ে শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধ। বিলেত থেকে জাহাজ আসতে পারছে না। জাহাজ এল না, খবর এল "নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে সার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটন উনসত্তর বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৯।" জন্মদিনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন স্যর ড্যানিয়েল। "তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মহাত্মা গান্ধী বললেন—যদি এক্ষণে স্যর ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটনের মত আদর্শ ও নিষ্কাম জমিদার সকলেই হতেন, তাহলে ভারতের লোক স্বাধীনতার সংগ্রাম কখনোই শুরু করত না।"

মৃত্যুর পূর্বে একটি উইলে সার ড্যানিয়েল তাঁর অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশ করেন: গোসাবা এস্টেটের প্রতিটি পাই পয়সা ব্যয়িত হবে গোসাবার সর্বসাধারণের উন্নতির জন্য। উইল বলে জমিদারী পরিণত হোল জনসেবার ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠানে। ট্রাস্টী নিযুক্ত হোলেন লেডি হ্যামিলটন ও স্যর ড্যানিয়েলের খুড়তুতো ভাই মিঃ ডি এম হ্যামিলটন ও মিঃ জেমস হ্যামিলটন।

এই ট্রাস্টই সার ড্যানিয়েলের মৃত্যুর পর দীর্ঘ উনিশ বছর গোসাবা এস্টেটের অন্যান্য বিভাগের মত শিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত রুরাল রিকনসট্রাকশন ইনস্টিটিউট ও হাইস্কুল পরিচালনা করেছে। এই উনিশ বছরে বিপুল পরিবর্তনের ঢেউয়ে প্রতিষ্ঠার প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে অনেক অনেক দূরে সরে এসেছে এই দুটি প্রতিষ্ঠান। দুটি একদিন মিলে মিশে এক হয়ে গিয়ে গোসাবা আর, আর, আই হাইস্কুলে পরিণত হয়েছে। সেকথাই এবার বলা যাক।

মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গে ঢুকলাম স্কুলের একমাত্র দোতলা বাড়ির দোতলার একটি ক্লাসরুমে। মাস্টারমশাইরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়ার মাঝেই এলেন স্কুলের বর্তমান এড হক কমিটির সেক্রেটারী গোসাবার আপামর জনসাধারণের অতিপরিচিত ও প্রিয় ডাক্তারবাবু—গোপীনাথ বর্মন। সাতচল্লিশ সাল থেকে এই মানুষটি সেবার মাধ্যমে এ অঞ্চলের প্রতিটি ঘরের আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছেন। অনেক কথা জানলাম তাঁর কাছ থেকে। জানলাম এই স্কুলেরই প্রাচীনতম শিক্ষক ও বর্তমানে অ্যাসিসট্যাণ্ট হেড-মাস্টার মণীন্দ্রনাথ গোস্বামী ও তাঁরই ছাত্র

বর্তমানে সহকর্মী ভবতোষ মুখার্জি ও সুনীতিৎ সর-এর কাছ থেকে। জানলাম কি করে ধীরে ধীরে হাইস্কুল গ্রাস করেছে—স্যার ড্যানিয়েলের সারাজীবনের সাধনার ফসল গ্রাম বাংলার প্রথম পল্লী সংগঠনের প্রাণ কেন্দ্র রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ইনস্টি-টিউটকে।

ইন্সটিটিউট যখন চৌত্রিশ সালে শুরু হোল তখন তার প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়ে এলেন জাস্টিস বি কে গুহর ভাই প্রমোদ-কান্তি গুহ। ফর্সা, বেঁটে, শীর্ণকায় ধুতি-সার্ট পরা মানুষটির জীবন অভিধানে ইন্সটিটিউট শব্দটি বোধ হয় ছিল সবটুকু জুড়ে। তারপর যখন এম-ই স্কুল পরিণত হোল হাইস্কুলে তখন তিনিই হোলেন তার হেডমাস্টার। স্কুলটি ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। স্কুলের লাগোয়া হোস্টেলে গোসাবার ও বাইরের অনেক ছেলেই থাকত। সব খরচ বহন করত এস্টেট। শুধু নাম মাত্র ফি হিসাবে নেওয়া হোত ছাত্রপিছু মাসে একটি টাকা। স্কুলের সেই যুগেরই ছাত্র ভবতোষবাবু। আজো ভবতোষবাবুর মনে আছে তাঁর প্রাক্তন হেড মাস্টারমশায়ের কথা।

ভোর হোতে না হোতে বেল বাজিয়ে মাস্টারমশাই নিজেই স্কুল শুরু করে দিতেন। হোস্টেলের ছেলেদের অনেকেরই বিছানা ছিল না। ছেলেরা যাতে এই নিয়ে কোন অনুযোগ করতে না পারে তাই নিজেই মাস্টারমশাই খড়ের উপর চাদর বিছিয়ে শুয়ে বলতেন—দ্যাখ কেমন সুন্দর বিছানা। শুধু কি তাই? সারাটা দিন ঘুরছেন চরকিবাজির মত। বিশ্রাম কাকে বলে জানতেন না। স্কুল তাঁর জীবিকা নয় মিশন। তাই রাতেও ঘুরে ঘুরে হোস্টেলের ছেলেদের খোঁজ নিতেন। একদিন এই ভাবেই ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল কয়েকটি ছেলে রাত জেগে ক্যারম খেলছে তখন কিছু বললেন না। হঠাৎ রাত বারোটার সময় এসে অপরাধীদের জাগিয়ে দিয়ে বললেন—চল ক্যারম খেলি। ছেলেরা তো হতভম্ব। সেদিন স্যার রাত ভোর করে দিলেন ক্যারম খেলে। ঘুমে-ক্লান্তিতে, অবসাদে ছেলেরা আর পারছে না। আর যে মানুষটি আগের দিন রাত চারটের ঘুম থেকে উঠে সারাটা দিন স্কুল চালিয়ে এসেছেন তিনি তখনো সমানে বলে চলেছেন—আয় আর এক বোর্ড খেলি। মারধোর, ধমক-ধামক নয়, এইভাবেই তিনি ছেলেদের নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্বন্ধে সজাগ করে তুলতেন। আর কোনদিন কোন ছেলে হোস্টেলের নিয়ম ভাঙতে সাহসী হয়নি।

বড় বেশী পরিশ্রম করছিলেন গুরু-মশাই। টের পাননি কখন অলক্ষিতে তাঁর দেহেই বাসা বেঁধেছে কর্কট। তেতাল্লিশ সাল। স্কুল সে বছরই পেল ইউনিভার্সিটির রেকগনিশন। আর হারাল চিরদিনের মত একটি সন্তান-শিক্ষক মানুষটিকে। গুরু-মশাইয়ের [illegible] (বর্তমানে ত্রিপুরা বি. টি. কলেজের প্রিন্সিপ্যাল)।

গুরুমশাই যখন হেডমাস্টার তখন সেভেন, এইট, নাইন, টেন মিলিয়ে বড়জোর চারশোটি ছেলে পড়ত স্কুলের সেকেণ্ডারী সেকশনে। গুরুমশাই ছাড়া আর যাঁরা তখন এসব ক্লাশে পড়াতেন তাঁরা হোলেন গোপালবাবু, বর্তমান অ্যাসিসট্যান্ট হেড-মাস্টার ফণীবাবু, আশুরঞ্জন ভট্টাচার্য ও মণীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী।

গোপালবাবু যেবার হেডমাস্টার হোলেন সেবারই স্কুল ও ইন্সটিটিউটের পরিচালন ব্যবস্থা আলাদা হয়ে গেল। এতদিন গুরু-মশাই ছিলেন দুটিরই সর্বাধ্যক্ষ। এবার থেকে ইন্সটিটিউট হোল সিনিয়র সেকশন, স্কুল হোল জুনিয়র সেকশন। তখন সিনি-য়র সেকশনের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বিমলকুমার রায়, নির্মলচন্দ্র মজুমদার, অরবিন্দপ্রকাশ দত্ত, হরিদাস চক্রবর্তী প্রমুখ। এরা প্রয়োজনে জুনিয়র সেকশনেও পড়াতেন।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ রীতিমত জমে উঠেছে। দলে দলে বয়স্ক ছাত্ররা যুদ্ধের খাতায় নাম লেখাচ্ছে। ফলে ছাত্রের অভাবে ইন্সটিটিউটের তখন প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা। ইতিমধ্যে ইউনিভার্সিটির অনুমোদন পেয়ে হাইস্কুল তখন ক্রমশ ফেঁপে ফুলে উঠছে। ছকবাঁধা পথে সবাই চায় এগুতে। চাষীর ছেলে চাষবাস ফেলে আসে না—দল ছুটী যারা তারা রিক্রুট হতে ছুটেছে। আর এস্টেটের কর্মচারীদের ছেলেরা ও বাইরের ছেলেরা (হোস্টেলের জন্য) হাইস্কুলে পড়ছে। ইনসটিটিউটের ডিপ্লোমা কোন ইউনিভার্সিটির অনুমোদিত নয়—ফলে চাকরী জুটবে কি না ভবিষ্যতে সে ভয়ও আছে। স্যার ড্যানিয়েল যা করতে চেয়ে-ছিলেন তা আর হোল না। এদিকে চুয়াল্লিশ সালে স্কুলের প্রথম ব্যাচ ম্যাট্রিক দিল। সে বছর সাতজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছজনই পাস করেছিল; একজন পেয়েছিল ফার্স্ট ডিভিশন। স্কুলের প্রথম ব্যাচের একমাত্র ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়া ছেলেটিই আজ কলকাতায় হোমিওপ্যাথী কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার তারাপদ মণ্ডল। ফণীবাবু বললেন খাঁটি চাষীর ঘরের ছেলে তারাপদ। ওর বাবার সেদিন হোস্টেলের এক টাকা ফি দেওয়ারও ক্ষমতা ছিল না। আর আজ ডক্টর মণ্ডল নিজেই কত ছাত্রের পড়ার খরচ বহন করবার ক্ষমতা রাখেন—অন্তত এটুকুর জন্য আমরা স্যার ড্যানিয়েলের কাছে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ প্রমোদবাবুর কাছে, কৃতজ্ঞ গোপালবাবুর কাছেও।

গোপালবাবু যেন প্রমোদবাবুর ঠিক বিপরীত। ছেলেরা রাত্রি জাগলে প্রমোদবাবু ক্ষুব্ধ হতেন। আর গোপালবাবু নিজে তাদের নিয়ে রাত তিনটে চারটে অব্দি জেগে পড়াতেন। যে মানুষ রাত জেগে ছেলেদের পড়াতেন তিনিই আবার প্রতি সন্ধ্যায় ফুলের টবে সাজানো বারান্দায় কাঠের টেবিলে লণ্ঠন জেলে পাঠ শোনাতেন হয় গীতা নয় কোরাণ, নয় বাইবেল। পৃথিবীর [illegible] মর্মার্থ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতেন ছাত্রদের। আবার দুপুরে

ক্লাসে যখন পড়াতে আসতেন তখন তাঁর অন্য চেহারা। যেদিন যে কবির যে কবিতা পড়াবেন তাঁরই অন্য কোন কবিতার গোটা-কয়েক লাইন উদাত্ত স্বরে আবৃত্তি করতে করতে ঢুকে পড়তেন ঘরে। এইভাবে রচিত হোত পরিবেশ। তারপর কখন যে পাঠ্য-বিষয়ে চলে আসতেন ছাত্ররা তা টেরই পেত না। পড়ানো শেষ হোলে জিজ্ঞাসা করতেন প্রশ্ন। ইচ্ছা করে কবিতার লাইনে ভুল শব্দ বসিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন—বলো তো কোথায় ভুল প্রয়োগ আছে এই লাইনটিতে? ছেলেদের সাহিত্যবোধের ও সমালোচনার ক্ষমতা এই ভাবেই জাগিয়ে তুলতেন গোপালবাবু।

এই ভাবেই চলছিল। কিন্তু মাত্র দুটি বছর বাদেই বৃহত্তর কর্মের আহ্বানে স্কুল ছেড়ে চলে গেলেন গোপালবাবু। তাঁর জায়গায় হেডমাস্টার হয়ে এলেন শ্যামাপদ বিশ্বাস। শ্যামাপদবাবু মাত্র বছরখানেক ছিলেন। তারপরই পরবর্তী তিন বছরে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্ষিতীশচন্দ্র সেন ও ফণীন্দ্রনাথ গোস্বামী (অফিসিয়েটিং) পালা করে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন। উনপঞ্চাশ সালে হেডমাস্টার হোলেন সতীশচন্দ্র ঘোষ। স্কুলের জীবনে শুরু হোল নতুনতর এক অধ্যায়।

ইতিমধ্যে ইনস্টিটিউট প্রায় বিলুপ্ত হয়ে এসেছে। তার অস্তিত্বের টেমিতে এক গণ্ডুষ তেলও বোধহয় ছিল না। হাইস্কুলই ধীরে ধীরে সব হয়ে উঠেছে। পঁয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশ এই চার বছরে হাইস্কুলের পরীক্ষার্থী আটান্নটি ছাত্রের মধ্যে ম্যাট্রিক পাস করেছে আটচল্লিশজন। ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে তিনজন।

সতীশবাবু প্রায় আট নয় বছর এই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি এস্টেটের এডুকেশন অফিসার হয়েছিলেন। তাঁর আমলে উনপঞ্চাশ থেকে সাতান্ন সালের মধ্যে মোট একশ চল্লিশটি ছেলে পরীক্ষা দেয়। পাস করেছে উনসত্তর জন, ফার্স্ট ডিভিশনে চারজন। স্কুল যখন ক্রমশ গোসাবার সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে, তার ছাত্ররা কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার কেউ শিক্ষক হয়ে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরবর্তী জেনারেশনের প্রাণে শিক্ষা সম্পর্কে কৌতূহলের বীজ বুনে চলেছেন তখনই এক প্রচণ্ড বিপর্যয়ের সম্মুখীন হোল স্কুল। সাতান্ন-আটান্ন সাল। স্কুলেরই এক [illegible]

[illegible]

যোগাড়। এস্টেটের অনিশ্চিত অবস্থা দেখে

বহু শিক্ষক স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অশ্বিনী চক্রবর্তী, অরিন্দম নান, শরৎ নাথ, অমল চক্রবর্তী ও এই স্কুলেরই শিক্ষক ভবতোষ মুখার্জি, মুকুন্দলাল গুহ, বীরেন্দ্রনাথ দাস ও রাধাকান্ত সুর প্রমুখ স্কুলের পাশে এসে না দাঁড়াতেন তাহলে আজ এর অস্তিত্ব বজায় থাকত কিনা সন্দেহ। আটান্ন সালে সরকার স্কুলটির দায়িত্ব গ্রহণ করে পরিচালনার জন্য একটি এডহক কমিটি গঠন করলেন। কমিটির সেক্রেটারী হোলেন ডাক্তার গোপীনাথ বর্মন কমিটি উঠে পড়ে লাগল স্কুলটিকে সেবায়-শুশ্রূষায় যত্নে আবার সারিয়ে তুলতে।

এস্টেটের অধীনে এখানকার অধিবাসীরা স্কুলের বিষয়ে যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন সে ব্যবস্থায় এল অনেক পরিবর্তন। আগে ক্লাস টেন পর্যন্ত ফ্রী ছিল। সে জায়গায় সরকার ক্লাস এইট পর্যন্ত ফি মকুব করে দিলেন। আগে হোস্টেলের ফি ছিল মাসে মাত্র এক টাকা, সে জায়গায় এখন জীবনধারনের খরচানুপাতিক ফি ধার্য হোল—অর্থাৎ মাস গেলে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা।

পরিবর্তন শুধু একতরফাই হয় না। তার উল্টোদিকও আছে। আগে যে স্কুলে শুধুমাত্র এস্টেটের মধ্যবিত্ত কর্মচারী সম্প্রদায়ের সন্তানরা ও বাইরের ছেলেরা পড়ত ষাটের যুগে সেখানেই ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠতে লাগল কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের ছাত্ররা। আজ তারাই এই স্কুলে মেজরিটি। শুধু তাই নয়। পঞ্চাশ সাল থেকেই মেয়েরা পড়ছে এই স্কুলে। এটি একটি কো-এডুকেশন স্কুল। পঞ্চাশের যুগে খুব অল্প মেয়েই পড়ত এই স্কুলে। সে জায়গায় আজ দলে দলে মেয়েরা আসছে পড়তে।

একটু স্থিতিশীল হতেই ক্রমশ স্কুলের ছাত্র সংখ্যা বাড়তে লাগল। আটান্ন সালে এড হক কমিটি যখন দায়িত্ব নেয় স্কুলের তখন সর্বসাকুল্যে ছাত্রসংখ্যা ছিল একশো ছিয়ানব্বই। আর আজ এই উনসত্তরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচশো ছাব্বিশ। মনোরঞ্জনবাবু বললেন বর্তমান ছাত্রসংখ্যার শতকরা নব্বইভাগ লোক্যাল ও প্রায় একশোজন ছাত্রী আজ পড়ছে তাঁর স্কুলে।

আটান্ন থেকে উনসত্তর, সময়ের বিচারে মাত্র এগারোটি বছর। কিন্তু গোসাবা হাই-স্কুলের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই এগারো বছরের প্রথম দুটি বছর ফণীবাবুই অ্যাকটিং হেডমাস্টার হিসাবে স্কুল চালিয়েছেন। উনষাটের মাঝামাঝি এলেন ভোলানাথ মিত্র। তিনি ছিলেন তেষট্টি সাল পর্যন্ত। তেষট্টির জুলাই মাসে প্রাক্তন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এই স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে আসেন। মনোরঞ্জনবাবুর সময়েই ছেষট্টি সালে শুধু হিউম্যানিটিজ স্ট্রীম নিয়ে হাইস্কুল রূপান্তরিত হোল হায়ার-সেকেন্ডারীতে। সাতষট্টি সালে বোর্ডের অনুমোদন পেয়ে স্কুল সায়েন্স স্ট্রীমও খুলেছে।

ইতিমধ্যে আটান্ন থেকে সাতষট্টি, এই দশ বছরে মোট দুশ পঁচিশটি ছাত্র-ছাত্রী স্কুল ফাইন্যাল দিয়েছে। পাশ করেছে একশো সাঁইত্রিশজন। ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে ছ'জন। এই বছরই স্কুলের প্রথম ব্যাচ হায়ার সেকেন্ডারী (হিউম্যানিটিজ) পরীক্ষা দিয়েছে। সতেরোজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছেলে বারোটি ও মেয়ে পাঁচটি। মেয়েরা সবাই পাশ করেছে। ফেল করেছে ছেলেদের মধ্যে তিনজন।

স্কুলের ক্রমবর্ধমান ছাত্র সংখ্যা ও হায়ার সেকেন্ডারীর প্রয়োজনেই ধীরে ধীরে স্কুলের বহিরঙ্গেও এসেছে বিস্তর পরিবর্তন। গোড়ায় ইনস্টিটিউটের একতলা বাড়িটিতেই সব ক্লাস বসত। তারপর পূবদিকে একটা এল প্যাটার্ণের একতলা পাকা বাড়ি উঠল পঞ্চান্ন সাল নাগাদ। দুটো বাড়িতেও জায়গা হয় না। ছেলেমেয়েরা বৃষ্টি ভিজে বারান্দায় বসে ক্লাস করে দেখে তেষট্টির মেন বিল্ডিংয়েরই উত্তর-পূর্ব কোণে মনোরঞ্জনবাবু একটা ছোট কাঁচা চালাঘর তোলালেন। পঁয়ষট্টি সালে হায়ার সেকেন্ডারীর প্রয়োজনেই আর একটা দোতলা বাড়ি তৈরী শুরু হোল। এই বাড়িটির জন্য সুন্দরবন উন্নয়ন সংস্থা সাহায্য দিয়েছে আঠারো হাজার টাকা। বাকিটা স্কুল কর্তৃপক্ষ অনেক কষ্টে তুলেছেন। কলকাতা থেকে যাত্রাপার্টি এনে আয়োজন করেছেন সাহায্য রজনীর। শুধু এই দোতলাটিই নয়, পাশের অসমাপ্ত একতলা সায়েন্স ব্লকের অর্থও সংগৃহীত হয়েছে অনুরূপ উপায়ে। এদের ইচ্ছা ভবিষ্যতে বাড়িটিকে দোতলা করবেন। কারণ এতবড় একটা হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের কোন লাইব্রেরী বা বিল্ডিং-রুম নেই। সামান্য যে চার পাঁচশো বই আছে তাই রাখারই জায়গা হয় না। আরো কত ইচ্ছা এদের—ভবিষ্যতে এই স্কুলকে কেন্দ্র করেই একটা কলেজ গড়বেন।

আশাকরি ভবিষ্যতে একদিন নিশ্চয়ই মনোরঞ্জনবাবু, গোপীনাথবাবুদের অনেক সাধের পরিকল্পনা সার্থক হয়ে উঠবে। সবার প্রার্থনা তাই। কিন্তু দুটি অভিযোগের কথা এই প্রসঙ্গে এখানে বলে রাখি, নইলে এই প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এদের এখুনি একটি পাকা হোস্টেল-বাড়ির বড় প্রয়োজন। সেই স্যার ড্যানিয়েলের জীবদ্দশায় স্কুলের উল্টোদিকে যে টালির শেডে ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল গত ত্রিশ বছরে তার কোন পরিবর্তন বিশেষ হয়নি। হবে কোত্থেকে? স্কুলের সামর্থ্য কোথায়? হোস্টেল সুপার করুণাবাবু রুগ্ন মাসগুলিতে কত কষ্টে যে ছেলেদের খাওয়ার খরচ চালান সে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এ অঞ্চলে অধিকাংশ অভিভাবকই ধান বেচে সন্তানের পড়ার খরচ জোগান। এ মরশুমে সবার জানিত কারণেই ধান বেচা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। আয় নেই হোস্টেলের। তবু করুণাবাবু অকরুণ হননি। কিন্তু প্রকৃতি এত দয়াময় নয়। বর্ষায় ফুটো টালি দিয়ে জল ঝরে ছেলেদের বিছানা ভাসিয়ে দেয়। যদি সরকার একটু দয়া করেন তাহলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। দয়াই বা বলি কেন? চার-পাঁচ বছর আগে চীফ ইনসপেক্টর অব স্কুলস বর্তমান হেডমাস্টারমশাইকে কথা দিয়েছিলেন একটি পঞ্চাশ জন ছাত্রের উপযোগী ভাল হোস্টেল করে দেবেন। কি হল সেই প্রতিশ্রুতির?

আর মহামান্য বোর্ড অব হায়ার সেকেন্ডারী এডুকেশন (নাকি এগজামিনেশন?) আপনারা সুদূর আন্দামানে পরীক্ষা নেওয়ার আয়োজন করতে পারেন অথচ গোসাবার বেলায় এত কাতর কেন? আপনারা জানেন না এক একটা পরীক্ষা এ অঞ্চলের তিনশো, সাড়ে তিনশো পরিবারের উপর কি অভিশাপ বহন করে আনে। এদের ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষার কেন্দ্র পড়ে হয় ক্যানিংয়ে, নয় বসিরহাটে। দূরত্বটা জানেন—নাকি তাও বলতে হবে? আর খরচের পরিমাণ? পরীক্ষার দশ পনেরো দিনের জন্য গোসাবা ও আশপাশের দ্বীপের মানুষগুলোকে চাল চিঁড়ে বেঁধে ঘর ভাড়া নিতে ছুটতে হয় পরীক্ষা কেন্দ্রে। যদি আপনাদের ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা কেন্দ্র আন্দামানে বা ত্রিপুরায় হোত তাহলেই বোধ হয় আপনারা এদের কষ্ট অনুভব করতে পারতেন। আপনাদের অনুরোধ জানাতাম না, বা জানানোর প্রয়োজনই হোত না যদি স্যার ড্যানিয়েল আর একটু সময় পেতেন। উনচল্লিশ না হয়ে যদি চুয়াল্লিশ সালে তিনি দেহ রাখতেন তাহলে নিশ্চয়ই এদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যানিকেতনের দুয়ারে পেশ করতেন তাঁর সর্বশেষ আর্জি—তোমরা গোসাবায় পরীক্ষার একটা সেণ্টার খোল। যে ইউনিভার্সিটি তাঁর স্কুলকে রেকগনিশন দিয়েছিল, তারাই এই অনুরোধটুকু রাখত নিশ্চয়।

পরদিন ভোরের লঞ্চেই ফিরে এসেছি। ফেরার মুখে বিদায় জানাতে এসেছিলেন করুণাবাবু ও সেই রমাপদ। মনোরঞ্জনবাবু ও ডাক্তারবাবু আসতে পারেননি। পারেননি ভবতোষবাবু ও অমলবাবু। অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন আমি ওঁদের আটকে রেখে কষ্ট দিয়েছি। বিনিময়ে পেয়েছি নিখাদ আতিথ্য-সুখ। ফেরার পথে সেই কথা ভেবে লজ্জা হল। ওদের সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে কিনা জানিনা—লজ্জা কখন কষ্ট হয়ে বুকের ভেতর টনটনিয়ে উঠেছে তা টেরও পাইনি। লঞ্চ তখন ঘোলা জল কেটে তর তর করে এগিয়ে চলেছে ক্যানিংয়ের দিকে।

—শম্ভুনাথ

পরের সংখ্যায় জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

স্বরূপ গোটাকতক টান দিয়ে আবার শুরু করল—

'সেকালের জমিদারী খেয়াল, মসনেতে বিয়ে অনেকরকম হয়ে গেছে দা'ঠাকুর। রকমারির অভাব হয়নি কখনও। দিদিমণির বিয়ের কথা শুনেচেনই, কিন্তু সে তাদের সামনে তুশ্চু। বেড়ালের বিয়েতে যদি পাঁচখানা গেরাম খেয়ে গেল তো তার পাল্টা জবাবে বাঁদরের বিয়েতে সাতখানা গেরাম পাত-পেতে গেল— তার মানে বেড়ালের বরকত্তা—কনেকত্তাকে বাঁদর বানানো আর কি। কিন্তু সে তো তবু মাঝ-খানে বেড়াল হোক, বাঁদর হোক কিছু একটা রয়েছে; একেবারে মেয়ের পাটই নেই, অথচ মেয়ের বিয়েতে যা ঘটাটা করলে তাতে, এসবকেই কানা করে দিলে কিনা। ইদিকে কনে নেই, উদিকে বরযাত্রী যা এল—আজ্ঞে, সব একসে এক মাতাল—তাদের মধ্যেও বর বলে কেউ নেই। অথচ মন্তর পড়ে বিয়ে দেওয়াও বন্ধ হোল না, পাত পেড়ে খেয়ে, ছাঁদা বেঁধে নিয়ে পাঁচখানা গেরামের লোক ঢেউ-ঢেউ করে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বর-কনেকে আশীর্বাদ করতে করতে চলেও গেল। এতে মসনেকে কোন তল্লাট পেছনে ফেলে যেতে পারবে না। এত জমিদার ঘরও তো কাছে-পিঠে কোথাও ছেল না।

সেই মসনেতে এই যা এক বিয়ে হোল তা যেন আরও আজগুবি। লাটের খাজনা দাখিল করবারই ওপিক্ষে ছেল—ঐ সময়টা ওনাদের সবাই ঐতেই জড়িয়ে থাকে তো—ওটা শেষ হয়ে যেতেই বিয়ের ব্যাপার নিয়ে পড়ল সবাই। লাট দাখিল হবার দিনপনেরো পরেই বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে, যেমন দুই দেউড়িতে তোড়জোড়ের ঘটা পড়ে গেল, তেমনি বাইরেও পড়ে গল একটা সোরগোল। বৈঠকখানা, চন্ডীমন্ডপ, তাস-দাবার আড্ডা—যেখানেই দেখুন এই কথা। এদিকে পাঁচটা স্তীলোক যেখেনে একত্তর হয়েছে—ঘাটেই হোক, বাটেই হোক, কারুর বাড়ির মজলিসেই হোক—এ ভেন্ন আর কথা নেই। কেউ বলে দামোদর চৌধুরীর আর এক মতিচ্ছন্ন, মেয়েটাকে জবাই করতে যাচ্ছেল, পারলে না, এবার ছেলেটাকে ধরেচে। কেউ কেউ আবার বললে—ভালোই হচ্চে, দুটো বড় বড় ঘরের পুরুষানুক্রমে বিবাদ যদি এই করে মিটে যায় তো ভালই। একটা-না একটা কিছু উঠছেই ঠেলে, আর যেন পারা যায় না। ধন-ঞ্জয়কে সবাই আরও প্রশংসা করতে লাগল। নিজের মেয়ে নেই, কি করবে, তবু বাপ-মা-মরা শালীর এত খরচ করে যে এমন একটি সুপাত্তরের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে—শুধু পুরনো বিবাদটা মিটিয়ে ফেলবার জন্যেই না? —আজকালকার বাজারে কে এমন করে? বিয়ের দিন সকাল থেকেই সারা মসনের দক্ষিণপাড়া একেবারে গুলজার। সেই গোরার-বাদ্যি আনানো হয়েছে দা'ঠাকুর, তবে এবার চৌধুরীমশায়েরই ছেলের বিয়ে, তিনিই কেল্লা থেকে আনেয়েচে। তারা সেবারে শুধু গন্ডগোল আর লাঠিবাজিই দেখে গেল, ভাবল এদের বিয়ে তাহলে নিশ্চয় ফৌজী কান্ড-কারখানাই, ভোরে নেবেই সেই যে পুরো দমে আরম্ভ করে দিলে, থামতে বললে থামে না। তারই মধ্যে ইদিকে য্যাতরকম আয়োজন,—বরযাত্রীর দলটাই হবে শ'চারেক নিয়ে, বেয়ারা, পাইক, বরকন্দাজ থেকে নিয়ে ঘোড়-সওয়ার, দিশী বাজনদারের দল, সঙ, মশালচি, লাঠিয়ালদেরও একটা বড় দল রয়েচে। সেকালের বরযাত্রীর, বিশেষ করে জমিদারের বরযাত্রীর সাজগোজ করে লেঠেরার দল একটা শোভাই ছেল। এছাড়া থাকবে ভদ্দরলোকের দল, যারা নাকি আসোল বরযাত্রী। তার মধ্যে মসনের জমিদার বাড়িগুলো থেকে কিছু কিছু রয়েচে, ছেলে-ছোকরাই বেশি, বড়রা তো গা তুলে কোথাও যেত না; বড়দের মধ্যে রয়েচে দশআনীর নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, অর্থাৎ কাকাবাবু আর জামাইবাবু। শোনা যাচ্চে, কাকাবাবুকে নাকি চৌধুরীমশাই বরকর্তা হয়ে যাবার জন্যে ধরাধরি করেচে। তানার নিজের শরীলের তামন যুৎ নেই। এখন, ও থেকে আপনি যা মানে বের করো।'

স্বরূপ আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে নিয়ে বলে চলল—'উদিকে দিদিমণির বাড়ি থেকে দিদিমণি, কাকাবাবুর বাড়ি থেকে মেয়েদের দল, আর সব পাড়ার গণ্যমান্যি গিন্নীর দল জুটেছে, চলছে তাদের গুলতানি। আর সবার উপরে মাসীমা। অনেকদিনের পরে মনের মতন কাজ পেয়েছে—আজ্ঞে, যাত্রার যা পালাটা খেটেখুটে দাঁড় কৈরেচে, সেতো ওনারই কারসাজি। মাঝে মাঝে হাঁক-ডাক, হুকুম-তাম্বিতে তানার গলা যেন গোরার বাদ্যিকেও ছাইড়ে উঠেচে। ,

সবই ভালো, কিন্তু ইদিকে আমার মনে তেমন ফুর্তি নেই যেন। যদি বলেন কেন তা বলব, প্রায় পোটাক জমির মাথায়—ইদিকে আমাদের বাড়িতে আমার বিয়েরও সব পুজো, স্তী আচার হচ্চে বটে—পুরুত এসেচে, গায়ে হলুদ হোল, তবে সবই কেমন যেন চাপাচুপির মধ্যে—দায়সারা গোচের করে। একটা কথা আপনেকে বলিনি বোধহয়, আজ-কাল সব তো গুছিয়ে মনেও থাকে না—কথাটা হচ্ছে, দিদিমণি আমায় একরকম আর সবই বলেচে, শুধু একেবারে শেষের দিকটা ভাঙেনি। বললে—ওটুকু তোর জামাই-বাবুর একেবারে দিব্যি দিয়ে বারণ। উদিকে অত ঘটা—গোরার বাদ্যির গজ্জন আকাশ ফুঁড়ে আসচে, কয়েকজন সমবয়সী ছেলেকে লাগেচি, তারা দেখে এসে রিপোর্টও দিচ্চে খাসা হচ্ছে ইদিকে আমার বেলায় সব ফাঁকা। ছেলেমানুষ, বিয়ের ব্যাপার, এও জানি ঐ বরযাত্রীর সঙ্গে আম্মো যাবো বিয়ে করতে। খুবই মনমরা হয়ে রয়েচি। তারপর হঠাৎ কানাকানিতে একটা কথা কানে যেতে একে-বারেই দমে গেনু দা'ঠাকুর। পাড়ার দামু-ঠাকুমা মাকে একটু আড়াল হয়ে সুদোলে—'হ্যাগা, রাঙাবৌমা, আমাদের স্বরূপের বিয়ে শুনেচি নাকি চৌধুরীদের বরযাত্রীর সঙ্গেই যাবে, তা সব কেমন যেন নিবু-নিবু। কথাটা কি?'

মা বললে—'বিয়ে কোথায় জ্যাঠাইমা? সাজিয়ে-গুছিয়ে নাকি সঙ্গে নে' যাচ্চে, কেন কি বেত্তান্ত পুরুষেরা তো বলে না সব। খুব নুকুনো কথা জ্যাঠাইমা, তোমাকেই বললুম। কত্তার হুকুম যেখানে, লোকদেখানো সবই করতে হচ্চে।'

একেবারে দমে গেনু দা'ঠাকুর। ছটফট করচি একবার দিদিমণির কাচে কি করে পৌঁছুই, কিন্তু কিছু না হোক বিয়ের বরই তো, নজর রয়েচে সবার, একবার যে যাব তার সুবিধে করে উঠতে পাচ্চি না। শেষে একে-বারে বিকেলের দিকে পাওয়া গেল একটু ফাঁক। সন্ধ্যের পর বরযাত্রী বেরুবে, ওদিকে কাজই আরও জমে উঠেচে, আশ্চয্যি বিয়ে, দেখবার জন্যে পাড়ায় টান ধরেচে, আমাদের বাড়িটাও অনেকটা খালি হয়ে এসেচে, আমি ইদিক-উদিক চেয়ে খিড়কির দোর দিয়ে বেইরে পড়ে মাঠ ভেঙে একেবারে চৌধুরী-বাড়ি। একেবারে সাদামাটাভাবে গেচি, চাপ ভিড়, ওর মধ্যে আমার যে—যাত্রার দলের কথায় বলতে গেলে মেন পাট, তা কেউ জানেও না—ভিড় কাটো সবার দিষ্টি বাঁচিয়ে আমি একে-বারে বাড়ির ভেতরে। পড়ে গেলুম একেবারে দিদিমণির নজরে। উঠোনের উদিকে বারান্দা হয়ে কি একটা কাজে হনহন করে একঘর থেকে বেইরে অন্য ঘরে যাচ্ছেল, আমায় দেখে একেবারে যেন আঁতকে দাঁইড়ে গেল, চোখ-দুটো বড় বড় করে। তারপরে একবার এদিক-ওদিক চেয়ে আমায় [illegible] ইসারাতেই ডাকল। কাচে গেলে বলল—'চিলের ছাতে চলে যা।'

এবাড়ির সব জানাই আমার। বিয়েবাড়ি, মেয়েদের বেশ ভিড়। আমার বয়সী দাসী-চাকর বেশ রয়েছে, যাওয়া আসা করছে, ইদিক-ওদিক, আমার পাশ কাটো ওপারে চলে যেতে অসুবিধে হোলনা। জায়গাটা একেবারে একটেরে, একটা বেলগাছ উঠে এয়েচে বলে বেম্মদত্তির ভয়ে যায়ও না কেউ বড়একটা। একটু পরেই দিদিমণি উঠে এল, চাপা গলাতে সুদোলে—'তোকে ডেকে নিয়ে এল, না, নিজেই একলা এলি?'

বললুম—'নিজেই এনু। শুনচি আমার নাকি বিয়ে নয়?'

দিদিমণি আবার চোখদুটো বড় বড় করে বললে—'বিয়ে কিয়ে। দ্যাখো আস্পা ছোঁড়ার! তোকে নিদবর করে নিয়ে যাচ্ছে, উদিকে থাকবে একটা নিদকনে। এতবড় জমিদারের ছেলে, তার নিদবর হয়ে যাচ্ছে, তাতে আশ মেটে না, ও চায় সত্যিকার বিয়ে হোক! তা পারিস তো না হয় সেই নিদকনেটাকেই......'

আমি আর সামলাতে পারলুম না নিজেকে দাঠাকুর, একে কোনকিছু নিয়ে মন খারাপ হলে দিদিমণিকে দেখলে উথলে উঠত মনটা, তার ওপর উল্টে ওনার কাছ থেকেই এই গঞ্জনা, ঠাট্টা, দুহাতে মুখ ঢেকে একেবারে হুহু করে কেঁদে উঠনু।

দিদিমণি একটু থতমত খেয়ে গিয়ে চুপ করে রইল, আজ্ঞে যাবেই তো, তারপর এগিয়ে এসে আমার কাঁধের ওপর হাত দিয়ে বললে—'চুপ কর স্বরূপে, চুপ কর। কাঁদছিলি টের পেলে কেলেঙ্কারি, জানিস তো সব কিরকম লুকিয়ে হচ্ছে! বিশ্বেস কর, আমি তোকে বলছি, ঐ নিদবর সেজে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে অনেক রগোড়, তুই শেষ পজ্জন্ত না মজা পাস, এই নাকাল তোর লুকোচুরির জন্যে যা খেসারৎ চাস আমার কাছে তা পাবি। যা, যেমন এসেছিলি, ভালো করে চোখ মুছে নিয়ে।......দাঁড়া, আর যাবিই বা কেন? সন্ধ্যে হলেই তোকে কেউ গিয়ে লুকিয়ে নিয়ে আসবার কথা। তা আগেই যখন এসে পড়েছিস্, আর যাবার দরকার নেই। আমি বারণ করতে বলে দিয়ে তোর মাকেও বলে পাঠাচ্ছি। বর না পাত্তা, সে বেচারি নিশ্চয় বুক চাপড়াচ্ছে।

একটু হাসলও দিদিমণি, আমার মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে। তারপর বললে—'আমি নীচে যাচ্ছি। তুই মিনিট কয়েক বাদ দিয়ে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে উঠোনের দক্ষিণ দিকের গলিটা হয়ে ওদিকে যে ঘরটা আছে, তাতে চলে আয়। কেউ টুকলে বলবি আমার কাছে যাচ্ছিস্। আমি থাকব সেখেনে।'

ঘরটা একটেরে। একটু পরে নেবে গিয়ে দেখি সেখেনে দিদিমণি ছাড়া চৌধুরী-গিন্নী, আর তানারই একজন ঝি রয়েচে, তানার খাস দাসী। আমায় ভালোরকমই চেনে, আমি যেতে উনি উঠে পড়ে বললে—'মেজো যেমন বলে চুপ-চাপ করে যা, জিজ্ঞেস-বাদ করতে যাবিনে, কাজ হয়ে গেলে মোটা দুক্ষিণে পাবি।'

ওনার ঝি একটু হেসে বললে—'যা পেতে চলেছে, তার চেয়ে বেশি তুমি আর কি দেবে?'

দিদিমণি বললে—'তা বৈকি, একেবারে রাজবেশ। তুমি তো আর ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছ না, পরা জিনিস। বাবা পেয়েছিল তাঞ্জাম, ছেলেও কম যাচ্ছে না।' (পরে টের পেলুম কথাটা চাপা দেছল)।

গিন্নী চলে গেলে ঝি উঠে দোরটা ভেতর থেকে খিল লাগিয়ে এসে বসল।

এরপর একটা প্যাটরা খুলে, আজ্ঞে, সে রাজবেশই বৈকি।

ঘরের একধারে এক বালতি জল, একটা ঘটি, তার ওপর একটা গামছা আর একটা সাবান রাখা। ত্যাখন সাবানের রেওয়াজ নতুন উঠেচে, তাও বড় ঘরে, আমার তো সেই হাতেখড়ি—দিদিমণিই বললে, 'যা মুখটা ধুয়ে আয় ভালো করে।'

ফিরে এসে সেই রাজবেশ। ঘরের উল্টো-দিকে একটা দোর, তারপর একটুখানি রক, তারপরেই আগাছার জঙ্গল। আমি রকে বেইরে গিয়ে ফিরলুম একেবারে যাত্রার দলের রাজপুত্তুরটি হয়ে। জরি-চুমকি বসানো লাল-সাটিনের পাজামা, হাঁটু পজ্জন্ত ঐ মেলের চাপকান, পায়ে সেকেলে জরির কাজকরা লক্ষ্ণৌয়ী শুঁড় তোলা নাগরা জুতো, হাতে একটা রেশমী রুমাল। আবার ঘরে এসে ঢুকতে, ঝি একটা যাত্রার দলের পরচুলো-বাবরী হাতে করেই বসেছেল পাটিরা থেকে বের করে, চেপে চেপে আমার মাথায় আঁট ক'রে বসিয়ে দিলে। দিদিমণি বললে—'নেঃ, এবার তোর বাবা শিবনাথ এলেও চিনতে পারবে না তোকে। বোস্ ওখানটায়।'

একটা সতরঞ্চি পাতা ছেল, পাশে শ্বেতচন্দনের বাটি আর খড়কে একটা। দিদিমণি দেখিয়ে দিতে লাগল, আর ঝি খড়কে ডুবিয়ে আমার মুখে বর-চন্দনের নক্সা তুলতে লাগল। শেষ হলে প্যাটরা থেকে সাচ্চার সূক্ষ্ম কাজকরা একটা মখমলের টুপি বের ক'রে আমায় দিয়ে বললে—'এটা হাতে নিয়ে চুপ ক'রে বসে থাক, এই ঘরে দোরটা ভেজিয়ে। ঝি বাইরে রইল, আসবে না কেউ, যদি পড়েই এসে, করে জিজ্ঞেস তো তোর জামাইবাবুর নাম ক'রে বলবি, তানার বউ বসিয়ে রেখে গেচে।'

ঝিকে বললে—'আমি একটু ওদিকটা দেখতে যাচ্ছি। ওকে কেউ নিতে এলে আমায় কিম্বা দিদিকে আগে ডেকে দেবে। সন্ধ্যের আগে কেউ আসবে না। ততক্ষণ নজর রাখবে। ও ছোঁড়া বিয়ের লোভে সাত তাড়াতাড়ি এসে ব'সে আছে, না রে?'

একটু হেসে, হাসি আর ফলবার জন্যে তাকালো আমার মুখে। তাতক্ষণে সে-ভাবটা তো পাল্টে গেচে, আমিও একটু হেসে মুখটা নাবো নিলুম।

রাত এগারটায় লগন। সন্ধ্যের একটু পরেই চারশ' লোকের সেই জগদ্দল বরযাত্রী বেইরে পড়ল। এগুনে ষোলজন মশালচি, তারপরেই গোরার বাদ্যি, তারপর এগু-পিছু ক'রে আমাদের দু'জনের তাঞ্জাম। প্রেথমে ঠিক হয়েছেল একই তাঞ্জামে আমরা দু'জনে পাশাপাশি বসে যাব। চৌধুরীমশাই-ই-বললে—তা কেন, শিবে-বেটার তো সেই নিজের তাঞ্জামটা রয়েচেই, সেই কুসমীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। আজ ছেলের বিয়েতে যদি ব্যাভার না করে তো নিজের গঙ্গাযাত্রার সময় ক'রবে? ভেতরের কথাটা ছেল অন্য কিছু দাঠাকুর, পরে যাবার মুখে প্রেকাশ পেল কিনা। কুসমীর সেই তাঞ্জাম যদি বাড়ি বয়ে গিয়ে কুসমীকে আবার দেখানো না হোল তো রস জমবে কি করে? পীরিত তো ত্যাখন চ'টে গেছে। দুটো আলাদা তাঞ্জাম দেখে আবার একটা কথা উঠল; কেউ বললে—নিদবরেরই—আজ্ঞে, আসোল কথাটা ঐ জনা পাঁচেক ছাড়া তো কেউ জানে না—কেউ বললে নিদবর, কেউ কেউ আবার বললে—না, আলাদা আলাদা ক'রে দুটো বিয়ে একলগ্নে। পাত্রীর কথাও নানারকম উঠল দাঠাকুর—এমন পজ্জন্ত যে, একশালী নয়, ধনঞ্জয়ের যমজ দুই শালী, তাই একলগ্নে একসাথে বিয়েও দেওয়া হ'চ্চে। আজ্ঞে, তা, বলবে বৈকি, ইদিকে বরও প্রায় জমজই তো। কুমার অনন্তনারায়ণের সঙ্গে আমার বয়সের তফাৎ বছর খানেকের বেশি নয়। আমার যদি তেরোর ওপর ক'টা মাস হ'য়ে থাকে তো, ওনারও পনেরোর ক'টা মাস ইদিকেই। পুবেই বলেচি, বাঁজা গরু নিয়ে আর মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে হয় না, খেয়ে-দেয়ে আরামে-আয়েসে, আমার চেহারাটা নন্দদুলালি গোচের হ'য়ে উঠেচে, তারওপর ঐ ধরণের সাজগোজ, ওনার যেমন আমারও তেমন—মনে হ'তেই হবে যে এদিক থেকেও যমজ বর চলেচে। যাওবা একটু আধটু ফারাক ছেল খুঁটিয়ে দেখতে গেলে, সব এক ঐ বাবরি চুলে মেরে দেচে কিনা। সেকালের একটা ফ্যাশান বড়ঘরে, অনন্তনারায়ণের মাথাতেও রয়েচে। এমন নিখুঁত ক'রে দাঁড় করইরেচে, অনন্তনারায়ণের মনে হবে উনি শিবে মণ্ডলের বেটা স্বরূপে নয়তো? ইদিকে আমি ভাবব তবে আমিই বুঝি কুমার অনন্তনারাণ।—তা বাইরের লোক যদি মনে করে, যমজ ভেয়ে যমজ ক'নে আনতে যাচ্ছে তো দোষটা কি ক'রেচে তা কেন? বললেন, যমজ ভাই এল কোথা থেকে? তা'হলে ব'লতে হয়, একটি ছেলে তাকে এমন ক'রে আলাদা ক'রে রেখেচে বাপ-মায়ে; লোকচক্ষুর বাইরে, আরও একটা যে নেই, এই রকম দ্বীপান্তরে সইরে রাখা যে ছেল না— তা কি ক'রে জানবে বলুন মনিষ্যিতে?

গুজব হোক, যাই হোক, আমার মনটাও খানিকটা চাঙ্গা হ'য়ে উঠবেই। এত জাঁক রাজ-রাজড়ার ভাগ্যে জোটে না— এ যদি কপালে লেখা ছেল, তো নিদবর হ'লে ওটুকুও হ'তে কতক্ষণ?

বলবেন, জেন্ডের তফাৎ। মানচি তফাৎ, কিন্তু ফূর্তির চোটে যদি মনে করে থাকি, এই তাহ'লে দিদিমণির সেই 'রগোড়' তো দোষ দেবেন কি ক'রে? উনি শেষেরটুকু তো না বলে লুকিয়েই রেখে দেচে।

শোভাযাত্রা সাজানোটা এখনও শেষ করিনি দাঠাকুর, যমজ বরের কথাটা মাঝখানে এসে পড়ল কিনা। তাঞ্জামের পেছনে খান পাঁচেক জুড়িগাড়ি, আগেরটায় কাকাবাবু, জামাইবাবু, আর পুরুত। তার পরেরগুলোয় জমিদারবাড়ির ছেলেরা সব। তারপর পাঁচ জোড়া ঘোড় সওয়ার তারপরে আবার মশাল হাতে করে একদল লোক। তাদের পেছনে একদল দিশী বাজনা। আগে-পিছে এই পজ্জন্ত নজরে পাড়ে, তারপর সে যে কতদূর পজ্জন্ত চলে গেছে, আন্দাজই পাওয়া যায় না। দামোদর চৌধুরীর ছেলের বরযাত্রী, সে মসনেতে একটা গপ্পই হ'য়ে আচে। কোশ-দেড়েক পথ, হৈ হৈ ক'রতে ক'রতে পেঁছুতে ঐটুকু বেতে পেরায় ঘণ্টাদুয়েক নেগে গেল। আমরা আন্দাজ ন'টার সময় গিয়ে দেউড়ির সামনে দাখিল হ'লুম। একটা খুব গোলমাল হবেই। অতবড় দল, তাদের অভ্যত্থনার জন্যে উঁদিকেও তেমনি আয়োজন। তারই মধ্যে 'অসুন-বসুন' ক'রে আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালে। মস্তবড় এক সামিয়ানা, সেকালের রঙ-বেরঙের বেলোয়ারী ঝাড়, ব্রাকেট, রঙ-বেরঙের হাঁড়ি, দিয়ে ঝলমল ক'রে
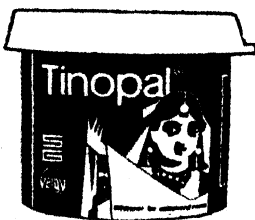
আসর সাজানো; তারই একদিকে বরবাত্রী-দের বাছাবাছা লোকেদের জন্যে বেশ খানিক দূর পর্য্যন্ত দামী গালচে বেছানো, তা পেরায় শ'দুয়েক লোক বসতে পারে বৈকি—তারই গোড়ার দিকে বরাসন।

এইখানেই এসে আমার বুক ধড়াস-ধড়াস্ ক'রতে লাগল দা'ঠাকুর। সেই যে কথায় বলে না?—কুকুরের মুগের পত্যি, কুকুর বলে আমার একি বিপত্তি। টোপর হাতে নাপতে ধ'রে নে যাচ্চে বসাবার জন্যে, ঘুরে দেখি নাপতে আর কেউ নয়, আমারই মতন একেবারে ভোল ফিরিয়ে, শিবনাথ মন্ডল, আমার বাবা। বাবা কানের কাচে মুখ নিয়ে এসে বললে—'কিচ্ছু ভয় নেই, দেখে যা।' দিদিমণিও ঐ কথা ব'লে দেছল। পাচে টের পেনু, সাহসটা চাড়া দিয়ে রাখবার জন্যেই এই ব্যবস্থা, নাপিত তো থাকবেই কাচাকাচি।

তা নয় হোল, কিন্তু বর কোথায়? আসল যে বর, কুমার অনন্তনারাণ। লোকে যমজ ভাবুক, আর যাই ভাবুক আমি তো জানি আসোল বরটা কে? তা, তাকেই যে দেখচি নে।

তার জায়গাও যে নেই। একটি বরাসন, আমাকেই বসিয়েচে। পাশেই নিদ-বরের জন্যে ছোট একটি আসন যেমন থাকে, একটু উঠে গিয়ে বাবা তাতেও একটি ম্যাপিকসই নিদবরই এনে বসালে, এই ধরুণ বছর-পাঁচ ছয়েকের। চিনিনে।

বাবা কানের কাচে মুখ নিয়ে এসে বললে—'ঘাবড়াবিনে, দেখে যা।'

আজ্ঞে, ভোজবাজিই বৈকি। সিদিনে কলকাতা থেকে দল এসে দেখিয়ে গেল না? বাক্সর মধ্যে গোটামানুষটাকে ঢুকিয়ে দিলে, বাক্সর ডালা এ'টে দিয়ে কাপড় ঢেকে দিলে। একটু পরে বার তিনচারি-বারে ঘুরে এসে তালা খুলে ডালা তুলে বাক্স কাৎ ক'রে দেখালে সে লোক নেই, বাক্সর মধ্যে তলোয়ারের খোঁচা দিয়েও সাড়া শব্দ নেই। তারপর সুরে এসে 'রামধন কোথায় গেলিরে বাবা?'—বলে হাঁক দিতেই রামধন পেছন দিকের ভিড়ের মধ্যে থেকে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বেইরে এল যেন কিছুই হয়নি। আজ্ঞে, খেলোয়াড় লোক থাকলে সবই সম্ভব হয়। সে ছেল দিনের বেলা, খোলামেলা জায়গা; খালি ক'জন ওদের লোক, আর এ ওদিকে শ'চারেক লোক, আর এদিকেও শ'পাঁচ-ছয় হবে, বরযাত্রী এয়েচে, দেখবার জন্যে চাপ বেঁধে উঠেচে। গোলমালে একটা ছেলেকে পাচার ক'রে দেওয়া আর শক্ত কি এমন? তাকে তো আর বিড়ি টানতে টানতে ফিরেও আসতে হচ্চে না। পরে যেমন শুনলুমও, তাঞ্জাম এসে পৌঁছুবার মুখেই সাজগোজ সব নাবো ভোল ফিরিয়ে দেচে, তারপর ভিড়ে মিশিয়ে ওদিক থেকে ওদিকেই লোক সুশো দিয়ে বাড়ি ফেরৎ। পনের দিন থেকে পাঁচটা মাথা শুধু এই তালে লেগে রয়েচে, শক্তটা কোথায় তা বলুন আমায়। অনন্ত-নারাণের তো আর কিছু করবার ছেল না। ওকে শুধু সবার সামনে একটু ঘটা ক'রে বের করা। যাতে সন্দো না হ'তে পায় কারুর। দামোদর চৌধুরীর ছেলের বিয়ে, তা ঐ তো ছেলে হুগলী থেকে এল, সেজেগুজে তাঞ্জামে চ'ড়ে বিয়ে করতেও গেল। একটা রেতের জন্যে সবার চোখে একটু ধুলো দেওয়া বৈত নয়। আর কী গুচিয়েই না তোয়ের করেচে পালা দা'-ঠাকুর। শীতকাল, অঘ্রান মাস, রাত ক'রে লগ্ন। উভয়পক্ষে মিলে সাব্যস্ত হয়েছেল, পৌঁছুলেই বরযাত্রীদের আহারে বসিয়ে দেওয়া হবে, যাতে তারা খেয়েদেয়ে সকাল সকাল মসনেতে যে যার আস্তানায় ফিরে যেতে পারে। শুধু এমনি যারা তারাই নয়। বাজনদার, মশালচি, আরও ঐরকম সবও যাবে চলে খেয়ে-দেয়ে। শীত-কাল, দরকারটা কি ঠান্ডা লাগিয়ে রাত কাটাবার?

সেই ব্যবস্থা তোয়ের ছেল। পৌঁছুবার আধঘন্টা টাক পরেই বসিয়ে দেওয়া হোল। তা পেরায় শ'তিনেকের ওপরই। সব মিলিয়ে ঘন্টা দুয়েকও হবে না, সবাই খেয়ে-দেয়ে ফিরে গেল। বলা সত্ত্বেও, গেল না শুধু গোরা-বাদ্যির দলটা। আজ্ঞে, তারা তো চাইবে না যেতে। সমস্তদিন মদ গিলে যা দম হয়েচে, তাদের ঢাক-খত্তাল-ভ্যাঁপো—ভ্যাঁপোর মধ্যে খরচ ক'রে গেচে, এখনও আসোল বিয়ের বাদ্যিই বাজানো হোল না। তাদের জন্যে বিলিতি খানার ব্যবস্তা হয়েছেল, আজ্ঞে, মসনেতেও এখেনেও, তারা খেয়েদেয়ে গ্যাট হয়ে বসে রইল। নড়তে চাইল না।

আর, ব্যবস্তার ওপরে যারা ফিরে গেল না তারা হচ্চে বাগ্দিপাড়ার লেঠেলার দল। কিছু লোক তো কাল বরকনে নিয়ে যাওয়ার সময় চাই। ভাবটা এইরকম আর কি। দিব্যি বরযাত্রীর সাজে সেজে এয়েচে, কেউ সন্দোও করুল না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু ওরা কেউ জানল না, কেউ বুঝল না বা বুঝতে চাইলও না যে হঠাৎ এমন প্রাণখোলা অহীন্দ্র এমন মনমরা হয়ে উঠল কেন? ভেতরে ভেতরে আমার মনটা ছিল ভীষণ রোমান্টিক, আর সেন্টিমেন্টাল—ঘা খেলাম সেইজন্যে সব থেকে বেশী। জাগতিক ব্যাপারে অনভ্যস্ত মন না হলে হয়ত আঘাতটা এত গুরুতরভাবে আমার বুকে বাজত না।

কিন্তু একটা কথা - মামলার কথা নিয়ে ছোট কিংবা বড়ো কেউ কোনোদিন আমার সঙ্গে আলোচনা করেনি, এমনকি প্রবোধবাবুও না। আমিও ও-সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব রইলাম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে মনটা আমার অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল—হাত-পা যেন আমার শেকলে বাঁধা পড়েছে। মনের এই অশান্ত ভাবটাকে কাটিয়ে উঠবার জন্যে কাজেকর্মে আরও দ্বিগুণ উৎসাহে আমি মেতে উঠলাম। কাজ ছাড়া আর কোন কথা নেই, থিয়েটার বা অন্য কোন চিন্তা নেই। তবু অবসর-মুহূর্তগুলিতে দুঃস্বপ্নের মতো আরোপিত কলঙ্ক-কাহিনীগুলো এক এক সময় কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করতো। অধ্যাপক-উপাধ্যাপক হলে সমাজে মুখ দেখাতে পারতাম না। আমি অভিনেতা, আমাদের সম্বন্ধে সমাজের অধিকাংশ লোকই এক খারাপ ধারণা পোষণ করেন, কিছু না করলেও দুর্নামের ভাগী হতে হবে। এঁদের ধারণা—অভিনেতা মাত্রেই মদ্যপায়ী এবং দুশ্চরিত্র। আমাদের শিল্পের আদর আছে কিন্তু চরিত্রের আদর নেই। গিরিশচন্দ্রকেও তদানীন্তন লোকে ভ্রূ কুঁচকে বলত 'নোটো গিরিশ'। গিরিশচন্দ্র বলেছেন,

'লোকে কয় অভিনয়
কভু নিন্দনীয় নয়,
নিন্দার ভাজন শুধু
অভিনেতাগণ
তিরস্কার পুরস্কার কলংক
কণ্ঠের হার,
তথাপি এ-পথে পদ
করেছি অর্পণ।

এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের একটি মূল্যবান মন্তব্য মনে পড়ে—'ভদ্রসন্তান হলেও যখন এর মধ্যে ঢোকেন তখন মনুষ্যত্ব যেন চলে যায় এত নীচ হয়ে পড়েন। কিন্তু যারা বেশ্যা, তারা এসে এখানে উঁচু হয়েছে। পাল্লা দেবার চেষ্টায় তারা ক্রমশ বড়ো হয়ে ওঠে।'

'নীচ হয়ে পড়েন'—এ-কথার তাৎপর্য আগে বুঝতাম না কিন্তু সেদিন বুঝলাম এই সব তথাকথিত 'বন্ধুদের' কুৎসারটনা ও মিথ্যাভাষণের বহর দেখে। একদিকে আমার প্রতি গোপন ঈর্ষা, আর অন্যদিকে চাকরী বজায় রাখার জন্য মালিকদের খুশি করতে গিয়ে সহকর্মীর নামে অবাধ মিথ্যা-ভাষণ—এটা নীচতা-হীনতা ছাড়া আর কি?

কিন্তু দুঃখের কাহিনী আর কত বলব? থাক ওসব কথা, তার থেকে যা বলছিলাম সেই কথায় ফিরে আসি।

এরপরই প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল অত্যন্ত আকস্মিকভাবে রাধিকানন্দবাবুর স্টারের সংশ্রব ছিন্ন করে ফেলা। রাধিকাবাবু আমার অবর্তমানে স্টারে প্রচুর খেটেছেন এবং একদিনে দুখানা পর্যন্ত নাটকে নেমেছেন—এ-কথা আগেই বলেছি। সম্ভবত ওঁর মনে মনে একটা আশা ছিল যে স্টার ও মনোমোহন যখন এক কোম্পানীর পরিচালনাধীনে এসে গেল, তখন উনি নিশ্চয় এক বড়ো কোনো 'পদ' পাবেন। আর ওদিকে হলো কী—আমি মনোমোহনে এসে একেবারে অধিষ্ঠিত হলাম একেবারে প্রধান অভিনেতা-রূপে। শুধু তাই নয়, অপরেশবাবু কাগজে-কলমে মনোমোহনের ম্যানেজার হলেও আসতেন খুবই কম। প্রবোধবাবু সকালে মনোমোহনে এসে টিকিটবিক্রির ব্যাপারটা ঠিকঠাক করে দিয়ে চলে যেতেন। বিকেলে স্টারে যেতে হত তাঁকে। আর ডিরেক্টরদের মধ্যে হরিদাসবাবু আসতেন তা-ও বেড়াতে। এবং রাত্রিবেলায়। অতএব 'সহকারী ম্যানেজার' বললেও কার্যত ম্যানেজার ছিলাম আমিই। রাধিকাবাবু সম্ভবত এতে বেশ একটু ক্ষুব্ধ হলেন। স্টার ছেড়ে পালানো লোক আমি, সেই আমাকে এতো খাতির করে নিয়ে এসে এতো বড়ো দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত করে দেবার অর্থটা কী? ব্যাপারটা মোটেই উনি সুস্থভাবে নিতে পারেননি। তাই উনি 'দুম' করে ছেড়ে দিলেন। অন্য কোনো থিয়েটারেও গেলেন না। আপাতত ঘরে বসেই রইলেন বলা যায়, বসে বসে নতুন কোনো থিয়েটার খোলা যায় কিনা, বা অন্য কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা তারই চেষ্টাচরিত্র করতে লাগলেন।

ওঁর অভিমান বা অভিযোগ সরাসরি আমার ওপর না হলেও, পরোক্ষভাবে সেটা এসে আমাকেই স্পর্শ করে। আমি স্টার ছাড়তে ওখানে ওঁরই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে উঠলো। আমার পার্টগুলো উনিই করতে লাগলেন। সে-সব পার্টে ওঁর সুনামই হল, পার্বলিসিটিও হল ভালো, লোকে বললে—'অনুকরণ নয়, নতুন ধরনের।'

কিন্তু আমি ফিরে আসাতে কর্তৃপক্ষ আবার সেইসব পার্টগুলো আমাকে দিয়েই করাতে লাগলেন—এতে ওঁর মনঃক্ষুণ্ণ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আমি যখন বাইরে বাইরে ঘুরছিলাম, তখন মিনার্ভা আঙুরবালাকে দিয়ে 'তুলসীদাস' করেছিল, কিন্তু তাও বেশীদিন চলেনি। ওদিকে অসুস্থতার পর শিশিরবাবু ফিরে এলেন নাট্যমন্দিরে। তার আগে দানীবাবুও স্বাস্থ্যোদ্ধার করে ফিরে এসে স্টারে 'প্রফুল্ল'-র পুনরাভিনয় শুরু করেছিলেন। দানীবাবু করতেন 'যোগেশ', তারাসুন্দরী—উমাসুন্দরী। আর আমার পার্ট 'রমেশ' করতেন রাধিকাবাবু। নাট্যমন্দিরে ফিরে এসে শিশিরকুমারও ধরলেন 'প্রফুল্ল'—এতে যোগেশ সাজতেন শিশিরবাবু। এটিই ওঁর সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম সামাজিক নাটকাভিনয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আমি মনোমোহনে আসার পর স্টার কবিগুরুর আর একখানি নাটক মঞ্চস্থ করেছিল—সেটি হচ্ছে 'পরিত্রাণ'। তাতে ধনঞ্জয় বৈরাগী ছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, বসন্ত রায়—নরেশ মিত্র, প্রতাপাদিত্য — তুলসী বন্দ্যো, বিভা—নীহারবালা, সুরমা—সরস্বতী।

একদিন হরিদাসবাবু মনোমোহনে রোজ যেমন বেড়াতে আসতেন, তেমনি এসে আমার হাতে একটা কাগজের বান্ডিল তুলে দিয়ে বললেন——অবসর সময়ে এটা একটু পড়ে দেখবেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কী এটা?

হরিদাসবাবু মিটিমিটি হাসছে হাসতে বললেন—নাটক।

—কার?

হরিদাসবাবু বললেন—স্টারে 'মুক্তির ডাক' বলে একখানা একাঙ্কিকা নাটিকা আপনি করেছিলেন, মনে আছে? সেই 'মুক্তির ডাক'-এর লেখক মন্মথ রায় এ-নাটকখানি লিখেছেন। পড়ে দেখুন আপনি, মনে হয় ভালো লাগবে, নতুন ধাঁচের লেখা।

সেই রাত্রেই পড়ে ফেললাম নাটকখানি। সেই চাঁদ বেনে বেহুলা লখিন্দরের পুরনো

গল্প। কিন্তু লেখার স্টাইলটা নতুন ধরনের। সংলাপও আধুনিক। এসব কারণে পুরনো গল্প নতুন এক রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে।

পরদিন হরিদাসবাবু এসে জিজ্ঞেস করতেই বললাম, বই ভালো, চলবে।

উনি খুশি হয়ে বললেন, তবে আর কী? শুরু করে দিন।

আমি বললাম—লেখাটাও যেমন নতুন ধরনের, প্রোডাকশানটাও তেমনি নতুন ধরনের হওয়া উচিত।

হরিদাসবাবু বললেন—তাই হবে। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। লেগে যান আপনি কাজে।

ও'র সঙ্গে কথা বলার পর উনি প্রবোধবাবুকে এই নাটক সম্বন্ধে বলে দিলেন। আমিও প্রবোধবাবুর সঙ্গেও পরামর্শ করলাম। প্রবোধবাবু ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী পুরুষ, কাজের ভারে ভয় পান না। উনি অবিলম্বে পাণ্ডুলিপি 'কপি' করতে দিলেন। তখনকার দিনে প্রত্যেক থিয়েটারেই একজন করে 'কপি-লিখিয়ে' থাকতো। পাণ্ডুলিপিও গোটা গোটা বড় বড় অক্ষরে কপি করবে, আবার পার্টও লিখবে। গিরিশবাবুর ছিল এই ব্যবস্থা এবং সেই থেকেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এটা চালু হয়ে এসেছে। থিয়েটারে সব বিভাগেই একজন করে 'প্রধান' বা 'মাথা' ছিল। স্ব স্ব বিভাগের কাজের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হোত ম্যানেজারের কাছে। আমার কাছে নতুন কপি-লিখিয়ে নেই, আছে স্টারে, সেজন্য প্রবোধবাবুই কপি করাবার ভারটা নিলেন।

কপি করার কাজে অভিজ্ঞ লোক স্টার থিয়েটারে ২।১ জনের বেশী নেই, সেইজন্য মনোমোহনে টপ্ করে সেরকম লোক পাই কোথায়? তখনো কার্বন পেপারের রেওয়াজ হয়নি, অথচ দুটি কপি চাই। সমস্ত বইখানা বড় বড় পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে দু' কপি করতে হবে ধরে ধরে। থিয়েটারে চলতি ভাষায় এই কপিকে 'সাট' বলে—তার ওপর সব আলো ফেলার নির্দেশ লেখা থাকত—কোন দৃশ্যে লাল, কোথায় নীল, কোথায় হলদে—এমনকি আর্কল্যাম্পের সাহায্যে কখন কোথায় কার ওপর 'ফোকাস' ফেলতে হবে—তাতে সব লেখা থাকত। তখনকার দিনে 'টর্চ' বাতির চলন এসে গেলেও, অনেকে টর্চের মুখটা লাল কাপড় দিয়ে বেঁধে নিত, যাতে আলোটা ছড়িয়ে না পড়ে। টর্চের আগে প্রম্পটাররা মোমবাতি দিয়ে কাজ চালাত।

যাই হোক, খুব শিগ্‌গীরই হাতে এসে গেল 'সাট' আর লেখা পার্টগুলো। একদিন সব ভূমিকা বণ্টনও হয়ে গেল। চাঁদ সদাগর —আমি, বেহুলা—সুশীলাসুন্দরী (ছোট), লখিন্দর — ইন্দু মুখার্জি, সনকা— রানীসুন্দরী (মনোমোহনের), সাঁই সদাগর —কনকনারায়ণ ভূপ, নেতা — আশ্চর্যময়ী কালু সর্দার — কুঞ্জলাল সেন, নেড়া — তুলসী চক্রবর্তী, ধন্বন্তরী — সন্তোষকুমার শীল, মনসা — নিভাননী। দুর্গাদাসকে এ-বইতে পাওয়া যায়নি। স্টারে তখন অপরেশবাবুর লেখা 'মুগের মুলুক' খোলা হবে — তাতে কাজ করছে সে।

মহলা চলতে লাগল। আগের স্টেজ-ম্যানেজার কালীবাবু তখন নেই, প্রবোধবাবু নিজে এসে সেট নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন। বইটাতে ইল্যুশান দৃশ্য ছিল কয়েকটি, আমার ইচ্ছে ছিল ওগুলো বাদ দিয়ে দিই, কিন্তু প্রবোধবাবু নাছোড়বান্দা, উনি বললেন—ঠিক আছে, দেখ না আমি সব করে দেবো। এছাড়া ছিল নৃত্য। বেহুলার সর্পনৃত্য ছিল, ময়ূর-নৃত্য ছিল। নৃত্যশিক্ষক হয়ে এসেছিলেন ললিতমোহন গোস্বামী। বয়স্ক ব্যক্তি, আমায় এসে বললেন—আপনি ঠিক কেমন চান? আপনার আইডিয়াটা বলুন—আমি ঠিক তেমনি করে দেব।

আমি বললাম—নাচের আমি কি জানি?

ললিতবাবু বললেন—আপনার কাছে অনেক বই আছে। সেগুলি দিয়ে আমাকে যদি একটু সাহায্য করেন, তাহলে আমি নতুন ধরনের কিছু করে দিতে পারি।

উৎসাহিত হয়ে বললাম—দেখুন ললিতবাবু, আমার ইচ্ছে খুব বেশী অঙ্গ-ভঙ্গী বা পায়ের কাজ না করিয়ে যতটা পারেন হাতের ভঙ্গী দিয়ে ভাবটা ফুটিয়ে তুলুন। যেমন ধরুন, সাপ দুধ খেতে আসছে বা বাঁশী শুনে আনন্দে দুলছে বা দংশন করতে চলেছে ইত্যাদি 'সর্পগতিকে' হাত বা দেহভঙ্গিমার মধ্যে নিয়ে আসুন। তাহলে এসব নৃত্য একটা নূতনত্ব পাবে।

ললিতবাবু স্টার থেকে এখানে এসেছেন, আর এখানকার নৃত্যশিক্ষক ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায় গেছেন স্টারে। ললিত-বাবু একটু সেকেলে ধরনের লোক, কিন্তু আমার ওপর তাঁর আস্থা অপরিসীম। আমার কাছে নৃত্যসম্বন্ধীয় কিছু বই ছিল —বিলেত থেকে ড্যান্সিং টাইমস্ আনাতুম। ললিতবাবুর আগ্রহ দেখে বইগুলো তাঁকে দেখালুম। ছবি আর গ্রাফগুলো বুঝিয়ে দিলাম। ললিতবাবু খুব নিষ্ঠার সঙ্গে সেগুলি বুঝে নিলেন। ফলে ও'র নৃত্য-পরিকল্পনায় যে নূতনত্ব প্রকাশ পেলো, তার জন্য উনি যথেষ্ট প্রশংসা পেলেন। শিল্পী যদি বিনয়ী হন এবং মনে যদি তাঁর অহঙ্কার না থাকে এবং সত্যিই যদি লোককে নূতন কিছু দেবার ইচ্ছে তাঁর মনে থাকে, তবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নূতন নূতন শিল্প সৃষ্টি করে যান। আর যদি তিনি মনে করেন, 'যা জানি তাই তো যথেষ্ট—এই যা কে জানে?' তাহলে ধরে নিতে হবে যে তাঁর সৃজনশীল ক্ষমতার অপমৃত্যু হয়েছে।

যাই হোক, প্রস্তুতি-পর্ব খুব জোর চলেছে। একদিকে মহলা চলছে, অন্যদিকে সেট নির্মাণ চলছে। সকাল-দুপুর-বিকেল— দিনে তিনবার করে প্রবোধবাবু এখানে আসছেন—প্রচুর খাটছেন তিনি। আবার সন্ধ্যার মুখে স্টারে চলে যান। একটা দৃশ্য আছে—যেখানে বেহুলা ভেলা করে নদীর ওপর দিয়ে যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে গান গাইছে। তাকে ভয় দেখাবার জন্যে ভূত-প্রেতের আবির্ভাব হতে লাগল এবং যাতে সে এগুতে না পারে, তার জন্যে নদীর বুকে বড়ো বড়ো পাথরের ঢিবি জেগে উঠতে লাগল।

আমি বললাম, ভূত-প্রেতের আওয়াজ না হয় নেপথ্য থেকে হাঁড়ির ভেতর থেকে করা গেল, কিন্তু সব মিলিয়ে এই ইল্যুশান সৃষ্টি করার দরকার কী? নাটকের নিজস্ব গতিতেই এ চলে যাবে। কিন্তু প্রবোধবাবু ছাড়লেন না। তিনি সব করে-টরে রিহার্সাল দেখালেন একদিন। ছাতার মত পাঁচ-ছ'টা অতিকায় বস্তু খুলে গিয়ে পাথরের ঢিবি হয়ে যেতে লাগলো—তার ভিতরে ছাতার শিকের মতোই শিক লাগানো, ছাতার মত খুলে যায়, বুজে যায়।

ব্যাপারটা দেখতে মন্দ লাগলো না কিন্তু তবু আমার মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল —আসল কথা আমার এ-সিনটাই ভালো লাগছিল না। এদিকে সোজাসুজি না বলতেও পারছি না, তাহলে যদি ও'র জেদ চেপে যায়! তবু আমি ঘুরিয়ে বললাম— আসলে এ-সিনটারই কোনো দরকার নেই।

প্রবোধবাবু বললেন—না হে, ঠিক আছে। দেখো, ঠিক হয়ে যাবে।

আমি আর কিছু বললাম না।

নাটকের প্রথম অভিনয় হয়ে গেল। নীচের দর্শক কিছু বলেনি, কিন্তু ওপর থেকে যারা দেখছিল, তারা পছন্দ করলে না। প্রবোধবাবু নিজেও দেখলেন, দেখে সম্ভবত ও'র নিজেরও ভাল লাগলো না। অভিনয়-শেষে আমাকে এসে বললেন—না হে, তুমি ঠিকই বলেছিলে—ওটা কেটেই দাও।

আমি তো এই চাইছিলাম—আমি তখখুনি বসে গেলাম 'এডিট' করতে। দ্বিতীয় রজনী থেকে ওসব দৃশ্য একেবারে বাদ হয়ে গেল, তাতে নাটকের কোনই অঙ্গহানি হল না।

'চাঁদ সদাগরে'র প্রথম অভিনয়-রজনীর তারিখ ছিল ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭, বুধবার, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা।

প্রথম রজনীতে নাট্যকার মন্মথবাবু আসেননি থিয়েটারে। কেন আসেননি তার কৈফিয়ৎটা তিনি নাটকের ভূমিকায় দিয়েছেন। ও'র মাতামহ রামপ্রাণ গুপ্ত ছিলেন তখন-কার দিনের প্রসিদ্ধ প্রবন্ধকার ও ঐতি-হাসিক। তিনি সেদিন মহাপ্রয়াণ করেন। দৌহিত্রকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাই মাতামহকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে তিনি আসতে পারেননি।

দ্বিতীয় অভিনয়-রজনীতে নাট্যকার এলেন। সুদীর্ঘ সুঠাম সুন্দর গৌরবর্ণ চেহারা। মিষ্টভাষী ও সদালাপী। মাথায় চুল একটু কোঁকড়ানো। হরিদাসবাবুই ভিতরে নিয়ে এলেন সঙ্গে করে। তখন অভিনয় শেষ হয়ে গেছে—আমি মেক-আপ তুলছি। আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিতভাবে মন্মথবাবু বলে উঠলেন—'আমার বই যে অভিনয় হবে এবং সেটা যে এত ভালো হবে তা আমি ভাবতেই পারিনি। দেশে বসে

নাটক লিখি—ক্লাবে প্লে হয়, ব্যস্ ঐ পর্যন্ত। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম আমার পূর্ণাঙ্গ নাটক অভিনীত হলো। অভিনয় সকলেরই চমৎকার হয়েছে—বিশেষ চাঁদ সদাগর, বেহুলো আর সনকা।'

এই থেকেই মন্মথবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ। আর সে-আলাপ জমে-জমে শেষ-পর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো যে, আমরা পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেলাম। সে-আলাপ ওঁতে-আমাতেই শুধু সীমাবদ্ধ রইলো না। অচিরেই আমাদের দু' পরিবারের মধ্যেও ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত হয়ে দাঁড়ালো যেন আমি বড়ো ভাই, আর উনি কনিষ্ঠ—আমরা যেন একই পরিবারের লোক। ওঁ'র মা আমার স্ত্রীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আজ পর্যন্ত আমাদের দুজনের সে-প্রীতির বন্ধন অটুট আছে। এঁ'র আরও নাটক আমি করেছি, এবং সেসব নিয়ে অনেক ঘটনাও আছে—যথাসময়ে সেসব কথা বলব।

'চাঁদ সদাগরে'র নাম হল খুব, কাগজে কাগজে সুখ্যাতিও বেরুল প্রচুর। স্থানাভাবে সেগুলি আর উদ্ধৃত করলাম না। আমাদের ডিরেক্টররা খুব খুশি। অপরেশবাবুও এসে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। মনে হল এতদিন যাবৎ স্টারে কাজ করছি—সেই ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত। প্রশংসা, সহানুভূতি অনেক পেয়েছি, কিন্তু এ অভিনয় ও প্রযোজনায় যা পেলাম, তা হল ঠিক প্রশংসা নয়—যাকে বলে শ্রদ্ধা। এরকমটি আর কখনও পাইনি। আর একটা কথা—নিজের ওপর এলো নির্ভরশীলতা। এই 'চাঁদ সদাগর' থেকেই আমার সত্তা এখানে সম্যক প্রতিষ্ঠিত হলো।

'চাঁদ সদাগর' সগৌরবে চলতে লাগল মনোমোহনে। আর ওদিকে নাট্যজগতে ঘটলো এক অভাবনীয় ঘটনা। নাট্যমন্দিরে শিশির ভাদুড়ী খুললেন নতুন নাটক শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' (দেনা-পাওনার নাট্যরূপ)। এর প্রথম রজনী হলো ৬রা আগস্ট ১৯২৭, ২১শে শ্রাবণ, ১৩৩৪। প্রথম কয়েক রাত্রি তেমন লোক হয়নি এ-নাটকে। দর্শক আকর্ষণের জন্য 'শেষরক্ষা'কে জুড়ে দিতে হল। তারপর অবশ্য দারুণ ভিড় হতে লাগল। প্রশংসায় অভিনন্দনে আকাশ-বাতাস ভরে গেল। প্রথম অভিনয়-রজনীতে ছিলেন জীবানন্দ—শিশির ভাদুড়ী, প্রফুল্ল—রবি রায়, এককড়ি—গোপাল ভট্টাচার্য, নির্মল—শৈলেন চৌধুরী, ষোড়শী—চারুশীলা।

প্রথম কথাই হলো নাটক। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র। নাটকের জোরালো গল্প। তার সংলাপ এবং চরিত্রচিত্রণ। তারপর হলো প্রযোজনা। সবদিক থেকে এমন একটা সামঞ্জস্য রূপে পরিগ্রহ করেছে যা দেখে প্রতিটি লোক মুগ্ধ হয়েছে। অন্য সবার অভিনয় বা প্রযোজনায় আমাদের পক্ষে চমক লাগাবার মতো তেমন কিছু দেখতে পাইনি বটে কিন্তু যেটা আমাদের মনকে সবচেয়ে বেশী করে নাড়া দিল, সেটা হল শিশির-কুমারের অদ্ভুত অভিনয় এবং সমগ্র নাটকখানির প্রযোজনা। 'জীবানন্দ' চরিত্রের সঙ্গে ওঁ'র অভিনয় যেন মিশে একাকার হয়ে গেছে। শিশিরবাবুর এতাবৎ যেসব অভিনয় আমি দেখেছি, তাতে নূতনত্ব যথেষ্ট থাকলেও নাটকের মধ্যে ওঁ'র অসাধারণ ব্যক্তিত্বই সবথেকে বেশী প্রকট হয়ে উঠত। মনে মনে ব্যক্তিগতভাবে ওঁর অভিনয়ের প্রতি এই ছিল আমার অভিযোগ। সেখানে শিশিরকুমার ছাড়া আর কাউকে তেমন নজরে পড়তো না। কিন্তু তাঁর 'জীবানন্দ' দেখবার পর আমার সব অভিযোগ খন্ডন করতে বাধ্য হলাম। জীবানন্দের চরিত্রের মধ্যে শিশিরবাবু যেন মিশে গেলেন—এমন আত্মমগ্ন অভিনয় যে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে একটা অন্তর্নিহিত মুগ্ধকর ভাব আগা-গোড়া বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে। নাট্যকার-সৃষ্ট চরিত্রে 'চরিত্র' ছাড়াও আরও যে কিছু করার থাকে অভিনেতার, সেই 'আরও কিছু'কে দর্শক হিসাবে সেদিন পরিপূর্ণ-ভাবে উপলব্ধি করে এলাম।

আমার তো মনে হয় এই অভিনয়ের পরে যদি শিশিরবাবু আর কোনও অভিনয় নাও করতেন, তাহলেও তিনি অমর হয়ে থাকতেন। জীবানন্দ-ষোড়শীর ভাবগত নাট্যদ্বন্দ্বে সেদিন জীবানন্দ এক-তৃতীয় বাণীর সঞ্চার করেছিলেন বললে অত্যুক্তি করা হবে না। সাহিত্য পাঠে যেমন "to read between the lines" বলে একটা কথা আছে, নাট্য-সাহিত্যেও তেমনি নির্দিষ্ট ঘটনা ও নির্দিষ্ট সংলাপ ছাড়াও কিছু বস্তু অনুভব করার আছে। সেই অনুভূতিকে যিনি যতো উপলব্ধি করতে পারবেন ও প্রকাশ করে বিশ্লেষণ করতে পারবেন, তিনি ততো বড়ো শিল্পী। দর্শকের পক্ষে এ-পাওনাটা উপরিপাওনা, আর এই 'উপরি-পাওনার' জন্য প্রতিটি রসজ্ঞ দর্শকের মন আকুলিবিকুলি করতে থাকে বলে তাঁরা বারবার প্রেক্ষাগৃহের দিকে ছুটে যান। এ 'উপরি-পাওনা'র ব্যাপারটা বলে বা লিখে বোঝাবার নয়, এটা উপলব্ধিসাপেক্ষ।

এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটল। পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে—সেই যে চরখেরীতে গিয়েছিলাম কিছুদিন আগে 'রাজসিংহে'র শ্যুটিং করতে। এই থিয়েটারের ফাঁকে ফাঁকে সেই 'রাজসিংহে'র শ্যুটিং হয়ে যেতে লাগল। ছবিটা তুলতে খরচও হয়েছিল যেমন, সময়ও লেগেছিল তেমনি। কলকাতার চোরবাগান মার্বেল 'প্যালেস'এ (এ বাড়িটি এখনও বর্তমান) আমাদের শ্যুটিং হল।

'রাজসিংহে' কাহিনীর যে স্থান-কাল, তার সঙ্গে পরিবেশের সংগতি রাখতে অবশ্য 'মার্বেল প্যালেস' পারেনি স্থাপত্য-রীতির দিক থেকে। কিন্তু ম্যাডান কোম্পানী ওসব দিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করল না। 'রাজসিংহ' রাজা-রাজড়াদের ছবি—তার সঙ্গে বেশ জাঁকজমকওলা কিছু দেখাতে পারলেই হলো। ঐতিহাসিক পারম্পর্য আবার কি? কেই বা ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে? যাইহোক, এইভাবে ছবি তো একদিন শেষ হল, কিন্তু মুস্কিল বাধলো ছবির 'রিলিজ' নিয়ে। মুসলমানরা আপত্তি তুললেন। আওরংজেব-কন্যা জেবুন্নিসা অন্তঃপুরে বসে বাইজী নিয়ে নৃত্যগীত উপভোগ করছেন ও মোবারকের সঙ্গে মদ্যপান করছেন এসব দৃশ্য তাঁরা পছন্দ করলেন না। আওরংজেবের অন্তঃপুরে নৃত্যগীত আবার কি? এমন কি শ্যুটিং-এর সময় পর্যন্ত গোলমাল হয়েছিল। আমাদের সঙ্গে 'মোবারক' যে করছিল সে ছিল মুসলমান। সে একটি দৃশ্যে অভিনয় করতে আপত্তি করে বসেছিল।

তবু ম্যামজীর দৃঢ়তায় বইটি তোলা শেষ হলো এবং সাড়ম্বরে মুক্তিদিবসও ঘোষিত হলো। রিলিজ সংক্রান্ত সমস্ত বন্দোবস্তও হয়ে গেল। ঠাকুরসিং বলে ম্যাডানে একজন বেশ নামকরা পেইনটার ছিল। সে সিনেমা-গৃহের সামনে ডিসপ্লে করার জন্য 'রাজসিংহে'র একটি প্রকাণ্ড কাট-আউট তৈরী করলো। যথারীতি মেকাপ নিয়ে পোশাক পরে তাকে কয়েকটা 'সিটিং' দিতে হয়েছিল এইজন্যে। ঘোড়ায় চড়ে রাজসিংহ চলেছেন, আর ঠাকুর সিংয়ের চাই 'রাজসিংহে'র বিগ ক্লোজ-আপ, মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত—অর্থাৎ ঘোড়া দেখা যাবে না, কিন্তু রাজসিংহ যে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন এটা যেন বেশ বোঝা যায়। আমাকেও সেইভাবে একটা চৌকির ওপর ঠায় বসে থেকে 'সিটিং' দিতে হল। আসল ঘোড়ায় চড়ে 'সিটিং' দিলে ঘোড়া স্থির থাকবে কেন? সে তো নড়াচড়া করবেই, তাই ঠাকুর সিং বললে, 'আপনি শুধু ঘোড়ার চড়ার পোজটা দিন। আমি আপনার ছবির সঙ্গে পরে ঘোড়া এঁকে নেব।

রিলিজ হবার দিন কয়েক যেতে না যেতেই আপত্তি উঠলো। এবং শান্তিভঙ্গের আশায় ম্যাডানদের বাধ্য হয়ে ছবি উঠিয়ে নিতে হল। ম্যামজী ম্যাডান ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি, তিনি ব্যাপারটা আগে থেকেই আন্দাজ করে তেইশটা প্রিন্ট করে সারা দেশ জুড়ে তেইশটা হাউসে 'রাজসিংহ' রিলিজ করে-ছিলেন। তখন ম্যাডানদের সারা ভারতে প্রায় একশোটা চিত্রগৃহ ছিল। ভেবে দেখুন সে যুগে তেইশটা প্রিন্ট একসঙ্গে!! এটা ম্যাডান কোম্পানী বলেই সম্ভব হয়েছিল। সব হাউসে এক সপ্তাহ ধরে চললেই তো তেইশ সপ্তাহ চলে গেল—তার ওপরে সব নিজেদের হাউস! পয়সা উঠিয়ে নিতে এমন কি কষ্ট!!

ম্যাডানরা পরে দানীবাবুকে দিয়ে 'শান্তি-কি-শান্তি' করিয়েছিল। দানীবাবুর সেই প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবিতে চিত্রাবতরণ। উনি ছিলেন প্রধান ভূমিকায় আর আমি 'প্রকাশ'। শ্যুটিং-এর সময়ে 'কাট' বললে যে অভিনয় বন্ধ করতে হয়, তারপর ক্যামেরা এগিয়ে বা পিছিয়ে নিয়ে ক্লোজ-আপ, মিড শট, লংশট নেয়—সে সব দানীবাবু বরদাস্ত করতে পারলেন না। মঞ্চাভিনয়ের সে স্বতঃস্ফূর্ত ধারাবাহিকতা ব্যাহত হতে লাগল। বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন—'না বাপু, এসব আমার দ্বারা হবে না।'

(ক্রমশঃ)

ফিগার

প্রাচীন সৌন্দর্যকাররা বলেছেন, দেহ-বল্লরী। তবেই তো ফিগার সুন্দর হবে। দেখে নয়ন-মন তৃপ্ত হবে। তা না হয়ে যদি চোখের সামনা দিয়ে বিরাট গজকচ্ছপ সদৃশ একটা শরীর চলে যায় তাহলে নয়ন-মনের তৃপ্তির বদলে হাঁফিয়ে উঠতে হবে। আবার যদি একটা রোগা-পলকা দেহধারীকে দেখি তখনো মনটা কি রকম অপ্রসন্নই থেকে যায়। এতো ঠিক সৌন্দর্য নয়। অথচ চেহারায় ঘষামাজার কিন্তু কমতি নেই।

হালফিল ফ্যাশানের উজ্জ্বলতায় সবাই নিজের নিজের শারীরিক ত্রুটি ঢেকে ফেলতে চাইছে। এজন্য প্রচেষ্টাও কম নয়। ফ্যাশানে কদর্যতা তাই দিনকে দিন উগ্র হয়ে উঠছে। যাদের দেহশ্রী হাজার ফ্যাশানেও বেমানান থেকে যাবে তারা এতসব বোঝে না। তারা মনে করে, যেটুকু খামতি আছে ফ্যাশানেই তা ম্যানেজ করে দেব। কিন্তু তা হয় না। বেমানান আরো বেমানান হয়। কখনো মনে হয়, সাজ-পোশাকের একটা ঢিপ চলে যাচ্ছে আবার কখনো মনে হয়, প্রসাধন-ফ্যাশানের এত বিজ্ঞাপনেও বিজ্ঞপ্তি ঠিক স্পষ্ট হচ্ছে না। এই অসম প্রতিযোগিতা আজকাল এত বেড়েছে যে, রুচির যাচাই করা এক শক্ত ব্যাপার।

অথচ নারী সৌন্দর্যপ্রিয়। সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই তাদের এই সৌন্দর্যপ্রিয়তা ধরা পড়েছে নানাভাবে। আজকের ফ্যাশানে হয়তো সেদিন ছিল না কিন্তু তখনও নারী সাজতো। ধূপের ধোঁয়ায় চুল শুকতো, তাম্বুলে অধর রঞ্জিত করতো, অলক্তরঞ্জিত চরণে পড়তো নূপুর, চন্দন-অগুরুতে করতো নিজেকে সুরভিত। তারপর দিন বদলেছে। দিনের পাঠও বদলেছে। সেদিন নারী নিজেকে সাজানোর পূর্বে নজর রাখতো দেহশ্রীর দিকে। দেহের শ্রী যদি না থাকে তবে আলগা রঙ চাপিয়ে তা সুশ্রী করা চলে না। বরং আরো কদাকার, কুৎসিত হয়।

আজও নারী সাজে। স্নো-পাউডার-লিপস্টিক আজকের প্রসাধন। পেঁচিয়ে জড়িয়ে পরা শাড়িতে শরীরের বাহার তুলে ধরার জন্য সে একান্ত ব্যস্ত। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের বদলে অসৌন্দর্যই সেখানে বাসা বেঁধে থাকে। এত সাজ-গোজেও কিন্তু আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে না চেহারা।

ফ্যাশানের যুগে আমাদের বাস। তাই ফ্যাশান বাদ দিয়ে বেঁচে থাকার কোন প্রশ্নই আসে না। কিন্তু সবকিছুর প্রয়োগই হওয়া চাই রুচিমাফিক। মাজাঘষা শহুরে মেয়ের তুলনায় গাঁয়ের প্রসাধনবিহীন মেয়েকে অনেক সময় চোখে ধরে বেশি। তার মধ্যে কৃত্রিমতা নেই। আদি-অকৃত্রিম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটুকু নিয়েই সে আছে। আর তাতেই সে সুন্দর। এবং অনেক পোশাকী মেয়েকে টেক্কা দিয়ে যাচ্ছে।

সাজ-পোশাকে মলিনতা নিশ্চয়ই অনেকখানি ঢাকা পড়ে। সৌন্দর্যও বাড়ে। কিন্তু আকর্ষণ? আর এখানেই আছে সৌন্দর্যের আসল চাবিকাঠি। তাই অনেক মেয়ে সুন্দর হয়েও আকর্ষণীয় নয়। আবার কেউ কেউ সৌন্দর্যের শাস্ত্র বিচারে না উতরোলেও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। অনেকে হয়তো মোটেই আকর্ষণীয় নয়। কিন্তু এর মধ্যেও যথেষ্ট রহস্য আছে। নারী নিজেকে সব সময়ই আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। এই ক্ষমতাটুকু তার জন্মগত। এর অনেকখানি নির্ভর করে শরীরের বাঁধুনির উপর অর্থাৎ ফিগার। ফিগার ভাল না হলে ব্যক্তিত্ব এবং সৌন্দর্য অনেকখানি চাপা পড়ে যায়। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুডোল শরীর।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সরু কোমর, সুডোল গলা, সুগঠিত বাহু ও বক্ষ—এই হলো সুন্দর চেহারা। এর উল্টো-দিকে তাকালে আর কোন পথ নেই। কেউ যদি খুব দুর্বল অথবা খুব মেদবহুল হয় তাহলে ফিগারের দিক থেকে সে অনেকখানি পেছিয়ে পড়লো। তবে এতে হতাশ হওয়ার খুব একটা কারণ নেই। সকলেই যে বিধিদত্ত সুন্দর ফিগার নিয়ে জন্মাবেন তেমন তো আর হতে পারে না। তাহলে তো পৃথিবী অসুন্দরে ভরে যেতো। তা যখন হয় নি তখন নিশ্চয়ই পথ খোলা আছে। প্রয়োজন কিছু মেহনত এবং শারীরিক কসরৎ। বাস, এই পর্যন্ত। তারপর শরীর আপনি গড়-গড়িয়ে চলবে। শুধু অভ্যাস বজায় রাখতে হবে।

এতো সামান্য অভ্যাসের ব্যাপার। মানুষ ইচ্ছায় কি না করতে পারে! চাঁদে পা দেও-য়ার পর মানুষের অসাধ্য কিছু আছে বলেই মনে হয় না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, চাঁদে পা দেওয়ার আগে এর পেছনে আমাদের কত দিনের সাধ-আকাঙ্ক্ষা-উদ্যোগ কার্য-করী ছিল। তারপর এসেছে সাফল্য। তেমনি বেঢপ শরীরকে ঠিকঠাক করতে সাধ-আকাঙ্ক্ষা-উদ্যোগের সমন্বয় চাই। না হলে কোন কিছুই হবে না।

দৃঢ় প্রত্যয়, পরিশ্রম, আর আকাঙ্ক্ষা যদি যুক্ত হয় তাহলে ফিগার-এর জন্য আর আক্ষেপ করতে হবে না। যদি শরীরে আলস্য বাসা বেঁধে না থাকে তবে দিন পনেরোর মধ্যেই পরিবর্তন অনুভব করা যাবে। বোঝা যাবে দেহের অতিরিক্ত মেদ কমতে শুরু করেছে। শরীর ফিটফাট মনে হচ্ছে। বডি শার্প হচ্ছে। দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তা কমবে। ফ্যাশান ব্যবহার সহজ হবে।

ফিগার সুগঠিত করার আগে দেখতে হবে শরীর কোন ধরনের। রোগা না মোটা। নজর রাখতে হবে সব কাজ নিয়মিত করার দিকে। এজন্য একটা রুটিন বানিয়ে নিতে হবে। সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠার নিয়ম মেনে চলা খুবই ভাল। যদি সম্ভব না হয় তাহলে যে কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে রাতের ঘুম শেষ করতে হবে। সে সকাল সাতটা বা আটটা যাই হোক না কেন। নিয়-মিত অভ্যাসে শরীর ঠিক। অনিয়মে শরীরও বিগড়ে যায়। এরপরই নজর দিতে হবে খাদ্যের দিকে। পরিমাণে কম হোক ক্ষতি নেই, পুষ্টিকর জিনিস খেতে হবে। এবং রোজই এক সময়ে।

এই তো প্রাথমিক কথা। অবশ্যই শরীর চর্চার। এইভাবে শরীরকে রুটিনের মধ্যে এনে শুরু হবে শারীরিক কসরৎ। যে যতই ব্যস্ত হোন না কেন কিছু সময়ের জন্য ব্যায়াম অভ্যাস করতেই হবে। তাহলেই শরীর একদম ফিট। আমাদের প্রাক্তন প্রধান-মন্ত্রী স্বর্গত জওহরলাল নেহরু ঠাসা কাজের মধ্যে সময় করে নিয়ে নিয়মিত ব্যায়াম করতেন। শরীর সুস্থ রাখার জন্য ব্যায়াম অবশ্য প্রয়োজনীয়।

ব্যায়াম হালকা হলে ক্ষতি নেই। শরীরকে কার্যক্ষম রাখতে গেলে খুব একটা কঠোর ব্যায়ামের দরকার নেই। ফ্রি-হ্যান্ড একসারসাইজই যথেষ্ট। একটি চার্ট অনু-যায়ী সবাই রোজ অন্তত আধ ঘন্টা ব্যায়াম করুন। শরীর সুগঠিত হবে। দেহমন প্রফুল্ল থাকবে। ফ্যাশান ব্যবহারে মন ভরবে। কেউ রসিকতার সুযোগও পাবে না।

[তিন]

কাল রাতে বেশ ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল। সমস্ত জঙ্গলে পাহাড়ে চলেছে তাণ্ডব নৃত্য। হাওয়ার সে কী দাপাদাপি আর গর্জন। অথচ বৃষ্টির তেমন তোড় নেই। হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সত্তা এমনভাবে মিশে গেছে যে হাওয়াটাই বৃষ্টি না বৃষ্টিটাই হাওয়া বোঝা যায় না। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত ঠান্ডা। রাতে দেরাজ খুলে বালাপোষ বের করে গায়ে দিতে হয়েছে। সকালে এখনও বেশ ঠান্ডা। হাওয়াটা মনে হচ্ছে জ্যৈষ্ঠের শেষের হাওয়া তো নয়, শরতের প্রথম হাওয়া।

আজকে আমার জীপ গাড়ি আসবে ডাল্টনগঞ্জে। এবং আমার নতুন বন্দুক। সেখান থেকে ঘোষদার ড্রাইভার গাড়ি, বন্দুক পৌঁছে দিয়ে যাবে।

মনে হচ্ছে, জীপটা যে এত তাড়াতাড়ি এলো তার কারণ আমি নয়, কোম্পানীর ডিরেকটরেরা সস্ত্রীক এবং সবান্ধবে শিকারে আসছেন পরের সপ্তাহে এখানে। বাঘ শিকারে। যার আর এক নাম "জঙ্গল ইনস্পেকশান্।" সব খরচা কোম্পানীর। যে খরচ কোম্পানীর খাতায় লেখার নিতান্ত অসুবিধা সে খরচ চাপবে তেওয়ারীবাবুর ঘাড়ে, কিংবা অন্য জায়গায় যে 'হ্যান্ডলিং কন্ট্রাক্টর' আছে তাঁদের ঘাড়ে।

সভয়ে দিন গুণছি। মালিক ও তাঁর স্ত্রীর আগমনের প্রতীক্ষায়।

পথে বেরিয়ে দেখি, সারা পথে পুষ্প বৃষ্টি হয়ে রয়েছে। শুধু ফুল নয়, কত যে পাতা—রঙীন পাতা, হলদে পাতা, ফিকে হলদে পাতা, গোলাপী পাতা, লাল পাতা, সবুজ পাতা, কাঁচ কলাপাতা রঙা-পাতা, জঙ্গলের পায়ে বিছানো রয়েছে কি বলব। তার সঙ্গে ফুল। সমস্ত জঙ্গলে মনে হচ্ছে যেন এক বিচিত্রবর্ণ মখমল কোমল, নয়নাভিরাম গালিচা বিছানো রয়েছে। পা ফেলতে মন কেমন করে। সেই চমৎকার আবহাওয়ায়, সেই সকালে সমস্ত প্রকৃতির শব্দ গ্রহণ ও শব্দ প্রেরণ ক্ষমতা যেন অনেক বেড়ে গেছে। দূর জঙ্গলের ময়ূরের কেঁয়া কেঁয়া, মোরগের কক্কর কঁ, হরিয়ালের সম্মিলিত পাখার চঞ্চলতার শব্দ যেন মনে হচ্ছে হাতের কাছে।

টাবড় আজ বন্দুক নিয়েছে সঙ্গে। মাঝে মাঝে ও টাঙ্গী ছেড়ে বন্দুকও নেয়। সে বন্দুকে দেখে মনে হয় তার জন্ম প্রাগৈতিহাসিক কালে। মুঙ্গেরী একনলা গাদা বন্দুক। তাতে কোনও টোপীওয়ালা কার্তুজ যায় না। গাদতে হয়। জানোয়ার বিশেষে সেই গাদাগাদির প্রকারভেদ হয়। ছোট জানোয়ারের জন্য কম বারুদ গাদতে হয়। এই গাদাগাদি কোনও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করে হয় না। অংগুলি ধরে হিসাব। যেমন বাঘের জন্য তিন অংগুলি, হরিণের জন্য দেড় অংগুলি ইত্যাদি।

আজকাল বেশ অনেক কিছু শিখে গেছি। আর সেই শহুরে বোকা ছেলেটি নেই। দেহাতী হিন্দিটাও মোটামুটি রপ্ত। সুমিতা বৌদির 'ক্যা' এবং 'বা' কিন্তু একেবারে উপেক্ষা করার নয়। রীতিমত কাজে লেগেছে।

টাবড় একদিন মুরগী মারতে নিয়ে গেছিল।

মাঝে মাঝে গভীর জঙ্গলে গেলে দেখা যায়, কোনো শুকনো গাছের ডালে পলাশ ফুলের মত মুরগী ফুটে আছে। টাবড়ের মত আমি মহুয়া খাই না। মহুয়া না খেয়েই বলছি।

সকালের সোনালী আলোয় যখন কোনও মদমত্ত মোরগ কোনও বিতৃষ্ণাগত-প্রাণা পলায়মানা মুরগীর পেছনে পেছনে ছলে, বলে, কৌশলে কক্ কক্ কুক্ কুক করতে করতে ধাওয়া করে জঙ্গলময় ছুটোছুটি করে বেড়ায় তখন কেন জানি না আমাদের সঙ্গে এই আত্মসম্মান-জ্ঞানহীন কুক্কুট প্রবরদের একটা জবরদস্ত ও অবিচ্ছেদ্য মিল দেখতে পাই। সোনালী পাখনায় মোড়া, দীর্ঘগ্রীবা, সুতনুকা কলহাস্য এবং লাস্যময়ী কুক্কুটিদের সঙ্গে, ফ্লেণ্ডরোল' করা সুগন্ধী স্মিতমুখী আধুনিকাদের কোনও তফাৎ দেখতে পাই না। পৃথিবীর সৃষ্টির পর থেকে আমরা যে মোরগ মুরগীদের থেকে কিছুমাত্র বেশী উন্নতি করেছি, তা তখন মনে হয় না।

দেখলাম টাবড় ডেকে ডেকে মুরগী মারে। কাজটা গর্হিত এবং সুখপ্রদ যে নয়, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু রকমটা আশ্চর্য।

আমরা বাঙলো থেকে প্রায় আধমাইল গেছি এমন সময় বেশ কাছেই [illegible] ডানদিকে একটি মোরগ ডেকে উঠল। টাবড়ের মুখখানা হাসিতে ভরে গেল। রামধানিয়াকে ঐখানে বসে থাকতে বলে আমাকে বলল, 'আইয়ে হুজুর।'

রামধানিয়া ঐখানে একটা পাথরের উপর বসে আমাকে আড়াল করে বিড়ি ধরাল।

আমি আর টাবড় পথ ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকলাম।

যেখান থেকে মোরগটা ডেকেছিল, তার কাছাকাছি গিয়ে একটি ঝোপের মধ্যে আমাকে নিয়ে টাবড় বসে পড়ল। তারপর গলা দিয়ে, জিব দিয়ে, তালু দিয়ে, অবিকল মুরগীর ডাক ডাকতে লাগল। কঁ-ক-ক-ক্ক-ক.... কঁ-ক, আর তার সঙ্গে মাঝে মাঝে মুরগী যেভাবে পা দিয়ে পাতা উলটে পোকা কি খাবার খোঁজে, সেই শব্দ করে আমাদের পাশের ঝরাফুল, পাতা, আঙুল দিয়ে নাড়া চাড়া করতে লাগল।

অবাক হয়ে দেখলাম, টাবড়-মুরগীর ডাকে সাড়া দিয়ে দিয়ে সেই অদৃশ্য মোরগের ডাক ধীরে ধীরে আমাদের নিকটবর্তী হতে লাগল। প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে, ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল, একটি প্রকান্ড সোনালীতে লালে মেশান মোরগ বীরদর্পে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। তার পেছনে ছোট-খাটো একটি মুরগীর হারেম।

চার চোখের মিলন হওয়ামাত্র টাবড় 'গদাম' করে দেগে দিল এবং একরাশ পালক হাওয়ায় উড়িয়ে মোরগটি, আর তার সঙ্গে একটি মুরগীও ঐখানেই উল্টে পড়ল। বাদবাকীরা কঙ্কর-কঁ-কুক্-কুক্-কুক্ করতে করতে পড়ি-কি মরি করে পালালো।

শিকারের ফল ভালো হলেও শিকারের প্রক্রিয়াটি ভালো লাগলো না। তারপর থেকে এভাবে মুরগী মারতে আমি টাবড়কে সবসময় মানা করেছি। আমার সামনে আর মারেনি সত্যি কথা, কিন্তু মনে হয় না আমার অনুরোধ উপরোধে কোনও কাজ হয়েছে।

মুরগী দুটো রামধানিয়ার হেফাজতে দিয়ে আমরা আবার এগোলাম।

সূর্যটা এখনও ওঠেনি। হাঁটতে এত ভাল লাগছে যে কি বলব। সমস্ত বন পাহাড় কী এক সুগন্ধে 'ম' 'ম' করছে।

একটি বাঁক নিলাম। দেখলাম পথের পাশেই একটু ফাঁকা জায়গায় চড়ুইরঙা একদল ছোট পাখি মাটিতে কুর্ কুর্ করছে।

আমাদের দেখেই পুরো দলটি অবিশ্বাস্য বেগে ছোট ছোট পা ফেলে মিকি মাউসের বাচ্চার মতো দৌড়ে গেল ঝোপের আড়ালে।

টাবড় শুধালো, 'ঈ কওন চি, আপ জানতে হ্যায় সাহাব?'

বললাম, 'আমি আর কটা চিজ্ জানি বাবা?'

যারা জানে না তারা ভাববে তিতির পাখী। হাবভাব রাহান-সাহান, অবিকল তিতিরের মতো।'

আমি শুধোলাম, 'রাহান্-সাহান্ কি?'

'রাহান-সাহান হচ্ছে চরাকরার জায়গা, আদব-কায়দা ইত্যাদি।'

টাবড়ুকে বললাম, 'আমাকে শিকার শেখাবে টাবড়? আমার বন্দুক আসছে কোলকাতা থেকে সাহেবদের সঙ্গে।' টাবড় বলল, 'জরুর শিখলায়গা হুজোর। আগে দিজিয়ে বন্দকোয়া।'

'বাগচুনয়া' নালায় পৌঁছে দেখি স্তূপীকৃত বাঁশ পড়ে আছে। লাদাই হচ্ছে আর লরী বোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে ছিপাদোহরে। লরী মানে আধুনিক দানবীয় ডিজেল মার্সিডিজ লরী নয়। সেই রাস্তায় আমলের ছোট ছোট চীংকুং লরী। অপর্যাপ্ত ধুলো, পেট্রোলের মিষ্টি গন্ধ এবং 'গীয়ার ব্রেকের' গোঙানি ভালো লাগে।

গাছতলায় বসে বসে ছাপানো স্টেটমেন্টে দাগ দেওয়া আর নোট নেওয়া—এইতো কাজ। তাছাড়া সেখানে আমি একজন ভীষণ রকম বড়লোক। লেখাপড়া জানি, সাড়ে চারশো টাকা মাইনে পাই, সাহেবদের সঙ্গে ইংরাজিতে কথা কইতে পারি, গায়ের রঙ্ কালো নয়, অতএব আমিও একজন সাহেব। এবং শুধু সাহেব নয় লালসাহেব।

কোনও সাহেবকে এপর্যন্ত নীল কিংবা কালো কিংবা জাফরানি হতে দেখিনি। সাহেবরা তাঁদের নিজেদের কোনও চেষ্টা ব্যতিরেকেই লাল হয়ে থাকেন। সুতরাং এ হেন পরিস্থিতিতে, হেন লোকের নীল সাহেব কি কালো সাহেব না হয়ে একেবারে লাল সাহেব বলে পরিচিত হবার কথা ছিল না। নামটার রটনা যশোবন্তের দুষ্কর্ম।

তবে ওখানে বেশিদিন থাকবার পরই দেখলাম যে, সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যারা আট আনা, এক টাকা মজুরী পায়, যাদের বিলাসিতা মানে ভাত খাওয়া, যাদের জীবন বলতে জঙ্গলের 'কুপ' আর কুপী-জ্বালানো একটি মাটির ঘর, যাদের খুশী বলতে চার আনার এক হাঁড়ি মহুয়ার মদ কি খেজুরের তাড়ি, তাদের কাছে আমি ছাড়া সাহেব পদবাচ্য আর অন্য কোন্ জীব হবে?

[চার]

যেরকম ভেবেছিলাম তেমন কিছু না। বিকেলের দিকে একটি জীপ আর একটি গাড়িতে ওঁরা এসে পৌঁছুলেন। হুইটলী সাহেব, মিসেস হুইটলী, বোন জেসমিন এবং হুইটলী সাহেবের বন্ধু বেকার। সঙ্গে আমার জীপও এলো। এতদিন পাঠাতে পারেন নি এবং যেদিন পাঠানো হবে কথা ছিল সেদিন পাঠানো সম্ভব হয়নি বলে সাহেব ভদ্রতা করে ক্ষমা চাইলেন।

যা দেখলাম, সাহেবের সঙ্গে যশোবন্তের রীতিমত তুই-তোকারি সম্পর্ক। পিঠে চাপড় দিয়ে কথা বলেন একে অন্যকে। যশোবন্তটা এতো ক্ষমতাবান জানলে তো আগে ওকে আরও বেশী খাতির যত্ন করতাম। যাকগে যা ভুল হয়েছে, তা হয়েছে। পরে শুধরে নেওয়া যাবে।

মিসেস হুইটলী চমৎকার মহিলা। রীতিমত সুন্দরী। মধ্যবয়সী, অপূর্ব কথাবার্তা এবং সবচেয়ে আনন্দের কথা আমেরিকান হলেও, ইংরাজী শুনে ওয়েস্টার্ণ ছবির কথা মনে পড়ে না। আর তস্য সহোদরার তো তুলনা নেই। এমন একটি আর্যকন্যাসুলভ মহিমা যে কি বলব। গায়ের রঙ গোলাপী। পরনে একটি ফিকে চাঁপা-রঙা গাউন। পোশাকের জন্য চেহারাটা বেশী সুন্দর মনে হচ্ছে; না চেহারার জন্য পোশাকটা বেশী সুন্দর মনে হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না। মাথাভরা সোনালী চুল। হাসলে কেমন যেন মাদকতা। সব মিলিয়ে দিন তিনচার একটু খিদমদ্‌গারী করতে হবে বটে এঁদের। তবে এই জঙ্গলে সঙ্গী, বিশেষ করে সুন্দরী সঙ্গী পেলে খারাপ লাগার কথা নয়। বেকার সাহেব যাঁকে দুঁদে শিকারী বলে হুইটলী সাহেব পরিচয় দিয়েছিলেন, অত্যন্ত কদাকার, মাঝারী উচ্চতার তীক্ষ্ণনাসা ভদ্রলোক। চেহারা দেখলে মনে হয় না নড়া চড়া করবার শক্তি রাখেন। কি করে যে বড় শিকারী হলেন জানি না।

বাঙলোর হাতায় চেরী গাছের তলায় চেয়ার পেতে বসে গল্প হচ্ছিল। যশোবন্তের ভাষায় ওর খুব দিল খুশ্। কারণ বিয়ারের বোতলের কমতি নেই। বেকার সাহেব বললেন, আমি ওল্ড স্কুলের লোক। সানডাউন-এর পর হুইস্কী ছাড়া কিছু খাই না। গর্দান খাঁ, জুম্মান এবং অন্যান্যরা সাহেবদের কাবাব ইত্যাদি জোগাতে ব্যস্ত। আজ বোধহয় দ্বাদশী কি ত্রয়োদশী হবে। চাঁদের জোর আছে। ভালই হবে। সন্ধ্যের পর আমার মালিক-মালকিনরা সবাই দিল্ খুশ্ করতে পারবেন।

যশোবন্ত আগামী কাল ভোরের শিকারের প্ল্যান বোঝাচ্ছিল। একেবারে ভোরে ভোরে হেভি ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়া সোজা বাগেচম্পার কাছে। কোয়েলের অববাহিকায়। মাচান বাঁধিয়ে রেখেছে যশোবন্ত। টাবড়ও তার হুলোয়া করার দলবল নিয়ে প্রায় রাত থাকতে হাজির থাকবে সেখানে। এখান থেকে ওখানে পৌঁছে আমরা মাচায় বসলেই হুলোয়া শুরু হবে। যশোবন্ত যা বলছে তাতে নাকি একজোড়া বাঘ আছেই। বরাত থাকলে একজোড়াই মারা পড়বে। সব নির্ভর করবে শিকারীদের ওপর। মিসেস হুইট্‌লী বললেন, 'দুটির মধ্যে একটি তো যশোবন্তই মারবে।' যশোবন্ত বলল, আমি একটিও মারবো না। আমি স্টপার। আপনারা অতিথি, আপনারা মারবেন।

হুইট্‌লী সাহেব আমার জন্য যে বন্দুক এনেছেন, কোম্পানীর পয়সায়, সেটি যশোবন্ত নেড়ে চেড়ে দেখল। ম্যান্টন্ কোম্পানীর সাদামাটা বন্দুক। আঠাশ ইঞ্চি লম্বা ব্যারেল, দোনালা। যশোবন্ত ফিস্ ফিস্ করে বলল, চলো তোমাকে এবার চেলা বানাব। তারপর মিঃ বেকারকে বলল, দেখুন তো এ ছোকরাকে কনভার্ট করতে পারেন কিনা। যদি পারেন তো বুঝব আপনার এলেম আছে। বেকার সাহেব সর্বসময় তৃষ্ণাগত প্রাণ, উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'ঠিক আছে। বাজী রইলে। যাবার আগে কনভার্ট করে যাব।'

হুইটলী সাহেব আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার মনে হয় তুমি জেসমিনের সঙ্গে কথা বলে আরাম পাবে। উনি-ভার্সিটিতে কি বিষয় নিয়ে পড়ছে জানো? তুলনামূলক সাহিত্য। আমরা অন্য যারা এখানে আছি তারা তো বাঁশ ছাড়া কিছুই বুঝি না।

আমি সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম শুনে জেস্‌মিনও খুব অবাক হোল। আমরা দুজনে দুটো বেতের চেয়ার নিয়ে এক-পাশে বসে গল্প শুরু করলাম।

আমি বললাম, 'এই চাঁদ ভালো লাগছে না?'

'এই চাঁদই আমার অসুখ। আমাদের দেশেও তো চাঁদ কম সুন্দর নয়। তবে বিভিন্ন পরিবেশে, রূপ আলাদা আলাদা সঠিক। কেন জানি না; এ জায়গাটা ভারী ভালো লাগছে। সারা রাস্তা আমি তাই বলতে বলতে এসেছি। এখানে আসার আগে আমরা নেতারহাটে একরাত কাটিয়ে এলাম। ভারী চমৎকার জায়গা। সেখান থেকে নেমে বানারি হয়ে পালামৌর গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে এতটা পথ এলাম। জঙ্গল আমার ভীষণ ভালো লাগে। কেন জানি না, আমার মনে হয় আমাদের 'আধুনিক সভ্যতার একমাত্র আশা, প্রকৃতির সঙ্গে দৃঢ়তর সম্পর্ক'।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আশ্চর্য, ঠিক এমনি কথাই আমি বোধহয় দুদিন আগে আমার ডায়েরীতে লিখেছি। আপনার কথা শুনে ভারী আনন্দ হোল।'

তারপর শুধোলাম, 'চাঁদই আপনার অসুখ বললেন সেটা কি রকম?'

জেস্‌মিন হাসলো। সেই ফালি চাঁদের আলোয় চেরী গাছের চিরুনী-চিরুনী পাতার ছায়ায় বসে রুমানিত্ত পাহাড়ের পটভূমিতে, মেয়েটির হাসি ভারী ভালো লাগল। জেসমিনের মধ্যে এমন কিছু একটি আছে; ভালো বাজনার মতো, যা দেশকালের কি ভাষার বাধা মানে না।

জেসমিন বলল, 'পূর্ণিমা রাত হলেই আমার পাগলামি বাড়ে; মনটা যেন কেমন করে, কি যে চাই, আর কি যে চাই না বুঝতে পারি না। কেবল সমস্ত মন জ্বালা করে। লুকিয়ে লুকিয়ে 'জিন' খাই। চাঁদের আলোর মত 'জিন'। আমার মা বলেন The moon has got into

খুব মজা লাগল ওর কথা শুনে। চাঁদে রকেট পাঠানো দেশের মেয়ে হয়েও চাঁদ নিয়ে এত কাব্য!

জেসমিন পরীর মত শ্বেতা হাতে ঢেউ তুলে; ভরা জ্যোৎস্নায় অনেক কথা অনর্গল বলে যেতে লাগল। আমি কল্পনার তুলি দিয়ে বসে বসে ওর কথার উপরে বুলিয়ে বুলিয়ে একটি মনের মত ওর ছবি আঁকলাম। যা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম কিন্তু অন্য কাউকে দেখাতে পারছিলাম না।

মাঝে মাঝে যশোবন্ত আর হুইটলী সাহেবের উচ্চকণ্ঠের হাসি এসে কানে ধাক্কা দিচ্ছে। যত রঙ চড়ছে হাসির জোরও তত বাড়ছে। আর এদিকে জেসমিন আমার মনের কাছে একটি পায়রার মত অনুচ্চে বকম্ বকম্ করছে। অদ্ভুত সুরের আমেজ।

জুম্মান এসে কানে কানে বলল, 'খানা লাগা দিয়া সাব।'

উঠে গিয়ে ও'দের বললাম 'এবার খেতে বসা যাক। কাল ভোরবেলা উঠতে হবে।' বেকার সাহেব আমাকে প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, 'রসুন রসুন খাওয়া তো আছেই, যশোবন্ত এখন জোর গল্প জমিয়েছে বাইসন শিকারের।' কিন্তু যশোবন্তই সবার আগে উঠে পড়ল এবং অর্ডারের ভঙ্গিতে তর্জনী দেখিয়ে বলল, 'এভরিবডি টু দি ডাইনিং রুম। ডিনার ইজ স্টার্টেড। দিস্ ইজ মাই শর্ট অ্যান্ড এভরিবডি শ্যাল ওবে মী।' দেখলাম সকলে বিনা বাক্যব্যয়ে সুড় সুড় করে খাওয়ার ঘরের দিকে চললো।

খাওয়া দাওয়া সারা হতে হতে রাত

ঘণ্টা বাজল। যশোবন্ত আমার তাঁবুতে শোবে আজ। কাল একদম ভোরবেলা রওয়ানা হওয়া যাবে এখান থেকে। যশোবন্ত বলল, তাঁবুর বাইরে ঝালর বন্ধ করা হবে না; গরম লাগবে। আমি বললাম, 'তোমার তো গরম লাগবেই। গরম গরম জিনিস পান করেছ—কিন্তু আমি এই জঙ্গলে উদোম-টাঁড়ে শুয়ে থাকতে রাজী নই।' যশোবন্ত বলল, 'সঙ্গে যশোবন্ত বোস্ আছে। কোনও জানোয়ারের ঘাড়ে একটার বেশী মাথা নেই, যে জেনে শুনেও এখানে আসবে।' ওর সঙ্গে তর্কে পারা ভার। তাও ভাগ্য ভালো। আকাশটা নির্মেঘ। ফুটফুটে স্বচ্ছ জ্যোৎস্না। তাঁবুর চারদিক খোলা থাকাতে তাঁবুময় আলোর বন্যা। ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। সুহাগী নদীর দিক থেকে নীচের উপত্যকায় একটা রাতজা টি টি পাখি, টিটিট্টি টি, টিটির-টি, করে ডেকে বেড়াচ্ছে। হাওয়াটায় মহুয়া এবং অন্যান্য ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। অবশ্য মহুয়া এখন প্রায় শেষ হয়ে এলো। মে-মাসের শেষ।

সবিস্ময়ে দেখলাম যশোবন্ত শুতে এলো না পাশের ক্যাম্প খাটে। বাইরে জ্যোৎস্নায় ইজিচেয়ার নিয়ে বসলো; এবং কোথা থেকে পেল জানি না একটি মার্টিনীর বোতল খুলে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধের পানীয় খেতে লাগল। আমি বললাম, 'যশোবন্ত এটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে। অনেক হয়েছে, এবার শুয়ে পড়ো, কাল ভোরে উঠে শিকারে যেতে হবে না?' যশোবন্ত ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, 'এরকম বাঘ শিকার জীবনে অনেক করেছি লালসাহেব: তার জন্যে তোমার চিন্তার কারণ নেই। মেয়েটির সঙ্গে তো খুব ভাল জমিয়ে ফেলছ—বেহেতবীন্!'

অন্ধকার থাকতে থাকতে ঘুম ভেঙে গেল। ড্রাইভারদের গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ, খাবার ঘরের টেবিলে ব্রেকফাস্টের আয়োজন. রামধানিয়ার নাগরা জুতোর অনুক্ষণ ফটাস্ ফটাস্ ইত্যাদিতে ঘুমিয়ে থাকা আর চলবে বলে মনে হোল না। উঠে দেখি যশোবন্ত যে শুধু ঘুম থেকে উঠেছে তাই নয়, চান করে, জামা কাপড় পরে, রাইফেল পরিষ্কার করছে জ্যাকারান্ডা গাছের তলায় ঊষার আলোয়। আমাকে উঠতে দেখে বলল, 'এই যে মাখনবাবু, তাড়াতাড়ি করুন, বন্দুকটাও নিয়ে নিন্। আজ মস্ত বাঘের উপর বর্ডান হবে।

'আমার নাম মাখনবাবু নয়!'

যশোবন্ত হেসে বলল, 'রাগ করছ কেন দোস্ত্। তুমি হলে গিয়ে কোলকাতার বাবু। ননীর পুতুল। রোদ লাগলেই গলে যাও কিনা। তাই নাম দিয়েছি মাখনবাবু।'

ব্রেকফাস্ট সেরে রওয়ানা হতে হতে একটু দেরীই হয়ে গেল। সূর্য অবশ্য তখনও ওঠেনি। দুটি জীপে বোঝাই হয়ে আমরা রওয়ানা হলাম বাগেচম্পার দিকে।

যশোবন্ত অনেকবার বলেছিল ওখানে নিয়ে যাবে। নিয়ে গিয়ে চাঁদনী রাতে বাইসনের দল দেখাবে। এ যাত্রায় তা যে হবে না বুঝতে পারছি।

চমৎকার রাস্তা। রুমান্ডিতে এসে সেই আমার এই প্রথম। দেশীর ভাগই শাল আর সেগুনের বন, বাঁশও আছে অজস্র। রাস্তার দু-পাশে জীরহুল ফুলদাওয়াই, আর মনরংগোলী সকালের শান্তিতে নিস্তেজ হাসি হাসছে। এখনো ওদের যৌবন-জ্বালা শুরু হয়নি। রোদের সঙ্গে সঙ্গে ওরা জ্বলতে থাকবে। আর জ্বালাতে থাকবে।

আমার বাঙলা থেকে প্রায় পৌনে এক ঘন্টার রাস্তা। কোয়েল নদীর পাশে, বড় বড় ঘাসে ভরা একটি জায়গায় এসে আমরা থামলাম। মধ্যে অনেকখানি জায়গায় শুধু ঘাস। ইংরাজীতে যাকে বলে 'এলিফ্যান্ট গ্র্যাস'। বড় জঙ্গলও আছে দু'পাশে। জীপগুলো একটা ঝাঁকড়া সেগুনের নীচে রাখা হোল। ড্রাইভারদেরও ওখানেই থাকতে বলা হোল এবং বলা হোল ওরা যেন কথা-বার্তা না বলে। চুপ করে গাড়িতে বসে থাকে। ভয়ের কোন কারণ নেই। যশোবন্ত আগে আগে চললো। কাঁধে ফোর-ফিফ্টি-ফোর হান্ড্রেড ডবল ব্যারেল। জেসমিনকে শিকারের জলপাই রঙা পোশাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। ওর হাতে একটি দোনলা মার্টু গান্, ডবল ব্যারেল চার্চিল। বেকার সাহেব ঘুমের সময় যা একটু বিরতি দিয়েছিলেন, ঘুম থেকে উঠেই আবার বীয়ার খেতে শুরু করেছেন। সারা পথ খেতে খেতে এসেছেন। এবং দেখলাম ট্রাউজারের পেছনের দুটো পকেটে (থলি বিশেষ) দুটি আমেরিকান বীয়ার ক্যান্ উঁকি মারছে। মনে মনে প্রমাদ গুনছিলাম। হাতে রাইফেল নিয়ে এই রকম বীয়ার-মত্ত অবস্থায় বাঘের সম্মুখীন হলে বাঘ কিংবা উনি ওদের মধ্যে কেউ না মরে, মরব হয়ত আমি। রাইফেল ঘুরিয়ে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় হয়ত আমাকেই দেগে দিলেন আর কি! গাঁট্টা-গোট্টা ফোর ফিফ্টি ফোর হান্ড্রেড ডবল্ ব্যারেল জেফরীস্। মিস্টার হুইটলীর হাতে থ্রি সেভেন্টি ফাইভ হল্যান্ড এ্যান্ড হল্যান্ড ডবল বারেল। দেখলেই মনে হয় একখানা যন্ত্রের মত যন্ত্র। হুইটলী সাহেব সুপুরুষ। তাঁর হাতে মানিয়েছেও ভালো। মিসেস্ হুইটলী নিজে শিকার করেন না। শিকার দেখেন। সঙ্গে কোমরে বাঁধা একটি বত্রিশ ওয়েবলী স্কটের রিভলভার। নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্যেই।

সেগুনে গাছের নীচে জীপটা রেখে আমরা ঘাসের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পাকদণ্ডি পথে যখন কোয়েলের ধারে এসে পৌঁছুলাম, তখন সূর্য অনেকক্ষণ উঠে গেছে। কোয়েলে সে সময় জল সামান্যই আছে। নদীটা সেখানে রীতিমত চওড়া। মাঝে মাঝে জলের ক্ষীণধারা আর শুধু বালি।

দেখা গেল তিনটি মাচা বাঁধা হয়েছে। নদীর ধার বরাবর অর্ধচন্দ্রাকারে। জঙ্গলের ভিতর থেকে বাগদাসে হাঁকোয়া করে আসবে হাঁকোয়াওয়ালারা নদীর দিকে এবং বাঘ নাকি নদীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে। নদীতে পৌঁছুবার আগেই শিকারীরা বাঘ দেখতে পাবেন ও গুলি করার সুযোগ পাবেন। আর কোনও কারণে সেখানে বাঘকে মারা না গেলে, বাঘ যখন নদী পেরোবে তখন বাঘকে পরিষ্কার দেখা যাবে। এবং যখন, তখন তাঁরা গুলি করার সুযোগ পাবেন। এবং বলাও যায় না তাঁদের নিক্ষিপ্ত দু' একটি গুলি বাঘের গায়ে বিঁধেও যেতে পারে। ফিস্‌ফিস্ করে যশোবন্তকে শুধোলাম, বাঘ যে নদীতে নামবেই এমন কোনও গ্যারান্টি তো নেই। যশোবন্ত বলল, 'নেহাৎ নিরুপায় না হলে বাঘ নদীতে নেমে অতখানি আড়াল-বিহীন জায়গা পেরোবার ঝুঁকি নেবে না। বরঞ্চ হয়তো রেগে 'বীটারস্' লাইনের মধ্যে দিয়ে দু' একজনকে জখম করে কিংবা মেরে, আবার জঙ্গলে ফিরে যাবে। আশঙ্কা আছে বলেই আমায় বীটারদের সঙ্গে থাকতে হবে।'

এমন সময় মিসেস হুইটলী একটি খুব সময়োপযোগী প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা যশোবন্ত, বাঘ যে আছে, তার প্রমাণ কি?' এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে, বলাবাহুল্য, যশোবন্ত খুব হকচকিয়ে গেল। তারপর আমাদের নিয়ে গিয়ে নদীর বালিতে বাঘের টাটকা-পায়ের দাগ দেখাল। বোধহয় শেষরাতে কি ভোর ভোর সময় নদী পেরিয়ে এসে জঙ্গলে ঢুকেছে। বাঘের পায়ের দাগ আমি ঐ প্রথম দেখলাম। প্রকান্ড থাবা দেখতে বিড়ালের মত, কিন্তু পরিধিতে অবিশ্বাস্য। বেকার সাহেব দাগ দেখে নাকি নাকি সুরে বললেন, 'মাই গড, হি ইজ দি ড্যাডি অফ অল গ্র্যান্ড ড্যাডিজ্!'

ভোরের জঙ্গলে বেশ একটি ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। ঝির ঝির করে হাওয়া দিচ্ছে। কে কোন্ মাচায় বসবে তা নিয়ে ফিসফিস করা আরম্ভ হল। হঠাৎ আমাদের হাতের কাছ থেকে কতকগুলো তিতির ফর্-র্-র্-র্ করে মাটি ফুঁড়ে উঠল। উঠে উড়ে পালাল।

ঠিক হলো বেকার সাহেব পশ্চিমের মাচায় নদীর কিনারায় বসবেন। মিস্টার ও মিসেস হুইটলী পুব-পশ্চিমের মধ্যে একটু উত্তর ঘেঁষে বসবেন। ঐ মাচা থেকেই বাঘকে প্রথম দেখার সম্ভাবনা। ও'রা যেহেতু প্রধান অতিথি সেইহেতু বেকার সাহেব কিছুতেই ও মাচায় বসতে রাজী হলেন না। তাছাড়া তিনি বসলেও কত যে বাঘ মারবেন সে জানি। মাচায় উঠেই হয়তো ঘুম লাগাবেন। সবসময় বীয়ার খেয়ে খেয়ে চোখ-মুখের যা অবস্থা হয়েছে, তা আর কহতব্য নয়।

পুবের মাচায় আমি আর জেসমিন বসব। সেদিক দিয়ে নাকি বাঘের আসবার সম্ভাবনা খুব কম। কি করে যশোবন্ত এমন জ্যোতিষশাস্ত্র আয়ত্ত করেছে জানি না। কিন্তু তার জ্যোতিষীতে মোটে ভরসা পেলাম না। বাঘ তো ট্রাফিক পুলিশের উত্তোলিত হাত মানবে না; যেখানে খুশী সেখানে চলে আসবে। এসব জানোয়ারের কাছ থেকে যত দূরে দূরে থাকা যায় ততই ভালো। জেসমিনকে এবং আমাকে প্রথমতঃ ইচ্ছে করে এক মাচায় বসিয়ে, পরে রগড় করবার অভিপ্রায়ে, এবং দ্বিতীয়তঃ বাঘকে কোনক্রমে আমাদের দিকে এনে ফেলে আমার চরম দুর্গতি সাধনের ইচ্ছাটা যশোবন্তের অত্যন্ত প্রবল বলে মনে হোল। কিন্তু ওর উপর কথা বলে কার সাধ্য। স্যান্ডারসন্ কোম্পানীর বড় সাহেব পর্যন্ত ওর আদেশের উপর 'রা' কাড়ছেন [illegible]। (—ক্রমশঃ)

পর্বতের আহ্বান

সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্বতের আহ্বান আমি শুনেছিলাম ১৯৬৪ সালে যখন কেদার বদ্রী যাই। তখনকার পথের কষ্ট ও দুর্গমতা মনে এনেছিল কিছুটা বীতরাগ। মনে হয়েছিল আর ইচ্ছা করে কখনও এমন কষ্টের পথে পা বাড়াবো না—কিন্তু একবার যে ঐ স্বাদ পেয়েছে তার মন মানে না।

দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটটি খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পেলাম। দেখা পেলাম তুষারশৃঙ্গ এভারেস্ট বিজয়ী বীরদের আর তাঁদের নেতা শ্রীতেনজিং নোরগের সঙ্গে হোলো আলাপ। মন যেন নেচে উঠলো আনন্দে—এই তো সুযোগ আমার পাহাড়ে যাবার। মনের বাসনা প্রকাশ করে অনুমতি চাইলাম অধ্যক্ষ কর্ণেল কুমারের। ওঁদের প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা আমাকে টেনে নিয়ে গেল ইন্সটিটিউট পরিচালিত মহিলাদের ৩৫ দিনব্যাপী বেসিক কোর্সে।

রওনা হলাম এটা পাহাড়ী পথে আমরা পাঁচজন নানা বয়সী মেয়ে। সারা ভারত থেকে এঁরা এসেছে যাদের অধিকাংশের বয়স ১৮ থেকে ৩৫-এর মধ্যে। আমরা ৪ জন ঘরণী আছি যারা স্বামী-সংসার ছেড়ে এসেছি।

দার্জিলিং-এর ৯ মাইল নীচে মিংলা-বাজার—সেখান থেকে পিঠে বোঝা নিয়ে আমাদের হাঁটা সুরু। পরনে সকলেরই এক ধরণের প্যান্ট ও উলের জামা। হাঁ, বলতে ভুলেছি। এর আগে আমরা শিখেছি কি করে তাঁবু লাগাতে হয়। কেমন করে এয়ার ম্যাট্রেশে হাওয়া ভরতে হয় ও কেমন করেই বা স্লিপিং ব্যাগে সেঁধিয়ে ঘুমোতে হয়। এর পরীক্ষা হয়েছিল দার্জিলিং থেকে ৯ মাইল দূরে টাইগার হিল-এ। এর উচ্চতা ৮৫০০ ফুট। পায়ে হেঁটে পিঠে ২৫।৩০ পাউন্ড বোঝা নিয়ে পাহাড়ী পথে সেখানে গিয়ে রাত্রিবাস ও পরদিন সেখান থেকে সেইভাবে ফেরা। প্রাথমিক প্রস্তুতি আগেই নিয়েছি।

মিংলা বাজার ছাড়িয়ে নদীর পাড়ের সরু আঁকাবাঁকা ভাঙ্গা পথ ধরে আমরা পৌঁছালাম নয়াবাজারে। মিংলা ও নয়াবাজারের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে চঞ্চলা পাহাড়ী নদী রঙ্গীত এবং সেই নদীই ভারত ও সিকিমের সীমানা রক্ষা করছে। আমাদের গন্তব্য স্থান উত্তর সিকিমের শেষ সীমারেখা। প্রথম রাত্রিবাস নয়াবাজারে। যার উচ্চতা মাত্র ১৫০০ ফুট। সঙ্গী আমাদের এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং, আং তেম্বা, জ্যানামগিয়াল ও আরও অনেকে। এঁরা সকলেই জাতিতে শেরপা। দেহে অসীম শক্তি, মনে রয়েছে আমাদের জন্য অগাধ ভরসা। পথের দুর্গমতা, ক্লান্তি সব ভুলে যেতে হয় এঁদের স্নেহ যত্ন ও উৎসাহে। স্নেহ আন্তরিকতায় এঁরা নিমেষে জয় করে শিক্ষার্থীদের মন। সেই আমরা আপনা থেকেই ভাবতে পেরেছিলাম, একই পরিবারভুক্ত সবাই বেড়াতে বেরিয়েছি।

নয়াবাজারের পর আরম্ভ হলো দুর্গম, বসতিবিরল পাহাড়ী পথ। আমাদের দ্বিতীয় দিনের তাঁবু পড়লো লেকশিপে। সেই পাহাড়ী নদী রঙ্গীতের ধারে। খেয়ালী নদী তার তীব্র স্রোতে কত ছোট বড় পাথর ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে—এর তীরে কিছুক্ষণ বসে থাকলে মনে বিচিত্র অনুভূতির উদয় হয়। দিনের আলো নেভার আগেই রাতের ভোজন পর্ব শেষ করার নিয়ম। তাঁবু প্রতি ১টি করে মোমবাতি, প্রতি তাঁবুর দুজন অংশীদার। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গেই আরম্ভ হোতো আমাদের নৃত্যগীতের আসর। ভারতের নানা জায়গা থেকে শিক্ষার্থীরা এসেছে। সকলেরই এই ব্যাপারে কিছু না কিছু পারদর্শিতা আছে, আর যাদের নেই তারাই বা কম কিসে। বেসুরো গলায় সুর ধরে বেতালা তালি বাজিয়ে আসর মাতিয়ে রাখতো। শেরপারা স্বভাবতই সঙ্গীত প্রিয়। আমাদের পাচকপ্রবর ছিল নৃত্যগীত রসিক। আসরের সে নিত্য অংশীদার। পাঁচমিশালী নাচ গান ও হোহো হাসির হুল্লোড়ে কখন যে রাত গড়িয়ে ৯টা বেজে যেতো তা কারও খেয়াল থাকতো না। হঠাৎ লক্ষ্য পড়তো, সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীতেনজিং। সবাইকে তিনি তাঁবুতে যাবার নির্দেশ দিচ্ছেন। অতএব চল সব নিদ্রা দেবীর আরাধনায়। আমি স্বামীর ঘরণী, সন্তানের মা। সারাদিন চলার নেশায় ঘরের কথা মনের কোণায় লুকিয়ে থাকে। রাতে এয়ার ম্যাট্রেসের উপর শুয়ে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঘুমোবার প্রস্তুতির মধ্যে মনে পড়ে স্বামীর চিন্তাচ্ছন্ন মুখ, কন্যার ছোট্ট মুখের প্রশ্ন 'কবে আসবে?'—মনটা আপনিই হয়ে উঠে ভারাক্রান্ত, মনে হোতো অজানার পথে পা বাড়িয়েছি আবার আপনজনের দেখা পাবো তো। এমনি করে কেটে যায় রাত। আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হই। পাচকপ্রবর মাঝরাত থেকে উঠে রান্না বসিয়েছে। আমাদের প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্ন আহার্য প্রস্তুত। প্রাতরাশ সেরে ছোট বেতের ঝুড়িতে দুপুরের খাবার নিয়ে পিঠে বোঝা ফেলে আরম্ভ হয় চলা। প্রতিদিন ৯ মাইল থেকে ১৫ মাইল চলার নিয়ম। পাহাড়ী পাকদণ্ডী পথ কোথাও বৃষ্টির ধাক্কায় তাও নেমে গেছে। এখানে ভরসা আমাদের আইস-একস। এ জিনিস বরফ ভাঙ্গা ও মাটি খোঁড়ায় সাহায্য করে। পাহাড়ে চলার সময় আইস-একস ও দড়ি এ দুটি জিনিস অপরিহার্য। আমাদের শেখানো হয়েছে রোপ ইজ দি লাইফ লাইন অব দি মাউন্টেনিয়ার। যেখানে হয়তো পা ফেলার স্থান নেই সেইখানে আইস-একস দিয়ে পথ খুঁড়ে নিতে শিখিয়েছেন আমাদের নির্দেশকরা। এমনি করে পথ চলে সেদিনের নির্দিষ্ট স্থানে কখনও পৌঁছাই বেলা ১২টা, কখনও দুপুর ৩টা। পৌঁছেই দেখি শ্রীতেনজিং আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন হাসি মুখে। তাঁর পথ চলা প্রতিদিন আরম্ভ হোতো আমাদের সঙ্গেই। কিন্তু তাঁর তো চলা নয়, মনে হয় বাতাসে ভর করে উড়ে যাওয়া। তাই আমাদের চলা শেষ হবার বহু আগেই তিনি গন্তব্য স্থানে উপস্থিত থাকতেন। আমাদের পৌঁছবার জন্য অপেক্ষা করে থাকতো ফলের রস। সবাই জল পেতে দাঁড়িয়ে পড়তাম। তার কিছু পরে চা বিস্কুট। সন্ধ্যার আগেই রাতের ভোজন পর্ব সমাধা। আমাদের তৃতীয় দিনের তাঁবু পোড়লো তাসিদিং-এ, যার চলতি নাম সিংপেক—এখানে নাকি একসময়ে সিংহ পাওয়া যেতো। এ আমাদের শোনা কথা। জানি না এর যথার্থতা। এখানে এটি চোরতাং আছে, যা সিকিমবাসীদের পবিত্র তীর্থস্থান। চোরতাং কথার অর্থ চৈত্য। এখানে মহাপুরুষদের দেহ সমাধিস্থ করা হয়। এর একদিকে গগন চুম্বি সিকিমের পর্বত, অপর দিকে সীমারেখা রক্ষা করছে নেপালের পর্বতশ্রেণী। এই স্থানের উচ্চতা প্রায় ৬০০০ ফুট। এখানে পৌঁছতে যে চড়াই আমরা ভেঙেছি তার উচ্চতা ৪০০০ ফুট। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ, কোথাও তা আছে আবার কোথাও তাও নেই। কত রকমারী পাখির ডাক সেদিন শুনেছিলাম।

পরদিন যাত্রারম্ভ। গন্তব্য স্থান ইয়ক-সাম। ইয়ক অর্থে লামা ও সাম অর্থে তিন অর্থাৎ তিন লামার স্থান। এখানে পাহাড়ের উপর আছে চোরতাং ও প্রধান লামার আসন যেখানে বসে তিনি প্রায় তিনশো বছর আগে সিকিমের প্রথম মহারাজাকে নির্বাচন করেছিলেন। উঁচু পাহাড়ের উপর আছে বৌদ্ধ গুম্ফা। এখানকার জল নাকি অতি পবিত্র। বছরে একবার ভীড় হয় বৌদ্ধ ভক্তদের। দূর-দূরান্ত থেকে তাঁরা জল নেবার জন্য এখানে জমায়েত হন। উত্তর সিকিমের পথে এই স্থানই হোলো শেষ লোকালয়। এরপর আরম্ভ হোলো লোকালয় বর্জিত স্থান। দুর্গম কঠিন পাহাড়। ইয়কসামে একজন কাজি থাকেন। তিনি জমিদার, দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা আবার সিকিম দরবারের একজন মন্ত্রীও। অনেকগুলি সন্তান সন্ততি নিয়ে তাঁরা কাঠের দোতলা বাড়ীতে বাস করেন—মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। চালচলন আদিম পর্যায়ের। তাঁর রাজত্ব দিয়ে আমাদের আনাগোনা। তাই আমরা তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দোভাষী মারফৎ আলাপ করে এলাম।

এখান থেকেই প্রকৃতি দেবী আমাদের প্রতি বিরূপ হলেন। আরম্ভ হোলো বজ্র-বিদ্যুৎসহ প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি। সেদিন আমাদের তাঁবু পড়েছিল ধানক্ষেতের মধ্যে। ঝড়ের দাপটে ছোট ছোট তাঁবুগুলি বুঝি উড়িয়ে নিয়ে যায়। চোখের সামনে দেখলাম দূরে পাহাড়ের মাথায় বাজ পড়ছে।

যাই হোক, রাত্রিশেষে বৃষ্টির মধ্যেই যাত্রা সুরু। গন্তব্য স্থান ১২ মাইল দূরে, বকিম। এখানকার উচ্চতা ৯৫০০ ফুট ও শুধুমাত্র গগনচুম্বি বাঁশঝাড় ব্যতীত আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। বকিম কথার অর্থ

এ পেলস অব ব্যাম্বুজে। বৃষ্টিতে ভিজে সেখানে পৌঁছতে পেলাম শ্রীতেনজিং এর সাদর সম্ভাষণ। জানালেন, কাঠকুটো দিয়ে আগুন তৈরি, হাত-পা সেঁকে নাও, ভিজে জামা শুকিয়ে নাও। এর আশেপাশে প্রচুর জোঁক। অনেক শিক্ষার্থীর জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতা হোলো জোঁকের কামড়। এখানেও সমানে ঝড় বৃষ্টি পেলাম—খারাপ আবহাওয়া যেন আমাদের পথ চলার সঙ্গী। পরদিন রওনা হলাম গামালিংগাও। এখানকার উচ্চতা ১২০০০ ফুট।

এক জায়গায় এসে আমাদের দাঁড়াতে হলো। দেখলাম সামনে আমাদের জন্য যে পথটুকু ছিল তা ধসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। দেয়ালের গায়ে সামান্য দু ইঞ্চি খাঁজ কাটা। তাও বৃষ্টি বরফে অত্যন্ত পিছল। ৫০ গজ জায়গা প্রায় এই রকম। সেখানে আমাদের পারাপারের ব্যবস্থা দাঁড় ধরে। পথের দু-পাশে দুটো মরা গাছের গুঁড়িতে দু'গাছ দাঁড় বাঁধা আছে, সেই দাঁড় ধরে শূন্যে ঝুলে পার হতে হবে। অবশ্য আমাদের কোমরেও দাঁড় বাঁধা থাকবে। এর দুজন ইনস্ট্রাকটর দু-পাশে দাঁড়িয়ে সেই দাঁড় একজন ঢিল দেবেন ও একজন টানবেন—এইভাবে পার হওয়া এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। একে বলা হয় ফিকসড্ রোপ সিস্টেম। দুর্গানাম জপ করে ঝুলে পড়া গেল আর দেখলাম পড়ে না গিয়ে ঠিক এপারে এসে মাটিতে পা দিয়েছি। তারপরই দেখলাম দুটো বাঁশ পাশাপাশি রেখে খাঁজ কাটা হয়েছে, যে খাঁজে শুধুমাত্র জুতাশুদ্ধ বুড়ো আঙুল রাখা যায় তারই মই এবং তার উচ্চতা প্রায় ১৫ ফুট। নীচে অতল খাদ, সেই মইতে চড়ে ওপারে যেতে হবে—বরফ ও শ্যাওলায় সেই মই দারুণ পিছল, যাই হোক, এ-ও পার হলাম, একটু করে পথ ফুরোয় আর যেন মনে হয় নবজন্ম হচ্ছে। এই পথ পার হোয়ে আসার পর পেছনে তাকাতে হৃৎকম্প হোতো।

দুপুর একটার পর থেকে আরম্ভ হোলো প্রচন্ড বরফ পড়া। তখনও আমাদের গন্তব্য স্থান লামালিংগাও অনেক দূরে। উইন্ড প্রুফ জ্যাকেট পরে গা থেকে বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে পথ চললাম। এইভাবে বেলা আড়াইটা বেজে গেলো। সকলেই পথ চলার পরিশ্রমে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছি। এমন সময় দেবদূতের আবির্ভাবের মত দেখি দু-জন ইনস্ট্রাকটর পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে সধূমে কফির ফ্লাস্ক ও বিস্কুটের টিন। সেই কফি ও বিস্কুট তখনকার মত যেন আমাদের দেহের লুপ্ত বল ফিরিয়ে দিল। এঁরা শ্রীতেনজিং-এর নির্দেশে আমাদের জন্য ঐ সব নিয়ে এসেছিলেন। শ্রীতেনজিং দলের নেতা শুধু নামেই নয় তাঁর প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাজ যেন আমাদের মনে বল ভরসা ও আনন্দ দেবার মত।

ক্রমশঃ পথ আরও দুর্গম হোলো। পথ নেই শুধু তার নামান্তর মাত্র। তাও বরফ পরে অসম্ভব পিছল। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি গেল পা ফসকে।

এক সময়ে পথ ফুরোলো। পৌঁছলাম হচ্ছে, কিন্তু হাত-পা সেঁকার জন্য আগুন পাওয়া গেল। পাওয়া গেল গরম চা ও বিস্কুট। কিছু পরেই রাতের খাবার। তাঁবুর ভেতর শুয়ে বোঝা যায় বরফ পড়ছে। সকালে উঠে তাঁবুর অবস্থা দেখে মনে হয় সেগুলো যেন ময়দা দিয়ে তৈরী। ঐদিন আমরা এখানেই থাকলাম। এই স্থানের উচ্চতা ১২৫০০ ফুট। এখানেই অনেকের কিছু কিছু হাই অলটিচুড সিকনেস দেখা দিল। তার মধ্যে প্রধানতঃ শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট ও মাথার যন্ত্রণা। বমির ভাবও ছিল। ঐদিন আমাদের শেখানো হোলো কেমন করে স্নোবুট পরতে হয়। এই বুটের প্রতি জোড়ার ওজন ৫ পাউন্ড ৯ আউন্স।

পরদিন রওনা হলাম পরম আকাঙ্ক্ষিত বেস-ক্যাম্প-এর উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছবার আশায় পথের সব কষ্ট তুচ্ছ করেছি। শুনলাম, আজ পথ মোটামুটি চলনসই। শুধু শেষ হাজার ফুট উঠতে হবে খুকে হাঁটু দিয়ে যেখানে বাতাসে অক্সিজেন এর অভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট ও চলার ক্ষমতা কেড়ে নেয়। শুনলাম অনেকে নাকি সেখান থেকে ফিরে আসে। দৃঢ় মন নিয়ে রওনা হলাম। কিছুতেই পেছবো না। আমাদের ওপর আদেশ হোলো সবাই কালো চশমা পর, বরফের উপর আলোর ছটায় চোখ অন্ধ হবার সম্ভাবনা। (স্নো ব্লাইন্ডনেস) কিছু অল্পবয়সী মেয়ে খুব ভয় পেলো। কয়েকজন আরম্ভ করলো কান্নাকাটি। সবাই তাদের বুঝিয়ে কোনরকমে হাত ধরে পথ চলতে লাগলাম। এমনি করে এসে পড়লো সেই পাহাড়, যা পার হতে পারলেই বেস ক্যাম্প। শোনা গেল, এই পাহাড়ে ওঠার সময়ে শুধুমাত্র পথশ্রমেই দুটি জীবনদীপ নিভে গেছে কিছুদিন আগে। আমাদের পিঠের বোঝা লাঘবের জন্য দু-জন শেরপা নিয়োগ করা হয়েছিল। এই পাহাড়ের কাছে পৌঁছে আমরা আমাদের বোঝা তাদের দিয়ে ভারমুক্ত হলাম।

আরম্ভ হোলো আমাদের সেই চড়াই ভাঙা। যার প্রতিটি ইঞ্চি প্রায় বুকে হেঁটে চলতে হয় এবং প্রতি মুহূর্তে মনে হয় আর বুঝি নিশ্বাস নিতে পারবো না। দু'পা চললে অন্তত তিন মিনিট বিশ্রাম। এই করে আমরা চড়াই উৎরালাম। এর পর সম্পূর্ণ গোড়ালি ডুবে যায় এমন বরফের মধ্যে দিয়ে কিছু পথ পার হলাম। তারপরই হুররে। দেখলাম আমাদের বেস ক্যাম্প। চারিদিকে বরফের পাহাড়ের প্রাচীরে ঘেরা ক্ষুদ্র এক সমতলভূমি, যার উপরে শুধু বরফের আস্তরণ। এর উপরে সারি সারি পড়েছে আমাদের লাল-নীল-হলুদ রং-এর বস্ত্রাবাস। এখানে পৌঁছতে পারার আনন্দ যে কি লিখে বোঝান যায় না। এসে পড়েছি কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে। একদিকে বনাবরু পাহাড়, আর একদিকে বিধানচন্দ্র শৃঙ্গ। ও পাশে ছেড়ে এসেছি জাংগ্রিলা। মাঝখানে আমরা। তিব্বতী ভাষায় লা অর্থে গিরিফুট। প্রতি শিক্ষার্থীকে এর চূড়ায় উঠতে হয়।

দার্জিলিং থেকে বেস ক্যাম্প-এর দূরত্ব ১০০ মাইল। এই বন্ধুর পথ পার হয়ে যেদিন আমরা এখানে পৌঁছলাম, সেদিনই রেডিও মারফৎ রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের মৃত্যু-সংবাদ পেলাম। দুদিন জাতীয় শোকদিবস পালন করার পর পাহাড়ে চড়ার নানারকম কলাকৌশল আমাদের শেখান আরম্ভ হলো।

যেদিন বিধানচন্দ্র শৃঙ্গে ওঠার পালা, তার আগের দিন বিপর্যয় ঘটে গেলো। প্রকৃতি এবারে আমাদের যাত্রারম্ভেই ছিল বিমুখ। তবু আমাদের মনের উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি। প্রতিদিনের তুষার-বরফকে তুচ্ছ করে ৬টি মেয়ে ১৯০০০ ফুটের এক শীর্ষে ওঠার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছিল। ইতিমধ্যে নেমে এলো তাদের উপর হিমবাহ। এ এক ধরনের ঝুরো বরফের চাদর যা শত শত ফুট ওপর থেকে হঠাৎ নেমে আসে। একজন ইন্সট্রাকটর ও দুটি মেয়ে প্রায় ৫ ফুট বরফের নীচে চাপা পড়ে ও দু-জন গড়িয়ে পড়ে যায় প্রায় ৫০ ফুট নীচে। যাই হোক অন্য একজন ইনস্ট্রাকটর দেখতে পেয়ে দৌড়ে গিয়ে সবাইকে উদ্ধার করেন। সকলেই অল্পবিস্তর আহত হয়েছিলো। শেরপাদের পিঠে চড়ে এই আহতরা কোনরকমে বেস ক্যাম্প-এ নেমে এলো—সেদিন আমাদের মনে এক নিদারুণ আতঙ্ক। সবাই আমরা ব্যস্ত হোয়ে পড়লাম ওদের সেবাযত্নের ব্যবস্থায়। ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে যে ওয়ারলেস সেট ছিল, তা বিগড়ে যাবার ফলে দার্জিলিং-এ কোন খবর পাঠান গেলো না। ডাক্তার যিনি উপস্থিত ছিলেন, তাঁর মতে আহতদের চিকিৎসা যত দ্রুত আরম্ভ হয়, ততই ভাল, অতএব ফিরে চল। আরম্ভ হোলো সেই চলা, চলা আর চলা। পথ সেই বিপদসংকুল। আরও ভয়ানক, কেননা এ-কদিন মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে তুষার ঝড়। সকলেরই মন ভারাক্রান্ত। চারটি অসুস্থ মেয়ে সঙ্গে। নিজেরাই কত সময়ে পথ চলতে থমকে দাঁড়াই। কেমন করে যাবে শেরপারা ওদের পিঠে নিয়ে ঐ বিপদসংকুল পথে? কিন্তু এই শেরপাদের যেমন প্রচন্ড সাহস তেমনি দরাজ মন। প্রচন্ড বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পিঠে করে নামিয়ে নিয়ে চলেছে আহতদের। সামান্য পা টললে সমূহ বিপদ। সে নিজে খাদের অতলে তো তলিয়ে যাবেই, সঙ্গে নিয়ে যাবে তার পিঠের বোঝাকে। এদের মনের জোর ও মুখের অনাবিল হাসি এক বিরাট অভিজ্ঞতা।

এই বিপদসংকুল শিক্ষা গ্রহণ করার সময়ে বুঝেছি মানসিক দৃঢ়তা একান্ত প্রয়োজন। শুধুমাত্র ঐ একটি বিজয়ীদের সাহচর্য ও শিক্ষা আমরা পেয়েছিলাম। এ-জিনিস উপলব্ধি করেছি তাদের কাছ থেকে এবং তা আমাদের পরবর্তী জীবনের

অনেকক্ষণ পরে জানালার বাইরে চোখ গেলো বিনীতার। টেবিলে একগাদা ফাইলের মধ্যে মুখ গুঁজে বসেছিলো সে।

বাইরে ইউক্যালিপটাস আর শিরীষ গাছের মধ্য দিয়ে ফাল্গুনের হাওয়া আসছে। টেবিলের কাগজ-পত্তর সেই হাওয়ায় মাঝে মাঝে শব্দ করে কাঁপছে। কাঁপছে বিনীতার অগোছালো চুলগুলো।

কিছুক্ষণ আগে বিকেলের আলো তার টেবিলের উপর ছড়িয়ে ছিলো। ইউক্যালিপটাসের পাতায় এখন সেই আলো শির-শির করছে।

বেশ কিছুক্ষণ আগে চায়ের কাপ রেখে গিয়েছে শোভারাণী। এক চুমুকে জুড়িয়ে যাওয়া চাটুকু শেষ করে কেমন চাঙ্গা হয়ে ওঠে বিনীতা। পুঞ্জীভূত কাগজ-পত্তরের মধ্যে আবার চোখ রাখলো সে। কলমটা দু-ঠোঁটের মাঝে চেপ ধরে কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আলমারি খুললো। একটা বড়ো খাতা আলমারি থেকে বের করে টেবিলের উপর মেলে ধরলো। আঙুল মটকাতে মটকাতে পায়চারী করলো কিছুক্ষণ। তারপর চেয়ারে বসে একটা কাগজে কি লিখে ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকলো, গোবিন্দ—গোবিন্দ—।

ঘরে ঢুকলো বেঁটে-খাটো বয়স্ক একটা লোক। বিনীতার দিকে তাকিয়ে একটু বিরক্তির ভাব দেখালো। বিড়-বিড় করে কী যেন বললো, কিন্তু কোনো শব্দ বের হলো না মুখ থেকে।

—এই চিঠিটা সেক্রেটারীবাবুকে দিয়ে আসতে হবে।

—রোববারটাও কি জিরোতে নেই। আর কি কেউ হেডমাস্টারি করে না? চারু-চন্দ্রবাবুকে হেডমাস্টারি করতে দেখলাম, কিন্তু তোমার মতো—! কই, দাও তোমার চিঠিটা। চিঠিটা নিয়ে গজ-গজ করতে করতে বেরিয়ে গেলো গোবিন্দ।

ফাইলগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে বিনীতা হাসলো। ভাবলো, মা হয়তো বাড়ির ভেতর তার উপর ভীষণ রেগে গজ-গজ করতে শুরু করেছেন এতক্ষণে। চা দিয়ে যাবার সময় শোভারাণী তাকে তির্যক দৃষ্টিতে হয়তো বিদ্ধ করবার চেষ্টা করে-ছিলো। ছোটো ভাই মিন্টু খানিক পরে

এসে গম্ভীর হয়ে তার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকাতে পারে। বিনীতা হাসলো। জানালা দিয়ে বাইরে ইউক্যালিপটাসের দিকে তাকিয়ে আবার হাসলো।

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে। ইউক্যালিপটাসের মাথা থেকে বিকেলের সোনালি আলোটুকু মিলিয়ে গেছে।

বিনীতা একান্তে নিজের সম্বন্ধে অনেক ভেবেছে। সত্যিই কাজ ছাড়া সে থাকতে পারে না। স্কুলের যে কোনোরকম কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে তার খুব ভালো লাগে। বাইরের পৃথিবীর আকর্ষণ তাই বলে তার কাছে কম নয়। তবু কাজ নিয়ে মেতে থাকার ইচ্ছেটা কেন যেন তার মধ্যে ছটফট করে। সে জানে বন্ধুরা, আত্মীয়-স্বজনরা, স্কুলের সহকর্মীরা তার সম্বন্ধে অদ্ভুত সব ধারণা পোষণ করে। সে দেখেছে সহকর্মীদের কটাক্ষদৃষ্টি। ওদের কেউ কেউ তাকে নিয়ে ফিস-ফিসও করে থাকে। সহকর্মী অসীমা সেন হাসতে হাসতে সহজভাবেই বলে, আপনাকে দেখলে বিষমবাহু ত্রিভুজের কথা মনে পড়ে নীতাদি। বিনীতা সব সময় ঠোঁটের কোণে শান্ত হাসির আভা ফুটিয়ে মন দিয়েছে কাজে। মনে মনে বলেছে, ছেলেমানুষে—সবাই ছেলেমানুষে।

জানালার পাশ দিয়ে একটা পাখি চীৎকার করতে করতে উড়ে গেল।

ভেতর-বাড়িতে গেলো সে। ঝি মাজা বাসনগুলো বারান্দার এক কোণে সাজিয়ে রাখছে। শোভারাণী রান্নাঘরের দরজার কাছে বসে তরকারী কুটছে। মা তাঁর ঠাকুরঘরের জন্যে একটা তেলের প্রদীপ জ্বালছেন। বিনীতার মনে হলো—একটা কিছু এখন তার বলা উচিত। কি বলবে তা চিন্তা করার আগেই মা কেমন এক ধরনের গাম্ভীর্য নিয়ে বলে উঠলো, জীবনটাকে একেবারে যন্ত্র করে ফেললি তুই। নিজের দিকে একটু-আধটু তাকিয়ে দেখতে হয়। বাইরে না বেরোস বাসায় বসেও এর-ওর সঙ্গে গল্প-গুজব করতে পারিস। মার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলো সে। এখন এখানে থাকলে মা বকেই যাবেন আর মাঝে মাঝে সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন।

মনে মনে হেসে ঘরে ফিরে এলো সে। অন্ধকার জমছে ঘরে। সুইচ টিপে আলো জ্বালো সে। বাইরের বারান্দার আলোটাও জ্বালো। তারপর একটা ইংরেজি ম্যাগাজিন নিয়ে বাইরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে গিয়ে বসলো।

আজ বিকেলে অসীমার আসার কথা। স্কুলের হেড সায়েন্স টীচার অসীমা। সন্ধ্যে হয়ে গেছে তবু ওর দেখা নেই।—যাক্, ভালোই হলো। বিনীতা যেন হাঁফ ছাড়লো। ও এলেই কথার খই ছিটোয়। ওর ঘর-সংসারের কথা, ছোট ছেলেটার দুষ্টুমির কথা, স্বামীর রাজনীতি-জ্ঞানের কথা, চুপচাপ বসে তাকে শুনতে হয়। অসীমাটা এত কথাও বলতে জানে! ওর স্বামী এলে বিচিত্র রসিকতা শুরু করে দেয় তার সঙ্গে আর ঘন ঘন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

কিছুদূরের রাস্তা দিয়ে লোকজন যাতায়াত করছে। এক্কা ও রিসকার আওয়াজ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। নদীর ধার থেকে কলরব করতে করতে ফিরছে মেয়ে-পুরুষরা। সকাল-বিকেলে এই ছোট মফঃস্বল শহরটা ভীষণ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

প্রায় বছর তিনেক হলো এখানকার গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস হয়ে এসেছে সে। বিকেলে একটু বেড়াবার সময়ও তার হয়ে ওঠে না। তবে দু-একজনের পীড়াপীড়িতে দু-একবার সে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছে। নদীর ধারে এখানে-ওখানে জটলা। কোথাও রাজনীতি-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা, কোথাও সিনেমা-খেলাধুলোর গল্প, কোথাও বা প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের কথা, অকারণ পরচর্চা। ঝিরঝিরে বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে উদাসীন হয়ে সে তাকিয়েছে নদীর ওপারে শ্যামল তরুশ্রেণীর দিকে। নির্লিপ্ত চোখে দেখেছে ছোটো ছোটো ডিঙির আনাগোনা। তার সঙ্গী যখন নদীর জলে হাত রেখে খুশি হয়ে উঠেছে, কথার ফুলঝুরি ছুটিয়েছে তখন সে পায়ের আঙুলে দিয়ে বালি খুঁড়তে খুঁড়তে ভেবেছে দু-একটা জরুরী কাজের কথা। ঘুরতে ঘুরতে তার চারপাশের মেয়ে-পুরুষদের দিকে চেয়ে নিস্পৃহ হাসি হেসেছে। কেন যেন তার বার-বার মনে হয়েছে মানুষগুলো বুঝি ফুঁ দিয়ে মূল্যবান সময় উড়িয়ে জীবনটাকে অকারণে ফানুস বানিয়ে রাখতে চায়। এই ধরণের মানুষকে তার দয়া করতে ইচ্ছা করে। আরো ইচ্ছে করে এইসব মানুষের মনোজগৎ নিয়ে কিছু লিখতে। একদিন মনোতোষকে বলেছিলো, এদের নিয়ে একটা কিছু লেখো না মনু। হো-হো করে হাসতে গিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলো মনোতোষ। বিনীতার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে আশ্চর্য ধীর স্বরে বলেছিলো, ওদের নিয়ে কিছু লেখা যায় কিনা তা পরে ভাবা যেতে পারে। কিন্তু আপনাকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে আমি এখনি পারি নীতাদি। বিনীতা একটু গম্ভীর হয়ে মনোতোষের দিকে তাকিয়ে ছিলো। মনোতোষ আগের মতোই ধীরস্বরে বলেছিলো, জীবনের সাত-আট বছর তো শিক্ষকতা আর বই-পত্তর নিয়েই মেতে রইলেন। আপনার নিষ্ঠাভরা কাজের জগতের বাইরে আর একটা যে সুন্দর বৃহৎ জগৎ আছে তার খোঁজ কতটুকু রাখেন? অত দূরেই বা যাই কেন, সংসারে নিজের যথার্থ স্থানটিই তো কোনোদিন খুঁজে দেখলেন না। আপনাকে রক্ত-মাংসের মানুষ বলে ভাবতে সত্যিই কষ্ট হয়। মনোতোষের কথায় বিনীতা সেদিন প্রাণখুলে হেসেছিলো। হাসতে হাসতে বলেছিলো, মুখ আর মুখোশ দুটোই সত্যি মনু। মনোতোষ অবাক হয়ে বিনীতার দিকে তাকিয়েছিলো।

মনোতোষ কোলকাতার একটা কলেজের অধ্যাপক। সাহিত্য-চর্চা করা তার নেশা। বিনীতার সঙ্গে তার পরিচয় কোলকাতাতে। এই মফঃস্বল শহরে মনোতোষের বাড়ি। তার অনুরোধেই বিনীতা এখানকার গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস হয়ে আসে।

পত্রিকার পাতা উল্টোতে উল্টোতে বিনীতা আকাশের দিকে তাকালো। তারায় ভরে গেছে আকাশ। দৃষ্টি নামিয়ে আনলো সে। রাস্তার আলো জ্বলছে। রাস্তার পাশের গাছগুলোর মাথা মৃদু মৃদু কাঁপছে। এবার সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো পত্রিকাটির পাতায়।

—কোলকাতা কবে যাচ্ছিস? মা নিঃশব্দে কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বিনীতা পত্রিকা থেকে মুখ তুললো না। বললো, কোলকাতায় যাবার তো প্রয়োজন নেই। তোমার কোনো কাজ আছে নাকি?

—কি বলছিস তুই! নয় তারিখে নিলয় যে বিলেত থেকে ফিরছে। ভুলে গেলি? মা ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়লেন।—এরোড্রোমে গিয়ে নিলয়কে—। বলতে বলতে মা থেমে গেলেন। চশমার আড়ালে মায়ের চোখ-দুটো অস্বাভাবিক উদ্বেগে ভরে উঠেছে। তাঁর বুকের মধ্যে অনেক কথা আঁকুপাকু করতে থাকে। কিন্তু গলা দিয়ে কোনো স্বর বের হয় না।

বুকের উপর এলিয়ে পড়া চুলের মধ্যে এলোমেলো ভাবে আঙুল চালাতে চালাতে বিনীতা ধীরে ধীরে বললো, নিলয়দার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের অভাব নেই মা। পত্রিকার পাতায় দৃষ্টি ফেললো সে।

বিনীতার হাত থেকে পত্রিকাটি ছিনিয়ে নিলেন মা।—চিরটা কালই কি পাগলামি করে কাটাবি! নিজের ভালো-মন্দ অতীত-ভবিষ্যতের কথা কি কোনোদিন ভাবার নেই? মায়ের কণ্ঠ থেকে বিস্ময় উদ্বেগ হতাশা একই সঙ্গে ঝরে পড়ে। একটু ঝুঁকে পড়ে তিনি বললেন, আজ তিন বছরে নিলয়কে তিন-চারখানার বেশী হয়তো চিঠি দিসনি, অথচ ও চিঠির পর চিঠি দিয়ে গেছে। নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। নরম হলো মায়ের কণ্ঠস্বর, তুই না গেলে ভীষণ দুঃখ পাবে নিলয়। ওর থেকেও হয়তো পস্তাতে হবে।

—মানে! বিনীতা চমকে উঠে সোজা হয়ে বসলো ইজিচেয়ারে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনের ভাব বুঝবার চেষ্টা করলো। গম্ভীর হয়ে বললো, তুমি কী বলতে চাচ্ছো বুঝতে পারছি নে মা!

—বারো বছরের মেয়ে যা বুঝতে পারে, তিরিশ পেরিয়ে যাওয়া মেয়ের কাছে তা কি এতই দুর্বোধ্য? তোর ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখের কথা কি আমাদের ভাবতে নেই? ভবিষ্যৎটা কি মাটি করতে চাস তুই? অসহায় কান্নার মতো শোনালো মায়ের কণ্ঠস্বর। পত্রিকাটা বিনীতার কোলে ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। ব্যথাহত কণ্ঠে বললেন, আজ সাত-আট বছর ধরে তোর বাবা, কাকা, আমাকে অগ্রাহ্য করে আসছো! আজকে তার ব্যতিক্রম করবিই বা কেমন করে? একটা দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে মা চলে গেলেন।

ইজিচেয়ারটায় ঘন হয়ে বসলো বিনীতা। মনে পড়লো তার বাবার কথা। কোলকাতার বাসায় বাবা একদিন কঠোর হয়ে উঠেছিলেন। কঠিন গাম্ভীর্য নিয়ে তিনি বলেছিলেন, কোনো বাধা আপত্তি আমি শুনবো না।

নীতুর একটা ব্যবস্থা এবার করতেই হবে। বাবার মুখের স্পষ্ট রেখার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে পাথর হয়ে গিয়েছিলো বিনীতা। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলেছিলো, আমার জীবন নিয়ে আমাকে ভাবতে দিলে ভালো হয় না! মনে মনে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চেয়েছিলো। বাবা গর্জন করে উঠেছিলেন, হোয়াট! লেখা-পড়া শিখে আর চাকরী করে—। বাবা কথা শেষ না করেই চলে গিয়েছিলেন। মা কাকার মুখ থম্‌-থম্‌ করছিলো।

তারাভরা আকাশের দিকে তাকালো বিনীতা। সেদিনকার কথা স্মরণ করে মনে মনে হাসলো। তারপর ভাবলো নিলয়ের কথা। কতদিন ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে সে। পার্কে রেস্টুরেন্টে সিনেমায় কতদিন দুজনে গিয়েছে। নিলয় একটু বেশীমাত্রায় উচ্ছল। গান গায় গলা ছেড়ে। কবিতা বানায়। কারণে অকারণে প্রচুর হাসে, অপরকে হাসায়। কথা বলতে বলতে কেন যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সব মেয়েই তার জন্যে অস্থির হত। বিনীতা মনের গভীরে ডুব দিলো। না, সে কোনোদিন অস্থিরতা বা উত্তেজনায় ছটফটিয়ে ওঠেনি।

হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো বাবার মুখখানা। ক'দিন আগে বাবার চিঠি পেয়েছে সে। এখনো উত্তর দেওয়া হয়নি ভেবে মনে মনে লজ্জিত হলো। কাল সকালেই সে বাবাকে চিঠিটা লিখবে।

বিনীতা নড়েচড়ে বসলো। রাস্তা দিয়ে একটা এক্কা গাড়ি চলেছে। তারই শব্দ ভেসে আসছে। পত্রিকাটির পাতাগুলো একের পর এক উল্টালো বিনীতা। খানিকক্ষণ কী সব ভাবলো। কোলকাতার কিছু কিছু ছোট্ট ঘটনা, অথবা অধ্যাপক পরেশ রায়, ডাক্তার অনন্যা চ্যাটার্জি, এ্যাডভোকেট অমল সেন প্রভৃতি মানুষের কথা তার মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে গেলো। কোনো কিছুই বুঝি তার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। নিজের চিবুকে আঙুলের কয়েকটি টোকা মেরে সে হাসলো। যেন এ-জগতে তার উত্তেজিত হবার, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হবার অথবা রাগ-অভিমান দুঃখ করার ব্যাপার নেই।

চোখ বুজলো সে। মনে পড়লো, স্কুলের জন্যে দুটো টেবিল আর একটা আলমারি বেশ কিছুদিন আগে তৈরী করতে দেওয়া হয়েছে। সেগুলো এখনো এসে পৌঁছায়নি। কালই একবার খোঁজ নিতে হবে। স্কুলের যেসব মেয়েরা এবার হায়ার-সেকেন্ডারী পরীক্ষা দিয়েছে তাদের কথা মনে পড়লো তার। কয়েকটি মেয়ে খুবই ভালো ফল করবে বলে তার ধারণা।

মিষ্টি হাওয়া আসছে। পত্রিকার পাতাগুলো হাওয়ায় শব্দ করে কাঁপছে।

ভেতরে ছোটো ভাই মিন্টু চেঁচিয়ে কী যেন পড়ছে। বিনীতা একবার ভাবলো, মিন্টুর কাছে গিয়ে ওর পড়া বুঝিয়ে দেয়। পড়া বুঝিয়ে না দিলেও ওর সামনে বসে থাকা উচিত। সুযোগ পেলেই ও ফাঁকি দেবে। স্কুলপাঠ্য বইয়ের নীচে গল্পের বই রেখে পড়তে থাকবে। উঠি-উঠি করেও উঠলো না সে। চোখ বুজে নিশ্চল হয়ে বসেই রইলো। তার সাধের স্কুলকে ঘিরে একটা সুন্দর স্বপ্ন রচনা করতে লাগলো। একটা দেশগৌরব আদর্শ স্কুলের স্বপ্ন। এমন একটা সুডৌল স্বপ্ন যা তার জীবনের মর্মরসে সঞ্জীবিত।

মিন্টুর চীৎকার আর শোনা যাচ্ছে না। চোখ বুজে নির্জনতাটুকু উপভোগ করতে লাগলো বিনীতা। এমন নির্জনতার মধ্যে স্কুলকে ঘিরে সুন্দর স্বপ্ন রচনা করতে, নতুন নতুন কাজের পরিকল্পনা করতে তার ভীষণ ভালো লাগে।

মিন্টু আবার চেঁচিয়ে উঠেছে। বিনীতা কান খাড়া করলো। মিন্টু পড়ছে, মরুভূমিতে কাঁটাযুক্ত ছোটো ছোটো বাবলা গাছ, ক্ষুদ্র তৃণলতা ও খেজুর গাছ জন্মে। কালাহারি মরুভূমিতে ভূগর্ভের মৃত্তিকাস্তরে অল্প জল থাকে। সেইজন্য ইহা সাহারার মতো একেবারে তৃণহীন নয়। মিন্টু চুপ করলো।

বিনীতা উঠে দাঁড়ালো। দু-একটা কাজ বাকি আছে। সেগুলো আজকেই শেষ করা দরকার।

পরদিন স্কুল থেকে বাসায় ফিরে সে দেখলো, মনোতোষ এসেছে। মিন্টুর সঙ্গে গল্পে মেতে আছে।

—কোলকাতা থেকে কবে এলে?

মনোতোষ মিন্টুর দিকে চেয়ে উত্তর দিলো, আজ দুপুরের ট্রেনে।—তুমি তারপর কি করলে মিন্টুবাবু?

দিদির আবির্ভাবে অস্বস্তি বোধ করলো মিন্টু। চাপাস্বরে বললো, আমি এখন আসি মনুদা। আজ আমাদের ম্যাচ আছে। বলেই এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

টেবিলের উপর চোখ পড়লো বিনীতার। খানচারেক চিঠি। আজকের ডাকে এসেছে। একটা চিঠি মামা লিখেছেন।...একবার দুবার তিনবার চিঠিটা পড়লো। দাঁড়িয়েছিলো সে। টেবিলের একটা কোণ শক্ত করে চেপে ধরে বসে পড়লো চেয়ারে।

মিন্টুর কথা ভেবে মিটি মিটি হাসছিলো মনোতোষ। কিন্তু বিনীতার দিকে চেয়ে একটা আশংকায় শক্ত হয়ে বসে রইলো সে। দৃষ্টি তার বিমূঢ় হয়ে উঠলো। তার মনে হলো, বিনীতার দৃষ্টি ঘরের বাইরে কোথায় যেন ভেসে গিয়েছে। দিন শেষের আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। সেই আলোয় বিনীতাকে কখনো মনে হলো কঠিন দৃঢ়চিত্ত, কখনো মনে হলো অবসন্ন অসহায়।

হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠলো বিনীতা। মনোতোষের দৃষ্টি এবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। বিনীতার চোখের দিকে তাকালো। মনে হলো, দূর আকাশের দুটি তারা যেন অসহনীয় নীরবতায় কাঁপছে।

ঘরের স্তব্ধতা ভেঙে একটা কিছু বলা উচিত বলে মনোতোষ মনে করলো। কী বলবে তা ভাববার আগেই বিনীতা বলে উঠলো, তারপর তোমার কি খবর মনু? চেয়ারে নড়েচড়ে বসে মনোতোষের দিকে তাকালো সে।

মৃদু হেসে মনোতোষ বললো, এই একটু আড্ডা মারতে এলাম। আর জানতে এলাম আপনি নিজে কোনো খবর হয়ে উঠেছেন কিনা।

বিনীতা হাসলো। কোনো উত্তর দিলো না। মামার চিঠিটা হাতে নিয়ে ঈষৎ উঁচু গলায় ডাক দিলো, মা!

মনোতোষ চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো। বিনীতার দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকালো সে।

ব্যস্ত হয়ে মা ঘরে ঢুকলেন।

—আচ্ছা মা, লীনার বয়স কত? ঈষৎ ঘাড় কাত করে মায়ের দিকে তাকালো বিনীতা। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো।

—আমার দাদার মেয়ের কথা বলছিস? চৌদ্দ-পনেরো হবে। হঠাৎ একথা—

—মামা চিঠি লিখেছেন। লীনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। দিন এখনো স্থির হয়নি।

চিঠিটা বিনীতার হাত থেকে নিয়ে মা গম্ভীর হলেন। চিঠিটা পড়বার পর কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। মনোতোষের দিকে চেয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করলেন। একটা উদ্গত নিঃশ্বাসকে সশব্দে বয়ে যেতে দিয়ে মা বললেন, দাদা আমার খুব সাবধানী। লীনা যাতে তোকে ফলো না করে তার জন্যেই হয়তো সাত-তাড়াতাড়ি এই ব্যবস্থা। মেয়েকে দৃষ্টির খোঁচা মেরে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন মা।

বিনীতা নতমুখে বসে রইলো। কেমন এক ধরণের অনাস্বাদিত ভাব তার সমগ্র সত্তায় ছড়িয়ে পড়ছে। ক্লান্তি এসে তাকে যেন ঘিরে ফেলছে।

অপ্রতিভ হয়ে বসে রইলো মনোতোষ। এভাবে বসে থাকতে কেমন অস্বস্তি বোধ করছে সে। আবার উঠে চলে যাওয়াটাও ভালো দেখায় না। ঘরের এককোণে ছোট্ট একটা টেবিলের উপর কালো পাথরের একটা পুরুষ-মূর্তি। সেদিকে তাকিয়ে শুধু সে ভাবলো, নীতাদি অদ্ভুত ধরনের মেয়ে। নীতাদির বিয়ের জন্যে অনেকেই চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গ বারবার এড়িয়ে গিয়েছে নীতাদি। বিয়ে না করার রহস্য আবিষ্কার করতে মনোতোষ বহু চেষ্টা করেছে। ভেবেছে, কারো আঘাত নীতাদিকে এমন করে ফেলতে পারে। কিংবা কোনো স্মৃতি ভয়ানক অভিশাপ হয়ে তাকে জীবন সম্বন্ধে উদাসীন করে তুলতে পারে। কিন্তু বিনীতাকে বুঝতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হয়েছে সে। তার কোনো ধারণাই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়নি। সে ভালোভাবেই বুঝেছে, বহু পুরুষের সঙ্গে মিশলেও কোনো পুরুষের প্রতি আকর্ষণ নেই। নিত্য চোখে দেখা মেয়ে-জগতের মানুষ নীতাদি নয়। মনোতোষের বারবার মনে হয়েছে, কাজের মধ্যে দিয়ে নীতাদি নিজেকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে চায়। নীতাদিকে মনে হয়েছে কী এক ঐশ্বর্যের আনন্দে পরিপূর্ণ নারী। কোনো সময়ে সে স্বার্থপর, কোনো সময়ে বা স্বার্থত্যাগী।

এতদিনকার বিনীতার সঙ্গে আজকের বিনীতার অনেকখানি প্রভেদ দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে মনোতোষ। শিরশির করে উঠলো তার বুকের মধ্যেটা। এদিক ওদিক কয়েকবার তাকিয়ে খুক্‌খুক্‌ করে কাসলো সে। কাসির শব্দ দিয়ে ঘরের অস্বস্তিকর

নিস্তব্ধতাকে তাড়িয়ে দিতে চাইলো। কিন্তু বিনীতা স্তব্ধ। তেমনি তার নতমুখ।

জানালার কপাট হঠাৎ শব্দ করে খুলে গেলো। এক ঝলক বাতাস ঘরে ঢুকে পাক খেলো।

বিনীতা চমকে উঠে তাকালো জানালার দিকে। একটু ভয় পেয়েছিলো সে, যেন গাছপালা, একদল লোক জানালা দিয়ে তার ঘরের মধ্যে চলে আসছে।

—আসি নীতাদি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে এতক্ষণ পরে উঠে দাঁড়ালো মনোতোষ।

বিনীতা নড়েচড়ে উঠলো। সশব্দে একটা নিঃশ্বাস ফেললো। গলা ঝেড়ে চোখ না তুলেই বললো, এখনই যাবে!

দেয়ালে দোলায়মান ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে মনোতোষ বললো, একটু বেড়াতে যাবো। নদীর ধারে।

চকিতে উঠে দাঁড়ালো বিনীতা। অপরিসীম উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলো, আমিও যাবো। চলো। বলে এমনভাবে মনোতোষের চোখে চোখ রাখলো যেন নদীর ধারে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিলো সে।

বিস্মিত হলো মনোতোষ। সবাই যে সময়ে বেড়াতে বের হয়, সে সময়ে কাগজপত্তরের মধ্যে যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, বাসার বাইরে পা দেবার সময় আগপাছ ভাবা যার স্বভাব, সে আজ বিকেলে নদীর ধারে যাবার জন্যে উৎসাহ প্রকাশ করছে!

মনোতোষের পিঠে ঠেলা দিলো বিনীতা।—কই, চলো। মনোতোষের মনে হলো, জীবনে বুঝি এই প্রথম অন্তরঙ্গ উৎসাহী হলো নীতাদি।

দুজনে বেরিয়ে এলো।

শোভারাণী পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, চা খাবেন না আপনারা?

দুজনেই শুনলো কথাটা। কিন্তু কেউ উত্তর দিলো না। বড়ো রাস্তায় গিয়ে উঠলো দুজনে।

শহরের এই অঞ্চলে লোকবসতি কম। রাস্তার দুপাশে মাঝে মাঝে দু-একটা বাড়ি। ছবির মতো দেখতে লাগে।

দুজনে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে।

এক দম্পতি গল্পে হাসিতে মেতে তাদের আগে আগে চলেছে।

চলতে চলতে মনোতোষ বললো, ছোটবেলায় আমরা শহরের এদিকটায় কোনো লোকবসতি দেখিনি। আপনার কোয়ার্টারও তো সেদিন হলো।

দম্পতির উচ্চহাসির শব্দ দুজনে শুনতে পেলো।

বিনীতা এতক্ষণ মুখ নীচু করে পথ চলছিলো। এবার সে মুখ তুলে দম্পতির দিকে তাকালো। তাকালো রাস্তার দুপাশে। দেখলো রাস্তার ধারের গাছগুলো সুন্দর কচি কচি পাতায় ভরে গেছে। এখন গাছগুলোর মাথায় অস্তগামী সূর্যের আলো এসে পড়েছে। তার মনে হলো বিকেলের ওই আলো যেন সোনার চড়ুই পাখি। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে দু-একটা পাখির উড়ে যাওয়া দেখলো। বিনীতার ভেতরের নানান ভাবনা বিকেলের আলোয় নিঃশব্দে যেন বেরিয়ে আসতে চাইলো।

তাদের পাশ দিয়ে একটা মোটরগাড়ি ধুলো উড়িয়ে চলে গেলো।

মনোতোষ মৌনভঙ্গ করলো, প্রকৃতির এতো কাছাকাছি এলে আমার তো অনেক কিছুই ভুলে যেতে ইচ্ছে করে। বলে বিনীতার মুখ দেখতে চেষ্টা করলো সে।

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বিনীতা চুপচাপ এগিয়ে চললো। তার মনে পড়ছে, চন্দননগরের বাড়িতে ছোটোবেলায় ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পেত বাগানের বকুল গাছের নীচে দুটো নীল পাখী লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। চন্দননগরে নদীর ধারে অফুরন্ত হাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে, দাদুর সঙ্গে কত কথা বলত, দু-এক কলি গান গাইতেও চেষ্টা করত। ছোটোবেলার সেই সব স্মৃতি আজ বিকেলের হাওয়ায় উজাড় হয়ে ফিরে আসছে।

নদীর ধারে এসে পড়লো তারা।

সূর্য ডুবে গেছে। পশ্চিমের আকাশে এখন রাঙা মেঘের উল্লাস। নদীর চর থেকে বসন্তের হাওয়া উঠে আসছে। বিনীতার কপালের চুল আর শাড়ির আঁচল উড়ছে। নদীর পাড়ে চরে লোকজনের অবিশ্রাম আনাগোনা। নদীর পাড়ে যেখানে এসে দুজনে নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালো তার কিছু দূরে কয়েকটি হিজল গাছ। গাছগুলোর ফুল নীচে কেমন সুন্দর বিছানো। গাছগুলোর ওপাশে অনেকখানি জায়গা নিয়ে যবের খেত। যবের পাকা শীষ বাতাসে দুলছে।

বিনীতা নিবিষ্ট চিত্তে সবকিছু তাকিয়ে দেখলো। তারপর কয়েকটি হিজল ফুল কুড়িয়ে দ্রুতবেগে এলো শুকনো বালির চরে। চরটুকু পার হয়ে এসে দাঁড়ালো জলের ধারে। পেছনে পেছনে মনোতোষও এলো।

স্রোতে ফুলগুলো ভাসিয়ে দিলো বিনীতা। তারপর জলে হাত ডোবালো। ভিজে হাতটা কপালে বুলিয়ে নিলো। বসে পড়লো ভিজে বালির উপর।

বিনীতার দিকে তাকিয়ে মনোতোষ যেমন বিস্ময় বোধ করছিলো, তেমনি খুশিও হয়ে উঠছিলো। চারদিকে আনন্দভরা দৃষ্টি রেখে নদীর স্রোতের মতো, স্বচ্ছ লঘু মেঘের মতো বিনীতা বুঝি এখন এখানে ওখানে ঘুরতে পারে।

নদীর জলে রাঙা মেঘের ছায়া দুরন্তপনায় মেতে উঠেছে। একটা পালতোলা নৌকো চলেছে ধীরে ধীরে। আকাশে দুই ঝাঁক পাখি উড়ে গেলো। বিনীতা সবকিছু দেখলো। সেই সময় তার চোখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত অভিভূত মনোতোষের মনে হলো, নীতাদির দুটি চোখ যেন দুটি উজ্জ্বল সন্ধ্যাতারা।

চারদিকের সবকিছু আবছা হয়ে আসছে খানিক পরেই অন্ধকার নামবে। নদীর ধার থেকে লোকজন ফিরতে শুরু করেছে।

মনোতোষ ঝিকমিকিয়ে ওঠা নদীর ছোটো ছোটো ঢেউয়ের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ভাবলো, আজ বিকেলের বিনীতার কথা। বিনীতাকে অন্য জগতের মানুষ বলে তার মনে হচ্ছে না। এই জগতেরই এক আশ্চর্য মেয়ে সে। একবার মনোতোষ কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলো, আপনি সমুদ্র দেখেছেন নীতাদি। ঈষৎ হেসে উত্তর দিয়েছিলো বিনীতা, সমুদ্রই তো পাড়ি দিচ্ছি মনু। এখন বিনীতাকে সেই প্রশ্নটাই করবার ইচ্ছে মনোতোষের মনে হঠাৎ জেগে উঠলো।

আবছা আঁধারে বিনীতাকে আত্মমগ্ন মনে হচ্ছে। নখ দিয়ে বালি খুঁড়তে খুঁড়তে সে আস্তে আস্তে বললো, কাল ভোরের ট্রেনে আমি কোলকাতা যাচ্ছি মনু। বাইরে বেরিয়ে এই প্রথম কথা বললো সে।

বিস্মিত কৌতূহলী হয়ে উঠলো মনোতোষ।—কেন? বলে ভুরু কুঁচকালো সে।

বিনীতা উঠে দাঁড়ালো।

মনোতোষ আবার জিজ্ঞেস করলো, স্কুলের কোনো কাজে?

বিনীতা হাঁটতে শুরু করলো। বললো, না।

চলতে চলতে মনোতোষ তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে বিনীতার মুখের দিকে তাকালো। ওর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলো না সে। আবার জিজ্ঞেস করলো, হঠাৎ কোলকতায় যাবার কারণ?

একটু শব্দ করে বিনীতা হাসলো। কোনো কথা বললো না।

পাড়ের উপর এসে মনোতোষ একটু ইতস্তত করে আর একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো, কবে ফিরবেন? রুদ্ধনিঃশ্বাসে তীক্ষ্ন চোখে বিনীতার মুখের দিকে তাকালো সে। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। সেই আলোর ক্ষীণ ছটা এসে পড়েছে বিনীতার মুখে। ওর চোখদুটিকে তখনো মনে হচ্ছে দুটি উজ্জ্বল সন্ধ্যাতারা।

হিজল গাছগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে বিনীতা বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো। শাড়ির আঁচল ঘন করে গায়ে টেনে দিয়ে বললো, কোলকতা গিয়ে ধীরে-সুস্থে ফেরার কথা ভাবব।

আপনার আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কেমন ?

নিজের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট ক্ষমতা না থাকলে অন্য পাঁচজনকে নিয়ন্ত্রণ করা কিংবা দশ-বিশজনকে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজে কেউ ভালভাবে অগ্রসর হতে পারে না।

নিচে একটি টেস্ট দেওয়া হল; উদ্দেশ্য—আপনার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কতখানি আছে, তার খানিকটা ধারণা পেতে আপনাকে সাহায্য করা।

প্রত্যেকটি প্রশ্নে সঠিকভাবে 'হ্যাঁ' কিম্বা 'না' জবাব দিয়ে চলুন। তারপরে সবশেষে নির্ভুল উত্তর হিসাব করার নির্দেশ দেখে নিন।

১। আপনার কাজকর্মের জিনিসপত্র এবং ব্যক্তিগত বিষয় সামগ্রী সব গুছিয়ে রাখেন কি?

২। কাজকর্মে এবং কোথাও যাবার কথা হলে নির্দিষ্ট সময়ে যাওয়াই কি আপনার স্বভাব?

৩। হঠাৎ যেসব মন্তব্য করলে ভবিষ্যতে নিজেকেই আফশোষ করতে হয়, সে-রকম কথা বলা আপনি কি দমন করতে পারেন?

৪। দারুণ গোলমেলে পরিস্থিতিতেও আপনি কি মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন?

৫। বই বা জিনিসপত্র চেয়ে আনলে আপনি কি অবশ্যই সেগুলি তাড়াতাড়ি ফেরৎ দিয়ে দেন?

৬। আপনি কি মাঝে মাঝে এমন বই পড়েন, যাতে গভীর মনোযোগ দরকার হয়?

৭। কোনও দরকারী কাজ বা জিনিসের জন্যে টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আপনি কি কখনও ইচ্ছে করে আমোদ-আহ্লাদ এবং বিলাসিতা বর্জন করেছিলেন?

৮। যখন বাধাবিপত্তির সামনে পড়েন, তখন কি আপনি ভয় পান?

৯। আপনার দাঁতের গোলমাল হলেই কি আপনি দাঁতের ডাক্তারের কাছে ছোটেন,

১০। কোন কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি কি তাতে জোর করে নিজেকে লাগিয়ে রাখতে পারেন?

১১। আপনি হয়তো কয়েকজন মনমরা হতাশাবাদী লোকের মধ্যে রয়েছেন, তখন তাদের মতো যাতে না হয়ে পড়েন, সে-বিষয়ে আপনি কি সতর্ক থাকতে পারেন?

১২। আপনি যেসব নীতি বিশ্বাস করেন, সেগুলি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে চলতে গেলে হয়তো একটু জনপ্রিয়তা হারাতে পারেন, তবুও কি আপনি নীতি মেনে চলবেন?

১৩। দায়িত্ব এলে আপনি কি নিজের মতো করে তা গ্রহণ করে নিতে পারেন?

১৪। লোকে আপনার সম্বন্ধে কি ভাবছে, তা নিয়ে আপনি কি খুব সামান্যই দুশ্চিন্তা বোধ করেন?

১৫। যখন আপনি কোন ভুল করেন, তখন কি আপনি খোলাখুলিভাবে মাফ চেয়ে নেওয়ার জন্যে এগিয়ে আসতে পারেন?

১৬। আপনি কি আন্তরিকভাবে সত্যি কথা বলতে পারেন যে, আপনি প্রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে কর্তব্যকাজকে আগে বিবেচনা করেন?

১৭। কোন বিশেষ উপলক্ষ্যে আপনি যেসব পণপ্রতিজ্ঞা করেন, সেগুলি কি আপনি মেনে চলতে পারেন?

১৮। বিলের টাকা শোধ এবং চিঠির জবাব দেওয়া ব্যাপারে আপনি কি চটপট সাড়া দেন?

১৯। ছাড়তে পারেন না এমন কোনো বদভ্যাস থেকে আপনি কি মুক্ত?

২০। কোনো ধাঁধা বা বুদ্ধির পরীক্ষায় আপনি সবগুলির উত্তর বের করার আগেই প্রদত্ত উত্তরমালার দিকে না তাকিয়ে কি থাকতে পারেন?

সঠিক উত্তরের হিসাব

প্রত্যেকটি 'হ্যাঁ' জবাবের জন্যে পাঁচ পয়েন্ট করে ধরতে হবে। কেউ ৭৫ পয়েন্টের বেশি পেলে বুঝতে হবে তাঁর অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি রয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায়, মানুষটি সকল ব্যাপারে ভরসা রাখার যোগ্য।

কিন্তু ইচ্ছাশক্তির ব্যাপারে অত্যধিক দৃঢ়তা যেমন মানুষকে একরোখা করে দিতে পারে, ঠিক তেমনি অত্যধিক আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও মানুষকে খুব আত্মকেন্দ্রিক করে তুলতে পারে। আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ, কাজকর্ম সেই জন্যেই সতর্কভাবে লক্ষ্য করতে হবে, যেন গোঁড়ামি না এসে পড়ে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের ফলে। তখন ভাল স্বভাবটাই খারাপ হয়ে সবার কাছে ধরা পড়বে।

যখনই পাঁচজনের কাছে আপনার অনমনীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার প্রকাশ খুব বেশি অসামাজিক দৃঢ়তা নিয়ে ধরা পড়বে, তখনই আপনি যে জনপ্রিয়তা হারাতে সুরু করবেন তা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আপনার মধ্যে বহু ভাল গুণ থাকলেও ক্ষমতাই থাকুক, আপনি একঘরে হয়ে পড়বেন। এবং ক্রমে নিঃসঙ্গ বোধ করবেন। তখন সুরু হবে আত্মবিশ্বাসের পতন এবং মানসিক দুর্বলতার নিঃশব্দ পদসঞ্চার। একদিন দেখবেন, আপনি সমাজে বাস করেও যেন সমাজের কেউ নন। তখন সমাজকে ভুল বুঝবেন না যেন!

যদি ৬৫ থেকে ৭৫ পয়েন্ট পান, তাহলে ভাল বলতে হবে। এরকম পয়েন্ট পেলে বুঝতে হবে, নেতৃত্ব ক্ষমতা মোটামুটি এবং সবদিক সামলে চলার মত ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে। কিন্তু, এক্ষেত্রে আপনার 'না' জবাবগুলির দিকে মন দিয়ে খানিকটা চিন্তা করলে আরও লাভবান হবেন। কারণ, ঐ 'না' জবাবগুলির মধ্যে আপনার কোন দোষ-ত্রুটি ধরা পড়ে থাকলে তা সংশোধন করবার চেষ্টা করতে হবে।

৪০ থেকে ৬০ পয়েন্ট পেলে, মন্দ নয়। যিনি ৩০ পয়েন্টেরও কম পাবেন, তাঁর হয়তো অনেক কিছু সুন্দর বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু তবু তাঁর দৃঢ় চরিত্র নেই এবং খুব সম্ভব পাঁচজনের কাছে তিনি বিবেচনা-বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন না। তাঁর জন্যে যা দরকার, তা হলো, সব কিছুর প্রতি আরও দায়িত্বপূর্ণ মনোভাব গড়ে তোলা এবং তাঁর উচিত, জীবনের কতকগুলি বেশি দরকারী জিনিসের দিকে সত্যিকারের গুরুত্ব দিয়ে মনোনিবেশ করার চর্চায় নেমে পড়া।

রমেশ দত্তের

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

৩৫

চিত্রকল্পনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে-চিত্রসেন

শিল্পী : অশোক দেব

প্রদর্শনী পরিক্রমা

অশোক দেব এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে আছেন। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ১৩ থেকে ১৯ অক্টোবর তাঁর একশখানি তৈলচিত্রের মধ্যে কতকটা ডেকোরেটিভ ও কিছুটা কিউবিস্টিক কাজের নমুনায় তাঁর নানান পরীক্ষার চেহারা দেখা গেল। ফিগার নিয়ে যে কটি কাজ তিনি উপস্থিত করেছেন তার ভেতর প্রকৃতির ছবি এবং কিছুটা ধর্মীয় বিষয় ঘেঁষা ছবিই প্রধান। "আনটোল্ড" বা "ওয়েটিং" জাতের ছবিতে পেঁচা ও হাঁসের ডেকোরেটিভ ট্রীটমেন্ট (দ্বিতীয়টি কতকটা কাজে নাক ঘেঁষা) ইণ্টারেস্টিং। "ব্রাইট ডে লাইট" "সঙ অব লাইফ" "স্পেলবাউণ্ড" জাতের ছবির ফিগারের ক্লান্ত রেখাবিন্যাসে কতকটা পুনরুক্তি দোষ-দুষ্ট। রঙের মধ্যে হলুদ নীল ও লালের প্রাধান্যই বেশী। তাঁর "ড্রীমল্যান্ড" ছবির রঙের সংযম ও গঠনপারিপাট্য উল্লেখযোগ্য।

●

১৫ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতা উৎসব উপলক্ষ্যে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে পুরনো প্রিন্টএর একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। ড্যানিয়েল, কোলব্রুক, ডয়েল, হাভেল, মোফাট, ফেজার, জোফানী প্রমুখ শিল্পীদের আঁকা প্রাচীন কলকাতা এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের বিচিত্র দৃশ্যাবলীর প্রায় পঞ্চাশখানি পুরোনো লিথোগ্রাফ প্রদর্শিত হয়। তার মধ্যে মোফাট, ডয়েল ও ফ্রেজারের আঁকা গভর্ণমেন্ট হাউস, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট এবং সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল ছবিগুলি কলকাতাপ্রেমিকদের কাছে কৌতূহলের বিষয় হবে। এমিলি ইডেনের রাজা শের সিং, হীরা সিং, হিন্দু রাও প্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি এবং ড্যানিয়েলের অটলা দেবী মসজিদ ও জোফানীর এলাহাবাদের দৃশ্য ও ব্যান্ডেলের কাছে হুগলী নদীর দৃশ্য প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল। এ ছাড়া বিভূতি রায় ও দীপেন বসুর আঁকা শক্তিমূর্তিগুলি প্রদর্শনীর মধ্যে স্বতন্ত্র একটি আকর্ষণের বস্তু হিসেবে উপস্থিত করা হয়।

●

'পূজোর ছুটির পরবর্তীকালীন প্রদর্শনীর মধ্যে ইন্দোরের শিল্পী জি কে পন্ডিতের ২৫ খানি তৈলচিত্র ও ১৮ খানি একবর্ণ ও বহুবর্ণের ড্রয়িং অ্যাকাডেমির অন্যতম আকর্ষণীয় প্রদর্শনী।

শ্রীপন্ডিতের ছবির মধ্যে ফিগারেটিভ ও নন্‌ফিগারেটিভ এই উভয় ধারার কাজেরই পরিচয় পাওয়া গেল এবং সবচেয়ে বেশী নজরে পড়ল তাঁর রঙের সম্বন্ধে সচেতন ভাব। চারপাশের প্রকৃতির রঙ তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। উজ্জ্বল এবং কোমল বর্ণের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে দৃষ্টি তাঁর সজাগ আর ফিগারের চাইতে অ্যাবস্ট্রাকশানেই তাঁর কল্পনাশক্তির বিকাশ বেশী বলে মনে হল। "টিউনস উইথ দি সয়েল" ছবির মাটির রঙ ও তার সঙ্গে অল্প নীল, সবুজ ও হলুদের উজ্জ্বল ছিটে মিশিয়ে যে সূক্ষ্ম টোনাল এফেক্ট ও কাব্যময় অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে তা সকলেরই ভাল লাগবে। তাঁর "ভিলেজ২" "ফিল্ডস ইন ইয়লো অ্যান্ড গ্রীন", "রেড রুফ" ইত্যাদি ছবির মধ্যে প্রকাশভঙ্গী ননফিগারেটিভ হলেও বিষয়বস্তুর প্রতি শিল্পীর একটা আত্মিক সংযোগ থাকার ফলে দুর্বোধ্যতা দুষ্ট হয়নি। প্রতিটি অ্যাবস্ট্রাকশনই তিনি নিসর্গ দৃশ্য বা গ্রামের ছবি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সুচিন্তিত বর্ণপ্রয়োগ ও কম্পোজিশনের বৈচিত্র্যে সেগুলি অর্থপূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছেন।

●

জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্তী একটি টাইপরাইটারকে শিল্পের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। ইতিপূর্বে তাঁর টাইপরাইটারে আঁকা কতকগুলি প্রতিকৃতির প্রদর্শনী হয়ে গিয়েছে। ২৭ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ২৬ খানি এক ও বহুবর্ণে টাইপরাইটারে আঁকা অপেক্ষাকৃত বড় মাপের ছবির প্রদর্শনী দেখা গেল। এর মধ্যে দু একটি শিশুর ছবি লেনিন ও হো চি মিন-এর প্রতিকৃতি বিশেষ আকর্ষণীয়। পৌরাণিক বিষয় নিয়ে করা ছবিগুলি মাপে বড় হলেও ছবি হিসেবে তত জমে ওঠেনি। কিন্তু এই বিশেষ মাধ্যমের সম্ভাবনা হিসেবে সেগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

●

ভারতবিদ্যার রিসার্চ কর্মী ও শিল্পী এস পোতাবেনকো বর্তমানে ভারতের সমসাময়িক শিল্পকলার অনুসন্ধানে ভারত-ভ্রমণ করছেন। স্বদেশে দীর্ঘকাল তিনি বইয়ের ইলাস্ট্রেশন, সংবাদপত্রের কার্টুনিস্ট এবং গ্রাফিক শিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া একমাত্র ভারতের বিষয়েই ছবি আঁকতে তাঁর ভাল লাগে। রাশিয়ান ভাষায় প্রকাশিত বীরবলের কাহিনীর ইলাস্ট্রেশনগুলি তার অন্যতম সাক্ষ্য। এতে তিনি ভারতীয় মিনিয়েচারের স্টাইল অনুসরণ করেছেন। টুর্গেনিভ ও রাশিয়ান সুরস্রষ্টা লিয়াদোভ-এর অনুপ্রেরণায় করা কয়েকটি পেন অ্যান্ড ইংকের কাজে তাঁর সূক্ষ্ম কলম চালানো দেখা গেল।

রাশিয়ার ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গৃহের কয়েকটি ছবিতে তাঁর ভিন্ন টেকনিকের পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি লিথোগ্রাফের অঙ্কনের সংযম লক্ষ্য করার মত। তাঁর ভারতভ্রমণের ডায়েরি হিসেবে লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, মথুরা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি জায়গার নগরের দৃশ্য বা ঐতিহাসিক ঘরবাড়ির ছবিগুলি কালি কলমের মাধ্যমে তাঁর সুন্দরভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। কলকাতার মার্বেল প্যালেস, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এবং লক্ষ্ণৌ ও হরিদ্বারের দুটি দৃশ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনী ৩ থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত খোলা ছিল।

●

বর্তমান পশ্চিম জার্মানীতে রঙীন এচিং-এর স্রষ্টাদের মধ্যে অটো এগলাউ অন্যতম প্রধান গ্রাফিক শিল্পী। ১৯৪১—৬৭র মধ্যে তিনি প্রায় চারশর মত এচিং করেছেন। তার থেকে ৪৫ খানি বহুবর্ণ ও একবর্ণের এচিং-এর একটি চমৎকার সুনির্বাচিত প্রদর্শনী সরকারি শিল্প-বিদ্যালয়ে ২ থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত প্রদর্শিত হল।

অটো এগলাউয়ের এই বড় মাপের এচিংগুলি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তৈরী। বাস্তবের হুবহু অনুকরণ বা পূর্ণ বিমূর্তভাব দুর্বোধ্য প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে বিচরণ এর কোনটাই তিনি করতে যাননি কিন্তু উভয় রীতির থেকেই প্রয়োজনীয় আঙ্গিক বেছে নিয়ে তাঁর আপন প্রতিভার বৈশিষ্ট্য দিয়ে নতুন রূপ সৃষ্টি করেছেন। এচিং-এর অল্পভাষণের আঙ্গিকের মধ্যে তাঁর এই ব্যক্তিগত প্রকাশ-ভঙ্গী যেন উপযুক্ত মাধ্যম খুঁজে পেয়েছে।

প্রদর্শনীতে যে সব ছবি ছিল সেগুলি মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। সমুদ্রতীর, যন্ত্রসভ্যতার চিত্র, টিউনিসিয়া, দূরপ্রাচ্য ও নিউইয়র্ক। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে তেইশখানি ছবির সমাবেশ হয়েছে। ডাইক, ব্রেকওয়াটার, ঝিনুক কুড়োবার ঝুড়ি, মাছ ধরার জাল এবং নিছক জমির উঁচু-নীচু গঠনভঙ্গিমার ক্ষণিক দৃষ্ট রূপের মধ্যে থেকে তিনি যে স্থায়ী একটি রূপ খুঁজে বার করেছেন তার নৈকট্যবোধ এবং প্রকাশভঙ্গীর সরলতা বিস্ময়কর। "ল্যান্ড-স্কেপ উইথ ডাইকস"-এর জ্যামিতিক রূপের ভেতর দিয়ে বিস্তৃত এক স্পেসের সৃষ্টি, মাত্র ষোলটি সরল রেখায় "ফরমস্ অ্যাট দি ডাইক"-এর সীমাহীন স্পেস, "ফরমস অ্যাট দি সী"তে কয়েকটি রেখার মধ্যে সমুদ্র, সাগরবেলার মাটি ও দিগন্ত-বিস্তৃত জমির প্রসার, মাত্র কয়েকটি বক্ররেখায় বালিয়াড়ি ও ঘাসের নৈকট্যবোধ, ছড়ানো কালো রেখায় মাছ ধরার জালের বিশ্রামরত মূর্তির আমেজ যেমন একটা নতুন কবিতার আস্বাদ এনে দেয়।

ল্যান্ডস্কেপ অব টেকনলজি সিরিজে পর্তুগালের উইন্ডমিলের বর্ণাঢ্য চিত্রে, হামবুর্গের বন্দরের রঙ ও রেখায়, রেলওয়ে লাইনের কালো রেখায় অ্যাবস্ট্রাকশন ও রিপ্রেজেন্টেশনের নতুন সিন্থেসিস সৃষ্টি হয়েছে। এই সিন্থেসিস আরো পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর টিউনিসিয়ার ওয়াডি ও ঘোরফার দৃশ্যে এবং বোধহয় পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে জাপানের আয়োশিমা, কিয়োতোর টোরি এবং কামাকুরার একান্ত কালো রেখার চিত্রে। মেকাও-এর মাছ ধরার জালের টুকরোগুলি যেন এক নতুন অর্থ নিয়ে দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়। ব্রুকলিন ব্রীজের কোণাকোণি রেখার সামনে নিউইয়র্কের খাড়াই স্কাইলাইন এক বিচিত্র প্যাটার্নের সৃষ্টি করেছে। সর্বত্রই এই দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপের সঙ্গে অ্যাবস্ট্রাক্ট কম্পো-জিশনের সহজ সমন্বয় এবং বিস্তৃত স্পেসের সৃষ্টি—যেটা জাপানী শিল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য- এগলাউয়ের ছবি-গুলিকে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

●

শুভবস্তু শিল্পশাখার উদ্যোগে ৬৫, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন থেকে 'প্রমিতি'র ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা একত্রে বেরোল। হাতে লেখা সাইক্লোস্টাইলে মুদ্রিত এই শিল্প-পত্রিকাটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ ধরণের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা বোধ হয় বাংলা দেশেই সম্ভব। বর্তমান সংখ্যার প্রবন্ধগুলির গুণগত উৎকর্ষ অনেক বেড়েছে। রঘুনাথ গোস্বামীর 'প্রমিতি প্রসঙ্গে' এবং বিজন চৌধুরীর পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক চিত্রকলা' বেশ সুচিন্তিত লেখা এবং অনেক স্পষ্টকথা বলার চেষ্টা এখানে করা হয়েছে। দেবপ্রসাদ ঘোষের 'প্রতীক' প্রবন্ধে শিল্পে প্রতীকের ব্যবহারের ঐতিহাসিক নিদর্শন নিয়ে আলোচনাটি চমৎকার। প্রমিতির লে-আউট লিপিশৈলী এবং ছবিগুলি আকর্ষণীয়। ছবি এঁকেছেন অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী ও রথীন রায়।

●

৬ থেকে ১২ অকটোবর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে হিন্দী হাইস্কুলের দুটি ছাত্র সরবজিৎ সিং ও এ কে পদ্মমিয়ার একটি যৌথ চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। ২২খানি তেলরঙ, জলরঙ, প্যাস্টেল-চিত্র ও কাঠ এবং সিমেন্টের ভাস্কর্যের মধ্যে অল্পবয়সী এই দুটি ছাত্রের কাজের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেল। শ্রী পদ্মমিয়ার করা রঙীন স্লেটওয়ার্কে ঘোড়দৌড় ও রথযাত্রার দুটি চিত্র এবং একটি কাঠের তৈরী বড় কাঠ-বেড়ালীর মূর্তি বেশ সুদৃশ্য। সরবজিৎ সিং-এর ১ নম্বরের শহরের দৃশ্যের তেল রঙের কাজটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। জল-রঙ ও প্যাস্টেলের অন্যান্য ছবিগুলির রঙ বেশ একটু কাঁচা। তাঁর সিমেন্টের তৈরী মুখোশ এবং কাঠের রিলিফ খোদাই উল্লেখ-যোগ্য কাজ।

●

১ থেকে ৪ অকটোবর হাওড়ার বিবেক-নাথ মিশন কলেজের উদ্যোগে কলেজ স্ট্রীটের ওয়াই এম সি এ'তে একটি পাঠ্যপুস্তকের প্রদর্শনী হয়ে গেল। ভারতীয় ও ভারত-বহির্ভূত দেশের বিভিন্ন ধরনের পাঠ্য-পুস্তকের একটি সুনির্বাচিত সমাবেশের মধ্যে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়েও অনেকগুলি সুদৃশ্য বই-এর দর্শন পাওয়া গেল। কলকাতার এম সি সরকার, বাক্ সাহিত্য, বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রভৃতি বিখ্যাত পুস্তক প্রতিষ্ঠান এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল, ম্যাক্সমুলার ভবন, অস্ট্রেলিয়ান ট্রেড কমিশন, সোভিয়েট বাণিজ্য সংস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন বৈদেশিক সংস্থার আনুকূল্যে প্রাপ্ত পুস্তকের অনেকগুলি নিদর্শন দেখা গেল।

—চিত্ররসিক

রেডিও সংগীত সম্মেলন সবে শেষ হল। এই সম্মেলন এখন একটা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। প্রতি বছর এই সময়ে এই সম্মেলন হয়।

রেডিও সংগীত সম্মেলন প্রথম প্রচারিত হয় ১৯৫৪ সালের ২৩শে অকটোবর। এখন এটাকে অনায়াসেই একটা বার্ষিক সম্মেলন বলা চলে। বার্ষিক সম্মেলন, সেইদিক দিয়ে এর যা বিশেষত্ব। এ ছাড়া অন্য কোনো বিশেষত্ব আছে বলে মনে হয় না। অনুষ্ঠানের দিক দিয়ে তো নয়ই।

অন্য যে কোনো সংগীত সম্মেলনের মতো এ-ও একটা সংগীত সম্মেলন ছাড়া আর কিছু নয়। সারা সপ্তাহ ঘণ্টা আড়াই কিংবা তারও বেশি সময় ধরে এই সম্মেলন রিলে করা হয়।

কখনও কখনও এই সম্মেলনের আগে আকাশবাণী থেকে সংগীত প্রতিযোগিতার বন্দোবস্তও করা হয়ে থাকে। ফাইনালে উত্তীর্ণ শিল্পীদের বিচার হয় হিন্দুস্থানী আর কর্ণাটক সংগীতের জন্য যথাক্রমে দিল্লীতে আর মাদ্রাজে। এবং সংগীত সম্মেলনের একটা অধিবেশন নির্দিষ্ট থাকে সংগীত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার-প্রাপ্ত শিল্পীদের জন্য।

ভারতের বিভিন্ন শহরে প্রতি বছর এত সংগীত সম্মেলন হয় এবং এতদিন ধরে হয় আর এত লোক তা শোনেন যে, এই রেডিও সংগীত সম্মেলনের কোনো প্রয়োজন আছে কিনা এবং প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট সময়ে রেডিও সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করে একের পর এক দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রচার করে আকাশবাণী কোনো উদ্দেশ্য সাধন করেন কিনা সে বিষয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন আছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, উচ্চাঙ্গ সংগীতের এই "ওভারডোজে" কি উচ্চাঙ্গ সংগীত বেশি জনপ্রিয় হয়? উচ্চাঙ্গ সংগীতে সত্যিকারের আগ্রহী শ্রোতারাও কি এই সুদীর্ঘ সম্মেলন শোনার সময় পান? এবং উচ্চাঙ্গ সংগীত যাঁদের প্রথম পছন্দ নয় তাঁদের অবস্থা কী দাঁড়ায়? প্রশ্নগুলি একেবারে অবান্তর নয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রেডিও সংগীত সম্মেলনকে শ্রোতারা কীভাবে গ্রহণ করেন এবং তার শ্রোতৃসংখ্যা কী রকম, আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে কখনও অনুসন্ধান করেছেন বলে জানা যায় নি। শুধু রেডিও সংগীত সম্মেলনের ব্যাপারেই নয়, অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সম্পর্কেও আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ কোনো রকম আন্তরিক অনুসন্ধান চালিয়েছেন বলে শোনা যায় নি। অথচ বেতার কেন্দ্রগুলিতে লিসনার্স রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট বলে একটা করে ঠুঁটো জগন্নাথ আছে। এবং তার জন্য মাসে মাসে সরকারের বেশ মোটা টাকা খরচ হয়।

১৯৫৯ সালের রেডিও সংগীত সম্মেলন (২৪শে অকটোবর) উদ্বোধন করে ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছিলেন :

"It has given considerable encouragement not only to masters of the art but also to young rising musicians. As a result of these annual competitions, the Karnatak and the Hindustani styles of music have tended to come closer and there has been appreciable increase in the number of those who are able to understand and enjoy music of both types".

দীর্ঘ দশ বছর পরে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের কথা কতখানি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে? বিগত দশ বছরে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি নিশ্চয়ই শ্রোতাদের আকর্ষণ বেড়েছে, আগে যাঁরা উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি বিকর্ষণ অনুভব করতেন তাঁদের অনেকেই এখন কিছুক্ষণ অন্তত রেডিও খোলা রেখে উচ্চাঙ্গ সংগীত শোনেন, কেউ কেউ সারাক্ষণই শোনেন। কিন্তু এই রকম শ্রোতার সংখ্যা কত হবে? হিসেব যা পাওয়া যায়, চোখে যা দেখা যায় তাতে কিন্তু খুব বেশি উৎসাহিত হওয়া যায় না।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি যতখানি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য রেডিও সংগীত সম্মেলনের কৃতিত্ব কি খুব বেশি? মনে হয় না। বছরে একবার দিন কয়েক ধরাবাঁধা পথে উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটা বিশেষ অধিবেশন করে উচ্চাঙ্গ সংগীতে জনপ্রিয় করা যায় না। তাছাড়া যে পদ্ধতিতে এই সম্মেলন প্রচারিত হয় তা-ও খুব প্রশংসার্হ নয়। দূরের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, এই কলকাতা শহরেই রিলে করা এই অনুষ্ঠান সমানভাবে শোনা যায় না— কখনও জোরে হয়, কখনও আস্তে হয়। মনে হয় যেন হাওয়ায় দুলছে। নির্ঝঞ্ঝাটে নিরুপদ্রবে শোনা যায় না সব সময়। তাছাড়া শিল্পী নির্বাচনেও সব সময় সুবিবেচনার পরিচয় মেলে না। তাই উচ্চাঙ্গ সংগীতের যেটুকু জনপ্রিয়তা এসেছে তার জন্য রেডিও সংগীত সম্মেলন বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না।

তাই বলে এর প্রয়োজনীয়তা নেই এমন কথা বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে, আর একটু আন্তরিকভাবে এই সম্মেলনের ব্যবস্থা করা দরকার। মনে রাখতে হবে, বড়ো বড়ো শহরে সারা বছর যত সংগীত সম্মেলনই হোক, শহর থেকে দূরের লোকদের তা শোনার সুযোগ বড়ো হয় না। নানা অসুবিধার জন্য অত্যুৎসাহীরাও বড়ো দূর থেকে শহরে এসে এইসব সংগীত সম্মেলন শুনতে পারেন না। দূরের শ্রোতাদের একমাত্র উপায় রেডিও। এবং রেডিও থেকে আজকাল শহরের বড়ো বড়ো সংগীত সম্মেলনের অধিবেশনগুলি রিলে করে শোনানো হয়। রেডিও সংগীত সম্মেলনও এই রকম একটি রিলে করা অনুষ্ঠান। তার বৈশিষ্ট্য না থাক, প্রয়োজন নেই এমন নয়। এটাকে "ওভারডোজ" বললে দোষ হয় না কিছু। এই "ওভারডোজ" উচ্চাঙ্গ সংগীতপ্রিয়দের বিশেষ উপকার না করলেও ক্ষতি কিছু করে না।

কিন্তু উচ্চাঙ্গ সংগীত যাঁদের প্রথম পছন্দ নয়, এখনও যাঁরা উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন নি তাঁদের কথাটাও চিন্তা করতে হবে। রাত সাড়ে ৯টার পর তাঁরা রেডিও বন্ধ করে বসে থাকবেন এটা নিশ্চয় বাঞ্ছনীয় নয়। তাই তাঁদের জন্য একটা বিকল্প ব্যবস্থা করা দরকার।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

১লা নভেম্বর সকাল সাড়ে ৯টায় ছিল ইংরেজী নিউজ রীল—সদ্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রাপ্তদের বিষয়ে। একেবারে সাদামাটা ধরনের অনুষ্ঠান। প্রাণের উষ্ণ স্পর্শ পাওয়া গেল না এতে। তাই তেমন মনোগ্রাহী হয়নি। অথচ অনুষ্ঠানটিকে বেশ চিত্তাকর্ষক করে তোলার সুযোগ ছিল।

এইদিন রাত পৌনে ৯টায় একটি সুন্দর কথিকা শোনা গেল। কথিকাটির শিরোনাম ছিল "কেন বিজ্ঞাপন", বললেন শ্রীদিলীপকুমার গুপ্ত। কেন লোকে বিজ্ঞাপন দেয়, বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন কী, কীভাবে বিজ্ঞাপন দিতে হয়, বিজ্ঞাপনের আকর্ষণ কোথায়—এই বিষয়ে কথিকা। বিশ্লেষণ—বৈজ্ঞানিক। বলার ভঙ্গিটিও ভালো। তাই সমগ্র কথিকাটি সাগ্রহে শোনার মতো হয়েছিল

২রা নভেম্বর বেলা ১টায় নাটক ছিল "বিপ্রতীপ", শংকরের "যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ" কাহিনী অবলম্বনে রচিত। নাট্যরূপ শ্রীমতী সাধনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেদিন ছিল জন দিনমণি বিশ্বাসের বিবাহ বার্ষিকী। দিনটি একান্তে মধুরভাবে পালন করার জন্য শাজাহান হোটেলে একটা হানিমুন সুইট ভাড়া নিয়েছে সে। ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে বুলার জন্য অপেক্ষা করছে। বুলা তার স্ত্রী। এখনও আসেনি। আসতে দেরি করছে। কেন দেরি করছে বুঝতে পারছে না। বারবার রিসেপশন কাউন্টারে ফোন করে খোঁজ নিচ্ছে। কিন্তু তারাই বা খোঁজ দেবে কেমন করে। ঘন ঘন ফোনে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

ফোনে শুধু বুলার খোঁজ তো নয়, তার রূপবর্ণনা, পরিচয়-চিহ্ন, কবে তাদের বিয়ে হয়েছিল, কেমন তাদের দাম্পত্য-জীবন, কতখানি সে দিনমণিকে ভালোবাসে ইত্যাদি অনেক কথা। কথা আর শেষ হয় না। সবই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কথা, যা বাইরের লোকদের বলার নয়। কিন্তু সবই রিসেপশনিস্টদের শুনতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মনেও রাখতে হচ্ছে। কেমন করে তারা বুলাকে চিনবে, কতখানি সে লম্বা, কী রকম তার চেহারা, কোথায় তিল, কোথায় কী সবই মনে রাখতে হচ্ছে বুলা এলেই তাকে চিনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দিনমণির সুইটে পৌঁছে দিতে হবে।

কিন্তু বুলা আর আসে না। রাত অনেক হ'ল। দিনমণির চিন্তা বাড়ল। রিসেপশনিস্টরা সসংকোচে জানাল, একবার হাসপাতালগুলোতে আর পুলিসে খবর নিলে হয়। বলা তো যায় না, যদি কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়ে থাকে। দিনমণি জানাল, সে চুপ করে বসে নেই, সমস্ত জায়গায় সে টেলিফোন করে খোঁজ নিয়েছে কিন্তু কোথাও বুলার খবর পাওয়া যায়নি।

এমনি করে রাত আরও গভীর হলে একজন পুলিস অফিসার এলেন শাজাহান হোটেলে। সেখানে জন দিনমণি বিশ্বাসের খোঁজ পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন তিনি। সারা কলকাতা শহরে তিনি তন্ন তন্ন করে তাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন অথচ শাজাহান হোটেলের কথা একবারও মনে হয়নি।

রিসেপশনিস্টদের নিয়ে গেলেন দিনমণি কাছে। দিনমণির মাও এসেছেন। হারানো ছেলেকে পেয়ে তিনি বুকের ধন পেলেন।

রিসেপশনিস্টরা ব্যাপারটা কিছুই বুঝল না। পুলিস অফিসার বুঝিয়ে দিলেন—এ কেস অভ মেন্টাল ডিরেঞ্জমেন্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কার্জন পার্কের ধারে দিনমণি তার স্ত্রীকে হারিয়েছিল। হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠলে চারদিকে ছুটোছুটি পড়ে গিয়েছিল। তারই মধ্যে বুলা গেল হারিয়ে। তখন একদল গোরা সৈন্য চলে গিয়েছিল কার্জন পার্কের কাছ দিয়ে। হয়তো তারাই—

বুলার আর খোঁজ নেই কিন্তু দিনমণি আজও প্রতিটি বিবাহ বার্ষিকীর দিনে হোটেলে ঘর ভাড়া করে, সুন্দর করে ঘর সাজিয়ে বুলার জন্য অপেক্ষা করে।.....

নাটকটি বেশ সরল, সাবলীল। সাসপেন্সও ভালো জোরে রাখা হয়েছে। কিন্তু তবু শেষপর্যন্ত মনে বিশেষ রেখাপাত করতে পারেনি, দিনমণির জন্য মনে ব্যথা জাগেনি তার কারণ বোধ হয়, শ্রীপ্রদীপকুমার সেনের অভিনয়ে দিনমণিকে তার স্বরূপে খুঁজে পাওয়া যায় নি। রিসেপশনিস্ট দুজন উইলিয়ামস্ আর সাথী বোসের ভূমিকায় শ্রীজীবনকুমার ঘোষ আর শ্রীমাণ ভট্টাচার্য কিন্তু ভালোই অভিনয় করেছেন। পুলিস অফিসারের চরিত্রে শ্রীঅজিতকুমার রায়ও ভালো। কিন্তু বুলা রূপী শ্রীমতী তনুশ্রী তালুকদার আর দিনমণির মায়ের বেশে শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায় খুশি করতে পারেননি।

৩ই নভেম্বর বেলা ২টো ৪০ মিনিটে গীত ও ভজন শোনালেন শ্রীমতী শুভ্রা মুখোপাধ্যায়। ভালো লাগল। ৩টায় শ্রীঅমরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নজরুলগীতি যান্ত্রিক গোলযোগের কবলে পড়েছিল। গান তো শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিলই, যতক্ষণ শোনা গিয়েছিল সমনাদে শোনা যায়নি—একবার জোর হয়েছিল, একবার আস্তে হয়েছিল। এবং এমনি করে সারাক্ষণ চলেছিল শেষে গাঁ গাঁ আওয়াজ করে থেমে গিয়েছিল।

৮ই নভেম্বর সকাল সাড়ে ৯টায় ছিল ইংরেজী নিউজ রীল হোমিওপ্যাথি সম্মেলন, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও কারিগরী মিউজিয়ম ও নরেন্দ্রপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংহতি প্রদর্শনী বিষয়ে। প্রথমটি থেকে ভারতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার গোড়ার ইতিহাস জানা গেল, দ্বিতীয়টিতে বিশেষজ্ঞরা মিউজিয়ম সম্পর্কে অনেক তথ্যপূর্ণ আলোচনা করলেন, আর শেষেরটিতে জাতীয় সংহতির 'ডিমন্সট্রেশন' শোনা গেল। এই শেষের অনুষ্ঠানটিই সবচেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষক হয়েছিল, আগের দুটি সাধারণ বক্তৃতা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞই হয়েছিল বলা চলে।

—শ্রবণক

'উত্তর দরবারী'

কলকাতার নাট্যানুরাগীদের কাছে 'উত্তর দরবারী' একটি পরিচিত নাম। দশ বছরের পথপরিক্রমায় এই গোষ্ঠীকে স্বীকার করতে হয়েছে নানা দুর্ভাগ্যের ঝড়কে, কিন্তু শিল্পীদের আন্তরিকতায় শৈথিল্য আসেনি. তাই আজো নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে 'উত্তর দরবারী'র বিশিষ্ট ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না কোন মতেই। যে নাটক মানুষকে জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে, যে নাটকে ক্ষয়িষ্ণু জীবনের উত্তরণের স্বপ্নসাধনার ছবি আছে, যা হতাশা আর গ্লানির অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান দেয় সেই সব নাটকই আজকের বাঙলাদেশে মঞ্চস্থ করতে হবে: এই বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি নিয়েই 'উত্তর দরবারী'র আবির্ভাব সূচিত হয়েছে।

১৯৬৯'র কোন এক সময়ে 'উত্তর দরবারী'র প্রথম পদধ্বনি শোনা যায়। প্রথম নাম ছিল 'দরবারী', কিন্তু ঐ নামে আর একটি সংস্থার আবির্ভাবের সংবাদ পেয়ে সামান্য একটু পরিবর্তন করে নামকরণ হয় 'উত্তর দরবারী'। কলকাতায় তখন নাট্য-আন্দোলনের ঢেউয়ে উদ্বেল মুখরতা সবেই [illegible] শুরু হয়েছে, দর্শকের নাট্যচেতনা পুরাতনের জীর্ণতা ছিন্ন করে নতুন দিগন্তের সঙ্গে পরিচিত হতে চলেছে। এই আশাপ্রদ পরিমণ্ডলেই গোষ্ঠীর শিল্পীরা প্রথম নাটক হিসেবে অভিনয় করলেন অলকেন্দু ভট্টাচার্যের 'কুশীলব'। একটি নাটকের দল, আর নাটককে ঘিরেই এই নাটকের কাহিনীর বিস্তার। নাটক যারা ভালবাসে, নাটকের দলকে যারা ভালোবাসে, যারা শুধু সীমাহীন আন্তরিকতা আর নিষ্ঠায় নানা বাধা আর বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে বাঙলাদেশে নাট্যপ্রবাহকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে, ভবিষ্যতে এদেরই পরিশ্রমের ফলশ্রুতি স্বরূপ বাঙলার নাট্যঐতিহ্য নতুনতর অর্থে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠবে: এই বক্তব্যকেই 'কুশীলব' নাটকে সোচ্চারে ঘোষণা করা হয়েছে।

'কুশীলব' নাটক প্রযোজনা সম্পর্কে এ'রা বলেছেন—'দু' একটি রাত্রি 'কুশীলব' অভিনয় করার পরেই একটা জিনিস দেখলাম, প্রায় প্রত্যেক দর্শকই নাটক দেখার পর কিছু-না-কিছু সমালোচনা করেছেন। অনেকে যেমন উচ্ছ্বসিত হোচ্ছেন, আবার কেউ কেউ নিজের অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বলছেন, 'এটা করলেন না কেন?' 'ওটা কেন হোল না?' ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ আর পাঁচটা নাটকের মতো দেখার পরই 'কুশীলব' ফুরিয়ে যাচ্ছে না, এ নাটক দর্শকদের ভাবাচ্ছে।............

একটা অনামী দলের পক্ষে একটা নাটককে অনেক মানুষের চোখ কানের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে যে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন তা আমাদের নেই, তবু চেষ্টা করে যাচ্ছি সাধ্যমতো, কারণ আমাদের বিশ্বাস, এ নাটক ভালো লাগার মতো নাটক।' ......এই নাটকটি কলকাতা ও কলকাতা বাইরে বহু রাত্রি অভিনীত হয়েছে এবং দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে পেয়েছে অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

'উত্তর দরবারী'র দ্বিতীয় নাটক 'অন্ধকারের আয়না'। নাট্যকারের নাম অমর গঙ্গোপাধ্যায়। সমাজের উচ্চাসনে বসে আছেন একদল মানুষ যাঁরা লোভের অঙ্ক বাড়াতে কোন রকম অপরাধ করতেই কুণ্ঠা বোধ করেন না, যাঁদের ঢালা বিষের জ্বালায় নীল হয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠছে সাধারণ মানুষ, তাঁদের আসল চেহারাকে সবার সামনে আরো বড়ো করে তুলে ধরতে হবে; এই বক্তব্যের পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে 'অন্ধকারের আয়না' নাটকটি।

সংস্থার আর একটি উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রযোজনা হোল 'আগ্নেয়গিরি'। জন স্টাইনবেকের 'দি মুন ইজ ডাউন'এর অনুপ্রেরণায় নাটকটি রচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাজী সাম্রাজ্যবাদের সমরাভিযানের পটভূমিকায় যে বক্তব্যটি নাটকের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে তা হোল, অত্যাচারী যতো শক্তিশালীই হোক অত্যাচারিতের সংহত শক্তির কাছে তাকে নতি স্বীকার করতেই হয়। আর একটি বিষয় আলোচিত এখানে,—যে যুদ্ধ কোনকালে কোন দেশেরই মঙ্গল আনে না, তা জীবনের যন্ত্রণাকেই শুধু বাড়িয়ে তোলে।

এই নাটকটি প্রথম অভিনয়ের পর বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিষদের গুণী বিচারক-মণ্ডলী যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তা সংস্থার শিল্পীরা আজো সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে থাকেন। এ'দের ধারণা সেদিনের প্রশংসা আর অভিনন্দনই 'আগ্নেয়গিরি' নাটককে আশাতীতভাবে ব্যাপ্তি দিয়েছে। এ নাটকটি বহুবার অভিনীত হয়ে 'উত্তর দরবারী'র খ্যাতিকে সুদৃঢ় করেছে নাট্যানুরাগীদের কাছে। কয়েকটি একাঙ্কিকাও এ'রা অভিনয় করেছেন—যেমন, 'রৌদ্রাভিসার', 'তুমি শুধু ছবি', 'ললিতকলা বিধো', 'ঠাকুর্দা', 'একদিন সন্ধ্যায়' 'বিয়াল্লিশের বেকুফ', 'গ্রন্থি' প্রভৃতি।

নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে, প্রয়োগ-শৈলীতে ও নাট্যচর্চার ব্যাপারে 'উত্তর দরবারী'র শিল্পীগোষ্ঠী আন্তরিকভাবে নীতিপরায়ণ। পরিপূর্ণ জীবনের নাটক নিয়েই এ'দের যা কিছু নাট্যপ্রচেষ্টা এবং এ'দের একমাত্র লক্ষ্য হোল বাঙলা নাটককে কিভাবে চিরন্তন শিল্পের আলোয় আভাসিত করে তোলা যায়। লাভের অঙ্কের কাছে শিল্পমূল্য কোনদিনই বিসর্জন দেওয়া চলবে না চরমতম ভাগ্যবিপর্যয়ের দিনেও, এ বিষয়ে সংস্থার শিল্পীরা সর্বদাই সচেতন। একজন সভ্য বেশ বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়েই বলেছেন—'সংস্থাকে রাখতে হোলে প্রথম শ্রেণীর সারিতে রাখার যোগ্যতায় রাখবো, নইলে এ পথ থেকে সরে যাবো, এই হোচ্ছে আমাদের কথা।'

বাঙলাদেশের নাট্যচর্চা যাতে একটি স্থায়ী রূপ নিতে পারে তার জন্য 'উত্তর দরবারী'র সভ্যরা যে সব ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার কথা ভেবেছেন তার মধ্যে অন্যতম হোল কলকাতায় একটি স্থায়ী মঞ্চস্থাপনা, যেখানে অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলো নিয়মিতভাবে তাদের নাট্যসম্ভার জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারে। উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্ক বা অন্য কোথাও মুক্ত অঙ্গনের মতো আরো একটি মঞ্চ এ'রা তৈরি করতে চান এবং এর জন্য সব রকম আন্দোলন করতেও এ'রা প্রস্তুত। এ ব্যাপারে 'উত্তর দরবারী'র সভ্যরা উত্তর কলকাতার সব নাট্যগোষ্ঠীরই সহযোগিতা চান। এ'রা আশা করেন প্রতিটি গোষ্ঠীর একজন করে সভ্য নিয়ে যদি একটি সুসংবদ্ধ অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলা যায় তাহোলে মঞ্চস্থাপনার ব্যাপারে সমস্ত প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত হবে নিশ্চয়ই।

—দিলীপ মৌলিক

অরণ্যের দিনরাত্রি ঃ সিমী ফটো ঃ অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

বাঙলা গল্পের হিন্দী রূপায়ণ

পরিচালক অজয় বিশ্বাস একদা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত উপন্যাস **'প্রথম প্রেম'-এর** বাঙলা চিত্ররূপ উপহার দিয়ে বাঙলা চলচ্চিত্রজগতে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন। সেই একই কাহিনী **'প্রথম প্রেম'-এর** অধিকতর জমকালো এবং রঙীন হিন্দী চিত্ররূপ **'সম্বন্ধ'** ভারতীয় দর্শক-সমাজে উপস্থাপিত করে তাঁর হিন্দী চল-চ্চিত্র জগতে প্রথম পদক্ষেপ সর্বজন স্বীকৃতিধন্য হয়ে অভিনন্দিত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বর্তমান হিন্দী চলচ্চিত্র জগতে **'সম্বন্ধ'** নানা কারণে অভিনব বলে বিবে-চিত হবে। প্রথমেই, এর কাহিনী মামুলি ছকে বাঁধা 'একটি ছেলে একটি মেয়েকে দেখামাত্র প্রেমে পড়ে গেল এবং মেয়েটি যতক্ষণ না তাকে আমল দিচ্ছে, ততক্ষণ সে নাছোড়বান্দার মতো তার পেছনে লেগে রইল'—এই ধরনের আরম্ভ, মধ্যে দুজন মিলে কাশ্মীরের বা সুইজারল্যাণ্ডের পার্বত্য প্রাকৃতিক পরিবেশে যুগল প্রেমের অভিব্যক্তিস্বরূপ নেচে গেয়ে পাগলামির চূড়ান্ত করা এবং শেষে উভয়ের প্রেমের পথে কাঁটাস্বরূপ এক ভীলেনের আবির্ভাব, নায়িকাকে নিয়ে তার অন্তর্ধান ও নায়কের সঙ্গে তার রিভলভার-ছোরা-ঘুষোঘুষি দ্বন্দ্বের পরে নায়িকার উদ্ধার—এই মামুলি ছকে বাঁধা নয়। তার পরিবর্তে আছে, এক-জন জমিদার সন্তানের ভাগ্যের হাতে ক্রীড়-নক হয়ে মা-বাপের কাছ থেকে সম্বন্ধচ্যুত হয়ে এক নিঃসন্তান দম্পতির স্নেহের পুতুলি হয়ে যৌবনে উপনীত হওয়া, পিতার সন্ধান পেয়েও তাঁর কাছে আত্ম-পরিচয় দিতে অক্ষম হওয়া, অতর্কিতে অসুস্থ মায়ের সন্ধান লাভ করেও তাঁকে বাঁচাতে না পারা এবং শেষ পর্যন্ত পালয়িত্রী মা নিজে সন্তানবতী হওয়ায় তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে বাপের বুকে ফিরে আসা। এই ঘটনাবহুল কাহিনীটিকেই চিত্রনাট্যকার পরিচালক অজয় বিশ্বাস 'ফ্ল্যাশ-ব্যাক' পদ্ধতির মারফত বিবৃত করতে গিয়ে ছবি-টিকে কুড়ি রীল দীর্ঘ করতে বাধ্য হয়েছেন সম্ভবত ছবিটিতে গানের সংখ্যা অন্ততঃ এগারো হওয়ার জন্যে এবং তারও মধ্যে তিনখানি গান সচরাচরের তুলনায় সুদীর্ঘ হওয়ায়। অথচ মজার কথা এই যে, ছবির দ্বিতীয় অভিনবত্ব হচ্ছে এর গানগুলিই। এগারোখানি গানের মধ্যে কোনোটিই রচনা ও সুরের দিক দিয়ে হাল্কা ধরনের নয়। প্রায় প্রতিটি গানই গভীরভাবপূর্ণ এবং বেশ কয়েকটি জীবনবেদনার অভিব্যক্তিতে ভরা। 'চলো একেলা' থেকে শুরু করে 'আনেবালা তো কভী লৌট কোন আয়েছে'। 'অব তো ইস দেশকো মাটী হৈ তেরী মাতা হৈ' পর্যন্ত প্রতিটি গানই প্রদীপের রচনার সঙ্গে ও, পি নায়ারের কৃত সুরের মিলনে অভিনব অন্তর-ছোঁয়া রূপ ধারণ করেছে। তৃতীয় অভিনবত্ব হচ্ছে, ছবিটিতে বর্তমান হিন্দী ছবিসুলভ ভাঁড়ামির লেশ মাত্র নেই। এক-মাত্র রাজগঞ্জের জমিদার বাড়ীতে দুটি জন-তার দৃশ্যে (এক, জমিদার পরিবারের বাড়ী ছেড়ে যাওয়া এবং দুই, ঐ জমিদারবাড়ীর দখলিকার হীরালালের কন্যা, নায়িকা সন্ধ্যার বিবাহরাত্রে গণ্ডগোল হওয়া) কিছু উত্তেজনা সৃষ্টি ছাড়া মূল কাহিনীর প্রায় সর্বত্র একটি আবেগময় বিষণ্ণতা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এবং সেই কারণেই চতুর্থ ও শেষ অভিনবত্ব স্বরূপ দেখা যায় যে, আলোচ্য ছবির অধিকাংশ শিল্পীই অযথা দাপাদাপি না করে সংযত ও ধীরভাবে গৃহীত ভূমিকা-গুলির রূপ দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। বলা যেতে পারে, ছবির সর্বাঙ্গে একটি বাঙলা ঢং পরিদৃশ্যমান। এবং এর জন্যে যা কিছু কৃতিত্ব, তা সর্বাংশে চিত্রনাট্যকার-পরিচালক অজয় বিশ্বাসের প্রাপ্য।

তাই বলে ছবিটি কি সম্পূর্ণ নির্দোষ? না, তা নয়। প্রথমেই ছবিটিতে গানের বাড়া-বাড়ির কথা বলেছি। "উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, জিধরভী দেখু মায়, অন্ধকার" গানটির মাধ্যমে চরিত্রটির মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই ভাবে মানসিকতা প্রকাশের প্রয়োজন ছিল কি? শেষের দীর্ঘ গানটির ভিতর দিয়ে যাত্রার ঢংয়ে পুত্র ও পিতার অতীত ইতিহাস ব্যক্ত করা কি চল-

চিত্ররীতিসম্মত? এছাড়া জমিদার উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় স্ত্রী ও পুত্রের স্মৃতিকে শুধু মনের মধ্যেই জীইয়ে রাখেন নি, তাদের সুবৃহৎ তৈলচিত্রও চোখের সামনে টাঙিয়ে রেখেছেন; অথচ তিনি নিজের ছেলেকে অপরের মুখ থেকে না শোনা পর্যন্ত চিনতে পারলেন না, এটা প্রায় অবিশ্বাস্যের পর্যায়ে পড়ে না কি?

আগেই বলেছি, ছবির প্রায় প্রতিটি শিল্পীই সংযত ও ধীরভাবে গৃহীত ভূমিকাটিকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছেন। তবে ওরই মধ্যে নায়ক মানব বেশে দেব মুখোপাধ্যায় ভাগ্যতাড়িত চরিত্রটিতে একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে সক্ষম হয়েছেন। নায়কের পিতা জমিদার উমাকান্ত-রূপে প্রদীপকুমার স্বাভাবিকভাবে একটি আভিজাত্যের প্রতিমূর্তি; নায়িকা সন্ধ্যার ভূমিকায় নবাগতা অঞ্জনা চরিত্রটির দরদী মনকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। একদা প্রেমার্থিনী এবং পরে ভগিনীস্থানীয়া আশা-রূপে বিজয়া চৌধুরী একটি শান্ত, সহানুভূতিশীলা নারীকে দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রথমে কুমারী শান্তি বসু, পরে মিসেস সেন বেশে অনীতা দত্ত অত্যন্ত সংযত অভিনয়ের মাধ্যমে গৃহীত চরিত্রটিকে চিত্রিত করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় সুলোচনা (নায়কের মা সুমতি), অচলা সচদেব (নায়কের পালিতা অনুপমা), অজিত ভট্টাচার্য (সংশীল), উল্লাস (হীরালাল), মনীষা (মানবের অন্যতমা প্রেমার্থিনী) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। দৃশ্যপটনির্মাণে সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন শিবশংকর। জে এস দিবাকরের সম্পাদনা ছবির টেম্পোকে সুন্দরভাবে বজায় রেখেছে; অবশ্য কয়েকটি গানের মধ্যে অতীতের ঘটনাসূচক দৃশ্যের সেগুলি দর্শকদের পরিতৃপ্তি নয়। অনুপ্রবেশ চমৎকারিত্বের পরিচায়ক হলেও নিরর্থক। ছবির পরিচয়লিপি সূচক লাল রঙে লিখিত হয়ে ঘন সবুজ বা অন্য গাঢ় বর্ণের পট-ভূমিকায় মুদ্রিত হওয়ায় দর্শক-দৃষ্টিকে আহত করেছে।

প্রতিবাদ/বিশ্বজিৎ এবং মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়।

এস মুখার্জি ফিল্ম সিন্ডিকেট প্রোডাকসান নিবেদিত চিত্রাঙ্গদা পরিবেশিত এবং অজয় বিশ্বাস পরিচালিত 'সম্বন্ধ' বহু অভিনবত্বে ভরা ও গানসমৃদ্ধ হয়ে দর্শকদের প্রীতি আকর্ষণ করবে।

আধুনিক হিন্দী ছবির ঢংয়ে অসমীয়া কাহিনীচিত্র

নেচে গেয়ে বিড়ি ফিরি করে বেড়ায়, এমন একটি লোকের রূপবতী কন্যা বিজলী; সেও রাস্তায় রাস্তায় নেচে গেয়েই লোকের মন হরণ করে। এমন বিজলী সত্রীয়া নৃত্যকলা মন্দিরে যোগদান করে প্রথমে করল নৃত্যশিক্ষা এবং পরে হল নৃত্যশিক্ষয়িত্রী। বিড়ির ফিরিওলার রাস্তায় নাচুনী মেয়ে যে-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষয়িত্রী, সেখানে গৃহস্থঘরের মায়েরা তাঁদের মেয়ে পাঠাতে গররাজি হলেন। ফলে সত্রীয়া নৃত্যকলা মন্দিরের দরজা বন্ধ হল। এই সুযোগে বিখ্যাত বিড়ি-ব্যবসায়ী কেশ মহাজন তাঁর প্রধান অনুচর বনমালীর সহায়তায় বিজলীকে তাঁর 'লক্ষ্মীরাজ বিড়ি'র প্রচারকার্য চালাবার জন্যে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু কেশ মহাজনের ত' ঐ একটিই ব্যবসা নয়; সুড়ঙ্গপথে তাঁর অনেক ব্যবসা চলে। তাই আশ্রয় দেবার নাম করে তিনি বিজলীকে এনে তুললেন এক বাইজীবাড়ীতে। সরলা বিজলী যখন ব্যাপারটা বুঝল, তখন সে পালাল সেখান থেকে হরজিৎ সিংয়ের মোটর গেরাজে, যেখানে কাজ করে তার প্রণয়ী প্রশান্ত বড়ুয়া। স্বাধীনচেতা প্রশান্তকে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ভালবাসে। ওরা সবাই মিলে করে ওদের বিয়ের ব্যবস্থা। বধূবেশে সজ্জিতা হয়েছে বিজলী। প্রশান্তও বরবেশে বিবাহযাত্রার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু তাই কি হয়? কেশ মহাজন ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর বনমালী কি এই বিবাহের নীরব দ্রষ্টা হয়ে থাকতে পারেন? তাই এই বিবাহে পড়ল বাধা। বিজলী হল নিরুদ্দেশ। প্রশান্তকে ছুটতে হল তার সন্ধানে। শেষ পর্যন্ত কেমন করে বিজলীর সন্ধান পাওয়া গেল এবং দুর্বৃত্তরা

অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত 'অপরাজিতা' ছবির সংগীত গ্রহণ অনুষ্ঠানে গীতিকার সুনীলবরণ, সুরকার সুকুমার মিত্র, শিল্পী মান্না দে এবং নির্মলা মিশ্র।

ধরা পড়ল, তারই উত্তেজনাপূর্ণ অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে ছবির শেষাংশে।

—নাচে-গানে, রোমান্সে ও সাস্পেন্সে ভরা এই কাহিনীর 'চিকমিক বিজুলী' নামে অসমীয়া চলচ্চিত্র রূপ দিয়েছেন রাজশ্রী প্রোডাকসন্স ও কামরূপ চিত্র যুগ্মভাবে। অসমীয় ভাষায় এ ধরনের আধুনিক হিন্দী ছবিঘেঁষা ছবি এর আগে কখনও হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এবং সেদিক দিয়ে ছবিখানির অভিনবত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু তবু বলব, আমরা ছবির কাহিনীকার, সঙ্গীতরচয়িতা, সুরস্রষ্টা ও পরিচালক ভূপেন হাজারিকার কাছে খাঁটী অসমীয় সমাজের, অসমীয় জনজীবনের নাট্যরসে ভরা চলচ্চিত্র দেখতে চাই। 'চিকমিক বিজুলী'র নাট্যকাহিনী পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় যে-কোনো সময়ে ঘটতে পারে।

নায়িকা বিজলীর ভূমিকায় বিদ্যা রাও নাচে, গানে, অভিনয়ে রীতিমত বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। নায়ক প্রশান্ত বেশে বিজয় শংকর অত্যন্ত সংযত অভিনয়ের মধ্যে চরিত্রটিকে চিত্রিত করেছেন। 'ভাইটি'র মা আজলী রূপে শর্মিতা বিশ্বাস অত্যন্ত দরদী অভিনয়ের নিদর্শন রেখেছেন। বাইজীর ছোট্ট ভূমিকাটিতে রমা গুহঠাকুরতার নাট্যনৈপুণ্য লক্ষণীয়। কেশ মহাজন ও তার দক্ষিণ হস্ত বনমালী রূপে যথাক্রমে শশাংক ও কুলদা চরিত্রগত খলতাকে সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। পানওয়ালার চরিত্রে জহর রায় নিজেকে জাহির করতে কসুর করেন নি। অপরাপর ভূমিকার মধ্যে ভাইটির চরিত্র সু-অভিনীত।

কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। বিদ্যা রাওয়ের ক্লোজ-আপগুলি ক্যামেরাম্যানের দক্ষতার নিদর্শন। ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণীয় অংশ হচ্ছে এর গানগুলি। পথে পক্ষীরাজ-ঘোড়ার মাঝে রূপকমরা ও বিজলীর নৃত্যগীত দর্শকবৃন্দের বিশেষ উপভোগ্য।

নৃত্যগীতবহুল 'চিকমিক বিজুলী' অসমীয়া চলচ্চিত্ররসিকদের প্রশংসা লাভ করবে।

দুঃসাহসিক চন্দ্রাভিযানের নাটকীয় দলিল

না দারা সিংয়ের 'চাঁদ পড় চড়াই' নয়, পৃথিবীর মানুষের চন্দ্রলোকে ঐতিহাসিক পদক্ষেপের জীবন্ত নাটকীয় দলিল হচ্ছে বর্তমানে গ্লোবে প্রদর্শিত টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স নিবেদিত 'ফুট প্রিন্টস অন দি মুন—অ্যাপোলো-১১' পূর্ণদৈর্ঘ চিত্রখানি। ১৯৬৯-এর ১৬ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত নীল আর্মস্টং, এডউইন অ্যালড্রিন এবং মাইকেল কোলিন্স — এই ত্রয়ী মহাকাশচারীকে নিয়ে অ্যাপোলো-১১-র সাফল্যমণ্ডিত চন্দ্রাভিযান পর্বটি পৃথিবীর

বিসর্জনে জয়সিংহের চরিত্রে ইন্দ্রজিৎ
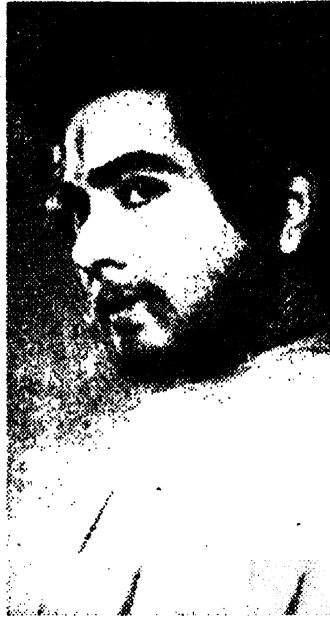
পৃষ্ঠদেশ ত্যাগ থেকে শুরু করে চন্দ্রলোকের কাছে গিয়ে প্রথম দুজনকে নিয়ে লুনার মডিউল-এর মূল স্পেস-শিপ থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া এবং ধীরে ধীরে চন্দ্রপৃষ্ঠে ২১ জুলাই তারিখে পৌঁছুনো, ওদের চন্দ্রপৃষ্ঠে মডিউল থেকে অবতরণ, সেখানে কিছু পাদচারণার পরে ধাতুনির্মিত স্মারক শিলান্যাস, পতাকা প্রোথিতকরণ এবং ওখানকার ধূলা, পাথর সংগ্রহ প্রভৃতি অন্তে মডিউলের চন্দ্রপৃষ্ঠ ত্যাগ, পরে মূল স্পেস-শিপের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং ২৪ জুলাই প্রশান্ত মহাসাগরে মহাকাশচারীদের অবতরণ—এ সমস্ত ঘটনাই ছবিটিতে উপযুক্ত ভাষণসহ দেখানো হয়েছে। তার সঙ্গে পৃথিবীর বুকে এই অভিযান সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের প্রতিটি সেকেন্ডের কার্যকলাপ, উৎসাহী দর্শকদের কেপ-কেনেডিতে সম্মিলিত হওয়া প্রভৃতি ব্যাপারকে যুক্ত করে বাস্তব দলিলটিকে যথাসম্ভব উত্তেজনা ও কৌতূহলোদ্দীপক করা হয়েছে। ব্যারী কো প্রযোজিত এবং বিল গিবসন পরিচালিত এই দলিল চিত্রটি পঁচাত্তর বছর আগে জুলেস ভার্ণে চন্দ্রলোক অভিযান সম্পর্কে যে আশ্চর্য কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। আলাবামা হান্সভিলের জর্জ সি মার্শাল স্পেস ফ্লাইট কেন্দ্রের পরিচালক ওয়ার্নহার ভন ব্রান নিজে এই ছবিটির বিভিন্ন পর্বে উপযোগী ভাষণ দিয়ে ছবিটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

স্টুডিও থেকে

শ্রীমতী সুপর্ণা সেন প্রযোজিত ও পীযূষ বসু পরিচালিত এস এস ফিল্মের 'দুটি মন' ছবির জন্যে গোমিয়া, তোপচাঁচি ও বোকারো প্রভৃতি স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশে বহু বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এই বহির্দৃশ্য গ্রহণের সময়ে শিল্পী ছিলেন—উত্তমকুমার (দ্বৈত ভূমিকায়) ও সুপর্ণা সেন। ছবিটির সংগীত পরিচালক হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের সুরে 'দুটি মন' ছবির কয়েকটি গানও রেকর্ড করা হয়েছে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গানগুলি গেয়েছেন—আরতি মুখোপাধ্যায় ও সুরকার হেমন্তকুমার স্বয়ং।

'দুটি মন' ছবির চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়। ছবিটির অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করছেন—ছায়া দেবী, অসিতবরণ, পদ্মাদেবী, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, সুখেন দাস, শ্যামল ঘোষাল, মিহির ভট্টাচার্য, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, শৈলেন গাঙ্গুলী, ও মাঃ পার্থ।

অপ্সরা ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

'পান্না হীরে চুণী' খ্যাত পরিচালক অমল দত্তের বর্তমান চিত্রাভিযান 'আবিরে রাঙানো'। মধু বন্দ্যোপাধ্যায় কাহিনীকার। নাটক, নাট্যকার ও নাটুকের দলের পটভূমিকায় এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। প্রগতি চিত্রমের পতাকাতলে ছবিটি তৈরী হবে। গত ৮ নভেম্বর ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে প্রথম পর্যায়ে সংগীত গ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। সংগীতে পরিচালক সত্যদেব চট্টোপাধ্যায় কণ্ঠদান করেছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, পিন্টু ভট্টাচার্য, সুক্রাতা মুখার্জি, মৃণাল ব্যানার্জি, লীনা মজুমদার এবং আরোও অনেকে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগীত গ্রহণ এ মাসের শেষের দিকে সম্ভবতঃ শিল্পী মান্না দে, ললিতা ধরচৌধুরী ও আশা মৈত্র। এ মাস থেকে চিত্র গ্রহণ সুরু হবে। অভিনয়ে অংশ নেবেন সুচন্দ্রা পাল, অনিল মুখার্জি, দিলীপ গোস্বামী, রঞ্জনী গুপ্তা, সলিল ঘোষ, সৌমিত্র পাল, শ্রদ্ধানন্দ ব্যানার্জি, দেবপ্রসাদ কুণ্ডু, সুপ্তি, মালা চক্রবর্তী ও দীপক চ্যাটার্জি প্রভৃতি নতুন শিল্পীরা। কলাকুশলীদের মধ্যে আছেন আলোকচিত্র শিল্পী সুবোধ ব্যানার্জি, সম্পাদক রমেশ যোশী, শিল্প নির্দেশক গৌর পোদ্দার ও রূপসজ্জাকর দুর্গা চ্যাটার্জি।

অদ্বিতীয়া-খ্যাত প্রযোজক অরুণ রায়চৌধুরীর প্রযোজনায় এ-আর-সি প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় ছবি 'রূপসী'র চিত্রগ্রহণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কয়েক মাস বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শেষ হওয়ার পরে গেল সপ্তাহ থেকে একটানা কাজ শুরু হয়েছে নিউ থিয়েটার্স ২নং স্টুডিওতে। বহির্দৃশ্য প্রধান গীতিবহুল 'রূপসী'র কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা এবং পরিচালনা করছেন অজিত গাঙ্গুলী। অনিল বাগচীর সুরে ইন্দ্রজাল রচনা করবে এই ছবির

স্মুর, কবির লড়াই, ভাটিয়ালী এবং অন্য সব গানই। চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছেন রামানন্দ সেনগুপ্ত। ছবির প্রধান চরিত্র-চিত্রণে আছেন—সন্ধ্যা রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ, অনুভা ঘোষ, সুলতা চৌধুরী, তপেন চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, জহর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুতপা চক্রবর্তী, অরুণ চৌধুরী। এন এ ফিল্মস ছবিটির পরিবেশন স্বত্ব গ্রহণ করেছেন।

বোম্বাই থেকে

সর্বজনবিদিতা ওয়াহিদা রেহমানের হাতেও এখন বেশ কয়েকটি ছবি। রঘুনাথ জালানী পরিচালিত 'মন কি আঁখে' (নায়ক ধর্মেন্দ্র), অসিত সেন পরিচালিত 'খামোশী' বিমল রাওয়েল পরিচালিত রাওয়েল ইন্টার-ন্যাশনালের প্রথম ছবি (নায়ক শশীকাপুর) প্রভৃতি। সায়রা বানুকে এবার দেখবেন একটি ধীবর কন্যার ভূমিকায়। তার বিপরীতে থাকছেন শশীকাপুর। শশীর বাবার ভূমিকায় তাঁর নিজের বাবা পৃথ্বীরাজ কাপুরও থাকছেন। ছবিটির এখনও নাম-করণ হয় নি, তবে তুলছেন মান্ডক্ক পিকচার্স। দীর্ঘদিন পরে আবার কমল অমরোহীর ছবি 'পাকীজার' শ্যুটিং শুরু হয়েছে মীনাকুমারীকে নিয়ে। মীনাকুমারীর সঙ্গে অমরোহী সাহেবের বিবাহ-বিচ্ছেদের পর বেশ কয়েক বছর 'পাকীজার' চিত্রগ্রহণ বন্ধ ছিল। [illegible] ছবি শেষ করে দিতে রাজী হয়েছেন। ইতিমধ্যেই [illegible] শ্যুটিং সেরে ফেলেছেন। সম্প্রতি তিনি বোম্বাই-এ [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] নিয়ে একটি [illegible] চিত্রায়িত করেছেন। [illegible] এই [illegible] সুরারোপ করেছেন রাহুল দেব বর্মণ। সেদিন নরেন [illegible] দেখলাম দশদিন ধরে [illegible] শ্যুটিং করছেন শ্রীসাউন্ড স্টুডিওতে। একটি গানে অংশগ্রহণ করতে দেখলাম নায়ক-নায়িকারূপে সঞ্জয় ও নূতনকে। নটরাজ স্টুডিওতে শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে দেখলাম সুনীল দত্তকে এবং [illegible]। তাঁরা 'পিয়াসী শাম' ছবিতে অভিনয় করছেন অমরজিতের পরিচালনায়। শাম্মী কাপুরের সঙ্গে এবারে দেখবেন সাধনাকে পিতৃক ফিল্মের 'ছোটে সরকার' ছবিতে। ... 'প্যার' দিয়ে যে কত ছবি হল তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এই তো সেদিন 'প্যার কী রাহেঁ' মুক্তিলাভ করল এর আগে হয়েছে 'প্যার কিয়া তো ডরনা ক্যায়' 'প্যার মহব্বৎ', 'প্যার কি বাজী' ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন হচ্ছে 'প্যার হি প্যার' ধর্মেন্দ্র এবং বৈজয়ন্তীমালাকে নিয়ে। 'প্যার'-এর আর বাকী থাকল কি?

অনেক অভিনেতা বা অভিনেত্রী আছেন যাঁরা একশোটি বা তারও বেশী ছবিতে অভিনয় করেছেন কিন্তু একশোটি ছবিতে সুর দেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ফুরিয়ে যান নি এমন লোক বোধহয় একমাত্র একটিই নজরে

এখানে 'পিঞ্জর'-এর সেটে নায়িকা অপর্ণা সেনকে নির্দেশ দিচ্ছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়

পড়ছে। তাঁরা হলেন শঙ্কর জয়কিষণ জুটি। তাঁরা বরাবরই দ্বৈতভাবে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। সম্প্রতি তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্যের ফলে তাঁদের আর একসঙ্গে কাজ করতে দেখা যায় না—কোন ছবিতে সুর দেন শঙ্কর, কোন ছবিতে জয়কিষেণ, যদিও সুরকার হিসেবে নাম থাকে শঙ্কর জয়কিষেণ জুটির। দুজনের নামের যে 'বক্স অফিস'—সেটা বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁরা—এটাই তাঁদের ব্যবসায়িক বুদ্ধির চূড়ান্ত নিদর্শন। যাই হোক, তাঁদের শততম ছবি হল 'চন্দা ঔর বিজলী'। এঁদের প্রথম ছবি 'বরসাত' মুক্তি পায় ১৯৪৯ সালে। এই ২০ বছরে তাঁদের ছবিগুলির মধ্যে ৩৫টি ছবির রজত-জয়ন্তী, একখানির সুবর্ণ-জয়ন্তী এবং দুখানির হীরক-জয়ন্তী হয়েছে এবং ৫৯ খানি ছবি শততম দিবসের গৌরব অর্জন করেছে। তাঁদের কয়েকখানি নামকরা ছবির উল্লেখ করছি — বরসাত, আওয়ারা, দাগ, শ্রী ৪২০, জিস দেশমে গঙ্গা বহতে হ্যায়, শশুরাল, জংলী, দিল এক মন্দির, সঙ্গম, আর্জু, তিসরী কসম, ইভনিং ইন প্যারিস, ব্রহ্মচারী, চন্দনা ঔর বিজলী, প্রিন্স ইয়াকীন, তুমসে আচ্ছা কৌন হ্যায় প্রভৃতি। শেষ চারখানি এখন বোম্বায়ে চলছে। হ্যাঁ, আর একটা খবর। শঙ্কর-জয়কিষেণ এবার একটি তেলেগু ছবিতে সুর দেবেন। এতে কণ্ঠ দেবেন শারদা আর ছবিটি পরিচালনা করবেন এস সি রাও।

এর আগের বারে আপনাদের জানিয়েছি যে, প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী মহম্মদ রফী গ্রামোফোন কোম্পানীতে দুখানি ইংরাজী গান রেকর্ড করেছেন এবারে আর একটি খবর দিচ্ছি। সেটি হল আর একজন বিখ্যাত বাঙালী কণ্ঠশিল্পী মান্না দে হিন্দী সঙ্গীত জগতে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, এবার সে খ্যাতি আরও সুদূরবিস্তৃত হল তেলেগু চিত্রজগতে। তিনি এবার 'রাগা দেবদূতে' নামক একটি ছবিতে কণ্ঠদান করেছেন। শ্রী দে বলেন যে, তেলেগু ভাষা আয়ত্ত করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। এর আগে লতা এবং আশা ভোঁসলে বাংলা গান গেয়েছেন, সায়গলের বাংলা গানের কথাও আপনারা ভুলে যান নি আশা করি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভাব এবং নিষ্ঠা থাকলে ভাষাটা একটা প্রতিবন্ধকই নয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি তরুণ অভিনেতার কথা মনে পড়ল, তিনি একসঙ্গে চারখানি ছবি করছেন চারটি ভাষায়। ছবিগুলির নাম হল রাজকুমার (হিন্দী), দেবদাস (কানাড়ী), মুলোকি মাগাড়ু পান্দু পেন্নাম (তেলেগু) এবং আর একটি তামিল ছবি।

বাংলাদেশের মেয়ে সন্ধ্যা রায় এসেছেন বোম্বায়ে 'জানে অনজানে' ছবিতে অভিনয়ের জন্যে। শক্তি সামন্তের ছবি, নায়িকা দুজন—সন্ধ্যা রয় এবং লীনা চন্দ্রাভারকার। নায়ক হলেন শাম্মী কাপুর।

—প্রবাসী

পথিকের ম্যাক্সিম গোর্কীর মা

মঞ্চাভিনয়

নাট্যামোদী রসিক সুধীজনের কাছে আজ কেবল একটি নামই উচ্চারিত—'পথিক' প্রযোজিত ম্যাকসিম গোর্কির 'মা'। এ্যাবসার্ড, কিমিতিবাদী, বিপ্রতীপ ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য গালভরা বুলি আওড়িয়ে মুখোশের আড়ালে নাট্য আন্দোলনের নামে ব্যাভিচার করতে 'পথিক' মোটেই অভ্যস্থ নয় তাই গোর্কি উপন্যাসের এমন সার্থক ন্যাট্যরূপ ও তার সুষ্ঠু উপস্থাপনা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে দিকে দিকে। নির্দিষ্ট কোন দেশ বা কালের বিচারে নাটকটিকে সীমাবদ্ধ না রেখে বিশ্বের সর্বহারা মেহনতী মানুষের কষ্টার্জিত শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের সূক্ষ্ম ভাবাদর্শ এখানে বর্তমান। গোর্কি এখানে উপেক্ষিত নন বরং পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আর তাই নাট্যরূপ দাতা বিষ্ণু চক্রবর্তীর শ্রম সার্থক। এছাড়া 'পথিক' শিল্পী সদস্যবৃন্দের ঐকান্তিক অভিনয় নিষ্ঠা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এক পরম সম্পদ। শহরের চৌহদ্দি পেরিয়ে গ্রামে-গ্রামান্তরে 'পথিক' পথ পরিক্রমায় ব্রতী হয়েছে। শিল্প সত্ত্বা ও শিল্প সৃষ্টির তাগিদে প্রতিটি সভ্য-সভ্যা সক্রিয় বলেই অভিনীত চরিত্রগুলি দর্শক-মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে। সমগ্র প্রযোজনাটি হয়ে উঠেছে বাস্তবিক শিল্পসম্মত। এজন্য সর্বাগ্রে ধন্যবাদার্হ হলেন নির্দেশক জ্যোতিপ্রকাশ। যুক্তিসম্মত চরিত্র বিশ্লেষণ, অভিনয় রীতি, সামগ্রিক আঙ্গিকের মার্জিত প্রয়োগ এমনই দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন যা অনেকের কাছে কল্পনাতীত। তাই বোধ হয় 'পথিক'এর পথ চলায় কোন ছেদ নেই, ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। একটির পর একটি অভিনয় রজনী অতিক্রান্ত হচ্ছে আর এঁদের খ্যাতির সীমারেখা বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হচ্ছে। 'পথিক'-এর 'মা' স্বল্পকালের মধ্যেই যে গৌরবের শীর্ষস্থানে পৌঁছবে এই আশা রাখি। জ্যোতিপ্রকাশের নির্দেশনায় এঁদের বর্তমান অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন সর্বশ্রী জয়ন্ত মতিলাল, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল সুর, সনৎ বসু, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোশ মজুমদার, সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়, প্রণব বল, কামাখ্যা ঘোষ, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপম বাগ্চী, মণি মানী, পঙ্কজ গাঙ্গুলী, শ্যামাসত্য মুখোপাধ্যায়, কান্তিময় রায়চৌধুরী, কল্যাণ কর্মকার, অশোক চট্টোপাধ্যায়, রুমা গোস্বামী, শিবানী ভট্টাচার্য ও রেবা রায়চৌধুরী।

•

শহীদ মিনারের নীচে একটি মুখর উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। উপলক্ষ্য, শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং তাঁদের অনুসৃত পথকে একমাত্র আদর্শ বলে গ্রহণ করার বলিষ্ঠ সংকল্প নেওয়া। অনুষ্ঠান কিছুটা এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ শহীদস্তম্ভ থেকে তিনজন শহীদ উঠে এলেন; ঘোষণা করলেন মৃত্যু তাঁদের হয় নি, কেন না যে জীবনের জন্য তাঁরা জীবন দিয়েছেন সে জীবন আজো আসে নি, তাই তাঁরা আবার জনতার সংগ্রামের তালে পদক্ষেপ মিশিয়ে দিতে চাইছেন। সবাই তো বিস্ময়ের অতলে নির্বাক, মৃত তিনজন দেশপ্রেমিক কি করে আবার জীবনের আলোয় ফিরে এলো। দেশের সর্বত্র এই আকস্মিক ঘটনার কথা ছড়িয়ে গেলো, নানা জটিলতা সুরু হোল এই সূত্রে। দেশের মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ কমিশনার, মেয়র এসে শহীদদের ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু কোন ফল হোল না, শহীদদের নিকটতম আত্মীয়ের অনুরোধও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোল। বাইরে অপেক্ষমান ক্ষুব্ধ জনতা শেষ পর্যন্ত প্রচন্ড আবেগে শহীদদের কাছে ছুটে এলো। শহীদরা নেমে এলেন একটি ধাপ। এগিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম পেলো সীমাহীন ব্যাপ্তি।

নাটকের নাম 'স্মৃতি থেকে'। আরউইন শ'র 'বেরি দি ডেড' অবলম্বনে নাটকটি রচনা করেছেন কুমার রায়। সম্প্রতি প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী 'রূপচক্রে'র শিল্পীরা 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে এই নাটকটি পরিবেশন করেছেন। যেসব নাটক এঁরা আগে মঞ্চস্থ করেছেন, তা থেকে 'স্মৃতি থেকে'র স্বাতন্ত্র বিষয়বস্তু ও প্রয়োগ-পরিকল্পনায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রচলিত বিশ্বাস আর চিন্তায় নাটকটি যে নিদারুণভাবে আঘাত হেনেছে একথা অস্বীকার করা যায় না। এদিক থেকে একে অ্যাবসার্ড নাটকের পর্যায়ে রাখলে বোধ হয় খুব একটা অযৌক্তিক হবে না। কয়েকটি জোনে মঞ্চটিকে ভাগ করা হয়েছে এবং আলোকসম্পাতের কৌশলে বিভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা। বলতে দ্বিধা নেই, আলোকনিয়ন্ত্রণ শিল্পীর ভীষণ রকম শৈথিল্য নাটকের দুর্দান্ত গতিকে প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিহত করেছে। নাটকটিকে সুপ্রযোজিত করতে গেলে এ ব্যাপারে নাট্য নির্দেশকের আরো অনেক বেশী সচেতনতার প্রয়োজন আছে। অভিনয়ের দিক থেকে নিশিকান্ত ঘোষ (পুলিশ কমিশনার), অবন্তীপ্রসাদ (স্বরাজ) অসাধারণ নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় রাখতে পেরেছেন; মমতা চ্যাটার্জির 'ইন্দু'ও একটি সংযত চরিত্রচিত্রণ। মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকায় রতন দেকেও ভালো লেগেছে। তিনজন শহীদের চরিত্রে গৌরকিশোর ভদ্র, প্রতাপ ব্যানার্জি, জয়ন্ত দে'র অভিনয় প্রত্যাশিত সফলতায় পৌঁছতে পারে নি। অন্য কয়েকটি চরিত্রে ছিলেন সন্তোষ পণ্ডিত, অজিত আঢ্য, কান্তি বসাক, প্রণব শেঠ, সঞ্জয় দত্ত, মাধব চট্টোপাধ্যায়, রামদাস চক্রবর্তী, কুমারী বুলা। শেষ দৃশ্যের কম্পোসিশনে নির্দেশক গৌরকৃষ্ণ ভদ্রের শিল্পবোধের স্বাক্ষর আছে।

পশ্চিমবঙ্গ আয়কর বিভাগের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা সম্প্রতি মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটকটি রঙমহলের মঞ্চে সার্থকতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। শ্রীখগেন চক্রবর্তীর নির্দেশনায় নাট্যপ্রযোজনাটি মোটামুটি দর্শকদের তৃপ্তি দিতে পেরেছে। কয়েকজন ছাড়া প্রায় প্রত্যেক শিল্পীই চরিত্রচিত্রণে সফল হয়েছেন বলে মনে হয়। বিশেষ করে অমর রায় (কংস), কনক পাল (বিদূরথ), মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী (কঙ্কন), বিমল ব্যানার্জী (বসুদেব), কুমারী শুক্লা (কীর্তিমান), তৃপ্তি দাস (চন্দনা), মিত্রা দাশগুপ্তা (দেবকী) অভিনয়ে তাঁদের স্বকীয় নৈপুণ্যের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। অন্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন নিরঞ্জন মুখার্জী, খগেন চক্রবর্তী, হরিপদ চক্রবর্তী, দেবেন দাস, সরোজ দাস, প্রেমানন্দ দাস, সুধীর নন্দী, হরিপদ চক্রবর্তী, জীবন দে, মণি দে, আশা বোস, এস বন্দোপাধ্যায়।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' একটি অতিপরিচিত মঞ্চসফল নাটক। ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় আজকাল হয় না বললেই চলে, কিন্তু মাঝে মাঝে অফিস নাট্যসংস্থার শিল্পীরা এই সব নাটকের প্রতি আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সম্প্রতি কলকাতা ল্যান্ড অ্যাকুইজিসন অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা রঙমহলের মঞ্চে 'আলমগীর' ও 'উদিপুরী' চরিত্র দুটিতে প্রাণ দিয়ে আমাদের বিস্মিত করেছেন। 'আলমগীর' ও 'উদিপুরী' চরিত্র দুটিতে অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন [illegible] ঘোষ ও [illegible]। বসু মল্লিকের 'দিলীরখান', অনিল দত্তের রাজসিংহ ও [illegible] তিনটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র-চিত্রণ। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন সমীর ব্যানার্জী, শিবানী [illegible], [illegible] ব্যানার্জী, নির্মল মিত্র, নির্মল গাঙ্গুলী, নিরঞ্জন সরস্বতী, সমীরণ চ্যাটার্জী, নির্মল চ্যাটার্জী, স্বপন চক্রবর্তী, সুকুমার ঘোষ। নাট্যপরিচালনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বহন করেন শৈলেন গুহ নিয়োগী।

প্রিমরোজ মিউজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্লাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত একাঙ্ক নাট্যপ্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী নির্বাচিত হয়েছে 'যান্ত্রিক গোষ্ঠী' ([illegible] মেলায়)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে শ্রীরঙ্গম (দিনান্তে), লোকরঞ্জন (সমাধানে)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ১ম পবিত্র চ্যাটার্জী (শ্রীরঙ্গম); ২য়—রতন গাঙ্গুলী (সান্ধ্য মজলিস); শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা : সুব্রত সান্যাল (যান্ত্রিক), পবিত্র ব্যানার্জী (লোকরঞ্জন); শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী—সবিতা দাস (বলাকা); শ্রেষ্ঠ পরিচালনা : ১ম—ভবেশ চক্রবর্তী (বলাকা), ২য়—নিখিল ভট্টাচার্য (যান্ত্রিক)। বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন মঞ্জু গাঙ্গুলী ও শ্রীমান চাটু।

মঞ্চাভিনেতা কাশীনাথ

লক্ষ্ণৌ বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত সপ্তম বার্ষিক সর্বভারতীয় প্রকাশ স্মৃতি পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতা আগামী ১৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ক্লাবের অতুল নাট্যমঞ্চে। উৎসাহী সংস্থারা অনুসন্ধানের জন্য ২০, শিবাজী মার্গ, লক্ষ্ণৌ—১ ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

বেহালা যুব সংগঠন পরিচালিত সপ্তম বার্ষিক অনুষ্ঠান ও নিখিল বঙ্গ একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা ১৪ থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নাম দেবার শেষ তারিখ ১৭ নভেম্বর, যোগাযোগের ঠিকানা—১৯৬, [illegible] চ্যাটার্জি রোড, বেহালা, কলিকাতা-৬১।

পাটনার শিল্পী সমিতি গত বছরের মত এবছরেও বড়দিনে সাতদিনব্যাপী এক [illegible] নাট্য-প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। উৎসাহী সংস্থারা আরপ্রকাশ হাউস, [illegible], পাটনা—এক ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

কলকাতা জেলার দশদিনব্যাপী উৎসবের শেষদিন ছিল গত ২৩ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার। ঐদিন মহাজাতি সদনে ভারতীয় শিল্পী পরিষদ মঞ্চস্থ করলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কৃত নৃত্যনাট্য 'শ্রীচৈতন্য'। ভারতের পর্যটনমন্ত্রী ডঃ করণ সিং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মুগ্ধবিস্ময়ে তিনি সেদিন 'শ্রীচৈতন্য' আগাগোড়া দেখেছেন। বিশেষ করে গয়ায় নিমাই-এর ভগবৎ-চেতনা প্রাপ্তির দৃশ্যটিতে তিনি বিশেষভাবে অভিভূত হয়েছেন বলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। অভিনয়শেষে শিল্পীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

'শিলায়ন' নাট্য সংস্থার 'স্বর্গ কি হবে না কেনা' নাটকটি গেল ২৫ অক্টোবর বিশ্বরূপায় বেশ সফলতার সঙ্গে মঞ্চস্থ হল। একাধারে নাট্যকার-পরিচালক-অভিনেতা শ্রীভবেশ চক্রবর্তীর পরিচালনা প্রশংসার দাবী রাখে। তবে অভিনয়ে শ্রীচক্রবর্তী সাধারণ স্তরের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন, তাঁরা হলেন সর্বশ্রী চিত্ত মুখোপাধ্যায় (সুমন), নবকুমার দাস (দুর্লভ), শাশ্বতী রায় (লাবণ্য) ও পুতুল চক্রবর্তী (বিচিত্রিতা)। এছাড়া জ্ঞানেন্দ্র লাহিড়ী, পরেশ সাহা, হরিদাস মজুমদার ও কল্যাণ রায়ও সু-অভিনয় করেছেন। আলোকসম্পাত এবং শব্দসংযোজনা প্রশংসা করবার মতো।

গত ২৩ ও ২৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় ইউনাইটেড ক্লাবের (মনীন্দ্রনগর কলোনী, মুর্শিদাবাদ) বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন তিনটি নাট্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। প্রথম দিন নির্মল সান্যাল রচিত 'এক সূর্য অনেক রঙ' ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'ভাড়াটে চাই' সাফল্যের সঙ্গে

দীনেন গুপ্ত পরিচালিত প্রথম প্রতিশ্রুতি কাজল গুপ্ত এবং নবাগতা সীমন্তী গুপ্ত।
ফটো ঃ অমৃত।

অভিনীত হয়। দ্বিতীয় দিন অভিনীত হয় 'কাঞ্চনরঙ্গ'। নাটকগুলির বিভিন্ন চরিত্রে অমল গুপ্ত, সত্যেন বাগচি, জিতেন দত্ত, দুর্গা দেওয়ানজী, শুভেন্দু মজুমদার মধুসূদন কর্মকার, পংকজ গোস্বামী, মিনতি চন্দ, বিমল চক্রবর্তী, চিত্ত চন্দ, স্মৃতিকণা চক্রবর্তী বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তিনটি নাটকের পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করেন সমর ভট্টাচার্য। আলোকসম্পাতে ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন জহুর নন্দী ও চিত্ত চন্দ।

শারদোৎসব উপলক্ষে গোরক্ষপুরের বাঙালী সমিতি দুটি বাংলা নাটক—কিরণ মৈত্রের 'তৃষ্ণা' ও সলিল সেনের 'স্বীকৃতি' মঞ্চস্থ করে।

'তৃষ্ণা'র অভিনয়ে নায়িকা কমলার ভূমিকায় পরিচালিকা-অভিনেত্রী অপর্ণা ভট্টাচার্য অপূর্ব। সত্যেনের ভূমিকায় অমিয়কান্তি ভট্টাচার্যের প্রাণবন্ত অভিনয় সকলকেই মুগ্ধ করে। এছাড়া অনিল ভট্টাচার্য, নবীন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী অনিমা মুখোপাধ্যায়, কুমারী পুষ্প নিয়োগী, শ্রীমতী লতা বোস, শ্রীমতী শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নিজ নিজ চরিত্রে সু-অভিনয় করেন।

'স্বীকৃতি' নাটকের প্রধান আকর্ষণ অজিতবেশী পরিচালক শ্রীঅমিয়কান্তি ভট্টাচার্যের অপূর্ব অভিনয়নৈপুণ্য। শান্তি-রূপী শ্রীমতী অপর্ণা ভট্টাচার্যও সুন্দর। অন্যান্য ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন—ডাঃ এন কে মিত্র, শ্রীমতী দীপালি দেওয়ানজী, কুমারী ঝর্ণা বিশ্বাস, শ্রীমতী দুর্গা দেবনাথ, মাস্টার দেবাশিস, নলিনী চট্টোপাধ্যায়। মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ও আবহসঙ্গীতের জন্য সর্বশ্রী সোম দেবনাথ, আবু হাসান, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর ও শঙ্কর দাস প্রশংসা লাভ করেন। বিচিত্রা-নুষ্ঠানের 'মহিষমর্দিনী' নৃত্যনাট্যে কুমারী উমা চট্টোপাধ্যায়, ভগতি মুখোপাধ্যায়, রমা মুখোপাধ্যায় ও রাণু সকলকে মুগ্ধ করেন।

সম্প্রতি স্থানীয় মহিলা মিলন সংঘের সভ্যাবৃন্দ পলিটেকনিক রঙ্গমঞ্চে 'চিরকুমার সভা' মঞ্চস্থ করেন। এঁদের অষ্টম বার্ষিক উৎসবের অঙ্গীভূত নাট্যাভিনয় মোটামুটি উত্তীর্ণ বলা যায়। সে-কাজে পরিচালক তিলক চৌধুরীর দক্ষতা অনস্বীকার্য। অভিনয়াংশে অর্চনা সেনগুপ্তা (চন্দ্রবাবু), গীতা বিশ্বাস (শৈলবালা), ডলি ঘোষ (নীরবালা), আলো গোস্বামী (নৃপবালা) ও মাধবী হালদার (অক্ষয়) নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। নীরবালার গানগুলি সুগীত। অন্যান্যদের মধ্যে মিনু চক্রবর্তী, পারুল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরাধা সেন ও পূর্ণিমা কুণ্ডু চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। রূপসজ্জা পরিকল্পনা প্রশংসার্হ। মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাত আকৃষ্ট করেনি। কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত সুব্যবহৃত।

বিবিধ সংবাদ

গত ৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রিলিফ এ্যান্ড সোসাল ওয়েল ফেয়ার রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলনী উপলক্ষে রাইটার্স বিল্ডিংস ক্যান্টিন হলে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন—শ্রীনিতাইহরি নন্দ মজুমদার। সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন—নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব রায়, পুলক চক্রবর্তী, সুশান্ত পাল, শ্যামল বিশ্বাস, শ্রীষষ্ঠীচরণ মিত্র, শক্তি বিশ্বাস, শ্রীমতী ডলি দাস, অরূপ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। তবলায় সহযোগিতা করেন—জয়দেব রায় ও শ্রীসুজিত প্রামাণিক। নৃত্য পরিবেশন করেন—সান্ত্বনা ভট্টাচার্য। পরিচালনায় ও সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন যথাক্রমে—শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীসলিল সেনগুপ্ত ও শ্রীমতী মাধবী সেনগুপ্তা। একক মূকাভিনয় পরিবেশন করেন—মূকাভিনেতা শ্রীকাশীনাথ। সমাগত দর্শকবৃন্দ শিল্পীর মূকাভিনয়ে (কেনা খাওয়া ওয়ার্ড্রপ্ত ওড়ান) মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

গত ৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় আর আই সি রিক্রিয়েশন ক্লাবের তৃতীয় বার্ষিকী বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। শ্রীএইচ কে ঘোষ এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। শিল্পী কৃষ্ণা দাশগুপ্ত, স্বপ্না চট্টোপাধ্যায়, বন্দনা মুখোপাধ্যায়, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, কানাই গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর বেহারা (উড়িয়া সংগীত) সংগীত পরিবেশন করেন। কৌতুক শিল্পী সুদর্শন বন্দ্যোপাধ্যায় সহজেই দর্শক মন জয় করেন। আবৃত্তি করে শোনান হিমাংশু মুখোপাধ্যায়। তরুণ মূকাভিনেতা গৌতম গুহ কয়েকটি ফিচার পরিবেশন করেন। সমীরণ তাঁর আমেরিকার কথা বলা পুতুল দেখিয়ে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেন। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক যাদুকর কে সি বাগচী তাঁর চমকপ্রদ যাদুর খেলা ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ।

শিবমন্দির পার্লামেন্ট প্রযোজিত গত ১ নভেম্বর উল্টোডাঙ্গা অধর দাস লেন ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত 'নাচমহল' যাত্রাটি মঞ্চস্থ হয়। শিল্পীদের দলগত ও একক সার্থক অভিনয়ের জন্য যাত্রাটির মঞ্চরূপ সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়। চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য রূপদান করেছেন সমুদ্রগড়ের রাজা সমুদ্র সেন-রূপী প্রমোদরঞ্জন কুণ্ডু। সমর সুরাইয়ের 'মুর্শিদকুলী খাঁ' যাত্রার আর একটি বিশিষ্ট

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীতের মিলন-তীর্থ

পঞ্চাশ নম্বর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে রাজেন্দ্রকিশোর সংগীত সমিতির এক ঘরোয়া আলোচনা সভায় সংগীতশাস্ত্রী বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-সংগীতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—এ দেশে যেমন আধুনিক গান এবং উচ্চাঙ্গ সংগীত সমান্তরাল ধারায় বিভিন্ন শ্রেণীর সংগীত-পিপাসুর রুচির তৃষ্ণা মিটিয়ে চলেছে ওদেশেও ঠিক সেই রকম 'পপ' বা 'জাজ' সংগীত আছে যার মধ্যে সমসাময়িক যুগ ও কালের ভাবনা, রুচি ও চিত্তচাঞ্চল্যের ছায়া পড়ে। আবার সমান আগ্রহে তাঁরা শোনেন বাক, বীটোফেন ও মোৎজার্টের রচিত সঙ্গীত। সুন্দরকে অনুভব করবার জন্য মানুষের চিরন্তন আকুতি সব দেশেই সমান। তফাৎ শুধু প্রকাশ-ভঙ্গীতে।

ওদেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বা ক্লাসিকাল গানের শ্রোতার সংখ্যাবাহুল্যে এদেশের চেয়ে কম নয়, আলি আকবর, রবিশঙ্কর এঁদের কাছেই শুনেছি। সংগীত পরিবেশনের আঙ্গিক-শৈলী বা নিয়মকানুন উভয় দেশেই সুচিন্তিত। বীরেন্দ্রকিশোর বললেন, তফাতের মধ্যে ওদেশের সঙ্গীত স্বরলিপি সীমিত। যতটুকু লেখা আছে তার এতটুকু নড়চড় বা পরিবর্তন হবার উপায় নেই। হয়ত সেইজন্যই ভাবের গভীরতা সত্ত্বেও অনেকসময় প্রাণস্পন্দনের অভাব অনুভূত হতে পারে আমাদের ভারতীয় শ্রোতাদের কাছে।

কারণ আমাদের ভারতীয় সংগীতের—চলন, বিস্তার নিয়মে বাঁধা থাকলেও শিল্পীর নিজস্ব কল্পনা—ও ভাববিস্তারের অবকাশ এতে যথেষ্ট আছে। একই 'ইমন' বা 'ভৈরবী' পদা, আরোহী, অবরোহী বজায় রেখেও বিভিন্ন শিল্পীর প্রকাশ-ব্যক্তিত্বের দরুণ বিভিন্ন ধরনের রূপ নেয়। শুধু তাই নয় একই শিল্পীর কণ্ঠে বা বাজনায় একই রাগের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রকাশ ঘটে। এই ক্রিয়েটিভিটি বা সৃজনশীলতার প্রাণবন্ত প্রকাশ ওদের মুগ্ধ করে।

'আর ভারতীয় সংগীতের এই নব নব উন্মেষশালী সৃষ্টির দিকটির সম্বন্ধে ওদের অবহিত করেছেন আলি আকবর, রবিশঙ্কর, বিসমিল্লা প্রমুখ শিল্পীরা। ভারতীয় সংগীতের এই পৃথিবীব্যাপী খ্যাতির মূলে আছেন এঁরা। বিলায়েৎ খাঁ প্রমুখ প্রতিভাবান শিল্পীরাও ওদেশে প্রচুর সমাদর পেয়েছেন। এঁদের জন্যই ভারতীয় সংগীতের মর্যাদা-মণ্ডিত ঐতিহ্য বিশ্বের গুণীর দরবারে স-সম্মানে প্রতিষ্ঠিত। আরও একটা জিনিষ একান্তভাবে আলি আকবর, রবিশঙ্করেরই অবদান। এঁরাই ভারতীয় সংগীতের মেজাজ ও গভীরতার ঐশ্বর্যে ইউরোপীয় শিল্পীদের আবিষ্ট করেছেন—ওদেশের শিল্পীর সাথে একসঙ্গে বাজিয়ে। বাইরে থেকে শুনে বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বোঝা একরকম আর সাঙ্গীতিকারের মর্মমূলে প্রবেশের চেষ্টা আর একরকম। এই প্রত্যক্ষ আস্বাদ না পেলে কোন বস্তুর প্রকৃত মাধুর্য অনুভব করা সম্ভব নয়।'

এরপর শ্রীরায় চৌধুরী ইহুদি মেনুহিন ও রবিশঙ্করের 'ইস্ট মিট্‌স ওয়েস্ট'—লং প্লেয়িং রেকর্ড এবং ইভেটি মিমিয়াক্সের বদলেয়ারের কণ্ঠে কবিতার আবৃত্তির সাথে বাজানো আলি আকবরের সরোদ 'ফ্লাওয়ার্স অফ ইভিল' রেকর্ডটি বাজিয়ে শোনালেন। প্রথমটি গ্রামোফোন কোম্পানী প্রকাশিত এদেশের রেকর্ড। দ্বিতীয়টি আমেরিকার।

প্রথমটির বৈশিষ্ট্য হোল এই যে এখানে ইহুদি মেনুহিনের মত প্রতিভাবান শিল্পীর বাজনায় ভারতীয় রাগের ধ্যান-সমাহিত রূপের প্রতিফলন। রবিশঙ্কর পরিচালিত সঙ্গীতে মেনুহিন ও রবিশঙ্করের একত্রে বাজানো প্রভাকেলী ও পিলং ভোলবার নয়।

'প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'-মেনুহিনের বেহালায় ভারতীয় রাগ শুনে এই কথাই বার বার মনে হয়েছে। 'প্রভাকেলী'তে যেন আরাধনার অনুভাব। হৃদয়ের সকল আগ্রহ অনুরাগ ও নিষ্ঠার নিবিড়তা নিয়ে ইহুদি মেনুহিন যেন ভারতীয় সংগীতের ধ্যানলোকে প্রবেশ করছেন শান্ত ধীর পদক্ষেপে। প্রতি পদক্ষেপের পর সশ্রদ্ধ সংকোচে বিরতির বিনয়টুকু লক্ষ্য করার মত। এ বাজনা শুনে চোখের সামনে ভেসে ওঠে একখানি ছবি। মন্দির-দেউলে দেবপ্রতিমার রূপ দেখে ভক্তচিত্ত বিহ্বল—দেবতার সামনে গিয়ে প্রণাম করবার জন্য সারা চিত্ত উন্মুখ। তবু চরণ ফেলতে দ্বিধা। যদি পূজার আয়োজনে কোনো ত্রুটি ঘটে? যদি যথাযোগ্য নিষ্ঠায় মন্ত্র উচ্চারিত না হয়? এই একাগ্রতা, অনুভব-গভীরতা তার বাজনায় বাজে। রবিশঙ্কর যেন সশ্রদ্ধ চিত্তে স্নেহভরে হাত ধরে এই সাধককে নিয়ে আসছেন ভারতীয় সংগীতের অন্দরমহলে।

'পিলং'-এ মনে হয় এ দ্বিধা অন্তর্হিত। ভারতীয় রাগ মেনুহিনের আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছে—তারই উজ্জ্বল আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে তাঁর প্রতিটি [illegible] এ তানে এবং সুরমিলন চমকে উঠেছে [illegible]—সেখানে হারমনি আছে, সিমফনী আছে কিন্তু [illegible] [illegible] মত মেলোডির ধারা প্রবাহিত বলেই তা সংগীতে এমন করে ফুটে উঠেছে।

কিন্তু আলি আকবর ও ইভেটি মিমিয়ক্সের যুক্ত বদলেয়ারের 'ফ্লাওয়ার্স অফ ইভিল' রেকর্ডে এ মিলন যেন আরও অন্তর্মুখী আরও দীপ্ত, আরও উদ্ভাসিত।

বদলেয়ারের আকণ্ঠ নিমজ্জিত বেদনা-বিদ্ধ জীবনের আত্মাহুতি বেদনা, বঞ্চনা, ক্রন্দন যেন মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে ইভেটির আলোছায়াভরা কণ্ঠে। কিন্তু এই প্রসঙ্গটির সৌন্দর্যরূপকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হোতো না যদি না তার পশ্চাৎপটে থাকত আলি আকবর খাঁ সাহেবের সরোদ।

এখানে পাশ্চাত্য কবির জীবন-বেদনার প্রতি সকাতর সহানুভূতিতে তাকিয়ে আছেন প্রাচ্যের সাধক শিল্পী। এই তাকিয়ে থাকাতে কখন যে বদলেয়ারের অন্তর্বেদনা নিজের বেদনা হয়ে উঠে সরোদের প্রতিটি 'বাজে', 'মীড়ে', 'ঝঙ্কারে' ভাষায় বেজে উঠেছে খাঁ সাহেব যেন বুঝতেই পারেননি। মহাভারতে [illegible] মরমনা কুন্তীর কথা মনে পড়ে যায় এই বাজনা শুনে। কুন্তী ইচ্ছে করলেই দিব্যদর্শন লাভ করছেন। এখানে আলি আকবরও যেন দিব্যভাবে বিভোর হয়ে কখনও 'মারবা' 'পূরিয়া'র ভক্তিভাব কখনও 'গৌরীমঞ্জরী'র রহস্য কখনও সাদামাটা মেঠো

বাউল ভাটিয়ালীতে কবিতার ভাবধারাকে অনুরণিত করেছেন। অজানতেই আলি আকবরের ধ্যানের ছায়া পড়েছে ইভেটির কণ্ঠে। আর ইভেটি মিমিয়াক্সের রং-ব্যবহারের রামধনু রাঙিয়ে তুলেছে আলি আকবরের বাজনাকে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন এখানে আরও সার্থক, কারণ দুই শিল্পীই এখানে বাইরের সম্বিৎ হারিয়ে একই ভাবের প্রেরণায় পথ চলছেন। কেউ কারো গুরু নয় দুজনেই সন্ধানী। এই আত্মহারা সন্ধানের ব্যাকুলতাই এ রেকর্ডকে এমন আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

প্রসঙ্গক্রমে জানা গেল ওদেশে আলি আকবর কলেজের শিক্ষার্থী-সংখ্যা ৫০০-তে উঠেছে। এটা যে হুজুগ নয় খাঁ সাহেবের টেপে শোনা ওদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের বাজনাই তার প্রমাণ বলে শ্রীরায়চৌধুরী জানান। আলি আকবর খাঁ সাহেবের এক আমেরিকান ছাত্রী বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কাছে থিওরী ও ধ্রুপদ শিক্ষা করছেন। তাঁর আগ্রহ ও শ্রমশীলতায় বীরেন্দ্রকিশোর মুগ্ধ। আলি আকবর খাঁর ছাত্রী শরণরাণীর দরবারী কিরবাণী এবং অন্যান্য লং প্লেয়িং রেকর্ড ওদেশে ঘরে ঘরে বাজছে।

একটি সার্থক সরোদানুষ্ঠান

সম্প্রতি কলামন্দিরে তিন ঘণ্টাব্যাপী এক সঙ্গীতাসরে তরুণ সরোদী আমজেদ আলী খাঁর বাজনা ছিল এক উপভোগ্য অনুষ্ঠান। তবলা সঙ্গতে ছিলেন বেনারসের শিল্পী পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ।

'দুর্গা' রাগ দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু হয়। আমজেদের বাজনায় এবারের উজ্জ্বল দিক হোল সু-সম্বন্ধ আলাপ যার অভাব তাঁর আগের বাজনাকে অসম্পূর্ণ রেখেছে। বিশেষ করে বিলম্বিতের সঙ্গে মীড়ের দীর্ঘস্থায়ী রেশ স্বর-সমন্বয় এবং বাজের গাম্ভীর্যে এ যুগের শ্রেষ্ঠতম সরোদী (অবশ্যই আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে বাদ দিয়ে বলছি) আলি আকবরের প্রভাব লক্ষণীয়। যদিও শিল্পীর নিজস্ব ভাবনার সমুজ্জ্বল ছাপও শ্রোতাদের নজর এড়ায়নি। গতের অঙ্গ অবশ্য পুরোপুরি হাফেজ আলি খাঁ সাহেবের ঢঙে (বিলম্বিত বাদ দিয়ে দ্রুত গৎ) বাজানো। রাগ-গাম্ভীর্য, ক্ষিপ্রগতি অবরোহী সাপট ও বোলতান প্রভৃতির শুদ্ধতায়, স্বরের স্পষ্টতায় সুর ও লয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলনে রসোত্তীর্ণ। কিন্তু ঘনিয়ে-ওঠা ভাব নিবিড়তার মায়া যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল হঠাৎ শান্তা প্রসাদজীর সঙ্গে ছন্দের লড়াই-এ যখন শিল্পী মেতে উঠলেন।

বাজনায় বৈচিত্র্য আনার জন্য এ অঙ্গের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু শুধুমাত্র 'তেরে কেটে তাক' গোছের বোলপ্রধান অঙ্গে নিবিষ্ট না থেকে 'পরণ' অঙ্গে এ ধরনের কাজ দেখলে শিল্পীচিত্তের সার্থকতর প্রকাশ ঘটত। অবশ্য তরুণ বয়সের এ ত্রুটি মার্জনীয়। তবে এই সাময়িক হতাশার ক্ষতিপূরণ ঘটেছে দ্বিতীয়ার্ধে 'মালকোশ' রাগ রূপায়ণে। এখানে শিল্পী যেন দীপ্ত হয়ে উঠেছেন তাঁর প্রকাশবৈভবের উজ্জ্বলতায়। রাগের বীরভাব, উন্নত ওজসে ঝলমলিয়ে উঠেছে তার গমকের বিচিত্র প্রকারে। বিশেষ করে 'ত্রিসপ্তক' গমকের বাহার ও স্বরশ্রুতির সমতা অনেকদিন মনে রাখবার মত। আলি আকবরি বাজের সঙ্গে হাফেজ আলি খাঁর স্পর্শকৃন্তন বেশ কয়েকটি সরস মুহূর্তের সৃষ্টি করেছে। শান্তাপ্রসাদ সংযত চিত্তে পাণ্ডিত্যকে সংহত রেখে তরুণ শিল্পীকে উদ্দীপ্ত করেছেন।

'সুরঙ্গমা'-র সঙ্গীতানুষ্ঠান

সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান 'সুরঙ্গমা' আয়োজিত এক সঙ্গীতাসরের প্রারম্ভে প্রধান অতিথি মণীন্দ্র রায় ছোট্ট একটি ভাষণে বলেন, 'ভাষা যেখানে মূক ঠিক সেইখানেই সঙ্গীতের সুরু। কাব্য যখন পথ হারায়, তখনই শোনা যায় সুরের কলগুঞ্জন।' সঙ্গীতের অমোঘ আকর্ষণ মনকে কাছে টানে সুখে-দুঃখে চিরসঙ্গী হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে সঙ্গীত-শিল্পীদের অন্যান্য কলাশিল্পের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন, কারণ সকল শিল্পই পরস্পরের পরিপূরক এবং সকলের সাহায্য নিলে তবেই হয়তো মহত্তর শিল্পসৃষ্টি সম্ভব। এরপর শ্রীমতী কল্যাণী রায়ের শিষ্য শ্রীদেবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সেতার বাদনের একক-অনুষ্ঠান সীমিত পরিসরের মধ্যেও শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছে। তবলা সঙ্গতে ছিলেন মানিক দাস। শ্রীচট্টোপাধ্যায় প্রথমে 'ইমন' পরে শ্রোতাদের অনুরোধে 'মালকোশ' বাজিয়ে শোনান। উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হোল তাঁর মীড়ের অঙ্গ, তানের স্পষ্টতা এবং লয়ের ওপর দখল। রেওয়াজে একনিষ্ঠ থেকে ইনি যথা-সময়ে উচ্চমানে পৌঁছবেন এই আশাই আমরা রাখব। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন ছন্দা বসু ও মল্লিকা মুখোপাধ্যায় (যুগ্ম সম্পাদিকা) ব্যবস্থাপনায় শ্রীলা মৈত্র, মিতা মৈত্র ও নান্টু মল্লিক।

সম্প্রতি জয়নগরের মজিলপুরে ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে যে সব শিল্পীরা অংশ নেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্তা, নিতাই গোস্বামী, মাঃ তিলক মাঃ অরবিন্দ মন্ময় রাহা, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়। একক মূকাভিনয় পরিবেশন করেন জনপ্রিয় মূকাভিনেতা শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী।

৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় পার্কসার্কাস বেনিয়াপুকুর সংযুক্ত পূজা কমিটির আয়োজিত পার্ক সার্কাস ময়দানে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরে 'শ্রীমতী' নৃত্যনাট্য ও নৃত্যবিচিত্রা অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্যনাট্যের প্রযোজনায় ছিলেন শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্তা। উপদেষ্টায় ছিলেন নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ। কৃষ্ণের ভূমিকায়—পাপড়ি বোস, শিপ্রা সেন (ছোট), রাধিকা—শুক্লা সেনগুপ্তা, কংসের ভূমিকায় সুতপা দত্ত, একক নৃত্যে (ভারতনাট্যম) কৃষ্ণা রায় ও বিভিন্ন ভূমিকায় অনুপ শঙ্কর সু-অভিনয় করেন। শ্রীমতী—শোভনা চৌধুরীর কীর্তন দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সহযোগিতায় ছিলেন বিপুল ঘোষ ও কুইনি চক্রবর্তী, অনুপশঙ্কর ও শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্তা।

আগামী ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর সুরসভার উদ্যোগে ৪ দিনব্যাপী গান্ধীশতবার্ষিকী সঙ্গীত সম্মেলন রবীন্দ্র-সরোবর মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। সঙ্গীত সম্মেলনের বিষয়সূচীতে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত ছাড়াও রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, হিমাংশুগীতি, পল্লীগীতি, অতুলপ্রসাদের গান, নৃত্য প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু তরুণ উদীয়মান শিল্পীদের ২৫ নভেম্বরের মধ্যে মেলোগ্রাম, ৮২এ রাসবিহারী এভিনিউ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

—চিত্রাঙ্গদা

ইডেনের ক্রিকেট

ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন আজ বিগত যৌবনা। এক সময়ে এর পরিবেশে বিদেশী পর্যটক তার মধ্যে বিশেষ করে পাশ্চাত্যের ক্রিকেটঅনুরাগীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে। এর যে সমস্ত ঐতিহাসিক ছবি যা দেশে বা বিদেশে ছড়িয়ে আছে তার সঙ্গে আজ মেলাতে গেলে তা আর মিলবে না। এর সুউচ্চ ঝাউ গাছ যার হিম-শীতল ছায়া পথচারীদের শ্রম লাঘব করতো তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ব্যবসায়ীরা ব্যবসাবুদ্ধির লোভে দর্শকদের স্থান সঙ্কুলানের অজুহাত দেখিয়ে জঞ্জাল সাফ করলে তাকে একেবারে উজাড় করে দিয়েছে। ফলে, ইডেনের পরিবেশ আজ নেড়া, যাকে বলে চাঁচা-পোঁছা। তার স্থানে গড়ে উঠেছে লোহার বেষ্টনীতে গাঁথা কংক্রিটের বসার আসন। খুঁজে পাওয়া যাবে না ফেলে-আসা দিনের মাঠের সেই সবুজ কার্পেট সম সেই শ্যামল তৃণ সম্বলিত মাঠ। নেই অনেক কিছু, তবুও আজ ইডেনের এই মাঠে হয়ে আছে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। শুধু আছে বললে সবটুকু বলা হল না আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

আগে এই মাঠে শুধু কি ক্রিকেট খেলাই হয়েছে? খেলা হয়েছে টেনিসও। পৃথিবীর ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের মধ্যে খেলে গিয়েছেন অনেক রথী-মহারথী। রণজি, স্যার ফ্রান্সিস স্টানলি জ্যাকসন, ট্যারান্ট, লর্ড হক, সি কে ম্যাকার্টনি, জ্যাক হবস, হ্যামণ্ড, সাটক্লিফ, ভেরিটি, টেট, গিলিগান প্রভৃতি ক্রিকেটার এবং সিমেজু, ওকামাটো, ইউয়েদা, আসানেয় ও কিটাগাওয়ার মত টেনিস খেলোয়াড়েরা। কিন্তু কেউ কি খুঁত বার করতে পেরেছেন ঐ মাঠের? পারেন নি, কারণ এর তত্ত্বাবধানের ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল তাঁরা তাঁদের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করে গিয়েছেন। এই মাঠে টেনিস খেলা ত অনেক আগেই অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কারণ মাঠের অবস্থা দিন-দিন খারাপের দিকে এগোচ্ছিল বলে। মাঠের চতুর্দিকে যেভাবে টাকের সৃষ্টি হচ্ছিল তাতে ক্রিকেট খেলাও অসম্ভব অনুমান করে মাঠের বর্তমান অভিভাবকরা একে ঢেলে সাজার ব্যবস্থা করেছেন। সমস্ত মাঠ খুঁড়ে এর সংস্কার হয়েছে। তবুও এ মাঠ তার আগের রূপ ফিরে পায় নি। কোনদিন পাবে কিনা সন্দেহ।

ইডেন রূপে-রসে-গন্ধে ভরপুর হোক বা না হোক তাতে কিছু আসবে-যাবে না। কারণ ইডেনকে কেউ কোনদিন ভুলতে পারবে না। এ মাঠ বহন করছে বহু যুগের সুখস্মৃতি। ইতিহাসের পাতায় এর নাম যুগ-যুগ ধরেই থেকে যাবে। এ মাঠ আদি এবং অকৃত্রিম। এ মাঠের সঙ্গে নাড়ীর সংযোগ ছিল ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের। সাগর পার থেকে ইংরাজের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে-সঙ্গেই যারা ক্রিকেটকে এদেশে এনেছে। বিশ্বের যত ক্রিকেট ক্লাব আছে ইডেন গার্ডেন সেই সমস্ত প্রাচীন মাঠের মধ্যে অন্যতম বলে নয়, শ্রেষ্ঠ মাঠ হিসেবে সারা বিশ্বের স্বীকৃত ছিল। এম সি সির কাছে খোঁজ করলে দেখা যাবে এ সংবাদ সত্য কিনা।

মনে পড়ে এই মনলোভা মাঠে বিদেশী গিলিগানের এম সি সি দলের বিরুদ্ধে ১৯২৫-২৬ সালে এবং ১৯৩৩-৩৪ সালে

শঙ্করবিজয় মিত্র

জার্ডিনের এম সি সি দলের খেলার সময় তদানীন্তন দর্শকদের কাছে খেলা দেখার জন্যে এখানকার স্থানীয় পরিচালকদের উদাত্ত আহ্বান। আজ আর দর্শকদের কাছে কর্তৃপক্ষের কাকুতি জানাতে হয় না। এমনিতেই দর্শকদের আসন উপচে পড়ে। এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। দর্শকদের টিকিটের চাহিদা মেটাতে পরিচালকদের এখন হিমসিম খেতে হয়। ১৯৬৭ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ভারত সফরের সময় আঠার লক্ষ টাকা ব্যয়ে দর্শকদের আসনের সংস্কার করা হয়েছিল। বাষট্টি হাজারের মত আসনের ব্যবস্থা করেও পরিচালক মণ্ডলী জনসাধারণকে খুশী করতে পারেন নি। লক্ষ লোকের আসনের ব্যবস্থা থাকলে কি হোত বলা যায় না। যা হোক বেশী লোকের ঠাঁই করতে গিয়ে ইডেনে লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে গিয়েছিল। ফলে পাঁচ দিনের মধ্যে এক দিনের খেলা ত পণ্ড হয়ে গিয়েছিল। মাঠে মারামারি এবং অগ্নিকাণ্ডের জন্যে শেষ পর্যন্ত সেন কমিশনের ওপর তদন্তের ভার পড়ে। সেন কমিশন যে সুদীর্ঘ রায় দিয়েছেন তা আর জনসাধারণের অজানা নেই। সেই তদন্তের ফলে শুধু টিকিটের বিলি-বন্টন বলে নয়, দর্শকদের আসন থেকে সব কিছুরই সংস্কার করতে হচ্ছে বা হবে।

রাজ্য সরকার কোন দায়-দায়িত্ব না নিয়ে স্থানীয় ক্রিকেট সংস্থার ওপরই সব কিছু ভার ছেড়ে দিয়েছেন। পুলিশ গেট আগলানোর ভার নিতে চায় না। ১৯৬৭ সালের দর্শকের আসন যেখানে ছিল বাষট্টি হাজার তাকে কমিয়ে করা হচ্ছে সাড়ে পঞ্চান্ন হাজার। কর্তৃপক্ষরা চান যে কম থেকে বেশী মূল্যের সব আসনই থাকবে সংরক্ষিত। দৈনিক টিকিট [illegible] দর্শকদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট নম্বর থাকবে। যাঁরা সেই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য [illegible] আসন নির্বাচন করবেন তাঁদের এবং সমস্ত সি এ বির কর্মকর্তাদের জন্যও থাকবে নির্দিষ্ট আসন।

সি এ বির ইচ্ছা ছিল মাঠের মধ্যে না করে মাঠের বাইরে স্টল বসানোর। দর্শকদের যাতায়াতের অসুবিধার কথা স্মরণ করে পুলিশ কমিশনার তাঁদের সেই ইচ্ছায় বাদ সেধেছেন। ফলে মাঠের এনক্লোজারের মধ্যেই থাকবে স্টল। খাবারের মেনু ও তার দাম বাঁধা হবে সি এ বির সঙ্গে পরামর্শ করে। প্যাকেট ছাড়া খোলা খাবার রাখার অনুমতি দেওয়া হবে না। দর্শকদের কাছে যাতে বেশী পয়সা আদায় করা না যায় সেই জন্য খাবারের মূল্য তালিকা ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা থাকবে।

কলকাতায় চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ উপলক্ষ্যে ইডেনের উইকেট এখন প্রস্তুতির পথে।

টিকিটের বিক্রি-বন্টনের ক্ষেত্রেও একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলা হবে। কোন কারণেই কোন দল বিশেষকে বেশী টিকিট দেওয়া হবে না। কর্তৃপক্ষের মতে এতে বেশীর ভাগ ক্লাবের অসন্তোষ এড়ান যাবে। ক্লাবগুলির মাধ্যমে টিকিট বিতরণ হলে প্রকৃত ক্রিকেট অনুরাগীরাই খেলা দেখার অবকাশ পাবেন। ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীরাম চ্যাটার্জি জনসাধারণের দরদে প্রকাশ্যে টিকিট বিক্রয়ের যে কথা তুলেছেন আমি তা সমর্থন করি না। তাতে অসন্তোষ বাড়বে ছাড়া কমবে না। টিকিট 'ব্লাক' করার জন্যে দু-তিন দিন ধরে অবাঞ্ছিত লোকের যে 'কিউ' পড়বে তা ঠেকান যাবে কেমন করে? এতে অশান্তি আরও বাড়বে বলে মনে হয়। মাঠের প্রবেশ পথের নিয়ন্ত্রণের ভার থাকবে সি এ বি'র স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর। শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে পুলিশ বাহিনী থাকলেও তারা গেট নিয়ন্ত্রণের ভার নিতে নারাজ। কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলায় তাদের ওপর দোষারোপ করা হয়েছে। মাঠের ব্যবস্থাপনার সব-কিছু নক্সা সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়েছে। সি এ বি'র সম্পাদক শ্রীনন্দলাল জালান ইতি-মধ্যেই রাজ্যের উপমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর আস্থা অর্জন করেছেন। শ্রীজালান উপ-মন্ত্রীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কোন অন্যায় ব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। সরকারের ধারণা সি এ বি অন্যায় প্রতিরোধে এবার দৃঢ়সংকল্প। 'টেলিভিশনে' খেলা দেখার ব্যবস্থা থাকলে গণ্ডগোলের কোন কারণ থাকবে না এবং সেই জন্যে কলকাতার পাঁচটি জায়গায় 'টেলিভিশন' সেট বসাবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে সি এ বি কেন্দ্রের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন।

ইডেনের গ্যালারীর সংস্কার চলছে। পুরোদমে চলছে 'মাঠের উইকেট' তৈরীর কাজও। ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা এখন হাজার গুণে বেড়ে গিয়েছে। এর হার-জিতে সারা দেশের জনসাধারণের প্রাণের কেন্দ্র-বিন্দুতে টান পড়ে। উত্তেজনা ও উদ্দীপনার অন্ত থাকে না। খেলা আরম্ভ হবার আগে উজ্জ্বল সম্ভাবনার এক ছবি জেগে ওঠে। খেলোয়াড়-দের কোন নির্দিষ্ট মান না থাকায় বার-বার হতাশার ছবি ফুটে ওঠে। কারণ আমাদের ব্যাটসম্যানদের ওপর ভরসা রাখা যায় না। পরাজয়েরও শিক্ষা থাকে। আমরা যেন কোন শিক্ষা নিতে নারাজ। আমরা ব্যাটিংয়ে যেমন মজবুত নই, বোলিং-এও কোন ধার নেই। ফাস্ট বোলারের অভাবের কথাই বার-বার শোনা যায়। এই অভাব মেটাবার কি কোন চেষ্টা হয়েছে? ফিল্ডিং এত খারাপ যে কোন দেশের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা আমাদের নেই। যে নিউজিল্যান্ড দলের কথায় আগে লোকের নাসিকা কুঞ্চিত হত তারা ফিল্ডিং-এর জোরে ম্যাচ জিতে চলেছে। আসল কথা আমাদের প্রকরণগত মূলধনের পুঁজি কম। এ ছাড়া দল বাছাই-এর ত্রুটি বিচ্যুতিতে আমাদের পরাজয়ের গ্লানি দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে। দল বাছাইয়ের প্রতি কি সত্যি গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে? যদি তাই হত তাহলে সুব্রত গুহকে খেলার মাঠ থেকে ফিরিয়ে আনা হত না। কানপুর টেস্টে যেখানে স্পিন বোলিং সহায়ক হবে সেখানে সুব্রত গুহকে দলভুক্ত করার অর্থ কি কারুর বুঝতে বাকী আছে। দলাদলির বলি হয়ে-ছেন বাংলার যশস্বী ব্যাটসম্যান শ্যামসুন্দর মিত্র। টেস্টে না হয় ঠাই না পেলেন, নেটে ডাক পড়ারও কি তিনি অযোগ্য। অথচ প্রতিটি বড় আসরেই তিনি ভাল ফল দর্শিয়েছেন। তাছাড়া ভারতীয় খেলোয়াড়দের বদনাম আছে খেলার মাঠের বাইরের আচরণে। ঐ আচ-রণের জন্যে বোর্ডের কমিটি গঠিত হয়েছে। রায় বেরুবে কবে? আসলে ক্রিকেট খেলতে গেলে ক্রিকেটের চরিত্র গড়ে তুলতে হবে। সেই চরিত্র গড়তে হলে দরকার পৌরুষ, ধৈর্য, স্থৈর্য, দুরন্ত সাহস ও ব্যক্তিত্ব। এই সব গুণের অভাব থেকে গেলে শুধু ক্রিকেট কেন কোন খেলাই চলে না। ভারতের চতুর্দিকের আবহাওয়া উত্তপ্ত। কোন কিছুতে ইন্ধন যোগালেই হয়। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে যে ঘটনা-বলী হয়ে গেল ইডেনের সবুজ গালিচায় পাতা আসরে তার পুনরাভিনয় না ঘটলেই সকলে খুসী হবেন। এবার ভারতের বিভিন্ন জায়গার খেলা কলুষমুক্ত হবে তো?
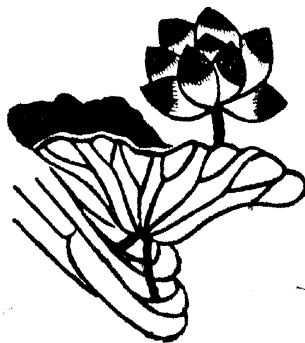
খেলাধূলা

দর্শক

অস্ট্রেলিয়ান বনাম মধ্যাঞ্চল দল

মধ্যাঞ্চল দল : ১৫৩ রান (সেলিম দুরানী ৫৫ রান। ম্যালেট ৪২ রানে ৩ উইকেট)।

ও ১৩৬ রান (হনুমন্ত সিং ৪০ রান। ম্যালেট ৩৮ রানে ৭ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়ান দল : ৩২১ রান (ওয়াল্টার্স ৮৪ রান। ঘাটানি ৫৭ রানে ৩ উইকেট)।

জয়পুরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল সফরের তৃতীয় খেলায় মধ্যাঞ্চল দলকে এক ইনিংস ও ৩২ রাণে পরাজিত করে। ১৯৬৯ সালের ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়ান দলের এইটি দ্বিতীয় জয়। পশ্চিমাঞ্চল দলের বিপক্ষে তাদের প্রথম খেলা ড্র হয়। প্রথম টেস্ট ওরফে সফরের দ্বিতীয় খেলায় তারা ৮ উইকেটে ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছিল।

মধ্যাঞ্চল দলের অধিনায়ক হনুমন্ত সিং টসে জয়ী হয়ে প্রথমেই ব্যাট করার দান নেন; কিন্তু কোন সুবিধাই করতে পারেন নি। মধ্যাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ১৫৩ রানের মাথায় পড়ে যায়। দলের সর্বোচ্চ ৫৫ রান করেন সেলিম দুরানী। প্রথম দিনের বাকী সময়ের খেলায় অস্ট্রেলিয়ান দল এক উইকেটের বিনিময়ে ৬৩ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ান দলের প্রথম ইনিংস ৩২১ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ১৬৮ রানে অগ্রগামী হয়। যখন তাদের ২০৫ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট পড়ে যায়, তখন কিন্তু তাদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। ওয়াল্টার্সের ৮৪ রান এবং শেষ দশম উইকেট জুটিতে ৫২ মিনিট সময়ে ঝড়ের গতিতে কনোলী এবং মেইনের ৬৯ রান অস্ট্রেলিয়ান দলকে শেষ পর্যন্ত ১৬৮ রানে এগিয়ে দিয়েছিল এবং খেলায় শেষ পর্যন্ত জয়যুক্তও করেছিল। দ্বিতীয় দিনের বাকী সময়ের খেলায় মধ্যাঞ্চল দল তিন উইকেটের বিনিময়ে ৮১ রান সংগ্রহ করে। খেলার এই অবস্থায় ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে তাদের তখন আরও ৮৭ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে জমা ছিল সাতটা উইকেট।

কিন্তু তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে লাঞ্চের এক মিনিট পর মধ্যাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৩৬ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়ান দল এক ইনিংস ও ৩২ রানে জয়ী হয়। মধ্যাঞ্চল দলকে দ্বিতীয় ইনিংসে কাবু করেছিল ম্যালেটের অফ স্পিন বোলিং (৩৮ রানে ৭ উইকেট)। ম্যালেট তৃতীয় দিনের খেলায় ১৫ রান দিয়ে ৫টি উইকেট পান। লাঞ্চের সময় মধ্যাঞ্চল দলের রান ছিল ১৩৬ (৯ উইকেটে)।

নেহরু জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

দিল্লীর শিবাজী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত নেহরু গোল্ড কাপ হকি প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে জলন্ধরের কোর অব সিগন্যালস ১—০ গোলে শক্তিশালী নর্দার্ন রেল দলকে পরাজিত করে। প্রথম দিন খেলাটি ১—১ গোলে ড্র ছিল।

সেমি-ফাইনালে কোর অব সিগন্যালস ১—০ গোলে কলকাতার ইস্টার্ণ রেলকে এবং নর্দার্ন রেল দল ৩—২ গোলে মীরাটের শিখ রেজিমেন্টাল দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

কোয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ১২শ মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইন্দোনেশিয়া ৩—২ গোলে গত বছরের বিজয়ী মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে এই নিয়ে তিনবার স্বর্ণনির্মিত টুঙ্কু আবদুল রহমন ট্রফি জয়ী হল। ইতিপূর্বে ইন্দোনেশিয়া এই ট্রফি জয়ী হয়েছিল ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে। গত বছরের প্রতিযোগিতায় ইন্দোনেশিয়া চতুর্থ স্থান পেয়েছিল।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল এই আটটি দেশ—'এ' গ্রুপে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইল্যান্ড এবং 'বি' গ্রুপে ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ। লীগের খেলায় 'এ' গ্রুপ থেকে ইন্দোনেশিয়া অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ান এবং মালয়েশিয়া রানার্স-আপ হয়েছিল। অপর দিকে 'বি' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ব্রহ্মদেশ এবং রানার্স-আপ সিঙ্গাপুর। সেমি-ফাইনালে ইন্দোনেশিয়া ৯—২ গোলে সিঙ্গাপুরকে এবং মালয়েশিয়া ৩—১ গোলে ব্রহ্মদেশকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

ভারতবর্ষ 'বি' গ্রুপের খেলায় যোগদান করে তালিকায় সর্বনিম্ন স্থান পায়। তিনটি খেলার মধ্যে ভারতবর্ষ ০—১ গোলে অস্ট্রেলিয়া এবং ০—৬ গোলে ব্রহ্মদেশের কাছে হেরে যায়। ভারতবর্ষের একমাত্র জয় ৩—০ গোলে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে।

ব্রহ্মদেশ ৯—০ গোলে সিঙ্গাপুরকে পরাজিত করার সূত্রে প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

লীগের খেলার চূড়ান্ত ফলাফল

'ক' বিভাগ

	খে	জ	প	ড্র	স্ব	বি	পঃ
ইন্দোনেশিয়া	৩	৩	০	০	১০	১	৬
মালয়েশিয়া	৩	২	১	০	৬	৪	৪
দঃ কোরিয়া	৩	১	২	০	৪	৭	২
তাইল্যান্ড	৩	০	৩	০	০	৮	০

'খ' বিভাগ

	খে	জ	প	ড্র	স্ব	বি	পঃ
ব্রহ্মদেশ	৩	৩	০	০	১৫	৩	৬
সিঙ্গাপুর	৩	১	২	০	৫	৮	২
পঃ অস্ট্রেলিয়া	৩	১	২	০	৫	৯	২
ভারতবর্ষ	৩	১	২	০	৩	৭	২

নিউজিল্যান্ড বনাম পাকিস্তান

তৃতীয় টেস্ট খেলা

নিউজিল্যান্ড : ২৭৩ রান (গ্লিন টার্ণার ১১০ এবং মার্ক বার্জেস ৫৯ রান। ইনতিখাব আলম ৯২ রানে ৫ উইকেট)।

ও ২০০ রান (মার্ক বার্জেস নট-আউট ১১৯ রান। সাজ্জাদ ৬২ রানে ৪ এবং ইনতিখাব আলম ৯১ রানে ৫ উইকেট)।

পাকিস্তান : ২৯০ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। আসিফ ইকবাল ৯২ এবং সাফকাত রানা ৬৫ রান। হাওয়ার্থ ৮৫ রানে ৪ উইকেট)।

ও ৫১ রান (৪ উইকেটে। কুনিস ২০ রানে ৪ উইকেট)।

ঢাকায় আয়োজিত নিউজিল্যান্ড বনাম পাকিস্তানের শেষ তৃতীয় টেস্ট খেলাটি ড্র ঘোষণা করা হয়েছে। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘন্টা আগে হাজার হাজার দর্শক মাঠের মধ্যে প্রবেশ করে খেলার পিচ নষ্ট করে এবং গ্যালারীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে খেলা পরিত্যক্ত হয়। এই সময় পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসের রান ছিল ৫১ (৪ উইকেটে)। নিউজিল্যান্ড ১—০ খেলায় (ড্র ১) পাকিস্তানকে পরাজিত করে 'রাবার' জয়ী হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় নিউজিল্যান্ডের এই প্রথম রাবার জয় এবং বিদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে নিউজিল্যান্ডের 'রাবার' জয়ও এই প্রথম।

প্রথম দিনে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৭টি উইকেট পড়ে ১৭২ রান দাঁড়ায়। টার্ণার ৯৯ রান করে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা ২৭৩ রানের মাথায় শেষ হয়ে যায়। তাদের ২৭১ রানের মাথায় ৮ম, ২৭২ রানের মাথায় ৯ম এবং ২৭৩ রানের মাথায় ১০ম উইকেট পড়ে। গ্লিন

সিঙ্গাপুরে আয়োজিত শ্রেষ্ঠ দেহী প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান রবীন চক্রবর্তী

টনীর সেঞ্চুরী (১১০ রান) করেন। দ্বিতীয় দিনে খেলার বাকি সময়ে পাকিস্তান ৩ উইকেট খুইয়ে ৯২ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে ২৯০ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় পাকিস্তান তাদের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার এই অবস্থায় পাকিস্তান ১৭ রানে অগ্রগামী হয়। তৃতীয় দিনের খেলায় নিউজিল্যাণ্ডের ৪ উইকেটে মাত্র ৫৫ রান উঠলে খেলার মোড় অনেকটা পাকিস্তানের অনুকূলে ঘুরে যায়। নিউজিল্যাণ্ড তখন মাত্র ৩৮ রানে অগ্রগামী এবং হাতে জমা ৬টা উইকেট।

চতুর্থ অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ২০০ রানের মাথায় শেষ হয়। এক সময় নিউজিল্যাণ্ড খুবই সংকটের মধ্যে পড়েছিল যখন তাদের ১০১ রানের মাথায় ৮ম উইকেট পড়ে যায়। ৯ম উইকেটের জুটিতে কুনিস এবং বার্জেস দলের ৯৬ রান তুলে পাকিস্তানের জয়লাভের পথে সুদৃঢ় বাধা সৃষ্টি করেন। বার্জেস ১১৯ রান করে নটআউট থাকেন। খেলার বাকি ১৪৮ মিনিটে ১৮৪ রান তুলতে পারলে জয় হবে এইরকম অবস্থায় পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। চা-পানের সময় পাকিস্তানের রান দাঁড়ায় ৪০, দুটো উইকেট পড়ে। চা-পানের পর তাড়াতাড়ি আরও দুটো উইকেট পড়ে গেলে জয়লাভ সম্পর্কে পাকিস্তান হাল ছেড়ে দেয়। এই কারণেই একশ্রেণীর দর্শক উত্তেজিত হয়ে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ে খেলায় বাধা সৃষ্টি করেন।

স্যার ওরেল ট্রফি

লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত স্যার ওরেল ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রথম বছরের ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব ৩ উইকেটে রুসী মোদীর একাদশ দলকে (জামসেদপুর) পরাজিত করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, এই বছর কলকাতার ক্রিকেট লীগ এবং নক-আউট প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান জয়ী হয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

রুসী মোদীর একাদশ : ১০৭ রান (আর মুখার্জি ২৮ এবং এস মুখার্জি নট-আউট ২৬ রান। শ্যামসুন্দর মিত্র ২০ রানে ৪ এবং রমেশ ভাটিয়া ২৬ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৫৩ **রান** (রমেশ সাকসেনা ৯১ রান। জলি সরকার ৬১ রানে ৭ উইকেট)

মোহনবাগান : ১৯৮ (প্রকাশ পোদ্দার ৫১ রান। প্রকাশ ভাণ্ডারী ৩৫ রানে ৬ উইকেট)

ও ৮৬ **রান** (৭ উইকেটে। দেব মুখার্জি ২৭ রান। প্রকাশ ভাণ্ডারী ৩০ রানে ৫ উইকেট)

জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠান

পুনায় পঞ্চদশ বার্ষিক শরৎকালীন জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠানে এ বছরের প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা মহারাষ্ট্র ১৯ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে উপর্যুপরি দুবার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ (উভয়েরই পয়েন্ট ১৩) এবং ৩য় স্থান বাংলা (১১ পয়েন্ট)।

মোহনবাগান ক্লাবের সম্বর্ধনা সভায় অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের হাত থেকে মানপত্র গ্রহণ করছেন মোহনবাগান ক্লাবের সহকারী সম্পাদক শ্রীধীরেন দে।

প্রদর্শনী জিমন্যাস্টিক

ইডেন উদ্যানের ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত প্রদর্শনী জিমন্যাস্টিক আসরে জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের জিমন্যাস্টরা তাঁদের নৈপুণ্য সৌষ্ঠব এবং নয়নাভিরাম ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় দিয়ে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন। পূর্ব জার্মানীর এই জিমন্যাস্টিক দলে ছিলেন পাঁচজন খেলোয়াড়—তিনজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা। পুরুষদের তিনজনই খ্যাতনামা জিমন্যাস্ট — বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ওয়ার্নার ডোর্যোলিং, টোকিও ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী আরউইন কোপে এবং মেক্সিকো ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী গুন্থার বেয়ার। অপরদিকে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রী কুমারী সুসান হেলসেউক এবং কুমারী হেইড ইফম্যান স্বদেশের বর্তমান সময়ের জুনিয়র চ্যাম্পিয়ান।

ওয়ার্ণার ডোর্যোলিং

মোহনবাগান দলের সম্বর্ধনা

১৯৬৯ সালে মোহনবাগান ক্লাবের অভূতপূর্ব সাফল্যের স্বীকৃতিতে উত্তর কলকাতা মোহনবাগান সম্বর্ধনা কমিটির পক্ষ থেকে এক মনোজ্ঞ সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ এবং প্রধান অতিথি হিসাবে সভায় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীশম্ভু ঘোষ। সভায় বহু প্রবীণ ও নবীন খেলোয়াড় এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৯ সালে মোহনবাগান ক্লাব ফুটবল, ক্রিকেট এবং হকি খেলার স্থানীয় ৬টি প্রতিযোগিতায় খেতাব জয়ের সূত্রে যে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দেয় তা বাংলাদেশের খেলাধূলার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। মোহনবাগান ১৯৬৯ সালে ক্রিকেট, হকি এবং ফুটবল খেলার প্রধান প্রতিযোগিতায় 'ডাবল' খেতাব লাভ করে অর্থাৎ লীগ এবং নকআউট চ্যাম্পিয়ান হয়। তাছাড়া তারা টেনিসেও খেতাব জয়ী হয়েছে এবং সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে আয়োজিত প্রথম বার্ষিক স্যার ওরেল ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

দাবার আসর

গজ-ঘোড়ার মাৎ

সমস্ত রকম মাতের গজ, ঘোড়া এবং রাজা দিয়ে বিপক্ষের একক রাজাকে মাৎ করা সবচেয়ে কঠিন। ঘ্‌'টি চালার ব্যাপারে বেশ খানিকটা দক্ষতা না থাকলে গজ-ঘোড়ার মাৎ করা সহজ নয়, কারণ হিসাব করে না চাললে 'পঞ্চাশ চালের সীমা' পেরিয়ে যেতে পারে। সেইজন্যে একা একা কিংবা দ্‌জনে মিলে বারম্বার এই মাৎটা অনুশীলন করলে ভাল।

গজ-ঘোড়ার মাৎ ছকের কোণে ছাড়া করা যায় না। গজটি যদি সাদা ঘরের গজ হয়, তাহলে মাৎ হবে ছকের দ্‌টি সাদা কোণের কোন একটিতে; গজটি কালো ঘরের হলে মাৎ করতে হবে কালো দ্‌টি কোণের কোন একটিতে। সেইজন্য যে পক্ষের রাজা নিঃসঙ্গ, সেই পক্ষ প্রতিপক্ষের রাজা, ঘোড়া এবং গজের মিলিত আক্রমণের চাপে পড়ে সব সময়ই যেতে চেষ্টা করে গজটি যে ঘরের তার বিপরীত রঙের কোণের দিকে। অর্থাৎ গজটি সাদা ঘরের হলে বিপক্ষ রাজা যাবে কালো কোণ দ্‌টির কোন একটির দিকে; কালো ঘরের হলে যাবে সাদা কোণ দ্‌টির কোন একটির দিকে।

ঘ্‌'টি চালনায় খানিকটা দক্ষতা এলে আপনি সহজেই রাজা, গজ এবং ঘোড়ার সহযোগিতায় বিপক্ষ রাজাকে ছকের প্রান্তে এবং কোন একটি কোণের দিকে নিয়ে যেতে পারবেন। সুতরাং শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রধান কর্তব্য হোল কি করে বিপক্ষ রাজাকে একটি কোণ থেকে বার করে অন্য কোণে নিয়ে গিয়ে মাৎ করা যায় সেটি আয়ত্ত করা।

এক কোণ থেকে রাজাকে অন্য কোণে নিয়ে যাওয়ার যে পদ্ধতি আমরা নীচে দিলাম, সেই পদ্ধতিটি প্রথম দেখিয়েছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী সঙ্গীত-রচয়িতা এবং দাবা খেলোয়াড় শ্রীআঁদ্রে ফিলিদর।

ধর্‌ন সাদার রাজা আছে রাজা ৫-য়ে, ঘোড়া আছে রাজাঘোড়া ৫-য়ে, এবং গজ আছে মন্ত্রী ৩ ঘরে। কালোর রাজা আছে রাজাঘোড়া ১ ঘরে। (চিত্রে দেখ্‌ন) এই অবস্থায় মাৎ করতে হলে কালো রাজাকে সাদার মন্ত্রী-নৌকা ৮ ঘরের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

সুতরাং (১) রাজা—গজ ৬ : রাজা—গজ ১ (২) ঘোড়া—গজ ৭ : রাজা—ঘোড়া ১।

এইবারে যে অবস্থা দাড়াল এরকম বা এর কাছাকাছি অবস্থা গজ-ঘোড়ার মাতে আসবেই। এইবারে সমস্যা হোল কালো রাজাকে মন্ত্রীনৌকার কোণের দিকে নিয়ে যাওয়া। লক্ষ্য কর্‌ন কালো রাজার একমাত্র গজ ১ ঘর ছাড়া যাবার অন্য কোন ঘর নেই। সুতরাং গজটির একটি চাল দিয়ে এক চাল অপেক্ষা করলে কালো রাজাকে গজ ১ ঘরে যেতেই হবে, এবং তখন গজ-নৌকা ৭ চাল দিলে কালো রাজাকে মন্ত্রীনৌকার ঘরের দিকে আরো এক ঘর সরে যেতে হবে।

সুতরাং (৩) গজ-ঘোড়া ৬ : রাজা-গজ ১ (৪) গজ-নৌকা ৭ : রাজা-রাজা ১ (৫) ঘোড়া-রাজা ৫। এই অবস্থায় রাজা-রাজা ৬ চাল না দিয়ে ঘোড়া-রাজা ৫ চালটাই দেবেন। অন্‌রূপে সমস্ত অবস্থাতেই এইভাবে ঘোড়াটির চাল দেবেন, তা না হলে মাৎ করতে অনেক বেশী চাল লেগে যাবে।

(৫)......রাজা-মন্ত্রী ১ (রাজাকে গজ ১ ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে কি হোত তা পরে বলছি।) (৬) রাজা-রাজা ৬ : রাজা-গজ ২ (৭) ঘোড়া-মন্ত্রী ৭ : রাজা-ঘোড়া ২ (৮) গজ-মন্ত্রী ৩ (কালো ৭নং চালে রাজা-গজ ৩ চাল দিলেও সাদা এই চালই দিত।) (৮) ......রাজা-গজ ৩ (৯) গজ-নৌকা ৬ : রাজা-গজ ২ (১০) গজ-ঘোড়া ৫ (পাঠক লক্ষ্য কর্‌ন রাজা এবং ঘোড়া দিয়ে কালো ঘরগ্‌লি আটকে রেখে গজটিকে এমনভাবে চালা হচ্ছে যাতে বিপক্ষ রাজা আর বেরোতে না পারে।) (১০) ..... রাজা-মন্ত্রী ১ (১১) ঘোড়া-ঘোড়া ৬ : রাজা-গজ ২ (১২) ঘোড়া-মন্ত্রী ৫ কিস্তি : রাজা—মন্ত্রী ১ (১৩) রাজা—মন্ত্রী ৬ : রাজা—গজ ১ (১৪) রাজা—রাজা ৭ : রাজা—ঘোড়া ২ (১৫) রাজা—মন্ত্রী ৭ : রাজা—ঘোড়া ১ (১৬) গজ—নৌকা ৬ : রাজা—নৌকা ২ (১৭) গজ—গজ ৮ : রাজা—ঘোড়া ১ (১৮) ঘোড়া—রাজা ৭ : রাজা—নৌকা ২ (১৯) রাজা—গজ ৭ : রাজা—নৌকা ১ (২০) গজ—ঘোড়া ৭ কিস্তি : রাজা—নৌকা ২ (২১) ঘোড়া—গজ ৬ কিস্তি মাৎ।
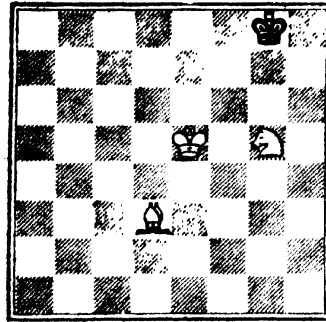
কালো

সাদা

এই পদ্ধতিটি ভালোভাবে ব্‌ঝে গেলে পাঠক সহজেই বার করতে পারবেন কালো অন্য কোনরকম চাল দিলে কিভাবে কালোকে মাৎ করা যাবে। যাই হোক, এইবারে দেখ্‌ন কালো ৫নং চাল রাজা—মন্ত্রী ১ না দিয়ে যদি রাজা—গজ ১ দিত, তাহলে মাৎ করতে আরো ৩টি চাল কম লাগত। যেমন: —(৫).....রাজা—গজ ১ (৬) ঘোড়া—মন্ত্রী ৭ কিস্তি : রাজা—রাজা ১ (৭) রাজা—রাজ. ৬ : রাজা—মন্ত্রী ১ (৮) রাজা—মন্ত্রী ৬ : রাজা—রাজা ১ (৯) গজ—ঘোড়া ২ কিস্তি : রাজা—মন্ত্রী ১ (১০) ঘোড়া—গজ ৫ : রাজা—গজ ১ (১১) গজ—মন্ত্রী ৩ : রাজা—মন্ত্রী ১ (১২) গজ—ঘোড়া ৫ : রাজা—গজ ১ (১৩) গজ—মন্ত্রী ৫ কিস্তি : রাজা—ঘোড়া ১ (১৪) রাজা—গজ [illegible] কিস্তি : রাজা—ঘোড়া ১ (১৫) রাজা—[illegible] ৬ : রাজা—নৌকা ২ (১৫) রাজা—গজ ৫ : রাজা—নৌকা ১ (১৬) রাজা—ঘোড়া [illegible] : রাজা—ঘোড়া ১ (১৭) ঘোড়া—নৌকা [illegible] কিস্তি : রাজা—নৌকা ১ (১৮) গজ—গজ ৬ কিস্তি মাৎ।

চাল মাৎ যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। যেমন প্রথম পদ্ধতিতে সাদা (২) গজ—ঘোড়া ৭ কিস্তি না দিয়ে যদি (২) ঘোড়া—গজ ৬ চাল দিত তাহলে কালো চাল মাৎ হয়ে যেত। গজ-ঘোড়ার মাতে [illegible] রকমের চালমাৎ আসতে পারে। নিচের ৩টি অবস্থা লক্ষ্য কর্‌ন:—

(১) সাদা : রাজা—[illegible] গজ ৬, গজ রাজা ঘোড়া ৬। কালো : [illegible] নৌকা ৫।

(২) সাদা : [illegible] ঘোড়া [illegible] গজ ৬। কালো : [illegible] রাজা নৌকা ১।

(৩) সাদা : রাজা—রাজা গজ ৬, গজ রাজা গজ ৩, ঘোড়া—[illegible] ঘোড়া [illegible] কালো : রাজা—[illegible] নৌকা ৫।

এই ৩ অবস্থায় [illegible] চাল হলে চালমাৎ।

ভুল চাল দিলে কালো [illegible] উপায়েও মাৎ হতে পারে, কিন্তু এই [illegible] চাল দিয়ে কালোকে [illegible] যেমন ধর্‌ন সাদার রাজা আছে মন্ত্রী [illegible] ৩ ঘরে, ঘোড়া আছে মন্ত্রী ঘোড়া ৫ [illegible] কালোর রাজা আছে মন্ত্রী ঘোড়া ৮ [illegible] এমন অবস্থায় সাদা গজের কিস্তি দিতে পারলেই মাৎ। কিম্বা ধর্‌ন সাদার [illegible] আছে মন্ত্রী ৩ ঘরে, গজ আছে মন্ত্রী [illegible] ঘরে, কালোর রাজা আছে মন্ত্রী ৮ [illegible] এমন অবস্থায় ঘোড়ার কিস্তি দিলেই [illegible] মাৎ হয়ে যাবে।

(৫).....রাজা—গজ ১ চাল [illegible] তারপর যে চালগুলি আসত, সেগুলি বর্ণনা করবার সময় আমরা দেখেছি [illegible] ১৩ নং চাল রাজা—ঘোড়া ১ দিয়েছে। [illegible] তা না হলে কালোকে মন্ত্রী—১ ঘরে [illegible] যেতে হয় এবং তাহলেই (১৪) ঘোড়া—রাজা ৬ অথবা ঘোড়া ৭ কিস্তি মাৎ।

—গজানন্দ ঘোষ

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

মহাত্মা গান্ধীর
শতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি

গান্ধী পরিক্রমা

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্
রাজাগোপালাচারী
কাকা কালেলকর
কৃপালনী
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
জয়প্রকাশ নারায়ণ
অন্নদাশঙ্কর রায়
অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
নারায়ণ দেশাই
বিজয়কুমার ভট্টাচার্য
আর, আর, দিবাকর
নির্মলকুমার বসু
হরিদাস মিত্র
নলিনীকিশোর গুহ
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়
অরুণচন্দ্র গুহ
ডাঃ জাকির হোসেন
বিনোবা ভাবে
শংকর রাও দেও
দাদা ধর্মাধিকারী
ইউ, এন, ঢেবর
হুমায়ুন কবির
সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
প্রমথনাথ বিশী
রতনমণি চট্টোপাধ্যায়
সুবোধ ঘোষ
রেজাউল করীম
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত
অম্লান দত্ত
ক্ষিতীশ রায়
দক্ষিণারঞ্জন বসু
সাধনা ঘোষ
শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রমুখ ৫০ জন শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনা-সমৃদ্ধ

।। পনেরো টাকা ।।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
মুক্তকের বিরল

গান্ধীজীবনী ১॥

নীতিকথা মালা -৬২

মহাত্মা গান্ধীর

সত্যাগ্রহ ৭॥

আমার ধ্যানের ভারত ৪॥

ছাত্রদের প্রতি ৫॥

আমার ধর্ম ৫,

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গান্ধীজীর গঠন কর্ম ৪॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নগর পারে রূপনগর

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশের পথে—১৫,

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দৃষ্টিপ্রদীপ

নূতন মুদ্রণ—সাত টাকা

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর
শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন

কাব্য-মালঞ্চ ৬,

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

যাত্রা গানে রামায়ণ ৯,

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর

বাঙ্গালী জীবনে রমণী ১০,

নলিনীকান্ত সরকারের

দাদাঠাকুর ৫॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

গৌরাঙ্গ পরিজন ১০,

।। নূতন বই ।।

সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস

ত্রিনয়ন ৪,

বিমল করের উপন্যাস

সঙ্গিনী ৪,

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

মুক্তাসম্ভবা ৫,

নীহাররঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস

কন্যাকুমারী ৬,

লীলা মজুমদারের

সুকুমার রায় ৪॥

আর কোনখানে ৫,

নির্মলকুমারী মহলানবিশের
।। রবীন্দ্র জীবনের এক নূতন অধ্যায় ।।

কবির সঙ্গে য়ুরোপে ১০

[illegible] [illegible]র ভ্রমণোপন্যাস

[illegible], সুন্দরী নেফা ৫,

।। [illegible] নূতন বই ।।
[illegible] মজুমদারের
[illegible]শো মজার বই

নেপোর বই ৩॥

বেঁড়ে বেড়াল নেপোর বই-সহ অন্তর্ধানের পরবর্তী লোমহর্ষণ রহস্যের ব্যাপার আর চন্দ্রযন্ত্রী ছোট মামা, বেকায় অভিজ্ঞ বড় মাস্টার, সন্দেহজনক ছোট মাস্টার দপ্তরে টিকটিকি নিতাই সামন্তের নানারকম কীর্তিকলাপ

সুখলতা রাওর
সর্বশেষ বই

নূতনতর গল্প ২,

সুখলতা রাওয়ের লেখা যারা ভাল বলে তারা নিশ্চয়ই এই বইখানি পড়বে।

সুমথনাথ ঘোষের

কিশোর গ্রন্থাবলী ৪॥

এর মধ্যে লেখকের আশ্চর্য বই 'বাংলার টার্জন' আর 'প্রথম হিমালয় অভিযান' আরও অনেক গল্প

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

কিশোর গ্রন্থাবলী ৪॥

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২/৩৪-৮৭৯১

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃতের কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে অমৃতের কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৯ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

২৯শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 28th Nov., 1969 শুক্রবার, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ **40 Paise**

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীতুষার সান্যাল

দিল্লীর যুব উৎসব

'দিল্লীর যুব উৎসব' শিরোনামায় শ্রীপ্রতীক রায় লিখিত যে, পত্রটি ২৩ আশ্বিনের অমৃতে প্রকাশিত হয়েছে, আমি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই। দিল্লীতে আমি তিন বছর কাটিয়ে সম্প্রতি কিছুদিন আগে কলকাতায় এসেছি। তাই শ্রীরায় যেখানে লিখেছেন,—'এখানে মেয়েরা যখন খুশি, যেভাবে খুশি, যেখানে খুশি একলা চলাফেরা করতে পারে।...কলকাতার মত দিল্লীতে আড্ডাবাজি নেই এবং 'ইভ-টিজিং'ও আনুপাতিকভাবে কম।'—তা পড়ে বড় বিস্মিত হয়েছি। কারণ, তিনি সত্য ঘটনা ত বলেনই নি বরং, কলকাতার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছেন। গত ১৯৬৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর রাত্রে দিল্লীতে কনট প্লেসের মত জায়গায় বেশ কিছু উচ্ছৃংখল যুবক মত্ত অবস্থায় রাস্তার গাড়ী থামিয়ে মেয়েদের নামিয়ে বিবস্ত্র করে ও যথেচ্ছ অপমান করে। পুলিশের জ্ঞাতসারেই এই ঘটনা ঘটে। কিন্তু তারা বাধা দেবার কোন চেষ্টাই করে নি। এরপরও এই বিষয়ে উপযুক্ত তদন্ত বা দোষীদের শাস্তির কোন ব্যবস্থাই হয় নি। এরপর কিছুদিন আগে দিল্লীর হাসপাতালের নার্সদের নিয়ে অনেক অপকর্ম করা হয়েছিল যার বলি হিসাবে কয়েকজন নার্স আত্মহত্যা করে লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য। এই ঘটনার অবশ্য তদন্ত হয়েছে। এছাড়া গত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ধর্মঘটের সময়ে দিল্লীর ইন্দ্রপ্রস্থ ভবনে পুলিশের হাতে মহিলা কর্মচারীদের শ্লীলতাহানি হয়। এই ঘটনার কোন প্রতিকারই হয় নি আজ পর্যন্ত। দিল্লীতে ট্যাক্সি ড্রাইভাররা মহিলা যাত্রীদের নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে এ রকম ঘটনা বেশ কিছু ঘটেছে। গত বৎসর হোলির সময়ে দেখেছি, একদল যুবক রাস্তার ধারে কয়েকটি মেয়েকে ধরে রং মাখাল, তাতে পথচারীরা কোন প্রতিবাদ করার বদলে বেশ উপভোগই করতে লাগল আর মেয়েগুলি অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। কলকাতায় এ রকম ঘটনা ঘটলে যে রকম পাবলিক 'রিঅ্যাকশন দেখা' যায়, দিল্লীতে তার কিছুই দেখা যায় নি। দিল্লীর মত নির্জীব, নিষ্প্রাণ শহর ভারতে বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি নেই, এখানকার লোকে এত বেশী মাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক যে দেখে অবাক লাগত। দিল্লীতে 'ইভটিজিং' মোটেই কম নয়,—এইত বছর দুয়েক আগে পার্লামেন্টে দিল্লীর গুণ্ডামি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল তখন কয়েকজন সংসদ সদস্য দিল্লীকে 'শিকাগো অফ ইণ্ডিয়া' আখ্যা দিয়েছিলেন। দিল্লীর বাস কণ্ডাকটররা যে রকম দুর্ব্যবহার করে যাত্রীদের সঙ্গে তা আর কোন শহরে হয় না। 'কলকাতার মত দিল্লীতে আড্ডাবাজি নেই'—ঠিকই, কারণ সেখানকার যুবসমাজের একটি বৃহদংশ আরও উচ্চমার্গে উঠে গেছে। সেখানে মদ্য পানের প্রাবল্য খুব বেশী; 'আনুষঙ্গিকও' আছে। পাঞ্জাবের সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রী কয়েক দিন আগেই বলেছেন, সেখানে যুবকদের মধ্যে 'ড্রাগ অ্যাডিকশান' বৃদ্ধি পেয়েছে ভীষণ ভাবে (স্টেটস্‌ম্যান ১১ই অক্টোবর দ্রষ্টব্য)। দিল্লীর অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। এখানে আড্ডাবাজির পাশে পাশে সাংস্কৃতিক চর্চাও আছে কিন্তু দিল্লীতে এই অন্য দিকটি বড়ই দুর্লভ। তিনি লিখেছেন, 'কলকাতাতেই বরং দেখেছি মেয়েরা সন্ধ্যার পর গোলমালের ভয়ে একলা পথে বেরোয় না বা বেরোতে চায় না।' তাঁর উক্তিটি সত্যই হাস্যকর। এখানে ত' দেখছি সন্ধ্যার পর রাস্তায়-ঘাটে মেয়েদের ভীড়ে গিজ্‌গিজ্‌ করে, বিশেষ করে পূজার সময়ে। দিল্লীতেই বরং রাস্তায় এত মেয়েদের ভীড় দেখি নি। বড় ধরনের গণ্ডগোলের সময়ে যে মেয়েরা এখানে রাস্তায় বেরোতে চায় না, তার কারণও হতাহত হবার ভয়ে, শ্লীলতাহানির ভয়ে নয়। আর রাজনীতি ত' দিল্লীর ছেলেরাও করে—তবে সে অন্য রাজনীতি; তার থেকে এখানকার রাজনীতি ভাল।

আচ্ছা, কমনওয়েলথ যুব উৎসবে 'বিট সো'র আয়োজন হয়েছিল কেন? এটা কি যুব-উৎসব না কার্ণিভাল? উদ্যোক্তাদের রুচি যে কত নিচু স্তরের এর থেকে তা বোঝা যায়। সাংস্কৃতিক অবনতিটা উত্তর ভারতে অনেক বেশী হয়েছে পূর্ব ভারতের তুলনায়। সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল, কমেক্স-৩এর প্রতিনিধিরা সঙ্গিনীদের সঙ্গে এক তাঁবুতে থাকতে চেয়েছিল, তাঁবু থেকে ভারতীয়দের জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল আর বলেছিল, তারা নাকি বিকিনির সঙ্গে রামধুনের মিল ঘটাতে চায়। কাজেই, এই প্রতিনিধিরাই বা কোন শ্রেণীর তা বোঝা যায়—মিনিস্কার্টশোভিতা কয়েকজন ছাত্রীর ছবি ত সংবাদপত্রেই দেখেছি। বিকিনির সঙ্গে রামধুনের তুলনা করা পরোক্ষভাবে গান্ধীজীর প্রতিই অশ্রদ্ধা প্রদর্শন। কলকাতার কোন যুব-উৎসবে কিন্তু 'বিট সো' হয় নি এখনও পর্যন্ত। বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিদল ত' নিজেরাই উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করেছিলেন, কিন্তু শ্রীরায় এ ক্ষেত্রেও উদ্যোক্তাদেরই সমর্থন করেছেন—যদিও সমস্ত সংবাদপত্রেই উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অব্যবস্থার অভিযোগ করা হয়েছিল।

কণিকা দত্ত
কলিকাতা-৮

বিগত টেস্ট প্রসঙ্গে

ছোটবেলায় একটা প্রবাদ শুনেতাম মা-ঠাকুরমার মুখে, যে যত বড় তার স্বভাব-চরিত্রের তত উন্নতি হয়। কিন্তু আমাদের ভারতীয় ক্রিকেট দলের পক্ষে কথাটা যেন একটু বেখাপ্পা ঠেকে। যে দেশ আজ পর্যন্ত ১০০টিরও বেশী টেস্ট ম্যাচ খেলেছে, সে দেশ যে কি করে স্বল্পখ্যাত এবং ভারত অপেক্ষা ন্যূনতম টেস্ট ম্যাচ খেলেছে, সেই নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলতে হিমসিম খেয়ে যায় সেটাই আশ্চর্য। আর এই দেশ খেলবে কিনা বর্তমানের টিম অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে। আমার সন্দেহ হচ্ছে নাকানি-চোবানি না খেতে হয়। যদিও এই টেস্টের প্রাক্কালে প্রশিক্ষণ শিবির ডাকা হয়েছে, তবুও আমার অভিমত, যতদিন পর্যন্ত এই দেশের ক্রিকেট বা যে কোন খেলায় দলীয় স্বার্থ, রাজনীতি ও স্বজন-পোষণ হ্রাস না হবে ততদিন পর্যন্ত এ-দেশের উন্নতি হবে না।

বিগত টেস্টে নামী ও দামী খেলোয়াড়েরা খেলতে নেমে সেঞ্চুরী ত' দূরের কথা, দু'অংকের রাণ সংখ্যা করতেই হিমসিম খেয়েছেন। বিগত টেস্টে আমাদের কোন খেলোয়াড়ই ৭০ রাণও করতে পারেন নি। কিন্তু আগন্তুক দলের একাধিক খেলোয়াড় ৭০ এর বেশী রাণ করেছেন। এর চাইতে যদি সর্ব-ভারতীয় স্কুল ক্রিকেটের খেলোয়াড়দের আগন্তুক দলের বিরুদ্ধে টেস্ট-ম্যাচ খেলতে দেওয়া হত তাহলে ওরাই বোধ হয় প্রতি ইনিংসে দুশোর মত রাণ ত করতই এমন কি বলে বলে ভেল্কি দেখিয়েও ছাড়ত। বিগত টেস্টের কোন ইনিংসেই ভারতীয় দল ৩০০ রানও করতে পারে নি, কিন্তু ওরা পেরেছে।

আমি 'অমৃত' কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি, এ সম্বন্ধে একটি বলিষ্ঠ রচনা প্রকাশের জন্য।

কয়েক দিন আগে কাগজে দেখলাম আগামী ১৯৭১ সালে এই ভারতীয় দল নাকি ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর করবে। আমার মনে হয় ভারতের মান-সম্মানকে আর 'গৌরবান্বিত' করার জন্য এই ক্রিকেট দলকে না পাঠিয়ে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেনের কথা স্মরণ করাই উচিত—ভারতের

খেলাধূলোর মান বাড়াতে হলে সর্বপ্রথম উচিত বিদেশ সফর বন্ধ করা।

শুভেন্দু চক্রবর্তী
হাইলাকান্দি, কাছাড়
আসাম

অমৃত সম্পর্কে

শারদীয় অমৃত পড়ে খুবই আনন্দ হয়েছে। লেখাগুলি সত্যই প্রশংসনীয়। অমৃতের সাধারণ সংখ্যাগুলি পাঠ করেও আমি অত্যন্ত তৃপ্তি পাই। 'অমৃত' পরিচালকদের নিকট আমার নিবেদন তাঁরা পত্রিকাখানিকে আরো ভালো করার চেষ্টা করুন।

অমৃতের লেখক, শিল্পী ও সম্পাদককে আমি শুভেচ্ছা জানাই। তাঁদের প্রচেষ্টা সুফলপ্রসূ হোক।

রাধানাথ রায়
ঝাড়াপাড়া, পুরুলিয়া

আজকের নাম ও আমরা

গত ২৮শে কার্তিকের অমৃতে পার্বতী গুহ আজকের নাম নিয়ে বেশ একটা চিন্তাকর্ষক সমস্যার বিষয় অবতারণা করেছেন। কতকগুলি নামের উদাহরণ দিয়ে লিখেছেন—স্ত্রী-পুরুষ সংজ্ঞা নিয়েও বেশ ঝামেলা সহ্য করতে হচ্ছে। আমার মতে, শুধু স্ত্রী-পুরুষ সংজ্ঞা নিয়েই নয়, স্থান-কালের পটভূমিকায় নাম নিয়ে অনেক সময় বিভ্রান্তি ঘটে। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কর্ম উপলক্ষে আমি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছি। বর্তমানেও আছি, তবে ঘটনাটি এখানকার নয়, আগের কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের। প্রায় বিশ বছর আগের ঘটনা। সাধরণতঃ নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে ভারতের নানান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক কংগ্রেস, কনফারেন্স অধিবেশনের ধূম পড়ে। ঐ সকল অধিবেশনে যোগদানে ইচ্ছুক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আবেদনপত্রগুলি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। তারপর সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় যাঁদের মনোনয়ন দেন মাত্র তাঁরাই সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে অধিবেশনে স্থান পান। যখনকার কথা বলছি, তখন এই দপ্তরটি আমার হাতে ছিল। আবেদনকারীদের মধ্যে কোন এক মহিলা-কলেজের একজন লেকচারারের আবেদনও ছিল। অন্যান্য বাছাই আবেদনপত্রগুলির সঙ্গে মহিলা কলেজের এই আবেদনপত্রখানি বিবেচিত হওয়ার জন্য আমি বিশেষভাবে সুপারিশ করি। আমার সুপারিশ কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে সমর্থন করে নিলেন। তারপর আমি তালিকাটি গভর্ণমেন্টে পাঠিয়ে দিই। তখনকার দিনে গভর্ণমেন্ট এই সকল ডেলিগেটদের রাহা-খরচ ইত্যাদির অর্ধেক বহন করতেন, বাকী অর্ধেক বহন করতে হতো সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে। যথা সময়ে গভর্ণমেন্ট থেকে জবাব এলো—তালিকাভুক্ত অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিশেষ করে মহিলা প্রতিনিধির প্রস্তাব গভর্ণমেন্ট সানন্দে মঞ্জুর করেছেন। আমিও তালিকাভুক্ত সকলকে জানিয়ে দিলাম, তাঁরা অধিবেশনে যোগদানের পর যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে রাহা খরচ নিয়ে যান। তারপর অধিবেশনগুলি শেষ হলে একে একে সকলেই এসে রাহা খরচ নিয়ে গেলেন, কিন্তু শ্রীমতী পরাগ বন্দোপাধ্যায়ের দেখা নাই। চার ছ মাস কেটে গেলে সেই মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা-র সঙ্গে দেখা হলে সখেদে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি এত তদ্বির করে ব্যবস্থা করে দিলাম শ্রীমতী পরাগ দেবী অধিবেশনে গেলেন না কেন? উত্তরে অধ্যক্ষা হাসতে হাসতে বললেন, আরে সার, পরাগ ব্যানার্জি জনানা নেহি মর্দানা। তারপর আপন মনে হেসে লুটিয়ে পড়ছেন তিনি। যত হাসেন তিনি বেকুবির লজ্জায় তত নুইয়ে পড়ি আমি।

তিনি উঠে গেলে ফাইলটা টেনে নিয়ে দেখলাম আবার। সত্যি তো মিস্টার পি ব্যানার্জি রাহা খরচের বিলটা আমার কাছ থেকেই পাশ করে নিয়ে গেছেন। বোধহয় আমার ব্যস্ততার মধ্যে। কেমন করে অনুমান করি মহিলা কলেজে দুজন পুরুষ লেকচারার থাকতে পারেন, যাঁদের মধ্যে একজনের নাম পুরুষকেও দেওয়া যায় নারীকে দিলেও বেমানান হয় না।

পার্বতী গুহ নামটাও আমার কাছে তেমনি ঠেকছে। শ্রীমান লিখবো কি শ্রীমতী লিখবো ঠিক করতে না পেরে হয়তো অপরাধ করে বসলাম। এখন প্রশ্ন, তিনি নিজের নামে এ সমস্যা রাখলেন কেন?

সে যাই হোক, একটা সময়োপযোগী সমস্যা তুলে ধরেছেন বলে ধন্যবাদ জানাই পার্বতী গুহকে।

ত্রিদিবেশ ঘোষ
রাঁচি—১।

একজন প্রবীণ গ্রন্থকার

আপনাদের 'চিঠিপত্র' বিভাগে আচার্য নলিনীমোহন সান্যাল সম্বন্ধে শ্রীশৈলজা বাগচী ও শ্রীবলরাম ঘোষের চিঠি পড়ে ক' লাইন লিখছি। ১৯৬৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রচারিত এক কথিকায় এই আক্ষেপ শুনিয়ে তিরুবাল্লুবরের তামিল ধর্মগ্রন্থ 'কুরল'-এর কোনও বাংলা অনুবাদ নেই। এই আক্ষেপ সম্পূর্ণ অমূলক। নলিনীবাবু এই ধর্মগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন এবং ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (এখন জাতীয় অধ্যাপক) তার ভূমিকা লিখেছিলেন। অবশ্য আজকাল এই গ্রন্থের কথা অনেকেরই না জানার কথা, কারণ গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য। পণ্ডিত নলিনীমোহন অনেক সদগ্রন্থ লিখে গিয়েছেন—হিন্দী, বাংলা ও ইংরাজীতে। তাঁর 'ভারতে লিপিবিদ্যার বিকাশ' 'বিহারী ভাষায়ো কি উৎপত্তি ঔর বিকাশ' 'ভক্তশিরোমণি মহাকবি সুরদাস', 'রামমোহন' 'মীরাবাঈ' ইত্যাদি গ্রন্থের কথা অনেকেই জানেন না। সাহিত্য অকাদমী তাঁর গ্রন্থাবলী অনায়াসে প্রকাশ করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকর সাহায্য করলে এই মূল্যবান রচনাবলীর পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হতে পারে। পুত্র অধ্যাপক বিনায়ক সান্যাল, এবং নলিনীবাবুর অসংখ্য খ্যাতিমান ছাত্রেরা (বলরামবাবু তাঁদের অনেকেরই কথা লিখেছেন) এ ব্যাপারে উৎসাহিত হবেন বলে আমি আশা করছি।

অলোক চৌধুরী
জিওলজি ডিপার্টমেন্ট
আই আই টি খড়গপুর।

'মাছ' প্রসঙ্গে

আমি অমৃতের নিয়মিত পাঠক। প্রায় পাঁচ বছর থেকে অমৃতের প্রতিটি সংখ্যা পড়ে আসছি। শাল মহুয়া ও পলাশ গাছে ঘেরা এই কিরিবুরু পাহাড়। এই পাহাড়ের একঘেয়ে জীবনযাত্রায় 'অমৃত' যেন অমৃত এনে দেয় জীবনে। আমি আরও পত্র-পত্রিকা পড়ি। কিন্তু অমৃতের মত কোন পত্রিকাই আমার কাছে এত ভাল লাগে না। এর কারণ অমৃতের উপন্যাস বিশেষ করে ছোটগল্পগুলো অতি বাস্তব মনে হয় আমার কাছে। যার জন্যে সপ্তাহের অমৃত আসবার দিনটার অপেক্ষায় বসে থাকি। কোন কোন সময় দু-একদিন দেরী হয় অমৃত পেতে। এই দিনগুলো কাটান কষ্টকর মনে হয় আমার কাছে।

অমৃতের ২৭শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীসুভাষ সিংহ মহাশয়ের 'মাছ' গল্পটি বেশ ভাল লাগল। লেখক একটা ছোট্ট গল্পের মধ্যে সরল অনাড়ম্বর ভাষায় বর্তমান দরিদ্র সমাজ-জীবনের ছবি এঁকেছেন। এ গল্পের পটভূমি অতি বাস্তব। সদানন্দ সুধা ও খোকার মত, এই ফলে, ফুলে কলহাস্যে ভরা পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ মনের অবচেতনে দারিদ্র্যের বোবা কান্না নিয়ে বেঁচে থাকে। লেখককে আমার ধন্যবাদ জানাই।

অতুলচন্দ্র মিত্র
কিরিবুরু, সিংভূম

সাদা চোখে

ভারতবর্ষ যে বিচিত্র দেশ একথা সেলুকাসকে বলবার আগে অন্যরা জানতেন কিনা, ইতিহাসে তার স্বীকৃতি নেই। কিন্তু সেলুকাসের অবগতির পর থেকেই এই বক্তব্য যে সত্য তা অদ্যাবধি কেউ অস্বীকার করেন নি। হালফিল নয়াদিল্লীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যে ঘটনা ঘটল তার অনিবার্য পরিণতি ঐ ঐতিহাসিক বক্তব্যের ভিত্তিভূমিকে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছে। এই উপমহাদেশের একই দলীয় শাসকগোষ্ঠী প্রশাসনিক ও বিরোধী দলের স্বীকৃতি লাভ করল। বিরোধী দলের স্বীকৃত ভূমিকা লাভের জন্য যাঁরা এতদিন পরিশ্রম করলেন—তাঁদের আশাকে আপাতত নির্মূল করে দিয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দুই অংশ "একোদর ভিন্ন গ্রীবায়" রূপান্তরিত হয়ে বিশ্বের বৃহত্তম "গণতন্ত্রে" শাসক ও বিরোধীদলের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা বোধহয় সাময়িকভাবে মিটিয়ে দিল। তবুও কেউ যদি এই দেশকে বিচিত্র বলে আখ্যাত করতে গররাজী হন, তিনি ইতিহাসকে উপেক্ষা করার ঝুঁকি নিয়ে বাস্তবকে অস্বীকার করতে পারেন। পৃথিবীর অন্য দেশের ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে এখনও কেউ উল্লেখ করেন নি।

এই বিস্ময়কর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা এই দেশের সার্বিক অবস্থার নব মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন। কেউ কেউ এই বিভাজনের গুণগত ও সংখ্যাগত পার্থক্যের তারতম্য বিশ্লেষণে রত। কেউ বা বিচার করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে কৌশলও স্থির করে ফেলেছেন। আবার দোটানায় পড়ে কোন কোন দল রাজনৈতিক বক্তব্য ঠিকই করতে পারছেন না। তবে কেউ কেউ ইতিমধ্যে সরাসরি বর্তমান সরকারের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কি প্রগতিশীল কি প্রতিক্রিয়াশীল, কি বামপন্থী কি দক্ষিণপন্থী সকলেই যে চিন্তার দৈন্য থেকে ভুগছেন, একথা পরিষ্কার বোঝা যায়, বিশেষ করে বামপন্থী দলগুলির তত্ত্বগত সিদ্ধান্তের ওপর যে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির অশুভ ছায়া পড়েছে তা ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। কেউ হয়ত ব্যঙ্গ করে বলবেন তত্ত্বগত বক্তব্য ও কৌশলের মধ্যে পার্থক্য না জানা থাকার ফলেই সবকিছু জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে বোধহয় তা নয়। একটু চিন্তা করলেই মনের মুকুরে ভবিষ্যৎ ভূমিকার প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে।

গণতন্ত্রে গঠনমূলক বিরোধিতা বলে একটা কথা আছে। ভারতের বামপন্থী দলগুলো বিশেষ করে যাঁরা রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়া অন্য কিছুর স্বপ্ন দেখতেও রাজী নন, সেই সমস্ত দলই ইন্দিরা সরকারের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। এবং তাঁদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দুটি উপাদান পাওয়া যায়। এক নম্বর, প্রতিক্রিয়াশীল সিন্ডিকেট ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দল, যথা—স্বতন্ত্র, জনসংঘ ইত্যাদি যদি প্রগতিশীল ইন্দিরা সরকারকে গদীচ্যুত করবার চেষ্টা করে তবে বিপ্লবী বামপন্থী দলগুলি ইন্দিরা সরকারকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। আর দু নম্বর হচ্ছে, ইন্দিরাজী যে সমস্ত কর্মপদ্ধতি, বিশেষ করে অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করবেন, তার গুণাগুণ বিচার করে লোকসভায় তাঁরা সমর্থন জানাবেন। এই সিদ্ধান্তগুলিকে কেউ জাতীয় গণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করবার জন্য কৌশল বলে আখ্যা দিচ্ছেন। কিন্তু সাদা চোখে দেখলেই বুঝতে পারবেন একেই বলে গঠনমূলক বিরোধিতা বা Constructive Opposition! এতদিন এই গঠনমূলক বিরোধিতার কথা যাঁরাই বলতেন তাঁদের প্রতি ধিক্কার দেওয়া হত। কারণ, তাঁরা নাকি পরিষদীয় গণতন্ত্রের নাগপাশে বদ্ধ হয়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে ঠেকিয়ে রাখছিলেন। আরও কড়া কথায় বললে এই দাঁড়ায় যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখে তথাকথিত প্রগতিশীলতার আলখাল্লা পরে এই সমস্ত শক্তি শুধু জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছিলেন তা নয়, পরোক্ষে ধনবাদীদের দালালি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গোস্তাকী মাপ করবেন। উপরের এই নির্মম কঠোর বাক্যবাণ রাজনৈতিক বক্তব্য মাত্র। কাউকে আঘাত দেওয়ার জন্য একথা বলা হচ্ছে না। যাঁরা এই সমস্ত কথা বলতেন, তাঁরাও কৌশলের নাম করে অজান্তে পরিষদীয় গণতন্ত্রে গঠনমূলক বিরোধী পক্ষের জুতোয় পা গলিয়ে দিচ্ছেন, এই নির্মম সত্য স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করবেন তাতে আর সন্দেহ কি। আমার এ কথার সঙ্গে একমত না হলে কিছু এসে যায় না, ইতিহাস চোখে আঙুল দিয়ে ভবিষ্যতেই সত্যি মিথ্যা দেখিয়ে দেবে।

কেউ কেউ বলছেন, সমর্থন বা অসমর্থন নির্ভর করবে কর্মসূচীর উপর। কিন্তু কর্মসূচী যাঁরা বাস্তবে রূপায়ণ করবেন সেই মানুষগুলির শ্রেণী-চরিত্রের কোনো ভূমিকা থাকবে না, একথা কিভাবে বিশ্বাস করা যায়? যাঁরা ওপারে ছিলেন তাঁরা এপারে আসার পরই বদলে যাবেন এমন গ্যারান্টি কোথায়? পরিবেশ হয়তো কিছু পালটে গেছে, হয়তো মানসিকতার ওপর একটু প্রতিক্রিয়াও উঠেছে। কিন্তু তাই বলে এপারে আসার পর কেউ দেবত্ব লাভ করবেন এমন নিশ্চয়তা কোথায়? পরিষদীয় গণতন্ত্র মানি না, অথচ অকুণ্ঠচিত্তে এর মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে দলের কৌশল বদলাতে হচ্ছে—এই দুয়ের মধ্যে চিন্তার সামঞ্জস্য আনা কঠিন নয় কি? কেউ কেউ আবার নিজেদের বিপ্লবী চরিত্র বজায় রাখবার জন্য সদর্পে বলছেন, ইন্দিরাপন্থীদের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা করবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই বক্তব্যও যে আবার বদলাতে হবে, কেরলের যুক্তফ্রন্টের দশা দেখে তা প্রতীয়মান করা কিছুই কঠিন নয়। সেখানে যাঁরা বর্তমানে সরকার চালাচ্ছেন, তাঁরা বলছেন, যদি কংগ্রেসীরা সমর্থন করে আমরা কি করতে পারি? কথাটা খুবই সত্যি। কিন্তু আবার একথাও বলা যায়, কংগ্রেস যে এমতাবস্থায় সমর্থন করবে অর্বাচীনেও আগে থেকে তা বলে দিতে পারত। কিন্তু এই অবস্থা যদি লোকসভায় ঘটে, এবং সেখানে যদি সিন্ডিকেট এগিয়ে আসে, তাহলেও সেখানে সেই সমর্থন প্রতিগন্ধময় হয়ে উঠবে কেন? অবশ্য সবই কৌশল বলে আখ্যা দিয়ে উতরে যাওয়ার চেষ্টা করা যায় বটে, কিন্তু আখেরে তা সম্ভব হয় না। কিছু কিছু পশ্চিমী দেশে যা ঘটেছে এখানেও কয়েকটি দল সেই গণতন্ত্রের ফাঁদে পা দিচ্ছেন।

কংগ্রেসের বিভাজনের ফলে পরিষদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ মনে হয় উজ্জ্বল হয়েই উঠল। ইন্দিরাজী এতদিন কেন তাঁর সমাজবাদী পরিকল্পনা রূপায়ন করতে পারছিলেন না, সেই বক্তব্য দেশবাসীর কাছে অকাতরে নিবেদন করেছেন। সেই বাধা যা এতদিন দুস্তর বলে পরিগণিত হচ্ছিল তা এখন উত্তরণের পথে। লোকসভায় তার প্রথম পরীক্ষা হয়ে গেল। সেই অগ্নিপরীক্ষায় ইন্দিরাজী উত্তীর্ণ হয়েছেন। এবং তাঁদের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নয়াদিল্লী অধিবেশনের পর ইন্দিরাজীর কংগ্রেস দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল রূপেও পরিগণিত হবে। দলীয় শক্তি ও লোকসভার শক্তি নিয়ে মাখনের মধ্যে ছুরি চালাবার মতই বিনা বাধায় ইন্দিরাজী তাঁর নির্দিষ্ট সমাজবাদী কর্মপন্থার সড়ক দিয়ে এগিয়ে যেতে পারবেন। বলতে কি, লোকসভায় অখণ্ডিত কংগ্রেসের যে শক্তি ছিল তার চেয়ে দেড়গুণ বেশী শক্তি নিয়েই ইন্দিরাজী এগুতে পারবেন। অতএব প্রকৃত কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যেও সত্যিকারের ভরসা দেখা দেবে। কারণ কংগ্রেস পরিত্যাগ করে এতদিন তাঁদের যাওয়ার মত অন্য কোন দল ছিল না। হয়

ভূদান, না হয় সর্বসেবা সংঘে যোগদান করে নিজেদের দেশসেবার বাসনা চরিতার্থ করতে হ'ত। অবশ্য প্রদেশ ভিত্তিক দল গড়ে অনেকেই সক্রিয় রাজনীতিতে থেকে গেছেন। কিন্তু এখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে কংগ্রেস কর্মীদের আর অসুবিধা দেখা দেবে না। তাঁরা প্রয়োজনমত পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কখনও এদল কখনও অন্য দল অর্থাৎ কংগ্রেসের দুই দলের মধ্যে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত ঘোরাফেরা করতে পারবে। আর সিণ্ডিকেট যত প্রতিক্রিয়াশীল এখন মনে করা হচ্ছে কিছুদিন বাদে সেই অবস্থাও হয়তো থাকবে না। কারণ, বিরোধী ভূমিকায় থাকার ফলে সমাজবাদী কর্মপন্থ প্রশাসনিক যন্ত্রের মাধ্যমে বানচাল করে দেওয়ার সুযোগ তাঁদের আর রইল না। অবশ্য তাঁদের নেতা ডঃ রামসুভগ সিংও পরিষ্কারভাবে সেকথা বলেছেন। বিশেষ করে কংগ্রেসের দশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী রূপায়ণের প্রশ্নে সরকারকে তাঁরা সাহায্যই করবেন। দেখে শুনে মনে হয়, আজ যাঁরা প্রতি-বিপ্লবী কিম্বা কয়েকদিন পূর্বেও প্রতি-বিপ্লবী বলে আখ্যাত হতেন তাঁরা এখন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সহযোগী হয়ে উঠেছেন। কথায় আছে কান টানলে মাথা আসে। অতএব নেতারাই যখন পাল্টে যাচ্ছেন, তাঁদের অনুগামী অসংখ্য জনসাধারণের মধ্যেও যে তখন পরিবর্তন আসবে এতো স্বাভাবিক।

ইন্দিরাপন্থী থেকে শুরু করে সকলেই এখন সিণ্ডিকেট বিরোধী। এই বিরোধিতা থেকেই উত্তরপ্রদেশ সরকার, যা একান্তভাবে কংগ্রেস অধ্যুষিত ছিল, তা ভেঙে কোয়ালিশন সরকার করার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছে। অতএব, প্রত্যেক রাজ্যেই নতুনভাবে রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস হতে শুরু করবে।

এই সর্বভারতীয় রাজনৈতিক পটভূমিকার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্টেও একটি ধাক্কা লাগবে। এবং তার সময় অত্যাসন্ন। ইন্দিরা-রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে পশ্চিম বাংলার ফ্রন্ট সরকারে ফাটল ধরতে বাধ্য। কেউ কেউ বলছেন, আপাততঃ এই সম্ভাবনা নেই। কেউ বলছেন, সকল দলই ফ্রন্টের উপযোগিতা সম্পর্কে আরও বেশী সচেতন হয়েছেন। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যারা যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তার উপর যত বেশী জোর দিচ্ছেন, তাঁরা মনে হয় ততই ফ্রন্টের আকৃতিগত চেহারা পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। হয়তো ওপরের পালিশ্তারা শুধু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে চাপা দেওয়ারই কৌশল।

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের বড় বড় বামপন্থীদের মধ্যে একটা অঘোষিত প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। সেই প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য হল, কারা ইন্দিরাজীর কত বেশী নিকট হতে পারবেন সেই প্রচেষ্টা চালাবার জন্য পাঁয়তারা করা। পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম বামপন্থী দল মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীপি সুন্দরায়া ইন্দিরাজীকে এমন কি নিবর্তনমূলক আটক আইনের মেয়াদ বাড়াবার প্রশ্নে সহযোগিতার কথাও নাকি বলেছেন। সেজন্য শ্রীসুন্দরায়াকে শ্রীডাঙ্গের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অবশ্য শ্রীগোপালন শ্রীডাঙ্গেকে নির্জলা মিথ্যা পরিবেশন করেছেন বলে অভিযুক্ত করেছেন। এই দুই বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, দুই দলের যে কোন একজন নেতা অবশ্যই সত্য কথা বলেন নি। যদি শ্রীসুন্দরায়া শ্রীমতী গান্ধীকে এরূপ আভাষ দিয়ে থাকেন তবে কিসের জন্য একাজ তিনি করলেন? কারণ হিসাবে বলতে গেলে প্রথমেই মনে আসে, পশ্চিমবঙ্গে সি-পি-এম্-কে বাদ দিয়ে কোন সরকার গঠনের চেষ্টা হলে তা শ্রীমতী গান্ধীর সমাজবাদী সমর্থকদের বাদ দিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ কেরালার মত কংগ্রেসের সমর্থন না পেলে এখানেও যুক্তফ্রন্টের আকৃতিগত পরিবর্তন আনা যাবে না। কাজেই শ্রীমতী গান্ধীকে যাতে অন্যেরা ভুল বোঝাতে না পারে, তার জন্য হয়ত শ্রীসুন্দরায় চেষ্টা করেও থাকতে পারেন। কারণ, কেরালায় মন্ত্রীত্ব যাওয়ার পর মার্কসিষ্টদের অভিজ্ঞতা খুব ভাল বলে মনে হচ্ছে না। না ধর্মঘট, না হরতাল, না অনুরূপ বিক্ষোভ মিছিল কিছুই সেখানে অনুষ্ঠিত হয়নি। উপরন্তু অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, মন্ত্রীত্ব চলে যাওয়ার পর দলের সমর্থনও কমতে থাকে। তাতেও এ ঘটনা নাকি ঘটেছিল। তাই, যদি শ্রীডাঙ্গে অহেতুক অভিযোগ করে থাকেন, তবে তারও একটি হেতু থাকা সম্ভব। সেই উদ্দেশ্যটা হচ্ছে, মার্কসবাদী কম্যুনিষ্টদের বেকায়দায় ফেলে নতুন ফ্রন্ট সৃষ্টির জন্য পটভূমিকা তৈরী করা। যাঁরা নিবর্তনমূলক আটক আইন ইত্যাদি সমর্থন করতে পারেন তাঁদের সঙ্গে একত্রে চলা অসম্ভব। অতএব, রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইতিমধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃবৃন্দও শ্রীডাঙ্গের সঙ্গে কেরালার বর্তমান অবস্থা ও দেশের সামগ্রিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। অবশ্য বিচার ধরায় একমত হয়ে কিছু আশার আলো দেখতে পেয়েছেন কিনা জানা যায়নি।

যা হোক, বাংলা কংগ্রেসের নেতা ও ফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় একথা বারবার ঘোষণা করেছেন যে, দরকার হলে তিনি আত্মহত্যা করবেন কিন্তু কংগ্রেসে ফিরে যাবেন না। এতদিন শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। কিন্তু বর্তমানে ইন্দিরাজীর নেতৃত্বে যে কংগ্রেস জন্মলাভ করছে, তা অন্য কংগ্রেস। সিণ্ডিকেটওলারা তাদের পুরানো কংগ্রেসের খোলসে গা ঢাকা দিয়ে আছেন। আর যারা সমাজবাদী কর্মকাণ্ডের জন্য সচেষ্ট, তারাই এই নতুন কংগ্রেসের স্রষ্টা। আরও বিশদ করে বললে একথাও স্পষ্ট হয় যে, শ্রীমুখার্জি একদিন প্রদেশের সীমিত ক্ষেত্রে যে জ্বালা নিয়ে বাংলা কংগ্রেসের সৃষ্টি করেছিলেন, ইন্দিরাজীও সেই ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নতুন কংগ্রেস সংগঠন করতে চলেছেন। অতএব, শ্রীমুখার্জি কেন ইন্দিরাজীর হাত শক্ত করবার জন্য এগিয়ে যাবেন না তার হদিশ পাওয়া কঠিন। কে জানে, শ্রীমুখার্জি নতুন ভাবে চিন্তা করছেন কিনা। যখন তিনি তা শুরু করবেন এবং তাঁর নতুন চিন্তার ফসল ফলতে শুরু করবে তখন নিদেন পক্ষে ইন্দিরাজীর সমর্থক ৪০।৪৫জন বিধানসভার সদস্য বাংলা কংগ্রেসের ৩৪জন সদস্যের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নয়া কংগ্রেসের সভ্য হয়ে যেতে পারবেন। আর মার্কসবাদীদের বিধানসভার শক্তির অহংকার তখনই খর্ব হতে শুরু করবে। নিদেন পক্ষে কংগ্রেসের ঐ পরিমাণ শক্তি ইন্দিরাজীর পক্ষ হয়ে আলাদা আসনে বসতে শুরু করলেই রাজনীতির ব্যালান্সের কাঁটা তখন নড়তে আরম্ভ করবে।

অবশ্য এজন্য কারও দোষ দেওয়া যায় না। কারণ রাজনীতির অর্থই হচ্ছে একে কাকে হটিয়ে দিয়ে প্রভাব বাড়াতে পারবে কিম্বা গদী দখল করতে পারবে তারই প্রয়াস। আর একথাও সত্য যে, প্রত্যেক দলই বিশ্বাস করে নিজের দলের কর্মসূচী ছাড়া জনতার মুক্তি আনা সম্ভব নয়। তার সেই অভিপ্সীত পরিবর্তন আনতে হলেই প্রয়োজন শাসনযন্ত্র দখল করা। নতুবা কর্মসূচীকে রূপ দেওয়া অসম্ভব। কাজেই কখনো দু'কদম এগিয়ে বা কখনো দু'কদম পিছিয়ে পাঁয়তারা কষে নির্ধারিত মার্গে পৌঁছুতেই হয়। এই চিন্তা করেই হয়ত সমস্ত বামপন্থী দলই নিজেদের মধ্যে ফ্রন্ট গড়ার কথা না ভেবে ইন্দিরাজীর সঙ্গে সমঝোতার পথে অভীষ্ট সিদ্ধ করবার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন। কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠী যখন দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, এবং যখন বামপন্থীরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এখনও জোট না বেঁধে একে অপরের ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তখনও আবার ইন্দিরাজীকে সমর্থনের প্রশ্নে। তখন স্বভাবতই মনে হয়, কংগ্রেসের এই সমাজবাদী অংশের মধ্যেই বামপন্থীরা তাদের নির্ভরশীল সহযোগী খুঁজে পেয়েছেন। এই পথ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা যেন বর্তমানে বামপন্থীদের মাথায় নেই। ক্ষমতা লাভের এই দৌড়ে কে যে কাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবেন তার কোন স্থিরতা নেই। আগেও বামপন্থীরা কংগ্রেস থেকে যাঁরা বেরিয়ে আসতেন তাদের সঙ্গে ফ্রন্ট করেছেন, এখন সেই সমস্ত দল আবার নতুন কংগ্রেসে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন। ফলে বামপন্থীদের সকলের আর তত ইমপরটেন্স থাকছে না।

শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ দিল্লীতে এ আই সি সি'র তলবী সভায় ভাষণ দিচ্ছেন (২৩শে নভেম্বর)।

দেশে বিদেশে
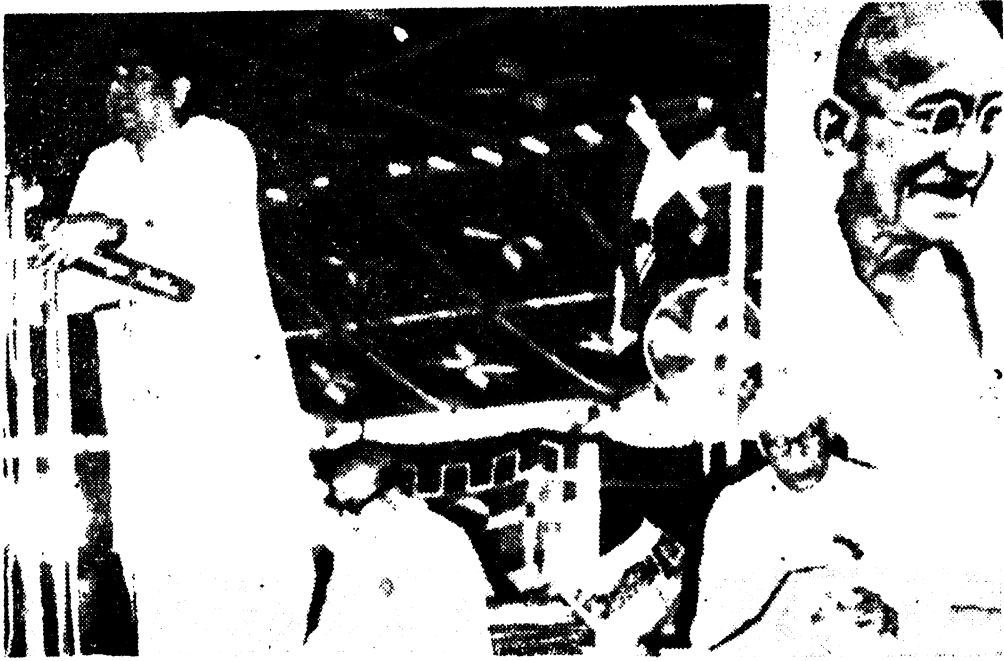
উত্তর প্রদেশে শুরু ?

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভাঙনের পর এই দেশের রাজনীতির যে নতুন ছক তৈরী হতে চলেছে তার প্রথম পরীক্ষা কি উত্তর প্রদেশে হবে?

উত্তর প্রদেশে শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের মন্ত্রিসভা থেকে উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী সহ আটজন মন্ত্রীর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। দিল্লীর রাজনীতির ঢেউ এসে সবার আগে সেই রাজ্যেই লাগল কংগ্রেস ও দেশের রাজনীতির দিক দিয়ে যার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। ভারতবর্ষে এ যাবৎ যে তিনজন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তাঁরা সকলেই উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছেন। সংসদে উত্তরপ্রদেশের প্রতিনিধি সংখ্যা অন্য যে কোন রাজ্যের চেয়ে বেশী। চন্দ্রভানজীর দিক থেকে এটা ভাগ্যের পরিহাসই বলতে হবে যে, দিল্লীর টালমাটালের ধাক্কা প্রথম তাঁর মন্ত্রিসভার উপরই পড়ল। ভারতবর্ষের যে কয়জন মুখ্যমন্ত্রী এবারকার দলীয় বিরোধে আগাগোড়া শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার দিকে ছিলেন তাঁদের মধ্যে চন্দ্রভান গুপ্ত মহাশয় শুধু অন্যতম নন, অগ্রগণ্য। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্তের তিনিও একজন শরিক। আর আজ ঐ সিদ্ধান্তের ফলভোগ তাঁকেই সর্বপ্রথম করতে হচ্ছে। তাঁর মন্ত্রিসভার এখন নসেমিরা অবস্থা।

একথা অবশ্য অজানা ছিল না যে, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় কংগ্রেস দলের মধ্যে শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের অবস্থান খুব মজবুত নয় এবং দলের মধ্যে টানাপোড়েন হলে তাঁর গদী রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে পড়বে। কংগ্রেসের আজকের সংকট দেখা দেয়ার অনেক আগে থেকেই চন্দ্রভানের সঙ্গে কমলাপতির বনিবনা নেই। ৪২৬ জন সদস্যের বিধানসভায় মাত্র ২২০ জন সদস্যের সমর্থনের উপর ভরসা করে তিনি যে মন্ত্রিসভা চালাচ্ছিলেন তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত ক্ষুরের ধারের মত। আটজন সদস্য সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলেই তাঁর মন্ত্রিসভা কুপোকাৎ। এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই গুপ্ত মহাশয় দিল্লীতে বেশী জোরে সাঁকো নাড়া দিতে চান নি। শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ও শ্রীমতী গান্ধীর শিবিরের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করার জন্য একমাত্র তিনিই শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এমন কি উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটি যাতে কঠোর ভাষায় কোন প্রস্তাব গ্রহণ করে এই ঐক্য প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না ফেলে সেজন্য তিনি তাঁর নিজের প্রভাব প্রয়োগ করে মৃদুভাষায় একটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন।

কিন্তু গুপ্তজীর পায়ের তলা থেকে দ্রুত মাটি সরে যাচ্ছিল। একদিকে তিনি নিজেকে পুরোপুরি সিন্ডিকেট পার্টির সঙ্গে যুক্ত করে ইন্দিরার শিবিরের বিরাগভাজন হলেন, অন্যদিকে অনেক চেষ্টা করেও তিনি ও তাঁর সমর্থকরা উত্তরপ্রদেশ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের অধিকাংশকেই প্রধানমন্ত্রীর শিবিরের বাইরে রাখতে অক্ষম হলেন। লোকসভার ৪২ জন সদস্যের মধ্যে ৪১ জন এবং রাজ্যসভার ৪৩ জনের মধ্যে ৩৪ জন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তাঁদের আনুগত্য জানিয়েছেন অর্থাৎ দুই কক্ষ মিলিয়ে উত্তরপ্রদেশের মোট ৯০ জন সভ্যের মধ্যে মাত্র ১৫ জন ছাড়া বাকী সকলেই শ্রীগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকদের পরিত্যাগ করলেন। স্পষ্টতই এর পর শ্রীগুপ্তের পক্ষে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার কংগ্রেস দলের অবিসম্বাদিত নেতা বলে নিজেকে দাবী করার নৈতিক অধিকার দুর্বল হয়ে পড়ল। এরপর যখন প্রকাশ পেল যে উত্তরপ্রদেশের ৭১টি জেলা কংগ্রেস কমিটি ও নগর কংগ্রেস কমিটির মধ্যে ৫৩টিই শ্রীমতী গান্ধীকে সমর্থন করেছেন তখন তাঁর অবস্থাটা আরও কঠিন হয়ে পড়ল।

এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রভান এমন একটি কাণ্ড করলেন যাতে উত্তরপ্রদেশের ইন্দিরাপন্থীরা আরও ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি বিধানসভার কংগ্রেস দলের সভা ডাকলেন ২২ নভেম্বর তারিখে। ঐ তারিখে যে ইন্দিরাপন্থীরা এ-আই-সি-সির তলবী সভায় মিলিত হচ্ছেন সেকথা আগে থেকেই জানা

ছিল। তা সত্ত্বেও উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার কংগ্রেস দলের নেতা যখন একই তারিখে লখনৌতে দলের সভা ডাকলেন তখন অপরপক্ষ বললেন, এটা চাতুরি, ইন্দিরাপন্থীরা যাতে দিল্লীর তলবী সভায় যেতে না পারেন সেজন্যই এইভাবে তারিখ দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটল। উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রিসভার উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর 'বৃহৎ মতপার্থক্যের' দরুন গুপ্ত মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভার আরও সাতজনের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল। শ্রীগুপ্তের তাঁর একজন প্রবল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও তাঁর মন্ত্রিসভার ভূতপূর্ব সদস্য এই সময়ে কংগ্রেস দলের ভিতরকার এই রাজনীতির আসরে প্রবেশ করলেন। তিনি হলেন ভারতীয় ক্রান্তি দলের নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং। একটি বিবৃতিতে তিনি বললেন, 'শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর অধিকাংশ সমর্থকরা জনপ্রিয় নীতি অনুসরণ করছেন আর ঐ নীতিগুলিকে বাধা দেওয়ার জন্য কায়েমী স্বার্থসমূহ সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে মিলে চক্রান্ত করছে। ঐসব কায়েমী স্বার্থের দালাল হচ্ছেন শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত।' শুধু শ্রীচরণ সিংয়ের এই বিবৃতিই লক্ষ্য করার মত নয়, আরও লক্ষণীয় যে, তিনি নয়াদিল্লীতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে নিভৃতে কথাবার্তা বললেন। তিনি যখন লখনৌ থেকে রওনা হয়ে দিল্লীর বিমান বন্দরে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সেখানেই 'আকস্মিকভাবে' তাঁর দেখা হয়ে গেল শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীর সঙ্গে। শ্রীত্রিপাঠী দিল্লী থেকে লখনৌতে যাচ্ছিলেন। উত্তরপ্রদেশের দুই নেতার মধ্যে বিমান বন্দরে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা হল।

এদিকে কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীরমেশ সিংহ একটি বিবৃতিতে বিধানসভার সমস্ত সিণ্ডিকেট-বিরোধী, প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ দলের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন যে, 'শ্রীগুপ্তকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ও অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে একটি বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করার জন্য এই সব দলের অবিলম্বে একত্রে একটি বৈঠকে মিলিত হওয়া উচিত। তিনি আরও বললেন যে, কংগ্রেসের ত্রিপাঠী গোষ্ঠী, ভারতীয় ক্রান্তি দল, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি, পি-এস-পি, রিপাবলিকান পার্টি ও নির্দলীয় সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিশ্চয়ই শ্রীগুপ্তকে হটিয়ে একটি প্রগতিশীল সরকার গঠন করতে পারেন।'

কম্যুনিষ্ট নেতা যা বলছেন উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে কি তাই হতে চলেছে! শ্রীত্রিপাঠীর সঙ্গে শখানেক কংগ্রেস সদস্য আছেন বলে দাবী করা হয়েছে। গত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার কংগ্রেস সদস্যদের ভোট যেভাবে বিভক্ত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে তাতে এই দাবী অতিরঞ্জিত বলে মনে হবে না। এই শখানেক সদস্যের একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে যদি ভারতীয় ক্রান্তি দলের ৯৭টি ভোট যুক্ত হয় তাহলে একটি বিকল্প কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের মত ভিত্তি অন্তত তৈরী হয়। সন্দেহ নেই যে, শ্রীত্রিপাঠী ও শ্রীচরণ সিং যদি এই রকম একটা পরিকল্পনা নিয়ে আসরে নেমে থাকেন তাহলে তাঁরা সেটা শ্রীমতী গান্ধীর আশীর্বাদ নিয়েই করেছেন। এটাও অনুমান করা যায় যে, উত্তরপ্রদেশে এই ধরনের একটি কোয়ালিশন গঠনের পরীক্ষা যদি সফল হয় তাহলে অনতিদূর ভবিষ্যতে খাস নয়াদিল্লীতেও ঐ পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি হতে পারে।

শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের মন্ত্রিসভার সামনে চ্যালেঞ্জটা ঠিক কি ধরনের তা অবশ্য বিধানসভার ভিতরে ছাড়া বোঝা যাবে না। বিধানসভার বৈঠক ডাকার জন্য শ্রীগুপ্তের কোন তাগিদ নেই। নিয়ম অনুযায়ী আগামী ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান না করেও কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করার সাংবিধানিক দায়িত্ব অবশ্য রাজ্যপালের। রাজ্যপাল যাতে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করেন সেজন্য একটি আবেদনপত্রে গুপ্ত-বিরোধী বিধানসভা সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চলছে বলে খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল কি বিধান-

সভার অধিবেশন শীঘ্র ডাকার পরামর্শ দেওয়ার জন্য শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের মন্ত্রিসভাকে বাধ্য করতে পারবেন? আর যদি তিনি তা না পারেন তাহলে তিনি কি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে যে পথে গিয়েছিলেন সে পথে গিয়ে একটি জটিলতার সৃষ্টি করবেন?

শ্রীগুপ্ত ও তাঁর সমর্থকরা অবশ্য এখনও প্রকাশ্যে অবিচলিত ভাব বজায় রাখছেন। তাঁদের তরফ থেকে ইতিমধ্যে বলা হয়েছে যে, জনসংঘ ও অন্যান্য বিরোধী দলের ১৮ জন সদস্য ইতিমধ্যে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু এই দাবী কতখানি সত্য বলা কঠিন।

উত্তরপ্রদেশের পরই যদি আর কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আসন অনিশ্চিত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেই রাজ্য হচ্ছে গুজরাট। সিণ্ডিকেটের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই যন্তর মন্তর রোডের ইন্দিরা-বিরোধী সিদ্ধান্তের আর একজন বড় শরিক। তাঁর চিন্তার বড় কারণ হল এই যে, তাঁর মন্ত্রিসভার একজন সদস্য সরদার শ্রীকান্ত সিং রাও গায়কোয়াড় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তাঁর আনুগত্য জানিয়ে এসেছেন। গুজরাট বিধানসভায় কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অবশ্য উত্তরপ্রদেশের চেয়ে অধিকতর নিরাপদ। শ্রীহিতেন্দ্র দেশাইয়ের মন্ত্রিসভাকে ফেলতে হলে অন্ততঃ ২৫ জন সদস্যের সাহায্য চাই। গায়কোয়াড় এই পরিমাণ সদস্যের সমর্থন সংগ্রহ করতে পারবেন কিনা এবং পারলে শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই অন্য দল থেকে (প্রধানতঃ স্বতন্ত্র দল থেকে) সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সক্ষম হবেন কিনা তার উপরই নির্ভর করছে গুজরাটের দেশাই মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ।

পিতৃ পরিচয়হীন

জার্মাণীতে ট্রাভে নামে একটি স্বল্প পরিচিত নদীর ধারে একটা পুরানো ছোট শহর, নাম লিউবেক। বিখ্যাত জার্মাণ সাহিত্যিক টমাস মান ঐ শহরে জন্মেছিলেন, তাই নিয়ে লিউবেকের গর্ব।

৫৬ বছর আগে আর একটি অবাঞ্ছিত শিশু ঐ শহরে জন্মেছিল, যার নাম সকলেই ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন এমন কি তার জন্মবৃত্তান্তও ভুলে যেতে চেয়েছেন। তার নাম ছিল হারবার্ট আর্নস্ট কার্ল ফ্রাম। পশ্চিম জার্মাণীর নবনির্বাচিত চতুর্থ চ্যান্সেলার (অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী) ভিলি ব্রান্ট তাঁর স্মৃতিচারণায় ঐ হারবার্ট ফ্রাম সম্পর্কে লিখেছেন, 'আমি জানি তার জন্ম হয়েছিল ১৯১৩ সালের বড়দিনের কিছু আগে, সঠিকভাবে বলতে গেলে ১৮ ডিসেম্বর তারিখে, লিউবেক-এ। তার মা ছিল একটি খুব কম বয়সী মেয়ে, যে একটি কো-অপারেটিভ স্টোরে সেলস-গার্লের কাজ করত। মেয়েটিকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। (হারবার্ট ফ্রাম) তার বাবাকে চিনত না, এমন কি কে তার বাবা তাও সে জানত না। আর সে তা জানতেও চাইত না কখনও।

ভিলি ব্রান্ট হারবার্ট ফ্রামের কথা লিখেছেন বটে, কিন্তু এমন কি তিনিও ঐ পিতৃপরিচয়হীন শিশুকে ভুলে যেতে চান, কেননা, তাঁরই কথায়, 'ঐ বালক হারবার্ট ফ্রাম প্রকৃতপক্ষে আমি, একথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন।'

লিউবেক থেকে অসলো, অসলো থেকে বার্লিন, বার্লিন থেকে বন—ভিলি ব্রান্টের জীবনে দীর্ঘ পদক্ষেপ।

পিতৃপরিচয়হীন হারবার্ট ফ্রাম, সেদিনকার জার্মাণীতে উৎসাহী সোস্যালিস্ট কর্মী ভিলি ব্রান্ট আর আজকের পশ্চিম জার্মাণীর সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা ও চ্যান্সেলার ভিলি ব্রান্ট একই ব্যক্তি। সেদিন যাঁর মধ্যে তিনি তাঁর রাজনৈতিক গুরু, তার পিতৃকল্প অভিভাবক খুঁজে পেয়েছিলেন সেই জুলিয়াস লেবার হিটলারের ঝটিকা বাহিনীর হাতে খুন হয়েছিলেন আর নরওয়েতে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন ১৯ বছর বয়সের ভিলি ব্রান্ট।

যুদ্ধের শেষে ভিলি ব্রান্ট যখন জার্মাণীতে ফিরলেন তখন তিনি ফিরলেন একজন নরওয়েজিয়ান নাগরিক হিসাবে। (হিটলারের জার্মাণী তাঁকে জার্মাণ নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করেছিল।) তখন তিনি বার্লিনে নরওয়েজিয়ান সামরিক মিশনে কাজ করেন। তাঁর পুরনো পার্টি সহকর্মীরা তাঁকে লিখলেন, 'জুলিয়াস লেবারের উত্তরাধিকারী হিসাবে আপনি লিউবেক-এ শুভযাত্রা আরম্ভ করতে পারেন। আপনিই আমাদের পক্ষে উপযুক্ত মানুষ।' কিন্তু লিউবেক-এ আর ফিরলেন না তার হারান সন্তান। ১৯৪৮ সালে জার্মাণ নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তিনি বার্লিনেই নতুন করে শুরু করলেন তাঁর রাজনৈতিক জীবন। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা, আক্রমণ ও সন্দেহের মধ্য দিয়ে সেই রাজনৈতিক জীবনই আজ তাঁকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে গেল। ২১-১১-৬৯

ইন্দিরাজীর জয় ও তারপর

দিল্লিতে এবারকার সংসদ অধিবেশনের দিকে সকলেরই কৌতূহলী দৃষ্টি। কংগ্রেসে ভাঙন ধরার পর এই প্রথম সংসদের অধিবেশন। অবশ্য ভাঙন এখনও সর্বস্তরে স্পষ্ট হয়নি। তলবী এ, আই, সি, সি-র অধিবেশনের পর দেখা যাবে তার আসল চেহারা। সংগঠন থেকে শ্রীমতী গান্ধীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়ে সিন্ডিকেটপন্থীরা কংগ্রেসকে দুভাগ করল। এবারই প্রথম সিন্ডিকেটপন্থীরা বিরোধী দল হিসাবে স্বীকৃতি পাবে। তাদের নেতা হয়েছেন মন্ত্রিসভা থেকে সদ্য চলে আসা বিহারের ডাঃ রামসুভগ সিং। সিন্ডিকেটপন্থীদের মধ্যে এই নেতা নির্বাচন নিয়েও মন-কষাকষি হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত মোরারজী দেশাইকে সিন্ডিকেটপন্থীদের পার্লামেন্টারি পার্টির চেয়ারম্যান করে বিবাদভঞ্জন করতে হয়েছে।

নিজলিঙ্গাপ্পার দলের স্তম্ভ বলে যাঁরা পরিচিত তাঁদের মধ্যে ইতিমধ্যেই নতুন চিন্তা দেখা দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রভান গুপ্ত ইন্দিরাজীর বিরোধিতা করেও তাঁর বহিষ্কার প্রস্তাবে ভোট দেননি। কারণ, উত্তরপ্রদেশে তাঁর মন্ত্রিত্ব রাখা দায় হয়ে উঠবে বলে তিনি সর্বদাই শংকিত ছিলেন। সেই শংকা এখন বাস্তব রূপ নিয়েছে। ইন্দিরাপন্থী মন্ত্রীরা তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। শ্রী এস কে পাতিলও আগের মতো হাঁকডাক করছেন না। কারণ, তাঁর মহারাষ্ট্র ইন্দিরাজীর পক্ষে। তাই তিনি এই বিলম্বেও ঐক্যের দৌত্যভার কাঁধে নিয়েছেন। ফল কী হবে তা তিনি জানেন না। কংগ্রেসের ভাঙন রোধ করার আর যারই থাকুক, শ্রীপাতিলকে দিয়ে তা হবে না। সিন্ডিকেটপন্থীরা আশা করেছিলেন, রাবাত প্রসঙ্গ নিয়ে ইন্দিরাজীকে হেনস্তা করবেন। অন্য সময় হলেও যদিও বা পররাষ্ট্রনীতির এই ইস্যু নিয়ে বামপন্থীরা সরকারের কঠোর সমালোচনা করতেন, সিন্ডিকেটপন্থীরা জনসংঘ-স্বতন্ত্রের সঙ্গে আঁতাত করায় তাঁরা এবার একযোগে সরকারের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। তার ফলে বিপুল ভোটে সরকারের জয় হয়েছে। ভোটের হিসাবে দেখা গেছে যে, কমিউনিস্টদের ভোট বাদ দিয়েই সরকার সিন্ডিকেটপন্থীদের এই আক্রমণের জবাব দিতে সক্ষম। অবশ্য প্রথমবারে হেরে গেছে বলেই তাঁরা নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবেন না। সুযোগমত তারা আবার আক্রমণ করবেন। তার জন্য সরকারকে প্রস্তুত ও সতর্ক থাকতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কংগ্রেসের ঘোষিত কার্যসূচী রূপায়ণে যাতে বাধা সৃষ্টি না হয় তার জন্যই সংগঠনকে মজবুত করে তুলতে হবে। যারা সংগঠন এতদিন দখল করেছিলেন তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী এবং দলের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতে বাধা দিচ্ছিলেন। কেননা, তাঁদের স্বার্থ অন্য। কাগজে-কলমে ভাল ভাল প্রস্তাব পাশ করে তারা জনসাধারণকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছিলেন তাকে কার্যে রূপায়িত না করার অজুহাত বের করে। কংগ্রেস সংগঠন যেমন তাদের হাতে, তাঁরা চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীও তেমনি তাদের হাতের মুঠোয় থাকুন। শ্রীমতী গান্ধী তা হতে চাননি। সেখানেই লেগেছে বিরোধ। এই বিরোধের পরিণতিতেই কংগ্রেস আজ দ্বিধা বিভক্ত।

প্রধানমন্ত্রীকে এখন খুব সাবধানে চলতে হবে এবং তার সঙ্গে বলিষ্ঠ কর্মসূচী নিতে হবে কালবিলম্ব না করে। কারণ জনসাধারণের মনে তিনি প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছেন। তারা আশা করে আছে যে, কংগ্রেসকে প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণশীলদের থেকে মুক্ত করার পর সমাজতান্ত্রিক কার্যসূচী রূপায়ণে আর কোনো বাধা থাকবে না প্রধানমন্ত্রীর সামনে। ব্যাঙ্ক তিনি জাতীয়করণের আওতায় এনেছেন। এ কাজের জন্য তিনি প্রগতিশীল, জনকল্যাণকামী মানুষের সাধুবাদ পেয়েছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থলগ্নীর একটা বড় সুবিধা তিনি পেলেন। যাতে আমলাতন্ত্রের আওতায় গিয়ে ব্যাঙ্কগুলোর আমানত না কমে এবং আমানতী টাকা যথাযথভাবে নিয়োজিত হয় তার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহযোগীদের যত্ন নিতে হবে। কারণ দেশের মানুষের মনে জাগ্রত প্রত্যাশা ব্যর্থ হলে তা থেকে সমাজের প্রভূত ক্ষতি অনিবার্য।

সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে কোনো কোনো মহলে প্রশ্ন উঠেছে। আমাদের মনে হয়, সেরকম শংকার কারণ নেই। সিন্ডিকেট ছত্রভঙ্গ এবং তা আরও ছত্রভঙ্গ হবে। শ্রীমতী গান্ধীকে এখন যা প্রথমে করতে হবে তা হল সংগঠনের দিকে নজর দেওয়া। রাজ্যে রাজ্যে সিন্ডিকেটের ঘুঘুর বাসা এতকাল কংগ্রেসের নামে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। তাকে ভাঙতে হলে ইন্দিরাজীর সমর্থকদের সক্রিয় হয়ে জনসাধারণের কাছে গিয়ে সংগঠনকে সচল করে তুলতে হবে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অবিচলনিষ্ঠা নিয়ে কাজ করলে তাঁরা কংগ্রেসের হৃতমর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পারবেন। শুধু দিল্লির লড়াইয়ে বা পার্লামেন্টে ভোট গণনায় যেন এই ঐতিহাসিক জয়ের সাফল্য নির্ণীত না হয়।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

কীভাবে শুরু করব ভাবতে পারছিনে। কারণ—শুধু সাহিত্যিক কেন, যেকোন যুগের যেকোন মানুষ—সাধারণ কিংবা অসাধারণ, তাঁর সমকালীন সমাজ সম্পর্কে তো কেউ ভালো ধারণা পোষণ করেননি! কেউ কি সেদিন অভিভূতকণ্ঠে বলেছিলেন, 'অহো! আমরা কী সুখেশান্তিতে বাস করিতেছি'—কিংবা 'আহা! অধুনা পৃথিবী কিরূপ স্বর্গরাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়াছে? এখানে মনুষ্য ও প্রাণীসকলের আনন্দ ও শান্তির অবধি নাই?' না, কেউ বলেন নি। আর এদেশের কবিসাহিত্যিক—বাল্মিকী ব্যাস থেকে ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ—তারপরেও, সমকালীন সমাজ সম্পর্কে একই হাহাকারে ও বিষণ্ণতায় পীড়িত হয়েছেন। ধর্মগুরুদের নজীরও আমরা জানি। দার্শনিক, সম্রাট, ভাঁড়—তাঁদের কথাও শুনেছি। তার মানে বর্তমান সবসময়েই যেন কুশ্রীতার অশান্তিতে নানা আবর্জনায় ক্লিষ্ট। অতীত সবসময়েই মোটামুটি সুন্দর আর নিভরযোগ্য। ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়েও বাতিজ্বলার আভাসে আশাপ্রদ—কারণ, স্বর্গরাজ্য সমীপবর্তী!

মোটামুটি বলতে গেলে, আসলে মানুষেরই মানসবৈশিষ্ট্যের একটা চিরকেলে কাঠামো এই ধারণার মধ্যে ধরা পড়ে। সে চলতির গণ্ডি খুঁটে যাচ্ছে। সে আশেপাশের কিছুতে সন্তুষ্ট নয়। অতএব—আর্যবাক্য অনুসারে বলতে গেলে, 'চরৈবেতি, চরৈবেতি!' মানুষ তার পৃথিবীকে নিয়ে এমন করে হাঁটছে। আগামীকালেও প্রতিটি মানুষ তার সমকালীন সমাজকে কী চোখে দেখবে, তা স্পষ্টই তার এই স্বভাববৈশিষ্ট্য থেকে অনুমান করা চলে। কিছু তার মনোমত হয়নি কোনদিন, হবেও না।

তাহলে কে তার সমকালীন সমাজকে সুন্দর ও শান্তিময় ভেবে ভালবাসে? হয়ত একমাত্র শিশু—নয়ত না। আরো ঠাহর করলে জানা যাবে, চোখের ওপর বয়স্ক মানুষ যা সব দেখছে, তার মধ্যে একমাত্র প্রকৃতিই তার কাছে সুন্দর আর শান্তিময় কিছুটা—কারণ তার বিশ্বাস, প্রকৃতি দ্বন্দ্বহীন। তার মানে এও তার চিরকালীন শিশুত্বের একটা নজীর। সত্যিকার বয়স্ক মানুষ মানেই বীতশ্রদ্ধ ক্লান্ত অভিমানী মানুষ। এসথেটিকস আর যুক্তিবোধের ভারী সনাতন কেতাব সে বসার আসন করে ফেলেছে। প্রকৃতি বা ঈশ্বরও কখনও কখনও তার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে।

'হতাশ' কথাটি ইচ্ছে করেই প্রয়োগ করলাম না এখানে। যে সত্যিসত্যি হতাশ, তার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। বস্তুত হাড়েহাড়ে—যারা সবাই বেঁচে থাকে এবং তথাকথিত 'হতাশায়' মধ্যে বাঁচে—তারা সবাই আশাবাদী। ভিতরের অন্ধকারে সেই অনির্বাণ বাতি কাঁপে : 'স্বর্গরাজ্য আসবেই! অন্তত আমার জীবনে একলা আমার জন্য আসবেই।'

•

তবে কি, আজকের অর্থাৎ উনিশ শো উনসত্তর সালের হেমন্তে আমার চারপাশের যে সমাজ দেখছি, কিংবা কেতাবপত্র আর সর্বনেশে খবরের কাগজের মারফৎ সারা পৃথিবীর মনুষ্যসমাজ সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে তুলেছি—তার সঙ্গে বিশ-ত্রিশ বছর আগের আমার সমবয়সী সমপেশার মানুষের ধারণা ও দেখাশোনার মধ্যে একটা মৌলিক

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

পার্থক্য ছিল। আকারের দিক থেকেও এ পার্থক্য হরাইজেন্টাল। মানুষের ভালমন্দ সম্ভাবনার কথা (আপেক্ষিক অর্থে), অর্থাৎ মানুষ কতটা ভালো কতটা মন্দ হতে পারে, এ ব্যাপারে মাত্রার তারতম্য ঘটেছে প্রচুর। আজ আমার চোখে ভালমানুষ মন্দ মানুষের ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সবরকম অভিজ্ঞতা তো ছাড়িয়েছেই—উপরন্তু মানুষ যে এমন হতে পারে বা এতদূরে যেতে পারে, কল্পনা করাও সেদিন দুঃসাধ্য ছিল। কে দেখেছিল এত আলো এত উজ্জ্বলতা কিংবা এত অন্ধকার এমন কালানিশা? ধ্রুপদী শিল্পে কি মহাকাব্যের মধ্যে আলো-অন্ধকার জ্ঞান-অজ্ঞানতার যে দারুন নজীর রয়েছে, নিঃসন্দেহে আজকের মানুষ তাকে নস্যি করে তুলেছে।

তুলবে-তুলতই। আজ বুঝতে পারছি, মানুষ হয়ত তার সবরকম 'হতে-পারা বা 'হয়ে ওঠার' চরম সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। শাস্ত্র-পুরাণের বর্ণিত নরক কি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বা সাম্প্রতিক ভিয়েৎনামী বীভৎসতার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে? সেই স্বর্গও অন্তত আকারের দিক থেকে আজ হার মানে টেকনোলজির আধুনিক ময়দানব যা বানাচ্ছে বা বানাতে পারে তার কাছে। অবশ্য স্বর্গের আকার আজ আপাতত শেষ। তার ভিতরে নেই অবাধ নিরুপদ্রব সৌন্দর্য ও শান্তির পরীরা। সেটুকুই আজকের বীতস্পৃহ মানুষের অন্ধকারে বাতি। এ বাতি নেভেনি। নিভলেই মানুষের খেল খতম—পৃথিবীর মাথায় দেবদূত ইস্রাফিল শিঙে ফুঁকে মহাপ্রলয় ঘোষণা করে দেবে।

•

তবু গুরুগুরু সংশয়। টেকনোলজিই হাতে তুলে দিয়েছে মহাবিধ্বংসী মারণাস্ত্র। কী হবে কী হবে সেই ভাবনা সবখানে। ওরা চাঁদে যাচ্ছে কেন? শিশুও প্রশ্ন করে সহসা। হয়ত ভালো হবে, হয়ত মন্দ হবে। কী হবে বলা কঠিন। কেবল মন বলে, না—না, শেষ অব্দি ভালই হবে।

বিদেশে ওদের হাতে টেকনোলজির অস্ত্র, আমাদের হাত ভরে আছে আসলে কী? আমি দেখছি—সেটা রাজনীতি। এই বিশ বাইশ বছরে আর কিছু না করুক, আমাদের সংবিধান হাতে তুলে দিয়েছে এক বিচিত্র উপহারবস্তু। সামাজিক বা সামূহিক শক্তির কথা দূরে থাক, আজ প্রতিটি ব্যক্তি সংবিধানের অবাধ দাক্ষিণ্যে মহা-মহাশক্তিমান হয়ে ওঠার অধিকার লাভ করেছে সন্দেহ নেই। যা নিতান্ত ঠোঁট ছিল, যা ছিল কণ্ঠস্বর—তা হয়েছে মাইক্রোফোন, তা পেয়েছে অত্যান্নত্যানপটিয়সী স্পীকার। সুতরাং এত চেঁচামেচি। কানে তালা ধরে যায়।

অন্যদেশে সমান পরিস্থিতিতেও ঠিক এভাবে কিছু ঘটেনি। তার কারণ ছিল। দেশপ্রেম বস্তুটা মজ্জাগত জন্মায় যুক্তিহীন আবেগ বা ভাবপ্রবণতার সাহায্যে মাটিতে—আমাদের দেশে এ মাটিরও অনেক কিছু আমদানীকরা। এর সঙ্গে ইনটেলেক্ট বা বুদ্ধির আলোকোজ্জ্বল যোগাযোগেই খাঁটি মহীরুহ হতে পারে। এদেশে তা হয় না। কেন ব্রিটিশ তাড়াবো, কেন স্বাধীনতা—সে প্রশ্নের পিছনে যতটা ছিল সেন্টিমেন্ট, ততটা ছিল না ইনটেলেক্ট। তার ফলেই ঠকলাম। এক দেশ দুই হল। তার ওপর হাজার বিচিত্র সমস্যা। তার মধ্যে কিছু কিছু আবার নিজেদেরই স্বার্থবুদ্ধিকৃত হাতেগড়া মাল। জেদ বা গোঁ ধরে থাকা, বারবার ভুল করা, ঠকবাজি, ধোঁকাবাজি, অর্থাৎ যা কিছু গ্রাম্যতাদোষ আমাদের মধ্যে দেখা গেল। সমস্যা যত এল, ধামাচাপা দিয়ে পাশ কাটালাম। এতদিন পরে রোগ বেড়ে গুরুতর হয়েছে। জাতীয়তাবোধ যত উগ্র হয়েছে, জাতীয় চরিত্র তত গড়ে ওঠেনি। এই মারাত্মক অসামঞ্জস্য পৃথিবীর কোন দেশে দেখা যায় না।

•

আজকের এদেশী সমাজে যাঁরা বিদেশে বহুবিজ্ঞাপিত তথাকথিত 'আধুনিক মানুষের' যাবতীয় লক্ষণ খুঁজে পান, আমি তাঁদের দলে নেই। ওটা বিশেষের সামান্যীকরণ দোষ। এলিয়েনেশন তথা উন্মূলতাবোধ তথা নিঃসঙ্গতাবোধ—যা নাকি 'আধুনিক মানুষের প্রধান সব লক্ষণ, হয়ত দৃষ্টিদোষে আমার অন্তত নজরে পড়ে না। শহর থেকে দু পা বাড়ালেই যেদেশে ভাঙাচোরা কুঁড়েঘর, ছ্যাকড়া গরুর গাড়ি, মাটির হাঁড়ি কী সানকিতে পান্তা—সে দেশ সম্পর্কে ধারণা বদলানো ভালো। বিদেশে টেকনোলজির

বিপুলে কল্যাণে প্রাচুর্য উপচে পড়ছে—সেখানে বিতৃষ্ণা স্বাভাবিক হতে পারে; আমাদের আসল দুঃখ অন্নাভাব। তাছাড়া মহাযুদ্ধের ঝড়ঝাপটাও আমরা বুকে বইনি অতখানি। মানুষ সম্পর্কে আমরা হতাশ হবার সুযোগ পাবো কেমন করে? এখনও সমাজের দরজায় আমরা উমেদারি করছি দিবারাত্র। এদেশের বড় শহরে বিদেশী 'আধুনিক মানুষের' যে আদল আবিষ্কৃত হচ্ছে, তা আসলে নিছক মেট্রোপলিটান জনপদেরই বৈশিষ্ট্য। উন্মার্গগামিতা বেড়েছে সবখানে। রাষ্ট্রযন্ত্র দুর্বল হলে এটা সবযুগেই স্বাভাবিক। পরিবারের কর্তা অমনোযোগী—ছেলেপুলেরা বখে যাবে। একটা ক্র্যাকার ফাটালে কেউ যখন বাধা দেবার নেই, তিনটে ফাটাবে। নেই কাজ তো খই ভাজ। টেকনোলজি কত ভালো দিতে পারে, আমরা দেখে চমৎকৃত আর লোভী কিন্তু তাকে পুরো ব্যবহার করে সেই ভালোগুলো সব মানুষকে দেওয়া গেল না। সবাই তা পেতে দাবী করছে। কেউ পেল, কেউ পেল না। ক্ষোভ বাড়তে থাকল। অভিমানী ছেলে বল ছুড়ে ঘরের কিছু ভাঙবেই—এমনকি নিজের প্রিয় খেলনাও তছনছ করবে। ওদিকে গ্রামের জমিতে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা ফুলে উঠছে, তার পুনর্বাসন হয়নি। তাই সেখানেও মাঠেঘাটে বিশৃংখলা শুরু হয়েছে। এবং এসবের পিছনে একান্ত কারণ গুরুত্বের অসামঞ্জস্যপূর্ণ ধনবন্টন ব্যবস্থা। তথাকথিত বিদেশী দার্শনিকতাসঞ্জাত 'আধুনিকতার ব্যাধি' বা 'সময়ের গভীরতর অসুখ' এদেশে প্রাদুর্ভূত হয়নি।

বরং কী শহর, কী গ্রাম, প্রত্যেকটি মানুষ আজ জীবনের প্রতি যতখানি অনুরাগী, এমনটি কখনও দেখা যায়নি। এত মৃত্যু চারদিকে, তাই 'জীবন জীবন' বলে চিৎকার। এত হতাশা, তাই আশার বাতি ঘরে-ঘরে। এতে নিঃসংগতা বিচ্ছিন্নতা উন্মূলতাবোধের কোন ব্যাপারই নেই। আর মূল্যবোধ ভাঙার কথা শুনি। এ কি ভাঙবার মত জিনিস? এ বদলায়—রূপান্তরিত হয় মাত্র। সনাতন মূল্যবোধ বলতে তেমন কিছু দেখি নে। এ হচ্ছে নিরবচ্ছিন্নভাবে রূপান্তরশীল পরিবর্তমান একটা বিচিত্র বস্তু। মানুষ বিজ্ঞান তথা টেকনোলজির প্রসারের সংগে-সংগে যেমন নিজেকে অবস্থার উপযোগী করে তুলেছে, তেমনি তার মূল্যবোধও পাল্টাচ্ছে; কিন্তু তার মানে এই নয় যে সে অ-মানুষ হয়ে পড়ছে। সত্যি বলতে কী, মানুষের সর্বমুখী সচেতনতা আর বুদ্ধির এত উৎকর্ষ আগেকার মানুষের কাছে অকল্পনীয় ছিল। এদিকে পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থাৎ মানুষে-মানুষে, মানুষে-সমাজে যে সম্পর্ক, তা কালে-কালে বদলায় বা বদলাচ্ছে; অধুনা টেকনোলজির কারণে একটু দ্রুত বদলাচ্ছে। একটা কথা বুঝতে ভুল হয়। মানুষ যাই করুক, সামাজিক আইন তো বটেই, রাজা বা (ব্যাপকার্থে) রাষ্ট্রের আইন মানতে তার জুড়ি নেই। মানুষ আইনেরই ভক্ত। মুণ্ডি-মুণ্ডি করে যতই চেঁচাক, পায়ে বেড়ি না পরলেও তার শান্তি-স্বস্তি নেই। আর আমাদের দেশের কথা! রাষ্ট্র যে আইনই করুক—সাধারণ মানুষ নির্বিবাদে সে আইন মেনে চলবে; যদি না অন্তত কেউ বা কারা তাকে ক্ষেপিয়ে তোলে। এমন হাড়েহাড়ে শান্তিপ্রিয় মানুষের দেশ বলেই তো এইসব দুর্ঘটনা ঘটছে।

•

আমরা সত্যিসত্যি কেউ নিঃসঙ্গ নই। একজন সাহিত্যিক নিজেকে নিঃসঙ্গ বলতে পারেন—কিন্তু তিনি ভালই জানেন যে তাঁর অস্তিত্বের সংগে কি চারপাশে হাজার হাজার পাঠকের ভিড়। চিরকালীন নিঃসঙ্গতা বলে একটা ব্যাপার অবশ্য মানুষের মধ্যে আছে—সেটা থাকবেই। তাই বলে তো কেউ সমাজের উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে নেই। সংবেদনশীল মানুষমাত্রেই টের পান—তাঁর দেহমনের অস্তিত্বে যা কিছু রয়েছে, তার প্রধান অংশই অন্য-অন্য মানুষ ও সমাজের উপহার। ইচ্ছে থাকলেও উদ্বাস্তু হওয়া অসম্ভব—জৈবিক দিক থেকে তো বটেই। তবে আমরা বিষণ্ণ। এটা স্বাভাবিক। সমকালীন সমাজের দিকে তাকিয়ে কার না খারাপ লাগে। কিন্তু তবু হাত-পা গুটিয়েও তো কেউ বসে থাকতে পারব না। আমাদের সক্রিয় হতেই হয়— এটা অস্তিত্বেরই অমোঘ বিধান। যুদ্ধের মধ্যে গিয়ে পড়লে হয় শত্রুপক্ষে নয় মিত্রপক্ষে যেতেই হয়। এখন যুদ্ধের ঋতু।

না, সমস্যা ও সংকটকে আমি লঘু করে দেখছিনে। সমকালের ভয়ংকর চরিত্র চোখের ওপর এত স্পষ্ট যে অন্ধও টের পেয়ে যায়। আমি শুধু বলতে চাই, এই ভয়ংকর অন্ধকার নানারূপে নানা চরিত্রে পৃথিবীতে হাজির হয়েছে মানুষের সামনে—অনেক অনেকবার। 'সডোম আর গোমরা' 'লঙ্কাকাণ্ড' 'কুরুক্ষেত্র' কত কী ঘটেছে। তবু মানুষ দিব্যি বেঁচে আছে। স্বীকার করছি, মাত্র একদেড় শতক বা সম্প্রতি দুতিনটে দশকের মধ্যেই পৃথিবীতে যা ঘটেছে বিগত হাজার-হাজার বছরের মোট বিঘটিত ব্যাপারগুলো তার তুলনায় নস্যি। কিন্তু আমার প্রশ্ন : মানুষ বেঁচে থাকতে চায়, না চায় না? অস্তিত্বঘটিত এই চিরকেলে ব্যাপারটা কি বদলেছে? মানুষ কি সমাজকে সত্যিসত্যি এড়াতে পেরেছে? যত জটিলই হয়ে উঠুক, মানুষ কি সত্যিই দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে?

আমার অস্তিত্বের যে অংশটাকে ব্যক্তিত্ব বলি, তা খণ্ডদ্বীপের মতো যত পৃথক হয়ে যাক, তলার দিকে দ্বীপে-দ্বীপে যোগসূত্র অব্যাহত। সমুদ্র উত্তরঙ্গ—কিন্তু আমার শিকড় তোমার শিকড় ছুঁয়ে রয়েছে—ওখানে তলার মাটি সনাতন আর কঠিন। ওদিকে বিশ্বজগতের সম্পর্কে ধারণা বদলাচ্ছে। ভূগোল প্রসারিত হচ্ছে। টেকনোলজি তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। এখন সেই জার্মান পণ্ডিতের কথা স্মরণ করা যাক। 'ঢের ব্যাখ্যা করেছ যাদুমণিরা, এবার শুধু বদলে দেওয়ার কাজে হাত লাগাও দিকি।'

শতাব্দীর এত বিপুল অভিজ্ঞতার ফলে অন্যান্য মানুষের সংগে আমিও জীবনকেই বরং আরো গভীর, আরো আবেগোচ্ছল বিহ্বলতায় ভালবাসতে পারছি। মানুষ আজ আমার কাছে এক প্রচণ্ড বিস্ময়। কারণ তার শক্তি দেখে আমার তাক লেগে গেছে। এখন আসল কাজ হল, 'সব বদলে দেওয়া।'

এই যে ডাঃ সোম আসুন আসুন কোন কষ্ট হয় নি তো? ও বুঝি পরে আসছে। তা আসুক। বলুন কেমন আছেন? আপনাকে দেখে কি মনে হচ্ছে জানেন? মনে হচ্ছে আপনার বয়স কমপক্ষে বিশ বছর বেড়ে গেছে। অবশ্য এই কটা বছর আমাদের দেখা-শোনাও তো হয় নি। জানেন ডাঃ সোম এক এক সময় মনে হয় এক একটা গাছ বয়সের ভারে নুয়ে পড়ছে। গা থেকে চাপড়া চাপড়া ছাল খসে পড়ছে। আজ এ ডালটা শুকিয়ে যাচ্ছে কাল ও ডালটা। এই এখন যেমন আমাদের অবস্থা। আজ কাশি, কাল প্রেসার, পরশু গাঁটে-গাঁটে ব্যথা। অথচ কি আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন। ঠিক ওরই পাশে উঠছে নবীন গাছ। আজ শিশু কাল কিশোর পরশু যৌবনের ঢল। আমার বাড়ীর সামনে সেই চাঁপা গাছটার কথা আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই। ওই গাছটার শরীরে এখন পরিপূর্ণ যৌবন। সব থেকে মজার ব্যাপার কি জানেন ঐ গাছটা আর আমার ছেলে সৌরেন মানে যাকে সঙ্গে নিয়ে আজ আপনার আসবার কথা ওদের দুজনের বয়েসও এক। ডাঃ সোম আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন বলুন তো। ওঃ বুঝেছি বুঝেছি এতটা পথ এসেছেন তাতেই ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে। তা সৌরেন এখন বেশ বড়-সড় হয়ে উঠেছে তো। দেখতে নিশ্চয়ই আমার মত লম্বা-চওড়া হবে। ভালোই হবে ওঃ আজ আমার যে কি আনন্দের দিন তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। শুধু আমিই নই আমার স্ত্রী সৌরেনের মাও আজ খুব খুশী হবেন। বেচারা রোজই ছেলের জন্য ঘর-দোর গোছ-গাছ করে রাখে। রান্না-বান্নাও করে। আর করবে নাই-বা কেন বলুন এক বছর দু বছর নয় বিশটা বছর পেরিয়ে গেল। ও সত্যিই আজ আমাদের বড় আনন্দের। জানেন ডাঃ সোম আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো তা বুঝতেই পারছি না। সেই কতটুকু বয়সে ফুটফুটে সৌরেনকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছিল ওরা বলুন তো। এমন বাবা-মা পাবেন। উঁহু পাবেন না। আমি জোর করে বলতে পারি এমনটি পাবেন না। পৃথিবীতে কোথাও পাবেন না। কি হল ডাঃ সোম আপনার কী খুবই কষ্ট হচ্ছে, চলতে পারছেন না বলে মনে হচ্ছে। তা এক কাজ করলে কেমন হয় বলুন না একটু বসে যাই। আমারও বোকামি দেখুন আপনাদের নিতে এলুম অথচ একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করলুম না। জানেন ডাঃ সোম আমার স্ত্রী আজকাল ভীষণ ভীতু হয়েছে। আমাকে বেরুতেই দিতে চায় না। মেয়ে-ছেলের বুদ্ধি তো। দেখুন দিখিনি আপনাকে নিয়ে আমার লজ্জার শেষ নেই। অবশ্য খুব বেশী পথও নয়। ঐ-ঐ যে বাঁকটা দেখছেন ওর পাশের গলিটা দিয়ে আরো কিছুটা পথ যেতে হবে। তাতে খুব কষ্ট হবে না। আর একটু গেলেই বাঁদিকে ছোট পার্কটা পড়বে। ওতে এখন সব ছোট-ছোট ছেলেরা খেলা করছে। ভারী ভালো লাগে। এক-এক সময় এই বড় বয়সেও মনটা এমন করে যে ওদের সঙ্গে ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি হুড়ো-

হুড়ি করে ধুলো-কাদা মেখে খেলা করি। আবার কখনও-কখনও ওদের মধ্যেই সোরেনকে খুঁজি। কি বোকামি দেখুন, এখন সে কত বড় হয়ে গেছে। আজ আর সেই ছোট্ট ফুলটি নেই। ওটা সোরেনের ডাক-নাম আপনার মনে আছে তো ডাঃ সোম। হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে না থাকবার কি আছে। সোরেন নামটাই তো আমরা ভুলে গেছি। ওর মা তো ফুল-ফুল করেই পাগল হয়ে গেল। ভুলেও কোনদিন ওকে সোরেন বলে নি। চলুন ও ফুটে যাই। ও দিকটায় বেশ গাছের ছায়া আছে। গাছগুলো আজকাল আর কেউ তেমন যত্ন করে না। তবুও আদরে-অনাদরে কেমন বেড়ে উঠেছে। থোকায়-থোকায় লাল-লাল ফুল যেন সবুজে ক্যানভাসে অস্তাচলের সূর্য। একটু সামলে চলুন, সামনে একটা গর্ত ইলেকট্রিক কোম্পানীর লোকেরা ওটা খুঁড়েছে ভরাট করার দায়িত্ব যে কার ভগবানই জানেন। হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম। আচ্ছা সোরেন আপনাকে বেশ মান্যটান্য করে তো। শ্রদ্ধা-ভক্তি জানায় তো। অবশ্য ওটা ওর বাপের রক্ত থেকে নিশ্চয়ই পেয়েছে সে বিশ্বাস আমার আছে। তবে ভয়ও হয় মাঝে-মাঝে, কেন জানেন? আজকাল সব ছেলে-ছোকরা-দের যা দেখি তাতে নিজেদেরই লজ্জা করে। অবশ্য তার জন্যে সব দোষ ওদের ঘাড়ে দিয়ে লাভ নেই। আমরা তো কম যাই না। সোরেন রাজনীতি-টাজনীতি করে না তো? ওটার ওপর ইদানিং ওর মায়ের আবার ভীষণ অরুচি। মানে উনি আমাকে দিয়ে বিচার করেন কিনা। সোরেনের মা মাঝে-মাঝে কি বলে জানেন, বলে তুমি ওয়ার্থ-লেশ, কত লোক কত সুযোগ-সুবিধে করে বাড়ী-গাড়ী কত কি করলো আর তুমি দেশ-দেশ করে সব খোয়াচ্ছো। বলুন তো কি অন্যায় কথা। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি ওদের কথা শুনলেই হাসি পায়। দেশের জন্য কিছু করতে পারাটা মহাভাগ্যের কথা। এটা কেমন করে বোঝাই বলুন তো। বলুন না আপনিই বলুন দেশকে নিয়ে কি আলু-পটলের মত ব্যবসা করা যায় যে আখের গুছিয়ে দেশটাকে পথে বসাতে হবে। মাঝে মাঝে খুবই দুঃখ হয়। বেদনাও পাই কোন কথা কাউকে বলতেও পারি না। তবে সোরেনের মত টাটকা তাজা ছেলেরা যখন দেশের ভার নেবে তখন দেখবেন নিশ্চয়ই দেশের চেহারা বদলে যাবে। আপনি হাসছেন। আমার কথা শুনে আজ আপনি হাসছেন হাসুন, কিন্তু দশ বছর পরে চোখে তাক লেগে যাবে। ওঃ মনে পড়ছে, আচ্ছা ডাঃ সোম সোরেন কি সেই ছেলে-বেলার মত এখনও পয়সার বায়না করে নাকি? এখন নিশ্চয়ই সে অভ্যাসটা আর নেই। ভারী মজার ব্যাপার হোত ওর মা যখন ওর চোখে কাজল পরাতো ও কিছুতেই পরবে না। ওর মাও ছাড়বে না। তখন বায়না তুলতো পয়সা দিতে হবে। আর সেই পয়সা নিয়ে ইস্কুলে গিয়ে কি খেতো জানেন। যত রাজ্যের ফেরীওয়ালার কাছ থেকে চাটনি। আমসত্ত চানাচুর এই সব। অবশ্য এসব ও কোনদিন লুকতো না। সবই বলে দিতো। আমরা শুনে হাসতুম। এখন এসব কথা শুনলে ও ভারী লজ্জা পাবে বেশ বড-সড় হয়েছে তো। আপটার অল ইয়ংম্যান। কি বলেন? আসুন এবার আমাদের বাঁদিকে যেতে হবে। আর বেশী দূরে নেই প্রায় এসে গেছি। আপনার কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি। তবে আপনাকে দেখলে আমার স্ত্রী খুব খুশী হবে। উনি প্রতিদিনই আপনার কথা বলেন। সোরেনের প্রসঙ্গ উঠলেই আপনার কথা বলেন। আসলে আমরা দুজনেই আপনার মুখ চেয়ে আছি। কেননা আপনি ছাড়া সোরেনকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবার কেউ নেই। জানেন ডাঃ সোম এখনও মাঝে মাঝে আমার কেমন একটা ভয় হয়। যেন ওর অসুখ করেছে। ও আমাদের ডাকছে বলছে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে বাবু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও। আমি তেতো ওষুধ কিছুতেই খাবো না। জ্বরে ওর চোখ-মুখ সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠেছে। ঠোঁটের ওপরে বালির দানার মত দু-চার ফোঁটা ঘাম। মাথায় আইস-ব্যাগ চাপানো হচ্ছে। টেবিল ফ্যানের সঙ্গে হাতপাখাও চলছে। আমরা সবাই ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। আপনি এলেন। ওঃ কি বাঁচান যে সেবার বাঁচালেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। সেই দৃশ্যগুলো এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আর অজানা আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়ি। এখন আর সে ভয় নেই। কেন নেই জানেন। কারণ এখন সে সব সময় আপনার কাছে-কাছেই আছে। আমরা তার কিছুই করছি না। সব-কিছুর দায়িত্ব আপনারই। আসুন-আসুন আর একটু। সামান্য পথটুকুর শেষ হলেই কি আশ্চর্য এতক্ষণ আপনাকে আমি রাস্তা দেখাচ্ছি অথচ এটা কিছুতেই খেয়াল হচ্ছে না যে আপনি আমাদের বাড়ীতে নতুন নন। তবে হ্যাঁ সেই পুরনো বাড়ী তো আর নেই। এখন অনেকটা অদল-বদল হয়েছে ছাড়া আশে-পাশেও অনেক বড়-বড় বাড়ী উঠেছে। এখন আর চিনতেই পারা যায় না। এই ক বছরে এলাকাটা যা হয়েছে আমারই এক-এক সময় ভুল হয়। এই তো সেদিন পার্কে ছেলেদের খেলা দেখছিলাম। ঐ যে লাল রঙের বাড়ীটা। চারতলা দেখছেন। ওটা মিঃ সেন ইনকামট্যাক্স অফিসারের বাড়ী। ভদ্রলোক রীটায়ার্ড। তাঁরই হবে বোধ করি। নামটাও ভারী মিষ্টি পিন্টু।

ফুটফুটে ছেলেটি একেবারে ঠিক আমার সোরেনের মত। ওর খেলা দেখতে-দেখতে আমি এমন তন্ময় হয়ে গেছি যে খেলা শেষ করে ওরা যখন বাড়ী ফিরছে তখন ওর পিছু-পিছু একেবারে ওদের সদরে। কি লজ্জার কথা। মিঃ সেন আমাকে দেখেই অবাক। আমি তো আজ-কাল আর কারো বাড়ীটাড়ি বেশী যাই না। উনি প্রশ্ন করলেন কি ব্যাপার মিস্টার রায়-চৌধুরী, হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে। লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়লো। আমতা-আমতা করে বললুম, আজ্ঞে না, মানে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি দেখলুম আপনি বসে আছেন তাই ভাবলুম একটু আপনার সঙ্গে গল্পসল্প করে যাই। তারপর বেশ কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করে এক পেয়ালা চা খেয়ে উঠলুম। বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীকে কথাটা বলবো-বলবো করেও বলতে পারলুম না। কেন জানেন। কারণ স্ত্রী-বুদ্ধি ভয়ংকরী। উনি তখনই আমাকে উপদেশ দিতেন, খবরদার ওরকম আর ছেলেদের পিছু-পিছু যেও না ছেলেধরা বলে পুলিশে দেবে। শুনুন কথা। পঞ্চানন রায়চৌধুরীকে এই কলকাতা শহরে কে না চেনে। অবশ্য আজ-কালকার ছেলে-ছোকরারা চিনতে পারবে না কিন্তু পুরোনরা। পুরোনরা তো চিনবে। তখন সব আমরা জেল থেকে ছাড়া পেলে কত মালা ফুলের তোড়া। এসব তো মনে আছে আপনার। আপনি তো একবার

সেই আলিপুরে সেন্ট্রাল জেলের গেটে গিয়েছিলেন। ওসব কথা মনে হলে দুঃখ হয়। আচ্ছা ডাঃ সোম সৌরেন নেশাটেশা করছে না তো। আমার আবার ওটাতে ভীষণ আপত্তি। কেন জানেন। আমি নিজে তো কখনও নেশা-ভাঙ করি নি। তবে আমার বিশ্বাস ও সেরকম কিছু করবে না। আর তাছাড়া বলতে কি যা যুগ পড়ছে তাতে একটু-আদটু না করাটাই বোধহয় পিছিয়ে পড়ার লক্ষণ। সব তাজা-তাজা ছেলেগুলো নেশা-ভাঙ করে বয়ে যাচ্ছে দেখলে দুঃখও হয় রাগও ধরে। কিন্তু ওরা করবেই বা কি। চাকরি-বাকরি নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ নেই। পড়াশুনাও আজকাল এমন ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠেছে যে সবার পক্ষে তা চালিয়ে যাওয়া মুস্কিল। তবে হাঁ ওদের তেজ আছে কবজিতে জোর আছে বলতে হবে জীবনের প্রতি একটুকু মায়া নেই। কথায়-কথায় ছুরি চালায়। বোমা মারে। এসিড বাল্ব ছোঁড়ে। এটাকে একটা অসুখ বলতে পারেন। কিন্তু এই অসুখের জন্য আমরাও তো কম দায়ী নই। আমাদের রোগ যদি এদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে থাকে তবে দোষটা কিসের। ভেতো বাঙালী শুধু দুনিয়ার কাছে মার খাবে আর ভাগ্যের দোহাই পেড়ে দু চোখ ঝরিয়ে কাঁদবে এটা হতে পারে না। ছেলেগুলো কেমন সাহসী। হয়তো পথের ভুল হতে পারে। তাও আমাদের মতে। আর পাঁচজনের মতে। ওরা কিন্তু ওদের বিশ্বাসে অটল। ওরা মরতে ভয় পায় না। এটাই তো বাঙালী হিসেবে আমাদের গৌরবের কথা। ছেলেরা ডানপিটে না হলে ছেলেই নয়। আমার সৌরেন খুব ডানপিটে ছিল। ছোটবেলায় ভারী শয়তানী করতো। একবার ও কি করেছিল জানেন। ওর ঠাকুরমা দুপুরে ঘুমাচ্ছিল। ও করেছে কি ওর কাকার স্টুডিও থেকে রঙ-তুলি নিয়ে ঠাকুরমার সারা মুখে সেই সব মাখিয়ে পালিয়ে গেছে। তারপর ওকে যখন ধরা হলো ও কি বললে জানেন, বললে ঠাকুমা আমাকে গঙ্গা নাইতে নিয়ে গিয়ে ছাপ দেয় নি কেন। সবাই তখন আমরা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছি। এখন এসব কথা শুনলে ও নিশ্চয়ই খুব লজ্জা পাবে। আর তাছাড়া এমনিতেই ভারী লাজুক। ডাকাতি যা করবার তা বাড়ীতেই করেছে, বাইরে কখনও কারো সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করেছে এরকম অভিযোগ শুনতে হয় নি। এখনও নিশ্চয়ই সেরকমই আছে। আচ্ছা ও কি এখনও চকলেট খাওয়ার অভ্যাসটা ছাড়তে পারে নি। ও কি ভীষণ ভাবে ও চকলেট খেত। চকলেট পেলে ওর আর কিছুই চাই না। প্রায়ই রাত্রে তখন ওর জন্যে চকলেট এনে রাখতাম। বাবু ঘুমচোখেই একটু ভেঙে মুখে পুরে দিত। একদিন চকলেটের বদলে আমসত্ত্ব এনেছিলাম ওর ঘুম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে আমসত্ত্বের প্যাকেট থেকে একটা টুকরো ছিঁড়ে ওর হাতে দিলুম। প্রথমটা একটু মুখটা কেমন করে বলে উঠলো বাবু তুমি ঠকিয়েছো এটা চকলেট নয় আমসত্ত্ব। আমি বললুম তা কি করে হয় চকলেটই তো এনেছি বাবা।

আমি যত বলি চকলেট এনেছি, ও ততই বলে না চকলেট না আমসত্ত্ব। মুখটা সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। আমসত্ত্বটুকু শেষ করেই বায়না জুড়লো চকলেট চাই। চকলেট দাও না দিলে আমি ঘুমাবো না। ওর মা তখন বললে বেশ তোকে ঘুমুতে হবে না। চুপচাপ শুয়ে থাক বায়না করিস নি। ও তাই করল। বায়না করল না বটে কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার সারারাত ও না ঘুমিয়েই মটকা মেরে পড়ে রইল। ভারি একগুঁয়ে এবং জেদী। এখন নিশ্চয়ই সে রকম গোঁ আর নেই কি বলেন? আপনি খুবই পরিশ্রান্ত আর এই সামান্যটুকু পথ চলুন তারপর বিশ্রাম করবেন তারপর একসঙ্গে বসে চা খাওয়া যাবে। কত দিন আমরা ছেলেটাকে দেখি নি। আপনার কথা মনে করেই আমরা নিশ্চিন্ত আছি। জানি জানি ডাঃ সোম আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবন দান করুন। তবে দীর্ঘায়ু হওয়াও তেমন সুখকর নয়। নানা শোকতাপে মানুষকে খুবই যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আপনার ক্ষেত্রে অবশ্য ও প্রশ্নটা ওঠে না কারণ আপনি ব্যাচেলার মানুষ। রিয়েলি আপনিই বোধ হয় পৃথিবীতে একমাত্র সুখী মানুষ। আচ্ছা ডাঃ সোম সৌরেন আমাদের চিঠি লেখে না কেন। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই রহস্যজনক বলে মনে হয়। ছেলে বাপমাকে চিঠি লেখে না। আপনি কি ওকে চিঠি লিখতে বারণ করেছেন। ওর হাতের লেখাটা এখনও কি সেই রকম বাঁকা বাঁকাই আছে? বেশ বড় বড় অক্ষরে লিখতো তবে অক্ষরগুলি স্পষ্ট ছিল। একবার কি করেছিল জানেন। পাজীটা করেছে কি আমার লেখা একটা পাণ্ডুলিপির পাতায় মনের আনন্দে লতাপাতা ফুল এঁকেছে আর বড় বড় হরফে লিখেছে বাবা রাজা দাদা মামা কাকা ঠাকুমা মা ফক্কা। পাণ্ডুলিপিটা এইভাবে নষ্ট করায় সেদিন ওকে খুব মার দিয়েছিলুম। আশ্চর্য বেদম মার খেয়েও চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল ফেলতে দেখি নি। ওর না ফেলা চোখের জল এখন চোখে জমা হয়েছে তাই এখন সেই পাতাটা আমার কাছে অমূল্য সম্পদ। যক্ষের ধনের মতো সেটিকে আমি বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখি মাঝে মাঝে লুকিয়ে সেই হস্তাক্ষর দেখি। খুব লুকিয়ে রাখি কেন জানেন, পাছে ওর মা টের পেয়ে যায়। ওর মাও একটা কালো রঙের প্যান্টকে লুকিয়ে রেখেছিল। রোজ রাতে বুকের কাছে সেটা নিয়ে কাঁদতো। সকালে আর সেটা দেখতে পেতাম না। ভোরে উঠেই এমন কোথাও লুকিয়ে রাখতো যা তিনি ছাড়া আর কারুর পক্ষেই জানা সম্ভব ছিল না। হাজার হলেও মায়ের প্রাণ তো আপনি আমার কথা শুনে আমাকে ছেলেমানুষ ভাবছেন তো। হয়তো আপনার হাসিও পাচ্ছে কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমরা আপনাকে ঈশ্বরের মতই বিশ্বাস করি কেন জানেন? কারণ আপনিই আমাদের একমাত্র সন্তান আমাদের সৌরেনকে ফিরিয়ে দেবেন এই বিশ্বাসেই আমরা দিন গুনছি। সে বড় হয়েছে, আরো বড় হবে, সে মানুষের মত মানুষ হবে এর চেয়ে আনন্দের আর কি

হতে পারে বলুন। চলুন ওদিকটায় যাই এদিকটাতে বড্ড রোদ্দুর। আচ্ছা ও কি এখনো সেই রকমই আছে? নিজে না খেয়ে বন্ধুদের খাওয়ানোর ঝোঁকটা কি আছে এখনো? ছেলেবেলায় ওর ক্লাশের ছেলেদের ও খুব খাওয়াতো। একদিন করেছে কি, টিফিনের সময় ক্লাশের দুটি ক্ষুদে বন্ধুকে নিয়ে বাড়ীতে এল। ঘরে বসে তিনজনে লুকিয়ে লুকিয়ে রুটিতে গুড় মাখিয়ে খেয়েছে তারপর যথারীতি আবার স্কুলে চলে গেছে ওর মা কিছুই টের পায় নি। পরে রুটির পাত্রটির ঢাকা খোলা দেখে সন্দেহ হয়েছে, ওমনি ধরেছেন এ কাজ নিশ্চয়ই ভুলুর। ভুলু স্কুল থেকে ফিরলে তাকে প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁরে দুপুরে তুই রুটি খেয়ে গেছিস ও তার জবাবে কি বললে জানেন বললে বারে আমি কি একলা খেয়েছি, রুনু, ঝুনুকেও খাইয়েছি। ওর মা বললে কেন? তার উত্তর হলো ওদের রান্না হয় নি ওরা বাড়ীতে কিছু খায় নি তাই খাওয়ালুম বলেই ঠাকুরমাকে সাক্ষী রেখে বললে ঠাকুমা তুমি, তুমি বলোনি কেউ না খেয়ে থাকলে তাকে খাওয়াতে হয়। মা বোধ করি ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলেন বললেন, বেশ করেছো। খুব ভাল কাজ করেছো। বউমা এসব নিয়ে তুমি আর ভুলুকে কোন দিনও বোকবে না বলছি। চলো দাদুভাই আমরা ওদিকে যাই বলে মা তো সৌরেনকে নিয়ে সরে গেলেন। আমার স্ত্রী খুবই লজ্জা পেলেন। এখন এসব গুণের কথা শুনলে ছেলে ক্ষেপে যাবে কি বলেন? অবশ্য সেটা স্বাভাবিক। কেননা এখন তো আর ও সেই ছোট্ট ভুলুটি নেই। আচ্ছা ডাঃ সোম আপনিও তো মাঝে মধ্যে দু-একটা চিঠি লিখতে পারেন। তাও লেখেননি। একটা চিঠি পেলে আমরা যে কি আনন্দ পেতাম তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারছি না। আচ্ছা ও কি এখনো ফল সহ্য করতে পারে না? বোধ হয় পারে না। ফলের উপর ছেলেবেলায় ওর ভীষণ অরুচি ছিল। অবশ্য তার জন্য আমিই দায়ী। একদিন ওকে সঙ্গে করে একজন কোটিপতির বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন বাড়ীর একটি চাকর একরাশ ফলের খোসা ডাস্টবিনে ফেলতে যাচ্ছিল, ওর নাকে সেই গন্ধটা লাগলো। চুপিচুপি আমার কানের কাছে মুখটা এনে বললে, 'বাবু' এদের বাড়ীর কারুর কি অসুখ করেছে?" আমি বললাম, "চুপ করো ওসব কথা বলতে নেই। আর তাছাড়া অসুখ করেছে বুঝলে কি করে?" ও বললে বারে অসুখ না করলে কেউ কি ফল খায়? ঐ যে লোকটা অতো ফলের খোসা নিয়ে গেল। আমি বললাম—না গরীব লোকরা ফল খায় অসুখ হলে আর বড়লোকরা ফল খাওয়ার অসুখেই ভোগে। আমার কথার কি অর্থ করলো সেই জানে। আসবার সময় বললে, বাবু আমি আর কোন দিনও কিছু ফল খাব না। সত্যিই ডাঃ সোম ওকে ফল খাওয়ানো যায় নি। নিশ্চয়ই সে অভ্যাসটা এখনো আছে। জামা-কাপড়ের দিকে ওর তেমন বিশেষ কোন ঝোঁক নেই। তবে কালো রং-এর প্যান্ট পড়তে ও খুব ভালবাসতো। এ নিয়ে

একটা ভারি মজার ব্যাপার আছে। ও যখন আপনার কাছে চলে গেল তারপর থেকে কেন জানি না আমি কিছুতেই কালো রংটা সহ্য করতে পারতাম না। আমি এখনো কালো রং-এর কিছু দেখলেই কেমন বিষণ্ন হয়ে পড়ি। কেবলই একটা অজানা আশংকা আশা বুকের মধ্যে পাথরের মত চেপে বসে। অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করি। কিন্তু একথা কাউকেই বলতেও পারি না। কালো রংটার সঙ্গে যেন কেমন একটা অশুভ, একটা ভয়ংকর রকমের কিছু জড়িয়ে আছে এটাই মনে হয়। সৌরেনের সেসব কথা এখন নিশ্চয়ই আর মনে নেই। ও এখন অনেক রং চিনতে শিখেছে। রংটাই কি সব। কি জানি বোধ হয় তাই। বোধ হয় তা নয়-ও বা। কি বলেন ডাঃ সোম। আপনি তো এ সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পারেন। যাক সে সব কথা পরে আলোচনা করা যাবে, এখন আমারও অখণ্ড অবসর, হাতে কোন কাজ নেই, শুধু আপনাদের আসবার প্রতীক্ষায় আমি প্রতিটি মুহূর্ত অধীর আগ্রহে কাটিয়ে চলেছি। সারাদিন শুধু আপনার কথা, সৌরেনের কথাই ভাবি। বিকেলে পার্কে এসে ছেলেদের হৈ-হুল্লোড় দেখি সময়টা কেটে যায়। তবে মাঝে মাঝে দুঃখও পাই। কেন জানেন? দুঃখে পাই তখনই যখন দেখি ফুলের মত সুন্দর ফুটফুটে ছেলে মেয়ে-গুলো আমাদের হাতে পড়ে হাঁপিয়ে উঠে, অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। ওরাও ছেলে-মেয়েদের ফাঁকি দিচ্ছে জানেন। ডাঃ সোম, মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয়? মনে হয় সবাই সবাইকে ফাঁকি দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। গোপনে গোপনে কেবলই ফন্দি আঁটছে। কি করে সর্বনাশ করা যায়। কিন্তু এটা বোঝে না যে, প্রত্যেকেই যদি প্রত্যেকের অমঙ্গল চিন্তা করে তবে গোটা মানব সমাজটাই যে ধ্বংস হয়ে যাবে। কে কার কথা শোনে। সারা দুনিয়া যেন একই রোগে আক্রান্ত পৃথিবীর সবটুকু সবুজ সবটুকু আলো, সমস্ত বাতাস যেন এক মুহূর্তে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব। এসবই আমাদের পাপের ফল কলঙ্কের ফসল। সভ্যতার নামাবলি গায়ে দিয়ে। সংস্কৃতির তিলক ফোঁটা কেটে। মানবতার বাণী উচ্চা-রণ করে প্রতিনিয়ত আমরা আত্মপ্রবঞ্চনার খেলায় মত্ত আর তা থেকেই জন্ম নিচ্ছে পাপ। এক-একটি পাপ শত-সহস্র পাপের জন্ম দিচ্ছে। এর থেকে মুক্তি কোথায়? সবাই আমরা অভিনেতা ঈশ্বরের সংসারে তাঁরই সৃষ্ট নাটকের ভূমিকায় আমরা যুগ-যুগ ধরে অভিনয় করে চলেছি একই অভিনয়। জীবনটা যেন একটা রঙ্গশালা। ক'দিনের জন্য শুধু অভিনয় করে যাওয়া।

এই তো কেমন সুন্দর অভিনয় করে চলেছি বলুন। প্রতিবেশীরা ভাবে পাগল। চিকিৎসক বলে অসুস্থ স্ত্রী সন্দেহ করে। চাকর-বাকর করুণার চোখে দেখে। পার্কের ছোট ছোট মেয়েরা কিভাবে তারাই জানে। তবে ওদের মধ্যে আমি আমার সৌরেনকে খুঁজে পাই। খুঁজে পাই নিজেকে। মনে হয়, আমরা যুগ যুগ ধরে এমনি করে একই খেলা সবাই খেলেছি, খেলছি এবং খেলবো। হয়তো আমার বাবাও একদিন এমনি করে খেলেছেন। খেলেছেন তাঁর বাবা, তাঁর বাবাও। তাহলে কি আমরা সবাই এক-একটা জীবনের প্রক্সি দিয়ে চলেছি বোধ হয় তাই। তা না হলে আমি যা করতে চাই আমি যা বলতে চাই তা সহজ করে মন-প্রাণ খুলে বলতে পারি না কেন। কেন বলতে পারি না তোমরা সবাই, সবাই আমাকে রাশি রাশি সান্ত্বনার ট্যাবলেট খাইয়ে চলেছো। সত্যকে গোপন করে প্রতি মুহূর্তে পাপের জন্ম দিচ্ছো এসব বুঝতে পেরেও আমি মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি না। আমার দুঃখ সেখানেই। আমার কাছে সমস্ত দুঃখের একটি মাত্র সান্ত্বনা কি জানেন ডাঃ সোম? আমি আমার সৌরেনকে ফিরে পাব। সেদিন আমার এক প্রতিবেশী অধ্যাপক বন্ধু কি বললে জানেন? বললে, মিঃ রায়চৌধুরী আমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে আর যে ক'টা দিন আছি হেসে খেলে কাটিয়ে দিতে পারলেই মুক্তি। শুনুন কথা। মুক্তি কি ছেলের হাতের মোয়া যে এত সহজে মিলবে। আমি বলি প্রক্সি দিতে এসেছো প্রক্সি দিয়ে যাও, ওসব যুক্তি-টুক্তির কথা ভেবো না, ভেবে কোন লাভ নেই। তাহলে তো সবাই আমাকে পাগল বলেই মুক্তি দিতে পারতো। আসলে সবাই পাগল, কেউ ক্ষমতার কেউ অর্থের জন্য পাগল,, কেউ যশ প্রতাপ প্রতিপত্তির জন্য পাগল, কে পাগল নয় বলুন। ওরা শুধু আমাকেই পাগল ভাবে কেন জানেন, আমি আমার ছেলেকে ফিরে পাবার জন্যে ব্যাকুল বলে। অথচ মা বাবা ছাড়া পৃথিবীতে সন্তানের কদর কে বোঝে সন্তানের মূল্য কেউই বুঝতে পারে না।

অবশ্য আপনার কথা আলাদা। আপনি আমার সৌরেনকে সন্তান স্নেহেই মানুষ করে তুলছেন। কিন্তু এঁরা তা নয়, এঁরা আমাদের হাতে ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত, হয়তো মা-বাবা অফিস-আদালত করছে। বিয়েলি অর্থ মানুষকে যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ঈশ্বরই জানেন। অর্থ না থাকাও অপরাধ, থাকলেও বিপদ। অর্থ না হলে আজকের দুনিয়ায় মানুষ অচল। একেবারে অচল। কাজেই ওদেরই বা কি দোষ দেব। যাগ্গে ওসব কথা ভেবে লাভ কি আসুন আমরা এসে গেছি। ঐ যে ঐ নিমগাছ আর তার পাশে চাঁপাফুলের গাছ-ওয়ালা বাড়ীটা দেখতে পাচ্ছেন ওটাই আমার বাড়ী। সত্যি ডাঃ সোম আপনার কাছে আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ আছি। আপ-নার ঋণ পরিশোধ করবার সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু ডাঃ সোম আমি যে খুব বিপদে পড়লুম মানে আমার স্ত্রীকে আমি কথা দিয়েছিলাম যে, সৌরেনকে ফিরিয়ে আনবো। কিন্তু কৈ তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারছি না তবে কি আমার আশঙ্কাটাই সত্যি। না না তা হতে পারে না, তা হতে পারে না। ডাক্তার আমি শুধু সে ফিরে আসবে একদিন নিশ্চয়ই সে ফিরে আসবে এই বিশ্বাসকে মনের মধ্যে লালন-পালন করে সান্ত্বনা পাই। আর সান্ত্বনা না থাকলে পৃথিবীতে মানুষ বাঁচবে কি নিয়ে। জীবনে অনেক ভুল করেছি। অনেক ঠকেছি কিন্তু বিশ্বাস করুন ডাঃ সোম, বিশ্বাস করুন, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আপনার কাছে আমি ঠকবো না, এই সান্ত্বনাটুকু যেন পাই। বিশ্বাস বস্তুটি মহামূল্যবান। একবার হারিয়ে গেলে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। জানেন ডাঃ সোম, আমার স্ত্রীও আজ-কাল বোধহয় আর আমাকে বিশ্বাস করতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে আমাকে কি বলে জানেন, বলে পাগল, দুপুরে বেরুলে বলে, "পাগলের মত সারা শহর ঘুরে কি লাভ হয় তোমার" শুনুন কথা। আরে লাভ-লোকসান কি শুধু ওজন মেপে বার করা যায়। এই যে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি, এর তো খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু তা হবে না। আমাকে বলে আপনি এলে খুশি হবে। কিন্তু আমি জানি ও খুশি হতে পারবে না। কেন না ও বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত বেদনার পাহাড় গোপনে-গোপনে বহন করে চলেছে। তাই আমি যখন দরজার কড়াটা নাড়বো, ও ভেতর থেকে দরজাটা খুলে দেবে। দিয়ে আমাকে ধমকাবে। কি বলবে জানেন। বলবে, আবার তুমি এই দুপুরের রোদে একা-একা পাগলের মত ঘুরে এলে।

জ্ঞানতাপস ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আশী বৎসরে পদার্পণ করা নিঃসন্দেহেই আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে স্মরণীয় ঘটনা। যে কয়জন বরেণ্য মনীষী বিশ্বের দরবারে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, আচার্য সুনীতিকুমার তাঁদেরই অগ্রবর্তী সারিতে। তাঁর আজন্ম সাধনা ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে তিনি অদ্বিতীয়। সংস্কৃতি এবং শিল্পসাহিত্যেও তাঁর অবদান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বাস্তবিক, দেশে দেশে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে তাঁর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন ব্যক্তি এ যুগে দুর্লভ। মানুষের প্রতি অপরিসীম প্রীতির জন্যে তিনি সারা পৃথিবীরই আত্মীয়তা লাভ করেছেন। তাঁর মতো প্রবীণ সাহিত্যাচার্যকে তাঁর এই অশীতিতম জন্ম-বৎসরে 'ভারত-রত্ন' পদবীতে ভূষিত করলে যোগ্যতম ব্যক্তির প্রতি সম্মান জানানো হবে। জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমারের কর্মময় দীর্ঘ-জীবন কামনা করি।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

গান্ধী-আলেখ্য

গান্ধী শতবার্ষিকী বৎসরে গান্ধীজীর জীবন ও কর্ম প্রসঙ্গে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এইসব গ্রন্থের মাধ্যমে গান্ধী-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে নূতন দিগন্ত আবিষ্কৃত হচ্ছে। গান্ধীজীর জীবনী ও বাণীর নব-মূল্যায়নে এইসব গ্রন্থাবলীর ভূমিকা অমূল্য।

সম্প্রতি এমনই একখানি গ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে। এই গ্রন্থটির নাম PROFILES OF GANDHI। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন প্রখ্যাত মার্কিন লেখক নরম্যান কাজিনস্ এবং দিল্লীর ইণ্ডিয়া বুক কোম্পানী এই সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থটির বিষয়-বিভাগ বিচিত্র। প্রথম অংশে আছে জীবিত গান্ধী-সম্পর্কে কয়েকটি মার্কিন স্মৃতি-চিত্রণ (১৯৩০-৪৮), দ্বিতীয় অংশে আছে গান্ধীজীর তিরোধানের পর প্রদত্ত মার্কিন শ্রদ্ধাঞ্জলি (১৯৪৮—৬৯), তৃতীয় অংশে আছে মার্কিন শ্রদ্ধাঞ্জলি (সংক্ষিপ্ত)— ১৯৩০—৬৯), চতুর্থ অংশে আছে গান্ধীজীর উত্তরাধিকার— অসহযোগ ও নাগরিক অধিকার—মার্কিন মুলুকে। পঞ্চম এবং শেষ অংশে আছে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট-গণ প্রদত্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি। এ ছাড়া গ্রন্থটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় আছে ফটোগ্রেভারে মুদ্রিত গান্ধীজীর বিভিন্ন ধরনের আলোক-চিত্র।

গ্রন্থটির সম্পাদনা কর্মের প্রতি লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয়। যে পদ্ধতি সম্পাদক অবলম্বন করেছেন তা এ দেশীয় সংকলকদের কাছে অনুকরণযোগ্য। তিনি প্রতিটি প্রবন্ধের সূচনা অংশে লেখক-পরিচিতি এবং লেখকের সঙ্গে গান্ধীজীর যোগসূত্র উল্লেখ করেছেন, এবং প্রয়োজন-বোধে প্রতিটি রচনার মাত্র সেই অংশটুকু এই গ্রন্থে সংযোজিত করেছেন যা বিশেষ-ভাবে প্রযোজ্য।

বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক ও আমেরিকাবাসী লেখক লেখিকাদের মধ্যে উইল ডুরাণ্ট, ফ্রেডারিক ফিসার, ইন্সিংগার ফিসার, মার্গারেট স্যাংগার, হাওয়ার্ড থরম্যান, জন গান্থার, লুই ফিসার, বার্ট্রাম নবুল, এডমাণ্ড টেইলর, ভিনসেণ্ট সীহান, মার্গারেট বার্ক-হোয়াইট, পার্ল বাক, এডগার স্নো, মেরী ম্যাককার্থী, স্টানলী জোন্স প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গান্ধীর উত্তরাধিকার বিষয়ে লিখেছেন চেস্টার বোলেজ, বেদ মেহতা, মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র), হেমার জাক। এ ছাড়া প্রেসিডেণ্ট হুভার, রুজভেল্ট, ট্রুম্যান, আইসেনহাওয়ার, জন কেনেডি ও লিনডন জনসনের শ্রদ্ধাঞ্জলি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

নরম্যান কাজিনস্ তাঁর ভূমিকায় বলেছেন যে, মহৎ মানুষের জীবনাদর্শ কিভাবে অন্য জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে তার উপর নির্ভর করে তাঁর মহত্ত্বের গভীরত্ব। গান্ধীজীবন ভারতীয়দের প্রতি যে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু সুদূর মার্কিন মুলুকেও গান্ধীজীর জীবন ও বাণী প্রতিফলিত হয়েছে। সেখানের মানুষকেও উদ্বুদ্ধ করেছে। গান্ধীজীবনের এক অত্যাশ্চর্য প্রতিফলন ঘটেছে মার্টিন লুথার কিং-এর জীবনে। সত্যাগ্রহের প্রেরণা গান্ধীজী পেয়েছিলেন থোরোর রচনা থেকে। কাজিনস্ বলেছেন—

'Public opinion in the United States was heavily behind Mahatma Gandhi in his quest for national freedom.' মার্কিন লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষাব্রতী এবং জননেতাগণ সকলেই গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের গণআন্দোলনকে অভিনন্দিত করেছেন। সেই কারণেই, কাজিনস্ 'গান্ধীজীর আলেখ্য' মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবেশনের প্রয়াস করেছেন।

ডাঃ ফ্রেডারিক ফিসার একজন মেথডিস্ট চার্চভুক্ত যাজক; তিনি আটত্রিশ বছর বয়সে বিশপ অব ইণ্ডিয়া পদাভিষিক্ত হয়ে কলকাতায় আসেন এবং ১৯২৪ থেকে তিনি গান্ধীজীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশারও সুযোগ পেয়েছিলেন। গান্ধীজীর কক্ষে এক স্মরণীয় দিনে তিনি উপস্থিত ছিলেন, সেদিন গান্ধীজীর মৌন-

দিবস, তিনি প্রার্থনা ধ্যান ইত্যাদির মধ্যে ছিলেন, একটিও কথা নেই কোথাও। ডাঃ ফিসার লিখছেন—

> 'My New Testament and my Christian communion with God seemed just as moral as there is in any Chruch or Cathedral. Never have Worship been more real'.

শ্রীমতী ফিসার স্বামীর মৃত্যুর পর বিশেষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন, তিনি সেইকালে হিন্দিও শিখেছিলেন, এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। ১৯৪৭-এর ডিসেম্বরে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা। এই প্রসঙ্গে তাঁর আত্মজীবনীতে হর্নসিংগার ফিসার লিখেছেন—

> 'We spoke tenderly of the beloved wife he had lost, and of Fred fisher, whom he had loved. As we parted he took my hands and said — 'when you come back to live in India, go to the villages. India is the village.'

গান্ধীজীর এই বাণী বর্তমানে ৮৮ বৎসর বয়স্কা এই সমাজসেবিকা মহিলার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সঞ্চয় হয়ে আছে।

শ্রীমতী ফিসার তাঁর প্রবন্ধ 'দি বিশপস ওয়াইফ্ অ্যান্ড গান্ধী'তে লিখেছেন—

"ভারতবর্ষে তিনজন মানুষকে দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। তাঁদের প্রতি 'মহৎ' ছাড়া আর কোনো বিশেষণ প্রযোজিত হতে পারে না।

প্রথমজন হলেন চার্লি এনড্রুজ, আমাদের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমাদের পরিবারে নিয়মিত শরিকদার। আমাদের ধর্মমতে বিশ্বাসী, জাত্যাংশে অ্যাংলো-স্যাকসন, সুতরাং একই জাতির অন্তর্গত। মাতৃভাষা আমাদের মত, ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছেন, আর মহৎ আদর্শ অনুসরণ করে এবং আত্মোৎসর্গের দ্বারা তিনি সাধুসন্তদের অন্যতম।

দ্বিতীয় ব্যক্তি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতবর্ষের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি, অভিজাত, শিক্ষাবিদ, উদ্ভাবক, বিদগ্ধ এবং অধ্যাত্মপ্রভাবে গরীয়ান। প্রথম যখন তাঁকে দেখি তিনি তাঁর ছয় ফুট চার ইঞ্চি আকৃতি নিয়ে চেয়ার থেকে যুক্তকর প্রশস্ত ললাটে ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, আমার মনে হল যেন বোধিসত্ত্বের এক মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। রজতশুভ্র কেশরাশি তাঁর সুন্দর আকৃতি ও মনোরম চোখ দুটিকে ঢেকে ছিল। তাঁর গায়ের রঙ হাতির দাঁতের মত, আর তাঁর অনাড়ম্বর পরিচ্ছদ তাঁর অনন্যসাধারণ দেহটি জড়িয়ে ছিল। তিনি মনীষী, কল্পনাবিলাসী মনীষী নয়, বাস্তব ভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি অধ্যাত্মলোকে প্রবেশ করেছেন।"

তিনি এর পর বলেছেন—সিসিল রোডস চেয়েছিলেন একটি অ্যাংলো-স্যাকসন সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে আর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিশ্বজনের জন্য এক সার্বভৌম বিশ্ববিদ্যালয়। আর তৃতীয় ব্যক্তি হলেন সরোজিনী নাইডুর 'মিকি মাউস' মহাত্মা গান্ধী। শ্রীমতী ফিসার বলেছেন, এই তিনজনের সঙ্গেই যে তাঁর স্বামীর অন্তরঙ্গতা ছিল এটা স্বাভাবিক, কারণ তাঁরও প্রকৃতিতে ছিল কাব্য ও মরমীয়া স্পর্শ এবং সেই সঙ্গে ছিল সাহস। এরপর তিনি কিভাবে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে 'শ্যামলী'তে এনড্রুজ ও গান্ধীজীর সঙ্গে একটা সপ্তাহ কাটিয়েছেন তার বিবরণ দিয়েছেন। সামগ্রিকভাবে এই রচনাটির মধ্যে একটা আশ্চর্য সারল্য আছে। তিনি এনড্রুজকে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভিত্তিগতভাবে পার্থক্য কতটুকু এই প্রশ্ন করলে, এনড্রুজ বলেন—

> 'Tagore is like—Everest. He towers majestic and, I think, alone. He seems to be in touch with the infinite, a seeker for abstract truth. Wherever he finds it he makes it his own and it adds to his stature the way snows add to the glacial heights of Everest. Gandhiji is like the leaping cataract on the mountainside trying to reach the stream so that he may add his life to the parched plains below where the people thirst.'

স্বল্পপরিসরে সকল রচনার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, তাই দু' একটি চমকপ্রদ রচনার উল্লেখ করব। পল রোস, এই গ্রন্থের একমাত্র ইংরাজ লেখক। পুনার সন্নিকটস্থ সিনগার নামক শৈলাবাসে গান্ধীজী কিছুদিনের জন্য ছিলেন, সেইখানে লেখকের বাবা ছিলেন রয়াল ইঞ্জিনীয়ার কোরের ক্যাপ্টেন, রোসের বয়স তখন মাত্র আট বছর। সেই আট বছর বয়সে বালক রোস গান্ধীজীর কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে একটি চরকা উপহার পেয়েছিলেন। ১৯৫৯-এ এই ঘটনা 'নিউ ইয়র্কার' পত্রিকায় 'সত্যাগ্রহ' নামে প্রকাশিত হয় এবং লেখক বলেছেন যে, বর্ণিত ঘটনার সামান্য অদলবদল ছাড়া সবই সত্য। গান্ধীজী তাঁকে যে চরকা দিয়েছিলেন সেটি অনেকদিন তাঁর কাছে ছিল। গান্ধীজী এই উপহারটি দেবার সময় লিখেছিলেন—

> "Don't forget India when you grow up, we'll always need good Englishmen. Your friend: Mohandas Karam Chand Gandhi."

গান্ধীজীর কাছে এই শিশুটি কিভাবে গিয়ে পড়েছিল এবং গান্ধীজী তাকে কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন তারই এক অনবদ্য কাহিনী এই 'সত্যাগ্রহ'।

মেরী ম্যাক্‌কার্থী এ যুগের একজন সুপ্রতিষ্ঠ লেখিকা, তাঁর 'দি গ্রুপ' নামক উপন্যাস এবং 'ভিয়েতনাম' নামক গ্রন্থ উচ্চপ্রশংসা লাভ করেছে। মিস ম্যাক্‌কার্থী লিখেছেন—"গ্লেয়ারিং ইম্‌প্রবাবিলিটি অব গান্ধিজ' ডেথ"। তিনি যখন সারা লরেন্সে শিক্ষয়িত্রী তখন একদিন কাফেটেরিয়ায় লাঞ্চ খেতে খেতে একজন মহিলা বলেছিল—

"Well, did you hear, they got the Mahtma" । লেখিকা বলেছেন যে, মহাত্মা কথাটি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে উচ্চারিত হয়েছিল—আর একজন মহিলা খাওয়া থামিয়ে বললেন 'মহাত্মা!' এইভাবে আলোচনা চলে। তরুণ শিক্ষকরা বাণীহীন। গান্ধীজীর জীবন—যদি তাঁকে রক্ষা করতে অশক্ত হয় তাহলে কি আর আমাদের বলার আছে? —বাড়ি ফিরে এলেন, দেখলেন তাঁর শিশুসন্তান ক্ষেপে আছে, আর তাঁর দাসীটা সখেদে বলছে—

> "They ought to have let him live out his life and finish his work in peace."

লেখিকা বলেছেন আমি, আমার সহকর্মীরা এই দাসীটি আর ঐ শিশুটি এদের কথা ভেবেই হয়ত রেডিয়োর মন্তব্যকার বলেছেন—

> "The world was shocked to hear &C &C".

আইনস্টাইনের গান্ধী প্রসঙ্গে লেখা সেই বিখ্যাত প্রবন্ধটিও এই সংকলন গ্রন্থে আছে। এমন একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর সংকলন গ্রন্থ কদাচিৎ চোখে পড়ে। গ্রন্থটির মূল্যও আশ্চর্য সস্তা।

—অভয়ংকর

PROFILES OF GANDHI—Edited by NORMAN COUSINS. Published by INDIAN BOOK COMPANY ... KASHMERE GATE : DELHI. Price ...

আন্তর্জাতিক সাহিত্য পুরস্কারের সংখ্যা নেহাতই কম। আর সে কারণেই আমেরিকার ওকলাহামা বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বুকস অ্যাব্রড' নামে একটি পত্রিকা দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে। বর্তমান পুরস্কারটি প্রদান করবেন এই পত্রিকারই পরিচালক গোষ্ঠী। পুরস্কারটির নাম হয়েছে 'বুকস অ্যাব্রড ইন্টারন্যাশানাল প্রাইজ ফর লিটারেচার'। প্রথমে এক বৎসর পর পর এই পুরস্কার দেওয়া হবে। পরে প্রতি বছরই কোন না কোন সাহিত্যিককে এই সম্মানে সম্মানিত করা হবে বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম পুরস্কার ঘোষণা করা হবে ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এর মূল্য হবে ১০,০০০ ডলার বা আরো বেশি। ওকলাহামা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ উৎসবে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। পুরস্কার কাকে দেওয়া হবে তা স্থির করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ছাড়াও আরও এগারজন সদস্য আছেন। এঁরা হলেন নাইজিরিয়ার জে. পি. ক্লার্ক, জার্মানীর হেইনরিশবোল, ইংলণ্ডের ফ্রাঙ্ক কারমোদ, আমেরিকার রিচার্ড উইলবার, ফ্রান্সের কাইটেন পিকন, ইতালীর পিয়েরো বিগনাগিয়ারি, পেরুর

মারিও ভার্গাস লোমা, রাশিয়ার আন্দ্রেই ভোজনেসেনস্কি, আমেরিকার রেনে ওয়েলেক এবং ভারতের এ কে রামানুজম। সদস্যদের এ বছরের জন্য তিনটি করে গ্রন্থের নাম সুপারিশ করতে বলা হয়েছে। এই নামগুলি নিয়ে কমিটি বসবেন এবং সেই কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত অনুসারে একজনকে নির্বাচন করা হবে। প্রতি বছরই কমিটি নতুন করে গঠিত হবে।

এই প্রচেষ্টাকে পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্য-রসিকই যে অভিনন্দিত করবেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব ব্যাপারে যা হয়ে থাকে, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়া—এ ব্যাপারেও সে সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কথাটা বিশেষভাবে মনে পড়ল এই পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি পড়ে। বর্তমান সংখ্যাটি হল বিশেষ ভারতীয় সংখ্যা। ভারতের বাইরে ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি যখন কোন বিদেশী আগ্রহ প্রকাশ করেন, তখন সত্যই আনন্দ হয়। কিন্তু যখন ভারতীয় সাহিত্যের নামে যাঁরা ভারতেই তেমন পরিচিত নন, এমন সব সাহিত্যিককে প্রতিনিধি স্থানীয় সাহিত্যিক হিসেবে প্রচারের চেষ্টা করা হয়। তখন সত্যই ব্যথিত হতে হয়। এ ব্যাপারে অবশ্য বিদেশীদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ তাঁদের পক্ষে ভারতীয় সাহিত্যের সব কিছু হয়ত জানা সম্ভব নয়। কিন্তু দোষ দেই সেই সব ভারতীয় সাহিত্যিকদের যাঁরা সুযোগ পেয়ে বিদেশীদের বিভ্রান্ত করেন। প্রসংগটি আর একটু বিস্তৃত করা যায়। উক্ত পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি হল ভারতীয় সাহিত্য সংখ্যা। কোন একটি পত্রিকায় কার লেখা প্রকাশিত হল, সে নিয়ে মাথা ঘামানোর বিশেষ কিছু থাকে না। কিন্তু যেখানে ভারতীয় সাহিত্য সংখ্যা হচ্ছে, সেখানে আমাদের আশা অন্ততঃ প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের কেউ কেউ থাকবেন। এই পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় সে রকম কোন প্রচেষ্টা দেখলাম না। একেবারে আরম্ভেই পি, লালের এক পৃষ্ঠার ছবি। অপর পৃষ্ঠায় শ্রীমতী মৃণালা রংগনায়কাম্মার ছবি। অন্যান্য যাঁদের ছবি ছাপা হয়েছে, তাঁরা হলেন এম. আর. রাঘবন, এস. বি. সারোহানিয়ম, কমলা দাস, জি শংকর কুরুপ, সুকান্ত চৌধুরী। ইরা দে, দেবকুমার দাস। লেখকসূচীর অবস্থাও অনুরূপ। বাংলা সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। বাংলা সাহিত্যের উপর একটি আলোচনাই আছে এবং সেটি হল শংকরের উপর। তারাশংকর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশংকর, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু কারো নামটি পর্যন্ত নেই। ভারতীয় কাব্য বিভাগের উদ্বোধন হয়েছে শিশির ভট্টাচার্যের কবিতা দিয়ে। এরপর বাংলা দেশে যাঁদের কবিতা অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁরা হলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গংগোপাধ্যায় এবং রাজলক্ষ্মী দেবী। এঁরা ছাড়া কি বাংলা দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি নেই? এ ব্যাপারে উপরে যে সব কবি বা লেখকদের নাম করা হল তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। আমার ধারণা, তাঁরাও একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সংকলন দেখলে খুশি হতেন। আমার অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে, যাঁরা সচেতনভাবে বিদেশীদের এভাবে বিভ্রান্ত করেন। এ ব্যাপারে ভারতীয় সাহিত্যিকদের সচেতন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

দেশমন্ত গ্রেইগ দক্ষিণ আফ্রিকার একজন বিশিষ্ট সমালোচক ও ভাস্কর। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল যে, তিনি একটি উপন্যাস লিখবেন। সম্প্রতি তাঁর এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটির নাম 'দি কান্ট্রি হাউস'। এই উপন্যাসের নায়কের নাম পল পারাডিকস। সে এক সপ্তাহ থেকে বিশ্রাম লাভের জন্য গিয়েছিল গ্রামের বাড়িতে। এখানে এসে তাঁর যে মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, তাই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। এক সময় পারাডিকসের মনে হয়েছে, 'আমার অনুভব করার শক্তি খুব প্রখর। এখানে সব কিছু স্বপ্নময়। এই সব মানুষ কেউ বাস্তব নন।' নায়ক জীবনের এই দ্বন্দ্বের মুহূর্তে লেখক মন্তব্য করেছেন, 'সে জীবনের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু জীবনের মতই সে পিচ্ছিল এবং তাকে বোঝা যাবে না।' এই গ্রামের বাড়িটি এখানে সম্পূর্ণভাবেই প্রতীকী অর্থে গৃহীত হয়েছে। উপন্যাসটির রচনা-রীতির মধ্যেও লেখকের মুন্সিয়ানা ফুটে উঠেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সাহিত্যের সংগে আমাদের পরিচয় প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু সেখানেও যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত হচ্ছে, আলোচ্য উপন্যাসটিই তার প্রমাণ।

বর্তমান জার্মান সাহিত্যে গুন্টার গ্রাস, বোধ হয় সবচেয়ে পরিচিত নাম। তিনি তাঁর সাহিত্যের প্রেরণা লাভ করেছেন বাস্তব জীবন থেকে। তাই সমকালীন রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে তিনি খুবই সচেতন। সমকালীন রাজনীতি বা সমাজনীতির উপর তাঁর অনেক বক্তৃতাও দিতে হয়েছে। ১৯৬৫ সালে তাঁর এই সব বক্তৃতার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বইটির নাম ছিল 'ফর ইউ আই সিঙ, ডেমোক্রেসি'। সম্প্রতি তাঁর রাজনৈতিক বক্তৃতাবলী সংকলিত করে আর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রাসের স্বচ্ছ রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন হিসেবে গ্রন্থটি সাহিত্যরসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে আশা করি।

আইভান স্লামিং, যুগোশ্লাভিয়ার একজন তরুণ কবি। ১৯৩০ সালে জাগরেবে তাঁর জন্ম হয়। এ পর্যন্ত তাঁর দুটি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আর সম্প্রতি তাঁর যে নতুন কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে, সেটির নাম 'লিম্বো'। এই গ্রন্থে তাঁর কবিতায় একটি নতুন সুর লক্ষ্য করা যায়। একটি আন্তর্জাতিক অনুভূতি কবিতাগুলোকে বৈশিষ্ট্যদান করেছে। এই গ্রন্থে 'বোম্বাই'-য়ের উপরে লেখা একটি কবিতাও আছে। যুগোশ্লাভিয়ার সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠকদের কাছে বইটি যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করবে বলে আশা করি।

কারাগার (কাব্যগ্রন্থ) কনক মুখোপাধ্যায়, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-১২ দাম চার টাকা।

এক ধরনের পানসে কবিতায় আজকাল বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। ফলে যেমন বক্তব্যের বলিষ্ঠতার অভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা দেখা যায় তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষাও সাম্প্রতিক কবিতায় ঈষৎ পরিমাণে অনুপস্থিত। অবশ্য নানারকম আন্দোলনের লেবেল এঁটে ধোঁয়াটে, রক্তশূন্য লেখাও চালানো হচ্ছে। ভবিষ্যতেও হবে হয়তো। তবে বাংলা কবিতার এইটেই শেষ পরিণতি নয়। এখনো কয়েকজন কবি রয়েছেন যাঁরা নিছক লেখার জন্যেই লেখেন না। শ্রীকনক মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। বিশেষ করে মহিলা সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে তাঁর মতো বলিষ্ঠ জীবনবাদী কবি সম্ভবত আর কেউ নেই। সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করা সত্ত্বেও কবিতার অন্তঃসলিল আবেগ ও যুক্তির ওপর নির্ভর করেই তিনি সত্যিকারের কবিতা কিছু লিখেছেন।

বেশ কিছুকালই ছিলেন তিনি জেলে বন্দী। এ সময়েই লেখেন আলোচ্য গ্রন্থের কবিতাগুলি। দেশের সাধারণ মানুষের সংগে মিশে ও কাজ করে যে অভিজ্ঞতা তিনি পেয়েছেন তারই প্রতিফলন ঘটেছে এখানে। ফলে ক্ষোভে-ক্রোধে যেমন ফেটে পড়েছেন তিনি বারবার, তেমনি আত্মঅভিমানের সুরও দেখা গেছে কখনো কখনো। কারাগারের বাইরের জীবনের দিনগুলোর স্মৃতি, সহ-বন্দিনীদের মুখের মেলা সব কিছুই তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। আর এসবই সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত।

এই কাব্যগ্রন্থে বেশ কটি চরিত্র-কবিতাও স্থান পেয়েছে। এই সুন্দর সাজানো-গোছানো বইটি বক্তব্যের প্রকাশে ও সততায় সাম্প্রতিক কবিতায় উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। যেমন ধরুন, ..সোনার রোদ্দুরটুকু। লোহার গরাদের ফাঁকে ফাঁকে এসে / ছড়িয়ে পড়ে / করুণ নরম হাত দুটো রাখো আমার / ঠাণ্ডা হিম পাঁজরগুলোর উপর /

সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য (গল্প সংকলন) সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। অধুনা। তিন টাকা।

শ্রীসন্দীপন চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রথম গল্প-গ্রন্থ 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী'তে একজন উল্লেখযোগ্য লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছিলেন। দীর্ঘ আট বৎসর পর তাঁর দ্বিতীয় গল্প-সংকলন 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ফলে, গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে স্বভাবতই কিছুটা ঔৎসুক্যের সঞ্চার হওয়া অসম্ভব নয়।

এ কালের লেখকদের সামনে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় স্কেচ বা নকসাজাতীয় লেখার মাধ্যমে নানাধরনের মডেল তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। সেদিক থেকে তাঁর সাফল্য নূনে নয় বলেই বিশ্বাস। 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য' পড়তে পড়তে মনে হয় নানা সুর, কাটা-ছেঁড়া কথা ও অনায়াস চলতি কথাবার্তার টানা টেপ-রেকর্ড শুনে যাচ্ছি। আমাদের স্বভাবে এই অভিজ্ঞতা নেই, তাই অস্বস্তির প্রাথমিক বাধা কাটিয়ে উঠতে পারলে এ জাতীয় রচনা আমাদের পরিশ্রম ও বিস্ময়ের দাবি করে। লেখকের 'কাউন্টার পয়েন্ট', 'কয়েকটি শিরোনামা ১ ও ২', 'উৎপল সম্পর্কে', 'আত্মক্রীড়া' প্রমুখ লেখা সম্পর্কে সাধারণভাবে এ হেন উক্তি করা যেতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম পকেট-বই প্রকাশের জন্য 'অধুনা' অবশ্যই ধন্যবাদ পাবেন। এ হেন স-যত্ন প্রকাশনাও সচরাচর চোখে পড়ে না।

ঋষি প্রেম কথা (সংকলন)—ক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী। ইউ এন ধর অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম সাত টাকা।

রামায়ণ মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণে ঋষিদের যে প্রেমকাহিনী ছড়িয়ে আছে, তাকে অনুসরণ করে অসংখ্য জনপ্রিয় বই লেখা হয়েছে। এ সমস্ত কাহিনী যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা সমসাময়িক কালের ঐতিহ্য, সংস্কার এবং জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার চেষ্টা করেছেন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারীর 'ঋষি প্রেমকথা' এই পর্যায়ে একখানি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গ্রন্থকার মূলকাহিনী অক্ষুণ্ণ রেখে বিগত যুগের ভাব ও ভঙ্গী যেভাবে বজায় রেখেছেন তা প্রশংসার্হ। অসংখ্য ছবিতে ছবিতে বইখানি সজ্জিত।

মহাজীবন (গীতিকাব্য)—শ্রীমাখন গুপ্ত। সর্বোদয় প্রকাশক সমিতি। সি-৫২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২। দামঃ এক টাকা।

মহাত্মা গান্ধীর শতবর্ষে প্রকাশিত এই নীতিকাব্যটিতে দেশবরেণ্য নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়েছে। গান্ধী মানসিকতার মূল বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতাকে রূপ দেওয়া হয়েছে কয়েকটি গানে। সংকলনটির প্রকাশ সময়োপযোগী।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

অনুক্ত (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬)—সম্পাদক সুনীলকুমার নন্দী।। ২২ ক্যানফিল্ড লেন, কলকাতা ১।। দাম ২-৫০ টাকা।

পূর্ব মর্যাদা ও আভিজাত্য বজায় রাখতে পেরেছে অনুক্ত। সাহিত্যের ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন সম্পাদক। এ সংখ্যায় লিখেছেন হরপ্রসাদ মিত্র, রাজেশ্বর মিত্র, দীনেশ রায়, জগদানন্দ দাস, লোকনাথ ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তী সেন, শিবশম্ভু পাল এবং আরো অনেকে। প্রবন্ধনিবন্ধের মান উঁচতে।

আমাদের গ্রাম (অকটোবর-ডিসেম্বর ১৯৬৯)—সম্পাদক : শতদল গোস্বামী ও মধু আচার্য। ৮ কৈলাস বসু স্ট্রীট। কলকাতা—৬। দাম দু টাকা।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'আমাদের গ্রামে'র এটি বিশেষ ভ্রমণ সংখ্যা। যারা ভ্রমণ-বিলাসী তাঁদের অনেক কাজে লাগবে সংখ্যাটি। পারিমল গোস্বামী, কৃষ্ণ ধর, যতীন্দ্রমোহন দত্ত, লহরীলাল গোস্বামী, জয়ন্ত আচার্য, শতদল গোস্বামী, বন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে লিখেছেন। বাংলা দেশের গ্রাম নিয়ে পত্রিকাটির একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলে বহুজন উপকৃত হবেন।

উত্তরণ—সম্পাদক : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। ৩১১, গাঙ্গুলীবাগান। কলকাতা-৪৭। দাম এক টাকা।

অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুশীল রায়, হরপ্রসাদ মিত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় গোপাল ভৌমিক, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, অমল দাশগুপ্ত, ভবতোষ দত্ত, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, রাম বসু, দুর্গাদাস সরকার, অরুণ ভট্টাচার্য, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, বাসুদেব দেব, জয়ন্তী সেন, মনীষীমোহন রায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক এবং আরো অনেকে লিখেছেন গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ।

মহিলা : সম্পাদিকা—আশা দেবী। ১২৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৬। দাম : আড়াই টাকা।

গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও এতে আছে সেলাই বোনার সচিত্র প্রবন্ধ এবং রান্নার হরেকরকম তালিকা। লেখিকাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছেন : উমা দেবী, রমা চৌধুরী, মহাশ্বেতা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, জ্যোতির্ময়ী দেবী, পারুল ভট্টাচার্য, বেলা দেবী, হেনা হালদার, বিভা সরকার, নমিতা চক্রবর্তী, কানন দেবী, পুষ্পদল ভট্টাচার্য, অঞ্জলি বসু, জ্যোতির্ময়ী সরকার, শিবানী বসু, মীনা চৌধুরী, পারুল ঘোষ, সুষমা দাশগুপ্ত, অমিতা দেবী, মালবিকা কানন, ছবি বসু প্রমুখেরা।

অংকুর—প্রকাশক শ্রীঅরূপ দাশগুপ্ত।। কোয়ার্টার ২ ডি, এন স্ট্রীট, ২৫ সেক্টর, পোঃ ভিলাই-১।।

প্রগতিশীল সাহিত্যের পত্রিকা। গল্প, কবিতা, অনুবাদ ও আলোচনা স্থান পেয়েছে। মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন। লিখেছেন বিষ্ণু দে, আলোক সরকার, ক্ষিতীশ দেব শিকদার, দীপিকা ঘোষ, কল্যাণময় রায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

জাগরী—সম্পাদক অপূর্বকুমার সাহা।। ৯এ হরলাল মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৩।। এক টাকা।

প্রচ্ছদে মঙ্গলঘট ও আলপনার ছবি। পত্রিকাটি চৌদ্দ বছর ধরে বেরোচ্ছে। এ সংখ্যায় লিখেছেন সরোজকুমার দত্ত, অমিতাভ চৌধুরী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত গুপ্ত, পশুপতি ভট্টাচার্য, সুনীল-বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল কর, ঋত্বিককুমার ঘটক এবং কয়েকজন।

তরুণের অভিযান—সম্পাদক : সুনির্মল চট্টোপাধ্যায় ও পিনাকীরঞ্জন চক্রবর্তী। ৭, জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড, কলকাতা-২০। দাম : ২ টাকা।

তরুণদের জন্য তরুণদের দ্বারা তরুণদের পত্রিকা 'তরুণের অভিযান' পত্রিকাটির তৃতীয় বর্ষের শারদ সংখ্যা। তরুণ ও কিশোর প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপ পরিগ্রহ করেছে। স্ফুটন-উন্মুখ প্রাণের দুর্বার আকাঙ্ক্ষার আন্তরিক আবেগ ও প্রাণ পত্রিকাটির সর্বাঙ্গে জড়ানো। প্রবন্ধ, ছোট-গল্প, বড় গল্প, সরস গল্প, নাটক, কবিতা, ফিচার, সঙ্গীতমূলক, নাট্যালোক, তরুণীমহল এবং ছোটদের পাতা—কটি বিভাগকে সুন্দর ও উপভোগ্য করে তোলা হয়েছে তরুণ ও কিশোরদের রচনায়। ছোটদের পাতায় ছোট্ট ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবি এবং কবিতা তারিফ করবার মতো।

এষণা—সম্পাদক : অনুপম রাহা। ২।২ সি, ঈশ্বর মিল লেন। কলকাতা-৬। দাম ত্রিশ পয়সা।

লিখেছেন শ্যামলকান্তি দাশশর্মা, রমা ভট্টাচার্য, অমর বসু, অমিতাভ বসু, শোভন গুপ্ত, সুধীর রাহা, গোপাল অধিকারী এবং আরো অনেকে।

কবিতার বইয়ের প্রকাশক

বাংলাদেশে আর যাই মিলুক, কবিতার প্রকাশক মেলে না। বিশেষ করে রুচিসম্মত প্রকাশকের সংখ্যা একান্তই বিরল। সম্প্রতি আমি কয়েকটি কবিতার বই হাতে পেয়ে আকৃষ্ট হই। প্রকাশকঃ 'ভারবি'। বাংলা কবিতার প্রচারে ও'দের আগ্রহ ও নিষ্ঠা অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

কয়েকদিন আগে 'ভারবি'তে যাই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ও ব্যবসা-পদ্ধতি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য। শ্রীযুক্ত গোপীমোহন সিংহরায় তার কর্ণধার। কেবল মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ সৌষ্ঠবে নয়, কাব্যমূল্য হিসেবে তাঁর প্রকাশিত বইগুলি উচ্চমানের।

কথায় কথায় তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ধরনের বই আপনি প্রকাশযোগ্য বলে মনে করেন? আপনার নির্বাচন-পদ্ধতিটা কি?

—সৎ, সিরিয়াস, প্রেস্টিজ পাবলিকেশন করাই আমার ইচ্ছে। এককালে কবিতা লিখতাম। কলেজের সভায় কবিতা পড়েছি। স্বভাবতঃই কবিতার প্রতি আকর্ষণ আমার একটু বেশী। কবিতার বই প্রকাশের পেছনে অন্যান্য কারণও আছে। যেমন—

১। কবিতার বই আকারে ছোট।

২। অর্থ নিয়োগ করতে হয় কম।

৩। কবিদের দাবী অল্প। রয়্যালটি দিতে হয় কম।

৪। বই প্রকাশিত হলে বেশী খুশী হন কবিরা। ঔপন্যাসিকদের বাজার আছে। এরকম তৃপ্তি তাঁদের নেই।

৫। প্রকাশক হিসেবে এটি বিশিষ্টতার লক্ষণ। পাঁচমিশেলী বইয়ের প্রকাশকের অভাব নেই।

৬। প্রত্যেক কবিই অত্যন্ত সৎ, বিনীত এবং ভদ্র।

৭। কবিতাকে আর্থিক প্রতিদানের বিষয় করে তোলা যায় কিনা, তা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরীক্ষা করে দেখা।

৮। কবিরা গাঁটের পয়সায় বই ছাপেন। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে তা বিলি হয়। এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন করা।

আপনার এই প্রয়াস কি সার্থক হয়েছে? এ সম্পর্কে কি কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন? কবিতার বইয়ের গ্রাহক কারা?

—ব্যবসায়ের দিক থেকে চিন্তা করলে কবিতার সার্থকতা যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। সরকার আমাদের বই বড় একটা কেনেন না। লাইব্রেরীগুলোও এ ব্যাপারে আগ্রহহীন। আমাদের পাঠক ও ক্রেতা হলেন একমাত্র ছাত্র, অধ্যাপক, কবি ও কবিতা-প্রেমিক কিছু কিছু মানুষ। এমন কি স্কুল-কলেজ লাইব্রেরীতেও কবিতার বই কেনা হয় সবচাইতে কম। তবে আমরা একটা পরিকল্পনা নিয়েছি, শ্রেষ্ঠ কবিতার একটা সিরিজ প্রকাশ করার। কাজও শুরু হয়ে গেছে। বেরিয়েছে দুটো সঙ্কলন—জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসুর। শীঘ্রই আরো কয়েকটা বেরোবে। এ বিষয়ে আমরা স্টোরে বই বের না করে বিদেশের মতো 'ডিরেকট মেইলিং'-এর প্রথায় পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার কথা ভাবি। তা না হলে বাঁচতে পারবো না। তাতে সুফলও ফলেছে। প্রথম দশটি বইয়ের দাম ঠিক করেছি ৬০ টাকার জায়গায় ৪৫ টাকা। অনেকে গ্রাহক হয়েছেন। এখনো হচ্ছেন। কেউ কেউ অনুরোধ করেছেন আরো সময় বাড়িয়ে দেবার জন্য। দিয়েছি। আশা করছি, আরো কিছু গ্রাহক বাড়বে।

এ পর্যন্ত কতো গ্রাহক হয়েছে?

—প্রায় চার শো।

কিছুক্ষণ আগেই বললেন, বিভিন্ন কবির কবিতা প্রচার করা আপনাদের উদ্দেশ্য। এ জাতীয় শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্কলন কি সকলের করা সম্ভব হবে?

—এ মুহূর্তেই সকলের করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু ইচ্ছে আছে। তবে সকলেই তো ভালো কবিতা লেখেন না। কিছুটা পরিচিতি ও খ্যাতি হওয়া দরকার। লিটল ম্যাগাজিনে লিখে জনপ্রিয়তা না বাড়লে কিংবা পাঠকের কাছে কবি-স্বীকৃতি না থাকলে, সেই কবির বই কে কিনবে? সেজন্যে কিছুটা সময় দরকার উভয়পক্ষেই। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রায় সকল কবির শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্কলন প্রকাশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আগামী তিন বছরের মধ্যে আমরা ত্রিশটি বই বের করবো। প্রতিটি ইনস্টলমেন্টেই আমরা প্রবীণ, মধ্যবয়সী ও নবীন—এই তিন শ্রেণীর কবিদের সঙ্কলন প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছি। তাতে জনপ্রিয় প্রায় সব তরুণ কবিই আছেন।

শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি নির্বাচন বা সম্পাদনা করেন কারা? বিদেশী বই সম্পাদনার জন্য একটা এডিটরিয়েল বোর্ড থাকে, জানেন নিশ্চয়ই!

—জীবিত কবিদের ক্ষেত্রে কবিরাই তাঁদের কবিতা নির্বাচন করেন। বুদ্ধদেববাবু তাঁর সঙ্কলনের প্রুফ দেখেছেন। তাতে সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন যা কিছু হয়েছে—সবই তাঁর নিজের হাতের। মৃত কবিদের ক্ষেত্রে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সাহায্য নেওয়া হয়। যেমন মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা সঙ্কলন করেছেন ভবতোষ দত্ত।

আপনাদের বইয়ের কলকাতায় পাঠক কেমন? বিক্রীর মাধ্যম কি?

—কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিই। হোলসেলাররা একসঙ্গে বেশী বই কিনে নিয়ে যান বেশী কমিশনে। তাতে আমাদের লাভ থাকে কম। মফঃস্বলের দোকানদাররা আমাদের বই বিক্রী করতে চান না। তাঁরা সস্তা গল্প-উপন্যাস বিক্রী করতেই বেশী উৎসাহী। কমিশন পান ৫০।৬০ পার্সেন্ট। ইচ্ছে আছে, আমরা একটা হোলসেল কাউন্টার খুলবো। ভালো জায়গা পাচ্ছি না। হ্যাঁ, কবিরা 'ভারবি'কে মনে করেন নিজেদের প্রতিষ্ঠান। অনেকে আমাদের গ্রাহক হবার ফর্ম নিয়ে যান। ভরতি করে টাকা পাঠান। কেউ বা কফি হাউস থেকে কোনো কবি কিংবা কবিতা পাঠককে ধরে নিয়ে আসেন গ্রাহক হবার জন্য।

বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাগুলো আপনাদের সাহায্য করছেন!

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। যুগান্তর এবং অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হচ্ছে। আপনি তো অমৃতে লিখছেন। সহযোগিতা পাচ্ছি চারদিক থেকেই।

আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, কলকাতার ক্রেতা কেমন?

—আমাদের গ্রাহক ও ক্রেতা বেশী মফঃস্বলেরই। কলকাতার কবি ও পাঠকেরা বই কেনেন কম। অন্তত আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিতার যাঁরা গ্রাহক হয়েছেন তাঁরা অনেকেই কলকাতার বাইরের লোক। নাগাল্যাণ্ড থেকে দিল্লী-বোম্বাই, অন্য দিকে নামখানা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত আমাদের গ্রাহক বিস্তৃত। আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, দূর দূর গাঁয়ের লোক আমাদের এই পরিকল্পনাটির প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিচ্ছেন এবং গ্রাহক করার জন্যে অনুরোধ করছেন।

বইয়ের প্রোডাকশনের ব্যাপারে আপনারা শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন কি? বইয়ের অঙ্গসজ্জা, মুদ্রণ, প্রচ্ছদ ইত্যাদি ব্যাপারে অভিজ্ঞ শিল্পীরা জড়িত থাকলে সাধারণত প্রকাশ সৌষ্ঠব বাড়ে হয়তো।

—হ্যাঁ। পূর্ণেন্দু পত্রী আমাদের কাজ করছেন বেশী। নানা ব্যাপারেই পরামর্শ দিচ্ছেন। কখনো ডিজাইন পছন্দ না হলে আবার তিনি তাকে পালটে দেন। এতে কোনো রকম অসন্তুষ্ট হন না। বরং তিনি আমাদের উন্নতমানের গ্রন্থ প্রকাশে নানাভাবে সাহায্য করেন। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ও আমাদের বইয়ের প্রচ্ছদ করেছেন।

লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন কি করে?

—আগে থেকে পরিকল্পনা নিই। অনেক সময় যোগাযোগ হয়ে যায়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা পূর্বসিদ্ধান্ত অনুসারে অ্যাপ্রোচ করেছি। লেখকেরা সহযোগিতা করেছেন বরাবরই।

—গ্রন্থদর্শী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

জমিদার বাড়ির সবাইকে দুটো হাতী আর ঘোড়ায় ফিরিয়ে দিয়ে চারখানা জুড়ি-গাড়ি আর ফিটন ধরে রাখা হোল। রয়ে গেল শুধু কাকাবাবু আর জামাইবাবু। হাল্‌কা করে ফেলা আর কি।

শীতকাল, রাত এগারটা হওয়ার আগেই কুসমীর যারা নেমতন্ন খেতে এসেছিল তারাও সব খেয়েদেয়ে পাৎলা হোল। কুসমী গেরামটা খুব বড় নয়। বিয়ে তো বলতে গেলে কিছুই নয়, বেশি নেমতন্নর দিকে যায়ওনি ধনঞ্জয় রায়। তবু রৈল বৈকি লোক, বেশ কিছুই, বিয়ে বাড়িই তো। এপক্ষে ওপক্ষে মিলিয়ে তা পেরায় শ'দুয়েকের ওপর লোক রয়ে গেল। আসরে বাই-নাচের ব্যবস্থা রয়েচে, খাওয়া-দাওয়া সেরে পান চিবুতে চিবুতে অনেক ভদ্দরলোক আবার এসে বসল। কুসমীর, আবার মসনেরও। হুগলী থেকে বাইজী এসেছে, যারা একটু শোখীন লপেটি গোছের, রয়েই গেল। কতটুকুই বা দূর মসনে?

কাকাবাবু, জামাইবাবু আরও কয়েকজন দূরের লোক—কুসমীরই বেশি, তবে মসনেরও দুচারজন রয়েচে, সভা ক'রে গালচের ওপর বসে রয়েচে। মাঝে মাঝে, 'কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ?' ক'রে গানের তারিফ, আর প্যালা ছুঁড়ে দেওয়া। জমিদারবাড়ির বিয়ের জলসা যেমন হ'তে হয়, আর কি। আজ্ঞে, দামোদর চৌধুরী নিজে আর আসেনি, তানার শরীলটে খারাপ নাকি। বরকত্তা কাকাবাবু। বাবা ইদিকে নাপিতের পাট নিয়ে আমার মখমল আঁটা তাকিয়ার পেছনটিতে বসে আচে; মাঝে মাঝে কানের কাচে মুখ নিয়ে এসে হেম্মৎ দিয়ে যাচ্চে ঘাবড়াবিনে মোটে রূপো।'

যাখন নাকি লগ্নের সময় হয়ে এয়েচে, ধনঞ্জয় এসে হাতজোড় ক'রে কাকাবাবুকে বললে—'এবার তাহ'লে বরকে ভেতরে নিয়ে যেতে রনুমতি দিন।'

ওদিকে যাখনই চৌধুরী বাড়িতে দেখেচি—এদানি তো যেত মাঝে মাঝে, আম্মো কোন কোনদিন যেয়ে পড়তুম বাবার সঙ্গে দেখা করতে—তা কখনও লেশা ক'রে গেচে এমন মনে হোত না; আজ কিন্তু যেন একটু একটু পা টলচে। আজ্ঞে, তা হবেই তো, আজ বাড়িতে ডেকে এনে চৌধুরীমশায়ের ওপর যাত আক্রোশ জমে ছেল—সেই বাপের আমল থেকে, তা সুদে-আসলে মিটিয়ে নিচ্চে যাচ্চে তো। কায়দা মাফিক হাত-জোড় ক'রে বললে 'এবার বরকে নিয়ে যাবার রনুমতি দিতে হবে।'

কাকাবাবু, যেমন বলতে হয় বললে—'অবিশ্যি, অবিশ্যি, এতে রনুমতির কি আচে? নিয়ে যাবে বৈকি।'

বাবা কানের কাচে মুখটা এইগ্যে এনে টোপর পরাতে পরাতে বললে—'সাবাস বেটা, ভয় পাবিনে।'

কাকাবাবু, জামাইবাবু, আরও দু-পাঁচ জন ভদ্দরলোক, বয়েস হয়েচে এইরকম গোচের—তানারাও উঠে পড়ে আমাদের পেছনে পেছনে এল।

এর পরেই যেন শুরু হ'য়ে গেল দা-ঠাকুর। ভেতরে নিয়ে যাবার কথা বললে বটে—অনেক বিয়ে দেখেচি, নিজেরও হ'য়ে গেচে, দেউড়ি হোক, গেরস্তর বাড়ি হোক, ভেতর বাড়িতেই বিয়ের ব্যবস্থা করে ভেতর বাড়িতেই নে' যায় বরকে। এ যেন মনে হোল, বাইরের দিকেই খানিকটে এক-টেরেয়। অবিশ্যি সাজানো-গোছানো, পুরুত নারায়ণশীলা, সবই রয়েচে, যারা ব'সে বিয়ে দেখবে তানাদের জন্যে দামী গালচেও পাতা একদিকে; তবু ভেতরে হ'লে যেমন একটা হৈ-হল্লা থাকে, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে, তা মোটেই নেই। ঘরটা বেশ বড়, একটা হলঘরের মতই। চারিদিকে বড় বড় জানলা, তাতে চিক ফেলা, মেয়েরা রয়েচে তার ভেতরে, মাঝে-মধ্যিখানে শাঁকও বাজচে, উলুও দিচ্চে, কিন্তু গোড়া থেকেই কুলকুল, খিলখিল, হাসিই বেশি। আর যেন মেয়েদের গায়ে মেয়ের দল এসে পড়ে হাসির ঘটা বেড়েও যাচ্চে। যেমন, আপনার গিয়ে, আমাদের দিকে তেমনি ইদিকেও নিখুঁত-ভাবে কথাটা চেপে রাখতে হয়েছেল, কেমন করে তা ওনারাই জানে, চাপা হাসির ওপর হাসি ভেঙে পড়চে দেখে মনে হয়, শেষ হয়ে যাওয়ার মুখে কথাটা প্রেকাশ হয়ে পড়েছে, ইচ্ছে করেই ধনঞ্জয় ঢিলে দিক, যা আপনিই বেইরে পড়ুক। তারই মধ্যে ইদিকে বিয়েও হয়ে যাচ্চে। সিদিনের অনেক রকম ব্যাপারের জট পাক্যে গিয়ে ঠিক একধার থেকে গুচ্যে বলতে পারচিনে দা'ঠাকুর। হোলও তো আজ নয়, চারকুড়ি থেকে গোটা তেরো-চোদ্দ বছর কুল্যে বাদ পড়েচে। বাপ-মা-মরা শালীর বিয়ে দিচ্চে, তা কন্যেদান খোদ ধনঞ্জয় নিজে না করে অন্য একজনকে দাঁড় কইরেচে, বললে—'ইনি হোল কনের কাকা গোয়াইমশাই, ইনিই সম্পোদান করবে।'

এই সময় উদিকে জানালার ভেতর হাসিটা জোর হয়ে উঠতে আমার দিষ্টি আপনিই গিয়ে কাকাবাবু আর জামাইবাবুর মুখের ওপর যেয়ে পড়ল। মুখ দুটো রাঙা টকটকে হয়ে উঠেচে। তবে সবই তো জানা, কাকাবাবু তারই মধ্যে সমীহ করে মেয়ের কাকাকে নমস্কার করে বললে—'আসুন, করুন শুরু।'

উদিকে চিকের বাইরে আবার একটা হাসির দমক।

হাতে-হাত দিয়ে গামছা-মালা জড়িয়ে সম্পোদানটা হয়ে বিয়েও হয়ে গেল। মাঝে স্ত্রী-আচারটা বাদ পড়ল দা-ঠাকুর। কেন, সেটা এখুনি টের পাবেন, তবে ত্যাখন-ত্যাখন ধনঞ্জয় বললে, 'ওগুলো আর কেন? শীতের রাত, ছেলেমানুষ বর-কনে। বাদ দিলে চলে না, পুরুতমশাই?'

আমাদের পুরুতমশাই চুপচাপ করে বসেছেল, তানাকেও শেষের দিকে এসে জানানো হয়েছেল, বিয়ের ব্যাপারটা কনের তরফের পুরুতই চালিয়ে নিয়ে গেল, উনি সারাক্ষণ বসেই ছেলো চুপ করে। ওনাকে সুদোতে উনিও বললে—'হাাঁ, শাস্তরের সঙ্গে তো ওসবের তেমন কিছু সম্বন্ধ নেই, বাদ দেওয়াই হোক না।'

ধনঞ্জয় বোধহয় আরও একটু টেনে এসেচে এর মধ্যে, পা দুটোও আরও একটু বেশি টলচে, উদিকে চোখও পেরায় শিব-নেত্র। পাশেই আমার শ্বশুর দাঁইড়ো ছেল, একটু পেছন দিকে,—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই নিবঞ্জপদ বৈকি—বাবার মতন ভোল পালটেও নয়, সেই আদি—অকিত্তিম নফরের বেশেই, ইসেরা করতে সামনে এসে দাঁড়াল। বাজিমাৎ হয়ে গেচে, আর লুকোতে যায় কেন, তাই রায়মশাই একটু হেসে রসিকতা করে বললে—'তাহলে এই হচ্চে কনের বাপ, আমার নফর নিবঞ্জে মণ্ডল; হয়তো চেনেনও। দামোদর যে আসেনি, নৈলে বেয়াইয়ে বেয়াইয়ে বেশ টাটকা-টাটকি মোলাকাতটা হয়ে যেত। এবার বরকে বাসর ঘরে নিয়ে যাবার রনুমতি দিতে হবে।'—বলে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠতে উদিকে মেয়ে মহলেও একটা হাসির হররা—এবার একেবারে বাঁধ ভেঙেছেই, কত আর সামলায় কন?

আজ্ঞে, ইদিকেও তো সবাই তোয়ের। কাকাবাবু, জামাইবাবু, পুরুত, নাপিত সবাই উঠে দাঁড়াল। কাকাবাবুই বাবাকে সামনে এইগো দিয়ে বললে—সে আপশোষেরও তো কোন দরকার নেই ধনঞ্জয়। এই ওনার বেয়াইও উপস্থিত রয়েচে; বরের বাপ, শিবনাথ

মন্ডল। তোমার তো দামোদরের বাড়ি যাওয়া আসা ছিল ইদিকে, চেন নিশ্চয়; হাতের সাজা ছিলিম, খেয়েছ কক। যাও গো শিবনাথ তোমার বেয়াইয়ের সঙ্গে কোলাকুলিটে সেরে নাও টাটকাটাটকি।'

একেবারে সব কাঠ মেরে গেছে দাঠাকুর। উদিকেও মেয়েদের অত যে হাসি, একেবারে ঠান্ডা। একটা ছুঁচ পড়লে তার শব্দটা শোনা যায়। ইদিকে ধনঞ্জয়ের শিবনেত্র ছুটে গিয়ে চক্ষু একেবারে চড়কগাছ!

তারপরেই সিংহনাদ—'তোমার সাধ মেটেনি ধনঞ্জয়, তাই মসনের সঙ্গে আবার পাল্লা দিতে এসেচ, এবার এই ভালো করে মিটিয়ে দিচ্চি সাধ।...কোই হ্যায়!!'

ডাক দিতে দেরি, সঙ্গে সঙ্গে উদিকে 'রে! রে!-রে!-রে!' কইরে সাধন সন্দারের দল ঝাঁপেপ পড়ল। তারপর সে যা কান্ড দাঠাকুর এক দক্ষযজ্ঞেই হয়েছেল শোনা যায়, তারপর এই। কিছুটা তোয়ের হয়তো ধনঞ্জয়ের লোকেরাও ছেল। একেবারে শালীর মেয়ে বলে চাকরের মেয়ে চালিয়ে দেওয়া—ওরা তো জানে বর সে খোদ দামোদর চৌধুরীরই ব্যাটা—কিছুটা তোয়ের ছেলই, তাছাড়া স্থানটা তো তাদেরই, কিন্তু সাধন সন্দারের দলে তিরিশটে বাছা-বাছা লেঠেল, ঐ করতেই আসা তাদের, লুকিয়ে ছেল, পারবে কেন তাদের সাথে? দক্ষ মহারাজেরও তো নিজের ঘর, নিজের লোকলস্কর ছেল, দাঠাকুর, কৈ, পেরেছেল কি সামাল দিতে? 'লোট! লোট! মার! মার!—হৈ-হৈ কান্ড বাইরে, বেলোয়ারী ঝাড়গুলো ভেঙে গাদচে, গদি, মসনদ তছনছ করে একসা করে দিলে। ভদ্দরলোকদের—মানে, যারা নেমতন্ন খেতে এয়েচে—তাদের গায়ে হাত দেওয়া বারন ছেল কাকাবাবুর—এই জন্যে ওদের আগে ভাগেই খাইয়ে দাইয়ে বিদেয় করা। কিন্তু শেষে যারা গান শোনার লোভে থেকে গেছল, "অর কেয়া বাৎ! কেয়া বাৎ!' করে প্যালা ছুঁড়ছিল, তাদের যে এক আধটা ঘা পড়লো না ঘাড়ে তা হলপ নিয়ে কি করে বলা যায়?

ভেতর-বাড়িতে মেয়েদের চিৎকার, বুক চাপড়ানি, সেও এক কান্ড! আজ্ঞে না, তা কি পারে? (জিভ কাটল স্বরূপ)—ভেতর বাড়িতে ঢোকা কি যারা বাইরেও ছিটকে-ছাটকে রয়েচে, যে সব স্ত্রীলোক ইতর-ভদ্দোর যাই হোক, তাদের গায়ে হাত দেওয়া একেবারে বারণ ছেল কাকাবাবুর। যা হবে তা বাইরেই।

সেদিকটা ওদের ভালো করে লাইগো দিয়ে সাধন সন্দার বিয়ের আসরে উপস্থিত হল, সঙ্গে, বেশি নয়, জনা তিনেক লোক, ঝুঁকে কাকাবাবুকে প্রেণাম করে সুদোলে—ইদিকে হুজুরের কি হুকুম হয় অধীনকে?'

ঘরে যারা বসে বিয়ে দেখছেল, বেশী না হলেও ছেল বৈকি, তাছাড়া বর পক্ষেরও কজন রয়েচে, ডাকাত-পড়া শব্দ হতে সব এসে এদিকে জমা হয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আচে। এনারাও বিয়ের ছেরাদ্দ এতদুর গড়াবে জানে না—সব ইদিকে এসে জড়ো হচ্চে কাঁপচে, তার মধ্যে ধনঞ্জয় আমার জামাইবাবুর একেবারে কাছ ঘেঁষে।

সাধন সন্দার মাথা প্রেমাণ লাঠি হাতে করে এসে হুকুম চাইতে কাকাবাবু একটু যেন ভাবলে রাগে অগ্নিকান্ড হয়ে রয়েচে তো, ঠিক করতে পাচ্চে না ধনঞ্জয়ের লাশটা পাত করে দিতে বলবে, কি, কি করবে। গুরুবল, তাই হঠাৎ টের পেয়ে যায়, নৈলে এই ঘরেই আজ চাকরের মেয়ে ঘরে তুলে দামোদর চৌধুরীর জাতকুল যা যেত তা যেতই, সারা মসনের মুখে তো চুনকালি লেপেই দিত। একটু ভাবলে—ধনঞ্জয় কাঁপচে যেন ফাঁসির রায় শুনবে এইবার—কাকাবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললে না গায়ে কারুর হাত দেবে না। তবে ধনঞ্জয়, শুনলুম তুমি গোড়ায় একেবারে সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ে দামোদরের মন ভিজিয়ে এই কান্ডটা বাধাতে যাচ্ছেলে, তাহলে ও অব্যেসটা যাখন আচেই, আবার সাষ্টাঙ্গ হয়ে তোমায় সবার সামনে নাকখৎ দিতে হবে, সেই বিয়ের আসরেই।'

রায়টুকু দিয়ে বুকটা একটু টেনে চিতিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে দাঁইড়ো রইল।

একটু দোমনা হয়ে রইলই ধনঞ্জয়। আজ্ঞে, অন্য কেউ হলে নাকখতের বদলে জানটাই দিয়ে দিত, তবে ওনার তো কিছু পদাত্থ ছেল না—মান-সম্ভ্রমের জ্ঞান থাকলে নিজেকে এতটা খেলো করতেই বা যাবে কেন সিদিনকে?—তবু একটু যেন টলল মনটা। বাইরে উদিকে নরক-কান্ড চলেচেই, তারপর আজ্ঞে, একেবারে অতটা নয়, ঝুঁকে পড়ে কপালটা ঠেকাল মাটিতে, নাকটা ঠেকাল কিনা কে আর অত দেখতে গেচে?'

কাকাবাবু বললে—'হয়েচে, ওঠো মনে রেখো!'

বাবাকে বললে—'বর-কনে নিয়ে আগে হও শিবনাথ। আমরাও পেছনে রয়েচি। সাধন গিয়ে থামিয়ে দে, আর একটি লাটি মাটি ছেড়েও ওপরে উঠবে না। হৈ-হল্লাও আর নয় একেবারে।'

আজ্ঞে, তা কি হয়? এদের হৈ-হল্লা না হয় থাকল, কিন্তু গোরার দল তাদের ঢাক-খঞ্জোল-ভ্যাঁপো-ভ্যাঁপো, নিয়ে কি করতে রয়েচে? তারা একটু জিরেন দিয়ে নিচ্ছেল, ভাবলে এই এতক্ষণে এদের আসোল বিয়ে তবে বুঝি শুরু হোল - সেবারেও তো তাই দেখে গেছে, এই মসনে কুসমীতে,—খুকে তামাম দম কষে নিয়ে আরম্ভ করে দিলো। আগে তারা, তারপর বর-কনের সেই কুসমীর তাঞ্জাম, তার-পরে সরকারী তাঞ্জামে কাকাবাবু আর জামাইবাবু, তার পেছনেই খলিল মেয়ার ছ্যাকরা গাড়িতে আমার শ্বশুর-বাড়ির কজনা,—শ্বশুর, শাউড়ী আমার একটি শালা, ছেলেমানুষই, আর তারই বয়েসের আমার শ্বশুরের একটি ভাই।

নিশ্চয়, একটু বেশি অনামনস্ক ছিলাম বলেই প্রশ্ন করলাম—'তোমার শ্বশুরবাড়ির সবাইও?'

স্বরূপ মাথাটা নীচু করে নিয়ে আমার অজ্ঞতার জন্যে একটু মুখ টিপে হাসল, বলল—'শ্বশুরই যে হোল সবচেয়ে বড় আসামী। তানার যোগসাজস না থাকলে—জমিদারের ছেলের হাতে মেয়ে পড়লে তবু তো জাতকুল যায়, তাইতেই না তাকে দলে টানতে পারল বাবা—তার যোগসাজস না থাকলে যা হোল তাতো হতে পারতো না। কথাটা তো বর-কনে বিদেয় হতে না হতে বেইরেই পড়েচে গো; ত্যাখন ওনাদের কারুর লাস আর দেখতে পেত কেউ, না, পরদিন সকালে কেউ বিশ্বেসই করতে পারত এখেনে দ্বিজপদ মন্ডল বলে একটা মানুষের বাস ছেল?'

আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে হেসে বললাম—'তা বটে, তা বটে। তারপর?'

স্বরূপ বলল—'শ্বশুরবাড়ি ওঁদের খলিল মিয়ার ছ্যাকরা গাড়ির পেছনে চারখানা ড়ুলি-ফিটনে বরযাত্রীর বাকি বকেয়া যারা ছেল, সবশেষে সাধন সন্দারের সেই তিরিশ জন লেঠেরা। সামনে গোরা বাদ্যি, পেছনে তারা সেই রাক্কুসে বাজনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রে!-রে!-রে!-রে! করে আকাশ-বাতাস কাঁপ্যে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে আসচে। আপনি তাঞ্জামের কথা সুদোচ্ছিলে, ঐ নিন, গদাইয়ের গবভধারিণীকে নিয়ে কুসমীর সেই তাঞ্জাম তার শ্বশুরবাড়ির দরজায় দাখিল হলেন। কতই বা তার বয়স ত্যাখন? সবই মেপে দেখলে, বরের থেকে কনে দু মুঠো আর আঙুলে দেড়েক খাটো।'

কাত্তা আর বাঁশীর নাবিয়ে দিয়ে স্বরূপ হাঁটু দুটো জড়িয়ে বসে একটু হাসল।

একটা কৌতূহল লেগে থাকবেই। আমি প্রশ্ন করলাম—'সেই বাবাজীর শেষ পর্যন্ত কি হোল? সব কিছুর গোড়ায় তো সেই ছিল।'

স্বরূপ বলল—'স্ত্রী আচার, বাসি বিয়ে, আরও যা-যা হওয়ার হয়ে যাওয়ার পর একদিন বাবা এসে বললে—'রূপো আর সব তো যা হবার হোল, সেই বাবাজী তোকে একবার দেখতে চাইচে, তুই শিষ্য হতে গেছলি কিনা সেই সেবার।'

হুগলীর হাসপাতাল ত্যাখন নতুন হয়েচে। বাবার সঙ্গে একদিন যেয়ে দেখি পায়ে মোটা করে বান্ডিজ বাঁধা একটা লোহার খাটে শুয়ে আচে। সেই বাবাজী; লাখের মধ্যেও ভুল হওয়ার নয় তো। বাবার ঠাঁই, কপাটের বাইরে থেকে দাঁইড়ো দেখনু একটু। মনে হোল যেন চিনি-চিনিও করচে, তবে শিষ্য করবার জন্যে যে আদর করে ডাকা—সে সব কিছু নয়। মনের দুঃখু মনেই চেপে আস্তে আস্তে সরে এনু।'

বাপের রসিকতার সঙ্গে সুর মিলিয়ে কথাটুকু বলে স্বরূপ এবার একটু ভাল করেই হেসে উঠল। রসিকতার জেরটুকু ধরে রেখে বাড়ির দিকে ঘুরে হেঁকে বলল—'কিরে সুদো, তোরা কি দাঠাকুরকে উপোসেরই নেমতন্ন করলি নাকি ত্যাখন?'

(সমাপ্ত)

অধ্যাপক ডার্ক বার্টন (বাঁদিকে)
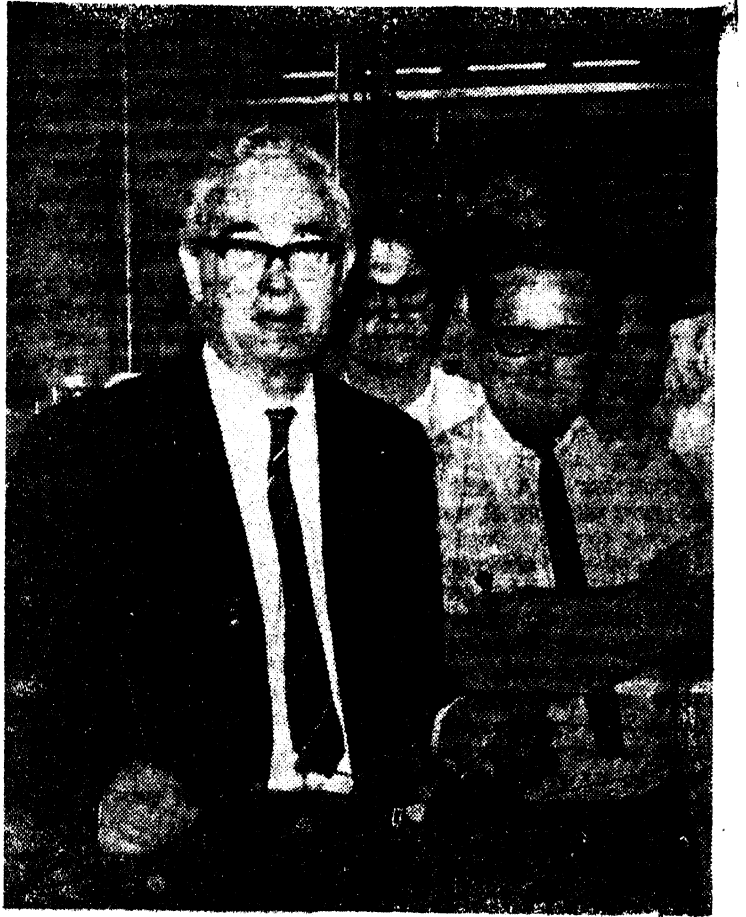
রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

ভেষজ বিজ্ঞানের মত রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ১৯৬৯ সালের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে যৌথভাবে দুজন বিজ্ঞানীকে। এই দুজন বিজ্ঞানীর নাম লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব্ টেকনোলজির অধ্যাপক ডার্ক বার্টন এবং অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নরওয়েজীয় বিজ্ঞানী ওড্ হ্যাসেল। রসায়ন বিজ্ঞানে অনুরূপন (কনফরমেশন) সংক্রান্ত মতবাদ গড়ে তোলা ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে দুজনের স্বতন্ত্রভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে বিজ্ঞানজগতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মাননায় তাঁদের ভূষিত করা হয়েছে।

অধ্যাপক বার্টন বৃটেনের সুবিখ্যাত জৈব রসায়নবিজ্ঞানীদের অন্যতম। তাঁর বর্তমান বয়স ৫১ বছর। তিনি যে অনুরূপন পদ্ধতি গড়ে তুলেছেন তার দ্বারা বহু জৈব রাসায়নিক পদার্থ কিভাবে সংশ্লেষণ করা যায় তা জানার অশেষ সুবিধা হয়েছে। অতি জটিল জৈব রাসায়নিক অণুর ধর্ম এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তারা কিরকম আচরণ করতে পারে সে সম্পর্কে পূর্বাহ্নে আভাস পাওয়ার সূত্র অনুরূপন পদ্ধতিতে পাওয়া যায়। একাধিক জৈব রাসায়নিক অণুর ত্রিমাত্রিক আকৃতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক বার্টন এমন একটি সূত্র উদ্ভাবন করেছেন, যার সাহায্যে রসায়ন বিজ্ঞানীরা স্টেরয়েড (একশ্রেণীর জটিল জৈব রাসায়নিক অণু) সংশ্লেষণে কি কি পরিবর্তন ঘটে তা অনেকটা নির্ভুলভাবে আগে থেকে বলতে পারেন।

অধ্যাপক বার্টনের ছাত্রজীবন যেমন কৃতিত্বপূর্ণ তেমনি তাঁর গবেষণা খ্যাতিও সুপ্রসারিত। ১৯৪২ সালে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্ররূপে পুরস্কার অর্জন করেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে তিনি স্বদেশ ও বিদেশে নানা সম্মাননা লাভ করেছেন। একাধিক মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আমন্ত্রিত অধ্যাপকরূপে আহূত হন। ব্রিটিশ ও মার্কিন রসায়ন সমিতি তাঁকে সম্মানিত করেছেন। রয়েল সোসাইটির ফেলোরূপেও তিনি নির্বাচিত হয়েছেন।

মানুষের সৃষ্ট আর একটি মৌল

মেণ্ডালিফের পর্যায়সারণী থেকে আমরা জেনেছি, প্রকৃতিতে ৯২টি মৌল বা মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। পরমাণবিক পদার্থের ক্রমাংক অনুযায়ী ৯২-সংখ্যক মৌল ইউরেনিয়াম হচ্ছে সর্বশেষ ও সবচেয়ে ভারী মৌল। প্রকৃতিতে যদিও ইউরেনিয়ামের পর আর কোন মৌলের সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে ইউরেনিয়াম-উত্তর একাধিক মৌল সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। এ পর্যন্ত ১২টি ইউরেনিয়াম-উত্তর মৌল কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট হয়েছে। এই সমস্ত মৌল কণিকা-ত্বরক (পার্টিকল অ্যাকসিলেটর) অথবা পরমাণু-চুল্লীতে (নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটর) সৃষ্ট হয়েছে। এর সর্বশেষ ১০৪ সংখ্যক মৌলটি সম্প্রতি ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক অ্যালবার্ট ঘিয়রশো ও তাঁর সহকর্মীরা আবিষ্কার করেছেন। এই নূতনতম মৌলটির নামকরণ এখনও হয় নি।

যে যন্ত্রে এই মৌলটি সৃষ্টি করা হয়েছে সেটি হচ্ছে মূলত বিকিরণ সনাক্তীকারক (রেডিয়েশন ডিটেকটর) সমন্বিত একটি চক্র-এবং একটি ভারী আয়ন ত্বরয়কের সঙ্গে এটি ব্যবহৃত হয়।

ইউরেনিয়াম-উত্তর এই সর্বশেষ মৌলটি অতীব তেজস্ক্রিয় এবং টাইটেনিয়াম, জারকোনিয়াম, হাফনিয়াম ইত্যাদি ধাতু পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আগে ভাবা হত, এই ইউরেনিয়াম-উত্তর মৌলগুলি তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের দিক থেকে শুধু গুরুত্বপূর্ণ, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাদের কোন উপযোগিতা নেই। কিন্তু এখন ইউরেনিয়াম-উত্তর অনেকগুলি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাজে লাগছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মহাকাশ অভিযানে অতিরিক্ত শক্তি সরবরাহের জন্যে তাপ-উৎস হিসাবে প্লুটোনিয়াম-২৩৮ ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্পক্ষেত্রে গামা-রশ্মির উৎস রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে আমেরিকিয়াম-২৪১ এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে ও ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় নিউট্রন উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ক্যালিফোর্ণিয়াম-২৫২।

জীবনের সীমান্তে

মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের প্রয়াস পৌরাণিক কাহিনীতে যেমন দেখা যায়; আধুনিককালে বিজ্ঞানীরাও তেমনি মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের জন্যে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা চালিয়ে আসছেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, চিকিৎসকরা যাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁদের দেহে বিজ্ঞানীরা প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছেন এবং সেই সব পুনর্জীবিত লোকেরা সুস্থ সবল হয়ে আবার কাজ-কর্ম

করতে পারছেন। বিজ্ঞানের ভাষায় এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'রিঅ্যানিমেশন' বা পুনর্জীবন বা প্রাণ সঞ্জীবন। এই বিষয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

বর্তমানে দেখা গেছে, চিকিৎসকদের অভিমতে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর ৫-৬ মিনিটের মধ্যেই তার দেহে প্রাণ সঞ্জীবন করা যেতে পারে। তার বেশি সময় অতীত হলে সেই মৃত দেহে আর প্রাণ সঞ্চার করা যায় না। এই পাঁচ মিনিটের সীমা আরও বাড়ানো যায় কিনা তা অনুসন্ধানের জন্যে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা বর্তমানে ব্যাপক গবেষণা চালাচ্ছেন। এ বিষয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার ইরাভ্যান মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা যে পর্যবেক্ষণ করেছেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাণ সঞ্জীবনের সমস্যার একটি প্রধান বাধা হচ্ছে অক্সিজেনের অভাবজনিত 'হাইপোঅর্কসিয়া' নামে দেহের অবস্থা। অক্সিজেনের অভাবজনিত এই অবস্থার দরুন মস্তিষ্কের কোষগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। ইরাভ্যান মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা উচ্চদেশে অবস্থিত পরীক্ষা কেন্দ্রে গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, যাঁরা উচ্চদেশে বাস করেন তাঁরা অক্সিজেনের অভাবজনিত অবস্থার সংগে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে যান যে, তাঁদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের মতে মৃত্যুর ১০-১২ মিনিট পরেও প্রাণ সঞ্চার করা যায়, যা সাধারণ ক্ষেত্রে ৫-৬ মিনিটের বেশি হলে সম্ভব হয় না। এই ব্যাপারটি বিজ্ঞানের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাণ সঞ্জীবনের সম্ভাব্যতার ওপর জ্বরের কোন প্রতিক্রিয়া আছে কিনা সে সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত বিশেষ কিছু জানা যায় নি। তবে দেখা গেছে, মৃত্যুর আগে জ্বর হলে সেই মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করা যায় না। এর কারণ কি তা এখনও জানা নেই।

ইরাভ্যান মেডিকাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক কাচাত্রিয়ান এ বিষয়ে ১০ বছর ধরে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছেন। তিনি দেখেছেন, যদি মৃত্যুর পূর্বে অবস্থায় জ্বর হয় তা হলে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও টিস্যু বা কলাসমূহে প্রভূত পরিবর্তন হয়, দেহের বিপাকক্রিয়া ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দেহের সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেট বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ ও ফসফরাসজাত পদার্থের পরিমাণ খুব কমে যায়। অর্থাৎ চিকিৎসকমতে মৃত্যুর অনেক আগেই জ্বর দেহের মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা রক্ষার জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি নিঃশেষ করে দেয়।

এই পরীক্ষার ভিত্তিতে ডঃ কাচাত্রিয়ান এমন একটি ভেষজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, যার সাহায্যে দেহের জীবনীশক্তি বজায় রাখা যায় এবং মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা রক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। এই উদ্দেশ্যে তিনি মনুষ্যেতর প্রাণীর দেহে ইনসুলিন ও গ্লুকোজের অন্তঃশিরা ইঞ্জেকশন দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। পরীক্ষায় দেখা গেছে, জ্বরাক্রান্ত মৃত প্রাণীর দেহে অঙ্গের কার্যকারিতা এইভাবে সঞ্জীবিত করা সম্ভব হয়েছে এবং মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র ও অন্যান্য আন্তর যন্ত্রের কার্যকারিতা অল্প সময়ের মধ্যে চালু করা গেছে। তাঁর পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে ডঃ কাচাত্রিয়ান মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও প্রাণসঞ্জীবনের পর ব্যবহারোপযোগী একটি নতুন ও মৌলিক ভেষজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন।

তাঁর এই পদ্ধতির অভিনবত্ব ও গুরুত্ব সারা সোভিয়েত রাশিয়া ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীমহলে গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। এই পদ্ধতির কার্যকারিতা সুপ্রতিষ্ঠিত হলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তর ঘটবে।

নারী ও পুরুষের মধ্যে কে বেশি দীর্ঘজীবী ?

নারী ও পুরুষের মধ্যে কে বেশি দীর্ঘজীবী এই বিতর্কের মীমাংসার জন্যে যদি বিজ্ঞানীদের কাছে মত চাওয়া হয়, তা হলে বিজ্ঞানীদের রায় নারীর পক্ষেই যাবে। এই বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল সমীক্ষা করেছেন। সমীক্ষায় তাঁরা দেখেছেন, সাধারণত পুরুষদের চেয়ে নারী বেশি দীর্ঘজীবী। মাকড়শা, মাছি, মাছ ও বহু স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে এই রায় সত্য বলে দেখা গেছে। সাধারণতে পুরুষদের তুলনায় নারীরা ৫-৬ বছর বেশি বাঁচেন। এই তারতম্যের কারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা হচ্ছেঃ (১) পুরুষের যৌনগত বৈশিষ্ট্য। (২) শারীরতাত্ত্বিক কারণঃ নারীদের চেয়ে পুরুষদের বিপাকক্রিয়া দ্রুততর সম্পাদিত হয়। নারীর তুলনায় পুরুষেরা বেশি সক্রিয় এবং একারণে তাদের শক্তি ক্ষয় হয় বেশি। কারো কারো মতে নারীর হর্মোনগত বৈশিষ্ট্য পুরুষের চেয়ে সুবিধাজনক। (৩) পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা রোগে কম আক্রান্ত হয়। মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভ্রূণ অবস্থায় ও শিশুবয়সে পুরুষ শিশুর মৃত্যু সংখ্যা বেশি। সম্ভবত এই অবস্থায় নারীদের চেয়ে পুরুষেরা সহজে রোগাক্রান্ত হয়। (৪) নিয়মিত যৌন সক্রিয়তা দীর্ঘ জীবনের ওপর প্রভাব করে। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর নারীদের সন্তান ধারণের ক্ষমতা আর থাকে না। কিন্তু পুরুষেরা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন।

কারণ যাই হোক সমীক্ষায় দেখা গেছে, পুরুষের তুলনায় নারীরা দীর্ঘজীবন লাভ করেন। বহু পতিব্রতা ভারতীয় নারী বিজ্ঞানীদের এই সমীক্ষার রায় প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবেন না, তাঁরা বরং বিপরীত রায়ই কামনা করবেন। তাঁরা চাইবেন, বিজ্ঞান তার অগ্রগতির দ্বারা এই প্রত্যক্ষ ফলের রায় পুরুষের ক্ষেত্রেই কার্যকর করে তুলুক। বিজ্ঞান তো আজ অনেক অঘটনই ঘটিয়েছে, নারীর কাম্য এই 'অঘটন' কি বিজ্ঞান ঘটাতে পারবে না?

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
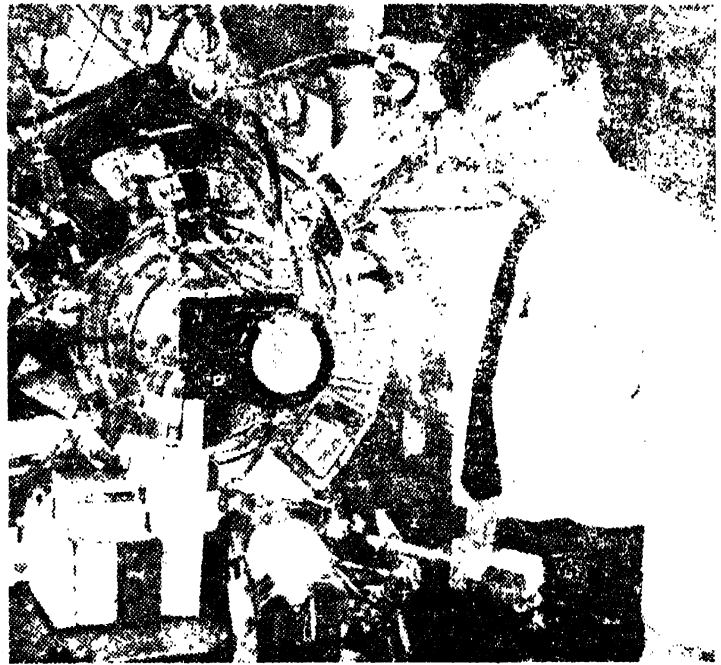
অধ্যাপক অ্যালবার্ট ঘিয়রশে

আগের ঘটনা

[কিছুদিন ধরেই চিল পড়ত রাতে।

সেদিন যখন নীপা ফিরে এল কলেজ থেকে সন্ধ্যে ঘনিয়েছে। বাড়ির চাকর দুঃখহরণ ছুটিতে। স্বামী অম্বরও ঘরে নেই। নীপা বিস্মিত। চিন্তিতও বটে।

ভাবছিল পুরনো দিনের কথা। নীলাদ্রির সঙ্গে কেমন করে তার পরিচয় হল। সুন্দরী নীপার কাছে প্রস্তাব এলো সিনেমায় অভিনয়ের। ওদিকে প্রাক্তন(?) প্রেমিক নীলাদ্রির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে। রাত। ঘরে অম্বর আর নীপা।

বাইরে শনশনে বাতাস। প্রেতাত্মার হাহাকার যেন। অম্বরের মনে সংশয়ের মেঘ। অশান্তির উত্তাপ।

পরের দিন সন্ধ্যে বেলা। রিহার্সাল থেকে ফিরেই আবার বেরুল নীপা।

একজন যুবকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্ধকার ঢেকে নিল দুজনকেই।

।। পাঁচ ।।

পাশাপাশি ওরা হাঁটছিল।

লেভেল ক্রসিংটা পেরিয়ে মিনিট চার-পাঁচ গেলেই ঘর-বাড়ি দোকানপাটের শুরু। উঁচু-নিচু মেঠো ঘাস... মাথায় মুকুট-মুকুটের মত এক ডালপালা ছড়ানো গাছ। ছাতিম গাছের একটি রাত-জাগা পাখি কর্কশ চিৎকার করে গাছটার আশ্রয় ছেড়ে অন্ধকারে নিরুদ্দেশ হল। ডালপালা আর পাতার ফাঁকে জোনাকির দল ঘুরছে। বিন্দু বিন্দু আলো নকশার কাজের মত বিচিত্র রঙ আঁকছে। ফের হয়ে আবার তা মুছে যাচ্ছে। অন্ধকার রাতে জোনাকির ঝিলমিল কি সুন্দর, ঠিক যেন এক রূপকথার রাজ্যের ইশারা।

চলতে চলতে নীপা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

লোকটা বলল—'কি ব্যাপার, থামলে যে?'

—'তুমি এবার যাও। আর পাশাপাশি হাঁটা উচিত হবে না।' নীপা সামনের দিকে চেয়ে পরিষ্কার জানাল।

লোকটা ঈষৎ হাসল। বলল—'তোমাদের মেয়ে-জাতের মাইরি কাণ্ডজ্ঞানটা সবসময় টনটনে। এতক্ষণ অন্ধকারে কলকল কথা কইলে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক-ফিক হাসলে। কথাগুলো গোগ্রাসে গিল-ছিলে। এখন সামনে আলো আর লোকজন দেখে বিলকুল সব ভুলে যাচ্ছ।' একটু থেমে সে ফের বলল—'অবশ্য সমাজে মুখ রাখতে হলে এই উপায়। নইলে সরকারী ডাক্তারের সুন্দরী বউয়ের নামে বদনাম ছড়াবে যে।'

ওর কথা মানেই বোলতার হুল। নীপা তা জানে। অন্যদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। কিছু বলল না।

লোকটা হি-হি করে হাসছিল। 'সুন্দরীর সঙ্গ চাইনে বাবা, আমার মাল-কড়ি পেলেই হল।' চোখ মটকে সে বলল, 'টাকাটা কিন্তু আমার দু-তিন দিনের মধ্যেই দরকার। নইলে জ্যাকসন লেনের সেই দোকানটা ফস্কে গিয়ে অন্য কারো কপালে উঠবে।'

—'অতগুলো টাকা! হুট করে আমি কোথায় পাবো?' নীপা যেন আঁতকে উঠল।

নেশাখোর মানুষের মত সে চোখ ঘুরিয়ে হাসল। বলল—'পারে বৌকি। সরকারী ডাক্তারের বউয়ের কাছে দু-হাজার টাকা তো খোলামকুচি। কেন ছলনা করছ মাইরি!'

—'অসম্ভব। দু হাজার টাকা কি চাট্টি-খানি কথা?' নীপা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল।

বাঁ-চোখটা ঈষৎ ছোট করে লোকটা তাকাল। 'তোমার টাকার অভাব! এক খান গয়না মানেই তো হাজার টাকা—' গলার হারটার দিকে ইঙ্গিত করে সে কথা শেষ করল।

নীপা ভয় পেল। লোকটা বলে কি? টাকা না পেলে গয়না-টয়নার দিকে ও হাত বাড়াবে নাকি? আড়ালে আবডালে ওর সঙ্গে দেখা করা উচিত হয়নি তার। মানুষের মন, না মতি। নির্জন জায়গায় ওকে একলা পেয়ে লোকটা যদি ওর মুখ চেপে ধরত।

—'গয়নাগাটি আমার নয়। ওগুলো আমার স্বামীর,—আমি শুধু অঙ্গে পরি।' নীপা মুখ গম্ভীর করে বলল।

—'আচ্ছা-হা! কি শোনালে মাইরি।' লোকটা হাত ঘুরিয়ে ছড়া কাটল। 'সব ধন হল তোমার, চাবিকাঠিটি রইল আমার। তা বেশ, গয়নার মালিকের কাছেই টাকাটা চাইব।'

—'তার মানে?' নীপা জবাব চাইল।

লোকটা হেসে বলল—'স্ত্রীর কলঙ্ক বলে কথা। পাঁচ কান হলে শহরে মান-ইজ্জত সব ডুববে। আমার তো মনে হয় দু হাজার টাকা ডাক্তারবাবু নিশ্চয় দেবেন। ভদ্দর-লোকের তাই উচিত কাজ হবে।'

মরীয়া হয়ে নীপা বলল—'কি ভেবেছ তুমি? তোমার জন্য কি শেষে আমায় আত্ম-হত্যা করতে হবে?'

লোকটা মূর্তিমান শয়তান। এক চটকা ব্যঙ্গ হেসে সে বলল—'আত্মঘাতী হবে? কি যে বল মাইরি! এমন সুন্দর ফিল্ম-স্টারের মত ঢলঢলে মুখখানা। স্ত্রী আত্মঘাতী হলে ডাক্তারবাবুর কি দশা হবে ভেবেছ?'

কথা নয়—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নীপা বলল—'আত্মহত্যা করলে আর কিছু না হোক, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।'

লোকটা এবার এগিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়াল। ক্রূর একটা ভঙ্গি করে বলল—'ওসব মরবার ভয় টয় সোয়ামীকে দেখিও। আমার টাকা নিয়ে কথা। তোমাকে দুদিন সময় দিলাম। সোম আর মঙ্গল, দুদিন পরে আমি আবার আসছি।'

—'কোথায় আসবে?' খুব অসহায় মুখ করে নীপা তাকাল।

—'তোমার বাড়িতে। টাকাটা জোগাড় করে রাখলে ভাল করবে।'

—'অসম্ভব।' নীপা প্রতিধ্বনির মত প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলল। 'এত টাকা আমার নেই। তোমার এসে কোন লাভ হবে না।'

অন্ধকারে অদৃশ্য হবার আগে লোকটা শুধু বলল, 'লাভ-লোকসানের কথা এখন থাক। বুধবার রাত্তিরে তার হিসেব হবে।'

হতভম্বের মত নীপা দাঁড়িয়ে রইল। তার মাথাটা বনবন করে ঘুরছিল। পা টল-ছিল। মনে হল এখনি সে পড়ে যাবে। একঠ্যাঙে তালগাছের মত নিশ্চল হয়ে সে কতক্ষণ রইল। একটু পরে নিজেকে সামলে

নিয়ে নীপা পা বাড়াল। রাত বেশী নয়। এখনও রেডিওতে খবর পড়া শুরু হয় নি। কাছেই একটা চায়ের দোকানে একদল উঠতি-যুবা জটলা করছে। তাকে দেখে নিজেদের মধ্যে ওরা কি বলাবলি শুরু করল। নীপা একটু এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে কে একজন হিরোইন, হিরোইন বলে দুবার চেঁচিয়ে উঠল। অন্য একটি ছেলে—আই আই কি হচ্ছে বলে তাকে ধমক দিল। কিন্তু সে দমল না। মুখের মধ্যে দুটো আঙুল পুরে সজোরে সিটি মারল।

বাড়ির কাছে এসে নীপা দেখল বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। ভিতরটা অন্ধকার। রান্নাঘরের বাতিটা কম পাওয়ারের। শোবার ঘরের আড়াল বলে রান্নাঘরের আলোটা রাস্তা থেকে চোখে পড়ে না। কে একজন ভদ্রলোক খবরের কাগজ মুখের উপর ফেলে চুপচাপ বসে। নীপা ভালো করে দেখল। অম্বর নয়, খবরের কাগজ আড়াল বলে মানুষটাকে ঠিক চেনা যায় না। নীপা ঘরে ঢুকতেই লোকটা মুখের উপর থেকে কাগজটা সরাল।

অবিনাশ সমাদ্দার একমুখ হাসি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করল। 'কোথায় গিয়েছিলেন আবার?'

—'কাছেই।' নীপা হাসবার চেষ্টা করল। 'আপনি কতক্ষণ এসেছেন?'

—'আধঘণ্টার মত হবে। এতক্ষণ ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

নীপা অবাক হল। বলল—'উনি এসেছেন নাকি?'

—'আমি এসে দেখলাম উনি বাড়িতেই আছেন। এই মাত্তর বেরিয়ে গেলেন। হাসপাতালে কি কাজ রয়েছে। আমাকে বললেন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে।' অবিনাশ একটু থামল। নীপার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—'অপেক্ষা করে অবশ্য ভালই হয়েছে। আপনার সঙ্গে দেখা হল।'

নীপাকে উদ্বিগ্ন দেখাল। তার মনের ভিতর সেই খটকাটা খোঁচার মত বিঁধছিল। অম্বর হঠাৎ এত উদার কেন? অবিনাশ তার বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে জেনেও সে উত্তপ্ত হয়নি। স্ত্রী অনুপস্থিত। সুতরাং দরজা থেকেই মানুষটাকে সুন্দর বিদায় করতে পারত। কিন্তু অম্বর তা করেনি। অবিনাশের সঙ্গে গল্প-গুজব করেছে। নিজে কাজের অছিলায় বেরোলেও অতিথিকে সে বসিয়ে রেখে গেল। বউ ফিরে এলে অবিনাশ তার সঙ্গে কথাবার্তা বলবে।

নীপা ক্লান্ত বোধ করছিল। সকালে ট্রেন-জার্নি, দুপুরে রিহার্সাল, আর সন্ধ্যাবেলা অতখানি পথ হাঁটা। লোকটার ভয় দেখানো হুমকি আর কথা কাটাকাটি। মনটা জং ধরা লোহার মত অকেজো হয়ে আছে।

কিন্তু অবিনাশ তারই জন্য অপেক্ষা করছে। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীপাকে বসতে হল। তারও দুটো কথা আছে ওকে বলবার।

—'রিহার্সাল থেকে কখন যে উঠে এলেন। আমি আর দেবরাজ আপনাকে খুঁজে হয়রাণ—' মুচকি হাসল।

—'তাই নাকি-' নীপা কানের কাছের চুলগুলি যত্ন করল। রহস্য করে বলল—'নাটকের নাম তো জানেন—নায়িকা সংহার। শেষদৃশ্যের অনেক আগেই নায়িকার মৃত্যু। অক্কা পেয়ে শেষ পর্যন্ত সে থাকবে কেমন করে?' নীপা ফিক করে একটু হাসল।

অবিনাশ ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। হাসলে ভারী সুন্দর দেখায় মেয়েটাকে। ঝকঝকে সাদা একসার দাঁত...মরালীর মত লম্বা গ্রীবা।...গালে সুন্দর টোল পড়ে। অম্বর রায়ের স্ত্রী-ভাগ্যকে ঈর্ষা না করে উপায় নেই।

—'হুট করে কলকাতা চলে গেলেন। আমি জানতেই পারলাম না।' অবিনাশ সখেদে বলল।

—'জানতে পারলে কি করতেন?'

—'কলকাতা যেতাম আপনার সঙ্গে। ঘনশ্যাম পিকচার্সের অফিস টালিগঞ্জে।—সেখানে একবার গেলেই বদ্রীদাসবাবুর সঙ্গে দেখা হত।'

'বদ্রীদাসবাবু মানে—'

অবিনাশ তাড়াতাড়ি বলল—'উনিই তো ঘনশ্যাম পিকচার্সের সিনিয়র পার্টনার। বলতে গেলে বদ্রীদাসবাবুই বইয়ের প্রোডিউসার।' একটু থেমে সে মোক্ষম কথাটি ছাড়ল, —'আপনাকে চাক্ষুস দেখলে বদ্রীদাসবাবু এক কথায় বই করতে রাজী হবেন।'

চপল বালিকার মত নীপা হেসে উঠল। 'বেশ কথা বলেন আপনি। কিন্তু ফিল্মে নামবো কিনা তাই যে এখনও ঠিক করতে পারিনি।'

অবিনাশ যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'বলেন কি মিসেস রায়। আমি তো ভেবেছিলাম আপনি ডিসাইড করে ফেলেছেন। ডাক্তারবাবুকেও গররাজী বলে মনে হল না।'

—'তার মানে? উনি মত দিয়েছেন নাকি?'

—'না-না। মতামত কিছু দেন নি। কিন্তু আপত্তিও করলেন না। বোধহয় আপনি যা বলবেন, তাই ওর মত।'

—'ইস।' নীপা একটা মেয়েলী ভঙ্গি করল। 'স্বামীরা কি স্ত্রীর বশ বলে মনে করেন নাকি?'

—'কি জানি।' অবিনাশ উদাসীন ভঙ্গি করল। একটু হেসে সে বলল,—'একটা কথা বলব মিসেস রায়? সাহিত্য-সঙ্গীত-নাট্যকলা-রাজনীতি যাই করুন সিনেমার মত তাড়াতাড়ি কোনো লাইনে পপুলারিটি পাবেন না। রাতারাতি আপনি ফেমাস হবেন। অগুণতি লোকের মনের আকাশে শুকতারার মত আপনার নামটি জ্বলজ্বল করবে। ভক্তের দল আকাশের দিকে চেয়ে ধ্রুবতারাকে ভুল করতে পারে। কিন্তু প্রিয় চিত্রতারকার মুখটি কেউ ভুল করবে না।'

—'উঃ। আপনি দেখছি সাঙ্ঘাতিক লোক।' নীপা খিলখিল শব্দ করে হাসল। সিনেমায় না এসে আপনার উকিল হওয়া উচিত ছিল। ফিল্মে দেখছি আমাকে নামাবেনই।।'

প্রসঙ্গ পাল্টে অবিনাশ শুরু করল,—'আপনার অভিনয় বলতে দেবরাজ তো অজ্ঞান। ও বলে ফার্স্ট বইতেই আপনি সুপারহিট করবেন।'

নীপাকে সন্তুষ্ট দেখাল।

—'দেবরাজবাবু কোথায়? আজ এলেন না কেন আপনার সঙ্গে?'

অবিনাশ এদিক-ওদিক তাকাল। গলা খাটো করে বলল, —'আসবার ইচ্ছে ছিল ওর। কিন্তু সেই গায়ে-পড়া মেয়েটা গিয়ে হাজির। আপনি তো চেনেন ওকে, —চৈতি নাকি যেন নাম। সব সময় দেবরাজের পিছনে চীনে-জোঁকের মত মেয়েটা লেগে আছে।' কথা শেষ করে অবিনাশ দেখল নীপার মুখের রঙ বদলেছে। চোখ দুটি অল্প ছোট, ঈষৎ কুঞ্চিত, ভ্রূ, —মেয়েলী ঈর্ষা প্রকাশ পাচ্ছে। 'দেবরাজবাবু ওকে আমল না দিলেই পারেন?' নীপা মন্তব্য করল।

অবিনাশ হাসল, 'তাই অবশ্য উচিত। কিন্তু দেবরাজকে তো জানি। ওর মনটা মাখনের মত নরম। কাউকে আঘাত করতে পারে না।'

নীপা কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ সে বলল, —'আচ্ছা অবিনাশবাবু, আপনার প্রস্তাবে রাজি হলে আমাকে নিশ্চয় কন্ট্রাক্টে সই করতে হবে।'

অবিনাশ এগিয়ে বসল। 'কন্ট্রাক্ট-ফর্মে সই না করলে জিনিসটা তো পাকা হবে না। কাজেই'— কথাটা সে অসমাপ্ত রাখল।

নীপা বলল, — 'চুক্তিতে সই করবার সময় কিছু টাকা নিশ্চয় অ্যাডভান্স পাওয়া যায়?'

—'অবশ্যই', অবিনাশ জোর করে বলল। 'কত টাকা আপনার দরকার বলুন না মিসেস রায়? বদ্রীদাসবাবুকে আমি কালই লিখে দিচ্ছি। সামনের শনিবারই কণ্ট্রাক্টে সই করবেন চলুন।' টাকার কথা বলতে নীপা লজ্জা পাচ্ছিল। একটু রাজি হয়ে সে বলল—'বেশী নয়। হাজার দুই টাকার খুব দরকার আমার। একটু তাড়াতাড়ি পেলে ভাল হয়। কিন্তু একটা কথা—'

অবিনাশ স্প্রীং দেওয়া পুতুলের মত ঘাড় বাড়িয়ে উৎকর্ণ হল। খুব আস্তে-আস্তে নীপা বলল, —'টাকার কথাটা এখনই কাউকে জানাবেন না। আমার স্বামীকে তো নয়ই,—এমন কি দেবরাজবাবুকে পর্যন্ত না। দেখবেন কিন্তু,—আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছি।'

অবিনাশ জিভ কামড়ে কসম খেল। 'আরে ছি-ছি। কি যে বলেন মিসেস রায়। একথা কাক-পক্ষীতে টের পাবে না। শুধু আপনি বললেন, আমি শুনলাম আর জানবেন বদ্রীদাসবাবু। এ লাইনে একবার আসুন, — দেখবেন অবিনাশ সমাদ্দার সিক্রেট-নিউজের একটি আয়রন-সেফ। তার পেট থেকে খবর বের করতে হলে ছুরি-কাঁচি ধরতে হবে।'

ঘড়িতে সাড়ে আটটার মত। হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবিনাশ উঠল। 'আপনি চিন্তা করবেন না। তলে-তলে আমি সব

কাজ সেরে রাখছি। টাকাটা খুব শীঘ্রি যাতে পান সেই ব্যবস্থা করব।'

● ●

খাটের উপর রোদে-শুকোনো গাছের গুঁড়ির মত নীপা টান-টান হয়ে শুয়েছিল। ঘরের মধ্যে জাল-বিছানো ছায়া-ছায়া অন্ধকার। খোলা জানলার ফাঁকে চার-পাঁচটি তারা চোখে পড়ে। রাস্তার আলোটা জ্বলে নি, — বাইরের নিমগাছের মস্ত ছায়াটার দিকে তাকালে কেমন ছমছমে আতঙ্ক লাগে।

অন্ধকার ঘরে নীপা চিন্তার স্রোতে ডুবছিল, ভাসছিল। নির্লজ্জ অমানুষটাকে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই। দু'টি হাজার টাকা হাতে না পেলে সে ঠিক অম্বরের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। হি-হি করে হাসতে-হাসতে দ্বিগুণ কিম্বা তিনগুণ বাড়িয়ে তার কুৎসার কথা বলবে। তারপর শয়তানের নোংরা হাত বের করে লোকটা নীপার স্বামীর কাছ থেকে দু হাজার টাকা দাবী করবে। ঘুষ না পেলে কলংকের কাহিনী ফাঁস করে দিতে সে দ্বিধা করবে না।

নীপা ভাবছিল অম্বরকে সব কথা বলবে। তার জীবনের একটা পরিচ্ছেদ,— অনেক দিন আগেই স্বামীকে সব কিছু খুলে বলা তার উচিত ছিল। এতদিন গোপন রেখে নীপা ভীষণ একটা অন্যায় করেছে। শুধু স্বামী নয়, — মানুষ হিসাবে অম্বর যেন তার বিচার করে। জীবনে এমন

ভুল তো কত মেয়ের হয়। ভালো ঘাট ভেবে চান করতে নেমে পাঁকে পা পড়ল। ভড়ভড়ে পাঁক, — দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে আসে। কিন্তু ভুল বুঝতে পারলে কেউ কি আর পাঁকে দাঁড়িয়ে থাকে? পায়ের কাদা ধুয়ে-মুছে সেই মেয়েই আবার ভালো ঘাট খুঁজে নেয়, —স্বচ্ছন্দে মরালীর মত হৃষ্টচিত্তে জলে নামে।

সব কথা মন দিয়ে শুনলে অম্বর নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করবে। মনে-মনে নীপা বলছিল, স্বামীর কথা সে কোনদিন ঠেলবে না। স্বামীর মতে চলবে, কোনদিন অবাধ্য হবে না। সিনেমা-থিয়েটার, হৈ-হুল্লোড় কিছুতেই সে থাকবে না। অম্বর বললে সে কলেজ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে পারে। কি হবে ছাই পড়াশুনো করে? তারচেয়ে ঘর-সংসারে ডুবে থাকা অনেক সুখের। কনে-বৌয়ের মত নীপা শুধু ঘরেই থাকবে।

চট করে অবিনাশ সমাদ্দারকে তার মনে পড়ল। লোকটা তাকে দু-হাজার টাকা অগ্রিম দেবার ব্যবস্থা করবে বলেছে। কিন্তু হাত পেতে অর্থ গ্রহণ করতে নীপার মন সায় দিচ্ছে না। ওর কাছ থেকে টাকা নেওয়া মানেই ফ্যাসাদ। চুক্তির কাগজে সই, —সিনেমায় নামতে অঙ্গীকার করা। তার মানেই জালে-বন্দী মাছের মত সম্পূর্ণ ফেঁসে যাওয়া। বউকে সিনেমায় নামতে দিতে অম্বর কিছুতেই রাজী হবে না। জেদ করলেই কুরুক্ষেত্র। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াবে, তা নীপাও জানে না। রাগ চাপলে লোকটার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়। হয়ত জোর করে মাথার সিঁদুর মুছে দিয়ে নীপাকে গলাধাক্কা দেবে। বলবে,—দূর হও আমার সামনে থেকে। কোনদিন এখানে মুখ দেখিও না।'

বাহিরে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে নীপা একটা কাণ্ড করল।.....

অম্বর মরা মাছের মত শক্ত হয়ে পড়েছিল। পাশে শুয়ে নীপা খানিকক্ষণ উসখুস করল। পা দুটো ঘষল। হাত দুটো টেনে হাই তুলল। ইচ্ছে করে একটা হাত স্বামীর বুকের উপর ফেলে রাখল। কিন্তু অম্বর সাড়াশব্দ দিল না। নীপা আড়চোখে তাকিয়ে দেখল মানুষটা ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। একটু সরে হাত দুটো দিয়ে গভীর আবেগে সে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরল। অম্বরের ঠোঁটে গালে পাগলের মত অজস্র চুমু খেতে লাগল।

স্ত্রীর আদরে-সোহাগে, উষ্ণ আলিঙ্গনে অম্বর কিন্তু গলল না। পাতলা ঠোঁটের স্বাদ পেয়ে তার বাঘের মত জেগে ওঠার কথা। কিন্তু অম্বর নিরুত্তাপ,—তেমনি চুপচাপ শুয়ে রইল।

স্ত্রী ক্লান্ত হলে পর অম্বর চোখ খুলল। কোমল দুটি হাত সন্তর্পণে গলা থেকে সে নামিয়ে রাখল। বলল, —'ব্যাপার কি? খুব খুশী-খুশী মনে হচ্ছে তোমায়?'

চোখ নামিয়ে নীপা জবাব দিল,—'কে আমায় খুশী করবে? তুমি ছাড়া—'

—'তোমাকে খুশী করবার মত অনেক লোক আছে। আমার প্রয়োজন নেই।' অম্বর ব্যঙ্গ করে বলল।

—'ছাই জানো তুমি।' নীপা সুন্দর একটি ভ্রূ ভঙ্গি করল। 'মেয়েমানুষকে স্বামী ছাড়া আর কেউ খুশী করতে পারে না। আর পাঁচজন পুরুষ খুশী করে না, চতুরালি করে। ও হল ঝুটো পাথর। অবশ্য আসল পাথর না পেলে ঝুটো পাথরের দিকেই মন ঝুঁকবে।' নীপা আবার স্বামীর দিকে তাকাল।

—'ভনিতা রাখো।' অম্বর প্রাঞ্জল হতে চাইল। 'আসল কথা বলো। এত আদর-সোহাগ, ছল-চাতুরী কেন? সিনেমায় নামবার অনুমতি চাও, এই তো?'

কথার মধ্যে বুনো গাছ-গাছালির মত একটা কটু ঝাঁজ। বিরক্ত হলেও নীপা তা প্রকাশ করল না। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে শুধু হাসল। রহস্য করে বলল,—'ধরো, যদি নামতে চাই? তুমি মত দেবে তো?—'

অম্বর রাগের সঙ্গে বলল,—'ঘর-সংসার ছেড়ে বউ সিনেমা-থিয়েটার আমোদ-স্ফূর্তি করবে। ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করে বেড়াবে। আর স্বামী তাতে মদত দেবে, এই তুমি বিশ্বাস কর?'

—'সিনেমা-থিয়েটার মানে অভিনয়, আমোদ-ফূর্তি করা নয়। দশজনের সঙ্গে ঘুরলে-ফিরলেই কি দোষের হয়?' নীপা প্রতিবাদ করে বলল।

—'দোষ হয় কিনা তা পাঁচজনকে বরং জিজ্ঞাসা কোরো?' অম্বর উদ্ধত কণ্ঠে বলল। 'সিনেমার ওই আড়কাঠিটাকে এবার ঘরে ঢুকতে দেখলে আমি কিন্তু গলাধাক্কা দেব।'

আলোচনাটা অন্য খাতে বইছে দেখে নীপা শঙ্কিত হল। কিন্তু উপায় নেই। কয়েক দিন ধরেই ছাই-চাপা আগুনের মত অম্বর অন্তরে জ্বলছিল। এখন মুখোমুখি হতেই সে মরীয়া। কথার মোড় ঘোরাতে নীপাও অপারগ।

বিছানার উপর উঠে বসল অম্বর। একটা সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল। প্রায় ধমক দিয়ে সে বলল,—'তোমাকে আমি সাফ কথা বলে দিচ্ছি নীপা। সিনেমা-থিয়েটারে নেমে ধিঙ্গিপনা করা আমি বরদাস্ত করব না। যা করেছ এই ঢের,—কিন্তু আর নয়। এইবার থাম, ঘর-সংসারে মন দাও।'

বিশ্রী কথার ঢঙ। নীপার গা জ্বলে উঠল। নিজেকে আর সামলাতে না পেরে সেও তেড়ে-ফুঁড়ে উঠে বসল। 'তুমি ভেবেছ কি? স্বামী হয়েছ বলে যা খুশী তাই হুকুম করবে। আজেবাজে কথা বলে অপমান করতে চাও? ধিঙ্গিপনা কিসের দেখলে? দিন দশ-পনের মোটে নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছি,—তাইতেই তুমি ভাবছ যে বউ একেবারে রসাতলে গেল।'

—'হ্যাঁ, তাই ভাবছি।' অম্বর দাঁতে-দাঁত চেপে বলল। 'তোমাকে সিনেমা-থিয়েটারের হিরোইন করব বলে আমি বিয়ে করিনি। আর পাঁচটা পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে ঢলাঢলি করে বেড়াবে তাও ভাবিনি। থিয়েটারের ডিরেক্টর তোমার বিশেষ বন্ধু। এক ট্রেনে দুজনের কলকাতা যাওয়া-আসা। এসব কি ভদ্রঘরের বউ মানুষের কাজ? আমি কিছু বুঝি না ভেবেছ?'

—'চুপ করো।' নীপা মুখ কুঁচকে তাকাল। 'তোমার নোংরা ছোট মন। ইতর ছোটলোকের মত কথা। নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে এমন অসভ্য ভাষা কেউ উচ্চারণ করে না।'

—'কি বললে?' অম্বর চেঁচিয়ে উঠল।

—'ঠিকই বলছি।' নীপা জবাব দিল। 'রাত দুপুরে আর গলাবাজি করো না। পাড়ার লোকে জেগে উঠলে তোমাকেও ছেড়ে কথা বলবে না।' একটু থামল নীপা। তেজী ঘোড়ার মত ঘাড় শক্ত করে ফের বলল,—'আমার কথাও তুমি জেনে রাখো। অবিনাশবাবুকে আমি কথা দিয়েছি। তার বইতে আমি অভিনয় করব। সামনের শনিবারেই কন্ট্রাক্টে সই হবে।'

বউয়ের স্পর্ধা দেখে অম্বরের রাগে ফেটে পড়ার কথা। তবু অনেক কষ্টে নিজেকে সে সংযত করল। বিষধরের হিসহিসানির মত তার ভারী নিঃশ্বাস পড়ল। চোখের ভাষা ক্রূর, নাসিকার অগ্রভাগ ঈষৎ স্ফীত দেখাল। চোখ দুটো প্রায় কপাল পর্যন্ত তুলে সে বলল,—'তোমার মত শয়তানীকে আমি জব্দ করতে জানি। সিনেমায় নামা বের করছি দাঁড়াও। দরকার হলে তোমাকে',—অম্বর দাঁতে-দাঁত ঘষল।

—'কি করবে বলে ফেলো।' নীপা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করল। 'বউকে মারধোর করবে, তাকে খুন করতে চাও?'

অম্বর শক্ত হয়ে রইল। কোন জবাব দিল না।

নীপা প্রায় চেঁচিয়ে বলল,—'তোমার যা খুশী করতে পার। আমি পরোয়া করি না। পরশু কাকা এলেই আমি বাড়ি বিক্রির ফাইনাল করব। তারপর ওঁর সঙ্গেই কলকাতা চলে যাব। তুমি আইন-আদালত যা খুশী করতে পার। দেখি, আমাকে কেমন করে আটকাও।'

●

সকালে চায়ের টেবিলে বসে অবিনাশ বলল,—'সুরপতি, একটা নিবেদন ছিল আমার।'

সম্বোধন শুনে দেবরাজ হাসল। 'ব্যাপার কি হে? সাত-সকালেই এমন তেল-তেলে ভাষা। ভনিতা ছেড়ে আসল কথা বলো।'

অবিনাশ বুঝল ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। কাজ কতদূর এগোল দেবরাজ তাই জানতে চায়। এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে সে বলল,—'কিছু মালকড়ি দরকার ছিল ব্রাদার।'

ভ্রূ কুঁচকে দেবরাজ তাকাল। 'কত টাকা চাই?' সে স্পষ্ট জানতে চাইল।

—'আড়াই হাজার।' অবিনাশ ফস করে বলে ফেলল। শ'পাঁচেক টাকা সে হাতে রাখতে চায়।

—'এত টাকা হঠাৎ?'

—'ময়না কথা বলেছে যে। কন্ট্রাক্টে সই করতে রাজী। তবে এই টাকাটা আডভান্স চায়।'

—'এতগুলো টাকা? দেবরাজ বিড়বিড় করে বলল, 'হঠাৎ অগ্রিম নেবার তাড়া কেন ওর?'

'কি জানি।' অবিনাশ টেবিলের উপর হাত দুটো প্রসারিত করে বলল।—'মনে হল টাকাটা ওর খুব দরকার। তবে মেয়েটা ভীষণ চাপা। কে জানে কোথায় ফেঁসে আছে ছুঁড়ি।'

দেবরাজকে চিন্তিত দেখাল। দোমনা খাদ্দেরের মত ইতস্তত ভাব। ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলল,—'বড্ড বেশী দাম লাগছে না অবিনাশ?'

—'কি করবে বলো ইয়ার। এ হল তোমার গেরস্থ ঘরের কুলবধূ,—যাকে বলে সোনার পাখি ময়না। কিনতে হলে মোটা কিছু খসবে বৈকি। তবে তোমার ভয় নেই। কোম্পানীকে তুমি যে টাকাটা ঢালবে বলেছ, এটা তার সঙ্গেই খাইয়ে দেব।'

—'তা ঠিক।' দেবরাজ হেসে বলল, 'কিন্তু দেখো, শিকলি কেটে পাখি যেন না উড়ে যায় আবার।'

—'ক্ষেপেছ তুমি। আমার একেবারে আটঘাট বেঁধে কাজ।' অবিনাশ ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, —'তোমাকে একটা খবর দিচ্ছি শোনা। মঙ্গলবার থেকে অম্বর রায় রাত্তিরে বাড়ি থাকছে না। সুন্দরীকে একলা শয্যায় নিশিযাপন করতে হবে।'

—'মাইরি? এ খবর তুমি কোথায় পেলে—' দেবরাজ সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল।

—'ঘোড়ার মুখের খবর নয় হে। একেবারে হিজ ম্যাজেস্টিস ভয়েস। অম্বর রায় আমাকে নিজে বলেছে। হাসপাতালের এমার্জেন্সীতে সাত দিন তার নাইট ডিউটি। দুজন ডাক্তার নাকি একসঙ্গে ডুব দিয়েছে। রাত দুপুরে হঠাৎ কেস এলে কিম্বা হাসপাতালে কোনো রোগীর দরকার হলে একজন পাকাপোক্ত ডাক্তার তো চাই।'

দেবরাজ এবার নিশ্চিন্ত হল। 'তাহলে তো পাকা খবর।'

অবিনাশ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করল। মুচকি হেসে বলল,—'কাল রাত্তিরে নীপা রায় তোমার খোঁজ নিচ্ছিল দেবরাজ।'

—'মাইরি অবিনাশ? তুমি সত্যি বলছ?'

—উৎসাহে দেবরাজের চোখ দুটো উজ্জ্বল দেখাল।

—'সত্যি নয় মানে? একেবারে বর্ণে-বর্ণে সত্যি। উনি আমাকে বললেন দেবরাজবাবু এলেন না কেন? তা আমি আর কথাটা গোপন করলাম না। বললাম দেবরাজের ইচ্ছে ছিল আসবার। কিন্তু ওই গায়ে-পড়া মেয়েটা গিয়ে হাজির। সব প্ল্যান ভণ্ডুল করে দিল।'

বিরক্ত মুখ করে দেবরাজ বলল,—'যা বলেছ। চৈতি বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। কবে ওর সঙ্গে দুটো কথা বলেছি। ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে সামান্য এদিক-ওদিক গেছি। আর ও ভেবেছে ছুঁড়ির প্রেমে আমি চক্কর খাচ্ছি। যত সব বোগাস আইডিয়া।'

—'কি করবে আর। মেয়েটাকে নাই দিয়েছো,—ঠ্যালা সামলাও এখন।'

দেবরাজ মুঠো পাকিয়ে বলল,—'আর নয়। এবার ওকে দাওয়াই দিতে হচ্ছে। নইলে চীনে জোঁকের মত ও ঠিক লেগে থাকবে। গলাধাক্কা দিলেও দূর হবে না।' কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ চিন্তা করল দেবরাজ। পরে কিছুটা স্বগতোক্তির মত বলল,—'হাতের কাছে তেমন কেউ ছিল না বলে কদিন ওকেই একটু নেড়েচেড়ে দেখলাম। কিন্তু দূর,—ও একটি পানসে চীজ। মাইরি বলছি অবিনাশ, চান্স পেয়েও ওকে কোনদিন আমি ছুঁয়ে দেখিনি।'

—'আরে ধুত্তোর। ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। কদিন একটু আলগা দাও, মুখ ফিরিয়ে থাক। তাহলেই ও কেটে পড়বে। ওর চোখ দুটো শুধু তোমার উপরই নেই বন্ধু, —আরো লোক আছে।'

চেয়ার থেকে উঠে দেবরাজ বলল,—'আমি ভাবছি একটা চক্কর দিয়ে আসি।'

অবিনাশ হাসল। দেবরাজ কোথায় যাবে তা সে জানে। নির্ভুল অংক কষার মত বলে দিতে পারে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে সময়টা দেখল। নটার কাছাকাছি। বলল,—'ভালো সময় হে। ডাক্তার হাসপাতালে গেছে। তুমি নির্ভাবনায় শ্রীরাধিকার কুঞ্জে চলে যাও। তবে সাবধান, —যা বলছি তা যেন ফাঁস করো না। তাহলে কিন্তু সব গুবলেট হয়ে যাবে।'

বাড়ির লাগোয়া গ্যারেজ। দেবরাজ ওর ছোট গাড়িখানা বের করল। অল্প একটুখানি পথ। গাড়ির তেমন প্রয়োজন নেই। স্বচ্ছন্দে পায়ে হেঁটে বা রিকশতে যাওয়া চলে। কিন্তু দেবরাজের মনে হল জামা, প্যান্ট, পায়ের জুতোর মত গাড়িটাও একটা সাজ। তার মর্যাদার স্বাক্ষর। সুতরাং নিয়ে যেতে হয়।

পথে লোকজন......মফঃস্বল শহরের অপরিসর রাস্তাঘাট। দেবরাজ মন্দগতিতে ড্রাইভ করছিল। হঠাৎ কে যেন পাশ থেকে তার নাম ধরে ডাকল। নারীকণ্ঠ। গাড়ি থামিয়ে পিছনে তাকাতেই দেবরাজ দেখতে পেল। চৈতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে।

—'কোথায় যাচ্ছ দেবরাজদা?' চৈতি গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

সীটে বসেই দেবরাজ বলল—'দরকার আছে এক জায়গায়। তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

—'গানের মাস্টারমশায়ের বাড়ি।' চোখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে চৈতি বলল, —'অনেকটা পথ। তুমি আমায় একটু লিফট দাও না দেবরাজদা।'

দেবরাজ মাথা নাড়ল। 'উঁহু, আমি অন্য দিকে যাব। ওদিকে নয়।'

—'কোথায় যাবে? আমাকে নামিয়ে দিয়ে না হয় একটু ঘুরেই গেলে। কত আর তেল পুড়বে তোমার—' চৈতি মুখখানা করুণ করে তাকাল।

এবার ইচ্ছে করেই ওকে আঘাত করল দেবরাজ। 'মিসেস রায় আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বিশেষ দরকার। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে চৈতি—' দেবরাজ গাড়িতে স্টার্ট দিল।

চৈতি মুখখানা কালো করে দাঁড়িয়ে রইল। রাস্তা দিয়ে একটা রিকশ যাচ্ছিল। চৈতিকে দেখে গাড়িটা প্রায় থামল। রিকশর দিকে একবার তাকিয়েই সে উঠে বসল। চালককে গন্তব্যস্থানের নির্দেশ দিল।

গানের মাস্টারের বাড়ি নয়,—চৈতি এল হরিপ্রকাশের কোয়ার্টার্সে। পাশাপাশি মেডিক্যাল কলেজ আছে, — হরিপ্রকাশ সেখানেই জুনিয়র হাউস-সার্জন।

ইনজেকশনের একটা অ্যামপিউল ভেঙে সিরিঞ্জে ভরছিল হরিপ্রকাশ। কাছেই একটা আধবুড়ো লোক বসে। সম্ভবত তাকেই দেবে।

চৈতির মুখের দিকে তাকিয়ে হরিপ্রকাশের খটকা লাগল। কেমন গোমড়া, থমথমে মুখ। হরিপ্রকাশ দেখল ইনজেকশনের সিরিঞ্জটার দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে চৈতি। নিশ্চয় মনে কিছু ভাবছে। কয়েক সেকেন্ড পরেই মুখ তুলে তাকাল চৈতি। চোখের ইঙ্গিতে ওকে কাছে ডাকল। বলল,—'তোমার সঙ্গে আমার দরকারী কথা আছে হরিপ্রকাশ।' (ক্রমশ)

কালের রাখাল ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

তবু বেঁচে থাকতে চাই।
বেঁচে থাকার জন্যে যে প্রাণটুকুর
একান্ত প্রয়োজন, তার ওপর
অসম্ভব পীড়ন সত্ত্বেও বেঁচে থাকার
প্রলোভন আমাকে পুতুলের মতো
নাচায়, বুদ্ধি জোগায় এবং যুদ্ধের
উন্মাদনা দেয়।

পৃথিবীতে এত সুখ!
কোথায় যাব সেই আনন্দের হাট ছেড়ে?
না, চলে যাবার কথা আমি ভাবতেই পারি না।
এত দুঃখ, এত সংগ্রাম, এত কদর্য কোলাহল—
তবু তারই মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই।
দেখে যেতে চাই সমস্ত আগাছা আবর্জনা
পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে, এবং
এই পৃথিবী এক সুন্দর বাগিচার
রূপ নিয়েছে।

নিরিবিলি এক এক সময় ভাবি,
আমি যদি বাবার মতো বড়ো হতে
না চাইতাম, যদি এখনো পাঠশালার
ছাত্র হয়েই থাকতাম, তাহলে আগামী দিনের
অনিন্দ্যসুন্দর সেই বিশ্ব-বাগিচায়
অনেককাল ধরে যেমন খুশি
ঘুরে বেড়াবার আমি সুযোগ পেতাম!
এখন আমি স্বপ্নের সৌরভে মাতাল,
মনে হয় সেই নতুন সৃষ্টিরই
গর্ভ-যন্ত্রণার কাল চলছে এখন।
স্বপ্ন যেন আজ সত্য হতে চলেছে:
কবিরা যে যুগে যুগে কালের রাখাল!

অনেকগুলো তন্ময়তা ॥

শিবশম্ভু পাল

অনেকগুলো তন্ময়তা স্বয়ংসম্পূর্ণ
বয়ে নিয়ে যাই এদিক ওদিক
এদিক সেদিক যেতে যেতে তোমার বাড়ি যাওয়া
এও আমার অন্যতম দায়!

কোন কাজেই ফাঁকি দিতে নেই
লাল কালি আর সেলামঠোকা আয়াসলব্ধ মৌনতার শিল্প
যথাযথ ভাগ করে দিই
এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি তাবৎ কলকাতা।

তোমার কাছে বাস্তবিকই প্রেমিক
  কোরনা সন্দেহ।
নিদ্রা, আমি তোমার কাছেও কম খাঁটি নই
রাত্রি হলেই বিছানাতে গা পেতে দিই, কোরনা সন্দেহ।

সবার কাছেই নিষ্ঠ আমি, কাউকে ভুলি না।
অনেকগুলো তন্ময়তা স্বয়ংসম্পূর্ণ
বয়ে নিয়ে এদিক সেদিক যেতে যেতে তোমার বাড়ি যাওয়া,
এও আমার অন্যতম দায়!

মানুষগড়ার ইতিকথা

সাবাশ সুব্রত! —এই সংবাদ শিরোনামাটি সকলেরই চোখে পড়েছে। বোম্বাই টেসটে স্বেচ্ছায় দেশের প্রয়োজনে দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আর একজন খেলোয়াড়ের জায়গা করে দেওয়ায় সুব্রতর খেলোয়াড়ি মনোবৃত্তিতে ভারতীয় হিসেবে আমরা যেমন আনন্দিত হয়েছি, তেমনি বাঙালী হিসেবে আর একবার সার্টের হাতায় মুছে নিয়েছি দু-ফোঁটা লুকোনো চোখের জল—ভারতীয় ক্রিকেট দলে বাঙালীর স্থান হয়েও হয় না দেখে। কিন্তু সুহাসবাবু দেখলাম একটুও দুঃখিত নন। এক্স মিলিটারীম্যান বর্তমানে জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের গেমস টিচার সুহাস দত্ত হাসতে হাসতে বললেন—এটাই আমাদের ট্র্যাডিশন। আমাদের ছেলেরা খাঁটি স্পোর্টসম্যান। খাঁটি সোনা। খেলাটা ওদের প্যাসন। তাই জাত খেলোয়াড় কখনো কোন কারণেই তার খেলোয়াড়ি মনোভাব হারায় না। এই সুব্রতর কথাই ধরুন না কেন। বাষট্টি সালে আই এস এস এ (সাউথ ক্যালকাটা) পরিচালিত লীগ ক্রিকেটে কেন আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি জানেন? ঐ সুব্রতর জন্য। আমাদেরই একটি প্রতিবেশী স্কুলের সঙ্গে খেলা ছিল। জিতলে আমরা পাব ট্রফি, হারলে ওরা। গেমটা ছিল আমাদের মুঠোয়। সাতাশী না অষ্টাশী, ঠিক মনে নেই, হোল আমাদের স্কোর। ওরা ব্যাট করতে নেমে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশেই গোটা সাতেক উইকেট হারাল। দারুণ বল করছিল সুব্রত। আর কয়েক ওভার ওভাবে বল করলেই আমাদের উইন একেবারে সিওর। কিন্তু আমরা হেরে গেলাম। না, গ্লোরিয়াস আনসার্টেনটির জন্য নয়। হঠাৎ সুব্রতর একটা রাইজিং বলে ওদের একজন ব্যাটসম্যান আহত হোল। তারপর থেকেই দেখি সুব্রত প্রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বল করল। আর শেষ পর্যন্ত ঐ আহত ব্যাটসম্যানই ওদের জিতিয়ে দিল। রাগে, দুঃখে, অভিমানে আমার মাথার কোন ঠিক ছিল না। খেলা ভাঙতে, টিম যখন মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে এল তখন প্রায় ধমকে উঠলুম—সুব্রত, কেন তুমি ঠিক মত বল করলে না? ক্যাপ্টেন হয়ে টিমকে হারিয়ে দিলে? খুব শান্তভাবে মাথা নীচু করে বলল—সার। ছেলেটি দারুণ চোট পেয়েছিল। আমার বলে এরকম হোল বলে, মনটা খারাপ হয়ে গেল। তারপর আম্পায়ার নিজে আমায় ডেকে যখন অনুরোধ করলেন, তুমি আস্তে বল কর, তখন স্যার আমি ক্রিকেটই খেলতে চেয়েছি, জিততে চাই নি। সে বছর আমরা রাণার-আপ হলুম। কিন্তু গত দু'বছর ধরে আমরা স্কুল ক্রিকেটে সাউথ ক্যালকাটা চ্যাম্পিয়ন। জানেন, নিশ্চয়ই ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট টীমের ক্যাপ্টেন হয়েছিল আমাদেরই ছেলে রাজা মুখার্জি।

ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটে বাঙালীর জায়গা না হলেও, স্কুল ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন হয়ে রাজা আমাদের মান রেখেছে। মান রাজা রাখে নি, রেখেছে জগদ্বন্ধু স্কুল। ভাল খেলোয়াড় হলেই ক্যাপ্টেন হওয়া যায় না। তার জন্য আরো অন্য কিছু গুণ দরকার। জাত খেলোয়াড় রাজা সে গুণ অর্জন করেছে জগদ্বন্ধু স্কুলের মাঠেই। স্কুলের ইতিহাস প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েই এসব কথা উঠল। ভিজিটার্স রুমে বসে হেডমাস্টার প্রফুল্লবাবু ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। স্কুলের গোল্ডেন জুবিলী ভল্যুমের একখানা কপি হাতে তুলে দিয়ে প্রফুল্লবাবু বললেন—সুব্রতর ব্যাপারটা যে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটাই যে আমাদের ট্র্যাডিশন এই ভল্যুমটা পড়লেই তা বুঝতে পারবেন। আপনি হিরণ্ময়বাবুর আর্টিকেলটা একবার পড়বেন। কে হিরণ্ময়বাবু? আই সি এস, রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই কি বলছেন? স্মিতহাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন প্রফুল্লবাবু—হাঁ। উনি আমাদের একদম গোড়ার দিকের ছাত্র। ওঁর বাবা মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ আর জগদ্বন্ধু রায়, এই তিনজনে মিলে গড়েছিলেন এই স্কুল—জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন।

সে সব কত কাল আগের কথা। কোথায় তখন আজকের আলো ঝলমল, পিচমোড়া, দোকান-পাটে সাজানো, উজ্জ্বল ঝকঝকে বালিগঞ্জ? চারদিকে জলা জায়গা। মাঝে মাঝে ধানক্ষেত, কপি ক্ষেত। এপাশে ওপাশে আধুনিক সদ্যাবিবাহিত তরুণীর প্রায়-অদৃশ্য সিঁদুররেখার মত দু-একটা সরু শুঁড়িকর রাস্তা। তখনো দক্ষিণ কলকাতা বলতে লোকে বোঝে ভবানীপুর, কালীঘাট। ট্রাম বাসের কোন প্রশ্নই ওঠে না। নেহাৎ রেল স্টেশনটার জন্যই পূবপ্রান্তে খানকয়েক পাকা বাড়ি উঠেছে। ঢাকুরিয়া লেভেল ক্রসিংয়ের ধারে কাঁকুলিয়া রোডের উপর ছিল সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের (বিদ্যাভূষণ) বাড়ি সারস্বত কুটির। সারস্বত কুটির থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে ফার্ণ রোডের ওপর ছিল সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মুরলীধর ব্যানার্জি'র বাড়ি। শহর কলকাতার জ্ঞানীগুণী নাগরিকরা তখন ধীরে ধীরে দক্ষিণে সরে আসছেন। যেমন বিদ্যাভূষণ, অধ্যক্ষ ব্যানার্জীরা এসেছিলেন। এসে কিন্তু হতাশ হয়ে পড়লেন। তাঁদের ছেলেরা তখন বড় হচ্ছে। অথচ দক্ষিণে সোনারপুর থেকে উত্তরে শিয়ালদা শহরের পূর্বদিকে কোথাও তখন একটিও হাইস্কুল নেই যে সেখানে তাঁদের ছেলেরা পড়ার সুযোগ পাবে। এ অভাব শুধু যে তাঁরাই অনুভব করেছেন তাই নয়, ঢাকুরিয়া, কসবার

জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন

বনেদী বাসিন্দারাও অনুভব করতেন। ঢাকুরিয়া, বালিগঞ্জ, কসবা সব পাড়ার ছেলেদেরই স্কুলে পড়তে হলে হয় রেলে চেপে শিয়ালদায় গিয়ে কলিন্স ইনস্টিটিউট, মিত্র ঘোষ, সিটি কলেজিয়েট বা বিপন কলেজিয়েট স্কুলে পড়তে হোত, না হয় জলাজঙ্গলে পায়ে হেটে পার হয়ে ভবানীপুরে মিত্র ব্রাঞ্চ বা সাউথ সাবারবণে যেতে হোত। এ অসহনীয় অবস্থার একটা সমাধান জরুরী হয়ে পড়ল। সবাই অনুভব করলেন, এখুনি এ অঞ্চলে একটি হাইস্কুল গড়ে ওঠা দরকার। দরকার ঠিকই, কিন্তু একটা হাইস্কুল তো আর চাট্টিখানি কথা নয় যে মুখের কথা খসালেই গড়ে উঠবে। তার জন্য জমি চাই, বাড়ি চাই, টাকা চাই, চাই যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক। কে করবে এর আয়োজন? কেন, জগদ্বন্ধু রায়।

কে জগদ্বন্ধু রায়? আরে সুন্দরবনের মস্ত জমিদার জগদ্বন্ধু রায় যে তখন ষোল নম্বর স্টেশন রোডের বাসিন্দা। নদীয়া জেলার দেবগ্রামের চকবেগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সেই একগুঁয়ে ছেলেটি যে কৈশোরে বাবার সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় এক কাপড়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল সেই তো আজ মস্ত জমিদার। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন কাহিনী ঐতিহাসিক উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে রায়মশাই উঠেছিলেন ভবানীপুরের শাঁখারীপাড়ার গ্রামসুবাদে পরিচিত এক কায়স্থের আশ্রয়ে। সেখানে থেকেই পড়াশোনা করেন। অপরের আশ্রিত হয়ে কি পড়াশোনা হয়? অতি অল্প বয়সেই তাঁকে চাকরীতে ঢুকতে হয়েছে। বছর কুড়ি বয়সে রায়মশাই পোর্ট-অফিসের একটি চাকরী পান। সেই সুবাদে গিয়েছিলেন ক্যানিংয়ে। পোর্ট ক্যানিং। সেই তখন যখন সবে রেললাইন কলকাতা থেকে ক্যানিং পর্যন্ত ইংরেজরা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ওখানে নতুন একটা বন্দর গড়বে বলে। সেব গত শতাব্দীর ষাটের যুগের কথা।

পোর্ট ক্যানিংয়ের এজেন্ট খুব ভালবাসতেন এই উদ্যমী যুবকটিকে। তাঁরই সস্নেহ উপদেশে রায়মশাই গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে জঙ্গলে হাঁসিলের কাজে নামলেন। উদ্দাম উত্তাল মাতলার ধারে ধারে সদ্য জেগে ওঠা চরের ইজারা নিয়ে বিপুল উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আবাদের কাজে। সেই কাজই তাঁকে এনে দিল প্রচুর অর্থ। অর্থ ফেরাল ভাগ্য। কপর্দকশূন্য ঘরছাড়া মানুষটি হয়ে উঠলেন দক্ষিণ বঙ্গের মস্ত জমিদার। আর সেই জমিদারী সূত্রেই তাঁর সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠল ভবানীপুরের বিখ্যাত মুখার্জি পরিবারের সঙ্গে।

সুন্দরবনে জমি জায়গা। তাই যাতায়াতের সুবিধার জন্য রায়মশাই গত শতাব্দীর শেষ দিকে বালিগঞ্জ স্টেশনের গায়ে স্টেশন রোডে বাইশ কাঠা জায়গা কিনে দু'কামরার একটি একতলা বাড়ি বানিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বসবাস শুরু করলেন। তারপর আস্তে আস্তে বালিগঞ্জের অনেক অনেক জায়গাও তিনি কিনে ফেলেছেন। বিপুল সম্পত্তির অধিকারী তিনি। সম্পত্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বয়সও বেড়েছে রায়মশায়ের। তখন প্রায় সত্তর বছরের বৃদ্ধ জগদ্বন্ধু রায়।

ঠিক সেই সময় বালিগঞ্জের পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, অধ্যক্ষ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকুরিয়ার জগদীশ মুখোপাধ্যায় ও আজকের প্রখ্যাত গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের ঠাকুর্দা (নামটা যোগাড় করতে পারিনি), কসবার বিখ্যাত উকীল নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায় (যার নামে কসবার একটি রাস্তা আজ সকলের পরিচিত বি বি চ্যাটার্জী রোড) সবাই এসে ধরে পড়লেন রায়মশাই আপনি থাকতে এ অঞ্চলে একটা হাইস্কুল হবে না এ কি কথা! এতজন জ্ঞানীগুণী মানুষের অনুরোধে কেমন আনমনা হয়ে গেলেন সেই বিষয়ী মানুষটি। অভাবের তাড়নায় তাঁর নিজেরই তথাকথিত শিক্ষার সুযোগ হয়ে ওঠে নি। এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন জগদ্বন্ধু রায়—দেব, সব সাহায্য আমি দেব। মুরলীধরবাবু, বিদ্যাভূষণমশাই গড়ে তুলুন আপনারা স্কুল। সাউথের সেরা স্কুল। টাকার জন্য কোন চিন্তা করবেন না।

১৪ নভেম্বর, ১৯১৩। সাতজন সদস্য নিয়ে একটি ট্রাস্ট বোর্ড গঠন করলেন রায়মশাই। ভবিষ্যতে স্কুলের সব দায়-দায়িত্ব বর্তাল এই ট্রাস্ট বোর্ডের ওপর। এমন কি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি গঠনের সম্পূর্ণ ক্ষমতাও ছিল ট্রাস্টীদের। ট্রাস্ট ডীড অনুসারে স্থির হোল—(১) স্কুলের নাম প্রতিষ্ঠাতা-সাহায্যদাতার নামানুসারে হবে জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন; কোন কারণেই ভবিষ্যতে এ নাম পালটানো চলবে না। (২) স্কুলের নিজস্ব বাড়ি ছাড়াও ছাত্রদের জন্য থাকবে একটি বোর্ডিং হাউস। (৩) স্কুলের কর্তৃত্বাধীনে প্রতিষ্ঠাতার পিতার নামে নামাঙ্কিত একটি চতুষ্পাঠী পরিচালিত হবে—'শীতল চতুষ্পাঠী।' ইত্যাদি, ইত্যাদি। স্কুলের জন্য রায়মশাই বর্তমান রাসবিহারী অ্যাভিনুর উপর একডালিয়া রোডে ধনবল্লভ শেঠের বাড়ির উল্টোদিকে এক বিঘা আঠারো কাঠা পনেরো ছটাক পঁয়ত্রিশ বর্গফুট জায়গা দান করলেন। ঐ জমিতে স্কুলের ও বোর্ডিং হাউসের দু-দুটি বাড়ি বানানো ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কেনার জন্য দান করলেন আরো কুড়ি হাজার টাকা।

ঐ জমিতে স্কুলের ভিৎপুজোর আয়োজন সুসম্পন্ন করতে এলেন রায়মশায়ের বিশেষ পরিচিত ভবানীপুরের বিখ্যাত মুখার্জী পরিবারের কর্তা গঙ্গাপ্রসাদের ছেলে বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ। চৌদ্দ সালের ১৯ জানুয়ারী ছিল ভিৎপুজোর দিন। সেই থেকে ঐ দিনটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে আজ পর্যন্ত পালিত হয়ে আসছে।

ভিৎপুজোর আগে থেকেই কিন্তু স্কুলের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ট্রাস্ট বোর্ড স্কুলের যথাযথ পরিচালনার জন্য একটা ম্যানেজিং কমিটি গঠন করেছিলেন যার সভাপতি হলেন স্যার এ চৌধুরী, যুগ্ম-সম্পাদক অধ্যক্ষ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। স্কুলের প্রথম হেডমাস্টার হয়ে এলেন সে যুগের নামকরা অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ শিক্ষক বেচারাম নন্দী। তারাশংকর ঘটক হলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার। অঙ্ক কষাতেন প্রফুল্ল সরকার। উমাপ্রসাদ মৈত্র পড়াতেন ইতিহাস। বাংলার জন্য এলেন গোপাল দাস, নিবারণ ভট্টাচার্য ও কুমারচন্দ্র রানা। কালিদাস কাব্যতীর্থ ছিলেন হেডপণ্ডিত। দু নম্বর একডালিয়া রোডের ওপর ধনবল্লভ শেঠের বাড়িতে স্কুল শুরু হয়ে গেল চৌদ্দ সালের জানুয়ারী মাসের একদম গোড়াতেই। প্রকাণ্ড বাড়ী। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে অনেক খোলা জায়গা। ভেতরে বড় উঠান একতলা দোতলায় অনেক ঘর। পড়াশোনা এবং খেলাধুলোর অনেক সুবিধা। স্কুল বসল এই বাড়ীতে। হোস্টেল চালু হল কসবায় আর একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে।

ছাত্ররা এলেন উৎসাহী প্রতিষ্ঠাতাদের ঘর থেকে। বিদ্যাভূষণ মশায়ের দু ছেলেই—শৈলেন্দ্রনাথ ও শচীন্দ্রনাথ—ভর্তি হলেন স্কুলে। মুরলীধরবাবুর ছেলে হিরন্ময় চৌদ্দ সালেই সপ্তম শ্রেণী অর্থাৎ আজকের ক্লাস ফোরে ভর্তি হলেন। ক্লাস মেট হিসাবে সেদিন যাঁদের হিরণ্ময় পেয়েছিলেন তাঁদেরই অন্যতম হরিসাধন ঘোষ আজ পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও শিক্ষক হিসাবে এই স্কুলের সংগে জড়িত আছেন। সেভেন বি (এখনকার ক্লাস থ্রি। সেভেন এ বর্তমানে ক্লাস ফোর) থেকে ফাস্ট ক্লাস, আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল স্কুল। শুরুতেই ইউনিভার্সিটির রেকগনিশন পেয়েছে স্কুল।

প্রতিষ্ঠার পরের বছরই স্কুলের নিজস্ব বাড়ী তৈরী হয়ে গেল। একডালিয়া রোডের দক্ষিণে ফার্ন রোডের পূবে উঠল জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের বিরাট দোতলা বাড়ি।

একতলা, দোতলা মিলিয়ে খানবারো বড় বড় ঘর। ছোট ছোট ঘর ছিল খান ছ-সাত। মেন বিল্ডিংয়ের দক্ষিণে তৈরী হল আর একটি দোতলা বাড়ি—উপরে স্কুলের বোর্ডিং এবং নীচের এক অংশে বোর্ডিং ও অপর অংশে শীতল চতুষ্পাঠী। ১৯১৫ সালে স্কুল চলে এল তার নিজস্ব বাড়িতে। বোর্ডিংও উঠে এল কসবা থেকে। সেই বছরই স্কুলের প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা ম্যাট্রিক দিতে বসল। প্রথম ব্যাচে যে দশজন ছাত্র পাশ করেছিলেন তাঁরা হলেন—সুধীরকুমার বসু, বিনোদবিহারী বিশ্বাস, ইন্দুভূষণ বিশ্বাস, মন্মথনাথ ঘোষ, প্রভাতকুমার ঘোষাল, জ্যোতেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, বিমলচন্দ্র গাঙ্গোপাধ্যায়, কালীগোপাল মজুমদার, বলেন্দ্রদেব রায় ও ভোলানাথ রায়।

সূচনা হয়েছিল খুবই মসৃণভাবে। কিন্তু যতই দিন কাটতে লাগল দেখা গেল স্বার্থের কাঁটা প্রতিপদে ছড়ান। স্কুল পরিচালন ব্যাপারেই ট্রাস্টীদের মধ্যে বেঁধে গেল ঝগড়া। একদলের নেতৃত্ব দিলেন জগদ্বন্ধু রায়ের বড় ছেলে হরিলাল রায় অপর দলের পুরোভাগে ছিলেন যোগেশ চৌধুরী ও রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। স্কুলটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি না সর্বসাধারণের এই নিয়ে বাধল লড়াই। মামলা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়াল। শেষ পর্যন্ত চৌধুরীমশাই ও বিদ্যাভূষণের অনুরোধে বিচারপতি মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্কুলটির দেখাশোনার ভার তুলে দিলেন একজন রিসিভারের হাতে। বিশেষ করে স্কুলের আয়-ব্যয়ের ওপর কড়া নজর রাখাই ছিল রিসিভারের অন্যতম দায়িত্ব। আভ্যন্তরীণ ঝগড়াও মামলায় তিতি-বিরক্ত হয়ে মুরলীধরবাবু ম্যানেজিং কমিটি থেকে সরে আসেন। ছেলে হিরন্ময়কেও স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে হেয়ার স্কুলে ভর্তি করে দেন (অবিশ্যি এ সময় মুরলীধরবাবু বালিগঞ্জ ছেড়ে পটলডাঙ্গায় উঠে যান)। বিদ্যাভূষণমশায়ের ছেলেরাও চলে গেল মিত্র স্কুলে। স্কুলের তখন রীতিমত টালমাটাল অবস্থা।

যাইহোক উনিশ সালে যখন প্যারিসে ভার্সাই প্রাসাদে বিশ্বশান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে তখন কলকাতার উপকণ্ঠে বালিগঞ্জের পূর্বতম প্রান্তে একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত স্কুলের পরিচালন সমিতির বিবদমান দুপক্ষের মধ্যেও আপোষ মীমাংসার চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। স্থির হল। ট্রাস্ট ডীড অনুযায়ী ট্রাস্ট বোর্ড আপোষ-মীমাংসা অনুসারে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব বহন করবেন। দশজন সদস্য নিয়ে একটি ম্যানেজিং কমিটিও গঠিত হল। এই কমিটি প্রতি তিন বছর অন্তর পুনর্গঠিত হবে। কমিটির সদস্য নির্বাচনের দায়িত্ব থাকবে ট্রাস্টবোর্ড ও বিদায়ী ম্যানেজিং কমিটির হাতে। ম্যানেজিং কমিটির দশজন সদস্যের মধ্যে একজন শুধু মনোনীত হবেন সাহায্যদাতার প্রতিনিধি হিসাবে। নতুন কমিটি রিসিভারের হাত থেকে স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

পরিচালন ব্যবস্থার ডামাডোলের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে স্কুলের জীবনে। বেচারামবাবু মাত্র কয়েকটি বছর এই স্কুলে ছিলেন। পনেরো কি ষোল সালে তিনি বিদায় নেন। তাঁর জায়গায় হেডমাস্টার হলেন বিপিন ব্যানার্জী। বিপিনবাবুও বেশীদিন থাকেন নি। নিমাইসুন্দর সিংহ হলেন হেড-মাস্টার। কিন্তু নিমাইবাবুও খুব শীগগিরই স্কুল ছেড়ে দিলেন। নিমাইবাবু চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ল।

তখন ভেতরে বাইরে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা চলছে। এরই মাঝে নতুন হেডমাস্টার নিযুক্ত হলেন সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে প্রবীণতম শিক্ষক হরিসাধনবাবু তাঁর স্মৃতি-কথায় লিখেছেন: 'অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন সুরেনবাবু। তাঁর শাসনক্ষমতা ছিল অসামান্য। সুরেনবাবু এলেন আর সঙ্গে সঙ্গে যেন কোন যাদুমন্ত্রে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। অন্ধকারের অবসানে আলোকের ঘটল অভ্যুত্থান। নিয়মশৃঙ্খলার এতটুকু ব্যতিক্রম নেই কোনখানে। সভয়ে কোন কোন শিক্ষক পদত্যাগ পত্র দাখিল করলেন। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ যঃ পলায়তি সঃ জীবতি নীতির অনুসরণ করে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেল।

সুরেনবাবু এলেন—সঙ্গে করে আনলেন শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রীকালিদাস দত্তকে। তারপরেই একে একে এলেন বিহারী-বাবু (বিহারীলাল চ্যাটার্জী) সুরেশ পণ্ডিতমশাই (সুরেশচন্দ্র শাস্ত্রী) এবং আশু পণ্ডিতমশাই (আশুতোষ ভট্টাচার্য)। এঁদের সঙ্গে এসে যুক্ত হলেন শ্রীহরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী এবং তাঁর অনুজ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। প্রফুল্ল সরকারমশাই তো ছিলেনই। এতগুলি অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ শিক্ষকের সম্মেলনে জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনে স্বর্ণ-যুগের আবির্ভাব ঘটল।'

সুরেনবাবু মাত্র তিনটি বছর এই স্কুলে ছিলেন। তিন বছরে বহু পরিবর্তন তিনি এনে দিয়েছেন স্কুলে। তাঁর সময়েই প্রথম স্কুলের বার্ষিক স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হয় ক্রাউন স্পোর্টিংয়ের মাঠে। প্রবর্তিত হল বিতর্ক সভা। ম্যাট্রিকের ফলাফলও ভাল হতে লাগল। পুরোনো যে সব ছাত্র স্কুল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তাঁরাও আবার ফিরে এলেন। হেয়ার স্কুল থেকে হিরন্ময় ফিরে এলেন তাঁর পুরোনো স্কুলে। স্কুল তখন রীতিমত জমজম করছে।

ইতিহাস পড়াতেন প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। তখন সব বিষয় পড়ানো হত ইংরেজীতে। এ ব্যাপারে প্রফুল্লবাবু ছিলেন ভীষণ কড়া। ক্লাসের ভেতরে ছাত্ররা বোধহয় কোনদিনই তাঁকে বাংলা বলতে শোনেন নি। সেই শীর্ণকায় চিররুগ্ন মানুষটির অসামান্য পঠনক্ষমতায় অতীতের ধূসর পৃষ্ঠাগুলি বিদেশী ভাষার বাধা অতিক্রম করে সজীব হয়ে উঠত ক্লাসরুমে। অঙ্কের ক্লাস নিতেন

কালিদাস দত্ত ও প্রফুল্ল সরকার। নাইনে পড়াতেন কালিদাসবাবু, টেনে প্রফুল্লবাবু। প্রায়ই প্রফুল্লবাবুর সহাস্য অভিযোগ শোনা যেত—কালিদাসবাবু সবই যদি অমনি শেষ করে দিলেন আমি তাহলে ফার্স্ট ক্লাসে করাব কি?

আশু পন্ডিতমশায়ের পড়ানোর কোন তুলনা ছিল না। দেবভাষা নবশিশুদের আয়ত্তগম্য করে তোলায় তাঁর সহজাত ক্ষমতা ছিল সর্বজনস্বীকৃত। ইংরেজী পড়াতেন অমূল্যচরণ নন্দী। বিরাট চেহারা, মুখময় গোঁফ-দাঁড়ি, আঙুলে বড় বড় নখ, ভয় পেত না তাঁকে এমন ছেলে বোধহয় সে আমলে এ স্কুলে পড়ে নি। ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষায় দখল ছিল অমূল্যবাবুর। অবসর কাটাতেন ইংরেজী ডিকসনারী পড়ে। এঁরাই সেদিন পড়াতেন জগদ্বন্ধু স্কুলে। আর পড়াতেন কুমারচন্দ্র জানা।

'ছাত্রদের নীতিবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল কুমার-বাবুর' হিরন্ময়বাবু তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক সম্বন্ধে বললেন, 'তাঁরই উৎসাহে ও অনু-প্রেরণায় ছাত্রদের মধ্যে সমাজসেবার মনোভাব গড়ে ওঠে।' ছাত্রদের নিয়ে তিনি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে দরিদ্র অনাথ আতুরের সেবা করে বেড়াতেন। ছাত্রদের স্বাভাবিক নৈতিক বোধ জাগানোর জন্য গড়ে ছিলেন একটি সমবায় ভান্ডার। ভান্ডারের কোন আলাদা রক্ষক ছিল না। ছাত্ররাই রক্ষক। খাতা, পেন্সিল, দোয়াত, কালি, রবার ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিষ সাজানো থাকত। প্রতিটি জিনিষের দাম লেখা আছে। যার প্রয়োজন কৌটোয় নির্দিষ্ট দাম ফেলে জিনিষ নিয়ে যাও। কেউ দেখতে যাবে না যে তুমি সবাইকে ঠকালে কিনা। কুমারবাবুর এক্সপেরিমেন্ট আশ্চর্য সফল হয়েছিল। কিন্তু বেশীদিন চলেনি। কারণ বিশের যুগের শুরুতেই তিনি নিজেই চলে গেলেন স্কুল ছেড়ে। সে আর এক ইতিহাস।

কুমারবাবুর আগেই বিদায় নেন সুরেন-বাবু স্বয়ং। ১৯২০ সালে ডিসেম্বর মাসে রাজসাহী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক হয়ে তিনি চলে যান। তাঁর জায়গায় হেডমাস্টার হলেন কামিনীকুমার ঘোষ।

কামিনীবাবু একুশ সাল থেকে পঁচিশ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ছিলেন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর সময়ে অনেক-গুলি বড় বড় ঘটনা ঘটেছে স্কুলের জীবনে। বাইশ সালে এই স্কুলের ছাত্র শুভেন্দুশেখর বোস ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পান। স্কুলের ইতিহাসে প্রথম স্কলারশিপ। শুভেন্দুশেখরদের ব্যাচেই হিরন্ময় পাঁচটি বিষয়ে লেটার পেয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করলেন। অথচ সময়ানুসারে এর আগের বছরই তাঁর পরীক্ষা দেওয়ার কথা। কিন্তু তখন ষোল বছরের কম হলে ম্যাট্রিক দেওয়া যেত না। সবাই মুরলীধর-বাবুকে অনুরোধ জানালেন, এফিডেভিট করে ছেলের বয়স বাড়াতে। স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এই সত্যনিষ্ঠ মানুষটি জবাবে শুধু বলেছিলেন—সে ত হয় না। জীবনটা আরম্ভ করবে মিথ্যার ওপর। সেটা কি ভাল?

বাইশ সালে মুরলীধরবাবু আবার স্কুলের সম্পাদক পদে ফিরে এলেন। বিদ্যা-ভূষণমশাই পুরোনো সহযোগীর হাতে দায়িত্বভার তুলে দিয়ে পরিচালন সমিতির একজন সদস্য হয়ে রইলেন। তাও বেশীদিন নয়, পঁচিশ সালের উনিশ জুন পর্যন্ত। তারপরে স্কুলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তিনি ছিন্ন করে দেন।

মুরলীধরবাবু দায়িত্বভার হাতে নিয়ে দেখেন স্কুলের সামনে প্রচণ্ড বিপদ। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট নতুন রাস্তা বানাবার প্ল্যান করেছে। স্কুলের জমি বাড়ি সবই প্ল্যানে রাস্তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে করেই হোক স্কুলকে বাঁচাতে হবে। মুরলী-ধরবাবু ছুটে গেলেন ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট মিঃ টি এমারসনের কাছে। শেষ পর্যন্ত এমারসন পারসুয়েশনের কাছে নতি স্বীকার করলেন। ঠিক হল ক্ষতিপূরণের সম-পরিমাণ মূল্যে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট স্কুলের জন্য নতুন একটুকরো জমি সংগ্রহ করে সেখানে বাড়ি বানিয়ে দেবে।

এমারসন তাঁর কথা রেখেছিলেন। রাস-বিহারী অ্যাভিন্যুর জন্য জগদ্বন্ধু ইন-স্টিটিউশন ছেড়ে দিয়েছিল তার বাস্তুভিটে সমেত—প্রায় উনচাল্লিশ কাঠা জমি, বিনিময়ে ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট স্কুলকে দিল ফার্ণ রোডের ওপর চৌষট্টি কাঠা জমি ও একটি ই-প্যাটার্ণের দোতলা বাড়ি। এই বাড়িটির কাজ শুরু হয় তেইশ সালের নভেম্বর মাসে। শেষ হতে হতে বছর ঘুরে যায়। সে সময় বছর দুয়েকের জন্য স্কুল তার বসতভিটে ছেড়ে পাশেই নরেন মিত্রমশায়ের বাড়িতে এসে ওঠে। পঁচিশ সালে ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট স্কুলের হাতে তুলে দিল নতুন বানানো বাড়িটা। স্কুল ভাড়া বাড়ি ছেড়ে আর একবার উঠে এল নিজস্ব আস্তানায়। সেই থেকে স্কুল বসছে ফার্ণ রোডের এই বাড়িতে। কিন্তু ঘন ঘন বাড়ি পাল্টানোর সেই দুঃসময়ে চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে স্কুলের বোর্ডিং।

ইতিমধ্যে চব্বিশ সালের ১ জুলাই আশী বছর বয়সে মারা গেলেন জগদ্বন্ধু রায়। এর ঠিক মাসখানেক আগে মারা যান স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট স্যার এ চৌধুরী। চৌধুরীমশায়ের শূন্য আসন পূর্ণ করলেন ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। পরের বছরই কামিনীবাবু স্কুল ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর জায়গায় ছাব্বিশ সালের মাঝামাঝি হেডমাস্টার হয়ে এলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপেনবাবু আট বছর এই স্কুলে ছিলেন। তাঁর আগে কামিনীবাবু ছিলেন পাঁচ বছর। উপেনবাবুর পর আরো অনেকেই হেডমাস্টার হয়েছেন। কিন্তু সব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যে মানুষটি চিরদিনই উপেক্ষিত থেকে গেছেন তিনি এই স্কুলের দীর্ঘদিনের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার প্রফুল্লকুমার সরকার। প্রতিষ্ঠার দিন থেকে পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত একটানা ছত্রিশ বছর নীরবে এই স্কুলের সেবা তিনি করে গেছেন। সে সেবার গুরুত্ব যে কতখানি যে এই স্কুলের ইতিহাস জানে না তার পক্ষে অনুমান করাও দুঃসাধ্য। কমিটি-ট্রাস্টের দীর্ঘস্থায়ী ঝগড়ার ফলে স্কুলের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন হয়ে উঠেছিল তখন প্রাণ দিয়ে আগলে রেখেছিলেন তিনিই। মা বোধহয় সন্তানকে এত ভালবাসে না, প্রফুল্লবাবু যতটা এই স্কুলকে ভালো-বাসতেন। আর তাই হেডমাস্টার না হয়েও তিনি ছিলেন স্কুলের প্রকৃত পরিচালক। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সবাই জানতেন প্রফুল্লবাবুই এই স্কুলের সব। মারা যেদিন যান সেদিনও তিনি স্কুলেই আসছিলেন। কিন্তু পৌঁছোতে পারেন নি। খবর শুধু এল স্কুলে প্রফুল্লবাবু নেই। আর সেই মুহূর্তে ফুলে ফলে সাজানো বাগানে বালিগঞ্জের পরিচ্ছন্ন পাড়ায় বহু প্রাচীন এই স্কুলবাড়ির প্রতিটি ইট কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। কান্নার জোয়ার ভাঁটার টানে নেমে যেতে কর্তৃপক্ষ যে সম্মান এই মহান শিক্ষককে কোনদিনই দেন নি, প্রাক্তন ছাত্ররা এগিয়ে এলেন তাঁদের গুরুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে। প্রফুল্ল-কুমার সরকার স্মারক বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হোল প্রাক্তন ছাত্রদের সংগৃহীত অর্থ ভান্ডারের সাহায্যে।

থাক সে সব কথা। স্মৃতি খুঁড়ে কে আর বেদনা জাগাতে ভালবাসে? তার চেয়ে পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই। উপেনবাবু তখন হেডমাস্টার। পুরোনো মাস্টার-মশাইরা অনেকেই তখন বিদায় নিয়েছেন। এসেছেন অনেক নতুন শিক্ষক। সাহিত্যিক তারাপদ রাহা, বিভূতিভূষণ কাঁঠাল, চারু-চন্দ্র চক্রবর্তী, ক্ষীরোদ চক্রবর্তী প্রমুখ অনেকেই এসেছেন। স্কুলের রেজাল্ট তখন কি বছরই ভাল হচ্ছে। ১৯১৫ থেকে ১৯৩৪ কুড়ি বছরে তিনশো বত্রিশটি ছেলে এই স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। সাতাশ সালে এই স্কুল থেকেই পাশ করে-ছিলেন আজকের প্রখ্যাত সাহিত্যিক গজেন্দ্র-কুমার মিত্র। পাঁচ বছর বাদে বত্রিশে পাশ করলেন বর্তমানে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির প্রো-ভাইসচ্যান্সেলার ডঃ পূর্ণেন্দুশেখর বোস। আর ঠিক তার দু বছর বাদেই উপেনবাবু পদত্যাগ করলেন, ১৯৩৪ সালে।

পরের বছর জগবন্ধু স্কুলের রেজাল্ট শুনে সারাদেশ চমকে উঠল। চমকাবারই কথা। প্রতিষ্ঠিত নামী দামী অজস্র স্কুল থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ কলকাতার পূর্বতম প্রান্তে বয়সের দিক থেকে নেহাৎ অর্বাচীন একটি স্কুল থেকে যদি দু-দুটি ছেলে স্ট্যাণ্ড করে তাহলে না চমকে উপায় কি। সে বছর ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হলেন এই স্কুলেরই ছাত্র নির্মলকুমার রায়। মধুসূদন চক্রবর্তী হলেন সিকস্থ। তখন স্কুলের হেডমাস্টার যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঐ বছরই আর এক ফ্যাকড়া দেখা দিল। ম্যানেজিং কমিটির অন্যতম সদস্য (দাতা মনোনীত) এস এন রায় উনিশ সালের আপোষ-মীমাংসার সূত্র ধরে পুরোনো পাওনা হিসেবে স্কুলের কাছে বিশ হাজার টাকা দাবী করে বসলেন। বিশ হাজার কেন বিশ পয়সাও তখন ফেরৎ দেওয়ার ক্ষমতা নেই স্কুলের। কেন নেই? নেই তার একমাত্র কারণ তহবিল তছরূপ। বহু টাকা অসৎ কেরানীরা দুহাতে লুটে স্কুলের আর্থিক অবস্থা একেবারে ঝাঁঝরা করে ছেড়ে দিয়েছে। স্কুলের শিক্ষকরা পর্যন্ত সে সময়ে ঠিকমত বেতন পেতেন না। একেই তাঁদের মাইনে ছিল অত্যন্ত কম। তাও সময়মত দেওয়া হত না। ইনক্রিমেন্ট দূরের কথা ইনসটলমেন্টে প্রাপ্য মাইনেটুকু পেলেই মাস্টারমশাইরা খুশী হতেন। আর কিই বা তাঁরা করতে পারতেন। তখন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের কেউই আর জীবিত নেই। মুরলীধরবাবু আগেই মারা যান। পঁয়ত্রিশ সালের জানুয়ারীতে বিদ্যাভূষণও মারা গেলেন। স্কুলের তখন রীতিমত দুরবস্থা এমন সময় রায়মশাই তাঁর দাবী পেশ করলেন—বকেয়া বিশ হাজার টাকা চাই।

স্কুল রাজী হল সব টাকা মিটিয়ে দিতে। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর ধরে ইনস্টলমেন্টে জগবন্ধু রায়ের উত্তরাধিকারীকে সেই টাকা ফেরৎ দিয়েছে স্কুল। ঋণমুক্ত হতে গিয়ে সেদিন স্কুলের এটুকু সামর্থ্য পর্যন্ত ছিল না যে উনচল্লিশ সালে রৌপ্যজয়ন্তী উৎসব উদযাপন করে। হেডমাস্টার যোগেনবাবু উৎসবের জন্য মাত্র সাড়ে চারশো টাকা চেয়েছিলেন ম্যানেজিং কমিটির কাছে। কিন্তু কমিটি সেদিন একটি টাকাও দিতে পারে নি। সেই বছরই মার্চ মাসে যোগেনবাবু স্কুল ছেড়ে চলে গেলেন।

পরবর্তী আট বছরে চার-চারবার হেড-মাস্টার পদে পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ গড়ে দু বছর অন্তর নতুন হেডমাস্টার এসেছেন জগবন্ধু স্কুলে। স্কুলের রেজাল্টের সুনাম যতই ছড়াক না কেন পরিচালন ব্যবস্থার গলদের কথা জানতে কারুরই তখন আর বাকী ছিল না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েও অনেকে আসতে রাজী হতেন না এই স্কুলে। ভয় পেতেন টিঁকতে পারবেন কিনা, যা দলাদলি স্কুলে। শেষ পর্যন্ত সব ভয় ভাবনা অস্বীকার করে উপেন্দ্রনাথ দত্ত এলেন হেড-মাস্টার হয়ে ছেচল্লিশ সালে। শুরু হল স্কুলের জীবনের আধুনিকতম অধ্যায়।

মডার্ণ পরিস্থিতির বর্ণনা শুরু করার আগে ক্রিকেটের ধারাভাষ্যকারের মত অন্তর্বর্তী অধ্যায়ের স্কুলের ফলাফলের চুম্বকটুকু দিয়ে রাখি। উনচল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ, এই আট বছরে মোট চারশ আটষট্টিটি ছাত্র জগবন্ধু থেকে ম্যাট্রিক দিয়েছে। পাশ করেছে তিনশো চুয়াত্তর জন। বিরানব্বইজন পাশ করেছে ফার্স্ট ডিভিশনে। চারজন পেয়েছে স্কলারশিপ। উপেনবাবু যে বছর স্কুলে এলেন সে বছর এদের ছাত্র অজয়কুমার বসু স্কলারশিপ পেয়ে স্কুলের উজ্জ্বল ফলাফলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন।

উপেনবাবু দীর্ঘ ষোল বছর জগবন্ধু ইনস্টিটিউশনের হেডমাস্টার ছিলেন। এই ষোলটি বছরকে নির্দ্বিধায় স্কুলের পঞ্চান্ন বছরের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম অধ্যায় বলে আখ্যাত করা চলে। তেষট্টি সালে উপেনবাবু রিটায়ার করেন। যখন এসেছিলেন তখন চার-দিকে শুধু সন্দেহ, ভয় আর অবিশ্বাস—এই সাধাসিধে মানুষটি টিঁকতে পারবে তো? আর যেদিন বিদায় নিলেন সেদিন জগবন্ধু স্কুল শহর কলকাতার অন্যতম প্রধান স্কুল বলে স্বীকৃত।

এই স্বীকৃতিটুকু সহজে আদায় হয় নি। এর পেছনে রয়েছে উপেনবাবু ও তাঁর সহকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম। আর রয়েছে স্কুলেরই সমসাময়িক অধ্যায়ের সম্পাদক অধ্যাপক তারকচন্দ্র দাসের অদম্য উৎসাহ ও সহযোগিতা।

কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের সহযোগিতার মনোভাব ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল ফলতে বেশী সময় নেয় নি। যখন উপেনবাবু তাঁর সহকর্মীদের সাহায্যে নিত্য নতুন পরিকল্পনা রূপায়ণে মেতে উঠেছেন, জগবন্ধু ইন-স্টিটিউশনকে একটি খাঁটি মডার্ণ স্কুলে পরিণত করার সাধনায় মগ্ন তখন টেরও পান নি যে তাঁর স্কুলের সুখ্যাতি একদিন এদেশের খোদ শিক্ষা কর্তাকেই তাঁর স্কুলে টেনে আনবে।

ছাপ্পান্ন সাল। তখন হায়ার সেকেণ্ডারী ব্যবস্থা চালু করার কথা উঠেছে পশ্চিম-

বঙ্গে। কোন কোন স্কুলে প্রথম এই ব্যবস্থা চালু হবে এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে। সেই বছর অকটোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে হঠাৎ কোন জানান না দিয়ে তৎকালীন এডুকেশন সেক্রেটারী নিজেই সদলবলে একদিন হাজির হলেন স্কুলে। বললেন—স্কুল দেখব। কাজের মানুষ তিনি, মাত্র একটি ঘণ্টা থাকবেন। কিন্তু সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যায় কে তার হিসাব রাখে। ঘণ্টা চারেক স্কুল পরিদর্শন করে খুশী হয়ে ফিরে গেলেন এডুকেশন সেক্রেটারী। তারপরেই চিঠি এল স্কুলে—জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনকে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে আপগ্রেডেড করা হল। পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম যে কটি স্কুল আপগ্রেডেড হয়েছিল, জগদ্বন্ধু স্কুল তার অন্যতম। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে স্কুল এর জন্য কোনরকম তদ্বির করেনি।

সাতান্ন সালে সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ ও টেকনিক্যাল তিনটি স্ট্রীম নিয়ে হাইস্কুল রূপান্তরিত হল হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে। টেকনিক্যাল স্ট্রীম চালু করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি স্কুলকে। তার কারণ বহু আগে থেকেই উপেনবাবু ও তাঁর সহকর্মীরা পথ প্রশস্ত করে রেখেছিলেন। বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিষয়ে ছাত্রদের উৎসাহী করে তোলার জন্য আগেই একটি ওয়ার্কশপ খোলা হয়েছিল স্কুলে। ওয়ার্কশপে ক্লাস এইটের কিছু বাছাই করা ছেলেকে ওয়্যারিং, সিট-মেটাল, কার্পেন্ট্রির কাজ শেখানো হত। এখন সেটা পুরোপুরি কাজে লাগল। হায়ার সেকেণ্ডারীর প্রয়োজনে সরকারী দাক্ষিণ্যে নতুন নতুন বিল্ডিং উঠল স্কুলের। এর আগে একবার ত্রিশের যুগে ই প্যাটার্নের দোতলা মেন বিল্ডিংয়ের মাঝের অংশটুকু তেতালা করা হয়েছিল, সে শুধু স্থানাভাব দূর করার জন্য। পঞ্চাশের যুগের শুরুতে পূর্ব-পশ্চিম দুদিকের দুটি ডানাকেই তেতালা করা হয় বিভিন্ন সাবজেক্ট রুম (হিস্ট্রী রুম, জিওগ্রাফী রুম, সায়েন্স রুম), লাইব্রেরী, মিউজিয়াম ও ল্যাবরেটরীর স্থান সংকুলানের জন্য। এবার উত্তর-পশ্চিম ধারে মেন বিল্ডিং ঘেঁষে উঠল তিনতলা সায়েন্স ব্লক। স্কুলের খেলার মাঠের উত্তরে উঠল টেকনিক্যাল ওয়ার্কশপের একতলা টিনসেড। আর পূর্বদিকে উঠল একতলা কমার্স ব্লক।

হায়ার সেকেণ্ডারীর প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে স্কুলের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খেলার মাঠটির প্রায় বারো আনাই আজ অবলুপ্ত। যে মাঠে একদিন ভারত বিখ্যাত বক্সার জগৎকান্ত শীল ছাত্রদের ড্রিল করাতেন, প্যারেড করাতেন যে মাঠে পরিতোষ চক্রবর্তী, চঞ্চল ব্যানার্জী, নিত্য ঘোষ, কল্যান সাহার মত ফুটবলার সুব্রত গুহ, রাজা মুখার্জীর মত ক্রিকেটার জন্মলাভ করেছে—সেই মাঠের আজ অবশিষ্ট বলতে আর কিছু নেই। পঞ্চমীর চাঁদের মত একফালি যেটুকু জায়গা পড়ে আছে তাতে নিশ্চয়ই সেকেণ্ডারীর নশ ও প্রাইমারীর সাড়ে চারশ ছাত্রের প্রয়োজন মেটে না। না মিটলেই বা উপায় কি? স্কুলের যা আয় তাতে নিজের সব খরচ মেটে না বরং সরকারী অনুদান পেলে স্কুল নিশ্চিন্ত বোধ করবে। তাই সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিল। সব শুনে কেন্দ্রীয় সরকার পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুরও করেছিলেন। টাকার অঙ্ক শুনে স্কুল তো অবাক। দিল্লীর কর্তারা কি কলকাতাকে রাজস্থানের মরুভূমি মনে করেন যে পাঁচ হাজারে একটা ফুলসাইজ মাঠের উপযোগী জায়গা কেনা যাবে? তাই মানে মানে টাকাটা ফেরৎ পাঠিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন।

মাঠের অবস্থা যাই হোক স্কুলের ভোল কিন্তু একদম পাল্টে দিয়েছেন তারকবাবু, উপেনবাবুরা। যে স্কুলে আগে শিক্ষকদের বেতনই ঠিক মত মাস মাস জুটত না, সেই স্কুলে শতকরা সাড়ে বারোভাগ কনট্রিবিউটরী প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ব্যবস্থা চালু হয়েছে। রিভাইজড গ্রাণ্ট ইন এড স্কিম অনুযায়ী সেকেণ্ডারী ও প্রাইমারী মিলিয়ে উনষাটজন শিক্ষকের বেতন দিতে স্কুল আজ সমর্থ। স্কুলের বার্ষিক আয় এখন প্রায় দেড় লাখ টাকা। আয় যাই হোক, স্কুলের প্রয়োজনীয় সব ব্যয় মেটানোর জন্য সরকারী অনুদান এখুনি পাওয়া দরকার। বহু পরিকল্পনা অর্থের অভাবে রূপায়িত হচ্ছে না।

সেই কথাই বলছিলেন প্রফুল্লবাবু। তেষট্টি সালে উপেনবাবুর রিটায়ারমেণ্টের পর প্রফুল্লকুমার ঘোষ হয়েছেন স্কুলের হেডমাস্টার। প্রফুল্লবাবুই জগদ্বন্ধু স্কুলের প্রথম হেডমাস্টার যিনি অ্যাসিসট্যাণ্ট টিচার পদ থেকে প্রমোশন পেয়ে পেয়ে আজ সর্বোচ্চ ধাপে উঠে এসেছেন।

চুয়াল্লিশ সাল থেকে এই স্কুলে পড়াচ্ছেন প্রফুল্লবাবু। গত পঁচিশ বছরে স্কুলে যত পরিবর্তন এসেছে তার প্রতিটি পরিকল্পনার ব্লুপ্রিন্ট রচনায় দক্ষ শিল্পী এই মানুষটি। একথা আমি শুনেছি উপেনবাবুর মুখে। স্কুলের বর্তমান বছরগুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাক্তন হেডমাস্টার তাঁর অনুজপ্রতিম বর্তমান প্রধান শিক্ষক সম্বন্ধে বললেন—স্কুলের প্রতি এই মানুষটির ভালবাসার কোন তুলনা হয় না। আমার সময়ে স্কুলের যা কিছু উন্নতি হয়েছে তার মূলে ছিলেন প্রফুল্লবাবু।

আমি সেই মূলেই যেতে চেয়েছিলাম। তার আগে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি গত দু-যুগের স্কুলের রেজাল্ট রেকর্ড। উপেনবাবুর ষোল বছরে প্রায় দেড় হাজার ছাত্র এই স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়েছে। পাশ করেছে তেরোশরও বেশী। আড়াইজন পাশ করেছে ফার্স্ট ডিভিশনে। নজন পেয়েছে স্কলারশিপ। পরবর্তী ছ বছরে অর্থাৎ প্রফুল্লবাবুর সময়ে স্কুলের রেজাল্ট অতীত সুনাম পুরোমাত্রায় বজায় রেখেছে।

বজায় না থাকলে জ্যোতিভূষণ চাকীমশাই কি বলতে পারতেন—আমার স্কুলে অন্তত একশজন ছাত্র-কবি নির্ভুল ছন্দে কবিতা লিখতে পারে। নারায়ণবাবু কি বলতে পারতেন—ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা? সে আবার কি? আমাদের স্কুলে ওসব নেই। হ্যাঁ, মারধোর করি। মারধোর না করলেই বরং ছেলেদের গোঁসা হয়, মাস্টারমশাই আর আমার উপর নজর রাখছেন না। মাস্টারমশাইদের প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনেছি তারপর রেজাল্ট রেকর্ড থেকে চোখ তুলে প্রফুল্লবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছি— আপনার স্কুলের সাফল্যের প্রধান কারণ কি? একবারও না ভেবে নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েছেন প্রফুল্লবাবু—আমাদের টিম স্পিরিট। সারা শহরে আমার মত সুখী হেডমাস্টার আর আছেন কিনা জানি না তবে আমার সবটুকু সুখের জন্য আমি দেবেনবাবু, হরিসাধনবাবু, নারায়ণবাবু, জ্যোতিবাবু, অহিবাবু ও অন্যান্য সকল মাস্টারমশায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। এদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় জগদ্বন্ধু স্কুল আজ এত বড় হয়েছে। স্কুলের ছাত্ররা আমার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখছে। এরা আছেন বলেই আজো এদেশে মানুষ তৈরী হয়। কারণ এরা তো শুধু শিক্ষক নন, এরা যে খাঁটি মানুষ গড়ার কারিগর। এদেরই স্নেহে মমতায় শত শত ছাত্রের জীবনের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে। এদের জন্যই ডঃ আনন্দমোহন ঘোষ, অধ্যাপক হরশংকর ভট্টাচার্য, হরিসাধন দাশগুপ্ত (ফিল্ম ডিরেকটর), অরূপ গুহঠাকুরতা, ডঃ দিলীপ কুমার সিংহ, ডঃ শংকর সেনগুপ্ত, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় তুষার তালুকদারের মত কৃতী ছাত্রদের গড়তে স্কুল সক্ষম হয়েছে।

ইন্টারভিউ শেষ হলে মাস্টারমশাইকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসছি দেখি স্কুলের করিডোরে দেয়াল-বোর্ডের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সুহাসবাবু। খেয়াল করেন নি যে তাঁর পাশেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম। উনি তখন একমনে তাঁর প্রাক্তন কৃতী খেলোয়াড় ছাত্র রাজা ও সুব্রত সম্পর্কে পত্র-পত্রিকার প্রশস্তির কাটিংগুলোর ওপর চোখ বোলাচ্ছেন। কে জানে সুব্রতর কথাই ভাবছিলেন কিনা! কারণ সব দেখে শুনে মনে হয়েছে জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের প্রতিটি শিক্ষকের মন জুড়ে রয়েছে শুধু একটি ভাবনা, তাহল ছাত্রদের শুভ কামনা। সেই কামনার সম্মিলিত সুরপ্রবাহে আমার ইচ্ছাটুকুও যে কখন মিশে গেছে টের পাই নি।

—সন্ধিৎসু

পরের সংখ্যা: বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

ভগবানের নাম স্মরণ করে অতি কষ্টে মাচায় উঠলাম। লতা দিয়ে কয়েকটা ডাল বেঁধে সিঁড়ি তৈরী করেছে। তাও জেস্‌মিন ওঠবার সময়েই দুটো লতা পটাং পটাং করে ছিঁড়ে গেল। চাকরি বজায় রাখতে এই পোড়া দেশে যে মালিকের সঙ্গে বাঘ শিকারেও বেরোতে হয় তা কোনদিন ভাবতে পারিনি। আজ দেখলাম সবই সম্ভব!

যাই হোক হাতে এবার নতুন বন্দুক। মাঝে মাঝে সেণ্ট মাখানো রুমাল বের করে নলটা মুছছি। যশোবন্ত বলেছে বন্দুকের মত আত্মীয় কোন ত্রুটি না হয়। নতুন স্ত্রীকেও আমার এই রাইফেলের মত কেউ ঘন ঘন রুমাল দিয়ে মুছবে বলে মনে হয় না।

যশোবন্ত টাবড়দের সঙ্গে ঐ সুঁড়ি পথ ধরে জঙ্গলের গভীরে চলে গেছে। হাঁকোয়া-ওয়ালাদের সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হেঁটে ও আসবে। মনে মনে যশোবন্তের ওপর ভক্তি বেড়ে যাচ্ছে। বড় পেছনে লাগে এই যা।

ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলাম ভয় পাবার মতো কিছুই ঘটতে যাচ্ছে না। আমি আছি। বন্দুকও। তাছাড়া সঙ্গে জেমসাহেব শিকারী আছেন হাতে তিন-হাজারী বন্দুক নিয়ে। তবে, শেষে একজন নারী আমার প্রাণরক্ষাকারী হবে, এই ভাবনাটা বেশ কাবু করে ফেলেছে। গলাটা খাঁকরে নিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললাম, 'আপনি এর আগে কি কি জানোয়ার মেরেছেন?'

'আমি?' জেস্‌মিন খুব অবাক এবং কিঞ্চিৎ ভীত হলো। কোনও উত্তর না দিয়ে আমতা আমতা করে পকেট হাতড়ে চকোলেট বার করে বললো, 'নিন চকোলেট খান।' তারপর চকোলেট চিবোতে চিবোতে বলল, একটি মাত্র জানোয়ার এ পর্যন্ত মেরেছি। কুকুর। পোষা কুকুর; পাগলা হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া...মানে...আর কিছু মারিনি।

বুকের মধ্যে যে কি করতে লাগল, তা কি বলব?

এমন সময় অত্যন্ত অবিবেচক এবং নিষ্ঠুরের মতো জেস্‌মিন আমাকে শুধলো, 'আপনি কি কি মেরেছেন? বাঘ-টাঘ নিশ্চয়ই মেরেছেন প্রচুর?'

চকোলেট চিবুতে চিবুতে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত বুদ্ধিমত্তা দেখিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ প্রচুর। যশোবন্ত আর আমি তো একসঙ্গেই শিকার টিকার করি।'

জেস্‌মিন একঢোকে চকোলেট গিলে ফেলে বলল, 'বাঁচালেন। সত্যি কথা বলছি, আমার এতক্ষণ বেশ ভয় ভয় করছিল। আপনি আছেন ভয়ের কি? কি বলুন?'

আমার কি তখন বলবার অবস্থা? তবু অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললাম, "আরে ভয়ের কি? আমি তো আছি।"

'হুক্কোয়া' শুরু হয়ে গেল। বহুদূরে থেকে গাছের গায়ে কাঠ-ঠোকরার আওয়াজ। মনুষ্য মুখরিত বিভিন্ন ও বিচিত্র অশ্রুত-পূর্ব আওয়াজ; সব ভেসে আসতে লাগল। ধীরে ধীরে সেই সম্মিলিত ঐকতান এগিয়ে আসতে লাগল। উত্তেজনা বাড়তে থাকল। হাতের চেটো উত্তরোত্তর ঘামতে লাগল। ঘন ঘন রুমালে হাত মুছে নিতে থাকলাম। গলাটা শুকিয়ে আসতে লাগল।

এমন সময় ঘাসের মধ্যে ভীষণ একটি আলোড়ন শুনতে পেলাম। তখন জেস্‌মিন আর আমি উৎকর্ণ উন্মুখ এবং যাবতীয়—উঃ—। হঠাৎ আমাদের হকচকিয়ে প্রকাণ্ড ডালপালাসম্বলিত শিঙ নিয়ে একটি অতিকায় মানে প্রায় প্রাগৈতিহাসিক কালের শম্বর সামনে বেরিয়ে এলো। তারপর প্রায়-বোরুদ্যমান দুজন বীর শিকারীকে বৃক্ষারূঢ় দেখতে পেয়েই গাঁক গাঁক আওয়াজ করে হাসতে হাসতে নদী পেরিয়ে চলে গেল ওপারে। লক্ষ্য করলাম, জেস্‌মিনের বন্দুক পাশে শোয়ান, কপালে এবং কপোলে স্বেদবিন্দু মুক্তোর মত ফুটে উঠেছে। চাঁপার কলির মতো বাঁ হাতের পাতাটি আমার হাঁটুর ওপর অত্যন্ত করুণভাবে শোভা পাচ্ছে।

জেস্‌মিন আমার দিকে ফিরে বললো, 'গুলি করলেন না কেন?'

আমি ধমকের সুরে বললাম, 'মাথা খারাপ? মারলে তো এক গুলিতেই ভূতল-শায়ী করতে পারতাম, কিন্তু আমরা তো বাঘের অপেক্ষায় আছি। এখন গুলি করব কি করে?'

কথাটা যশোবন্তের কাছে শোনা ছিল যে বাঘের শিকারে অন্য জানোয়ারের ওপর খামোকা গুলি করতে নেই।

জেস্‌মিন হেসে বলল, 'তাই বলুন, আমি ভাবলাম কি হলো, মারলেন না কেন?'

মনে মনে বললাম মারব ঐ জানোয়ারকে? বাঘের মত দাঁত নেই বটে কিন্তু শিঙ তো আছে। আর সেই ভয়ংকর পা। অন্য কিছু না করে পেছনের পায়ে একটি লাথি মেরে দিলেই তো সব শেষ!

সাঁই সাঁই ফর্‌ ফর্‌ করতে করতে একদল ময়ূর আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। অত বড় বড় শরীর নিয়ে যে অমন উড়তে পারে তা না দেখলে কল্পনা করা যায় না। উড়ে গিয়ে কোয়েল নদীর ওপারে পৌঁছেই কতগুলো নাম-না-জানা গাছে বসে কেঁয়া কেঁয়া করে ডাকতে লাগল। সমস্ত জঙ্গল যেন সেই ডাকে জেগে উঠল। এদিকে হাঁকোওয়ালারা আরো কাছে এসে পড়েছে। তাদের চিৎচাণ্ডলোর চিৎকারে মাথা ঠিক রাখা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যান্য মাচাগুলো দেখা যাচ্ছে না আমাদের জায়গা থেকে। ওরাও নিশ্চয় আমাদের দেখতে পাচ্ছে না।

বীটাররা আরো কাছে এসে পড়েছে—আরো কাছে—এখন মাথার মধ্যে হাতুড়ির আঘাতের মত সেই নিস্তব্ধ বনে বিচিত্র আওয়াজ এসে লাগছে।

এমন সময় পাহাড় বন কাঁপানো একটি গুড়ুম আওয়াজ কানে এলো। আর সঙ্গে সঙ্গে মেদিনী-কাঁপানো বজ্রনিনাদী চিৎকার। বাঘের আওয়াজ। বোধহয় গায়ে গুলি লেগেছে।

মনে হলো প্রলয় কাল উপস্থিত। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি লাল-কালোয় মেশানো উল্কাবিশেষ একটি 'স্প্রিং' এর মতো লাফাতে লাফাতে জঙ্গলের পাতা মচমচিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। মনে হল অজ্ঞান হয়ে যাব। জেস্‌মিন আমার গায়ে ঢলে পড়লো। মাচাটা থরথর করে কাঁপছে। ভগবান রক্ষা করলেন। বাঘটা কি মনে করে আমাদের থেকে পঁচিশ তিরিশ গজ দূরে থাকাকালীন দিক পরিবর্তন করে পশ্চিম-মুখো ছুটলো কিছুক্ষণ। তারপর নদীতে। নদীর শাদা বালি, নীল জল, আর সকালের রোদে লাফাতে লাফাতে জলবিন্দু ছিটোতে ছিটোতে, কাঁপাতে কাঁপাতে, লাল কালো বাঘটা নদী পেরোতে লাগল।

ওপারের ময়ূরগুলো নতুন করে চেঁচিয়ে উঠলো; কেঁয়া কেঁয়া কেঁয়া...। এমন সময় কোন অদৃশ্য জায়গা থেকে জানি না মেঘনাদের বাণের মত সশব্দে একটি গুলি এসে বাঘটিকে ভূতলশায়ী করলো। কিছুক্ষণ থর থর করে কাঁপল বালির ওপর, জলের ওপর। তারপর স্থির হয়ে গেল।

ততক্ষণ হাঁকোয়াওয়ালারা এসে পড়েছে প্রায় আমাদের কাছে। সম্বিত ফিরে পেতে দেখলাম জেসমিন আমার গায়ে মাথা এলিয়ে তখনো মূর্ছিতের মতো পড়ে আছে। আর মাচার নীচে দাঁড়িয়ে বাঘের চেয়েও ভয়াবহ যশোবন্ত।

জেসমিনকে দুবার নাম ধরে ডাকতেই ও স্বপ্নোত্থিতার মত মাথা তুলে খুব লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত হয়ে একটু হেসে বলল, 'Oh I am most awfully sorry.'

যশোবন্ত দূরে গেছে কিনা ভাল করে দেখে নিয়ে আমি মুরুব্বি শিকারীর মত বললাম, 'আরে তাতে কি হয়েছে—প্রথম প্রথম সকলেরই অমন হয়।' জেসমিন বলল, 'কি আশ্চর্য। বাঘটা আমাদের মোটেই দেখতে পায়নি। অথচ আমি কি ভয়ই না পেলাম।' আমি বললাম, 'তাতে কি হয়েছে, আমরা তো দেখেছি বাঘকে। বাঘ আমাদের নাই বা দেখল।'

মেঘনাদের বাণের মতো অদৃশ্য বাণটি যে কে ছুঁড়লেন তা আবিষ্কার করতে হচ্ছে। বাঘটিকে ঘিরে নদীর মধ্যে বীটাররা দাঁড়িয়ে আছে। উল্লাসে চেঁচাচ্ছে। হুইটলী সাহেব বেজায় খুশী। এই সময় একটি 'ইন ক্রিকেটের' কথা বলে ফেললে হয়। যাকগে থাক্। প্রকাণ্ড বাঘ।

যশোবন্ত বলল, বাঙলোয় ফিরে মাপ-জোপ করা হবে। তবে মনে হচ্ছে ন'ফিটের ওপর হবে।

জানা গেল, বেকার সাহেব বীয়ার খেয়ে 'বোম' হয়ে ঘুমুচ্ছিলেন মাচার উপরে। হঠাৎ হুইটলী সাহেবের গুলির আওয়াজে এবং বাঘের চিৎকারে ঘুম ভেঙে উঠে দেখেন নদীতে একটি বড় বাঘ লঙ-জাম্প প্র্যাকটিশ করছে। অমনি রাইফেল ঘুরিয়ে দেগে দিলেন। একদম। আর দেখতে হলো না। টোবড়ের ভাষায় 'গোলী অন্দর-জান্ বাহার।' যাই করুন না কেন, যশোবন্ত বলছিল, বেকার সাহেব সত্যিই ভাল শিকারী। উল্টোমুখে মাচা বাঁধা, ঘুমুচ্ছিলেন, তবু ঘুম থেকে উঠে শরীর ঘুরিয়ে মাচার পেছন থেকে গুলি করে গতিষ্মান বাঘকে ভূতলশায়ী করা সোজা কথা নয়।

বেকার সাহেব একটি পাথরের উপর বসে, ট্রাউজারের হিপ পকেট থেকে একটি বীয়ার ক্যান নিজে নিলেন, অন্যটা যশোবন্তকে বাড়িয়ে দিলেন। বুঝলাম সকলেরই বিস্তর আনন্দ হয়েছে বাঘ মারা পড়েছে বলে। আমারও আনন্দ হয়েছে কম নয়, মারেনি বলে।

হাঁকোওয়ালারা যশোবন্তর নির্দেশে দুটি ডাল কেটে আনল। তারপর দড়ি দিয়ে, লতা দিয়ে বাঘের চার-পায়ের সঙ্গে সেই দুটি ডাল লম্বালম্বি করে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হলো জীপ অবধি। তারপর তাকে জীপের বনেটের উপর পাথালি করে শুইয়ে দেওয়া হলো এবং বনেট ক্লিপের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হলো। মিসেস হুইটলীর সিনে-ক্যামেরা চলতে লাগল অবিরাম : কি-র্-র্-র্-র্—কুর্-র্র-র।

চামড়া ছাড়ানো আরম্ভ হতে হতে সেই বিকেল। দেখতে দেখতে রাত নেমে এলো। 'জ্যাকারাণ্ডা' গাছের ডালে বড় বড় 'হ্যাজাক' ঝুলিয়ে চামড়া ছাড়ানো হচ্ছে। বাঘটাকে চিৎ করে শোয়ানো হয়েছে। চারটে পা চারদিকে দিয়ে বেঁধে টানা দেওয়া হয়েছে। গলা থেকে আরম্ভ করে বুক ও পেটের মাঝ বরাবর চামড়া কাটা হয়েছে। তারপর সাবধানে চামড়া ছাড়ানো হচ্ছে। এটাও একটি আর্ট। যে সে লোকের কর্ম নয়। গুলিটা যেখানে লেগেছে, ঘাড়ে, সেখানে একটি গাঢ় কালচে লাল ক্ষত। চারপাশে অনেকখানি জায়গাও অমনি কালচে লাল এবং নীলাভ। বাঘের গায়ে মাংস বলে কিছুই নেই। সব পেশী। দড়ির মত ফিকে লাল পাকান-পাকান পেশী; তার উপরে পেশী। মেদ বলে যা আছে তা সামান্য। পেটের কাছে বেশী এবং সারা শরীরেই যা আছে তা একটি পাতলা আস্তরণ ছাড়া কিছু নয়।

বাঘের সামনের পায়ের কিংবা হাতের গুলি দেখবার মত। চামড়া না ছাড়ালে কোনও অনুমান করাই সম্ভব হতো না যে সেই হাত দুখানি কতখানি শক্তির অধিকারী। চোয়ালের পেশীও দেখবার মত। চলমান বাঘ তাই যখন সুন্দর চামড়া-মোড়া চেহারায় হেলে দুলে চলে, তখন কেউ তাকে দেখলে বুঝতে পারবে না, যে বিনা আয়াসে মুহূর্তের মধ্যে সে কি সংহার মূর্তি ধারণ করতে পারে।

বন্দুকটা সবে হাতে পেয়েছি। বনে পাহাড়ে বাহাদুরি করার আগে এই চামড়া ছাড়ানো বাঘের আসল চেহারাটা দেখার আমার প্রয়োজন ছিল।

চারদিকে এখন ভিড়। কেউ বলছে বাঘের চর্বি চাই, তেল করবে, বাড়ীতে বুড়ি মা আছে, বাত হয়েছে, বাত নাকি বাঘের চর্বির তেল ছাড়া সারবে না। আবার কেউ বলছে বাঘ-নখ চাই। বউয়ের গলার হার বানিয়ে দেবে।

গোঁফগুলো তো নেই-ই। কখন যে হাতে হাতে লোপাট হয়ে গেছে তার পাত্তাই নেই।

যে কারণ আসা সেই বাঘই যখন মারা পড়ে গেল তখন বোধকরি এই জঙ্গলে পড়ে থাকতে সাহেবদের কারো আর ইচ্ছা রইল না। তবু জেসমিন আর মিসেস হুইটলীর খুব ইচ্ছা ছিল আরও দিন তিনেক থেকে যাবার। শুক্লপক্ষ বলেই ওদের উৎসাহটা বেশী। কিন্তু হুইটলী সাহেব বললেন, অনেক কাজ আছে কলকাতায়। অতএব পরদিনই দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে মালিক মালিকনরা রাঁচীর দিকে রওনা হয়ে গেলেন গাড়িতে। অনেক হ্যান্ডশেক হলো; অনেক 'থ্যাঙ্ক', অনেক বাই বাই-ও। তারপর লালধুলো উড়িয়ে গাড়ি ছুটল। উধাও।

স্বস্তির নিঃশ্বাস এবার। হাত-পা ছড়িয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসলাম।

যশোবন্ত বলল, 'সাবাস দোস্ত। গুরু গুড় : চেলা চিনি। তুমি যে আমাকেও টেক্কা মেরে বেরিয়ে যাবে হে। তোমার প্রমোশন ঠেকায় কোন্ শালা।'

[পাঁচ]

জুন মাস এসে গেল। পনেরোই জুন নাগাদ কাজ বন্ধ হবে জঙ্গলের। তারপর বৃষ্টি নামবে। কোয়েল, আমানত, ওরঙ্গা, কালহার সকলেই সংহার মূর্তি ধারণ করে। পথঘাট অগম্য হবে। অতএব কাজ আবার আরম্ভ হতে হতে সেই সেপ্টেম্বর। অতএব এই ক'মাস ছুটিই বলা চলতে পারে। অবশ্য স্টেশন থেকে ওয়াগনে মাল পাচার হবে। জঙ্গলেই শুধু কাজ বন্ধ থাকবে। এই সময় বাঁশ-কাঠের ঠিকাদারদের কোলকাতায় কি মুঙ্গেরে কি পাটনায় গিয়ে বাবুয়ানী করার সময়। এই সময়টা এখানে কেউই পড়ে থাকে না। বরসাত হচ্ছে রইসী ঠিকাদার-দের ওড়বার সময়। তাঁরা তখন গেরোবাজ পায়রার মত ওড়েন।

যশোবন্তের বিহার গভর্ণমেন্টের চাকরী। ও ইচ্ছা করলে ঐ সময়টা ছুটি নিতে পারে। কিন্তু ও আমাকে বলল, 'কোথায় যাবে? থেকে যাও। বর্ষাকালে বন জঙ্গলের আরেক চেহারা। একেবারে নাজোয়াব।'

বললাম, আমার অবশ্য যাওয়ার জায়গা নেই। যশোবন্ত বলল, 'থেকে যাও, থেকে যাও।' মাঝে মাঝে চুপ ক'রে বসে ভাবি, পালামৌ সম্বন্ধে অনেক জানবার শুনবার আছে। এ যেন ইতিহাস নয়, এ এক জীবন্ত বর্তমান, বেড়াতে বেড়াতে পিছিয়ে পড়েছে। বুড়ো টোবড় মুন্সী অনেক কিছু জানে। বসে বসে ওর গল্প শুনি।

বহু জায়গা থেকে আদিবাসীরা এসে এই পর্বতময় নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় বসবাস আরম্ভ করে। 'খারওয়ারেরা' আসে, 'ওরাওঁরা' আসে, 'চেহারা' আসে। রুমান্ডি পাহাড়ের নীচে যে বস্তি 'সুহাগী', সেটি ওরাওঁদের বস্তি। আমার টোবড় মুন্সীও জাতে ওরাওঁ। বহুদিন আগে খারওয়ারেরা রোটাসগড়ের শাসক ছিল। রোটাসগড়-শাহাবাদের দক্ষিণে সেই উঁচু মালভূমি, যেখান থেকে দাঁড়িয়ে শোন নদের সর্পিল পথরেখা চোখে পড়ে। সেই মালভূমির মস্ত দুর্গ ওদের। বিরাট দুর্গ। অনেক লড়াই করেছে তারা সেখান থেকে। সে জায়গা ছেড়ে, এগারো থেকে বারো খৃষ্টাব্দের মধ্যে ওরা এসে এই জায়গায় বসবাস আরম্ভ করে।

ওরাওঁরাও দাবী করে যে তাদের পূর্ব-পুরুষেরাও নাকি রোটাসগড়ে শিকড় গেড়ে ছিলেন। কিন্তু ওদের আদি নিবাস কর্ণাটকে, সেখান থেকে নর্মদা নদ বেয়ে উঠে আসে ওরা। তারপর শোন নদের পারে, বিহারে এসে নতুন করে ঘর বাঁধে। এরাও বলে রোটাসগড়ে এদেরও জবরদস্ত দুর্গ ছিল একটি। কিন্তু এক উৎসব রাত্রে যখন প্রচণ্ড আনন্দোল্লাসের পর পুরুষেরা পানোন্মত্ত হয়ে নেশায় অজ্ঞান হয়ে ঘুমুতে থাকে—তখন শত্রুপক্ষ এসে ওদের দুর্গ আক্রমণ করে। একজন পুরুষেরও নাকি তখন যুদ্ধ করার মত অবস্থা নয়। কেবল মেয়েরাই প্রবল বিক্রমে লড়াই চালায়। কিন্তু পরাজিত।

সেই যুদ্ধে হেরে দুর্গ পরিত্যাগ করে ওরাওঁরা দুদলে ভাগ হয়ে রোটাসগড় থেকে পালায়। একদল চলে যায় রাজমহল পাহাড়ের দিকে, অন্যদল পূবে ঘুরে কোয়েল নদী বরাবর এগিয়ে এসে ছোটনাগপুর মাল-ভূমির উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আস্তানা গেড়ে বসে।

খাঁরওয়ার ও ওঁরাও ছাড়া চেরোরাও এমনি একটা গল্প বলে। গল্পগুলো নাকি সত্যি। যশোবন্ত বলছিল, এই জেলার নথিপত্রে এসব কথার সত্যতা নির্ধারিত হয়েছে।

যশোবন্ত একদিন পালামৌ নামের ব্যাখ্যা শোনাচ্ছিল।

পালামৌ নামটার আসল উচ্চারণ পালাম্‌ন্‌। আসলে এ নামটির ব্যুৎপত্তি একটি দ্রাবিড় শব্দ থেকে। ঐতিহাসিকেরা বলেন, খুব সম্ভব পালাম্‌ন্‌, পাল, অম্ম ঔং এই দ্রাবিড় শব্দ ক'টির বিকৃতি। পাল মানে দাঁত। অম্ম মানে জল এবং ঔং হলো বিশিষ্ট স্থান বিশেষের বিশেষণ, যথা—গ্রাম, দেশ, জঙ্গল। ঐতিহাসিকদের এই অনুমান একেবারে হাওয়ায় ওড়া নয়। আদিবাসী চেরো প্রধানরা যে গ্রামে থাকতেন সে গ্রামের নাম ছিল পালামন্‌। সেই গ্রামেই তাঁদের বহু-সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। এই দুর্গবহুল দুর্গম গ্রামের ঠিক নীচ দিয়েই ঔরঙ্গা নদী বয়ে যেত। সেখান থেকে বসে বসে ঔরঙ্গা দেখা যেত। ঐ গ্রামের প্রায় কয়েক মাইল ভাঁটাতে এবং উজানে ঔরঙ্গা নদীর কোল, বড় বড় কালো কালো পাথরে ভরা ছিল। বর্ষাকালে নদীতে যখন বান আসত তখন পাথরগুলো সব দাঁতের মত উঁচু হয়ে থাকত। তাই নদীর নাম হয়েছিল দাঁত-বের-করা-নদী অথবা 'পালাম্‌ন্‌'। সেই থেকে জায়গার নামও তাই।

এসব জানতে শুনতে বেশ লাগে। অতি গরীব, সরল হাসি-খুশী কুচকুচে কালো ও'রাও যুবক-যুবতী। ওরা যেন ইতিহাসের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আমাকে কোন দূরে হাতছানি দেয়। ইতিহাস যেন একটি কল-রোলা নদী। কোয়েলের মত। আজ থেকে নশ হাজার বছর আগে যখন ওরা শ্বেত ঘোরগ নিবেদন করে ধার্মেসের পুজো দিয়ে এই পালামৌতে এসে বাসা বেঁধেছিল সেদিন আর আজ, যেন বেশী ফাঁক নেই। ইতিহাসের নদী বেয়েই যেন ওরা চলেছে। চলেছে-চলেছে-চলেছেই।

রুমান্ডি পাহাড়ের নীচে যে সুহাগী নদী, সেও গিয়ে মিশেছে কোয়েলে। সুহাগীকে অবশ্য নদী বলা ঠিক নয়—পাহাড়ী ঝোরা বলা ভাল। পালামৌতে একমেবাদ্বিতীয়ম হচ্ছে কোয়েল।

ঔরঙ্গা আমানত, কানহার এবং অন্যান্য সবই গিয়ে মিশেছে কোয়েলে। এই সব কটি নদীই অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং সাংঘাতিক। শুধু যে বর্ষাকালে চকিতে বান আসে তাই নয়, এদের তটরেখায় ও তীরে কোথায় যে চোরাবালি আছে এবং কোথায় যে নেই তা কেউ জানে না।

আরও কত কিছুর গল্প করত টাবড়। বাইরে হয়ত টিপ-টিপিয়ে বৃষ্টি পড়ত। ঘনান্ধকার বন পাহাড় থেকে কেয়া ফুলের গন্ধবাহী হাওয়া এসে নাকে লাগত। অসহ্য যন্ত্রণায় কাঁকিয়ে কেঁদে উঠত নীল জঙ্গলের ময়ূর : কেয়া-কেয়া-কেয়া। মনটা যেন কেমন উদাস লাগত। যা যা চেয়েছিলাম এবং যা যা পাইনি সেই সব চাওয়া পাওয়ার দুঃখগুলো একসঙ্গে পুবের কালো মেঘের মতো মনের আকাশে ভীড় করে আসত। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, নিজেকে অত্যন্ত একলা এবং অসহায় মনে হোত। মনে হোত এই বন-পাহাড়ের নির্জনতা, এর সুন্দর সত্তার মাঝে আনন্দ যেমন আছে, তেমন দুঃখও। সে দুঃখ বনো জানোয়ারের ভয়জাত নয়। তা নিজেকে হারানোর।

হাজার হাজার বছর ধরে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে বিপরীতমুখী ছুটে, তার সঙ্গে লড়াই করে, যে পার্থক্য অর্জন করেছি, তার গালভরা নাম দিয়েছি সভ্যতা। আমার মনে হোত, এই সভ্যতার সাজাকাবেশ আবরণটি এখনও যথেষ্ট পুরু হয়নি এই এত বছরেও। প্রকৃতির মধ্যে এলেই বাইরের ঠুনকো আবরণটি খসে যেতে চায়। তখন বোধহয় ভিতরের নগ্ন, প্রাকৃত ও সত্য আমি বেরিয়ে পড়ে—সে সত্য রূপকে আমরা ভয় পাই।

মেলা বসেছে 'মহুয়াডাঁরে'। মে-মাসের শেষ থেকে মেলা চলবে সেই জুন-মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এগ্রাম ওগ্রাম থেকে লোক যাচ্ছে—নানা জিনিস কিনে আনছে। দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের কল-কাকলিতে জঙ্গল-পাহাড়ের পথ মুখর হয়ে উঠেছে। এখানকার এরা হাসতেও জানে। কেবল মহুয়া আর বাজরার ছাতু খেয়ে থেকেও যে ওরা কি করে এত হাসে জানি না। সব সময় হি-হি-হা-হা করছে। কথাবার্তা বললেই বোঝা যায় যে ওরা খুব রসিক। সবচেয়ে আমার যা ভাল লাগে তা ওদের সরলতা। ভণ্ডামি বলে কোনও শব্দ বোধ হয় ও'রাওরা জানে না। হেসেই জীবনটাকে উড়িয়ে দিতে যেন বংশপরম্পরায় শিখেছে।

আগামীকাল ওদের জেঠ-শিকার বা মৌসুমী শিকারের দিন। এই শিকারটা একটি সামাজিক উৎসব। আগে একদিন ছিল, যখন ও'রাওদের শিকারটাই প্রধান উপজীবিকা ছিল। আজ আর তা নেই। ওরা 'ক্ষেতি' করে 'কুপ' কাটে, কেউ কেউ বা দূর শহরে গিয়ে অন্যান্য নানাভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। ওদের পোশাক-আশাক এবং সামাজিক বাঁধনটাও ঢিলে হয়ে গেছে। শহর-প্রত্যাগত কালো জিনের ইস্ত্রী-বিহীন ট্রাউজার আর তার উপরে ঘন লাল রঙা সার্ট এবং হাতে ঘোরতর বেগুনী রুমাল নেওয়া ও'রাও যুবকও আজকাল এই জঙ্গলে পাহাড়ে চোখে পড়ে।

তবে পুরানো জীবনযাত্রা ও মূল্যবোধ এখনও পুরোপুরি ধুয়ে মুছে যায় নি।

শিকারে যাবার নেমন্তন্ন আমারও ছিল। টাবড় মুন্সী এসেছিল, সঙ্গে মুন্সীর বড় ছেলে আশোয়াও এসেছিল। কিন্তু যশোবন্ত এখানে নেই। ডাল্টনগঞ্জ গেছে। নইহারে থাকলেও একটা খবর পাঠানো যেত। অতএব ওদের সবিনয়ে 'না' করে দিলাম।

লক্ষণটা খুব খারাপ মনে হচ্ছে। দিনে দিনে যশোবন্তের সান্নিধ্য একটি সাংঘাতিক নেশার মত আমাকে পেয়ে বসেছে। আমার কল্পনা-রঙিন আরামপ্রিয়তার জগত থেকে বাইরের জগতে দুঃসাহস-সূচক একটি পা ফেলতে গেলেও যশোবন্তের হাত ধরতে ইচ্ছা করে। ওর কর্কশ চিৎকৃত, বেপরোয়া সঙ্গ, আমি আজকাল আমার প্রেমিকার শরীরের মতই কামনা করি।

সন্ধ্যাবেলা টাবড়দের দলবল ফিরল শিকার থেকে। তীর ধনুক টাঙী নিয়ে। বলল, একটি বড় কা দাঁতাল শুয়োর একটি কোটরা এবং একটি শম্বর শিকার করেছে ওরা।

ওদের মধ্যে কেউ কেউ মাংস রোদে শুকিয়ে রেখে দেবে। তারপরে টুকরো টুকরো করে কেটে যখন বীজ ছড়াবে ক্ষেতে, সেই ধান, কিংবা বাজরা কি মাড়ুয়ার সঙ্গে মাংস দেবে মিশিয়ে। ওদের বিশ্বাস, তাতে ফসল ভাল হবে। শিকার জিনিসটাকে ওরা নিছক শখ বলে জানে নি, তার সাফল্য-অসাফল্যের উপর ওদের কৃষির সাফল্য-অসাফল্য নির্ভরশীল; একথা ও'রাও চাষী আজও বিশ্বাস করে।

বেশ লাগে এই টাবড়দের। টাবড় আমাকে অনেকখানি হরিণের মাংস দিয়ে গেল শালপাতায় মুড়িয়ে। মেটে মেটে দেখতে। বলল, শম্বর খেতে ভালো না আর শুয়োর তো আপনি খাবেন না, তাই হরিণ দিয়ে গেলাম। জুম্মান রাঁধতে জানে। ভালো করে রেঁধে দেবে।

সেদিন বিকেলের দিকে মেঘ করে এলো। সমস্ত পূব-দক্ষিণ এবং দক্ষিণের জঙ্গল পাহাড় সব নতুন করে চোখে ধরা পড়ল।

মনে হোল এদের চিনতাম না। মোটে চিনি না। কালচে আর নীলচে মেঘে সমস্ত দিকচক্রবাল ভরে গেছে। আকাশ যে কোনও দিন সাদা কি নীল ছিল এখন তা দেখে চেনার উপায় নেই। সেই কালো পট-ভূমিতে গাছ-গাছালি এবং পাহাড়ের নিষ্কম্প রং বদলে গিয়ে তাদের অন্য রংয়ের বলে মনে হচ্ছে। যে দিকের জঙ্গলের কোনও নিষ্কম্প রংয়ের বাহার ছিল না; দিনের বেলায় যাদের পাটকিলে ফ্যাকাশে বলে মনে হোত, তাদেরও রূপ খুলে গেছে।

নইহারের পাশে মওয়াতালাও থেকে উড়ে-আসা একঝাঁক কুন্দশুভ্র বক মালার মতো সেই কালো আকাশে দুলতে দুলতে উড়ে চলেছে 'বুড়ু হাকরামের' দিকে। কত-গুলি শকুনি, যারা চাহাল-চওরুর দিকের মাথা উঁচু পাহাড়টার নীচের ঘন উপত্যকার উপরে বাঘে-মারা কোনও জানোয়ারের ঘাড় লক্ষ্য করে এতক্ষণ চক্রাকারে উড়ছিল তারাও অনেক অনেক উপরে উঠে গেছে। মনে হচ্ছে ওরা বৃষ্টিকে পথ দেখিয়ে আমাদের এই রুমান্ডি পাহাড়ের আর সুহাগী নদীতে আনাবে বলে মেঘ ফুঁড়ে উপরে উঠবার চেষ্টা করছে।

ঝাঁকে ঝাঁকে হরিয়াল, রাজঘুঘু, টিয়া, টুই মাথার উপর দিয়ে চঞ্চল পাখনায় দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছে। সুহাগী গ্রামে আসন্ন বৃষ্টির আগমনী শব্দগুলো ঝুম ঝুম করে বাজতে শুরু করেছে। আর এই সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে দূর জঙ্গল থেকে ময়ূরের কেয়া কেয়া রব এই আদিগন্ত বন পাহাড়ের বুকের, কেয়া ফুলের গন্ধবাহী বর্ষা বরণের আনন্দে অধীর একটি মাত্র সুর হয়ে, ক্ষণে ক্ষণে ভেসে আসছে।

কবে যেন শুনেছিলাম, ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, গগনে গগনে ডাকে দেয়া। এখন মনে হচ্ছে, সেই গানটি মেঘ হয়ে, সুহাগী নদীর সোহাগ হয়ে ধীরে ধীরে এই বর্ষা-দিনের সান্ধ্য প্রকৃতিতে করুণ হয়ে বাজছে।

পৃথিবীতে যে এত ভালো-লাগা জিনিস আছে তা রুমান্ডি পাহাড়ে এই গোধূলির মেঘে ঢাকা আলোয় উপস্থিত না থাকলে জানতাম না। প্রকৃতিকে ভালোবাসার মতো ব্যাখানহীন অনুভূতি যে আর নেই, তা জানতাম না।

এসে গেল—এসে গেল, রুম-ঝুম রুম-ঝুম করে ঘুঙুর পায়ে সাদা গুটি-বসানো, নীল ঘাঘরা উড়িয়ে শিলাবৃষ্টি এসে গেল। বর্ষা।

বনের রং, জলের রং, মেঘের রং, সন্ধ্যার রং সব মিলে মিশে একাকার হয়ে চতুর্দিকে নরম সবুজে হলুদে সাদায় এমন একটি অস্পষ্ট ছবি হোল যে আমার বড় সাধ হলো আবার নতুন করে জন্মাই। নতুন করে ছোট-বেলা থেকে এই রুমান্ডিতে একটি ও'রাও ছেলের মতো বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে বড় হবার অভিজ্ঞতা, বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা, মোষের পিঠে চড়ে তিল তিল করে নতুন করে উপভোগ করি।

ক্রমশঃ

প্রায় একশ' বছর আগে কলকাতা পুলিশের বিখ্যাত গোয়েন্দা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বহু তদন্তে অসামান্য কর্ম-কুশলতার পরিচয় দিয়ে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকাহিনীগুলিকে দারোগার দপ্তর নাম দিয়ে বই আকারে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেইসব ছোট-ছোট বইগুলি আজ আর একেবারেই পাওয়া যায় না। একটি কাহিনী আমরা পুনরুদ্ধার করেছি এবং বিষয়বস্তু অক্ষুণ্ণ রেখে আধুনিক বিন্যাসে এই সংখ্যায় পরিবেশন করছি। আধুনিককালে অপরাধপ্রবণতা যেমন বেড়েছে, তার রূপ কার্যপদ্ধতি প্রকৃতিও তেমনি ভয়াবহরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রিয়নাথের কাহিনীটি ঠিক সে ধরনের না হোলেও এর মধ্যে যে চতুরতা আর শঠতার নিদর্শন আছে অভিনবত্বের দিক দিয়ে তা কম আকর্ষণীয় নয়। কাহিনীটির মধ্যে তখনকার দিনের পুলিশীব্যবস্থা এবং সমাজের চিত্রও কিছুটা প্রতিফলিত।

।।এক।।

এই কাহিনীর নায়ক মফস্বলের এক দারোগা ত্রিশ বছর পুলিশের চাকরি করে তিনি সসম্মানে অবসর নেন এবং পেনসনের টাকায় ও অন্য নানা ভাবে উপার্জিত অর্থে দিব্য আরামে ও সুখে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন।

বাংলা ১৩০৬ সালের কথা। সে-সময় মফস্বলের জমিদারদের মধ্যে জমি নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর প্রায়ই শোনা যেতো। 'লাঠি যার জমি তার'—তখনকার জমিদার-দের এই ছিল নীতি। ফলে দাঙ্গা, খুন-জখম আর মামলা লেগেই থাকতো। সেই রকম এক ঘটনা নিয়ে এই কাহিনী।

এক টুকরো জমি নিয়ে কালনা থানার দুই জমিদারের মধ্যে বিবাদ বাধলো এবং দুই জমিদারেরই জেদ চাপলো, জোর করে তাঁরা সেই জমি দখল করবেন। জমি জবর-দখল করতে হলে লোকবলের বিশেষ দরকার। অতএব দুই পক্ষই লাঠিয়াল সংগ্রহ করতে শুরু করল। ডাকসাইটে দাঙ্গাবাজ, লেঠেল, সড়কিওয়ালারা দু'পক্ষে গিয়ে জুটলো। দু'পক্ষই প্রবল বিক্রমে দাঙ্গার জন্যে তৈরী হোতে লাগল। দুই জমিদারের মধ্যে শিগ্গিরই জমি নিয়ে ভীষণ দাঙ্গা হবে, এই খবর জানতে পেরে সেই থানার দারোগা দুই জমিদারকেই বলে পাঠালেন যে, তিনি তাঁর এলাকায় কোন মতেই দাঙ্গা হতে দেবেন না, তিনি তাঁর লোকজন নিয়ে সেই জমিতে গিয়ে বসে থাকবেন এবং কেউ দাঙ্গা করতে এলেই তাকে গ্রেপ্তার করবেন।

এই নোটিশ পেয়ে একজন জমিদার তাঁর এক বিশ্বস্ত কর্মচারীকে দারোগার কাছে পাঠালেন। কর্মচারী দারোগার সঙ্গে দেখা করে বললেন,—আপনি আগে থেকেই দাঙ্গা বন্ধ করছেন কেন? দাঙ্গা হয়ে যাক, তারপর আপনি তদন্ত করবেন।

দারোগা বললেন, আপনি তো বেশ কথা বললেন মশাই! দাঙ্গা আগে হয়ে যাক! না, তা হবে না। খবর যখন পেয়েছি তখন দাঙ্গা রোধ করাই আমার প্রধান কর্তব্য!

কর্মচারী বললে, দাঙ্গা হবে অনেক লোকের মধ্যে। আপনার লোকজনের সংখ্যা তো খুবই কম! আপনি পারবেন কেন? দাঙ্গার সময় সেখানে আপনাদের লোকজন গিয়ে কিছুই করতে পারবে না। উল্টে জখম হবে।

দারোগা সরোষে বললেন, সে আমি বুঝবো। ভুলে যাবেন না, আমরা সরকারী প্রতিনিধি। সরকারী প্রতিনিধি জখম হলে তার ফল বড় ভয়ানক হবে আপনাদের পক্ষে, তা জানবেন।

কর্মচারীটি ছাড়বার পাত্র নয়, সবিনয়ে বললো, দেখুন দারোগাবাবু, ঐ জমি যে জমিদার দখল করে রেখেছে সে জমিদারের কাছ থেকে সেটা আমরা কেড়ে নেবই। সে-জন্যে আমার মনিব যে কোন উপায় অবলম্বন করতে প্রস্তুত। এখন আপনি একটু সহায় হলেই হয়।

দারোগা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে বললেন, আমি সহায় হব কেমন করে? ——

কর্মচারী। তার উপায় আছে। আপনি মনে করলে আমাদের সম্পূর্ণ সাহায্য করতে পারবেন, আর আপনার সরকারী কাজেরও কোন ত্রুটি হবে না। অধিকন্তু, আপনার কিছু লাভ হবারও বিশেষ সম্ভাবনা।

দারোগা। সরকারী কাজ বজায় রেখে আপনারা আমার কাছ থেকে কী রকম সাহায্য চান।

কর্মচারী। দাঙ্গা হবার বা আমাদের জমিটা দখল করে নেবার আগে আপনি কোন রকম বাধা সৃষ্টি করবেন না। কাজ শেষ হয়ে গেলে, আপনি যথারীতি তদন্ত করবেন এবং মোকর্দমা চালাবেন। তাতে আমাদের আপত্তি নেই।

দারোগা। কিন্তু তাতে আমার লাভ?

কর্মচারীটি বুঝলো, ওষুধ ধরেছে, নীচু গলায় বললো, লাভ আছে বৈকি! আপনি যদি দাঙ্গা বন্ধ করবার ব্যবস্থা না করেন তাহলে আমরা আপনাকে পাঁচশো টাকা দেব।

একটু ভেবে দারোগা বললেন, এ-কাজ পাঁচশো টাকায় হয় না।

কর্মচারী। কত টাকায় হয়?

দারোগা। নিদেন পক্ষে এক হাজার।

কর্মচারী। আচ্ছা, আমি আমার মনিবকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখি, তিনি যদি রাজী হন তাহলে এক হাজারই আপনাকে দেব।

দারোগা। শুধু টাকাটা দিলেই চলবে না। আমি আপনাদের যেভাবে কাজ করতে বলব, সেইভাবেই আপনাদের কাজ করতে হবে।

কর্মচারী। তা তো অবশ্যই। আপনার কথা অমান্য করলে চলবে কেন? আমাদের কি ভাবে কাজ করতে হবে বলে দিন, আমরা সেই ভাবেই কাজ শুরু করি।

দারোগা। আগে আপনার মনিবকে বলে এদিককার ব্যবস্থা করুন। তারপর যা করতে হবে আমি বলে দেব।

কর্মচারী। আচ্ছা, আমি এখন চললাম। কাল খুব ভোরে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

এই বলে জমিদারের নায়েব চলে গেল, আর তার পরদিন ভোরে এসে দারোগার সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে পাঁচশো টাকার নোট দিয়ে বললো, আমি মনিবকে বলে সব ঠিক করেছি। তিনি আপাতত এই পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছেন। বলেছেন, কাজ হয়ে গেলেই আর পাঁচশো দেবেন। তাঁর কথার খেলাপ হবে না। এখন আমাদের কি করতে হবে বলে দিন।

টাকাটা পকেটস্থ করে দারোগা বললেন, বেশ, আপনাদের কথায় বিশ্বাস করে পাঁচশোই এখন নিলাম। আপনাদের কি করতে হবে তা এখনই বলবার দরকার নেই, আর আমি যা করব, সেদিকেও আপনারা লক্ষ্য করবেন না। আপনারা কেবল এই করবেন, আপনাদের লোকজন সব ঠিক রাখবেন, আমি যে সময় স্থির করে দেব। ঠিক সেই সময় আপনারা দাঙ্গা আরম্ভ করবেন, তার আগেও না, পরেও না।

নায়েব বললো, বেশ, তাই হবে। আর কিছু বলবেন?

দারোগা বললেন, উপস্থিত আর কিছু বলবার নেই। দরকার হলে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো। আপনি নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারেন।

নায়েব নমস্কার করে চলে গেল।

দারোগা হৃষ্টচিত্তে ভাবতে লাগলেন, আচ্ছা পাঁচশো টাকা তো বাগানো গেল, আরও পাঁচশো পাওয়া যাবেই বলে মনে হয়। এখন কাজটি সবদিক বজায় রেখে কি করে হাসিল করা যায়? দাঙ্গা হবার আগে আমি খবর পাই নি, তাই দাঙ্গা বন্ধ করতে পারি নি, এ কৈফিয়ৎ কি উপরওয়ালা কর্তারা সহজে বিশ্বাস করবে? হয়ত আমাকে জবাবদিহি করতে হবে, এমন কি আমার চাকরি নিয়েও টানাটানি হতে পারে।

চিন্তিত মনে দারোগাবাবু থানা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে পায়চারি করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে এক ব্যক্তি থানার কাছে এসে দাঁড়ালো। তাকে দেখে দারোগা বললেন, আপনি কি কারুকে খুঁজছেন?

আগন্তুক বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ! আমি আপনার কাছেই এসেছি।

দারোগা বললেন, আমার কাছে? বেশ, বলুন।

আগন্তুক। আমাদের একটা জমি নিয়ে অন্য এক জমিদারের সঙ্গে বিবাদ বেঁধেছে। হয়ত আপনি তা জানেন। সেই ব্যাপারেই আপনার কাছে এসেছি।

দারোগা। আপনাদের জমিদারে জমিদারে ঝগড়া, আমি তার কি করতে পারি?

আগন্তুক। আপনি মনে করলে সবই করতে পারেন।

একটু ভেবে দারোগা বললেন, সে জমি কার? কার দখলে এখন আছে?

আগন্তুক। সে জমি আমাদের। আমাদের দখলেই এখন আছে। তাতে আমাদের চাষ-করা ধান আছে।

দারোগা। বেশ, তাই যদি হয় তাহলে ধান তো প্রায় পেকে উঠল। এইবার সেই ধান কেটে নিলেই তো সব গোলযোগ মিটে যায়।

আগন্তুক। আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের ধান আমরা কেটে নেব ঠিকই। কিন্তু শুনতে পাচ্ছি, ধান পাকবার আগেই অন্য জমিদার তা জোর করে কেটে নেবে।

দারোগা। আপনারা তা কেটে নিতে দেবেন কেন?

আগন্তুক। সহজে দেব না। কিন্তু তারা যদি জোর করে কাটতে আসে তাহলে দাঙ্গা হবে।

দারোগা। তা হোতে পারে বৈকি! সে-ক্ষেত্রে আমি যখন খবর পেয়েছি তখন দাঙ্গা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা আমায় করতে হবে। সেই ধানক্ষেতে লোকজন নিয়ে আমায় হাজির থাকতে হবে এবং কোন পক্ষই যাতে ধান কাটতে না পারে তা আমায় দেখতে হবে।

আগন্তুক। এতো দেখছি মন্দ কথা নয়। আমাদের ধান আমরা কাটতে পারবো না, যেখানকার ধান সেখানেই থাকবে?

দারোগা। নইলে দাঙ্গা বন্ধ করব কেমন করে?

আগন্তুক। দাঙ্গা আপনাকে বন্ধ করতে হবে না। আপনি ওদিকে লক্ষ্য দেবেন না। যার জোর বেশি সে-ই জমি দখল করুক। দাঙ্গা হয়ে যাবার পর আপনার যা কর্তব্য আপনি তাই করবেন।

দারোগা বললেন, কিন্তু তাতে আমার লাভ কি? কেন আমি তা করব?

আগন্তুক। লাভ আছে বৈকি! আপনি যদি দাঙ্গা বন্ধ করবার জন্যে কোন ব্যবস্থা না করেন তাহলে আমরা আপনাকে দুশো টাকা দেব।

দারোগা হেসে বললেন, দুশো টাকায় হয় না।

আগন্তুক। কত টাকায় হয়?

দারোগা। কম পক্ষে পাঁচশো।

আগন্তুক। বেশ। পাঁচশোই আপনাকে দেব। আপনি ওদিকে একেবারে লক্ষ্য করতে পারবেন না।

দারোগা। লক্ষ্য আমাকে রাখতে হবেই। না রাখলে আমার চাকরি রাখা যাবে না। কিন্তু আপনাদের কাজ আমি ঠিক ঠিক করে দেব। আপনারা যদি আমার কথায় রাজী হন তাহলে আমি একটি সময় স্থির করে দেব, সেই সময়ে গিয়ে আপনারা ধান কেটে নেবেন। তার আগেও না, পরেও না। আমার কথার অন্যথা করলে আপনাদের কাজ হাঁসিল তো হবেই না, উপরন্তু আপনারা বিশেষ বিপদে পড়বেন।

আগন্তুক। বেশ, তাই হবে। আমি এখনি গিয়ে জমিদার বাবুকে বলে আপনাকে টাকা এনে দিচ্ছি।

এই বলে আগন্তুক চলে গেল এবং ঘণ্টা দুই-এর মধ্যেই ফিরে এসে দারোগাবাবুকে পাঁচশো টাকা দিয়ে গেল।

।।দুই।।

ভেবে-চিন্তে দারোগাবাবু সেই দিনই একটি রিপোর্ট লিখলেন।

রিপোর্টের এক কপি পাঠালেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, দ্বিতীয় কপি পাঠালেন ডিস্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের কাছে। সেই রিপোর্টটি এই রকম ঃ

"এক খণ্ড জমির ধান কাটা উপলক্ষে দুইজন জমিদারের মধ্যে ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, উভয় পক্ষে দাঙ্গাবাজ লাঠিয়াল প্রভৃতি বিস্তর লোক সংগৃহীত হইতেছে। সেই জমি লইয়া উভয় জমিদারের মধ্যে যে একটি ভীষণ দাঙ্গা হইবে, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এবং দাঙ্গা হইতেও আর কিছুমাত্র বিলম্ব নাই। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র হুজুরে এই রিপোর্ট করিয়া আমি আমার লোকজন লইয়া ঘটনা-স্থলে রওনা হইলাম। আপনাদিগের দ্বিতীয় আদেশ পাওয়া পর্যন্ত আমি সেই স্থানেই অবস্থিতি করিব এবং যাহাতে কোন রূপ

দাঙ্গা-হাঙ্গামা না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ-রূপে চেষ্টা করিব।”

এইভাবে রিপোর্ট করে দারোগাবাবু নিজের জবাবদিহি কাটাবার রাস্তা করলেন এবং তিনচারজন কনস্টেবল নিয়ে সেই বিবাদি জমিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

একদিন দুদিন করে তিন-চার দিন কেটে গেল। দারোগা সেই জমির কাছাকাছি রইলেন। গ্রামের মধ্যে এক মুদির একটা খালি ঘরে তিনি রাত্রে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিলেন।

এদিকে জমিদারের প্রতিনিধিরা তাঁর কাছে আসতে লাগল। একজন আসে সকালে তো অন্যজন আসে সন্ধ্যায়। দারোগা তাদের প্রত্যেককে একই রকম জবাব দিতে লাগলেন। বললেন, দেখবেন, সময় মতো আমি ঠিক আপনাদের কাজ উদ্ধার করে দেব। জমি আগলে বসে আছি দুটো কারণে। এক, আমার ওপরওয়ালাদের চোখে ধুলো দাওয়া, দুই, যাতে আপনাদের কাজ বিনা গোল-যোগে হয়ে যায়, তার রাস্তা পরিষ্কার করা। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে আর দু-চার দিন অপেক্ষা করুন। আমার কাছ থেকে ইসারা পেলেই কাজ যেন শেষ হয়।

উভয় পক্ষই দারোগার কথায় বিশ্বাস করে চলে গেল।

চার দিনের দিন সদর থেকে ঘোড়ায় চড়ে এলো দুই লালমুখো সার্জেন্ট। তাদের পিছনে অনেক লোক। তারা কৌতূহলী হয়ে সাহেব দুজনকে পথ দেখিয়ে সেই বিবাদি জমির কাছে নিয়ে এসেছে।

দারোগাকে দেখে যে-সার্জেন্টটি পদে বড় সে বললে, তুমিই রিপোর্ট পাঠিয়েছিলে?

দারোগা সেলাম করে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কতদিন এখানে রয়েছো?

—চার দিন।

সার্জেন্ট মুখের একটা শব্দ করে বললে, অনর্থক তুমি এখানে থেকে কষ্ট পাচ্ছ। কোন দরকার ছিল না। আমরা দুই জমিদারের সঙ্গে দেখা করেছি। তাছাড়া আরও খোঁজখবর নিয়েছি। তোমার রিপোর্ট সর্বৈব ভুল। এখানে দাঙ্গা হবার কোন সম্ভাবনা নেই। অনর্থক একটা মিথ্যে খবর দিয়ে তুমি আমাদের হয়রান করলে। কার কাছ থেকে তুমি দাঙ্গার খবর পেয়েছিলে?

দারোগা বললেন, গ্রামের লোকজন গিয়ে আমায় খবর দেয়।

সার্জেন্ট বললে, তারা তোমায় মিথ্যে খবর দিয়েছে। সেজন্যে তাদের গ্রেপ্তার করা উচিত।

দারোগা ঘাড় নেড়ে বললেন, নিশ্চয় গ্রেপ্তার করা উচিত। আমি তাদের তল্লাস করে তাদের গ্রেপ্তার করব।

সার্জেন্ট বললে, হ্যাঁ, অবশ্যই তাদের গ্রেপ্তার করবে। আমরা বহু লোককে জিগ্যেস করেছি, জমিদার দুজনও বলেছে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা তারা স্বপ্নেও ভাবে নি, ইংরেজ রাজত্বে দাঙ্গা করা অত সোজা নয়। আমরা দেখে খুশি হয়েছি যে এখানকার জমিদার দুজন আর গ্রামের লোকজন খুবই শান্তিপ্রিয় আর রাজভক্ত। তারা সকলেই বলেছে, দাঙ্গায় খবর একেবারেই মিথ্যে। যাক। তোমায় আদেশ করছি, তুমি এখনই তোমার লোকজন নিয়ে থানায় ফিরে যাও। তুমি নিতান্ত মূর্খ, তাই একটা উড়ো খবর পেয়ে নিজেও কষ্ট পেলে আমাদেরও কষ্ট দিলে।

এই বলে সঙ্গীকে নিয়ে সার্জেন্ট ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

দারোগাবাবু মনে মনে বিশেষ পুলকিত হলেন। এভাবে অবস্থা যে তাঁর অনুকূল হবে তা তিনি ভাবতে পারেন নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি কনস্টেবলদের নিয়ে জমির এলাকা থেকে ফিরে এলেন।

একটু পরেই প্রথম জমিদারের নায়েব তাঁর কাছে এলো। তাকে দেখে দারোগা বললেন,—আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এবার আপনারা দাঙ্গা করে জমি দখল করে নিতে পারেন। তার জন্যে আমায় আর কোন রকম জবাবদিহি করতে হবে না।

নায়েব বললে,—আমাদের তো সব ঠিক আছে। তাহলে কি এখনই —

দারোগা বললেন, না, না, এখনই নয়। আজ শেষ রাতে অর্থাৎ কাল খুব ভোরে আপনারা আপনাদের কাজ উদ্ধার করবেন।

নায়েব বললেন, বেশ, তাই করব। কিন্তু অপরপক্ষ যদি তার আগেই ধান কেটে নেয়?

দারোগা বললেন, যাতে অপর পক্ষ আজ সে জমির ধান কাটতে না পারে আমি তার বন্দোবস্ত করব। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

নায়েব বললে, যে আজ্ঞে। তাহলে আমি এখন যাই।

—বাকি টাকাটা?

—সে ঠিক ঠিক সময় মতো পাবেন।

এই বলে নায়েব নমস্কার করে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে দারোগাবাবু অপর জমিদারকে খবর পাঠালেন। তাঁর লোক যেন এখনি এসে দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করে। জরুরী খবর আছে।

খবর পেয়ে সেই জমিদার নিজেই এসে উপস্থিত হলেন, দারোগা বললেন, আপনাদের সব ঠিক আছে তো?

জমিদার বললেন, তা আছে। আপনার হুকুম পেলেই হয়।

দারোগা বললেন, বেশ। তাহলে আজ শেষ রাত্রে মানে, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা জমিতে গিয়ে চড়াও হবেন এবং ধান কেটে নেবেন।

—এত দেরী কেন? রাত্রেই যাই না?

—না। অমন কাজ করবেন না। তাহলে বিপদে পড়বেন।

—আচ্ছা। আপনি যেমন বলছেন তেমনই হবে। আমি তাহলে যেতে পারি?

—হ্যাঁ। আসুন। সময়টা ঠিক রাখবেন। আজ রাত শেষ হলেই কাল খুব ভোরে।

জমিদার ঘাড় নেড়ে চলে গেলেন।

দারোগাবাবু আবার আপিসে গিয়ে বসলেন।

সার্জেন্ট দুজন যেখানে থাকে, সে-জায়গা দারোগাবাবুর থানা থেকে প্রায় দশ-ক্রোশ দূরে। ঘোড়সওয়ারকে দিয়ে খবর পাঠালেও প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে।

ক্রমে রাত বাড়লো। বারোটা যখন বাজলো তখন দারোগাবাবু মনে করলেন, এইবার যদি কাউকে ঘোড়ায় করে সার্জেন্ট-দের কাছে পাঠানো যায় তাহলে খবর পেয়ে দাঙ্গার আগে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছাতে পারবে না। দাঙ্গা হয়ে গেলে, আমার মতলব সিদ্ধ হবে। অথচ আমার ওপর কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।

এই রকম অভিসন্ধি এঁটে দারোগাবাবু সার্জেন্টদের উদ্দেশ্যে এক পত্র লিখলেন এবং তার কপি সুপারিন্টেন্ডেন্টকেও পাঠিয়ে দিলেন। পত্রের মর্ম এই রকম :

“আপনাদিগের আদেশ প্রতিপালন করিয়া আমি আমার লোকজনের সহিত থানায় আসিয়া উপস্থিত হই। সারা দিবস থানাতেই থাকি। রাত দশটার পর সেই গ্রামের একজন লোক আসিয়া আমাকে সংবাদ প্রদান করেন যে, যে-বিবাদি জমি লইয়া দাঙ্গা হইবার প্রস্তাবনা চলিতেছিল, সেই প্রস্তাব এখন কার্যে পরিণত হইতে বসিয়াছে। উভয় জমিদারই বিস্তর লোক সংগ্রহ করিয়া বিবাদি জমির সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উভয় পক্ষে ভয়ানক দাঙ্গা হইবার আর কিছুমাত্র বিলম্ব নাই। এইরূপ সংবাদ পাইয়াও, সংবাদদাতার কথায় প্রথমে বিশ্বাস করিতে সাহসী হইলাম না। কারণ, হুজুর-দ্বয় নিজেরা যে-বিষয় অনুসন্ধান করিয়া সম্পূর্ণ রূপে মিথ্যা বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমি সহজে বিশ্বাস করি কি রূপে? তথাপি কথাটা যে কি তাহা জানিবার

নিমিত্ত আমি নিজেই পুনরায় আর একবার গুপ্তবেশে সেই স্থানে গিয়া, প্রকৃত লোকজন সমবেত হইয়াছে কিনা, তাহা জানিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম। রাত্রি দশটার পরই আমি আমার অশ্বে আরোহণ করিয়া এবং সংবাদদাতাকে আর একটি অশ্বে উঠাইয়া লইয়া সেই স্থানে গমন করিলাম। দেখিলাম, সংবাদদাতা আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত। দুই পক্ষে অনুমান চারি-পাঁচ-শত লোক সেই বিবাদি জমির সন্নিকটে অবস্থান করিতেছে। এই অবস্থা দেখিয়া সেই সময় তাহাদিগকে কোন কথা বলিতে আমার সাহস হইল না। কারণ, পুলিশ কর্মচারীর মধ্যে এক আমি একাকী, তাহার উপর আমি পুলিশের বিনা পোশাকে গুপ্ত-ভাবে সেই স্থানে গমন করিয়াছি।

"এই অবস্থা দেখিয়া আমি দ্রুতগতি নিজের থানায় ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদ আপনাদের নিকট প্রেরণ করিতেছি। সংবাদ-বাহী অশ্বারোহণে গমন করিয়া যত শীঘ্র পারে আপনাদের নিকট উপস্থিত হইবে। আমিও উপস্থিত মত কনস্টেবল, চৌকিদার ও অপরাপর যাহাদিগকে সংগ্রহ করিতে পারি তাহাদিগকে লইয়া সেই স্থানে গমন করিলাম। দাঙ্গা যাহাতে নিবারণ করিতে পারি তদ্বিষয়ে বিধিমত চেষ্টা করিব। কিন্তু সামান্য লোক লইয়া যে সেই দাঙ্গা রোধ করিতে পারিব, তাহা আমার অনুমান হয় না। কারণ, যেরূপ আমি দেখিয়া আসিয়াছি তাহাতে দাঙ্গা অপরিহার্য। যদি এই দাঙ্গা বাঁধিয়া যায় তাহা হইলে উহাতে বিস্তর লোকজন যে মৃত ও আহত হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দস্তুর মত লোকজন লইয়া যদি দাঙ্গার পূর্বেই আপনারা দাঙ্গা-স্থলে উপনীত হইতে পারেন তাহা হইলেই মঙ্গল। অধিক কথা, আমি আর এই স্থানে লিখিতে পারিলাম না। রাত্রি বারোটার সময় এই সংবাদ আপনার নিকট প্রেরণ করিয়া আমিও লোকজন লইয়া সেই স্থানে গমন করিলাম।"

এইভাবে পত্র লিখিয়া দারোগা দু' জায়গাতেই চিঠি দুখানা পাঠিয়ে দিলেন। তারপর গ্রামের যে কজন চৌকিদার ছিল তাদের নিয়ে থানা থেকে বেরুলেন। রাত তখন দুটো।

তোড়জোড় করে বেরুতে আরও কিছু দেরী হল। দারোগাবাবু ধীরেসুস্থে বল-লেন। কোন তাড়া নেই। এইভাবে যখন তিনি জমির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছোলেন তখন ভোর হয় হয়।

বিবাদি জমির কিছু দূরে লোকজনদের রেখে দারোগা একা জমির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। দূরে থেকে দেখলেন। দু'পক্ষই জমায়েত হয়েছে, দাঙ্গা লাগল বলে।

দারোগা আর এগুলেন না। সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

দেখতে দেখতে দাঙ্গা বেঁধে গেল। হৈ-হৈ চীৎকার। একপক্ষ জমির ওপর চড়াও হল, অপরপক্ষ তাদের বাধা দিতে লাগল। প্রচণ্ড মারামারি সুরু হয়ে গেল।

দারোগা তখন সেখান থেকে চলে এসে নিজের লোকজন নিয়ে একটা উঁচু জমির ওপর গিয়ে দাঁড়ালেন। ধানজমির ওপর তখন যেন লক্ষ অসুরের তাণ্ডব নৃত্য চলেছে।

এমন সময় একজন গ্রামবাসী ছুটতে ছুটতে এসে বললে, সাহেবরা আসছে।

পিছন দিকে তাকিয়ে দারোগা দেখলেন, ঘোড়ায় চড়ে সেই সার্জেণ্ট দুজন আসছে। তিনি তাড়াতাড়ি সেই দিকে ছুটলেন। তাঁকে দেখে প্রধান সার্জেণ্ট প্রশ্ন করল,—ব্যাপার কি! দাঙ্গা লেগেছে নাকি!

দারোগা বললেন,—ভয়ানক দাঙ্গা লেগেছে। কত লোক যে মারা পড়ছে বা জখম হচ্ছে তার ঠিক নেই।

সার্জেণ্ট বললে—দাঙ্গা হচ্ছে, আর তুমি এখানে কেন? তোমার লোকজন কোথায়?

দারোগা বললেন—আমরা যেরকম বিপদে পড়েছিলাম তাতে প্রাণ নিয়ে যে ওখান থেকে আসতে পেরেছি তা আমাদের বহু ভাগ্য! দু-চারজন লোক নিয়ে কি আর এত বড় দাঙ্গা ঠেকানো যায়!

সার্জেণ্ট। দু পক্ষে কত লোক হবে?

—হাজারের বেশি।

—এত লোক!

সার্জেণ্ট দুজন দুজনের মধ্যে পরামর্শ করল, তারপর প্রধান সার্জেণ্ট দারোগাকে বললে—চল। আমরা এই দাঙ্গা থামাবো।

—চলুন। বলে দারোগা তাদের সঙ্গে এগুলেন।

জমির কাছাকাছি গিয়ে সার্জেণ্টরা যে দৃশ্য দেখলো তাতে তাদের আর এগুতে সাহস হল না। হঠাৎ একটা সড়কি এসে লাগল একজনের পায়ে! ব্যস! আর যায় কোথায়? দুই সার্জেণ্ট লাফাতে লাফাতে সেখান থেকে ছুটে পালালো। দারোগাবাবু তাদের রকম দেখে মনে মনে খুব হাসলেন।

দূরে গিয়ে সেই উঁচু ঢিবিটার উপর দাঁড়িয়ে সাহেব দুজন আর দারোগাবাবু দাঙ্গা দেখতে লাগলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে প্রচণ্ড মারামারি চলল, তারপর দু'দলই চক্ষের নিমেষে উধাও হয়ে গেল।

দাঙ্গাকারিরা অদৃশ্য হবার পর দুই সার্জেণ্ট আর দারোগাবাবু জমির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁরা দেখলো জমির ধান সব কেটে নেওয়া হয়েছে। চারদিকে অনেক লাঠি সড়কি পড়ে আছে, আর জমির এক ধারে পড়ে রয়েছে একটা মুণ্ডকাটা মানুষের দেহ। কার দেহ, বোঝবার উপায় নেই। মুণ্ড না থাকলে সনাক্ত হবে কি করে? বোঝা গেল, মাথাটা কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই জন্যে যে সেটা যে কার, সে কোন পক্ষের থেকে, তা কিছুই জানা যাবে না, ফলে, মামলায় সমস্ত কিছুই প্রমাণিত হবে না।

দাঙ্গার দিন কেউই গ্রেপ্তার হল না। পরে সদর থেকে আরও দুজন দারোগা এসে তদন্ত করল। এবং দু'পক্ষের জনকুড়ি লোককে গ্রেপ্তার করল। দুই জমিদারকেও আসামী করবার চেষ্টা তারা করল বটে, কিন্তু তাতে তারা সফলকাম হল না, তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন যে দাঙ্গার সময় তাঁরা সেখানে ছিলেন না আর দাঙ্গার বিষয় তাঁরা আগে কিছুই জানতে পারেন নি, তাঁদের নায়েব গোমস্তারাই এই সব কাণ্ড করেছে। দুই জমিদারের প্রধান প্রধান নায়েব গোমস্তারাও জমিদারদের টাকার জোরে আসামী হবার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেল। মামলার সময় দুই জমিদারই তাঁদের পক্ষের লোকদের জন্যে অকাতরে অর্থব্যয় করলেন, কলকাতা থেকে বড় বড় ব্যারিস্টার আনিয়ে মামলা লড়াতে লাগলেন, ফলে দায়রায় গিয়ে অনেকেই খালাস পেয়ে গেল। কেবলমাত্র দু'পক্ষের জন চারেক জেলে গেল।

এইভাবে সেই দারোগা অসামান্য চাতুরির জোরে শুধু যে কেবল দেড় হাজার টাকা হাতিয়ে নিলেন তাই নয়। মোকদ্দমা চলা কালে দু'পক্ষের কাছ থেকে আর হাজারখানেক টাকা আদায় করলেন।

এই দাঙ্গার এবং তার মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণ গভর্ণমেণ্টের কাছে যাবার পর সরকারী দপ্তর থেকে এক লম্বা নোট বেরুলো। সেই নোটে সেই সার্জেণ্ট দুজন কড়া ভাষায় তিরস্কৃত হল আর সেই সঙ্গে দারোগাবাবুর কাজের বিশেষ প্রশংসা করা হল। সেই নোটে বলা হল সার্জেণ্ট দুজনের দুটির ঘাটতিতেই দাঙ্গা হয়েছে তারা যদি দারোগাবাবুর কথা উড়িয়ে না দিত তাহলে দাঙ্গা রোধ করা যেতো, কারণ দারোগা দাঙ্গা রোধের জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, তিনি সময় মতো ওপরওলাদের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, তিনদিন তিন রাত্রি দাঙ্গার জায়গায় উপস্থিত থেকেছেন। সার্জেণ্ট দুজনের হুকুমেই তাঁকে চলে আসতে হয়। তাছাড়া রাত্রে দাঙ্গার খবর পেয়েই তিনি সার্জেণ্টদের খবর পাঠিয়ে-ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজে দাঙ্গার জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সার্জেণ্ট দুজন সময়মত দাঙ্গার স্থানে পৌঁছোতে পারে নি এবং পৌঁছুবার পরেও তারা কোন বিহিত করে নি। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, সার্জেণ্ট দুজনের কর্তব্যে ত্রুটি ঘটেছে এবং তারা নিতান্ত অকেজো।

এই নোটের পর সরকারী দপ্তর থেকে দারোগাবাবুর কাছে এক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পত্র এলো এবং শিগগিরই তাঁর পদোন্নতি হল।

সীতা চিত্রে শম্বুকের ভূমিকায়
অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খবর শুনে ফ্রামজী নিজে এলেন। দেখেশুনে বললেন—ঠিক আছে, আপনি স্টেজে যেরকম করেন সেই রকমই করুন। আপনার বেলায় আমরা আর 'কাট' করবো না।

দানীবাবু খুশী হয়ে বললেন—বেশ, তাহলে হতে পারে।

ফ্রামজীর উপস্থিত বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। উনি ওর মুভমেণ্টটা দেখে নিয়ে ৪।৫টা ক্যামেরা সাজিয়ে রাখলেন। চার পাঁচজন ক্যামেরাম্যান একযোগে কাজ করতে লাগলো—'শট' নিতে লাগলো সুবিধামতো। পরে 'শটগুলো' এডিট করে নেওয়া হয়েছিল।

যাক, এবার ছবির কথা ছেড়ে দিয়ে আবার মঞ্চের কথায় আসা যাক।

স্টারে মাঝে মাঝে অভিনয় করতে হয়। একদিন হরিদাসবাবু তাঁর যেমন অভ্যাস কানে কানে কথা বলা, আমায় ডেকে বললেন—'আলমগীর' করুন না?

চমকে উঠে বললাম—আলমগীর? কোন্ আলমগীর?

হরিদাসবাবু মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললেন—কোন্ আলমগীর আবার? ক্ষীরোদপ্রসাদের আলমগীর। আপনি নাম-ভূমিকায়।

একটু চুপ করে থেকে বললাম—ওতো শিশিরবাবু করেছেন, এখনও করছেন মাঝে মাঝে।

হরিদাসবাবু বললেন—তা করুন না তিনি, আপনার করতে বাধাটা কোথায়? আপনি নতুন একটা রূপ দেবেন—এটাই তো আমরা আশা করব।

কথাটা ভাবতে লাগলাম। উনি কিন্তু নাছোড়বান্দা। এর পর যেদিন আবার দেখা হল, উনি প্রথমই প্রশ্ন করলেন—আলমগীরের কী হলো?

এবারে আমি মনস্থির করে বললাম—ঠিক আছে, করবো আলমগীর।

ইতিমধ্যে বইটা নিয়ে আগাগোড়া পড়ে ফেলেছি এবং নিজের মনের মধ্যে কল্পনায় ছকও নিয়েছি সব জিনিসটা। কথাটা শুনে হরিদাসবাবু উৎসাহিত হলেন, আর আমিও প্রস্তুত করতে লাগলাম নিজেকে। স্যর যদুনাথ সরকারের 'হিস্ট্রি অফ আওরঙ্গজেব' আমার কাছে ছিল, সেটা থেকে 'আউরংজেব' বা আলমগীর সংক্রান্ত বিষয়গুলোর খুঁটি-নাটি সব পড়ে ফেললাম ভালো করে। কেমব্রিজ-এর 'হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া' আর ভিনসেণ্ট স্মিথের 'হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া' বই দুখানিও পড়ে নিলাম। এসব পড়লেও যদুনাথবাবুর বইই আমার কাজে এসেছিল বেশী। তাঁর মতো এমন বিশদ বর্ণনা এমন মনোরমভাবে কেউ করতে পারেন নি বলে আমার ধারণা। যাই হোক, এইসব বই থেকেই ঐতিহাসিক আওরংজেব চরিত্রটা ঠিক মত বুঝে নিতে চেষ্টা করলাম। স্যর যদুনাথের 'অ্যানেকডোটস অফ আউরংজেব'ও আমার খুব উপকারে লেগেছিল।

ঐতিহাসিক কাহিনীগুলোতে এমন খুঁটিনাটি বর্ণনা অনেক থাকে যা আপাত-দৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর মনে হলেও আমাদের পক্ষে মূল্যবান। মুঘল দরবারের আদব-কায়দা বাদশাহদের পাঞ্জা দেওয়ার পদ্ধতি,—এগুলো আমার কাছে খুব প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। আর একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছিল আলমগীরের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে। বহু খুঁটিনাটি ঘটনার বিবরণ পাঠ করে আমার ধারণা হলো যে এই চরিত্রটির মধ্যে আবেগের স্থান ছিল না। আবেগশূন্য, গম্ভীর এবং অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন আলমগীর। অভিনয়ের মাধ্যমে আমি সেই রূপটিই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলুম। তার আগে সচেষ্ট হয়েছিলাম আলমগীরের চেহারা সম্পর্কে। ছবি দেখে তাঁর সেই বয়সের হুবহু সাদৃশ্য মেক-আপের সাহায্যে প্রকাশ করা এমন কিছু কঠিন ছিল না, কিন্তু আমি চাইছিলুম এমন একটি ছবি যাতে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।
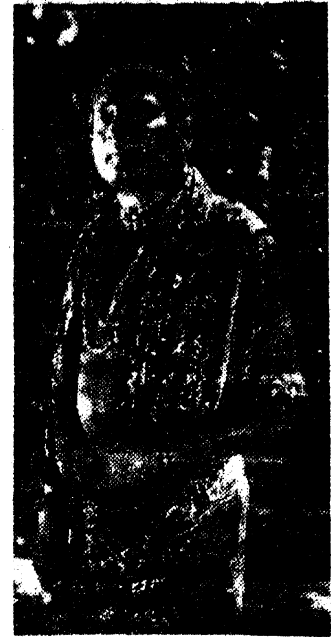
অনেক ছবি দেখতে দেখতে অবনীন্দ্রনাথের একখানি ছবি দেখলাম ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটিতে। অবনীন্দ্রনাথের 'আলমগীরের এই ছবির মধ্যে আছে—এক হাতে তাঁর পবিত্র কোরান, অন্য হাতে তরবারি এবং দুটি হাতই পিছনে জড়ো করা। ছবি-খানিকে এত জীবন্ত ও চরিত্রানুগ মনে হলো যে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এই ছবিখানাই হল আমার প্রেরণার উৎস—ছবিতে যেরকম পোশাক ছিল আমিও সেইরকম পোশাক তৈরী করালাম।

অভিনয় হলো। আমার চলন, বলন, অভিব্যক্তি, আদবকায়দা প্রভৃতির মধ্যে লোকে অনেক কিছু নতুনত্বের স্বাদ পেলো। কথাবার্তার মধ্যেও অনেক কিছু নতুনত্ব পেলো দর্শক। উদিপুরীর সঙ্গে যেসব বিদ্রূপাত্মক সংলাপ আছে সেখানে চরিত্রটিকে আমি লঘু না করে খুব সংযত করলাম। যেমন কথার পূর্বে সব সময় কথা না বলে, চোখের চাউনি এবং এক্সপ্রেশান দিয়ে উদিপুরীর কথাগুলো ধরে নিয়ে তারপরে ধীর অথচ বলিষ্ঠ কণ্ঠে সংলাপ উচ্চারণ। অর্থাৎ 'ইমোশন' বা 'আবেগ' প্রকাশে যথেষ্ট সংযত ভাব রক্ষা করে চলা। শেষ দৃশ্যের আগের দৃশ্যে যেখানে আলমগীর দিলীরকে বলছেন—'আমি ঊর্ধ্বে উঠে যেতে লাগলুম' ইত্যাদি সেখানে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ খানিকটা আবেগ বা 'ইমোশনে'র প্রকাশ ঘটিয়েছেন—এখানে 'ইমোশন'টা নাটকের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং পরিহার করা চলে না। যদিও আমার মতে নাটকের এ অংশ অনাবশ্যকভাবে রোমাণ্টিক হয়ে উঠেছে।

আমার অভিনয় দেখে বহু পত্র-পত্রিকাই সেদিন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে থেকে গোঁড়া শিশিরভক্ত 'নাচঘর' (২৫শ সংখ্যা, ১৩৩৪)-এর উক্তিই উদ্ধৃত করছি। "অহীন্দ্রবাবু আলমগীরের ভূমিকার অঙ্গসজ্জা করেছিলেন চমৎকার। ঔরংজেবের যে ঐতিহাসিক চিত্র 'ভিকটোরিয়া মেমো-রিয়াল' প্রভৃতি স্থানে দেখেছি তার সঙ্গে এঁর অঙ্গসজ্জা চমৎকার মিলে যায়। তার উপর অহীন্দ্রবাবুর অভিনয়ে ইসলাম ধর্মে একনিষ্ঠ, বিলাসিতার একান্ত বিরোধী, আত্মনির্ভরতায় অতুলনীয় সম্রাট আলম-গীরের ঠিক ঐতিহাসিক মূর্তি যে ফুটে উঠেছে তাও অস্বীকার করবার যো নেই।... পরন্তু অহীনবাবুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুখ্যাতির কথা এই যে তিনি হাততালি পাবার লোভে ভ্রমক্রমেও কোথাও তাঁর পূর্ববর্তী বিখ্যাত প্রতিভার অনুকরণ করেননি। ইনি নতুন কিছু দেখাতে চেয়েছেন এবং তাতে সফলও হয়েছেন।"

শিশিরবন্ধু হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর "বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার" গ্রন্থে লিখেছিলেন, "তিনি হচ্ছেন চতুর নট, এ ভূমিকাটি নিজের পদ্ধতিতে নূতনভাবে দেখিয়ে নিজের মান রক্ষা করেছিলেন বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই।" আমি ঐ যে আবেগ একটু কম দেখিয়েছি সেইজন্যেই এই সমালোচনা। তবু যাহোক, "নিজের পদ্ধতিতে নূতনভাবে" কথাটি যে ব্যবহার করেছিলেন, এতেই তাঁর একটা স্বীকারোক্তি প্রকাশ পায়—আমি তাতেই খুশী।

'আলমগীর'-এর ভূমিকা সম্পর্কে আরও একটি তদানীন্তন বিখ্যাত পত্রিকার মন্তব্য উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—আগ্রহী পাঠকের কৌতূহল নিরসনের জন্য। পত্রিকাটির নাম 'দীপালী'। বেশ কিছুদিন পরে ১৯৩৪ সালের মে মাসে (৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪) এঁরা লিখেছিলেন—"অহীন্দ্রের ঔরঙ্গজেব স্থির, ধীর। তাঁহার মেক-আপ হইতে চলিবার ভঙ্গী, স্বরের বিকৃতি প্রথমেই দর্শকের মনে বৃদ্ধত্বের, কূট রাজনীতিজ্ঞতার ছাপ রাখিয়া যায়। তাঁহার অভিনয়ে বাদশার গাম্ভীর্য বিদ্যমান। সে যে সমগ্র হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র সম্রাট, সে যে নীরব ফন্দিবাজ, চক্রান্তকারী অথচ স্থির, ধীর, অনুতপ্ত, তাহা তাঁহার প্রতি পাদক্ষেপে ও প্রতি ভাষণে সম্পূর্ণ প্রকটিত হয়। তাঁহার চলনে ও বলনে বাদশার গাম্ভীর্য আছে, কণ্ঠস্বরে আছে বৃদ্ধের (স্খলিত) স্বর।"

এইসব মন্তব্য থেকে পাঠক খানিকটা 'আলমগীরে'র রূপারোপ সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন। আমার অভিনয় লোকে নিয়েছে, দেখে খুশী হয়েছে—এতে আমার আত্মপ্রসাদও কম হয়নি। আমি যে অন্যের অনুকরণ না করে নতুন কিছু দিয়ে দর্শকদের খুশী করতে পেরেছি সেইটেই আমার চরম ও পরম সার্থকতা।

'আলমগীর' তারপর বহুদিন ধরে চলেছিল, যদিও নিয়মিতভাবে নয়, কারণ স্টারে তখন সাপ্তাহান্তিক নতুন নাটকের অভিনয় চলছে 'মগের মুল্লুক'। অতএব মধ্য-সপ্তাহান্তিক আকর্ষণ হিসেবেই চলতে লাগলো 'আলমগীর'।

ম্যাডানের বেঙ্গলী থিয়েটারে শিশির-বাবু যখন 'আলমগীর' করেছিলেন তখন 'রাজসিংহ' সাজতেন প্রবোধ বসু। সেই প্রবোধ বসুই এসে আমাদের সঙ্গে 'রাজসিংহ' করেছিলেন। দুর্গাদাস সাজতো ভীমসিংহ, উদিপুরী তারাসুন্দরী। পরে অবশ্য চারুশীলাও নেমেছে, শান্তিবালাও নেমেছে, তারও পরে কুসুমকুমারী নেমেছে।

স্টারে মাঝে মাঝে 'নরমেধ যজ্ঞ' এবং 'চন্দ্রশেখর'ও হতো। আমি 'চন্দ্রশেখর'-এ তখন করতাম 'নবাব'। 'চন্দ্রশেখরে' 'নবাব'ই আমার প্রথম ভূমিকা, পরে অবশ্য অন্য ভূমিকা করেছি।

দেখতে দেখতে এসে গেল বড়দিন। তখন বড়দিন হল থিয়েটার-জগতের একটি বিশেষ মরশুম। সবাই নতুন বই খোলার চেষ্টা করত। স্টার ধরলো অপরেশবাবুর লেখা নতুন নাটক গীতিবহুল 'পুষ্পাদিত্য'। তিনকড়িবাবু, নরেশবাবু, আশ্চর্যময়ী নীহারবালা—এঁরা ছিলেন 'পুষ্পাদিত্যে'। মিনার্ভা খুললো বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের লেখা 'নর্তকী'। দানীবাবু তখন মিনার্ভায় গেছেন—ওঁকে তাই নামানো হলো নায়কের ভূমিকায়। তরুণ সেনাপতি, বা নগর কোতোয়াল নর্তকীর প্রেমে পড়েছেন—এই হলো 'নর্তকী'র গল্প। নায়কের ভূমিকায় এমন কিছু দেখাবার ছিল না যাতে দানী-বাবুর মতো অভিনেতার প্রয়োজন। কোনো তরুণ অভিনেতা হলে ভূমিকাটিতে মানাতো দানীবাবুর মতো বৃদ্ধকে তাতে মানাবে কেন?

মনোমোহনে বড়দিনে—আমিও ধরলাম নতুন নাটক 'আরবী হূর'। এই নাটকের কথা একটু গোড়া থেকে বলি। হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—রাণাঘাট বাড়ী—'হরবোলা'র পাঠ করে একদা খুব নাম করেছিলো 'পরদেশী' নাটকে। নাটকটি হয়েছিল পুরাতন মনোমোহনে। সেই হরিদাস এখন আমাদের সঙ্গেই কাজ করছে মনোমোহনেই। ওর জন্যে 'মনোমোহনে' 'পরদেশী'ও করা হয়েছিল বারকতক। এরকম ভিন্ন ভিন্ন নাটক সুবিধা বুঝলেই ধরা হতো। মনোমোহনে আলিবাবাও হয়েছে। নাম-ভূমিকায় কনকনারায়ণ, মর্জিনা—সুশীলা-বালা।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। 'পরদেশী' নাটকটি লিখেছিলেন পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বলে এক ভদ্রলোক। এঁর সঙ্গে আমার বেশ আলাপপরিচয় হয় এবং এঁর অপেরা রচনায় বেশ হাত আছে দেখে একদিন ইটালিয়ান অপেরা 'রিগোলিটো'র গল্প বললাম কথায় কথায়। ইটালিয়ান অপেরার বৈশিষ্ট্য হল, প্রথম দিকে নাচ-গান হাস্যরস থাকলেও শেষটা হত বিয়োগান্তক বা ট্র্যাজিক। পঞ্চাননবাবু ঐ 'রিগোলিটো'র গল্পকেই অনুসরণ করে নাটক লিখলেন 'আরবী হূর'। পাঁচটি দৃশ্যে পাঁচ অঙ্কের নাটক। অর্থাৎ এক একটি দৃশ্য এক একটি অঙ্ক। গোড়ার দিকটা বেশ অপেরার স্টাইলে লেখা, কিন্তু শেষটা নিদারুণ ট্র্যাজেডী। যদিও ভাষা দুর্বল এবং প্রহসনের ধারায় সংলাপ লেখা, তবু বেশ একটা নূতনত্ব ছিল। কনকনারায়ণ এ নাটকের গানগুলিতে সুর দিলেন বা 'মিউজিক সেট' করলেন। চমৎকার হয়েছিল গানের সুর-গুলি। 'আরবী হূর' প্রথম অভিনয় হল ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২৭ সাল। সত্যি কথা বলতে কি, দর্শকদের ভালোই লেগেছিল নাটকখানি, এবং আমরাও বেশ সুখ্যাতি পেয়েছিলাম। আমি করতাম প্রধান ভূমিকা—কুব্জ মূসা বেদুইন।

এখানে 'আরবী হূর' করলে কি হবে, স্টারে গিয়ে আবার 'আলমগীর' করতে হত।

(৮)

১৯২৭ সাল হল আমার জীবনের একটি স্মরণীয় বৎসর। বহু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত। একদিকে যেমন পরিশ্রমের অন্ত ছিল না, তেমনি অন্যদিকে ছিল নিয়ত কাজে ডুবে থাকার আনন্দ। অভিনেতার জীবনে যা কাম্য সেইরূপ পরিপূর্ণতায় ভরা ছিল মন। কিন্তু আজ মনে হয় সমগ্রভাবে দেখতে গেলে শিল্পী জীবনের দুটি বিপরীতধর্মী প্রবাহ আছে—যা একসঙ্গে দুটি বিভিন্ন ধারায় বয়ে চলে—একধারা অমৃত, অন্যধারায় বিষ। যখন

শিল্পকর্মে অমৃতের জোয়ার ওঠে, তখন ব্যবহারিক জীবনে আসে সমস্যা আর বেদনার ঢেউ। আবার ব্যবহারিক জীবনে যখন সুখসমৃদ্ধি নেমে আসে তখন শিল্পক্ষেত্রে দেখা দেয় সংঘাতের তরঙ্গমালা।

কর্মজীবনে সাফল্যলাভ করলেও ১৯২৭ সাল আমার পারিবারিক জীবনকে করে তুলেছিল অশান্তিময়, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং সমস্যাজর্জরিত। সংসার সম্বন্ধে যতই নির্লিপ্ত থাকি না কেন, সাংসারিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে তো সম্পূর্ণ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায় না। মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা যখন থিয়েটারের যাবতীয় কাজ সেরে রাত্রি দুটো-তিনটের বাড়ী গেছি। তারপর খেয়েদেয়ে শুতে প্রায় ভোর হয়ে যেতো। সেই কারণে স্বভাবতই সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠতে দেরী হোত। বাড়ীতে থাকা আর কতক্ষণ। উঠে স্নান, খাওয়া-দাওয়া—আর একটু বইয়ে চোখ বুলোনো। ব্যস—এতেই দুপুর গড়িয়ে গেল। দুপুরে কাটতে না কাটতেই আবার থিয়েটারে চলে যাওয়া। এর ওপর যখন শ্যুটিং থাকত, তখন তো আর কথাই নেই। সকাল দশটায় সময় ঘুম-চোখেই স্নানাহার সেরে স্টুডিও চলে যেতাম। সেখানে মেক-আপ চড়াবামাত্র আবার অন্য মানুষ হয়ে যেতাম, তারপর সারাটা দিন শ্যুটিং করে ওখান থেকেই সোজা থিয়েটার। সেখানে গিয়ে আবার অন্য কাজের মধ্যে মেতে যেতাম। তারপর যখন অধিক রাত্রে থিয়েটারের কর্মশেষে বাড়ী ফিরতাম তখন শ্রান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ত যেন। সুতরাং এই কর্মপ্রবাহের মধ্যে "ব্যবহারিক আমি"র অস্তিত্ব কোথায়, কতটুকু?

হয়ত বাবা আমাকে বুঝতেন, তাই অতো রাতে, আমি দরজায় ধাক্কা দিলে তিনি এসে দরজা খুলে দিতেন। সঙ্কুচিতভাবে আমি বলতাম, 'তুমি কেন—এত রাতে—?'

বাবা বলতেন—আমি বুড়ো মানুষ—রাতে আমার ঘুমই হয় না—বৌমা ছেলেমানুষ, সারাদিন খেটেখুটে ঘুমিয়ে পড়েছে—ও কি আর এত রাত্রি পর্যন্ত জেগে বসে থাকতে পারে? আর চাকর-বাকরের ওপর সব সময় বিশ্বাস করে থাকা যায় না। তারাও তো ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

বাবা ইদানিং কাজে বেরুতেন না, অর্থাৎ বয়সের জন্যে বেরুতে পারতেন না।

বাবা বললেন বটে, বৌমা ছেলেমানুষ—রোজ রোজ এত রাত্রি পর্যন্ত কি জেগে থাকতে পারে? কিন্তু আসলে সুধীরা একরকম জেগেই থাকত। আমি এসে কোনদিন খেতুম কিছু, কোনদিন হয়ত কিছুই খেতুম না—ও কিন্তু খাবারটি ঢাকা দিয়ে টেবিলের ওপর রেখে বসে থাকত। আমার সঙ্গে সুধীরার কথাবার্তা বিশেষ হতো না। বাবার শরীর যে ভাল না তাও আমাকে জানতে দেওয়া হতো না একরকম। আমি কোন কোনদিন জিজ্ঞেস করলে জবাব পেতুম—ভালো—ডাক্তার দেখছে।

ব্যস্ এই পর্যন্তই।

দক্ষযজ্ঞ চিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী

এই সময় মাঝে মাঝে বাইরে আমরা থিয়েটার করতে যেতাম। সেবার গিয়েছিলাম স্টারের হয়ে আসানসোলে। সেখানে বসেই প্রবোধবাবুর মুখে খবর পেলাম—আমার ভাই পণ্টু এসেছিল থিয়েটারে আমাকে খুঁজতে।

হঠাৎ আমাকে খুঁজতে কেন? মনটা চিন্তিত হয়ে রইল।

কলকাতায় এসে জানতে পারলুম পণ্টু হঠাৎ বিলেত চলে গেছে—তাই যাবার আগে আমার কাছে এসেছিল।

'বিলেত যাবো' 'বিলেত যাবো' বলে প্রায়ই সে বাবার কাছে আবদার ধরতো। এবার সে মন স্থির করেই ফেলেছিল, তাই আমাকে জানাতে এসেছিল।

পরে শুনলাম, মাদ্রাজ মেলে সোজা গেছে মাদ্রাজ হয়ে কলম্বো। কলম্বো থেকে জাহাজ ধরে একেবারে লণ্ডন। বাবার ডায়রীতে লেখা আছে ২৫শে মে, ১৯২৭—পণ্টু অ্যারাইভড অ্যাট লন্ডন।

এদিকে ভাই চলে গেছে বিলেত, ওদিকে বাবার শরীর খারাপ। সুতরাং পারিবারিক অবস্থা আর বিশেষ কিছু না বললেও চলবে আশা করি।

সংসার সম্বন্ধে যতই কেননা উদাসীন থাকি, মনের ওপর বেশ খানিকটা চাপ পড়ে বৈকি!

একদিন স্ত্রী আমাকে বললেন: দেখ, অন্য কিছু নয়, বাজার খরচ বাবদ দুটো করে টাকা আমায় রোজ দিয়ে যেও!

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। বাবা তো কখনো মুখ ফুটে আমার কাছে কিছু চাইবেন না জানি, এমন কি সুধীরাকে উনি বলে রেখেছিলেন, দেখ বৌমা, তোমার যখন যা দরকার তা আমার কাছে চাইবে। আমি শুধু তোমার শ্বশুরই নয়, বাপ বলো, ছেলে বলো—সে আমি।

সেজন্যে সুধীরা কোনদিন আমার কাছে কিছু চাইত না, সুতরাং সে যখন আমার কাছে বাজার খরচের টাকা চাইছে, তখন নিশ্চয় টানাটানি চলছে এবং অত্যন্ত নিরুপায় হয়েই আমার কাছে চেয়েছে।

অবশ্য টানাটানি হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ শারীরিক অসুস্থতার জন্য বাবা ব্যবসার কাজকর্ম ছেড়ে বাড়ীতে বসে আছেন। এতে তো আর্থিক ক্ষতি হবেই! তা ছাড়া আমার নাম-ডাক যাই হোক না কেন, অর্থপ্রাপ্তির ব্যাপারটা তখনো এমন কিছু বলার মত হয়নি।

যাইহোক, সুধীরার কথা মতো মাসে ষাটটি টাকা করে তার হাতে দিতে লাগলাম।

বাড়ীতে তখন আমাদের অনেকগুলো গরু ছিল, যথেষ্ট দুধ হতো। সেই দুধ থেকে মা সন্দেশ তৈরী করতেন, সুধীরা মাকে এ বিষয়ে সাহায্য করত। আর চাল-ডালের ব্যবস্থা ছিল বাবার—বাকী রইল শুধু বাজার। এই বাজার খরচ হিসাবেই ষাট টাকা আমি বরাদ্দ করেছিলাম।

এই রকম যখন সংসরের অবস্থা তখন পণ্টু চলে গেল বিলেত। পণ্টু ম্যাট্রিক পাশ করেছিল লণ্ডন মিশনারী স্কুল থেকে। কলেজে ভর্তি হয়ে ৪।৫ মাস পড়লো, কিন্তু লেখাপড়ায় ওর মন বসলো না। ও বাবাকে বলল—আর্ট স্কুলে পড়বো—ছবি আঁকা শিখব।

কিন্তু ও তো সাধারণ ছবি আঁকতে চায় না—ও চায় কমার্শিয়াল আর্ট শিখতে। এই দিকেই ওর ঝোঁক। ওর বিলেত যাওয়ার উদ্দেশ্যই হল ওখান থেকে ভাল করে কমার্শিয়াল আর্ট শিখে আসবে।

জয়পুর আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন কুশল মুখোপাধ্যায়—আমাদের বিশেষ পরিচিত। আমার কাছে আসতেন নানা রকম স্টেজের মডেল দেখাতো। কমার্শিয়াল আর্ট তিনি শিখে এসেছিলেন বিলেত থেকে। সম্ভবত পণ্টুর কমার্শিয়াল আর্ট শিখবার প্রেরণা যুগিয়েছিলেন তিনিই।

পণ্টু ছিল একটু জেদী প্রকৃতির, ও যখন জিদ ধরেছে একবার, তখন না গিয়ে ছাড়বে না। বাবা একটু বেশী রকম ভালবাসতেন পণ্টুকে, ওর ওপর একটু বিশেষ দুর্বলতা ছিল বলা চলে, সেই জন্যে ওর বিলেত যাওয়ায় বাবা বাধা দিতে পারলেন না। কিন্তু আমি তো বাবার অবস্থা জানি—'প্যাসেজ মানি'টা হয়ত কোন রকমে যোগাড় করে দিয়েছেন, কিন্তু তারপর?

এইবার আমি সত্যি সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমি যে কোথা থেকে কিভাবে টাকা পাব তা আমি নিজেই ভেবে পেলাম না। তার ওপর এত কাজের ভীড়ে প্রতি মাসে সময় মত টাকা পাঠানোও তো এক মহা সমস্যার ব্যাপার!

সুধীরাকে একদিন ডেকে বললাম—দেখ, আমার পকেটে ব্যাগের মধ্যে যখন যা থাকে তার থেকে আন্দাজ করে সামান্য কিছু রেখে বাকীটা নিয়ে নিও সংসার খরচের জন্যে। হিসেবের দরকার নেই।

'সংসার' বলতে আমরা ক'জন, রাঁধুনি, ঝি, চাকর সবই ছিল। আর ছিল গরু। বাবা নিজে ওদের যত্ন করতেন, সেবা করতেন। ওদের জন্যে 'ক্রাসড্ ফুড' কিনে আনতেন হগ্ সাহেবের বাজারের পিছন থেকে। বাবা নিজের হাতে ওদের গা বুরুশ করে দিতেন—ওরাও বাবাকে দেখে শান্ত হয়ে থাকত। উনি ওদের এত যত্ন করতেন বলেই তারা ছিল স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী।

এইসব কাজ আমাদের ছোটবেলার তারাপদ থাকলে অনেক সাশ্রয় হতো। কিন্তু সে এখন বৃদ্ধ হয়েছে, তার ভাইপোরা এখন আর কাজ করতে দেবে কেন?

সে এখন দেশেই থাকে—দেশে থেকেই শুনতে পায় আমার নাম। তার আদরের 'খোকাসাহেব' এখন বড়ো বড়ো পার্ট করে, কতো নাম-ডাক হয়েছে তার। আমাদের ওপর তার মায়া এখনো পুরোমাত্রায় আছে। চিঠি দেয় মাঝে মাঝে, উত্তর না পেলে আবার অভিমানও করে।

হঠাৎ কখনো-কখনো চলে আসত কলকাতায়—এসে এক নাগাড়ে ৩।৪ মাস থাকত, তারপর আবার চলে যেতো। যখন এখানে থাকতো, তখন সব সময় আমার ছেলেমেয়েদের কোলে করে বেড়াতো। আমার মেয়ে মীরার পা ছিল খুব নরম, সেই পায় ও দাড়িওয়ালা মুখ নিয়ে চুমু খেতো, বলতো—লক্ষ্মীঠাকরুণের মত পা।

বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য হলেও সুধীরা ওর সামনে ঘোমটা টেনে কথা কইতো, তাও আবার একটু আড়াল থেকে তারাপদ খেতে বসলে থামের আড়াল থেকে তদারক করতো সুধীরা। তারাপদ বলতো—না মা, শুতে যাও—

(ক্রমশঃ)

'কথা' শিল্প

দুলেন্দ্র চক্রবর্তী

গুণীজনেরা বলে থাকেন, কথা বলা একটি শিল্প। কেমনা, বাকযন্ত্রে গণ্ডগোল ঘটে গেছে এমন ব্যক্তি ছাড়া আর সকলেই যদিও কথা বলে থাকেন, তবু সকলের কথাই সুখশ্রাব্য নয়। সকলের কথাতে কাজও হয় না। ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি গুছিয়ে বলা এবং শ্রোতার মেজাজ ও মর্জি বুঝে অভিজ্ঞ মাঝির মতো কথারূপ নৌকোকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে চালনা করা সকলের কর্ম নয়। আর তা নয় বলেই বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে নিজের ওপর নির্ভর না করে আমরা কইয়ে-বলিয়ে মানুষ খুঁজি। উকিলেরা আইন জানেন বলেই যে জীবনে উন্নতি করেন তা নয়। আইন জানা সত্ত্বেও অনেক পণ্ডিত উকিলকে বার লাইব্রেরিতেই জীবন কাটাতে হয়, এজলাসে দাঁড়ানোর সুযোগ ঘটে না। ডাক পড়ে তাঁদেরই, যাঁরা কথা বলতে পারেন এবং কথার মোড়ে হয়কে নয় করে দিতে পারেন। রাজনীতিবিদ, কি, চিত্রশিল্পীদের বেলাতেও তাই। এমন কি পাড়ার নিত্য সমস্যায় কাউন্সিলর কর্তা হয়ে ওঠেন তাঁরাই যাঁদের আসল মূলধন কথা বলা। তাই মেয়ের বিয়ে ঠিক করার জন্য তাঁর ডাক পড়ে, ঝগড়া মেটানোর সময় তাঁর ডাক পড়ে, আবার ভোটের ক্যানভাসেও তিনিই অনন্যগতি।

অবিশ্যি অন্য শিল্পের বেলাতেও যেমন কথার বেলাতেও তেমনি যশোলিপ্সুর সংখ্যা অগণ্য। হাত থাকলেই লেখা যায় না। অন্তত লেখক হওয়া যায় যে জাতের লেখা লিখলে, সে ধরনের লেখা সম্ভব হয় না। তেমন লেখা লিখতে পারার জন্যে হাত ছাড়া আরো কিছু থাকা দরকার। কিন্তু অনেকেই তা মানতে চান না, এবং অকুতোভয়ে লিখে থাকেন। 'বলিয়ে-কইয়ে মানুষ' হিসেবে নাম কেনার ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার ঘটে। মুখ এবং জিহ্বা আছে শুধু এই মূলধনটুকুর জোরেই অনেকে ভালো 'কথা বলিয়ে' মানুষ বলে নাম পাওয়ার প্রত্যাশা করেন। পরিচিত আড্ডায় এ জাতের মানুষকে সকলেই একটু ভয়ের চোখে দেখে থাকেন। একবার এঁদের খপ্পরে পড়লে আর রক্ষা নেই। সেজন্যে আড়ালে এঁদের ডাকা হয়, বিরাট ছ্যাঁদা, অর্থাৎ 'গ্রেট বোর'। (অনুবাদ অবিশ্যি আমার নয়, কপিরাইট পরশুরামের।) আড্ডায় এঁদের আবির্ভাব ঘটা মাত্র অনেকেরই জরুরী অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের কথা মনে পড়ে যায় এবং বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে পড়েন। কিন্তু যাঁরা তা পারেন না, তাঁরা দায়ে মজেন।

গল্প শুনেছি, বাংলাদেশের একজন নামকরা মৃত কবির কাছে একজন দাদা-স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি এলেন একদিন, যিনি ছোটোখাটো একটি 'ছ্যাঁদা' বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অপিচ উনি শুধু কথাই বলতেন না, কথাগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে লিখেও আনতেন। সেদিনের কথা বলছি, সেদিন এই দাদাটিকে দেখেই কবিবরের বুক কেঁপে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললেন, এই যে দাদা, আপনি এলেন, কী ভালো যে লাগল—কিন্তু দেখুন, একটা জরুরী কাজ পড়েছে, এক্ষুনি তো একবার বেরোতে হচ্ছে।'

দাদা বললেন, বেরোচ্ছ? কিন্তু আমি যে ভারি ইণ্টারেস্টিং কতকগুলো কথা তোমাকে শোনাব বলে এলাম। একটু বসো না, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শুনিয়ে দিচ্ছি।

কবিবর ছটফটিয়ে উঠে বললেন, ওরে বাপরে, এখন পাঁচ মিনিটও বসা যাবে না। তার চেয়ে চলুন, আপনাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাই।

দাদা বললেন, নাঃ, এখন আর বাড়ি ফিরব না। দেখি একবার আরেকটা জায়গায় ঘুরে যাই।

কথাটা হচ্ছিল শ্যামবাজারে। কবিবরের গাড়ি ছিল। দাদাকে উনি এসপ্ল্যানেডে নামিয়ে দিলেন। তারপর একটা কাফেতে ঢুকে কিছুক্ষণ কফি খেলেন, কিছুক্ষণ গঙ্গার ঘাটে অযথা চক্কর দিলেন, এবং ঘণ্টাখানেক পরে গাড়ি ফেরাবেন এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, বালীগঞ্জে এক বন্ধুর অসুখ করেছিল শুনেছিলেন, তাঁকে একবার দেখে যাওয়া দরকার।

গাড়ি ফিরিয়ে অতএব বালীগঞ্জে এলেন। এবং বন্ধুর বাড়ি পৌঁছে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় তাঁর শোবার ঘরে ঢুকলেন। না, ঢুকলেন বলা ঠিক নয়, ঘরের ভেতর শুধু একটি পা দিলেন, এবং সেইখানেই তিনি সিনেমার ফ্রিজ শট-এর মতো স্থির হয়ে গেলেন। বন্ধু খাটের ওপর চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর পাশে চেয়ারের ওপর ও' কে বসে? ঐ তো সেই ভয়াবহ কথা-কইয়ে দাদাটি, যাঁকে একটু আগে কবি এসপ্ল্যানেডে ছেড়ে দিয়েছিলেন! কবি ভাবলেন, দাদা পেছন ফিরে বসে আছেন, এইবেলা কেটে পড়ি। হাতজোড় করে মূকাভিনয়ে বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরতে যাবেন, এই সময়ে শয্যাশায়ী বন্ধুর দৃষ্টি অনুসরণ করে দাদা হঠাৎ পেছন ফিরে তাকালেন, এবং কবিকে দেখতে পেয়ে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, এই যে ভায়া, কাজটা চুকিয়ে ফেলেছ দেখছি। বেশ বেশ, এসে পড়েছ যখন, গোড়া থেকে আবার পড়ে শোনাই।

সেদিন কবিকে সেই লিখিত কথার মহাভারতখানি শুনতে হয়েছিল। এবং অসুস্থ বন্ধুটিকে শুনতে হয়েছিল সেটা ডবল করে। এজন্যে কবির ওপর বন্ধুটি যে কী পরিমাণ চটে গিয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য!

কিন্তু যাঁরা কথা বলার শিল্পী তাঁরা কেউ কখনো অন্যকে 'বোর' করেন না। তার একটা কারণ হল, লোকচরিত্রে এঁদের অভিজ্ঞতা অপরিসীম। তাঁরা বুঝতে পারেন, কোন প্রসঙ্গ কখন কার ভালো লাগে, কোন কথায় কে খুশি হয়, অথবা দুঃখ পায়। সেইভাবে স্থান কাল পাত্র অনুসারে কথা বলেন তাঁরা। এবং তাঁরা জানেন, কোথায় থামতে হয়। একজন লেখক বা আঁকিয়ে কি গাইয়ে যেমন জানেন, কতোটা লেখা দরকার, কতোখানি আঁকা দরকার বা কতোক্ষণ গাওয়া দরকার, একজন ভালো কথা কইয়ে মানুষও তেমনি জানেন, কতোদূর বলা দরকার। আর তা জানেন বলেই তো তিনি শিল্পী।

শিল্পী : ইশা মহম্মদ

অশোক সেন ও মল্লিকা সেন অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে তাঁদের প্রথম যৌথ চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন ১০ থেকে ১৬ই নভেম্বর। অল্পকাল ধরে শিল্প অনুশীলনের ফলে এখনো এঁদের শিল্পরীতি কোনরকম দানা বেঁধে উঠেছে বলে মনে হল না। এর মধ্যে শ্রীঅশোক সেনের কাজ আরো বেশী এ্যামেচারিশ বলে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ তিনি খুব তাড়াতাড়িই অ্যাবস্ট্রাকশনের একটি সহজ পথ বেছে নিয়েছেন। কিন্তু জ্যামিতিক ঘেঁষা ও আকারের প্যাটার্ণ তৈরী করাই যেন তাঁর ছবিগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে হল। কয়েকটি প্যাটার্ণ ও রঙের ব্যবহার মহিম রুদ্রের অনেকদিন আগেকার কোন কোন ছবির যেন কাছাকাছি বলে মনে হল। অনেক ক্ষেত্রেই রং ও প্যাটার্ণ অবশ্য অত্যন্ত কাঁচা। তবু এরই মধ্যে ৪ নম্বরের ড্রীম ছবিটি প্রশংসার যোগ্য।

মল্লিকা সেনের ছবিগুলি মূলত ফিগার ও ল্যান্ডস্কেপের ওপরেই নির্ভর করে তৈরী। কিছুটা অনুশীলনের ছাপ পাওয়া যায়। রঙের হাতও মন্দ নয়। এর মধ্যে উটির দু-একটি দৃশ্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর ১৭ নম্বরের "সান কোর্ট ইয়ার্ড" ছবির কম্পোজিশন এবং দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসনীয়।

●

আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ-এ ১২ থেকে ১৮ নভেম্বর ইশা মহম্মদের ১০খানি ছোট ও বড় ক্যানভাস ও দুটি ড্রয়িং-এর একটি সুনির্বাচিত প্রদর্শনী হয়ে গেল।

প্রদর্শনীতে প্রথমেই চোখে পড়ে শিল্পীর রঙ ব্যবহারের ঔজ্জ্বল্য ও স্বচ্ছন্দ ভাব। এই আধা-ফিগারেটিভ ও অ্যাবস্ট্রাক্ট কাজগুলির চিত্রপটের সুপরিকল্পিত বিভাজন, টোনের ক্রমামিল, প্রতীকের পরিমিত ব্যবহার, শিল্পীর অনেকখানি পরিণত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তিনি আধুনিক সমস্যা ও পরিস্থিতির প্রতিফলন ছবিতে আনবার চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁর প্রকাশের ভাষা অনেক ক্ষেত্রে বেকমান প্রমুখ এক্সপ্রেসানিস্টদের খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছে। বিশেষ করে 'ডিজায়ার' বলে ছবিটির বিবসনা শ্বেতাঙ্গিনীর ওপর কৃষ্ণবর্ণের রক্তজিহ্ব জীবের আক্রমণ ছবির রং রেখা ও প্যাটার্ণ (অত্যন্ত সুদৃশ্য হলেও) বড় বেশী বিদেশী ইডিয়ম ঘেঁষা বলে মনে হল। 'দি মাদার' ছবি কম্পোজিশনের বাহুল্য বর্জিত সরলতা এবং গোলাপী রঙের প্রাধান্যে মিষ্টতার পরিবেশনটাই বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'এমার্জেন্স' ছবির সূক্ষ্ম ও বিভিন্ন ধরনের ধূসর বর্ণের আড়াল থেকে দুটি মূর্তির আবির্ভাব এবং 'স্ট্রাগল' ও 'ম্যান অ্যান্ড মেশিন'এর কম্পোজিশনের বলিষ্ঠতা ও স্পেস-এর বিস্তার শিল্পীর সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্বের পরিচয় বহন করে।

●

গত বারো বছর ধরে কলকাতার রিজিওনাল ডিজাইন সেন্টার—আমাদের দেশের বিভিন্ন হস্তশিল্পের জনপ্রিয়তা বর্ধনের জন্যে নানাভাবে সচেষ্ট রয়েছেন। একদিকে দেশের হস্তশিল্পের বিদেশে প্রচার এবং অন্যদিকে বংশপরম্পরায় যে সব শিল্পীরা বিচিত্র কারুশিল্পের সৃষ্টি করে আসছেন এবং যাঁদের আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক মূল্য ক্রমেই নিম্নগামী হচ্ছে তাঁদের প্রকৃত পুনর্বাসনের দিকেও দৃষ্টি রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। এর ফলে বিদেশের বাজারে ভারতীয় কারুশিল্পীদের কাজের প্রচুর চাহিদা বেড়েছে কিন্তু এই লোকায়ত শিল্প যদি দেশের লোকের কাছেই সমাদর লাভ না করে তবে এর ভিত্তি কখনোই দৃঢ় হতে পারে না। স্বদেশে এর চাহিদা কতখানি তার কিছু কিছু নমুনা এই কেন্দ্রের আয়োজিত পূর্বেকার প্রদর্শনীতে অনেকখানি অনুমান করা গিয়েছিল। তাই গত ১২ থেকে ১৭ নভেম্বর প্রথম জনসাধারণের কাছে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অল ইন্ডিয়া হ্যান্ডিক্রাফট্ বোর্ড ও মিনিস্ট্রি অব ফরেন ট্রেড অ্যান্ড সাপ্লাই-এর উদ্যোগে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ভারতের পূর্বাঞ্চলের হস্তশিল্পের একটি সুন্দর ও বৃহৎ প্রদর্শনীর আয়োজন হল। প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গ আসাম ও উড়িষ্যার বহু প্রকার হস্তশিল্পের নিদর্শন—যা বিদেশ পাঠানো হয়ে থাকে এবং ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হয়ে গিয়েছে সেগুলি সাজিয়ে রাখা হয়। ঢোকরা কামারের তৈরী বহু মূর্তি ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য, শম্ভু ভাস্করের কাঠের রাবণ, দুর্গা, শিব ইত্যাদি মূর্তি, উড়িষ্যার কাঠের কাজ, জুট কার্পেট, শোলার নানারকম ছোট ছোট পুতুল, টেবল ম্যাট ছাপা কাগড়, স্কার্ফ রুমাল, বিভিন্ন ধাতুর পাত্র, দার্জিলিং-এর গহনা ইত্যাদি নানারকম জিনিষের প্রচুর চাহিদা দেখা গেল। মূল্যও অনেক কম। বোঝা গেল সম্প্রতি থাকলে এই সব বস্তু সর্বসাধারণের সমাদর লাভ করতে পারে। কলকাতায় যদি একটি স্থায়ী বিক্রয় কেন্দ্র থাকে এবং যদি অল্পমূল্যে দেশের লোককে এগুলি সরবরাহ করা যায় ত তার ভবিষ্যৎ নেহাৎ খারাপ নয়।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথার উল্লেখ করতে হয়। শোনা গেল আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রির সংগ্রহশালা ও লাইব্রেরী ডিজাইন সেন্টারের অধিকারে এসেছে। কলকাতায় একটি লোকশিল্পের স্থায়ী প্রদর্শনীর অভাব অনেকেই বোধ করে থাকেন। যদি এই সুযোগে এখানে একটি স্থায়ী ফোক-মিউজিয়াম এবং লাইব্রেরী স্থাপনা করা যায় ত অনেকেই খুশী হবেন সন্দেহ নেই। ব্রতচারী গ্রামে এ ধরণের একটি সংগ্রহশালা আছে সেটির দিকেও জনসাধারণ ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পরলোকে শিল্পী অশোক মুখোপাধ্যায়

বাঙলার জ্যেষ্ঠ শিল্পীদের অন্যতম অশোক মুখোপাধ্যায় গত ১২ নভেম্বর অপরাহ্নে তার খড়দহের বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। জন্ম : ১৯১৩, শিক্ষা : সরকারী আর্ট কলেজ, অধ্যাপনা : ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুল। পিতা পি কে মুখার্জি রায়সাহেব ছিলেন উড়িষ্যার পদস্থ পুলিশ কর্মচারী, যে জন্যে উড়িষ্যার লোকশিল্পের প্রেরণা ছিল অঙ্কনরীতির বৈশিষ্ট্য। ২২ নভেম্বর খড়দহে শিল্পীর নির্বাচিত চিত্রের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। শ্যামবাজার থেকে খড়দহ থানা : বাসরুট ৭৮।

—চিত্ররসিক

ভুল

লতিকা চট্টোপাধ্যায়

সুব্রত অফিসের কোন কাজেই মন দিতে পারছিল না আজ। ফাইলগুলো একটা করে খোলে, আবার বন্ধ করে টেবিলে রাখে। পকেট থেকে লাইটার বের করে সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার রিঙ ছড়ায়। সেই সঙ্গে কালকের ঘটনাটা ছায়াছবির মত তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ছিঃ ছিঃ কাল ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে সুব্রতর। কেন সে হঠাৎ এমন রেগে গেল সে নিজেই বুঝে উঠতে পারছে না। এভাবে সুমনাকে কোন-কিছু বলার ইচ্ছে ত সুব্রতর ছিল না তবে? বিরক্ত হয়েই সুব্রত ছাইদানীতে সিগারেট ফেলে দেয়।

'আসবো স্যার?' টেবিলের ওপারে প্রতিধ্বনি হল। চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ে সুব্রতর। টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখে একটা ফাইলও এপর্যন্ত দেখা হয়ে ওঠেনি। আবার দরজায় নক্ করে। 'আসতে পারি স্যার?' সুব্রত রিভলভিং চেয়ারটাকে দরজার দিকে ঘুরিয়ে উত্তর দেয় 'কে, রমেন? এসো, কাম ইন'। রমেন নমস্কার করে ভেতরে আসে। রমেনকে ফাইলগুলো দেখিয়ে বলে,—'তুমি আজ এগুলো রেখে দাও রমেন। আমি কালকে সব দেখে সই করে দেবো আজ আমার শরীরটা ভালো নেই।'

সুব্রত কোন এক ব্রিটিশ ফার্মের পার্টনার। তার অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে! সুব্রত সিগারেট ধরিয়ে বলে—আমি এখন একটু বাইরে যাবো। তুমি বেয়ারাকে বলো একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে।' আবার কি ভেবে বলে—'থাক, আমি রাস্তায় ডেকে নেবো।' সুব্রত স্যুইঙ ডোর ঠেলে বাইরে আসে।

ফ্রিস্কুল স্ট্রীট ধরে ট্যাকসীটা একটা রেস্তোরাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। ভাড়াটা মিটিয়ে সুব্রত ভেতরে নানান ধরনের সাজ-পোশাক, মেয়ে-পুরুষে সব টেবিলগুলোই

কাটলেট সরিয়ে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে, বলে—'আমি তো কাউকে খেতে বারণ করিনি মা!' যা বল সু, তোর ওই দোষ, না বুঝে চট করে রেগে যাস। কি দরকার ছিল ও সমস্ত বলবার'—মা বললেন; সুব্রত আর কথা না বাড়িয়ে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে যায়।

বাথরুম থেকে ঘরে যাবার সময় সুব্রত দেখলো রাস্তার দিকে মুখ করে সুমনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছে করেই জুতোর আওয়াজ তুলে সুব্রত সুমনার কাছে এসে দাঁড়ালো। সত্যি দুদিনে সুমনা যেন শুকিয়ে গেছে। চুল বাঁধেনি হয়তো, এলোমেলো চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে। সুব্রত একটুখানি অপেক্ষা করে, যদি সুমনা কথা বলে, কিন্তু ওপক্ষ থেকে কোন উৎসাহ দেখা গেল না। সুমনার এই নিস্পৃহ ভাব দেখে সুব্রত একটু আহত হলো। তবু সুব্রত আস্তে আস্তে বলে—'সুমনা, কাল থেকে খাওনি কেন? মাও খেয়ে নাওগে, কি হলো? খাবে না? শোন সুমনা আমার দিকে ফেরো।' সুব্রত সুমনার কাঁধে হাত রেখে আবার বলে—'কি হলো কথা বলবে না?' সুমনা সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। সুব্রত আরো একটু কাছে সরে আসে সুমনাকে নিজের দিকে ফেরানোর জন্য। কিন্তু সুমনা, সুব্রতর হাত সরিয়ে দিয়ে বারান্দা থেকে চলে যায়। সুব্রতর স্পর্শে অভিমান বুঝি অশ্রু হয়ে ঝরে পড়লো। এ দুর্বলতা সুব্রতর কাছে প্রকাশ করতে চায় না সুমনা। তাই বুঝি নিজেকে অন্ধকারে লুকোয়, সুব্রতর সামনেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়।

আহত সিংহের মতো নিজের ঘরে ফিরে আসে সুব্রত। শ্রান্ত দেহটা চেয়ারে এলিয়ে দেয়। পৌরুষে আঘাত লেগেছে সুব্রতর। চলে গেল কেন?

এ ঘরে কান্নায় ভেঙে পড়ে সুমনা। সত্যিই কি সুমনার জন্য দুঃখ পেয়েছে সুব্রত? তবে কেন সেদিন অমনভাবে অপমান করলো সুব্রত? সেদিনের কথাগুলো কিছুতেই ভুলতে পারে না সুমনা। কোনো অন্যায় করেনি। এভাবে বলার দরুণ সুব্রতও কি ছোট হলো না সবার সামনে? সুমনার মনে পড়ে, অফিসের কোন কাজে দিল্লী যেতে হয়েছিল সুব্রতকে। সেখানে টি পার্টিতে কোন অফিসের মেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল ওর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য, কার মিসেস্ নিজের গাড়ীতে, হোটেলে পৌঁছে দেবার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছিল, ঐ ধরনের কত কথাই সুমনাকে সুব্রত একটি একটি করে শুনিয়েছিল। কই, সুমনা তো কিছু মনে করেনি। শুনে হেসেছিল খুব।

কেন মনে হবে? সুমনা কি সুব্রতকে জানে না? সুব্রত কেন যে এই বিশ্রী কান্ড করলো, সুমনা আজও বুঝে উঠতে পারে না। না, না, সুব্রতকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবে না। স্বামীত্বের অহমিকাতেই সুব্রত সুমনাকে অপমান করেছে। তাকে ক্ষমা করা চলে না। তবে? এ বাড়ীতে এমনি করে কাটাবে? না—চলেই যাবে। বাপের বাড়ী যাওয়া চলবে না। তাহলে কোথায় যাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ওর বন্ধু রত্না কিছুদিন আগে এসেছিল, সে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে রেঙ্গুনে। ওরা একসঙ্গে পড়তো। খুব মেধাবি মেয়ে রত্না। বি-এ পরীক্ষা দেবার পর সুমনার বিয়ে হয়ে যায়, কিন্তু রত্না সংসারের ধার দিয়ে গেল না। সে নিজের সংসার বেছে নিয়েছে। সেবার মাধ্যমে। রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছে। সুমনা ভাবে রত্নার সঙ্গে সেওতো যেতে পারে। অনেক দূরে, নিজেকে সেবার মাধ্যমে বিলিয়ে দেবে। সুমনা ঠিক করে কাল সকালেই রত্নাকে ফোন করবে। ভাবতে ভাবতে সুমনা কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

গাড়ীর হর্নে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সুমনা তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। এত ভোরে গাড়ী কোথায় চলেছে? সুমনা জানালা দিয়ে দেখে ড্রাইভার রতন গাড়ী বার করছে। তিনদিন পরে দিনের আলোয় সুব্রতকে দেখলো সুমনা। একি! বড় রোগা লাগছে সুব্রতকে। শরীর ভালো আছে তো? মুখটা শুকিয়ে গেছে, জামাকাপড়গুলো ইস্ত্রী নেই, চুলগুলো রুক্ষ্ম এলোমেলো। সুমনা অস্থির হয়ে ওঠে। সুব্রত সত্যিই কি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে! সুব্রতকে কাল ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। যদি আজ সুব্রত আসে সে ফেরাবে না—ফেরাতে পারবে না। ক্ষমাই করবে সুব্রতকে। মেয়েরা তো চিরকাল ক্ষমাই করে এসেছে পুরুষদের। ক্ষমার চেয়ে পৃথিবীতে বড় কিছু নেই একথা সে বহুবার বাবার কাছে শুনেছে। কিন্তু সুব্রত কি তার পৌরুষত্বের অহঙ্কার ভুলে আবার সুমনার কাছে আসবে?

বাথরুমে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলো সুমনা। এতে মাথা ও মন দুই যেন ঠান্ডা হয়। সারা রাত দাপাদাপির পর আজ সুমনার মনের ঝড় অনেকখানি শান্ত হয়ে আসে। আয়নার সামনে চুল আঁচড়ায় সুমনা। ছোট্ট কপালে টিপ পরে। স্নান সেরে শাশুড়ীর পুজোর জোগাড় করা সুমনার রোজকার কাজ। কিন্তু একদিন এদিকে আসেনি সুমনা। আজ পুজোর ঘরে এসে দেখে শাশুড়ী এরই মধ্যে সব জোগাড় করে পুজোয় বসেছেন। সুমনা শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির কাছে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়। 'চুড়ির শব্দে ব্রজবালা দেবী চোখ খুললেন। বউয়ের দিকে চেয়ে হেসে বললেন—'কি মা, রাগ কমলো? কি ছেলেমানুষ বলো দিকি তোমরা? আজ 'সু' বাড়ী এলে আর রাগ করে থেকো না। ও ভোরেই কোথায় বেরিয়েছে। অনেক না কি কাজ আছে। সে সব সেরে ফিরতে রাত হবে। তুমি এখন যাও মা, চা খাওগে। 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম' বলে তিনি আবার পুজোয় বসলেন।

শাশুড়ীর কথায় সুমনা একটু লজ্জা পায়। একদিন সংসারের কোন কাজেই মন দিতে পারেনি। তাড়াতাড়ি নীচে এসে গণেশকে ছোটবাবুদের জন্য চা নিয়ে আসতে বলে দিল। গণেশ, ভজহরি, গোপালের মা, বউদির সাড়া পেয়ে নিজের কাজের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। গণেশ আধপোড়া বিড়িটাকে ট্যাঁকে গুঁজে ফেলে। গোপালের মা ঝাঁটা বালতি হাতে উপরে আসে। ভজহরি প্রাণপণে উনুনে হাওয়া করতে থাকে। বউদিকে সামনে পেয়ে গোপালের মা ঠকাস করে বালতিটা মেঝেতে রেখে দোক্তা খেতে খেতে বলে—'সে কথাইতো বলছিলাম গো গণেশকে, বউদিদি না থাকলে আমাদের কিছু ভাল লাগে না। কাজেই মন বসে না।' বকতে বকতে গোপালের মা ঘর ঝাঁট দিতে থাকে। সুমনা ধমকে ওঠে—'তোমাকে আর বকতে হবে না গোপালের মা। আমি দুদিন কিছু দেখিনি যেই সেই সুযোগে তোমরাও ডুব মেরেছ। মর ঘরের অবস্থাটা কি হয়েছে বল দেখি!' —'হ্যাঁগো তুমি না হলে আমাদের একদন্ড চলবে না বাপু।'—'নাও বাপু থামো

তোমাদের বউদি যদি মরে যায়।'—সুমনা বলে। ঝাঁটা মেরে গোপালের মা বলে 'কি সব অলুক্ষণে কথা যে বল বউদি, কিছু বুঝতে পারিনে।'—তোমার আর বুঝতে হবে না', বলে সুমনা সুজিতের ঘরে যাবার সময় নিজের ঘরখানা একবার দেখলো, সুব্রত বেরিয়ে গেছে, ঘরটা খালি খালি লাগছে, জুতোগুলো দরজার কাছে জমা হয়ে আছে। চাকরদের তোলবার সময় হয়নি। সুজিতের ঘরও তথৈবচ। সুজিত মুখে সাবান ঘষছিল দাড়ি কামাবার জন্য। আয়নাতে বউদির ছায়া পড়লো। পিছনে ভজহরির হাতে চায়ের ট্রে। বুরুশ নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়ালো। একটু অবাক হয়ে বউদির মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সুমনার মুখটা লজ্জায় একটু লাল হয়ে ওঠে।

চায়ে চুমুক দিয়ে সুজিত বলে—'আঃ বাঁচালে বউদি, তোমার জয় হোক। ঐ ভজহরি আর গণেশের চা খেলে মনে হয় চা এর সেন্ট দেওয়া গরম জল খাচ্ছি।' আর একবার চায়ে চুমুক দিয়ে বলে—'কি বলছিলে ঘর? ঘরের দোষ কি বল, গৃহলক্ষ্মী যদি গোঁসাঘরে খিল দিয়ে বসে থাকে তবে ঘরের শ্রী কি করে হবে?' সুমনা চায়ের কাপটা নিজের কাছে নিয়ে এসে বলে—'এবার একটি গৃহলক্ষ্মী নিয়ে এসো না ভাই।' কাপটা রেখে সুজিত বলে—'গৃহলক্ষ্মী আনবো কি নিজেই গৃহছাড়া হবো ভাবছিলাম।' 'না ভাই তুমি এবার বিয়ে করে আমাকে ছুটি দাও ভাই।' সুমনার কথায় অভিমানের সুর ফোটে। সুমনা গণেশকে চা-এর ট্রে নিয়ে যেতে বলে। সুজিত সাবান মাখা মুখটা তোয়ালে দিয়ে মুছে চেয়ারটা বউদির কাছে সরিয়ে এসে বসে।

দুজনে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে সেদিনের বিবাদ নিয়ে। দোষ দুজনেরই। কিন্তু মীমাংসা কিছু না হলেও, সুমনার মনের ঝড় যেন অনেকখানি নেমে যায়।

সুমনা গণেশকে ডেকে ছোটবাবুর ঘর পরিষ্কার করতে বলে নিজের ঘরে আসে। তিনদিন পরে এসে মনে হয় যেন তিন যুগ পরে এলো। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। খাটের বিছানা দেখলে মনে হয় না কেউ বিছানায় শুয়েছিল। ইজিচেয়ারে আধখোলা বই পড়ে আছে। অ্যাসট্রেতে ডজনখানেক পোড়া সিগারেট আর ছাই জমে রয়েছে। না খেয়ে, না ঘুমিয়ে এই ধোঁয়াগুলো খেয়ে রাত কাটিয়েছে সুব্রত। সুজিতের কথাগুলো কানে বাজে—সমস্ত জেনেও দাদাকে না খাইয়ে রেখেছ। আজ সকালে সুমনা দেখেছে সুব্রতর শ্রীহীন চেহারা।

হাঁ, মেয়ের স্নেহ, ভালোবাসা, মমতা দিয়ে পুরুষদের জয় করেছে। এটা সুজিতের থেকে সুমনা ভালভাবেই বোঝে। সুজিত আর তাকে কি বোঝাবে। সুজিত কি করে জানবে তার দিনরাত কেমন করে কাটছে। সুব্রতর বালিশে মাথা রেখে সুমনা ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। সে একেই যাবে ভেবেছিল। কিন্তু আজ সকালে সুব্রতকে দেখার পর সে প্রতিজ্ঞা তার ভেঙে গেছে। সুমনা বুঝেছে সুব্রতকে ছেড়ে, কোথাও গিয়ে সে শান্তি পাবে না। অভিমানের বর্ম আজ সে খুলে ফেলছে। সুজিত ছেলেমানুষ বক্তৃতা দিয়েই শেষ। সুমনার ব্যথা কতটুকু বোঝে।

বাইরে সুজিতের সাড়া পাওয়া যায়—'বউদি রতনের হাতে দিয়ে দাদা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে।' সুব্রতর চিঠি? ড্রাইভার এনেছে? কেন? সুমনার বুকটা কেঁপে ওঠে। বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে যতটা সম্ভব নিজেকে শান্ত রেখে দরজা খোলে। পকেট থেকে একটা ছোট্ট খাম বের করে রতন সুমনার হাতে দিয়ে বলে—'দাদাবাবু নীল সাহেবের বাড়ীতে গেছেন। রাতে গাড়ী নিয়ে যেতে বলেছেন। কথাগুলো সুমনার কানে গেল কিনা কে জানে। চিঠি পড়তে থাকে।

সুমনা,

কাল রাতে আমাকে ফিরিয়ে দিলে। ভাল করলে কি? আজ সন্ধ্যায় বোম্বে যাচ্ছি। অফিসের কাজ নিয়ে ওখানেই থাকবার চেষ্টা করবো। কোলকাতায় ফিরে কি লাভ? ফিরলে তোমার অশান্তি বাড়বে। গাড়ী, বাড়ী সমস্তই রইলো, ইচ্ছে মত ব্যবহার করতে পারো। আমার দিক থেকে কোন বাধা আসবে না। তবু একবার ভেবে দেখো, যদি কিছু বলার থাকে তিনটে থেকে চারটের মধ্যে অফিসে ফোন করতে পারো।

সুব্রত

সুজিত বউদির মুখ দেখে কিছু বুঝবার চেষ্টা করে। মুখখানা কিরকম মনে হচ্ছে না?—'কি ব্যাপার বউদি!' সুমনার সুপ্ত অভিমান আবার জেগে ওঠে। বাইরে শান্ত হয়ে সুজিতকে বলে—'কিছু না, তোমার দাদার ফিরতে দেরী হবে।'—'ও তাই বল, আমি যাচ্ছি। রতন তুমি যাও, ঘরের দরজা বন্ধ করে সুমনা চিঠিটা আবার পড়ে। ফিরিয়ে দিয়েছিল সুমনা সত্যি, কিন্তু সুমনার মনের ভেতর যে কি ঝড় বইছিল, সেটা কি সুব্রত বুঝতে পারেনি? সুব্রতকে ফিরিয়ে দিয়ে সুব্রতর চেয়ে সুমনা অনেক বেশী ব্যথা পেয়েছে। সুব্রতর কাছে হার মানবে বলেই ত সুমনা অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সে সুযোগ তো সুব্রত দিল না।

গাড়ী, বাড়ী, অর্থ সুমনা কি ঐ সবের কাঙাল? এতদিনে তার এই পরিচয় পেল সুব্রত, সুমনা নিজের মনকে শক্ত করে সুব্রতকে বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে না। সে না থাকলে সুমনা এ বাড়ীতে কোন্ অধিকারে থাকবে? সুমনাই চলে যাবে। সুব্রত বুঝুক সুমনা গাড়ী, বাড়ী, অর্থের ভিক্ষুক নয়। না; তাকেই যেতে হবে।

সুমনা পাশের ঘরে এসে ফোনের রিসিভার তুলে রত্নাকে ডায়াল করে।—'হ্যালো, হ্যাঁ, আমি রত্না বলছি। ও সুমনা? কি বললি আমার সঙ্গে রেঙ্গুনে যাবি? সে কি? হঠাৎ এ বৈরাগ্য কেন?' সুমনার উত্তর—'না, না, সত্যি বলছি যদি ব্যবস্থা করতে পারিস খুব ভাল হয় রে।' ওদিক থেকে উত্তর আসে—'আর একটু আগে খবর দিলে পারতিস আচ্ছা ধর এক মিনিট, আমি স্বামীজিকে জিজ্ঞেস করে আসি।' কিছুক্ষণ নীরবতার পর রত্না ফিরে আসে হ্যালো সুমনা, শোন তোর ভাগ্য ভাল, আমাদের একজন সহকর্মী অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি আজকের ফ্লাইটে যাবেন না। তুই তার টিকিটে যেতে পারিস।—'সত্যি?' উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সুমনা।—হ্যাঁ কিন্তু স্বামীজি জিজ্ঞেস করছিলেন তুই হঠাৎ যেতে চাইছিস কেন? আমি বললাম সেসব এয়ারপোর্টে গিয়ে ভাল করে জেনে নেবো। রেঙ্গুনে একটা শিশু হাসপাতাল খোলা হবে, তারই ব্যবস্থা করতে আমরা যাচ্ছি। তা প্রায় একমাস থাকবো। তুই অতদিন বরকে ছেড়ে থাকতে পারবি?' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারবো!' সুমনা তাড়াতাড়ি বলে। 'কিন্তু তোর ব্যাপার কি বুঝলাম না। শেষকালে বউ চুরির দায়ে হাতকড়া পড়বে না তো?' 'নারে রত্না সেসব কিছু না। আমি তোকে সব পরে বুঝিয়ে বলবো।'—'আচ্ছা সাড়ে ছটার কিন্তু প্লেন ছাড়বে, তুই তাহলে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে এয়ার পোর্টে আসিস।—'আচ্ছা রাখছি।'—'আচ্ছা', সুমনা রিসিভার নামিয়ে রেখে নিজের ঘরে আসে। হাতে চার-পাঁচ ঘণ্টা সময়। এরই মধ্যে তৈরী হয়ে নিতে হবে।

গণেশ চা-এর ট্রে রেখে যায় টি-পয়ের উপর। ব্রজবালা দেবী চা করে সুজিত, সুব্রতকে দেন— নিজের জন্য এক কাপ তৈরী করেন। চা-এর কাপ হাতে নিয়ে তিনি আবার সুমনার প্রসঙ্গ তোলেন।—'আমার বউমা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।' সুব্রত চায়ে চুমুক দিয়ে বলে 'তা তোমার অশেষ রূপগুণসম্পন্না বউমার আগমন হবে কখন?' কি ভেবে আবার জিজ্ঞেস করেন—ড্রাইভার নিয়ে গেছে না নিজেই ড্রাইভ করেছে?' ব্রজবালা দেবী উত্তর দেন—ঠাকুর ত বললো যে রতনকে ছুটি দিয়ে সুমনা নিজেই চালিয়ে নিয়ে গেছে।' —'ও' বলে সুব্রত চা-এর কাপটা নামিয়ে রেখে মুখ তুলেই ফুলগুলোর প্রতি ওর নজর পড়ে। যাঃ একদম ভুলে গিয়েছিল ফুলগুলোর কথা। এতক্ষণে বুঝি শুকিয়েই গেছে। ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে ফুলগুলো নেবার জন্য সুব্রত এগিয়ে গেল। একি? একি!—ফটো—ফ্রেমের মধ্যে একটা চিঠি মনে হচ্ছে না! সুব্রতর বুকটা ধড়াস করে ওঠে। তাড়াতাড়ি ফ্রেম থেকে চিঠিখানা বার করে আনে। সুজিত জিজ্ঞেস করে—'কার চিঠি দাদা?' —'বোধ হয় তোর বউদির।' সুব্রত ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিটা খোলে। কিন্তু কিছুতেই যেন পড়তে সাহস হচ্ছে না। তবু সাহস করে পড়তে আরম্ভ করে।

সুমনা চলে গেছে। আর আসবে না লিখেছে।

সময় হাতে বেশী নেই। সাড়ে চারটে বেজে গেছে। বেশ খানিকটা যেতে হবে এখনও। সুমনার গাড়ী চিত্তরঞ্জন এভিনিউ পেছনে ফেলে যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ ধরে দমদমের দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ রাস্তার

লোকেরা হইহই করে। সুমনা চমকে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে ব্রেক কষে। যাক্, খুব বেঁচে গেছে বুড়োটা। নইলে যে কি হতো। সুমনা আর দেরী করে না, এক্সিলেটারে চাপ দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায়। হঠাৎ সুমনা লক্ষ্য করলো একখানা গাড়ীর ছায়া ভিউমিরারে। একটা কালো অ্যাম্বাসাডার গাড়ীর ছায়া পড়েছে। সুমনা একবার পেছন ফিরে তাকাল। কিন্তু গাড়ীর মধ্যে কে বসে আছে, এটা সে বুঝতে পারল না। সুমনা ভাবে গাড়ীটা অনেকক্ষণ থেকে ওর পেছনে পেছনে আসছে; কিন্তু এতক্ষণ ও খেয়াল করেনি। সন্দিহান হয়ে ওঠে সুব্রত নয়তো? কিন্তু সুব্রত কি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ওর চিঠিটা দেখেছে। সেটা কি করে সম্ভব? ওতো, সন্ধ্যেবেলা ফিরবে বলেছিল। তবে? সুব্রত কি তাকে ফিরিয়ে নিতে আসছে, কিন্তু এতক্ষণ ও খেয়াল করেনি তো? সুমনা ভাবে, গাড়ীটা অফিসের গাড়ী বোধহয়। কিন্তু সুমনা কিছুতেই ফিরবে না। রঞ্জাকে কথা দেওয়া আছে। গাড়ীটা তীব্রবেগে বাঁক নিয়ে এয়ারপোর্টের রাস্তাটা ধরবার চেষ্টা করে। কিন্তু হঠাৎ যেন কি হয়ে যায়। অত স্পিডের মাথায় ঘুরতে গিয়ে গাড়ীটা সজোরে একটা গাছের গুঁড়িতে গিয়ে ধাক্কা মারে। একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে আসে সুমনার দেহটা স্টিয়ারিংয়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে।

সুজিত আর ব্রজবালা দেবী উদ্বিগ্নচিত্তে সুব্রতর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সুব্রত চিঠিটা পড়ে সুজিতের হাতে তুলে দেয়। 'কি ব্যাপার সু?' মা জিজ্ঞেস করেন। 'সুমনা চলে গেছে মা।' ভারী গলায় উত্তর দেয় সুব্রত। 'চলে গেছে সে কিরে?' তিনি ভীষণ আশ্চর্য হয়ে যান। 'হ্যাঁ মা চলে গেছে।' 'আমি যে বাবা কিছু বুঝতে পারছি না' ব্রজবালা দেবী বলে ওঠেন। [illegible], ওখানে গেলে নিশ্চয়ই সুমনার কোন খবর পাওয়া যাবে। তুই সব মাকে বুঝিয়ে বলিস' সুজিতকে বলে।

সুব্রত ড্রয়ার থেকে মানিব্যাগ বার করে পকেটে পোরে। এমন সময় ফোন বেজে ওঠে। সুব্রত প্রায় ছুটে গিয়েই ফোনটা ধরে। 'হ্যাঁ রায় বলছি বলুন, কি বললেন? হসপিটাল! কি সুমনা রয়? হ্যাঁ হ্যাঁ আমার স্ত্রী. কেন কি হয়েছে? কোথায়? এখন? হ্যাঁ আমি এখনই যাচ্ছি। আপনি ডাঃ ঘোষ বলছেন? আচ্ছা ঠিক আছে। আমি এখনই যাচ্ছি।' সুব্রত ফোন রেখে বলে—'সুজিত, সুমনার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, দমদমের কাছে। তুই থাক মার কাছে। আমি যাচ্ছি আর, জি, কর হাসপাতালে। সুব্রত নেমে যায়। ঘরের মধ্যে দুটি প্রাণী মূক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সুব্রত রাস্তায় একটা ট্যাক্সী ধরে। 'জলদি চলিয়ে সর্দারজী। সিধা শ্যামবাজার আর, জি, কর হাসপাতাল।' কলকাতার জনবহুল রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সীটা ছুটে যায়। হঠাৎ ট্যাক্সীটা ঘ্যাচ করে থেমে যায়। কি ব্যাপার, ও রেড লাইট সুব্রত ঘড়ি দেখে। যত তাড়াতাড়ি যেতে চায়, তত বাধা আসে। উত্তেজনায় সে সিগারেট ধরায়। ট্যাক্সী আবার চলতে শুরু করে। সুব্রত ভাবে বালীগঞ্জ থেকে শ্যামবাজার কতদূরে? ওঃ রাস্তা কি শেষ হবে না। অনেক ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে ট্যাক্সীটা অবশেষে আর, জি, করের সামনে এসে থামল। সুব্রত কোন রকমে ভাড়া মিটিয়ে গেট দিয়ে হাসপাতালের ভেতরে আসে। চারদিকে লোক, ডাক্তার নার্স ঘোরাঘুরি করছে। ডেটল আর ইথারের গন্ধে সমস্ত পরিবেশটা যেন ভারী হয়ে উঠেছে।

চওড়া সিঁড়িগুলো দিয়ে ওপরে উঠে যায়। স্টাফ নার্সকে জিজ্ঞেস করতেই সে সুব্রতকে চোদ্দ নম্বর কেবিনে যেতে বলে। সুব্রত আবার জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ডাঃ ঘোষকে ওখানে পাওয়া যাবে ত।' নার্স উত্তর দেয় 'নিশ্চয়ই। ওনারই তো কেস ওটা। আপনি লিফটে করে উঠে যান।' নার্স চলে যায় তার কাজে। সুব্রত দেখে লিফট সম্ভবত নিচে গেছে। ও আর লিফটের জন্য অপেক্ষা না করে সিঁড়ি দিয়ে তাড়িৎপদে উঠতে থাকে। নার্সকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুব্রত তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে—'আচ্ছা ডাঃ ঘোষ কোথায়?' নার্স জিজ্ঞেস করে আপনি কি মিস্টার রয়?' 'হ্যাঁ সুব্রত রয়! উত্তর দেয় সুব্রত। 'ও আচ্ছা বসুন আপনি আমি খবর দিচ্ছি ডাঃ ঘোষকে। নার্স একটা চেয়ার এগিয়ে দেয়—'সিস্টার, আমার স্ত্রী মানে সুমনা রায় কেমন আছে?' 'ব্যস্ত হবেন না, ডাঃ ঘোষ যখন ভার নিয়েছেন তখন অত চিন্তার কিছু নেই।' জুতোর হিলের শব্দ তুলে নার্স চলে যায়।

সুব্রতর দেরী সহ্য হয় না। ঘড়ি দেখছে বসছে, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। কেবিনের দরজা পর্দা দিয়ে ঢাকা। ভিতরের কিছুই দেখা যায় না। সুব্রত চেয়ার ছেড়ে করিডরে পাইচারী করতে থাকে। "নমস্কার"। ডাঃ ঘোষ সুব্রতর দিকে চেয়ে বলেন—'আসুন অস্থির হবেন না। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।' তবে কি? তবে কি? না ডাঃ ঘোষকে জিজ্ঞেস করতে ভয় করে। যদি সেই অপ্রিয় সত্যটা শুনতে হয়। সুব্রত যন্ত্রচালিতের মতো ডাক্তারকে অনুসরণ করে। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢোকে। খাটের কাছে একজন নার্স দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তার ঘোষকে দেখে একটু সরে দাঁড়ায়।

একটা ছোট লোহার খাটে শুয়ে সুমনা। বুক পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা, মুখ খোলা কিন্তু চোখ বন্ধ। বাইরে কোথায় একটু কাটাছড়ার দাগ নেই। শুধু কপালের কাছে ভুরুর উপরে একটা প্লাস্টার আটকানো আছে। সুব্রত কিছুই বুঝতে পারছে না। সুমনার মুখের দিকে চেয়ে নিশ্চল পাথর হয়ে গেছে সে। তার চলবার শক্তি যেন রহিত হয়ে গেছে। না এক-পা এগিয়ে যেতে পারছে না সুমনার কাছে। ডাঃ ঘোষের কথায় সে যেন শক্তি ফিরে পায়। 'ভেঙে পড়বেন না সুব্রতবাবু আমরা খুব চেষ্টা করেছি। মাথার ভেতরে হেমারেজ হয়েছিল। দু বোতল রক্তও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু—ডাক্তার একটু থামলেন। আপনাকে আরো আগে খবর দিতাম। প্রথমে রোগী নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। আপনার ঠিকানা পেতে দেরী হয়ে গেছে। এই কিছুক্ষণ আগে আপনার ঠিকানা পেতে আপনাকে রিঙ করি। ওনার গাড়ীটার পেছনে আমি ছিলাম। আমি যাচ্ছিলাম আমার বন্ধুকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে। আমি লক্ষ্য করলাম হঠাৎ তিনি স্পিডটা মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে দিলেন। গাড়ীটা যেন ডানদিকে ঘুরলো তারপরেই শুনলাম ভীষণ আওয়াজ। তখনই আমি বুঝেছিলাম একটা কিছু হয়েছে। গাড়ী থামিয়ে কাছে গিয়ে দেখি গাড়ীটার আর কিছু নেই। আপনার স্ত্রীর দেহটা স্টিয়ারিং আর সিটের সঙ্গে আটকে গেছে। মাথাতেই ধাক্কা লেগেছিল বেশী। ওখান থেকে রোগীকে হসপিটালে আনবার ব্যবস্থা করতে কিছু সময় লাগল।" তিনি একটা সাদা হ্যাণ্ডব্যাগ সুব্রতর হাতে দিয়ে বললেন 'এর মধ্যে কিছু চিঠিপত্র ছিল। এতেই আপনার ঠিকানা পেয়ে ফোন করি।' আমরা বহু চেষ্টা করলাম মিঃ রয় কিন্তু কেস আমাদের হাতের বাইরে। আমার আর কিছু করবার নেই। শেষের দিকে তাঁর গলার স্বর ভারী হয়ে আসে তিনি কি যেন ইঙ্গিত করলেন। সিস্টার এসে সুমনার মুখটা চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়। সুব্রত এতক্ষণেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না সুমনা নেই। সিস্টার চাদর দিয়ে মুখটা ঢেকে দিতেই সে শিউরে ওঠে। 'না সিস্টার না এ হতে পারে না।' সুব্রত সব কিছু ভুলে যায়। ডাঃ ঘোষ আর সিস্টার মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

হাঁটাপথে

ইউরোপে মেয়েরা ফুটবল খেলছে। অনেক দেশেই একাধিক মহিলা ফুটবল ক্লাব আছে। খেলার মাঠে দর্শক হয়তো তেমন হয় না। কিন্তু খেলোয়াড় মেয়েরা কারো তুলনায় কম দড় নয়। তাঁরা একইরকম কায়দায় হেড করেছেন, প্রতিপক্ষকে আটকাতে মাথার উপর দিয়ে লাফিয়েছে সেন্টার হাফ। কিছু কিছু হাস্যকর দৃশ্যেরও অবতারণা হয়েছে। একজনের পায়ে বল। প্রতিপক্ষ বাধা দিতে এসেছেন। তৃতীয়জন এসেই যত গোলমাল। জড়াজড়ি করে গড়াগড়ি। চতুর্থ বা পঞ্চম জনেরও বল উদ্ধার করতে এসে একই অবস্থা।

এমনি সপ্রমাণ দক্ষতা এবং হাসির আনন্দে অনুষ্ঠিত হলো মেয়েদের আন্তর্জাতিক ক্লাব ফুটবল প্রতিযোগিতা। সারা ইউরোপের ছেচল্লিশটি মহিলা দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। দুদিক থেকে ফাইনালে ওঠে ইংলন্ডের ফডেন লেডিস ক্লাব এবং স্কটল্যান্ডের ওয়েস্টহর্ন ইউনাইটেড ক্লাব। এই খেলায়ই সবচেয়ে হাস্যকর ঘটনাটি ঘটে। একটি সংকটপূর্ণ মুহূর্তে বল হেড করেছেন ফডেন লেডিস দলের লেফট ইন জন টেম্প। দলের বিপদ কাটাতে এগিয়ে এসেছেন ওয়েস্টহর্নের দলনায়িকা মেরি ডেভেনপোর্ট। বল আটকানোর জন্য তিনি লাফালেন। ইতাবসরে জন টেম্পের প্যান্ট আলগা হয়ে গেছে। সারা মাঠে হাসির রোল। যেমন হাসছেন দর্শক তেমনি সতীর্থরাও।

ইউরোপে মেয়েদের মধ্যে ফুটবলের প্রসার অনেককেই উৎসাহিত করবে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমরাও ফুটবল খেলতে মাঠে নেমে পড়বো। দস্তুরমতো জার্সি গায়ে বুট মোজা-অংকলেট-নীক্যাপ পরে। সেদিন অবলা বাঙালী মেয়ের দুর্নাম আরো মধুর হবে। এমনিভাবে একসময় এই কলঙ্কিত বিশেষণটাই ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হবে।

আরতি সাহা যেদিন ইংলিশ চ্যানেল জয় করলেন আমরা এমনি পুলকিত হয়েছিলাম। বাঙালী মেয়ে পুকুরে সাঁতার কাটা যাঁদের অভ্যাস সেই মেয়ে যে দুরন্ত ইংলিশ চ্যানেলের ঝুঁটি পাকড়ে ধরবে সেকথা আমরা ভাবিনি। কিন্তু সেই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। ইংলিশ চ্যানেল জয় করে আরতি মেয়েদের অভিযানের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন, নতুন প্রেরণা জুগিয়েছেন।

এমনি প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে বাংলার মেয়েরা বেরিয়ে পড়েছে তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের হাতছানিতে। একের পর এক অভিযান তারা পরিচালনা করেছে। রোণ্টি থেকে বড়া শিগ্রী পর্বতচূড়ায় উড়ছে তাদের বিজয় পতাকা। এবার সংকল্প তাদের অল্পেস অভিযান।

অভিযানের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। অজানার হাতছানিতে উদ্দাম হয়ে মেয়েরা নিত্য নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়ছে। এমনি একটি অভিযান সমাপ্ত করে ফিরে এলো চারজন মেয়ে। তারা কলকাতা থেকে পদব্রজে দীঘা যাত্রা করেন। উদ্যোক্তা নিজেরাই। যদিও এই চারজন মেয়েই কলকাতার এক্সপ্লোরারস ক্লাবের সদস্য তবু ক্লাব এই উদ্যোগে প্রত্যক্ষভাবে কোন সাহায্য করেনি। অজানায় অভিযানে উৎসাহ দেওয়াই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ডিউক-পিনাকী সেই উৎসাহেই নৌকা নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন আন্দামান। ও'রা সফল হয়েছিলেন। সে সাফল্যের আমরাও অংশীদার।

ডিউক-পিনাকীর সাফল্যই ওদের এই অভিযানে প্রেরণা জোগায়। তারপর নিজেরাই সব ব্যবস্থা করে ফেলে। ৬ নভেম্বর দীঘার পথে ওরা হাঁটতে শুরু করে। যাবার সময় ওদের আশীর্বাদ জানান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের চেয়ারম্যান শ্রীমিহির সেন এবং আরো অনেকে।

উপস্থিত সকলের এবং অনুপস্থিত অনেকের আশীর্বাদ নিয়ে চারজন মেয়ে বেরিয়ে পড়ে। ওদের পূর্ব সিদ্ধান্ত ছিল কোন টাকাপয়সা সঙ্গে থাকবে না। পথেই ওরা নিজেদের বাসস্থান ঠিক করে নেবে। শুধু সঙ্গে ছিল জামাকাপড় এবং কিছু খাবারসহ প্রত্যেকের একটি হ্যাভারস্যাক। এঁদের নেতৃত্ব দেন শ্রীমতী রমা ভট্টাচার্য। সহযাত্রীরা হলেন মীরা, স্বপ্না, মিনতি। পথ দেখানোর দায়িত্ব নেয় স্বপ্না। কাঁথিতে তার বাড়ি।

চারজনই পড়ুয়া। যাত্রা শুরুর পূর্ব মুহূর্তে মনটা একটু ভারী ঠেকছিলো। পথে পা দিয়েই সব হালকা। একদিকে তখন পথ চলার আনন্দ আর অন্যদিকে অভিযান-সাফল্যের দুর্জয় নেশা। চোখমুখে দুরন্ত স্ফূর্তি। মনে কঠোর সংকল্প। ওরা চলছে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে দুলছে লক্ষ কোটি নারী হৃদয়ের স্পন্দন, আশা-আকাঙ্ক্ষা শুভেচ্ছা।

চলার পথে এক-একটি গ্রাম পার হয়ে গেছে আর পথের আদর-অভ্যর্থনায় ওরা মুগ্ধ। দলে দলে মহিলা-পুরুষ এগিয়ে এসেছেন। ওদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। সাদর আতিথ্যে বরণ করেছেন। ঠাঁই দিয়েছেন নিজেদের ঘরে। খাওয়াদাওয়া শোয়ার সব ব্যবস্থাই তাঁরা করে দিয়েছেন।

অগ্রগতির পথে এক একটা লোকালয় ওরা পেছনে ফেলে যাচ্ছে। জনসাধারণের উৎসাহ উদ্দীপনায় ওরা অভিভূত হয়েছে। কখনো যদি ক্লান্তি আসে, মন অবসাদগ্রস্ত হয় ওদের ঘিরে কৌতূহলী নরনারীর ভিড় এবং আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা সব ক্লান্তি দূর করে দেয়। অবসাদ দূরে হয়ে মন নতুন উদ্দীপনায় ভরে ওঠে। পথ চলা শুরু হয় দ্বিগুণ আনন্দে।

দিগন্তজোড়া মাঠ ধানক্ষেতের। তার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে উদ্দাম বাতাস। ধানের উপর দিয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। মনে হয় দীঘার সমুদ্র ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছে অপরূপ তরঙ্গভঙ্গে। কত নাম না জানা পাখি। ওদের কিচিরমিচির। আনন্দ আর ধরে না। সেই আনন্দে ওরা গলা ছেড়ে গান ধরে। অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ে সে গানের রেশ। ওদের গান শুনে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে এসেছে। ওরা গানও শুনিয়েছে।

গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশে মন উদাস হয়ে গেছে। মাটির বাড়ি, নারকোলের বন মনকে উদাস করেছে। পুকুরে ফুটন্ত পদ্মফুল, কচুরিপানার ফুল মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তার ওপর গ্রামবাসীদের মন-খোলা কথা আর মিষ্টি পাখির গান মনকে নাড়া দেয়। কলকাতার মেয়েরা এরকম পায়ে হেঁটে পাড়ি জমানোয় গ্রামের লোকেরা আনন্দে উচ্ছল।

পথ চলতে চলতে সন্ধ্যা নেমেছে। ওরা আশ্রয় নিয়েছে কোন গেরস্থর বাড়ি। সাদর অভ্যর্থনা। শুধু রাত নয়, দিনেও। কোথাও ওরা পুকুরে স্নান করেছে। এমন আন্তরিকতা অকল্পনীয়।

পথে পথে উলুধ্বনি। শঙ্খধ্বনি। দেখতে দেখতে এসে গেল কাঁথি। দীঘার দূরত্ব আর মাত্র ২১ মাইল। রাত চারটায় উঠে ওরা যাত্রা শুরু করে। আর তর সইছে না। পা দ্রুত চলে। দূরত্ব কমে। অভ্যর্থনা বাড়ে। দুপাশে ফুলের মালা আর তোড়া নিয়ে অপেক্ষমান নরনারী। এই সাফল্যে ও'রা সমান আনন্দিত। ১১ নভেম্বর দীঘায় পৌঁছুলো ওরা। পথশ্রমে তখন ওরা ক্লান্ত। কিন্তু সাফল্যের আনন্দে এবং অভিনন্দনের জোয়ারে আরো আনন্দিত।

নতুন জয়ের গৌরবে পথযাত্রার অভিযানে ওরা পথিকৃৎ।

—প্রমীলা

যাদুর রাজা কার্ল হার্টজ্

যাদুর ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে আমেরিকার স্থান সর্বোচ্চ একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। হ্যারি হুডিনি থেকে আরম্ভ করে দান্তে, চুং লিং সু (স্কচ আমেরিকান) হ্যারী কেলার কার্ল হার্টজ্ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত যাদুকরেরাই এর প্রমাণ।

এদের প্রায় প্রত্যেকেই ম্যাজিকের খেলা দেখাবার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং বিপুল খ্যাতি এবং অর্থ অর্জন করেছেন। কার্ল হার্টজ্ যাদুর খেলা দেখাবার জন্য বহু দেশ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন।

এই রকম ভাবে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি একবার চীন দেশে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর যাদু-নৈপুণ্যে এবং স্বভাব-কৌশলগুণে তিনি স্বল্পকালের মধ্যেই সে দেশে শ্রেষ্ঠ যাদুকর হিসেবে স্বীকৃত হলেন।

চীনের অনেক বড় বড় শহরে খেলা দেখাবার পর তিনি যখন চীন ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন সে দেশের কয়েকজন বন্ধু তাঁকে সাংহাই শহরটা ঘুরে যেতে বললেন। বলা বাহুল্য যে তিনি চীনের অন্যান্য শহরগুলোয় খেলা দেখালেও সাংহাই শহরে দেখাননি। চীনের পূর্বদিকের একটি অত্যন্ত কর্মবহুল বন্দর বলেই সাংহাইতে সম্ভবতঃ কার্লের খেলা দেখাবার জন্য আগে থেকে কোনরকম বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়নি।

যাই হোক কার্ল বন্ধুদের নির্দেশ পালন করবেন বলেই ঠিক করলেন। তিনি তল্পিতল্পা গুটিয়ে সাংহাই বন্দরের দিকে যাত্রা করলেন। সাংহাইতে পৌঁছে কিন্তু কার্ল একটি সমস্যার সম্মুখীন হলেন। তিনি জানলেন যে, সাংহাইতে একটিই মাত্র থিয়েটার হল আছে, যেখানে তিনি খেলা দেখাতে পারেন, কিন্তু সেই হলটিতে তখন চীনদেশের একটি নাটক চলছিল। তিনি যখন জানতে পারলেন যে এই ধরণের নাটকগুলো দীর্ঘদিন ধরে একনাগাড়ে চলে তখন তিনি আরো বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন।

নাটক শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার মত অবসর বা ধৈর্য তাঁর ছিল না। আর তা ছাড়া দীর্ঘদিন অপেক্ষা করলে তাঁর আর্থিক ক্ষতি হবে প্রচুর।

অন্যদিকে এতদূরে এসে খেলা না দেখিয়ে তিনি ফিরে যাবেন, তাও তাঁর মনোমত নয়। তাঁর মত একজন বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর সাংহাই শহরে খেলা দেখাবেন একথা বিপুলভাবে প্রচারিত করার পর তিনি ফিরে যাবেন কোন্ মুখে?

তাছাড়া তাঁর বন্ধুরা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, সাংহাই শহরে নাম করতে পারলেই তাঁর প্রতিভা সত্যিকারের স্বীকৃতি পাবে এবং কৃতী যাদুকর হিসেবে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ, সাংহাই বাণিজ্যকেন্দ্র হলেও সাংস্কৃতির তীর্থকেন্দ্র হিসেবে চীন দেশে এর আদর বিস্তর।

বাণিজ্যকেন্দ্র বলে এই শহরে খেলা দেখালে আশাতীত আর্থিক লাভ হবে এ কথাও কার্ল বুঝতে পেরেছিলেন।

কার্ল রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটা করা চাই একথা তিনি ঠিকই বুঝলেন কিন্তু কি করবেন সেটাই ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। সাংহাই শহরের রাস্তা দিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মনে সেই এক চিন্তা। হঠাৎ বড় রাস্তার কাছাকাছি একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা মাঠ পড়ে আছে দেখে তিনি খুব অবাক হয়ে গেলেন। এই শহরে যে কোথাও একটু ফাঁকা জায়গা থাকতে পারে তা তিনি ভাবতেই পারেননি। তাই এই প্রকাণ্ড মাঠটা দেখে তিনি অবাক হলেন। এটিকে যে কেন ফেলে রাখা হয়েছে তা তিনি ভেবে পেলেন না। যাই হোক সংগে সংগে তিনি এ নিয়ে আর চিন্তা করেননি। অন্যান্য ছোটখাট চিন্তা ভাবনার মধ্যে ফাঁকা মাঠ দেখার কথা তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন। পরে আবার যখন তাঁর সেই দৃশ্যের কথা মনে পড়লো তখন চট করে তাঁর মাথায় এক প্ল্যান খেলে গেল। মাঠটার মালিক কে—তা তিনি খোঁজ-খবর করে জেনে নিলেন।

প্রভাতকুমার দত্ত

তারপর তিনি বেরিয়ে পড়লেন মালিকের সঙ্গে দেখা করতে। মালিককে পাকড়াও করে তিনি তাঁকে জানালেন যে মাঠটি তিনি (কার্ল) এক মাসের জন্য ভাড়া নিতে চান। কত ভাড়া দিতে হবে জিজ্ঞেস করায় মালিক বললেন যে তাঁর ভাড়ার প্রয়োজন নেই। মাসখানেকের জন্য মাঠটি নিয়ে কার্ল ব্যবহার করতে পারেন। ভদ্রলোকের কথা শুনে কার্ল অবাক হলেন। কিন্তু এই সুযোগটি তিনি হাতছাড়া করতে চাইলেন না।

অতঃপর কার্ল একজন চীনা কণ্ট্রাক্টরের সংগে যোগাযোগ করলেন। কার্ল তাঁকে বোঝালেন যে ঐ মাঠটিতে তিনি একটি অস্থায়ী কাঠের তৈরী থিয়েটার বানাতে চান। কার্লের কথা শুনে কন্ট্রাক্টর ভদ্রলোক তো অবাক।

কার্ল তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে তাঁর ম্যাজিকের খেলা দেখাবার জন্যই প্রেক্ষাগৃহ দরকার। তিনি একমাসের জন্য খেলা দেখাবেন সুতরাং থিয়েটারটি অস্থায়ী হলঘরের মতই গড়া শ্রেয়। কার্ল তাঁকে আরো বুঝিয়ে দিলেন যে, হলঘরটি তৈরী করতে গিয়ে তাঁকে মোটেই কাঠ কিনতে হবে না। কাঠ ভাড়া করে আনলেই চলবে। এতে খরচও অনেক কমে যাবে।

থিয়েটারটি গড়ে তুলতে কিরকম খরচ পড়বে তা জানতে চাওয়ায় চীনা কন্ট্রাকটর কয়েক মুহূর্ত কি ভাবলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন যে চট করে তাঁর পক্ষে হিসেব করা সম্ভব নয়। থিয়েটারটি গড়ে তুলতে লোক লাগবে প্রচুর, কাঠও কম লাগবে না।

কার্ল হার্টজ্ হাল ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। তিনি কায়দা করে প্রশ্ন করলেন, "আপনি এই কন্ট্রাকটারি লাইনে রয়েছেন, যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন; আপনি চেষ্টা করলে মোটামুটি একটা হিসেব আমায় নিশ্চয়ই দিতে পারেন।"

ভদ্রলোকটি উত্তরে বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আমার পক্ষে ব্যাপারটা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এতবড় প্রেক্ষাগৃহ এর আগে আমি আর কখনো করিনি। তা ছাড়া আপনার মত এমন প্রস্তাবও আগে আমার কাছে কখনো আসেনি।"

এমন সঙ্কটে কার্ল এর আগে কখনো পড়েছেন বলে মনে পড়ল না। কি করবেন তিনি? কি করতে পারেন? এই শহরে এসেও খেলা না দেখিয়ে তিনি ফিরে যাবেন? না না তা হয় না।

তিনি কন্ট্রাক্টরকে বললেন, "ঠিক আছে, আপনি থিয়েটারটি সত্বর গড়ে তুলুন। যা খরচ হবে আমাকে পরে বিল করে দেবেন। আমি দিয়ে দেব। তবে খরচ যতদূর সম্ভব কম করার চেষ্টা করবেন এবং থিয়েটারটি যাতে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি গড়ে তোলা যায় সেদিকে সতর্ক থাকবেন।"

কাজ সুরু হয়ে গেল। চীনা ভদ্রলোকের আত্মবিশ্বাসের যতই অভাব থাক কার্যে দক্ষতার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তিনি বিস্তর লোক কাজে লাগিয়ে নিজে তদারকি করে মাত্র দু-সপ্তাহের মধ্যে থিয়েটারটি শেষ করে ফেললেন। বিরাট কাঠের বাড়ীটি যে দেখলো সেই তাজ্জব বনে গেল। কার্লও চীনা ভদ্রলোকের কর্মদক্ষতায় খুব খুশী হলেন।

তিনি ভাবতেই পারেননি যে একজন সামান্য চীনা কন্ট্রাক্টরের পক্ষে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত সুন্দর একটা বাড়ী গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তিনি চীনা ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে তাঁর কাজের প্রশংসা করলেন। প্রশংসা শুনে কন্ট্রাক্টর তাঁকে যথেষ্ট ধন্যবাদ জানালেন। তিনি কার্লকে বললেন, "আমার কাজ যে আপনার পছন্দ হয়েছে তাতে আমি সত্যিই আনন্দিত হয়েছি।"

একটুখানি চুপ করে তিনি আবার বললেন, "আমি কি আপনাকে এখন আমার বিলটি দিতে পারি?'

ভদ্রলোক উত্তরের অপেক্ষা না করেই হঠাৎ একটা লম্বা লাঠি বার করলেন। হার্টজের মনে হল যে জগতের একজন সেরা ম্যাজিসিয়ান কার্ল হার্টজ যেন একজন চীনা কন্ট্রাকটরের অফিসে বসে ম্যাজিক দেখছেন।

হার্টজ আরো দেখলেন যে সেই লম্বা লাঠিটার গায়ে সুদীর্ঘ একটি কাগজ জড়ানো। কাগজটার দৈর্ঘ্য কত হবে তা তিনি সঠিক বুঝতে না পারলেও সেটা যে

বেশ কয়েক গজ তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না। কাগজটা খুলে হার্টজ যখন দেখলেন যে তাতে চীনা ভাষায় অসংখ্য ক্ষুদে ক্ষুদে সংখ্যা লেখা আছে তখন তাঁর চক্ষু কপালে উঠলো।

এই বিলটি মেটাতে গেলে তিনি যে সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরবেন সে বিষয়ে তাঁর আর কোন সন্দেহই রইলো না। তিনি চীনা ভদ্রলোকটিকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁকে কত পাউন্ড দিতে হবে তখন কন্ট্রাকটর জবাব দিলেন যে তিনি পাউন্ডের সঙ্গে চীন দেশীয় মুদ্রার কি সম্পর্ক তা জানেন না। তা ছাড়া তার হিসেবটা পুরো জুড়তে হবে।

কার্লের অবস্থা সঙ্গীন। তিনি কাছাকাছি একটা ব্যাঙ্ক থেকে একজন কেরাণীকে ধরে নিয়ে এলেন। বিল বাবদ তাঁকে মোট কত পাউন্ড দিতে হবে তার হিসেবটা তিনি কেরাণীকে করে দিতে বললেন।

ব্যাঙ্ক কেরাণীটি বিলের কাগজটি হাতে নিয়ে অত্যান্ত সাবধানে প্রত্যেকটি সংখ্যা বা অঙ্ক যোগ করে যেতে লাগলেন।

এদিকে কার্ল নিজের বোকামির জন্য আঙুল কামড়াতে সুরু করেছেন। তিনি যতই ভাবছেন যে এই বিলটি মেটাতে গিয়ে তাঁকে বেশ কয়েক হাজার পাউন্ড গচ্চা দিতে হবে ততই তাঁর নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। একজন সাধারণ অশিক্ষিত চীনা কন্ট্রাকটর তাঁর মত প্রতিভাশালী বুদ্ধিমান আমেরিকান যাদুকরকে হাতের মুঠোয় টিপে মারবে এ তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর মনে হল তাঁকে যেন কেউ কৌশল করে আগুনের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, কোনো দিকে পালাবার রাস্তা নেই।

তিনি অধীর হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "কি হিসেবটা এখনো শেষ হল না?"

তাঁর চীৎকারে ব্যাঙ্ক কেরাণীটি মৃদু হাসলেন। বললেন, "পুরোপুরি হিসেবটা করতে পারলুম না তবে এটুকু বলতে পারি যে সব মিলিয়ে বিলটার পরিমাণ দশ পাউন্ডের কাছাকাছি।"

দশ পাউন্ড! কার্ল যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। কিন্তু সত্যি-সত্যিই বিলটির পরিমাণ দশ পাউন্ডের মতই ছিল এবং কার্লকেও মাত্র সেই পরিমাণ অর্থই দিতে হয়েছিল।

কার্ল হার্টজের এই থিয়েটারটি যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সস্তা থিয়েটার এতে কারুর কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। তাছাড়া সারা পৃথিবীতে থিয়েটার গড়ার ইতিহাস ঘাটলেও এত তাড়াতাড়ি গড়ে ওঠা অন্য কোন থিয়েটারেরই খোঁজ পাওয়া যাবে না।

পুরো একমাস ধরে হার্টজ তাঁর নবনির্মিত থিয়েটারে খেলা দেখালেন। প্রতিভাশালী যাদুকর হিসেবে তিনি নাম কিনে ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর শো দেখার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। খুলে সাংহাই শহরে তাঁর যে আর্থিক লাভ হল তার পরিমাণ অকল্পনীয়। অতুলনীয় খ্যাতি অপরিমেয় অর্থ উপার্জন করে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে চীন দেশ ত্যাগ করলেন।

ফাঁকা মাঠে কাঠের থিয়েটার গড়ে তোলার কল্পনা একজন সাধারণ মানুষের মাথায় কিছুতেই আসতো না, কিন্তু কার্ল হার্টজ তো সাধারণ নন। অসাধারণ চতুর এবং কল্পনাপ্রবণ না হলে তাঁর পক্ষে অত দ্রুত সাংহাইতে খেলা দেখানো সম্ভবপর হত না। তা ছাড়া তিনি সাহস করে যে বিরাট ঝুঁকি নিয়ে থিয়েটার গড়ার হুকুম দিয়েছিলেন সেটাও সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। অনেকে বলতে পারেন, এই ধরণের ঝুঁকি নেওয়াটা মোটেই বুদ্ধি বা যুক্তির পরিচয় দেয় না। আমি বলবো যে যাঁরা এই কথা বলেন তাঁরা তাঁদের জীবনকে একই বৃত্তের পরিধির ওপর নিরন্তর সঞ্চরণশীল করে রাখতে ভালবাসেন, তাঁরা সহজ, স্বচ্ছন্দ, অভ্যস্থ, পূর্বনির্দিষ্ট জীবন-গণ্ডীর বাইরে এক পা-ও বাড়াতে সাহস করেন না।

এই বাঁধন ছেড়ে যাঁরা সুদূরের আহ্বানে সাড়া দিতে এগিয়ে যান তাঁরাই জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যান। আমেরিকা আবিষ্কার তাঁদেরই ভাগ্যে লেখা থাকে। এই ধরণের ঝুঁকি নিলে যে প্রতিবারেই সাফল্য লাভ করা যাবে তা সত্য নয়। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল ঝুঁকি নেওয়ার সাহস। এই সাহস কার্ল সারাজীবন ধরেই দেখিয়ে গেছেন। বলা বাহুল্য সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে তাঁর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি বিফল হয়েছেন। কিন্তু তাঁর অসাধারণত্ব এই যে তিনি কখনো হাল ছাড়েন নি। তাই একদা সামান্য নদীর জলের ঢেউতে যে নৌকা ওলট-পালট খেয়েছে সেই একদিন তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগর-পারের গৌরব অর্জন করেছে।

কার্ল হার্টজের আসল নাম লুই মর্গেনস্টাইন। ঊনিশ শতকের শেষার্ধের প্রথমাংশে এক ইহুদী পরিবারে সান ফ্রান্সিসকো শহরে তাঁর জন্ম হয়। ঐ শহরেরই অনভিজাত পাড়ায় কার্লের বাবার একটি দোকান ছিল। দোকানটা দেখাশুনো করার ভার কার্ল নেন—এই তাঁর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কার্ল তাঁর সে ইচ্ছায় বাদ সাধলেন। ইতিমধ্যেই তিনি যাদুকর হবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে ফেলেছেন।

একজন খ্যাতনামা যাদুকরের একদিনের খেলা দেখে কার্ল এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি সেদিনই দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন যে, তাঁকে যাদুকর হতেই হবে। এই খ্যাতনামা যাদুকরের নাম—দি গ্রেট হারমান।

কার্ল প্রথমেই কয়েকটি যাদুর কৌশল শিখতে লাগলেন। অন্য কারুর সাহায্য না নিয়ে নিজে নিজেই তিনি কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে লাগলেন। তার চেষ্টার মধ্যে আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার পরিমাণ এতই বেশী ছিল তিনি খুব শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে বাইরের দর্শকদের সামনে তিনি তাঁর ম্যাজিকের খেলা দেখাবার উপযুক্ত হয়ে উঠেছেন। এই সময়ে সব যাদুকরের ক্ষেত্রেই যে প্রশ্নটি গুরুতর হয়ে দেখা দেয় তাঁর জীবনেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না।

তিনি খেলা দেখাবার উপযুক্ত হয়ে উঠেছেন বটে কিন্তু তাঁকে খেলা দেখাবার কাজে নিয়োগ করবেন কে? এই সমস্যার সঙ্গে তরুণ সাহিত্যিকের প্রকাশক সন্ধান করার সমস্যার একটা বিশেষ মিল আছে বলে মনে হয়।

এই সময়ে তাঁদের পারিবারিক জীবনেও নানা বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল। কার্লের বাবা তাঁর দোকানটি বেচে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কাছাকাছি আর একটি দোকানে তিনি কার্লের একটা চাকরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কার্লের ম্যাজিক করার নেশা রক্তে মিশে গিয়েছিল। তিনি দোকানের কাজ করার মধ্যেই ম্যাজিকের খেলা দেখাতে সুরু করেছিলেন। দোকানের মালিকের পক্ষে এমন দারা সৃষ্টিছাড়া কর্মচারীকে বরদাস্ত করা সম্ভব হোল না, সুতরাং বরখাস্তই করতে হল।

ম্যাজিকের প্রতি আন্তরিকতার অভাব থাকলে এই একটি ঘটনাতেই কার্লের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হত। কিন্তু তাঁর ম্যাজিক-নেশা তাঁকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তিনি এর পরও অনেকগুলি ভাল চাকুরী জুটিয়ে ছিলেন বা বাড়ীর চাপে জোটাতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু একই কারণে তার প্রত্যেকটা থেকে তিনি বরখাস্ত হয়েছেন।

কার্লের ব্যাপার দেখে তাঁর পিতামাতা রীতিমত বিচলিত হয়ে উঠলেন। কার্লকে কোনমতেই তাঁদের বশে আনতে না পেরে তারা তাঁকে এই বলে ভয় দেখালেন যে, যদি কার্ল তার ম্যাজিকের নেশা না ছাড়েন তবে তাঁর ম্যাজিকের সমস্ত যন্ত্রপাতি তাঁরা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। কার্ল কিন্তু এতে মোটেই ভয় পাননি বা তাঁর স্বপ্নের পথ থেকে ফিরে আসেন নি।

কার্লের অনমনীয় মনোভাবে তাঁর বাবা-মা অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁরা সত্যিই তাঁর ম্যাজিকের যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট করেছিলেন, কিন্তু কার্ল তখন 'দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা'।

নিজের ওপর প্রবল আত্মবিশ্বাস থাকলেও একটা আশ্চর্যের কথা এই যে, প্রথম দিন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চের ওপর খেলা দেখাতে গিয়ে তিনি চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মঞ্চভীতি তাঁকে এমন ভাবে পেয়ে বসেছিল যে, তাঁর সমস্ত খেলাই ভুল হয়ে গিয়েছিল এবং দর্শকদের চীৎকারের তাড়নায় তাঁকে মঞ্চ থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল।

প্রথম দিনের খেলাতেই তিনি মারাত্মক রকমের গোলমাল করে ফেলেছিলেন। কোন একটি খেলায় তাঁকে রিভলবার চালাতে হতো। তিনি সেদিন স্নায়ু ঠিক রাখতে না পেরে ভুল করে এমন একটি রিভলবার চালালেন, যার মধ্যে একটি আসল এবং তাজা গুলী পোরা ছিল। উইংসের মধ্যে দাঁড়ানো একজনের কানে এই গুলীটা লাগে এবং তাঁর কান কেটে যায়। এই মারাত্মক ভুলের ফলে কাউকে মেরে ফেলাও কার্লের পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র ব্যাপার ছিল না।

সৌভাগ্যক্রমে এই 'কানকাটা' যাদুকরকে তাঁর অপরাধের জন্য কোনও বিচারের সম্মুখীন হতে হয়নি। কার্ল নিজের শোচনীয় ব্যর্থতায় এতই মুসড়ে পড়লেন যে, বাইরের দর্শকদের কাছে তিনি আর কোনদিনই ম্যাজিক দেখাবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করলেন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই যখন তিনি একটি ভ্রাম্যমাণ দলের কাছ থেকে ম্যাজিক দেখাবার আহ্বান পেলেন তখন তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা ভুলে সেই দলে যোগদান করলেন।

সাউথ ক্যালিফোর্ণিয়ার কয়েকটি শহরে দলটির খেলা দেখাবার কথা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে দুদিন খেলা দেখাবার পরেই দলে ভাঙ্গন ধরলো। দলের ম্যানেজার কোথায় গা ঢাকা দিল কে জানে। কার্ল এক অকূল পাথারে পড়লেন। সানফ্রানসিসকোয় ফিরে আসার মত টাকাও তখন কার্লের কাছে ছিল না। সোনার তৈরী একটি 'বন্ধনী' বন্ধক দিয়ে তিনি সানফ্রান্সিসকোয় ফিরে যাবার ভাড়া জোগাড় করলেন।

এই ধরনের ঘটনা কার্লের জীবনে বার বার ঘটেছে। পথে ঘাটে খেতে খেতে তিনি বারে বারেই বিপদে পড়ে গেছেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই তিনি আর একটি ভ্রাম্যমান দলের থেকে খেলা দেখাবার আহ্বান পেলেন। এই দলটির ম্যানেজার লোকটি সুপরিচিত ছিলেন। কার্ল অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে চুক্তি স্বাক্ষর করে ফেললেন।

কয়লা খনি অঞ্চলের কয়েকটি শহরে খেলা দেখাবার জন্য এই দলটি বেরিয়ে পড়লো। প্রথম যে শহরে খেলা দেখাবার কথা সে শহরের নাম পেটালুমা। কার্ল পেটালুমায় পৌঁছে দেখলেন দলের অন্যান্য লোকজন তেমন বিশেষ কেউ নেই। দুজন অভিনেতা এবং একজন অভিনেত্রী ছাড়া কাউকেই দেখা গেল না। ম্যানেজার কার্লকে জানালেন যে দলের অন্যান্য সভ্যেরা এখনো এসে পৌঁছয় নি। অতঃপর ম্যানেজার তাঁর হাতে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা এক তাড়া পান্ডুলিপি ধরিয়ে দিলেন।

পান্ডুলিপিটি হাতে পেয়ে কার্ল অবাক। বিস্ময়ের সুরে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এটা কি?'

'এটা তোমার পার্ট'। আমরা 'এইচ এম এস পিনাফোর'র নাটকটা মঞ্চস্থ করছি তা জানো না?'

মুহূর্তের জন্য কার্ল বোবা বনে গেলেন। তারপর প্রতিবাদের সুরে বললেন, 'চুলোয় যাক আমার পার্ট'। আমি অভিনয় জানি না, আমি একজন যাদুকর।'

ম্যানেজার বললেন, 'আরে তোমার ওসব ছেঁদো কথা রাখো তো বাপু। ম্যাজিক সম্পর্কে তুমি তো কিছুই জানো না, তুমি আবার ম্যাজিক দেখাবে কি? আমাদের গীতিনাট্যে তোমাকে বাজনা বাজাতে হবে।'

'আমি বাজাতে জানি না। আমার পক্ষে কোনক্রমেই বাজানো সম্ভব হবে না।' — কার্ল গম্ভীরভাবে প্রতিবাদ করে ওঠেন। আগেই বলেছি ম্যানেজারটি নিজের লাইনে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর দক্ষতা কম ছিল না। কার্লের মত এক-গুঁয়ে ছেলেকে কি করে বশে আনতে হয় তা তাঁর জানা ছিল। তিনি কার্লের প্রতি-বাদকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'শোন ছোকরা, তুমি যদি তোমার অংশ অভিনয় না করো তবে তুমি সোজা বাড়ী চলে যেতে পারো। কিন্তু হ্যাঁ, টাকাকড়ি কিছুটি পাবে না। স্রেফ হেঁটে ফিরতে হবে।'

কার্লের শরীর রাগে জ্বলতে লাগলো কিন্তু ম্যানেজারের কথা শোনা ছাড়া আর অন্য পথ রইলো না।

বলাই বাহুল্য যে, সেটি পুরোপুরি ব্যর্থ হল। ঐ শহরের ছাত্ররা দলে দলে 'শো' দেখতে এসে যখন বুঝলো যে মাত্র চারজন তার অনেক বেশী সংখ্যক চরিত্রে রূপ দেওয়ার ব্যর্থ এবং হাস্যকর প্রচেষ্টা করে চলেছে তখন তারা রীতিমত ক্ষেপে গেল। থিয়েটারের মধ্যেই নানা রকম জীব-জন্তুর ডাক শোনা যেতে লাগলো এবং স্টেজের ওপরে ঝাঁকে ঝাঁকে পচা ডিম পড়তে শুরু করলো। ম্যানেজার এবং তার সাঙ্গো-পাঙ্গোদের কিছুই করার ছিল না। পরের দিনই পুরো দলটি সানফ্রান্সিসকোয় ফিরতে বাধ্য হল।

জীবন সম্পর্কে কার্ল এইভাবেই ধীরে ধীরে অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে লাগলেন। কার্ল আপাতত পুরোনো দোকানের কাজেই লাগলেন। এই কাজে তিনি এমন খাটাখাটি করতে লাগলেন যে, তাঁর বাবা-মা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা আশা করলেন যে কার্ল এবারে ভাল ছেলের মত কাজকর্ম করবে এবং স্বাভাবিক-ভাবে জীবন কাটাবার চেষ্টা করবে। কার্ল বাইরে-বাইরে যতই ম্যাজিক থেকে দূরে আসুক না কেন, ভেতরে ভেতরে তিনি তার চেয়েও বেশী ম্যাজিকের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেছেন। মন দিয়ে কাজকর্ম করার তাঁর একটিই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল—আর সে উদ্দেশ্য হল কিছু অর্থ সঞ্চয় করা।

তিনি সংকল্প করেছিলেন যে এবারে কোন দলের সংগে তিনি আর ভিড়বেন না। একা-একাই ম্যাজিকের খেলা দেখাতে বেরিয়ে পড়বেন। সুদূর তিন হাজার মাইল দূরে কানসাস শহরকেই তিনি তাঁর খেলা দেখাবার স্থান বলে বেছে নিলেন।

ইতিমধ্যে অবশ্য কাজকর্ম করার ফাঁকে ফাঁকে তিনি গোপনেই বিভিন্ন জায়গায় ম্যাজিকের খেলা দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন। এইভাবে একদিকে তিনি মানসিক সাহস এবং অন্যদিকে দক্ষতা অর্জন করতে লাগলেন।

প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হবার পর কার্ল অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পথে পা বাড়ালেন। সুদূর তিন হাজার মাইল দূরের কানসাস শহরে যাওয়ার জন্য তিনি ট্রেনে চাপলেন। দুর্দান্ত গরমের মধ্যে একটা নোংরা দুর্গন্ধময় ট্রেনের কামরায় বসে উচ্চাভিলাষী কার্লের পুরো এগারোটা দিন যে অসহনীয় অবস্থার মধ্যে কেটেছিল তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

টিনের কৌটোয় পোরা মাংস এবং তরকারি দিয়েই তাঁর ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে হত। স্নান করার সুযোগ ঘটেনি। কানসাস শহরে নেমে তিনি প্রথমেই মুখ-হাত-পা ভাল করে ধুয়ে নিলেন। তারপরেই স্টেশনেই দীর্ঘ উপবাসী যেমন করে গোগ্রাসে গিলতে থাকে, তেমনিভাবে খাবার গিলতে লাগলেন। এইভাবে খাওয়ার ফলে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে তাঁকে হজমের গোল-মালে ভুগতে হয়েছিল।

যাই হোক কানসাস শহরের সবচেয়ে ভাল হোটেলে গিয়ে তিনি ঘর ভাড়া করলেন। সেদিন সন্ধ্যায় হোটেল-গেটের বাইরের রাস্তায় পায়চারি করতে করতে কার্ল এক যুবকের দেখা পেলেন। যুবকটি পাশের একটি দোকানের জানালা কিভাবে সাজাতে হবে, সে-সম্পর্কেই অপর একটি লোককে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। কার্লের যুবকটির সঙ্গে জমিয়ে গল্প করার ইচ্ছে হল। গল্প করতে করতে কার্ল জানতে পারলেন না কখন তিনি তাঁর জীবনের দুঃখের কাহিনী যুবকটির কাছে উজাড় করে দিয়েছেন।

যুবকটির নাম হল হ্যানো। সে ঐ দোকানেরই কর্মচারী। হ্যানো কার্লকে বললেন, 'আপনি থিয়েটার কমিকেই খেলা দেখাতে চান?' থিয়েটার কমিক কানসাস শহরের শ্রেষ্ঠ থিয়েটার হল। হ্যানো বলে চললেন, 'আমার মনে হয়, আপনাকে এখনো বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। থিয়েটারটা এখন সারাচ্ছে এবং তিন সপ্তাহের আগে সারানো শেষ হবে কিনা সন্দেহ আছে।'

কার্ল মনে মনে একটু চোট খেলেন। মুখে বললেন, 'তাই নাকি? তবে তো বড়ই মুশকিল হলো। শহরের সবচেয়ে ভাল হোটেলে আমি উঠেছি। আমার কাছে যা টাকা আছে, তাতে এক সপ্তাহও চলবে না, আমি তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করি কিভাবে?'

কানসাসের সমস্যা অনেকটা সাংহাই শহরের সমস্যারই মত। অবশ্য সাংহাই শহরে যখন তিনি থিয়েটার হল খালি না পাওয়ায় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তখন তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ যাদুকর এবং স্বয়ং সমস্যার সমাধান করেছিলেন। কানসাস শহরে অবশ্য তিনি যখন এই সমস্যার সম্মুখীন হলেন তখন তিনি তরুণ এবং যাদুকর হিসেবে তখনো তাঁর নাম হয়নি। কিন্তু এই প্রথম ক্ষেত্রেও সমস্যার সমাধান হয়েছিল এবং তা করেছিলেন হ্যানো।

হ্যানো বললেন, 'আরে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। আপনি ও-হোটেল ছেড়ে দিন। আপনার মালপত্র নিয়ে আমার ঘরেই চলে আসুন। যতদিন না আপনি খেলা দেখাতে শুরু করছেন, ততদিন আপনি আমার কাছেই থাকবেন।' হ্যানোর কথায় কার্ল হাতে স্বর্গ পেলেন। সাহায্যের হাতটি এখানে এমন অযাচিতভাবে এসে উপস্থিত হয়েছে যে কার্লের পক্ষে হঠাৎ সেটি বিশ্বাস করাই যেন শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। কার্লের ভাবভঙ্গি দেখে হ্যানো সহজ-ভঙ্গীতে অন্তরঙ্গ সুরে বলে উঠলেন, 'আরে আপনার জন্যে আমার এর মধ্যেই মন টেনেছে। আমি বুঝতে পারছি আপনি খুব নাম করবেন।' কয়েক মিনিটের আলাপেই এরকম সহৃদয় বন্ধুলাভ করা নিতান্তই সৌভাগ্যের ব্যাপার। কার্ল তাঁর মালপত্র নিয়ে হোটেল ছেড়ে হ্যানোর ঘরে আস্তানা গাড়লেন। হ্যানো তাঁকে এভাবে আশ্রয় না দিলে কার্লের পক্ষে আবার তিন হাজার মাইল দূরে বাড়ী ফিরে দোকানদারি করা ছাড়া গত্যন্তর থাকতো না।

পরের দিন সকালেই কার্ল থিয়েটার কমিকের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চললেন। ম্যানেজারের কাছে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে কার্ল বললেন, 'আমি বিখ্যাত যাদুকর কার্ল হার্টজ। আপনারা তিন সপ্তাহের মধ্যেই থিয়েটার চালু করবেন বলে খবর পেলুম। আপনি যদি এক সপ্তাহের জন্য এখানে আমায় খেলা দেখাতে দেন, তবে আমি তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করতে রাজি আছি।'

ম্যানেজার মুচকি হেসে কার্লকে বললেন, 'আপনি তাহলে একজন বিখ্যাত যাদুকর? আপনার নাম শোনার সৌভাগ্য কিন্তু আমাদের হয়নি। আর কারুর সে-সৌভাগ্য হয়েছে বলেও তো আমার মনে হয় না। আপনি দু-একটা নমুনা-খেলা দেখাতে পারেন?'

কার্ল এইবার মওকা পেলেন। তিনি একটু সুন্দর খেলা দেখিয়ে ম্যানেজারকে মুগ্ধ করে দিলেন।

ম্যানেজার বললেন, 'ঠিক আছে, আপনার খেলা তো মোটামুটি ভালই লাগলো। এবারে বলুন আপনি কত নেবেন?'

'সপ্তাহে ষাট ডলার হলেই আমার চলবে।' কার্ল উত্তর দিলেন।

'ষাট ডলার! কি বলছেন আপনি? তিরিশ ডলারে রাজী থাকলে বলুন।'

'তিরিশ ডলার? সেও কি সম্ভব? পঞ্চাশ ডলার দিতে পারবেন কিনা বলুন।'

'পঞ্চাশ ডলার বড্ড বেশী হয়ে গেল নাকি?' ম্যানেজারের সুর কিঞ্চিৎ নরম হয়েছে।

কিছুক্ষণ দরাদরির পর ম্যানেজার এবং যাদুকরের মধ্যে একটা রফা হল। এক সপ্তাহ খেলা দেখাবার বিনিময়ে কার্ল চল্লিশ পাউন্ড পাবেন বলে ঠিক হল।

কিন্তু খেলা দেখাবার আগের তিন সপ্তাহ কার্ল কি করবেন? হ্যানোর ব্যবস্থা-মত তিনি 'বোসটন ওয়ান প্রাইস ক্লোথিং স্টোর' নামক দোকানে নানা-রকম টুকিটাকি কাজ করতে লাগলেন। এই কাজে তিনি এমন দক্ষতা দেখিয়েছিলেন যে দোকানের মালিক কার্লকে ম্যাজিক-লাইন ছেড়ে তাঁর দোকানে কাজ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য কার্ল মালিককে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

কানসাস শহরের 'থিয়েটার কমিক' হলে এক সপ্তাহ খেলা দেখিয়ে কার্ল এমন নাম করলেন যে ম্যানেজার বাধ্য হয়ে কার্লের 'শো' আরো দু' সপ্তাহ বাড়িয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে কার্ল আমেরিকার বিভিন্ন শহরের থিয়েটারের এজেন্টদের কাছে তাঁর খেলার বিবরণ এবং কানসাস শহরের খবরের কাগজগুলোয় প্রকাশিত তাঁর খেলার প্রশংসাসূচক সমালোচনার কপি পাঠাতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এর ফল হিসেবে আমেরিকার বিভিন্ন শহর থেকে তাঁর কাছে খেলা দেখাবার আমন্ত্রণ আসতে লাগলো।

এইভাবেই কার্লের বিজয় অভিযান শুরু হলো। কার্লের প্রতিভা ছিল, নিষ্ঠা ছিল এবং বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার মত মনের জোরের অভাব ছিল না। সুতরাং কার্ল দ্রুত খ্যাতি অর্জন করতে লাগলেন।

আমেরিকায় রীতিমত বিখ্যাত হবার পর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি ইংলেণ্ডে কয়েক মাস খেলা দেখাবার উদ্দেশ্যেই এসেছিলেন কিন্তু তাঁর মত প্রতিভাধর যাদুকরকে ইংলন্ড অত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে পারেনি। পুরো তিন বছর খেলা দেখিয়ে তিনি একদিকে যেমন নিজের কৃতিত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন অন্যদিকে তেমনি বিপুল জনপ্রিয়তারও অধিকারী হয়েছিলেন। আমেরিকার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ যাদুকর হিসেবে কার্ল হার্টজ ইংলণ্ডে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বটে কিন্তু সেখানেই খেলা দেখাবার সুযোগ করে নেওয়ার জন্য তাঁকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। তিনি প্রথমে লিভারপুলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন কিন্তু লিভার-পুল শহরের থিয়েটার ম্যানেজারেরা তাঁকে কোন পাত্তাই দিতে চাননি।

কার্ল যখন তাঁদের বোঝালেন যে তিনি আমেরিকার প্রথম শ্রেণীর যাদুকরদের মধ্যে অন্যতম, তখনও তাঁদের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হলো না।

অন্য যে-কোন যাদুকর এই অবস্থায় ক্ষেপে উঠতেন কিন্তু কার্ল অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। তিনি লিভারপুল ছেড়ে ম্যাঞ্চেস্টারে চলে গেলেন।

সেখানকার এক থিয়েটার ম্যানেজার কার্লের খেলা দেখাবার ব্যবস্থা করতে রাজী হলেন। মাত্র এক সপ্তাহ খেলা দেখাবার ব্যবস্থা করা হল। অবশ্য কার্লকে এই চুক্তি করতে হল যে যদি তিনি আশানুরূপ খেলা দেখাতে না পারেন, তবে তাঁকে কোন টাকা দেওয়া হবে না। নামকরা যাদুকরদের ক্ষেত্রে এইরকম বিড়ম্বনা খুব কমই দেখা যায়।

কার্লের প্রতিভা অচিরেই স্বীকৃত হল। তিনি এক সপ্তাহ ছেড়ে তিন সপ্তাহ খেলা দেখালেন। অতঃপর সাফল্যের বিজয়—পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে তিনি লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করলেন। লণ্ডনের বিভিন্ন থিয়েটারে ম্যাজিকের খেলা দেখিয়ে তিনি পূর্বার্জিত সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখলেন।

এই সময়ে Beautier de Kolta নামক জনৈক যাদুকর 'ভ্যানিশিং লেডি' নামক একটি ম্যাজিকের খেলা দেখিয়ে লণ্ডনে হুলুস্থুলু ফেলে দিয়েছিলেন। কার্ল হার্টজ এই খেলা অদল-বদল করে নাম পাল্টিয়ে দেখাতে শুরু করলেন। এর-পর যে সমস্ত শহরে তিনি ঐ খেলাটি দেখালেন, সেখানেই প্রচুর বিস্ময়ের সঞ্চার করলেন।

এইভাবে ভাল ভাল খেলা সংগ্রহ করে কার্ল তাঁর প্রদর্শনীকে ভীষণরকম চিত্তা-কর্ষক করে তুললেন। অত্যল্প কালের মধ্যেই তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়ে পড়লেন।

এরপর তিনি কয়েকবার বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন শহরে খেলা দেখাতে গিয়ে তাঁকে কতবার কত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিন্তু তিনি অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে ক্ষুরধার বুদ্ধি মিশিয়ে সে-সমস্যার সমাধান অচিরেই করে ফেলতেন। এইখানেই তাঁর কৃতিত্বের পরিচয়, প্রতিভার স্বাক্ষর।

সফল যাদুকর হিসেবে দীর্ঘদিন খেলা দেখাবার পরও তাঁর জীবনে এমন সমস্যা এসেছে যা অকল্পনীয়। কিন্তু সমস্যা সমাধানে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এবারে সে-কাহিনীটিই বলি।

সময়টা ছিল ১৯২১ সাল। লণ্ডনের কয়েকজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক একটা দল গড়েছিলেন। সামান্য কারণে প্রাণীহত্যা করার অভ্যাস নিবারণ করার জন্য এই দল বিশেষ চেষ্টা করছিল। এই প্রভাবশালী দলটির কার্যকলাপে অনেকের মত কার্লও বিপদে পড়লেন।

পশু বা প্রাণী ক্লেশ নিবারণী সমিতি কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করাবার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। এই সমিতিতে স্মিথ নামে এক উৎসাহী সদস্য ছিলেন। তিনি একটি পুরানো যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত বইতে বার্ড কেজ ট্রিক নামে একটি খেলার বিবরণ এবং কৌশল পড়েছিলেন। পাখীসমেত একটি খাঁচাকে মঞ্চের ওপর থেকে অদৃশ্য করার এই খেলায় পাখীটিকে মেরে ফেলাতে হতো।

কার্ল হার্টজ এই সময়ে খাঁচা অদৃশ্য করার খেলাটি দেখাতেন। এই খেলাটি দেখাতে গিয়ে কার্লকে অনেক পাখি মেরে ফেলতে হতো। পূর্বোক্ত সমিতির উৎসাহী সদস্য স্মিথ কার্ল হার্টজের কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

কার্ল স্মিথের কাছে তাঁর বক্তব্য শোনার পর বেমালুম বলে বসলেন যে তাঁর খেলায় তাঁকে কোন পাখিই মারতে হয় না। স্মিথও এত সহজে ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বলে বসলেন যে খেলাটি কিভাবে হয় তা তিনি দু-একদিনের মধ্যেই যাদুকর কার্লকে দেখিয়ে যাবেন।

স্মিথ চলে যাবার পর কার্ল বুঝতে পারলেন যে তিনি চালে ভুল করে ফেলেছেন। বিখ্যাত যাদুকর উইল গোল্ডস্টোনের বই থেকেই স্মিথ খাঁচা অদৃশ্য করার কৌশলটা জেনেছিলেন।

দু-একদিনের মধ্যেই গোল্ডস্টোন, স্মিথ এবং কার্ল তিনজনে একত্রে আলাপ-আলোচনায় বসলেন। গোল্ডস্টোন স্মিথকে এই কথা বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে তাঁর বইতে স্মিথ খেলাটির যে কৌশল পড়েছেন, আর কার্ল যে-কৌশলে খেলাটি দেখিয়ে থাকেন, সে-দুটি পুরোপুরি আলাদা। বলাই বাহুল্য গোল্ডস্টোন স্মিথকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছিলেন। কার্লই বহু কষ্ট করে গোল্ডস্টোনকে নিজের দলে টানতে পেরেছিলেন।

কিন্তু কার্লের সমস্যা সাধারণত অসাধারণ হয়েই দেখা দেয়। স্মিথকে যতই সাধারণ দেখাক না কেন, তিনি ছিলেন অসাধারণ। গোল্ডস্টোনের মত অত্যন্ত প্রভাবশালী লোকের কথাও তাঁর বিশ্বাস হল না। তিনি বললেন যে তিনি নিজেই খেলাটি দেখাবেন। কার্ল যদি পারেন তবে অন্যরকমভাবে যেন খেলাটি তাঁকে দেখান। স্মিথ কেবল বাক্যবাগীশ ছিলেন না, তাঁর কথার সম্মান রাখার জন্যে খেলাটি দেখাতে শুরু করলেন। অনভ্যস্ত হাতে খেলাটি দেখাতে গিয়ে তিনি অবশ্য মোটেই সফল হলেন না। এবং পাখীটিও খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু তাতে কার্লের আনন্দ করার কিছুই ছিল না। কারণ, তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে স্মিথ খেলাটির সত্যিকারের কৌশল পুরোপুরি জানেন। স্মিথ চলে গেলেন কিন্তু যাবার আগে কার্লকে বলে গেলেন যে হাউস অব কমন্সে তাঁকে এই খেলাটি দেখাতে হবে এবং খেলাটি দেখাতে গিয়ে কার্লকে প্রমাণ করতে হবে যে এতে তিনি কোন পাখিকে মেরে ফেলেন না।

কার্ল পরের দিনই গোল্ডস্টোনের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। তিনি গোল্ডস্টোনকে বললেন, 'গতকাল স্মিথ অপটু হাতে খেলা দেখাতে যাওয়ায় পাখিটা ছাড়া পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল এটা নিশ্চয়ই আপনি লক্ষ্য করেছেন। এই ঘটনা থেকে কি আমরা এই শিক্ষাই লাভ করি না যে একটু মাথা খাটিয়ে খেলাটার অন্য এমন রূপ দেওয়া যেতে পারে যেক্ষেত্রে পাখিটাকে না মেরে ফেলেও খেলাটা দেখানো চলে?'

যাদু-জগতের দুই মহারথীর ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় একটা নতুন ধরনের খাঁচা তৈরী করা সম্ভব হল যার সাহায্যে খেলা দেখালে পাখীটি মেরে ফেলার দরকার হবে না।

হাউস অব কমন্সে যেদিন তাঁর খেলা দেখাবার কথা, সেদিন তাঁর বিরোধী পক্ষ তাঁকে নানাভাবে জব্দ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কার্লের বিন্দুমাত্র মনোবিকার হয়নি। মঞ্চে ওঠার পর প্রতিটি যাদুকরই যেমন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সমস্ত দর্শকের চেয়ে তার বুদ্ধি অনেক বেশী, কার্লও সেদিন সেই একই বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেন। বুদ্ধিমান, চতুর বাঘা বাঘা জাঁদরেল দর্শকদের চোখের সামনে পাখিসমেত খাঁচা অদৃশ্য করে পরমুহূর্তেই জীবিত পাখীটিকে বার করে দিলেন। সুদীর্ঘকাল ম্যাজিক দেখিয়ে কার্ল দর্শন-ভঙ্গী রীতিমত রপ্ত করেছিলেন। সুতরাং দর্শক যতই চতুর হোক না কেন কার্লের খেলার কৌশল ধরে ফেলা তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য কাজ ছিল।

কার্লকে হারানো স্মিথের পক্ষে সম্ভব হোল না। তবে স্মিথও যে একেবারে হেরে গেলেন তাও নয়। তিনি ঠিকই বুঝলেন যে কার্ল এখন যেভাবে খেলাটি দেখাচ্ছেন তাতে কোন পাখি মারা পড়ছে না, অতএব তাঁর আপত্তি করার এখন কিছুই থাকতে পারে না।

স্মিথের জন্য কার্লের লাভ হল অনেক। প্রথমত, নিত্যনতুন পাখি সংগ্রহ করার ঝঞ্ঝাট থেকে তিনি মুক্তি পেলেন। দ্বিতীয়ত প্রত্যহ পাখি না লাগাতে তাঁর খরচ কিছু কমে গেল। তৃতীয়ত একটি পুরোনো খেলা নতুনভাবে তৈরী করা হল এবং দেখানো হতে লাগলো। চতুর্থত……

হ্যাঁ, তাঁর চতুর্থ লাভটাই সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ঘটনায় কার্লের বিনামূল্যে যা প্রচার হয়ে গেল তা অতুলনীয়। কাগজে কাগজে স্মিথের চ্যালেঞ্জের যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্যে কার্লকে প্রশংসা করা হতে লাগলো। খবরের কাগজের সমস্ত কাটিংগুলোর এক-চতুর্থাংশেরও কম অংশের সাহায্যে কার্ল তাঁর বাড়ীর সমস্ত দেওয়াল ভরিয়ে ফেলতে পারতেন বলে জানা যায়।

কার্ল হার্টজের জীবনের কাহিনী এমনই মজার, এমনই চিত্তাকর্ষক। যাদুকর হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁকে একবার একটি অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর মামলায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করতে হয়। তাঁকে প্রমাণ করতে হয় যে ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ বলে কিছুই নেই এবং যদিও বা তা থেকে থাকে তবে যে-কোন সাধারণ যাদুকরের পক্ষে সেই ধরনের খেলা দেখানো মোটেই শক্ত হয় না।

এই মামলাটির পটভূমিকা রীতিমত বিস্তৃত এবং গভীর। যাঁর বিরুদ্ধে এই মামলাটি করা হয়েছিল তিনি এমন একজন নারী যাঁর তুলনা সারা পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া ভার।

এই ধাপ্পাবাজ নারীর আসল নাম এডিথা সালোমেন। যে-কোন রকমের অপরাধই তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত হতে পারতো কিন্তু প্রবঞ্চনা করে অর্থ উপার্জন করার প্রবৃত্তিই বিশেষভাবে তাঁর রক্তকণিকায় মিশে গিয়েছিল। মাত্র বিশ বছর বয়সে ইনি আমেরিকার বাল্টিমোর শহরে নাম এবং পরিচয় ভাঁড়িয়ে অর্থ উপার্জনের জন্য ধনী যুবকদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয়ে মেতে উঠেছিলেন। নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন বিখ্যাত নর্তকী লোলা মন্টেজ এবং জার্মানীর ব্যাভেরিয়ার অধিপতি প্রথম লুই-এর অবৈধ সন্তান হিসেবে।

বাল্টিমোরের ধনী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এইভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে এডিথা নিউইয়র্কের পথে পা বাড়ালেন। এইভাবে তিনি তাঁর কর্মপদ্ধতিরও পরিবর্তন করলেন।

আমেরিকায় সে-সময়ে সম্মোহনবিদ্যার প্রচলন হয়েছিল। এডিথা এই সুযোগটি হাতছাড়া করলেন না। তিনি ধনী লোকদের সম্মোহন করতে শুরু করলেন এবং তার ফি বাবদ মোটা টাকা উপায় করতে লাগলেন। বলাই বাহুল্য, সম্মোহনবিদ্যার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই ছিল না। এডিথার বুদ্ধি ছিল প্রখর এবং বোকা ধনীদের ওপর তার প্রয়োগ করার সুযোগ তৈরী করে নেওয়ায় ছিল তাঁর ক্ষমতা। এই সময়ে অভিজাত

বংশের জনৈক ডিস-ডেবারকে তিনি বিয়ে করে বসলেন। নতুন নাম নিলেন এ্যান ও' জেলিয়া ডিস-ডেবার। এর আগে অবশ্য এডিথা ডাঃ মেস্যান্ট নামে এক ডাক্তারকে বিয়ে করেছিলেন কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তাঁকে স্বর্গের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন এডিথা।

এডিথা ওরফে মিসেস ডিস-ডেবার আবার তাঁর পেশা পাল্টালেন। সম্মোহন-কারিণীর ভূমিকা ছেড়ে তিনি ভৌতিক চক্রের মিডিয়ামের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। এবারে তাঁর বিশেষ শিকার হলেন নিউইয়র্ক শহরের বিখ্যাত ধনী আইনব্যবসায়ী লুথার মার্শ।

বৃদ্ধ লুথার মার্শের স্ত্রী সেই সময়ে মারা গিয়েছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে মার্শ একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। এক ভৌতিক চক্রের অধিবেশনে মিঃ মার্শ উপস্থিত আছেন দেখে শ্রীমতী ডিস-ডেবার মিডিয়ামে পরিণত হলেন। তার পরেই সবাই শুনলো যে মিসেস মার্শের আত্মা মিঃ মার্শকে সম্মোধন করে কথা বলছেন।

মৃতা পত্নীর সঙ্গে যোগাযোগের এক-মাত্র অবলম্বন মিসেস ডিস-ডেবারকে হাতছাড়া করতে মন চাইলো না বৃদ্ধ লুথার মার্শের। তিনি মিসেস ডিস-ডেবারের পরি-বারের সবাইকে নিজের প্রাসাদোপম বাড়িতে এনে তুললেন।

এর পর নিয়মিত পালা করে ভৌতিক চক্রের অধিবেশন বসতে লাগলো এবং প্রতিবারই শ্রীমতী ডিস-ডেবারের আর্থিক লাভ হতে লাগলো অপরিমেয়। বিভিন্ন ধনী পরিবারের লোকেরা এসেও তাঁদের মৃত আত্মীয়দের আত্মার সঙ্গে কথা বলার জন্য শ্রীমতীকে প্রচুর টাকা দিয়ে যেতে লাগলেন।

কিন্তু এত টাকাতেও মিসেস ডিস-ডেবার তৃপ্ত হলেন না। তাঁর আরো টাকা চাই, অনেক অনেক টাকা। তিনি লুথার মার্শকে পরামর্শ দিলেন যে র‍্যাফায়েল প্রমুখ বিগত যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আত্মা আহ্বান করে তাঁদের দিয়ে উচ্চমানের ছবি আঁকিয়ে নিলে সেগুলি বিক্রী করে প্রচুর টাকা পাওয়া যাবে।

মার্শ তখন মিসেস ডিস-ডেবারের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছেন। তিনি ডিস-ডেবারের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। একের পর এক শিল্পী-আত্মাকে আহ্বান করে চললেন মিসেস ডিস-ডেবার। প্রতি-বারেই তাঁর অর্থপ্রাপ্তি হতে লাগলো প্রচুর। একটু কৌশলে তিনি একদিন শেকস-পীয়ারের আত্মাকে এনে হাজির করলেন নিউইয়র্ক শহরের ম্যাডিসন অ্যাভিনিউতে অবস্থিত প্রাসাদতুল্য মার্শ ভবনের ভৌতিক চক্রের অধিবেশনে। এর পর ক্রমে ক্রমে দেশ-দেশান্তর থেকে যুগ-যুগান্তরের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের আত্মারা এসে লুথার মার্শের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে যেতে লাগলো।

শ্রীমতী ডিস-ডেবার এইভাবেই তাঁর প্রবঞ্চনার জাল বিস্তার করে চলছিলেন। কিন্তু লুথার মার্শের বিপুল সম্পত্তির তুচ্ছ ভগ্নাংশ দখল করে তিনি তৃপ্ত হলেন না। পুরো সম্পত্তির ওপর এবার তাঁর চোখ পড়লো।

বহুদিন আগে লুথার মার্শের এক মেয়ে অল্পবয়সে মারা গিয়েছিল। শ্রীমতী ডিস-ডেবার এবার সেই মৃত মেয়ের আত্মা আহ্বান করলেন। লুথার মার্শের মেয়ের আত্মা এসে লুথার মার্শকে অনুরোধ করলো তিনি যেন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি মিসেস ডিস-ডেবারকেই দিয়ে যান।

লুথার মার্শ মৃত মেয়ের অনুরোধ ঠেলতে পারলেন না। তিনি কথা দিলেন যে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি শ্রীমতী ডিস-ডেবারকেই দিয়ে যাবেন। যেই কথা সেই কাজ। উইল তৈরী করা হয়ে গেল।

লুথার মার্শের আত্মীয়স্বজন এতদিন পর্যন্ত মিসেস ডিস-ডেবারের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করেন নি। কিন্তু এবারে তাঁরাও ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। তাঁরা মিঃ এবং মিসেস ডিস-ডেবারের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনলেন। বিচারের ইতিহাসে এই মামলাটি নিঃসন্দেহে চাঞ্চল্যকর বলে ধরা যেতে পারে। এ ধরনের প্রবঞ্চনা সচরাচর দেখা যায় না। মামলা চলাকালীনও মিসেস ডিস-ডেবার প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন যে তিনি নামকরা মৃত আইন-ব্যবসায়ীদের আত্মা আহ্বান করে মামলার ব্যাপারে তাঁদের কাছ থেকেও যথাযোগ্য উপদেশ নিচ্ছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রীমতী ডিস-ডেবার অবশ্য বুঝলেন যে তাঁর প্রতিপক্ষের জীবিত আইন-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মৃত আইন-ব্যবসায়ীরা পেরে উঠবেন না। মান বাঁচানোর জন্যে তিনি মিঃ মার্শের উইলটি তাঁর হাতেই ফেরত দিলেন এবং বললেন যে আইনজ্ঞ আত্মারা তাঁকে উইলটি ফেরত দেবার পরামর্শই দিয়েছেন।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন যে তাঁকে অভিযুক্ত করার কোন অর্থই হয় না, কারণ সমস্ত ব্যাপারটা অলৌকিক বা আত্মিক প্ররোচনার দ্বারাই ঘটেছে।

কিন্তু এত সহজেই মিসেস ডিস-ডেবার মুক্তি পেলেন না। তিনি যে লুথার মার্শকে বিশেষভাবে এবং অন্যান্য কয়েকজনকে সাধারণভাবে ঠকিয়েছেন সেটা প্রমাণ করার জন্য কার্ল হার্টজকে আদালতে নিয়ে আসা হোল। কার্ল হার্টজকে প্রমাণ করে দিতে হবে যে মিসেস ডিস-ডেবার যা-কিছু করে-ছেন তা মোটেই ভৌতিক বা অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ নয়। কার্ল স্বয়ং অনুরূপ ক্রিয়া-কলাপ দিনের বেলায় সর্বসমক্ষে দেখাতে পারেন।

কার্ল অতঃপর হাতে-কলমে প্রমাণ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। কার্ল একটি সাদা কাগজ নিয়ে আদালতে উপস্থিত সকলকে সেটি দেখালেন। কাঠগড়ায় দাঁড়ানো মিসেস ডিস-ডেবারের হাতে সেটি দেওয়া হল। তিনিও পরীক্ষা করে দেখে নিলেন যে সেটি একটি সাদা কাগজ মাত্র। অতঃপর কার্লের নির্দেশে মিসেস ডিস-ডেবার কাগজটি ভাঁজ করে কার্লের হাতে দিলেন। কার্ল কাগজটি মিসেস ডিস-ডেবারকে ফিরিয়ে দিয়ে সেটি তাঁর (কার্লের) কপালে স্পর্শ করতে বললেন।

অতঃপর কাগজের ভাঁজটি খুলে মিসেস ডিস-ডেবার দেখতে পেলেন যে সাদা কাগজটি লেখায় ভরে গেছে। একথা সহজ-বোধ্য যে কার্লের কাছে যখন মিসেস ডিস-ডেবার কাগজটি দিয়েছিলেন এবং তিনি আবার সেটি হস্তান্তর করেছিলেন তখন কার্ল সাদা কাগজের সঙ্গে একটি লেখা কাগজ পাল্টিয়ে নিয়েছিলেন। হস্ত-কৌশলের খেলায় পারদর্শী যে কোন সাধারণ যাদুকরের পক্ষেই এটি সহজেই করা সম্ভবই।

ঠিক একই ধরনের আরো একটি খেলা তিনি সেদিন আদালতে দেখিয়েছিলেন। সবাইকে প্রথমে একটি সাদা প্যাড দেখানো হল। পরে প্যাডটি খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ে কার্ল এবং হার্টজ সেটি ধরলেন। অতঃপর খসখস করে লেখার আওয়াজ পাওয়া গেল এবং খবরের কাগজের মোড়ক থেকে প্যাডটি বার করে আনতেই দেখা গেল যে, প্যাডটির পাতায় পাতায় অনেক কিছু লেখা রয়েছে।

কাগজ পরিবর্তনের মত প্যাড পরি-বর্তন করতেও তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। আর নখ দিয়ে খবরের কাগজের ওপর খসখস শব্দ সৃষ্টি করা তো আরও সহজ।

বলা বাহুল্য হার্টজের কেরামতিতে শ্রীমতী ডিস-ডেবারের সরকারী আতিথ্য গ্রহণ করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না।

হোরেস গোল্ডিন যাদু-জগতে আসার আগে কুড়ি বছর ধরে কার্ল হার্টজ শ্রেষ্ঠ যাদুকরের সম্মান পেয়ে এসেছেন। কিন্তু তারপর ধীরে-ধীরে কার্লের খেলার চমক এবং জনপ্রিয়তা কমতে লাগলো। কার্ল বহু-গুণের অধিকারী হলেও তাঁর একটি দোষ ছিল। তিনি ছিলেন দুর্দান্তরকমের জুয়াড়ী এবং যখন-তখন সামান্য কারণে বাজী ধরতেও তিনি ছিলেন ওস্তাদ।

জীবনের শেষের দিকে কার্ল তাঁর খেলার মান এবং নাম ধীরে-ধীরে খুইয়ে-ছিলেন—একথা সত্য কিন্তু প্রায় দু-যুগ ধরে শ্রেষ্ঠ যাদুকরের সম্মান তিনি লাভ করে এসেছেন একথাও সমান সত্য।

তিনি আজীবন সংগ্রাম করে নাম করে-ছেন। নিজের ক্ষমতার যথাযোগ্য প্রমাণ দিয়েই তিনি মঞ্চে ওঠার অনুমতি পেয়েছেন। আত্মীয়-স্বজন, পরিবেশ ও জীবনের অনেক ঘটনাই তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছে কিন্তু তিনি অচল-অটল অম্লান হয়েই সবকিছু সহ্য করেছেন এবং বুকভরা জীবনাদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ থেকেছেন।

এই একনিষ্ঠতার এবং আন্তরিকতার পুরস্কারস্বরূপেই সম্ভবত সান ফ্রান্সিসকোর একজন সামান্য দোকানীর ছেলে লুই মর্গেনস্টাইন ওরফে কার্ল হার্টজ বিশ্বের যাদুকরের তালিকায় নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

রমেশ দত্তের

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

৩৬

চিত্রকল্পনা- প্রেমেন্দ্র মিত্র

রূপায়ণে - চিত্রসেন

আচরণ-কৌশলের টেস্ট

নীচেনয়ে কটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলি আন্তরিকভাবে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত করুন আপনি এ অবস্থায় কি করবেন বা করতে বলবেন। তারপর নিজেকে পয়েন্ট দিন; পয়েন্ট হিসাবের নিয়ম সবশেষে দেওয়া আছে।

(১) অজিত একজন ভালো সেলস-ম্যান; একদিন তার এক ভালো খদ্দের অন্য এক প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীর মাল সম্পর্কে খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে কথা বলতে শুরু করে দিল। আপনি যদি ঐ অজিত হতেন, তাহলে কি আপনি (ক) এমন গণ্ডাকটা পয়েন্ট খুঁজে বার করতেন যা দিয়ে ঐ কোম্পানীর জিনিসের নিন্দা করা যায়, (খ) ঐ কোম্পানীর জিনিসের কয়েকটি প্রশংসা শুনিয়ে দেবেন, কিংবা (গ) শুধুই নিজের জিনিস সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে কথা বলে যাবেন?

(২) যতীন এক ভদ্রলোকের সংগে কথা বলছে; বেশ বোঝা যাচ্ছে, তিনি যতীনের নামটা ভুলে গেছেন। আপনি যদি যতীন হতেন, তাহলে আপনি (ক) কি কথা বলতে বলতে নিজের নামটার উল্লেখ করতেন? কিংবা (খ) ও নিয়ে কোনো ঝঞ্ঝাট করতেন না।

(৩) মিস্ ঘোষের প্রেমিকটি একদিন মিস্ ঘোষের এক বান্ধবীর খুব প্রশংসা করলেন। তখন মিস্ ঘোষের কি করা সবচেয়ে ভালো : (ক) এমন কিছু করবেন যেন আহত ঈর্ষান্বিত হয়েছেন, (খ) কৌতুকভরে তাঁকে দিয়েই বলিয়ে নেবার চেষ্টা করবেন যে, তিনিও বান্ধবীর মতই কিংবা তার চেয়েও সুন্দরী, (গ) খুশিমনে ওকথা এড়িয়ে যাবেন।

(৪) শ্রীমতী মনোরমা খুব দামী একটা ফেন্সকীম উপহার পেয়েছেন, যেটা ডাকে আসবার সময় চুরমার হয়ে গেছে। তিনি কি (ক) উপহারটি রেখে দেবেন যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকে দেখাবার জন্যে, (গ) তাঁকে লিখে জানাবেন যে, পার্শেলটা ভেঙে গেছে, (গ) ক্রীমটা যতটা পারেন বাঁচিয়ে তুলে নেবেন এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখবেন যেন কিছুই হয়নি?

(৫) আপনার বাড়ীর একদিকের প্রতি-বেশী জানতে চাইলেন অন্যদিকের প্রতিবেশীটি কেমন। আপনি কি তখন (ক) বেশ পরিষ্কার করে অনেকক্ষণ ধরে আপনার সত্যিকারের মতামত জানিয়ে দেবেন, (খ) এড়িয়ে গিয়ে তাঁকেই জিজ্ঞেস করবেন, তিনি কি ভাবেন, (গ) অন্যদিকের প্রতিবেশীটি সম্পর্কে আপনি, যত ভাল কিছু জানেন, সেগুলিই বলতে থাকবেন?

(৬) যখন আপনাকে কোন সমালো-চনা বা অভিযোগ করতে হয়, তখন কি (ক) খুব তীব্রভাবে তা করেন, (খ) কোনো প্রশংসা বা সহানুভূতির কথা দিয়ে শুরু করবার চেষ্টা করেন, (গ) মুখে যা আসে, সহজভাবেই তাই বলে যান?

(৭) শ্রীমতী দত্ত জানেন, রাত্রে তাঁর বাড়ীতে যাঁর খেতে আসবার কথা আছে, তিনি নিরামিষ খান। শ্রীমতী দত্ত কি (ক) স্বাভাবিকভাবেই খাবার-দাবার তৈরী করবেন যেন অতিথি ইচ্ছা করলে যা পছন্দ না করেন তা না খেতেও পারেন, (খ) অন্য সব খাবার থেকে আলাদা করে বিশেষভাবে কিছু খাবার অতিথির জন্যে রাঁধবেন, (গ) নিরামিষাশী অতিথির পছন্দমত খাবারই সকলের জন্যে তৈরী করে রাখবেন?

(৮) আপনি একটা নতুন কাজের জন্য দরখাস্ত করেছেন; কারণ আপনার বর্তমান চাকরীর যিনি কর্তা, তাঁর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। একটা ইন্টারভিউতে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কেন আপনার বর্তমান চাকরীটা ছাড়তে চাইছেন। তখন আপনি কি (ক) বিস্তারিতভাবে বলতে শুরু করবেন আপনার বর্তমান চাকরীস্থল কি কি কারণে পছন্দ হচ্ছে না, (খ) বলবেন, চাকরীটা ছাড়তে চাওয়ার কারণ—আরও ভাল কিংবা আরও দায়িত্বপূর্ণ কোন কাজ করতে চান, (গ) বলবেন, আপনার মনে হচ্ছে একটা পরিবর্তন দরকার।

(৯) আপনি লক্ষ্য করছেন, আপনার পাশের বাড়ীর রেডিওটা খুব বেশী বাড়িয়ে দিয়ে বাজানো হচ্ছে। আপনি কি (ক) পরোক্ষভাবে তাঁদের বুঝিয়ে দেবার কোন পথ খুঁজবেন যে, ওভাবে রেডিও বাজানোর ফলে আপনার বিরক্তি ঘটছে, (খ) তাঁকে সোজা কথাটা বলে দেবেন এবং কমিয়ে বাজাতে বলবেন, (গ) পুলিশে খবর দেবেন?

সঠিক উত্তর এবং পয়েণ্টের হিসাব :

১০ পয়েণ্ট করে পাবেন কোন্ কোন্ জবাবে :

১ (খ); ২ (ক); ৩ (গ); ৪ (গ); ৫ (গ); ৬ (খ); ৭ (গ); ৮ (খ); ৯ (ক)।

৫ পয়েণ্ট করে পাবেন কোন্ কোন্ জবাবে :

১ (গ); ২ (খ); ৩ (খ); ৫ (খ)।

২ পয়েণ্ট করে পাবেন কোন্ কোন্ জবাবে :

৪ (খ); ৬ (গ); ৭ (ক); ৮ (গ); ৯ (খ)।

আপনি কত পয়েণ্ট পেলেন, এবার সহজেই হিসাব করে দেখে নিতে পারবেন।

যদি ৯০ পয়েণ্ট কিংবা তার চেয়েও বেশি পয়েণ্ট পান, আপনি তাহলে একজন অসাধারণ চতুর কূটনীতিসম্পন্ন মানুষ।

৮০ থেকে ৯০ পয়েণ্ট পেলেও চমৎকার, ৭০ থেকে ৮০ পয়েণ্ট পেলে ভালই; ৬০ থেকে ৭০ পয়েণ্ট যাঁরা পাবেন তাঁরা মোটা-মুটি সাধারণ পর্যায়ের মানুষ।

আচরণ-কৌশলের মূল কথা, অন্যের মন বুঝে কথা বলা এবং কাজ করা। তার মানে এই নয় যে, নিজের মনকে পঙ্গু করে রাখতে হবে। ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা কমিয়ে, যথাসম্ভব কম সংঘর্ষ ও মনো-মালিন্য সৃষ্টি করে, নিজের মনের মত শান্তির পরিবেশ তৈরী করে নেওয়াই আচরণ কৌশলের লক্ষ্য। সহ্য করবার ক্ষমতা, প্রশান্ত স্নিগ্ধ সহানুভূতিবোধ এবং অপরের দুর্বল মনের আহত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্কতা—এইগুলি থাকলে আচরণ-কৌশল রপ্ত করা সহজ হয়ে আসে।

রবীন্দ্রসংগীতের অনুরোধের আসর আগে সপ্তাহে একদিন শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টা থেকে ১০টা, এই একবার প্রচারিত হ'ত। কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে, সপ্তাহে একদিন শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টা থেকে ১০টা এবং সাড়ে ১০টা থেকে ১১টা, এই দু'বার প্রচারিত হচ্ছে।

একই দিনে মাত্র আধ ঘণ্টার ব্যবধানে একই অনুষ্ঠান দু'বার প্রচারের কী সার্থকতা, বোঝা যাচ্ছে না। আকাশবাণী থেকে এর কোনো কারণ দেখানো হয়েছে বলে শোনা যায় নি। আকাশবাণীতে এই রকম ইন্টারভ্যাল দেওয়া আর কোনো অনুষ্ঠান নেই।

সবিনয় নিবেদনের আসরে মাঝে মাঝে শোনা যায়, আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ শ্রোতাদের অনুরোধ অনুযায়ীই অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করে থাকেন (থাকেন তো?)। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, শ্রোতাদের অনুরোধেই (?) এই রকম একই দিনে একই অনুষ্ঠান মাত্র আধ ঘণ্টার ব্যবধানে দু'বার প্রচারিত হচ্ছে।

কিন্তু এই অনুমান বাস্তবসম্মত বলে মনে হয় না। শ্রোতারা এই রকম অনুরোধ করেছেন বলে জানা যায় নি, এই রকম অনুরোধ করতে পারেন বলে ভাবা শক্ত। কারণ, কলকাতা কেন্দ্র থেকে টেপ রেকর্ডে ও গ্রামোফোন রেকর্ডে নানাভাবে নানা অনুষ্ঠানে অজস্র রবীন্দ্রসংগীত প্রচার করা হয়ে থাকে। অন্যান্য গানের তুলনায় রবীন্দ্রসংগীতের কমতি আছে এই কেন্দ্রে, এমন কথা বোধ হয় কেউ বলবেন না। অতএব রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের পছন্দের গানও নিশ্চয় শোনা যায়। সুতরাং শ্রোতারা একই দিনে একই আসর দু'বার প্রচারের অনুরোধ জানিয়েছেন, ভাবতে সহজ লাগে না। তাঁরা এই আসর দু'দিন প্রচারের অনুরোধ জানিয়ে থাকতে পারেন। এবং সেটাই বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়। আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ যদি শ্রোতাদের অনুরোধ অনুযায়ী রবীন্দ্রসংগীতের অনুরোধের আসরের সময় বাড়াতে আগ্রহী হয়ে থাকতেন তাহলে আসরটি দু'দিন করা যেতে পারত—এবং সেটাই বোধহয় সুপরিকল্পনা হ'ত।

তাছাড়া হঠাৎ এই অনুষ্ঠানটির বেলায় আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি শ্রোতাদের অনুরোধ মেনে নিলেন যে বড়ো? শ্রোতারা তা অনেক দিন ধরে ছায়াছবির গানের আসরের সময় বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করে আসছেন। সেই অনুরোধ তাঁরা কানে তুলছেন না কেন? কেন নানা ওজুহাতে তাঁরা অনুরোধটাকে আমল দিচ্ছেন না? তাঁরা তো শ্রোতাদের অনুরোধ অনুযায়ীই অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করে থাকেন!

ছায়াছবির গানের আসরের সময় বৃদ্ধির অনুরোধ আজকের নয়। কবে এর আরম্ভ, আজ আর তা মনে পড়ে না। আকাশবাণীর দপ্তরে এই অনুরোধের পাহাড় জমেছে। তাঁরা অনায়াসেই সেই পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছেন।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় শ্রোতাদের অনুরোধ মেনে নিয়ে ছায়াছবির গানের আসরের সময় বৃদ্ধির জন্য অনেকবার অনেক করে লেখা হয়েছে, শ্রোতাদের চিঠিও ছাপা হয়েছে অনেক। তবু তাঁরা টলেন নি। আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ কিসের জোরে এমন অটল থাকতে পারেন, বোঝা শক্ত। তাঁদের এই প্রচন্ড শক্তির উৎস কোথায় তা-ও জানা সহজ নয়। এটাকে জিদ্ অথবা কর্তব্য কর্মে উদাসীনতা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? যদি কোনো সঙ্গত এবং স্বীকার্য কারণ থেকে থাকে তাহলে তাঁরা তা অকপটে বলেন না কেন? কেন বলেন না—এই আমাদের সত্যিকারের অসুবিধা এবং এই অসুবিধার জন্য শ্রোতাদের অনুরোধ রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না? কেন তাঁরা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন? ছলনার আশ্রয় নেন?

শ্রোতাদের দুটি অভিযোগ ছায়াছবির গানের আসরের বিষয়ে। প্রথম, আসরের সময় অত্যন্ত কম—সপ্তাহে মাত্র একদিন, আধ ঘণ্টা। দ্বিতীয়, এই আসরে বেশির ভাগই পুরনো ছায়াছবির গান বাজানো হয়ে থাকে এবং খুব ঘন ঘন। তাঁদের অনুরোধ, ছায়াছবির গানের আসর আরও অন্তত একদিন বাড়ানো হোক এবং নতুন নতুন গান বাজানো হোক।

প্রথম অনুরোধটিকে নির্মমভাবে অবহেলা করা হচ্ছে, তবে দ্বিতীয় অনুরোধটি সম্প্রতি অংশত স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আগে প্রত্যহ অতি পুরাতন, অতি প্রাচীন—বহু শ্রুত, বহু গীত ছায়াছবির গান বাজানো হ'ত, এখন অপেক্ষাকৃত নতুন ছায়াছবির গানও মাঝে মাঝে শোনা যায়।

ছায়াছবির গানের প্রতি কর্তৃপক্ষের এই যে অবহেলা বা উদাসীনতা, এর ফল কিন্তু শুভ নয়। একদিন এর পরিণাম মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে এখনই সতর্ক হওয়া দরকার।

শ্রোতারা তাঁদের পছন্দমতো হালকা বাংলা ছায়াছবির গান শুনতে না পেয়ে বিবিধ ভারতীর (না কি বিবিধ্ ভারতী বলব?) নাক্কারজনক হিন্দী গানের দিকে ঝুঁকছেন, বিবিধ ভারতীর "জনপ্রিয়তা" বাড়ছে (এখন অনেক শিক্ষিত রুচিবান্ বাঙালী পরিবারেও বিবিধ ভারতী শুনতে দেখা যায়)। তার ফলে বাংলার যে উন্নত শিল্পরুচির সুনাম আছে তা অবনমিত হচ্ছে, ছ্যাবলামির প্রসার ঘটছে এবং সারা বাংলাদেশটাই হয়তো একদিন ছ্যাবলামিতে ভরে যাবে, তার নিজস্ব সংস্কৃত মনের পরিচয় অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

আর, যাঁরা এখনও হালকা চটুল ছ্যাবলামিভরা নাকারঞ্জনক হিন্দী গানে অভ্যস্ত হতে পারেন নি তাঁরা আধুনিক বাংলা ছায়াছবির গান শোনার জন্য পাকিস্থান বেতারের দিকে ঝুঁকছেন। কলকাতা কেন্দ্রে পছন্দমতো হালকা বাংলা ছায়াছবির গান শুনতে না পেয়ে তাঁরা ঢাকা ও রাজশাহী ধরছেন (যেসব বাংলা ছায়াছবির গান কলকাতা কেন্দ্রে শোনা যায় না অথবা শুনতে অনেক দেরি হয়, ছবি রিলিজ হওয়ার প্রায় পরে পরেই তা পূর্ব পাকিস্থানের বেতারকেন্দ্রগুলি থেকে শোনা যায়—কলকাতাকেন্দ্র পশ্চিম বাংলার যেসব গান সহনীয় সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করতে পারেন না, পূর্ব পাকিস্থানের বেতারকেন্দ্রগুলি অনায়াসেই তা অল্পকালের মধ্যে সংগ্রহ করে থাকেন, এ এক দুর্বোধ্য ব্যাপার) এবং গানের সঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের রাজনৈতিক প্রপ্যাগান্ডাও শুনছেন। এবং এর ফল যে স্বাস্থ্যকর নয় তা, আশা করি, বলার দরকার করে না।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

৮ই নভেম্বর বেলা ৩টেয় নাটক ছিল "জঙ্গলগড়"। কাহিনী — শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; বেতার-রূপ — শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী।

নাটকটা এমনিতে জমেছিল ভালো, সামগ্রিক অভিনয়ও মন্দ না—কিন্তু আদিবাসীদের ভাষায় সমতা ছিল না, উচ্চারণেও না। নাট্যকার আর প্রযোজক যদি এদিকে আর একটু নজর দিতেন তাহলে ভালো হত। বরং এই দিকেই বেশি করে নজর দেওয়া উচিত ছিল, কারণ, যাদের নিয়ে কাহিনী তাদের নিজস্ব রূপটাই যদি নাটকে পরিস্ফুট না হয়, তাহলে সে নাটক মনে ছাপ ফেলতে পারে না।

৯ই নভেম্বর বেলা ১টার নাটক "ডাকাত"। কাহিনী—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়; বেতার-রূপ—শ্রী শ্রীধর ভট্টাচার্য।

শিলিগুড়ি লাইনে ট্রেন চলছে। একখানা মহিলা-কামরায় কয়েকজন মহিলা চলেছেন। তাঁদের নেতৃত্ব করছেন কার্টুপিসি।

কলকাতার যে পাড়ায় কার্টুপিসি থাকেন সে-পাড়ায় তাঁর নামডাক আছে। এক ডাকেই লোকে তাঁকে চেনে—ভয়ও করে, খাতিরও করে।

তাই কার্টুপিসি সকলের নেতৃত্ব নিয়ে রাত্রের গাড়িতে বিদেশে চলেছেন। গাড়িতে উঠেই তিনি জানলা-দরজা সব আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ করে দিলেন। তাতে নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। একজন প্রতিবাদ জানাতে তিনি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে কারণ ব্যাখ্যা করতে বসলেন : এ লাইনে চুরি-ডাকাতি লেগেই রয়েছে। চোর-ডাকাতরা কেমন করে ভালোমানুষ সেজে গাড়িতে উঠে শেষে সুযোগ বুঝে কাজ সমাধা করে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বৃন্দাবন সাঁতরার গল্প ফেঁদে বসলেন।

বৃন্দাবন সাঁতরা নামকরা ডাকাত। একবার সে কেমন করে অসহায় যাত্রী সেজে মেয়েদের কামরায় উঠে তারপর আপন মূর্তি ধরে কামরার সকলের যথাসর্বস্ব নিয়ে বাথরুমের ফোকর দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল সে গল্প বললেন। কিন্তু গল্প শেষ হতে না হতেই বেঞ্চির তলা থেকে বেরিয়ে এল একটি পুরুষ, ঘোষণা করল সে-ই বৃন্দাবন।

মহিলাদের মধ্যে তখন কান্নাকাটি আর কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। কার্টুপিসি আর গিরিবালা সবিনয়ে বৃন্দাবনের কাছে নিবেদন করলেন, তাঁদের যাঁর কাছে টাকাকড়ি গয়নাপত্র যা আছে সব তাঁরা স্বেচ্ছায় দিয়ে দেবেন, বৃন্দাবন যেন তাঁদের প্রাণে না মারে। তারপর শুরু হয়ে গেল সংগ্রহ। যাঁর যা ছিল সব জমা করে বৃন্দাবনের পায়ের কাছে রাখা হ'ল।

হঠাৎ বৃন্দাবন বলে উঠল : 'কিছু খেতে দিতে পারেন? বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে খাবার আয়োজন শুরু হয়ে গেল। যাঁর কাছে যা ছিল— চিঁড়ে, খৈ, নাড়ু, সন্দেশ, আচার, মায় শিশুর দুধ পর্যন্ত সব 'বাবার ভোগে' দেওয়া হ'ল। পরম তৃপ্তির সঙ্গে বৃন্দাবন খেল।

তারপর স্টেশন এসে পড়তে যখন সে কিছু না নিয়ে খালি হাতে নামতে যাবে তখন কার্টুপিসি বলে উঠলেন : 'ও কি বাবা, এই সোনাদানা গয়না এসব নিলে না যে!

বৃন্দাবন তখন আসল রহস্য ভেদ করল : সে বৃন্দাবন ঠিক, কিন্তু ডাকাত বৃন্দাবন সাঁতরা নয়। সে বেকার, দরিদ্র। ট্রেনের মধ্যে বেঞ্চির তলায় শুয়ে ছিল। ক্ষিদের জ্বালায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল তখন কার্টুপিসি বৃন্দাবন সাঁতরার গল্প বলছেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। তারপর ঐ কাণ্ড। সে মোটেই ডাকাত নয়, সাধারণ ভদ্র ঘরের ছেলে। ক্ষিদের জ্বালায় তাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাঁরা যেন তাকে ক্ষমা করেন।

বেশ রসাল হয়েছিল নাটকটি। সাসপেন্সও বজায় ছিল শেষ পর্যন্ত। আর অভিনয়?...... বেশ অম্লমধুর,—উপভোগ্য। কার্টুপিসির ভূমিকায় শ্রীমতী মলিনা দেবী আর গিরিবালার ভূমিকায় শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ সুন্দর অভিনয় করেছেন—বীরত্ব, ভয়, স্নেহ, মমতা মাতৃত্ব সুন্দর ফুটেছে। আর ঐ যে ভয় না পাওয়া, আচপল থাকা তরুণীটি, যার নাম নন্দা, তার চরিত্রটিও বেশ মনোরমভাবে ফুটিয়েছেন শ্রীমতী রুবি বাগচি। বৃন্দাবনের ভূমিকায় শ্রীশ্যামল ঘোষ খুব কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও তার ছবিটি স্পষ্ট করেই তিনি এঁকেছেন।

১১ই নভেম্বর সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনালেন শ্রীমতী রমা দাস পুরকায়স্থ। ভালো লাগল।

এইদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ছোটোদের আসরে 'ভারতের বীর যোদ্ধা' পর্যায়ে হায়দর আলি সম্পর্কে বললেন শ্রীমতী খনা দাসগুপ্ত। তাঁর কথিকাটি থেকে হায়দর আলির একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া গেল। ছোটোদের উদ্বুদ্ধ করার মতো কিছু উপাদানও ছিল এতে। কিন্তু শেষের দিকে একটুখানি একঘেয়েমি এসে গিয়েছিল—সে বোধহয় ঐ একটানা পড়ে যাবার জন্য।

এই ধরনের কথিকার শেষে সাধারণত সকলকেই বলতে শোনা যায়—এ বিষয়ে তোমরা বড়ো হয়ে অনেক কিছু পড়বে জানবে ইত্যাদি খানিকটা করে উপদেশাত্মক বাণী। এবং এই কথিকাটির শেষেও বলা হয়েছিল। কিন্তু এই জাতীয় উপদেশাত্মক বাণী না থাকলেই বোধহয় ভালো হয়। কথিকাটির সারমর্ম গ্রহণ সহজ হয়। আর শিল্পের দিক থেকেও সেটাই হয় বাঞ্ছনীয়।

১৩ই নভেম্বর রাত ১০টা ১৫ মিনিটে শ্রীনিরুপেন্দ দাসের কণ্ঠে লোকগীতি বেশ একটা মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল : দরদী কণ্ঠে, পল্লীর নিজস্ব সুরে গান, মনটাকে খুশি করেছিল।

১৪ই নভেম্বর রাত সাড়ে ৭টায় দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা খবরে ঘোষিকা ঘোষণা করলেন—অ্যাপেলো-১২। অ্যাপেলো থেকে অ্যাপেলো বা অ্যাপোলো? উদ্ভাবনীশক্তির প্রশংসা না করে পারা যায় না। মাস কয়েক আগেও দিল্লী থেকে অবিরাম বলা হয়েছে—অ্যাপেলো-১১। তা নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে। তবু অ্যাপেলো চলছে। ভুলটা ধরিয়ে দেবার কেউ কি নেই সংবাদ বিভাগে? কিংবা সারা আকাশবাণীতে?

১৫ই নভেম্বর রাত ৯টা ২০ মিনিটে কলকাতা থেকে প্রচারিত বাংলা খবরে বলা হ'ল—মার্কিনী। এ যে অর্ধাঙ্গিনীর মতো হয়ে গেল! তবে অর্ধাঙ্গিনী ব্যাকরণ-দুষ্ট হলেও বহুলপ্রচলিত, কিন্তু মার্কিনী তা নয়।......মার্কিন কী দোষ করল?

১৬ই নভেম্বর সকাল সাড়ে ৯টায় শিশুমহলে গঙ্গোত্রী গুহঠাকুরতার রবীন্দ্র-কবিতা আবৃত্তি খুব সুন্দর লাগল—যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সাবলীল। এই শিশুশিল্পী সম্বন্ধে আশা পোষণ করা যায়।......এই আসরে পরে শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও শ্রীতারকনাথ দে সুরারোপিত 'এসেছ নন্দন কাননে' সঙ্গীত-আলেখ্যটিও বেশ মনোজ্ঞ হয়েছিল। শিশুদের চিত্ত আকর্ষণ করার মতো হয়েছিল। —শ্রবণক

ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ

ধ্যানী শিল্পী আলি আকবর

দীর্ঘ দু বছর বাদে আবার ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেবের সরোদ শোনবার দুর্লভ সুযোগ পাওয়া গেল গত ১৮ নভেম্বর। গোল পার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ্ কালচারের বিবেকানন্দ হলে। পরিবেশক ম্যাক্সমুলার ভবন। ইন্দো-জার্মান ফেলোশিপ এঁরা সমাপ্ত করলেন—আলি আকবর খাঁর বাজনা দিয়ে। শিল্পী পরিচয় করালেন ডাঃ লেসনার। রাগ ঘোষণা বিশ্লেষণ করেন শিল্পী জয়া বসু (বিশ্বাস)।

সুরু হয় 'পাহাড়ী ঝিঁঝিট' রাগের আলাপ দিয়ে। মূলতঃ 'লোক-সঙ্গীত' ভিত্তিক 'চিত্তরঞ্জনী' রাগ হলেও ধ্যানী শিল্পীর গভীর বোধের আলোয় দৈনন্দিন জীবনের মূল কাঠিন্যের অন্তরালের হাসি, অশ্রু, বেদনা যেন ভক্তিভাবের নিবিড় রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। আগ্রহী শ্রোতা। কিন্তু ঘড়ি-ধরা সীমিত সময়। ভারতীয় রাগের যথার্থ রূপ বিশ্লেষণ এতে সম্ভব নয়। কিন্তু সাধক শিল্পীর সীমাহীন প্রকাশ-ক্ষমতায় অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল। স্বল্প পরিসরে রাগের অন্তহীন আকাশকে যেন ছবির মত দেখা গেল—লহর, উহর, অংশ ইত্যাদি অঙ্গ যেন শিল্পীর ইঙ্গিতে তারার মত ফুটে উঠে মৃদু দীপ্তিতে আত্ম-নিবেদনের বিনম্র আলোকে ফুটিয়ে তোলে। গমকের চাঞ্চল্য নেই। বাজের দাপট ভাবের প্রয়োজন সংযত, সঙ্গীতের সকল অলঙ্কারের সম্রাট হয়েও পরিমিত অলংকারে রাগচিত্রের এমন সর্বাঙ্গ-সুন্দর, উজ্জ্বল-দীপ্ত রূপা-ভাস দেওয়া বুঝি আলি আকবরের মত ধ্যানী শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। বাজনা শুনতে শুনতে বার বার মনে হয়েছে জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের চরমে পৌঁছেও পাণ্ডিত্য-প্রকা-শের প্রলোভন সংযত করার আর্ট অথবা শিল্পজ্ঞান শিক্ষা করার জন্যই তরুণ শিল্পী-দের এ অনুষ্ঠান মন দিয়ে শোনা উচিত।

গৎ বাজান 'বেহাগ' রাগে। নায়িকা সজ্জা-সমাপণান্তে নায়কের জন্য প্রতীক্ষমানা। কিন্তু নায়ক এলেন না। তারই বেদনায় নায়িকা কাতর কিন্তু সকরুণ কাতরতা প্রকাশ চাঞ্চল্য নেই। আছে বেদনাকে সযত্নে রুদ্ধ রাখার মর্যাদামণ্ডিত গাম্ভীর্য।—আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের রচিত দ্রুত গতের বন্দেজ-এর ধ্রুপদী গতি, আড়ির চিকারি এবং নায়কের বাণীর চকিত-দীপ্তিতে ঐশ্বর্যময়ী নায়িকার অন্তর-সৌন্দর্য যেন ঝলমলিয়ে ওঠে। অনুষ্ঠান শেষ হয় ঝিলা-কাফি দিয়ে। এখানে পাপা'র রকমারী সমন্বয়। মন্দ্র সপ্তক ও তারসপ্তকের সুরের অনুরণনের অর্কেস্ট্রা-র ছাঁচ যেন সবই ছিল—সবার ওপর ছিল ভারতীয় মনের অন্তহীন প্রসারতা—যা ঐশ্বর্যের লয়কে ছাড়িয়েও ঠিক কাঁটায় কাঁটায় নটার সময় তেহাই-এর মৃদু রেশে মিলিয়ে গেল। কিন্তু সারা প্রেক্ষাগৃহে রেখে গেল অনপনেয় সুরের গুঞ্জন। সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন শঙ্কর ঘোষ। প্রথমের দিকে এঁর বাজনা খাঁ সাহেবের সেদিনের পরিবেশন-মেজাজের অনুকূল ছিলনা, একটু যেন বেশী কড়া। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে তিনি উপযুক্ত ভারসাম্য বজায় রেখে শিল্পীজনোচিত জবাব দিতে পেরেছেন।

রেকর্ডে ছড়াগান

হিন্দুস্থান ডিস্কে রূপমালা ঘোষ পরি-বেশিত দুটি ছড়াগান এবার শোনা গেল পুজোর রেকর্ড হিসেবে। গান দুটি হোল 'কাঠঠোকরা কাঠঠোকরা' ও 'আম পাতা জোড়া জোড়া'। সুর ও সঙ্গীত-পরিচালক অভিজিৎ। কথা অমিয় দাশগুপ্ত। গাওয়ার ও কণ্ঠের গুণে দুটি গান শুনেই শিশুদের সঙ্গে সঙ্গে বড়রাও আনন্দ পাবেন।

নিখিল ভারত আব্দুল করিম সংগীত সম্মেলন

বেলেঘাটা মেন রোডে ২রা নভেম্বর নিখিল ভারত আব্দুল করিম সঙ্গীত সম্মেলনের মাসিক অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন যথাক্রমে খেয়ালে শক্তিরাণী বসু। সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন স্বপনকুমার শীল ও হারমোনিয়ম বাজান কল্পনা বসু। তবলা-লহরায় ছিলেন স্বপনকুমার শীল—পরিবেশিত তাল চৌতাল ত্রিতাল ও ঝাঁপতাল। এরপর পুরিয়া রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন সেনাপতি (বোম্বে)।

পণ্ডিত রবিশংকরের অনুষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ মাস পৃথিবী পর্যটনের পর পণ্ডিত রবিশংকর কলকাতায় ফিরে এসে-ছেন। আগামী ডিসেম্বরের ৬ এবং ৭ তারিখে তিনি দুটো অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন যথাক্রমে 'লোটাস সিনেমা' ও 'নিউ এম্পায়ার'-এ। ৬ তারিখের অনুষ্ঠানটি হবে সকাল সওয়া-নটায় এবং ৭ তারিখের অনুষ্ঠানটি হবে সকাল দশটায়। খবরটি দিয়েছেন 'কিংশুক'-এর সভাপতি অদ্রীজানাথ মুখোপাধ্যায়।

পণ্ডিত রবি শংকর

নাটকের পাণ্ডুলিপি এবং বিসর্জনের মুক্তি

বিশ্বভারতী থেকে শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় গত জুলাই মাসে প্রবীণ কম্যুনিস্ট নেতা মুজাফফর আমেদকে জানান ১৯২৩ খৃঃ কলকাতা পুলিশের কাছে বিসর্জন নাটকের পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়া হয়। আমেদ সাহেব চিঠিটি উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে দেন। তারপর কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিসর্জনের পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করেন। গত ১৪ জুলাই নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের ঐ পাণ্ডুলিপিখানি বিশ্বভারতীকে অর্পণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্যের হাতে পাণ্ডুলিপি অর্পণ করেন। এই উপলক্ষে নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে কলকাতা পুলিশ বাহিনীর শিল্পীরা 'বিসর্জন' নাটকটির অভিনয় করেন। অনুষ্ঠানে শ্রীজ্যোতি বসু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন এই পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতীকে অর্পণ করায় জন্যে তিনি গর্ব অনুভব করছেন। পাণ্ডুলিপিতে কি পরিবর্তন হয়েছে তা গবেষণার বিষয়। আশা করেন, গবেষণার ফলাফল সরকারকে জানান হবে। শ্রীবসু বলেন, পরাধীনতার সময়ে এবং স্বাধীনতার পরেও প্রতিটি নাটকের পাণ্ডুলিপি পুলিশের কাছে পেশ করা হোত। পুলিশ অফিসাররা ঐ নাটক পড়ে মন্তব্য করতেন। 'বিসর্জন' নাটকেও মন্তব্য আছে। তবে এখন শিল্পী ও লেখকদের আন্দোলনের মারফৎ ঐ ব্যবস্থা বাতিল হয়েছে। কিন্তু পুলিশের কাছে যে সমস্ত নাটক আছে সেগুলি যাঁরা গবেষণা করবেন তাঁদের কাছে দেওয়া প্রয়োজন। ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য বলেন, পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া এই পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত মূল্যবান। কেননা, বিশ্বভারতীর কাছে বিসর্জনের যে পাণ্ডুলিপি আছে, তার সঙ্গে এখানকার তুলনা করে একটা নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বিশ্বভারতী এই পাণ্ডুলিপি থেকে যে নতুন তথ্য পাবেন তা রাজ্য সরকারকে জানাবেন।

ঐদিনের অনুষ্ঠানে পুলিশ কমিশনার জানান কলকাতা পুলিশের মহাফেজখানায় পাওয়া গেছে এগারোশ ছত্রিশখানি নাটকের পাণ্ডুলিপি। ১৮৯১ খৃঃ থেকে ১৯৬৭ খৃঃ মধ্যে ঐ পরিমাণ নাটক জমা পড়েছিল। স্বাধীনতার আগে তখনকার নিয়ম অনুযায়ী পুলিশের হাতে জমা পড়া নাটকের সংখ্যা ছিল ৪৩৬। আর স্বাধীনতার পর ১৯৪৭-৬৭ খৃঃ মধ্যে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে আসে ৭০০ নাটকের পাণ্ডুলিপি। প্রাক স্বাধীনতা যুগে জমাপড়া নাটকের মধ্যে বেশির ভাগই সুপরিচিত সৃষ্টি। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, জলধর চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ রায়, প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেক প্রখ্যাত নাট্যকারের নাটক আছে এর মধ্যে।

নাটকের তালিকা দেখে নাট্য গবেষকরা ইতিমধ্যে সচেতন হয়ে উঠেছেন। কারণ এর অধিকাংশ নাটকই বিষয়ের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ণাঙ্গ গবেষণার পর নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হবে। সম্প্রতি পুলিশ কর্তৃপক্ষ বছর অনুযায়ী জমা দেওয়া নাটকের তালিকা তৈরি করেছেন।

থিয়েটার হলের মালিকরাই সেকালে নাট্যকারদের দিয়ে নাটক লিখিয়ে নিতেন। নাট্যকার নিজের ইচ্ছামত সব সময় লিখতে পারতেন না। নাটক রচনা নিয়ে থিয়েটার হলগুলোর মধ্যে নিয়মিত প্রতিযোগিতা চলত। ভাল নাটক লেখবার জন্য নাট্যকাররাও আন্তরিক চেষ্টা চালাতেন নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী। ১৮৯৬ খৃঃ—১৯১৫ খৃঃ পর্যন্ত মিনার্ভা থিয়েটার সাতটি নাটক রচনার ব্যবস্থা করে। কতকগুলি নাটক সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অভিনীত হয়। ১৮৯৬ খৃঃ মিনার্ভা থিয়েটার প্রথম 'ছবি' নাটকের পাণ্ডুলিপি পুলিশের কাছে জমা দেয়। এসময় আরও কয়েকটি নাট্যশালার নাটক জমা পড়েছিল। এর মধ্যে কৃষ্ণাষ্টমী (১৯০৪ খৃঃ), 'রমা ও রমণী' (১৯০৬ খৃঃ), 'রঙ্গরাজ' (১৯০৯ খৃঃ), দারিয়া (১৯১২), মেদিয়া (১৯১২ খৃঃ), বভ্রুবাহন (১৯১৫ খৃঃ) নাটক কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্টার থিয়েটার উদ্যোগে রচিত 'সপ্তপ্রতিমা', 'রূপকথা', 'খাসদখল', 'অভিনেত্রীরূপে'; ন্যাশনাল থিয়েটারের 'মায়া', প্রেসিডেন্সি থিয়েটারের 'হাটে হাটে' মনমোহন থিয়েটারের 'সতীলক্ষ্মী', 'দেবলাদেবী' নাটক পুলিশের কছে জমা পড়ে। 'খাসদখল' এবং 'দেবলাদেবী' নাটক দুটি সেকালের মঞ্চে দীর্ঘ রজনী অভিনয়ের গৌরব ও জনসমাদর লাভ করে।

১৯১৪ খৃঃ গোড়ার দিকে কিশোরী প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বরোদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এবং সেকালের আরও অনেক নামী নাট্যকারের পাণ্ডুলিপি পুলিশের ছাড়পত্রের জন্য জমা পড়েছিল। ভূপেন্দ্রনাথের 'সওদাগর' এবং বরদা প্রসন্নের 'মতির মালা' নাটক দুটি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। তাছাড়া 'রত্নেশ্বরের মন্দির', 'বিদুরথ', 'গোলকুণ্ডা', 'মন্দাকিনী'—পুলিশ দপ্তরে জমাপড়া এই নাটকগুলি সম-সাময়িককালের সমাজ ব্যবস্থার ওপর আলোকপাত করে। এ সমস্ত নাটক নিঃসন্দেহে পুলিশ সংগ্রহশালার সম্পদ।

নাট্যকার অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন', 'মুক্তির ডাক', 'উর্বশী', 'অপ্সরা' পুলিশের ছাড়পত্র পেয়েছিল। বরোদা প্রসাদের 'নর্তকী' 'সুভদ্রা', 'দেবযানী' এবং 'চিত্রাঙ্গদা' নিঃসন্দেহে বাঙলা সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

১৯৪৬ খৃঃ দশটি নাটক জমা পড়ে ছাড়পত্রের জন্য। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উইলসন ব্যারেটস-এর নাটক অবলম্বনে 'আহুতি' নামে একখানি নাটক লেখেন। সেটিও পুলিশ দপ্তরে জমা পড়ে। এবছর 'মহারানা হামির সিং', 'শেরশাহ', 'সম্রাজ্ঞী নূরজাহান' প্রভৃতি বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক কলকাতার মঞ্চকে উদ্দাম করে তুলেছিল।

—সাংবাদিক

পূর্ণিমা পিকচার্সের ‘মৃগয়া’র স্যুটিং আরম্ভ হয়েছে। অপর্ণা সেন, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে দৃশ্য গ্রহণ করছেন পরিচালিকা অরুন্ধতী দেবী। পাশে রয়েছেন ক্যামেরাম্যান বিমল মুখোপাধ্যায়। সহকারী ঝণ্টু দত্ত এবং বীরেন মুখোপাধ্যায়।—ফটোঃ অমৃত।

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র সমালোচনা

দক্ষিণ ভারতে নির্মিত বহু পৌরাণিক ও ধর্মমূলক ছবির মূল তামিল বা তেলেগু সংলাপ ও গানকে বর্জন করে পরিবর্তে বাংলা সংলাপ ও গানকে শিল্পীদের মুখে বসিয়ে ছবিগুলিকে বাঙালী দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে গেল কয়েক বছরের মধ্যে। পৌরাণিক চরিত্রের বেশ-ভূষার মধ্যে ভারতের উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম অঞ্চল ভেদে খুব বড়োরকম পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলেও দক্ষিণী শিল্পীদের মুখাবয়ব, কেশ-বিন্যাস এবং অভিনয়কালীন অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে এমন একটা বিশেষ ধরণের বৈশিষ্ট্য আছে, যার ফলে তাঁদের মুখে বাংলা সংলাপ যেন কিছুতেই খাপ খেতে চায় না। "ডাবিং" যদি খুব ভালোও হয় অর্থাৎ কথিত বাংলা সংলাপের সঙ্গে শিল্পীদের ঠোঁট নাড়াকে যদি হুবহু মিলিয়েও দেওয়া যায়, তা' হলেও বাঙালী দর্শকের মনে প্রশ্ন না জেগে পারে না ; এ কাদের মুখ থেকে এমন বাংলা কথা শুনছি, কারা এমন সুন্দর করে বাংলা গান গাইছে ?

কিন্তু এমনও কয়েকটি দক্ষিণ ভারতীয় ছবি দেখা গেছে—অবশ্য সংখ্যার দিক থেকে সেগুলি অঙ্গুলিমেয়, যেগুলি বাংলা শব্দ রূপান্তরের পরে পূর্বকথিত প্রাথমিক অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও মাত্র সুষ্ঠু বাংলা সংলাপ ও গানের জন্যেই নয়, মূল চিত্রের অন্তর্নিহিত মহিমাগুণে আমাদের দর্শকদের বেশ কিছুটা খুশী করতে সমর্থ হয়েছে। এমনই একখানি ছবি হচ্ছে বর্তমানে কলকাতার আলেয়া, রূপম, সুরশ্রী, রূপায়ণ প্রভৃতি বিভিন্ন চিত্রগৃহে সাফল্যের সঙ্গে প্রদর্শিত এবং **বলাকা পিকচার্স পরিবেশিত "কৃষ্ণলীলা"**।

ছবির কাহিনী নামেই প্রকাশ। নারায়ণ জন্মগ্রহণ করবেন কংসবধের জন্যে, রাজা কংসের এই তথ্য জানার পর থেকে বসুদেবের প্রথম পুত্রের জন্ম, তাকে কংসের হাতে তুলে দেওয়ার পরে কংসের তাকে ফিরিয়ে দেওয়া ও বলা ঃ 'আমার ভগ্নীর অষ্টম গর্ভের সন্তানই আমার শত্রু', পরে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উত্তেজিত হয়ে বসুদেব দেবকীর প্রথম সাত সন্তানকেই হত্যা করা, বসুদেব-দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ, কৃষ্ণ-জন্ম, বাসুদেবের তাকে নন্দালয়ে নিয়ে গিয়ে ঘুমন্ত যশোদার পাশে শুইয়ে যশোদা-কন্যাকে নিয়ে আসা, মায়াহত্যায় কংসের অসাফল্য, 'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'—দৈববাণী, কৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর লীলা এবং শেষ পর্যন্ত কংসবধে ছবির সমাপ্তি।

"কৃষ্ণলীলা" ছবির সংলাপ ও গানগুলি দর্শকমনে বিচিত্র মাদকতার সৃষ্টি করে। "কৃষ্ণ! মুরারী, গিরিধারি, শৌরি, কৃষ্ণ!", "কি জানি কি পূজায় জানি না, বিধি" প্রভৃতি গান বারংবার শোনবার মতো। এ ছাড়া শিশু কৃষ্ণকে নন্দালয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ে যমুনার দু'ফাঁক হয়ে যাওয়া, কৃষ্ণের বাল্যলীলার বহু কৌতুকপ্রদ ও চমকে দেওয়ার মতো ট্রিক-ভরা দৃশ্যগুলি দর্শককে মোহিত ও বিস্মিত করে। কংস, নারদ, বালক-কৃষ্ণ ও কিশোর-কৃষ্ণের অভিনয় অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ।

বাংলা-ডাবিং করা হলেও দাক্ষিণী ছবির "কৃষ্ণলীলা" বাঙালী দর্শককে খুশী করবার ক্ষমতা রাখে।

স্টুডিও থেকে

বিশ্বজিৎ পুজোর সময় গিয়েছিলেন টেগোরীর আউট ডোরে শিলংয়ে। সেখানে কাজ শেষ করার পর কলকাতায় ফিরেছিলেন ক'দিন। লক্ষ্মীপুজোও এবার ঘটা করে হয়েছিল। ফিরব ফিরব করছিলেন বম্বেতে। কিন্তু বন্ধুবর নিমাই মৈত্রের প্যাঁচে পড়ে থেকে যেতে হলো আরও ক'দিন। 'প্রতিবাদ' নামে একটা ছবি করবেন বলে ঠিক করেই রেখেছিলেন। নায়ক হিসাবে মৈত্র চাইছিলেন বিশ্বজিৎকে। কিন্তু ওকে পাওয়া তো মুশকিল। বম্বেতে এখন বিশ্বজিতের ছবি হ্যাটট্রিকের মত চলছে। ওখানেও কম করে হাতে প্রায় খান দশেক ছবি। তবে বন্ধু বলতেই রাজী। বিশ্বজিৎ রাজী হলেন 'প্রতিবাদ'এর নায়ক চরিত্র করতে। ওঁর বিপরীতে আছেন মৌসুমী। পরিচালনা করছেন তপেশ্বর প্রসাদ। তপেশ্বরবাবুর প্রথম ছবি এটি স্বাধীন পরিচালক হিসাবে। ইনি আগে ছিলেন সত্যজিৎ রায়ের সহকারী। নিত্যানন্দ দত্ত (ইনিও সত্যজিৎবাবুর সহকারী ছিলেন) যখন 'বাক্স বদল' ছবি করছিলেন তখন তাঁর সঙ্গেও সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন। যাত্রিক গোষ্ঠীর সঙ্গেও ছিলেন কিছুদিন। বর্তমানে উনি কাজ করছিলেন তরুণ মজুমদারের প্রধান সহকারী হিসাবে। বেশ মোটা পরিমাণ অভিজ্ঞতার ঝুলি কাঁধে নিয়েই তপেশ্বর

প্রথম বসন্ত/অনিল চট্টোপাধ্যায়, মাধবী চক্রবর্তী। পরিচালনা নির্মল মিত্র। —ফটো ঃ অমৃত।

প্রসাদ স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করছেন এ ছবিতে, কাজেই তাঁর সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় নিশ্চয়ই।

দীনেন গুপ্ত এ পর্যন্ত ছবি করেছেন দুটো। প্রথম ছবি 'নতুন পাতা'র অসাধারণ সাফল্য পরবর্তী ছবি 'বনজ্যোৎস্না'তে আশানুরূপ বজায় না থাকলেও শ্রীগুপ্ত এতটুকু বিচলিত হননি। সিনেমা জগতটাই তো এই। একবার উন্নতি আবার অবনতি। সবার ভাগ্যেই তো এইরকম। ক'জন আর তপন সিংহ, সত্যজিৎ রায়? তবে সাধারণ দর্শকের মুখ চেয়ে কিছু নিষ্ঠার সঙ্গে করতে পারলে তা নিশ্চয়ই তারা নেবে। এ বিশ্বাস দীনেনবাবুর আছে। বহুদিন আগেই শুনেছিলাম ওঁর নতুন ছবি করা সম্পর্কে। শেষ পর্যন্ত ক'দিন আগে সত্যিই নতুন ছবির কাজ শুরু করলেন দীনেনবাবু ইন্দ্রপুরীতে। ছবির নাম 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'। চিত্রনাট্য অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আগের দুটো ছবির মত এ ছবিতেও তিনি নতুন মুখ আনছেন আরেকটি। 'নতুন পাতা'র আরতি আর 'বনজ্যোৎস্না'র মীনাক্ষীর পর এবার আসছে সীমন্তী গুপ্ত। দীনেনবাবুরই কিশোরী মেয়ে। বাবার নির্দেশে মেয়ে খুব সুন্দর কাজ করছে দেখলাম। এই প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালো সীমন্তী। কিন্তু এতটুকুও ক্যামেরা কনসাসনেস চোখে পড়ল না। তবে মাঝে মাঝে যেন একটু ঘাবড়ে যাচ্ছিল। অবশ্য সেটে সেদিন বসন্ত চৌধুরী, অমিত ভঞ্জ, মা কাজল গুপ্তও ছিলেন। তবুও। বাবা পরিচালক ক্যামেরাম্যান, মা অভিনেত্রী মেয়েও তাই, পরিবারের তিনজন।

ধর্মতলার চিত্র পরিবেশকদের অফিসে বস্তু পরিচালক হিসাবে অগ্রদূতের নাম লেখা আছে বেশ বড় অক্ষরেই। 'চিরদিনের' করার পর অগ্রদূতের অন্যতম বিভূতিবাবু (লাহা) অনেকদিন বসেছিলেন চুপচাপ। হয়তো তখন চিত্রনাট্য তৈরী করছিলেন। যতবার দেখা হয়েছে জিজ্ঞেস করেছি—'নতুন ছবি কবে শুরু করছেন?' হেসে বিভূতিবাবু বলেছেন—'এই করব এবার।' এতদিনের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বিভূতি লাহা (অগ্রদূত) নতুন ছবির কাজ শুরু করলেন ক'দিন আগে এনটির দু-নম্বরে। ছবির নায়ক উত্তমকুমার। শুভ মহরতের দিন ক্যামেরায় সুইচ অন করেন পরিচালক তপন সিংহ। উত্তমকুমারকে নিয়ে অগ্রদূত আগে বহু ছবি করেছেন। সেই কারণেই বিভূতিবাবুর সঙ্গে উত্তমকুমারের সম্পর্ক যতনা ব্যবসায়িক তার চাইতে বেশী আন্তরিক। মাঝখানে নীতিগত ব্যাপারে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হলেও মনের টান কি সহজে ছেড়ে? মহরতের দিন সদাহাস্য উত্তমকুমারকে অভিনন্দন জানাতে বিভূতিবাবু যখন এগিয়ে গেলেন তখন এই কথাই বার বার মনে হয়েছে যে উত্তমকুমার বিভূতি লাহা কখনও আলাদা হতে পারেন না।

শ্রীতপন সিংহের সহকারী অমিতাভ দাশগুপ্ত তাঁর অবসর সময়কে কাজে লাগাবার জন্যে 'অন্তবিহীন পথ'' নামে একটি ছবি তৈরীর পরিকল্পনা করেছেন। স্টুডিও সেটকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে এ ছবির যাবতীয় অন্তঃদৃশ্য নাকতলার শ্রীএস সি রায়ের বাড়ীতে গৃহীত হবে। এছাড়া কলকাতার কিছু বহিঃদৃশ্য আছে। স্বরচিত এই কাহিনীর চিত্রনাট্য, সঙ্গীত, সম্পাদনা ও পরিচালনার দায়িত্ব অমিতাভ দাশগুপ্ত একাই বহন করবেন। আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে ছবিটির সুটিং শুরু হবে, শেষ হতে লাগবে কুড়ি দিন। কোননরকম তাড়াহুড়ো না করে মাস চারেকের মধ্যে শ্রীঅমিতাভ ছবিটিকে শেষ করবেন। এ ছবির চিত্রশিল্পী পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের অদীপ ট্যান্ডন। উত্তমকুমার, রবি ঘোষ, কল্যাণ চ্যাটার্জি, তরুণকুমার, সুব্রতা, শিপ্রা মিত্র এবং দুটি নতুন মুখ শকুন্তলা ভট্টাচার্য ও অরূপ সেন এ ছবিতে অভিনয় করবেন। এ ছবিতে শ্রীঅমিতাভকে বিশেষভাবে সাহায্য করছেন ''আকাশকুসুম''এর প্রযোজক শ্রীনির্মল চক্রবর্তী।

গেল সোমবার ১৭ নভেম্বর নিউ থিয়েটার্স ২নং স্টুডিওতে অ্যাপোলো পিকচার্স-এর প্রথম প্রয়াস তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বহু পঠিত উপন্যাস ''মঞ্জরী অপেরা''র শুভ মহরৎ সম্পন্ন হয়। মহরৎ দৃশ্য হিসাবে কাহিনীকার তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ক্যামেরার সুইচ অন করেন প্রখ্যাত পরিচালক তপন সিংহ। ছবির পরিচালনা ও সুর-সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে অগ্রদূত ও সুধীন দাশগুপ্ত। ছবির নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন—উত্তমকুমার। ছবিটি পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন সীমা ফিল্মস্।

হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত রূপশ্রী চিত্রের ভক্তিমূলক ছবি ''ত্রিনয়নী মা''-র বহিদৃশ্য গ্রহণের জন্যে ছবিটির

প্রথম কদম ফুল/সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তনুজা এবং পরিচালক ইন্দর সেন। ফটোঃ অমৃত

পরিচালক পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে সম্প্রতি রাজগীর রওনা হয়ে গেছেন। সংগীতবহুল ও ধর্মমূলক "ত্রিনয়নী মা" ছবিতে সুরসৃষ্টি করেছেন—অনিল বাগচী। শ্যামল গুপ্ত রচিত গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অলক বাগচী। চরিত্রচিত্রণে আছেন—অসিতবরণ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, মণি শ্রীমানী, রাজা মুখোপাধ্যায়, শৈলজা রায়, শমিতা বিশ্বাস, রজনী গুপ্তা (বেবী), শচীন মল্লিক, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, সীমা দেবী, অমরেশ দাস, রুপক মজুমদার ও বছরের চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার নবাগতা মঞ্জু দেবী।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে রামানন্দ সেনগুপ্ত ও অমিয় মুখোপাধ্যায়।

সুপর্ণা সেন প্রযোজিত ও পীযূষ বসু পরিচালিত এস এস ফিল্মসের 'দুটি মন' ছবির জন্যে গোমিয়া, তোপচাঁচি, বোকারো প্রভৃতি মনোরম স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশে বহু দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এই বহির্দৃশ্য গ্রহণের সময়ে শিল্পী ছিলেন উত্তমকুমার ও সুপর্ণা সেন। ছবিটির সংগীত-পরিচালক হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের সুরে 'দুটি মন' ছবির কয়েকটি গানও রেকর্ড করা হয়েছে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গানগুলি গেয়েছেন আরতি মুখোপাধ্যায় ও হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় স্বয়ং।

ছবির চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়। ছবিটির অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করছেন—ছায়া দেবী, অসিতবরণ, পদ্মা দেবী, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, শ্যামল ঘোষাল, মিহির ভট্টাচার্য, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, শৈলেন গাঙ্গুলী ও মাং পার্থ।

অপ্সরা ফিল্মস্ ছবিটির পরিবেশক।

স্বদেশ সরকার পরিচালিত শান্তি চিত্রে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

বোম্বাই থেকে

এখানে চিত্রজগতে একজন যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করল অমনি তার বংশের সবাই আস্তে আস্তে চিত্রনির্মাণটাকে জাত-ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করছেন দেখা যাচ্ছে। আপনারা জানেন যে, পৃথ্বীরাজের ছেলেরা (রাজ, শাম্মি ও শশী) এবং নাতি (রণধীর) অভিনেতা এবং চিত্রনির্মাতা হিসেবে কিরকম খ্যাতিলাভ করেছেন। মহেশ্বরীদের চার ভাই (রাম, পান্নালাল, পদম ও প্রেম) এবং তাঁর ভাইপোরা কৃষণ ও কৈলাশ চিত্রজগতে আছেন। এস ডি নারাং-এর ভাইএরাও চিত্রজগতের বাসিন্দা। 'গুরু দত্তের ভাই আত্মারাম বিদেশে শিক্ষালাভ করে এখানে করলেন 'চন্দা আর বিজলী'—আবার নতুন ছবির কাজে হাত দিয়েছেন। শশধর মুখোপাধ্যায়ের পরিবারস্থ জয়, রাম, দেব, সুবোধ, রোণো প্রভৃতি এ-লাইনে অনেকদিন থেকেই আছেন। শচীন দেববর্মণের ছেলে

রাহুল দেববর্মণ এখন প্রচুর নাম করেছেন সঙ্গীত-পরিচালনার ব্যাপারে। হেমন্ত মুখার্জির ছেলে জয়ন্ত ফিল্মের হিরো হচ্ছে শিপ্‌্গীর। কাহিনী ও সংলাপকার রাজেন্দ্রসিং বেদীর ছেলে নরেন্দ্রসিং বেদীও একজন ডিরেকটার। সম্প্রতি এসেছেন চেতন আনন্দের ছেলে কেতন আনন্দ পিতার সহকারীরূপে। অভিনেতা তেওয়ারীর ছেলে গুলশানও ফিল্মজগতে এসেছে। অভিনেতা ও চিত্রনির্মাতা মেহমুদের ভগিনী মিনু মমতাজকে আপনারা অনেক ছবিতে দেখেছেন। চিত্রনির্মাতা বি আর চোপরার ভাই বন চোপরা সম্প্রতি 'ইত্তেফাক' করে সকলকে অবাক করে দিয়েছেন। অশোককুমার, কিশোরকুমার, অনুপকুমার তো আছেনই। ফিরোজ শা'র ভাই হলেন সঞ্জয় (আব্বাস খাঁ)—এ-খবর আপনাদের আগেই জানিয়েছি। এরকম আর কত বলব! ...

বোম্বাই-এ এখন রেকর্ড করার দিকে সকলের ঝোঁক পড়েছে। সম্প্রতি আর একটি ছবি শুরু হয়েছে যেটি মহরতের দিন থেকে রিলিজের দিন পর্যন্ত সময় নেবে মাত্র ৩০ দিন। এই সময়ের মধ্যে শুটিং, গান রেকর্ডিং, সম্পাদনা, সেন্সর করা, ল্যাবরেটরীর কাজ, প্রচার সবই হবে। ফিল্মিস্তান স্টুডিওটিকে রীতিমত বোর্ডিং হাউস বানিয়ে ফেলেছেন, কর্তৃপক্ষ। সমস্ত শিল্পী এবং কর্মীদের এইখানে থাকা, খাওয়া ছাড়াও ওষুধপত্রের বন্দোবস্ত পর্যন্ত করে রাখা হয়েছে। ৭ই অক্টোবর শুটিং শুরু হয়েছে এবং রিলিজের দিন ধার্য হয়েছে ৭ নভেম্বর। অভিনয় করছেন অভি ভট্টাচার্য ও জয়মালা। ছবিখানির নাম 'রামভক্ত হনুমান'। শান্তিলাল সোনি এই ছবির পরিচালক।

* * *

নবগতা নায়িকাদের মধ্যে বাংলার রাখী বিশ্বাস এবং মাদ্রাজের রেখার একজ [illegible]

চাহিদা। রেখা এখন কাজ করছে মোহন সায়গলের নতুন ছবি (নামকরণ হয়নি), শক্তি সামন্তর পরবর্তী ছবি মেহমান, অঞ্জনা, সফর ইত্যাদি। রাখীর হাতেও আছে প্রায় ১৩খানি ছবি। এছাড়া সুনীল দত্তের নতুন ছবি 'রেশমা ঔর শেরা' ছবিতে তাঁকে অতিথিশিল্পী হিসেবেও দেখা যাবে। সেদিন মানে দশেরা বা বিজয়াদশমীর তার নবতম ছবির মহরৎ হয়েছে আর কে স্টুডিওতে। নামকরণ হয়নি। ছবিটির প্রযোজক হলেন এল আর টি ফিল্মস্। শশী কাপুর হচ্ছেন নায়ক। পরিচালনা করবেন নবাগত প্রয়াগ রাজ। বাংলাদেশের কমল বসু এর ক্যামেরা-ম্যান এবং শান্তি দাস এর শিল্পনির্দেশক।

* * *

বম্বেতে গত সপ্তাহে দুটি সামাজিক অনুষ্ঠানে বহু শিল্পী ও প্রযোজকদের দেখা গিয়েছিল—দুটিই বিবাহ অনুষ্ঠান। একটি হল সুপরিচিতা শিল্পী শশীকলার মেয়ে শৈলজা এবং অপরটি হল অভিনেতা জিতেন্দ্রর ভগিনী। জিতেন্দ্রর ভগিনীর বিবাহে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রীচৌরিয়ান সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। শশীকলার মেয়ের বিয়ে—কিন্তু মেয়ের পাশে তাঁকে দাঁড় করালে কেউই বলবে না যে ইনি মেয়ের মা। মনে হবে—এ সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটি যার বয়স এখনও কুড়ি পেরোয়নি। বিয়ের দিন অভ্যর্থনা রাত্রে মীনাকুমারী তো শশীকে দেখে বলেই ফেললেন ঃ কাকে যে কনে বলব বুঝতেই পারছি না।

আর একটি বিয়ের খবর শিগ্‌গীর পাবেন আপনারা—সেটি হল বাংলা ও হিন্দী চিত্রজগতের খ্যাতিময়ী শিল্পী তনুজা। তাঁর বিয়ে কিন্তু কোন চিত্রজগতের বাসিন্দার সঙ্গে নয়। বরের নাম শ্রীশ্রীবাস্তব, নিবাস দিল্লী।

* * *

গত সপ্তাহে চিত্রজগতের একটি মর্মান্তিক দুঃসংবাদ হল ভারতের প্রথম টকী ফিল্মের নির্মাতা আর্দেশীর এম ইরাণীর পরলোকগমন। ১৯০১ সালে 'আলম আরা' করেন তিনি ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানীর হয়ে। তারপরেও তিনি বহু ছবি করেছেন এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি চিত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারতের প্রথম রঙীন ছবি 'কিষাণকন্যা'ও তাঁরই ছবি। সবথেকে অবাক লাগল এবং দুঃখ হল এই দেখে যে, ভারতীয় চিত্র-জগতের এমন একজন মহারথীর মহাপ্রয়াণে তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য কোনও স্টুডিও বা ল্যাবরেটরী পাঁচ মিনিটের জন্যও কাজ বন্ধ করেননি।

লণ্ডন থেকে ফিরেই সায়রা বানু তাঁর অসমাপ্ত এবং অর্ধসমাপ্ত ছবিগুলিকে শেষ করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। বি আর চোপরার 'আদমী ঔর ইনসান' ছবিটি শেষ করে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই। শ্যুটিং-এর শেষ দিন চোপরাসাহেব সাংবাদিকদের ডেকে একটি প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করে-ছিলেন। এর পর সায়রাকে দেখা গেল কিশোর সাহু পরিচালিত 'সিন্দুরের' সেটে। শিল্পনির্দেশক শান্তি সিং এর প্রযোজক। সায়রার বিপরীতে নায়কের ভূমিকায় আছে জিতেন্দ্র। প্রবীণ পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে, বহুদিন আগে কিশোর সাহু একখানি ছবি করেছিলেন তার নামও 'সিন্দুর'।

এবারে কয়েকটি নতুন ছবির খবর জানাচ্ছি আপনাদের। খ্যাতনামা বাঙালী চিত্রনির্মাতা বিভূতি মিত্র সম্প্রতি তাঁর নতুন ছবির কাজ শুরু করেছেন। ছবি-খানির নাম 'মেহমিল'। এতে প্রায় সবই নতুন মুখের সমাবেশ—অভিনয়ে আছেন ফারা, বিশাল আনন্দ ও কৃষণ মেহতা। সোনিক ওমি হচ্ছেন এর সঙ্গীত-পরি-চালক। কাহিনীও বিভূতিবাবুর।

আর একজন বাঙালী প্রযোজক-পরিচালক গাবুল মিত্র তাঁর নতুন ছবির নাম দিয়েছেন 'শাওন কি ঘটা'। এতে অভি-নয় করছেন দেব মুখার্জি, লালিতা চ্যাটার্জি, অজিত, অরুণা ইরাণী, অচলা সচদেব, জগদীপ প্রভৃতি। এরও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সোনিক ওমি।

লেখক-পরিচালক চরণদাস শোখ তাঁর নিজের চিত্রপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন—নাম দিয়েছেন শোখ প্রোডাকশন। চরণদাসজী নিজেই এর কাহিনী লিখেছেন। ছবিটির বিশেষত্ব হবে একটি 'সেট'কে কেন্দ্র করেই এর সমস্ত ঘটনা-সমাবেশ। নায়করূপে দেখা যাবে জয় মুখার্জিকে এবং নবাগতা কোমলকে। সঙ্গীত-পরিচালনা করবেন নবাগত ঘনশ্যামজী শ্যামজী।

কিশোর সাহুর নতুন ছবি 'অপ্সরা'র শ্যুটিং শুরু হয়েছে রণজিৎ স্টুডিওতে। জিতেন্দ্র এবং হেমা মালিনী এর নায়ক-নায়িকা এবং লক্ষ্মীকান্ত প্যারীলাল এর সুরকার।

রূপতারা স্টুডিওতে আর একটি নতুন ছবির কাজ শুরু হয়েছে—তার নাম হল 'মস্তানা দিওয়ানা'। প্রযোজনা ও পরিচালনা করছেন আর ভট্টাচার্য। এতে আছেন সঞ্জীবকুমার, কোমল, মেহমুদ, অরুণা ইরাণী প্রভৃতি। কাহিনী হল ধ্রুব চট্টো-পাধ্যায়ের এবং সুর দিচ্ছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল।

অভিনেতা সঞ্জয়ের ভাই আসগর আলি এবং এম মির্জা সঞ্জয় ইন্টারন্যাশনাল নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এঁদের প্রথম ছবির নামকরণ হয়েছে 'মন, মন্দির আউর পূজারী'। অবশ্যই নায়কের ভূমিকায় থাকছেন সঞ্জয়, নায়িকা হচ্ছেন সায়রা বানু। পরিচালনা করবেন বিনোদ-কুমার এবং সুর দেবেন নৌশাদ।

* * *

আপনারা ফুটবল খেলোয়াড় গুরুদ কৃপাল সিংকে দেখেছেন কলকাতার ময়দানে, অন্তত নামটা নিশ্চয়ই শুনেছেন। তিনি এবারে মাঠ ছেড়ে পর্দায় বিচরণ করবেন। ছবিটা হল পাঞ্জাবী ভাষায়—নাম 'উদীকন' (মানে দীর্ঘ প্রতীক্ষা)।

কণ্ঠশিল্পী হিসেবে শারদার নাম আপনারা শুনেছেন, কিন্তু সম্প্রতি তিনি আর একটি গুণের পরিচয় দিয়েছেন। শ্যাম বেহলের ছবি 'গোল্ড মেডাল' ছবির একটি গান তিনি রচনা করেছেন এবং গেয়েছেন। মহিলা কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে তিনি প্রথম মহিলা যিনি স্বরচিত গান রেকর্ড করলেন ফিল্মে।

সম্প্রতি অভিনেতা রাজেন্দ্রকুমার বেশ কয়েকখানি ছবির কন্ট্রাক্ট করেছেন। প্রথম হল মোহনকুমারের 'আনোখা'। তারপর নাদিয়াদওয়ালার সঙ্গে একখানি এবং মালিকচাঁদ কোচারের একখানি ছবি। এছাড়া তাঁর হাতে আছে রামানন্দ সাগরের 'গীত', প্রযোজক-পরিচালক রাজহংসের 'ধালোক' মাদ্রাজের শ্রীধরের 'সাথী' প্রভৃতি।

পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জি বেশ কিছুদিন পরে আবার তাঁর 'আনোখা প্যার' ছবির কাজ শুরু করেছেন রূপতারা স্টুডিওতে। এতে অভিনয় করছেন বিশ্ব-জিৎ, মালা সিনহা, নিরূপা রায়, দেবেন বর্মা প্রভৃতি।

দীর্ঘ ৩৪ বছর চিত্রজীবনের মধ্যে অশোককুমার এখনও চিরনবীন। তাঁর জন-প্রিয়তা ও সম্মান এখনও অপ্রতিহত। সর্বত্রই তিনি 'দাদামণি' নামে সমাদৃত। তাঁর নতুন ছবির নাম পরিচালক ব্রিজের পরিচালনায় 'দো ভাই'। এতেও নায়িকা হলেন মালা সিনহা।

আবার একখানি 'প্যার' মার্কা ছবি। এবারে শিবপারস প্রোডাকশনের 'করে পড়োশী প্যার'। শিবকুমার এবং স্বপ্না নায়ক-নায়িকা, আই এস জোহরও সম্প্রতি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

* * *

সম্প্রতি কোন একটি ছবির উঠতি নায়ক কোন একটি ছবির শ্যুটিং-এর মধ্যাহ্নভোজের বিরতির সময় পরিচালককে না বলে বাইরে চলে গিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনে। তিনি যখন ফিরলেন, তখন 'লাঞ্চে'র সময় অতিক্রান্ত হয়ে এক-

ঘণ্টা হয়ে গেছে। এদিকে পরিচালকমশায় তো রেগে আগুন। নায়িকা যদিও নতুন—তবুও তিনিও মনে মনে ফাঁদ আঁটলেন কি করে এই উঠতি 'হিরো'কে 'টাইট' দেওয়া যায়। যাই হোক, হিরো ফিরলেন, ফিরে আবার মেক-আপ করে যখন ফ্লোরে এসে পৌঁছুলেন, তখন পাঁচটা বাজে। ডিরেক্টারমশায় মনে মনে চটলেও মুখে কিছুই বললেন না। হিরোইন কিন্তু সন্ধ্যা ৭টার সময় বললেন যে, সকাল থেকে তিনি মেক-আপ করে রয়েছেন—তাঁর মেক-আপ খারাপ হয়ে গেছে। সুতরাং তাঁকে আবার মেক-আপ করতে হবে। ক্যামেরাম্যানও হিরোইনের কথায় সায় দিলেন। ফলে হিরোইনও নিলেন পুরো একঘণ্টা। ফলে হলো কি—সেদিনের প্রোগ্রাম শেষ করতে রাত্রি বারোটা বেজে গেল। আর বেচারা টেকনিশিয়ানেরা বাড়ী গেল রাত্রি একটার সময়। পরে অবশ্য উঠতি নায়ক অনুতপ্ত হয়ে পরিচালকের কাছে মাপ চেয়েছিলেন। আমে-দুধে মিশে গেল কিন্তু মরল বেচারা টেকনিশিয়ানের দল। তারা যদি কেউ এইরকম অনুপস্থিত হতো, তাহলে তো পরিচালক-প্রযোজক সেটের মধ্যেই তুমুল কাণ্ড করতেন। এই হল চিত্রজগতের ধারা।

* * *

আপনি কি জানেন যে, যুগ্ম সংগীত-পরিচালক সোনিক ও ওমির মধ্যে যাঁর নাম সোনিক, তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন?

—যে প্রখ্যাত পরিচালক নীতীন বসু মশায় শিগগীর আবার চিত্রজগতে ফিরে আসছেন এবং শিগগীর তাঁর নতুন ছবি ঘোষণা করবেন?

—পরিচালক বাসু ভট্টাচার্যের নতুন ছবির সমস্তটাই তোলা হচ্ছে আউটডোরে—মাত্র একটি সেট ছাড়া?

আপনার কি জানা আছে যে, সুর-শিল্পী রবি একদম পুরোপুরি নিরামিষাশী? তিনি যে তিন মাস কাল বিদেশ সফর করে এলেন সেখানেও তিনি এ নিয়ম থেকে বিচ্যুত হন নি?

যে সুরসম্রাজ্ঞী লতা মুঙ্গেশকরের অন্যতম প্রধান 'হবি' হচ্ছে ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলা?

যে লতা মুঙ্গেশকরের সহোদরা ভগ্নী হলেন মধুকণ্ঠী আশা ভোঁসলে এবং তাঁর এক ভাইয়ের নাম হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর? হৃদয়নাথ ইতিমধ্যেই সুরশিল্পীরূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন মারাঠী চিত্রজগতে। এবার বসন্ত যোগলেকারের হিন্দী ছবি 'প্রার্থনাতে'ও তিনি সুরশিল্পীরূপে আত্ম-প্রকাশ করছেন।

যে বোম্বয়ে একটি রেস্তোঁরা আছে নাম 'বুলক কার্ট'। এটির মালিকানাস্বত্ব হল শংকর-জয়কিষেণ জুটির শ্রীশংকরের পুত্র রবিকুমারের। তরুণ-তরুণীদের এক রমণীয় মিলন-কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন এটি।

—প্রবাসী

তপন সিংহ পরিচালিত সাগিনা মাহাতো/সায়রা বানু

মঞ্চাভিনয়

লণ্ডনের প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রবণতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। কিছুদিন আগে একটি নতুন সাংস্কৃতিক সংস্থার নবজন্ম লাভ হয়েছে। কয়েকজন রসিক বাঙালী মিলে এই দলটি গঠন করেন এবং নাম দিয়েছেন 'কালচার'। গত ২৫ অকটোবর স্থানীয় কিংস জর্জেস হলে 'কালচারে'র প্রথম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উদ্‌যাপিত হল। নৃত্য আর নাটক ছিল এর প্রধান আকর্ষণ।

চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনুশীলা দাসের নৃত্য দেখে বহু বৃটিশ ও ভারতীয় যেমন মুগ্ধ হয়েছেন তেমনি আনন্দিত হয়েছেন 'কালচার গোষ্ঠীর অভিনীত নাটক 'ফিংগার প্রিন্ট' (রচনা পার্থপ্রতিম চৌধুরী।) দেখে। নাটকটি পরিচালনা করেছেন সত্যেন বড়ুয়া এবং নায়ক ইন্দ্রনীলের ভূমিকায়ও তিনি অংশ নিয়েছেন। স্বাতীর ভূমিকায় সন্ধ্যা দে সুন্দর। অন্যান্য ভূমিকায় শোভনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর ভট্টাচার্য, সুশীরঞ্জন রায়চৌধুরী, পরিতোষ ঘটকের অনবদ্য অভিনয়ে দৃঢ়তার ছাপ আছে। ইতিমধ্যেই দু-একটি বাঙালীবহুল শহর থেকে এই গোষ্ঠী আমন্ত্রিত হয়েছেন। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এরা আরো নাটানুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবাসী বাঙালীদের নাট্যতৃষ্ণা নিবারণ করবেন।

মধ্যমগ্রাম 'চলন্তিকা' নাট্যগোষ্ঠীর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত প্রয়াসের স্বাক্ষর আছে তা আবার নতুন গৌরবে দীপ্ত হয়ে উঠলো সম্প্রতি ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তব জীবন-নিষ্ঠ 'চোর' প্রযোজনায়। বান্ধব সমিতির মঞ্চে পরিবেশিত এ নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব সার্থকভাবে বহন করেন শ্রীসুবোধ রায়-চৌধুরী। নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টির ব্যাপারে শ্রীরায়-চৌধুরী নিঃসন্দেহে সুগভীর শিল্পবোধের পরিচয় রেখেছেন এবং তাঁর নিষ্ঠার সঙ্গে সমান তালে মিলেছে শিল্পীদের আন্তরিক অভিনয়। ফলে প্রযোজনার গতি হয়েছে দুর্বার, শৈথিল্য বা কৃত্রিমতায় মন্থর হয়ে পড়েনি। শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী যার অভিনয় স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত ও জীবন্ত হয়ে

লন্ডনের সাংস্কৃতিক সংস্থা কালচার প্রযোজিত পার্থপ্রতিম চৌধুরীর ফিংগার প্রিন্ট নাটকের একটি দৃশ্যে নায়ক-পরিচালক সত্যেন বড়ুয়া, সন্ধ্যা দে এবং পরিতোষ ঘটক।
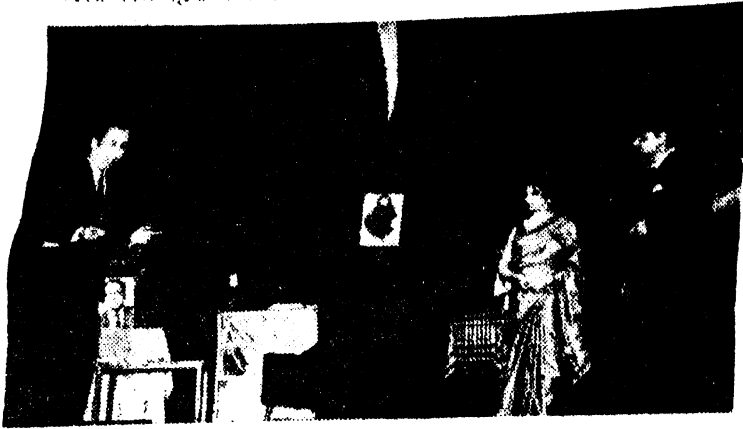
ওঠে তার নাম হোল দীপ্তি চক্রবর্তী, 'বাবুয়া' চরিত্রে তার অভিনয় সত্যি ভোলা যায় না। মনতোষ বসু (রামলাল), সমীর কর (বারীন), রমেশ রায়চৌধুরী (হারিণ), প্রভাত ঘোষ (ধর্মদাস), অলীমা মিত্র (কাজল), স্মৃতিকণা চক্রবর্তী (সুমিতা) চরিত্রচিত্রণে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন সমীর ঘোষ, মাখন ঘোষ, সুভাষ মিত্র, গোপাল চক্রবর্তী, তপন চক্রবর্তী, আজিত মুখার্জী, রতন ঘোষ, অমল বসু।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক চৌরঙ্গী স্কোয়ার স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনায় সম্প্রতি 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হোল শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে'। শ্রীপার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যরূপায়ণ ও নির্দেশনায় যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। দীপিকা দাসের 'বিন্দু' ও গীতা দে'র 'অন্নপূর্ণা' এই নাট্যপ্রযোজনার দুটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রচিত্রণ। প্রফুল্ল সরকারও 'যাদব' চরিত্রে বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে পেরেছেন। পূর্ণেন্দু রায়ের সঙ্গীত পরিচালনা নাটকটিকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদাও দিয়েছে স্বীকার করতে হবে।

এ বছর সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী স্যামুয়েল বেকেটের সম্মানার্থে সুপ্রসিদ্ধ 'মাইমেসিস' সংস্থা এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন গত ১৩ নভেম্বর ম্যাকসমুলার ভবনে। আলোচনায় বেকেট সম্পর্কে বলেন ডঃ শচীন গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ নরেশ গুহ ও অধ্যাপক পি লাল। সকলের বক্তব্যই তথ্যপূর্ণ ও মনোজ্ঞ। পরিশেষে বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোদো'র বাংলা রূপান্তর 'ঈশ্বরবাবু আসছেন' (প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়) নাটকটি অভিনীত হয়। আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতা ও জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা বড় কঠোরভাবে ফুটিয়েছেন এই নাটকে। আধুনিক মানুষের কোন পরম প্রাপ্তি নেই। শুধু ক্লান্তিকর প্রতীক্ষাই তার ললাটলিপি। নাটকের দু প্রধান চরিত্র ভুতো আর গদাই বসে আছে তাঁদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী ঈশ্বরবাবু আসবেন সেই জন্য। কিন্তু ঈশ্বরবাবু আসেন না। তারা শুধুই আশায় বসেই থাকে। সংলাপের চমৎকারিত্বে ও শিল্পীদের অভিনয়ের গুণে নাটকটি একটি সার্থক প্রযোজনা। দুটি প্যাকিং বাক্স, একটি ছেঁড়া বাঁশের বেড়া, আর একটি গাছ দিয়ে তৈরী মঞ্চ সত্যিই প্রশংসনীয়। অভিনয় সকলেরই উচ্চমানের। অভিনয়ে—অশোক সরকার, হরিহর দাশগুপ্ত, অবিজিৎ গুহ, কমল ঘোষদস্তিদার (নির্দেশক) ও স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশংসা পাবেন। সামগ্রিকভাবে 'ঈশ্বরবাবু আসছেন' প্রযোজনাটি মাইমেসিস-এর সুনাম বৃদ্ধি করবে।

কর্পোরেশন বিল্ডিং রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যারা সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক পরিবেশন করেছেন। মঞ্চসফল এই নাটকটিতে যাঁরা অংশ নেন তাঁরা প্রায় সবাই আন্তরিকতার সঙ্গে চরিত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অভিনয় করতে চেষ্টা করেছেন। অভিনয়ের ব্যাপারে তারাশঙ্কর বক্সী 'চাণক্যে'র ভূমিকায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় রাখতে পেরেছেন। 'সেলুকাস' ও চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায় অমূল্য সাহা ও শরদিন্দু সাহার অভিনয় মন্দ নয়। প্রতিমা পালের 'ছায়া' একটি প্রাণবন্ত চরিত্র চিত্রণের উদাহরণ, তাঁর গানের মাধুর্য শ্রোতাদের আবিষ্ট করেছে প্রতিমুহূর্তে। শম্ভু কর্মকার ও যূথিকা ভট্টাচার্য 'অ্যান্টিগোনাস' ও 'হেলেনে'র ভূমিকায় নিজেদের কোন মুহূর্তেই মানিয়ে নিতে পারেন নি। গীতা দের 'মুরা' দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন অনিল সাহা, নিরঞ্জন ব্যানার্জী, সুবোধ দাস, নির্মল রাউত, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, দিলীপ গাঙ্গুলী। আলোকসম্পাতের ব্যাপারে বহু শৈথিল্য চোখে পড়েছে।

চন্দননগর ধ্রুব নাট্য সমাজের শিল্পীরা সম্প্রতি স্থানীয় 'নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে' রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'কালের মৈনাক' নাটক সার্থকতার সঙ্গে অভিনয় করেন। বিভিন্ন চরিত্রে আন্তরিকতা মিশিয়ে অভিনয় করেন অরুণ নন্দী, মায়া মৈত্র, শান্তি নন্দী, নিশীথ ব্যানার্জি, সুহাস সুর, বরুণ নন্দী, রবীন দত্ত, সুকুমার কুন্ডু, শ্রীলেখা দত্ত।

বিবিধ সংবাদ

গত সপ্তাহে অমৃতবাজার পত্রিকা যুগান্তর ও অমৃত পত্রিকার সিটি অফিসে কর্মীদের উদ্যোগে বিজয়া-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মাত্র কয়েকজন শিল্পীর সমাবেশে। শ্রীদিলীপ সরকারের আধুনিক গান দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু হয়। তারপর পরিবেশিত হয় কল্যাণী ঘোষের রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অমর পালের ভক্তিভাবমিশ্রিত লোকসঙ্গীত। প্রতিটি অনুষ্ঠানই আপনাপন বিষয়বস্তু অনুযায়ী রস-সমৃদ্ধ হতে পেরেছে সুকণ্ঠ শিল্পীদের আবেগভরা পরিবেশনার জন্য। আসরের মেজাজানুসারী উচ্চাঙ্গ-লঘু-সঙ্গীতের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উপহার দেন শিল্পী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে যুগ্মযোগ্য সঙ্গতে আনন্দ দিয়েছেন চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সবশেষে ছিল জনাব কেরামতুল্লা খাঁর যাদুকরী তবলা সঙ্গতে ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর সরোদানুষ্ঠান। বাংলা দেশে যথোচিত সমাদর না পেলেও সারা ভারতের সম্পদ : শিল্পী বাহাদুর খাঁর সমপর্যায়ী সরোদী (আলি আকবর খাঁকে বাদ দিয়ে) যে আর নেই সে সত্যই নতুন করে অনুভব করা গেল সেদিন খাঁ-সাহেবের পরিবেশিত দক্ষিণ-ভারতীয় রাগ 'কিরবাণী' শুনে। রঙে-রসে উজ্জ্বল এ অনুষ্ঠান বহুদিন মনে থাকবে।

সুকান্ত পাঠাগারের সাহায্যার্থে নিজ সিঁথি যুব সঙ্ঘের পরিচালনায় গত ১৩, ১৪ ও ১৫ নভেম্বর তিন দিনব্যাপী ষষ্ঠ বার্ষিকী সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। প্রথম দু দিন সেমিনার ও আন্তঃসঙ্ঘ একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা হয়। ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন দৈনিক বসুমতীর প্রধান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির হয়েছিলেন শ্রীমণীন্দ্র রায়। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সুসাহিত্যিক শ্রীবিমল কর, অধ্যাপক অরুণ সান্যাল, দিলীপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্ঘ সভাপতি বিশ্বনাথ আচার্য, পাঠাগার উপসমিতির সভাপতি শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত, উমাপদ দত্ত এবং স্লাইড-সহযোগে 'ভিয়েৎনাম'-এর উপর বক্তৃতা করেন শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী। প্রতি বৎসরের মতো এ বছরও সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ পাঁচটি নাটক দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করেন। তার মধ্যে 'সমুদ্র সন্ধানে' নাটকটি বিচারকমণ্ডলীর বিচারে প্রথম হয়। পরিচালক হিসাবে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী 'সমুদ্র সন্ধানে'র যুগ্ম পরিচালক শ্রীঅর্ধেন্দু চক্রবর্তী ও মানস ঘোষাল, শ্রেষ্ঠ অভিনেতার গৌরব লাভ করেন ও রবিবারের সকাল ও 'দলাদিদুক' নাটকে যথাক্রমে 'মহেশ' ও সুরেজলালের চরিত্রে অভিনয় করে শ্রীশ্যামল মিত্র। এই একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমর গঙ্গোপাধ্যায়। সম্মেলনের শেষ দিনে সঙ্ঘের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রদান করা

হয় এবং সারা রাত্রিব্যাপী বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ইলা বসু, নির্মলেন্দু চৌধুরী, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মিন্টু দাশগুপ্ত, চন্দ্রাণী মুখার্জি, বটুক নন্দী ও সম্প্রদায়, সুপ্রিয় সেনগুপ্ত, গার্গী ভৌমিক ও সম্প্রদায় ও হাস্যকৌতুকে শ্রীসুনীল চক্রবর্তী।

প্রত্যহ 'ভিয়েৎনাম' চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সাবলীল পরিবেশে তিন দিনব্যাপী ষষ্ঠবার্ষিকী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

বাংলাদেশের প্রখ্যাতা মঞ্চ ও চিত্রাভিনেত্রী সর্বজন প্রশংসাধন্যা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর সম্মানার্থে ভারতীয় শিল্পী পরিষদের অনন্যসাধারণ সার্থক মঞ্চসৃষ্টি চিরনতুন নৃত্যনাট্য অতীনলাল পরিকল্পিত 'শ্রীচৈতন্য' অভিনীত হবে আগামী ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬-৩০টায় মহাজাতি সদনে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীপ্রশান্ত সুর। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়।

১৪ নভেম্বর বালিগঞ্জস্থিত রবিতীর্থ ভবনে দক্ষিণ কলিকাতার সাংস্কৃতিক সংস্থা 'সুরসভা' উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশিত হল। 'সেথায় কবি [illegible]' গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে রবীন্দ্রসংগীত, রজনীকান্তের গান, [illegible] ভজন ও পল্লীগীতি গেয়ে শোনান [illegible] সিংহ, সৌমেন বসু, [illegible] রায়, মঞ্জু ঘোষ, পূর্ণিমা রায়, চন্দা মুখোপাধ্যায়, নন্দিতা চক্রবর্তী, রত্না রায়, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, [illegible] ও গীতা চৌধুরী। সব শেষে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে কৌশিকী রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান কালীপদ দাস। ইমন রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান [illegible] এবং মধ্যকোষ রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন [illegible]। [illegible] তবলায় ও সহযোগিতায় [illegible] ভট্টাচার্য, [illegible] চৌধুরী, অমল পাল ও স্বপন মুখোপাধ্যায়।

গেল ১৬ নভেম্বর [illegible] [illegible] [illegible] সংস্থার বার্ষিক [illegible] উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। [illegible] [illegible] রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে বিভিন্ন [illegible] অংশ গ্রহণ করেন [illegible] চৌধুরী, অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, [illegible] মিত্র, [illegible] ও মাধব মিত্র। [illegible] রবীন্দ্রসংগীতের [illegible] পরিবেশন করেন [illegible] মিত্র। সঙ্গতে ছিলেন [illegible] চট্টোপাধ্যায় ও [illegible] নন্দী। [illegible] হাস্য-কৌতুক পরিবেশন করে অমিতাভ মুখোপাধ্যায় সকলকে পরিতৃপ্ত করেন।

বর্তমান হানাহানি এবং অশান্তিময় পরিপার্শ্ব থেকে সাধারণ মানুষের মন ঈশ্বরমুখী এবং ভ্রাতৃপ্রেম উদ্বুদ্ধ করবার সদিচ্ছায় সর্বসাধারণ হয়ে চণ্ডীতলা সোদপুর শ্রীগৌর মিলন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী রতিনাথ সুদীর্ঘকাল ধরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করে আসছেন। এই নাম-আন্দোলনকে আরো জোরদার করবার উপায় নির্ধারণের জন্যে সম্প্রতি শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মোৎসব কমিটির আহ্বানে আশ্রম-প্রাঙ্গণে এক আলোচনার আসর বসে শ্রীবিমল বসুর সভাপতিত্বে। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাক্তন বিপ্লবী শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দেবরায়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী হরিদাস গোস্বামী, রথীন তালুকদার, পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী, রমেশ পাকড়াশী, রাজেন ঘোষ, চিত্ত সরকার, সুধীন্দ্রনাথ দেবরায়, অমিয় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা। সভান্তে নাম-গানের আসর বসে।

পত্রিকা সিটি অফিসে আয়োজিত বিজয়া সম্মেলনে বাহাদুর খাঁ সরোদ বাজাচ্ছেন।
ফটো : অমৃত।

গত ২ অকটোবর সন্ধ্যায় বালীগঞ্জ শিক্ষা সদন মঞ্চে চন্দননগর 'যাদুকর চক্র' এক যাদু উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। দক্ষিণ কলকাতায় এই ধরনের প্রচেষ্টা প্রথম। যাদুকর দি গ্রেট সুশীল এই যাদু উৎসবে তাঁর বিখ্যাত 'মণিপুরের মায়া, বাল্কের বিচার এবং রহস্যময় দুধ' পরিবেশন করেন। যাদু উৎসবে এছাড়াও যাদুকর ভি এম ঘোষ, কমলেশ ভট্টাচার্য, অনাদি দত্ত, কাশীনাথ চন্দ্র, জি দাঁ, অবনী বন্দ্যোপাধ্যায়, তপনকুমার, যাদুকর শৈলেশ্বর, শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের বিখ্যাত কয়েকটি যাদুর খেলা পরিবেশন করেন। উপরোক্ত যাদুকরদের মধ্যে যাদুকর শৈলেশ্বর-এর কমেডি ম্যাজিক, ভি এম ঘোষের সোর্ড এরিয়াল, তপনকুমারের টেম্পল অফ ইণ্ডিয়া, কমলেশ ভট্টাচার্যের ডলস হাউস, শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর হ্যাট থ্রু গ্লাস এবং জি দাঁর কথা বলা পুতুল খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

গত ২৫ অকটোবর শনিবার সার্বজনীন দুর্গোৎসব উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতার লেডিস পার্কে বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমাংশু বিশ্বাস ও সম্প্রদায়, সৌরেন পাল, বনশ্রী সেনগুপ্তা, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত মুখোপাধ্যায়, দেবী মল্লিক, মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, লাবু বিশ্বাস, তপন মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।

পরিচিত হরবোলা শিল্পী অজয় গঙ্গোপাধ্যায় গত ৩ নভেম্বর অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথ আয়োজিত উৎসবে শিক্ষাসদন হলে এককভাবে অংশ নেন। এছাড়াও বিভিন্ন যেসব অনুষ্ঠানে তিনি সম্প্রতি অংশ নিয়েছেন, তার মধ্যে আছে মহেশতলা ইউরেকা ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান, যাদবপুর শ্যামা সংঘের অনুষ্ঠান প্রভৃতি। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় নানা ফিচারের মধ্য দিয়ে নিজের জনপ্রিয়তাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার রান

ক্ষেত্রনাথ রায়

ক্রিকেট খেলোয়াড়দের প্রধান লক্ষ্য রান সংগ্রহ করা। এই রানকে প্রধানত মাপকাঠি করেই ক্রিকেট খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা করা হয়। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় রান সংগ্রহের বিভিন্ন দিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার কৃতিত্ব কতখানি বর্তমান নিবন্ধে তারই পর্যালোচনা করা হল।

এক ইনিংসে সর্বাধিক দলগত রান

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় আজও কোন দেশ এক ইনিংসের খেলায় এক হাজার রান তুলতে পারে নি। নিকট দূরত্বে গেছে একমাত্র ইংল্যান্ড। ১৯৩৮ সালে ওভালের ৫ম টেস্টের প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ড যে ৯০৩ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) তুলেছিল তা আজও টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক রানের বিশ্বরেকর্ড হয়ে আছে। টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ৭০০ বা তার বেশী রান সংগ্রহ করেছে মাত্র এই তিনটি দেশ মোট ৬ বার—অস্ট্রেলিয়া ৩ বার, ইংল্যান্ড ২ বার এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ একবার। সুতরাং টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ৭০০ বা তার বেশী রান সংগ্রহের দিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার কৃতিত্বই বেশী।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯৫৪-৫৫ সালে কিংস্টনের পঞ্চম টেস্টের প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া যে ৭৫৮ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) তুলেছিল অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে তা আজও টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক রানের রেকর্ড হয়ে আছে। অস্ট্রেলিয়ার এই প্রথম ইনিংসের খেলাটি আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নানা দিক থেকে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১৯৫৪-৫৫ সালের ২য় ও ৪র্থ টেস্ট খেলা ড্র যায়। অস্ট্রেলিয়া ১ম ও ৩য় টেস্ট খেলায় জয়লাভের সূত্রে 'রাবার' জয়ী হয়ে কিংস্টনের এই ঐতিহাসিক ৫ম টেস্ট খেলতে নামে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ব্যাট করার দান হাতে নেয়। দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসের খেলা মাত্র আধ ঘন্টা টিঁকেছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস ৩৫৭ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস খেলতে নামে। অস্ট্রেলিয়ার খেলার সূচনা খুবই খারাপ হয়েছিল। স্কোরবোর্ডে তাদের রান জমা পড়ার আগেই প্রথম উইকেট পড়ে যায়। আর দ্বিতীয় উইকেট পড়ে দলের সাত রানের মাথায়। দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার আর কোন উইকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফেলতে পারে নি। ওপনিং ব্যাটসম্যান ম্যাকডোনাল্ড এবং নীল হার্ভে তৃতীয় উইকেট জুটি বেঁধে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। চতুর্থ দিনে চা-পানের পর অস্ট্রেলিয়া আর খেলে নি। তারা দলের ৭৫৮ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস ৩১৯ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৮২ রানে জয়ী হয়।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৭৫৮ রানে (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) এই পাঁচজনের সেঞ্চুরী ছিল—সি সি ম্যাকডোনাল্ড (১২৭ রান), নীল হার্ভে (২০৪ রান), কিথ মিলার (১০৯ রান), রন আর্চার (১২৮ রান) এবং রিচি বেনো (১২১ রান)। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে কোন একটি দলের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় পাঁচটি সেঞ্চুরী করার নজির এই প্রথম এবং আজও অপর কোন দল এই নজির সৃষ্টি করতে পারে নি। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের এই ৭৫৮ রানে ৩য়, ৫ম এবং ৮ম উইকেট জুটিতে এইভাবে শতাধিক করে রান উঠেছিল : ম্যাকডোনাল্ড এবং হার্ভের ৩য় উইকেট জুটিতে ২৯৫ রান, মিলার এবং আর্চারের ৫ম উইকেট জুটিতে ২২০ রান, বেনো এবং জনসনের ৮ম উইকেট জুটিতে ১৩৭ রান।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে নীল হার্ভের ২০৪ রান ছিল উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান। কিন্তু রিচি বেনো ১২১ রান করে অপর খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব ম্লান করে দেন। বেনো মাত্র ৯৬ মিনিটে তাঁর ১২১ রান সংগ্রহ করেছিলেন—শতরান পূর্ণ করেছিলেন মাত্র ৭৮ মিনিটের খেলায়। তাঁর ১২১ রানে ছিল ১৮টা বাউন্ডারী এবং দুটো ওভার-বাউন্ডারী।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস

৫ম টেস্ট, কিংস্টন, ১৯৫৫, জুন

ম্যাকডোনাল্ড ব ওরেল	১২৭
ফ্যাভেল ক উইকস ব কিং	০
মরিস এল বি-ডব্লিউ ব ডিউডনি	৭
হার্ভে ক ওরেল ব স্মিথ	২০৪
মিলার ক ওরেল ব এ্যাটকিনসন	১০৯
আর্চার ক ডিপিজা ব সোবার্স	১২৮
লিন্ডওয়াল ক ডিপিজা ব কিং	১০
বেনো ক ওরেল ব স্মিথ	১২১
জনসন নট-আউট	২৭
অতিরিক্ত	২৫
(৮ উইঃ ডিক্লেঃ) মোট	৭৫৮

দ্রষ্টব্য : ল্যাংলে এবং জনস্টন ব্যাট করেন নি।

বোলিং : ডিউডনি ২৯-৭-১১৫-১, কিং ৩১-১-১২৬-২, এ্যাটকিনসন ৫৫-২১-১৩২-১, **স্মিথ** ৫২-৭-১৭-১৪৫-২, ওরেল ৪৫-১০-১১৬-১, সোবার্স ৩৮-১২-৯৯-১।

এক সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান

টেস্টের এক সিরিজের খেলায় এ পর্যন্ত কোন খেলোয়াড় মোট হাজার রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হন নি। নিকট দূরত্বে গেছেন অস্ট্রেলিয়ার ডন ব্র্যাডম্যান। টেস্টের এক সিরিজে তাঁর মোট রান দাঁড়ায় ৯৭৪ (১৯৩০ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, খেলা ৫, ইনিংস ৭, নট-আউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৩৪, **সেঞ্চুরী ৪ এবং গড় ১৩৯-৩৪)।** ব্র্যাডম্যানের এই ৯৭৪ রান আজও টেস্ট ক্রিকেটের এক সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক মোট রান সংগ্রহের বিশ্বরেকর্ড হয়ে আছে। এখানে উল্লেখ্য, টেস্টের এক সিরিজে ৮০০ রান (বা তার বেশী) করেছেন মাত্র পাঁচজন খেলোয়াড় মোট ৭ বার—এঁদের মধ্যে ব্র্যাডম্যান করেছেন ৩ বার।

টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে সর্বাধিক মোট রান

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে সর্বাধিক মোট রান করার অধিকারী ডন ব্র্যাডম্যান। তাঁর মোট রান দাঁড়ায় ৬৯৯৬ (**খেলা** ৫২, **ইনিংস** ৮০, নট-আউট ১০ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৩৪, সেঞ্চুরী ২৯ **এবং গড়** ৯৯-৯৪)। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ব্যক্তিগত সর্বাধিক মোট রানের ক্রমপর্যায় তালিকায় ব্র্যাডম্যানের স্থান ২য়। প্রথম স্থানে আছেন ইংল্যান্ডের ওয়াল্টার হ্যামন্ড—মোট রান ৭২৪৯ (খেলা ৮৫, ইনিংস ১৪০, নট-আউট ১৬ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নট-আউট ৩৩৬, সেঞ্চুরী ২২ **এবং গড়** ৫৮-৪৫)। তবে গড় তালিকায় ব্র্যাডম্যানের স্থান শীর্ষদেশে—তাঁর গড় সংখ্যা ৯৯-৯৪।

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৫৭-৫৮ সালের কিংস্টন টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের গারফিল্ড সোবার্স যে নট-আউট ৩৬৫ রান করেছিলেন তা আজও টেস্ট ক্রিকেট খেলার এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্বরেকর্ড হয়ে আছে। টেস্টের খেলায় এ পর্যন্ত এই চারটি দেশের ৮ জন খেলোয়াড় মোট দশবার ব্যক্তিগত ৩০০ রান (বা তার বেশী) করেছেন—অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড় ৪ বার, ইংল্যান্ডের খেলোয়াড় ৪ বার, ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড় একবার এবং পাকিস্তানের খেলোয়াড় একবার।

১৯৩০ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লিডস মাঠে ডন ব্র্যাডম্যানের ৩৩৪ রান (যা এক সময়ে বিশ্বরেকর্ড ছিল) আজও অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। ব্র্যাডম্যান তাঁর এই ৩৩৪ রানের মধ্যে ৩০৯ রান সংগ্রহ করেছিলেন এক দিনের খেলায় (৩৪০ মিনিটে), যা আজও একদিনের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান সংগ্রহের রেকর্ড হয়ে আছে।

ব্র্যাডম্যান তাঁর এই ঐতিহাসিক ৩৩৪ রান সংগ্রহের সূত্রে এই দুটি উল্লেখযোগ্য নজির সৃষ্টি করেন—লাঞ্চের পূর্বে সেঞ্চুরী (১০৫ রান) এবং প্রথম দিনের খেলায় ৩৪০ মিনিটে ৩০৯ রান সংগ্রহ যা আজও একদিনের খেলায় সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান সংগ্রহের বিশ্বরেকড হয়ে আছে।

এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রান

(পুরো এক ইনিংসের খেলায়)

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে পুরো এক ইনিংসের খেলায় সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড—৩৬ রান (**১৯০২ সালে** ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, বার্মিংহাম)।

কানপুরে ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া দল ফিল্ডিং করতে নেমেছে। খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থাকে।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষ

দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

ভারতবর্ষ : ৩২০ **রান** (ইঞ্জিনীয়ার ৭৭, মানকাদ ৬৪ এবং সোলকার ৪৪ রান। কনোলী ৯১ রানে ৫ এবং ম্যালেট ৫৮ রানে ৩ উইকেট)।

ও ৩১২ **রান** (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বিশ্বনাথ ১৩৭, মানকাদ ৬৮ এবং সোলকার ৩৫ রান। ম্যাকেঞ্জি ৬৩ রানে ৩ এবং কনোলী ৬৯ রানে ২ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া : ৩৪৮ **রান** (সিহান ১১৪, রেডপাথ ৭০ এবং ওয়াল্টার্স ৫৩ রান। ভেঙ্কটরাঘবন ৭৬ রানে ৩, গুহ ৫৫ রানে ২ এবং প্রসন্ন ৭১ রানে ২ উইকেট)।

ও ৯৫ **রান** (কোন উইকেট না পড়ে)।

কানপুরে আয়োজিত ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই খেলা ড্র করার সমস্ত কৃতিত্ব ভারতীয় খেলোয়াড়দের।

ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের ২৩৭ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়। পাতৌদির নবাব ৩৬ রান এবং সোলকার ১৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। **ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলার** গোড়াপত্তন খুব শক্ত হয়েছিল। প্রথম উইকেটের জুটিতে ইঞ্জিনীয়ার এবং অশোক মানকাদ তাঁদের উজ্জ্বল ব্যাটিং নৈপুণ্যে দলের ১১১ রান সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁরা অস্ট্রেলিয়ার বোলিং শক্তিকে পিটিয়ে তছনছ করে দেন। তাঁদের বিদায়ের পরই অস্ট্রেলিয়া খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করে। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ১১৮ (১ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১৮৬ (৪ উইকেটে)। **ইঞ্জিনীয়ারের** ৭৭ **রানে ছিল** ১২টা

বিশ্বনাথ—২য় টেস্টে সেঞ্চুরী (১৩৭) করেন

বাউণ্ডারী। অপরদিকে **মানকাদ ১৬৭** মিনিট খেলার **পর নিজস্ব ৬৪ রানের** মাথায় ম্যালেটের **বল খেলে তাঁরই হাতে** 'ক্যাচ' দেন। কনোলী ৬৩ রানে ৩টে উইকেট পান।

দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের **প্রথম ইনিংস** ৩২০ রানের মাথায় শেষ হয়। **অর্থাৎ এই** দিন তারা ১৪০ মিনিট খেলে **বাকি ৫টা** উইকেটের বিনিময়ে মাত্র **৮৩ রান সংগ্রহ** করে। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের **রান ছিল** ৩০০ (৮ উইকেটে)। দ্বিতীয় দিনের **খেলার** বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের **৩টে** উইকেট খুইয়ে ১০৫ রান **তুলেছিল**। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ভারতীয় খেলোয়াড়রা মাথা তুলে প্যাভেলিয়নে ফিরেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার তিনজন **শক্তিধর** খেলোয়াড় স্টাকপোল, লরী এবং চ্যাপেলকে খেলা থেকে বিদায় করেছেন এই আনন্দে।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার **প্রথম ইনিংস** ৩৪৮ রানের মাথায় শেষ হলে তারা মাত্র **২৮** রানে অগ্রগামী হয়। এই দিন অস্ট্রেলিয়া তাদের বাকি ৭ উইকেটের বিনিময়ে **২৪৩** রান সংগ্রহ করেছিল। পল সিহান তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের **প্রথম** সেঞ্চুরী (১১৪ রান) করার গৌরব লাভ করেন। অস্ট্রেলিয়ার ১৪০ **রানের** মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়ে। দলের এই অবস্থায় রেডপাথের সঙ্গে সিহান **৫ম উইকেটের** জুটি বেঁধে **খেলার মোড়** ঘুরিয়ে দেন। লাঞ্চের সময় অস্ট্রেলিয়ার **রান** দাঁড়ায় **২১৭** (৪ উইকেটে)। রেডপাথ এবং সিহান দুজনেই **৪২** রান করে অপরাজিত থাকেন। অস্ট্রেলিয়ার **২৭১** রানের মাথায় **৫ম উইকেটের** পতন **হল**—রেডপাথ **নিজস্ব** ৭০ রান করে খেলা থেকে বিদায় নিলেন। **৫ম উইকেটের জুটিতে রেডপাথ এবং সিহান**

দলের অতি মূল্যবান ১৩১ রান সংগ্রহ করেন। অস্ট্রেলিয়া ৪০২ মিনিট খেলে ৮ উইকেটের বিনিময়ে তাদের ৩০০ রান পূর্ণ করে। সিম্পসন তাঁর ৯৬ রানের মাথায় ভেংকটরাঘবনের বলে স্কোয়ার কাট মেরে বাউন্ডারী করেন এবং সেই সূত্রে তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম শত রান করেন। তাঁকে এই শত রান করতে ২২৫ মিনিট খেলতে হয়েছিল; বাউন্ডারী করেছিলেন ১৮টা। সিম্পসন তাঁর ১১৪ এবং দলের ৩৩১ রানের মাথায় সুব্রত গুহের বল খেলতে গিয়ে ইঞ্জিনীয়ারের হাতে "ক্যাচ" দিয়ে আউট হন। তিনি মোট ২০টা বাউন্ডারী করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৩৪৮ রানের মাথায় শেষ উইকেট পড়লে তৃতীয় দিনের খেলাও সেই সঙ্গে শেষ হয়।

ভারতবর্ষের ফিল্ডিং খুব খারাপ হয়েছিল। তা না হলে ভারতবর্ষের থেকে অনেক কম রানের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হত। বোলার সুব্রত গুহের ওপর অধিনায়ক পতৌদি বেশ কিছুটা অবিচার করেছিলেন। গুহর বোলিং ভাল হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে মাত্র ২১ ওভার খেলতে দেওয়া হয়েছিল।

চতুর্থ দিনের খেলায় ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের ৫ উইকেটের বিনিময়ে ২০৪ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলায় অপরাজিত থাকেন বিশ্বনাথ (৬৯ রান) এবং সোলকার (২০ রান)। এই দিনটি ভারতীয় ক্রিকেট অনুরাগীদের বহুকাল স্মরণ থাকবে। ভারতবর্ষের যুবশক্তিই শেষপর্যন্ত ভারতবর্ষের মুখ রেখেছিল। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন মহীশূরের ২০ বছরের যুবক বিশ্বনাথ। তাঁর সঙ্গী মানকাদ (৬৮ রান), পতৌদি (০) এবং গানদোত্র (৮ রান) একে একে অল্প রানের ব্যবধানে খেলা থেকে বিদায় নেন। দলের ১৪৭ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়লে তাঁর সঙ্গে ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি বাঁধেন সোলকার। দলের চরম সংকটের মুখে বিশ্বনাথ এবং সোলকার দৃঢ়তায় বুক বেঁধে খেলে যান এবং এই দিন তাঁরা ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ৫৭ রান তুলে অপরাজিত থাকেন। অস্ট্রেলিয়ার যোগ্য অধিনায়ক লরীর জয়লাভের আশা এবং প্রচেষ্টা তাঁরাই ব্যর্থ করে দেন। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে হিসাব নিয়ে দেখা গেল, ভারতবর্ষ ১৭৬ রানে অগ্রগামী, হাতে জমা দ্বিতীয় ইনিংসের ৫টা উইকেট এবং মাত্র একদিনের খেলা বাকি।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের ৩১২ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। শেষ দিনের খেলায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে বিশ্বনাথের সেঞ্চুরী (১৩৭ রান)। বিশ্বনাথকে নিয়ে ৬ জন ভারতবর্ষের পক্ষে খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করলেন। এখানে উল্লেখ্য টেস্ট খেলার ইতিহাসে খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করেছেন মাত্র ৩০ জন খেলোয়াড়। বিশ্বনাথ তাঁর শত রান পূর্ণ করেন ২৮২ মিনিট খেলে। বাউন্ডারী করেন ১৯টা। দলের অতি সংকটকালে অসাধারণ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে তিনি দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছেন। বিশ্বনাথ মোট ৩৫৪ মিনিট খেলে তাঁর ১৩৭ রানের মাথায় খেলা থেকে বিদায় নেন। বাউন্ডারী করেন ২৫টা। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে সোলকার (৩৫ রান) এবং বিশ্বনাথ দলের অতি মূল্যবান ১১০ রান সংগ্রহ করে দলকে যথেষ্ট বিপদমুক্ত করেন। বিশ্বনাথের শত রান করার মূলে সোলকারের অবদান কম ছিল না। তিনি বিশ্বনাথের সঙ্গে ২০০ মিনিট খেলেছিলেন।

অস্ট্রেলিয়া চা-পানের ৪০ মিনিট আগে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৮৫ রান সংগ্রহ করতে অস্ট্রেলিয়া কোন চেষ্টাই করেনি। কারণ ১৩০ মিনিটের খেলায় এত রান সংগ্রহ করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের ৯৫ রানের মাথায় খেলা শেষ হয়। এই রান তুলতে অস্ট্রেলিয়াকে কোন উইকেট হারাতে হয়নি।

জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী

ভারতবর্ষের পক্ষে এই ৬ জন তাঁদের খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করেছেন :

লালা অমরনাথ (১১৮ রান), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, বোম্বাই, ১৯৩৩-৩৪

দীপক সোধন (১১০ রান), বিপক্ষে পাকিস্তান, কলকাতা, ১৯৫২-৫৩

এ জি কৃপাল সিং (নট আউট ১০০ রান), বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, হায়দরাবাদ, ১৯৫৫-৫৬

আব্বাস আলী বেগ (১১২ রান), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৯

হনুমন্ত সিং (১০৫ রান), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, দিল্লী, ১৯৬৩-৬৪

জি আর বিশ্বনাথ (১৩৭ রান), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, কানপুর, ১৯৬৯

এখানে উল্লেখ্য, ভারতবর্ষের পক্ষে এই ৬ জন খেলোয়াড় ছাড়া বিভিন্ন দেশের পক্ষে আরও ২৪ জন খেলোয়াড় তাঁদের খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করেছেন। সর্বপ্রথম এই কৃতিত্বের গৌরব লাভ করেন অস্ট্রেলিয়ার চার্লস ব্যানারম্যান (বিপক্ষে ইংল্যান্ড, মেলবোর্ণ, ১৮৭৭)।

লিজেল ভেন্টারম্যান

পশ্চিম জার্মানীর শ্রীমতী লিজেল ভেন্টারম্যান মহিলাদের ডিসকাস নিক্ষেপে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৬৭ সালের ৫ই নভেম্বর তিনি ৬১-২৬ মিঃ (২০০ ফিট ১১ ইঞ্চি) দূরত্বে ডিসকাস নিক্ষেপ করে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন। এবং এই সূত্রেই মহিলাদের ডিসকাস নিক্ষেপের ইতিহাসে ৬০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করার গৌরব তিনিই প্রথম অর্জন করেন। তিনি এ পর্যন্ত ডিসকাস নিক্ষেপে তিনবার বিশ্ব-রেকর্ড ভেঙেছেন। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসের মাস দুই আগে (২৮শে জুলাই) তিনি ২০৫ ফিট ২ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম করে নতুন বিশ্ব-রেকর্ড করেছিলেন; কিন্তু ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক গেমসের ডিসকাস নিক্ষেপে তিনি স্বর্ণপদক পাননি, ১৮৯ ফিট ৬ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম করে রৌপ্য-পদক পেয়েছিলেন। রুমানিয়ার ম্যানোলিউ ১৯১ ফিট ২-৫ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম করে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন।

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা

১৯৭০ সালের মে মাসে মেক্সিকোতে যে ৯ম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসবে, সেই আসরে শুধু ১৬টি বাছাই-করা দেশ অংশগ্রহণ করবে। বাছাই পর্ব এখনও শেষ হয়নি, চারটি গ্রুপের চূড়ান্ত ফলাফল বাকি। এপর্যন্ত এই ১২টি দেশ মেক্সিকোর শেষ লীগ পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা লাভ করেছে : ইংল্যান্ড, মেক্সিকো, ব্রেজিল, পেরু, উরুগুয়ে, এল-সালভাডর, পশ্চিম জার্মানী, বেলজিয়াম, সুইডেন, মরক্কো, রাশিয়া এবং রুমানিয়া।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১ অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২ প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩ রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১ গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২ ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

১ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৩শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 5th Dec. 1969. শুক্রবার, ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপুলক মণ্ডল

নিজেরে হারায়ে খুঁজি প্রসংগে

'অমৃতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত নট-সূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর লেখা স্মৃতিচারণ 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' পড়ে অভিভূত হয়েছি। অতীতের বঙ্গ রঙ্গজগতের কথা শ্রদ্ধেয় শ্রীচৌধুরী এরূপ গভীর দরদ ও অন্তরঙ্গতার সঙ্গে লিখছেন যে, তা রসোত্তীর্ণ উপন্যাসের মতো মনে দাগ কাটে। বাংলা ছায়াছবির পথিকৃৎ নির্বাক যুগের ম্যাডান কোম্পানীর সম্বন্ধে এই লেখায় কিছু পড়তে পেয়ে তৃপ্তি লাভ করলাম। সেকালের রঙ্গজগতের আরও অনেক অন্তরঙ্গ কাহিনী শ্রীচৌধুরীর নিকট আশা করছি' ইঁহার ভাষা ও রচনাশৈলীও লক্ষ্য করার মতো।

নীলাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা-৪০।

উত্তরবংগের সাহিত্যপত্র প্রসংগে

আমি উত্তর বংগের সাহিত্য পত্র-পত্রিকা পড়বার খুব আগ্রহী। কিছু দিন হতে চেষ্টা করেও এইসব পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি নি। সম্প্রতি অমৃতের ২৭শ সংখ্যা চিঠিপত্র বিভাগে কবিতা সরকার এবং স্বপ্না দেব লিখিত 'উত্তরবঙ্গের সাহিত্যপত্র প্রসঙ্গে' উত্তরবঙ্গের ভাল পত্রিকা হিসাবে 'শালবনী' ও 'সমাবেশ'এর নাম জানলাম। কিন্তু কবিতা সরকার ও স্বপ্না দেবের লেখায় নাম ছাড়া পত্রিকার ঠিকানা জানতে পারলাম না।

আমি ঐ সকল পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই। সেই জন্যে কবিতা সরকার, স্বপ্না দেবের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, অমৃতের চিঠিপত্র বিভাগে শালবনী ও সমাবেশ অথবা উত্তরবঙ্গের অন্য কোন ভাল সাহিত্য পত্রিকার ঠিকানা জানালে ভালো হয়।

অতুলচন্দ্র মৌর
কিরিবুরু, বিহার

(২)

'অমৃতে'র আমি একজন গুণমুগ্ধ পাঠক। গত ৯ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ২৭ সংখ্যায় উত্তরবঙ্গের সাহিত্যপত্র সম্পর্কে জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে কবিতা সরকার, স্বপ্না দেব-এর চিঠি পড়লুম। চিঠিখানা অত্যন্ত ভুল তথ্যে ভরা। আমার মনে হয়, শ্রীমতী সরকার, শ্রীমতী দেব উত্তরবঙ্গের সাহিত্যপত্র সম্পর্কে স্পষ্ট খবর পান নি। দুটি সাহিত্যপত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সাহিত্যপত্রের উপর অত্যন্ত অবিচার করেছেন। সর্বোপরি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট কটি সাহিত্যপত্র প্রকাশ হয় সে সংবাদ শ্রীমতী সরকার, শ্রীমতী দেব-এর জানা নেই। এমন কি জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজের ছাত্রী হিসেবে নিজেদের পরিচিতি করলেও জলপাইগুড়ি জেলার অন্যতম মাসিক 'সমাবেশ'এর সরকার অনুমোদিত নাম 'সীমান্তিক' এ সংবাদটি পরিবেশন করতে তাঁরা ভুলে গেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, জলপাইগুড়ি জেলা থেকে প্রকাশিত 'পাবক' নামে যে মাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি গত দু'বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে তার নামটিও তাঁদের লেখায় নেই।

মালদা জেলা থেকে 'উত্তর দিগন্ত' 'অন্বয়' নামে আরো দুটি সাহিত্যপত্র নিয়মিত প্রকাশ হয়ে থাকে। আলিপুরদুয়ার থেকে 'দাবী' ও কোচবিহার থেকে 'তোর্ষা' নামে দুটি পত্রিকা বেরোয়।

মধুপর্ণী, অভিযান, স্পন্দন ভিন্ন 'সমাজবলী', 'কুন্তন', 'সঞ্চারিণী', 'পাখী ডাকা বিকেল' নামে আরো কটি পত্রিকা উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশ হয়ে থাকে।

মধুপর্ণী, অভিযান, স্পন্দন উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারছে না, এ সংবাদটি শ্রীমতী সরকার, শ্রীমতী দেব কি করে জানলেন?

আমি উত্তরবঙ্গের মানুষ। উত্তরবঙ্গের সাহিত্যসংস্কৃতিকে মনে-প্রাণে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। আমার মতে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট কয়েকটি সাহিত্যপত্রের নাম হলো : 'অভিযান' (রায়গঞ্জ), পাবক (ময়নাগুড়ি), 'সীমান্তিক' (জলপাইগুড়ি) 'মধুপর্ণী' (বালুরঘাট), 'অন্বয়' (মালদা) আধুনিক সাহিত্য (কোচবিহার) উত্তর দিগন্ত (মালদা) 'শালবনী' (ধূপগুড়ি)।

এদের মধ্যে অভিযান, পাবক, সীমান্তিক-এ উত্তরবঙ্গের নতুন লেখকদের রচনা সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়ে থাকে। গত পাঁচটি খণ্ড 'অভিযান'এ কমপক্ষে একশজন উত্তরবঙ্গের নতুন লেখক লেখিকার রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এবং উত্তরবঙ্গের নতুন লেখক লেখিকাদের কাছে 'অভিযান' অত্যন্ত জনপ্রিয় নামও বটে। —মানিকরঞ্জন দাশ, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

(৩)

বিগত ২৭শ সংখ্যা 'অমৃতে' কবিতা সরকার ও স্বপ্না দেব-এর 'উত্তরবঙ্গের সাহিত্যপত্র প্রসঙ্গে চিঠিটি পড়লুম। চিঠিটি পড়তে গিয়ে কয়েকটি জায়গায় এঁদের মতের সঙ্গে একমত হতে পারলুম না বলেই এই চিঠি লেখা। হয়তো উত্তরবাংলার অনেক বিদগ্ধ পাঠকই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

(১) চিঠির লেখিকাদ্বয় যে কটি পত্রিকার আলোচনা করেছেন সে কটি পত্রিকা নিয়মিত পড়েন কিনা আমার সন্দেহ হয়। লেখিকাদ্বয় জলপাইগুড়িতে থাকেন বলেই হয়তো শুধুমাত্র জলপাইগুড়ির পত্রিকারই প্রশংসা করছেন। এতো আর কারো অজানা নয় যে, 'শালবনী' পত্রিকাটি জলপাইগুড়ি থেকে বের হলেও জলপাইগুড়ির অন্যান্য পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর যেমন, কুঁড়ি, অংকুর, সমাবেশ, প্রতিধ্বনি, দাবী, পাবক প্রভৃতি) কারো লেখাই উক্ত পত্রিকায় দেখা যায় না। (অবশ্য লেখিকা দাবী ও পাবক পত্রিকা দুটির নামোল্লেখ করেন নি।) অন্যান্য পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর লেখা তো নয়ই। কেবল উত্তরবঙ্গের একজন কবি বা লেখক ছাড়া আর কারো লেখাই এ পত্রিকার চোখে পড়ে না।

(২) লেখিকা কুচবিহার থেকে প্রকাশিত 'ত্রিবৃত্ত' ও 'আধুনিক সাহিত্য' পত্রিকা দুটি উত্তরবাংলার লেখক-লেখিকাদের নিয়ে প্রকাশ হয় বলে সাধুবাদ জানিয়েছেন। শুধু তাই নয় উক্ত পত্রিকা দুটির সম্পাদক (একজন তরুণ কবি) উত্তরবাংলার পত্র-পত্রিকা ও কবি-লেখকদের নিয়ে নিজের পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে পাঠক ও লেখকদের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ ত্বরান্বিত করেছেন। স্মরণে রাখা ভাল যে এ বিষয়ে তপনকিরণ রায় সম্পাদিত অভিযান, সুধীর করণ সম্পাদিত মধুপর্ণী এবং ফণী পাল সম্পাদিত অন্বয়-এর দানও কম নয়।

(৩) উত্তরবাংলার সংস্কৃতিকে তুলে ধরবার কাজে মালদহ থেকে প্রকাশিত অন্বয় (লেখিকাদ্বয় অবশ্য অন্বয় পত্রিকার নামোল্লেখ করেন নি) ভূমিকাও প্রশংসনীয়।

(৪) উত্তর বাংলা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার কোনটি ভাল বা মন্দ এ আমার চিঠির বিষয়বস্তু নয়। প্রত্যেক সংখ্যাতেই উত্তরবাংলার সংস্কৃতির উপর একটি করে প্রবন্ধ রাখেন এবং উত্তরবাংলার নতুন লেখক-লেখিকাকে লেখা প্রকাশের আরো সুযোগ করে দেন।

(৫) উত্তরবাংলায় ভাল কোন ছাপাখানা না থাকায় পত্রিকা প্রকাশ খুবই দুরূহ, যাঁরা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশে আগ্রহী তাঁদের পক্ষে কখনই পরিষ্কার ঝকঝকে কাগজ বের করা সম্ভব নয়। আমার মনে হয়, উত্তরবাংলার সবকটি পত্রিকাগোষ্ঠী মিলিত হলে সমগ্র উত্তরবাংলা থেকে একটি ভাল মাসিক সাহিত্য-পত্রিকা বের করতে পারেন এবং এই সঙ্গে সমবায় ভিত্তিতে একটি প্রেসও।

(৬) সর্বশেষে উত্তরবাংলার সাহিত্য পত্রিকার পাঠক-পাঠিকার কাছে নিবেদন, তাঁরা যেন বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় চিঠির মাধ্যমে 'উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারছে না', 'পরিষ্কার নয়' ইত্যাদি মন্তব্য করে ছোট পত্রিকাগুলিকে নিরুৎসাহিত না করেন। একমাত্র উপদেশ বা নির্দেশই পত্রিকার পক্ষে মঙ্গলজনক এটুকু ভুললে চলবে

যে, শ্বাস-যন্ত্রণা ও আর্থিক অভাব-এর মধ্যেও এই ছোট কাগজগুলো বেঁচে থাকে আমার-আপনার মতো শুভানুধ্যায়ীর আন্তরিকতার সঙ্গী হয়েই। এঁদের মঙ্গল কামনা যদি করতেই হয় তবে পত্রিকার সম্পাদককে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লেখাই উচিত নয় কি?

নরেশ সরকার
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
দার্জিলিং

বেতারশ্রুতি

২৩শে নভেম্বর সকাল সাড়ে ছটায় এবং দুপুরে ১-৫০-এ কাজী অনিরুদ্ধর গীটারে বাজানো দুটি গান দুদফা শোনানো হয়। একই গান দুবার করে এটা কী করে হয়?

নীনা সেন
রাজীপাড়া, শিলচর-১

কোয়েলের কাছে

আপনাদের অমৃত পত্রিকায় কিছুদিন যাবৎ বুদ্ধদেব গুহর 'কোয়েলের কাছে' নামক উপন্যাসটি প্রকাশিত হচ্ছে। উপন্যাসখানি প্রথম থেকেই আমাকে বেশ আকৃষ্ট করেছে। জঙ্গলের পটভূমিকায় লেখা এ-জাতীয় উপন্যাস সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। উপন্যাসখানি সম্পূর্ণ নূতন আঙ্গিকে লেখা। গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে লেখক যেন অন্য পথ ধরে উপন্যাসটি লিখতে বসেছেন। এ উপন্যাসখানি পড়তে পড়তে জঙ্গলের একটা সুন্দর চিত্র আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সাধারণত জঙ্গলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুবই কম। বিশেষ করে যারা শহরের মানুষ তাদের কাছে জঙ্গল ত' বলতে গেলে প্রায় অপরিচিতই। জঙ্গলের কত রহস্যই ত' আমাদের অজানা। চার দেয়ালের মাঝখানে থেকে এবং নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতায় যখন হাঁফিয়ে উঠেছি, তখন এরকম একটা উপন্যাসের আগমনে খুব খুশী হলাম। লেখককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

অভিজিৎ গোস্বামী
ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি

আসামের কারুশিল্প

'আসামের কারুশিল্প' এই শিরোনামায় প্রকাশিত শ্রীআশীষ বসু মহাশয়ের প্রকাশিত প্রবন্ধে, শীতল পাটীর কাঁচামাল হিসাবে মোত্রা কথাটি ব্যবহার করা সম্পর্কে একটি প্রতিবাদ পত্র আপনার কাগজে প্রকাশ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমরা আসামস্থ বাঙ্গালী পাটীকরেরা শীতল পাটীর কাঁচামালকে মোত্রা বলেই জানি। শ্রীবসু মোত্রা শব্দটি যথাযথই ব্যবহার করেছেন।

স্থান বিশেষে অবশ্য মোত্রার অন্য নামও আছে। যেমন কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসীরা বলে থাকেন মুর্তা, পাবনা ও ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসীরা বলে থাকেন পাহিতা গাছ। অসমীয়া ভাষায় মোত্রাকে বলে পাটী দৈ গাছ।

সুরেশচন্দ্র দে পাটীকর
প্রাক্তন সম্পাদক, পাটীকর কো-অপারেটিভ লিঃ, পোঃ কাটাখাল, জিলা কাছাড় (আসাম)

তাঞ্জাম

অনেক দিন পরে স্বরূপ মণ্ডলকে তাঞ্জামে চড়িয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গনে আবার নিয়ে আসার জন্যে অমৃতকে ধন্যবাদ জানাই।

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট চরিত্রদের মধ্যে স্বরূপ মণ্ডল অন্যতম। স্বরূপের গল্প বলার অনবদ্য ভঙ্গীতে প্রথম থেকেই শ্রোতারা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তারপর স্বরূপের গল্প চলে অনেক গলিখুঁজি পার হয়ে গোলোকধাঁধাঁপাক খেতে-খেতে একটি আনন্দদায়ক ক্লাইম্যাক্স বা অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স-এর দিকে। শ্রোতারাও তার সঙ্গে চলেন টক্কর খেতে খেতে। কখনও আনন্দে ভরে ওঠে মন, কখনও মুখর হয়ে ওঠে অট্টহাসি, আবার কখনও বা হেমন্তের শিশিরে ভিজে ওঠে চোখের পাতা, যখন কড়া তামাকের আছিলায় স্বরূপ কাপড়ের খুঁট লাগায় চোখে।

স্বরূপ অশিক্ষিত বটে, কিন্তু তার একটা নিজস্ব ফিলজফি আছে। বেশ জোর দিয়েই স্বরূপ তার ফিলজফি ব্যক্ত করে। শ্রোতারা তার সঙ্গে একমত হতে না পারলেও উপভোগ করেন তার সরলতা আর কৌতুকপ্রিয়তার সংমিশ্রণ।

সবথেকে উপভোগ্য বোধ করি স্বরূপের ভাষা। বাংলা সাহিত্যে কথ্য ভাষায় অনেক কাহিনীই রচিত হয়েছে। কিন্তু স্বরূপের মুখে বিভূতি মুখোপাধ্যায় যে ভাষা দিয়েছেন তার তুলনা পাওয়া যাবে না। এমন নির্ভুল আঞ্চলিক উচ্চারণ ও শব্দপ্রয়োগ এবং একই সঙ্গে ভাষার এমন সাবলীল গতি আমাদের মুগ্ধ করে।

'বিশ্বাস' ও 'শোকশোভা'র স্বরূপের বয়স 'কাঞ্চনমূল্যে' পেরিয়ে 'তাঞ্জাম'-এ এসে আরও পরিপক্ক হয়েছে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কথায় অসংলগ্নতা একটু বেড়েছে, তার সঙ্গে বেড়েছে অনুভূতির গভীরতা।

এবার কিন্তু স্বরূপ লেখককে ঠকিয়েছে। 'গোড়া থেকেই শুরু' করেছিল বটে, কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি শেষে এনে ফেলেছে। ক্ষতিপূরণ হিসেবে লেখকের জন্যে বাড়ীতে ভূরিভোজের আয়োজন করেছে। তবে তাতে পাঠকদের ক্ষতিপূরণ হবে কি করে? অদূর ভবিষ্যতে আবার স্বরূপকে দা হাতে দাদাঠাকুরের কাছে গল্প করতে দেখব এই আশায় রইলুম।

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-১৯

মানুষ গড়ার ইতিকথা

২১ কার্তিক ১৩৭৬ 'মানুষ গড়ার ইতিকথা'-এ মিত্র ইনস্টিটিউশন (মেন) রচনাটি পড়ে আনন্দিত হলাম। প্রবন্ধে দেখলাম ১৯১৩ সালে প্রমথনাথ সরকার প্রথম এবং সতীশচন্দ্র সেন তৃতীয় স্থান লাভ করেছিলেন। কিন্তু আমি যতদূর জানি, সেই বৎসর তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন চাইবাসা স্কুল (বিহার) থেকে শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন। পরে এই সেন মহাশয় বাংলা সাহিত্যে ডকটরেট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং বাংলা দেশে এম-এল-এও হয়েছিলেন।

সুনীলকুমার নিয়োগী
আসানসোল, বর্ধমান।

(২)

আপনার বহুল প্রচারিত 'অমৃত' পত্রিকায় আমার নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশিত হলে বাধিত হব।

আমি আপনার 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকার প্রতিটি বিভাগের রচনা আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু বর্তমানে 'সন্ধিৎসু'র লেখা 'মানুষ গড়ার ইতিকথা' নামে যে প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে তা আমার কাছে বেশী আকর্ষণীয়। 'সন্ধিৎসু' মহাশয় যে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বিভিন্ন স্কুলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটাচ্ছেন তার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এই প্রবন্ধ বিভিন্ন স্কুলের ঐতিহাসিক তথ্যাদি সম্বন্ধে যে কৌতূহল মেটাচ্ছে তাতে অতীত সম্পর্কে আমাদের মনে বেশ স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠছে। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

নিলয়কুমার লাহিড়ী
কলকাতা-৩৬

সাদা চোখে

পশ্চিম বাংলায় কি ঘটছে? এই প্রশ্ন যদি যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করা হয়, উত্তর পাবেন : মশায়, কিছুই বুঝতে পারছি না। আর যদি রাজনীতিজ্ঞ, অর্থনীতিজ্ঞ কিম্বা অন্য কোনো বিচক্ষণ অর্থাৎ যাকে বলে 'ওয়াকেবহাল মহল'কে ঐ একই প্রশ্ন করেন—তাহলেও উত্তরের কিছু হেরফের ঘটবে না। এর পর যদি সব কিছুর মধ্যে আকণ্ঠ যাঁরা ডুবে আছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন, তবে উত্তরের একটু ব্যতিক্রম ঘটবে। কেউ বলবেন, আমাদের গদীচ্যুত করার ষড়যন্ত্র চলছে। অন্যরা বলবেন, এটা ও'দের আর্তনাদ বা আতঙ্কজনিত চিৎকার। ও'দের বাদ দিয়ে কিছু করার কথা কেউ ভাবছে না। আবার কারণ দেখিয়ে বক্তব্যকে শক্ত-সমর্থ করার উদ্দেশ্যে হয়তো বলা হয়, বুঝতে পারছেন না মশায়, পশ্চিম বাংলার মানুষ আলাদা জিনিষ। এখানকার শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, কেরাণী বা অন্য স্তরের লোকেরা সকলেই বিশেষ সচেতন। কাজেই ও'দের বাদ দিয়ে অন্য কিছু করা 'উচিত নয়', 'সম্ভব নয়' এবং রাজনৈতিক দিক থেকে অচিন্তানীয়।

'ও'রা' কিন্তু সাবধান বাণী দিচ্ছেন, ক্যাডাররা তৈরী। কিছু করলেই একেবারে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দেব। এটা পশ্চিমবঙ্গ। পুলিশ মিলিটারির সাহায্য নিয়ে মাথা বাঁচাতে হবে। তবে ও'রা একথা সঠিক বলতে পারছেন না, কবে ঐ ভয়াবহ দিনটা আসবে। কিন্তু ক্যাডারদের যখন নির্দেশ দিয়েছেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সহজেই অনুমান করছেন, ঘটনা ঘটল বলে।

পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে অবশ্য এরকমই মনে হয়। কাজেই এখন প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্ত। আবার কেউ কেউ বলছেন এরকম সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়ে একসঙ্গে ঘর না করাই ভাল। এই মত যাঁরা গোপনে বলছেন প্রকাশ্যে বলতে তাঁরা এখনও নারাজ। কারণ, ভয়ে তাঁরা জড়সড়। তাঁদের ধারণা ঐ বক্তব্য প্রকাশ্যে রাখলেই পশ্চিমবঙ্গের মেহনতী মানুষের সংগ্রামী ঐক্যে ফাটল ধরবার অপচেষ্টা শুধু নয়, চক্রান্তে মেতেছেন বলে অভিযুক্ত করে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়বেন। অতএব!

এই সমস্ত মতামত প্রতিনিয়ত ব্যক্ত করছেন পশ্চিম বাংলার নয়নের মণি যুক্তফ্রন্টের বড় তরফের শরিকগণ। আগে যখন এ'রা পৃথক পৃথকভাবে রাজনৈতিক লড়াইয়ে নেমেছেন তখন একে অপরের বিরুদ্ধে এত কুৎসা প্রচার করেন নি। হয়ত দূরে দূরে থাকার ফলে একে অপরের পূর্ণ অবয়ব দেখতে পান নি। কিন্তু বর্তমানে একই ঘরের বাসিন্দা হওয়ার ফলে কারও গোপন তথ্য মনে হয় গোপন থাকছে না। ফ্রন্টের বড় তরফের সকল শরিকই জোতদারদের বা পুঁজিপতিদের দালাল একথা, আগে কি কেউ বিশ্বাস করতে পারতেন? এ'রাও যে সমাজবিরোধী লোকদের আশ্রয় দিতে পারেন কিম্বা দুর্নীতিগ্রস্ত হতে পারেন, একথা আগে কি কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন? এমন কি প্রথম নয় মাসের রাজত্বকালেও অনেক কুৎসা এ'দের ভাগ্যে জুটেছিল। কিন্তু তখনও কেউ একথা বলতে রাজী ছিলেন না যে এ'রা দুর্নীতিগ্রস্ত। কিন্তু এবার ভারতীয় পেনাল কোড্-এর সব ধারা দিয়েই এ'দের বিচার চলতে পারে। কারণ, যে সমস্ত গর্হিত কাজ করছেন বলে এক শরিক আর এক শরিকের বিরুদ্ধে গণ-চার্জশীট দিতে সুরু করেছেন, শত্রুদের প্রয়োজন হবে না কষ্ট করে জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলবার। নিজেরাই নিজেদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে এখন গণ-আদালতে বিচারের প্রার্থনা করছেন। একটা সুখের বিষয় এই যে, এ'রা নিজেদের মোহভঙ্গ ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছেন, আর আমজনতাকেও মোহভঙ্গে সাহায্য করছেন। জনসাধারণের এটাই একমাত্র লাভ। তাঁরা নতুন করে বিচার করতে পারবেন—চিন্তার পথ খুলে যাবে।

সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন, বাংলা কংগ্রেসের প্রতিরোধ আন্দোলন বা গণ-অনশন সত্যাগ্রহকে কেন্দ্র করে ফ্রন্টের মধ্যে লড়াইটা আরও জোড়দার হয়ে উঠেছে। কেরালায় নতুন ফ্রন্ট গঠনের পর এবং দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে জাতীয় সরকার গঠনের সময় এসেছে বলে বক্তব্য পেশ করবার পর সন্দেহ আরও প্রবল হতে সুরু করেছে। এটা আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, শরিকী লড়াই অন্তত ফ্রন্ট ভাঙার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বাম ও ডান কম্যুনিস্ট দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বামপন্থীরা প্রকাশ্যে বলছেন দক্ষিণপন্থীরা চক্রান্ত সুরু করেছেন, আর বাংলা কংগ্রেস তাতে যোগ দিয়েছে। আক্রমণই আত্মরক্ষার প্রধান উপায়। কাজেই বাম কম্যুনিস্টরা আগে থেকেই দক্ষিণপন্থীদের উপর আক্রমণ শুরু করেছেন, এবং বাংলা কংগ্রেসকে সাকরেদ হিসাবে দাঁড় করাতে চাইছেন। শুধু যেটুকু কৌশলের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা হচ্ছে এই, বাম কম্যুনিস্টরা এখন সরাসরি ফরওয়ার্ড ব্লককে গালমন্দ করছেন না। এস এস পি কি আর-এস-পি, কি এস-ইউ-সি ইত্যাদি দলকেও ফ্রন্ট ভাঙার চক্রান্তে মেতেছেন বলে অভিযুক্ত করছেন না, বরং একটুখানি বন্ধু-বন্ধু ভাব নিয়ে উদার দৃষ্টিতে তাকানোর চেষ্টা করছেন।

সি-পি-এম কেন এই কৌশল অবলম্বন করেছেন তা বেশ সুস্পষ্ট। বিধানসভার সদস্যদের তালিকার প্রতি নজর রেখেই তাঁরা তথাকথিত সি-পি-আই, বাংলা কংগ্রেস চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেবার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় এ ধরনের অবস্থা সৃষ্ট হওয়ার মূলে কি আছে তা খুঁটিয়ে দেখালে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এক দলের অপর দলের প্রতি আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করার ফলেই এই অসহনীয় অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। কি খেতে-খামারে, কি কলকারখানায়, একে অপরকে জোতদার কিম্বা ধনীদের 'দালাল' হিসাবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যই হল জনসাধারণের সামনে তাকে প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে তুলে ধরা। অর্থাৎ অন্য দলকে ঈপ্সিত সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব বা বিপ্লব করা অসম্ভব, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য জনতাকে সাহায্য করা। আরও পরিষ্কারভাবে বললে কথাটা দাঁড়ায়—অপসৃয়মান কংগ্রেস দলের বিকল্প হিসাবে নিজেদের গণসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করা। এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে রূপ দেওয়ার জন্যই শরিকদলের মধ্যে লড়াই-এর বিস্তৃতি ঘটেছে, এবং আরও ঘটবে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যাঁরা জোতদারের বা মালিকের দালাল বলে অহরহ নিন্দিত হচ্ছেন, তাঁদেরই আবার সি-পি-এম 'গুড হিউমারে' রাখার চেষ্টা করছেন। কারণ, গদীতে থাকলেই দলের কলেবর বৃদ্ধি যে সহজ একথা সি-পি-এম সম্যক উপলব্ধি করেছেন। অতএব, সুযোগ হেলায় হারাবার চেষ্টা করবেন কেন? যে সমস্ত দল সি-পি-এম'র দৃঢ় সমর্থক বলে পরিচিত তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলেই পরিষ্কার ছবিটি পাওয়া যায়। যেমন ধরুন, সি-পি-এম-এর স্থির বিশ্বাস কেরালায় আর-এস-পি ক্ষুদে ফ্রন্টে যোগ দিয়ে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদকে গদীচ্যুত করলেও পশ্চিম বাংলায় আর-এস-পি কোন ক্রমেই সি-পি-এম-এর সঙ্গ ছাড়বে না। একথা সি-পি-এম বুঝেছে বলেই কেরালার আর-এস-পি'র দোষ ক্ষমা করে পশ্চিমবঙ্গের আর-এস-পিকে তাঁরা কোন সমালোচনা করেন না। আর-এস-পি এর জন্য অবশ্য মনে মনে নিশ্চয় খুশি। কিন্তু আর-এস-পি হয়ত বুঝতে পারছেন না, পরোক্ষে এতে জনসাধারণের সামনে তাঁদের আদর্শ ও নীতিহীন এবং সর্বোপরি সুবিধাবাদী দল বলেই প্রতিপন্ন করা হচ্ছে।

আগে বেশ কিছু সংখ্যক লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূলে ছিল যে, কম্যুনিস্টরা যা বলতেন তাই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের নামান্তর। ঠিক তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সোভিয়েট রাশিয়া যে বক্তব্য রাখতেন তাই বিপ্লবী। কিন্তু চীনের অভ্যুত্থানের পর থেকেই সোভিয়েটের বিপ্লবী বক্তব্যকে অনেকের কাছে ম্লান মনে হতে শুরু করেছে। ঠিক তেমনিই ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার পর থেকেই মার্কসবাদীদের অনেকেই বেশী বিপ্লবী বলে মনে করতে শুরু করেন, অন্তত দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদের চেয়ে। কিন্তু নকশালবাদীদের অভ্যুত্থানের পর মার্কসবাদীদেরও

অপেক্ষাকৃত কম-বিপ্লবী বলে মনে করতে আরম্ভ করেছেন অনেকেই। তবুও, এখনও মার্কসবাদীদের সঙ্গে থাকলে অনায়াসে যে কিছু কিছু বিপ্লবী বলে চিহ্নিত হবেন এরকম ধারণা অনেকেরই ছিল বা আছে। আর যেহেতু মার্কসবাদীদের সংগঠন জোরালো সেজন্যে নির্বাচনেও কিছু বেশী আসন পাওয়ার সম্ভাবনা। সেজন্যেই অনেকে সমর্থন করে আসছিলেন মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দলকে। কিন্তু আরও কড়া বিপ্লবী দল ময়দানে হাজির হওয়ার পর অন্য কম্যুনিস্টদের বিপ্লবের একচেটিয়া কারবারে ভাটা পড়েছে। ফলত সহযাত্রীদের অনেকেরই মোহভঙ্গ হওয়ার উপক্রম ঘটেছে। তা সত্ত্বেও ছোট ছোট দলগুলিকে স্বপক্ষে রাখার চেষ্টায় মার্কসবাদীরা শুধু দক্ষিণ-পন্থী ও বাংলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন।

মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা আরও মনে করেন যে, সত্যিই যদি ফ্রন্ট ভাঙে তবে ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস-এস-পি'র মধ্যেও ভাঙন আসবে। অর্থাৎ তাঁদের মতে এই দুই দলের মধ্যে অন্তত কিছু কিছু বিধান-সভা সদস্য আছেন যাঁরা তাঁদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সমর্থন জানাবেন। এই প্রসঙ্গে তাঁদের ধারণা, এস-এস-পি'র অন্তত চার-জন সদস্য অর্থাৎ যাঁরা শ্রীনিরেন দাসের সমর্থক যাঁরা দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে প্রমোদবাবুদের সাহায্যে ছুটে যাবেন। তাঁদের আরও ধারণা, এস-এস-পি কেরলে তাঁদের সমর্থন করলেও এখানে তাঁরা সি-পি-এম-এর সঙ্গে থাকবে না। আবার ফরওয়ার্ড ব্লকের কিছু বিধানসভা সদস্যও শ্রীঅশোক ঘোষ ও শ্রীশম্ভু ঘোষের নেতৃত্বে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের স্বপক্ষে চলে যাবেন। শুধু সি-পি-আই এখনও সঠিক আন্দাজ করতে পারছেন না, আখেরে শ্রীসুবোধ ব্যানার্জির এস-ইউ-সি'র সদস্যরা কোন দিকে থাকবেন। কাজেই তাঁদের আক্রমণ করে ফ্রন্ট ভাঙার চক্রান্তে অভিযুক্ত করে বিরোধী শিবিরে ঠেলে দিতে চান না। তাঁরা আরও বিশ্বাস করেন, পুরুলিয়ার লোকসেবক সংঘ এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে নিরপেক্ষ হয়ে যাবেন। গুর্খা লীগকে তাঁরা পাবেন না বলে আগেই ধরে নিয়েছেন, তবে ওয়ার্কার্স পার্টি তাঁদের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে পাশেই থাকবেন। সমস্ত হিসাব পত্তর করেও অন্য ছোট দলগুলির সমর্থকদের যোগফলে সংখ্যা ১৯৫ জনের বেশী সদস্যের সমর্থন পাবেন বলে এখনও তাঁরা অঙ্কের দিক থেকে নিঃশঙ্ক হতে পারেন নি। তদুপরি কংগ্রেস দ্বিধা-বিভক্ত হলেও কিম্বা ইন্দিরাপন্থীদের সংখ্যাধিক্য ঘটলেও বাম কম্যুনিস্টদের কিছুই আসে যায় না। কারণ সিন্ডিকেটপন্থীরা কম হলেও [illegible] মার্কসবাদীদের সমর্থন করবেন এ দুরাশা মার্কসবাদীরা পোষণ করেন না। তবে রাজনীতি বিচিত্র জিনিস। কে কখন কোন দলের সঙ্গে হাত মেলাবেন একমাত্র ঘটনার পরিবেশের উপরই তা নির্ভর করে। এবং এটা যে অভ্রান্ত সত্য, অতীতে তার অনেক প্রমাণও পাওয়া গেছে। তাই মুসলীম লীগের সঙ্গে মার্কসবাদীদের আঁতাত সম্ভব হয়েছিল এবং তাই অধুনা ইন্দিরা গান্ধীকে প্রগতিশীল মেনে নিলেও কয়েক মাস আগেও ইন্দিরার বিরুদ্ধে জোট বাঁধার প্রশ্নে স্বতন্ত্র, জনসংঘ কি অকালী দলের সঙ্গে সংযুক্ত বৈঠক করতে তাঁদের মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। অতএব শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ভবিষ্যতে একই সঙ্গে চলতে পারেন না অন্ততঃ রাজনৈতিক কৌশলের দিক থেকে একথা বিধাতাপুরুষও হলফ করে এখন বলতে পারবেন না।

শ্রীঅজয় মুখার্জি ও বাংলা কংগ্রেস দলকে অনশনের পথ থেকে নিরস্ত করবার জন্যে সেদিন যুক্তফ্রন্টের যে বৈঠক হল তাতেও বাম ও দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টরা একে অপরকে অভিযুক্ত করলেন। এবং ফ্রন্ট ভাঙবার কাজে দু-দলই নেমে পড়েছেন—তাঁদের বক্তব্য থেকেই তা সুস্পষ্ট হল। যেহেতু দু-দলই শক্তিশালী, সেজন্য এঁরা যা ভাববেন অন্য দলকে তা ভাবতে বাধ্য করতে সমর্থ। এখন তাঁরা বিবাদে রত বলে অন্য দলগুলোকে দুই শিবিরে বিভক্ত করবার জন্য তাঁরা সচেষ্ট হয়েছেন। অন্য দলগুলিও প্রায় তাঁদের নিজস্ব সত্তা বিসর্জন দিয়ে যেন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দোদুল্যমান হয়ে উঠেছেন। বাম কম্যুনিস্টরা সেদিনের সভায় শ্রীঅজয় মুখার্জিকে সরাসরি অনুরোধের কোন কথাই বলেন নি। সত্যিই তাঁদের একটা আত্মসম্মান আছে যে তাঁরা বলেছেন অনশন করে কি হবে? শত্রুর হাত শক্ত করা হবে মাত্র। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের শরিকরা যে রকম পরস্পরের শত্রু, অন্য কেউ সেরকম শত্রু আছেন কি? দৈনন্দিন গালিগালাজের যদি কেউ ডায়েরী রেখে থাকেন তবে দেখবেন এঁদের তালিকা দেখে কংগ্রেসও লজ্জা পাবে।

অবশ্য, এ হেন অসহনীয় অবস্থার মধ্যেও কখন কখন যুক্তফ্রন্ট রক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে শরিকরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এর বিস্তৃতির স্বপ্ন দেখে থাকেন। কিন্তু কেউ সহমত হন বা না হন, একথা সত্যি যে, মানসিক দিক থেকে চিন্তা করলে পশ্চিমবঙ্গের জনতার নয়নমণি যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেছে। কেউ হয়ত বলবেন ভাবমূর্তিটা কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে, কিন্তু ফ্রন্ট এখনও আছে। কেননা যেহেতু সকল শরিকের প্রতিনিধিরা এখনও মহাকরণের দপ্তরে রোজ গিয়ে উপস্থিত হন, যেহেতু কেবিনেট মিটিং করেন কিম্বা ফ্রন্টের বৈঠকে মিলিত হন, অতএব ফ্রন্ট এখনও সশরীরে বর্তমান একথা বলতে দোষ কি? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ বেঁচে থাকার লাভ কি? গত প্রায় দু-মাস যাবৎ ফ্রন্টের বৈঠক হয়েছে এবং সেখানে শুধু [illegible] হচ্ছে ফ্রন্ট কিভাবে রক্ষা করা যায়। উপায় হিসাবে ৩২ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের কথা [illegible] [illegible] কিন্তু জনতার জন্য কি করা হবে, তা নিয়ে বিশেষ কোন আলোচনাই হয়নি। গণমঙ্গলের জন্যে যদি কিছুই করা সম্ভব না হয়, তবে যুক্তফ্রন্ট বেঁচে থেকে লাভ কি? শুধু কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে বলেই কি যুক্তফ্রন্ট গদীতে থাকা উচিত? অবশ্য শরিকরা বলবেন শ্রমিকের মজুরী বেড়েছে, ভূমিহীন ও ভূমিওয়ালা কৃষক বেনামী জমি উদ্ধার করেছেন, এবং সর্বোপরি মেহনতী মানুষ ভয়হীন হয়ে আন্দোলনে নামতে পেরেছেন, এ কি কম লাভ? আবার পুলিশী নির্যাতন কমে গেছে সেই জনতার উপর যাঁরা আন্দোলন করতে চাইলেই আগে মার খেতেন। তবে এ সমস্ত কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেই আবার এঁরা বলেন, গত দু-মাস ফ্রন্ট কিছুই করতে পারছে না। তাহলে দাঁড়াল কী? ফ্রন্টের সদস্যরা যদি মনে করেন এ সমস্ত বুনিয়াদী পরিবর্তন ঘটেছে তবে অন্য কথা। কিন্তু নয় মাসের মধ্যেই ছয়-সাত মাস কিছু কাজ করবার পর যদি পরবর্তী মুহূর্ত থেকেই ইতি-হাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বাঁচতে হয়, সে বাঁচার মূল্য কী? কংগ্রেসও প্রথমে স্বাধীনতার যুদ্ধ করেছে বলে গদীতে তাঁদের অধিকার জন্মে গেছে, একথা বলত। তারপর 'আমরাই স্বাধীনতা এনেছি' শুধু একথা নয়—'আমরা দিয়েছি বুনিয়াদী অধিকার যে অধিকারের বলে সরকার পর্যন্ত পালটে দেওয়া যেতে পারে—অতএব জনসাধারণের উচিত আমাদেরই গদীতে রাখা।'—একথা তাঁরা বলেছেন। চিন্তা করে দেখলে, বিশেষ করে যুক্তফ্রন্টের গদীতে বসার পরিপ্রেক্ষিতে যদি বিচার করা যায়, তবে স্বীকার করতেই হবে, কংগ্রেস সে অধিকার জনতাকে দিয়েছে। কিন্তু তবু সেই অধিকার প্রয়োগ করেই জনসাধারণ কংগ্রেসকে গদীচ্যুত করেছে। এবং যুক্তফ্রন্টের হাতে ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু এ পরিবর্তন কেন? কংগ্রেসীরা গণমঙ্গলের কাজ করতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন বলেই তো? সকলেই সমস্বরে নিশ্চয় বলবেন, জনসাধারণের মঙ্গল করতে অপারগ এবং নানা প্রকার দুর্নীতির শিকার হয়েছিল বলে জনতা তাঁদের গদী থেকে হটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু নয় মাস যেতে না যেতেই যাঁদের পূর্ববর্তী কয়েক মাসের কৃতিত্বের সম্বল করে বাঁচতে হচ্ছে, তাঁদের ঐক্যের ভণিতা করে বাঁচার লাভ কি, দরকারই বা কি?

তবে নিশ্চয় একটি বিষয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে ফ্রন্টের আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। সেটা হচ্ছে এই কংগ্রেসকে যতক্ষণ জনতা গদীচ্যুত করে রাজনৈতিক মৃত্যুদণ্ড না দিয়েছে, ততক্ষণ কংগ্রেস সরে যায় নি। কিন্তু ফ্রন্টের লোকেরা সেদিক থেকে অনেক সৎ। তাঁরা আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে মনকে শক্ত করে প্রস্তুত হচ্ছেন। জনতার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বা যে প্রতি-শ্রুতি দিয়েছিলেন তা যে পালন করতে তাঁরা অক্ষম, বাস্তবের কঠোর আঘাতে সেই সত্য তাঁরা উপলব্ধি করেছেন পরি-পূর্ণভাবে।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

আটক আইনের অন্তিম

কংগ্রেস ভাগের ফলে লোকসভায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর নেই। এটা স্পষ্ট যে, এখন থেকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে শ্রীমতী গান্ধীর সরকারকে কিছু মূল্য দিতে হবে। কি ধরনের মূল্য তাঁদের ভবিষ্যতে দিতে হতে পারে তার একটা নমুনা পাওয়া গেল নিবর্তনমূলক আটক আইন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত সিদ্ধান্তের মধ্যে।

নিবর্তনমূলক আটক আইন কোনদিনই জনপ্রিয় আইন ছিল না—যদিও লোকসভায় প্রচণ্ড বিরোধিতার মধ্য দিয়ে দফায় দফায় কয়েকবার এই আইনের মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী নির্বিশেষে বিভিন্ন রাজ্য সরকার এই আইন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সেই ভোটের জোর নেই যাতে তাঁরা আগেকার মত অনায়াসে ও সুনিশ্চিতভাবে এই আইন লোকসভাকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার আশা করতে পারেন। এদিকে নিবর্তনমূলক আটক আইনের মেয়াদ আগামী ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে শেষ হয়ে যাচ্ছে। লোকসভার যে শীতকালীন অধিবেশন এখন চলছে, তাতে ঐ আইনের মেয়াদ বাড়াবার একটি প্রস্তাব আলোচ্য বিষয়তালিকার মধ্যে রাখাও হয়েছে। কিন্তু ভারত সরকারের সামনে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে : তাঁরা কি এই আইনের কার্যকাল আরও বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ভাঙ্গা দল নিয়ে সংসদে একটা শক্তি-পরীক্ষা করতে নামবেন? অথবা আপনা-আপনিই এই আইন বাতিল হয়ে যেতে দেবেন?

প্রশ্নটা জরুরী হয়ে দেখা দেওয়ার কয়েকটি কারণ আছে। কথাটা প্রথমে তোলেন কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ার শ্রীএস এ ডাঙ্গে। সংসদে শীতকালীন অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিবৃতিতে তিনি জানান যে, যদিও তাঁর দল সিণ্ডিকেটের আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রীমতী গান্ধীর সরকারকে রক্ষা করতে যাবেন, তাহলেও তাঁদের এই সমর্থন নিঃসর্ত নয়। দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে শ্রীডাঙ্গে বলেন যে, নিবর্তনমূলক আটক আইনের মেয়াদ বাড়াবার চেষ্টা হলে তাঁরা বাধা দেবেন, তাতে যদি ইন্দিরা সরকারের পতনের ঝুঁকি নিতে হয় তাও তাঁরা নেবেন।

শ্রীডাঙ্গের এই বিবৃতির পর বিরোধী কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি দলের লোকসভার নেতা ডঃ রামসুভগ সিংও নিবর্তনমূলক আটক আইনের বিরোধিতায় সামিল হলেন। অতীতে এই আইনের 'অপব্যবহার' করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে তিনি বললেন যে, তাঁর দল নিবর্তনমূলক আটক আইনের মেয়াদ বাড়াবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন।

ইতিমধ্যে নয়াদিল্লী থেকে সংবাদ বেরোল যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে আগে থেকে যে অভিমত সংগ্রহ করেছেন তাতে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল সহ প্রায় সমস্ত রাজ্যের সরকার এই আইনের মেয়াদ বাড়াবার প্রস্তাবে সায় দিয়েছিলেন। কলকাতায় মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সভায় এই প্রসঙ্গ উঠল। প্রকাশ যে, সেই সভায় শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে এই বিষয়ে তাঁদের নীতি ব্যাখ্যা করে প্রকাশ্য বিবৃতি দিতে বলেন। পরের দিন শ্রীবসু বলেন যে, নিবর্তনমূলক আটক আইন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাঁরা নিজেরাও এই আইনে আটক হয়েছেন। ঐ আইনের মেয়াদ বাড়াবার প্রয়োজন নেই। সমাজ-বিরোধী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী, খাদ্যের চোরাকারবারী, মজুতদার ইত্যাদি দমনের জন্য যদি ঐ ধরনের কোন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হয়, তাহলে রাজ্য সরকার নিজেদের আইনসভাতেই উপযুক্ত ক্ষমতা চেয়ে নেবেন। শ্রীবসু একথা অস্বীকার করেন নি যে, এর আগে রাজ্য সরকার নিবর্তনমূলক আটক আইন বলবৎ রাখার পক্ষেই মত দিয়েছিলেন।

যাই হোক, এর পর মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোও সুস্পষ্টভাবে নিবর্তনমূলক আটক আইনের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। শ্রীচাগলা, শ্রীকৃষ্ণ মেনন প্রভৃতি কয়েকজন আইনজীবী এম-পিও বিরোধিতা করলেন।

সংসদের বিরোধী পক্ষের অন্যান্য দলও আটক আইনের মেয়াদ বৃদ্ধিতে বাধা দেবে বলে অনুমান করা যায়। সুতরাং, আটক আইনের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব আনলে সেটা ভারত সরকারকে আনতে হবে শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থক কংগ্রেস দলের প্রায় একক শক্তির ভরসায়। সেখানেই নয়াদিল্লীর সামনে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

মুশকিল হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশের প্রশাসকরা দীর্ঘকাল ধরে এই আইনের উপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত। ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কোন দেশেই শান্তির সময়ে কাউকে বিনা বিচারে আটক রাখা যায় না। জাপানের ১৯৪৬ সালের সংবিধানে বলে দেওয়া হয়েছে যে, বিনা বিচারে কাউকে আটক করে রাখা যাবে না। বর্মা, ঘানা, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে অবশ্য বিনা বিচারে আটক রাখার আইন আছে এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় কতকগুলি প্রশাসনিক নিরাপত্তা সংস্থাকে "সমাজের দিক থেকে বিপজ্জনক" ব্যক্তিদের পাঁচ বছর পর্যন্ত শ্রম-শিবিরে রাখার ক্ষমতা দেওয়া আছে। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে ভারতই সম্ভবত একমাত্র দেশ যার সংবিধানের দ্বারা বিধিবদ্ধ নিবারণমূলক আটক আইনের ব্যবস্থা আছে। নিবারণমূলক আটক আইন সংক্রান্ত এই বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়ে। সংবিধানের ২২ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, মাত্র দুটি ব্যতিক্রম বাদে অন্য কাউকে ন্যায়বিচারের সুযোগ না দিয়ে আটকে রাখা যাবে না। যে দুটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে সে দুটি হল : (১) শত্রু দেশের লোক এবং (২) নিবারণমূলক আটক আইনে ধৃত ব্যক্তি।

বিনাবিচারে আটক রাখার আইন ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের উত্তরাধিকার এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধানপ্রণেতারাও এই উত্তরাধিকার বহনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তা করেছিলেন বলেই তাঁরা সংবিধানের ভিতরে নিবারণমূলক আটক আইনের উল্লেখ করে গেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন ভারত-রক্ষা আইন বাতিল হয়ে গেল, তখন রাজ্য সরকারগুলি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিজের নিজের প্রয়োজন ও অভিরুচি অনুযায়ী নিবারণমূলক আটক আইন পাশ করিয়ে নিলেন। জনজীবনে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা ও অত্যাবশ্যক কাজ চালু রাখা সম্পর্কে ২৩টি আইন বলবৎ ছিল বলে জানা আছে।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতীয় সংবিধান বলবৎ হল। সেদিনই রাষ্ট্রপতি নিবারণমূলক আটক আদেশ নামে একটি আদেশ জারী করলেন। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির সেই আদেশকে সংবিধান-বিরুদ্ধ, অবৈধ বলে রায় দিলেন। ঠিক এক মাসের মাথায়, ১৯৫০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী নিবারণমূলক আটক আইন চালু হল। ঐ আইনে বলা হল যে, কোন ব্যক্তি যাতে এমন কাজ করতে না পারে যে (ক) ভারতের প্রতিরক্ষা, ভারতের সঙ্গে বিদেশী শক্তির সম্পর্ক অথবা ভারতের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়, (খ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অথবা জনগণের শৃঙ্খলা নষ্ট না হয়, (গ) জনগণের পক্ষে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির সরবরাহ ব্যাহত হয় এবং অত্যাবশ্যক কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়,

সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকার ঐ ব্যক্তিকে আটক রাখার আদেশ দিতে পারেন।

গত প্রায় ২০ বছরে এই আইনের ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে। বিভিন্ন আদালতের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে এটা সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, খাদ্য ও বস্ত্রের চোরাকারবারি ও মজুতদারি বন্ধ করার জন্য যেমন এই আইন ব্যবহার করা যায় (কিন্তু ভেজাল বন্ধ করার জন্য ব্যবহার করা যায় না), চায়ের দোকানের সামনে গালিগালাজ করা ও হল্লা করা ও মেয়েদের সম্পর্কে অসভ্য কথা বলা বন্ধ করার জন্য যেমন এই আইন ব্যবহার করা যায় তেমনি কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য এই আইন ব্যবহার করা যায় (চেকুরিনারায়ণ রাজু বনাম মাদ্রাজ সরকারের চীফ সেক্রেটারি ও অন্য একজন, মাদ্রাজ, ১৯৫১), যদিও দলীয় সরকারের নিন্দা করার জন্য এই আইনের প্রয়োগ করা যায় না (সরযু পাণ্ডে বনাম সরকার, এলাহাবাদ, ১৯৫৬)। সন্দেহ নেই যে, গত দুই দশককাল ধরে নিবারণমূলক আটক আইন গুণ্ডামি-বদমায়েসি, চোরাকারবার ও মজুতদারি নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে আবার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আজ অন্তত একটি কেন্দ্রীয় বিধান হিসাবে ঐ আইনের অন্তিম দশা ঘনিয়ে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। সর্বশেষ যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে জানা গেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের কার্যকাল আর বাড়াবার জন্য পীড়াপীড়ি করে বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ঝুঁকি নেবেন না। তার মানে, ১৯৬৯ সালেই এই আইনের আয়ু ফুরোচ্ছে এবং সারা ভারতে এই আইনে আটক হাজার দুয়েক মানুষের মুক্তির দিন আসন্ন।

কিন্তু সত্যই কি তাদের মুক্তি আসন্ন?

সংবিধানের যে ধারায় বিনা বিচারে আটক রাখার আইনের কথা বলা হয়েছে, সেই ধারাটি বাতিল করা হচ্ছে না, এই আইন করার ক্ষমতাও রাষ্ট্রের হাত থেকে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে না। সংবিধানের সমস্ত তপশীলের প্রথম তালিকার নবম দফা অনুযায়ী প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে নিবারণমূলক আটক আইন করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নক্ষমতার এক্তিয়ারে পড়ে। ঐ তপশীলের তৃতীয় তালিকার তৃতীয় দফায় জনজীবনে শৃংখলা রক্ষার উদ্দেশ্যে, এবং জনসাধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক দ্রব্যের সরবরাহ ও অত্যাবশ্যক কাজকর্ম চালু রাখার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে একই সঙ্গে কেন্দ্রের ও রাজ্যের আইনসভাকে।

অতএব কেন্দ্রীয় সরকার যদি তাঁদের আইন বাতিল হয়ে যেতে দেন তাহলে রাজ্য সরকারগুলির নূতন আইন করার বাধা নেই। একমাত্র পুরানো আইনে যেখানে দেশরক্ষা ও বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্কসম্বন্ধীয় অপরাধ নিবারণের কথা বলা হয়েছে, সেই ধারাটি রাজ্য আইনের অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না। অন্যান্য দফায় রাজ্য সরকারগুলি আইনত যে-সব ক্ষমতা পেতে পারেন সেগুলি থেকে তাঁরা নিজেদের বঞ্চিত করবেন বলে মনে হয় না। অন্ততপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানিয়ে রেখেছেন যে, সমাজবিরোধী চোরাকারবারী, মজুতদার ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দমন করার ব্যাপারে এই আইন বিশেষ কার্যকর হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় আইনের স্থান গ্রহণ করার জন্য তাঁরা নিজেদের আইন তৈরী করে নিতে পারেন।

'পিংকাভিল' হত্যাকাণ্ড

কাটসুইচি হোণ্ডা নামে একজন জাপানী একজন ক্যামেরাম্যানকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৬৭ সালে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি সে দেশের গ্রামে গ্রামে যুদ্ধের একটি বিবরণ লেখেন। তাঁর সঙ্গী ক্যামেরাম্যানের ছবিসহ ঐ বিবরণ "জাপান কোয়ার্টারলি" পত্রিকার এপ্রিল-জুন, ১৯৬৮ সালের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। একজন আমেরিকান সৈনিককে কিভাবে তিনি একজন মৃত নারী গেরিলার কান থেকে দুল খুলে নিতে এবং তারপর আর একজন গেরিলা যোদ্ধার একটা কান কিভাবে ছুরি দিয়ে কেটে প্লাস্টিকের থলেতে ভর্তি করতে দেখেছিলেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন। হোণ্ডা লিখছেন, "আর একজন ক্যামেরাম্যানও ঘটনাটি লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি যে আমেরিকান সৈনিকটির সঙ্গে কথা বলছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সৈনিকটি ঐ কান নিয়ে কি করবে।' সৈনিক গোমড়া মুখ করে চাঁছাছোলা জবাব দিলেন, 'সংগ্রহ হিসাবে রেখে দেবে।'... মিঃ পি যোগ করলেন, 'সে ওটাকে প্রথম শুকিয়ে নেবে এবং তারপর তার সংগ্রহ হিসাবে বাড়ীতে নিয়ে যাবে। এটা তেমন বিশেষ কিছুই নয়। আমি একবার একজন সৈনিককে মৃতদেহ থেকে লিভারটা কেটে বার করে নিতে দেখেছিলাম।'

হোণ্ডা যখন দক্ষিণ ভিয়েৎনামে গিয়েছিলেন, তার কিছুদিন আগে মার্কিন টেলিভিসনের পর্দায় আমেরিকান সৈন্যদের হাতে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের গ্রাম জ্বলে যাওয়ার দৃশ্য দেখান হয়েছিল।

গ্রীষ্মের দুপুরে রোদে মার্কিন সৈনিকরা সিগারেট লাইটার জ্বালিয়ে চালাঘরের শুকনো ঘরে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি অগ্নিময় নরকে পরিণত হচ্ছে। টেলিভিসনে এই দৃশ্য দেখাবার পর

পশ্চিম বাংলার রাজনীতি

কেরলে যুক্তফ্রণ্টের চেহারা বদলের পর পশ্চিমবঙ্গেও রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে, এখানে তার পুনরাবৃত্তি হবে কি না। ১৯৬৭ সালে যখন যুক্তফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসে তখন কিন্তু শরিকী সংঘর্ষ এত প্রবল হয়নি। সে সময়ে নকশালপন্থীদের আন্দোলন নিয়ে সরকার বিব্রত হয়ে পড়েছিল এবং আইন ও শৃঙ্খলার অবনতিতে যুক্তফ্রণ্টের অন্যান্য শরিকদের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল উদ্বেগ। অবশ্য তখন স্বরাষ্ট্রদপ্তর ছিল অজয় মুখোপাধ্যায়ের হাতে। অন্যায়ভাবে ক্ষমতাচ্যুত হবার পর যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে নির্বাচনী ঐক্য আরও সুদৃঢ় হয়। ফলে মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্ট অবিসম্বাদী রাজনৈতিক শক্তিরূপে আবির্ভূত হয় পশ্চিমবাংলায়।

এইবার যুক্তফ্রণ্টের পক্ষে তাদের কার্যসূচী রূপায়ণের দায়িত্ব পালন সহজ ছিল। কারণ, কংগ্রেসের বিরোধিতা নগণ্য। কেন্দ্রীয় সরকারও এবার যুক্তফ্রণ্ট সরকারের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করেননি। তবু যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে এত দুর্ভাবনা কেন? পশ্চিমবাংলার মানুষ কংগ্রেসকে বিদায় দিয়ে সন্দেহাতীতভাবে যুক্তফ্রণ্টের প্রতি আস্থা জানিয়েছিল। সেই আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে এমন কথা বলার সময় আসেনি। কিন্তু যুক্তফ্রণ্টের যারা শরিক তারাই পরস্পরের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে বলে মনে হয়।

মন্ত্রীরা বিভিন্ন দলের লোক হতে পারেন কিন্তু একই কোয়ালিশন সরকারের সদস্য। নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছে এই সরকার। যুক্তফ্রণ্টের ভাষায় যার ভিত্তি হল বত্রিশ দফা কর্মসূচী। এই কর্মসূচী যখন গৃহীত হয়েছিল তখন সবাই ধরে নিয়েছিলেন যে, এর রূপায়ণে সকল দলের সহযোগিতা পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন বিভিন্ন দলের মন্ত্রী একই বিষয়ে বিভিন্ন সুরে কথা বলছেন। দলের সভায় যদি এ-ধরনের কথা উঠত তাহলে কোনো আপত্তি উঠত না। পারস্পরিক সমালোচনা হচ্ছে প্রকাশ্যে এবং তা সব সময় তাত্ত্বিক স্তরে আবদ্ধ থাকছে না। কৃষিমন্ত্রী ফসলের ফলনের হিসাব দিচ্ছেন একরকম, খাদ্যমন্ত্রী বলছেন তা ঠিক নয়। তার ফলে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হচ্ছেন, কোনটা ঠিক এবং কোনটা রাজনীতি! মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যেও প্রচুর মতভেদ এবং তাঁরাও সাংবাদিকদের বকলমে পরস্পরের সমালোচনা করছেন। অবস্থা আর যাই হোক খুব স্বস্তির নয়।

এরই মধ্যে যুক্তফ্রণ্টের অন্যতম শরিকদল বাংলা কংগ্রেস রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলার অবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অনশন সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও এর অংশীদার। নিজের সরকারের বিরুদ্ধে নিজের সত্যাগ্রহ—এ-ঘটনা অভূতপূর্ব হতে পারে কিন্তু এর দ্বারা পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রণ্টের অভ্যন্তরে কী বিচিত্র টানাপোড়েন চলছে তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই অবস্থা কোনো সরকারের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নয়। যুক্তফ্রণ্ট থেকে কোনো দলকে বাদ দিয়ে বিকল্প ফ্রণ্ট গঠনের কথাও শোনা যাচ্ছে। যদিও ফ্রণ্টের বিভিন্ন নেতা এই সংবাদের সত্যতা স্বীকার করেননি তবু এমন চিন্তা যে কারু কারু মনে উঁকি দিচ্ছে না তা নয়। যুক্তফ্রণ্টের বিকল্প কোনো শক্তি আপাতত পশ্চিমবঙ্গে নেই। জনসাধারণ চায় চার-পাঁচ বছর যুক্তফ্রণ্ট গদীতে থেকে তার প্রতিশ্রুত কর্মসূচী পালন করুক। গাণিতিক হিসাবে বিকল্প ফ্রণ্ট যে সরকার গঠন করতে পারে না তা নয়, কিন্তু রাজনীতিক দিক দিয়ে তা কতটা বাঞ্ছনীয়, এ নিয়ে মতভেদ আছে। সারা রাজ্যে গভীরতর ও প্রচণ্ডতর অশান্তির সৃষ্টি করে সরকার চালানোর কোনো অর্থ হয় না। সমৃদ্ধির মূলে কথা হল শান্তি ও নিরাপত্তা। এই দুটি জিনিস যদি বর্তমান যুক্তফ্রণ্টের নেতারা বহাল রাখতে পারেন তাহলে তাঁদের নির্ধারিত কর্মসূচী রূপায়ণে বাধা সৃষ্টির কোনো কারণ নেই।

দিল্লিতে কংগ্রেস দলের শুদ্ধিকরণের পর আমাদের মনে হয়, বামপন্থী দলগুলোর পক্ষে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শক্তির সংহতি ও ঐক্যসাধন সহজতর হবে। শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেসের সামনে যে কার্যসূচী রেখেছেন নীতিগতভাবে তার সঙ্গে বামপন্থী দলগুলোর বিরোধ থাকার কথা নয়। কার্যসূচী রূপায়ণের কৌশলগত প্রশ্নে মতভেদ থাকতে পারে। এই মতভেদ তো কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মার্কসবাদী পার্টির বা সংযুক্ত সমাজবাদী পার্টিরও আছে। কিন্তু তাতে ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট গঠনে বাধা কোথায়? ইতিহাসে দেখা গেছে, বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদ এবং অতিবিপ্লবীয়ানা শেষপর্যন্ত চরম দক্ষিণপন্থী শক্তির ক্ষমতা দখলে সহায়তা করেছে। হিটলারের পূর্ববর্তী সময়ে জার্মানীতে তাই হয়েছিল। পাকিস্তানেও বামপন্থী দলগুলোর অন্তর্বিরোধ আয়ুব খাঁর ক্ষমতা দখলের সহায়তা করেছিল। ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক রক্ষণশীলতা এবং সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার পক্ষপাতী শক্তিগুলো ক্রমশ একজোট হচ্ছে। তারা কংগ্রেসের এই বিবর্তনে আতঙ্কিত। বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শক্তিগুলো যদি আত্মকলহ বন্ধ না করে তাহলে ক্ষতি হবে জনসাধারণের, যারা অনেক আশা নিয়ে যুক্তফ্রণ্টকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। সুতরাং সময় থাকতে তাঁরা সাবধান হোন। নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ করার দুর্মতি শিশুসুলভ রাজনীতির বিকার। পশ্চিমবাংলার বামপন্থী দলগুলো কি সেই পথ বেছে নেবে? তাহলে দেশবাসীর সামনে আর কি প্রতিশ্রুতি রইল?

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমস্যা

বর্তমান সাহিত্য ও বর্তমান সমাজের পাঠকদের দিকে তাকালে হঠাৎ মনে নিরাশা জাগে। মনে হয় বুদ্ধিআশ্রিত লেখার পাঠক ক্রমে কমে যাচ্ছে আর সেই সঙ্গে সাধারণ আবেগজাত এবং পাঠকমন বিক্ষিপ্তকারী নিম্নশ্রেণীর রচনার পাঠক অসম্ভব রকম বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য হয় তো তা নয়। আমার মনে হয় দুই-ই বাড়ছে, তবে গত যুগের অনুপাত হয় তো একই আছে। একটা কাল্পনিক অঙ্কের হিসাবে আসা যাক। ধরা যাক গত যুগে বুদ্ধি-আশ্রিত লেখার পাঠক ছিল ১০০, আর প্রধানত যুক্তি বর্জিত আবেগ প্রধান নিম্নস্তরের লেখার পাঠক ছিল ১০,০০০০। আরো একটু ব্যাখ্যা দরকার। আমি বুদ্ধি-আশ্রিত লেখা বলতে প্রবন্ধ গল্প উপন্যাস-কাব্য সবই বোঝাতে চাই। গল্প উপন্যাস-সচেতন শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস যেখানেই আছে, সেখানেই তা বুদ্ধি-আশ্রিত বা চিদবৃত্তি প্রধান হতে বাধ্য এবং তা হৃদবৃত্তি আশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও। তুলনা বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। এ সবের কোনো বালাই নেই যে সব রচনায়, তাকেই আমি নিম্নস্তরের রচনা বলছি।

এবারে আগের অনুপাতের কথায় আসি। আমার বর্ণিত প্রথম শ্রেণীর পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এখন দাঁড়িয়েছে ১০,০০০, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০,০০০০০। এই সংখ্যা শুধু আনুমানিক অনুপাত দেখানোর জন্য।

দশ লাখ চোখে পড়ে বেশি। এবং যদিও অনুপাত ঠিক থাকা খুব আশাপ্রদ নয়, কারণ আমার বর্ণিত প্রথম শ্রেণীর পাঠক অর্ধশতকে ১০০ থেকে বেড়ে মাত্র ১০,০০০ হয়েছে। এতে প্রমাণ হয় এই শ্রেণীর পাঠক আশানুরূপ বাড়েনি। লেখক সংখ্যা কিন্তু অনেক বেড়েছে, এবং শুধু প্রবন্ধ এবং বহু জাতীয় আলোচনা, এমন কি গ্রন্থ সমালোচনার জন্যও স্বতন্ত্র সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছে বর্তমানে। এ সবের পাঠক সংখ্যা আরো অনেক বাড়া উচিত ছিল।

এ জাতীয় পত্রিকায় যে সব রচনা প্রকাশিত হয়, তা পড়লে বাঙালী লেখকদের চিন্তাশীলতা, যুক্তিপূর্ণ বিচার এবং রচনা ক্ষমতা দেখলে বিস্ময় বোধহয়। কিন্তু চিন্তাশীলতার অনুরাগী পাঠক যে সব শর্তে বৃদ্ধি পেতে পারে, সে সব শর্ত বর্তমানে বাংলাদেশে দ্রুত কমে আসার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। সমাজের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে এর বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

যাকে 'ইনটেলেকচুয়াল পারসুট' বলা হয়, বুদ্ধির সাহায্যে যেসব বিষয় শিখতে হয়, বুদ্ধিকে প্রধান আশ্রয় করে যেসব শিক্ষাকে আয়ত্ত করতে হয়, সেসব শিক্ষা বা শখ বা বৃত্তি থেকে বর্তমান তরুণ সমাজের প্রবৃত্তি বা ঝোঁক সাধারণভাবে কিছু অন্য-দিকে ঘুরে যাচ্ছে। অথচ এখন যারা যুবক তাদের অনেকের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি এবং চিন্তাশক্তির আশ্চর্য প্রকাশ আমি দেখেছি, যা আগের যুগে অল্পই লক্ষ্য করা যেত। এখনকার পরিবেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রবলতর হচ্ছে। অবশ্য এর পিছনে ঐতিহাসিক কারণ বর্তমান, অর্থাৎ যা হয়েছে তা ছাড়া অন্য কিছু হওয়া আপাতত সম্ভব ছিল না।

একটা ক্ষতিকর ব্যাপার লক্ষ্য করছি এই যে পাশ্চাত্য দেশের যা কিছু নোংরা তার দ্রুত অনুকরণ হচ্ছে এদেশে। মনে হয় একটা 'ডিজেনারেট' যুগের সম্মুখীন হচ্ছি আমরা। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আছে এর পটভূমিতে। মূলে আরো অনেক জটিলতা। সামাজিক অসাম্য হঠাৎ এমন বেড়ে গেছে যে বহু মানুষ আজ দিশাহারা। বাস্তু-হারা তো বটেই। আগের যুগে অনেকে অদৃষ্ট মেনে নিজ নিজ অবস্থায় খুশি থাকত। অভাব ছিল, কিন্তু অভাববোধ এমন তীব্র ছিল না। বাইরের সাম্যবাদের আদর্শের চাপ পূর্বে থেকেই ছিল। তার হাত থেকে বাঁচতে বিশেষ কোনো চেষ্টাই হয়নি—একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র গড়ার প্রতিশ্রুতি ছাড়া। এদেশের নানা পরস্পরাবিরোধী ভাবধারার সর্বনাশকর পরিণাম থেকে দেশকে বাঁচাবার উপায় আমার মনে হয় এদেশের নিজস্ব মেজাজ, ঐতিহ্য ও প্রকৃতিকে মান্য করে অবিলম্বে যতটা সম্ভব উঁচু-নিচু ভেদ দূর করে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। দুমুশ চালিয়ে সাম্য নয়, কারণ সেক্ষেত্রে অবিরাম নিষ্পেষণ না চালালে 'রেজিমেনটেড' মন বিদ্রোহ করতে বাধ্য। ধনী সম্প্রদায়কে এ জন্য অনেকখানি নিচে আসতে হবে, এবং সাধারণ মানুষ যাতে বাসস্থান পায়, স্বাস্থ্য পায়, শিক্ষা পায়, তার জন্য সোজাসুজি কাজ আরম্ভ করতে হবে এবং অবিলম্বে। পালনহীন প্রতিশ্রুতিতে দেশের অবস্থা আরো খারাপ হবে।

এ সমস্ত পটভূমির কথা। নতুন দিন একটা আসবে, ভাল হোক মন্দ হোক পরি-বর্তন প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। বর্তমান-কালটা একটা ক্রান্তি কাল। পরিবর্তনের মুখে এমনই সব খানিকটা এলোমেলো হয়ে যায়। এবং সাহিত্যও এমন অবস্থায় বণিক নিয়ন্ত্রিত এবং চটুলধর্মী হতে বাধ্য। ইতিমধ্যেই সিনেমায় চুম্বন এবং নগ্নতা চলবে কিনা তা নিয়ে কথা উঠেছে। তার মানে ওটা চলবে। সাহিত্যে আরো বেশি আসবে। বিজ্ঞাপন ও সিনেমার ছবিতে এর ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। তাতে মনে হয় বুদ্ধি-আশ্রিত সাহিত্য, চিন্তাজনক সাহিত্য এবং যে সাহিত্যে কোনো রকম আদর্শ (আদর্শ আমার পছন্দ, আদর্শবাদ পছন্দ নয়) আছে, তার সীমা যতদূর এসেছে সেইখানেই থেমে থাকার সম্ভাবনা। যে সাহিত্য আমাদের আগের যুগের মতে ভাল, যার মধ্যে মন আশ্রয় পায়, ভরসা পায়, প্রেরণা পায়, আনন্দ পায়, নতুন করে বাঁচার মন্ত্রের ইঙ্গিত পায়, তার স্থান দ্বিতীয় বা তৃতীয়তে নেমে যাবে। গেছেও অনেকখানি ইতিমধ্যে। চটুল ভাব, চটুল ইঙ্গিত পূর্ণ গল্প, যা অপরিণত মনকে বিচলিত করে তারই প্রভাব এখন ব্যাপক। যা আগে গোপনে বিক্রি হত এখন তা প্রকাশ্যে এসে গেছে। আরো আসবে।

এর ভাল-মন্দ সমালোচনার বাইরে। সমাজ একটা দিকে ছুটে চলেছে, এখন তা কোনো উপায়ে ঠেকানো যাবে না। এ পথে প্রবল ধাক্কা খেলে আপনা থেকেই আর একদিকে ছুটবে। সমাজ কোনো অবস্থাতেই থেমে থাকতে পারে না। এবং কোনো সত্যই শেষ সত্য নয় এই সত্যটা অন্তত চোখের সামনে দেখতে পাই। মানুষকে সুখে-শান্তিতে রাখতে হাজার হাজার বছর ধরে চেষ্টা চলছে, কোনো শেষ সিদ্ধান্ত হয়নি, হবেও না, প্রাকৃতিক নিয়মেই হবে না। প্রকৃতি অমোঘ পরিবর্তনের সমর্থক।

মানুষের মনকে যে সাহিত্য সুস্থ রাখে, আনন্দ দেয়, তার আদর্শও বদল হতে বাধ্য। সাহিত্যেও এই পালা বদল চলছে, এবং চলবে। এবং মানুষ আত্মরক্ষার সহজ ধর্ম থেকেই যা ক্ষতিকর তা একদিন ছেড়ে দেবে। বিষকে সে চেনে, অমৃত আজও সে লাভ করেনি, তার স্বাদও জানে না। অতএব লেখকের চোখে সাহিত্যের মূল্যায়নে স্থায়ী কোনো আদর্শ থাকতেই পারে না। তবে বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে মোটের উপর, একটা আদর্শ-কঙ্কাল সে লাভ করেছে, তাকে ভিত্তি করে রূপের বদল ঘটছে এই মাত্র। সাহিত্যের সেই মূল আদর্শ হচ্ছে মানুষকে ভালবাসা। অথবা প্রকৃতিকে, অথবা ইতর প্রাণীকে। আমি ব্যাপক অর্থে বলছি কথাটা। আসলে মানুষকে ভালবাসার ক্ষমতা থেকেই মহৎ সাহিত্যের জন্ম। যা দেখছি তার অনুকরণ নয়, সমাজকেও অনুকরণ নয়, সমাজকে কেমন দেখতে চাই তার ছবির ইঙ্গিত দেওয়াই সাহিত্যিকের ধর্ম। ব্যঙ্গ সাহিত্য অসত্যের মুখোশ খুলবে, স্রষ্টা সাহিত্যিক সত্যকে গড়ে তুলবে।

ব্রিটিশ আমলে জাতির লক্ষ্য এক ছিল, স্বাধীনতার লক্ষ্য। তাকে ঘিরে কত সাহিত্য আবির্ভূত হল—মূলে ছিল দেশকে ভালবাসা। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর কি করতে হবে সে শিক্ষা ছিল না। উপরের চাপ সরে যাওয়ার পর শুধু বুদবুদ উঠছে। নিজস্ব সৃষ্টিক্ষমতা দুর্বল, তাই অনুকরণ চলছে। সাহিত্যে, শিল্পে, রাজনীতিতে, বিদেশে যা হচ্ছে তৎক্ষণাৎ তার অনুকরণ করা হচ্ছে এখন। প্রভাব এড়ানো যায় না, কিন্তু অনুকরণ এড়ানো যায়।

মনের যেমন রেজিমেনটেশন বা অতি নিয়ন্ত্রণ আমার পছন্দ নয়, তেমনি শিল্পেরও অতিনিয়ন্ত্রণ স্বাস্থ্যকর মনে করি না। 'আর্টিসটস ইন ইউনিফরম' সাময়িকভাবে অতি সংকটজনক অবস্থায় চলতে পারে।

সবাই বলেন, স্বাধীনতার শৈশব আমাদের এখনো কাটেনি। অর্থাৎ আমরা এখনো শিশু। তবু শিশুর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে বলেন মনস্তাত্ত্বিকেরা, শিক্ষাবিদেরা। শ্রদ্ধা পোষণ কর, কিন্তু ক্ষতিকর কাজ থেকে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিবৃত্ত কর। তারা যদি ভুল পথে যায় তবে সোজা বলো না যে, ভুল করেছ। বলো যা করেছ বেশ করেছ, কিন্তু আরো ভাল করা যায় কেমন করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তবে, যে দেখিয়ে দেবে সেও যদি শিশু হয়, তা হলে ভরসা থাকে না। সেখানে কর্তব্য কি, তা আমার জানা নেই, তবে শিশুরা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও অনিষ্টকর জিনিস পরিহার করতে শেখে। আগুনে দ্বিতীয়বার হাত দেয় না।

আমি বাঙালী জাতির কথা ভাবছি। এখানে আমরা হাজার লক্ষ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছি, এমন অবস্থায় আমাদের সবাইকে শ্রদ্ধা করে, ভালবেসে, আমাদের ভুল বুঝিয়ে সবাইকে একটা লক্ষ্যে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে, এমন কাউকে দেখা যায় না। তাই সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করা ঠিক হবে না। শুধু এইটুকু বলব এ ঝোঁক স্থায়ী হবে না। কিন্তু এ কথাও বলা উচিত—কেউ যেন বাইরে থেকে উপদেশ দিয়ে একে রোধ করার ব্যর্থ চেষ্টা না করেন। প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি যাঁরা করবেন, তাঁরা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যান, 'প্রফেট' সাজবেন না। এ বিষয়ে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি আদর্শ মনে করি। যাঁরা বুদ্ধি-আশ্রিত সাহিত্য রচনা করছেন, তাঁদের নিরাশ হবার কারণ নেই, তাঁরা আশা করতে থাকুন চিন্তার ক্ষেত্র বিস্তৃত হবেই, পাঠকদের মধ্যে আরো বেশি চিন্তাশীলতা জাগবে।

আমার সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু নৈরাশ্য হয় তো ফুটেছে, কিন্তু তা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। অদৃষ্টবাদেও আমার বিশ্বাস নেই। আমি শুধু অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিবর্তনটা লক্ষ্য করে যাচ্ছি।

নভেম্বর, ১৯৬২ খৃঃ। এখানকার আর্মি রিক্রুটিং সেণ্টারে ভীষণ ভিড়। এক-দিন তিন বন্ধু এসে এখানে লম্বা কিউতে দাঁড়ায়। তিনজনে বয়সে তরুণ, সবেমাত্র ডিগ্রী কলেজের চৌকাঠ পার হয়েছে। অন্য কোন পেশা তাদের জীবনে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। প্রত্যেকের চোখেমুখে একটা দীপ্তি, বেশ রোমাণ্টিক বলে মনে হয়। ভারতের উত্তর সীমান্তের দিকে তাদের স্থির লক্ষ্য।

সময়ে সিলেকসান বোর্ডের সামনে গিয়ে তারা দাঁড়ায়। বেশ উত্তেজনাপূর্ণ একটি ঘণ্টার ব্যাপার। তারপর সেখান থেকে পথে বেরিয়ে এসে তারা এমন উল্লাস উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে থাকে, যেন এখুনি এক একজন জুনিয়র কমিশনড অফিসার।

এদিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; ঝড়জল যে-কোন মুহূর্তে শুরু হতে পারে। একজনের তা খেয়াল হতেই তারা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আরো এ-ব্যস্ততা সামনে পাঞ্জাবী রেস্তোরাটা দেখে। আজ তাদের দারুণ দরাজ দিল। পকেট খালি করে বাড়ী ফিরতে চায় সবাই।

তিন বন্ধু ফৌজী মেজাজে রেস্তোরায় গিয়ে ঢোকে। কারণে অকারণে বেয়ারাদের হাঁকডাক করে, প্রচুর খায় এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ক্লান্তিতে ঢলে পড়ে।

ঠিক এমন সময় সিলেকসান বোর্ডের ডেপুটি চীফ-এর আবির্ভাব। মনে হয়, বাইরে দুর্যোগ দেখে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়েছেন। কফির পেয়ালা হাতে ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন দেখে তিন বন্ধু শশব্যস্ত হয়ে ওঠে। কি করবে না করবে ভেবে শেষে তারা দাঁড়িয়ে উঠে কড়া স্যালুট দেয়।

অবশ্য জাঁদরেল অফিসারটিকে এখন তার এক সামরিক পোশাক ছাড়া চেনাই যাচ্ছে না। কোথায় সেই কঠিন ব্যক্তিত্ব, গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং অনুসন্ধিৎসু শ্যেনদৃষ্টি: বরং অমায়িকতায় পরিহাসে কয়েক মিনিটের মধ্যে নিজেকে তিন আর একে চার করে নেন।

মানব ভট্টাচার্য

এরপর আবার বেয়ারাদের হাঁকডাক। প্লেটের পর প্লেট বাড়ে টেবিলে। বায়ুস্তর সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। চিত্তখুশি গল্পে মশগুল এই তিনবন্ধু আর এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে দেখে মনেই হয় না যে, বয়স ও ব্যক্তির দিক থেকে এদের কোন অমিল আছে।

কিছুক্ষণ পর ফ্লুওরেসেণ্ট ল্যাম্পগুলো হঠাৎ নিভে যায়। এতক্ষণ কারুরই খেয়াল নেই যে, বাইরে ঝড়জলের কী ভীষণ তাণ্ডব-নৃত্য চলেছে। আরো জানা যায়, রাস্তায় দু'-আড়াই ফুট জল, যানবাহন সম্পূর্ণ বন্ধ।

নীরন্ধ্র অন্ধকার। রেস্তোরাঁর স্বাভাবিক কোলাহল স্তব্ধ। প্রত্যেকের মনে কেমন এক স্বপ্নানুভূত ভীতি। ভদ্রলোক পকেট থেকে তাঁর ছোট্ট ওয়াইন-ফ্লাক্সটি বের করেন। তিন বন্ধুকে নীরব দেখে তাঁর হাসি পায়। হায়রে, ওদের রোমাঞ্চকর যুদ্ধ-উন্মাদনা কোথায় গেল! হঠাৎ বলেন, তোমরা একটা গল্প শুনবে, ওয়ারের গল্প?

তিন বন্ধু সাগ্রহে উত্তর দেয়, চমৎকার প্রস্তাব স্যার। আপনি বলুন।

ভদ্রলোক কোন ভূমিকা না করে শুরু করেন :

ফরটিটুর ফেব্রুয়ারীতে ফিল্ড্যান্টার অফ অফ দি ইস্ট—সিঙ্গাপুর হলো সাইননটো। বিজয়ী জাপানীদের দেওয়া নাম। আমাদের গোটা রেজিমেণ্ট তখন একফ গার্ডেনের কাছে এক শিবিরে বন্দী। রণক্লান্ত পর্যুদস্ত বাহিনীর সে এক অবর্ণনীয় দুর্দশা। তবু যুদ্ধ এখানে নেই, একথা ভাবতে ভারী ভালো লাগছে।

পরদিন জাপানী হাইকম্যাণ্ড আমাদের তলব করে। যাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াই তাঁর নাম জেনারেল ফাকুদা। দেখতে, ধ্যানমগ্ন তথাগতের মূর্তি যেন। অত্যন্ত সমাদরে অভ্যর্থনা জানান। সদ্য যুদ্ধজয়ী একজনের কাছ থেকে এতটা খাতির আশা করিনি।

আসন গ্রহণ করতেই জেনারেল ফাকুদা কাজের কথা জানিয়ে দেন; বেশ চমৎকার ইংরেজীতে বলেন, সাইননটোর পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব আমার। এ-ব্যাপারে আপনাদের সহযোগিতা চাই। যে ফেটিগ পার্টি তৈরী হবে, তাতে ভারতীয়দের কাজ-কর্ম, শৃঙ্খলা ইত্যাদির দায়দায়িত্ব আপনাদের।

মনে মনে সকলে শঙ্কিত হয়ে উঠি। এ তো যুদ্ধবন্দীদের ওপর জবরদস্তি শ্রম চাপিয়ে দেওয়া। আমাদের কম্যাণ্ডিং অফিসার মেজর কোটারাম প্রতিবাদ করেন সঙ্গে সঙ্গে; বলেন, অর্থাৎ জেনেভা চুক্তি-বিরোধী কাজ।

জেনারেল সামান্য নড়ে বসেন। মুখ-খানা ক্ষণিকের জন্য কঠিন হয়ে স্বাভাবিক হয়ে যায়; শান্ত গলায় উত্তর দেন, জেনেভা বৈঠকে জাপানের কোন প্রতিনিধি ছিল না।

—আমরা দু'দিন কোন রেশন পাইনি—অভুক্ত।

জেনারেল ফাকুদা যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন; তবু বলেন, ঠিক আছে, কাজ শুরু

হলেই ফেটিগ পার্টির ওপর সরকার নজর দেবেন।

আমরা হতাশায় ভেঙে পড়ি। ক্যাম্পে গেলেই হাজারখানেক ক্ষুধার্ত সৈনিক তাদের অফিসারদের সামনে এসে দাঁড়াবে। সেই অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করি।

হঠাৎ জেনারেল কলিং বেলে হাত রাখেন। দুজন সাহেব ঘরে এসে দাঁড়ায়। তাদের পরনে পরিচারকের বেশ। আদেশ হতেই তারা জেনারেলের জুতো খোলে, ঘাসের চটি এনে পরায়, তারপর কিমনো হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। জেনারেল পাশের ঘরে যান এবং দু' মিনিট পরে পুরোপুরি জাপানী হয়ে ফিরে আসেন। এবার হুকুম হয় আমাদের প্রত্যেকের জুতো খুলে দেবার।

আমাদের দিকে তাকিয়ে সাহেবদের মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। তারা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

জেনারেল ফাকুদা কিন্তু একেবারের বেশী দুবার আদেশ দেন না। সাহেব দুজনকে নিয়ে যায় কয়েকজন জাপানী সেনট্রি; বোধহয় পাশেই কোন একটা ঘরে। তাদের প্রত্যেকের হাতে বেত; জলে ভিজে বেতগুলো বেশ ফুলে ফুলে উঠেছে।

জেনারেল বলেন, ইংরেজরা আমাদের ঘৃণা করে, কারণ আমরা এশিয়াবাসী, বলে, জাপ। এদের আমি চ্যাণ্গি জেল থেকে এনেছি। সিভিলিয়ান এরা। একজন ইংরেজ। সে এখানকার এক রবার বাগানের ম্যানেজার ছিল। অপরজন অস্ট্রেলিয়ান ব্যবসাদার; যুদ্ধে কিছু কামাবার আশায় এখানে আগমন। কিন্তু ভারতীয়দের সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই ভালো। তবে আপনারা পরাধীন জাতি, সে কারণে সহানুভূতি তো থাকবেই।

এরপর জেনারেল চা-পানের আমন্ত্রণ জানান। আমরা অন্দরের দিকে পা বাড়িয়েছি এমন সময় কানে আসে তীব্র আর্তনাদ। সকলে শিউরে উঠি। যদিও পরক্ষণে বুঝতে পারি এ আহত পশুর আর্তস্বর কাদের এবং কেন।

অন্দরে প্রবেশ করে প্রথমেই গৃহকর্তার রুচির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতে হয়। এত অল্প সময়ে জেনারেল ফাকুদা অসাধ্য সাধন করলেন কি করে! কাগজের দেওয়াল, বাঁশের চিক্, সুদৃশ্য ফুলদানি, ফুল এবং মেঝেতে কার্পেটের ওপর নীচু জলচৌকি; চায়ের পট কাপ সবই সাজানো রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য হয়ে যাই যখন কিমনো পরিহিতা দুটি তরুণী নতজানু হয়ে অভ্যর্থনা জানায়।

সকলের পায়ে ওঠে ঘাসের নরম চটি। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ি একে একে। মেয়ে দুটি আমাদের পরিচর্যার কোন ত্রুটি রাখে না।

আমাদের সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করে জেনারেল ফাকুদা বলেন, ভয় পাবার কিছুই নেই। আর এদের এতো খাতির কিসের? এরা দুজনেই চীনা, আমার সেবাদাসী, এদের বাপ আর ভাইকে নিজের হাতে হত্যা করেছি। তারা কম্যুনিস্ট ছিল।

সকলেই চকিতে একবার মেয়ে দুটির দিকে তাকাই। আশ্চর্য, ওদের মুখে আর আনতদৃষ্টিতে কোন ভাবান্তর দেখতে পাই না।

জেনারেল ফাকুদা বক্তা; বলে চলেছেন, আমেরিকায় আমার শিক্ষা। সেখানকার এক য়ুনিভার্সিটির ছাত্র। তবে আসলে আমি একজন খাঁটি জাপানী। সম্রাট আর ছবি নিয়ে জীবন শুরু করি। তারপর—সে যাক, সত্যি আমার ছবি প্রশংসা পাবার মত কিনা বলুন তো?

ঘরে একটাই ছবি। সেদিকে আঙুল দেখান জেনারেল ফাকুদা। ওয়াটার কালারে একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত চন্দ্রমল্লিকার গুচ্ছ। সত্যি অপূর্ব। ছবির কিছুই বুঝি না, তবু মুগ্ধ হয়ে যাই। বোধহয় একটি মুহূর্তের জন্যে অন্তত আমি গায়ে বারুদ আর ঘামের দুর্গন্ধ পাই না; মন থেকে মৃত্যু বিভীষিকা মুছে যায়।

ভদ্রলোক থামেন; অবশ্য বাধা পান তাই। বেয়ারা এসেছে টেবিলে মোমবাতি জ্বালাতে। ভদ্রলোক আপত্তি জানান। অন্ধকার তার ভালো লাগছে। ওয়াইন ফ্লাস্কটি টেবিলে নামিয়ে রেখে বলেন, তারপর, কিরকম লাগছে গল্প? মিলিটারি লাইফ, ওয়ার, এ্যাডভেঞ্চার—বেশ জমে উঠেছে না? ভদ্রলোক হো-হো করে হাসিতে থাকেন।

তিন বন্ধু উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে। মাঝখানে কথা বলে অনর্থক দেরী করাতে চায় না।

ভদ্রলোক শুরু করেন, শেষপর্যন্ত আমরা অবশ্য পালিয়ে যাই শ্যামদেশে। কম্বোডিয়া থেকে পরে মিত্র বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়। এদিকে জাপানীদের "কেমপিও কেসৎ সু" অর্থাৎ সীমান্ত রক্ষীদল আমাদের তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। এদের ধারণা, জেনারেল ফাকুদাকে আমরাই খুন করেছি। এখন সেকথা থাক্।

হ্যাঁ, সেই দিনই রেশন পাওয়া যায়। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত। ব্যারাকে হৈ হৈ পড়ে যায়। রসুই-এর জন্য লোক দৌড়ে আসে। গোটা রেজিমেণ্ট দুদিন ধরে অভুক্ত। তাদের উদরপূর্তির ব্যবস্থা রাত বারোটা অবধি চলে।

পরদিন শেষরাতে জেনারেল ফাকুদা ভারতীয় অফিসারদের ফের তলব করেন।

গিয়ে দেখি, বেশ জাঁকজমকপূর্ণ সামরিক পোশাক পরে তিনি একা চুপচাপ বসে আছেন। সামনে সাদা কাপড়ে ঢাকা দেওয়া একটা ইজেল। তার পাশে রং তুলি সবই রয়েছে।

আমাদের দেখে একজন সেন্ট্রিকে ডেকে ইজেলের ওপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে নিতে বলেন।

আদেশ পালন হয় তৎক্ষণাৎ। বেশ কৌতূহলের সঙ্গে দেখি সাদা ক্যাম্বিসের গায়ে রং-এর একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগে নি।

এরপর তিনি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তার ইঙ্গিতে আমরাও আসি। সামনের মাঠে অনেক জাপানী সেন্ট্রি। এক জায়গায় একটা গর্ত খোঁড়া রয়েছে। তার ধারেই একজন চীনা যুবক দাঁড়িয়ে আছে।

জেনারেলের আগমন ঘোষণা করা হয় লাউডস্পিকারে। বিউগল বেজে ওঠে। সকলে সতর্ক হয়ে যায়। চীনাটিকে একজন সেনট্রি নতজানু হয়ে বসতে ইঙ্গিত করে।

বুঝতে পারি কি ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু যখন দেখি জেনারেল স্বয়ং কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন দু'চোখ আমার আপনি বুজে আসে।

ব্যাটেল ফিল্ডে দুপক্ষের হাতে থাকে মৃত্যু, এখন যে যার ঘাড়ে পারো চাপিয়ে দাও। তাই আক্ষেপ নিয়ে কেউ মরে না। কিন্তু এই জমকালো রাজদণ্ড না ন্যায়দণ্ড দেখে অন্তরে জ্বালা ধরে যায়।

কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাই। পূর্বাকাশ রক্ত রং-এ একাকার। হরিদ্রাভ বুকে তখন এক টুকরো অন্ধকার গর্তকে বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে। আবার বিউগল বেজে ওঠে। অবনতমস্তকে জেনারেল ফাকুদা মৃতের প্রতি সম্মান জানান। জাপানীদের এইটাই বৈশিষ্ট্য।

এক একটি দিন তখন কত দীর্ঘ! সেই সময় জীবন-মৃত্যুকে কতবার কাছ থেকে দেখেছি। সেই কত বছর আগে—কই ভুলিনি তো কিছুই। তবে জেনারেল ফাকুদার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

ভদ্রলোক ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে একটু থামেন। ক্ষণিকের জন্য গলায় যেন বিষাদের সুর। হঠাৎ অন্ধকারে সোজা হয়ে বসেন। মনে হয় নিজেকে সামলে নেন। ওয়াইন ফ্লাস্ক-এর ছিপি খোলার শব্দ পাওয়া যায়। বোধহয় শেষবিন্দুটুকু নিঃশেষ করে গলায় ঢালেন। এরপর শুরু করেন কাহিনীর আর এক অধ্যায়ঃ

এদিকে জেনারেল ফাকুদা রোজই দু'হাত রক্তে রাঙিয়ে নেন, তারপর দিনের কাজ শুরু করেন। সেই একই ভয়ঙ্কর অনুষ্ঠান। এই হত্যাযজ্ঞে আত্মাহুতি দেয় কেবল চীনারা। জাপানীরা যাদের সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে।

এদিকে তার সারাদিনের সঙ্গী আমরা। কত অত্যাচার আর নির্যাতন যে প্রত্যক্ষ করেছি তার হিসেব নেই। এ ব্যাপারে জেনারেল অভিনব সব ফন্দি বের করেন। দু'দিন আগে এক বোমা-বিধ্বস্ত মেটারনিটি হোমের সামনে দাঁড়িয়ে আদেশ দেন, প্রতিটি গর্ভবতী লাশের পেট চিরে ফেলতে হবে।

চাঙ্গী জেলের বন্দীদের ওপর এই দণ্ডাদেশ; অর্থাৎ অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান ফেটিগ পার্টি। কজন তো গেট পর্যন্ত গিয়ে বমি করে ফেলে। ভীষণ দুর্গন্ধ, নাড়ী ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। তার ওপর যখন পচা লাশগুলো বাইরে এনে পেট চেরাই হয়, তখন থাকতে না পেরে কয়েকজন তো পাগলের মতন এদিকে-সেদিকে পালাতে থাকে।

জেনারেলের আদেশ, যারা পালাবে, বিশ ঘা বেত।

পরদিন পৌরভবনে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান। জেনারেল ফাকুদা ছাড়াও আরো হোমরা-চোমড়া অফিসাররা এসেছেন। যুদ্ধে ভবনটি দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ফেটিগ পার্টি দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করে যতটা সম্ভব সংস্কার করেছে। হয়তো সেকথা

স্মরণ করে জাপানীরা কেবল আমাদের এখানে হাজির থাকতে বলে।

প্রথমে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য নেওয়া হয়। তারপর জাপান যা চায় তার ব্যাখ্যা হয়: এশিয়ার অভিভাবকত্ব, এ্যাংলো-আমেরিকান গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ সামরিক পরাজয়, চীনে কম্যুনিজমের প্রতিরোধ এবং শেষে ভামাকারের মুখে ভারতের স্বাধীনতার কথা শুনে অবাক হই।

সে যাক, অনুষ্ঠান শেষে জেনারেল ফাকুদা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান। বাংগা টকটকে মুখ, হাতে পানপাত্র—বেশ প্রমত্ত হয়ে উঠেছেন। জাপানী পতাকাটি দেখিয়ে অহংকারে ফেটে পড়েন—য়ুনিয়ন-জ্যাক নেই! সে জায়গায় হিনোমারু। ফোর্টক্যানিং, চোদ্দতলা ব্যাথ বিল্ডিং সর্বত্র দেখবেন হিনোমারু। সারা এশিয়াকে ও দেখাবে মুক্তির পথ।

আমাদের তরফ থেকে কোন প্রতিবাদ নেই। তবু তার আন্দোলন বন্ধ হয় না, দাপাদাপি করে বলে চলেন, কোটাবারুতে আপনারা বৃথাই যুদ্ধ করেছেন। সাইনানটো দখলের পরিকল্পনা আমার। জেনারেল ইয়ামাসিতা সহজেই জয়ী হলেন। আর আপনাদের জেনারেল পার্সিভ্যাল প্রাণভিক্ষা চান। চেয়ে দেখুন, গোটা সাইনানটোতে কটা আর্মি স্পটের ওপর আমি বোমা ফেলিয়েছি? একটাতেও না। কিন্তু সিভিলিয়ানদের আমি ছাড়ি নি। ওদের ঘরবাড়ী, হাসপাতাল, পথঘাট সব ধ্বংস করেছি। এর ফলে কি পেলাম? প্রচুর রসদ, অস্ত্রশস্ত্র, ব্যারাক্, অফিসার্স কোয়ার্টার—এমনকি ইংরেজদের সিগারেট আর লাইটার পর্যন্ত।

এরপর জেনারেল ফাকুদা হঠাৎ থেমে শান্তকণ্ঠে বলেন, ইংরেজরা প্রিন্স-অব-ওয়েলস্ আর রিপালসের শোকে মগ্ন থাক। চলুন, আপনাদের দেখিয়ে আনি যে আমরা কত খুশি।

জেনারেলের মিলিটারি কনভয় সহর পরিক্রমা শুরু করে। উদ্দেশ্যহীন যাত্রা। একই গাড়ীতে রয়েছি তার সংগে। সাগরতটে এসে হঠাৎ তিনি থামবার নির্দেশ দেন। অদূরে ছবির মতন সুন্দর ছোট্ট একটা বাড়ী। সামনে বাগান। আছাড়া এমন প্রাকৃতিক পরিবেশে বাড়ীটি যে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে।

এদিকে দুজন সেপাই দৌড়ে গিয়ে খবর আনে, বাড়ী ফাঁকা, কেউ নেই। জেনারেল গাড়ী থেকে নেমে পড়েন। আমাদেরও কৌতূহল বেড়ে যায়। তার পিছু পিছু বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করি। সুন্দর-ভাবে সাজানো ড্রইংরুম, কিন্তু লোকজন কোথায়?

অবশ্য পরমুহূর্তে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে তার সমাধান পাই। এ সেই পচা লাশের দুর্গন্ধ। ইতিমধ্যে সিকিউরিটির দুজন লোক ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করে দেয়। ভেতর-বাড়িটা বোমায় বিধ্বস্ত।

পর্দা সরিয়ে দেখি সত্যি তাই। মাঝের দুটো ঘরের ছাদ নেই, মেঝেতে বিরাট গর্ত। অবশ্য ক্ষতি বলতে এইটুকু যা বাড়ির আর কোথাও কিছু হয়নি।

জেনারেল ফাকুদা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখেন। কিন্তু দোতলার শোবার ঘরে এসে থমকে দাঁড়ান। সামনে দেওয়ালে একটা ফোটো—এক ইউরেশিয়ান স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে স্বর্গীয় হাসি নিয়ে একটি হৃষ্টপুষ্ট বাচ্চা।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন জেনারেল। তারপর কি যে হয়, তিনি সোজা গাড়িতে এসে বসেন। যাবার আগে কড়া হুকুম, যেভাবে হোক্ লাশগুলোর উদ্ধার চাই। দুজন জাপানী অফিসার সমেত বারোজন সেপাই তিনি রেখে যান। আমাদেরও থাকতে হয়।

অনেক মেহনতের পর লাশ দুটো যখন পাওয়া যায় তখন মধ্যরাত্রি। গর্ত থেকে তোলাই যায় না, ধরতে গেলে খসে পড়ছে। ওদিকে জাপানী অফিসার দুজন ভাংগা ভাংগা ইংরেজীতে যা বলে তার অর্থ, লাশ এখানে থাক, তোমরা জেনারেলকে গিয়ে খবর দাও।

আমরাও বলি, তা আপনারা যাবেন না কেন?

উত্তরে 'ফেটিগ ফেটিগ' বলে আপনারা মুখ ঘুরিয়ে নেন।

বুঝতে পারি তাদের ভয় কোনখানে।

ভয় কি আমাদের নেই,—আছে। অতবড় একজন মিলিটারি হাইকম্যাণ্ড-এর সান্নিধ্য সাধ্য খুব ভয়ের। তার ওপর রহস্যময় লাঞ্চ এই জেনারেল ফাকুদা। তবু তাঁকে গিয়ে বসতে হয়। দুজন সেপাই লাইসেন্স হাতে সংগী হয়; আমরা যে বন্দী।

বাংলোয় ঢুকতেই সিকিউরিটির লোকেরা জেনারেলের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়; যাবার আগে সতর্ক করে দেয়, জেনারেলের মেজাজ ঠিক নেই সাবধান।

বেশ ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকি।

—ওহায়েও গোজাইমাস্, গুডমর্ণিং গুডমর্ণিং। জেনারেল অভ্যর্থনা করেন।

এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে আমরা হকচকিয়ে যাই। তবু মেজর কোটারাম সাহস নিয়ে বলেন, কিন্তু এখন যে মধ্যরাত্রি জেনারেল।

জেনারেল শান্তকণ্ঠে উত্তর দেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

এর পর তিনি বলতে শুরু করেন। মনে হয়, কোন জাপানী ভদ্রলোকের মাননীয় অতিথি আমরা। অল্প দু-চার কথা বলার পর জানান সেই চীনা পরিচারিকাদের ছুটি দিয়েছেন, এবং কোন চীনাকে আর অকারণ চরমদণ্ড দেওয়া হবে না। আরো জানান, ছবি এঁকেছেন। তিনি ইজেলের ওপর রাখা ছবিটি আমাদের দিকে ঘুরিয়ে দেন।

একি ছবি! দেখি, গোটা ক্যাম্বিসের গায়ে লাল তেল রং-এর প্রলেপ। যেন অসংখ্য ক্ষতের মুখ দিয়ে রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে!

আমাদের সাত জোড়া চোখে একই অভিব্যক্তি—ঘোর বিস্ময়!

জেনারেলের মুখে সকরুণ মৃদু হাসি।

এই রহস্যময় হাসি জেনারেলের মুখে আর একবার দেখেছি। রাত্রে যখন ইউ-রেশিয়ান দম্পতিকে কবর দেওয়া হয় তখন বাচ্চাটার লাশ পাওয়া যাইনি শুনে হাসেন—ঠিক সেই হাসি, বলেন, পাওয়া যে যাবে না তা জানতাম। আসুন আর একবার ছবিটা দেখে আসি।

জেনারেলকে অনুসরণ করি। সিকিউ-রিটির লোকেরা আসছে দেখে তিনি ইশারায় নিষেধ করেন। ব্যাপারটা বুঝলাম না কেউ।

ঘরে ঢুকে জেনারেল একেবারে অন্য মানুষ; এমন কি ফোটোটার দিকে একবার তাকান না। তাড়াতাড়ি বিরাট তরবারিটা কোমর থেকে খুলে ফেলেন। শুধু তাই নয়, সামরিক পোশাক থেকে পদমর্যাদার চিহ্নগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেন।

এটা কল্পনাতেও স্থান দেইনি। শুধু রুদ্ধশ্বাসে আমরা কটি প্রাণী লক্ষ্য করছি সব। কিন্তু কে জানতো আর কিছুক্ষণ পর এক অবিশ্বাস্য নাটকীয় সংঘাত আমাদের জীবনটাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেবে।

এবার জেনারেল স্থির হয়ে দাঁড়ান; বলেন, সম্ভবত জাপান দ্বীপপুঞ্জে আমি একা যে সম্রাট আর যুদ্ধকে পরিহার করলো।

তারপর গর্জে ওঠেন, কিন্তু কেন ৪২ সালের পর আর একটি ক্যাম্বিস রং-এ রক্তে ভরে উঠলো না? কেন ইয়াকোহামায় সেই বিস্ফোরণে আমার স্ত্রী আর একমাত্র সন্তান—আর্তনাদ করে ওঠেন হঠাৎ—যুদ্ধ আমার আত্মাকে কলুষিত করেছে, আত্মাকে হত্যা করেছে!

এক মুহূর্ত, তারপরই অপ্রকৃতিস্থ জেনারেলের চেহারা পালটে যায়। তিনি ধীরে ধীরে শান্ত ভঙ্গিতে বসে পড়েন, যেন প্রার্থনায় বসেছেন। এর পরই আচম্বিতে রিভলবারের আওয়াজ!

চোখের সামনে দেখি জেনারেলকে আত্মহত্যা করতে। এই মুহূর্তে মনে হয় যেন ফ্রণ্টে রয়েছি। বাংকারে সদ্য একটা গোলা পড়েই ফেটেছে। কিন্তু তার আগেই চেতনায় উৎকীর্ণ হয়ে যায় কম্যাণ্ডিং অফিসার কোটারামের আদেশ, জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়—পালাও! পালাও!!

সিঁড়ি দিয়ে সিকিউরিটির লোকেরা ফায়ারিং করে দ্রুত উঠে আসছে। সামনে ভাংগা জানালা, নীচে নীরন্ধ্র অন্ধকার—আমাদের ভবিষ্যৎ। চোখ বুঁজে ঝাঁপিয়ে পড়ি সকলে।......

দুর্যোগ কেটে গেছে। রেস্তোরাঁর বাইরে এসে ভদ্রলোক দাঁড়ান, সংগে তিন বন্ধু। ওরা একের পর এক নিজের নিজের অভিমত প্রকাশ করে; কেউ যুদ্ধের পক্ষে, কেউ বিপক্ষে আর কেউ নিরপেক্ষ। তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নেয়।

ভদ্রলোক নীরব নিশ্চল। শুধু নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন খোঁজেন। হয়তো ওই মহাজ্যোতিষ্কলোকে আর একটি গ্রহের সন্ধান করছেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অনুবাদক সম্মেলন

এই স্তম্ভে আমরা মাঝে মাঝে অনুবাদ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করেছি। বাংলা ভাষা থেকে ইংরাজী বা অন্য ভাষায় এবং ইংরাজী বা অন্য বিদেশী ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা আজ সবাই জানেন। বাংলাভাষায় বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি থেকে সুরু করে অনেক বিচিত্র ধরনের গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। বিদেশী ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করার ধারাটি অতি সুপ্রাচীন। মধ্যে অনেক শক্তিমান বাঙালী সাহিত্যিকের নিরলস সাধনায় এই বিভাগটি বিশেষ পরিপুষ্ট হয়েছিল। বর্তমানে অবশ্য তার সেই গৌরবময় ভূমিকা আর নেই। প্রকাশকরা অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করতে উৎসাহী নন, যা তাঁরা প্রকাশ করেন তা বিদেশী রাষ্ট্রের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত সাধারণ শ্রেণীর প্রচার পুস্তক মাত্র, তার সাহিত্যিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর। এই সব অনুবাদও আবার সর্বদা যোগ্য অনুবাদকের হাতে পড়ে না, ফলে অনেক অনুবাদ গ্রন্থ অপাঠ্য হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে পাঠক এবং প্রকাশক উভয়পক্ষই যদি উদাসীন হয়ে ওঠেন তাহলে তার জন্য তাঁদের অপরাধী করা চলে না।

প্রথমত অনুবাদককে উভয়বিধ ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হতে হয়, তারপর যে গ্রন্থটি অনুবাদ করা হবে তার নির্বাচনটুকুও একটা মুখ্য বিষয়। যে কোনো ধরনের গ্রন্থ বাঙালী পাঠকের রুচিকর না হতেও পারে। যেমন যে কোনো বাংলা গল্প, উপন্যাস বা কবিতার অনুবাদ বিদেশী পাঠকের কাছে ভালো না মনে হতে পারে। তাই প্রয়োজন উপযুক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা। অনেক বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি শিক্ষণের গ্রন্থও মাঝে মাঝে অনূদিত হয়েছে বাংলা ভাষায়, কিন্তু ভাষার ত্রুটিতে তা বাঙালী পাঠকের কাছে 'গ্রীক' হয়ে গেছে।

যে কোনো সজীব সাহিত্য যে অনুবাদের দ্বারা পুষ্টিলাভ করে এ কথা অস্বীকার করা চলে না। ফরাসী গ্রন্থ প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে ইংলণ্ডে তার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এর ফলে দুটি ভাষাগোষ্ঠীর পাঠকই উপকৃত হন।

বাংলা কবিতার ইংরাজী অনুবাদও অনেক হয়েছে, সব ক্ষেত্রে সেই সব অনুবাদ সার্থক না হলেও তার একটা বৃহৎ অংশ বিদেশী পাঠকের প্রশংসা অর্জন করেছে, এবং সেইখানেই অনুবাদকের কৃতিত্ব।

অনুবাদকে একটা সুনির্দিষ্ট ধারায় চালিত করার জন্য আজ পৃথিবীর অনেক অংশে অনুবাদক সমিতি গঠিত হয়েছে। এঁরা সুপরিকল্পিত ধারায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন শক্তিমান অনুবাদক গোষ্ঠীর সাহায্যে। ১৯৬৫-র নভেম্বর মাসে ওয়ারশতে প্রথম আন্তর্জাতিক অনুবাদক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিশ্বের অনুবাদকদের আমন্ত্রণ করা হয় এবং সেখানে অনুবাদ এবং অনুবাদকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়।

অনেকের স্মরণ থাকতে পারে সদ্য পরলোকগত অধ্যাপক হুমায়ুন কবির যখন কেন্দ্রে শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তখন হায়দ্রাবাদে একটি অখিল ভারতীয় অনুবাদক সম্মেলনের আয়োজন করেন। বাংলাদেশ থেকে সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী লীলা রায়। সেই সম্মেলনে অনুবাদ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সমস্যাবলীর আলোচনা হত, তবে তারপর ভারত সরকার কি করেছেন তা কেউ জানেন না। যেমন সর্বক্ষেত্রে হয়, এই ব্যাপারেও হয়ত তাই হয়েছে, অর্থাৎ সমগ্র ব্যাপারটিকে সুষ্ঠুভাবে কবরস্থ করা হয়েছে।

কলিকাতার ইউ এস আই এস কয়েক বৎসর পূর্বে একটি অনুবাদক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের অনুবাদক গোষ্ঠী আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের অনেক খ্যাতিমান লেখক বিভিন্ন আলোচনায় যোগদান করেছিলেন, একটি সুন্দর পরিকল্পনাও করা হয়েছিল, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তারপর আর সেই বিষয়ে কোনো কিছু সংবাদ জানা যায়নি।

আমরা জানি জাতীয় সংহতি সংগঠনে অনুবাদ একটি মূল্যবান মাধ্যম। কিন্তু অন্য প্রদেশের রচনাবলীও যতটুকু অনুবাদ করা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়, বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ অন্য আঞ্চলিকভাষায় অনেক বেশী হয়েছে। সরকারীভাবে সাহিত্য আকাদেমি কিছু আঞ্চলিক ভাষার গ্রন্থাবলীর অনুবাদ করিয়েছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় অনুবাদ কর্মের ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্বল অনুবাদকের হাতে পড়ায় অনুবাদের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। এছাড়া অনুবাদ করার জন্য যে সব গ্রন্থাবলী নির্বাচিত হয়েছে তার সাহিত্যিক মূল্য বিচার করা হয়নি।

এই সব দিক বিবেচনা করে কিছুকাল পূর্বে কলিকাতায় 'ট্রান্সলেটার্স সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এই সংস্থার প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী লীলা রায়। ভারতবর্ষের পক্ষে আজ অনুবাদ-কর্ম যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে এই সোসাইটি অবহিত। এই সোসাইটির তরফ থেকে ইণ্টার ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ট্রান্সলেটার্স (এফ আই টি) নামক প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত পি এফ কেইলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং তাঁর আগমন উপলক্ষে আগামী ১৯শে ডিসেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি সর্বভারতীয় অনুবাদক সম্মেলন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হবে স্থির হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে 'আধুনিক ভারতে অনুবাদের ভূমিকা' বিষয়ে বিদেশীর দৃষ্টিভঙ্গীতে বলবেন শ্রীযুক্ত পি এফ কেইল এবং ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বলবেন শ্রীমতী লীলা রায়।

এর পরবর্তী অনুষ্ঠানে 'অনুবাদ এবং ভারতীয় ভাষা সমস্যা' আলোচিত হবে। ভারতবর্ষে বর্তমান অনুবাদ কর্মের ধারা, অনুবাদ কর্মের সাফল্য বিষয়েও আলোচনা হবে। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে— টেকসট বুকের অনুবাদ। বিশ্ব সাহিত্যের সংযোগ সাধনে অনুবাদও এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়।

অনুবাদের কাজে 'কপিরাইট' ব্যবস্থা একটা প্রচন্ড অন্তরায়। এদিকে আবার অনেক সময় লেখকের বিনানুমতিতে বাংলা উপন্যাস হিন্দিতে অনুবাদ করা হয়েছে এবং সেই উপন্যাসের রাশিয়ান অনুবাদ হয়েছে মূল বাংলা থেকে নয়, হিন্দি থেকে এমন এক-আধটা দৃষ্টান্তও পাওয়া গেছে। এই সব সমস্যার সমাধান আবশ্যক। যিনি মূল লেখক, সম্মান মূল্য—থেকে বঞ্চিত করা যেমন নিন্দনীয়, তেমনই আবার অনুবাদের অনুমতি প্রার্থনা করলে সেই প্রার্থীর কাছে চড়া দর হাঁকা অনুচিত। তার ফলে অনেক উত্তম গ্রন্থ অনুবাদ করা সম্ভব হয় না।

কলিকাতায় এই সম্মেলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বে-সরকারী প্রচেষ্টায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা বড় সহজ নয়, ট্রান্সলেটার্স সোসাইটি অব ইন্ডিয়া এই দায়িত্বপূর্ণ কাজটির ভার নিয়ে বিশেষ প্রশংসার অধিকারী হয়েছেন।

শ্রীমতী লীলা রায় দীর্ঘকাল মিশনারীর মত নিষ্ঠায় অনেক বাংলা রচনা ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। আসন্ন সম্মেলনটিকে সার্থক করার ভারও তাঁর ওপর পড়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই সম্মেলনকে সার্থক করে তোলার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

ইতিপূর্বে কলিকাতা শহরে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে কয়েকটি লেখক ও কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, এবং সেই সব অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলার নেতৃত্বের এক গৌরবময় অধ্যায় সৃষ্টি করেছে, আসন্ন অনুবাদক সম্মেলন সফল হলে আমাদের পক্ষে তা বিশেষ গৌরবের কারণ হবে।

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যে সব অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে সবগুলিই সার্থক না হলেও ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সাহিত্যকে বাংলাভাষায় প্রকাশিত করার ফলে সেই সব ভাষা বা সাহিত্যিক সম্পর্কে এদেশের পাঠকের আগ্রহ জেগেছে। বোম্মানা বিশ্বনাথন একক প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার গল্প ও উপন্যাস অনুবাদ করেছেন, তাঁর এই পরিশ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিক হয়ত পাওয়া যায়নি তথাপি তাঁর অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'এ বুক অব বেঙ্গলী ভার্স' আর একটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ গ্রন্থ—এই কাব্যসংকলনে প্রায় হাজার বইয়ের সুনির্বাচিত বাংলা কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। 'বেঙ্গলী লিটারেচার' নামক ত্রৈমাসিক পত্রে গত কয়েক বছরে অনেক আধুনিক কবিতার প্রশংসনীয় অনু-বাদ প্রকাশিত হয়েছে। মনোজ বসুর অনেক-গুলি উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ করেছেন প্রবীণ সাংবাদিক শচীন্দ্রলাল ঘোষ। এই সব ব্যক্তিগত অনুবাদ প্রচেষ্টাকে যথাযোগ্য অভিনন্দন জানানো কর্তব্য। অন্য ভাষা-গোষ্ঠীর অনুবাদকদের সমস্যা বিষয়ে আমরা যথেষ্ট অবহিত নই, হয়ত অনুবাদক সম্মেলনে সেসব কথা শোনা যাবে। বাংলা দেশের যে সব সমস্যা আছে সেইগুলি সম্মেলনে তুলে ধরা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্যে যে অপেশাদারী ভাব আছে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় তা নিঃসন্দেহে সার্থকতর হবে এই আমাদের বিশ্বাস।

—অভয়ংকর

সাহিত্যের খবর

পরলোকে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার গুরুতরভাবে হৃদ-রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৮ নভেম্বর পাটনায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর বছর।

নবদ্বীপ থেকে পাটনায় এসে ১৯২০ খৃঃ ডঃ মজুমদার বিহার ন্যাশনাল কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে তিনি আবার এইচ ডি জৈন কলেজে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের প্রধান এবং শেষে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হন। কলেজটি ভারতের একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হওয়ার মূলে তাঁর অবদান সবথেকে বেশী। তিনি বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের পরিদর্শকও নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিছুকাল পূর্বে তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, চিন্তার বৈদগ্ধ্যে তাঁর তুলনীয় ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ খুব কমই মেলে সমসাময়িককালে। বই ছাড়াও অসংখ্য প্রবন্ধে যে মূল্যবান উপাদান রেখে গেছেন, তা অবিলম্বে সংগ্রহের প্রয়োজন। বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা পরমবৈষ্ণব ডঃ মজুমদারের 'চৈতন্যচরিতের উপাদান' বইটিকে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে মনে করেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সরকার, রামমোহন থেকে দয়ানন্দ, রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী চরিত্র তাঁর কয়েকখানি বিখ্যাত বই। সম্পাদিত বই-এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী, পাঁচশত বৎসরের পদাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে হলে সেই দেশের শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতেই হবে। পৃথিবীর উন্নতশীল দেশগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যের নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদের উপর জোর দিয়ে থাকেন। ইউনেস্কো থেকে ১৯৬৭ সালে পৃথিবীর কোন্ ভাষায় কটি গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে, তার একটি পরি-সংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে। এতে দেখা যায়, অনুবাদের ক্ষেত্রে ১৯৬৭ সালে সোভিয়েট রাশিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। সেখানে সে-বৎসর ৩,৫৪৭টি অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর পরেই পশ্চিম জার্মানী। সেখানে প্রকাশিত হয়েছে ৩,৫৩৬টি। অবশ্য সাহিত্য-গ্রন্থের অনুবাদের কথা ধরলে পশ্চিম জার্মানীরই স্থান প্রথমে। পশ্চিম জার্মানীতে সাহিত্য-গ্রন্থের অনুবাদ বেরিয়েছে ২,২৪৫টি। রাশিয়ায় সেখানে প্রকাশিত হয়েছে ১,৭৫৭টি। অবশ্য আইন, শিক্ষা ও বিজ্ঞান গ্রন্থ অনুবাদের ক্ষেত্রে রাশিয়ার স্থান প্রথমে। এক্ষেত্রে ৩০৭টি গ্রন্থ অনুবাদ করে জাপান দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। ১৯৬৭ সালে আর যেসব দেশ ২,০০০ হাজারের বেশি অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করেছে, তাদের মধ্যে আছে

আমেরিকা, ইতালী ও স্পেন। সারা পৃথিবীতে ঐ বছরে সবসমেত ৩৯,০০০ গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে বলে উক্ত পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে।

খান আব্দুল গফ্‌ফর খানের অনেক জীবনী-গ্রন্থ ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর কোন আত্ম-জীবনী ছিল না। সম্প্রতি সেই অভাব দূর হয়েছে। হিন্দ পকেট বুক 'মাই লাইফ এণ্ড স্ট্রাগল' নামে বাদশা খানের একটি আত্ম-জীবনী প্রকাশ করেছেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিয়োজিত এই মহান পুরুষ জীবনকে কিভাবে দেখেছেন, তার অন্তরঙ্গ পরিচয় এতে ফুটে উঠেছে। এই আত্ম-জীবনীতে তিনি বলছেন—"আমার শুধু একটাই স্বপ্ন ছিল, একটাই আকাঙ্ক্ষা। আমি বেলুচিস্থান থেকে চৈত্রাল পর্যন্ত ভূখণ্ডের অধিবাসী পাঠানদের এক ভ্রাতৃত্ব-বোধে সমবেত দেখতে চেয়েছিলাম। আমি দেখতে চেয়েছিলাম তাঁদেরকে একে অন্যের দুঃখে দুঃখিত হতে। সমান অংশীদার হিসেবে কাজে এগিয়ে আসতে।" কিন্তু তাঁর সে-আশা পূর্ণ হয়নি। এর জন্য তিনি প্রায় ৪০ বৎসর কাটিয়েছেন ইংরেজের কারাগারে আর দুই দশক পাকিস্তানের কারাগারে। কিন্তু কিছুই হল না। অথচ এখনও তিনি সেই স্বপ্নই দেখে চলেছেন। এই আত্মজীবনীতে বাদশা খানের জীবনী সম্বন্ধে আরো অনেক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। ছোটবেলায় তাঁর বাসনা ছিল বৃটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য দরখাস্ত করেন এবং তা মঞ্জুর হয়। কিন্তু সেই সময়ের একটি ঘটনা তাঁর জীবনের বিরাট পরিবর্তন ঘটায়। একদিন বাদশা খান তাঁর এক মিলিটারী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যান। সেই বন্ধুটি তখন ইংরেজি কায়দায় বেশভূষা করে তাঁর সঙ্গে রাস্তায় বের হন। এই সময় একজন উচ্চপদস্থ সেনাবাহিনীর ইংরেজ লেফটেনাণ্ট সেই পথ দিয়ে যাবার সময় ভারতীয়কে ইংরেজি কায়দায় পোশাক পরতে দেখে বিদ্রূপ করেন। অথচ বন্ধুটি অসহায়ের মত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। প্রতিবাদ করতে পারল না। বাদশা খান বুঝলেন, বৃটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করলে তাঁকেও এরকম ব্যক্তিত্বহীন জীবনযাপন করতে হবে। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেই তাঁর মনে দেশাত্মবোধ জ্বলে উঠল। সমস্ত গ্রন্থে এরকম আরো অনেক তথ্য ছড়িয়ে আছে।

আমেরিকার তরুণ কবিদের মধ্যে শ্রীমতী ভাসার মিলার একটি পরিচিত নাম। সম্প্রতি তাঁর চতুর্থ কবিতাগ্রন্থ 'ওনিয়নস এণ্ড রোজেস' প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ করেছেন ওয়েসলিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রেস। এই গ্রন্থটি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে রয়েছে ধর্মীয় কবিতা। এখানে তাঁর কবিতার ভাষা তেমন উল্লেখ্য নয়। পরবর্তী দুই ভাগে রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর লিরিক কবিতা। প্রসঙ্গতঃ তাঁর 'পরিবর্তন' কবিতাটির ভাবানুবাদ উল্লেখ করা যাচ্ছে—

"আমি মনে করতে পারি—
একটি বিরাট সোনালী ঈগলের মতো সূর্য—
আমার বাসনায় তার ডানা
প্রসারিত করছে।
এখন ধীরভাবে তা এগিয়ে চলেছে।
পৃথিবীর গলিত মাংসের উপরে
প্রসারিত আকাশে
একটা গুণ্ গুণ্ শব্দ।"

বইটিতে এরকম আরো অনেক কবিতা ছড়িয়ে আছে। সাম্প্রতিক আমেরিকান কবিতা সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠকদের কাছে গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে হবে।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন — 'আধুনিক সাহিত্যিকদের সঙ্গে সাহিত্য-পরিষদের সংযোগ খুব ক্ষীণ। সাহিত্য পরিষদের যে সমস্ত কাজ এখনও অসম্পূর্ণ আছে, তা সম্পূর্ণ করবার জন্য এখানে নতুনকালের লেখকদের সাদর আহ্বান জানাতে হবে।' এইদিনের অনুষ্ঠানে রাজা রামমোহন রায়ের উপর একটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পরিষদের সম্পাদক সোমেশচন্দ্র নন্দী, দিলীপকুমার বিশ্বাস প্রমুখ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

দুই বাংলার কবি সাহিত্যিকেরা বাংলা-দেশে এক হতে পারেনি, বিদেশে গিয়ে আত্মীয়তার বন্ধন স্বীকার করেছে। আন্ত-র্জাতিক বাংলা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 'বাংলা মেলা।' বিস্তারিত বিবরণের জন্য আবেদন জানাতে হবে: শামসুদ্দোহা, গীয়ারী রোড, লণ্ডন, এন ডবলিউ ১০।

প্রতি তিন মাস অন্তর এম সুলতানের সম্পাদনে একটি বাংলা কাগজ বেরোচ্ছে ওখান থেকে। ছাপাখানার অসুবিধা সত্ত্বেও দমেনীন এতটুকু। কাগজে লিখে মূল রচনার ফটোস্টাট কপি ছাপানো হচ্ছে নিয়মিত। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও সাহিত্য-সংস্কৃতি পাঠাবার ঠিকানা: এম সুলতান ১ আদেলায়েদ ভিলাস, কপস রোড, সেণ্ট জনস ওয়ার্কিং, সারে।

মহানগরীর রাণী (উপন্যাস)—সুকুমার রায়। চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং। ১২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম দশ টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসে এক মধ্যবিত্ত ঘরের উচ্চশিক্ষিতা মেয়ের জীবন-সংগ্রামের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। সে চেয়েছিল জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে। রাণী ঘোষ কলকাতা শহরের আরো অজস্র শিক্ষিতা তরুণীর মতো তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে স্কুল-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদশায়। তারপর সে পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসেছে শিক্ষিকাবৃত্তি গ্রহণ করে। বুড়ো বাপ-মাকে প্রতিপালনের চেষ্টা করে। তার সেই কাজে এসেছে বাধা, বার-বার লোলুপ মুখোসধারী শুভানুধ্যায়ীদের আগমন ঘটেছে, আর রাণী চেষ্টা করেছে দেওয়ালে পিঠ রেখে আত্মরক্ষার। রাণীর বাবা ছিলেন পোস্টমাস্টার। পড়াশোনায় তাকে সহায়তা করেছিলেন মৃণ্ময়। মৃণ্ময় রাণীর জীবনের অনেকখানি ছেয়ে ছিল। কিন্তু রাণীকে আপন করে পাওয়ার চেষ্টা ছিল অনেকের। মহাদেব নন্দীর মতো, সেই দলে অনেকে এগিয়ে এসেছে। রাণীকে পাওয়ার লোভে সে সহদেবের টাকা চুরি করে বিদেশ যাত্রা করেছিল। সেই সময় সহদেব ধরিয়ে দিল রাণীকে পুলিশের হাতে। রাণীর জীবনের সেই সংকটমুহূর্তে সাহায্য করেছিল মৃণ্ময় আর দেবনাথ। রাণী পুলিশের হাত থেকে বাঁচলো। উপন্যাসটিতে অনেক ঘটনা, অনেক ঘাত প্রতিঘাত। জীবনের যাত্রাপথে কত অজানা ও অপরিকল্পিত বাধা এসে হাজির হয় এবং আবিলতা ও কলুষে বোঝাই বর্তমান সমাজে সহজভাবে বাঁচার পথ নেই। আত্মরক্ষারও কোন উপায় নেই। বহু বিচিত্ররূপে জীবনের গলি-ঘুঁজিতে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নৃ-মুণ্ড শিকারীর মত লালসা-সিক্ত চোখে অজস্র ঘৃণিত চরিত্রের মানুষে। সেই সব সংকট থেকে আপনাকে মুক্ত রেখে চলা যে একালের মেয়েদের পক্ষে কি কঠিন হয়েছে রাণী ঘোষের কাহিনীর মধ্যে লেখক সেই কথাই বলেছেন। এই মহানগরীতে অসংখ্য রাণী ঘোষ আজ জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পরাজয় স্বীকার করেছে, আবার অসীম মনের জোরে কেউ-কেউ পতাকা উচ্চে রেখে দাঁড়িয়ে আছে রণক্ষেত্রে। সুকুমার রায় সুকৌশলে সেই রাণী ঘোষদের কাহিনী পরিবেশন করেছেন এই উপন্যাসে।

উপন্যাসটির ছাপা সুন্দর তবে প্রচ্ছদ প্রাচীন রীতির।

অনিকেত (ছোট গল্প সংকলন)—মীরা দেবী। ডি লাইট বুক কোং: ১৭৩।৩, বিধান সরণি, কলকাতা—৬। দাম তিন টাকা।

বারোটি ছোটগল্পের সংকলন 'অনিকেত'। গল্পগুলি যথার্থই আয়তনে ছোট। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গল্পরস তেমন সুন্দরভাবে জমে উঠতে পারেনি। দু-একটি গল্প ছাড়া ঘনসংবদ্ধ কাহিনীও নেই।

বংগলা ভাষাকী ভূমিকা—ব্রজনন্দন সিংহ। মালঞ্চ প্রকাশন। পোঃ রাণীগঞ্জ বাজার, জেলা বালিয়া, উত্তরপ্রদেশ। কলকাতার ঠিকানা—সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ টাকা।

লেখক বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্ত করে কংগ্রেসের কাজে যোগদান করেন এবং কারারুদ্ধ হন। গান্ধীজীর নির্দেশে তিনি রাষ্ট্রভাষা প্রচারে সক্রিয় এবং বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ করেন। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের হিন্দী শিক্ষা আসর তিনি দীর্ঘকাল পরিচালনা করেছেন। অনেক দিন ধরে তাঁর বাসনা ছিল বাংলা ভাষার সাহিত্য বিষয়ে হিন্দীতে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করার। 'বংগলা ভাষাকী ভূমিকা' তাঁর সেই ইচ্ছাপূরণের নিদর্শন। এই কর্মে তিনি শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের কাছে সহায়তা লাভ করেছেন এবং ভূমিকায় স্বীকার করেছেন যে, 'জিনকি ছায়া ইস্ গ্রন্থ কা প্রত্যেক পৃষ্ঠো মে মেরে সাথ সাথ রহী হায়—উন সাহিত্য গুরুকো মেরা ভক্তি ভরা নমস্কার।' —শ্রীব্রজনন্দন সিংহ বাংলা ভাষার উৎপত্তি, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়, আর্য, মূল জাতি দেশ আর ভাষা, বাংলা ভাষার গঠনভংগী, বাংলা লিপি, বাংলা সংস্কৃতিতে গৌড়ীরীতির প্রভাব, প্রাচীন বঙ্গ সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চর্যাপদের পটভূমিকা, ছন্দ, বিতর্কিত বড়ু-চণ্ডীদাস ও তাঁর কৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। এই সূত্রে তিনি আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রভৃতি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং ইতিহাস বিষয়ে যাঁদের অবদান সর্বজনস্বীকৃত সেই সব মনীষীদের মতবাদ সমর্থন করেছেন। অপভ্রংশধারা, সংস্কৃতধারা, জয়দেব ও গীত-গোবিন্দ প্রভৃতি অধ্যায়গুলি সুলিখিত।

এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লেখক এমনই স্বচ্ছন্দ ও সরল ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন যা বিশেষ প্রশংসনীয়। গ্রন্থটির আয়তনের অনুপাতে মূল্য কিঞ্চিৎ বেশী ধার্য করা হয়েছে মনে হয়।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

শুকসারী (শরৎ সংখ্যা ১৩৭৬)—সম্পাদক মিহির আচার্য।। ১৭২।৩৫, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা—১৪।। দাম : দু টাকা।

ছোটগল্পের ত্রৈমাসিক হিসেবে শুকসারীর খ্যাতি সাহিত্যিক মহলে যথেষ্ট। নতুন ধরনের গল্প প্রকাশ করে সম্পাদক পত্রিকাটিকে বাজার চলতি ত্রৈমাসিকের প্রবাহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছেন। এ-সংখ্যায় 'আধুনিক ওড়িআ ছোটগল্পের রূপরেখা' শীর্ষক একটি আলোচনা লিখেছেন বিভূতি পটনায়ক। গল্প লিখেছেন সমরেশ দাশগুপ্ত (কাচপোকা), মিহির আচার্য (জন্তুজানোয়ার বিষয়ক), সুবিমল মিশ্র (জাতীয় পতাকা ও ভুবনের শ্বাসকষ্ট), ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র পাল, বাসুদেব দেব, রবীন্দ্র গুহ, মীরা দেবী, অশোককুমার সেনগুপ্ত, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সুনীল দাশ ও বিশ্ববিজয় গোস্বামী। টমাস মানের একটি গল্প অনুবাদ করেছেন অমিতা রায়।

প্রগতি (অগ্রহায়ণ ১৩৭৬)—সম্পাদক মৃণাল চট্টোপাধ্যায়। ৩৯বি, ডেন্ট মিশন রোড, কলকাতা ২৯।। দাম : এক টাকা।।

লিখেছেন গোপাল ভৌমিক, নচিকেতা ভরদ্বাজ, উৎপল দত্ত, বিনোদ বেরা, দেবনাথ, বিজয়কুমার দত্ত, সন্তোষকুমার সরকার এবং আরো অনেকে।

পার্থসারথি—সম্পাদক প্রীতিকুমার ঘোষ।। ৫।১, অক্ষয় বসু লেন, কলকাতা ৪।। পঞ্চাশ পয়সা।

প্রচলিত পাঁচমিশেলী কাগজ। প্রকাশকের ঘোষণা অনুসারে 'ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী মাসিক পত্রিকা'। বিজ্ঞান ও ধর্ম বিষয়ে অনেকগুলো আলোচনা আছে।

প্রাণের প্রদীপ—সম্পাদক মদন চৌধুরী।। আরামবাগ (সদরঘাট), হুগলী।। দাম : ১-৫০ টাকা।

লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু, জীবেন্দ্র সিংহরায়, আনন্দ বাগচী, কুমারেশ ঘোষ, বিজিতকুমার দত্ত এবং আরো অনেকে।

আসর : সম্পাদক—সত্যচরণ ঘোষ। ২।১।এ, নারায়ণ সুর লেন, কলকাতা-৫। দাম : ১-৫০ টাকা।

লিখেছেন : রণজিৎকুমার সেন, প্রাণতোষ ঘটক, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, তারকনাথ ঘোষ, দেবকুমার চক্রবর্তী, কৃষ্ণলাল দাস, অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন সাহা, যজ্ঞেশ্বর হাজরা প্রমুখেরা। গল্প-কবিতা এবং নানান ধরণের চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধের সমাহারে এই সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। গল্পের চেয়ে প্রবন্ধগুলিই সুনির্বাচিত এবং অধিকতর চিত্তাকর্ষী।

বইকুণ্ঠের খাতা

পৌরাণিক পরশুরামের হাতে কুঠার, বুকে বল, তেজস্বী ও অকুতোভয়। বাঙালি পরশুরামেরও অনেকটা তাই। হাতে কলম। মুখে গাম্ভীর্যের অন্তরালে তীক্ষ্ণ হাসির আভাস। নির্মম, কিন্তু সুসহ। রাজশেখর বসু তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়। সামাজিক জীবনে তিনি ঐ নামেই চিহ্নিত। কিছুটা সাহিত্যের সমাজেও। নিঃসংশয়ে বলা যায়, পরশুরাম ছাপিয়ে গেছেন রাজশেখরকে। যদিও রাজশেখরের সঙ্গে পরশুরামের কোনো বিরোধ নেই।

আমি রাজশেখরের আগে পরশুরামকেই চিনেছিলাম 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-এর লেখক হিসেবে। কতবার পড়েছি এই গল্পটি। 'গড্ডলিকার' ছবি এঁকেছিলেন যতীন্দ্রকুমার সেন। পাঁচটি গল্পের পাঁচশটি ছবি। রাজশেখরের ইচ্ছা এবং পরশুরামের উক্তিগুলিকে পূর্ণোজ্জ্বল করে তুলেছিলেন যতীন্দ্রকুমার। ছবির নিচের ক্যাপসানগুলিও চমকপ্রদ।

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষেরও নাকি ভাল লেগেছিল এই ইলাস্ট্রেটেড গল্পগুলো। সম্ভবতঃ একই কারণে তিনি 'এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর শ্রীযুক্ত সুপ্রিয় সরকারকে (বাচ্চুবাবু) বলেছিলেন পরশুরামের অন্যান্য গল্পগুলিকেও সচিত্র করতে। সাহস পাননি সুপ্রিয়বাবু। বললেনঃ প্রায় এক যুগ আগে সত্যজিৎ রায় যখন তাঁর পরশপাথরকে চলচ্চিত্রে রূপ দেন, তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন কিছু ছবি এঁকে দেবার জন্য। শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। অন্য কাউকে দিয়ে ইলাস্ট্রেশান করাতে তাঁর রীতিমতো আশঙ্কা হয়। হয়তো যতীন্দ্রবাবুর অসাধারণ ছবিগুলোর পাশে অন্য সবই বিবর্ণ হয়ে যাবে।

অমৃতে বিজ্ঞাপন দেখলাম, পরশুরামের গ্রন্থাবলী বেরিয়েছে তিন খণ্ডে। প্রকাশকের ভাষায়ঃ "এই অবক্ষয়ের যুগে, মানসিক অবদমন থেকে নিজেকে মুক্ত ও লঘু করার জন্য পরশুরামের রস-সাহিত্যের অনবদ্য সংগ্রহ নিজে পাঠ করুন এবং প্রিয়জনকে উপহার দিন। প্রতি খণ্ডের মূল্য পনের টাকা। মজবুত বাঁধাই ও বহু রঙের বিচিত্র প্রচ্ছদপট। প্রতি খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫০-এর উপর। ভূমিকাঃ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।"

বিজ্ঞাপনেই উল্লেখ আছে, বিভিন্ন খণ্ডের সূচিপত্র। প্রথম খণ্ডে আছেঃ গড্ডলিকা, কজ্জলী, ধুস্তুরীমায়া, গল্প-কল্প, জামাই-ষষ্ঠী (অসম্পূর্ণ), লঘুগুরু। দ্বিতীয় খণ্ডে কজ্জলী, আনন্দীবাঈ, চমৎকুমারী, চলচ্চিত্তচঞ্চরী, রবীন্দ্র-কাব্যবিচার। এবং তৃতীয় খণ্ডে হনুমানের স্বপ্ন, নীলতারা, কৃষ্ণকলি, বিচিন্তা।

আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম বিজ্ঞাপনটি পড়ে। পরশুরামের বই এখনো প্রায় সবই পাওয়া যায়। তবে বিচ্ছিন্নভাবে। গ্রন্থাবলী বেরোবার পর পাঠকের সুবিধা হলো বাড়তি রকমের। এক সঙ্গে হাতের কাছে সবকটি বই পেলে বাংলা-সাহিত্যের ছাত্র, অধ্যাপক ও গবেষকেরা তাঁর পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নে অগ্রসর হতে পারবেন।

গেলাম প্রকাশকের কাছে। পরশুরাম বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁর কাছেই যেতাম। শ্রীযুক্ত সুপ্রিয় সরকারকে এই মহৎ প্রয়াসের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, গ্রন্থাবলী প্রকাশ করলেন কেন? কবে প্রথম পরিকল্পনা নেন?

সুপ্রিয়বাবু বললেন, অনেকদিন আগেই পরিকল্পনা নিয়েছিলাম। বোধহয় আট-দশ বছর হবে। দু-একজন বলেওছিলেন। নিজেদের দিক থেকেও তাগাদা ছিল কম নয়। সামান্য হেজিটেশান ছিল বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত অন্য বইগুলোর জন্য। ভেবেছিলাম হয়তো গ্রন্থাবলী বেরোলে সেল হ্যাম্পার করবে। এখনো বুঝতে পারছি না, কমছে কিনা।

প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থাবলীর বাইরেও তো আরো কয়েকটা বই রয়ে গেছে। আপনারা কি রাজশেখর বসুকে বাদ দিচ্ছেন? না, অন্য কোনোরকম পরিকল্পনা আছে?

—রাজশেখর এবং পরশুরাম একই ব্যক্তি। ভেতরে-বাইরে দু-রকমেই। কেবল রচনাভঙ্গির দিক থেকে আলাদা। কয়েকটা বইকে গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি গ্রন্থস্বত্বের অসুবিধায়। বিশ্বভারতী তাঁর দু'একটা

পরশুরাম ওরফে রাজশেখর এবং বাংলা সাহিত্যে একযুগ

বইয়ের প্রকাশক। পারমিশন পেলে ইচ্ছে আছে, আরেকটা ছোট বই করবো। তাতে থাকবে গীতা, হিতোপদেশের গল্প, ভারতের কুটিরশিল্প, খনিজ শিল্প, চলন্তিকা ও অন্যান্য রচনা।

ওঁর বইয়ের এখন প্রকৃত সত্ত্বাধিকারী কে?

—নাম প্রকাশে একটু অসুবিধা আছে। প্রকারান্তরে বললেন : ওঁর নাতনীই রয়েল্টি পান।

আপনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কবে থেকে?

—পাবলিকেশনের সূত্রেই যা কিছু যোগাযোগ। ১৯৪৪ সাল থেকে দেখছি। মিশেছি খুব ঘনিষ্ঠভাবে। বই সম্পর্কিত যাবতীয় কথাবার্তা—সবই হতো আমার সঙ্গে। সপ্তাহে আমি প্রায় দু'দিন ওঁর ওখানে যেতাম। রাজশেখরবাবুর জামাই আমার পালিত ছিলেন বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাছাড়া তাঁর ভাই গিরীন্দ্রশেখর বসুর সঙ্গে বাবার আলাপ ছিল। তিনি তাঁর কাছে যেতেন।

স্বগত সুধীরকুমার সরকার ছিলেন সাহিত্যপ্রাণ মানুষ। অমৃতে তিনি ধারাবাহিক ভাবে 'আমার জীবন' নামে যে স্মৃতিকাহিনী লিখেছেন, তাতে রাজশেখর বসু—প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে ব্যাপকভাবেই।

সুপ্রিয়বাবু সে প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ করে বললেন, পাবলিকেশন সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল রাজশেখরবাবুর। ব্যবসা-সংক্রান্ত সব কাজই করতাম আমি। হাতে-লেখা ম্যানাস্ক্রিপ্ট দেখেই বলে দিতে পারতেন ছাপলে কত পৃষ্ঠা হবে। কখনো তিনি পাণ্ডুলিপির ওপর কাটাকুটি করতেন না। কোনো শব্দ ভুল হয়ে গেলে, সাদা কাগজে সেই শব্দটিকে লিখে তার ওপরে পেস্ট করে দিতেন। প্রতিটি লেখার নিচে থাকতো তার শব্দসংখ্যা। আমরা কম্পোজ না করিয়ে কখনো বলতে পারি না কত পাতা হবে। তিনি লে-আউট ও শব্দসংখ্যা দেখেই তা বলে দিতে পারতেন।

আপনারা ওঁর বই প্রথম প্রকাশ করেন কখন? কোন সালে? কিভাবে যোগাযোগ হয়?

—আমার পক্ষে বলা মুস্কিল। তখন আমি ছোট। যোগাযোগ হয়, বাবার সঙ্গে। মনে হয়, গড্ডলিকা বেরোবার সময়। ১৩৩২ সালে। প্রথম আমরা বইটি বের করিনি। ছাপিয়েছিলেন ব্রজেনবাবু — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা ছিলাম সেলিং এজেন্ট। এ সবই বলছি আমি স্মৃতি থেকে। দ্বিতীয় মুদ্রণ থেকে আমরা গড্ডলিকার প্রকাশক। তারপর তো তাঁর প্রায় সবকটি বই-ই বের করেছি আমরা।

তিনি কি আপনাদের দোকানে আসতেন?

—না, তিনি কখনোই আসতেন না। আমিই যেতাম। আমার মনে হয়, সারাজীবনে তিনি কলেজ স্ট্রীটে এসেছিলেন দু-তিন বারের বেশী নয়। কোনো বইয়ের দরকার হলে ফোনে বলতেন। দু'একবার এখানে এলেও দোকানে ঢোকেননি। গাড়ীতেই থাকতেন। বই নিয়ে বা কথা বলে চলে যেতেন।

তাহলে, বই-প্রকাশের ব্যাপারে যোগাযোগ হতো কি করে?

—হনুমানের স্বপ্ন ও চলন্তিকার পরে আমাদের সঙ্গে তাঁর বইয়ের সম্পর্ক পাকাপাকি হয়ে যায়। পুজোর সময়ে ওঁর যেসব লেখা বেরোত সেগুলি তিনি প্রায় সারাবছর ধরে লিখতেন। পুজোর পরে বলতেন, ম্যানাস্ক্রিপ্ট রেডি। আমরা তো হাতে স্বর্গ পেতাম। বই বেরিয়ে যেতো। ঘোরাঘুরি করতে হতো না। এমন হয়ে গেল, উনি যা লিখতেন, সবই আমরা প্রকাশ করতাম।

একটু সময় নিলেন সুপ্রিয়বাবু। বললেন, সব কথা সকলের জানার নয়। আপনিও হয়তো জানেন না। মৃত্যুর প্রায় দশ বছর আগের কথা। রাজশেখরবাবু, 'গীতা' লেখেন। স্ক্রিপ্ট রেডি করেও তা প্রকাশ করেননি তিনি। পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে : 'এ বই ছাপা হবে না।' এখনো আমার কাছে সেই পাণ্ডুলিপি আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কারণ কি? ছাপতে দিতে চাননি কেন?

—কারণ, সম্ভবত সেই সময়ে গিরীন্দ্রশেখর বসুও একটা গীতাভাষ্য লেখেন। যথাসময়ে তা ছাপাও হয়। রাজশেখরবাবু হয়তো আশংকা করেছিলেন, তাঁর বই বেরোলে গিরীনবাবুর বইয়ের বাজার খারাপ হবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি নিজের বইয়ের প্রকাশ বন্ধ রাখেন।

আমাকে সতর্ক করলেন সুপ্রিয়বাবু। বললেন, ভেবে দেখুন একথা লিখবেন কিনা। কিছুটা ডেলিকেট ব্যাপার। অবশ্য আপনারা লিখলে আমার কোনো আপত্তি নেই। রাজশেখরবাবু এখন পরলোকগত। যাঁর কাছে পাণ্ডুলিপি ছিল তিনি চিরকালের মতো অনুপস্থিত।

আপনারা গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছেন কদ্দিন হলো? কেমন বিক্রী হয়েছে?

—পুজোর আগেই বের করেছি। এখন তো মন্দা বাজার। তবু রেসপন্স মন্দ নয়। তবে যে-পরিমাণ বিক্রী হচ্ছে, তার চেয়ে বেশী হচ্ছে কোয়্যারি। তাছাড়া দামটাও তো কম নয়। সে হিসেবে বিক্রী ভালোই।

'ভুশণ্ডীর মাঠে' যতীন্দ্রনাথ সেনের আঁকা একটি বিখ্যাত ছবি

জনপ্রিয় প্রবীন লেখকদের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করলে কি চাহিদা বাড়ে? এখনো জীবিত এমন লেখকের প্রথমদিককার চাহিদা কমে-যাওয়া বইগুলি গ্রন্থাবলী ধরণে বের করলে কেমন হয়?

—আমরা শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী বের করেছি। বিক্রী ভালোই হয়েছে। এখনো হয়। শুনেছি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলীর চাহিদা প্রচুর। এডিশন পর্যন্ত হয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী বের করার এটাই তো সময়। তবে বইয়ের চাহিদা এবং বিক্রী নির্ভর করে লেখকের জনপ্রিয়তা ও লেখার স্ট্যাণ্ডার্ডের ওপরে। আমার মনে হয়, জীবিত লেখকদের গ্রন্থাবলী বের করার দরকার নেই। তবে খুব পুরনো দিনের উল্লেখযোগ্য বইয়ের পকেট-বুক সংস্করণ বের করা চলে। বিক্রী কম হবে না।

আজকাল তো অনেকে জনপ্রিয় লেখকের বহু সংস্করণ হয়ে যাওয়া পুরনো গল্প কিংবা ছড়িয়ে ছিটিয়ে-থাকা লেখার সংকলন প্রকাশ করছেন। তার বিক্রী কেমন?

—হ্যাঁ। অনেকেই সেরকম বই করছেন। যেমন অচিন্ত্যবাবুর বই বেরিয়েছে। গল্প-সংকলন। বিক্রী ভালোই।

আপনারা পরশুরামের যে গ্রন্থাবলী বের করেছেন, তার ভূমিকা তো লিখেছেন প্রমথনাথ বিশী। সম্পাদনা করেছেন কে? বহু বিভিন্ন সংস্করণের লেখার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, কিংবা রকমফের তো অনেকেরই হয়। সেসব মিলিয়ে দেখারও তো একটা প্রয়োজন আছে?

—রাজশেখরবাবুর কোনো বইয়ের সংস্করণ হয়নি। সবই পুনর্মুদ্রণ। আমি যদ্দুর জানি, লেখার আগেই তাঁর যা কিছু ভাবনা-চিন্তা চলতো। বলতে পারেন, প্রথম ও শেষ সংস্করণে কোনো পার্থক্য নেই। কোথাও কোনো বইতে পাঠান্তর হয়ে থাকলে, জানবেন সবই ছাপার ভুল। সেজন্যেই কিছুই এডিট করা হয়নি, ছাপার ভুল সংশোধন ছাড়া। আমি মুদ্রণের সময় সাজিয়ে দিয়েছি মাত্র।

কালানুক্রমে কি সব লেখাগুলো সাজানো হয়েছে?

—না, ঠিকমতো সাজাতে পারিনি। তার অসুবিধা ছিল। অনেক সমালোচক ও সাহিত্যিক এদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু উপায় ছিল না। কারণ :

প্রথমত, বইয়ের আকার, আয়তন ও পৃষ্ঠা সংখ্যা। আমি প্রতিটি গ্রন্থাবলীতেই গ্রন্থ সংখ্যা সমান রাখতে চেষ্টা করেছি। সেরকম করতে হলে কালানুক্রমে সাজানো যায় না। একটা বড় বইয়ের সঙ্গে অনেকগুলি ছোট বই দেওয়া দরকার।

দ্বিতীয়ত, রাজশেখরের প্রথম তিনটি বই ইলাস্ট্রেটেড। অন্য বইগুলি নয়। একই খণ্ডে সব কটা সচিত্র বই দিলে অন্য খণ্ডগুলির চিত্র-আকর্ষণ কমে যাবার সম্ভাবনা। সেজন্যে আমি প্রতি ভল্যুম-এ একটা করে সচিত্র বই দিয়েছি।

—গ্রন্থদর্শী

(ছয়)

ফার্স্ট পিরিয়ডে নীলাদ্রির ক্লাস।

ঘড়িতে মোটে সাড়ে নটা। ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকেই আসেনি। ক্লাস অবশ্য দশটায়। আর এই আধঘন্টা ঢের সময়। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ার মত এখনই দু-একজন ছাত্র আসতে শুরু করেছে। আর একটু পরেই বড় বড় ফোঁটা,—অর্থাৎ তখন ওরা দলে দলে কলেজে ঢুকবে। অধিকাংশ পায়ে হেঁটে কেউ বা সাইকেলে। অধ্যাপক এবং ছাত্রীদের অনেকের সঙ্গে সাইকেল রিকশর বন্দোবস্ত আছে। মাসকাবারে চুক্তি করা টাকা দেওয়া নিয়ম। কলেজের গেটের কাছে তাদের নামিয়ে দিয়ে রিকশগুলি আবার নতুন যাত্রীর খোঁজে দ্রুতগতিতে ছোটে।

কমনরুমে ঢুকে নীলাদ্রি কাউকে দেখতে পেল না। বারান্দার এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে হলধরের সন্ধান করল। হলধর কলেজের বেয়ারা এবং সাধারণত প্রফেসরদের বিশ্রাম-ঘরেই তার থাকবার কথা। নীলাদ্রির ইচ্ছে করছিল এক গ্লাস জল খায়। সকাল থেকে কেমন ভ্যাপসা গরম। এই পথটুকু হেঁটে আসতে সে বেশ ঘেমে উঠেছে। এখন নিজেকে রীতিমত তৃষ্ণার্ত মনে হচ্ছে তার। এক গ্লাস জল পেলে কিছুটা অবসাদ কাটত। কিন্তু হলধর অনুপস্থিত। সুতরাং কলসীতে সম্ভবত জল ভর্তি করা হয়নি। হয়ত গতকালের জল কিছুটা পড়ে থাকবে। কিন্তু নীলাদ্রি বাসি জল খেতে রাজি নয়। টাটকা জল না পেলে, সে বরং তৃষ্ণা সইতে পারবে।

ফুলফোর্সে পাখা ঘুরিয়ে দিয়ে নীলাদ্রি একটু জিরিয়ে নিল। হাত-পা ছড়িয়ে বসে মিনিট দুই-তিন আয়েস করল। কিন্তু তারপরই সে উঠল। ঘরে কেউ নেই,—কমনরুমের জানালা দিয়ে নীলাদ্রি বাইরে তাকাল। প্রকান্ড কম্পাউন্ড, সবুজ মাঠ জুড়ে ঝলমলে রোদের আসর। এখানে সেখানে গাছের স্নিগ্ধ ছায়া। মাথা উঁচু দেবদারু......খোলা ছাতার

মত আমগাছের আকৃতি। পথের পাশে কোথাও পাতাবাহারের বিচিত্র সাজসজ্জা। মাঝে মাঝে দু-একটা সুদৃশ্য কৃষ্ণচূড়াও চোখে পড়ে। বর্ষার জল-হাওয়া পেয়ে বোগেনভিলিয়ার ঝাড়টা জীবনের লাবণ্যে সতেজে বেড়ে উঠেছে।

নীলাদ্রি কিন্তু এসব কিছুই দেখছিল না। তার দৃষ্টি পথের উপর। কলেজের গেট পেরিয়ে ছেলেমেয়েরা ঢুকছে। মাঠের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁটছে ওরা....এগিয়ে আসছে। ছেলেদের ক্ষিপ্র এবং দীর্ঘ পদক্ষেপ,...মেয়েদের গতি ছন্দোময়, সুন্দর। নীলাদ্রির দুটি চোখ নীপাকে খুঁজছিল। ফার্স্ট পিরিয়ডে নীপারও ক্লাস, নীলাদ্রি তা জানে। ওর রুটিনটা প্রায় মুখস্থ তার। সোমবার প্রথমেই নীপার 'অনার্সের ক্লাস। মঙ্গলবারে ইংরেজী....বুধবারেও তাই। আর সব দিনগুলো অনার্স দিয়ে শুরু। সুতরাং নীপাকে আসতেই হবে। অনার্সের ক্লাস ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ মিস করতে চায় না।

পথের উপর দেখা না পেলেও, নীপার মুখটা অ্যাকোয়ারিয়ামের লাল-নীল রঙের মাছের মত ওর মনের পর্দায় কতক্ষণ ভেসে বেড়াল। হাসি-খুশী, চকচকে উজ্জ্বল দৃষ্টি। নীলাদ্রি চিন্তা করছিল। স্বামীর সংসার গেরস্থালি ছাড়তে নীপা কি ভয় পাচ্ছে? নইলে তার সংগে নতুন করে ঘর বাঁধতে ওর এত ভাবনা কিসের? আর আসলে স্বামী মানেই তো একটি পুরুষ। তার সান্নিধ্যে এলেই স্নিগ্ধ ছায়ার নিশ্চিন্ত আশ্রয়। কিন্তু সেই আশ্রয়ই যদি উত্তপ্ত, রৌদ্রময় হয়ে ওঠে তবে সেখানে থেকে আর লাভ কি? ছায়াটুকু সরে গেলে আশ্রয়ের আর কি বাকী রইল? নীলাদ্রির মনে হল নীপা একটু বাড়াবাড়ি করছে। তার সংগে অনেকদূর এগিয়েছে নীপা,— অনেকখানি পথ গেছে। তাদের কলকাতার আলাপ-পরিচয়ও এতদূরে গড়ায় নি। এখন এই দোমনা-ভাবের কোন অর্থ হয় না।

এই পলাশপুরে এসে ওকে নতুন করে পেল নীলাদ্রি। প্রথমে কলেজের করিডোরে দেখাশোনা, অল্প একটু কুশল বিনিময়। তারপর সাহস করে নীলাদ্রিই এগিয়ে গেল। বিয়ের পরেও নীপা যে এমন অসুখী, নীলাদ্রি ওর চোখ-মুখ দেখে এতটুকু আন্দাজ করতে পারেনি। ফলে অগ্রসর হতে, তাকে একবারও হোঁচট খেতে হল না। একদিন চোখাচোখি হতেই নীপা তার দিকে চেয়ে ফিক করে হাসল। সাড়া দিতেও দেরি করল না।

মিনিট পনের সময় একভাবে কাটিয়ে নীলাদ্রি বেশ অধৈর্য হল। ভিড় করে পড়ুয়ারা আসছে। কত মেয়ে,...ডিমালো, গোল এবং লম্বাটে, ধরনের মুখ। কারো পরনে রঙবাহার শাড়ি, চিত্তাকর্ষক সাজ-গোজ। নীলাদ্রি মনে মনে ক্ষুব্ধ হল। তবে কি নীপা আজ ডুব দিয়ে রইল? কিংবা তাড়াহুড়োতে ফার্স্ট পিরিয়ডের জন্য সে তৈরি হতে পারেনি?

ঘরের মধ্যে পায়ের শব্দ শুনে নীলাদ্রি পিছন ফিরল। সে ভেবেছিল অধ্যাপকরা কেউ এসেছেন। নাহলে হলধর তো নির্ঘাত। বড়জোর কোনো উৎসাহী ছাত্র। প্রফেসরদের বিশ্রাম ঘরে আর কে হানা দিচ্ছে?

কিন্তু সামনে তাকিয়ে নীলাদ্রি প্রায় চমকাল। খোদ প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বেয়ারা বিষ্টুচরণ। নিশ্চয়ই তাকে কিছু বলতে চায়। সাত সকালে প্রিন্সিপ্যাল হঠাৎ তাকে তলব করতে গেলেন কেন?

নীলাদ্রি বলল,—'কি খবর বিষ্টুচরণ? প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ডেকেছেন বুঝি?'

—'আজ্ঞে না', বিষ্টুচরণ মাথা নেড়ে জবাব দিল। 'আপনার টেলিফোন এসেছে। একটু তাড়াতাড়ি যান।'

—'টেলিফোন!' নীলাদ্রি ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। 'কে তাকে টেলিফোন করবে এখানে? হতে পারে, শিমুলপুর স্টেশনে নেমে বন্ধু-বান্ধবরা কেউ তার সংগে যোগাযোগ করতে চাইছে। কিংবা কলকাতা থেকে ট্রাঙ্ককল, অথবা নাটকের উদ্যোক্তারা কেউ কথা বলতে চায়। নীলাদ্রি আর দেরি না করে বিষ্টুচরণের পিছু নিল।

টেলিফোনটা প্রিন্সিপ্যালের ঘরে। ভাগ্য ভালো বলতে হয়, ঘরের মালিক অনুপস্থিত। এখনও প্রিন্সিপ্যাল এসে পৌঁছোননি। নইলে অন্যের ঘরে গিয়ে টেলিফোন ধরা মানেই তো এক ঝকমারি। মনের কথা প্রকাশ করার উপায় নেই,— কোনোমতে হুঁ-হাঁ দিয়ে কাজ সারতে হবে। একটু অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে গেলেই তৃতীয় ব্যক্তির কানে তা নিঃশব্দে প্রবিষ্ট হবে। গোপনীয় বলতে কিছুই থাকবে না।

টেলিফোন তুলে নীলাদ্রি পরিষ্কার বলল,—'হ্যালো, কে বলছেন?'

অপর প্রান্ত থেকে সুরেলা নারীকণ্ঠ ভেসে এল,—'আপনি কি নীলাদ্রি সেন?'

—'হ্যাঁ, আমি নীলাদ্রি বলছি। কিন্তু আপনি কে?'

—'আমি?' অল্প একটু থেমে সে খিলখিল করে হেসে উঠল। নীলাদ্রি খুব অবাক হল। কে কাকে টেলিফোন করছে? নিজের নাম বলতে গিয়ে ও অমন হেসে উঠল কেন?

টেলিফোনের অন্য দিক থেকে সে বলল,—'নীলাদ্রিবাবু, আপনি তো নীপা রায়কে চেনেন?'

নীলাদ্রি একটু লজ্জিত হয়ে বলল,— 'হ্যাঁ, চিনি বই কি। কিন্তু কেন বলুন তো?' নীলাদ্রি একটু সজাগ হল।

—'উনি আপনাকে এখুনি একবার যেতে বললেন। বিশেষ দরকার আছে।' নীলাদ্রিকে সে অনুরোধ জানাল।

—'এখুনি? কিন্তু তা কি করে সম্ভব? মানে আমার যে একটা ক্লাস আছে।'

টেলিফোনের তারে আবার হাসির ঝঙ্কার ভেসে এল।

—'আচ্ছা পুরুষমানুষ তো আপনি। একটি মেয়ে খুব দরকারে পড়ে আপনাকে ডাকছে, আর কলেজের ক্লাস নেওয়াই বড় হল আপনার কাছে!'

নীলাদ্রি একটু লজ্জিত হয়ে বলল,— 'না-না, ঠিক সে কথা নয়। আচ্ছা দেখছি, যদি ম্যানেজ করে যেতে পারি।'

—'যদি নয়, কাইন্ডলি এখুনি একবার যান। মিসেস রায়ের বাড়িতে তো টেলিফোন নেই। নইলে, হয়ত উনি নিজেই আপনাকে ফোন করতেন।' একটু থেমে সে ফের বলল, 'আমি এই মাত্র আসছি ও বাড়ি থেকে। আপনি না গেলে উনি হয়ত ভাববেন টেলিফোন করতে আমি ভুলে গেছি।'

নীলাদ্রি বলল,—'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কষ্ট করে আপনি টেলিফোন করেছেন।'

—'তাতে কি হয়েছে? এ কি খুব শক্ত কাজ? কিন্তু আপনি না গেলে আমি ভীষণ দুঃখ পাব। মনে করব আমার কথার আপনি গুরুত্ব দিলেন না।'

কথায় ভদ্রমহিলা ঠিক ফেনার মত উচ্ছল। ওর চপল, রিণ-রিণে কণ্ঠস্বর নীলাদ্রির ভালো লাগল, টেলিফোনের মুখটা প্রায় ঠোঁটের কাছে এনে সে গলা নামিয়ে বলল,—'আপনি মন খারাপ করবেন না। আমি সেখানে যাচ্ছি।'

—'যাচ্ছেন? আঃ—বাঁচালেন। মিসেস রায় তাহলে আর আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

নীলাদ্রি কণ্ঠস্বর একটু গাঢ় করে বলল,—'আপনার নামটা কিন্তু এখনও আমাকে বলেননি।'

জলতরঙ্গের টুং-টাং বাজনার মত মিষ্টি, ঝিরঝিরে হাসি রিসিভারে শুনতে পেল নীলাদ্রি। পুনরায় নারীকণ্ঠ, —কিন্তু এবার পরিহাসতরল। টেলিফোনে সে

বলল,—'কি হবে একটি মেয়ের নাম শুনে? আপনার ধ্যান-জ্ঞান জপমন্ত্র,—সে তো অন্য একটি নাম। তার কথাই বরং ভাবুন।'

—'কি যে বলেন আপনি।' নীলাদ্রি মৃদু প্রতিবাদ করতে চাইল।

—'আমি ঠিকই বলছি নীলাদ্রিবাবু। নাটকের পিছনে আরো একটা নাটক হচ্ছে। অনেকে না জানলেও আমি তার সংবাদ রাখি। সে নাটকও জমে উঠেছে। নেপথ্য-নায়ক, নেপথ্য-নায়িকা সবাই খুব ব্যস্ত এখন। একটা ক্লাইম্যাক্সও হবে। নীলাদ্রি-বাবু, একটা কথা শুনবেন আমার?

—'কি কথা বলুন না।'

—'আপনি একটু সাবধান থাকবেন। জানেন তো, জীবন বড় বিচিত্র। কাউকে বিশ্বাস করা যায় না।'

—'তার মানে? কি বলতে চাইছেন আপনি? এই হেঁয়ালি করার কি অর্থ?' নীলাদ্রি একটু বিরক্ত হল।

সে বলল,—'আপনি দেখছি রেগে যাচ্ছেন! কিছু মনে করবেন না আমার কথায়, প্লিজ।'

নীলাদ্রি শান্ত হল। কিন্তু তার বিস্ময় কাটল না। ভদ্রমহিলা কি বলতে চায় তাকে? সম্ভবত পরিচয় দিতেও আপত্তি তার। চুলোয় যাক গে। ওর নাম-ধাম নীপার কাছে জেনে নেওয়া সহজ হবে। মিছিমিছি জোর করে লাভ নেই।

নীলাদ্রি একটু হেসে বলল,—'আপনি দেখছি অনেক খোঁজ-খবর রাখেন। যাই হোক, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সুযোগ এখন হল না। যদি কখনও হয় এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।'

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে নীলাদ্রি ঘর থেকে বেরোল। দশটা বাজতে সামান্য দেরি। ক্লাসরুম আর করিডোরে এখন বাজার-হাটের দশা। হৈ-চৈ, চেঁচামেচি। চটুল একটা গানের সুর নীলাদ্রির কানে ভেসে এল। নিশ্চয় কোনো উঠতি রোমিওর কাজ। গানের কলি ভেঁজে একটি মেয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে।

নীলাদ্রি আর দেরি করল না। কাউকে কিছু বলতে গেলেই এখন নানা কৈফিয়ৎ দাও। তার চেয়ে চুপি-চুপি কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের পরিচয়। পরে একটা ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেই চলবে। প্রফেসর নেই বলে অমন কত ক্লাস কলেজে ফাঁকা যাচ্ছে।

সাইকেল রিকশাটা একটু দূরে ছেড়ে দিল নীলাদ্রি। এবার সে পায়ে হেঁটে এগোল। পথে লোকজন বেশী। কোর্ট-কাছারী, স্কুল-কলেজের সময়। দিনের-বেলায় সে কোনোদিন এ বাড়িতে আসেনি। নীলাদ্রি একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে হাঁটছিল। তার কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, কিংবা পরিচিত লোকজনের সঙ্গে দেখা হতে পারে। তখন কুশল-বিনিময়, এদিকে সে কোথায় যাবে ইত্যাদি নানা প্রশ্নের বেড়া ডিঙোতে তার প্রাণান্ত হবে।

খানিক দূর থেকেই নীলাদ্রি দেখতে পেল। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে রাস্তার বাঁয়ে একটা গাড়ি দাঁড় করানো রয়েছে। ডাক্তার রায়ের নিজস্ব গাড়ি নেই,—নীলাদ্রি তা জানে। তাহলে গাড়িটা কার? তার নিজের মনেই প্রশ্নটা উঠল। হবে কোন লোকের। কাজকর্মে এদিকেই কোথায় এসেছে। গাড়িটা রেখে নিশ্চয় কোথাও গিয়ে থাকবে। নীলাদ্রির মনে হল মোটর-গাড়িটা সে আগেও দেখেছে। সে ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু অনেক চিন্তা করেও মরা অতীতের মস্ত ফ্রেমের মধ্যে গাড়িটাকে কোথাও খুঁজে পেল না।

দরজাটা বন্ধ, বাইরের ঘরে সম্ভবত কেউ নেই। নীলাদ্রি খুব সন্তর্পণে রোয়াকের উপর উঠে এল। সে ভাবছিল হঠাৎ নীপা তাকে ডেকে পাঠাল কেন? অসময়ে নীপার এই আহ্বান কেমন বিচিত্র, অদ্ভুত ঠেকল তার কাছে। ঠিক বিশ্বাস-যোগ্য মনে হয়নি তার। টেলিফোনে সেই অচেনা ভদ্রমহিলা একটা মোক্ষম রসিকতা করলেন না তো—

নীলাদ্রি একটু ইতস্তত করছিল। বাড়ির মধ্যে কে রয়েছে তার জানা নেই। দরজায় টোকা দেবে কিনা ভাবল সে। কি খেয়াল হতে নীলাদ্রি দু পা এগিয়ে গেল। এসে দাঁড়াল শোবার ঘরের জানালার কাছে। মাথাটা ঈষৎ হেলিয়ে সে উঁকি দিয়ে দেখল। আর সেই মুহূর্তে আচমকা একটা শক্‌ খাওয়ার মত তার দেহের সমস্ত রক্ত-কণিকা নেচে উঠতে চাইল। জানালার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখল নীলাদ্রি। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নীপা দাঁড়িয়ে আছে। অলস-নায়িকার মত ভঙ্গি। তার একটা পা মেঝের উপর। অন্য পাটি বাঁকাভাবে দেওয়ালে ভর করে আছে। হাত দুটি ভাঁজ করে বুকের উপর ছড়ানো। নীপার ঠিক সামনে যে লোকটি দাঁড়িয়ে, তাকেও চেনে নীলাদ্রি। লোকটা খুব কাছ ঘেঁষে ফিস-ফিস করে কথা বলছে। নীলাদ্রি তাকিয়ে দেখল কেমন অনায়াসে নীপার একটা হাত সে নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল। নীপা কোন বাধা দিল না, মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল। তারপর মৃদুভাবে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল।

নীলাদ্রির মনে হল যথেষ্ট হয়েছে। চুরি করে প্রেমলীলা দর্শনের আর কোন প্রয়োজন নেই। তার মাথাটা সীসের মত ভারী ঠেকল। কানের দুটো পাশ এখন গরম, বুকের মধ্যে ক্ষতের জ্বালা। নীলাদ্রি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছিল। নিজেকে সে বার বার ধিক্কার দিল। নীপা তার প্রতি অবিশ্বাসিনী হতে পারে, এ যেন ধারণারও অতীত ছিল। নিজের উপর প্রচণ্ড একটা দুঃখবোধ হল তার। অন্তরে একটা শূন্যতার সৃষ্টি। আশ্চর্য! কি বোকা সে। এতদিন অযথা সময় নষ্ট করেছে।

খুব দ্রুতগতিতে হাঁটছিল নীলাদ্রি। রাস্তার পাশে সেই মোটরগাড়িটা তখনও রয়েছে। এতক্ষণে তার মনে পড়ল। গাড়িটার মালিককে সে একটু আগেই দেখেছে। দেবরাজ মিত্র,—নাটকের সুদর্শন নায়ক। টেলিফোনে একটু আগে শোনা কথাটা ফের মনে পড়ল তার। নাটকের পিছনে আরো একটা নাটক হচ্ছে। কে জানে নেপথ্যে কতদিন ধরে নায়ক-নায়িকা এই নাটকেরও মহলা দিচ্ছে।

পাশ দিয়ে একটা রিকশ যাচ্ছিল। খালি রিকশ। হাত বাড়িয়ে নীলাদ্রি সেটা থামাল। সে ভাবল দুপুরেই কলকাতা যাবে। পলাশপুর বিশ্রী পানসে লাগছে তার কাছে। একটা ভগ্ন পরিত্যক্ত রাজপুরীর মত সে নিঃসঙ্গ। অলক্ষ্যে দেবরাজ কখন তাতে নিদারুণ বজ্র দিয়ে আঘাত করেছে।

কালো একখণ্ড মেঘ এসে সূর্যকে আড়াল করল। নীলাদ্রি মাথা তুলে দেখল। রৌদ্রহীন, ছায়াময় পৃথিবী। শক্ত পাথরের

তিরিশ
উনি
আনন্দের সঙ্গে
পার্লে বিস্কুট খাচ্ছেন
৩0 বছর ধরে...
...এখন অবধি উনি নানা রকমারি বেছে নিতে পারেন—আর ওঁর পরিবারেও বিস্কুট খাবার লোক বেড়ে উঠেছে। উনি খান জেমস্, ওরলে, চীজলিংস্, গ্লিন-এইচ—ভারতের প্রথম মজাদার স্বাদের বিস্কুট—আর বিশেষ ক'রে গ্লুকো ও মোনাকো-ভারতের সবচেয়ে বেশী কাটতির মিষ্টি ও নোন্তা বিস্কুট।
কিন্তু ওঁর মতটাকেই আপনি মেনে নেবেন না যেন—নিজেই সবগুলি যাচাই ক'রে দেখুন। দেখুন কোন্ পার্লে বিস্কুট আপনার সবচাইতে ভাল লাগে। এই সব বিস্কুটই চমৎকারভাবে তৈরী হয়েছে ভারতের অন্যতম অতি আধুনিক বিস্কুট ফ্যাক্টরীতে।
পার্লে
বিস্কুট
আজই এক প্যাকেট পার্লে কিনে নিন!
গ্লুকো
মোনাকো
ওরলে
গ্লিন এইচ
জেম্স
চীজলিংস
everest/565 a/PP bn
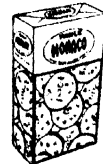
মূর্তির মত আসনে বসে রইল নীলাদ্রি। তার কপালের পাশে রগ দুটো তখনও দপ-দপ করছিল।

*   *   *

গুন গুন করে গান করছিল দেবরাজ।

একটু আগেই খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে। চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজন। একটা আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে দেবরাজ পরম সুখে চোখ বুজল।

ঘরের ভিতর থেকে অবিনাশ বলল,—'ব্যাপার কি হে সুরপতি? প্রাণ-পাখি আজ হঠাৎ গান গেয়ে উঠল কেন?'

—'তার মানে?' দেবরাজ হেসে উঠল, 'এক কলি গান গাইতে শুনে তোমার অমনি জল্পনা শুরু হয়ে গেল।'

অবিনাশ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার পরনে ফুলপ্যান্ট, গায়ে বুশ-শার্ট। কোথাও বেরোবার জন্য সে তৈরি।

দেবরাজ ওর দিকে তাকিয়ে বলল,—'কি হল, কোথায় চললে আবার?'

চোখ নাচিয়ে অবিনাশ বলল,—'ঘনশ্যাম পিকচার্সের অফিসটা একবার তদারক করে আসি। নইলে হুট করে মেয়েটাকে তুলব কোথায়? বদ্রীদাসবাবুকেও কথাটা বলা দরকার। নইলে সব ভেস্তে যেতে পারে।'

ইঙ্গিতটা দেবরাজ বুঝল। ভ্রূ কুঁচকে সে বলল,—'ফিরবে কখন?'

—'কাল সন্ধ্যেয়। পরশু সকালেও হতে পারে।'

দেবরাজ ইসারা করে ওকে কাছে ডাকল। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় কিছু বলল। অবিনাশের মুখখানা পালিশ-করা সোনার গয়নার মত উজ্জ্বল দেখাল। ছুরির ফলার মত ধারালো চাউনি। সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল,—'মাইরি। তবে তো কেল্লা ফতে।'

দেবরাজ ডান হাতের তর্জনী তুলে ঠোঁটের কাছে রাখল। বলল,—'চুপ করো অবিনাশ। আর একটি কথাও নয়। এই সবে সকাল। এখনও অনেক দেরি।'

অবিনাশ বন্ধুর থুতনিটা স্পর্শ করে অদ্ভুত হাসল। বলল,—'আহা! কালাচাঁদ তোমারই জয়জয়কার।'

চেয়ার ছেড়ে একবার ঘরে গেল দেবরাজ। চেকটা আগেই লিখে রেখেছিল। সেটা অবিনাশের হাতে তুলে দিয়ে বলল,—'তোমার সেই টাকাটা। কলকাতা যাচ্ছ, ভাঙিয়ে নিও। দেখো, যা বন্দোবস্ত করার তা যেন ঠিক থাকে।'

সযত্নে চেকটা পকেটে রাখল অবিনাশ। বলল—'তুমি বেকার চিন্তা করো না দোস্ত। কাজের ভার যখন আমায় দিয়েছ, তখন চিন্তাটাও আমার থাক।'

ঘন্টাখানেক পরে অবিনাশ শিমুলপুর স্টেশনে এল। লোক্যাল ট্রেণটা সবে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছে। কামরাগুলো এখনও ফাঁকা। অল্প কিছু যাত্রী গাড়িতে উঠে বসেছে। ইচ্ছে করলে যে কোন একটা কামরায় অবিনাশও উঠে পড়তে পারে। কিন্তু সে তা করল না। ট্রেণটার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াল। সমস্ত কামরা দেখে অবিনাশ রীতিমত নিরাশ হল। সুন্দরী তো দূরের কথা, সুশ্রী দেখতে এমন কাউকেও তার চোখে পড়ল না। অবিনাশের এই বদভ্যাস। সুন্দরী সহযাত্রিণী না পেলে রেলভ্রমণই বিস্বাদ লাগে।

টালিগঞ্জে ঘনশ্যাম পিকচার্সের অফিস।

দোতলার উপর সওয়া শ বর্গফুটের একখানা ঘর। ফিল্ম কোম্পানির অফিস বটে,...কিন্তু হতশ্রী, অচল অবস্থা। রঙ-চটা দেওয়াল, সিলিঙে ঝুল,...আসবাবপত্র মলিন। জানালা দরজার পর্দাগুলি পর্যন্ত ময়লা, জীর্ণ। দেখলেই বোঝা যায় সেগুলি বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ঘরে ঢুকে অবিনাশ বলল,—'খবর কি বদ্রীদাস?'

কালো হোঁৎকা-মতন একটা লোক মুখ তুলে তাকাল। লোকটার চোখে বিস্ময় এবং বিমর্ষভাব,—দুই-ই। সে বলল, —'সংবাদ ভালো নয় হে। পাওনাদারদের জ্বালাতনে অস্থির। এবার দরজায় তালা লটকে দিয়ে সরে পড়ব ভাবছি।'

—'পাগল হয়েছ।' অবিনাশ ওকে উৎসাহিত করতে চাইল। 'সব ব্যবস্থা আমি করে এসেছি। সরো দেখি,—একটা টেলিফোন করতে দাও।'

লোকটা ম্লান হাসল। টেবিলের উপর আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুই হাত প্রসারিত করে সে বলল,—'কাল দুপুরে টেলিফোনের লাইনটা কেটে দিয়ে গেছে।'

—'তাই নাকি?' অবিনাশ চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলল। তাহলে তো কঠিন অবস্থা।' মুখটা গম্ভীর করে সে কি ভাবতে লাগল।

বদ্রীদাস বলল,—'কি সব ব্যবস্থা করে এসেছ বলছিলে।'

—'হুঁম।' অবিনাশ উঠে দাঁড়াল। 'এদিকে সেদিকে ঘুরে ঘরখানা সে ভালো করে জরিপ করল। খানিক পরে স্বগতোক্তির মত মন্তব্য করল,—'আগা-গোড়া ঢেলে সাজাতে হবে বদ্রীদাস।'

—'তার মানে?'

অবিনাশ রহস্য করে হাসল। 'শাঁসালো' এক পার্টনার পেয়ে গেছি। ছোকরা রূপে কন্দর্প, ধনে কুবের। অগাধ টাকার মালিক। ফালতু বেচারী এক বন-কি-চিড়িয়ার চার-পাশে ঘুরপাক খাচ্ছে।'

বদ্রীদাস বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করে হাসল। বলল,—'তা এই চিড়িয়াটি কোথায়?

—'কোথায় আবার, চিড়িয়া যেখানে থাকে। বন-কি-চিড়িয়া তো বনে থাকে না বদ্রীদাস। সে থাকে গেরস্থ বাড়ির ঘরে। মেয়েটা এক ডাক্তারের বউ। কি চেহারা মাইরি! ঠিক যেন অপ্সরার বাচ্চা। আরে ওকেই তো আমাদের বইয়ের হিরোইন করব।'

—'তাই নাকি?' বদ্রীদাস একটু ঝুঁকে বসল। 'আচ্ছা ঘোড়ের চাল দিয়েছ কিন্তু। এক ঢিলে দুই পাখি পড়বে।'

অবিনাশ বলল,—'ফালতু কথা এখন থাক। কাজের কথায় এস দেখি। তোমাকে শ দুই টাকা কাল দিয়ে যাব। ঘরখানার ভোল পালটে ফেলতে হবে। একেবারে ঝকঝকে, তকতকে—টিপ-টপ অফিস দেখতে চাই।'

বদ্রীদাস বলল,—'তুমি ফের আসছ কবে?'

—খুব শীঘ্রই। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে। কিন্তু তার আগে ঘরের ছিরিছাঁদ যেন বদলে গেছে দেখি।'

বদ্রীদাস নীরবে তাকিয়ে রইল।

ভ্রু কুঁচকে কিছু ভাবল অবিনাশ। হেসে বলল,—'তুমি হচ্ছে এই কোম্পানির সিনিয়ার পার্টনার। কথাটা মনে রেখো বদ্রীদাস। জামা-কাপড়গুলোয় একটু মাজা দিয়ে নিও।'

অবিনাশ চোখ মটকে ফের রহস্য করল।

• • •

সোমবার দুপুরে অম্বর বাড়িতে খেতে এল না। স্নান-টান সেরে নীপা শুয়েছিল। কখন বারোটার আগেই তার খাওয়া-দাওয়া শেষ। সে ভেবেছিল এক চটকা গড়িয়ে দুটো নাগাদ একবার কলেজ ঘুরে আসবে। লাইব্রেরীর দু-তিনখানা বই তার কাছে। সেগুলি ফেরৎ দেওয়া প্রয়োজন। নীলাদ্রির সঙ্গে তার অনেক কথা আছে। অন্তত ঘন্টাখানেকের জন্যও দুজনের মুখোমুখি হওয়া দরকার। নীপা নিজের কথাই ভাবছিল। তার ভাগ্যটাই এমনি। সে ভুল করে কিংবা অন্যে তাকে ভুল বোঝে। সকাল থেকে অম্বরের সঙ্গে একটা কথাও তার হয় নি। রাগ করে অম্বর খেতেও এল না। নীপা ভাবছিল এবার তার একটা সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। তার ভাগ্যের গাড়িখানা তাকে এক চৌমাথার মোড়ে এনে হাজির করে দিয়েছে। কোন পথে সে যাবে, এবার তাকে স্থির করে নিতে হয়। আর গড়িমসি চলে না। এক পথে স্বামী ঘর-সংসার, শান্ত নিরুপদ্রব জীবন। অন্য পথে নীলাদ্রির প্রেম-ভালবাসার হাতছানি। ঘর-সংসার ভেঙে তার সঙ্গে দিল্লী পালানো। নয়তো অবিনাশ সমাদ্দারের ডাকে সাড়া দিতে হয়। দেবরাজ আর অবিনাশ তাকে সিনেমার হিরোইন করবে। রূপোলি পর্দায় তার ছবি। ঝলমলে জীবন। আনন্দ, হাসি, কলরব। একটা বই হিট করলেই তাকে নিয়ে হৈ-চৈ শুরু হবে। কতজনের মুখে মুখে তার নাম। দেবরাজ আরো কত কথা বলেছে তাকে।...

আর চতুর্থ পথটা? সেকথা ভাবতেই নীপার মুখটা শুকিয়ে এল। সে পথে যাওয়া শক্ত, কিন্তু একবার যেতে পারলে আর চিন্তা-ভাবনার কারণ নেই। গতকাল শেষ রাতে ঠাণ্ডা মেঝের উপর শুয়ে নীপা সেই পথের কথাই ভেবেছে। ডাক্তারের বউ.—বিষ-টিসের ব্যাপারটা সে বোঝে। আত্মহত্যার সহজ উপায়ও তার জানা। হাতে বিষ তুলে নিয়েছে কল্পনা করতেই নীপা শিউরে উঠল। মনে হল একরাশ কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ে তার সমস্ত শরীরের উপর হেঁটে বেড়াচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে ওরা তাকে কামড়ে ধরবে। তার সমস্ত দেহে বিশ্রী জ্বলুনি। নীপা ভাবল সে চিৎকার করে লোক ডাকে। পিঁপড়ে-গুলো কিছুতেই যে তার শরীর থেকে নামতে চাইছে না।

হঠাৎ চোখ তুলে নীপা দেখল দরজার বাইরে দুঃখহরণ তাকে ডাকছে।

কখন দু চোখের পাতায় ঘুম নেমে এসেছে তার। নীপা বুঝতেও পারেনি। মাথা তুলে জানালায় ফাঁক দিয়ে নীপা দেখল। রাস্তার ওপারে ঘোড়ানিমের গাছের মাথায় এক চিলতে মরা রোদ্দুর। ঘরের উঠোনে এখন অপরাহ্ণের ঘন ছায়া।

দুঃখহরণ বলল,—'হাসপাতাল থেকে লোক এসেছে দিদিমণি। বাবু কি খবর পাঠিয়েছেন—'

সে বিছানার উপর ধড়মড় করে উঠে বসল। 'কই লোক? কোথায় সে?' নীপা ব্যস্ত হয়ে বলল।

—'রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডেকে আনব ঘরের ভিতর?'

—'দরকার নেই। চল আমি যাচ্ছি—'

কাপড়টা গুছিয়ে পরতে অল্প একটু সময় লাগল। নীপা এসে দাঁড়াল বাইরের ঘরে।

হাসপাতালের লোকটি বলল,—'ডাক্তার-বাবু আজ দুপুরের ট্রেনে রতনপুরে গেলেন। আমাকে বললেন খবরটা বাড়িতে দিতে।'

—'হঠাৎ রতনপুরে?' নীপা অবাক হয়েছে মনে হল।

—'কি জরুরী দরকার আছে। আজ রাত্তিরে ফিরতে পারবেন না। সে কথাই আপনাকে বলতে এলাম।' কথা শেষ করেই সে আবার রাস্তায় নামল।

লোকটা চলে গেলে নীপা অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। জরুরী দরকার, না ছাই। ওসব ঢঙ নীপার জানা আছে। আসলে অম্বর তাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে। তাদের সম্পর্কটা সে নিজেই ঘোরালো করে তুলেছে। নইলে জেনেশুনে বউকে কেউ এমন লাগাম ছেড়ে দেয়। কি চায় অম্বর? বিবাহ-বিচ্ছেদ? ছাড়াছাড়ি? তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের একটা ইতি হোক—।

নীপার মনে পড়ল দিনটা সোমবার। বিকেলে অনিমেষবাবুর কাছে তার পড়তে যাওয়ার কথা। ঠোঁট উল্টিয়ে নীপা নিজের মনেই একটা ভেংচি কাটল। কি হবে পড়তে গিয়ে? কার কাছে সে পড়ছে? কেন পড়ছে? ভবিষ্যতে আর পড়বে কিনা এ সমস্ত বিষয়ই খতিয়ে দেখা দরকার।

কিন্তু সামনে অন্য সমস্যা। সর্বাগ্রে তারই ফয়সালা হওয়া প্রয়োজন।

দুঃখহরণকে নীপা ডাকল। বলল,—'তুই টাউন ক্লাবের ঘরটা চিনিস?

—'বেলাবের ঘর? যেখানে থিয়াটার-গান বাজনা হয় দিদিমণি?'

'হাঁ, হাঁ। সেখানে একবার যেতে পারবি?'

—'খুব পারব। কি করতে হবেক বলুন না—'

—'সেখানে নীলাদ্রিবাবু বলে এক ভদ্রলোক আছেন। তাকে একখানা চিঠি দিয়ে আসবি—'

—'আপনার চিঠি?'

—'হ্যাঁরে। আজ আর যাব না রিহার্সালে। কথাটা জানাব ওদের, নইলে সবাই আবার বসে থাকবে।' অকারণেই নীপা খানিকটা কৈফিয়ৎ দিল।

খামে বন্ধ করবার আগে চিঠিখানা আর একবার সে পড়ল। সম্বোধনহীন ছোট চিঠি।

...'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। বাড়িতে আমি একা। উনি বাইরে,—রাত্তিরে ফিরবেন না। সাড়ে নটার সময় এসো—নীপা।' খামের উপর গোটা গোটা অক্ষরে নাম লেখা,—শ্রীনীলাদ্রি সেন।

(চলবে)

বিজ্ঞানের কথা

চন্দ্রপৃষ্ঠে মনুষ্যবিহীন মহাকাশযান সার্ভেয়ার-৩ (বামে) এবং অ্যাপোলো-১২ অভিযানের চন্দ্রযান 'ইনট্রেপিড' (ডাইনে)।

চাঁদের বুকে আবার মানুষের পদচিহ্ন

মর্ত্যের সীমা ছেড়ে চার লক্ষ কিলোমিটার দূরবর্তী বায়ুহীন প্রাণহীন শব্দহীন বিভীষিকাময় চাঁদের বুকে পৃথিবীর দুটি মানুষ আবার পদচিহ্ন অঙ্কিত করলেন গত ১৯শে নভেম্বর। এবার আর চান্দ্র রাজ্যের 'প্রশান্ত সাগরের' বুকে নয়, ঝঞ্ঝাসাগরের তীরে তাঁদের পদচিহ্ন অঙ্কিত হল। কালচক্রে পৃথিবীর লক্ষ, কোটি বছর পার হয়ে যাবে, উন্নততর সভ্যতা সমৃদ্ধতর জীবনের বিকাশ ঘটাবে, কিন্তু বায়ুহীন জলহীন চাঁদের বুক থেকে মানুষের এই পদচিহ্ন কোনকালেই মুছে যাবে না। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এই বিস্ময়কর স্বাক্ষর চাঁদের বুকে অনন্তকাল ধরে আঁকা থাকবে।

চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের এই পরম দুঃসাহসিক দ্বিতীয় অভিযানে প্রথমবারের মত সারা বিশ্ব জুড়ে তেমন উদ্দীপনা উদ্বেলতা ও উৎকণ্ঠা দেখা যায় নি হয়তো। কারণ মানুষের মনের গতিই তাই। প্রথম যা কিছু, তাকে ঘিরেই তার মনে উদ্দীপনা উচ্ছ্বাসের যে জোয়ার বয় দ্বিতীয়বারে তাতে যেন কিছুটা ভাঁটা পড়ে। প্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গ বিজয়ে, বা প্রথম পরমাণু বোমার বিস্ফোরণে মানুষের মনে যে দোলা লেগেছিল, দ্বিতীয়বারে তেমন জাগে নি। সেজন্যই চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের এই দ্বিতীয় অভিযানে আমাদের মনে প্রথম বারের মতো তেমন উৎসাহ উদ্দীপনা জাগে নি।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক দিক থেকে এই অ্যাপোলো—১২ অভিযান চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের প্রথম অভিযানের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এবার চার্লস কনরাড এবং অ্যালেন বীন অ্যাপোলো—১১র নীলস আর্মস্ট্রং এবং এডউইন অলড্রিনের চেয়ে চাঁদের বুকে বেশি সময় থেকেছেন, বেশি দূরে হেঁটেছেন এবং বৈজ্ঞানিক কর্মসূচী বেশি সম্পাদন করেছেন। অ্যাপোলো—১১ অভিযান ছিল মূলত সাফল্যের সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণ ও নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কার্যকারিতা যাচাই করা। অ্যাপোলো—১২ অভিযানে এই সফল্যজনক পদ্ধতিকে বিস্তৃততর বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়োজিত করা হয়। কনরাড এবং বীন এবার চন্দ্রপৃষ্ঠে অ্যাপোলো—১১ অভিযানের তুলনায় দেড়গুণ সময় বেশি থেকেছেন। চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের সময় থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠ ত্যাগ করা পর্যন্ত তাঁরা মোট সাড়ে ৩১ ঘন্টা সেখানে অতিবাহিত করেন। চন্দ্রযান থেকে নেমে তাঁরা প্রায় সাত ঘন্টা ধরে চন্দ্রপৃষ্ঠে বিচরণ ও বৈজ্ঞানিক কর্মসূচী সম্পাদন করেছেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁরা চাঁদের মাটিতে প্রায় আড়াই কিলোমিটার পর্যন্ত হেঁটেছেন। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক কর্মসূচী সম্পাদন করেছেন এবং পরমাণু শক্তিচালিত একটি যন্ত্রাগার স্থাপন করে

ডঃ মারে গেল-ম্যান

এসেছেন। এবার তাঁরা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৫ কিলোগ্রাম পরিমাণ মাটি ও উপলখণ্ড (প্রথমবারের তুলনায় দ্বিগুণ) সংগ্রহ করেছেন। এবার সংগ্রহের সময় তাঁরা সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন সেখানকার ছবিও (সংগ্রহের আগে ও পরে) তুলেছেন।

কনরাড এবং বীন তাঁদের চন্দ্রপৃষ্ঠে বিচরণকে দুটি সমানভাগে ভাগ করেছিলেন। সাড়ে তিন ঘন্টা করে দুবার মোট সাত ঘন্টা তাঁরা চাঁদের বুকে চলাফেরা করেছেন। প্রথম সাড়ে তিনঘন্টার পর তাঁরা চন্দ্রযানে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম, আহার অক্সিজেনের সরবরাহ পূর্ণ করে নেন।

চন্দ্রযান থেকে নেমে মহাকাশচারী দুজন 'সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট বে' নামে একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আধার উন্মুক্ত করে দেন। এতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির দুটি প্যাকেজ ছিল। এই দুটি প্যাকেজ যৌথভাবে 'অ্যাপোলো লুনার সারফেস একসপেরিমেন্ট প্যাকেজ' নামে অভিহিত। এই যন্ত্রপাতি সমন্বয়ের মোট ওজন পৃথিবীতে ১২৬ কিলোগ্রাম। কিন্তু চাঁদের বুকে মহাকাশচারীদের একজনই সেটা বহন করে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, কারণ চাঁদের অভিকর্ষ পৃথিবীর তুলনায় ছয় ভাগের একভাগ হওয়ায় তার ওজন অনেক কমে যাবে। এই যন্ত্রপাতিগুলিকে চন্দ্রযান থেকে তিনশো মিটার পর্যন্ত দূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যাতে চন্দ্রপৃষ্ঠ ত্যাগ করে যাবার সময় ইঞ্জিনের ঝাপটায় যন্ত্রপাতিগুলি নষ্ট না হয়ে যায়।

যন্ত্রাধার খুলে মহাকাশচারীরা প্রথম কেন্দ্রীয় যন্ত্রাগার স্থাপন করেন। এই যন্ত্রাগারে গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র আছে, যার সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠে সংগৃহীত তথ্যাদি রিলে করে পৃথিবীতে পাঠানো যায় এবং পৃথিবী থেকে প্রেরিত বেতার নির্দেশ

চন্দ্রপৃষ্ঠে ধরা যায়। কেন্দ্রীয় যন্ত্রাগার থেকে কিছু দূরে মহাকাশচারীরা পরমাণু শক্তি-চালিত একটি ছোট যন্ত্র স্থাপন করেন। রিবনের মতো তার দিয়ে যন্ত্রটি কেন্দ্রীয় যন্ত্রাগারের সংগে সংযুক্ত। এই যন্ত্রটি 'রেডিও আইসোটোপ থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটার' বা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদকযন্ত্র নামে অভিহিত। অ্যাপোলো—১১ অভিযানে সৌরশক্তিচালিত একটি যন্ত্র স্থাপন করে আসা হয়েছিল। সেটি চান্দ্র রাজ্যে দিনের সময় কেবল চালু থাকত এবং রাত্রির সময় অকেজো হয়ে যেত। কিন্তু পরমাণু শক্তিচালিত এই বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রটি দিন বা রাত্রি সব সময়েই যন্ত্রগুলিকে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করে যাবে।

কেন্দ্রীয় যন্ত্রাগার থেকে ত্রিশ মিটার দূরত্বে মহাকাশচারীরা বৈজ্ঞানিক তথ্য-সন্ধানী পাঁচটি যন্ত্রস্থাপন করেন।

এই পাঁচটি যন্ত্র হচ্ছে (১) চন্দ্রের কম্পন পরিমাপের জন্যে সিসমোমিটার। (২) সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত তেজস্ক্রিয় কণা তথ্যসন্ধানী যন্ত্র, (৩) চন্দ্রলোকে বিদ্যুৎক্ষেত্রের অস্তিত্ব সন্ধানী যন্ত্র (৪) মানুষ ও চন্দ্রযানের চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের ফলে সেখানকার অবক্ষয় সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী যন্ত্র (৫) চন্দ্রে চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব সন্ধানী যন্ত্র।

চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের পর মহাকাশচারীদের এবার আর একটি বিশেষ কর্মসূচী ছিল, ১৯৬৭ সালে ঝঞ্ঝা সাগরের কাছে যে যাত্রীবিহীন মহাকাশ যান সার্ভেয়ার ৩ টেলিভিশন ক্যামেরাসমেত নেমেছিল তার কাছে গিয়ে মহাকাশযানের অংশবিশেষ এবং টেলিভিশন ক্যামেরাটি কেটে পৃথিবীতে পরীক্ষার জন্যে নিয়ে আসা। কনরাড এবং বীন ঝঞ্ঝাসাগরে নেমে সার্ভেয়ার—৩কে একটি খাদের মধ্যে দেখতে পান। তাঁরা মহাকাশ যানটির কাছে গিয়ে তার অংশবিশেষ এবং টেলিভিশন ক্যামেরাটি কেটে নেন।

চন্দ্রপৃষ্ঠে নির্ধারিত বৈজ্ঞানিক কর্মসূচী সম্পাদন এবং চন্দ্রযানে ফিরে এসে বিশ্রামের পর কনরাড এবং বীন একটি রকেট ইঞ্জিন প্রজ্বলিত করে চন্দ্রপৃষ্ঠ ত্যাগ করেন। চন্দ্রের কক্ষপথ কয়েকবার পরিক্রমা করে পরবর্তী অভিযানের জন্যে সম্ভাব্য অবতরণ স্থানগুলির ছবি তোলার পর তাঁরা মূলযানের সংগে মিলিত হন।

তারপর চাঁদের আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে বেরিয়ে আসার আগে তিনজন মহাকাশচারী চাঁদকে একবার প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেন। যে চন্দ্রযানে করে কনরাড এবং বীন চাঁদের বুকে নেমেছিলেন এবং চাঁদের মাটি থেকে উঠেও এসেছিলেন। পৃথিবীর দিকে যাত্রার আগে সেটিকে তাঁরা চাঁদের বুকে ছুঁড়ে দিয়ে কম্পন সৃষ্টি করেন। এই আঘাতের ফলে চন্দ্রপৃষ্ঠ প্রায় ত্রিশ মিনিট ধরে কেঁপেছিল এবং চাঁদের বুকে রেখে আসা সিসমোমিটারে তা ধরা পড়ে। পৃথিবীতে ৭২০ কিলোগ্রাম টি এন টির বিস্ফোরণ ঘটলে যে পরিমাণ বিস্ফোরণ হতো ঠিক তত জোরেই ১১২ কিলোমিটার উঁচু থেকে ভেলাটি (চন্দ্রযান) চন্দ্রপৃষ্ঠে আঘাত করেছিল।

এবারকার অভিযানে সব কটি নির্ধারিত কর্মসূচী যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছে এবং যন্ত্রপাতিগুলিও ঠিকভাবে কাজ করেছিল। শুধু একটি ক্ষেত্রে নৈরাশ্য দেখা যায়। মহাকাশচারীদের রঙীন টেলিভিশন ক্যামেরাটি কিছুক্ষণ কাজ করার পর অকেজো হয়ে পড়ে। এবং চেষ্টা করেও তাকে আর চালু করা সম্ভব হয় নি। মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠে যে যন্ত্রগুলি রেখে এসেছেন, সেগুলি একবছর চালু থেকে সেখানকার সংগৃহীত তথ্যাদি পৃথিবীতে প্রেরণ করবে।

মহাকাশচারীরা মূলযানে করে ২২ নভেম্বর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের যাত্রা শুরু করে ২৪ নভেম্বর ভারতীয় সময় রাত্রি আড়াইটের সময় প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নিরাপদে অবতরণ করেছেন। চন্দ্রলোকে কোন জীবাণুর সংক্রমণ ঘটেছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে মহাকাশচারী তিনজনকে আগামী ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশেষ পরীক্ষাগারে পৃথক করে রাখা হবে এবং তারপর তাঁরা পরিবারবর্গের সংগে মিলিত হবেন।

পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

১৯৬৯ সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক ডঃ মারে গেলম্যানকে। সমস্ত বস্তুর উপাদান যে মৌলিক কণিকাগুলি, সেগুলির সুসংহত শ্রেণীবিন্যাস এবং এই সকল মূল কণিকার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত অবদান ও আবিষ্কারের জন্যে সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস তাঁকে বিজ্ঞান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মাননায় ভূষিত করেছেন।

ডঃ গেল-ম্যানের বর্তমান বয়স ৪০ বছর। কিন্তু বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ হলেও গত এক দশককাল তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। বস্তুত, অনেকের মতে আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানে ১৯৫৪ সালের পরবর্তীকাল গেল-ম্যান যুগ হিসাবে অভিহিত হওয়া উচিত। কারণ মৌলিক উপাদানের আধুনিক অগ্রগতিতে এমন একটি ক্ষেত্রও নেই যেখানে গেল-ম্যানের মৌলিক অবদান নেই।

গেল-ম্যানকে নোবেল পুরস্কার প্রদান-প্রসংগে সুইডিশ অ্যাকাডেমি বলেছেন, পরমাণুর গঠন সম্পর্কে কণিকা-পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক অবদান আছে।

২০ বছর বয়সে গেল-ম্যান এমন একটি সূত্র দেন, যার সাহায্যে কণিকার শ্রেণী-বিন্যাস সহজে করা যায়। এই সূত্রে 'অপরিচিত' নামে একটি নতুন কোয়ান্টাম-সংখ্যার তিনি প্রস্তাবনা করেন। গেল-ম্যানের কৃতিত্ব হচ্ছে, 'অপরিচিত' (স্ট্রেঞ্জনেস) কোয়ান্টাম সংখ্যার পশ্চাতে যে গাণিতিক যুক্তি আছে তা তিনি উদ্ভাবন করেন। 'ওমেগা-মাইনাস' নামে একটি নতুন মৌলিক কণা এবং 'কোয়ার্ক'স'-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। পরবর্তী-

ইণ্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ন্যাশনাল ফার্মেসি সপ্তাহের গ্রাণ্ড হোটেলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীপি চক্রবর্তী, তাঁর ডানদিকে রয়েছেন চেয়ারম্যান শ্রী এ দাস এবং এস এইচ মার্চেন্ট।

কালের গবেষণায় গেল-ম্যানের এই ভবিষ্যৎ-বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

১৯৬১ সালে ডঃ গেল-ম্যান আমন্ত্রিত হয়ে ভারতে এসেছিলেন। সে সময় বাঙ্গালোরে তাঁর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে তিনি একটি বক্তৃতামালা দিয়েছিলেন।

অষ্টম জাতীয় ফার্মেসী সপ্তাহ উদ্‌যাপিত

সম্প্রতি কলকাতায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে অষ্টম জাতীয় ফার্মেসী সপ্তাহের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধকের ভাষণে শ্রীপি বি চক্রবর্তী বলেন যে, উন্নতমানের ওষুধ প্রস্তুতের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমরা বিদেশী ওষুধের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এ'টে উঠতে পারছি না। এর একমাত্র কারণ 'ইম্পোর্ট কন্ট্রোল।' এর ফলে একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস আমদানী করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য আমরা পিছিয়ে পড়ছি। অথচ ওষুধের মান উন্নয়ন না করতে পারলে আমাদের কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না।

জাতীয় ফার্মেসী সপ্তাহ কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীএ দাস তাঁর ভাষণে কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সেমিনার 'রিফ্রেসার কোর্স' এবং প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং-এর উপর গুরুত্ব দেন। এতে কর্মীরা ফার্মেসীশিল্পের বিরাট অগ্রগতির সঙ্গে সংযোগ সাধন করতে পারবেন।

সভাপতির ভাষণে ভারতের সহকারী ড্রাগ কন্ট্রোলার শ্রীএস এইচ মার্চেন্ট বলেন, আজকের অগ্রগতির আলোকে ফার্মাসিউটিক্যাল শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কার দরকার। তবেই আমরা বিদেশের সংগে পাল্লা লড়তে সক্ষম হবো।

১৬ থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত অষ্টম জাতীয় ফার্মেসী সপ্তাহ হিসাবে উদযাপিত হয়। 'পরিবার পরিকল্পনা এবং ফার্মাসিস্ট' পর্যায়ে বিশেষ পোস্টার, ব্যানার, সিনেমা স্লাইড, বেতার ভাষণ এবং আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়।

মহাকর্ষের সীমা

মহাবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের সাধারণ তত্ত্বে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সীমাকে সসীম, কিন্তু মহাকর্ষের শক্তিকে অসীম বলে বিবৃত করেন। যদিও সার্বিকভাবে আইনস্টাইনের এই মতবাদ বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃত হয়ে থাকে, কিন্তু বহু জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী অসীম মহাকর্ষ ক্রিয়ার গাণিতিক ও তত্ত্বীয় অসামঞ্জস্য নিয়ে দীর্ঘকাল বিব্রত বোধ করে আসছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ পিটার ফ্রয়েন্ড। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : যদি মহাকর্ষের সীমাকে অসীম এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সসীম বলে ধরি, তা হলে তত্ত্বের নির্ভুলতা সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত হওয়া যায় না।

ডঃ ফ্রয়েন্ড তাই একটি নতুন তত্ত্ব প্রস্তাব করেছেন, যাতে মহাকর্ষের প্রভাব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের 'কার্যকর' আকারের মধ্যে সীমিত। অর্থাৎ মহাশূন্যের যে সীমানার মধ্যে মহাকর্ষ প্রভাবান্বিত অধিকাংশ বস্তু আছে, সেই সীমার মধ্যে মহাকর্ষের প্রভাব বিস্তৃত। তিনি পরিমাপ করেছেন পৃথিবী থেকে ১০ হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত মহাকর্ষের প্রভাব সীমিত। এই প্রসঙ্গে ডঃ ফ্রয়েন্ড মন্তব্য করেছেন : আমাদের নীহারিকমণ্ডল পর্যবেক্ষণের কোন পরীক্ষার দ্বারাই এই দুই তত্ত্বের পার্থক্য ধরা যাবে না, কিন্তু সুদূরবর্তী নীহারিকালোক থেকে আগত আলোকের নির্ভুল পরিমাপে এই পার্থক্য ধরা পড়বে।

ডঃ ফ্রয়েন্ডের এই তত্ত্ব যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। এই তত্ত্বের দ্বারা স্পন্দনশীল বিশ্বের (যা কখনও প্রসারিত, আবার কখনও সংকুচিত হয়) ধারণা সমর্থিত হবে এবং তত্ত্বীয় কণিকা-পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন দেখা দেবে।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বছরটা ছিল ১৯২৩। আমি তখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। 'দেশের ডাক' লিখেছিলাম ১৯২১-এ। তার ফলে দেড় বছরের দণ্ড হয়েছিল। তার আগে মাস-তিনেক ছিলাম প্রেসিডেন্সী জেলের সিবিল মহলে। ওটা তখন ছিল বর্তমান প্রেসিডেন্সী জেলের বাইরে এবং সামনে। যে ঘরে আমি ছিলাম, সেই ঘরেই একদা দেশবন্ধুকে বিচারাধীন কয়েদী করে রাখা হয়েছিল। এবং বিচারাধীন অবস্থায় নজরুলও ছিলেন এখানেই।

সাজা হয়েছিল ৮ই আগস্ট, ১৯২২। পরদিন সকালবেলা আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেন্ট্রাল জেলে। আগেই জানতে পেরেছিলাম যে, দেশবন্ধুর মুক্তি আসন্ন। কিন্তু সেটা কতখানি কাছে তা অবশ্য জানা ছিল না। সেন্ট্রাল জেলে ঢুকিয়ে আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল সিগ্রিগেশন ইয়ার্ডে। যা কিছু সামান্য জিনিসপত্র ছিল লোহার খাটের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই আমি ছুটলাম দেশবন্ধুর কাছে। পাশের মহলেই থাকতেন তিনি।

চমকে উঠেছিলাম তাঁর নতুন রূপ দেখে। সাদা চকচকে ভাবগম্ভীর মুখখানার বদলে এক মুখ লম্বা দাড়ি আর হাতকাটা কুর্তা গায়ে তাঁকে দেখে বেশ হকচকিয়ে গিয়ে-ছিলাম। মনে আছে, প্রণাম করতে সেদিন খানিকটা দেরীও করে ফেলেছিলাম।

রাত তখন প্রায় ৯টা কি ১০টা। ঘুমে বিভোর। সারা দিনের ধকলটা বড় কম ছিল না। নতুন আগন্তুকের পক্ষে অবশ্য করণীয় কিছু ছিল। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ ও সতীর্থ-দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। আরো একটা গুরুত্বের আকর্ষণ আমাকে দীর্ঘ সময় আটকে রেখেছিল অন্যত্র। বমবু ইয়ার্ডে। অর্থাৎ সদ্য আন্দামান ফেরত কয়েকজন, যাঁদের অনুষ্ঠিত ও অসমাপ্ত কর্মের এক প্রায়-অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চ সেদিনকার আমাদের মতো সদ্য দেশ-প্রেমিকদের শুধু মন নয়—অনুরাগে, বিস্ময়ে এবং সম্ভ্রমে সমস্ত সত্তাকেই অভিভূত করে ফেলেছিল—তাঁদের মহলে। আচমকা ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল। তখন কানে তালা লাগবার উপক্রম। এক-নাগাড়ে রব উঠছিল,—বন্দেমাতরম। দেশ-বন্ধু মুক্তি পেলেন।

উপক্রমণিকা দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু উপায় নেই। যে-কাহিনীর সূত্রপাত ১৯২২-২৩, তা একটু দীর্ঘ হতে বাধ্য। আজকের দিনে উপকথায় যাঁদের নাম,—তাঁরা সেদিন ছিলেন আলিপুর জেলের এক-এক মহলের একান্তই বাস্তব। আবুল কালাম আজাদ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মুজিবর রহমান, সতীন সেন, —কাকে ছেড়ে কার কথা বলব? সবাই সেদিনকার কেঁদো বাঘ।

তাছাড়া ঐ বমবু ইয়ার্ড। নরেন ঘোষ-চৌধুরী, সানুকূল চট্টোপাধ্যায়, অমৃত হাজরা, মদন ভৌমিক, ত্রৈলক্য চক্রবর্তী (মহারাজ); —আজকের এবং জাতির নবতম ইতিহাসের পাতায় এঁদের নাম থাকবার কথা নয়। কিন্তু সেদিন? ছিল। এবং অপরিহার্য-ভাবেই ছিল। তাই, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ না হবার যে অন্তহীন ক্ষোভ, তাও সহ্য হয়েছিল এঁদের দিকে তাকিয়ে।

আমাদের মহলের বারান্দায় দাঁড়ালে ওঁদের দোতলার বাসিন্দাদের সাক্ষাৎ মিলত। সব সময়ে ওঁদের মহলে যাবার অনুমতি ছিল না। অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ সেদিন থেমে যাবার লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। সত্যাগ্রহীরা দলে দলে বেরিয়ে যাচ্ছিল। প্রবেশ শেষ। কারাগারের শিথিল শৃঙ্খলা-বন্ধনও শক্ত হতে শুরু করেছিল। বারান্দা থেকে সারাক্ষণ ওঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। অপেক্ষা করতাম বিকেলের জন্য। আর সে সময় ঘনিয়ে এলেই ছুটতাম ওঁদের মহলে।

কাগজের নাম 'ধূমকেতু' রাখবার পরি-কল্পনা কার মাথায় প্রথম এসেছিল জানা নেই। যারই মাথায় স্থান পেয়ে থাক কাগজ নয়, 'ধূমকেতু'র সারথি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কেও এ কথাটা যথাযথ। সেই ধূমকেতুই স্বয়ং একদিন সহসা আলিপুর জেলে এসে উদয় হলেন। দিনটা ছিল ১৭ জানুয়ারী, ১৯২৩। এবং নিমেষে জয় করে নিলেন সকলের মন। শুধু কথা ও গান দিয়ে নয় রূপ দিয়েও। সেদিনকার নজরুলের রূপ ছিল অনিন্দ্যসুন্দর। মাজা শ্যামলা রঙ। অনতি দীঘল মেদহীন দেহ। মাথাভরা ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল। টানা ভ্রূ-যুগল আকর্ণ-বিস্তৃত। বাঙালী কবির দেহ-সৌষ্ঠবের দুর্বার আকর্ষণ বাঙালীকে সেদিন কম টানে নি।

কাজীকে আগে কখনো দেখবার সুযোগ আমার হয় নি। সেদিন কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়ে-ছিলাম গ্রামে। কাজীর কথা ও গান সেদিন-কার পল্লীর নিভৃত অঙ্গনে তখনো পৌঁছোয় নি। ১৯২১-এর উদ্দাম ও উন্মাদনার অতিক্ষীণ ও অল্প পরিসর অবকাশেও আমার সাহিত্য-চেতনা কখনো-সখনো সমকালীন সাহিত্যের পরিচয়-লোভে উদগ্রীব হয়ে উঠত। সুযোগ পেলেই দেখতাম 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ'। সহসা 'প্রবাসী'র পাতায় দেখেছিলাম "বিদ্রোহী" কবিতা। অন্য পত্রিকা থেকে সংকলিত। সম্ভবত 'মোশ্লেম ভারত'।

এক বছরে স্বরাজ আসবার অভ্যর্থনা-আয়োজনে সেদিন আমরা এত বেশী কর্ম-ব্যস্ত ও তৎপর হয়ে উঠেছিলাম যে, অন্য কোন দিকে মন দেবার মতো ক্ষমতা অথবা দৃষ্টি দেবার মতো চোখ ছিল না। স্বরাজ আসবে। স্বরাজ আসছে। এই পরমক্ষণে অবান্তর কথাবার্তায় কান দিতে নেই। এই তুরীয় অবস্থায় কাব্য বা কবিতার পেলব কোমল আকর্ষণে দৈবাৎ যদি মনে কোন প্রকার চাঞ্চল্য ওঠে,—চক্ষু ও কর্ণকে দস্তুর-মতো শাসন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল কি? তবুও 'বিদ্রোহী' বার বার না পড়ে থাকতে পারি নি। এবং কাজীকে হয়তো ভালোও বেসে ফেলেছিলাম।

বমবু ইয়ার্ড ছিল দুটো মহলে ভাগ করা। লম্বালম্বি। দুটোই দোতলা। মাঝখানে পাঁচিল। যাতায়াতের দরজা ছিল। উত্তরাংশে থাকতেন বেশীর ভাগই যুগান্তর দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাঁরা, তাঁরা। দক্ষিণাংশে অনুশীলন। এই বাঁটোয়ারা বন্দোবস্ত ইংরেজ আমল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ছিল পরেও। শুধু একত্রিশ সালে বেড়েছিল নতুন আর একটি দল। কমিউনিস্ট। তিন দলেরই পৃথক পৃথক মহল। অন্নের ব্যবস্থাও ছিল আলাদা।

আমরা পড়েছিলাম উভয় সংকটে। প্রায় শৈশবে, আমাদের গ্রামের বঙ্কিমদা, বঙ্কিম-চন্দ্র রায়, অনুশীলনের ঘাঁটি গেড়েছিলেন গ্রামে। রায়-বংশের এই কুলতিলক আমাদের শুধু দাদাই ছিলেন না, ছিলেন আদর্শস্বরূপ এবং প্রায় দেবতাতুল্য। পরবর্তীকালে কল-কাতার পাঠ্যজীবনে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম যুগান্তরের সঙ্গে। ঝাঁপ দিলাম অসহযোগ আন্দোলনে। গণ্ডীর মোহ, সবটা না হলেও অনেকটা প্রায় কাটিয়ে উঠেছিলাম। এই কারণেই উভয় দলের সঙ্গে আমরা একই-ভাবে মিশতাম। বাধত না।

নজরুলের ভাগ্যেও এ-বিড়ম্বনা দেখা দিয়েছিল। বোমা মহলের পেছনের মহলে পূর্বে ছিলেন আক্রাম খাঁ, বাদশা মিঞা চাঁদ মিঞা, সামসুদ্দীন প্রমুখ। নজরুলের বাসস্থান প্রথমটায় ওখানেই ছিল। কিন্তু নামে। সারাদিন তাঁর কাটত এ-মহল-ও-মহল করে। আর বিকেল এলেই ছুটে আসতেন বোমা মহলে। মহলের সামনে ছিল প্রশস্ত অঙ্গন। সবুজ ঘাসে ঢাকা। চারপাশে অনতি-প্রশস্ত পথ। দুধারে ইঁটের কেয়ারি। তার পাশে নানা ফুলের সমারোহ। বন্দীরা প্রাণভরে ওদের পরিচর্যা করতেন। অঙ্গনে জমা হতেন সবাই। কাজীর গান চলত।

চলত কবিতার আবৃত্তি। অনর্গল। অফুরন্ত। মাঝে-মাঝে বলে উঠতেন,—'দে গরুর গা ধুইয়ে'। হাসির বান ডাকত।

কাজীর মহল থেকে আসবার পথে প্রথমে পড়ত যুগান্তরের মহল। সেখানেই হৈ-হুল্লোড়টা বেশী হত। মাঝে-মাঝে যেতেন অনুশীলন মহলেও। বন্দীদের কারও ভাগ্যেই 'ধূমকেতু' দেখবার সৌভাগ্য তখনো হয় নি। মূর্তিমান ধূমকেতু সবাইকে মাতিয়ে রেখেছিলেন আকণ্ঠ। তবুও ধূমকেতু কাগজের জন্য সবাই অস্থির হয়ে উঠলেন। পরিত্রাণায় বন্দীনাং এগিয়ে এলেন নরেন ঘোষ চৌধুরী।

অদ্ভুত এবং বিচিত্র ছিলেন এই মানুষটি। অত্যন্ত মামুলী চেহারার এই লোকটিকে দেখে কেউ ধারণাও করতে পারত না যে, একদা এই মানুষটিই ছিলেন জাঁহাবাজ পুলিশ-কর্তা টেগার্টের অতীব দুশ্চিন্তা এবং সম্ভবত খানিকটা ভীতিরও কারণ। কিন্তু কথাটা ছিল সত্য। সশস্ত্র সংগ্রাম পরিকল্পনার অধিনায়ক যতীন মুখার্জির মৃত্যুর পর যুগান্তর দলের ক্রিয়া-কাণ্ডের গুরুদায়িত্ব অনেকখানি বহন করতে হয়েছিল এঁকেই।

শিবপুর ডাকাতির নায়ক ছিলেন এই নরেন ঘোষ চৌধুরী। এবং সেকালের কলকাতা ও আশে-পাশের বহু অসমসাহসিক অঘটনে তিনি শুধু অংশই গ্রহণ করেন নি,—নেতৃত্বও করেছেন। সেই মানুষটিকে বন্দীশালার এই সংকীর্ণ পরিবেশে দেখে এবং বন্দী-জীবনেও একটি মানুষ কত অবলীলায় অঘটন ঘটাতে পারে, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে, বিস্ময় জেগেছিল মনে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চাইতেও মানুষটিকে ঘিরে যে বাস্তব ও কল্পনার সীমাহীন সমারোহ মনের নিভৃতে অগাধ সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলেছিল, তারও বুঝি তুলনা ছিল না।

দিন কয়েকের মধ্যেই 'ধূমকেতু' সশরীরে দেখা দিল। কাজী বিস্ময়ে হতবাক। তাঁর কাগজ, সম্পাদক তিনি, কিন্তু কারাগারে বসে 'ধূমকেতু' আনানো তাঁর পক্ষেও অসাধ্য ছিল। নরেন ঘোষ চৌধুরীর কাছে কোন কিছুই কোনদিনই অসম্ভব বলে মনে হয় নি। কাজী আদর করে নরেনবাবুকে বলতেন সব্যসাচী। ধূমকেতুর দুটি বা তিনটি সংখ্যা সাকুল্যে পাওয়া গিয়েছিল।

প্রথম ঠিক নয়, তবুও গান্ধী-নেতৃত্বের সরাসরি বিরোধিতা না হলেও 'ধূমকেতু'র কণ্ঠে সেদিন জেগেছিল ভিন্ন সুর ও স্বর। পূর্বে 'বিজলী' এবং 'শঙ্খ' এ-কাজে ব্রতী হয়েছিল। কিন্তু বিজলীর স্তম্ভে উন্মাদনা ছিল না। শঙ্খ বেজেছিল ঠিকই কিন্তু আওয়াজ বেরুচ্ছিল যে আধারটির ভেতর দিয়ে, সেই শঙ্খের গায়েই ছিল চিড়। তাই সুর সেদিন অসুরের প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়েছিল।

ধূমকেতুর নতুন সুরে বাঙালীর মনে,—বিশেষ করে যে শ্রেণীর বাঙালী সেদিন খানিকটা সজাগ হয়ে দেশের স্বাধীনতা কামনা করছিল বিলক্ষণ নাড়া দিয়েছিল। বিদ্রোহী বাঙলার বুকে সত্যিই সেদিন বেদনা ও অপমান-জ্বালা মুখর হতে চাইছিল। গান্ধীর স্বরাজ বাঙালীর মনঃপূত হয় নি। কিন্তু সে-কথা সোচ্চার হয়ে কারও কণ্ঠে ধ্বনিতও হয় নি। সংগ্রাম, সংঘর্ষ,—তা হিংসা হোক আর অহিংসে হোক, বাঙালী তার চেতনায় প্রারম্ভে তাকেই অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। বরদলী-সিদ্ধান্ত অন্যান্য প্রদেশ অবলীলায় মেনে নিলেও বাঙালী প্রসন্ন হতে পারে নি। বাঙলার মৌন বেদনা এবং গোপন কামনা ধূমকেতুর বুকে খানিকটা স্থান পেয়েছিল। বাঙালী সাগ্রহে তাকে নিজের বলে চিনে নিয়েছিল। গ্রহণও করেছিল। বাঙালী কাজীকে মনে করেছিল প্রিয়জন।

ইংরেজ সম্পর্কশূন্য স্বাধীনতা শুধু কামনা করা নয়, তাকে সশব্দে সবাইকে শুনিয়ে দেওয়া সেদিন খুব সুলভ ছিল না। এই দুর্লভ কাজটি কাজী করেছিলেন ১৯২২-এ। এ-কথাটি ভুলে গেলে ইতিহাস বাঙালীকে ক্ষমা করবে না।

আরও একটি কথা; ১৯১৯-এর গান্ধী অত্যন্ত সহসা তাঁর অপরিমেয় গঠন শক্তি ও আবেদন নিয়ে ভারতবর্ষের বুকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তার চাপে বাংলা দেশ;—চিরন্তন সংগ্রামস্পৃহা পরিহার করে নয়, স্বল্পকালের জন্য গান্ধীর কথায় সায়ও দিয়েছিল। কিন্তু গান্ধী-দর্শনের ত্রুটি-বিচ্যুতিও তার অজানা ছিল না। পারম্পর্য-হীন গোঁড়ামি বাঙালী কোনদিনই দীর্ঘকাল সহ্য করে নি। সে বিদ্রোহ করেছে বার-বার। সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিদ্রোহ বাঙালীর মজ্জাগত। বরদলীর পর আবার নতুন করে এই বিদ্রোহ-আকাঙ্ক্ষা তার প্রাণে জেগেছিল। এবং কাজী নজরুল জাতির চারণের মতো এই বিদ্রোহ মানসের ছিলেন বাঙময় রূপকার।

অতি-অকস্মাৎ স্বরাজ আকাঙ্ক্ষা উন্মাদিনী জাহ্নবীর দুকূল ভাসানো বেগ-বন্যার মতোই দেশের বুকে ঢল নামিয়েছিল। থেমে যেতেও তর সইল না। বরদলী সিদ্ধান্তের পর হুকুমনামা জারী হবার সঙ্গে-সঙ্গেই বন্দী-মুক্তির ধুম পড়ে গেল। জেলে ঢোকবার ব্যাকুলতায় চাইতে জেল থেকে বাইরে যাবার তাগিদটা কমজোরী ছিল না। বিশেষ করে তাদের কাছে, যারা জেলে ঢুকেছিল খেলাফৎ আন্দোলনের মোহে এবং গড্ডালিকার ঝোঁকে। আলিপুর জেল প্রায় শূন্য হয়ে গেল। শুধু রাজদ্রোহ ও তৎসম্পর্কীয় ধারায় অভিযুক্ত বন্দীরা ছাড়া পেল না।

আবুল কালাম আজাদ, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুজিবর রহমান থাকতেন মেয়ে মহলে। কারাগারের আঞ্চলিক পরি-ভাষায় ওটাকে বলা হত 'রেণ্ডী ফাটক'। অর্থাৎ মেয়ে কয়েদীদের ওখানে রাখা হত। সামনের অফিস ঘরের বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকার ধারেই ছিল মহলটা। মেয়েদের অন্যত্র সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। পাশাপাশি চারখানা ঘর। সামনে বারান্দা। ভেতর দিয়ে বারান্দার ধারেই একটুখানি মাটির উঠোন। ছোট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। মুজিবর রহমান ছিলেন একখানি সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক। রাজদ্রোহের অপরাধে সাজা হয়েছিল। মেয়াদ শেষে মুক্তি পেলেন। কাজী এলেন সেই ঘরে। জিতেনবাবু ও কাজীর ঘর ছিল লাগোয়া।

রশুইখানার পাশে ছিল ছোট ছোট চারখানা ঘর। যাকে বলে সেল। ওরই দুটোতে সতীন সেন ও আমি উঠে গেলাম। আমরা সবাই ছিলাম 'স্পেশাল ক্লাস' প্রিজনার। অর্থাৎ সুবিধাভোগী কয়েদী। রাজনৈতিক কয়েদী বলে জেলের পরি-ভাষায় কোন শব্দ তখন ছিল না। দেশবন্ধুর কারাদণ্ডের পর মূলত তাঁর জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে সবাইয়ের জন্য সেদিন এ-ব্যবস্থা হয়েছিল। বন্দীদের ধুতি-জামা-জুতো-বিছানা-মশারী দেয়া হল। পরিবার-পরিজন-এর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের কিছুটা সুরাহা হয়েছিল। এবং বাইরের খাবার-দাবার ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনবার অনুমতি মিলেছিল।

প্রতিদিন আড়াইটে-তিনটের সময় আমি যেতাম জিতেনবাবুর কাছে। উনি আমাকে ব্রাউনিং পড়াতেন। কাজীর ঘরের সামনেই পাতা হত আমাদের মাদুরখানা। শুরু হত জিতেনবাবুর পড়ানো। সে এক অপূর্ব অধ্যাপনা। স্পিরিচুয়াল ও ইনটেলেকচুয়াল রিয়ালাইজেশন-এর সম্যক ধারণা বা পার্থক্য বোঝবার মতো জ্ঞান-গাম্য আমার ছিল কিনা বলতে পারব না। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবোন্মাদ রামকৃষ্ণ বা চৈতন্য সম্পর্কে কিছুটা ধারণা এর আগেই আমার গড়ে উঠেছিল। এঁদের জীবনের সঙ্গে জিতেন-বাবুর জীবনের যৎকিঞ্চিৎ বা স্বল্পতম সাদৃশ্য থাকবার কথা নয়, কিন্তু নবতম এবং ভিন্নতর এক বিচিত্র অনুভূতির লক্ষণ জিতেনবাবুর কণ্ঠে ও দেহে প্রকাশ পেতে দেখেছি।

দিন কয়েক পরের কথা। 'গ্রামারিয়ান্স্ ফিউনারেল' পড়া শেষ হবামাত্র আমি উঠে পড়েছিলাম। যাবার সময় কাজীর দিকে ফিরে চেয়েছিলাম। মাথাটা লোহার খাটের বাজুতে রেখে কাজী নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে ছিলেন। বিছানার চাদরখানা মেঝেতে লুটোচ্ছিল। মাথার বালিশটা ছিটকে পড়ে ছিল অনেক দূরে। মনে হয়েছিল কাজী হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সতীনবাবু ও আমার যাবার কথা ছিল হাসপাতালে। অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে। ফিরে এসে দেখি কাজী আমার ঘরে বসে আছেন একা।

নজরুল চঞ্চল। নজরুল ভাববিলাসী। নজরুল খেয়ালী। এবং সর্বোপরি নজরুল কবি। নজরুলের এই পরিচয় এরই মধ্যে আমার মনে খানিকটা স্থান করে নিয়েছিল। দুরন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে অবসাদ ও সাময়িক বেদনা দূর করে দেবার শক্তি ছিল তাঁর। এ সবই সত্য। কিন্তু নজরুল যে কোন কারণে সত্যি-সত্যি গভীরে তলিয়ে যেতে পারতেন কিম্বা বিশেষ কোন বেদনা বা আর্তি তাঁর স্বভাব-চঞ্চল উন্মাদনামুখর প্রকৃতিকে স্তব্ধ ও শান্ত করে দিতে পারে,

এ সম্ভাবনা কোনক্রমেই সেদিন আমার মনে হয় নি।

আমার খাটের পাতা বিছানার ওপর বসেছিলেন কাজী। দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মাটির দিকে। নিচে। ঘরে ঢুকতেই ফিরে চাইলেন আমার দিকে। পাশে টেনে বসালেন। খুব ধীরে, প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বললেন,—'ঐ জীবনই আমাদের। তাই না?'

আমি বিমূঢ়। কার জীবন? সে কে?

নিজেই বললেন,—ঐ যে আজ পড়া হল গ্রামারিয়ানের কথা। হয়তো কোন স্বপ্নই সার্থক হবে না। স্বপ্ন স্বপ্ন হয়েই মরে যাবে। তবুও।'

আমি হেসে ফেলেছিলাম। ব্রাউনিং কবিকে জোর নাড়া দিয়েছে। কবি তাই ছুটে এসেছেন আমার ঘরে। কিন্তু। কবির চোখের দিকে চেয়ে হাসি আমার থেমে গেল। সাময়িক উত্তেজনায় মানুষ যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, এতো তা নয়। মনের গভীরে যে অব্যক্ত নাম-না-জানা বুঝতে-না-পারা অস্ফুট কাতরতা সময়ে সময়ে মানুষের সকল বাহ্যিক রূপ নিমেষে রূপান্তরিত করে দেয়, একটা বিশেষ চাওয়া তার সমগ্র অন্তর আচ্ছন্ন করে ফেলে, কিন্তু তাকে সম্যক ধরা যায় না, চেনাও যায় না,—এমনি একটা ব্যাকুল দুর্বোধ্য আকৃতি ঠিকরে বেরুচ্ছিল কাজীর চোখের মণি থেকে।

একখানা হাত নিজের হাতে টেনে নিতেই নজরুল বলে উঠলেন,—'কিন্তু

স্বপ্ন দেখেছি সে কথা তো মিথ্যে নয়।'

কাজীর পড়াশুনোর বহর আমার জানা ছিল না। ও'র জীবনের কথাও কি বেশী জানতাম? যুদ্ধে যোগ দেবার সাধ নিয়ে সৈন্য দলে নাম লিখিয়েছিলেন। কিছুদিন শিক্ষানবিশীও করেছিলেন। ফিরে এসেছেন। কাব্য চর্চা করছেন। এবং তাঁর গায়ে আগুনের ছোঁয়াচ ছিল, এটুকু জানা ছিল। 'বিদ্রোহী' পড়েছি। ও'র মুখে ও'র লেখা দু-একটা কবিতা শুনেছি। ধূমকেতুতে ও'র লেখাও দেখিছি। কিন্তু কাজীকে জানবার আগ্রহ তখনো নিজের মনে বোধ করি নি।

'কিন্তু হঠাৎ...?'

'হ্যাঁ, হঠাৎ। হঠাৎ মানুষ জন্মায়। আবার মরেও হঠাৎই। এই আকস্মিকতাই মানুষের সবচেয়ে বড় কথা। আকর্ষণও বড়। ইংরেজের বেতনভুক সৈনিক হয়ে হঠাৎ একদিন গোলামি নিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ আমি ইংরেজের কাছে রাজদ্রোহী। কিন্তু—'

সহসা থেমে গেলেন। কেমন একটা বিষণ্ণ কাতরতা কণ্ঠের ভেতর থেকে গলেগলে বাইরে আসতে চাইছিল। ঢোক গিলে বলে ফেললেন,—'এসব আমার পড়া হয় নি। সময় পেলাম না। বড় সুন্দর,—না?'

কাজী চলে গেলেন।

সেদিনের কথা একটুও ভুলি নি। প্রদোষের স্তিমিত আলোকে কাজীর সেই ক্লান্ত প্রস্থানভঙ্গি আজও মনকে নাড়া দেয়। যে কোন কারণেই হোক, অসমাপ্ত জীবনের আন্তর বুভুক্ষা হয়তো কাজীকে চঞ্চল করে থাকবে। বিশ্বের অসংখ্য প্রখ্যাত কবির অগাধ সৃষ্টি বৈভব তাঁর নাগালের বাইরে। হয়তো কবির রূপ ও রসপিপাসু অন্তরে না-দেখা না-পাওয়ার বেদনা বৃহৎ হয়ে তাঁকে অভিভূত করে ফেলাও বিচিত্র নয়। কিন্তু ঐ যে স্বপ্ন, মুক্তির স্বপ্ন, স্বাধীনতার খোয়াব, — চঞ্চল, খেয়ালী, দুরন্ত কাজী নজরুলের প্রাণে একই সঙ্গে কেমন করে কখন ওতপ্রোত মিশে গেল, দুঃখ ও নির্যাতন বরণ করে নিলেন বিনা ভূমিকায়,—সেদিন ছিল তা একান্তই দুর্বোধ্য।

সরস্বতী পুজো এসে গেল। আমরা সবাই মেতে উঠলাম। কারাজীবনের এসবও দুরন্ত আকর্ষণ। একঘেয়ে জীবনে যা এবং যতটুকু বৈচিত্র্য আনবার উপায় থাকে, তাতেই মন সাড়া দেয়। পুজো উপলক্ষ্য। একটু হৈ-হুল্লোড়, একটু বাঁধনহারা উল্লাস, যে-কোন কারণে বন্দী-জীবনে দেখা দিলেই অন্তত সেই ক্ষণের মাদকতা বন্ধনের বেদনা শিথিল করে দেয়।

'না' করে লাভ নেই, আরো একটি কারণও হয়তো এর ভেতর ছিল। কারাগারে সেদিন খৃস্টানদের সবগুলি পার্বণের ব্যবস্থা তো ছিলই, সাপ্তাহিক উপাসনাও বাদ যেত না। দস্তুরমত বিধি ও বিধান অনুযায়ী তা প্রতিপালিত হত। সমবেত প্রার্থনার জন্য ওদের গীর্জা ছিল, সেখানে অর্গান পর্যন্ত রাখা হয়েছিল।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের রোজা প্রতিপালিত হত। নামাজের সময় ও সুযোগ মঞ্জুর করা ছিল। প্রতি শুক্রবার ইমাম আসত। সমবেত নামাজ পড়া হত। ঈদের কোরবানী বাদে আর সবই হত। ব্যবস্থাও ছিল। ছিল না শুধু হিন্দুর জন্য কিছুই।

তবুও যে কোন পুজোর নামে বাঙালী হিন্দুর মন আনচান করে ওঠে। কোথায় কোন্ দুর্জ্ঞেয় নাড়িতে টান পড়ে। আর্য-হিন্দুদের নাকি পুজো-টুজো তেমন ছিল না। অনার্য বাঙালীর কিন্তু ছিল। এবং আজো আছে।

যাই হোক সেদিন এসব আদৌ ভাবি নি। পুজো আসছে। পুজো হবে। যথেষ্ট। চাঁদা আদায় হল। আয়োজনের কোন ত্রুটি রইল না।

বেলা ৮টায় একেবারে স্নানটান শেষ করে মণ্ডপে ঢুকলাম। পুজো হয়েছিল আমাদের মহলের প্রাঙ্গণে। সেদিনের লেখা আমার রোজনামচা থেকে এইবার শোনাই :

'২২শে জানুয়ারী, ১৯২৩।

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই দেখি সাজ-সাজ পড়ে গেছে। সকলের মুখে-চোখে নতুন আনন্দ ও সজীবতার আলো উঠেছে ফুটে। সবুজ গাঁদা গাছ খাড়া করে দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করা হয়েছে। ওর গায়ে ঝোলানো হয়েছে নানা ফুলের মালা। মাঝে-মাঝে ফুলের স্তবক বেঁধে দেওয়ায় ফুলের মেলা বলে মনে হচ্ছিল। মূর্তি না আনিয়ে আনা হয়েছে দেবীর একখানা ছবি। পটখানা খুব সুন্দর। সবুজ গাছের পাঁচিল ঘেঁষে আসন বসেছে দেবীর। সামনে দেবীর পট। সামনে জলপূর্ণ ঘট। ডানদিকে পুজোর নানাবিধ উপকরণ ও ভোগের উপাচার। দেবীর মুখোমুখি পুরোহিতের আসন।

সাদা খদ্দর পরে উত্তরাস্য হয়ে বসেছেন পুরোহিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। গায় উত্তরীয়। দুই পাশে রাজনৈতিক বন্দীরা। ধূপ-দীপ জ্বলে উঠল। শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের সমবেত ধ্বনিতে প্রাঙ্গন মুখরিত। পুজোর প্রাঙ্গনে অনেক হিন্দু সেপাই ও জমাদারও হাজির।

পুজো শেষে পুরোহিত বদ্ধাঞ্জলি হয়ে দাঁড়ালেন। পুষ্প-বিল্বপত্র হাতে নিয়ে বন্দীরা দাঁড়িয়ে পড়লেন, দেবী সরস্বতী বাঙ্ময়ী ভারতী...অঞ্জলির ফুল-বেলপাতা ঘটে নিক্ষিপ্ত হল।

কবি নজরুল নিচের ঘরে কম্বলের উপর সাদা চাদর বিছিয়ে আসর সাজিয়েছিলেন। গানের আসর। তাঁর অঞ্জলি দেবার খুব সাধ ছিল। কিন্তু শ্যামবাবুর ভয়ে দিতে পারলেন না। পুজান্তে আমরা গানের আসরে গিয়ে বসলাম। কাজী বললেন, 'ফুলের অঞ্জলি আপনারা দিলেন, আমি দেব গানের অঞ্জলি।' গানের মাঝে মাঝে কাজীর আবৃত্তিও চলতে লাগল। কাজীর গান ও আবৃত্তি কারাগারের যাবতীয় গ্লানি আর বন্ধন-বেদনা অন্তত সেদিনের মতো দূর করে দিল।

সন্ধ্যাবেলা সেই প্রাঙ্গনেই সকলে মিলে আমরা খাওয়া-দাওয়া করলুম। কাজীও ছিলেন। দুপুরবেলা কিছুক্ষণ আমরা তাসও খেলেছিলুম। উদ্যোগী ছিলেন জিতেনবাবু। তাঁর মতে তাস খেলা একটি উচ্চাঙ্গের বিদ্যা। বিদ্যার আরাধনায় দেবী তুষ্ট বই রুষ্ট হবেন না।

বন্দী-সংখ্যা দিন-কে-দিন কমতে শুরু করেছিল। বৃদ্ধের মধ্যে ছিলেন শ্যামবাবু, মেদিনীপুরের কিশোরীপতি রায় ও ফরিদপুরের যদু পাল। কিশোরীবাবুর মুক্তির পরই মুক্তি পেলেন যদুবাবু। ফরিদপুরের অনেক বন্দীকে একই দিনে দণ্ডকাল শেষ হবার আগেই ছেড়ে দেওয়া হল। আমরা থাকলাম মোট দশজন মাত্র।

শ্যামসুন্দর মুক্তি পেলেন পাঁচই ফেব্রুয়ারী

আচমকা ছুটতে ছুটতে কাজী ভেতরে ঢুকেই হড়বড় করে বলে ফেললেন যে, জিতেনবাবু ও আমি রিলিজড অর্থাৎ আমাদের মুক্তি। অবিশ্বাস্য কথা। তবু ভেতরটা নিমেষের জন্য দুলে উঠল।

আমাদের কাব্য-আলোচনা চলছিল। জিতেনবাবু মুখ তুলে বললেন—'কার কাছে শুনলে?'

'একজন ওয়ার্ডার'। কাজীর উত্তর শেষ হতে না হতে একজন ফিরিঙ্গি সার্জেন্ট এসে দাঁড়াল। বলল—'এই যে তোমরা দুজনেই আছ। তোমাদের ট্রানস্ফার অরডার এসেছে। যেতে হবে বহরমপুরে। আজই।'

'তা কী করে হবে? আজ যাওয়া সম্ভব নয়। দাঁড়াও।' জিতেনবাবু ঘস ঘস করে একখানা খাতায় কী লিখে সার্জেন্ট-এর হাতে দিলেন। ও চলে গেল।

বিকেল গড়িয়ে আসছে। চারদিকে কর্ম-ব্যস্ততার অবধি নেই। কয়েদীদের ব্যারাকে ব্যারাকে ফাইল শুরু হয়ে গিয়েছে। বৈকালিক আহার-পর্ব শেষ। এইবার ওরা যার যার আস্তানায় ঢুকবে। কাঁটা কম্বলের বিছানায় পড়বে ঢলে। ফিসফাস কথা চলবে। টুকরো হাসি ও মসকরা। দু-একটা ভাঙা গানের কলি শোনা যাবে। ধমকে উঠবে ওয়ার্ডার। ভারি বুটের খটাখট শব্দ আসবে গরাদের ধারে এগিয়ে। বলে উঠবে—'শালা চুপ রহো।' শোনা যাবে আরো খিস্তি। শান্তির নিঃশব্দ বুকের তলায় ফুঁসতে থাকবে অসন্তোষের আগুন।

খবর ছড়াতে কালবিলম্ব ঘটল না। ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সব মহলে। ছুটে গেলাম নিজের মহলে। গিয়ে দেখি জমজমাট। অনেকে এসেছেন বোমা মহল থেকে। উদগ্রীব জিজ্ঞাসা সবাই-এর মুখে-চোখে।

পরদিন অর্থাৎ ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩, দুপুরবেলা আমরা উঠলাম ট্যাক্সিতে। কাঠের ঢাকা ফটকের ফোকরে তখনো কয়েক জোড়া বিমর্ষ ম্লান চক্ষু চেয়েছিল। যাত্রার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত কাজী একটা কথাও বলেননি। শুধু ফটকের ধারে এসে আমার একখানা হাত টেনে নিয়েছিলেন নিজের হাতে। নিঃশব্দে।

কাজী সেদিন যে-গান আমাকে শুনিয়েছিলেন, তার সবটাই ছিল নোমতো।

(ক্রমশঃ)

।। ছয় ।।

খাওয়া দাওয়া সেরে রওনা হওয়া গেল।

বাঁয়ে, দূরে মেঘ মেঘ নেতারহাটের পাহাড় দেখা যাচ্ছে। মেঘলা আকাশে একটি মেঘ-স্তম্ভের মতো। প্রায় আধ ঘণ্টাখানেক চলার পর যশোবন্ত জীপ থামালো কুরুয়া বলে একটি ছোট গ্রামে। ওঁরাওদের গ্রাম। বেশী হলে ১৫।২০ ঘর লোকের বাস। এই গ্রামের মোড়লের বাড়ির গোয়ালঘরে জীপটা ট্রেলার শুদ্ধ ঢুকিয়ে দিল যশোবন্ত। জনাচারেক লোক তৈরী ছিল, তারা শিরিণবুরু থেকে এসেছে আমাদের নিয়ে যেতে। সবচেয়ে মজা লাগল একটি ছোট সুখে-ভরপুর ডুলি দেখে, এই ডুলিতে বৌদি যাবেন।

সুমিতাবৌদি ডুলি দেখেই ত খিল খিল করে হাসতে লাগলেন। বলেন, মরে গেলেও এতে চড়তে পারবো না। তোমাদের সঙ্গে হেঁটেই যাব। যশোবন্ত বলল, আপনি পাগল নাকি? এক মাইল পথ, সবটাই প্রায় চড়াই, হেঁটে যাওয়া সোজা কথা?

বন্দুক আর রাইফেল আমি নিজেই হাতে নিলাম। অন্য লোকের হাতে দেওয়ার জিনিস নয় এগুলো। তাছাড়া গরু আমার সঙ্গে আছে। বন্দুকের অযত্ন করি, সাধ্য কি?

পাকদণ্ডী রাস্তা। কোথাও চড়াই কোথাও বা উৎরাই। বেশীটাই চড়াই, কখনো পথ গেছে সবুজ উপত্যকার উপর দিয়ে, কোথাও বা ঘন শাল বনের মধ্যে। শটী-ফুলের মতো কি এক রকম রঙীন ফুল ফুটে আছে গাছের গোড়ায় গোড়ায়। নতুন জল পেয়ে ডালে ডালে কত শত কচি-কলাপাতা রঙা পাতা। সমস্ত জঙ্গল পাহাড় সবে-চান-করা সুন্দরী কিশোরীর মতো এই মেঘলা দুপুরে স্বপ্নাতুর চোখে চেয়ে আছে।

কি বৌদি কষ্ট হচ্ছে নাকি? বৌদি বললেন, একটুও না। বৌদি একটি ফিকে কমলা রঙা তাঁতের শাড়ী পরেছেন। গায়ে একটি হালকা শাদা শাল।

ঘোষদার বপু ক্ষীণ নয়। বেশ হাঁপিয়ে পড়েছেন, এবং কিছুটা গিয়েই বলছেন, 'দাঁড়াও ত ভায়া একটু।' আমি আর ঘোষদা দাঁড়াচ্ছি, যশোবন্ত আর সুমিতা-বৌদি এগিয়ে যাচ্ছেন। আবার ওরা গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, আমরা ধরছি।

দেখতে দেখতে আমরা বেশ উঁচুতে উঠে এসেছি, বেশ উঁচু। দূরে কোয়েলের চওড়া গেরুয়া শাদা মেশানো আঁচল দেখা যাচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন ও সবুজ জঙ্গলে পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে।

নেতারহাটের পাহাড়টা যেন একেবারে নাকের সামনে। এক একবার নিঃশ্বাস নিলে মনে হচ্ছে যে বুকের যা কিছু গ্লানি সব সাফ হয়ে গেল।

আরো কিছুদূরে উঠে একটি বাঁক ঘুরতেই চোখে পড়ল একটি ছবির মতো ছোট গ্রাম, পাহাড়ের খাঁজের উপর শান্তিতে রয়েছে। কিন্তু এখনো প্রায় পনেরো কুড়ি মিনিটের রাস্তা।

এমন সময় বৃষ্টি নামল। ঝুপঝুপিয়ে না হলেও টিপটিপিয়েও নয়। দৌড় দৌড়। বৌদি বেচারীর দুরবস্থার একশেষ। শাড়ি-টাড়ি লাল হয়ে গেছে লাল মাটি লেগে। চুল ভিজে গেছে, নাক দিয়ে চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। জামাকাপড় স্বচ্ছ। ভাগ্যিস শালটা ছিল। নইলে দেবরদের সামনে বৌদিকে বেশ বিব্রত হতে হত। একটি ঝাঁকড়া মহুয়া গাছের নীচে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা হল, কিন্তু সে গাছের পাতা থেকে টুপটুপ করে যা জমা জল পড়ছিল তার চেয়ে বৃষ্টিতে ভেজা অনেক ভাল। ঘোষদা টাকে ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে রুমাল জড়িয়েছেন। সকলেরই চুল ভিজে এলোমেলো, ঝোড়োকাকের মত অবস্থা।

সুমিতা বৌদিকে কিন্তু ভেজা অবস্থায় সাধারণ অবস্থার চেয়ে বেশী সুন্দরী দেখাচ্ছে। গালের দুপাশে অলকগুলো ভিজে কুঁকড়ে আছে। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চিবুক গড়িয়ে নাক বেয়ে জল নামছে। কোনো প্রসাধন নেই, কোনো আড়াল নেই। ঋজু শরীরে ভেজা পাইনের মত দেখাচ্ছে।

আরো বেশ কিছুক্ষণ চলার পর যশোবন্ত হাঁক ছেড়ে বলল, পৌঁছ গ্যায়া।

তাকিয়ে দেখলাম।

আমি যে ভারতবর্ষেই আছি, অন্য কোনো বহুল প্রচারিত সুন্দরীর দেশে নেই তা বুঝতে কষ্ট হল। পরমুহূর্তেই বুঝলাম, আমি ভারতবর্ষেই আছি এবং একমাত্র ভারতবর্ষেই এই নিসর্গ সৌন্দর্য সম্ভব। অন্য কোনো দেশে নয়।

গ্রামটা সমতল জায়গায় ইতস্তত ছড়ানো। বাড়িগুলো চতুষ্কোণ নয়, কেমন বেঢপ। যশোবন্ত বলছিল চতুষ্কোণ বাড়ি ওঁরাও-দের মতে মাঙ্গলিক নয়। সব কটি বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে একটি দোতলা বাড়ি চোখে পড়ল। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বন বিভাগের বাংলো বুঝি। শালের খুঁটির উপর দোতলা বাংলো। উপরে টালির ছাদ। বৃষ্টি ধোওয়া কোমল নয়নাভিরাম লাল রং। কৃষ্ণচূড়া ও ইউক্যালিপটাসের সারির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

আমাদের সাদারঙা কাঠের গেট খুলে ঢুকতে দেখেই একটি ছাই রঙা অ্যালসে-সিয়ান লাফাতে লাফাতে ডাকতে ডাকতে আমাদের দিকে ছুটে এলো।

সুমিতা বৌদি হাঁক দিল : মারিয়ানা, মারিয়ানা। প্রায় ডাকের সঙ্গে সঙ্গে বাং-লোর বারান্দায় একটি মেয়েকে দেখা গেল। পরনে একটি হালকা সবুজ শাড়ি। ভারি সুন্দর গড়ন। বারান্দার রেলিং-এ একবার হাত দুটো ছুঁইয়েই শরীরে দোলা দিয়ে আনন্দে কলকলিয়ে বলল, একী তোমরা এসে গেছ? পরক্ষণেই কাঠের পাটাতনে শব্দলহরী তুলে শরতাকাশের দ্রুত শ্বেতা-মেঘের মত মারিয়ানা সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নেমে এসে সুমিতাবৌদিকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'ঈস কী খারাপ। এতদিনে আসবার সময় হলো?'

সুমিতা বৌদি হেসে বললেন, বেশ বাবা বেশ, আমি খুব খারাপ, নইলে এই বৃষ্টিতে কাকের মতো ভিজে পোশাকে দেখতে আসি।

হুঁ। আমাকে দেখতে না আরো কিছু? এসেছো তো শিরিণবুরুর হাতী দেখতে।

যশোবন্ত কপট ধমকের সুরে বলল, 'আঃ মারিয়ানা, আমরা এসে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই ঝগড়া শুরু করলেন, দেখছেন না, সঙ্গে নতুন অতিথি আছেন? বলে আমাকে দেখালো।

মারিয়ানা বোধহয় সত্যিই আমাকে লক্ষ্য করেনি, এবং এখন যশোবন্ত বলতে হঠাৎ নবাগন্তুকের প্রতি চোখ পড়ল। মারিয়ানা হাত তুলে নমস্কার করল, আমি প্রতি নমস্কার করলাম।

মারিয়ানা সুন্দরী নয়, কিন্তু তার চোখ দুটি ভারী সুন্দর লাগল, মানে এত সুন্দর যে ওর চোখ ছাড়া অন্য কিছু না থাকলেও ক্ষতি ছিল না।

তখনো ভালো করে আলো ফোটেনি। কাঠের দরজার গায়ের ছোট বড় ফুটো দিয়ে খোলা রংয়ের আলোর আভাস এসে ঘরের অন্ধকারকে জোলো করছে।

বেশ শীত। শুয়ে শুয়ে শুনতে পাচ্ছি বাইরে বেশ হাওয়া বইছে। কম্বলটা বেশ ভাল করে টেনে কাঁধ ও গলার নীচ দিয়ে জড়িয়ে যথাসম্ভব আরাম করে আর একটি জবরদস্ত ঘুম লাগাবার চেষ্টা করলাম, যতক্ষণ না ভাল করে সকাল হয়। এমন সময় যশোবন্ত ওর ঘর থেকে উঠে এসে আমাকে এক ঠেলা মারল। বলল, কেয়া

সাহাব? চলিয়ে জেরা শিকার খেলকে আয়ে।

আমি বললাম, এই সুখশয্যা ছেড়ে আমি কোনোরকম শিকারে যেতেই রাজী নই। যশোবন্ত বিনা বাক্যব্যয়ে কম্বলটা এক-টানে মাটিতে ফেলে দিল এবং সিরিয়াস্‌লি বলল, দশ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে নাও।

নিরুপায়।

যশোবন্ত ওর রাইফেলটা নিয়েছে। আমার হাতে নয়া বন্দুক। হিমেল আমেজ ভরা হাওয়ায় পার্বত্য প্রকৃতি থেকে ভোর সুবাস বেরুচ্ছে। কোথায় শাল মুড়ি দিয়ে বসে কফি খেতে খেতে মেজাজ করব তা নয়, চলো এখন শিকারে। ভাগ্যিস মনে মনে বললাম কথাটা। যশোবন্ত শুনতে পেলেই লাফিয়ে উঠতো, বলতো, 'ওরে আমার মাখনবাবু।'

সুমিতা বৌদিরা ওঠেননি এখনো কেউ। বাবুর্চিখানার চিমনী থেকে ধুঁয়ো বেরুচ্ছে। আহা-হা বড় শীত। এক কাপ চা কিম্বা কফি খেয়ে বেরোতে পারলে বড় ভাল হত। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে লোভাতুর দৃষ্টি ফেলতে লাগলাম। মনের সাধ মনেই রইল। এমন সময় আমাদের দুজনকে চমকে দিয়ে রান্নাঘরের জানলা থেকে মারিয়ানা ডাকল। ওকি আপনারা চলেছেন কোথায় এই সকালে? যশোবন্ত বলল, কেন? আপনিই না কাল বললেন হরিণ না মেরে আনলে খাওয়া নেই। এমনভাবে অতিথি সৎকার করেন জানলে আগে কি আর আসতাম? মারিয়ানা হেসে বলল, না না ভাল হবে না কিন্তু। জল হয়ে গেছে। অন্ততঃ এক কাপ করে কফি খেয়ে যান। যশোবন্ত অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে আকাশ এবং ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আর বিরক্ত হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললো, তথাস্তু।

আমরা রান্নাঘরের বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কফি খেলাম, আগুনে একটু গরমও হয়ে নিলাম।

কফি খেতে খেতে বললাম, উইলফোর্স' বলে একটি কথা আছে তো। ইচ্ছার জোর যাবে কোথায়?

যশোবন্ত বলল, ভালোর জন্যেই বলছিলাম। খামোকা হয়রাণ হবে, শিকার মিলবে না—দেরি করে ফেললে। যা মাখনবাবুর পাল্লায় পড়েছি। মারিয়ানা একটি শাদা শাল জড়িয়েছে গায়ে, তাতে কালো কাশ্মিরী পাড় বসানো। আগুনের লাল আভা লাগছে ওর গালের একপাশে কপালে, অলকে। দুধেলি রাজহাঁসের গায়ে প্রথম ভোরের সোনালী আলো যেমন ছড়িয়ে পড়ে। মারিয়ানা হেসে বললে, ভদ্রলোককে এমন করে নাজেহাল কচ্ছেন কেন?

সমবেদনা জানিয়ে মারিয়ানা আমাকে আরো অপ্রতিভ করে তুলল।

কফির কাপ নামিয়ে রেখে আমরা রওয়ানা হলাম। মারিয়ানা বলল, গাড়ুয়া—গুরাং-এর বাম ঢালে নিশ্চয়ই যাবেন কিন্তু। আমার ইনফরমেশন পাক্কা। হরিণ পাবেনই।

একটি পাকদণ্ডী রাস্তা বেয়ে যশোবন্ত নিয়ে চলল আমাকে। আঁকাবাঁকা পায়েচলা পথ নেমে গেছে নীচে। দূরে নেতারহাটের মাথা-উঁচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে। বহু নীচে কোয়েলের আঁচল বিছানো।

পাখিরা সবে জেগেছে। শ্বাপদেরা সবে ঘুমুতে গেছে রাতের টহল শেষ করে। অশ্বাপদেরা সবে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে সারারাত সজাগ থাকার পর। ময়ূর ডাকছে। মোরগ ডাকছে থেকে থেকে। ছাতারেদের সম্মিলিত চীৎকার আর বনটিয়াদের কাকলি এই প্রভাতী হাওয়া মুখরিত করে রেখেছে। গাছে লতায় পাতায় তখনো শির শির করে হাওয়া বইছে—তখনো জলে ভেজা ঝরা ফুল, লতা-পাতায় পথপ্রান্তর ছেয়ে রয়েছে।

আমরা বেশ অনেকদূরে নেমে, একটি মালভূমির মত জায়গায় এলাম। সেখানে বড় বড় গাছ আছে, কিন্তু বেশী নয়। শাল সেখানে কম। বহেড়া, পাসন, পুইসার, গামহার ইত্যাদি গাছের ভীড়ই বেশী। কুল ও কেলাউন্দার ঝোপও আছে। যশোবন্ত পথের নজর করতে করতে চলেছে। নানা জানোয়ারের পায়ের দাগ।

ময়ূরেরা মাটি আঁচড়ে রয়েছে। সজারুদের গর্তও চোখে পড়ল। এক জায়গায় অনেকগুলো সজারুর কাঁটা কুড়িয়ে পেলাম। তার মধ্যে কিছু কাঁটা ভেঙে বেঁকে গেছে। যশোবন্ত বলল, হয় এখানে বাঘে কোন সজারু ধরেছে, নয়ত স্থানীয় কোন শিকারী সজারু শিকার করেছে।

গাড়ুয়া-গুরাং-এর ঢাল যে কোন্ দিকে তা যশোবন্ত জানে।

একটি বাঁক ঘুরতেই আমরা এক তাল তোবড়া সর্বস্ব হাতীর পুরীষের সামনে উপস্থিত হলাম। আশে-পাশের গাছের ডালপালা ভাঙা। যশোবন্ত বাঁ হাত দিয়ে সেই পুরীষে হাত ছুঁইয়ে দেখল। তারপর কেঁদ গাছের পাতায় হাত মুছতে-মুছতে বলল, এখনো গরম আছে দোস্ত, বেটারা একটু আগেই গেছে। বন-জঙ্গল ভেঙে নিজেদের রাস্তা নিজেরাই করে যেখান দিয়ে কোয়েলের দিক নেমে গেছে হাতীরা, আমরা তার বিপরীত মুখে চললাম। কারণ আমাদের আশু উদ্দেশ্য হরিণ শিকার। হাতীর দলের সামনে গিয়ে পড়া নয়।

আরও কিছু দূরে যেতেই যশোবন্ত বলল, 'বন্দুকে গুলী ভরো। ডান দিকে বুলেট, বাঁ দিকে এল-জি। চল, আমার আগে আগে চল, এমনভাবে পা ফেল যাতে একটুও শব্দ না হয়। শুকনো পাতা বাঁচিয়ে, শুকনো ডাল বাঁচিয়ে, আলগা পাথর বাঁচিয়ে।'

মিনিট পনেরো যাবার পর যশোবন্ত আমাকে মাটিতে বসে পড়তে বলল। গুরু-বাক্যানুযায়ী বসে পড়লাম। যশোবন্ত আমার পাশেই বসলো। বসে, একটি ঘন কেলাউন্দার ঝোপের পাশ দিয়ে কি যেন দেখতে লাগল।

এমন সময় একটি অতর্কিত আওয়াজ হল ব্বাক্ ব্বাক্। মনে হলো কোন অ্যাল-সেশিয়ান ডেকে উঠল। সেই সুহাগীর চড়ায় চড়ুইভাতির সময় শুনেছিলাম। ডাকটি অনেকটা সেই রকম। যশোবন্ত আঙুল দিয়ে আমাকে কাছে যেতে ইশারা করল। ওর কাছে গিয়ে দেখি দুটি ছাগলের চেয়ে বড় হরিণ পাহাড়ের উপরের ঢালে যেখানে কচি-কচি সবুজ ঘাস গজিয়ে উঠেছে, সেখানে মুখ নীচু করে ঘাস খাচ্ছে। দুটির মধ্যে একটি আমাদের বিপরীত দিকে পাহাড়ের খাদে কি যেন দেখছে আর ডেকে উঠছে। যশোবন্ত ফিস-ফিসিয়ে বলল, এল-জি দিয়ে মারো। আমি হাঁটু গেড়ে বসে এক সঙ্গে দুটি ট্রিগার টেনে দিলাম।

হরিণগুলো খুব বেশী দূরে ছিল না। তবু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একটি হরিণ আমার মতো শিকারীর গুলীতেই সঙ্গে সঙ্গে ওখানেই পড়ে গেল।

আনন্দে অধীর হয়ে আমি লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, অমনি যশোবন্ত আমাকে হাত ধরে টেনে বসালো।

অন্য হরিণটি এক দৌড়ে পাহাড়ে উঠছিল। মাঝে-মাঝে গাছ-পালার আড়ালে-আড়ালে তার শরীরের কিছু লালচে অংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। সেই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমাদের থেকে প্রায় দেড়শ গজ দূরে পেঁছে গেল এবং হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কান খাড়া করে আমাদের দিকে চাইল। সেই মুহূর্তে আমাকে সম্পূর্ণ হতবাক করে দিয়ে যশোবন্ত ওর থার্টি-ও-সিক্স রাইফেলটা এক ঝটকায় তুললো এবং গুলী করলো। এবং কি বলব, হরিণটা সার্কাস করতে করতে ডাল-পালা ঝোপ-ঝাড় ভেঙে প্রথম হরিণটা যেখানে পড়েছিল প্রায় তার কাছা-কাছি ডিগবাজি খেয়ে গড়াতে-গড়াতে পাহাড় বেয়ে এসে থেমে গেল।

লোকের মুখে শুনেছিলাম যশোবন্ত ভাল শিকারী। আজ সত্যিকারের প্রত্যয় হল। কত ভাল শিকারী সে।

আমি বললাম, তোমার রাইফেল কি যাদু করা? ও বলল, আরে ইয়ার যাদু হচ্ছে ভালোবাসার যাদু। রাইফেলকে যদি তেমন করে ভালোবাসো তবে রাইফেলও ভালোবাসবে তোমাকে।

ততক্ষণে পূবের পাহাড়গুলোর মাথার উপরের আকাশটায় একটু লালচে ছোপ লেগেছে। অবশ্য সামান্য জায়গায় মেঘও করেছে মনে হচ্ছে। যশোবন্ত ওর রাইফেলটা আমায় ধরতে দিয়ে, এগিয়ে চলল হরিণ-দুটোর কাছে।

প্রথম বন্দুকে প্রথম শিকার করে অত্যন্ত আনন্দ হয়েছিল এবং হয়ত গর্বও।

হরিণগুলোর কাছে গেলাম। দেখলাম আমার দুটি গুলীই লেগেছে। বুলেটটা বুকে লেগেছে—একটা রক্তাক্ত ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে বুকে। আর, এল-জি'র দানাগুলো সারা শরীরে ছিটানো রয়েছে। যশোবন্ত যে হরিণটা মেরেছিল তার কাছে গিয়ে দেখি রাইফেলের গুলী গলা দিয়ে ঢুকে একটি চার-পাঁচ ইঞ্চি পরিমিত গর্ত করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। জিভটা বেরিয়ে গেছে এবং মৃত হরিণটা দাঁতে জিভটা কামড়ে রয়েছে। দু চোখের কোণে দু' বিন্দু জল জমে আছে। এই দৃশ্য দেখে এক লহমায় আমার শিকারের শখ যেন উবে গেল। এত খারাপ লাগতে লাগল যে কি বলব।

যশোবন্তকে বললাম, আমাদের খাবার একটি হরিণই ত যথেষ্ট ছিল তবু তুমি অন্যটাকে মারলে কেন? ও ধমক দিয়ে বলল, নিজের পেট ভরালেই তো চলবে না; গাঁয়ের লোকেরা বড় গরীব। ওরা বছরে একদিন মাংস খায় কিনা সন্দেহ। ওরা খাবে। এদের জন্যে মারলম।

আমি তখন বেশ রেগে বললাম, তা বলে এরকমভাবে মারবে?

এবার যশোবন্ত আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল, বলল, তবে কিরকমভাবে মারবো? কশাইখানায় যখন পাঁঠা কাটে তখন পাঁঠার এর চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট হয়। খাসীকে যখন আড়াই প্যাঁচ দিয়ে জবাই করা হয় তখনো খাসীর এর চেয়ে বেশী কষ্ট হয়। অষ্টমীর দিন ভোঁতা রামদা দিয়ে যখন আনাড়ি লোক মোষের গলায় কোপের পর কোপ মারে তখনও মোষের এর চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট হয়। কষ্ট হয় মানেটা কি? একটি প্রাণ শেষ হবে, আর কষ্ট হবে না? তবে আমরা যেভাবে মারলাম এর চেয়ে কম কষ্ট দিয়ে জানোয়ার মারা সম্ভব নয়। যাদের এত কষ্টজ্ঞান তাদের শিকারে আসা উচিত না এবং শিকারের মাংস খাওয়াও অনুচিত।

আমার বক্তব্যটা ও মোটে বুঝতে পারে নি। তদুপরি এতগুলো রূঢ় কথা বলল। চুপ করে থাকলাম। মনে-মনে ঠিক করলাম আর কোনদিন শিকারে যাব না ওর সঙ্গে।

যশোবন্ত কোমরে ঝোলানো ছোরাটা দিয়ে একটি শলাই গাছের ডাল কাটল। তারপর ছুরি দিয়ে যে হরিণটিকে আমি মেরেছিলাম তার খুরের একটু উপরে চিরে দিল। সামনের দু পা এবং পেছনের পায়েও। তারপর পাতলা মাংসের ভেতর দিয়ে সেই কাঠিটা গলিয়ে দিল। ফলে হরিণটা চার পায়ে ঝুলে থাকল সেই কাঠে। যশোবন্ত আমার রুমালটা চাইল এবং নিজের খাকী-রঙা রুমালটাও বের করল। হরিণটাকে কাঠটির এক প্রান্তে ঝুলিয়ে তার আগে ও পিছনে রুমাল দুটি কষে বাঁধল, যাতে হরিণের পা হড়কে না যায়। তারপর অবলীলাক্রমে সেই তিরিশ-সেরী হরিণটিকে কাঁধে উঠিয়ে বক রাক্ষসের মত তর-তরিয়ে পাহাড় নামতে লাগল। আমাকে অর্ডার করলো, 'রাইফেল বন্দুকে গাছে-টাছে ধাক্কা না লাগে। আমার পেছনে-পেছনে পথ দেখে চলো।'

ঘোষদাকে দেখলে মনে হয় খাদ্যদ্রব্যের উপর লোভ থাকাতে অন্য অনেক জ্বালাময়ী রিপুর হাত থেকে উনি বেঁচে গেছেন।

আমরা সবাই ব্রেকফাস্টে বসেছি। মারিয়ানা ও সুমিতাবৌদি যদিও আমাদের সঙ্গেই খেতে বসেছেন তবু ওরা দুজনেই নিজেরা খাওয়ার চেয়ে আমাদের খাবারই তদ্বির করছেন বেশী।

যশোবন্ত এই এল হরিণের চামড়া ছাড়িয়ে। গাঁয়ের লোকদের পাঠিয়েছে গাড়ুয়া-গুরুং-এর ঢালে দ্বিতীয় হরিণটি নিয়ে আসতে। রাতে নাকি খুব জোর মহুয়া খাওয়া হবে এবং ভেজ্জ নাচা হবে।

যশোবন্ত আমার পাশে এসে বসল। তারপর চওড়া কব্জিওয়ালা হাত দিয়ে থাবা মেরে-মেরে খেত লাগল। ওর হাতে আমি হরিণের রক্তের গন্ধ পাচ্ছি। মারিয়ানাকে যশোবন্ত বলল, মাংসটাকে স্মোক করতে হবে। গ্যারেজ ঘরে কাউকে বলুন না বেশ কিছুটা শুকনো ডালপালা এবং খড় পাঠিয়ে দিক। সরষের তেল আর হলুদ আমি মাখিয়ে রেখে এসেছি।—'তা বলছি। আপনি আগে খেয়ে নিন তো। তারপর হবে।' মারিয়ানা বলল।

সুমিতাবৌদি বললেন, তাহলে লাল-সাহেব হরিণ শিকার হল। গুরুর নতুন চেলা।

যশোবন্ত কোঁৎ কোঁৎ করে দুধ গিলতে গিলতে বলল, এমন চেলা হলে গুরুর জাত যেতে বেশী দেরী নেই। চেলা, মরা হরিণ দেখে মেয়েদের মত কাঁদে।

সুমিতাবৌদি হি-হি করে হেসে লুটিয়ে পড়লেন। বললেন, এ মাঃ তুমি কি সত্যি কেঁদেছ?

ঘোষদা বললেন, কাঁদবেই ত! কোন ভদ্র-লোক এমন করে নিরাপরাধ পশুকে মারে?

যশোবন্ত বলল, মারিয়ানা, ঘোষদার পাতে আজ এক টুকরো মাংসও যদি পড়ে ত খুব খারাপ হবে কিন্তু।

খাওয়ার সঙ্গে কি আছে? খাওয়ার জিনিস খাবে না? তবে মারামারি আমি পছন্দ করি না।

মারিয়ানা কিন্তু একটি কথাও বলল না। ও শুধু আমার দিকে তাকাল একবার।

(ক্রমশঃ)
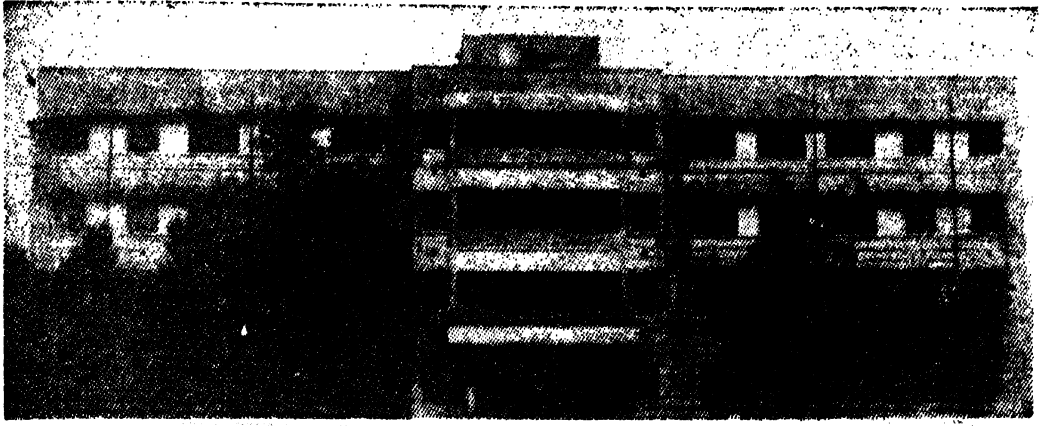
মানুষ গড়ার ইতিকথা

"সে আজ পঞ্চাশ বছরেরও আগেকার কথা। হাওড়া কাসুন্দিয়াপাড়ার দুটি তিনেক ছেলে সবে কলেজমুখো পা বাড়িয়েছে। সেই সময় তাদের খেয়াল হলো একটু সদগ্রন্থাদি পাঠ করার। দু-চারখানা ঠাকুর-স্বামীজীর বইও জুটে গেল। এই নিতান্তই অনাড়ম্বর সূচনা থেকে কালে এক সুবৃহৎ লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের ঘটলো আবির্ভাব। একে একে মাথা তুলে দাঁড়াল আশ্রম, স্কুল প্রভৃতি। এ যেন সত্যিই বালসুলভ চপলতার বশে কোন ছোট ছেলের হাতের ছোট্ট ছুরিখানি দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে সহসা এক উৎস-মুখ খুলে ফেলা গোছের ব্যাপার ঘটে গেলো।" ওপরের লাইনকটি আমি সংগ্রহ করেছি হাওড়ার রামকৃষ্ণ-বিবেকান্দ আশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক পুস্তিকায় প্রকাশিত স্বামী সন্তোষানন্দের আশীর্বাণী থেকে। মহারাজ নিজে ব্যাপারটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন বলেই হয়তো 'দুটি তিনেক ছেলের' আদর্শনিষ্ঠ সংগ্রামী মনোভাবের মধ্যে 'বাল-সুলভ চপলতা' খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু যে চপলতা বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের জন্মদাতা তাকে আমরা নিছক খেয়াল-খুশী বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। পারি না বলেই তার একবার আমাদের অতীতে ফিরে যাওয়া দরকার।

প্রথম মহাযুদ্ধ তখন রীতিমত জমে উঠেছে। খুরুট কাসুন্দিয়ার তিন বন্ধু শশাঙ্ক, ফণী ও ভরত তখন ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই তিনবন্ধু ধর্মচর্চা করতেন। ধর্মগ্রন্থ পড়া ছাড়াও তাঁরা নিয়মিত যেতেন বেলুড় মঠে। মঠের সন্ন্যাসী মহারাজের উপদেশে তাঁদের মনে দেশসেবার উদ্দীপনা জেগে ওঠে। ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁরা দেশের কাজে। কোন অভিজ্ঞতা নেই। সম্বল শুধু ঠাকুর ও স্বামীজীর উপদেশামৃত ও অপরিমিত যৌবন। কুছ পারোয়া নেই, কারণ তাঁরা জানেন ঠাকুর চিরদিনই সৎকার্যের সহায়।

তারাচাঁদ পল্লে লেনে ফণীদের ভাড়াবাড়ী। ফি রোববার সমমনোভাবাপন্ন বন্ধুদের জুটিয়ে ঐ বাড়ির ছাদে বসে এঁরা ধর্মালোচনা করতেন। শশাঙ্কর বাবা ছিলেন সে আমলের রিপন কলেজিয়েট স্কুলের (বর্তমান হাওড়া অক্ষয় শিক্ষায়তন) হেড-পণ্ডিত মহাধ্যাপক রাখালদাস বিদ্যারত্ন। শশাঙ্কশেখর বাবাকে না জানিয়ে নিজের শোবার ঘরে রামকৃষ্ণের পট বসিয়ে নিয়মিত পুজো-আচ্চা শুরু করে দিলেন। ঐ ঘরের কুলুঙ্গিতে খান কয়েক ধর্মগ্রন্থ ছিল। এঁরা নিজেরাই সংগ্রহ করেছিলেন। ঐ পট ও কুলুঙ্গি মিলিয়ে এই ঘরই হোল এঁদের আশ্রম কাম লাইব্রেরী। পুজোপাঠ ও গ্রন্থপাঠ দুই চলল সমানে।

শশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য, ফণী দে ও ভরত বন্দ্যোপাধ্যায়—তিনবন্ধুর ব্যাপার-স্যাপার আরো অনেকেরই ভালো লেগে গেল। একে একে পান্না সরকার, সুনীল মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, গোর-মোহন সাঁতরা ও নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় এসে জুটলেন। সবারই খুব ভাল লেগেছে। তখন সবাই মিলে ঠিক করলেন যে তাঁদের এই ভালো লাগাটুকু স্থায়ী করবার জন্য একটা আশ্রম গড়বেন। প্রাথমিক পর্যায়ে শশাঙ্কশেখরের বাড়ী হল আশ্রমের ঠিকানা। উদ্দেশ্য, ঠাকুর-স্বামীজী নির্দেশিত পথে চরিত্র গঠন ও লোকসেবা। এইভাবেই গড়ে উঠল আজকের বিখ্যাত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই আশ্রম গড়ে ওঠে এবং শুরু হয়ে যায় তার কাজ।

গোড়াতেই এরা হাত দিলেন একটি নাইট স্কুল গড়ার কাজে। কেন প্রথমেই স্কুল খোলার দিকে এদের নজর গেল তার কারণ জানতে হোলে সবার আগে জানা দরকার আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে খুরুট কাসুন্দিয়া পল্লীর প্রকৃত অবস্থা। তখন 'এখানে লোকজনের বাস ছিল অল্প। এখন আশ্রম যে স্থানটিতে, সেই স্থানটি এবং তার আশপাশের অঞ্চলগুলি বন-জঙ্গলে ভর্তি। গোপাল মুখুজ্যের বাড়ী পর্যন্ত ইলেকট্রিক লাইট ছিল—তার এধারে অর্থাৎ আশ্রমের দিকটায় রাত্রিতে মোড়ে মোড়ে টিমটিমে তেলের আলো জ্বলত। তার উপরে এ অঞ্চলে মাতালের খুবই উৎপাত ছিল।'

গোটা তল্লাটে সে সময়ে বলতে গেলে শিক্ষার কোনরূপ পরিবেশই ছিল না। 'শিক্ষায় ও সংস্কৃতির দিকে থেকে এই পল্লী ছিল অনগ্রসর। পল্লীর স্থানে স্থানে সম্পন্ন ও শিক্ষিত দুই-এক ঘর বাসিন্দা ছিল বটে কিন্তু অধিকাংশ অধিবাসীই নিম্নবিত্ত ও অশিক্ষিত। একটি ছেলেদের পাঠশালা ও একটি মেয়েদের পাঠশালা এবং সরস্বতী ইনস্টিটিউশন নামে প্রাথমিক বিদ্যালয়—এই ছিল পল্লীর প্রধান শিক্ষা-ব্যবস্থা। সম্পন্ন বা শিক্ষিত বাড়ীর ছেলেরা অধিকাংশই যেত বেশ দূরে রিপন (রিপন কলেজিয়েট স্কুল), বাটরা (বাটরা মধুসূদন পালচৌধুরী ইনস্টিটিউশন), বেলিলিয়স (আই আর বেলিলিয়াস ইনস্টিটিউশন) বা জিলা (হাওড়া জিলা) স্কুল।'

সরস্বতী ইনস্টিটিউশনে সে সময়ে রাতের বেলায় একটি স্কুল বসত। শুরুতে এই স্কুলটিতেই এঁরা যোগদান করলেন। কিন্তু শীগগিরই টের পেলেন যে স্কুলের

বিবেকানন্দ ইনসটিটিউশন

কর্মকর্তারা এদের আদর্শ রূপায়ণে যতটা না আগ্রহী তার চেয়ে ঢের বেশী নজর তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে। নবীন সন্ন্যাসীরা ঐ স্কুল ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই তখন আর একটা নাইট স্কুল গড়ে তুললেন। স্কুলটি বসত ৩৯ কাসুন্দিয়া রোডে। এই বাড়ি তখন একই সঙ্গে নাইট স্কুল ও আশ্রমের অফিসে পরিণত হোল।

দেখতে দেখতে চারটে বছর কেটে গেল। চার বছরে এঁদের কাজ ও কর্মীর সংখ্যা বেড়েছে বহুগুণে। নাইট স্কুল ছাড়াও লাইব্রেরী ও অনাথ ভাণ্ডার তখন এঁরা চালাচ্ছেন। ইতিমধ্যে আশ্রম প্রতিষ্ঠার মুখে মুখে এঁদেরই যে সব ছোট ছোট ভাই স্কুলে পড়ত তারা গ্র্যাজুয়েট হয়ে দাদাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যাচে এলেন গোবর্ধন বাগ, কেশবলাল চট্টোপাধ্যায়, মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ দাস, সাধনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ দাস ও সুধীরকুমার চৌধুরী।

এতদিন সবাই যে যার বাড়িতে থেকে আশ্রমের কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছিলেন। সেকেণ্ড ব্যাচের ছেলেরা আসতেই এঁদের মাথায় ঢুকল—আশ্রম যখন গড়েছি তখন সবাই মিলে আশ্রমে বাস করলে কেমন হয়? যেমন ভাবা তেমনি কাজ। ঠিক হল একটা বড় বাড়ী ভাড়া নেওয়া হবে। ভাড়া তো নেওয়া হবে, কিন্তু টাকা আসবে কোথা থেকে? একটা পয়সা আয় নেই এঁদের। দু-একজনের টিউশনী সম্বল। তবু পেছপা হোলেন না। মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়ায় ৬৯ নবীন সেনাপতি লেনে ছখানা কুঠরীওয়ালা একটা বড়সড় দোতলা বাড়ী (ভূতের বাড়ী নামে এটি এ অঞ্চলে পরিচিত) ভাড়া করে ফেল্লেন। এই বাড়ীতেই কাসুন্দিয়া রোড ছেড়ে আশ্রম উঠে এল এবং অনেক কর্মীই আশ্রমে বসবাস শুরু করলেন। ১৯২২ সালের মাঝামাঝি সময়ের কথা এসব।

আশ্রমে বাস করলেই হবে না। জীবিকার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু চাকরী করা মানেই তো ইংরেজের গোলামী করা—তা সবারই না-পসন্দ। কি করা যায়? কে দেবে পথ-নির্দেশ? তখন এঁদের কয়েকজন গেলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছে—বলে দিন আমরা কি করব? সব শুনে আচার্য তো বেজায় খুশী—বলিস কি রে, বি-এ পাশ অথচ চাকরী করবি না? ঠাট্টা করে বললেন—তোদের এক-একজনার বাজার দর তো আড়াই হাজারের কম নয়। তারপর যাচাই করে নেওয়ার জন্য আদেশ করলেন—জামা খোল, শরীর দেখি। আশ্রমিকদের ব্যায়ামপুষ্ট মজবুত শরীরে বেশ জোরে জোরে গোটা কয়েক কিল মেরে বললেন তোরা স্বাধীন ব্যবসা কর। পোলট্রি কর, ডেয়ারী খোল।

কিন্তু পোলট্রি বা ডেয়ারী করা আর হোল না। হঠাৎ সব ওলট-পালট হয়ে গেল। বাইশ সাল। এ সময়ে সরস্বতী ইনস্টিটিউশনের প্রায় উঠে যাওয়ার অবস্থা। তার সম্পত্তির মধ্যে ছিল গোটা কয়েক বেঞ্চ, দু একটা চেয়ার, টেবিল এবং একটা ঘণ্টা, কয়েকটি ব্ল্যাকবোর্ড, দুটো ঝোলানো হ্যারিকেন, গুটি পঞ্চাশেক ছেলে এবং ভাড়া করা ঘর। কিছু বকেয়া ভাড়াও সেই সঙ্গে। স্কুলের কর্তৃপক্ষ বললেন, যে সব ছোকরারা আশ্রম করে দেশোদ্ধার করছে, তারা যদি পারে তো স্কুল চালাক।'

প্রস্তাব শুনে আশ্রমে মিটিং বসল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলল মিটিং। অনেক তর্ক-বিতর্কের শেষে স্কুলের দায়িত্ব নেওয়াই স্থির হোল। এ ব্যাপারে যিনি সর্বদাই কর্মীদের মনে উৎসাহ জুগিয়েছেন তিনি হলেন বেলুড় মঠের জ্ঞান মহারাজ। মহারাজের পরামর্শে স্কুল চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হোলেও চূড়ান্ত নির্দেশের জন্য আশ্রমের কর্মকর্তারা গেলেন বেলুড় মঠে স্বামী শিবানন্দের কাছে। সব শুনে শিবানন্দ বললেন—ব্যবসা-ট্যাবসা হবে না। তোমরা স্কুলটাকেই ভালভাবে গড়ো। এতে ভাল কাজ করাও হবে আবার স্বামীজীর আদর্শ অনুযায়ী জনসেবাও করা যাবে। স্বামী শিবানন্দের আদেশ শিরোধার্য করে স্কুল চালানোর দায়িত্ব পালনে ব্রতী হোলেন নবীন সন্ন্যাসী দল।

স্কুল তখন ছিল ডুমুরতলায় ১২৩ কাসুন্দিয়া রোডে। খান তিনেক ছোট ছোট পাকা ঘর, একটি চালা ও একটি ঘেরা বারান্দা, এতেই ক্লাস বসত। স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রামকৃষ্ণপুরের দুলাল চক্রবর্তী। স্কুলের পোষাকী নাম সরস্বতী ইনস্টিটিউশন হোলেও লোকে বলত দুলাল মাস্টারের স্কুল। এই দুলাল মাস্টারের স্কুলেই বর্তমান বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের হেডমাস্টার সুধাংশুবাবু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কিছুদিন পড়েছিলেন। ঠিক করে কখন দুলাল মাস্টার এই স্কুল খুলেছিলেন সে প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে না পারলেও সুধাংশুবাবুর ধারণা বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের শুরুতেই দুলাল মাস্টার এই স্কুল খুলেছিলেন। দুলালবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে সতীশ চক্রবর্তী হলেন স্কুলের হেডমাস্টার। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আভ্যন্তরীণ ঝগড়ার ফলে সতীশবাবু সরস্বতী ইনস্টিটিউশন ছেড়ে দিয়ে সাকুলার রোডে সাহাদের বাড়ীতে আর একটি স্কুল খোলেন—বীণাপাণি ইনস্টিটিউশন। সতীশবাবু ছেড়ে দেওয়ার পর প্রায় বছর সাতেক এই স্কুল চালিয়েছেন মন্মথ চক্রবর্তী, হারান মিত্র, বিশ্বনাথ বাড়ুজ্যে প্রমুখ কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা। তাঁরাই শেষ পর্যন্ত আশ্রমের হাতে তুলে দিলেন স্কুলের দায়-দায়িত্ব সব।

আশ্রম যে বছর দায়িত্ব নেয় সে বছর কুল্যে বাহান্নটি ছেলে পড়ত স্কুলে। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ানো হোত। দায়িত্ব পেয়ে আশ্রম ঝেড়েপুঁছে নতুন করে স্কুল গড়ে তোলার কাজে মন দিল। কেশবলাল চট্টোপাধ্যায় হলেন স্কুলের সেক্রেটারী, ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় হেডমাস্টার। ইন্দুবাবু, কেশববাবুর সঙ্গে মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাগ, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, গৌরমোহন সাঁতরা স্কুলে পড়াতে শুরু করলেন। এদের প্রায় কেউই কোন মাইনে পেতেন না। মাইনে পাওয়া দূরে থাক স্কুলের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এদের অনেককেই প্রাইভেট টিউশনী করতে হোত। ক্লাস রুম পরিস্কার করা থেকে বেল বাজানো সব কাজই করতেন মাস্টারমশাইরা। পাড়ার বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে অভিভাবকদের বলে কয়ে ছাত্র যোগাড় করতেন। অধিকাংশ ছাত্র আসত অতি দরিদ্র সব পরিবার থেকে। মাসে দেড় টাকা, দু টাকা টিউশন ফি। তাই অনেকের দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে আশ্রম থেকে বই খাতা দেওয়া হোত। অথচ আশ্রমেরই বা তখন আয় কোথায়?

আয় নেই, অথচ ব্যয় প্রচুর। তার ওপর আবার এক নতুন বিপদে পড়ল আশ্রম। অনাদায়ী বাড়ীভাড়া (যা কিনা পূর্বতন পরিচালকরাই বাকী রেখে গিয়েছিলেন) আদায়ের জন্য বাড়ীওয়ালা স্কুলের সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষকের নামে মামলা ঠুকে দিলেন। সে এক নিদারুণ অসহায় অবস্থা। অনেক কষ্টে চেয়ে চিন্তে যখন বাড়ীভাড়ার টাকা কটা যোগাড় হোল, তখন দেখা গেল, নেওয়ার লোক নেই। বাড়ীওয়ালা মারা গেছেন।

এরই মাঝে আশ্রম স্কুলের নাম পাল্টে রাখল বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন, তেইশ সাল। সে বছরই ক্লাস সিক্স খোলা হোল স্কুলে। গোড়া থেকেই একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে স্কুল চালানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন নবীন সন্ন্যাসীরা। চরিত্র গঠন ও লোকসেবা ছাড়াও তাঁদের ইচ্ছা ছিল স্থানীয় একটি প্রধান সমস্যা, হাইস্কুলের অভাব মেটানো। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা স্কুল চালাচ্ছিলেন।

এদিকে বছর বছর ক্লাস বাড়ছে, ছাত্রসংখ্যাও বাড়ছে স্কুলের। শিক্ষকদের পড়ানোর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে গোটা তল্লাটে। বহু ঘর থেকেই ছেলেরা আসছে। এত ছেলের জায়গা হয় না ডুমুরতলার বাসায়। তাই কয়েকটা ক্লাস নিয়ে যাওয়া হোল আশ্রমে, ভূতের বাড়িতে। দু-একটি ক্লাস বসত স্কুল-বাড়ীর পিছনে প্রফুল্ল মুখুজ্জেমশায়ের সদর দালানে। খানতিনেক বাড়ীতে ছড়ানো স্কুল। তাই ক্লাসের ঘণ্টা খুব জোরে জোরে বাজানো হোত যাতে মাস্টারমশাইরা শুনতে পেয়ে এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে তাড়াতাড়ি যেতে পারেন।

খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। ছাত্র বাড়ছে অথচ জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না। তিন-তিনটে বাড়ীতে ছুটে ছুটে হয়রান হয়ে পড়ছেন মাস্টারমশাইরা। এবার একটা কিছু করা

দরকার। অনেক খুঁজে পেতে সার্কুলার রোডের ওপর একটা বাড়ী পাওয়া গেল। বেশ বড়সড়। দুমহলা বাড়ী। লোকে বলত সূর্য ডাক্তারের বাড়ী। অনেকদিন ধরে পড়েছিল, ভাড়াটে জুটছিল না। বেশ কয়েক বছর আগে এখানেই হয়েছিল প্লেগের হাসপাতাল। তাই আর কেউ আসতে চায় না। ভূতের ভয়। এরা স্থির করলেন ঐ বাড়ীই নেবেন। সব ঠিকঠাক। যেদিন সকালে কাগজপত্রে সই হবে সেদিন দেখা গেল কলকাতার কটন স্কুল ও বোর্ডিং এসে বাড়ীটা দখল করে বসেছে।

সবাই হতাশ হয়ে পড়লেন। হতাশ হোলেও, ভেঙে পড়েন নি। আবার নতুন করে বাড়ী খোঁজা শুরু হোল। শেষ পর্যন্ত বাড়ী একটা খুঁজেও বার করলেন। ১০৭ খুরুট রোডে ভিষক নিবাস। এই এলাকার নামী ডাক্তার সতীশরণ মিত্র থাকতেন এই বাড়ীটিতে। মিত্রমশাই হঠাৎ মারা যাওয়ায় বাড়ীটি খালি হোল। কেশববাবু, ইন্দুবাবুরা গিয়ে বাড়ীওয়ালাকে ধরে করে রাজী করালেন। বাড়ীভাড়া ঠিক হোল মাসিক পচাঁত্তর টাকা। হাওড়া শহরের প্রায় মাঝখানে এই দোতলা বাড়ীটি পেয়ে মাস্টারমশাইরা হোলেন দারুণ খুশী।

এদিকে আশ্রমের তখন নাভিশ্বাস উঠেছে। একদিকে ভূতের বাড়ীর ভাড়া মেটাতেই প্রাণান্তকর অবস্থা, তার ওপর আবার এই নতুন দায়। অথচ দায় মেটানোর ক্ষমতাই নেই আশ্রমের। তাই ভূতের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে স্কুলের সঙ্গে আশ্রমও উঠে এল ভিষক নিবাসে, চব্বিশ সাল। সে বছর ক্লাস সেভেন খোলা হোল স্কুলে।

আশ্রমের তখন একটিই উদ্দেশ্য—বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনকে একটি হাই-স্কুলে পরিণত করতে হবে। তার জন্য চাই একটি ভাল বাড়ী, স্কুল পরিচালনার দায়িত্ববহনক্ষম উপযুক্ত একটি কমিটি ও কিছু সঞ্চিত অর্থ। তাহলেই মিলবে বাঞ্ছিত অ্যাফিলিয়েশন। ভিষক নিবাস বাড়ি সমস্যার সমাধান করেছে। স্কুল কমিটির সদস্য হতে স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই রাজী হলেন। কিন্তু রিজার্ভ ফাণ্ডের কি হবে? ইউনিভার্সিটি স্পষ্ট জানিয়ে দিল উপযুক্ত পরিমাণ সঞ্চিত অর্থ দেখাতে না পারলে অনুমোদন মিলবে না। অথচ টাকার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়—তিনটি হাজার টাকা। কোথায় পাবে স্কুল? কে দেবে? শেষ পর্যন্ত এই চূড়ান্ত সমস্যাটির সমাধান করলেন স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট রায়সাহেব উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। রায়সাহেবের অনুরোধে রায়বাহাদুর সেডমল ডালমিয়া স্কুলের রিজার্ভ ফাণ্ডের জন্য দু হাজার পাঁচশো এক টাকা দান করলেন। এই টাকাতেই স্কুলের রিজার্ভ ফাণ্ড গড়ে উঠল এবং সেই সঙ্গে স্কুলও পেল ইউনিভার্সিটির অনুমোদন, ছাব্বিশ সাল। তখন স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা শিশুশ্রেণী ধরে তিনশোরও বেশী।

দু বছর বাদে স্কুলের ছেলেরা প্রথম ম্যাট্রিক দিল। আটাশ সালে মোট ছটি ছেলেকে পাঠানো হয় পরীক্ষা দিতে। পাশ করেছিল ছজনই। শুরুতে ফলাফলের যে উজ্জ্বল ঐতিহ্য প্রথম ব্যাচের ছেলেরা রচনা করেছিল, পরবর্তী একচল্লিশ বছরে কখনো তা ক্ষুণ্ণ হয়নি। শিক্ষকরাই ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। গোড়ায় যে ছজন মিলে এই স্কুল চালানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তী সময়ে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন আরো অনেক তরুণ আদর্শবাদী শিক্ষক। এসেছেন একে একে বিভূতিভূষণ দাস, নিরঞ্জনকুমার বসু, হারাণচন্দ্র দাস, বিপিনবিহারী বসু, পণ্ডিত ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ফণীভূষণ চ্যাটার্জী, যুগলকিশোর দাস, রাধাকান্ত মল্লিক, হিমাংশুশেখর ভট্টাচার্য ও সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য। শেষোক্ত দুজনই আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা শশাংকশেখরের ভাই। মেজ সুধাংশু ও ছোট হিমাংশু দু ভাই বত্রিশ সালে স্কুলে জয়েন করলেন। তখন স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা প্রায় সাতশোর কাছাকাছি। বর্ধিত ছাত্রসংখ্যার স্থান সংকুলানের জন্য ঐ বছরই স্কুল নিজের খরচে দোতালা ভিষক নিবাসকে তেতালায় পরিণত করল।

ত্রিশের যুগ স্কুলের ইতিহাসে এক সুবর্ণ অধ্যায়। শুধু পরীক্ষার ফলাফলের দিক থেকেই নয় সব দিক দিয়েই বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন তখন হাওড়ার অন্যতম সেরা স্কুল। যে সময়ে স্কুলে দূরের কথা বৃহত্তর জাতীয় ক্ষেত্রে আমাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকৃত হয় নি, সেই সময়ে ১৯৩১ সালে এই স্কুলে ছাত্রদের ইউনিয়নের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। স্কুলের ডিসিপ্লিন বজায় রাখার দায়িত্ব ছিল ছাত্রদেরই।

শুধু যে ছাত্রদের স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়া হয়েছিল তাই নয়, বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করার প্রাথমিক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে দৈহিক ব্যায়ামের চর্চাও শুরু হয় ত্রিশের যুগের শুরুতেই। সে যুগের বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ রাধাকান্ত মল্লিক উনত্রিশ সালে বিবেকানন্দ স্কুলে জয়েন করেন। রাধাকান্ত পনেরো বছর এই স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর সস্নেহ যত্নে ও সেবায় স্কুলের ব্যায়াম বিভাগটি দৃঢ় বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফুটবল, ক্রিকেট, হকির পাশাপাশি ব্যায়াম ও ড্রিলে চৌখশ হয়ে ওঠে স্কুলের ছেলেরা। 'বিবেকানন্দ স্কুলের ড্রিল ছিল এক দেখবার মত জিনিষ। মাঠের এক কোণে দাঁড়িয়ে রাধাকান্ত মল্লিক কম্যান্ড করতেন আর ঘড়ির কাঁটার মত তারই অনুসরণ করে অনুগত ছাত্র-সৈনিকের দল একে একে দেখাত স্কোয়াড, সেকশন, ক্যালিসথেনিকস, ওয়ান্ড, পোল, ডাম্বেল, ক্লাব, লেজিম, ইত্যাদি অজস্র অসংখ্য ধরনের ড্রিল।' সুবিখ্যাত বুকানন ট্রেণিংয়ের জনক জেমস বুকানন বিবেকানন্দ স্কুলের ড্রিল দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে মন্তব্য করেছিলেন: 'যে পরিমাণ সুক্ষ্মতার সঙ্গে এ ধরনের ব্যায়ামগুলি পর পর অনুষ্ঠিত হোল তা এককথায় অসাধারণ ও উচ্চ মানের শিক্ষকতার পরিচায়ক।'

রাধাকান্তবাবু আসার দু বছর আগেই বয়েজ স্কাউটও চালু হয়েছে স্কুলে। ১৯২৭ সাল। ঐ বছরই প্রথম স্কুলের ম্যাগাজিন জাগরণ প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশের পর থেকেই পত্রিকাটি স্কুলের নাম ধারণ করেই প্রকাশিত হতে থাকে। এই ম্যাগাজিনের পাতাতেই জাগরিত হয়েছে এ যুগের দুটি জোরালো কলমের কুসুমকলি। মণিশংকর মুখোপাধ্যায় বললে অনেকেই হয়তো চিনবেন না, অথচ শংকর নামে প্রতিটি সাহিত্যপাঠকের পরিচিত লেখকটি একদিন ছিলেন এই স্কুল ম্যাগাজিনেরই সম্পাদক। অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসুরও সাহিত্যিক-জীবনের সূচনা এই ম্যাগাজিনের পাতাতেই। কিন্তু সেসব অনেক পরের কথা।

ইতিমধ্যে উনচল্লিশ সালে স্কুল কমিটির সঙ্গে বিরোধের ফলে দীর্ঘ সতেরো বছর প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব বহন করে শেষ পর্যন্ত ইন্দুবাবু নিজে আর একটি স্কুল

(রামকৃষ্ণ শিক্ষালয়) খুলে চলে গেলেন। তাঁর জায়গায় নতুন হেডমাস্টার হয়ে এলেন নন্দলাল চক্রবর্তী। চক্রবর্তীমশাই মাত্র একটি বছর ছিলেন এই স্কুলে। চল্লিশ সালে তিনিও বিদায় নেন। তখন ম্যানেজিং কমিটি স্কুলেরই অন্যতম সহকারী শিক্ষক সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্যকে হেডমাস্টার পদে নিযুক্ত করেন। গত ঊনত্রিশ বছর ধরে সুধাংশুবাবু বিবেকানন্দ স্কুলের হেডমাস্টারের দায়িত্ব বহন করছেন। ছাব্বিশ বছর বয়সে যে মানুষটি বিবেকানন্দ স্কুলের সহকারী শিক্ষকপদে যোগদান করেছিলেন, আজ তারই বয়স তেষট্টি। এই সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ শিক্ষকের কাছে বসে সেদিন শুনেছি বিবেকানন্দ স্কুলের আদিযুগের ইতিহাস ও বর্তমানের কাহিনী।

চল্লিশ সালে সুধাংশুবাবু দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সে বছরই বিবেকানন্দ স্কুলের ছাত্র অজয়শঙ্কর ভাদুড়ী ডিসট্রিক্ট স্কলারশিপ পান (এর আগে এদেরই ছাত্র শান্তিপ্রসাদ মল্লিক চৌত্রিশ সালে ডিভিশনাল স্কলারশিপ পেয়েছিলেন)। তখন স্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় দু'শর কাছাকাছি। এই বছরই স্কুল তার বর্তমান ঠিকানায় (৭৫ এবং ৭৭ স্বামী বিবেকানন্দ রোড) ছেলেদের খেলার মাঠের জন্য প্রায় এক একর জমি কেনে।

পরের বছর ডিসেম্বর মাসে স্কুল ও আশ্রম হারাল তাদের অন্যতম অকৃত্রিম সুহৃদ ও প্রতিষ্ঠাতা ফণী দে-কে। ফণীবাবুর মৃত্যুর ঠিক তিন বছর বাদে একই বছরে পর পর মারা যান অন্যতম প্রধান দুই শিক্ষক গৌরমোহন সাঁতরা ও রাধাকান্ত মল্লিক। সেই বছরই মারা গেলেন স্কুলের সভাপতি ব্যারিস্টার শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এত বিপর্যয়ের মধ্যেও কিন্তু স্কুল তার ফলাফলের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। পঁয়তাল্লিশ সালে এদেরই ছাত্র প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ম্যাট্রিকে সেভেন্থ স্ট্যান্ড করেন। পাঁচ বছর বাদে বিবেকানন্দ স্কুলের ছাত্র দেবীচরণ খান ম্যাট্রিকে প্রথম স্থান অধিকার করে সারাদেশে ছড়িয়ে দিলেন তাঁর স্কুলের সুনাম। এই চল্লিশের যুগেই বিবেকানন্দ স্কুলের ছাত্র ছিলেন স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু, অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও আজকের খ্যাতিমান সাহিত্যিক শংকর।

পঞ্চাশের যুগের মাঝামাঝি সময়ে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এল বিপুল পরিবর্তন। সাতান্ন সালে হায়ার সেকেন্ডারী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার সময় হাওড়া শহরে যে একটি স্কুল প্রথম আপগ্রেডেড হয় সেটি হোল এই বিবেকানন্দ স্কুল। হিউম্যানিটিজ, সায়েন্স ও টেকনিক্যাল তিনটি স্ট্রীম নিয়ে চালু হোল হায়ার সেকেন্ডারী ব্যবস্থা। একষট্টিতে খোলা হয়েছে কমার্স সেকশন।

নতুন ব্যবস্থা শুরু হওয়ার দু বছর আগেই কিন্তু স্কুলের নিজস্ব বাড়ী তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেছে। চল্লিশ সালে কেনা শিবতলার জমিতে পঞ্চান্ন সালে স্কুলের বাড়ীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। সাতান্ন সালে দোতালার কাজ কমপ্লিট হতে খুরুট রোডের তেত্রিশ বছরের আস্তানা ছেড়ে স্কুলের একটা অংশ (ক্লাস নাইন ও টেন) উঠে এল নিজস্ব ভিটেয়। বাকী অংশ সেদিন পর্যন্ত বসেছে খুরুট রোডের ভাড়া বাড়ীতে। ইতিমধ্যে সাতান্ন সালে স্কুল আরো প্রায় দেড় একর জমি কিনেছে নিজস্ব অস্তানার গায়ে। ষাট সালে দোতলা মাল্টিপারপাস ব্লক চারতলা হতে ক্লাস এইট থেকে ইলেভেন পর্যন্ত চারটি ক্লাসই বসতে শুরু করে এই বাড়ীতে। আট বছর বাদে মেন বিল্ডিংয়ের অদূরে উঠল স্কুলের আর একটি একতলা বাড়ী। নতুন বাড়ীটির প্ল্যান চারতালার। বর্তমানে উঠেছে শুধু একতালা। ক্লাস ওয়ান টু সেভেন এই বাড়ীতে বসছে আটষট্টি সাল থেকে। খুরুট রোডের পাট চুকে গেছে সেই থেকে।

আজ বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদ্যালয়। দু-দুটো বাড়ী, সংলগ্ন খেলার মাঠে আজ সকাল সন্ধ্যে দাপাদাপি করে বেড়ায় হাওড়া শহরের চৌদ্দশ তরতাজা কুসুম কোমল প্রাণ। শুধু সেকেন্ডারীরই ছাত্র-সংখ্যা প্রায় হাজারের কাছাকাছি। পঁয়তাল্লিশজন শিক্ষক আজ পড়াচ্ছেন মাধ্যমিক বিভাগে। স্কুলের আর্থিক ভাবনাও আজ অনেকটা মিটেছে। বাষট্টি সাল থেকে সরকারী অনুদান পাচ্ছে বিবেকানন্দ স্কুল। অথচ একদিন, আজ থেকে সাতচল্লিশ বছর আগে কাসুন্দিয়াপাড়ার গুটিকয়েক আদর্শবাদী যুবক যখন প্রায়-উঠে-যাওয়া সরস্বতী ইনস্টিটিউশনের দায়িত্বভার মাথায় তুলে নিয়েছিলেন, সেদিন কি তাঁরা কেউ আশা করেছিলেন যে একদিন তাঁদের স্কুল এত বড় হবে, তার সুনাম বিস্তৃত হবে সারাদেশে। যে নবীন সন্ন্যাসীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই স্কুলের ভিত্তিয়াদ একদিন রচিত হয়েছিল তাঁদের অনেকেই আজ আর আমাদের মাঝে নেই। যে আশ্রম থেকে এই স্কুলের জন্ম সেই আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা তিনটি যুবকের মধ্যে চল্লিশের যুগেই মারা যান ফণী দে। বাষট্টিতে শশাঙ্কশেখরও চিরদিনের মত বিদায় নিয়েছেন। তিন বন্ধুর অন্যতম ভরত বন্দ্যোপাধ্যায় যৌবনেই সন্ন্যাস অবলম্বন করে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেছিলেন। আজ তিনিই বেলুড় মঠের শত সহস্র ভক্তের কাছে স্বামী সন্তোষানন্দ নামে পরিচিত। গত বছর আশ্রমের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে যে বাণীটি পাঠিয়েছিলেন তাতেই এক জায়গায় তিনি লিখেছেনঃ "এ যেন সত্যিই বালসুলভ চপলতার বশে কোন ছোট ছেলের হাতের ছোট্ট ছুরিখানি দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে সহসা এক উৎস-মুখ খুলে ফেলা গোছের ব্যাপার ঘটে গেল।"

—সন্ধিৎসু

পরের সংখ্যায়ঃ দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ বিদ্যায়তন।

নিমাই ভট্টাচার্য

— এগার —
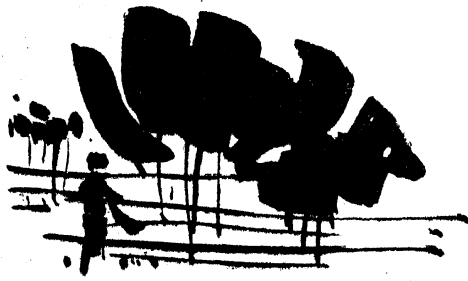
লণ্ডনের মত ভারতীয়দের ভিড় বা নিউইয়র্কের মত ভি আই পি-র স্রোত নেই বার্লিনে। ভারতীয় ডিপ্লোম্যাটদের কাছে এটা শুধু শান্তি নয়, স্বস্তিরও বটে। তবে বার্লিনে আছে ডেলিগেশনের অফুরন্ত ধারা। অতীত দিনের বাংলাদেশের মত বারো মাসে তেরো পার্বন লেগেই আছে এখানে। পার্লামেন্টারিয়ানের সংখ্যা সীমিত হলেও ডিগনিটারীর অভাব নেই। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, আর্কিটেক্ট থেকে শুরু করে ফিল্ম-স্টার, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট পর্যন্ত।

ডেলিগেশন বে-সরকারী হলে ডিপ্লোম্যাটদের দায় থাকে, দায়িত্ব থাকে না; কর্তব্য থাকে না কিন্তু দুশ্চিন্তা আছে। কন্সাল জেনারেল মিঃ ট্যাণ্ডন নিছক ভদ্রলোক। রিটায়ার করার মুখোমুখি কাউকেই অসন্তুষ্ট করতে চান না। তাছাড়া ফরেন অফিসের একজন প্রবীণ ডিপ্লোম্যাট বলে আলাপ আছে সারাদেশের সরকারী বে-সরকারী মানুষের সঙ্গে। সুতরাং ঝামেলার শেষ নেই।...

সেবার জেনেভায় ইন্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্সে ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশনের লীডার ছিলেন মাইশোরের লেবার ও ইণ্ডাস্ট্রি মিনিস্টার মিঃ ভীমাপ্পা। ভীমাপ্পাসাহেবের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। ভীমাপ্পা-জনক ছিলেন মাইশোর মহারাজার ডেপুটি পলিটিক্যাল সেক্রেটারী। শৈশব, কৈশোরে দশেরার শোভাযাত্রায় হাতি চড়ে ঘুরেছেন 'গার্ডেন সিটি' মাইশোরের রাজপথ। প্রথম যৌবনের সোনালী দিনগুলিতে লুকিয়ে-চুরিয়ে ঘোরাঘুরি করেছেন রাজপ্রাসাদের আনাচে-কানাচে।

ভীমাপ্পাসাহেবের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের এই শেষ নয়, শুরু। পড়াশুনা করেছেন ব্যাঙ্গালোরের মিশনারী কলেজে, হৃদ্যতা হয়েছে ডজন ডজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে। সন্ধ্যাবেলায় তাদের সান্নিধ্য উপভোগ করেছেন চমরাজ সাগর-লেকের ধারে। ছুটির দিনে ছোট রেল চড়ে দল বেঁধে গিয়েছেন নন্দী পাহাড়ে। কখনও বা শিবাসমুদ্রমে গিয়ে কাবেরীর জলপ্রপাতের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

আরো কত কি করেছেন এই ভীমাপ্পা-সাহেব। দক্ষিণ ভারতীয়দের মত সুর করে ইংরেজী ইনি বলেন না। অক্সোনিয়ন ইংলিশ না বললেও বেশ ভাল ইংরেজী বলেন।

আরো পরের কথা। এম এল এ হবার পর চুড়িদার শেরওয়ানী পরে ঘোরাঘুরি শুরু করলেন দিল্লীর রাজনৈতিক মহলে। গোটা-দুয়েক ডেলিগেশনের সদস্য হয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার প্যাসেঞ্জার হবার পর একদিন শুভক্ষণে মন্ত্রী। লেবার অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি মিনিস্টার। অদৃষ্টের সিংহদ্বার খুলে গেল।

একবার নয়, দুবার নয়, সরকারী-বেসরকারী ডেলিগেশনের সদস্য হয়ে বহুবার বহু কারণে গিয়েছেন পৃথিবীর নানা দেশে। মিঃ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে সেই সূত্রেই আলাপ। একবার একটা গুড উইল ডেলিগেশনে ওরা দুজনেই গিয়েছিলেন ইস্ট ইউরোপের কয়েকটি দেশে।

ভীমাপ্পা যে জেনেভায় ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশনের লীডার হয়ে গিয়েছেন, সে-খবর পৌঁছেছিল বার্লিনে। কিছুদিন পরে ওর একটা চিঠিও এলো মিঃ ট্যাণ্ডনের কাছে। ...কি নিদারুণ পরিশ্রম করতে হচ্ছে, তা বোঝাতে পারব না। এত মতভেদ ও মতবিরোধ যে দেখা দেবে আমাদের ডেলিগেশনের মধ্যে, তা আগে ভাবতে পারিনি। যাই হোক কনফারেন্স শেষ হলে কয়েক সপ্তাহের জন্য একটু ঘুরেফিরে বেড়াব। বার্লিনে নিশ্চয়ই যাব। কয়েকটা দিন একটু আনন্দ করা যাবে।

সেদিন কনস্যুলেটে যেতেই মিঃ ট্যাণ্ডন তলব করলেন তরুণকে। বললেন, আই হোপ ইউ নো মিঃ ভীমাপ্পা? ঐ যে মাইশোরের লেবার অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি মিনিস্টার।

তরুণের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও ভীমাপ্পাসাহেবের কথা সে শুনেছে। বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি ওঁর কথা। তাছাড়া উনি তো আই এল ও কনফারেন্সে আমাদের ডেলিগেশনের লীডার।

মিঃ ট্যাণ্ডন খুশী হয়ে বললেন, দ্যাটস্ রাইট। তুমি দেখছি কারুর কথাই ভুলে যাও না।

হাসতে হাসতে তরুণ বলে, ভারতবর্ষের এসব স্মরণীয় ব্যক্তিদের ভুললে কি আর চাকরি করতে পারি?

ট্যাণ্ডনও একটু না হেসে পারলেন না। 'তা তুমি ঠিকই বলেছ। স্মরণীয়ই বটে।'

একটু থেমে একটু মুচকি হেসে বললেন, তুমি কিছু জান নাকি ওর সম্পর্কে?

'বিশেষ কিছু না, তবে শুনেছি জাঁদরেল গুড ফেলো।'

'ঠিক শুনেছ। যাই হোক উনি আসছেন কয়েকদিনের জন্য। যদিও প্রাইভেট ভিজিটে আসছেন, তবুও মিনিস্টার তো, কিছু ব্যবস্থা, কিছু দেখাশুনা করতেই হবে।'

পশ্চিমের অনেক দেশে ডিপ্লোম্যাটদের অনেক রকম টুকটাক সুবিধে দেওয়া হয়। ডিপ্লোম্যাট হিসেবে কেনাকাটা করলে অনেক শস্তায় জিনিসপত্র পাওয়া যায়। ডিপ্লোম্যাটিক মিশন থেকে 'বুক' করলে বহু হোটেলেও চার্জ কম লাগে। ভীমাপ্পা-সাহেবের মত যারা ঘন ঘন বিদেশ যান ও ইণ্ডিয়ান মিশনের সঙ্গে খাতির আছে, তাঁদের হোটেলে বুকিং হয় ইণ্ডিয়ান মিশনের মারফৎ। সুতরাং মিঃ ভীমাপ্পার জন্য হোটেল আম জুলেই অ্যাকোমডেশন বুক করা হলো। কন্সুলেটের একটা গাড়ীও রাখা হলো মাঝে মাঝে ভীমাপ্পা-সাহেবকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করার জন্য। সরকারীভাবে নয়, বেসরকারীভাবে। দিন-কাল বদলে যাচ্ছে। কোথা থেকে কিভাবে যে খবর বেরিয়ে যায় তার ঠিক নেই। এসব খবর অপোজিশন এম পি-দের হাতে পড়লে রক্ষা নেই। সুতরাং আইন-কানুন বাঁচিয়েই গাড়ীর ব্যবস্থা করা হলো।

মিঃ ট্যাণ্ডন নিজেই এয়ারপোর্ট গেলেন ভীমাপ্পা সাহেবকে রিসিভ করতে। তবে এয়ারপোর্টে রিসিভ করার পর হোটেলে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দিলেন কন্সুলেটের একজন সাধারণ কর্মীকে।

এয়ার ফ্রান্সের প্লেন ঠিক সময়েই এলো। কথা মত ভীমাপ্পা এলেন। পিছন পিছন এলেন মিঃ শর্মা। হাসি মুখে মিঃ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে করমর্দন করার পর ভীমাপ্পা সাহেব বললেন, মীট মাই ফ্রেণ্ড মিঃ শর্মা...

স্বভাব সুলভ খুশী মনেই মিঃ ট্যাণ্ডন হ্যাণ্ডসেক করে বললেন, গ্লাড টু মীট ইউ, মিঃ শর্মা।

এর পর ভীমাপ্পা সাহেব শর্মাজীর পরিচয় দিলেন। ...জানেন মিঃ ট্যাণ্ডন,

শর্মাজী একজন ফেমাস ট্রেড ইউনিয়ন লীডার। এবার আমাদের ডেলিগেশনের একজন মেম্বারও ছিলেন। র‍্যাদার হি ওয়াজ দি মোস্ট অ্যাকটিভ মেম্বার অফ অল অফ দেম।

ভীমাপ্পা শর্মাজীর আরো অনেক গুণের কথা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এয়ার-পোর্টের লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে অতক্ষণ বকবক করা ভালো দেখায় না বলে মিঃ ট্যান্ডন বললেন, কয়েক দিন থাকছেন তো? পরে ভালভাবে কথাবার্তা বলা যাবে।

'মিঃ ভীমাপ্পার সঙ্গেই আবার চলে যাব।'

'আপনি কোথায় থাকছেন?'

ভীমাপ্পাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, একসঙ্গে এসেছি, একসঙ্গেই থাকব।

ট্যান্ডন সাহেব চিন্তিত না হয়ে পারলেন না। 'এক্সকিউজ মী মিঃ ভীমাপ্পা, আপনি কি ওর বিষয়ে কিছু জানিয়েছিলেন?'

'না, তবে যেভাবেই হোক ম্যানেজ করে নেওয়া যাবে।'

কথাটা শুনে মনে মনে মিঃ ট্যান্ডনও বিরক্ত বোধ করলেন। হরিদ্বার-লছমনঝোলা বা কাশী-গয়ার ধর্মশালায় এক ঘরে পাঁচ-দশজনকে থাকতে দিতে পারে কিন্তু বার্লিনে যে তা সম্ভব নয়, ভীমাপ্পা ভালভাবেই জানেন। একটু খবর দিলেই সবকিছু ব্যবস্থা ঠিক থাকত। কিন্তু অধিকাংশই ভীমাপ্পার দলে। কেউ সোমবার বলে মঙ্গলবার, সকাল বলে বিকেলে আসেন; আবার কখনও তিনজন বলে একজন অথবা একজন বলে তিনজন।

এইত ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশন নিয়ে কি কাণ্ডটাই হয়ে গেল। দুটি ফিচার ফিল্ম, একটি ডকুমেণ্টারী ইণ্ডিয়ার অফিসিয়াল এনট্রি ছিল। এইসব ফিল্মের প্রডিউসার, ডিরেক্টার, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দলে এগারজন থাকার কথা। এ ছাড়া ফেস্টিভ্যাল কমিটি আমন্ত্রণ জানিয়ে-ছিলেন ভারতীয় ফিল্মী দুনিয়ার চারজনকে। এরা সবাই আসবেন বলে কলকাতা, দিল্লী, বোম্বে থেকে চিঠি এলো। চিঠি পাবার পর হোটেল বুক করা হলো।

আবার চিঠি এলো, টেলিগ্রাম এলো। কেউ জানালেন সোমবার আসছেন, কেউ জানালেন মঙ্গলবার আসছেন, কেউ সকালে, কেউ বিকেলে।

চিঠি আসা বন্ধ হলো, শুরু হলো টেলিগ্রাম আসা। ফরেন এক্সচেঞ্জ নট ইয়েট স্যাংশানড্। ডিপারচার ডিলেড—বলে জানালেন কলকাতা থেকে মিঃ গুপ্ত। ফেষ্টিভ্যাল কমিটির আমন্ত্রণে যে চারজনের আসার কথা তাঁদের দুজন বোধহয় ধার-দেনা করেও প্লেন ভাড়া জোগাড় করতে পারেননি, তাই শেষ মুহূর্তে দুজনেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। 'সরি কান্ট অ্যাটেন্ড, সিরিয়াসলী ইল' বলে জানালেন কলকাতার এক বিখ্যাত ফিল্ম জার্নালিষ্ট। বোম্বের ভদ্রলোক হিন্দী ফিল্মের মত টেলিগ্রাম করে জানালেন, এয়ারপোর্টে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। সুতরাং সরি, ভেরী সরি। সামনের বছর নিশ্চয়ই আসব।

আরো কত টেলিগ্রাম এলো। বোম্বের প্রডিউসার ভোঁসলে জানালেন, নায়িকা কুমারী সুন্দরীকে নিয়ে বুধবার আসছি। নায়ক দুর্লভকুমার রিচিং থার্সডে। কিন্তু কখন? বার্লিনে কি একটাই ফ্লাইট? এক দিনে তিনটে টেলিগ্রাম এলো কলকাতা থেকে। কোনটাতেই স্পষ্ট করে কিছু লেখা নেই।

কি বিভ্রাটেই না কন্সুলেটকে পড়তে হয়েছিল! ফেস্টিভ্যাল কমিটি থেকে বার বার করে ফোন আসে কন্সাল জেনারেলের কাছে। অথচ তিনি কিছুই বলতে পারেন না। বলবেন কী? নিজেদের সরকারের অকর্মণ্যতার কথা বাইরে বলা যায়? বলা যায় না, বিশ্বের সব চাইতে অস্পষ্ট মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষগুলোই ফরেন একস্চেঞ্জ ডিপার্টমেণ্টের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করেন।

শেষ পর্যন্ত তিনদিন ধরে চারটে আলাদা আলাদা ফ্লাইটে এলেন সাতজন। হোটেলে পৌঁছে প্রডিউসার ভোঁসলে অবাক হলেন, সিঙ্গল রুম অ্যাকোমোডেশন দেখে। প্রথমে অনুরোধ, পরে দাবী জানালেন ডবল রুমের জন্য। ইউরোপের নানাদিক থেকে হাজার হাজার মানুষ এসেছেন বার্লিন ফেস্টিভ্যাল দেখতে। তিল ধারণের জায়গা নেই কোন হোটেলে। হোটেল কর্তৃপক্ষ অক্ষমতা জানালেন। ভোঁসলে সাহেব ক্ষেপে লাল।

মুখে বললেন না, তবে বেশ স্পষ্ট-ভাবেই কন্সাল জেনারেলকে বুঝিয়ে দিলেন, আপনাদের মত সত্যমেব জয়তের তিলক পরে আমাকে গোলামী করতে হয় না। হাজার হাজার টাকা খরচা করে হিরোইনকে নিয়ে এসেছি শুধু ফিল্ম জার্নালে দু' চারটে ছবি ছাপাবার জন্য নয়, নিজের প্রয়োজনে।

মিঃ ট্যান্ডনের মত লোকও আর সহ্য করতে পারলেন না। বললেন, মিঃ ভোঁসলে, আপনাদের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। নিছক ভদ্রতা, সৌজন্যের খাতিরে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। দ্যাটস অল রাইট।

দেশের সুনাম বা প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তো নয়, নিছক রক্ত-মাংসের দেহটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্যই কোনো কোনো অনারেবল ডেলিগেটের আগমন হয়। কিন্তু তাহলে কি হয়? ইণ্ডিয়ান মিশনের জ্বালাতনের শেষ নেই।

ভীমাপ্পা সাহেব একজন মন্ত্রী ও ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশনের নেতৃত্ব করেছেন। দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে তাকে অপবাদ দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তবুও তিনি শর্মাজীকে আনার আগে একটা খবর দেওয়া কর্তব্য মনে করেন নি।

মিঃ ট্যান্ডন মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে বললেন, ঠিক আছে, চলে যান হোটেলে। আই হোপ দে উইল ম্যানেজ সাম হাউ।

পরের দু'দিন ভীমাপ্পা ও শর্মাজীর টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না। তিন দিনের দিন দুপুরের দিকে কন্সুলেটে হাজির হয়ে ট্যান্ডনকে অনুরোধ করলেন, 'আমি আর শর্মাজী কিছু কেনাকাটা করব। মিঃ মিত্র যদি একটু কাইন্ডলি হেলপ করেন...?'

লণ্ডনে গিয়ে ভীড়ে ভর্তি 'পাবে' গিয়ে এক জাগ বিয়ার না খেলে বিলেত যাওয়া বৃথা। প্যারিসে গিয়ে নাইট ক্লাবে যেতে হয় আর পারফিউম কিনতে হয়। রোমে গিয়ে ক্যাসিনো। জের্মান বার্লিনে গিয়ে নাইট ক্লাবে রাত কাটাতে হয়, সস্তায় ক্যামেরা কিনতে হয়। এসব নিয়ম পালন না করলে ইণ্ডিয়ান ভি, আই, পি-দের ধর্মরক্ষা হয় না।

ভীমাপ্পা নিজেই বললেন, ইউ সী মিঃ ট্যাণ্ডন, লাস্ট দুটো নাইট রেসীতে বেশ কেটেছে।

রেসী?

হ্যাঁ, বলহাউস রেসী। বার্লিনের পৃথিবীখ্যাত নাইট ক্লাব। ডান্সিং ফ্লোরের চারপাশে ছোট ছোট কেবিন। প্রত্যেক টেবিলে আছে টেলিফোন ও ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে চিঠি আদান প্রদানের অপূর্ব ব্যবস্থা। খোলামেলা কেবিনে বসে দেখে নিন কে কোথায় বসেছে। টেবিলের উপর রাখা ম্যাপ দেখে জেনে নিন অন্যের টেবিল নম্বর। তারপর চিঠি লিখুন, দূরে থেকে আপনাকে বেশ লাগছে। যদি আপত্তি না করেন তাহলে এই ভারতীয় আপনার সঙ্গে একটু নাচতে চান।

ইলেকট্রনিক্সের কৃপায় মুহূর্তের মধ্যে সে চিঠি পৌঁছে যাবে ঠিক অভীষ্ট স্থানে। উত্তর আসবে, এই স্যাম্পেনটুকু শেষ করার ধৈর্য ধরতে পারলে বার্লিন ভ্রমণরতা ও হ্যামবুর্গবাসিনী কৃতার্থ হবে।

জার্মান মেয়েদের সম্পর্কে আমার অত্যন্ত উঁচু ধারণা ছিল, কিন্তু সামান্য এক

গেলাস শ্যাম্পেনের প্রতি আপনার দুর্বলতা দেখে স্তম্ভিত না হয়ে পারছি না।

'মাই ডিয়ার জেন্টলম্যান, কি করব বলুন? শুধু নাচতেই নেমন্তন্ন করলেন। শ্যাম্পেনের অফার তো পেলাম না।'

ভীমাপ্পা সাহেব নিশ্চয়ই ভাবলেন, বিদেশ বিভুঁইতে তোমার মত ডাগর-ডোগর জার্মান বান্ধবী পেলে এক গেলাস কেন, বোতল বোতল শ্যাম্পেন দিতে পারি।

যাই হোক উত্তর গেল, 'ইউ আর ওয়েলকাম টু ডান্স অ্যান্ড ড্রিংক।'

এমনি করে চলে খেলা। ঘন্টার পর ঘন্টা। শ্যাম্পেন খেয়ে নাচতে নাচতে মদীর হয়ে অনেকে দেখতে বসেন রেসী ওয়াটার শো। সে আর এক অপূর্ব দৃশ্য। প্রতি মিনিটে ন' হাজার জেট আট হাজার লিটার জল ছড়াচ্ছে এক লক্ষ আলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে।

রেসী'র গল্প করতে করতে আনন্দে, খুশীতে ভীমাপ্পা সাহেবের মুখখানা হাসিতে ভরে গেল, চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'জানেন মিঃ ট্যান্ডন, রেসীতে গেলে ভুলে যেতে হয় এই মাটির পৃথিবীর কথা।'

ভীমাপ্পা সাহেব এত আগ্রহ করে সব বলছিলেন যে মিঃ ট্যান্ডন তাঁকে একেবারে থামিয়ে দিতে পারলেন না। —'এরা আনন্দ করতে জানে।'

এবার ভীমাপ্পা সাহেব লীডারের মত কথা বলতে শুরু করলেন, যে জাত আনন্দ করতে জানে না, সে পরিশ্রম করতেও জানে না। কাজ করতে হলে আনন্দ করার, স্ফূর্তি করার স্কোপ চাই। কিন্তু ইণ্ডিয়াতে কোথায় সেই আনন্দ করার স্কোপ?

'দ্যাটস রাইট মিঃ ভীমাপ্পা।'

মিঃ ট্যান্ডন প্রবীণ হলেও ফরেন সার্ভিসের লোক। খুব বেশী না বুঝলেও এটুকু বুঝলেন, রেসী'তে নাচতে নাচতে মিঃ ভীমাপ্পা কোন শিকার ধরেছিলেন নিশ্চয়ই।

শর্মাজী এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। রেসীর স্মৃতি মনের মধ্যে টগবগ করে ফুটছিল। আর সামলাতে পারলেন না, 'ডু ইউ নো মিঃ ট্যান্ডন, ঐ যে মেয়েটি'—মিস রিটারের সঙ্গে দুদিন কাটিয়ে কিছু কিছু জার্মান কথাও শিখেছি।'

মিঃ ট্যান্ডন ইংরেজীতে ধন্যবাদ না জানিয়ে বল্লেন, 'ডাংকেসন!'

শর্মাজী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'বিটুসন।'

ভীমাপ্পা আবার কেনাকাটার কথা শুরু করলেন, টুমরো উই আর ফ্রি। তারপর কিছু ইন্ডাস্ট্রী দেখব। দু' একটা পার্টির সঙ্গে কথাবার্তা আছে। ওরা হয়ত কোলাবরেশন করে মাইশোরে কিছু স্টার্ট করতে পারে।

'অর্থাৎ আগামী কালই শপিং করতে চান?' ট্যান্ডন জানতে চাইলেন।

'দ্যাট উড বি ফাইন।'

ট্যান্ডন সাহেব তরুণ মিত্রকে ভালভাবেই জানেন। এক বোতল বিয়ার বা একটা ডিনারের লোভে সে ইণ্ডিয়ান ভি, আই, পি-দের ল্যাংবোট করে ঘুরতে আদৌ পছন্দ করে না। তাছাড়া নিজের নামে প্রায় অর্ধেক দামে রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা কিনে ভীমাপ্পাকে দিতে তাঁর আপত্তি থাকবেই। অথচ— ।

অথচ আবার কি? ফরেন সার্ভিসে কাজ করতে এসব হুজম করতেই হয়। কতজনের মেয়ের বিয়ের সময় হাজার হাজার টাকার মালপত্র কিনে ডিপ্লোম্যাট বা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ মারফত পাঠাতে হয়।

'কি কি কিনতে চান তার একটা লিস্ট আর সেগুলোর দাম রেখে যান। আই উইল ট্রাই টু হেলপ ইউ।' ট্যান্ডন সাহেব আর কি বলবেন?

সঙ্গে সঙ্গে দুজনে পকেট থেকে ক্যাটলগ-প্রাইস লিস্ট বের করলেন। দুজনে মিলে কত আলোচনা—সমালোচনার পর একটা লম্বা লিস্ট তৈরী করলেন।

'আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, এতগুলো কেনা সম্ভব হবে না।'

শর্মাজী বললেন, 'আমরা তো রোজ আসব না। আর তাছাড়া ভীমাপ্পার ডিপ্লো-ম্যাটিক পাশপোর্ট আছে। বোম্বে বা দিল্লীতে কাস্টমসের ঝামেলা থাকবে না। তাই...।'

'কিন্তু আপনার মত অনেকেই তো আসছেন।'

ভীমাপ্পা অত্যন্ত বিবেচকের মত বললেন, 'ঠিক আছে। লিস্ট রেখে গেলাম, যা পারেন তাই কিনবেন।'

ভি-আই-পি-দ্বয় বিদায় নিলেন। ট্যান্ডন সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন তরুণকে।

তরুণ ঘরে ঢুকতেই ঐ লিস্ট আর এক বাণ্ডিল দ্যবেকস্তা মার্ক এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার পুরস্কার দেখছ?'

তরুণ হাসতে হাসতে বলল, 'উনি যে ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার! তাই তো দেশের কিছুই ওর পছন্দ হবে না। ইমপোর্টেড জিনিষে ঘর ভর্তি না থাকলে কি ওদের প্রেস্টিজ থাকে?'

একটু থেমে তরুণ আবার বলে, 'মাঝে মাঝে মনে হয় ট্রান্সজিসটার—টেরিলিন—ক্যামেরা—হুইস্কীর জন্য ইংরেজ যদি কিছু ব্যয় করত, তবে বোধহয় ওরা আবার ভারতবর্ষে রাজত্ব করতে পারত।'

ট্যান্ডন সাহেব বললেন, 'বোধহয় তোমার কথাই সত্যি।'

(ক্রমশঃ)

ব্রিজ ॥

- আনন্দ বাগচী

একাকী পেশেন্স খেলে নদীর ওপরে বৃদ্ধ ব্রিজ
দিনেরাতে বারদুই ট্রেন যায় পাঁজর কাঁপিয়ে
নানান সন্ধিতে সব পুরাতন নাটবল্টু বাজে
নানারূপ ইচ্ছা জাগে, নানা বয়ঃসন্ধির স্মৃতিতে।
প্রাকৃতিক হিজিবিজি, অতিকায় চরুটের মত
আকাশে ধোঁয়াটে চোঙ তুলে ইটভাটা, ঘরবাড়ি,
পটে আঁকা গৃহস্থালী মানুষের জেগে আছে দূরে,
স্রোতের কুটোর মত নৌকো, বালিহাঁস, ছায়ামেঘ
এপারে ওপারে গ্রাম, বালুচর, সজল স্তব্ধতা
নদীর ওপরে হুমড়ি খেয়ে দিনেরাতে বৃদ্ধ ব্রিজ।।

সমুদ্র এবং শূন্য ॥

- আশিস সান্যাল

সম্মুখে সমুদ্র ছিলো।
সারারাত শব্দক্ষয় ব্যাপক জলের
প্রবল স্বপ্নের মতো ছিলো সে আঙিনা।
অদ্ভুত উজ্জ্বল ছিলো।
প্রতিদিন ভোরবেলা যেমন গুঞ্জনে
চতুর্দিকে সমাহিত আশ্চর্য মহিমা
দ্বিধাহীন জ্বলে ওঠে—
তেমনি সর্বত্র স্নিগ্ধ দুর্লভ জলের
ছিলো শান্ত প্রতিধ্বনি।

আমি কতোকাল
এই মুগ্ধ মনোহর সমুদ্র গভীরে
ফিরে যেতে করেছি প্রার্থনা।
আমি কতোদিন
তোমার পায়ের কাছে নতজানু চেয়েছি নির্ভর
আমলকি বনের ছায়া।
চেয়েছি নির্জন বৃষ্টি
তরমুজের মতো ম্লান
তোমার বুকের থেকে উৎসারিত ভোরের যমুনা।

তবু আজ নিভে যাচ্ছে আমার সম্মুখে
বিপুল জলের ধ্বনি।
ক্রমশ আঁধার
পথের কিনার ঘেঁসে হেঁটে যাচ্ছি সুদূরে ইথারে
অযুত আলোকবর্ষ পার হয়ে
ক্রমাগত মিশে যাচ্ছি অস্থির আকাশে।
অথচ বুকের কাছে
ক্লান্ত সব ঘরণীর তীব্র হাহাকার।
এক কোটি বৎসরের আগে
সে সব সুন্দরী একা জোছনার চন্দনে
প্রণয়ের পথ চেয়ে ফেলেছে নিশ্বাস
সেই সব রমণীর অক্ষত কাহিনী
সারাক্ষণ বুকের পাথরে
নীরব আনন্দে হানে তীব্র কশাঘাত।

সম্মুখে সমুদ্র ছিলো।
দক্ষিণে বিশাল
শূন্যের শ্যামল বৃত্ত।
সমুদ্র এবং শূন্য
সব আজ নিমজ্জিত বুকের তিমিরে।
যখন যেখানে থাকি
সে জন্মে সবাই
পরম আত্মীয় বন্ধু।
ভীষণ সংগ্রামে
কিছুকাল বেঁচে থাকি।
জেনেছি হৃদয়,
ভোরের বৃষ্টির মত
দাঁড়াবার মতো শান্তি এক জন্মে দেবে না সময়।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তোমাকে আর দাঁড়াতে হবে না।

ভাত ঢাকা থাকতো ওর, নিজেই খুলে খেতো, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়তো—কেউ তদারক করলে ওর একটু অস্বস্তিই হতো।

শুধু সুধীরা ওর খাবার সময় দাঁড়িয়ে থাকত—কারণ ওর কর্তব্যজ্ঞানটা ছিল অসাধারণ। অগত্যা তারাপদ আর মানা করবে কি করে? খেতে-খেতে গল্প করত—আমাদের দেশে জানো বৌমা, চৌদ্দ হাত বলরাম হয়। পুজো হয় বলরামের। গাজন হয় সে-সময়। আর কি ধুমধাম—সে কি বলব তোমায় বৌমা।

বলতে বলতে হঠাৎ এক সময় গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলতো—বৌমা, অনেক রাত হয়ে গেছে—আর গল্প নয়, তুমি শুতে যাও।

কোন কোন দিন বলতো—হ্যাঁ বৌমা, খোকাসাহেব নাকি বড়ো অভিনেতা? একদিন বলো না আমি দেখতে যাবো। আমার খোকাসাহেবের বক্তিমে শুনবো না একদিন?

আমি তো ফিরতাম গভীর রাত্রে। সুধীরা আমাকে বলবার অবকাশই পেতো না।

এর কয়েক দিন পরে তারাপদ আবার জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ বৌমা, বলেছিলেন?

সুধীরা মাথা নাড়তো। হয়তো কোন সময় সে আমাকে বলেও ছিল, কিন্তু আমার খেয়ালই থাকতো না।

শেষ পর্যন্ত তারাপদর আর যাওয়া হতো না। তার খোকাসাহেবের বক্তিমে আর শোনা হলো না। এদিকে দেশ থেকে চিঠি আসত ঘন-ঘন। একদিন সে চলে যেতো।

আবার হয়ত বেশ কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন এসে হাজির হতো। আবার বলতো — এবার খোকাসাহেবের বক্তিমে শুনবো।

সেবারও নানা কাজে তার আর যাওয়া হয়ে উঠতো না।

এইভাবেই চলতে লাগল আমাদের সংসারের রথচক্র—আর অন্য দিকে চলতে লাগল আমার মঞ্চ এবং নাটক।

এদিকে ১৯২৭ সালে ম্যাডান কোম্পানী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' তুলতে শুরু করলেন—এই তোলা শেষ হল ১৯২৮ সালে গিয়ে। এতে আমি করলাম নগেন্দ্রনাথ। অন্যান্য ভূমিকায় ছিল—শ্রীশ—ইন্দু মুখার্জি, সূর্যমুখী—নিভাননী, কুন্দ—সরস্বতী, দেবেন্দ্র—তুলসী বন্দ্যোঃ; হীরা-র ভূমিকায় নামল বোম্বাই থেকে আগত একটি নতুন শিল্পী, তার নামটা আজ মনে নেই। পরিচালনা করেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সব ছবিতে কাজ করতে-করতেই মনে একটা প্রবল বাসনা হল নিজস্ব চিত্র-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার।

ইচ্ছে তো হল, কিন্তু টাকা কোথায়? এতে অনেক টাকার দরকার। সাধ তো হল কিন্তু সাধ্য কোথায়? কল্পনায় তো অনেক কিছু করবার ইচ্ছা করে, কিন্তু বাস্তবে তা পরিণত করবো কি করে, সেদিকে খেয়াল নেই।

যাই হোক, এইভাবে শেষ হল আমার সুখ-দুঃখের দোলায় দোলানো ১৯২৭ সাল।

আটাশ সালের প্রথম পর্বই হলো পাকাপাকিভাবে আমার স্টারে থাকা। মনোমোহন থেকে 'আরবী হূর' স্টারে চলে এল। 'আরবী হূর' ছাড়া আরও কাজ বাড়লো। এই সময় তিনকড়িবাবু অসুস্থ হয়ে ছুটি নিলেন, ফলে 'মগের মুলুকে' তাঁর পার্ট শাহসুজা আমাকেই করতে হল। 'মহম্মদ' করতো দুর্গাদাস, 'সন্ধ্যা' আগের মত কুসুমকুমারীই করতে লাগলো। শুধু সরস্বতীর বদলে নীহারবালা করতে লাগল 'গুলেবাদু'।

১৯২৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর-এর একটা পুরনো বিজ্ঞাপনে দেখছি স্টারে আমি করছি 'আলমগীর'—এই সঙ্গে ছিল 'পাণ্ডবগৌরব'—এতে কুসুমকুমারী করতো সুভদ্রা, আর ওদিকে মনোমোহনে চলছিল 'কৃষ্ণকান্তের উইল' — তাতে গোবিন্দলাল ছিল তুলসী বন্দ্যোঃ, ভ্রমর—সুশীলাবালা, তার সঙ্গে ছিল 'দুর্গেশনন্দিনী'— ওসমান—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়।

এইভাবে আমাদের দুই থিয়েটারই চলতে লাগলো। আটাশ সালের গোড়ার দিকে স্টারে 'আলমগীরে'র প্রতাপটাই ছিল খুব বেশী, সঙ্গে চলছিল 'আরবী হূর' আর 'মগের মুলুক'।

এর এক মাস পরে মনোমোহনে থিয়েটার বন্ধ হয়ে চলতে লাগল বায়স্কোপ। পাঠকরা যেন মনে না করেন যে, থিয়েটারের অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্যে কর্তৃপক্ষ এখানে বায়োস্কোপ চালু করলেন। তখন বাঙালীর তোলা ছবি অবাঙালী হাউসে দেখানো খুব মুস্কিল হয়েছিল, তাই বাঙালীকে বাঙালী না দেখলে কে দেখবে। এ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মনোমোহনে ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে বায়োস্কোপ দেখানো শুরু হয়। ইস্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেট নামে একটি নবগঠিত বাঙালী প্রতিষ্ঠান শরৎ-চন্দ্রের "দেবদাস' তুলেছিলেন—আট রীলের ছবি। উত্তর কলিকাতায় তখন 'ক্রাউন' সিনেমা ছাড়া তো আর হাউস ছিল না। ম্যাডান কোম্পানী নিজেদের ব্যবসা নষ্টের ভয়ে বাঙালীর তোলা ছবি দেখাতে রাজী হলেন না—তাই মনোমোহনের এই ব্যবস্থা। প্রত্যহ দুটি করে শো হত—৬টা ও ৯॥টা। নাম-ভূমিকায় ছিলেন ফণী বর্মা এবং অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন তিনকড়িবাবু, নরেশবাবু, কনকনারায়ণ, নীহারবালা, মণি ঘোষ, তারকবালা (লাইট) প্রভৃতি।

মনোমোহনে যখন এই বায়োস্কোপ চলা আরম্ভ হল তখন আমাকে সদলবলে বেরিয়ে পড়তে হল উত্তরবঙ্গ সফরে।

ফিল্ম কোম্পানী প্রতিষ্ঠার বাসনা মনে জাগলেও তা মনেই পুষে রেখে মত্ত হয়ে পড়লাম স্টারে অভিনয় নিয়ে। উত্তরবঙ্গের পর আমরা চললাম ঢাকায়, অবশ্য সোজা ঢাকা নয়, ময়মনসিংহ হয়ে ঢাকা। ময়মন-সিংহে আমরা প্রোগ্রাম শেষ করে আমাদের দল যখন ঢাকা রওনা হবার উদ্যোগ করছে, তখন আমি এক কাণ্ড করে বসলাম। ময়মনসিংহে থাকতেই গৌরীপুরের কথা শুনেছিলাম। সেখান থেকে কিছু দূরে মধুবন বলে একটি সুবৃহৎ বন আছে, সেখানে আবার বিরাট বিরাট অনেক জলাশয় আছে, যেখানে অজস্র পাখীর ঝাঁক নামে। কদিন এই হ্রদের মতন জলাশয় আর পাখীর কথা শুনতে-শুনতে মন বড় অধীর হয়ে উঠলো। তখন বন্দুক কিনেছি নতুন, পাখী শিকারের নামে মনটা একেবারে নেচে উঠল।

সবাই বললে—আজ রওনা হবো ঢাকা—আর তুমি যাচ্ছ কিনা পাখী শিকারে?

বললাম—ট্রেন তো আপনার ছাড়ছে গিয়ে সেই সন্ধ্যেবেলায়—আমি ঠিক সময়ে ফিরে আসব।

গেলাম শিকারে। খুব ভোরবেলায় উঠেই বেরিয়ে পড়া গেল। বেশ বড়ো বড়ো জলা। এপারে দাঁড়িয়েছি ওপারে ধোপারা কাপড় কাচছে। জলাটা এত চওড়া যে ক্ষুদে ক্ষুদে দেখাচ্ছে এই সব ধোপাদের।

একটা ছোট নৌকা নিয়ে চললাম জলার ওপর দিয়ে। উদ্দেশ্য, সুবিধামত জায়গা

মঞ্চে চাঁদসদাগরের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী

থেকে নৌকোয় দাঁড়িয়ে পাখী শিকার। যাঁরা শিকারের উদ্দেশ্যে আসেন তাঁরা এই-ভাবেই শিকার করেন। এতেই সুবিধা।

কিছুক্ষণ চলার পর একটা সুবিধেমত জয়গায় এসে নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে বন্দুক ছুঁড়লাম। আমি আগ্রহসহকারে জিজ্ঞেস করলাম, দেখতো, দেখতো—কী হলো?

মাঝি বললো—পড়েছে, পড়েছে—একটা পড়েছে।

—কিন্তু পড়লে কী হবে, কোথা থেকে একটা চিল এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল সেটা। অতএব মারো চিলকে।

উত্তেজনার মুখে চিলকে তাক করে মারতে গেলাম। বন্দুক ছুঁড়তে গিয়ে হল এক বিপদ—এদিকে নৌকোর দোলানির সঙ্গে নিজে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম নৌকোর ওপর। ফলে হলো কি, ছররাগুলো জলের ওপর দিয়ে হড়কে ওপারে একটা ধোপার রগ ঘেঁষে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। একটুর জন্যে বেঁচে গেল লোকটা তাই রক্ষে—নইলে কি যে দারুণ ফ্যাসাদ হতো এখন ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।

কপালের ঘাম মুছে মাঝিকে বললাম—আর নয় এবার ফেরো, আমাকে ট্রেন ধরতে হবে।

মধুবন কি এখানে? চলেছি তো চলেছিই — এদিকে ট্রেনের সময়ও এগিয়ে আসছে—শেষকালে ট্রেন না ফেল করি!

যখন ফিরে এলাম তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি আর সময় নেই। তাই আর বাড়ী না গিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলাম একেবারে স্টেশনে।

আমার খাস চাকর হল নীলু—আমি ভাবলুম যে আমার দেরী দেখে নীলু নিশ্চয়ই বুদ্ধি করে জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে দলের অন্য সকলের সঙ্গে গাড়ীতে উঠে বসেছে।

আমি যখন স্টেশনে পৌঁছলাম তখন দেখি গার্ড সাহেব বাঁশী বাজিয়েছে, নীল পতাকা নাড়ছে— আর গাড়ীও সবে চলতে শুরু করেছে। আমি আর অগ্র-পশ্চাৎ কিছু না দেখে সামনেই যে সেকেন্ড ক্লাশ কামরাটা পেলাম তাতেই উঠে পড়লাম। কিন্তু কি অদ্ভুত যোগাযোগ। সেই কামরাটা আমাদেরই লোকজনে ভর্তি। দলের সব মাতব্বররা মনের আনন্দে জাঁকিয়ে বসে গুলজার করছেন। আমাকে ওভাবে উঠতে দেখে ও'রা আনন্দ ও বিস্ময়ে ফেটে পড়লেন। মনে হল এতক্ষণে ও'রা যে অস্বস্তির মধ্যে দিয়ে সময় কাটাচ্ছিলেন তা কেটে গেল।

একজন বললে—তুমি তো এলে কিন্তু তোমার নীলু যে এলো না—সে তো তোমার অপেক্ষায় বাড়ীতে বসে আছে।

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম—সে কি? নীলু আসে নি?

—না, আমরা কত বললাম, আমাদের সঙ্গে আয়। বাবু ঠিক গিয়ে হাজির হবে। কিন্তু ও তোমার বিছানা-বাক্স বেঁধে ঠায় বসে আছে—বললে বাবু না এলে কি করে যাব?

—কী অনুগত দেখেছ — একেবারে ক্যাসাবিয়াঙকার দ্বিতীয় সংস্করণ। বাপ বলেছে এখানে দাঁড়িয়ে থাকো, নড়ো না। জাহাজ পুড়ে গেল তবু ছেলে নড়লো না—জ্যান্ত পুড়ে মারা গেল। এই রকম সব রঙ-তামাশা হতে লাগলো।

আমি গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি যে ট্রেন তখনও প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে যায় নি, স্থানীয় লোকেরা যাঁরা স্টেশনে এসেছিলেন আমাদের বিদায় জানাতে তাঁদের একজনকে মুখ বাড়িয়ে বলে দিলাম, নীলু রয়ে গেল—দয়া করে তাকে যেন পরের ট্রেনেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়, আমরা ঢাকায় নামিয়ে নেবো।

তাঁরা সে অনুরোধ রেখেছিলেন। নীলু তার পরদিন সকালে এসে ঢাকা পৌঁছুলো।

ঢাকায় প্লে করছি, হঠাৎ কলকাতা থেকে একখানা টেলিগ্রাম গিয়ে হাজির—আমার বোন প্রতিমার হঠাৎ বিয়ে স্থির হয়েছে। টাকার দরকার।

আমি জানালাম টাকা পাঠাচ্ছি—আয়োজন কর, বিয়ের দিন পৌঁছুব।

প্রবোধবাবু আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। তাঁকে টেলিগ্রাম দেখিয়ে টাকার কথা বললাম।

উনি বললেন—কিছু টাকা নিয়ে তুমি চলে যাও। এখানে অবশ্য অসুবিধে হবে। তা হোক, কি আর করা যাবে? তুমি যাও, তোমার যাওয়া দরকার।

তাই হলো। বিয়ের দিন সকালে আমি কলকাতা এসে পৌঁছলাম। বাবার শরীর ভালো নয়, আমাকেই কন্যা সম্প্রদান করতে হল। এই দিনটা ছিল ৮ই মার্চ ১৯২৮—২৪শে ফাল্গুন ১৩৩৪ সাল।

এদিকে মনোমোহনে আবার বায়োস্কোপ থেকে থিয়েটার হতে শুরু করেছে। অর্থাৎ 'দেবদাসের' প্রদর্শন শেষ হতে আবার 'পুনর্মূষিকোভব।' মনোমোহনে চলছে 'চাঁদসদাগর', স্টারে 'মগের মুল্লুক'।

পরদিন রবিবার স্টারে ছিল 'চাঁদ-সদাগর'। সুতরাং ঐ যে শনিবার স্টারে

এলাম 'শাহ সুজা' করতে, সেই আমার বরাবর থেকে যাওয়া। মনোমোহনে তখন 'জয়দেব', 'সর্দ্দিয়া' এই সব হতে শুরু করল।

এদিকে আবার ডিরেক্টরদের সঙ্গে প্রবোধবাবুর মতবিরোধ হতে লাগল। ঢাকা-সফরে টিকিট বিক্রয় হয়েছে বেশ, খরচও হয়েছে তেমনি আন্দাজে। কিন্তু লাভের ঘর একেবারে শূন্য কেন?

আমাকে ডেকে একজন ডিরেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন কথাটা। আমি কোনো উত্তর দিলাম না। এসব হচ্ছে যাকে বলে হায়ার পলিটিক্স—এ-সবের মধ্যে থাকতে আছে কখনও?

এই হলো প্রবোধবাবুর স্টার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার সূত্রপাত।

এ তো গেল থিয়েটারের কথা। এদিকে আমার মনের মধ্যে সেই সুপ্ত বাসনাটা আবার মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল—মানে সেই নিজস্ব চিত্র-প্রতিষ্ঠান গঠনের কল্পনাটা। কথাটা যখনই মনে হয়, তখন কল্পনার মন ছুটতে থাকে তীব্র গতিবেগে। মনে মনে প্রতিষ্ঠানের নামকরণও করে ফেলি—অহীন্দ্র ফিল্ম কর্পোরেশন।

এই সময় একটা ছেলেমানুষীর মধ্যে দিয়ে একটা বিরাট ব্যাপার ঘটে গেল। বিমল পাল বলে এক ভদ্রলোক এই সময় প্রায়ই স্টারে আসতেন—তিনি একটা দল নিয়ে স্টারে কিছুদিন অভিনয়ও করেছিলেন। বিমলবাবু ছিলেন কন্ট্রাক্টর এবং ফিল্মের ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলেন। একটা ফিল্ম পত্রিকাও বার করেন—নাম 'বায়োস্কোপ'। স্টারে ঘুরতেন সেই পত্রিকার বিজ্ঞাপনের জন্য। ক্রমে ক্রমে আমার সঙ্গে আলাপ জমে উঠল। একদিন রহস্যচ্ছলে ওঁকে বলে বসলুম—দাম পাবেন না, এরকম একটা বিজ্ঞাপন ছাপাবেন?

বিমলবাবু তৎক্ষণাৎ বললেন—ঠিক আছে—কি ছাপতে হবে বলুন।

কৃত্রিম গাম্ভীর্যে আমি বললাম—অহীন্দ্র ফিল্ম কর্পোরেশন।

বলেছি—এই পর্যন্তই। তারপর আমি ব্যাপারটা একদম ভুলে গেছি। তারপর কয়েকদিন পরে একদিন হঠাৎ বিমলবাবু পত্রিকা নিয়ে এসে হাজির। দেখি ছেপে দিয়েছেন একটা বেশ বড় রকমের বিজ্ঞাপন—গঠিত হইতেছে—অহীন্দ্র ফিল্ম কর্পোরেশন, স্বত্বাধিকারী অহীন্দ্র চৌধুরী ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপন দেখে তো আমি অবাক।

উনি বললেন—আপনার অনারে দাম দিতে হবে না।

উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম—দামের কথা না-হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু এর পর?

আর এরপর? উনি তো হাসতে হাসতে বিদায় নিলেন সেদিন, কিন্তু আমার হলো সমূহ বিপদ। লোকে এসে আমাকে নানা-রকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল।

—হ্যাঁ মশাই, কোথায় জমি নিলেন? কোথায় স্টুডিও? কি ছবি হবে? কারা তুলছে? ইত্যাদি হরেক রকম প্রশ্ন।

তখনকার দিনে ছবির সিনারিও লেখা হতো একটা ছাপানো ফর্মে। আমি অতিষ্ঠ হয়ে লোকের কৌতূহল মেটাবার জন্যে 'অহীন্দ্র ফিল্ম কর্পোরেশনের' নামে কিছু ফর্ম ছাপিয়ে নিলাম। অর্থাৎ ভাবটা হল এই যে, সব হচ্ছে মশাই—তবে ধীরে ধীরে।

কী করি—যদি বলি 'না', তাহলে তো প্রেস্টিজ (আজকালকার ভাষায়) পাংচার্ড।

ও হরি, লোকের জ্বালাতন এতে আরও বাড়লো। তখন এই ঝামেলা থেকে পরিত্রাণ পেতে মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি খেলালো। সেই সময় অভিনেতা রবি রায় প্রায়ই ছেলেকে কোলে করে নিয়ে এসে স্টারের বুকিং অফিসে এসে বসতেন সকালবেলায় গল্পগাছা করবার জন্যে। তাঁকেই বলে ফেললাম কথাটা—ওহে রবি, আমার কোম্পানীর কাস্টিং ডিরেক্টর হবে তুমি? বলো তো তোমার নামটা ছাপিয়ে দিই।

রবিও বিশেষ কিছু না ভেবে বলে দিল তা দিতে পারো।

দিলাম ছাপিয়ে ওর নাম। আর যাবে কোথায়, রবি তখন নাট্যমন্দিরে অভিনয় করতো—লোকে ধাওয়া করতে লাগলো সেইখানে।

এদিকে অনেককেই বলেছিলাম, স্টুডিও করবো—একটা জমি খুঁজে দিতে পারো? একদিন হঠাৎ খবর নিয়ে এল স্টারেরই কয়েকজন ইলেকট্রিসিয়ান আর অ্যাপ্রেন্টিস যে, একটা ভালো জমি বাড়ীশুদ্ধ পাওয়া যেতে পারে উল্টোডাঙ্গায়।

মহা উৎসাহে জমিসহ বাড়ীটা একদিন দেখে এলাম। বেশ বড়ো জমি—১০১নং উল্টোডাঙ্গা মেন রোড—উল্টোডাঙ্গা স্টেশনের ঠিক পূর্বদিকে। পরে ওখানে বিরাট কাঁচের কারখানা গড়ে উঠেছিল, এখন অবশ্য বাড়ীটা আর নেই। যাই হোক, জায়গাটা পছন্দ হল আমার এবং সঙ্গে সঙ্গে লীজ নিয়ে ফেললাম।

দু'পাশে বড় বড় ধানক্ষেত—বিস্তৃত ছাড়া প্রাঙ্গণ। তার মাঝখানে আমার জমি—বাড়ীশুদ্ধ। জমিতে একটা পুকুরও ছিল। গেট থেকে মেন বিল্ডিং-এ পৌঁছতে তিন-চার মিনিট সময় লাগতো—এর থেকেই বোঝা যায় জমির পরিমাণটা কতোখানি। বাড়ীর সামনে পুকুরঘাটটা ছিল সান-বাঁধানো, দু'পাশে বসবার বড়ো বড়ো বেদী। দু'পাশে দুটি বিপুলকায় বকুলগাছ ছিল। বকুল ফুটলে সেই বকুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়ে উঠত।

বাসগৃহ নির্মাণ আপাততঃ রইলো—শুরু হলো স্টুডিও নির্মাণের এলাহি প্রস্তুতি। দৌড়ঝাঁপ, ছুটোছুটি আমাকে কিছুই করতে হয় না—ছেলেরাই মহা উৎসাহে সব করে। কিছু বলতে গেলে বলে—আপনি চুপ করে বসে দেখুন না স্যার, আমরা সব করে দিচ্ছি।

প্ল্যানটা অবশ্য প্রায় সবটাই আমার, কিন্তু সে তো কাগজেকলমে। ওরা সেটাকে রূপ দিতে শুরু করলো। একেবারে সর্বাধুনিক বিলাতী স্টুডিওর অনুকরণে তৈরী হতে লাগল আমার স্টুডিও। ওভার-হেড ট্যাঙ্ক বসলো, প্লাম্বিং মিস্ত্রীরা কাজে লেগে গেল। দেড় ইঞ্চি পাইপ বসানো হতে লাগল। ল্যাবরেটরীর ডার্করুমের জন্যে জল চাই, টিউবওয়েল বসানো হল, কারণ পুকুরের জলে তো আর ফিল্ম ডেভেলাপ হতে পারে না। টিউবওয়েল থেকে জল উঠিয়ে ট্যাঙ্ক ভর্তি হবে, সেখানে জল পরিশ্রুত হবে, তারপর সেই জল ল্যাবরে-টরীতে যাবে—তারও ব্যবস্থা হল। এলাহি কাণ্ড—আমি যেন শুধুমাত্র দর্শক—ওরাই সব করে।

স্টুডিও তো তৈরী হতে লাগল—এই ফাঁকে একটু থিয়েটারের কথা বলে নিই।

এই সময় মন্মথ রায়েরই আর একখানা নাটক খোলা হল স্টারে—নাম 'দেবাসুর'। প্রথম অভিনয় তারিখ—২৮শে এপ্রিল, ১৯২৮। ১৫ই বৈশাখ ১৩৩৫।

'দেবাসুর'কে বৈদিক নাটক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এর আগে আমরা এক-খানা বৈদিক নাটক করেছিলুম—ঋষির প্রেম। কিন্তু সেটি ছিল তপোবন-কেন্দ্রিক। ঋষিদের তপোবনের জীবন—তাদের সংসার এবং দৈনন্দিনতার পরিচয়—এই ছিল তার উপজীব্য বিষয়। কিন্তু তার সঙ্গে এ-নাটকের প্রভেদ প্রচুর। রসের দিক থেকেও বটে আবার বিন্যাসের দিক থেকেও বটে। তাছাড়া পৌরাণিক নাটকের প্রধান উপকরণ হলো ভক্তি ও করুণ রস। এখানে তা অনুপস্থিত। এখানে ভক্তিও নেই, করুণও নেই—এ-নাটক শুধু বুদ্ধিজীবী। এবং কিছুটা প্রতীকীও বটে। দধীচির আত্মদান ও অস্থিই সেই প্রতীক। নিপীড়িত জন-গণের শক্তি—প্রেরণার উৎস।

এই কিছুদিন আগেও ভিয়েতনামে বৌদ্ধ নিপীড়নের প্রতিবাদে কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী পর পর স্বেচ্ছায় অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন দেশকে।

কিন্তু কী সে শক্তি যার বলে মানুষ এভাবে আত্মোৎসর্গ করতে পারে? এই শক্তির স্বরূপের কথাই নাট্যকার বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন নাটকে।

কিন্তু তখনকার দিনে এইরকম বুদ্ধি-জীবী বিষয় দর্শকে তেমন নিলো না, কয়েক রাত্রি চলার পর 'দেবাসুর'কে স্থানত্যাগ করতে হয়েছিল। যদিও সকলের অভিনয় হয়েছিল খুব সুন্দর।

এই নাটকের কাহিনী বিশ্লেষণে এবং চরিত্র-চিত্রণে নাট্যকার কল্পনারই আশ্রয় নিয়েছিলেন বেশী।

বেদে পাওয়া যায় শচী দানবকন্যা। পৌলমী ও'র অপর নাম। নাট্যকার এই ইঙ্গিতটিকে প্রধানতম নাট্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। দানবকন্যা বিবাহ করেছেন দেবতাকে। বৃত্রাসুর শক্তিবলে হারা স্বর্গরাজ্য অধিকার করে পেতে চান পৌলমীকে। এই চাওয়াকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বৃত্রাসুরের অত্যাচার, দধীচির

আত্মত্যাগে যে-শক্তির দমন ও ইন্দ্রের পুনরুত্থান।

আমি করতাম বৃত্রাসুর। ইন্দ্র—মণি ঘোষ, দধীচি—নরেশ ঘোষ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়—ইন্দু মুখার্জি ও সুশীল ঘোষ, ত্বষ্টা—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, বলাসুর—সন্তোষ দাস, শচী—নিভাননী, ঊষা—নীহারবালা, সূর্যা—সুশীলাবালা।

বৃত্রাসুররূপে আমাকে মানাতো ভাল। মেক-আপ করে কস্টুম পরবার পর আমাকে বৃত্রাসুর ছাড়া আর কিছুই মনে হত না। দধীচির অস্থি দেখে আঁতকে উঠে বৃত্রাসুরের একটা পলায়ন-দৃশ্য ছিল। আমি অস্থির দিকে দুটি বিস্ফারিত চোখ রেখে ভীত, সন্ত্রস্তভঙ্গিতে পিছনে হটতে হটতে ঠিক সময়মতো এক সময় পিছু-হটা অবস্থাতেই স্টেজের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতাম। মনে আছে লোকের খুব ভালো লেগেছিল এটা।

অথচ আমাকে সময় ঠিক রেখে ভিতরে ভিতরে সতর্ক হয়ে প্রস্থান করতে হতো। আমার পিছন দিকে উঁচু ঢিবির মত দেখানো থাকতো যেন পাহাড়ের অংশ। সেটা পাহাড়ের পাথরের চাঁই। মনে হতো যেন পাহাড়ের কোলেই দৃশ্যটি অভিনীত হচ্ছে। জায়গাটা উঁচু-নীচু আর প্রস্থান-পথটা ছিল সরু কাঠের ওপর দিয়ে। পিছু হটবার সময় মনে রাখতে হতো যেন এক-পেশে হয়ে পড়ে না যাই। পিছনে তাকাতে

পারব না—শুধু পায়ের স্পর্শ দিয়ে বুঝে নিতে নিতে যেতে হতো।

যাক, 'দেবাসুরে'র প্রথম রজনী হয়ে গেল। তারপর ২রা জুন মনোমোহনে 'শ্রীরামচন্দ্র" ও 'মগেরমুলুক' হলো। তিনকড়িবাবু ফিরে এসেছেন এতদিনে। তিনি মনোমোহনে 'শ্রীরামচন্দ্রে' আমারই পার্ট 'দশরথ' করতে লাগলেন। আর 'রাবণ' করতে লাগলেন দুর্গাপ্রসন্ন বসু। আর 'মগের মুলুকে' তিনকড়িবাবু নিজের 'শাহ-সুজা'র পার্টটাই করতে লাগলেন। ২রা জুন ওখানে ঐ ব্যাপার আর স্টারে হতে লাগল নির্বাচিত নৃত্যগীত, রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট নাটক 'বশীকরণ' ও 'চিরকুমার সভা'। শেষোক্ত নাটকে 'অক্ষয়' করতেন তিনকড়িবাবু, অর্থাৎ ওখানে দশরথ করার পরই এখানে এসে করতেন 'অক্ষয়'।

এইভাবে আমি স্টারে রয়েছি 'দেবাসুরে' ছাড়া উল্টে-পাল্টে নানান বই হতে লাগল —অবশ্য সবই এখানকার অভিনীত বই।

মিনার্ভা এই সময় খুলেছিলেন অমৃতলাল বসুর 'যাজ্ঞসেনী'—৫ই মে, ১৯২৮। এই বইখানিও বেশী দিন চলেনি, তার কারণ প্রথমতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা, তারপর ভাষাও ছিল অত্যন্ত দুর্বোধ্য। অর্থাৎ মানে বুঝতে গেলে অভিধানের সাহায্য নিতে হয়।

এর পরে আমরা নতুন নাটক খুললাম, শরৎচন্দ্রের 'রমা' ('পল্লীসমাজে'র নাট্যরূপ, —৪ঠা আগস্ট। এই নাটক সম্বন্ধে হরিদাসবাবুর চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। তিনকড়িবাবু ছিলেন আমাদের মধ্যে প্রধান, কিন্তু তিনি বয়েস হয়েছে বলে রমেশ করতে চাননি। সেইজন্যে বইটা বেশ কিছু দিন পড়েছিল, এইবার হরিদাসবাবু আমাকে বললেন 'রমেশ' করবার জন্যে। যদিও চরিত্রটি আমার পছন্দ হয়নি, তবুও চক্ষুলজ্জার খাতিরে 'না" বলতে পারলুম না। এক তো প্যাসিভ চরিত্র, তার ওপর প্রেমানুভূতির প্রকাশ—এসব আমার ঠিক আসে না। জ্যেঠাইমা করেছিলেন—তারাসুন্দরী, বেণী—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গোবিন্দ —প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, আকবর—মণি ঘোষ, রমা—নীহারবালা, ভৈরব — ননীগোপাল মল্লিক, ধর্মদাস—নরেশ ঘোষ।

দৃশ্যপট সুন্দর, ছোটোখাটো পার্টগুলো সুন্দর হয়েছিল, কিন্তু 'রমেশ' আমার মনের মত হলো না। আমার ধারণায় জীবনে যত অভিনয় করেছি, তার মধ্যে 'রমেশ'-এর মতো খারাপ কখনো করিনি।

ঠিক এর পরেই মিনার্ভা খুলল তরুণ নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম নাটক 'সত্যের সন্ধান'—এ-নাটকখানি খুব জমে গিয়েছিল। বিশেষ করে কেষ্টবাবুর দু'খানি গান—'আমার কবিতা হারায়ে ফেলেছি' ও 'স্বপন যদি মধুর এমন' আজকের ভাষায় হলো সুপারহিট। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিল অরিন্দম—শরৎ চট্টোপাধ্যায়, চন্দন—ভূমেন রায়, সারঙ্গদেব—কার্তিক দে, পুরোহিত—প্রভাত সিংহ, কবি—কৃষ্ণচন্দ্র দে, অধীরা—শশিমুখী, পিয়াবী—আঙুরবালা।

স্টারে ১৬ই আগস্ট আবার 'রাজসিংহ' খুললো। 'রাজসিংহে' আমি আগে করতুম ঔরংজেব, এখন কর্তৃপক্ষ আমাকে নামভূমিকায় নামতে বললেন। তখন একটা রেওয়াজ ছিল যে, ভূমিকা অদল-বদল করে অভিনয় করা। ও'রা সেই রেওয়াজ ধরেই আমাকে বদলালেন। আমার মনটা খুঁত খুঁত করলেও ও'দের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না।

অগত্যা রাজী হতেই হল। হেড ড্রেসার যে ছিল, সে খুঁজে খুঁজে বের করল অমৃত মিত্র যে-পোষাক পরতেন 'রাজসিংহে' সেই পোষাক। বাঘের ছালের পোষাক—জামা, প্যান্ট, সব। এই পোষাকটা আমার পছন্দ হল। আমি বললাম—ঠিক আছে, এইটেই পরবো।

'রাজসিংহে' অন্যান্য ভূমিকায় নেমেছিল মোবারক—দুর্গাদাস, অনন্ত মিশ্র—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, জেবউন্নিসা—নীহারবালা, চঞ্চলকুমারী—সুশীলাবালা।

কিছুদিন চললো এইভাবে।

এদিকে পুজো এসে গেল। পুজোর সময় নতুন বই খুলতে হবে। কে লিখবে নাটক? অপরেশবাবু কলম ধরলেন—কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কালকেতু—ফুল্লরার কাহিনী নিয়ে তিনি নতুন নাটক লিখলেন 'ফুল্লরা'। এ-নাটকের উদ্বোধন হল মহাসপ্তমীর দিন—২১শে অক্টোবর, ১৯২৮।

ভূমিকালিপি ছিল এইরকম : কালকেতু —আমি, মহাদেব—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, ভাঁড়ু দত্ত—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, পার্বতী—শান্তবালা, পদ্মা—সুশীলাবালা, ফুল্লরা—নীহারবালা, নারদ—তুলসী চক্রবর্তী, যুবরাজ—সন্তোষ দাস।

'ফুল্লরা'য় নাচ ছিল—এই নাচ নীহারকে শিখিয়েছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। নীহার নিজে একজন নামকরা নাচিয়ে ছিল। কিন্তু সে নিজে যে-স্টাইলে নাচতো, তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা স্টাইলে নাচ শিখিয়েছিলেন মণিলালবাবু। নিজের জিনিসকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে একেবারে অন্য জিনিস গ্রহণ করার মধ্যে বিরাট শক্তি ও সাধনার প্রয়োজন। এইটাই ছিল নীহারের বিশেষত্ব। নতুন কিছু পেলে কি নাচে, কি গানে, কি অভিনয়ে—সব সময়ই ও আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছে। কখনও কোনরকম অহমিকা প্রকাশ করেনি।

মণিবাবু ওর পায়ে ঘুঙুর দিলেন না। ঘুঙুরের বদলে ও পায়ে পরলো 'আধলা'কে (তখনকার দিনে আধ-পয়সা চালু ছিল) ফুটো করে মালা গেঁথে। তার উপর পায়ের গয়না হিসেবে পরেছিল পলা। দেখলে মনে হতো যেন আধলার ওপরে পাড় বসানো হয়েছে। এই পয়সার নূপুরে ঝংকারটাও নতুন এবং আওয়াজটাও ভারী মিঠে। আর নাচের ভঙ্গী যে আলাদা—এ-কথা তো আগেই বলেছি।

'ফুল্লরা'র প্রথম প্রবেশের মুখে নাট্যকার বর্ণনা দিয়েছেন—'বুকে গাছের ছাল আঁটা, পরনে কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম, মুক্ত কেশরাশিতে বনফুল জড়ানো। গায়ে পলা ও রক্তিম পাথরের গয়না। এই বর্ণনা থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন ফুল্লরার সাজপোষাকের ব্যাপারটা।

'ফুল্লরা'র সেট-সেটিংসের ব্যাপারেও খুব অভিনবত্ব ছিল। ম্যাজিসিয়ান রাজা বোসের নাম আমি আগেই করেছি। সেই রাজা বোসই এসে গেলেন এই সেট-সেটিংসের ব্যাপারে, যদিও প্রবোধবাবুর ইচ্ছে ছিল না রাজা বোসের আসায়। রাজা বোস আমাদের অন্যতম ডিরেক্টর কুমারবাবুর লোক, প্রবোধবাবুর ভয় ছিল লোকটা কুমারবাবুর কাছে গিয়ে যদি কিছু লাগানি-ভাঙানি করে তো মুস্কিল। লোকে বলত ওর নাকি এর কথা তাকে আর তার কথা একে বলা স্বভাব। প্রবোধবাবুর সঙ্গে ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষের একটু মন-কষাকষি শুরু হয়ে গিয়েছিল — আবার প্রবোধবাবুর বিরুদ্ধে সব সাক্ষী-প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্যেই রাজা বোসকে পাঠান হয়েছে কিনা কে জানে?

রবিবার আমাদের 'ফুল্লরা' খোলা হবে, আর শুক্রবার দেখলাম চলতি নাটকের সঙ্গে রাজা বোসের ম্যাজিক জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রবোধবাবুর দিক থেকে প্রবল বাধা উঠলেও রাজা বোস রয়ে গেলেন স্টারে।

এতে কিন্তু আমার একটা খুব সুবিধে হল। ফুল্লরায় দুটো 'ট্রিক' সিন ছিল—সে দুটো অতি চমৎকার করেছিল রাজা বোস।

এ দুটো 'সিনে'র একটা এমন কিছু মারাত্মক নয়—কারাগার থেকে লোহার শিক বেঁকিয়ে কালকেতুর পলায়ন।

কিন্তু অন্যটি ছিল বেশ শক্ত — এই দৃশ্যটি লেখাও হয়েছিল চমৎকার, আর জমতোও অদ্ভুত। 'চোখ গেল, চোখ গেল—কেনরে পাখী কাঁদিস অমন কাতর করুণ স্বরে' বলে একখানি গান গাইত নীহার। এ গানটির সুর দিয়েছিলেন জানকী বসু। সুরও যেমন সুন্দর হয়েছিল, নীহার গেয়েছিলও তেমনি দরদ দিয়ে। গানের পরে কালকেতু ধনুকের গুণে বেঁধে নিয়ে এল একটি গো-সাপ। ফুল্লরা দেখে বললে—ভারী সুন্দর তো এটা। একেবারে কাঁচা সোনার রঙ। ওকে মারবো না, পুষবো।

বলে কুঁড়ে ঘরের ভেতরে সাপটাকে রেখে ঝাঁপ বন্ধ করে দিল।

(ক্রমশঃ)

ঐতিহ্য-উত্তাপ

ক্ষেতে সবুজ ধানগাছ সোনালি হয়েছে। শুরু হয়ে গেছে ধানকাটার মরশুম। কিষাণের ফুরসত নেই। ধান কেটে, মাড়াই করে গোলায় তুলতে হবে। তারপর ছুটি। সারা বছরের আশা-ভরসা এই ধান। কাস্তে হাতে তাই সে ক্ষেতে ক্ষেতে ছুটে বেড়াচ্ছে।

কিষাণ ধান কাটে, আর কিষাণ রমণী সেই ধান মাড়াই করে। কখনো কখনো স্বামীর সঙ্গে লেগে যায় ধান কাটার কাজে। কাজটা চটপট সেরে ফেলতে চায়। দেরী হলেই নানা অসুবিধা। তার ধারালো কাস্তেতে ধান কাটা হয় চটপট। সেই ধান আঁটি বাঁধা হয়ে এসে পৌঁছয় কিষাণের উঠোনে। মাড়াই-এর দায়িত্ব পুরোপুরি কিষাণ রমণীর। নিজের হাতে হুঁশ-হুঁশ করে পাড়া মাড়িয়ে ধান মাড়াই করে। যতক্ষণ না ধান গোলায় ওঠে ততক্ষণ তার নাওয়া-খাওয়ার হুঁশ থাকে না। হাতের কাজ ফেলে রেখে উঠতে ইচ্ছে হয় না। এখন শুধু ধান আর ধান। মনে শুধু এই একই চিন্তা। কাজটা ভালয় ভালয় মিটলে তবেই স্বস্তি।

কিষাণ তো ধান তুলেই রাজা হয়ে বসে। পায়ের ওপর পা দিয়ে ভুড়ুক ভুড়ুক হুকো টানে। ধান ভালয় ভালয় গোলায় উঠেছে এবার আর তাকে পায় কে? কিষাণ রমণীর কাজ এখনো শেষ হয় না। ধান বিচুলি প্রথম ব্যবস্থা না হয় হলো কিন্তু ধান সেদ্ধ করা, শুকনো, ধানভানা এসব রুজির কাজ তার জন্য রয়েছে। তারপর হিসেব করে দেখতে হবে তারা বছরের খোরাক বাঁচিয়ে এই ধান থেকেও দুটো পয়সা পাওয়া যায় কিনা। শুধু ভাতে তো আর চলে না। অন্য কত খরচ। সে সবই তো এখান থেকেই ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর ছোটখাটো চাষ দু'একটা আছে অবশ্য তবে তার উপর তেমন ভরসা করা যায় না। তাই কিষাণ রমণীর চিন্তা সারা বছর থেকে যায়। এমনি চিন্তা নিয়েই সে কাটিয়ে দেয় বছরের পর বছর। এরই মধ্যে আছে আবার কত না দুশ্চিন্তা। অনাবৃষ্টি, পোকার উপদ্রব, বান-বন্যা কত কি। এসব কাটিয়ে ধান যখন গোলায় ওঠে হাজার চিন্তা ছাপিয়ে কিষাণ রমণীর অন্তরের খুশি উপচে পড়ে। সেই হাসি হাসি মুখ আনন্দে উজ্জ্বল।

শুধু কিষাণ রমণীর নয় স্বামীর সঙ্গে এমনি হাত লাগিয়ে কুমোর গিন্নিও সারা বৎসরের কথা ভাবে। কুমোর কর্তার সঙ্গে সঙ্গে তার গিন্নি কাজে সমান তাল দিয়ে যায়। কর্তা যখন বড় বড় মূর্তি গড়ায় বিভোর তখন গিন্নি গড়ে সেই মূর্তির হাত পায়ের আঙুল, মূর্তির মুখ। তাদেরও তো সারা বছরে এই একটাই মরশুম। পুজোর মরশুম। এখন যদি কাজকর্মে ভাল না হয় তো বছর চলবে কি করে? তাই কুমোর গিন্নি কর্তার পাশে এসে দাঁড়ায়, হাত লাগায়! প্রাণপণ সহযোগিতা করে।

কুমোর পাড়ার কাজ চলে প্রায় বছর বোপে। বলতে গেলে বিশ্বকর্মা পুজোয় শুরু। দুর্গা পুজোয় চরমে ওঠে। কালী পুজোই বা কম কিসে। বরং এ সময় সবাই দুটো পয়সা পায়। তারপর একটু ঢিলে। আবার এসে যায় পুজোর ধুম। সরস্বতী বিদ্যাবতীর মূর্তি গড়তে শুরু করে দেয় কুমোর।

এরই মধ্যে চলেছে কুমোর গিন্নিরও কাজ। বড় পুজোর মরশুমে সে স্বামীর সঙ্গে কাজ করে। কিছু আবার তার নিজের কাজও আছে। মাটির প্রদীপ, খেলনা পুতুল সে নিজেই করে। কুমোর কর্তার সাহায্য ছাড়াই। কালীপুজোর দিনই চাই মাটির প্রদীপ আর খেলনা পুতুল। তাই কুমোরকে সাহায্য করার ফাঁকে ফাঁকে এ দিকটাও তাকে লক্ষ্য রাখতে হয়। এজন্য কুমোর গিন্নি বাড়ির বাচ্চাদেরও সাহায্য নেয়। নাহলে কাজ উঠবে না। পয়সা আসবে না। আর বাচ্চাদেরও হাতে খড়ি হবে না।

মাটির প্রদীপ তৈরি করে পোড়ালেই কাজ শেষ। পুতুলের বেলায় কিন্তু তা হবার জো নেই। মাটি তৈরি করে পুতুল বানাতে হয়। সে পুতুল রোদে শুকুবে। তার গায়ে এবার পড়বে খড়িমাটি। সবশেষে রঙের তুলি। পোচের পর পোচ। কান, ঠোঁট। এবার চোখ। পুতুল খোকাখুকুর খেলার উপকরণই শুধু হবে না। হবে তাদের সবসময়ের সাথী। চলবে, বলবে, খেলবে। তবেই তো কুমোর গিন্নির শ্রম সার্থক। আর তখনি কুমোর গিন্নির মুখ উজ্জ্বল হবে। হাসি হাসি মুখে সে নতুন করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখবে।

জেলে যায় দূর-দূরান্তে মাছ ধরতে। ঘরে ফেরার ঠিক-ঠিকানা থাকে না। তাই জেলে-গিন্নিও চুপ করে থাকতে পারে না। খ্যাপলা জাল অথবা পলোটা নিয়ে সেও বেরিয়ে পড়ে। বিল-পুকুর ঘেঁটে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে হাজির হয় বাবুদের দরজায় অথবা কাছে-পিঠের বাজারে। বিক্রি করে যে কয় গণ্ডা পয়সা পায় তাই দিয়ে হাট-বাজার সেরে বাড়ি ফেরে। সারাদিন খেটে-খুটে এসে লোকটা যদি দুটো ভাত না পায় আবার ছেলেপুলেদের মুখেও তো কিছু দিতে হবে। তাই জেলে যখন উদরান্নের সংস্থানের জন্য তন্ময় হয়ে মাছ ধরে তখন এই লোকটির কথা ভেবে জেলে-গিন্নীও চুপচাপ বসে থাকতে পারে না।

এখানেই কিন্তু তার কাজ শেষ নয়। জেলে মাছ ধরে বাড়ি ফেরে। ক্লান্ত, বিশ্রাম নেয়। জেলে গিন্নীর কিন্তু বিশ্রাম নেই। নিয়মিত জাল শুকুতে দিতে হবে। নইলে সুতো পচে জাল ফুটো হয়ে যাবে। জাল বুনতেও হয়। আবার কখনো কখনো জেলে মাছ ধরে ফিরলে সেই মাছ নিয়ে বাজারে বেরুতে হয় বেচতে। এসবই তাকে করতে হয় ঘরকন্নার ফাঁকে। এমনি চলে বারো মাস —সারা জীবন।

আজ আমাদের মেয়েদের কত জয়জয়কার। তারা মর্তে ঘোরে, আকাশে ওড়ে, পর্বতের চূড়ায় পা রাখে। অফিসকর্মী মেয়েদের কথা না হয় বাদই তালিকাবিহীনই থাক। কিন্তু এই যে কর্মধারা অক্লান্তভাবে বয়ে চলেছে আমাদের মেয়েদের মধ্যে পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে পুরুষের সহকর্মীরূপে এ-ধারা থেকেই হয়তো আরো বহুতর ক্ষেত্রে আমাদের মেয়েরা এগিয়ে এসেছে। এবং অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদেরও পাল্লা দিচ্ছে। আজকের বিরাট অগ্রগতির দিকে পুরুষ ও নারীর মিলিত কর্মসাধনার নিরবচ্ছিন্ন ধারা থেকে আমরা যতই উত্তীর্ণ হই না কেন আমাদের স্বীকৃতি থাকবে এখানে।

—প্রমীলা

[illegible] চীফ এয়ার হোস্টেস কনফারেন্সে মিঃ জি ই কেকের সঙ্গে করমর্দন করছেন এয়ার ইন্ডিয়ার চীফ হোস্টেস মিস জুলিয়ান ডুলে।
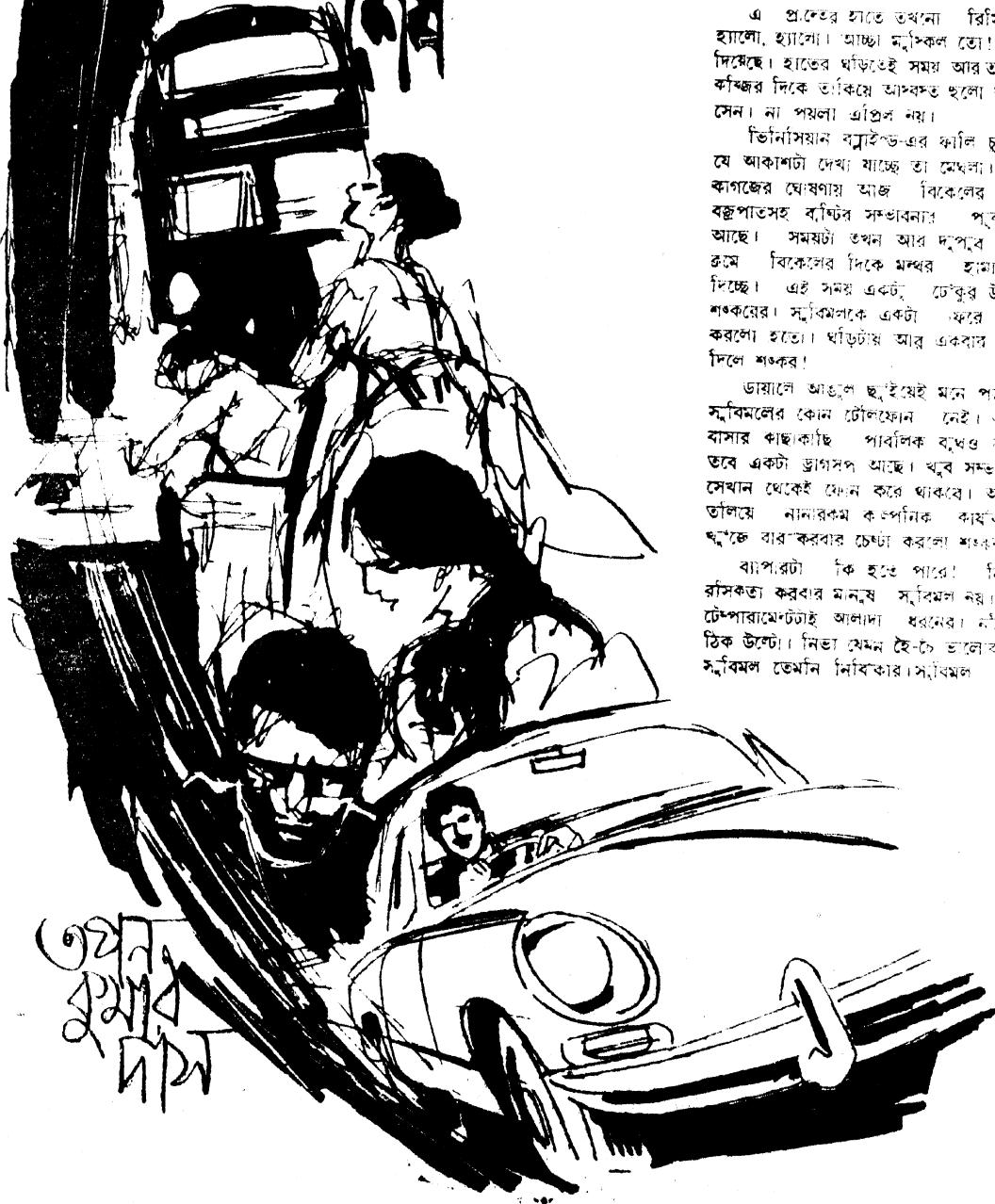
হ্যালো, কে শঙ্কর? আমি সুবিমল বলছি। একবার আসতে পার এখুনি! কিছু মনে করো না—তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করেও চলে এসো। খুব জরুরী. এ্যাঁ—কি বললে? বিকেলে, মানে ছুটির পর বলছো? নো-নো প্লিজ—অনেক দেরি হয়ে যাবে। না ফোনে-সব কথা বলা যাবে না। (মাঝখানে এই সময় হঠাৎ অন্য কেউ লাইনটায় গোলমাল বাধাচ্ছে)। হ্যাঁ-হ্যাঁ সুবিমল বলছি। যা বলছিলুম, ফোনে বলাটা ঠিক হবে না। চলে এসো, ছাড়ছি। ক্লিক। রিসিভার নামিয়ে রাখা হলো।

এ প্রান্তের হাতে তখনো রিসিভার। হ্যালো, হ্যালো। আচ্ছা মুশ্কিল তো! ছেড়ে দিয়েছে। হাতের ঘড়িতেই সময় আর তারিখ। কব্জির দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত হলো শঙ্কর সেন। না পয়লা এপ্রিল নয়।

ভিনিসিয়ান ব্লাইন্ড-এর ফালি ছুঁইয়ে যে আকাশটা দেখা যাচ্ছে তা মেঘলা। খবর কাগজের ঘোষণায় আজ বিকেলের দিকে বজ্রপাতসহ বৃষ্টির সম্ভাবনার পূর্বাভাষ আছে। সময়টা তখন আর দুপুর নেই। ক্রমে বিকেলের দিকে মন্থর হামাগুড়ি দিচ্ছে। এই সময় একটু খেঁকুর উঠলো শঙ্করের। সুবিমলকে একটা ফোন করে রিং করলো হতো। ঘড়িটায় আর একবার নজর দিলে শঙ্কর!

ডায়ালে আঙুল ছুঁইয়েই মনে পড়লো, সুবিমলের কোন টেলিফোন নেই। ওদের বাসার কাছাকাছি পাবলিক বুথও নেই। তবে একটা ড্রাগসপ আছে। খুব সম্ভব ও সেখান থেকেই ফোন করে থাকবে। অনেক তলিয়ে নানারকম কল্পনিক কার্যকারণ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করলো শঙ্কর।

ব্যাপারটা কি হতে পারে! নিছক রসিকতা করবার মানুষ সুবিমল নয়। ওর টেম্পারামেন্টটাই আলাদা ধরনের। নীভার ঠিক উল্টো। নিভা যেমন হৈ-চৈ ভালোবাসে, সুবিমল তেমনি নির্বিকার। সুবিমল বরং-

বরাই গম্ভীর প্রকৃতির। অথচ নীভা ওর সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যক্তিত্বকে কি করে সে সময় মেনে নিয়েছিল ভাবতে আশ্চর্য লাগে। অল্প সময়ের জন্যে শংকর অনামনস্ক হয়ে গেল। একটা ধূসর অতীত। না ধূসর নয়। একটা উজ্জ্বল প্রাণোচ্ছল অতীত ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। অথচ খুব বেশিক্ষণ ভাববার অবকাশ নেই। ইতিমধ্যে একটা টেলিফোন কল রিসিভ করলো ও। কয়েকটা জরুরী কথাবার্তা চালাচালির পর রিসিভার নামিয়ে রাখার সময় মনে হলো, তবে কি নীভার কিছু? কোন অসুখ-বিসুখ?

মাথা চুলকে নীভার চেহারাটা মনে করবার চেষ্টা করলো। মনে হলো সম্প্রতি ওর স্মৃতিশক্তির ধার কমে যাচ্ছে। ব্যাটারী পুরোনো হলে যেমন রেডিওর শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসে তেমনি। ওর স্মৃতিতেও আগে যেমন সব পুরোনো ছাপ খুব স্পষ্ট ধরা পড়তো—ইদানীং আর পড়ে না। ও ইচ্ছা করেই সব ভুলে যাবার চেষ্টা করে করে মোটামুটি সফল হচ্ছে বলা যায়।

এই তো দিন দশেক আগে দেখা হয়েছে। রাত দশটা পর্যন্ত স্টেকে ফিস খেলেছে তিনজনে। অতো রাতে না খাইয়ে ছাড়েনি নিভা। সুবিমলের কাছে ও পঞ্চাশ টাকা হেরেছিল। কোনরকম সিরিয়াস কিছু ঘটবে ঘটবে এমন কোন সম্ভাবনার ছায়া ছিল কি সেদিন নীভার চোখে-মুখে?—শংকর প্রথাসিদ্ধ ফর্মুলাসবাকে প্রসঙ্গটা ভাববার চেষ্টা করে নিষ্ফল হলো।

হঠাৎ নার্সিং হোমে পাঠানোর মতো এ্যাকিউট এখন-তখন গোছের হলে দশদিন আগে নিশ্চয়ই ওর চোখে ধরা পড়তো। না সেরকম কোন স্টান্ট নয়। তাহলে কোন আত্মহত্যার ঘটনা নাকি? সুবিমলের কণ্ঠ-স্বরটা ভাবতে চেষ্টা করলো। কোন উত্তেজনা ছিল কি? তাছাড়া সেরকম কোন ঘটনা ঘটলে সুবিমল তাকেই কেন জরুরী ডেকে পাঠাবে? শংকর মনে মনে আতঙ্কিত হলো। হলেও হতে পারে। মেয়েরা এমন ঘটনা খুব সহজভাবেই ঘটাতে পারে। ঘটনা ঘটে যাবার প্রাক মুহূর্তেও কোন রকম বিসদৃশ ফলাফলের প্রতিক্রিয়ার কথা ভুলেও ভাবে না। অথচ খুব ভালোভাবে ভেবেই সব কিছু করে থাকে। হয়তো কোন চিঠি। বিস্তারিত লেখার ভঙ্গে ভঙ্গে এমন কোন তথ্য পরিবেশন করে গেছে যার জন্যে একটা মিউচুয়াল বোঝাপড়া করবার জন্যে (নীভার মৃতদেহ সামনে রেখে) সুবিমল তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। হয়ত এখনও কেউ জানে না। পুলিশ খবর পায়নি এখনো।

নীভার কথাটাই মনে হচ্ছে বেশি করে। কব্জিতে সময় আরো আধঘন্টা নিঃশব্দে এগিয়ে গেছে। ভেতর থেকে বোঝা না গেলেও ইতিমধ্যে বাইরে একপশলা বৃষ্টি নেমেছিল। পশলা বৃষ্টির সঙ্গে কয়েকটা বড় বড় বরফের কুঁচিও পড়েছিল আকাশ থেকে। শংকর ভিনিসিয়ান ব্লাইন্ড-এর কাছে এসে ফালি ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেল এ্যাসফাল্টে রোদ পড়েছে। ধোঁয়া উঠছে। বৃষ্টির পর ধোয়া-মোছা আকাশটা দারুণ পরিষ্কার।

এখন কি করা যায়। ভাবতে ভাবতে শংকর টাইয়ের নটটাকে আলগা করলো। খুব চেপে বসেছিল ওটা। তারপর কলিং বেলে চাপ দিলো।

সুইং ডোর খোলার পাতলা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে—হুজুর।

মিস দাশগুপ্ত। ঠোঁটের আগায় জুগিয়ে গেল শব্দটা।

সযত্নলালিত ছিপছিপে গঠনভঙ্গী। সর্টহ্যান্ডের খাতা আর ফাউন্টেন কলম পেন্সিল হাতে মিস দাশগুপ্ত তখনি হাজির। আজকের শাড়ীর রঙটা যদিও বড্ড চড়া। এতে মেয়েকে বড়ো সুন্দর আকর্ষণীয় না। কাঁধের পাশে নেমে আসা প্রায়সংস্কৃতিক হাতওয়ালা শালীন ব্লাউজে মনে হচ্ছিল যেন কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এসেছে। কিন্তু একটা পার্টির দেখা শংকরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ হলে তাকে অনামনস্কের মতো দেখে যে ওর দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে থাকলো, সেটাই ভাবার কথা। নিজে ঐ ধরনের রঙটাই বিশেষভাবে পছন্দ করে। হয়তো-ইয়েস?

অন্যমনস্কতার চটকা ভাঙতে শংকর অপ্রস্তুত হলো। আই অ্যাম সরি, মিস দাশগুপ্ত। অন্য কোন ডিকটেশন নয়। আমি বলছিলাম কি যে, আমি একটু বিশেষ কাজে বেরোচ্ছি। যদি মিঃ আচার্য অথবা অন্য কেউ আমার খোঁজ করেন বা কোন জরুরী মেসেজ থাকে—তাহলে দয়া করে নোট রাখবেন। বলবেন, আমি আজ আর ফিরবো না। কাল দেখা হবে। ঠিক আছে? কিছু বলবেন?

নিজেকে আজ বার বার সব ব্যাপারে কেমন নিষ্ঠুর বোধ হচ্ছিল। শংকর যেন ওর নিজের নিষ্ঠুরতা ঢাকবার চেষ্টাতেই মেয়েটির মুখে ধরা পড়ে গেছে বলে সন্দেহ করলো। এবং সেজন্যেই জিজ্ঞেস করলো—কিছু বলবেন?

নো, থ্যাংক ইউ।

সুইংডোর ঠেলে বেরিয়ে গিয়ে পরমুহূর্তেই আবার ঢুকলো মেয়েটি।

এক্সকিউজ মী।

অন্যমনস্কতায় মেয়েটিও তার পেন্সিলটা টেবিলে ছেড়ে গিয়েছিল। আবার একটা ঢেকুর উঠলো। শব্দ করে ঢেকুর তোলাটা খুবই কদর্য। মেয়েটি ফিরে তাকালো। সম্ভবত ক্ষীণ হাসিও ফুটে উঠেছিল। শংকর সেটা দেখেনি। আস্তিনটা ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলো। সাড়ে তিনটে। চেয়ারের ওপর থেকে কোটটা তুলে নিয়ে কাঁধে ফেললো। সিগারেটের টিনটা তুলে নিয়ে আকস্মিক বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

হিসেব করে দেখলো, সুবিমলের টেলি-ফোন পাওয়ার পর প্রায় আধ ঘন্টার মতো সময় কেটেছে। অনেক জরুরী কাজ ছিল। তবুও যেতে হচ্ছে। গিয়ার বদলে গাড়ীটাকে একটু বেশী গতিশীল করার চেষ্টা করার সময় শংকরের মনে হলো—তাইতো সুবিমল টেলিফোনে ডাকলো আর ও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাচ্ছে। কেন? নিজের প্রতি এই জিজ্ঞাসার সময় ও গাড়ীর আয়নার দিকে তাকালো। পেছনে একখানা ডবল ডেকার দ্রুত আসছে। এ্যাকসিলারেটারে চাপ দিতেই সামনে লাল। দমকা ব্রেক কষতে হলো। প্রথমটা প্যাডালে চাপ দিয়েই বুকটা প্রায় হাল্কা হয়ে যাচ্ছিল। যাক দ্বিতীয়বার প্যাডালে গভীর চাপ দিতে গাড়ীটা দমক খেয়ে থেমে গেল। আর মাত্র এক সেকেণ্ডের মতো যদি দেরি হতো তাহলে ঠিক ট্যাকসিটার বাম্পারে ধাক্কা খেত।

ব্রেক কষার সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জিনটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সবুজের সংকেত হবার সময় ও বুঝতে পারলো সেলফ ঠিক কাজ করছে না। মাঝে মাঝেই ট্রাবল দিচ্ছে গাড়িটা। পেছনের গাড়ীগুলো পরিত্রাহী হর্ণ বাজাচ্ছে। দু-তিনবার সেলফ টানার পর ইঞ্জিনটা চললো। যাক শেষ পর্যন্ত গাড়িটা স্টার্ট নিয়েছে। ইঞ্জিনটা যে রেটে শব্দ করে চলে তার থেকে পঞ্চাশগুণ কম গতিতে। বাঁ-পাশ দিয়ে একটা ঢাউস ডবল ডেকার টিকি মেরে এগিয়ে গেল। প্রচুর কালো ধোঁয়া ছেড়ে নড়বড়ে ট্যাকসিটাও ওকে ফেলে ওভারটেক করে গেল। ফাটা সাইলেন্সারের উৎকট আওয়াজ। যা সত্যিকার পাবলিক ন্যুইসেন্স। শংকর ওর গাড়ীটাকে খুব জোরে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। একেবারেই পিক-আপ নেই। সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছে গাড়ীটা। আঃ শংকরের চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। সাদা রাজহাঁসের মতো এক-খানা কনভার্টিবল ইম্পালা বেরিয়ে গেল। একজন সম্ভবতো পাঞ্জাবী ভদ্রলোক গাড়ীটা চালাচ্ছেন, তাঁর পাশে একজন সুন্দরী মহিলা। এরকম দৃশ্য চোখের সামনে মাঝে মাঝে ভেসে উঠলে অন্ততঃ চোখ দুটো আরাম পায়।

এরকম পিঁপড়ের মতো এগোলে সে কোনদিনই পৌঁছুতে পারবে না। সুবিমলের জরুরী তলবের কথাটা মনে পড়তে ভাবলো তার এই দেরী হওয়াটাকে সুবিমল ইচ্ছাকৃত ভাবতে পারে। যেহেতু শংকর এখন ওয়েল-টু-ডু। একটা কুলীন কোম্পানীর আসিসট্যান্ট ম্যানেজার। মোটামুটি ভালো কেরিয়ারের অর্ধেক সিঁড়ি ডিঙিয়েছে। যেহেতু নিজের গাড়ী আছে। দ্রুত যথেচ্ছ যাতায়াত সেহেতু হাতের মুঠোয়। কিন্তু আটচল্লিশ মডেলের থার্ডহ্যান্ড ভকসল যে বর্তমানে বুলক কার্টকেও লজ্জা দিচ্ছে সেটা সুবিমল বিশ্বাস করবে কি করে।

ব্যর্থ অক্ষম গাড়ীটার ওপর শংকর ভীষণ ক্রুদ্ধ হলো। সেই মুহূর্তে মনে

হলো ও রাস্তার পাশে ওটাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে একটা যে কোন নতুন ট্যাক্সির বলবান ইঞ্জিনের সহায়তায় খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সুবিমলের ওখানে পেশছে যায়। আবার সেই বিশেষ ব্যাপারটা ওর মন পাক খেতে লাগলো। নীভা নিজে ওকে টেলিফোন করলে হয়তো এতটা রহস্যের ভেতরে ফেলে রাখতো না। মনে করে দেখলো—নীভা ওকে কতোবার টেলি-ফোন করেছে। একশো-দুশো-তিনশো-চারশো, সাড়ে চারশো অথবা অসংখ্যবার টেলিফোন করেছে। একটা তীব্র হর্ণ আর দারুণ গতিবেগে যে গাড়ীটা ওকে ওভারটেক করলো, ওটা বিদেশী গাড়ী। কনস্যুলেটের হলুদ নাম্বার প্লেট লাগানো সদ্য আমদানি লিংকন। তার পেছনে একটা মার্সিডিজ বেনংজ। ওর নিজের জীবনের কেরিয়ারের আরও পাঁচগুণ তুঙ্গ অবস্থায় পেশছে গেলে একটা ঐ জাতের গাড়ীর মালিক সে সহজেই হতে পারবে। নিজের প্রিমিটিভ ধরনের গাড়ীটার তিন থেকে চার ইঞ্চি ফলস্ স্টিয়ারিঙ হুইল আয়াসসাধ্য ঘোরাতে গিয়ে মাত্র চার বছর আগের একজন বেকার যুবকের ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। উইন্ড স্ক্রীন-এর ওপর দিয়ে ছবিটা চলমান রাজপথের সঙ্গে সুপারইম্পোজড হয়ে গেল। ধার করা ট্রাউজার, বুশসার্টের সঙ্গে পায়ে তালি মারা ডার্বি আর

পকেটের ভেতর ভাজে ভাঁজে জীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট। নোটারী পাবলিকের সই করা পরিচয়পত্র সম্বল করে ঘুরে বেড়াতো একটি যুবক এবং একটি মেয়েকে ভালোবাসতো। (যদিও ভালোবাসা শব্দটা ইদানীং ভয়ঙ্কর ক্লিশে) তবু ঐ যাকে বলে একটা আশ্চর্য অবিশ্লেষণীয় অনুভূতি। যা নিয়ে দিন-রাত ভাবা আর ভাবা। সময় কালের অনিবার্য নিয়মকানুনগুলোকেও মনে হতো অর্থহীন। সেই আর কি!

জানো নীভা, নিজেকে মনে হতো আমি একজন পৃথিবীর শেষ ব্যর্থ মানুষ। যার কিছু হবে না। কোন ভবিষ্যৎ নেই। জানো, আমি একদিন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলুম। যে পদ্ধতিটা মাথায় এসেছিল তাও ভয়ংকর। নিজেকে ছিন্নভিন্ন কিমাকার করে সকলের সামনে একটা খুব এফেক্টিভ বিজ্ঞাপনের মতো হাজির করে বোঝাতে চেয়েছিলুম এবং এ ধরনের আমার মতো পরিস্থিতির অনেককে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলুম যে আমাদের পরিণতি এই-ই হওয়া উচিত। অথচ হাতের তেলোর সুদীর্ঘ গভীর আয়ুরেখা আমাকে নিরস্ত করেছিল। (আমি অন্ধ জ্যোতির্বিশ্বাসী ছিলাম তখন) ডাক মারফৎ একসঙ্গে তিন জায়গা থেকে ইন্টারভ্যু এসেছিল। কেরিয়ারের হাতছানি।

সুবিমল আমাকে তিনশো টাকা ধার দিয়েছিল। অনেকগুলো অনুকূল শর্ত ছিলো বলে আমি বোম্বের ইন্টারভ্যুটাই বেছে নিয়েছিলুম।

প্রেস্টনজী পার্সি। সাধারণত ঐ ধরনের নামের সঙ্গে ভাঙ্গা হাড়ের চিকিৎসকদের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু প্রেস্টনজী-র ছিলো এক বড় রকমের আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা। নানা রকম ওষুধপত্র থেকে শুরু করে বিদেশী ছোটখাটো যন্ত্রপাতি পর্যন্ত নিয়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ব্যবসার জাল বিস্তার করেছিলেন। কোলাবার হেড্‌অফিসে ইন্টারভ্যু দিয়েই হাতে হাতে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার গুঁজে দিয়েছিলেন ওঁর ছোট ভাই আদমজী। তিন মাস ওখানে আমার কাজকর্মের নানাবিধ আদমসুমারীর পর কলকাতার অফিসে পাঠানো হয়েছিল।

শঙ্কর এ্যাকসিলারেটারের প্যাডালে সম্পূর্ণ চাপ সৃষ্টি করেও সফল হচ্ছে না। সেই স্টেডি তিরিশ মাইল পর্যন্ত কাটা উঠে থমকে যাচ্ছে।

শঙ্কর ওর পাশ কাটিয়ে বেগে চলে যাওয়া একটা বাসের পেছনে পরিবার পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন দেখলো। একটা বিরাট লাল ত্রিকোণের ছবি। এমন অদ্ভুত একটা প্রতীক কার মাথা থেকে এসেছিল কে জানে। শঙ্কর মনে মনে তাকে ধন্যবাদ জানালো। দারুণ আইডিয়া। এমন পরিশুদ্ধ অশ্লীল প্রতীক ভাবা যায় না। ভীষণ এফেক্টিভ্‌। ত্রিকোণ প্রতীক থেকে ও নিজের মধ্যে একটা বিশেষ মানে খুঁজে পেল। নীভা, সুবিমল আর সে নিজে। ইটারন্যাল ট্র্যাংগল।

শঙ্কর ভাবলো। ওর ভাবনাতেই—আমি নীভাকে খুব ভালোবাসতুম। তার থেকেও সুবিমলকে। সুবিমল আমাকে তিনশো টাকা ধার দিয়েছিল। বিনা শর্তে এই বাজারে কে এ ধরনের ঝুঁকি নেবে। সুবিমলের কেরিয়ার তখন তৈরী। ও তখন সিনেমার হিরো। চমৎকার চেহারা নিয়ে ও ঠিক রাস্তাই বেছে নিয়েছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে ভাগ্যের অলৌকিক চাকা অজ্ঞাত কারণে উল্টো ঘুরে গেছে কারও কিছু বলবার নেই। পরপর সাতখানা ছবি ফ্লপ্‌। অতএব ফ্লপ-মাস্টার সুবিমল তখন ভীষণ বেকায়দায়। যে সময়টায় আমি বিধ্বস্ত ছিলাম মানে ভেতরে ভেতরে আত্মহননের পরিকল্পনা আর নীভার ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মুৎসুদ্দি প্রেস্টনজীকে দরখাস্ত পাঠিয়ে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ছিলুম। তখনই নীভা ওর নিজের সিকুরিটির কথা ভেবেই সুবিমলকে ধরে ফেলেছিল। আসলে ওরা প্যারাসাইট্‌। এখন আমার নতুন করে জীবনে জোয়ার এসেছে। আকস্মিক দুর্ঘটনার মতোই মানুষের জীবনে সুদিন আসতে পারে।

একটা অসীম বিরক্তিতে শঙ্করের মুখটা বিকৃত হ'লো। এই তিরিশ মাইল গতিতে কি সে সারা জীবন ধরে গিয়ে পৌঁছবে সুবিমলের ওখানে! ওখানে গিয়ে কি দেখবে? কি শুনবে? সুবিমল কি সেই তিনশো টাকা ফেরত চাইবে বলে কায়দা করে এইভাবে ডেকে পাঠালো? তাহলে সে নগদ পাঁচশো টাকার একটা চেক্‌ কেটে দেবে। নীভাকে শুনিয়ে বলবে—'বল তো আরও কিছু বেশি দিই!' (নীভা, এখনো তোমার জন্যে সব দিতে পারি) অথবা সুবিমল বলতে পারে ওর স্বভাবসুলভ অভিনয়ের ভংগীতে শঙ্করের দুটো হাত ধ'রে—'আসলে মুক্তি দাও শঙ্কর। অন্তত নীভাকে গ্রহণ করে ওকে নতুন ক'রে বাঁচতে দাও। জীবনটা ওর ভীষণ বোরড্‌ হয়ে পড়েছে। প্লীজ্‌। বল তো কালই আইনজ্ঞর পরামর্শ নিই।

নীভা কোনদিন ভাবতে পারেনি আমি আবার একদিন প্রতিষ্ঠায় ফিরে আসবো। আমি নিজে ভাবিনি। হঠকারিতার যদি আত্মহননের চেষ্টাটা কার্যকরী হতো তাহলে এই আমি—শঙ্কর ভাবলো, এই আমি আমার নিজস্ব গাড়ীতে চড়ে নীভাদের বাসায় যেতে পারতাম না। (সুবিমলের একখানা চমৎকার গাড়ী ছিল একদিন।) সুবিমল তুমি কেন ডেকেছ? আমি কিছু জানি না। হ'তে পারে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্রের দিকে আমি মন্থরগতিতে এগিয়ে যাচ্ছি। সুবিমল তুমি খুব সহজে আমাকে খুন ক'রতে পার। একজন ব্যর্থ মানুষের পক্ষে মরিয়া হয়ে হঠাৎ খুন করাটা খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। মোটিভটা জোরালো। নিজের স্ত্রীর অবৈধ নাগরকে একজন বিশ্বস্ত স্বামী যদি খুন ক'রে তাহলে তার ফাঁসি নাও হ'তে পারে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ'লে প্রাণে বেঁচে যাবে।

কৌতূহল অসহ্য হয়ে উঠতে শংকর তার [illegible] গাড়ীটার এ্যাকসিলারেটার প্যাডেলে জোরে একটা লাথি মারলো। আর ম্যাজিকটা ঘটলো তখনি। অদ্ভুত একটা গর্জন করে নড়বড়ে গাড়ীটা যেন মন্ত্রবলে চাঙ্গা হয়ে উঠলো। আকস্মিক গতি পেয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে স্টিয়ারিং হুইলটা বাগিয়ে ধরে শংকর স্টেডি হলো। সব ব্যাপার, কার্যকারণ তলিয়ে বোঝবার সময় পর্যন্ত না দিয়ে সমস্ত সামনে এগিয়ে যাওয়া গাড়ীগুলোকে পিছনে ফেলে ও এগিয়ে গেল। এক সময় ওর ক্ষীণ ভাবে মনে হলো, গাড়ীটাকে থামানো যাবে তো? যদি প্রয়োজন হয়? পরীক্ষামূলক ব্রেক কষতে গিয়ে ওর বুক হালকা হয়ে গেল। সামনে গাড়ী। তার পেছনে আরও গাড়ী। তার পেছনে—
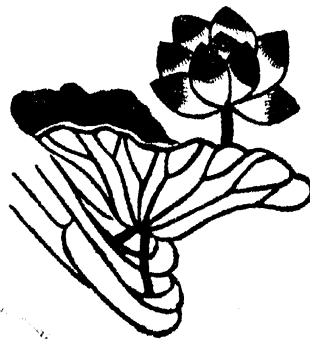
আপনার ইচ্ছাশক্তি কি মেপে দেখবেন?

জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আমাদের খুবই দরকার ইচ্ছাশক্তির। নীচের মনো-প্রশ্নচর্চায় যোগ দিলে বুঝতে পারবেন আপনার ইচ্ছাশক্তি কতখানি। প্রশ্নগুলিতে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' জবাব দিয়ে চলুন; সবশেষে সঠিক জবাবের যে নির্দেশ আছে, সেদিকে এখন তাকাবেন না।

১। অস্বস্তিকর, কঠিন, কিংবা একঘেয়ে কোন কাজে যদি আপনি লাগেন, তাহলে সে কাজ শেষ না করা পর্যন্ত আপনি কি লেগে থাকেন?

২। কোন নতুন জ্ঞান অর্জনের জন্যে কোন কৌশল, দক্ষতা যা শিখলে আপনার কাজে লাগবে, তা শেখবার জন্যে আপনি কি দরকার হলে আপনার থেকে কমবয়সী-দের সঙ্গেও বসতে পারেন?

৩। বাধাবিপত্তি এলে তা আপনি কি চ্যালেঞ্জ বলে গ্রহণ করেন এবং তার ফলে আপনার উদ্যম কি আরও বেড়ে যায়?

৪। আপনাকে সবাই বলছে কাজটা ছেড়ে দিতে; কিন্তু আপনার বিশ্বাস, সফল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে আপনি কি কাজটা চালিয়ে যাবেন?

৫। আপনি হয়তো ভাল-মন্দ সবদিক যাচাই করে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, আপনার আন্তরিক বিশ্বাস, সেটাই ঠিক। তখন কি আপনার স্ত্রী কিংবা আপনার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুও বাধ্য হবে আপনাকে সেই সিদ্ধান্ত থেকে ফিরিয়ে আনতে?

৬। সমালোচনা সইতে পারেন কি?

৭। আপনি ঠিক করেছেন, একদিনেই অনেকগুলো কাজ সেরে ফেলবেন। কিন্তু আপনার কাজে বাধা এলো, কিংবা একটা জটিলতা সৃষ্টি হলো। আপনি কি তবুও আপনার প্রোগ্রাম মত কাজ করে যাবেন?

৮। বাড়ীতে কিংবা বাগানে আপনাকে সত্যিই একটা কাজ সেরে ফেলতেই হবে। কিন্তু দিনটি বড় সুন্দর— বন্ধুরা গাড়ী নিয়ে হাজির, তারা খুব ধরেছে আপনাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুবে। আপনি কি বাড়ীর যে-কোন একজনকে যেতে দিয়ে নিজেই বাড়ীতে থেকে যাবেন এবং পূর্বনির্ধারিত কাজে লেগে থাকবেন?

৯। বাড়ীতে যাওয়ার আগে যদি আপনার মাথা ধরে, তাহলে কি আপনি বিশেষ দরকারী কাজগুলো পরিষ্কার করে সেরে রেখে যাবেন?

১০। যখন আপনার নিজেকে খুব বিশ্রী লাগে—বদমেজাজী ও খিটখিটে হয়ে পড়েন, তখন কি করেন? ঐ মেজাজ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার ঝোঁকটা দমন করতে পারেন কি?

১১। নিয়মমত বিচার-বিবেচনা করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আপনি মেনে চলতে পারেন কি?

১২। সকালবেলায় যদি আপনাকে ডাকা হয়, কিংবা 'অ্যালার্ম' ঘড়িটা বাজতে থাকে, তাহলে যত ভোরই হোক, আপনি কি উঠে পড়েন?

১৩। যখন আপনাকে কেউ ইচ্ছে করে বিরক্ত করে মেজাজ বিগড়ে দেবার চেষ্টা করে তখন কি আপনি মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে পারেন?

১৪। এক কাপ চা খাওয়ার পরেই আবার আর এক কাপের অনুরোধ করলে, কিংবা ভোজবাড়ীতে আকণ্ঠ খাওয়ার পরেও আর দুটো মিষ্টি খাওয়ার উপরোধ করলে, আপনি কি 'না' বলতে পারেন এবং কারণটা বুঝিয়ে দিতে পারেন?

১৫। আপনি জানেন, আপনাকে এবার চলে যেতেই হবে; নাহলে আপনার দেরী হয়ে যাবে, এবং আপনার স্ত্রী (কিংবা স্বামী) নয়তো বাড়ীর সকলে। দুশ্চিন্তা করবেন। কিন্তু গল্পের আসরটা আপনার খুব ভালো লাগছে এবং সত্যিই খুব উপভোগ করছেন। আপনি কি ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারেন?

১৬। আপনার কোন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্যে ঝঞ্ঝাট কিংবা অসুবিধা হলেও আপনি কি কথা রাখবেন?

১৭। আপনি এমন কতকগুলি লোকের মধ্যে পড়েছেন, যারা খুব খারাপ আচরণ করছে। আপনি কি কেবল তাদের সঙ্গে থাকতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবেন, না, পরিষ্কার সঙ্গত্যাগের কারণ বলবেন?

১৮। অন্যায়, অবিচার, ভুল ধারণার বশে বিরোধিতা, খোলাখুলি উগ্র আচরণ, এ সকলের সম্মুখীন হলেও কি আপনি প্রশান্ত অধ্যবসায় নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারেন?

১৯। আপনি কি কখনো কোন বদ-অভ্যাসকে জয় করবার জন্যে দারুণ প্রতিজ্ঞা করে নেমেছিলেন এবং তাতে কি পুরোপুরি সফল হয়েছেন?

●

প্রত্যেকটি 'হ্যাঁ' জবাবের জন্যে পাঁচ পয়েন্ট করে পাবেন। ৭০ পয়েন্ট পেলে চমৎকার, এবং ৬০ থেকে ৭০ পেলে ভালোই। ৫০ থেকে ৬০ মন্দ নয়। ৫০ পয়েন্টের কম পেলে খারাপ।

ইচ্ছাশক্তি বাড়িয়ে তুলতে হলে আমাদের সব কিছুর পেছনে একটা জোরালো উদ্দীপনা, প্রেরণা থাকা দরকার। যেমন, জীবনে এগিয়ে চলার জন্যে চাই উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কিংবা প্রিয়জনকে ভালবাসার জন্যে চাই তাদের আরও কিছু ভাল জিনিস দেবার আকুলতা, নয়তো, যে অভ্যাস আমাদের নানা কাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, তা চিরতরে নির্বাসন দেওয়ার জন্যে অভিযান সুরু করা।

কিন্তু যদি আপনি ৭০ পয়েন্টেরও বেশি পেয়ে থাকেন, তাহলে ভালভাবে লক্ষ্য করে চলবেন—আপনার তীব্র ইচ্ছাশক্তি কঠোর হতে হতে একগুঁয়েমীর বদভ্যাস না জাগায়।

ইচ্ছাশক্তি বাড়িয়ে তুলতে গিয়ে কেউ যদি একরোখা হয়ে পড়ে, তাহলে স্বচ্ছন্দ-ভাবে পথচলার চেয়ে বেয়াড়া পথে কানা গলিতে গিয়ে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনাই বাড়বে।

সুতরাং, ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে বিবেচনা-শক্তিরও শুভ পরিণয় ঘটিয়ে রাখা একান্ত দরকার।

ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে যেমন শক্তিশালী প্রেরণা মনে জাগাতে হয়, তেমনি প্রশান্ত বিচারবুদ্ধিকেও পাশে পাশে এগিয়ে রাখতে হয়।

এই জন্যেই আমাদের দেশে ইচ্ছাশক্তি চর্চার নানা পদ্ধতির মধ্যে একটি মনকে অন্তরমুখী করে সমস্ত চেতনাকে দুটি ভুরুর মাঝখানে কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্টা করা। এতে দেহমন স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে ভরে যায়, তখন ইচ্ছাশক্তি, প্রেরণাশক্তি, বিচারশক্তি সবই সুন্দর স্বচ্ছন্দভাবে কাজ করতে থাকে। এটি অবশ্য যোগসাধনার অঙ্গ। মনো-বিজ্ঞানেও অনেকটা সেইভাবে অটো-সাজেশান অর্থাৎ আত্ম-অভিভাবন পদ্ধতির সাহায্যে ইচ্ছাকে প্রশান্ত মনের আধারে শক্তিশালী এবং কার্যকরী করে তোলার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

কেন বলেছিলি পুষ্প এ আংটি দুর্জয় সিংহকে দিয়েছে? তুই অতি নীচ, লোভী, মিথ্যুক-

মায়া পড়েছিল-

একটু শুনে যাও-

যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে তেজসিংহ জ্বলন্ত স্বরে বলে গেলেন —

সত্যিই তেজসিংহ আর ফিরলেন না। দেখতে দেখতে দূর পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভীল মেয়েটি শিলামূর্তির মত নিস্পন্দ হয়ে তখনো দাঁড়িয়ে।

তার পাথরে খোদাই মুখে এক বিন্দু অশ্রুর রেখাও নেই।

পাহাড়ের দেশে সন্ধ্যা নামল। ভীল মেয়েটি যেন আচ্ছন্নের মত হ্রদের নির্জন তীরে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তেজসিংহ তখন সূর্যমহল থেকে বার হয়ে দূর পথে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন।

তেজসিংহ ভোরের আগে মহারাণার গোপন পার্বত্য আশ্রয়ে পৌঁছলেন।

কেমন করে পুষ্পের কাছে মার্জনা চাইবেন সেই চিন্তাই তখন প্রধান।
যে অপমান করেছি, তারপর পুষ্পের ক্ষমা কি পাব?

অতীতের চাবিকাঠি

"হায়রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল,
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে
লয়ে তারিখ সাল।"

কিন্তু আজকের দিনের পণ্ডিতদের আর অনেকক্ষেত্রেই এ-বিবাদ করতে হয় না। তাঁরা জানেন যে, 'কালিদাসের কালের মাত্র ছ গ্রাম ওজনেরও যদি কোনো নিশ্চিত নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহলেই তার তারিখ না হোক, সাল নির্ণয় করা যাবে। এতে ভুলচুক যে কিছু হবেই না এমন নয়, তবে অবাধ কল্পনায় ইতস্ততঃ পদচারণ কিছুটা সংরুদ্ধ হবে। বিজ্ঞানের আলোকপাতে সুগম হয়ে উঠবে ঐতিহাসিকের অন্ধকার অতীত পথ পরিক্রমা।

এ-আলোকপাত সম্ভব হয়েছে পদার্থের তেজস্ক্রিয়া সম্পর্কিত বেকেরেল-আবিষ্কৃত তথ্যাদির ভিত্তিতে। প্রধানতঃ নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতিতে পৃথক বা যুক্তভাবে এই কাল নির্ণয় করা হয়ে থাকে—

(১) সীসা পদ্ধতি
(২) হিলিয়াম পদ্ধতি
(৩) রুবিডিয়াম-স্ট্রনসিয়াম পদ্ধতি
(৪) তেজস্ক্রিয়-অঙ্গার পদ্ধতি

এই পদ্ধতিগুলি বর্ণনা করার আগে প্রথমে আমাদের পদার্থের তেজস্ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড রাদারফোর্ড দেখালেন যে, রেডিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণ আলফা, বিটা এবং গামা রশ্মির সম্মিলন মাত্র। এটি একটি ছোট্ট পরীক্ষার সাহায্যে দেখানো যেতে পারে।

একটি সীসার পাত্রের একদিক মাত্র খোলা রেখে, তাতে কিছুটা রেডিয়াম শক্তিশালী চুম্বকের প্রভাবে রাখা হল। এখন ঐ রেডিয়াম থেকে আলফা, বিটা এবং গামা রশ্মি বিকিরিত হতে দেখা যাবে।

আলফা রশ্মি হল ধনাত্মক তড়িৎশক্তিসম্পন্ন এবং দ্রুতগতিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থকণা। তারা আশপাশের পরমাণু থেকে দুটি করে ঋণাত্মক তড়িৎশক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন সংগ্রহ করে হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণুতে পরিণত হয়। এ থেকেই আমরা এখন জানলাম যে, একটি মৌলিক পদার্থ থেকে অপর একটি মৌলিক পদার্থে রূপান্তর সম্ভব।

বিটা রশ্মি হল ঋণাত্মক তড়িৎশক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন সমষ্টি। এর গতিবেগ আলফা রশ্মির থেকেও অনেক বেশী।

গামা রশ্মির প্রকৃতি অনেকটা রণ্টগেন আবিষ্কৃত এক্স রশ্মির মত। কোনোরকম বৈদ্যুতিক বা চৌম্বকশক্তির দ্বারা একে প্রভাবিত হতে দেখা যায় না।

এখন এই যে রেডিয়াম থেকে আলফা-রশ্মি ও তা থেকে হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণুতে পরিণতি, তার ফলে ঐ রেডিয়ামের পক্ষে নিজের অবস্থায় থাকা সম্ভব নয়। র‍্যাডন নামক একপ্রকার গ্যাস সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঐ গ্যাস থেকে আবার হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণু বিচ্ছুরিত হয়ে যা থাকে, তা হল কঠিন রেডিয়াম 'এ'। তার থেকে রেডিয়াম 'বি', 'সি' 'ডি' 'ই' ও 'এফ' পর্যায় পেরিয়ে শেষপর্যন্ত পড়ে থাকে সীসা। যার থেকে আর কোনোরকম রূপান্তর হয় না।

এখন প্রতিটি আলফা বা হিলিয়ামকণার পরমাণবিক ভর হল চার (৪)। অর্থাৎ হিলিয়ামের পরমাণুর মধ্যে থাকে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন। এখন নিউট্রনের ভর বা ওজন প্রায় প্রোটনের সমান। যদি নিউট্রনের ভরকেই একক ধরা যায় ত হিলিয়াম পরমাণুর মোট ভর বা ওজন হবে চার (৪)। আমরা জানি যে, ইউরেনিয়াম—১

সৌমেন দত্ত

থেকে ইউরেনিয়াম—২, আয়োনিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি আটটি পর্যায় পেরিয়ে সীসার সৃষ্টি হয়। প্রতি আটবারই একটি করে হিলিয়াম পরমাণু বা চার করে ইউরেনিয়ামের পরমাণবিক ভর কমে যায়। অর্থাৎ মোট ৪ × ৮ = ৩২ কমে যায়। ইউরেনিয়াম—১-এর পরমাণবিক ভর হল ২৩৮। অতএব শেষে যে সীসা পড়ে থাকে তার পরমাণবিক ভর হবে ২৩৮—৩২ = ২০৬। আর যথার্থই সীসার পরমাণবিক ভর হল ২০৬। এইসঙ্গে আরেকটি কথাও বলে নেওয়া প্রয়োজন। একেবারে সবটুকু ইউরেনিয়াম—১'ই ইউরেনিয়াম—২'তে পরিণত হয় না। ৪৫৬০০ লক্ষ বছরে ১ গ্রাম ইউরেনিয়াম—১'এর শুধু অর্ধেক অংশ (অর্থাৎ ½ গ্রাম মাত্র) ইউরেনিয়াম—২'তে রূপান্তরিত হয়। ঠিক এইভাবেই ইউরেনিয়াম—২ থেকে আয়োনিয়াম, আয়োনিয়াম থেকে রেডিয়াম ইত্যাদিতে। তবে কালের ব্যবধান এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধেক অংশের এই রূপান্তরকাল সর্বক্ষেত্রেই ধ্রুবক, অতএব নির্ণয়সাধ্য। কোন বাহ্যিক পরিবর্তনই একে প্রভাবিত করতে পারে না। তাই মহাকালের চরণপাত নির্ভুলভাবে চিহ্নিত হয়ে চলেছে পদার্থের এই তেজস্ক্রিয়ায়। এদিকে প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অধ্যাপক বল্টউড।

এখন আমরা জানি যে, দশ লক্ষ গ্রাম ইউরেনিয়াম—১ প্রতি বছরে ১।৭৬০০ গ্রাম মাত্র সীসায় পরিণত হয়। যদি কোন নিদর্শনে সীসার পরিমাণ হয় 'ক' এবং ইউরেনিয়ামের পরিমাণ 'খ', তবে তার অস্তিত্বকাল বা বয়স হবে—

অস্তিত্বকাল = (ক : খ) × ৭৬০০০ লক্ষ বছর।

আগ্নেয়শিলা ইত্যাদি যেসব নিদর্শনের মধ্যে গোড়া থেকেই সীসার পরিমাণ থাকে যথেষ্ট, তাদের অস্তিত্বকাল নির্ণয়ে আমাদের হিলিয়াম পদ্ধতির শরণাপন্ন হতে হবে। যদিও সীসা পদ্ধতির মত অত সুদূরের অতীতের নিদর্শনগুলির কালনির্ণয় তার দ্বারা সম্ভব নয়।

রাসায়নিক দিক থেকে হিলিয়াম হল একপ্রকার নিষ্ক্রিয় গ্যাস। সূর্যের অভ্যন্তরের বিরাট অংশে জুড়ে এর অবস্থিতি। বলতে গেলে পৃথিবীতে অস্তিত্ব আবিষ্কারের আগেই ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সূর্যের বর্ণালীর মধ্যে জ্যান্সেন ও লকইয়ার প্রথম এর সন্ধান পান।

হিলিয়াম পদ্ধতির সার্থকভাবে প্রয়োগ করার সবথেকে বড় বাধা হল এই যে, হিলিয়াম গ্যাসের কিছু অংশ বাতাসের সঙ্গে মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যদিও যেসব নিদর্শন শিলার ঘনত্ব বেশী বা তেজস্ক্রিয়তা কম, তাদের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির বেশ সুফল দেখা গেছে। এখন কোনো বিশেষ নিদর্শনে হিলিয়ামের পরিমাণ 'ক', ইউরেনিয়ামের পরিমাণ 'খ' এবং থোরিয়ামের পরিমাণ 'গ' হলে তার অস্তিত্বকালের সমীকরণটি হবে—

অস্তিত্ব কাল = [ক/(খ+০.২৭ গ)] × ৮৮ লক্ষ বছর।

বর্তমানে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হিলিয়াম গ্যাসের এক ঘন সেণ্টি-

মিটারের দশ লক্ষ ভাগ কার্য ও পরিমিত সম্ভব হওয়ায়, এই হিলিয়াম পদ্ধতি আরো কার্যকর হয়ে উঠেছে। তবু বিভিন্ন খনিজ পদার্থের মধ্যে এই গ্যাস ধরে রাখার ক্ষমতার তারতম্য থাকায় অনেক অসুবিধা দেখা যায়।

কিন্তু নিদর্শনে যদি ইউরেনিয়াম গোষ্ঠীর ভারী ধাতু না থাকে, তবে রুবিডিয়াম-স্ট্রনসিয়াম পদ্ধতি প্রয়োগে তাতে বেশ সুফল দেখা গেছে। রুবিডিয়াম অতি অল্প পরিমাণে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের সঙ্গে এর প্রচুর মিল। রুবিডিয়ামের সমধর্মবিশিষ্ট ("আইসোটোপ") দুইটি পরমাণু। একটির পরমাণবিক ভর ৮৭ অপরটির ৮৫। এই কম-বেশীর কারণ একই পদার্থের ঐ উভয় পরমাণুর মধ্যে নিউট্রন সংখ্যার তারতম্য। নিউট্রনের কোনরকম তড়িৎশক্তি নেই। অতএব প্রোটনসংখ্যা এক থাকলে নিউট্রনের সংখ্যা বৃদ্ধিতে একই পদার্থের পরমাণবিক ভর বেড়ে যায় মাত্র। এদের মধ্যে যেটির পরমাণবিক ভর আট (৮), সেটি তেজস্ক্রিয় পরমাণু। দ্বিতীয়টির সঙ্গে এর অনুপাত সবক্ষেত্রেই ২৭ঃ ৭৩। সুতরাং, তেজস্ক্রিয় রুবিডিয়ামের পরিমাণ= ০·২৭× মোট রুবিডিয়াম।

এখন তেজস্ক্রিয় রুবিডিয়াম বিটা রশ্মি বিচ্ছুরণের দ্বারা সমভর বিশিষ্ট স্ট্রনসিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয়। কিন্তু ঐ রুবিডিয়ামের অর্ধ অংশেরও এই পরিণতি ঘটতে লাগে ৬০,০০০০ লক্ষ বছর। রূপান্তর এত মন্থর গতিতে ঘটে বলে যে কোন নিদর্শনেরই তেজস্ক্রিয়াজাত স্ট্রনসিয়ামের সৃষ্টি হয় অতি তুচ্ছ পরিমাণে। যার ফলে তার পরিমাণ নির্ণয় করাই মুস্কিল হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাটাক ০·৩ মিলিগ্রাম পর্যন্ত স্ট্রনসিয়াম আইসোটোপের পরিমাণ নির্দেশ করেছেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে এ্যারেন্স বিচ্ছুরণ বর্ণালি-যন্ত্রের ("এমিসন স্পেক্টোগ্রাফ") সহায়তায় রুবিডিয়াম-স্ট্রনসিয়াম অনুপাত নির্ণয়ে-কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছেন।

তবে অধুনা বিজ্ঞানীদের মত এই যে যেসব ক্ষেত্রে সীসা ও রুবিডিয়াম-স্ট্রনসিয়াম পদ্ধতি সমভাবে প্রযোজ্য, সেসব ক্ষেত্রে শেষোক্ত পদ্ধতিতে নির্ণীত সময় প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে নির্ণীত সময়ের থেকে শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ বেশী হবে। অতি প্রাচীন শিলা, যার মধ্যে নিষ্ক্রিয় স্ট্রনসিয়ামের অস্তিত্ব নেই কিন্তু আছে রুবিডিয়ামের প্রাচুর্য, একমাত্র তার ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি প্রযোজ্য। যথা পেগমাটাইট-জাত অভ্র, গ্রানাইট শিলা ইত্যাদি।

অতঃপর ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে অ্যান্ডারসন ও লিবি তেজস্ক্রিয় অঙ্গার পদ্ধতির প্রয়োগে প্রভূত সাফল্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক কালনির্ণয় করে দেখান। উপরের বাতাবরণে নাইট্রোজেনের ওপর কসমিক রশ্মির প্রভাবে অঙ্গারের সমধর্মবিশিষ্ট তেজস্ক্রিয় পরমাণুর (কার্বন—১৪) সৃষ্টি হয়। এই রশ্মিতে তেজস্ক্রিয় নিউট্রন বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে। ৪০,০০০ ফুট উর্ধ্বে এই বিচ্ছুরণ হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। এখন নাইট্রোজেনের আছে দুটি সমধর পরমাণু ("আইসোটোপ")। এদের মধ্যে নিষ্ক্রিয় যেটি, সেটির পরমাণবিক ভর হল ১৫। আর সক্রিয় পরমাণুটির ভর ১৪। বাতাসে দুটির অস্তিত্বের অনুপাত যথাক্রমে ০·০৩৮ঃ ৯৯·৬২। এই শেষেরটির সঙ্গে তাপের গতিবেগসম্পন্ন নিউট্রনের বিক্রিয়ায় সাধিত হয় কার্বন—১৪'র প্রস্তুতি। যথা,

নাইট্রোজেন—১৪+নিউট্রন

=কার্বন—১৪+হাইড্রোজেন—১

এই কার্বন—১৪'র অর্ধেক অংশ আবার একটি করে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ৫৫৬৮+৩০ বছরে সমভরবিশিষ্ট ("আইসোবার") নাইট্রোজেন পরমাণুতে (নাইট্রোজেন—১৪) রূপান্তরিত হয়। প্রায় প্রতিটি জৈব নিদর্শনেই এই তেজস্ক্রিয় অঙ্গার (কার্বন—১৪) অতি অল্প অথচ ধ্রুবক অনুপাতে থাকে (সাধারণতঃ কার্বন-ডাইঅক্সাইডের আকারে)। বাতাসে এই কার্বন—১৪'র সৃষ্টি ও বিনাশের মধ্যেও একটা সাম্য দেখা যায়। কেননা কসমিক রশ্মির তীব্রতা গত ১০,০০০ বছর আগেও যা ছিল, আজ বা ২০,০০০ বছর পরেও থাকবে তাই। শুধু জৈব পদার্থের সৃষ্টিতে অঙ্গারের প্রয়োজনীয়তা থাকায় বাতাসে কার্বন—১৪ এবং কার্বন—১২'র ধ্রুবক অনুপাত কমে যায়। আর যতখানি কমে সেই মত হিসাবে গাইগারের নির্দেশক যন্ত্রের ("গাইগারস কাউন্টার") সাহায্যে ঐ পদার্থের সৃষ্টিকাল নির্ণীত হয়। অথবা একদা জীবিত নিদর্শনের মৃত্যুর পর থেকেই তার মধ্যের তেজস্ক্রিয় অঙ্গার ক্ষয়-প্রাপ্ত হতে থাকে। এই ক্ষয়ের পরিমাণ বিচার করেও অনেকটা নিশ্চিতভাবে এর কাল নির্ণয় করা সম্ভব।

মাত্র ৫০,০০০ বছরের পুরনো জৈব নিদর্শনগুলির ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি কার্যকর। তেজস্ক্রিয় অঙ্গারের অস্তিত্বই যে শুধু ঐ নিদর্শনে থাকতে হবে তাই নয়, থাকতে হবে যথেষ্ট পরিমাণে (অন্তত ছ গ্রাম পর্যন্ত)। এই পদ্ধতি নিয়ে আজও প্রচুর গবেষণা চলেছে। এতে ভুলের সম্ভাবনা শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ মাত্র। তবু আশার কথা হল এই যে প্রাগৈতিহাসিক কালনির্ণয়ে আজ আর শুধু কল্পনা বা আপেক্ষিক বিচারের ওপরই নির্ভর করতে হয় না।

অতীত আজ মানুষেরই নির্মিত যন্ত্রের নাগালে। সে যন্ত্র হয়ত এইচ জি ওয়েলসের গল্পের 'টাইম মেসিন' নয়। যার সাহায্যে সেই দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে পাড়ি দেওয়া যায়। অতটা এখনও কপোলকল্পনা মাত্র (যদিও বিজ্ঞানের যুগে তা হয়ত একদিন সম্ভব হলেও হতে পারে)। তবু আজও যা সম্ভব, তাতেই যেন মানুষের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না। একটি যন্ত্রের সাহায্যে শুধুমাত্র পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ বিচার করে যে কোনো প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের সন-তারিখ সম্বন্ধে নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া—মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে এ নিঃসন্দেহে একটা ওলট-পালট! তবু এখনও আশা করব যে মানুষের এই বর্তমান মুহূর্তের অস্তিত্বের পেছনে যে যুগ-যুগান্তব্যাপী অন্ধকারের রাজ্য—তা একদিন আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। 'মৌন অতীতের 'গোপন সত্তার' শব্দ 'মর্মের মাঝখানে' নয়, চর্মের অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে আমাদের কাছে। হয়ত ফুরিয়ে আসবে 'অনাদি অনন্ত রাতের অন্ধকারে 'চেয়ে বসে' থাকার আশ্চর্য প্রতীক্ষা!!

গতবারে ছায়াছবির গান সম্পর্কে শ্রোতাদের অভিযোগের প্রতি আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার বিষয়ে লেখা হয়েছে। এই উদাসীনতার উৎস সম্বন্ধে শ্রোতাদের কৌতূহল আছে, এই উদাসীনতার কারণ সম্বন্ধে শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা আছে। শ্রোতাদের অভিযোগ, আকাশবাণী থেকে এই জিজ্ঞাসার সদুত্তর পাওয়া যায় না, আকাশবাণীর সবিনয় নিবেদনের আসরে শ্রোতাদের চিঠিপত্রের উত্তরে কখনই সঠিক কথা বলা হয় না। শ্রোতাদের অনেকেই আমার কাছে ছায়াছবির গান সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন এবং কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণ জানতে চেয়েছেন। আমি যেটুকু জেনেছি, সংক্ষেপে বিবৃত করছি।

গতবারেই বলেছি, ছায়াছবির গান সম্পর্কে শ্রোতাদের প্রধানত দুটি অভিযোগ। প্রথম, সপ্তাহে মাত্র একদিন আধঘণ্টা এই আসর প্রচারিত হয়—তা-ও সব সময় আধঘণ্টা থাকে না, হঠাৎ সময়ের দরকার পড়লে ছায়াছবির গানের আসর থেকেই কেটে নেওয়া হয়, এই যেমন নেহরু মানবের জন্ম-পঞ্চসপ্ততিবার্ষিকী উপলক্ষে ২৩শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর বেতার ভাষণের বাংলা অনুবাদ প্রচারের জন্য দশ মিনিট সময় কেটে নেওয়া হয়েছিল; আবার কখনও কখনও বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে পুরো অনুষ্ঠানটাই বাতিল করে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় অভিযোগ, এই আসরে পুরনো ছায়াছবির গান বাজানো হয় এবং অধিকাংশ গানই বেশ পুরনো ও ভুলে-যাওয়া সব ছবির গান।

শ্রোতাদের বক্তব্য, এই আসর সপ্তাহে আরও অন্তত একদিন বাড়ানো দরকার এবং নতুন নতুন ছবির গান বাজানো উচিত।

আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ দুটি অভিযোগের প্রতিই যে অল্পাবিস্তর উদাসীন সে-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রথম অভিযোগটির প্রতিই তাঁরা বেশি উদাসীন, দ্বিতীয় অভিযোগটি সম্পর্কে সম্প্রতি কিঞ্চিৎ সদয় হয়েছেন বলে মনে করা যেতে পারে, কারণ কিছুদিন থেকে এই আসরে কিছু কম-পুরনো ছবির গানও মাঝেমধ্যে শোনা যাচ্ছে।

এবারে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার উৎস সন্ধান করা যাক।

১৯৫২ সালে তদানীন্তন তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ডঃ বি ভি কেশকর ছায়াছবির গানকে (শুধু বাংলা ছায়াছবির গানকেই নয়, সমগ্র ছায়াছবির গানকে) শস্তা ও অশ্লীল ('চীপ অ্যান্ড ভালগার') আখ্যা দিয়ে আকাশবাণী থেকে তার প্রচার প্রায় নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। সরকারীভাবে কখনই এই নিষিদ্ধকরণের কথা স্বীকার করা হয়নি, সরকারীভাবে সব সময়েই বলা হয়েছে আকাশবাণীতে ছায়াছবির গানের উপর কোনোরকম বাধানিষেধ নেই।

যা-ই হোক, আকাশবাণী থেকে ছায়াছবির গানের প্রচার সাংঘাতিকভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ব্যাপারটা সেখানেই থামেনি। আকাশবাণী থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, ছায়াছবির গানের বদলি হিসাবে তাঁরা নিজেরাই উচ্চ মানের লঘু গীতি তৈরি করবেন। আকাশবাণীর এই লঘু গীতি রচনার দিক দিয়েই শুধু উচ্চ সাহিত্যিক ও নৈতিক গুণ-বিশিষ্ট হবে না, তার সুর হবে রাগভিত্তিক অথবা লোকগীতির ধাঁচের—ছায়াছবির গানে যে উগ্র মাত্রায় পাশ্চাত্য ঢঙের প্রভাব থাকে, তা পরিহার করা হবে।

কিন্তু আকাশবাণীর এই ধরনের হাল্কা গান তৈরির সম্পত্তি ছিল না। তা সত্ত্বেও আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্রকে খুব তাড়াতাড়ি রম্যগীতি শাখা গঠন করার এবং যে-কোনো প্রকারে ছায়াছবির গানের ফাঁক ভরাট করার আদেশ দেওয়া হল। ঘটনাক্রমে তখন 'রেডিও সিলোন' খুব জনপ্রিয় হচ্ছিল এবং আকাশবাণী বছর দুয়েকের মধ্যে তাঁদের লাইসেন্স-সংখ্যা সাড়ে ছ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে দশ লক্ষ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এই বিরোধাভাসমূলক চিন্তাধারার ফলাফল কর্তৃপক্ষ তলিয়ে দেখেননি। তাই তাঁরা বহু চলচ্চিত্র প্রযোজকের অসন্তুষ্টির কারণ হলেন। চলচ্চিত্র প্রযোজকদের অনেকে আকাশবাণী থেকে তাঁদের গান প্রচার করতে দিতে অস্বীকার করলেন। আকাশবাণীর বহু শ্রোতা রেডিও সিলোনের দিকে চলে গেলেন—এবং দু বছরের জায়গায় চার বছর পরেও আকাশবাণী তাঁদের লাইসেন্স-সংখ্যা দশ লক্ষ করতে পারেননি।

চলচ্চিত্র প্রযোজকদের সঙ্গে গোলমাল মিটতে কয়েক বছর লাগল। বলা হল, ছায়াছবির গানকে কখনও পাইকারি হারে গালমন্দ করা হয়নি, আকাশবাণী তাঁদের পছন্দমতো গান প্রচারের অধিকারের কথাই শুধু বলেছিলেন—অর্থাৎ কোন গান তাঁরা বাজাবেন তা তাঁরাই স্থির করবেন, এই অধিকার।

শ্রোতাদের বোঝানো হল, আসলে চলচ্চিত্র প্রযোজকরাই দোষী—তাঁরা আকাশবাণীর সঙ্গে তাঁদের চুক্তি 'রিনিউ' করেননি। ইতিহাস দীর্ঘ করে লাভ নেই, সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলা দরকার যে, চলচ্চিত্র প্রযোজকদের সঙ্গে আবার নতুন করে চুক্তি স্বাক্ষরিত হল এবং যে ছায়াছবির গান নিষিদ্ধ হয়েছিল তা আবার প্রচারিত হতে লাগল। হিন্দী গানের জন্য বোম্বাইয়ে ও অন্যান্য ভাষার গানের জন্য আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলিতে 'স্ক্রীনিং কমিটি' গঠিত হল। প্রচারের আগে বাছাইয়ের জন্য এই স্ক্রীনিং কমিটি। সরকারের আর পাঁচটা কাজের মতো এই কাজেও লাল ফিতার ফাঁস পড়ল, এবং বাছাইয়ে দেরি হতে লাগল। কমিটি পুরনো সব গান, যার অনেকগুলিই লোকে ভুলে গেছে অথবা প্রায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে, সেগুলি নিয়ে বাছাইয়ের কাজ শুরু করলেন। তাই জনপ্রিয় নতুন গান প্রচারের কোন সুযোগ হল না। অবশ্য পরে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হল, ছবি মুক্তি পাবার অল্প পরেই তার গান প্রচারিত হতে লাগল। কিন্তু সে হিন্দী গানের ক্ষেত্রে। বাংলা ছায়াছবির গানের বেলায় বিশেষ উন্নতি দেখা গেল না। বাংলায় এখনও নতুন ছায়াছবির গানের প্রচার প্রায় "নিষিদ্ধ" হয়েই আছে। এই "নিষেধাজ্ঞা" কে দিয়েছেন, জানা যায়নি। তবে হিন্দীওয়ালারা হিন্দী প্রচারের জন্য নতুন বাংলা ছায়াছবির গানের প্রচার "নিষিদ্ধ" করেছেন বলে কারও কারও ধারণা। যদি নতুন নতুন বাংলা ছায়াছবির গান প্রচার করা না হয় এবং পুরনো ছায়াছবির গান ঘন ঘন বাজানো হয় তাহলে বাঙালী শ্রোতারা ক্রমশ বাংলা গানের চেয়ে হিন্দী ছায়াছবির গানের দিকে ঝুঁকবেন, বিবিধ ভারতীর শ্রোতৃসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে—হিন্দীর প্রচার ঘটবে। এই ধারণাটাকে কি একেবারে অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়?

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর "ভাষার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে "লিপির উদ্ভব" অধ্যায়ে লিখেছেন : "ভারতবর্ষের প্রাচীনতম লিপিমালা দুইটি, খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী, অশোকের অনুশাসনে প্রথম পাওয়া যাইতেছে খরোষ্ঠী। সেমীয় লিপি হইতে উৎপন্ন। ব্রাহ্মীর উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে।"

এখন দেখা যাচ্ছে, ব্রাহ্মী সম্বন্ধেই মতভেদ আছে। এই লিপি ব্রাহ্মী লিপি, না ব্রাহ্মণী (!) লিপি সে বিষয়ে দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছে। ভাষাবিৎরা এই লিপিকে ব্রাহ্মী লিপি বলেছেন, কিন্তু আকাশবাণী দিল্লী-কেন্দ্রের বাংলা সংবাদ বিভাগ এই লিপিকে ব্রাহ্মণী লিপি বলে ঘোষণা করেছেন। ১৪ই নভেম্বর বেলা ১২টা ৫০ মিনিটের খবরে ব্রাহ্মণী লিপি বলা হয়েছে। নিশ্চয়ই তাঁরা গবেষণা করে ব্রাহ্মণী লিপি পেয়েছেন? যদি তাঁরা অনুগ্রহ করে তাঁদের গবেষণাপত্রটি (থীসিস) প্রকাশ করেন তাহলে ভাষাতত্ত্বের ছাত্রদের অনেক উপকার হয়। তাই নয় কি?

"ভারতীয় ডাক ও তার সপ্তাহের" প্রাক্কালে ১৫ই নভেম্বর রাত ৮টায় এই সপ্তাহ পালনের তাৎপর্য সম্পর্কে ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ শাখার অধিকর্তা শ্রীচুনীলাল দে'র সঙ্গে শ্রীমিহির বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হল। এটিকে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান না বলে প্রশ্নোত্তরের আসর বললেই বোধহয় ঠিক হত। কারণ, কোনো বিষয়েই তেমন আলোচনা করা হয়নি—শুধু প্রশ্ন আর উত্তর। প্রশ্নগুলি খুবই সরল, ছেলেমানুষি ধরণের—এবং যদি অপরাধ না হয় তো বলি বোকা-বোকা। এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রশ্নগুলি আর একটু বুদ্ধিদীপ্ত হওয়া দরকার, যাতে শ্রোতারা এটিকে ছোটোদের অনষ্ঠান বলে ভুল না করেন এবং অনুষ্ঠানটির প্রতি আকৃষ্ট হন।...অনুষ্ঠানটি এমনিতে বেশ প্রয়োজনীয় ছিল, অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ও ছিল এতে।

এইদিন সকাল সাড়ে ৯টায় ছিল সংবাদ বিচিত্রা, বিষয় ছিল শিশুদিবস ও বিশ্বভারতীকে রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন" নাটকের পাণ্ডুলিপি দান। শিশুদিবসের অনুষ্ঠানে শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষণের অংশটুকু বেশ লাগল। বেশ মনোগ্রাহী। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের এবং রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরীর ভাষণের অংশও উল্লেখযোগ্য—বিশেষ করে শিশুদের সঞ্চয়াভ্যাস গড়ে তোলা সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের অংশ।

"বিসর্জন" নাটকের পাণ্ডুলিপি প্রদান অনুষ্ঠানে উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর ভাষণের অংশ তথ্যবহ এবং বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্যের ভাষণটুকু বেশ সুন্দর। এই অনুষ্ঠানে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ দপ্তরে নাটকের পাণ্ডুলিপি পেশ করার যে ইতিহাস বর্ণনা করলেন তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রশংসনীয়ই বলা যায়, তবে অনুষ্ঠানটি যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেল—সেটা কানে বড়ো লাগল।

১৭ই নভেম্বর সকাল সওয়া ৭টায় ভজন গাইছিলেন শ্রীঅমলেন্দুবিকাশ করচৌধুরী। মন্দ গাইছিলেন না, কিন্তু তাঁর শেষ গানটি হঠাৎ কেটে দেওয়ায় খুব খারাপ লাগল।

১৮ই নভেম্বর সকাল সাড়ে ৯টায় ছিল বিচিত্রা—আঞ্চলিক বাহিনী সম্পর্কে।...একেবারে মামুলি ধরনের অনুষ্ঠান। একটু একঘেয়েও।

১৯শে নভেম্বর রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে আধুনিক গান শোনালেন শ্রীমতী শিপ্রা বসু। ভালো লাগল। মিষ্টি গলা, গাইলেনও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে।

২০শে নভেম্বর সকাল সওয়া ৮টায় শ্রীমতী প্রগতি মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক গান শুনে কিন্তু খুশি হওয়া গেল না।...অনেকটা ছড়ার মতো লাগল।

২১শে নভেম্বর সকাল ৮টায় লোক-গীতি (আকাশবাণীর উচ্চারণে লোক্‌গীতি) বলে ঘোষিত শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের গান দুটিকে বারবার আধুনিক গান বলে ভুল হচ্ছিল। পানী, গোওহালিনী (গোয়ালিনী) প্রভৃতি কয়েকটি কথা ছাড়া প্রায় সব কথাই আধুনিক গানের মতো, এবং সুরও প্রায় আধুনিক গানের। লোকগীতির এইরকম বিকৃতি সাধন করে কী লাভ?

২২শে নভেম্বর সকাল ৮টায় শ্রীমতী সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকগীতির অনুষ্ঠানকেও এইরকম আধুনিক গানের অনুষ্ঠান বললে বিশেষ ভুল হয় না বোধহয়। তাঁর প্রথম গানটির কথায় ও সুরে অনেকখানি আধুনিকের ভেজাল ছিল। প্রাণপাখি, পারঘাটা প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ থাকলেই কোনো গানকে লোকগীতি বলা চলে না। তাঁর দ্বিতীয় গানটিতে অবশ্য পল্লীর সুর কিছুটা ছিল।

২৩শে নভেম্বর সকাল ৮টায় যিনি লোকগীতি গাইলেন তাঁর নাম যতদূর জানি, প্রদ্যোতনারায়ণ। বেতারজগতে অবশ্য ছাপা হয়েছে প্রদ্যোৎনারায়ণ। কিন্তু ঘোষিকা ঘোষণা করলেন প্রদ্যুৎনারায়ণ। ঘোষক-ঘোষিকারা কি ইচ্ছেমতো নাম পরিবর্তন করতে পারেন? অর্থ না হলেও?

এইদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা খবরে বলা হল, "কন্যাকুমারিকায় বিবেকানন্দ রক...।" বাংলায় বিবেকানন্দ রক বলা হয় নাকি? আমরা তো জানি 'রক' থাকে পাড়ার বাড়িতে। কন্যাকুমারিকায় আছে 'বিবেকানন্দ শিলা'। খবরে বাংলা 'শিলা' বলতে আপত্তি ছিল কিছু?

—শ্রবণক

ট্যান্ট

জার্মান ছবির নবতরঙ্গ

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বর্তমান বিশ শতকের পনের দশকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইতালীর চলচ্চিত্রশিল্পে যখন দেখা দিল 'নিও রিয়ালিজম' এবং 'কাহিয়ে দ্যু সিনেমা' নামক মাসিকপত্রের কল্যাণে ফ্রান্সে দেখা দিল 'ন্যুভেল ভাগ', রণশ্রান্ত জার্মানী কিন্তু তখনও আঁকড়ে ধরে রইল সেই প্রযোজনাধারা, যার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দর্শকচিত্তের নিবেদন সাধন। জার্মানীর সমকালীন অবস্থার প্রতিফলন, তার তখনকার আর্থিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থার রূপায়ণ তার চলচ্চিত্রের মধ্যে রইল একান্তভাবে অনুপস্থিত। জার্মানীর চিত্র-প্রযোজকেরা ব্যস্ত রইলেন ইতালীর মতো সংগীতমুখর, ইংল্যাণ্ডের মতো গোয়েন্দা-ধর্মী এবং আমেরিকার মতো সস্তা ওয়েস্টার্ণ (যাতে আছে ঘোড়ার চড়া, বন্দুক হাতে সমাজবিরোধী দুর্ধর্ষ দল) ছবি নির্মাণে। তৈরী হতে লাগল 'স্টার অব সাণ্টা ক্লারা', 'মাই নাইন্টিনাইন ব্রাইডস', 'দি সঙ অব নেপলস', 'দি ইণ্ডিয়ান টুম্ব', 'সেলাম আলেকাম', 'থাউজ্যাণ্ড স্টার্স আর শাইনিং' প্রভৃতি নামধেয় ছবি, যাদের ভিতর জার্মানীর জার্মানত্বকে খুঁজে পাওয়া যাবে না শত চেষ্টা করেও।

এই সমস্ত ছবি দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন চলচ্চিত্রানুরাগী জার্মান যুবক-বৃন্দ। প্রায় জন পঁচিশ তরুণ জার্মান চলচ্চিত্রকার ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত অষ্টম ওবারহাউজেন স্বল্প দীর্ঘ চলচ্চিত্রোৎসবে একটি প্রকাশ্য ঘোষণা মারফত জানালেন যে, ছেলেভুলানো চলচ্চিত্র-নির্মাণের পুরাতন পদ্ধতিকে বিদায় দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধারার আমদানী করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। এরই বছর তিনেকের মধ্যে কয়েকজন ক্ষমতাসম্পন্ন, কর্মক্ষম এবং আপোষবিরোধী তরুণ চলচ্চিত্রপরিচালক সরকারের কাছ থেকে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য গ্রহণ করে অনেকগুলি সুন্দর ছবি তৈরী করে ফেললেন। ভি স্লোয়েনডর্ফ-এর 'ই-জ', পি স্যামোনির 'ক্লোজড সিজন ফর ফক্সেস' এবং ক্রুগের 'ইয়েস্টারডে গার্ল' ছবিগুলির জন্যে সরকার দিয়েছিলেন প্রতিটিকে ৪ লক্ষ জার্মান মার্ক (ডি-এম)। অধুনা অন্ততপক্ষে কুড়িজন প্রতিভাশালী চলচ্চিত্রপরিচালক সরকারী সাহায্যে চিত্রনির্মাণ কাজে ব্যাপৃত আছেন।

এইসব তরুণ চলচ্চিত্রপরিচালকেরা যে ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচনে তাঁদের ব্যক্তি-গত চিন্তাধারা ও মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত হবেন, একথা বলাই বাহুল্য। তাই তাঁদের ছবিতে দেখা যায়: বিধ্বংসী বিশ্ব-যুদ্ধের পরে তরুণ সম্প্রদায়ের জীবন সম্পর্কে একান্ত অনীহা ও মোহভংগ; বিধিবদ্ধ জীবনযাত্রা, প্রচলিত নিয়মকানুন, বয়োজ্যেষ্ঠ্য গুরুজন পদবাচ্যের দল, সকল রকম চিরাচরিত সংস্কার এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রাম; সরকার ও কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিতদের প্রতি একান্ত অনাস্থা; ঠুনকো জীবনযাত্রা প্রণালী এবং একমাত্র সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে সতত সচেষ্ট সামাজিক অভ্যাস ও ব্যবস্থা সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধা এবং সেই চিরনতুন ও চির-পুরাতন প্রেম-ভালোবাসা তথা যৌন-সম্পর্কের আনন্দ-বেদনাকে দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশিত করবার প্রয়াস।

সাতজন তরুণ জার্মান পরিচালকের (এঁদের বয়েস ২৭ থেকে ৩৭-এর মধ্যে) যে সাতখানি ছবি সম্প্রতি জ্যোতি সিনেমাতে দেখানো হল, তার প্রতিটিতেই দেখা গেল, পরিচালকের অস্থির মনেরই যেন প্রতিফলন স্বরূপ ক্যামেরাও সতত অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে: একমাত্র পাত্রপাত্রীদের ক্লোজ-আপ ছাড়া ক্যামেরা কোথাও যেন দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছে না। আর দেখা গেল, চিরাচরিত নিয়ম সম্পর্কে প্রত্যেকেরই বিদ্রোহী মনোভাব: সমাজ, সংস্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে তো বটেই, এমন কি, চলচ্চিত্রগ্রহণপদ্ধতি সম্পর্কেও। শুধু নারী নয়, পুরুষের নগ্ন দেহ দেখানোর ব্যাপারেও তাঁদের কারুরই মনে

কোন দ্বিধা নেই। আর একটি বিষয়ে তরুণ পরিচালকগণের মানসিক ঐক্যের সন্ধান পাওয়া গেল। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এক-একটি দার্শনিক সত্যে উপনীত হবার প্রয়াস পেয়েছেন। ছোট ছোট তীব্র দার্শনিক উক্তিতে ছবিগুলি ভরপুর। অথচ এই সাত-খানি ছবির মধ্যে বিষয়বস্তু ও কাহিনীগত অনুমাত্রও সাদৃশ্য নেই; আবাসিক বিদ্যালয়ে কিশোর ছাত্রের সমস্যা থেকে শুরু করে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নরত যুবক, বেপরোয়া অসামাজিক হিপী, গৃহস্থাশ্রয়ে অনাথ আশ্রমে পালিত যুবক, প্রচারশিল্পী, আহত সৈন্য এবং সার্কাসওয়ালীর সমস্যা পর্যন্ত এই ছবিগুলিতে স্থান পেয়েছে। প্রতিটি কাহিনীর চিত্রায়ণ কি দৃশ্য ও শট বিভাগ, কি চিত্রগ্রহণ, কি দৃশ্যনির্বাচন, কি সম্পাদনা, কি সংগীতানুষঙ্গ—সব দিক দিয়েই পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। সাতখানি ছবি দেখার পরে মন খেয়েছে বিষমভাবে নাড়া, পেয়েছে একটা নতুন জগতের পরিচয়, যা হচ্ছে আধুনিক জার্মানী।

ফলকার শ্লেনডর্ফ পরিচালিত 'ইউ আর **এ ম্যান, মাই বয়'** ছবিতে আমরা দেখি, একটি সুনামবিশিষ্ট আবাসিক বিদ্যালয়ে নিজেদের স্নেহের সন্তান এক কিশোরকে ভর্তি করে দিয়ে অভিভাবক যখন নিশ্চিন্ত বোধ করে বিদায় গ্রহণ করলেন, কিশোরটি তখন কিন্তু স্নায়বিক পীড়াগ্রস্ত সমবয়স্ক সহাধ্যায়ীদের সঙ্গী হতে বাধ্য হয়ে মানসিকভাবে জর্জরিত হবার উপক্রম। অবস্থার চাপে পড়ে সে সহাধ্যায়ীদের পর্যন্ত অক্ষম হয়ে পড়ল। সে দেখল, অভ্যাসের বশে অত্যাচারিত এবং অত্যাচারী, কারুরই অত্যাচার বোধ থাকে না। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সে বিদ্যালয়টি ত্যাগ করে ঐ অসহ্য অবস্থা থেকে মুক্তি পায়। স্কুলের ছাত্রাবস্থাতে ভোজনাগারের পরিচারিকার কাছ থেকে দুর্দান্ত শিক্ষাও তাকে স্কুলে ধরে রাখতে পারেনি।

অস্ট্রিয়ান লেখক রবার্ট মুজিল লিখিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগের অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের পটভূমিকায় স্থাপিত এই কাহিনীটিকে চিত্রায়ণের জন্যে শ্লেনডর্ফ গ্রহণ করেছেন পরবর্তী কালে অনুরূপ বিষয়বস্তু জার্মানীর ভবিষ্যৎকে প্রভাবান্বিত করেছিল বলে। পরিচালক এক-জন দ্রষ্টার মতো নিজেকে কাহিনী থেকে দূরে রেখে একান্ত বিশ্বাস্যভাবে কাহিনী-নিহিত ঘটনাবলীকে চিত্রিত করে দর্শক-অনুভূতিকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিতে পেরেছেন।

ইউ আর এ ম্যান, মাই বয়

এডগার রাইটজ কৃত **'লাস্ট ফর লভ'** একজন তরুণী ফোটোগ্রাফার ও জনৈক চিকিৎসাবিজ্ঞান পাঠরত যুবকের মধ্যে প্রথম দর্শনে প্রেম অবলম্বনে শুরু। ছেলে এবং মেয়েটি পরস্পরকে অত্যন্ত ভালোবাসে। কিন্তু দুজনের এই গভীর প্রেমের ফলে যখন বছরের পর বছর সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে থাকে একের পর এক তখন ছেলেটি রোজগারের ধান্ধায় মন বসাতে বাধ্য হওয়ার ফলে নিজেকে হতভাগ্য মনে করতে থাকে। এরই মধ্যে মেয়েটি যখন আর এক যুবকের প্ররোচনায় একটি বিশেষ ধর্মমতে দীক্ষিত হয়ে ছেলেটিকে সম্ভবত পরিহাসচ্ছলেই বলল, 'অতঃপর আমরা দুজনে ভাই-বোন', তখন ছেলেটি মনে করল সংসারজীবনে সে চূড়ান্তভাবেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং এই ভাবনার পরে সে করল আত্মহত্যা। মেয়েটি ক্ষণেকের জন্যে পেল চূড়ান্ত আঘাত। কিন্তু পরে জনৈক আমেরিকান যুবক পাঁচটি সন্তানসহ মেয়েটিকে গ্রহণ করল এবং সকলে আমেরিকা রওনা হল। মেয়েটির কথায় প্রকাশ, তার মনকে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে রয়েছে তার প্রেমিক-স্বামীর স্মৃতি।

এডগার রাইটজ-এর ছবির নায়ক রালফ আজকের জার্মানীর বহু ভাগ্যাহত যুবকেরই প্রতীক। জীবনপথে চলতে গিয়ে তাদের স্বপ্ন একের পর এক করে চূর্ণ হচ্ছে কঠিন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে। জার্মান যুব-জীবনের আনন্দ-বেদনাকে রাইটজ চিত্রায়িত করেছেন অপূর্ব স্বচ্ছন্দ ক্যামেরার সাহায্যে তাঁর কাহিনীকে দ্রুতগতিতে দৃশ্যের পর দৃশ্যের ভিতর দিয়ে আলোছায়ার দোলায় দোলাতে দোলাতে। রালফ এবং এলিজাবেথের যুগ্ম জীবনকে তিনি যে আশ্চর্য চিত্ররূপে

কাম টু দি পয়েন্ট, ডার্লিং

দিয়েছেন, তা আমাদের বিস্মিত, মুগ্ধ, অভিভূত করেছে। 'ভক্সওয়াগেন' মোটর-গাড়ীর এগ্জস্ট পাইপ নিঃসৃত দূষিত গ্যাসের সাহায্যে বন্ধ গাড়ীর মধ্যে রালফ-এর মৃত্যুবরণের দৃশ্য আমাদের স্মৃতিপটে বহুদিন গভীরভাবে আঁকা থাকবে। 'লাস্ট ফর লাভ' নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় চিত্র।

'কাম টু দি পয়েন্ট, ডার্লিং' হচ্ছে এই উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে একমাত্র ছবি, যা মে স্পিলস নামে জনৈক মহিলা দ্বারা পরিচালিত। মাত্র আটাশ বছর বয়স্কা এই তরুণীটি বলেছেন, 'স্বভাবপ্রণোদিত হয়ে মানুষ যেমন ছবি আঁকে, লেখে, গান গায়, সঙ্গীত রচনা করে, আমিও তেমনই চিত্রপরিচালনা করি। ছবি পরিচালনা করতে আমি আনন্দ পাই।' ছবির কাহিনীটি আসলে বাস্তবভিত্তিক হলেও এর মধ্যে পরিচালিকা মিশিয়েছেন কিছু কিছু কৌতুক-কর কল্পনা। ফলে ছবিটি হয়েছে হাল্কা ধরনের, কোনো রকম সমস্যাকণ্টকিত নয়। মিউনিকের বোহেমিয়ান অঞ্চল শোয়াবিং-এর জীবনযাত্রা প্রণালী বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করবার পরে পরিচালিকা তাঁর নায়ককে করেছেন কল্পনাশক্তিসম্পন্ন, অথচ দুরন্তভাবে অলস ও পরিশ্রমবিমুখ। পানাসক্ত হিপি-শ্রেণীভুক্ত নায়ক জীবনে কোনো রকম দায়িত্বভার বহন না করেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায়। এমন কি নারীর সান্নিধ্য সে পছন্দ করলেও নারীবক্ষকে সে আবৃত দেখতেই চায়, উন্মুক্ত নারীবক্ষ তার কাছে কুদৃশ্য। অপর দিকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চুরি, রাহাজানিতে লিপ্ত হতে তার আপত্তি নেই। শ্রীমতী স্পিলস ছবির নায়ক এবং তার বন্ধু-বান্ধবীদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত-ভাবে চিত্রিত করেছেন বটে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে ছবিটি কোনো বিশিষ্ট আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

জোহানেস শাফ পরিচালিত 'ট্যাটু' হচ্ছে বর্তমান উৎসবে প্রদর্শিত একমাত্র ইস্টম্যান রংয়ে রঞ্জিত চিত্র। একটি ষোলো বছর বয়েসের অনাথ আশ্রমে পালিত ছেলেকে এক নিঃসন্তান দম্পতি পুত্র রূপে গ্রহণ করল। তারা তাদের স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে ছেলেটির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ছেলেটি এই অস্বাভাবিক অতি ভালোবাসাকে সইতে পারল না। তার মনে হয়, এ সমস্তই ফাঁকা, এই ভালোবাসার মধ্যে প্রাণের স্পর্শ নেই। সে ভাবে, অনাথ আশ্রমের পিঞ্জর থেকে বেরিয়ে সে আর এক পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এরই ফাঁকে সে দেখতে পেল, ঐ দম্পতির আশ্রয়পুষ্ট এক তরুণীকে, যার প্রতি ও কিছু আকর্ষণ বোধ করে, তাকে তার পালকপিতা আলিঙ্গনবদ্ধ করেছে। সে চাইল, এই বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে। একবার সে ফিরে গেল আগেকার আশ্রয় অনাথ আশ্রমে, কিন্তু সে দেখল, সেখানে সে অন্য ছেলেদের কাছে অবাঞ্ছিত। তাই শেষ পর্যন্ত সে মেকী স্নেহের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে তার পালকপিতাকে করল হত্যা এবং নিজে দিল ঝাঁপ এক সাঁতারকুণ্ডে প্রচণ্ড সাঁতারে মেতে ওঠবার জন্যে।

বার্লিন শহরকে ঘটনাস্থল করে আমেরিকার দাক্ষিণ্যে পশ্চিম জার্মানীর অগাধ স্বচ্ছলতার প্রতি তীব্র ইঙ্গিত করেছেন পরিচালক জোহানেস শাফ। বর্তমানের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থায় যে সামাজিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে তাকে বরদাস্ত করতে পারল না ছবির নায়ক, এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন পরিচালক।

'ওয়াইল্ড রাইডার লিমিটেড' ছবির মাধ্যমে 'মাত্র প্রচারের দ্বারা কিনা করা যায়' এই কথাই বলতে চেয়েছেন রঙ্গব্যঙ্গের ভিতর দিয়ে পরিচালক ফ্রাঞ্জ য়োসেফ স্পীকার। জনৈকা মঠবাসিনীকে জলে ডোবা থেকে উদ্ধার করার সুযোগকে সত্য-মিথ্যায় মেশানো প্রচারের দ্বারা জনৈক আধাপাগল গ্রাম্য অশ্বারোহীকে কি বিরাট খ্যাতিসম্পন্ন করে তোলা হল, তারই প্রধানত কৌতুকপ্রদ কাহিনী ছবিটির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। বিচিত্র কৌতুকরসে ভরা ছবিখানি।

ওয়ের্ণার হার্জোগ পরিচালিত **'সাইনস অফ লাইফ'** ছবিটি একজন সৈন্যের মানসিক বিকারের ঘটনাকে চিত্রিত করেছে। সৈন্যটি দুর্ঘটনায় আহত অবস্থা থেকে আরোগ্য লাভের অব্যবহিত পরে একটি নির্জন দ্বীপে প্রেরিত হয় স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে। তার সঙ্গে থাকে তার স্ত্রী এবং আরও দুজন সৈন্য। তিনজন সৈন্যের কাজ হল ঐ দ্বীপে রক্ষিত অস্ত্রাগারটিকে পাহারা দেওয়া। কিন্তু ঐ দ্বীপের গরম আবহাওয়া, নির্জনতার একঘেয়েমী এবং একক পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব শিগগিরই সৈন্যটির মনে বিরূপতার সৃষ্টি করল। এই সময়ে হঠাৎ প্রায় হাজারখানেক বায়ুচালিত কলের পাখা একসঙ্গে দৃষ্টিগোচর হওয়ায় সে তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল এবং ক্ষিপ্ত হয়ে নিজের স্ত্রী ও সঙ্গীদের তাড়া করল, ঐ সঙ্গে সে নিকটবর্তী শহর-বাসীদের বিরুদ্ধে একক যুদ্ধ শুরু করে দিল। সকলে মিলে বুদ্ধি খাটিয়ে তাকে শেষ পর্যন্ত বন্দী করে চিকিৎসার জন্যে স্থানান্তরিত করল।
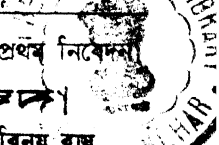
ছবিটি একটু মন্থরগতিসম্পন্ন। তবে নায়ক যখন পাগল হয়ে যায়, তখন থেকে শেষ অবধি বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। ছবির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আবহসঙ্গীতে। মাত্র বিভিন্ন তারের যন্ত্র ও পিয়ানো সহযোগে সৃষ্ট সঙ্গীত ছবিটিকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

তরুণ জার্মান পরিচালকদের শিরোমণি আলেকজান্ডার ক্লুগে পরিচালিত **'দি আর্টিস্টস আন্ডার দি বিগ টপ: ডিসঅরিয়েন্টেড'** ছবিখানি উৎসবের শেষ ছবি হিসেবে দেখানো হয়। ছবিটি ১৯৬৮ সালে ভেনিসে 'গোল্ডেন লায়ন অবস্যান মার্কো' গ্র্যান্ড প্রাইজ দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছে।

বাস্তব ও কল্পনার অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে ছবিখানিতে। আসল কাহিনীটি আবর্তিত হয়েছে লেনি পাইকার্ড নামে জনৈকা সার্কাসওয়ালীকে ঘিরে। আদর্শচেতা এই নারী তাঁর কমনীয় নারীত্বের দিকটিকে সম্পূর্ণ বজায় রেখে এই আধুনিক যুগেও তাঁর প্রাণপ্রিয় সার্কাসটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। যখন দৈবানুগ্রহে আর্থিক সমস্যার সমাধান হওয়ায় তিনি তাঁর সার্কাসের উদ্বোধনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন সহসা তিনি অনুভব করলেন, আজকের অগ্রগতির যুগে সার্কাস জিনিসটা নেহাৎই সেকেলে, একটা অলীক স্বপ্ন মাত্র। ফলে তিনি যোগ দিলেন টেলিভিশানে।

কিন্তু এই কাহিনীর রূপায়ণে ক্লুগে কাহিনীটিকে মাত্র প্রতীক রূপে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, একজন আর্টিস্ট যখন তাঁর বিশেষ শিল্পের শেষ ধাপে, একেবারে চূড়ায় ওঠেন, তখন তাঁকে নিশ্চয়ই নতুন কিছু ভাবতে হয়; ভাবতে হয়, তাঁর শিল্পের সঙ্গে আর কোন জিনিসকে খাপ খাইয়ে তিনি নবতর সৃষ্টি করতে পারেন। যেমন লেনি ভেবেছিল, ব্যালের সঙ্গে সার্কাসের যোগ সাধন করতে। ক্লুগে বলেছেন, শিল্পীকে বিপ্লবী হতে হবে, নইলে সে মরে যাবে। তাঁর চিত্রায়ণপ্রথায় বিপ্লবী মনোভাব পদে পদে। হিটলারের বিরাট কুচকাওয়াচ শোভাযাত্রা, অতীতের বিরাট শিল্পসৃষ্টির প্রতীক মূর্তি সমন্বিত শোকযাত্রা প্রভৃতি দিয়ে ছবির আরম্ভ। জনৈক শিল্পীর ক্লোজ-আপের সঙ্গে তার চিন্তা-ভাবনাকে সমন্বিত করে কিছুক্ষণ কাটাবার পরে লেনি পাইকার্ডের কাহিনীর শুরু, সঙ্গে সঙ্গে সার্কাসের দৃশ্য, তার ব্যক্তিগত জীবন, যেখানে পুরুষ-নারীর সম্পূর্ণ নগ্নতাও স্থান পেয়েছে। ছবিটিতে যেভাবে শটের পরে শট অচিন্তিত পর্যায়ে স্থান পেয়েছে, তা সাধারণ দর্শক কেন, অত্যন্ত মার্জিত-বুদ্ধি চলচ্চিত্রবোদ্ধার বোঝবার পক্ষে যথেষ্টই কঠিন।

জার্মান চলচ্চিত্রশিল্পের বর্তমান রূপ বিস্ময়করভাবে বৈচিত্র্যময়।

মানহাইম উৎসবে ছবির মেলা

ভিন্ন স্বাদ, ভিন্ন রস, ভিন্ন রুচির ডকুমেন্টারি শর্ট ও কাহিনী চিত্রের মাধ্যমে তরুণ চলচ্চিত্রকারদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতি গভীর নিষ্ঠার ফলশ্রুতি এবার অষ্টাদশ মানহাইম চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিফলিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের নিত্যনতুন আন্দোলন যথা আন্ডার গ্রাউন্ড সিনেমা, সিনেমা অফ অ্যাবসার্ড, ডাইরেক্ট সিনেমা—ইত্যাদির ছায়া বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে দেখতে পাওয়া গেছে। ছাত্র আন্দোলন, যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবিদ্বেষ ও ভিয়েৎনাম নীতি, পুলিশী বর্বরতা ইত্যাদির বাস্তব রূপে কয়েকটি চিত্রে দেখতে পাওয়া গেল।

যেমন উইসম্যান পরিচালিত 'ল এন্ড অর্ডার'—যার মূল বক্তব্য কানসাস সিটির বর্ণবিদ্বেষ। কোন কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে পরিচালক কানসাস সিটির রাস্তায় রাস্তায় দিনের পর দিন ধরে ছবির উপাদান সংগ্রহ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে আরও দুটি ছবি দেখান হয়েছে যথা ব্ল্যাকপাওয়ার ও স্ট্রেঞ্জফ্রুট। ব্ল্যাকপন্থার দলের নেতা স্টোকলি কারমাইকেল কৃষ্ণ আমেরিকানদের আরো সংঘবদ্ধ হয়ে ঐক্য রক্ষার প্রয়াস ও অস্তিত্ব রক্ষার দাবী নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বলেন ব্ল্যাকপাওয়ার ছবিতে। বিশ্ব সফরান্তে কারমাইকেলের প্রথম বক্তৃতা অবলম্বনে এই চিত্রটি পরিচালনা করেছেন লেওনার্ড হেনী। বার্লিনের টি ভি ও ফিল্ম আকাদমির হয়ে স্কিপনোরমান 'স্ট্রেঞ্জফ্রুট' ছবিটি পরিচালনা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ভেদ নীতি কিভাবে কৃষ্ণকায়দের ন্যায্য দাবি থেকে বঞ্চিত করে চলেছে তাই তিনি বলতে চেয়েছেন ৪০ মিনিটের এই দলিল চিত্রে। শিক্ষা, সংস্কার ও ছাত্র আন্দোলন সমস্যার প্রতি আলোকপাত করেছে কানাডার ছবি 'ক্রিস্টোপার মার্ভি ম্যার্টিন'। 'রোডেশিয়া কাউন্ট ডাউন' হল বর্ণ বিদ্বেষ নিয়ে একটি চমৎকার স্যাটায়ার। থিয়েটার অব অ্যাবসার্ডের ছায়া চলচ্চিত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল মাইকেল লাগারের 'ইন' ও ওয়ারনার নেকাসের 'কেলেক' চিত্রে। মিউনিকের অংকনশিল্পী মাইকেল লাগারের প্রথম চলচ্চিত্র প্রচেষ্টা 'ইন' বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। বিভিন্ন বর্ণের সমন্বয়ে ক্যানভাসে তাঁর কল্পনাপ্রবণ মনের প্রতিফলন অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। সিনেমা অফ অ্যাবসার্ডের চূড়ান্ত এক্সপেরিমেন্ট করেছেন ওয়ারনার নেকাস 'কেলেক' চিত্রে। 'কেলেক' ছবির শুরু থেকে শেষ একটাই দৃশ্য, একটা সেতু, মাঝে মাঝে দেখা যায় দু-এক জন লোকের যাতায়াত। আবার আসে নিস্তব্ধতা। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। কোন সাড়াশব্দ নেই। কখনো কখনো দু-একটা পায়ের ছাপ সেতুর বুকে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়। আবার সেই সূচিভেদ্য নিস্তব্ধতা। অন্ধকার হয়ে আসে। সেতু ঢাকা পড়ে রাত্রির অন্ধকারে। ঘটনাহীন চরিত্রবিহীন সংলাপ-শূন্য প্রায় এক ঘন্টার এই ছবি সিনেমা অফ অ্যাবসার্ডের উল্লেখযোগ্য অবদান 'কাউন্ট অফ ডেস' জুরিখের জনৈক যুবকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার রূপ শহরে কোলাহলে, ব্যস্ততায় গ্ল্যামারে রঙরেখা ও কল্পনার মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছেন পরিচালক রোবার্ট বিডার্স। সোজাসুজি কাহিনী না বলে অ্যাবসার্ড সিনেমার ভঙ্গিতে এই চলচ্চিত্রায়ন কিছুটা দুর্বোধ্য হলেও প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা।

আন্ডার গ্রাউন্ড সিনেমার একটা উদাহরণ পাওয়া গেল কাস্টার্ড পরিচালিত স্যাপরেসন অফ দি ওম্যান' চিত্রে। ছবিতে দেখান হয়েছে জনৈক যুবকের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত থাকা। ঘরকন্নার কাজের এত খুঁটিনাটি ছবিটিতে দেখান হয়েছে যে, পরিচালকের ডিটেল এর প্রতি গভীর অনুরাগে শুধু বিস্মিতই হতে হয়। অথচ কোথায়ও এতটুকুও একঘেয়েমি নেই। ভোর বেলায় এলার্মে যুবকটির নিদ্রাভঙ্গ হয়, দু-তিনবার হাই তুলে বিছানা ছেড়ে ওঠে হাত-মুখ ধুয়ে কফির জল চাপিয়ে আনমনে কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল। খানিক বাদে ব্রেকফাস্ট করে বাসনপত্র ধুতে শুরু করল। ধোয়া হয়ে গেলে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করল। কিছুক্ষণ সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করল। এক ফাঁকে চিঠির বাকসে উঁকি দিয়ে দেখল। নাইলন শার্টগুলো ব্যালকনিতে শুকোতে নিয়ে গেল। প্রতিটা শার্টে ক্লিপ এঁটে দিল—যেন হাওয়ায় পড়ে না যায়। খানিকবাদে ঢুকল রান্না-

হংকং-এর ছবি ট্রায়াম্পেল আর্চ

আর্জেনটিনীয় ছবি ইনভেসন

পোলিশ ছবি দি স্ট্রাকচার অফ ক্রিস্টেল

ঘরে দুপুরের খাওয়া তৈরী করতে। একটা পোর্ক কাটলেট ও আলুভাজা দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন হল। কোচে কিছুক্ষণ কাৎ হয়ে রইল। হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোন। কাজেই উঠতে হল। কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে কোন আওয়াজ এল না (বোধ হয় রঙ নাম্বার), বিরক্ত হয়ে ব্যালকনিতে এসে বসল। নিবিড় দৃষ্টিতে দূরের নীল আকাশের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আপন মনে হেসে উঠল। ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল সন্ধ্যা, দিনের অবসান হল। আশ্চর্য এক ঘন্টার এই ছবিটিতে একটি সংলাপও ব্যবহৃত হয় নি।

তরুণ জার্মান নাট্যকার ও পরিচালক কার্সকিস্তারের উল্লেখযোগ্য চিত্রসৃষ্টি 'কাৎসেলমাখার' এবার মানহাইমের অন্যতম আকর্ষণ ছিল। যন্ত্রসভ্যতা মানুষকে কি নির্মমভাবে যান্ত্রিক করে তুলেছে, নিঃসঙ্গ করে তুলেছে, আর তার ফলে স্নেহ, মায়া মমতা, প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদি মানবিক সম্পর্কগুলো ক্রমশই কৃত্রিম হয়ে উঠছে, তারই নির্মম আলেখ্য কাৎসেলমাখার। চারজন তরুণ-তরুণী মিউনিকের পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকে। সবাই সবার বিশেষ পরিচিত। দেখা-সাক্ষাৎ হলে মুখে কৃত্রিম হাসি টেনে শুভেচ্ছা বিনিময় হয় কিন্তু তারপর আর কোন কথাবার্তা হয় না। মাঝে মাঝে একত্রে আউটিং হয়, পিকনিকে বা কফি-হাউসে যাওয়া হয়। কিন্তু একঘেয়েমি কাটে না, কিসের একটা দেওয়াল যেন একের কাছ থেকে অন্যকে পৃথক করে রেখেছে। অথচ অর্থের দিক দিয়ে সবাই স্বচ্ছল। অন্ন, বাসস্থান শিক্ষা, জীবনযুদ্ধের কোন সংগ্রামে এরা মাথা ঘামায় না। তবু স্বাভাবিক হতে পারে না এরা, প্রাণ খুলে পারে না হাসতে। সবাই কেমন যেন নিঃসঙ্গ। আর এই একাকিত্বই এদের জীবনের মূল যন্ত্রণা, তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন কার্সকিস্তার এই চিত্রে। সম্প্রতি সম্প্রতি প্রগতিশীল নাট্যকার হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। মিউনিকের শোয়েবিং-এ পানশালা 'ভিটকেবোলুটের' পেছনে তিনি নিয়মিত নাটক পরিবেশন করেন। তাঁর রচিত 'এনার্কি' ইন ব্যাভেরিয়া' চমৎকার স্যাটায়ার। তাতে তিনি দেখিয়েছেন ফ্রান্স জোসেফ স্ট্রাউস পঃ জার্মানীর চ্যান্সেলার হয়েই যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীকে ব্যাভেরিয়ায় পাঠালেন বিদ্রোহ দমন করতে। কার্সকিস্তারের প্রয়োগধারাটিও অতি মনোরম। অনেকের মতে চলচ্চিত্রে এ্যান্টিসিনেমাই প্রয়োগ করলেন তিনি।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ছবি বলতে আমরা সাধারণত বুঝি প্রাগ স্টুডিওতে নির্মিত ও বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক মিলস ফোরম্যান, যানেমার, জিরি মেনজেল, কাদার, ক্লোজ প্রভৃতির ছবি। কিন্তু এঁরা সবাই হলেন চেক, শ্লোভাক নন। কিন্তু সম্প্রতি ব্রাটিশ্লাভা স্টুডিওতে শ্লোভাক পরিচালকগণ উল্লেখযোগ্য চিত্রসৃষ্টি করেছেন, যেমন ইউকো-বিস্কোর 'এজ অফ ক্রাইস্ট' ও স্টেফান উবের 'জিনি' যথাক্রমে মানহাইমে ও ভেনিসে ইতিপূর্বে প্রদর্শিত ও প্রশংসিত হয়েছে। এবার মানহাইমে আরেকজন তরুণ শ্লোভাক চলচ্চিত্রকার ডুজান হানেক তাঁর প্রথম কাহিনীচিত্র '৩২২'এর মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। '৩২২' এবার শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র হিসাবে মানহাইমে পুরস্কৃত হয়েছে। প্রাগ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের স্নাতক ডুজান হানেক প্রথম টি, ভি,র হয়ে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র '৬ কোশ্চেন টু য়ান ওরিস' পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। গত দুই তিন বছর তিনি যে ক'টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র পরিচালনা করেছেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—'আর্টিস্টস'। সার্কাস শিল্পীদের সুখদুঃখের কথা তিনি দরদী মনে বিশ্লেষণ করেছেন এখানে। '৩২২' চিত্রে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার কোন এক স্যানেটোরিয়ামের যথার্থ পরিবেশে যক্ষ্মারোগীদের নিয়ে স্যুটিং করেছেন—তাদের আশা হতাশার নিখুঁত আলেখ্য এই '৩২২'।

বৃটেনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন প্রখ্যাত ডকুমেন্টারিস্ট পিটার হোয়াইটহেড, ছবির নাম 'দি ফল'। হোয়াইটহেডের দুটি ডকুমেন্টারি—হোলিকমিউনিয়ন ও বেনিফিট অফ ডাউট ইতিপূর্বে মানহাইমে উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে। 'দি ফল' চিত্রে তিনি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং তাঁর বক্তব্য মনে হয় লন্ডনের একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রা তাকে অত্যন্ত বিষণ্ণ করে তুলেছিল। তিনি ভিয়েতনাম বা দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে বিপ্লবী ছবি তুলবেন স্থির করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি গেলেন নিউইয়র্কে। তিনি যেদিন নিউইয়র্কে এসে পৌঁছান তার পরদিন আততায়ীর গুলিতে মার্টিন লুথার কিং, ও কিছুদিন বাদে রব কেনেডি নিহত হন। পর পর দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে নিউইয়র্কবাসীর মানসিক প্রতিক্রিয়া সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে 'দি ফল' চিত্রে। আলোচনা প্রসঙ্গে হোয়াইটহেড কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিপ্লবী মনোভাবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন, "আমি যখন সেখানে গেলুম জনৈক ছাত্র সেখানকার ছাত্রনেতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল আমার। প্রায় ৬০০ ছাত্র তখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ দখল করে নিয়েছে। ঘন ঘন সভা চলছে, নানা প্রস্তাব অনুমোদিত হচ্ছে। সবাই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ পেশ করে চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার মনে হল আমি ওদেরই একজন, ওদের মতই বিপ্লবের অংশীদার।" হোয়াইটহেডের শ্রম ও নিষ্ঠা সার্থক হয়েছে। 'দি ফল' তার অভিজ্ঞতার ডকুমেন্টেশন হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

যুক্তরাষ্ট্রের মেসেলস ভ্রাতৃদ্বয় প্রযোজিত ও পরিচালিত 'সেলসম্যান' পরীক্ষামূলক ছবির একটা উদাহরণ। চারজন বাইবেল বিক্রেতা, দরজায় দরজায় গিয়ে তারা বাইবেল বিক্রী করে। ক্রেতাকে বশীভূত করার মন্ত্রতন্ত্র সবই এদের জানা, তবুও সব সময় আশাতীত বিক্রী হয় না। অনেকে ত মুখের 'পর দরজা বন্ধ করে দেয়, কেউবা দেয় কুকুর লেলিয়ে; আবার সহৃদয় ক্রেতাও আছেন—যাঁরা এক কাপ চায়ের সঙ্গে দু চারটা মিষ্টি কথা বলেন, ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করেন। সন্ধ্যাবেলা যখন চারজন সেলসম্যান একত্র হন তখন সমস্ত দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আলোচনা হয়; কেউ খুশীতে ডগমগ, কেউ বা বিষণ্ণ। কোন পূর্বপরিকল্পিত চিত্রনাট্য ছাড়াই ডেভিড ম্যাসেলস ছবিটি পরিচালনা করেছেন, এবং সেলসম্যানদের ভূমিকায় কোন অভিনেতা নেওয়া হয়নি। চারজন সত্যিকারের বাইবেল বিক্রেতার কর্মকান্ড ১৬ মিঃ মিঃ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। ছয় সপ্তাহ ধরে ডেভিড ম্যাসেলস বাইবেল বিক্রেতাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে গিয়ে এই ছবিটি তুলেছেন। তারপর ১৫ সপ্তাহ সম্পাদনার পর ছবির কাজ শেষ হয়। "আমার দৃঢ়বিশ্বাস বাস্তব পরিবেশে সত্যিকারের চরিত্র যতটা স্বাভাবিক হয় স্টুডিওতে অভিনীত কৃত্রিম পরিবেশে তা হয় না। একজন সেলসম্যান যখন দরজায় দরজায় গিয়ে বই বিক্রী করে সেটা সব সময়ই কৌতুহলোদ্দীপক। তার অবিকৃত বাস্তব রূপে যদি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় তবে কেন তা আর্ট ফিল্মের মর্যাদা পাবে না?" বলেন ডেভিড ম্যাসেলস। তিনি হলিউড়ি পদ্ধতিতে ছবি তোলার সম্পূর্ণ বিরোধী। হলিউড এস্টাবলিশমেণ্টকে তীব্রভাবে সমালোচনা করে বলেন, "হলিউডে পরীক্ষামূলক ছবি তোলার কোন সুযোগ নেই। কর্তাব্যক্তিরা ব্যালেন্সসীট নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে তরুণদের কথায় কান দেন না। এইভাবে এরা সিনেমাশিল্পের সর্বনাশ করে চলেছে এবং নিজেদের সমাধি রচনা করছে। এমন একদিন আসবে যখন হলিউডের বড় বড় স্টুডিওগুলো গুদামে পরিণত হবে।' 'সেলসম্যান' চিত্রে ম্যাসেলস ভ্রাতৃদ্বয় যে নূতন চলচ্চিত্র মাধ্যম প্রয়োগ করলেন তার নাম হল 'ডাইরেক্ট সিনেমা'। একদা ইতালীয় 'নববাস্তববাদ' ও ফরাসী 'নুভেলভাগ' চলচ্চিত্র আন্দোলনে বিপ্লব এনেছিল, কিন্তু তাতেও পূর্বলিখিত চিত্রনাট্য ছিল, নাটকীয় সংঘাত ছিল। অনেক ক্ষেত্রে অনেক চরিত্রে বড় বড় স্টারেরা অভিনয় করেছেন। কিন্তু ডাইরেক্ট সিনেমার প্রয়োগরীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে কোন পূর্বলিখিত কাহিনী বা নামডাকওলা স্টার সহযোগে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হবে না। এই পদ্ধতিতে ছবি তুলে যদি ম্যাসেলস ভ্রাতৃদ্বয় সাফল্যলাভ করতে পারেন তবে ভবিষ্যতে আরও বেশী শিল্পসম্মত ছবি ১৬ মিঃ মিঃ ক্যামেরায় তুলতে তরুণ পরিচালকগণ এগিয়ে আসবেন।

সৈকত ভট্টাচার্য

প্রেক্ষাগৃহ

কাজল মজুমদার

ফটো : অমৃত

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব

প্রায় পাঁচ বছর ধরে অপেক্ষা করবার পরে আজ শুক্রবার, ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ খৃস্টাব্দ তারিখে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী নয়াদিল্লীতে সত্য সত্যই চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব শুরু হতে চলেছে। বলা বাহুল্য ১৯৬৫ সালের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের মতো এই চতুর্থ উৎসবটিও হবে প্রতিযোগিতামূলক। এই উৎসব অনুষ্ঠানটিকে সম্ভব করে তোলা নিয়ে ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরকে যে-হাঙ্গামা পোহাতে হয়েছে, তা বর্তমান উৎসবটিকে প্রতিযোগিতামূলক করা নিয়েই। প্যারিসের প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফিল্ম প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন' (এফ-আই-এ-পি-এফ) নামে যে আন্তর্জাতিক সংস্থাটির অনুমোদন না পেলে কোনো দেশই প্রতিযোগিতামূলক চলচ্চিত্রোৎসবের আয়োজন করতে পারে না, সেই সংস্থার ভারতের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ছিল যে, ভারত ১৯৬৫ সালে তৃতীয় উৎসব অনুষ্ঠানের অনুমতি লাভের সময়ে যে-সব শর্ত পালন করবে বলে স্বীকৃত হয়েছিল, তা যথাযথভাবে পালন করতে সে সক্ষম হয় নি। প্রথম শর্ত ছিল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ছাড়া অন্যান্য দেশ থেকে ভারত বছরে অন্তত তিরিশখানি ছবি আমদানি করবে। দ্বিতীয় শর্ত ছিল, অপরাপর প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে যে-সব ছবি পুরস্কার লাভ করবে, ভারত সেগুলিকেও আমদানি করবে। তৃতীয় শর্ত ছিল, এই প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবকে একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। কিন্তু এই শর্তগুলির কোনোটিই যথাযথভাবে পালিত না হওয়ায় এফ আই এ পি এফ ভারতের প্রতি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অসন্তুষ্ট হয়। আন্তর্জাতিক সংস্থাটির মতে প্রতিযোগিতামূলক চলচ্চিত্রোৎসব হচ্ছে অপরিহার্যভাবে একটি ব্যবসায়িক বিনিময়ের অনুষ্ঠান। কিন্তু ভারত যখন তার চলচ্চিত্রোৎসবে প্রদর্শিত বিভিন্ন দেশের ছবিগুলিকে আমদানি করবার কোনো ব্যবস্থাই করে উঠতে সক্ষম নয়, তখন সেখানে প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হবার সার্থকতা কোথায়? এফ আই এ পি এফ'এর এই বিরুদ্ধ মনোভাবকে দূর করে চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠানের জন্যে প্রয়োজনীয় সম্মতি আদায় করতে ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রককে যে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে, একথা অনুমান করা কঠিন নয়।

মূল প্রতিযোগিতাসমেত এবারের আসল উৎসবটি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৫ থেকে ১৮ ডিসেম্বর চোদ্দ দিন ধরে। ১৯৬৫-র উৎসবে যেখানে মাত্র ২২টি দেশ যোগ দিয়েছিল, সে জায়গায় এবারে মোট ৩৩টি দেশ যোগদান করছে বলে আশা করা যায়। এই দেশগুলির মধ্যে আছে : বেলজিয়াম, ব্রেজিল, ব্রিটেন বুলগেরিয়া, কাম্বোডিয়া, কানাডা সিলোন (সিংহল) কিউবা, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, ফেডারাল রিপাবলিক অব জার্মানী (ওয়েস্ট), জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক (ইস্ট), গ্রীস, হংকং, হাঙ্গেরী, ইণ্ডিয়া, ইতালী, জাপান, ম্যালেসিয়া, নেদারল্যাণ্ডস্, নাইজেরিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, সাউথ কোরিয়া, স্পেন, ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক, ইউ-এস-এ, ইউ-এস-এস-আর এবং ইউগোশ্লাভিয়া। প্রতিযোগিতার জন্য প্রতিটি দেশ একটি কাহিনীচিত্র এবং একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র কিংবা দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্র উপস্থাপিত করতে পারে। এবং এ ছবিগুলি ১৯৬৮-র ১ জানুয়ারীর আগে সমাপ্ত হয়ে থাকলে চলবে না। শুধু তা নয়, বর্তমান উৎসবে প্রদর্শিত হবার আগে এগুলি অন্য কোনো প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক উৎসবে এবং ভারতে কোথাও দেখানো হয়ে থাকলেও অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অবশ্য ভারতীয় ছবি ভারতে দেখানো হয়ে থাকলে ক্ষতি নেই।

প্রতিযোগিতার ছবিগুলি ছাড়াও গেল কয়েক বছরের মধ্যে নির্মিত ও প্রদর্শিত আন্তর্জাতিকখ্যাতিসম্পন্ন বহু ছবি এই উৎসবে

দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় এবং প্রতিযোগিতার বাইরে দেখাবার জন্যে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত ষাটটি কাহিনীচিত্র ও ছেচল্লিশটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র হরিশচন্দ্র খান্নার নেতৃত্বে গঠিত উৎসব কর্তৃপক্ষের হাতে এসেছে। ২০ নভেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ যে, ভানেসা রেডগ্রেভ (প্রতিযোগিতার বাইরে এ'র 'ইসাডোরা' ছবিটি দেখানো হবে), ইনগ্রিড টুলিন (ভিসকোন্টি পরিচালিত এ'র অভিনীত ছবি 'দি ড্যামড্' এই উৎসবে দেখানো হয়ে নিখিল এশিয়ায় প্রথম মুক্তি পাবে), ডাচ তথ্যচিত্রনির্মাতা বার্ট হানস্ট্রা, ল্যাটিন আমেরিকার বিখ্যাত পরিচালক টোর নিলসন, প্রখ্যাত রুশ চিত্রপরিচালক সার্গেই গেরাসিমভ প্রমুখ বারোজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত থাকবেন। প্রতিযোগী ছবিগুলির শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্যে নজন সদস্যবিশিষ্ট যে জুরী গঠিত হয়েছে, তাতে থাকবেন খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রপ্রযোজক, পরিচালক, কাহিনীকার, অভিনেতা, কলাকুশলী ও চিত্রসমালোচক। নজনের মধ্যে যে-দুজন ভারতীয় থাকবেন, তাঁরা হচ্ছেন রাজকাপুর এবং বিখ্যাত কাহিনীকার আর কে নারায়ণ। এছাড়া জুরীর সদস্যপদ গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন ওয়ার্ল্ড ফিল্ম আর্কাইভ-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক জার্সি টোপ্লিজ (পোল্যান্ড), রুশ চিত্রপরিচালক আলেকজান্ডার জার্খি, লন্ডন টাইমস্-এর চিত্রসমালোচক জন রাসেল টেলার এবং ব্রেজিলের চিত্রপরিচালক নলসন পারেরা ডোজ স্যান্টোজ।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র রেক্স হ্যারিসন ও রিচার্ড বার্টন অভিনীত 'স্টেয়ারকেস' ছবিটিকে প্রতিযোগিতায় উপস্থাপিত করেছে। প্রতিযোগিতার জন্যে ভারতের কাহিনীচিত্র ২০ নভেম্বর পর্যন্ত নির্বাচিত হয় নি; তথ্যচিত্র হিসেবে দেওয়া হচ্ছে রণবীর রায় পরিচালিত 'টেগোর্স পেন্টিংস' (রবীন্দ্র-চিত্রাবলী)।

উৎসবের দুটি মূল কেন্দ্র হচ্ছে : বিজ্ঞান ভবন এবং মভলঙ্কর প্রেক্ষাগৃহ। এছাড়া দিল্লী ও নয়াদিল্লীর তিনটি অঞ্চলে নটি চিত্রগৃহের প্রতি তিনটিতে চারটি করে কাহিনীচিত্র ও তথ্যচিত্র (প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিতার বহির্ভূত) দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতার জন্যে যেসব ছবি এসেছে, তাদের মধ্যে কয়েকটির নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ : রুপো (বেলজিয়াম)— এই রঙীন ছবিটির পরিচালক হচ্ছেন লুই গ্রেসপীয়ার; ছবিটিতে একটি ছোট ছেলে এবং তার বাপ-মায়ের মনোমালিন্যকে ঘিরে একটি কাহিনী বিবৃত। সিংহলের ছবির নাম হচ্ছে গোলু হাদাওয়াথা; ১৯৬৫-র প্রতিযোগিতায় যাঁর গাম প্যারেলিয়া শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছিল, সেই লেস্টার জেমস পিয়ারিস এই ছবিখানিরও পরিচালক। চেকোশ্লোভাকিয়ার এ ফান ওজন্ত মান মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় ছবি। পোল্যান্ডের রেড অ্যান্ড গোল্ড ছবিতে বর্ণিত হয়েছে এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবার চল্লিশ বছর বাদে আবার কেমন করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। ইতালীর দি অ্যামড্ ছবির কাহিনী নাৎসী আমলে এক জার্মান ব্যবসায়ীর পরিবারে রাজনৈতিক মতবিরোধকে ঘিরে। দক্ষিণ কোরিয়ার দি ওল্ড ক্রাফ্‌টস্‌ম্যান অব জার্ন-এরও উপজীব্য হচ্ছে একটি পারিবারিক কাহিনী। দক্ষিণ কোরিয়া চিত্রনির্মাণপদ্ধতি সম্পর্কে [illegible] অনুগামী। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্টেয়ারকেস হচ্ছে যৌন ব্যাপারে বিকৃত রুচিসম্পন্ন দুজন পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাপারে মনস্তত্ত্বমূলক ছবি।

প্রতিযোগিতার বাইরের ছবিগুলির মধ্যে আছে : কানাডার ডোণ্ট লেট দি এঞ্জেলস্ ফল; ছবিটি বর্তমান পারিবারিক জীবনের সমস্যাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। কাম্বোডিয়ার রেপাকুল (টোয়লাইট) ছবিটি পরিচালনা
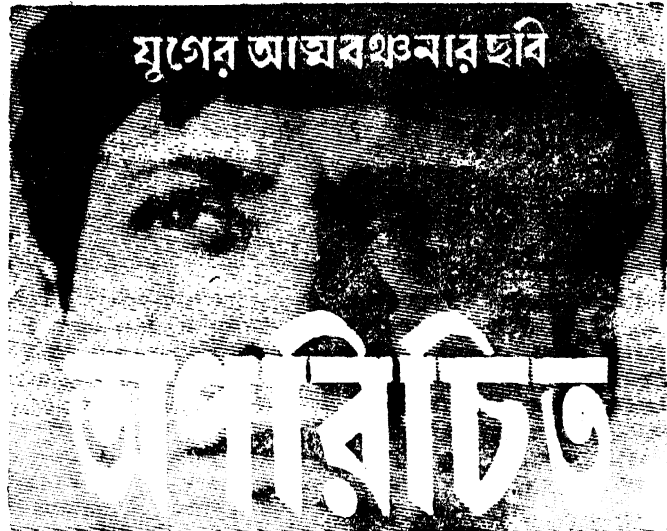
চৈতালী / তনুজা এবং বসন্ত চৌধুরী

করেছেন প্রিন্স নোরোদোম সিহানুক; শুধু তাই নয়, তিনি নিজে এতে অবতীর্ণও হয়েছেন। বিখ্যাত পরিচালক জ্যাক কার্ডিফ-এর ছবি হচ্ছে **দি গার্ল অন দি মোটরসাইকল** (ফ্রান্স)। হাঙ্গেরীর **ফরবিডন গ্রাউন্ড**-এর পরিচালক হচ্ছেন পল গ্যাবোর। নেদারল্যান্ডস্-এর **বার্ট হানাস্ট্রার** দুটি তথ্যচিত্রের নাম (১) **ভয়েস অব দি ওয়াটার** ও (২) **শী ইজ লাইক এ রিভার**। পোল্যান্ডের **দি ডেজ অব ম্যাথু** হচ্ছে ভগ্নীর উপর নির্ভরশীল এক অলস ভ্রাতার কাহিনীকে ঘিরে। ওখানকার বিখ্যাত পরিচালক আঁদ্রে ওয়াইদার ছবিদুটি হচ্ছে **হান্টিং ফ্লাইজ** এবং **এভরিথিং ফর সেল**। এছাড়া আছে **ইসাডোরা, থ্রী ইনটু টু ওন্ট গো** এবং কান ফেস্টিভ্যালে গ্রাঁ প্রী প্রাপ্ত লিন্ডসে অ্যান্ডার্সন-এর **ইফ**।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের মধ্যে যেগুলি ক্লাসিকের মর্যাদা পেয়েছে, এমন একুশটি ধ্রুপদী চিত্র ও বিশিষ্ট তথ্যচিত্র ইন্দ্রপ্রস্থ এস্টেটে অবস্থিত অডিও-ভিস্যুয়াল এডুকেশন ডিরেকটরেট-এর প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হবে এই উৎসবের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে।

এবারে ভারত সরকার প্রতিযোগিতায় সাতটি পুরস্কার প্রদান করছেন : চারটি কাহিনীচিত্রের জন্যে এবং তিনটি স্বল্প-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট চিত্রের জন্যে। ১৯৬৫তে প্রদত্ত পুরস্কারগুলি ছিল 'ময়ূর'। এবারে তার পরিবর্তে দেওয়া হবে নটরাজ মূর্তি। পুরস্কারগুলি হচ্ছে : (১) শ্রেষ্ঠ কাহিনী-চিত্রের জন্যে স্বর্ণ নটরাজ; (২) শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট চিত্রের জন্যে স্বর্ণ নটরাজ ;(৩) শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : রৌপ্য নটরাজ; (৪) শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী : রৌপ্য নটরাজ; (৫) কাহিনীচিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচালক : রৌপ্য নটরাজ এবং (৬-৭) স্বল্প-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট চিত্রের জন্যে আরও দুটি রৌপ্য ও ব্রোঞ্জনির্মিত নটরাজ।

ভারতীয় ও বৈদেশিক চিত্রপরিচালক, সমালোচক ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে একটি আলোচনাচক্রের (সিম্পোসিয়াম-এর) ব্যবস্থাও করা হয়েছে এই উপলক্ষ্যে।

স্মরণ থাকে যে, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবটি হচ্ছে এশিয়ার একমাত্র প্রতিযোগিতামূলক উৎসব। এবং এই কারণে উৎসবটি গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক চলচ্চিত্রশিল্পটিকে যাতে সব দিক দিয়েই এই উৎসবে প্রতিফলিত করা যায়, সে জন্যে উৎসব-পরিচালক শ্রীখান্না সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করেন নি।

গেলবারের মতো এবারেও উৎসব উপলক্ষ্যে একটি তথ্যসংবলিত পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে। দিল্লীর উৎসবে আনুমানিক ব্যয় হবে ছ'লক্ষ টাকা।

দিল্লীর উৎসব শেষ হবার পরে কলকাতা মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে একটি করে 'চলচ্চিত্র সপ্তাহ' পালিত হবে।

স্টুডিও থেকে

অপর্ণা হাঁটু মুড়ে পা পেতে খাটের ওপর বসে। পরনে ঝালর-দেওয়া পুরোনো দিনের ব্লাউজ। টানা চোখ নিয়ে হাসিমুখে বসে আছেন।

পায়ের গোড়ায় বসে রয়েছেন শুভেন্দু। গিলে-করা পাঞ্জাবী। চুল এক পাশে সিঁথি করে আঁচড়ান। বসার খাট, ঘরের আসবাব-পত্র থেকেই বোঝা যায় সময়টা জমিদারী আমলের। অপর্ণার পায়ের পাশে আলতার বাটি। সামনে ঝুঁকে পড়ে অপর্ণাকে আলতা পরাচ্ছেন শুভেন্দু।

ক্যামেরাম্যান বিমল মুখোপাধ্যায় আলোর মাপজোক সব ঠিক করে নেওয়ার পর অরুন্ধতী দেবী বলে উঠলেন 'অ্যাকশন'।

অমনি অপর্ণা সলাজ ভঙ্গিতে শুভেন্দুর দিকে তাকান। শুভেন্দু নিজের মনে হাসতে হাসতে পায়ে আলতা পরান অপর্ণার।

অপর্ণা—পায়ে হাত দিচ্ছ, পাপ হবে আমার কিন্তু।

শুভেন্দু—হোকগে, কিছু কিছু পাপ হওয়া ভাল।

অপর্ণা—কেন?

শুভেন্দু—আমি তো নির্ঘাৎ নরকে যাব জানি। নরকে গিয়ে মহাফাঁপরে পড়ে যাব তোমাকে যদি না পাই সেখানে।

অরুন্ধতী দেবীর নির্দেশেই দৃশ্যটির ছেদ পড়ল এখানেই। গত একুশ তারিখ এন-টি'র দু' নম্বরে নতুন ছবি 'মৃগয়া'র কাজ শুরু হয়েছিল এ-দৃশ্যটার শুটিং দিয়েই। ছবিতে অবশ্য অপর্ণা, শুভেন্দুর নাম হয়েছে তরঙ্গিনী আর ছোটবাবু।

'ছুটি'র আশাতীত সাফল্যের পর অরুন্ধতী দেবী যে-ছবিটা করেছেন (মেঘ ও রৌদ্র) তা মুক্তি পায়নি এখনও। মুক্তির এখনও দেরী আছে। যে চেনে রিলিজ হবার কথা, সেখানে এখন গুপীগাইন বাঘাবাইন সেঞ্চুরীর পথে এগিয়ে চলেছে। আবার তার ওপর ঐ রিলিজ চেনের সঙ্গে অন্য ছবিরও রিলিজের ব্যাপার নিয়ে মুক্তির সমস্যাটি আরও জটিল হবে বুঝি।

যাই হোক, অরুন্ধতী দেবী যখন ছুটি'র মত একখানা পরিচ্ছন্ন ছবি উপহার দিয়েছিলেন, তখন থেকেই তাঁর সম্পর্কে আমাদের আশা অন্যরূপে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মেঘ ও রৌদ্র' কাহিনী নির্বাচন আরও উৎসাহিত করেছে দর্শকদের। কৌতূহলী হয়েছে তারা অরুন্ধতী দেবীর ছবি সম্পর্কে। সে-ছবি মুক্তি এখনও পেল না। ইতিমধ্যে নতুন ছবি 'মৃগয়া'র কাজ শুরু করলেন তিনি। অবশ্য এ-ছবি করার সংবাদ প্রায় দেড় বছর আগের পুরোনো। বাংলাদেশের সব জনপ্রিয় শিল্পীদের নিয়ে এর কাস্টিং ঠিক হয়েছিল। উত্তমকুমার থেকে শুরু করে বহু খ্যাতনামা শিল্পীর এ ছবিতে অংশ নেওয়ার কথা।

কিন্তু শেষ অব্দি তা হলো না।

উত্তমকুমার বাদ পড়লেন আর তার জায়গা পূরণ করতে আনা হচ্ছে অশোককুমারকে। শেষপর্যন্ত যদি কোনো 'অনিবার্য' বাধা না আসে, তাহলে যাঁরা এ-ছবিতে কাজ করবেন তাঁদের মধ্যে আছেন অশোককুমার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ দত্ত, শমিত ভঞ্জ, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, পার্থ, অপর্ণা, সন্ধ্যা রায়, রুমুই বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, মাঃ অরিন্দম ইত্যাদি। অনিবার্য বাধা বললাম এই কারণে যে, ইতিপূর্বে শিল্পী নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে অনেক কিছু 'ঘটনা' ঘটে গেছে কিনা!

●

হিন্দী 'আপনজন'-এর কি খবর জিজ্ঞেস করায় তপন সিংহ বললেন, 'এখনও সবই প্রায় প্রাইমারী স্টেজে। আর তাছাড়া হিন্দী ছবি করাতো চট করে হয় না।'—শুনেছিলাম শচীনদেব বর্মন নাকি কলকাতায় এসেছিলেন 'আপনজন'-এর মিউজিকের ব্যাপারে কিছু কাজ করতে?

: হ্যাঁ, এসেছিলেন, খুব একটা কিছু কাজ হয়নি এখনও—জানালেন তপনবাবু। 'সগিনা মাহাতো'র আউটডোর থেকে ফেরার পর এখনও ইনডোরে যাননি। যেতে একটু দেরী আছে এখনও। এবারের আউটডোর নাকি খুব ভালো হয়েছে। বাকিটুকু ইনডোরে করলেই ছবি শেষ। তারপর মুক্তি পেতে যা সময়।

●

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'ফাঁকি'কে চিত্ররূপ দেবেন পরিচালক সাংবাদিক বুলু চক্রবর্তী। এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক নিজেই। সম্পূর্ণ আউটডোরে তোলা এ ছবির চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় থাকবেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এবং অরবিন্দ সেন। সরকার বিলায়েত হুসেন খাঁর সুরে কণ্ঠদান করেন কিশোরকুমার (রবীন্দ্রসংগীত)। কয়েকজন নবাগত শিল্পীদের নিয়ে এ ছবির কাজ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বিলাসপুরে আউটডোরে শুরু হবে।

রুবি ফিল্ম-এর সুরিন্দর সিং ও বীরেন্দ্র বর্মা ছবিটির প্রযোজনা করবেন।

●

'পান্না হীরে চুনী'খ্যাত পরিচালক অমল দত্ত পরিচালিত, সত্যদেব চট্টোপাধ্যায় সুরারোপিত প্রগতি চিত্রমের 'আবিরে রাঙানো'-র নিয়মিত চিত্রগ্রহণ সংগীত গ্রহণের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। ডিসেম্বর থেকে একটানা শ্যুটিং শুরু হবে। চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীত রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীদত্ত নিজেই। কাহিনী রচনা করেছেন মধু বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে রূপ দেবেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সুচন্দ্রা, গীতা দে, অরুণ মুখোপাধ্যায় ও নিপন গোস্বামী। রমেশ যোশী, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণীষ রায় যথাক্রমে সম্পাদনা, আলোকচিত্র ও সহযোগী পরিচালনার দায়িত্ব বহন করবেন।

অপরিচিত / উত্তমকুমার এবং অপর্ণা সেন
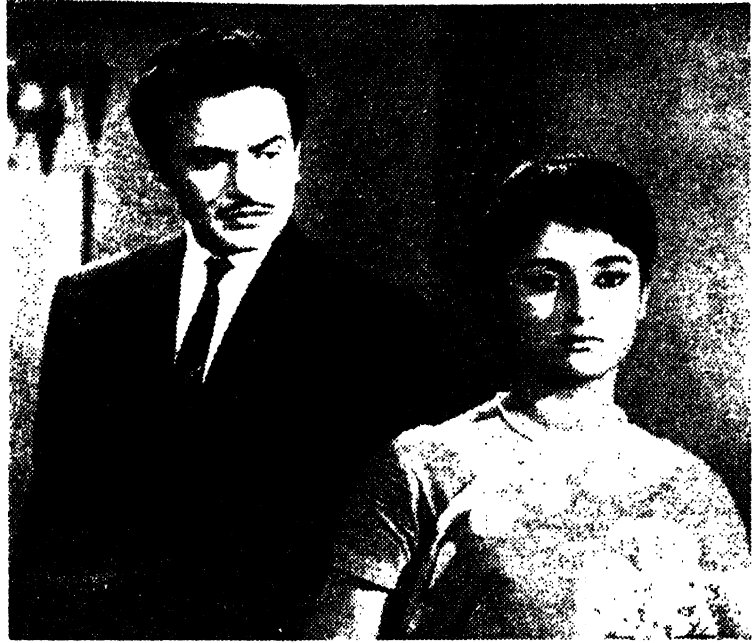
বোম্বাই থেকে

কিছুদিন আগে বোম্বাই-এর এক চিত্রনির্মাতা গিয়েছিলেন কলকাতার এক স্টুডিও দেখতে। সেখানে তিনি কলকাতার স্টুডিওটি দেখে নাক সিঁটকে বলেছিলেন যে, তোমরা এই অসুবিধের মধ্যে কি করে কাজ কর? এখানে অমুক নেই, তমুক নেই, লোকজন আস্তে আস্তে কাজ করে, যেন সবাই আফিং-এর নেশায় আচ্ছন্ন। আমরা হলে তো বাপু এত অসুবিধের মধ্যে কাজ করতে পারতুম না। আমার তখন বোম্বাই স্টুডিওর সম্বন্ধে কোনরকম অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই, বোকার মত চেয়ে চুপ করেছিলাম। এখন বোম্বাই এসে দেখে মনে হল—দু' জায়গারই কাজ করার ধারা একই রকম। তবে এখানকার স্টুডিওতে এখন বেশীর ভাগই 'কালার' ছবি, সেইজন্যে আলোর সংখ্যা বেশী এবং লোকজনের কর্মক্ষমতাও বেশী। তবে একটা জিনিস দেখে তাজ্জব বনে যেতে হয়, সেটা সর্বসময় ফ্লোরের মধ্যে গেস্টদের ভিড়। অনেক সময় দেখা গেল বেশ সেজেগুজে সপরিবারে এসে অনেক অজানা-অচেনা লোকও অতিথি সেজে বসে গেল ফ্লোরে। এমনকি রাত্রি ১১টার সময়ও দেখেছি বান্ধবীদের নিয়ে তরুণরা এসে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে যায়। এ যেন অনেকটা পার্কে বেড়ানোর মত। হাতে সময় আছে, অথচ কাজকর্ম নেই, অতএব চল খানিকটা স্টুডিওতে ঘুরে আসি। এছাড়া তো আর্টিস্টদের বন্ধুবান্ধব, প্রোডিউসার ডিরেকটারের বন্ধুবান্ধব এবং স্তাবকদের দল (যাদের এখানে বলা হয় 'চামচা') এবং হবু অভিনেতা-অভিনেত্রীর দলের তো কমাই নেই। তবে হ্যাঁ—এখানে কর্মীদের সংখ্যা বেশী এবং এরা বাংলাদেশের তুলনায় যে বেশী কর্মঠ সেটা মানতেই হবে। জিনিসপত্র, মানে যাকে বলে 'ইকুইপমেন্টস' তাও বেশী এবং আধুনিক। যান্ত্রিক উৎকর্ষের দিক থেকে বোম্বাই

এক হাসিনা দো দিওয়ানে'তে ববিতা

চিত্রজগত বাংলার থেকে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। কিন্তু যখন হৃদয়ের আবেদনের প্রশ্ন আসে সেখানেই এদের দৈন্য ধরা পড়ে। সেই জন্যেই দেখবেন বোম্বাই ছবিতে সব জিনিসটাই স্থূল, সূক্ষ্ম জিনিস এদের মগজে আসে না।

●

প্রযোজক এবং অভিনেতা সুনীল দত্ত তাঁর নবতম ছবির শ্যুটিং-এর জন্যে সমস্ত ইউনিটকে নিয়ে গেছেন রাজস্থানের এক মরুভূমিতে। জায়গাটির নাম পোচিনা। জয়সেলমার থেকে ৮০ মাইল দূরে একটি ছোট্ট গ্রাম। সেখানে যেদিকে তাকাবেন খালি বিস্তীর্ণ বালুকারাশি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়বে না। জল এবং পেট্রোল পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। বহুদূর থেকে এ দুটি জিনিস সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হয়। সেইজন্যে সোনাদানা হীরা জহরৎ থেকে এই দুটি জিনিসই হল সবথেকে মূল্যবান সেখানে। তাঁবু খাটিয়ে সমস্ত ইউনিটে রয়েছে প্রায় ২৫০ জন লোক। দিনের বেলায় যেমনি গরম, রাত্রে তেমনি ঠাণ্ডা। এর ওপরে আছে প্রচুর সাপ এবং কাঁকড়াবিছার উপদ্রব। মাঝে ২।৩ দিন তো সর্বক্ষণ এমন বালির ঝড় বয়ে গেল যে সকলকে তাঁবুর ভেতরে বসেই কাটাতে হল। রাত্রে যে একটু এদিক ওদিক বেড়াবেন তারও উপায় নেই। কারণ পথ ভুলে এদিক সেদিক গিয়ে পড়তে পারেন এবং হারিয়ে যেতে পারেন। তা ছাড়া চোরাবালির ভয় আছেই। একবার তো পরিচালক সুকেদেব একদিন এইরকম হারিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় পুরো একদিন পরে। রাত্রিবেলা আলোর জন্যে সঙ্গে করে নিজেদের বৈদ্যুতিক জেনারেটর নিয়ে যেতে হয়েছে। এ জায়গাটিতে নাকি গত আট বছর ধরে কোনো বৃষ্টি হয়নি।

এই রকম একটি জায়গায় শ্যুটিং করা যে কি কষ্টসাধ্য তা আশা করি সহজেই অনুমান করতে পারছেন। কিন্তু সমস্ত কর্মীর দল হাসিমুখে কাজ করছেন সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত, কখনও কখনও তারও বেশী।

নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুনীল দত্ত এবং ওয়াহিদা রহমান।

●

রাজকাপুরের বিরাট ছবি 'মেরা নাম জোকার' (তিন খণ্ডে সমাপ্ত) সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ১ম খণ্ডে আছেন মনোজকুমার, সিমি, অচলা সচদেব এবং রিমি (ঋষি) কাপুর; ২য় খণ্ডে আছেন দর্মেন্দ্র, মস্কোর বলশই থিয়েটারের কিসিয়েনা বাবিয়েংকো দারা সিং, সোভিয়েৎ সার্কাস এবং জেমিনী সার্কাসের শিল্পীরা; এবং ৩য় খণ্ডে আছেন রাজেন্দ্রকুমার, পদ্মিনী এবং রাজ কাপুর নিজে। এর কাহিনী হল খাজা আমেদ আব্বাসের। এমন বিরাট ছবি যে ভারতীয় চিত্রজগতে আর হয়নি সেটা বলাই বাহুল্য। রাজ কাপুরের বিশেষত্বই হল সব সময় নতুন কিছু দেওয়া আর সেজন্যেই তিনি এত প্রিয় সকলের কাছে।

মার্চেন্ট-আইভরীর নাম আপনাদের কাছে অজানা নয়। ইসমাইল মার্চেন্টের প্রযোজনায় এবং জেমস আইভরীর পরিচালনায় আপনারা 'শেক্সপীয়ারওয়ালা' ছবি দেখেছেন যদিও ছবিখানি তেমন জনপ্রিয় হয়নি। এঁরা আবার ছবি করছেন ভারতে। এবারকার ছবির নাম হল 'অ্যান আইডল মাইন্ড'। ছবিখানি হবে ইংরাজীতে অবশ্য। অভিনয় করবেন উৎপল দত্ত, অপর্ণা সেন এবং জিয়া মহিউদ্দিন। ক্যামেরায় কাজ করবেন সুব্রত মিত্র। সুরসৃষ্টি করবেন জয়কিষণ।

এখানকার শিল্পীদের জন্মদিন পালন করা একটা বিশেষ নেশা। অনেকে নির্মীয়মান ছবির 'সেটে'র উপরেই জন্মদিন উৎসব পালন করেন। সেদিন রামানন্দ সাগরের 'গীত' ছবির সেটে মালা সিনহার জন্মদিন উৎসব পালন করা হল নটরাজ স্টুডিওতে। আবার নায়িকা ভিম্মির জন্মদিন উৎসব পালন করা হল জেমস স্টুডিওতে কল্পনালোকের গগনচুম্বী ছবি সানক নাম জাহাজ ছবির সেটে। এই ধরনের উৎসবে সাধারণত এক বিরাট কেক কাটা হয় এবং সেই কেক উপস্থিত সকলকে বিতরণ করা হয়।

স্বর্গত পরিচালক হেমেন গুপ্তের মেয়ে জয়শ্রী গুপ্তাকে প্রথম আপনারা দেখবেন গুরু দত্ত ফিল্মস কম্বাইনের ২নং ছবিতে নায়িকারূপে। পরিচালনা করবেন স্বর্গত গুরু দত্তের ভাই আত্মারাম যার 'চন্দা আউর বিজলী' সম্প্রতি মুক্তিলাভ করে জনসমাদর লাভ করেছে। সৌরেন সেন এর শিল্পনির্দেশক। প্রথম গান রেকর্ডিং করে এর 'মহরৎ উৎসব' সম্পন্ন হয়েছে। গানের প্রথম লাইন হল 'অ্যাপোলো ৯৯'। গেয়েছেন কিশোরকুমার, মহেন্দ্র কাপুর এবং জয়শ্রী গুপ্ত। সুর দিয়েছেন শংকর ও জয়কিষণ। এদিনের অর্কেস্ট্রার যন্ত্রীর সংখ্যা ছিল একশোজন।

—প্রবাসী

'তরুণ অপেরা'র 'লেনিন'

যা ছিল আমাদের ধারণার বাইরে তাকে যেমন দর্শকের চোখের আলোয় বাস্তবে প্রতিভাত করে বাংলা নাটক আজ নতুনতর স্বাদ এনেছে নাট্যলোকের প্রচলিত ধারায়, ঠিক তেমনি যাত্রার আসরে আজ সোচ্চারে ধ্বনিত হোচ্ছে অত্যাধুনিক জীবন-সমস্যা ও শিল্পকলার দর্পণে নতুন তরঙ্গের জয়গান। মাঝে মাঝে এই জোয়ার নাট্য-নিরীক্ষার উচ্ছ্বসিত সীমাকেও তা ডবে যাচ্ছে বলে মনে হোচ্ছে; আর এই আবেগকে

লেনিন যাত্রাভিনয়ের দৃশ্য

আকস্মিকতার এক মুঠো ঝলক বলে এর সম্পর্কে আর বোধহয় আমরা উদাসীন থাকতে পারছি না। 'তরুণ অপেরা'র 'লেনিন' দেখতে দেখতে এই গভীরতর চিন্তাগুলোই অনুভূতি আর বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বহারাদের মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম হোতা মহামতি লেনিনের কর্মময় জীবন ও সাম্যবাদের দর্শনকে প্রাঞ্জল করে দর্শকদের উপলব্ধির স্বচ্ছলতায় যে ঢেলে দেওয়া যায়, তা কি এর আগে কেউ ভাবতে পেরেছিল?

জীবনীমূলক পালা রচনা ও তার অভিনয় দেখছি কয়েকটি বছর ধরে যাত্রার দলগুলোর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এর একটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য আছে নিশ্চয়ই। যে ইতিহাস আর সংস্কৃতির পটভূমিকায় মনীষীদের জীবন আবর্তিত হয়েছিল, তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমাদের একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এই ধরনের পালা পরিবেশনে 'তরুণ অপেরা'র নাম আগে থেকেই বেশ কিছু গভীরতায় ব্যাপ্তিলাভ করেছে। 'রাজা রামমোহন', 'হিটলার' 'তরুণ অপেরা'র নিষ্ঠা ও শিল্পচিন্তার দীপ্তিকে দ্বিধাহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'লেনিন' তাঁদের বলিষ্ঠতম সংযোজন। বিশেষ একটি মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে 'লেনিন' প্রযোজিত হয়েছে, এরকম দু' একটি অভিযোগ সংক্ষিপ্তভাবে শুনেছি। এ বিষয়ে বক্তব্য হোল সর্বহারাদের জন্য লেনিনের সংগ্রাম তা ইতিহাসের সত্য, আর এই সত্যটিকেই নাটকীয় সংঘাতে রূপ দেওয়া হয়েছে 'লেনিনে', ইতিহাসকে অবিকৃত রেখেই।

পালাকার শম্ভু বাগ 'লেনিনে' যে কাহিনীকাল এনেছেন তা খুব দীর্ঘ নয়, কিন্তু এর মধ্যে একটি বিরাট পশ্চাদপট সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরা হয়েছে। জারতন্ত্রের অবসানের পর কেরনস্কি সরকারের পতনের সময়টুকু পর্যন্তই পালাটির কাহিনীকাল হয়েছে বিস্তৃত। অথচ এই স্বল্প অবসরে শম্ভু বাগ 'লেনিনের' অপূর্ব ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ নেতৃত্ব ও সর্বহারাদের জন্য তাঁর কর্মের ধারা দক্ষতার সঙ্গে পরিস্ফুট করে তুলতে পেরেছেন। জীবনী নাটক আসরস্থ করতে গেলে যে কয়েকটি প্রত্যাশিত শর্ত আছে তাও বোধ হয় মানা হয়েছে এই পালাটিতে।

অন্যান্য পালার মতো 'তরুণ অপেরা'র 'লেনিন'ও বলিষ্ঠ ও আন্তরিক অভিনয়-গুণে রসোত্তীর্ণ হোতে পেরেছে। যে কথা সামগ্রিক অভিনয়রীতি সম্পর্কে বলা প্রয়োজন তা হোল, স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় মনের মতো কিছু উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা প্রকাশ করা। যেখানে 'মেলোড্রামা' বা অতিনাটকের প্রচুর অবকাশ ছিল, শিল্পীরা আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে সে আবেশ কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। পালাটির কয়েকটি মুখর মুহূর্ত ও কয়েকটি কোমল অনুভবের ক্ষণটুকুকে শিল্পসম্মতরূপে তুলে ধরতে নির্দেশক অমর ঘোষ যে বিস্ময়কর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তাকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। রাশিয়া তথা সারা পৃথিবীর অত্যাচারিত মানুষের নেতা লেনিনের ভূমিকায় শান্তিগোপালের অভিনয় এ বছরের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। লেনিনের সীমাহীন ব্যক্তিত্ব, সর্বহারাদের জন্য তাঁর আন্তর অনুভূতি, অতীতের জীবনকে স্মৃতির পটে কিছুক্ষণ তুলে ধরা, জনসাধারণের সামনে উদ্দীপক বক্তৃতা—সব কিছুকেই শান্তিগোপাল এমন স্বাভাবিক ছন্দে, এবং সংহত আকারে মূর্ত করে তুলতে পেরেছেন যার জন্য শিল্পী হিসাবে তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে নিতে মনে কোন দ্বিধা জাগে না। রূপসজ্জা হয়েছে নিখুঁত, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শান্তিগোপালকে দেখে মনে হয়েছে রাশিয়ার মাটিতে কর্মবীর লেনিন যেন বারবার পদক্ষেপ ফেলছেন। 'কেরনস্কি'র জটিল চরিত্রকে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দিয়ে আসরে পরিস্ফুট করে তুলেছেন অমর ভট্টাচার্য; তাঁর স্বরপ্রক্ষেপন ও বিভিন্ন ভঙ্গিমা আমাদের মাঝে মাঝে আবিষ্ট করেছে। গুণসিন্ধু মন্ডলের 'স্তেপান' একটি স্বাভাবিক ও সংযত চরিত্রচিত্রণ, - প্রসেনজিৎ সরকারের 'তেরেশেঙ্কো'ও সমগ্র প্রযোজনার একটি আকর্ষণ। অজিত দত্ত ও রজগোপাল দে সাবলীল ভঙ্গিমায় তাঁদের স্বকীয় ভূমিকাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পেরেছেন। 'নাজেদা'র ভূমিকায় পুতুল দত্ত প্রথম দৃশ্যে যেমন স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক অভিনয়রীতির নজীর রেখেছেন, পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর প্রয়াস ঠিক তেমন করে মনকে ছুঁতে পারেনি। সুদেশকুমার, বাবলু চৌধুরী, আরতি দত্ত, লিলি মন্ডল, বর্ণালী ব্যানার্জি, গোবিন্দ নাড়ু, গীতা দত্ত, সুদর্শন সেন, পঞ্চানন ব্যানার্জি।

পালাটিতে যে ক'টি গান আছে তার সুরসৃষ্টিতে হেমাঙ্গ বিশ্বাস গভীরতর শিল্পবোধের পরিচয় রেখেছেন, কিন্তু গানগুলো ঠিক সুরে, তালে ও লয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। আর গানগুলো গাওয়ার মুহূর্তগুলোও বোধ হয় সব সময়ে যথার্থ হয়ে ওঠেনি। যাই হোক্, এমন দু' একটি শৈথিল্য ছাড়া 'লেনিনে'র মধ্যে আর কিছুই নেই যা চোখ আর মনকে ক্ষণিকের জন্যও আঘাত দিতে পারে। পালার শেষে শিল্পীপরিচিতির ধারাটিও নিঃসন্দেহে অভিনব। তরুণ অপেরা জীবনীপালার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে জাতির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এই ধরনের অভিনয়ের শিক্ষার ও জানার দিক রয়েছে। সবশেষে বলবো সব রুচি ও মতের উপযোগী এমন একটি জীবননিষ্ঠ বলিষ্ঠ পালা পরিবেশন করে 'তরুণ অপেরা' যে আদর্শ ও যাত্রাশিল্পের স্বাতন্ত্র্য এনেছেন তার স্বীকৃতিস্বরূপ 'লেনিনে'র অভিনয় প্রমোদকরমুক্ত হয়েই হওয়া উচিত।

মঞ্চাভিনয়

আধুনিক সমাজ জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে রূপ দেবার প্রয়াস

নবগঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান দক্ষিণায়ন গেল ১৫ নভেম্বর বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করেছিলেন তাঁদের প্রথম নাট্য-প্রয়াস, রণজিৎ দত্ত রচিত ও পরিচালিত 'ওরা ঘুরছে'। বিংশ শতাব্দীর নাগরিক সভ্যতাপুষ্ট নরনারী জীবনকে উপভোগ করবার চেষ্টায় দিগ্বিদিকে ছুটোছুটি করে

যখন ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন তারা নিজেদেরই চারপাশে ঘুরতে থাকে অভ্যাস মতো—জীবন তাদের কাছে অর্থহীন। কারণ তারা ভুলে গেছে 'জীবনের কাছে মানুষ যত সহজ হতে পারবে, সুখ ততই তার মুঠোয় এসে ধরা দেবে।'

একটি মানসিক হাসপাতাল সরকারী ঔদাসীন্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরে সেখানে এসে ভীড় করে নাটকের চরিত্রগুলি। সভাসমাজে এরা সুস্থ বলে পরিগণিত হলেও নাট্যকারের মতে এদের সকলেরই মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। আর যে-ছেলেটি এখানে বহুদিন ধরে চিকিৎসিত হয়ে সম্প্রতি সুস্থ বলে বিবেচিত হয়েছে, সেই সরোজই যে একমাত্র সুস্থ, সহজ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, তা বুঝতে কারুরই বাকী থাকে না।

অভিনয়ে সবথেকে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সরোজেন্দ্র রায়ের ভূমিকায় রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়; নাট্যকার দর্শকসহানুভূতি তারই ওপর আরোপ করেছেন। অ্যাংরি ইয়ংম্যানের অনুচর 'পানু' জীবন্ত হয়ে উঠেছে হর্ষনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়গুণে। লালী চৌধুরী ও দোলনচাঁপা ঘটকের ভূমিকা দুটি যথাক্রমে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে অভিনীত হয়েছে যূথিকা ভট্টাচার্য ও রেবা মুখোপাধ্যায় দ্বারা। কালসাময়ী কৃষ্ণা উপাধ্যায়ের দুরূহ ভূমিকাটিকে যথাসাধ্য জীবন্ত করবার প্রয়াস পেয়েছেন রমা গুহ। দেবশঙ্কর বসুর ভূমিকায় নাট্যকার-পরিচালক রণজিৎ দত্ত চরিত্রটির একটি নিটোল রূপ দিয়ে উঠতে পারেন নি—দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে রূপটি বদলাচ্ছিল। অপরাপর ভূমিকায় ছিলেন চট্টোপাধ্যায় (সিদ্ধার্থ বসু), সদানন্দ মুখোপাধ্যায় (অ্যাংরি ইয়ংম্যান), মুকুল সরকার (কমলাক্ষ ঘটক), শিশির গাঙ্গুলী (রমেশ উপাধ্যায়), এন বসু (পুলিন পান) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য। প্রযোজনার ক্ষেত্রে আবহ-সংগীতের অবদান স্মরণীয়।

উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা 'উত্তর দরবারী' তাদের 'আগ্নেয়গিরি' নাটকের নিয়মিত অভিনয়ের আয়োজন করেছে। প্রথম পর্যায়ে আগামী ১৩, ২০, ২৭শে ডিসেম্বর '৬৯ ও ৩রা জানুয়ারী '৭০ প্রতি শনিবার বেলা ২-৩০ মিঃ বিশ্বরূপা মঞ্চে এই নাটকটি অভিনীত হবে।

জন স্টাইন বেক-এর 'দি মুন ইজ ডাউন' অনুপ্রাণিত কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন অমর গঙ্গোপাধ্যায় এবং পরিচালনা করেছেন জয়ন্ত ভট্টাচার্য। জীবনধর্মী এই নাটকটিতে রূপ দিচ্ছেন রাণু রায়, মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, অজিত দাস, দেবী চ্যাটার্জি, শ্যামল ভট্টাচার্য, দীপু চক্রবর্তী, রঞ্জন চক্রবর্তী, পরিমল রায়, তাপস বোস, কল্যাণ মিত্র, সত্য ঘোষ, চন্দন গাঙ্গুলী, শংকর বন্দোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে 'উত্তর দরবারী' ইতিমধ্যেই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এঁদের বর্তমান পরিকল্পনা সমস্ত অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী যাতে নিয়মিতভাবে তাঁদের নাট্যসম্ভার জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারেন তার জন্যে একটি স্থায়ী মুক্ত অঙ্গন মঞ্চ উত্তর কলকাতায় তৈরী করার জন্যে আন্দোলন করা। এ ব্যাপারে এঁরা সকল নাট্যসংস্থার সাহায্য কামনা করেন।

কাবেরী বসু ফটো : অমৃত

ডিসেম্বর মাসের ৯ এবং ১০ তারিখে তরুণ অপেরার শিল্পীরা কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে 'লেনিন' ও 'হিটলার' অভিনয় করবেন। আরম্ভ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। শম্ভু বাগ রচিত এই দুই নাটকের নির্দেশনায় আছেন অমর ঘোষ।

আগামী ১৩ ডিসেম্বর, '৬৯ শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় স্টার থিয়েটারে 'শর্মিলা' নাটকের দ্বিশততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র সভাপতি ও সুপরিচিতা কথাশিল্পী শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবী প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন। এ উপলক্ষে স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র নাট্যকার-পরিচালক শিল্পী ও মঞ্চের অন্যান্য কর্মীদের পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থা করেছেন।

'পথিক' গোষ্ঠীর যে নাটকটি ইতিমধ্যে শহরে গ্রামে আলোড়ন তুলেছে সেটি ম্যাক্সিম গোর্কির মা। আগামী ৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ কলকাতার ত্যাগরাজ হল-এ সন্ধ্যা ৬টায় মঞ্চস্থ করছেন সংস্থার শিল্পীসদস্যারা। এটি দক্ষিণ কলকাতায় প্রথম অভিনয়। সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 'মা' উপন্যাসের সার্থক নাট্যরূপান্তর ঘটিয়েছেন বিষ্ণু চক্রবর্তী। জ্যোতিপ্রকাশের নির্দেশনায় সংস্থার কুশলী শিল্পীবৃন্দ অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করছেন।

'রতী' সংঘের পরিচালনায় আগামী ৮ই জানুয়ারী থেকে পাঁচদিনব্যাপী একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। যোগদানের শেষ তারিখ ২০শে ডিসেম্বর। যোগাযোগ করার ঠিকানা—রতনকুমার ঘোষ, কৈলাসনগর, পোঃ বারাসত, ২৪-পরগণা।

'রূপতরঙ্গে'র পঞ্চম বার্ষিক একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী জানুয়ারী মাসে। যোগদানের শেষ তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর। যোগাযোগের ঠিকানা : ব্যানার্জিপাড়া, নৈহাটি, ২৪-পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

ত্রিবেণী টিস্যুজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান শ্রী এ. কে. সেন সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কোম্পানী কর্তৃক ১১৩৯১২০টি ইকুইটি শেয়ার বাজারে ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন। প্রতিটি দশ টাকা মূল্যের এই শেয়ার চোদ্দ টাকায় বিক্রী হবে। সাত টাকা দিতে হবে আবেদনের সঙ্গে আর বাকি সাত টাকা দিতে হবে ১৯৭০ সালের জুলাই—ডিসেম্বরের মধ্যে। এই শেয়ারের শতকরা ১০ ভাগ কোম্পানীর কর্মচারী ও ডিরেক্টরদের জন্য সংরক্ষিত।

টি। প গ্রুপের অন্যতম সংস্থা ত্রিবেণী টিস্যুজ কোম্পানী ১৯৫১ সালে কলকাতার কাছে ত্রিবেণীতে উচ্চগুণসম্পন্ন টিস্যু কাগজ, বিশেষত সিগারেট টিস্যু কাগজ উৎপাদন শুরু করে। প্রথমে দুটি মেসিন নিয়ে কাজ শুরু হয়, যার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২৮০০ টন। ১৯৬৮ সালে দিনরাত চব্বিশঘণ্টা কাজ করে উৎপাদন পৌঁছায় ৫৮০০ টন। সম্প্রতি তৃতীয় মেসিন বসানো হয়েছে। এর ফলে বার্ষিক উৎপাদন দাঁড়াবে ৮৫০০ টনে। উৎপাদনের ২০ শতাংশ রপ্তানী করা হয়।

নতুন শেয়ার বিক্রির পর কোম্পানী ঋণমুক্ত হবে এবং আরো সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। এ ছাড়া ১৯৭০ সালে বর্ধিত আদায়ীকৃত মূলধনের উপর ১৫ শতাংশ দেওয়ার আশা রাখেন কোম্পানী কর্তৃপক্ষ।

গত ১৬ নভেম্বর, রবিবার সন্ধ্যায় চেৎলাইতে 'ল্যাডকো জুট কোং লিঃ'-এর স্টাফ মেম্বার ও তাঁদের পরিবারবর্গ শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌল্লা' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। বিভিন্ন চরিত্রে মমতা বসু, কেয়া ভৌমিক, সন্ধ্যা চক্রবর্তী, বিরাজ বসু, প্রাণবেশ ঘোষ, সন্তোষ ঘোষদস্তিদার, জ্যোতি ভৌমিক তাঁদের অভিনয়ে দর্শকদের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেন। অন্যান্য চরিত্রে কল্যাণ সেনগুপ্ত, সুবোধ ঘোষ, অজিত সেন, কামাক্ষ্যা মিশ্র এ ভট্টাচার্য, নির্মল গাঙ্গুলী, মুক্তি চ্যাটার্জি, কৃষ্ণ ঝা ও নরেশ সাহা মোটামুটি অভিনয় করেন।

ঝঙ্কারের অধিবেশন

আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস হলে ঝঙ্কারের এক অধিবেশনে বোম্বাই-এর শিল্পী সায়হাদ সাথের এক একক কণ্ঠ-সংগীতের আসর পরিবেশিত হয়। শ্রীসায়হাদ সাথে গোয়ালিয়র ঘরাণার শিল্পী। স্বর্গত ডি ভি পালুসকার এবং পণ্ডিত দেওধরজীর কাছে ইনি সংগীতশিক্ষার তালিম গ্রহণ করেন। প্রথমে 'ইমনকল্যাণ' রাগ পরে টপ্পা ভজন এবং পরিশেষে 'বাহার' রাগে ইনি খেয়াল গেয়ে শোনান। উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষার ফলশ্রুতি এঁর পরিশুদ্ধ রাগ বিশ্লেষণ এবং তানের কৌশল। কিন্তু নিজস্ব কোন সংগীতচিন্তার ছাপ না থাকায় এঁর অনুষ্ঠান মনে কোন দাগ কাটেনি। ছন্দ এবং লয়ে দক্ষতা থাকলেও সুরের অভাবে প্রথম খেয়ালটি তেমন শ্রীমণ্ডিত হয়নি। তুলনা-মূলক বিচারে টপ্পা এবং ভজন উপভোগ্য হয়। বিশেষ করে ভজনে পালুসকারের প্রভাব সুপরিলক্ষিত। 'বাহার' রাগে পরিবেশনা প্রাণবন্ত। এঁর সঙ্গে সারেঙ্গী সংগত করেন বাচ্চালাল মিশ্র। তবলায় ছিলেন আনন্দ বোজাস।

নৃত্যাঙ্গনা'র চিত্রাঙ্গদা

কবিগুরুর 'চিত্রাঙ্গদা'-র গীতিকাব্য-ধর্মী সৌন্দর্য ও ভাবভাব রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহের এক অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্যে তুলে ধরেন 'নৃত্যাঙ্গনা' প্রতিষ্ঠানের শিল্পীবৃন্দ। 'নৃত্যাঙ্গনা'র সভ্যরা সকলেই রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। হয়ত বা সেইজন্যই এঁদের পরিবেশনাশৈলীতে রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনার যথার্থ ছবিটি অবিকৃতরূপে পাওয়া গেল।

যৌবনের চিত্তবিভ্রান্তকারী রূপের আয়ু ক্ষণস্থায়ী। কবির ভাষায় 'ঋতুরাজ বসন্তের কাছে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ-বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য।' রূপের ঊর্ধ্বে ব্যক্তিত্বের অমোঘ শক্তির দানই প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, 'যুগলজীবনের জয়যাত্রার সহায়।' নৃত্যাঙ্গনার সকল শিল্পীই নৃত্য ও সংগীতে তাঁদের উচ্চমান বজায় রাখলেও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন অর্জুনরূপী শান্তি বসু। সুন্দরী এবং কুরূপা চিত্রাঙ্গদার নৃত্যাভিনয়ে ছিলেন যথাক্রমে জয়শ্রী লাহিড়ী ও সুনন্দা সেনগুপ্ত।

অর্জুনের রূপ ও পৌরুষের আকর্ষণে 'বীরাঙ্গনা' চিত্রাঙ্গদার অন্তরে সুপ্ত নারীত্বের জাগরণ ও অর্জুনের চিত্তজয়ের দুরন্ত বাসনার গাম্ভীর্য ও উজ্জ্বলতা সমান দক্ষতায় পরিস্ফুট করেছেন সুনন্দা সেনগুপ্ত। আবার দুরন্ত কামনায় উন্মাদনা, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও চাপা উদ্বেগের এক বিশ্বাসযোগ্য রূপ মেলে ধরেছেন জয়শ্রী লাহিড়ী। মদনরূপী ধূর্জটিপ্রসাদকে চমৎকার মানিয়েছে। প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পী শান্তি বসুর নৃত্যপরিচালনায় কেরালা ও মণিপুরের বিভিন্নপ্রকার লোকনৃত্যের সমন্বয়ে বীর, মধুর ও অন্যান্য সঞ্চারী ভাবের নাটকীয় প্রকাশ চিত্তগ্রাহী হতে পেরেছে। সংগীতে চিত্রাঙ্গদার গানে সুচিত্রা মিত্র-র যোগ্যতার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অর্জুনের গানে ধীরেন বসু তাঁর ক্রমাগ্রসারী সাফল্যের উজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছেন। মদনের ভূমিকায় অর্ঘ্য সেনের গান সুশ্রাব্য। তবে উচ্চারণ আরো পরিশীলনের অপেক্ষা রাখে। সমবেত সংগীতগুলি স্বরসংগতি রাখতে না পারায় নিষ্প্রাণ। অনেকসময় হাস্যকর এ ত্রুটি সংগীতপরিচালকদের। কনিষ্ক সেনের আলোকপাত তাঁর সুনামকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। আবহসংগীতে দীনেশচন্দ্রর শিল্পীমনের পরিচয় ছিল। অনুষ্ঠান শুরু হয় দেবব্রত বিশ্বাসের কয়েকটি সুনির্বাচিত রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর

গত ১৫ নভেম্বর গাঙ্গুলী কলেজ অফ মিউজিকের বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে সারারাত্রিব্যাপী উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর স্থানীয় প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের এক সুন্দর মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। তরুণ শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন শ্যাম গাঙ্গুলীর কন্যা শ্রী গাঙ্গুলী। ইনি 'মালকোষ' রাগে সরোদ বাজিয়ে শোনাচ্ছেন। রাগবিস্তারে রেওয়াজ ও শিক্ষার ছাপ অনস্বীকার্য। শ্রাবণী গঙ্গোপাধ্যায় ও গোপা মিত্র জিলা কাফি ও দেশ রাগে সেতার বাজালেন। মণিলাল নাগ আপন বৈশিষ্ট্যে জমিয়ে তুলেছিলেন হেমললিত। বিশেষ অনুরোধে ইনি একটি ধুন বাজিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। কণ্ঠ-সংগীতের আকর্ষণীয় শিল্পী ছিলেন কানন-দম্পতি। মালবিকা কানন ছায়ানট ও ঠুংরী এবং এ কানন 'আহীর ভৈঁরো' রাগ পরিবেশন করে শ্রোতাদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। কথক নৃত্যে বন্দনা সেনের নৃত্য প্রশংসনীয়। সর্বশেষ অনুষ্ঠানে হীরেন্দ্র-কুমার গাঙ্গুলীর তবলাসংগতে সরোদ বাজিয়ে শোনান বাংলার সুবিখ্যাত সরোদী শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়। রাগ 'কোমি ভৈরব'। দুই প্রবীণ শিল্পীর পরিণত সংগীতবোধ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিবেশনায় প্রতিটি অঙ্গই মন দিয়ে শোনবার মত। অন্যান্য সংগীতয়াদের মধ্যে ছিলেন নানকু মহারাজ, জামন খাঁ, বাচ্চালাল মিশ্র, শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়, সুখেন্দু কর্মকার এবং আফাক হোসেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে ডাঃ রমা চৌধুরী এবং শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু পরিচালনা করেন বরেন গঙ্গোপাধ্যায়।

ধ্রুপদের আলোচনা সভা

যদু ভট্ট সংগীত সমাজের পক্ষ থেকে ৮৮।২ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটে উদাহরণসহ ধ্রুপদী গানের এক মনোজ্ঞ সভায় শিক্ষণীয় বহু বিষয় জানা গেল।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য। মঙ্গলাচরণের পর অন্যতম উদ্যোক্তা শ্রীকৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে বলেন, বাংলাদেশ ছিল ধ্রুপদী সংগীতের এক উজ্জ্বল কেন্দ্রস্বরূপ। এখন তার একান্ত অভাব চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পীড়িত করে। এই প্রসঙ্গে তিনি সদারং সংগীত সমাজে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের ধ্রুপদ সম্বন্ধে সুচিন্তিত এবং সময়োচিত উক্তির উল্লেখ করেন। সংগীতাচার্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ঠসঙ্গীতে 'বাগেশ্রী' রাগের আলাপ, ধ্রুপদ ও ধামারে সুগভীর পাণ্ডিত্য ও জীবনব্যাপী অনুশীলনীর এক উজ্জ্বল নিদর্শন পেশ করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'দো পিয়া বিনা' ইত্যাদি পদের ঝাঁপতালের গান। এসব গান আজকাল শোনাই যায় না। এই প্রসঙ্গে সত্যকিংকরবাবু বলেন, বিষ্ণুপুরের বহু অমূল্য বস্তু তাঁর কাছে সঞ্চিত আছে। প্রয়োজন হলে বিনা পারিশ্রমিকে এইসব খেয়াল টপ্পা, ভজন ও বাংলা খেয়াল তিনি গেয়ে থাকেন এবং সেতার ও সুরবাহারে বাজান। যেসব পশ্চিমগত শিল্পী বিষ্ণুপুরের সংগীতকে সাদামাটা এবং সাধারণ বলে অবজ্ঞা করেন তাঁদের সামনে সত্যকিংকরবাবু চ্যালেঞ্জ দিতে প্রস্তুত। প্রাচীন ঐতিহ্য সসম্মানে রক্ষিত হওয়া উচিত। অধুনা উপেক্ষিত পুরনো বহু রাগের অধিকাংশেরই ১৫।২০টি করে তিনি গাইতে পারেন এবং উদাহরণস্বরূপে ধ্রুপদ, ধামার, সাদরা ও খেয়াল প্রভৃতির ২০টি গান গেয়ে শোনান। তিনি আরো বলেন ধ্রুপদ গাইলেই খেয়ালের গলা খারাপ হয়ে যায় একথা যে কতবড় অলৌকিক 'রাধিকা-প্রসাদ গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ রাও তার প্রমাণ। পশ্চিম ভারতেও বড়ে মোহাম্মদ খাঁ, ধ্রুপদ খেয়াল উভয় সংগীতেই শীর্ষস্থানীয় ছিলেন।

সংগীতশাস্ত্রী বীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী রবাবে 'দেশ' রাগ বাজিয়ে শোনালেন এবং রবাবের উৎপত্তি ও ব্যবহার প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়েও দিলেন। ভারতীয় রবাবে ধ্রুপদের অনুশীলনী চলে, এবং আলাপ পদ্ধতিতেও এর ব্যবহার যথেষ্ট। বর্তমানে রবাব কেউ-ই প্রায় বাজান না। এসব যন্ত্রে অতীতের ইতিহাস-রক্ষায় প্রয়োজনেও প্রচলিত থাকা প্রয়োজন।

—চিত্রাঙ্গদা

ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যানের স্কোর বোর্ড : এই স্কোর বোর্ডই আগামী ১২ই ডিসেম্বর থেকে ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে দর্শকদের মনে উৎসাহ, উদ্দীপনা, উত্তেজনা এবং হতাশা সৃষ্টি করবে।

খেলাধূলা

দর্শক

ইডেনে টেস্ট ক্রিকেট

কলকাতার ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আগামী ১২ই ডিসেম্বর থেকে ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট খেলা শুরু হবে। এই ইডেন উদ্যানে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসর প্রথম বসে ১৯৩৪ সালের ৫ই জানুয়ারী, ইংল্যান্ড বনাম ভারতবর্ষের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা উপলক্ষে। সে এক যুগ আগের কথা। ইডেন উদ্যানের ঝাউগাছ পরিবেষ্টিত ছায়া-শীতল মায়াবী পরিবেশ রঞ্জি স্টেডিয়াম তৈরীর সময় থেকেই অদৃশ্য হয়েছে। বিদেশী ক্রিকেট খেলোয়াড়রা ইডেনের এই পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন।

ইডেন উদ্যানে ভারতবর্ষ এ পর্যন্ত পাঁচটি দেশের বিপক্ষে মোট ১৪টি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছে—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪টি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩টি, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩টি, পাকিস্তানের বিপক্ষে ২টি এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২টি। এই ১৪টি টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষের জয় ১, পরাজয় ৩ এবং খেলা ড্র ১০। **ভারতবর্ষের জয় : ১৮৭ রানে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৬১-৬২ সালের চতুর্থ টেস্ট খেলায়। ভারতবর্ষের পরাজয় : ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ২ বার—** ১৯৫৮-৫৯ সালে এক ইনিংস ও ৩৩৬ রানে এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে এক ইনিংস ও ৪৫ রানে। এবং অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১৯৫৬-৫৭ সালে ৯৪ রানে।

ইডেনের টেস্ট রেকর্ড

ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত ১৪টি টেস্ট খেলার উল্লেখযোগ্য রেকর্ড :

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রান

ভারতবর্ষের পক্ষে : ৪৩৮ (৭ উইকেটে ডিক্লেঃ), বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, ১৯৫৫-৫৬

ভারতবর্ষের বিপক্ষে : ৬১৪ (৫ উইকেটে ডিক্লেঃ)—ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৫৮-৫৯।

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

ভারতবর্ষের পক্ষে : ১২৪ রান, বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৫৮-৫৯

ভারতবর্ষের বিপক্ষে : ১৭৪ রান—অস্ট্রেলিয়া, ১৯৬৪।

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষের পক্ষে : ১৫৩ রান—পতৌদি, বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, ১৯৬৫

ভারতবর্ষের বিপক্ষে : ২৫৬ রান—রোহন কানহাই (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), ১৯৫৮-৫৯

সেঞ্চুরী

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্ববিশ্রুত খেলোয়াড় এভার্টন উইকস প্রথম ইনিংসে যে ১৬২ রান করেন, ইডেন উদ্যানে তাই প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী। ভারতবর্ষের পক্ষে এখানে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী (১০৬ রান) করেন মুস্তাক আলী (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৪৮-৪৯)। **ইডেনের টেস্ট খেলায় এপর্যন্ত ১৮টি সেঞ্চুরী হয়েছে—ভারতবর্ষের পক্ষে ৭টি**

তৃতীয় টেস্টে ভারত জয়ী

দিল্লীর তৃতীয় টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ ৭ উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে বর্তমানে খেলার ফলাফল সমান করেছে—উভয় দেশই একটি করে খেলায় জয়ী এবং একটি খেলা ড্র। তৃতীয় টেস্ট খেলাটি চতুর্থ দিনে চা-পানের পূর্বে মুহূর্তে শেষ হয়।

স্কোর বোর্ড

অস্ট্রেলিয়া : ১ম ইনিংস : ২৯৬

(স্ট্যাকপোল ৬১, চ্যাপেল ১৩৮, টাবর ৪৬। বেদী ৭১ রানে ৪, প্রসন্ন ১১১ রানে ৪ উইঃ)।

ভারত : ১ম ইনিংস : ২২৩

(মানকাদ ৯৭, ইঞ্জিনীয়ার ৩৮, ম্যালেট ৬৪ রানে ৬)।

অস্ট্রেলিয়া : ২য় ইনিংস : ১০৭

(লরি ৪৯ অপরাজিত। বেদী ৩৭ রানে ৫, প্রসন্ন ৪২ রানে ৫ উইঃ)।

ভারত : ২য় ইনিংস

ইঞ্জিনীয়ার ক ম্যাকেঞ্জি ব ম্যালেট	৬
মানকাদ ব ম্যালেট	৭
বেদী ব কনোলি	২০
ওয়াদেকার অপরাজিত	৯১
বিশ্বনাথ অপরাজিত	৪৪
অতিরিক্ত	১৩
মোট :	৩ উইঃ ১৮১

উইকেট পতন : ১।১৩, ২।১৮, ৩।৬১। **বোলিং** : ম্যাকেঞ্জি ১৪।৫।২১।০; কনোলি ১৬।৫।৩৩।১; ম্যালেট ২৯।১০।৬০।২; গ্লিসন ১২।৫।২৪।০; চ্যাপেল ১।০।১৭।০; স্ট্যাকপোল ৮।৪।১৩।০।

বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড ৩টি, ইংল্যান্ড ২টি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১টি এবং পাকিস্তান ১টি) এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১১টি (ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৬, নিউজিল্যান্ড ৩, ইংল্যান্ড ১ এবং অস্ট্রেলিয়া ১)।

ইডেনের টেস্ট খেলায় একমাত্র ওয়েস্ট ইন্ডিজের এভার্টন উইকস ২টি সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেছেন। বাঙালী খেলোয়াড়দের মধ্যে ইডেনে টেস্ট সেঞ্চুরী করেছেন একমাত্র পংকজ রায় (১০০ রান, বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, ১৯৫৫-৫৬)।

উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

১৬২ ও ১০১ : এভার্টন উইকস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), ১৯৪৮-৪৯

দ্রষ্টব্য : কলকাতা মাঠে ভারতবর্ষের অপর কোন স্থানে টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরীর নজির নেই।

এক ইনিংসে ৩টি সেঞ্চুরী
(একদলের পক্ষে)

১৯৫৮-৫৯ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসের ৬১৪ রানের (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) মধ্যে এই তিনজন সেঞ্চুরী করেন কানহাই (২৫৬ রান) বুচার (১০৩ রান) এবং সোবার্স (নট আউট ১০৬ রান)।

ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়া

ইডেন উদ্যানে এপর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতবর্ষ যে তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে তার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ১ (১৯৫৬-৫৭ সালে ৯৪ রানে) এবং খেলা ড্র ২। ইডেন উদ্যানে ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলায় উল্লেখযোগ্য খবর :

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রান
(পুরো ইনিংসের খেলায়)

ভারতবর্ষ : ৩৩৯ রান, ১৯৫৯-৬০
অস্ট্রেলিয়া : ৩৩১ রান, ১৯৫৯-৬০

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

অস্ট্রেলিয়া : ১৭৪ রান, ১৯৬৫
ভারতবর্ষ : ১৩৬ ও ১৩৬ রান, ১৯৫৭

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

অস্ট্রেলিয়া : ১১৩ রান—নর্মান ওনীল, ১৯৫৯-৬০
ভারতবর্ষ : ৭৪ রান—এম এল জয়সীমা ১৯৫৯-৬০

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

ভারতবর্ষ : ৭টি (৪৯ রানে)—গোলাম আমেদ, ১৯৫৬-৫৭
অস্ট্রেলিয়া : ৬টি (৫২ রানে)—রিচি বেনো, ১৯৫৬-৫৭

একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট

অস্ট্রেলিয়া : ১১টি (১০৫ রানে)—রিচি বেনো, ১৯৫৬-৫৭
ভারতবর্ষ : ১০টি (১৩০ রানে)—গোলাম আমেদ, ১৯৫৬-৫৭

সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া : ১ : ভারতবর্ষ ০।

অস্ট্রেলিয়া বনাম উত্তরাঞ্চল

অস্ট্রেলিয়া : ৩৩৫ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। চ্যাপেল ১৬৪, সিহান নট-আউট ৫৪ এবং টাবের ৪৩ রান। চক্রবর্তী ৯০ রানে ২ এবং অমরনাথ ৯৮ রানে ২ উইকেট)।

ও **১২৬ রান** (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। টাবের ৫৩ রান। গানধোত্রা ১১ রানে ৩ উইকেট)

উত্তরাঞ্চল : ২৬১ রান (অমরনাথ ৬৮, হায়দার আলি ৫৪ এবং লাম্বা ৪৪ রান। ফ্রিম্যান ৬৩ রানে ৬ উইকেট)

ও ৭০ রান (২ উইকেটে। লাম্বা নটআউট ৩৭ রান)

জলন্ধরের বার্লটন পার্কে আয়োজিত অস্ট্রেলিয়ান বনাম উত্তরাঞ্চল দলের তিন-দিনের খেলাটি অমীমাংসিত থেকে গেছে। বিল লরীর বদলে অস্ট্রেলিয়ান দলের নেতৃত্ব করেন আয়ান চ্যাপেল। অপরদিকে উত্তরাঞ্চল দল পরিচালনা করেন বিষেণ সিং বেদী।

প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ান দল প্রথম ইনিংসের ৬ উইকেটের বিনিময়ে ৩৩৫ রান সংগ্রহ করে। অধিনায়ক চ্যাপেল তাঁর ১৬৪ রানে ২২টি বাউণ্ডারী এবং ৪টি ওভারবাউণ্ডারী করেন।

দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে টেয়াস এবং চ্যাপেল ১২৯ রান এবং ৩য় উইকেটের জুটিতে আর্ভিন এবং চ্যাপেল দলের ১০৫ রান তুলে দেন। একসময় অস্ট্রেলিয়ান দলের তিনটে উইকেট অল্প রানের ব্যবধানে পড়ে যায়। যেখানে খেলার একসময় ৩টি উইকেট পড়ে তাদের ২০৩ রান ছিল, সেখানে দেখা গেল তাদের ৬ষ্ঠ উইকেট পড়লো ২৭১ রানের মাথায়। প্রথম দিনের খেলায় সিহান ৫৪ রান এবং তাঁন ২১ রান করে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ান দল আর প্রথম ইনিংস খেলতে নামেনি, পূর্ব দিনের সঞ্চিত ৩৩৫ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। উত্তরাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস দ্বিতীয় দিনেই ২৬১ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ৭৪ রানে অগ্রগামী হয়। উত্তরাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংসের খেলার গোড়াপত্তন মোটেই ভাল হয়নি। শেষপর্যন্ত দলের তিন তরুণ খেলোয়াড়—মহিন্দর অমরনাথ (৬৮ রান), হায়দার আলী (৫৪ রান) এবং বিনয় লাম্বা (৪৪ রান) অস্ট্রেলিয়ার বাঘা বোলার ম্যাকেঞ্জী, ফ্রিম্যান এবং কিলসনের বোলিংয়ের কোনরকম তোয়াক্কা না করে দলকে সংকট থেকে উদ্ধার করেন। উত্তরাঞ্চল দলের ৭৬ রানের মাথায় ৪র্থ এবং ১০৪ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। চা-পানের সময় [illegible] ৭ম উইকেটে)।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ান দল ১১৫ মিনিট ব্যাট করেছিল। তারা দ্বিতীয় ইনিংসের ৭ উইকেটের বিনিময়ে ১২৬ রান সংগ্রহ করে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার চূড়ান্ত মীমাংসার দিকে অস্ট্রেলিয়ান দলের কোন আগ্রহই ছিল না। খেলার বাকি ১২০ মিনিটে ২০১ রান সংগ্রহ করে খেলায় জয়লাভ করা উত্তরাঞ্চল দলের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব ছিল না। উত্তরাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ৭০ রানের (২ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়ান দলের ১৯৬৯ সালের ভারত সফরে এইটি ছিল তৃতীয় অমীমাংসিত খেলা।

পরলোকে প্রণব বসু

বাংলার প্রাক্তন ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ান প্রণব বসু আকস্মিকভাবে তাঁর ৪৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে তিনি একবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কিছুদিন হাসপাতালে ছিলেন। মৃত্যুর দিনে তিনি স্বাভাবিকভাবেই কাজকর্ম করে রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় দেহত্যাগ করেন।

শ্রীবসু উপর্যুপরি পাঁচবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন এবং জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় তিনি পর পর দু'বছর পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পান। তিনি পশ্চিম বাংলার ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের যুগ্ম-সম্পাদক এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের কর্মী হিসাবে বি এন আর রিক্রিয়েশন ক্লাবের সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

দাবার আসর

অপোজিশন বা বিপরীত অবস্থান

ছকে ঘুঁটি যখন বেশ কমে গেছে, তখন রাজা স্বচ্ছন্দে তার দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে খেলতে পারে। শুধু তাই নয়, অন্ত-খেলায় রাজার চাল এবং অবস্থানের ওপর খেলার অনেক কিছু নির্ভর করে। ছকে যখন শুধু কয়েকটি বড়ে এবং রাজা ছাড়া আর কিছু নেই, তখন ঠিকমত রাজার চাল দিয়ে বিপক্ষের বড়েকে মেরে নেয়া যাবে কি না, স্বপক্ষের বড়েকে বাঁচানো যাবে কি না, কিভাবে রাজার সাহায্য নিয়ে বড়েকে অষ্টম ঘরে নিয়ে গিয়ে মন্ত্রীতে রূপান্তরিত করা যায়, এসবই জানতে হবে। এই জন্যে অন্তখেলায় রাজার চালের হিসেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দুটি রাজা যখন মুখোমুখি—অর্থাৎ মাত্র ১ ঘর তফাতে অবস্থান করে, তখন এক রাজার অগ্রগমন অন্য রাজা দিয়ে রুদ্ধ হয়ে গেল। এই অবস্থাকে বলে 'অপো-জিশন' বা রাজার 'বিপরীত অবস্থান'। অপোজিশন রয়েছে এমন অবস্থায় কোন পক্ষকে যদি রাজার চাল দিতেই হয়, তাহলে সে পক্ষ অপোজিশন হারাচ্ছে, কারণ এক-বার রাজা সরলে বিপক্ষের রাজার অগ্রগমন আর রোধ করা যাবে না। যে পক্ষকে রাজার চাল দিতে হচ্ছে না, সে পক্ষ অপোজিশন রাখতে পারছে, অর্থাৎ বিপক্ষ রাজার অগ্র-গমন রুখতে পারছে। অপোজিশন হারালে অনেক সময়ই খেলায়ও হার হয়ে যায়।

অপোজিশন মূলতঃ দু'রকমের হতে পারে :— 'ডিরেক্ট' এবং 'ডায়াগোনাল' অপোজিশন। এ ছাড়াও, রাজা যখন পরস্পর থেকে দূরে রয়েছে, তখন তাদের মধ্যে 'ডিসট্যান্ট' এবং 'অবলিক্' (তীর্যক) অপোজিশন থাকতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডিসট্যান্ট এবং অবলিক্ অপো-জিশন থেকে ডিরেক্ট কিংবা ডায়াগোনাল অপোজিশনই আসবে।

ডিরেক্ট অপোজিশন :—

চিত্রে সাদা রাজা মন্ত্রীগজ ২ ঘরে এবং কালো রাজা মন্ত্রীগজ ৫ ঘরে রয়েছে। এই দুই রাজার মধ্যে যে অপোজিশন রয়েছে, তা হচ্ছে 'ডিরেক্ট' বা সরাসরি অপোজিশন। যে রাজার চাল হবে, সে রাজা কিছুতেই অন্য রাজাকে এড়িয়ে এক ধাপ এগিয়ে বসতে পারে না, অর্থাৎ তার অগ্রগমন রুদ্ধ।

ধরা যাক এখন সাদার চাল। তাহলে কালো ইচ্ছে করলেই সাদা রাজার এগুনো বন্ধ করে দিতে পারে। যেমন :—(১) রাজা-মন্ত্রী ২ : রাজা-মন্ত্রী ৫ (২) রাজা-রাজা ২ : রাজা-রাজা ৫। কালো সাদাকে সরাসরি বাঁধা দিচ্ছে। সাদা দ্বিতীয় র‍্যাঙ্ক থেকে আর তৃতীয় র‍্যাঙ্কে উঠতে পারছে না। সেই রকম, কালোর প্রথম চাল হলে কালো রাজাও পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ র‍্যাংকে আসতে পারবে না। যেমন (১).....রাজা-মন্ত্রী ৫ (২) রাজা-মন্ত্রী : রাজা-রাজা ৫ (৩) রাজা-রাজা ২ ইত্যাদি।

যে পক্ষ অপোজিশন হারায়, সে পক্ষ যে শুধু নিজে এগোতে পারে না তা নয়, সে পক্ষ বিপক্ষের এগুনো বন্ধ করতে পারে না। চিত্রে যে ডিরেক্ট অপোজিশন দেখানো হয়েছে, সেখান থেকে কালোর চাল হলে সাদা রাজা যে কোন প্রান্তিক ফাইলে বা র‍্যাংকে, কিংবা যে কোন কোণের দিকে যেতে পারবে, কালো তা আটকাতে পারবে না। কি ভাবে, তা দেখে নিন।

(১) রাজা-মন্ত্রী ৫ (কালো রাজা প্রথম চালে ঘোড়া ৫ ঘরে গেলে সাদা রাজা মন্ত্রী ৩ ঘর দিয়ে বেরিয়ে যেত।)

(২) রাজা-ঘোড়া ৩ : রাজা-গজ ৪ (৩) রাজা-নৌকা ৪ : রাজা-ঘোড়া ৩ (৪) রাজা-ঘোড়া ৪। সাদা আরেকবার অপো-জিশন নিয়ে নিল, ফলে কালো সাদাকে আবার পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য।
(৪)...রাজা-গজ ৩ (৫) রাজা-নৌকা ৫ : রাজা-ঘোড়া ২ (৬) রাজা-ঘোড়া ৫ : রাজা-গজ ২ (৭) রাজা-নৌকা ৬ : রাজা-ঘোড়া ১ (৮) রাজাঘোড়া-৬।

কালো রাজা তার মন্ত্রীনোকা ১ অথবা মন্ত্রীগজ ১ ঘরে সাদা রাজাকে বসতে নাও দিতে পারে, কিন্ত সাদা রাজাকে অষ্টম র‍্যাঙ্কে এসে পেঁছানোয় বাঁধা দিতে পারে না। (৮) রাজা-নৌকা ১ (৯) রাজা-গজ ৭ : রাজা-নৌকা ২ (১০) রাজা-গজ ৮ অথবা (৮)...রাজা-গজ ১ (৯) রাজা-নৌকা ৭ : রাজা-গজ ২ (১০) রাজা-নৌকা ৮।
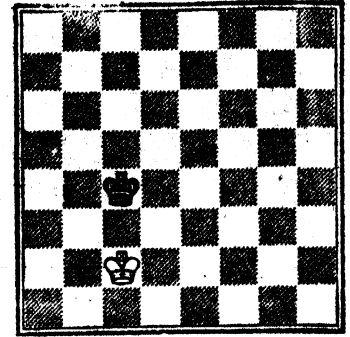
কালো মন্ত্রী নৌকা ১ অথবা মন্ত্রীগজ ১ যে কোন ১টি ঘরকে সাদা রাজার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু ২টি ঘর-কেই বাঁচাতে পারে না।

কিন্তু মনে রাখবেন, উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কখনো অপোজিশন ছাড়তে নেই। যেমন, কালো প্রথম চালে মন্ত্রীগজ ৪ ঘরে গেলে, সাদাকে অপোজিশন ধরে রেখে প্রথম চালে মন্ত্রীগজ ৩ ঘরে উঠে বসতে হোত। অন্য কোন চাল দিলেই সাদাকে অপোজিশন হারাতে হবে।

সাদাকে যদি রাজার দিক দিয়ে অষ্টম র‍্যাংকে পেঁছাতে হয়, তাও সম্ভব হবে। তবে এ করতে গেলে প্রথমে সাদাকে অপো-জিশন ধরে রেখে দ্বিতীয় র‍্যাংক ধরে চলতে হবে।

(১).....রাজা-মন্ত্রী ৫ (২) রাজা-মন্ত্রী ২। সাদা প্রথমেই ঘোড়া ৩ ঘরে গেলে কালোরাজা মন্ত্রী ৬ ঘরে বসে যাবে অপো-জিশন নিয়ে, এবং তাহলে সাদা শুধু মন্ত্রী-নৌকা ৮ কিংবা মন্ত্রীঘোড়া ৮ ঘরে পেঁছাতে পারে।

(২)...রাজা-রাজা ৫ (৩) রাজা-রাজা ২ : রাজা-গজ ৫ (৪) রাজা-গজ ২ : রাজা-ঘোড়া ৫ (৫) রাজা-ঘোড়া ২ এবং এখন কালো (৫)...রাজা-গজ ৫ চাল দিলে (৬) রাজা-নৌকা ৩ অথবা (৫)...রাজা-নৌকা ৫ চাল দিলে (৬) রাজা-গজ ৩ এবং এইবার সাদা রাজা ফাইল ধরে এগিয়ে যাবে।

এইভাবে সাদা রাজা ছকের যে কোন দিকেই যেতে পারে, যদিও বিশেষ কোন ঘরে ইচ্ছে করলেই বসতে পারে না। চিত্রের অবস্থা থেকে সাদার চাল হলে কালোও এইভাবে ছকের যে কোন দিকে যেতে পারে।

ডিরেক্ট এবং ডায়াগোনাল অপোজিশন নিয়ে আমরা পরে আরো আলোচনা করব।

—গজানন্দ বোড়ে

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১৯শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩১শ সংখ্যা
মূল্য
১ টাকা

Friday 12th Dec. 1969 শুক্রবার, ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ Re. 1-00

সূচীপত্র

ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যা, ১৩৭৬

প্রচ্ছদ : শ্রীতুষার সান্যাল

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মিহিজামের স্বনামধন্য ডাঃ পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহান্ আদর্শে এবং আদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা কলিকাতায় একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করিয়াছি — যেখানে তাঁহার মহাগুণসম্পন্ন ঔষধসকল সেই প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বনে তৈয়ারী করিতেছি। তাঁহার বিখ্যাত চিকিৎসা ধারায় লিখিত পুস্তক "আধুনিক চিকিৎসা" একমাত্র আমাদের চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয়ে এবং অফিসেই পাওয়া যায়।

পিতার স্নেহাশীর্ব্বাদ আমাদের পাথেয়

আধুনিক চিকিৎসা

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখিত পারিবারিক চিকিৎসার
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সহজ বই

৩৬বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড
ফোন : ৪৭-৫০৮১

ডাঃ প্রশান্ত ব্যানার্জ্জী
১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড
ফোন : ৪৭-২০১৮
৪৭-৭১২৯

ডাঃ প্রণব ব্যানার্জ্জী
৫৩, গ্রে ষ্ট্রীট
ফোন : ৫৫-৪২২৯

ক্রীড়া ও বিনোদনসংখ্যা ॥ ১৩৭৬

আমাদের জীবনে সমস্যার অন্ত নেই। মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য চলছে প্রচেষ্টা। এরই মধ্যে আমাদের সময় করে নিতে হয় জীবনের সাংস্কৃতিক বিকাশের, সামগ্রিক আনন্দের। খেলাধূলো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সে কারণেই আজকের যুগে কর্মচঞ্চল মানুষের জীবনে এমন অপরিহার্য। তরুণদের আকর্ষণ খেলাধূলোর প্রতি গড়ে তোলবার দায়িত্ব সমাজের। অধ্যয়ন-অনুশীলনে হয় তাদের চিত্তবৃত্তির বিকাশ। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তারা পায় শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের ও কুশলতা প্রকাশের সুযোগ। সেই কারণেই আজ সকল উন্নত দেশে স্পোর্টসের এত কদর। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সমাজের তরুণেরা শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা এবং যৌথ প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হয়। স্কুলে যতটুকু শিক্ষা স্কুলের বাইরে খেলার মাঠে সে শিক্ষার প্রসার জীবন সম্পর্কে তরুণদের আত্মনিষ্ঠ করে তোলে।

কলকাতায় এবারকার বৃহৎ আকর্ষণ অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতের ক্রিকেট টেস্ট খেলা। কলকাতার মানুষ ক্রিকেট ও ফুটবলের অনুরাগীরূপে খেলার জগতে স্বীকৃতি পেয়েছে। দিল্লীর টেস্টে ভারতের আকর্ষণীয় খেলা ও বিজয়লাভের পর কলকাতার ইডেন উদ্যানে চাঞ্চল্যকর ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্য ক্রিকেট অনুরাগী বাংলার মানুষ সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। ইডেন ভারতের খেলোয়াড়দের চিত্তাকর্ষক ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখবার জন্য অপেক্ষমান। তাঁদের জয় কামনা করি আমরা।

এই মরশুমে কলকাতায় এবং বাংলাদেশে বহুবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন শুরু হয়েছে। যাত্রা, থিয়েটার, চিত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলার শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য সর্বজনস্বীকৃত। নতুন চিন্তার অগ্রদূতরূপে বাংলাদেশ চিরকাল ভারত সংস্কৃতির পরিপোষক। শুধু চিত্তবিনোদনই এর উদ্দেশ্য নয়। সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনার প্রতিফলনে এই অনুষ্ঠানসমূহে বাংলার প্রতিভারও দর্পণ হিসেবে গণ্য হবে। দেশবিদেশ থেকে নানা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলও এ সময়ে আসবেন কলকাতায়। তাঁদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের মাধ্যমে মানবজাতির অগ্রযাত্রার পরিচয় লাভ এবং আন্তর্জাতিক প্রীতি ও মৈত্রীস্থাপনের পথ হবে সুগম।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা অমৃতের ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যার আয়োজন করেছি। বাংলা সংস্কৃতির অনুরাগী ও ক্রীড়ানুরাগীদের কাছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ক্রীড়ানুশীলনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার এই প্রচেষ্টা আশা করি পাঠক-পাঠিকাদের আনন্দ দিতে সমর্থ হবে।

সুকুমার সেন

(১)

সেকাল মানে ইংরেজ আমলের আগেকার দিন, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে পিছিয়ে যতদূর সম্ভব যাওয়া যায়, মানে যত দূর-দিনের কথা জানা যায়—সেই নিম্নসীমাবদ্ধ অপরিগণিত বৃহৎ কাল। এই বৃহৎ কাল-খণ্ডে বাংলাদেশে সাধারণ আমোদ-প্রমোদের যে টুকরো খবর পাওয়া যায়, তাতে ইতিহাসের গাঁট বাঁধা যায় না বটে তবে ইতিহাসের ধারার স্থানে স্থানে শুকনো খাতের দেখা মিলে।

আবহমান কাল থেকে বাঙালী "জেতে চাষা"। মাটির সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ, তার জীবন-প্রবাহ বয়ে এসেছে চষা ক্ষেতে। যাই করুক না কেন, বাণিজ্য করুক অথবা বই লিখুক, সে চাষ করেছে, তার অন্নবস্ত্র জুগিয়েছে চাষ। মুকুন্দরামেরা জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতের বংশ, নিজেও জ্ঞানে-গুণে কম ছিলেন না, তিনি আত্ম-পরিচয় সুরু করেছেন এই বলে "দামুন্যায় চাষ-চষি নিবাস পুরুষ ছয়-সাত।"

চাষের কাজে মেয়ে-পুরুষের যোগান সমান সমান ছিল। হয়ত মেয়েদের কাজের চাপ একটু বেশীই ছিল। পুরুষে চাষ করলে ঘরে ফসল তুললে, ফুরিয়ে গেল। তারপরে যা কিছু করবার তা মেয়েদের। তারা ধান ভানলে, মুড়ি খই ভাজলে, চিঁড়ে হুড়ুম কুটলে, গৃহস্থের ভাত হাতের ব্যবস্থা করলে, ঘরদ্বার পরিচ্ছন্ন রাখলে, কাপাস পিঁজে তুলো করলে, তুলো কেটে সুতো করলে, সেই সুতো তাঁতির ঘরে দিয়ে কাপড় বোনালে সকলের জন্যে, অতিরিক্ত কাটনা হাটে বেচে কড়ির সংস্থান করলে (এবং তার দ্বারা কখনো কখনো স্নেহভাজনদের অকর্মণ্যতার পথে এগিয়ে দিলে। তুলনা করুন পুরানো রাগিণী ভাজবার ছড়া—'বউ আমাদের কাটনা কেটে কিনে দেবে বাজনা'।)

সুতরাং সেকালের বাঙালীর জীবন-তরণী ছিল ভিটে-মাটি আর সে তরণীর কাণ্ডারী ছিল নারী। অতএব ঘর-সংসারের আমোদ-প্রমোদ বলতে মেয়েদের আমোদ-প্রমোদ এবং মেয়েলি আমোদ-প্রমোদ। মেয়েলি আমোদ-প্রমোদের প্রধান উপলক্ষ্য ছিল বিবাহ এবং বিবাহের পূর্বাপর আনুষঙ্গিক কোন কোন অনুষ্ঠান। বিবাহকাণ্ডে যে "স্ত্রী-আচার" বিশেষ করে ছাঁদনাতলার অনুষ্ঠান, তাতে একদা নাপিত ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষের উপস্থিতি নিষিদ্ধ ছিল। নাপিত ছাঁদনাতলায় যে ছড়া বলত তাতে তুকতাকের রেশই (অশ্লীলতা) বেশি, আমোদের ভাগ অল্প এবং ক্ষীণ। বাসরঘরের পালায় অবশ্য আমোদ-প্রমোদ নির্বাধ এবং সেখানে নারী বয়স নির্বিশেষে সর্বময়ী। বিবাহের পরে যথাকালে হত 'পুষ্পবিবাহ'। সে ব্যাপার কেবলি মেয়েলি আমোদ-প্রমোদের হুল্লোড়। এই উপলক্ষে বিশেষ ধরণের গান গাওয়া হত, সে গানের প্রধান বস্তু বা গুণ যাই বলুন অশ্রাব্য অশ্লীলতা। উৎসবটি খুব প্রাচীন কালের প্রজননতন্ত্রের (fertility cult এর) জের টেনে এসেছিল। এই অনুষ্ঠানে গানের (ও ছড়ার) অশ্লীলতা সেই তুক-তাকেরই অঙ্গ। কুঙ্কুমের রঙ ছড়িয়ে হলুদ গোলা জল ছিটিয়ে, কাদা ছুঁড়ে বিবাহিত মেয়েরা হুল্লোড় করত। (প্রজননতান্ত্রিক ব্যাপার বলে অবিবাহিত ও বিধবা নারীর এখানে প্রবেশ অধিকার ছিল না।) কুঙ্কুম-গোলা ও হলুদ গোলা জলের আয়োজন অফুরন্ত নয়, জল-কাদার যোগান অপর্যাপ্ত। এবং কাদা ছোড়াছুঁড়িতেই মজা জমত বেশি করে। এই অন্তত তিন শ বছর আগে থেকে উৎসবটি 'কাদা-খেড়ু' নামে উল্লিখিত হয়ে এসেছে। এই কাদা-খেলায় অশ্লীল গান ও সে গানের চঙ্ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে 'খেড়ু' বলা হয়েছে। অন্য অক্ষরে ধ্বনি-বিপর্যয়ের ফলে পরে কথাটি হয়েছে 'খেউড়'।

"পুষ্পবিবাহ" উপলক্ষে মেয়েরা যেমন পাত্রীকে নিয়ে হুল্লোড় করত একদা পুরুষেরাও তেমনি পাত্রকে নিয়ে নদীতে পুকুরে কাদা-বালি জল নিয়ে খেলা করে মাতামাতি করত। মুকুন্দরামের কাব্যে তার ভালো বর্ণনা আছে। বলি—

খুল্লনার পুষ্পবিবাহের খবর পেয়ে গাঁয়ের মেয়েরা পাড়া ভেঙে ছুটল ধনপতির অন্দরমহলের দিকে। ধনপতির বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়রা খবর পেয়ে দল বেঁধে এসে জুটল সদর মহলে। সেই উপলক্ষে পুরুষের ও মেয়ের স্বতন্ত্র 'কাদা-খেড়ু' হুল্লোড়ের বর্ণনা মূল রচনা থেকে শোনানোই ভালো।

সাধুর মন্দিরে আইসে পরিহাস জন
রাম কৃষ্ণ জগন্নাথ হরি সনাতন।
দাণ্ডকায় ভিতরে সাধু পাঠশালা
(=বৈঠকখানা) ছাড়ি
মেলিয়া গর্বিত ভাই (সম্পর্কে বড় ও ছোট)
করে তাড়াতাড়ি (=ধর্ ধর্)।
দামোদর দাস নামে সাধুর বেহাই
(=গ্রাম সুবাদে)
সর্বকাল সাধুর সঙ্গেতে পড়া ভাই
(=সমধ্যায়ী ভাইয়ের মতো)।
পাছে ছোট ভাই ধরে মাতুল-নন্দন
রামকৃষ্ণ নারায়ণ ভরত লক্ষ্মণ।
সাধুর ভগিনীপতি আইসে রাম দাঁ
অন্য শালীপতি তই যশোবন্ত খাঁ।
আর যত গ্রামের সম্বন্ধে তারা ভাই
জলযন্ত্র (=পিচকারী) লইয়া আইল ধাওয়া-
ধাই (=তাড়াতাড়ি)।
অজয় নদীর তটে জলেতে খেলার
জলযন্ত্রে উঠে জল পিচকারী আকার।
নাম গঙ্গাধর নন্দী জাতি এরা তাঁতি
গ্রাম সম্বন্ধে হয় সদাগরের নাতি।
সঙ্গে মেলি সাধুকে কাঁদিল দিগম্বর
পদ্মপত্র পরিধান বলে ধর ধর।
নীলাম্বর দাস তাঁতি (=তারা করিয়া)
ধরে ধনপতি
হরিষে সাধুকে ধরে যেন মত্ত হাথি।
বহু বেলা হৈল বলে মুকুন্দ দাস
জলখেলা সাঙ্গ করি সভে যাই বাস।
আনি দিল রাম দাঁ তৈল-হরিদ্রা ধুতি
স্নান করি চলে সভে আপন বসতি।

এ উৎসবে আহারাদি ছিল না। তবে তৈল-হরিদ্রা ও ধুতি লাভ ছিল। তবে মেয়েরা তেল-হলুদে শাড়ির সঙ্গে খই-মুড়কি চিঁড়ে কলা আর কড়িও পেত।

খবর পেয়ে সধবা মেয়েরা সব হাঁড়ি-কুঁড়ি কাজকর্ম ফেলে রেখে পাড়া ভেঙে ধনপতির গৃহে উপস্থিত হয়েছে। জল-কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির সঙ্গে গান চলেছে

কুলবধূ কামতন্ত্র বেজক মুরল যন্ত্র
(=বাঁশের চোঙার পিচকারি)
বালুকা সহিত জলপূরে।
হরিদ্রা কুঙ্কুম আনি মিশায়ে কলসে পানি
কুলবধূ জলে করে রণ...
চারি পাঁচ নারীজনে লহনারে ধরি আনে
গায়ে তার দেয় কাদা জল...
কেহ ধায় কেহ গায় কেহ কাদা দেয় গায়
কেহ নাচে দিয়া করতালি
কেহ বা লুকায় কোণে কোন বধূ ধরি আনে
তার মাথে দেয় জল ঢালি।

দেখিয়া জলের ক্রীড়া কুলবধূ যুবা বুড়া
মদন-মঙ্গল গীত গায়
কুলবধূজন মেলি জল খেলা কুতূহলী
লাজ পায়্যে পুরুষ পলায়।
পুর্বের হব্যাসে (=তীর ইচ্ছা)
ঝুড়ি ধরিয়া বেতের কাঁড় (=ছোঁড়)
গায় নাচে গড়াগড়ি যায়
সাধুর ভান্ডার লুঠে আনি ঘৃত দধি ঘটে
ঘৃত দধি কর্দমে ফেলায়।
সাত পাঁচ সখী বোঁড় ধরিয়া দুবলা চেড়ী
(=দাসী)
বিবসনা করিয়া নাচায়
জলখেলা সাঙ্গ করি ঘরে চলে যত নারী
সাধুঘরে নানাধন পায়।

(২)

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্ত-উৎসব এবং সে উৎসবে আবীর ও রঙিন জল নিয়ে খেলা অনেকদিনের রীতি, তবে ষোড়শ শতাব্দীর আগে এ উৎসবের সঙ্গে বৈষ্ণব উপাসনার বিশেষ কোন যোগ ছিল না। পশ্চিমে এই উৎসবের নাম, 'হোলি' (অর্থাৎ হুড়োহুড়ি), এবং তা পুরোপুরি মদনোৎসব। মথুরা বৃন্দাবনের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার ফলে বাংলা দেশে দোল-উৎসবে বসন্ত-বিহার ও মদনোৎসব মিলে গেছে। জনগণের আমোদ-প্রমোদরূপে দোল-হোলি এখন সর্ব-ভারতীয়ত্বের উচ্চ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। মদনোৎসবের সূত্রেই এতে কাদাখেলা, গোময় খেলা, আলকাতরা খেলা, ইত্যাদি অঙ্গ-উপজাত হয়েছে। এর মধ্যে আনন্দ যেটুকু আছে তা আত্মীয়দের মধ্যে অনাত্মীয়দের মধ্যে অসুবিধার সৃষ্টি করাই আনন্দের স্থান নিয়েছে। সুতরাং দোলে হোলিকে এখন বড় বড় শহরে আমোদসহ আপদের মধ্যেই স্থান দিতে হয়।

মুকুন্দরামের বর্ণনায় পেয়েছি মাটিতে ঘি ঢেলে দিয়ে কাদা খেলা। এ খেলার তাৎপর্য ছিল দুদিকে, আনন্দের আতিশয্য প্রকাশে সাংসারিক লাভ-ক্ষতি উপেক্ষা এবং বহু লাভের প্রতীক্ষায় স্বল্পলাভকে পরিত্যাগ। শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবের পরেরদিন বাংলা দেশে যে নন্দোৎসব হয় তাতে গোয়ালাবেশী বৈষ্ণব গায়ন নর্তকদের পায়ে দই ঢেলে দেওয়া হয় (অথাৎ একদা হত। একে বলে 'দধিকর্দম'।)

বিবাহ অনুষ্ঠানের উদ্যোগপর্বে সেকালে একটা আমোদ-প্রমোদের উপলক্ষ্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিল (—এখনও কোথাও কোথাও তার রেশ আছে।) 'বিবাহ' শব্দটির অর্থ বহন করে দূরে নিয়ে যাওয়া, অর্থাৎ পিতৃস্থান থেকে কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রাগৈতি-হাসিক কালে হয়ত সত্য সত্যই তা করা হত। বরপক্ষ জোর করে কন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে যেত। এই নিষ্ঠুর রীতি লুপ্ত হয়ে গিয়ে তার স্থানে mock fight (লড়ালড়ি খেলা) দেখা দেয়। পরে লাঠিখেলার স্থান নেয় বাগাড়ম্বর। চারশ বছর আগে বাংলা দেশে বরযাত্রীরা কন্যাপক্ষের গ্রামে প্রবেশ করলে কন্যাপক্ষ বাধা দেওয়ার ছলে অভ্যর্থনা করত। এবং সে অভ্যর্থনা হত সেকালের রীতি অনুসারে একটি বীরভোগ্য সুপারি দিয়ে। এ সুপারি পেতেন বরযাত্রীদের মধ্যে যিনি "বীর" তিনিই। সুতরাং ঝগড়া দাঁড়াত বরযাত্রীদের মধ্যেই। এভাবে অভ্যর্থনা করার নাম ছিল "বাঁকড়াগুয়া" দেওয়া। (বাকড়া মানে "লড়াই, লড়াই-বীর' (তুলনীয় ধর্ম-ঠাকুরের এক নাম বাঁকুড়া রায়), এখন মানে দাঁড়িয়েছে 'অযথা বাধা দেওয়া।' বাকড়া-গুয়ার কান্ডটাই অযথা বাধা দেওয়া। কোন কোন স্থানে সুপারির বদলে নারকেল দেওয়া হত।)

তারপরে বিবাহসভায়ও আর একরকম আমোদ-প্রমোদ ক্রমে উঠত, এমনকি মারা-মারিতেও পর্যবসিত হত। সে হল বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে বুদ্ধির লড়াই—সমস্যা ও তার পূরণ নিয়ে। বিবাহ চুকে গেলে উভয়পক্ষের কর্তৃপক্ষদের মধ্যে বিশ্রম্ভালাপ হলে সংঘর্ষ চলত। বিবাহ হয়ে গেলে বর কর্তাকে পায় কে। তিনি যথেচ্ছ ছড়া কেটে যথেষ্ট অপমান করতে পারতেন কন্যাপক্ষের এমনি একটি দীর্ঘ ছড়া পেয়েছি দ্বিজ পালের মনসামঙ্গলে। কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করছি

বেহুলাকে দেখে চাঁদোর পছন্দ হয়েছে পুত্রবধূ রূপে। চাঁদোর সব পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিবাহচুক্তি ঠিক হওয়ার পর চাঁদো একে একে কন্যাপক্ষকে মান্য বিতরণ উপলক্ষ্যে ভাবী বেহাইয়ের সঙ্গে ঠাট্টা জুড়ে দিলে।

(চাঁদো) 'অ বেহাই হে।'
(বেহুলার বাপ) 'কেনে হে।'
'আর কে আছে?'
'গাঙের ঠাকুর।'
একটি মাণিক দিল, ডাকিয়া।।
'বেয়াই হে।'
'কেনে হে।'
'আর কে আছে?'
'গাঞের মোড়ল।'
একটি মাণিক দিল ডাক দিয়া।।
'বেয়াই হে।'
'কেনে হে।'
'আর কে আছে?'
'কন্যার জেঠা।'
"তাথে দাওগা মুড়া ঝাঁটা।'
'গালি দাও যে।'
'বেয়াই বলে ঢোল করিলাম।'
'ভালই কইলে।।'
'বেয়াই হে।'
"কেনে হে।'
'আর কে আছে?'
'কন্যার খুড়ি।'
'তাথে দাও গা তপ্ত মুড়ি।'
"গাল পুড়িবেক।'
'ভালই হবেক।।'
'বেয়াই হে।'
'কেনে হে।'
'আর কে আছে?'
'কন্যার মামী।'
'তাথে যে নিব আমি।'

(৩)

নারী-পুরুষ বাল-বৃদ্ধ নির্বিশেষে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার উল্লেখ সবার আগে পাই যেখানে সেখান থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের যথার্থ আরম্ভ। অর্থাৎ অশোকের অনুশাসনে। প্রজাবর্গের মনোরঞ্জনের এবং চিত্তশুদ্ধির একটা বিশেষ ব্যবস্থারূপে অশোক 'বিহারযাত্রা' অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন 'যাত্রা' মানে আরামে যাওয়া, জলপথে অথবা স্থলপথে। 'বিহার' যুক্ত থাকায় মনে হয় হয়ত জলপথেই অশোক এই শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এমন ব্যবস্থা সাধারণত নৌবিহার বা জলযাত্রা-রূপেই প্রচলিত ছিল। এই অর্থে 'যাত্রা'র আধুনিক রূপান্তর 'জাত' সাধারণত স্থল-যাত্রা হলেও তার উদ্দিষ্ট স্থান হল নদী-কিনারা বা নদীচর। অশোকের বিহারযাত্রায় ছিল এখন যেমন বড় বড় শোভাযাত্রায় থাকে, নানারকম মূর্তি, ঘরবাড়ি ইত্যাদি প্রতিকৃতি। শোভাযাত্রায় অশোক দেখিয়েছিলেন অনেক তলা উঁচু বাড়ি, দেবদেবী, আতশবাজী, সুসজ্জিত হাতির ঘটা প্রভৃতি নানারূপে আশ্চর্য কান্ড। তার মধ্যে দেবদেবী নিয়ে অভিনয় (সম্ভবত মূক) ব্যবস্থাও ছিল। এ অনুমান করছি অশোকের উক্তি থেকেই। তিনি বলেছেন আমি বিহারযাত্রার করিয়েছি এমন ব্যাপার যা আমার আগে কেউ কখনো করে নি (বা করায় নি)—দেবদেবীদের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করিয়ে দিয়েছি।

অশোকের প্রায় তিনশ বছর পরে ছিলেন খারবেল কলিঙ্গের (উড়িষ্যার) রাজা। ইনি এঁর অনুশাসনে নিজের কীর্তিকলাপের বর্ণনার মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে একদা—সিংহাসন প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে?—তিনি পঁয়-ত্রিশ হাজার মুদ্রা খরচ করে প্রজাবর্গের মনস্তুষ্টি করেছিলেন। সম্ভবত এও অশোকের মত বিহার-যাত্রা হয়ত যে যাত্রার স্মৃতি ক্ষীণতর হয়ে পুরীর রথযাত্রায় পরিণত হয়েছে। জল-বিহার যাত্রার ভালো বর্ণনা সবার আগে পাওয়া যায় হরিবংশে। অর্জুনের অভ্যর্থনায় কৃষ্ণ-বলরাম প্রমুখ যদুবীরেরা এই অনুষ্ঠান করেছিলেন। তদুপলক্ষে পোতবক্ষে নৃত্য ও অভিনয় হয়ে-ছিল। এইখানে আমাদের পরিচিত যাত্রা-গানের সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। স্থলবিহার যাত্রায় শকটের উপর, জলবিহার যাত্রায় নৌকার উপর নাচ-গান ও অভিনয় (আদিতে সম্ভবত মূক, অথবা পুতুলবাজি) হত। এই হল যোগসূত্রে মিছিল যাত্রার সঙ্গে যাত্রা-গীতাভিনয়ের। যাত্রায় খোলা আসর, অর্থাৎ দর্শকেরা যে কোন দিকে বসতে পারে। যদি যাত্রার আসরের উদ্ভব দেবালয়ে নাটমন্দিরে হত তবে একটা দিক, দেবতার দিক, দর্শকের কাছে নিষিদ্ধ থাকত। কিন্তু মিছিল-যাত্রায় তা নয়। মিছিল-যাত্রা থেকে অভিনয়-যাত্রার উৎপত্তি কল্পনার পক্ষে এও একটা যুক্তি।

আধুনিক কালের 'জাত' হল মকর সংক্রান্তিতে নদীতে পুণ্যস্নানের জন্য মিছিল করে মেলায় সমবেত হওয়া। অর্ধোদয় সন্ন্যাসীদের 'জাত', তাঁরা শোভাযাত্রা করে গঙ্গায় অথবা অন্য পুণ্য নদীতে স্নান করতে যান। জয়দেবের 'কেন্দুলি'ও বা "মেলা'ও বাউল বৈষ্ণবদের জাত। একদা যুগীদের মহাস্থান মহানদের জাত পশ্চিমবঙ্গে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ধমান শহরে দামোদর নদীর জাতে সেদিন পর্যন্ত শোভাযাত্রা করে লোক যেত। সে শোভাযাত্রায় থাকত গোরুর গাড়ী, ময়ূরপঙ্খী নৌকার মতো সাজানো। (মনে হয় জলবিহার যাত্রার স্মৃতিচিহ্ন) ময়ূর-পঙ্খী গাড়ী করে সাধারণত মুসলমানরাই যেতেন—নদীস্নানে নয়, নদীকূলে মেলার উৎসবে, ঘুড়ি ওড়াতে। পশ্চিমবঙ্গে—কলকাতা বাদে—ঘুড়ি ওড়ানোর পর্বদিন—অর্থাৎ শেষদিন ছিল মকর সপ্তমী। কলকাতায় ভাদ্র সংক্রান্তি। বাংলাদেশে জল-যাত্রা উৎসবের শেষ রেশ ছিল মাহেশের দ্বাদশ গোপালের বাইচ উৎসব। সে রেশ অনেকদিন হল লুপ্ত হয়েছে।

প্রাচীনকালের নাট্য-অভিনয়ের ধারা কালবশে আধুনিক সময়ে যে রূপ নিয়েছে তাকে বলে 'নেটো' (অর্থাৎ নাটুয়া)। নেটো সম্বন্ধে এবং পাঞ্চালী নাট-গীত-যাত্রা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা আছে 'নট-নাট্য-নাটক' বইটিতে। এখানে তার পুনরা-বৃত্তি না করে কৌতূহলী পাঠককে বইটি পড়তে বলি।

(৪)

সেকালে সাধু ফকীর বৈষ্ণব বাউলের গৃহস্থের নামে গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এর মধ্যে আমোদ-প্রমোদের অংশ সামান্যই। তবে অনুরূপ আর একরকম গানের রীতি ছিল যা পুরোপুরি আমোদ-কৌতুকের মধ্যে পড়ে। সে হল 'হাপু' গানা। এ গান হাঁফের মতো টেনে টেনে, প্রথম কলির প্রথমার্ধের পুনরাবৃত্তি করে গাওয়া হত। সঙ্গে কোন যন্ত্র বাজানো হত না, বগল বাজিয়ে, গাল-বাদ্য করে, গোড়তালি ঠুকে তাল দেওয়া হয়। এই ছেলে-ভুলানো ছড়াটি হাপু গানের নমুনা বলে নেওয়া যায়।

মামাদের পাখি মলো,—
মামাদের পাখি মলো
সেখানে যেতে হলো
চিঁড়ে দই, খেতে হলো।
আমি নিই ঘি-কলসী
তুমি নাও মন্ডা হাঁড়া
তামাক খাবো টিকে ধরা—
ভুড়ুক ভুড়ুক।।

হাপু গানে রচনায় ও বিষয়ে বৈচিত্র্য ছিল এবং তাতে ছেলেমি কৌতুক রসের যোগান খুব বেশি ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত হাপু গান শোনা গেছে। এখনও বোধকরি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়নি নিভৃত গ্রামাঞ্চলে।

চাষী সংসারে ও সমাজে শীতকাল আনন্দ করবার কাল। ফসল ঘরে উঠেছে, সংবৎসরের ভাবনা নেই। তাই এই সময় পিঠে-পরব, এই সময়ে বন-ভোজন। প্রাচীন-কালে শীতের অন্তে বন-ভোজনের মতো একটা আমোদ-প্রমোদের আয়োজন ছিল বালক ও বর্ষীয়ানদের মধ্যে। বনের শুকনা খড়বড়, ফসলতোলা পরিত্যক্ত মাঠের মাচান গুমটি ও অন্যান্য আবর্জনা নিয়ে জড় করে তাতে আগুন লাগানো হত আর সেই আগুনে কাঁচা ফল-মূল জনার ইত্যাদি পুড়িয়ে খাওয়া হত। এর নাম ছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে 'হাদুস' (বা ভাদুস)। আমে-রিকানদের Barbecue মত ছাগল ভেড়া পুড়িয়েও খাওয়া হত। সেইজন্যে এই বহ্নুৎসবের নাম হয়েছিল 'মেড়াপোড়া'। এ ব্যাপার অনেকদিন লোপ পেয়েছে, কেবল নামটি আছে।।

ইকেবানা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(চিত্রাখ্যান)

কয়েকটি ফুল আর বাহারী পাতার মধ্যে ঠিক চম্পক অঙ্গুলী না হোক নধর সুঠাম কটি আঙুলের কাজ প্রথমে দেখা গেল। সযত্নে বাড়ানো নখগুলির রঙও বোঝা যাচ্ছে।

বেশ কয়েক মুহূর্ত ক্যামেরা শুধু ওই ফ্রেমেই স্থির হয়ে রইল। ফুল আর লতা-পাতা নানাভাবে সাজিয়ে আবার বদলানো হচ্ছে।

ক্যামেরা এবার পিছিয়ে এল একটু। যে পাত্রে ফুলগুলি রাখা প্রথমে সেটি, তারপর ফুল যে সাজাচ্ছে সে মেয়েটিকেও দেখতে পেলাম। আঙুলগুলি দেখে যা মনে হয়েছিল মেয়েটি পোশাকে-প্রসাধনে সেই রকম আধুনিকা। পাতলা দোহারা চেহারা। মুখশ্রী বিশেষ না থাকলেও শরীরের বাঁধুনি যা আছে বেশভূষায় তাই প্রধান আকর্ষণ করে তোলবার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি।

মেয়েটির চেহারা পোশাকে যে স্বচ্ছল আভিজাত্যের ইঙ্গিত আছে, ঘরটার যেটুকু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে তা কিন্তু অনুপস্থিত। (অর্থাৎ মেয়েটিকে পার্ক স্ট্রীটে কোন বিলেতী ময়রার দোকানে দেখলে তার অবস্থা সম্বন্ধে যে ধারণা হত ঘর-দোরের চেহারায় তা ভুল বলে প্রমাণ হচ্ছে।) সাধারণ মধ্যবিত্ত চেহারাকে আধুনিক করে তোলবার একটা আন্তরিক চেষ্টা আছে অবশ্য। ঘরের যে জানলাটা ক্যামেরা পেছুবার সঙ্গে দেখা গেছে তার কাটা পর্দার ভেতর দিয়ে অন্য দিকের বাড়ির আভাস দেখে এটা সারি সারি ফ্ল্যাট বাড়ির অংশ বলেই বোঝা যাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে ফুল সাজাবার পাত্রটি আর ফুলগুলি মেয়েটির চরিত্রই প্রতিফলিত করছে কি না জানলেও প্রথম থেকে মনে ছাপ রাখবার মত করে দেখানো।

মেয়েটি ফুল সাজাতে তন্ময়। মুখে সেই একাগ্রতার সঙ্গে কখনো একটু ভ্রু-কুটি কখনো একটু প্রসন্নতা ফুটে উঠছে।

ক্যামেরা ধীরে ধীরে এগিয়ে শুধু মুখটিকেই বড় করে তুলল, একটু পেছন থেকে। গলা আর কাঁধের সামান্য অংশ শুধু দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ একটু অস্ফুট আতঙ্কের শব্দের সঙ্গে মেয়েটির মুখ মুহূর্তের জন্যে চমকে বিবর্ণ হয়ে গেল।

তার গলার পাশ আর কাঁধের ওপর দিয়ে দুটো হাত ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে।

আঙুলগুলো একটু নাড়াচাড়ার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার ধরনে ঠিক যেন সরীসৃপের অস্বস্তিকর স্পর্শের আভাস দিচ্ছে।

মেয়েটির মুখের সেই চমকে-ওঠা ভয়ের বিবর্ণতা একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে।

মুখটা স্থির। শুধু দু চোখের তারা নিচের দুটো হাতের আঙুলগুলোকে লক্ষ্য করল দুবার একোণে-ওকোণে সরে।

মুখের ভাবটা ক্রমশ বেশ কঠিন হয়ে এসেছে। কঠিন মুখ আর সেই সঙ্গে ঠোঁটের কোণে ঈষৎ বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ হাসি।

দু হাতের আঙুলগুলো তখন মেয়েটির সুঠাম গলার কোমল মসৃণতা যেন বুলিয়ে-বুলিয়ে উপভোগ করছে।

অত কাছে থেকে হাত আর হাতের আঙুলগুলো লক্ষ্য না করে উপায় নেই। পুরুষের বলিষ্ঠ হাতের আঙুল, গড়নও খারাপ নয়, কিন্তু কেমন খসখসে চামড়া, আঙুলের গাঁটগুলোও বড় স্পষ্ট। আর নখগুলোও দিন কয়েক আগে অন্তত কাটা উচিত ছিল। নখের ডগাগুলো পরিষ্কার নয় বলেই সন্দেহ হয়। ডান হাতের বুড়ো আঙুলে আর তর্জনীটাই ভাল করে চোখে পড়ছে। সেখানে স্পষ্ট ধূমপানের তামাকের ছোপ।

মেয়েটির কঠিন মুখ থেকে বিদ্রূপের হাসিটা মুছে গেল এবার। নিজের ডান হাতটা তুলে সে তার গলার ওপর বুলোনো আঙুলগুলো সরাতে চেষ্টা করলে। পারলে না। আঙুলগুলো আরো নিবিড়ভাবে তার গলাটা যেন জড়াতে চাইছে।

মেয়েটির চোখে একটা ক্রুদ্ধ ঝিলিক দেখা দিল এক মুহূর্তের জন্যে।

উপদ্রবের আঙুলগুলো সরাবার চেষ্টা আর না করে বললে,—হাত সরাও।

চোখের দৃষ্টিতে জ্বালা কিন্তু গলার স্বর শান্ত দৃঢ় অনুচ্চ।

হাত সরল না তবু।

তার বদলে শুধু একটু হাসি শোনা গেল—কৌতুকের চাপা হাসি।

সেই হাসির সুরে মেশানো একটু চিমটি দেওয়া কথা, তারপর,—সরাতে ইচ্ছে করছে না যে। খুব খারাপ লাগছে কি?

মেয়েটি দাঁতে দাঁত চেপে বললে,—এতখানি সাহস তোমার হবে ভাবি নি।

ভাবো নি! — সেই ঈষৎ কর্কশ কৌতুক-মেশানো গলা শোনা গেল,—স্ত্রীর কাছে স্বামীর কি সাহসের দরকার হয়!

মেয়েটি এক ঝটকায় ফিরে দাঁড়াল। ক্যামেরাও সেই সঙ্গে পিছিয়ে গেল খানিকটা। মেয়েটি আর পুরুষটিকে এক ফ্রেমে ধরবার জন্যে ঠিক যতটা দরকার।

স্বামী! তুমি স্বামীত্বের দাবী করো!—মেয়েটির চোখের দৃষ্টি আর কণ্ঠ দিয়ে আগুনের হল্কা বার হচ্ছে, — জানো, এই মুহূর্তে আমি চিৎকার করতে পারি।

নিশ্চয় পারো। — পুরুষটির গলায় ও মুখের ভাবে এবার কৌতুকের সঙ্গে একটা উদ্ধত তাচ্ছিল্য, — তাতে কি হবে কি নীল! তোমার সব পাড়াপড়শীরা ছুটে এসে তোমাকে রক্ষা করবে আমায় উত্তম-মধ্যম দিয়ে? তোমার এই ফ্ল্যাট বাড়ির ডুঁইচিবিতে সেরকম পরের দায় ঘাড়ে নেবার মানুষ আছে বলে ত মনে হয় না। চেঁচিয়ে তুমি গলা চিরে ফেললেও পুলিশের হ্যাঙ্গামায় জড়াতে হবার ভয়ে কেউ দরজা খুলে সাড়াও দেবে না। আর ধরো তোমার এই ফ্ল্যাট বাড়ির কবুতর মহলে কেউ কেউ সত্যিই ছুটে এল বিপন্ন নারীকে উদ্ধার করতে। কি বলবে তুমি তাদের? একটা পাষণ্ড তোমার ঘরে ঢুকেছে পাশবিক অত্যাচার করতে? পারবে সে কথা বলতে!

পুরুষটি কথা বলতে শুরু করার পর থেকেই ধীরে ধীরে প্রায় যেন আমাদের অজান্তে ক্যামেরা এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে ফ্রেম থেকে বাদ দিয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুষটিকে ভালো করে এবার লক্ষ্য করতে হবেই। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স হবে। চেহারা খারাপ নয়। এককালে পুরুষালী একটা শ্রী-সৌষ্ঠব নিশ্চয় ছিল বলিষ্ঠ ও কিছুটা ধারালো মুখ-চোখের ছাঁদে। কিন্তু চেহারা পোশাক সব কিছুর ওপর উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবনের একটা ছাপ পড়ে সে শ্রী-সৌষ্ঠব প্রায় মুছে গেছে এখন। গায়ের যে শার্টটাই শুধু এখন পর্যন্ত দেখা গেছে তা ধোপদস্ত ত নয়ই ঘাড়ের কলারের কাছটায় বেশ রোঁয়া-ওঠা। মুখে একদিনের না-কামানো গোঁফ দাড়ির ছায়া। দৃষ্টি উজ্জ্বল হলেও চোখ বেশ কোটরে ঢোকা আর তার তলায় কালী। মুখের হাসিতে চোখে আর চেহারায় একটা বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকের আভা যা লাগে তা অপ্রীতিকর নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে দাঁতের পাটিতে যে সুস্থ উজ্জ্বলতার অভাব তাও লক্ষ্য না করে পারা যায় না।

পুরুষটির কথার শেষে ক্যামেরা তাকে ছেড়ে এতক্ষণের একটানা ছবির ধারা কেটে দিয়ে 'নীল' বলে যাকে সম্বোধন করা হয়েছে শুধু সেই মেয়েটির ওপর নিবদ্ধ হল।

'কি বলবে তুমি তাদের? একটা পাষণ্ড তোমার ঘরে ঢুকেছে পাশবিক অত্যাচার করতে? পারবে সে কথা বলতে?' — এই কথাগুলি 'নীল'-এর ছবির ওপর শোনা যাবার সঙ্গে তার মুখের ভাবান্তরও লক্ষ্য করা গেল। প্রথম একটু যেন বিব্রত অস্থির ভাব তারপর স্থির কঠিন।

ওসব কথা বলবার দরকার হবে না। গম্ভীর গলায় বললে 'নীল',—বিনা অনুমতিতে সম্পর্কহীন কোন পুরুষের পক্ষে কোন মেয়ের ঘরে ঢোকাই অপরাধ। বিশেষ করে মেয়েটি যেখান অভিযোগ করছে।

হ্যাঁ,—পুরুষটি মুখে একটু ধূর্ত হাসি ফুটিয়ে স্বীকার করল,—সত্যিই যদি কেউ তোমার আর্তনাদে ছুটে আসে তাহলে তোমার নালিশের পর আমার জবানবন্দীর জন্যে আর অপেক্ষা করবে না। সরাসরি আমার শ্রাদ্ধ করতে চাইবে। কিন্তু চাওয়াটাই ত' সব নয়। আমার এ চেহারাটা খুব ভদ্রলোক ভালোমানুষের নয়। চোখ রাঙিয়ে রুখে দাঁড়াবার ভঙ্গি করলে একটু থমকে যেতে হবেই। সেই সুযোগে আমি যদি বলি যে আমি শ্রীঅনুপম চক্রবর্তী হলাম তোমার পরিত্যক্ত স্বামী—যার ঘর থেকে তুমি পালিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে ঘর বেঁধেছ আর যে এতদিন বাদে তোমার খোঁজ পেয়ে তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে, তাহলে ব্যাপারটা একটু গোলমেলে হয়ে উঠতে পারে না কি?

নীল-এর কথা শেষ হবার পরই তাকে ছেড়ে আমরা শ্রীঅনুপম চক্রবর্তীকে দেখছিলাম। প্রথমে তার কোমর পর্যন্ত ছবিই দেখা গেছে তারপর সেই ফ্রেমেই সে কথা বলতে-বলতে সরে গিয়ে ঘরের এ-পর্যন্ত না-দেখা অংশের একটি 'সেটী'-তে গিয়ে আলসভরে গা এলিয়ে দেওয়ায় তার সমস্ত শরীরটাই দেখতে পাচ্ছি। ক্যামেরা তার চলা-ফেরার সঙ্গেই ঘোরানো হয়েছে। মাঝে শুধু একটিবার কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমরা নীলাকে দেখেছি। মুখে অধৈর্যের ভ্রূকুটির সঙ্গে কৌতুকের হাসি নিয়ে সে যেখানে ফুল সাজাচ্ছিল সেখানেই একটি দেয়ালে ঈষৎ হেলান দিয়ে অনুপমকে লক্ষ্য করছে।

তোমার পরিত্যক্ত স্বামী, যার ঘর থেকে তুমি পালিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে ঘর বেঁধেছ...' এই কথাগুলো 'নীল'-এর ছবির ওপর শোনা গেছে। তার মুখের ঈষৎ কৌতুকের হাসিটাও ফুটে উঠেছে 'যার ঘর থেকে তুমি পালিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে ঘর বেঁধেছ...' কথাগুলোর সঙ্গে।

'সেটী'তে গা এলিয়ে দিয়ে অনুপম এক মুহূর্ত থেমে হঠাৎ গলা ও ভঙ্গি বদলে ফেলে সোজা হয়ে উঠে বসে একটু মধুর-ভাবে হাসল। তারপর ডান হাতের তর্জনী নেড়েই 'নীলা'কে অন্তরঙ্গভাবে ইসারায় ডেকে প্রায় গাঢ় স্বরে বললে,—কিন্তু তুমি ও কিছু চিৎকার করছ না, আর আমারও নিজের ওরকম সাফাই গাইবার দরকার হচ্ছে না। সুতরাং এসব বাজে কথা রেখে একটু কাছাকাছি বসি এসো। এসো লক্ষ্মীটি! নীল আমার নীলিমা!

শেষ কথাগুলো নীল অর্থাৎ নীলিমার মুখের ওপর। অনুপমের গলার স্বরে আর 'নীল আমার নীলিমা।' ডাকটার ধরনে যেন একটা অশুভ যাদু আছে। নীলিমা যেন নিজের অনিচ্ছাতেই একটু শিউরে উঠল।

তারপর নিজেকে যেন জোর করে সামলে তুষার শীতল কঠিন গলায় বললে,—না, তুমি যাও। এখনো ভালো কথায় বলছি এখুনি চলে যাও। তোমার এ অন্যায় জুলুম আমি বেশীক্ষণ সহ্য করব না।

নীলিমার শেষ কথাটা আমরা অনুপমের মুখের ছবির ওপর শুনলাম। তার মুখে রাগ নয় মিটিমিটি কৌতুকের হাসি।

চমৎকার! — যেন মুগ্ধ প্রশংসার

দৃষ্টিতে নীলিমার দিকে চেয়ে সে বললে,—রাগলে এখনো তোমাকে কি মিষ্টিই দেখায়...

থামো!

নীলিমার তীব্র স্বরের আদেশটা অনুপমকে প্রায় চমকে থামিয়ে দিল। অদ্ভুত একটু মুখভঙ্গি করে সে কপট বাধ্যতার ভান করে বললে, জো হুকুম! কিন্তু মাইরি, থুড়ি—সত্যি, প্রাণের কথাটাই বলছিলাম।

তোমার প্রাণের কথা শোনবার সময় বা সাধ আমার নেই। নীলিমার ওপর ক্যামেরা নিবদ্ধ হল। তারপর তাকেই ফ্রেমে ধরে রেখে তার এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এল সোফায় বসে-থাকা অনুপমকেও ছবিতে একত্র করবার জন্যে।

নীলিমা তখন উত্তেজিতভাবে এগিয়ে আসতে আসতে বলে চলেছে,—সত্যি করে বলো কি তোমার আসল মতলব? আমার এ ঠিকানা খুঁজে বের করে কেন তুমি হানা দিতে এসেছ মূর্তিমান অভিশাপের মত? কি তুমি চাও? টাকা? মৌতাতের রসদে ঘাঁকতি পড়েছে, না জুয়ার দেনা শোধ করতে হবে?

নীলিমা শেষ কথাগুলো যখন বলছে তখন ক্যামেরায় অনুপমকেও তার সঙ্গে দেখছি। অনুপম সেটীতেই বসে কৌতুকের মুখভঙ্গি করে নীলিমার দিকে তাকিয়ে আছে আর নীলিমা তার সামনে দাঁড়িয়ে রাগে ফুলছে।

মৌতাতের রসদে ঘাঁকতি আর নেই কখন? — নীলিমার কথা শেষ হবার সঙ্গে কাঁধ নেড়ে দু হাতের অসহায় ভঙ্গি করে বললে অনুপম—দেবে তা মোটা বাঁধা টাকা? দাও। আপত্তি করব না। সত্যি কথা স্বীকার করছি কিছু টাকা বাগাবার মতলব নিয়েই এসেছিলাম।

কথা বলতে বলতে অনুপম উঠে পড়ে নীলিমার মুখের দিকেই ঈষৎ কৌতুক ঈষৎ মুগ্ধতা মেশানো দৃষ্টি রেখে তার সামনে দিয়ে পায়চারী করতে শুরু করেছে। ক্যামেরা তাকেই কাছে থেকে অনুসরণ করছে বলে খানিক অনুপমকে একা দেখছি আর নীলিমার কাছ দিয়ে যাবার সময় দুজনকে পাচ্ছি এক সঙ্গে।

পায়চারী করতে করতে অনুপম বলে চলেছে,—এমনি ইমারজেন্সীর জন্যে ঠিকানাটা আগে থাকতেই যোগাড় করা ছিল সুতরাং খুঁজে বার করার কোন ঝামেলা হয় নি। শুধু ভাবনা হচ্ছিল বাসায় যদি সুবিধেমত নিরিবিলিতে না পাই। যা চেয়েছিলাম তাই পেলাম কিন্তু সব কেমন উল্টো হয়ে গেল।

'খুঁজে বার করায় কোন ঝামেলা হয় নি।' জানাবার পরই অনুপম নীলিমার সামনে এসে থেমে দাঁড়িয়েছে। শেষ কথাগুলো বলেছে নীলিমার সামনেই। অনুপম দাঁড়িয়ে পড়বার পর আমরা তার একটু পেছন থেকে তার শেষ কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া নীলিমার মুখে দেখেছি। সে প্রতিক্রিয়া বোঝা শক্ত। নীলিমার মুখ পাথরের মত কঠিন। চোয়াল দুটো দেখে মনে হচ্ছে সে যেন দাঁতে দাঁত চেপে আছে। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে আর কোন যন্ত্রণার আভাস।

অনুপমের কথা শেষ হতেই নীলিমা শুকনো যান্ত্রিক গলায় বললে,—আর কথা বাড়াবার দরকার নেই। যে জন্যে এসেছ তাই নিয়ে আমায় রেহাই দাও।

কথাটা বলে নীলিমা ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের আরেক দিকে এগিয়ে গেল। ক্যামেরাও সঙ্গে সঙ্গে গেল পেছন থেকে হাঁটুর খাঁজটা পর্যন্ত ফ্রেমে ধরে রেখে। নীলিমার হাঁটাটা যে সুন্দর, দেহের সুঠাম দোলায় তা স্পষ্ট হয় উঠল।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে নীলিমাকে ছেড়ে অনুপমের মুখটা বড় করে এবার দেখলাম। নীলিমার গতিছন্দ দেখার অকপট প্রতিক্রিয়া তার মুখে বাঁকা ঈষৎ হাসির সঙ্গে কৌতুক-কুঞ্চিত চোখে কামনার একটু স্ফুলে উগ্রতা ফুটে উঠছে।

ক্যামেরা আবার নীলিমাকে ধরল। ওদিকের দেয়ালে রাখা সুদৃশ্য দেরাজের একটা ড্রয়ার এক ঝটকায় খুলে সে একটা ব্যাগ থেকে বেশ কয়েকটা নোট বার করলে, তারপর ড্রয়ারটা ঠেলে বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, — নাও যা আমার কাছে ছিল সবই দিয়ে দিচ্ছি। এই নিয়ে দয়া করে বিদেয় হও। আর একথাও মনে রেখো যে, এর পর দ্বিতীয়বার কখনো এলে এ ব্যবহার পাবে না।

নীলিমার কথার মাঝখানেই তাকে ছেড়ে ক্যামেরা অনুপমের মুখের ওপর গেছে। অনুপম নীলিমার কথা শুনতে শুনতে এগিয়ে আসছে আর ক্যামেরাও তাকে ধরে নিয়ে পিছিয়ে আসছে। অনুপম নীলিমার কাছে এসে দাঁড়াবার পর দুজনকে মিলিয়ে দিয়ে ক্যামেরাও থামল।

এ ব্যবহার পাব না? — কেমন একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে অনুপম বললে,— না পাওয়াই উচিত। সত্যি সত্যি এতগুলো টাকা তুমি দিয়ে ফেলবে তা কি আশা করতে পেরেছিলাম!

[বলতে বলতে অনুপম হাত বাড়িয়ে নীলিমার হাত থেকে টাকাগুলো যেন ছোঁ মেরে নিয়ে আগ্রহভরে গুণতে শুরু করল। তার লুব্ধ উল্লসিত চোখ আর মুখে সাফল্যের হাসিটা দেখবার জন্যে ক্যামেরা তখন নীলিমাকে ছেড়ে শুধু তাকেই আলাদা করে ধরেছে।]

এ যে প্রায় শ'-দুই টাকা! গোনা শেষ করে মুখ তুলে একটু বিস্ময়ের দৃষ্টিতেই নীলিমার দিকে তাকিয়ে অনুপম বললে,— এতগুলো টাকা এক সঙ্গে আমায় দিয়ে দিচ্ছ! আমায় বিদেয় করবার তাড়াতেই দিচ্ছ জানি, কিন্তু টাকাগুলো এককথায় বার করে দেবার ক্ষমতা ত তোমার হয়েছে। তার মানে অবস্থা তোমার এখন বেশ

মা বলছিলেন,
আমায় নাকি
দিন-দিনই
কচি দেখাচ্ছে ...
মা তো ছেলের দিক
টেনে কথা কইবেনই!
আসলে কিন্তু নির্মল
আর আমার তারিফ করা
উচিত। তিনি তো জানেন না
ওঁর আদরের ছেলেটিকে
আমিই নির্মল বার সাবানে
কাচা ধবধবে পোশাক
পরিয়ে অমন খোকাটি
ক'রে রেখেছি।
নির্মল
Nirmal
BAR
SOAP
পূর্ব ভারতে বার সাবান
হিসেবে কাটতিতে
সবার উপরে
—সবার সেরা
বলেই।
কুসুম
প্রোডাক্টস লিমিটেড,
কলিকাতা-১
KPN 4625

স্বাচ্ছন্দ্য। অবশ্য এ ঠিকানায় এসে তোমার বাসায় ঢুকেই তা বোঝা যায়।

[কথা বলতে বলতে অনুপম ঘরটা ঘুরে দেখবার জন্যেই পা চালাতে সুরু করেছে। ক্যামেরা একটু পিছিয়ে গিয়ে তার সেই ঘোরাফেরাটাই অনুসরণ করছে।]

এমন কিছু আহামরি হয়ত নয়,—অনুপম ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে কতকটা নিজের মনে বলে চলেছে,—কিন্তু পরিচ্ছন্ন পরিপাটী, তোমার নিজের রুচির ছাপটাই এ ঘরে দেবার চেষ্টা করেছ! এমনি ঘর সংসার, এই জীবন তুমি চেয়েছিলে। রুচি প্রবৃত্তি তোমার একটু দো-আঁশলা। আমার সঙ্গে মেলে না। তা হোক, তার মধ্যে অন্ততঃ ভান নেই। আগেও ছিল না...

থাক্! যথেষ্ট হয়েছে!

নেপথ্যে নীলিমার তিক্ত স্বরে বলা কথাটায় একটু চমকে অনুপম ফিরে দাঁড়াল।

ক্যামেরা এবার নীলিমার ওপর। সে তিক্তস্বরে বলছে,—টাকা পাওয়ার কৃতজ্ঞতা আমায় ওভাবে জানাতে হবে না। তার বদলে আমায় একটু অনুগ্রহ করো। আর এক মুহূর্ত দেরী না করে চলে যাও এখুনি। আমার স্বামীর ফেরবার সময় হয়েছে। তিনি এসে তোমাকে এখানে দেখবেন এটা বাঞ্ছনীয় নয়।

[শেষ কথাগুলো শোনা গেল অনুপমের মুখের ওপর। তার মুখেরভাবে কি একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন এর মধ্যে হয়ে গেছে। সেই কৌতুকের হাসি আছে ঠোঁটের কোণে, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটু অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা।]

বাঞ্ছনীয় নয়! —একটু হেসে উঠে বললে অনুপম,—না তোমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নিশ্চয় নয়। স্বামীর কাছে এরকম একটা ব্যাপারের জবাবদিহিটা বেশ অস্বস্তিকর হতে পারে। বিশেষ করে নতুন স্বামীর কাছে। বেশী নয়, মাত্র বছর খানেকের স্বামী, তাঁ কি নাম যেন তোমার নতুন স্বামীর? দত্ত, কি যেন দত্ত? —হ্যাঁ এস দত্ত। —মানে শুভঙ্কর দত্ত। এই যে!

[কথা বলতে বলতে অনুপম আবার দেয়ালের পাশে পাশে ধীরে ধীরে চলতে সুরু করেছিল। যে জায়গায় এসে সে থামল সেখানে ছোট একটা রাইটিং টেবিলের ওপরে একটা ফটো-ফ্রেম রাখা। 'এই যে' বলে অনুপম ফটোটা তুলে নিয়ে যেন ভালো করে দেখবার জন্যে চোখের কাছে ধরল। ক্যামেরাও এগিয়ে গিয়ে এক ফ্রেমে বড় করে ফটোটা আর অনুপমের মুখটা ধরল। ফটোতে একটি বেশ প্রসন্ন শান্ত গোলগাল মুখ দেখা গেল। অনুপমের সঙ্গে সবদিক দিয়েই তার তফাৎ]

এই ইনি শ্রীশুভঙ্কর দত্ত—ফটোটা হাতে ধরে একটু যেন অকপট প্রশংসার সুরেই অনুপম বলে চলেছে,—উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রহীন অকর্মণ্য অপদার্থ নন, দস্তুর মত সচ্চরিত্র সজ্জন, জীবনে সাফল্যের চূড়ায় ধাপে ধাপে উঠে চলেছেন। কোন এক বিলেতী কোম্পানীর যেন ডেভেলপমেন্ট অফিসার। একাগ্র চেষ্টায়, অটুট নিষ্ঠায় আরো অনেক ওপরের ধাপে উঠবেন......

ফটোটা ধরে অনুপম কথা বলা সুরু করবার একটু পরেই ক্যামেরা তাকে ছেড়ে নীলিমার ওপর চলে গেছে। কথাগুলো যেন চাবুকের মত তার গায়ে লাগছে। মুখে চোখে তার তীব্র রাগের জ্বালা কোন রকমে যেন সামলে রেখে শেষে সে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে এক ঝটকায় ফটোটা ছিনিয়ে নিলে অনুপমের হাত থেকে। ক্যামেরা তাকেই ধরে এনে অনুপমের সঙ্গে তখন মিলিয়ে দিয়েছে।

তুমি নীচ ইতর অমানুষ! —ফটোটা ছিনিয়ে নিয়ে নীলিমা জ্বলন্ত স্বরে তখন বলছে,—তোমার মত মানুষের তুলনায় উনি দেবতা। ওঁর বড় চাকরীই তুমি হিংসা করো, ওঁর মহত্ত্ব তোমার কল্পনারও বাইরে। টাকা পেয়েছ, যাও এখুনি তুমি যাও। এ ঘরে দাঁড়িয়ে ওঁকে বিদ্রূপ করতে তোমায় আমি দেব না।

নীলিমাকে ছেড়ে ক্যামেরা শেষের দিকে অনুপমকে ধরেছে। 'ওর মহত্ত্ব তোমার কল্পনার বাইরে থেকে...' আরম্ভ করে শেষ অবধি নীলিমার কথা শুনে অনুপমের মুখে এই প্রথম বুঝি একটু বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল।

আশ্চর্য, নীল, আশ্চর্য! নীলিমার দিকে একটু যেন হতাশার ভঙ্গিতে চেয়ে বললে অনুপম,—আমার গলার স্বরটাও তুমি ভুলে গেছ! তুমি কি জানো না, বিধাতা এমন বাঁকা করে আমায় গড়েছেন যে, সোজা জিনিস আমার বাঁকা কাচে উল্টো দেখায়! চেহারা দেখলেই লোকে আমাকে শঠ কপট বলে সন্দেহ করে, আন্তরিকভাবে যা বলতে চাই, তা আমার এই বাঁকা হাসির ছাঁচে ঢালাই-করা বেয়াড়া মুখের জন্যে বিদ্রূপের মত শোনায়। আমি তোমার শুভঙ্কর দত্তকে বিদ্রূপ করে কিছু বলিনি। যা বলেছি, তার মধ্যে ঈর্ষার জ্বালা হয়ত একটু ছিল কিন্তু ব্যঙ্গ কি অবজ্ঞা নয়। আজ আরো কিছু সরল সত্য আন্তরিকভাবে বলবার চেষ্টা করেছিলাম। এসেছিলাম শুধু কিছু টাকা বাগাবার মতলব নিয়েই কিন্তু চুপি চুপি ঘরে ঢুকে পেছন থেকে তোমায় দেখে সত্যিই কি যেন হয়ে গেল। 'কি হারাইয়াছেন আপনি জানেন না' অবস্থাটা হয়েছে সেই থেকে। আমার বর্বরতা মাপ কোরো। কিন্তু...

[কথা বলতে বলতে অনুপম ক্রমশঃ নীলিমার দিকে এগিয়ে এসেছে। নীলিমা প্রথমে একটু পিছিয়ে গিয়েছিল, তারপর নিজের অজ্ঞাতসারেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অনুপম কথার মাঝে এক সময় একটা হাত ধরে ফেলেছে নীলার। তারপর সেটা নিজের দু হাতের মধ্যে ধরে রেখে আদর করে টিপতে টিপতে গাঢ় স্বরে কথা বলে যাচ্ছে। ক্যামেরা দুজনকে অন্তরঙ্গভাবে ধরে রেখেছে এখন।]

হাতছাড়া হয়ে গেছ বলেই তোমার দাম যেন—অনুপম তার সেই ছাঁচে-জমানো ধূর্ত কৌতুকের হাসিটি মুখে নিয়েই বলে চলল—এতদিনে ঠিকমত বুঝতে পারছি। তুমি আজ আমার নও, কিন্তু আকর্ষণটা তার-ই ফলেও পরস্ত্রী বলে তোমায় ভাবতে পারছি কই? মনে হচ্ছে, শুধু ত কটা কাগজের হিজিবিজি লেখা, তাই দিয়ে কি রক্তের বন্যাবেগ বেঁধে রাখা যায়......

[অনুপম আরো কাছে সরে গিয়ে একটা হাত নীলিমার কোমরের পেছনে দিয়ে তাকে কাছে টেনে এনেছে। হঠাৎ বেল বেজে উঠল। টেলিফোন নয়, নিচের দরজার কলিং-বেল। নীলিমা চমকে পিছিয়ে সরে দাঁড়াল।]

দত্তই এলেন!—অনুপম যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে থেকে বললে,—না, দত্ত তা নয়। তিনি কলিং-বেল বাজিয়ে আসবেন কেন? দেখো কোন উপদ্রব আবার উপস্থিত!

[অনুপমের কথার মধ্যে আর একবার কলিং-বেল বাজল। নীলিমা নীরবে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে অনুপমের দিকে এতক্ষণ

চেয়েছিল। এবার যেন হঠাৎ চটক ভেঙে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফটোটা কাছের টেবিলে রেখে চলে গেল নিচে কে এসেছে দেখবার জন্যে।

অনুপম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর এদিক-ওদিক ঘুরে দেখতে দেখতে নীলিমা যেখানে ফুল সাজাচ্ছিল, সেখানে 'ভাস'টার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বেশ একটু মনোযোগ দিয়ে দেখল সাজানো ফুলগুলো। তারপর মাথা নেড়ে কি যেন খোঁজবার জন্যে এদিক-ওদিক চেয়ে ঘরের এক কোণে আর একটা পেতলের বড় 'ফ্লাওয়ার ভাস'-এর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে একটা আধা-শুকনো ফুলের তোড়া। তার ভেতর থেকে শুকনো লম্বা কাঁটা ওঠা ক'টা কাঠি টানতে দেখিয়েই ক্যামেরা তাকে ছেড়ে দিলে।

ক্যামেরা এবার নিচে সিঁড়ির তলার ল্যান্ডিং-এ। নীলিমা টেলিগ্রাফ পিওনের খাতায় সই করে টেলিগ্রাম নিলে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়েও থেমে পড়ে, খুলে ফেললে টেলিগ্রামটা। টেলিগ্রামটা আমরাও দেখতে পেলাম।

ইংরেজীতে যা লেখা তার মর্মার্থ হল —আটকে পড়েছি। কাল পৌঁছোব। দত্ত।

টেলিগ্রামটা পড়ার পর হাতে নিয়ে বেশ কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীলিমা। ক্যামেরা তার শুধু মুখটাকেই দেখছে। সে-মুখে যেন একটা গাঢ় আচ্ছন্নতা।

নীলিমা তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

ওপরে ঘরে ঢোকবার সময় তাকে সামনে থেকে দেখলাম। সে ঘরে ঢুকে প্রথমে একটু অবাক হয়ে এদিক-ওদিক চাইল, তারপর দূরে যেন অনুপমকে দেখতে পেয়ে সবিস্ময়ে বললে—ওকি! ওখানে কি করছ?

ক্যামেরা চলে গেল অনুপমের ওপর। সেও যেন একটু চমকে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে একটু হেসে বললে,—না, কিছু না।

[ক্যামেরায় শুধু অনুপমেরই পুরো চেহারাটা দেখা যাচ্ছিল। নীলিমা এসে সেখানে দাঁড়াবার সঙ্গে ক্যামেরা একটু পিছিয়ে তাকে জায়গা দিলে।]

কি করছিলে কি!—বলে নীলিমা নিচের দিকে চেয়ে ভ্রুকুটি করলে। নিচের সাজানো ফুলের পাত্রটা অবশ্য ফ্রেমে নেই।

বললাম ত' কিছু না! অনুপম তার মনোযোগটা অন্য দিকে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কে এসেছিল কে?

জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে নীলিমার হাতের টেলিগ্রামটা দেখতে পেয়ে ছিনিয়ে নিলে অনুপম। আচমকা টান পড়ায় নীলিমা বাধা দিতে পারেনি।

অনুপমকে টেলিগ্রামের ভাঁজ খুলে পড়তে দেখে সে এবার তীব্র প্রতিবাদই জানালে, টেলিগ্রাম পড়ছ কেন? দাও।

অনুপমের টেলিগ্রাম পড়া তখন হয়ে গেছে। সেটা নীলিমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে হেসে বললে,—চিঠি ত' নয়, টেলিগ্রাম পড়তে দোষ কি? একটু থেমে আবার বললে,—চিঠি হলেও অবশ্য পড়তে আপত্তি করতাম না। নীচ, ইতর কি বলবে বলো এবার।

সেসব কিছুই বলব না—নীলিমা শান্ত স্বরে বললে,—এবার তুমি যাও।

যেতে বলছ!—নীলিমার দিকে চেয়ে অদ্ভুতভাবে হাসল অনুপম—আর যাবার কি দরকার আছে? রাস্তা ত' আমাদের পরিষ্কার। আজকের রাত্রের মত কোনো ভাবনা নেই। কী মহাপ্রলয় হয় পৃথিবীতে যদি থেকে যাই?

কোনো উত্তর দিলে না নীলিমা। তীব্র দুর্বোধ দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে রইল অনুপমের দিকে।

অনেকক্ষণ নীরবে সে-দৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করে যেন হেরে গিয়ে বেশ একটু সশব্দে হেসে উঠে অনুপম বললে,—না, পকেটের এ-টাকাগুলো ওড়বার জন্যে ছটফট করছে। যেতেই হয় সুতরাং।

শুধু ওইটুকু বলেই চলে যেতে যেতে খানিক গিয়েই ফিরে দাঁড়াল অনুপম। ক্যামেরা তাকেই অনুসরণ করে গেছে সেখানে।

দরজা-টরজা কিন্তু ভালো করে বন্ধ করে রেখো নীলু!—এখনই যেন নেশায় গলাটা জড়িয়েছে বলে ভান করে অনুপম বললে, নেশা তেমন চাপলে হয়ত এখানে হানা দিতে আসতেও পারি।

কথাটা বলেই আর এক মুহূর্তে দাঁড়াল না অনুপম। যেন মিলিটারী কায়দায় ফিরে দাঁড়িয়ে গট গট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ওই পর্যন্ত দেখেই ক্যামেরা ফিরল নীলিমার মুখের ওপর। স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ অমনি নিস্পন্দ হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ফিরল তার সেই সাজানো ফুলের পাত্রের দিকে।

সেদিকে তাকাবার সঙ্গে তার চোখের বিস্ময় স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সে নিচু হয়ে বসবার পর তার পেছন থেকে ক্যামেরায় বিস্ময়ের কারণটা বুঝলাম।

ফুলগুলো এখন নতুনভাবে সাজানো। নীলিমা যখন নিচে টেলিগ্রামটা নিতে গিয়েছিল, তখন অনুপমই সাজিয়েছে।

সাজানো বলতে কিছু নয়, বাহারী ফুল পাতার মধ্যে তিনটে শুকনো কাঁটা-ওঠা মরা কাঠি আঁকাবাঁকাভাবে পোতা।

সব মিলে অদ্ভুত একটা চেহারা কিন্তু তাতে হয়েছে।

আজকাল বারোয়ারি পুজোয় নূতন এক উৎপাত শুরু হয়েছে—'প্রতিমার আবরণ উন্মোচন'। শুধু মা-দুর্গার বেলায় নয়, বুঝুন, মা-কালীর বেলায়ও। বিজ্ঞপ্তি বেরুল, বিশিষ্ট কোনো সাহিত্যিক না সম্পাদক বা কোনো বিদুষী মহিলা প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করবেন। কী দারুণ দুষ্কাণ্ড, সন্তানের হাতে মায়ের আবরণ-উন্মোচন! প্রতিমা তো প্রকাশিতা, তার আবরণ কে উন্মোচন করবে?

কিন্তু মাঠের আবরণ জোর করে টেনে তুলে ফেলল ডাউলিং, নিউজিল্যান্ডের ক্যাপটেন। হায়দ্রাবাদ টেস্টের শেষ দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে ইন্ডিয়া যখন ব্যাট করছে তখনই তাপভঞ্জন বৃষ্টি নামল। আহা, কী ব্যাটিং-এর ছিরি! প্রথম ইনিংসে চার শ্রীমান শূন্য—জয়সীমা, সোলকার, পাটাউডি, অম্বর রায়—অল আউট উননব্বুই। দ্বিতীয় ইনিংসে জয়সীমা আবার শূন্য, পাটাউডি ৯, অম্বর রায় ৪—সাত উইকেটে ছিয়াত্তর। তারপর ইন্ডিয়া যখন হারের মুখে লজ্জা-নিবারণ বৃষ্টি নামল। নামল মুষলধারে। যদি এবার বৃষ্টি বাঁচায়। জলে কলঙ্কের দাগ মোছে!

তেরপল দিয়ে তাড়াতাড়ি পিচ ঢাকা হল। ডাউলিং ভাবছে বৃষ্টিটা থামুক, পাটাউডি ভাবছে বৃষ্টিটা চলুক। এপার-ওপার। এক চোখে কাঁদা আর-চোখে হাসা। চাষী ভাবছে, বৃষ্টি হলে মাঠে লাঙল দেব, আবার বুড়ি ভাবছে রোদ উঠলে বড়ি কটা শুকিয়ে নেব।

মাঝপথে বৃষ্টি হঠাৎ থেমে গেল আর মাঠ ভরে গেল রুপালি রোদে।

এবার তবে আচ্ছাদন সরাও। আবরণ উন্মোচন করো।

কর্তাব্যক্তিরা গা করে না। উপযুক্ত সংখ্যক লোক নেই যে মাঠটাকে খালাস করে।

ঢাকবার বেলায় ছিল, তোলবার বেলায় নেই? ডাউলিং-এর তর সয়না, সে নিজেই গেল তেরপল টানতে। ক্যাপটেনকে নামতে দেখে তার দলের খেলোয়াড়রাও হাত লাগাল। এ পর্যন্ত ইন্ডিয়ার বিপক্ষে একটা সিরিজও জিততে পারেনি নিউজিল্যান্ড। হায়দ্রাবাদে শেষ টেস্টে জিততে পারলে তার একটা কীর্তিস্থাপন হয়—আর এই সেই সুবর্ণসুযোগ। বৃষ্টি যখন থেমেছে তখন যে করেই হোক, খেলা ফের শুরু করা চাই আর শুরু করলেই যে ইন্ডিয়ার বাকি তিন উইকেট তিন ফুঁয়ে উড়ে যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তাই দলবল নিয়ে ডাউলিং-এর তেরপল টানা।

কিন্তু প্রশ্ন এই, এই আচরণটা কি ক্রিকেট?

তেরপল টানা কি বিপক্ষ দলের ক্যাপটেনের এক্তিয়ার? সেটা সম্পূর্ণ আম্পায়ারদের এলাকা। যদি উপযুক্ত সংখ্যক লোক না থাকে, বুঝতে হবে আম্পায়ারদের অভিমতে বৃষ্টি-ভাসা মাঠে ক্রিকেট অচল। তারা যদি বুঝত সামান্য বৃষ্টি, খেলা চলবে, তা হলে তারাই লোক জোগাড় করে তেরপল হটাত। মাঠে পুলিশ ছিল, তাদের ডাকত। ডাউলিং-এর দলকে কষ্ট করে হাত লাগাতে হত না।

কিন্তু দেখা গেল ডাউলিং জেতার জন্যেই খেলছে, সেটা ষোল আনা ক্রিকেট হোক বা না হোক।

জয়ের জন্যে খেলবে এ তো জানা কথা কিন্তু ক্রিকেটকে বিসর্জন দিয়ে নয়। আজকাল ক্রিকেট যেন ক্রিকেট থাকছে না, রিকেট হয়ে যাচ্ছে।

আচ্ছাদন সরিয়ে দেখা গেল মূলে পিচেও জল ঢুকেছে, খেলা অসম্ভব। বাকি খেলা আম্পায়াররা বাতিল করে দিল। কিউইদের আর সিরিজ জেতা হল না। শুধু হানা হানলেই শিকার পাওয়া যায় না। শুধু পাড়-মার ছুটলেই ধরা যায় না সৌভাগ্যের ট্রেন।

হ্যাঁ, বৃষ্টিটা ইন্ডিয়াকে বাঁচিয়েছে। এতে গোসা করবার কিছু নেই। বৃষ্টিটাও খেলার মধ্যে।

জেতার জন্যে উৎসাহ ভালো, অন্ধ জেদ ভালো নয়।

ঘাসী ব্যাপারটাকে কী বলবেন?

চতুর্থ দিনে পিচের ঘাস ছাঁটতে দিল না ডাউলিং। নিয়ম ছিল একদিন পর একদিন ছাঁটতে হবে। সেই হিসেবে তৃতীয় দিনই ছাঁটার দিন। তৃতীয় দিন রেস্ট-ডে গিয়েছে, খেলা হয়নি, ছাঁটাও হয়নি, তাই চতুর্থ দিনে পাটাউডি ঘাস ছাঁটবার দাবি জানাল। ডাউলিং আপত্তি করল, রেস্ট-ডে হলেও ওটাই তৃতীয় দিন, ও দিনের বদলে চতুর্থ দিনে ছাঁটা চলবে না। না, কিছুতেই না।

আম্পায়ারদেরও বলিহারি, ডাউলিং-এর জেদের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করলে। ঘাস আর ছাঁটা হল না। ঘাস থাকলেই ফাস্ট বোলারদের সুবিধে, নিউজিল্যান্ডের সুবিধে।

কিন্তু হালে যে ঘাস ছাঁটার নিয়মটা পালটেছে এ আর কেউ না জানুক আম্পায়ারদের জানা উচিত ছিল। হালের নিয়মে বলা হয়েছে, রেস্ট-ডেতে ঘাস ছাঁটা হবে না। এই নিয়ম অনুসারে পাটাউডির কথামত চতুর্থ দিনেই ঘাস ছাঁটা উচিত ছিল।

একজন লিখছে, পকেটে শুধু ছাতা মার্বেলই নয়, ক্রিকেটের একখানা বাইবেলও যেন রাখে আম্পায়ার।

ঘাস ছাঁটাই হোক বা আছাঁটাই থাক, বৃষ্টির কাছে তুলামূল্য। কিন্তু তাই বলে পিচ থেকে জল সরাবার চেষ্টায় মাঠে গর্ত খুঁড়বে ডাউলিং? না কি এটাই ক্রিকেট?

কিছুতেই কিছু হল না। বিধাতা বিমুখ হলে সুখ কোথায়? নিউজিল্যান্ডের তাই সিরিজ জেতা হল না এ বছর।

জেতার জেদ অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপটেনও দেখাল। ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে আগুন লেগেছে, মাঠে বোতল-বৃষ্টি হচ্ছে, পড়ছে ভাঙা চেয়ারের টুকরো, সদলে পুলিশ ঢুকে

পড়েছে, পুলিশও ছোঁড়া বোতল পালটা ছুড়ে মারছে জনতার দিকে—এমনি পরিস্থিতিতেও লারি জেদ ধরল, খেলা বন্ধ করা চলবে না, চালিয়ে যেতে হবে। খানিকক্ষণ স্থগিত থাকার পর খেলা যখন ফের আরম্ভ হল, তখন উত্তেজনা কিছু শান্ত হলেও আগুন জ্বলছে এখানে-ওখানে। সবচেয়ে গোলমেলে কথা, স্কোর-বোর্ড কাজ করছে না, ধোঁয়ার জন্যে দেখা যাচ্ছে না খেলা—তাতে কী, রেডিও ভাষ্যকারেরা যে স্কোর দিচ্ছে তাই লরি মেনে নেবে, তবু খেলা চাই। দ্বিতীয় ইনিংসে ইন্ডিয়ার আটটা উইকেট পড়ে গিয়েছে, এই এলোমেলো অবস্থায় বাকি দুটো ফেলে দিতে পারলেই শ্মশানের শান্তি।

আশ্চর্য, আম্পায়াররা রাজি হল খেলা চালাতে! যেখানে সাইট স্ক্রিনের সামনে একটা লোক দাঁড়ালে খেলা বন্ধ করতে হয় সেখানে চারদিকে এমন জ্বলন্ত কোলাহল চললেও খেলা চালিয়ে যেতে হবে এর তাৎপর্য বোঝা কঠিন। একটা প্রশ্নও তখন জ্বলে আগুন হয়ে — এটাও কি ক্রিকেট?

প্রসন্ন আউট হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গেই নতুন বিক্রমে শুরু হল উপদ্রব।

খেলা বন্ধ। দিন শেষ। প্যাভিলিয়নে ফিরে গেল ক্যাঙ্গারুরা। যে পারল একটা করে স্টাম্প কুড়িয়ে নিল। কেউ বা নিল বোতল কুড়িয়ে। কে জানে যদি কারু সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়!

আচ্ছা লোকে আম্পায়ার হয় কেন? একেবারে জলজ্যান্ত বোল্ড বা কট-আউট হয়, সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু আম্পায়ার নো-বল বললে কোন বোলার তা খুশি মনে মেনে নেয়? এল-বি বললে কোন ব্যাটসম্যানই বা অনুদ্বিগ্ন থাকে? কিংবা কট-বিহাইন্ড? কিংবা স্টাম্প-আউট? ইন-সাফিসিয়েন্ট লাইট? যাই আম্পায়ার সিদ্ধান্ত করুক, যার বিরুদ্ধে যাচ্ছে সেই বলবে এক-চক্ষু। বিদেশীর পক্ষ হলে স্বদেশীরা বলবে পদলেহী, স্বদেশীর পক্ষ হলে বিদেশীরা বলবে অসাধু। অর্থাৎ এক পক্ষ বলবে শালা, অন্যপক্ষ বলবে চোর।

কিন্তু তুমি ক্রিকেট খেলতে এসেছ তোমাকে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত অপ্রতিবাদে মেনে নিতে হবে। তার সঙ্গে খেলার আগেই তোমার একটা অলিখিত চুক্তি হয়েছে যে, হাঁ-না তার যে-রায়ই হবে তাই শিরোধার্য করবে।

অস্ট্রেলিয়ার বোলার কেন ম্যাকে বল বিপক্ষের খেলোয়াড়ের পায়ে লাগতেই এল-বির আপিল করল: হাউ?

আম্পায়ার ঘাড় ফিরিয়ে 'না' করে দিল।

ম্যাকে রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করলে: আর তবে কী হলে বল স্ট্যাম্পে গিয়ে লাগত জিজ্ঞেস করি?

আম্পায়ার রসিক, চটল না। হাসিমুখে বললে, তোমার বল স্ট্যাম্পে গিয়ে লাগলেও বেল পড়ত না।

ঘুরিয়ে কেমন ফিরিয়ে দিল আম্পায়ার।

রামাধীনের একটা বল মারতে গিয়ে ফসকাল ব্যারিংটন। বলটা ব্যারিংটনের বাঁ পায়ের প্যাডে লেগে উইকেটকিপার আলেকজান্ডারের গ্লাভসের মধ্যে ঢুকল। যথারীতি দুর্ধর্ষ গর্জন উঠল: হাউ? আম্পায়ার জোডার্ন আঙুল তুলে দিল: আউট।

বলা বাহুল্য, সিদ্ধান্তটা ব্যারিংটনের মনঃপুত হল না। সে দাঁড়িয়ে রইল। বিপক্ষের ক্যাপটেন আলেকজান্ডারকে জিজ্ঞেস করল: কী আউট হলাম—এল-বি?

আলেকজান্ডার বললে, না। কট বিহাইন্ড।

ভীষণ বিরক্ত হল ব্যারিংটন। কিন্তু প্যাভিলিয়নে ফিরে না গিয়ে উপায় কী! ব্যারিংটন খুব আস্তে আস্তে শোক-সঙ্গীতের সুরের চেয়েও মন্থরগতিতে ফিরে চলল। প্রেস চারদিক থেকে তাকে ছেঁকে ধরল: কী ব্যাপার বলুন।

ম্যানেজার রবিন্স ব্যারিংটনকে বললে, আমার মনে হয় তোমার চুপ করে থাকাই সমীচীন হবে।

ব্যারিংটন কথাটা মানল। কোনো মন্তব্য করল না।

তারপর রবিন্স ব্যারিংটনকে ড্রেসিং রুমে নিয়ে গিয়ে বললে, তোমার ঐ ব্যবহারটা ঠিক হয়নি।

কোন ব্যবহার?

ঐ আলেকজান্ডারকে প্রশ্ন করা আর অমন শোকার্ত পায়ে ফিরে আসা।

ব্যারিংটন চোখ নামাল।

আমার মনে হয় তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। বললে রবিন্স, শুধু আম্পায়ারের কাছে না, আলেকজান্ডারের কাছেও। ভুলো না তুমি ক্রিকেট খেলছ। এখানে আম্পায়ার আঙুল তুললেই তোমাকে পত্রপাঠ বিদায় নিতে হবে।

ব্যারিংটন খাঁটি ক্রিকেটারের মত আলেকজান্ডার ও জোডার্নের কাছে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলে।

ব্যাট হাতে প্যাভিলিয়নে ফিরে এলে কোনো ক্রিকেটারকেই পরাভূত দেখায় না—যতই সে রান করুক, শূন্য বা সেঞ্চুরি। ব্যাটটাকে লাঠি করে ফিরলেই সে পরাভূত।

বেঙ্কটরাঘবনকে কট-বিহাইন্ড আউট দিল আম্পায়ার। তবু সে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ স্তব্ধতাটা প্রতিবাদের ভঙ্গি। যেন সে বলতে চাইছে ব্যাটের সঙ্গে বলের সংস্পর্শ হয়নি, অতএব সে আউট নয়। তার বলায় কিছু হবে না, রেডিওর ভাষ্যকারদের সমর্থক টিপ্পনীতেও কিছু হবে না, সমগ্র জনতার চিৎকারেও কিছু হবে না। আম্পায়ার যখন তর্জনী তুলেছে তখন তুমি নিরবকাশরূপে আউট—আউট না হলেও আউট। আদালতি রায়ের বিরুদ্ধে আপিল চলে কিন্তু আম্পায়ারের রায় একেবারে নিরঙ্কুশ। এখানে ভুলও ভুল নয়। রাজা যেমন অন্যায় করতে পারে না, আম্পায়ারও পারে না ভুল করতে। আর সব কিছুর প্রতিকার আছে কিন্তু মৃত্যুই অপ্রতিকার্য।

এই সর্ত মেনে চলাই ক্রিকেট।

আচ্ছা যদি এমনি হয় আউট দেবার পরও ব্যাটসম্যান নড়ল না, স্টে-ইন করে মাঠে বসে রইল, তখন কী হবে? কিংবা যদি জনতা এসে আম্পায়ারকে ঘেরাও করে আর ধ্বনি তোলে, আউট দেওয়া চলবে না, তা হলে আম্পায়ার কি আউট নাকচ করে দেবে?

ক্রিকেট কি এখন সেই দিকে যাচ্ছে?

আরো যন্ত্রণা, সবজান্তার ভূমিকায় রেডিওর ধারাবিবরণীতে উত্তাপ ছড়ানো।

এখানে ধারাবিবরণী ঢাকায় চর্বিত-বিবরণী।

ঢাকায় বেতারে নিউজিল্যান্ডের খেলায় সেকী উত্তেজনা! আট উইকেট পড়ে গিয়েছে, পাকিস্তানের নির্ঘাৎ জিত। যে যেখানে আছ পাকিস্তানের জয় প্রত্যক্ষ করে যাও। রেডিওর আহ্বানে সে কী সাড়া, সে কী সুখ! লোকে লোকারণ্য হল মাঠ। হুলুস্থুল পড়ে গেল।

কিন্তু বার্জেস আর কিউনিস আউট হয় না কিছুতেই। ক্যাচের পর ক্যাচ ফেলতে লাগল পাকিস্তান—বার্জেস সেঞ্চুরি করে বসল।

তারপর যখন অল-আউট হল দেখা গেল নিউজিল্যান্ডের রান প্রায় পর্বতকায়।

পাকিস্তান খেলতে এসে দ্রুত হারাতে লাগল উইকেট। এ যে দেখি বিপরীত কান্ড! কোথায় নির্ঘাৎ জিতবে, তা নয় উলটে হেরে যাওয়া! অসম্ভব। জনতা তখন আওয়াজ তুলল, ইনসাফিসিয়েন্ট লাইট, খেলা বন্ধ করো।

জনতা খেলা বন্ধ করিয়ে ছাড়ল।

আবার সেই প্রশ্ন—লোকে আম্পায়ার হতে যায় কেন? এক মুহূর্তের জন্যেও শিথিল হওয়া নেই, উইকেট-কিপারের চেয়েও কঠিন চাকরি, তারপর এক থেকে ছয় গোনা, অন্যের টুপি আর সোয়েটার ধরা। তারপরে রামে মারে রাবণে মারে হনুমানও দাঁত খিঁচোয়। 'না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ্গ।'

'কানপুর টেস্টে কী হবে?' স্বপ্না জিজ্ঞেস করল। তারপর দুঃখিত মুখ করে বললে, 'সুরতি চলে গেল।'

আমি বললুম, 'না, আরতি চলে গেছে। যদি থাকতে হয় সুরতিই আছে।'

'তুমি কার কথা বলছ?' স্বপ্না অবাক হল, 'আমি বলছি সুর্তি, রুসী সুর্তি চলে গেছে।'

'সুর্তি গেছে তো সুরতি কেন?'

'কাগজে যে তাই লিখেছে—সুরতি চলে গেলেন।'

'তারপর যখন ফিরে এসে খুব স্ফূর্তিতে ব্যাট হাঁকড়াবে তখন কী লিখবে?'

স্বপ্না খিলখিল করে হেসে উঠল: 'লিখবে সুরতির ফুরতি!'

ততদিন পর্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ না করে উপায় নেই।

অজয় বসু

প্রমীলা ক্রিকেট পুরোনো ব্যাপার

হকির ধাত্রীগৃহ আমাদের ভারতভূমি। এ দেশের অঞ্চল বিশেষে ফুটবলও এক সাড়া জাগানো অনুষ্ঠান। কিন্তু গত দশ বছরে ক্রিকেট, বিশেষ করে টেস্ট ক্রিকেট ঘিরে যে মাতামাতি আরম্ভ হয়েছে তার তুলনা মেলা ভার।

ক্রিকেটের জনপ্রিয়তার কারণ অনেক। মূল কারণ বোধহয় এই যে, টেস্ট ক্রিকেট মাঠে হাজিরা দিতে পারলে রথ দেখা ও কলা বেচা, দুটি কাজই সুসম্পন্ন করার সম্ভাবনা থাকে। খেলাকে খেলাও দেখা হয়। এবং দেখতে দেখতে শীতের দুপুরটিকে নীল আকাশের নীচে মুক্ত পরিবেশে কাটিয়েও দেওয়া যায়। চোখের সামনে চিত্তাকর্ষক চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। আবার গ্যালারিতে বসে টিফিন বাক্সগুলির সদ্ব্যবহার করে পিকনিকের মেজাজেও ডুবে থাকা যায়।

বছর বছর বিদেশী দলের ভারত পরিক্রমণের সূত্রে ক্রিকেটের আকর্ষণ বাড়ছে তো বাড়ছেই। বলতে গেলে, ক্রিকেটের আবেদন আজ যেন ভারতীয় জনজীবনের সর্বস্তরেই ছড়ানো। এক একটি খেলায় ভীড় যা হয় ইডেন বা ব্রাবোর্ণের সীমিত পরিবেশে তা আটকে রাখা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

ভীড় জমাতে শুধু ছেলেরাই নন, মেয়েরাও তৎপর। শুনেছি ইডেনের গ্যালারির মাথায় এবার সামিয়ানা বিছানো হবে না। তাই দুপুরের গনগনে আঁচে দর্শকমণ্ডলীর তালু ফাটার আশংকা থাকবে। এই অসহ্য পরিস্থিতি অনেকের কাছেই স্বস্তিদায়ক নয়। হয়তো সেই কারণে এবার ইডেনে মহিলাদের ভীড় কিছুটা পাতলা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে তো ভবিষ্যতের কথা। অতীতে, মানে গত দশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, ক্রিকেট খেলা স্বচক্ষে দেখার বিষয়ে মহিলাদের উৎসাহ, আগ্রহ পুরুষদের চেয়ে কম নয়। মাঠে যদি মহিলারা সংখ্যায় কম থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে যে টিকিট প্রাপ্তির গলিঘুঁজিগুলির সন্ধান তাঁরা এখনও ঠাওর করতে পারেননি।

তবে মহিলাদের উৎসাহ শুধু দেখা এবং শোনাতেই। হাতে-নাতে ব্যাট বল করায় তাঁদের সক্রিয়তা এখনও উজ্জীবিত হতে পারেনি। পাড়ার গলিতে বা আশপাশের সংরক্ষিত মাঠে-ঘাটে বিক্ষিপ্ত ভাবে দু-চারজন কিশোরীকে অথবা চিত্র-তারকাদের প্রীতি-প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে রূপোলী পর্দার নায়িকাদের ব্যাট হাতে নামতে দেখা গেলেও অসংকোচে বলা যায় যে, এখনও আমাদের দেশে ক্রিকেট খেলাটা পুরুষালী একচেটিয়া হয়ে রয়েছে। মেয়েরা সক্রিয়ভাবে ওই আঙিনার ধারেও আসতে পারেন নি।

ইঞ্চি নয়েক পরিধি এবং পৌনে ছ' আউন্স ওজনবিশিষ্ট ক্রিকেট বলটি আকারে কিছুই নয়। কিন্তু কাঠিন্যে রীতিমতো এক বস্তুবিশেষ। মারাত্মক গোলার মতো। এই বল বেটপকা স্থানে অস্থানে লেগে গেলে বড়সড় আঘাত পাওয়াও বিচিত্র নয়। তাই হয়তো মহিলারা সাহস করে ক্রিকেট মাঠের দিকে পা বাড়াতে ভরসা পাননি। কিন্তু আজকাল তাঁরা অন্য যেসব খেলায় সক্রিয়ভাবে যোগ দেন, সেগুলিতেও আঘাতপ্রাপ্তির আশংকা যে একেবারে নেই এমন কথাও বলা যায় কি?

অ্যাথলেটিকের আসরে মেয়েরা আজকাল নিয়মিত দৌড়ঝাঁপ করছেন। টেনিস, কাবাডি ভলি, বাস্কেটবলও চুটিয়ে খেলছেন। এইসব খেলায় আঘাত পাবার সম্ভাবনা কি আদৌ নেই? সিণ্ডার ট্র্যাকে আচমকা মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেই হলো। হাত-পা ছড়ে যেতে পারে। ভলিবল বা কাবাডি কোর্টে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতেই বা কতক্ষণ? মিক্সড ডাবলস টেনিসে ওপক্ষের পুরুষ খেলোয়াড় কাছ থেকে সজোরে স্ম্যাস করলে বল যে গতিতে ছোটে তা গুলীর চেয়ে কম নয়। সেই বল যদি শরীরে লাগে তাহলে কালশিরার দাগ পড়বে না কি?

আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে জেনেও আমাদের দেশের মেয়েরা অন্য অনেক খেলায় হাত দিয়েছেন। কিন্তু ক্রিকেট সম্পর্কে যাঁদের পরোক্ষ অনুরাগ অপরিমিত হলেও, ক্রিকেটের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ গড়ার এখনও তাঁরা প্রেরণা পান নি। সাবেকী সংকোচ, শংকা এবং পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতাই এক্ষেত্রে পথের বাধা। এই বাধা যদি সরানো যেতো তাহলে ক্রিকেট যে আরও মজার খেলায় রূপান্তরিত হোতো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এমনিতেই ক্রিকেটের অনেক গ্ল্যামার। সে গ্ল্যামার আরও বাড়তো বৈকি।

তবে আমরা না খেললেও অন্য দেশে মহিলারা কিন্তু ক্রিকেট খেলেন। প্রীতি ক্রিকেট তো বটেই। এমনকি পাঁচদিনব্যাপী টেস্ট ক্রিকেটও। এবং অন্য দেশে প্রমীলা ক্রিকেটের নজীর কোনো সাম্প্রতিক দৃষ্টান্তও নয়। ওঁরা ব্যাট-বলে হাত দিয়েছেন বহু যুগ আগেই।

'ক্রিকেটের জনক' ডাঃ ডব্লিউ জি গ্রেসের জন্মসাল ১৮৪৮। 'প্রাচীন ব্যক্তি' হিসেবেও তিনি সর্বত্র পরিচিত। কিন্তু এ হেন প্রাচীন ব্যক্তির জন্মের একশ বছর আগেও ইংরাজ ললনারা ক্রিকেট খেলেছেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।

ক্রিকেট অনুরাগীদের উৎসাহে এক প্রতিনিধি সম্মেলনে যে বছর ক্রিকেটের নিয়মাবলী প্রথম রচিত হয় সেই ১৭৪৫ সালেই ছাব্বিশে জুলাই ইংলণ্ডের গিলফোর্ডে গসডেন কমন মাঠে প্রমীলা ক্রিকেটের প্রথম আসর পাতা হয়। খেলা হয়েছিল হ্যাম্বলেডনের এগারোজনের সঙ্গে ব্রামলের এগারোজন তরুণীর মধ্যে। এলোমেলো খেলা নয়, নিয়মমাফিক অনুষ্ঠান। তাই সংগৃহীত রানের হিসেবে সে খেলার হারজিত হয়েছিল। হ্যাম্বলেডন দলই জেতে ১২৭ রান করে, প্রতিপক্ষের ১১৯ রানের জবাবে।

সুরু সেই ১৮৪৫ সালে। সেই থেকে ইংরাজ ললনারা ক্রিকেট খেলে আসছেন। পুরুষ প্রভাবিত সমাজ মেয়েলী ব্যাপার বলে এই আসর সম্পর্কে বরাবরই নিস্পৃহ থাকতে চাইলেও ঘটনাবলী কিন্তু ইতিহাসের হাত ধরে ধীরে ধীরে এগিয়েছে।

এগোতে এগোতে মহিলাদের মাঠে পেশাদারী ক্রিকেটেরও অনুষ্ঠান হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে (১৮১১) মিডলসেকসের বল্‌স পনডের কাছে পাঁচশ গিনীর বাজী ধরেও দুই মহিলা দলে তিনদিনব্যাপী কাউন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই খেলাতে সারেকে হারিয়েছিল হ্যাম্পশায়ার। আইন মাফিক অনুষ্ঠান। দু দলই দু ইনিংস ব্যাট করে।

মহিলা মহলের প্রথম পেশাদারী কাউন্টি ম্যাচে শুধু যে তরুণীরাই অংশ নিয়েছিলেন তা নয়। প্রবীণাও হাজির ছিলেন। দু-পক্ষ মিলিয়ে যিনি সেই আসরে সেরা বোলারের স্বীকৃতি পান তিনি হলেন সারের অ্যান বেকার, বয়স ষাট। অ্যান বেকার ছোটাছুটিতেও কমতি যান নি—তাঁর গতির সঙ্গে কমবয়সীরাও নাকি পাল্লা দিতে পারেন নি।

মোটা টাকার বাজী ও আড়ম্বরপূর্ণ ভোজের ব্যবস্থা ঘিরে ১৮৩৫ সালে কুমারী ও গৃহবধূদের একটি উল্লেখযোগ্য ক্রিকেট খেলা হয়েছিল ইংলন্ডের পারসনস গ্রীন মাঠে। বলা বাহুল্য, সেই খেলায় গৃহবধূরা কুমারীদের কৃতিত্বের নাগাল ছুঁতেই পারেন নি।

ইংলন্ডই পথিকৃৎ। ইংলন্ডের দেখাদেখি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের তরুণীরা ক্রিকেট মাঠে নামতে আরম্ভ করেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে।

বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৯০১ সালে ভিজিটার্স বনাম ইস্ট-বোর্ণের রেসিডেন্ট দলের খেলায় আগন্তুক পক্ষের কুমারী ম্যাবেল ব্রায়ান্ট (পেশায় স্কুল শিক্ষিকা) ২২৪ রান করে অপরাজিত থেকে যান। এটি এক রেকর্ড, যে রেকর্ড পরবর্তী আটষট্টি বছরেও কেউ ভাঙতে পারেন নি।

কুমারী ব্রায়ান্টের কীর্তিতে আরও উৎসাহিত হয়ে মহিলা ক্রিকেটাররা এম-সি-সির অনুসরণে মহিলা ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। অন্য মহল যদি তাঁদের সাহায্য করতেন তাহলে হয়তো ওই সংস্থা অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হোতো। কিন্তু সে সাহায্য পাওয়া যায়নি। ফলে মহিলাদের একক চেষ্টায় নিয়ামক সংস্থা প্রতিষ্ঠায় অনেক বিলম্ব ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯২৬ সালে মহিলা ক্রিকেট সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সাত বছরের মধ্যেই মহিলা ক্রিকেট দলের আন্তর্জাতিক সফর বিনিময়ও শুরু হয়ে যায়। সর্বপ্রথম ইংলন্ডই সফর করে (১৯৩৪ সালে) অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

সফরকারী সেই দলের মার্টেল ম্যাকলাগান সিডনীতে ১১৯ রান করে মহিলাদের ক্রিকেট টেস্টে সর্বপ্রথম সেঞ্চুরী করেছিলেন। সেই দলের অপর সদস্যা মলি হাইড হলেন মহিলা ক্রিকেটকুলে সবচেয়ে প্রচারিত চরিত্র। সফরে তাঁর ব্যক্তিগত রানের গড় পৌঁছেছিল ৬৩·২৫ এর ঘরে। মলি উত্তরপর্বে ইংলন্ডকে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন এবং ব্যাটিংয়ে ব্যক্তিগত সাফল্যের মূল্যায়নে তিনি 'মহিলা মহলের ব্র্যাডম্যান' এর স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন।

ইংলন্ডের পর অস্ট্রেলিয়ার ও নিউজিল্যান্ড মহিলা ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এই শতকের তিন দশকে এবং ইংলন্ডের পদাঙ্ক অনুসরণে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড দলও ইংলন্ড পরিক্রমায় আসে। আসা যাওয়ায় আজও ছেদ পড়েনি। তবে টাকা পয়সার অভাব বলেই তেমন নিয়মিত সফর বিনিময় করা সম্ভব হয় না।

ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকা, নেদারল্যান্ড, মায় আমেরিকাতেও মহিলা ক্রিকেটের প্রচলন রয়েছে এবং মহিলাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণে ১৯৫৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী একটি আন্তর্জাতিক সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইংলন্ডের মলি হাইডের পর যিনি ব্যক্তিগত দক্ষতায় মহিলা মহলে সবচেয়ে নাম কিনেছেন তিনি হলেন অস্ট্রেলিয়ার বেটি উইলসন। ব্যাটে বলে সমান, রীতিমতো চৌকশ। ভিক্টোরিয়ার সেণ্ট কিলডা মাঠে একটি টেস্টে তিনি হ্যাট-ট্রিক করেছেন। এবং কদিন পর এডিলেড টেস্টে ১২৭ রান করার পর বেটি উইলসন একাত্তর রানে বিপক্ষের ছ'জনকে আউটও করে দেন। মলি হাইড যদি 'ব্র্যাডম্যান' হন, তাহলে বেটি উইলসনকে 'গ্যারি সোবার্স' বলতে বাধা কোথায়? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে আর এক নামকরা ক্রিকেটার হলেন ইংলন্ডের মেরি ডুগান। এক পর্যায়ের মাত্র দুটি টেস্টে মেরি ডুগান নয় নয় করে তেইশটি উইকেট পেয়েছেন।

মলি হাইড, বেটি উইলসন, মেরি ডুগানেরা তো নাতে হাতে ক্রিকেট খেলছেন। কিন্তু নিজেরা খেলেন নি অথচ এই খেলাটির ইতিহাস রচনার পথে পরোক্ষ অবদান রেখে গিয়েছেন ক্রিকেট অনুরাগী এমন মহিলাকেও আমরা চিনি।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে গ্রেস জননী শ্রীমতী মার্থার নাম। ক্রিকেটের প্রতি অসীম অনুরাগ ছিল এবং ছেলেরা যাতে দক্ষ ক্রিকেটার হতে পারেন তার জন্যে তিনি চেষ্টার কসুর করেন নি। ছেলেদের উৎসাহ দিতেন এবং প্রয়োজনে তাঁদের খেলার নির্দয় সমালোচনাতেও মুখর হয়ে উঠতেন। সন্তানদের খেলোয়াড় জীবন মনোমত গড়ে তোলায় জননীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল বলেই ডব্লিউ জি, ই এম ও জি এফ গ্রেস, তিন সহোদরই কালে বিখ্যাত ক্রিকেটার হয়ে একই টেস্টে (১৮৮০ সালে ওভালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে) জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

জন ওয়াইলস ক্রিকেটে এক ঐতিহাসিক চরিত্র। আন্ডারআর্মের বদলে ওভারআর্ম বোলিং (কাঁধের ওপর হাত তুলে) তিনিই প্রথম আরম্ভ করেছিলেন। ওভারআর্ম বোলিংয়ের বিপ্লবাত্মক পদ্ধতি এক সময় ক্রিকেট দুনিয়ায় প্রচণ্ড বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। নিয়মবিরুদ্ধ বলে রীতিটিকে সেদিন অনেকে বরবাদ করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত ক্রিকেট মাঠে ওভারআর্ম বোলিং চালু হয়েছে। ওভারআর্ম বোলিং চালু হতে জন ওয়াইলস এই পদ্ধতির পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত হলেও আসলে ওভারআর্ম বোলিং-য়ের কৌশলটি আবিষ্কার করেছিলেন জনের সহোদরা ক্রিশ্চিয়ানা।

ক্যান্টারবারিতে ওয়াইলস পরিবারের বাড়ী সংলগ্ন মাঠে জন আর ক্রিশ্চিয়ানা যখন ক্রিকেট খেলতেন তখনই ক্রিশ্চিয়ানা কাঁধের ওপর হাত তুলে বল করতেন। তখনকার দিনে ইংরাজ ললনাদের ঘাগরাটি ছিল বৃহদাকার। কোমরের নীচ থেকে ফুলে ফেঁপে ফানুসের মতো হয়ে থাকতো। বৃহদায়তন ঘাগরার জন্যে কোমরের নীচে হাত ঘুরিয়ে বল করতে অসুবিধে হোতো বলেই ক্রিশ্চিয়ানা তাঁর ডান হাতটিকে কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে বল ছাড়তেন। তাতে বলের গতি বাড়তো, নিশানাও লক্ষ্যে স্থির থাকতো। দেখে ওভারআর্ম বোলিংয়ের কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে জন ওয়াইলসও এই বোলিং পদ্ধতি ছেলেদের খেলার মাঠে আমদানী করেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দিকপাল খেলোয়াড় লর্ড লিয়ারি কনস্টানটাইনের সহোদরা লিওনোরা এবং লিয়ারির জননী, উভয়েই মহোৎসাহে ক্রিকেট খেলতেন।

প্রমীলা-ক্রিকেট : নেহাৎ মেয়েলী ব্যাপার নয়। ফিল্ডিংয়ের ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে ওঁরা রীতিমত সিরিয়াস।
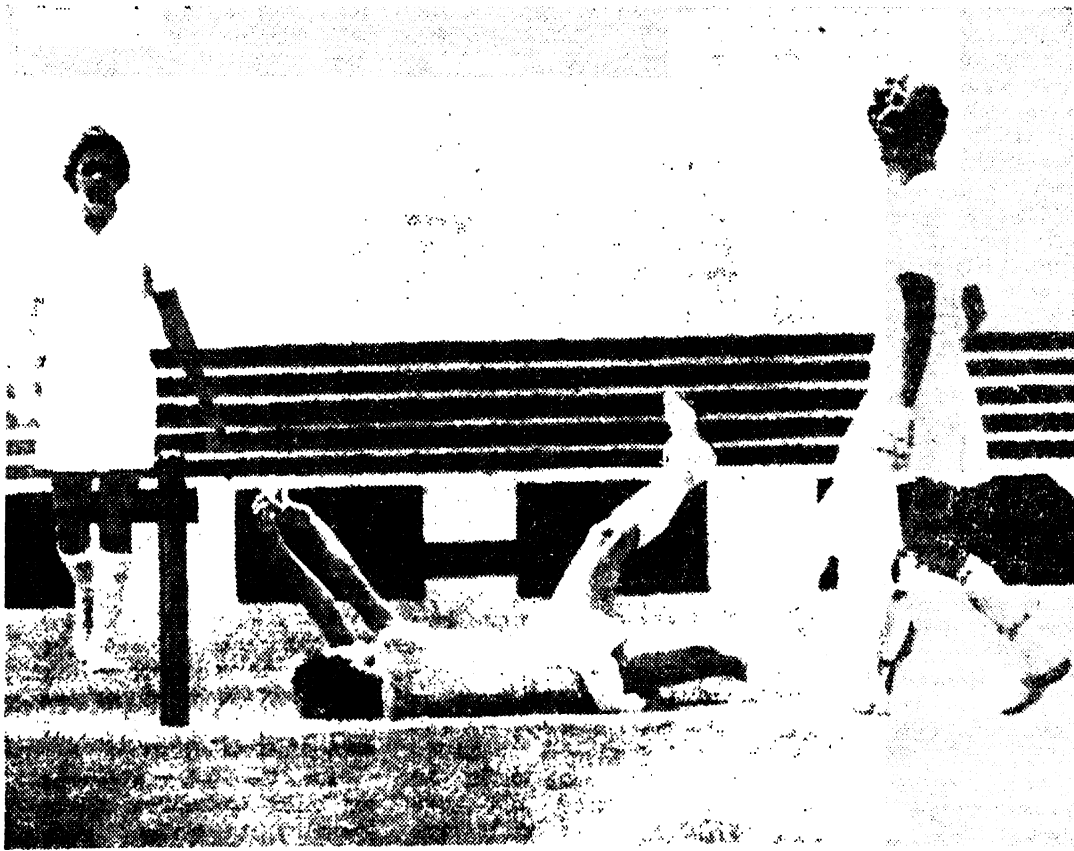
লর্ড লিয়ারি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'মা ছিলেন উইকেট-কিপার। উইকেটরক্ষণে তাঁর নৈপুণ্য কাউণ্টি ক্রিকেট দলের সাধারণ উইকেট-রক্ষকের সমপর্যায়ভুক্ত ছিল। আর বোন লিওনোরার ঝোঁক ছিল ব্যাটিংয়ের প্রতিই বেশি। লিওনোরার মারের জোর ছিল এমন যে স্বচক্ষে দেখলে লজ্জা পেয়ে অনেক পুরুষ ক্রিকেটার বোধহয় খেলাই ছেড়ে দিতে চাইতেন!'

কিন্তু এ সবই তো অন্য মুলুকের কাহিনী। মহিলা মহলে ক্রিকেটের প্রচলনে আমাদের দেশ সত্যিই পিছিয়ে রয়েছে। শক্ত গোলার মতো বলের ঘায়ে দেহের এখান ওখান আঁচড়ে যাবার আশঙ্কা ও সম্ভাবনা থাকলেও (মহিলাদের ব্যবহৃত বলের ওজন অপেক্ষাকৃত কম। বড়জোর পাঁচ আউন্স) ইংলণ্ড ও অন্য কয়েকটি দেশের মেয়েরা সেই আশঙ্কাকে উপেক্ষা করতে পেরেছেন। কিন্তু ভারতীয় ললনারা এখনও পারেন নি।

মেয়েরা ক্রিকেট মাঠে নামলে হৈ হট্টগোল বাড়তে পারে বলে যাঁরা মহিলা ক্রিকেটের বিরোধী, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে একালে হৈ হট্টগোলের আওতা থেকে কোন্ খেলার আসরই বা মুক্ত থাকতে পারছে। মেয়েরা খেলেন না অথচ ফুটবল মাঠে নিত্যই তো নানা মেঠো কাণ্ড ঘটছে। ভেঙ্কটরাঘবন আউট বলে আম্পায়ার যেই তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন অমনি আসিনে গোটানো ছোকরারা ইট চেয়ার ছুড়ে, সামিয়ানায় আগুন ধরিয়ে ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়ামে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। ব্র্যাবোর্ণ টেস্টে তো কোন মহিলা খেলেন নি?

ও সব বিক্ষিপ্ত অঘটন। দল সমর্থকদের বিকৃত মনেরই বহিঃপ্রকাশ। বিকৃত রুচির দাস যারা তারা কবে কি তুলকালাম কাণ্ড বাধাবে তার ভয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা কোনো কাজের কথা নয়। ইংলণ্ডে মহিলা ক্রিকেটের আবির্ভাবেই একদিন খেলোয়াড় সমর্থকদের দল বিক্ষোভের আগুন জ্বালাতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই আগুনে মহিলা ক্রিকেট পরিকল্পনাকে পুড়িয়ে ছাই করা যায় নি।

সেই ঘটনার আদি পর্ব কিন্তু ভারী মজার। ১৭৪৭ সালের ঘটনা এটি। সাসেকসের গ্রামাঞ্চলে দুটি মহিলা দলের খেলায় আম্পায়ার একজনকে আউট দেওয়া মাত্র মাঠের ধার থেকে এক তরুণ ঘুষি বাগিয়ে আম্পায়ারের দিকে ছুটে আসেন। দেখাদেখি আর কজন তরুণও। তরুণদের উদ্ধত শাসানির চোটে খেলা ভেঙে যায় আর কি!

পরে আবিষ্কার করা গিয়েছিল যে সেদিন আম্পায়ার যে তরুণীকে আউট বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং ঘুষি বাগিয়ে যে তরুণ মাঠ মুখে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছিলেন, তাঁরা পরস্পরের প্রেমিক-প্রেমিকা। প্রণয়িনীর অসাফল্য সইতে না পেরে প্রেমিক তাঁর পৌরুষের পরিচয় রাখতে মাঠের মধ্যেই আস্ফালন জুড়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু এইসব আস্ফালনেও ইংলণ্ডে প্রমীলা ক্রিকেটের অগ্রগতি থেমে পড়ে নি। আমাদের দেশে প্রমীলা ক্রিকেটের আসর পাতা হলে আনাচে কানাচে যে একালের রোমিওরা থাকবেন না, তাও হলপ করে বলা যায় না। কিন্তু তাতেই বা কি যায় আসে? ওসব ঘটনাকে বিক্ষিপ্ত জ্ঞানে উপেক্ষাও করা যাবে। আসলে কাজটা আরম্ভ করতে যা বিলম্ব ঘটছে। একবার চালু করা গেলে, এদেশেও প্রমীলা ক্রিকেটের রথ গড়গড়িয়ে ছুটবে বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ, আগেই বলেছি, ক্রিকেট সম্পর্কে ভারতীয় মহিলাদের আগ্রহ, অনুরাগ দিনে দিনে বাড়ছে বই কমছে না।

সে আমি নই আমি নই

মন্মথ রায়

(একাংকিকা)

ললিতা ।। কতকাল পর কালিম্পঙ এলি। তুই আমাদের একেবারে ভুলেই গিয়েছিলি মিত্রা!

মিত্রা ।। যদি ভুলেই যাবো, তবে এসেই তোকে ডেকে আনবো কেন ললিতা?

ললিতা ।। অবাক হয়েছি তাতে। সত্যি এতটা আশা করিনি। তুই এখন জাঁদরেল একটা মিলিটারী অফিসারের বৌ। কত বদলে গেছিস তুই।

মিত্রা ।। কি আবার বদলালাম?

ললিতা ।। বদলাসনি? তোকে আগে যারা জানতো না, তাদের চোখে হয়তো ধরা পড়বে না সেটা। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখছি আমাদের সে মিত্রা আর নেই।

মিত্রা ।। বদলাবার জন্যেই তো মানুষে। জীবনে কত ঢেউ আসছে। ঠিক থাকবো কি করে ললিতা? তুই আমার সাজ-সজ্জা দেখে হয়তো চমকে উঠেছিস।

ললিতা ।। তা চমকে গেছি। তুই না পরতিস খদ্দরের শাড়ি? একটা পান খেতেও কোনোদিন দেখিনি তোকে। আজ দেখছি লিপস্টিক! আর এ পোশাকে তোর বাবার সামনে বেরিয়েছিস নাকি?

মিত্রা ।। কি করবো বল! স্বামী যদি এই সবই চায়, স্ত্রীর উপায় কি? জানিস ললিতা, মাঝে মাঝে ড্রিংক করতেও হয়। বিয়ে করিসনি বলেই স্বামী কি 'চিজ' বুঝিসনি আজও।

ললিতা ।। আমি তোর বাবার কথা ভাবছি। একমাত্র সন্তান তোকে যে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছিলেন—তার কোনো লক্ষণই কিন্তু এবার তোর মাঝে দেখছি না—অন্তত বেশভূষায় আর প্রসাধনে। তিনি কিছু বলেন নি?

মিত্রা ।। ক্ষমা বাবার ভূষণ। আর তাছাড়া, তিনি এখানে নেই। কালিম্পঙ থেকে গ্যাঙটকের পথে কোন এক খুব বড় তিব্বতী সাধু আশ্রম করেছেন, আজ মাস দুই বাবা সেই আশ্রমে গিয়ে পড়ে আছেন।

ললিতা ।। তা, ভালোই হয়েছে।

মিত্রা ।। হ্যাঁ, তা ভালোই হয়েছে। তুই ভাবছিস, বাবা আজ আমাকে দেখলে আঁতকে উঠতেন। কিন্তু আমার স্বামীটিকে দেখলে হয়তো তাঁর হার্ট ফেলই হতো।

ললিতা ।। তিনিও এসেছেন নাকি? ক্যাপ্টেন সেন এখানে?

মিত্রা।। না না, তোর ভয় নেই। এখনো তিনি আসেননি। তবে হ্যাঁ, আজ তাঁর আসবার কথা। এখনো কেন এসে পৌঁছলেন না তাই ভাবছি। তিব্বতের লাসা কি এখান থেকে এতদূরে?

ললিতা।। ক্যাপ্টেন সেন তিব্বতে গেছেন?

মিত্রা।। হ্যাঁ, দিন-পনেরো আগে কলকাতা থেকে উড়ে গেছেন সেখানে। মিলিটারী ডিউটি। আজ তাঁর কালিম্পঙ আসবার কথা—জীপে। আমি বলে দিয়েছিলাম—ফেরবার সময় কালিম্পঙে শ্বশুরবাড়িটা দেখে এসো। দেখেননি কোনোদিন—না শ্বশুর, না শ্বশুরবাড়ি। রাজি হলেন। আদরযত্ন হবে না ভয়ে, আমিও চলে এলাম।

ললিতা।। তোর বরকে দেখতে খুব ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু তোর কথাতে ভয় পাচ্ছি যে। খুব ড্রিংক করেন বুঝি?

মিত্রা।। লোকটি ভারি আশ্চর্য। যতক্ষণ মনের আনন্দে আছে, এক ফোঁটাও মদ খাবে না সে। গ্লাসও ছোঁবে না। কিন্তু মনে যদি দুঃখ এলো তবে আর রক্ষে নেই।

ললিতা।। তাই নাকি? খুব ইনটারেস্টিং তো! তবে ভরসা এই, তাঁর দুঃখের কোনো কারণ হয়তো হয়ই না—তোর জন্যে।

মিত্রা।। না না, ললিতা, এ-কথা বলা চলে না। জীবনটা কোনো ধরাবাঁধা ছক নয়। একজন যাতে আনন্দ পায়, আর একজন পায় তাতে দুঃখ। তাছাড়া মানুষের রুচি হরদম বদলাচ্ছে। আজ যেটা ভালো লাগে, কাল সেটা লাগে না।

ললিতা।। তাই তো দেখি—সংযম নেই, নিষ্ঠা নেই। আধুনিক সমাজ-জীবনে আমার মনে হয় এইটেই সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। আজ তোকে মনের কথা খুলে বলেছি মিত্রা। এই ভয়েই আমি বিয়ে করিনি এতদিন।

মিত্রা।। তুই বেঁচে গেছিস ললিতা—তুই বেঁচে গেছিস। জীপের শব্দ শুনেছিস কি?

ললিতা ।। হ্যাঁ। নিশ্চয় ক্যাপ্টেন সেন।

মিত্রা।। হয়তো।

ললিতা।। আমি ভাই পালাই।

মিত্রা।। কেন, পালাবি কেন?

ললিতা।। না, না ভাই, আনন্দে আছেন কি দুঃখে আছেন, কে জানে? কাল সকালে যদি আনন্দে থাকেন তার খবর দিস। আসবো।

মিত্রা।। একি! পালিয়ে গেলি যে!

ক্যাপ্টেন সেন।। ঝড়ের মতো কে বেরিয়ে গেলেন! অল্পের জন্য কলিশনটা হয়নি।...তুমিই তো চিত্রা?

মিত্রা।। আসুন—বসুন।

সেন।। আশ্চর্য! মিত্রা বলেছিলো বটে যে দেখলে ভুল হবে। না বলে দিলে সত্যিই ভুল হতো চিত্রা।

মিত্রা।। আমরা যমজ বোন বলে এ-ভুল অনেকেই করে। হ্যাঁ, জানেন ক্যাপ্টেন সেন, ঐ আমাদের বিপদ। পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো?

সেন।। সে-কষ্ট আমার সার্থক। এখন ভাবছি তোমার দিদি কেন তোমাকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন এতদিন। হ্যাঁ, তাই বলবো, নইলে কেন তোমাকে নেননি কলকাতায় আমার সামনে!

মিত্রা।। না, তা বলবেন না। তা যদি হতো তবে আপনাকে আসতে বলতেন না এখানে। দিদি জানেন, আপনার জন্যে তাঁর কোনো ভয়ের কারণ নেই। আমার জন্যেও না। আরাম করে বসুন। (কলিং বেল টিপতেই বাহাদুর ছুটে এল।) চা।... আপনি কাঁটায় ডিনার খান ক্যাপ্টেন সেন?

সেন।। তোমার দিদির হুকুম 'dinner at eight'। কিন্তু আজ কোনো নিয়মে বাঁধা পড়তে মন চাইছে না এখানে।

মিত্রা।। ডিনার রেডি করে গরম করে রেখো বাহাদুর। এখন চা। (বাহাদুরের প্রস্থান) দিদি লিখেছেন, 'দেখিস

কোনো অযত্ন না হয়।' স্নান করবেন কি? গরম জল রয়েছে।

সেন।। না, এই ঠাণ্ডায় স্নান না।...তুমি মিত্রাকে দিদি বলো কেন চিত্রা?

মিত্রা।। দিদি আমার চেয়ে একঘণ্টা আগে পৃথিবীর আলো দেখেছিলো ক্যাপ্টেন সেন! আর তাই হয়তো আমার চেয়ে ওর রূপের ছটাটা বেশি!

সেন।। Absurd! তুমি ওকে আজকাল দেখনি। আলোটা ফিকে হয়ে গেছে ওর। ও যেন অস্ত যাচ্ছে! তোমাকে দেখছি মূর্তিমতী ঊষা।

মিত্রা।। সন্ধ্যায় দেখছেন ঊষা? আপনি কবি নাকি ক্যাপ্টেন সেন?

সেন।। এমন একটি শ্যালিকা পেলে কে না কবি হয় চিত্রা? ভালো কথা, শ্বশুরমশাইকে দেখছি না তো? শুনেছি তিনি খুব বুড়ো।

মিত্রা।। তিনি আজ কিছুদিন থেকে এখানে নেই। গ্যাঙটকের পথে এক সাধুর আশ্রমে বাস করছেন।

সেন।। That's good! আশ্রমে থাকা ভালো। সরে থাকা ভালো। বাড়ি আর কে আছে চিত্রা?

মিত্রা।। বাড়িতে আমি একা।

সেন।। That's awfully good! একা থাকায় যে কি আনন্দ! কোনো ঝামেলা নেই। তুমি একা আছো চিত্রা? চমৎকার।

মিত্রা।। না না, একা নেই।

সেন।। ও, ঐ বাহাদুর রয়েছে। ওকেও মানুষ বলে ধরো নাকি?

মিত্রা।। না না, বাহাদুর ছাড়াও লোক রয়েছে এ-বাড়িতে।

সেন।। কে?

মিত্রা।। আপনি!

সেন।। (হো হো করে হেসে উঠে) আমি? আরে, আমি তো তোমার আপনার লোক। নই কি?

মিত্রা।। আপনি দিদির লোক।

সেন।। আমার গায়ে কিন্তু সেটা লেখা নেই।

মিত্রা।। কিন্তু মনে তো লেখা রয়েছে

সেন।। সেটাও আর খুঁজে পাই না। বোধহয় মুছে গেছে।

মিত্রা।। কিন্তু মুছেই বা যাবে কেন? জীবনের ঐ দলিলটা যে রেজিস্ট্রী করেছিলেন, সেদিন, ওটা কোনোদিন মুছে যাবে এ-কথা ছিলো না কিন্তু।

সেন।। তবে তোমাকে বলি চিত্রা। আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুল তোমার ঐ দিদি। তাকে দেখেই আমি ভুলেছিলাম। ভেবেছিলাম, এই অ-সুরের জীবনে পেলাম আমি সুরের বীণা। বাজাতে গিয়ে দেখি বাজে না—বাজে না।

মিত্রা।। যন্ত্র যদি না বাজে সেটা যন্ত্রীরই দোষ। কারণ যন্ত্রটা সে দেখেই নিয়েছিলো হাতে। না না, নাচতে না জানলে উঠোনের দোষ দেবেন না।

সেন।। তোমার সঙ্গে কথায় পারবো বলে মনে হচ্ছে না চিত্রা। তাই এক কথাতেই বলা ভালো, তোমার দিদিটি মানুষ নয়। একটি স্ট্যাচু। তুমি তাকে ভেনাস বলো, আপত্তি করবো না আমি। শুধু বলবো, ভেনাসের স্ট্যাচু। ওতে প্রাণ নেই। যে-প্রাণের স্পন্দন জ্বলজ্বল করছে তোমার মধ্যে। আমি চাই জীবনের উন্মাদতা। কিন্তু ও হচ্ছে মৃত্যুর প্রশান্তি।

মিত্রা।। দিদি আমাকে লিখেছিল, আপনি একটা ঝড়। আপনাকে শান্ত করবার শক্তি পায় না সে। আর যা লিখেছিল তা বলতে আমি শিউরে উঠেছি। (হেসে) বলবো?

সেন।। তোমার ঐ হাসিটা খুব লোভনীয় মনে হচ্ছে। নিশ্চয় বলবে।

মিত্রা।। কিন্তু বলতে আমার ভয় হচ্ছে।

সেন।। কিন্তু তোমার চোখে দেখছি কৌতুক। বলো আর কি লিখেছে?

মিত্রা।। আঃ! হাতটা ছাড়ুন।

সেন।। না বললে ছাড়বো না।

মিত্রা।। লিখেছিলো, বিধাতা ওঁকে পাঠিয়েছিলেন তোর জন্যে। আমার কাছে এসেছে ভুলে।

সেন।। (আবেগে) চিত্রা! তোমাকে আজ দেখামাত্র এই একটি কথাই আমার বার বার মনে হচ্ছে চিত্রা!

মিত্রা।। কিন্তু দিদির চিঠিতে জেনেছি, আপনাকে জয় করবার আশা এখনো সে ছাড়েনি। আপনার জীবনের ঝড় যখন থেমে যাবে, তখনই সে আপনাকে পাবে, এই আশায় সে বসে আছে!

সেন।। তবে তাকে বৈধব্যের জন্য অপেক্ষা করতে বলো চিত্রা। আর তুমি এসো আমার জীবনে। আমার জীবনের জীপে উঠে পড়ো চিত্রা!

মিত্রা।। কলঙ্কের ভয় রাখেন না আপনি?

সেন।। কলঙ্ক আছে বলেই না ঐ চাঁদ এত সুন্দর। সেই যৌবনই যৌবন, যা কলঙ্কের ভয় রাখে না—যা বে-পরোয়া।

মিত্রা।। মানি। কিন্তু বে-পরোয়া জীবনে আমাদের দুজনের বাঁধন যদি খসে যায়? যদি আমি ছুটে চলে যাই আর কোনোখানে? ভালো যদি লাগে আমার অন্য কোনো জীবন? সইতে পারবেন আপনি সেটা?

সেন।। হুঁ, বুঝেছি। তোমার দিদি বলেন একনিষ্ঠ প্রেমের কথা। কিন্তু চিত্রা, জীবনটা অনেক বড়ো। মানুষের মন, বড় তার চেয়েও। কোনো বন্ধনে বাঁধা পড়া মানেই জীবনটাকে ছোট করা। তাই নয় কি চিত্রা?

মিত্রা।। হুঁ!

সেন।। চলো, আমরা বেরিয়ে পড়ি।

বাহাদুর।। চা।

সেন।। থাক চা। বাইরে উঠেছে জ্যোৎস্না। ঐ জানালা দিয়ে দেখ কাঞ্চনজঙ্ঘা। চলো বেরিয়ে পড়ি। তুমি ওভারকোটটা নাও। কী ভাবছো?

মিত্রা।। ভাবছি অনেক কিছু। ভাবছি দিদি আপনাকে পেলো না—পেলাম কিনা আমি। মনে পড়ছে আজ চিত্রাঙ্গদার কথা।

সেন।। চিত্রাঙ্গদা? সে আবার কে?

মিত্রা।। পুরাণের গল্প। সে ছিলো রাজকন্যা। সবই ছিলো তার, কিন্তু ছিলো না তার রূপ—যা দিয়ে অর্জুনের মতো বীরকে জয় করতে পারে।

সেন।। চিত্রাঙ্গদা নাটকটা নিউ এম্পায়ারে দেখেছি। প্রেমের ডালি নিয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। কিন্তু অর্জুন দিয়েছিলো তাড়িয়ে। দেবে না? অর্জুনও ছিলো মিলিটারী। তাকে জয় করতে হলে চাই রূপের উন্মাদতা।—যা তোমার আছে।

মিত্রা।। পরে কিন্তু কঠোর তপস্যা করে, শিবের বরে, বিশ্বজয়ী অর্জুনকে জয় করবার রূপই পেয়েছিলো চিত্রাঙ্গদা।

সেন।। হ্যাঁ, আর তখনই অর্জুন তাকে বুকে তুলে নিয়েছিলো চিত্রা।

মিত্রা।। হ্যাঁ, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা তখন ভাবলো, যাকে অর্জুন বুকে নিলো, সে তো আমি নই, আমি নই।

সেন।। রাখো ও-সব ন্যাকাপনা। নাটকটা বিশ টাকার টিকিট কিনে ফার্স্ট রো থেকে আমি পুরোপুরিই দেখেছি। শেষটায় অর্জুনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার বিয়েই হয়েছিল। কে কি ভাবছে সেটা বড় কথা নয়, কি ঘটছে সেইটেই বড় কথা। প্রথম দর্শনেই তুমি আমাকে জয় করেছো। বিয়ে একদিন আমাদেরও হবে। আমাদেরও হবে। আমি জীপটা বের করছি। তুমি এসো।

মিত্রা।। বাহাদুর!

বাহাদুর।। কী দিদিমণি?

মিত্রা।। দরজাটা বন্ধ করে দে।

বাহাদুর। কেন সাহেব আর আসবেন না?

মিত্রা।। না।

●

সেন।। একি, দরজা বন্ধ কেন? চিত্রা, চিত্রা, চিত্রা! দরজা বন্ধ কেন? দরজা খোলো।

মিত্রা।। না। তুমি যাকে চাইছো সে আমি নই। আমি ছলনা। এ-জয় আমার জয় নয়, পরাজয়। তুমি চলে যাও। তুমি চলে যাও।

।। যবনিকা।।

যুগযুগ যন্ত্রণা

নির্মলকুমার ঘোষ (এম-কে-জি)

'অমৃত'-র ক্রীড়াবিনোদন সংখ্যার জন্য সিনেমা সংক্রান্ত একটা কিছু লিখতে বসে ভাবছি একটা কথা। এই বিশেষ সংখ্যাটির মূল কল্পনাটুকুর সঙ্গে সিনেমাবিষয়ক কোন রচনার আত্মিক সংযোগ আদৌ কতোটুকু? এই উভয়ের মধ্যে ভাবের সেতুবন্ধন কি সম্ভব? এমনিধারা এলোমেলো চিন্তাধারার বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে যখন লেখনীর জন্য একটা বিষয়বস্তুর কথা ভাবছি, তখন সহসা এ যুগের একজন বিখ্যাত চিন্তাশীল ও বিদগ্ধমনা লেখক আমার মুস্কিল-আসান-রূপে আবর্তিত হলেন আমার মনের সামনে, 'অমৃত'র গত পুজো সংখ্যায় তাঁরই একটি অমৃতসুন্দর লেখার মাধ্যমে। তিনি শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। কিন্তু সে কথা বলতে চাই পরিশেষে।

ঐ যে চিন্তাটুকুর কথা গোড়াতেই উল্লেখ করলাম সিনেমার ও ক্রীড়া-বিনোদনের সহভাবিতা সম্বন্ধে, এ নিয়ে অনেকের মনের মধ্যেই হয়তো একটা নিশ্চিত সংশয় প্রশ্ন হয়ে অতি সূক্ষ্মরূপে হ'লেও লুকিয়ে আছে। তাঁদের হয়তো যুক্তি দিয়ে, প্রতি-প্রশ্নের খাঁড়া তুলে চুপ করিয়ে দেওয়া যায়। বলা চলে, 'নয় কেন?' সিনেমা তো জন-সাধারণের প্রমোদবৃত্তি চরিতার্থতারই একটা অংগ মাত্র। নয় কি? কাজেই পাঠক-সমাজে ছড়িয়ে রয়েছে যে বিশাল বিপুল দর্শক-মানসিকতা, তাঁদের চিত্তবিনোদনের ব্যাপারে যথোচিত একাভিমুখিতার দাবী কেন সিনেমা করতে পারবে না? এই প্রসংগে এ কথাও সবিনয়ে সিনেমার আনন্দপন্থীরা নিবেদন করতে পারেন : আমাদের দেশের দর্শকসমাজের একটা বিরাট অংশ এখনও সিনেমাগমন-কে বলেন—'খেলা' দেখতে যাওয়া! সেটা আবার এমন একটা মজাদার, চটকদার 'খেলা' যার মধ্যে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ, ভালভালবাসা, মান-অভিমান, বিরহমিলন, সংশয়-বিশ্বাস, সংস্কার-প্রগতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস প্রভৃতি মানব-মনের চিরন্তন ভাবরাশির টানা-পোড়েন দিয়ে তৈরী করা হবে এমন একটি ছন্দোবদ্ধ কাহিনী, এমন একটি হৃদয়গ্রাহী নাটক, এমন সব বিচিত্র চরিত্র-র ফুলকাটা নক্‌সা, যা মনকে আচ্ছন্ন করবে বিভিন্ন ভাবের লীলায়। এবং তার মধ্যে থেকেই সে পাবে—একক ও যৌথ মানসিকতার প্রেরণা, আমাদের রসক্ষরণ। এই লীলাই কি শ্রেষ্ঠ 'খেলা' নয় মনের আবেশ ঘটাতে?

হাঁ, নিশ্চয় একথা বলতে পারেন আপনি। শুধু তাই নয়। এই কথাই তো বলে আসা হয়েছে এতকাল অবধি সিনেমা নাটকের ব্যাপারে! "সারাদিন খেটেখুটে, হরেক রকমের ঝক্‌কি পুইয়ে, বিশেষ করে বর্ত-মান দিনের ক্রমশ ঘনীভূত নানা রকমের জীবনযুদ্ধ ক'রে ক্লান্ত, ক্ষত বিক্ষত হয়ে আমাদের ঝিমিয়ে পড়া মনটাকে বৌ-বাচ্চা বা বন্ধুবান্ধবীর সহ-গামিতায় একটু চাঙা ক'রে তুলতেই তো মশাই সিনেমায় যাই, যাব। বহু কষ্টোপার্জিত পয়সা খরচা করে এই দুর্মূল্যের বাজারে সেখানে কি যাব দুঃখ কিনতে না দুঃখ, যন্ত্রণা ভুলতে?" এমন কথা বেশ দাবীর চেহারা দিয়ে বলবার লোক কি সংখ্যায় বা অগ্রগণ্যতায় লক্ষকোটি নয়?

তবু মজা হচ্ছে সিনেমার বা নাটকের ক্ষেত্রে আজকের দিনের নতুন মনোভাব ও নতুন কল্পনার নানা সংঘাতে বিপ্লবের এক বিপুল প্লাবন আমাদের বহুদশকের সংস্কারের বাঁধ দিয়ে সুরক্ষিত, দর্শকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা আশা-আনন্দের সখ্যসী-প্রবৃত্তি দিয়ে সুগোপনে-লালিত ধ্যানধারণার ভিত-ভূমিতে সফেন সমুদ্রতরঙ্গের অবাধ্যতায় খান্‌খান্‌ হ'য়ে আছড়ে পড়ছে। যার বিপুল সংঘর্ষণে আজ গোটা পৃথিবী জুড়ে সিনেমা-নাটকের মূল সংজ্ঞাটাকে, তার ভাবের মান-চিত্রের চেহারাটাকেই বিদ্রোহীর দুর্মদ তীব্রতা দিয়ে সে বদ্‌লে দিতে চাইছে। সিনেমাকে সে আর মানবমনের প্রমোদ-প্রবৃত্তিকে সুড়সুড়ি দেবার অসার নিত্য-সংগী হ'য়ে থাক্‌তে দেবে না। সিনেমাকে তার নতুন শিল্পমন্ত্রের বাস্তব দীক্ষাদানে বলিষ্ঠ, জীবননিষ্ঠ ক'রে তুলবে এর নতুন সৈনিকেরা। সেখানে থাকবে না কোন নিস্তব্ধ ভাবালুতার, কোনো ফরমূলা-সর্বস্বতার কারাপ্রাচীরে মনকে বন্দী করে রাখা। অসার গল্পপ্রিয়তার রঙীন ফানুসের মতো তাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তাৎক্ষণিক আনন্দদানের ছত্রধারক হয়ে থাক্‌তে দেবে না। সিনেমাকে তারা মুক্ত ক'রে আনবে আফিম্‌-খেয়ে বুঁদ-হয়ে-থাকা মনের নিঃসাড় চৈতন্যমগ্নতার খাদ থেকে উদ্ধার ক'রে নতুন জীবন-দ্যোতনা দিয়ে তাকে প্রাণের অফুরন্ত প্রাচুর্যে পূর্ণ ক'রে তুলবে। প্রকৃত জীবনদর্শনের অনুসন্ধিৎসায় বিজ্ঞানী শিল্পীর শিল্প-গবেষণার নিরলস সাধনায় ব্রতী করবে, নতুন রূপসংজ্ঞা দেবে। তার শৈল্পিক চেতনার রূপদান কিন্তু ঘট্‌বে সৈনিকের নির্লিপ্ত অভিযানের মতো, সন্ন্যাসীর গৈরিক অভি-যাত্রার মতো।

প্রথম কদমফুল। তনুজা

এ'রা এই চিন্তার পথে আজ এতোদূরে অগ্রসর হয়ে গেছেন যে এমনকি সিনেমার যে টেকনিক—আশ্রয়ী মূল অস্তিত্ব, যা একান্তরূপে নির্ভর করে আছে শ্রবণ ও দর্শনের আধেয় ছায়াচিত্রকল্পের উপর—সেই টেক্‌নিক্‌কেও তাঁরা আজ আর এক-নায়কতন্ত্রের প্রাধান্য দিতে রাজি নন্। তার টেকনিক হবে সিনেমার নব-বাস্তববাদের পথে, জীবনের নতুন করে মূল্যায়ণের পথে গভীর উপলব্ধি সাধনের অনুগামী একটা প্রচ্ছন্ন অংগের মতো। তার কারণ, কোন রকম জ্যামিতির সীমানাবন্ধনের শাসনকেই সে মানতে চায় না।

মানবমনের অনাবিষ্কৃত যেসব গুহা-কন্দরের গভীর অন্ধকার মধ্যে মানুষ তার মনশ্চৈতন্যের নয়নে এতকাল পারেনি—কেন না তাকে নাকি তা পেতে দেওয়া হয়নি সংস্কারের ও গতানুগতিকতার বেড়াজাল

দিয়ে বন্দী করে রেখে—সেইসব মানস-লোকের বিচিত্র নতুন অনুভূতির উপরই আজকের নবজাগ্রত সিনেমার শিল্পসত্তা তার সন্ধানী আলোক ফেলে তাকে প্রায় চান্দ্র অভিযানের মতোই বিপুল সম্ভাবনার মহিমায় অগ্নিসম্ভবা ক'রে তুলবে। সমস্ত কিছু প্রাচীন বিশ্বাসকে, শ্রদ্ধাকে, লোকাচার বা সমাজাচারের ধর্মীয় আনুগত্যকে সে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলবে। নতুন ক'রে দেখবে। বলতে গেলে পশুর নখরতা দিয়ে সে সবকিছু তীক্ষ্ণ গভীরভাবে ছিঁড়ে ফেলে মানুষের প্রাণকেন্দ্রের সমস্তকিছু বিদ্যুৎগর্ভ শক্তিকে আকাশেবাতাসে সঞ্চারিত ক'রে দেবে আলোকধারায় স্নাত ক'রে। সেখানে থাকবে না কোন ভাবের ঘরে চুরি।

বোধ করি একটি মাত্র পুরাতনীকে আজকের সিনেমার নবপুরোহিতেরা এখনও পরিত্যাগ করার কোন সংকেত দেননি। সেটা হ'ল প্রতীকের সূক্ষ্ম ব্যবহার। যেটা আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে পুরাতনভাবেরই ক্রমধারা। যেমন ধরুন সৃষ্টির ব্যাকুলতাকে, পুরুষ-নারীর প্রবল আসঙ্গলিপ্সাকে রূপায়িত করা হল অশান্ত, বন্ধনমুক্ত, ক্ষিপ্ত এক সমুদ্র তরঙ্গপ্রবাহের সঙ্গে।

এ'দের এই স্বাধীন মনোভাবের বেপরোয়া চেহারাটকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করা যাবে। সেটা হল সিনেমার কোনো সাহিত্যগত নিষ্ঠার
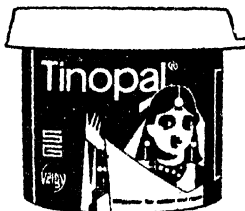
প্রতি চিত্রনাটক বা কাহিনী সংবন্ধতার প্রতি এই নবযুগের প্রবল অনীহা। একজন লেখকের কলমের যতো শক্তিই থাক, মানবমনের রূপকল্পের যে প্রতিভাস এ'রা ফুটিয়ে তুলতে চান সিনেমার আলোকরেখায়, তাতে সাহিত্যের মেজাজ, তার আচরণ ও প্রচলিত প্রয়োগ হবে সৃষ্টির পথে নাকি বাধার মতো, তার বাস্তববাদের পরিপ্রেক্ষিতে। ছবি তুলতে তুলতে হঠাৎ বিশেষ কোন ঘটনা, বা চরিত্রের প্রকরণ বা উপকরণ তাকে তার আপন লীলায়, আপন গতির স্রোতে যেদিকে যেভাবে নিয়ে যাবে তাতে আসবে তার প্রকৃত রূপদর্শন।

অর্থাৎ, সংক্ষেপে বলতে গেলে এ'রা, এই সিনেমার নবপথিকৃৎরা বলতে চান, সিনেমা আর কোন কাহিনীর বা ভাবের বিধি-বন্ধতায় জড় পঙ্গুর মতো থাকবে না। সে ফুটিয়ে তুলবে নিপুণ দুঃসাহসিক বিপ্লবীর মনে এই দিনের, বা আগামী দিনের মানুষের জীবনবিশ্লেষণ, ভাববিপ্লব, যুগযন্ত্রণা। ঘটনা বা কাহিনী বিস্তারের পরি-বেশে সে আর ব্যাপ্ত ও বিধৃত থাকবে না। এই যে অনির্দিষ্ট যাত্রাপথে তার প্রতিভার পদচারণা, সে হবে এই যুগযন্ত্রণারই নগ্ন উৎঘাটক। নতুন দিগ্‌দর্শনের যুগযন্ত্রও বলতে পারেন। সে আর বোধ করি কোন ধার ধারবে না মানুষের যুগ-যন্ত্রণার।

যুগকে কি তবে আজ আমরা কঠোর সংকল্প ক'রে যুগ-যুগের মানবমনের যোগ-সূত্র থেকে সমূলে ছিন্ন ক'রে আনবার জন্য পরশুরামের কুঠার হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব হুহুংকারে? তাই যদি হয় তবে যে মানসিকতায় সোচ্চার হয়ে উঠে এই যুগ-যন্ত্রণার ধারক বা বাহকরূপে আজকের সিনেমা আত্মঅভিব্যক্তি খুঁজছে সেকি যুগ থেকে যুগে প্রবাহিত, চিরন্তন মানবমনের অন্তর্লীন রূপটুকুরই প্রসারিত ব্যাপ্তি নয়, আর সেই ব্যাপ্তি কি সত্যিই দাবী করে মানুষরূপী প্রাণীর সম্পূর্ণ নতুন সংজ্ঞা?

এই চিন্তার, এই প্রশ্নের উত্তর আজকের দিনের যুগযন্ত্রণার প্রকাশলিপ্সায় উদ্দীপ্ত সিনেমার বিদ্রোহী স্রষ্টাদের কাছে কি মিলবে? নতুন যুগের চিত্র-আন্দোলনের দাপটে নতুন চিত্রকল্পের গর্ভসঞ্চার হতে চলেছে যাঁদের দ্বারা তাঁরা কি যুগ-যুগের উত্তরাধিকারের সর্বকিছু শর্তকে নির্মূল করে দিতে প্রয়াসী।

ভাবধ্যানী অন্নদাশঙ্করের শক্তিময় চিন্তাপ্রসূত রচনা 'সব চেয়ে দুঃখের' তার সবশেষের লাইনটিতে এই ভাবনাটিকেই আমার মনে ধরিয়ে দিল।

দুটি মন। পরিচালনা পীযূষ বসু। উত্তমকুমার ও সুপর্ণা সেন। —ফটো : অমৃত।

এই যুগ, সেই যুগ, এখনো অজ্ঞাত যে-যুগ, এরা কি সবাই চিরযুগের বন্ধনে বাঁধা নয়? এরা কি তবে তাদের সর্বকিছু অহংকার, বাসনা, ঋদ্ধি নিয়ে স্বয়ম্ভূ?

অন্নদাশঙ্করকে নমস্কার।

অন্নদাশঙ্কর, তথা তাঁর কাহিনীর প্রথম পুরুষোক্ত লেখক-নায়ক তাঁর লেখাটি যাঁরা চাইতে এসেছিলেন তাঁদের হতাশ করলেন, কেননা রচনাটিতে যুগযন্ত্রণার কোন সাক্ষর পেলেন না। আজকের যুগের ভারতীয় এবং বাঙালী চিত্রনির্মাতাদের কারুর চিত্রকর্ম-কাণ্ডে (একটিমাত্র সম্মানিত ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে) আজকের অতিপ্রগতিবাদী চিত্র-রসিকদের দল কোথাও যুগযন্ত্রণার অবি-কৃত প্রতিভাস ফুটিয়ে তোলবার মত কোন বলিষ্ঠ শিল্পরচনার প্রমাণ পাচ্ছেন না কি! এবং সেই সঙ্গে এই অতিপ্রগতিশীল চিত্র-ছাত্রদল (নাকি তাঁদের চিত্রশিক্ষক অভিধানে ভূষিত করাই আরো ন্যায়সংগত হবে?) আজ-কের বিভিন্ন পেশাদার চিত্র-সমালোচকদের লেখায়ও নাকি সেই যুগযন্ত্রণাকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলার মতো কোন গভীরতা, কোন নন্দনরসোত্তীর্ণ রচনাশক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। যুগযন্ত্রণার পশারী ও দিশারী নন, এমন কেউ এ'দের তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির কাছে আজ রেহাই পাচ্ছেন না। অগ্রগামীর টিকেট পাচ্ছেন না।

এই সমালোচকের—সমালোচকেরা যাঁরা যুগ-যুগযন্ত্রণার শিল্পপ্রতিভাসে অবিশ্বাসী তাঁদের কাছে আজ ভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন সবাই বাতিল হ'য়ে গেলেন।

অন্নদাশঙ্করকে আবার নমস্কার।

ঋত্বিককুমার ঘটক

ছবি করার সাধারণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে এ লেখা আরম্ভ করিনি। সে ক্ষমতাও আমার নেই। সামান্য যে কদিন আমি কাজ করেছি, তার মধ্যে বিশেষ যে সব চিন্তা আমাকে বিব্রত করে তুলেছে থেকে থেকে, তারই কিছু লিখে ফেলতে বড় ইচ্ছে হল।

—আচ্ছা, নিজের জমির ওপর না দাঁড়িয়ে কিছু করা যায় কি? কিছু সত্যিকারের গভীরকে ছোঁয়া সম্ভব? আমি জানি না, হয়ত শেষ বয়সে, বহু মোচড় খেয়ে, বহু মারের মধ্য দিয়ে উত্তরণ হওয়া হয়তো সম্ভব। কিন্তু আমার তো সে স্তরে আসেনি, সে স্তরে পেঁছান কোনদিন হয়ে উঠবে কিনা সে বিষয়েই আমার ঘোর সন্দেহ আছে। কিন্তু সৃষ্টিকর্মের গোড়ার ধাপে কাজ করতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে পেছনে খোরাক যার দেউলিয়া হয়ে গেছে, সে কি করবে?

আমি বলছি দেশভাগের কথা। আমি পূর্ববাংলার ছেলে। যে সামান্য কয়েকজনের আমার কাজ ভাল লাগে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন—ঋত্বিক ঘটকের বর্তমানের বা অতি অল্পকালগত অতীতের সঙ্গে এবং বুঝিবা একটু একটু ভবিষ্যতের সঙ্গে—একটা যোগের মাঝে মাঝে মনে হয় আছে, কিন্তু অতীত নেই, অতীতের ঐতিহ্য নেই।

কথাটা বড় লাগে। অতীতবিহীন নিরালম্ব বায়ুভূত কাজ কাজই নয়। কিন্তু আমার অতীত আমাকে কে এনে দেবে?

আছে, যোগ আছে, ছোঁয়া আছে, গল্প আছে, টুকরো টুকরো ছবি আছে, তার অনেকটাই হয়তো ভুল, আমার মনগড়া। কিন্তু আমার মনগড়া কাজই তো আমার শিল্প। ফটোগ্রাফার সত্যি তো আমার ঠিকেদারির মধ্যে যাবে না।

আমার দিন কেটেছে পদ্মার ধারে...... একটা দু'দে ছেলের দিন। গহনার নৌকার মানুষদের দেখেছি অন্য গ্রহের বাসিন্দে। মহাজনি হাজার দু হাজার মনী ভাড়া করে পাটনা বাঁকীপুর—মুঙ্গের থেকে মাল্লারা পার হয়ে যেত, এক ভাঙা দেহাতী আর পদ্মাপারি বাংলার টান মাখানো কথা বলে। জেলেদের দেখেছি। ইলশেগুঁড়ির গ্রাম বর্ষায় হঠাৎ হঠাৎ বেজায় খুশি হয়ে যে সুরে টান মারে, মনমাতানো হাওয়াতে দমকায় দমকায় ভেসে আসতো কেমন অস্পষ্ট মন কেমন করা পাগল সুরে, স্টীমারে শুয়ে রাতে দোলা খেয়েছি মাতাল নদীর দাপটে, আর শুনেছি ইঞ্জিনের ধস্ ধস্, সারেঙের ঘণ্টা খালাসীর বাঁও না মেলা আর্তনাদ। পদ্মায় শরতে নৌকো নিয়ে পালাতে গিয়ে একবার তিন মাথা সমান উঁচু কাশবন হয়েছে কাতলামারীর চরটার কাছে, ভীষণ সাপ থাকে ওখানে, ঢুকে পড়ে আর বেরোতে পারি না, নৌকো দুলিয়ে দুলিয়ে চেষ্টা করতে গিয়ে সেই ডাকাত কাশের কেশরের শাদা রেণু উড়ে উড়ে দেহমন আচ্ছন্ন করে নিঃশ্বাস প্রায় আটকে দিয়েছিল। কাশগুলো থেকে গিয়েছিল। "সিন্ধুগৌরবে" রাজা জাহিরের পার্ট করার জন্যে হায়ার (Hired) হয়ে গিয়ে ট্রেন ফেল করে সন্ধ্যেবেলা পৌঁছেছি অজ পাড়াগাঁয়ে। সামনের হাঙরবিল ডাকসাইটে ভূতের জায়গা, কোজাগরী পূর্ণিমার আগের রাত। সেই আবছা বিলে দুই বন্ধু মিলে লগী ঠেলেছি। দিগন্তলীন বিলে মাঝে মাঝে জেগে আছে দ্বীপের মত গ্রাম। নীহার পড়ছে, কাঁপছি। শেষে বোঝা গেল বিলের আত্মারা ধরেছে আমাদের, দু ঘণ্টার পথ সারারাতেও কাবার করতে পারলাম না, ধাঁধা লেগে গেছে, আমরা গেছি বেপরোয়া হয়ে—শুয়ে পড়েছি সেই দিগন্ত-লীন বিলের বুকে। সকালে পেঁছেছি।

মা, বাবা, দাদা, দিদি, একান্নবর্তী পরিবার, হইচই করে ভাইবোন মিলে খাওয়া। দুর্গাপুজো, মুসলমান চাষীদের সেই বাঁ পায়ে পেতলের মল পরে শারীগান। কত ডানপিটে বন্ধু। মারপিট, আম-লিচু-ডাব চুরি। পাড়ে পা ভেঙে যাওয়া, ধরা পড়ে মার খাওয়া। বাড়ীর দেওয়ালে নোনা ধরে কত বিচিত্র দাগ। কত শব্দ, ছবি, কত মন। একটা সভ্যতা। মানুষের এক বিচিত্র প্রবাহ।

আর নেই। কিন্তু যদি থাকত ...দাঁড়াতে পারতাম তার ওপরে, বলতে হয়তো পারতাম কিছু। এমন ভাবে বর্তমানকে বিকৃত মন নিয়ে দেখতাম না, ভবিষ্যতকে এত ভয় করতাম না, দেশের এই মানুষের ভবিষ্যতকে।

এগুলো প্রাণময়, এগুলো উদ্দাম। কিন্তু এই তো আমার আছে, আমি যদি লিখতে পারতাম, কবি হতাম, ছবি আঁকিয়ে হতাম, হয়তো এগুলো থেকে জারিয়ে নিয়ে বাড়তে পেতাম। কিন্তু আমি যে ছবি তুলি, আমার মত কেউ হারাকে না। যা দেখেছি তা দেখাতে পারছি না।

কে চায় দুঃখ? জীবন দুঃখ নয়, জীবন বীরত্ব।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় : কয়েকটি বিশেষ মুহূর্তে।

ফটো : অমৃত

উত্তমকুমার । কয়েকটি বিশেষ মুহূর্তে।

ফটো : অমৃত

এখানে কি নেই? আছে। দু'দেশ দেখছি, খোঁজ করছি। কিন্তু, আমি ছোটবেলার সেই রূপকথা চোখে দেখতে পাচ্ছি না। সেটা হারিয়েছি। সেটা না থাকলে তো বাস্তব থেকে নতুন রূপকথা তৈরী করতে পারা আমার সাধ্য না। এখানে যুক্তি হবে। ট্রাজেডি হবে। কমেডি হবে, ...মানে যদি সামলাতে পারি। কিন্তু রূপকথা, সরল রূপকথা যা দেখলে যুক্তি চুপ, বড় বড় খেয়ারী মাথা চুলকোতে আরম্ভ করে, ছোট ছোট ডানপিটের মন চাগাড় দিয়ে উঠে বসে, কোথায়? আমার চৌহদ্দির মধ্যে তা নেই।

আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা এইটে। কাজ আরম্ভ করার আগেই একটা সীমায় বন্ধ হয়ে গেছি। কারণ ও ল্যান্ডস্কেপ এখানে পাব না। ও মুখের আদল, ও কথা বলার বিশেষ ঢংটি এখানে তৈরী করা যাবে না। দুনিয়ার লোকের কাছে ঐ বলে চালিয়ে দেখান যায়, এমন কিছু, হয়তো সাজিয়ে গুছিয়ে দাঁড় করা যায়। কিন্তু জিনিস বড় সংবাদী। ওতে চিঁড়ে ভিজবে না। যার জন্যে করা, সেই রূপকথাটাই হারাবে।

আমার এই কথাগুলো থেকে কেউ যদি মনে করেন, আমার পশ্চিমবাংলার হু হু উধাও খোয়াই, মেদিনীপুরে ছোট ছোট নদী আর গাছ, কী চব্বিশ পরগণার শহরের রক্তশোষা ক্ষয়িষ্ণু সমাধিস্থ ভাঙা ভাঙা ইমারতওয়ালা গাঁ,—এদের বক্তব্য নেই,— তবে আমার প্রতি অবিচার করা হবে। ঘ্রাণ যেখানে সেখানেই নিংড়ে পাওয়া যাবে রস। আমার খালি নিবেদন এই আমার ছবিতে অতীতে মগ্ন হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, কতগুলো নিষ্ঠুর কারণে। এদিকে যার শৈশব কেটেছে সে আমার দেশে গেলে কোথায় পাবে সে মায়ার যাদু, যাতে কলি ফুটবে? আমিই বা কেমন করে সেখানে যাব?

তাই বলি, আমার উত্তরপুরুষের চোখ দিয়ে যখন দেখতে পাব তখন হয়তো নতুন সংযোগ ঘটবে, নতুন উত্তরণ, যদি তেমন দিন আসে।

আমার ছবি করার সবচেয়ে বড় বাধা এইটেই। কারণ, আমার মনের মধ্যে ছবির একটা মান ঠিক হয়েই আছে যাতে এই মশলাটাই লাগে সবচেয়ে বেশী।

আমি অনুভব করতে পারি এই প্রথম ধাপটি পেলে ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়ে গিয়ে দেশ-বিদেশ—মহাদেশকে জড়িয়ে ধরার সূত্রটি পেতাম। এমন অসুস্থভাবে প্রাথমিক চেতনাটা ভূতুড়ে বোঝা হোতো না আমার ঘাড়ে, তাই হয়েছে এখন।

॥ ২ ॥

ছবি করার আর একটা বড় মুশকিল আমাকে ভাবিয়ে তোলে, যে সমস্যা আগের কথাগুলির সঙ্গে জড়িত। সেটা হচ্ছে বলার ভঙ্গি সম্পর্কে।

আমার বিদ্যাসাগরের ভঙ্গীটি বড় ভাল লাগে। এব্রাহাম লিংকনের লেখা আমার সামনে আদর্শ খাড়া করে দেয়। বাইবেলের ইংরিজী আমাকে ধ্যানস্থ করে। যার জন্য হেমিংওয়ের Old man & the son অনেক আপত্তি সত্ত্বেও অভিভূত করে।

ছবিতে করে Flaherty, করে Song of Cyclone, করে জায়গায় জায়গায় General Line!

বেশী ছবি দেখা এদেশে বসে আমার সৌভাগ্য হয়নি। বেশী পড়াশুনোও করিনি। তবু এই একটা আদর্শ কেমন করে জানি না আমার সামনে আস্তে আস্তে খাড়া হয়ে উঠেছে। টুকরো টুকরো উপনিষদের শ্লোক-গুলি যেমন ঈশোপনিষদ, কাঠোপনিষদ বিশেষ করে।

একটা ভাষা, যেটা কম বলবে, বেশী ফেনাবে না। কচ্‌কচ্‌ করবে না। যে স্বয়ং প্রকাশ, যার allusion এর ভার নেই, পরিপূর্ণে ধার আছে, যেখানে preference চিন্তিত করে না, মনে করিয়ে দেয়, কারণ সেগুলো archetypal ...যে ভাষা অসম্ভব ক্ষমতাশালী, সব mood কে একটা patriachal ভঙ্গীতে ধরিয়ে দেবে। যা আপাত শুষ্ক, ফল্গুর মত, মালদার আমের মত একেবারে রসে টইটম্বুর।

যে ভাষার কথা বলছি, তাকে ঠিকমত বোঝানোও বোধহয় আমার পক্ষে সম্ভব হোলো না। ইঙ্গিত করা গেল ঐ নামগুলো বলে।

সেই ভাষাটা কিন্তু আছে, তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। ছবিতে ঐ ভাষাতে কথা বলা যায়। Europe পারবে না এ যুগে। আমরা পারব, যদি খুঁজি।

এটুকু বুঝি, এ ভাষা জন্মাতে পারে শুভ্র উত্তাপময় প্রেরণা থেকে। সে প্রেরণা, মনে হয়, পেশাদারী ছবি করিয়েদের দিয়ে হবে না। অর্থাৎ আমাদের পেশাদারী মানে, যারা একটার পর একটা করেই যাচ্ছে। এ ভাষা বোধহয় জন্মায় যে রোজ করে না তার চেতনায়। জীবনে খুব দরকার না পড়লে সে মুখ খোলে না। এবং যে মুখ খোলে একমাত্র জীবনমরণ সমস্যার চাপে পড়ে। খুব খানিকটা না রাগলে, খুব ভাল না বাসলে, খুব খুশী না হলে, খুব না কাঁদলে, এ আদিম মিষ্টি ভাষা কোত্থেকে জুটবে? আমি সেই দুরাশা করেছি। সেই ভাষাটাকে ধরার জন্য প্রাণপাত করে যাব।

কিন্তু বাধা। ঐ যে নিজের জমির ওপর পা নেই আমার। অন্যত্র জমি হাসিল করব কি করে এবং কবে?

কারণ, আমাকে তো ফিরে যেতে হবে আমার মায়ের গর্ভে, এ ভাষার উৎস সন্ধানে।

তবেই ছবির ভাষার সার্বজনীন স্তরে উন্নীত হবার পথ খুঁজে পাব।

অয়স্কান্ত

যদি বলি, মানুষের কী ক্ষমতা দ্যাখ, রকেটে চেপে গোটা পৃথিবীকে এক ঘণ্টায় চক্কর দিচ্ছে, চাঁদের দেশে পাড়ি দিচ্ছে, পরমাণুর শক্তিকে আয়ত্ত করেছে, খুশিমতো তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বানাচ্ছে, যে অঙ্ক কষতে ত্রিশজন মানুষের ত্রিশ দিন ধরে হিমসিম খাবার কথা ইলেকট্রনিক কম্পুটরের সাহায্যে নিমেষের মধ্যে তা করে ফেলছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি, তাহলে কথাগুলো মেনে নিতে কারও আপত্তি হবে না। কেননা মানুষের এই ক্ষমতাগুলো যে আছে তার পরিচয় অহরহ পাওয়া যাচ্ছে। এসব অবশ্য বড়ো বড়ো ব্যাপার, বিজ্ঞানের অনেক উঁচু মহলের কান্ডকারখানা। রকেট বা পারমাণবিক চুল্লী বা ইলেকট্রনিক কম্পুটর—আমরা যারা শহরে থাকি, রোজ খবরের কাগজ পড়ি—অনেকেই চোখে দেখিনি। আর গাঁয়ের লোকের তো অনেক কিছুই না জানার কথা। কিন্তু আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে এমন একটি যন্ত্র সারা দেশময় ছড়িয়েছে যার কল্যাণে রাশিয়ার লুনিক ও আমেরিকার অ্যাপোলোর খবর গাঁয়ের লোকও রাখে, এমন কি অতি অজ গাঁয়ের লোকও, যেখানে পৌঁছতে হলে পায়ে-চলা রাস্তাটুকু পর্যন্ত পাওয়া যায় না, গাড়ির চাকা তো দূরের কথা। যন্ত্রটি হচ্ছে ট্রানজিস্টর রেডিও। আমাদের দেশে গাঁয়ের দিকে এমন মানুষ এখনো পাওয়া যেতে পারে যে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে জানতে পারে নি যে প্রকান্ড একটা বিশ্বযুদ্ধ চলছে কিন্তু ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকের তাৎক্ষণিক খবর, হয়তো কিছু খুঁটিনাটি বিবরণ সমেত, যার অজানা নয়। এসব কথা বলার উদ্দেশ্য, বিজ্ঞান এখন আর শুধু ল্যাবরেটরির গবেষণা নয়, বা বড়ো জোর কিছু যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও উদ্ভাবন মাত্র নয়, বিজ্ঞান আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, প্রতিটি মানুষের জীবনে, জীবনযাত্রায়, প্রাত্যহিকতার দাবি পূরণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান অতি বিপুল ও অজস্র। আমরা এই জীবনযাত্রায় এতই অভ্যস্ত যে 'দাও ফিরে সে অরণ্য' বলে কবিতা লিখতে হলেও কবিতা লেখার আয়োজনটির জন্যে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপরেই নির্ভর করে থাকি। প্যাপিরাস বা তালপাতার ওপরে শলাকা দিয়ে লিখতে হলে এ কবিতা লেখা যেত কিনা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও পারতেন কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। অবশ্য ব্যাপারটা শুধু আয়োজনের নয়। ইট কাঠ লোহা পাথরে জীবন এতই পিষ্ট যে তপোবনের জীবনও কাম্য মনে হচ্ছে, এমন কি সে-জীবনের নীবারধান্যের মুষ্টি ও বল্কলবসন পর্যন্ত। নবসভ্যতাকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে তুমি তোমার এই নগর ফিরিয়ে নাও। কবির উক্তি শুনে মনে হতে পারে, এই নগরজীবনটার জন্যেই যতো অশান্তি, মানুষের এত অধঃপতন। সেই অরণ্যে ফিরে যেতে পারলেই মানুষ আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

এমনি ধরনের কথা ঠিক এই ভাষায় না হলেও প্রায় একই অর্থে হামেশাই আমাদের শুনতে হয়। কেউ হয়তো মস্ত একটা গায়ের জোরের ব্যাপার দেখিয়েছে, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই বলে উঠবে, এ আর এমন কি, আমাদের বাপ-ঠাকুর্দার আমলে...ইত্যাদি ইত্যাদি। আর বাপ-ঠাকুর্দার আমলে গায়ের জোরের ব্যাপারটা যে কী কল্পনাতীত রকমের প্রকান্ড ছিল সে-সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্যে অজস্র গল্পের অবতারণা করা চলবে। বিশ্বের কোনো দেশেই বাপ-ঠাকুর্দাদের বীরত্ব ও শক্তিমত্তা নিয়ে গল্পের অভাব নেই, পুরাণের গল্পের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ভীমের চেয়ে বড়ো পালোয়ান আর কে? ভীমের চেয়ে বড়ো বীর? পৌরাণিক চরিত্রকে কোনোভাবেই চ্যালেঞ্জ করা চলে না। কিন্তু আমাদের বাপ-ঠাকুর্দাদের ব্যবহার করা কিছু শিরস্ত্রাণ কিছু অস্ত্রশস্ত্র কিছু বর্ম ও পোশাক-আশাক আমরা পেয়েছি। সেগুলো মাপের দিক থেকে একালের মানুষের পক্ষে বেমানান নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বরং খাটো। অন্তত শরীরের মাপের দিক থেকে আমাদের বাপ-ঠাকুর্দার আমলের মানুষেরা আমাদের চেয়ে কোনোদিক থেকে বড় ছিলেন এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

আর সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপরই যদি নির্ভর করতে হয় তাহলে বরং উল্টো সিদ্ধান্তটাই অবধারিত হয়ে পড়ে। খেলাধুলোয় ও ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় অতীতের মানুষেরা কতখানি কৃতিত্ব দেখিয়েছে আর এখনকার মানুষেরা কতখানি দেখাচ্ছে তার একটা তুলনামূলক বিচার অনায়াসেই সম্ভব। তা থেকে শরীরের ক্ষমতা সম্পর্কে একটা তুলনামূলক ধারণা। যুদ্ধে জয়লাভ করাটা অনেক সময়ে সৈন্য চলাচলের কলাকৌশল ও অস্ত্রপ্রয়োগের নিপুণতার ওপরে নির্ভর করে। কিন্তু ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে হলে শরীরের ক্ষমতারই মুখ্য ভূমিকা।

দু-একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক।

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রাচীনকালের রেকর্ড কী তার সঠিক সংবাদ আমাদের জানা নেই। তবে পরোক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে অনুমান করা চলে লং জাম্পে প্রাচীন গ্রীসের লাফবীরেরা ৫·৫ মিটারের বেশি লাফাতে পারতেন না। অথচ প্রাচীন গ্রীসের অ্যাথলেটদের যে চেহারা আমরা ছবিতে দেখি, অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক থেকে তা অতুলনীয়। তবুও স্বীকার করতে হবে, একালের একটি স্কুলের ছেলেও এই সামান্য ৫·৫ মিটার লাফ দিয়ে থাকে। সোভিয়েট অ্যাথলেট ইগর তের-ওভানেসিয়ান লাফিয়েছেন ৮ মি ৩১ সে·মি।

প্রাচীন কালের কথা ছেড়ে দিয়ে কয়েক দশক আগেকার রেকর্ডের সঙ্গেই বরং একালকে তুলনা করা যাক।

শরীরের ক্ষমতা সঠিকভাবে যাচাই হয় যে ক্রীড়ায় তার নাম ভারোত্তলন। এই ক্রীড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুখোমুখি দাঁড়াবারও প্রয়োজন হয় না। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ভারোত্তলনকারীরা ভার তুলে থাকেন আর তা মিলিয়েই রেকর্ড স্থির হয়।

পঁচিশ বছর আগেও হেভিওয়েট বিভাগে ঝাঁকুনি দিয়ে ভার তোলার রেকর্ড ছিল মাত্র ১৪০ কেজি। বছরে বছরে এই রেকর্ড ভাঙা হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন ভারোত্তলনকারী পল অ্যান্ডারসন রেকর্ড করেন ১৯৭·৫ কেজি ওজন তুলে। কিন্তু এই রেকর্ডও অধিককাল স্থায়ী হয় নি। সপ্তদশ অলিম্পিকে সোভিয়েট

ভারোত্তলনকারী যুরি ভ্লাসফ ওজন তুলে বসেন ২১১ কেজি। বলা বাহুল্য, এই রেকর্ডও ভঙ্গ হয়েছে।

ভারোত্তলনের ব্যাপারেই যদি এই হতে পারে তাহলে অন্যান্য ক্রীড়ার ক্ষেত্রে তো হবেই।

১৮৯৬ সালে প্রথম অলিম্পিকে হাঙ্গেরীয় অ্যাথলেট আলফ্রেড হায়োস ১০০ মিটার ফ্রী স্টাইল সাঁতার দিয়েছিলেন ১ মিনিট ২২·২ সেকেন্ডে। আজকের দিনে স্কুলের মেয়েরাও ফ্রী স্টাইল সাঁতারে এর চেয়ে কম সময়ে ১০০ মিটার পাড়ি দিতে পারে।

ট্র্যাক অ্যান্ড ফীল্ডের দিকে তাকানো যাক।

প্রথম অলিম্পিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টমাস বার্ক ১০০ মি দৌড়েছিলেন ১২ সেকেন্ডে। দ্বিতীয় অলিম্পিকে (১৯০০) ২০০ মি দৌড়ের (প্রথম অলিম্পিক ২০০ মি দৌড়ের ব্যবস্থা ছিল না) রেকর্ড ছিল ২২·২ সেঃ। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিমাত্রই জানেন, একালের এই অলিম্পিক রেকর্ড স্পর্শ করার ক্ষমতা একালের অনেক স্কুলের ছেলেও রাখে।

হাই জাম্পে প্রথম অলিম্পিকের রেকর্ড ছিল এক মি ৮১ সে-মি। আর ভালেরি ব্রুমেল ষোল বছর বয়সেই লাফিয়েছিলেন ১ মি ৯৫ সে-মি। আর একালের অনেক স্কুলের ছেলের কাছে প্রথম অলিম্পিকের রেকর্ড ম্লান হয়ে গিয়েছে।

শুধু ছেলেদের কথা বলা হল। মেয়ে-দের বেলাতেও একই কথা। প্রাচীন গ্রীসে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল না, দর্শক হিসেবেও নয়। কিন্তু একালের মেয়েরা সমান অধিকার নিয়ে পাল্লা দিচ্ছে। সেখানেও রেকর্ডের ছড়াছড়ি। বছরের কীর্তির বছর না ঘুরতেই ম্লান হয়ে যাচ্ছে। প্রথম অলিম্পিকে যা ছিল ছেলেদের রেকর্ড, একালের মেয়েরা অনায়াসেই তা অতিক্রম করে থাকে।

তাহলে ব্যাপারটা কী? আমাদের বাপ-ঠাকুর্দার ক্ষমতা আমাদের চেয়ে বেশি ছিল এ তত্ত্ব আর টিকছে না। তাহলে কি ধরে নিতে হয় যে আমাদের ক্ষমতা আমাদের বাপ-ঠাকুর্দাদের চেয়ে অনেক বেশি? এক অর্থে তাই বইকি। তবে একটা কথা আছে। আমরা এই বাড়তি ক্ষমতাটা লাভ করেছি কোনো বিশেষ শারীরগত উৎকর্ষের জন্যে নয়, বিজ্ঞানের দৌলতে, আমাদের বাপ-ঠাকুর্দাদের আমলে যার বিশেষ অভাব ছিল। কথাটা পরিষ্কার করা দরকার। ধরা যাক দুজন প্রতিযোগীর শরীরের ওজন, পুষ্টি, উচ্চতা ইত্যাদি সবই একই মাপের। তবুও হয়তো দেখা যাবে, সমানে চর্চা ও অনুশীলন করার পরেও একজন দু মিটার লাফাতে পারছে, অপরজন পারছে না। এমনটি কেন হবে?

এ-প্রশ্নের জবাবেই ক্রীড়াচর্চার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ভূমিকার কথা তুলতে হয়। অতীতের সঙ্গে একালের যে এতখানি হেরফের, এমন কি একালের একজন প্রতিযোগীর সঙ্গে অপর একজনের। তার ব্যাখ্যাও পাওয়া যাবে ক্রীড়াচর্চার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা গ্রহণের মধ্যে।

এমনিতে মনে হতে পারে, খেলাধুলো হচ্ছে খেলাধুলো, তার মধ্যে আবার বিজ্ঞান আসে কি করে! একজন লোক ওজন তুলছে বা লাফাচ্ছে বা সাঁতার দিচ্ছে—বিজ্ঞান সেখানে তাকে কিভাবে সাহায্য করে থাকে?

যে যাই করুন না কেন—ওজন তোলা বা লাফ দেওয়া বা সাঁতার কাটা—ভালোভাবে করতে হলে শরীরটা পুরোপুরি ফিট থাকা চাই। সেজন্যে জানা দরকার শরীরটা কিভাবে চলে, অর্থাৎ শারীরতত্ত্ব। আর শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে জানতে হলে এ্যাথলেটকে বিজ্ঞানীর দ্বারস্থ হতেই হয়।

প্রচুর খেলেই বুঝি শরীরের জোর বাড়ে, প্রচুর বিশ্রাম নিলেই বুঝি শরীরের ক্লান্তি দূর হয়—ক্রীড়াবিদ মহলে এমনি একটা ধারণা কিছুকাল আগেও বেশ দাপটের সঙ্গেই বজায় ছিল। বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখালেন ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। মানুষের শরীর একটা যন্ত্র বিশেষ। সেই যন্ত্রটিকে পুরোপুরি চালু রাখতে হলে প্রথমত চাই যন্ত্রের প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক অংশে নিখুঁত অবস্থা, দ্বিতীয়ত চাই পৃথক পৃথক অংশের মধ্যে সঠিক সমন্বয়। বিজ্ঞানী জানালেন, এজন্যে যেমন চাই খাওয়া ও বিশ্রাম, তেমনি না-খাওয়া ও না-বিশ্রাম। মনে করা যাক একজন প্রতিযোগী ১০০ মি দৌড়ে নামছে। প্রতিযোগিতার দিন সে কি শুধু খাবে আর বিশ্রাম নেবে? মোটেই নয়। খেতে হবে প্রচুর নয়, পরিমিত ও সুষম। বিশ্রাম নিতে হবে নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয়।

প্রচুর খাওয়ার ফল কী সে-অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর আছে। ভুঁড়ি বাড়িয়ে চললে আর যাই হোক চটপটে যাওয়া যায় না, খেলোয়াড় হওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু অখন্ড বিশ্রাম নিলেই কি শরীরের ক্ষমতার সঞ্চয়ে হাত পড়বার কোনো কারণ ঘটে না? বিজ্ঞানীর গবেষণার রায় কিন্তু উল্টো।

দুজন শারীরতত্ত্ববিদের নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। দুজনেই রুশ দেশের। একজন হচ্ছেন সেচেনফ, অপরজন পাভলভ।

শরীরের মাংসপেশী কোন্ অবস্থায় সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে? ১৯০৩ সালে সেচেনফ এ-নিয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন।

তাঁর একটি পরীক্ষাকার্য ছিল এই রকম: বিশেষ রকমের একটা আয়োজনের সামনে তিনি বসতেন আর করাত দিয়ে কাঠ কাটার সময়ে হাত যেমন ওঠা-নামা করে তেমনি ওঠা-নামা করাতেন একটা ওজন তুলে আর নামিয়ে। প্রথমে ডান হাতে। পুরো চারটি ঘণ্টা ধরে। এই চার ঘণ্টায় বিজ্ঞানীর হাত ৪৮০০ বার ওঠা-নামা করেছিল। তারপরে বিজ্ঞানী টের পেলেন তাঁর ডান হাতে ক্লান্তি আসছে, ওজন আর আগের মতো ততোটা উঠছে না। তখন ডান

গবেষণাগারে কুস্তি এবং যুডো খেলার কলা-কৌশল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সাহায্যে রেকর্ড করা হচ্ছে।
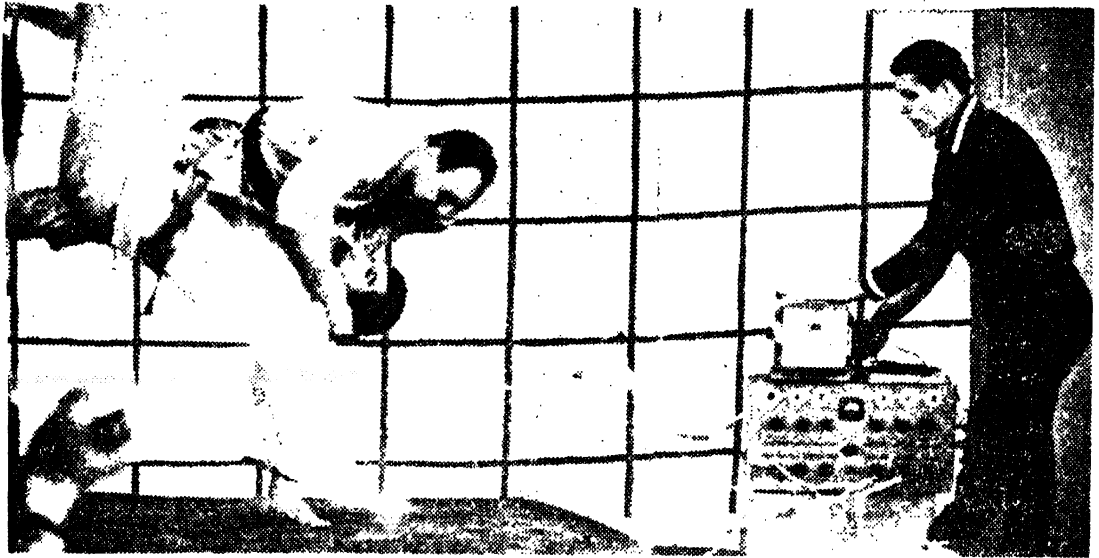
হাত বদলে বাঁ হাত। বিজ্ঞানী লিখছেন, "এই পরীক্ষাকার্য প্রথম যখন শুরু করি, আমি খুবই অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম যে কাজ করার ক্ষমতা আমার ডান হাতের চেয়ে বাঁ-হাতের অনেক বেশি। আমি আরো অবাক হলাম যখন দেখলাম, প্রথম বিশ্রামের পরে আমার ডান হাতের কাজ করার ক্ষমতা যা ছিল, বাঁ-হাতের কাজ শেষ হবার পরে ক্লান্ত ডান হাতের কাজ করার ক্ষমতা অনেক বেশি।"

এই পরীক্ষাকার্যের সিদ্ধান্ত কি? বিশ্রাম অবশ্যই চাই, কিন্তু নিষ্ক্রিয় নয় সক্রিয়, তাহলেই কর্মক্ষমতা বাড়ে। খেলোয়াড় খেলা শুরু করার আগে অবশ্যই বিশ্রাম নেবেন, কিন্তু চিৎপাত হয়ে শুয়ে থেকে নয়, হাত-পা নেড়ে, দৌড়-ঝাঁপ করে, শরীরটাকে বাঁকিয়ে দুমড়িয়ে ও অন্য নানাভাবে। কথাটা আজকাল আর নতুন নয়। যে-কোনো খেলার আসরে গিয়ে বসলেই দেখা যায় খেলোয়াড়রা এমনি সক্রিয় বিশ্রাম নিচ্ছেন।

পাভলভ বিশেষ নজর দিয়েছিলেন শরীরচর্চার দিকে। তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, মানুষের কাজ করার ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে, কিন্তু আচমকা কদাচ নয়। এ-ব্যাপারে তিনি হাতেকলমে পরীক্ষা করেছিলেন। প্রতিদিন সাইকেল চালাতেন তিনি, গোড়ার দিকে দৈনিক দেড় থেকে দুই কিলোমিটার পর্যন্ত, শেষের দিকে বাড়াতে বাড়াতে অনায়াসে সতেরো কিলোমিটার পর্যন্ত। ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পাভলভ বলেছেন, "মাংসপেশীর কাজের সঙ্গে অনেক কিছুর সম্পর্ক। কে বলতে পারে কত কি নতুন প্রক্রিয়া শুরু হবে-নতুন শ্বাসপ্রশ্বাস, নতুন হৃদস্পন্দন, নতুন নিঃসরণ ও এমনি অনেক কিছু, নতুন প্যাটার্ণটি গড়ে উঠতে সময় দরকার।"

বিষয়টি অন্য দিক থেকেও দেখার আছে, পাভলভ বললেন। মানুষের সমস্ত কার্যকলাপ তার সমস্ত নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে নার্ভতন্ত্র। ভালো হৃদপিন্ড ও ফুসফুস থাকলেই ভালো খেলোয়াড় হওয়া যায় না। এই হৃদপিন্ড ও ফুসফুসের কাজ হওয়া চাই নার্ভতন্ত্রের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। ঠিক যেমন জোরালো ইঞ্জিন থাকাটাই বেগে ট্রেন চলাচলের নিশ্চয়তা নয়, সেজন্য সর্বোপরি থাকা চাই নিখুঁত কন্ট্রোল ব্যবস্থা। মানুষের শরীরে এই কন্ট্রোল-ব্যবস্থাটি হচ্ছে নার্ভতন্ত্র যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মস্তিষ্ক।

জন্তু-জানোয়ারের ওপরে পরীক্ষাকার্য চালিয়ে পাভলভ আবিষ্কার করলেন জৈবিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্কের সূত্র। তার একটি হচ্ছে কন্ডিশনড রিফ্লেক্স বা সাপেক্ষ প্রতিবর্ত। পাভলভের তত্ত্ব অনুসারে মানুষের উচ্চতর নার্ভীয় ক্রিয়ার ভিত্তি হচ্ছে এই কন্ডিশনড রিফ্লেক্স। মানুষ যতোই বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরনের শরীর চর্চা করে চলবে ততোই উন্নত হয়ে উঠবে তার নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়া।

অ্যাথলেটদের ট্রেনিং কেমন হবে, প্রতিযোগিতার জন্যে তাদের কিভাবে তৈরি হতে হবে, শরীরটাকে কিভাবে শক্তসমর্থ করে তুলতে হবে, ট্রেনিং-এর পদ্ধতি কী, এতদ্‌সংক্রান্ত বহু প্রশ্নের সমাধান সম্ভব হয়েছে পাভলভের তত্ত্বের সাহায্যে। তাঁর অনুগামীরা এই তত্ত্বকে আরো অগ্রসর করে নিয়ে গেছেন এবং শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে, বিশ্রামের সময়ে ও প্রচন্ড শারীরিক শ্রম করার সময়ে মাংসপেশী হৃদপিন্ড ফুসফুস কিভাবে কাজ করে সে-সম্পর্কে ভেতরকার রহস্যটি অনেকখানি জানতে পেরেছেন। এমনিভাবে বিজ্ঞানীরা উপস্থিত করেছেন—শরীরটাকে কিভাবে আরো শক্তসমর্থ করে তোলা যায়, কি-ভাবে খেলাধুলোয় আরো ভালো ফল করা যায়— তার জন্যে প্রস্তুতির উন্নততর এক পদ্ধতি। বছরে বছরে এত রেকর্ড ভঙ্গ হওয়ার মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের এই অবদান।

তাহলেও প্রশ্ন উঠতে পারে, রেকর্ড ভঙ্গ হওয়ার কি একটা সীমা নেই? রেকর্ডের মাত্রা উঁচু হতে হতে এমন একটি বিন্দু কি স্পর্শ করবে না যা ছাড়িয়ে যাওয়া মানুষের এই শরীরের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব? বিজ্ঞানীরা কী বলেন দেখা যাক। তাঁরা একটা হিসেব করে দেখিয়েছেন মানুষের কর্মক্ষমতার ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত অব্যবহৃত থেকে যায়। ব্যাঙ্কে টাকা মজুদ থাকার মতো এই কর্মক্ষমতাও তার শরীরে মজুদ থাকে। অ্যাথলেটকে চেষ্টা করতে হয় এই মজুদ থেকে যতোটা বেশি সম্ভব বার করে আনতে। বিন্দুসম আনতে পারলেও লাভ, তাতেও হয়তো এক-পা বেশি এগিয়ে যাওয়া চলবে।

এই মজুদ কর্মশক্তি কিভাবে উদ্ধার করা যায়? গত এক দশকেরও অধিককাল ধরে ক্রীড়াবিদরা ও বিজ্ঞানীরা এ-ব্যাপারে গবেষণা করছেন। বিষয়টি নির্ভর করে প্রধানত ট্রেনিং-এর ওপরে।

এক সময়ে ধারণা ছিল, যে দৌড়বে তার পায়ের জোর থাকলেই হল, যে ওজন তুলবে তার হাতের জোর। এখন এই ধারণা বাতিল হয়ে গেছে। ক্রীড়া যাইহোক, তাতে ভালো ফল করতে হলে সমস্ত মাংসপেশী সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুসমন্বিত সক্রিয়তা চাই। অর্থাৎ যে দৌড়বে বা লাফ দেবে তাকে নজর দিতে হবে হাতের দিকেও, যে ওজন তুলবে তাকে পায়ের দিকেও। ভালেরি ব্রুমেল হাইজাম্পে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, কিন্তু তিনি প্রচুর সময় ব্যয় করে থাকেন ভারোত্তলনে। জিমন্যাস্টিকস অ্যাক্রোব্যাটিকস বল নিয়ে খেলাতেও তাঁর সমান আগ্রহ। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের অনুষ্ঠানেও নেমে

থাকেন ও ভালো ফল করেন। আসল কথা, ট্রেনিং শুধু বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নয়, গোটা শরীরের। কোনো ক্রীড়াই বাদ দেওয়া চলবে না। যতো বেশি রকমের ক্রীড়ার চর্চায় নিজেকে নিযুক্ত করা যাবে ততো বেশি সম্ভাবনা থাকবে মজুদ কর্মক্ষমতা টেনে বার করার। বিজ্ঞানীরা এ-নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন ও বিস্তারিত পদ্ধতি উপস্থিত করেছেন। সুতরাং আশা করা চলে বিজ্ঞানের দৌলতে আরো বেশ কিছুকাল রেকর্ড ভাঙতে থাকবে।

এতক্ষণ শুধু শারীরতত্ত্ববিদদের কথাই বলা হল। কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্য শুধু এই একটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাহায্যও আছে, যে-সাহায্য না থাকলে আধুনিক স্পোর্টস গড়ে উঠতে পারত না।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় পদার্থ-বিদ্যার। ক্রীড়া যাইহোক, পদার্থবিদ্যার কোনো না কোনো সূত্রে তার সঙ্গে জড়িত থাকেই। মেকানিকস, হাইড্রো ও এরো ডাইনামিকস-এর সাহায্য না নিলে ক্রীড়া-ক্ষেত্রের অনেক প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া যায় না।

অ্যাথলেটদের ট্রেনিং-এর বেলাতেও পদার্থবিদ্যার সাহায্য না নিলেই নয়। পদার্থ-বিজ্ঞানীরা যে-সব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরি করেছেন তার সাহায্যে ট্রেনিং দেবার ব্যাপারটি অতিমাত্রায় নিখুঁত করে তোলা সম্ভব হয়েছে। দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হবে। ধরা যাক হাইজাম্পের অনুশীলন হচ্ছে। একজন দু-মিটার লাফিয়ে পার হয়ে গেল, আরেকজন পারল না। দুজনের শরীরেই সূক্ষ্ম সব যন্ত্রপাতি লাগানো আছে যাতে ধরা পড়ছে লাফ দেবার সময়ে মাংসপেশীর টান ও বিন্যাস, শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি, হৃদপিন্ডের স্পন্দন ইত্যাদি। যে লাফিয়ে পার হয়ে গেল তার শরীরের যন্ত্র থেকে পাওয়া যাবে এক রকমের রীডিং, যে পারল না তার শরীরের যন্ত্র থেকে অন্যরকমের রিডীং। শেষোক্ত ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় ঘাটতি? দ্বিতীয়-জনকে যদি দু-মিটার লাফিয়ে পার হতে হয় তাহলে এই ঘাটতিগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এমনি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে। কে দৌড়চ্ছে, কে বর্শা ছুড়ছে, কে সাঁতার দিচ্ছে, কে ওজন তুলছে—সবার শরীরে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি লাগিয়ে দাও, দ্যাখ কার কোথায় ঘাটতি, তারপরে এমনভাবে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করো, যাতে এই ঘাটতি-গুলো পূরণ হয়।

শুধু সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি বানিয়েই নয়, পদার্থ-বিজ্ঞানীরা আরো নানাভাবে ক্রীড়া-বিদদের সাহায্য করে চলেছেন।

তেমনি, খেলাধুলোর জগতে রসায়নের সাহায্যও বড়ো কম নয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই।

স্কেটিং করতে হলে বরফ চাই। তাহলে কি শীতের দেশ না হলে স্কেটিং করা চলবে না? অবশ্যই চলবে। রসায়নবিদরা আছেন কী করতে! তৈরি হল কৃত্রিম বরফ, স্কেটিং করার জন্যে প্রয়োজনীয় গুণাগুণের দিক থেকে যা আসল বরফের মতোই, অথচ গরমে গলে না। রসায়নবিদ্যার কল্যাণে এমন কি এই কলকাতা শহরের ময়দানেও তাই স্কেটিং সম্ভব হয়েছে।

ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে দৌড় প্রতি-যোগিতারই সবচেয়ে বড়ো স্থান। এখানেও রসায়নবিদদের হাত পড়েছে। দৌড়বীররা যে জুতো পড়েন তাতে লাগানো থাকে বড় বড় স্পাইক বা কাঁটা। কেন? না, যাতে পা পিছলে না যায়। স্পাইকের সাহায্যে পা পিছলে যাওয়া যে একেবারে রোধ করা যায় তা নয়। যতো ভালো ট্র্যাক হোক, যতো ভালো স্পাইক—প্রতি পদক্ষেপে প্রায় ৫ মি-মি পরিমাণ পিছলে যেতে হয়। পিছলে যাওয়া মানেই পিছিয়ে পড়া। প্রতি পদক্ষেপে ৫ মি-মি হলে ১৮০ মিটার দৌড়ে মোট পিছিয়ে পড়ার পরিমাণ একশো সেন্টিমিটারের কাছাকাছি হয়ে যেতে পারে। এই পিছিয়ে পড়াটা কি একেবারেই রোধ করা যায় না? সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন রসায়নবিদ। তৈরি হল পলিথিলিনের স্পাইক। পিছলে পিছিয়ে পড়া এখন অনেক কম। চেষ্টা চলছে স্পাইকের ব্যাপারটাকেই তুলে দিতে। অর্থাৎ রানারের জুতো হবে স্পাইকহীন! প্রায় একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

বাতিল হতে চলেছে এমনি আরো অনেক পরিচিত সরঞ্জাম। যেমন, পোল-ভল্টের পোল বা বাঁশটি। বাঁশের সাহায্যে যতোদিন লাফ দেওয়া হত, রেকর্ড ছিল ৪ মি ৭৭ সে-মি। মার্কিন লম্ফবীর রবার্ট গুতোভস্কি ব্যবহার করলেন ইস্পাতের পোল। তিনি লাফ দিলেন ৪ মি ৮০ সে-মি। অতঃপর? খোঁজ হতে লাগল এমন কোনো উপকরণের যা দিয়ে পোল তৈরি হলে তা হবে হাল্কা, নমনীয় অথচ অভঙ্গুর। এগিয়ে এলেন রসায়নবিদ। তৈরি হল ফাইবার গ্লাসের পোল। দৃশ্যটি দেখার মতো। লম্ফবীর ফাইবারগ্লাসের পোল বা দন্ড নিয়ে ছুটে আসছেন। লাফ দিলেন। দন্ডটি বেঁকে গেল। বেঁকতে বেঁকতে প্রায় একটি রিং-এর মতো। তারপরে আবার সোজা হতে লাগল। গুলতি থেকে গুলি ছিটকে যাওয়ার মতো শূন্যে উঠে গেলেন লম্ফবীর। অর্থাৎ ফাইবারগ্লাসের দন্ডটি এক্ষেত্রে লম্ফবীরকে উঁচুতে ঠেলা মারতে অনেকখানি সাহায্য করছে। ফলে পোলভল্টে রেকর্ডের পর রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। মার্কিন লম্ফবীর জন পেনেলের রেকর্ড ৫ মি ২০ সে-মি।

তাহলে তো এমন দন্ডও তৈরি হতে পারে যার ধাক্কা প্রচন্ডতর? পারে বৈ-কি। সে-চেষ্টা চলছে। এখানেই একটা মূল প্রশ্ন ওঠে। একটা মাত্রা বা সীমানা অবশ্যই থাকবে যা ছাড়িয়ে যাওয়া চলবে না। স্পোর্টস যেন কোনোক্রমেই কসরৎ বা ম্যাজিক না হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি এদিকে কড়া নজর রেখেছেন। তা সত্ত্বেও নতুন নতুন সাজ-সরঞ্জাম তৈরি হয়েই চলবে এবং অলিম্পিকের রেকর্ডও ভঙ্গ হতে থাকবে। ইতিমধ্যে অনেকেই অলিম্পিকের রেকর্ড-গুলোকে বোগাস বলতে শুরু করেছেন। কেননা, তাঁদের মতে, রেকর্ডের কৃতিত্ব যতোটা না ব্যক্তিগতভাবে ক্রীড়াবিদের, তার চেয়ে বেশি সাজ-সরঞ্জামের। তবুও খেলা-ধুলার পুরনো জগতে ফিরে যাওয়া আর কিছুতেই সম্ভব নয়। দাও ফিরে সে অরণ্য বলে কবিতা লিখলেও নয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে ক্রীড়ার গাটছড়া বাঁধা হয়ে গিয়েছে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ক্রিকেট মাঠে জনসমাগমের হার ক্রমশই কমে আসছে। বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট মাঠগুলোতে; এ-ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষরা খুবই উদ্বিগ্ন। আমাদের দেশে, বিশেষ করে কলকাতায় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত—এখানে খুব ভাগ্যবান ছাড়া মাঠে ঢোকার ছাড়পত্র পাওয়া একরকম অসম্ভব। অস্ট্রেলিয়ার পরলোকগত উইকেটরক্ষক ওয়ালি গ্রাউট এ-প্রসঙ্গে একটা ভাল বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, কলকাতায় একটা টেস্ট টিকিটের বদলে যে-কোন সুবিধা পাওয়া যায়। ১৯৫৬ সালে টেস্ট ম্যাচের আগের দিন হোটেলে তাঁর ঘরে হঠাৎ এক যুবক ঢুকে গ্রাউটকে বলেন, গ্রাউট যদি তাঁকে একটা টিকিটের ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে তক্ষুনি তিনি গ্রাউটের একটা ছবি এঁকে দিতে পারেন।

এদেশে ক্রিকেটের এই জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেটের আইন ও পরিভাষা সম্পর্কে দর্শকদের ওয়াকিবহাল হওয়ার প্রয়োজন আছে; যদিও ভারতের কোন কোন স্থানের, বিশেষ করে কলকাতার দর্শকরা সমঝদার সম্মানে পরিচিতি লাভ করেছেন। বর্তমান লেখায় এই বিষয়েই কিছু আলোচনা করব।

ক্রিকেটে এমন অনেক আইন আছে যার আওতায় খুব বেশী ঘটনা ঘটে না। কিন্তু ঘটলে দর্শকদের মনে বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। যেমন, ক্রিকেটে যে দশ রকমের আউট আছে, তার মধ্যে একটি হোল 'অবস্ট্রাক্টিং দ্যা ফিল্ড' অর্থাৎ কোন ফিল্ডসম্যানকে যদি কোন ব্যাটসম্যান ইচ্ছাকৃতভাবে তার কর্তব্যে বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে এই আইনের বলে ব্যাটসম্যানকে আউট বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া যায়। কিন্তু এই আইনের ব্যাখ্যায় আছে, যদি বোলার অথবা কোন ফিল্ডসম্যান ক্যাচ ধরার সময় নন্-স্ট্রাইকার বা রানার তাকে বাধা দেন, সেক্ষেত্রে স্ট্রাইকার অর্থাৎ যিনি বল খেলেছেন, তাঁকে আউট বলে গণ্য করা হবে। ব্যাপারটা দাঁড়াল রামের অপরাধে শ্যামের দণ্ডভোগ, কিন্তু আইনের ব্যাখ্যায় শ্যামকেই মাঠ ছেড়ে যেতে হবে। রান-আউট বা অন্যান্য ক্ষেত্রে যে বাধার সৃষ্টি করেছে, তাকেই আউট বলে গণ্য করা হবে।

এবার হায়দরাবাদে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের চতুর্থ দিনে (খেলার তৃতীয়) পিচের ঘাস কাটা প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট খেলার আম্পায়ার ও অধিনায়কদ্বয়ের মধ্যে মতান্তর কেন্দ্র করে এক অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে গেছে। এ-দৃশ্য যাঁরা প্রত্যক্ষ করেননি, সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁরা সব জেনেছেন। আইনে আছে, প্রথম দিনের খেলা আরম্ভ হওয়ার অন্তত আট ঘণ্টা আগে ঘাস কাটা হবে। তারপর একদিন অন্তর ঘাস কাটা হবে। এর মধ্যে কোনদিন যদি বিরতির দিন হিসেবে ধার্য থাকে অথবা কোন কারণে যদি কোন দিন খেলা পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হয়, সেক্ষেত্রে সেই দিনগুলোকে ঘাস কাটার আইনে একটি দিন বলে ধরতে হবে এবং পরবর্তী যেদিন খেলা শুরু হবে, সেদিন ঘাস কাটা হবে।

ধ্রুব রায়

বিশেষ কোন চুক্তি আগে থাকতে হয়ে থাকলে বিরতির দিন অথবা পরিত্যক্ত খেলার দিন ঘাস কাটার ব্যবস্থা হতে পারে। নতুন আইনে খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে ছাড়া ঘাস কাটার অনুমতি নেই। হায়দরাবাদে প্রথম দিন খেলা হওয়ার পর দ্বিতীয় দিন বৃষ্টির জন্যে খেলা পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হয়। তার পরের দিনটি ছিল বিরতির দিন। একদিন অন্তর বলতে এই দিনটিকে বোঝায়। কিন্তু যেহেতু সে-দিনটা বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট, সুতরাং সেদিন ঘাস কাটা না হয়ে পরের দিন হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এক্ষেত্রে আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে নিউজিল্যাণ্ডের অধিনায়ক এবং আম্পায়ারদের মধ্যে মতবিরোধ হোল। অধিনায়ক ডাউলিং ঘাস কাটায় বাধা দিলেন; শেষপর্যন্ত ঘাস না কেটেই খেলা শুরু হোল। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আর একটা ঘটনাও আইন প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। রুসি সুর্তি ক্যাচ ধরে একই গতিতে মাঠের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। আইনের ব্যাখ্যায় এক্ষেত্রে মাঠের মধ্যে বল ধরা সত্ত্বেও আউট দেওয়া হবে না। উপরন্তু ব্যাটসম্যানের ঐ মারটিকে ছয় রান বলে ধার্য করা হবে।

এবার বলব রান আউট প্রসঙ্গে। রান আউট খুব বিরল ঘটনা নয় কিন্তু রান আউটের ক্ষেত্রে উভয় ব্যাটসম্যানের মধ্যে কোন্ খেলোয়াড়কে রান আউট বলে ধরা হবে সে প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

(১) রান করার সময় যদি একজন ব্যাটসম্যান অপরজনকে 'ক্রশ' করে যান, সেক্ষেত্রে যাঁর সামনের স্টাম্প ভেঙে দেওয়া হবে, তাঁকেই আউট বলে ধরা হবে। (চিত্র ১)

(২) কিন্তু উভয় ব্যাটসম্যান ক্রশ করার আগে যদি স্টাম্প ভেঙে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে যেদিককার স্টাম্প ভাঙা হোল, সেদিকে বল মারার আগে যে ব্যাটসম্যান ছিলেন, তাঁকে আউট বলে ধরা হবে। (চিত্র ২)

ব্যাটসম্যানের ব্যাটে লাগা বল যদি কোন ফিল্ডার 'ক্যাচ' ধরেন, সেই বল ব্যাটে লাগার আগে শরীরের কোন অংশে লাগলেও তাঁকে ক্যাচ-আউট বলে ধরা হবে। ব্যাটসম্যানের ব্যাটে বল লেগে মাটিতে পড়ার আগে যদি ব্যাটসম্যানের প্যাডে আটকে যায়, সেক্ষেত্রে ডেড্ বল বলে ধরা হবে। কিন্তু ঐ একইভাবে যদি উইকেটরক্ষকের প্যাডে বল আটকে যায়, সেক্ষেত্রে হাতে করে কেউ তুলে নিলেই ব্যাটসম্যানকে 'ক্যাচ' আউট বলে ধরা হবে। ক্যাচ আউটের ক্ষেত্রে ব্যাট বলতে ব্যাট ও হ্যাণ্ডগ্লাভস্ সমেত হাতের অংশকে বোঝায়। যদি ব্যাটসম্যান ব্যাট করার সময় নিজের নির্দিষ্ট এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে আসেন আর বল উইকেটরক্ষকের হাত অথবা শরীরের কোন অংশে লেগে ফিরে এসে যদি উইকেট ভেঙে দেয়, সেক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানকে স্টাম্প আউট বলে গণ্য করা হবে।

'নো' বলে যদি কোন রান হয়, তাহলে শুধু এক্‌সট্রায় 'নো' বলে এক রান যোগ হবে। ব্যাটসম্যান ব্যাটে লাগিয়ে যদি কোন রান করেন, সেক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানের রানের সঙ্গে সেই রান যোগ হবে। এক্ষেত্রে কিন্তু 'নো' বলে পেনাল্টি হিসেবে যে এক রান এক্‌সট্রার সঙ্গে যোগ হয়, সে-রান আর যোগ করা হবে না। 'নো' বলে যদি কোন ব্যাটসম্যান আউট হন আর আউট হবার আগে যদি কোন রান সম্পূর্ণ করে থাকেন, সেই রান তাঁর রান-সংখ্যার সঙ্গে যোগ হবে। যদি কোন রান না করে থাকেন, তাহলে শুধু এক্‌সট্রার সঙ্গে এক রান যোগ হবে। ওয়াইড বলের ক্ষেত্রে যদি রান বাউণ্ডারীর সীমানা ছাড়িয়ে যায় অথবা ব্যাটসম্যান দৌড়ে কোন রান করেন, সেই রান এক্‌সট্রায় ওয়াইড রান হিসেবে গণ্য করা হবে।

আইন প্রসঙ্গে সবশেষে বলব, ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে গত প্রথম টেস্ট

ফ্লিপার অফ্ ব্রেকের মত করে ছাড়া হয়, কিন্তু বল ছাড়ার সময় আঙুলের ডগার সাহায্যে বলের গতি খুব দ্রুত করে দেওয়া হয়; ফলে বল মাটিতে পড়ে মোচড় নেওয়ার বদলে একটু বেশী জোরে যায় এবং সোজা হয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার রিচি বেনো ও ব্রুস ডুলান্ড এই ধরনের বল করতেন।

রাউন্ড দ্যা এবং ওভার দ্যা উইকেট বোলার যে-হাতে বল করছেন সেই হাত যদি উইকেটের কাছের দিকের হাত হয়, তাকে বলা হয় ওভার দ্যা উইকেট বোলিং (চিত্র ১)। আর যে-হাতে বল করছেন না, সেই হাত যখন উইকেটের কাছের দিকের হাত হয়, তখন বলা হয় রাউন্ড দ্যা উইকেট। (চিত্র ২)

ফ্লিক গ্রীপ বর্তমান সফররত অস্ট্রেলিয়ান বোলার গ্লীসন এই গ্রীপে বল ধরেন। এই-ভাবে বল ধরে অফ ব্রেক ও লেগ ব্রেক করান যায়—ফলে ব্যাটসম্যানের পক্ষে বোঝা শক্ত হয় কোন্ বলটা কোন্ দিকে ঘুরবে। গুগলি ও লেগব্রেক দিয়েও ব্যাটসম্যানকে ঠকানো হয়; কিন্তু এই গ্রীপের একটা বিশেষ সুবিধা হচ্ছে যে, বল হাত থেকে বেশ জোরে ছাড়া যায় যার ফলে বল মাটিতে পড়ার পর ব্যাটসম্যান খুব বেশী সময় পান না তাঁর সিদ্ধান্ত ঠিক করার। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেস্ট বোলার জ্যাক আইভারসন এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সোনি রামাধিন এই গ্রীপে বল করে ক্রিকেটে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন।

কোন ব্যাটসম্যান এক ম্যাচের উভয় ইনিংসে শূন্য রানে আউট হলে তাঁকে বলা হয় 'পেয়ার' অথবা 'স্পেকটাকেলস'। ব্যাটসম্যানের ব্যাটের কানায় বল লেগে উইকেটের পিছনের দিকে ক্যাচ গেলে আমরা এদেশে বলি স্নিক—অস্ট্রেলিয়ানরা বলে 'নিক'।

'ডাক্' বা 'ডাকিং'—খাটো লেংথে বল পড়ে যখন লাফিয়ে ওপর দিকে ওঠে, সেই বল ব্যাটসম্যানরা অনেক সময় ব্যাটে খেলার চেষ্টা না করে নিচু হয়ে বলটাকে ওপর দিয়ে চলে যেতে দেন, এই নিচু হওয়াকে ডাক্ করা ডাকিং বলে।

বার্ণ-ডোর গেম : কোন ব্যাটসম্যান যখন রক্ষণমূলক ব্যাট করেন এবং তাঁর রান সংখ্যা খুব মন্থরগতিতে উঠতে থাকে তখন তাকে বার্ণ-ডোর গেম বলা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক জে ডবলিউ এইচ টি ডগলাস। খুব মন্থর-গতিতে তিনি ব্যাট করতেন। অস্ট্রেলিয়ার দর্শকরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'জনি ওসট হিট টুডে'। এসেক্স ও ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত অলরাউন্ডার টেভর বেইলিকেও একই কারণে 'বারনাকেল বেইলি' বলা হোত।

র‍্যাবিট : দলের যাঁরা বোলার তাঁরা সাধারণতঃ ব্যাটিংএ দুর্বল হন। এ'দের অনেক সময় 'র‍্যাবিট' বলা হয়। এ'রা সাধারণতঃ শেষ দিকে ব্যাট করতে আসেন বলে এ'দের বলা হয় 'টেলএন্ডারস্'।

ডলি ক্যাচ : ব্যাটসম্যান খুব সহজ ক্যাচ দিলে তাকে বলা হয় 'ডলি' ক্যাচ।

স্টীকি ডগ : বৃষ্টি ভেজা নরম পিচে বল স্বাভাবিকভাবে আসে না। কখন লাফায়, কখন নিচু হয়ে যায়। সাধারণ পিচের চেয়ে কখন অনেক বেশী স্পীন করে, কখন আবার স্পীন না করে সোজা হয়ে যায়। এই ধরনের পিচের অবস্থাকে 'স্টীকি ডগ' বলা হয়।

(এক)

শেষ পর্যন্ত যখন সত্যি সত্যি নুরিয়া-গ্রামে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যে নেমে গেছে। ঝোপে-ঝাড়ে হাজার হাজার জোনাকি জ্বলছে। সরু সরু রাস্তাগুলোতে টিমটিমে তেলের বাতির নিচে আলোর চেয়ে ছায়াই বেশি। ঐ একটুকু দীপশিখার চারদিকে পোকার রাশি। বাঁশবনে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। শিরশিরে শীতের হাওয়ায় শুকনো পাতা খসে পড়ছে। লোকচক্ষুর অগোচরে থাকতে হলে, এমন জায়গা ভূ-ভারত ঢুঁড়লেও আরেকটি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তার উপর এক টুকরো কালো মেঘ এসে ভাঙা চাঁদটাকে আড়াল করে দিল। আমারও গা শির শির করতে লাগল। কোথায় বনিদি?

একটু পরে বিশাল একটা ফটকের সামনে পৌঁছতেই মেঘটুকু আবার সরে গেল। দেখলাম মাঝখানে নকসা-করা প্রকাণ্ড লোহার গেটে তালা দেওয়া। তার দুই পাশে দুটি সিংহ থাবা তুলে ভয় দেখাচ্ছে। রিকসাওয়ালা বলল এইটেই স্কুল-বাড়ির ফটক। বোর্ডিং-এর সদর দরজা পাশের গলিতে। একালে সেটাই সম্ভবতঃ খিড়কি-দোর ছিল। একেবারে নিরিবিলি নির্জন। এই রকমই আমি খুঁজছিলাম।

চারদিকে বড় বড় বটগাছ ঝুরি নামিয়েছে। মস্ত মস্ত তেঁতুল শিরীষ আমগাছ

জঙ্গল করে রেখেছে। শুনেই এসেছিলাম বড় বাড়িতে ক্লাস হয় আর এই অন্দরমহলে শিক্ষিকাদের থাকবার জায়গা। মেয়ে-বোর্ডিং বলতে এইটুকুই বোঝায়। আমিও শিক্ষিকাদের একজন হয়ে এসেছি। বিয়ের আগেকার নাম নিয়েছি, বি-এ, বি-টি'র সার্টিফিকেটে সেই নাম-ই আছে। ইন্টার-ভিউ-এর সময় কেউ কিছু সন্দেহও করে নি। ও-ডি কলোন দিয়ে সিঁদুরের দাগ মুছে ফেলেছি। ও-সব কুসংস্কার আমার নেইও, তাছাড়া সামান্য একটু ও-ডি কলোন ও লোকটার কিছু করতে পারবে না। এইভাবে, এখানে থেকে, নিরাপদে কাজ হাসিল করা যাবে। ছোট গেট দিয়ে ঢুকে রিক্‌স থামলে দেখি যেখানে এসে পৌঁছেছি সেটাকে একটা ছোটখাটো প্রাসাদও বলা চলে। কিন্তু তার সদর দরজা এঁটে বন্ধ করা। এখান থেকে একতলায় বা দো-তলায় কোথাও। এতটুকু আলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। সাইকেল-রিক্‌সর ঘণ্টা বাজিয়ে, হাঁকডাক করেও যখন দরজা খুলল না, তখন রিক্‌সওয়ালা নিচে নেমে প্রথমে কপাটে ধাক্কা-ধাক্কি করতে ও পরে গুম-গুম করে পেটাতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে মোমবাতি হাতে যিনি দরজা খুললেন, তাঁর বগলে দেখলাম একটা পাথরের নোড়া। পরে জেনেছিলাম তাঁর নাম গুণময়ী, সবাই ডাকত গুণোদিদি। হোস্টেলের মেট্রন। আমার বিছানা বাক্‌স দোর-গোড়ায় বাড়ির ভিতরে নামিয়ে রেখে, রিক্‌সওয়ালা যেন বড় তাড়াতাড়ি বিদায় নিল। আমার মনে হল এই পৃথিবীতে আমার শেষ অব-লম্বনটিকেও হারালাম।

গুণোদিদি দরজা বন্ধ করে, হুড়কো লাগালেন। তারপর আমার হাতে মোমবাতি দিয়ে, ওপরে নিচে ছিটকিনি দিলেন। তার-পর দরজার ভারি লোহার কড়া দুটোকে একসঙ্গে করে প্রকাণ্ড একটা তালা লাগাতে লাগাতে বললেন, প্রায়ই জোড়া-খুনের কথা শোনা যায়।'

নোড়াটা দেখলাম বগল-দাবাই হয়েই রইল। তারপর আমার মাথা থেকে পা অবধি দেখে নিয়ে, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, 'ঐ ছোট্ট একটা বিছানা আর অ্যাটাচি কেস ছাড়া আর কিছু নেই নাকি তোমার? তুমিই যে সত্যি সত্যি সেই লোক তাই বা কি করে জানব? সঙ্গে কোনো কাগজপত্র এনেছ?'

বললাম, 'মাইনে পেলেই দরকারি জিনিসপত্র আর যা যা লাগবে কিনে নেব। আর আমার সঙ্গে বি-এ, বি-টি পাশের সার্টিফিকেট আছে, দেখে নিতে পারেন।

গুণোদিদি জিব দিয়ে টাকরায় চক্‌-চক্‌ শব্দ করে বললেন, 'ঐ দেখ, কি জন্যে কি বললাম তা বুঝল না আর অমনি রাগ হয়ে গেল! যা চোর-ডাকাতের ভয় এদিকে, বাছা, সাবধানের মার নেই। বলি, মশারি এনেছ? নইলে মশারা এ-ঘর থেকে টেনে ও-ঘরে ফেলে দেবে, এ আমি বলে রাখলাম।'

সদর দরজার পরেই লম্বা প্যাসেজ, তাকে গুণোদিদি বলতেন 'চলন'। মোমবাতি নিয়ে সেই চলন ধরে দু-পা এগিয়ে কি মনে করে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'খেয়ে এসেছ আশা করি?'

তখন হয়তো সবে সন্ধ্যা সাতটা, খেয়ে আসব কি! তবু রিক্‌সওয়ালা বলেছিল, স্টেশন থেকে কচুরি আলুর দম কিনে নিয়ে যাও, দিদি, নয়তো ওরা শুকিয়ে রাখবে।' আমার বড় হ্যান্ড-ব্যাগ ভরে এনেও ছিলাম তাই। তাছাড়া মশারি, কম্বল, তোষক, বালিশ, ওয়াড়, চাদর, সুজনি, মায় একটা পার্টিকলে হোল্ড-অল সব-ই স্টেশন রোডে কিনে নিয়েছিলাম।

চলন শেষ হল বড় হল-ঘরে। তার এক পাশে সরু কাঠের সিঁড়ি। গুণোদিদি সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। অমনি নিচের হল-ঘরখানিও অন্ধকারে ভরে গেল; জানলা-দরজার ফাঁক দিয়ে শীতের হাওয়া কান্নাকাটি লাগিয়ে দিল; আমার সমস্ত মন নিদারুণ বিষণ্ণতায় ভরে গেল।

পুরনো বাড়ি, সরু কাঠের সিঁড়ি, তাতে এককালে গালচে পাতা ছিল নিশ্চয়, গালচে আটকাবার পেতলের আংটাগুলো এখনো রয়েছে দেখলাম। উঁচু উঁচু ধাপ। দেড়-তলার সমান উঁচু একেকটা তলা। চারদিক নিস্তব্ধ; ঘুটঘুটে অন্ধকার; জনমানুষ বাস করে বলে মনে হয় না। আমি যদি অন্য পাঁচজন মেয়ের মতো হতাম, তাহলে ভয় করত।

অ্যাটাচি কেসটা হাতে তুলে নিয়ে, গেলাম ওঁর সঙ্গে একেবারে তিনতলায়। সিঁড়ির মাথায় লম্বা হল-ঘর, তারি লাগোয়া দুটি বড় ঘর। বাকিটা খোলা ছাদ। সেই ছাদের উপরেও মাথা তুলে রয়েছে কতকগুলো বড় গাছের ডালপালা। আকাশের বুকে পাতাগুলি দুলছে; হাজার হাজার তারা ফুট-ফুট করছে। তবু সাদা আলোয় ছাদটা খাঁ-খাঁ করছে; কোথাও বাতি জ্বলছে না।

গুণোদিদি বললেন, 'টর্চ এনেছ তো? এখানে গাছের ডালে বাতাস লাগলেই বিজলি-বাতি নিবে যায়। এইটি হল শোবার ঘর। ও-পাশে দুটি স্নানের ঘর। রোজ দুবার হাত-পাম্পে জল তোলা হয়। সাব-ধানে খরচ করবে, নইলে ফুরিয়ে গেলে এক তলার কলঘরে যেতে হবে। দো-তলায় অন্য টিচাররা থাকেন। কাল সকলের সঙ্গে আলাপ কর।'

মোমবাতির আলোতে ঘরের দেয়ালে আমাদের ছায়াদুটি দুলতে লাগল। ক্ষীণ আলোয় দেখলাম ঘরের দুপাশের দুই দেয়াল ঘেঁষে বিশাল দুটি কারিকুরি করা কালো মেহগনির খাট। তার একখানিতে শতরঞ্চির উপরে কম্বল ঢাকা সরু একটা বিছানা পাতা। দেখে আশ্চর্য হলাম।

গুণোদিদি বললেন, 'ওটি মিসেস্‌ সামন্তর বিছানা। নিরাপদ হবে মনে করে দুজনকে এক ঘরে দিয়েছি। যথেষ্ট বড়-ও ঘরখানি। আজকালকার যে-কোনো বাড়ির চারটি ঘরের সমান।' কথাটা যে সত্যি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নিরাপত্তার কথা উঠছে কেন? গুণোদিদি বলে যেতে লাগলেন, 'অন্য ঘরটাও খালি আছে। বসবার ঘর করে নিতে পার, ভালো ভালো আসবাবে ভরা। আর নেহাৎ যদি মিসেস সামন্তর সঙ্গে থাকতে না চাও, ওটা তুমি নিতে পার। একটা স্নানের ঘর ওর-ই লাগোয়া। তবে কি না—'

গুণোদিদি ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। 'কি তবে? খোলাখুলি বলুন না কথাটা।'

'আশা করি ভূতের ভয় নেই তোমার?'

বললাম, 'না, সে রকম শিক্ষা পাই নি। আজ না হয় এ-ঘরেই শোব, কাল যা হয় করা যাবে।'

'আলো আছে?'

অ্যাটাচি কেস খুলে দাদার দেওয়া পাঁচমুখো লণ্ঠন-টর্চ বের করে, আমার খাটের পাশের পালিশ-জ্বলা জাফরির কাজ করা টেবিলে রাখলাম। গুণোদিদি বললেন, 'দরজাটাকে ভিতর থেকে বন্ধ করে দিও। ও দরজাটার চাবি মিসেস সামন্তর কাছে, উনি ওদিক দিয়ে ঢুকবেন। এই নাও তোমার চাবি।'

চাবি দিয়ে, নিচু হয়ে দুই খাটের নিচে মোমবাতির আলো ফেলে ভালো করে দেখে নিলেন। 'দক্ষ চোররা কিছু সিঁদ কেটে ঘরে ঢোকে না। সন্ধ্যার সময় কোনো সুযোগে ভেতরে সেঁদিয়ে খাটের নিচে বা চিলে-কোঠায় লুকিয়ে থাকে। শুনেছিলাম কে যেন রাতে মরবার জন্যে ঠ্যাং ঝুলিয়েছে আর অমনি একটা কনকনে ঠান্ডা হাত পায়ের কাঁক্ক ধরে টেনে—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনাদের তো দেখছি এখনি মাঝরাত। মিসেস সামন্ত গেলেন কোথায়?'

গুণোদিদি যেন একটু বিরক্ত হলেন। 'সে আমি কি করে বলব। এটা তো আর জেলখানা নয়, যে যার খুশিমতো যাওয়া-আসা করে। আমি বোর্ডিং-এর মেট্রন, রাঁধা-বাড়া ঘর-কন্নার তদারক করা আমার কাজ। যা দেখি তার অর্ধেকও যদি আজ তোমাকে বলি তাহলে আর আমার চাকরি দেখতে হবে না। এককালে যাদের বাড়িতে হাতি বাঁধা থাকত, আজ তাকে এইভাবে—সে যাকগে, এখন চলি। এ সময় ওপরে আসতে আমার গা ছমছম করে। যা সব শুনি—।'

যেতে যেতে দোরগোড়ায় থেমে বললেন, 'সকালে চা-জলখাবার সাতটায়; ভাত দশ-টায়; ইস্কুল বসে সাড়ে দশটায়; টিফিনের ছুটি বারোটা থেকে সাড়ে বারো। মেয়েদের ক্যান্টিনে ভালো খাবার দেয়; ইস্কুল ছুটি সাড়ে চারটায়; রাতের খাওয়া সাড়ে ছটায়। ব্যস, আমার ছুটি। রাতের চা জলখাবার সবাই নিজেরা করে নেয়। এ-সব ব্যবস্থা গোড়াবাবু নিজে করে দিয়েছেন। এ নিয়ে আমি কোনো নালিশ শুনতে পারব না। বরং একটা ছোট জনতা স্টোভ কিনো। ছোট দরওয়ানকে দিয়ে তোমার বিছানা পাঠাচ্ছি।'

এই বলে শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি গেলেন চলে গুণোদিদি। সিঁড়িতে আস্তে আস্তে তাঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

আমার লণ্ঠন-টর্চ জেবলে ভালো করে ঘরখানিকে দেখলাম। কে এমন শখ করে এ-ঘর সাজিয়েছিল? দেয়ালে ফিকে সবুজ রং, মেঝেতে চিনে-মাটির কাজ, ছাদে নক্সা তোলা। দুটি মানুষের ঘর, দুটি সেগুন-কাঠের আলমারি, দুটি গদিমোড়া আরাম-কেদারা, দুটি পড়ার টেবিল। এখানে থাকব মিসেস সামন্ত আর আমি? তবে আমার আসল কাজের এতে সুবিধাই হবে।

(দুই)

মনটাকে শক্ত করে আলো নিয়ে স্নান করতে গেলাম। স্নানের ঘরে ঢুকে চমকে গেলাম। আহা, কার এত শখ ছিল গো! শ্বেত-পাথরের ঘর, মেঝেতে বসানো টব, শ্বেত-পাথরের মুখ ধোবার বেসিন, তার উপরে আয়না, তার উপরে ঝালর দেওয়া আলো। দেয়ালে ঝোলানো লম্বা আয়না, মস্ত মস্ত কাচের জানলা, অ-ব্যবহারে মলিন। জানলার উপরে ঘষা কাচের ভেন্টি-লেটর, দেয়ালে গাঁথা সাদা কাঠের আলমারি। বুকে যেন এক মন বোঝা চেপে বসল।

বিছানা নিয়ে ছোট দরোয়ান এসেছে তার সাড়া পেলাম। এ-ঘরে এসে তার সঙ্গে কথা বললাম। লম্বা মজবুৎ শরীর, ছোট ছোট করে চুল কাটা, সোজা তাকায়। বুঝলাম একে দিয়ে আমার কাজ হবে না। আমার বাঁকা লোকের দরকার। নাম বলল তেওয়ারি। গোঁপের একশেষ, বিছানা পাততে পাততে গুষ্টির খবর দিল। চমৎকার বাংলা বলে।

ওর কাছেই শুনলাম স্কুলের মেয়েরা সবাই হয় নদীয়া, নয় তো তার আশে-পাশের অন্য গ্রাম থেকে আসে। এ দিককার লোকদের বেশির ভাগই উদ্বাস্তু হলেও, এখন তাদের প্রবল প্রতিপত্তি। তাই শুনে কান খাড়া করলাম। এরা নাকি আদি বাসিন্দাদের চেয়েও অনেক বেশি কায়েমি। পুরনো গ্রাম-বাসীরা সুবিধা পেলেই চাকরি নিয়ে, কি পানের দোকান ফেঁদে অষ্টপ্রহর এদিকে ওদিকে চলে যাবার তালেই থাকে। তাতে নবাগতদের বরং সুবিধাই হয়ে যাচ্ছে, তারা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। এখান থেকে সহজে কেউ নড়বে বলে মনে হয় না। গোড়াবাবুও আসলে তাদেরি একজন। অবিশ্যি ওনার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। এসেছেন-ও সবার আগে, সেই ১৯৪৭ সালে, তখন তেও-য়ারি পাটনার শহরতলিতে সবেমাত্র পাঠ-শালা থেকে পালাতে শিখেছে। অবিশ্যি এখানেও কম দিন নেই সে, সাত বছর বয়স থেকে এই ইস্কুলেই মানুষ। ওর বাবা বড় বাড়ির দরোয়ানি করে। তাই ওকে ছোট দরোয়ান বলা হয়।

যাবার আগে তেওয়ারি আরো বলল, 'এর চেয়ে ভালো বিছানা কিনতে হয়, দিদি, নইলে এ-খাটে মানায় না। সামন্তদিদিমণির বিছানাটা দেখেছেন? কিম্পনের জাস্‌! মাইনে পায় দু শো টাকা, প্রাইভেট পড়িয়ে আরো পঞ্চাশ, অথচ বিছানার ছিরি দেখ! মরে গেলেও এক পয়সা খরচ করবে না, কাকেও একটা পয়সা দেয় না, রাতে জল-খাবারের বদলে গাছ থেকে বেল পাড়িয়ে খায়। অথচ এ-বাড়ির বেলগাছের এত বদ-নাম যে রাতে কেউ তার তলা দিয়ে যায় না।' ভাবলাম এরা না জানে এমন কিছু আছে কি?

ঐ অবধি বলেই তেওয়ারি চট করে আমার দিকে এক পলক দেখে নিল। তখনি আমার মনে হল নিতান্তই কি আমার কাজের অ-যোগ্য এই লোকটা? কথাটা তখনকার মতো মন থেকে ঝেড়ে ফেললাম। মশারির টানানো হয়ে গেলে আমার প্যাংলা মনি-ব্যাগ থেকে একটা টাকা বের করে ওর হাতে দিয়ে বললাম, 'আমার হাতে এখন পয়সা-কড়ি নেই বলে এর চেয়ে ভালো বিছানা কিনতে পারি নি। মাইনে পেলে দেখব কি করা যায়।'

তেওয়ারি মশারির কোণাটা আঙুলে দিয়ে ঘষে বলল, 'এ তো স্টেশন রোডের যদু ঘোষের দোকান থেকে কেনা। আমারও এই রকম আছে।'

বলেই, মোহরের মতো, দাঁড়িয়ে গেছে ভেবে, ছোট্ট একটা নমস্কার করে চলে যাচ্ছিল, আমিই আবার ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঐ গোড়াবাবুটি কি করেন? তাঁর কথা তো আগে শুনি নি। স্কুলের মাস্টার-মশাই নাকি?

তেওয়ারি জিব কেটে বলল, 'এমন দশ-বিশটা স্কুল উনি কিনে ফেলতে পারেন। এ তল্লাটের সবাই ও'র কথায় ওঠে-বসে। এই স্কুলবাড়িটা তো উনিই লাটে কিনে নিয়ে এই স্কুল বসিয়েছেন। বলতে গেলে উনিই এর মালিক।' এই বলে আর অপেক্ষা না করে, দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে সে নেমে গেল, যেন বড় বেশি বলে ফেলেছে বলে ভয় ঢুকেছে।

কারিকুরি করা টেবিলে খবরের কাগজ পেতে ঠাণ্ডা কচুরি, জমা আলুর দম আর কড়া-পাকের রসগোল্লা খেলাম। ছোট ছোট রসগোল্লা, তার গায়ে বড় দানার চিনি মাখা, এরা তাকে বলে মেঠাই।

তারপর জিনিসপত্র একটু গুছিয়ে, অ্যাটাচি কেস থেকে সামান্য যা কাপড়-চোপড় এনেছিলাম, বিশাল আলমারির চওড়া তাকের এক কোণে রেখে, আলমারির গায়ে লাগানো চাবি দিয়ে বন্ধ করে, লণ্ঠন-টর্চ নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। এক ডজন মোমবাতি আর দুই বাক্স দেশলাই কিনতে হবে।

কে বলেছে চিন্তা না করে থাকা যায় না? এই তো আমি কিচ্ছু না ভেবে দিব্যি সময় কাটিয়ে দিচ্ছি? নইলে এক জোড়া ছোট ছোট হাত আর একটা গম্ভীর স্বরের কথা ভাবলে তো পাগল হয়ে যেতাম। মনটাকে শূন্য করে একবার যেই শুলাম, চোখ বন্ধ করলাম, অমনি গাঢ় ঘুমে ডুবে গেলাম। এ আমার অনেক দিন ধরে অভ্যস্ত করা বিদ্যা। মিসেস সামন্ত কেমন লোক একবারও ভাবলাম না। চেনা লোকের সঙ্গে এখন আমার কোনো সম্পর্ক নেই। কেউ জানে না আমি কোথায়। তবে ঐ লোকটা বড় বেশি চালাক, শুঁকে শুঁকে না শেষে সব বের করে। তার আগে কাজ সারা চাই।

দাদাকে অবিশ্যি একটা ছোট্ট চিঠি না লিখে পারি নি। নইলে সে আকাশ-পাতাল ভেবে পাবে না, রাতে ঘুম হবে না। আমার দাদা ঐ রকম। এদের বাড়ির মতো নয়। লিখেছি, 'বিশেষ কাজে যাচ্ছি, গোপনীয়তার প্রয়োজন, কাউকে বল না, কিছু ভেবো না।' বে-পাড়ায় গিয়ে ডাকে দিয়েছি। আমার দাদা ভালো মানুষ চেহারার মাস্টারমশাই হলে কি হবে, বেজায় বুদ্ধি ওর। তবে পয়সাকড়ি বেশি নেই, এখন কলেজ কামাইও করতে পারবে না, বার্ষিক পরীক্ষার সময় এটা। খরচপত্র করে খানাতল্লাসিও করতে পারবে না। ঐ লোকটার কাছেও চিঠির কথা ফাঁস করবে না। কিন্তু বড্ড ভাববে। সায়েন্স ফিকসন লেখে। ডিটেকটিভ বই পেলে এক নিশ্বাসে আগাগোড়া পড়ে ফেলে। না জানে এমন জিনিস নেই।

এইটুকু ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাতে কখন মিসেস সামন্ত ফিরেছিলেন টের পাই নি। ভোরে চোখ খুলেই দেখি রোগা একজন আধাবয়সী শামলা মানুষ, ছাই রঙের লম্বা-হাতা দ্রাত-কামিজ পরে ঘরময় ঘুর-ঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি চোখ খুলতেই বললেন, নমস্কার, ঘরের এদিকটা আমার, ও দিকটা আপনার। আপনার জিনিসপত্র দয়া করে আপনার দিকেই রাখবেন।'

এই রকম প্রথম সম্ভাষণে আমি তো অবাক। হঠাৎ কেমন চটে গেলাম, অথচ মনের ভাব গোপন করাই আমার কর্তব্য। তবে বাড়ি ছেড়ে অবধি মাথাটা সব সময় ঠিক থাকে না। হেসে কথাটাকে হাল্কা না করে, একটু চেঁচিয়ে বললাম, 'আপনার কোনো ভয় নেই, আমি এখন থেকেই পাশের ঘরটাতেই থাকব, আপনার কোনো অসুবিধা করব না।'

চিরুনি হাতেই মিসেস সামন্ত বসে পড়লেন।

'ও ঘরে থাকবেন মানে? ওটা তো ভূতের ঘর।'

বিছানা ছেড়ে উঠলাম। বললাম, 'সেই আমার ভালো।' মিসেস সামন্ত কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, আমি আমার স্নানের ঘরে ঢুকে পড়লাম।

আধ ঘণ্টা পরে তৈরি হয়ে যখন বেরিয়ে এলাম, দেখলাম ইতিমধ্যে তাঁর চুলবাঁধা কাপড় ছাড়া সমাধা হয়ে গেছে এবং তাঁকে মনে হল বড় ভাবিত। বললেন, 'দেখুন সামান্য একটা কথায় আপনি এতটা অসন্তুষ্ট হবেন জানলে কিছুই বলতাম না। আসলে একটু ছুঁচিবাই আছে বলে ও-কথা বলেছিলাম। কিছু মনে করবেন না, ভাই, ক্ষমা করবেন। একা আমি থাকতে পারব না, আপনি এ ঘরেই থাকুন। জিনিসপত্র যেখানে ইচ্ছে রাখুন।'

সত্যিই অবাক হয়ে বললাম, 'সে কি, আপনি তো এতকাল একাই এই তিনতলায় শুয়ে এসেছেন, গুণোদিদি বললেন। আমি তো পাশেই থাকবো, দরকার হলেই ডাকবেন। আলাদা থাকাই ভালো।'

বাস্তবিক-ই তাই। ঘরে অন্য লোক থেকে আমার কার্যকলাপ লক্ষ্য করবে, এ আমার আদৌ ইচ্ছা নয়। পাশের ঘরের দরজায় চাবি গোঁজা ছিল, খুলে দিতেই এক দমকা বাসি হাওয়া বেরিয়ে এল। আমার জিনিসের মধ্যে তো ঐ অ্যাটাচি কেস আর বিছানা। ভাবলাম নিজেই নিয়ে আসতে পারব। ঘরটাকে একটু পর্যবেক্ষণ করতে গেলাম।

এর মধ্যে চা নিয়ে তেওয়ারি এল। মিসেস সামন্ত সম্ভবতঃ কিছু বলে থাকবেন, তাড়াতাড়ি এ-ঘরে এসে বড় বড় সাতটা জানলা খুলে দিল। অমনি পুব থেকে ফিকে শীতের রোদ এসে ঘরখানিকে ভরে দিল।

(তিন)

জন্মে অবধি যত ঘর দেখেছি, সেসব থেকে এ ঘরটি একটু অন্য রকম। ছাই রঙের দেয়াল, শ্বেত-পাথরের মেঝে, জানলার উপরে অর্ধচন্দ্রাকারে ফিকে নীল কাচ বসানো। কাচের মধ্যে দিয়ে ভোরের আলো নীল হয়ে নিচের শ্বেত-পাথরের মেঝের উপর নক্সা কেটে দিচ্ছে। ঘর ভরা পুরনো কারিকুরি করা সেগুন কাঠের আসবাব। কোথাও এতটুকু ধুলো নেই। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয় এ-ঘরে, তেওয়ারি?'

তেওয়ারি বলল, 'কিছু না। রবিবার রবিবার ধোয়া-মোছা হয়। অন্য সময় বন্ধ থাকে। কেউ শোয় না এ ঘরে, সবাই বলে ভূতের ঘর। আপনার ভয় করবে না তো দিদি? জানলা নাকি নিজের থেকে খুলে যায়।'

'আমি ভূত বিশ্বাস করি না, তেওয়ারি। এ ঘরে বেশ আরামেই থাকব। ঐ তক্তপোশে শোব। দেয়ালের হুকে মশারি টানাব। এ-বাড়িতে আগে কারা থাকত, তেওয়ারি?'

তেওয়ারি মাথা নেড়ে বলল, 'কি জানি দিদি। তবে ছোটবেলা থেকে শুনেছি তাঁরা এদিককার জমিদার ছিলেন। বড়বাবু ফাট্কা খেলে দেউলে হলেন। ছোটবাবুরো সর্বনাশ হল। গোঁড়াবাবু প্রায় বিশ বছর আগে নিলামে এসব নাকি জলের দরে কিনেছিলেন। বড়বাবু, ছোটবাবু বেঁচে আছেন কিনা তাও জানি না।'

এর মধ্যে গুণোদিদিও হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললেন, 'এ-ঘরে থাকাই ঠিক করলে নাকি? ঘরটার কিন্তু বদনাম আছে। আগের মালিকরা নাকি কোথায় সোনাদানা লুকিয়ে রেখেছিল, এখনো অশরীরী হয়ে তাই খুঁজে বেড়ায়। জানলা খোলে, দেরাজ টানে। ঐ যাঃ, আসল কথাই ভুলে যাচ্ছিলাম। আজ গোঁড়াবাবুর গুরুদেবের জন্মদিন, তাই ইস্কুল বন্ধ। এইমাত্র খবর এল। বড় একটা কাতলা মাছও পাঠিয়ে দিয়েছেন। দুপুরের খাওয়া ছুটির দিনে যেমন হয়, সেই সাড়ে এগারোটায়। ভালোই হল, সকালবেলাটা বসে গোছগাছ করে নিতে পারবে। বিকেল চারটেয় বড়বাড়িতে ইস্কুল সুদ্ধু সকলের চায়ে নেমন্তন্ন। এর চেয়ে একটু ভালো কাপড়চোপড় পর, বাছা। আর আমরা সবাই মিলে ওনাকে গরদের চাদর কিনে দিচ্ছি, তার এক টাকা চাঁদা দাও। মিসেস সামন্তও দিয়েছেন।'

গুণোদিদি হাত পাতলেন। আমার প্যাংলা মনিব্যাগ থেকে আরেকটা টাকা বের করে দিলাম। ভাগ্যিস ভাঙা মাসের মাইনে পাব আর দশ দিন বাদেই, নইলে হয়েছিল আর কি! তেওয়ারির কিন্তু ব্যাপারটা পছন্দ হল না। আমার দিকে ফিরে বলল, 'ব্যস, অমনি একটা টাকা দিয়ে দিলেন?' সামন্ত তো আধুলি দিয়েছে।' গুণোদিদি চটে গেলেন, 'হ্যাঁ, তোমার মত নিয়ে তবে দিয়েছে! বড় বেশি কথা বল বাপু!' বলে আর অপেক্ষা না করে, তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

তেওয়ারি একটু উসখুস করে বলল, 'কথায় কথায় টাকা বের করছেন, দিদি, মাসকাবার অবধি চলবে তো?' আমি বললাম, না চলে তো তোমাদের কাছে ধার করব।' তেওয়ারি এবার খুশি হয়ে উঠল, 'আমাকে বললেই বন্দোবস্ত করে দেব দিদি। বাবা তেজারতি করে। মাসে টাকায় দশ পয়সা সুদ নেয়।'

তেওয়ারি চলে গেলে, ঘরটাকে আরেকবার ভালো করে দেখলাম। এক দিকের দেয়াল জুড়ে প্রকাণ্ড একটা মেহগিনির আলমারি-ই বলা যাক। কি খাট বলা যাক। হাতল টানলেই লেখার টেবিল বেরিয়ে আসে। খানিকটা দেরাজের মতো, খানিকটা আলমারি। ভিতরটা সব খালি, পাকা কাঠের একটা মিষ্টি গন্ধ। সব চেয়ে নিচের টানার একেবারে কোণায় গোঁজা একটা রূপোর ক্লিপ্। ক্লিপটা আমার খুব চেনা। দেখেই সর্বাঙ্গে আমার কাঁটা দিল। এ ক্লিপ আমিই বনিদিদিকে দিয়েছিলাম। এইটাই। এ রকম আরেকটা নয়। কব্জার কাছে খুলে গিয়েছিল, আমিই পোদ্দারের দোকান থেকে সারিয়ে নিয়েছিলাম। দেরাজটা বন্ধ করে সিংহাসনের মতো দেখতে শক্ত কেঠো চেয়ারটাতে বসে পড়লাম।

এই তবে নিশানা। এতদিন অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিলাম, এবার নিশ্চিত জানলাম। অথচ ইন্টারভিউ দেবার সময় স্কুলের কর্তৃপক্ষীয় যাঁরা ছিলেন, তাঁরা স্পষ্ট বলেছিলেন যে গত তিন বছরের মধ্যে কোনো নতুন কর্মী রাখা হয় নি। এতদিনে ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বাড়াতে, নতুন লোকের কথা ও'রা ভাবতে পেরেছেন। কিন্তু বিজ্ঞাপন দেওয়া সত্ত্বেও মনের মতো কাকেও পান নি। উপযুক্তের মধ্যে আমিই নাকি প্রথম। ক্লিপটা হাতে নিয়ে ভাবছি তাহলে দিদির কি হল?

এমন সময় মিসেস্ সামন্ত এসে ঢুকলেন। আমি ক্লিপটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললাম, 'কিছু বলবেন?' মিসেস্ সামন্ত কিছু বলতে গিয়েও যেন হঠাৎ কথা বন্ধ হয়ে গেল। অবাক হয়ে দেখি এত বড় বড় চোখ করে ক্লিপটার দিকে চেয়ে আছেন। ভিতরে একটা চাঞ্চল্য অনুভব করলেও বাইরে স্বাভাবিক গলায় বললাম, 'কি হল?' মিসেস সামন্ত কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'ঐ ওটা কোথায় পেলেন?' হাসলাম। 'কেন, এটা আবার অদ্ভুত কিছু নাকি? ভবানীপুরে পোদ্দারের দোকানে এ রকম ঢের পাওয়া যায়। সাত টাকা জোড়া। নকসা না থাকলে পাঁচ টাকা।'

মিসেস্ সামন্ত হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। 'তাই বলুন। আমি অন্য কথা...' এই অবধি বলে চুপ করে গেলেন। আমিও আর ঘাঁটালাম না। অন্য কথা পাড়লাম। এরকম
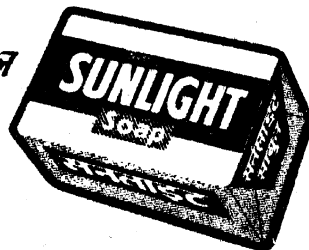
ছুটি এখানে প্রায়ই হয় নাকি? মিসেস্ সামন্ত যেন অনেকগুলো কথা বলতে পেরে নিশ্চিন্ত হলেন। তা মাঝে মাঝে হয় বৈকি। গোড়াবাবুর গুরুদেবের জন্মদিন, তাঁর স্ত্রীর বাৎসরিক, গোড়াবাবুর বাবার আর মার বাৎসরিক, স্কুলের প্রতিষ্ঠা-দিবস। ভারি উদার অমায়িক মানুষ। খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির খরচ নিজেই দেন। এ সব ছুটিকে ওয়ার্কিং ডে বলে লেখা হয়। গোড়াবাবু বলেন এতে অনেক ঝামেলা বেঁচে যায়।' 'সে কি! তবে কি উনিই স্কুলের মালিক? কাগজপত্রে তো কই নাম ছিল না।' 'নাম থাকবে কি? ঐ ওঁর স্বভাব, সর্বদা নিজেকে আড়ালে রাখেন, অথচ পয়সাকড়ি বিলি ব্যবস্থা, যখন যা দরকার মুক্ত হস্তে দেবেন। স্কুলের প্রেসিডেন্ট কলকাতার কে একজন নামকরা লোক। তাতে নাকি এডুকেশন বোর্ডের কান পাওয়া গেছে। তবে সে ভদ্রলোক হাত উপুড় করতে জানেন না। এখানে তাই গোড়াবাবু যা বলেন তাই হয়।'

আরো কিছু খবর জানবার ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ক'জন টিচার এখানে থাকেন?' 'তা, জনা-কুড়ি হবেন। আরো দরকার। মেয়ে তো কম নয়। গত বছর থেকে দেখতে দেখতে ছয়'শো ছাড়িয়ে গেছে। ইংরিজির ভালো লোক ছিল না। এবার আপনি এসেছেন।'

আমি অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে ধাঁ করে বলে বসলাম, 'আমার আগেও তো ইংরিজির জন্যে অন্য লোক এসেছিল। সে টিকল না কেন?' কথাটা শুনে মিসেস্ সামন্ত দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'কে বলেছে অন্য লোক এসেছিল? তেওয়ারি বুঝি? ব্যাটা মিথ্যেবাদীর একশেষ। আমি কিছু বলি নি, তবু ওর বলা চাই। মোটেই অন্য লোক আসে নি।' আমি তাঁকে ঠান্ডা করার জন্যে তাড়াতাড়ি বললাম, 'না, না, কেউ বলে নি। তবে কাগজের বিজ্ঞাপনটা পাঁচ ছয় মাসের পুরনো কিনা তাই ভেবেছিলাম—' মিসেস্ সামন্ত জোর করে হাসতে লাগলেন, 'ওহো, তাই বলুন। লোক-ই পাওয়া যায় না। এই ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুরে ভালো লোক আসবে কেন বলুন?'

আমি বললাম, 'আজকাল লোকে শহরে চাকরি পায় না। তাই ভাবলাম আসতেও পারে। আড়াইশো টাকা মাইনে তো ফেলনা নয়। থাকা-খাওয়ার জন্যে মাত্র পঁচিশ টাকা কেটে রাখে। নিজে ঘর ভাড়া করে রেঁধে খেয়ে ওর ডবলের ডবল পড়ত কিনা বলুন?'

মিসেস্ সামন্ত উঠে পড়ে বললেন, 'তা হলে। যাই কয়েকটি জিনিস কেনার আছে। আপনি ততক্ষণে গোছগাছ করে ফেলুন। আপনার কাপড়-চোপড় ওপরে আলমারিতে রেখেছেন, এই বেলা নিয়ে আসুন। আমি ঘরে তালা দেব।'

কাপড় আনতে গিয়ে বললাম, 'এদিকে বুঝি খুব চোরের উপদ্রব? গুণধিদি বলছিলেন। নাকি জোড়া খুন হয়?' এবার মিসেস্ সামন্ত সত্যি করে হেসে ফেললেন, 'আরে, ওর কথা ছাড়ুন। সত্যি কথা বলতে কি ওর কথার ঠিক নেই। ও-ও বলে নাকি ওদের বাড়িতে হাতি ছিল, ভারি বড়লোক ছিল। হেসে বাঁচি না। ওর বড় বেশি নাক গলানো স্বভাব বলেই আমরা দরজায় তালা দিই। তাছাড়া ছোটখাটো জিনিস পেলে না নিয়ে পারে না। সুবিধে পেলেই এটা টানবে, ওটা খুলবে, চিঠি পড়বে, আর বলেন কেন। ভালো চান তো আপনিও দোরে তালা দিন। তাছাড়া স্নানের ঘরের পেছনে ঢাকা ছোট সিঁড়ি দিয়ে বাস্তবিক-ই যে-কেউ ওপরে উঠে আসতে পারে। এককালে হয়তো নিচে একটা দরজা ছিল, এখন তার কিছু বাকি নেই। ওদিকে খেয়াল রাখবেন। চলি, সাড়ে এগারোটায় দেখা হবে।'

মিসেস্ সামন্ত চলে গেলে, চুল থেকে কাঁটা দুটি বের করে নিয়ে, বেশ করে মাথা ধুয়ে ফেললাম। চুল মেলে দিয়ে নিচু একটা সেকেলে ডিভানে পা মেলে দিয়ে গত তিন সপ্তাহের কথা ভাবতে বসলাম। কারণ মনের ভিতর একটা ষষ্ঠ অনুভূতি আমাকে বারবার সাবধান হতে বলছিল। বাইরে থেকে যতই না শান্তশিষ্ট পরিবেশ মনে হক, টের পাচ্ছিলাম এ বড় কঠিন ঠাঁই।

(চার)

ঐ ক্লিপ যে বানিদিদির সে বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বানিদিদি বাল-বিধবা, কিন্তু বড় শৌখিন। কি-ই বা পেয়েছিলেন জীবনে? কেউ ওঁর জন্যে কিছু করে নি। ভাইয়ের বাড়িতে পড়ে থাকতেন; বৌদিদিদের ঘরকন্নার এক-জোড়া বিনি পয়সার বাঁদি হাত; উদয়াস্ত গঞ্জনা খেতেন; বৎসরান্তে একখানা আস্ত কাপড়ও জুটত না। কি ভাগ্যে পাশের বাড়ির বুড়ো বাঙালী পাদ্রীর সুনজরে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনিই ওঁর বড়দাদার মত করিয়ে, ওঁদের মিশন-স্কুলে ফ্রিতে পড়িয়ে, ট্রেনিং পাশ করিয়ে, ঐখানেই চাকরি করিয়ে দিয়েছিলেন।

পড়ার জন্য এক পয়সা খরচ হল না তবু বৌদিদিদের কি রাগ। যা-তা বলত তারা; বুড়োর অত মাথা-ব্যথা কেন, হেনাতেনা কত কি। তখন বানিদিদির হয়তো ষোল বছর বয়স, পাদ্রীর কম করে ষাট-পঁয়ষট্টি। তবু ওদের মুখ বন্ধ করে কে? চাকরি না পাওয়া অবধি মুখ বুজে বানিদি সব সয়ে ছিলেন। স্কুল থেকে দশ টাকা জলপানিও পেতেন, হয়তো পাদ্রীই দিতেন, কে জানে। যেমন করেই হক, পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরে ক্লাসে যেতে হবে তো।

মাস কাবারে আট দশ আনা বাঁচত মাঝে মাঝে। বানিদি তাই দিয়ে সাদাকালো পুঁতির মালা কিনে পরতেন, রঙীন সুতো কিনে জামায় নকসা তুলতেন। বৌদিদিরা কি না বলত। নিশ্চয় খৃশ্চান করে নিয়েছে। আর কি! এবার বুড়োকে বিয়ে করে ফেললেই পারে! চাকরি পেয়ে অবধি নিজের খরচ দিতেন বানিদিদি, বরং বেশি করেই দিতেন। তবু ওদের মুখ বন্ধ হত না।

চাকরি করতে করতেই প্রাইভেটে বি-এ বি-টি পাশ করেছিলেন বানিদিদি। চাকরিতে অনেক উন্নতি হয়েছিল। মিশন-স্কুল থেকে ওদের হাইস্কুলে বদলি হয়েছিলেন। অনেক বেশি মাইনে পেতেন। এই সময় বুড়ো পাদ্রীও মারা গেলেন। বানিদিদির এতদিনের ধৈর্য ছিঁড় খেল। তিনি দাদাদের মতের অপেক্ষায় না থেকে, হাই-স্কুলের বোর্ডিং-এ গিয়ে উঠলেন।

ঐ স্কুলেই আমার সঙ্গে ওঁর প্রথম দেখা। বানিদিদি আমাদের ইংরিজি পড়াতেন। এত ভালো শিক্ষিকা আমি অন্ততঃ কখনো দেখি নি। ছোটমাসির বাড়িতে থেকে আমি পড়াশুনো করতাম। আমার মা-বাবা কবে মারা গিয়েছিলেন। থাকার মধ্যে শুধু দাদা ছিল, আমার চেয়ে দশ বছরের বড়। সে তখন বহরমপুরে সবে চাকরিতে ঢুকেছিল। চাকরি মানে কলেজের মাস্টারি, বেশি পয়সা-কড়ি পেত না। তার থেকেই আমার পড়ার খরচ দিত।

আমি এত বেশি বানিদিদির ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম যে ছোট মাসি তাঁকে মাঝে মাঝে চায়ে নেমন্তন্ন করত। ওর-ই সমবয়সী হবেন; দুজনার মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। যদিও হাল-চালে আকাশ-পাতাল তফাৎ। বানিদিদি ততদিনে চুল কেটেছেন, থান ছেড়েছেন, জামাতে ব্যাগেতে জুতোতে রং মেলাতে শিখেছেন। কাজেও খুব সু-নাম। সবাই বলত উনিই একদিন প্রধান শিক্ষিকা হবেন। ছোট মাসির কাছে একদিন বলেছিলেন যে যতদিন পাদ্রী বেঁচেছিলেন ততদিন উনি খৃশ্চান হন নি; পাদ্রীও কখনো জোর করেন নি। তবে হলে যে খুশি হতেন বানিদিদির সেটা অজানা ছিল না। পাদ্রী মলে বানিদিদি খৃশ্চান হলেন।

কিন্তু বোর্ডিং-এর নিয়ম-বাঁধা জীবন-যাত্রা ওঁর ভালো লাগত না। ঘড়ি ধরে খাওয়া-দাওয়া, রাত নটায় গেট বন্ধ, রবিবারে রবিবারে খৃশ্চান মেয়েদের নিয়ে গির্জে যাওয়া। এ-সব তাঁর ধাতে সইত না। তবু বেশ কয়েক বছর কোনো রকমে কাটিয়ে দিলেন। আমিও ততদিনে বি-এ বি-টি পাশ করে, একদল বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেয়ে-পুলিশে নাম লিখিয়ে ফেললাম। খেলা-ধুলো, কুচ-কাওয়াজ, বন্দুক ছোঁড়া, ও-সব আমার বেশ আসে।

ছোটমাসি কিন্তু বেজায় চটে গেল। শুধু ছোটমাসি নয়, আমার ভালোমানুষ ডাক্তার মেসো-ও। শেষ পর্যন্ত দাদার ব্যাচেলর ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠতে বাধ্য হলাম। দাদা ততদিনে কলকাতার একটা কলেজে পড়ায়। দাদারো খুব পছন্দ ছিল না, কিন্তু দাদা আমাকে কিছু বলতে পারে না। মা-বাবা রেল দুর্ঘটনায় মারা গেলে পর আমি নাকি দাদার গলা জড়িয়ে ঘুমোতাম। কখনো ওকে ডাকতাম মামণি, কখনো ডাকতাম বাবামণি। আজ পর্যন্ত সে-সব

কথা বলতে গেলে দাদা জোরে জোরে নাক টানে, চশমার কাঁচ মোছে। দাদা ঐরকম।

সুখের বিষয়, বছর না ঘুরতে একজন বড় পুলিশ অফিসারের সঙ্গে যখন আমার বিয়ে ঠিক হল, দাদাকে পায় কে! এত ধুমধাম করে সে আমার বিয়ে দিয়েছিল যে আত্মীয়স্বজনরা ওর নিন্দে করেছিলেন। আমার দাদার মতো একটাও লোক দেখলাম না।

এখন দাদার বয়স চল্লিশ, আমার ত্রিশ, আমার স্বামীর আটত্রিশ, মেসোর পঞ্চাশ, ছোটমাসির বেয়াল্লিশ। ছোটমাসির মতে বনিদিদিরো বেয়াল্লিশ, বনিদিদি বলেন চল্লিশ। ছোটমাসি তাই শুনে চটে যায়, বলে এ বয়সে মাত্র দু বছর কমিয়ে কি লাভ? কমাতে হলে দশ বছর কমাক না।

বেশ আনন্দে দিন কাটছিল। ছোট-মাসিদের সঙ্গে বিয়ের সময় থেকেই আমার মিটমাট হয়ে গেছে। ওরা দুজনে সোনার গয়না নিয়ে এসে মিটমাট করে গেছিল। বনিদিদিও বোধহয় ছোটমাসির দেখাদেখি কিছুদিন আলাদা আলাদা ছিলেন। এখন মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসেন। আমার তিন বছরের ছেলে টুংকে খুব ভালোবাসেন। আমার বুড়ো শাশুড়ি ওঁকে বেশ পছন্দ করেন। কোথায় গেলেন বনিদিদি? কোনো ভাবনা চিন্তা ছিল না আমাদের। আমরা মধ্য-কলকাতায় থাকি। বনিদিদি আমাদের কাছেই ছোট ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন। দাদা ছোটমাসিদের ভবানীপুরের বাড়িতে দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। আমরা মাঝে মাঝে বলাবলি করি টুংকে কোন স্কুলে দেব। আবার মাঝে মাঝে বলি দাদার একটা বিয়ে হলে ভালো হয়। বেশ বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের একজন হাসিখুশি টিচার, কিম্বা মেয়ে-ডাক্তার, কিম্বা আপিসের সেক্রেটারী, যার নিজের কাজকর্ম থাকবে, দাদার পিছনে বেশি টিকটিক করতে পারবে না, অথচ যত্ন করবে। দাদা বড় ভালোমানুষ। এ সবের চাইতে বড় দুশ্চিন্তা আমাদের কিছু ছিল না।

এমন সময় বনিদিদি নিখোঁজ হয়ে গেলেন। খবরটা আগে আমিই পেলাম। আমিই বনিদিদির জন্যে আমাদের বাড়ির কাছেই, এলিয়ট রোডে একটা ছোট ফ্ল্যাট খুঁজে দিয়েছিলাম। কালো ফিরিঙ্গি মেমের বাড়ির দোতলার আধখানা, তার আলাদা ঢুকবার দরজা। সুন্দর ছিমছাম ফ্ল্যাট; একটা বড় শোবার ঘর, একটা চওড়া বারান্দাকে কাঁচের জানলা দিয়ে ঘিরে বসবার ঘর করা হয়েছে, একটা স্নানের ঘর, একটা বড় রান্নাঘর, তার পিছনে সরু একটা বারান্দা। ভাড়া একশো টাকা, তিন মাসের ভাড়া জমা রাখতে হবে, প্রতি মাসের সাত তারিখের মধ্যে সে মাসের ভাড়া দিয়ে দিতে হবে। রাত বারোটার মধ্যে যদি সদর দরজা বন্ধ হয় তো বাড়িওয়ালী খুব-ই বাধিত হবেন। ভালো লোকরা তার পরে বাইরে থাকে না।

বনিদিদিরই উপযুক্ত ফ্ল্যাট। তাঁর ভারি একটা মেম-মেম ভাব ফুটে উঠেছে। চুলে তেল দেন না, খুর-তোলা জুতো পরেন, ফিকে রঙের ছাপা ফুল-ভয়েলের শাড়ি পরেন। পাৎলা পাৎলা সুদৃশ্য দুটো একটা গয়নাও পরেন। কেনই বা না পরবেন! কে কবে তাঁকে কি দিয়েছিল? এ-সব নিজে করেছেন। খৃশ্চান হয়ে অবধি বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। একা থাকেন, মনে খুব সাহস, নিন্দা-মান্দার ধার ধারেন না। তাঁর সব কাজ করে দেয় অ্যাবি নামের এক আয়া। মিশন থেকেই তাকে বনিদি সংগ্রহ করেছেন, ভারি দক্ষ মেয়ে, রাঁধে যেন দ্রৌপদী, বনিদির পান থেকে চুনটুকু খসতে দেয় না। মিশনারি মেমরা ওর নাম রেখে-ছিল অ্যাবিগেল। বনিদিদি ছোট করে ডাকেন, অ্যাবি। অ্যাবি তাঁকে প্রায় ঠাকুরপুজো করে।

বলেছি তো বাড়িটা আমিই ঠিক করে দিয়েছিলাম। আমাদের বাড়ির যাবতীয় সেলাইয়ের কাজ হত মিসেস্ ডি-ক্রুজের দোকানে, এ বাড়িটা তাঁর-ই। নিচে তাঁর দোকান ছাড়াও আরো কয়েকটা দোকানপাট আছে। দোতলার বাকি অর্ধেকে নিজে থাকেন, তার প্রবেশপথ আলাদা। মিঃ ডিক্রুজ অনেক বছর আগে তাঁর নিজের বৌদিদির সঙ্গে লণ্ডনে গিয়ে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান হোটেল খুলে বড়লোক হয়ে গেছেন, অথচ বিয়ে-করা স্ত্রীকে এক পয়সা পাঠান না। মিসেস্ ডি-ক্রুজও নিয়েছেন এক হাত। লণ্ডনের ইনকম ট্যাক্স হেড অপিসে ওদের নামে দিয়েছেন এক উড়ো চিঠি ঝেড়ে। এখন তার ফলাফলের অপেক্ষায় আছেন। ইন দি মিনটাইম খেতে হবে তো, তাই দরজির দোকান আর বাড়ি ভাড়া দেওয়া। বাড়িটা অবিশ্যি টম্-ই করে দিয়েছিল। সেজন্য মিসেস ডি-ক্রুজ যথেষ্ট কৃতজ্ঞও আছেন। আজও যদি টম্ সত্যি অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে, তিনি কি আর তাকে ফিরিয়ে দেবেন। এই বলে মিসেস্ ডি-ক্রুজ গোলাপি রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিয়েছিলেন।

এই রকম সৎমহিলার হেপাজতে বনি-দিদিকে সমর্পণ করে আমি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলাম। বনিদিদিও আঠারো মাস ওখানে পরম সুখে ছিলেন। অনেকদিন পর পর আসতেন। একদিন হঠাৎ দুপুরে, নিতান্ত অসময়ে মিসেস্ ডি-ক্রুজ এসে উপস্থিত। মুখ খুব লাল, রাগ রাগ ভাব।

(পাঁচ)

এসেই বিনা ভূমিকায় মিসেস ডি ক্রুজ বললেন, 'দেখুন মিসেস চ্যাটার্জী, রাত বারোটাকে আধাবয়সী একা ভদ্রমহিলার পক্ষে কিছু এমন সকাল সকাল বলা যায় না। কিন্তু রাত বারোটা দূরে থাকুক, আজ বারো সপ্তাহ ধরে মিসেস্ বিশ্বাসের দেখা নেই। তাঁর আক্কেলটা কি রকম বলুন দিকি!'

আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। 'সে-কি! কোনো বিপদ-আপদ হয় নি তো? হাসপাতালে খোঁজ করেছিলেন?

থানায় খবর দিয়েছিলেন? কলকাতার পথে পা দিলেই বিপদ—'

মিসেস্ ডি ক্রুজ কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'তা নিজে যদি বিপদকে নেমন্তন্ন করে ঘরে ঢোকান তো কে কি করতে পারে বলুন! ইস্কুলের অত ভালো চাকরিটা ছাড়লেন। সামান্য কারণে বকাবকি করে অ্যাবিকে ছুটি দিলেন। সুখের বিষয় ঠিক সেই সময় আমার খানসামাটা ছুটে যাওয়াতে, আমি-ই অ্যাবিকে রেখে নিয়েছি আর র‍্যাশনের কার্ডটা তো ব্যবহার না করলে তো নষ্ট হয়ে যাবে। শেষটা হঠাৎ করে এসে যদি বলেন, "আমার র‍্যাশন কার্ড কই?" তখন আমি কি বলব?'

ততক্ষণে আমি নিজেকে অনেকটা সামলিয়ে নিয়েছিলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাড়িও ছেড়ে দিয়েছেন?'

'না, না, তাই তো আপনাকে বিরক্ত করা। বাড়িও ছাড়েন নি, জিনিসপত্রও সরান নি। জানেন তো আমার কাছে তিন মাসের ভাড়া জমা রাখা ছিল। সেই তিন মাস পরশু ফুরোবে। এদিকে একজন ভালো ভাড়াটে পয়লা থেকে আসবে বলে তাগাদা দিচ্ছে। আপনি দয়া করে জিনিস-পত্রগুলো সরাবার ব্যবস্থা করুন। মিঃ ভেলাওয়ারের বড় আগ্রহ।' বলতে বলতে মিসেস্ ডি-ক্রুজের গাল দুটো যে-ভাবে লাল হয়ে উঠল, তাতেই বুঝলাম আগ্রহটা নিতান্ত এক পক্ষের নয়।

মেমকে চা দিলাম, কাল-ই সকালে গিয়ে যা-হয় ব্যবস্থা করব বলে আশ্বাস দিলাম। তারপর বনিদিদির বিষয়ে আরো যা খবর পেলাম তাতে আমার দুর্ভাবনা বাড়ল বই কমল না। মেম নাকি অ্যাবিকে জেরা করেছিলেন। যতদিন বনিদির কাছে অ্যাবি ছিল, ততদিন সে ছিল বনিগত-প্রাণা। যেই না মালিক বদল হল, অ্যাবিও তার আনুগত্য স্থানান্তরিত করল। এখন সে মেমের বিশ্বাসী আয়া, বনিদিদির হাঁড়ির খবর ঢাক পিটিয়ে রটনা করতে তার কোনো আপত্তি নেই।

নাকি কিছুদিন ধরে দিদিমণির এক পুরুষ বন্ধু জুটেছিল। দেখতে ভালো, সাজেগোজে ভালো, কথায় কথায় পয়সা খসায়। দিদিমণি কিছু না বলতেই জিনিস এনে দিত, দিদিমণিও তার কথায় ওঠ-বোস করত, অথচ ওনার চাইতে কম করে দশ-বিশ বছরের ছোট হবে। বলা বাহুল্য এ-সব কথা অ্যাবির কপোল-কল্পিত হিংসার কথাও হতে পারে। বনিদিদির জীবনে ও নিজে ছাড়া আর কেউ সর্বে-সর্বা হবে এটা সে সইবে কি করে? নিত্যি নাকি সিনেমা থিয়েটারে নিয়ে যেত, ছবির এগ্‌জিবিশন দেখাত, এখানে-ওখানে খাওয়াত, কাগজের বাক্সে করে সুগন্ধী চপ-কাটলেট কেক প্যাটি চীনে খাবার নিয়ে আসত। তবে সে-সবের দাম কে দিত সে আর অ্যাবি জানবে কি করে।

বোঝা গেল এত কথা অ্যাবি মিসেস্ ডি ক্রুজকে একদিনে বলে নি। হয়তো সব কথা বলেও নি তাঁকে। কি জানি, হঠাৎ যদি বনিদিদি ফিরে এসে বলেন 'অ্যাবি, চল্!' তখন অ্যাবি কোথায় মুখ ঢাকবে? মিসেস ডি ক্রুজ নিজেও মিসেস্ বিশ্বাসকে যথেষ্ট ভালোবাসেন, তাই আর পুলিশ হাসপাতাল করে কেলেঙ্কারি করেন নি। মানুষের দুর্বলতা তাঁর অজানা নয়। মিসেস্ বিশ্বাসের ভবিষ্যতের পাছে কোনো অনিষ্ট করে ফেলেন, তাই ভেবে মেম এত-দিন চুপচাপ ছিলেন। যাইহোক, কাল তিনি আমার জন্যে সকাল থেকে অপেক্ষা করবেন এবং অ্যাবিকে আজই একবার পাঠাবেন।

সেইদিন-ই সন্ধ্যেবেলায় অ্যাবি এসে, খুব খানিকটা কেঁদে নিল। বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আবার কান্না কিসের? বেশ তো আছ। বনিদিদি চলে গেছেন কোন কালে, এতদিন একটা খবর অবধি দাও নি। এখন তাঁর কোথায় খোঁজ করি?'

অ্যাবি হাউমাউ করে বলতে লাগল, 'ইচ্ছে করেই গেছেন দিদিমণি, আমি তাঁর বিশ্বাসী চাকর হয়ে কেন তাঁর অসুবিধা করব? শখ মিটে গেলে নিজেই ফিরে এসে ডাকবেন আমাকে। ও রাগ করে চাকরি ছাড়ানো কিছু নয়। এখন মেম বলে কিনা ঘর খালি করে দাও। তাহলে কি হবে, দিদি?'

একটু নরম হয়ে বললাম, 'তোকে কিছু বলে যায় নি?' অ্যাবি মাথা নাড়ল। 'আগের দিন ঐ ম্যাসিক সাহেবের চা একটু কড়া হয়ে গেছিল বলে দিদিমণি আমাকে যা নয় তাই বলে তাড়িয়ে দিলেন। এত রাগ কখনো দেখি নি, দিদি। নিজে দাঁড়িয়ে আমার বাক্স গোছানো দেখলেন, তারপর পাওনা মাইনের উপর আরো এক মাসের মাইনে দিয়ে বললেন আর যেন এ-মুখো না হই।' এই অবধি বলে অ্যাবির কান্না আর থামে না।

রাতে আমার স্বামীকে আর শাশুড়িকে কথাটা বলতে হল। স্বামী বললেন, 'জিনিসপত্র রাখবে কোথায়?' 'কেন, এখানে ঐ গুদোমঘরটাতে রাখা যায় না?' কপালে চোখ তুলে বললেন, 'না, না পুলিশ অফিসারের কোয়ার্টারে কখনো ফেরারির সম্পত্তি তোলা যায়? তোমার যদি একটুকু আক্কেল থাকে। ছোট মেয়ে নয়, আধা-বয়সী ভদ্রমহিলা নিজে ইচ্ছা করে চলে গেছে, এ-সব ব্যাপার ঘটাতে হয় না।'

ছোটমাসিও শুনল কথাটা। শেষ পর্যন্ত বলল, 'সরাতে তো হবেই, নইলে মেম টেনে সব রাস্তায় ফেলে দেবে। আমরা তো সবাই জানি কত কষ্ট করে ও-সব করে-ছিল বনি। জিনিসপত্র ছিল ওর প্রাণ। তুই গিয়ে মেমকে সাক্ষী রেখে জিনিসের ফর্দ করে, আমার এখানে নিয়ে আয়। আমার একতলার ঐ বাড়তি ঘরটাতে তালা দিয়ে রেখে দেব।' তাই ঠিক হল।

পরদিন ভোরে লোকজন নিয়ে গিয়ে, বনিদিদির দেড়খানা ঘর খালি করলাম। খুব বেশি জিনিসপত্র ছিল না। কাপড়-চোপড় গয়না-গাঁটি এসেন্স পাউডার প্রায় সব-ই নিয়ে গেছেন দেখলাম। শৌখিন মানুষ। গলার কাছে একটা শক্ত দলা যেন ঠেলে উঠে আসতে চাইছিল। আমার মাতৃ-হীন কৈশোরে, দাদার কাছ থেকে দূরে ছিলাম যখন, তখন ছোটমাসির মেসোর আর বনিদিদির কাছ থেকে যে স্নেহ আর সহানুভূতি পেয়েছিলাম, আমার জীবনে

তার প্রতিদান দিয়ে উঠতে পারব না। কোথাও কোনো বিপদে পড়েছেন বনি-দিদি, এ নিয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

আসবাব কিছু কেনা, কিছু ভাড়া নেওয়া। শেষেরগুলি যথাস্থানে পাঠাতে আর কেনা জিনিস ঠেলাগাড়িতে গুছিয়ে তুলতে প্রায় সারা দিনটাই লেগে গেছিল। শুধু খুব বেশি জিনিস নয়। অ্যাব অনেক সাহায্য করল। মিসেস্ ডি ক্রুজের তো কথাই নেই। বাসন, বিছানা, ঘর সাজাবার জিনিস, কাগজপত্র, সব আলাদা করে প্যাক্ করলাম। প্রত্যেকটি বাক্সে ব্যাগে কি আছে তার আলাদা ফর্দ করলাম। সব যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তখন দেয়াল আলমারির তাকের কাগজের ঢাকাটা তুলতেই এক টুকরো কাগজ মাটিতে পড়ে গেল।

একটা খবরের কাগজের কাটিং। নুরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ইংরিজি শিক্ষিকা চাই। লাল কালিতে চার মাস আগের তারিখ লেখা এক কোণে। বনি-দিদির হাতের লেখা। সংগে সংগে মনের মধ্যে সাহস পেলাম। বনিদিদিকে আমি খুঁজে বের করবই এক মুহূর্তে সংকল্প করে ফেললাম। কেউ বা কিছু আমাকে বাধা দিতে পারবে না। টুং না, টুং-এর বাবা, ঠাকুমা কেউ না। ছোটমাসি, মেসো বা দাদাও না। কারণ কাউকে কিছু জানাব না।

বাড়ি ফিরে স্বাভাবিকভাবে সন্ধ্যাটা কাটালাম। পরদিন আমার বন্ধু নীরুর ঠিকানা দিয়ে নুরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে একটা আবেদনপত্র পাঠালাম। আমার বিয়ের আগের নাম দিলাম। নীরুকে বললাম, লুকিয়ে দাদার বিয়ের সম্বন্ধ করছি, কাকেও যেন কিছু না বলে। এক সপ্তাহ পরে ওঁরা আমাকে ইন্টারভিউ-এ ডাকলেন। কাগজপত্র নিয়ে গিয়ে তক্ষুনি মনোনীত হয়ে গেলাম। ইন্টারভিউ করেছিলেন বিদ্যালয়ের হেড মিসট্রেস মিস্ ললিতা সিংহ আর দুজন কমিটি মেম্বর। খালি শাশুড়িকে বলেছিলাম বনিদিদির খোঁজে যাচ্ছি। টুং ওঁর কাছে বেশ থাকবে। টুংকে ফাঁকি দিয়ে চলে আসতে হয়েছিল। আমার শাশুড়ি একটু কেঁদে-ছিলেন, কিন্তু বাধা দেন নি। কোথায় যাচ্ছি তাও বলি নি।

।। ছয় ।।

বিকেলে যথাসময়ে গুণদিদির সংগে বড়বাড়িতে চা-পার্টিতে গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস সংগে একটা ঘি রঙের আসল ঢাকাই শাড়ি ছিল, তাই রক্ষে। গুণদিদিকে দেখলাম সেজেগুজে বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। জরির দাঁত দেওয়া কালাপাড় শান্তিপুরি পরে যেন গায়ের রঙ ফুটে বেরুচ্ছে। মিসেস সামন্ত ঠাট্টা করলে কি হবে, গুণদিদির চেহারায় সত্যিই একটা বনেদিয়ানার ছাপ আছে। এতদিন মেট্রনের কাজ করেও সেটি ঘুচে যায় নি। তবে সধবা না বিধবা বলা যায় না। হাতে লোহা নেই, কপালে সিঁদুর নেই। কুমারীও হতে পারেন। খাওয়া-দাওয়াতেও যে কোনো বাছ-বিচার নেই, সেটা দুপুরে লক্ষ্য করেছিলাম। আমায় যথেষ্ট দেখাশুনো করেছিলেন। আমার নামতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, অন্যদের খাওয়া ততক্ষণে শেষ। গুণদিদি আমাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে ছোট শ্বেত পাথরের নড়বড়ে টেবিলে বসিয়ে, কালো পাথরের থালায় পরিপাটি করে খাইয়েছিলেন। নিজেও আমার সংগে বসে খেয়েছিলেন। চোর-ডাকাতের আর বড়লোকামির গল্প বাদ দিলে, মানুষটি বেশ। আঁচিয়ে উঠবার সময় চাপা গলায় বলেছিলেন, 'গয়নাগাটি এনেছ নাকি সংগে?' অপ্রস্তুত হলাম। হাতের চুড়ি, গলার সরু হারগাছা আর কানের দুটি ছোট মুক্তো ছাড়া তো আমার গয়নার বালাই ছিল না। গুণদিদি বললেন, 'না থাকে তো ভালোই। মধুপুরে আমার পিসির নামে যেই না পাঁচশো টাকার মণিঅর্ডার এল। অমনি বাড়িতেও চোর ঢুকল। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে ঘুঁটের গাদায় বুড়ি টাকা লুকিয়ে ছিলেন, তাই রক্ষে। আমিও তাই করি। যেখানে সেখানে পয়সা-কড়ি ফেলে রাখি। কারো সাধ্যি নেই খুঁজে বের করে। আমি নিজেই কত সময় পাই না। চল, চল, একটু পা চালাও, নইলে ওঁরা আগে এলে লজ্জার কথা।'

কথা বলতে বলতে দুই বাড়ির মাঝখানের ছোট জালি-কাটা লোহার ফটক পেরিয়ে বড়-বাড়ির হাতায় এসে ঢুকলাম। মনটা কেমন করতে লাগল। অনেক দিন আগে বড় শখ করে কেউ এ বাড়ি-বাগান করেছিল। বাগানের মধ্যে শ্বেত পাথর দিয়ে বাঁধানো চাতাল, ছোট ছোট পদ্ম-পুকুর, লোহার বসবার জায়গা, আম গাছের গোড়া বাঁধানো। এখন এখানে স্কুল হয়। গরীবদের মেয়েরা পড়তে আসে। অবিশ্যি তেওয়ারির কথা শুনে মনে হয় এরা কেউ-ই গরীব নয়। কেউ কেউ নাকি দস্তুর মতো বড়লোক। কি করে হা-ঘরেরা বড়লোক হয়, সে-কথা তেওয়ারি জানলেও নাকি বলতে চায় না। কি জানি, কোথা থেকে কে শুনবে, তারপর এখানে তিষ্ঠুনো দায় হবে। তেওয়ারিও ঐ পুব-দিকটাতে কিছু জমি কিনে রেখেছে। অ্যাসবেস্টসের ছাদ দিয়ে ছোট একটা ইঁটের ঘরও তুলেছে। সেখানে তার পরিবার এনে রাখার ইচ্ছা। এখন সবাই বাপের কোয়ার্টারেই থাকে, খরচ কম হয়। কিন্তু সংমাটি ভালো না। সহানুভূতি দেখিয়ে যেই বললাম, 'আহা, তোমার মা নেই বুঝি!' তেওয়ারি সংক্ষেপে বলল, 'আছে।'

গুণদিদি বললেন, 'কারো সংগে যেন আবার বেশি ভাব করে বস না। এরা বড় বেশি কথা বলে। সবাই জানতে চায় গোড়াবাবু এত পয়সা কামালেন কি করে? কোথাও কাজ-কাম করেন বলে তো মনে হয় না। বাড়ি থেকে প্রায় বেরোনই না। বাড়িতেও

লোকে ঢোকা পছন্দ করেন না। দেখ না ঝাড়, না জয়পুরের দুর্গো! করেন তো তো করেন, তোদের কি রে!' চেয়ে দেখি বড়বাড়ির দক্ষিণে ছিমছাম একটি দোতলা বাড়ি। আগাগোড়া গ্রিল দেওয়া জানলা। চারদিকে এক মানুষ উঁচু পাঁচিল। তার লোহার গেটটি বন্ধ। ভিতরে একটা বড় অ্যালসেসিয়ান কুকুর ছাড়া আছে তাও দেখলাম। সত্যিই একটু অদ্ভুত। লোকে বলবে নাই বা কেন?

বড়বাড়ির হল ঘরে দেখলাম সবাইকে। শ্বেত পাথরের মেঝে, দেয়ালে বড় বড় আয়না ঝোলানো, উঁচু ছাদ থেকে পেতলের মোটা চেন দিয়ে এক সারি ঝাড়-লণ্ঠন। এখন তাতে বিজলি বাতি জ্বলে। ঘরের এক দিকের দেয়ালে তেল রঙের মস্ত একটা ছবি। গুণদিদি বললেন, ঐ নাকি গোড়াবাবুর গুরুদেব। ফরসা, নাদুস-নুদুস, এক মুখ দাড়ি গোঁপ, মাথা ভরা কুচকুচে কালো কোঁকড়া বাবরি চুল। ঘরে ঢুকে আগেই ছবিটার উপর চোখ পড়ে। তারপর লক্ষ্য হয় ঘরের অন্য মানুষদের।

তার মধ্যে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ হল, পরিচালক সমিতির সভ্যদের সঙ্গে আলাপ হল, বড়দিদিমণি মিস্ ললিতা সিংহকেও আবার দেখলাম। বেশ কাঠ-খোট্টা মনে হল, তবে ভারি ভদ্র ব্যবহার করলেন। নাকি লণ্ডনের এম-এ। ঝাঁটাকাটির গায়ে সাদা কাঞ্চিপুরী সাড়ি জড়ালে যেমন দেখায়, ঠিক তাই। কিন্তু গোড়াবাবুকে দেখছি না কেন? গুণদিদি বললেন, 'আহা, গুরুদেবকে সঙ্গে করে আনবেন, নাকি আগেবাগে এসে বসে থাকবেন! বলেছি না ভারি লাজুক, নিজেকে সর্বদা লুকিয়ে রাখতে চান, যেন চোরের দায়ে ধরা পড়েছেন। তাই বলেও হিংসুটেরা। মেয়েদের ইস্কুল চালিয়ে আর অত পয়সা করতে হত না। তাও সব ফ্রি আর হাফ-ফ্রি। একবার পায়ের কাছে কেঁদে পড়লেই হল!' এমন সময় সবাই উঠে দাঁড়াল। ঘরে একটা ছোট শোভাযাত্রা ঢুকল। আমিও সবাইকে একসঙ্গে দেখবার সুযোগ পেলাম। ঐ নাকি গুরুদেব, গোড়াবাবু, গোড়াবাবুর সেক্রেটারী, তার নাম নাকি ট্যাংরা। আর দেখলাম এখানকার চিফ অ্যাকাউন্টেন্টকে। সরু কালো পেন্টেলুন, ছুঁচলো জুতো, নীল বুস-সার্ট, কোঁকড়া-চুল, টানা চোখ, অদ্ভুত ফরসা, বয়স ত্রিশ বত্রিশের বেশি নয়। ওর নাম নাকি, মিঃ ম্যাসিক। পাশে বসা অংকের দিদিমণি বললেন। ম্যাসিক? ম্যাসিক! মনে হল হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ম্যাসিক আবার নাম নাকি? কোথায় বাড়ি ওর?' অংকের দিদিমণি বললেন, 'কোথায় আবার, চব্বিশ পরগণাতে নিশ্চয়। নাকি ভালো বামুনের ছেলে, খৃশ্চান হয়ে ম্যাসিক নাম নিয়েছে। হুঁঃফু। অন্য কথা বলুন।' গুণদিদি চটে গেলেন, 'খৃশ্চান তো খৃশ্চান। তোমাদের ললিতাদি ত তো বেম্ম, কই সে বিষয় তো কিছু বল না!'

আমার গায়ের রক্ত শির শির করতে লাগল। এই নাকি বীনাদিদির ম্যাসিক সাহেব? বীনাদিদির স্বচ্ছন্দে এমন একটা ছেলে থাকতে পারত। এমন রূপ ভালো মানুষের হয় না। কাঁচ সুকুমার মুখখানি, যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। চোখোচোখি হতেই আবার একটু সলজ্জ হাসল। হাড়-পিত্তি জ্বলে গেল। ম্যাসিক আবার নাম নাকি!

সঙ্গীত হচ্ছিল। সঙ্গীতও ঠিক নয়, বরং গুরুদেবের গুণগানও বলা চলে। গুরুদেব দেখলাম গোঁপের ফাঁকে মুচকি হাসছেন। ট্যাংরা তাঁর পায়ের কাছে বসে অনাবশ্যক ভাবে চন্দন কাঠের হাত পাখা দিয়ে হাওয়া করছিল। মাথার উপরে পাখা ঘুরছিল পাশে একটা বড় পেডেস্টেল ফ্যানও ঘুরছিল। ট্যাংরার কেমন একটা ছিমছাম চকচকে পিছলা-পিছলা চেহারা, দেখেই মনে হয় নামটি সার্থক হয়েছে। তেল চুকচুকে চুল, মাঝখানে টেরি কাটা। গুণদিদি হঠাৎ আমার কানে কানে বললেন, 'ট্যাংরা বোধ হয় মিসেস্ সামন্তর কেউ হয়।' অংকদিদিমণি নাক সিঁটকে বললেন, 'কেউ হয় আবার কি, কিছু হয় বলুন।' খুব খারাপ লাগল। অনেকগুলো মেয়েমানুষ একসঙ্গে অনেক দিন থাকলে তারা এই রকমই হয়ে যায়।

কথা পালটাবার জন্যেও বললাম, 'কিন্তু গোড়াবাবু কোনজন?' গুণদিদি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আহা, ঐ যে, গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে লেমোনেড বিতরণ করছেন।' দেখে আমি অবাক। বেঁটেখাটো, গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবি, তাতে কাপড়ের বোতাম, মোটা খদ্দরের ধুতি, একটু খাটো করে পরা, ছোট ছোট করে কাটা কাঁচাপাকা চুল, পায়ে চপ্পল। এরই নাকি টাকার কাঁড়ি, তাও আবার সন্দেহজনক উপায়ে সংগ্রহ করা।

অংকদিদিমণি বললেন, 'অত অবাক হবার কি আছে? পাছে কারো নজর পড়ে, তাই গরিব সাজ! তা নয় তো কি!! এই বাড়ি বাগান কিনে, সারাতে উনি তিন লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। মাসে মাসে স্কুলের তহবিলে এক হাজার টাকা দান করেন। তাইতেই স্কুল চলে। বাড়িভাড়া নেন না। আবার নিজের জন্য ঐ নতুন বাড়ি। হাঃ

গুণদিদি বললেন, 'সব-ই ওঁর। কিন্তু স্কুল চালায় অন্য লোকে, কোনো খাতায় ওঁর নামটি নেই।' অংকদিদিমণির ওপাশ থেকে সেলাইয়ের দিদিমণি হেমদিদি বললেন, 'নামটা নেই বটে, শুধু আড়ালে বসে কলকাঠিটি নাড়েন অমনি আর সবাই ওঠ্-বোস করে। হুঃ!' হেমদিদির ওপাশে পুঁটিদি, নিচের ক্লাসে ইংরিজি পড়ান। তিনি বললেন, 'আহা উনি যে ইংরিজি জানেন না, লোকের সামনে বেরুবেন কি করে? এই, চুপ, এদিকে আসছেন।'

।। সাত ।।

গোড়াবাবু তিনটি খোলা লেমোনেডের বোতল নিয়ে আমাদের কাছে এসে, বিশেষ করে আমাকেই বললেন, 'নমস্কার, আমি পাঁচকড়ি, তেষ্টা পেয়েছে নিশ্চয়, যা ভিড়!' আমিও নমস্কার করে একটা লেমোনেড নিয়ে, অবাক হয়ে দেখলাম যে হেমদিদি, পুঁটিদিদি ইত্যাদি সকলে গোড়াবাবুর উপর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। 'আহা, আপনি কেন কষ্ট করছেন? দিন, দিন, আমাদের দিন।'

গোড়াবাবু সে-কথায় কান দিলেন না। 'আপনারা আমার অতিথি, আমি দেব না তো কে দেবে?' তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'গুরুদেবকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। আপনিও কিছু বলুন না।' মহামুস্কিলে পড়ে গেলাম। মানুষটার সম্বন্ধে কিছু জানি না, বলবটা কি? গোড়াবাবু আমার অসুবিধা বুঝতে পেরে, পকেট থেকে এক-টুকরো হলদে নোট-পেপার বের করে বললেন, 'কিছু মনে না করেন তো এইটে বলতে পারেন। পড়ে নিন দুবার, মুখস্থ করে ফেলুন, কাগজটা আর বের করবেন না। তাহলে গুরুদেব চটে যাবেন, শেখানো-পড়ানো নকল জিনিস উনি দেখতে পারেন না। বলেন সব কথা অন্তর থেকে আসা উচিত। এই নিন, ধরুন।'

আমি অবাক হয়ে, কাগজটা নিয়ে তার মধ্যে চার পাঁচ লাইনে লেখা গুরুদেবের প্রশস্তিটুকু মুখস্থ করে ফেললাম। গোড়াবাবু আরো কিছু লেমোনেড পরিবেশন করে, ফিরে এসে, কাগজটা নিয়ে নিলেন। সলজ্জ হেসে বললেন, 'ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগবে এগুলো। কত লোককেই তো সম্বর্ধনা দিতে হয়।' শুনে আমি হাঁ। বেশিক্ষণ হাঁ করে থাকার সময় পেলাম না। গোড়াবাবু কাকে যেন একটু চোখ টিপে দিলেন, অমনি মোটাসোটা আধা-বয়সী একজন টেকো ভদ্রলোক আমাকে ডেকে, একেবারে গুরুদেবের সামনে নিয়ে গেলেন। সেখানে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে মুখস্থ করা কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে গেলাম।

গুরুদেব ট্যাংরাকে ডেকে বোধ হয় আমার পরিচয় নিলেন। তারপর একটু হেসে, মাথা নেড়ে যেন সায় দিলেন। ট্যাংরাকে ডেকে বললেন, 'বেশ বলেছে, লেখাপড়া না জানলে কি আর মনের কথা গুছিয়ে বলা যায়। ওকে একটা প্রসাদী ফুল দাও দিকি নি।'

ট্যাংরা আমার হাতে একটা আধ-শুকনো কাঠচাঁপা গুঁজে দিল। আমি গুরুদেবকে নমস্কার করে নিজের জায়গায় ফিরে এসেই লক্ষ্য করলাম এর মধ্যে আবহাওয়ার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। সবাই আমার উপর রেগে টং। হেমদিদি থাকতে না পেরে বলেই ফেললেন, 'ভাই, এটা কি খুব ভালো হল? আমরা দশ পনেরো বছর এখানে কাজ করছি। আমাদের ফেলে আগেবাগে ও ভাবে গুরুদেবের নজরে পড়ার চেষ্টা করাটা খুব-ই দৃষ্টিকটু হয়েছে। কিছু মনে করবেন না, সত্যি কথা বলাটা আমার বদভ্যাস।'

আমার ভারি রাগ হল, তবু কিছু বললাম না। বলবার অবিশ্যি দরকার-ও হল না, কারণ গুণদিদিই আমার হয়ে ওদের মিষ্টি মিষ্টি দুকথা শুনিয়ে দিলেন। গুণদিদি বললেন, 'আহা, রেখে দাও বাছা, তোমাদের হিংসের কথা। ওকে ডাকবে না তো কি তোমাদের ডাকবে? যা-সব ছিরি একেকজনার। মাগো! আমাকেও তো ডাকে নি, অথচ সেকালে আমার দাদাশ্বশুর তোমাদের ঐ গোড়াবাবুর মতো কত লোককে মাস-

মাইনে দিয়ে রাখতেন। তা আমি কি কিছু বলেছি? তোমাদের মত—ইয়ে।'

পার্টিদিদি, হেমদিদি যে খঙ্গ ফোঁস করে উঠলেও, খন্ড-যুদ্ধটি দানা বাঁধতে পারল না। মিঃ ম্যাসিক এসে আমার পাশের খালি চেয়ারটিতে বসে পড়ল। বলিহারি রূপ। পুরুষ মানুষের এত ফরসা হবার কোনো মানেই হয় না। চুলগুলো থোপা থোপা কালো আঙুরের মতো। ভুরু দুটি ধনুকের মতো। মাথায় ছয় ফুট হবে। পাৎলা বলিষ্ঠ শরীর।

তাকে দেখেই গুণদিদি বিরক্ত হয়ে উঠে গেলেন। অন্যরা নমস্কার করে, কান খাড়া করে বসে রইল। পরে শুনলাম ওকে সবাই ভয় করে। নাকি পার্ট-টাইম হলে কি হবে, প্রেসিডেন্টের নিকট আত্মীয়। তাই ওকে কেউ ঘাঁটাতে চায় না। তবে ওর ডিপার্ট-মেন্টের লোকরা বলে নাকি ভারি দক্ষ। কিন্তু সব কিছুতে নাক গলানো চাই। নতুন লোক এলেই হল, অমনি ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াবে। একটু সাবধান হয়ে চলাই ভালো। খুব বেশি দিন আসে নি এখানে, বড় জোর বছর খানেক, তাও হবে কিনা সন্দেহ।

আমাকে এত কথা পরে বললেও, তখন সবাই ম্যাসিককে সে কি খাতির। এদিকে আসুন, পাখার নিচে বসুন ইত্যাদি। ম্যাসিক জানতে চাইলে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা। খাওয়া-দাওয়া ভালো তো? সে নিজে বালিগঞ্জে থাকে, কিন্তু রোজ একবার আসতে হয়। কোনো অসুবিধা হলেই যেন তখনি তাকে জানাই। হাতে টাকা-কড়ি যথেষ্ট আছে তো? না থাকলে যেন বলি, আগামী মাসের মাইনেটা অ্যাডভান্স দিয়ে দেয়া যায়। ইত্যাদি। ভারি ভদ্র সত্যি। কিন্তু এই ভদ্রতাই বানীদিদির কাল হয়েছিল।

হঠাৎ ম্যাসিকের দিকে ফিরে তাকাতেই দেখি কি রকম একটা অদ্ভুত দৃষ্টি তার চোখে। যেন আমাকে যাচাই করছে। অথচ সে দৃষ্টির মধ্যে ব্যক্তিগত কিছু ছিল না। বরং যেন কোনো একটা মৎলবের জন্যে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই, তার চোখ থেকে সে ভাবটা এক নিমেষে মুছে গেল। তখন কেউ দেখলে ভাবত আহা, কি অমায়িক ছেলেটি। সত্যি কথা বলতে কি আমার বুক টিপটিপ করতে লাগল। এ আমি কোথায় এসে পড়লাম?

ততক্ষণে বক্তৃতার পালা শেষ হয়েছে। গুরুদেব বেশি বক্তৃতা পছন্দ করেন না। তাঁর ঘুম পায়। গোঁড়াবাবু ট্যাংরার কানে কানে কি বলে দিলেন। ট্যাংরা উঠে হাত-জোড় করে সবাইকে বাইরে এসে কিঞ্চিৎ জলযোগ করতে অনুরোধ করল। অমনি ঘরের হাওয়াটাও হালকা হয়ে গেল। কলকল করে দেখতে দেখতে অত বড় ঘরটা খালি হয়ে গেল।

চমকে দেখি গুরুদেবের দল আমার পাশেই। গোঁড়াবাবুর কাঁধে হাত রেখে গুরু-দেব এগুচ্ছেন। এতক্ষণে মনে হল নিশ্বাস হয়তো সহজ হবে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন ঘর দিয়েছে মা তোমাকে?' সব শুনে যেন ভাবিত হয়ে বললেন, 'এত ঘর থাকতে ঐ ঘরটি-ই কেন দিল? তুমি বরং অন্য কোনো ঘরে যাও।' আমি বিনীতভাবে বললাম যে আমি বেশ আরামেই আছি। এত সুন্দর ঘরে আমি কখনো থাকি নি। কারা এত শখ করে করেছিল, কিন্তু সেখানে থাকতে পেল না, ভাবলেও আমার কষ্ট হয়।

গুরুদেব কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'যেমন শুনি তাতে মনে হয় যে তাদেরো বেশ কষ্ট হয়। গোঁড়াবাবা, এ বিষয়ে একটু নজর দিও।' অন্য লোকরাও গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তাই আমি একটু সরে দাঁড়ালাম। অমনি ম্যাসিক এসে বলল, 'চলুন, এদিক দিয়ে তাড়াতাড়ি হবে।'

এক-কালে হয়তো ছাদওয়ালা এই বাঁধানো চাতালে দামী দামী বিদেশী ফুলে আর পাতাবাহার রাখা হত। ছাদের আংটা থেকে হয়তো অর্কিড ঝুলত। আজও জায়গাটাকে সাজানো হয়েছে। চারদিকে পাম গাছের টব, নিয়ন বাতি। সাদা চাদর ঢাকা লম্বা লম্বা টেবিলে রাশি রাশি লোভ-নীয় সব খাবার। স্কুলের দিদিমণিরা মাটির প্লেট বোঝাই করে সবাইকে খাওয়াচ্ছেন।

গুণদিদি একবার এসে কানে কানে বলে গেলেন, 'পেট ভরে খেয়ে নিও। এবেলা আমাদের হাঁড়ি চড়ে নি।' ম্যাসিক তাই শুনে ফিক করে হেসে ফেলল। তারপর দুটো বোঝাই প্লেট নিয়ে, বাগানের মাঝখানে একটা লোহার বেঞ্চিতে আমার পাশে বসল। বলল, 'গোঁড়াবাবুর হাতটা উপুড় করাই থাকে। এর জন্যে এক হাজার টাকা দিয়ে-ছেন।—আচ্ছা, ঐ ঘরটাতে রাতে কোনো উপ-দ্রব হয় নি তো?' আমি একটু উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'এখনো ওঘরে রাত কাটাই নি। আমার জন্যে এত চিন্তিত হবেন না। আমি ভূতে বিশ্বাস করি না।' ম্যাসিক কাষ্ঠ হেসে বলল, 'আপনি বিশ্বাস করেন না বলেই যে ভূতরা নেই হয়ে যাবে, এমন তো কোনো কথা ছিল না। অনেকেই তো বলে কি-সব দেখেছে শুনেছে।' বললাম, 'নিজে একবার চাক্ষুষ পরীক্ষা করে দেখেন না কেন?' ম্যাসিক খুব হাসল, 'আরে, ও বাড়িতে যে পুরুষদের রাত্রিবাস নিষিদ্ধ। স্কুলের নিয়মাবলীতে এই রকম-ই লেখা আছে। নইলে—' বলে ম্যাসিক থামল। আমি বললাম, 'নইলে কি হত?' 'কি আবার হত, অন্য এবং অনিচ্ছুক লোকের উপর আমাকে নির্ভর করতে হত না।'

আবার আমার বুক টিপটিপ করতে লাগল। তবু বললাম 'কিসের জন্যে নির্ভর করতে হত না?' ম্যাসিক চমকে লাফিয়ে উঠল। 'ভূত দেখার জন্যে।' কি জানি কেন বলে ফেললাম, 'ভূত দেখার, না বানি দেখার জন্যে?' ম্যাসিকের ফরসা মুখটা অস্বাভাবিক রকম সাদা হয়ে গেল। চোখের মণি দুটো বিন্দুতে পরিণত হল। চাপা গলায় বলল 'কি যা-তা বলছেন। এই যে মিসেস সামন্ত, আমরা এইখানে।' তারপর আবার আমাকে স্পষ্ট গলায় বলল, 'যে যাই বলুক, কিছুতেই ও-সব ছাড়লেন না কিন্তু।'

তারপর মিসেস সামন্ত আমাদের কাছে আসতেই হা-হা করে হেসে বলল, 'কি মাসিমা, ঠিক খুঁজে বের করেছেন তো?' আমাকে বলল, 'জানেন, আমি কারো সঙ্গে বেশি কথা বললেই মাসিমা জেলাস হয়ে পড়েন।'

মিসেস্ সামন্ত বেজায় চটে গেলেন, 'কথার ছিরি দেখে হাড় পিত্তি জ্বলে যায়। তাও যদি মায়ের বয়সী না হতাম! চলুন ভাই, আমাদের দল বোর্ডিং-এ ফিরছে।' আমি উঠে পড়তেই চোখ পড়ল মিসেস্ সামন্তর পিছনে দাঁড়িয়ে ম্যাসিক ঠোঁটের উপর আঙ্গুল রেখে বলছে যেন এসব কথা প্রকাশ না করি।

।। আট ।।

সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরতে আরো কিছুটা সময় নিল। গুরুদেব, গোঁড়াবাবু, টাংরা ইত্যাদি কেউ কেউ দেখলাম আগেই চলে গেছেন। ম্যাসিক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমাদের মানে মিসেস্ সামন্ত, গুণদিদি আর আমার সঙ্গে। তাই বলে ম্যাসিক যে খুব একটা জনপ্রিয় তা মনে হল না। আমাদের সঙ্গে আসার হয়তো অন্য কোনো কারণ ছিল। বোর্ডিং-এর দোর গোড়ায় পৌঁছে ছোট একটা নমস্কার করে আমার দিকে ফিরে বলল, 'ভূতের ঘরে খুব সাবধানে থাকবেন।'

গুণদিদি ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে রইলেন। ম্যাসিক তাঁকেও বলল, 'চলি?' গুণদিদি মাথা ঘুরিয়ে নিলেন। মিসেস্ সামন্ত বললেন 'থাক বাছা আর বাড়িও না।' ম্যাসিক বলল, 'উনি নতুন লোক, নিজেদের মধ্যে যা খুসি করুনগে, কিন্তু ও'র একটু দেখাশুনো করবেন।' এই বলে ঝোপ-ঝাপের মধ্যে এত তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল যে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

গুণদিদির ঘর এক তলার রান্নাবাড়ির পাশেই। তিনি কোনো কথা না বলে বিদায় নিলেন। মনে হল কোনো কারণে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আজ সিঁড়ির আলো জ্বলছিল। মিসেস সামন্ত আর আমি আস্তে আস্তে তিন তলায় উঠলাম। এতক্ষণে বুঝতে পারছিলাম যে আমি কত ক্লান্ত। মনে হচ্ছিল রাতে টুং-এর খাবার সময় আমি কাছে না থাকলে সে ভালো করে খায় না। সূর্য ডুবলে তার ঠামুকে আর ততটা ভালো লাগে না। অবিশ্যি তার যত্নের কোনো অভাব হবে না। তার ঠামু বড় ভালো। তাছাড়া গোবিন্দের মা আছে, সে টুং-এর বাবাকেও মানুষ করেছিল। এখনো তাকে খোকা বলে ডাকে। বলা বাহুল্য মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। কেন এলাম এখানে ভূতের ব্যাপার ঘাঁটতে তারপরেই মনে হল ভূতের ব্যাপার তো নয়। জন্মের ঋণ। কিন্তু এ ঋণ কখনো শোধ হয় না। দরজার তালার চাবি ঘুরিয়ে খুলে ফেললাম। তখনো আলো জ্বালি নি।

ক্যাঁ—চ! এমনি চমকে গেলাম যে মনে হল হৃৎপিন্ডটা এক লাফে মুখের মধ্যে চলে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টিপে দিলাম। দেখি দেয়াল আলমারির নিচেকার বড় টানাটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে। সত্যি বলব একটুক্ষণের জন্য হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার পরেই লক্ষ্য করলাম অনেকটা বেরিয়ে এসে টানা থেমেছে। আর অপেক্ষা করলাম না। এক দৌড়ে টানার ভিতরে আমার টিনের সুটকেসটি আড়ভাবে দাঁড় করিয়ে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে টানা বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু ইঞ্চি বন্ধ হয়েই সুটকেসের গায়ে আটকে গেল। সুটকেস চড়চড় করে উঠল। হয়তো সাধারণ দোকানে কেনা সুটকেস হলে চাপের চোটে তালগোল পাকিয়ে যেত। কিন্তু এটা আমার বাবার ছিল। টিনের নয়, সত্যিকার স্টিলের। কাজেই টানা ঐখানেই আটকিয়ে রইল। সুটকেসের চড়-চড় থেমে, টানার ভিতর থেকে একটা ঘড়ঘড় শব্দ বেরুতে লাগল। এই নাকি ভূতের শব্দ? এ তো কলকব্জার আওয়াজ।

হাসি পেল। সব ভয় দূর হয়ে গেল। দরজার কাছে ফিরে গিয়ে, দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিলাম। খট করে ঘড়ঘড় শব্দটাও থেমে গেল। একটু বাদে, কাপড়-চোপড় ছাড়া, চুল বাঁধা হয়ে গেলে পরে, কাছে গিয়ে ঐ দেরাজের হাতল ধরে টানলাম। সড়সড় করে সাধারণ টানার মতো অনেকটা বেরিয়ে এল। সুটকেসটা বের করে ফেলে, লন্ঠন-টর্চ জেনেশে দেরাজের মধ্যে রাখলাম। এই দেরাজেই বনিদির ক্লিপ পেয়েছিলাম। দেখি সব বিষয়ে সাধারণ টানার মতো, শুধু একটি বিষয়ে ছাড়া। সাধারণ টানার তাক টেনে একেবারে বের করে আনা যায়। এটা ঐ যতখানি খোলা হয়েছিল, তার বেশি বেরোয় না। ভাবলাম আমার ছোট হাতুড়ি দিয়ে টানার পিছন দিকটা ঠুকে ঠুকে দেখি, ফাঁপা শব্দ বেরোয় কি না। এমন সময় দরজায় কে টোকা দিতে লাগল।

নিঃশব্দে টানা বন্ধ করে দিয়ে, গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। মিসেস্ সামন্ত বাইরে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে বললেন 'কি হল? কিছু দেখলেন নাকি? কি রকম একটা যেন শব্দ শুনলাম মনে হল।' আমি বললাম, 'কই না তো। কিছু দেখা উচিত ছিল নাকি?' মিসেস সামন্ত ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছিলেন। টেনে চেয়ারে বসালাম। 'এত উত্তেজিত হবার কিছু নেই ভাই। ভূতটুতে আমি মানি না। ভূতের ভয় নেই আমার। তবে চোরের ভয় আছে। চোর তাড়াবার ওষুধও আছে আমার কাছে। আগে আমি মেয়ে পুলিশে চাকরি করতাম।'

তাই শুনে মিসেস সামন্তর মুখটা কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল। আমি হেসে ফেললাম। মিসেস সামন্ত যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। 'ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি? তাই বলুন। যা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। চোরের চেয়েও বোধ হয় পুলিশকে বেশি ভয় করি। উঃফ্! চলি। দরকার হলেই ডাকবেন।' ভয়ে ভয়ে আমার ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মিসেস সামন্ত বিদায় নিলেন। শুনতে পেলাম নিজের ঘরের ভিতর থেকে তালাচাবি দিচ্ছেন। যা ভয় এদের। তবে ভূতের গল্পটা ভালো করে শুনতে হবে। ঠিক করলাম একেবারে বড়দিদিমণিকে ধরতে হবে। যদিও তিনি এ বাড়িতে না থেকে, বড়বাড়ির লাগোয়া কটেজে থাকেন, তবু জানেন নিশ্চয় সব-ই।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল তবু বসে বসে এলো-পাতাড়ি কত কি যে ভাবলাম তার ঠিক নেই। বাইরে গাছের পাতার ফাঁকে ঝোড়ো বাতাস বওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। জানালার কাছে গিয়ে দেখি, আকাশে বড় একটা চাঁদ, তারি আলোয় টুকরো টুকরো মেঘ বলাকা হাওয়ায় দক্ষিণ দিকে ছুটে চলেছে। চারদিক এত নিস্তব্ধ যে নিচেরতলা থেকে পায়ের শব্দ কানে এল। উৎসুক হয়ে গাছের তলায় দেখতে চেষ্টা করলাম। মনে হল ঐ বুঝি ম্যাসিক। বেল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে যার সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছে, তাকে দেখে টুং-এর বাবার কথা মনে হতে লাগল। টুং-এর বাবা লোক খারাপ নয়। তার বাড়িতে প্রথম এসেই মনে হয়েছিল এত দিন পরে পাখি বুঝি নিজের বাসা খুঁজে পেয়েছে। তার পরেই আবার কাউকে দেখতে পেলাম না। সব হয়তো মনের ভুল।

ঠিক করলাম কাল প্রথমেই ভূতের ইতিহাস শুনতে হবে। তারপর তদন্ত শুরু করব, ভালো করে এবং গোপনে। যেমন করে পারি, বনিদিদিকে কিম্বা তাঁর সন্ধান খুঁজে বের করব-ই। এবং এখানেই। জানতাম সে-রাত্রে আর কোনো ভৌতিক ব্যাপার ঘটবে না। যেমন শুলাম, অমনি ঘুমিয়ে পড়লাম। বলেছি না ঘুমোবার কায়দা জানা আছে আমার। আমাদের ট্রেনিং অফিসার বলতেন, 'অবসর সময় যখন তখন পাঁচ মিনিটের জন্যে হলেও, পায়ের উপর দাঁড়িয়েও ঘুমিয়ে নেবে। যাতে কাজের সময় দিনের পর দিন না ঘুমিয়ে কাটাতে পার।'

সকালে উঠে দেখি সব যেমনকে তেমন, শুধু গ্রিল্ দেওয়া সাতটা জানলার তিনটি খুলে রেখেছিলাম, এখন তার একটি বন্ধ। তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। যে-কেউ কার্ণিশে চড়ে হাত বাড়িয়ে আঁকড়া খুলে জানলা বন্ধ করে দিতে পারে। জানলাটা আবার খুলে দিলাম। মনে হল সবটা না খুলে কিসে যেন বেধে গেল। সেদিকের পাল্লা বন্ধ করে, গ্রিলের ভিতর দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম কি আছে ওদিকে। মনে হল ছোট একটা শিক দেয়া জানলা, কিম্বা বরং লোহার সিঁড়িও হতে পারে। এই পথেই নিশ্চয় সেকালের ঝাড়ুদাররা যাওয়া আসা করত। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে, এই সিঁড়ি দিয়ে চওড়া কার্ণিশ, জানলার ছাউনি, এই সব পরিষ্কার করত। নইলে এত বড় বাড়িতে কোথায় অশ্বত্থের চারা গজিয়েছে কে-ই বা দেখতে পাচ্ছে। বাড়ির যত্নের এত ভালো ব্যবস্থা দেখে মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। যারা করেছিল তারা কোথায়?

স্কুল বসল যথাসময়ে। বড় হলঘরে সবাই জমায়েৎ হল। গুরুদেবের বড় ছবির দিকে মুখ করে প্রথমে গুরু-বন্দনা হল। তারপর বড় দিদিমণি আমাকে পাশে ডেকে এনে মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেয়েরা জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে সুর করে একসঙ্গে বলল, 'সুপ্রভাত, দিদিমণি।' আমিও অপ্রস্তুত হয়ে নমস্কার করলাম। ছাত্রীরা যে যার ক্লাসে চলে গেলে ললিতাদি আমাকে ডেকে হলের পাশেই তাঁর আপিস-ঘরে নিয়ে গেলেন। হেসে বললেন, 'কেমন লাগছে, ভাই? আশা করি লক্ষ্য করেছেন এখানে কেমন সাদা-সিধে ব্যবস্থা? কারো গায়ে সোনা-রুপো নেই। হাতে কাঁচের চুড়ি। সবুজ জামা, চুলে সবুজ ফিতে, এখনকার ঐ ইউনিফর্ম। আগে কেউ কেউ খালি পায়ে আসত, এখন গোঁড়াবাবুর

ইচ্ছায় সবাই চটি পরে। যারা কিনতে পারে না, তাদের স্কুল থেকেই দেওয়া হয়। মানে গোঁড়াবাবুই দেন। তাঁর গুরুদেব বলেছেন, খালি পায়ে হাঁটলে হুক্‌-ওয়ার্ম হয়। টিফিনে সবাই দুধ পাঁউরুটি খায়। এ-ও ও'রই ব্যবস্থা। আমাদের নিজেদের গোরু আছে। বিকেলে সব ঘুরে দেখবেন। ভালো লাগছে তো এখানে?'

বললাম 'খুব ভালো। কিন্তু আমাকে কি পড়াতে হবে তা তো বললেন না।' ললিতাদি হাসতে লাগলেন। 'উপরের তিনটি ক্লাসের সব ইংরাজি। অসুবিধা হবে না তো?' 'না, না, কিসের অসুবিধা। বই-এই নিশ্চয় আছে, একটু না হয় দেখে নেব।'

ব্যস্, তখনি আমার অধ্যাপনা শুরু হয়ে গেল। ছোট্ট জায়গার পক্ষে অনেকগুলি মেয়ে বলতে হবে। সবাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, দু-পাশে দুটি পরিপাটি বিনুনি ঝুলছে। হাসি-হাসি মুখ। সত্যি ভালো লাগল। মনে হল মেয়েদেরও আমার পড়ানো ভালো লাগল। মনে হল এই প্রসন্নতা আজকাল প্রায় কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু এর পিছনে কি আছে?

মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম বানীদি বা অন্য কেউ তাদের পড়াতে আসেন নি, সত্যিই বেশ কিছুদিন ধরে ইংরাজি পড়বার লোকের অসুবিধা চলছিল। ললিতাদি, ইতিহাসের টিচার মিস্ সোম, কিম্বা কমিটি মেম্বরদের দুই-একজন পালা করে কাজ চালাচ্ছিলেন।

দুটো থেকে সোয়া দুটো হল ছোট-টিফিন। তখন ললিতাদি তাঁর ঘরে চা খেতে ডাকলেন আমাদের চার-পাঁচজনাকে। রোজই নাকি ডাকেন টিচারদের, পালা করে। সেই সুযোগে গোলাঘরের ভূতের ইতিহাস জানতে চাইলাম। ললিতাদি বললেন, 'ও-সব কতক কিংবদন্তী, কতক কু-সংস্কার, কতক কল্পনা।'

মিসেস সামন্ত বললেন, 'না, না, মিস্ সিংহ, ও কথা বলে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পুরনো মালিকদের কথাটা ও'কে বলা উচিত। উনি জিদ করে তিন-তলার ঐ বড় ঘরটিতে আছেন। কবে না বিপদে পড়েন।'

মিস্ সিংহ একটু চমকে উঠলেন। বললেন, 'আমিও তো একদিন ছিলাম ওখানে, প্রথম যে-দিন আসি। আমার বাড়িটার রং শুকোয় নি বলে। কিছু দেখি নি বা শুনি নি। আপনি কিছু দেখেছেন নাকি, ভাই?'

আমি অম্লানবদনে বললাম, 'না তো।' ললিতাদি মিস্ সোমকে বললেন, 'আপনি-ই বলুন গল্পটা। ও ব্যাপার নিয়ে তো সেবার অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেও কিছু সমাধান করতে পারেন নি।'

মিস্ সোম বললেন, 'শেষ মালিকদের ঠাকুরদার আমোলের বাড়ি এটা। অনেকেই বলেন দেবোত্তর না হলে একেকটা বাড়ি তিন পুরুষের বেশি কেউ ভোগ করতে পারে না। এ-ও তাই। প্রথম মালিক শিবনারায়ণ চৌধুরী এটাকে করেছিলেন প্রায় আশি বছর আগে। ভারি বুদ্ধিমান ছিলেন। তেজারতির টাকা। কিন্তু নানারকম মন্ত্র-পাতির দিকে মন ছিল। শেষ বয়সে নাকি বলতেন, এই বাড়িতে তিনি একশোটা লুকোবার জায়গা করে রেখেছেন। জিনিস লুকোবার আর মানুষ লুকোবার। অনেক ধনসম্পত্তিও নাকি লুকিয়ে রেখেছেন। বংশধররা খুঁজে পেলে ভোগ করবে, নইলে বোকাদের জন্যে কে আর কি করতে পারে। সেই ধন-সম্পদ আজও কেউ খুঁজে পায় নি। নাতিরা দেউলে হয়ে গেল, বাড়ি লাটে উঠল, তবু পাওয়া গেল না। এখনো তারা ভূত হয়ে নাকি খুঁজে বেড়ায়।'

।। নয় ।।

বংশধররা ভূত হয়ে ধন-রত্ন খুঁজে

বংশধররা ভূত হয়ে ধন-রত্ন খুঁজে বেড়ায় শুনে আমি অবাক হলাম। 'কেন, জ্যান্ত বংশধর কি কেউ নেই নাকি?' মিস্ সোম হাসলেন। ললিতাদি বললেন, 'সত্যি কথা বলতে কি বাড়ি যখন লাটে উঠেছিল তখন থেকেই তারা নিখোঁজ। আর কখনো তাদের নাম-ও কেউ শোনে নি। শিবনারায়ণের একটি মাত্র সন্তান রামনারায়ণ স্ত্রী মারা যাবার পর ত্রিশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করে। তার দুই ছেলে, রুদ্রনারায়ণ আর দর্পনারায়ণ। কর্পূরের মতো স-পরিবারে উবে গেছে তারা। বাড়ি বেচেও তাদের ধারের অর্ধেকও শোধ হয়নি। লোকে বলত দেশে থাকলে সারা জীবন ধরে ধারের ঝুঁকি বইতে হত, তাই বিদেশে পালিয়ে গেছে। জাপানে কিম্বা বর্মায় কিম্বা আমেরিকায়। তখন বিদেশ যাওয়া নিয়ে এত নিয়ম-কানুন-ও ছিল না। তা-ছাড়া মেলা চোরাই জাহাজ এই ব্যবসা করেই, মালিকদের কোটিপতি করে দিত। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মধ্যে তারা হয়তো নির্বংশ হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'তাহলে আবার ভূত হয়েও টাকার খোঁজ করে কেন? বংশধরদের জন্যে হলেও বুঝতাম, ভূতদের তো আর টাকার দরকার নেই। রুদ্রনারায়ণ আর দর্পনারায়ণের ছেলেমেয়ে ছিল কটি?'

ললিতাদি বললেন, 'গোঁড়াবাবুর কাছে শুনেছিলাম কোর্টের নিলামে সম্পত্তি কিনবার সময় জানা গেছিল, রুদ্রনারায়ণের স্ত্রী আগেই মারা যান, তাদের একটি মেয়ে, তার নাম বামি। সে-ও বাপের সঙ্গে
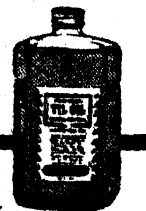
নিখোঁজ। দর্পনারায়ণের স্ত্রী ছিলেন তার একটি ছোট্ট ছেলে। তাদের কারো কথা কেউ জানে না। ওদের পক্ষে নির্বংশ হয়ে যাওয়া খুব শক্ত নয়, ভাই। ঐ তো পাঁচটি মানিষ্যি। তাও ফেরারি।'

ততক্ষণে ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে গেছে, তবু গল্প ছেড়ে কেউ উঠতে চায় না। শেষটা ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে আমি বললাম, 'তিনতলার অমন সৌখিন ঘরগুলো তা হলে কার তৈরি?' মিস্ সোম বললেন, 'সে তো দলিলপত্রেই আছে। বড় বসবার ঘরটি আর তার সঙ্গে লাগোয়া একটি স্নানের ঘর নিজের নিরিবিলি ব্যবহারের জন্য শিবনারায়ণ করেছিলেন। আর ঐ শৌখিন শোবার ঘর আর অন্য স্নানের ঘর রামনারায়ণ বিলিতী নক্সা দেখে, নিজে দাঁড়িয়ে করিয়েছিলেন। তাঁর রূপসী স্ত্রীর জন্য। বৌয়ের বাপ বিলেতফেরত, তাদের খুবি সাহেবিয়ানা। তা সে তার কপালে ছিল না। ছোট ছেলে দর্পনারায়ণ জন্মাবার সময় সেই যে বৌ বাপের বাড়ি গেল, সেইখানেই তার কাল হল। খবর পেয়েই রামনারায়ণ আফিং খেয়ে মল। নাকি ঐ বড় ঘরের আরাম-কেদারায় বসে।'

মিসেস্ সামন্ত বললেন, 'যে আরাম-কেদারায় আপনি কাল বসে আরাম করছিলেন।'

তারপর যে যার ক্লাসে চলে গেলাম, তখন আর কিছু শোনা হল না। বিকেলে ছুটির ঘণ্টা পড়লে, মিসেস সামন্ত আর আমি একসঙ্গে উপরে উঠলাম। তাঁকে বললাম, 'বলুন না তারপর কি হল।' মিসেস্ সামন্ত বললেন, 'কি আবার হবে? বুড়ো একা থাকত এই বাড়িতে, দুই নাতি নিয়ে। বুড়োর তিনজন বাল-বিধবা বোন ছিল, তারা সবাই নাকি কোথাকার এক বুড়ো কুলীনের বিধবা। তারাই ঘরকন্না আর ছোট ছেলে দুটিকে দেখত। চাকর-দাসী, সইস-কোচমান, নায়েব-গোমস্তায় বাড়ি গম-গম করত। তেজারতি করতে করতে বুড়ো জমিদার বনে গেল। যাতে হাত দেয় সোনা ফলে। কিন্তু এদিকে সংসার-ধর্মে তো ছাই পড়েছিল। করবেটা কি অত সোনা দিয়ে? এখানে ওখানে লুকিয়ে রাখত। তারপর নিজেই ভুলে যেত। বলত, "ভালো ভালো জায়গা করেছি ধনরত্ন লুকোবার। নাতিরা যেন খুঁজে নেয়।" মরার সময় ওদের উকিলকেও তাই বলেছিল। বিলেত থেকে নানারকম কলকব্জা এনে ইটালিয়ান কারিগর দিয়ে কাজ করিয়েছিল। উকিল সব লেখা-পড়া করে নিয়েছিল। মিস সোম দেখেছেন সে কাগজ। তবে তার মধ্যে গোপন কলকব্জার কোনো প্ল্যান নেই!'

ততক্ষণে আমার ঘরে এসে পৌঁছেছি আমরা। মিসেস্ সামন্ত বেজায় গোপ্পে, তাঁকে এখন থামায় কে? অবিশ্যি থামাবার আমার এতটুকুও ইচ্ছা ছিল না। মাঝে-মাঝে এক-আধটা প্রশ্ন করছিলাম। 'তাহলে সোনা লুকোতে তো অনেক জায়গাও চাই।'

মিসেস্ সামন্ত উঠে পড়ে বললেন, 'মিস সোম ঐ-সব কাগজপত্তর দেখেছিলেন, সোনার তাল বলে লেখা নেই। ধনরত্ন বলে লিখেছে। হয়তো সোনা নয় কিম্বা সব-ই হয়তো বানানো কথা। তাছাড়া বুড়ো মরে গেলে পর বহুদিন নাতিরা এ-বাড়িতে ছিল। কেউ কোনো কাজ করত না, অথচ বড়মানুষির অন্ত ছিল না। তারা কি আর তন্নতন্ন কর ধনরত্ন খোঁজে নি। তাদের টাকার দরকার ছিল। রেস্, ফট্‌কা, ভোজ। মুড়ি-মুড়কির মতো পয়সা উড়ত। লক্ষ লক্ষ টাকা কয়েক বছরের মধ্যে শেষ। নাকি বড় ভাই-ই সর্বনাশটি করলেন। টাকা খরচ করবার নানান্ বিচিত্র উপায় খুঁজে বের করতেন তিনি। ছোট যেমনি শৌখিন, তেমনি আয়েসী। কুটোটি ভাঙতেন না। তবু শেষটা দাদার সঙ্গে তিনিও দেউলে হলেন। ফেরারি হলেন। এখন মরেও শান্তি পাচ্ছেন না।' এই অবধি বলে টপ করে মিসেস্ সামন্ত উঠে গেলেন।

আমি দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি দিলাম। ঘরটাকে একটু ভালো করে না দেখলেই নয়। বলেছি তো এক দিকের প্রায় অর্ধেক দেয়াল জুড়ে একটা প্রকাণ্ড দেয়াল আলমারির মতো। খানিকটা আলমারি খানিকটা বুক-কেস, মাঝখানে কারুকার্য করা পেতলের হাতল ধরে টানলে, নিঃশব্দে একটা বনাত-মোড়া তক্তা নেমে আসে। তক্তাটার দুদিকে দুটি নক্সাকাটা পিতলের দাঁড়। তক্তা তুললে দাঁড় দুটি আলমারির গায়ে বসে যায়। এক কথায় নি-খুঁৎ একটি প্রাক্-ভিক্টোরীয় যুগের রাইটিং-ডেস্ক। হয়তো বিলেত থেকে আনিয়ে শিবনারায়ণ এটিকে এখানে বসিয়েছিলেন। সেকালে নাকি দক্ষ ইটালিয়ান কারিগর ছিল কলকাতায়। তখনকার বড়লোকদের মধ্যে এই ধরনের সাহেবিয়ানা দেখা যেত। ছাদ অবধি কাঠের কারিকুরি। তারপর স্নানের ঘরের দরজা, তারপর আবার দেয়ালে কাঠের কাজ। রাইটিং ডেস্কটাকে নামিয়ে, ভালো করে পরীক্ষা করলাম। বনাতমোড়া লেখার তক্তাটার সামনে কাগজপত্র রাখার সারি সারি খোপ। তার নিচে দুটি ছোট দেরাজ। মাঝখানে একটা ছোট্ট কাঠের সিন্দুকের মতো, তার-ই দুই পাশে দুই সারি খোপ। সিন্দুকটা মনে হল বন্ধ, কিন্তু চাবির ছাঁদা দেখলাম না। হয়তো কোথাও জং ধরে গেছে, কতকাল কেউ খোলে নি। টেনে কিছু করতে না পেরে শেষটা ছেড়ে দিলাম। খোপগুলোকে দেখতে লাগলাম। অমনি আমার চোখের সামনে সিন্দুকটা খুলে গেল। অর্থাৎ আলমারির মতো দুদে খুদে দরজার পাল্লাদুটো খুলে গেল। আমি তক্ষুনি আমার নতুন পাওয়া স্কুলের বইয়ের গাদা তার ভিতরে ঠুসে দিলাম। যাতে বন্ধ হতে না পারে। কানে ক্ষীণ একটু কড়-কড় শব্দের পর খুট্ করে কিছু একটা থেমে গেল। ভয়ের ব্যাপার না আরো কিছু! এ-সব নিশ্চয় শিবনারায়ণের কলকব্জা। হয়তো এত কাল পরে বিগড়ে গেছে।

বইগুলি বের করে নিয়ে, সিন্দুকটা বন্ধ করে, ডেস্কের ডালা ফেলে, লক্ষ্য করলাম যে কাল এই ডেস্কেরই নিচের বড় দেরাজে বৌদিদির মাথার ক্লিপ পেয়েছিলাম। বৌদিদি নিশ্চয় এক সময় এই ঘরেই ছিলেন।

যেই না মনে হওয়া, অমনি আবার ডেস্কের সিন্দুকটা খুলতে গেলাম। ওর ভিতরটা দেখা দরকার। যদি চোরা কুঠরি থাকে। আশ্চর্য হয়ে দেখি খুদে সিন্দুকটা আবার তেমনি এঁটে বন্ধ হয়ে আছে। এ তো বেশ মজা। কোথাও একটা কল আছে নিশ্চয়। খোপগুলোর মধ্যে হাতড়াতে লাগলাম।

এমন সময় টক-টক করে ঘরের বন্ধ দরজায় কে টোকা দিল। ডেস্কটা নিঃশব্দে তুলে দিয়ে, দরজা খুলে দেখি যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। মিসেস্ সামন্ত। মুখে ভারি একটা উদ্বেগের ছাপ। আমার দুই হাত ধরে বললেন, 'ভাই, জেদ ধরে থাকবেন না। এ-ঘর ভালো নয়, আমার ঘরে চলুন। যদি আমার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছা না হয়, আমি না হয় নিচে গিয়ে মিস সোমের ঘরে শোব!'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। একটা রাত তো নির্বিঘ্নে কেটেছে, তবে আর কিসের ভয়? কিন্তু উনি যে ভয় পেয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। হেসে বললাম, 'কেন মিছিমিছি নিজের মনকে কষ্ট দিচ্ছেন বলুন তো? বলেছি না ভূত আছে বলে আমার বিশ্বাস নেই। তবে চোর, বদমায়েস, দুষ্টু লোক আছে জানি। বলি নি তার-ও ওষুধ আছে আমার কাছে?' এই বলে আমার ছোট সুটকেসের তলা থেকে ঝিনুক দিয়ে বাঁধানো আমার খুদে বন্দুকটি বের করে দেখালাম। এটা এক সময় ঐ লোকটাই আমাকে দিয়েছিল। হেসে বললাম, 'বলি নি আমি পুলিসে কাজ করতাম?'

অমনি অস্ফুট আর্তনাদ করে, দরজা ছেড়ে দিয়ে মিসেস্ সামন্ত ধুপ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও বুঝতে পারলাম, এত বড় কাঁচা কাজ করা আমার ভুল হয়ে গেছে। কাউকে ডাকলাম না। ঐ তো খুদে এক রোগাভোগা মানুষ, তাঁকে স্বচ্ছন্দে তুলে নিয়ে ও-ঘরে তাঁর নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলাম।। ওর স্নানের ঘরে গিয়ে এক মগ জল ভরলাম। চোখে পড়ল বেসিনের পাশের ছোট সাদা দেয়াল-আলমারিটার দরজা খোলা। ভিতরে স্মেলিং সল্টের শিশি। এক বনিদিদি ছাড়া আজকাল আবার কেউ যে স্মেলিং-সল্ট ব্যবহার করে জানতাম না। তবু সেটি তুলে আনলাম। সত্যি বলব এত হাত কাঁপছিল, যে মনে হচ্ছিল আলমারির পিছনের কাঠের দেয়ালটা দুলছে। নিজেকে সামলাবার জন্য সেটিকে চেপে ধরলাম। তবে না মোলা থামল। তাড়াতাড়ি এ ঘরে এসে মিসেস্ সামন্তের মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে, নাকের তলায় স্মেলিং-সল্টের শিশিটি খুলে ধরলাম। কাঁপা-কাঁপা একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়েই, চোখ খুললেন।

চোখ খুলে আমাকে দেখেই আঁৎকে উঠলেন, 'কি—কি— কি হল? আমাকে এখানে কে আনল?' আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'আমি এনেছি, ভাই। আপনার হঠাৎ কি-রকম মাথা ঘুরে গেল। বোধ হয় বড় বেশি খাটেন আপনি। সারাদিনের স্কুলের পর রাতেও আবার কি কাজটাজ করেন—'

তড়াক করে উঠে বসে, কর্কশ গলায় মিসেস্ সামন্ত চেঁচিয়ে বললেন, 'আমি কি করি না করি, আপনার তাতে কি? খবরদার আমার ব্যাপারে নাক গলাবেন না। যান যান আপনি। এ ঘরে কে আপনাকে আসতে বলেছিল?' বলে চকিতে একবার স্নানের ঘরে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে নিলেন। ভিতরে খোলা দেয়াল-আলমারিটাও দেখা যাচ্ছিল। লজ্জায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আমার হাত থেকে শিশিটা ছিনিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমার জিনিস ঘাঁটতে কে বলেছে আপনাকে?' আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'ও আলমারিটা খোলাই ছিল। আপনার জ্ঞান ফেরাবার জন্যে ওষুধ নেওয়াটা কি খুব অন্যায় হয়েছে?' চোখের সামনে কেমন যেন নিজেকে সামলে নিলেন। অপ্রস্তুতভাবে হেসে বললেন, 'আমার নার্ভগুলো সব গেছে। কি বলতে কি বলি তার ঠিক নেই। কিছু মনে করবেন না। এখন নিজের ঘরে যান। আমি একটু বিশ্রাম করি। আমার খাবার উপরে পাঠাতে বলবেন।'

।। দশ ।।

নিঃশেষে [illegible] হয়ে ঘরে ফিরলাম। আইন-ভঙ্গকারীর ভূমিকা নেবার মতো মনের জোর যে মিসেস্ সামন্তর নেই, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাহলে অত ভয়টা কিসের, পুলিসের ভয়,

সিন্দুকের ভয়, ঘরে অন্য লোক ঢোকার ভয়। ধাঁধা লেগে গেল আমার মনের ভিতর। কিন্তু ঘাড়ের লোমগুলো শির-শির করতে লাগল। কে যেন নিঃশব্দে আমার মগজে বলতে লাগল, সাবধান, সাবধান।

যখন কিছু ভেবে পাওয়া যায় না, তখন কুড়ি ঘটি জল ঢেলে স্নান করতে হয়। তা হলেই বুদ্ধি আবার খুলে যায়। এ আমি অনেকবার পরীক্ষা করে দেখেছি। শীত-শীত ভাব থাকলে কি হবে, স্নানের ঘরে গিয়ে ভালো করে গায়ে মাথায় জল ঢেলে, নতুন খড়খড়ে তোয়ালে দিয়ে আচ্ছা করে মুছে, যেই না শোবার ঘরে ঢুকেছি, অমনি ওষুধ ধরল। টপ্ করে মনে পড়ল যে এ পর্যন্ত দু'বার আপনা-থেকে-খুলে যাওয়া দেরাজ বা সিন্দুকে আটকিয়েছি, দু-বারই কড়-কড় শব্দ হয়েছে আর দু-বারই সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ সামন্ত এসে দরজায় টোকা দিয়েছেন। কিছু যে একটা ঘটেছে তা টের পেলেন কি করে? এইখানেই নিশ্চয় ভূতের ব্যাপারের সুতোর অন্য মাথা! মিসেস্ সামন্তর স্নানের ঘরের ওষুধের দেয়াল-আলমারির পিছনটা কি সত্যি দুলে উঠেছিল, নাকি আমার-ই মনের ভুল? আরেকবার দেখতে পারলে হত। দেয়ালের ভিতর দিয়ে দুই ঘরে নিশ্চয় যোগ আছে। এদিকের ব্যাপার ওদিক থেকে টের পাওয়া যায়। ভূত না আরো কিছু।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়াতে উঠতে হল। সাতটাই হয়তো সাড়ে ছয়টায় খাবার দেবে। তারপর গুণোদিদির ছুটি হয়ে যাবে। মনে করে মিসেস্ সামন্তর খাবারটা উপরে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। ভিজে চুল গামছা দিয়ে ঝেড়ে আলগোছে বেঁধে, দরজায় তালা দিয়ে নিচে গেলাম। এ তালাটা আমার নিজের। গুণোদিদির সম্বন্ধে মিসেস্ সামন্ত যেমন আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, তেমনি মিসেস্ সামন্ত সম্বন্ধে গুণোদিদিও আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। 'নিজে ভালো তালা কিনো খুকিও, বাছা, বুড়ি যে ওপরের সব তালার মোমের ছাপ নিয়ে চাবি করিয়ে রাখেনি, তাই বা কি করে বলতে পার? সাবধানের মার নেই। কোথাও একটা পয়সা দেখলে ওর চোখ জ্বলজ্বল করে। অথচ দরকারের জন্যেও খরচ করতে চায় না। সব জমায়।'

মুখে বলেছিলাম, 'বুড়ি কোথায়, গুণোদিদি? ওর বয়স পঞ্চাশের নিচেই হবে। খুরখুরে রোগা চেহারা, চুলগুলো উস্কো-খুস্কো আর আধ-পাকা বলে বয়স বেশি দেখায়।' গুণোদিদি একটু যেন আশ্চর্য হলেন। 'খুব নজর তো তোমার— বাছা। তা, ওঁর কানের কাছে সিঁদুরের আঁচড়টিও দেখেছিলে নাকি? কানাঘুষো শুনেছি নাকি লম্বা জেল খাটছে ওর বরটি। তার জন্যেই টাকা জমায়। যাতে ছাড়া পেয়ে আর তাকে দুষ্কর্ম করতে না হয়।'

কেমন একটু কষ্ট হয়েছিল মিসেস্ সামন্তর জন্য। ওকে লোক খারাপ বলে মনে হয় নি, তবে একটু রহস্যময়ী বটে। নিচে গিয়ে দেখলাম, ওপরে খাবার পাঠানো যত সহজ ভেবেছিলাম, আসলে তত সহজ নয়। তেওয়ারি রান্না জিনিস ছোঁয় না। তারপর এঁটো নামাবে কে? অন্য লোক বাড়ন্ত।

আমি কোনো কথা না বলে, মিসেস্ সামন্তর বাড়া থালা-বাটি হাতে করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। গুণোদিদি হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলেন, কিন্তু কার্যতঃ কিছু করলেন না। আমি খাবার নিয়ে যাওয়াতে মিসেস্ সামন্ত প্রায় কেঁদে ফেললেন। 'এ কি ভাই, এমন জানলে আমি নিজেই নিচে যেতাম। আপনি নিয়ে আসবেন এ আমি ভাবতে পারি নি। কেউ কারো জন্যে কিছু করে না এখানে?'

আমি হেসে বললাম, 'তাতে কি হয়েছে, আমার মাঝে মাঝে মাথা ঘোরে। তখন আপনি আমার খাবারটা দিয়ে যাবেন। ব্যস্ শোধবোধ হয়ে যাবে।'

নিচে গিয়ে দেখি গুণোদিদির মুখ গম্ভীর। শুনলাম তেওয়ারি বলছে, 'ওনাকে দিয়ে ঝিয়ের কাজ করাচ্ছেন শুনলে ম্যাসিক্ সায়েব বেজায় চটে যাবেন। তারপর গোঁড়াবাবুর কানে কথাটা উঠতে কতক্ষণ।' শুনে ভারি বিরক্ত লাগল। 'তুমি থামো দিকি নি, তেওয়ারি, দু-একবার উপর-নিচ করলে আমার কিছু হয় না। ধর, আমিই যদি অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকতাম, তুমি নিশ্চয় আমার খাবার দিয়ে আসতে না? ঐ মিসেস্ সামন্তই হয়তো দিত।'

গুণোদিদি বললেন, 'কি জানি, বাছা, আমি তো এই পনেরো বছরের মধ্যে কখনো ওনাকে কারো জন্যে কুটোটি ভাঙতে দেখি নি।'

ততক্ষণে আমরা সবাই টেবিলে এসে বসেছি। শ্বেত-পাথরের লম্বা লম্বা দুটি টেবিল। একেকটাতে বারোজন বসতে পারে। স্টেনলেস স্টিলের বাসন-পত্র। পাথরের টেবিলে চাদর দরকার হয় না। সব কিছু পরিষ্কার তক-তক করছে। এ-সব দিকে গুণোদিদির কড়া দৃষ্টি।

আমার পাশেই পুঁটিদিদির জায়গা। গুণময়ীর কথা শুনে তিনি বললেন, 'তা বলবেন না, গুণোদিদি, আমি নিজে দেখেছি মিসেস্ সামন্ত লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো রোগা মানুষের জন্য মোজা, সোয়েটার, কান-ঢাকা টুপি কেনেন।' তাই শুনে সকলের কি হাসি। গুণোদিদি আরো বললেন, 'নতুন মানুষকে মিসেস্ সামন্তর কানের পাশের সিঁদুরের আঁচড়টি লক্ষ্য করতে বলেছি।'

পট্ করে পুঁটিদিদি মুখে এক গ্রাস পরটা আর কপির ডালনা তুলে বললেন, 'আর সেই সঙ্গে আপনার দেরাজে লুকনো সোনা বাঁধানো নোয়াটার কথাও বলেছেন আশা করি? আমি নিজে না দেখলেও তেওয়ারির মুখে শুনেছি।'

গুণোদিদির ফরসা মুখটা অমনি টক্-টকে লাল হয়ে উঠল। আর তেওয়ারি বিনা বাক্যব্যয়ে চোঁ-চাঁ দৌড় দিল। মা-বাবা না থাকলেও, বোর্ডিংএ থাকিনি কখনো, তা এ-সবের এখন নতুন করে পাঠ নিতে হচ্ছিল। আমাদের চারটি ঘরের ছোট ফ্ল্যাটের খাবার টেবিল আনন্দে গম-গম করে। ছোটমাসির বাড়িতে, দাদার বাড়িতে খেতে বসে সবাই উড়ো তর্ক করে আর বেজায় হাসে। সে অন্য রকম হাসি।

কোনোমতে খাওয়া সেরে উঠে পড়লাম। গুণোদিদি ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'রান্না ভালো হয়নি বুঝি? ভালো করে খেলে না যে?'

আমি সত্যি করেই বললাম, 'না, না, খুব ভালো হয়েছে। মাছটা তো অপূর্ব। নিজেরই খিদে নেই।'

মিস্ সোমও উঠে পড়ে বললেন, 'চলুন, ললিতাদিদি বাড়ি, বাগান গোয়াল মুরগির ঘর, সব দেখাতে বলেছেন। দেখতে ভালোই লাগবে ভাই।'

বাস্তবিকই তাই। দেখে বড় ভালো লাগল। শুনলাম, এ ছাড়া ধানের জমিও আছে। সেখানে 'তাই-চুং' প্রথায় বছরে দুটো ধানের আর একটি সবজির ফসল তোলা হয়। সরকারের কাছ থেকে পারমিট নেওয়া হয়েছে। বাইরে বিক্রি হবে না, কিন্তু নিজেদের খাবার জন্য যত লাগে সব নিয়ে, যা বাকি থাকবে সেটুকু সরকারকে বেচতে হবে। নাকি দুইশো লোক গোঁড়াবাবুর মাইনে খায়।

অবাক হয়ে গেলাম। এত খরচ জোগান কি করে গোঁড়াবাবু? ছাত্রীদের মাইনে থেকে কতটুকুই বা আয় হয়? ওঁর অমায়িক চেহারাটি মনে পড়ল। অমনি অমায়িক চেহারার ছদ্মবেশে কত রকম কাজ হাসিল করা হয় কে জানে!

মিস সোমকে বললাম, 'গোঁড়াবাবুর বাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে চলুন। কাল ভালো করে দেখতে পেলাম না। আপনি ভিতরে গিয়েছেন নাকি?' মিস্ সোম চমকে উঠলেন। 'আমি যাব ভিতরে! পাগল হলেন নাকি? আমি কেন, বড় দিদিমণিও কখনো ভিতরে যান নি। গোঁড়াবাবুর ঐ এক খেয়াল। বাড়িতে কেউ ঢুকবে না। এক গুরুদেব যান, তাঁর চ্যালারা দু-তিনজন আর এদিক থেকে টাংরা যায়। আর কেউ গিয়েছে বলে তো শুনি নি। অবিশ্যি ওঁর ঝি-চাকর-বামুন আছে। তারা পেছনের খিড়কি দিয়ে যাওয়া-আসা করে। সদরের সঙ্গে তাদের যোগ নেই। মাঝখানে ঐ উঁচু পাঁচিলটা ঘুরে গেছে! রান্নাবাড়ির লাগোয়া ওদের থাকবার ঘর। কাজের সময়টুকু ছাড়া ওরাও বাড়ির মধ্যে থাকে না। অবিশ্যি টাংরার যাতায়াত আছে। আজকাল গোঁড়াবাবুর ঐ বারবাড়ির দেউড়িতে থাকে ও।'

আমি বললাম, 'ভারি অদ্ভুত তো। ভালোমানুষেরা আবার এই রকম করে নাকি?' আমরা গোঁড়াবাবুর বাড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। এর মধ্যে ম্যাসিক্ কখন এসে হাজির হয়েছে টের পাই নি। আমার কথা শুনে এক গাল হেসে বলল, 'ভালোমানুষরাই তো এই রকম করে। ও-রকম করলে লোকের সন্দেহ হবে জেনে মন্দরা করে না। তারা ভিড়ের মধ্যে চারিয়ে থাকে। পাঁচজন ভালোমানুষের সঙ্গে ভালোমানুষ সেজে থাকে। তাদের ধরা তাই বড় শক্ত। কি বলেন মিস্ সোম?'

মিস্ সোম একেবারে কাঠ। কোনোরকমে বললেন, 'কি করে জানব? আচ্ছা, ভাই, এই তো পৌঁছে গেলাম, এবার চলি। একটু দোকানে যাব।' এরা কেউ পুরুষমানুষদের বিশ্বাস করে না।

ম্যাসিক হাসিমুখে তাঁকে বিদায় দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বোর্ডিংএ কিছু গোলমাল হয়েছে নাকি?' আমি হেসে ফেললাম। মিসেস্ সামন্তর কাহিনী শুনে ম্যাসিক অবাক। তাও আলমারির দেরাজের

ব্যাপার তখনো কিছু বলি নি। কি জানি কেন এবার তাও বলে ফেললাম।

কেন যে বললাম নিজেই বুঝতে পারলাম না। হয়তো অব-চেতনায় এই আশা ছিল যে এই লোকটির কাছ থেকেই বাঁদির বিষয়ে জানা যাবে। ম্যাসিক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। 'আশা করি বেশি ভয় পান নি?'

আমি খুব হাসলাম, 'ভয় পাব কিসের? ভূতে কখনো ঘড়-ঘড় শব্দ করে? ভিতরে খাঁজ কাটা চাকার ব্যাপার আছে। ঘড়িতে যেমন থাকে। নিশ্চয় জং ধরে গেছে, বহু-কালের অব্যবহারে। নইলে ঘড়-ঘড় শব্দ হবার তো কথা নয়। হয়তো থেকে থেকে কোথাও তেল দেবার কথা। খুঁজে দেখব ফুটো-টুটো পাই কি না। শিবনারায়ণের ধন-রত্ন যদি আমি খুঁজে বের করতে পারি, কি মজা হয় বলুন তো।'

ম্যাসিক বলল, 'কিন্তু সে আপনাকে রাখতে দেবে না। এই রকম আইন আছে। গোড়াবাবু নিলেম থেকে বাড়ি বাগান ও তার মধ্যে যাবতীয় সামগ্রী আছে, লেখা-পড়া করে সব কিনেছিলেন। কি-সব আইন আছে এ বিষয়ে।'

আমি বললাম, 'তা থাকতে পারে, কিন্তু এ-ও আমি বলে রাখলাম, আমি খুঁজে পেলে কাউকে কিছু বলার আগে, এক খাবলা তুলে নিয়ে লুকিয়ে রাখব।'

বাঁদির কথাটা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু জিব যেন আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ম্যাসিক বলল, 'আসলে মিস্ সিংহের কাছে এসেছিলাম। খবর পেলাম সোনার কালোবাজারিদের ব্যাপার নিয়ে এই অঞ্চলে তদন্ত শুরু হয়েছে। ফটক আর দরজা-টরজাগুলো একটু বন্ধ টন্ধ করে রাখা ভালো। এখানকার কর্মীরা তো সবাই বিশ্বাসী। অন্ততঃ এখানকার আপিসে আমাদের সেই রকম ধারণা। তবে বাইরে থেকে কে আসে তার ঠিক কি?'

এই বলে এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল যেন কথাটা অবিশ্বাস করতে চ্যালেঞ্জ করছে। কিম্বা আমাকেই সেই বাইরে-থেকে-আসা শত্রু বলছে।

মনের ভাব ঢাকবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, 'পুলিশ কি করছে না করছে, অত খবর আপনার কানে পৌঁছয় কি করে?' ম্যাসিক্ বলল, 'ও মা, তা পৌঁছবে না? জানেন না পুলিসদের যেমন গুপ্তচর থাকে যারা আইনভঙ্গকারী সেজে তাদের দলে মিশে থাকে, তেমনি আইনভঙ্গকারীদেরও গুপ্তচর থাকে, যারা পুলিসের লোক সেজে হয়তো বছরের পর বছর ধরে থানায়, হেড-আপিসে চাকরি করে আর সব গোপন পরামর্শ পাচার করে দেয়। শোনেন নি এ-কথা?'

আমি বললাম, 'তাই যদি হবে তো এত চোরডাকাত-খুনে-গুণ্ডা-কালোবাজারি ধরাই বা পড়ে কি করে?'

ম্যাসিক্ খুব হাসল, 'তাও জানেন না বুঝি? ওদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি মন কষা-কষি হয় আর অমনি থানায় একটা উড়ো চিঠি বা টেলিফোন কল্ গিয়ে সব ফাঁস করে দেয়। আইন ভেঙে খাওয়ার এটা একটা অকুপেশনেল্ হ্যাজার্ড।'

ম্যাসিকের বোধ হয় বশীকরণ বিদ্যা জানা ছিল। নইলে বাঁদির বিষয়ে সব কথা জানা থাকা সত্ত্বেও, কেন ওকে ভালোই লাগছিল? ভালো চেহারা বলে কি? টুং-এর বাবাও দেখতে খারাপ নয়। ছোটমাসি তো বলে ঐ-রকম মানুষকে পুরুষ-সিংহ বলে। ছোটমাসির কুড়ি বছরের মেয়ে গীতা তাই ওকে 'সিংহ' বলে ডাকে।

ম্যাসিক আমাকে দোরগোড়ায় পৌঁছে দিল। যাবার আগে বলল, 'দরজা-জানালার ছিটকিনি দেবেন। বেশি সাহস ভালো নয়। ছিটকিনি দিয়ে ভালো করে ঘরটা দেখবেন। ধনরত্ন পেলে মন্দ কি? রাতের চা-জল-খাবারের কি ব্যবস্থা করেছেন?'

মনে মনে ভাবলাম, 'হ্যাঁ, ধনরত্ন আমি পাই আর তুমি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে সেটি গাপ্ কর আর কি! কিন্তু আমি কি খেলাম না খেলাম, তাই নিয়ে ওর অত মাথা-ব্যথা কিসের? তাও যদি সুন্দরী-রূপসী-রহস্যময়ী হতাম। এমনি করেই আত্মীয়তা পাতিয়ে ও বাঁদিকেও হাত করেছিল।

রাতে তেওয়ারি একটা খুদে ফ্লাস্ক ভরা গরম কফি আর একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সে চিকেন, শশার, টোমাটোর স্যান্ডউইচ দিয়ে গেল। ম্যাসিক সায়েব পাঠিয়েছেন। এগুলো কিছু রান্নাখাবার নয়। তাই আনলাম।'

।। এগারো ।।

তেওয়ারি চলে গেলে টেবিলের উপর খাবারগুলো রেখে, পাশের চেয়ারটাকে টেনে বসে পড়লাম। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। বাড়িতে এই রকম কফি আর স্যাণ্ডউইচ খাই আমরা প্রত্যেক রবিবার রাতে। সেদিন দুপুরের পর থেকে কাজের লোকদের ছুটি দেয়া হয়। বাক্স খুলে একটা স্যান্ডউইচে কামড় দিলাম। চিবুতে পারছিলাম না, চোয়াল ধরে আসছিল গলা টন টন করছিল। চোখে ঝাপসা দেখছিলাম।

আঁচলে চোখ মুছে উপরে তাকাতেই, দেয়ালে গাঁথা ঝোলানো লেখার ডেস্কটার উপরে, কারুকার্য করা বইয়ের তাকের মাথায়, অপূর্ব কাঠ-খোদাই করা এক সারি ফুলের নক্সার উপর নজর পড়ল। ছোট একটি করে টিউলিপ ফুলের গায়ে লাগা একটি করে পাঁচ-পাপড়ি ডগ্-রোজ। বিলিতী ডিজাইন।

চোখ দুটি আপনা থেকেই ডান দিকের সারি ধরে ফুলের নক্সা দেখে চলল। মাঝ-খানে এক জায়গায় দৃষ্টি বেধে গেল। নক্সার নিয়ম ভেঙে পাশাপাশি দুটি ডগ-রোজ। হয়তো ঐখানে কাঠের জোড়া আছে। নক্সা হয়তো আগে তুলেছে, তারপর তাক তৈরি হয়েছে। বাঁ দিকেও একটু নজর করে দেখতে লাগলাম। কিছু দূরে পাশাপাশি দুটি টিউলিপ।

আমাদের ট্রেনিং অফিসার বলতেন, নিয়মের ব্যতিক্রম দেখলেই অনুসন্ধান করতে হয়। তাই খেতে খেতেই সমস্ত দেয়াল-জোড়া কারুকার্য দেখতে লাগলাম। ছোট ছোট আরো দু-চারটে ব্যতিক্রম চোখে পড়ল। এক জায়গায় একটা ডগরোজ, আরেক জায়গায় একটা টিউলিপ যেন একটু বেশি গভীর করে কাটা হয়েছে।

খাওয়া সেরে, কফিটাও শেষ করলাম। ট্রেনিং অফিসার বলতেন, শরীরকে খেতে না দিলে, সে কাজ করবে কেন? তারপর স্নানের ঘরে গিয়ে মুখ ধুয়ে কপালে মাথায় জল দিলাম। ট্রেনিং অফিসার বলতেন, তাঁর গুরুর ছিল মাথা ভরা টাক, তার উপর ভিজে গামছা জড়িয়ে তিনি নানা রকম জটিল সমস্যার সমাধান করতেন। বলা বাহুল্য, গুরুটিও পুলিস আপিসেই কাজ করতেন। আমিও তাঁকে দেখেছি।

আমার স্নানের ঘরেও ওষুধ রাখবার সাদা কাঠের দেয়াল-আলমারি ছিল। সেটিকে খুব ভালো করে পরীক্ষা করলাম। একেবারে নীরেট গাঁথুনি। অন্ততঃ আমার ছোট হাতুড়ির ঘায়ে তো তাই মনে হল।

তারপর এ ঘরে এসে চেয়ারের উপর চড়ে, ডগরোজ দুটিকে একবার আলাদা করে, একবার এক সঙ্গে টিপলাম। কিছু হল না। টিউলিপ দুটিও তাই। তারপর চেয়ারটাকে মাঝখানে রেখে দু পাশে দুই হাত বাড়িয়ে চারটে ফুল এক সঙ্গে টিপতেই প্রথমে মনে হল মাথাটা একটু ঘুরে গেল। তারপরেই টের পেলাম মাথা ঘোরে নি, বইয়ের তাকের আর ডেস্কের মাঝখানের কারিকুরি করা কাঠের দেয়ালটা নিঃশব্দে এক পাশে সরে তার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। দেয়ালের ভিতরে নিশ্চয় খাঁজ আছে।

যখন থামল তখন দেখি এক হাত উঁচু, তিন হাত চওড়া একটা আলমারির মতো ফাঁকা জায়গা। তার পিছনটা যে নীরেট দেয়াল তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। দুই পাশ আর তলাটা কাঠের তৈরি। কোথাও কিছু নেই। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। এই নিশ্চয় সেই একশো লুকনো জায়গার একটা। এখানে যদি কিছু থাকত, কি ভালোই না হত।

চেয়ার থেকে নেমে, ঠিক ঐ তাকের নিচেই রাইটিং ডেস্কটাকে টেনে নামালাম। তার ভিতরকার সেই বন্ধ সিন্দুকটি ঠিক ঐ

তাকের একটু নিচে এবং মাঝ বরাবর বসানো। যোগ থাকা অসম্ভব নয়। ট্রেনিং অফিসার বলতেন, কোনো সূত্র দেখলে, অনুসন্ধান না করে ছাড়বে না। ক্ষীণতম, ক্ষুদ্রতম চিহ্নতেও ভীষণ গুরুত্বের ব্যাপার জড়িত থাকতে পারে। সেই কবে এইসব পাঠ নিয়েছিলাম। গত সাত বছরের মধ্যে এত কথা একবারও মনে হয়নি। এখন দরকারের সময় একে একে মনে পড়তে লাগল।

আস্তে টেনে দেখলাম সিন্দুকটা এঁটে বন্ধ। গায়ের জোরে টানতেই স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম উপরের লুকনো জায়গাটার নিচের তক্তাটি দুই ভাগ হয়ে বাক্সের ঢাকনির মতো উঠে গেল। ভিতরে আধ হাত গভীর এক হাত চওড়া, এক হাত লম্বা একটা খোপ। খোপটা কোরা মার্কিনে জড়ানো ছোট ছোট ইঁটের মতো কি জিনিষ দিয়ে ঠাসা।

তার একটি তুলে নিলাম। ন্যাকড়া খুলে দেখলাম একটা সোনার ইঁট। হাত কাঁপতে লাগল। ঘাড়ের চুল আবার শির-শির করতে লাগল। দু হাত দিয়ে চেপে খোপের ডালা বন্ধ করলাম। অমনি নিঃশব্দে ডেস্কের সিন্দুকের দরজা আপনা থেকে একটু খুলে গেল। পা কাঁপতে লাগল। তবু চেয়ারে চড়ে দু হাত দু দিকে বাড়িয়ে সেই চারটে ফুল একসঙ্গে টিপতেই লুকনো তাকের দরজা নিঃশব্দে দেয়াল থেকে বেরিয়ে, আবার যেমনকে তেমন খোপটাকে ঢেকে দিল। চেয়ারটাকে তুলে খাটের পাশে রাখলাম। সোনার ইঁট বালিশের নিচে গুঁজলাম। এক টানে গায়ের জামাটা খুলে ফেললাম। স্নানের ঘরে ঢুকে যেই তোয়ালে তুলেছি, অমনি দরজায় টোকা পড়ল। আমি তার-ই জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এক নিমেষে ব্যাপারটা আমার কাছে অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গেল। আমার ঘরের দেয়ালের এই অর্ধেকের ও-পিঠেই মিসেস্ সামন্তর স্নানের ঘর। ও'র ওষুধের আলমারিটা এই ডেস্ক আর ঐ লুকনো তাকের সঙ্গে পিঠোপিঠি বসানো। এদিকে কিছু খুললে ওদিকে নিশ্চয় কোনো সংকেত হয়। যেমন ওদিকে কিছু করলে এদিকের বন্ধ সিন্দুক, বন্ধ দেরাজ আপনা থেকে খুলে আসে। যাতে ঐ স্নানের ঘরে কেউ থাকলে, এ ঘরে কি হচ্ছে তার সংকেত পায়। আবার এ ঘরে থাকলে ঐ স্নানের ঘরে কি হচ্ছে, তার-ও সংকেত পায়। পরে দেখেছিলাম আমার অনুমানই সত্যি।

লিখতে এতটা সময় লাগল, কিন্তু চিন্তাটা এক নিমেষে মনে এসেছিল। ঘরের দরজা খুলে দিতে খুব কম দেরি হয়েছিল। মিসেস্ সামন্ত অনুমতির অপেক্ষা না করে ভিতরে এসে ঢুকলেন। আমার দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'এত রাতে কি করছিলেন?'

আমি হেসে বললাম, 'দেখতেই তো পাচ্ছেন, খাওয়াদাওয়া সেরে, হাত মুখ ধুয়ে শোবার জোগাড় করছিলাম। কেন বলুন তো? কিছু দরকার ছিল?' মিসেস্ সামন্ত উঠে পড়ে ঘরটার চারদিক তাকিয়ে বললেন, তবু জেদ ধরে রইলেন। এ ঘরটা ছাড়ুন, নইলে আপনার কপালে দুঃখ আছে।' আমি কাষ্ঠ হাসলাম। তখন কাছে এসে আমার হাত ধরে ব্যাকুলভাবে বললেন, 'দেখুন, আমার কথা রাখুন। আজ আপনার মনের পরিচয় পেয়েছি। আপনার কিছু হলে আমার কষ্ট হবে।'

আমি বললাম, 'পাগল নাকি? এই শোব আর কাল সকালে উঠব। যান, অসুস্থ শরীরে আর রাত জাগবেন না।' তাঁকে এক রকম জোর করে বিদায় দিলাম। তখন অনেক রাত, এত রাতে কিছু করার উপায় নেই বুঝে চুল বেঁধে, সত্যি সত্যি শুয়ে পড়লাম। বালিশের নিচে থেকে সোনার ইঁটটা বের করে খাটের তলায় চটির বাক্সে পুরে রাখলাম। জিনিস নিরাপদ রাখার ঐ নিয়ম। গুণময়ী ঠিকই বলেছিলেন। চোরে এসে সিন্দুক ভাঙে, চটির বাক্স খুলতে যায় না।

অন্য দিন শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ি, কিন্তু আজ কেমন একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা আমাকে জাগিয়ে রাখল। এর আগে টংকে ছেড়েও দিব্যি ঘুমিয়েছি, অথচ আজকে এমন কি মানসিক অসোয়াস্তির কারণ হল যে চোখের দু পাতা আর এক হয় না। খট্ করে মনে প্রশ্ন হল যে-বনিদির খোঁজে এখানে আসা, সেই বনিদিই এখন দ্বিতীয় স্থান নিচ্ছেন না তো? রক্ত-নেশা বড় সাংঘাতিক জিনিস। বনিদিকেও পেয়েছিল কি না কে জানে? নইলে সব ছেড়েছুড়ে লুকিয়ে এখানে চলে আসবেন কেন? তবে সব ছেড়েছুড়ে আসেন নি তিনি। ঘরভরা জিনিস রেখে আসার মানেই তিনি মনে করেছিলেন শীগগির আবার ফিরে যাবেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এসেছিলেন সেটা নিশ্চয় খুব গোপনীয় কোনো ব্যাপার, তাই কাউকে কিছু বলতে পারেন নি। আমাকেও না। এখানেই যে এসেছিলেন, ঐ ক্লিপ খুঁজে পাবার পর সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না।

নিশ্চয় কোনো বিপদে পড়েছেন। ম্যাসিক মিস্ সোমকে বলেছিল যে সত্যিকার মন্দ লোকরা ভালোমানুষদের দলে ভালো-মানুষ সেজে থাকে। এই স্কুলের ভালো-মানুষদের মধ্যেই নিশ্চয় দুষ্টুলোকরা লুকিয়ে আছে। বাইরের কোনো লোক এখানে এসে বনিদিকে গুম করবে না। সোনার ইঁটও হয়তো সাধারণতঃ ভালো লোকদের থাকে না। কিন্তু শিবনারায়ণ তো যতদূর জানা যায় ভালো লোকই ছিলেন। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

পরদিন উঠতে দেরি হয়ে গেল। তেওয়ারি চা এনে দরজায় টোকা দিতে তবে ঘুম ভাঙল। তেওয়ারিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ম্যাসিক সায়েব আসে কখন?' তেওয়ারি অবাক হয়ে বলল, 'তিনি তো সেই ভোর থেকেই এসে গেছেন। পুলিশের লোক এসেছে, বড়বাবুর সঙ্গে কি কথা হয়েছে। বড়বাবু, ম্যাসিককে ফোন করে ডেকে পাঠিয়েছিল। কিছু দরকার থাকে তো বলতে পারি।'

এই বলে উৎসুকভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, 'না, সে-রকম কিছু নয়। খাবারটার জন্য ধন্যবাদ দেব। ফ্লাস্কটা ফেরত দেব।' তেওয়ারি বলল, 'সে তো আমিও দিতে পারি, দিদি।' আমি নিঃশব্দে ওর হাতে ফ্লাস্কটি দিয়ে দিলাম। তারপর তৈরি হয়ে যখন নিচে গেলাম, প্রথম যাকে দেখলাম, সে-ই হল ম্যাসিক। বেল-গাছের পাশে ঘোরানো সিঁড়ির ভাঙা দরজার পাশে কার জন্যে অপেক্ষা করছে। দেখা হবামাত্র বললাম, 'বনিদিদির কথা যদি খুলে বলেন, তাহলে সোনার কথাও বলি।'

এমনি চমকে গেল ম্যাসিক যে মুখটা কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল। দেখে মনে হতে লাগল মার্বেল পাথরে খোদাই করা মূর্তি। 'সোনা? কোন সোনা? আপনার শরীর ভালো আছে তো?'

আমি বললাম, 'কেন, শিবনারায়ণের লুকনো সোনা, আপনারা সবাই যা খুঁজছেন।' ম্যাসিক কাষ্ঠ হাসল। 'আমি কিন্তু বনি-দিদিকেই খুঁজছি। তার এতটুকু চিহ্ন পাই নি। অথচ আমি জানি তিনি এখানে এসে-ছিলেন। আমি ছাড়া আর কে জানবে বলুন? এক রকম আমিই তাকে এখানে এনেছিলাম।' ওর গলায় কেমন হতাশার সুর শুনে আমিও হতাশ হলাম। ও যদি না জানে, তাহলে আমি তাঁকে পাব কি করে?

নিঃশব্দে হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে ন্যাকড়া জড়ানো ইঁটটি ম্যাসিকের হাতে তুলে দিলাম। কাছেপিঠে কেউ ছিল না, ম্যাসিকের হাত কাঁপছিল, ন্যাকড়া খুলে ফেলে আমার দিকে চেয়ে রইল। বললাম, 'শিবনারায়ণের সোনা।'

ম্যাসিক বলল, 'হয়তো এর-ই জন্য বনিদিদি প্রাণ দিয়েছেন। এ কোথায় পেলেন? তবে শিবনারায়ণের সোনা নয়, কালোবাজারির সোনা। এই দেখুন বিদেশী শীলমোহর, এই দেখুন গত বছরের তারিখ।'

হঠাৎ বুঝতে পারলাম ম্যাসিক বনিদিদির শত্রু নয়। বনিদিদিকে ফিরে পাবার জন্যে প্রাণটা আঁকুপাঁকু করে উঠল। সোনা কিভাবে পেয়েছি সব বললাম। তারপর সোনাটা নিয়ে আমার ব্যাগে ভরলাম। এ আমি সহজে হাতছাড়া করছি না। ট্রেনিং অফিসার বলেছিল আমার নজর কম! ইঃ! ম্যাসিক হয়তো আপত্তি করতে যাচ্ছিল, এমনি সময় গোড়াবাবুর বাড়ির ওদিক থেকে গলার স্বর শুনলাম। কে যেন রাগতভাবে কি বলছে। ম্যাসিকের দু কান খাড়া হয়ে উঠল। আমাকে বলল, 'এ বিষয়ে কাকেও কিছু না বলাই ভালো।' ছোট একটা নমস্কার করে গেল চলে। কিন্তু যাবার আগে আমার ব্যাগ ছিনিয়ে, আমার সোনার ইঁটটি নিয়ে পকেটে পুরে ফেলল। কি আর করি? জলখাবারের খোঁজে খাবার ঘরে গিয়ে শুনলাম মিসেস সামন্ত কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে ভোর-বেলাতেই কোথায় চলে গেছেন। শুনে একটু ভাবনা হল। তার মানে তিন তলায় ঐ তাল তাল কালোবাজারিদের সোনা আর একলা আমি। কিন্তু তারপরেই মনে হল, তাহলে চারদিক খুঁজে দেখারও সুবিধা হবে। গুণদিদি দেখলাম ভারি উত্তেজিত। ম্যাসিক নাকি গোড়াবাবুর বাড়িতে ঢুকেছে। কুকুর বাঁধা হয়েছে। অন্য কারাও এসেছে। সকাল থেকে বকাবকি হচ্ছে। এবার হয়তো টাকার রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। কিন্তু যে যাই বলুক, গোড়াবাবুর মতো মানুষ হয় না।

আমি বললাম, 'ট্যাংরা কোথায় থাকে?'

গুণদিদি অবাক, 'ট্যাংরা? হঠাৎ ট্যাংরার কথা মনে হল কেন? সে তো বরাবর গোঁড়াবাবুর বারবাড়ির দেউড়িতে থাকে। ওর ঘরে ঘণ্টা আছে, দরকার হলেই গোঁড়াবাবু যাতে ডাকতে পারেন। ভিতরে যাবার ওর আলাদা পথ আছে, নইলে কুকুর দেখলে তো ওর নাড়ি ছেড়ে যায়। এমনি বীরপুরুষ!'

।। বারো ।।

আস্তে আস্তে আমার মনের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছিল। কালোবাজারিদের সোনা চালানের ব্যাপার নিয়ে উংএর বাবাকে এত বেশি ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে যে ব্যাপারটা আমারো জানা হতে বাকি ছিল না। গত আড়াই বছরের আ-প্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কালোবাজারিদের প্রধান ঘাঁটি খুঁজে পাওয়া যায় নি। একটু হাসি পেল। বিয়ের পর সে আমাকে চাকরি ছাড়িয়েছিল, বলেছিল আমি ফার্স্ট ক্লাস স্ত্রী কিন্তু থার্ড ক্লাস পুলিশ-উওম্যান, আর আমিই কিনা সেই ঘাঁটি খুঁজে দিলাম! এবার সোনার ইঁটটা হাতে নিয়ে একবার তার সামনে দাঁড়ালে তার মুখটা কেমন হয় দেখা উচিত। তবে ইঁটটা তো আর আমার কাছে নেই। অমনি বুকটা ধড়াস করে উঠল। তাহলে ম্যাসিকেরই বা কি হবে? বীনিদিদিও নিশ্চয় ম্যাসিকের চক্রান্তে এই ব্যাপারে জড়িত। তাঁর কি হবে? আর আমি যে সব কথা ম্যাসিককে খুলে বলেছি, আমারই বা কি হবে? মনের ভাবনা মনে রেখে বললাম, গোঁড়াবাবুর বাড়িতে পুলিশ ঢুকেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এবার কি সবাই জালে পড়বে, গোঁড়াবাবু, ম্যাসিক দুজনেই? মাঝখান থেকে ট্যাংরা বেচারাকেও না টেনে নিয়ে যায়।'

সব দায়িত্বজ্ঞানহীন বোকার মতো কথা। কে যেন আমার মুখে পুরে দিচ্ছিল, চাপতে পারছিলাম না। ম্যাসিক এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। হেসে বলল, 'গোঁড়াবাবুর বাড়ি সার্চ হল। কিছু পাওয়া গেল না। তবে ট্যাংরাকে ওরা বোধ হয় সঙ্গে নিয়ে যাবে। তার ঘর ভরা কাগজের ডাঁই, কেন বা কি জন্য কিছুই বলতে পারছে না, কিম্বা বলছে না। মেঝে থেকে ছাদ অবধি এত সাদা কাগজ জীবনে কখনো দেখিনি। তার উপর পোকা-মারা ওষুধ ছড়ানো, হেঁচে হেঁচে মরি। ট্যাংরা খুব চ্যাঁচামেচি করছে।' এই বলে সাদা ধবধবে একটা রুমাল বের করে ম্যাসিক আলগোছে নিজের নাকটা মুছে নিল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই রুমালের উপর দিয়ে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। আমার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। আমি একজন বড় পুলিশ-অফিসারের স্ত্রী, গোপনে একটা নিজস্ব তদন্ত করবার জন্যে এক রকম প্রাণ হাতে করে, ছদ্মবেশ ধরে, এখানে রয়েছি আর আমার কি না প্রমাণিত আইনভঙ্গকারীদের জন্য সহানুভূতি হচ্ছে! ছি, ছি!

তবে ট্রেনিং অফিসার নিজেও এ কথা বলেছিলেন। তদন্ত করতে গিয়ে অ-মানুষ হওয়া যাবে না, এমন কি অনেক সময় অন্যায়-কারীদের জন্য সম-বেদনাও বোধ করতে দোষ নেই। কিন্তু তাদের সহায়তা করলে শুধু যখন নিজের কাজের জন্য প্রয়োজন হবে। আরো কি বলে বসতাম জানি না, ভাগ্যিস সেই সময় ট্যাংরা সহ পুলিশ অফিসাররা এদিক আসছে দেখা গেল। তাদের মধ্যে ঐ লোকটার অনেক দিনের সহকর্মী কে মণ্ডলকে দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ। কাকেও কিছু না বলে, এদিকে তার চোখ পড়ার অনেক আগেই, একেবারে পিছন ঘুরে আমি সরে পড়লাম। সামনের সিঁড়ি দিয়ে না গিয়ে, পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে গেলাম। নিচে থেকে কেমন যেন কানে এল, ধর, ধর, ধর! ঐ গেল গেল গেল গেল! ততক্ষণে আমি দোতলায় উঠে গেছি। আমাকে নয় নিশ্চয়ই।

ঐ সিঁড়ি দিয়ে দোতলার বন্ধ বারান্দায় ওঠা যায়। তার দরজা এখন খোলা, ঝাড়ু-দাররা কাজ করছে। সেখান থেকে বারান্দা ঘুরে বড় সিঁড়ি দিয়ে, তিন তলায় আমার নিজের ঘরে পৌঁছাতে কতক্ষণই বা লাগল। ঘরে ঢুকে দরজায় ছিটকিনি দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলাম। কেন জানি মনে হতে লাগল চারদিক দিয়ে জালের বেড় ছোট হয়ে আসছে। এই সময় পালাবার জন্যে মাছরা আকুলি-বিকুলি করে। খুব ছোট যারা, তারা জালের ফুটো দিয়ে গলে পালায়। মাঝারিরা কেউ কেউ জালের মুখ দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে সাঁতরে পালায়। কিন্তু বড় বড় মাছদের কোনো উপায় থাকে না। বীনিদির তো সবেমাত্র ঢুকেছেন, তিনি তাহলে মাঝারি মাছ। ছোট কিছু হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তিনি যেন পালিয়ে গিয়ে থাকেন, ভগবান। নিচে কে জানে কে পালাল, কার পিছনে ধর ধর করে সবাই ছুটল।

চুলোপুঁটি ট্যাংরাকে ধরে নিয়ে ওরা গোঁড়াবাবুর চোখে ধুলো দিয়েছে। নিশ্চয় ভেবেছে এবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন উনি। অসাবধান হয়ে পড়বেন। ওঁর প্রথম কাজ হবে সোনার তাল সরানো। ম্যাসিক তাহলে ওঁরই দোসর। সে তো জানে আমি সোনার কথা জানি। আমার মুখ সে কি করে বন্ধ করবে?

চোখ তুলেই বুঝলাম কি করে করবে। যেমন করে বীনিদিদির মুখ বন্ধ করেছে, ঠিক তেমনি করে। একটা মানুষের মুখ বন্ধ করা এ-বাড়িতে কত সহজ সেটা আমার বোঝা উচিত ছিল। আমার ঐ ডেস্কের পাশে এক হাত জায়গা ছেড়ে আমার স্নানের ঘরে যাবার দরজা। তার ওপাশে আরেক হাত জায়গা ছেড়ে আবার ঐ নক্সা-কাটা জোড়-উত্তর তক্তা বসানো। ইংরিজিতে একে বলে 'ওয়েন্সকটিং', দেখতে বড় সুন্দর লাগে। এরই মাঝখানে দুটি নক্সা করা ফুল অন্যগুলির চেয়ে গভীরভাবে কাটা।

এখন দেখলাম ঐ কাঠের তক্তা দুভাগ হয়ে দুদিকে সরে যাচ্ছে। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেল না। ছিটকিনিটা নামিয়ে দিলাম, যদি দৌড়ে পালাতে হয়। টপ করে বালিশের নিচে থেকে আমার খুদে বন্দুক তুলে নিয়ে, ফাঁকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। অনেক সময় বিপদের জন্য অপেক্ষা না করে বিপদের সম্মুখীন হওয়াই বুদ্ধির কাজ। কিন্তু ফাঁকটা থেকে যখন মাত্র তিন ফুট দূরে পৌঁছলাম, পায়ের নিচের মেঝেটা যেমন দুলে পড়ল, আমি নিচে পড়ে গেলাম। পড়ে গেলাম বটে, কিন্তু ব্যথা পেলাম না। দুটি হাত আমাকে জড়িয়ে ধরল, একটা নরম কোলের উপর পড়লাম। এ হাত, এ কোল আমার খুব চেনা। ছোটবেলা থেকে অনেক সময় অনেক রাগ-দুঃখ-হতাশায় এই কোলে আমি মুখ গুঁজেছি। আজও কোলে মুখ গুঁজলাম। মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না। বিষম অনন্দে আমি ডাক ছেড়ে কেঁদে ফেললাম। বীনিদিদি সব বুঝতে পারলেন। আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

অমনি পেছনে খল-খল করে উঠল। চমকে গিয়ে মুখ তুলে চেয়েই দেখি বীনি-দিদির ফরসা পায়ের কাছে দুটি পেতলের শিকল দিয়ে একসঙ্গে করে বাঁধা। পা দুটি কাছা-কাছি রেখে, সবু একটা তক্তাপোষে, বিছানার উপর বসে আছেন। মনে হল বুকটা ফেটে যাবে। পেতলের শিকল আবার দেয়ালের সঙ্গে আটকানো। বেশী দূরে যাবার জো নেই। বীনিদি একটু হেসে বললেন, 'বেশি লাগে না রে, সয়ে গেছে। কামিনী ভালো ভালো খাবার এনে দেয়। ওর মনটা বড় ভালো। আমার টিন বুরুশ সাবান এনে দেয়।'

'কামিনী? কামিনী কে?' 'ঐ যে স্কুলের টিচার কামিনী সামন্ত। একটু

আমাকেই এই উলটা দিয়ে গেছে। কি করি? কিছু না করলে দিন কাটবে কি করে? অনাথ আশ্রমের জন্য এই দেড় মাসে দশটা সোয়েটার বুনেছি। কামিনী বড় ভালো। ওর কোনো দোষ নেই, ওকে দিয়ে অন্যরা কাজ করায়।'

কষ্ট পেয়ে পেয়ে হয়তো বনিদিদির মাথার গোলমাল হয়েছে। বললাম, 'সে তো ছুটি নিয়ে কোথায় চলে গেছে, তোমার উল আনবে কি করে, তাই বল, বনিদি!' বনিদি হাসলেন, 'কোথাও যায়নি, যেমন হুকুম পেয়েছে, তেমনি কাজ করেছে। নিজের ঘরে বাইরে থেকে তালা দিয়ে, বড় সিঁড়ি দিয়ে সবার সামনে নেমে গিয়ে, আবার লুকিয়ে পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওর স্নানের ঘর দিয়ে, ঘরে ঢুকেছে। ও কাছে না থাকলে তো আমি কোন্ কালে না খেয়ে মরে যেতাম।'

এতক্ষণ পরে বনিদিদির গলার স্বরটা একটু কেঁপে উঠল। তারপরেই হেসে আমাকে ছোট একটা ঝাঁকি দিয়ে বললেন, 'আমাকে খুঁজতে এসেছিস্ নিশ্চয়? আমি এই চোর-কুঠরিতে নির্ভয়ে দেড় মাস কাটিয়েছি। ঠিক জানি যেমন করে হক তুই আমাকে খুঁজে বের করবি।' আমি কাঁপা গলায় বললাম, 'পুলিসের ট্রেনিং আছে বলে খুঁজে খুঁজে বের করব?' বনিদি বললেন, 'না, ভালোবাসার চোখ আছে বলে দেয়াল ভেদ করে আমাকে দেখতে পাবি।' আমার কান গলা সব ব্যথা করতে লাগল।

এ কি চেহারা হয়েছে বনিদির। সূর্যের আলো দেড় মাস না দেখে ফরসা রং কাগজের মতো সাদা, চোখের নিচে এতখানি কালি, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে এসেছে। বললাম, 'কেন এসেছিলে এখানে আমাকে কিছু না বলে?'

বনিদি যেন কি বলবেন ভেবে পেলেন না। আমি রেগে বললাম, 'বুঝেছি। অ্যানির কাছে শুনেছি। সব ম্যাসিকের চক্রান্ত। ও আর গোঁড়াবাবু, সোনা পাচারের ব্যাপারে এরাই হল পাণ্ডা। আপনার কামিনী শুধু হুকুম পালে। আপনাকে দিয়ে সোনা চালান করবে। তার জন্য ভালোমানুষ চেহারার লোক দরকার হয়, যাকে কেউ সন্দেহ করবে না। এ বিষয়ে আমি বই পড়েছি।'

বনিদি চমকে উঠে বললেন, 'সোনা পাচারের তুই কি জানিস?' শেষ পর্যন্ত সব খুলে বললাম তাঁকে। বললাম, 'লুকনো ধন-রত্ন কিছু নেই। নিশ্চয় শিবনারায়ণের নাতিরা কোন কালে সব বের করে নিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। লুকনো জায়গাগুলো বের করা তো খুব শক্ত নয়। আমি বের করেছি, তুমিও নিশ্চয় বের করেছিলে, ধরা পড়ে গেছিলে, তাই অন্ধ-কূপে বন্ধ হয়ে দিন কাটাচ্ছ।'

বলতে বলতে কেমন কান্না পেয়ে গেল। ভাঙা গলায় বললাম, 'আমিও অন্ধ-কূপে বন্ধ। আর টুংকে দেখতে পাব না, টুংএর বাবাকে দেখতে পাব না।' আরো কি বলতে যাচ্ছিলাম, বনিদি এক ধমক দিলেন, 'ও কি হচ্ছে! কে বলেছে লুকনো ধনরত্ন নেই? এই দ্যাখ্!'

এই বলে দেয়ালে শেকল-বাঁধার আংটা ধরে ঝুলে পড়লেন। অমনি সেটাও দেয়াল থেকে খুলে নেমে এল। ভিতরে একটা খোপ। সেটা রং-জলা গয়নার বাক্সে ঠাসা। একটা খুলে দেখালেন বনিদি, সব হীরে। ঠিক সেই সময়ে ঘরের আলোটা টুপ করে নিবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে আমার ঘাড়ের উপর কি একটা পড়ল। বনিদি চেঁচিয়ে উঠলেন, তারপর আর কিছু মনে নেই।

কতক্ষণ পরে জানি না, স্বপ্নে মনে হল টুং ডাকছে—'মা, মা, চোখ খুলছ না কেন?' টুং কাঁদছে 'মা, মা, মা।' অমনি চোখ খুলে বললাম, 'এই যে চোখ খুলেছি, তুই কোথায়?' আর সত্যিকার টুং আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। উঃ! কোথায় যেন ব্যথা লাগল। টুংএর বাবা ব্যস্ত হয়ে টুংকে কোলে তুলে নিল। 'মার ব্যথা টুং, তুমি পাশে বস।'

তারপর কাছে এসে ঐ লোকটা বলল, 'এই দেখ, কার জন্য তুমি আর বনিদি বেঁচে গেছ। তাছাড়া তোমার ছোটমাসির মেয়ে রীতার সঙ্গে এর বিয়ে হবে, তাই ওর আগ্রহ আরো বেশি। আমার ডান হাত এই চৌধুরী, ওরফে ম্যাসিক্।'

তাইতো ম্যাসিক্ যে পুলিসের লোক এ তো আমার বোঝা উচিত ছিল। তাই ওর সঙ্গে এত সহানুভূতি হচ্ছিল বুঝি? কিন্তু ম্যাসিককে দেখে লেজায় রাগ হল। হাত পেতে বললাম, 'আমার সোনার ইট দাও!' ম্যাসিক ভালোমানুষের মতো পকেট থেকে সেটিকে বের করে আমার হাতে দিল। টুংএর বাবা ব্যাপার দেখে অবাক্। 'এভিডেন্স স্থানান্তর করেছ তুমি?' ম্যাসিক্ লজ্জিতভাবে বলল, 'স্যার, একটা প্রমাণ না দেখালে তো আপিসে আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না! এই প্রমাণটার জন্য কি না করেছি, আপনি তো সব-ই জানেন।'

ঐ লোকটা বলল, 'তা আর জানি না? নিজে দুই বছর অ্যাকাউণ্টেণ্ট সেজে এখানে হিসেব রেখেছ। তবু কিছু না পেয়ে, বেচারা বনিদিদিকে তোমার গুপ্তচর করে এখানে ঢুকিয়েছ। বনিদি ঠিক পনেরো দিনের মধ্যে প্রমাণ পেয়েও, তোমাকে দেখাতে পারেন নি, কারণ দুষ্কর্মকারীরা তাঁকে গায়েব করে দিয়েছিল।'

বনিদি ও পাশে চেয়ারে বসেছিলেন, বললেন, 'না, না, লুকনো দেরাজ-টেরাজ কিছু পাই নি। কামিনী স্নানের ঘরের দেয়াল-আলমারির পিছন খুলে সোনা লুকোচ্ছিল, আমি ঠিক সেই সময় পাউডার চাইতে ঢুকেছিলাম। ঘোরানো সিঁড়ির মাথায় ওদের দলের পাণ্ডা দাঁড়িয়েছিল দেখতে পাইনি। দুজনে মিলে আমাকে কি করে যে অন্ধ-কুঠরিতে বন্ধ করল সে আর বলে কাজ নেই। ঐ দিকের স্নানের ঘর থেকেও ওখানে যাবার পথ আছে। মিনি আমাকে খুঁজে বের না করলে ঐখানেই আমার জীবন কাটত। আর তুমি বলেছিলে কি, না ও থার্ড ক্লাস পুলিস অফিসার। ও-ই তো সবার উপর টেক্কা দিল!'

ঐ লোকটা বলল, 'তা কি করে জানব বলুন? ও মিনি, পরীক্ষা নিচ্ছিলাম যখন সব ভুলভাল বলছিলে কেন?'

আমি রেগে বললাম, 'নার্ভাস লাগছিল বলে। গোঁড়াবাবুকে কি সত্যি সত্যি ধরে নিয়ে গেল নাকি, লোকটি বড় ভালো।' এই বলে একটু কেঁদে নিলাম। বলা বাহুল্য ঐ লোকটাই ছিল আমার ট্রেনিং অফিসার।

আমার কথা শুনে সবাই হেসে খুন, 'সে কি, ওঁকে ধরে নিয়ে যাবে কেন? সোনার কারবার ওঁর স্কুলেই হত বটে, কিন্তু উনি সে-বিষয়ে বিন্দু-বিসর্গও জানতেন না। মেয়েদের বোর্ডিংএ পদার্পণ করাতেও তাঁর গুরুর নিষেধ আছে। আসল পাণ্ডাকে দেখে তো উনিও অবাক্।'

তারপর ম্যাসিক্ একটু কাছে এসে বলল 'গোঁড়াবাবু লুকিয়ে লুকিয়ে নভেল লেখেন হাজারে হাজারে বিক্রি হয়। নিজের নামে লেখেন না, তাঁর পঁচিশটা ছদ্মনাম আছে প্রত্যেকটি নামের দারুণ সাফল্য। কিন্তু লুকিয়ে করতে হয়, শেষটা যদি গুরুদেব তাও বারণ করে বসেন! এদিকে বানান-টানানের ধার ধারেন না, তাই একজন সেক্রেটারির দরকার। ট্যাংরা সেই সেক্রেটারি। ভারি চালাক লোকটা, গুরুদেবকে বুঝিয়েছে—তেজারতি করেই গোঁড়াবাবুর টাকা। বই ছাপার ব্যবস্থা ও-ই করত, তাই অত কাগজ। এদিকে আমার চেষ্টায় বনিদিদি এখানে চাকরি নিয়ে আসতেই, গোঁড়াবাবু তাঁকে দ্বিতীয় সেক্রেটারি করেন। বইগুলোকে ইংরিজিতে অনুবাদ করে দিতে হবে। একটু একটু কাজ আরম্ভও করেছিলেন; বাকি সময় আমাদের গুপ্তচর করতেন। এমন সময় হঠাৎ তিনি 'নেই' হয়ে গেলেন। আমাদের তো হাত-পা ঠাণ্ডা। নিরুপায় হয়েই, মিনিদি, আপনাকে আনা।'

শুনে আমি তো হাঁ। 'আমাকে আনা মানে? আমিই না লুকিয়ে নিজের চেষ্টায় নিযুক্ত হলাম।' ম্যাসিক্ মাথা চুলকিয়ে বলল 'হ্যাঁ, মানে আরো ভালো ভালো ক্যান্ডিডেট ও ছিল, এম-এ পাশ, বি-টি পাশ। আমি তাদের দরখাস্তগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। যাতে মিস্ সিংহ আপনাকেই পছন্দ করে নেন। ওঁরা কেউ কিন্তু এসব ব্যাপার কিছু জানেন না, ওঁদের দোষ দেবেন না।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে মিঃ কে মণ্ডল ঘরে ঢুকে বললেন, 'নাঃ, সোনা উদ্ধার করা গেলেও, ট্যাংরা বেমালুম হাওয়া।' 'ট্যাংরা?' ম্যাসিক বলল, 'ট্যাংরাই সোনা-পাচারের পাণ্ডা!'

।। তেরো ।।

আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক ঐ সময় ডাক্তার এসে কি একটা ইন্‌জেকসন দিলেন, তখুনি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে চোখ খুলেই দেখি গুণোদিদি আমার পাশে চেয়ারে বসে আছেন। প্রথমেই জিজ্ঞাস করলাম, 'আমার মাথার পেছনে কে মেরেছিল?' গুণোদিদি অবাক হয়ে বললেন, 'মারে নি তো, তবে মারতেই বা কতক্ষণ? বলেছি না কাগজে প্রায়ই দেখা যায় জোড়া খুন তুমি যে প্রাণে বেঁচে আছ, সেই ঢের। পইপই করে সবাই মিলে বলিনি, এ-ঘর ভালো নয়, এঘরে থেকো না। তোমার বর আর

ছেলে বড় গেছে। একটু বাদে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'এ-ঘরে ছিলাম বলেই তো শিবনারায়ণের ধনরত্ন পাওয়া গেল।' শুনেই আঁ-আঁ করে গুণীদিদি চেয়ার থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। শেষটা আমিই উঠে কুঁজো থেকে ওঁর মাথায় জলের ছিটে দিলাম। বনিদি বললেন, 'আবার উঠলি?' দেখি সেই ভুতের ডিভানে দিব্যি আরামে বালাপোষ গায়ে দিয়ে বনিদি শুয়ে আছেন। তিনি আবার বললেন, 'লুকনো ধন-রত্নের কথা কাউকে বলা হয়নি। শুনেই দেখছ দাঁত-কপাটি!' আমার মাথার পিছনে একটা কমলালেবুর মতো ফুলো হয়ে থাকলেও, শরীরটা একেবারে ভালো হয়ে গেছিল। এর মধ্যে গুণীদিদি উঠে বসে বললেন, 'মাগো, শুধু পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার হল।' 'পৈতৃক সম্পত্তি আবার কি?' গুণীদিদি হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলেন, 'পৈতৃক না হক, শ্বশুরকুলের তো বটে। বাঁদিন দোরগোড়ায় হাতি বাঁধা থাকত? কিন্তু কেউ আমার কথা বিশ্বাস করত না।'

আমি অবাক হয়ে বনিদিদির মুখের দিকে চাইলাম।

গুণীদিদি বলতে লাগলেন, 'দুধকলা দিয়ে কেউটে সাপ পোষা আর কাকে বলে! অবিশ্যি ধনরত্ন যখন পাওয়া গেছে, তখন আমার আর কিছু বলার নেই। কেউ আমাকে সে-কথা বলেনি। সবাই আমার কাছ থেকে লুকিয়েছে—'

আমি বললাম, 'আচ্ছা গুণীদিদি, কেনই বা আপনাকে বলতে যাবে বলুন? এর সঙ্গে আপনার কি? গোঁড়াবাবু হলেও বুঝি। এই বাড়ি এবং এর মধ্যে যা-কিছু আছে, সব তিনি আইনতঃ কিনেছেন। যদি কিছু পাওয়া যায় তো সে-সবই তাঁর।'

গুণীদিদি তেরিয়া হয়ে উঠলেন, ;আমার শ্বশুরের ধনরত্ন গোঁড়াবাবুর, সে আবার কেমন কথা? এর জন্যেই কি আমি রাজ-রাণী হয়েও, বাঁদী সেজে পনেরো বছর রান্নাঘর আগলেছি!'

এতক্ষণে কথাটা আমার কানে গেল। 'রাজরাণী? শ্বশুরের সম্পত্তি? আপনি তবে কে?'

গুণীদিদির হিস্টিরিয়ার মতো হয়েছিল। হি-হি করে হেসে বললেন, 'কে আবার? ছোটবাবুর স্ত্রী ছাড়া আর কে! সেই যে ছোটবাবু রাজার দুলাল, যিনি এখন স্টেশন রোডের "বদু ঘোষের যাবতীয় সরঞ্জামের দোকানের" মালিক। অবিশ্যি তাই বলে যেন কেউ না ভাবে যে, তিনি কুটোটি ভেঙে হাত নোংরা করেন! আমিই না হয় রান্না-ঘরের বাঁদী বনেছি। উনি এখনো সেই ফুল-বাবুটি আছেন। খালি হাতে পয়সা-কড়ি বিশেষ নেই বলে চুপটি করে থাকেন।'

এমন সময় দরজার টোকা দিয়ে কে মণ্ডল এসে বলল, 'এই যে, এবার আপনারা তৈরি হয়ে নিন, তা হলে। চীফ এঞ্জিন গাড়ি নিয়ে আসবেন। এদিকে ম্যাসিকের এক বিপদ হয়েছে—' বলামাত্র আঁ-আঁ করে গুণীদিদি আরেকবার মূর্ছা গেলেন।

কে মণ্ডলের দারুণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখলাম। কুঁজোর সব জলটুকু গব-গব করে ওঁর মাথায় ঢাললেন। ঢালতেই উঠে বসে গুণীদিদি বললেন, 'কোথায় সে মুখপোড়া? মরে গেছে বুঝি? নইলে তার বুড়ো মাকে জ্বালাবে কে!' এই বলে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

দরজার কাছ থেকে তেওয়ারি বলল, 'এটা কেমন হল, মাসিমা? তেনাকে এখুনি নিচে দেখে এলাম, জলজ্যান্ত বসে বসে চা নিমকি খাচ্ছেন! তা তেনার জন্যে এত কান্না কিসের?'

গুণীদিদি দারুণ চটে গেলেন, 'আমি কাঁদব না তো কাঁদবে কে শুনি? সে যে আমার পেটের সন্তান।'

এমনি অবাক হলাম যে, কি বলব। কে মণ্ডলকেও দেখে দারুণ বিচলিত মনে হল। 'আমাদের ম্যাসিক সায়েবের মা আপনি? তা তো জানতাম না।'

গুণীদিদি চোখ মুছে, ঠাণ্ডা হয়ে বসে বললেন, 'কি করে জানবেন? যখন আমরা ঘরছাড়া হলাম, ব্যাটা পালিয়ে গিয়ে মিশনারিদের কাছে আশ্রয় নিল। ক্রিশ্চান হল; নাম বদলাল। ওর আসল নাম রূপনারায়ণ চৌধুরী। মিশনারিরা—'

বনিদিদি বাধা দিয়ে বললেন, 'মিশনারিরাই ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে বিলেত পাঠিয়ে মানুষ করল। এখন সে পুলিসে বড় চাকরি করে। তোমার স্বামীর কাছেই তো শুনেলে, মিনি। আমি ওকে ছোট থেকে জানি। আমিও অনেক দিন ঐ মিশনেই ছিলাম। আমাকে মাসি বলে ডাকে। ম্যাসিকের মতো ছেলে হয় না।'

গুণীদিদি হঠাৎ উঠে বনিদিদির পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন। 'উহু, উহু, লাগে লাগে ভাই। আমাকে ছেড়ে মিনিকে আদর করুন। তার মাসির মেয়েকে আপনার ছেলে বিয়ে করবে।'

গুণীদিদি কেমন গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মাসির মেয়ে যদি এর অর্ধেকের অর্ধেক ভালো হয় তো আমার ছেলের অনেক ভাগ্য।'

তেওয়ারি বলল, 'সিকির সিকি হলেও ভাগ্য। বাবা! ম্যাসিক সায়েবের যা মেজাজ!'

গুণীদিদি আমার কাছে এসে বললেন, 'তুমি যে কত ভালো সে-দিনই বুঝেছিলাম, যখন মিসেস সামন্তর খাবার নিয়ে এলে। উঃফ্, মানুষ না কাল-সাপ! এইখানে লুকিয়ে লুকিয়ে সোনার কারবার করত। এ্যাঃ! আসলে ট্যাংরার বৌ! ছি ছিঃ"

তেওয়ারি বলল, 'আহা, ওনারা একেবারে নিখোঁজ হয়ে গেছেন, ওনাদের নাম করতে নেই!'

মিসেস সামন্ত যে টাংরার বৌ সে-কথা শুনে বেজায় আশ্চর্য হলাম। তাঁকে অনেক ভদ্র শিক্ষিত মনে হয়েছিল। গুণীদিদির তাই শুনে কি হাসি। 'বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না বাছা। ম্যাসিক সায়েব যে আমারি ছেলে, তাই বা কি বুঝতে পেরেছিলে? আমি নিজেই ভেবে আশ্চর্য হতাম! অমন সাধুভক্ত পরিবারের ছেলে ক্রিশ্চান হবে কে ভেবেছিল?' তারপর চোখ মুছে মুখ তুলে আবার বললেন, 'অহঙ্কারী ছোটবাবুর বৌ যে রান্নাঘরের মাসিমা হবে, তাই বা কে ভেবেছিল। ছোটবাবু তো আজও জানে না। শুধু দোকানের রোজগারে যে নিয়মাই ধুতি আর অম্বুরি তামাক হয় না, তাই বা তাকে কে বোঝাবে!'

বনিদিদি বললেন, 'সে কি! এদ্দিনেও কেউ তাকে সুখবরটা বলে নি?'

গুণীদিদি কাষ্ঠ হাসলেন। 'কারো সঙ্গে মিশলে তবে তো তারা বলবার সুযোগ পাবে! দোকানের দোতলায় যে ছোটবাবু আজ পনেরো বছর বাস করছেন, সে-কথা তেওয়ারি পর্যন্ত জানে না।'

তেওয়ারি বলল, 'তা বলবেন না, মাসিমা, আমি ওনার দোরগোড়ায় রাতে না শুলে, ওনার ফাই-ফরমায়েস কে খাটবে বলুন? আমার দাদামশাই ওনার ঠাকুরদাদার দরওয়ান ছিল। সবাই চলে গেলে খালি বাড়ি সে-ই আগলাত। গোঁড়াবাবু এলে, আমার বাবাকে এখানে বসিয়ে তবে সে চোখ বুজেছে। ছোটবাবুর কথা, আপনার কথা, তার কাছেই প্রথম শুনি।'

গুণীদিদি অবাক হলেন। 'সে জানল কি করে?' তেওয়ারি বলল, 'ছোটবাবু যে রোজ রাতে তার কাছে গিয়ে আগের দিনের গল্প করতেন।'

কে মণ্ডল এতক্ষণ কোনো কথা না বলে যে যা বলছিল নোটবুকে টুকে রাখছিলেন। গুণীদিদি আরেকবার চোখ মুছে তাঁকে বললেন, 'দুঃখী লোককে নিয়ে মস্করা করতে হয় না, সায়েব। ও-লেখা ছিঁড়ে ফেল।' কে মণ্ডল অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন, 'মস্করা না মা, আমাকে যে রিপোর্ট লিখতে হবে। বয়স হয়েছে, ভুলে ভুলে যাই। মাপ করবেন।'

তারপরেই নিচে একটা হৈ-চৈ শোনা গেল। টুং দৌড়তে দৌড়তে ঘরে ঢুকে বলল, 'চ' মামণি বাড়ি চ।' সবাই হেসে ফেলল। ঘরের থমথমে ভাবটাও অমনি কেটে গেল। আমার সুটকেস গোছানো হতে লাগল। কে মণ্ডল দেয়ালের নক্সার ফুল-দুটিকে টিপতেই, দেয়াল সরে গেল, মেঝের ট্র্যাপ-ডোর খুলে পড়ল। কে মণ্ডল বনিদিদির বাক্স প্যাটরা উদ্ধার করতে স্বচ্ছন্দে নিচে নেমে পড়লেন। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল, 'ভালো কথা, কে মেরেছিল আমার মাথায়?'

কে মণ্ডল দু হাতে দুটি সুটকেস নিয়ে উঠে এসে, মাথা নিচু করে বললেন, 'ঠিক মারি নি, ম্যাডাম। ট্র্যাপ-ডোরটা ঝুপ করে খুলে দিয়েছিলাম। আপনি তারি নিচে দাঁড়িয়ে কি করে জানব বলুন? বড় দোষ করে ফেলেছি। কিন্তু টাংরার খোঁজে এ-ঘরে এসে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ট্র্যাপডোর খুললাম। তাও বলুন।'

বনিদিদি হাসতে লাগলেন, 'তেমন কিছু দোষ হয় নি, বাপু, তবে কি না সেই সুযোগে ট্যাংরা আর কামিনী হাওয়া হয়ে গেছে আর মিনির মাথা দু-ফাঁক! আর কিছু নয়।'

কে মণ্ডল উঠে বিনাবাক্যব্যয়ে প্রস্থান করলেন। তবে আমাদের গোছগাছ সারা হতেই ঐ লোকটাকে সঙ্গে করে আবার ফিরে এলেন। টুং-এর বাবা দেখলাম ভারি প্রসন্ন। 'থ্যাঙ্ক ইউ, বনিদিদি। আসল ধন্য-

বাদ আপনার প্রাপ্য। আপনি যদি—' বাধা দিয়ে কে মন্ডল বলল, 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ না বের করতেন, তাহলে এ-সব কিছুই হত না।' সবাই হাসতে লাগল। এমন সময় গুণেদিদি আঁচল থেকে একটা নীল কাগজ বের করে কে মন্ডলকে দিয়ে বললেন, 'দেখ বাছা, যদি কাজে লাগে। আমার বিয়ের পর নিজের হাতবাক্স থেকে উটি বের করে আমার দাদাশ্বশুরে আমাকে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, দেখিস এটা যত্ন করে তুলে রাখিস্, ঐ উড়নচড়েদের দেখাস্ না। তারপর একদিন এটা থেকেই বড়লোক হয়ে যাবি। তা সে তো আমার কপালে লেখা ছিল না। দেখ এখন যদি তোমাদের কোনো কাজে লাগে।'

কে মন্ডল কাগজটা খুলেই একেবারে লাফিয়ে উঠলেন। 'এ কি স্যার! এ যে এ বাড়ির সব লুকনো জায়গার একটা নক্সা!' টুং-এর বাবাও সেটি হাতে নিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। 'এটা যদি আগে পাওয়া যেত, অনেক হাঙ্গামা বেঁচে যেত।' বনিদিদি বললেন, 'হ্যাঁ, তার-ও অনেক আগে পাওয়া গেলে এদের হয়তো বাড়িছাড়া হতেও হত না।'

গুণেদিদি আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ম্যাসিক এসে তাঁকে ধরে বলল, 'তোর কি হয়েছে, মা, আমি আবার তোমাকে বড়লোক করে দেব। আমি সত্যি কিছু খৃশ্চান হই নি, মা কেন মিছিমিছি কষ্ট পাও?' গুণেদিদি আরেকবার মূর্ছা গেলেন। তবে মিনিট দুইয়ের জন্য।

তিনি সুস্থ হলেই আমাদের যাবার বন্দোবস্ত হতে লাগল। জায়গাটার উপর কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। টুংকে কোলে নিয়ে বসেছিলাম, তবু একটু কষ্ট হচ্ছিল। বনিদিদি বললেন, তাহলে তো ঐ হীরের গয়নার ভাগ পাবে গুণময়ীরা।' ম্যাসিক মাথা নেড়ে বলল, 'না মাসিমা, ও সবই গোঁড়াবাবুর। তবে উনি সমস্তই গুরুদেবকে দান করে দিয়েছেন। তাঁর আশ্রমের জন্যে টাকা দরকার।'

গুণেদিদি বললেন, 'যতদিন পাওয়া যায় নি, ওর জন্য জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিলাম। বাড়ি ছেড়ে যেতে পারিছিলাম না, ঝি-গিরি করেও এখানে আঁকড়ে পড়েছিলাম। কিন্তু যেই পাওয়া গেল, দেখছি ওর উপর আর এতটুকুও লোভ নেই। নিন, গুরুদেবই নিন, সৎকাজে লাগান।'

এরপর আর কোনো কথা হয় না। সকলে নিচে নেমে এলাম। ম্যাসিক্ আমাকে ধরে নামাল। বনিদিদিকে চেয়ারে করে তেওয়ারির দল নামাল। উনি কিছুদিন আমাদের বাড়িতে থেকে সুস্থ হয়ে আবার নাকি এখানেই ফিরে আসবেন। একটা ছোট সুটকেস ছাড়া আর সব জিনিস মিস সিংয়ের বাড়িতে জিম্মা রইল।

ম্যাসিক্ বলল, 'মাকে এখানে কিছুদিন থাকতে হবে বুঝলাম। অন্ততঃ আর কেউ এসে কাজের ভার না নেওয়া অবধি। কিন্তু আপনি কেন আসবেন? ঐ সোনা খুঁজে দেবার জন্য আপনার দশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রাপ্য, তা জানেন?'

অবাক হয়ে দেখলাম বনিদিদির গালদুটি অস্বাভাবিক রকম হয়ে উঠেছে। আমরা নিচে আসাতে গোঁড়াবাবু, মিস সোম, পুটিদির দল আরো অনেকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। গোঁড়াবাবু এগিয়ে এসে গলা খাঁকরে বললেন, 'ও'র যাবার কোনো প্রয়োজনই নেই। আপনাদের একটা কথা বলা হয় নি। যেদিন উনি নিখোঁজ হন, সেদিনই সকালে আমাদের রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়ে গেছিল। এত গুণী মেয়েকে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না মনে হয়েছিল। তাছাড়া দেখতেও বড় ভালো।' এই বলে গোঁড়াবাবু লজ্জায় মুখ ফেরালেন।

'কিন্তু মিসেস সামন্ত বলেছিলেন উনি ইচ্ছা করেই আমাদের এখান থেকে চলে গেছেন। জিনিসপত্রও নিয়ে গেছেন। আমি বিশ্বাস করেছিলাম।'

তারপর সেকি হাসি, সেকি আনন্দ, সেকি আদরের ঘটা। গুরুদেব বড় হীরের হারটা হাতে নিয়ে গোঁড়াবাবুর বাড়ি থেকে এসে পৌঁছলেন। সেটি বনিদিদির গলায় পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, 'সুখী হও, মা। আমার গোঁড়াবাবাকে পেয়েছ, তার কাছে এর আর কি দাম। তবে এটি আমার ঠাকুমার ছিল, তাই দুর্মূল্য। রূপ, এদিকে আয়।'

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম ম্যাসিক আস্তে আস্তে গিয়ে ঢিপ করে তাঁকে একটা প্রণাম করল। তাঁর হাতে একজোড়া হীরের কানবালা দিয়ে বললেন, 'বিয়ের সময় বৌমাকে দিস্।' আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমাদের জানানো উচিত আমি রূপের জ্যাঠা। আমাকেই লোকে বড়বাবু বলত। ফেরারি হয়ে আমার গুরুর আশ্রমে চালা সেজে, আমার মেয়ে বামিকে নিয়ে লুকিয়ে থাকতে থাকতে সত্যি সত্যি চালা বনে গেলাম। এমন গুরুদেবের অভাবে বামি আর আমি হিমালয়ের এক গোপন জায়গায় আশ্রমের সেবা করি। এ গয়নাগুলো দিয়ে সেখানে হাসপাতাল করব একটা। পাহাড়িদের বড় কষ্ট।' এই বলে যেন কার উদ্দেশ্যে কপালে হাত ঠেকালেন। তারপর হঠাৎ কি মনে হওয়াতে, কোঁচড় থেকে একটা গেরুয়া পুঁটলি বের করে ম্যাসিকের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। 'ধর্, অর্ধেক গয়না তোর মা-বাবার প্রাপ্য।'

গুণেদিদি পুঁটলিটা ম্যাসিকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গুরুদেবের পায়ে পড়লেন। 'না, বটঠাকুর, তা হয় না। সবটা দিয়ে হাসপাতাল করুন। এ বড় দুঃখের টাকা। লোকের দুঃখ দূর করার জন্যেই খরচ হোক। শুধু মাঝে মাঝে আমাদেরও ওখানে যাবার অনুমতি দিন।'

গুরুদেব গলা খাঁকরে, নাক ঝেড়ে বললেন, 'তোমাদের আশ্রমে তোমরা যাবে না তো কে যাবে?' এই বলে তাড়াতাড়ি ফিরে চললেন গোঁড়াবাবুর বাড়ির দিকে। গোঁড়াবাবু বনিদিদিকে বললেন, 'সাতদিন পরে গিয়ে নিয়ে আসব। কুকুরটা তোমাকে খোঁজে, বড্ড ভালোবাসে।' এই বলে গুরুদেবের পিছন পিছন দৌড়লেন। গুণেদিদির মুখ দেখলাম হাসি ভরা। আমরা গাড়িতে উঠে বাড়ি চলে এলাম।

বিকেলে দাদা এসে নাকটাক ঝেড়ে একাকার। নাকি এ ক'দিন খায় নি, ঘুমোয় নি, কলেজ যায় নি। এমনি, পাগল। ছোটমাসি, মেসোও এসে বকেঝকে আদর করে একাকার করল। বনিদিদিকে নিয়ে কে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। কখনো আদর করে, কখনো রাগ দেখায়। বনিদিদি কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন। আর বারবার সবাইকে নুরিয়া যেতে নেমতন্ন করেন। ছোটমাসি আবার তাঁর কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিল। কি সুন্দর দেখাচ্ছিল কি বলব।

এ-সবের মাঝখানে হঠাৎ আমার শাশুড়ি আমার গলায় তাঁর আটভরি নারকেল ফুলের হারগাছি পরিয়ে দিয়ে, খানিকটা কেঁদেকেটে নিলেন। এই গল্পের এইখানেই শেষ। সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বনিদিদি নুরিয়া স্কুলে ইংরিজি পড়াচ্ছেন বিনা পয়সায়। রূপনারায়ণ অর্থাৎ ম্যাসিক আমাদের বাড়ির কাছেই কোয়ার্টার্স পাচ্ছে। আপাততঃ সে এত বেশিসময় ছোটমাসির বাড়িতে কাটাচ্ছে যে মেসো ভারি বিরক্ত। ঐ লোকটাও তাই। বোধহয় আগামী অগ্রহায়ণেই শুভকাজ সমাধা হবে।

শুধু কামিনী আর ট্যাংরাকে কোথাও পাওয়া গেল না। অবিশ্যি তাতে আমি একটুও ভাবিত নই, কারণ বনিদিদি আমার কানে কানে বলেছেন যে, ওরা গুরুদেবের আশ্রমে আছে। গুরুদেব বলেছেন তিনি নিজে ওদের চেয়েও শতগুণে পাপিষ্ঠ ছিলেন। ও'র যখন মত এতটা বদলেছে, ওদেরই বা বদলাবে না কেন? তাছাড়া হাসপাতাল তৈরি, হাসপাতাল চালানো চাট্টিখানিক কথা নয়। দক্ষ লোক না হলে হবে কেন। ট্যাংরা দাড়ি রেখেছে, ওদের নতুন নাম হয়েছে কুরুবক আর উন্মত্তিনী। ভালো নাম না? বনিদিদি দিয়েছেন।

ওঃ, আরেকটা কথা বলা বাকি থেকে গেল। পর্শু বনিদিদির চিঠি পেয়েছি, তাতে লিখেছেন, 'তোরা যেদিন আসবি বটুকেও আনবি। (বটু হল আমার কাকা।) ললিতা সিংহ বড় ভালো রাঁধে। ইতি। আঃ বনিদি।'

নন্দলাল ভট্টাচার্য

যাত্রা এগিয়ে চলেছে। এখন নেই এতে সেই আদিম দিনগুলোর মত শুধু গানের ঝঙ্কার কিংবা নৃত্যের নিক্কণধ্বনি। একদা যার জন্ম হয়েছিল দেবকাহিনী পরিবেশন বা স্মরণের জন্য, আজ তা হয়ে উঠেছে দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধের হাতিয়ার।

প্রথম যেদিন যাত্রা শুরু করেছিল তার যাত্রা, তারপর থেকে গঙ্গায় বয়ে গেছে অনেক জল, ভারতের বুকে ঘটেছে অনেক উত্থান-পতন। তার বুকের পরতে পরতে জমেছে অনেক ব্যথা-বেদনা, বঞ্চনা আর শোষণ তথা বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। স্বভাবতই জননাট্য যাত্রারও অন্তরঙ্গে আর বহিরঙ্গে এসেছে অনেক পরিবর্তন। অনেক ঘটনার নীরব সাক্ষী যাত্রা, মেকী রঙের আড়ালে লুকিয়ে রাখা অন্তর্বেদনার উৎস-মুখ আজ দিয়েছে খুলে। আর গোপনতার আশ্রয় নয়, এখন শুধু হৃদয় দেখানোর পালা।

একটা সময় ছিল, যখন যাত্রা ছিল 'ইতর জনের' আনন্দ (অবশ্যই বুদ্ধি-জীবীদের চোখে)। তখনকার শিবযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রা বাংলার লোক-শিল্পের ধারাটিকে রাখে প্রাণবন্ত করে, কিন্তু পরিবর্তে পায় শুধু অবজ্ঞা। যাত্রা তখন জাতে উঠতে পারেনি, শিল্পীরা পায়নি মর্যাদা এবং সামাজিক সম্মান। এই হেয় অবজ্ঞাত শিল্পটিকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছে তখন ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ শলাকা, বলা হয়েছে, 'যাত্রা শোনে ফাতরা লোকে' অর্থাৎ বাজে লোকের আনন্দ হচ্ছে যাত্রা। এরপর এসেছে নন্দবিদায় যাত্রা, নলদময়ন্তী যাত্রা, এসেছে বিদ্যাসুন্দর পালাগান। তবু যাত্রা মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থেকেছে সমাজের এক কোণে।

মতি রায়ের সময় থেকে যাত্রার কপাল খুলেছে—সে পেতে শুরু করেছে সামাজিক মর্যাদা। ওই দীর্ঘ সংগ্রামের শেষে আজকের যাত্রার দিকে বিদগ্ধজনের আগ্রহ, আসক্তি তথা অনুরাগ দেখে তাই প্রাণে আশা জাগে—আনন্দ হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনের আকাশে ছায়া ফেলে আশঙ্কার কালো মেঘ। বুদ্ধিজীবীদের মনের চাহিদা মেটাতে কিছুটা অনুকরণের পথে দ্রুত ছুটে চলেছে যাত্রা, তাতে শেষ পর্যন্ত সে তাল রাখতে পারবে তো? নাগরিক মনের ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে গ্রামীণ মনকে বঞ্চনা করে শেষ পর্যন্ত সরিয়ে ফেলবে না তো নিজের পায়ের তলার শক্ত মাটিটুকু?

একথা সত্য, পশ্চাত্যে যেমন একদিন মিস্ট্রি আর মিরাকলের মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছে কমেডি আর ট্র্যাজেডি, বাংলার যাত্রাও তেমনি চিরন্তন সৎ-অসতের দ্বন্দ্ব-নির্ভর, ঐশীশক্তির বন্দনামুখর পৌরাণিক আর দেবকাহিনীগুলিকে সযত্নে একপাশে সরিয়ে রেখে, কল্পনার সাতরঙা রামধনুর পিছু ছেড়ে নেমে এসেছে আজ বাস্তবের ধুলোকাদার মাটিতে। এর ধুলোমাটি থেকে, কাঁটা-ফুল থেকে, দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামের নানা রূপ থেকে বেছে নিচ্ছে তার পালার কাহিনী। সবশেষে একটা প্রচণ্ড জীবন-বোধের সম্বলে সে হয়ে উঠেছে জননাটক বা গণনাটক।

গণ-নাট্যসৃষ্টির তাগিদে একদিন মঞ্চের নাট্যভাবনায়ও এসেছিল দারুণ জোয়ার। দেশকে জানার, তার মানুষের কথা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার সাধনায় মঞ্চ মেতে উঠেছিল যেন অফুরন্ত প্রাণ-শক্তির আবেগে। হঠাৎই কাজ শেষ হওয়ার আগেই যেন বেজে উঠল বিসর্জনের ঢাক—এলো ভাটা। ওই প্রচণ্ড কর্মপ্রবাহ থেকে ছিটকে পড়লো সবাই। তারপর দেখা গেল, সাততলা বাড়ীর উপরের জানালাটাকে সামান্য ফাঁক করে দেখা হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবনযুদ্ধের রূপ। আর পর মুহূর্তে নিদারুণ আবেগে আঁকা হলো ছবি—যা দেখে সাধারণ মানুষ লজ্জায় নীল মুখ ঘুরিয়ে এবং শহুরে তথা উচুতলার মানুষের নাকে এল কেমন একটা বাসি বাসি গন্ধ। অন্য দিকে আবার কেউ কেউ নিজেদের এই ছোটখাট সমস্যা বা জীবনের প্রতি সব দায়িত্ব শেষ করে আন্তর্জাতিকতার পেছনে ছুটলেন—অনূদিত হলো বহু ভাল বিদেশী নাটক। কাগজের বিলিতি ফুলে ভরে উঠল সাজি। অবস্থাটা দাঁড়াল সেই তোতার মতো—কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না, মনে হয় তাকে না দেখলেও চলে। অতএব গণনাট্যের প্রশ্নটাই গেল হারিয়ে। এই রকম একটা মুহূর্তে যাত্রা এগিয়ে এসে আজ প্রকৃত গণ-নাটক পরিবেশন করতে চলেছে। অবশ্য একথা অনেক আগেই স্বীকৃত হয়েছে যে, যাত্রার মাধ্যমে গণচেতনা জাগানোর কাজটি হয় অতি সহজে।

বর্তমান অবক্ষয়ী সমাজের মর্মান্তিক ব্যথা-বেদনার ও ব্যর্থতার কথা অতি সোচ্চার আজকের পালায়। একদিকে যেমন তাতে রয়েছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের টুকরো টুকরো হাসি-কান্না, পতন উত্তরণের কথা, তেমনি রয়েছে অতীতকে স্বীকার করার—জানবার এক সৎ-সাহসী মননের ছোঁয়া। তাই আজকের যাত্রাপালায় মূর্ত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী, রামপ্রসাদ-কমলাকান্তের মাতৃসঙ্গীতের অমিয়ধারা, বিদ্যাসাগর আর রামমোহনের সমাজসংস্কারের কথা, ধ্বনিত হচ্ছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ — ক্ষুদিরামের বন্ধনঘোষ, মুকুন্দদাস, এন্টনী কবিয়ালের জীবনগীতি, মধুসূদনের সাহিত্যকীর্তি আর জীবন-যন্ত্রণার কথা। অন্য দিকে যাত্রার আসরে ঠাঁই করে নিচ্ছে হিটলার, লেনিন, নেপো-লিয়ান, সিজার প্রভৃতি বিদেশী চরিত্র আর তাদের স্বপ্নকল্পনা। সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান শ্রেণীসংগ্রাম আর জীবনযুদ্ধের কথায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে একটি পয়সা, পদ-ধ্বনি, ঘুমভাঙার গান, মুখোশ পাচালী, জ্বলন্ত বারুদ, পথের ছেলে, ফাঁসির মঞ্চে মরেও যারা মরে না, চণ্ডীতলার মন্দির, এক টুকরো রুটি, আগুন নিয়ে খেলা প্রভৃতি পালায়। এবং সঙ্গে পরিবেশিত হচ্ছে ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি ভিন্ন আলোকে, ভিন্ন ব্যাখ্যায়। তাই আজকের শ্রোতার কাছে সিরাজদ্দৌলা, চাঁদসুলতানা, পাঠান-পাঞ্জাবী সৈনিক, বঙ্গনারী [illegible], শিবাজী, লোকনায়ক, সম্রাট কামুকোনাশ প্রভৃতি পালায় আকর্ষণ অসাধারণ।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, যাত্রার এই যুগেই বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, দেবীচৌধুরাণী, শরৎ-চন্দ্রের চন্দ্রনাথ, বিন্দুর ছেলে প্রভৃতি কথা-সাহিত্যের এবং গোর্কির মাদার, ইবসেনের ঘোস্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য কথাসাহিত্য ও নাটকের যাত্রারূপ আসরে আসরে পরি-বেশিত হচ্ছে। এরই সঙ্গে মঞ্চের বহু সফল নাটকও যাত্রারূপে আসরে ঠাঁই করে নিয়েছে।

১৯৬২ সালে শোভাবাজার রাজবাড়ীর যাত্রা উৎসব থেকেই যাত্রার প্রতি নাগরিক-মন আকর্ষিত হতে শুরু করেছে। এবং সে আকর্ষণের চরম স্বীকৃতি গত বছর যাত্রার প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদের সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার লাভের মধ্য দিয়ে। স্বভাবতই এই দশকের যাত্রাপালা তাই ভিন্ন আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

মোটামুটিভাবে এই যুগের যাত্রাকে বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই লক্ষ্য পড়বে, আজকের যাত্রার অভিনয়ধারা অনেক বেশী সহজ স্বাভাবিক, অনেক বেশী অনাড়ম্বর। কারণ হিসেবে বলা যায়, বিদগ্ধ শ্রোতার মনোরঞ্জন ও আজকের সমাজের কথা বাস্তব-

ভাবে তুলে ধরার প্রবণতাই অভিনয়ধারায় এই স্বাভাবিকতা এনেছে। এ ছাড়া অন্য কারণও অবশ্য আছে। বর্তমানে যাত্রা অতি-মাত্রায় মঞ্চ ও চলচ্চিত্রকে অনুকরণ করছে, তাছাড়া একটা চমক বা গ্ল্যামার সৃষ্টির জন্য বেশীর ভাগ দলই এখন মঞ্চ ও চলচ্চিত্র শিল্পীদের দলে রাখছেন। তাঁদের পক্ষে যাত্রার নিজস্ব ধারাকে আত্মস্থ করা বড় একটা সহজ ব্যাপার নয় এবং যাত্রা পরিচালনার ক্ষেত্রেও মঞ্চের বহু পরিচালক হাত দেওয়াতে অভিনয়ধারা স্পষ্টতই পাল্টাতে বাধ্য।

এই দশকের পালার কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, চিরাচরিত পৌরাণিক কাহিনী, মঙ্গলকাব্য বা চৈতন্য-কাহিনী এবং কল্পনামিশ্রিত ঐতিহাসিক কাহিনীগুলিকে বাদ দিয়ে যাত্রার মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হতে শুরু করেছে অন্য জাতের নাট্য-কাহিনী। বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে যাত্রায় ঐতিহাসিক বা স্বাজাত্যমূলক কাহিনী আসরস্থ হয়েছে। তবে দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর থেকেই যাত্রায় ওই 'অন্য জাতের কাহিনী'র আনাগোনা। এই সময় আমরা দেখি কাল্পনিক কাহিনী, রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাহিনী বা সন্ত্রাস-বাদীদের কাহিনী জনমানসে ছাপ রাখতে সমর্থ হচ্ছে। এরই পরবর্তী প্রয়াসে আজকের আসরের পুঁজিপতিদের শোষণের কাহিনী। চোরাকারবারী, মুনাফাখোর ও মজুতদারদের ঘৃণ্য ক্লেদাক্ত কাহিনী বা অসংখ্য শোষিত নির্যাতিতের অপমান লাঞ্ছনা, দুঃখ-বেদনার কাহিনী বা এই গণতন্ত্রকে আশ্রয় করে একদল ভোটপ্রার্থী, ভণ্ডামির যে নির্লজ্জ খেলা খেলছে তারই ছবি। এরই সঙ্গে আছে চৈনিক বা পাক আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত পালা বা ছিন্নমূল বাস্তুত্যাগীদের কান্নায় ভেজা কাহিনী।

এই সামগ্রিক রূপের পাশে বিগত দু বছরে দুটি জিনিসের উপর সকলের দৃষ্টি পড়তে বাধ্য। মঞ্চও যেখানে জীবনী-নাটক মঞ্চায়নের ব্যাপারে অনীহা দেখাতে অভ্যস্ত, যাত্রা সেখানে প্রায় অনায়াসে একের পর এক জীবনী-পালা আসরস্থ করে গণদেবতার তুষ্টি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মহাজীবনের মহা-বাণী সবার সামনে তুলে ধরছে। দ্বিতীয়ত, বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার দিনে যাত্রা-দলগুলি আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের কাহিনীগুলি তুলে ধরে আমাদের নতুন করে স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছে এবং এর মধ্য দিয়ে জাতীয় সংহতি সৃষ্টির প্রয়াসটিও অভি-নন্দন যোগ্য সন্দেহ নেই।

যাত্রা পালার এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এসেছে নানা পরিবর্তন। আগে ছিল যাত্রাগান এখন হয়েছে যাত্রাপালা। অর্থাৎ আগে যেখানে সঙ্গীতের ছিল প্রাধান্য এখন সেখানে এসেছে কাহিনী বা নাটকের প্রাধান্য। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আগে মার্গসঙ্গীতের সুর সংযোজিত হতো বেশী। তারপর এতে লাগল কীর্তনাঙ্গ সুর, জুড়ির গানে উচ্চাঙ্গ সুরের পাশেই খেমটা নাচের উপযোগী চটুল সুরও তাতে থাকত। বর্তমানে যাত্রায় সঙ্গীতের আধিক্য আর নেই। প্রায় বিবেক-বর্জিত আজকের যাত্রাপালায় সুরের ক্ষেত্রে লঘু সুরের প্রাধান্যই বেশী। অবশ্য টপ্পা ভাঙা থিয়েটারী সঙ্গীতের সুরও আছে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যাত্রাগানে—সুর-সংযোজনার জন্য মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের বহু খ্যাতনামা সুরশিল্পী আসছেন। এর ফলে যাত্রায় সুর-বৈচিত্র্য আসছে সন্দেহ নেই।

যাত্রার এই আধুনিক পর্যায়ে পালা ও সঙ্গীতের কথা বলা হোল। প্রসঙ্গত আরেকটি কথা উল্লেখ্য, আগের যাত্রাপালায় পদ্য বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের সংলাপের ছিল এক বিশিষ্ট স্থান। এবং সংস্কৃত নাট্য-রীতির অনুসরণে সে সময় তাতে মূল কাহিনী বা শিষ্ট চরিত্রের সংলাপ রচিত হতো ছন্দে, শুধু সাধারণ চরিত্র বা ভাঁড় ইত্যাদির সংলাপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো গদ্য। কিন্তু আজকের পালাগুলিতে পদ্যের কোন স্থান নেই—সবই গদ্য। এবং ওইসব পালায় আজকাল প্রায়শই রবীন্দ্রনাথ, নজ-রুল, সুকান্ত থেকে আরম্ভ করে একদম আধুনিক কবির কবিতাও স্থান পাচ্ছে কোন কোন চরিত্রের মুখে। সব মিলিয়ে যাত্রা-পালাগুলির এখন আরেক সাহিত্যিক মূল্য নির্দিষ্ট হচ্ছে।

যাত্রার সর্বস্তরে এই যে প্রগতির ছোঁয়া তার রেশ লেগেছে এর উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও। আজকের যাত্রা আর হাজার

চৈতালি ভনুজা

বাতির রোশনাই-এর মধ্য দিয়ে হচ্ছে না। মঞ্চের মতই এখন সেখানে চলছে আলোর চাতুরী। ওই আলোর খেলায় আজ যাত্রার আসরে জীবন্ত মানুষ পুড়ছে। ফাঁসির দৃশ্য দেখানো হচ্ছে, স্টেনগান নিয়ে যুদ্ধ ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। প্রয়োজনের খাতিরে এই যে বৈদ্যুতিক কারিগরির আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে, তাতে আপত্তির কোন কারণ নেই, কিন্তু প্রয়োজনটা যখন বাতিকে দাঁড়িয়ে যায় ভয়টা দানা বাঁধে ঠিক তখনই। অতিরিক্ত যান্ত্রিকতার উপর নির্ভর করে যাত্রা ক্রমশ যেন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি একেবারে না বিসর্জন দেয়। আলোকনিয়ন্ত্রণ বা শব্দ-প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে বিশেষ মাত্রা বজায় রেখে, থিয়েটারী অনুকরণের মোহ কাটিয়ে যাত্রা যদি এগুতে পারে তবে তা আনন্দের হবে সন্দেহ নেই। তবে সব সময়ই মনে রাখা দরকার যান্ত্রিক কলাকৌশল যেন মূল যাত্রাকাহিনীকে ছাপিয়ে না ওঠে।

যাত্রার এই অগ্রগতির দিনে সরকারী আনুকূল্যের অভাবের কথাও মনে হয়। যে কোন দেশের যে কোন লোকশিল্পই সর-কারী বা জনগণের সহযোগিতা ছাড়া তার বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখতে পারে না। তাই বাংলার এই লোকশিল্পটির সাহায্যে সরকার যদি এগিয়ে আসেন, তবে তাকে মিথ্যে চমকের পেছনে আর ছুটতে হবে না। অন্তঃপ্রকৃতিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রেখে এবং বহিঃরঙ্গকে সুসংস্কৃত করে সে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে সামনের দিকে। এবং সে অগ্রগমনের ছন্দিত গতি তখন সবারই অভিনন্দনে হবে আরো স্বপ্নিল—আরো মোহময়।

নাটকপ্রসঙ্গে

শম্ভু মিত্র

'নবান্ন' নাটক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাংলার যে নাট্যনিরীক্ষা, তার মধ্যে প্রায় পঁচিশটি বছরের রোদ, ঝড়, জল, বৃষ্টি লেগেছে। এই দীর্ঘদিনের ক্লান্তিময় নাট্যচর্চায় বাংলা নাটকের পালাবদল হয়েছে, এসেছে অনাস্বাদিত এক স্বকীয়তার দীপ্তি। শিল্পের অন্যান্য শাখার সঙ্গে সমানতালে তা চলেছে এগিয়ে। এ ছবি নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ ও অপূর্ব আলোয় উদ্দীপ্ত। কিন্তু যাঁরা নাটকের জোয়ারকে বহু জড়তা ও গতানুগতিকতার অন্ধকার আবর্ত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে প্রাণের আবেগে নতুন বেগ দিলেন, তাঁরা কিন্তু আজ একদিকে চলার ছন্দে উচ্ছ্বসিত, আবার অন্যদিকে কি এক পুঞ্জীভূত যন্ত্রণায় কতুটা ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। তবু তাঁরা চলেছেন। লক্ষ্য হোল, সুস্থ জীবনবোধের পটভূমিকায় নাট্যশিল্পের নতুনতর অর্থ আবিষ্কার করে বাংলার সংস্কৃতিকে মহিমময় করে তোলা। তাঁরা এতোদিন ধরে কি ভেবেছেন, আজকের জটিল প্রহরের আবর্তনে কি ভাবছেন, তার গভীরতা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে বাংলা থিয়েটারের এক শৈল্পিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে। এঁদের চিন্তার আলো, অন্ধকারের কম্পনের সঙ্গে পরিচিত হোতেই কিছু প্রশ্ন রেখেছিলাম নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ শ্রীশম্ভু মিত্রের কাছে। প্রশ্নোত্তরে যা এসেছে তাতে মনে হয় বর্তমান নাট্যশিল্পের চেহারা এবং কি করলে বাংলা থিয়েটারের ভালো হয় এবং প্রকৃত নাট্যপ্রেমী ও নাট্যশিল্পীর ক্ষোভ; এসব বিষয়ের ওপর আমাদের চিন্তার সম্যক আলোকসম্পাত সম্ভব।

প্রশ্ন : যে থিয়েটারের সঙ্গে আপনি দীর্ঘদিন ধরে জড়িত আছেন, তার কি করলে ভালো হবে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : মোটামুটি থিয়েটারকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক, ব্যবসায়িক থিয়েটার; দুই, 'অন্যধরনের' থিয়েটার (other theatre) বুঝতেই পারছেন আমরা এই অন্যধরনের থিয়েটার করি। এই থিয়েটারকে উন্নত করতে গেলে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় চিহ্নিত করতে গেলে, একটি নির্দিষ্ট জায়গার প্রয়োজন, যেখানে আমাদের নাট্যচিন্তাকে প্রত্যাশিত প্রয়োগ পরিকল্পনায় রূপ দিতে পারবো, আর যেখানে নিয়মিত এবং বিশেষ করে ছুটির দিনে কলকাতা এবং তার চারপাশের উৎসাহী দর্শক এসে নাটকের অভিনয় দেখতে পারেন।

প্রশ্ন : তা এমন জায়গা হোচ্ছে না কেন?

উত্তর : নাট্যচর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল যে শহর কলকাতা সেখানে এতটুকু জায়গার দাম যে কতো, তা সহজেই অনুমেয়। নাটক প্রযোজনা করেই অপেশাদার দলগুলো হিমসিম খেয়ে যায়, তারওপরে জমি কেনার টাকা তারা পাবে কোথায়! ও ছাড়া জায়গা নির্বাচনেও যথেষ্ট দৃষ্টি রাখতে হবে। ধরুন, টালা বা ট্যাংরায় কিছু জমি পাওয়া গেল; কিন্তু সেখানে মঞ্চ তৈরী করে কি হবে। সব জায়গার নাট্যানুরাগীরা কি সেখানে এসে নাটক দেখতে পারবেন? এমন একটি জায়গা কলকাতা শহরে খুঁজে বার করতে হবে যেখানে কলকাতা এবং তার চারপাশ থেকে দর্শকরা খুব বেশী কষ্ট সহ্য না করে এসে অভিনয় দেখতে পারেন। কলকাতায় এমন জায়গা পেতে হোলে মূল্যও দিতে হয় অনেক। কোন একটি দলের পক্ষে সে মূল্য মিটিয়ে দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তাই ইচ্ছে থাকলেও তাকে সুপ্ত রেখে অসম্ভাব্যতার ছবিকেই বার বার দেখতে হোচ্ছে।

প্রশ্ন : আপনাদের থিয়েটার তো দেশের শিল্প সংস্কৃতিকে গৌরবান্বিত করেছে, ও সত্ত্বেও ভালো জায়গা পাওয়ার ব্যাপারে সরকার বা কর্পোরেশন এতো উদাসীন কেন?

উত্তর : সে কথা তাঁদেরই জিজ্ঞাসা করুন, আমি তার কি উত্তর দেবো। আমি শুধু বলবো, আমরা জায়গা পাইনি। এর চেয়ে বেশী কি বলতে পারি বলুন?

প্রশ্ন : এই ঔদাসীন্যের ফলে পঁচিশ বছর ধরে প্রবাহিত 'অন্যধরনের' থিয়েটারের কি অপমৃত্যু হবে? একে বাঁচাবার কি কোন চেষ্টা করা যাবে না?

উত্তর : নিশ্চয়ই না। এই থিয়েটার ম্লান হয়ে গেলে, দেশের সংস্কৃতিও পাবে প্রচণ্ড আঘাত। তাই যে কেউ এব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারেন, আমরা পারি না। এই থিয়েটারকে যেভাবেই হোক বাঁচাতে হবে, এই ব্রত নিয়ে আমরা যাঁরা নাটক করি এবং যাঁরা নাট্যানুরাগী, সবাই মিলে বেশ কিছুদিন হোল বাংলা 'নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি' বলে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছি। এর লক্ষ্য হোল, এমন একটি মঞ্চ এখানে তৈরী করতে হবে, যেখানে অনায়াসে অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা তাঁদের নাট্যনিরীক্ষার স্বাক্ষর রাখতে পারবেন। আমরা সমিতির পক্ষ থেকে পরিশ্রম করে বেশ কিছু টাকা সংগ্রহ করেছি। টাকার যে অংক আজকে হয়েছে, তাতে কর্পোরেশন বা অন্য কেউ যদি জায়গা দেন তাহোলে হয়তো এখুনি একটি 'হাউস' শুরু করা যায়। আর তা না হোলে, যে টাকা জমেছে তা জমি কিনতেই চলে যাবে; 'হাউস' করার টাকার জন্য আবার দেশের লোকের কাছে হাত পাততে হবে।

প্রশ্ন : 'নাট্যমঞ্চ সমিতি' এই টাকা সংগ্রহ করলো কি করে?

উত্তর : টাকা আমরা সংগ্রহ করেছি শো করে এবং চাঁদা তুলে। নাট্যমঞ্চ সমিতিকে বহু লোক বিনাসর্তে ১০০ টাকা করে দিয়েছেন। এঁরা সবাই মধ্যবিত্ত জীবনের অংশীদার—কেউ কেরানী, কেউ স্কুল, কলেজের শিক্ষক, কেউ ডাক্তার আবার কেউ কারখানার শ্রমিক। কিছু কিছু কারখানার কর্মী ১০০ টাকা একেবারে দিতে পারেনি বলে, ধীরে ধীরে অন্যলোকের কাছে টাকা জমিয়ে পরে একবারে দিয়েছে। সত্যি মুগ্ধ হয়েছি এঁদের নাট্যানুরাগ দেখে।

প্রশ্ন : মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে 'অন্যধরনের' থিয়েটারের দিকে আকৃষ্ট করার ব্যাপারে আপনারা যে কাজ করছেন, তাতে নিয়মিত নাট্যচর্চার জায়গা তো এমনিতেই আপনাদের পাওয়া উচিত, তাই না?

উত্তর: আমারও মনে হয় নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত। কোন দেশ রাজনৈতিক দিক দিয়ে উন্নতি করবে, আর সে দেশের সংস্কৃতি থাকবে পিছিয়ে, এমনতো হোতে পারে না। একটি দুর্বল মানুষের হাতের মাংসপেশী হঠাৎ ভীষণভাবে ফুলে গেলো তা যেমন হোতে পারে না, তেমনি সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে অর্থনীতির প্রগতি প্রত্যাশিত ফল আনতে পারে না। সমাজের নৈতিক মূল্যমানকে বাঁচিয়ে রাখে সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি অধঃপতিত হোলে সুস্থ সমাজ কি গড়ে তোলা যায় নিশ্চয়ই না।

প্রশ্ন : নাটক কিভাবে নৈতিক মূল্যমান বজায় রাখতে সাহায্য করে?

উত্তর : চোখ মেললেই দেখা যাবে পৃথিবীর একদিকে প্রাচুর্যের বন্যা আর অন্যদিকে নিরন্নের হাহাকার। সাধারণভাবে ব্যক্তিগত মানুষ আজ এক বেহিসেবী গণ্ডগোলের সামনে। সে যেন নিজেকে সব কিছু থেকে কেন যেন বারবার বিচ্ছিন্ন বোধ করছে। সে ভাবছে কি করে সমাজের

ধারার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে নিজেকে মেলাবে। এটা এক নিদারুণ সমস্যা। এই সমস্যা নিয়েই পৃথিবীর যতো ইমপরটান্ট থিয়েটার কাজ করছে। সার্থক থিয়েটারে শুধু সেটের জৌলুস ও আলোর খেলা দেখালে চলবে না, তার দৃষ্টির কেন্দ্রে থাকবে মানুষ। পটভূমিকা তৈরী করতে হবে এমন ভাবে যাতে শিল্পসংস্কৃতির আলোয় উজ্জীবিত হয়ে মানুষ একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে পারে। যথার্থ নাট্যপ্রযোজকের দৃষ্টি এই মূল্যমান টিকিয়ে রাখার দিকেই অনন্য হওয়া উচিত বলে মনে করি।

প্রশ্ন : তাহোলে পৃথিবীতে অ্যাবসার্ড নাটকের কি কোন স্থান নেই?

উত্তর : অ্যাবসার্ড নাটক সম্পর্কে গভীর কোন আলোচনা করতে চাইছি না। অ্যাবসার্ড নাটকে জীবনকে মায়াময় বলা হয়। কিন্তু যেখানে আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষ নিরন্ন হয়ে বাঁচছে, সেখানে জীবনকে মায়াময় বলে মেনে নেওয়া যাবে কি করে? আর যে বিচ্ছিন্নতাবোধের কণ্ঠ থেকে অ্যাবসার্ড নাটকের জন্ম, তা থেকে সাধারণ মানুষকে বিচ্ছিন্ন একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজের সুরে মিলিয়ে দেওয়াই হোচ্ছে আমাদের নাট্যপ্রযোজনার একমাত্র লক্ষ্য।

প্রশ্ন : তবে স্লোগান থিয়েটার করে কি এইসব মানুষকে আগামী প্রভাতের আশা দেওয়া যাবে?

উত্তর : না। মোটেই না। স্লোগানমুখী থিয়েটার একরকম আফিমের মতো। কতগুলো উত্তেজক শব্দ শুনিয়ে তা দর্শককে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। কিন্তু এ ধরনের নাটক কিন্তু চিরন্তনত্ব লাভ করতে পারে না। কেননা যেখানে মুক্ত চোখে জীবনকে না দেখা হয়, কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেখানে সংগ্রামী মানুষকে কম্পিত না হোতে হয়, তা কখনো চিরকালীন মর্যাদা লাভ করতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস। আসল কথা হোল, স্লোগান না শুনিয়ে, জীবনের বিস্তৃত পরিসরে মানুষের মানবত্ববোধ ও সম্ভাবনা ফুটিয়ে তুলতে হবে। তবেই হবে সার্থক থিয়েটার। আমরা সেই থিয়েটারই প্রথম থেকে করে আসছি এবং করবোও চিরকাল।

প্রশ্ন : মানুষকে সুস্থ জীবনবোধ ও উন্নত শিল্পচিন্তায় জড়িয়ে ফেলার বৃহৎ দায়িত্ব সম্পর্কে আপনারা কি ভেবেছেন?

উত্তর : আমরা যে 'নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি' করেছি তাতে শুধু মঞ্চই থাকবে না। এর পাশে যাতে প্রয়োজনীয় আরো শিল্পচর্চার ব্যবস্থা থাকবে। যেমন সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতি চর্চারও জায়গা হবে এখানে। সব ক্ষেত্রের শিল্পীরা সমবেত হয়ে একটি সুসংহত শিল্পবোধের দ্বারা একটি সুগভীর সংস্কৃতি যাতে বিকশিত করে তুলতে পারেন সেদিকেই রয়েছে নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির উদ্দেশ্য। মোট কথা এইসব শিল্পীরা মিলে নিবিড়ভাবে ভাববেন

দিবারাত্রির কাব্য সিমি এবং অন্যান্য

কি করে বর্তমান শতাব্দীর অস্থিরতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধে ক্লান্ত মানুষকে প্রসন্ন করে তোলা যায়। এ দায়িত্বের কথা বোধহয় এর আগে ভাবা হয়নি।

প্রশ্ন : আপনার কি এখন মনে হয় বাংলাদেশের দর্শক এখন সম্পূর্ণভাবে আপনাদের শিল্পবোধের সঙ্গে অনুভব মিলিয়েছে?

উত্তর : আমার মনে হয় তাই। তার কারণ 'নবান্ন', 'চার অধ্যায়' 'রক্তকরবী' 'রাজা ওয়াদিপাউস' করে আমরা যে স্বকৃতি ও প্রশংসা পেয়েছি, তাতে এ বিশ্বাস আমার দৃঢ়তর হয়েছে যে এখানকার দর্শক অন্যধরনের থিয়েটার খুব বেশী করে চাইছে। কিন্তু তাঁদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা মতো ব্যাপক আকারে খুব বেশীবার অভিনয় করতে পারছি না। কেননা মঞ্চ কোথায়, যেখানে আমাদের শিল্পচিন্তার সঙ্গে দর্শকদের চিন্তার এক আত্মিক সেতু-বন্ধন হয় বিরাট পটভূমিকায়। যদি পঁচিশ বছর ধরে অন্যধরনের থিয়েটার করে দর্শকদের অনুভবে কিছুটা আলোড়ন তুলে কোন অন্যায় না করে থাকি তাহোলে আমরা আমাদের সমাজনেতাদের কাছ থেকে কিছুটা সক্রিয় সহযোগিতা কি পেতে পারি না। করপোরেশন বা সরকারী কর্তৃপক্ষ কি স্থায়ী মঞ্চ প্রতিষ্ঠার জন্য এতটুকু জমির ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না। আমি শুধু আমার জন্য বলছি না, আমার মতো আর যাঁরা এই ধরনের নাট্যচর্চায় ব্যাপৃত আছেন তাঁদের সবারই হয়ে বলছি। যাঁরা আজ তরুণ নাট্যশিল্পী আছেন তাঁদের সামনে থেকে এই মর্মান্তিক ছবিটি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব অপসারিত করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন : 'ন্যাশনাল থিয়েটার' সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

উত্তর : পৃথিবীর শিল্পসচেতন ও সমাজসচেতন সব দেশেই এই থিয়েটার আছে, নেই শুধু আমাদের দেশে। এই শিল্পটির এতো উপেক্ষা পাবার কারণ আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। তাছাড়া যে ধরনের আইন আমাদের জন্য তৈরী হয়েছে তাতে আর যাই হোক থিয়েটারের বিন্দুমাত্র সহায়তা হোচ্ছে না। আমরা 'বহুরূপী'র সভারা প্রথম থেকে দশ বছর প্রমোদকর দিয়ে অভিনয় করেছি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হোল এই দশ বছর ব্যবসায়িক থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে কোন প্রমোদকর দিতে হোত না। দশ বছর পর ১৯৫৯ সালে স্বর্গত ভূপতি মজুমদার আমাদের 'রক্তকরবী' নাটক দেখে মুগ্ধ হয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে এলেন, তখন আমরা তাঁকে এই ব্যবস্থার কথা বললাম। যাই হোক তাঁর চেষ্টায় প্রমোদকর আমাদের সেই থেকে রহিত হোল। এর মধ্যে আবার আমাদের মতো দলগুলোর কিছু শিল্পীকে যদি টাকা দেওয়া হয়, এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের দপ্তরে সে খবর পৌঁছে যায়, তাহোলে প্রমোদকর রহিত হবার ব্যবস্থাটি বলবৎ থাকবে না। অথচ ব্যবসায়িক থিয়েটারের ওপর এ ধরনের প্রশ্ন তোলা হয় না। আমরা যদি কোথাও শো করতে যাই তাহোলে আমাদের আসা-যাওয়ার দুপিঠেরই ভাড়া দিতে হবে। কিন্তু ব্যবসায়িক থিয়েটারের লোকেরা গেলে একবার মাত্র ভাড়া দিলেই চলবে। এই হোচ্ছে আইন। এখন বলুন আপনারা এটা সহায়তা না প্রতিবন্ধকতা! আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য হোল এ ছবি আপনারা জনসাধারণের চোখের সামনে তুলে ধরুন। তাঁদের বুঝতে দিন আমরা কোন্ অন্ধকারের মধ্যে আছি।

প্রশ্ন : এমন প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে কতোদিন থিয়েটার করে যেতে পারবেন বলে মনে হয়?

উত্তর : এর উত্তরে শুধু বলবো কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

সাক্ষাৎকার : দিলীপ মৌলিক

দিলীপ মৌলিক

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জীবিকার প্রয়োজনে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। রোদ, বৃষ্টি আর ক্লান্তির মধ্য দিয়ে শুধু এগিয়ে যাওয়া। সন্ধ্যার ধূসর আলোয় একটি ছোট্ট ঘরে এসে নাটকের মহড়া। নাটকের চরিত্র হয়ে দিনের কর্মমুখর গতানুগতিক জীবনধারার ক্ষণিক বিস্মৃতি। এই বিস্মৃতির লগ্নেই নতুন উদ্দীপনা, নতুন শিল্প চিন্তার জোয়ার। সব মিলিয়ে নাট্য চর্চার এক সীমাহীন আলোকময়তা। এই আলোই অতীতের নাটক থেকে আজকের নাট্য প্রযোজনার স্বাতন্ত্র্যকে সোচ্চারে ঘোষণা করছে। আর নাট্যানুরাগীদের উপলব্ধির প্রহরে স্থান পাচ্ছে উদ্দীপ্ত কয়েকটি নাট্য-পিপাসুকে নিয়ে গড়ে ওঠা অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর শিল্প প্রয়াস। 'নবান্ন' নাটক থেকে নাট্য আন্দোলনের যে ধারা তা এদেরই আন্তরিকতায় ও শিল্প-চর্চার দ্যুতিতে যে আশ্চর্য গতিবেগ লাভ করেছে, এই ঐতিহাসিক সত্যকে আজ আর কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। আজকের চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা ও পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের রূপোলী পর্দার বহু 'তারকা' সমাবেশের ছবিকে সামনে রেখেও নাটকের একটি সেটে পরিবেশিত অমল, বিমল, কমল এবং ইন্দ্রজিতের জীবন সংগ্রাম ও স্বপ্নময়তায় আমরা আন্দোলিত হচ্ছি। নাট্যশিল্পের ক্ষেত্রে অনুভবের এই অভাবনীয় রূপান্তর নিঃসন্দেহে অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীদের পরিশ্রম আর নিষ্ঠার ফসল।

নাটক করা যাদের 'পেশা' নয়, বলতে পারা যায় 'নেশা' তাদের আন্তরিকতার ছোঁয়া পেয়েই নাট্য প্রযোজনার নতুন এক দিগন্ত উন্মোচন; ব্যাপারটা সত্যি অভিনব। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের শিল্পীদের মতো সন্ধ্যা ছয়টায় এসে ৯-৩০ মিঃ-এ মঞ্চ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরিচিত অভ্যাসে এঁরা অভ্যস্থ নন। অভিনয়ের বহু আগে থেকেই এঁদের ব্যস্ততা শুরু হয়, নাটক মঞ্চস্থ হবার অন্ততঃ পনেরো দিন আগে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার লাগাতে হয়, জোর করে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে 'কার্ড' দিয়ে প্রযোজনা চালাবার মতো খরচের কিছুটা তুলতে হয়; তারপর আসে অভিনয়ের দিন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেটের কাজ, আলোর কাজ; তারপর গ্রীণ রুমে বসে নাটকের চরিত্রের সঙ্গে মিশে যাওয়া। মনে অসীম আনন্দ 'সেই বহু আকাঙ্খিত দিনটি আজ এলো'। নাটক অভিনীত হয়, শেষে দর্শকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন কখনো মেলে, কখনো আবার সমালোচনার ঝড়। দুটি বিপরীত ধারাকেই এঁদের বরণ করে নিতে হয়। সব শেষে মানসিক প্রশান্তিও হয় মাঝে মাঝে বিঘ্নিত। প্রযোজনার টাকা সবটা ওঠে নি, তাই পাওনাদারের শ্লেষ সহ্য করতে হয়। সব মিলিয়ে এঁদের যে অভিজ্ঞতা তাতে নাটক না করতে পারলেই চিন্তামুক্ত থাকা যায়। তবু এঁদের ভিতরের শৈল্পিক মনটা এঁদের টেনে নিয়ে চলে অনেক আবর্তের মধ্য দিয়ে। তাই এঁরা নাটক করছেন এবং করবেনও।

নাটক সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের যে ধারণা আগে বাসা বেঁধে ছিল তা অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীদের বহু রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রয়াসে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এইভাবে চূর্ণ হয়ে যাওয়ার জন্য মনে কিন্তু বেদনা জাগে না, বরঞ্চ নতুন সৃষ্টিকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নেবার আবেগই পাচ্ছে প্রাধান্য। বাংলা নাটক দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে রূপ ও রীতিতে কতোটা স্বাতন্ত্র্য এনেছে, সে ইতিহাস স্পষ্ট করে তুললেই অপেশাদার নাট্য শিল্পীদের শিল্প-চর্চার দীপ্তি নতুনতর অর্থে ভাস্বর হয়ে উঠবে।

বিষয়বস্তু ও প্রয়োগ পরিকল্পনা, দুটি ক্ষেত্রেই বাংলা নাটকের যে পালা বদল হয়েছে সে সত্য নিশ্চয়ই কারো কাছে আজ আর অজানা নেই। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র-লাল, ক্ষীরোদপ্রসাদের উচ্ছ্বসিত নাটক দেখতে দেখতে আমাদের যে মোহ জন্মে গিয়েছিল, যুগ ও জীবনের তাগিদে সেই 'মোহ' থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে এনেছেন এই অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা। মোহমুক্তির প্রসন্ন লগ্নে আজ আমরা বুঝতে পারছি, কোথায় আমরা ছিলাম আর কি আমরা আজ পেয়েছি! যে নাটক অভিনীত হচ্ছে তার মধ্যে রূপ লাভ করছে বাস্তব জীবন এবং তার বহুবিধ সমস্যা যার সঙ্গে আমরা প্রতিটি মুহূর্তে রয়েছি জড়িয়ে। অবচেতন মনে মানুষের যে সুতীব্র অদ্ভুত আন্দোলন, তারও দিকে দৃষ্টি পড়ছে নাট্যকারের। প্রযোজিত হচ্ছে মনস্তত্ত্বমূলক নাটক। যে-সব চিন্তাকে আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বলে মনে হয়, সেগুলোকে নিয়েও রচিত হচ্ছে 'অ্যাবসার্ড' নাটক।' নাটকের 'ফর্ম' ও 'কণ্টেন্টে'র প্রচলিত ধারণাকে সাংঘাতিক ভাবে আঘাত করছে 'অ্যান্টি-প্লের' প্রযোজনা। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা চেষ্টা করছেন কি ভাবে সব রকম চিন্তাই নাটকের মধ্যে একটি চিরন্তন শৈল্পিকরূপে গ্রোথিত করা যায়।

অনূদিত নাটকের অভিনয় এঁদের নাট্যচর্চার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সোফোক্লিশ, ইবসেন, পিরান-দেল্লো, চেকভ, ব্রেখট, বেকেট, গোর্কি, আয়ানেস্কো, চ্যাপলিন, আর্থার মিলার প্রভৃতি বিশ্বের স্মরণীয় নাট্যকারদের সৃষ্টির সঙ্গে আজ আমরা পরিচিতি লাভ করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-শিল্পের প্রতি হয়ে উঠছি অতিমাত্রায় সিরিয়াস। বিদেশী নাটকের অভিনয় আমাদের নাট্যচিন্তাকে যে নানারূপে প্রসারিত করেছে, এ সম্পর্কে আজ আর কোন দ্বিধা নেই। তবে মূল বিদেশী নাটকটির বক্তব্য ভাবানুবাদের মধ্য দিয়ে বোধহয় যথার্থভাবে ফুটে উঠতে পারে না। মূল নাটককে বাংলাদেশের পরিবেশ ও চরিত্রের মতো করে পরিবেশনের মধ্যে অনূদিত নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্য কি সফল হয়ে ওঠে? প্রশ্নটি নিশ্চয়ই ভেবে দেখার মতো।

আঙ্গিক পরিকল্পনায় অপেশাদার নাট্য-গোষ্ঠীর শিল্পীরা যে পরীক্ষামূলক চেষ্টা চালাচ্ছেন তা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। সাজেসটিভ সেট, আলোকসম্পাত ও আবহ-সঙ্গীত সব কিছুরই মধ্যেই মঞ্চের নেপথ্য শিল্পীদের সামগ্রিক সহমর্মিতার আভাস। আমাদের যে চোখ রাজপ্রাসাদ, রাজ দরবার বা প্রমোদ উদ্যানের ঝলসানো দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত ছিল, সে আজ মঞ্চের পিছনে কালো বা নীল পর্দার ওপরে কয়েকটি রং আর রেখার কম্পনের মধ্যেই সমগ্র নাটকের ছন্দকে খুঁজে পায়। আলোক-সম্পাতের মধ্যে অনেক সংঘাতসমৃদ্ধ মুহূর্ত ও চরিত্রের অনেক অব্যক্ত কথা নতুন ব্যঞ্জনায় মুখর হয়ে উঠতে পারে তার সত্যতাও আজকের নাট্য প্রযোজনায়

প্রমাণিত। আবহসঙ্গীতের প্রয়োগেও যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়।

বলা যেতে পারে নাটক নিয়ে যা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা তার সবটুকুই করছেন এই অপেশাদার গোষ্ঠীর শিল্পীরা। শুধু নাটকের অভিনয় নয়, নাট্য সম্মেলন, নাট্য প্রতিযোগিতা, নাট্য বিষয়ক পত্রিকা, নাট্যালোচনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নাট্যচর্চার ব্যাপ্তি ও গভীরতা আসছে। আজকে চোখ মেললে দেখা যাবে কলকাতা এবং মফঃস্বলের বহু জায়গায় পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতার প্রবেশমূল্য থাকে কম, তাই এতে বহু গোষ্ঠী যোগ দিতে পারেন, আর পরীক্ষামূলক নাটকই এখানে অভিনীত হয় বেশী। স্থানীয় জনসাধারণ প্রতিযোগিতায় অভিনীত নাটক দেখে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাটকের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারেন। কয়েকটি গোষ্ঠী নাট্য বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। দু' একটি পত্রিকা ইতিমধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। নাটকের সেমিনারের ব্যবস্থা করা এ'দের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। সব মিলিয়ে নাট্য-শিল্পের সামগ্রিক রূপে প্রতিষ্ঠার এক সংঘবদ্ধ আন্তর প্রয়াস।

অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে রূপান্তর এনেছেন, একথা যেমন সত্য; সবচেয়ে বেশী প্রতিবন্ধকতার সামনে দাঁড়িয়ে সীমাহীন কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে এ'দের, এটাও তেমনি সত্য। নাটকের একটি চিরন্তন শৈল্পিক রূপকে

অপরিচিত/অপর্ণা

আবিষ্কার করা এবং সেই উন্মাদনায় প্রচণ্ড কষ্ট আর পরিশ্রমকে হাসি মুখে বরণ করে নেওয়ার নজীর বাংলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে সত্যি অভিনব।

একটি নাটক সার্থকভাবে নিজেদের শিল্পচিন্তার আলোয় মঞ্চস্থ করতে চাওয়ার ব্যাপারে যেটা সবচেয়ে বেশী এ'দের চোখের সামনে নৈরাশ্যের অন্ধকার মেলে ধরে, সেটা হোল অর্থ। প্রয়োজন মতো অর্থ এ'দের নেই, সভ্যরা চাঁদা দিয়ে কিছু শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে যৎকিঞ্চিৎ নিয়ে প্রযোজনা করতে হয়। কোথাও শেষে ধার থাকে আবার কোথাও মোটামুটি খরচ উঠে যায়। তবু এ'দের তৃপ্তি কিছু লোক এ'দের নাটক দেখলো, এ'দের প্রযোজনার রীতির সঙ্গে পরিচিতির সেতুবন্ধন করলো। দ্বিতীয় অসুবিধা হোল 'মঞ্চ' নিয়ে। কলকাতা এবং মফঃস্বলে যে ক'টি নাট্য-গোষ্ঠী আছে তাদের তুলনায় মঞ্চের সংখ্যা মর্মান্তিকভাবে ম্লান। সারা বছরে দুটি প্রযোজনা করার মতো সুযোগও এখানে মেলে না, তাহলে কিভাবে নতুন চিন্তার ঢেউকে উত্তাল করে তোলা যাবে বাংলাদেশের তটে। কলকাতার একমাত্র 'মুক্ত অঙ্গনে'ই পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক নাটক অভিনীত হয়, কিন্তু এখানে 'তারিখ' পাওয়া নিয়ে বহু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এতো গোষ্ঠী এখানে নাটক করতে চায়, কিন্তু তাদের সবাইকে নিয়মিত দেওয়া যাবে কি করে। 'মুক্ত অঙ্গন' ছাড়া আর যে ক'টি পেশাদারী মঞ্চ আছে সেখানে প্রবেশাধিকার অর্জন করার জন্য যে নগদ মূল্য দিতে হয় তাতে করে একটি অপেশাদারগোষ্ঠীর দুটি নাটকের প্রযোজনা চলে। ব্যবসায়িক মঞ্চ মালিকদের সুস্থ শিল্পচিন্তা জাগ্রত হলে এ'রা বোধ হয় কিছুটা উপকৃত হবেন। প্রবেশমূল্য অনেক হ্রাস করে অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীদের নাটক করতে দিলে অর্থের অঙ্কে বেশি কিছু আসবে না ঠিক, কিন্তু তাতে পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় দেশীয় নাট্য শিল্পের ঐতিহ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এই সমুন্নত বোধ কি এখন ব্যবসায়িক মঞ্চ মালিকদের স্বীকৃতি পেতে পারে না? কয়েকটি গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা সূত্রে জেনেছি যে তাঁরা 'মুক্ত অঙ্গনে'র মতো আরো কয়েকটি মঞ্চ নিজ নিজ এলাকায় গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হয়েছেন। এ চেষ্টা যে বলিষ্ঠ, সে

রূপসী সন্ধ্যা রায়

বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এঁদের এই প্রচেষ্টার সঙ্গে জনসাধারণের এবং সরকারী সহযোগিতা নিশ্চয়ই থাকা প্রয়োজন।

অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অভিনেত্রীরা পেশাদারী। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই গোলোযোগ বাধে। যে মন, যে শিল্প চিন্তা নিয়ে অন্যান্য শিল্পীরা অভিনয়ের মধ্যে নিজেদের বিলীন করে দেন, অভিনেত্রীদের কিন্তু এই চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। জীবিকার প্রয়োজনে বেশীর ভাগ এঁরা মঞ্চের আলোয় আসেন এবং ধীরে ধীরে শিল্প চেতনার আস্বাদ তাঁরা পান। তবে তাঁদের পক্ষে প্রথম কথা হল একশো টাকা দিতে হবে, রিয়েসার্লে সপ্তাহে একদিন যাবো, আর বাড়ী থেকে যাতায়াতে ট্যাক্সি ভাড়া। এইসব কথা পাকা হলে তারপর শিল্পচর্চার পালা। গোষ্ঠীর সভ্যদের রাজী হতেই হয়, তাছাড়া উপায় কি। অভিনেত্রীদের নিয়ে এছাড়াও আরও অসুবিধা আছে। সপ্তাহের যে দিন আসার কথা, সেদিন হয়তো এলেন না, মহড়ার প্রায় সব আয়োজনই ব্যর্থ হোল। অভিনয়ের দিন আসতে দেরী করে মাঝে মাঝে অন্যান্য শিল্পীদের উদ্বেগের কারণ ঘটান। তবু এঁদের ছাড়া অপেশাদার গোষ্ঠীদের কোন উপায় নেই। দুঃখ লাগে সেখানে যেখানে কিছু কিছু নামী পেশাদারী অভিনেত্রী এই দুর্বলতার ও অসহায়তার সুযোগ নেন। শিল্পীদের নিষ্ঠা জড়ানো প্রয়াসের প্রতি যেন এঁদের এতটুকু সমবেদনা নেই। ব্যাপারটা অপ্রিয় হলেও চূড়ান্তভাবে সত্য। আর্থিক অসচ্ছলতা মেটাতে গেলে কি মানবিক এবং শৈল্পিক সহযোগিতা দেওয়া যায় না?

দেখেছি কয়েকটি গোষ্ঠীর মহড়া দেবার ঘর নেই। সপ্তাহে দু'দিন কিম্বা তিন দিন একই ঘরে কয়েকটি গোষ্ঠী মহড়া দিয়ে যাচ্ছেন। এর জন্য বেশ কিছু পয়সাও ব্যয় হয়। তারপর যাঁদের সেট বা আলোক-সম্পাতের উপকরণ নেই, তাঁদের সেগুলোও অর্থ দিয়ে অন্য জায়গা থেকে জোগাড় করতে হয়। এটা খুবই আনন্দের কথা যে কয়েকটি গোষ্ঠীর শিল্পীরা অনেক কষ্ট করে প্রযোজনার অনেক উপকরণ নিজেরা করে নিয়েছেন। নিজেদের মধ্যে যেমন নাট্যকার সৃষ্টি হচ্ছে, তেমনি আবার মঞ্চের নেপথ্য শিল্পীদের জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বাইরের আনুকূল্য চাইতে হচ্ছে না।

অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর যে শিল্প প্রয়াস এবং সেগুলোকে রূপায়িত করতে গিয়ে যে কষ্ট ও পরিশ্রম, তা মফঃস্বলের নাট্য প্রচেষ্টার মধ্যেও মূর্ত হয়ে উঠছে আজ। কলকাতা শহর থেকে দূরে যে-সব নাট্যগোষ্ঠী তাঁদেরও যে আন্তরিকতার এতটুকু অভাব নেই, একথা সেই গোষ্ঠীদের প্রয়াসের বিচার করে বুঝেছি। বলতে পারা যায় শহর কলকাতার নাট্য সংস্থাগুলোর যে সব অসুবিধা ভোগ করতে হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী ঝড়ের বিদ্রূপ সহ্য করতে হয় মফঃস্বল নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পী-দের। তবু এঁরা কলকাতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাট্যচর্চা করে চলেছেন। এঁদের ক্ষোভ আছে, কিন্তু চলার ক্লান্তি নেই।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে কলকাতার নাট্য প্রয়াসের সঙ্গে মফঃস্বলের নাট্য প্রযোজনার মিলনের ব্যাপারে আজ পর্যন্ত যা কিছু করা হয়েছে তার মধ্যে এখনো ফাঁক আছে। ব্যবধানের বিষয়টা এখনো মনকে ব্যথিত করে। এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত নাট্যদলগুলোর। মফঃস্বলের নাট্য প্রচেষ্টার সঙ্গে শহর কলকাতার একটি নিবিড় 'কো-অরডিনেশন' গড়ে তোলার দায়িত্ব এঁদেরই।

বাংলাদেশের নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীদের এক দিকে দু'চোখ ভরে যেমন মুঠো মুঠো অনেক স্বপ্ন... বাংলার থিয়েটার ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন দিগন্ত আনবে... আবার আর একদিকে বুক ভরে রয়েছে অজস্র ক্ষোভ...নাট্য-শিল্পের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা যথার্থ মূল্য পাচ্ছে না। এই দুই অনুভবকে প্রয়াসের সঙ্গে বেঁধে এরা এগিয়ে চলেছেন। লক্ষ্য হোল যেভাবেই হোক বাংলা নাট্য প্রযোজনার মধ্যে একটি বিশ্বজনীন আবেদন ফুটিয়ে তোলা আর পৃথিবীর প্রতিটি নাট্যানুরাগীকে বাংলা নাটকের প্রতি আকৃষ্ট করা। আমরা বলবো ব্যবসায়িক মঞ্চ মালিক-দের উদাসীনতা এঁদের এগিয়ে যাওয়ার বেগকে প্রতিহত করতে পারবে না কেননা নাট্যশিল্পসহ জনসাধারণের শুভেচ্ছা রয়েছে এঁদের সঙ্গে।

নির্মল ধর

সত্যজিৎ রায়

ভারতের সিনেমার কথা আলোচনা করতে বসলেই এক ডাকে যে নামটা মুখে আসে সেটা সত্যজিৎ রায়েরই। এরকম সার্বজনীন অ্যাপ্রিসিয়েশন সত্যজিৎবাবুর আগে আর কজনের ভাগ্যে ঘটেছিল? আধুনিক সিনেমা জগতে তো নয়ই পুরোনো দিনের কারও সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায় না। এই তুলনা না করার কারণ প্রধানত দুটো।

প্রথমত পুরোনো দিনের বিখ্যাত পরিচালকদের ছবিগুলো ছিল প্রকৃতপক্ষে জনপ্রিয় গল্পের কার্বন কপি। পরিচালকের নিজস্বতা সেখানেই প্রায়শই অনুপস্থিত। আর যে সব ছবির দর্শকদের অ্যাপ্রিসিয়েশন (এ শব্দটা তখনকার সাধারণ দর্শক সম্পর্কে ব্যবহার করা যায় কি?) পাওয়ার মূলে কারণ ছিল সিনেমাকে 'খেলা' দেখতে যাওয়ার মানসিকতা। অবশ্য তার জন্য একথা বলাও সত্যের অপলাপ হবে যে আজকের দর্শক মানেই সবাই শিল্পরসজ্ঞ। দ্বিতীয়ত তখনকার খ্যাতনামা পরিচালকদের সিনেমা

পূর্ব জার্মানীর ছবি টাইম টু লিভ

যে একটা শুদ্ধ আর্ট সে সম্পর্কে অন্য ধারণা ছিল। সত্যজিৎ সে সংজ্ঞার পরিবর্তন করলেন। তিনি বললেন—পরিচালককে প্রথমে জীবনের কাছে আসতে হবে পরে মনোরঞ্জন।

এজন্যই সত্যজিতের তুলনা খোঁজা বৃথা। 'পথের পাঁচালী'কে বিভূতিভূষণের লেখার অনুসরণ বলা যেতে পারে কারণ সেখানে বিভূতিভূষণ আর সত্যজিতের শিল্পীমন একরেখায় একই দিকে বয়ে চলেছে। কিন্তু পরের ছবিগুলোতে সত্যজিৎ তাঁর স্বকীয় রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছেন। তাঁর চিন্তা, সামাজিক সমস্যা, শিল্পীমন নিয়ে তার বাস্তবায়নের প্রথম আংশিক ছবি পাওয়া গেল 'জলসা ঘরে' আর পুরো ছবির দেখা মিলল 'কাঞ্চনজঙ্ঘায়'। কঠিন বাস্তবকে উপেক্ষা করে জীবনকে সুন্দর দেখাবার জন্য মিথ্যা জোলো নাটকের আশ্রয় নিয়ে তিনি কিছু করতে চান না। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র অরুণ বা 'অভিযানে'র নরসিংকে তাই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। যে কারণে সত্যজিৎকে নিশ্চয়ই নৈরাশ্যবাদের শিল্পী বলতে পারি না, বরং উল্টোটাই। অরুণের চরিত্রে যে চাপা দানা-বাঁধা ক্ষোভ তা থেকেই নতুন অরুণের জন্ম নেবে এটাই আশা। সূক্ষ্ম শিল্পীমনে এর চাইতেও মোটা দাগের সমাপ্তি আশা করা অনুচিত।

শিল্পের কোন শেষ কথা নেই। যে শিল্পী তা করতে চান বা চেষ্টা করেন সেখানে শিল্পধর্মের অবমাননাই করা হয়। সত্যজিৎবাবু তা কোনদিন কোথাও করেন নি।

পটভূমি স্থান পাত্র যাই হোক না কেন সত্যজিৎ নিজস্ব চিন্তা ও ভাবের প্রয়োগ করেন সেখানে। এজন্য তাঁকে কখনও-সখনও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে বটে কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করলে মূল কাহিনীর পরিবর্তন পরিবর্ধন প্রয়োজনীয় থাকে বলেই তিনি তা করেন।

বাংলা চিত্রজগতে সত্যজিৎ কি দিলেন বা দিয়েছেন তার বিচার করার সময় এখনও আসেনি। কিন্তু এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় তিনি ভগীরথের গঙ্গা আনার মত নব্য-বাস্তবতার এক ঢেউ অন্তত এনেছেন বাংলা ছবিতে। অনেক পরিচালক আজ তাই নতুন ধরনের গল্প নিয়ে ছবি করতে সাহস পাচ্ছেন। নতুন কিছু চিন্তা করার প্রয়াস পাচ্ছেন। সত্যজিৎই দর্শককে বুঝিয়েছেন ফিল্ম দেখতে যাওয়ার অর্থ মুখ্যত 'খেলা' দেখতে যাওয়া নয়। সেক্সের সুড়সুড়ি বা সুখ-দুঃখের খিচুড়ি দিয়ে দুঃখ চাপা দেওয়া কান্নার চাগাড় দেওয়া বা আনন্দের ফুরফুরে হাল্কা জোয়ারে ভাসা নয়। ফিল্ম দেখার মধ্যে চিত্র প্রদর্শনী দেখার মত তাৎক্ষণিক কোনো অনুরণন নেই বটে কিন্তু চিন্তার খোরাক আছে, আলোচনার বিষয় আছে। সব দর্শক নয়, যে স্বল্পসংখ্যক লোকও যে সিনেমার 'অন্য' দিকের কথা ভাবছেন তা সত্যজিৎবাবুর জন্যই।

সে কারণেই তাঁকে 'পথের পাঁচালী' থেকে 'দেবী'তে যেতে হয়েছে, আবার সেখান থেকে সরে গেছেন 'কাঞ্চনজঙ্ঘায়'। সেখানেও তাঁর তৃপ্তি হয়নি, তাই তাঁকে করতে হয়েছে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', রূপকথার সৌকর্য তাঁকে মুগ্ধ করলেও হুগেনগুলোর শিকার হয়ে আবার ফিরে যেতে হচ্ছে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবি করতে। তাঁর এই বিষয়ান্তরে চেষ্টা কেন?

হয়তো তাঁর ভেতরের শিল্পীসত্তাই তাঁকে নতুন বিষয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

জঁ লুক গদার

চিত্র সমালোচকদের সত্তাকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিতে গদার ছাড়া তেমনভাবে আর বুঝি কেউই পারেন নি। সারা ইউরোপের সব ডাকসাইটে কাগজগুলো একসময় পড়েছিল মহা মুশকিলে। তাঁরা গদারের ছবিকে কি বিশেষণে বিভূষিত করবেন ভেবে উঠতে পারেন নি। তবে এক বাক্যে সবাইই স্বীকার করেছেন যে, ফ্রান্সের নুভেল ভগ আন্দোলন আবিষ্কার করেছে এক প্রচন্ড শক্তিশালী বোমাকে। গদারের তীব্র বুদ্ধিমত্তা, তীক্ষ্ম সমাজ-সচেতনতাকে সবাই মেনে নেন। 'ব্রেথলেস'এর পর যেকটি ছবি উঠছে সব কটাতেই সেই একই সুর একই ভঙ্গী,

অবশ্য যে কারণে তিনি নিশ্চয়ই একঘেয়েমির সৃষ্টি করেন না।

'ব্রেথলেস' ওঁর প্রথম ছবি। এ ছবির মত অনেক পরে তোলা 'পিয়ের দ্য ফুল'য়েও নায়ক-নায়িকার মধ্যে এক নিরালম্ব সম্পর্ককে দেখিয়েছেন। গদারের বৈশিষ্ট্যই এটা। গদার বলেন—'বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আমি আনন্দ পাই। যা বলি তার উল্টোটাই করি সব সময়।'

ছোটবেলা থেকেই ঝোঁক ছিল সিনেমার দিকে। তরুণ বয়সে অবশ্য চিত্রকলা আর সাহিত্যের দিকেই ঝুঁকেছিলেন বেশী করে। সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তেই প্যারিসের সিনেমাথেকে তাঁরা যাতায়াত শুরু। সেখানেই পরিচয় হয়, রিভেৎ, ত্রুফো, আস্ত্রুকের সঙ্গে। তখন থেকেই লিট্ল সিনেমা পত্রিকায় ছদ্মনামে গদার লিখতে শুরু করেন। চার পাঁচ ঘণ্টা সিনেমাথেকে কাটাবার পর আর পড়াশোনার দিকে নজর দিতে পারতেন না। বাড়ীর মাসোহারা বন্ধ হোল একদিন। আর সেদিন থেকেই তাঁর আঁকা বাঁকা পথে জীবন শুরু। এখনও চলছে।

গদারকে দেখে বোঝা যায় না তিনি কি ভাবছেন বা পরমুহূর্তে কি করবেন। ত্রুফো বলেছিলেন যে গদারের স্ব-বিরোধী মনোভাব আর উল্টোপাল্টা আচরণের প্রতি অন্ধ আসক্তি লক্ষ্য করলে কারোরই বিশ্বাস থাকতে পারে না তাঁর ওপর। একদিন তিনি উধাও হয়েছিলেন আমেরিকায় ছবি তোলার জন্য। দুম করে আবার কয়েক মাস বাদে ফিরে এলেন শূন্য হাতে। ছবি তিনি তোলেন নি কিছুই, একমাত্র প্রথম দৃশ্যটা ছাড়া। এদিকে ফরাসী চিত্রজগতের আকাশে তখন নতুন এষণা, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর অভিনব আঙ্গিকের সংঘাতে ঝড়ের মেঘ তখন ঘনিয়ে আসছে। 'ব্রেথলেস' ঠিক সে সময়ই বজ্রের মতো বিস্ফোরিত হলো আকাশে। ছবি তৈরীর সব

চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ইতালির ছবি দি ডিমান্ড

নিয়ম-কানুন ভেঙে চুরমার করে দিলেন গদার। মাত্র তিন পাতায় লেখা খসড়া চিত্রনাট্য থেকে জন্ম এ ছবির। রাতারাতি গদার সবার সামনে এসে পড়লেন।

কাল আর মরণ গদারের শিল্পপ্রকৃতির দুটো প্রধান উপজীব্য বিষয়। এ দুটো বস্তুই তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক ধ্যানধারণার নিয়ন্তা। তাঁর ছবির সংলাপে প্রায়ই মৃত্যু উঁকি দেয়। আর একটা বস্তুর অবধারিত উপস্থিতি থাকে গদারের ছবিতে, তা হল পিস্তল। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও শিল্পাসন উভয় ক্ষেত্রেই বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যগুলো যে একটা সত্তায় রূপায়িত হয়েছে, এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। তাঁর বক্তব্য পরস্পরবিরোধী, তাঁর সংলাপ একটা অপরটার বিবাদী। তাঁর সম্পাদনার রীতিটাই বিপরীত।

সৃজনশীল এই শিল্পী শিল্পীর ক্রমবিবর্তনে অনীহা পোষণ করেন। পৃথিবীকে রূপান্তরিত করার শক্তি মানুষের সাধ্যায়ত্ত এ বিশ্বাসে গদারের আস্থা নেই। তিনি তাঁর ছবির মধ্যে বেশ সুপরিকল্পিতভাবেই বিবর্তনের ভবিষ্যতের চেয়ে তাৎক্ষণিক বর্তমানকে, কারণের জটিলতার চেয়ে ফলাফলের প্রত্যক্ষতাকে অধিকতর মূল্যবান করে উপস্থাপিত করেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেন গদারের এই অসংলগ্নতা, পরস্পর বিরোধিতা সময় ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁর এক ধরনের অর্থহীন প্রতিবাদ। ওঁর সর্বশেষ 'উইকএণ্ড' বা 'ওয়ান প্লাস ওয়ান'-এও তার ছাপ স্পষ্ট। নতুন কিছু বলতে অনুরোধ করলে উনি বলেন—'আমি ডিরেকটর বা ফিল্মস্টার নই, কি বলব?'

গদারের ছবি

অপারেশন বেটন্ (১৯৫৪), ডনে ফেমে কথ্‌ং (১৯৫৫), কালেঁাং এন্ড ভেরোনিক (১৯৫৭), উনে হিস্তোরি দ্য উং (১৯৫৮), কালেঁাং সন্ জুলে (১৯৫৯), ব্রেথলেস (১৯৫৯), লা পেতি সোলদৎ (১৯৬০), উনে ফেমে এৎ উনে ফেমে, লা মেপ্রিস্ (১৯৬১), ভিভ্রে সা ভি (১৯৬২), লা নুভো মন্দে (১৯৬২), লাস্ ক্যারাবিনিয়াস, লা প্যারিস (১৯৬৩), লা গ্রাঁ এস্ককর্ক (১৯৬৩), বঁদে এ পর্যৎ উনে ফেমে মারী, প্যারি ভু প্যার (১৯৬৪), আলফাভিল, পিয়ের দ্য ফুল, ম্যাসকুঁলা ফেমি (১৯৬৫), মেড ইন ইউ-এস-এ, টু আর থ্রি থিংস আই নো অ্যাবাউট হার (১৯৬৬), অ্যান্টিসিপেশন, লা চায়নীজ, ফার ফ্রম ভিয়েৎনাম (১৯৬৭), উইক এণ্ড (১৯৬৮), ওয়ান প্লাস ওয়ান (১৯৬৯)।

লুই বুনুয়েল

উনিশ শো আঠাশের আগে পর্যন্ত বুনুয়েল বা তার অন্যতম সহযোগী সল-ভাদর দালি কারও নামই শোনা যায় নি। ঐ বছরে 'আন্ চিন দা আন্দালু' ছবি বেরোবার পর জানল সবাই বুনুয়েল ও দালি কে আর তাঁরা কি বলতেই বা চান।

সুর-রিয়্যালিজমের প্রবক্তা দালি বুনু-য়েলকে প্রভাবিত করেছিল খুব বেশী করেই। সারা প্যারিসের বুদ্ধিজীবীরা চমকে গেলো প্রথম ছবির ফ্রেম আর শট টেকিং-এর কারিকুরি দেখে। পরের ছবি 'লা এজ দ্য ওর' আবার বজ্রপাত ঘটাল প্যারিসের সিনেমায়। লা ফিগারো ও অন্যান্য কয়েকটা কাগজ চিৎকার করে উঠল 'ফ্যাসিস্টদের চাইতেও সুর-রিয়া-লিস্টরা বেশী বিপজ্জনক।'

প্রেম, ধর্ম, মানবিকতা ইত্যাদি যাবতীয় বস্তুগুলো জারিত তিনি সরে পড়লেন প্যারিস থেকে। এ ছবির কাহিনী ছিল দালির লেখা। দালি কিন্তু নিজে ছবি দেখে সন্তুষ্ট হন নি। বরং নিরাশই হয়ে-ছেন।

পর পর তিনটে ছবির মুখ থুবড়ে মার খাওয়ার দরুণ পরের পনেরোটা বছর বুনুয়েল কিছু করতে পারেন নি। সুর-রিয়্যালিজম্ আন্দোলন তখন সাহিত্য ছেড়ে চিত্রকলার দিকে হাত বাড়িয়েছে। দালির সঙ্গে [illegible] মতবিরোধ তখন চরমে। বুনু-য়েলের নিজের [illegible] তখন [illegible] [illegible] হয়ে উঠেছে। স্পেনের [illegible] থেকে [illegible] নিবৃত্ত করেছে। তিনি চিৎকার করে উঠতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের [illegible] সাধারণ মানুষের [illegible] যে আঘাত করেছিল [illegible] তিনি তাঁর জোরে নাড়া দিতে চাইলেন। [illegible] স্পেন বা ফ্রান্সে [illegible] কিছু করা সম্ভব নয়। তাই আট-লান্টিক [illegible] মেক্সিকোয় পাড়ি [illegible] উনিশ শো [illegible]।

প্রায় তের বছর পরে কান উৎসবে আবার হৈ-চৈ উঠল একটা ছবি নিয়ে। অতীতকে সমালোচকরা [illegible] গেলেন আবার। ছবির নাম 'লস অলভিদাদস'। 'আন চিন দা আন্ডালু'র বুনুয়েল [illegible] রাখলেন সবই। এ ছবি যেন সমাজকে চাবুক মারতে চাইল। দুটো কিশোর চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সমস্ত অভি-যোগকে মূর্ত করে তুললেন। বুনুয়েল যেন বলতে চাইলেন 'ঈশ্বরের এ পৃথিবীতে ঈশ্বর ভদ্রলোক অনুপস্থিত।' এ ছবি দেখার পর অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছিল পরিচালকের ঈশ্বর বিশ্বাস সম্পর্কে। উত্তরে একজন বলেছেন বুনুয়েল প্রথমে খৃশ্চান পরে মানুষ। ছেলেবেলা থেকেই বুনুয়েল একটু বেশী বখেদার ছিলেন। ডারউইনের 'অরিজিন অফ স্পেসিস' পড়ার পর থেকেই বিরাট পরিবর্তন আসে তাঁর মধ্যে। সেরকার আর দালির সঙ্গে। সুর-

চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে কানাডার ছবি প্রোলোগ

রিয়্যালিস্ট আন্দোলনে এঁরা তিনজন আর লুই আরাগ ছিলেন পাশাপাশি। দালির সঙ্গে বিচ্ছেদের পর রাজনৈতিক মত-ভেদের জন্য লুই আরাগও বেরিয়ে গিয়ে-ছিলেন দল থেকে।

বুনুয়েল পরবর্তীকালে ছবি করেছেন অনেক, কিন্তু মাত্র গুটিকয় ছবি ছাড়া কোনোটাই তেমন সাড়া জাগাতে পারে নি। 'নাজারিন' বা 'ভিরিদিয়ানায়' অলভিদাদসের রুক্ষ ও তেজদীপ্ত চেতনা যেন স্তিমিত। 'নাজারিনে' বুনুয়েল যেন অনেকটা ঈশ্বর-নির্ভর। আবার 'ভিরিদিয়ানা' থেকে 'বেল দ্য জুর' পর্যন্ত পথ খুব একটা বেশী না হলেও তাঁর মানসিক গতি যেন বাঁক নিয়েছে অন্য পথে। যেন অন্য কোন পথে সরে যাচ্ছেন বুনুয়েল। আবার গত বছর এল 'লা ভয়েস্ ল্যাকতি'। ধর্মকে অনু-বীক্ষণ যন্ত্রের তলায় ফেলে বিচার করেছেন এ ছবিতে। এবং পর্দায় যা দেখেছেন দর্শক তা 'আন্ চিন্ দা আন্দালু'র বুনুয়েলেরই প্রতিরূপ। এ ছবি দেখার পর মনে হয় বুনুয়েল মরেন নি, মরবেন না, বুনুয়েল কোন দিন মরেন নি।

বুনুয়েলের ছবি :

আন্ চিন্ দা আন্দালু (১৯২৮), লা এজ দ্য ওর (১৯৩০), লাস হার্ডেস (১৯৩২), গ্রান্ড কাসিনো (১৯৪৭), গ্রান্ডে কালাভেরা (১৯৪৯), অলভি-দাদস (১৯৫০), সুসানা (১৯৫১), দ্য কুইতি এল আমোর (১৯৫১), উনা মুজে সিন আমোর (১৯৫১), সুবিদা এন সিয়েলো (১৯৫১), এল ব্রুতো (১৯৫২), কাম্বারস্ বারম কেলস (১৯৫৩), লা ইলিউশন ভিজ আ ভেরী (১৯৫৩), এল রিও লা মুয়ের্তে (১৯৫৪), দি ক্রিমিনাল লাইফ অফ আর্চিবাল্ডো ডেলাক্রুজ (১৯৫৫), মেক্সা আপিল দ্য আয়েরোর (১৯৫৫), এভিল ইডেন (১৯৫৬), নাজারিন (১৯৫৮), রিপাবলিক

মাদ্রিদে দর্শন পড়তে এসে পরিচয় হয়

অফ সীন (১৯৫৯), দি ইয়ং ওয়ান (১৯৬০), ভিরিদিয়ানা (১৯৬১), দি একসটারমিনেটিং এঞ্জেল (১৯৬২), ডায়েরী অফ চেম্বারমেড (১৯৬৪), সিমন্ দা ডেসার্টো (১৯৬৫), বেল দ্য জুর (১৯৬৬), লা ভয়েস ল্যাকটি (১৯৬৮)।

ইঙ্গমার বেয়ারম্যান

বাবা ছিলেন গোঁড়া পাদ্রী। আর ছেলে ঠিক তার উল্টো। ছোটবেলা থেকে যে হাও-য়ায় মানুষ তার বিপরীত চরিত্রই তাঁকে পরবর্তীকালে প্রভাবিত করেছে। তাঁর নাটক ও ছবি দুয়ের মধ্যেই ধর্মের প্রতি এই 'অনীহা' প্রবৃত্তি ফুটে ওঠে বেশ জোরালোভাবেই।

ফিল্মে কাজ করার আগে বেয়ারম্যানের নাটক সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। তাই ওঁর প্রথম দিককার ছবিতে নাটকীয় দৃশ্যের প্রাধান্য ছিল বেশী। চিত্রপরিচালক হিসাবে বেয়ারম্যানের প্রথম ছবি 'ক্রাইসিস'।

১৯৪৫ থেকে '৫০ পর্যন্ত বেয়ারম্যান যেসব ছবি করেছেন তা পরীক্ষামূলক স্তরের। গল্প আর নাটকই ছিল সে সব ছবির প্রধান মশলা। উনিশ শো বাহান্নয় 'দি ওয়েটিং ওম্যান' তাঁকে জনপ্রিয়তা এনে দেয়। আর 'স্মাইলস্ অফ এ সামার নাইট' তাঁকে দিয়েছিল খ্যাতি। কাঁ উৎসবে জুরী-দের বিশেষ পুরস্কার পেয়েছিল এ ছবি। ফ্রান্সে তখন নিউ ওয়েভের জোয়ার। কাহিয়ে দ্যু সিনেমার সব তরুণ লেখকরা জোট বেঁধে নেমেছেন ছবি করতে। এঁরা বেয়ারম্যানকে স্বাগত জানাল। আত্মানু-সন্ধানী বেয়ারম্যান এরপর থেকেই নতুন-ভাবে নতুন দিকে যাত্রা শুরু করলেন। 'স ডাস্ট অ্যান্ড টেনসিল' তাঁর প্রথম প্রবীণ ছবি। আগের ছবির মত এখানেও তাঁর জীবনদৃষ্টি বিষণ্ণ, আর্ত। কিন্তু প্রয়োগ-নৈপুণ্যে যেমন জটিল তেমনি বাস্তসিক আত্মপ্রত্যয়ী। সার্কাসের এক খেলুড়ের

জীবন ও জীবনজিজ্ঞাসা নিয়ে তোলা এ-ছবি। জীবনে যার প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, সাফল্য দূরের কথা, ধারে-কাছেও যার যাওয়া সম্ভব হয় নি; সে তাই শেষ পর্যন্ত আত্মধিক্কারে আত্মহত্যা করতে গেল। কিন্তু তা হল না। এ ছবি দেখতে বসে মাঝে মাঝে মুরনোর 'লাস্ট লাফ' বা স্ট্রিণ্ডবার্গের 'ব্লু এ্যাঞ্জেল'র কথা মনে আসে। প্রতীক ধর্মিতা এ ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রতীকের এত সমাবেশ একমাত্র 'ইলেকট্রা' ছাড়া অন্য কোন ছবিতে বেয়ারম্যান ব্যবহার করেন নি। 'ইলেকট্রা' অবশ্য অনেক পরের ছবি। জীবনের অর্থ কি? বেঁচে থাকার কি প্রয়োজন, সার্থকতাই বা কি? —এ ধরনের নানা জিজ্ঞাসা তাঁকে বিব্রত করেছে। তিনি তাই নাটক লিখেছেন ছবি তৈরী করেছেন। যৌনতা তাঁর কাছে কোনো সমস্যা হয়ে দেখা দেয় নি কোন দিনই। মানুষের নৈতিক অবনতি মানুষের মধ্যে কিভাবে ভুয়া অন্ধ বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে তা তিনি দেখান বিভিন্ন ছবিতে।

উনিশ শো একষট্টি থেকে তেষট্টি পর্যন্ত তোলা তিনখানা ছবিকে বেয়ারম্যানের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে ধরা হয়। এ সিরিজের প্রথম ছবি 'থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি'। একজন স্ত্রীলোকের অর্থহীন দুর্ভোগ আর যন্ত্রণা দেখিয়ে তিনি যেন বলতে চেয়েছেন 'ভগবান কিছু নয় ভালোবাসাই সব।' ঈশ্বরে বিশ্বাসের চাইতে বড়ো প্রয়োজন প্রেমের, মানুষের সঙ্গে মানুষের সুসম্পর্কের'। 'উইন্টার লাইট' ছবির শেষাংশে অবশ্য এ ছবির তুলনায় জটিল, কিন্তু আশাবাদের সুর স্পষ্ট। পাদ্রী যখন বুঝল চার দেয়ালের মাঝে ভগবানের পুজো করা নিতান্তই খ্যাপামী ছাড়া কিছু নয়, তখন বড় দেরী হয়ে গেছে। তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে এসে ফিরে গিয়ে জেলেটা আত্মহত্যা করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। শুরু ও শেষে যীশুখৃস্টের যে বিকৃত ছবির ব্যবহার কত সুন্দর প্রতীক ভাবা যায় না। এ সিরিজের শেষ ছবি 'সাইলেন্স' সারা পৃথিবীতে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিল।

যৌনতাকে তিনি এর আগে এত কড়াভাবে কোনো ছবিতে ব্যবহার করেন নি। আগের দুটো ছবিতে ঈশ্বর সম্পর্কে যদিও বা কিছুমাত্র আশার সুর শোনা গিয়েছিল, এ ছবিতে তার ছিটেফোঁটাও ছিল না। কিৰ্কেগার্ডের সুরে গলা মিলিয়ে তিনি বলে উঠলেন 'পৃথিবীতে এখন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের দরকার, নইলে কিছু হবে না।'

আজ বেয়ারম্যান প্রতিষ্ঠিত শুধুমাত্র খ্যাতির চূড়ায় নয় আর্থিক সাফল্যের মাপকাঠিতেও। তাঁর ছবি আজ ভালো হোক মন্দ হোক, একজন শিল্পীর একটা সমগ্র রচনা হিসাবে বিচার্য। বেয়ারম্যান শিল্পচর্চা সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছেন— 'এই জগৎটাকে আমি দুচোখ মেলে দেখি, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করি। নোট নেই। মনে হয়, সমস্তই অবান্তর, কাল্পনিক ভয়ঙ্কর কিংবা নিছক বোকামি। একটা উড়ন্ত ধূলিকণা আমি মুঠোয় চেপে ধরি। হয়তো এটাই একটা ছবি। এর কি গুরুত্ব আছে? কিছুই না। কিন্তু আমার ভীষণ আকর্ষণীয় মনে হয়। তাই এখন এও ছবিতে রূপান্তরিত হয়। মুঠোর মধ্যে ওটাকে নিয়ে আমি ঘুরি, দুঃখসুখে ভরা কাজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।'

বেয়ারম্যানের পরের ছবি 'পারসোনা' 'আওয়ার অফ দি উলফ' ও 'সেম' জটিল দার্শনিক তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর ছেড়ে তিনি এখন অন্য পথে পা বাড়িয়েছেন। নতুন চিন্তা নতুন দর্শন নিয়ে বেয়ারম্যান এখন চিন্তিত।

বেয়ারম্যানের ছবি :

ক্রাইসিস (১৯৪৫), ম্যান উইথ অ্যান আমব্রেলা (১৯৪৬), এ শিপ টু ইণ্ডিয়া (১৯৪৭), পোর্ট অফ কল (১৯৪৮), দি ওয়েটিং ওম্যান (১৯৫২), লেসন ইন লভ (১৯৫৩), স্মাইলস অফ এ সামার নাইট (১৯৫৫), স ডাস্ট এণ্ড টেন্সিল (১৯৫৩), ওয়াইল্ড স্টবেরীজ, সেভেন্থ শীল, ব্রিংক অফ লাইফ (১৯৫৭), দি ভার্জিন স্প্রিং (১৯৬০), থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি (১৯৬১), উইন্টার লাইট (১৯৬২), সাইলেন্স (১৯৬৩), পারসোনা (১৯৬৪), আওয়ার অফ দি উলফ (১৯৬৭), দি সেম (১৯৬৮)।

মাইকেলেঞ্জেলো আন্তোনিওনি

সাতান্ন বছরের আন্তোনিওনি আজকের ইতালীর চিত্রজগতের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বোলগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে খবরের কাগজে লিখতেন মাঝে মাঝে।

সিনেমা করার ঝোঁক থাকায় আন্তোনিওনি সে পথটাই বেছে নিলেন। সিনেমাটোগ্রাফিয়া সেন্টারে ঢুকলেন হাতে-কলমে কাজ শেখার জন্য। সেখান থেকে বেরিয়ে স্বাধীন পরিচালক হিসাবে আত্ম-

প্রকাশ করলেন 'ক্রনাকা দি এন আমোর' ছবি দিয়ে। পরের ছবি 'লা ভেন্তুরা' কান উৎসবে বিশেষ প্রশংসা পায়। উৎসবে এ ছবির প্রদর্শনীর সময় আন্তোনিওনির জনপ্রিয়তা ছিল না এতটুকুও। ও ছবি শুরুর আগে তিনি যে একটা লম্বা বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে তাঁর চিত্রকর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেই আলোচনা আছে। আন্তোনিওনিকে বুঝতে গেলে সবচেয়ে আগে তাঁকে বোঝা দরকার।

আন্তোনিওনি বলছেন, 'আজকের দিনে বিজ্ঞান এমন সামগ্রিকভাবে এবং সচেতনভাবে ভবিষ্যতের ওপর আলো ফেলছে যে, সমকালীন নীতিবোধের সঙ্গে তার মারাত্মক বিচ্ছেদ ঘটছে। এই অনমনীয় ও ছাঁচে ঢালা নীতিবোধকে আমরা আমাদের ভীরুতা ও জড়তার দ্বারা বাঁচিয়ে রেখেছি।...আজ আবার এক নতুন মানুষের জন্ম হচ্ছে, যে জন্মকালীন ভীতি, ত্রাস ও যন্ত্রণাদির দ্বারা আক্রান্ত। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, এই নতুন মানুষ এমন কতকগুলো আবেগের দ্বারা ভারাক্রান্ত, যেগুলোকে পুরোনো বা সেকেলে না বলে বলা উচিত অনুপযুক্ত ও অপ্রচুর। এরা আমাদের মানসিক সহায় না হয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এরা সমস্যার সৃষ্টি করে কিন্তু সমাধান জানে না। আমরা এই নৈতিক মনোভাবগুলোর সযত্ন পরীক্ষা, ব্যবচ্ছেদ এবং বিশ্লেষণ করে দেখেছি। কিন্তু কোনও নৈতিক মূল্যমান সৃষ্টি করে এই সমস্যা সমাধানের পথে এক পাও এগোতে পারিনি। কাজেই আজ বৈজ্ঞানিক মানুষ এবং নৈতিক মানুষের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান এবং সেই ব্যবধান দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। স্বভাবতঃ এ-সমস্যার সমাধান আমার লক্ষ্য নয়—কেন না, আমি নীতিবাগীশ নই এবং আমার ছবিগুলোও নৈতিক নিন্দা বা হিতোপদেশ নয়। কারণ আমার কথার পুনরুক্তি করেই বলব, যে নৈতিক মূল্যমানের দ্বারা আজ আমরা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছি, তার রূপকথা, তার আচার-আচরণ সবই সেই মান্ধাতার আমলের! একথা আমরা সবাই জানি। তবুও একে সমর্থন করি। কেন?

আমাদের সাহিত্যে, নাটকে এবং অন্যত্রও আজকাল এত যে যৌনতার ছড়াছড়ি এর কি কারণ মনে হয়? এ হল এক আত্মিক অসুস্থতার লক্ষণ। কিন্তু এই যৌনচেতনা যদি সুস্থ হোত, যদি তা মানবিক পরিণতির দ্বারা সীমিত হোত, তাহলে দুশ্চিন্তার কোনো কারণই থাকত না। কিন্তু আজকের মানুষের যৌনচেতনা অসুস্থ, মানুষ আজ অস্থির। মনে হয় কি যেন তাকে স্বস্তি দিচ্ছে না। এবং সেই অস্বস্তি থেকেই যখন মানুষের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়, তখনই সে এমন প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, যার প্রতিফলন কেবল মাত্র যৌনরূপেই আত্মপ্রকাশ করে। তখনই সে হয় অসুখী।'

এই রকম যৌনবৃত্তি থেকেই 'লাভেন্তুরা'র ট্রাজেডির সূত্রপাত, যে যৌনবৃত্তি অসুখী, বিপর্যস্ত ও নিষ্ফল। ছবির নায়ক যে প্রবল যৌনবৃত্তির দ্বারা তাড়িত, তার গ্রাম্যতা ও ফলহীনতা সম্পর্কে সমালোচনা প্রবল হওয়াই যথেষ্ট নয়; কারণ তাতে কোন সুফল নেই। এখানে চোখের সামনে একটা পুরোন কথা ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়ে আমাদের কাছে বলতে চায় যে, নিজেদের সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে সচেতন হওয়া, নিজেদের বিশ্লেষণ করে আত্মব্যক্তিত্বের সমস্ত জটিলতা ভেঙে মুখোশ খুলে দেওয়াই আমাদের পক্ষে এখনকার মত যথেষ্ট। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, এই বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয়। এটা একটা প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র।

শুধু 'লাভেন্তুরা'য় নয়, পরবর্তী সব ছবিগুলোর মধ্যেই আন্তোনিওনি তাঁর এই দর্শনকে বিভিন্ন গল্পের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। 'লা নত্তে', 'লা এক্লিপস', 'ডেসার্তো রোসো'র সমস্যা পুরোপুরি এক। ব্যক্তিক চেতনাকে নিয়ে এঁর আগে আর কেউ ভেবেছেন কি? সেদিক থেকে ইতালীয় মাইকেলেঞ্জেলো আন্তোনিওনি পৃথিবীর সিনেমায় এক স্মরণীয় নাম।

আন্তোনিওনির ছবি ঃ

ক্রনাকা দি আন আমোর (১৯৫০), আই ভিন্তি (১৯৫২), লা সিগনোরা সেন্জা কামেলি (১৯৫৩), টেনটাটো সুইসিডিও (১৯৫৩), লে অ্যামিস (১৯৫৫), ইল গ্রিদো (১৯৫৭), লাভেন্তুরা (১৯৬০), লা নত্তে (১৯৬১), লা এক্লিপস (১৯৬২), ডেসার্তো রোসো (১৯৬৪), প্রফাজিওন (১৯৬৫), ব্লো আপ (১৯৬৬), জাব্রিস্কি পয়েন্ট (১৯৬৮)।

আকিরা কুরোশোয়া

উনিশশো একান্ন সালের আগে পর্যন্ত জাপানী ছবি সম্পর্কে বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি কোথাও। অতর্কিতে ভেনিসে 'রশোমন' নামে একটা জাপানী ছবির সর্বোচ্চ পুরস্কার পাওয়ার পর অনেকেরই চোখ ফিরল জাপানের দিকে। 'রশোমন' সম্পর্কে এই কথা একবার বলা হয়েছে যে, নতুন করে কিছু বলতে গেলে পুনরাবৃত্তি হবারই আশঙ্কা। সে-ছবির পরিচালক আকিরা কুরোশোয়া আজ বিশ্ববিখ্যাত।

ওঁর পাশাপাশি ওজু, মিজোগুচি, হানি ও আরো কয়েকজন রয়েছেন। কিন্তু কুরোশোয়ার তুলনা মেলা ভার। ওঁর প্রতিটা ছবিই কি বিষয়বস্তু, কি ট্রিটমেন্ট সর্বদিক থেকেই নতুনত্বের স্বাদ দেয়। 'রেড বিয়ার্ড', 'ইকিরু' বা 'রশোমন'—সব ছবিতেই আশার দৃপ্ত প্রতিমূর্তি যেন কুরোশোয়ার প্রতিটা চরিত্র। জীবনে বেঁচে থাকা ও তার

ওয়ারিস / হেমামালিনী

সঙ্গে সততানিষ্ঠার যে প্রয়োজন তার কথাই বলতে চান কুরোশোয়া। মৃত্যুর মুখোমুখি মানুষ যে কি ভয়ানক, কি দুর্বল, কি অসহায় তার সুন্দর উদাহরণ 'ইকিরু' ছবির নায়ক। আবার বাঁচার আনন্দে মানুষ যে কত প্রাণময় উদ্দাম তার প্রমাণ 'সেভেন সামুরাই'।

এক ফটো কোম্পানীতে সহকারী পরিচালক হিসাবে চাকরী করতেন। সেখানে কাজ করার সময়েই কাজিরো ইয়ামামাতোর 'দি হর্স' ছবি তৈরীর বিভিন্ন কাজে সাহায্য করেছিলেন এবং তখনই ছবি করার বাসনা উঁকি দেয় মনে। দু'বছর বাদেই নিজের চিত্রনাট্যে প্রথম ছবি করলেন কুরোশোয়া। নাম—'জুডো সাগা'। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, জাপানে সাধারণত দু' ধরনের ছবি হয়। সামুরাই যুগের পটভূমিকায় আর সামুরাই পরবর্তী সময়, আধুনিক যুগের পটভূমিকায়। প্রথম ধরনের ছবিকে বলা হয় জিদাই গাকি আর দ্বিতীয় ধরনের ছবির নাম 'জেন্দাই গাকি'। কুরোশোয়ার বেশীর ভাগ ছবি জিদাই গাকি ধাঁচের। তবে প্রকৃত কুরোশোয়ার চরিত্রের ছবি হচ্ছে 'নো রিগ্রেটস্ অফ মাই ইওথ'। শহর ও গ্রামের জীবনের সুবিধা-অসুবিধাগুলোকে পাশাপাশি দেখিয়ে শহুরে সভ্যতার প্রতি তীক্ষ্ম সমালোচনার বাণ নিক্ষেপ করেছেন। এরপর কুরোশোয়া বস্তুবাদী জগৎ ছেড়ে ভাবের জগতে পাড়ি দিয়েছেন। একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তিনি 'ওয়ান্ডারফুল সানডে' ছবিতে ধ্বসে পড়া, ক্ষয়িষ্ণু সমাজ থেকে কোথাও কোন কল্পনার জগতে চলে যেতে চেয়েছেন।

এরপর কুরোশোয়ার সঙ্গে পরিচয় হয় তোশিরো মিফুনের। প্রতিভাধর শক্তিশালী এই শিল্পী কুরোশোয়ার মানসিকতার সঙ্গে একবারে একাত্ম। পোল্যান্ডের ওয়াইদার সঙ্গে সিবুলস্কির বা ফেল্লিনির সঙ্গে মাস্ত্রোয়ানির, আন্তোনিওনির সঙ্গে জা মোরো বা মনিকা ভিত্তির যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, মিফুনের সঙ্গে কুরোশোয়ার সম্পর্ক তার চাইতে আরও কাছের ও আরও গভীর। সেই দু'জনের পরিচয়ের সময় (১৯৪৮) থেকে আজ পর্যন্ত কুরোশোয়া যত ছবি করেছেন, একমাত্র 'ইকিরু' ছাড়া সব ছবিতেই মিফুনে অংশ নিয়েছেন প্রধান চরিত্রে। 'রশোমনে'র খুনী নায়কের মানসিকতা মিফুনে আত্মসাৎ করেছেন সম্পূর্ণভাবে। অভিনেতার সঙ্গে পরিচালকের কি ধরনের সম্পর্ক থাকা উচিত মিফুনে আর কুরোশোয়াকে দেখলে তা বোঝা যায়। কুরোশোয়ার ছবির যে আজ এত জনপ্রিয়তা, তার মিফুনের প্রাণবন্ত অভিনয়ও কম দায়ী নয়। 'সেভেন সামুরাই' যদি তাঁর স্পেকটাকুলার ফিল্ম হয়, আর 'ইকিরু' যদি গভীর অনুভূতির চিত্রায়ণ হয়, তাহলে 'রশোমন' হচ্ছে কুরোশোয়ার সবচাইতে গভীর জীবনবোধ ও আত্মপ্রত্যয়ের ছবি।

কুরোশোয়ার কিছু ছবি দেখার পর মনে হতে পারে, উনি বুঝি দুর্ধর্ষ যুদ্ধের, বীভৎস রসের ছবি তৈরীর কাজে বিশেষ পারদর্শী। কিন্তু 'ইকিরু' প্রমাণ করেছে সে ধারণা মিথ্যা। সামাজিক পটভূমিকায় ছবি করতেও কুরোশোয়া তুলনাহীন। 'ইকিরু'র সঙ্গে একমাত্র তুলনা চলে বেয়ারম্যানের 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজে'র। কুরোশোয়া সহানুভূতিশীল শিল্পী, তাঁর মধ্যে জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দর্শন কাজ করছে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় 'রেড বিয়ার্ড' ছবির ডাক্তার চরিত্রের মধ্যে। এ-ছবিতে পরিচালক নতুন পুরোনোর দ্বন্দ্বে শেষপর্যন্ত বিশেষ কোনো পক্ষের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করেননি। তবে তিনি পুরোনোকে বাদ দিয়ে নিরালম্ব নতুনকে গ্রহণ করার বিরোধী তা বুঝিয়েছেন। জিদাই গাকি ছেড়ে জেন্দাই গাকি ধাঁচে ছবি তুলছেন এখন বেশী করে।

কুরোশোয়া শুধু মহৎ শিল্পী নন, মহত্তম শিল্পী। শিল্পসৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য যদি মানুষকে বাঁচবার প্রেরণা দেওয়া হয়, যদি জীবনে এগিয়ে যাবার মদৎ জোগান হয়, তবে কুরোশোয়ার প্রতিটা ছবিই তাই। সেই মাপকাঠিতেই তিনি মহত্তম শিল্পী, শুধু জাপানের নয়, সারা এশিয়ার, সারা পৃথিবীর।

কুরোশোয়ার ছবি :

জুডো সাগা (১৯৪৩), মোস্ট বিউটিফুল (১৯৪৪), জুডোসাগা—সিকুইল (১৯৪৫), ওয়াকার্স অন টাইগার্স টেল (১৯৪৫), দোন্ত হু মেক টুমরো, নো রিগ্রেটস ফর আওয়ার ইওথ (১৯৪৬), ওয়ান্ডারফুল সানডে (১৯৪৭), ড্রাঙ্কেন আঞ্জেল, সাইলেণ্ট ডুয়েল (১৯৪৮), স্ট্রে ডগ (১৯৪৯), স্ক্যান্ডাল, রশোমন (১৯৫০), ইডিয়ট (১৯৫১), ইকিরু (১৯৫২), সেভেন সামুরাই (১৯৫৪), আই লিভ ইন ফিয়ার (১৯৫৫), থ্রোন অফ ব্লাড (১৯৫৭), লোয়ার ডেপথস্ (১৯৫৭), হিডন ফোর্ট্রেস (১৯৫৮), ব্যাড শিলপ ওয়েল (১৯৬০), দি বডিগার্ড (১৯৬১) সানজুরো (১৯৬২), হাই এন্ড লো (১৯৬৩), রেড বিয়ার্ড (১৯৬৪), টোরা টোরা (১৯৬৮)।

খোসলা কমিশনের রিপোর্ট

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় ফিল্ম সেন্সারবিধি সম্পর্কে সংস্কারসাধনের উদ্দেশ্যে খোসলা কমিশন প্রদত্ত রিপোর্টটি যদিও কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক লোকসভায় পেশ করা হয়েছে বর্তমান ১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসে, তবু এ-কথা উল্লেখের প্রয়োজন আছে যে, চারশোরও বেশী ফুলস্ক্যাপ পাতায় ঘনভাবে টাইপকরা এই রিপোর্টটি আজও প্রকাশিত না হয়ে উৎসুক জনসাধারণের নাগালের বাইরে রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় চুম্বকের আকারে এর যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে চুম্বন ও নগ্নতা সম্পর্কে কমিটির মন্তব্যকে ঘিরে ভারতযুক্তরাষ্ট্রের আসমুদ্রহিমাচল সর্বত্র যে তুমুল উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে, তা বহুজনের পক্ষেই বেশ উপাদেয় খোরাকের যোগান দিয়েছে।

চুম্বন ও নগ্নতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্ন। কিন্তু আমার কাছে যেটি সুস্বাদু খাদ্য, সেটি অপরের পক্ষে যেমন বিষবৎ হতে পারে, ঠিক তেমনভাবেই একটি সম্প্রদায়ে যা শ্লীল বলে বিবেচিত, অন্য আর একটি সম্প্রদায়ের পক্ষে সেই জিনিসই সম্পূর্ণ অশ্লীল হতে পারে। আমরা ভারতবাসী পুরুষেরা ধনী-নির্ধননির্বিশেষে বহু সময়েই বাড়ীর মধ্যে খালি গায়ে থাকি এবং আমাদের মেয়েরা আমাদের নগ্ন গাত্র (কটিদেশের উপরের অংশ) দেখে আদৌ আঁতকে ওঠেন না। কিন্তু হিপিদের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত (নিশ্চয় করে বলতে পারা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত) ইয়োরোপাঞ্চলে 'লেডীর সামনে নেকেড গা' পুরুষদের কল্পনার অতীতভাবে অশ্লীল ছিল। সেই কারণেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে মন্তব্য করতে পেরেছিলেন : অর্ধনগ্ন ফকির। আবার অপরদিকে দেখা যায়, প্রতীচ্যের সর্বত্র স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়ে কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বা বহুদিন বিদেশ-বাসের পরে ফিরে প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ স্ত্রীকে সর্বসমক্ষে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে। চন্দ্রাভিযানের পর পৃথিবীতে ফিরে নিরাপত্তা-কক্ষে প্রয়োজনীয় দিনাতিপাত করে নীল আর্মস্ট্রং যখন সকলের সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে তাঁর স্ত্রীকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন, তখন তাঁর আচরণের মধ্যে কেউই কোনো লজ্জার কারণ খুঁজে পাননি নিশ্চয়ই। অথচ এখানে আমাদের ভারতভূমিতে দিল্লী টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করবার পর ভারতীয় দলের অধিনায়ক পতৌদির নবাব প্যাভিলিয়নে ফিরে সকলের সপ্রশংস দৃষ্টির সমনে তাঁর স্ত্রী শর্মিলা ঠাকুরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে চুম্বন করতে পারেন না, কারণ প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ প্রকাশ্য চুম্বন বর্তমান সভ্য ভারতে একটি রীতিবিগর্হিত ব্যাপার। আসলে অশ্লীলতা, অশালীনতা, অভব্যতা বা কুদৃশ্যতা (অবসিনিটি) হচ্ছে নিতান্ত আপেক্ষিক অভিধা; অশ্লীলতা প্রভৃতি বোধ কালে কালে, দেশে দেশে, এমনকি একই দেশের সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পৃথক ও পরিবর্তনশীল। অতিসাম্প্রতিককালে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের আধুনিকা মেয়েরা নাভিকে উন্মুক্ত রেখে শাড়ী পরা প্রচলন করেছেন। অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীলদের ভিতর কিংবা পল্লীগ্রামে কিন্তু এই আচরণ রীতিমত অসভ্যতা বলে ধিক্কৃত। অথচ দেখুন, অজন্তাগাত্রে অঙ্কিত নারীমূর্তি, রাজস্থানী চিত্রকলার নারীমূর্তি কিংবা ভুবনেশ্বর, কোনারক বা খাজুরাহোর প্রস্তরখোদিত নারীমূর্তি—সর্বত্রই তাদের পরিধেয় বস্ত্র নাভিদেশের নিম্নে। মহাভারতে পড়ি, রাজকুমারী উত্তরা বৃহন্নলাবেশী অর্জুনের কাছে নৃত্যশিক্ষা করতেন, দ্রৌপদী অর্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণের কাছে সম্পূর্ণ সংকোচহীনা এবং নারীরা হতেন স্বয়ংবরা। অথচ মুসলমান রাজত্বকালের শেষ পাদে দেখি, বাংলার নারী হয়েছেন অসূর্যম্পশ্যা, বাল্যাবস্থাতেই কন্যাকে পাত্রস্থা করা হচ্ছে এবং নৃত্যগীত, এমনকি বিদ্যাশিক্ষাও বাংলার নারীর পক্ষে বিষবৎ বর্জনীয়। রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, শ্লীল-অশ্লীল জ্ঞান—সমস্তই যুগাপেক্ষী।

খোসলা কমিশনের রিপোর্টের অষ্টম পরিচ্ছেদে সেন্সার-প্রথার ধারাকরণ সম্পর্কে সুপারিশ করতে গিয়ে ঐ পরিচ্ছেদের চতুর্থ অনুচ্ছেদের (ঙ) ধারাতে কমিশন শোভনতা ও নৈতিকতা (ডিসেন্সি অ্যান্ড মর্যালিটি) সম্পর্কীয় সূক্ষ্মগ্রাহী প্রশ্নটি তুলেছেন। প্রশ্নটি এমনই উত্তেজক ও স্পর্শকাতর যে, চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নতাকে বৈধকরণের সুপারিশ করা হয়েছে, মাত্র এই সংবাদটাই ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাপ্তাহিক-মাসিক পত্র-পত্রিকার বুকে বহু প্রবন্ধ, চিঠিপত্র মারফৎ বহুজনের মত এবং অমতকে

পয়সা ই পীয়ার / বিশ্বজিৎ এবং মালা সিনহা

প্রতিবাদ / পরিচালক তপেশ্বর প্রসাদ মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী এবং বিশ্বজিৎ।। ফটো ঃ অমৃত।

ব্যক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এমনকি 'চুম্বন ও নগ্নতার' বিতর্কিত আলোচনাকে অবলম্বন করে আমাদের 'অমৃত' পত্রিকাতেই সুপারিশের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অন্তত ছাব্বিশটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে ন'সপ্তাহ-কাল ধরে। কৌতূহলী পাঠকরূপে প্রত্যেকটি চিঠি পাঠ করা সত্ত্বেও আমি চিঠিগুলি সম্বন্ধে কোনোরকম আলোচনা না করে কমিশনের মূল সুপারিশকে কেন্দ্র করেই আমার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখব।

'শোভনতা ও নৈতিকতা' সম্পর্কে সুপারিশ করতে গিয়ে কমিশন প্রথমেই বলেছেন, এ-ব্যাপারে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট যে-সূত্রাবলী নির্ণয় করেছেন, সেন্সার বোর্ড তা যেন ভালোভাবে অনুধাবন করেন ও চলচ্চিত্রকে ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যাপারে তা প্রয়োগ করেন। সূত্রগুলি হচ্ছে ঃ

(১) সাহিত্য ও চারুকলায় যৌন-বিষয়ের ব্যবহার ও নগ্নতাকে অশ্লীলতার নিদর্শন বলে গণ্য করা চলবে না, যতক্ষণ না তার সঙ্গে আরও কিছু যুক্ত হচ্ছে।

(২) কতখানি অভিযোগ আনা যেতে পারে, তা নির্ণয় করার ব্যাপারে একটি বইয়ের সঙ্গে অপর কোনো বইয়ের তুলনা করবার প্রয়োজন নেই।

(৩) কোন্ জিনিস শিল্পসম্মত এবং কোন্ জিনিস অশ্লীল, তা যখন শেষপর্যন্ত আদালতের এবং আপীলসাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্টের বিচার্য, তখন অশ্লীলতার প্রশ্নে সাহিত্যিক বা অন্য কারুর মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ অপ্রয়োজনীয়।

(৪) অশ্লীল বিষয়টিকে সম্পূর্ণ সৃষ্ট বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করা অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু অশ্লীল বিষয়টিকে একক ও পৃথক করেও বিবেচনা করার দরকার আছে এই কারণে, যাতে বুঝতে পারা যায় যে, বিষয়টি এমনই গর্হিত এবং অবিসংবাদীভাবে অশ্লীল যে, কোনো দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি এর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

(৫) সমকালীন সমাজের স্বার্থ ও তার ওপর বইটির বা অন্য সৃষ্ট বস্তুর প্রভাবের কথাও উপেক্ষা করা চলবে না।

(৬) অশ্লীলতা ও চারুকলা যেখানে মিশ্রিতভাবে উপস্থিত, সেখানে চারুকলা এমন সমধিক প্রভাবশালী হওয়া চাই যে, অশ্লীলতাকে নগণ্য বলে বিবেচনা করা চলবে।

(৭) আমাদের জাতীয় আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে যে-মৌলিক আইন রচিত হয়েছে, সেই অনুযায়ী সাধারণ শালীনতা ও নৈতিকতা জ্ঞান আহত হয় এবং অপরিণত মনে অযথা কামোদ্রেক করে, এমনভাবে যৌন ব্যাপার উপস্থাপিত করা হয়েছে কিনা বিচার করতে হবে।

(৮) জনসাধারণের স্বার্থে বা তাদের উপকারের জন্যে যেখানে তথ্য, মতবাদ বা ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে বাক্-স্বাধীনতা ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অনুকূলে রায় দেওয়া যায়। একটি ডাক্তারী বইয়ে যৌনসংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান সচিত্র হলেও অশ্লীল নয়, কিন্তু ডাক্তারী শিক্ষাকে বাদ দিয়ে ঐ একই যৌনসংক্রান্ত চিত্রাবলী সাধারণ পুস্তকে অশ্লীল বলে বিবেচিত হবে।

(৯) অর্থলাভের উদ্দেশ্যে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারকভাবে অশ্লীলতা বাক-

স্বাধীনতা ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা হিসেবে সাংবিধানিক প্রশ্রয় পেতে পারে না। মানবচরিত্রের কামেচ্ছাকে ইন্ধন যোগাবার উদ্দেশ্যে যৌন-বিষয়ের উপস্থাপনাকে অশ্লীলতা বলা হয়, এই ধরনের যৌন উপস্থাপনা শোভনতা ও শালীনতার পরিপন্থী।

(১০) অপরাধ সম্পর্কে সজ্ঞানতা আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বইটি অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট কিনা, সে-সম্বন্ধে দোষীর জ্ঞান আছে কি নেই, বিচারের সময়ে তা দেখবার প্রয়োজন নেই; এসম্পর্কে সম্পূর্ণ দায়িত্ব অপরাধীকে নিতেই হবে।

সুপ্রীম কোর্ট নির্ধারিত উপরোক্ত সূত্রাবলী প্রয়োগ করে যে-ছবিকে দোষমুক্ত বলা যায়, অথচ যাকে সাধারণভাবে কুরুচিকর এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের দর্শনের অযোগ্য বলে মনে হবে, তার জন্যে ছবিগুলিকে 'মাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' বলে ছাড়পত্র দিলেই চলবে। ছবির বিচারের সময়ে তাকে একটি শিল্পসৃষ্টি বা প্রমোদ-উপকরণ হিসেবে সামগ্রিকভাবে বিচার করতে হবে। চিত্রের মাধ্যমে একটি কাহিনীকে বিবৃত করবার জন্যে যদি একটি প্রণয়াকুল চুম্বন বা নগ্ন মনুষ্য-শরীরের দৃশ্য দেখানো যুক্তিযুক্ত এবং অপরিহার্যভাবে আবশ্যিক বলে বিবেচিত হয়, তাহলে তাতে আপত্তির কিছু নেই, যদি বিষয়টিকে অনুভূতির সঙ্গে কমনীয়ভাবে শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত করা হয় এবং অযথা কামোদ্রেক করার উদ্দেশ্য বর্জিত হয়। এর দ্বারা যথার্থ শিল্পমনা পরিচালকের শিল্পসৃষ্টির পথে সহায়তা করা হবে। অযথা কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল দৃশ্যসমন্বিত ছবিকে সেন্সার কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি প্রদর্শনের অযোগ্য বলে রায় দেবেন; কাটছাঁট করে তাকে চালানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

খোসলা কমিশন মনে করেন, সেন্সারের সদস্যরা সকলরকম প্রভাবমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ শিল্পসৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের কাজ করবেন।

মৌসুমী মনের নায়িকা মিতা চৌধুরী

অভয়ঙ্কর

ছায়াছবির রোমিও

ফ্রাঙ্কো জেফিরিল্লির নতুন ফিল্মে 'রোমিও জুলিয়েত' একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিগত তেত্রিশ বছরে এই নিয়ে শেকস্‌পীয়রের 'রোমিও জুলিয়েতের' তৃতীয়তম ছায়াচিত্র তৈরী হল। ১৯৩৫-এ যখন হলিউড প্রথমতম ছায়াছবি প্রকাশ করেছিল তখন একটা প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। লেসলী হাওয়ার্ড আর নরমা সীয়ারার নামভূমিকায় অভিনয় করে প্রায় রূপকথার চরিত্রে রূপান্তরিত হন।

ছায়াছবির প্রথম রোমিও এই ভূমিকাটিকে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গ্রহণ করেছিলেন. সেই কালে তিনি বলেন—

> The poet had his heart and soul Juliet ... his whole interest is so clearly centred in the shining girl. She is the perfection of youth, beauty, passion and unswerving fidelity. Romeo was necessary since you can not have a love story without a lover. But he seems hardly to be a three dimensional figure..."

বিয়াল্লিশ বছর বয়স তখন নায়কের ভূমিকার অভিনেতার. তাঁর মুখাকৃতিতে গ্রীক দার্শনিকের ছাপ. তাই তিনি জানতেন যে শেকস্‌পীয়রের রোমিও তারুণ্যের প্রতীক. সে ভূমিকা ঠিক ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। ভূমিকাটিকে তিনি তেমন গুরুত্ব দেন নি।

লেসলী হাওয়ার্ড সেইকালে মঞ্চ সফল নাটক 'হ্যামলেট' অভিনয় করছেন. বিশেষ খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন সেই ভূমিকাভিনয়ে। তাঁর মন সেদিকে পড়েছিল। নরমা সীয়ারার স্বামী আরভিং থালবের্গ তাঁর স্ত্রীর জন্য এই 'প্রেসটিজ প্রোডাকসনে' সমস্ত মন ঢেলে দিয়েছিলেন, তিনিই ধরলেন হাওয়ার্ডকে, অনেক অনুনয় করে শেষ পর্যন্ত রাজী করালেন লেসলী হাওয়ার্ডকে রোমিওর ভূমিকা গ্রহণে।

যুদ্ধ-পূর্ব হলিউডের কাছেও এই ছবি 'প্রেসটিজ প্রোডাকসন', তাই মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁরাও খরচপত্র করলেন দরাজ হাতে। ভেরোনার উদ্যান, রাজপথ, প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণানুসারে মেট্রো-গোল্ডউইন মায়ারের কালভার সিটি অঞ্চলে প্রকান্ড সেট তৈরী করা হল। জুলিয়েটের কক্ষের সেই ভুবনবিখ্যাত বাতায়ন কোণটি ত্রিশ ফিট উঁচু করা হল। মারকুইটোর ভূমিকার জন্য নির্বাচন করা হল প্রবীণ নট জন ব্যারিমুরকে বেসিল রাথবোন টাইবাল্টের ভূমিকা পেলেন। আর নার্সের ভূমিকা দেওয়া হল এডনা মে ওলিভারকে।

এই সব নাম বর্তমান কালে নিছক নামমাত্র, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু-কাল পর পর্যন্ত এই সব নাম মুখে মুখে ঘুরেছে। আজ এঁরা বিস্মৃত।

বিখ্যাত নাটকের এই চিত্র রূপায়ণ একালে নিছক মঞ্চঘেঁষা মনে হবে। জর্জ কুকার সেই ছবির নির্দেশক ছিলেন। তারা-ভরা আকাশও সেদিন চিত্রায়িত ড্রপ টাঙিয়ে দেখানো হয়েছিল। চরম সততার সঙ্গে মূলকাহিনীকে অনুসরণ করায় ছবির গতি অতিশয় মন্থর হয়ে পড়ে। ফিল্‌মটা একেবারে স্টেজ প্রোডাকসনের সেট-সমৃদ্ধ সংস্করণ হয়ে দাঁড়াল। সেদিন যাঁরা এই ছবি দেখেছেন তাঁদের মনে আছে নরমা সীয়ারারের অপরূপ রূপ লাবণ্য এবং হাওয়ার্ড-এর গাম্ভীর্যমণ্ডিত মুখভঙ্গী. চমৎকার বাচনভঙ্গী আর ব্যারিমুরের উচ্ছ্বাস উজ্জ্বল 'কুইন ম্যাব' বক্তৃতা। যে কুকার পরবর্তীকালে 'মাই ফেয়ার লেডীর' চিত্ররূপে এমন স্টাইল আর আধুনিক জাঁকজমক সৃষ্টি করেছেন, আজ এই নাটক ছবিতে তুলতে হলে তিনি অন্যভাবে তুলবেন।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় রূপান্তরে রেনাটো কাসতেলানী এইদিকে সচেতন হয়ে নতুন রোমিও রূপালি পর্দায় আনলেন। পরবর্তী সংস্করণের ফিল্মের সঙ্গে তাঁর ফিল্মের অনেক প্রভেদ। ছাব্বিশ বছর বয়সের লারেন্স হারভীকে তিনি রোমিওর ভূমিকা দিলেন আর সুসান সেনটালকে দিলেন জুলিয়েতের ভূমিকা, অজ্ঞাত, অখ্যাত মাত্র কুড়ি বছরের মেয়ে এই সুসান। এছাড়া সমগ্র ছবিটি 'লোকেসনে' হাজির হয়ে তোলা হল। ১৯৩৫-এ এই জাতীয় পরিকল্পনা অভাবনীয় ছিল। সুবর্ণ যুগের ভেনিস ভেরোনা, সীয়েনা ও আরও কয়েকটি ছোট-খাটো শহরে ছবি তোলা হল।

কাস্‌তেলানী নায়ক-নায়িকা এবং অন্যান্য পাত্র-পাত্রীর পোষাক-আসাক নকল করলেন বিখ্যাত প্রাচীন চিত্রকর লিপ্পো-লিপ্পি, পিসানেল্লো, কারপাচিও এবং লোরেনজোর ছবি দেখে। কাপুলেটদের বল নাচের আসরের দৃশ্যে এবং জুলিয়েতের কিছু অংশে বাতিচেল্লী র‍্যাফাএলের প্রভাব লক্ষিত হল।

বিভিন্ন দৃশ্যের প্রয়োজনে প্রাচীন ভেনেসীয় প্রাসাদ, উদ্যান প্রভৃতি ব্যবহৃত হল। সীয়ানার পিয়াৎসা দেল ডুয়োমো, আর ভেরোনার প্রাচীন গির্জা প্রভৃতি যেসব প্রাচীন সৌধে রোমিও জুলিয়েতের জন্ম ও বিচরণ সম্ভব তা 'লোকেসন' হিসাবে গৃহীত হল।

লরেনস্ ওলিভারের 'পঞ্চম হেনরী'র রঙীন ছবি যিনি তুলেছিলেন সেই রবার্ট ক্রাশকার কাসতেলানীর এই রোমিও জুলিয়েতের যে ছবি তুললেন তা সেলুলয়েডের কাব্য। এম জি এম-এর 'রোমিও জুলিয়েত'র তুলনায় এ ছবি অনেক উচ্চমানের। কিন্তু এ ছবির ত্রুটী হল এই যে, শেকস্‌পীয়রীয় দৃশ্যাবলীর অন্তর্নিহিত ছন্দ-মাধুরী ঠিক ঠিক ধরা যায় নি। প্রেমিক যুগল বাস্তবায়িত হয়েছে তাদের তারুণ্যে কিন্তু তাদের আবৃত্তি অশুদ্ধ। শেকস্‌পীয়রীয় ভঙ্গী বিরহিত। কাসতেলানীর এই ফিল্মের পর কিন্তু কয়েক বছর ধরে শেকস্‌পীয়রীয় নাটকের স্রোত বয়ে গেল, এর মধ্যে কয়েকটিতে অবশ্য কাব্য ও নাটকের মূলে সুর অক্ষুণ্ণ ছিল, সিনেমা দর্শকের চোখভরানোর মত বস্তুও ছিল। অভিনয়ের দিক থেকে ত্রুটি ছিল, বাচনভঙ্গী অশুদ্ধ ছিল। তথাপি একটা নতুন ধারা রচনার সহায়ক হল এই নতুন তরঙ্গ।

এইবার আসরে নেমেছেন জেফিরেল্লী। তাঁর 'রোমিও ও জুলিয়েত' শেকস্‌পীয়রের নাটকের তৃতীয়তম চিত্ররূপায়ণ। এই জেফিরেল্লী লন্ডনের 'ওল্ড ভিক্' থিয়েটারে কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করে লন্ডনের নাট্যরসিক মহলে তুফান তুলেছিলেন। জেফিরেল্লীর শেকস্‌পীয়রীয় নাটকে হাতেখড়ি 'দি টেমিং অব দি স্রু' প্রযোজনায়। ক্যাথেরিনার ভূমিকায় এলিজাবেথ টেলর আর পেট্রচিওর ভূমিকায় নেমেছিলেন রিচার্ড বারটন।

জেফিরেল্লীর 'রোমিও' অতিশয় স্বাভাবিক ভঙ্গীতে পরিবেশিত। যতদূর সম্ভব ভেরোনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন—আগেকার সংস্কারগুলি তাঁকে সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই। এছাড়া তিনি অতিশয় অল্পবয়সী অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে নামভূমিকা দুটি বণ্টন করেছেন।

ফেজিরেল্লীও ইতালীর পল্লী অঞ্চলে ছবি তুলেছেন, বিশেষতঃ টাসকানি ও আমব্রিয়ায়। সেই সব অঞ্চলের পঞ্চদশ শতাব্দীর গির্জাঘর এবং প্রাচীন প্রাসাদ ব্যবহার করেছেন।

ভেরোনার সেই মুখ্য স্কোয়ারটির সেট এঁকেছেন রেঞ্জো মোনজিয়ার ডিনো। ইনিই এঁকেছিলেন 'টেমিং অব দি স্রু'র সেট। সমগ্র সেট আশ্চর্যভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছে। পূর্বসূরীদের অনুকরণে জেফিরেল্লীও রেনেসাঁস যুগের শিল্পীদের সহায়তা গ্রহণ করেছেন পোষাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজনে। টাসকানিয়ার— সান পিয়েত্রোর গির্জা-গাত্রের প্রাচীন ছবির কিছু অংশকে স্পষ্টতর করার জন্য মিলানপন্থী একজন শিল্পীর সহায়তা নেওয়া হল। পিয়েনজার পোপের প্রাসাদের দেয়ালগাত্রের অনেক ছবি অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল সেগুলিকে স্পষ্টতর করা হল।

দুই বিবদমান পরিবারের প্রতিনিধির ভূমিকায় নেওয়া হল লিওনার্ড হোয়াইটিং ও ওলিভিয়া হাসেকে, এদের বয়স তখন যথাক্রমে সতের আর পনের। এই ভূমিকায় যাঁরা পূর্বে অভিনয় করেছেন তাঁদের বয়সের চেয়ে এঁদের বয়স অনেকখানি শেকস্‌পীয়রীয় কল্পনার সমতুল। উপযুক্ত ট্রেনিং-এর অভাব থাকলেও চরিত্রাভিনয়ে যথোচিত গভীরতা ও আবেগের অভাব দেখা যায় না। জেফিরেল্লী তাঁদের যৌবনচপল কামনাবেগ অনেকখানি ছবিতে ধরেছেন, তবে সেনসর কাঁচি চালিয়েছেন শয়নকক্ষের দৃশ্যে। অথচ এই ছায়াছবির এই অংশটি ছিল অতিশয় কবিত্বময়। জেফেরেল্লীর অল্পবয়সী জুলিয়েতের দেহের স্থূলতা রুবেনসের 'ন্যুড' এবং 'ম্যাডোনা'র মহিমাময়ী রূপ স্মরণ করিয়ে দেয়। ভারী গাউনটা যেভাবে জুলিয়েত তোলে তার মধ্যে যথেষ্ট সৌকুমার্য লক্ষিত হয়। রোমিওর প্রতি তার জ্বলন্ত আবেগ, তার প্রতিটি গতি-বিভঙ্গে ফুটে উঠে। আর রোমিওর চোখ যদিও স্বপ্নালু, তথাপি তার আচার-আচরণে বলিষ্ঠতার পরিচয় ফুটে ওঠে।

শহরের স্কোয়ারে সেই যে মনটাগু ও কাপুলেত পরিবারের সংঘর্ষ হল, সেই দৃশ্য থেকেই জেফিরেল্লীর এই অপরূপ ছবির গতিবেগ সুরু হয়েছে। বাজারের দৃশ্য প্রভৃতিতে লোকজনের বাস্তবতার মধ্যে একটা দ্রুততার ছাপ সুস্পষ্ট। অতিশয় অন্তরঙ্গ দৃশ্যের আলোকচিত্রও এইভাবে নেওয়া হয়েছে, তবে যেখানে রোমিও মৃত জুলিয়েতের দেহ দেখে আত্মহত্যা করছে সেই দৃশ্যে যেন জেফিরেল্লী পরাভূত।

রোমিও ও টাইবাল্টের দ্বৈরথ দৃশ্যে জেফিরেল্লী যথেষ্ট প্রাণ সঞ্চার করেছেন। এই ছবির আর দুটি বিশেষ দৃশ্য কাপুলেটদের বলনৃত্যের দৃশ্য যেখানে জুলিয়েতের সঙ্গে প্রথম দর্শন আর সেই বাতায়ন দৃশ্য। এইখানে ক্যামেরার কাজ হয়েছে অপূর্ব। ক্লোজ আপগুলি এমন ভাবে গৃহীত যা দর্শক-চিত্তে আবেগ সৃষ্টি করে। নৃত্যপরা অতিথিদের মধ্যে প্রেমিকযুগল পরস্পরকে সন্ধান করছে সেখানে ক্যামেরা অদ্ভুত ভঙ্গীতে ছবি তুলেছে।

বাতায়ন দৃশ্যে জেফিরেল্লী এক সুদীর্ঘ অলিন্দ রচনা করেছেন, সেখান থেকে এক সুন্দর কুঞ্জবীথি চোখে পড়ে। জুলিয়েত যখন রোমিওকে জড়িয়ে ধরেছে তখন জুলিয়েত খিল্‌খিল্ করে হাসে। এই হাসির মধ্যে একটা সুন্দর সহজ সারল্য ফুটে উঠেছে। ক্যামেরা সেই সময় অবশ্য শারীরিক আকর্ষণের দিকগুলির ছবি তুলেছে, তবু তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকা এই দৃশ্যেই দর্শকচিত্ত জয় করে নেন।

জেফিরেল্লীর অন্য তরুণ অভিনেতাদের মধ্যে মারকুশিওর ভূমিকায় জন ম্যাকএনেরী এবং টাইবাল্টের ভূমিকায় মাইকেল ইয়র্কের অভিনয় রেনেসাঁস যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

রোমিও-জুলিয়েত এক অবিস্মরণীয় প্রেমকাহিনী। এই কাহিনী সকলের মনে গাঁথা হয়ে আছে, তাই একই কাহিনীর চিত্র রূপান্তর ঘটল এই নিয়ে তিনবার। তার নতুনতর সংস্করণের মধ্যে যে শেকস্‌পীয়রীয় কাহিনীকে যথাযথভাবে তুলে ধরবার যে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, তার ফলে মনে হয় শেকস্‌পীয়রের সকল নাটকেরই হয়ত এই জাতীয় সার্থক রূপায়ণ একদিন সম্ভব হবে। জেফিরেল্লীর এই নতুন রোমিও শেকস্‌পীয়রীয় কল্পনাকে অনেকখানি বাস্তবরূপ দিয়েছে।

ক্রিকেট প্রসঙ্গে প্রবীর সেন

ভারতীয় ক্রিকেটে তিনজন শ্রেষ্ঠ উইকেট-কিপারের নাম উল্লেখ করতে গেলে সর্বাগ্রে মনে পড়ে প্রবীর সেনের নাম। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ডন ব্র্যাডম্যানকে তাঁর চরম সাফল্যের যুগে বাজপাখীর ক্ষিপ্রতায় ষ্টাম্প-আউট করে শূন্য হাতে প্যাভিলিয়ানে ফিরিয়ে দেবার দুর্লভ কৃতিত্ব একদা তাঁকে আলোচনার বিষয়-বস্তু করে তুলেছিল। দেশে-বিদেশে তিনি অবিশ্যি 'খোকন সেন' নামেই বেশী পরিচিত।

খুব উঁচুদরের ক্রিকেটার হিসেবে অনেক ভারতীয়ই বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন; কিন্তু মাঠের ভেতরে ও বাইরে বোধকরি খোকন সেনই একমাত্র খেলোয়াড় যাঁকে বিদেশীরা অন্তর দিয়ে ভালবেসে ছিলেন। খেলায় জয়-পরাজয় এবং সুখ-দুঃখ—সব কিছু সহজভাবে প্রশান্ত মনে গ্রহণ করতে পারাই স্পোর্টসম্যানশিপের মূল কথা। খেলোয়াড় জীবনের এই সত্যটা খোকন সেনের জীবনে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, বোধকরি তার নজীর খুব বেশী নেই। এই কারণেই খোকন সেনকে শুধু খ্যাতির সম্মান দিয়েই বিদেশীরা সন্তুষ্ট হননি—তাঁকে নিজেদের অত্যন্ত আপনারজনও করে নিয়েছিলেন। এই সম্মান একমাত্র সত্যিকারের স্পোর্টসম্যানদের ভাগ্যেই জোটে। এহেন দেশ-বিদেশ খ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার দায়িত্ব ও সুযোগ যেদিন পেলাম, সেদিন স্বাভাবিকভাবেই একটু শঙ্কিত হয়েছিলাম।

টালিগঞ্জে অশোক পার্কের বাড়ীতে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর হাসিমুখের অভ্যর্থনা আমার মনের জড়তা অনেকখানিই দূর করে দিল। তারপরও যেটুকু ছিল, কথাবার্তার মধ্যে কখন যে কেটে গিয়ে সহজ হয়ে যায় তা নিজেও টের পাইনি। ব্যক্তিগতভাবে সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম তাঁর সাফল্যের মূল উৎস।

শেষ পর্যন্ত কাজের কথায় এলাম—আমার প্রশ্ন এবং তাঁর উত্তর।

আমার প্রশ্ন করার আগেই তিনি হাসিমুখে বললেন,—বেশতো! আরম্ভ করুন। শুধু একটা অনুরোধ কোন জটিল প্রশ্ন করবেন না।

প্রশ্নঃ এ কথাটা কেন বলছেন? আপনার কাছে আমার আসার উদ্দেশ্য তাতে হয়ত অনেকখানি ব্যর্থ হতে পারে।

উত্তরঃ জানি। তবুও মনে হয় এতদিন ধরে যে-আদর্শকে বজায় রেখে এসেছি, আজ জীবনের মাঝপথে এসে তা বিসর্জন দিয়ে আমি যেন কোন কারণেই অপরের মনোবেদনার হেতু না হই। তার থেকে বড় দুঃখ আমার নেই।

প্রশ্নঃ আপনার এ কথার যথাযথ মর্যাদা দিয়েই আমি প্রশ্ন করতে চেষ্টা করবো। আচ্ছা নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের এই নৈরাশ্যজনক ফলাফলের কারণ আপনার কি মনে হয়?

উত্তরঃ কারণ অনেক থাকতে পারে; তবে যে দু-একটি আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তার উল্লেখ করছি। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে ক্রিকেট খেলার মরশুম খুবই সীমাবদ্ধ। বড়জোর তিন মাস। গ্রীষ্ম ও বর্ষার সময়টা অনুশীলনের পরিপন্থী। বছরের প্রায় নটি মাস ক্রিকেট খেলার সঙ্গে খেলোয়াড়দের কোন যোগাযোগই থাকে না। বর্ষার শেষে ক্রিকেট পিচ তৈরী হয়; তারপর খেলা সুরু হতে প্রায় ডিসেম্বর এসে যায়। এর আগেই যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে তার ফলাফল যে বিশেষ আশাপ্রদ হতে পারে না তা খুবই স্বাভাবিক। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের শোচনীয় বিপর্যয়ের মূলে অনেকখানি এই পরিস্থিতিই দায়ী।

প্রশ্নঃ এই প্রাকৃতিক কারণই কি আপনার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তরঃ না, তা ছাড়াও আছে। যেমন ভারতীয় ক্রিকেট পরিচালকদের দূরদর্শিতার অভাব। নির্বাচিত খেলোয়াড়দের উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতির আগেই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক খেলায় অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে দুঃসাহস থাকতে পারে, কিন্তু যুক্তি নেই। নিউজিল্যাণ্ড দল বেশ কিছুদিন ধরে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে সফর করে ভারতে এসেছিল। ফলে নিউজিল্যাণ্ড দলের প্রতিটি খেলোয়াড় বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়েই ভারত সফরে এসেছিলেন। অপরদিকে ভারতীয় খেলোয়াড়দের তখনও জড়তা ভাঙেনি।

প্রশ্নঃ আপনার কি মনে হয় না অন্যান্য সফরের তুলনায় এবারকার নিউজিল্যাণ্ড দল অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল?

উত্তরঃ মেনে নিলেও, একথা আমি স্বীকার করবো না। পঞ্চাশ লক্ষ নিউজিল্যাণ্ডবাসী যদি আঠারোজন উপযুক্ত খেলোয়াড় বাছাই করে শক্তিশালী দল গঠন করতে পারে তাহলে পঞ্চাশ কোটি ভারতবাসী থেকে আমরা আঠারোজন খেলোয়াড় বাছাই করে উপযুক্ত দল গঠন করতে পারতাম না—এটা আমার কল্পনার বাইরে।

প্রশ্নঃ এর জন্যে দায়ী কে?

উত্তরঃ বর্তমানের ক্রিকেট পরিচালকরা। শুধু যে তাঁদের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব তাই নয়, প্রতি পদে পদে কেমন যেন একটা দ্বিধা, হতাশা, উদাসীনতা, শিথিলতা তাঁদের ঘিরে রয়েছে। এই দেখুন না। অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পরস্পরকে বাহবা দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড়দের দিয়েই তাঁরা ভারতীয় ক্রিকেট দল গড়বেন। কয়েকজন পুরোন খেলোয়াড়কে বাদ দিয়ে বেশ কয়েকজন নতুন খেলোয়াড় দিয়ে দলও তৈরী করেছিলেন নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। অত্যন্ত আশাপ্রদ সংকল্প। কিন্তু ক্রিকেট জগতের শেষ স্থান অধিকারী নিউজিল্যাণ্ডের কাছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের আকস্মিক বিপর্যয়ে ভারতীয় পরিচালক মণ্ডলের মনোবল ভেঙে পড়ে। বিপর্যয়ের কারণ খুঁজে বার না করে দিশেহারা এবং ভীত হয়ে সেই পুরোন খেলোয়াড় দিয়েই আবার দল গঠন করতে উদ্যোগী হলেন।

প্রশ্নঃ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বোম্বাই টেস্টে জয়সীমা, বোরদে ও সরদেশাইয়ের অন্তর্ভুক্তি কি ঐ পরিস্থিতির ফলশ্রুতি?

উত্তরঃ নিশ্চয়ই। আর তার ফল যে, কত শোচনীয়, কত মর্মান্তিক, তা কারো অজানা নয়।

প্রশ্নঃ বোম্বাই টেস্টের মাত্র কয়েকদিন আগে এই অস্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধেই এবং আঞ্চলিক খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েই তাঁরা টেস্টে দলভুক্ত হয়েছিলেন, একথা তো অস্বীকার করা যায় না।

উত্তরঃ এই কৃতিত্ব কতটা ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিজস্ব আর কতটা অস্ট্রেলিয়ানদের দাবার চালের জের, সেটা বিচার সাপেক্ষ।

প্রশ্নঃ একটু সহজ করে বলুন।

উত্তরঃ আশা করি আমাকে ভুল বুঝবেন না। সরদেশাই, বোরদে এঁরা সবাই উঁচুদরের খেলোয়াড়। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও এঁদের গুণগ্রাহী। কিন্তু আজ তাঁরা অস্তগামী সূর্য। বিল লরী এবং তাঁর দলও সে খবর ভালোভাবেই রাখেন। ভারতীয় পরিচালকদের স্নায়বিক দুর্বলতার খবরও তাঁরা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন। তাই সুযোগ বুঝে এক ঢিলে দুই পাখী মারার ফাঁদ তাঁরা পাতলেন।

প্রশ্নঃ 'দুই পাখী' কথাটার অর্থ?

উত্তরঃ প্রথমটি হচ্ছে, ভারতীয় পরিচালকদের বোকা বানানো আর দ্বিতীয়টি

হচ্ছে, পড়ন্ত খেলোয়াড়দের দলভুক্ত হবার সুযোগ তৈরী করে দিয়ে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে দেওয়া। আর সেদিন তাঁরা সফলও হয়েছিলেন।

প্রশ্ন: কিভাবে?

উত্তর: আঞ্চলিক খেলায় সরদেশাই এবং বোরদেকে ইচ্ছে করে প্রচুর রাণ তোলার সুযোগ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হোল যে ওরা এখনও সতেজ আছেন এবং তাঁদের দলভুক্তি ভারতীয় দলকে যথেষ্ট শক্তিশালী করবে। আর বিচার-বিবেচনাহীন ভারতীয় পরিচালকমণ্ডলী বিনা দ্বিধায় সে ফাঁদে পা দিলেন। আর তার ফলাফল কি দাঁড়ালো সে সম্বন্ধে যত কম আলোচনা করা যায় ততই মঙ্গল। একথা আমি হলফ করে বলতে পারি—যেদিন ভারতীয় টেস্ট দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়, সেদিন রাতে হোটেলের রুদ্ধকক্ষে বিল এবং তার দলবল শুধু হেসেই খুন হননি, এমন কি আসল টেস্টে নিশ্চিত জয়ে বিজয়োল্লাসটুকুও অগ্রিম সেরে নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন: ভারতীয় পরিচালকরা কি তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন নি; বুঝতে পারেন নি যে বিল লরী তাঁদের বোকা বানিয়েছেন?

উত্তর: পেরেছিলেন, তবে অনেক দেরীতে। ইতিমধ্যে তাঁদের সেই বোকামীর মূল্য দিতে হোল শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানিতে। তবুও মন্দের ভাল যে, নিজেদের বোকামী স্বীকার করে নিয়ে পরবর্তী কানপুর টেস্টে সে ভুল সংশোধন করে নিয়েছেন।

প্রশ্ন: বোম্বাই টেস্টের নির্বাচিত খেলোয়াড় সুব্রত গুহের খেলা সুরু হবার প্রাক-মুহূর্তে আকস্মিকভাবে সরে—দাঁড়ানো সম্পর্কে আপনার কি মত?

উত্তর: বিচিত্র এই দেশ ভারতবর্ষ! এখানে সব কিছুই সম্ভব। তা না হলে উদীয়মান এক অল্প বয়স্ক তরুণ খেলোয়াড়কে নিয়ে সেদিন বিজয় মার্চেন্টের নেতৃত্বে যে মর্মান্তিক প্রহসন নাটকের অবতারণা হয়েছিল পৃথিবীর অন্য কোন দেশ হলে বোধকরি পরিচালকমণ্ডলী তার উপযুক্ত কারণ না দেখিয়ে রেহাই পেতো না।

প্রশ্ন: মাফ করবেন। খবরের কাগজ পড়ে যতদূর জানতে পারা গেছে, তাতে গুহ নিজেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই তো মনে হয়েছে।

উত্তর: বাইরের লোকের কাছে সেরকম মনে হওয়াটা কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। তবে ভারতীয় পরিচালকমণ্ডলীর মতিগতির সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, তারা কিন্তু মোটেই সে কথা মানতে রাজী হবেন না। ঐ 'স্বেচ্ছা নির্বাসনের' পেছনে কত অন্যায়, কত অবিচার, কত অপমান লুকিয়ে আছে—সে কথাটা একমাত্র তাঁদের পক্ষেই কল্পনা করা সম্ভব।

প্রশ্ন: গুহ সে অবিচার সম্বন্ধে কিছু বলেননি কেন?

উত্তর: গুহ তরুণ উদীয়মান খেলোয়াড়। নির্বাচকদের বিরাগ উৎপাদন করে নিজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দেবার মত ঝুঁকি নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলেই বোধকরি নীরবে ঐ পরিস্থিতিকে তিনি মেনে নিয়েছেন। অবিশ্যি এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ধারণা। ভুলও হতে পারে।

প্রশ্ন: এ ধারনা সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ আছে কি?

উত্তর: দেখুন, কোন মাঠের পিচ কি রকম হতে পারে এবং সেই পিচে কোন ধরনের বোলিং কার্যকরী হবে এ সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত ধারনা বা সিদ্ধান্ত নিয়েই শেষ মুহূর্তে দলের খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়। সেই জন্যেই প্রাথমিকভাবে বারোজন খেলোয়াড় মনোনীত হন অবস্থা বুঝে যাতে ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু চূড়ান্ত দল ঘোষণা করার পর, মাঠে নামতে যাবে এমন খেলোয়াড়কে যদি মাত্র কয়েক মিনিট আগে সরে দাঁড়াতে বলা হয়, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া শুধু সেই খেলোয়াড়ের একার নয় সমস্ত দলের উপরেও মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে যাঁরা উঠতি খেলোয়াড়।

প্রশ্ন: গুহ নিজেই তো মাঠে পরীক্ষা করে সরে দাঁড়াতে মনস্থ করেছিলেন—এ সম্বন্ধে আপনার কি ধারনা?

উত্তর: জানি না, এ সিদ্ধান্ত গুহের নিজের না অপর কারোর। হয়ত অন্য সকলের মত আমিও সেকথা বিশ্বাস করতাম—যদি না ঢাক-ঢোল পিটিয়ে, গুহের এই সিদ্ধান্তকে দেশপ্রেম ও দলগত স্বার্থের জন্যে একটা বিরাট ত্যাগ বলে রেডিও মারফৎ মারচেন্ট সম্প্রদায় ঘন ঘন বাহবা না দিতেন। এইখানেই আমার সন্দেহ। দলের প্রয়োজনে সরে দাঁড়ানোর নজির ক্রিকেটজগতে এ নতুন নয়। তাকে নিঃসন্দেহে স্পোর্টসম্যানশিপ বলা যেতে পারে; কিন্তু তা নিশ্চয়ই দেশপ্রেম নয়। বারবার গুহকে 'হীরো' বানিয়ে দেশপ্রেমিক স্পোর্টসম্যান বলার মধ্যে নিছক পিঠ চাপড়িয়ে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি না। যদি এ সিদ্ধান্ত গুহের নিজেরই হয়ে থাকে, তাহলে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য খেলোয়াড় হওয়ার মত মনোবল তাঁর নেই। কিন্তু আমার মনে হয় না, গুহ তাঁর জীবনের সেই পরম সুযোগ স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছিলেন। থাকগে সে কথা,—

প্রশ্ন: সেই ভালো এবার বরং আপনার মুখ থেকে পুরোন এবং বর্তমান অস্ট্রেলিয়ান দলের একটা তুলনামূলক আলোচনা শুনতে চাই।

উত্তর: এখানেই মুস্কিল। পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর প্রতি মানুষের একটা বিরাট দুর্বলতা থাকে। জীবনের মাঝপথে এসে মানুষ যখন মনের অবকাশের ফাঁকে ফাঁকে তার জীবনের হিসেব-নিকেশ করতে বসে তখন একথা নিশ্চিতভাবেই তার মনে হয় যে, ফেলে আসা দিনগুলি কত না সুন্দর, কত না সার্থক ছিল। তাই পুরোনর সঙ্গে বর্তমানের তুলনায় কখনও নিরপেক্ষ হওয়া যায় না। তবুও এ প্রসঙ্গে একটা কথা আমার মনে হয়, বর্তমানের অস্ট্রেলিয়ান দল আমাদের সময়কার তুলনায় খুব বেশী না হলেও কিছুটা দুর্বল। ব্র্যাডম্যান, হ্যাসেট, মিলার, নীল হার্ভে, লিণ্ডওয়াল ইত্যাদির মত খেলোয়াড়ের দেখা সব সময়ে মেলা সহজ নয়। তবুও বর্তমান দলে বেশ কয়েকজন আছেন যাঁরা তাঁদের সমকক্ষ না হলেও কিছু কমতি যান না। কিন্তু আমার মনে হয়, বর্তমান দল বোলিংয়ে আগেকার তুলনায় বেশ দুর্বল।

প্রশ্ন: ডন ব্র্যাডম্যানকে স্টাম্প-আউট করার ঘটনা সম্পর্কে একটু কিছু বলুন।

উত্তর: আমাকে কি বিপদেই ফেললেন। এ কথা আমি বেশ ভালভাবেই জানি যে, প্রত্যেক ছোট বড় খেলোয়াড়ের জীবনেই এমন একটা অসতর্ক মুহূর্ত আসে যাকে ক্রিকেটের ভাষায় 'অফ ডে' বলা হয়। হয়ত বিশ্ববিশ্রুত ডন ব্র্যাডম্যানেরও সে দিনটা 'অফ ডে' ছিল—এ ঘটনাকে বড় বেশী প্রাধান্য দিতে আমি নারাজ।

সেদিন সেই মুহূর্তেই বুঝতে পেরেছিলাম—খোকন সেন কত বড় স্পোর্টসম্যান। যে দুর্লভ সম্মানকে ভাগ্যের নিজেকে জাহির করার লোভ অনেকের পক্ষেই সংবরণ করা সম্ভব নয়—সেটুকু তিনি সাক্ষাৎকারের খেলোয়াড়ী দৃষ্টিভঙ্গীতে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করে নির্লিপ্ত ছিলেন।

সাক্ষাৎকার: **সত্যব্রত দে**

বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামের প্রথম টেস্টে বেংকটারাঘবনের আউটকে কেন্দ্র করে মাঠের দর্শকরা যে তাণ্ডবলীলা সুরু করেন, 'আউট নয়' বলে আম্পায়ারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনেন, বেতার ভাষ্যকাররা ধারা-বিবরণী দিতে গিয়ে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে ব্যাপারটাকে যেভাবে জটিল করে তোলেন, তা দেখেশুনে আমার গায়ে জ্বর আসে। ক্রিকেট ভালবাসি। তাই বলে এই কলঙ্ক সই কি করে? ক্রিকেট ত' সে কথা বলে না। খেলার মাঠে যাঁরা সাধারণ অপরাধও সইতে পারেন না সেই হেন ক্রিকেট অনুরাগীরা না জানি কত দুঃখ পেয়ে স্বগতোক্তি করেছেন হয়তো, 'ইট ইজ্ নট ক্রিকেট! ইট ইজ্ নট ফেয়ার!' ক্রিকেটের মাঠকে যে কোন অন্যায় থেকে আগলে রাখবার গুরুদায়িত্ব যাঁরা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন না জানি এ ধরনের ঘটনাকে তাঁরা কত ধিক্কার দিচ্ছেন! আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে খুশী না হতে পেরে দর্শকরা অপরাধীকে নিজ হস্তে সাজা দেবেন এ কেমন কথা? কিন্তু কথা হচ্ছে—আম্পায়াররা কি মানুষ নন? না তাঁদের ভুল হতে নেই? না এমন ভুল আর কখনও হয়নি? এমন ছিল যখন শত ভুলেও দর্শকরা মুখ খোলেন নি। আফশোষ ঢাকতে নিজের হাতে কামড় বসিয়েছেন, তবু প্রতিবাদ করেন নি। এটা যে ক্রিকেট। লর্ডস গেম। কিন্তু দিনকাল যে পাল্টাচ্ছে, সে কথা ভুলব কেমন করে? অবশ্যই সেই ফেলে আসা আইন মানা দিন অনেক ভালো ছিল, কিন্তু সেদিন আর নেই। ত্বেহিনো দিবসাঃ গতাঃ। হাস্যাস্পদ এক ঘটনা নিয়ে সেদিন ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে যে নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা আবার ঘটলে বিদেশীদের কাছে মুখ দেখান যাবে না। আর এটাও বা কি কথা, আম্পায়ার রয়েছেন ব্যাটসম্যানের অনেক কাছে, ব্যাটের খোঁচার আওয়াজ শোনা যতটা সহজ তাঁর কাছে ততটা কি সহজ ঐ দূর প্রান্তে বসে থাকা দর্শকদের কাছে? কি বিচিত্র আজকের ক্রিকেট! সামান্য উন্মাদনার বশে যাঁরা খেলার মাঠের বিরুদ্ধতা করেছেন তাঁরা হলেন ক্রিকেটের বড় শত্রু। আমাদের দেশে ক্রিকেটের যত জনপ্রিয়তা বাড়ছে তত উচ্ছৃংখলতাও বাড়ছে। আসুন না কেন আমরা পাকা খেলোয়াড়ী মনোভাবাপন্ন হয়ে দর্শক আসনে বসে খেলার সুষ্ঠু পরিচালনার কাজে হাত লাগাই। বছর তিরিশ আগে ইংলন্ডের মাঠে দর্শক আসনে বসে ৩০।৪০ হাজারের মত দর্শকের যে অপরিসীম ধৈর্য দেখেছিলাম আজ সেটা হতে বাধা কিসের? সে ক্রিকেটের সুদিন আর কখনও

কমল ভট্টাচার্য

আসবে কিনা বলা শক্ত। হ্যামণ্ড-ব্রাডম্যানের সে ক্রিকেট আজও সেরা খবর। বরং আজ ক্রিকেটে ভরাডুবি। কেন জানেন? তাঁরা শুধু বড় খেলোয়াড় ছিলেন না, মানুষ হিসেবেও তাঁরা ছিলেন উঁচু পর্যায়ের। ক্রিকেটকে সম্মান দিতে তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল তুলনাহীন। সেই কথাই বলি।

উনিশশো আটতিরিশ সালে অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট সিরিজে হ্যামণ্ড-ব্রাডম্যান এই দুই অধিনায়কের তীব্র লড়াইয়ের কথা কে না শুনেছে। প্রথম টেস্ট নটিং-হ্যামশায়ারে। ব্রাডম্যানের খেলা কে না দেখতে চায়? কিন্তু সেই হেন ব্রাডম্যানের তড়বড়ে চল্লিশ রাণের মধ্যেই উইকেট নড়ে উঠবে কে জানত? দর্শকরা তা দেখে কঁকিয়ে উঠলেন। তবু যদি বল সত্যি সত্যিই উইকেট ছিটকে দিত। ডগলাস রাইটের একটি লেগ ব্রেক বল গ্লাইড মারতে গিয়ে ব্রাডম্যান ফসকে যান। অর্থাৎ ব্যাটে বলে হয়নি। বলটি সোজা উইকেট কীপার বার্ণেটের হাতে যায়। বোলার রাইট ব্রাডম্যানকে 'বিট' করেছেন। একটা শব্দও হয়ত শুনেছিলেন তিনি। তাই একান্ত বিনীতভাবে তিনি আম্পায়ারের কাছে আউটের আবেদন জানান। এদিকে উইকেট কীপার বার্ণেটও কেমন সন্দিহান হয়ে স্টাম্প কটি গ্লাবস ছুঁয়ে হেলিয়ে দিয়ে আম্পায়ারের কাছে আউটের আবেদন জানান। কিন্তু কিসের আউট? আম্পায়ার হকচকিয়ে যান দুটি ভিন্ন ধরনের আউটের আবেদন দেখে। সময় নষ্ট না করে তিনি লেগ আম্পায়ারের কাছে যান পরামর্শ করতে। পরামর্শ করে লেগ আম্পায়ার স্টাম্প আউট দেন ব্রাডম্যানকে। কিন্তু দর্শকেরা ঘেমে উঠলেন ব্যাপারখানা দেখে। এটা কি হোল ব্রাডম্যান বল ব্যাটে লাগিয়েছেন কিনা বলা শক্ত। আর স্টাম্প আউট? সেটা সম্পর্কেও সন্দেহ ছিল। কেননা ব্রাডম্যান ক্রীজ ছাড়েন নি। তাহলে? আফশোষের কথা বৈকি!

ব্রাডম্যান ততক্ষণ তাঁবুর দিকে পা বাড়িয়েছেন। অগণিত দর্শক দেখলেন ব্রাডম্যান অল্প রাগে ফিরছেন মুখ রাঙা করে। চলার গতিও শ্লথ—ধীর স্থির। দর্শকরা নীরব। আউট সম্বন্ধে কেউ আর কোন মন্তব্য করতে সাহস পেলেন না। কেননা দর্শকের আসনে বসে এ' ধরনের আউট সম্পর্কে কোন কথা বলা উচিত নয়—সম্ভবও নয়। আর ভুল হলেও করার কি আছে? দুর্ভাগ্য তাদের যারা সেদিন ব্রাডম্যানের একটা বড় ইনিংস দেখতে পেলেন না।

কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হয়নি। খেলা শেষ হতে না হতেই খবর বেরুল 'ইভনিং স্টার'-এ। লিখছেন বিখ্যাত ক্রিকেটার জ্যাক হবস। আর তিনি লিখেছেন ব্রাডম্যানের আউট সম্বন্ধে। বক্তব্যটা হোল—'ব্রাডম্যান যখনই মাঠে নামেন খুব তাড়াতাড়ি যান। আসেনও তাড়াতাড়ি। বোধকরি ফ্যানেদের তাড়নার ভয়ে। কিন্তু এবার ব্রাডম্যান ফিরলেন খুব ধীরে—এটা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কাজ নয়। এর মধ্যে কি কোন রহস্য থেকে যায়নি? ব্রাডম্যান কি সত্যিই আউট হননি?' কে বলবে সে কথা? ব্রাডম্যান? তিনি ত' নীরব। এ নিয়ে আর কথা ওঠেনি। তবে ইংল্যান্ড ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ পরের টেস্টে লর্ডস মাঠে সেই আম্পায়ারটিকে বাদ দেন।

লর্ডস মাঠেও ব্রাডম্যান ফিরলেন মাথা নীচু করে। এল, বি, ডবলিউ আউট। মাঠে থমথমে ভাব। এবারও কি তিনি আউট ছিলেন না? কে বলবে সে কথা? প্লেয়ার্স গেস্টের আসনে বসে মাঠের আবহাওয়া দেখে ঘেমে নেয়ে উঠলাম। কাছেই বসে ছিলেন পাতৌদির নবাব (ইফতিকার আলী)। ভ্রু কুঁচকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"কি বুঝলে? তোমার কি মনে হয়?" আমি চোখ নামালাম। অপ্রস্তুত হয়ে বললাম—'তুমিইত' বলবে সে কথা। সেই আশায় এলাম তোমার কাছে!" পাতৌদি হাসলেন। সাঁকি দিয়ে বোঝালেন ইংল্যান্ডের বিল এডরীচের বোলিংয়ের বিশেষত্ব এইখানেই। লেগ কাটার দিতে দিতে বল

সোজা আসে কখনও। ব্রাডম্যানেরটা সোজাই ছিল। তবে আমি মনে করি তা সত্ত্বেও তিনি আউট হননি। পরের দিন কাগজে বড় বড় হরফে হেডলাইন—ব্রাডম্যান আউট ছিলেন না। পাতৌদির ধারণা তাহলে মিথ্যে নয়। কথাটা পাকা করলাম পরের টেস্টে আম্পায়ারটিকে বাদ হতে দেখে।

•

হাউজ দ্যাট। বোলারের জোর আপীল। লেগ স্লিপে ক্যাচ ধরেছেন ফিল্ডার। আম্পায়ার কোন দ্বিধা না করেই আপীল মঞ্জুর করেছেন। ব্যাটসম্যান ফিরতে না ফিরতেই আম্পায়ার বুঝতে পারলেন তাঁর ভুল। সম্ভবত ব্যাটসম্যানের পায়ের প্যাডে লেগে বলটি স্লিপ ফিল্ডারের হাতে উঠেছিল। আম্পায়ারের মুখ কালো হয়ে উঠলো, লজ্জায় আর মাথা তুলতে পারলেন না। লাঞ্চের অবসরে তাই আম্পায়ারটি সেই ব্যাটসম্যানটির পাশে গিয়ে বসলেন। জানতে চাইলেন আউট সম্পর্কে।

—"আপনি কি ব্যাটে খেলেননি?

—"সেকি কথা! তাহলে আপনি আউট দিলেন কি করে?

"ভুলতো হতে পারে?"

—"না, না ভুল আপনি কেন করবেন! এ সংশয়টাই বা এল কেন আপনার মনে? আপনি ঠিকই আউট দিয়েছেন।"

—আপনি বিনয় করছেন। আমি ভুল করেছি সেটা জানতে দিন। আমি এত অপরাধী মনে করছি নিজেকে যে কি বলবো! ব্যাটসম্যানটি কিছুতেই ভাঙলেন না। আম্পায়ারটিও বুঝলেন ওঁর মুখ থেকে কিছু বেরুবে না। এমন কি খেলার শেষে ডিনার পার্টিতে আম্পায়ারটি আর একবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ব্যাটসম্যানটি তখনও কোন কথা ভাঙেননি। ব্যাটসম্যানটি কে জানেন? হেমু অধিকারী। হেমু বরোদার হয়ে সে খেলা খেলেছিলেন হোলকারের বিরুদ্ধে রণজি ট্রফি ম্যাচে।

•

১৯৪৫ সালে ইডেনের মাঠে তখন অস্ট্রেলিয়ার সার্ভিস টিম খেলছে। দুর্ধর্ষ দল। বিশিষ্ট খেলোয়াড় লিন্ডসে হাসেট ও কীথ মিলারের গুণমুগ্ধ ফ্যানেরা মাঠে গিয়ে দেখলেন দলের অন্যান্য খেলোয়াড়েরা কম যান না। ফাস্ট বোলার মিলার ও রোপারের দৌরাত্ম্য দেখে দর্শকরা অবাক দৃষ্টি মেলেছিলেন। যে দর্শকদের মনে গুণমুগ্ধ বোলার রোপার খুশীর ছোঁয়াচ এনেছিলেন সেই মনেই তিনি আগুন ধরালেন তাঁর এক অশান্ত আচরণে। আম্প্যায়ার এল, বি, ডবলিউ আউট-এর আবেদন নাকচ করে রোপারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছিলেন। শুরু হয় কথা কাটাকাটি। যুক্তিতর্কের মহড়া তুলে রোপার আম্পায়ারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। অগত্যা আম্পায়ার বেগতিক দেখে রাগে ভ্রূ কুঁচকে তুললেন। অধিনায়কের কাছে হুমকি জানালেন খেলা বন্ধ করবেন বলে। অধিনায়ক অবশেষে বাধ্য করালেন রোপারকে আম্পায়ারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে। রোপারের গরম মেজাজ নরমের নরম হোল। মাথা হেঁট করে অপরাধ স্বীকার করলেন তিনি।

•

"প্লে ক্রিকেট এন্ড লারন্ ম্যানারস্।" —কথাগুলো বলেছিলেন তদানিন্তনকালের বাংলার সাহেব ক্রিকেটাররা। ইডেনে জ্যাক রাইডারের মহানুভবতা দেখে সাহেব ক্রিকেটাররা আমার পিঠ চাপড়ে গর্বের সঙ্গে কথাগুলি বলেছিলেন। অর্থাৎ মানুষ যদি হতে চাও ক্রিকেট খেল। এই খেলার মধ্যে সব খুঁজে পাবে। যদি তোমার মধ্যে নিষ্ঠা ও সততাবোধ থাকে তাহলে এই খেলার সাধনা করে ঈশ্বরের কৃপালাভ করবে। জাননা আমাদের ইংল্যান্ডে যত লোক গীর্জায় যায় ঠিক ততলোক ক্রিকেট খেলে। এত সাচ্চা এ খেলা!—

সাহেব ক্রিকেটাররা সেদিন উচ্ছ্বাসভরে কথাগুলো যে বলেছিলেন তার কারণ আছে। রাইডারের দলের সঙ্গে বাংলার গভর্নর দলের খেলা। খেলা খেলাই। না পারলেও রেহাই নেই। তাই ভারী নামী বোলারদের কাছে বাংলার হবু খেলোয়াড়েরা একেবারে কোণঠাসা হলেন। মায় সাহেবরা পর্যন্ত। রাইডার কারুরে খাতির রাখলেন না। তাই দলের সবচেয়ে নির্ভরশীল ফাস্ট বোলার আলেকজাণ্ডারকে দিয়েই আক্রমণটা শুরু করেছিলেন—শেষ পর্যন্তও। গুড় লেংথে থেকে বল তুলতে আলেকজাণ্ডার খুব ওস্তাদ। আর এই বলেই উরুতে তিন তিনটি ঘা খেয়ে আমার নড়বার উপায় রাখেননি বোলার আলেকজাণ্ডার। পরের বলটিই আমার হাতের গ্লাভস ছুঁয়ে উইকেটকিপার এলিসের হাতে পৌঁছয়। এলিস তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মিহি গলায় ডাক ছেড়ে আউটের আবেদন জানান। রাইডার্স সিলি মিড্ অনে দাঁড়িয়েছিলেন। তৎপর হয়ে বলে উঠলেন—"না, না, ব্যাটের কোন শব্দ আমি পাইনি—'উইকেটকিপার এলিস আর কথা বাড়ালেন না। আম্পায়ার সার্জেন্ট কার্টার আধা আঙুলে তুলেও নামিয়ে নিয়ে উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন—নটআউট। সাড়ে চারঘণ্টা ব্যাট করার পর যখন প্যাভিলিয়নে ফিরলাম তখন রাইডারই সর্বপ্রথম আমার খেলার প্রশংসা করলেন। '৪৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার সার্ভিস টিমটির কথা আজও ভুলিনি তাই।

ক্রিকেট আজও ক্রিকেট। তবে আজকের ক্রিকেটে এ আগুন ধরালো কে? আমাদের ক্রিকেটের শ্রীবৃদ্ধি না হোক জ্ঞানবৃদ্ধি বেড়েছে অনেক। খেলায় আমাদের প্রাধান্যের অভাব হলেই আমরা সব হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। ম্যাচ জেতার নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকি। কিন্তু আমরা কি সত্যি সত্যিই মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছি? সেটা বুঝতে পারলেই অন্তত মাঠের হামলাবাজী বন্ধ হবে। আম্পায়ারদের প্রতিও একটু ক্রিকেট-সুলভ মনোভাব দেখানো সম্ভব। নইলে খেলা কেন?

শংকরবিজয় মিত্র

জাতীয় ফুটবল খেলা

খেলাধূলোয় অঙ্গনে ভারতের কৃতিত্বের স্বাক্ষর ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। হকি, ক্রিকেট, টেনিস বা ফুটবল প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই ভারতকে পিছু হটতে দেখা যাচ্ছে। হকিতে যে ভারত সমগ্র বিশ্বের বন্দিত দল হিসেবে গণ্য হত সেখানেও সে আজ হতমান, তার স্বর্ণ-সিংহাসনে বসেছে প্রতিবেশী পাকিস্থান। শুধু তাই নয়, এখন বিশ্বের বহু দেশই ভারতকে চ্যালেঞ্জ করবার সামর্থ্য অর্জন করেছে। এ নিয়ে অনেক আলোচনাই হয়েছে, ভারত যাতে তার পূর্বের সুনাম ও প্রতিষ্ঠা ফিরিয়ে আনতে পারে তার জন্যে সমালোচনার অন্ত নেই। কিন্তু কাজে কতদূর কি হবে তা হলফ করে কিছু বলা যায় না।

ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতেও ভারত এখন কোন কৃতিত্ব দেখাতে পাচ্ছে না যাতে আমরা গৌরব অনুভব করতে পারি। বিশ বছরের পাকিস্থান তার সীমিত সামর্থ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যে দাগ কেটেছে বিপুল ভারতের অধিবাসী আমরা তাও করতে পারিনি। অথচ ক্রিকেটে প্রতিভার অভাব ভারতে আছে বলে মনে হয় না। বহু ধুরন্ধর ক্রিকেট খেলোয়াড় ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের অনিন্দ্য ক্রীড়াধারায় আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জন করেছে। ব্যক্তিগত নজীরের অভাব না থাকলেও দলগত কৃতিত্বে ভারত তেমনটা কিছু করতে পারেনি। অতীতের অসাফল্যের জের না টেনেও বলা যায় সম্প্রতি নিউজিল্যাণ্ড দলের কাছেও ভারতকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়া দল আমাদের দেশ সফর করছে। অষ্ট্রেলিয়ার কাছে প্রথম টেস্টে পরাজিত হয়ে দ্বিতীয় টেস্ট 'ড্র' করে কোনমতে মুখরক্ষা হয়েছে। বাকী তিনটি টেস্টে ভারতীয় দল কি ফলাফল দেখায় তা লক্ষ্য করতে হবে। তবে একমাত্র ব্যাটিং ছাড়া অন্যান্য বিভাগে ভারতীয় দল এমন কোন উন্নত নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখতে পারেনি যাতে আমরা সাফল্যের আশা পোষণ করতে পারি। তা ছাড়া বিল লরির নেতৃত্বাধীন অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল সর্ববিভাগেই শক্তিশালী। এমন একটি শক্তিশালী দলকে পরাজিত করে রাবার জয়ের আশা করাও চলে না।

সর্বজনপ্রিয় ফুটবল খেলাতেও কি ভারত এগিয়েছে বলা যায়? সম্প্রতি কোয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়াম ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের শোচনীয় অবস্থা এই কথাই প্রমাণিত করেছে যে ভারতের ফুটবলের মান এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির চেয়ে অনেক অনেক নীচে। ভারতের ফুটবলের মান এক সময়ে সত্যিই ভাল ছিল। ১৯৪৮ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারত ফ্রান্সকে হারাবার অপূর্ব সুযোগ পেয়েও তা কাজে লাগাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে। ভারত ২—১ গোলে পরাজিত হলেও দু দুটি পেনাল্টি কিক পেয়েও তা কাজে লাগাতে পারেনি। সেদিন পেনাল্টি কিকের সুযোগ অপচয়ের জন্যে দায়ী ছিলেন—শৈলেন মান্না ও মহাবীর প্রসাদ। এর পর মেলবোর্ণ ওলিম্পিক গেমসে ভারতের স্থান হয়েছিল চতুর্থ। এ ছাড়া ভারত বার কতক এশিয়া ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মানও লাভ করেছে। আর এবারকার ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারত যে ফল দেখিয়েছে তাতে ভারতীয় ফুটবলের সুনাম ত মোটেই রক্ষা পায়নি বরং হতমান হয়েছে বলা চলে। এত নৈরাশ্যজনক ফল এর আগে কখনও দেখা যায়নি। ভারত এখন ওলিম্পিক ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতা ত দূরের কথা, বাছাই পর্বের খেলা থেকেই বাদ হয়ে যাচ্ছে।

এবারের মারদেকা প্রতিযোগিতায় এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া নিয়ে আটটি দেশ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। 'ক' বিভাগে ছিল ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও থাইল্যাণ্ড এবং 'খ' গ্রুপে ছিল ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া ও ভারত। লীগ প্রথার খেলায় 'ক' গ্রুপ থেকে ইন্দোনেশিয়া অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ান এবং মালয়েশিয়া রাণার্স আপ হয়। ওদিকে 'খ' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান হয় ব্রহ্মদেশ এবং রাণার্স আপ হয় সিঙ্গাপুর। প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালের খেলা দুটি লক্ষ্য করার মত। প্রথম সেমিফাইনালে ইন্দোনেশিয়া ৯—২ গোলে সিঙ্গাপুরকে এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মালয়েশিয়া ৩—১ গোলে ব্রহ্মদেশকে পরাজিত করে। ফাইনালে ইন্দোনেশিয়া ৩—২ গোলে হারায় গতবারের চ্যাম্পিয়ান মালয়েশিয়াকে।
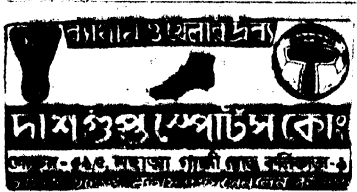
ভারত প্রতিযোগিতায় যে তিনটি খেলায় যোগদান করে তার একটি খেলায় জয়লাভ করে এবং অপর দুটি খেলায় হেরে যায়। ভারত জয়ী হয় সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ৩—০ গোলে এবং পরাজিত হয় অস্ট্রেলিয়ার কাছে ০—১ গোলে এবং ব্রহ্মদেশের কাছে ০—৬ গোলে। লীগ প্রতিযোগিতার 'খ' গ্রুপে ভারতের স্থান ছিল সকলের তলায়।

ভারতের এই পরাজয়ের সূত্রে অনুসন্ধান করলে একটা কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে পরিচালকরা টিম নির্বাচনের সময় সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পারেন না। দেশের সুনামের তুলনায় ব্যক্তিগত স্বার্থ যেখানে প্রাধান্য পায় সেখানে সুফল আশা করা বৃথা। একদিকে টিম গঠনে দুর্বলতা, অন্যদিকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে খেলোয়াড়দের গড়ে তোলা ও তাদের মধ্যে 'টিম-স্পিরিট' সঞ্চারিত করার কাজও সুষ্ঠুভাবে হয়নি। যোগ্য ও তরুণ খেলোয়াড়দের দাবী উপেক্ষা করে ভারতীয় দলটিকে যখন কোয়ালালামপুরে পাঠান হয় তখনই এই দলের সাফল্যের সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন ক্রীড়ারসিক ও সমালোচকরা দলের ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিয়ে দিলেও তা সংশোধনের কোন প্রয়াস নেওয়া হয়নি এবং তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ভারতকে মারদেকা প্রতিযোগিতায় মার খেয়ে ফিরে আসতে হয়েছে।

বিশ্ব ফুটবলের উন্নত মানের কাছে এশিয়ান ফুটবলের মান তেমন ঠাঁই পায় না। অথচ সেই এশিয়ান মানের কাছেও ভারত পৌঁছাতে পারে নি। এই যদি অবস্থা হয় তবে কতকাল লাগবে ভারতীয় ফুটবলের মান তুলতে?

১৯৭০ সালে মেকৃসিকোর আজটেক স্টেডিয়ামে বিশ্ব ফুটবল (নবম) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। জুন মাসে বাছাই ১৬টি দলের মধ্যে শেষ প্রতিযোগিতা হবে। এই ষোলটি দল উঠে আসবে পৃথিবীর ৭১টি দেশের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতার শেষে। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশের মধ্যে গ্রুপবিন্যাস করে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে। এইসব গ্রুপ হয়েছে ইউরোপের জন্যে ৯টি, দক্ষিণ আফ্রিকার জন্যে ৩টি, উত্তর আমেরিকার জন্যে দুটি, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার জন্যে একটি এবং আফ্রিকার জন্যে একটি। এই ষোলটি দেশকে সমান চারভাগে ভাগ করে লীগ প্রথায় খেলা চালান হবে। তারপর প্রতি ভাগের চ্যাম্পিয়ান ও রাণার্স-আপ দেশকে নিয়ে নকআউট প্রথায় খেলা হবে। প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শেষ করে এ পর্যন্ত মূল প্রতিযোগিতায় উঠতে পেরেছে আটটি দেশ—সুইডেন, বেলজিয়াম, পশ্চিম জার্মানী, ব্রেজিল, পেরু, উরুগুয়ে, এল সালভেডর ও মরক্কো। তা ছাড়া ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপ জয়ী ইংলণ্ড দল এবং ১৯৭০ সালের আমন্ত্রক দেশ মেক্সিকো দল মূল প্রতিযোগিতায় আপনা থেকেই স্থান করে নিয়েছে।

বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ ফুটবলের জন্যে যে সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি নেয় এবং তার জন্যে যে সংগঠন গড়ে তোলে ভারত তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে ফুটবলের মান উন্নত করার পথ খুঁজতে বেগ পেতে হবে না।

এই প্রসঙ্গে এবারকার সন্তোষ ট্রফির কথা তুললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বাংলা দল এবার এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে সার্ভিসেস দলকে শোচনীয়ভাবে ৬—১ গোলে পরাজিত করে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বাংলা দলের এই সাফল্যের মূলে ছিল তারুণ্যের দৃপ্তশক্তি। দল গঠনে বাংলার কর্মকর্তারা সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে তারুণ্যের প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তারই ফলে এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। এবারের প্রতিযোগিতায় বাংলা দল যে সুযোগ-সন্ধানী খেলা খেলেছে তার পরিচয় রয়েছে তার পাঁচটি খেলার ফলাফলের মধ্যে। বাংলা হারিয়েছে গোয়াকে ৪—০ গোলে, মাদ্রাজকে ৮—০ গোলে, সেমিফাইনালে অন্ধ্রকে ৪—১ গোলে এবং ফাইনালে সার্ভিসেস দলকে ৬—১ গোলে। বাংলা ২৮টি গোল দিয়ে গোল খেয়েছে মাত্র দুটি। এতেই তার আক্রমণ ও রক্ষণ বিভাগের সুসংহত বিন্যাসের পরিচয় মেলে।

শুধু কি তাই। মোহনবাগান দলের লীগ এবং শীল্ড বিজয়ের পর্যালোচনা করলে এ কথা আরও সুস্পষ্টভাবে এই কথারই পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। মোহনবাগান দলের নামী ও দামী খেলোয়াড়েরা দল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বিভিন্ন দলে। মোহনবাগান দলে যে সমস্ত নবাগত খেলোয়াড়ের সমাবেশ হয়েছিল তাতে কি মোহনবাগানের অতি বড় গোঁড়া সমর্থকও চিন্তা করতে পেরেছিলেন মোহনবাগান এবার ক্রিকেট এবং হকির মত ফুটবল ডাবলও পাবে? তরুণ খেলোয়াড়দের পেয়ে দলের কোচ শ্রীঅমল দত্ত উঠেপড়ে লেগে গিয়েছিলেন তাদের ঠিকভাবে পরিচালনা করতে। শ্রীদত্তের অক্লান্ত পরিশ্রমের সার্থকতা দেখা গেল যখন মোহনবাগান দল এবারের প্রতিযোগিতার সেরা এবং তাদের অনন্য প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল দলকে সর্ববিভাগে পর্যুদস্ত করে ভারতের বিশেষ ঐতিহ্যসম্পন্ন আই এফ এ শীল্ড জয়ের গৌরব অর্জন করলো।

এইভাবে তরুণ প্রতিভার সমাদর হলে এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষকের হাতে প্রশিক্ষণের ভার পড়লে বাংলার ফুটবল যে আরও উন্নত হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কলকাতার বড় বড় ক্লাবগুলি তাদের দল গঠনের সময় যদি এইদিকে লক্ষ্য রেখে স্থানীয় প্রতিভার সন্ধানে উদ্যোগী হন তাহলে বাইরে থেকে খেলোয়াড় আমদানীর জন্যে অনাবশ্যক অর্থ ব্যয়ও বন্ধ হবে এবং বাংলার তরুণ খেলোয়াড়রাও অনুপ্রাণিত হয়ে উন্নত ক্রীড়াশৈলীর চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে পারবে।

গজানন্দ ঘোড়ে

কম্পিউটারের কিস্তিমাৎ

কম্পিউটার এবার দাবা খেলা নিয়ে মেতেছে। এই সেদিনইত রাশিয়ার এক কম্পিউটারের সংগে আমেরিকার এক কম্পিউটারের দাবা খেলা হয়ে গেল।

অংকের ভেলকী দেখিয়ে যন্ত্রদানব গোটা পৃথিবীকেই তো হতবাক করে দিয়েছে। এর পরের অধ্যায়ে, কম্পিউটারের পিছনে কাজ করেন যে সমস্ত পাকা মাথার অংকবিশারদ, তাঁরা আরো মাথা ঘামাতে সুরু করেছেন আরো রোমহর্ষক চমক দেবার জন্যে। কম্পিউটারকে একটি পাকা দাবা খেলোয়াড় তৈরী না করে তাঁরা ছাড়বেন না।

কম্পিউটার বিশেষজ্ঞরা আর মাত্র পাঁচ থেকে দশ বছর সময় চেয়েছেন। এর মধ্যে সমস্ত রকম সমস্যার সমাধান তাঁরা করে ফেলবেন আশা করেন। তারপরেই আমরা পাব দুনিয়ার এক দুর্ধর্ষ বিস্ময় হিসেবে এমন একটি মেশিন যা দাবা খেলার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান স্পাসকী এবং পেত্রোসিয়ানদের কচুকাটা করতে সুরু করবে।

প্রাক্তন বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ান বটভিনিক পর্যন্ত কোমর বেঁধে লেগেছেন এই 'মেশিন-প্রতিম অধিনায়ক'কে তৈরী করবার জন্যে।

সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্বের নামকরা অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই হৈ চৈ করে ফেলেছে; কারণ বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই কম্পিউটার গবেষণায় সফল হলে তাঁরা আলোকপাত করবেন এমন একটি বিষয়ের ওপর যার দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক রহস্য আজও অনাবৃত। সেই চূড়ান্ত রহস্যটি হচ্ছে মানবচিন্তার ক্রিয়াকলাপ ও তার প্রকৃতি।

PROGRAM'S POSSIBLE MOVES
POSITIONS REACHED AFTER ONE MOVE BY THE PROGRAM
OPPONENT'S POSSIBLE REPLIES TO PROGRAM'S FIRST MOVE
POSITIONS REACHED AFTER ONE MOVE BY EACH PLAYER
ROOT (POSITION WITH PROGRAM TO MOVE)
TERMINAL NODES FOR A TREE OF DEPTH 2
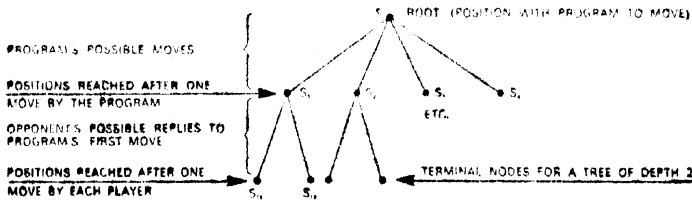
আর, একবার চিন্তার রহস্য ভেদ হওয়া মাত্রে জ্ঞানের সমস্ত চাবিকাঠিই মানুষের হাতে চলে আসা।

উনবিংশ শতাব্দীতেও অবশ্য মেশিনে দাবা খেলা হত। কিন্তু সে মেশিনের সংগে জোড়া থাকত একটি বড় আকারের টেবিল, যার চারদিকেই ঢাকা। আর সেই টেবিলের ভিতরে লুকিয়ে বসে থাকতেন কোনো নামকরা খেলোয়াড়। টেবিলের ওপরে পাতা থাকত একটি দাবার ছক। ঐ ছকে কেউ চাল দিলেই মেশিনও ঘুঁটি চেলে তার জবাব দিত। আসলে ছকের প্রতিটি ঘরের সংগে যন্ত্রপাতি সংযুক্ত থাকতো, যাদের আরেকটি প্রান্ত যুক্ত থাকতো টেবিলের ভিতরের খেলোয়াড়ের সামনে পাতা দাবার ছকের সংগে। কোনো ছকে একটি চাল দিলেই সংগে সংগে চালটি অন্য ছকটিতেও চলে যেত যন্ত্রের সাহায্যে।

কম্পিউটার কিন্তু এভাবে দাবা খেলে না। কম্পিউটারকে তার ভাষায় চাল জানিয়ে দিলে কম্পিউটারও তার জবাব দেবে। নানারকম গাণিতিক হিসাব করার পর। ফলে কম্পিউটারের সংগে দাবা খেলার অর্থ দাঁড়িয়েছে একটি দুরূহ ভাষায় নিবিড় কথোপকথন।

কম্পিউটারে দাবা খেলার জন্যে এক বৃক্ষ-পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে। এর বৃক্ষ-মূলটি (রুট) থাকে সবার ওপরে। দাবার পরিভাষায় এই বৃক্ষমূলটি হবে খেলা সুরুর আদি অবস্থা অথবা যে-কোন পজিশন, যে পজিশন থেকে কম্পিউটারকে চাল দিতে হবে। কোনো চাল দেওয়ার পর ছকে যে পজিশন আসবে তাকে বলা হয় নোড। সুতরাং কোনো পজিশন থেকে এক চাল পরে অনেক নোড আসতে পারে, কারণ চাল বিভিন্ন ঘুঁটির হতে পারে বিভিন্ন ঘরে। চিত্রে মূলের সংগে নোডগুলির, এবং এক নোড থেকে অন্য নোডের সংযোগ দেখানো হয়েছে বিভিন্ন সরলরেখা দিয়ে। প্রতিটি সরলরেখাই এক একটি চালের প্রতীক, এবং প্রতিটি নোডের প্রতীক হচ্ছে একটি বড় বিন্দু। চিত্রে মূল পজিশনের সংগে চারটি নোডের সংযোগ রয়েছে। তার মানে মূল পজিশন থেকে আইনসিদ্ধভাবে মাত্র চার রকম উত্তর কম্পিউটার দিতে পারে, ভালো বা মন্দ যে রকম উত্তরই হোক না কেন। এই চারটি নোডের প্রত্যেকটি থেকেই আরো অনেক নোড আসতে পারে। কারণ বিপক্ষের উত্তরও হতে পারে নানা রকম। যেমন চিত্রে এস ১ নোড থেকে বিপক্ষের মাত্র দুটি উত্তর আইনসিদ্ধভাবে সম্ভব ধরে নিয়ে এস ১১ এবং এস ১২ নোড দেখানো হয়েছে।

বৃক্ষটি ঠিক সেই কটি ধাপ 'গভীর' হবে, যে কটা চাল কম্পিউটার ভাবতে পারে। এই ভাবনার সীমারেখাকে বলা হয় টার্মিনাল নোড। চিত্রে যে বৃক্ষটি দেখানো হয়েছে, তাতে মূল পজিশনের মাত্র দু'চাল পরেই টার্মিনাল নোড এসে গেছে, কারণ এক্ষেত্রে কম্পিউটারের ভাবনার ক্ষমতা মাত্র দু'চাল পর্যন্ত—১টি স্বপক্ষের এবং ১টি বিপক্ষের। অবশ্য এই দুটি চালের সীমার মধ্যে যতরকম পারমিউটেশন-কম্বিনেশন সম্ভব, কম্পিউটারের নিপুণ গণনায় তার প্রত্যেকটিই ধরা পড়বে।

কম্পিউটার যে চাল দেয়, তা বাছাই করে কি করে? আমরা সকলেই জানি ৩টে বা ৪টে পর্যন্ত ভাবতে সক্ষম কোন খেলোয়াড় যখন একটি পজিশন বিশ্লেষণ করে তখন সে দেখে কোন চাল দিলে ৩।৪ চাল পরে (টার্মিনাল নোডে) তার অবস্থা ভাল হবে। কোন একটি পজিশনের মূল্যায়ন মানুষ করে অনেকটা ইনটিউশনের ওপর নির্ভর করে, বাকিটা নানা বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে। কম্পিউটারও একইভাবে চাল বাছাই করে, তবে এর ক্ষেত্রে ইনটিউশন বলে কিছু নেই। কম্পিউটার শুধু বিচার করে টার্মিনাল নোডে ঘুঁটি সমান সমান থাকছে কি না (মেটিরিয়াল), বেশী সংখ্যক ঘর কার দখলে থাকছে (স্পেস), বড়ের অবস্থান-প্রণালী (পন স্ট্রাকচার), ছকের মাঝখানটার কার দখল বেশী (সেন্টার কন্ট্রোল), ঘুঁটিসমূহের গতিশীলতা (মোবিলিটি), রাজার নিরাপত্তা (কিং সেফটি) ইত্যাদি বিষয়।

কম্পিউটারকে দেখতে হয় কোনো পজিশনে খেলার এই প্রত্যেকটি দিক ঠিক কি পরিমাণে রয়েছে। যেমন গতিশীলতার অর্থ কম্পিউটারের কাছে হতে পারে ঐ পজিশনে স্বপক্ষে মোট কতগুলি উত্তর দেওয়া সম্ভব। এইভাবে পজিশনের বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন পরিমাণকে অঙ্কে রূপান্তরিত করা হয়। অর্থাৎ গতিশীলতার জন্যে একটি অঙ্ক, স্পেসের জন্যে আর একটি অঙ্ক, সেন্টার কন্ট্রোলের জন্যে আরো একটি। এইভাবে যে বিভিন্ন অঙ্ক পাওয়া গেল তার প্রত্যেকটি অঙ্ককেই গুণ করা হয় বিভিন্ন 'কনস্ট্যান্ট' দিয়ে যে কন্স্ট্যান্টগুলি নির্ভর করে পজিশনের বিভিন্ন দিকের আনুপাতিক হারের। অর্থাৎ কনস্ট্যান্টগুলির আনুপাতিক হার

নির্ভর করে কোনো পজিশনে গতিশীলতা, সেন্টার কন্ট্রোল, রাজার নিরাপত্তা, বড়ের অবস্থান ইত্যাদির আনুপাতিক গুরুত্বের ওপর। এইভাবে যে সমস্ত অঙ্ক পাওয়া গেল, তাদের যোগফল হচ্ছে কম্পিউটারের কাছে সেই পজিশনের 'মূল্য' বা 'স্কোর'।

এইভাবে কম্পিউটার বার করে টার্মিনাল নোডে যে কটা পজিশন হতে পারে সেই পজিশনগুলির আলাদা আলাদা স্কোর। এবং এই পজিশন হতে পারে লক্ষ লক্ষ। এই লক্ষ লক্ষ পজিশনের মূল্যায়নের পর কম্পিউটার ঠিক করে কোন চাল দেওয়া যেতে পারে।

দাবার চাল এবং নিয়মকানুন কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তরিত করা, পজিশনের মূল্যায়ন শেখানো ইত্যাদির জন্যে দরকার জটিল অঙ্ক পদ্ধতির, এবং বড় বড় অঙ্ক-বিশারদের। অঙ্কের এই সমস্ত পদ্ধতি এবং বিরাট বিরাট সব অঙ্ক আগে থেকে একটি প্রোগ্রামের আকারে তৈরী করে কম্পিউটারকে দেওয়া হয়। এর পর শুধু বিপক্ষের চালটি কম্পিউটারকে জানিয়ে দিলেই কম্পিউটারও তার জবাব দেয়।

রিচার্ড ভাব গ্রীনব্লাট 'ম্যাকহ্যাক ৬' নামে যে কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরী করেছিলেন, বৃটিশ চেস্ ফেডারেশনের রেটিং অনুসারে এই কম্পিউটারের খেলোয়াড়ী দক্ষতা ১৪০—অর্থাৎ একজন সাধারণ ক্লাব খেলোয়াড়ের সমান। মন্দ কি। এই কম্পিউটার আবার মাঝে মাঝে ঘুঁটি চেপে দিতে পারে। এবং একবার একটি নৌকা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় আছে স্ট্যানফোর্ড প্রোগ্রাম, যা এই সেদিন একটি ম্যাচ হারল এক সোভিয়েট কম্পিউটারের কাছে। বৃটেনে ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আই, সি, এল ১৯০৯' নামে পরিচিত প্রোগ্রামটি লিখেছিলেন জন স্কট। তিনি স্কুল ছেড়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হবার আগে এই প্রোগ্রাম লিখেছিলেন। স্কটের প্রোগ্রাম অবশ্য ক্যাসল করতে পারে না, আঁ পাসা বা চলতি বড়ের মার জানে না, বড়ে অষ্টম ঘরে গিয়ে শুধু মন্ত্রী হতে পারে। তাহলেও ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরাই এর সঙ্গে খেলেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই প্রায় হেরেছেন।

ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব্ টেকনলজির তৈরী এক কম্পিউটার ত রীতিমত ওস্তাদ। একে এমন প্রোগ্রাম শেখানো হয়েছে যে, এ সমস্ত রকম দু চালে মাতের প্রব্লেম সমাধান করে দিতে পারে। আর একটি কম্পিউটার এমন এক কীর্তি করেছে, যা মানুষের মধ্যে একমাত্র ক্যাপাব্লাংকাই করতে পেরেছিলেন। ক্যাপাব্লাঙ্কা যেমন তার মাত্র ৪ বছর বয়সে তাঁর বাবার দাবা খেলা দেখতে দেখতে খেলার সমস্ত চালই শিখে নিয়েছিলেন, এই কম্পিউটারও সেই রকম অন্যের খেলা দেখেই সমস্ত চাল শিখে ফেলেছে। কেউ একে হাতে ধরে শিখিয়ে দেয় নি। তাজ্জব ব্যাপার নয় কি?

তাহলেও সব মিলিয়ে কম্পিউটারের খেলার মান খুব উঁচু নয়। মোটামুটি উঁচু মানের খেলতে পারে ড্রাফটস্ কম্পিউটার।

আজ থেকে বছর দশেক আগে এ, এল, স্যামুয়েল নামে একজন আমেরিকান একটি কম্পিউটারকে ড্রাফটস্ খেলা শিখিয়েছিলেন। তাঁর এই কম্পিউটার কানেকটিকাটের ড্রাফটস্ চ্যাম্পিয়নকে পর্যন্ত হারিয়ে দেয়। ড্রাফটস কম্পিউটার যদি এতদূর এগিয়ে যেতে পারে, তাহলে দাবার কম্পিউটার তা পারছে না কেন? এর একটা কারণ ড্রাফটসের চাল দাবার মত নানা দিক হিসাব করে দিতে হয় না। ফলে অনেক দূরে এমন কি খেলার শেষ পর্যন্ত চাল হিসাব করা যায়। তাছাড়া দাবা খেলায় বিভিন্ন রকম পজিশনের সম্ভাবনা ড্রাফটসের সম্ভাবনার থেকে অন্তত পক্ষে ১০০০ গুণ বেশী। উপরন্তু, ড্রাফটস কম্পিউটারের অনেক খেলার অভিজ্ঞতা থাকায়, প্রত্যেকটি পজিশন মূল্যায়ন করার সময় কম্পিউটার অনেক সময়ই স্মৃতির ওপর নির্ভর করতে পারে। ফলে এর বিশ্লেষণেও গভীরতা এসেছে। কিন্তু ড্রাফটসে যেখানে কয়েক হাজার পজিশন কম্পিউটার সেলের মধ্যে জমা রেখে দিলেই কিছুটা সুবিধা পাওয়া যায়, সেখানে দাবার ক্ষেত্রে অনুরূপ সুবিধা পেতে গেলে জমা করতে হবে অন্তত পক্ষে কয়েক মিলিয়ন বা বিলিয়ন পজিশন। কিন্তু এতেও তো মূল সমস্যার সমাধান হোল না। কারণ খেলার সময় যে চিন্তার ভিত্তিতে পেত্রোসিয়ান বা স্প্যাসকী সূক্ষ্ম চালের হিসাব করেন, সেই চিন্তাপ্রক্রিয়া কম্পিউটারের না জানার দরুণ তাঁদের মত সমান বা বেশী তাৎপর্যপূর্ণ চাল দিতে পারে না। ফলে প্রোগ্রামের প্রণেতারা যে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে দেওয়ার মত কম্পিউটার সৃষ্টির স্বপ্ন দেখছেন, সেই স্বপ্ন সার্থক হবে না।

তাহলে মূল সমস্যা হচ্ছে খেলার সময় একজন গ্র্যান্ডমাস্টারের মাথায় যে সব চিন্তা-প্রক্রিয়া চলতে থাকে, সেই প্রক্রিয়াকে কি করে অঙ্কে রূপ দেওয়া সম্ভব? এবং এই মূল সমস্যাটি যে একই সঙ্গে একটি অতি বৃহৎ সমস্যাও বটে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ কেউই নিজের চিন্তা-প্রক্রিয়াকে ঠিকমত ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। পুস্তকে বর্ণিত কার্য-প্রণালীকে (মেথড) কি করে কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তরিত করতে হবে, তার ওপর গবেষণা করে বারবারা হুবেরম্যান নামে একজন মহিলা স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি, এইচ ডি ডিগ্রী পেয়েছেন। তিনি ক্যাপাব্লাঙ্কার 'চেস্ ফান্ডামেন্টালস' নামে বই থেকে রাজা এবং নৌকা বনাম রাজা, রাজা এবং দুই গজ বনাম রাজা, এবং রাজা এবং গজ ও ঘোড়া বনাম রাজা—এই তিনটি স্ট্যান্ডার্ড এন্ড-গেম কম্পিউটারের ভাষায় অনুবাদ করেছেন। যদিও ক্যাপাব্লাঙ্কার বইয়ে এই 'এন্ড-গেম'গুলি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া আছে, তবুও এগুলি অনুবাদ করা যে কি কঠিন ব্যাপার, শ্রীমতী হুবেরম্যান তা মর্মে মর্মে অনুভব করে সে কথা স্বীকার করেছেন।

'দাবায় চিন্তার লজিকের কয়েকটি সমস্যা' এই নামে যে বিখ্যাত থিসীস প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডঃ পেত্রোসিয়ান ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে দিয়েছেন, তার এক জায়গায় ত তিনি বলেই ফেলেছেন যে, দাবা খেলাকে সরাসরি অঙ্কের ভাষায় রূপদান করার ফলেই কম্পিউটার দাবার মান আর এগুতে পারছে না। পেত্রোসিয়ানের মতে, এই পদ্ধতিতে একটি বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে, কারণ তাঁর মতে, দাবা খেলা বাহ্যতঃ ঘুঁটি নাড়ানাড়ি করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে খেলার সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত প্রকান্ড একটি লজিক এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামের প্রণেতারা দাবাখেলার প্রাণস্বরূপ এই লজিককেই উপেক্ষা করে গেছেন। পেত্রোসিয়ান বলছেন, চিন্তা নামে যে প্রক্রিয়া একজন দাবা খেলোয়াড়ের মাথায় চলতে থাকে, সেই প্রক্রিয়ার ওপরেই আগে গবেষণা করে আলোকপাত করা দরকার। কারণ, কম্পিউটারকে আগে খেলোয়াড়ের চিন্তা-প্রক্রিয়া শেখাতে হবে, তবেই এর জন্যে অঙ্কের মডেলও অনেক উন্নত করা যাবে এবং কম্পিউটারও একজন গ্রান্ডমাস্টারের মত চাল দিতে সক্ষম হবে।

কিন্তু তা কি সত্যই সম্ভব? তাহলে ত চিন্তা-প্রক্রিয়া কি বস্তু তাই আবিষ্কার করতে হয়। সেটা সম্ভব নয় ভেবে অনেকেই বলছেন যে, কম্পিউটারের পক্ষে কোনদিনই মানুষের চিন্তার সমান স্তরে আসা সম্ভব হবে না। মালমশলা দিলে সমস্ত জটিল গণনা কম্পিউটার হয়ত করে দেবে; কিন্তু মৌলিক চিন্তা তার পক্ষে অসম্ভব। আর দাবার গ্র্যান্ড-গ্র্যান্ডমাস্টার হবার আশাও কম্পিউটারের কাছে চিরকালই এক মোহময়ী ছলনা থেকে যাবে।

কিন্তু কম্পিউটারের স্বপক্ষেও তো দল বেশ ভারী আছে। তাঁরা বলছেন, 'সবুর, আর মাত্র পাঁচ কি দশ বছর দেখুন।'

এ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় আশাবাদী হলেন ভূতপূর্ব বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডঃ মিখাইল বংভিন্নিক। তিনি এবং তাঁর শিষ্য অঙ্কের ওস্তাদ শ্রীভ্লাদিমির বুতেঙ্কো নাকি প্রায় এক নূতন ধরনের 'এ্যালগারিসম' (কম্পিউটারের গণনা পদ্ধতি) আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এই এ্যালগারিসমকে অঙ্কের ভাষা থেকে মেশিনের ভাষায় অনুবাদ করার কাজও সমাপ্তপ্রায়। এক সাক্ষাৎকারে বংভিন্নিক বলেছেন, এ বছরই বা আগামী বছরের (১৯৭০) প্রথম দিকে তাঁদের কম্পিউটার রাশিয়ার 'মাস্টার' আখ্যাপ্রাপ্ত দাবা খেলোয়াড়দের হারাতে সুরু করবে। এইভাবে ধাপে ধাপে এগুতে পারলে কম্পিউটার যে একদিন গ্র্যান্ডমাস্টারদেরও হারাতে পারবে না বংভিন্নিক তা মনে করেন না।

একটি প্রথম শ্রেণীর দাবা-কম্পিউটার তৈরী হলে কি খেলাটির আকর্ষণ মানুষের কাছে কমে যাবে না? এই প্রশ্নের উত্তর বংভিন্নিক বলেছেন, একটি পরিষ্কার 'না'। তাঁর মতে, কম্পিউটার যদি পাকা খেলোয়াড় হয় তাহলে লাভ হবে অনেক। শিক্ষার্থীরা অনেক দ্রুত নিজেদের খেলার মান উন্নত করে নিতে পারবেন, বিভিন্ন টুর্ণামেন্টে খেলার জন্যে তাঁদের আর অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে না। ফলে সকলেরই খেলার মান বাড়বে এবং খেলায় উৎসাহ আসবে আরো বেশী। তাছাড়া, টুর্ণামেন্টে যা নিয়ে হামেশাই গন্ডগোল দেখা যায়—অর্থাৎ অসমাপ্ত খেলার ফলাফল ঠিক করা—কম্পিউটার তা একেবারে নির্ভুলভাবে করে দেবে।

তাছাড়া বংভিন্নিক বলেছেন, সম্ভব হবে বিভিন্ন যুগের বা শতাব্দীর খেলোয়াড়দের মধ্যে ম্যাচ খেলানো, যে সব খেলোয়াড় পরস্পরকে কোনোদিন চোখে দেখেনি এবং যে সব ম্যাচের ফলাফল জানবার জন্যে সমস্ত দাবার জগৎ এখনো উদগ্রীব: পল মারফির সঙ্গে ববি ফিশারের ম্যাচ, ফিলিদরের সঙ্গে মিখাইল তালের, ভেরা মেনচিকের সঙ্গে নোনা গ্যাপিন্ডাশভিলির ম্যাচ। তাছাড়া, বিশ্বচ্যাম্পিয়ন খেতাবের জন্যে এ্যালেখাইনের সঙ্গে বংভিন্নিকের যে ম্যাচটি খেলবার কথা ছিল, এবং এ্যালেখাইন হঠাৎ মারা যাওয়ায় যে ম্যাচটি হতে পারে নি, বংভিন্নিক সেই ম্যাচটির ফলাফল জানবার উৎসুক্যও প্রকাশ করেছেন।

টুর্ণামেন্টে যাঁরা খেলেন, তাঁরাও জেনে যাবেন সিসিলিয়ানের ড্র্যাগন ভ্যারিয়েশন, কিংস গ্যাম্বিট, বুদাপেস্ত কিংবা এ্যালেখাইনস ডিফেন্স সত্যসত্যই খেলা চলে কিনা।

কিন্তু এসব যখন সম্ভব হবে, চিন্তার রহস্য যখন সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হবে, কম্পিউটার যখন ফিশার-মারফি বা ক্যাপারাব্লাঙ্কা-এ্যালেখাইনের খিরীত খেলার ব্যবস্থা করতে পারবে, তখন কম্পিউটার ত সমস্ত দুনিয়াকেই কিস্তিমাৎ করে দেবে। জগৎ এবং জীবনে রহস্য বলে আর কিছু থাকবে না। পাঠক, সত্য করে বলুন, সেই রোমাঞ্চকর দিন পৃথিবীতে আসুক, এ কী আপনি সত্যিই চান?

●

কম্পিউটার কেমন দাবা খেলে নীচের খেলাটি থেকে ইন্সটিটিউট অব্ টেকনোলজি বনাম আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের, কম্পিউটার-দাবা প্রতিযোগিতা উপলক্ষে। অনেকগুলি খেলা হয়েছিল, তার মধ্যে এটি একটি। প্রতিযোগিতায় মস্কোর কম্পিউটারই জয়লাভ করেছিল।

সংলগ্ন টীকাগুলি বিজয়ী কম্পিউটারের ভাষ্যকার শ্রীএ এস ক্রনরডের। টীকাগুলি থেকে দাবা-কম্পিউটারের শক্তি ও দুর্বলতার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে।

সাদা: রাশিয়ার কম্পিউটার
কালো: ইউ এস এ কম্পিউটার

(১) ব—রা ৪ : ব—রা ৪ (২) ঘ—রা গ ৩ : ঘ—ম গ ৩ (৩) ঘ—গ ৩ : গ—গ ৪ (৪) ঘ×ব!

(সাদা ওপনিং বেশ ভালই শিখেছে। সাময়িকভাবে এই বড়ে মেরে ঘুঁটি মার দেওয়াই হচ্ছে সাদার খেলা খুলে নেবার সবচেয়ে ভাল উপায়)

(৪).....ঘ×ঘ (৫) ব—ম ৪ : গ—ম ৩ (৬) ব×ঘ : গ×ব (৭) ব—গ ৪ : গ×ঘ কিস্তি (৮) ব×গ : ঘ—গ ৩ (৯) ব—রা ৫ : ঘ—রা ৫

(আমরা খেলার একটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। চিত্র দেখুন।)

(১০) ম—ম ৩

(কম্পিউটার দাবার একটা নিজস্ব মজা আছে। মেশিন যান্ত্রিকভাবে হয়ত হিসাব করে দেখে লক্ষ লক্ষ চালের ধারা (সেকোয়েন্স), যে সব 'ইডিয়টিক' লাইনে কোন খেলোয়াড় একবারও চিন্তা করে না। এত বেশী ভাবার ফলে মেশিন হয়ত সাধারণ ভুল এড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু সময় নিয়ে নেয় অত্যন্ত বেশী, যদিও মেশিন সব সময়
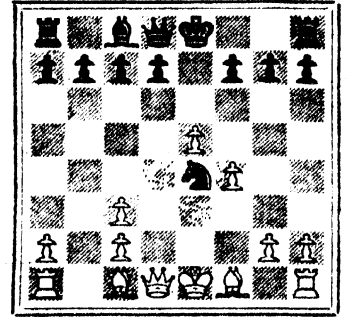
খুব দ্রুতগতিতেই হিসেব করে যায়। বিশ্লেষণে এক কণা গভীরতা বাড়ালেই সময় পড়ে অনেক বেশী।

মেশিন (১০) ম—ম ৫ চালটা ভেবেছিল কিন্তু দিল না কারণ (১০).....ঘ×ব (১১) ম—গ ৪। এই সময় যে কোন খেলোয়াড়ই একবার ছকের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে কালোর ঘোড়াটা মারা পড়ছেই, এমন কি কালো এখনি হার মেনে নিতে পারে। তাহলে সাদা মেশিন কেন এই পজিশনকে কালোর পক্ষেই ভালো ধরে নিল এবং (১০) ম—ম ৫ চালটা বাতিল করল?

কারণ, কালোর (১১).....ম—ন ৫ কিস্তি চালটা রয়ে গেছে। যদিও তখন সাদার একটি সুন্দর উত্তর রয়ে গেছে (১২) ব—ঘ ৩, কিন্তু মেশিনের ভাবার ক্ষমতার যে এখানেই পরিসমাপ্তি। মেশিন সাদার পক্ষে ৩টি এবং কালোর পক্ষে ২টি বা মোট ৫টি 'হাফ-মুভ'ই চিন্তা করতে পারে। সুতরাং, এই ৫টি হাফ-মুভের মধ্যে কালোর খেলা যদিও খুবই খারাপ হয়ে গেছে তবুও সাময়িকভাবে কালোর ১টি বড়ে বেশী থাকছে, সুতরাং সমস্ত লাইনটাই সাদার পক্ষে হার ধরে নিয়ে বাতিল!!

অবশ্য মেশিনকে অন্যায় নিন্দা করা ঠিক হবে না। চিত্রের অবস্থা থেকে মেশিন হয়ত ৫টি হাফ-মুভের সমস্ত কম্বিনেশনই চিন্তা করেছে, মোট প্রায় ১০২ মিলিয়ন চালের মত। যেমন এই লাইনটিও হয়ত মেশিন চিন্তা করেছে: (১০) ম—ম ৬ : ম—গ ৩ (১১) গ—ন ৬ : ঘ—গ ৭ (১২) ম—রা ৭ কিস্তি ইত্যাদি।

যাই হোক এইবার দেখা যাক খেলাটা কিভাবে শেষ হোল।

(১০)...ঘ—গ ৪ (১১) ম—ম ৫ : ঘ—রা ৩ (১২) ব—গ ৫ : ঘ—ঘ ৪ (১৩) ব—রা ন ৪ : বা—রা গ ৩ (১৪ ব×ঘ : ব×ঘ ব (১৫) ন×ব!!

মেশিন কেমন চাল দিল দেখুন তো!

(১৫)...ন—গ ১ (১৬) ন×ব : ব—গ ৩ (১৭) ম—ম ৬ : ন×ব? (১৮) ন—ঘ ৮ কিস্তি : ন—গ ১ (১৯) ম×ন মাৎ।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

যে-বেষ্টনীর মধ্যে আপনি বাস করছেন তাতে আছে বন্ধন, আছে একঘেয়েমি। এই ক্লান্তির হাত থেকে মুক্তি চাই। সেজন্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। যেতে হবে, পাহাড়ে কিম্বা সমুদ্রের ধারে—সমতলে কিম্বা প্রকৃতির কোলে—স-জনে কিম্বা নির্জনে।

অর্থাৎ আপনার একটা চেঞ্জ চাই, একটা পরিবর্তন। যাকে বলা যায়, ঘরের দিকে চোখ রেখে খানিকটা বাইরে ঘুরে-আসা। পরিচয় থেকে অ-পরিচয়ের দিকে যাত্রা। কিম্বা বলতে পারেন, নিজের অস্তিত্বকে আস্বাদন করার দ্বিতীয় প্রয়াস। দূরকে নিকট করে দেখা।

কিন্তু যাবেন কোথায়?

দেশান্তরী না হোক, স্থানান্তরী হবার আকাঙ্ক্ষা তো নিশ্চয়ই আপনারও। কেউ যাচ্ছেন ইতালী কিম্বা ফ্রান্সে, কেউ যাচ্ছেন টেমস-এর ধারে। আপনি ভারতীয় হলে আসুন পশ্চিমবঙ্গে। বিদেশী হলেও আসুন। পশ্চিমবঙ্গ আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আপনি তার আতিথ্য গ্রহণ করুন।

আপনি হয়তো ভারত সরকারের সেই বিখ্যাত পুস্তিকাটি পড়েছেন। ভাবছেন সর্বাঙ্গ। তাতে তো স্পষ্ট করেই লেখা আছে: "আদার পার্টস অব ইন্ডিয়া হ্যাভ এ গ্রেট ডিয়েল টু শো অব এ রিয়েল অ্যান্টিকুইটি টু হুইচ বেঙ্গল ক্যান লে নো রিয়েল ক্লেইমস।"

সত্যি বলছি, ও-সব কথায় বিশ্বাস করবেন না। আপনাকে প্রকৃতি দেখাবো। মৌসুমী অঞ্চলের সবুজ অরণ্যভূমি, শ্যামল শস্যক্ষেত্র, রাঙা মাটির পথ। পাহাড় দেখাবো। পাহাড়ের চূড়োয় শাদা বরফ। এবং বঙ্গোপসাগরের নীল জল। এখানে প্রকৃতি উদার, অনাবৃত। আপনাকে দু-হাত তুলে ডাকছে। নিষেধ মানবেন না, পশ্চিমবঙ্গে আসুন।

রবি ঠাকুর কতবার গেছেন হিমালয়ে। গেছেন দার্জিলিং। বাংলাদেশটা তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হয় নি। বোটে করে ঘুরেছেন পদ্মার তীরে তীরে। প্রকৃতির মধ্যে শুনেছেন জনকল্লোল। শান্তিনিকেতন হবার অনেক আগেই গেছেন বোলপুরে। ওখানকার নুড়ি-পাথর কুড়িয়ে আনন্দ পেয়েছেন ছোটবেলায়। নালার জলে হাত ডুবিয়েছেন। দূরশ্রুত শব্দের মতো শুনতে পেয়েছেন প্রকৃতির ডাক। আপনিও শুনতে পাবেন।

আসুন দার্জিলিং-এ। এখানকার প্রকৃতি ধ্যানমগ্ন, উদাসীন, কিন্তু ঐশ্বর্যময়। অনেকে বলেন, সুইজারল্যান্ডও তুচ্ছ হয়ে যায় দার্জিলিংয়ের কাছে। তার সমর্থন আছে, পৃথিবীর সর্বাধিক বিক্রীত বই ফোদোর্স টুরিস্ট গাইডে। তাতে বলা হয়েছে: "দার্জিলিং অ্যান্ড ইট্স সারাউন্ডিংস মেক সুইজারল্যান্ড লুক লাইক বাট কম্পারিজন। দেয়ার ইজ নো ফাইনার পেনস ইন দি ওয়ার্ল্ড টু স্টাডি ইটসেল্ফ ইন দি গ্র্যানজার অ্যান্ড বিউটি অব দি টাওয়ারিং স্নো-ক্যাপড মাউন্টেনস।"

আপনি মার্ক টোয়েনের কথা স্মরণ করতে পারেন। একবার নয়, বারবার আপনাকে দার্জিলিং আসতে হবে। মার্ক টোয়েন লিখছেন: "দি ওয়ান ল্যান্ড দ্যাট অল মেন ডিজায়ার টু সি, অ্যান্ড হ্যাভিং সিন ওয়ান্স—বাই ইভেন এ গ্লিমস—উড নট গিভ দ্যাট গ্লিমস ফর দি শোজ অব দি রেস্ট অব দি গ্লোব কমবাইন্ড।"

কার কথা বিশ্বাস করবেন আপনি?

এখানে দেখতে পাবেন উঁচু-নিচু পাহাড়, তুষারাবৃত পর্বত, কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্যাবলী, সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের বর্ণময় সমারোহ, উড়ন্ত মেঘ, ছোট রেলগাড়ী। সব মিলিয়ে প্রকৃতির রাজসিক আয়োজন। সারা ভারতের সাহেবসুবোরা এককালে এখানে এসে ভিড় জমাতেন গ্রীষ্মকালে। শীতকালে বড় ঠাণ্ডা। বর্ষাকালে বৃষ্টির উপদ্রব। এখানে আসুন মার্চ থেকে জুনের মধ্যে কিম্বা সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে।

দার্জিলিং হলো সেই জায়গা, হোয়েরার দি পাইন্স নিড্‌ল দি স্কাই। উদ্যান-প্রেমিকদের স্বর্গভূমি। রাস্তার ধারে ধারে অজস্র নাম-না-জানা ফুল, ফার্ণ, অর্কিড ও লতাগুল্মের গাছ। ওক, বাদাম, চেরী, ম্যাপ্‌ল গাছ দেখতে পাবেন এখানে ওখানে। আইভি লতা অজস্র। পার্বত্য এলাকায় ম্যাগনোলিয়া, ডালিয়া, ক্রিসেন্থিমাম দেখতে পাবেন। দার্জিলিং এবং তরাই অঞ্চলে রয়েছে দীর্ঘ বনভূমি - বাঘ, বন-বিড়াল, বাঘ, বুনো কুকুর, হরিণ, ভালুক, শেয়াল, চিতা, বাইসন, হাতী প্রভৃতি। প্রায় চৌদ্দ রকমের পাখির আবাস বলা যায় দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকাকে।

বঙ্গোপসাগরের সমতল থেকে দার্জিলিংয়ের উচ্চতা সাত হাজার ফুট। পিকনিক করতে পারেন বার্চ হিলে, দেখতে পারেন জুলজিক্যাল পার্ক, হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, ন্যাচারেল হিস্ট্রি মিউজিয়াম, টাইগার হিল, শ' খানিক বছরের পুরনো বোটানিক গার্ডেন। আরো কত কি!

আসলে কি করতে চান আপনি, তা আপনাকেই ঠিক করে নিতে হবে। প্রকৃতি জোগান দেবে উপভোগের সামগ্রী। কাছাকাছি রয়েছে মিরিক, কালিম্পং, কার্শিয়াং, সান্দাকফু-র সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য। আছে গোর্খা, নেপালী, তিব্বতী, ভুটানীদের আতিথ্য, শিল্পসামগ্রী ও লোকসংস্কৃতি। দার্জিলিং ব্যস্ত হবার জায়গা নয়, নিশ্চিন্ত হবার পরিবেশ।

আপনি দিল্লী, কাশ্মীর, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রী, কোনারক, পুরী, ভুবনেশ্বর, মানাকুলাত্তালী, সমগ্র দাক্ষিণাত্য ঘুরে এসেও নিরাশ হবেন না। বাংলাদেশ আপনাকে মুগ্ধ ও আবিষ্ট করবে।

উঁচু পাহাড়পর্বত থেকে নেমে আসুন জলপাইগুড়ি, মালদা, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, শিলিগুড়িতে! যত এলোমেলো বললাম নামগুলো। গৌড়, পাণ্ডুয়ার ঐতিহাসিক দিক আছে। আছে কোচ-বিহারের। জলপাইগুড়ির চা-বাগিচার সৌন্দর্যে আপনি আকৃষ্ট হবেন। এখানেও আছে বনভূমি। আছে অরণ্য সম্পদ।

কাজেই প্রকৃতি-উপেক্ষিত নয় পশ্চিম-বঙ্গ, বরং প্রকৃতি-আশ্রিত। দক্ষিণ দিকের নদীবেষ্টিত সুন্দরবনে যান। দেখবেন সুন্দরী, গরান আর হোগলার জঙ্গলে অজস্র জন্তু-জানোয়ার। আপনি সাহসী হলে ঘুরে দেখতে পারেন মোটরে কিম্বা নৌকায়। প্রকৃতির কী অপরিসীম দাক্ষিণ্য! জলের ওপরে মাথা নুইয়ে আছে গাছের ডালপালা। অজস্র পাখির আবাস এই সুন্দরবন। বলা যায়, আন্তর্জাতিক পাখির মিলনকেন্দ্র।

পৃথিবীখ্যাত 'রয়েল বেঙ্গল টাইগারের' জন্মভূমি তো এটাই।

ভারত সরকারের পুস্তিকায় এ সবের স্বীকৃতি নেই। ট্যুরিজম এদেশে এখনো ইন্ডাস্ট্রীতে পরিণত হয় নি। বিদেশী মুদ্রার টানাটানিতে পর্যটন বিভাগ খোলা হয়েছে। বিদেশে কত বই বেরোয় ট্যুরিস্টদের জন্যে। সকলে এসে দেশটাকে দেখুক, চিনুক—এটা ওদের কাম্য। সেজন্য পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে চায় নিজের দেশকে। পশ্চিমবংগও নিজেকে অনাবৃত করতে চায়—প্রকাশ করতে চায়। আসুন, পশ্চিমবংগে।

যদি সমুদ্রের ধার পছন্দ করেন, তাহলে যেতে হবে দীঘায়।

অতীতে দীঘা ছিল বীরকুল পরগণার অন্তর্গত। তার বর্তমান উন্নতি বেশীদিনের নয়। শেষ-অষ্টাদশ শতকে ওয়ারেন হেস্টিংস স্ত্রীর কাছে লেখেন : "বীরকুল ওয়াজ দি স্যানাটরিয়াম—দি ব্রাইটন অব দি ইস্ট অ্যান্ড দি নিউজ-পেপার্স অ্যান্ড কাউন্সিল সেনসন কনস্ট্যান্টলি দ্যাট সো অ্যান্ড সো ইজ 'গন টু বীরকুল ফর হিজ হেলথ'।"

প্রসঙ্গটি আছে সিডনী গ্রীয়ারের লেখায়। ১৭৮০ সালের বেংগল গেজেটে বীরকুলের আধুনিকীকরণ সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা ছাপা হয়। জায়গাটা সম্পর্কে বলা হয়েছে : "ইট হ্যাজ অলরেডী দি অ্যাডভানটেজ অব এ বীচ হুইচ প্রোভাইডেড পারহ্যাপস দি বেস্ট রোড ইন দি ওয়ার্ল্ড ফর ক্যারেজেস অ্যান্ড ইজ টোটালি ফ্রি ফ্রম অল নক্সিয়াস অ্যানিম্যালস একসেপ্ট ক্র্যাবস অ্যান্ড দেয়ার ইজ প্রপোজেল টু ইরেক্ট কনভেনিয়েন্ট অ্যাপার্টমেন্টস ফর রিসেপসন অব নোবিলিটি অ্যান্ড জেন্ট্রি অ্যান্ড অরগ্যানাইজ এন্টারটেইনমেন্টস।"

হেস্টিংস-আকাঙ্ক্ষিত এই মনোরম জায়গাটিতে নির্জনবাস মন্দ লাগবে না আপনার। সমুদ্রতীরে ঝাউবন, সুবিপুল সৈকতভূমি। সামনে নীল জল। সামান্য হাঁটলেই পাবেন উড়িষ্যার গ্রামসীমান্ত। এখানে সমুদ্র উচ্ছৃংখল নয়। ঝাউবনে বসে সময় কাটাতে পারেন একা এবং কয়েকজন। ঝিনুক কুড়োতে পারেন সমুদ্রোপকূলে কিংবা সমুদ্রশৈলার অংশাবিশেষ। বালির ওপরে বসে থাকতে পারেন জোয়ার না-আসা পর্যন্ত। ময়লা লাগবে না জামা কাপড়ে। আছে একটি ছোট্ট বাজার, পোস্ট-অফিস, সৈকতাবাস, সরকারী ডাক্তারখানা, কাফে, টেলিফোন।

সামান্য কিছু অর্থব্যয়ে প্রস্তুত থাকলে যেতে পারেন, গড়বেতা, ঝাড়গ্রাম, তমলুক, খড়্গপুর-এ। 'তাম্রলিপ্ত' এককালে প্রসিদ্ধ ছিল সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে। সমুদ্র ছিল তারই কাছাকাছি। ঝাড়গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য কি আপনি দেখতে চান না?

সমুদ্র-সান্নিধ্যে আসার দ্বিতীয় জায়গা আছে পশ্চিমবঙ্গে। তার নাম ফ্রেজারগঞ্জ। কলকাতার কাছাকাছি। পিকনিক করতে পারেন ডায়মণ্ডহারবারে। নদী এখানে বেশ চওড়া। অনেকখানি আকাশ পাবেন। ফ্রেজারগঞ্জ কিছুটা কষ্ট দেবে আপনাকে। নদীনালা পেরিয়ে যেতে হবে। সমুদ্র অনেক শান্ত। প্রকৃতির কাছে নিবিড়। ডায়মণ্ডহারবারে থাকতে চাইলে, উঠুন ডাকবাংলোয়। রেস্তোঁরা, বার, ডবল বেডের শয্যা, টেলিফোন, রেডিও—সবই পাবেন। আরামের পক্ষে ভালো। বিশ্রামেরও।

আসল কথা হলো, আপনার ইচ্ছা এবং অভিপ্রায়। ভেবে দেখুন, কী চান আপনি?

কলকাতাবাসী গরীব কেরানী হলে কাছাকাছি গ্রামগঞ্জটাও ঘুরে আসতে পারেন। যেতে পারেন বেড়াচাপা কিংবা ব্যাণ্ডেলে। ভারত সরকারের ১৯৫৫ সালের ছাপা পুস্তিকায় এত খবর পাবেন না। ওতে বোটানিক্যাল গার্ডেনের বড় গাছটার একটা ছবি আছে। ওখানেও যেতে পারেন। আধবেলার আরাম। তাই-বা মন্দ কি?

ব্যাণ্ডেল চার্চটাও তো আজকের নয়। পর্তুগীজ আমলের পুরনো স্মৃতি। ইমামবাড়ায় দেখতে পারেন, মহসীনের ঘড়ী আর প্রকাণ্ড সূর্যঘড়িটা। চুঁচড়োর গীর্জা, পর্তুগীজ সৈনাদের ব্যারাক, চন্দননগরের চার্চ, বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেবের মন্দির, হংসেশ্বরী মন্দির, পাণ্ডুয়ার বিজয়স্তম্ভ, তারকেশ্বরের মন্দির—সবই দেখতে পারেন হুগলী জেলাটা ঘুরে ঘুরে। একদিনেই দেখতে হবে, তার কোনো মানে নেই। ধীরে-সুস্থে দেখুন। ছুটিছাটার দিনগুলোতে মন্দ লাগবে না। শ্রীরামপুরের স্মৃতি ঐতিহাসিক। কেরী-মার্শম্যানের কথা মনে পড়বে।

বাঙালী পর্যটকরা পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে উদাসীন। তাঁরা হিল্লি-দিল্লী গিয়ে ভ্রমণ-কাহিনী লেখেন। নিজের দেশটা ঘুরে দেখেন না। এক হরিদ্বার-লছমনঝোলা নিয়েই লেখা হয়ে গেছে কয়েক ডজন বই। ঐতিহাসিক রোমান্সের মোগলাই রসদ বাংলাদেশে নেহাৎ-ই দুষ্প্রাপ্য। মুর্শিদাবাদ নিয়ে কিছুটা লেখা যায়। হয়েছেও। কিন্তু আগ্রা-দিল্লীর মতো বড় ধরনের হারেম ছিল না সিরাজের।

আপনি হাজারদুয়ারী দেখে আসতে পারেন।

নানারকমের প্রবাদ ও জনশ্রুতি আছে মুর্শিদাবাদকে নিয়ে। মুর্শিদ কুলি খাঁর নাম অনুসারে মুর্শিবাদ নামকরণ হয়েছিল জায়গাটার। শোনা যায়, এখন যেখানে মণি বেগমের মসজিদ, এখানেই ছিল 'চেহেল সেতুনে'। মুর্শিদ কুলি খাঁ নিজের দুষ্ট ছেলের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন এখানে বসে। এই মসজিদের কড়িবরগাহীন বিশাল গম্বুজগুলো দেখলে অবাক হতে হয়। কাটরা মসজিদ নামেও এটা প্রসিদ্ধ।

তার কাছাকাছি রয়েছে গোবরনালার ওপর তোপখানা। ২১২ মণ ওজনের বিখ্যাত জাহানকোষা কামানটি পড়ে আছে এখনো। দেখতে পারেন, ত্রিপলিয়া তোরণ-দ্বার। অবশিষ্ট আছে রোশনিবাগে সুজা খাঁর সমাধি। লালবাগের কাছেই আছে সরফরাজ খাঁর কবর। আলিবর্দীর জামাই নওয়াজেস মহম্মদ তাঁর স্ত্রী ঘসেটি বেগমকে খুশি করার জন্য তৈরী করিয়েছিলেন মতিঝিল। সিরাজউদ্দৌল্লা তার অনুকরণে তৈরী করান হীরাঝিল। মীরজাফরের বাড়ীটা আছে মুর্শিদাবাদে। দেখে আসুন, আলিবর্দী খাঁর মায়ের সমাধি খোসবাগ।

এই অনার্যপ্রধান বাংলাদেশটার প্রতি অনেকের রাগ আছে। রাঢ় দেশে এসে জনৈক জৈন ধর্মপ্রচারক নাকি কুকুরের তাড়া খেয়েছিলেন। সেই দুঃখে ওরা বাঙালীর নাম দিয়েছিলেন বয়াংসি। ভারত সরকারের পর্যটন বিভাগ মনে হয়, খবরটা জানেন। বেদবেদান্ত ঘেঁটে ও'রা লিখেছেন : "বেঙ্গল ফাইণ্ডস নো মেনসন ইন দি ভেদিক হাইমস অ্যান্ড ওয়াজ আউটসাইড দি কনভেনসানেল বাউণ্ডারিজ অব এরিয়ান সিভিলাইজেশন ইন ইটস আরলিয়ার স্টেজেজ।"

বিশেষ করে বাংলাদেশটা যেন কেমন কেমন, বিচ্ছিরি, অদ্ভুত। ও'রা বলেন : "দি পিকশ্চার ইজ প্যাচি। আউট অব দ্যাট ভ্যারাইটি অন ক্লিয়ার পিকশ্চার এমার্জেস, ফর দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল অ্যাজ সাচ হ্যাজ নট রিয়্যালি বীন কনটিনিউয়াস।"

আপনি হয়তো ভাবছেন, এ তো ভারি ঝকমারি হলো। কি করতে যাবো বাংলাদেশে?

আবারো বলছি, আসুন। পশ্চিম-বাংলার পক্ষ থেকেই বলছি। ঠকবেন না। আপনাকে দেবানন্দপুর, কাঁঠালপাড়া, ভাটপাড়া, জোড়াসাঁকো, সিমলা স্ট্রীট, পানিহাস, বনগাঁ যেতে বলছি না। বীরসিংহ গ্রামেও ইচ্ছে না থাকে যাবেন না। বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, নেতাজী, শরৎচন্দ্র, নজরুলের জন্মস্থানগুলো না-ই বা দেখলেন।

কিন্তু মালদা, বিষ্ণুপুরে যেতে আপত্তি কি? বীরভূম, কিংবা বাঁকুড়ায়?

পশ্চিমবাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো ছড়িয়ে আছে ওখানে। মালদার গম্ভীরা গান শুনতে পারেন কলকাতায় বসেও। কিন্তু ভগ্ন-স্তূপগুলো তো দেখতে পাবেন না!

বিষ্ণুপুরের স্থাপত্যভাস্কর্য তো অনন্যসাধারণ। মল্লরাজাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাবেন ওখানে। দেখে আসুন দলমাদল, লাল বাঁধ, মদনমোহন মন্দির। সংগীতের জগতে বিষ্ণুপুর ঘরানার নাম আছে।

কিংবা দেখে আসুন কৃষ্ণনগর ও বর্ধমানের পুরনো জায়গাগুলো। বর্ধমানের রাজবাড়ীটা এখনো আছে, কৃষ্ণনগর ভগ্ন-দশা। তবু ভারতচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলালের বাসভূমি তো। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সভাঁড় গোপালচন্দ্রকে নিয়ে সুখেই ছিলেন এককালে। দানধ্যানে তাঁর খ্যাতি তো জনশ্রুতির বিষয়। অন্তত দুটো চারটে মাটির পুতুলও তো কিনে আনতে পারবেন ওখান থেকে। শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কাটোয়া ছিল বৈষ্ণবদের আবাসস্থল। চৈতন্যদেবকে বাদ দিলে মধ্যযুগটাই যে

অন্ধকার! একা হোসেন শাহের কীর্তি-কাহিনী আর কত বলবেন?

উত্তর চব্বিশ পরগণা এককালে নীলকরদের কুঠিতে ঠাসা ছিল। এখন তেমন কিছু নেই। আছে খড়দা, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, হালিশহর। বসিরহাটে গিয়ে দেখে আসতে পারেন ভারত-পাকিস্তানের মানুষ কিভাবে ইছামতীর জল ভাগাভাগি করে খায়।

কেন্দুলি, নানুরে যেতে পারেন। জয়দেব-চণ্ডীদাসের জন্মভূমি। যেতে পারেন দামুন্যায়। বাঙালী হিসেবে আপনার কাছে যতটা ভালো লাগবে, অবাঙালীর কাছে এসব জায়গা ততটা স্মৃতিবহ নয়।

বীরভূমের মধ্যে শান্তিনিকেতন একা-ই একশ। কবিগুরুর পিতাঠাকুর ওখানকার ছাতিমতলায় দীক্ষা নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশ্বভারতী। আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটা কেন্দ্র বলা যায় শান্তিনিকেতনকে। কবিগুরুর স্বপ্ন ও সার্থকতার স্মৃতিবাহী। উদয়ন, বিচিত্রা, শ্যামলীতে যেতে পারেন। রামকিঙ্করের ভাস্কর্যগুলো দেখতে কিন্তু ভুলবেন না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কখন যাবেন?

পৌষ উৎসবে যোগ দিতে চান তো ডিসেম্বরের বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে যাবেন। বসন্তোৎসব হয় একুশে মার্চ। বর্ষামঙ্গলের তারিখ ঠিক নেই। ওটা বর্ষাকালেরই উৎসব। মাঘোৎসব হয় পঁচিশে জানুয়ারী। বৃক্ষরোপণ উৎসব ৭ই আগস্ট।

আগে থেকে যোগাযোগ করে গেলে খুব অসুবিধে হবে না হয়তো। শান্তিনিকেতনের অতিথিশালায় আপনি থাকতে পারেন পাঁচ থেকে আট টাকা দিয়ে। সঙ্গে নিয়ে যাবেন মশারি আর বিছানাপত্র। কিংবা উঠতে পারেন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ডাকবাংলো, বনবিভাগের ইন্সপেকসন বাংলো, টাটা গেস্ট হাউস, কিংবা সেচ বিভাগের ইন্সপেকসন বাংলোয়।

কাছেই তারাপীঠ আর বক্রেশ্বর। বীরভূমের দুটো উপেক্ষিত স্থান।

একটু কষ্ট করতে হবে আপনাকে। সিউড়ী থেকে তারাপীঠ তের মাইল। ওখান থেকে মোটরে যাওয়া যায় ম্যাসানজোর। তারাপীঠের মন্দিরটি তৈরী করিয়েছিলেন রাণী ভবানী। জনশ্রুতি আছে, সতীর চোখের তারা পড়েছিল ওখানে। কালীঘাটের মন্দির সম্পর্কেও আছে লোকশ্রুতি। দক্ষিণেশ্বর যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনক্ষেত্র, তেমনি তারাপীঠ সাধক বামাক্ষ্যাপার। মাইল কয়েক জুড়ে রয়েছে একটা বিরাট শ্মশান। ভরদুপুরেও ওখান দিয়ে পথ চলতে আপনার গা ছমছম করবে।

সিউড়ী থেকে বারো মাইল দূরে বক্রেশ্বর। রাজগীরের সঙ্গে তুলনা করা যায় জায়গাটাকে। উষ্ণ প্রস্রবণ আর স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। ওখানে কুণ্ড আছে

কুণ্ড। প্রতিটি কুণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটি করে লৌকিক কাহিনী। সংগুধারার জল প্রতি মুহূর্তে একটা বিরাট বাঁধানো চৌবাচ্চার মধ্যে জমা হচ্ছে। শীতকালে স্নান করার পক্ষে আরামপ্রদ।

এভাবেই গ্রামবাংলা ছড়িয়ে আছে লৌকিক আর ঐতিহাসিক সম্পর্কসূত্রে। এখনো মাটি খুঁড়লে পাওয়া যাচ্ছে ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপাদান। ধর্মমঙ্গলের ঐতিহাসিক নিদর্শন ঢেকুর গড়।

বলুন, এসব কি আপনার দেখতে ভালো লাগবে না?

উত্তরবাংলার ছিমছাম শহর, বৃষ্টিধোয়া চায়ের বাগান, দুর্গাপুরের কলকারখানা, আধুনিক বাংলার বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র। দেখে আসুন দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন। শিল্প সমৃদ্ধিতে দুর্গাপুর উজ্জ্বল। পঞ্চাশ হাজার মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছে এই সুদৃশ্য শিল্পনগরী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোক-ওভেন প্রজেক্ট তার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। সোভিয়েত বন্ধুত্বের প্রতীক মাইনিং মেশিনারী প্ল্যান্ট। ফরাসী সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড। তাছাড়া রয়েছে ইস্পাত কারখানা। জাপান-কানাডা সহযোগিতার নিদর্শন অ্যালয় স্টীল প্রজেক্ট।

রাত্রিবাসের কোনো অসুবিধা নেই দুর্গাপুরে। সর্বাধুনিক ডিজাইনের টুরিস্ট লজ। এয়ার-কন্ডিশনড ঘর। সুন্দর লন। পর্যটন বিভাগের বাসে ঘুরে দেখতে পারেন দুর্গাপুর ব্যারেজ, দামোদরের ভিউ। কেবল বাঙালীরাই এখানকার বাসিন্দা নয়। কাজ করেন ভারতের নানা প্রান্তের লোক। বিদেশীরাও সংখ্যা কম নন।

এই আন্তর্জাতিক সমাবেশে পশ্চিমবঙ্গ মুখর।

আপনি গাঁয়ের দিকে যেতে না চান কোলকাতায় আসুন। নানাদেশের লোক আছে এখানে। আছে মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, আর্ট কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকুরিয়া লেক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, পরেশনাথের মন্দির, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম। এ শহরটা জায়গা দিয়েছে বহু কবি সাহিত্যিক, রাজনীতিক, মনীষী আর দেশপ্রেমিককে। যে-কারণে আপনি দিল্লী-বোম্বাই-মাদ্রাজ ঘুরতে প্রস্তুত, সে-কারণে আসুন কলকাতায়। তারচেয়েও বেশী আনন্দ এবং তৃপ্তি পাবেন এখানে এসে। গঙ্গার দুধারে অজস্র কলকারখানা। আউটরাম ঘাটে বসে থাকলেও দেখতে পাবেন ভাগীরথীর দুপারের আলোকসজ্জা।

দিল্লী কি তার চেয়েও আকর্ষণীয়?

ইডেন গার্ডেনের সেই ভাঙা প্যাগোডাটা দেখতে পাবেন গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে। সারাটা দিন বসে থাকতে পারবেন লেকের ধারে। কেউ আপনাকে বাধা দেবে না, গড়ের মাঠে শুয়ে থাকতে।

শুনেছি চেস্টার বেলজের মেয়ে নাকি কলকাতায় এসে রীতিমতো উল্লসিত হয়েছিলেন। আপনি নিশ্চয়ই সে খবর জানেন না। তিনি লিখছেন : "আই ওয়াজ অ্যামেজড। আই অ্যাম ডেড ইফ আই কাম টু নিউ ইয়র্ক।"

কলকাতার ট্রাম, বাস, ঠেলাগাড়ী, লোকজন ট্যাক্সি আর নিয়নের আলো দেখে নাকি তাঁর খুব ভালো লেগেছিল। এমন কি কলকাতার দশকও।

এককালে গড়ের মাঠটা ছিল য়ুরোপীয়দের প্রমোদ উদ্যান। তাদের যা-কিছু, ক্রিকেট-ফুটবল, রেসকোর্স, বেড়ানো, ঘোড়ায় চড়া সবই হতো গড়ের মাঠে। এখনো সেই মাঠ আছে। তেমনি সবুজ, তেমনি উদাসীন, তেমনি বিস্তৃত।

ইংরেজ লেখিকা মিসেস মিচেল তো বলেছিলেন, গড়ের মাঠটা হলো : "অ্যাজ গ্রেট অ্যান্ড গ্রীন অ্যাজ অ্যানি ইংলিশ পার্ক।"

এদেশের লোকেরা বিদেশে গিয়ে কাফে-রেস্তোরাঁয় আড্ডা মারে। বিশেষত ফরাসীরা নাকি দারুণ আড্ডাবাজ। আপনি কলকাতার কফি হাউসকে সে রকম একটা আড্ডাকেন্দ্র ভাবতে পারেন। উৎসাহ থাকে তো সারাদিন ধরে কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে গল্পগুজব করুন।

আপনি বলতে পারেন, কলকাতাটাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা যেতো পার্কগুলিকে নিয়ন লাইট আর গাছগাছালি দিয়ে, কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করা যেতো এখানে ওখানে, স্থায়ী আর্ট গ্যালারি করা যেতো অনেকগুলো, উন্নত মডেলের বাড়ী তৈরী করা যেতো চণ্ডীগড়ের মতো, ভাগীরথীর জলে ভাসানো যেতো অজস্র ময়ূরপঙ্খী নৌকো কিংবা সুদৃশ্য লঞ্চ-বোট, তরুণ-তরুণীরা জড় হতে পারতো গঙ্গার প্রশস্ত পথে। সে সব তেমন কিছুই করা হয়নি। সম্ভব হচ্ছে না কিছুতেই।

কৈফিয়তের মতো মনে হতে পারে, আমার এই আত্মকথন। হাওড়া-শিয়ালদায় আপনার জন্যে কোন অভ্যর্থনার আয়োজন নেই ঠিকই। টুরিস্ট বাস অপেক্ষা করে থাকবে না আপনার অপেক্ষায়। কেউ বলবে না, চলুন বাবু, কলকাতা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি, মাত্র দুচার টাকা লাগবে। কিংবা কেউ আমন্ত্রণ জানাবে না, কামারপুকুর কিংবা হাওড়া-হুগলীর দ্রষ্টব্য স্থান দেখার জন্যে। গাড়িঘোড়া আছে। আপনাকে ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

আপনি হয়তো অভিযোগ করবেন। আমাদের দোষ স্বীকার করতে হবে। বাংলাদেশের মেলা আর লোক-উৎসবগুলি আপনাকে দেখানো দরকার। উপজাতীয়দের মুখোশ নাচ, বাউল গান, কীর্তন—সবই আপনি দেখতেশুনতে পারেন। টুরিস্ট ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কিছুটা খবরাখবর পেতে পারেন। না হয়, নিজেই খোঁজ-খবর করে চলে যাবেন কেন্দুলির মেলায় কিংবা অন্যত্র। কথাবার্তা বলতে পারেন কুমোরটুলির কুমোর কিংবা কালীঘাটের পটুয়াদের সঙ্গে।

বাংলাদেশ অনেকখানি বেঁচে আছে তার লোকসংস্কৃতি আর উৎসবের মধ্যে। তাকে না জানলে, বাংলাদেশ দেখা সম্পূর্ণ হবে না আপনার।

আর কলকাতার কথা বলছেন?

একশ আটত্রিশ বছর আগেকার একটা ইংরেজী বইতে লেখা আছে, কলকাতা শহরটা নাকি অনেকটা সেন্ট পিটার্সবার্গের মতো। বইটির নাম : ক্যাপটেন মুন্ডিজ ন্যারেটিভ।

সেকালের কলকাতা অবশ্য তেমনটি নেই। জন মুলেন্স-এর মতটাই খাঁটি। তিনিও শতবর্ষ আগেকার লোক। কলকাতার লোকজন নানা শ্রেণী ও বর্ণের মানুষ দেখে ভদ্রলোক বলেছিলেন, এটা একটা আন্তর্জাতিক শহর।

হয়তো নিজের সীমানায় বসে আপনি হাঁপিয়ে উঠেছেন। রবি ঠাকুরের মতো নিশ্চয়ই আপনারও বলতে ইচ্ছে করছে : "চলো, চলো, চলো। ঝরণার মতো চলো, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চলো, প্রভাতের পাখির মতো চলো। সেজন্যেই তো পৃথিবী এমন বৃহৎ, জগৎ বিচিত্র, আকাশ এমন অসীম।"

পশ্চিমবাংলা আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আপনি পশ্চিমবঙ্গে আসুন। ভেবে দেখুন, কোথায় থাকবেন—শান্তিনিকেতন না দার্জিলিংয়ের শৈলাবাসে, কলকাতায় না দীঘার সৈকতাবাসে। সময় থাকে তো সারা পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে দেখুন।

ভবতোষ সাহা
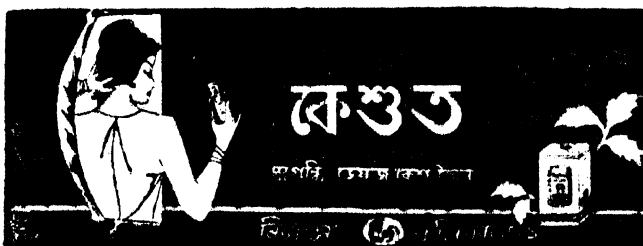
সাজগোজ

একটা গল্প মনে পড়ে গেল। একজনের কাছে শোনা। যার সার কথা, মরতে রাজি তবু সাজগোজ ছাড়তে পারবো না। এমনি মাহাত্ম্য। যতদিন রূপ-রস-গন্ধ আছে ততদিনই চাকচিক্য অমলিন রাখার জোর চেষ্টা। কোন ত্রুটি রাখা নয়। তাই শেষ শখের প্রলেপ আলতোভাবে চালাতে চালাতে মনের কোণে ভাবনা জমে, সব হলো তো? প্রসাধনের দ্বিতীয় মাহাত্ম্য এটা। সব শেষ না হওয়ার ভাবনায় সময় নেয় অনেক। তাই গুছিয়ে সাজগোজ করার পরও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সময় কেটে যায় বেশ কয়েক মুহূর্ত। ঘুরেফিরে নিজেকে দেখি। বারবার। আশ মিটিয়ে। যখন আপনাতে আপনি বিভোর তখনই শেষ দৃষ্টিপাত। খুশি খুশি মনে হাফ ছেড়ে সিধে হয়ে দাঁড়াই।

যূঁই বন্দ্যোপাধ্যায়

ফটো : অমৃত

কেউ কেউ আরো ভাগ্যবান। মনের মত সাজেন। অনেকক্ষণ ধরে। এক সময় সমাপ্ত হয় প্রসাধন পর্ব। ডাক পড়ে আর একজনের। তার মনের সঙ্গে মিলিয়ে নেন। প্রসাধনের সুরভি তখন আরো সুরভিত। খুশির আমেজে অপরূপ রূপে যেন কথা কয়। সময়সাপেক্ষ সাধনা সার্টি-ফিকেট পেয়েছে। এ আনন্দ রাখবার জায়গা নেই। যদি এটুকু না পাওয়া যায় বৃথাই খাটাখাটুনি। গুচ্ছের শিশিবোতল আর কৌটা সাজিয়ে সাজতে বসা। তাই সার্টিফিকেট চাই। নিজের মনের মতো সাজের সঙ্গে আর একজনের মন মিলিয়ে নেবার সৌভাগ্য যার নেই তিনি আশা করবেন অন্য কিছু।

সেজেগুজে বেরিয়েছেন। আলতো পায়ে রাস্তায় চলছেন। অন্যমনা। চোখ সতর্ক। কান খাড়া। কেউ হয়তো পরি-পূর্ণ নয়নে তাকালেন। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। অবজ্ঞার ভাব। কিন্তু পথচারীর সুস্থ হাসিটি নজর এড়ায়নি। আর তখনই পরিপূর্ণ। সন্তোষ এবার উপছে পড়ে। রূপচর্চায় সার্টিফিকেটই হলো আসল। কেউ যদি না তাকায়, মন খুলে প্রশংসা না করে তাহলে অত করে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় খুইয়ে সেজেগুজে কি ফলটা হলো! সে আপশোষটুকু মিটে গেলে রূপগর্বিতা প্রসাধিকা নারীকে আর পায় কে। ফুর-ফুরে হাওয়ায় তিনি প্রজাপতির মতো ডানা মেলে দেন। কোন ক্ষোভ নয়, বেদনা নয়, কেবল আনন্দ। সেই আনন্দে তিনি নিজে মাতেন, দশজনকে মাতান।

'লেডিস স্পেশালের' সেই ভদ্রমহিলার সঘন দীর্ঘশ্বাস বড় করুণ। বেশ সাজগোজ করেছেন। শখ স্পষ্ট। কিন্তু পরিমাণ জানেন না। তাই পুরু প্রসাধনেও বেমানান। একদিন মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেই ফেললেন, এত যে সাজগোজ করি কেউ ফিরেও তাকায় না। তার কথায় হাসির খোরাক। আশেপাশের মেয়েরা হেসে অস্থির। ও ওর গায়ে ঢলাঢলি। তিনিও হাসিতে যোগ দেন। অনেক দুঃখে যে কথাটা বললেন তার মর্মার্থ কেউ নিতে পারেনি। এজন্য তিনিও হাসছেন। তার হাসির মাত্রাটা সকলের চেয়ে বেশিও বটে।

প্রসাধনে মাত্রাজ্ঞানই সারাৎসার। এ বোধ যার আছে তিনি বাজিমাৎ করলেন। আর যার সাতে হয় না, তার সতেরো ছেড়ে সাতাশেও হয় না। তাকে এমনি আক্ষেপ করে যেতে হয়। অথচ প্রসাধন সামগ্রী

সুস্মিতা সান্যাল ফটো : অমৃত

ব্যবহারের পাল্লাটা তার দিকেই বেশি ভারি। আবার পরিমিতি বোধে সেই মেয়েটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কত সুন্দর মনে হচ্ছিল। একটু খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়। কাছে যাই। না, বেশ বড় রকমের খুঁৎ আছে চেহারায়। কিন্তু সব ছাপিয়ে গেছে। সহসা ধরাই যায় না। ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপের লোভ সংবরণ করতে পারিনি। তার সৌন্দর্যের গোপন চাবিকাঠি হাতড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে। দু-এক কথার পর এ প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। কথা অন্য খাতে বইলো। সব কথা জানাতে তিনি রাজি কেবল এটি বাদ দিয়ে। রূপচর্চার প্যান্ডোরা বক্সের চাবিকাঠির সন্ধান কাউকে দিতে নারাজ। শুধু ছোট হেসে বললেন, মাত্রাজ্ঞান। ভদ্রমহিলার হাসিতেও তাই।

গাদা গাদা প্রসাধনে বাজার ছেয়ে গেছে। রূপবতীদের সাজাতে রূপকারদের ব্যস্ততার সীমা নেই। তাই প্রসাধনে-প্রসাধনে ছয়লাপ। রূপচর্চার টেবিলে প্রসাধন সামগ্রীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলে। উপকরণের ভিড়ে মাথা ঘুরে যায়। কোনটা ফেলে কোনটা রাখি। পরস্পরে আলাপ-আলোচনা চলে। প্রসাধন ঠিক হয়। কয়েকজনে মিলে একই জিনিস কেনে। তাতেই সাজে। তবু ওরা স্বতন্ত্র। শেষ টানে সবাই যাদু সৃষ্টির চেষ্টা করে। আর এখানেই একজনের সঙ্গে আর একজনের তফাৎ। বলে বটে, শেষ টান। আসলে তা নয়। তফাৎ শুরু হয় গোড়া থেকেই। আর তাই 'গায়ে দাঁড়ায় শেষ টানে। অর্থাৎ রূপচর্চার প্রকার চিন্তায় একজনের সঙ্গে আরেকজনের আসমান-জমিন ফারাক। ব্যাকারণে ব্যাকরণে গুরুতর প্রভেদ। এই স্বাতন্ত্র্যের স্বাদটুকুই আসল। এ না থাকলে সব নীরস। পাখির গান, ফুলের বাসনাই, নদীর কলতান সব অর্থহীন। হাসিমুখ মন ছোঁয় না। এজন্যই স্বাতন্ত্র্য। একজনের সঙ্গে আরেকজনের মেলে না। জনে জনে তফাৎ তাই বিস্তর।

প্রসাধন। ঘষামাজা করে ধোয়ামোছা। 'বেস ওয়ার্ক' করতেই সময় যায় অনেক। বাড়ির যেমন ভিত, প্রসাধনে তেমনি 'বেস ওয়ার্ক'। এখানে কাজ কাঁচা হলে সব-কিছু কেঁচে যাবে। শত অলংকরণেও দাঁড় করানো যাবে না। যার পরিণতি, পপাত ধরণীতল। তাই সবকিছুর আগে এদিকে নজর দিতে হয়। সময় নিক ক্ষতি নেই। তবু কাজটা গুছিয়ে করতে হবে। তারপর চলবে রূপচর্চা। এখানে যিনি নিখুঁত রূপ-চর্চায় তিনি পরিপাটি। তার অঙ্গরাগে সবাই মুগ্ধ হবেন। সেই সুন্দর ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করবেন। ঈপ্সিত সার্টিফিকেট হাতের মুঠোয়।

প্রসাধনে আমরা অতীত অনুসারী। প্রসাধন সামগ্রীতে নয়, প্রসাধনের মৌল রূপে। সেদিন রূপবতী সায়রে গা ডুবিয়ে যখন উঠতো তার যৌবনভার অপেক্ষা করতো প্রসাধনের। দীর্ঘ কেশ-ভার এলিয়ে সে বসতো। ধূপের ধোঁয়ায় চুল শুকুতো। সুগন্ধে মেঘবরণ কেশ আমোদিত। তারপর অগুরু চন্দনে অঙ্গ-রাগ। কুসুম অলংকরণে রূপচর্চা সমাপ্ত। স্বল্প বেশবাস আর প্রসাধনের সুপ্রয়োগে দেহ জুড়ে অপরূপ লাবণ্য। রূপগর্বে উগ্র-মগ্ন বরনারী বসতো কুসুমিত উদ্যানে অথবা তরুশোভিত মর্মর আসনে। সেখানে বসে প্রতীক্ষা করতো অনুরাগী সুজনের রং-এর খেলা। বাইরে বইতো পরিচ্ছন্ন দিগন্তের উল্লাস। কাজল টানা দু'চোখে তার বেদনার ঝনাৎকার। প্রিয় মিলনের আকাঙ্ক্ষা।

প্রসাধনে আমরা সেই ঐতিহ্যই বয়ে নিয়ে চলেছি। সেদিনের সঙ্গে আজকের প্রকারভেদ অনেক। কিন্তু মৌল তফাৎ নেই। সেখানে অতীত এবং বর্তমান একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। যা কিছু হচ্ছে তা শুধু ডেভেলপমেন্ট। বৈচিত্র্যের কোন ব্যাপার নেই। শুধুই এগিয়ে যাওয়া। তাই সাজগোজে এত সময়। বেস ওয়ার্কের পর পাউডার, স্নো, রুজ, সুর্মা, লিপস্টিক। ভুরু আঁকা, আই শেড। সর্বশেষে আবার পাউডার পাফ। প্রসাধন শেষ। হাত পা ছড়িয়ে টান টান হয়ে এবার দু'চোখ মেলে দেখে নেওয়া। পরিতৃপ্তি। নিজের সুবাসে নিজে আমোদিত। আরো অনেকের মাতোয়ারা হওয়ার পালা। সেই যে ভদ্র-মহিলার আক্ষেপ, এত সাজের পরও যদি কেউ না ফিরে তাকায়। তাকালেই সার্থক। নইলে ফক্কা।

এ হলো সাজ। এরপর সজ্জা। দুয়ে মিলে সাজসজ্জা। একই সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে। আগে আর পিছে। একে অপরের পরিপূরক। বিচ্ছিন্ন অংশকে ধরে যেমন গোটা দেহের কল্পনা করা যায় না তেমনি সাজসজ্জার একটিকে বাদ দিয়ে আর একটির কথা ভাবা যায় না। মনের মত সাজবার পর তাই ভাবতে হয় মিলিয়ে মিলিয়ে পোশাকের কথা।

পোশাক অর্থেই হাল ফ্যাশান। ছাল-বাকলের দিন সুদূরে অতীত। 'চলছে চলবে'র যুগ এখন। তাই রূপসীকে আর সময়ক্ষেপ করতে হয় না হাতের কাছেই পোশাক প্রায় প্রস্তুত। তবু একটু থমকে দাঁড়াতে হয়। দু-দণ্ড সুস্থির হয়ে ভাবতে হয়। দেহ বর্ণের সঙ্গে পোশাক খাপ খাওয়া চাই। আকৃতির সঙ্গে মানানসই। সর্বোপরি প্রকৃতি যাতে স্পষ্ট হয়। ব্যক্তিত্ব যেন লঘুতে না পরিণত হয়। অত-শত ভাবনা মাথায় নিয়ে পোশাক নির্বাচন। তারপর আজকের ফ্যাশান জগৎ। রীতিমত সময়সাপেক্ষ।

সাজে রূপ খোলে। কিন্তু পোশাক নির্বাচনে দেহবর্ণ প্রাধান্য পায়। ফর্সা হলে কথা নেই। সব রং-এই মানিয়ে যায়। এত সাজের পর তবু পেস্টল রং-এ তারা অপরূপ। কালো হলে অবশ্য অন্য ভাবনা। গাঢ় রং তখন সযত্নে এড়িয়ে চলতে হবে। সব সময় হালকা রং-এর দিকে টান। সাদায় আবার এদের মানায় খুব।

যে রং আর শাড়িই হোক আকৃতির সঙ্গে মানানসই হওয়া চাই। শরীর ছিপছিপে হলে কথা নেই। হরেক রং হাতের সামনে হাজির। তখন আবার ভাবনা কাকে ছেড়ে কাকে রাখি। তবে ছিপছিপে দেহধারীদের সাধারণতঃ সাদা, হলদে আর পেস্টল রং-এ দেখায় ভাল। আবার শরীর যদি ভারী হয় তবে কালোয় অতটা বুঝতে পারা যায় না। বেশ ছিপছিপেই মনে হয়।

এবার আসে ব্যক্তিত্ব। সাজপোশাক যেমনই হোক এখানে কেউ লঘু হতে রাজি নয়। তাই সবদিক গুছিয়ে এনেও এখানে এসে আবার আটকে যেতে হয়। দেহ, বর্ণ এবং আকৃতিতে যে রং উপযোগী তা ব্যক্তিত্বের সহায়ক নাও হতে পারে। ফর্সা এবং ভারী মহিলাকে কালো রং-এ মানায়। কিন্তু হয়তো তিনি কালো রং-এ খুব একটা স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না। সেক্ষেত্রে কালো রং ছেড়ে তাঁকে অন্য রং-এর কথা ভাবতে হবে। রং অনুকূলে এলেও মন স্বচ্ছন্দ না হলে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ হবে না। প্রকাশভঙ্গী অনেকখানি জড় হয়ে যাবে। তাই যে রং যার মনের মতো সেই রং-এর পোশাক নির্বাচনই উপযুক্ত।

সময় সময় রুচির প্রশ্নও রং নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কোন উজ্জ্বল রং চোখে ধরলেও মন খুঁতখুঁত করে। অথচ রংটা ছাড়তেও ইচ্ছা হয় না। সঙ্গে সঙ্গে সেই রং-এর সঙ্গে অন্য রং-এর মিলমিশ খাওয়ানোর কথা এসে পড়বে। ফলও অনেক ক্ষেত্রে হাতে হাতে পাওয়া যায়। রুচি তখন অতুলন।

রং নির্বাচনই কিন্তু সব নয়। ফ্যাশানের রাজ্যে অত সহজে নিস্তার পাওয়ার উপায় নেই। দুনিয়াজোড়া তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে ফ্যাশান নিয়ে। হৈ-চৈ এর অন্ত নেই। উত্তেজনা কখনো মিইয়ে যাওয়ার অবসর পায় না। সব সময় গনগনে। যে কেউ সে উত্তাপে একটু হাত সেঁকে নিতে পারেন। এই ডামাডোলের বাজারে ফ্যাশানবিলাসীরা বরং একটু বেকায়দায় পড়ে গেছেন। আজকের ফ্যাশান কাল অচল। চব্বিশ ঘন্টার নোটিশও অনেক সময় পাওয়া যায় না। এখানে সমস্যা ভীষণ। সব গুছিয়ে এনেও নিস্তার নেই।

কিছুদিন আগে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা। দর্জির দোকানে। ব্লাউজের অর্ডার দিয়ে বলে গেল, দেখবেন বডি লাইন যেন শার্প হয়। আজকের ফ্যাশানের সার কথা বলে গেল মেয়েটি। লজ্জা নিবারণ যেমন সাজানোও তেমনি পোশাকের উদ্দেশ্য। একটা করতে গিয়ে আরেকটাকে বিসর্জন দিলে চলবে না। লজ্জা নিবারণ তো হবেই দেহের প্রকাশও স্পষ্ট হওয়া চাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরই পোশাকে এই চিন্তা উথালপাথাল। তার আগে অধিকাংশ শরীরে এক বাণ্ডিল জামাকাপড় বয়ে বেড়াতো। দেহ সৌন্দর্য প্রকাশে এত যত্ন দেখা যায়নি।

গত শীতের একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা এখনো স্মরণে আছে। শহরে সেদিন কনকনে ঠাণ্ডা। রাস্তাঘাটে লোকজনও তেমন নেই। সবাই তাড়াতাড়ি লেপের তলায় ঢুকে পড়েছে। ঠাণ্ডা কাটানোর জন্য একটু দ্রুত পা চালাই। বাস আসতেই হাত দেখিয়ে উঠে পড়লাম। বসতে গিয়ে দেখি সামনের সীটে দুটি মেয়ে। এত শীতেও কারো গায়ে কোন গরম জামাকাপড় নেই। এমনি বারোমেসে পোশাক। বেশ আঁটোসাঁটো। টানটান। কেমন কৌতূহল হয়। সেধে আলাপ করি। ফাঁকা বাসে আলাপ জমতে দেরি হয় না। একথা-সেকথার পর এ প্রসঙ্গ আসতেই ওরা সরাসরি বললো, এত কষ্ট করে সাজগোজ করি তাও যদি জামাকাপড়ে চাপা পড়ে যায় তবে আর খাটাখাটনি করে লাভ কি? সত্যি তো, দেহ যদি আড়াল হয়ে যায় তবে সাজপোশাক একদম নিরর্থক।

এই হলো ইদানীং কালের ফ্যাশান মর্জি। বডি লাইন শার্প হবে, দেহ প্রকাশ স্পষ্ট হবে তবেই ফ্যাশান। এজন্য কত তোলপাড়। শ্লীল-অশ্লীলের মাত্রা নিয়ে তুমুল কচকচি। স্নীভলেশ আর লো-কাটের গমক এখনো কাটেনি।

... ব্লাউজেই আমরা সাজি। হালে অন্যান্য পোশাকেরও বাজার জমিয়েছে মন্দ নয়। অভিজাতদের মধ্যে শালোয়ার-কামিজের সঙ্গে সঙ্গে স্ল্যাক্‌সও বেশ জায়গা করে নিয়েছে। স্ল্যাক্‌স শোভিত তরুণী এখন দেখা যায় অনেক। কিছুদিন আগেও এ পোশাকে রাস্তাঘাটে বেরুতে সংকোচ করতো। সে ভাব এখন অনেকখানি কেটে গিয়েছে। স্ল্যাকসের পাশাপাশি চলছে স্কার্ট-মিনি স্কার্টের বহুল ব্যবহার। উল্লেখ্য, এ-সবই টিন-এজারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গণ্ডী যে কোনদিন অতিক্রম করবে না একথা হলফ করে বলা যায় না।

পোশাকে কিছু পাল্টাও হয়েছে। তিব্বতি উদ্বাস্তুরা এদেশে আসার পর ওদের কোন কোন পোশাক আমাদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। নাইট গাউন হিসেবে এর ব্যবহার অনেককেই করতে দেখা যায়। কিছুটা ছাটকাট হয়েছে। নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে তাই আমরা গ্রহণ করেছি। দু-একটি অন্য বিদেশী পোশাকের বেলায়ও এই রীতি অনুসৃত হয়েছে। তবে নিজের পোশাকেই আমরা সবচেয়ে বেশি গৌরবদীপ্ত। বিশেষ, আমাদের শাড়ি-ব্লাউজের কদর যখন বিদেশেও।

শীত ছুঁই ছুঁই। এখন হালকা-পলকা। তারপরই জমজমাট। পোশাকের বাহারও তখনই। বিজ্ঞাপনের ভাষায়, শীতকালেই তো সাজগোজ। কার্ডিগান-কোটের মেলা বসে যাবে। আর আজকের পোশাকের তুমুল বিবর্তনের মধ্যে বডি লাইন শার্প আর দেহ প্রকাশ স্পষ্ট রেখেও ফ্যাশান করা যায় কি না, এ ভাবনা যেমন ফ্যাসানবিলাসীদের তেমনি ফ্যাশানকারদের। পুরনোর ভাংচুরে নতুন কি দাঁড়ায় সেটাই লক্ষণীয়।

আশিস সান্যাল

অলঙ্কারের প্রতি রমণীর আকর্ষণ চিরকালের। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সব দেশেই রমণীসমাজ অলংকারে ভূষিতা হয়ে নিজস্ব রূপশ্রী বাড়াতে ভালবাসেন। অলংকার রমণীর অনেক দুঃখকেও ভুলিয়ে দিতে পারে। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে এর একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। ধনপতি সওদাগর রূপসী খুল্লনার পাণিগ্রহণ করছেন শুনে তার প্রথমা পত্নী লহনা কান্নাকাটি জুড়ে দেন। চতুর স্বামী তাকে পাটের শাড়ি ও পাঁচ পল সোনার চুড়ি দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি আদায় করেন। কবি লিখেছেন—

"পরিতোষে লহনারে দিয়া পাটশাড়ি।
পাঁচ পল সোনা দিল গাড়িবারে চুড়ি।।
• •
বস্ত্র পেয়ে যত্নে নিল লহনা যুবতী।
বিবাহের তরে তবে দিল অনুমতি।।

এই তুলনা দেখে হয়ত অনেক রমণীই এতক্ষণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। ভাবছেন, রমণীসমাজের প্রতি এ অকারণ কটাক্ষ। স্বামীপ্রেম থেকে অলংকারের মূল্য কোন রমণীর নিকটই বেশি হতে পারে না। যে-সময় ও পরিবেশে কবিকংকণ এ-কথা লিখেছেন, তার বিকৃত ব্যাখ্যা হয়েছে। হতে পারে। কিন্তু অলংকারের প্রতি লোভ নেই, ক'জন নারী জোর করে এ-কথা বলতে পারেন? আপনারা কি প্রায়ই স্বামী বেচারার কাছে আবেদন করেন না—'এইবার টাকা পেলে আমাকে একটা হার করে দিও। অমুকদি কি সুন্দর একটা হার করিয়েছে।'

অলংকারের প্রতি ভারতীয় নারীর আকর্ষণের কথা বহু প্রাচীনকাল থেকেই জানা যায়। অজন্তা, ইলোরা বা প্রাচীন শিল্পকর্মের প্রতি দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে, সেই বিস্মৃতপ্রায় যুগেও অলংকার নারী-সমাজের কিরূপ প্রিয় ছিল। সেকালেও সাধারণ সমাজের রমণীরাও অলংকার ব্যবহার করতেন। তবে সেইসব অলংকারের অধিকাংশই নীলা, পলা, ঝিনুক এবং নানা বর্ণাঢ্য পাথর দিয়ে তৈরী হত। তাছাড়া পুষ্প ও লতার অলংকার রমণীরা পরিধান করতেন।

কালিদাসের 'মেঘদূতে' পুষ্পালঙ্কারের কিছু কিছু পরিচয় আছে। অলকাপুরীর রমণীদের কথা বলতে গিয়ে কবি লিখেছেন, তারা করপুটে নীলাকমল ধারণ করেছে। কালো কেশে তাদের কুন্দ কচি, অলকচূড়ায় নব-কুরুবক, আর চারু দুটি কানে শিরীষ ফুল।

সেই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে পুরুষরাও যে কিছু কিছু অলংকার পরিধান করত, তা বিরহী যক্ষের বর্ণনায় পাওয়া যায়। কবি লিখেছেন—

"তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবিপ্রযুক্তঃ স কামী,
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।"

চর্যাপদেও পুষ্পালংকারের কথা আছে। উঁচু উঁচু পর্বত—সেখানে শবরী বালিকা বাস করে। তার গলায় গুঞ্জারের মালা। 'মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।'

প্রাচীন যুগে স্বর্ণালংকারের ব্যবহার ধনিক সমাজের বাইরে বিশেষ প্রচলিত ছিল না। সাধারণের মধ্যে স্বর্ণালংকারের প্রচলন হয় মোগল আমল থেকে। তাও অল্প-বিস্তরভাবে। তারপর থেকেই সাধারণ ও দরিদ্রসমাজে স্বর্ণালংকারের প্রচলন বেড়ে যায়। এর কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তাকে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সরলভাবে বলতে গেলে বলা যায়, এই ব্যাপারে আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রথম থেকেই একটা জট পাকান হয়েছে। তাই আমাদের দেশে বিয়ের সময়ে পিতামাতা যত দরিদ্রই হোন না কেন, সাধ্যাতিরিক্ত অলঙ্কার দিয়ে থাকেন আর পাত্রপক্ষও এই

জোলি/ববিতা

ব্যাপারে নিতান্ত কম যান না। বিয়ের সময়ে পাত্র যেরকম উপযুক্তই হোক না কেন, কিছু না কিছু স্বর্ণালংকার আদায় করে থাকেন।

যা হোক, যে কথা বলছিলাম, মধ্যযুগ থেকেই ভারতীয় সমাজে স্বর্ণালংকারের প্রচলন বেড়ে যায়। 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে সেকালের বাঙালী রমণীর অলংকার-প্রীতির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। রমণীরা কুলদীপম্ শংখ অর্থাৎ দুই হাতে খিল দেওয়া শাখা এবং বাম হাতে নোয়া পড়ত। তাছাড়াও অভিজাত সম্প্রদায়ের রমণীরা বিচিত্র ধরনের অলংকারে নিজেকে ভূষিতা করতেন। খুল্লনার রূপ বর্ণনায় কবি-কংকণ লিখেছেন—

"গলে শতেশ্বরী হার শোভে নানা অলঙ্কার
করে শংখ শোভে তাড় বালা।
অনাত্র অঙ্গুরী কেনবার পর কালকেতু আর যেসব জিনিস কেনেন, তার বর্ণনা :
"হীরা নীলা মতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা
ঝিনিল কুন্তল স্বর্ণচুড়ি।।"

বৈষ্ণব পদাবলীতেও সেকালের পুরুষ ও রমণী যে বিভিন্ন ধরনের অলংকার পরিধান করতেন, তার অজস্র ছবি ফুটে উঠেছে। কবি শ্রীকৃষ্ণের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্য-চঞ্চল কাল অঙ্গে নানা রত্নালংকার ঝলমল করছে। মনে হয় যেন কালিন্দীর তরঙ্গে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব ভেসে চলেছে। কবির ভাষায়—
"অঙ্গে নানা অভরণ কালিন্দী তরঙ্গে যেন
চাঁদ চলিছে হেন বাসি।
মিশামিশি হেল রূপে ডুবিলাম রসের কূপে
প্রাণ অঙ্গে হেরি কত শশী।।"
সে কালের নারীরা যে গলায় 'মোতিয়া হার' এবং পায়ে নূপুর পরিধান করত। শ্রীরাধিকার রূপবর্ণনায় বিভিন্নভাবে বৈষ্ণব কবিরা তার পরিচয় দিয়ে গেছেন। অভিসারের সেই বিখ্যাত পদটিতে আছে কমলের ন্যায় কোমল পদের নূপুর শ্রীরাধিকা বস্ত্রখণ্ডে আবৃত করেছেন, পাছে নূপুরের শব্দ হয়, এই আশংকায়। কিংবা অন্যত্র অভিসারের আবেগে দ্রুত ব্যস্ত শ্রীরাধার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও সেকালের রমণীর অনেক অলংকারের পরিচয় পাওয়া যায়। রাধা তখন উল্টো করে কাপড় পরেছেন অঙ্গদ দিয়েছেন কানে। সিঁথি-পাটি বালা মনে করে পরেছেন হাতে, আর কুণ্ডলকে করেছেন আংটি। কিংকিণীজালকে মালা বলে কণ্ঠে ধারণ করেছেন, হার দিয়ে সাজিয়েছেন হাত। চূড়ার সাজ চলে এসেছে পায়ে, আর পায়ের সাজ গিয়েছে মাথায়। সেইরূপ অলঙ্কার ভূষিতা রাধাকে কবি চিত্রিত করতে গিয়ে লিখছেন—

"বিপরীত চীর পহিরি হরি সাজল
দুহুঁ অঙ্গদ দুহুঁ কানে।
গাঁথি বলয় করি হাথে সাজাওল
কুণ্ডল মুদরিক ভানে।।
কিঙ্কিণী জাল মাল করি পহরল
হার সাজাওল হাতে।
চূড়ক সাজ করি চরণহি পহিরল
মঞ্জীর পহিরল মাথে।।"

উনিশ শতকে রুচির অনেক পরিবর্তন ঘটে। একালের অলংকার-প্রীতির মধ্যেও সেই সময় একটা বিপুল পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু অলঙ্কারের প্রতি ভালবাসায় কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। মেয়ের বিয়েতে যৌতুক হিসাবে তখন থেকেই অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এরকম একটি পরিচয় পাওয়া যায়। "ধনদাস বাণিজ্যহেতু চীনদেশে নির্মিত একটি বিচিত্র কৌটো পেয়েছিলেন। কৌটো অতি বৃহৎ—ধনদাসের পত্নী তাতে অলঙ্কার রাখতেন। ধনদাস কতকগুলি নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করে পত্নীকে উপহার দিলেন। শ্রেষ্ঠি-পত্নী পুরাতন অলংকারগুলি কৌটো সমেত কন্যাকে দিলেন।" সেকালেও অবশ্য নারীরা অঙ্গের ভূষণ হিসাবে অলংকার পরত।

সম্প্রতি কালে কিন্তু বেশি অলঙ্কার ব্যবহারের রীতি নেই। হাত-ঘড়ি একালে বোধহয় প্রধান অলংকারে পরিণত হয়েছে। কারো হাতে চুড়ি কিংবা গলায় সরু মালা এবং কানে সূক্ষ্ম কারুকার্য করা দুল—এই হল এ-কালের রমণীর অলঙ্কার। কিন্তু ঘরে অলঙ্কার রাখেন না, এমন রমণী একালেও দুর্লভ।

সোনা ক্রমাগত মূল্যবান ও দুর্লভ এক প্রকার ধাতুতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। ১৯৬৩ সালে যখন স্বর্ণ আইন আরোপ করা হয়, তখন থেকেই ভারতীয় রমণীদের স্বর্ণালংকারের প্রতি অত্যধিক প্রীতির বিপক্ষে নানাপ্রকার যুক্তি দেখান হতে থাকে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের রমণীরা যখন স্বর্ণালংকার ছাড়াই চলছেন, তখন ভারতীয় রমণীদের স্বর্ণালংকারের প্রতি আগ্রহ অনুচিত। উত্তরে অনেকে বলবেন, এককালে যেমন গৃহিণীর ভারী ক্যাশ-বাক্সটি সম্বল থাকায় কন্যাকে সৎপাত্রে দান বা হাতছাড়া জমির পুনরুদ্ধার এদেশে সম্ভব হয়েছে, তখন ভারতীয় মহিলারা সেই কথা মনে রেখে অলংকারের প্রতি এখনও এমন দুর্বলচিত্ত। এখনও তো অনেক ছাত্রের ফি-এর টাকা মায়ের মকরমুখো বালা বন্ধক রেখে দিতে হয়। অস্বীকার করি না।

অলংকারের প্রয়োজনীয়তা কতখানি? অলংকারের দ্বারা নারীর সৌন্দর্য কতদূর মাধুর্যমণ্ডিত হয়, সে-ব্যাপারে সাহিত্যে অলংকার সম্বন্ধে ধ্বন্যালোককারের উদাহরণটিই উদ্ধৃত করব। মনে করা যাক, কোন সুন্দরী রমণী অলঙ্কারে ভূষিতা হলেন। মনে করা যাক, অলঙ্কারের জন্যই তিনি এত সুন্দর। কিন্তু যদি তখনই তার মৃত্যু হয়, তখন সেই মৃতদেহের উপর অলংকার পরালে কি তাকে সুন্দর দেখাবে? নিশ্চয়ই না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অলংকার তাকে মাধুর্যমণ্ডিত করেনি। তার সুন্দর দেহশ্রীই তার সৌন্দর্যের মূলে। অলংকার তাকে সাহায্য করেছে মাত্র। তবে অত্যধিক অলঙ্কার পরিধান করলে তা সাহায্য না করে বরং ক্ষতিই করবে। দেহশ্রীই প্রধান। তাই সেইদিকেই ভারতীয় রমণীদের প্রথম দৃষ্টি দিতে হবে। অলংকার অবশ্যই চাই। কিন্তু দেহ-লাবণ্যকে ঢাকা দিয়ে নয়। লক্ষ্য রাখতে হবে, কার কতখানি অলঙ্কারের দরকার। এই পরিমিতি-বোধেরই অলংকার পরিধানের সাফল্য।

সন্ধ্যা সেন

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ক্ষণিকের ভাবনার তাৎক্ষণিক মূল্য অপরিহার্য হলেও এর আয়ু ক্ষণকালীন। কিন্তু সহনশীলা ধরিত্রীর মতই হঠাৎ-উপচে-ওঠা নানাভাবের উচ্ছ্বাসকে স্বীকার করে নিয়েও একটি চিরকালীন শাশ্বত ধারা অবিচলিত নিয়মে সদা প্রবহমান। এ ধারার ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই এবং জ্ঞানে-অজ্ঞানে, চেতনে, অবচেতনে মানুষের মন এই ধারাটিই খুঁজছে।

এই শাশ্বত ধারাটিই সংস্কৃত যুগে গান্ধর্ব-সঙ্গীত বা ধ্রুবাগীতি এবং হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যুগে ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ নামে পরিচিত। ধ্রুবপদ মানে যার পদ ধ্রুব এবং যে পদদ্বারা অবিনাশী ব্রহ্মকে অনুভব করা যায়। শব্দ এখানে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হবার এই ঊর্ধ্বমুখী আকুতি দিয়েই ভারতীয় সঙ্গীতের সুরু। ধ্রুবাগীতির সময় চারটি খণ্ডে গান রচিত হোত—উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুবা ও আভোগ।

হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ (বৈজু বাওয়ার যুগে) আস্থায়ী অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ—এই চারটি ধ্রুবপদ বিভক্ত।

আস্থায়ী—হোল স্থায়িত্ব, যেখানে ঘুরে ফিরে আসতে হবে। নানান গতি, ছন্দ, লয় ও চাঞ্চল্যের পর স্বাভাবিক নিয়মেই আবার আপন আবাসে ফিরে আসা। অধ্যাত্ম-দর্শনের ভাষায় স্থায়ীকে জ্ঞান বলা যায়।

অন্তরা—স্থায়িত্ব থেকে অন্তরে প্রবেশের শক্তি। মধ্য এবং তারাস্থানে বিস্তারের পরিক্রমণশীল প্রসারতা—যার প্রসাদে সুরের ধ্বনি করতে করতে শিল্পী অন্তর্মুখী সংঘার সঙ্গে মুখোমুখি হবার প্রেরণায় যেন এগিয়ে যাবার গতি খুঁজে পান। এই গতি হোল বিজ্ঞান।

সঞ্চারী—হোল সমচারণ। স্থায়ী ও অন্তরা এই দুই-এর মধ্যে যাওয়া-আসা, ঘোরা-ফেরা, একবার দূরে যাওয়া একবার কাছে আসা। এই সঞ্চারণ হোল কর্ম, যার ফলে শিল্পী আপন কল্পনাশক্তিকে বিস্তৃত করেন।

আভোগী অংশে অন্তরা থেকে তারাগ্রামে লয়ের গতি বাড়ানো—তথা পরমাত্মার চরণে আত্মনিবেদনের আবেগের চরমে পৌঁছান।

কোন আঙ্গিক জ্ঞানের বিতর্কিত ক্ষেত্রে প্রবেশ না করে সাদামাটা ভাষায় এই হোল ধ্রুপদের অবিমিশ্র রূপ বা পটভূমিকা।

নিয়মবন্ধতা, ধ্রুপদের ভিত্তি, আবার আবার এই নিয়মবন্ধতার মধ্যেই শিল্পীর নবসৃষ্টির পথ বা স্বাধীনতার বীজ নিহিত। এইখানেই ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীতের তফাৎ। স্বরলিপি-বদ্ধ হয়েও হৃদয়ের মুক্ত প্রকাশের বিস্তৃত অবকাশ এখানে আছে। গ্রহ, অংশ, ন্যাস, বাদী, সমবাদী অণুকার ইত্যাদির বিস্ময়কর বৈচিত্র্যও যে অরূপের রূপৈশ্বর্যের প্রকাশ ইউরোপীয় সঙ্গীতে নিয়মবন্ধতার এতটুকু নড়চড় হবার উপায় নেই। ঋষিদের তপস্যালব্ধ এই ধ্রুপদ ক্রমশঃ তানসেনের মাধ্যমে সম্রাট আকবরের দরবারে এল। এতদিন অবধি যা একান্তভাবেই ঈশ্বরের আরাধনা ছিল দরবারে পরিবেশিত হওয়ার দরুণ তার মধ্যে রাজা বা সম্রাটকে মানবদেহে দেবতারূপে বা দেব-অংশরূপে স্তুতি করা হোত।

আবার আবহমানকাল ধরে মার্গ-সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরাল ধারায় বিভিন্ন দেশে সাধারণ মানুষের আনন্দ, বেদনার প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদে সাদামাটা লোকসঙ্গীতের এক গীতিকাব্যধারা গড়ে ওঠে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনেক গুণী এইসব লোকসঙ্গীত ও অনার্যজাতির মধ্যে প্রচলিত সুরের মিশ্রণ ঘটিয়ে দেশী রাগের সৃষ্টি করেন। দেশগত এবং জাতিগত ভিত্তিতে এই রাগগুলির নামই এদের উৎপত্তির পরিচয়-বাহক। 'আহীর' বা গোয়ালাদের গানের সুর থেকে 'আহীরি', পুলিন্দ জাতির সুর থেকে 'পুলিন্দিয়া', 'ভীরবা' জাতির সুর থেকে 'ভৈরবী' রাগের সৃষ্টি। আবার 'সৌরাষ্ট্র' দেশের সুর থেকে 'সুরাট', কর্ণাট দেশের সুর থেকে 'কানাড়া', কলিঙ্গ দেশের সুর থেকে 'কালাংড়া', সিন্ধু দেশের সুর থেকে সিন্ধবী 'সিন্ধুড়া' ইত্যাদি বহু পুরোন রাগ দেশীসুরে গঠিত হয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাধারণ্যে প্রচলিত সুরের স্পর্শের দরুণ এই রাগের আবেদন একদিকে যেমন সর্বব্যাপী হয়েছে অন্যদিকে রাগ-সঙ্গীত পর্যায়ের সর্বলক্ষণ প্রয়োগ করে (আরোহী, অবরোহী, বাদী, সমবাদী, পকড় ইত্যাদি দশটি লক্ষণ) একে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

খেয়ালের অধ্যায়ের প্রথম যুগে সূচিত হয় পার্শী কবি আমীর খসরু রচিত 'কাওয়ালী খেয়াল' থেকে। ইনি আলাউদ্দিন খিলজির দরবারের গুণী। পারস্য সংস্কৃতি প্রচারকার্যে পারস্যের folk song এর মেজাজ, ভাব ভাষার সঙ্গে ভারতীয় ভাষা (ব্রজভাষাও ছিল) মিশিয়ে পারস্য পদ্ধতির কৌল, কালোয়ান, গুলনাক্স ইত্যাদি কাওয়ালী পদ্ধতির গান প্রচলন করলেন। মোকাম (প্রধান), সুব্বা, গোস্বা—এই খেয়ালের অন্তর্ভুক্ত। পার্শীয়ান চঙে তারাণা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ এঁরই অবদান। পার্শীয়ান ভারতীয় রাগের মিশ্রণে জিলা, কাফি, সাজগিরি, জিলফ, পিলু, 'গনম্‌সনম্‌' ইত্যাদি বহু রাগ এবং পাঞ্জাবী সং, ফিরদৌসী, তিলবাড়া তাল এই যুগ থেকেই চলে আসছে। দরবারে গুণীদের আনুকূল্যে হলেও এ খেয়াল বিশিষ্টতা লাভ করেছে। হিন্দুস্থানী খেয়াল নয়।

হিন্দুস্থানী খেয়ালের সুরু জৌনপুরের সুলতান হোসেন সুর্কীর আমল থেকে। ইনি একাধারে কবি ও গায়ক। স্বরচিত রাগে হিন্দুস্থানী ভাষায় বিলম্বিত খেয়াল এঁরই সৃষ্টি। এঁর রচিত জৌনপুরী টোড়ি, হোসেনী কানাড়া বিখ্যাত। বিভিন্ন অঞ্চলের গুণীদের একত্র করে 'প্রথম সঙ্গীত-সম্মেলন' আহ্বান করে সুলতান পণ্ডিতসমাজের অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করেন।

কিন্তু তাঁর সৃষ্টি অতি সীমিত ছিল। ধ্রুপদের কাঠামোসহ যথার্থ খেয়াল প্রচলন করেন তানসেনের দৌহিত্রবংশীয় নিয়ামৎ খাঁ। বাদশাহের মনোরঞ্জনার্থে তানের বৈচিত্র্য ও বাহারের ঔজ্জ্বল্য দীপ্ত খেয়ালের একান্তভাবে এই সময় থেকেই শুরু। বাদশাহের কাছে নিয়ামৎ আলি 'সদারঙ্গ' উপাধিভূষিত হন।

ধ্রুপদের কাঠামো থাকল আবার শুদ্ধ ভক্তিভাবের রদবদল করে বিচিত্র ভাব-প্রকাশের নানারঙা আবেগ বা মানবিক আবেদন থাকায় বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর শ্রোতসমাজেও খেয়াল বিস্তৃত হয়। তবে বাইরের নানা ভাবকে

আত্মসাৎ করে আপন কারীগরী দেখিয়ে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করার দিকে শিল্পীচিত্ত ধাবিত হওয়ায় ধ্রুপদের ধ্যানগাম্ভীর্য এখানে অনেকটাই বিচলিত।

এরপর টপ্পার যুগ। টপ্পার মূল স্রষ্টা পঞ্জাবের সরী মিঞা। এঁর পিতা লক্ষ্ণৌতে সুপ্রতিষ্ঠিত খেয়ালী ছিলেন। পিতার সঙ্গে মনান্তর হওয়ায় লক্ষ্ণৌ ছেড়ে স্বদেশে গিয়ে পাঞ্জাবী ফোক্ সঙের ঢঙে জমজমা প্রধান লঘু রাগসংগীত সৃষ্টি করলেন। কাফি, সিন্ধু, ভৈরবী, সিন্ধু-খাম্বাজ, যোগিয়া, সরপর্দা ইত্যাদি জমজমার সুরের উপযোগী রাগ বেছে নিয়ে যে আবেগ-প্রধান এবং 'শ্রুতিমধুর' আঙ্গিক সৃষ্টি হোল তারই নাম টপ্পা। এই টপ্পা ওস্তাদকুল বাহিত হয়ে বাংলাদেশে এল এবং বাংলার সজল মাটির স্পর্শে ও নিধুবাবুর কল্পনারঞ্জিন মনের ছাঁচে পড়ে এক অতুলনীয় রসরূপ লাভ করল। এই টপ্পাই 'নিধুবাবুর টপ্পা', প্রাণোচ্ছলতাই এর সৌন্দর্য। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই টপ্পা ধ্রুপদ খেয়ালের পরেও গাওয়া হোত। ভক্তি ও প্রেম উভয় জাতীয় সংগীতই টপ্পার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে হাওড়ার কালিপদ পাঠকের কাছে এই গান শুনতে পাওয়া যায়। গ্রামোফোন কোম্পানী-কৃত শ্রীপাঠকের একটি রেকর্ডও আছে।

ঠুংরী—প্রথম রূপ বাদশাদের আমলের খাড়ী-ঠুংরী। বাঈরা কথক নৃত্যের সঙ্গতরূপে এই গান ব্যবহার করতেন। গহরজান, মালিকজান, মালিককাফুরের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

উচ্চাঙ্গ ঠুংরীর শুরু লক্ষ্ণৌর নবাব আসুফদ্দৌলার সময় থেকে। এঁর সময়ে কদর পিয়া নামে প্রসিদ্ধ কবি—বাঙ্গনান্দদীপ্ত উচ্চাঙ্গ ভাবের বহু গান রচনা করেন। লঘু রাগাশ্রিত এই গানে দাদ্রা, কাহারবা যৎ প্রভৃতি তাল ব্যবহৃত হোত। খাম্বাজ, পিলু, যোগিয়া, ভৈরবী রাগেই প্রধানতঃ ঠুংরী গাওয়া হোত—এবং ঠুংরী মূলত প্রেম-সংগীত। তবে অ-লৌকিক (রাধা-কৃষ্ণ) এবং লৌকিক উভয় প্রকার প্রেমসংগীত লোক-সংগীতের বাহন হোল ঠুংরী। সুকুমার-ভাবের পেলব-কোমল প্রকাশের উপযোগী সুরের সূক্ষ্ম কাজ এবং বোল-তানই এর আঙ্গিক-বৈভবের বৈশিষ্ট্য। এ-ছাড়া হৃদয়াবেগের রংবাহারী বিস্তারের আধার ঠুংরীতে কীর্তনের আখরের মত বোলবানানা এবং ভাও-বাতানা ত আছেই। আবার নৃত্যাভিনয়ের অংশবিশেষ থাকায় এ-গানের প্রকাশ-বৈচিত্র্যের শিল্পকৃতির অবকাশও প্রচুর। ঠুংরী-রচয়িতারূপে শ্রেষ্ঠ কবি-খ্যাতি অর্জন করেন লক্ষ্ণৌর কদর পিয়া ও সনদ পিয়া। ওয়াজিদ আলি খাঁও নামী ঠুংরী রচয়িতা ছিলেন। সারেঙ্গী বাদক ও বাঈদের মাধ্যমে ঠুংরীর গীতের অঙ্গের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে এবং এর বিস্তার কথকের নৃত্যবিদ্-সহযোগে। এই প্রসঙ্গে কালিকাপ্রসাদ, বিগাজীনের নাম উল্লেখযোগ্য। নটবরী বোলের দ্বারা ঠুংরীকে এঁরা নৃত্যের অঙ্গ করেন। ঠুংরীর শিল্পীরূপে স-সম্মান-

পাহাড়ী সান্যাল ফটো : অমৃত

স্বীকৃতির দাবী রাখেন সিদ্ধেশ্বরী দেবী, গিরিজা দেবী, রসুলান বাঈ, বেগম আখতার, গোয়ালিয়র রাজবংশীয় ভায়া গণপৎ সিং, মিজুদ্দিন, গিরিজা চক্রবর্তী। ঠুংরীতে এক রাগের সঙ্গে অন্য রাগের মিশ্রণ চলে এবং এ-গান উচ্চাঙ্গ লঘু রাগ-সংগীতের অন্তর্ভুক্ত।

ফোক্ সং আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। বাদশাদের সময় থেকে ভারত ও পারস্যের গজল লঘু-সংগীতরূপে প্রসিদ্ধ; এতে নিয়মবদ্ধতা নেই। এগুলি মেজাজ-প্রধান কাব্যগীতি। আউল-বাউলের মত কাব্যই এখানে প্রধান। সুর কাব্যপ্রকাশের বাহন মাত্র। বর্তমান যুগে গাওয়া অধিকাংশ ঠুংরী পাঞ্জাবী ধুন, পাঞ্জাবী গজল। ঠিক ঠুংরী একে বলা যায় না।

পূর্ববর্ণিত খেয়াল কালের স্রোতে পরিবর্তিত হতে হতে আমাদের যুগে এসে পৌঁছল। আর খেয়ালের বিহ্বল করা বর্ণচ্ছটায়, বিদ্যুদ্দীপ্ত তানের চমকে ধ্রুপদ যেন অবহেলিত হতে হতে পশ্চাদপটে একটা ঐতিহাসিক স্মৃতিরূপে মুষ্টিমেয় কয়েকজন গুণীর কাছে কোনরকমে টিঁকে থাকল।

এই ধ্রুপদকে আবার পূর্ণ গৌরবে উজ্জীবিত করে তার সনাতনত্ব সম্বন্ধে বর্তমান যুগের মানুষকে সচেতন করলেন এ-যুগের সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ। ধ্রুপদকে যুগের উপযোগী বাণী দিয়ে সাজিয়ে তার সকল গ্লানি মুছিয়ে নতুন করে ভক্তিরসের আবেগে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁরই কীর্তি। কিন্তু মুক্ত মনের মানুষ রবীন্দ্রনাথ 'যুগচেতনা' সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং জনমানসের চাহিদার প্রতি উদাসীন ছিলেন না বলেই স্থায়ী, অন্তরা-যুক্ত অবিমিশ্র ভক্তিরসাশ্রিত গানগুলি তিনি ব্রাহ্ম-সংগীতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেন। কারণ সাধারণ লোকের পক্ষে যে এ সঙ্গীত গ্রহণ করা সম্ভব নয়, সাধকোচিত দিব্য-দৃষ্টির বলেই এ সত্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ সম্বলিত গানগুলি তিনি সাধারণের গ্রহণোপযোগী করে এমন এক অভিনব রূপ দান করলেন যার মধ্যে আবেগ আছে, কিন্তু সে আবেগ সংযমের শাসনে বাঁধা, ভাবের স্বচ্ছতা আছে, সঙ্গেসঙ্গে ভাবাতীত ব্যঞ্জনা দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। জ্ঞানে, ভক্তিতে, অনুরাগে ঈশ্বর এখানে 'প্রিয়' সম্ভাষণে সম্ভাষিত।

বহুধা বিচিত্র রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদ থেকে সুরু করে রাগসংগীত, কাব্যগীতি প্রেমগীতি, দক্ষিণ ভারতীয় রাগ এমন কি লোকসংগীতেও সহজ ভাবও আছে কিন্তু কবির ধ্রুপদী মনের ছায়া পড়ে তাতে ভাষার অতীত এমন এক ভাবের ইঙ্গিত নিহিত—যা অ-ধরা জগতের আকুলতায় মনকে উদাস করে।

রবীন্দ্র-ভাবান্বিত এক কবি এবং সুরকার গোষ্ঠি গড়ে উঠল যাঁরা মূল প্রকৃতিতে নবজাগরণের অমৃত-সিঞ্চনে বাংলার সংগীতলোকে এক উজ্জ্বল দিগন্ত উদ্ভাসিত করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, যতীন্দ্রমোহন, অজয় ভট্টাচার্য, অনিল ভট্টাচার্য, সুরসাগর হিমাংশু দত্ত এ'রা প্রত্যেকেই কম বেশী রবীন্দ্র-ভাবেরই অনুগামী। তবে রবীন্দ্রনাথের গান, কাব্য, সুরে যে মাধুর্যের পরিপূরক ঠিক সে জাতের মাধুর্য হয়ত বা এ'দের গানে নেই। এইখানেই তিনি এ-যুগের কবিগুরু, সংগীতগুরু।

কিন্তু সূর্যের আলোয় জ্যোতিষ্মান হলেও চাঁদের আলোর একটা নিজস্ব রমণীয়তা আছে। ঠিক সেই কারণেই আপন-আপন ব্যক্তিত্বের আলো ও বৈশিষ্ট্য এ'দের গানে এমন এক মাধর্যালোক সৃষ্টি হয়েছে যা সহৃদয় রসিকচিত্তকে আকৃষ্ট না করে পারে না। বর্তমান আধুনিক গানের স্রষ্টা এ'রাই। শাশ্বত ভাবে এ'রা বিশ্বাসী, কিন্তু সঙ্গে সমসাময়িক যুগের রুচি ও চাহিদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই সাধারণ মানুষের ছোট গান, ছোট কথা ক্ষণিকের অশ্রুজল এ'দের গানে একটা কাব্যমধুর রসমূর্তি লাভ করেছে। তাই এ'দের গানের আবেদন অনস্বীকার্য।

এর পরের যুগের আধুনিক গান হোল অবক্ষয়ী যুগের অস্থির চিত্তের প্রতিধ্বনি। এর কোন নিয়ম নেই, শৃঙ্খলা নেই, বাঁধন নেই, শাসন, সংযম কিছুই নেই এবং সেই কারণেই এর কোন স্থায়িত্বও নেই। তাই আজকের গান কাল নিষ্প্রভ। আগাছার মত ঝাঁকে এরা জন্মায় আবার শুকোয়। ব্যাকরণ বা বাঁধন যে গানে নেই তার কোন শাশ্বত মূল্য থাকতে পারে না।

বর্তমানের উপযুক্ত ধ্রুপদ বা শাশ্বত গান হোল রবীন্দ্রসংগীত। যুগচাঞ্চল্যকে সর্বদ্রষ্টা কবি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি বলেছিলেন 'আমার গানে যেন স্টীমরোলার চালানো না হয়।' ব্যাপ্তি এ গানে অবশ্যই আছে তবে বন্ধনকে অস্বীকার করার উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা নয়।

শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে আজ যেন বাদীসুরের মত মানুষের সংগীতপ্রবণতা আবার ধ্রুপদকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে—পুরাতনের কাছে আশ্রয় চাইছে। তাই এ-যুগের গানের সঙ্গে সঙ্গে আগের যুগের শিল্পীদের গান নতুন শিল্পীদের কণ্ঠে পরিবেশন করে লংপ্লেয়িং-এ গ্রন্থনার উদ্যোগ গ্রামোফোন কোম্পানীতেও দেখা যাচ্ছে।

এ ত গেল সাধারণ সমাজের গানের কথা। উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে উজীর খাঁর ধ্রুপদী ঐতিহ্য আলাউদ্দিন প্রবর্তিত যন্ত্রসংগীতের ধারা এবং কণ্ঠ-সংগীতে নাসিরুদ্দিনের সুযোগ্য বংশধর ডাগার শিল্পীরা ধ্রুপদের প্রতি চিন্তাশীল শ্রোতাদের আকৃষ্ট করছেন।

আজ পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় সংগীতের প্রতি যে শ্রদ্ধা, সম্মান ও শিক্ষার আগ্রহ দেখা যায় তার কারণ কি প্রশ্ন করায় আলি আকবর খাঁ উত্তর দেন, বাইরের জগতের সকল চাহিদা ওঁরা বিজ্ঞানের শক্তিতে মেটাতে পেরেছেন। কিন্তু বাইরে ঐশ্বর্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে হাহাকার করছে মরু-রিক্ততা। এই স্পিরিচুয়াল থার্স্ট তৃপ্তি খোঁজে ভারতীয় সংগীতের অধ্যায় ধারায়।

ঐ একই প্রশ্নের উত্তরে রবিশংকর বলেন, ভারতীয় সংগীতের অবিমিশ্র শুদ্ধতা ওদের মুগ্ধ করে।

আজকের এই কাঞ্চন-কৌলিন্যের যুগেও এ-হেন উক্তি যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সারা পৃথিবীর মানুষ আজ ভারতীয় সংগীতের ধ্রুপদী ঐতিহ্যের কাছে হাত পাতছে। এই ধ্রুপদী ঘরানার অভিজাত বন্দেজ মহম্মদ দবীর খাঁ, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, আমিনুদ্দিন ডাগার, রাহিম ফাহিমুদ্দিন ডাগার প্রমুখ গুণীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে সযত্নে রক্ষিত করার গুরুদায়িত্বের কথা আজ সংগীত-সমাজের চিন্তা করার দিন এসেছে।
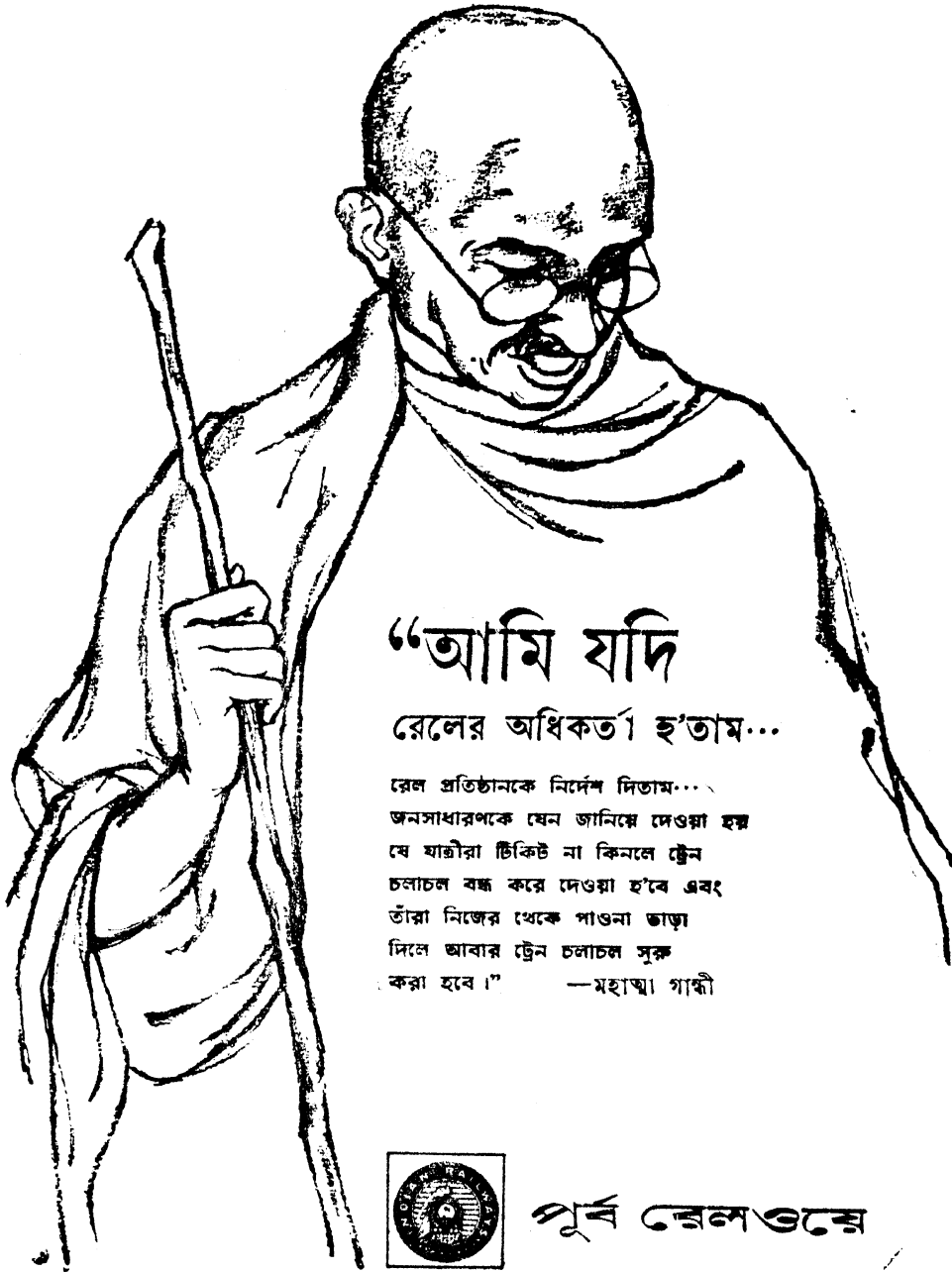
"আমি যদি
রেলের অধিকর্তা হ'তাম...
রেল প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিতাম...
জনসাধারণকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়
যে যাত্রীরা টিকিট না কিনলে ট্রেন
চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হ'বে এবং
তাঁরা নিজের থেকে পাওনা ভাড়া
দিলে আবার ট্রেন চলাচল সুরু
করা হবে।"
—মহাত্মা গান্ধী
পূর্ব রেলওয়ে

বধ্যভূমির সামনে দাঁড়িয়ে যে অটুট নিস্তব্ধতা, তেমনি নিস্তব্ধতা। উঁচুদিকে তাকিয়ে স্থির নিয়তির মতন সেই শক্ত ফাঁসির রজ্জু।

ধীরাই প্রথম ক্লান্ত সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের শূন্য কক্ষে এসে ঢুকেছিল। ছোকরা ফুর্তিবাজ কেরানী আপ্যায়ন করে বসতে বলেছিল। শূন্য ঘর, 'ওরা এখনো এসে পড়েনি' 'ছটা বাজল' 'বাইরে বাসন্তী সন্ধ্যা' ইত্যাদি ভাবনা-রাশির জালে আটকা পড়ে ধীরা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। অথচ দেরি হয়ে যাবে ভয়ে—লজ্জায় বরানগর থেকে সোজা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসেছিল। কলেজ থেকে আর বাড়ি যায়নি। মাত্র পরশুদিন ওরা যুগলে এসেছিল শান্তা আর নীলাব্জ। যে-দুঃসাটা এতদিন পল্লবিত হচ্ছিল এবং যেটার অবশ্যম্ভাবী সমাপ্তি আশু আকাঙ্ক্ষা করছিল ধীরা, অবশেষে তাই হল। 'আশা করি আপনার আপত্তি নেই ধীরাদি' শান্তা মুখ নিচু করে বলেছিল। ওর গলা কী কাঁপছিল। বাইশ বছরের তরুণ অধ্যাপিকা শান্তা। ধীরা সাপের মতো নিস্তেজ গলায় বলেছিল : 'তোমরা সুখী হলেই...' 'তাহলে তোমাকে আমাদের বিয়ের সাক্ষী

দিতে হবে। আসবে তো?' 'আসব।' নীলাব্জ, আটচল্লিশ, কানের পাশে চুলগুলো রুপোলি শাদা, হেসে বলেছিল : 'জানি আপনি আসবেন।' তারপর দরজায় ওদের ট্যাক্সি উধাও হয়ে গেল।

ধীরা এই বাসন্তী-সন্ধ্যায় মৃদু উত্তেজনা বোধ করছিল। 'ওরা এখনো এসে পড়েনি না?' ছোকরা কেরানী বলল : 'আপনার জন্যে কোকাকোলা এনে দেবো?' 'না।' 'বসুন। মিঃ লাহিড়ি এখুনি এসে পড়বেন। একটা কল-এ গেছেন।' জায়গাটা অচেনা নয়। বছর-পাঁচেকের সমূহ দৃশ্যপট এখনো সাজানো রয়েছে। কেবল ক্যালেণ্ডারটা বদলেছে। দেয়ালে ক্রুশবিদ্ধ যীশু। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে, সেটা বোধহয় শীতকাল, মাঝখানের চেয়ারদুটোয় বসেছিল নমিতা, নীলাব্জ। নীলাব্জর পিসি, নমিতার কাকা, নীলাব্জর বন্ধু, আর, আর ধীরা। রেজিস্ট্রারের হাসিমুখ এখন মনে পড়ছে, চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, নমিতার হাতে চুক্তিপত্রটা যৌতুক তুলে দিলেন : 'মাই চাইল্ড, এটা তোমার কাছেই যত্ন করে রাখো। এটাই তোমার রক্ষাকবচ।' নমিতা হেসে হাত বাড়িয়ে নিয়েছিল। সম্ভবত এগিয়ে গিয়ে মিঃ লাহিড়ির পা ছুঁয়ে প্রণামও করেছিল। নমিতা, ধীরার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বড় ভালো মেয়ে। সেই নমিতা কেন স্লিপিং পিল খেয়ে আত্মহত্যা করল। নমিতা, বাপীর মা, যে-বাপী ছিল তার চোখের মণি। ধীরার সর্বাঙ্গ শিরশির করে উঠল : না, আত্মহত্যা নয়। মিছে কথা। তার মনের বানানো। নমিতাকে অধিক ভালোবাসত কিনা! নীলাব্জ দেখা করে বলেছিল : 'বিশ্বাস করুন, ও একটা কলিক পেন-এ ভুগছিল। মাঝে এমন মোরোস্ হয়ে গিয়েছিল...'

রাস্তায় গাড়ির শব্দ।

রেজিস্ট্রার তরতর করে উঠে এলেন। 'ও'রা এখনো এসে পড়েননি। অবশ্য ও'দের সাড়ে ছ'টায় আসতে বলেছিলাম।'

ধীরা হেসে বলল : 'বোধহয় রাস্তায় ট্যাক্সি জ্যামের জন্যে—'

'তাছাড়া আর কী।'

ধীরা চেয়ার ছেড়ে রাস্তার ধারের খোলা বারান্দায় হে'টে এল। বাইরে পার্কে কোলাহল। 'আচ্ছা : বাপী কী ওর নতুন মাকে...' কী ভাবছি? নীলাব্জ সম্ভবত বাপীকেও নিয়ে আসবে। শান্তা চালাক মেয়ে। নীলাব্জের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই ওর আলাপ হয়েছে। বাপীকে কী আর সে এতদিনে হাত করেনি! নমিতা! আবার ওর কথা কেন। খুব ভালোবাসত নীলাব্জকে। বিশ্বাস করত। ওরা সুখী হয়েছিল। প্রতি ছুটিতে ওরা বাইরে বেরুত। নীলাব্জ সম্পর্কে ওর কাছেই যাবতীয় খবর শোনা। এমনকি ছাত্রজীবনে রাজনীতির সূত্রে নীলাব্জের সেই প্রেমের অধ্যায়গুলি পর্যন্ত হাসতে হাসতে বলত নীলাব্জ। ধীরার রাগ হত। আর সেটা বুঝতে পেরে নমিতা বলত : 'না ভাই, ও একেবারে বদলে গেছে।' বদলে গেছে! ভালোই তো! কিন্তু ধীরা বিশ্বাস করবার জোর পেত না। তার মনে হত নমিতার মতো স্বল্পসুখী মেয়ে তার পাওনার বাইরে এক পাও যেত না। হয়তো নীলাব্জকে সম্পূর্ণ করে বোঝবার মতো ক্ষমতা ওর ছিল না। নীলাব্জের গ্ল্যামার ওকে ভুলিয়েছিল। বাচ্চা হওয়ার পর শেষদিকে নমিতা আর সময় পেত না। সে ছেলের ব্যাপারে ডুবে ছিল। আর সেই সুযোগে নীলাব্জ বড় বেশি বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকত। বড় রাত্রি করে ফিরত। আর সেই সময়ে, নমিতা না বললেও শান্তার সঙ্গে নীলাব্জের মেলামেশাটা বাইরের সমাজে দৃষ্টিকটু ঠেকেছিল। কিন্তু কোনোদিন নমিতার তরফ থেকে কোনো অভিযোগ পায়নি। হয় এ-বিষয়টাকে বিশ্বাস করেনি, অথবা গুরুত্ব দেয়নি। কিংবা নীলাব্জ ওকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল। তাছাড়া—ধীরার নিজের চোখেই দেখা বাপীর জন্যে নীলাব্জের কী প্রচণ্ড ভালোবাসা। এবং এই নিখাদ পিতৃত্বের কারণেই নীলাব্জের সম্পর্কে একেবারে হাল ছাড়তে পারেনি ধীরা। শান্তার ব্যাপারটা তাই বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে, হিংসুক লোকের বানানো বলে মনে হয়েছে। অথবা, ছাত্রজীবন থেকে নীলাব্জ সম্পর্কে যে লোকশ্রুতি সেইটেই কাজ করেছে। কিন্তু, নমিতা এই কাজটা কী করল? ওই কলিক্ পেন বা আত্মহত্যা-জাতীয় ব্যাপারটা? এখন আর ওর মনের ভেতরে প্রবেশ করবার কোনো উপায় নেই। মৃত্যুর শেষ কয়েকমাস সে কী ভেবেছিল! এর উত্তর কারুর জানা নেই। বোধ করি নীলাব্জরও নয়। তাহলে হয়তো নমিতার সিদ্ধান্তকে নীলাব্জ ঠেকাত। যেমন করে এতদিন ঠেকিয়ে এসেছে! না-কি শেষের দিকে নমিতা নিজের চারদিকে একটা অবিশ্বাসের জাল রচনা করেছিল! সে-কী অন্য কিছু সন্দেহের গন্ধ পেয়েছিল! এবং সেটা শান্তা-নীলাব্জকে ঘিরেই! কেউ কী তার মনভারি করেছিল, অথবা নিজেই কিছু আঁচ করেছিল! কিন্তু, সে যাই হোক, সেই কারণেও নমিতার মৃত্যুটা সমর্থন করা যায় না। যেহেতু সে মা হয়েছে। বাপীর জন্যেই তার বাঁচা উচিত ছিল। দরকার হলে সে স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ

করতে পারত। তার মতো স্বাধীন স্বাবলম্বী মেয়ে।

আহ্, কী ভাবছে ধীরা। ওরা বড় দেরি করছে! অপেক্ষাগুলো শলাকার মতো বিঁধছে। যা হবার তাড়াতাড়ি হয়ে যাক। আর, সে-ও হোস্টেলে ফিরে গিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলুক।

অবশ্য আজ সে না আসতেও পারত। অন্তত নমিতা তার বন্ধু, সে-স্মৃতিকে মনে রেখেই। তবু, শান্তা যখন অমন করে বলল, না এসে পারা গেল না। নমিতার স্মৃতিকে অসম্মানের জন্যে নয়। বরং শান্তার মুখ চেয়েই এসেছে। কারণ কেন জানি শান্তার করুণ শুকনো মুখে নমিতার স্মৃতির আদল ছিল! শান্তাকে বড় দুঃখী, ভাগ্য-তাড়িত মনে হয়েছিল। শান্তার তো কোনো দোষ নেই। শান্তা তো এই প্রথম বিয়ের অভিজ্ঞতার রাজ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। তার আবেগ থাকতে পারে, লোভের চটুলতা ধীরার চোখে পড়েনি। শান্তাকে শীতের নদীর মতো শান্ত দেখিয়েছে। কে জানে, ওর মনের জগতটাও এই ক'দিনে প্রবীণ হয়ে উঠেছে কিনা। শান্তা সমস্ত কিছু জেনেশুনেই এগিয়ে এসেছে। শান্তা এই সম্পর্কে আপত্তি করতে পারত কিনা সে-প্রশ্ন থাক। হয়তো এমন হতে পারে, তার ফের-বার উপায় ছিল না। ইতিমধ্যেই তাদের নিয়ে যথেষ্ট রটনা রটেছে, সেই রটনাকে বন্ধ করবার জন্যেই হয়তো...।

তাহলে বিষয়টাকে আবার নতুন করে ভাবা যায়। নমিতার অকালমৃত্যুর কারণ শান্তা। নাহলে নমিতার মৃত্যুর বছর-খানেকের মধ্যেই তারা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের আপিসে ছুটে এল কেন! সিদ্ধান্তটা সাম্প্রতিক হতে পারে, তার প্রস্তুতি দীর্ঘ-দিনের। এবং নমিতা সেটা বুঝেছিল। যে-নমিতা একদিন ভালোবেসেই নীলাব্জকে গ্রহণ করেছিল। ভালোবাসা! নিশ্বাস ফেলল ধীরা।

ভালোবাসা এক ধরনের অসুখ, নীলাব্জ জাতীয় মানুষদের কাছে। প্রিয় অসুখ! আর এই অসুখে সংক্রামিত হয় নির্বোধ মেয়েরা—নমিতা, শান্তা। এ যেন এমন উত্তেজক রোগ যার আক্রমণে ব্যক্তিত্ব-রুচি-শিক্ষাদীক্ষা কাদার মতো গলে' একাকার হয়ে যায়। মনে পড়ছে নমিতা ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারত, চমৎকার রান্না আর সেলাই করতে পারত। আর, এমন দরদী বন্ধুবৎসল। ভালোবাসার রোগের ধমকে তার সমূহ গুণরাশি নষ্ট হয়ে গেল। সঙ্গী নির্বাচনের ভুলের জন্যে। সংসারে ওর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ও ছাড়া আর কে করবে! বোধহয় অনেক লজ্জায় ঘেন্নায় সে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল।

এবার শান্তা। ভালোবাসার নিশ্চিত অসুখের মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছে।

ধীরা ঈষৎ চমকাল। ছি, সে কী ভেবে চলেছে। শান্তার মতো ঠান্ডা, নরম মেয়ে... হয়তো আর ভুল হবে না। হয়তো, হয়তো সে সুখী হবে।

রাস্তার নিচে এবার একটা প্রাইভেট গাড়িকে থামতে দেখল ধীরা।

ওরা এসে পড়েছে। নীলাব্জর পিসি। ধীরার মেসো। আর, নীলাব্জরই বশংবদ এক অধ্যাপক। নাঃ ঝর্ণা ওদের সঙ্গে আসেনি।

সিঁড়িতে ভারি পদশব্দ।

ধীরার মনে হল বধ্যভূমির শান্ত্রীরা মার্চ করে আসছে। ফাঁসির দড়ির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির মতো স্থির। জহ্লাদের উপস্থিতি নিকটে কোথাও।

'ধীরাদি এসে গেছেন—' শান্তা এগিয়ে এসে ওর হাত ধরল।

ধীরাকে এবার হাসতে হবে! 'একটা ভালো শাড়ি পরতে পারিসনি!' ধীরা ধমকাল ওকে।

শান্তা মুখ টিপে বলল : 'আমার যা বিয়ে, এই যথেষ্ট।'

'কেনরে মুখপুড়ি? বর নিজেই পছন্দ করেছিস? ভালোবাসার বিয়ে।'

'কী জানি', অন্যমনস্ক এবং শুকনো দেখাল শান্তাকে : 'কাল সারারাত্তির ঘুম হয়নি। মা কাঁদছিল। বাবা কিছু বলেননি, শুধু আশীর্বাদ করেছিলেন। আচ্ছা, ধীরাদি, তুমিই বলো এছাড়া আর আমি কী করতে পারতাম।'

'নতুন জগতে ঢুকতে যাচ্ছিস তো, সব মেয়েদেরই এমন হয়।'

'হয় বুঝি? তুমি কী করে জানলে ধীরাদি? তুমি তো এ-পথ মাড়ালে না কোনোদিন?'

ধীরা বলল : 'সকলের কী সব হয়? চল—ও'রা ডাকছেন।'

মিঃ লাহিড়ি বললেন, 'আপনারা সকলে বসুন।'

একটা আনুষ্ঠানিক চেহারা গড়ে উঠল।

ধীরা আড়চোখে নীলাব্জর ওপর তাকাল। গেরুয়া পাঞ্জাবি। চোখে সোনার রঙের চশমা। কান ঘেঁষে পরিষ্কার করে কামানো দাড়ি। রুপোলি ইঙ্গিতগুলো চাপা পড়ে যায়নি।

হঠাৎ নীলাব্জের সাজানো চেহারার দিকে তাকিয়ে ধীরার খুব খারাপ লাগল। হয়তো কোনো কারণ নেই, তবুও। কিংবা কারণ আছে। নীলাব্জ অকারণ ঘামছিল, টেবিলের ওপর ওর আঙুলগুলো অস্থিরতা প্রকাশ করছিল। সম্ভবত নীলাব্জ এখন নার্ভাস। ও একটু ঘাবড়ে গেছে কী। এই ঘর, এই টেবিল, অই ক্রুশবিদ্ধ যীশু এবং মিঃ লাহিড়ি, তার কী বছর-পাঁচেকের দৃশ্য মনে পড়ছে। কিংবা কোনো বেফাঁস মুহূর্তে কেউ যদি পুরনো ঘটনাটা উল্লেখ করে ফেলে, তারি তীক্ষ্ণ আশঙ্কা।

আজ আর কারুর মুখে কোনো ভাষা নেই। টেবিলে নিচু হয়ে বিবর্ণ দৃষ্টিতে কী ভাবছে শান্তা। 'আমার যা বিয়ে, এই যথেষ্ট।' শান্তা এমন আটপৌরে পোশাকে এসেছে কেন। ওকে কী কেউ একটু সাজিয়ে দিতে পারেনি। মা কাঁদছে। তার মায় এখন কাঁদার কোনো অর্থ আছে কী। মেয়ে বড় হয়েছে, তার ভালোমন্দ বোঝবার বয়েস হয়েছে। ধীরা একটু হোঁচট খেল। সত্যি কী ওর ভালোমন্দ বোঝবার বয়েস হয়েছে! জীবনকে কে কতটুকুই-বা বুঝতে পারে। শান্তার জীবনটা জটিল হচ্ছে। হয়তো এ-জটিলতা ওর কাঙ্ক্ষিত ছিল না। কিন্তু, এখন আর ভেবে কী হবে? যা হবার হয়ে গেছে। ভাগ্যের হাতে আমরা পুতুল। 'এছাড়া আর আমি কী করতে পারতাম!' নাঃ কিছুই করা যেত না। হয়তো এই ভালো হয়েছে। শেষপর্যন্ত সম্পর্কটা একটা নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছেছে। তা না হলে হয়তো সারাজীবন ব্যাখ্যাহীন উদ্দেশ্যহীন একটা সম্পর্কের আবর্তে ঘুরতে হত। এবং নীলাব্জ তাকে মিথ্যা ব্যবহারের জালে মাছির মতো আটকে ফেলত। সে-পরিণতি আরো মর্মান্তিক হত। সেইদিক থেকে নীলাব্জকে সাধু বলতে হবে। সে-দায়িত্ব নিয়েছে। যেমন ভালোবেসে নিয়েছিল একদিন নমিতার। ভা-লো-বা-সা। শব্দটা পৃথিবীতে কতবার ব্যবহৃত হয়েছে। ক-ত-বা-র। নীলাব্জ কী শান্তাকে সত্যিই ভালোবাসে? ভালোবাসা, না প্রয়োজন। প্রয়োজন শব্দটা অশ্লীল চিত্রের মতো দুলে উঠল ধীরার চোখের পরদায়। পুরুষের প্রয়োজন একটা মেয়ে-মানুষকে। আহ্, কী ভাবছে ধীরা। সন্ধ্যে থেকে তার মেজাজটাই খিঁচড়ে রয়েছে। নাকি তাকে ঈর্ষা গ্রাস করছে। ঈর্ষা! মনে মনে হাসল ধীরা। সুশোভন এখনো তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। আবার সুশোভনের কথা কেন, ক্লান্তিকর মাছিটাকে হাত দিয়ে সরাতে চাইল ধীরা : সে কী দুর্বল হয়ে পড়ছে। সুশোভন ইজ ডেড্। মনে পড়ছে : ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশনের নোটিশের খবরটা দিতে ছুটে এল একদিন। 'আমি আর কোনো কথা শুনতে চাইনে, মাসখানেক পরেই আমাদের বিয়ে।' সুশোভন, আহ্। নাঃ বাধা দিতে পারেনি ধীরা। বাধা দিতে চায়ওনি। 'বেশ, তাই হবে।' তারপর কী হল? এক সন্ধ্যায় মিথ্যে করে তাকে ঠকিয়ে সুশোভন নিয়ে এসেছিল খারাপ ফ্ল্যাটে। ধীরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। এবং সেই একদিনের হঠ-কারিতায় জোর করে ওকে ঠেলে ফেলে সমস্ত সম্পর্কের বাঁধনকে ধীরা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এই দীর্ঘ বারো বছর সুশোভন অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে। ধীরা ওকে ক্ষমা করতে পারেনি। আহ্, কী আকাশপাতাল ভাবছে সে। মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা।

মিঃ লাহিড়ি বললেন : 'আরেকজন কে সই করবেন?'

নীলাব্জ বলল : 'মিস সেন আপনি করুন।'

'আমি!' ধীরা দুর্বল গলায় বলল : 'আমি কেন!'

'ধীরাদি—' শান্তার ঠান্ডা হাতটা ধীরার মণিবন্ধে।

'আচ্ছা—' কিন্তু আমি কেন! আমি এর কী বুঝি! আমি তো এর কোনো দায়িত্বই

নিতে পারব না। আহ্‌, কী ভাবছে ধীরা। নমিতার চুক্তিপত্রে তার সই ছিল। কিন্তু, কী হল? ওরা তাকে অনুরোধ করছে কেন। শান্তাও! শান্তা কী ভীত হচ্ছে? ভীষণ ভয়কাতুরে মেয়ে। ওর ভয় কী সে দূর করতে পারবে? জীবনটা তার, তার একার। যেমন একা ছিল নমিতার। বেশ, আমি এই সই করলাম। কিন্তু কী এর মানে হল? শান্তার মা কাঁদছিল! এখন কান্নার কী অর্থ আছে! শান্তা কী আমাকে জড়িয়ে রাখতে চায়। আমি জীবনের অনেক দেখে ফেলেছি। সুশোভন! সুশোভন এখন কোথায়? পোর্ট রেয়ারে সোস্যাল ওয়ার্কে মেতেছে। আমি আর কিছুই বিশ্বাস করিনে। জীবনের ব্যাপারে কোনো কিছুতে আমার আগ্রহ নেই। আমি নির্ভেজাল কৌমার্যের নিদর্শন। সময়ের স্রোতগুলো তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ধীরার বেরোবার সময় পরিচ্ছন্ন সাজগোজ দেখে রুমমেট মৃণালিনীর জেরার মুখে তার এখানে আসার ঘটনাটা বেরিয়ে এসেছিল। মৃণালিনী, সংস্কৃতের অধ্যাপিকা, বয়েসে বেশ ছোটো, চোখের তারা গোল করে অদ্ভুত গলায় বলেছিল: 'তুমি কী ধীরাদি, অই লোকটা তোমার প্রিয় বন্ধু নমিতাকে খুন করেছে, আর তুমি...' ধীরা শাদা হয়ে গিয়েছিল, দ্বন্দ্বটা যে তার মধ্যে ছিল না তা নয়, কিন্তু...। 'অমন করে বোলো না মৃণাল, ছি—' 'কেন বলব না? সকলে তো আর তোমার মতো পাথর নয়। আশ্চর্য, তুমি কী করে ক্ষমা করলে ওকে।' 'আমি, আমি ক্ষমা করবার কে!' 'কেন যাচ্ছ তুমি?' কেন যাচ্ছি, সত্যিই তো কেন! আমি না গেলে কী এদের বিয়ে আটকাবে! কিন্তু, না গেলে কী আমি ছোটো হয়ে যাব না? শান্তা, শান্তার কাছে আমি মুখ দেখাব কী করে? শান্তা তো কোনো দোষ করেনি! হ্যাঁ, ধীরা শক্ত হল, সে এসেছে শান্তার জন্যই। মেয়েটার মুখে এমন কিছু ছিল, একটা অসহায়তা, একটা পাণ্ডুর অসহায়তা...। যে-মেয়েটা এই বাইশ বছরে এত রটনার পথ মাড়িয়ে, এসেছে নির্বিবাদে, যার সঙ্গে কেউ ভালো করে কথা বলেনি, অবজ্ঞা নিন্দা অবিশ্বাস যে এতদিন কুড়িয়ে এসেছে, তার সঙ্গে অমন নিষ্ঠুর অসহযোগিতা করতে পারেনি ধীরা। যখন ব্যাপারটা শুধু একটা সন্ধ্যার কয়েকটি ঘণ্টা, তারপর স্রোতের মতো তারা ভেসে যাবে...

সশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ লাহিড়ি। নীলাব্জ শান্তার সঙ্গে প্রীত করমর্দন করলেন। 'আপনাদের সুখ-শান্তি...'

চেয়ার থেকে সকলে উঠে পড়েছে। শান্তার হাতে চুক্তিপত্র। ওর হাত ধরে ধীরা খোলা বারান্দায় বেরিয়ে এল।

শান্তা কার্ণিসে হেলান দিয়ে সামনে তাকিয়েছিল। চিন্তিত, মূক। গোধূলির আলোয় ওকে গৈরিক দেখাচ্ছিল।

'ধীরাদি—'

'তুমি শেষ পর্যন্ত আসবে...'

'আহা, সে-কথা এখন মনে পড়ল?

শান্তা ওর হাতটা চেপে ধরল।

'তুমি এখুনি চলে যাবে না তো?'

'বা, আমাকে এবার যেতে হবে না? তোর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি করতে যাব?'

'আমি কী কাল থেকে কলেজে যাব?'

'কেন? এত তাড়া কিসের? ছুটি তো আছে।'

'সকলকে বোলো। আমি...'

'সবাই জানতে পারবে।'

'এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা হয়ে গেল, কাউকে বলতে পারলাম না। আর তাছাড়া...'

'পরে একদিন সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দিস—'

'হুঁ...'

'তুই কী আবার মার কাছে যাবি?'

'না, ও আমাকে ওদের বাড়িতেই নিয়ে যাবে। পরে একদিন মার কাছে যাব।'

নীলাব্জ বারান্দায় এগিয়ে এসে বলল: 'চলুন এবার আমরা নিচে যাই। আপনার কিন্তু এখুনি ছুটি হচ্ছে না। একটু রিফ্রেশমেন্টের আয়োজন করেছি, এই কাছেই সুইস্ কনফেকশনারিতে—'

ধীরা বলল, 'না ভাই, এবার আমাকে যেতে হবে।'

নীলাব্জ বলল: 'আর একটু সময় আমাদের জন্যে নষ্ট করুন।'

ধীরা বলল, 'আমার জরুরি কাজ আছে।'

শান্তা বলল, 'ধীরাদিকে ছেড়ে দাও। ওকে অনেকদূরে যেতে হবে।'

'তাহলে পরে একদিন—'

'দেখা যাবে।'

ট্যাক্সি হু হু করে ছুটে চলেছে।

সিটে গড়িয়ে-পড়া মস্তিষ্ক বন্যার মতো থই-থই করছে।

বিদায়ের সময়টা কী খুব রূঢ় হয়ে পড়ল, ধীরা হাই তুলল। ক্লান্তি, মাগো ক্লান্তি। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। যেন এইমাত্র ম্যাটিনি শোয়ে এয়ারকন্ডিসান্ড হল থেকে বেরিয়ে এসেছে। মাথা ভার, চোখ ঝিমঝিম, আর, আচ্ছন্নতা।

ট্যাক্সির গতিবেগটা তরল স্রোতের মতো গলে গলে পড়ছে। একটা দামাল শিশু যেন তার শরীরে ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। নমিতা, শান্তা, নীলাব্জ, অস্পষ্ট ধষা ফ্রেমে আটকানো ছবির মতো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

ধীরা আবার হাই তুলল। একটা নিরবয়ব বিরক্তির গমকে তার ইন্দ্রিয়গুলো যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। ধীরার মনে পড়ল, কালকে মেয়েদের টিউটোরিয়াল খাতাগুলো ফেরত দিতে হবে।

ভালোবাসার সুসময়

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ আর ওর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হল না। ট্রাম-বাসের ভিড় কমলে বাড়ি ফেরবে। ছুটির সঙ্গে সঙ্গে ঠাসাঠাসি করে বাড়ি ফেরার একটা আনন্দ আছে। সেই সকালে সে দুটো নাকে-মুখে গ‍ুঁজে এ-অফিস পাড়ায়। সারাটা দিন, একটা চেয়ারে বসে উবু হয়ে কাজ করা। পিঠে ফিক ধরে ধরে গেলেও মাথা তোলার উপায় নেই। তবু সংসারের জন্য, সুনীতার জন্য এবং মেয়ে কমলার জন্য সে ঘাড় গ‍ুঁজে কাজ করতে করতে কখন দেখে ক্রমে ঘড়ির কাঁটা নেমে আসছে, অফিস ফাঁকা ফাঁকা। ফাঁকা ফাঁকা মনে হলেই স্ত্রী সুনীতার জন্য মনটা কেমন করে ওঠে। মেয়েটার জন্য মনটা হাহাকার করতে থাকে। সেই কবে যেন ওদের বনবাসে রেখে সে চলে এসেছে। যেমন নাকে-মুখে গ‍ুঁজে অফিস চলে আসে তেমনি ছুটতে-ছুটতে ট্রাম করার অভ্যাস। একটা কি দুটো ট্রাম ছেড়ে দিলেই ফাঁকা ট্রাম সে পেতে পারে, কিন্তু কেন জানি তার আদৌ অপেক্ষা করতে ভাল লাগে না। ঝুলতে ঝুলতে সে টালিগঞ্জের ট্রামে উঠে পড়ে। আজ এই প্রথম ওর ট্রামে উঠতে ইচ্ছা হল না। একটু নিরিবিলি অথবা ফাঁকা ট্রামের জন্য সে যেন গাছটার নিচে বসল।

প্রথম গাছটা থেকে কয়েকটা পাতা ঝরে পড়ল। সে একটু আলস্য নিয়ে শুয়েছিল, পাতা ঝরতে দেখেই কেন জানি মনে হল, কিছু পাখি এসে উড়ে বসতে পারে। পাখিরা কোন কোন সময় ঠুকরে-ঠুকরে পাতা গাছের নিচে ফেলেও থাকে। নতুবা এই বর্ষার দিনে, কচি কাঁচা ডালে কি সবুজ পাতা, এখনত ঝরা পাতার সময় নয়, সুতরাং সুধাংশু উপরের দিকে তাকাল। আশ্চর্য একটা পাখি নেই গাছে। কলকাতায় এ-অফিস পাড়ায় গাছগুলোতে সে কতদিন একটা দুটো পাখি—এই যেমন দোয়েল, টিয়া অথবা বক এবং টুনটুনি পাখি খ‍ুঁজেছে। বড় চোখে পড়ে না। কিছু কাক, কাক একটা-দুটো কেন, প্রায় হাজারটা হবে সে এ-পাড়ায় উড়তে দেখেছে। আশ্চর্য অন্য রঙের পাখিরা এ-পাড়ায় আসে না কেন। একবার মনে আছে সুধাংশু সুনীতাকে নিয়ে রেড রোড পার হচ্ছিল, মাঠের শেষ দিকটাতে একটা গাছের ঝুপসিতে সুনীতাই আবিষ্কার করেছিল, একটা পাখি, ওরা পাখি খ‍ুঁজতে গিয়ে দেখল, পাখি একটা নয়, দুটো। দুটো গাঙ শালিখ। এই দুটো গাঙ শালিখ দেখতে পেয়ে ওরা নদীর ধারে

গেল না। ওদের একটা তখন নিরিবিলি জায়গা ছিল, ফোর্টের এদিকটাতে, একটু রেলিঙ-ঘেরা সবুজ ঘাস এবং ভাঙা কিছু ইঁট-কাঠের ফাঁকে শীতের সোনালি রোদে সুনীতা এবং সুধাংশু অনেক দিন পা ছড়িয়ে বসেছে। সেদিন সেই পাখি দুটো কেন জানি বেশি দূর ওদের যেতে দিল না। গাছটার নিচে বসে পাখি দেখার জন্য একটু এগুতেই মনে হল, ঝুপসি মতো জায়গা-টাকে দুজন শুক-শারী শুয়ে বসে প্রেম নিবেদন করার মতো ভঙ্গিতে মাথা গুঁজে আছে।

সুনীতার আর সেদিন পাখি দেখা হল না।

সুধাংশু বসে-বসে সেই পুরানো পাখি দুটোকে খুঁজে দেখতে গিয়ে দেখল না পাখি, না কাক। গাছটা থেকে শুধু দুটো-একটা পাতা ঝরে পড়ছে। সুধাংশুর মনে হল, এটা কদম গাছ, তারপর মনে হল এটা জারুল গাছ, বস্তুত দীর্ঘদিন শহরে থেকে সুধাংশু কদম গাছ এবং জারুল গাছের তফাৎ ভুলে গেছে। কদম গাছ হলে এখন কদম ফুল ফুটত—শুধু ওর একথাটা মনে হল।

সুধাংশু নিরিবিলি জায়গাটায় বসে ভাবল একটু খোলামেলা জায়গায় বসে শরীরে হাওয়া লাগানো যাক। তারপর কি ভেবে ওর মনে হল, সারাটা দিন অফিসে সে বসে থাকে, মাঝে-মাঝে ওর মনে হয় এভাবে বসে থাকলে শরীরের রক্ত চলাচল একদিন কমতে-কমতে থেমে যাবে। ওর মাঝে-মাঝে এখন কেন জানি মৃত্যুভয় কাজ করে। আগের মতো আর সহসা লাফ দিয়ে ট্রামে চড়তে পারে না, সে ছুটতে ছুটতে এসে ট্রামে না চেপে খুব ধীর স্থির ভাবে ট্রামে চড়ে অফিসে আসে। বয়স যেন বাড়ছে। সে ওর হাত-পা দেখল। আয়নায় মুখ দেখার অভ্যাস কমে গেছে। দাড়ি কামাবার সময় সাদা রঙের পেস্টের মুখ দেখতে দেখতে কখনও নিজেকে মনে হয় বেশ সঙ সেজে এই সংসারে কাটিয়ে দিল। স্ত্রী, মেয়ে অর্থাৎ এই সংসার বাদে অন্য কোন অস্তিত্ব আছে সে ভুলেই গিয়েছিল। ফলে সে উঠে দাঁড়াল। সুনীতাকে নিয়ে, বিয়ের আগে, সুনীতা কলেজ পালিয়ে এই বড় মাঠে চলে আসত, দুর্গের রেমপার্ট পার হয়ে নদীর ধারে। কোন কোন দিন রেড রোড ধরে হাঁটতে-হাঁটতে অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়া অথবা ইডেনের নিরিবিলি গাছ-গাছালির নিচে একটু বসা তারপর কোন কোন দিন, এখন বড় বিস্ময় লাগে, সুনীতাকে নিয়ে এই সব ঝুপসি ছায়ায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসত, কখন কোন গাছের নিচে ছায়া থাকবে, কখন কোন অন্ধকারে কি পোশাক পরে এলে ওদের কেউ দেখতে পাবে না—এসব ওদের প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ফলে সুধাংশুর এই বড় মাঠের সব চেনা, এবং পরিচিত গাছের নিচে সেই নীল রঙের পাখি দেখে আশ্চর্যভাবে তাকাতেই সুনীতা বলেছিল, এখানে আজ এক জোড়া কবুতর বকম-বকম করছে, ওদের এমন সুখকে নষ্ট করে দিও না। ওরা সেখানে আর বসতে পারেনি। ওরা হাঁটতে-হাঁটতে নদীর পাড়ে চলে গিয়েছিল। সুতরাং সুধাংশু যেই না দাঁড়াল, মনে মনে তার অন্য কথা এসে যাচ্ছে। রক্তের ভিতর তেমন নেশা আর খেলা করে বেড়ায় না। সে দশ বছরের উপর হবে, এই অফিস পাড়ায় আসছে, অথচ একবার মনে হয় নি পুরোনো প্রেমের জায়গাগুলো এখন কেমন দেখাচ্ছে, এখন সেখানে কারা এসে বসে, মনে-মনে এই সব ভাবনার উদয় হতেই—একটু হাঁটা যাক এমনভাবে আড়মোড়া ভাঙল। অথবা এও মনে হতে পারে বসে থেকে শরীরের রক্ত জমে যাচ্ছে, একটু হাঁটা যাক, সে আয়ু বাড়াবার জন্য এই বড় মাঠে হাঁটতে থাকল। কিছুক্ষণ পরই সূর্য অস্ত যাবে। আকাশবাণী ভবনের ও পাশটায় সূর্য ডুবছে। সে একবার নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সুনীতার হাত ধরে সূর্যাস্ত দেখেছিল। সুনীতার মুখে সাঁঝবেলার ম্লান আলো, সে আলোতে মুখ রেখে সুনীতা ওর কাছে

কি যেন চাইছিল। বস্তুত সুনীতার প্রাণে তখন এক আবেগ। সে পাগলের মতো মাঝে মাঝে হাত টেনে ওর কপালে রাখত। সুধাংশু আমার জ্বর আসছে। আমার হাত-পা জ্বালা করছে। চুপি চুপি বলত, আমি মরে যাব। তুমি আমায় কোথাও নিয়ে চল। সুধাংশু বুঝতে পারত সুনীতা সত্যি মরে যাচ্ছে। সে অন্ধকারের জন্য প্রতীক্ষা করত। মাঠের এক পাশে, গাছের নিচে ওরা উবু হয়ে বসত। তারপর সুধাংশু বলত, এই দেখাও না।

—কি দেখাব। সুনীতা লজ্জা পেত।

—কেন কি দেখাবে জানো না। বলে সুধাংশু কেমন পাগলের মতো আরও ঘন হতে চাইত।

—এই লোক আসছে। তুমি যে কি কর না!

—কেন তুমি না এই মরে যাচ্ছিলে।

—আমি মরে যাচ্ছিলাম। আমার কি যে ইচ্ছে হচ্ছে না!

সুধাংশু বলল, গাছটাকে আড়াল করে বসো।

—ওদিকে বাসস্ট্যান্ড।

—এই স্ট্যাচুটা সামনে রেখে বসি।

—ডান দিকে লোক বসে আছে। ওরা চিনাবাদাম খাচ্ছে।

সুধাংশু এবার বলল, এখানে কেয়ারি করা বাগানের মতো মেহেদি গাছ আছে। এস এখানে বসি। এখন আবছা অন্ধকার। গাছের ছায়ায় জায়গাটা বেশ অস্পষ্ট। দাঁড়াও, বলে সে একটু দূরে সরে গেল। তুমি বসো সুনীতা, সে সুনীতাকে বসিয়ে হাত দশ দূরে থেকে, উত্তর পশ্চিম হেঁটে গেল। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, মেয়ে না ছেলে। তারপর সে ডানদিকে ঘুরে এসে স্ট্যাচুর বেদিটায় বসল। এখানে কোন লোক বসলে দেখতে পেতে পারে। সে ভাবল, গাছটা সামনে, স্ট্যাচুটা পিছনে, ডানদিকের রেলিঙ প্রায় বিশ গজ দূরে, শুধু পূবের দিকটা ফাঁকা। সেখানে সব সময় চোখ তুলে দেখতে হবে।

সুধাংশু সুনীতাকে বলল, এই জায়গাটা বেশ!

সুনীতা বলল, বৃষ্টি আসতে পারে।

সুধাংশু বলল, বেশ হবে। আমাদের কাছে প্লাস্টিকের ওয়াটারপ্রুফ আছে। বরং সুধাংশু এই বৃষ্টির দিনগুলোয় বেশি সুযোগ নিত। বিকালের দিকে বৃষ্টি হয়ে গেলে, বসার জায়গার নিতান্ত অভাব। রেলিঙের ধারে ধারে কিছু মানুষ বসে থাকে। তাও অল্প সময়ের জন্য, কিন্তু কেন জানি সুনীতার অপেক্ষা করতে ভাল লাগত না। ওর একটা কৌশল জানা ছিল, শায়া ব্লাউজ সব ঠিক থাকবে, কেবল পাড় দিয়ে শাড়ির যে অংশটুকু পিছনে সাপের মতো ঘুরে বুকের কাছে উঠে এসেছে, শাড়ির সেই অংশটুকু একটু তুলে নিলে সুনীতার বাঁ দিক, সুধাংশুর ডানদিক, মনে হবে সুনীতা সুধাংশুর হাত কোলে নিয়ে বসে আছে। খুব কাছে এলেও বোঝা যাবে না। সুনীতা সুধাংশু ভিতরে ভিতরে সাপে বাঘের খেলা আরম্ভ করে দিচ্ছে। সুধাংশুর হাত শাড়ির ভিতর নানাভাবে লুকোচুরি খেলছিল।

সুধাংশুর তখন মনে হত, মাঠের এইসব গাছগুলো, রেনট্রি, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া অথবা জারুল গাছের মতো যে সব গাছ রয়েছে মাঠময় সব তুলে ফেলে, সারা মাঠে কেবল কদম ফুলের গাছ লাগিয়ে দিলে, কি আশ্চর্য রঙের মাঠ হয়ে যেত। কদম ফুল থোকা থোকা, শাদা হলুদ রঙের ফুল, গোল গোল কদম ফুল। কদম ফুলের মতো নরম সুনীতার সেই লুকোচুরি খেলার আধারগুলো—মনে হত সুধাংশুর, পৃথিবীতে এই জীবন, সুখ, অনন্তকালের এবং পাগলের মতো সুনীতাকে নিয়ে মাঠের ভিতরই ছুটতে চাইত। নরম কদম ফুল, বৃষ্টিতে ভিজে গেলে যেমন নরম নরম চাপ চাপ, এক মৃদু নরম চাপ—হাতে দিলে কেবল নরম নরম, ভেজা কদম ফুলের মতো নরম, আহা এই ফুলের গাছ সে এখন কোথায় পাবে, বৃষ্টিতে ভিজে কদম ফুলের গাছ সারা মাঠে লাগিয়ে দেবার জন্য সে পাগলের মতো করতে থাকত।

পনের বছরে সুধাংশু সব ভুলে গিয়ে এক এঁদো গলির অন্ধকারে যেন ডুবেছিল, অনেকদিন পর হাঁটতে হাঁটতে সেই সব স্থান ভ্রমণের নিমিত্ত সুধাংশু একটা বাঘ হয়ে গেল। তার চোখে মুখে এমন একটা তাজা গন্ধ অথবা স্বাদ বলা যেতে পারে কেবল থেকে থেকে কাজ করছে।

হাঁটতে হাঁটতেই বলত সুধাংশু, জানো সুনীতা ভেজা কদম ফুলের মতো লাগছে।

—তুমি ভারি অসভ্য সুধাংশু।

—অসভ্যতার কি দেখলে!

—এই, এদিকে একটা বুড়ো মতো লোক হেঁটে আসছে।

—আসুক।

—কি ছেলেমানুষি করছ! বলে সুধাংশুর হাতটা সে টেনে সরিয়ে দিত।

পনের বছর কি তারও আগে এই লুকোচুরি ভালবাসা। প্রেমে এক অদ্ভুত বিস্ময়কর বৃষ্টিপাতের শব্দ ছিল। সারাদিন বৃষ্টি হলে, সূর্য আকাশে উঠে না এলে যেমন ঘর অন্ধকারময় থাকে, তারপর সহসা সূর্য উঠলে যেমন আলো, আলোময়, তেমন মনে হত, এই মাঠ, মাঠের ঘাস, সাঁঝবেলা, কোন গাছের নিচে চুপচাপ বসে থাকা—মানুষজন তাকিয়ে তাকিয়ে চলে যাচ্ছে, ওদের খেয়াল থাকত না, ভালবাসায় এমন টান! এমন লুকোচুরি খেলা, চুরি করে ভালোবাসায় কি যে স্বাদ, সেই স্বাদ সে যেন একেবারে ভুলে গেছে। এই মাঠ, ঝোপ এবং বৃষ্টিপাতের জন্য কোথাও কোথাও যে সামান্য ঘাস লম্বা হয়ে গেছে খুব খেয়াল করলে সে দেখতে পেল, জোড়ায় জোড়ায় পাখিরা উড়ে বসে ধান কি অন্য কিছু শস্য দানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ওর পা সরছিল না। সে একটা গাছের নিচে বসে পড়ল। যেন সেই পনের বছর আগের মতো সেও পাখি হয়ে গেছে! শুধু সুনীতা নেই। সুনীতা থাকলে পাখি হয়ে যেতে পারত। সুনীতার সঙ্গে প্রেম করতে করতে মেয়েটাকে আর পড়তে দিল না। সুধাংশু পর্যন্ত কেমন মাতাল হয়ে গেল প্রেমে। একটা চাকুরি দেখে সকাল সকাল ওরা দুজন বাড়ির অমতে বিয়ে করে কেমন খাঁচায় বন্দি হয়ে গেল।

হাওয়া দিচ্ছিল। মাঠের খেলা ভেঙেছে। লীগ কি শিল্ডের খেলা। এসবও এখন সে মনে রাখে না। ট্রাম বাসগুলোর মাথায় দরজায় সবাই ঝুলতে ঝুলতে চলে যাচ্ছে। কিছু কিছু আলো ফুটে উঠছে। বৃষ্টি-পাতের সময় এই আলো জলের নিচে জোনাকি ডুবে গেলে যেমন দেখায়, অস্পষ্ট, তেমন দেখাচ্ছে। বর্ষায় বৃষ্টি এই আসে এই যায়। সে ছাতাটা আজ ইচ্ছা করেই খুলল না। বৃষ্টি এলে একটা শেডের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর যখন মনে হল ফের আকাশ ঝকঝকে এবং রেলিঙে আবার এক দুই করে মানুষজন এসে বসতে শুরু করেছে এবং সন্ধ্যায় অস্পষ্ট অন্ধকার এই নগরীকে ঢেকে দিচ্ছে তখন যেন তার কি দেখার ইচ্ছা হল। সহসা বৃষ্টিপাত হয়ে গেছে বলে মানুষজন সরে যাচ্ছে। রাস্তা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। চিনাবাদামওয়ালা ট্রাম কোম্পানির ঘরের নিচে চলে গেছে। সে দেখল তখন এই বয়স কত হবে, আন্দাজ করা যায় না, মুখ এত কাছে থেকেও স্পষ্ট নয়, তবু বলা যায় যুবক যুবতী, বাড়ি থেকে এই একটু রাত করে, পড়ার নাম করে হতে পারে বেলা অথবা অমলার কাছ থেকে পরীক্ষার পড়া জেনে আসার জন্য, অথবা অমুক স্যারের নোটটা আমি নিতে পারিনি মা, সুধার বাড়িতে নোট আনতে যাচ্ছি, একটু রাত হবে, এই করে সুনীতা বার বার বড় মাঠ পার হবার জন্য সুধাংশুর আশায় মেমোরিয়েলের এক নির্দিষ্ট কোণে এসে অপেক্ষা করত। মেয়েটা অপেক্ষা করে করে এখন এই বেলা পরমানুষকে ঠিক সুনীতার মতো কাছে নিয়ে একটু আড়াল মতো জায়গায় নিরিবিলি সামান্য সময় বকবকম করে চলে যাওয়া—সুধাংশু স্থির থাকতে পারছিল না। সে বসে বসে লক্ষ্য রাখছে। প্রায় গাছপালা উপরে থাকলে মনে হত সুধাংশু এখন কোন ধ্যান অথবা যোগাভ্যাস করছে। এই যে দুই যুবক যুবতী ঝোপটার পাশে গিয়ে বসল, এবং ওয়াটারপ্রুফ পেতে নিল, লোকে দেখলে ভাববে, সাবাস মেয়ে, এই বৃষ্টিতে লোকে ঘরে বসে জলপড়া দেখে, অথবা দুহাতে জল নিয়ে ভালবাসার মানুষকে ছিটিয়ে দেয়, তুমি মেয়ে এখানে বসে ঘাসের ভিতর অথবা এই যে কর্পো-রেশন ছোট্ট মতো একটা ঝোপ করে রেখেছে তার ভিতর টেনে টেনে নেমে যাচ্ছ। এক সময় আমরা সবাই জানি, কে কার জন্য আর অপেক্ষা করে, চোখ খাড়া করে বসে থাকলে দেখা যাবে, সহসা ঝোপের ভিতর সাপে বাঘের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে।

সুধাংশুর হাত পা শির শির করছিল। সে আর একটু ঝুলে বসল। যেন সে এখন বড় একটা বিজ্ঞাপন দেখছে, বিজ্ঞাপনে নানা রকমের কথা ফুটে উঠছে, ফর ভ্যালু ফর কোয়ালিটি শেষ শব্দটা দেখার আর সাহস হল না। সাপ যেমন ব্যাঙ ঝোপের ভিতর টেনে নেয়, তেমনি যুবক যুবতীকে টানতে

টানতে ক্রমে ঝোপের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এখন পা দেখা যাচ্ছে। সে স্থির থাকতে পারছে না, সে কেমন পাগলের মতো উঠে দাঁড়াল। এত বড় আকাশের নিচে আহা মেয়েরা কি সুন্দর, কি ফুলের মতো, বোধহয় কদম ফুলের মতো নরম স্থান. স্থান কাল পাত্রে এখন টুপটাপ বৃষ্টিপাতের শব্দ। হায় এমন দিনে এইসব মাঠে শুধু রেনট্রি কেন? কদম ফুলের গাছ, প্রায় সারা মাঠে তবে এখন শাদা হলুদ রঙের কদম ফুল ফুটে থাকত।

সুধাংশু দেখল ঝোপটা কাঁপছে। এবং তখনই ঠিক দুই তিন কি আরও চারজন হবে ষণ্ডা মার্কা লোক — যেন সাধু সন্ন্যাসি হবে এমন মুখ করে, পৃথিবী জাহান্নমে গেল, রসাতলে গেল, ধরণীকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য সেই ঝোপটার পাশে ছুটে এল।

—ঝোপের তলায় কে জাগে?

সুধাংশু শুনতে পাচ্ছে। আহা এই মানুষগুলি এমন একটা ভালবাসার জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ টুলিশ পর্যন্ত গড়াতে পারে।

খাটাশের মতো মুখ লম্বা গোঁফ, মুখে বসন্তের দাগ মানুষটা এবার একটা কাছিমের মতো থপ থপ করে হেঁটে গেল।

সুধাংশুর সেই গাছের নিচে বসে বলার ইচ্ছে হল, রাক্ষসের ভাই খোক্কস জাগে। হারামজাদা! যেন কিছু জানে না! দুটো কাঁচ প্রেম সবুজ ঘাসে ফুটে উঠছে, শুয়োরের বাচ্চারা তা পর্যন্ত ফুটতে দিল না।

ঝোপ থেকে তখন ওরা ওদের টেনে তুলছে। সুধাংশু আর বসে থাকতে পারল না। সে ভেবেছিল বসে বসে এই যে প্রেম কতকাল আগে সে এমন সুনীতাকে নিয়ে ছুটেছে, পুলিশের ভয় ছিল, তবে ওরা এতটা সাহস করেনি। ভাল মানুষের মতো সুনীতা বসে থাকত পা তুলে। যেন কত নিরিবিলি কথোপকথন, অন্য কিছু নেই, কিন্তু সুধাংশু জানত, সুনীতার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছে, ভিতরে ভিতরে জ্বালা, যৌবন জ্বালা, গাছের নিচে, অথবা খোলা আকাশের নিচে বসলে সে যেন দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে। একটু খুনসুটিতেই শীতের মতো ঠাণ্ডা ওদের গা বেয়ে নামতে থাকত। সুধাংশু খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবার সময় এমন সব ভাবল। কাছে গেলে দেখল, সেই যুবক যুবতী, বয়স আর কত হবে, ঠিক যেন সেই আগের সুনীতা আর সুধাংশু বসে, মুখ চোখ অস্পষ্ট। অন্ধকারে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

ওরা ওদের পুলিশের ভয় দেখালে সুধাংশু এই প্রথম কথা বলল, কি হয়েছে?

—এখানে বসে ভালোবাসাবাসির খেলা হচ্ছিল।

—হয়েছেত কি হয়েছে। এই বয়সেত এই হয়।

—বাঃ বাঃ আপনি যে বড় রসিকজন দেখছি স্যার।

—রসিকজন নয়। ঠিকই বলছি।

—আমরা ভাবছি ওদের পুলিশে দেব।

—অপরাধ।

—প্রেম করছে।

—সে তো ভালো ব্যাপার

—জঘন্য ব্যাপার। কাছিমের মতো মুখ বার করল একটা লোক।

সুধাংশু এবার ধমক দিল, এই তোমরা আমার সঙ্গে এস।

—ওরে এ যে দাদা দালাল, শালা শুয়োরের বাচ্চা মাল নিয়ে মালয়ে যাচ্ছে।

—সাবধানে কথা বলবেন।

—আপনি দাদু কে! বলে একটা লোক এসে ওর থুতনিটা নেড়ে দিল। একটু বসে বসে খেলব, তাও দাদু বাধ সাধছেন।

—এই তোমরা এখান থেকে চলে যাও। তোমার লজ্জা করে না। ভদ্রঘরের মেয়ে নিয়ে এখানে ফুর্তি করছ। বলে সুধাংশু যুবককে ধমক দিল।

—তা একটু বলুন, কি রকম খেলেন স্যার?

ওরা কথা বলছিল না চলে যাচ্ছিল। —আরে যাবেন কোথায়? হল্লা করলে হাজার লোক জড় হবে। বলে ফিস ফিস করে বলল, কিছু ছাড়ুন।

সুধাংশু নিজেকে বড় অসহায় ভাবল।

একজন বলল, শুধু একটু চেখে দেখব।

সুধাংশু এবার সরল মানুষের মতো বলল, ছেড়ে দিন যা হবার হয়ে গেছে।

মুখে বসন্তের দাগ, একটা চোখে বিনষ্ট মানুষটা এবার প্রায় যেন জোর করে হাত চেপে ধরল যুবতীর। হাতের গহনা গলার গহনা খুলে নেবার লোভে নিমেষে মানুষটা অতিকায় একটা হাঙরের মতো মুখ করে ফেলল। ওরা ঘিরে রেখে যুবক-যুবতীকে। পুলিশ এলে ওরা আরও অসহায়। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। সুধাংশু কি করবে ভেবে পেল না। লোকজন সে ডাকতে পারত, একটু দূরে পুলিশ টহল দিচ্ছে। কিন্তু এই যুবক এসেছে প্রেম করতে, যুবতী পালিয়ে এসেছে, এরা কারা, এখন কেন জানি সুধাংশুর ভাল লাগছিল না কিছু। সে যেন মানে মানে সরে পড়তে পারলে বাঁচে। সেই যে লোকটা বলছিল, মাল নিয়ে মালয়ে যাচ্ছে, এখন মনে হচ্ছে, যদি ওরা চারজন ওকে দালাল প্রতিপন্ন করতে চায় এবং পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেয় তবে কে জানে কি হবে! অনর্থক ঝামেলাতে জড়িয়ে পড়তে সুধাংশুর আর মন চাইল না। সে গুটি-গুটি করে আসল। ফাঁকা একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল। একেবারে চলে যেতে পারল না। ওর মনটা কেন জানি এই দুই যুবক-যুবতীকে নিজের ছায়ার মতো অথবা সেই যে বলে না, অতীতের ছবি এবং প্রেম ভালবাসার মুখ ভেসে উঠলে যা হয়, মনে হয় কেবল এই সব অট্টালিকা এবং বড় বড় স্কাইস্ক্র্যাপার উপড়ে ফেলে এক বনঝোপ তৈরী করলে কেমন হয়—সে যেন এই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বনঝোপ, গাছপালা পাখি এবং সূর্য ধরে আনতে চায়। এখানে এই সন্ধ্যায় কিছু কিশোর-কিশোরী কেবল ঝুপসি মতো জায়গায় ছুটে ছুটে লুকোচুরি খেলবে। কারণ সেই যুবক-

যুবতী, যারা এখন বাস স্ট্যান্ডের দিকে হেঁটে যাচ্ছে, যাদের সম্বল কিছু নেই, যারা ঘাড়, আংটি এবং গহনা রেখে গেল দুর্বৃত্তদের কাছে তাদের কাছে গিয়ে আর একবার দাঁড়াতে পারলে যেন ভাল হতো। কিন্তু নিজেকে বড় কাপুরুষ ভাবল সুধাংশু। দূর থেকে ওদের বাসে উঠতে দেখল কেবল। এবার যেন নিশ্চিন্তে বাড়ি ফেরা যায়। সুনীতাকে বলবে, মাঠে আজকাল বসা যাচ্ছে না। আমাদের সময় কিন্তু এমনটা ছিল না সুনীতা।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল। সুনীতা বলল, এত দেরি তোমার।

—এই একটু মাঠের হাওয়া খেয়ে ফিরলাম।

সুনীতা বলল, ওরা বসে বসে বের হয়ে গেল!

—কারা।

—কমলা, অঞ্জলি, অচিন্ত্য অক্ষয়।

—কেন কেন!

—ওরা সিনেমা দেখবে বলে গেছে।

সুধাংশু মাথায় কেমন রক্ত উঠে গেল। বলল, কমলকে তুমি রাত করে পাঠালে!

—আমি পাঠালাম কোথায়! যা আদুরে মেয়ে করেছ। সেই থেকে যায়না।

সুধাংশু কোন কথা বলল না। মেয়েকে সে স্নেহ করে। এখন ওর মনে হল, স্নেহটা যেন একটু অধিক মাত্রায়। কমলার বন্ধু-বান্ধবের অভাব নেই। ভাল ছাত্রী। সবই আছে কমলার। শুধু মনে হয়েছিল, কমলা বালিকা, সে পিসতুতো মাসতুতো দাদাদের সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরতে যায়। আজ কেন জানি মনে হল, ব্যাপারটা ভালো নয়। মনে হল, কোথাও কোন মাঠে ওরা হারিয়ে গেলে কেউ ধরতে পারবে না। সুধাংশুর এই প্রথম মনে হল, কমলা আর বালিকা নেই। ওর চোখ-মুখ মনে পড়তেই সুধাংশুর চোখ-মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকল। সেই যেন সুনীতা—সুনীতাকে সে খুব কম বয়সে, সুনীতা ওর সম্পর্কে আত্মীয়া ছিল, ওর সঙ্গে সুনীতা নানা জায়গায় গেছে, আত্মীয় বাড়ি গেছে, নদীর পারে বসে সূর্য ওঠা দেখেছে। সুধাংশুর এমন একটা সরল অকপট ব্যবহার ছিল, আপন মানুষের মতো ব্যবহার ছিল, সুনীতার বাবা-মা টেরই করতে পারেনি, এই ভালো মানুষ সুনীতাকে নিয়ে অতল জলে ডুবে মণি-মুক্তোর স্বাদ নিতে পারে।

সুধাংশু চেয়ারে বসে আলোটা দেখছিল। এই সময় সে সামনের জানালাটা খুলে দেয়। একটা গাছ দেখতে পায়। গাছে কিছু জোনাকি এসে কিছুদিন হল আশ্রয় নিয়েছে। জানালা খুলে সে আলো নিভিয়ে দিল। আলো নিভিয়ে দিলে জোনাকির আলো স্পষ্ট হয়। এ-জায়গাটার পাশে কিছু খালি জমি আছে, শহরে আর কোথাও বুঝি খালি জমি থাকবে না। গাছটাও থাকবে না। জোনাকিগুলো উড়ে কোন জলাশয়ে একদিন চলে যাবে। অন্ধকারে বসেই সে টের পেল এই মাঠে কারা ইট কাঠ রেখে গেছে। নিভৃতে একটু গাছের নিচে বসে, খোলা আকাশের নিচে বসে, অথবা দুরন্ত মাঠে ছুটতে ছুটতে আর প্রেম করা যাবে না।

সুনীতা এসে দেখল সুধাংশু চুপচাপ অন্ধকারে বসে আছে। সে বুঝতে পারল, কমলার উপর সুনীতার উপর সে এক প্রচন্ড আক্রোশ নিয়ে বসে আছে। কোথায় কোন মাঠে একদিন কমলা, ঠিক আজ যে ঘটনা ঘটেছে—নাকি ওরা কমলা এবং অক্ষয়, কারা ছিল? সেতো ওদের মুখ ভালো করে দেখেনি। সেতো কাছে যেতে সাহস পায়নি। অস্পষ্ট অন্ধকারে কারা ছিল। এবার সে কেমন পাগলের মতো চোখ-মুখ নিয়ে বসে থাকল। ওরা কথা পর্যন্ত বলেনি। কেবল দুই ছায়ামূর্তি, ওর ভিতর কেমন এক জ্বালা, সে দুহাতে মুখ ঢেকে বসে থাকল।

সুনীতা কাছে এসে বলল, কি হয়েছে তোমার।

সুধাংশু বলল, ওরা কখন গেছে সুনীতা।

—ছটায় শো হবে, অক্ষয় টিকিট কেটে আনল। আমাকে যেতে বলেছিল। আমি যাই কি করে। তুমি অফিস থেকে আসবে। ওরা পাঁচটায় বের হয়ে গেল।

সুধাংশু হাত-পা ধুল। সামান্য খেল। তারপর মশারির নিচে যাবে বলে স্থির করতেই মনে হল ঘড়িটা দেখা দরকার। এখন দশটা বাজে। সে আর মশারির নিচে গেল না। জানালায় বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

কমলা এল ঠিক দশটা পনেরোয়। এসেই দেখল, বাবা মুখ গোমরা করে বসে আছে। ওর বুকটা কাঁপছে। সুধাংশু প্রথম চিনতে পারল না। মেয়ে তার শাড়ি পরেছে। একেবারে যুবতীর মতো মুখ। সে ভালভাবে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না। সুধাংশু ওর হাত দেখল। না হাতে গলায় সব ঠিক আছে। অক্ষয় দরজা থেকেই চলে গেছে। সে মুহূর্তে দাঁড়ায়নি। সুধাংশু মনে হল, এই মুখে কি যেন ধরা পড়ছে। এক নিষ্পাপ মেয়ের মুখ মনে মনে সে এতদিন এঁকে এসেছিল, আজ মনে হল মেয়ে তার ধরা পড়ে গেছে। কমলা বাপের দিকে সোজা তাকাতে পারছে না। বাপ যেন তাকে ধরার জন্য এই জানালায় চুপচাপ বসে আছে।

সুধাংশু ডাকল, কমল শোন।

কমল কাছে এলে বলল, কোথায় গিয়েছিলি?

—কোথায় যাব! সিনেমা দেখতে।

—ঠিক করে বলো কোথায়?

কেমন থতমত খেয়ে গেল।

—বল বলছি।

—বলছি ত? অক্ষয়দা আমি অঞ্জলি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।

—আবার মিথ্যে কথা! ঠাস করে একটা চড় কসিয়ে দিল।

সুনীতা ছুটে এল। সে অবাক। সুধাংশু কোনদিন এমন ব্যবহার করে না। কোনদিন কমলার গায়ে হাত তোলেনি। সুধাংশু কেমন পাগলের মতো ঘরে বেড়াতে থাকল, ভাল হবে কি করে, মেয়ে তো মায়ের মতোই হবে!

সুনীতা বলল, কি বললে! কি বললে! ঠিকই বলেছি।

—তুমি এত ছোট!

সুধাংশু ফেটে পড়ত। কিন্তু একটা সিন ক্রিয়েট হবে ভেবে সে বিছানায় ঢুকে শুয়ে পড়ল। বস্তুত সুধাংশু ভিতরে ভিতরে ছটফট করছে। সে যে কি চায়, নিজেও বুঝতে পারছে না। নিজের কথা, কৈশোরের কথা, দুই কিশোর-কিশোরীর কথা মনে হলেই মনে হয় সংসারে কেমন ঝুপসি মতো ঝোপ জঙ্গল, বন মাঠ থাকে না, যেখানে শৈশব পার হতে হতে কৈশোর চলে আসবে, এবং উদার আকাশের নিচে সেই জীবনের খেলা, কি খেলা যেন, নিত্য খেলা, গাছে কদম ফুল ফুটলে, বৃষ্টি হলে, জলে ভিজে ভিজে ফুলের যে কোমল নরম আস্বাদ জন্মায় তেমন আস্বাদ, আর কৈশোরের ফুল-ফল চোখে না দেখলে, জীবনের মূল্যবান সময় মানুষের হারিয়ে যায়। কমলা সেই ফুল-ফলের জন্য অক্ষয়ের হাত ধরে হারিয়ে যেতে চাইছে।

ঘুমের ভিতর মনে হল, ওঘরে সুনীতা, কমলা উভয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তারপর একসময় কান্না থেমে গেল। নিভৃতে অন্ধকার ওদের ঢেকে ফেলছে। ওর কেন জানি এখন সুনীতার কাছে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু পারছে না। সুনীতার কাছে এখন গেলে—। না কি ভেবে সে যেন শক্ত হয়ে পড়ে থাকল। এবং একসময় ঘুম এসে গেলে সে স্বপ্ন দেখল, মাঠের সব গাছপালা সে উপড়ে ফেলছে! সে লাট ভবনের বড় বড় পাথর নদীর জলে নিক্ষেপ করছে। যেখানে যত ইট কাঠ আছে সব সে টেনে আনছে, সে সুনীতা এবং কমলা, আরও সব কিশোর-কিশোরী মিলে সব টেনে এনে নদীর জলে ফেলে দিচ্ছে। জলে স্রোত ছিল, প্রাচীন কলকাতা নগরী যেন জলে ভেসে যেতে থাকল। একা সে দাঁড়িয়ে আছে পাড়ে। পিছনের দিকে তাকালেই সমতলভূমি। সে চাষবাস করে সেখানে কদম ফুলের চারা, বেত ঝোপ এবং কিছু বন অতসীর গাছ এনে রোপন করে দিল। সেই সব গাছ দিনে দিনে বড় হয়ে গেল। সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। সে একা একা। গাছপালা বৃক্ষের নিচে ছুটে বেড়াচ্ছে, পাশে কমলা। এমন এক বনের ভিতর সে কমলার জন্য অক্ষয়কে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বিছানায় শাদা চাদরটা পাতা ঠিক হয় নি। বদলে দিতে পারলে ভাল হত। এখনই বদলে দেওয়া সম্ভব না। আবার ওকে টানাটানি করলে ওর দুর্বলতা বাড়বে। কয়েক ঘণ্টা আগেই তো ঈষদুষ্ণ জলে ওর গা মুছিয়ে, বিছানায় ধবধবে শাদা চাদরটা পেতে, ওকে শুইয়ে দিয়েছে। চাদরটা শাদা বলেই হয়ত ওর নিরক্ত মুখ এমন করুণ অসহায় দেখাচ্ছে। চাদরটা রঙিন হলে, যেমন সবুজ অথবা কমলা, এত করুণ দেখাত না।

টুকুর চুলে ষোলদিন তেল পড়েনি, এলোমেলো, চিরুনি চলে না। টুকুর ঠোঁট শুকিয়ে ফেটে ফেটে গেছে, ঠিক থরথরে হয়ে যায় নি, কারণ বয়েসের কাঠিন্য তো আসে নি—সবে আট পার হয়ে ন'য়ে পড়েছে—তবু দু' আঙুলে ঠোঁটে মৃদু চাপ দিলেই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। টুকুর রঙ এত ফরসা না হলে, একটু চাপা হলে, হয়ত এমন করুণ মনে হত না, অথবা ওর ছোট শরীর একটু মাংসল হলে, অথবা—আবারও হৈমন্তী ভাবল—বিছানার চাদরটা রঙিন হলে, যেমন সবুজ অথবা কমলা, এত অসহায় দেখাত না।

আজ ষোল দিন। কাল একশ'র বেশী জ্বর ওঠে নি। আজ জ্বর নেই। গা সামান্য গরম। ওটা দুর্বলতার জন্যে। শরীরে মেদ থাকলে ওটাও থাকত না। টুকুর শরীরে মেদ নেই, চামড়ার চিকন পরতের তলায়ই রক্ত ছুটছে, আজ যে গা সামান্য ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে সেটা সেই রক্তের তাপ। তাই কি? হৈমন্তীর এসব ভাবনা কি বিজ্ঞানসম্মত? যেসব মায়েরা কলেজের গণ্ডি ডিঙিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে দু' বছর কাটিয়েছে তারাও কি এমন করে ভাবে?

শুরু থেকে জ্বর দ্রুত ওঠানামা করছিল, ছেড়ে যাচ্ছিল না একবারও। সর্দি-কাশি ছিল না। ঠোঁট শুকনো, জিভের ওপর পাতলা শাদা আস্তরণ, বেশী জ্বরের সময়ও চোখ নীলাভ থাকছিল, লালচে হচ্ছিল না। ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা করবার প্রয়োজন বোধ করল না, ন'দিনের মাথায় ক্যাপসুল দিল। চার ঘণ্টা অন্তর ক্যাপসুল চলছিল, এখনো চলছে, তবে ছ' ঘণ্টা অন্তর। আজ এবং কাল জ্বর না এলে তারপর আরো দু'দিন দু'বেলা দু'টো করে ক্যাপসুল চলবে। এতদিন শুধু তরল খাদ্য আর মাঝে মাঝে এক আধখানা বিস্কুট টুকু পেয়েছে। আজ প্রথম বিকেলের দিকে আপেল সিদ্ধ খাবার অনুমতি দিয়েছে ডাক্তার। টুকু দারুণ খুশী। মৃদু রিনরিনে গলায় খুশী জানিয়ে বিকেলের প্রতীক্ষা করতে করতে এখন তন্দ্রাচ্ছন্ন।

বিকেল হয়ে এল। আপেলের টুকরো-গুলো জলে ডুবিয়ে অ্যালিউমিনিয়মের পাত্রে হিটারে চাপিয়ে দিয়েছে হৈমন্তী।

ফ্ল্যাটটা পুবমুখো। বিকেলে বড় তাড়াতাড়ি উজ্জ্বলতা কমে যায়। বিশেষত এই ঘরে, যেখানে শাদা বালিশে ছড়ানো টুকুর শুকনো চুল ও নিরক্ত মুখের একপাশ, ছায়াছায়া বিষণ্ণতা। এক কোণের টেবিলে টুকুর বইখাতা। আজকাল বাচ্চাদের বইয়ের সংখ্যা দেখলে আশ্চর্য লাগে। শিয়রের কাছে ছোট টেবিলে ওষুধ, একটা মাঝারি আকারের লাল আপেল। আর এক কোণে আলনায় অনেক জামাকাপড়ের ওপর একটা আধময়লা পাঞ্জাবি ঝুলছে। আজই ছেড়ে রেখে গেছে বিমল। আজ সকালে বেরোবার সময় বিমল দেখে গেছে, মেয়ের জ্বর নেই।

হৈমন্তী আপেলটা দেখে এল। সিদ্ধ হতে প্রচুর সময় নেবে। নরম হলে, জলটা শুকিয়ে এলে, চামচের চাপে টুকরোগুলো জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।

এই মুহূর্তে হাতে কোনো কাজ নেই। ঘরে পাতলা অন্ধকার ঘন হচ্ছে। আলো জেবলে বিষণ্ণ ছায়া মুছে দেওয়া যায়, ঘর উজ্জ্বল করা যায়। কিন্তু দিনের বেলায় আলো জ্বললে হৈমন্তীর খারাপ লাগে। তাছাড়া তীব্র আলোর আকস্মিক আঘাতে টুকু পুরোপুরি জেগে উঠতে পারে। আপেলটা তৈরি হওয়ার আগে হৈমন্তী তা চায় না।

টুকুর পড়ার টেবিলটা গুছিয়ে রাখছিল। সবে তো ক্লাস থ্রি। এর মধ্যেই এত বই, এত খাতা। ষোল দিন এসব ছোঁয় নি টুকু। অথচ তার স্কুলের পরীক্ষার মাত্র এগার দিন বাকী। কী হবে? কেমন এক বিচিত্র আতঙ্কের মৃদু কাঁপুনি হৈমন্তী অনুভব করল। রাত জেগে জেগে শরীর কাহিল। এখন টুকুর আসন্ন পরীক্ষার কথা ভেবে, বইখাতা গুছোতে গুছোতে দুঃখে হতাশায় নিজের হাতের আঙুলগুলো অবশ মনে হল। এগার দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠে কী করে পরীক্ষায় বসবে টুকু? বসতে পারলেও এতদিন বইখাতা না ছুঁয়ে কেমন পরীক্ষা দেবে?

গত বছর টুকু ফাস্ট হয়েছিল।

মায়েদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা, দারুণ রেষারেষি। প্রতিদিন দুবার এ অঞ্চলের সবথেকে বনেদী মেয়েস্কুলের ফটকে মায়েদের নিজের নিজের সৌভাগ্যের, বৈশিষ্ট্যের মেলা বসে। বিয়েটিয়েতে যাবার জমকালো শাড়ি এবং নেহাত আটপৌরে শাড়ি ছাড়া মাঝারি ধরনের শাড়ি কে কত নতুন নতুন পরে আসতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলে প্রত্যহ। শীতকাল ছাড়া অন্য সব ঋতুতে নানা রঙ ও নকশার ছাতা, কারো কারো কনুইয়ের ওপর ভাঁজ করে রাখা অথবা গায়ে জড়ানো ফুললতাপাতার ছাপ দেওয়া প্ল্যাস্টিকের বর্ষাতি। কারো কারো সর্বাঙ্গে গয়নার ভার, শুধু সোনার অথবা জড়োয়ার, পানের রসে লাল ঠোঁট, সৌভাগ্যের প্রতিমা। কারো বাঁ হাতে সোনা দিয়ে বাঁধানো একটি লোহা, ডান হাতে শুধু ঘড়ি, কানে হালকা দুল, গলায় খুব সরু হার, দাঁতের শাদা নষ্ট হবে বলে পানের প্রতি ঘৃণা এবং প্রাত্যহিক ঘোষণা : তার প্রচুর গয়না ভল্টে রয়েছে। এদের মধ্যে দু' একজন পান ছাড়তে না পেরে, দাঁতের শাদা বাঁচাতে খয়ের ছাড়া পান খায়। স্কুলফটকের অল্প সময়ের জমায়েতে সহজেই বুঝে নেওয়া যায়, কে ডাক্তারের স্ত্রী, কার স্বামী ঘেরাও হবার মতন অফিসার, কে অধ্যাপকের স্ত্রী, কার স্বামী শুধুই কেরানী। ফটকের দুপাশের দুটো মাধবীলতার ছায়ায় রোজ দুবার অল্প সময়ের জন্য তাদের উচ্চারণ, তাদের শব্দ-প্রয়োগ, তাদের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য বড় সহজে বুঝিয়ে দেয়। মূলত এই প্রায়-সমবয়সী মায়েদের মধ্যে অমিল যে খুব কম, ওইটুকু সময়ে বুঝতে পারা কঠিন। বরং ওইটুকু সময়ে অমিলটাই স্পষ্ট চোখে পড়ে।

যে-মা নিজেই অন্য স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, সে অন্য মায়েদের কর্মহীনা বলে করুণা করে। অথবা, হৈমন্তী ঠিক বুঝতে পারে না, হিংসে করে কি? নিজেকে রোজ পাঁচ ছ'টি ক্লাসে মেয়েদের সামলাতে হয়, প্রায়ই পাহাড়প্রমাণ পরীক্ষার খাতা দেখতে হয়, তার জন্যে কি শিক্ষয়িত্রী-মা তথাকথিত কর্মহীনা মায়েদের হিংসে করে? এবং লুকোবার তাগিদে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে করুণা প্রকাশ করতে গিয়ে ব্যাপারটা এক এক সময় স্থূল হয়ে পড়ে? এই কারণেই কি অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া মেয়েদের সত্যিকার মুক্তি আসতে পারে না---একথা বলবার সময় শিক্ষয়িত্রী-মা আচমকা উচ্চকণ্ঠ হয়, গলার দুপাশের শিরা ঈষৎ স্ফীত হয়ে ওঠে?

এসব নিয়ে মায়েদের রেষারেষি আছে, তীব্রভাবেই আছে। কিন্তু আসল প্রতি-দ্বন্দ্বিতার কেন্দ্রবিন্দু এখানে নয়, মায়েদের অঙ্গবাসে, আচরণে, উচ্চারণে নয়। কার মেয়ে কোন্ পরীক্ষায় কেমন্ করল, কার মেয়েকে ক্লাসের দিদিমণি বেশী পছন্দ করে, তাই নিয়েই আসল প্রতিযোগিতা। মায়েদের রেষারেষি এক একটি কেন্দ্রবিন্দু এক একটি মেয়ে। নিজের নিজের মেয়েদের ছুটিয়ে মায়েদের উত্তেজিত হ্রেষা, ক্ষিপ্রতম দৌড়।

সকালে বিকেলে দুবার করে মায়েরা আসে, দু'চারজন মধ্যদিনেও আসে মেয়েদের নিজের হাতে টিফিন খাওয়াতে। কেউ নিজেদের গাড়িতে আসে, কেউ রিকশয়, কেউ হেঁটে। স্কুলের একখানাই বাস। একটি মেয়ের জন্য মাসে সতের টাকা। অনেকেই ওই টাকা দিতে পারে। কিন্তু ওই বাসে মেয়েরা প্রতিদিন এক সময়ে যেতে পারে না, এক সময়ে ফিরতে পারে না। কোনদিন সকাল ন'টায় বাস এল, কোনদিন দশটায়, আবার কোনদিন মেয়ে ফিরল বিকেল সাড়ে চারটায়, কোনদিন সাড়ে পাঁচটায়। এই কারণে স্কুলের বাস অধিকাংশের অপছন্দ। সুতরাং মায়েরাই মেয়েদের নিয়ে যায়, নিয়ে আসে। সুতরাং স্কুলফটকে মাধবীলতার ছায়ায় মায়েদের সৌভাগ্যের, বৈশিষ্ট্যো প্রাত্যাহিক প্রদর্শনী।

তার মতো উজ্জ্বল রঙ এই স্কুলের অন্য কোনো মেয়ের মায়ের দ্যাখেনি হৈমন্তী। কিন্তু তার গাড়ি নেই, তার গয়না খুব বেশীও নয়, খুব কমও নয়, অজস্র নতুন নতুন মাঝারি শাড়ি কেনার উৎসাহ নেই, বিমলের কাঠের ব্যবসা, বিমল ডাক্তার নয়, ইঞ্জিনীয়ার নয়, ঘেরাও হবার

মতন অফিসারও নয়, অধ্যাপকও নয়। ফলে হৈমন্তীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু কেন্দ্রবিন্দুতে। শুধু টুকুর জোরে অন্য মায়েদের সঙ্গে তার রেষারেষি। বস্তুত অন্য মায়েদের সঙ্গে যতটা, তার থেকে বেশী, অনেক বেশী এবং গোপন যন্ত্রণাসঞ্চারী দ্বন্দ্ব তার বাসন্তীর সঙ্গে, তার সহোদরার সঙ্গে।

অথচ টুকুর এখনো ক্যাপসুল চলছে। টুকুর পরীক্ষার আর মাত্র এগার দিন বাকী।

ওর ঠোঁটে দুপুরে একবার ক্রিম লাগিয়ে দিয়েছিল; এখন আবার দিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এখন ক্রিম ঘষতে গেলে টুকু জেগে উঠবে। থাক, আপেলটা সিদ্ধ হক, আপেল খাওয়ার পর ক্রিম লাগিয়ে দেবে।

হৈমন্তীর নিজের ঠোঁট টুকুর ঠোঁটের মতো পাতলা, তবে টুকুর ঠোঁটের মতো ফেটে যায় নি, কারণ হৈমন্তীর তো কোনো অসুখ করে নি। কিন্তু হৈমন্তীর ঠোঁটে এবং ঠোঁটের পাশেই বাঁ গালে একটা দুঃসহ জ্বালা আছে, অনেকদিন থেকে আছে। হীরেনের দাঁতে বিষ ছিল, অথবা তরল আগুনের মতো কোনো তীব্র আরক যা হৈমন্তীর ঠোঁটে এবং ঠোঁটের পাশেই বাঁ গালে একদা ভালবেসে ঢেলে দিয়েছিল। তার জ্বালা কোনোদিন গেল না। মাঝে-মাঝেই জ্বলে পুড়ে যাবার অনুভব বড় তীব্র হয়। হৈমন্তীর নিজের দাঁতে দাঁতে ঘষটানি লেগে যায় না সত্যি, দাপাদাপি করে না, বলা বাহুল্য, তবে এক গোপন এবং পুরোন অপমান-মেশানো দুঃখের শিকড়গুলোয় বারংবার টান পড়ে।

হীরেনের সরে যাওয়া, ক্রমান্বয়ে হৈমন্তীর ছায়া থেকে সরে যাওয়ার কথা ভাবলে এখনো আশ্চর্য লাগে। আশ্চর্য লাগলেও অসঙ্গত মনে হয় না, অবিশ্বাস্য মনে হয় না। এমন হওয়াই হয়ত স্বাভাবিক ছিল। নিজেদের দেশবাড়ি থুইয়ে এই শহরে চলে আসতে না হলে হয়ত এমন হত না। এমন হত না? এমন না হলে তো হীরেনের সঙ্গে আজও হৈমন্তীর জড়িয়ে থাকার কথা আসে। তাহলে তো ভাবতে হয়, তার শরীরমনে হীরেন ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে, শিকড় নামিয়ে দিয়েছে গভীরে। এতকাল পরে তেমন ভাবনাকে আর একটুক্ষণের জন্যও প্রশ্রয় দেওয়া অসম্ভব। তবু একটুক্ষণের জন্য অনিচ্ছুক মনে তেমন ভাবনা এলে সত্যি হৈমন্তীর দাঁতে দাঁতে ঘষটানি লেগে যেতে চায়, কোন্ প্রচ্ছন্ন অতলে দাপাদাপি শুরু হয়ে যেতে চায়।

দেশঘর থুইয়ে আসার আগে সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ যে-দিনগুলোয় বাবার প্রিয় ছাত্র হীরেন হৈমন্তীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিল, তখন বাসন্তী নিজের শাড়িতে প্রতিষ্ঠা পায় নি, হয়ত দু' একবার মাত্র শখ করে দিদির শাড়ি পরেছে। বাবাকে কলেজের চাকরি ছেড়ে, ঘরদুয়োর থুইয়ে এই শহরে চলে আসতে হল। দুই দাদার কারো তখনো ছাত্রাবস্থা কাটেনি। সেই এলোমেলো দিনগুলোয় হৈমন্তীর পড়াশুনো আর এগোল না। তার জন্য হয়ত হৈমন্তী নিজেও কিছুটা দায়ী, হয়ত তার সঙ্কল্পে শিথিলতা ছিল। সেই ছন্নছাড়া সময়ের আঘাতগুলো বাসন্তীর গায়ে তেমন লাগে নি, ওরা লাগতে দেয় নি, সবাই মিলে তাকে সযত্নে আড়াল করে রেখেছিল।

তখনো হৈমন্তীর বৃত্তেই ছিল হীরেন। সীমান্তের ওপারে প্রথম যে-বিষ ভালবেসে ঢেলেছিল, তখনো তার ক্রিয়া চলছিল। তারপর ঋতু বদলে গেল। বাবা অনিচ্ছায় অবসর নিলেও, ভাল চাকরি পেয়ে গেল দুই দাদাই। কচি লাউডগার মতো ছিল যে-বাসন্তী, সে দ্রুত বেড়ে উঠল। পড়াশুনোয়, শহুরে সহবতের ঔজ্জ্বল্যে চমকে দিল সবাইকে। বাসন্তী সগৌরবে মঞ্চে এসে দাঁড়াল। শরীরে প্রখর আলো ধরে নিজের অলজ্জ ছায়া প্রসারিত করে দিল, জালের মতো ছুঁড়ে দিল, ক্রমান্বয়ে জাল গুটিয়ে হীরেনকে টেনে নিল নিজের মধ্যে।

বসার ঘরে পাখা চালিয়ে আপেলটা ঠান্ডা করে আনলে টুকু উত্তেজনায় উঠে বসল। মস্ত হাঁ করে মুখ এগিয়ে আনল, যেন চামচটাও খেয়ে নেবে। আপেলের টুকরোগুলো গলে জলের সঙ্গে মিশে গেছে, চামচ দিয়ে তেমন চাপ দিতে হল না। কাঠের আলমারির একটা পাল্লায় আয়না বসানো। সেদিকে একবার তাকিয়ে হৈমন্তী দেখল, তার নিজের ঠোঁটে করুণ হাসি জড়ানো। টুকুর হ্যাংলামি দেখে কষ্ট হচ্ছিল, হাসিও পাচ্ছিল।

ঘরে অন্য কেউ নেই, অন্য কেউ এখন আসবেও না। বিমলের ফিরতে দেরি হবে। আজ দেখে গেছে, মেয়ের জ্বর নেই। টুকুকে সুস্থই মনে হচ্ছে, গায়ে তাপ নেই, আপেল খেতে পেয়ে দারুণ খুশী। এখন যদি টুকু বইয়ের পাতায় একটু আলতো-ভাবে চোখ বুলোয়, যদি দুটো অঙ্ক করে? পরীক্ষার তো আর মাত্র এগার দিন বাকী। টুকু যদি অসাধারণ কিছু না হয়, টুকুর ওপর প্রখর আলো যদি না ঝলকায়, হৈমন্তী কেমন করে মানুষের সামনে দাঁড়াবে?

ঘরের আলো জেলে দিয়ে গোপন ষড়যন্ত্রের ফিসফিস গলায় অথচ কথায় স্নিগ্ধ হাসি মাখিয়ে হৈমন্তী বলল, একটু পড়বে টুকু? বসে বসে অথবা কষ্ট হলে শুয়ে শুয়ে একটু পড়বে?

টুকু যোল দিন বিছানায়। স্কুলে যায় না, খেলতে পারে না, তরল ছাড়া আর কিছু খেতে পায় না। মা পড়তে বলছে শুনে টুকু অবাক। মুখ শুকিয়ে যাওয়ায় চোখ দুটো আরো বড়। সেই চোখ মেলে মার দিকে একটুক্ষণ শুধু তাকিয়ে রইল।

অবশ্য পড়াশুনোয় টুকুর উৎসাহ প্রচুর, অনেকের থেকেই অনেক বেশী। আপেল খেতে পাওয়ার উত্তেজনার রেশ তখনো সম্ভবত ছিল। মা'র কথায় প্রথমে অবাক হলেও, বিস্ময়ের ভাবটা অল্প পরেই কেটে গেল। আগ্রহেই বলল, পড়ব মা বসে বসেই পড়ব, লিখব। আমাকে তো ফার্স্ট হতে

হবে। আমার কষ্ট হচ্ছে না মা, অসুখ সেরে গেছে!

টেবিল থেকে বিছানায় বই খাতা পেন্সিল এনে টুকুকে দুটো অঙ্ক করতে দিল হৈমন্তী। অঙ্ক হয়ে গেলে আধ পাতা ইংরেজি লিখবে। না লিখলে, অসুখের জন্য লেখার অভ্যেসটা চলে গেলে, পরীক্ষার খাতায় জানা কথারও ভুল বানান লিখবে। আর অঙ্ক তো পুরোপুরি অভ্যেসের ব্যাপার। টুকুকে দেওয়া অঙ্ক দুটো মিলি-গ্রাম, সেন্টিগ্রাম, ডেসিগ্রামের। এসব হৈমন্তীর সময়ে ছিল না সত্যি, তবে টুকুকে বোঝাতে বোঝাতে হৈমন্তীর মুখস্থ হয়ে গেছে, বই দেখতে হয় না।

হৈমন্তী জানলার কাছে সরে এসে বসল। বিকেল আর নেই। দূরের কয়েকটা জানলায় আলো। আকাশটার পেন্সিলের সীসের রঙ। এখান থেকে বড় রাস্তা দেখা যায় না, শুধু একটা সরু গলি চোখে পড়ে। বড় রাস্তার ধ্বনিতরঙ্গ খুব মৃদু আঘাত করছিল। শুকনো হাওয়ায় আসন্ন শীতের টান। এই জন্যই হয়ত টুকুর ঠোঁট আরো এমন ফেটে-ফেটে যাচ্ছে। গত বছর শীতের শুরুতে টুকুর পরীক্ষার আগে বাসন্তীদের সঙ্গে সবাই মিলে দার্জিলিং গিয়েছিল। শীতের শুরুতে ওখানে বেড়াতে যেতে হৈমন্তীর আপত্তি ছিল। শেষ পর্যন্ত যেতে হয়েছিল বাসন্তীর জিদের জন্য। বাসন্তীর ধারণা, ওখানে শীতকালই তো আরাম! তখন কিন্তু টুকুর ঠোঁট এমন ফেটে যায় নি, বরং পানের দিনেই দুই গালে ঈষৎ লাল আভা ফুটেছিল।

বিকেলে হোটেল থেকে চা ইত্যাদি খেয়েই বেরিয়েছিল, তবু ম্যাল-এ এবং তার আশপাশে ঘন্টাখানিক বেড়িয়ে সবার আবার খিদে পেয়ে গেল। শৈলাবাসে এমন হয়, ঘন-ঘন খিদে পায়। শীতে হাড়ে-হাড়ে প্রায় ঠোকাঠুকি লাগছিল, আঙুল কান অবশ, চারপাশে কুয়াশা। হীরেন আর বাসন্তী বিদেশী বইয়ের দোকানে ঢুকল। নতুন কী সব পেপার ব্যাক এসেছে, দেখতে গেল। ওদের ও বিষয়ে আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। হীরেন প্রথম দিকে অধ্যাপনা করত, এখন সওদাগরী অফিসের বড় এক্সিকিউটিভ, বাসন্তী সকালবেলা মেয়ে কলেজে পড়ায়। চাকরি করার দরকার নেই বাসন্তীর। শখ। ওরা বইয়ের দোকান থেকে একটু পরে কোথাও চা খেতে যাবে। হৈমন্তীরা ওদের সঙ্গে থাকলে কিছু ক্ষতি ছিল না। কিন্তু বিমল একটু যেন জোর করে হৈমন্তী ও টুকুকে অন্যদিকে টেনে নিয়ে এল। ম্যাল থেকে নিচের দিকে নামতে নামতে বিমল বলল, ওরা কোনো সাহেবী কেতার দোকানে যাবে। খাবার সঙ্গে একটু পিনাও করবে মনে হচ্ছে।

—তার মানে?

হৈমন্তীর কানের কাছে মুখ এনে, প্রশ্রয়ের হাসির সঙ্গে বিমল বলল, ওরা এই শীতে আজ একটু হুইস্কিটুইস্কি খাবে বলে আমার ধারণা।

—ওমা! সে কি! হৈমন্তীর কানে ঠাণ্ডায় তালা লেগে গিয়েছিল, বিমলের কথায় মনে হল ছেড়ে গেল। হীরেনের সঙ্গে বাসন্তীও! তাদের বাসন্তী, তার বাসন্তী, যে নাকি সেদিনও নিজে ইজেরের দড়ি ঠিকমতো বাঁধতে পারত না, হৈমন্তী বেঁধে দিলে তবে একমাথা কোঁকড়া চুল নিয়ে লাফিয়ে বেড়াত মেয়ে!

অনেক নিচে নেমে বিমল তাদের একটা দোকানে নিয়ে গিয়েছিল। কাচের মধ্য দিয়ে ছোট-বড় নানা আকারের নানা রকমের অজস্র মিষ্টি সাজানো দেখা যাচ্ছিল। দোকানটায় বেশ ভিড়, রেডিও খুব জোরে বাজছিল। পর্দার আড়ালে ছোটঘরে বসবার পর বিমলের নির্দেশে প্লেটভরতি মিষ্টি এল, অন্য প্লেটে গরম লুচি, শুকনো তরকারি। চায়ের বদলে বিমল কফি চাইল। সবই স্বাভাবিক, সঙ্গত। বিমল অশিক্ষিত নয়, সফল ব্যবসায়ী, স্বাস্থ্যবান কৃপণ নয়। তথাপি সেই দুঃসহ শীতের সন্ধ্যায় পর্দার আড়ালে ছোটঘরে বসে কেন যে হৈমন্তী সব কিছুতে গ্রাম্যতা দেখেছিল!

কারো সঙ্গে কি তার রেষারেষি আছে? হৈমন্তী স্বীকার করে না। টুকুকে নিয়ে বাসন্তীর সঙ্গে রেষারেষির প্রশ্নই ওঠে না। বাসন্তী এত বছরেও তো মা হল না। হয়ত এতগুলো বছর ওরা এমন হালকা থাকতেই চেয়েছিল। কারো সঙ্গে, এমন কি টুকুদের স্কুলের অন্য মেয়েদের মায়েদের সঙ্গে, তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হৈমন্তী স্বীকার করে না। সে শুধু তার অপূর্ণ ইচ্ছেগুলো টুকুর মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে চায়, টুকুর মধ্যে তার ইচ্ছেগুলোর নিখাদ পূর্ণতা দেখতে চায়। আসলে হৈমন্তীর কষ্টটা কেউ বোঝে না, বিমল পর্যন্ত বোঝে না।

—হয়ে গেছে মা। রিনরিনে গলায় মাকে ডেকে টুকু আবার শুয়ে পড়ল, মিশে গেল বিছানার সঙ্গে।

হৈমন্তীর দেখল, টুকু দুটো ভুল করেছে। অসুখের কথা মনে রাখলেও এমন বাজে ভুল ক্ষমার অযোগ্য। নিয়মটিয়ম জেনেও একটা অঙ্ক ভুল করেছে। 'এ লায়ন রোরস' লিখতে গিয়ে 'রোরস' বানান লিখেছে 'আর-ও-আর-ই-এস'। অথচ এই ধরনের বানান টুকুকে কতবার শিখিয়েছে। পরীক্ষার আর মাত্র এগার দিন বাকী। হৈমন্তী বড় অসহায় বোধ করল। টুকুর

মাথায় কি কিছু নেই! টুকু যদি অসাধারণ কিছু না হয়, টুকুর ওপর যদি প্রখর আলো না ঝলসায়, হৈমন্তী সবার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে কেমন করে? ভুল অঙ্কটা পেন্সিলের নিষ্ঠুর চাপে কেটে দিয়ে বলল, ষোল আর সাতে চব্বিশ কেমন করে হল টুকু? এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি পরীক্ষায় ভাল করবে! নিজের গলার রুক্ষতা নিজেরই কানে আঘাত করল, আমল দিল না।

বই-খাতা থেকে মুখ তুলে দেখল, টুকু করুণ টলটলে চোখে মা'র দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ শুকিয়ে যাওয়ায় চোখ দুটো আরো বড়, ভয়ার্ত আহত হরিণশিশু যেন। কেমন সন্দেহ হওয়ায় টুকুর কপালে হাত রাখল। গরম। আবার জ্বর এসেছে, বসে-বসে এতক্ষণ লেখায় থকলে আবার জ্বর এসেছে টুকুর।

চমকে উঠে দাঁড়িয়ে খাতা-বই পেন্সিল টেবিলে রেখে এল। টুকুর বিছানায় ফিরে আসতে গিয়ে আলমারির পাল্লায় লাগানো আয়নায় নিজের মুখ প্রতিফলিত দেখতে পেল হৈমন্তী। একটু থামল। নিজের ঘৃণ্য মুখ দেখে নিতে চাইল। নিজের ওপর ঘেন্নায় আঙুল কামড়ে রক্ত বের করে দেবার বাসনা হল। ভাবছিল, সে ঘোড়-দৌড়ের মাঠে কাঠের শাদা রঙকরা রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, দৌড় শুরু হলে রোদ্দুরের চশমা সরিয়ে নিয়ে দূরদর্শনযন্ত্র চোখে লাগিয়ে উদ্বেগে উল্লাসে লাফাচ্ছে। অথচ আয়নায় প্রতিফলিত মুখে হৈমন্তী কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা অথবা উল্লাস খুঁজে পেল না। বরং টুকুর মুখের মতো অসহায়, করুণ। টুকু অবিকল মায়ের মুখ পেয়েছে। ঠিক তখন, কী বিশ্রী, কুয়াশা জমে গেল চোখে।

টুকুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত আলনার কাছে সরে গেল। বিমলের ছেড়ে রাখা জামাটা দিয়ে চেপেচেপে মুখ-চোখ ঘষল। ঘাম আর ধুলো-ময়লার মিশ্র গন্ধ, তার সঙ্গে বিমলের গায়ের বিশিষ্ট গন্ধ। ক্ষিপ্র হাতে এবং সযত্নে জামাটা ভাঁজ করে রেখে টুকুর বিছানায় ফিরে এল।

থার্মোমিটার দেবার সাহস হল না। এতটুকু সময়ের মধ্যে দ্বিতীয়বার কপালে হাত রেখে মনে হল, তেমন গরম তো নয়! সামান্য একটু তাপ। পড়তে-লিখতে বসার আগেও তো ওটুকু ছিল। তাহলে হয়ত আবার টুকুর জ্বর আসেনি। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই আসেনি।

মা'র মুখ কিছুটা নির্ভার হতে দেখে যেন টুকুর মুখও একটু বদলে গেল। প্রথমে টুকুর সারা গায়ে এবং তারপর চুলের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে হৈমন্তী বলছিল, তুমি পরীক্ষা দিতে না পারলেও তোমাকে ওপরের ক্লাসে তুলে দেবে। তাছাড়া সুস্থ হয়ে আর একটুও পড়াশুনো না করে পরীক্ষা দিতে পারলেও তুমি নিশ্চয়ই পাশ করে যাবে। তুমি সামনের বছর আবার ফার্স্ট হবে টুকু। তুমি আমার সোনা মেয়ে।

বাংলার পুতুল

আশীষ বসু

পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে পুরোন পুতুলের নিদর্শন রয়েছে বেড়াচাঁপা, তমলুক হরিনারায়ণপুরে পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহগুলির মধ্যে। এই পুতুলগুলি মাটির এবং এগুলিকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হাতে টিপে টিপে তৈরী করা হয়েছে এবং এগুলিতে ছাঁচের কোনও ব্যবহারই হয়নি। অনুমান করা যায় যে, মৌর্যরাজাদের রাজত্বের কিছুকাল পরেই ছাঁচেগড়া পুতুলের প্রচলন হয়। বাঁকুড়া জেলার পোখরানা বা প্রাচীন পুস্করনা, ২৪ পরগণা জেলার চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলে খননের সময় ছাঁচে গড়া পুতুল পাওয়া গেছে। দিনাজপুরের বাণগড় অঞ্চলে শুঙ্গযুগের পোড়ামাটির পুতুল ও অন্যান্য কাজ পাওয়া গেছে। এইসব আবিস্কার থেকে এই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, প্রাচীন বাংলায় পোড়ামাটির পুতুল তৈরীর বেশ চল ছিল এবং বাংলার সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হিসাবেই পুতুল তৈরীর শিল্পটির জন্ম এবং বিস্তার লাভ ঘটেছিল। প্রাচীন এই পুতুলগুলি দেখলে মনে হয় যে, মোটামুটিভাবে দু' ধরনের কাজের জন্য সে-যুগের পুতুল তৈরী হোত। (এক) গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা নানারকমের ব্রত পালন করতেন তার জন্য, (দুই) গ্রাম-দেবতার কাছে আহুতি দেওয়ার জন্য এই জাতীয় মাটির পুতুলের ব্যবহারের যে বিশেষ রেওয়াজ ছিল সেজন্য। এছাড়াও অবশ্য পুতুলের আর একটি ব্যবহার ছিল, সেটি শিশুর মনোরঞ্জন। গৃহসজ্জার কাজে পুতুলের ব্যবহারও যে একেবারেই হোত না তাও জোর করে বলা যায় না।

ক্ষুদ্রায়তন মূর্তিকেই পুতুল বলা হয়ে থাকে। এইসব ছোট ছোট মূর্তি পরিকল্পনার পিছনে মানুষের একটি বিশেষ ইচ্ছা অর্থাৎ শক্তিকে করায়ত্ত করার ইচ্ছারই প্রকাশ ঘটে। জংগলের পোষ-না-মানা বাঘ, হাতী, সিংহ, গন্ডার, ভাল্লুক, সাপ এগুলিই লোকশিল্পে বেশী জায়গা পেয়েছে, শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র। প্রাচীনকালে মানুষ ছিল দুর্বল, তার শক্তি ছিল সীমায়িত বিজ্ঞানের এতো উন্নতি হয়নি, যানবাহন ছিল না, অস্ত্রশস্ত্রও ছিল সামান্য, প্রকৃতি ছিল অপরাজেয়, তাই অতি স্বাভাবিক কারণেই মানুষ এই জন্তুগুলিকে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেছে এবং এদের বশ করতে চেয়েছি। বাঘ-সিংহ শিকার করার মধ্যেই এই সেদিন অবধি পৌরুষের পরীক্ষা হয়েছে। এই ভয় থেকেই বাঁচার জন্য মানুষ শিশুর হাতে বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, হাতীর ক্ষুদ্রায়তন মূর্তিগুলিকে তুলে দিয়েছে এবং তাদের এই খেলার মধ্যেই শিশুরা বাঘ-সিংহের উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ পেয়ে যথেষ্ট মজা পেয়েছে।

টটেম বা যাদুক্রিয়া কি ম্যাজিকের সাহায্যে সম্ভাব্য ক্ষতি বা অনিষ্টের হাত থেকে বাঁচার প্রয়াস থেকেই সবরকমের পুজো, গ্রাম-দেবতা, ব্রত, আলপনা ইত্যাদির প্রচলন হয়েছিল প্রাচীন সমাজে। এইসব প্রয়োজন মেটাতেও ক্ষুদ্রায়তন মূর্তি বাঘ, ঘোড়া, হাতী, পশুর বিকল্প হিসাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই যথাক্রমে তাদের দেবতার স্থানে ও দরগায় দিয়ে থাকেন। সমাজের এই ব্যবস্থার জন্যও মাটির পুতুলের বহুল ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।

জন্ম ও মৃত্যু মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড়ো বিস্ময়। বিবাহ মানুষের জীবনের আর একটি বড় ঘটনা। জন্মের প্রতীক হিসাবে মা-পুতুল পৃথিবীর প্রায় সব প্রাচীন সভ্যতাতেই দেখা যায়। মৃত্যুর পর বানানো হয় বৃষকাষ্ঠ—সেও তো টোটেমই। বিবাহে পুতুল খেলারও প্রচলন ছিল। নব-বিবাহিতার পিঠে মাটির ছাঁচের পুতুল বানিয়ে লেপটে দিত বর। এই অনুষ্ঠানকে পুত্র-কামনার প্রতীক হিসাবে ধরা যেতে পারে। পশ্চিমবাংলার সব গৃহস্থঘরেই ষষ্ঠীঠাকরুনের আদর দেখা যায়। ষষ্ঠীর পুতুলগুলিকে পশ্চিমবাংলার পুতুলগুলির মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট পুতুল বলা যেতে পারে।

মাটি সহজলভ্য। পুতুল নির্মাণের উপ-করণ হিসাবে মানুষ তাই সবচেয়ে আগে মাটির কথাই ভেবেছে। এছাড়াও বিভিন্ন পদার্থের মাধ্যমে নানা ধরনের পুতুল তৈরী হতে দেখা গেছে। যেমন তামা, পিতল ও রুপোর পুতুল, শোলার পুতুল, সাদা কাঠের বা কাঠের উপর রঙকরা পুতুল, পাথরের পুতুল, কাপড়ের পুতুল, এমনকি ক্ষীর, সর, চিনির পুতুলও তৈরী হোত বাংলাদেশে। চিনির তৈরী ছাঁচের পুতুল দোলের এবং দেওয়ালীর দিনে কলকাতার বাজারেও পাওয়া যায়। শুনেছি আগে নাকি গোবরের পুতুলও তৈরী হোত গ্রামাঞ্চলে।

> **বর্তমান সংখ্যায় ধারাবাহিক ও নিয়মিত বিভাগীয় রচনা প্রকাশ সম্ভব হোল না। আগামী সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হবে।**

বাংলাদেশে যাঁরা মাটির পুতুল তৈরী করে থাকেন, তাঁদের বলা হয় কুঁচো পটুয়া। এ'রা কিন্তু প্রতিমার কাজ করেন যে-পটুয়ারা তাঁদের থেকে অনেকাংশে পৃথক। মাটির কাজের মধ্যে নানা ভাগ রয়েছে, যেমন মূর্তি ও প্রতিমা তৈরী, বাসনপত্র অর্থাৎ মাটির পাত্র, কলস, হাঁড়ি, গেলাস, খুরি, সরা, টালি, পাতকুয়োর চোঙ ইত্যাদি তৈরী, ঘট, নকসা-সরা ও পুতুল তৈরী ইত্যাদি। পোড়ামাটির পুতুল কুঁচোরাই করে থাকেন। বিয়ের জন্য তৈরী আই-হাঁড়ি, রঙীন সরা, মনসার ঘট ইত্যাদিও এ'দেরই কাজ। অবিভক্ত বাংলার দুই প্রান্তে পূর্বদিকে টাঙ্গাইল এবং পশ্চিমে বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া গ্রামে প্রাচীন বঙ্গসংস্কৃতির পোড়া-মাটির কাজের শিল্পের দুটি ম্রিয়মাণ ধারা আজও সঞ্চারিত। টাঙ্গাইলের কুঁচো-পটুয়ারা দেশবিভাগের পর অনেকেই পশ্চিমবাংলায় চলে এসেছেন এবং কলকাতা আর তার আশে পাশে ছড়িয়ে রয়েছেন। কয়েক বছর আগে বারাসাত অঞ্চলে এ'দের কয়েকটি পরিবারকে দেখেছিলাম।

পশ্চিমবাংলায় আজও কিছু কিছু পুতুল তৈরী হয়। মাটির পুতুলের কাজ হয় চব্বিশ পরগণার মজিলপুর-জয়নগরে, বারাসাত-গঙ্গানগরে এবং আরও দু-একটি জায়গায়। এছাড়া পোড়ামাটির পুতুল তৈরী হয় বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ায়, অন্যান্য রঙীন মাটির পুতুল তৈরী হয় বীরভূমের রাজ-নগরে, মেদিনীপুরের নাড়াজোলে এবং আরও কিছু কিছু জায়গায়। মাটির পুতুলে অভ্রের প্রলেপ দেওয়া হয় বীরভূমে আর মুর্শিদাবাদের কাঁটালিয়ায়।

কাঠের পুতুল—কালীঘাটের পুতুল, প্যাঁচা, গৌর-নিতাই মূর্তি, রাবণ মূর্তি বামন ইত্যাদি তৈরী হয় বর্ধমান জেলার নতুনগ্রামে। নতুনগ্রামের সূত্রধরেরা এই রঙীন কাঠের পুতুল তৈরী করে থাকেন। নতুনগ্রাম কাটোয়া লাইনে অগ্রদ্বীপ এবং পাটুলীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। কাঠের অতি উৎকৃষ্ট পুতুল তৈরী হোত শান্তি-পুরে, পাটুলীতে, রাণাঘাটে এবং এই অঞ্চলের আরও দু-একটি জায়গায়।

কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণীতে হয় মাটির পুতুল। প্রায় দশ-পনেরো ঘরে এখনো কাজ হচ্ছে। সাপুড়ে, চাষী, গ্রামবধূ, ঝাঁকামাথায় মুটে, নানাপ্রকার কৃত্রিম ফল ও তরকারী, আর-শোলা, প্রজাপতি, সুপুরী ও নানারকমের মশলা এখানে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তৈরী হয়ে থাকে।

নাচিয়ে পুতুল তৈরী শুরু হয়েছিল ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুল থেকে। কাপড়-পুতুল তৈরী হয় কামারহাটিতে এবং টালি-গঞ্জের রিজিওন্যাল হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌টস ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে, শোলার পুতুল তৈরী হয় বারুইপুরের কারুশিল্পবিষয়ক গবেষণা-কেন্দ্রে। এছাড়াও বাংলাদেশের নানা জায়গায় শোলার পুতুল, শোলার কদম, ঝরা ইত্যাদি আজও তৈরী হয়ে থাকে।

পুতুল তৈরী হয় কিন্তু পুতুল প্রায়ই বাজারে পাওয়া যায় না। কলকাতার সমস্ত দোকানগুলি ঘুরেও পাওয়া যাবে না। মজিলপুরের আহ্লাদী পুতুল, দক্ষিণেশ্বর পুতুল কালীমূর্তি, বীরভূমের রাজনগরের পুতুল তৈরী করেন মাত্র একটি পরিবার—সে-কাজ কলকাতায় আসে না। জয়নগর-মজিলপুরেও মাত্র দুজন এ-কাজ জানেন। পাঁচমুড়া-বাঁকুড়ার পটুয়ারা পুতুল খুব কম বানান, তাও কলকাতায় আসে না বললেই হয়। ঘোড়া কিছু আসে, কুঁচো-পুতুল আসে না। নাড়াজোলের পুতুলেরও সেই অবস্থা। নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল কখনো-সখনো পাওয়া যায় শিয়ালদহের রথের মেলায়, নচেৎ নতুনগ্রামের প্যাঁচা, কালীঘাটের পুতুল, গৌর-নিতাই ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য। নতুনগ্রামের কারিগরেরাও তা বানান পাল-পার্বণে, নচেৎ গরুরগাড়ীর চাকা বানিয়েই দিন গুজরানো হয়। একমাত্র কৃষ্ণনগরের পুতুল কিছু আসে কলকাতায় এবং তা আজও পাওয়া যায় নানা দোকানে আর মেলায়।

ক্ষেত্রনাথ রায়

খেলাধুলোর বংশমর্যাদা তালিকায় ক্রিকেটের স্থান নিঃসন্দেহে প্রথম। তবুও এ্যাথলেটিকস স্পোর্টস, ফুটবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলার মত ক্রিকেট জনপ্রিয় নয় এবং ক্রিকেট খেলার বিশ্ব প্রতিযোগিতার আসরও বসে না। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলনের সদস্যমাত্র এই ৬টি দেশ—ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড এবং পাকিস্তান। এক সময় দক্ষিণ আফ্রিকাও সদস্য ছিল। সুতরাং এই থেকেই দেখা যায় ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা অন্যান্য খেলার থেকে কত কম। তবুও আমরা যে ক্রিকেটকে খেলার রাজা বলি তার যথেষ্ট কারণ আছে। ক্রিকেট খেলাকে মহিমান্বিত করেছে তার ঐতিহ্য, বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ এবং ফলাফল সম্পর্কে দারুণ অনিশ্চয়তা। ক্রিকেট খেলায় দলগত এবং ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রকাশের সুযোগ-সুবিধা অন্যান্য খেলার থেকে অনেক বেশী। বিভিন্ন দফায় সেগুলির স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ক্রিকেট খেলা নিয়ে একদিকে তৈরী হয়েছে সাহিত্য এবং অপরদিকে রেকর্ডের বিরাট পাহাড়। ক্রিকেট অনুরাগীদের কাছে দুই-ই অতি আকর্ষণীয় বস্তু।

ক্রিকেট ইংরেজদের জাতীয় খেলা। ইংরেজরাই অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ক্রিকেট খেলার প্রবর্তক। ক্রিকেট খেলার প্রসার এবং মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার অবদানই সব থেকে বেশী। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলা সুদীর্ঘ ৯২ বছরে যে সুমহান ঐতিহ্যের সৌধ নির্মাণ করেছে আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসরে তার দ্বিতীয় নজির নেই। এই দুই দেশের টেস্ট ক্রিকেট খেলা বিদেশের অগণিত ক্রিকেট অনুরাগীদেরও কাছে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা, উত্তেজনা এবং হতাশার হেতু হয়ে দাঁড়ায়।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন করেন ইংরেজরা। ১৮০৩-৪ খৃষ্টাব্দে সিডনিতে বৃটিশ রেজিমেন্টের অফিসাররা যে ক্রিকেট ম্যাচ খেলেন তাই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম ক্রিকেট খেলা। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে একই সময়ে ক্রিকেট খেলার সূত্রপাত হয়নি। রেকর্ডে দেখতে পাই প্রথম ক্রিকেট খেলা হয় ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়াতে ১৮৩৫ সালে, মেলবোর্নে ১৮৩৮ সালে এবং সাউথ অস্ট্রেলিয়াতে ১৮৩৯ সালে। ১৮৩২ সালে স্থাপিত হোবার্ট টাউন ক্লাবই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম ক্রিকেট ক্লাব। মেলবোর্ন ক্লাব স্থাপিত হয় ১৮৩৮ সালে। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই ঘটনাগুলিও উল্লেখযোগ্য ঃ ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার প্রথম খেলা ১৮৪৬ সালে, টাসমানিয়ার সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার প্রথম খেলা ১৮৫১ সালে এবং নিউ সাউথ ওয়েলসের সঙ্গে ভিকটোরিয়া প্রথম খেলে ১৮৫৬ সালে। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কাউন্সিল স্থাপিত হয় ১৮৯২ সালে এবং তাদেরই পরিচালনায় অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় শেফিল্ড শীল্ড ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়েছে ১৮৯২ সালেই। এর কয়েক বছর পর ১৯০৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড অব কন্ট্রোল নামে শক্তিশালী সংস্থা স্থাপিত হয় তা আজও সগৌরবে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট শক্তির একমাত্র উৎস হল অস্ট্রেলিয়াবাসী ইংরেজ জাতির বংশধরগণ—যাঁদের পূর্বপুরুষেরা সুদূর অতীতে ইংল্যান্ডের মাটি ছেড়ে অস্ট্রেলিয়াতে এসেছিলেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করে শেষ পর্যন্ত বিরাট বৃটিশ উপনিবেশ গড়ে তুলেছেন।

সুদূর অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে সারে কাউন্টি ক্রিকেট দলের এইচ এইচ স্টিফেন্সের নেতৃত্বে যে ইংলিশ ক্রিকেট দলটি ১৮৬১ সালের ১৮ই অক্টোবর লিভারপুল ত্যাগ করে, সেই দলটিই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম বৈদেশিক দল। এই সফরের উদ্যোক্তা ছিলেন দুই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। এই সফর থেকে তাঁরা প্রায় ১১০০০ পাউন্ড লাভ করেছিলেন। খেলোয়াড়দের মাথা পিছু ১৫০ পাউন্ড করে দেওয়া হয়েছিল। খেলোয়াড়দের যাতায়াত এবং রাহা খরচ নিজেদের পকেট থেকে দিতে হয়নি। অস্ট্রেলিয়াতে দ্বিতীয় ইংলিশ ক্রিকেট দল খেলতে যায় ১৮৬৩-৬৪ সালের ক্রিকেট মরশুমে জর্জ পারের নেতৃত্বে। এই দলটি ১৬টি খেলায় অংশ গ্রহণ করে অপরাজেয় সম্মান নিয়ে স্বদেশে ফিরেছিল। ১৮৭৩-৭৪ সালে ইংলিশ ক্রিকেট খেলার জনক ডাঃ ডবলিউ জি গ্রেসের নেতৃত্বে তৃতীয় ইংলিশ ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া সফর করে। এই তিনটি সফরের কোন খেলাই প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে না। কারণ অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দলগুলি ১১ জনের অনেক বেশী খেলোয়াড় নিয়ে প্রতিটি খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৮৭৬-৭৭ সালে জেমস লিলি হোয়াইটের নেতৃত্বে পেশাদার খেলোয়াড়পুষ্ট যে ইংলিশ ক্রিকেট দলটি অস্ট্রেলিয়া সফরে যায় তারাই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম শ্রেণীর খেলায় প্রথম অংশ গ্রহণ করে। এবং ১৮৭৭ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে তারা মেলবোর্নে যে দুটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলে তা পরবর্তী-কালে টেস্ট ক্রিকেট খেলার মর্যাদা পায়। ইংলিশ ক্রিকেট দলের ১৮৭৬-৭৭ সালের

রিচি বেনো

স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান

সফর অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলার নতুন যুগের সূচনা করে। এই সময় থেকেই অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট খেলায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। ইংলিশ ক্রিকেট দলের অল রাউন্ডার চার্লস লরেন্স দলের সঙ্গে স্বদেশে ফিরলেন না; তিনি এলবার্ট ক্লাবের কোচ হয়ে সিডনিতে থেকে গেলেন। এই চার্লস লরেন্সকে পেয়ে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট খেলায় যথেষ্ট লাভবান হয়।

১৮৬১ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত—এই ৪২ বছরে ইংলিস ক্রিকেট দল যে ১৫ বার অস্ট্রেলিয়া সফরে যায় তা সরকারী সফরের পর্যায়ে পড়ে না। এইসব সফরের উদ্যোক্তা ছিলেন ক্রিকেট খেলা অনুরাগী ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ইংলিস ক্রিকেট খেলার নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এম সি সি (মেরীলিবন ক্রিকেট ক্লাব) সরকারীভাবে প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফরে যায় ১৯০৩-০৪ সালের ক্রিকেট মরশুমে, এম এ নোবেলের নেতৃত্বে। এই সফরের আগে (১৮৭৬-১৯০২) ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ৬৬টি টেস্ট খেলা হয়েছিল। ১৯০৩-০৪ সাল থেকে এম সি সি টেস্ট ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা নিজেদের হাতে নিয়েছে।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেস্ট ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন হয় ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ, মেলবোর্ণ মাঠে। এই খেলাই আবার পৃথিবীর মাটিতে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা। এই খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৪৫ রানে জয়ী হয় এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ওপনিং ব্যাটসম্যান চার্লস ব্যানারম্যান সেঞ্চুরী (১৬৫ রান করে আহত অবস্থায় অবসর গ্রহণ) করেন। ইংল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন হয় ১৮৮০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর, ওভাল মাঠে। এই খেলায় ইংল্যান্ড ৫ উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ডবলিউ জি গ্রেস সেঞ্চুরী (১৫২ রান) করেন—টেস্ট ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের পক্ষে প্রথম সেঞ্চুরী। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে ওপনিং ব্যাটসম্যান ডবলিউ এল মার্ডক ১৫৩ রান করে খেলায় অপরাজিত থেকে যান—টেস্ট ক্রিকেটে পুরো ইনিংসের খেলায় ওপনিং ব্যাটসম্যানের পক্ষে অপরাজিত থাকার নজির এই প্রথম। ইংল্যান্ডের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম জয় ১৮৮২ সালের ওভাল মাঠে, ৭ রানে। অস্ট্রেলিয়ার এই অপ্রত্যাশিত জয়ের সূত্রেই ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলা প্রসঙ্গে 'এ্যাসেজ' কথার উৎপত্তি। এই দুই দেশের টেস্ট ক্রিকেট খেলার অপর নাম 'ফাইট ফর দি এ্যাসেজ' অর্থাৎ 'ছাই নিয়ে যুদ্ধ'।

যে-সব খেলোয়াড়দের অবদানে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাস গড়ে উঠেছে তাঁদের নামের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করাও এখানে সম্ভব নয়। যাঁরা বিশেষ কৃতিত্বের সূত্রে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার তালিকায় বিশেষ স্থান পেয়েছেন শুধু তাঁদের নামই এখানে উল্লেখ করছি : ব্যাটিংয়ে স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান নীল হার্ভে, আর্থার মরিস, ক্লিমেণ্ট হিল, ভিক্টর
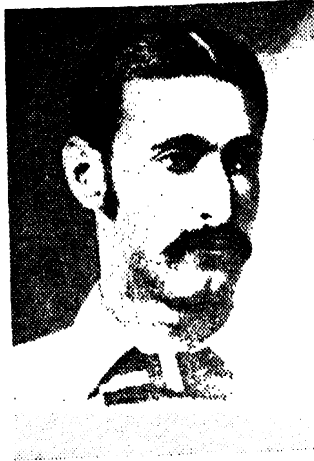
ফ্রেডারিক স্পফোর্থ

ট্রাম্পার, কলিন ম্যাকডোনাল্ড, লিণ্ডসে হ্যাসেট, কিথ মিলার, ওয়ারউইক, আর্মস্ট্রং, স্ট্যানলে ম্যাককেব, ওয়ারেন বার্ডসলে, উইলিয়াম উডফুল, সিডনি গ্রেগরী, চার্লস ম্যাকারটনি, উইলিয়াম পন্সফোর্ড, বব্ সিম্পসন, উইলিয়াম লরী ইত্যাদি; বোলিংয়ে রিচি বেনো, রেমণ্ড লিণ্ডওয়াল, ক্লারেন্স গ্রিমেট, এ্যালান ডেভিডসন, গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি, কিথ মিলার, উইলিয়াম জনস্টন উইলিয়াম ওরেলী, হাগ ট্রাম্বল (টেস্টে
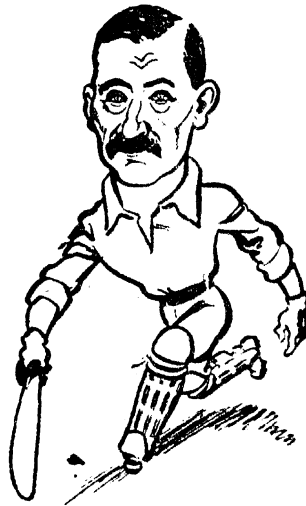
চার্লস ব্যানারম্যান
টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম রান, প্রথম বাউন্ডারী এবং প্রথম সেঞ্চুরী করেন।

২ বার হ্যাটট্রিক করেন), মন্টেগু নোবল, আয়ান জনসন, জর্জ গিফিন, আর্থার মেইলী, ফ্রেডারিক স্পোফোর্থ (যিনি টেস্টে সর্বপ্রথম হ্যাটট্রিক করেন), টি জে ম্যাথুজ (একটি টেস্টের উভয় ইনিংসে হ্যাটট্রিক, যা একমাত্র নজির) ইত্যাদি; উইকেট কিপিংয়ে উইলিয়াম ওল্ডফিল্ড, এ ডবলিউ

উইলিয়াম ওল্ডফিল্ড

গ্রাউট, জি আর ল্যাংলী, জ্যাক ম্যাকার্থি ব্ল্যাকহাম ইত্যাদি।

অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলার উন্নতি-কল্পে ইংল্যান্ডের সাসেক্স কাউন্টি ক্রিকেট দলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লর্ড শেফিল্ড যে অর্থ দান করেন তা দিয়েই তাঁরই নামে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের পুরস্কার 'শেফিল্ড শীল্ড' নির্মিত হয়। এই শেফিল্ড শীল্ড প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয় ১৮৯২ সালে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার এই জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে এই পাঁচটি স্টেটস—ভিকটোরিয়া, নিউসাউথ ওয়েলস, সাউথ অস্ট্রেলিয়া, কুইন্সল্যান্ড এবং ওয়েস্টার্ণ অস্ট্রেলিয়া। শেষের দুটি দল যথাক্রমে ১৯২৬ এবং ১৯৪৭ সালে প্রথম যোগদান করে। এই পাঁচটি দলের মধ্যে একমাত্র কুইন্সল্যান্ড দল আজও শেফিল্ড শীল্ড জয়ী হয় নি। বাকি চারটি দল এইভাবে প্রথম শেফিল্ড শীল্ড জয়ী হয়—ভিকটোরিয়া ১৮৯২-৯৩ সালে, সাউথ অস্ট্রেলিয়া ১৮৯৩-৯৪ সালে, নিউ-সাউথ ওয়েলস ১৮৯৫-৯৬ সালে এবং ওয়েস্টার্ণ অস্ট্রেলিয়া ১৯৪৭-৪৮ সালে। সর্বাধিকবার শেফিল্ড শীল্ড জয়লাভের রেকর্ড আছে নিউসাউথ ওয়েলসের। তারা মোট ৩৬ বার শীল্ড জয়ী হয়েছে। নিউ সাউথ ওয়েলস উপর্যুপরি ৯বার (১৯৫৪-৬২) শেফিল্ড শীল্ড জয়ী হয়ে বিভিন্ন দেশের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় উপর্যুপরি সর্বাধিকবার জাতীয় চাম্পিয়ান হওয়ার বিশ্ব রেকর্ড করেছিল। তাদের এ রেকর্ড আজ আর নেই। ১৯৬৮ সালে বোম্বাই দল উপর্যুপরি ১০বার রঞ্জি ট্রফি জয়ের সূত্রে নিউ সাউথ ওয়েলস দলের বিশ্বরেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। বোম্বাই ১৯৬৯ সালেও রঞ্জি ট্রফি পেয়েছে।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার

প্রভাব অপরিসীম। এই দুই দেশের টেস্ট খেলা উপলক্ষে সারা পৃথিবীর ক্রিকেট অনুরাগীরা প্রবল উত্তেজনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং হতাশায় হাবুডুবু খান। বলতে কি, ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলা আজ আর এই দুই দেশের ঘরোয়া ব্যাপার নয়, যথেষ্ট আন্তর্জাতিক গুরুত্ব লাভ করেছে। এই দুই দেশের সঙ্গে যে-সব দেশের টেস্ট ক্রিকেট খেলার সম্পর্ক আছে তারা ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার গতিপ্রকৃতি বিশেষ গুরুত্বে অনুধাবন করে থাকে। এ পর্যন্ত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ২০৩টি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়ে গেছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একমাত্র ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলাই ১৯৬৮ সালের ২০শে জুন ২০০তম সংখ্যায় পূর্ণতা লাভ করেছে।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার আর এক নাম—'ছাই নিয়ে যুদ্ধ'। এই নামের প্রধান কারণ হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার দুজন খেলোয়াড় স্পফোর্থ এবং ম্যাসাই। ১৮৮২ সালের ওভাল মাঠে ম্যাসাই এবং স্পফোর্থ যদি না খেলতেন তাহলে এই দুই দেশের টেস্ট ক্রিকেট খেলা প্রসঙ্গে 'ছাই' কথার ব্যবহারই হত না। স্পফোর্থ ৯০ রানে ১৪টা উইকেট পান এবং ম্যাসাই নিজ দলের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ ৫৫ রান করেন। প্রধানত এই দুজনের এই কৃতী সাফল্যের মূলেই অস্ট্রেলিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে মাত্র ৭ রানে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় স্পফোর্থের মারাত্মক বোলিংয়ের (৪৪ রানে ৭ উইকেট) সামনেই ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ে 'ছাই' পড়েছিল।

ব্র্যাডম্যানের যুগ

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিশ্রুত ক্রিকেট খেলোয়াড় স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান নিঃসন্দেহে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে 'ব্র্যাডম্যানের যুগ' এই নামে একটি পৃথক অধ্যায়ই যোজনা করা হয়েছে। ব্র্যাডম্যান তাঁর অসাধারণ ক্রীড়াশৈলীর মাধ্যমে ক্রিকেট খেলায় নতুন করে প্রাণ-সঞ্চার করেছিলেন। প্রধানতঃ তাঁকে উপলক্ষ্য করেই ক্রিকেট খেলা সহস্র গুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং তাঁর সময়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্রিকেট খেলা যথেষ্ট লাভবানও হয়েছিল। একমাত্র মেসিমের সঙ্গেই তাঁর ক্রীড়াকৃতির তুলনা চলে। ক্রিকেট মাঠে দর্শক সাধারণের কাছে তিনি ছিলেন এক শক্তিশালী চুম্বক। উইকেটে ব্র্যাডম্যান যতক্ষণ খেলতেন ততক্ষণই সারা মাঠ লোকে-লোকারণ্য। খেলা থেকে তাঁর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই মাঠ ফাঁকা হয়ে যেত।

ক্রিকেট খেলায় তাঁর অসাধারণ সাফল্যের মূলে ছিল—ক্রিকেট খেলায় তাঁর

কিথ মিলার

সূক্ষ্ম সহজ ও বিচারজ্ঞান, প্রখর দৃষ্টিশক্তি, দৈহিক নমনীয়তা, কাঁধের শিথিলতা, ফুট-ওয়ার্ক এবং পাকা সময় জ্ঞান। এইসব গুণের সমন্বয়ে তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান আখ্যা লাভ করেন।

আগামী দিনের ক্রিকেট খেলায় যা কিছু দর্শনীয়, উপভোগ্য এবং উল্লেখযোগ্য হবে ক্রিকেট অনুরাগীরা তার সঙ্গে ব্র্যাডম্যানকে স্মরণ করবেনই। ক্রিকেট খেলায় যতদিন ব্যাট, বল এবং স্কোর বোর্ড অক্ষয় হয়ে থাকবে ততদিনই স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের নাম বারম্বার উচ্চারিত হবে।

ডন ব্র্যাডম্যান তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজ খেলেন ১৯২৮ সালে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে ১৯৩০ সালের ইংল্যান্ড সফর ছিল তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। তিনি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৩০ সালের টেস্ট সিরিজে যে মোট ৯৭৪ রান সংগ্রহ করেন তা আজও টেস্টের এক সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক মোট রান সংগ্রহের বিশ্বরেকর্ড হয়ে আছে। ডন ব্র্যাডম্যান বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে মোট ১১টি টেস্ট সিরিজ খেলেন—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৮টি, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট-ইন্ডিজ এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে একটি করে। এই এগারটি টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার রাবার জয় ৮বার, পরাজয় ২বার (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে) এবং সিরিজ ড্র ১বার (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে)। ডন ব্র্যাডম্যানের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া দল ৫টি টেস্ট সিরিজ খেলে অপরাজিত থাকে। এই পাঁচটি সিরিজের ফলাফল দাঁড়ায়: রাবার জয় ৪ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১) এবং সিরিজ ড্র ১ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৩৮ সালে)।

বহু যুদ্ধের বিজয়ী ডন ব্র্যাডম্যান তাঁর শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেন ১৯৪৮ সালে ওভালে, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। তাঁর এই শেষ খেলাটি ছিল ১৯৪৮ সালের টেস্ট সিরিজের পঞ্চম টেস্ট। তিনিই দলের অধিনায়ক। আগে থেকেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন এই তাঁর খেলোয়াড় জীবনের শেষ টেস্ট খেলা। সুতরাং তিনি প্রথম ইনিংসে খেলতে নামলে সারা মাঠ তাঁকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জানায়। অভিনন্দনের বিপুলতায় তিনি এমনই অভিভূত হয়ে পড়েন যে, খেলায় তাঁর স্বাভাবিক একাগ্রতা এতটুকু ছিল না। ব্র্যাডম্যান নিজেই স্বীকার করেছেন, হোলিজের প্রথম বলটা তিনি ভাল করে অনুধাবনই করতে পারেন নি, সম্পূর্ণ আন্দাজে ব্যাট চালিয়ে ব্যাটে-বলে এক করেছিলেন। হোলিজের দ্বিতীয় বলটা তাঁর ব্যাটে মার খেয়ে উইকেটের মাথা থেকে বেল নামিয়ে দেয়। ব্র্যাডম্যান আউট! সমস্ত মাঠ স্তম্ভিত। দর্শকরা দ্বিতীয় ইনিংসের অপেক্ষায় বুক বাঁধলেন। তাঁরা তখনও বুঝতে পারেন নি খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস জয় হবে, অর্থাৎ তাঁদের আর দ্বিতীয় ইনিংস খেলার প্রয়োজন হবে না।

হোলিজের বলে আউট হয়ে ব্র্যাডম্যান শূন্য হাতে ভারাক্রান্ত পদক্ষেপে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। তাঁকে সারা পথ অনুসরণ করে যায় এক দীর্ঘ অনুচ্চ নিস্তব্ধতা—ওভালের সহস্র সহস্র দর্শকের বিস্ময়, মর্মবেদনা, সহানুভূতি, আশা এবং বিদায় সম্ভাষণ।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৫২, ইনিংস ৮০, নট-আউট ১০ বার, রান ৬৯৯৬, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৩৪, সেঞ্চুরী ২৯টি এবং গড় ৯৯·৯৪।

ব্র্যাডম্যানের বিশ্বরেকর্ড

ব্র্যাডম্যানের নিম্নলিখিত ক্রীড়াকৃতি আজও সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার বিশ্বরেকর্ড হিসাবে অক্ষুণ্ণ আছে।

সর্বাধিক সেঞ্চুরী—২৯টি (৫২টি টেস্টের ৮০ ইনিংসে)।

এক সিরিজে সর্বাধিক রান : ৯৭৪ (বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৩০। খেলা ৫, ইনিংস ৭, নট-আউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৩৪, সেঞ্চুরী ৪ এবং গড় ১৩৯·১৪)।

এক দিনে সর্বাধিক রান : ৩০৯ (৩৬০ মিনিটে; বিপক্ষে ইংল্যান্ড, লিডস ১৯৩০)।

এক ইনিংসে সর্বাধিক বাউন্ডারী : ৪৬টি (৩৩৪ রানের মধ্যে, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, লিডস ১৯৩০)।

এক সিরিজে সবাধিক ডাবল সেঞ্চুরী : ৩টি, (লর্ডসে ২৫৪ রান, লিডসে ৩৩৪ রান এবং ওভালে ২৩২ রান, বিপক্ষে ইংল্যান্ড ১৯৩০)।

খেলোয়াড় পরিচিতি

অস্ট্রেলিয়ান দল

(পরিসংখ্যান ৩রা নভেম্বর, ১৯৬৯ পর্যন্ত)

উইলিয়াম মরিস লরী (ভিকটোরিয়া)

জন্ম ১১-২-১৯৩৭। দলের অধিনায়ক। ন্যাটা ওপনিং ব্যাটসম্যান। বব সিম্পসনের অবসর গ্রহণের পর অস্ট্রেলিয়ান দলের অধিনায়কত্ব লাভ করেন। তাঁর প্রথম নেতৃত্ব ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৬৭—৬৮ সালের টেস্ট সিরিজের ৩য় টেস্ট খেলায়। লরীর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া দল ১৯৬৭—৬৮ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে এবং ১৯৬৮—৬৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে 'রাবার' জয়ী হয় এবং ১৯৬৮ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ ড্র করে 'এ্যাসেজ' সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট ক্রিকেট দলে তিনিই সর্বাধিক মোট রাণ (৪,৪৭৮ রাণ) এবং সর্বাধিক সেঞ্চুরীর (১৩টি) অধিকারী। ১৯৬৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তাঁর মোট রাণ ছিল ৬৬৭ এবং সেঞ্চুরী ৩টি। বেসবল খেলোয়াড় হিসাবেও তাঁর খ্যাতি আছে।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৫৩, ইনিংস ১৫, নট আউট ৭ বার, মোট রাণ ৪৪৭৮, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ২১০ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ব্রিজটাউন, ১৯৬৫), সেঞ্চুরী ১৩ এবং ক্যাচ ২০টি।

আয়ান মাইকেল চ্যাপেল (দঃ অস্ট্রেলিয়া)

জন্ম ২৬-৯-১৯৪৩। সহ-অধিনায়ক। ডান হাতে ব্যাট করেন এবং লেগস্পিন বল দেন। অস্ট্রেলিয়ার ভূতপূর্ব অধিনায়ক ভিকটর রিচার্ডসনের পৌত্র। ১৯৬৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৫টি খেলার ৮টি ইনিংসে তাঁর মোট রাণ ছিল ৫৪৮ এবং সেঞ্চুরী ২টি।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ২২, ইনিংস ৩৮, নট আউট ৩, মোট রাণ ১৩৫১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ১৬৫ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মেলবোর্ণ, ২য় টেস্ট, ১৯৬৯), সেঞ্চুরী ৩টি এবং ক্যাচ ৩১টি।

কেভিন ডগলাস ওয়াল্টার্স (নিউ সাউথ ওয়েলস) জন্ম ২১-১২-১৯৪৫। ডান হাতে ব্যাট করেন এবং মিডিয়াম পেস বল দেন। দলের অতি নির্ভরশীল এবং জনপ্রিয় খেলোয়াড়। ১৯৬৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৪টি টেস্টের ৬টি ইনিংস খেলে তিনি মোট ৬৯৯ রাণ (গড় ১১৬·৫০) করার সূত্রে উভয় দলের ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেন এবং তাছাড়া সর্বাধিক মোট রাণ এবং সর্বাধিক সেঞ্চুরী (৪টি) করারও গৌরব লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিডনির ৫ম টেস্টে তিনি যে ২৪২ ও ১০৩ রান করেন তা টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একমাত্র নজির

অধিনায়ক বিল লরী

হয়ে আছে এই কারণে যে, তিনি ছাড়া অপর কোন খেলোয়াড় একটি টেস্ট খেলায় দ্বিশত এবং শতরাণ আজও করতে পারেন নি।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১৬, ইনিংস ২৬, নট আউট ৩ বার, মোট রাণ ১৭০৬, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ২৪২ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, সিডনি, ৫ম টেস্ট, ১৯৬৯) সেঞ্চুরী ৬ এবং ৪০৫ রাণে ১১টি উইকেট।

আয়ান রিচি রেডপাথ (ভিকটোরিয়া)

জন্ম ১১-৫-১৯৪১। ওপনিং ব্যাটসম্যান। ডান হাতে খেলেন।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ২৮, ইনিংস ৪৯, নটআউট ৪ বার, মোট রাণ ১৬২৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ১৩২ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৬৯), সেঞ্চুরী ১ এবং ক্যাচ ৩৯টি। বর্তমানের অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলে তিনিই টেস্টে সর্বাধিক ক্যাচ (৩৯টি) ধরার অধিকারী।

গ্রাহাম ডগলাস ম্যাকেঞ্জি (পঃ অস্ট্রেলিয়া)

জন্ম ২৪-৬-১৯৪১। ডান হাতে মিডিয়াম ফাস্ট বল করেন। দলের পক্ষে বিপক্ষ দলকে আক্রমণের প্রধান অস্ত্র তিনিই। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এ পর্যন্ত যে ৭জন বোলার মোট ২০০ উইকেট (বা তার বেশী) পেয়েছেন, তাঁদের ক্রমপর্যায় তালিকায় ম্যাকেঞ্জির স্থান ৬ষ্ঠ। তাঁকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ৪জন খেলোয়াড় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় মোট ২০০ উইকেট (বা তার বেশী) পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন। টেস্ট ক্রিকেটে তিনি মাত্র ২২ বছর বয়সে তাঁর ১০০তম উইকেটটি এবং ২৭ বছর বয়সে তাঁর ২০০-তম উইকেট পান। এত কম বয়সে বোলিংয়ে এই কৃতিত্ব (১০০তম ও ২০০তম উইকেট) লাভ করতে আজও অপর কোন খেলোয়াড় সক্ষম হন নি। টেস্ট খেলায় তাঁর প্রথম শিকার ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত কলিন কাউড্রে (লর্ডসের ২য় টেস্ট, ১৯৬১) এবং ২০০তম শিকার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স (মেলবোর্ণের ২য় টেস্ট। ১৯৬৮-৬৯)। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯৬৮-৬৯ সালের টেস্ট সিরিজে তিনি ৭৫৮ রাণে ৩০টা উইকেট পেয়েছিলেন।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৪১, ইনিংস ৭১, নট আউট ৯ বার, মোট রাণ ৮১৭, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ৭৬ এবং ক্যাচ ২৫। বোলিং : ৬২০৩ রাণে ২১৭ উইকেট।

এণ্ড্রু পল সীহান (ভিকটোরিয়া)

জন্ম ৩০-৯-১৯৪৬। ডানহাতে খেলেন। ইংল্যান্ডের ক্রিকেট অনুরাগীরা তাঁর খেলায় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের অন্যতম ওয়াল্টার হ্যামন্ডের কথা স্মরণ করেন।

এল্যান কনোলী

আয়ান রেডপাথ

আয়ান চ্যাপেল

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১৪, ইনিংস ২৫, নটআউট ৩ বার, মোট রাণ ৭৮৮, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ৮৮ এবং ক্যাচ ১২টা।

এল্যান নর্ম্যান কনোলী (ভিকটোরিয়া) জন্ম ২৯-৬-১৯৩৯। ডানহাতে ফাস্ট বল করেন। দলে ম্যাকেঞ্জির যোগ্য অংশীদার। বর্তমানের অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলে তিনি এবং ম্যালেট সর্বাপেক্ষা দীর্ঘদেহী (৬ ফিট ৩ ইঞ্চি) খেলোয়াড়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯৬৮-৬৯ সালের টেস্ট সিরিজে তিনি ৬২৮ রাণে ২০ উইকেট পেয়েছিলেন। উইকেট পাওয়ার তালিকায় ম্যাকেঞ্জির ২১৭ উইকেটের পরই তাঁর স্থান (৬৪ উইকেট)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১৯, ইনিংস ২৮, নটআউট ১৬ বার,মোট রাণ ৮৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ৩৭ এবং ক্যাচ ১২টি। বোলিং : ১৯৬৩ রাণে ৬৪ উইকেট।

এরিক ওয়াল্টার ফ্রি ম্যান (দঃ অস্ট্রেলিয়া) জন্ম ১৩-৭-১৯৪৪। ডানহাতে ফাস্ট মিডিয়াম বল করেন। ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবেই তাঁর প্রথম খ্যাতি। তাঁকে ক্রিকেট খেলায় উৎসাহিত করেন টেস্ট খেলোয়াড় নীল হক।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৮, ইনিংস ১৩, নটআউট ০, মোট রাণ ২৬৫, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ৭৬। বোলিং : ৭৭৪ রাণে ২৬ উইকেট।

জন উইলিয়াম গ্লীসন (নিউ সাউথ ওয়েলস)

জন্ম ১৪-৩-১৯৩৮। ডান হাতে লেগ-স্পিন বল করেন। তাঁর বোলিংয়ের চাতুরী ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়দের পক্ষে সঠিকভাবে উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয় নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯৬৮-৬৯ সালের সিরিজে তিনি ৮৪৪ রাণে ২৬টা উইকেট পান। ম্যাকেঞ্জির ৩০টা উইকেটের

জন গ্লিসন

পরই উভয় দলের পক্ষে তাঁর স্থান ছিল দ্বিতীয়।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১৪, ইনিংস ২৩, নট আউট ৬ বার, মোট রাণ ২৩৮, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ৪৫ এবং ক্যাচ ১০টা। বোলিং : ১৫৫৮ রাণে ৪৭ উইকেট।

কিথ রেমন্ড স্ট্যাকপুল (ভিক্টোরিয়া) বয়স ২৯। ওপনিং ব্যাটসম্যান। ডান হাতে খেলেন। লেগস্পিন বল করেন।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১২, ইনিংস ২০, নট আউট ১ বার, মোট রাণ ৫৭১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ১৩৪ (বিপক্ষে দঃ আফ্রিকা, কেপটাউনের ২য় টেস্ট ১৯৬৬-৬৭); সেঞ্চুরী ১ এবং ক্যাচ ১২। বোলিং : ৪৯৭ রানে ৭ উইকেট।

হেডলি ব্রায়ান ট্যাবার (নিউ সাউথ ওয়েলস) জন্ম ২৯-৪-১৯৪০। উইকেট-কিপার। ডান হাতে খেলেন। ১৯৬৬-৬৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিনি তাঁর

ডগ ওয়াল্টার্স
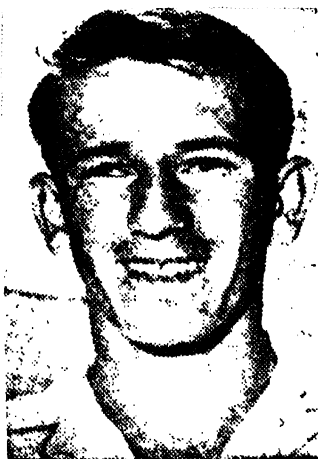
গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী

খেলোয়াড়জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে প্রথম টেস্টেই ৮ জনকে বিদায় করেন (কট ৭ এবং স্টাম্পড ১)। এই সিরিজের ৫টা টেস্টে তাঁর মোট পরিসংখ্যান দাঁড়ায় ২০ (কট ১৯ এবং স্টাম্পড ১)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৭, ইনিংস ১২, নট আউট ২, মোট রাণ ১৭৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ৪৮। উইকেট কিপিং: ডিসমিস্যাল ২৮ (কট ২৭ এবং স্টাম্পড ১)।

এ্যাশলি ম্যালেট (দঃ অস্ট্রেলিয়া)

জন্ম ১৩-৭-১৯৪৫। ডান হাতে অফ-স্পিন বল করেন।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ২, ইনিংস ৪, নট আউট ১বার, মোট রাণ ৬৮, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ নট আউট ৪৩। বোলিং : ২৫০ রাণে ৬ উইকেট।

লরেন্স মেইন (পঃ অস্ট্রেলিয়া) বয়স ২৭। ডান হাতে ফাস্ট বল দেন। বর্তমান অস্ট্রেলিয়ান দলে তাঁর মনোনয়ন বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কারণ ১৯৬৫ সালে ওয়েস্ট-ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩টে টেস্ট খেলার পর আর দলভুক্ত হননি।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৩, ইনিংস ৫, নট আউট ৩বার মোট রাণ ২৫, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ নট আউট ১১। বোলিং : ২৬১ রাণে ৯ উইকেট।

জন টেলার আর্ভিন (পঃ অস্ট্রেলিয়া)

বয়স ২৫। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অল-রাউন্ডার হিসাবে খ্যাত। ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে এই প্রথম বিদেশ সফর। এখনও টেস্ট ম্যাচে হাতে-খড়ি হয়নি।

রেমন্ড জর্ডন (ভিক্টোরিয়া) বয়স ৩২। উইকেট-কিপার। ক্রিকেট দলের সঙ্গে এই প্রথম বিদেশ সফর। সফরের আগে টেস্ট দলে খেলেননি।

খেলোয়াড় পরিচিতি

ভারতীয় দল

(পরিসংখ্যান ১৯৬৯ সালের ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত)

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কলকাতার চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় যে ১২ জন খেলোয়াড় ভারতীয় টেস্ট দলে নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

মনসুর আলী খাঁ (হায়দরাবাদ) :

জন্ম : জানুয়ারী ৫, ১৯৪১। আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে ব্যাট করেন। ১৯৬২ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে ভারতীয় দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। তিনিই আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৩৮, ইনিংস ৬২, নট-আউট ২ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০৩ নট আউট (বিপক্ষে ইংল্যান্ড, নিউ দিল্লী, ১৯৬৩-৬৪) মোট রান ২০৩২ এবং সেঞ্চুরী ৬।

বি এস চন্দ্রশেখর

অধিনায়ক নবাব পতৌদি

বিষেণ সিং বেদী

ফারুক ইঞ্জিনীয়ার (বোম্বাই) :

জন্ম : ফেব্রুয়ারী ২৫, ১৯৩৮। ব্যাটসম্যান এবং উইকেটকিপার।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ২৫, ইনিংস ৪৭, নট-আউট ১বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১০৯ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মাদ্রাজ ১৯৬৬-৬৭), মোট রান ১০৭৩ এবং সেঞ্চুরী ১।
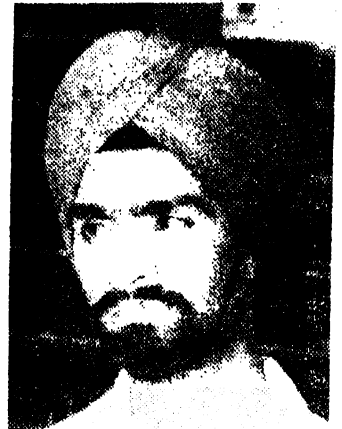
অজিত ওয়াদেকার (বোম্বাই) :

জন্ম : এপ্রিল ১, ১৯৪০। বাঁহাতে ব্যাট করেন।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১৬, ইনিংস ৩২, নট-আউট ১বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৪৩ (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড ১৯৬৮) মোট রান ১০৩০ এবং সেঞ্চুরী ১।

অশোক মানকড় (বোম্বাই) :

জন্ম : অক্টোবর ১২, [illegible]। ব্যাটসম্যান।

ফারুক ইঞ্জিনীয়ার

অজিত ওয়াদেকার

ভেংকটরাঘবন

সুব্রত গুহ

অম্বর রায়

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ২, ইনিংস ৪, নট-আউট ১বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৯ এবং মোট রান ৬৫।

একনাথ সোলকার (বোম্বাই) :

বয়স ২১। নামী চৌকশ খেলোয়াড়।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১, ইনিংস ২, নট-আউট ১, মোট রান ১৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নট আউট ১৩।

এস ভেঙ্কটরাঘবন (মাদ্রাজ) :

জন্ম এপ্রিল ২১, ১৯৪৫। ডান হাতে অফ স্পিন বল করেন।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা [illegible], ইনিংস [illegible], নট-আউট ৫বার, মোট রান [illegible], এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নট-আউট ৩৬। বোলিং : [illegible] রানে [illegible] উইকেট।

এরাপল্লী প্রসন্ন (মহীশূর) :

জন্ম : মে ২২, ১৯৪০। ডান হাতে অফ স্পিন বল করেন।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১৭, ইনিংস ৩১, নট-আউট ৫, মোট রান ২৯৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৬। বোলিং : ২৩৮৫ রানে ৮৮ উইকেট।

সুব্রত গুহ (বাংলা) :

জন্ম জানুয়ারী ৩১, ১৯৪৬। মিডিয়াম পেস বোলার।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১, ইনিংস ২, নট-আউট ০, মোট রান ৫। বোলিং : ১১৫ রানে ০ উইকেট।

বিষেণ সিং বেদী (দিল্লী) :

জন্ম : সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯৪৬। বাঁ-হাতে লেগ স্পিন বল করেন।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১৪, ইনিংস ২৪, নট-আউট ৪ বার, মোট রান ১৫৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২। বোলিং : ১৩৬৬ রাণে ৪৯ উইকেট।

বি এস চন্দ্রশেখর (মহীশূর) :

জন্ম : জুন ১৭, ১৯৪৫। ডান হাতে লেগ স্পিন বল করেন।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১৬, ইনিংস ২৩, নট-আউট ১২ বার, মোট রান ৭২ এবং এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২।

উল্লেখযোগ্য বোলিং : ১৫৭ রাণে ৭ উইকেট (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বোম্বাই ১৯৬৬)।

জি আর বিশ্বনাথ (মহীশূর) :

বয়স ২০। ব্যাটসম্যান এবং লেগব্রেক বোলার।

অম্বর রায় (বাংলা) :

জন্ম : মে ৫, ১৯৪৬। বাঁ-হাতে ব্যাট করেন।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ২, ইনিংস ৪, নট আউট ০, মোট রান ৫৪ এবং এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৪৮।

দ্রষ্টব্য : উপরোক্ত বারজনের মধ্যে বিশ্বনাথ টেস্ট খেলায় হাতে-খড়ি নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬৯ সালে।

কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে (১৯৫৯-৬০) বিজয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দল : অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতবর্ষের প্রথম জয় (১১৯ রানে)।

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

দর্শক

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

(১৯৬৯ সালের ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত)

বছর	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	খেলা ড্র
১৯৪৭-৪৮	৪	০	১
১৯৫৬-৫৭	২	০	১
১৯৫৯-৬০	২	১	২
১৯৬৪	১	১	১
১৯৬৭-৬৮	৪	০	০
মোট :	১৩	২	৫

টেস্ট সিরিজের ফলাফল

অস্ট্রেলিয়ার জয় ৪, ভারতবর্ষের জয় ০ এবং অমীমাংসিত ১

বিভিন্ন স্থানের খেলার ফলাফল

স্থান	খেলা	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	খেলা ড্র
মেলবোর্ন	৩	৩	০	০
ব্রিসবেন	২	২	০	০
সিডনি	২	১	০	১
এডিলেড	২	২	০	০
মোট :	৯	৮	০	১

স্থান	খেলা	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	খেলা ড্র
বোম্বাই	৩	০	১	২
কলকাতা	৩	১	০	২
মাদ্রাজ	৩	৩	০	০
নিউদিল্লী	১	১	০	০
কানপুর	১	০	১	০
মোট :	১১	৫	২	৪

স্থান	খেলা	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	খেলা ড্র
অস্ট্রেলিয়াতে	৯	৮	০	১
ভারতবর্ষে	১১	৫	২	৪
মোট :	২০	১৩	২	৫

এক ইনিংসে সর্বাধিক রান

অস্ট্রেলিয়া : ৬৭৪ রান, এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮

ভারতবর্ষ : ৩৮১ রান, এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮

এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রান

(পুরো ইনিংসের খেলায়)

ভারতবর্ষ : ৫৮ রান, ব্রিসবেন, ১৯৪৭-৪৮

অস্ট্রেলিয়া : ১০৫ রান, কানপুর, ১৯৫৯-৬০

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

অস্ট্রেলিয়া : ২০১ রান—ডন ব্র্যাডম্যান, এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮

ভারতবর্ষ : ১৪৫ রান—বিজয় হাজারে, এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

ভারতবর্ষ : ৯ উইকেট (৬৯ রানে) : জেসু প্যাটেল, কানপুর, ১৯৫৯-৬০

অস্ট্রেলিয়া : ৭ উইকেট (৪৩ রানে)—রে লিন্ডওয়াল, মাদ্রাজ, ১৯৫৬-৫৭

৭ উইকেট (৩৮ রানে)—রে লিন্ডওয়াল, এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮

৭ উইকেট (৬৬ রানে)—গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি, মেলবোর্ন, ১৯৬৭-৬৮

৭ উইকেট (৭২ রানে)—রিচি বেনো, মাদ্রাজ, ১৯৫৬-৫৭, ৭ উইকেট (৯৩ রানে)—এ্যালান ডেভিডসন, কানপুর, ১৯৫৯-৬০

একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট

ভারতবর্ষ : ১৪টি (১২৪ রানে)—জেসু প্যাটেল, কানপুর, ১৯৫৯-৬০

অস্ট্রেলিয়া : ১২টি (১২৪ রানে)—এ্যালান ডেভিডসন, কানপুর, ১৯৫৯-৬০

একটি সিরিজে সর্বাধিক উইকেট

অস্ট্রেলিয়া : ২৯টি (৪৪০ রানে)—এ্যালান ডেভিডসন, ১৯৫৯-৬০

২৯টি (৫৬৮ রানে)—রিচি বেনো, ১৯৫৯-৬০

ভারতবর্ষ : ২৫টি (৬৮৬ রানে)—ই এ এস প্রসন্ন, ১৯৬৭-৬৮

দ্রষ্টব্য : প্রসন্ন ৪টি খেলায় ৭ ইনিংসে ২৫টি উইকেট পান। অপরদিকে ডেভিডসন এবং বেনো ৫টি খেলায় ১০ ইনিংস খেলে ২৯টি করে উইকেট পান।

একটি খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া : ১৩২ ও ১২৭*—ডন ব্র্যাডম্যান, মেলবোর্ন, ১৯৪৭-৪৮

ভারতবর্ষ : ১১৬ ও ১৪৫—বিজয় হাজারে, এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮

এক সিরিজে সর্বাধিক রান

অস্ট্রেলিয়া : ৭১৫ (গড় ১৭৮·৭৫)—ডন ব্র্যাডম্যান, ১৯৪৭-৪৮

বিজয় হাজারে

জেসু প্যাটেল

ভারতবর্ষ : ৪৩৮ (গড় ৪৩·৮০)—নরী কন্ট্রাকটর, ১৯৫৯-৬০

এক সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া : ৪টি—ডন ব্র্যাডম্যান, ১৯৪৭-৪৮

ভারতবর্ষ : ২টি—বিজয় হাজারে, ১৯৪৭-৪৮

: ২টি—ভিনু মানকাদ, ১৯৪৭-৪৮

উভয় দেশের টেস্টে সর্বাধিক সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া : ৪টি—ডন ব্র্যাডম্যান

: ৪টি—নীল হার্ভে

ভারতবর্ষ : ২টি—বিজয় হাজারে

: ২টি—ভিনু মানকাদ

বছর	সেঞ্চুরী অস্ট্রেলিয়া	ভারতবর্ষ
১৯৪৭-৪৮	৮	৫
১৯৫৬	২	১
১৯৫৯	৫	২
১৯৬৪	০	১
১৯৬৭-৬৮	৬	১
মোট :	২১	৯

বিভিন্ন স্থানে সেঞ্চুরী

	অস্ট্রেলিয়া	ভারতবর্ষ
মেলবোর্ন	৭	২
এডিলেড	৫	৩
ব্রিসবেন	১	১
সিডনি	১	০
মোট :	১৪	৬

	অস্ট্রেলিয়া	ভারতবর্ষ
বোম্বাই	৪	২
মাদ্রাজ	১	১
নিউদিল্লী	১	০
কলকাতা	১	০
কানপুর	০	০
মোট :	৭	৩

টেস্টে দুই দেশের রেকর্ড

[আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে ১৯৬৯ সালের ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত ভারতবর্ষ ১১১টি এবং অস্ট্রেলিয়া ২৯৯টি টেস্ট খেলার সূত্রে নিজ দেশের পক্ষে যে-সব রেকর্ড সৃষ্টি করেছে তার খতিয়ান।]

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

ভারতবর্ষ

বিপক্ষে	খেলা	জয়	পরাজয়	ড্র
ইংল্যান্ড	৩৭	৩	১৮	১৬
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২৩	০	১২	১১
অস্ট্রেলিয়া	২০	২	১৩	৫
পাকিস্তান	১৫	২	১	১২
নিউজিল্যান্ড	১৬	৭	২	৭
মোট :	১১১	১৪	৪৬	৫১

অস্ট্রেলিয়া

বিপক্ষে	খেলা	জয়	পরাজয়	ড্র
ইংল্যান্ড	২০৩	৮০	৬৬	৫৭
দঃ আফ্রিকা	৩৯	২৭	৩	৯
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৩০	১৭	৬	৭*
ভারতবর্ষ	২০	১৩	২	৫
পাকিস্তান	৬	২	১	৩
নিউজিল্যান্ড	১	১	০	০
মোট :	২৯৯	১৪০	৭৮	৮১

দ্রষ্টব্য : দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ১৯৬৩-৬৪ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজের মোট ১০টি খেলার ফলাফল তালিকাভুক্ত হয়নি যেহেতু ১৯৬১ সাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা যে-সব টেস্ট খেলছে তা বে-সরকারী হিসাবে গণ্য।

সর্বাধিক টেস্ট খেলা

অস্ট্রেলিয়া : ৭৯টি—নীল হার্ভে
ভারতবর্ষ : ৫৯টি—পলি উমরিগড়

সর্বাধিক উইকেট লাভ

অস্ট্রেলিয়া : ২৪৮টি (৬৭০৪ রানে ও গড় ২৭·০৩) রিচি বেনো (৬৩টি টেস্টে)

ভারতবর্ষ : ১৬৪টি (৫২৩৫ রানে ও গড় ৩২·৩১) ভিনু মানকাদ (৪৪টি টেস্টে)

সর্বাধিক উইকেট একটি সিরিজে

অস্ট্রেলিয়া : ৪৪টি (৬৪২ রানে)—সি ভি গ্রিমেট, (বিপক্ষে দঃ আফ্রিকা) ১৯৩৫-৩৬

ভারতবর্ষ : ৩৪টি (৫৭১ রানে)—ভিনু মানকাদ, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৫১-৫২
: ৩৪টি (৬৬৯ রানে)—সুভাষ গুপ্তে, বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, ১৯৫৫-৫৬

সর্বাধিক উইকেট এক ইনিংসে

ভারতবর্ষ : ৯টি (৬৯ রানে)—জে এম প্যাটেল, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, কানপুর ১৯৫৯-৬০
: ৯টি (১০২ রানে)—সুভাষ গুপ্তে, বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কানপুর ১৯৫৮-৫৯

অস্ট্রেলিয়া : ৯টি (১২১ রানে)—আর্থার মেইলী, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, মেলবোর্ণ, ১৯২০-২১

ভিনু মানকাদ

সর্বাধিক উইকেট একটি খেলায়

অস্ট্রেলিয়া : ১৪টি (৯০ রানে)—এফ আর স্পোফোর্থ, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ওভাল, ১৮৮২

ভারতবর্ষ : ১৪টি (১২৪ রানে)—জে এম প্যাটেল, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, কানপুর, ১৯৫৯-৬০

সর্বাধিক সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া : ২৯টি (৫২টি টেস্টে)—ডন ব্র্যাডম্যান

ভারতবর্ষ : ১২টি (৫৯টি টেস্টে)—পলি উমরিগড়

শ্রেষ্ঠ অল-রাউন্ডার

অস্ট্রেলিয়া : রিচি বেনো (খেলা ৬৩, মোট রান ২২০১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১২২. সেঞ্চুরী ৩। বোলিং : ৬৭০৪ রানে ২৪৮ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ভিনু মানকাদ (খেলা ৪৪, মোট রান ২১০৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৩১, সেঞ্চুরী ৫। বোলিং : ৫২৩৫ রানে ১৬৪ উইকেট)

সর্বাধিক ক্যাচ

(উইকেটকিপার বাদে)

অস্ট্রেলিয়া : ৬৫টি (৬৩টি টেস্টে)—রিচি বেনো

ভারতবর্ষ : ৩৩টি (৫৯টি টেস্টে)—পলি উমরিগড়

দ্রষ্টব্য : রিচি বেনোর টেস্ট পরিসংখ্যানের মধ্যে ১৯৬৩-৬৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তাঁর ৪টি টেস্ট খেলায় মোট ২৩১ রান, ৬টি ক্যাচ এবং ৪৪৯ রানে ১২টি উইকেট ধরা হয়েছে।

সর্বাধিক 'ডিসমিস্যাল'

(উইকেটকিপারের দক্ষতা)

অস্ট্রেলিয়া : ১৮৭ (কট ১৬৩ ও স্টাম্পড ২৪)—এ ডবলিউ গ্রাউট (৫১টি টেস্টে)

ভারতবর্ষ : ৫১টি (কট ৩৫ ও স্টাম্পড ১৬)—এন এস তামহানে (২১টি টেস্টে)

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রান

পক্ষে	রান	বিপক্ষে	স্থান	বছর
অস্ট্রেলিয়া	৭৫৮ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ)	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	কিংস্টন	১৯৫৪-৫৫
ভারতবর্ষ	৫৩৯ (৯ উইঃ ডিক্লেঃ)	পাকিস্তান	মাদ্রাজ	১৯৬০-৬১

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

(পুরো ইনিংসের খেলায়)

পক্ষে	রান	বিপক্ষে	স্থান	বছর
ভারতবর্ষ	৫৮	অস্ট্রেলিয়া	ব্রিসবেন	১৯৪৭-৪৮
	৫৮	ইংল্যান্ড	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৫২
অস্ট্রেলিয়া	৩৬	ইংল্যান্ড	বার্মিংহাম	১৯০২

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান

পক্ষে	রান	খেলোয়াড়	বিপক্ষে	স্থান	বছর
অস্ট্রেলিয়া	৩৩৪	ডন ব্র্যাডম্যান	ইংল্যান্ড	লিডস	১৯৩০
ভারতবর্ষ	২৩১	ভিনু মানকাদ	নিউজিল্যান্ড	মাদ্রাজ	১৯৫৫-৫৬

এক সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক মোট রান

এক ইনিংসে

রান	খেলোয়াড়	বিপক্ষে	সর্বোচ্চ রান	সেঞ্চুরী	গড়	বছর
৯৭৪	ডন ব্র্যাডম্যান (অ)	ইংল্যান্ড	৩৩৪	৪	১৩৮·১৪	১৯৩০
৫৮৬	বিজয় মঞ্জরেকার (ভা)	ইংল্যান্ড	১৮৯*	১	৮৩·৭১	১৯৬১-৬২

* নট আউট

টেস্ট খেলায় সর্বাধিক রান

এক ইনিংসে

পক্ষে	রান	খেলা	খেলোয়াড়	সর্বোচ্চ রান	সেঞ্চুরী	গড়
অস্ট্রেলিয়া	৬৯৯৬	৫২	ডন ব্র্যাডম্যান	৩৩৪	২৯	৯৯·৯৪
ভারতবর্ষ	৩৬৩১	৫৯	পলি উমরিগড়	২২৩	১২	৪২·২২

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ১৯৪৭-৪৮ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরকালে গৃহীত ঐতিহাসিক চিত্র : বাঁদিক থেকে—খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় দলীপ সিংজী, অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ডন ব্র্যাডম্যান এবং ভারতবর্ষের অধিনায়ক লালা অমরনাথ

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

১৯৪৭-৪৮ : অস্ট্রেলিয়া ৪—০ খেলায় (ড্র ১) 'রাবার' জয়ী।

ব্রিসবেন (১ম টেস্ট) : নভেম্বর ২৮, ২৯ ডিসেম্বর ১, ২, ৩ ও ৪। অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ২২৬ রানে জয়ী।

অস্ট্রেলিয়া : ৩৮২ রান (৮ উইঃ ডিক্লেঃ ব্র্যাডম্যান ১৮৫, হ্যাসেট ৪৮ এবং মিলার ৫৮ রান। অমরনাথ ৮৪ রানে ৪ এবং মানকাদ ১১৩ রানে ৩ উইকেট)।

ভারতবর্ষ : ৫৮ রান (টসাক ২ রানে ৫ উইকেট) ও ৯৮ রান (টসাক ২৯ রানে ৬ উইকেট)।

সিডনি (২য় টেস্ট) : ডিসেম্বর ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮। খেলা ড্র।

ভারতবর্ষ : ১৮৮ রান (ফাদকার ৫১ এবং কিষেণচাঁদ ৪৪ রান। ম্যাককুল ৭১ রানে ৩ উইকেট)।

ও ৬১ রান (৭ উইকেটে। জনস্টন ১৫ রানে ৩ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া : ১০৭ রান (হাজারে ২৯ রানে ৪ এবং ফাদকার ১৪ রানে ৩ উইকেট)।

মেলবোর্ণ (৩য় টেস্ট) : জানুয়ারী ১, ২, ৩ ও ৫। অস্ট্রেলিয়া ২৩৩ রানে জয়ী।

অস্ট্রেলিয়া : ৩৯৪ রান (ব্র্যাডম্যান ১৩২, হ্যাসেট ৮০ এবং মরিস ৪৫ রান। অমরনাথ ৭৮ রানে ৪ এবং মানকাদ ১৩৫ রানে ৪ উইকেট)।

ও ২৫৫ রান (৪ উইঃ ডিক্লেঃ। মরিস নট-আউট ১০০ এবং ব্র্যাডম্যান নট-আউট ১২৭ রান। অমরনাথ ৫২ রানে ৩ উইকেট)।

ভারতবর্ষ : ২৯১ রান (৯ উইঃ ডিক্লেঃ। মানকাদ ১১৬ এবং ফাদকার নট-আউট ৫৫ রান। জনসন ৫৯ রানে ৪ উইকেট)।

ও ১২৫ রান (জনস্টন ৪৪ রানে ৪ এবং জনসন ৩৫ রানে ৪ উইকেট)।

এডিলেড (৪র্থ টেস্ট) : জানুয়ারী ২৩, ২৪, ২৬, ২৭ ও ২৮। অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১৬ রানে জয়ী।

অস্ট্রেলিয়া : ৬৭৪ রান (বার্ণেস ১১২, ব্র্যাডম্যান ২০১, হ্যাসেট নট-আউট ১৯৮ এবং মিলার ৬৭ রান। রঙ্গচারী ১৪১ রানে ৪ উইকেট)।

ভারতবর্ষ : ৩৮১ রান (হাজারে ১১৬, ফাদকার ১২৩, মানকাদ ৪৯ এবং অমরনাথ ৪৬ রান। জনসন ৬৪ রানে ৪ উইকেট)।

এবং ২৭৭ রান (হাজারে ১৪৫ এবং অধিকারী ৫১ রান। লিণ্ডওয়াল ৩৮ রানে ৭ উইকেট)।

মেলবোর্ণ (৫ম টেস্ট) : ফেব্রুয়ারী ৬, ৭, ৯ ও ১০। অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১৭৭ রানে জয়ী।

অস্ট্রেলিয়া : ৫৭৫ রান (৮ উইঃ ডিক্লেঃ। ব্রাউন ৯৯, ব্র্যাডম্যান ৫৭, হার্ভে ১৫৩ এবং লক্সটন ৮০ রান)।

ভারতবর্ষ : ৩৩১ রান (মানকাদ ১১১, হাজারে ৭৪ এবং ফাদকার নট-আউট ৫৬ রান। রিং ১০৩ রানে ৩, জনসন ৬৬ রানে ৩ উইকেট)।

ও ৬৭ রান (জনসন ৮ রানে ৩ এবং রিং ১৭ রানে ৩ উইকেট)।

১৯৫৬ : অস্ট্রেলিয়া ২—০ খেলায় (ড্র ১) 'রাবার' জয়ী হয়।

মাদ্রাজ (১ম টেস্ট) : অক্টোবর ১৯, ২০, ২২ ও ২৩। অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৫ রানে জয়ী।

ভারতবর্ষ : ১৬১ রান (মঞ্জরেকার ৪১। ক্রফোর্ড ৩২ রানে ৩ এবং বেনো ৭২ রানে ৭ উইকেট)।

এবং ১৫৩ রান (লিণ্ডওয়াল ৪৩ রানে ৭ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া : ৩১৯ রান (ক্রেগ ৪০ এবং জনসন ৭৩ রান। এস পি গুপ্তে ৮৯ রানে ৩ এবং মানকাদ ৯০ রানে ৪ উইকেট)।

বোম্বাই (২য় টেস্ট) : অক্টোবর ২৬, ২৭, ২৮, ৩০ ও ৩১। খেলা অমীমাংসিত।

ভারতবর্ষ : ২৫১ রান (মঞ্জরেকার ৫৫ এবং রামচাঁদ ১০৯ রান। ক্রফোর্ড ২৮ রানে ৩ এবং ম্যাককে ২৭ রানে ৩ উইকেট)।

এবং ২৫০ রান (৫ উইকেটে। পি রায় ৭৮ এবং উমরিগড় ৭৮ রান)।

অস্ট্রেলিয়া : ৫২৩ রান (৭ উইঃ ডিক্লেঃ। বার্ক ১৬১, হার্ভে ১৪০, বার্জ ৮৩ এবং লিণ্ডওয়াল নট-আউট ৪৮ রান। এস পি গুপ্তে ১১৫ রানে ৩ উইকেট)।

কলকাতা (৩য় টেস্ট) : নভেম্বর ২, ৩, ৪ ও ৬। অস্ট্রেলিয়া ৯৪ রানে জয়ী।

অস্ট্রেলিয়া : ১৭৭ **রান** (বার্জ ৫৮ রান। গোলাম আমেদ ৪৯ রানে ৭ উইকেট)।

এবং ১৮৯ **রান** (৯ উইঃ ডিক্লেঃ। হার্ভে ৬৯ রান। গোলাম আমেদ ৮১ রানে ৩ এবং মানকাদ ৪৯ রানে ৪ উইকেট)।

ভারতবর্ষ : ১৩৬ **রান** (নিম্বলকার ৩২ রানে ৩ এবং বেনো ৫২ রানে ৬ উইকেট)।

এবং ১৩৬ **রান** (বেনো ৫৩ রানে ৫ এবং বার্ক ৩৭ রানে ৪ উইকেট)।

১৯৫৯-৬০ : অস্ট্রেলিয়া ২—১ খেলায় (ড্র ২) 'রাবার' জয়ী।

নিউদিল্লী (১ম টেস্ট) : ডিসেম্বর ১২, ১৩, ১৪ ও ১৬। অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১২৭ রানে জয়ী।

ভারতবর্ষ : ১৩৫ **রান** (কন্ট্রাক্টর ৪১ রান। ডেভিডসন ৩০ রানে ৩ এবং বেনো শূন্য রানে ৩ উইকেট)

এবং ২০৬ **রান** (পি রায় ৯৯ রান। ক্লিন ৪২ রানে ৪ এবং বেনো ৭৬ রানে ৫ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ৪৬৮ **রান** (ফ্যাভেল ৪০, হার্ভে ১১৪, ম্যাককে ৭৮, গ্রাউট ৪২ এবং মেকিফ নটআউট ৪৫ রান। উমরীগড় ৪৯ রানে ৪ উইকেট)

কানপুর (২য় টেস্ট) : ডিসেম্বর ১৯, ২০, ২১, ২৩ ও ২৪। ভারতবর্ষ ১১৯ রানে জয়ী

ভারতবর্ষ : ১৫২ **রান** (ডেভিডসন ৩১ রানে ৫ এবং বেনো ৬২ রানে ৪ উইকেট)

ও ২৯১ **রান** (কন্ট্রাক্টর ৭৪, বোরদে ৪৪, কেনি ৫১ এবং নাদকার্নী ৪৬ রান। ডেভিডসন ৯৩ রানে ৭ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ২১৯ **রান** (ম্যাকডোনাল্ড ৫৩, হার্ভে ৫১, এবং ডেভিডসন ৪১ রান। প্যাটেল ৬৯ রানে ৯ উইকেট)

ও ১০৫ **রান** (প্যাটেল ৫৫ রানে ৫ এবং উমরীগড় ২৭ রানে ৪ উইকেট)

বোম্বাই (৩য় টেস্ট) : জানুয়ারী ১, ২, ৩, ৫ ও ৬। খেলা অমীমাংসিত।

ভারতবর্ষ : ২৮৯ **রান** (কন্ট্রাক্টর ১০৮ এবং বেগ ৫০ রান। ডেভিডসন ৬২ রানে ৪ এবং ম্যাকিফ ৭৯ রানে ৪ উইকেট)

ও ২২৬ **রান** (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। পি রায় ৫৭, কন্ট্রাক্টর ৪৩, বেগ ৫৮ এবং কেনী নটআউট ৫৫ রান। মেকিফ ৬৭ রানে ৩ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ৩৮৭ **রান** (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হার্ভে ১০২ এবং ওনীল ১৬৩ রান। নাদকার্নী ১০৫ রানে ৬ উইকেট)

ও ৩৪ **রান** (১ উইকেট)

মাদ্রাজ (৪র্থ টেস্ট) : জানুয়ারী ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৭। অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৫৫ রানে জয়ী

ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক কেনিংটন ওভাল মাঠে ১৯৩৪ সালে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ডন ব্র্যাডম্যান কিভাবে তাঁর ২৪৪ রান সংগ্রহ করেছিলেন, তারই আলেখ্য।

অস্ট্রেলিয়া : ৩৪২ **রান** (ফ্যাভেল ১০১, ম্যাককে ৮৯ এবং ওনীল ৪০ রান। দেশাই ৯৩ রানে ৪ এবং নাদকার্নী ৭৫ রানে ৩ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ১৪৯ **রান** (কুন্দরন ৭১ রান। ডেভিডসন ৩৬ রানে ৩ এবং বেনো ৪৩ রানে ৫ উইকেট)

এবং ১৩৮ **রান** (কন্ট্রাক্টর ৪১ রান। বেনো ৪৩ রানে ৩ উইকেট)

কলকাতা (৫ম টেস্ট) : জানুয়ারী ২৩, ২৪, ২৫, ২৭ ও ২৮। খেলা অমীমাংসিত।

ভারতবর্ষ : ১৯৪ **রান** (গোপীনাথ ৩৯ রান। ডেভিডসন ৩৭ রানে ৩ এবং বেনো ৫৯ রানে ৩ উইকেট)

ও ৩৩৯ **রান** (কেনী ৬২, বোরদে ৫০ এবং জয়সীমা ৭৪ রান। বেনো ১০৩ রানে ৪ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ৩৩১ **রান** (গ্রাউট ৫০, ওনীল ১১৩ এবং বার্ক ৬০ রান। দেশাই ১১১ রানে ৪, প্যাটেল ১০৪ রানে ৩ এবং বোরদে ২৩ রানে ৩ উইকেট)

এবং ১২১ রান (২ উইকেটে। ফ্যাভেল নট-আউট ৬২ রান)

১৯৬৪ : সিরিজ অমীমাংসিত

মাদ্রাজ (১ম টেস্ট) : অক্টোবর ২, ৩, ৪ ৬ ও ৭

অস্ট্রেলিয়া ১৩৯ রানে জয়ী

অস্ট্রেলিয়া : ২১১ **রান** (লরী ৬২ রান। নাদকার্নী ৩১ রানে ৫ উইকেট এবং কৃপাল সিং ৪৩ রানে ৩ উইকেট)

ও ৩৯৭ **রান** (সিম্পসন ৭৭ এবং বার্জ ৬০ রান। নাদকার্নী ৯১ রানে ৬ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ২৭৬ **রান** (পতৌদির নবাব নটআউট ১২৮ এবং বোরদে ৬৯ রান। ম্যাকেঞ্জি ৫৮ রানে ৬ উইকেট)

এরাপল্লী প্রসন্ন

নর্ম্যান ওনীল

● ১৯৩ রান (হনুমন্ত সিং ৯৪ এবং মঞ্জরেকার ৪০ রান। ম্যাকেঞ্জি ৩৩ রানে ৪ উইকেট)

বোম্বাই (২য় টেস্ট) : অকটোবর ১০, ১১, ১২, ১৪ ও ১৫
ভারতবর্ষ ২ উইকেটে জয়ী

অস্ট্রেলিয়া : ৩২০ রান (বার্জ ৮০ এবং জার্মান ৭৮ রান। চন্দ্রশেখর ৫০ রানে ৪ উইকেট)

● ২৭৪ রান (কাউপার ...৮১, বুথ ৭৪ এবং লরী ৬৮ রান। নাদকার্নী ৩৩ রানে ৪ এবং চন্দ্রশেখর ৭৩ রানে ৪ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ৩৪১ রান (পতৌদির নবাব ৮৬, জয়সীমা ৬৬ এবং মঞ্জরেকার ৫৯ রান। ভিভার্স ৬৮ রানে ৪ এবং কনোলী ৬৬ রানে ৩ উইকেট)

● ২৫৬ রান (৮ উইকেটে। সারদেশাই ৫৬ এবং পতৌদির নবাব ৫৩ রান। কনোলী ২৪ রানে ৩ উইকেট)।

কলকাতা (৩য় টেস্ট) : অকটোবর ১৭, ১৮, ২০, ২১ ও ২২
খেলা অমীমাংসিত

অস্ট্রেলিয়া : ১৭৪ রান (সিম্পসন ৬৭ এবং লরী ৫০ রান। দুরানী ৭৩ রানে ৬ উইকেট)

● ১৪৩ রান (১ উইকেটে। সিম্পসন ৭১ এবং লরি নট-আউট ৪৭ রান)।

ভারতবর্ষ : ২৩৫ রান (বোরদে নটআউট ৬৮ এবং জয়সীমা ৫৭ রান। সিম্পসন ৪৫ রানে ৪ এবং ভিভার্স ৮১ রানে ৩ উইকেট)

১৯৬৭-৬৮ : অস্ট্রেলিয়া ৪—০ খেলায় 'রাবার' জয়ী

এডিলেড (১ম টেস্ট) : ডিসেম্বর ২৩, ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮
অস্ট্রেলিয়া ১৪৬ রানে জয়ী

অস্ট্রেলিয়া : ৩৩৫ রান (কাউপার ৯২, সিহান ৮১ এবং সিম্পসন ৫৫ রান।

আবিদ আলী ৫৫ রানে ৬ এবং প্রসন্ন ৬০ রানে ৩ উইকেট)

● ৩৬৯ রান (কাউপার ১০৮ এবং সিম্পসন ১০৩ রান। সুর্তি ৭৪ রানে ৫ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ৩০৭ রান (ইঞ্জিনিয়ার ৮৯, সুর্তি ৭০ এবং বোরদে ৬৯ রান। কনোলী ৫৪ রানে ৪ উইকেট)

● ২৫১ রান (সুব্রহ্মনিয়াম ৭৫ এবং সুর্তি ৫৩ রান। রেনে বার্জ ৩৯ রানে ৫ উইকেট)

মেলবোর্ন (২য় টেস্ট) : ডিসেম্বর ৩০, জানুয়ারী ১, ২ ও ৩। অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৪ রানে জয়ী

ভারতবর্ষ : ১৭৩ রান (পতৌদির নবাব ৭৫ রান। ম্যাকেঞ্জি ৬৬ রানে ৭ উইকেট)

● ৩৫২ রান (ওয়াদেকার ৯৯, পাতৌদির নবাব ৮৫ এবং ইঞ্জিনিয়ার ৪২ রান। সিম্পসন ৪৪ রানে ৩ এবং ম্যাকেঞ্জি ৮৫ রানে ৩ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ৫২৯ রান (চ্যাপেল ১৫১, সিম্পসন ১০৯, লরী ১০০ রান এবং জার্মান ৬৫ রান। প্রসন্ন ১৪১ রানে ৬ এবং সুর্তি ১৫০ রানে ৩ উইকেট)

ব্রিসবেন (৩য় টেস্ট) : জানুয়ারী ১৯, ২০, ২২, ২৩ ও ২৪
অস্ট্রেলিয়া ৩৯ রানে জয়ী

অস্ট্রেলিয়া : ৩৭৯ রান (ওয়াল্টার্স ৯৩, লরী ৬৪, সিহান ৫৮ এবং কাউপার ৫১ রান। সুর্তি ১০২ রানে ৩ উইকেট)

● ২৯৪ রান (রেডপাথ ৭৯ এবং ওয়াল্টার্স ৬২ রান। প্রসন্ন ১০৪ রানে ৬ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ২৭৯ রান (পতৌদির নবাব ৭৪, জয়সীমা ৭৪ এবং সুর্তি ৫২ রান। কাউপার ৩১ রানে ৩ এবং ফ্রিম্যান ৫৬ রানে ৩ উইকেট)

● ৩৫৫ রান (জয়সীমা ১০১, সুর্তি ৬৪, বোরদে ৬৩ এবং পতৌদির নবাব ৪৮ রান। গ্লিসন ৫৩ রানে ৩ এবং কাউপার ১০৪ রানে ৪ উইকেট)

সিডনি (৪র্থ টেস্ট) : জানুয়ারী ২৬, ২৭, ২৯, ৩০ ও ৩১
অস্ট্রেলিয়া ১৪৪ রানে জয়ী

অস্ট্রেলিয়া : ৩১৭ রান (ওয়াল্টার্স নটআউট ৯৪, সিহান ৭২ এবং লরী ৬৬ রান। প্রসন্ন ৬২ রানে ৩ উইকেট)

● ২৯২ রান (কাউপার ১৬৫ এবং লরী ৫২ রান। প্রসন্ন ৯৬ রানে ৪ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ২৬৮ রান (আবিদ আলী ৭৮, পতৌদির নবাব ৫১ এবং ওয়াদেকার ৪৯ রান। সিম্পসন ৩৮ রানে ৩ এবং ফ্রিম্যান ৮৬ রানে ৪ উইকেট)

● ১৯৭ রান (আবিদ আলী ৮১ রান। সিম্পসন ৫৯ রানে ৫ এবং কাউপার ৪৯ রানে ৪ উইকেট)
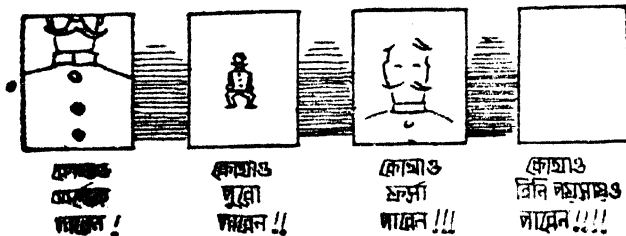
অমৃত পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

"নিউ ইয়র্কের সিং সিং জেলের নিভৃত কক্ষ থেকে দলের সর্দারেরা হাত বাড়ালেন আমার দিকে। খুনীরা এলো রাত্রির অন্ধকারে। অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে গেল। কিন্তু আমি বললাম না সোনা কোথায় লুকোনো আছে। সারারাত নির্যাতন চলল। শেষে আমায় কথা বলাতে না পেরে তারা আমার দু-হাত কেটে ফেলল। তারপর আমার হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে গুলি চালিয়ে চলে গেল।

.....কিন্তু একটা কথা তারা জানত না, মিঃ বন্ড। আমার হৃৎপিণ্ড বুকের ডানদিকে অবস্থিত—দশ লাখে বড়জোর একজন লোকের যা থাকে। আমি বাঁচলাম। কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তির জোরে আমি সেই অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করে বেঁচে রইলাম।..."

—এক আশ্চর্য মানুষের কাহিনী,

মৃত্যু ও পরাজয়কে যিনি অস্বীকার করেছিলেন—

ডক্টর নো

(বাংলায় বই)

আন্তর্জাতিক গুপ্তচর জেমস বণ্ড

-এর ভয়াবহ অভিযান কাহিনী

দাম—৮·০০

জেমস বণ্ড-এর আরেকটি —

থাণ্ডারবল (৬·৫০)

প্রকাশক : ব্লু-বেল পাবলিশার্স, ১২৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিঃ-২৬। পরিবেশক : কথা ও কাহিনী, ১৩, বংকিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি - ১২।

১ম বর্ষ ৩য় খণ্ড

৩২শ সংখ্যা মূল্য ৪০ পয়সা

Friday 19th Dec. 1969 শুক্রবার, ৩রা পৌষ, ১৩৭৬ 40 Paise

সুচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপরিমল চৌধুরী

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য

প্রতি বৎসর ঈদ উপলক্ষে আমরা এক প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করি। কিন্তু তা পরিচিত 'বিচিত্রানুষ্ঠান' ধরনের নয়। কারণ ঐ জাতীয় আনন্দানুষ্ঠান যে কোন উপলক্ষেই করা চলে, তাতে ঈদের নাম সংযোজনের প্রয়োজন নেই। বস্তুত ঈদ শব্দের আক্ষরিক অর্থ আনন্দই বটে। কিন্তু এর তাৎপর্য সুগভীর। ঈদ মানুষের কাছে প্রেম ও মৈত্রীর বাণীই বহন করে আনে। এই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা ঈদ প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করছি।

আমরা বিশ্বাস করি যে ঈদের আনুষ্ঠানিক অংশটুকু মুসলমানদের নিজস্ব, কিন্তু এর প্রীতির ভাগে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সবারই দাবী আছে। এই-ভাবে দোল-দুর্গোৎসবের মত ঈদও বাংলার জাতীয় উৎসব হয়ে উঠতে পারে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পথ প্রশস্ত হতে থাকে। আজ আমাদের দেশে উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে। এর মোকাবিলা করার জন্য দেশের প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকের উচিত সাম্প্রদায়িকতা বিরোধি আন্দোলন গড়ে তোলা। বর্তমান পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রচার একান্ত কাম্য। এর জন্য ঈদ এক সার্থক উপলক্ষ সন্দেহ নেই। তাই আমরা প্রীতি সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে এক আলোচনার ব্যবস্থা করেছি। তাছাড়া, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-মূলক একটি নাটক মঞ্চস্থ করার ইচ্ছাও আমাদের আছে। সর্বোপরি এই বিষয়ে প্রদর্শনী এবং এক সাহিত্য প্রতিযোগিতারও আয়োজন করছি।

এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে আপনার পত্রিকার পাঠকদের সহযোগিতা কামনা করি। আমাদের প্রদর্শনীর জন্য ছবি, আইডিয়া, নিউজ কাটিংস ইত্যাদি তাঁরা পাঠাতে পারেন। যাঁরা সাহিত্যানুরাগী এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে চিন্তা করেন, তাঁদের অনুরোধ করি, আমাদের সাহিত্য প্রতিযোগিতায় রচনা পাঠাতে। ছোট গল্প, প্রবন্ধ এবং কবিতা—এই তিনটি শাখায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি রচনা 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' বিষয়ে হওয়া উচিত। যোগদানের শেষ তারিখ—২০ ডিসেম্বর, ১৯৬৯। যোগাযোগের ঠিকানা—৩০।১।এ, একবালপুর লেন, কলিকাতা-২৩।

দলিলুদ্দীন আহমেদ,
সাধারণ সম্পাদক
প্রগেসিভ কালচারাল ফোরাম।

ছোট পত্রিকার কথা

গত ৯ বছর ধরে আমি অমৃত'র নিয়মিত পাঠক। এক অখ্যাত লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক হিসেবেও আপনার পত্রিকার প্রতি আমার বিশেষ আস্থা আছে। স্বভাবতই সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগটির প্রতি নজর এজন্য একটু বেশীই দিয়ে থাকি। এ ব্যাপারে আপনার উন্নত সম্পাদনা ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীই বিস্ময়ের কারণ। এই বিভাগের সাহিত্যের খবর, বইপাড়ায়, নতুন বই, বই-কুণ্ঠের খাতা-ই তার অজস্র প্রমাণ। তাছাড়া নিয়মিতভাবে বহু ছোট পত্রিকার পক্ষপাত-শূন্য সমালোচনাও আগ্রহের সঙ্গে পড়ে থাকি। ছোট পত্রিকার প্রতি আপনার এই সহানুভূতি ও ভালবাসা গভীর মনোযোগের সঙ্গে দীর্ঘকাল যাবৎ লক্ষ্য করে আসছি। এই ব্যাপারে আপনার সমগোত্রীয় অন্য কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে অখ্যাত ছোট পত্রিকা-গুলির প্রতি কি রকম অবিচার চালাচ্ছেন, তার কথা উল্লেখ না করলে অমৃতকে হেয় করা হবে বলে মনে করি। ছোট পত্রিকার প্রতি আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা মনে রেখে নিম্নোক্ত একটি প্রস্তাব আপনার বিবেচনার জন্য পেশ করছি।

আমার পরিষ্কার মনে আছে, প্রায় বছর দেড়েক আগে অভয়ংকর লিখেছিলেন যে তিনি বাংলাদেশের শহর ও মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য ছোট পত্রপত্রি-কার একটি আলোচনা আলাদা আলাদা-ভাবে অমৃত-এ করবেন। সেই প্রতিশ্রুত প্রবন্ধ তাঁর পক্ষে আজও কেন লেখা সম্ভব হয়ে ওঠে নি, সেকথা জানতে পারিনি বলে অস্বস্তি বোধ করছি।

সুনির্মল চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক : তরুণের অভিযান
কলকাতা—২০

মহাপুরুষ গুরু নানকজী

ভারতের সব মহাপুরুষই তাঁদের জীবিতাবস্থায় সমাজের সব থেকে নীচু শ্রেণীর লোকদের উপরে ওঠানোর জন্য সব সময় চেষ্টা করে গিয়েছেন।

কার্তিক পূর্ণিমার শুভ মহালগ্নে মহাপুরুষ গুরু নানকের পঞ্চম জন্ম-শতাব্দী পালন করার সময় আমাদের উপ-রোক্ত বাণীই বেশী করে মনে পড়ছে।

একবার গুরু নানকজী একটি গ্রামে গিয়েছিলেন। সেই গ্রামের জমিদার তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু নানকজী জমিদারের ঘরে না গিয়ে ভালোভাই নামক একজন ভক্ত সূত্রধরের গৃহে গিয়ে আহার করলেন।

জমিদার বিরক্ত হয়ে গুরু নানকজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আপনি আমার গৃহে আহার করলেন না?

নানকজী শান্ত সংযত গম্ভীর হয়ে জমিদারকে বললেন, আমার দুধ খেতে ভাল লাগে কিন্তু রক্ত নয়।

জমিদার মনে মনে রুষ্ট হয়ে বললেন, আমি তো আপনাকে ঘি-দুধেরই খাবারের ব্যবস্থা করেছি। এই সূত্রধর তো শুধু শুধু শুকনো রুটি আপনাকে খেতে দিয়েছে।

গুরু নানকজী বললেন, ভাল কথা। আপনার ভোজন সামগ্রী আনুন। সঙ্গে সঙ্গে সূত্রধরকেও বললেন তোমার শুকনো রুটিও কিছু আন।

নানকজী সেই শুকনো রুটি ধরে টিপ-লেন। উপস্থিত জনতা আশ্চর্য হয়ে দেখল, সেই শুকনো রুটি থেকে ফোটা ফোটা দুধ ঝরে পড়ছে। কিন্তু নানকজী যখন সেই জমিদারের খাঁটি ঘিয়ে জবজবে পরোটা টিপলেন, তখন ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ল।

গুরু নানকজী বললেন, যে ব্যক্তি আদৌ পরিশ্রম না করে পরের শ্রম থেকে খায় তার খাদ্য রক্তমিশ্রিত, কিন্তু যে পরিশ্রম করে খায়, তার শুকনো রুটি হলেও সেটা দুগ্ধ-তুল্য। আজ মহাপুরুষ নানকজী সমস্ত পৃথিবীর শিখদের আদি গুরু। পঞ্চম জন্ম-শতাব্দীর শুভ লগ্নে আমরা সমস্ত ভারত-বাসী আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে প্রণতি জানাচ্ছি এই ভারতীয় মহাপুরুষকে।

নারায়ণচন্দ্র অধিকারী
হিরাকুদ
ওড়িষা

শাদা চোখে

মহাশয় আপনার সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিক 'শাদা চোখে' প্রবন্ধটির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। এই প্রবন্ধটির ধারাবাহি-কতার মধ্যে সময়োপযোগী বাস্তবধর্মী যে চিত্রের আলোকপাত করা হয়—তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। নেপথ্য থেকে একটি বলিষ্ঠ প্রয়োজনীয় বক্তব্য সম্পাদনের জন্য এই জাতীয় রচনাকে পাঠকের সামনে উপ-স্থিত করে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও দায়িত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

আশা করবো, সত্যদর্শীর শাদা চোখের দৃষ্টি আরও সজাগ হয়ে আমাদের সামনের পর্দাকে আরও তুলে ধরতে সাহায্য করবে।

কবি কঙ্কণ গুপ্ত
সাঁওতালডি, পুরুলিয়া

মানুষগড়ার ইতিকথা

২১ কার্তিকের 'অমৃতে'-তে 'মানুষ গড়ার ইতিকথা' শিরোনামায় শ্রীবলরাম ঘোষের চিঠিখানা দেখলাম। সাউথ সুবার্বন স্কুলের ষাট বর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে বই ছাপা হয়েছিল, তাতে দেখা যায় যে—

(১) ১৯২০ খৃস্টাব্দে ঐ স্কুল থেকে যাঁরা পাশ করেছিলেন, তাঁদের ফর্দে বলরামবাবুর নামটি নেই ;

(২) সে বছর ১৩ জন নয় দশ জন ছাত্র ঐ স্কুল থেকে স্টার মার্ক পেয়ে পাশ করেন।

(৩) ক্ষিতীনবাবু, প্রতুলবাবু আর চারুবাবু তা পাননি।

(৪) সে বছরের ঐ স্কুলের সেরা ছাত্রের নাম ছিল বিভূতি 'ঘোষ' নয়, বিভূতিভূষণ বসু।

প্রবীর দাশগুপ্ত
কলকাতা-৫৩।

(২)

৫।২২ সংখ্যার 'অমৃতে' বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের ইতিকথা গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। আমি এই বিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র। ১৯৩৫ সালের মাঝ থেকে দেড় বছর মাত্র পড়েছিলাম, কিন্তু এখনও এই সময়ের ঘটনাবলী মনের কোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। যাই হোক আপনাদের প্রতিনিধি পরিবেশিত রচনাটি সুলিখিত ও তথ্যভিত্তিক। কিন্তু একটি ঘটনার উল্লেখ নেই। বর্তমান প্রধান শিক্ষক মহাশয় ১৯৬৩ সালে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। এটির উল্লেখ থাকলে ভাল হত। বিদ্যালয়ের ইতিহাস জুগিয়েছেন প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্বয়ং। মনে হয় তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয়ে নিজের সম্বন্ধে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেন নি।

নির্মলকুমার সরকার
খুরুট, হাওড়া

(৩)

গত ৫ অগ্রহায়ণের শ্রীসন্ধিৎসুর মানুষ গড়ার ইতিকথায় গোসাবা আর আর হাইস্কুলের ইতিহাস পাঠ করিলাম। গোসাবা স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে আমরা ঐ ইতিকথার অসম্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেতেছি।

(১) প্রসঙ্গত ঐ ইতিকথায় গোসাবা আর আর হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী 'মহামতি লেডি হ্যামিল্টনের নামের কোন উল্লেখ নেই।

(২) স্কুলের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষকও অস্থায়ী সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ স্কুলস গোসাবা এস্টেট শ্রীগোপাল ভট্টাচার্যের নাম উক্ত ইতিকথায় উল্লেখ আছে। কিন্তু গোসাবা হাইস্কুলের ক্রমোন্নতি ও আধুনিকীকরণে সবচেয়ে বেশী অবদান যাঁর তৎকালীন এডুকেশন অফিসার ও গোসাবা স্কুলসমূহের সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীসুজিত চক্রবর্তীর নাম উল্লিখিত না হলে ইতিকথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ইউরোপীয় উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত শ্রীচক্রবর্তী মহাশয় গোসাবায় প্রথম Audio-Visual Education এবং হাতের কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী বর্তমানে নয়াদিল্লীতে মিনিস্ট্রি অব এডুকেশনে Audio-Visual Section এর সেক্রেটারী।

(৩) গোসাবা স্কুলের ভূতপূর্ব শিক্ষকগণের মধ্যে পাণ্ডিত্য এবং ছাত্রী প্রীতির জন্য যাঁরা উল্লেখযোগ্য শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্তী (খড়দহ রামকৃষ্ণ হাইস্কুলের প্রধান পন্ডিত) এবং শ্রীযুক্ত রজতবরণ দত্তরায় বর্তমানে বারাসত গর্ভঃ কলেজের অধ্যাপক শশীবাবু, কিশোরীবাবু, বারীনবাবু, হরিপদবাবু ও তদানীন্তন গোসাবা সেন্ট্রাল স্কুলের মিঃ নাথ ইত্যাদি নামের উল্লেখ নেই।

(৪) গোসাবা হাইস্কুলের ছাত্রদের ব্রতচারী, সমাজসেবা, সমবায় শিক্ষা, কৃষিকাজ, রোগ-শুশ্রূষা, সঙ্গীতচর্চা ও খেলা-ধূলার মাধ্যমে ভবিষ্যতের আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা হত। স্কুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সাপ্তাহিক পাঠচক্র, এবং হোস্টেলের চেষ্টা ছিল নিজেকে স্বনির্ভর করার দিকে। এই অবদান অরবিন্দ দত্ত মহাশয়ের ও নির্মলকুমার মজুমদার মহাশয়ের।

(৫) এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৫৭-৫৮ সালে এস্টেট যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়ত্তাধীনে যায় সেই দোদুল্যমান অবস্থায় শ্রীযুক্ত অমূল্যভূষণ মজুমদার মহাশয় তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সহায়তায় স্থানীয় জনসাধারণের জন্য স্কুলটিকে স্পনসার্ড স্কুলে পরিণত করান। এর উল্লেখ না থাকলে ইতিহাস ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়।

(৬) জনসাধারণের বহুদিনের চাহিদা মিটাইয়া গোসাবা হাইস্কুলটিকে মহা-বিদ্যালয় করার জন্যেও আপনার মাধ্যমে আবেদন জানাচ্ছি।

রনেনকুমার দত্ত এম-এ (ক্যাল), বি-এড (বিশ্বভারতী), ডিপ মন্টসারী (লন্ডন)।

(প্রধান শিক্ষক প্রফুল্লপ্রতাপ বিদ্যায়তন)।

সমরকৃষ্ণ দত্ত এম-কম, বি-এ, বি-টি, এল-এল-বি (অ্যাডভোকেট)।
অধ্যাপক নরসিংহ দত্ত কলেজ।
জয়ন্তকুমার মজুমদার বি-ই।

(৪)

২৮ কার্তিক ১৩৭৬ (২৭শ সংখ্যা) 'অমৃত'তে মিত্র ইনস্টিটিউশন (ব্রাঞ্চ) সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে তাতে কিছু ভুল তথ্য আছে।

(১) সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাশ এই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন নি। তিনি বোলপুরে শান্তিনিকেতন থেকে প্রাইভেটে ঐ পরীক্ষা দেন এবং পাশ করেন ১৯১১ সালে। তিনি শান্তিনিকেতনেই দশ বৎসর বয়স থেকে প্রায় দু বৎসর কাল পড়াশো করেন। Viswabharati News, September 1969. জগদানন্দ রায় স্মৃতি সংখ্যায় তাঁর নিজের লেখা থেকে একথা স্পষ্ট জানা যায়।

(২) স্যার আশুতোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র জাস্টিস রমাপ্রসাদ সাউথ সুবার্বান (মেন) স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন কৃতিত্বের সঙ্গে।—মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে নয়। কিন্তু আর তিনজন শ্রীশ্যামাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ ও বামাপ্রসাদ মিত্র স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন।

(৩) খ্যাতনামা আইনজীবী ও সংসদ সদস্য শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যা St. Mary's School (যা বর্তমানে Cathedral Mission School নামে পরিচিত Elgin Road, বা লাজপত সরণি) থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন।

(৪) শ্রীযতীন্দ্রমোহন মজুমদার (অধ্যক্ষ বিরাজমোহন মজুমদার মহাশয়ের পুত্র) অধ্যাপক ছিলেন না। মিত্র স্কুলের তিনি অবশ্য কৃতী ছাত্র। কিন্তু তিনি ছিলেন Port Commissioner সংস্থানের একজন উচ্চপদাসীন কর্মকর্তা। বোধহয় এখন আশুতোষ কলেজ (তিন বিভাগের) গভর্ণিং বডির সেক্রেটারী।

তারাপদ ঘোষাল
কলকাতা-২০।

সাদা চোখে

শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যসাধন করে ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থার উপর আঘাত হানবার জন্য শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী সমস্ত বামপন্থীদল তাঁদের কার্যক্রমকে যথাযথভাবে বিন্যাস করে থাকেন, শ্রেণীযুদ্ধের প্রধান দুই স্তম্ভ মজুর ও কিষাণ যদি সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত না হয় তবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এই সত্যকে যাঁরা বিপ্লবে বিশ্বাসী তাঁরা অভীষ্ঠ পথের একমাত্র পাথেয় বলে মনে করেন।

আবার অনেক রাজনৈতিক দল আছে, যারা মনে করে শ্রমিক শ্রেণী লড়াই করবে, তবে সে লড়াই হবে নিয়মতান্ত্রিক এবং দৈনন্দিন রুটি-রুজির লড়াই। অর্থাৎ অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া আদায়ের স্তরেই মাত্র সেই সংগ্রাম সীমাবদ্ধ থাকবে। সেই লড়াইকে রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত করে রাষ্ট্র কাঠামো পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যাবে না।

এই দুই মত ও পথের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলন। যদিও বা প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে শ্রেণীশক্তিকে আদর্শগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও কখনো কখনো প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির মারপ্যাঁচের জন্যে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে কখনো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সার্বিক লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ করা যায় নি। ফলে, সর্বাত্মক আঘাত হানাও সম্ভবপর হয় নি। রাজনৈতিক আদর্শের শক্ত প্রাচীর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণকালকে ভারতের বুকে বিলম্বিত করেছে মাত্র।

রাজনৈতিক আদর্শের সেই লড়াই আজ শ্রমিক সংগঠনে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। তার ফলে চারিদিকে শুধু ভাঙনের পালা চলছে। যত কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থা আছে তার মধ্যে কয়েকটি ইতিমধ্যেই খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে। আর দু-একটি তড়িত-গতিতে সেই মরণফাঁদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যে দুটি সংস্থা বর্তমানে অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে, সেগুলি কম্যুনিস্ট বাম ও ডান পরিচালিত এ আই টি ইউ সি ও কংগ্রেস পরিচালিত আই এন টি ইউ সি।

কম্যুনিস্ট পার্টি যখন অবিভক্ত ছিল তখন এ আই টি ইউ সি'র ঐক্য সম্বন্ধে সকলেই সন্দেহমুক্ত ছিল। এমন কি নেতৃত্বের জন্যেও কখনো কোনো প্রতিযোগিতার কথা শোনা যায় নি। কারণ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিয়তা নাকি কোন রকম নেতৃত্বের কোন্দল কিম্বা অন্য কোন প্রকার মত-পার্থক্যের সুযোগ সৃষ্টির সাহায্য করে না। বক্তব্যটা অনেকাংশে সত্যি, কিন্তু আজকে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে নিছক আদর্শগত লড়াইয়ে অনিবার্য পরিণতি হিসাবে পরিগণিত করলে কিছুটা ভুল করা হবে। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে বিভাজনমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তার মুখ্য কারণ—আদর্শগত পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে— দলীয় আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপূরক হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করা এবং দলীয় কর্মসূচী রূপায়ণের জন্যে সেই সংগঠিত শক্তিকে শাণিত হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করার সমস্যা। ইতিমধ্যেই কম্যুনিস্ট পরিচালিত কিষাণ সভা কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেছে। বাম কম্যুনিস্ট ও ডান কম্যুনিস্টদের দুটি পৃথক সংগঠন একই নামে চলছে, আবার নকশালপন্থীরাও তাঁদের অনুগামীদের পৃথক করে নিয়ে 'কৃষি বিপ্লব' সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তবে তাঁদের মধ্যেও সকলে সহযাত্রী নন। তত্ত্বগত পার্থক্যের জন্য নকশালবাদী কৃষকজনতাও ছিন্নভিন্ন।

যা হোক, এ আই টি ইউ সি থেকে নকশালপন্থীরা সমারোহের সঙ্গে বেরিয়ে না গেলেও অনেক দিন আগে থেকেই তাঁরা নিজেদের ছকবাঁধা পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বাম ও ডান কম্যুনিস্টরা কোন্দলের তীব্রতা সত্ত্বেও একই নৌকোয় এতদিন পাড়ি জমাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁদের একজন শ্রমিক নেতা অন্য জনকে হেনস্তা করবার জন্য যে সমস্ত রাজনৈতিক উপায় অবলম্বন প্রয়োজন, প্রায় তার প্রত্যেকটিই নির্মমভাবে ব্যবহার করছিলেন। একই শ্রমিক সংগঠনে থেকেও বাম কম্যুনিস্টরা ডান কম্যুনিস্টদের এবং ক্ষেত্রবিশেষে দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের সকল বাধা দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে অমিতবিক্রমে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এই বক্তব্যের যথার্থ প্রমাণের জন্য উদাহরণের প্রয়োজন নেই। দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় রোজই এ ধরনের অজস্র খবর প্রকাশিত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও 'ঐক্য' বজায় ছিল। কিন্তু তাঁদের আসন্ন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে অনৈক্যের সুর বেজে উঠেছে এবং যুদ্ধং দেহী ভাব নিয়ে দু'-অংশই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন।

বাম ও দক্ষিণ পন্থীদের আদর্শগত পার্থক্য খুব সূক্ষ্ম। কিন্তু কৌশলের দিক থেকে দুই দলের অনেক সময় একই প্রকার মনোভাব। ফলে দেখা যাচ্ছে, এ আই টি ইউ সি ভাঙনের মুখে। বাম কম্যুনিস্টরা সংগঠনটিকে দখলের চেষ্টা করছেন গত কয়েক বছর ধরেই, কিন্তু সফলকাম হতে পারেন নি। কারণ, সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দক্ষিণপন্থীদের হাতে ন্যস্ত থাকার ফলে বাম কম্যুনিস্টদের সমস্ত কারিকুরি ব্যর্থ হয়েছে। বিগত অধিবেশন বসেছিল কলকাতায়। সেবার দু'দল সমঝোতা করে, অর্থাৎ নেতৃত্বের সমবণ্টন করে নিয়ে, সংগঠনকে দু'ভাগ হতে দেন নি। রাজনৈতিক পরিভাষায় শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য বজায় রেখেছিলেন।

গত অধিবেশনের পর অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বাম কম্যুনিস্টরা তাঁদের প্রভাবিত ইউনিয়নের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। এবং এই শক্তিবৃদ্ধির জন্যে তাঁরা যে কৌশল অবলম্বন করেছেন তার ফলে স্বর্ণডিম্ব প্রদানকারী হাঁসের প্রাণান্ত হতে চলেছে। অর্থাৎ, যুক্তফ্রণ্ট বিযুক্ত হয়ে যেতে বসেছে। এই শক্তি সঞ্চয়নের উপর নির্ভর করে বাম কম্যুনিস্টরা এবার আশান্বিত ছিলেন যে, তাঁরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একচেটিয়া অধিকারী হতে পারবেন। কিন্তু এ আই টি ইউ সি'র সভাপতি দক্ষিণপন্থী

বাম কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীশ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গে সেই আশায় বাধ সাধলেন। কলকাতায় সম্মেলন না ডেকে তিনি গুন্টুরে সে অধিবেশনের স্থান নির্দিষ্ট করেছেন। বাম-কম্যুনিস্টরা এতে ক্ষেপে গেছেন। তাঁরা বলছেন, যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর কোন সংগঠন নেই বললেই চলে সেখানে এই অধিবেশন বসবার যৌক্তিকতা নেই, কলকাতায় সম্মেলন বসা উচিত ছিল। শ্রীডাঙ্গে ও তাঁর সহকর্মীরা খুবই ধুরন্ধর। কলকাতায় সম্মেলন বসলে তাঁরা হালে পানি পাবেন না একথা অনেক দিন থেকেই উপলব্ধি করে আসছিলেন। কেন কোলকাতায় সম্মেলন ডাকা হয় নি তার কারণ ব্যাখ্যা করে শ্রীডাঙ্গে বলেছেন, অন্ধ্রের গুন্টুর হচ্ছে একদিক থেকে নিরপেক্ষ এলাকা। অর্থাৎ সেখানে দু-দলেরই তেমন প্রভাব নেই। কিন্তু কলকাতায় যেহেতু মার্কসিস্ট কম্যুনিস্টরা খুবই শক্তিশালী সেহেতু নির্বিঘ্নে সম্মেলনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার আশা খুবই কম। বরঞ্চ, হানাহানি হওয়ার আশঙ্কাই সমধিক। অর্থাৎ কৌশলে শ্রীডাঙ্গে গুন্টুরে অধিবেশন ডেকে খানিকটা ঠেকিয়ে রাখলেন। আবার যে সমস্ত ইউনিয়নের চাঁদা বাকী, অর্থাৎ সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সংগঠনের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হয় নি, সে সমস্ত ইউনিয়নকে প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত করার জন্য কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়েছে। অফিস হাতে থাকলে সব কিছুই করা যায়। অতএব, সংগঠনের সাংবিধানিক দায়িত্ব যে সমস্ত ইউনিয়ন পালন করতে পারে নি তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে দেওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। শ্রীডাঙ্গের প্রভাবিত সংস্থাগুলি তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেছে বলে প্রতিনিধির সংখ্যাও অটুট থাকবে। আর অন্য দিকে বাম কম্যুনিস্টদের সংস্থাগুলির মধ্যে অনেকেই কর্তব্য পালনে অক্ষম হওয়ার ফলে প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত থাকবে। অতএব, প্রতিনিধি সংখ্যার জোরে যখন অফিস দখল করবার প্রশ্ন আসবে তখন স্বাভাবিকভাবেই শ্রীডাঙ্গের দল জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকবে। তদুপরি গুন্টুরে বাম কম্যুনিস্টদের প্রভাবও বেশী নেই। কাজেই বেশি সংখ্যায় সমর্থনকারী আমদানী করে ক্ষমতা দেখাবার সুযোগও সীমিত।

অতএব এ আই টি ইউ সি'র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দখল করবার যে অভিপ্রায় বাম কম্যুনিস্টদের ছিল তা ইতিমধ্যেই প্রায় ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। গুন্টুর সম্মেলনে যোগ দিলেও শেষ পর্যন্ত মার্কসিস্ট কম্যুনিস্টরা এ আই টি ইউ সি'তে থাকবেন না বলেই মনে হয়। গুন্টুরে একটি 'শো' দিয়েই তাঁরা সরে পড়বেন।

বাম কম্যুনিস্ট নেতা কঠোরপন্থী শ্রীবি টি রণদিভে ইতিমধ্যেই সেই মঞ্চ তৈরীর কাজে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন। শ্রীরণদিভে দলের পক্ষ থেকে শ্রমিক সংস্থাগুলিকে শাণিত হাতিয়ারে রূপান্তরিত করার জন্য নিযুক্ত আছেন। তিনি ইতিমধ্যেই বলেছেন, জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন ছাড়া দলের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করা অসম্ভব। বর্তমানে এ আই টি ইউ সি'র নেতৃত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের রাজনৈতিক দর্শন সংশোধনবাদের দূষিত আবহাওয়ায় বিষাক্ত; তাই শ্রমিক আন্দোলন অর্থনীতিক লড়াইয়ের স্তর থেকে উন্নীত হয়ে শ্রেণী সংগ্রামের বাস্তব রাজনৈতিক রূপ নিতে পারছে না। কাজেই দলের জঙ্গী কর্মসূচী প্রতি পদক্ষেপেই বাধা পাচ্ছে। এবং শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মকান্ড স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে। দলও জঙ্গী নেতৃত্ব হারিয়ে ক্রমেই বিচ্যুতির শিকার হয়ে পড়ছে। কিন্তু শ্রীরণদিভের বক্তব্য, খবরে প্রকাশ, এতদিন দলের অনুমোদন লাভ করে নি। গোঁসা করে শ্রীরণদিভে নাকি পলিট-ব্যুরোর সদস্যপদেও ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন। এবার যখন কলকাতায় পলিট ব্যুরোর সভা বসেছিল তখন কলা-কৌশল নিয়ে বৈঠকে মোটামুটি একটি কৌশলও স্থির হয়েছে। শ্রীডাঙ্গে ও তাঁর অনুগামিরা বাম কম্যুনিস্টদের যে কায়দা করেই তফাতে রাখছিলেন, গুন্টুরে অধিবেশন ডাকার পর মার্কসিস্টরা সে সম্পর্কে এখন সম্পূর্ণ একমত এবং আর কালক্ষেপণ না করে একটি নিশ্চিত পদক্ষেপ চালনা করা যে উচিত সে সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে আর দ্বিমত নেই। এবং সে পদক্ষেপ কিভাবে শুরু করতে হবে সে সম্পর্কেও নাকি ব্লু-প্রিন্ট রচিত হয়েছে। ওয়াকেবহাল মহলের মতে গুন্টুর অধিবেশনের পরই ঐ অঘটন ঘটবে। অর্থাৎ ভারতের আর একটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থা পুরোপুরিভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে।

অন্যাদিকে, কংগ্রেস অধ্যুষিত ইনটাক-এরও নাভিশ্বাস উঠেছে। এই সংস্থার নেতারা যতই রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে উল্লেখ করুন না কেন, সংগঠনের উপর দলের প্রভাব পড়তে বাধ্য। কারণ নেতারাই কেউ ইন্দিরাপন্থী বা কেউ গাম্পাজীপন্থী হিসাবে নিজেদের ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করে ফেলেছেন। ইনটাকের সভাপতি শ্রীগুলজারিলাল নন্দ স্বয়ং ইন্দিরা-কংগ্রেসের একজন প্রথম সারির সেনানী। অতএব, সংগঠনের উপর এর প্রভাব না পড়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

ইনটাকের জন্ম হয়েছিল এক যুগসন্ধিক্ষণে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় জন্মলগ্নেই এই সংস্থা ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন পরিকল্পনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। বামপন্থীদের শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্রতর হলে উৎপাদন ব্যাহত হতে

বাধ্য, ফলে, কংগ্রেস সরকার তাঁদের অভিষ্ট পথে জনকল্যাণে এগিয়ে যেতে পারবেন না। তাই এই আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে ইনটাক নতুন বাণী নিয়ে শ্রমিক সংগঠনে অবতীর্ণ হয়েছিল। কাজেই এই সংস্থা শ্রমিকের অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়ার অনুকূলে আন্দোলন করলেও হরতাল বা ধর্মঘটের পথে পা বাড়াতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিল না। কিন্তু অন্য সংস্থার চাপে পড়ে কখনো কখনো ধর্মঘট যে তারা করে নি, এমন নয়। তবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে সমস্ত আঘাত বামপন্থীরা হানবার চেষ্টা করেছিলেন তাকে ব্যর্থ করে দিতে ইনটাকের ভূমিকা খুব অসামান্য নয়। সর্বাত্মক রেল ধর্মঘটের বিপর্যয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সেই ইনটাকের মধ্যে এখন অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠবে। কারণ, সরকারী দলই যখন দুভাগ হয়ে গেল সেই দু-অংশের সমর্থনকারী ইনটাক গোষ্ঠীভুক্ত শ্রমিক শ্রেণীর নেতাদের ভূমিকা কখন এক হওয়া সহজ নয়।

রাষ্ট্র যাঁরা পরিচালনা করেন তাঁদের হাতে থাকে পুলিশ, মিলিটারী এবং অন্যান্য হাতিয়ার, যার বলে বিরোধী পক্ষের আক্রমণকে তাঁরা ব্যর্থ করে দিতে পারেন। যে সমস্ত দল একেবারে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বাসী তাঁদের সম্বন্ধে ভাবনার কোন কারণই থাকে না। কিন্তু যাঁরা যেকোন উপায়ে রাষ্ট্রকাঠামো পরিবর্তনে অভিলাষী বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁরাই সরকারের চিন্তার কারণ হয়ে থাকে। এই সমস্ত দল শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী মানুষকে সংগঠিত করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর আক্রমণ চালান। এই শ্রেণীশক্তির যথার্থ প্রয়োগ রাষ্ট্র কাঠামোকে বানচাল করতে সমর্থ। উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার ফলশ্রুতিই হল সমস্যার সৃষ্টি। আর সমাজ জীবনে সমস্যা যত বাড়বে মানুষের স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবাদ প্রতিরোধের সংকল্প তত বৃদ্ধি পাবে। এবং এই কারণেই কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা শ্রমিক ও কিষাণদের সংগঠিত করবার জন্য এত আগ্রহী।

অনেকদিন আগেই সোস্যালিস্টদের শ্রমিক সংস্থা হিন্দ মজদুর সভা ভেঙেছে। হিন্দ মজদুর সভার একাংশ রাজনৈতিক কারণে এখনো এই সংগঠনের প্রতি অনুগত থাকলেও একই দলভুক্ত সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির আর এক অংশ হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েৎ সংগঠিত করে আছেন। ইউ টি ইউ সি প্রথমে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা হয়ে গড়ে উঠলেও বর্তমানে দুখণ্ডে বিভক্ত হয়ে দুটি দল আর এস পি ও এস ইউ সি'র দ্বারা লালিত-পালিত হচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ইনটাক, এ আই টি ইউ সি, হিন্দ মজদুর সভা, ইউ টি ইউ সি প্রত্যেকটি সংস্থাই হয়ত বা বিভক্ত হয়ে পড়েছে নতুবা ভাঙনের মুখে। এবং রাজনৈতিক কারণেই এই বিপর্যয় ঘটেছে, ও ঘটবে। কোন দলই শ্রেণীশক্তিকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে না। কারণ, দেশের সমৃদ্ধির বা অবনতির—দুইয়েরই চাবিকাঠি এদেরই হাতে। আয়ত্তের মধ্যে না রাখতে পারলে উপযুক্ত সময়ে এই শক্তির যথার্থ ব্যবহার সম্ভব নয়। আর তার ফলে রাষ্ট্রশক্তি ও বিরোধী শক্তি দুইয়েরই বিপর্যয় ঘটতে বাধ্য।

কাজেই রাজনৈতিক মতাদর্শে প্রকৃত প্রতিফলন এক-একটি শ্রেণীসংস্থার উপর পড়বেই। এবং সেই কারণেই শ্রমিক সংস্থাগুলি বিভক্ত হচ্ছে, এবং হবে। ঐক্যের কথা যত জোরেই বলা হোক না কেন, তা সত্যগোপন করার প্রয়াস মাত্র। বাম কম্যুনিস্টরা তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শকে রূপায়িত করবার জন্য নিজস্ব কায়দা ও পদ্ধতি অনুযায়ী শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলবেন এতে আশ্চর্য কি? বরং গত কয়েক বছর কিভাবে এঁরা শোধনবাদীদের সঙ্গে একত্রে চললেন, তাই আশ্চর্যের বিষয়।

—সমদর্শী

সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফফর খান পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে দমদম বিমান-ঘাটিতে অবতরণ করার পরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁকে সম্বর্ধনা জানান। ৩০ বছর পরে তাঁদের মধ্যে আবার এই দেখা, আনন্দ আর আবেগে উভয়ে উভয়কে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

সবুজ বিপ্লবের রং বদল?

যে সবুজ বিপ্লব আমাদের দেশে খাদ্য ফসলে স্বয়ংসম্পূর্ণতার আশা এনে দিয়েছে সেই বিপ্লবের কি রং বদল হতে চলেছে। সবুজ বিপ্লব কি লাল বিপ্লবে পরিণত হতে চলেছে?

আর কেউ নয়, খোদ ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীযশোবন্ত রাও চাবন অন্তত এইরকমই একটা সম্ভাবনা দেখছেন। তিনি বলেছেন যে, দেশে যে সবুজ বিপ্লব চলেছে সেটা যদি সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে এই বিপ্লব "সবুজ" নাও থাকতে পারে।

কথাটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন নয়াদিল্লীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে। ঐ সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল ভূমি সংস্কার সম্পর্কে আলোচনার জন্য। যদিও নিয়ম অনুযায়ী এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন ভারত সরকারের কৃষি ও খাদ্য দপ্তর তাহলেও একথা গোপন নয় যে, এই সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল প্রধানত ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগেরই উদ্যোগে। কেননা, স্পষ্টতই, ভারত সরকার ভূমি সংস্কারের প্রশ্নটিকে একটি জরুরী আইন ও শৃংখলার প্রশ্নরূপে গণ্য করছেন।

শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতার মধ্য দিয়েই নয়, এই সম্মেলনে মুখবন্ধরূপে তাঁর দপ্তর যে দীর্ঘ নোট প্রস্তুত করেছিলেন তার মধ্য দিয়েও এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আগ্রহ ভালভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ঐ নোটে দেখান হয়েছে যে, সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষি উৎপাদন অনেক বেড়েছে এবং জমি অনেক বেশী দামী হয়ে গেছে: এমনকি ক্ষুদ্র আকারে চাষও লাভজনক হয়েছে অথবা অন্ততপক্ষে পরিবার পোষণের উপযুক্ত হয়েছে। কৃষিপণ্যের চড়া দাম ও উৎপাদন বৃদ্ধির মিলিত ফলস্বরূপ গ্রামাঞ্চলে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা বেড়েছে এবং চাষের ক্ষেত্রে কাজের দরুণ মজুরীর হার বাড়াবার দাবী অনেক বেশী উচ্চগ্রামে উঠেছে। আরও বলা হয়েছে যে, গ্রামাঞ্চলে বৈষম্য বৃদ্ধির একটি বড় কারণ হল এই যে, কৃষি শ্রমিকরাও অপেক্ষাকৃত স্বল্পবিত্ত ও অরক্ষিত চাষীরা ঋণ যোগাড় করতে ও চাষের অর্থ লগ্নী করতে পারছে না। জমির উপর যাদের পাকা স্বত্ব রয়েছে তারা এবং সঙ্গতিসম্পন্ন চাষীরা স্বচ্ছলতা লাভ করেছে এবং তারা অনেকাংশেই ট্যাক্সের আওতার বাইরে রয়ে গেছে। অন্যদিকে, নীচুতলার চাষী ও অধস্তন প্রজাদের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার অসম বণ্টন হয়েছে।

তাছাড়া, অধিকতর উৎপাদনের ন্যায্য অংশ না পেয়ে কৃষি শ্রমিকরা দরিদ্র অবস্থায়ই থেকে গেছে।

সবুজ বিপ্লব সম্পর্কে এই ধরনের আশঙ্কা যে শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্র দপ্তরই প্রকাশ করেছেন তা নয়। সম্প্রতি অন্যান্য মহল থেকে অনুরূপ অন্যান্য যেসব আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উলফ্ লাডেজিনস্কির বক্তব্য। লাডেজিনস্কি হচ্ছেন বিশ্ব ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন বিশেষজ্ঞ। বিহারের পূর্ণিয়া ও সহরশা জেলায় বিশেষভাবে সমীক্ষা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যে, ভারতবর্ষ যদি তার কৃষি নীতির পরিবর্তন করে সবুজ বিপ্লবের পরিধি প্রসারিত না করে তাহলে ফসল বৃদ্ধি ও বাড়তি ফসলের দরুন আয় বৃদ্ধি অল্পসংখ্যক চাষীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। লাডেজিনস্কি তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, কি জমির পরিমাণের দিক থেকে, কি যোগদানকারী চাষীদের সংখ্যার দিক থেকে, সবুজ বিপ্লবের পরিধি খুবই সংকীর্ণ এবং সেচ পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ হয়ে গেলেও ও নলকূপের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেলেও এই পরিধি সংকীর্ণ থেকে যাওয়ারই সম্ভাবনা। লাডেজিনস্কি লিখেছেন, "বেশ কিছুসংখ্যক চাষীর জলের সমস্যা থেকেই যাবে। বেশ কিছু চাষীর এমন সম্বল থাকবে না যাতে তারা এই নূতন প্রযুক্তিবিদ্যার সুযোগ নিতে পারে। চাষীদের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যেসব কারণে এই নূতন কৃষিপদ্ধতির প্রয়োগে যোগ দিতে পারবে না সেগুলি হল :— কর্জ দেওয়ার বর্তমান ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং বড় বড় মালিকদের ভাগেই কর্জের মোটা টাকা চলে যাওয়ার ঝোঁক, চড়া সুদে মহাজনদের টাকা ধার দেওয়ার রীতি এবং চাষীদের স্বত্বের অনিশ্চয়তা। যখন মানুষ বোঝে যে, তার সামনে অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে অথচ ঐ অগ্রগতিতে তার ভাগ নেই তখন গুরুতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়। এই ধরনের কতকগুলি সমস্যা সহজেই নজরে পড়ে। বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে উৎপাদন ও আয়ের বৈষম্য।"

সবুজ বিপ্লব যে ধরনের সমস্যা নিয়ে আসতে পারে তার দৃষ্টান্ত হল গত বছর ডিসেম্বর মাসে তাঞ্জোর জেলায় ৪৫ জন হরিজন খেতমজুরকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা। সবুজ বিপ্লব যখন ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে দিচ্ছে তখন ঐ বাড়তি উৎপাদনের ভাগ কৃষি শ্রমিকরা পাবে না কেন, মূলত এই প্রশ্ন থেকেই তাঞ্জোরের ঐ ঘটনার উদ্ভব হয়েছিল। অন্ধ্রের এজেন্সী এলাকায় গিরিজান আন্দোলন, বিহারের ছোটনাগপুর এলাকায় ও উড়িষ্যা কোরাপুট জেলায় কৃষকদের আন্দোলনও একই ব্যাধির অন্যান্য লক্ষণ।

যদিও ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ভূমি সংস্কারের আইন দীর্ঘদিন যাবৎ চালু আছে তাহলেও এই নূতন পরিপ্রেক্ষিতে নূতনভাবে ভূমি সংস্কারের প্রশ্নটি আলোচনা করা হয়েছে নয়াদিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে। সমস্যাটা যে প্রধানত ভূমি সংস্কার আইন কার্যকর করার সেকথা মোটামুটি সকলেই স্বীকার করেন। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে ভূমি সংস্কার আইন চালু হয়ে যাওয়ার পর এখনও শতকরা ৮২ জন চাষীর জমির উপর পাকাপাকি স্বত্ব নেই। প্রধানত অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, তামিলনাড়ু, বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিমবঙ্গেই চাষীদের ভূমিস্বত্ব এইরকম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। জমির উপর এইসব প্রজার অধিকার জমির মালিকের খেয়ালখুশীর উপর নির্ভরশীল। নিজে চাষ করার অজুহাত দিয়ে জমির মালিক অনেক ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দে চাষীর অধিকার কেড়ে নিতে পারেন। ভাগচাষীদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আইন অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর করা যায়নি। চাষী স্বেচ্ছায় জমি ফিরিয়ে দিয়েছে, এই অজুহাতে চাষীকে উচ্ছেদ করাও বন্ধ করা কঠিন হচ্ছে। যদিও ১৯৬১ সালের মধ্যে সমস্ত রাজ্যে জোতের সর্বোচ্চ সীমা স্থির করে আইন করা হয়েছে তাহলেও এই আইন ব্যাপকভাবে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে এবং সব রাজ্যে সমানভাবে এই আইন চালুও করা হয়নি। কেরল, মহীশূর ও উড়িষ্যায় জোতের সর্বোচ্চ সীমাসংক্রান্ত আইন এখনও প্রয়োগ করা হয়নি। অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার ও রাজস্থানে যদিও এই আইন চালু হয়েছে তাহলেও এই আইন অনুসারে কোন জমি মালিকের কাছ থেকে নিয়ে বণ্টন করে দেওয়া হয় নি। অন্যান্য রাজ্যে যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন করা হয়েছে সেগুলি হল :—কাশ্মীর—১,৮০,০০০ হেক্টেয়ার, পশ্চিমবঙ্গ—৭২,৮০০ হেক্টেয়ার, উত্তরপ্রদেশ—৪৮,৪০০ হেক্টেয়ার, মহারাষ্ট্র—৪৬,৪০০ হেক্টেয়ার, তামিলনাড়ু—৭,০০০ হেক্টেয়ার, গুজরাট—৫,৬০০ হেক্টেয়ার, মধ্যপ্রদেশ—৫,০০০ হেক্টেয়ার ও আসাম—২,০০০ হেক্টেয়ার। জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে যেটুকু জমি বণ্টন করা হয়েছে তাতে অসম বণ্টনের যে বিশেষ কোন তারতম্য হয় নি সেটা ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভেতে প্রকাশ পেয়েছে। খেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরী সম্পর্কে আইন চালু করার ব্যাপারে পরিস্থিতি ততোধিক শোচনীয়। ন্যাশনাল লেবার কমিশনের একটি অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে যে, ৮।১০ বছর ধরে ন্যূনতম বেতন আইন সংশোধন না করার ফলে এই আইন কাগজেপত্রে মাত্র পর্যবসিত হয়ে আছে। গ্রামের খেতমজুর প্রায়শ এই আইন সম্পর্কে অবহিতই নয়। কৃষির ক্ষেত্রে ন্যূনতম বেতন আইন চালু করার কার্যকরী ব্যবস্থা বলতে গেলে কোন কিছুই নেই।

এইসব ও অন্যান্য প্রশ্ন আলোচনা করে নয়াদিল্লীতে দুদিনব্যাপী মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে যেসব সিদ্ধান্ত স্থির করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে আছে :—এক বছরের মধ্যে সবরকমের মধ্যস্বত্ব লোপ করা হবে এবং জমির মালিকরা যাতে চাষীর হাত থেকে জমি চাষের অধিকার ফিরিয়ে নিতে না পারেন সেজন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।

সম্মেলনের এইসব সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে অবশ্য ভূমি সংস্কারের উপর যে নূতন করে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তার যথোপযুক্ত প্রতিফলন হয় নি; কিন্তু এই আলোচনা থেকে একটি বিতর্ক নূতন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সেটা হচ্ছে, ভূমি সংস্কারের কার্যসূচী রূপায়ণে কেন্দ্র ও রাজ্যের দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন যে, ভূমি সংস্কার রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়। অপরপক্ষে পশ্চিমবঙ্গসহ কয়েকটি রাজ্যের সরকার বলছেন, ভূমি সংস্কারের সবচেয়ে বড় বাধা বর্তমান সংবিধান।

মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু ও কেরলের অকংগ্রেসী সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগ দিয়ে রাজস্থানের কংগ্রেসী সরকারের প্রতিনিধিও সংবিধান সংশোধনের দাবী তুলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার কিছুদিন যাবৎ বলে আসছেন যে, সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুযায়ী জমির মালিকদের আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার রাস্তা বন্ধ করতে না পারলে ভূমি সম্পর্কের পরিবর্তন আনা অসম্ভব। কিছুদিন আগে বিধানসভায় এক বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে, আদালতের নির্দেশের ফলে সারা পশ্চিমবঙ্গে যেসব জমিতে জমিদারী দখল আইন অথবা ভূমি সংস্কার আইনের বিধানগুলি কার্যকর করা যায় নি সেসব জমির মোট পরিমাণ দেড় লক্ষ থেকে দুই লক্ষ একর হবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় দিল্লীর বৈঠকে শ্রীকোঙারের বক্তব্য সমর্থন করেই বক্তৃতা দিয়েছেন।

অপরপক্ষে, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম ও রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এ পি সিন্ধে বলেছেন যে, বর্তমান সংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই যথেষ্ট কিছু করণীয় আছে। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, ভূমি সংস্কার আইনের বিভিন্ন বিধান আইনসিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে তিনবার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে এবং ভূমি সংস্কারের সঙ্গে সম্পর্কিত কতকগুলি আইনকে সংবিধানের নবম তপশীলের মধ্যে স্থান দিয়ে এইসব আইন সম্পর্কে আদালতের প্রতিকূল নির্দেশ অকেজো করে দেওয়া হয়েছে। (১২-১২-৬৯)

বাংলাদেশে বাদশা খান

ভারত পরিক্রমার পথে বাংলা দেশে এসেছেন বাদশা খান। সত্য, পবিত্রতা নির্ভীকতার প্রতীক খান আবদুল গফফর খানকে বাংলার মানুষ জানিয়েছে আন্তরিক স্বাগত অভিনন্দন। কলকাতা কংগ্রেসেই বাদশা খান প্রথম গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচিত হন। এই শহরে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে এসেছেন বহুবার। কিন্তু এবারের আগমন অন্য কারণে, অন্য পরিবেশে। বাদশা খান আর ভারতের অধিবাসী ন'ন। দেশ বিভাগের পাপে আমরা বাদশা খানকে পরবাসী করে দিয়েছি। তিনি এবং তাঁর অনুগত সত্যসন্ধানী সংগ্রামী পাখতুন জাতি নিক্ষিপ্ত হয়েছেন 'নেকড়ের মুখে'। তাই তেইশ বছর আমরা তাঁকে দেখেনি, দেখবার সুযোগ পাই নি। পাকিস্তান সরকার এই মানুষটিকে নিক্ষেপ করে রেখেছিল দীর্ঘকাল তাদের কারাগারে। কিন্তু বাদশা খাঁর তেজ, নির্ভীকতা এবং সংগ্রামী দৃঢ়তার এতটুকু ব্যত্যয় হয় নি। বাদশা খানের এই আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ভারতবাসীকে গান্ধীজীর বাণী স্মরণ করিয়ে দেওয়া। বহুকষ্টে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। বহু মানুষের আত্মদানের বিনিময়ে যে-স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তার গৌরব আজ অবলুপ্ত। বাদশা খান সেই কথাই আমাদের বার-বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। খান আবদুল গফফর খান যে-স্বাধীনতা চেয়েছিলেন এই উপমহাদেশের জন্য, দেশভাগের ফলে সেই স্বপ্ন তাঁর সফল হয় নি। সেই বেদনা বাদশা খানের চোখেমুখে, তাঁর দেহের প্রতি রেখায় আজ অঙ্কিত। তবু তিনি উদার হৃদয়ে ভারতবাসীকে বুকে টেনে নিয়েছেন। কারণ, আমাদের সকলের জন্যই তিনি সংগ্রাম করেছেন, নির্যাতন ভোগ করেছেন।

আমরা যদি এই স্বাধীনতাকে দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির সহায়করূপে গৌরবান্বিত করে তুলতে পারতাম তাহলে কোনো দুঃখ ছিল না। দুঃখ এই যে, পরাধীন ভারতের সংগ্রামী জনতা যে মর্যাদা অর্জন করেছিল গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতার পর তাও যেন আমরা হারিয়েছি। আমরা মুখে অহিংসার কথা বলি, মানুষে মানুষে সম্প্রীতির কথা বলি কিন্তু কার্যত সমাজদেহ আজ হিংসা ও বিদ্বেষে জর্জরিত। বাদশা খান গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করে বলেছেন যে, ঘৃণার দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না, এই সত্য আমরা ভুলে গিছি। ইয়োরোপে দুই-একটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হল, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নি। এখন তারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে পৃথিবীকে। এ থেকেও তো আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। স্বাধীনতার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশের অগণিত জনসাধারণের আত্মিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার বিকাশ। প্রতিটি মানুষের চোখের অশ্রু দূর করার ব্রত নিয়েছিলেন গান্ধীজী। জাতিভেদ, ধর্মভেদ, প্রাদেশিকতার বিদ্বেষ দূর করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গৃহীত হয়েছিল স্বাধীনতাসংগ্রামীর সংকল্পবাক্য। বাদশা খান তাই দুঃখ করে বলেছেন, গান্ধীজীর নিজের রাজ্য গুজরাটে গিয়ে দেখলেন কত পরিবর্তন হয়ে গেছে সেদিনের সত্যাগ্রহী গুজরাটের। গান্ধীজীকে তারা ভুলে গেছে। মুখে অহিংসা কিংবা গান্ধীজীর নামোচ্চারণ করলেই সব দোষ স্খালন হয়ে যায় না। তাঁর অনুগামীরাই দেশ শাসন করেছেন এতকাল। তাঁরা দেশকে সত্য, প্রেম ও অহিংসার পথে নিতে পারেন নি, এজন্য বাদশা খাঁর বেদনার অন্ত নেই। ধর্মের নামে চরম হানাহানি দেশের যে ক্ষতি করছে তার কোনো পরিসীমা নেই। দারিদ্র্য ক্রমবর্ধমান। স্বাধীনতার ফল ভোগ করে মুষ্টিমেয় মানুষ বিত্তশালী হয়েছেন, প্রভাবশালী হয়েছেন।

বাদশা খাঁর মুখ থেকে এই কথা শোনার প্রয়োজন ছিল আমাদের। তিনি পবিত্রপ্রাণ, সত্যসন্ধ। কারু প্রতি তাঁর কোনো বিদ্বেষ নেই। ভারতবর্ষকে ভালবাসেন বলেই তিনি এই তিরস্কার আমাদের করতে পারেন। আমরা জানি দেশভাগের পর তাঁর দেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কী অপরিসীম নির্যাতন ভোগ করেছে। যে-পাখতুন জাতি বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সবচেয়ে বেশী নির্যাতন ভোগ করেছে তারা এই স্বাধীনতার কোনো আস্বাদ পায় নি। পাকিস্তানের শাসকরা এই বীর জাতিকে দমন করার জন্য চালিয়েছে অকথ্য নির্যাতন। বাদশা খাঁর মতো মহান পুরুষকে তারা দীর্ঘ ষোল বৎসর কারাগারে ফেলে রেখেও পাঠানদের মনোবল এতটুকু ক্ষুণ্ন করতে পারে নি। এই বল সত্যের এবং অহিংসার। বাদশা খাঁই এই উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গান্ধীবাদী। বাংলা দেশও দেশবিভাগের দ্বারা প্রভূত কষ্ট সহ্য করেছে। বাংলার বীর সন্তানেরা বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পাখতুনদের মতোই জীবন তুচ্ছ করেছিলেন। বাদশা খাঁর দিকে তাকালে আমরা আমাদের সেই বীর সন্তানদেরই যেন প্রত্যক্ষ করি যাঁরা একদিন ফাঁসির মঞ্চে গেয়েছিলেন জীবনের জয়গান। তাঁদের পথ হয়তো ছিল ভিন্ন। কিন্তু তাঁরাও সত্যনিষ্ঠায় ছিলেন অকম্পিত দীপশিখার মতো উজ্জ্বল। আজ সেই বাংলা দেশে বাদশা খান এসেছেন। তিনি দেখে গেছেন আমাদের দুঃখ ও বেদনা। আমরা তাই প্রার্থনা করি বাদশা খাঁর এই শুভাগমন বাংলা দেশকে নতুন কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করুক। যে সুখী, সমৃদ্ধ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন দেখি আমরা তা সফল হয়ে উঠুক এই সত্যাগ্রহীর শুভ আশীর্বাদে।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমস্যা

এমন কোনো কালই ইতিহাসে নেই—যখন সমস্যা ছিল না এবং সমকালীন শিল্পে-সাহিত্যে (যে রূপেই তা থাকুক) তা অল্প-বিস্তর নির্দেশিত হয়নি। অ্যারিস্টোফানেসের নাটকেও প্রচুর রাজনীতি এসেছে—বিচার-ব্যবস্থা আর শিক্ষানীতির সমালোচনা রয়েছে, তাঁর আক্রমণ থেকে সোক্রাতেসও নিস্তার পান নি। জীবন আছে, তার সমস্যারাও থাকবে—শিল্পী-সাহিত্যিক তাকে চিরকাল রূপও দেবেন। কখনো-কখনো ওভিদ কিংবা ভিক্তর য়্যুগোর মতো তাঁকে নির্বাসনে যেতে হবে, কখনো বা আঁদ্রে শেনিয়ের মতো প্রাণ দিতে হবে, কখনো ফিল্‌ডিংয়ের 'লিটল থিয়েটার' বন্ধ হয়ে যাবে, কখনো মাক্‌সিম গোর্কীর মতো জেল খাটতে হবে; কখনো সাহিত্যিকের রচনা নিগ্রো ক্রীতদাসত্বের মূল উচ্ছিন্ন করবে, কখনো বাস্তিলের কারাগার চুরমার করবে। সমকালীন চিন্তার সব বিচ্ছিন্ন ধারা-উপধারাগুলো লেখকের মনে এসে সমন্বিত হয়—তিনি তার ব্যাখ্যাতা হন—লেখক-শিল্পীর মধ্য দিয়েই যুগমনন প্রতিফলিত হয়। কোনো লেখক কোনো যুগের থিসিস হতে পারেন, দ্বিতীয়জন হতে পারেন অ্যান্টিথিসিস এবং তৃতীয়জনের সিনথিসিস হতেও বাধা নেই।

কোনো দেশকে জানবার শ্রেষ্ঠ উপায়ই হল তার সাহিত্য—এই সদুক্তিটি সুপ্রাচীন হলেও আজ পর্যন্ত সত্য হয়ে আছে। দেশ-কাল-মানুষের সত্যিকারের ইতিহাস সাহিত্যই লেখে—ইতিহাস লেখে না, রাজনীতি লেখে না, সমাজতত্ত্ব লেখে না, বিজ্ঞানও লেখে না। এরা সবাই আংশিক—ভিক্তর য়্যুগো, স্তাঁদাল আর বোদলেয়ারকে মিলিয়ে তখনকার ফ্রান্‌সকে যেভাবে চেনা যাবে—কোন্ ইতিহাসে তা সম্ভব?

আমি নিজে কোনো মহৎ দ্রষ্টা-স্রষ্টা নই, নগণ্য লেখক মাত্র। কিন্তু লিখি যখন, তখন স্বভাবতই কালটাকে দেখি, তার আবর্তের মধ্যে থেকে (কারণ, দূরত্বের নিরাসক্ত বিচ্ছিন্নতা আমার পক্ষে সম্ভব নয়) যতটা সম্ভব তাকে বুঝতে চেষ্টা করি। ইংরেজ আমলে—প্রধানভাবে বিপ্লববাদের আব-হাওয়ায় আমার লেখনী-চর্চা শুরু—পদ্য লিখে ক্ষুদিরাম-কানাইলালের আগুন ছড়িয়ে দেব চারদিকে, এই ছিল প্রেরণা।

তারপর গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেল; যুদ্ধ-মন্বন্তর পার হয়ে স্বাধীনতার ঘাটে এসেও পৌঁছোনো গেল শেষ পর্যন্ত।

দেশ-সমাজ-জাতির দিকে তাকিয়ে কী পেয়েছি আর কী পাই নি—তার হিসেব-নিকেশ অগ্রণী সাহিত্যিকেরা করেছেন, পরে আরো অনেকে করবেন। আমি তার মধ্যে যেতে চাই না। কিন্তু এটা দেখছি আজকের বাংলা দেশে সমস্যা অনেক বেশি, জটিলতা অনেক বেশি জটিল। স্বাভাবিক। বাংলা দেশ কেন, পৃথিবীটাই তো জটিল হয়ে উঠছে।

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সমস্যাকে যতখানি দেখেছিলেন, তার চাইতে অনেক বেশি দেখতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রকে; 'মহা-কালের জটার জটে' আরো বেশি বিভ্রান্ত হতে হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ইতিহাস বলে—এক-একটা মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসরের চক্রপাকে পঞ্চাশ-ষাট-একশো বৎসরের বিবর্তন ঘটে যায়, দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধে কেবল বাংলা দেশের ভূগোল বদলে যায় নি, তার আত্মিক বিপ্লবও ঘটে গেছে। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তবু কয়েকটা সরল-তির্যক রেখায় সমস্যার রূপগুলো ফোটানো যেত, কিন্তু ১৯৬৯-এর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখছি—সব মিলে সমস্যা আর মানসিকতার চেহারা অসংখ্য রেখার অসংলগ্নতায় কোনো অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট আর্টের মতো ঃ তার ব্যাখ্যাতা হওয়া হারবার্ট রীডের পক্ষেও সম্ভব নয় বোধ হয়।

দক্ষিণ কলকাতার যে উপান্তের আমি অধুনা বাসিন্দা—তারই অদূরে রয়েছে ওয়াগন-ব্রেকার, চোলাই-কারবারী ছোরা-বোমাবিশারদের দল; পথে-ঘাটে দেখছি ক্রুদ্ধ-অবিশ্বাসী-অস্থির যুবমানস; ঘরে ঘরে অনিশ্চয়তার ছায়া; প্রতিদিন গর্জিত শোভাযাত্রা; দেখছি জীবিকার লড়াই—নৈরাশ্য, রিক্ততা। আর হানাহানি খুনোখুনি তো আছেই—তা রাজনৈতিক রেষারেষিতেই হোক আর 'মস্তানী' উত্তেজনাতেই হোক।

কারণ একটিই। কোথাও আমাদের কোন কেন্দ্রবিন্দু নেই; একদা কতগুলো 'মূল্যে'র ওপর আমরা ধ্রুব-প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতুম, সেইগুলোই চূর্ণ-বিচূর্ণ। গোটা দেশই যেন 'ডায়ার্কি'র যুগের বেকার সৈনিকের দল—নেতৃত্ব নেই, তাই অস্ত্র হাতে যে-যেদিকে পারে বেরিয়ে পড়েছে।

এই নেতিমূলক অবস্থা কখনো থাকতে পারে না—থাকেও না। অর্থনৈতিক সমাধানই একমাত্র পথ। এগুলো সাময়িক বিকার মাত্র—অর্থনৈতিক বিপ্লবই তিনদিনে তিনশো বছরের আবর্জনা মুছে নিতে পারে। পুরোনো আদর্শ না-ই থাকল—থাকবার কথাও নয়—নতুন আদর্শ আবার দেশকে সুস্থ-সমন্বিত করে নিতে পারে; যারা বিক্ষিপ্ত—যারা বিকৃত, তারাই নতুন সংগঠনের দায়িত্ব নিতে পারে সেদিন।

আমি কিন্তু অবিমিশ্র অন্ধকার দেখছি না। আশ্চর্য গণ-জাগরণ ঘটছে গ্রামে-গ্রামে; মধ্যবিত্ত অনেক বেশি সজাগ-সচেতন; বিপ্লব-বাদী বীরেদের মতোই অকুণ্ঠ আত্মত্যাগে বেরিয়ে পড়েছে আমাদের ছেলেরা। বিকার-বিকৃতি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের অনেকটা দূষিত করেছে, কিন্তু গোটা বাঙালী জাতির শরীরে গ্যাংগ্রীন এনেছে, একথা আমি বিশ্বাস করি না—কখনো করব না।

দরকার নেতৃত্বের—রাজনৈতিক নেতৃত্বের। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, মার্কসীয় কমিউনিস্ট, নক্‌শালপন্থী—যিনিই হোন, লেখক হিসেবে, বাঙালী হিসেবে একটিই নিবেদন। পার্টি নিশ্চয় দরকার—কিন্তু পার্টির জন্যে দেশ নয়, দেশের জন্যেই পার্টি। থিয়োরী আর দলীয় হানাহানি একটু সরিয়ে রেখে তাঁরা দেশের 'অবজেকটিভ'—বাস্তব অবস্থার দিকে তাকান, সেইভাবে কর্মনীতি স্থির করুন, এগিয়ে চলুন—দিন বদলাতে সময় লাগবে না। বিকারটা বাইরের মাত্র, ভেতরে ভেতরে দেশ তার সব যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আপনিই প্রস্তুত হয়ে আছে—আমাদের নেতৃত্বই এখনো অপ্রস্তুত।

তাঁরা না পারেন, আর কেউ আসবেন, কারণ ইতিহাস থেমে থাকে না। আর সেদিন যদি বেঁচে থাকি (আমি প্রচণ্ড আশাবাদী), তা হলে আমি হেন সামান্য লেখকও এক-খানা 'রোড টু কালভারী' লিখবার চেষ্টা করব।

জীবন যন্ত্রণা

কল্যান সেন

মাথা নামিয়ে একটা চিঠির ড্রাফট তৈরি করছিল অজয়। দিল্লির অফিস থেকে কী একটা জরুরি খবর জানতে চেয়ে 'টেলেক্স ম্যাসেজ' পাঠিয়েছে, সকাল থেকে সেই ঝামেলাটা আর কিছুতেই কাঁধ থেকে নামাতে পারছিল না সে। ড্রাফটটা শেষ করে, অ্যাপ্রুভ করিয়ে, টাইপে পাঠিয়ে তবে দম ফেলতে পারবে অজয়। খুব ক্লান্ত লাগছে এখন। পরপর কয়েকটা কাগজ নষ্ট করল, কিন্তু কিছুতেই কায়দা করতে পারছিল না। আর এই এক অদ্ভুত ব্যাপার অফিসিয়াল ইংরেজী। প্রথম প্রথম তো তার মেজাজ খারাপ হয়ে যেতো—'উইথ রেফারেন্স টু ইয়োর ডি-ও লেটার' আর 'কাইন্ডলি রেফার টু'—এইসব মারপ্যাঁচ শিখতে শিখতেই তার বছর দুই কেটে গেল। এখন শুধু যান্ত্রিক অভ্যাসে সে পর পর কাজগুলো করে যায়, ক্রমশ সব কিছুই কেমন গা সওয়া হয়ে যাচ্ছে তার। বোধহয় এই হয়। এখন অজয় কোনো কিছু নিয়েই আর চাঞ্চল্যবোধ করে না। সে খায়, ঘুমোয়, অফিসে আসে, ট্রামে বাসে ভিড়ে কষ্ট পায়। মাঝে মাঝে অসুখে ভোগে, এ ছাড়া জীবনে আর কোনো ঘটনা নেই এখন। কতদিন কোনো গাছের নিচে যে একা বসেনি কতদিন কারো মুখ মনে করে সে কষ্ট পায়নি।

গ্লাস থেকে খানিকটা জল খেল অজয়। মাথা কী রকম ঝিমঝিম করছে। খুব দ্রুত একটা ট্রেন যেন ছুটে আসছে তার মাথার ভেতরে। মুখের ভেতর কী রকম নোনতা স্বাদ, অথচ সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে না এখন। চোখ বুজলো অজয়, খুললো, আবার বুজলো। ঘাড়ের নিচে পিঠের নানা জায়গায় কেমন জ্বালা করছে এখন। কী রকম যেন হচ্ছে আজকাল, কী রকম ভাবে যেন সে বেঁচে আছে। ছোটবেলায় স্কুলের মাঠের পাশে একটা গাড়ি বিকল হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছিল সে, রোদে, বৃষ্টিতে, ধুলোয় কী রকম দুঃখীর মত গাড়িটা ক্রমশ মাটিতে বসে যাচ্ছিল: হঠাৎ তার সেই গাড়ির দৃশ্যটা এখন মনে পড়ল।

আজকাল তার ভাল ঘুম হয় না। মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখে সে। মাঠের পথ ধরে কুয়াশার মধ্যে আলো দোলাতে দোলাতে কারা যেন তাকে খাটে করে নিয়ে যাচ্ছে। অথবা এক বিরাট পুরনো প্রাসাদ, প্রতিধ্বনির মত যেন কে তার নাম ধরে ডাকছে। অথচ অন্ধকারে সে পথ খুঁজে পাচ্ছে না, নদীতে ডুবে যাচ্ছে সে আর কৃষ্ণা।... তখন ভয়ে তার শরীর ভিজে যায়, জানলার দিকে তাকাতে পারে না, মনে হয়, কাদের অলৌকিক পা চারপাশে হেঁটে যাচ্ছে। পর পর হেঁটে যাচ্ছে। অফিসের তারকবাবু হোমিওপ্যাথি ওষুধটষুধ দিয়েছেন তাকে, কিন্তু তেমন কাজ হয় না। দু' একজন বলে আসনটাসন কর, বুঝলে না, সবই হলো আসলে নার্ভের গণ্ডগোল। অজয় কোনো রকমে হ্যাঁ, তা ঠিকই বলেছেন, এরকমভাবে দায় সারে। তার ঠোঁট শুকিয়ে যায়। আবার দু' চারজন আরও বেশি উৎসাহ দেখায়: আরে অসুখফসুক ওসব কিস্সু নয়, আসলে যা দরকার: বাতলে দিচ্ছি, মানে, বরসকালে এ রকম পোড়ামাটি হয়ে থাকলে...।

—চা খাবেন? বলে অজয় প্রসঙ্গ পালটাবার চেষ্টা করে।

জানলা দিয়ে সামান্য হাওয়া আসছে, টেবিলের কোণায় তীক্ষ্ণ রোদ। নতুন বাড়িতে অফিস উঠে এসেছে তাদের, বাড়ির কাজ শেষ হয়নি, সব সময় নানারকম শব্দ শোনা যায়, ক্রেনে খুব সাবধানে মাল ওঠানো হয়। অজয়ের মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে হয়, অনেক উঁচুতে যেখানে চারদিকে বিশুদ্ধ আকাশ, গঙ্গা দেখা যায়, সেইখানে উঠে গিয়ে সে তার শৈশব ফিরে পাবার প্রার্থনা করে, অথবা ট্রাপিজের খেলা দেখায়।

সমস্ত টেবিলে সরের মতো ধুলো ভাসছে। ফাইলগুলো নোংরা। ভেতর থেকে ময়লা বিবর্ণ পাতাগুলো বেরিয়ে আছে, কেমন একটা চাপা ভ্যাপসা গন্ধ, একবার ধরলে জামাকাপড়ের বারোটা বেজে যায়। তবু এইসব জিনিস নিয়ে তাকে কাজ করতে হয়। আর কী সব অদ্ভুত নাম্বার এই ফাইলগুলোর; যার কোনো মানে সে কখনো বুঝতে পারে না। এখন শুধু সে এইটুকু বুঝেছে যে, অনুকরণ করে বেঁচে থাকা ছাড়া কিছুই সে করতে পারে না। আর এইভাবেই একদিন গলায় মালা আর হাতে 'সচিত্র রামায়ণ' অথবা 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' নিয়ে তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। অবশ্য যদি সে দীর্ঘ পরমায়ু পায়। আর এই বাঁচার কথা মনে হতেই তার দেয়ালের ঘড়ির ওপর চোখ পড়ল। যে কোনো সময় যন্ত্রটা বিকল হতে পারে, ভেঙে যেতে পারে, তবু ওই ঘড়িটা দেখেই তাদের যেতে আসতে হয়। নিয়ম। আর নিয়ম মানেই তোমার আগের লোক যা করেছে, আর তোমার পরের লোককেও যা না করে উপায় নেই। কে জানে, এখন সে যে টেবিলে বসে কাজ করছে, কাল সে অফিসে আসতে পারবে কী না। যে কোনো রকম দুর্ঘটনাও তো ঘটতে পারে।

তাহলে কী হবে? অজয় কী রকম দুর্বল বোধ করল। কিছুই হবে না সে জানে। অফিসে একটা নতুন ভেকান্সি হবে, তার সীটে নতুন বা পুরনো কেউ কাজ করবে। সেই ড্রাফট, নোটস চিঠির ডিস্‌-পোজাল, পুরনো রেফারেন্স ঘাঁটা, চা, সিগারেট, টাইপের শব্দ, কাজে ফাঁকি, রাজনীতি, অফিসারের কড়া মুখ, সব অবিকল থাকবে। মেয়েরা সুন্দর পোশাক পরে বেণী দুলিয়ে কলরব করতে করতে স্কুলে যাবে, সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল দেখলে ঈশ্বরের অলৌকিক মুখ মনে পড়বে কারো। জল জমবে জগুবাজারে, বোমা ফাটবে কলেজ স্ট্রীটে, সিনেমা হলে দুলতে থাকবে 'হাউস ফুল'। তার মানে, অজয় না থাকলে কিছু অঘটন ঘটবে না। পৃথিবী তার কক্ষপথে অবিরাম ঘুরতেই থাকবে। অথচ কী সুন্দর এই জীবন!...অজয়ের নিঃশ্বাস পড়ল। না, অফিসে একটা শোক-সভা হবে, তার জন্য এক মিনিট মাথা নিচু করে থাকবে সহকর্মীরা। অথচ অজয় জানে, তখন কারো কারো মনে পড়বে বৌয়ের মুখ, কেউ ভাববে কোথায় ধর পাওয়া যায়, অথবা ইভিনিং শো-এর টিকিট পাওয়া যাবে কী না।

'আটান্ন সালের রুলিং-এর ফাইলটা দিতে পারো?'

—চমকে উঠল অজয়। হঠাৎ সে টের পেল, অফিসে বসে আছে অজয়। একটা ড্রাফট নিয়ে বেকায়দায় পড়েছে সে। এখন তার সামনে ফাইল, কাগজপত্র, জলের গ্লাস, নীল রঙের রেজিস্টার......।

—দেখুন না, আপনার বাঁ দিকের র‍্যাকে; অজয় মাথা না তুলেই জবাব দিল।

—কেসটা তো তুমিই নিয়েছিলে, দ্যাখো তো এই চিঠিটা;

—পরে দেখাবেন দাদা; শালা, দিল্লীর ভূত কাঁধ থেকে নামাতে না পারলে আর কোনোদিকে তাকাতে পারছি না'।

—'খুব তো আঠা দেখছি, এ দিকের কাগজে দেখেছো, ফিনান্স মিনিস্টার কী সব বলছে?'

—'এই যে অজয়বাবু, আজ পাঁচটার পর জেনারেল বডির জরুরি মিটিং; থাকবেন কিন্তু।'

—'কিন্তু আমার যে একটু; মানে পাঁচটার পর......'

—'আরে, ওসব কাজটাজ রাখুন এখন। বুঝলেন না। লড়াই করে বাঁচতে হবে।'

অজয় বুঝতে পারল, এখন আর তার কিছুই করার নেই। এখন এই ভদ্রলোক যা বলবেন তার অনেক কথা ওর বেশ মুখস্থ হয়ে গেছে। শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য, বুর্জোয়া, অটোমেশান, দালাল, সি-আই-এ, ভিয়েৎনাম, ঘেরাও; ফ্যানের ব্লেডের মত কথাগুলো যেন তার চারপাশে ঘুরছে, দ্রুত ঘুরে যাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল, সে যখন খুব ছোট ছিল, সন্ধ্যাবেলা ঘুমে ঢুলতো সে, তখন হ্যারিকেনের আলোয় ভাত মেখে মা তাকে গল্প বলত—নীলকমল আর লালকমলের। বাইরে বৈশাখের জ্যোৎস্নার রাত কী মন্থর; তখন সে স্বপ্ন দেখত—সোনার খাটে ঘুমিয়ে আছে রাজকন্যা। তার মেঘবরণ কেশ, আর দুধবরণ রঙ; অজয় হঠাৎ বলে উঠতে চাইল—উত্তর-পূব, পূর্বের-উত্তর, মায়া-পাহাড় আছে......সে যেন পথ বলে দিচ্ছে কাকে।

—'কই হে আটান্নর কেসটা...'

—না, জ্বালাতন! অজয় উঠে র‍্যাকের কাছে গেল। একগাদা পুরনো ফাইল আর রেজিস্টারের জঞ্জাল। এগুলো কেন যে জমিয়ে রাখা হয়! লেখাগুলো পড়া যায় না, ছোট ছোট পোকা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়, আরশোলা মরে আটকে আছে কাগজে। হাতে উঠে এল বাহান্ন সালের একটা ফাইল। অজয় মনে করার চেষ্টা করল বাহান্ন সালে সে কোন ক্লাসে পড়ত, সেভেনে?... না সিক্সে?... চোখ বুজে অজয় দেখতে পেল এক বিরাট মাঠ। শতক্ষণ বল দেখা যায়, তারা বল খেলেছে। তারপর মাঠের ভেতর গোল হয়ে বসে আছে তারা; সন্ধ্যার ট্রেন এসে গেছে। মুকুলদের বাড়ি থেকে শাঁখের শব্দ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। তার হঠাৎ মনে পড়ে যায়—ট্রানশ্লেশান লেখা হয়নি। তপতীদি, অপর্ণাদি মঞ্জুদিরা স্টেশনের দিক থেকে বেড়িয়ে ফিরছে, তপতীদি নিচু গলায় গাইছে—'পুরনো জানিয়া চেয়ো না...।'

কী সুন্দর সন্ধ্যার আকাশ, স্টেশনের রাস্তার আলো, সাইকেল রিক্সার টুং টুং শব্দ,...

—'না, কোনো কম্মের নয়; একটা ফাইল বার করতে বুড়িয়ে গেল!'

—'বাহান্নয় চলবে?'...

'চাইলাম জল, আর উনি দিতে এলেন বেল। বোগাস!'

ভদ্রলোক চটেছেন দেখে অজয় নিজের মনে হাসল।

অজয় দেখতে পেল রোদের রঙ ক্রমশ হলুদ হয়ে আসছে। এই রকম আলোয় হাত, পা সব কী রকম অলৌকিক হয়ে ওঠে। আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ। আর আধ-ঘণ্টার মধ্যেই অফিসগুলো ছুটি হবে। পিঁপড়ের সারের মত মানুষ ছুটবে বাস আর ট্রাম ধরতে। যারা ট্রেনের যাত্রী, তারা স্ট্র্যান্ড রোড আর বৌবাজার দিয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে যাবে। আশ্চর্য! দৃশ্যটা পুরনো হলেও অজয়ের যেন বিস্ময়ের শেষ হয় না। কোথায় যায় এত মানুষ? কেন এত ব্যস্ততা? হিসেবে কেমন গোলমাল হয়ে যায় তার; এরা সব সংসারী মানুষ! কী রকম নির্বিকারভাবে যেন পৃথিবীর গায়ে আটকে আছে ওরা। খায়, ঘুমোয়, ধারদেনা করে, মাঝে মাঝে বৌকে হাস-পাতালে পাঠায়, পরনিন্দা, পরচর্চা করে সুখ পায়। তারপর এক সময় অনেক কাজ বাকি রেখে একদিন সুন্দরভাবে মরে যায়। তারপর নতুন আর একদল মানুষ আসে। তারাও একই নিয়মে বেঁচে থাকে।

অজয় তাড়াতাড়ি বারান্দা পার হয়ে সিঁড়িতে পা রাখে। মাথার বাঁ দিকে একটা চাপা যন্ত্রণা হচ্ছে, সে জানে, যন্ত্রণাটা রাতের দিকে আরও বাড়বে। সমস্ত শরীরে একধরনের অবসন্নতা টের পাচ্ছে এখন, জামার ভেতর হাত চালিয়ে শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করল। যেন কারো কাঁধে হাত রাখতে পারলে সে একটু ভালো বোধ করত। অনেকেই নামছে এখন সিঁড়ি দিয়ে, জুতোর শব্দগুলো তালগোল পাকিয়ে তার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কোনো রকমে শরীরটা টানতে থাকল অজয়। যেন কেউ তাকে ঢালু জমিতে গড়িয়ে দিয়েছে।

রাস্তায় সেই পুরনো দৃশ্য। হেয়ার স্ট্রীটের ক্রশিং-এ লরি ভেঙে ট্রাফিক বন্ধ। গাড়ির শব্দ, লোকজনের ছুটোছুটি, ট্রাম-গুলো পর পর দাঁড়িয়ে আছে। অজয় হাঁটতে থাকল। কোথায় যাবে সে? ফুটপাথের একপাশে সে দাঁড়িয়ে জনতার দৃশ্য দেখতে থাকল। এতক্ষণ পরে বাইরের হাওয়ায় সিগারেট ধরাতে নিজেকে একটু সুস্থ বোধ

করল সে। সবাই বাড়ি ফিরছে। অজয় দেখতে পেল—জি-পি-ও-এর মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক পাখি কোথায় চলে যাচ্ছে। তার চারপাশে লোডিজ ট্রামের জন্য কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী রকম বিষণ্ণ চেহারা তাদের। আর হঠাৎ তার মনে পড়ল, এই রকম হলুদ রোদে গাছপালা যখন জীবিত হয়ে ওঠে, মানুষের মুখ দেখলে ঈশ্বরের কথা মনে হয়, তখন খুব নির্জন স্থানে, যেখানে কাঠবেড়ালি নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়, সেইখানে সে সূর্যাস্ত দেখতে চলে যায়।

ঠিক এই রকম বিকেলের আলোতেই রমেনদা রেললাইনে মাথা পেতে দিয়েছিল। অজয় যেন রমেনদার বিকৃত মুখ দেখতে পেল, রক্ত দেখতে পেল। কোথায় যাবো আমি? ফিরে গেলে তার মেসের লোকেরা তাকে তাশ খেলতে ডাকবে; অথবা রুম-মেট সুশান্তবাবু রেডিও চালাতে থাকবে, তেলের বিজ্ঞাপন, সাবান আর শাড়ির রঙিন কথাবার্তা। অথবা শ্যামলবাবু এসে লটারির টাকা পেলে কী করবেন সেই গল্প শুরু করবেন; না হলে, যৌবন পত্রিকার ছবি কেটে রাখবেন, তাকে বলবেন দু' একটা প্রশ্ন পাঠাবো, জানেন এসব হলো...

রোদের পাতলা আবরণের মধ্য দিয়ে অজয় হাঁটতে থাকল। কোথাও একটু বিশ্রাম করতে পারলে ভাল হতো। যদি কেউ এখন তাকে জিজ্ঞেস করত—কেমন আছেন? চারদিকে একবার তাকাল অজয়; অফিস-গুলো তার কাছে এখন দুর্গের মত মনে হচ্ছিল। অথচ ওরই একটা বাড়ি থেকে একটু আগে সে রাস্তায় নেমে এসেছে। এখন তার মনে হলো, ফিরে গেলেই দরজায় তাকে বাধা দেওয়া হবে। চারদিকে সুসজ্জিত সৈন্য, ঘোড়ার পায়ের শব্দ, আর নীল মখমলে জড়ানো যুবতীদের সুন্দর মুখ।...

সিগারেট ফেলে দিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পড়ল অজয়।

না, সত্যিই বোধহয় তার জ্বর আসছে; হাত ঘামছে এখন। বাতাসে শরীর শিরশির করছে তার। জ্বর হলেই সে নানারকম স্বপ্ন দেখে। গতকাল সে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিল; ভেবেছিল এই স্বপ্নের কথা সে কৃষ্ণাকে চিঠিতে লিখবে। বড় বিচিত্র স্বপ্নের সেই অভিজ্ঞতা।

অজয় দেখতে পেয়েছিল—সে একটা পাহাড়ে উঠে যাচ্ছে, ক্রমশ তার চারপাশে বাদামী আলো, আর সেই আলোয় সে দেখতে পেল একটু দূরে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে, কনসার্টের মত একটা বাজনা একটানা বেজে যাচ্ছে। বোধহয় কুয়াশা ছিল, বোধহয় বৃষ্টি হচ্ছিল। আর তখন সে দেখতে পেয়েছিল মুখ ঢেকে কৃষ্ণা কাঁদছে......। ঠিক তখনই তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। অবয়বহীন অন্ধকার। মশারির ভেতরে। বাইরে। শব্দ নেই কোথাও। সে উঠে জল খেয়েছিল, জানলায় দাঁড়িয়ে দেখেছিল বাইরে বৃষ্টি নেই। রাতের পরিচিত চেহারা। মলিন আকাশ। নিঝুম বাড়িগুলো তার চোখে পড়েছিল আর তখনই মনে হয়েছিল কৃষ্ণাকে তার চিঠি লেখা দরকার। খুব দরকার। কৃষ্ণার মুখ, তার শরীর, শরীরের গন্ধ অবিকল তার মনে পড়ল। আর তখন ইচ্ছে হল এই মধ্যরাতে কোনো যাদুকরের কাছে সে প্রার্থনা করে। আশ্চর্য এখন সে পরিষ্কার মনে করতে পারল—কৃষ্ণার চিঠি সে আজ অফিসের ড্রয়ারে ফেলে এসেছে। অফিসের লোকজন হয়তো পেলে এক ধরনের আমোদ আর গল্পের সুখ পাবে। অথচ কোনো সাজানো কথা লেখেনি কৃষ্ণা; অজয় মনে করতে পারল চিঠির সামান্য কয়েকটা লাইন—'এখন প্রণবের যা অবস্থা; তাতে আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। অফিস থেকে বোধহয় ছুটি পাবে, ছুটি কেন, এমন ব্যাপারটা আর চাপা নেই; বোধহয়, চাকরিটাও থাকবে না। কারণ প্রণব নাকি আজকাল অফিসেও গোলমাল করছে; পরশুদিন তো নন্তুকে গলা টিপে মারতেই গিয়েছিল, আমি হঠাৎ এসে পড়ায়...। যাক তোমাকে আগেও একটা চিঠি দিয়েছিলাম; বোধহয় পাওনি, একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো খুব দরকার। তুমি চিঠির উত্তর দিও'—

ক্রমশ পথ, বাড়ি ঘর, দোকানের আলো, মানুষের পায়ের শব্দ, যেন সব কুয়াশায় মুছে গেল। চোখ বুজলো অজয়।

কেবিনের পর্দা সামান্য দুলছিল, হাওয়ায় উড়ে আসছিল তার গায়ের ওপর। অজয় দেখল কেমন অরুচিকর গোলাপি ফুলটুল আঁকা মোটা পর্দা। চোখ ফেরাতেই হালকা সবুজ দেয়াল আর কৃষ্ণা। অথচ অজয় এখন চাইছিল কেউ তার নাম ধরে ডাকুক, একটা দুর্ঘটনা ঘটুক কোথাও, কেউ পাহাড় জয় করে ফিরে আসুক; অথবা—। মুখের ভেতর কোনো স্বাদ নেই এখন। চোখে জল দিতে পারলে ভাল হতো, অজয় ঘুমের মত কিছু প্রার্থনা করছিল এখন। মনে হয়, মাথার মধ্যে মিহি কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ছে; আর একবার তাকাল কৃষ্ণার দিকে। কৃষ্ণার শরীর, মুখের রেখা, সব, খুব হালকা আবরণে ঢেকে যাচ্ছে এখন; নাকি তার চশমার কাচে জলের দাগ লেগে আছে?... কেবিনের ঈষৎ নীলাভ আলোয় তার মনে হলো ঠিক প্রতিমার ভঙ্গিতে কৃষ্ণা এখন বসে আছে। এখন যদি হাত তুলে তাকে আশীর্বাদ করে অথবা প্রাণদণ্ড দেয়, তাহলে হয়তো রূপকথার মন্ত্রীপুত্রের মত সে পাথর হয়ে যাবে; মাটিতে বসে যাবে তার শরীর। টেবিলের ওপর কৃষ্ণার ব্যাগ, কলেজের লম্বা খাতা; কী মসৃণ মনে হয় ওর নখের রঙ, চিবুকের গড়ন, আর আঙুলের কারুকার্য!

আমি তো ইচ্ছে করলেই এখন ওকে আদর করতে পারি; বলতে পারি—সিনেমা যাবে। অথবা কোন জনহীন শীতল রাস্তায়, যেখানে প্রতিটি পাতা ঝরে পড়ার শব্দ আলাদা করে অনুভব করা যায়, সেখানে, ক্রমশ কৃষ্ণার চুলের মধ্যে মুখ নামিয়ে আনতে পারি...। চোখে পড়ল কৃষ্ণার মুখে সামান্য ঘামের দাগ, হাওয়ায় কপালের ওপর শুকনো চুল উড়ছে, কৃষ্ণাও কী তাহলে এখন বিশ্রাম চায়?

সারাদিন ও কলেজ করেছে, তারপর বিকেলের আলোয় অনেক মানুষ, শব্দ, আর উত্তেজনার মধ্য দিয়ে তার কাছে এসেছে। অজয়ের ইচ্ছে করল, কৃষ্ণার আঙুলগুলো একবার স্পর্শ করে। তারপর—আর ঠিক সেই সময় সে টের পেল তার তালু ক্রমশ শুকিয়ে আসছে, কতদিন সে জল খায়নি; ইচ্ছে হল এখন নতজানু হয়ে সে কৃষ্ণার কাছে কিছু প্রার্থনা করে। এখন সে...

—'একদম হাওয়া আসছে না, ম্যানেজারকে একটু বল তো, ফ্যানের স্পীডটা বাড়িয়ে দিতে;' কৃষ্ণা একসময় ছেলেটিকে আদেশ করল।

—'এবার বল, তোমার কী ভীষণ দরকার!' কৃষ্ণা ক্রমশ সহজ হয়ে আসছে। কী রকম ঠোঁট ভিজিয়ে হাসল কৃষ্ণা। মেয়েদের এই ভঙ্গি তাকে কী রকম অবশ

করে দেয়। একবার ভাবল অজয়, এখন ওকে—না, বলা যায় না...

অজয় জানে, কোনো জরুরি কথা শোনার আগ্রহ নিয়ে কৃষ্ণা এখন তার কাছে বসে নেই। আসলে ও এখন নিজের মধ্যে একধরনের অস্থিরতার তীব্র সুখ ভোগ করছে; জলের ঘূর্ণির মত সময় ওর শরীর ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে।

—'একটা সুখবর আছে,—'

—'কী,' অজয় চশমা খুলে টেবিলে রাখল।

—'টেস্টে অনার্সে, হায়েস্ট মার্কস পেয়েছি আমি,'

—'খুব ভাল, ফাইনালেও যদি—'

—'যাঃ অত সোজা,' কৃষ্ণা লজ্জা পেয়ে গেল।

খুব ইচ্ছে হলো অজয়ের, ওকে দু' একটা আশা ভরসার কথা বলে; জীবনে উন্নতি নিয়ে একটা ছোট লেকচার দেয়—

—'আর একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছে;' কৃষ্ণা টেবিলের কোণে নখ ঘসছে; 'খুব ইন্টারেস্টিং'

—'কী,' অজয় আগের মতই আলগা-ভাবে কথা বলল।

'শুনলে তুমি...' কৃষ্ণা আবার আগের মত ঠোঁট ভিজিয়ে সুন্দর করে হাসল।

—'আমাদের 'ইতিহাসে'র নতুন যিনি এসেছেন, কী যেন কে, আর না কী নাম; আমাকে চারপাতার চিঠি লিখেছেন;' কৃষ্ণা যেন সাবানের ফেনা দিয়ে বাতাসে বেলুন ভাসিয়ে দিচ্ছে। যেন ক্রমশ বয়স কমে যাচ্ছে কৃষ্ণার।

—'ভাল।'

—'সর্বনাশ! কোথায় একটু জেলাসি ফীল করবে, তা না ঋষ্যশৃঙ্গ হয়ে উঠলেন একেবারে!'...

—'জেলাসির কী আছে'; অজয় চশমা তুলে নিল।

আর হঠাৎ অজয় ভাবল এখন যদি সব আলো নিভে যায়, অথবা ছুটে আসে এক ভয়ানক সাইক্লোন, তাহলে সেই দুর্ঘটনার মধ্যে সে হয়তো কৃষ্ণাকে বলতে পারবে জানো, আজকাল আমি মাঝে মাঝে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি। কারা মাঠের পথ ধরে আলো দোলাতে দোলাতে আমাকে খাটে তুলে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে আমার ঘুম হয় না, বমি হয়ে যায় মাঝরাতে। মাঝে মধ্যে যেখানে বিশুদ্ধ আকাশ আর অসংখ্য গ্রহজগৎ, সেখান থেকে আলো এসে পড়ে আমার শরীরে। আমার শরীর কী রকম পালকের মত হালকা হয়ে যায়; জ্যোৎস্নায় আমার ভয় করে; ভীষণ...না, এসব বলা যায় না, কিছুই বলা যায় না কৃষ্ণাকে!...

—'কই বললে না তো?'

—'আর কয়েকদিন পরে আমার আর চাকরি থাকবে না...'

—'সে কী!' কৃষ্ণা যেন আচমকা হোঁচট খেল।

—'হ্যাঁ, অফিসে গোলমাল চলছে খুব, আমাকে বনবাসে পাঠাতে চায়।'

—'কোথায়?'...

—'ঠিক জানি না,'

—'এই ব্যাপার!' কী সুন্দর কৃষ্ণার কথা বলা; যেন সিনেমার সুখদুঃখ স্পর্শ করে দেখছে এখন।

—'আসলে, তুমি কলকাতার পোকা; কিছুতেই বাইরে যাবে না'...

অজয় লক্ষ্য করল, পাশের কেবিন থেকে কারা দ্রুত বেরিয়ে গেল।

—'আচ্ছা, তুমি তো অনেকগুলো 'ইন্টারভিউ' দিলে...'

—'দেখো, একদিন একটা না একটা—।' হঠাৎ কৃষ্ণার যেন অনেক বয়স বেড়ে গেছে; খুব গভীরভাবে কথা বলছে কৃষ্ণা।

অথচ অজয় কী রকম ক্লান্ত বোধ করছিল এখন। মনে হচ্ছিল—আজ রাতে খুব বৃষ্টি হবে। ভেসে যাবে কলকাতা শহর। তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল—এখন কৃষ্ণা অন্য কথা বলুক, চালের দাম বাড়ছে, বাস ব্রেকডাউন, বন্ধুর বিয়ের গল্প, মার অসুখ, সিনেমার কোনো নায়কের কথা, অথবা যাহোক কিছু।... যে কোনো কথা।

—'ওই যে কোন ভদ্রলোক তোমাকে দেখা করতে বলেছিলেন, খুব হোল্ড্ আছে, তার কাছে একবার—'

অজয় কথা বলল না।

—'জানো, আমার মেজমামা খুব ভাল হাত দ্যাখেন; তুমি যাবে তাঁর কাছে?...' কৃষ্ণার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ক্রমশ। কী বোঝাতে চায় কৃষ্ণা?...

অজয় ভাবল কৃষ্ণা কী রকম সুখে বেঁচে আছে; হয়তো এর পরই বলবে—'আমি জানি, পরের বার লটারির 'ফার্স্ট প্রাইজ' তোমার নামেই উঠবে।'

সামান্য হাওয়ায় পর্দা উড়ছে, পর্দার ফুল উড়ছে, অজয়ের মনে হলো হয়তো আর একটু পরে এই দেয়াল, নিভৃত আশ্রয়, প্রতিমার ভঙ্গিতে বসে থাকা কৃষ্ণা, সব মুছে যাবে......কৃষ্ণার চুল এখন আর উড়ছে না, মুখে আর ঘামের দাগ নেই; আজ কৃষ্ণা নিশ্চয়ই ফিরে গিয়ে স্নান করবে, অনেকক্ষণ আকাশ দেখবে। অন্ধকারে একা, তারপর—

বাইরে বেরিয়ে এল একসময়।

—'তুমি একটু কিছু হলেই খুব ভেঙে পড়,' কৃষ্ণা এতক্ষণ পরে আবার কথা বলল।

পরিপূর্ণ চোখে এইবার কৃষ্ণাকে আবার দেখল অজয়। মনে হল আলো সহ্য হচ্ছে না ওর শরীরে। যেন রাতের মলিন আকাশ ওর দেহে, শাড়ির ভাঁজে, জড়িয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। রাস্তার আলোয় কী রকম মোমের মত মনে হয় ওর হাত, চিবুকের মসৃণতা।

হঠাৎ মনে হল তার—বড় ছেলেমানুষ কৃষ্ণা। ইচ্ছে হল, ওর কাঁধে হাত রাখে; সান্ত্বনা দেয় ওকে। ভাবল যে জীবন ফড়িং-এর, যে জীবন পাখিদের, কৃষ্ণা কী তার সন্ধান পেতে চায় এখন? 'তুমি কত বেশি বেঁচে আছ কৃষ্ণা'—

অস্ফুটে ঠোঁট নড়ল অজয়ের। অজয় জানে, ওর ওই লম্বা লম্বা খাতায় অনেক ভালো ভালো কথা লেখা আছে; এখনো কৃষ্ণাকে কবিতার মর্মার্থ লিখতে হয়। চোখে পড়ল ময়দানের অন্যপারে ট্রাম চলে যাচ্ছে, খুব ইচ্ছে হলো তার—একবার চীৎকার করে বলে—আমি তোমার জন্য সুখ নিয়ে আসব কৃষ্ণা, আর এক স্বপ্নের বাগান!...

রাস্তা পার হবার সময় ট্রাফিকের আলো পাল্টে গেল। খুব বিরক্ত বোধ করল অজয়। একের পর এক গাড়িগুলো চলে যাচ্ছে, বাস, প্রাইভেট গাড়ি, লাইন বেঁধে ট্রাম। অথচ আশ্চর্য! একটা গাড়ি থেকেও কোনো পরিচিত মুখ চেঁচিয়ে উঠলো না, আরে, অজয় নাকি?...আশ্চর্য! কোনোদিন ঘটল না। এখন তার বিকেলের অবসন্নতায় কেমন ক্লান্ত লাগছিল। বোধ হয়, জ্বর আসছে তার। গাড়িগুলোকে লক্ষ্য করছিল সে। কিন্তু লাভ নেই। অথচ, গল্পে কেমন দেখা যায়, পাতাল থেকে উঠে আসে এক গাড়ি, আর দরজা খুলে দিয়ে সাবানের ফেনার মত গালে পড়ে কোনো পুরনো বান্ধবী; নয়তো খুব বৃষ্টির মধ্যেও একটা ট্যাক্সি একেবারে কাছে এসে থেমে যায়।...অজয়ের ইচ্ছে হয়, সে রেগে ওঠে, লোক জুটিয়ে 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করে, একবার ইচ্ছে হল—ট্রাফিক-পুলিশকে সে ভয় দেখায় অথবা — রেড সিগন্যাল পেয়ে এইবার গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল। আর হঠাৎ তার সমস্ত দৃশ্যটা খুব ভালো লাগল। কলকাতার কোথাও এক আশ্চর্য যাদুকর আছে; সে হাত তুললেই; রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল সে। গাড়ির জানলায় চোখ পড়ল। একটি মেয়ে তাকাল তার দিকে; টের পেল অজয়, একটু যেন নষ্টামি করবার ঝোঁক আছে মেয়েটির। কিন্তু হঠাৎ মাঝখানে একটা দোতলা বাস এসে থেমে গেল। বাসের গায়ে কী শান্ত এক বাঘ। অদ্ভুত! সুন্দরবন থেকে এসে কলকাতার বাসের গায়ে চুপ করে বসে আছে!...বাসের ভিড় লক্ষ্য করল অজয়।

তার মনে হলো, এখন আমি যদি সুরেন, যদুনাথ, মিহির অথবা স্বপ্না, বেলা, নন্দিতা যে কোনো নাম ধরে ডেকে উঠি, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই উত্তর দেবে। বেশ একটা ঘটনা তৈরি করা যায়। হয়তো কালীঘাট রোডের মিহির দত্তের পাশেই মহানির্বাণ রোডের মিহির ভৌমিক দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো দুই স্বপ্না পাশাপাশি বসে বাড়ি যাচ্ছে। সত্যি, এসব ব্যাপার কত সিরিয়াস!...এক ধরনের সুখ পাচ্ছিল অজয়।

একটু দূরেই ফুটপাথে একটা জটলা। একটা লোক অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। তার চারপাশে অনেক লোক; দু-চারটে হিপি ছেলে-মেয়েও দেখতে পেল অজয়।

দেশ-নেতাদের কায়দায় লোকটা বক্তৃতা চালিয়ে যাচ্ছে; — এই যে দেখুন স্যার, কোনো ম্যাজিকের খেলা নয়, ভেলকি নয়, শুধুমাত্র কৌশল, ভারতের সনাতন যৌগিক প্রক্রিয়া স্যার! লোকটার গলার ভেতর কী একটা পিন লাগানো আছে?...অজয়ের ইচ্ছে হল বলে—আরে, আমরা জানি এসব বোগাস; কিন্তু এখন ট্রাম-বাসে ভিড় আমাদের কিছু করার নেই ভাই......

লোকটা টপ করে মাছটা খেয়ে ফেলল তারপর জল খেতে শুরু করল, গুনল অজয়, পর-পর তের গ্লাস জল অক্লেশে খেয়ে ফেলল লোকটা; পেটের ভেতর পুকুর আছে নাকি? অজয়ের নিজের ছেলেবেলার কথা মনে হলো তার! এখনও বোধহয় তার পেটের ভেতরে মাছটা চুলবুল করছে!

হিপি ছোকরারা ছবি তুলছে। লোকটা এবার হয়তো বিদেশে গিয়ে খুব নাম করবে তারপর—

পকেটে হাত ঢোকাল অজয়। চার-পাশের ভিড় হাল্কা হয়ে গেছে। কী যেন খ‍ুঁজল সে। আর তখনই তার মনে হল, আজ সে ড্রয়ার বন্ধ করে আসতে ভুলে গেছে। খুব ক্লান্ত বোধ করল এখন। চার-পাশে তাকাল—বিকেলের এক ধরনের বিষাদ সমস্ত আকাশ, বাড়ি-ঘর, লাইট-পোস্ট, সিনেমার ছবি, সব কিছুকে যেন কেমন দুঃখী করে তুলছে এখন। নাকি তার মনের ভুল? আজকাল প্রায়ই হয়, বড় ভুলে যাচ্ছে সব। হয়তো ঘরের দরজা দিতে ভুলে গেল, সমস্ত রাত ঘরে আলো জ্বলে; নেভাতে মনে থাকে না। কোথাও বসলে রুমাল ফেলে আসে। কতদিন রাতে জল পড়ে গেছে কল-ঘরে, ক্যালেন্ডারের পুরনো পাতা আর পাল্টানো হয় না তার। এখন মনে পড়ল, তার ড্রয়ারে অনেক জরুরি চিঠিপত্র আছে, যৌবনমার্কা একটা ম্যাগাজিন দেখছিল সে দুপুরে, সেটা তেমনি আছে। কৃষ্ণার চিঠি, দু-চারটে ফোন নম্বর। অসম্ভব রাগ হল নিজের ওপর। ইচ্ছে হল, নিজের জুলপি ধরে টানে। অফিসের হরিপদবাবু তাকে জ্ঞান দিতে এসেছিল, সে তখন ছবি দেখ-ছিল। 'আপনারা এত শিক্ষিত মানুষ, আপনারাও যদি এসব—' ইচ্ছে হচ্ছিল, লোকটার ভুলপেটে ঘুঁসি চালায়। কী এক-ভূদেব মুখুজ্জে এলেন! তুমি শালা ওপর-ওয়ালার বাড়ির পর্দা কিনে দাও, আর এখন এলে আমায় 'মানুষ' করতে!...কী রকম অস্বস্তি বাড়ছিল তার। একবার ইচ্ছে হল, অফিসে ফিরে যায়। অফিসের কথা মনে হতেই তার সমস্ত শরীরে যেন ছুঁচ বিঁধতে লাগল। মনে পড়ল, ঠিক বারোটা নাগাদ অফিসারের ঘরে তার ডাক পড়েছিল। এই সব ঘরগুলো অনায়াসে 'বাবুঘর' বানিয়ে ফেলা যায়; কী রকম হাল্কা সবুজ দেয়াল, মোটা পর্দা। অজয় চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। টেবিলে কয়েকটা কাঁচের মসৃণ পেপার-ওয়েট, টেবিল-ক্যালেন্ডার, পর-পর সাজানো কয়েকটা ফোন; আর তার ভেতর লর্ড ক্লাইভের মত বসে আছে লোকটা। অজয়ের খুব মজা লাগছিল, আরে, 'যদি তুমি এখন জন্মাতে তাহলে কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে লাইন লাগানো ছাড়া কী করতে চাঁদ।.....

'—কী করেছেন আপনি?'
অজয় বোকার মত তাকাল।

—'দিল্লির চিঠি, আর আপনি অ্যাড্রেস করছেন বম্বে সেন্ট্রাল? আর আপনার কী মাথাকাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি, নিচে ডেট দিয়েছেন এক বছর আগের?...' খুব ইচ্ছে হচ্ছিল তার, একটা ফোন তুলে নিয়ে কাউকে বলে—বুঝলেন আমার খুব বিপদ: ঘাম হচ্ছিল শরীরে, খিদে পাচ্ছিল খুব, ইচ্ছে করছিল এখুনি নুন দিয়ে লোকটার নাকটা খেয়ে নেয়...অথবা চিৎকার করে ওঠে—মহারাজ, 'যবন সৈন্য পুরী অবরোধ করেছে!'...

রাস্তায় বেরিয়েই প্রথম আকাশ দেখল অজয়। দুর্গের মত মেঘ; কী রকম দ্রুত রঙ পাল্টে যাচ্ছে এখন। রাস্তায় বিজ্ঞাপনের দু-একটা আলো জ্বলে উঠছে। কোথায় যাব আমি? কার্জন পার্কে মানুষের এক-টানা শোভাযাত্রার বিরাম নেই। সামনেই রেড রোড, আশ্চর্য! কোথাও লাল রঙ নেই। বরং সাদা আলোগুলো দূষিত রক্তের মত জ্বলছে এখন। বড় ইচ্ছে হয় তার, সমস্ত আলো নিভিয়ে দেয় সে; তারপর বানায় এক অলৌকিক আলো। চারপাশে সন্ধ্যার কলকাতা জাল ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঠোঁট চাটল অজয়। চারপাশে শব্দ : মানুষ, আকাশের রঙ। অজয় দেখল কয়েকটি শিশু বেলুন ভাসিয়ে দিল আকাশে। অজয় টের পায়, তার চারপাশের কলকাতা যেন আস্তে-আস্তে একটা দোলনা হয়ে যাচ্ছে। এখন ইচ্ছে হয়—এক বেহালাবাদককে খ‍ুঁজে বার করে সে, তারপর তার কাছে শোনে কোনো স্বপ্নের সুর। যেখানে নদী, মাঠ, জ্যোৎস্নায় কে যেন হেঁটে যায় মাথা না তুলে; যেখানে কৃষ্ণার শরীর আর আঁচল উড়তে থাকে রাতের বিষণ্ণ বাতাসে!...

ধর্মতলার গুমটিতে আসতেই আচমকা বৃষ্টি নামল। সঙ্গে সঙ্গে লোক ছুটতে আরম্ভ করল। বুটপালিশ, বাদামওয়ালা, রাস্তার অসংখ্য লোক। অজয় ধাক্কা খেল, বোধহয়, ময়দানে মিটিং-ফিটিং ছিল, বোধ-হয় খেলা ছিল, কী রকম ঠাণ্ডা আর অন্ধকার হয়ে এল চারদিক। ঠিক মাঝপথে মাঠের মধ্যে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ার মত এই গুমটিতে কলকাতা যেন আটকে গেছে। বৃষ্টির শব্দ এখন কী রকম ঘুমের মত লাগছিল তার। যেন তার উষ্ণ কপালে এখন কেউ হাত রাখুক, কেউ চাদর টেনে দিক তার গায়ে। তার চারপাশে বৃষ্টির ধূসর দৃশ্য ঠিক বিদেশী ফিল্মের শটের মত। চোখ বুজলো অজয়। বিরাট প্রান্তর, মাঝে-মাঝে কাঁটা বাবলার ঝোপ, একটু দূরেই জামবাগান আর ছোট মসজিদ...চারদিক সাদা হয়ে বৃষ্টি পড়ছে, তপতীদি মাথায় আঁচল তুলে দিয়েছে, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে তপতী কী রকম ছবির মত হয়ে গেছে; ঠোঁট কাঁপছে তার, শীত-শীত করছে কেমন, 'দ্যাখ, এই জামগুলো কত বড়!'...কী চমৎকার তপতীদি হাসছিল। এই বৃষ্টি, মেঘ, বিদ্যুৎ, মাঠের মধ্যে তপতীদি...তার খুব ভয় করছিল। হয়তো জ্বর হবে তার। ছুটির অংক হয় নি, কিন্তু সে টের পাচ্ছিল, তপতীদির শরীরের মধ্যে, বৃষ্টির মধ্যে, আকাশের মধ্যে, তার শরীর যেন গলে যাচ্ছে, ক্রমশ গলে যাচ্ছে। তপতীদির শরীরের এক ধরনের উষ্ণতা সে টের পাচ্ছিল। তার মাথায় তপতীদির হাত...'অজু তুই...অজু তুই...' ভয়ে সে চোখ খুলতে পারছিল না মনে হচ্ছিল, এইবার গল্পের ডাকাতের মত, তপুদি তাকে এইখানে বলি দেবে অথচ অথচ...

গোলমালে অজয় তাকাল চারপাশে। বৃষ্টির মধ্যে সে ধর্মতলার গুমটির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। নির্বিকার ভালমানুষের মত দুটো গরু মানুষের এই জটলার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। কী রকম দুর্বল, কিশোর প্রেমিকের মত অসহায় দৃষ্টি!...ইস্, কল-কাতায় গরুদের দেখার কেউ নেই! অজয় ঠিক করল, কালই সে খবরের কাগজে চিঠি লিখবে—

—'দেখছেন দাদা, ঠিক ছুটির মুখেই'... পিছু হাতে এক ভদ্রলোক অজয়কে খোঁচা দিয়ে ফেলল।

'কী ঝামেলা বলুন তো? যাবো হসপিটালে রোগী দেখতে...'

—'আর দাদা, কলকাতার কী হাল হল ক্রমশ; দশ মিনিটেই একেবারে সমুদ্র; অথচ, দেখুন, সাহেবদের আমলে'—

—'নৌকো কিনুন দাদা'; কে পেছন থেকে চেঁচাল।

—'শালার ট্রাম তুলে দিলেই হয়'...

—'বুঝলেন, পুঁজিপতিদের কায়েমী স্বার্থই'...

—'যা দেখছি, রাতে তো ভোগাবে মনে হয়—'

—'আরে, আপনার ফরটি টু-এর সেই সাইক্লোনের কথা মনে আছে মশাই?'...

অজয় কী রকম অবসন্ন বোধ করছিল। হাঁটুর মধ্যে চিন-চিন করছে এখন। চার-পাশের কলকাতা বৃষ্টিতে মুছে যাচ্ছে; নিঃশ্বাস ফেলল অজয়—কতদিন সে মিউ-জিয়ম দেখে নি, কতদিন সে একা দাঁড়ায় নি হাওড়ার ব্রীজের ওপর। কতদিন সে ঘোড়ার গাড়িতে চড়েনি, কতদিন শোনে নি কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর!...

এখন বৃষ্টি নেই। সামান্য জলো আবহাওয়া খুব ভাল লাগল তার। অনেক-খানি নির্ভেজাল বাতাস টেনে নিল সে। পিছল পথে গাড়ির চাকার শব্দ। আবার

পোকার মত মানুষ বেরিয়ে পড়েছে পথে। ফুটপাথে হকারদের নানারকম চিৎকার। ওপরে চায়ের বিজ্ঞাপন, রাণীগঞ্জের কয়লা জ্বলছে আকাশে, অনেক উঁচুতে চিত্র-তারকার ছবি। অজয় ভাবল—সে কারো কাছে প্রার্থনা করে একটা ছোট জানলার জন্য; যার বাইরে ছোট পুকুরে এখন হাল্কা বৃষ্টির শব্দ, কোথায় বেলফুলের গন্ধ, হ্যারিকেনের হলুদ আলোয় মার ভাত খেতে দেওয়া...চোখ বুজে ফেলল সে।

—পেন নেবেন স্যার? ভাল মাল স্যার। জাহাজী জিনিস!...

অজয় শুনতে পেল পায়ের শব্দ, চাকার শব্দ, বাজনার শব্দ। ট্রাম-গুমটিতে মাইকে জানানো হচ্ছে—শ্যামবাজারের ট্রাম বন্ধ...। একটা আঁতকায় পিঁচ্ছল সাপ যেন সন্তর্পণে তার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। ঠোঁট চাটল অজয়। লাল আলো জ্বলতেই রাস্তা পার হল অজয়। না, বোধহয় জ্বর আসছে তার। মাথার মধ্যে ধুলো উড়ছে এখন; যেন এই-মাত্র সে জেনেছে খুব কঠিন একটা অসুখ হয়েছে তার। রক্তের ভেতর চলেছে এক দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা। অথচ সম্রাটের মত তার ইচ্ছে হল বলে—'তোমার কোনো ভয় নেই কৃষ্ণা; আমি নিয়ে আসব এক সুখের জীবন...' আর ঠিক তখন সে একটু দূরে পরিমলকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখল। পরিমলকেও দেখতে পেয়েছে তাকে।

—'কোথায় থাকিস আজকাল! ফোনেও তোকে পাওয়া যায় না', দেওয়ালের ধারে বসতে বসতে পরিমল বলল। পরিমলকে দেখছিল অজয়। হলুদ টেরিলিনের জামার ওপর লাল রঙের টাই; একটা বনমোরগের মত দুর্দান্ত লাগছে এখন ওকে। নানারকম শব্দ, আলোর কায়দা, একটা মেজাজী গন্ধ, হাল্কা বাজনা, সব ঢেউয়ের মত অজয়কে ডুবিয়ে দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ তার মনে হল—সে বোধহয় একটা স্বপ্নের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে, ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। স্বপ্নে যে রকম থাকে, বিরাট দরজা, মোমের মত আলো, বিচিত্র সব লোকজন, সাজসজ্জা, অজয় চারপাশে অবিকল সেই সব দেখছিল এখন। পরিমল কী যেন একটা অর্ডার দিল 'বয়'কে ডেকে। চারপাশে সেই হাল্কা বাজনাটা ক্রমশ দ্রুত হচ্ছে; দেয়ালের গায়ে ঈষৎ বাদামী নকসা কাটা কাগজ। সমস্ত টেবিলে কথা, শব্দ, মানুষের নানারকম মুখ। দেয়ালের ফাঁক থেকে আলোর রেখা তার শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে বারবার। তার খুব ইচ্ছে হলো, এই টেবিলের ওপর সে তার চোখ, মুখ, নাক, কান, হাত-পা, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, সব একের পর এক সাজিয়ে রাখে। তারপর কাউকে চিৎকার করে বলে 'একটা ভয়ঙ্কর সিঁড়ি আমাকে টানছে, ক্রমশ টানছে বুঝলেন আপনারা।...'

সামনের টেবিলে দুজন মহিলা বসে আছে। শরীরের উঁচু-নীচু সব দেখা যায়। অজয় দেখল, এক সর্দারণী শয়তানের মত সেদিকে তাকিয়ে আছে।

কী একটা গোলমাল অজয় তাকাল চারপাশে।

দেখতে-দেখতে অজয় টের পাচ্ছিল, তার চোখ ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে, মাথার মধ্যে আবার যেন মিহি কুয়াশা জমছে। বাজনাটা ক্রমশ চড়ছে এখন। ইচ্ছে হল তার, এই মহিলাদের কাছে গিয়ে বলে—বলতে পারেন আজ ঠিক কখন সূর্যাস্ত?...

—'ছুকরি লাগবে স্যার?' একটা দাড়ি-ওয়ালা রোগা লোক পরিমলের কাছে এসে ফিস-ফিস করে কী যেন বলছে,

'পাঞ্জাবী, গুজরাটী, বাঙালী, কলেজ গার্ল স্যার?'...

তাকাল অজয়। অর্ধবৃত্তাকার কাউন্টার-এর পাশে লাইন দিয়ে কয়েকটি বাসি মুখের মেয়ে বসে আছে। অজয় চোখ বুজে ফেলল। একটা ট্রেন যেন সাঁকো পেরিয়ে যাচ্ছে, চারপাশে শরৎকালের উজ্জ্বল আকাশ: সে বসে আছে ক্লাস নাইন সেকশান 'বি'; এখন থার্ড পিরিয়ড—সে শুনতে পাচ্ছে, বাবার গলা কী রকম কাঁপছে, পড়াচ্ছেন বাবা—মাল্যবান পর্বতে বর্ষার বর্ণনা...

বাইরে বেরিয়ে সে সমস্ত শরীরে হাওয়া মেখে নিল। ঘামে ভিজে গেছে শরীর। পরিমল উল্টোদিকে চলে যাবার সময় খুব মোলায়েম করে হাসল, দূরে গলির মধ্যে আবছা আলোয় সেই রোগা দাড়িওয়ালা লোকটা দাঁড়িয়ে। নিঃশ্বাস ফেলল অজয়। পকেটে সিগরেট খুঁজল। নেই। ওপরে স্বচ্ছ আকাশ কেমন সরের মত ভাসছে। একবার ভাবল—সে যদি মহাকাশচারী হয়ে দেখতে পেত এই পৃথিবী কী অদ্ভুত...। একটা ছেলে ভিক্ষে চাইল। ট্রাম ঘুরে-ঘুরে ঢুকছে এসপ্ল্যানেডে। সামনেই সেলুন। ঢুকবে নাকি সে? কাঁচির কিচ-কিচ শব্দে হয়তো তার কিছু মনে পড়বে, হয়তো ঘুম পাবে তার। এখন আবার জল খেতে ইচ্ছে হল খুব।

বৃষ্টি নেই। কিন্তু স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় সে ময়দানের অন্ধকারে হাঁটতে থাকল। নিশ্চয়ই আজ রাত্রে দারুণ বৃষ্টি হবে। ভেসে যাবে শহর, আলমারির ওপর বসে রাত কাটাবে অফিসের লোকজন। তার ইচ্ছে হল হাততালি দিয়ে বলে নেবুর পাতায় করমচা...নেবুর পাতায়...

আলোর নীচে অক্ষরগুলো পরিষ্কার দেখতে পেল সে। 'যীশু কহিলেন—আমিই সত্য, আমিই জীবন।'... কী জানি হঠাৎ তার সেই বাসি মুখের মেয়েগুলোকে মনে পড়ল, এখনো কী তারা বসে আছে?......

'হাউস-ফুল' বোর্ডটা খুলে নিচ্ছে একটা লোক। হলের আলো নেভানো হচ্ছে। অন্ধকার থেকে মনুমেন্টের দিকে হাত বাড়াল অজয়। যেন মনুমেন্টটা উঠে যাচ্ছে, ক্রমশ অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। একটা ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল দ্রুত। কতদিন সে মাকে স্বপ্ন দেখেনি। আজ রাতে কৃষ্ণাকে চিঠি লিখতে হবে তার। এই আর্দ্র আবহাওয়ায় যখন তার বৃষ্টির কথা মনে হচ্ছিল তখন ভাবল—বোধহয় ভুয়ার্সেও এখন অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে; আর সেই বৃষ্টির জলে ভিজে যাচ্ছে কৃষ্ণার মুখ, হয়তো প্রণবকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; হয়তো অপেক্ষা করে আছে কৃষ্ণা তার চিঠির জন্য। হয়তো—

একটা শবযাত্রা চলে গেল পাশ দিয়ে। আশ্চর্য! কোনো গোলমাল নেই। অজয়েরও খুব ইচ্ছে হয় সেও এদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে। সামনে অন্ধকার ময়দান; বৃষ্টির পথ। মনে হলো তার, এখন হয়তো 'সদর স্ট্রীটে'র অলৌকিক অন্ধকার থেকে কৃষ্ণা তার নাম ধরে ডেকে উঠবে। বাস-প্রাইভেট গাড়ি, ঘণ্টার শব্দ—আকাশ, সব যেন এখন তার শরীরের ওপর ছুটে যাচ্ছে। আবার কাল অফিস! টাইপের শব্দ, টেলিফোন, বিবর্ণ ফাইল...

—'দেখেছেন দাদা, চল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছি, বাসের কোনো পাত্তা নেই।'

চমকে উঠল অজয়। রাত মন্থর হয়ে আসছে। ইচ্ছে হল হাত তুলে বর দেয় লোকটিকে। বাজনার শব্দ যেন কোথায় তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এখন তার শুয়ে পড়া দরকার। খুব দরকার। 'বড় দীর্ঘদিন তুমি বেঁচে আছ অজয়: বড় অকারণ।... কৃষ্ণা সাহস হারিও না। তুমি।'...

চমকে উঠে দেখতে পেল অজয়—একটা ডবল-ডেকার বাস দৈত্যের মত তার দিকে ছুটে আসছে। ক্রমশ ছুটে আসছে।...

সখারাম গণেশ দেউস্কর

আশিস সান্যাল

বাংলা সাহিত্য ও সমাজ জীবনে সখারাম গণেশ দেউস্কর আজ একটি স্বল্প পরিচিত নাম। অথচ একদিন, যুগ-সন্ধিক্ষণের এক সংকটময় মুহূর্তে অগ্নি-গর্ভ রচনায় তিনি জাতীয় জীবনে সঞ্চার করেছিলেন সুতীব্র প্রেরণা। ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও রাষ্ট্রতত্ত্ব বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধগুলি কেবল প্রেরণা সঞ্চারের জন্যই নয়, সাহিত্যিক মূল্যায়নেও বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে বিভিন্ন দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে। অবাঙালী হয়েও বাংলা সাহিত্যের প্রতি এমন নিষ্ঠা, বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির প্রতি এমন দরদভরা ভালবাসার নিদর্শন ইতিহাসে সত্যই দুর্লভ।

জন্মসূত্রে সখারাম গণেশ দেউস্কর ছিলেন মারাঠি। কিন্তু আচারে ব্যবহারে, রীতিনীতিতে এবং বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগে তিনি বাঙালী জাতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবনেতিহাসও খুব বিচিত্র। প্রখর ব্যক্তিত্ব এবং আত্মাভিমানের জন্য তিনি তাঁর নিজস্ব স্বাধীন চিন্তাকে কখনও অবদমিত হতে দেন নি আর এই কারণেই, জীবন সংগ্রামে বার বার দুঃখ এবং অসচ্ছলতাকে বরণ করতে হয়েছে।

।।এক।।

আজ থেকে একশত বৎসর আগে ১৮৬৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর এক মারাঠি ব্রাহ্মণ পরিবারে সখারাম গণেশ দেউস্করের জন্ম। তাঁর আদি নিবাস ছিল বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি জেলায় ছত্রপতি শিবাজীর আলবান নামক দুর্গের নিকটবর্তী দেউস গ্রাম। সখারামের পিতামহ সদাশিব বিঠল ছিলেন শেষ বাজীরাওয়ের সমসাময়িক। প্রবল বিদ্যানুরাগ তাঁকে প্রথমে টেনে নিয়ে যায় চিত্রকূটে এবং পরে কাশীতে। তিনি তাঁর শ্যালকের কাছ থেকে বিয়ের যৌতুক হিসেবে সাঁওতাল পরগণার কারমাটার রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী করোঁ গ্রামটি প্রাপ্ত হন। জীবনীকার লিখেছেন—"করোঁ গ্রামে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। পুত্র গণেশ সদাশিব কাশীধামে বেদ অধ্যয়ন করেন। গিধোড়ের ভূতপূর্ব মহারাজ জয়মঙ্গল সিংহ বৈদ্যনাথ দেওঘরে বাস করিতেন। তিনি গণেশ সদাশিবকে আশ্রয় দেন।" সেখানেই পৌষ মাসে শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে সখারামের জন্ম হয়। তাঁর বয়স যখন মাত্র পাঁচ, তখনই তিনি মাকে হারান। তখন তাঁর পিতা নিজের এক বোনের উপর এই মাতৃহীন শিশুর লালন-পালনের ভার অর্পন করেন। বস্তুতঃ পক্ষে সখারামের জীবনে এই মহীয়সী নারীর প্রভাব অপরিসীম। তিনি যেমন বুদ্ধিমতী এবং বিদ্যানুরাগিনী ছিলেন, তেমনি গৃহকর্মেও ছিলেন সুনিপুণা। মহারাষ্ট্রের সাহিত্যে এবং ধর্ম-শাস্ত্রে তাঁর অধিকার ছিল অপরিসীম। তিনিই সখারামের শিশুমনে মারাঠি সাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন, তাই পরবর্তী-কালে নানা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে বিচিত্র বর্ণে গন্ধে অপরূপ রূপশ্রী ধারণ করে।

বাংলা ভাষার সঙ্গে সখারামের পরিচয় ছোটবেলা থেকেই। যে গ্রামে তাঁরা বাস করতেন, সে গ্রামটি বিহারে পড়লেও তার ভাষা ছিল বাংলা। তাই সখারাম বাঙালি শিশুদের মতই বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর শিক্ষা জীবনের সূত্রপাত হয় বেদ অধ্যয়নের দ্বারা। কিন্তু কিছুকাল পরে দেওঘরের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সখারামের জীবনে এ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ এখানে ভর্তি হয়েই তাঁর জীবনের এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত হয়। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন মাইকেলের প্রখ্যাত চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু। মারাঠার বীর সন্তান শিবাজীর প্রতি যোগীন্দ্রনাথের ছিল অপরিসীম ভক্তি। কিছুদিনের মধ্যেই সখারাম তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। তাঁর কাছ থেকেই সখারাম প্রাচীন বাংলা সাহিত্য এবং ইতিহাস পাঠ করবার প্রেরণা লাভ করেন। তখন থেকেই সখারাম ঐতিহাসিক বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। সেই সব প্রবন্ধের কিছু কিছু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত "সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তরুণ লেখকের পক্ষে এ কম সম্মানের বিষয় ছিল না। ১৮৯০ খৃঃ সখারাম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু উচ্চশিক্ষা লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। ফলে, এইখানেই তাঁর শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই সময়ে সখারামের জীবনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল মনস্বী রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে পরিচয়। রাজ-নারায়ণ বসু শেষ বয়সে দেওঘরে বসবাস করতেন। সখারামের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'আর্যাবর্ত' (অগ্রহায়ণ, ১৩১৯) পত্রিকায় এ সম্বন্ধে লিখেছেন—"তিনি (সখারাম) অবসর পাইলেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের গৃহে যাইতেন। বসু মহাশয় পরম ধার্মিক, সুপণ্ডিত, সাহিত্যানুরাগী ও মজলিশী লোক ছিলেন। সখারাম নানা বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেন।"

।।দুই।।

সখারাম গণেশ দেউস্করের কর্মজীবনও বৈচিত্র্যে ভরপুর। পারিবারিক অভাব-অনটনের জন্য অল্প বয়সেই জীবিকা সংস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। ১৮৯৩ খৃঃ দেওঘর বিদ্যালয়ে মাত্র পনের টাকায় সেকেন্ড পন্ডিত হিসেবে কর্মজীবনের আরম্ভ করেন। কিন্তু সে জীবনও সখার তাঁর কাছে নিষ্কণ্টক ছিল না। দেওঘরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন মিঃ হার্ড। তিনি উক্ত বিদ্যালয়েরও সভাপতি ছিলেন। এই সময় "হিতবাদী" পত্রিকায় মিঃ হার্ডের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ প্রকাশিত হতে থাকে। ফলে সখারাম এবং সেই সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ মিঃ হার্ডের পতিত হন। কিছুদিনের মধ্যেই সখারাম চাকরি ত্যাগ করতে বাধ্য হন, এমন কি দেওঘরে বাস করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। ১৮৯৭ খৃঃ তিনি সপরিবারে দেওঘর পরিত্যাগ করেন। তাঁর জীবনের এই ভীষণ সঙ্কট মুহূর্তে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এগিয়ে আসেন সাহায্যের জন্য। তিনি সখারামকে "হিতবাদী" পত্রিকায় মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে প্রুফরিডারের কাজে নিযুক্ত করেন। ক্রমশঃ তিনি কাব্য-বিশারদের একনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে উঠলেন। বৃটিশের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণে "হিতবাদী"র ভূমিকা সর্বজনবিদিত। এই সময় "আত্মশক্তির পরিণাম" নাম দিয়ে 'হিতবাদী'র পাতায় একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়। বিপিনচন্দ্র পাল এতে খুব চিন্তিত হয়ে ওঠেন। এর কিছুদিন পরেই "রুচি-বিকার" নামে "হিতবাদী"তে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র উক্ত কবিতা প্রকাশের জন্য "হিতবাদী"র বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলায় "হিতবাদী"র পরাজয় ঘটে। এতে কালীপ্রসন্নের মনে একটা প্রচন্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ১৯০৭ খৃঃ সখারামের হাতে "হিতবাদী"র সম্পাদনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে জাপানে যান। সেখান থেকে দেশে ফেরার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন ঐ পত্রিকার পরিচালকবর্গ মাসিক ৯০৲ টাকা বেতনে সখারামকেই স্থায়ী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন। সখারাম খুব দক্ষতার সঙ্গে "হিতবাদী" সম্পাদনার কাজ করে যাচ্ছিলেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এ বিষয়ে লিখেছেন—"তিনি কিরূপ দক্ষতার সঙ্গে এই কর্ম সম্পন্ন করে-ছিলেন—দলাদলির ব্যাপার, রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গাভিঘাতে—তিনি কিরূপ নিপুণতা সহকারে হিতবাদী পরিচালিত করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই।"

কিন্তু সখারামের মত স্বাধীনচেতা মানুষের পক্ষে এই সম্পাদনার কাজ দীর্ঘ-দিন নির্বিঘ্নে পরিচালনা সম্ভব হল না। তিনি সম্পাদক নিযুক্ত হবার চার-পাঁচ মাস পরে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এই অধিবেশন লোকমান্য তিলকের অনুগামীদের দ্বারা দক্ষযজ্ঞে পরিণত হয়। যেদিন এই ঘটনা ঘটে, সেদিনই সুরাট থেকে "হিতবাদী"র স্বত্বাধিকারীরা তিলকের বিরুদ্ধে লেখবার জন্য তার করেন। তিলক ছিল সখারামের রাজনৈতিক গুরু। দেশহিতে উৎসর্গীকৃত তিলকের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি মনে মনে স্থির করেন, বরং ভিক্ষে করে খেতে হয়, তাও ভাল—তবু এ কাজ তাঁর দ্বারা হবে না। তিনি "হিতবাদী"র

সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। 'মতের স্বাতন্ত্র্যে' তাঁহার অকপট অনুরাগ ছিল। জীবিকার জন্য তিনি পরমতের অনুবর্তন ও আত্মমতের বলিদানে সম্মত হন নাই।" 'হিতবাদী' থেকে পদত্যাগের পর তিনি "জাতীয় শিক্ষা পরিষদে" অধ্যাপনা সুরু করেন। কিন্তু এই চাকরীটিও তাঁর বেশিদিন স্থায়ী হল না। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই বিষয়ে লিখেছেন—"সরকার হইতে তাঁহার সামান্য আয়ের উপায় 'দেশের কথা' ও 'তিলকের মোকদ্দমা' পুস্তকের প্রচার বন্ধ হইয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে 'জাতীয় পরিষদে'র শঙ্কিত কর্তৃপক্ষীয়দিগের ভাব বুঝিয়া সখারাম অধ্যাপক পদ ত্যাগ করিলেন।" শেষ জীবনে রোগ ও দারিদ্র্যের আক্রমণে সখারামের শরীর ভেঙে পড়ে। তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র তাঁর আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই বিয়োগ-ব্যথা এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে ১৯১২ খৃঃ ২৩ নভেম্বর দেওঘরের গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন।

তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য এক একনিষ্ঠ সেবকের সেবা থেকে বঞ্চিত হল। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'সাহিত্য' পত্রিকায় লিখেছিলেন—"সাহিত্যসেবীর চিরন্তন অভিশাপ দারিদ্র্য দেউস্করের চিরজীবনের সঙ্গী ছিল। মৃত্যুশয্যায় সেই দারিদ্র্যের যাতনা ও রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গত ৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার প্রভাতে তিনি ধরার বন্ধন ছিন্ন করিয়া পৃথিবীর সুখ-দুঃখের অতীত হইয়াছেন। ভগবান কর্মক্লান্ত, পথশ্রান্ত পথিকের কর্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া করুণার পরিচয় দিয়াছেন। পরলোকে তিনি তাঁহাকে শান্তি দান করুন।" অন্যত্র তাঁর পরলোকগমনে লেখা হয়েছিল—

"তাই হোক, হোক। নিভে চিতানল,
কলসে কলসে ঢাল শান্তিজল।
ধরা-দগ্ধ প্রাণ হউক শীতল—
ভব জনমের হা-হা।
লহ লহ, বন্ধু, মরণ-সম্বল,
জীবনে খুঁজিলে যাহা।"

।। তিন ।।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সখারাম গণেশ দেউস্করের অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। মারাঠি ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেভাবে বাংলা ভাষার সেবা করে গেছেন, তা হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। বস্তুতঃপক্ষে তাঁর রচনার মাধ্যমেই বাংলা এবং মহারাষ্ট্রের মধ্যে একটা আত্মিক সংযোগ স্থাপিত হয়। দেশাত্মবোধ ছিল তাঁর সমস্ত রচনার মূল উৎস। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যথার্থই লিখেছেন—"দেশাত্মবোধের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি বাণীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যেই ইনি সংবাদপত্রের সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। ... ইনি মহারাষ্ট্রীয় হইলেও বঙ্গদেশকে এবং বাঙ্গালীকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের পুষ্টি সাধনকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।"

সখারামের রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'দেশের কথা' গ্রন্থটি সর্বাধিক পরিচিত। এই গ্রন্থে সখারাম ভারতবর্ষীয় শিল্প-বাণিজ্যাদির অধোগতির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। ১৯০৪ সালে গ্রন্থটির প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ সালের মধ্যে এর চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং দশ হাজারের মত গ্রন্থ বিক্রীত হয়। এই গ্রন্থটিতে বৃটিশ শাসন ও শোষণের কুফলগুলিও বিশেষভাবে আলোচিত হয়। তাই তৎকালীন সরকার শেষ পর্যন্ত বইটি বাজেয়াপ্ত করেন। সখারাম এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে নালিশ করেছিলেন। কিন্তু মামলা শুনানীর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই গ্রন্থে সখারাম কি বলতে চেয়েছিলেন তা গ্রন্থের ভূমিকাতেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে তা এখানে নিবেদন করা যাচ্ছে—"জাতীয় মহাসমিতির আরব্ধ কার্যে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে 'দেশের কথা' প্রচারিত হইল। মিঃ উইলিয়াম ডিগবী, সি-আই-ই শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরজী ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি-আই-ই ভারতের দারিদ্র্য ও শিল্প বাণিজ্যের বিনাশ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, বর্তমান পুস্তকের রচনায় তাহাই আমার প্রধান অবলম্বন। ...অনেকেই এই সকল (এই তিনজনের লেখা গ্রন্থ) গ্রন্থের নাম শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু তৎসমূহ পাঠ করিবার সুবিধা অতি অল্প লোকেরই আছে। অবকাশের অভাবেও অনেকে এই অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে পারেন না। যাঁহারা ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাহাদিগের অসুবিধা আরও অধিক। এই সকল শ্রেণীর পাঠকেরা যাহাতে পূর্বোক্ত গ্রন্থনিচয়ের সারমর্ম অবগত হইতে পারেন, তজ্জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তক সর্বজন বোধগম্য ভাষায় রচিত হইল। বিবিধ সরকারী রিপোর্ট ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতেও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।" লেখকের এই দাবী যে অযৌক্তিক হয় নি তা গ্রন্থটি পাঠ করলেই বোঝা যায়। এই গ্রন্থে লেখকের ভাষা ব্যবহারের প্রাঞ্জলতা এবং সহজবোধ্যতা সত্যই ঈর্ষণীয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'র মত 'দেশের কথা' গ্রন্থটিও খুব সহজভাবে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তিনি যে কত সহজভাবে বিষয়টিকে পাঠকের কাছে নিয়ে আসতে পারতেন, তা 'দেশের কথা' থেকে উদ্ধৃতি দিলেই স্পষ্ট হবে। তিনি লিখেছেন—"ভারতের সংবাদপত্রসমূহকে প্রায়ই গভর্ণমেন্টের দোষ কীর্তন করিতে দেখি। গভর্নমেন্টের অনেক দোষ আছে সত্য, কিন্তু তোমাদিগের নিজের দোষই সর্বাপেক্ষা অধিক। তোমরা নিজে কর্তব্য পালন করিবে না, স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর উন্নতিকল্পে সর্বস্বপণে আত্মবিসর্জন করিবে না, শুধু গভর্নমেন্টের দোষ দিলে চলিবে কেন? তোমাদিগের উন্নতি তোমাদিগেরই উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরা সমস্ত সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত মতভেদ বিস্মৃত হও, পরস্পরকে বিশ্বাস কর, ভণ্ডামি ও কপটতা পরিত্যক্ত হউক, সকলে এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, রাত্রিদিন ভুলিয়া এক মনে, এক ধ্যানে উদ্দেশ্য-সংসাধন-পথে অগ্রসর হও, অবিচলিত, অক্ষুব্ধ ও অসন্দিগ্ধচিত্তে কার্যে ব্যাপৃত হও, দেখিবে, আশু তোমাদিগের কামনা পূর্ণ হইবে।"

সখারামের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে 'এটা কোন্ যুগ?' 'মহামতি রাণাডে', 'ঝাঁশীর রাজকুমার', 'বাজীরাও', 'আনন্দীবাঈ', 'শিবাজীর মহত্ত্ব', 'কৃষকের সর্বনাশ', 'শিবাজীর দীক্ষা', 'বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ?' ইত্যাদি। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে অধিকাংশই ইতিহাস বিষয়ক। 'এটা কোন যুগ?' সখারামের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে। এর প্রথম অংশ প্রথমে 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে সেটিই আবার পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। এর পর আরো কয়েক বার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে যুগকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'মহামতি রাণাডে', 'ঝাঁশীর রাজকুমার', 'বাজীরাও', 'আনন্দীবাঈ' এবং 'শিবাজীর মহত্ত্ব' গ্রন্থগুলি এক অর্থে ঐতিহাসিক জীবনীগ্রন্থ। এর মধ্যে আবার 'শিবাজীর মহত্ত্ব' গ্রন্থটি কলকাতায় শিবাজী মহোৎসব উপলক্ষে রচিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সখারামই বাংলাদেশে শিবাজী মহোৎসবের প্রবর্তক।

এ-ছাড়াও মাসিক পত্র-পত্রিকায় সখারামের অজস্র রচনা ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে অনেক কটি প্রবন্ধই মহারাষ্ট্রীয় জীবন ও সাহিত্যের উপর। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের কথা এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে—'সাহিত্য' পত্রিকায় 'মহারাষ্ট্রীয় ভাষার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব', 'পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ', 'মহারাষ্ট্র সাহিত্য', 'মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপকরণ', 'মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয়', 'মালবে মহারাষ্ট্র অধিকার', 'মহারাষ্ট্রে শক-শোণিত', 'ভারতী' পত্রিকায় 'যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল', 'বৈদিক আলোচনা', 'বঙ্গীয় শব্দোৎপত্তি রহস্য' প্রভৃতি।

ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সখারাম অজস্র রচনা লিখেছেন। কিন্তু সমস্ত রচনার মূলেই ছিল তাঁর দেশাত্মবোধ। এই দেশাত্মবোধই তাঁর ব্যক্তিত্বকে পরিশীলিত করেছে। জীবন সংগ্রামে দিয়েছে প্রেরণা। মহারাষ্ট্রের সন্তান হয়েও বাংলাদেশ, বাঙালী জাতি এবং বাংলা ভাষাকে তিনি যেভাবে আপন করে নিয়েছিলেন তা ভারতীয় ইতিহাসে এক দুর্লভ ঘটনা। বাংলাদেশের সাহিত্য ও সমাজ জীবনে সেই দুর্লভ ঘটনার নিদর্শন হিসেবে তিনি সহৃদয় পাঠক সমাজে অভিনন্দিত হবেন। সেই দুর্লভ আসনে প্রতিষ্ঠিত রেখেই বাংলাদেশ তাঁকে চিরকাল শ্রদ্ধা জানাবে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

গুরু নানকের পদাবলী

এই বছরটি গুরু নানকের পঞ্চদশ জন্মবার্ষিকীর জন্য চিহ্নিত। ইতিমধ্যে কয়েকটি উৎসব অনুষ্ঠানে এই মহান ধর্ম-গুরুর জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়েছে। গুরু নানক শুধু মাত্র শিখ সম্প্রদায়ের আদি গুরু তা নয়, তাঁর বাণীতে আছে বিশ্বজনীন আবেদন, মানবজাতির দুর্দশা ও দুর্গতি দূরীকরণে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। ভারতপথিক গুরু নানকের বাণীর মধ্যে যে ভারতআত্মার শাশ্বতবাণী নিহিত আছে তা রবীন্দ্রনাথ অনেকবার উল্লেখ করেছেন। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ে গুরু নানকের প্রচারিত শিখধর্ম প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালী মনীষী এই মহা-পুরুষের বাণীতে এক নতুন আলোর সন্ধান লাভ করেছিলেন, তাই রজনীকান্ত গুপ্ত, কুমুদিনী মিত্র (পরে বসু), শরৎকুমার রায়, যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গুরু নানকের বাণী ও জীবন সাধনার সঙ্গে বাঙ্গালীর পরিচয় সাধন করেছেন। নব-বিধান ব্রাহ্মসমাজ গুরু নানকের কিছু স্তব তাঁদের 'শ্লোক-সংগ্রহে' সংকলন করে-ছিলেন। বাঙ্গালী এই মহাসাধকের সঙ্গে দীর্ঘদিন পরিচিত; এমন কি প্রথম মহা-যুদ্ধের পর যে সব গবেষক শিখজাতির ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করে নতুন আলোকপাত করেছেন তাঁদের মধ্যে ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। বাকী তিনজন গবেষকই পাঞ্জাবী এবং তাঁদের নাম সীতারাম কোহলী, হরিরাম গুপ্ত এবং গানদা সিং। শিখদর্শনের নবমূল্যায়ন এঁদের গবেষণার ফলশ্রুতি।

গুরু নানকের এই পঞ্চশত জন্ম-বার্ষিকীতে ইউনেসকো তাঁদের প্রতিনিধি স্থানীয় ভারতীয় রচনাবলী সিরিজে প্রকাশ করেছেন 'হিমস অব গুরু নানক'—এবং এই অনুবাদ করেছেন একালের বিশিষ্ট শিখ লেখক খুশবন্ত সিং। গুরু নানক যে সব পদ রচনা করেছেন বা গান করতেন তার একটি নির্বাচিত সংকলন অনুবাদ কর্মে খুশবন্ত সিং যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। খুশবন্ত সিং গুরুমুখী এবং ইংরাজী উভয় ভাষাতেই সুপন্ডিত, তাই একথা মনে করা অসঙ্গত হবে না যে, তাঁর অনুবাদে মূলের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে।

ধর্ম-নিরপেক্ষ বর্তমান ভারতবর্ষে সকল প্রকার ধর্মমতের প্রতি সমান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সকলের কর্তব্য, তা ছাড়া ধর্মের উদার বিশ্লেষণে সকল ধর্মই যে এক, তার শিক্ষা এ যুগের মানুষ পেয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন 'যত মত তত পথ'। তাই শিখগুরু নানকের বাণী বা তাঁর পদাবলী ভারতীয়দের কাছে এক পরম পবিত্র উত্তরাধিকার। এই পদাবলীর মধ্যে আছে উদার বিশ্বজনীনতা আর সেই দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁর প্রচারিত মতবাদকে এতখানি শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

গুরু নানক একদিন এক মসজিদে কাবার দিকে পা রেখে শুয়েছিলেন। একজন তাঁর এই অর্বাচীনের মত কান্ড দেখে উত্তেজিত হয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে বলল—'করেছ কি! ওদিকে যে কাবা!' গুরু নানক উত্তরে বলেছিলেন, 'তাহলে যেদিকে ঈশ্বর নেই সেই দিকে আমার পা ফিরিয়ে দাও।' ঈশ্বরকে যে কোনো এক বিশেষ ধর্মমতের গন্ডীতে বেঁধে রাখা যায় না, কোনো একটি বিশেষ স্থানে বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছে তিনি বাঁধা নেই এই বিশ্বাস ছিল গুরু নানকের। তাই তাঁর ধ্যানের দেবতাকে সকল ধর্মমত বিশ্বাসী মানুষই পূজা করতে পারে—তিনি এক এবং অখন্ড। গুরু কা লঙ্গার—বা গুরুর রন্ধনশালায় সকল জাতের মানুষ এসে পরমানন্দে অন্ন গ্রহণ করতে পারে। সেখানে জাতের নামে কোনো রকম বজ্জাতি নেই।

গুরু নানকের মতে সকল মানুষ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সমান, তাঁকে যারা পরম সত্য বলে বিশ্বাস করে তিনি তার। ঈশ্বরের ভূমিকা পিতার, ও পিতা নেহসি—এই সুরটিই যেন তিনি তাঁর মূলমন্ত্র বলে গ্রহণ করেছেন—তুমি আমাদের পিতা—আর সকল মানুষ আমাদের ভ্রাতা। সত্যকে উপলব্ধি

করার পথ বিভিন্ন হতে পারে, তবে ঠিক পথে চালিত হলে সেই পরম রূপকে পাওয়া যায়, কৃষ্ণরূপে, বুদ্ধরূপে, খৃষ্টরূপে, নানকরূপে।

গুরু নানক তাই বলেছেন—কাল কেবল নাম আধার—এই কালে (কলিযুগে) নামগান করাই মানুষের মোক্ষের পথ এবং তার দ্বারাই উপলব্ধি সম্ভব। হিন্দু ধর্মমতেও বলা হয়েছে—কলিতে নাম সংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ পূজা। শুনিতে বিষম কলি, সুসম তরিতে, কারণ, নামগানে সব পাপ দূর হয়।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে এম এ ম্যাকলিফ ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ 'দি শিখ 'রিলিজিয়ন' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছিলেন যে, শিখধর্ম প্রায় অপরিচিত ধর্ম। তাঁর এই গ্রন্থ প্রকাশের পর শিখধর্ম সম্পর্কে সর্বত্র আগ্রহ সঞ্চারিত হয়। ম্যাকলিফ পাছে কারো ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে এই আশংকায় গ্রামীণ নিরক্ষর মানুষের কাছ থেকেও যে-সব কাহিনী শুনেছেন তা লিপিবদ্ধ করেছেন। ম্যাকলিফ শিখ স্তবমঞ্জরী অনুবাদ করেছেন এবং এই অনুবাদ অতিশয় আক্ষরিক করার চেষ্টায় তাঁর অনুবাদের সাহিত্যরস ক্ষুন্ন হয়েছে। তার ফলে মধুর পাঞ্জাবী গীতাবলী নিরাভরণ গদ্যে পরিণত হয়েছে।

১৯৬০ খৃষ্টাব্দে শিখ পণ্ডিতগণ অনূদিত 'সেকরেড রাইটিংস অব দি শিখস' ইংলণ্ডের এ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন কর্তৃক প্রকাশিত হওয়ার ফলে শিখগুরুদের রচনার কিছু কিছু পরিচয় লাভ সম্ভব হয়েছে। গুরু নানকের আদি গ্রন্থের ৯৭৪টি পদের মধ্যে অনেকগুলি এই সংকলনে অনূদিত হয়েছে এবং অনুবাদক খুশবন্ত সিং নিজে এই অনুবাদকর্মের সাফল্যে খুসী।

এই সংকলনের প্রথম অংশে গুরু নানকের আটাশো পৃষ্ঠাব্যাপী জীবনী আছে এবং আরো দুটি পরিচ্ছেদে 'ধর্মীয় উত্তরাধিকার' এবং গুরুজীর বাণী বিষয়ে আলোচনা আছে। বলা বাহুল্য এই তিনটি পরিচ্ছেদই সুলিখিত এবং শিখধর্ম সম্পর্কে যাঁরা বিশেষ অবহিত নন তাঁদের পক্ষে মূল্যবান।

গুরু নানকের আদি গ্রন্থে আছে—'ঈশ্বরের সেবাকর্মে তোমার বুদ্ধি প্রয়োগ কর, সেইভাবে জ্ঞান আহরণ কর। যা পড়ছ তা উপলব্ধি করার জন্য মস্তিষ্কের ব্যবহার করো, যা পড়ছ তা বুঝবার চেষ্টা করো এবং দাতব্য খাতে ব্যয় করো। এই একমাত্র পথ—বাকী সব শয়তানের কর্ম।'

'আকলি সাহিব সেবেয়াই, আকলি
পায়েয়াই মান
আকলি পড়কে বুঝেয়াই, আকলি
কি চাই দান,
নানক আখাই রাহ এ ওহর গলা
শয়তান।'

এই সমস্ত পদাবলী ১৮টি বিভিন্ন রাগে গেয়। এই সব পদাবলী কোন সময়ে, কি উপলক্ষে রচিত তার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। নানকের সঙ্গে সর্বদা একটি ঝুলি থাকত তার নাম 'জমে সখী', তিনি যা লিখতেন তা সবই তার ভিতর রাখতেন। মনে হয়, তিনি এবং তাঁর সহচর মুসলিম বাদ্যকর মরদানা কোন রাগে এই পদগুলি গাইতে হবে তা স্থির করে দেন। গুরু অর্জুনের মতে ৯৮৫টি পদ গুরু নানকের রচনা বলে স্বীকৃত হয়, তবে এই পদাবলীর কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না।

গুরু নানকের 'জপজী' একটি বিখ্যাত প্রভাতী প্রার্থনা। গুরু নানকের 'জপজী' পূর্বেও বাংলায় অনূদিত হয়েছে এবং সম্প্রতি নতুন করে বাংলায় অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক সুধীর গুপ্ত।

জপজী শিখদের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা মন্ত্র। গুরু অর্জুন (পঞ্চম গুরু) যখন আদি গ্রন্থ সংকলন করেন তখন এই রচনাটিকে প্রথম স্থান দেন। কিছু শিষ্য অনুযোগ করেন যে, এই পদগুলি জটিল এবং ভাষাও তেমন প্রাঞ্জল নয়। এর ব্যাখ্যা স্বরূপ আরো পদ সংযোজন করা প্রয়োজন। তখন গুরু অর্জুন বলেন যে, সমগ্র আদি গ্রন্থই 'জপজীর ব্যাখ্যা অংশ।

জপজী সম্ভবতঃ ১৫০০ থেকে ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে রচিত। সুলতানপুরে যখন তাঁর অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি ঘটে সেই কালের রচনা। শিখ পণ্ডিতগণের মতে জপজী, আশা-দি-বার, সিদ্ধ গোষ্ঠ এবং 'বরা-মা' সম্ভবত গুরু নানকের পরিব্রাজ্যার কালের অন্তে রচিত, কারণ এই সব কবিতার মধ্যে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা ও পরিণত মানসের ছাপ আছে।

খুশবন্ত সিং জপজী, শ্রীরাগ, বরা-মাঝ, রাগ গৌড়ী, রাগ আশা, আশা-দি-বার, রাগ গুজরী, রাগ বাধান, রাগ সোরথ, রাগ ধনশ্রী, রাগ তিলঙ, রাগ সুহী, রাগ বিলাওল, সিদ্ধ গোষ্ঠ ও বরা-মা অনুবাদ করেছেন। আমরা মূল পদাবলীর সঙ্গে পরিচিত নই, তথাপি খুশবন্ত সিং-এর অনুবাদ পাঠে মনে হয় যে মূলের সুর তিনি অনুবাদে আনতে সক্ষম হয়েছেন। গুরু নানকের এই পদাবলীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ও গীতালীর কবিতা ও গানের কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তার কারণ গুরু নানকও রবীন্দ্রনাথের মতো উপনিষদের অনুসরণ করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। গুরু নানকের রচনায় উপনিষদ ছাড়া আরো কয়েকটি হিন্দু ধর্মগ্রন্থের কিছু কিছু প্রভাব দেখা যায়। গুরু নানকের পদাবলীর মতো এই মূল্যবান গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশের আয়োজন করার জন্য ইউনেসকো সর্বসাধারণের কাছে অভিনন্দনযোগ্য।

—অভয়ঙ্কর

HYMNS OF GURU NANAK : Translated by KHUSWANT SINGH : Published by Orient Longmans : Price Rs. 12.50P.

সাহিত্যের খবর

যে যাই বলুক, কলকাতা কিন্তু এখনও বিদেশীদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের বিষয়—বিশেষ করে বিদেশী শিল্পী-সাহিত্যিকদের কাছে। কলকাতাকে না দেখলে ভারতকে জানা যায় না। তাই কলকাতায় বিদেশী লেখকদের প্রায়ই আসতে দেখা যায়। এবার এসেছিলেন দুজন রুমানিয়ান ঔপন্যাসিক। এঁদের নাম আলেকজান্দ্রু ইভাসিয়েভ ও ফানুস নাগু। গত ৮ ডিসেম্বর, সন্ধ্যায় 'সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন' কর্তৃক আয়োজিত এক 'চা-চক্র' অনুষ্ঠানে ইভাসিয়েভ যোগদান করেন কলকাতার বিশিষ্ট বাঙালী এবং অবাঙালী কবি ও লেখকরা উপস্থিত ছিলেন সেদিনের অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সতীকান্ত গুহ। তিনি প্রথমে অতিথি লেখকদের পরিচয় করিয়ে দেন সকলের সঙ্গে। এর পর ইভাসিয়েভ বলেন, ভারতে এসে তিনি ভারতীয় জীবনযাত্রার ছবি দেখে মর্মাহত হন। তিনি জানতে চান, কিভাবে এখনও ভারতীয়রা সেই বৈদিক যুগের আদর্শকে বজায় রেখেছেন? এখনও কেন যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে স্নানান্তে ভারতীয়রা সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করেন? এর উত্তর দেন অন্নদাশঙ্কর রায়। তিনি ভারতীয় জীবনধারার পরিবর্তনের ছবিটি পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেন। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে একাল পর্যন্ত ভারতীয় জীবনের যে পরিবর্তন, তার দার্শনিক দিকগুলিও তিনি প্রসঙ্গত বর্ণনা করেন। ইভাসিয়েভ প্রসঙ্গত বলেন—'ভারতে আসার পর এই সর্বপ্রথম একটা সাহিত্যিক সমাবেশে মিলিত হয়ে খুব আনন্দ পেলাম। দিল্লিতে সাহিত্য আকাদামিতে গিয়েছিলাম। সে বড় ফর্মাল ব্যাপার। বেনারসে একটা হিন্দি সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলাম। ওঁদের মনোভাব আমাকে ব্যথিত করেছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে ওঁদের একজন কর্মকর্তা আমাকে বলেন বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানার আগ্রহ তাঁদের নেই। বাংলা দেশে বিশেষ করে এই সাহিত্য সমাবেশে শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব আলোচনা হল, তা যদি প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা আমার না হত, তাহলে ভারত সম্বন্ধে ভিন্ন ধারণা নিয়ে আমি দেশে ফিরতাম।' ডঃ লোকনাথ ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, রুমানিয়ায় লেখকরা আর্থিক সঙ্কটে ভোগেন না। লেখক সংস্থা থেকে তাঁদের নিয়মিত সাহায্য করা হয়। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—'রাশিয়ার কাছে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনাকে রুমানিয়ার অধিবাসীরা একেবারে উড়িয়ে

দেন না।' আশিস সান্যাল 'বেংগলী লিটারেচার' পত্রিকার একটি সেট তাঁকে উপহার দেন। তিনি পত্রিকাগুলি পেয়ে খুব আনন্দ প্রকাশ করেন। ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী যখন তাঁকে জানান যে, বাংলায় রুমানিয়ান কবিতার একটি অনুবাদ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, তখন তিনি বাঙালী লেখকদের এই ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি রুমানিয়ান ভাষায় অনুদিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি গল্পের প্রশংসা করেন। মণীন্দ্র রায় রুমানিয়ান সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। গণেশ বসু, গৌরাংগ ভৌমিক, শিশির ভট্টাচার্য, অমল ভৌমিক, নিখিলেশ গুহ প্রমুখও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

কুচবিহারে গত ১৬ নভেম্বর একটি সাহিত্য-সভা অনুষ্ঠিত হয়। অমিয়ভূষণ মজুমদার ঐ সভায় সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সাধারণ লেখক এবং যথার্থ লেখকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেন—'লেখক দৃশ্যত সাধারণ মানুষের মত। কিন্তু আমরা সাধারণ লোক থেকে একজন লেখকের পার্থক্য এখানেই বুঝব, যেখানে লেখকের ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণ লোক থেকে ভিন্নতর। এই ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গীই গড়ে তুলবে লেখকের ব্যক্তিসত্তা, যা সাধারণ দৃষ্টিতে উদ্দেশ্যহীন মনে হলেও সার্বিক আবেদনে ক্ষুণ্ণ হয় না। তাই প্রত্যেক লেখক নিজেই নিজের অধীশ্বর।' সভায় তরুণ গল্পকার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। যাঁরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে রণজিৎ দেব, নীরজ বিশ্বাস, হরিপদ মুখোপাধ্যায়, নিখিল ভট্টাচার্য, সমীর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা কবিতা পত্রিকার ইতিহাসে "একক" পত্রিকার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সুদীর্ঘ দিন ধরে যে রকম নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদক শুদ্ধসত্ত্ব বসু পত্রিকাটি প্রকাশ করে আসছেন, তার প্রশংসা অবশ্যই করতে হবে। সম্প্রতি পত্রিকাটির শততম সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ চলছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা থেকে কবিতা অনুবাদ করে উক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে বলে জানা গেছে। পত্রিকাটির সফলতা কামনা করি।

গত বছর ইতালীর 'বেস্ট সেলার' সম্মান লাভ করেছে একটি উপন্যাস। উপন্যাসটির রচয়িতা জির্জিও বাসানি। উপন্যাসটির নায়কের নাম এডগার্দো লিমেন্টানি। একজন ইহুদী। কিছু জমি-জমারও মালিক। ব্যক্তিগত জীবনে সে ভীষণ অসুখী। আধুনিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সে ভীত। তার সমসাময়িক মানুষদের থেকে সে সব সময়ই দূরে দূরে থাকে। নিজের এই চরিত্র সম্বন্ধে সে সচেতন। কারণ, সে জানে ভেতরে সে একজন 'মৃত মানুষ'। হতাশা এবং শূন্যতাবোধ তাঁর সমস্ত চরিত্রকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই কখনো কখনো ভ্রমণে যাওয়া, কিম্বা শিকারে যাওয়া, কিম্বা নারীসংগম ইত্যাদি সব কিছুই তার সেই শূন্যতাকে ভুলে থাকার অবলম্বন। যখন এসবেও তার কিছু হল না, তখন সে আত্মহত্যা করবে বলে মনস্থির করল। অনেক সমালোচক বাসানির এই রচনা-রীতিকে ফ্লবেয়ারের রচনারীতির সমধর্মী বলে উল্লেখ করেছেন। একথা অবশ্য অস্বীকার করবার উপায় নেই, লেখক কেবল কতকগুলি চিত্রকে সময়ের রঙে রঞ্জিত করে পরিবেশন করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এমন একটি গুণ আছে, যা পাঠক চিত্তকে মথিত করে।

স্টিফান দিচেভ বর্তমান বুলগেরিয়ার একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। সম্প্রতি তাঁর 'র‍্যালি' উপন্যাসটি ইংরেজিতে অনুদিত হয়ে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ করেছে একটি বেসরকারী প্রকাশন সংস্থা। অনুবাদ করেছেন মার্গারেট রবার্টস। এই বইয়ের অলংকরণ করেছেন প্রখ্যাত বুলগেরিয়ান শিল্পী লিলিয়ানা দিচেভা। বুলগেরিয়ার সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ হল ব্রাসেলস থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক কবিতা পত্রিকা 'লা জার্ণাল দ্য পোয়েটস'-এ বারজন বুলগেরিয়ান কবির কবিতার অনুবাদ প্রকাশ। যে বারজন কবি অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, তাঁরা হলেন—আতানাস দালচেভ, ব্লাগা ডিমিট্রভা, জর্জি জিজাগারভ, ভ্লাদিমির বাশেভ, কাসাশেলোভক, পাভেল নতেভ, ভানিয়া পেটকোভা, লেভচেভ, স্টাঙ্কা সানচেভা, এবং পিটার কারানগভ।

বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ রচনার জন্য এই বছর ইউনেসকো পুরস্কার পেয়েছেন ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ। এঁর 'বিজ্ঞানের বিচিত্রবার্তা' গ্রন্থটির জন্যেই এই পুরস্কার। উক্ত গ্রন্থে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে ১৭টি ভিন্নার্থক রচনা সন্নিবেশিত। বিশেষ করে 'হিবিয়ার অশ্রু' 'পেট্রোল যদি ফুরায়' এবং 'চলো যাই চাঁদের দেশে' এই তিনটি প্রবন্ধ বিশেষ চিত্তাকর্ষক। পুরস্কারের আর্থিক-মূল্য এক হাজার চারশ' টাকা।

জানা গেল ডঃ গুহের বিজ্ঞানভিত্তিক অপর একটি রচনা 'আকাশ ও পৃথিবী' ১৯৬৪ সালে রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়। ডঃ গুহ বর্তমানে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত।

নতুন চীনের কবিতা —ময়ূখ বসু সম্পাদিত। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রা) লিঃ কলিকাতা—১২। দাম তিন টাকা মাত্র।

নতুন চীনের এক আশ্চর্য রূপান্তর ঘটেছে। অথচ আমরা বর্তমানে সেই বিরাট দেশের মানুষের চিন্তার জগতে কি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে তার পরিচয় পাই না। নতুন চীনের কবিতা সেই কারণে এক মূল্যবান সংযোজন। বাংলা সাহিত্যেও আজ দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এই নবযুগের সন্ধিক্ষণে ময়ূখ বসু নতুন চীনের কবিতার সংকলনটি সম্পাদনা করার জন্য অবিমিশ্র প্রশংসার অধিকারী হয়েছেন। এই কাব্য-গ্রন্থে হো চিং শী, সুহান, এসেমা, চা, সাও সুং, পাও-যু-তাং, ঈন ফু, লু উ ও মাও সে তুঙ, কুও হাসিয়াও, চুয়াং কাওচি, এমি সিয়াও, ওয়েন চিয়ে ও সৌউ, তি ফান, চ্যাং চি, লিপো, ওয়াং উই, ইয়েন চেন, লি-ইয়াং ফং, তুফু, পাই, চু-ই, চিয়াং চি, ইয়েন তাই-ইং, চেন জান, ইয়ে তিং, তেং চুং সিয়া, হুয়াং চেং, অনামী, চ্যাং-চু, পাই-চু য়ি, প্রভৃতির কবিতা আছে। কবিতাগুলির সঙ্গে কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে। কবিতাগুলি অনুবাদ করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, হরপ্রসাদ মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, গণেশ বসু, দুর্গাদাস সরকার, ময়ূখ বসু, প্রভৃতি খ্যাতনামা প্রবীণ ও নবীন কবিবৃন্দ। ইয়ে তিং-এর বন্দীর গান কবিতাটির প্রথম লাইনটি চমৎকার—'মানুষের দরজায় শক্ত তালা। খোলা শুধু কুকুরের গর্ত।' প্রেমেন্দ্র মিত্র অনুদিত আমার স্বীকারোক্তি কবিতার শেষ চারটি লাইন চমৎকার—'মৃত্যুর মুখে চেয়ে আমি হাসি। শয়তানের প্রাসাদ কেঁপে ওঠে সে হাসিতে। সাম্যবাদীর এই স্বীকারোক্তি/মরণের ঘণ্টা বাজে তোমাদের পাপের রাজত্বের।' প্রেমেন্দ্র মিত্র আটটি কবিতা অনুবাদ করেছেন। মনোজ বসু অনুবাদ করেছেন দুটি কবিতা। মনোজ বসুর অনুদিত হো চিং শীর কবিতার কয়েকটি লাইন—ওই দেখ, লাল পতাকা উড়ছে দিকে দিকে। এক নতুন যুগ আর নতুন পৃথিবীর জন্ম হচ্ছে আজ/পুরোনো পৃথিবীকে পিছু ফেলে/অতীত ইতিহাসকে মাড়িয়ে।

মণীন্দ্র রায় অনুবাদ করেছেন ও সৌউ তি-ফানের একটি 'সাম্প্রতিক কবিতা' 'কঙ্গোর জলাধারা'—সেই কবিতাটির শেষের কটি লাইন—'কঙ্গো এখন শিকল-ছেঁড়া দৃপ্ত এবং স্বাধীন/দেশবাসীরা সতর্ক

আজ, জঙ্গী কোতোয়াল/বেটন হাতে চালাও এবার পথের যতো যাত্রী অন্ধ ধরে ঠেকাও তুমি হাবিলদারের পাল। কণ্ঠো থেকে তফাৎ হটো রাজ্যলোভী যতো দুনিয়া জোড়া পাহারা আজ বন্ধু শত-শত।'

প্রতিটি কবিতার মধ্যে আছে নবজাগরণের কল্পনা। মন্মথ বসুর সম্পাদিত এই সংকলন গ্রন্থটি বিদগ্ধ মহলে সমাদৃত হবে।

চলো যাই দূরদেশে (ভ্রমণ কথা)—**দিলীপ মালাকার। প্রকাশক পাপিরাস, ৯, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯। দাম দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।**

শ্রীদিলীপ মালাকার দীর্ঘকাল য়ুরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করেছেন এবং সেই সূত্রে সর্বত্র ভ্রমণ করেছেন। তাড়াহুড়ো করে ভ্রমণ করা নয়, এক জায়গায় দীর্ঘদিন হাজির থেকে সেখানকার খুঁটিনাটি দেখে তার কথা লেখার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব আছে। শ্রীমালাকারের বলার ভঙ্গীটি মনোরম। তিনি অতি সহজ ভঙ্গীতে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় যে সব অঞ্চলে গিয়েছিলেন তারই বিবরণ মাঝে মাঝে বাংলা সাময়িকপত্রে লিখেছিলেন। 'চলো যাই দূর দেশে' গ্রন্থে লেখক সেই সব রচনা সঞ্চয়ন করে প্রকাশ করেছেন। শ্রীমালাকারের এই ভ্রমণ-চিত্রাবলী পড়ার সময় মনে হয় লেখক যেন স্বয়ং উপস্থিত থেকে তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ দান করছেন। সাধারণত আমরা যে সব ভ্রমণকথা পাঠ করি তার মধ্যে অতিশয় তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় এবং গাল-গল্পের প্রাধান্য থাকে এত বেশী যে নীর থেকে ক্ষীরটুকু গ্রহণ করা কঠিন হয়ে ওঠে. এই গ্রন্থের লেখক কিন্তু অবান্তর বর্ণনায় গ্রন্থটির পৃষ্ঠা বৃদ্ধি না করে ঠিক যেটুকু পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্তি করতে পারে সেইটুকুই পরিবেশন করেছেন. সেই কারণে তাঁর এই গ্রন্থটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। চলো যাই দূর দেশে গ্রন্থটিতে কয়েকটি ছবিও আছে। এই গ্রন্থের শেষাংশে চমৎকার গল্প আছে। এই গল্পগুলি ছোটদের জন্য লেখা হলেও গল্পগুলি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। ওয়াল্দ গল্পের কুকুর, জীবন্ত ফানুসে, কে মরিসের বন্ধু এবং তার মৃত্যুতে তার শোক পাঠককে অভিভূত করে। পুলিশ পুলিশ খেলা, আপেল চোর, জমিদার কাহিনী, প্রতিধ্বনি ও টিরোলের দেশপ্রেমিক গল্পগুলি আকারে ছোট হলেও গল্প হিসাবে সার্থক, বিশেষত টিরোলের দেশপ্রেমিক গল্পটি। গ্রন্থটির মুদ্রণ পারিপাট্য ও প্রচ্ছদ প্রশংসনীয়।

নকশালবাড়ী (উপন্যাস)—**চোজং জামা। আনপ্রতিভা প্রকাশালয়। চাকুরিয়া: ২৪ পরগণা। দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।**

রাজনৈতিক উপন্যাস লেখা হচ্ছে এখন সারা পৃথিবীতে। কোথাও অতি-বর্তমানের [illegible] স্পর্শ করার প্রয়োজনে। সাম্প্রতিককালের উত্তপ্ত ঘটনাবলী লেখকদের উপাদান যোগায়।

'নকশালবাড়ী' নামটা শুনলেই অনতি-অতীতের স্মৃতি মনে পড়ে। বাস্তব পটভূমিকা ও পরিবেশের অন্তরালে অবশ্য গড়ে উঠেছে লিরিকধর্মী অন্য এক প্রেমের কাহিনী। লেখাপড়া জানা রাজবংশীয় মেয়ে উর্মিলার সঙ্গে চাষী যুবক কেল্টো প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু অজানা এক অনির্দেশ্যের আহ্বানে বাসরঘর থেকে পালিয়ে যায় কেল্টো।

তরাই অঞ্চলের মৌখিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে সংলাপে ও আংশিকভাবে বর্ণনায়। পড়তে মন্দ লাগবে না।

রবীন্দ্র অভিধান (৪র্থ খণ্ড)—**সৌমেন্দ্রনাথ বসু। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১ শংকর ঘোষ লেন। কলকাতা-৬। দাম ছয় টাকা।**

রবীন্দ্রনাথের বিরাট সৃষ্টি-ভান্ডারে ছড়িয়ে আছে অফুরন্ত সম্পদ। প্রয়োজনীয় উপাদান এর থেকে সংগ্রহ করা খুবই দুঃসাধ্য। রবীন্দ্র সাহিত্যের উৎসাহী পাঠক দীর্ঘকাল এই অসুবিধায় বিব্রত ছিলেন। শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ বসু 'রবীন্দ্র অভিধান' রচনা করে একটি মহৎ জাতীয় কর্তব্য পালন করছেন। ইতিমধ্যে চারটি খণ্ড বেরিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্যের উল্লেখযোগ্য প্রথম পংক্তি প্রয়োজনীয় নাম, গ্রন্থ শিরোনাম, গানের পংক্তি প্রভৃতি খুঁজে পাওয়ার সহজ সূত্র আছে এই অভিধানে। কোন গানটি কোন নাটকে আছে, সেই সংগে স্বরবিতানের স্বরলিপি সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। ঠিক অনুরূপভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ বিষয়কে। খুব সহজেই কোন গল্প বা কবিতার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রমানসিকতার বিশেষ বিশেষ পর্যায় এবং আন্তরিকতাই শ্রীবসুর এই দুঃসাধ্য কাজের অন্যতম সহায়ক। আশা করা যায় তিনি রবীন্দ্র অভিধান রচনার কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন।

ফোটা-ফুল (কবিতা পুস্তিকা)—**বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউ সাধনা প্রকাশনী ৩৯, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা—৬। দাম ঃ এক টাকা।**

নামকরণের মধ্যেই কবিতাগুলির সার্থকতা নিহিত। লিরিকধর্মী, প্রথাগত ভঙ্গিতে লেখা। আধুনিক কবিদের ভালো লাগবে না। কারো কারো লাগবে।

অমরবাণী—ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস, কলকাতা—১৩।

দেশ-বিদেশের মনীষীদের নির্বাচিত বাণী-সংকলন। নানা সময়ে অনেকের কাজে লাগবে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান—**সম্পাদক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। পি-২৩ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা—৬। দামঃ দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।**

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পত্রপত্রিকা বেশী নেই। বিশেষ করে, বিজ্ঞানের কঠিন সমস্যাগুলিকে জনপ্রিয় ভঙ্গিতে প্রকাশ করার উদ্যম প্রায় হয় নি বললেই চলে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' বাইশ বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় উভয় ধারার রচনা প্রকাশ করে এসেছে। এ সংখ্যায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা লিখেছেন প্রিয়দারঞ্জন রায়, বলাইচাঁদ কুণ্ডু, জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, রমেশ দাশ, সুখেন্দুবিকাশ কর, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, প্রবোধকুমার ভৌমিক এবং আরো কয়েকজন। দু-একটি লেখা সমাজ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত। কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তরটি সত্যিকারের আকর্ষণীয় বিভাগ। 'আলকাতরা', 'জীবন্ত ঘড়ি', 'পদার্থ ও বিপরীত পদার্থ' সম্পর্কে কয়েকটি লেখা ছাপা হয়েছে। পত্রিকাটি জনপ্রিয় হলে আমরা খুশি হবো।

কবিপত্র (সংকলন ২০) — **সম্পাদক তুষার চট্টোপাধ্যায় ও পবিত্র মুখোপাধ্যায়। ১২২।১।১-এইচ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা—২৬। দাম ঃ এক টাকা।**

দশ বছরে কুড়িটি সংকলন বেরিয়েছে কবিপত্রের। দীর্ঘ এক দশকের কবিতার আন্দোলনের সঙ্গে পত্রিকাটি কম-বেশী জড়িত। এ সংকলনে লিখেছেন বিমলচন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, হরপ্রসাদ মিত্র, তরুণ সান্যাল, দীপেন রায়, লোকনাথ ভট্টাচার্য, সত্য গুহ, অঞ্জন কর, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তুষার চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। তাছাড়া রয়েছে আলোচনা, যা চিন্তার খোরাক জোগাবে।

বর্ধমান সংস্কৃতি-কথা—**সম্পাদক ননীগোপাল দত্ত। বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদ, ১ মহতাব রোড, বর্ধমান।**

আঞ্চলিক বা জেলাওয়ারী সংস্কৃতি-আলোচনার কোনো স্থায়ী বা নিয়মিত-সাহিত্যপত্র নেই পশ্চিমবঙ্গে। বর্ধমানের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য বিষয়ে লিখেছেন জগদ্বন্ধু রায়, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অনিল মণ্ডল, সত্যনারায়ণ দাশ, ননীগোপাল দত্ত, হরিহর দে, মদন পাল, সুবোধ মুখোপাধ্যায় ও আরো কয়েকজন। আমরা পত্রিকাটির সাফল্য কামনা করি।

শতরূপা (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)—**সম্পাদক নির্মলকুমার খাঁ। ১৪ মাকড়দহ রোড, কদমতলা, হাওড়া—১। দাম ঃ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।**

গল্প-উপন্যাস-নাটক, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও কবিতায় শতরূপার প্রথম সংখ্যাটি আকর্ষণীয় হয়েছে। পত্রিকাটির সম্পাদক-

মণ্ডলীর সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখেছেন তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, বিমান বিহারী মজুমদার, পুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বোধিসত্ত্ব, বটকৃষ্ণ দাশ, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, প্রদোষ দত্ত এবং আরো অনেকে।

উত্তরকাল (৪র্থ-৫ম সংকলন)—সম্পাদক শিবেন চট্টোপাধ্যায় ।। ৭ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯ ।। ত্রিশ পয়সা।

শিল্পসাহিত্যের এই মাসিক পত্রিকাটি ইতিমধ্যে শহর ও শহরতলির পাঠকমহলে যথেষ্ট পরিচিতি পেয়েছে। আমরা পূর্ববর্তী সংকলনগুলিতে লক্ষ্য করেছি সম্পাদকের নিষ্ঠা ও রচনা-নির্বাচনের স্বাতন্ত্র্য। বর্তমান সংকলনে চিন্মোহন সেহানবীশ, অশোক সেন, ধনঞ্জয় দাশ (কবি মণীন্দ্র রায় ও বাংলা কবিতার তিন দশক), গৌরাঙ্গ ভৌমিক (মণীন্দ্র রায়ঃ যেমনটি তাঁকে দেখেছি), কান্তি সেন (পঞ্চাশ বছরের প্রান্তে) ও কমলেশ চক্রবর্তী (ভিনসেন্ট ভান গগ) প্রমুখ কয়েকটি প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছেন। কবি মণীন্দ্র রায়ের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সংকলনটি প্রকাশিত। তা ছাড়া আছে দুটো সুন্দর স্কেচ, সাহিত্য সংস্কৃতি সংবাদ ও গ্রন্থ আলোচনা।

নবাহ্ঃ সম্পাদক—সমর দত্ত এবং বিমান পাল। ৩৪সি, হরিশ নিয়োগী রোড। কলকাতা-৪। দাম এক টাকা।

লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, তরুণ সান্যাল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শান্তি লাহিড়ী, শিবশম্ভু পাল ধনঞ্জয় দাস, অজিতকুমার ঘোষ, হরপ্রসাদ এবং আরো অনেকে।

একক — সম্পাদক ঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু ২১, কালী টেম্পল রোড। কলকাতা-২৬। দাম এক টাকা।

কবিতার পত্রিকা একক। এই বিশেষ সংখ্যায় লিখেছেন ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সুশীল রায়, জগদীশ ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ হরপ্রসাদ মিত্র, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, রাজলক্ষ্মী দেবী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উমা দেবী, গোপাল ভৌমিক এবং আরো অনেকে।

প্রবাহ—সম্পাদক ঃ যশোদাজীবন ভট্টাচার্য ও পূর্ণেন্দুনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। প্রবাহ সাহিত্য সংসদ, মনাই ট্যাণ্ড, ধানবাদ। দাম ঃ এক টাকা।

কলকাতার বাইরে থেকে পত্রিকা বের করা এখন সহজ নয়। মুদ্রণ ব্যয় বেড়েছে কয়েক গুণ। ভালো প্রেসও পাওয়া যায় না। তবু এসব অসুবিধাকে উপেক্ষা করে 'প্রবাহ' বেরিয়েছে উন্নত সাহিত্য-রুচি ও উন্নততর জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়ে। এ-সংখ্যায় লিখেছেন পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার নবীন-প্রবীণ কবি-সাহিত্যিকরা। সময় ও সমাজ-চেতনায় সকলেই আস্থাশীল বলে অনুমিত হয়। স্থানীয় লেখক-লেখিকাদের লেখাও স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেনঃ সুধীরকুমার করণ, গোলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখময় সরকার, মণীন্দ্র রায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, বিষ্ণু মজুমদার, মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান, আবদুস সাত্তার, তালিম হোসেন, সুজিত চট্টোপাধ্যায়, করুণ মুখোপাধ্যায়, ইন্দু পাল এবং আরো কয়েকজন। আমরা পত্রিকাটির বহুল প্রচার ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

অভিযান—সম্পাদক ঃ তপনকিরণ রায় এবং জয়নারায়ণ সাহা। উকিলপাড়া। রায়গঞ্জ। পশ্চিম দিনাজপুর। দাম এক টাকা।

তপনকিরণ রায়, শ্রীকান্ত, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, রণজিৎ দেব, কবিরুল ইসলাম, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কালীপদ কোঙার এবং আরো অনেকে।

শিবম্—সম্পাদক ঃ শচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য এবং কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১ মহেশ চৌধুরী লেন। কলকাতা—২৫। দাম —দুই টাকা।

ধর্ম বিষয়ক রচনা, উপদেশ, কবিতা, প্রভৃতি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকাটি।

চন্দনা—সম্পাদক ঃ শংকরনাথ ভট্টাচার্য। ২৮।২জি, নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেন। কলকাতা-২৬। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

দীপন—সম্পাদক ঃ রণজিৎ পাল। সি-১৪, আনন্দপুরী, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা। দাম ঃ এক টাকা।

নামকরণে তেমন ভারিক্কি না হলেও পত্রিকাটি রচনা নির্বাচনে সিরিয়াস বলেই মনে হয়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লেখা লিখেছেন অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, তুলসী মুখোপাধ্যায়, শিশির ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, তরুণ সান্যাল, জীবন সরকার, দীপেন রায়, তরুণ সেন, সত্য গুহ এবং আরো কয়েকজন। ছাপা ঝকঝকে। পাঠককে আকৃষ্ট করার মতো।

অনুষ্টুপ—সম্পাদক ঃ অনিল আচার্য। ৫১, বদন রায় লেন, কলকাতা-১০। দাম দু টাকা।

লিটল ম্যাগাজিনের নিরুত্তেজ পরিবেশে অনুষ্টুপের এ-সংখ্যাটি যথেষ্ট আশা সঞ্চার করবে। সম্পাদকের গভীর দায়িত্ববোধ রচনা নির্বাচনে প্রতিফলিত। কবিতা নির্বাচনে অবশ্য একটা হেলাফেলার ভাব আছে। এ-সংখ্যায় লিখেছেন হাসান হাফিজুর রহমান (পূর্ববঙ্গের কবিতা ও কাব্য-বিচার), দীপেন্দু চক্রবর্তী, আরতি দাস, উজ্জ্বল মজুমদার (হুইটম্যান ও রবীন্দ্রনাথ), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর রক্ষিত, রাম বসু, তরুণ সান্যাল, তুষার চট্টোপাধ্যায়, অসিত ঘোষ, জয়দেব মল্লিক এবং আরো অনেকে। পত্রিকাটির ছাপা, অঙ্গসজ্জা ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

পূর্ব-ভারতী (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)—সম্পাদক ঃ বিভা বসু শাস্ত্রী। লাবান। শিলং-৪। আসাম। দাম দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আসাম থেকে প্রকাশিত বাংলাভাষার এই প্রবন্ধ পত্রিকাটি নানাদিক থেকে আকর্ষণীয়। ধ্রুব মজুমদার, বিভাবসু শাস্ত্রী (সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রেমপত্র), যতীশ দত্ত, রণেন্দ্রনাথ বাগচি (নাগা কাঠখোদাই), শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, কালিদাস কয়াল, বিজন চৌধুরী, ই এম রিভ সিয়েম (খাসিয়া সংস্কৃতি নৃত্য-গীত), বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত (অসমীয়া ছন্দের উৎস ও বিবর্তন), বিভূতিভূষণ চৌধুরী (খাসিয়া ভাষা ও লিপি), বনমালী গোস্বামী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (শিলং-এর প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র) লিখেছেন। পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশ এবং শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান—সম্পাদক ঃ মুরারিমোহন চক্রবর্তী। সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ। সোদপুর। ২৪ পরগণা।

কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধ লিখেছেন দেবীপদ ভট্টাচার্য, পূর্ণেন্দুনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শান্তিকুমার ঘোষ, নচিকেতা ভরদ্বাজ, সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার সান্যাল এবং আরো অনেকে।

দৈনিক সংবাদ—সম্পাদক ঃ ভূপেন দত্ত ভৌমিক। জগন্নাথ বাড়ী রোড। আগরতলা।

এই সংখ্যাটি প্রবন্ধ, নাটক, গল্প, কবিতা প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ। লিখেছেন এ এইচ হাফিজউদ্দীন আহম্মদ, ভরতকুমার রায়, অরুণকুমার বর্মণ, অশোক চক্রবর্তী, শান্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ চৌধুরী, প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য, বিনয় ভট্টাচার্য, রঞ্জন ঘোষ, কমলকুমার সিংহ, ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য, বিমল চৌধুরী, সমর সেন, দক্ষিণারঞ্জন বসু, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শিবশম্ভু পাল, রথীন ভৌমিক, ধীরাজ গুহ, অশোক চক্রবর্তী, কানাই পাকড়াশী, অমলকুমার মিত্র এবং আরো অনেকে। অনেকগুলি ছবি আছে।

পারাবত—সম্পাদক আনন্দ বাগচী ।। প্রতাপ বাগান, বাঁকুড়া ।। দাম ঃ দেড় টাকা।

সাধারণ চরিত্রের লিটল ম্যাগাজিন। কেমন একটা হেলাফেলা ভাব নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এ সংখ্যায় লিখেছেন কল্যাণী প্রামাণিক, হরপ্রসাদ মিত্র, অম্বিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র গুহ এবং আরো অনেকে।

কৌশিক—সম্পাদক তরুণ সরকার। চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান ।। দামঃ চল্লিশ পয়সা ।।

কলকাতা থেকে দূরবর্তী শিল্পনগরী চিত্তরঞ্জন থেকে প্রচারিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। অগ্রণী গোষ্ঠীর পরিচালনায় কাগজটি বেরিয়ে থাকে। এ সংখ্যায় লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, তরুণ সান্যাল, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, অরুণ চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানচেতনা

অভিযোগটা প্রায়ই কানে আসে। মাঝে মাঝে তাই নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়। বাংলা ভাষার নমনীয়তা, শিল্পসৌন্দর্য, সাহিত্যগুণ ও প্রকাশক্ষমতা নাকি অনেক বেড়েছে। কেবল বাঙালী কবিসাহিত্যিকদের বাড়ে নি বিজ্ঞানচেতনা। পাল্টা অভিযোগও যে শোনা যায় না—তা নয়। বুদ্ধিজীবীরা বলেন, যে দেশে অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত, 'বিজ্ঞানীরা ঘরকুনো, সেদেশে সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক অনাত্মীয়ের। প্রচলিত পাঠক্রমে ভাষার কচকচিই প্রধান। সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা উন্মেষের অবকাশ কোথায়?

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু জাতীয় অধ্যাপক হয়েও বুঝেছিলেন, মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পথ সুগম না হলে সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা জাগানো অসম্ভব। সকলেই বিজ্ঞানী হবে না। কেউ সাহিত্যিক হবেন, কেউ বা ঐতিহাসিক। কিন্তু সকলেরই চাই বিজ্ঞানদৃষ্টি, জগৎ এবং জীবনকে পর্যবেক্ষণের যুক্তিগ্রাহ্য চেতনা। পরিবেশকে অনুকূল করে তুলতে না পারলে, সবই ব্যর্থ। নতুন বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হবে কি করে?

অথচ এর প্রয়োজনীয়তা যে আমরা উপলব্ধি করিনি, তাও বোধহয় সঠিক সংবাদ নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা বাংলা দেশে শুরু হয়েছে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। উদ্যোক্তা অবশ্য বাঙালি নন। রবার্ট মে নামে জনৈক স্কুল ইন্সপেক্টর লেখেন 'মে গণিত' নামে একটি বই ১৮১৭ সালে। উইলিয়াম কেরীর ছেলে ফেলিকস কেরীর 'বিদ্যা হারাবলী' এবং উইলিয়াম ইয়েটস-এর "পদার্থবিদ্যাসার" এ সময়ের দুটি স্মরণীয় বই। বাংলায় প্রথম রসায়নের বই লেখেন শ্রীরামপুরে কলেজের কেমিস্ট্রি অধ্যাপক ম্যাক সাহেব। বইটির নাম 'কিমিয়া বিদ্যার সার' (১৮৩৫)।

বাংলা গদ্যের মতো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও য়ুরোপীয়দের দান আমাদের সবার আগে স্বীকার করে নিতে হয় নানাকারণেই। তাতে লজ্জা পাওয়ারও কিছু নেই। দুর্বলতাকে স্বীকারের মধ্যে অপমান নেই, বলিষ্ঠতাই আছে। ভাষার অক্ষমতাকে মান্য করেও সেদিন বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন রামমোহন রায়। নিজে বিজ্ঞানী মন। বিজ্ঞানচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে বলেছিলেন : 'আমাদের টাকা দাও। দেশবাসীকে বিজ্ঞানশিক্ষা দিতে না পারলে জাগানো যাবে না।' আমহার্স্ট তাঁর অনুরোধের মর্যাদা রেখেছিলেন। বৃটিশ পার্লামেন্ট মঞ্জুর করেছিলেন এক লাখ টাকা।
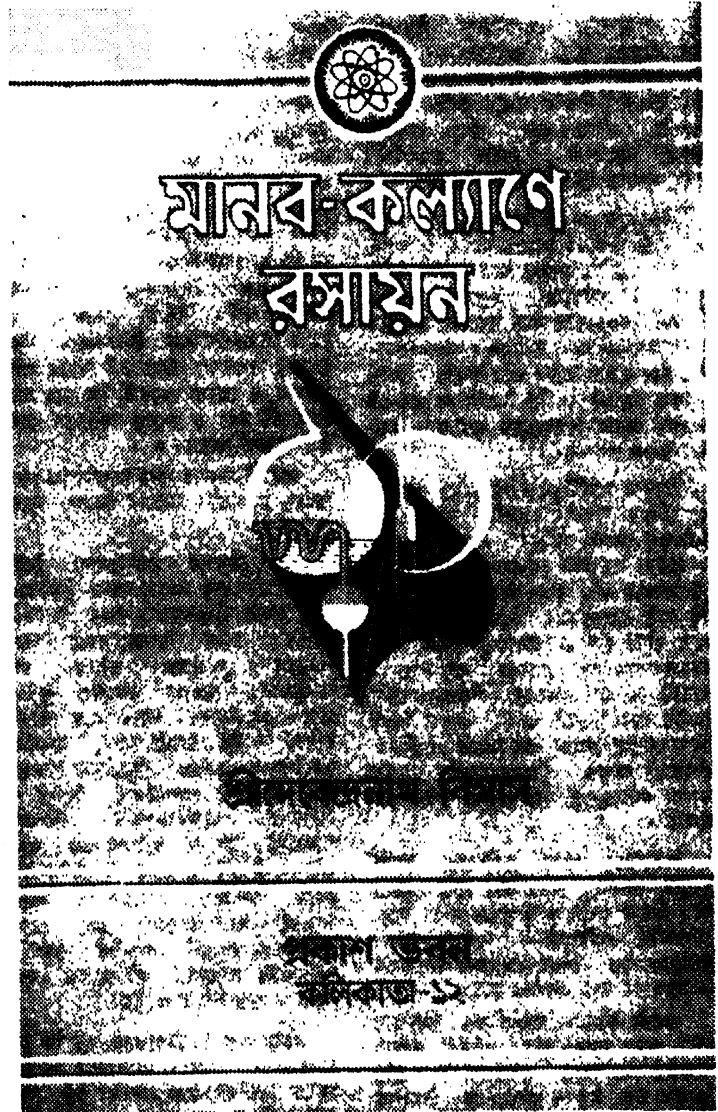
হিন্দু কলেজে শুরু হলো পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চা।

রামমোহন রায় নিজেই লেখেন দুটো বই—"জ্যোগ্রাফী, আর 'রেখাগণিত'। অক্ষয়কুমার দত্ত করলেন বিজ্ঞানের পরিভাষা। তৎকালীন সাময়িক পত্রিকাগুলিতে বেরোতে থাকে বিজ্ঞানের সংবাদ, প্রবন্ধ নিবন্ধ। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় 'দিগদর্শন, সমাচার দর্পণ, তত্ত্ববোধিনী. পত্রিকার সমকালীন সংখ্যাগুলি।

বলা যায়, প্রায় দেড়শ বছরের উত্তরাধিকার নিয়েও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার মান উন্নত হয়নি তুলনামূলকভাবে। সাহিত্যের উন্নতি হয়েছে। কালোপযোগী ভাবপ্রকাশের সামর্থ্য অর্জন করেছে। এগোয়নি বৈজ্ঞানিক মননে কিংবা চিন্তনে। অবশ্য এই দেড়শত বছর একেবারে বন্ধ্যা যায় নি। সাহিত্যিকরাও লিখেছেন বিজ্ঞানবিষয়ে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদানন্দ রায় প্রমুখ অনেকেই লিখেছেন আকাশ, মাটি এবং পশুপাখি, লতাপাতার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। বিজ্ঞানীদের মধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডঃ মেঘনাথ সাহা, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শিশিরকুমার মিত্র প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

আজকাল সংবাদপত্র, সাময়িকপত্রে নিয়মিত বিজ্ঞানের পাতা বেরোয়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের সংবাদ পরিবেশন করেন এমন একজন অধ্যাপক বলেন, বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার অসুবিধা এখনো যায় নি। প্রথমত উপযুক্ত পরিভাষার অভাব, দ্বিতীয়ত অভ্যাসের জড়ত্ব, তৃতীয়ত পারিবেশিক অসুবিধা তাঁর মতে, ইদানীংকালে বিজ্ঞান বিষয়ে ভালো

আলোচনা লিখেছেন এবং লিখছেন প্রিয়দারঞ্জন রায়, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ, সমরেন্দ্রপ্রসাদ সেন, রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, অমল দাশগুপ্ত, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ বসু, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলেশ রায়, শংকর চক্রবর্তী, রমেন মজুমদার প্রমুখ কয়েকজন। এবং সম্প্রতি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

অনুরূপ একজন নিরীহ, নীরব মানুষ হলেন শ্রীবিশ্বাস। আত্মপ্রচারহীন, নির্লোভ, সরল প্রকৃতির লোক। মনে কোনো ঘোর-প্যাঁচ নেই। এককালে স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, রেলওয়েতে কাজ করতেন, ব্যবসায়ে হাত পাকাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনটাই মনে ধরেনি তাঁর। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জড়িয়ে আছেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ-এর সঙ্গে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু তার অন্যতম প্রধান কর্ণধার।

স্বর্গত সুধীরকুমার সরকারের প্রেরণায় ও তাগিদে 'বিজ্ঞান ভারতী' নামে একটা অভিধান লেখেন তিনি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের সর্বপ্রথম অভিধান ছাপলেন এম সি সরকার এন্ড সন্স। সাধারণত বিজ্ঞানের বই কেউ ছাপেন না। সুধীরবাবু নিজে শুধু বইটি ছাপার ব্যবস্থাই করেন নি। দেবেনবাবুকে বহু ইংরেজী বই, ডিকশনারী জোগান দিয়েছেন 'বিজ্ঞানভারতী' লেখার জন্য। সেই বছরই বইটি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নরসিংদাস পুরস্কার' পেয়েছে। আজও 'বিজ্ঞানভারতী' বাংলা ভাষায় একমাত্র বই, যার সগোত্র দ্বিতীয়টি জন্মায়নি।

গত মার্চ মাসে বেরিয়েছে 'মানব কল্যাণে রসায়ন' নামে তাঁর আর একটি বই। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে, অদ্বিতীয়, পরিশ্রমী ও সার্থক রচনা। রসায়নশাস্ত্রের ওপর সাধারণের উপযোগী এ রকম বই আর একটিও নেই।

কথাটা আমাকে আলোড়িত করেছিল বইটি পড়ার সময়। প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠার কলেবরে দেবেনবাবু রসায়নের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য, তত্ত্ব ও রাসায়নিক শিল্পের ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ভাষা মার্জিত, পরিচ্ছন্ন ও রুচিকর। বিজ্ঞানী প্রিয়দারঞ্জন রায়ের মতে : 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলীর একটি অভাব এতে পূর্ণ হবে।'

দেবেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম : এ বই লেখার প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে?

বিনীত কন্ঠে বললেন দেবেনবাবু : আমি সারাদিনই বিজ্ঞান নিয়ে আছি, বিজ্ঞান নিয়ে ভাবছি। 'ভাষাবিজ্ঞান' পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। জানেন বোধহয়, পত্রিকাটির সম্পাদক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। অনেকে লেখা নিয়ে আসেন। নানা রকমের আর্টিকল। কারো কারো লেখা পড়ে মনে হতো, কেমন যেন একটা ধোঁয়াটে হালকা ধারণা নিয়ে লেখা। খুব স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন চিন্তা না থাকলে বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু করা যায় না। পাঠককে বিভ্রান্ত করা আরো বিপজ্জনক। প্রথম প্রেরণা আমার তখন থেকেই। তাছাড়া, প্রায়ই রাস্তায় যেতে দেখতাম, পথের ধারে রবারের টায়ারগুলো নতুন করে চালু করার চেষ্টা হচ্ছে। আজকাল তো কেউ বড়একটা গাছের তৈরী রবার ব্যবহার করে না। সবই প্রায় আর্টিফিসিয়েল রবার। কিন্তু কেউ তার আসল রহস্য জানে না। অনেকে নাইলন, প্লাস্টিকের জিনিস, নানারকম রং, বার্ণিস, স্টেনলেস স্টীল ব্যবহার করেন। কিন্তু জিনিসগুলো যে কি তা কেউ জানেন না। অথচ জানতে পারলে সকলেই উপকৃত ও আনন্দিত হতেন সন্দেহ নেই। আমি রসায়নের এই সহজ জিজ্ঞাসাগুলির উৎস-বিচার করতে চেয়েছি সাধারণের উপযোগী করে। আমার উদ্দেশ্য ও প্রেরণা একটাই, কি করে মানুষ বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বকে অনায়াসে জানতে ও বুঝতে পারবে।

এই বই লেখার সময় আপনি কি কোনো প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর পরামর্শ কিংবা সাহায্য পেয়েছেন?

—না, সেভাবে কারো সাহায্য নিইনি, বা চাইনি। তবে লেখার সময়ে কুঞ্জবিহারী পাল প্রমুখ দু-একজনের সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমার পাণ্ডুলিপি পড়েছেন। তাঁদের আমি শুনিয়েছি। সাহায্য পেয়েছি কয়েকটি প্রখ্যাত বই থেকে। লিখে নিতে পারেন—আচার্য পি সি রায়ের 'হিন্দু কেমেস্ট্রি', সমরেন্দ্রনাথ সেনের 'বিজ্ঞানের ইতিহাস', স্যার এডওয়ার্ড থোপের-এর 'হিস্ট্রি অব কেমিস্ট্রি', আলেকজান্ডার ফিন্ডলের 'কেমিস্ট্রি ইন দি সার্ভিস অব ম্যান', অধ্যাপক ই এন আন্দ্রাদের' দি অ্যাটম অ্যান্ড ইট্স এনার্জি', রুদ্রেন্দ্রকুমার পালের 'হর্মোন বা উত্তেজক রস,' হেফার ক্যামব্রিজের 'হোয়াট ইন্ডাস্ট্রি ওজ টু কেমিক্যাল সায়েন্স,' হীরেন্দ্রনাথ বসুর 'কাচ ও কাচ শিল্প' প্রভৃতি।

পাণ্ডুলিপি তৈরী হওয়ার পর কি কেউ আপনার ম্যানসক্রিপ্ট দেখেছেন? আপনার লেখার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কি কারো কোনো সন্দেহ আছে?

—ম্যানসক্রিপট দেখেছেন অনেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। শ্রীযুক্ত প্রিয়দারঞ্জন রায়, ডঃ সুশীল মুখার্জি, ডঃ এস আর পালিত, দুঃখহরণ চক্রবর্তী, শান্তিকুমার চ্যাটার্জি, আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। বহু তথ্য ও তত্ত্বের সংশোধনে সাহায্যও করেছেন। তাঁদের নির্দেশ অনুসারে আমি অনেক কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন করেছি। অনেক ব্যাপারে তাঁরা মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। সকলেই বলেছেন, বইটি নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য। রসায়নবিদদের অন্তত তাই অভিমত।

প্রকাশক ধরলেন কি করে? বিজ্ঞানের বইয়ের তো প্রকাশক পাওয়া মুশকিল।

—আমার সঙ্গে 'চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং'-এর বিনোদলাল চক্রবর্তীর পূর্ব-পরিচয় ছিল। তাঁকে বললাম। তিনি আমাকে ইনট্রোডিউস করিয়ে দেন 'প্রকাশ ভবন'-এর শচীনবাবুর সঙ্গে। তিনি ম্যানসক্রিপট খানিকটা পড়েই খুশী হন। বের করেন 'মানব কল্যাণে রসায়ন'। পরে ভাবলাম এ বই বের না করে দুটো টেকসট বুক বের করলে তাড়াতাড়ি রিটার্ণ পেতেন। স্কুল-কলেজে অবশ্য বইটি রেফারেন্স হিসেবে পাঠ্য হতে পারে।

বললাম : সেকথা লিখবো। প্রত্যেকেরই এ বই পড়া উচিত। আমার তো খুব ভালো লেগেছে।

—হ্যাঁ আরেকটা কথা লিখবেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বইটা ছাপার জন্য কিছু টাকা দিয়েছেন। সেজন্যেই দাম অনেক কম করা সম্ভব হয়েছে। অনেকটা তৃপ্ত এবং কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললেন দেবেনবাবু।

তারপর, অতর্কিতে মনে পড়ে গেছে এমন দ্রুততার সঙ্গে বললেন : ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কেও আমি বইটার পাণ্ডুলিপি দেখিয়েছিলাম। তিনি বললেন, আমি তো বিজ্ঞানী নই, ভাষা নিয়ে চর্চা করি। দেখে মনে হচ্ছে অনেক পরিশ্রম করেছেন। বহু জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে। যান প্রিয়দারঞ্জনবাবুর কাছে। তিনি দুএকটা বক্তৃতায় আমার 'বিজ্ঞান-ভারতী'র খুব প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে, এ জাতীয় বই বিজ্ঞানশিক্ষার ক্ষেত্রে একান্ত জরুরী। তিনিই আমাকে বইটা রবীন্দ্র-পুরস্কারের জন্য দিতে বলেছিলেন।

—'মানব কল্যাণে রসায়ন'-এর কি কোথাও কোনো সমালোচনা হয়েছে?

—বিশেষ কিছু হয়নি। 'যুগান্তরে' পরিমল গোস্বামী একটি রিভিউ করেছেন। খুব ভালো। একজন বিজ্ঞানীর পক্ষেও এর-চেয়ে ভালো কিছু বলা সম্ভব ছিল না। তিনি খুব রসজ্ঞের মতো সমালোচনা করেছেন।

পাশেই বসেছিলেন শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। আমাদের আলোচনায় তিনিও মতামত যোগ করছিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, বাংলাদেশে বিজ্ঞান-চর্চার বর্তমান কি?

দুঃখজনক চিত্র তুলে ধরলেন গোপালবাবু। বললেন : এদেশে নতুন কিছু হচ্ছে না। নতুন কিছু করার উৎসাহ নেই, উদ্যম নেই, পরিবেশ নেই। যা কিছু হচ্ছে সবই পুরোনো চর্বিত চর্বণ। বিদেশে যা বহুদিন আগে হয়ে গেছে, তাই এখন করার চেষ্টা চলছে। অথচ বাঙালী ছেলেরা মেধাহীন নন। তাঁরাও নতুন কিছু করতে পারেন। বিদেশে অত্যন্ত সাধারণ স্তর থেকে বিজ্ঞানীরা এসেছেন। আমরা তাঁদের শক্তিকে কাজে লাগাতে পারছি না। নিউটন বেশী দূর লেখাপড়া করেন নি, ফ্যারাডে বুক-বাইন্ডার ছিলেন, মার্কনীর শিক্ষাদীক্ষাও এমন কিছু ছিল না। কিন্তু সকলেই জগৎবিখ্যাত বিজ্ঞানী হয়েছিলেন পরিবেশের গুণে। কোনো ভালো কাজ করতে চাইলে, তার পেছনে উৎসাহ এবং সমর্থন থাকা দরকার। একবারও ভেবে দেখি না, সারা পৃথিবীর তুলনায় আমরা

কতখানি পিছিয়ে আছি। অনেকে বিজ্ঞান নিয়ে নানারকম গবেষণা করেন, ডকটরেট পান —সবই চাকুরীর উন্নতির জন্য। নতুন কিছু করবো, নতুন কিছু ভাববো—এটা যেন দেশ থেকে প্রায় উঠে গেছে।

আমি এমন একটা চেয়ারে বসেছিলাম যেখান থেকে দেখা যাচ্ছিল দুই দরজার ফাঁক দিয়ে দুটো ছবি—একটা মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের, অপরটি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর।

বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলাম : এ অবস্থার প্রতিকার কি?

উত্তর দিলেন গোপালবাবুই। বললেন : স্কুল-কলেজগুলিতে যদি আন্তরিকভাবে বিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়, শিক্ষক ও অধ্যাপকরা যদি ছাত্র এবং গবেষকদের নতুন আবিষ্কারে উৎসাহিত করেন, সকলে যদি দেশের ও জাতীয় কল্যাণের কথা ভাবেন —তবেই তার প্রতিকার সম্ভব।

বিজ্ঞানের জন্য বাংলা ভাষায় আরো বই দরকার। অনেকে সায়েন্টিফিক টার্মগুলোর বাংলা পরিভাষা খুঁজে পান না। আমার মনে হয়, এ সবের কোনো দরকার নেই। ইংরেজীতেও বিদেশী শব্দগুলি অবিকৃত রাখা হয়। বাংলায় লিখতে অসুবিধা কি? আসল কথা হলো, উৎসাহদাতার অভাব। তার প্রতিকার হলেই সব হবে। বিজ্ঞান-চেতনা ও বিজ্ঞান-দৃষ্টি বাড়বে।
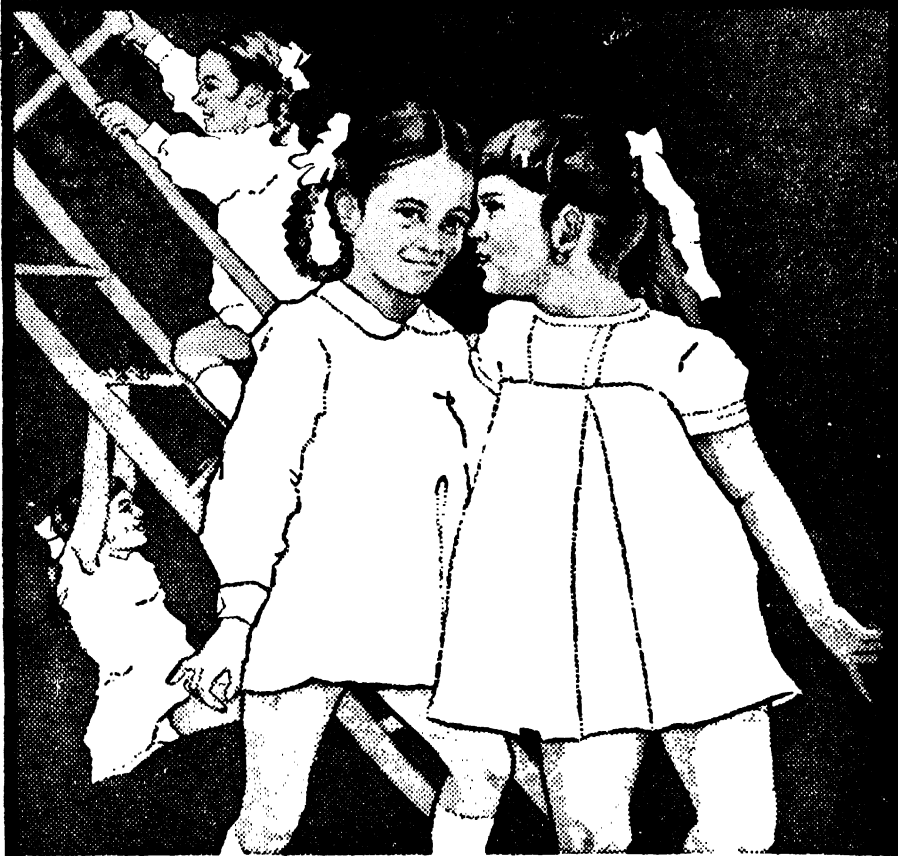
—গ্রন্থদর্শী

॥ ২ ॥

আমাদের জন্য একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করা ছিল। সঙ্গে এসেছিল একজন পুলিশ অফিসার আর দুজন সেপাই। তারা আমাদের কামরায় উঠলই না। শেয়ালদা পেঁছুবার একটু পরেই আমাদের কামরার সামনে এসে দাঁড়ালেন শ্যামসুন্দর। আগেই জিতেনবাবু খবর পাঠিয়েছিলেন। কামরা থেকে নেমে আমি প্রণাম করলাম। জিতেনবাবুর সঙ্গে হল কোলাকুলি। একটু পরেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

একগাদা কাগজ ও ম্যাগাজিন কিনে বুঁদ হয়ে রইলেন জিতেনবাবু। আমিও একখানা হাতে নিয়েছিলাম। পড়ায় মন বসল না। চোখের সামনে ভাসতে লাগল ফেলে আসা আলিপুর জেল, জেলের বাসিন্দা আর প্রতিটি দিনের কথা। ওখানকার মানুষগুলি জ্যান্ত ছবি হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল আমার চোখের ওপর। সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে এলেন আন্দামান ফেরতা ঐ পরমাশ্চর্য মানুষগুলি।

তাঁরা দ্বিতীয় দফার আন্দামান-বন্দী। প্রথমবার গিয়েছিলেন মাণিকতলা বোমার আসামীরা। তারপর এঁরা। অধিকাংশেরই যৌবন প্রায় অতিক্রান্ত। চুলে পাক ধরেছে। কারো-কারো দেহ ভেঙে পড়েছে। এঁরাও মুক্তি পাবেন একদিন। কিন্তু সে একদিন কবে দেখা দেবে? আর মুক্তি যদি হয়ই—তারপর? অজানা কোন ভবিষ্যৎ এঁদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে? ভবিষ্যৎ বলে সত্যিই কি কোনদিন এঁদের ছিল? কেউ, কোথাও,—কোন অধীর প্রতীক্ষায় এঁদের জন্য দিন গুনেছে? মায়াহীন সংসার এঁদের কথা মনে রেখেছে, তারই কি কোন প্রমাণ আছে?

এঁদের পেছন-পেছন দেখা দিলেন কাজী। দুরন্ত চঞ্চলতা আর অফুরন্ত আনন্দের এক ঘূর্ণি হাওয়া। মুসলমানের ছেলে, যুদ্ধে নাম লিখিয়েছিলেন। ইচ্ছে করলেই,—খুব ভালো না হোক, মাঝারি গোছের একটা চাকুরি জোটানো অসম্ভব ছিল না। তা না করে উনি এ পথে এলেন কেন? এই মানুষটির চিন্তাধারার প্রবল স্বাতন্ত্র্য এতো বেশি স্পষ্ট ও শাণিত, যা ভোলা কঠিন।

৪ জানুয়ারি, ১৯২৩, মওলানা আবুল কালাম আজাদ মুক্তি পেয়েছিলেন। কাজী ছাড়া, যতদূর মনে পড়ছে, ছিলেন মওলানা সুফী, মনজুর আলম ও আফসারউদ্দীন। আর কোনো মুসলমান রাজবন্দী সেদিন ছিল না।

আজাদ সাহেব সত্যিই ছিলেন রাজা-বাদশা জাতের মানুষ। রূপও বেশ ছিল তদনুযায়ী। দীর্ঘ সুগৌর দেহ। মেদহীন। সযত্নে ছাঁটা দাড়ি। সর্বদা পরিধানে থাকত ধবধবে আচকান পাজামা অথবা চুড়িদার। খুব কমই টুপি ছাড়া খালি মাথায় ঘরের বের হতেন। দেখা হলে আগে-ভাগেই আদাব জানাতে ভুল হত না। ঈষৎ বিকসিত হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠত অভ্যর্থনার আভাষ দিয়ে। অপরাহ্নে মাপা পায়ে দু-চারবার উঠোনে বা বারান্দায় হাঁটতেন। পেছনদিকে হাত দুখানা থাকত গোটানো। আজাদ সাহেবের খানা আসত ঘর থেকে। একটা বড় টিফিন ক্যারিয়ারে।

লোকের কাছে কাজীও ছিলেন মুসলমান হিসাবেই পরিচিত। কিন্তু এই মানুষটির সব কিছুই ছিল স্বতন্ত্র। এক নাম ছাড়া কোন কিছু দিয়েই বোঝবার উপায় ছিল না যে, কাজী মুসলমান। অন্তত সেদিন মুসলমান বলতে গ্রাম-বাঙলায় বা শহরে যাদের চিহ্নিত করা হত, তাদের সঙ্গে কাজীর বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য ছিল না।

বাঙলা দেশের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অনেক বিষয়েই মিল ছিল, সত্য কথা। কিন্তু পার্থক্যও ছিল বহুক্ষেত্রে। প্রায় সব মুসলমান সেদিন দাড়ি রাখতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গোঁফও ছাঁটতেন। ভাষা ছিল এক। দারিদ্র্যও ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন। তবু মুসলমানকে মুসলমান বলে চেনা যেত। চেনা যেত হিন্দুকেও। বাঙালী বলতে সেদিন সাধারণত বোঝাত হিন্দুকে। অবশ্য মুসলমানরাও যে বাঙালী তাতে সন্দেহ কারো নেই।

কিন্তু কাজী ছিলেন সর্বক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম। দাড়ি রাখতেন না। রাখতেন গোঁফ। লুঙ্গি বা পাজামা পরতেন না, পরতেন ধুতি। খেতেন আমাদের সঙ্গে। বাতচিৎ-এর সঙ্গে উর্দুর সম্পর্ক আদৌ ছিল না। কেতাবে আদব-কায়দার ধারও ধারতেন না। অট্টহাসি, উদ্দাম, উদার অন্তহীন প্রাণ-প্রাচুর্য ছড়িয়ে দিতেন মুঠো মুঠো। বাঙালী কাজীর সারা অঙ্গ সারা প্রাণ ভরা ছিল বাঙালীর পাগলামিতে।

দুর্গাপূজোর প্রাক্কালে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার জন্য কাজীর কারাদণ্ড হয়েছিল। অতীতে বহু ছিল,—আধুনিক-কালেও বাঙালী মুসলমান কবির সংখ্যা নগণ্য নয়। কাজী ছাড়া বাঙালীর দুর্গা-পূজো নিয়ে আর কোন মুসলমান কবির কবিতা আমার চোখে পড়েনি। এ কবিতায় ইন্দ্র-বরুণ তো ছিলই, গঙ্গা মাসীও বাদ পড়েন নি। বিদ্রোহী কবিতায় বিদ্রোহী ভৃগুকে স্মরণ করেছেন কাজী। ছিন্নমস্তা চণ্ডীকে আহ্বান করেছেন। বলরামের লাঙল ও শ্যামের বাঁশী ভুলতে পারেন নি।

কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, ঈদ বা আরবের নানা কাহিনী ও কথা অথবা বর্ণনা কাজীর প্রথম জীবনের রচনায় স্থান পেয়েছে। এবং এই স্থান পাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিস্ময় জাগে কাজীর কবিতায় হিন্দুর কাব্য ও পুরাণের অসংখ্য ছবি, নাম আর উপমার বহর দেখে। সংখ্যাগুরু হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিম বাংলায় কাজী জন্মেছিলেন, বাল্যে দীর্ঘদিন বেশির ভাগ হিন্দু সহপাঠীর সঙ্গে পড়েছেন, খেলেছেন, বেড়িয়েছেন; তাই কি কাজীর মনে হিন্দুর প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মেছিল? কাজী কি হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা জন্মাবধিই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন? এসব কথা কেউ কেউ পরবর্তী কালে আলোচনা করতে চেয়েছে, কিন্তু কাজীর সঙ্গে দিনের পর দিন এক সঙ্গে বাস করে একথা ক্ষণকালের জন্যও মনে উদয় হয়নি যে, কাজী বাঙালী ছাড়া অন্য কিছু। হিন্দু বা মুসলমানের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন ছিল বাঙালী ও বাঙালীত্ব নিয়ে। বাঙলার সবই ছিল কাজীর আপন। প্রিয়। পুরাণ, রামায়ণ বা মহাভারত বাঙালীর কাব্য। বাঙালীর সাহিত্য। কাজী বাঙালী। তাই কাজীর কাছে প্রাচীন কাব্য ও সাহিত্য তার রূপ ও বৈভব নিয়ে ধরা দিয়েছিল।

বাঙলা ভাষা শুধু নয়, বাঙালীর আচার-ব্যবহার, তার বেশভূষা, মায়া-মমতা, নদ-নদী, পলিমাটি আর তারই মতো নরম মরমী মনের কমনীয়তা; তার অবারিত শ্যামল মাঠ, আউল-বাউল ভাটিয়ালি কাজীকে সে দুর্নিবার আকর্ষণে নিবিড় বাঁধনে বেঁধেছিল, তারই সঙ্গে বাঙলার বিদ্রোহী রূপও দিয়েছিল একান্ত সহজে ও স্বাভাবিকভাবে। বাঙলার অনবদ্য রূপ কবিগুরু এঁকেছেন 'ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ-হাত করে শংকা হরণ।' কাজী বাঙালী কবি, কাজী বাঙালী মরমী প্রেমিক, কাজী বিদ্রোহী বাংলার মুখর বন্দনা।

বহরমপুর জেলে আমাদের অভ্যর্থনা-আয়োজনের কোন ত্রুটি ছিল না। বেশ রাত হয়েছিল। টিমটিমে কেরোসিনের আলোয় জেলের সবটাই মনে হচ্ছিল ভূতের আস্তানা। চারদিক নিস্তব্ধ। ঘন অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে জোনাকি জ্বলে।

নেভেও। ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে। সামনের মস্তবড় গাছের ডালে ডালে চাপ বাঁধা অন্ধকার। নাম-না-জানা কোন কোন পাখি শব্দ করে। গা ঝাড়া দেয়।

ভেতরে গেলাম। দূরে দূরে এক-একটা লন্ঠন কেঁপে কেঁপে চলতে থাকে। মানুষ দেখা যায় না। অদূরে বিরাট একটি সৌধ। ত্রিতল। ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। মনে হয় কোন প্রাচীন দুর্গ।

সিঁড়ির মাথায় দলবদ্ধ সতীর্থরা। পুরোভাগে পূর্ণ দাস। সকলের মুখেই হাসি। পূর্ণবাবু সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গেই দুচোখ জুড়িয়ে গেল। এমন উদার ও মহৎ বিস্ময় সহসা চোখে পড়েনি। নিবিড় প্রসন্ন সৌন্দর্যে প্রাণ আকণ্ঠ ভরে উঠল। মাথার দিকে দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিল। সেদিকে চাইতেই প্রথমে চোখে পড়ল সীমানার বিরাট দেয়াল। তার ওপাশে সবুজ গাছের সারি। তারও ওপাশে গঙ্গার নিস্তরঙ্গ সুনীল বক্ষ। ও-পারে কাশের ঝাড়।

মস্ত বড় হল ঘর। মাঝে মাঝে গরাদ বসানো। প্রতিটি গরাদের সামনে একখানা করে লোহার খাট। ছুটে গেলাম উল্টো দিকে। গরাদের ভেতর দিয়ে চাইতেই সমস্ত অন্তর গানে ভরে উঠল। সবুজ মস্তবড় মাঠ। ডিমের আকারে মাঝখানটা ছোট ছোট গাছে ঘেরা। বেলফুলের ঝাড়। বাঁ-দিকে বড় বড় কয়েকটা অশথ গাছ। গোড়াগুলি সিমেন্টে উঁচু করে বাঁধানো। সেইদিকেই আমাদের রশুইখানা। ওরই সংলগ্ন স্নানাগার।

আমাদের দল ছিল খুবই ছোট। মোট-মাট পনেরজনের মতো। ঢাকার জনাচারেক আর নোয়াখালি-কুমিল্লার জনাচারেক মুসলমান। সবাই অচেনা। চেনা শুধু পূর্ণবাবু।

বড় হলঘর সংলগ্ন আর একখানা ঘর ছিল। সেখানা থাকত বন্ধ। ঘরখানার সঙ্গে লাগোয়া একটা ছাদ ন্যাড়া। সামান্য একটু উঁচু আলসে চারদিকে। ঘরখানার প্রবেশ দ্বার ছিল স্বতন্ত্র। পেছন দিক দিয়ে। সিঁড়ির দিকেও একটা দরজা ছিল। খোলা। হলঘর ও এই ছোট ঘরের চারদিকে ছিল ছোট সরু একটু চলার পথ। গোটা বাড়িটা ঘিরে। শেষ হয়েছে ছাদে গিয়ে। ঐ পথে রাত্রিবেলা সেপাই পাহারা দিত।

বেলা আটটার পর এলেন সুপারিন-টেণ্ডেন্ট। সংক্ষেপে সুপার। সিতেশ চক্রবর্তী। টিপটপ সাহেব। পোশাক তো বটেই, কথায়ও। ইংরেজী ছাড়া ভুলেও বাংলা বলতেন না। যাও-বা বলতেন— বিকৃত করে। সেকালের সেই কেতাদুরস্ত ফরেন প্যাটার্নের লোক। বিয়ে করেছিলেন বিলেতে। বিলিতি মেয়েকে। অথচ খাঁটি দেশী লোক। পাবনা জেলার আরেঙ্গা গ্রামের অধিবাসী।

দু-চারটি কথার পরই জিতেনবাবু ঐ ঘরখানায় থাকবার অনুমতি চাইলেন। যদিও একটু আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু অনুমতি মিলেওছিল। একদিন বাদে জিতেনবাবু ও আমি উঠে গেলাম ঐ ঘরে।

ন্যাড়া ছাদে যাওয়া আগে নিষেধ ছিল। আমরা ঐ ঘরে যাবার পর আর কোন নিষেধ থাকল না। আমাদের বিকেলের মজলিশ বসত ঐ ছাদে। আমাদের ঘর থেকে তো বটেই, হলঘর থেকেও দেখা যেত বাইরে বাসিন্দাদের গৃহ। আমাদের দেখতে ওদের ছাদ থেকে ছেলেমেয়ে চেয়ে থাকত আমাদের দিকে। ওদের দেখবার প্রলোভনও আমাদের কম ছিল না।

ন্যাড়া ছাদ থেকে গঙ্গার দুকূল অনেক দূর অবধি দেখা যেত। সকালে বিকেলে দেখা যেত সারবন্দী স্নানার্থিনীদের। নানা বয়েসের। নানা রূপের। ভেজা কাপড়ে ওরা স্নান সেরে ঘরে ফিরত। চেয়ে চেয়ে আশ মিটত না। দুপুরের খর রোদের স্পষ্টতায় আর ঘনায়মান সন্ধ্যায় আবছায়া আঁধার কেটে দৃষ্টি ওদের ওপর ঠিকরে পড়ত। চোখে জ্বালা ধরে যেত। বুক তোলপাড় করত।

বন্দীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। এলেন অমরেশ কাঞ্জীলাল, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, গিরিজা মুখার্জি, আবতাবুল ইসলাম, মওলানা মুন্সী ও মনজুর আলম। মওলানার দেশ ছিল লক্ষ্ণৌ। ফিরিঙ্গী মহলের খানদানি বংশের ছেলে। বয়েসে আমাদেরই মতো। কিন্তু চাপদাড়ি আর ঝোপড়া-ঝোপড়া পোশাকে মনে হত তার ভারিক্কি বিজ্ঞ ব্যক্তি। প্রথমটায় আমাদের ঘরে ছিলেন। পরে উঠে গিয়েছিলেন নিচ-তলার একখানা ঘরে। সঙ্গে মঞ্জুর আলমও। মওলানা ছিলেন কলকাতা খেলাফৎ কমিটির সভাপতি। সব শেষে এলেন সতীন সেন আর নরেন দাশগুপ্ত।

কাজী বন্দী হবার পর অমরেশবাবু হয়েছিলেন ধূমকেতুর সম্পাদক। ধরে নিয়ে গেল অমরেশবাবুকে। সম্পাদক হলেন শিবরাম চক্রবর্তী। মুদ্রাকর গিরিজা মুখার্জি। দুজনেই তখন নেহাৎ বালক। অন্তত দেখতে। শিবরাম তখন কবিতা লিখতেন বেশি। মাঝে মাঝে আসতেন আমাদের ঘরে। জিতেনবাবুকে ওঁর কবিতা শোনাতেন। গিরিজা পড়তেন কলেজে। পরবর্তী কালে এই গিরিজাই হয়েছিলেন ডঃ মুখার্জি এবং নেতাজীর বার্লিনে গড়া ইণ্ডিয়া লিজিয়নের অন্যতম প্রধান সদস্য। আজাদ হিন্দ রেডিও প্রচার বিভাগের ছিলেন অন্যতম প্রধান। আর শিবরাম? আজকের রম্য সাহিত্যের দিক্‌পাল শিবরাম চক্রবর্তী সেদিন ছিলেন কুঁড়ি।

নজরুল তখন ছিলেন হুগলী জেলে। প্রায়োপবেশন শুরু হয়ে গেছে। এবং সে সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছেও গেছে।

একেবারে হঠাৎই অমরেশবাবুকে ডেকে নিয়ে গেল জেল গেটে। একটু পরেই জানা গেল, তাঁকে পাঠিয়েছে হুগলী জেলে। জেল গেটেই তাঁর হাতে হাতকড়া ও কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল। শুনে আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

অমরেশবাবু একদা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী এবং সেই দলের সদস্য ছিলেন। খুবই সরল ও অমায়িক মানুষ। মুহুর্মুহু পান খেতেন, আর বসে বসে একমনে আঁকতেন ছবি। হুগলী জেলে সহসা তাঁর ডাক পড়ল কেন? কাজীর প্রায়োপবেশনের সঙ্গে কি এই দেশ বদলির কোন সম্পর্ক ছিল? তাঁকে দিয়ে কাজীর উপোষ ভাঙানোর চেষ্টা? সবই কেমন গোলমেলে। সত্যি কথা বলতে কি কাজীর উপোস নয়, অমরেশবাবুর এই আকস্মিক লাঞ্ছনা আমাদের প্রত্যেকের মনে বিলক্ষণ উত্তাপ ও দুশ্চিন্তা জাগিয়ে তুলেছিল। বিনা কারণে, কোন কৈফিয়ৎ না দেখিয়ে খুশি ও খেয়াল মতো ওরা যাকে-তাকে আর যখন-তখন হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে। হাতে লাগাবে হাত কড়া, পায়ে বেড়ি অথবা কোমরে দড়ি পরাবে। কখন কার ভাগ্যে এই রাজ সম্মান প্রতীক্ষা করে আছে জানবার উপায় নেই।

আাডি সাহেব। ডবলিউ এস আাডি। মুর্শিদাবাদ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট। কখনকার নামও শুনিনি। চেনা জানা নেই কোন খবর। অতি অকস্মাৎ একদিন আমাদের ঘরে মস্ মস্ করে ঢুকে পড়লেন।

সকাল বেলা। সেরখানেক করে দুধ আমরা নিতাম জেলের ভাণ্ডার থেকে। খাঁটি দুধ জিতেনবাবু খেতে চাইতেন না। দুধ আমার ছিল দুচোখের বিষ। অতএব প্রতিদিন সকালবেলা স্টোভ জ্বেলে প্রথমে চা করতাম, তারপর দুধের ছানা হত। সন্দেশ করতাম।

নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে সাহেব আলাপ জমিয়ে তুললেন। লম্বায় পাক্কা ছ ফুট। [illegible] মুখ। ইংরেজী কথার মাঝখানে দুম করে এক-

একটা বাংলা শব্দ জুড়ে দেন। ভারি মজা লাগত শুনতে।

টিফিন ক্যারিয়ারে একটা বাটিতে দুধ ফুটছিল স্টোভের ওপর। জিতেনবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে সহসা চোখ ফিরিয়ে বলে বসলেন সাহেব,—'দুধে কী হোবে?'

'ছানা হবে।' বললাম আমি।

'চানা? চানা দিয়ে কী হোবে?'

'সন্দেশ।' জবাব দিলাম।

'সন্দেশ? খুব ভালো জিনিস আছে। আমাকে দিবেন তো?'

'নিশ্চয়।'

ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন।

একটুখানি কাছে এগিয়ে এসে পরক্ষণেই যে কথা কটি বললেন, বিস্মিত হয়েছিলাম নিশ্চয়ই; কিন্তু তার চাইতেও কথা শুনে অনেক বেশি ভালো লেগে গিয়েছিল এই মানুষটিকে।

সংবাদপত্র আমরা পেতাম না। নিষিদ্ধ। সাহেব একথা জানতেন। সংবাদপত্রের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কও তার অজানা ছিল না। সাহেব বলে গেলেন যে, তাঁর নিজের কাগজগুলো রাত্রিবেলায় পৌঁছে যাবে আমাদের কাছে। প্রতিদিন। এবং নিয়মিত। বলেই চলে যাচ্ছিলেন। একটু থেমে চোখ দুটো মিটমিট করে বলে গেলেন যে, কথাটা যেন আর কেউ না জানে। এবং পুরনো কাগজ যেন ঠিক মতো আবার পরদিন ফিরেও যায়।

লম্বা লম্বা পা ফেলে দুটো করে সিঁড়ি একসঙ্গে টপকে সাহেব চলে গেলেন। ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি মশারির ওপর পড়ে আছে সার্ভেন্ট, বেঙ্গলী, আর স্টেটসম্যান। পরে মাঝে মাঝে আনন্দবাজারও আসত।

অ্যাডি সাহেব। আই-সি-এস এবং ব্যাঙলার। জাতিতে আইরিশ। স্থানীয় লোকেরা বলত পাগলা সাহেব। সত্যি সত্যি পাগলই ছিলেন বা। দেশবন্ধু গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদ। স্টেশনে হাজির অ্যাডি। হাত জোড় করে নিমন্ত্রণ করেছিলেন নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে।

মিছিল হত রাজপথে। সাহেব মাটি ফুঁড়ে মিছিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। কলকণ্ঠে মিছিলের লোক বলে উঠত বন্দেমাতরম। সাহেব চেঁচিয়ে বলে উঠতেন,—'আরো জোরসে। জোরসে বোলো 'বণ্ডে মাটরম।'

দীর্ঘদিন কাগজ পড়া হয়নি। অস্বস্তিকর বুভুক্ষায় ছটফট করতাম। হাতে পেয়ে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। মিটে গেল খিদে। কিন্তু আরো একটি অভাববোধ কুরে খাচ্ছিল সবাইকে। নিয়মমাফিক মাসে একখানা বা দুখানা চিঠি লেখবার অনুমতি ছিল। প্রাপ্তি সংখ্যাও তাই। তাতে কি আশ মেটে? তাছাড়া ঐ নিষিদ্ধ ফলের স্বাদঃ আইনের বেড়াজাল কেটে এবং টপকে যদি বাড়তি কিছু করা যায়। তার তুল্য আস্বাদ কোথায়? আর রোমাঞ্চও?

তাক করে রাত্রি জাগরণের পালা চলল। একদিন ধরা পড়ে গেল সেই সেপাইটি, যে রোজ কাগজ নিয়ে আসত আর পড়া কাগজ নিয়ে যেত। প্রতি মাসে পাঁচ টাকা কবুল করে ওর হাতে চিঠি পাঠানো শুরু হল। বাইরের একটা ঠিকানায় চিঠি আসবে। বড় একখানা খামের ওপর গৃহ স্বামীর নাম-ঠিকানা লেখা থাকবে, ভেতরে থাকবে ছোট একখানা খামে চিঠি আর খামের ওপর আসল নাম। সুড়ঙ্গ পথে ডাক ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।

এরই মধ্যে একদিন সন্তর্পণে সতীন সেনকে হুগলী জেলে চালান দেওয়া হল। কী কারণ, তা জানবার প্রশ্নই অবান্তর। কয়েদীর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

কিছুদিন আগের কথা। অসহযোগ আন্দোলন তখন রবরবা। রাজসাহী জেল ভরতি। ফলে আইন-শৃঙ্খলার বালাই-ই ছিল না। জেলের ভেতর ছিল একটা কুল গাছ। ছেলের দল নির্ভাবনায় এবং নির্দয় হয়ে কুল পাড়ত। খেত। আফিস ঘরের ওপর তলায় থাকত জেলার। সপরিবারে। জেলারের একটি মেয়ে,—সদ্য কিশোরী ছেলেদের হুটোপাটি করে কুল খেতে দেখে ছুটে গিয়েছিল মায়ের কাছে। মাকে ধরে নিয়ে এসেছিল সামনের খোলা ছাদে। আঙুল দিয়ে ছেলেদের দেখিয়ে বেশ উঁচু গলায় মাকে বলেছিল—'ঐ দেখ মা, কয়েদীও কুল খায়।'

১৮ জুন, ১৯২৩। রাত্রিবেলা পৌঁছে গেলেন নজরুল ও অমরেশবাবু। সম্ভবত একটু বেশি রাতেই ও'রা এসে থাকবেন। আমরা টের পাই নি।

সকালবেলা আচমকা গানের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। পাশের ঘরে অর্থাৎ ৭ নং ঘরে,—সেই বড় হলঘরটায় ভেতর থেকে সবল কণ্ঠে গান চলেছে,—'কারার ঐ লৌহ-কপাট......।"

ইংরেজ সরকারের মর্জি বা খেয়াল-খুশি কোন দিনই স্পষ্ট ও বোধগম্য ছিল না। আইন ছিল। কানুনেরও অভাব ছিল না। কিন্তু তাদের যথাযথ প্রয়োগ-পদ্ধতি ছিল চিরদিন দুর্বোধ্য। সাধারণ ক্ষেত্রে ইংরেজের আইন ও তার ব্যবহার ছিল নিরঙ্কুশ, অপক্ষপাত এবং যথাযথ, সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজনৈতিক সম্পর্ক বিন্দু পরিমাণেও যেখানে দেখা দিয়েছে সংশয়, অথবা নিছক সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে, ইংরেজ সেখানে হয়ে পড়ত নৃশংস। শুধু ইংরেজ নয়, তার হাতে গড়া দেশীয় কর্মচারীরা,—ছোট-বড় নির্বিশেষে, সম্যক আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়, কিন্তু তার বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংগৃহীত হলে জাতীয় ইতিহাসের মূল্যবান দলিল হতে পারত।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কাজীকে আমাদের সঙ্গে এবং আমাদের মতো করেই রাখা হয়েছিল। আলিপুর থেকে হুগলী জেলে পাঠাবার সময় তাঁকে জোর করে সাধারণ কয়েদীর ডোরাকাটা জাঙিয়া ও কুর্তা পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ কজীকে 'স্পেশাল ক্লাশ' বন্দী বলে আর গণ্য করা হল না। আগেই-বা কেন তাঁকে স্পেশাল ক্লাশ করা হয়েছিল, আর পরেই বা তা নাকচ করা হল—তার কোন কারণ দর্শাবার প্রয়োজন ওদের ছিল না। 'দোষী জানিল না কিবা দোষ তার, বিচার হইয়া গেল।'

পর্বত প্রমাণ চুরি ও চামারির ব্যূহ ভেদ করে সেদিনকার সাধারণ কয়েদীর ভাগ্যে যে আহার্য জুটত,—তা শুধু অখাদ্য ছিল না, ছিল পশুরও অযোগ্য। সেই খাদ্যই দেওয়া হল কাজীকে। এবং সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক জুলুম ও দুর্ব্যবহারেরও অবধি রইল না।

ইংরেজ ১৯২১ দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল। ভারতবর্ষ—যার ভেতর হাজারখানেক ইংলন্ড পুরে রাখা যায়,—সেই বিশাল দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দুলে উঠেছিল। উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ এ-অবস্থার জন্য তৈরী ছিল না। অপ্রস্তুত ইংরেজের সেদিন, তাই, আইন ও শৃঙ্খলার কথা বেমালুম ভুলে যেতে বাধে নি কোথাও। কিন্তু বরদলী সিদ্ধান্তের পর ইংরেজ সে-ধাক্কা সামলে নিয়েছে। শূন্য কারাগারে জনাকয়েক কয়েদীকে শায়েস্তা করবার যন্ত্র তার আছে, এবং কলাকৌশলও তার অজ্ঞাত নয়।

অবসাদগ্রস্ত দেশের বুকে যে স্তব্ধতা দেখা দিয়েছিল, এই স্বল্পসংখ্যক কয়েদীর জীবন সন্ত্রস্থ করবার পক্ষে তা কম কার্যকর ছিল না। বস্তুত দেশের বুকে সেদিন যে ক্লৈব্য দেখা দিয়েছিল, ইংরেজকে তার হিংস্র স্বরূপ জাহির করতে তা কম প্ররোচিত করেনি।

যেটুকু বাকি ছিল, মহাত্মাজির কারাদণ্ডের পর তাও নিঃশেষ হয়ে গেল। ভক্তিভরে মহাত্মার ছবি চোখের সামনে ঝুলিয়ে রেখে চরকায় সুতো কাটতে যে-সব গান্ধীভক্তরা সেদিন উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা একথাটা বেমালুম ভুলে বসেছিলেন যে, গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের মর্মবাণী চরকা নয়—সংগ্রাম মানসিকতা। যে মুহূর্তে সংগ্রামের গতিপথ রুদ্ধ হয়ে গেল, চরকার চাকাও রইল স্থির হয়েই।

কারাগারের প্রায়োপবেশন শেষ প্রতিবাদ পন্থা। কয়েদীর জীবনে আর কোন অস্ত্র নেই, যা দিয়ে প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সে লড়াই করতে পারে। শেষ এবং মোক্ষম অস্ত্র তার প্রায়োপবেশন। নিজের জীবন বিপন্ন করেও এই নিঃশব্দ, কিন্তু মর্মস্পর্শী প্রতিবাদ হয়তো প্রতিপক্ষের মনে রেখাপাত করলেও করতে পারে। একদিকে কয়েদীর মনের ভেতর আশা জোগায় এই অবচেতন কামনা; অন্যদিকে দেশবাসীর বিক্ষোভ। অর্থাৎ জনমতের চাপে বিরুদ্ধপক্ষকে কব্জা করা। নতি স্বীকার করানো সর্বক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়তো না—তবু রফা হবার পথ উন্মুক্ত হয়। এই সম্ভাব্য জন-বিক্ষোভ ঘটে রাজনৈতিক বন্দীর ভাগ্যেই। এবং বিরোধীপক্ষ এই বিক্ষোভে হয়তো সেই মুহূর্তে ভীত না হলেও পরিণামে যে এই আপাত নিরীহ উপোসের ধাক্কা বিলক্ষণ উপদ্রবের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, সে সম্পর্কে সজাগ না হয়ে উপায় থাকে না।

কাজীর প্রায়োপবেশনের দরুণ বিক্ষোভ করবার মানসিক অবস্থা দেশের ছিল না। কাজীও একথা জানতেন। কিন্তু আত্মসম্মান ও জীবন রক্ষার ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা এ-পথে যেতে তাঁকে বাধ্য করেছিল। আমাদের কয়েকজন সাহিত্য বন্ধু এগিয়ে এসেছিলেন কাজীর পাশে। আর এসেছিলেন দেশবন্ধু। বন্ধুরা চেষ্টা করে রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও শরৎবাবুর (চট্টোপাধ্যায়) মতো কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির উপবাস ভাঙ্গার অনুরোধপত্র জোগাড়ও করেছিলেন।

দেশবন্ধু সেদিন স্বরাজ পার্টি গঠনের কাজে সারা ভারত চষে বেড়াচ্ছিলেন। সর্বস্ব পণ করে পাগলের মতো ছুটছিলেন দেশের এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্ত অবধি। ওরই অবকাশে কাজীর জন্য তিনি জনসভায় প্রতিবাদ করেছিলেন। দেশবাসীকে সজাগ হতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তবুও বলব, তাঁর আবেদনেও দেশের বুকে সাড়া তেমন জাগে নি।

প্রাণের টানে ছুটে এসেছিলেন মাতা বিরজাসুন্দরী। কাজীর ধর্মমা। বন্ধু-বীরেন সেনের জননী। সুদূর কুমিল্লা থেকে ছুটে এসেছিলেন এই মা।

এর আগে এসেছিলেন কাজীর গর্ভধারিণী, আম্মাজান। কাজী তাঁর সঙ্গে দেখাও করেন নি। কিন্তু এবারে কাজীর প্রায়োপবেশনের সংবাদ পাবার পর মুহূর্ত থেকে বিরজাসুন্দরী আহার্য পরিত্যাগ করেছিলেন। উপবাসে দেহ দুর্বলও হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সেই দেহটাকে টেনে নিয়ে তিনি ছুটে এসেছিলেন হুগলী জেলের দ্বারে। আম্মাজানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কাজী, কিন্তু বিরজাসুন্দরী যেদিন এসে দাঁড়ালেন? এলেন মা? এলেন তাঁর "সর্বসহা কন্যা মোর, সর্বহারা মাতা?"

সেই মা,—

"দূর-দূরান্তর হতে আসে ছেলে-মেয়ে
ভুলে যায় তারা সব তব মুখ চেয়ে।
বলে, 'তুমি মা হবে আমার'? ভেবে কী যে
তুমি বুকে চেপে ধর, চক্ষু ওঠে ভিজে
জননীর করুণায়। মনে হয় যেন
সকলের চেনা তুমি, সকলেরে চেন।
তোমারি দেশের যেন ওরা ঘর ছাড়া
বেড়াতে এসেছে এই ধরণীর পাড়া
প্রবাসী শিশুর দল। যাবে ওরা চলে
গলা ধরে দুটি কথা 'মা আমার' বলে।"

সেই মা,—যে মা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে সকল সংকীর্ণতা ও সংস্কার উপেক্ষা করে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে টেনে নেয় বুকে; সিক্ত করে অমৃত নিস্যন্দিনী স্নেহ ও মমতার উজাড় করা বাৎসল্যে। কাজী নয়,—মুসলমান নয়,—সন্তান। এই উদার ও পবিত্রভূমিতে যার জন্ম হয়েছে সে ডাকে একেও মা বলে।

নিজের হাতে লেবু চিপে রসধারায় কাজীর উপবাসখিন্ন কণ্ঠ মা ভিজিয়ে দিয়েছিলেন। কাজীর দাবি ইংরেজ সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হল। কাজী বদলি হলেন বহরমপুর জেলে। সঙ্গে এলেন কালিলাল। (আমার রোজনামচায় লেখা রয়েছে যে, কাজীর সঙ্গে গোপাল সেন ও সেরাজুদ্দীনও উপোস করেছিলেন। গোপালবাবু মুক্তি পেয়েছিলেন কয়েক দিনের মাথায়। সতীন সেনও সে সময় ছিলেন হুগলী জেলে।)

শান্তি ও স্বস্তিতে যে জেলবাস ভাগ্যে নেই, সতীন সেনের আগমনের পর থেকে এটা অনেকেই অনুমান করেছিলেন। হুগলী জেলে যাবার কয়েক দিন পরই অনুমান বর্ণে-বর্ণে ফলে গেল। সংবাদ পেঁৗছে গেল যে, সতীনবাবু হাঙ্গার-স্ট্রাইক শুরু করেছেন। এ ব্যাপারে সতীনবাবুর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। পরবর্তীকালে এই একটানা উপোসের কল্যাণে তিনি বিলক্ষণ খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন।

সতীনবাবুকে হুগলী জেলে পাঠাবার পেছনে একটু ইতিহাস আছে। যখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলাম, একদিন বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে সতীনবাবু ও আমি সাধারণ কয়েদীদের ব্যারাকে দার্জিলিং-এর দলবাহাদুর গিরিকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। গিরিজি পূর্বেও এই জেলে কারাদণ্ড ভোগ করে গেছেন। তখন ছিলেন 'স্পেশাল ক্লাশ'। এবার সরকার বাহাদুর কৃপা করে তাঁকে নামিয়ে দিয়েছেন থার্ড ক্লাশে।

অপূর্ব মানুষ ছিলেন এই দলবাহাদুর। সেদিনকার দার্জিলিং-এর এক এবং অদ্বিতীয় নেতা ও কংগ্রেস কর্মী। সেদিন গোর্খা ও পাহাড়ীরা ছিল ইংরেজের মস্ত বড় হাতিয়ার। এদের মধ্যে বিন্দুমাত্র অসন্তোষ বা ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার করা ইংরেজ বরদাস্ত করতে চায় নি। তাই বারবার দলবাহাদুরকে গ্রেপ্তার করেছে। জেলেও পাঠিয়েছে। এবং উপযুক্ত শিক্ষা দেবার অভিলাষে দলবাহাদুরকে চোর-ছ্যাঁচোরদের সঙ্গে কারাবাস করতে ও তাদের কদন্ন গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। দলবাহাদুর মাছ-মাংস পেঁয়াজ-রসুন খেতেন না। শুকনো ভাত ও চোকলা মেশানো আটার করকরে রুটি খেতে তাঁর খুবই কষ্ট হত। কিন্তু মুখের অনির্বাণ হাসি ও প্রসন্ন দৃষ্টি টিকে রইল একই ভাবে। মোটা লোহার রডের ভেতর দিয়ে আমাদের দুজনের হাত দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

আমরা কথা হারিয়ে ফেলেছিলাম। দলবাহাদুরের সামনে ধুতি-জামা-জুতো পরবার সে অসহ্য ধিক্কার আমাদের সর্বাঙ্গে ছুঁচ ফোটাচ্ছিল, তার জ্বালা বড় কম ছিল না।

ফিরে এসে আমরা গিয়েছিলাম অনেকের কাছে। সেদিন আবুলকালাম আজাদ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মেদেনীপুরের কিশোরীপতি রায় প্রভৃতি ছিলেন আমাদের নেতৃস্থানীয়। তাঁরা খবর শুনলেন, সহানুভূতি দেখালেন, তারপর চোখ ফিরিয়ে চুপ মেরে গেলেন।

কিন্তু সতীন সেন চুপ মেরে যাবার বান্দা ছিলেন না। জেলারকে প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দিলেন এবং জানিয়েও দিলেন যে, সাত দিনের মধ্যে এই অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিকার না হলে তিনি নিজে স্পেশাল ক্লাসের যাবতীয় সুবিধা পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছায় বেছে নেবেন তৃতীয় শ্রেণী কয়েদীর জীবন।

আমার রোজনামচার বিবরণ : তারিখ ১৮ই জানুয়ারী, ১৯২৩।

"শীত ক্রমেই কমে আসছে। দুপুরবেলা বেশ গরম বোধ হয়। ফাল্গুনের আগমন-টান গায়ে লাগছে।'

'সতীনবাবু আজ স্পেশাল ক্লাসের যাবতীয় সুবিধা পরিত্যাগ করলেন। সাধারণ কয়েদীর খাবার আনিয়ে খেলেন। খাট ও বিছানা পরিত্যাগ করে মাত্র দুখানা কাঁটা-কম্বল রেখেছেন। কাপড়-জামা পরিত্যাগ করে কুর্তা ও পাজামা নিয়েছেন। অ্যালুমিনিয়মের থালার বদলে কালো লোহার চাটুতে খাচ্ছেন। নিজের মহলের বাইরে যাওয়া দিলেন

ছেড়ে। চিঠি লেখা, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার সুযোগ ও সুবিধা সাধারণ কয়েদীর প্রাপ্যানুযায়ী চলবে।

"সতীনবাবুর এ কার্য সম্পর্কে অনেক চিন্তা করেছি। সকলে মিলে যদি এ পথ গ্রহণ করতে পারতাম, খুবই ভাল হত সন্দেহ নেই। সতীনবাবুর আদর্শ অনুকরণযোগ্য তাহাও অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু নিজেদের অক্ষমতা নিবন্ধন আমরা তাঁর পথে এগোতে পারলাম না।

"কিছু না করে চুপ করে বসে থাকবারও আমার উপায় নেই। সতীনবাবু ও আমি পাশাপাশি ঘরে থাকি। নির্বিবাদে সতীনবাবুর কৃচ্ছ্রসাধন পরিপাক করা আমার পক্ষে অসম্ভব। গিরিজির জন্য যদি সতীনবাবুর ন্যায় সব ছাড়তে পারতাম, ভাল হত নিশ্চয়ই। কিন্তু পারলাম না। সতীনবাবুর জন্যই তাই আমাকেও ঐ পথ বেছে নিতে হল।'

'জেলারকে কিছু জানালাম না। আমাদের ফালতুর সঙ্গে খাদ্য বিনিময় করলাম। মেটকে ধরে কুর্তা ও পাজামা নিলাম। রাত্রিবেলা খাট সরিয়ে মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে শুলাম। এবং সতীনবাবুকে আমার অভিপ্রায় জানিয়ে দিলাম।'

একমাস চার দিন এইভাবেই ছিলাম। বহরমপুর যাবার দিন কুর্তা ও পাজামা ছেড়ে ধুতি-জামা জুতো পরেছিলাম।

সাধারণ কয়েদীর বেশে সতীনবাবু বহরমপুরে এসেছিলেন। সতীনবাবুর আচরণ নিছক একগুঁয়েমি হিসেবেই সরকার পক্ষ দেখতে চেয়েছিল এবং তিনি পাছে সংক্রামক হয়ে পড়েন, এ দুশ্চিন্তাও তাঁদের বড় কম ছিল না। এবং সম্ভবত এই আশঙ্কায় সতীনবাবুকে হুগলী জেলে স্থানান্তরিত করাও হয়েছিল। তাছাড়া যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজের সুখ-সুবিধে ছেড়ে সাধারণ কয়েদীর জীবনকেই প্রশস্ত ও কল্যাণকর ভাবতে পারে, তার স্থান হুগলী জেলে বাঞ্ছনীয় এবং বিধেয়। হুগলীর সবাই ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী।'

বেলা ৯টার সময় নিচতলায় মওলানা সুফীর ঘরে আমাদের সভা বসল। প্রধান-বক্তা কাজী।

আমার রোজনামচা : 'আজ নয়, গত তিন মাস ধরে হুগলী জেলের এই পৈশাচিক অত্যাচার চলছে। কাজী বললেন,—'কুখাদ্য কায়িক পরিশ্রম ও দন্ড বা হরেক রকমের বাধা-নিষেধ আছে। ওসব অত্যন্ত আপত্তিজনক। কিন্তু তবু আমরা চুপ করেই ছিলাম। সবচেয়ে অসহ্য ওখানকার ইংরেজ সুপারের ইতর ব্যবহার। জীব-জন্তুর সঙ্গেও মানুষ এর চেয়ে ভাল ব্যবহার করে। কথায় কথায় অকথ্য গালাগালি ওর মুখে লেগেই আছে। মানুষে মানুষে ও কাউকেই মনে করে না। অথচ রাজনৈতিক বন্দীদের সবাই ভদ্রসন্তান ও শিক্ষিত।' একটানা কাজী বলে চললেন। সতীনবাবু হুগলী জেলে যাবার পর থেকেই তাঁকে 'সেলে' আটকে রাখা [illegible] সঙ্গে মিশবার বা কথা বলবার উপায় নেই। পাছে সতীনবাবুর সংস্পর্শে এসে অন্যান্য বন্দীরা চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে পড়ে এই দুশ্চিন্তায় সুপার নাকি অস্থির। কথায় কথায় ছোট ছোট ছেলেদের হাতকড়া, পায়ে বেড়ি এবং ঘানি-টানার সাজা নিত্য-নৈমিত্তিক। এই সমস্ত অত্যাচারের কথা দেশবাসী না জানে তা নয়। অথচ আশ্চর্য কেউ একটু উচ্চবাচ্যও করছে না। দেশবাসীর এই নির্বাক উপেক্ষাই আমাদের হাংগার-স্ট্রাইকের শরণ নিতে বাধ্য করল।'

৩০ তারিখ থেকে স্ট্রাইক করা সাব্যস্ত হল। সভায় একথাও আলোচিত হল যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আমাদের প্রায়োপবেশনের কারণ জানিয়ে চিঠি দেবে যাতে বেশ একটু আন্দোলন বাইরে গড়ে ওঠে, তার জন্য সবাই যেন যথাসাধ্য চেষ্টাও করে। গণ-আন্দোলন ছাড়া ইংরেজ সরকারের চৈতন্যোদয় সুদূর পরাহত, এই তত্ত্বকথাটা বারবার স্মরণ করিয়ে সুড়ঙ্গ পথে চিঠি ছুটল ঝাঁকে ঝাঁকে।

শুরু হল উপোস। আগের দিন সন্ধ্যা বেলা জেলারকে চিঠি লিখে আমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সকাল হতে না হতে সকলের আগে ছুটে এসেছিলেন আমাদের নতুন অস্থায়ী সুপার বসন্ত ভৌমিক। স্থায়ী সুপার সিতেন্দ চক্রবর্তী ছুটি নিয়ে বিলেত ছুটেছিলেন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করাতে। বেচারা বিলেত পর্যন্ত যেতে পারেন নি। পথেই মারা যান।

বসন্তবাবু ছিলেন আমাদের একান্তই ঘরের মানুষ। আনন্দবাজার পত্রিকার তখনকার সম্পাদক প্রফুল্ল সরকারের ভগ্নিপতি। দিল-খোলা। অমায়িক। এবং সজ্জন। ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। একেতো অস্থায়ী চাকুরি, তাতে বাঙালী তায় এবং বিলেতে না গিয়ে এত বড় দায়িত্ব—ভয় পাবারই কথা।

ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের যে বিন্দুমাত্রও অভিযোগ নেই, একথা তাঁকে বোঝাতে আমাদের বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়েছিল। তবুও, যাবার সময় তাঁর মুখে-চোখে যে বিষণ্ণ কাতরতা ও অসহায় উদ্বেগ লক্ষ্য করেছিলাম, তা ভোলবার নয়।

খাওয়া-দাওয়ার বালাই নেই। কাজীর গানের আসর বসল হলঘরে। জিতেনবাবু ও মওলানা ছাড়া সবাই আমরা জমায়েৎ। কাজী হুঙ্কার ছেড়ে গান ধরলেন: 'শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল'। তারপর অবিরাম। অজস্র। এইখানেই হুগলী জেলে লেখা তাঁর গান শুনলাম; 'তোমারি জেলে, পালিছ ঠেলে, তুমিই ধন্য ধন্য হে।'

দুপুরবেলা একদল বসল তাশ নিয়ে। অন্য দল পাশা। পূর্ণবাবুর আকর্ষণ পাশায়। তাঁর আমন্ত্রণে আমাকে বসতে হল তাঁরই সঙ্গে। পাশা খেলা আমি জানতাম না। পূর্ণবাবু আমার হাতেখড়ি দিলেন। কিন্তু সর্ত একটা ছিল। প্রতি বাজির শেষে একটা করে সিগারেট। এর আগে কোন প্রকার তামাকের নেশাই আমার ছিল না। এ বিষয়েও পূর্ণবাবু আমার শিক্ষাগুরু। তামাক, তা যে প্রকারের হোক, বিড়ি, সিগারেট অথবা হুঁকো, হলেই হল। পূর্ণবাবুর নিত্য সঙ্গী ছিল তাম্রকূট।

কাজী আর জিতেনবাবু বসলেন দাবা নিয়ে। দুজনেই সমান। ক্ষিপ্রচালে বাজিমাৎ করবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা উভয়েরই। চটপট বাজি শেষ করতে হবে। ঝপাঝপ বল পড়ছে। মাঝে মাঝে হৈ-হৈ করে উঠছেন দুজনেই। অর্থাৎ ভুল চাল ধরা পড়েছে। চাল ফেরৎ নিয়ে হৈ-হৈ। 'পাশা লজ্জা দিয়ো না' শোনা গেল বারকয়েক। সবাই মশগুল।

ধীরে ধীরে বিকেল এগিয়ে আসছে। তপ্ত গ্রীষ্মের দারুণ অগ্নিবাণে ঝলসে উঠেছে মাটি। খোলা গরাদের ভেতর দিয়ে খা-খা করে ঢুকছে আগুনের ঝলকানি। মাঠের বেলির ঝাড়ে ঝাড়ে থোকা থোকা বেলকুঁড়ি। কয়েদী জল ঢালছে ফুলগাছে। ভেজা মাটির গন্ধের সঙ্গে বেলকুঁড়ির গন্ধ ভেসে আসছিল।

সন্ধ্যাবেলা দুখানা টেলিগ্রাম এল একসঙ্গে। বসন্তবাবু নিজে নিয়ে এলেন টেলিগ্রাম। একখানা কাজীর নামে, অন্যখানা পূর্ণবাবুর। বসন্তবাবুর মুখের কালো ছাপ সরে গেছে। ফুটে উঠেছে হাসির রেখা। আমরা ওঁকে ঘিরে দাঁড়ালাম। সতীনবাবু উপোস ভেঙেছেন।

দেশবন্ধু, শ্যামসুন্দর ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুরোধে সতীনবাবু খাদ্য গ্রহণ করেছেন। শ্যামসুন্দর এর পরেই নির্বাচিত হয়েছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

সেদিন আমরা কিছু খেলাম না। বরং দু'দিনের বরাদ্দ একত্র করে পরদিন ভূরিভোজের প্রস্তাব অনুমোদন করল সবাই। এবং রাতেই খাদ্য তালিকা তৈরী হয়ে গেল।

আমরা অনেকেই ছিলাম মাঠে। সহসা আকাশ ভরে গেল গাঢ় কালো মেঘে। কড়কড় করে বজ্রের গর্জন। উঠল ঝড়। সঙ্গে নিয়ে এল বৃষ্টির ধারা। মাঠ থেকে দৌড়ে ঢুকে পড়েছিলাম হলঘরে। গোটা কয়েক লণ্ঠনের আলো,—অতবড় ঘর,—আবছায়া অন্ধকারে আমরা গোল হয়ে বসেছিলাম ঘরের মাঝখানে। গান শুরু হল। কাজীর গান। রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে হল বন্দনা। শেষ হল নিজের গানে। কত নতুন নতুন সুর। কত বিচিত্র কথা। কাজীর গানের সীমা নেই। কাজীর এ-জীবনের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। অজানা-অচেনা কোন গোপনপুরীর রুদ্ধ অর্গল সহসা মুক্ত হয়ে এক নতুন অপরিমেয় মহৎ সৃষ্টি-বৈভব রূপ নিয়ে দাঁড়াল। বাইরে ঝড়-জলের মাতামাতি। ভেতরে কাজীর কণ্ঠে মূর্তিমতী সঙ্গীত-বিভূতি গানে গানে স্রোত বইয়ে দিল। আমরা ভেসে গেলাম।

(ক্রমশঃ)

সাত

ঠিক সাড়ে ন'টার সময় দরজায় টোকা পড়ল,—ঠক্ ঠক্। শব্দ শুনেই নীপা উৎকর্ণ হল। নীলাদ্রি...নিশ্চয় নীলাদ্রি এসেছে।

বিছানার উপর এতক্ষণ সে গড়াচ্ছিল। কাছারির পেটা ঘড়িতে ন'টা বাজবার পর থেকেই নীপা চঞ্চল। কতক্ষণে নীলাদ্রি আসবে। খানিক আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনও আকাশে কালো মেঘ। বাতাসটা ভেজা। পথঘাট ফাঁকা। রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল নেই বললেই চলে। এমনিতেই এদিকে মানুষজন কম হাঁটে। বৃষ্টি হলে তো আর কথাই নেই। তখন পথ জনহীন, আঁধারে বিলীন।

শুয়ে শুয়ে সে এতক্ষণ নীলাদ্রির কথাই ভাবছিল। মুখের উপর অবশ্য একটা পত্রিকা খোলা ছিল। কিন্তু একটা পাতাও নীপা উল্টে দেখেনি। দেখবে কেমন করে? তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে একটা চাপা উত্তেজনা। নীপা ভাবছিল নীলাদ্রি এলে সে কি বলবে? ইচ্ছে করলে ওর মুখের উপর স্পষ্ট জবাব দিতে পারে। পরিষ্কার বলা চলে,—নীলাদ্রি, মাই ডিয়ার। এতদিন তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন ছিল। পলাশপুরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমার জীবন মরুভূমি হয়ে উঠত। মনে মনে তোমার প্রতি আমি ভীষণ আকর্ষণ অনুভব করেছি। একে তুমি প্রেম, ভালবাসা বা খুশী বলতে পার। কিন্তু আজ সে-প্রয়োজন ফুরিয়েছে বন্ধু। এখন তোমার সঙ্গ, সাহচর্য, ভালবাসা কিছুই আমার আবশ্যক নেই। তোমাকে আর আমি চাইনে। নীলাদ্রি, আমার সামনে এখন সৌভাগ্যের দিন। আমাকে যদি ভালবেসে থাক, আমার সাফল্যে তোমার সুখী হওয়া উচিত। তুমি শুনলে খুশী হবে আমি সিনেমায় চান্স পাচ্ছি। চিত্রতারকার ঝলমলে, হাসি-কলকল, গতিময় জীবনের সঙ্গে তুমি কেমন করে তাল দেবে? সুতরাং আমাকে ক্ষমা করো—গুড বাই। হে বন্ধু বিদায়!

কিন্তু এত সব কথা মনে মনে ভাবা চলে। মুখের উপর বলা যায় না। শুরুতেই এই সব কথা বললে নীলাদ্রি রেগে টঙ হয়ে উঠবে। এতদিন একভাবে কাটানোর পর, মুখের উপরে প্রত্যাখ্যান শুনলে কার না ধৈর্যচ্যুতি হয়?

মনে মনে তাই সে ঠিক করেছে। কথাগুলো একসঙ্গে নয়। ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু করে শোনাবে। এবং শেষের কথাটি সবশেষে বলবে। নীলাদ্রি নাটকের ডিরেক্টর হতে পারে। কিন্তু নীপাও কিছু কম যায় না। সে রমনী এবং সুন্দরী। সর্বোপরি চতুরা, নিপুণা অভিনেত্রী। নীলাদ্রি এলেই তাকে সমাদর করে সে-ঘরে বসাবে। নানাভাবে তাকে তুষ্ট করবে। মুখের হাসি, চোখের ইঙ্গিত, ওষ্ঠের বঙ্কিম ভঙ্গি, নানা ছলাকলা সবকিছু দিয়ে নীলাদ্রিকে সে মাকড়সার জালে বন্দী পতঙ্গের মত শক্তিহীন, নির্বিষ করে তুলবে।

দরজায় আবার টোকা পড়ল।

নীপা এবার ব্যস্ত হয়ে বিছানা থেকে নামল। নীলাদ্রি ভারী ছটফটে,...একটু ভীতুও। বাড়ির দরজায় কাছে এসে এক সেকেণ্ডও অপেক্ষা করতে চায় না। অন্তঃপুরে না প্রবেশ করা পর্যন্ত ওর স্বস্তি নেই। সর্বদাই আশঙ্কা। কেউ যদি তার উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। তাহলেই সর্বনাশ হবে। আর সে কারণেই, এ-বাড়িতে নীলাদ্রির আনাগোনা খুবই কম। নীপা কতদিন পরিহাস করে বলেছে, 'আচ্ছা ভীতু মানুষ তো। ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম করবার শখ আছে। অথচ অপবাদ আর সর্বনাশের ভয় ষোল আনা।'

নীলাদ্রি হেসে উত্তর দিয়েছে। 'শুধু হলে এত ভয়ের ছিল না। কিন্তু এ যে পরস্ত্রী। জানাজানি হলে কেলেঙ্কারির একশেষ। মুস্কিল তো সেখানেই—'

দরজা খুলবার আগে নীপা বলল,—'দাঁড়ান না মাস্টারমশায়। এখনই খুলছি। এত ব্যস্ত হলে কি চলে?' তার কণ্ঠে পরিহাসের সুর।

কিন্তু ওদিক থেকে কোন সাড়া এল না। নীপা ভ্রূ কুঁচকে কি ভাবল। তারপর ছিটকিনি নামিয়ে কপাট ধরে টানল। দরজা খুলতেই প্রায় ভূত দেখার মত চমকে উঠল নীপা। চৌকাঠের ওপারে সিঁড়ির উপর অম্বর দাঁড়িয়ে। তার দুটি চোখ একদৃষ্টে শুধু নীপাকেই জরিপ করছে। মুখের রঙ বদল, ভীতত্রস্ত অপরাধীর মত ভঙ্গি, সচকিত বিহ্বলভাব, কিছুই সম্ভবত ওর দৃষ্টি এড়ায়নি।

বাঁকা হেসে অম্বর বলল,—'হঠাৎ ফিরে এসে তোমার খুব অসুবিধে করলাম, কি বলো?'

চট করে নীপার মুখে কোন উত্তর যোগাল না। আমতা আমতা করে সে বলল, —'অসুবিধে মানে? আমার আবার অসুবিধে কিসের?'

—'তাই নাকি?' অম্বর এবার ব্যঙ্গ করল। চৌকাঠ পেরিয়ে সে ঘরে পা দিল। বলল,—'দরজা খুলে নিশ্চয় আমাকে আশা করনি। যেরকম চমকে উঠলে দেখলাম। তা, যার আশায় বসেছিলে তিনি কে?'

নীপার বুকের ভিতরটা কামারশালার হাপরের মত ওঠানামা করছিল। মনের ভিতর একটা অশান্ত ঝড়। রতনপুর থেকে আজ রাতে যে অম্বর ফিরতে পারে, এ-কথা সে একবারও ভেবে দেখেনি। কি বিশ্রী কাণ্ড হল। হয়ত আর একটু পরেই নীলাদ্রি আসবে। তাহলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়। তারপরের কথা নীপা আর ভাবতেও পারে না।

ঝড়ের মুখেও মাঝি যেমন শক্ত হাতে নৌকোর হাল ধরে, নীপাও তেমনি চেষ্টা করল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল,—'কার আশায় আবার বসে থাকব? কি সব আজেবাজে বকছ—?'

অম্বর কটকট করে তার দিকে তাকাল। 'ন্যাকামি করো না। তোমার ছলচাতুরী সব

আমি বুঝি। স্বামী ঘরে নেই বলে কাকে নেমন্তন্ন করেছিলে? দরজা খোলার সময় কি বলছিলে মনে নেই?' কণ্ঠস্বর বিকৃত করে অম্বর নীপার কথাই পুনরাবৃত্তি করল, —'দাঁড়ান না মাস্টারমশাই। দরজা খুলছি। এত ব্যস্ত হলে কি চলে?'

অকাট্য যুক্তি। কেমন করে খণ্ডন করবে নীপা ভেবে পেল না। তবু রণক্ষেত্রে আহত সৈনিকের মত সে মরীয়া হয়ে উঠল। ভ্রূ কুঁচকে মুখখানা শক্ত করে নীপা স্বামীর দিকে তাকাল। বলল,—'তুমি দেখছি ভীষণ সন্দেহবাতিক হয়েছ। আগে আমার কথাটা শোন। তারপর তোমার যা খুশী ভেব।' একনজরে অম্বরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সে ফের শুরু করল। 'আজ বিকেলে মাস্টারমশায় বললেন তাঁর একটা বইয়ের খুব দরকার। ক'দিন ধরে বইটা আমার কাছেই পড়ে আছে। আমি ভাবলাম দুঃখ-হরণকে দিয়ে বইটা পাঠিয়ে দেব। পরে মনে হল দুখু তো ওর বাড়ি চেনে না। তাই শুনে উনিই আমাকে বললেন, রাত্তিরে সিনেমা দেখে এ-পথ দিয়েই তাঁকে বাড়ি ফিরতে হবে। বইটা তখন পেলেও চলবে। বিশ্বাস না হয়। মাস্টারমশাইকে গিয়ে এখনই জিজ্ঞেস করে এসো।' কথা শেষ করে নীপা আর দাঁড়াল না। দুম দুম করে পা ফেলে শোবার ঘরে এসে ঢুকল।

পিছু পিছু অম্বরও এল। আড়চোখে স্বামীর মুখের উপর নীপা একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। মুখ দেখে ঠিক বোঝা যায় না। তবু মনে হল, তার কথায় কাজ হয়েছে। ঝড়ের দাপাদাপি এখন অনেক কম। মানুষটা আগের চেয়ে শান্ত।

—'দুঃখহরণ কোথায়?' গায়ের জামা খুলে রেখে অম্বর প্রশ্ন করল।

মুখ নীচু করে এক মুহূর্ত নীপা কি ভাবল। কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে সে বলল,—'কি করব বল? দুপুর থেকে খালি বলছে সেকেণ্ড শোয়ে সিনেমা দেখতে যাবে। ওকে বললাম কতবার। আমি একলা বাড়িতে থাকব? তুই বরং অন্যদিন যাস। কিন্তু ভারী বেয়াড়া আর জেদী। সেই যে বলল যাবে, তা সে যাবেই।'

মুচকি হেসে অম্বর মন্তব্য করল। 'তাহলে ব্যবস্থা পাকা করেছিলে? রাত্তিরে স্বামী বাড়ি ফিরবে না, চাকরটাকে সেকেণ্ড শোয়ে সিনেমা দেখতে পাঠিয়ে দিয়ে শ্রীমতী নীপা একলা ঘরে রইলেন।' শক্ত করে দাঁত চিপে ঠোঁটদুটি বন্ধ করল অম্বর। স্ত্রীর চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। শিকারী মার্জারের মত এক-পা দু-পা করে এগিয়ে আবার থামল। বলল,—'যার আসবার কথা ছিল সে তোমার পড়ার মাস্টারমশায় নয়।'

থতমত ভঙ্গিতে নীপা শুধু বলল,—'কে তবে? তুমি কাকে সন্দেহ কর? স্পষ্ট করে বল দিকি।'

আরো এক-পা এগিয়ে স্ত্রীর ঠিক সামনে দাঁড়াল অম্বর। একেবারে মুখো-মুখি। শক্ত দুটো হাত থাবার মত নীপার কাঁধের উপর রাখল। বউকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সে বলল,—'চুপ করো। চোরের মায়ের মত বড় গলা করে চেঁচিও না। যার আসবার কথা ছিল তিনিও তোমার গুরুমশায়। তোমার নাট্যগুরু।' একটু থেমে সে ব্যঙ্গ করে যোগ করল,—'তা ভালই তালিম পেয়েছ মনে হচ্ছে। বেশ অভিনয় করছ কিন্তু। আমার হাততালি দিতে ইচ্ছে করছে নীপা।'

স্বামীর হাতের আঙুলগুলো তার কাঁধের নরম মাংসের উপর সজোরে চেপে বসেছে। ব্যথা পেলেও অম্বরের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য সে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না। শুধু মুখে বলল, 'ছাড়ো, ছেড়ে দাও আমাকে। তোমার সন্দেহ ভীষণ। কেউ তোমাকে বোঝাতে পারবে না।'

—'আর বুঝিয়ে কাজ নেই।' অম্বর ক্রুর হেসে বলল।—'অন্য স্বামী হলে এমনি নষ্টচরিত্রের মেয়েমানুষকে কি করত জানো?'

নীপা পর্যুদস্ত, বিপন্ন, আহত। বিফল অভিনেত্রীর মত সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

অম্বর কণ্ঠস্বর একখাদ নামিয়ে বলল,—'সে তোমাকে গলা টিপে খুন করত।'

ভয় পেয়ে নীপা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'তুমিও কি তাই চাও নাকি? রাত্তিরবেলায় সন্দেহের ভূত তোমায় ভর করেছে। এখন দেখছি তুমি সব পার। ছেড়ে দাও বলছি আমাকে। নইলে কিন্তু আমি চিৎকার করে লোকজন জড়ো করব।'

বউয়ের কাঁধের উপর থেকে হাত নামাল অম্বর। মুখ কুঁচকে একটা ঘৃণার ভঙ্গিতে বলল,—'তোমার অঙ্গ স্পর্শ করতেও আমার ইচ্ছে হয় না। একটা কথা তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই। আমাদের আর একসঙ্গে বসবাস করার কোনো মানে হয় না। তোমার পথ এবার তুমি নিজেই দেখে নাও। সিনেমা থিয়েটার বা খুশী করে বেড়াও। আমাদের সম্পর্কের ইতি হোক।'

সমস্ত রাত্তির মেঝের উপর আঁচল বিছিয়ে নীপা শুয়ে রইল। ঠাণ্ডা মেঝে। শক্ত সিমেন্ট তার নরম দেহে একখণ্ড বরফের মত ঠেকল। পালঙ্কের উপর অম্বর আয়েস করে ঘুমোচ্ছে। মানুষটা একবার তাকে কাছে ডাকল না। ঠাণ্ডা মেঝেয় শুতে নিষেধ করে নি। বিছানায় উঠতে বলে নি। দুঃখে, অভিমানে, নীপার চোখ ফেটে জল এল। অম্বর তাকে জঘন্য ভাষায় আজ অপমান করেছে। আর কোন মেয়ে হলে হয়ত একবস্ত্রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত। সকালেই কেচ্ছা মেশানো একটা রসালো কাহিনী শহরে চাউর হত।

ভয়ে, আশঙ্কায় নীপার চোখে ঘুম এল না। হঠাৎ নীলাদ্রি যদি দরজায় এসে টোকা দেয়। অম্বর তাহলে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শক্ত দুই হাতে তার গলা টিপে ধরবে। কাকুতি-মিনতি, ছটফট করলেও নীপাকে সে রেহাই দেবে না। ছেনাল বউকে খুন করে সে বরং জেলে যাবে। আর নীলাদ্রি? তাকে বিশ্বাস নেই। অসম্ভব নয়, সাড়ে নটা রাত্তিরে নীপার কাছে আসতে তার সাহস হয় নি। আর একটু নিশুতি হলেই লোকজন ঘুমিয়ে পড়বে। নীলাদ্রির পক্ষে তখন নিঃশব্দে, চুপিসাড়ে অভিসারে বের হওয়া অনেক বেশী নিরাপদ।

কিন্তু ঈশ্বর তার মুখ রাখলেন। নীলাদ্রি আসেনি। শেষরাত্তিরে ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামল। ঠাণ্ডা জলে ভেজা বাতাস। কখন এক সময় নীপার চোখেও ঘুম নেমে এল। যখন চোখ খুলল, তখন আর অন্ধকার নেই। সমস্ত ঘরে আলোর বন্যা। অনেক বেলা হয়েছে। দুঃখহরণ কাজ করছে আপন-মনে। খোঁজ নিয়ে নীপা জানল চা-টা খেয়ে অম্বর হাসপাতাল গেছে। তাকে কিছু বলে যায় নি।

মঙ্গলবারও নীপা আর কলেজে গেল না।

চান-টান সেরে সে একবার যাবে বলে ঠিক করল। কিন্তু ভাত খেয়ে উঠবার পরই তার কলেজে যাবার ইচ্ছে রইল না। গত রাত্তিরে ভাল করে ঘুম হয় নি। ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়েছিল বলে সমস্ত শরীরে একটা টাটানি ব্যথা। খানিক আগে আয়নায় নিজের চোখমুখ দেখে নীপা প্রায় চমকে উঠেছিল। এক রাত্তিরেই কি বিশ্রী চেহারা হয়েছে তার। ঠোঁট শুকনো। রাতে ঘুম হয় নি বলে চোখ দুটো ফোলা এবং ঈষৎ লাল। সমস্ত দুপুর টানা ঘুম দিতে পারলে বিকেলের দিকে চোখমুখের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হত।

বিছানার উপর নীপা ভেঙে পড়ল। ভাত খাবার পর থেকেই তার খুব ঘুম পাচ্ছে। চোখ দুটো জড়িয়ে এল। এর পর

কি করবে নীপা তাই চিন্তা করছিল। অম্বর তাকে সাফ জবাব দিয়েছে। তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শেষ হোক। নীপাকে তার প্রয়োজন নেই। এই সংসারে সে এখন অবাঞ্ছিত, অনাবশ্যক মেয়ে। চলার পথ তাকে নিজেই দেখে নিতে হবে। অম্বরের ঘরের এক কোণে উচ্ছিষ্ট, আবর্জনা বা জঞ্জালের মত সে পড়ে থাকতে পারবে না।

আজ সকালেই নীপা কলকাতা যাবে ভেবেছিল। কিন্তু মঙ্গলবার বিকেলেই কাকার আসবার কথা। যে লোকটা বাড়ি কিনতে চায়, সঙ্গে সেও হয়ত আসবে। বাড়ি বিক্রির ব্যাপারটা চুকলেই নীপা খানিকটা জোর পায়। তার হাতে থোক কিছু টাকা আসে। আর টাকাই হল মরদ। যত বয়স বাড়ছে, নীপার তাই উপলব্ধি হচ্ছে।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেলা মরতে আর বাকি নেই। গাছের মগডালে রোদ উঠেছে। পাখপাখালির কলরব ঘরে বসেও শোনা যায়। অপরাহ্ণের ছায়াভরা মাঠে ছোট ছেলেমেয়ের দল কখন হুটোপাটি করে খেলতে নেমেছে।

সামনে দুঃখহরণ দাঁড়িয়ে। সম্ভবত বেশ কিছুক্ষণ ধরে সে তাকে ডাকাডাকি করছিল। নীপা উঠে বসতেই একগাল হেসে সে নিবেদন করল,—ইস্। কি বেদম ঘুমোচ্ছিলেন। আমি ডেকে ডেকে হয়রান।'

চোখ মুছতে মুছতে নীপা বলল,—'বাবু এসেছিলেন খেতে?'

—'হুই? এলেন বৈকি। জামা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুলেন। খেয়ে দেয়ে ওই চিয়ারটায় বসে জিরালেন কতক্ষণ। আবার বেরিয়ে গেলেন হাসপাতালে।'

নীপা একটু অবাক হল। অম্বর বাড়িতে এল, আবার বেরিয়ে গেল। আর সে জানতেই পারল না। তার ইচ্ছে হল দুঃখহরণকে জিজ্ঞেস করে। সে তাকে ঘুম থেকে ওঠায়নি কেন? কথাটা তার মুখে এল। কিন্তু সাহস করে নীপা বলতে পারল না। দুঃখহরণ যদি তার মুখের উপর বলে দেয়। বাবু তাকে নিষেধ করে-ছিলেন। দিদিমণিকে ঘুম থেকে ডেকে তুলবার প্রয়োজন নেই। তাহলে তার সম্মানটা থাকে কোথায়? স্বামীই যখন তাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে। তখন মিছিমিছি চাকর-বাকরের সামনে নিজেকে শস্তা করে লাভ কি?

দুঃখহরণ এবার আসল কথাটা বলল,—'দিদিমণি, সেই বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এয়েছেন। তেনাকে বসিয়ে রেখেছি বাইরের ঘরে।'

—'কোন বাবুরে?' নীপা বিস্ময় প্রকাশ করল। 'কি রকম দেখতে বল তো? হাস-পাতালের কোনো লোকটোক নাকি?'

'না, না।' দুঃখহরণ প্রায় প্রতিবাদ করল। একটু গলা নামিয়ে বলল,—'কাল সকালে যে বাবু এসেছিলেন। সেই যে সোনার মত দেখতে। কুকড়া কুকড়া চুল দিদিমণি।' কথা শেষ করে দুঃখহরণ একটু হাসল।

নীপা বুঝতে পারল। দেবরাজ এসেছে। এক মুহূর্ত সে চিন্তা করল। বিছানা থেকে নেমে ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নার সামনে দাঁড়াল। দর্পণে তার প্রতিবিম্ব দেখে নীপা মুখ কোঁচকাল। সত্যিই খুব ঘুমিয়েছে সে। চোখ ফোলা, মুখটা কেমন ভারী দেখাচ্ছে। ঘুমিয়ে উঠে ঠোঁট দুটো পর্যন্ত পুরু হয়েছে তার। এমনি রাক্ষুসীর বেশে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ান যায় না। নীপা এখন বাথরুমে গিয়ে ঢুকবে। মুখ হাত ধোবে। গায়ে জল ঢালবে। আয়নার সামনে বসে কেশচর্চা করবে। মুখ পরিষ্কার করে কপালে টিপ আঁকবে, ঠোঁটে স্টিক বোলাবে। জামা-কাপড় বদলে তার সজ্জা সম্পূর্ণ হতে সন্ধ্যে কাবার। দেবরাজ কি বাইরের ঘরে অপেক্ষা করবে? উঁহু, সে হয় না। ইতিমধ্যে যদি অম্বর হাসপাতাল থেকে ফিরে আসে তাহলে আর কথাই নেই। একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারির সৃষ্টি হবে।

নীপা বলল,—'বাবুকে তুই বলে আয়, দিদিমণির শরীর খুব খারাপ। আজ আর দেখা করবেন না। আপনি বরং পরে আসবেন।'

মাথা হেলিয়ে দুঃখহরণ চলে গেল। নীপা ফের বিছানায় গড়াল। একটু পরেই দরজাটা সশব্দে বন্ধ হল। দেবরাজ চলে গেল ভেবে নীপা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। শুধু অম্বরের কথা ভেবে নয়, অনেকটা ইচ্ছে করেই আজ সে দেবরাজকে এড়িয়ে গেল। পুরুষজাতের দুর্বলতা তার জানা। মেয়ে দেখলেই চঞ্চল। সুন্দরীর সান্নিধ্যে এলে অনেকেরই প্রায় পাগল-দশা। কিন্তু দেবরাজ একটু ভিন্ন, একটু অন্য ধাঁচের। তার চাঞ্চল্যের বহিঃপ্রকাশ কম। কিন্তু অন্তরে তা দুর্বার, বর্ষার চলনামা পাহাড়ী নদীর মত বেগবতী। ফলে নারীকে ধীরে ধীরে জয় করবার ইচ্ছে ওর কম। ও চায় গ্রাস করতে। একদিনে,...অকস্মাৎ। দেবরাজের চোখের দুই মণির মধ্যে সেই সর্বগ্রাসী কামনা। গতকালই নীপা তা টের পেয়েছে।

একলা ঘরে দেবরাজের মুখোমুখি হতে নীপার আজ সাহসে কুলোয়নি। তার ঘুম-ভাঙা চেহারা, আলগা বেশবাস, এলোচুল, শিথিল ভঙ্গি একটা ঘুমন্ত পশুকে খোঁচা দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ঘরে অবশ্য দুঃখহরণ ছিল। কিন্তু চাতুরী করে ওকে সরাতে কতক্ষণ? ছল করে দেবরাজ ওকে সিগারেট কিনতে পাঠাবে। কাছাকাছি কোনো দোকানে যা মিলবে না। প্রথমদিন নীলাদ্রি তাকে একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে তুলেছিল। লতা-পাতা আঁকা পর্দা-ঢাকা কেবিনের মধ্যে সে তার হাত ধরল। নীপা জানে, দেবরাজের অনেক বেশী দাবি। প্রথমদিনেই সে আধুনিক সৈন্যবাহিনীর মত অনেকদূর অগ্রসর হতে চায়। তার আগ্রাসী দাবি মেটানো নীপার পক্ষে সম্ভব নয়।

দুঃখহরণ এসে আবার তার সামনে দাঁড়াল। হাতে একটা স্লিপ কাগজ।

—'বাবু এটা দিতে বললেন আপনাকে।' কাগজটা সে নীপাকে এগিয়ে দিল

ছোট্ট স্লিপে দু লাইন লেখা—

একটা খবর দিতে এসেছিলাম। নীলাদ্রি-বাবু হঠাৎ কাল কলকাতা গিয়েছেন। কবে ফিরবেন বলে যান নি। সুতরাং রিহার্সাল এখন বন্ধ—

দেবরাজ।

চিঠি পড়েই নীপা একটু হাসল। কেমন কাটা কাটা ভাষা। বাবুর রাগ আর অভিমান

দুই-ই চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে। দেবরাজ মেয়েদের মত সেন্টিমেন্টাল নাকি? ভ্রূ কুঁচকে নীপা কি যেন ভাবতে লাগল।

ফের এক দুর্ভাবনা। নতুন করে এইমাত্র তা গজিয়ে উঠল। গতকাল নীলাদ্রি কলকাতা গিয়েছে? মাত্র রবিবারই তো সেখান থেকে ফিরল। হঠাৎ আবার কলকাতা দৌড়বার কি প্রয়োজন ঘটল? ব্যাপারটা কিছুতেই তার বোধগম্য হল না।

আর একটা প্রশ্নও তার মনের নিভৃত কোণে কাঁটার খোঁচার মত বিঁধল। নীলাদ্রিকে লেখা সেই চিঠিখানা কাকে দিয়ে এল দুঃখহরণ? যা হাঁদা গঙ্গারাম ছেলে। কার হাতে চিঠিখানা তুলে দিল কে জানে। নীলাদ্রি যদি কলকাতা চলে গিয়ে থাকে, তাহলে চিঠিখানা কেমন করে তার হস্তগত হবে?

গালে হাত দিয়ে নীপা সাত-পাঁচ ভাবতে লাগল।

●

রাত আটটা নাগাদ কাকা এলেন।

নীপা তখন একটা বইয়ে মুখ দিয়ে বসে। টেবিলের উপর ধূমায়িত এক কাপ চা। অন্যমনস্কের মত নীপা বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছিল। আজ তার পরনে আকাশী নীল রঙের একটা তাঁতের শাড়ি। গায়ে স্লিভলেস ব্লাউজ নয়। হাত-ওলা জামা,—কনুয়ের একটু উপর পর্যন্ত ঝুলে। প্রায় কোমর পর্যন্ত ঢাকা। কাকা আসবেন বলেই নীপার এই ভিন্ন ধরনের পরিমিত সাজ। সিল্কের কাপড় তার গায়ের উপর যেন চেপে বসে। পিঠের আদ্ধেক-ঢাকা খাটো জামাগুলো পরে কাকার সামনে বসা যায় না। কেমন অস্বস্তি লাগে।

দরজা খুলেই নীপা ছোট্ট মেয়ের মত কলকল করে উঠল।

—'উঃ। এত দেরি হল তোমার আসতে। আমি কখন থেকে বসে আছি। আচ্ছা মানুষ বাবা!''

কাকা একটু হাসলেন। নীপার মাথায় একটা হাত রেখে বললেন, —'পাগলী মেয়ে, কি করবো বল? যা দিনকাল,—ট্রেনই একঘণ্টা লেট। নইলে তো তোর কাছে কখন পৌঁছে যেতাম।'

কাকার দিকে ভালো করে তাকিয়ে নীপা কি যেন খোঁজ করল। পরক্ষণেই সে অবাক হয়ে বলল,—'তোমার সুটকেস-টুটকেস কিছুই এবার আননি কাকা?'

—'এনেছি রে।' কাকা রহস্য করে হাসলেন। 'সেগুলো রেখে এলাম হোটেলে।'

—'হোটেলে?' নীপা যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'হোটেলে কেন উঠতে গেলে? কি ব্যাপার বল তো তোমার? ও বুঝি কিছু লিখেছিল?'

কাকা হো হো হাসলেন। 'তুই দেখছি জামাইকে খুব অবিশ্বাস করিস। তোকে না জানিয়ে ও কি আমায় কিছু লিখতে পারে? বিশেষ করে সম্পর্কটা যখন তোরই মাধ্যমে।'

ন্যায্য কথা। নীপা বেশ লজ্জিত হল। তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে এখন মস্ত ফাটল। কাকা কি তাই টের পেয়েছেন? তার বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন করে উঠল।

তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে সে বলল,—'তাহলে বল, কেন হোটেলে উঠতে গেলে?'

—'কেন আবার?' কাকা যেন ওকেই প্রশ্ন করলেন। একটু থেমে ফের বললেন,—'আরে, সেই চন্দ্রবদনবাবু যে এসেছেন আমার সঙ্গে। বেচারী হোটেলে একা থাকতে চায় না। কাজেই আমাকেও থাকতে হচ্ছে।'

—'চন্দ্রবদনবাবু মানে? যিনি আমার বাড়ি কিনতে চান?'

—'ঠিক ধরেছিস। ওকেও নিয়ে এলাম সঙ্গে করে। তোদের সঙ্গে সামনাসামনি কথাবার্তা হোক। তাতে দু পক্ষেরই সুবিধে।'

একটু চিন্তা করে নীপা বলল,—'আমরা আবার কি কথাবার্তা বলব কাকা? তুমি যা ঠিক করে দেবে, তাই হবে। বাড়ি-বিক্রীর আমরা কতটুকু বুঝি?'

—'সে হয় না মা।' কাকা মুখ গম্ভীর করে বললেন। 'এ হল সম্পত্তি হস্তান্তর। তোমার পৈতৃক বিষয়। বিক্রী করবার আগে দরদাম ঠিক করে নাও, পরে এই নিয়ে যেন কোনো ক্ষোভ বা দুঃখ না হয়।'

—'কি যে বল তুমি।' নীপা হাল্কা-সুরে বলল।

—'ঠিকই বলছি রে।' কাকা সহাস্যে ওর মুখের দিকে তাকালেন। 'জামাইকে কাল সকালে একটু থাকতে বলিস। চন্দ্রবদনকে নিয়ে আমি আসব। এই ধর আটটা নাগাদ,—কথাবার্তা তখনই শুরু করা যাবে।'

—'বেশ, তাই হবে কাকা।' নীপা ফস করে বলে ফেলল।

কুচোকাচা আরো দু চারটে কথা সেরে কাকা উঠলেন। বিদায় জানাতে নীপা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল। কাকা বললেন,—'জামাইয়ের সঙ্গে দেখা হল না। আমার নাম করে বলিস ওকে। তোর এখানে উঠলাম না বলে বাবাজীবন আবার না রাগ করে বসে।'

—'সে আমি বুঝিয়ে বলব। তুমি কিছু ভেব না।' নীপা আশ্বাস দিয়ে বলল।

ছায়ার মত ওর কাছ ঘেঁষে কাকা হঠাৎ বললেন,

—'একটা কথা তোকে আগেই বলে রাখি। চন্দ্রবদনের সাদা টাকার একটু টান আছে। অবশ্য বাড়ির দাম দেবার ক্ষমতা রাখে। শুধু হাজার পনের টাকা একটু হেরফের করে নিতে হবে।'

সাদা কালোর মহিমা ভাইঝির মাথায় তেমন ঢুকল না দেখে কাকা হেসে বললেন, —'যা, এই নিয়ে তোকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। কাল সকালে জামাইকে বললেই সে বুঝবে।' নীপাকে একটু আদর করে কাকা এবার পথে নামলেন।

রাত এগারোটার মত। মফঃস্বল শহরে এখনই নিশুতি রাত। সাড়াশব্দ কম। অনেকেই গাঢ় ঘুমে অচেতন। যারা এখনও ঘুমোয় নি তাদের কেউ বা শয্যা আশ্রয় করে ছেলেবেলাকার ঘুমপাড়ানি গানের সুর মনে করবার চেষ্টা করছে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিশুতি পৃথিবী। আকাশের বোবা নক্ষত্রের দল শুধু অতন্দ্র প্রহরী। গাছগাছালির ফাঁকে জোনাকির আলো চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে কুকুরের নৈশ চীৎকার, কিংবা একটা সান্টিং ইঞ্জিনের ঘস্ ঘস্ ধ্বনি, কাঁপা কাঁপা হুইসিল কানে আসে।

হোটেলের ঘরে দুজনে কথা বলছিল।

ঘরের মধ্যে ছায়া ছায়া রাত। কাছাকাছি কোনো কামরা থেকে একটা টাইমপিসের টিকটিক শব্দ আসছে।

—'আমার ভাইঝির বাড়িটা তোমার খুব পছন্দ হয়েছে চন্দ্রবদন, তাই না?'

—হোয়েছে বৈকি। নইলে আপনার সঙ্গে কি এতোদূর আসি মোশায়।'

—বাড়িটা আমার হলে তোমার কাছে কত দাম পেতাম চন্দ্রবদন?'

—'তা কম-সে-কম ষাট কি সত্তর হাজার তো পেতেনই। কিন্তু ফালতু এ কথা কেনো বলছেন? বাড়িটা তো আপনার নয় নরেশবাবু।'

আশ্চর্য! অপরপক্ষের কাছ থেকে আর কোনো উত্তর এল না।

অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যায় না। শুধু সিগারেটের অগ্নিবিন্দুটি চোখে পড়ে।

একটা চক্রান্তের প্রতীকের মত অগ্নি-বিন্দুটি অন্ধকারে জ্বলতে লাগল।

(চলবে)

প্রাচীন ভারতের সন্ধানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন

অতীতে ভারতের বুকে কত সভ্যতা কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটেছে। সেইসব সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন ভারতের মাটির গর্ভে রয়ে গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যের অনেক কথা আজ আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু এখনও আরো অনেক কিছু জানার বাকি আছে। তাই ভারতের নানাস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রতি বছরই হয়ে থাকে। গত তিন বছর ধরে শীত ও বসন্তকালে মথুরার কাছে শোংখ ঢিবিতে খনন কার্য চালানো হচ্ছে এবং তার ফলে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু অমূল্য নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই খনন কার্যে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকদের সহযোগিতা করছেন জার্মানীর গবেষণা সমিতির একদল বিজ্ঞানী। এখানে প্রথম খনন কার্য হয় ১৯৬৬-৬৭ সালের শীতকালে। সে সময় ঢিবির উত্তর দিকে একটি বড় ট্রেঞ্চ বা পরিখা খোঁড়া হয়। পরের বছর ঢিবির উত্তর পূর্ব দিকে একটি ৫০×৫০ মিটার আয়তনের আনুভূমিক খনন করা হয়। এই দুটি খননের ফলে সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে জাঠ যুগের প্রাচীর বেষ্টিত বাসগৃহ ও একটি প্রাচীন দুর্গ আবিষ্কৃত হয়। এই অবস্থাতেই নিচের স্তরে পূর্ববর্তী যুগের প্রাচীরের ভগ্নাংশ দেখা যেতে থাকে। ১৯৬৮-৬৯ সালে এইখানেই খনন কার্য শুরু করা হয়।

এই খনন কার্যের ফলে যে ভগ্ন নিদর্শনগুলির সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি মধ্যযুগের (অর্থাৎ খৃস্টীয় পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীকালের) বলে প্রমাণিত হয়। এই ভগ্ন নিদর্শনগুলি পর্যবেক্ষণ করে জানা যায়, শোংখ ঢিবির পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পর পর বহু আক্রমণকারী বিজেতার দ্বারা বিধ্বস্ত হয়, যেমন হয়েছিল মথুরার পার্শ্ববর্তী অধিকাংশ অঞ্চল। তৃতীয় খনন কার্যের সময় চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তর্বর্তীকালের পোড়ামাটি ও মৃৎপাত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু আরও নিচের স্তরে আরো প্রাচীনকালের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্তি সমন্বিত ধূসর প্রস্তর ও পোড়ামাটির ফলক এবং নানারূপ অলংকৃত মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। মধ্যযুগের গোড়ার দিকের (অষ্টম শতাব্দীর) নিদর্শনগুলির মধ্যে দেখা যায় শঙ্খ পদ্ম ও জ্যামিতিক নকসা আঁকা অপরূপ পানপাত্র। খনন-কার্যের শেষ পর্যায়ে আবিষ্কৃত হয় বড় আকারের ইঁটের তৈরী বাসগৃহের ছাদ।

এই নিদর্শনগুলির আনুমানিক কাল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত হচ্ছে, এগুলি কুশান যুগের (আনুমানিক খৃষ্টীয় ৩০০ অব্দ) শেষ দিকের। আমরা জানি, কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের কাল নিরূপণ করা হয় নিদর্শনটির শিল্পবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে। কুশান যুগের প্রস্তর-রিলিফের আরও নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেছে, শোংখ ঢিবি ঐ যুগেরই। এই খনন কার্যের (১৯৬৮-৬৯ সালের) সবচেয়ে মূল্যবান নিদর্শন হচ্ছে, একটি দ্বিপ্রস্থের রিলিফ। এই রিলিফে দেখা যায়, পুরাণের বিষ্ণুর বাহন গরুড় একটি তিন-ফণাবিশিষ্ট সাপকে ধরে আছে। এই নিদর্শনটি থেকে স্থির সিদ্ধান্ত করা যায়, এটি কোন প্রবেশ দ্বারের অংশ হওয়া অপেক্ষা একটি সম্পূর্ণ প্রাসাদেরই অংশ বিশেষ। এ থেকে আশা করা যাচ্ছে, ঐ যুগের একটি মন্দিরের ভগ্নাংশ খুঁজে পাওয়া যাবে। এখন পর্যন্ত দেবদেবীর মূর্তি, পোড়ামাটির কাজ, মৃৎপাত্র, অলংকার ও মুদ্রার নিদর্শন পাওয়া গেছে। ১৯৬৯-৭০ সালে এই শোংখ ঢিবি অঞ্চলে যে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য চালানো হবে তার ফলে আশা করা যায়, আরও মূল্যবান নিদর্শন আবিষ্কৃত হবে এবং এ সম্পর্কে আরও বিস্তৃতভাবে জানা যাবে।

ভারতে পরমাণু শক্তির ভবিষ্যৎ

বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের ৫২তম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে গত ৩০ নভেম্বর ট্রম্বের ভাবা পরমাণু শক্তি গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ডঃ হোমী শেথনা ৩১ বার্ষিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্মারক-বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'ভারতে পরমাণু শক্তির ভবিষ্যৎ।'

ডঃ শেথনা তাঁর বক্তৃতায় ভারতের প্রগতি ও শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে পরমাণু-শক্তির ভূমিকা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন ঃ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই নতুন শক্তি-উৎসের সম্যক তাৎপর্য সবেমাত্র অনুভূত হয়েছে। এই শক্তি উৎসের দ্বারা কোন দেশ কতদূর উপকৃত হতে পারে তা অনেকগুলি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। কোন্ সময়ের মধ্যে পরমাণু-শক্তি চালু হবে এবং কি হারে পরমাণু-শক্তি কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠবে তা নির্ভর করে বর্তমানে যে প্রচলিত জ্বালানী ও জল-শক্তি আছে তার উৎসের ওপর। কোন দেশে পরমাণু-শক্তি গড়ে তোলার সময় সেখানে বর্তমান অবস্থায় কি পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয় তার ওপর ভিত্তি করে পরমাণু-চুল্লীর আকার এবং সেটি কি ধরনের চুল্লী হবে তা স্থির করা হয়। বর্তমানে ভারতে চারটি প্রধান বিদ্যুৎ উৎপাদন গ্রীড আছে। প্রত্যেক গ্রীড থেকে ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যায়। বর্তমানে যে হারে বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা বেড়ে চলেছে তা পূরণ করতে হলে প্রত্যেক গ্রীডে বছরে অতিরিক্ত ৪০০-৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করতে হবে।

ভারতে যে সব জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপিত হয়েছে তা থেকে বর্তমানে আকর্ষিত বিদ্যুৎ শক্তির শতকরা ৩০-৫০ ভাগ পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে এই উৎপাদন হার বাড়বে আশা করা যায়। কিন্তু ভারতে বৃষ্টিপাত সব সময় এক রকম হয় না— কখনও হয় বেশি, কখনও হয় কম বা একেবারেই হয় না। এর ফলে এদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-হার সীমিত।

কয়লার সাহায্যে যে শক্তি উৎপাদন হয় সে সম্পর্কেও একটা সমস্যা আছে। ভারতের সর্বত্র কয়লা পাওয়া যায় না। ভারতের কয়লা-সম্পদের বেশির ভাগ আছে বাংলা বিহার উড়িষ্যা অঞ্চলে এবং কিছু আছে মধ্যপ্রদেশে। ভারতের যে তিনটি অঞ্চলে পরমাণু-শক্তি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে ও হচ্ছে সেখানে মূল জ্বালানী কয়লা ৮০০-২০০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে নিয়ে যেতে হয়। এতে পরিবহনের খরচ হয় বেশি। এছাড়া ভারতীয় কয়লার ছাই-এর অংশ বেশি এবং তাপ-উৎপাদন হার (ক্যালোরী অংক) কম। এ জন্যে কয়লার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ হয় অনেক বেশি।

ভারতের তৈল সম্পদও খুব বেশি নয়। নতুন তৈল-উৎসের সন্ধান যদিও বা পাওয়া যায়, কিন্তু তার দ্বারা ক্রমবর্ধমান শক্তি-উৎপাদনের চাহিদা মেটানো যাবে না।

এ সমস্ত কারণে ভারতে পরমাণু-শক্তি উৎপাদনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৪৮ সালের অগাস্ট মাসে পরলোকগত ডঃ হোমী ভাবার নেতৃত্বে ভারতের পরমাণু-শক্তি কমিশন গঠিত হয়। ট্রম্বের পরমাণু-শক্তি কমিশন গঠিত হয়। ট্রম্বের পরমাণু-শক্তি গবেষণা কেন্দ্রে ইতি-মধ্যেই দুটি পরমাণু-চুল্লী চালু হয়েছে এবং কানাডার সহযোগিতায় তৃতীয় পরমাণু-চুল্লী গড়ে উঠছে। ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে তারাপুরে ভারতের প্রথম পরমাণু-শক্তি তাপ-উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং গত মাস থেকে সেটি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চালু হয়েছে।

ভারতের পরমাণু-শক্তি উৎপাদনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে তুলতে হবে। আমাদের দেশে যে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তার সদ্ব্যবহারের জন্যে কানাডায় উদ্ভাবিত ভারী জল মন্দীকৃত ধরনের পরমাণু-চুল্লীই হচ্ছে বিশেষ উপযোগী। ভারতে অপেক্ষাকৃত কম খরচে শক্তি উৎপাদনের জন্যে এই শ্রেণীর পরমাণু-চুল্লী নির্মাণ করা প্রশস্ত। এ-সব দিক বিবেচনা করে ভারতের পরমাণু-শক্তি কমিশন রাজস্থানের রানা প্রতাপ-সাগরে কানাডা ধরনের দ্বিতীয় পরমাণু শক্তি কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাজস্থান পরমাণু-শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের নির্মাণ শুরু হয় ১৯৬৪ সালে এবং দ্বিতীয়

শেওথা ঢিবির খনিত অংশের একটি দিক

ইউনিটের কাজ আরম্ভ হয়েছে ১৯৬৭ সালে। তামিলনাড়ুর কালপাক্কামে তৃতীয় পরমাণুশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে। এখানকার পরমাণু চুল্লীটিও হবে কানাডা ধরনের।

বহু সংখ্যক ভারতীয় বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশলী পরমাণুশক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের নক্সা রচনা ও নির্মাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এখন এমন অবস্থায় পৌঁছনো গেছে, যখন ভারতীয় বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদেরা বৃহদাকার পরমাণুশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। এতদিন পর্যন্ত আমরা বিদেশী বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশলীদের সহযোগিতায় পরমাণুশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করেছি।

ভারতে থোরিয়ামের বিপুল সম্পদ আছে। এই থোরিয়ামকে পরিণত করা যায় ইউরেনিয়াম—২৩৩-এ। এছাড়া প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামকে পরিণত করা যায় প্লুটোনিয়ামে। ভারতে পরমাণু-শক্তি উৎপাদকের ভবিষ্যৎ বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে প্লুটোনিয়াম ভিত্তিক পরমাণু চুল্লী এবং থোরিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম-২৩৩ উৎপাদনকারী পরমাণু চুল্লীর বিশেষ সম্ভাব্যতা আছে। পরমাণু শক্তি কমিশন বর্তমানে এই বিষয়টি বিবেচনা করে দেখছেন এবং এই পরিকল্পনার প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

ভারতে পরমাণু বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা দেশের সামগ্রিক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার প্রগতির জন্যে একান্ত প্রয়োজন। যদিও অর্থনৈতিক দিক বিশেষভাবে বিবেচ্য, তবু শুধু প্রাথমিক খরচের কথা ভেবে পরমাণু শক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনা ত্যাগ করা উচিত। ভবিষ্যতে এই নতুন শক্তি উৎস থেকে আমরা যে বিপুল উপকার পাব, সে কথা বিবেচনা করেই আমাদের এ বিষয়ে অগ্রসর হতে হবে।

চুলে অপুষ্টির লক্ষণ আবিষ্কার

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী সম্প্রতি প্রমাণ পেয়েছেন, মানবদেহে সাময়িকভাবে প্রোটিনের অভাব ঘটলে মাথার তালুর উপরকার চুলের গোড়ার গঠন প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। হাসপাতালে 'কোয়াসিওরকর' রোগ নির্ণয় করা হয় চুলের গোড়ার পরিবর্তন দেখে। এ রোগের লক্ষণ হল প্রোটিনের অভাব। বালক-বালিকাদের মধ্যে এই রোগ হয় এবং তাতে হাড়ের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।

বর্তমানে শুধুমাত্র প্রোটিন-ক্যালোরীজনিত অপুষ্টিই ধরা যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে প্রোটিনজনিত পুষ্টি বা অপুষ্টি নির্ণয়ের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্যায়ের লক্ষণ আবিষ্কারের কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞানীরা চুলের মাধ্যমে দেহে প্রোটিনের অভাব নির্ণয় করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করছেন।

জীব-বিজ্ঞানে ইলেকট্রন অনুবীক্ষণের ভূমিকা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্র

গত ১—৩ ডিসেম্বর কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিকস্-এ জীব-বিজ্ঞানে ইলেকট্রন অনুবীক্ষণের ভূমিকা সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান।

বর্তমানে জীববিজ্ঞানের প্রায় সকল বিভাগে ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ একটি অপরিহার্য হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এ জাতীয় আলোচনা-চক্রের গুরুত্ব অসীম। ভারতীয় বিজ্ঞানী ও গবেষকরা ছাড়া অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, জাপান, সুইডেন, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত কয়েকজন বিশিষ্ট ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ-বিজ্ঞানী এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। জীববিজ্ঞানে ইলেকট্রন অনুবীক্ষণের ভূমিকার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রায় পঞ্চাশটি গবেষণা-পত্র নিয়ে আলোচনা হয়। এই সমস্ত আলোচনা কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল ঃ (১) ডি এন এ এবং ক্রোমোজোম, (২) শস্যাদির ভাইরাস, (৩) প্রাণীর ভাইরাস এবং ব্যাক্টিরিয়া, (৪) কোষজ আনুবীক্ষণিক বস্তু (নিউ-ক্লিয়াস, মিটোকনড্রিয়া, মেমব্রেন ইত্যাদি), (৫) স্তনপায়ী জীবের টিস্যু এবং নিদানতত্ত্ব, (৬) ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ পদ্ধতি।

ডি এন এবং ক্রোমোজোম বিভাগে বর্তমানকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডঃ ক্লিনস্মিডট্ তাঁর সর্বশেষ গবেষণা সম্পর্কে বিবরণ দেন। এ সম্পর্কে ভারতীয় এবং জাপান ও ইটালীর বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার বিষয় আলোচনা করেন। শস্যাদির ভাইরাস বিভাগে ভারতীয় কৃষি গবেষণা মন্দিরের বিজ্ঞানীরা চাল ও গমের ভাইরাস সম্পর্কে তাঁদের ইলেকট্রন আনুবীক্ষণিক গবেষণার বিষয় আলোচনা করেন। মহীশূরের বনজ গবেষণা মন্দিরের বিজ্ঞানীরা চন্দন কাঠের একটি রোগের কারণ সম্পর্কে তাঁদের অনুসন্ধানের বিবরণ পেশ করেন। কোষজ আনুবীক্ষণিক বস্তু বিভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডঃ জোন্স্টান্ড এবং ডঃ রোথ, ফ্রান্সের ডঃ বার্নার্ড, জাপানের ডঃ ইয়াসুজুমি প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। স্তনপায়ী জীবের টিস্যু এবং নিদানতত্ত্ব বিভাগে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ক্যানসার কোষ সম্পর্কে তাঁদের গবেষণার বিবরণ প্রদান করেন। ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ পদ্ধতি বিভাগে ইলেকট্রন অনুবীক্ষণতত্ত্ব সম্পর্কিত সমিতিসমূহের আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের সভাপতি ফ্রান্সের অধ্যাপক ডুপোয়ি তাঁর উদ্ভাবিত ত্রিশ লক্ষ ভোল্ট ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের বিবরণ দেন। কেম্ব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ গবেষণাগারের ডঃ কসলেট জীববিজ্ঞানে অতি শক্তিশালী ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ, সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ সহযোগিতায় এই আলোচনা-চক্র আয়োজিত হয়।

—প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিছুক্ষণ পরে ঝাঁপ খুলতেই দেখা গেল কোথায় গো-সাপ! সেখানে বসে আছেন এক পরমাসুন্দরী কন্যা, তিনি বসে মৃদু মৃদু হাসছেন। যাঁরা মঙ্গলকাব্য পড়েছেন তাঁরা বুঝবেন যে, 'গোধিকা'র রূপ ধরে কালকেতুর ঘরে যিনি এসেছিলেন তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং পার্বতী। ছদ্মবেশিনী পার্বতীর সঙ্গে ফুল্লরার সরস কথোপকথন যা নাট্যকার লিখেছেন তা খুব উপভোগ্য। তার কিছু কিছু তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

পার্বতী স্বামীর পরিচয় দিতে দিতে বলছেন—

কভু দিগম্বর
নাহি ঘৃণা লজ্জাডর
কর্মহীন, ফেরে স্বেচ্ছাধীন,...
...চিতা-ভস্ম অঙ্গের ভূষণ,
ও গো শব লয়ে শ্মশানে-মশানে ফেরে
নাহি ক্ষুধা নাহি তৃষ্ণা—অজয় অমর।

ফুল্লরা ।। আদেষ্ট। সে কি পাগল! আর তোমার বাপ-মাই-বা কী? দেখে-শুনে তোমায় এমন পাগলের হাতে দিয়েছে। তার পরে পার্বতী বলছেন—'আমি এ-কুটিরে রব আজি হতে।'

শুনে ফুল্লরা স্বগত উক্তি করছে—ওমা! আমার মাথা খেতে এ কী কথা বলে গো?...আমি জেনে-শুনে এই সুন্দরী, ঘোর যুবতীকে আমার ঘরে ঠাঁই দেব?

ফুল্লরা অনেক বোঝালো, কিন্তু দেবী নাছোড়বান্দা, তিনি কিছুতেই যাবেন না ওদের ঘর ছেড়ে।

তারপরে এলেন কালকেতু। এখানে ফুল্লরার মনোগত ঈর্ষার ভাব নিয়ে নাট্যকার মাধুর্যে, ব্যঞ্জনায় অপূর্ব রস পরিবেশন করেছেন। অভিজ্ঞ নাট্যকার বেশী বাড়াবাড়ি করেন নি। একটু পরে কালকেতু নিজেই এগিয়ে গিয়ে মহিলাটিকে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন। তিনি বললেন — এভাবে পরের স্বামীকে আঁকড়ে থাকলে লোকে [illegible]টনা করতে পারে, আপনি বাড়ী যান।'

উত্তরে পার্বতী নিরুত্তর, মৃদু-মৃদু হাসছেন শুধু।

এখানে নাট্যকার কবিকঙ্কন মুকুন্দ রামের আসল লাইন ক'টি কালকেতুর মুখে বসিয়ে দিয়েছেন—

'পুরাণো বসন ভাতি অবলাজনার জাতি
রক্ষা পায় অনেক যতনে।'

কালকেতু বললেন—'কোথায় আপনার ঘর বলুন, আমি আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

তবু দেবী নিরুত্তর—মুখে মৃদু হাসি।

কালকেতু তখন রেগে গিয়ে ধনুকে তীর যোজনা করলেন, বললেন—এভাবে পর-পুরুষের ঘরে এসে থাকা অন্যায়, আমি বিনাশ করব।

তখনো জনসাধারণের মন থেকে ভক্তি ভাব বিদূরিত হয় নি। তাঁরা দেখছেন কালকেতু জগজ্জননীর ওপরে তীর নিক্ষেপে উদ্যত। তাদের মন এইখানে এক অপূর্ব রসে ভরপুর হয়ে উঠত। তাদের মন যেন বলত—আরে কাকে মারছিস? এঁর গায়ে আঘাত করবি তোর সাধ্য কি?

এর পরে কালকেতু যখন সত্যিই তীর মারতে গেলেন তখন কালকেতুর তীর আটকে গেল অলৌকিকভাবে। তিনি অবাক বিস্ময়ে বলে উঠলেন—কে তুমি?

—কে আমি!

বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন ছদ্মবেশিনী পার্বতী। আর তার পরমুহূর্তেই কি দেখলেন কালকেতু আর ফুল্লরা?

দশভুজা দাঁড়িয়ে আছেন দশ হাত মেলে —মাথায় স্বর্ণকিরীট ঝলমল করছে, ডাইনে-বামে লক্ষ্মী-সরস্বতী কার্তিক-গণেশ।

পরক্ষণেই 'ড্রপ'। আর সঙ্গে সঙ্গে হাত-তালিতে আর লোকের প্রশংসাধ্বনিতে ভেঙে পড়ত প্রেক্ষাগার।

মাত্র এই দৃশ্যটি দেখবার জন্য খুব ভীড় হতো দর্শকদের। দৃশ্যটি হতো সত্যিই অদ্ভুত—আর এর সমস্ত কৃতিত্ব রাজা বোসের। এ সিনটি ছিল এমনিই চমকপ্রদ। লোকে ভেবে পেতো না যে এ রকম একটি ইলিউশান মুহূর্তের মধ্যে হতো কী করে?

স্টেজের আলো কিন্তু নিভতো না, পূর্ণ আলোকচ্ছটার মধ্যেই দৃশ্যটি পরিবর্তিত হতো। কোনো 'ডামি' নয়—যিনি পার্বতী করতেন, তিনিই থাকতেন মঞ্চে, মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে যেতেন।

অথচ জিনিসটা এমন কিছু কঠিন নয়, মঞ্চচাতুরীমাত্র। কুটিরের পশ্চাৎপটে থাকতো কালো ভেলভেটের পর্দা, স্টেজের আলো সেখানে তেমন যেতো না, তারই আড়ালে পটে জীবন্তভাবে কাট-আউট করা থাকতো লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশ। এর প্রত্যেকটি খণ্ড কালো ভেলভেট দিয়ে ঢাকা।

অভিনয়ের সময় পার্বতী নির্দিষ্ট একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতেন। ভেলভেটের পর্দা আর তার-এ বাঁধা কুটির সরে যেতো এক লহমায়, সঙ্গে সঙ্গে বাকী সব কিছু দৃশ্যমান হয়ে পড়তো। পার্বতীর মুকুট, আরও ৮টি হাত, সিংহ, অসুর মায় চালচিত্রটি পর্যন্ত। এসবগুলো আগে থাকতেই যথোপযুক্ত স্থানে পর্দার আড়ালে সাজানো থাকতো। ব্ল্যাক-আর্টের ব্যাপার আর কি।

এই গেল ফুল্লরার কথা। তারপর হলো বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী'—নাট্যরূপ দিলেন অপরেশচন্দ্র। ৫ ডিসেম্বর থেকে 'রজনী' সুরু হয়েছিল। আমি করতাম 'অমরনাথ', লবঙ্গলতা— নীহারবালা, হীরালাল—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রামসদয়—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, রজনী—ছোট সুশীলা, আর শচীন্দ্র—সন্তোষ সিংহ।

সন্তোষবাবু আগে স্টারে ছোটখাটো কি বড়জোর মাঝারি ধরনের ভূমিকা করতেন, 'হিরো'র ভূমিকায় এই প্রথম। সেজন্যে অনেকেই সন্দেহ ছিল ঠিকমত ভূমিকাটি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন কিনা—কিন্তু অভিনয় দেখার পর সকলেই খুশী হলেন—চমৎকার উৎরে গেলেন সন্তোষ সিংহ।

ছোট সুশীলা নামভূমিকায় (অন্ধ ফুলওয়ালী) যা করেছিলেন তা এক কথায় অপূর্ব। 'লবঙ্গলতা' রূপে নীহারের অভিনয়ের তো কথাই নেই। কুঞ্জবাবু ও মনোরঞ্জনবাবুও বেশ ভালোই করেছিলেন। আমার ভূমিকাটি নিজে মুখে কী করেই বা বলি—তবে অভিনয় খুব সংযত হয়েছিল এইটুকু বলতে পারি। তদানীন্তন পত্র-পত্রিকায় সমালোচনায় ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। বাহুল্যবোধে সেই সব সমালোচনা আর এখানে উদ্ধৃত করলাম না। আমার ব্যক্তিগত ধারণায় 'অমরনাথ', 'লবঙ্গলতা'র সঙ্গে যে সিনগুলো ছিল সেগুলি আরও একটু সংযত হলে ভাল হতো।

'কালকেতু' আর 'রজনী' দুখানা বই একসঙ্গে চলতে লাগল। দুটো সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরিত্র। 'কালকেতু' হল বুনো মোষ আর অমরনাথ হল ধীর স্থির শান্ত। রিয়ালিস্টিক নাটকের চরিত্রায়ণে অভিনয়ের সংযমটাই বড় কথা। এটা দিনের পর দিন ধরে আমি বুঝতে শিখেছিলাম।

'রজনী' বেশ কিছুদিন চলার পরে বড়দিনের আসরে ধরা হলো ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শাঁখের করাত'। এই বই-খানি খুব জমে গিয়েছিল। ঐ নাটকে অবশ্য আমি কোন অংশ গ্রহণ করতাম না। প্রধান ভূমিকা অর্থাৎ জামাই 'নন্দন'-এর ভূমিকায় সন্তোষ দাস (ভুলো) সুন্দর অভিনয় করতেন। রাজা—কুমার কনকনারায়ণ, মন্ত্রী—তুলসী চক্রবর্তী, রাজপুরোহিত—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, কালিন্দী—সরস্বতী, জামাইয়ের বন্ধু সুরদাস—সন্তোষ সিংহ, আরেক বন্ধু কেশব—জহর গাঙ্গুলী।

নাটকখানি যেমনি কৌতুকপ্রদ তেমনি শিক্ষণীয়ও ছিল। লোভ যে মানুষকে কতটা অমানুষ করতে পারে এবং সেই সঙ্গে বহু মানুষের অশান্তির কারণ হতে পারে 'শাঁখের করাতে' তাই দেখানো হয়েছিল।

(৯)

এতক্ষণ স্টারের কথা বললাম—এবার বলি অন্য থিয়েটারের কথা।

মিনার্ভায় নতুন নাট্যকার শরৎচন্দ্র ঘোষের 'জাতিচ্যুত' খুললো বড়দিনের সময় ২২শে ডিসেম্বর '২৮। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা। রাজা যদু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দীন হয়ে যান, সেই কাহিনী। এর মধ্যে 'যদুর মা'র একটি পার্ট ছিল—করতেন নগেন্দ্রবালা। কি অপূর্ব অভিনয়ই করতেন নগেন্দ্রবালা! আমি পরে যখন মিনার্ভায় যোগদান করি, তখনও মাঝে মাঝে 'জাতিচ্যুত' হয়েছে। তখন দেখেছি নগেন্দ্রবালা কি অদ্ভুত জীবন্ত অভিনয় করতেন। ও'র সম্বন্ধে গল্প শুনেছি যে স্টারে যখন অমৃতলাল বসু নাট্যরূপায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' হয়েছিল তাতে নগেন্দ্রবালা শৈবালিনীর জন্য নির্বাচিতা হয়েছিলেন। মহলা দেওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিগত কারণে শেষ পর্যন্ত 'শৈবালিনী' আর করেন নি, অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। 'জাতিচ্যুত' দেখে বুঝলাম কেন এতো মেয়ে থাকতে এ'কেই শৈবালিনী করতে ডাকা হয়েছিল। 'জাতিচ্যুত'র যদুর মার মধ্যে সেই শৈবালিনীর দুরূহ অংশের প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছিলাম ও'র বৃদ্ধ বয়সে। পরে অবশ্য উনি শৈবালিনী করে-ছিলেন এবং তা প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিল।

ও'র সঙ্গে প্রথম আলাপ হতে আমি ও'কে এই কথাটাই বলেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মুখখানি ও'র উজ্জ্বল হয়ে হাসিতে ভরে উঠেছিল, কিন্তু এত বিনয় যে সঙ্গে সঙ্গে হেঁট হয়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবার উপক্রম করতেই আমি ও'র হাত ধরে সবিস্ময়ে বলে উঠেছিলাম—ছি-ছি—এ কী করছেন?

উনি আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলেছিলেন—আপনি এতো বড়ো অ্যাক্টর, আপনি প্রশংসা

আমি বাধা দিয়ে বলেছিলাম আমার থেকে আরও বড়ো বড়ো অ্যাক্টর প্রশংসা করে গেছেন আপনার যৌবনকালের অভিনয় দেখে—সে সব আমি নিজের কানে শুনেছি।

উনি মুখ নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

এই রকম ছিলেন তখনকার দিনের অভিনেত্রীরা। যে সত্যিকারের বড়, তার মধ্যে অহমিকা বা আত্মম্ভরিকতা থাকে না, তাঁদের সবচেয়ে গুণ হল বিনয় এবং তা চরিত্রটিকে মহনীয় করে তোলে।

যাই হোক, নগেন্দ্রবালার কথা ছেড়ে আবার আগের কথায় ফিরে আসি। স্টারে মাঝে মাঝে 'সাজাহান' হয়, 'কর্ণার্জুন'ও হয়। 'সাজাহানে' নাম-ভূমিকায় আমি আর ঔরংগজেব করতো দুর্গাদাস। দুর্গাদাস ঔরংগজেবের ভূমিকায় কখনো নেমেছিল একথা তেমন শোনা যায় না, কিন্তু সে যে ঔরংগজেবের একটা বিশিষ্ট রূপ দিয়েছিল এটা বলবার জন্যেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম।

'কর্ণার্জুনে' শকুনি করতেন মনোরঞ্জনবাবু, কর্ণ করতাম আমি, পরে দুর্গাদাসও করতো। তাছাড়া মাঝে মাঝে 'হরিশ্চন্দ্র' হয়েছে—নাম-ভূমিকায় নামতেন কুঞ্জলাল চক্রবর্তী।

হ্যাঁ ভাল কথা, একটা প্রয়োজনীয় খবর দিতে আপনাদের ভুলে গেছি। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি অভাবিত বজ্রপতন ঘটে গিয়েছিল—এই বছরেরই জুলাই মাসে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ পরলোকগমন করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স প্রায় ৬৪ বছর হয়েছিল।

মনোমোহনে এখন অনাদি বসু মশায় সিনেমা চালিয়ে যাচ্ছেন, আমিও অবসরমত কখনো-সখনো যেতাম। বসে-বসে অনাদিবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতাম। স্টুডিও তো গড়ে তোলা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সিনেমা হাউসও চাই যে! এখন যেটা লিবার্টি সিনেমা তখন সে জায়গাটা ফাঁকা পড়েছিল। অনাদিবাবু বললেন—ওটা পাওয়া যেতে পারে চেষ্টাচরিত্র করে। নেবেন?

উনি এমন ভাব দেখালেন যেন আমি একাই নেবার মালিক।

তবে এটা ঠিক অনাদিবাবু সিনেমা হাউস তৈরী করবার ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে পড়লেন। তোড়জোড় করতে লাগলেন।

এইসব পরামর্শের ব্যাপারে মনোমোহনে আমি মাঝে মাঝে যাই। একদিন গিয়ে দেখি প্রবোধবাবু গুহমশাই ওখানে ঘোরাঘুরি করছেন। সবিস্ময়ে বললাম—আপনি এখানে?

একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন প্রবোধবাবু। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—না, এই সব দেখতে-টেখতে এলুম আর কি!

ব্যাপারটা ভাঙলেন না—কিন্তু মনে একটা খটকা রয়ে গেল—ব্যাপারটা কী? উনি এখানে কেন?

এখনকার লিবার্টি সিনেমার আগে নাম ছিল 'জুপিটার'। তারও আগে ওখানে ছিল একটা খোলা মাঠ। এই মাঠে আমি আর অনাদিবাবু গিয়ে মাপজোপ করেছিলুম। জায়গাটা সকলেরই পছন্দ হলো। নিজেদের সিনেমা হাউস যদি থাকে তা সিনেমার ব্যবসা মারে কে?

মনোমোহনে প্রায়ই যাই অনাদিবাবুরে কাছে আর তাগিদ দিই। অনাদিবাবু বলেন—লিমিটেড কোম্পানী করব, শেয়ার বিক্রি করতে হবে।

আমি বললাম—বেশ তো করুন।

দিন যায়—কিন্তু কোম্পানী আর গড়ে ওঠে না। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা আঁচ করতে প্যারলাম! ও'র আসল উদ্দেশ্য ছিল সিনেমা নয়, থিয়েটার করা। সেটা উনি আমার কাছে একেবারে চেপে রেখেছিলেন।

আমি একদিন ও'কে খুব বোঝালুম—দেখুন অনাদিবাবু, আপনার দৌলতে আর দেবী ঘোষের কর্মপ্রেরণায় বহু লোক করে খাচ্ছে, আপনার নিজের টুরিং থিয়েটার কোম্পানী আছে, কিন্তু এর ওপর আবার আপনি কলকাতায় যদি থিয়েটার কোম্পানী করতে যান তাহলে, আমার তো মনে হয় আপনি ক্ষতিগ্রস্তই হবেন। কলকাতায় এই প্রতিযোগিতার বাজারে থিয়েটার চালানো কি কম কথা? আপনি কত দিকে মন দেবেন?

কথাটা উনি অবশ্য মন দিয়েই শুনলেন—এবং হাঁ-হুঁ করেই কাটিয়ে দিলেন, স্পষ্টভাবে কোনো উত্তর দিলেন না।

এর কয়েকদিন পরে অবশ্য অনাদিবাবু আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন। আমি গেলুম। কি ব্যাপার? না, ও'র অরোরা কোম্পানীতে 'কেল্লোর কীর্তি' নামে একটা ফিল্ম তোলা হবে। অনাদিবাবু বললেন—আপনিই করুন।

এসব কাজে আমার চিরকালই খুব উৎসাহ! সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলাম। কাগজপত্র নিয়ে প্রস্তুত হতে লাগলাম, এমন সময় শুনলাম, শেষ পর্যন্ত ঐ থিয়েটারই করছেন অনাদিবাবু। আসলে প্রবোধবাবুই রয়েছেন এর পিছনে। মনোমোহনবাবুর কাছ থেকে থিয়েটার নেওয়া হয়ে গেছে অনাদিবাবুর নামে। দেখাশোনা করার ভার দিয়েছেন অনাদিবাবু প্রবোধবাবুর ওপর। আমার কথাটা উনি কানেই তুললেন না—সেই শেষ পর্যন্ত অভিনয়ই করলেন শেষ পর্যন্ত কলকাতায়—আমার প্রচণ্ড অভিমান হলো, রাগও হলো।

উনি আমাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন, বললেন—করছি কেন জানেন?

আমাদের সিনেমা কোম্পানীর অনেক শেয়ার বিক্রি হবে এতে।

—কী করে?

উনি আমাকে বোঝাচ্ছেন—বক্সে সব বাছা বাছা বড় লোক আসবে, বুঝলেন? তাদের কাছে গিয়ে শেয়ার গছাবার চেষ্টা করব—বুঝলেন না?

আমি বললাম—চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, থিয়েটারের কী হবে? যাক, আমি আর এসব ব্যাপারের মধ্যে নেই। বলে রেগে হন-হন করে বেরিয়ে এলাম মনোমোহন থিয়েটারের গেট দিয়ে। উনি পিছন পিছন ডাকতে ডাকতে বেরুলেন—কী হল মশাই—এই যে—ও অহীনবাবু!

কিন্তু কে শোনে সেই ডাক? আমি মুখ না ফিরিয়ে সেই যে চলে গেলাম আর ওমুখো হইনি বহুদিন। সত্যিকথা বলতে কী, এই মনোমালিন্য বহুদিন ছিল আমাদের মধ্যে। পরে একদিন হঠাৎই সেটা মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। দেখা হতেই হেসে বলেছিলেন অনাদিবাবু—কী মশাই, রাগ পড়েছে? হ্যাঁ, পুরুষের রাগ বটে!

আমি উল্টাডিঙিতে জমি নিয়েছি শুনে একদিন দেখতেও এলেন। জিতেনের কথা বোধহয় ইতিপূর্বে বলা হয়নি। জিতেন ব্যানার্জী, সে নিজে ছিল ল্যাবরেটরীম্যান সুতরাং আমি ল্যাবরেটরীর যে পরিকল্পনা তাকে দিয়েছিলাম সেটা সে দলবল নিয়ে দিব্যি গড়ে তুলেছিল। অনাদিবাবু ওসব দেখে অবাক হয়ে গেলেন। উল্টাডাঙার এই এত বড়ো জমি, তাতে ল্যাবরেটরী করা হয়েছে, ডার্করুম করা হয়েছে। 'ওভারহেড' ট্যাংক আছে, জল পরিশ্রুত করার ব্যবস্থা আছে। প্রায় আট ইঞ্চি উঁচু করে চারদিকে ইঁট বসিয়ে তার ওপর কাঠের পাটাতন বসানো। ইচ্ছে করলে সেই পাটাতন যেখান থেকে খুশী তুলে ফাঁক করে নেওয়া যায়। এটা করা হয়েছিল জল যাতে নীচে দিয়ে গড়িয়ে যেতে পারে সেইজন্য। আমার একটা ছোট্ট মুভি ক্যামেরা ছিল সেটা নিয়ে জিতেনই ঘুরে বেড়াতো, ছবি তুলতো। আর স্টারের ইলেকট্রিসিয়ানদের নিয়ে এসে স্টুডিওর কাজ জাঁকিয়ে তুলতো। বড়ো বড়ো শালবল্লীর খুঁটি বসিয়ে ইলেকট্রিক লাইন পর্যন্ত টানা হয়েছে—গেট থেকে বাড়ী পর্যন্ত।

এই সময় জিতেনরা আমাকে দিয়ে একখানা গাড়ী পর্যন্ত কিনিয়েছিল—সেকেণ্ডহ্যাণ্ড পুরনো 'ওভারল্যাণ্ড' গাড়ী। আমাকে নিয়মিত থিয়েটারে দিয়ে আসতো এবং থিয়েটার থেকে নিয়ে আসতো। আর দিনের বেলায় নানা কাজে এখানে-ওখানে যেতো। গাড়ী বসে থাকলে বাবাকে নিয়ে মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে আনতো। বাকী সময়টা ওদেরই হেপাজতে থাকতো। নিজেরাই একজন ড্রাইভার ঠিক করে রাখলো—আমি শুধু টাকা দিয়ে খালাস।

অনাদিবাবু দেখে-শুনে বললেন—করেছেন কী মশাই, অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছেন দেখছি।

প্রহ্লাদ চিত্রে হিরণ্যকশিপুর ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী

বললাম—আমি তো দেউলে হয়ে গেলুম। এবার—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, অনাদিবাবু—আর কিছু ভাববেন না, আমি আপনার সঙ্গে আছি।

—ভালো, আমার পয়সা নেই, আপনার আছে। সুতরাং—

উনি বললেন—সুতরাং ছবি আরম্ভ করে দিন।

—করবো? আশা ও আনন্দে অধীর হয়ে বলি।

—নিশ্চয়ই। উনি আশ্বাস দিলেন।

ব্যস এবার আরও দ্বিগুণ উৎসাহে লেগে গেলাম। ইতিমধ্যে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত তাঁর প্রথম নাটক 'রক্তকমল' লিখেছেন এবং সেটির রিহার্সাল হতো মাঝে মাঝে—বেশীর ভাগই গান-বাজনার রিহার্সাল। প্রবোধবাবু তখনো স্টারে, তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম—কী ব্যাপার? স্টারে হবে নাকি?

উনি বলেছিলেন—আরে না-না, অন্য জায়গায়—এখানে নয়।

শচীনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় আগে থাকতেই ছিল। ওঁকে গিয়েই বললাম—একটা গল্প ডেভেলাপ করুন তো মশাই। সিনেমা করব।

উনি একটি গল্প দাঁড় করালেন। সে গল্প অবশ্য সিনেমা করা আর হয়ে ওঠেনি, এবং প্রসঙ্গত বলে রাখি পরে এই গল্পেরই একটু রদ-বদল করে উনি নাটক লিখেছিলেন 'সতীতীর্থ' নামে, পরে সেটি নাট্যনিকেতনে অভিনীত হয়েছিল। সে সব কথা পরে বলব।

(ক্রমশঃ)

মূল ডায়েরীটা পাওয়া গেলে আরো অনেক তথ্য জানা যেত। জানা যেত দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইন্সটিটিউশনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? কারণ সম্প্রতি এই স্কুলের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসকে কেন্দ্র করে অনেক জল ঘোলা করা হয়েছে, বলা হচ্ছে শুধু শরদিন্দুবাবু নাকি এর প্রতিষ্ঠাতা নন। প্রতিষ্ঠাতা তিনি ছাড়াও আরো কয়েকজন। শরদিন্দুবাবুর জীবদ্দশাতেই সত্যকে বিকৃত করা হয়েছে। তবু কিছু বলেন নি মাস্টারমশাই। কারণ বড় অভিমানে একদিন নিজের সর্বস্ব দিয়ে গড়ে তোলা এই স্কুল তিনি ছেড়ে চলে যান। তাই সায়াহ্নবেলায় কে কোথায় সত্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তার হিসাব নেওয়ার কোন ইচ্ছাই ছিল না তাঁর। শুধু টালিগঞ্জ রেলব্রীজের ধারে ঝোলানো পাঁঠার শবদেহের সমান্তরাল গলির অন্ধকারে দোতালা বাড়ীর একতালার ঘুপচি ঘরে রোগশয্যায় শুয়ে বহুযত্নে বহুদিন ধরে রচিত একান্ত গোপনীয় কথামালার ডালিখানি নাড়াচাড়া করতে করতে পুরোনো দিনের সহকর্মীদের বলতেন—এই ডায়েরীতেই সব কথা লিখে গেলাম। ডায়েরীটা থাকবে, আমি থাকি আর নাই থাকি।

এই তো সেদিন, মে মাসের ন' তারিখে দক্ষিণের পাড়ায় পাড়ায় রটে গেল—মাস্টারমশাই আর নেই। চুয়াত্তর বছর বয়সে মারা গেছেন শরদিন্দু বিশ্বাস। খবরটা শুনে অনেক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী বিশ্বাসই করতে পারেন নি। পারেন নি শান্তিপল্লী, বৈশাখী সঙ্ঘ, সুইস পার্ক, বাঙ্গালপাড়া, লেকপল্লী, চারু অ্যাভিনু, মুদিয়ালী, লেক রোড, চন্দ্র মণ্ডল লেন, কে. পি. রায় লেন, প্রতাপাদিত্য প্লেসের হাজার হাজার মানুষ—নেই, তিনি আর নেই। যিনি গত ত্রিশ বছর ধরে টালিগঞ্জ, কালীঘাট পাড়ার শত শত ঘরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে এসেছেন, তাঁরই জীবনদীপ হঠাৎ এক নিমেষে এক ফুঁয়ে কে এসে নিভিয়ে দিয়ে গেছে। সেই যুইফুল শুভ্র খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবির আড়ালে ঋজু, পাতলাদেহী অথচ অনিন্দ্যসুন্দর ব্যক্তিত্বের দীপ্ত মশালখানি নিভে গেল চিরদিনের মত। ফিরে আর আসবেন না তিনি কখনো।

অথচ কত সামান্য অবস্থাতেই শুরু হয়েছিল এই অসামান্য মানুষ গড়ার কারিগরের জীবন। ১৮৯৫ সালের ৯ আগস্ট। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সাবডিভিশনে আমতলা থানায় বৃন্দাবনপুর গ্রামে যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাসের ঘরে সেদিন কোন মঙ্গলশঙ্খ বেজেছিল কিনা কে বলতে পারে—শরদিন্দু এলেন। বাবা জমিজমা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ছেলের পড়াশোনার দায়িত্ব বর্তাল কাকার ঘাড়ে। বাড়ীতেই একটা পাঠশালা খুলেছিলেন কাকা। সেই পাঠশালাতেই হোল তাঁর হাতেখড়ি। তারপর দেখতে দেখতে কেটে গেছে চব্বিশটি বছর। ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করে অনায়াসেই যে মানুষটি সেদিন সরকারী চাকরী নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট সমৃদ্ধিতে জীবন কাটিয়ে যেতে পারতেন তিনি কিন্তু পার্থিব সুখশান্তির দিকে আদৌ আকৃষ্ট হন নি। বরং বেছে নিয়েছিলেন জীবিকা হিসেবে এদেশে সবচেয়ে অনাদৃত, অবহেলিত শিক্ষকতা বৃত্তি। কারণ খুঁজতে গেলে যে সত্যের সম্মুখীন আমাদের হতে হয় তা হোল ছাত্রজীবনেই মুর্শিদাবাদের এই সত্যনিষ্ঠ যুবকটি যার সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি বাংলাদেশের সেই সুবর্ণযুগের এক আশ্চর্য মহাপ্রাণ মানুষ—দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। মেদিনীপুরের সেই তেজোদৃপ্ত বলিষ্ঠ প্রাণের স্পর্শে শরদিন্দুর চলার পথ নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গোলামী নয়, স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করে গড়তে হবে তরুণ তাজা শতসহস্র স্বাধীন প্রাণ।

শহর থেকে গাঁয়ে ফিরে এলেন শরদিন্দু। নিজের দেশে সেই উনিশ সালেই গড়ে তুললেন আমতলা হাইস্কুল (বর্তমানে হায়ার সেকেণ্ডারী)। এই স্কুলে থাকতে থাকতেই পাশ করলেন বি-টি। তারপর কেটে যায় অনেকগুলি দিন, মাস, বছর। সময় কখনো একটানা বাধাহীনভাবে যায় না। বাঁকে বাঁকে অজানা নিত্যনতুন বিঘ্ন লুকিয়ে থাকে। সহজ সরল আবেগপ্রবণ শরদিন্দু বিবেকের অনুশাসন মেনে চলতেই জানতেন। জানতেন না স্বার্থের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে। তাই কখন যে তাঁর পায়ের তলার মাটি সরে গেছে তা টেরও পান নি। ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে এক বিরোধকে কেন্দ্র করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ছাড়তে হোল তাঁর নিজের হাতে গড়া স্কুল। অভিমানী মানুষটি নীরবে সেই অপমান সহ্য করে একদিন দেশ গাঁ ছেড়ে চলে গেলেন সুদূর চট্টগ্রামে এক হাইস্কুলের হেডমাস্টার হয়ে। বছর কয়েক সেই স্কুলের হেডমাস্টারী করে ত্রিশের যুগের মাঝামাঝি চলে এলেন কলকাতার কাছাকাছি নদীয়ায় দশঘরা হাইস্কুলে। সেখানেও কেটে যায় পাঁচ পাঁচটি বছর।

ইতিমধ্যে দুরন্ত মেলট্রেনের মত লাফিয়ে ছুটে আসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। বাইরের পৃথিবীতে যে যুদ্ধ বেঁধেছে যেন তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্কুল কমিটি আর শরদিন্দুর নীতির লড়াই বেঁধে গেল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে দশঘরা স্কুলও ছাড়তে হোল। ঠিক করলেন, আর গাঁয়ে নয়—এবার খোদ শহর কলকাতাতেই নতুনভাবে শুরু করবেন তাঁর জীবনের অপূর্ণ ব্রতের শেষ পর্যায়টুকু। চলে এলেন কলকাতায়।

তখন টালিগঞ্জ ছিল সাউথ সাবারবন মিউনিসিপ্যালিটির আওতায়। ট্রাম লাইনের সরু ফালিটুকু বাদ দিলে কোথাও পিচের ছিটেফোঁটাও ছিল না রাস্তায়। রাস্তার দুধারে এত বড় বড় বাড়ীও তখন গড়ে ওঠে নি। দিনে বেসরকারী বাসের কণ্ডাকটরদের চীৎকার আর ঠেলাওয়ালাদের হুঁসিয়ারী আর রাতে ঠাণ্ডা গ্যাসের নিভন্ত আলোয় বহুদূরে রেলব্রীজের প্রবেশমুখে ট্রামের তারে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠত। উত্তরে কালীঘাট, ভবানীপুরে এবং দক্ষিণে আনোয়ার শাহ রোডে হাইস্কুল থাকলেও রেলব্রীজের কাছাকাছি পাড়ায় স্কুল তখন কোথায়। শরদিন্দু স্থির করলেন এখানেই কাছেপিঠে কোথাও স্কুল গড়বেন।

তাঁর স্কুল গড়ার বাসনার কথা জানতেন শুধু আর একটি মানুষ। শরদিন্দুরই বন্ধু, ছাত্র, আত্মীয় কাঠের ব্যবসায়ী রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। মাস্টারমশায়ের ইচ্ছার কথা শুনে রাজেন ভায়া সোৎসাহে বললেন—কিছু চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চি লাগবে তো। সব দেব আমি। ছাত্রের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে মনস্থির করে ফেললেন শরদিন্দু।

মনস্থির করা আর কাজ শুরু করার মধ্যে সামান্যতম সময়ের অপচয়ও তাঁর সয় না। যাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ গড়ার ব্রত পালনে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন এবার তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশে সার্থক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে এগিয়ে এলেন শরদিন্দু। চৌত্রিশ সালে মারা যান দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র-

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশন

নাথ। তখন শরদিন্দু ছিলেন দশঘরা স্কুলে। ঊনচল্লিশে নতুন স্কুল বসানোর পরিকল্পনা মাথায় আসতেই ছুটে গেলেন বীরেন্দ্রনাথের স্ত্রীর কাছে (রাজেন বিশ্বাসই তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন) মনের একান্ত প্রার্থনাটুকু নিবেদন করতে—দেশপ্রাণের নামের একটি স্কুল খুলতে চাই। আর কিছু নয়। কোন সাহায্য প্রার্থনা করি না, চাই শুধু আপনার সস্নেহ আশীর্বাদটুকু। এককথায় রাজী হলেন হেমন্তকুমারী দেবী। ব্যস আশীর্বাদ যখন পাওয়া গেছে তখন আর ঠেকায় কে তাঁকে। শরদিন্দু নতুন উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাজে। তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ।

চাল নেই চুলো নেই। একটি পয়সাও যার সঙ্গতি নেই তিনি লেগে গেলেন একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে। তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন কাঁথির প্রসিদ্ধ জননেতা ত্রৈলোক্যনাথ প্রধান ও এইচ এস রাউথকে। সব শুনে খুশী হয়ে তাঁরা মত দিলেন। দু' দুবার চিঠি লিখে এম-এল-এ ঈশ্বরচন্দ্র মালকেও শরদিন্দু সব জানালেন। পরিকল্পনাটি খুঁটিয়ে দেখে সবরকম সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি জানালেন শ্রীযুক্ত মাল। তখন একদিন সবাইকে ডেকেডুকে শাসমলদের বাড়ীতে মিটিং করা হোল। মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করলেন আইনজীবী মন্মথনাথ রায়। এই সভাতেই স্কুলের আর্থিক সম্ভাবনার সব দিক বিবেচনা করে দেখার জন্য গঠিত হোল একটি কমিটি। দিন আষ্টেকের মধ্যে কমিটি রিপোর্ট পেশ করল (১৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৯)। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী সবাই একমত হোলেন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। স্কুলের পরিচালনার জন্য একটি কমিটিও গঠিত হোল। ওয়ার্কিং কমিটির (স্কুলের এই আদি কমিটির নাম ছিল ওয়ার্কিং কমিটি ম্যানেজিং নয়) প্রেসিডেন্ট হোলেন মন্মথবাবু; সেক্রেটারী অধ্যাপক হরিপদ মাইতি। দেশপ্রাণের ভাগনে বিখ্যাত অধ্যাপক ও আইনজীবী শিশিরকুমার দাস হোলেন এই কমিটির অন্যতম সদস্য। গণ্যমান্যরা সবাই স্থান পেলেন কমিটিতে। পেলেন না শুধু একজন, যিনি গোড়া থেকে এই স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শরদিন্দুকে উৎসাহ জুগিয়ে এসেছেন—স্বয়ং রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। সামান্য কাঠের ব্যবসায়ী কি করে স্থান পাবে একটি হাইস্কুলের পরিচালন সমিতিতে। শরদিন্দুর ব্যক্তিগত ইচ্ছা এক্ষেত্রেও মর্যাদা পায়নি। ক্ষুব্ধ রাজেন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতি বজায় রেখেছিলেন, আসবাবপত্র প্রায় সবই তিনি জুগিয়েছেন।

কমিটি হয়েছে, আসবাবপত্রও মিলবে। এবার চাই একটা বাড়ী। রেলব্রীজের উত্তরে লেকের (রবীন্দ্র সরোবর) গায়ে প্রখ্যাত চিকিৎসক অমল রায়চৌধুরীর দোতালা বাড়ীটির একটি ঘর ভাড়া করে ফেললেন শরদিন্দু মাত্র পনেরো টাকায়। চেয়ে চিন্তে ভিক্ষে করে, ধার করে ভাড়ার টাকা কটা যোগাড় হোল। ৯২ রসা রোডের (বর্তমানে ১৬৯এ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড) এই বাড়ীটিতেই চল্লিশ সালের ২ জানুয়ারী দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনের দরজা উন্মুক্ত হোল।

নতুন স্কুল। কোন পরিচিতি নেই। কেই বা পাঠাবে তার ছেলেকে পড়াতে। এ যুগের মত সেদিন শুরু থেকেই গাড়ী, বাড়ী, সাইনবোর্ডের চোখ ধাঁধানো জৌলুসের কেরামতি জানা ছিল না মাস্টারমশায়ের। শরদিন্দু পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে অভিভাবকদের অনুরোধ করে ছেলে জোটালেন স্কুলের। ছাত্র যেমন জুটল তাঁরই চেষ্টায়, একদল আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতীকেও তেমনি খুঁজে পেতে সংগ্রহ করলেন তিনিই। একে একে এলেন সূর্যকুমার চক্রবর্তী (পণ্ডিতমশাই), কানাইলাল দাস, হৃষীকেশ জানা, সুবোধ চৌধুরী, রসিক মাইতি, শিবদাস ব্যানার্জী, কালিদাস রায় ও রাধানাথ সিং। শিক্ষক সংখ্যা স্ফীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাস ছয়েকের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যাও এত বেড়ে গেল যে ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে আর জায়গা হয় না। আরো ঘর দরকার। স্থান সমস্যার সমাধান করার জন্যই সেদিন স্কুল ডাক্তারবাবুর বাড়ী ছেড়ে পাশেই এন এন রক্ষিত মশায়ের দোতালা বাড়ীটিতে (৮৪ রসা রোড, বর্তমানে ১৭১ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড) উঠে এল। নতুন বাড়ীতে ঘর যেমন বেশী, তেমনি রয়েছে বাড়ীর সামনে ছোট একফালি সুন্দর উঠোন। কচিকাঁচারা এখানে হাত পা মেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেলাধুলোরও সুযোগ পেল। পাশেই লেক। সুন্দর পরিচ্ছন্ন খোলামেলা পরিবেশে একদল সুস্থ সৎ নাগরিক গড়ে তোলার সাধনায় মত্ত হোলেন মাস্টারমশাইরা।

পরের বছরই স্কুল পেল ইউনিভার্সিটির অ্যাফিলিয়েশন, সেই সঙ্গে বিয়াল্লিশ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ছাত্র পাঠানোর অনুমতি। রীতিমত তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল স্কুলে। উঠে পড়ে লাগলেন মাস্টারমশাইরা পরীক্ষার্থী ছাত্রদের ম্যাট্রিকের উপযোগী করে গড়ে তুলতে। কিন্তু সব হঠাৎ কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

যুদ্ধ তখন জমে উঠেছে। জাপানী বোমার ভয়ে সারা কলকাতা তখন হাওড়া আর শেয়ালদামুখো। সবাই পালাচ্ছে। সেই সব পালানোর হিড়িকে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা গেল ভীষণভাবে কমে। এত কমে গেল যে শিক্ষকদের মাইনে দেওয়া তো দূরের কথা, বাড়ীভাড়া পর্যন্ত বাকী পড়তে লাগল। প্রায় সতেরো শ টাকা বাকী পড়ে গেল বাড়ীভাড়া। কোথাও কোন কূলকিনারা না পেয়ে শরদিন্দু ছুটে গেলেন বিমলানন্দর শাসমলের কাছে। বীরেন্দ্রনাথের ছেলে বিমলানন্দ দুরবস্থার কথা শুনে বললেন—ছাত্র যখন এত সামান্য কেন মিছিমিছি আর বাড়ীভাড়া গুনবেন। স্কুল নিয়ে আসুন আমার বাড়ীতে। জায়গা হয়ে যাবে। হাতে স্বর্গ পেলেন শরদিন্দু। ভবিষ্যতে সুদিন এলে প্রতিটি পাই পয়সা মিটিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্কুল নিয়ে এলেন রাসবিহারীর মোড়ে আজ যে বাড়ীতে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক রয়েছে, শাসমলদের সেই বিখ্যাত বাসভবনে। একচল্লিশের শেষ থেকে বিয়াল্লিশের প্রায় শেষ পর্যন্ত স্কুল বসেছে এই বাড়ীতে। নামমাত্র বসা। কুল্যে পঞ্চাশটি ছেলেও তখন ছিল কি না সন্দেহ। দশ, পনেরো টাকা মাইনে পেতেন সূর্যবাবু, কানাইবাবুরা। তাও সব মাসে জুটত না। আর শরদিন্দুর কথা তো ছেড়েই দিলাম। সহকর্মীরা যেখানে মুখের অন্ন থেকে বঞ্চিত, তখন তাঁর নিজের বেতন নেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

দেখতে দেখতে বিয়াল্লিশ সাল শেষ হয়ে এল। অবস্থার একটু উন্নতি হতে ছাত্ররা আবার আসতে শুরু করল ক্লাসে। স্কুল তখন শাসমলদের বাড়ী ছেড়ে উঠে এল রজনী সেন রোডের একটি দোতালা বাড়ীর দোতালায়। খানতিনেক ঘর। তাতেই স্কুল বসত। কিন্তু খরচ কুলিয়ে ওঠা দুঃসাধ্য। মনে মনে ভাবলেন শরদিন্দু চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চি, ব্ল্যাকবোর্ড সবই যখন আছে তখন সকালে একটা মেয়েদের স্কুল খুললে কেমন হয়। দুপুরে ছেলেদের ক্লাস যেমন চলছে চলুক। একই খরচে দু' দুটি স্কুল চালাতে পারলে সাশ্রয় হবে, দিনের খরচও কিছু উঠে আসতে পারে। আর মেয়েদের স্কুল খোলার প্রয়োজনীয়তাও তখন দেখা দিয়েছিল। দক্ষিণে রেলব্রীজ থেকে উত্তরে রাসবিহারীর মোড় পর্যন্ত এই ফার্লং দুয়েক জায়গায় তখন কোথাও ছিল না কোন মেয়েদের হাইস্কুল। কিন্তু দু দুটো স্কুল তো আর এই দোতালা বাড়ীর খান তিনেক ঘরে চলতে পারে না। তাই ঐ বাড়ীরই উল্টোদিকে ৩ রজনী সেন রোডের তেতলা বাড়ীর একতলাটি স্কুল ভাড়া নিল। তেতাল্লিশ সাল। সামান্য ভাড়া। গত ছাব্বিশ বছরে বেড়ে এই ভাড়া আজ দাঁড়িয়েছে নব্বই টাকায়। কোলাপসিবেল

গেট পেরিয়ে সামনে দশ পয়সার লাউয়ের ফালি প্যাসেজ একচুকরো। প্যাসেজের দুপাশে দুটি ঘর। প্যাসেজ ছাড়ালে সামনে একফালি ছোট্ট বাঁধানো উঠোন। উঠোনের চারপাশে ছোট ছোট আরো খান ছয়েক ঘর।

রজনী সেন রোডের বাড়ীতে স্কুল উঠে আসার পর শরদিন্দু গার্লস স্কুল খোলার ব্যাপারে মন দিলেন। সেক্রেটারী অধ্যাপক মাইতির আপত্তি ছিল, এখুনি আবার নতুন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার কি দরকার। কিন্তু সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন শরদিন্দু। গোড়ায় ঠিক ছিল প্রাক্তন এম-এল-এ উর্মিলা দেবী হবেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টি-টিউশন ফর গার্লসের হেডমিস্ট্রেস। ঠিক কি কারণে যে তিনি শেষ পর্যন্ত রাজী হন নি, তা আজ বলতে পারেন না লীলাদি। লীলা গুহ। প্রতিষ্ঠা ইস্তক যিনি গার্লস সেকশনের হেডমিস্ট্রেস। ভয়ের নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে চিরদিনই তাঁর স্নেহের সম্পর্ক, তাই তো তিনি সকলেরই বড়দি-মণি। সেই বড়দিমণির কাছেই শুনেছি সেদিন গার্লস সেকশন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শরদিন্দুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যোগের কথা।

প্রাক্তন ডিস্ট্রিক্ট জজ কামিনীকুমার দত্তের মেয়ে ও ইঞ্জিনীয়ার অমূল্যচন্দ্র গুহর স্ত্রী লীলা গুহ বললেন ঃ আজো মনে পড়ে সেদিনের কথা। ছাব্বিশ বছর আগে। একদিন সকালে সদর দরজার কড়া বেজে উঠতেই দরজা খুলে দেখি বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের ছেলে বিমলানন্দ ও মেয়ে অশ্রুকণা এক ভদ্রলোককে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিমলানন্দ ভদ্রলোককে পরিচয় করিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, আসুন প্রধান-শিক্ষিকার কাজ নিয়ে একটি স্কুল গড়ে তুলুন। আমি তো অবাক! বিদ্যালয় গড়ে তোলার কোন কাজই জানি না, ভদ্রলোককেও চিনি না, কিভাবে কি করব? আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত লক্ষ্য করে তক্ষুনিই বলে উঠলেন, আসুন না স্কুলে কাল, একবার দেখে যাবেন গরীবখানা।

সে আহ্বানের যে কি প্রচণ্ড আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল তা বলে বোঝানোর নয়। মাইনে-পত্র, অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার কোন কিছুর কথা হওয়ার আগেই লীলাদি জয়েন করলেন স্কুলে, ১৫ মার্চ, ১৯৪৩। কিন্তু ছাত্রী কোথায়? পড়াবেনই বা কারা? তিন মাসের মধ্যে সব প্রশ্নের মীমাংসা করে ভোল পাল্টে দিলেন শরদিন্দু। জুন থেকে পুরোদমে শুরু হয়ে গেল মেয়েদের স্কুল। প্রথম দিন যে মেয়েটিকে নিয়ে গার্লস সেকশন শুরু হয়েছিল তাঁর নাম আজও মনে আছে বড়দিমণির, পূর্ণিমা দত্ত। ক্লাস ফোরে ভর্তি হয়েছিল পূর্ণিমা। তারপর থেকে রোজই একটি দুটি করে ছাত্রী বাড়তে লাগল। আর এই ছাত্রীদের পড়ানোর দায়িত্ব বহন করতে সেদিন যাঁরা লীলাদি ও শরদিন্দুর সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা হলেন মিসেস দ (বাঙালী খৃষ্টান), মিসেস বোস, মিসেস নন্দী, মিস সেন ও অমিয়া দত্ত। সবচেয়ে বেশী মাইনে পেতেন লীলাদি, মাসে ত্রিশ টাকা। অন্যরা কেউ সতেরো, কেউ পনেরো, কেউ বা মাত্র বারো। হেডমিস্ট্রেসের নামে কাগজে কলমে ত্রিশ টাকা বেতন লেখা হলেও প্রথম দু বছর লীলাদি একটি পয়সাও নেন নি স্কুল থেকে।

বছর শেষ হওয়ার আগেই দেখা গেল স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা প্রায় শয়ের কোঠায় পৌঁছেছে। শিক্ষিকার সংখ্যা হয়েছে সাত। এঁদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে দুবছরের মধ্যে গার্লস সেকশন ইউনিভার্সিটির অনুমোদন পেয়ে একটি হাইস্কুলে পরিণত হোল, ১৯৪৫ সাল। তখন দেশপ্রাণের ছাত্র বিভাগে প্রায় তিনশো ছেলে পড়ে আর ছাত্রী বিভাগে পড়ে দুশো চল্লিশটি মেয়ে। দুটি বিভাগেরই পরিচালন দায়িত্ব বহন করত একই ম্যানেজিং কমিটি। দুটি স্কুলের যৌথ খরচের দুই-পঞ্চমাংশ বহন করত গার্লস সেকশন, বাকীটা বয়েজ সেকশন।

দু বছরও গেল না, স্কুলের দুটি বিভাগই স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল যে টালিগঞ্জ, কালীঘাটের প্রায় সব পাড়া থেকেই দলে দলে ছাত্রছাত্রী আসতে লাগল ভর্তির জন্য। সাতচল্লিশ সালে দুটি বিভাগেরই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা চারশোর কোঠা অতিক্রম করে গেল। রজনী সেন রোডের একতলার ঐ আটখানি মোটে ঘরে জায়গায় আর কুলোয় না। আরো বড় বাড়ী দরকার। তাই অনেক খুঁজে পেতে শরদিন্দু রসা রোড ও টিপু সুলতান রোডের মোড়ে (বর্তমান ১৯৬এ ও ১৯৮বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড) প্রায় তেরো কাঠা জায়গার ওপর একতলা টালির শেড দেওয়া খান বারো চৌদ্দ ঘরের একটা বাড়ী স্কুলের জন্য ঠিক করলেন। বাড়ীটির দুটি অংশ। টিপু সুলতান রোডের ওপর সামনের অংশটিতে মাঝে অনেকটা বড় উঠোনের চারপাশে টালির ঘর। পেছনের অংশটিরও প্রায় অনুরূপ চেহারা। ভাড়া ঠিক হোল মাসিক সোয়া চারশো টাকা। সেলামী দিতে হোল পাঁচ হাজার টাকা।

দুটি স্কুলেরই প্রাইমারী সেকশন রয়ে গেল রজনী সেন রোডে, সেকেণ্ডারী সেকশন উঠে এল এই নতুন আস্তানায়। সেই থেকে গত বাইশ বছর ধরে এই বাড়ীতেই বসছে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনের বয়েজ ও গার্লস সেকশন দুটি, সকালে ও দুপুরে।

এই বাইশ বছরে সময়ের স্রোতে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে স্কুলের ইতিহাসে। পুরোনো শিক্ষক শিক্ষিকা যাঁরা একদিন এই স্কুলের গোড়া পত্তন করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আরো কত নতুন শিক্ষক ও শিক্ষিকা। বয়েজ সেকশনে এসেছেন অতুলচন্দ্র বিশ্বাস, নীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অন্তর্যামী জানা, সত্যশঙ্কর দাসগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ দাস, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, সুভাষিত দাসগুপ্ত, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, মাখনলাল চক্রবর্তী, মদনমোহন নাথ, সতীশচন্দ্র মাইকাপ ও আরো অনেক শিক্ষক। মেয়েদের জন্য এসেছেন সাধনা গুহ, জ্যোতির্ময়ী চৌধুরী, অমিয়া চ্যাটার্জী, বাণী দে ও আরো অনেকে। নতুনরা যেমন এসেছেন তেমনি পুরনো অনেকেই নিয়েছেন বিদায়। কিন্তু শত পরিবর্তনের মধ্যেও বিগত বছরগুলিতে এঁরাই স্কুলের বনিয়াদ দৃঢ়ভাবে পোক্ত করেছেন, গড়েছেন শতসহস্র ছাত্র-ছাত্রীর জীবনের ভিত্তিভূমি। অথচ বিনিময়ে কিই বা পেয়েছেন? চল্লিশ, পঞ্চাশ বড় জোর ষাট টাকা মাইনের একদিন যাঁরা এসেছিলেন পড়াতে এই স্কুলে, অপরাহ্ন বেলায় আর্থিক দিক থেকে কতটুকু লাভবানই বা তাঁরা হয়েছেন? তিন অঙ্কের বেতন-মইয়ের নীচু ধাপে দাঁড়িয়ে আজো তাঁরা সমান উৎসাহে ব্রত উদযাপন করে চলেছেন। আজ যে এঁরা দেড়শো, দুশো কি বড় জোর শ তিনেক টাকা বেতন হিসাবে পাচ্ছেন তাও তো সরকারী অনুগ্রহে। আটচল্লিশ সাল থেকে গার্লস সেকশন ডেফিসিট গ্র্যাণ্ট পাচ্ছে। বয়েজ সেকশন পাচ্ছে সাতান্ন সাল থেকে। তবু তো এঁরা সামান্যতম হলেও কিছু পেয়েছেন—শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা ও ম্যানেজিং কমিটির আস্থা। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক শরদিন্দু কি পেয়েছেন? কোন কৃতজ্ঞ উপহার তাঁর চরণমূলে এই স্কুল নিবেদন করেছে এই প্রশ্ন যদি আজ রাখা যায় তাহলে বলতে হবে চুয়ান্ন সালের বছর-শুরুর এক শীতার্ত অপরাহ্নে সেই আজন্ম-দরিদ্র স্বভাব-শিক্ষক অপমান ও অবহেলার বোঝা মাথায় নিয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরই হাতে গড়া স্কুল থেকে। অপরাধ? তহবিল তছরূপের দায় সেদিন চাপানো হয়েছিল তাঁর ঘাড়ে। কিন্তু ডায়েরীর পাতা যদি সত্য কথা বলে তাহলে বলব সে অপবাদ মিথ্যে। কিন্তু সেদিন সেই মিথ্যাই সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

থাক সে সব অপ্রিয় কথা। পনেরো বছরের অক্লান্ত সাধনায় স্কুলকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দু দুটি ভাড়া বাড়ীতে বয়েজ সেকশনে প্রায় সাতশো ছাত্র ও গার্লস সেকশনেরও প্রায় অনুরূপ সংখ্যক ছাত্রী পড়ছে। এক একটি সেকশনে কুড়ি-পঁচিশ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা পড়াচ্ছেন। স্কুলের ফলাফল ভাল না হলেও অ্যাভারেজ নিশ্চয়। এই ভরাভরতি সংসার ছেড়ে সহায়সম্বলহীন ষাট বছরের নিঃস্ব মানুষটি আবার বেরুলেন রাস্তায়। বিত্তে নিঃস্ব হলেও চিত্তে নন। আবার তিনি গড়ে তুললেন আর একটি স্কুল এই টালিগঞ্জে—আদর্শ বিদ্যা-পীঠ, ১৯৫৬ সাল।

শরদিন্দু বিশ্বাসের পরিত্যক্ত প্রধান শিক্ষকের চেয়ারে এসে বসলেন যামিনীরঞ্জন দাস, ১৯৫৫ সাল। শুধু যে হেডমাস্টার পদে পরিবর্তন ঘটেছে তাই নয়, এই ঘটনার কয়েক বছর আগে মন্মথবাবুর জায়গায় স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়েছেন দেবেন্দ্র-

নাথ সেন ও শিশিরকুমার দাস হয়েছেন সেক্রেটারী। পরিবর্তিত ব্যবস্থা ও সময়ের সঙ্গে তাল রেখে স্কুলের বয়েজ ও গার্লস সেকশন তেষট্টি সালে আপ গ্রেডেড হল হায়ার সেকেন্ডারীতে। সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজ দুটি স্ট্রীম চালু হল বয়েজ সেকশনে। সাতষট্টি সালে কমার্স স্ট্রীমও খোলা হয়েছে। গার্লস সেকশনে শুধু একটি স্ট্রীম—হিউম্যানিটিজ।

স্কুল আপগ্রেডেড হওয়ার মুখে মুখেই চৌষট্টি সালে যামিনীবাবু রিজাইন করে চলে যান। তাঁর জায়গায় এই স্কুলেরই প্রাক্তন সহকারী শিক্ষক সতীশচন্দ্র মাইতি হয়েছেন হেডমাস্টার। বয়েজ সেকশনে গত উনত্রিশ বছরে কর্ণধার পদে তিন তিনবার বদল হলেও গার্লস সেকশনে লীলাদি ছাব্বিশ বছর পূর্ণ করে এখনও আছেন। তবে তাঁরও বয়েস হয়েছে। আর বড় জোর বছর দুয়েক। বড় সাধ ছিল স্কুলের নিজস্ব জমি বাড়ী দেখে যাবেন, তবে সে সাধ পূর্ণ হবে বলে বিশেষ ভরসা রাখেন না। যদিও ইতিমধ্যে স্কুলের প্রাক্তন সম্পাদক শিশিরকুমার দাসের চেষ্টায় গঠিত হয়েছে দেশপ্রাণ এডুকেশন ট্রাস্ট। এই ট্রাস্ট সাতষট্টি সালে স্কুলের উত্তর দিকের পাঁচকাঠা প্লটটি পঁচিশ হাজার টাকায় কিনেছে। আর বাকী আট কাঠা জমির জন্য পঁচিশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে বায়নানামা করে রেখেছে। গত দুবছরে আরো কুড়ি হাজার টাকা ট্রাস্ট দিয়েছে জমির মালিককে। তবু দরকার আরো প্রায় সত্তর আশী হাজার টাকা। এই টাকার সংস্থান করে হবে, কি করে হবে তার হদিশ লীলাদি বা সতীশবাবু কেউই দিতে পারেন নি। শুধু বলেছেন, যে স্কুলে গত উনত্রিশ বছরে প্রায় বিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেছেন তাঁরা যদি এককালীন দান হিসেবে পাঁচটি টাকাও প্রত্যেকে দান করেন তাহলে শরদিন্দুর স্বপ্ন নিশ্চয়ই সার্থক হয়ে দাঁড়াবে। গড়ে উঠবে দেশপ্রাণ স্কুলের নিজস্ব বাস্তুভিটে। টিপু সুলতান রোডের ওপর মাথা তুলে দাঁড়াবে স্কুলের নিজস্ব বাড়ীটি স্টোরিড বিল্ডিং। ঐ বাড়ীতে পাশাপাশি দুটি ব্লকে দুপুরে ছেলেদের ও মেয়েদের স্কুল বসবে। সকাল সন্ধ্যায় চলবে কলেজ। কত সাধ, কত পরিকল্পনা মাস্টারমশাইদের।

এই সাধ ও পরিকল্পনা অনুযায়ীই এগুচ্ছিলেন স্কুল কমিটির সেক্রেটারী শিশিরবাবু। কিন্তু সাতষট্টি সালে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হওয়ায় সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায় ট্রাস্টের কাজ। ট্রাস্টের সম্পাদক ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ সেন। সহযোগীর অপূর্ণ সাধ যে সেনমশাই নিশ্চয় পূরণ করবেন এ স্কুলের সকলেই তা বিশ্বাস করেন।

দেশপ্রাণ স্কুলের সুদীর্ঘ উনত্রিশ বছরের চলার পথে এই বিশ্বাসটুকুই যে একমাত্র মূলধন। এই বিশ্বাসের জোরেই মাস্টারমশাইরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আর তার ফলেই আমরা পেয়েছি সৌরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য (১৯৬৪ সালে স্কুল ফাইনালে প্রথম স্থানাধিকারী), অধ্যাপক প্রদ্যোৎকুমার ঘোষ, অধ্যাপিকা মঞ্জুলা চৌধুরী, অধ্যাপিকা সীতা সেন, সাংবাদিক তরুণ গাঙ্গুলী, প্রখ্যাত গায়ক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভারত বিখ্যাত চিত্রকর সুনীল দাস, স্বনামধন্য ফুটবলার দীপক দাস, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ক্রিকেট প্লেয়ার অসিত ব্যানার্জি, ও আত্মভোলা সমাজসেবী হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের মত কীর্তিমান ছাত্রদের। সবই সম্ভব হয়েছে মাস্টারমশাইদের অকৃত্রিম চেষ্টায় ও সহানুভূতিতে। তাঁরাই তো তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন এক অপরূপ তিলোত্তমা। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি সেই সৌন্দর্য প্রতিমার অবয়বখানি। কোথাও পাইনি কোন খুঁত। তবু কেন জানি থেকে বুকের গভীরে লুকোনো কোন সুদূর গোপন গহ্বর থেকে উৎসারিত বেদনা-নির্ঝরে প্লাবিত হয়ে যায় সারা মন। যার ইচ্ছা ও চেষ্টায় দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশন আজ এতবড় হয়েছে, দক্ষিণ কলিকাতায় অন্যতম নামী ও প্রধান স্কুল হিসেবে পেয়েছে স্বীকৃতি, সেই সবার ভালবাসা ও শ্রদ্ধার মানুষটি আজ কোথায়? শেষ জীবনে নিঃসঙ্গ এই মানুষটি (সংসারী হয়েও যিনি ছিলেন সন্ন্যাসী) একলা ঘরে বসে বসে ডায়েরীর পাতাগুলো অতীত ইতিবৃত্তে ভরিয়ে তুলতেন এই আশায় যে একদিন নিশ্চয়ই তাঁর ছাত্রদের কাছে পৌঁছবে তাঁর সেই আহ্বান—"মাই বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, আর্ত সেবাই প্রকৃত দেশসেবা। সমস্ত ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই সেবাধর্ম। অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা—একথা সত্য, কিন্তু সেবাধর্মও এই তপস্যারই অঙ্গ।—ছাত্র তথা মানবজীবনের মহান কর্তব্য। জ্ঞানচর্চার সাথে সাথে সেবার কাজেও যদি দীক্ষা গ্রহণ করতে পারো, তাহলেই সার্থক হবে তোমাদের শিক্ষা আর এ পথেই দেশের কাজ হবে সবচেয়ে বেশী।"

—সন্ধিৎসু
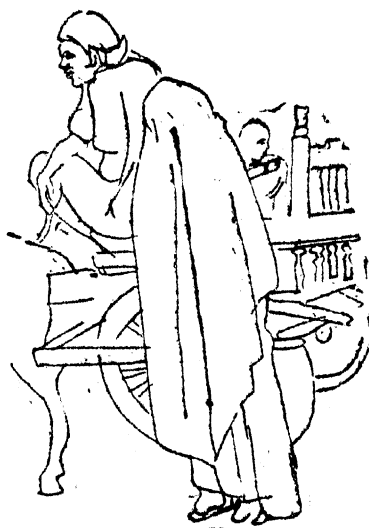
দক্ষস্মৃতির বাগান

বিষ্ণু দে

তোমরা ভালোই জানো, কতটা কৃতজ্ঞ, আনন্দিত—
কে না জানে! এই যে সদলবলে ঘুরিফিরি
বিস্তৃত নিসর্গে
অথবা প্রাচীন ঐশ্বর্যে বর্ণাঢ্য কালের বাগানে,
এদিকে ওদিকে, প্রায়ই, অন্তত মাঝে মাঝে
স্মৃতির চারণে, পুষ্পবীথি ফল, আর বনস্পতি, উপকারী বহু গাছে
পাতাবাহারেও,
রঙের গন্ধের ঐশ্বর্যে বাগান পরিপূর্ণ সারাদিন
রৌবিক সকালে সাঁঝে, মধ্যাহ্নেও আর নাক্ষত্রিক অন্ধকারে
প্রত্যহের গ্লানিহীন
জীবনের স্বপ্নে আর স্বপ্নের পরেও
বাস্তবে ও ঘুমে যে দেশে চৈতন্যে ঝরে
মেঘ রোদ জল, অবিরল গানের ত্রিধারায়
ধারাস্নান সংহত গম্ভীর—
স্নায়ু এবং বুদ্ধির অর্থাৎ চৈতন্যের সর্বাঙ্গে গভীর
মুক্তিস্নান।

অবশ্য হঠাৎ হঠাৎ হয়তো বিশিষ্ট কারণে
—যে বিষয়ে, হয়তো অন্তত আমি নিতান্তই অজ্ঞ অজ্ঞ—
সম্ভবত অকারণে কোনো আপতিক গৌণ আক্রমণে
নিজের মনের অগোচর মনে তোমরাই কেউবা
ছিন্ন করো দশপ্রহরণধারিণীর খর খড়্গে
ইবার ও পরোভাগে চিৎকমলতারিণীর মহাযজ্ঞ
বাস্তবে স্বপ্নে যা একাকার।

দক্ষ স্মৃতির বাগান দগ্ধ মুহূর্তেই শুধু
তোলে হাহাকার শত কিরাতের ক্ষিপ্ত ভর্গে।

দীর্ঘকাল ইতিহাস স্বয়ং পালায় সেই অস্পষ্ট নিসর্গে।।

গ্যারেজের বাইরে তখন বেশ রোদ্দুর। কিন্তু এমন ঠান্ডা যে, বর্ষাকাল বলে মোটে মনেই হচ্ছে না। মনে হচ্ছে পৌষ মাস। বাইরে বেরিয়ে রোদ্দুরে আমরা দুজনে একটু চুপ করে দাঁড়ালাম।

যশোবন্ত আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, আজকে তোমার প্রথম শিকারের দিন। অত হতাশ বা দুঃখিত হয়ো না। পৃথিবীতে কাউকে দুঃখ না দিয়ে অন্য কাউকে আনন্দ দেওয়া সম্ভব নয়।

একটু থেমে যশোবন্ত বলল, তুমি জানো না লালসাহেব, আজকে রাতে এই শিরিণবুরু গাঁয়ের ভারী গরীব ছেলে-মেয়েরা যখন ঐ হরিণের মাংস খেয়ে আনন্দে গাইবে, ডেঙ্গা নাচবে, কল-কল করে হাসবে, তখন তোমার মনে হবে হরিণ মেরে ভগবানের কাছে কোন পাপ যদি করেও থাক, সে পাপের প্রায়শ্চিত্তও করেছ। লালসাহেব, ন্যায়-অন্যায়টা রিলেটিভ।

চুপ করেই শুনছিলাম ওর বক্তৃতা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম, মারিয়ানা, সুমিতাবৌদি এবং ঘোষদা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আমাদের দিকে আসতে লাগলেন। সুমিতাবৌদি ওখান থেকেই চেঁচিয়ে বললে, মহুয়াসিঁড়ি নদীর ধারে দুপুরে চড়ুইভাতি হবে না কি? যশোবন্ত আবার সেই পুরনো যশোবন্ত হয়ে হেসে বললে, নিশ্চয়ই হবে। আমি তোমাদের বাঁশ-পোড়া কোটরার কাবাব খাওয়াব। মারিয়ানা বলল, আমি ভিনিগার দিয়ে ভিজিয়ে রেখে এসেছি; কিছু মাংস দিয়ে বিকেলে তোমাদের চাটনি খাওয়াব।

'তা ত হল; এখন হাতী দেখাবে না আমাদের?'

তোমাদের হাতী দেখাতে হলে ত পর্বতের মতো হাতীকে মহম্মদের কাছে আসতে বলতে হয়।

মারিয়ানা বলল, ইস্ ভারী ত দেমাক আপনার। আপনি ছাড়া বুঝি আর কেউ এখানে নেই?

তারপর মারিয়ানা লিড করল। সকালে আমরা যে পথে গিয়েছি, সে পথে নয়, অন্য পথে। কিন্তু পথটা খাড়া চড়াই। মারিয়ানা সাদা খরগোশের মত তরতরিয়ে উঠতে লাগল। বেশ অনেকখানি খাড়া উঠলাম। আমাদেরই বেশ কষ্ট হচ্ছিল। মেয়েদের হবারই কথা। কিন্তু উপরে উঠে যা দৃশ্য দেখলাম তাতে হৃদয় জুড়িয়ে গেল। আমরা বোধহয় একটি পাহাড়ের একেবারে মাথায় উঠেছি। নীচে খাড়া খাদ এবং সেই খাদ গিয়ে কোয়েলের উপত্যকায় মিশেছে। মাইলের পর মাইল ঘন অবিচ্ছেদ্য জঙ্গল। দুটি শকুন উড়ছে আমাদের পায়ের নীচে চক্রাকারে। বাঘ কিম্বা চিতা কোন জানোয়ার মেরে থাকবে।

পুবে সূর্যটা উঠে এখন প্রায় মাথার কাছাকাছি আসব আসব করছে। সমস্ত বৃষ্টিস্নাত উপতকা কাঁচারোদে ঝলমল করছে।

যশোবন্ত বলল, ডাইনে-বাঁয়ে ভাল করে নজর করো। কোন কিছু নড়লে-চড়লেই বলবে। প্রায় মিনিট পাঁচেক আমরা নির্বাকে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোন কিছুই নজরে পড়ল না। হতাশ হয়ে নেমে যাব, এমন সময় প্রায় আমাদের পায়ের নীচের গভীর ও ঘন-অন্ধকার উপত্যকা থেকে মার্সিডিস ট্রাকের হর্ণের মত একটি আওয়াজ শোনা গেল।

যশোবন্ত বলল, হাতীর দল চরতে-চরতে একেবারে পাহাড়ের গোড়ায় চলে এসেছে। পাহাড়টা এদিকে এত খাড়া যে হাতী যে উঠে আসবে সে সম্ভাবনা নেই। কাউকে না বলে, হঠাৎ যশোবন্ত দুটো বিরাট বিরাট পাথর গড়িয়ে দিল উপর থেকে নীচে। পাথরগুলো কড়-কড় শব্দ করে নীচে গড়িয়ে যেতে লাগল। কিন্তু গাছ-পালার জন্যে নীচ অবধি পৌঁছল বলে মনে হল না। তারপর যশোবন্ত আর একটি পাথর পুটিং দি শট ছোঁড়ার মত করে নীচে ছুঁড়ল। এবং সে পাথরটা নীচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়ত-বা কোন হাতীর গায়েই পড়ে থাকবে। নীচের জঙ্গলে একটি আলোড়নের সৃষ্টি হল। তারপর যা দেখলাম তা ভোলার নয়। অত বড়-বড় হাতী চার পা তুলে যে কি করে আর কত জোরে দৌড়য় জঙ্গলে তা না দেখলে বিশ্বাস হত না।

ঘোষদা বললেন, ইস কি ডেঞ্জারাস। ওদিকে না গিয়ে যদি এদিকে আসত। এসব খুনে লোকেদের সঙ্গে বাড়ির বাইরে বেরুনোও বিপদ। হাতীর দল প্রচণ্ড শব্দে দৌড়তে দৌড়তে চোখের নিমেষে গিয়ে আরো গভীর জঙ্গলে পৌঁছল। সেখানে তাদের আর দেখা যাচ্ছিল না।

মারিয়ানা বলল, কেমন? হাতী দেখলাম ত।

এবার নামার পালা। আমরা সবাই নামতে লাগলাম। হঠাৎ সুমিতাবৌদি বললেন, এই তোমরা একটু এগোও, আমি আসছি। কেউ পেছনে তাকিও না কিন্তু। আমরা সকলে এগিয়ে গেলাম। পরে বৌদি এসে আমাদের ধরলেন। যশোবন্ত বলে উঠল, এটা অত্যন্ত অন্যায়। একটুও ফ্র্যাঙ্ক হত পারেন না? সুমিতাবৌদি অবাক এবং কিঞ্চিত বিরক্ত গলায় শুধোলেন, কীসের ফ্র্যাঙ্ক? মানে বুঝলাম না তোমার কথার। যশোবন্ত বলল, সে গল্প জানেন না? আমার হাজারীবাগী খুরশেদের গল্প। খুরশেদের সঙ্গে শিকারে গেছি। সে মেমসাহেবের গল্প বলছ, যে মেমসাহেব আগে নাকি ওখানে শিকারে এসেছিল। খুরশেদ ইংরিজি বলে 'টেক টেক নো-টেক নো-টেক একবার ত সী' গোছের। সে বলল, 'ক্যা কহে হুজৌর উ মেমসাহেব ইতনা, ফ্র্যাঙ্ক থা। বেশক্ ফ্র্যাঙ্ক!' শুধোলাম মানে? খুরশেদ বলল, হামলোগ হিঁয়া বৈঠকে গপ কর রহা হ্যায় ঔর মেমসাব হুঁয়াই বৈঠকে হিসি কর রহা হ্যায়। কেয়া ফ্র্যাঙ্ক, কেয়া ফ্র্যাঙ্ক!

যশোবন্তের এই গল্প শুনে সুমিতা-বৌদি এবং মারিয়ানা দুজনে একসঙ্গে নাভি থেকে নিশ্বাস তুলে বললেন, ই—স—সু—কী—খারাপ। বলেই সুমিতাবৌদি হাসতে লাগলেন। ঘোষদা ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসতে লাগলেন। যশোবন্ত সেই হাসির তোড়ের মাঝে বলল, আপনারা কই জঙ্গলে ফ্র্যাঙ্ক নন তো।

মারিয়ানা সত্যিই লজ্জা পেয়েছে। একবার একটু ফিক করে হেসে গম্ভীর হয়ে গেছে।

যশোবন্তটাকে নিয়ে একদম পারা যায় না এমন অনেক পুরুষালি রসিকতা ও মজার কথা আছে যা পুরুষের সঙ্গে অবলীলাক্রমে বলা চলে কিন্তু মেয়েদের সামনে ভুলেও বলা চলে না। কিন্তু কে বোঝাবে? এটা একটি জংলী। একেবারে আকাট জংলী। একে সভ্য করা আমার পক্ষেও সম্ভব নয়।

বেশ ভাল খাওয়া হল দুপুরে। মুর্গীর ঝোল আর ভাত। খাওয়ার পর সুমিতা-বৌদি বললেন, আমি একটু জিরিয়ে নিচ্ছি ভাই, তোমরা মনে কিছু কর না। বড় খাড়া ছিল পাহাড়টা।

ঘোষদা আগেই গিয়ে বিছানা নিয়েছেন। যশোবন্ত একটি শালপাতার চুট্টা ধরিয়ে বারান্দায় পায়চারী করে বেড়াল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আমিও একটু গড়িয়ে নিই, রাতে আবার ডেঙ্গা নাচতে হবে। তারপর শুধোলো, গাঁয়ে সেই সুন্দরী মেয়েটি আছে ত? না অন্য গ্রামে চলে গেছে বিয়ে হয়ে? মারিয়ানা হেসে বলল, আছে। আপনি এসেছেন এ খবরও সে পেয়েছে। খবর পেয়েই হাসতে আরম্ভ করেছে। বলছে, পাগলটা আবার এসেছে। আমি বললাম,

হ্যাঁ পাগল না ন্যাকা-পাগল। মারিয়ানা মুখ নীচু করে হাসতে লাগল, যশোবন্তকে বলল, এমন চেহারা বানিয়েছেন যে গুরুর গুরুত্ব থাকলে হয়। যশোবন্ত বলল, ওসব কথা শোনেন কেন?

যশোবন্ত ঘরে গেল শুতে। আমি ইজিচেয়ারে বসেছিলাম। ভেবেছিলাম চুপ করে বসে বসে এই অপূর্ব জিরিণবুরুর একটি প্রশান্ত দুপুরকে বিকেলে গড়িয়ে যেতে দেখব। সেই আপাততুচ্ছ সম্পদ বিচিত্র, আনন্দময় দৃশ্য সকলে দেখতে পারে না। সকলের সে চোখ নেই। সিনেমাটোগ্রাফী অত্যন্ত সার্থক শিল্প কারণ তাতে অডিও-ভিসুয়াল এফেক্ট আছে। কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি আমার রুমান্ডির বাংলোর বসে প্রতিদিন রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে ভরা যে সিনেমা রোজ দেখি সেই পর্যায়ে কোনদিন কোন আর্ট পৌঁছবে কিনা জানি না। প্রকৃতি নিজের হাতে তুলি ধরে, নিজের হাতে বাঁশি ধরে, সেই ছবি রোজ আঁকেন রোজ মুছে ফেলেন। অথচ প্রতিদিনের ছবিই বিচিত্র। কোন ছবিই অন্য কোন ছবির প্রতিভূ নয়।

মারিয়ানা কোথায় গিয়েছিল জানি না, হঠাৎ বারান্দা আলো করে ফিরে এল। মশলা খাবেন? বললাম, দিন।

একটি ছোট জাপানী কাচের রেকাবীতে একমুঠো দারুচিনি-লবঙ্গ-এলাচ এনে মারিয়ানা হাত বাড়াল। মারিয়ানা বলল, আপনি বুঝি দুপুরে ঘুমোন না? আমি বললাম মোটেই না। মানে [illegible] পারি না। ও হেসে বলল, আমারই মত। আমি শুধোলাম, এখানে আপনার একা একা লাগে না? একদম একা একা থাকেন?

মাঝে মাঝে যে একা খুবই একা লাগে তা নয়, তবে বেশীর ভাগ সময়ই লাগে না। জঙ্গল ত আছেই—তাছাড়া ক্ষেত-জমি দেখা-শোনা করি, মুরগী ও গরুর তত্ত্বাবধান করি, একটু আধটু বাগান করি তাতেই এক্সারসাইজকে এক্সারসাইজ এবং সময় কাটানোকে সময় কাটানো হয়। বাদবাকি সময় পড়াশুনা করি। ও পড়াই ত জানেনই।

আমার কিন্তু এই বন-পাহাড়ে ভালো লাগে। ছোটবেলা থেকেই ভালো লাগে।

আমি শুধোলাম, কিসের পড়াশুনো? কোনো বিশেষ বিষয় নিয়ে নিশ্চয়ই? মারিয়ানা বলল কোনো বিশেষ বিষয় নিয়ে নয়। যা পড়তে ইচ্ছা হয় তাই পড়ি। তবে বেশির ভাগই সাহিত্যের বই। আজকাল একটু আধটু ছবিও আঁকার চেষ্টা করি।

কি আঁকেন ল্যান্ডস্কেপ?

না! না! আমি ওসব [illegible] রং বোলাই। [illegible] কোনো [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] আর কিছু নেই।

আমি [illegible] নতুন পরিচয়ে বলাটা সমীচীন হবে কিনা ভেবে বললাম, ভোলাবার প্রয়োজনই বা কি? নিজেকে?

মারিয়ানা একরাশ বিষন্ন হাসি হেসে বলল, হয়ত বা আছে প্রয়োজন। নিজেকে মাঝে মাঝে ভোলাবার প্রয়োজন কার না আছে? তারপর বলল, প্রায় হঠাৎই, চলুন আমার পড়ার ঘর এবং বাড়িটা আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাই।

ঃ চলুন।

কোনো ব্যক্তির পড়ার ঘর বা স্টাডিতে যেতে আমার খুব ভাল লাগে। সেই ঘরটি যেন সেই বিশেষ লোকটির মনের আয়না। অবশ্য, যাঁরা সত্যিকারের সে ঘর ব্যবহার করেন। অনেকে লোক দেখাবার জন্যে যেমন ঘর সাজিয়ে রাখেন তেমন ঘর নয়। যে ঘর ব্যবহৃত হয় সে ঘর দেখলেই বোঝা যায়। সে ঘরে তার ব্যক্তিত্বের অনেকখানি ছড়িয়ে থাকে।

মারিয়ানার দোতলা কাঠের বাঙলোটির চারপাশে চওড়া ঘোরানো কাঠের বারান্দা। সামনে-পেছনে দুটি করে ঘর। পেছনে পশ্চিমমুখে একটি ছোট ঘর।

স্টাডিটি ছোট—আগে ওর বাবার ছিল। পুরো পশ্চিম দিকটাতে দেওয়াল নেই। কাচের জানালা। ভেতরে পর্দা ঝুলছে। তবে সে পর্দা পুরোটা সরানো। একটি টেবিল। বেতের কাজ করা একটি টেবল-ল্যাম্প। চতুর্দিকে দেওয়ালে বসানো আল-মারীতে সারি সারি রাশি রাশি বই। [illegible] একটি সাদা মোটা গালিচে পাতা। যে চেয়ারে বসে ও পড়াশুনা করে সেই চেয়ারটির উপরে একটি হরিণের চামড়া পাতা। টেবিলের উপরও ইতস্ততঃ অনেক বই কাগজপত্র ছড়ানো। কলম টেবিলের উপরই রাখা। ঘরটা থেকে একটি মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে—হয় মারিয়ানা [illegible] মাথে মাথায় সে তেলের গন্ধ, নয় যে আতর বা অন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে তার সুবাস এই ঘরের আবহাওয়ায় ভরে রয়েছে। এই বুঝি মারিয়ানার মনেরও গন্ধ।

মারিয়ানা বলল, বসুন না, আমার চেয়ারে বসুন।

আমি অবাক। বললাম, কেন?

ঃ আহা বসুনই না।

বসলাম। বসে যা দেখলাম তা একেবারে [illegible]। পুরো কাচের জানালা দিয়ে আদিগন্ত [illegible] দেখা যায় কেবল পাহাড় আর পাহাড়, জঙ্গল আর জঙ্গল। বহুদূরে বেশ চওড়া নদীর রেখা দেখা যাচ্ছে। মারিয়ানা জানাল, আমানত নদী, কোয়েলে গিয়ে মিশেছে।

সবুজের যে কত রকম বৈচিত্র্য তা এই ঘরে বসে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায়। এই রকম একটি স্টাডি পেলে সারাজীবন আমি আনন্দে কাটাতে পারি—আর কোনো কাজ-[illegible] উপর আমার লোভ নেই।

মারিয়ানাকে [illegible] বললাম কথাটা। মারিয়ানা হাসল। বলল বেশ ত যখন খুশী আসবেন। এলেই আমি এই স্টাডি আপনাকে ছেড়ে দেব। যে কদিন থাকবেন সে কদিন এ স্টাডি আপনার। উত্তরে চুপ করে থাকলাম। ভাবলাম, এ রকম ঘর ত মনেরই একটি কোণ, এতে কি দূর থেকে এসে কেউ বসতে পারে? না এ ঘরে কেউ কাউকে বসাতে পারে?

মারিয়ানা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

স্টাডির দেওয়ালে চেয়ার থেকে বসে সামনাসামনি চোখে পড়ে এমন জায়গায়, পাশাপাশি ছবি। একটি ছবি কেমন বাথা-তুর, বিশীর্ণ মুখ, চশমা চোখে ভদ্রলোকের। সমস্ত মিলিয়ে মনীষীসুলভ পরিমণ্ডল। মারিয়ানা বলল 'আমার বাবা।' তার পাশে আর একটি ছবি কমবয়স্ক ভদ্রলোকের। বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। পরণে সাহেবী পোশাক, মাথার ঘন কোঁকড়া চুল উল্টো করে ফেরানো। ভারী সুন্দর ও অন্তি-ব্যক্তিময় চোখ যেন অনেক কিছু না-বলা কথা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। মানে এমন একটি মুখ, যা একশ লোকের মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়বে।

মারিয়ানা বলল, সুগত রায়চৌধুরী। ব্যারিস্টার। কোলকাতায় প্র্যাকটিস করেন।

আমি বললাম, বাঃ ভারী ইম্প্রেসিভ চেহারা ত।

ভদ্রলোক মারিয়ানার কে হন তা মারি-য়ানা বলল না। আমিও শুধোই নি।

আমরা ফিরে বারান্দায় বসলাম। হাওয়াটা বেশ জোরে জোরে বইছে। পাহাড়টার নীচে বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশটা আবার কালো করে এলো। মারিয়ানা ঘর থেকে একটি পশমী শাল নিয়ে এল। জড়িয়ে বসল গায়ে।

বারান্দা থেকে বাঁদিকে চাইলে একটি বেশ উঁচু পাহাড়ের চুড়ো দেখা যায়। ঘন বনে ছেয়ে আছে সমস্ত পাহাড়। মেঘ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের চূড়ো। আমি শুধোলাম ঐ পাহাড়টার নাম কি? মারিয়ানা [illegible] বলল ঐ ত মচুকরানীর পাহাড়। ঐ পাহাড়ের নাম বহুরাজ। খাঁরওয়ারেরা ওখানে পুজো দেয়। মচুকরানীর 'ছিহার' বলে ওরা ঐ পাহাড়টাকে।

ঃ বলুন না কি করে পুজো করে? কি দেবতা মচুকরানী?

ঃ সে তো অনেক কথা। সংক্ষেপে মধ্যে আপনাকে বলছি।' মচুকরানী খাঁরওয়ারদের সবচেয়ে প্রিয় দেবতা। অনেকে এঁকে 'দুর্যোগিয়া দেবতা'ও বলে। এখন আর তেমন হাঁক ডাক নেই। খাঁরওয়ারেরাও আজকাল অনেকে ক্রিশ্চান হয়ে গেছে। আমরা ছোটবেলায় এখানে মচুকরানীর যা [illegible] তা [illegible] নয়। এখনো যে হয় না তা নয়, তবে সেই প্রাণ আর নেই।

ঃ কি করে বিয়ে হয়?

ঃ দেখতাম সন্ধ্যে তিনবার করে বিয়ে হত। ঐ বহুরাজ পাহাড়ের ওপারে জঙ্গল-মাদার গাছ। [illegible] একটি [illegible] গান [illegible] পাহাড়ের নীচে। [illegible] তারা [illegible] মচুকরানীর [illegible] [illegible] আমার। [illegible] কেঁপে সকালের রোদ্দুরে সেই গান আমাদের এই [illegible] ওরা গাইতে গাইতে বহুরাজ পাহাড়ের মাথায় উঠে যেত। ঐ পাহাড়েই গুহায়

মুচুকরানীর বাস। মুচুকরানীর ছোট সুডোল সিঁদুরচর্চিত মূর্তিখানি পুরোহিত নামিয়ে আনতেন। রানীর মাথায় এক ফালি তসর শিল্কের পট্টি জড়িয়ে দেওয়া হত-বসানো হত একটি নতুন দোহারের উপর। তারপর একটি বাঁশের পাল্কীতে রানীকে চড়িয়ে তারা নেমে আসতো পাহাড় বেয়ে।

পুরোহিত সবচেয়ে আগে নামতেন নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে। রানীকে এনে একটি বিরাট বটগাছের তলায় রাখা হত জড়ুয়াহারে। সেখান থেকে বরের বাড়ি উক্সামন্দে রওনা হত কনে-যাত্রীরা রানীকে নিয়ে। উক্সামন্দে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপহার সামগ্রী এসে পৌঁছত মুচুকরানীর সামনে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা কৌতূহলী চোখে চেয়ে থাকত। আমরাও যেতাম। বাবা আমাদের বহুবার নিয়ে গেছেন দেখাতে। এই অবধি বলে মারিয়ানা থেমে গেল, বলল, আর শুনতে আপনার ভাল লাগবে? আমি বললাম, দারুণ লাগছে, বলুন বলুন।

ঃ উক্সামন্দের কর্ণাদি পাহাড়ে থাকতেন মুচুকরানীর বর। বরের বর্ণ হচ্ছে অগোরা। তারপর সেই বটগাছের তলা থেকে আবার নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে ওরা সকলে উঠতো কর্ণাদি পাহাড়ে। বরের গুহায় পৌঁছাবার জন্যে।

প্রবাদ ছিল যে, কর্ণাদি পাহাড়ের সেই গুহার নাকি তল নেই। সমস্ত পাহাড়টাই নাকি মধ্যেখানে ফাঁপা। সুড়ঙ্গ নেমে গেছে কত যে নীচে তার খোঁজ কেউ রাখে না। সেখানে পৌঁছে মুচুকরানীকে আবার পূজো দিয়ে পাল্কী থেকে নামানো হত। তারপর বর সেখানে বসে আছেন, গুহার ভেতরে একটি পাথরের খাঁজে, সেখানে তাঁকে বরের পাশে রেখে আসা হত। পুরোহিত একটি বড় পাথর নিয়ে সেই গুহায় গড়িয়ে দিতেন। সেই অতল গুহাতে পাথরটি গুহার গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে শব্দ করে গড়িয়ে গড়িয়ে চলতো নীচে। তখন বাইরে সমবেত গ্রামবাসী নিঃশব্দে ও সভয়ে দাঁড়িয়ে সেই শব্দ শুনতো।

গুহাটি এত গভীর ছিল যে বহুক্ষণ পর্যন্ত ঐ শব্দ শোনা যেত। তারপর সব শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেলে, মনে করা হতো যে মুচুকরানী ও তার অগোরা বরের শুভবিবাহ সম্পন্ন হল। তখন ওরা সবাই আনন্দ করতে করতে পাহাড় থেকে নেমে আসত এবং সন্ধ্যেবেলায় নেচে-গেয়ে বিবাহ উৎসব শেষ করত।

এই অবধি বলে মারিয়ানা থামল।

মনে হল, মারিয়ানার গল্প যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। ঐ জড়ুয়াহার গ্রামের খারিওয়ারদের সঙ্গে আমিও যেন মারিয়ানার মতো কোনোদিন মুচুকরানীর বিয়েতে উপস্থিত ছিলাম। চোখের সামনে সব যেন সত্যি হয়ে উঠছিল ওর গল্প শুনতে শুনতে।

এক সময়, দেখতে দেখতে সন্ধ্যে নেমে এল। সন্ধ্যে হবার প্রায় পরেই মারিয়ানার বাঙলোর গেট পেরিয়ে দু'জন চারজন করে মেয়ে-পুরুষ এসে জুটতে লাগল। বাঙলোর হাতার পেছন দিকে যেখানে হাতাটি গড়িয়ে গিয়ে ও-পাশের খাদের দিকে নেমেছে সেখানে একটি ঝাঁকড়া চেরী গাছের তলায় আগুনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। শেষ-বিকেল থেকে। তবে দমকা হাওয়াটা আছে। মাঝে মাঝেই নীচের উপত্যকা থেকে হিমেল হাওয়াটা নানা রকম মিষ্টি সুবাস খাদ থেকে বয়ে এনে সমস্ত বাগানে উথাল-পাথাল করছে।

আমরা একে একে জড়ো হলাম সেই গাছের নীচে। মারিয়ানা বেতের চেয়ার পাতিয়ে দিয়েছে। আগুনটাও বেশ গনগনে হয়ে উঠেছে। আমরা একেবারে ভি-আই-পি ট্রিটমেন্ট পাচ্ছি। সকলেই বেশ আরামে বসে নাচ দেখার জন্যে তৈরি।

যশোবন্ত ওদের সঙ্গে নাচবে। ছেলেরা ও মেয়েরা সামনা-সামনি এক লাইনে দাঁড়ালো। মেয়েদের পরনে শুধু শাড়ি বুকের ওপর দিয়ে ঘোরানো। হাঁটুর একটু নীচ অবধি শাড়ি। বেশির ভাগই শাদা হাতেবোনা মোটা মোটা পেড়ে শাড়ি! লাল এবং সবুজ পাড়ই বেশি। মাথার চুলে ভাল করে তেল মেখেছে। ঘাড়ের এক পাশে হেলিয়ে খোঁপা বেঁধেছে। খোঁপায় নানা রকমের ফুল গুঁজেছে প্রত্যেকে।

জঙলি মেয়েদের গায়ে বাঘের গায়ের মত কেমন যেন একটি নিজস্ব গন্ধ আছে। তেলের গন্ধ, চুলের গন্ধ, শারীরিক পরিশ্রমজনিত ঘামের গন্ধ, সব মিলিয়ে কেমন যেন বিজাতীয় ভাব।

ওদের দূর থেকে দেখতে ভাল লাগে, মনে মনে কল্পনায় আদর করতে ভাল লাগে, কিন্তু ওদের কাছে গেলে, তখন ওরা যতই আমন্ত্রণী হাসি হাসুক না কেন; কেমন যেন গা-রি-রি করে। কেন হয় জানি না।

যশোবন্তের কিন্তু ও-সব কোন সংস্কার নেই। মনে-প্রাণে জঙলি। সত্যি সত্যিই জঙলি—মুখোশ নয়।

একটি ভারী আমেজভরা ঘুমপাড়ানি গানের সঙ্গে সঙ্গে ওরা নাচ আরম্ভ করল। ছেলেরা মেয়েরা একেবারে একে অন্যের কাছে চলে আসছে। আগুনের আভায় মেয়েদের মুখের লজ্জা ঢাকা থাকছে না। ছেলেরা দুষ্টুমিভরা চোখে হাসছে।

ওরা দুলে দুলে গান গাইছে, মাথা হেলাচ্ছে, ভঙ্গুর গ্রীবা ভঙ্গিমায় গুন-গুনিয়ে গাইছে। দেখতে দেখতে সমস্ত জায়গাটার যেন চেহারা পাল্টে গেল। মাদল-গুলো হয়ে উঠল পাগল।। পায়ের তালে তালে কোমর দোলানোর ছন্দে, আঁখির ঠারে ঠারে ওরা নাচতে লাগল।

যশোবন্ত কিন্তু ওর অভিজাত্যহীন ট্রাউজার ছেড়ে ওদের মত ধুতি পরেছে। সে যে কতখানি সুপুরুষ তা ঐ ও'রাও যুবকদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পটভূমিতেও প্রতীয়মান হচ্ছে। পায়ের মাংসপেশী থেকে আরম্ভ করে [illegible] পর্যন্ত কোনো জায়গায় কোনো অসংগতি নেই। যৌবনের চিকন চিতাবাঘের মত ও নাচছে।

মারিয়ানা কানের কাছে ফিস্ ফিস করে গানের মানে বলছিল—এই নাচের নাম ভেজ্জা নাচ। ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে এভাবে নাচলেই তাকে ভেজ্জা নাচ বলে। যে গানটি ওরা আজ গাইছে তার মানে হল—

এই দাদা, তুই আমাকে জামপাতা
এনে দিল।
তোর সঙ্গে আমি ভেজ্জা নাচব,
কানে জামপাতা পরব।
যদি আনিস্ তবে তোর সঙ্গে ভেজ্জা
নাচব;
নিশ্চয়ই আনিস্ কিন্তুরে দাদা।

ইস্ খারাপ।
ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরা একসঙ্গে নাচে,
ইস্ কি খারাপ—
যখন ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে নাচে,
তখন নাচতে নাচতে ভোর হয়ে এলে
ছেলেদের কক্ষনো বিশ্বাস করতে নেই।
এই জুরি, অসভ্য।
আমার গা থেকে হাত সরাও না,
দেখছ না! নাচতে নাচতে
আমার শাড়ি আলগা হয়ে গেছে?
তাই হোক, আলগা হয়ে হয়ে
খুলে পড়ুক,

নাচের সময়ও শেষই হয়ে এল।

ধীরে ধীরে নাচের বেগ আরো দ্রুত হতে লাগল। তারপর সেই বর্ষণসিক্ত, হিমেল রাতকে আর চেনা গেল না, মনে হতে লাগল এ এক আলাদা রাত—অন্য কোন পৃথিবীর প্রাণের গল্প নিয়ে পিদিম জেলে এ-রাত আমাদের জন্যে অনেক আনন্দের পসরা সাজিয়ে এনেছে।

"ইস্ কি খারাপ—ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে নাচে। ইস্ কি খারাপ...। এই দাদা জামপাতা এনে দিবি—এই দাদা জামপাতা এনে দিবি।"

নাচ গানে মিলে ছেলে-মেয়েদের মুখ-ভরা হাসি আর চোখভরা প্রাঞ্জলতায় কেমন যেন নেশার মত হয়েছিল। নেশায় বুঁদ হয়েছিলাম। এমন সময় ফটাং করে একটি আওয়াজ হল। যশোবন্ত নাচ ছেড়ে দৌড়ে এল। দৌড়ে এসে আগুন থেকে বাঁশের টুকরোটা বের করল। ওখানেই বেতের চেয়ারে বসে আমরা বাঁশ-পোড়া খেলাম। সত্যি! কোথায় লাগে কাবাব। জিভে দিতে না দিতে গলে যায়। অপূর্ব!

নাচ চললো প্রায় রাত ন'টা অবধি। এ নাচ ত আমাদের দেখানোর জন্যে। ওরা যখন গাঁয়ের মধ্যে সত্যি সত্যি ভেজ্জা নাচে তখন সারারাত ত বটেই সকালেরও দু এক প্রহর অবধি নাচ গড়ায়।

চমৎকার কাটল সন্ধ্যাটা। রুথার্ণিডর একাকীত্বে অভ্যস্ত মনটা অনেকদিন পর এত লোক এত নাচ, এত গান এত হৈ-চৈ দেখে আনন্দে চমকে চমকে উঠল।

(ক্রমশঃ)

(বারো)

এরপর ভীমাপপা সাহেব যেদিন কনসুলেটে এলেন, সেদিন আর শর্মাজীকে দেখা গেল না। ট্যান্ডন সাহেব একটু বিস্মিত হলেন। দীর্ঘদিন ফরেন সার্ভিসে কাজ করে এই তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছে যে একটু চালু মন্ত্রীরা ঠিক একলা একলা দেশভ্রমণ করা পছন্দ করেন না।

কারণ?

কারণ একটা নয়, একাধিক। তবে শুধু উমেদারী, আবেদারী বা খিদমতগারীর জন্য নয়, নিজেদের রসনা আর বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য।

নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে মন্ত্রীদের পক্ষে বেহিসেবী হওয়া যায় না। মোটা খদ্দরের তলায় মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে বাধ্য হয়ে চাপা রাখতে হয়। এত পরিচিত সমাজে খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করা অসম্ভব। একটু এদিক-ওদিক হলেই বিধানসভা-লোকসভায় 'মে আই নো স্যার' বলে না জানি কে প্রশ্ন করবেন। এরপর লোকাল কাগজের রিপোর্টারগুলো তো আছেই।

বিহারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী দিব্যেন্দুবিকাশ চৌধুরী মিঃ ট্যান্ডনকে একবার বলেছিলেন, 'আচ্ছা বলুন তো মিঃ ট্যান্ডন, মন্ত্রী হয়েছি বলে কি আমরা রক্ত-মাংসের মানুষ নই?'

সহানুভূতি জানিয়ে মিঃ ট্যান্ডন বলেছিলেন 'তা তো বটেই।'

'কলেজের ছেলেরা মেয়েদের নিয়ে ঘুরতে পারে, অধ্যাপকরা ছাত্রীদের আদর করতে পারেন, চাকুরিয়া সহকর্মী মেয়েদের নিয়ে ডায়মন্ডহারবার বা পুরী যেতে পারেন, মার্কেন্টাইল ফার্মের অফিসার ইয়ং মেয়ে স্টেনোদের নিয়ে মুসৌরী-নৈনীতালে কনফারেন্স বা সেমিনারে যেতে পারেন...!'

ঝড়ের বেগে দিব্যেন্দুবিকাশের দুঃখের ইতিহাস বেরিয়ে আসে।

বেইরুটের ইন্ডিয়ান এম্বাসীর চান্সেরী বিল্ডিং-এর তিনতলার ঐ কোনার ঘরে বসেই মিঃ ট্যান্ডন ভূমধ্যসাগরের মাতাল হাওয়ার স্পর্শ অনুভব করেন। জানলা দিয়ে একবার বাইরের আকাশটা দেখেন। তারপর সান্ত্বনা দিয়ে মাঝপথে মন্তব্য করলেন, আমি আপনার কথা কোয়াইট রিয়ালাইজ করি।

একটু আস্তে হলেও উত্তেজনায় টেবিল না চাপড়ে পারলেন না দিব্যেন্দুবিকাশ। 'রিয়ালাইজ' কেন, অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন আমার কথা—কারণ দেয়ার ইজ লজিক ইন মাই আর্গুমেন্ট।

'দ্যাটস রাইট।'

ছোটখাট মন্ত্রীরা ছোটখাট শিকার ধরেন। কেউ শপিং করে দেয়, কেউ ট্যাক্সি বিল মেটায় আর কেউ বা বেইরুটের পৃথিবী খ্যাত নাইট ক্লাব 'কট-ক্যাটে' নিয়ে যায়।

বড় বড় কর্তাব্যক্তিরা চুনোপুঁটি শিকার করেন না।...

একজন অতি সাধারণ বিদেশযাত্রীর মত অশোক আগরওয়ালা নামে এক ভদ্রলোক দমদম থেকে কোয়ান্টাস ফ্লাইটে ইউরোপ গেলেন। বাইরের দুনিয়ার কেউ জানল না, খেয়াল করল না। পরিচিতরা জানল, দুর্গাপুরের এক কারখানার কোলাবরেশনের জন্য অশোকবাবু 'বিলাইত' গেলেন।

কোলাবরেশনের মকরধ্বজ খেয়ে ভারতবাসীরা স্বর্গে যাবে বলে যেসব দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন নেতৃবৃন্দের ধারণা, তাঁরা অশোকবাবুর পকেট ভর্তি করে ফরেন এক্সচেঞ্জ দিয়েছেন। এছাড়া—

এছাড়া আবার কি?

এছাড়া এ-বি-সি অ্যান্ড এক্স-ওয়াই-জেড ইন্টার ন্যাশনাল কনসট্রাকশন কোম্পানীর ওভারসীজ ম্যানেজারের একাউন্টে তো মাসে মাসে পাঁচশ ডলার জমছে।

তার মানে?

অশোক আগরওয়ালা আর তাঁর বন্ধুরা হয়ত ভাবেন কেউ কিছু বোঝে না। ট্যান্ডন সাহেব মনে মনে হাসতেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বলা হলো, ওভারসীজ ম্যানেজারের মাইনে দশ হাজার টাকা প্লাস কার এলাউন্স প্লাস অফিস এলাউন্স প্লাস এন্টারটেনমেন্ট এলাউন্স প্লাস...। ওভারসীজ ম্যানেজারকে বলা আছে, শ্রীমানজী। মাসে মাসে পাঁচশ ডলার ব্যাঙ্কে জমা রাখবে। কর্তাব্যক্তিরা বা তাঁদের বন্ধু-বান্ধব-হিতাকাঙ্খীরা এলেই ঐ ডলার খরচ হবে।

সুতরাং পকেট ভর্তি ফরেন এক্সচেঞ্জ ছাড়াও অশোকবাবুর আরো কিছু সম্বল ছিল। এক মাস ধরে ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়ে 'বন্ধুদের' সেবার জন্য ফুলপ্রুফ ব্যবস্থা করলেন অশোকবাবু।

এক মাস পরে 'বন্ধুবর' যেদিন ভারতের কোনো এয়ারপোর্ট থেকে বি-ও-এ-সি প্লেনে চাপলেন, সেদিন লোকে-লোকারণ্য। যেদিন ফিরে এলেন, সেদিনও শত-সহস্র মানুষের ভীড়। কেউ জানল না, কার নিঃস্বার্থ সেবায় তাঁর যাত্রা সফল হলো।

ট্যান্ডন সাহেব এসব জানেন, বোঝেন। ছোটখাট সেবা-যত্ন পাবার লোভেই যে ভীমাপপা সাহেব শর্মাজীকে সঙ্গে রেখেছিলেন, তাও তিনি জানেন। আর জানেন যে, শর্মাজীও লীডার। কাঁচা লোক নন। একেবারে ফিনিশড প্রডাকট। সুতরাং তিনিও তাঁর ঐ টিটাগড়ের কারখানার ইংরেজ জেনারেল ম্যানেজার মারফত বিধিব্যবস্থা করেছেন ইউরোপ দর্শনের সুব্যবস্থার জন্য। শ্রমিক-কল্যাণের জন্য বিদেশী মিল-মালিকের দল যে ইউরোপ ভ্রমণকারী কোনো কোনো লীডারের সেবা-যত্নের ব্যবস্থা করেন, তা শুধু মিঃ ট্যান্ডন নয়, সব ডিপ্লোম্যাটরাই জানেন।

তবুও মিঃ ট্যান্ডন জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোয়াট হ্যাপেন্ড টু মিস্টার শর্মা? ওকে আজ দেখছি না যে?'

'আর বলবেন না। আমাদের কোনো কোনো লীডার এমন করাপটেড আর হোপলেস যে কি বলব? ওঁর গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ব্রাউন অ্যাকসিডেন্টালী বার্লিনে এসেছিলেন। মার্টিনী খেতে খেতে একটু নিভৃতে দু-একটা ইস্যু নিয়ে আলোচনার জন্য কয়েক দিন...!

মিঃ ট্যান্ডন বাধা দিয়ে বললেন, 'না-না, আমি অত কিছু জানতে চাইনি। লেট হিম মাইন্ড হিজ ওন বিজনেস।'

'ইন এনি কেস', ভীমাপপা সাহেব এবার কাজের কথায় আসেন, 'ঐ ক্যামেরা আর বাইনোকুলারটা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে দিল্লী পাঠাতে হবে।'

শর্মাজী অসৎ, কিন্তু ভীমাপপা সৎ। সৎ হয়েও ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে মাল পাচার করার অনুরোধ করতে দ্বিধা হয় না।

কূটনৈতিক জগতের এক আশ্চর্য আবিষ্কার হচ্ছে এই ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ। কূটনৈতিক মিশনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি হচ্ছে এই ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ। ওয়াশিংটনের সি-আই-এ দপ্তর থেকে মস্কোর আমেরিকান এম্বাসী মারফত এজেন্টদের কাছে যে গোপন সংকেত ও নির্দেশ যায়, তা থাকে এই ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে। আমেরিকান এম্বাসী থেকে যে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ ওয়াশিংটনে যায়, তাতে থাকে রাশিয়ার অনেক গুপ্ত খবর। সারা দুনিয়া থেকে ক্রেমলিনে যেসব ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ আসে, তাতেও ভর্তি থাকে অনেক রহস্য।

এই লেনদেনের কাহিনী সবাই জানে, সবাই বোঝে। তবে কেউ বাধা দেয় না। শান্তির সময় ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের যাতায়াতে বাধা দেবার নিয়ম নেই, প্রথা নেই।

সাধারণত নিজের নিজের দেশের এয়ার

লাইন্স এই ব্যাগ আনা-নেওয়া করে। ব্রিটিশ ফরেন অফিস বা বৃটিশ এম্বাসী প্যান অ্যামেরিকান বা এয়ার ফ্রান্সেও ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ পাঠাবে না। এয়ার ক্র্যাফটের কম্যান্ডারের ব্যক্তিগত হেপাজতে এই ব্যাগ থাকে। কোন দেশের গোয়েন্দা, পুলিশ বা কাস্টমস'এর স্পর্শ করার অধিকার নেই।

ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে যে শুধু গোপন তথ্য যায় তা নয়। মিশনের নিত্য-নৈমিত্তিক চিঠিপত্র ও টুকিটাকি অনেক কিছু যায়। জরুরী প্রয়োজনে ডিপ্লোম্যাটদের ব্যক্তিগত জিনিষপত্রও পাঠান হয়।

সে যাই হোক ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের রাজনৈতিক মূল্যের তুলনা নেই। প্রয়োজনেরও শেষ নেই। তাই তো বহু দেশ ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের দেখাশোনা করার জন্য সঙ্গে দু-একজন ডিপ্লোম্যাটকেও পাঠায়।

ভারতবর্ষের অত ফালতু পয়সা নেই। তাছাড়া দুনিয়ার গোপন খবর লুঠপাট করে নেবার প্রয়োজনও তার নেই। তবুও তো ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ। ফরেন মিনিস্ট্রির অনেক গোপন খবর ও চিঠিপত্র তাতে থাকে।

ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ এম্বাসী থেকেই যাতায়াত করে, কনসুলেট থেকে নয়। এই ব্যাগে কিছু পাঠাতে হলে কনসুলেট থেকে এম্বাসীতে পাঠাতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে তার স্থান হবে।

বার্লিন থেকে কোন ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ সোজা দিল্লী যায় না। প্রথমে সব কিছুই

বন-এ ইন্ডিয়ান এম্বাসীতে যাবে। তারপর সেখান থেকে নির্দিষ্ট দিনে ফ্রাঙ্কফুর্ট গিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার দিল্লীগামী প্লেনের কম্যান্ডারের হাতে তুলে দেওয়া হবে সেই অমূল্য ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ।

আমাদের ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে শুধু যে জরুরী নথিপত্র যায়, তা নয়। প্যারিস-ডিপ্লোম্যাটদের জন্য ধনে-জিরে-শুকনো লংকাও ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে যেতে পারে। আবার দিল্লীগামী ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে জয়েন্ট সেক্রেটারীর মেয়ের বিয়ের জন্য সুইস ঘড়ি বা জামাতা বাবাজীর স্কটিশ টুইডের স্যুট যায় কিনা বলা শক্ত। আরো অনেক কিছু যেতে পারে।

তবুও অপরের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য নিজে সেই কাজ করা সম্পূর্ণ আলাদা কথা।

'একসকিউজ মী, মিঃ ভীমাপপা, আমাদের এখান থেকে তো কোন ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ দিল্লী যায় না।'

'ঠিক আছে বন'এ এম্বাসীতে পাঠিয়ে দিন। ওরা ওখান থেকে আপনাদের হয়েই সেক্রেটারী মিঃ নানজাপপার কাছে পাঠিয়ে দেবে। তাহলেই—।'

'বাট স্যার, আমরা তো কোনো ব্যাগ বন-এ পাঠাই না। অপনি বরং ফেরার পথে বন-এ এম্বাসীতে দিয়ে দেবেন।'

এর আগে কোনো কনসুলেটে তরুণের পোস্টিং হয়নি। দিল্লীর ফরেন মিনিস্ট্রী ছাড়া বিভিন্ন এম্বাসীতে কাজ করেছে। বার্লিন আসার আগে ইউনাইটেড নেশনস-এ ছিল। তাইতো ভেবেছিল কনসুলেটে এসে ঝামেলা কমবে, কিন্তু ভীমাপপার মত নিত্য নতুন ভূতের উপদ্রবে যে জীবন অতিষ্ঠ হবে ভাবতে পারেনি।

ভীমাপপাকে কোন মতে বিদায় করার পর মিঃ ট্যান্ডনও বল্লেন, 'জানো তরুণ, ভেবেছিলাম রিটায়ার করার আগে একটু শান্তিতে দিন কাটাব কিন্তু এদের উপদ্রবে তাও হলো না।'

একটু থেমে ট্যান্ডন সাহেব আবার বললেন, 'সারা জীবন কোনো না কোনো অফিসার বা অ্যাম্বাসেডরের অন্ডারে কাজ করেছি। তাঁদের খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তাইতো বার্লিনে ইন্ডিপেনডেন্ট চার্জ নিলাম, কিন্তু এখন দেখছি আগেই ভাল ছিলাম।'

কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন বার্লিনের ইন্ডিয়ান কন্সাল জেনারেল মিঃ ট্যান্ডন।

এবার তরুণ বলে, 'আপনি তো সামনের সপ্তাহে কনসালটেশনের জন্য বন যাচ্ছেন, তখন আমার কি দুর্গতি হবে বলুন তো?'

মিঃ ট্যান্ডন হাসতে হাসতে বললেন, 'নার্ভাস হবার তো কিছু নেই! নেকসট উইকে তো ডান্সার প্রীতিকুমারী ছাড়া কোন পার্লামেন্টারিয়ান আসছেন বলে তো শুনিনি। সো ইউ উইল হ্যাভ এ প্লেজান্ট টাইম, আই হোপ।'

'হোপ' তো অনেকেই অনেক কিছু করেন কিন্তু বাস্তব তো সম্পূর্ণ আলাদা।

আমাদের 'পিসফুল কো-একজিসটেন্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি কো-অপারেশন' বিদেশে যত বেশী অচল হচ্ছে ইন্ডিয়ান ডান্স অ্যান্ড বাজনা তত বেশী পপুলার হচ্ছে বলে শোনা যায়। ইন্ডিয়ার খবরের কাগজগুলো পড়লে মনে হয় আমাদের বাজনা আর ডান্সের ঠেলায় হলিউডে ফিল্ম তৈরী বন্ধ হয়েছে, প্যারিসের নাইট ক্লাবে খদ্দের হচ্ছে না।

ওস্তাদ সাহেবের দল সাকসেসফুল ফরেন টুরের পর খুশিতে ডগমগ হয়ে বেনারসী পান-জর্দা চিবুতে চিবুতে প্রেস কনফারেন্সে বলেন, 'বাজনা? আহাহা, ওরা কি ভালই বাসে! হল প্যাকট! অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাত ব্যথা হয়ে যায়।'

কোন সাংবাদিক অবশ্য প্রশ্ন করেন না, 'কত ফরেন একসচেঞ্জ নিয়ে বাড়ী ফিরলেন? তাহলেই ঝোলা থেকে বেড়াল ছানা বেরিয়ে পড়ত!'

এই প্রেস কনফারেন্সের পর কলকাতার মিউজিক কনফারেন্সগুলোতে, ওস্তাদ সাহেবের রেট শেয়ার বাজারের ফাটকাকে হার মানিয়ে চড় চড় করে বাড়ে।

সুন্দরী যুবতী ডান্সারদের পয়সা খরচা করে প্রেস কনফারেন্স করতে হয় না। রিপোর্টার-ক্যামেরাম্যানরাই সুন্দরীদের দোর গোড়ায় ভীড় করেন। ঘন্টার পর ঘন্টা ধর্ণা দেবার পর মুহূর্তের জন্য সেই অমৃতলোকবাসিনী সুন্দরী দর্শনে তাঁরা ধন্য হন। আর কাগজে ছাপা মিস পদ্মাবতীর নাচ দেখার জন্য প্যারিসে ট্রাফিক জ্যাম হয়, রাশিয়ায় বলশয় থিয়েটারের টিকিট বিক্রী হয়নি।

'আর রোমে?

পাগল ইতালীয়নরা এয়ার পোর্টে এমন ভীড় করেছিল যে চারটে ইন্টার-ন্যাশনাল ফ্লাইট ঘন্টার পর ঘন্টা ডিলেড হয়ে যায়।

'ভাল কথা। অনেক দেশের ফিল্ম প্রডিউসার ডাইরেকটরা আমাকে তাঁদের ফিল্মে নাচতে ইনভাইট করেছেন।'

ব্যস! রেসের মাঠের ট্রিপল টোট! চার লাখ কালো, এক লাখ শাদা দিয়েও প্রডিউসাররা পদ্মাবতীর কনট্রাকট পান না।

লেক মার্কেটের পটলদা বা দর্জিপাড়ায় বিধুবাবু এসব কাহিনী বিশ্বাস করলেও তরুণের মত ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটরা শুনলে হাসি চাপতে পারে না। নেকসট উইকে প্রীতিকুমারীর আগমন বার্তা শুনে তাই তো তরুণ খুব বেশী সুখী হতে পারল।

তাছাড়া তরুণ একটু ভিন্ন প্রকৃতির। কিছু কিছু ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাট আছেন যাঁরা প্রীতিকুমারীর মত ডান্সারদের সেবা করে ধন্যবোধ করেন। প্রোগ্রামের শেষে হোটেলের নিভৃত কক্ষে দু-চার রাউন্ড ড্রিংক করার পর এদের ভাগ্যে কখনও কখনও উপরি পাওনাও জুটে যায়। তরুণদের সহকর্মী সাবারওয়াল এমনি এক নৃত্যোপটিয়সীর সেবা করে ঘুম থেকে উঠতে অনেক দেরী করে তাড়াহুড়ো করে অফিস যাবার সময় লেডিস জুতো পরে এম্বাসী গিয়েছিলেন, সে কথা ফরেন সার্ভিসের কে না জানে?

তরুণ এসব উপরি পাওনার স্বপ্ন কোনদিন দেখেনি জীবনে। শুধু একজনেরই স্বপ্ন দেখেছে সে সারাজীবন ধরে। মনের সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে, মাধুরী দিয়ে যাকে সে ভালবেসেছে, সেই ইন্দ্রাণী ছাড়া আর কোন নারীর স্থান নেই তরুণের জীবনে।

জীবনের ধূসর মরু-প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে বন্দনার কাছে বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ ইঙ্গিত পেয়েছিল তরুণ। অনেক আশা নিয়ে এসেছিল বার্লিনে। মনসুর আলির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য করাচীতে সেকেন্ড সেক্রেটারী বড়ুয়াকে চিঠি দিয়েছিল। বড়ুয়া ছুটিতে থাকায় উত্তর এসেছে মাত্র কদিন আগে। পাকিস্থান সরকারের কোন অফিসারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে বলে বড়ুয়া জানিয়েছে। বড়ুয়া লিখেছে, আমার ক্ষতির চাইতে মিঃ আলির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশী। কারণ পাকিস্থান সরকার ভাবতে পারে ওর সঙ্গে আমাদের কোন গোপন সম্পর্ক আছে। করাচীর আবহাওয়া বড্ডই খারাপ। সেজন্য মিনিস্ট্রির লেভেলেই যোগাযোগ হওয়া ভাল।

বড়ুয়া চিঠির শেষে লিখেছে, আমাদের মিনিস্ট্রী থেকে পাকিস্থান ফরেন মিনিস্ট্রীতে চিঠি এলে কাজের অনেক সুবিধে হবে। প্রথম কথা হাই কমিশনও সরকারীভাবে তদ্বির করতে পারবে। তাছাড়া সব চাইতে বড় কথা, এখন এখানে যিনি ইন্ডিয়া ডেস্কের এসব দেখাশুনা করেন, তিনি পূর্ব বাংলারই একজন মুসলমান। খুব সম্ভব ঢাকারই লোক। প্রায়ই ঢাকা যান। আমার স্থির বিশ্বাস ইনি নিশ্চয়ই খুব সাহায্য করবেন।

কটা দিন এমন বিশ্রী ঝামেলার মধ্যে কাটছে যে তরুণ মিনিস্ট্রীতে একটা ফর্মাল কম্যুনিকেশন পাঠাতে পারল না। ট্যান্ডন সাহেবের অবর্তমানে নিশ্চয়ই সময় পাবে না।

তরুণ বলল, 'ওসব ডান্সারের চিন্তা পরে করা যাবে। আপনি কনসালটেশনের জন্য বন-এ যাবার আগে আমার ঐ চিঠির ড্রাফটটা দেখে ফাইনাল করে দেবেন, অ্যান্ড ইউ শুড সী দ্যাট ইট ইজ ইমিডিয়েটলি ডেসপ্যাচড টু ফরেন অফিস।'

মিঃ ট্যান্ডন অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বললেন, 'সার্টেনলি।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'বেটার টু ওয়ান থিং। তুমি আজ রাত্রে আমার ওখানে চলে এসো। ডিনারের পর দুজনে বসে ফাইনাল করে ফেলব।'

তরুণ হাসতে হাসতে বললো, 'আপনি জানেন না আমি আজ রাত্তিরে আসছি?'

'তার মানে?'

'তার মানে আজ ভাবীজি আমার জন্য কিছু স্পেশ্যাল ডিস...।'

মিঃ ট্যান্ডন হাসতে হাসতে বলেন, 'ডিপ্লোম্যাট হয়ে রিটায়ার করার সময়ও ডিপ্লোম্যাসীতে তোমাদের কাছে হেরে যাচ্ছি!'

(ক্রমশ)

আলোকবিন্দু

পরিতোষ মজুমদার

এমনিতেই বেশ দেরী হয়ে গেছে। তার ওপরে ক'টা বাস ছেড়ে দিয়ে যে বাসে ওঠা যাবে কে জানে। মনটা তেতো হয়ে ওঠে পরিপূর্ণার। অফিস তো আর ওর অসুবিধার কথা শুনবে না। চাকরী বজায় রাখতে গেলে সময়মাফিক হাজিরা দিতেই হবে। তা সে যেমন করেই হোক। কয়েকদিন আগে বড়োবাবু ওকে ডেকেছিলেন। পরিপূর্ণা টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে রাইমোহন চক্রবর্তী মুখে কিছু বলেন নি। রেজিস্টার খুলে লাল কালিতে পর পর চার-পাঁচদিনের লেট মার্কটা দেখিয়ে খাতাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রাগে দুঃখে আর অপমানে প্রায় চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছিলো পরিপূর্ণার। তবু বড়োবাবুর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে কোনক্রমে সামলে নিয়েছে। সিটে এসে বসে লেজারে মন দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারে নি। রাগটা গিয়ে পড়েছে সুধাময়ের ওপর। কেন, মানুষটা কি ইচ্ছে করলে ওকে এতোটুকু সাহায্য করতে পারে না? সংসারের সব দায়-দায়িত্বই কি ওর? একেই তো জোয়াল টানতে গিয়ে নিজের সবকিছু নিংড়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে। তার ওপর একঘর লোকের সামনে লেট করে আসার জন্য অপমানটা প্রায় নিত্যকার পাওনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক একসময় রাগে দুঃখে মনে হয় সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে যে দিকে দুচোখ যায় চলে যেতে। কিন্তু—।

পরিপূর্ণাকে ড্রয়ার, টেবিল হাতড়াতে দেখে সুধাময় বিছানার পাশের জানালার তাক থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে এগিয়ে দেয়।

বাজার থেকে ফিরে এসে রেখেছিলো। পরিপূর্ণা হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিয়ে এক এক করে খুচরো পয়সাগুলো গোনে। মাইনে পেতে এখনো আট-দশ দিন বাকী। আর মাইনে পেলেই বা কী! বরং মাইনের দিনটা এগিয়ে এলেই যেন বুকের ভেতরে হাতুড়ী ঠোকে। মাস-পয়লা মানেই তো মাস ফুরনো। আর তার পরের রাত ফর্সা হতে না হতেই বাড়ীভাড়া, গয়লা আর মুদি দোকানের বাকী। এইসব কতো পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে সারাটা মাস কি করে টানবে, ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়।

ব্যাগে খুচরো যা আছে তাতে যাতায়াত হয়ে যাবে। অফিসে টিফিন বলতে তো কিছুই হবে না। শুধু দু-তিন কাপ চা না খেলে কাজ করতে পারে না। দুপুর বেলাটায় ঘুম ঘুম পায়। ঝিমুনী ধরে। তবু মাসের শেষের দিকে যতোটা পারে টেনেটুনে কেটে-ছেঁটে দেয়। ক্যান্টিনের সে পয়সা কটা ও সব সময় মেটাতে পারে না। মাসের প্রথম মাইনে পেলে তবে দিতে হয়। ব্যাগের চেনটা টেনে মুখটা বন্ধ করে নীচু হয়ে শাড়ীর কুঁকড়ে থাকা পাড়টা সোজা করতে গিয়ে দেখে সুধাময় ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর এই তাকিয়ে থাকার অর্থটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না পরিপূর্ণার। আজকে বাজারের তাড়া-হুড়োর মধ্যে ওর জন্য সিগারেট আনার কথা আর মনে থাকে নি। আজকাল সুধাময় অবশ্য পুরো প্যাকেট খায় না। খুচরো কটা সিগারেটেই চালিয়ে নেয়। আর সেই মাপা সিগারেট কটাও পরিপূর্ণা বাজার ফেরত এনে দেয়। অন্যদিন হলে হয়তো রেগে যেতো। যার এক পয়সা রোজগার নেই, তার নেশা থাকাটাও উচিত নয়। ও কটা পয়সায় সংসারের তো একটু হলেও সাশ্রয় হয়। তবু আজ পারে না। বরং মানুষটির জন্য করুণাই হয়। আগে যে মানুষটা চেইন-স্মোকার ছিলো, সংসারের হাল দেখে সেই মানুষটাই সিগারেট খাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু এতো বছরের নেশাটা কি একেবারে ছাড়া যায়।

শাড়ীটা ঠিকঠাক করে উঠে আলমারীটা খুলে একটা টাকার নোট বার করে সুধাময়ের হাতে দিয়ে বলে—শোন, আমার সময় নেই, কাউকে দিয়ে সিগারেট আনিয়ে নিও।

সুধাময় টাকার নোটটা হাতে নিয়ে যত্নের সঙ্গে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। তারপর নিশ্চুপে বিছানার নীচে রেখে দেয়।

আলমারীটা বন্ধ করে আজ আর চাবির গোছাটা সঙ্গে নেয় না। সুধাময়কে দিয়ে বেরোতে গিয়েও ফিরে আসে। বাজার থেকে ফিরে এসে রুমাকে দেখে নি। কোনরকমে রান্নাটা নামিয়ে রেখে স্নান সেরে অফিস যাবার জন্য মনটা এতো ব্যস্ত ছিলো যে রুমার খোঁজ-খবর করার মতো ফুরসুৎ পায় নি। মেয়েটাকে একবার চোখের দেখা দেখে না গেলে অফিসে বসে মনটা খুঁতখুঁত করে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পরিপূর্ণা পাশের বাড়ীর মেয়েটাকে ডাকে—অণিমা, অণিমা আছিস নাকি রে?

অণিমা উত্তর দেয়—কি বৌদি, আমায় কিছু বলছো?

—তোদের ওখানে রুমা থাকলে পাঠিয়ে দে তো।

এতোক্ষণ পরে সুধাময় একটু সাহস সঞ্চয় করে বলে,—তুমি অফিসে যাও, আমি দেখবোখন।

নিরুত্তর সুধাময়কে তবু যেন সহ্য হচ্ছিলো। এবার রাগে ফেটে পড়ে পরি-পূর্ণা,—তুমি যে কতো দেখবে তা আমার জানা আছে। হাড়মাস কালি হয়ে গেলো, ঘর-বার করতে করতে মুখে রক্ত ওঠার জোগাড় তবু যদি একটু হুঁস থাকে! কেন, মেয়েটাকে ডেকেডুকে একটু স্কুলে পাঠালেও তো পারো।

রাগের মাথায় কথাগুলো বলে ফেলে নিজেই লজ্জা পায় পরিপূর্ণা। ছ'মাসের ওপর স্কুলের মাইনে বাকী। নাম কেটে দিয়েছে। ওকে আর স্কুলে ঢুকতে দেয় না। প্রথমদিকে মেয়েটা কান্নাকাটি করতো। পরি-পূর্ণা উপায় না দেখে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে বুঝিয়েছে,—বাবার কাছে বসে বসে পড়বি, কেমন। স্কুলে অতো ছেলে-মেয়ের মধ্যে কি আর পড়াশুনা হয়! কি করবে? একা-একা কতোদিক সামলাবে ও? রুমার আসতে দেরী দেখে হাতের ঘড়িতে সময় দেখে পরিপূর্ণা। তারপর সুধাময়কে বলে—আমার আর দেরী করার উপায় নেই। মেয়েটাকে একটু খোঁজ-খবর করে ঘরে এনো। রোদ নেই, বৃষ্টি নেই—সারাটাদিনই পাড়ায় পাড়ায় টো-টো করছে। কথা কটা কোন-রকমে ছুঁড়ে দিয়ে রাস্তায় নামে পরিপূর্ণা।

বাসস্ট্যাণ্ডে এসে দেখে বেশ ভীড়। পর পর কটা বাস ছেড়ে দিয়ে একটাতে কোন-রকমে নিজেকে গলিয়ে দেয়। ক'বছর আগে এইভাবে যাতায়াত করা দূরে থাক ভাবতেও পারতো না। সেই সব কথা ভাবলেও আজ হাসি পায়। পরিস্থিতি আর পরিবেশ মানুষকে সব কিছু সহ্য করিয়ে দেয়।

বাস থেকে নেমে রাস্তাটা পেরিয়ে অফিসের তিনতলার সিঁড়িগুলো তাড়াতাড়ি ভেঙে ওপরে উঠে দেখে পিয়ন রামসেবক টেবিলের ওপর থেকে রেজিস্টারটা তুলে বড়োবাবুর ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর কয়েক সেকেন্ড দেরী হলে আবার গিয়ে দাঁড়াতে হতো রাইমোহন চক্রবর্তীর টেবিলের সামনে। কাজ করতে করতে হঠাৎ মুখ তুলে মরা মাছের মতো ঠাণ্ডা চাউনিতে তাকাতেন রাইমোহন চক্রবর্তী। তারপর রেজিস্টারটা এগিয়ে দিয়ে ঠোঁট চেপে চেপে ছোট্ট কয়েকটা বিষ মাখানো কথা।

—অফিসটা যে আপনারা একেবারে ঘর-বাড়ী করে তুললেন দেখছি এ্যাঁ।

কথাক'টায় সারা শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে যেন আগুনের হল্কা ছুটিয়ে দেয়। সুধাময়ের ওপর অভিমানে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায়।

রামসেবককে ডেকে ব্যাগটা খুলে পেন বার করে নিজের নামের পাশে ইনিসিয়াল দেয়। তারপর সিটে এসে বসে।

ফাঁড়াটা জোর কেটে গেছে। সিটে বসে বেয়ারাকে জল দিতে বলে। পুরো গ্লাসটা খালি করে কালকের শেষ না করে যাওয়া লেজারটা টেনে নেয় পরিপূর্ণা।

চেষ্টা করেও মনটাকে লেজারে বসাতে পারে না। এলোমেলো জট পাকানো কতো-গুলো ভাবনা মনটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। কিছুতেই যেন তার হাত থেকে ওর মুক্তি নেই।

টিফিন হয়ে গেছে। ঘরের সবাই ছুট-ছাট এদিক-ওদিক বেরিয়ে গেছে। ক্যান্টিনের অল্পবয়সী ছেলেটা টিফিনের একটু আগে সিটে সিটে চা দিয়ে গেছে। নইলে টিফিনের ভীড়ে চা দিয়ে যাবার মতো ফুরসুৎ কোথায়! ইচ্ছে করেই ক্যান্টিনে যায় না পরিপূর্ণা। লেজারের হিসেবের মতো সংসারটাকে সচল রাখতে গিয়ে প্রতিটি নয়া পয়সা পর্যন্ত গুনে গুনে খরচ করতে হয়।

মাঝে মাঝে অফিসের ডিউটি আওয়ার্সটাকে অত্যন্ত দীর্ঘ আর বিলম্বিত বলে মনে হয়। প্রথমদিকে তো মনটাকে কিছুতেই বসাতে পারতো না। মনে হতো কে যেন জোর করে ধরে বেঁধে বাঘবন্দীর ছকে ওকে বন্দী করে রেখেছে। কাজ করতে করতে এখন অবশ্য সয়ে গেছে।

বাড়ী থেকে বেরোবার সময় রুমাকে দেখে আসে নি। মেয়েটা এতোক্ষণে বাড়ী এসেছে কিনা কে জানে। হয়তো বা টই-টই করে রোদে রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইচ্ছে থাকলেও তো সুধাময়ের খুঁজে আনার উপায় নেই। একবার মনে হয় অফিসে লেট হলেও রুমাকে বাড়ীতে রেখে তবে আসা উচিত ছিলো। পরক্ষণেই মনটা আবার বিদ্রোহ করে ওঠে। কেন, সংসারের সব দায়িত্ব কি আর ওর একার?

এমন ওপর থেকে জানালা দিয়ে [illegible]

আসে না। রোদে পুড়ে রাস্তাটা যেন খাঁ-খাঁ করছে। এতোদিন পরিপূর্ণা ভেবে রেখেছিলো, কয়েক মাস পরেই ওর একটা ইনক্রিমেণ্ট পাবার কথা আছে। পেলে কয়েকটা শাড়ী কিনবে। নইলে যে কটা শাড়ি অদল-বদল করে অফিসে আসে, সেগুলোর পরমায়ু খুব বেশী দিন আর নেই। কিন্তু এখনভাবে এগুলো দিয়েই যেমন করে হোক আরো কিছুদিন চালিয়ে নেবে। বরং ইনক্রিমেণ্টটা যদি সত্যি পাওয়া যায় তবে একটা ঠিকে ঝি রাখতে হবে। ওর সময়ের অভাবের জন্য মেয়েটা বয়ে যাচ্ছে। মেয়েটারই বা দোষ কী? বেড়ার গায়ের আগাছার মতো বেড়ে উঠছে। একটু নজর দেবার তো কেউ নেই।

পরিপূর্ণা স্বয়ংবরা নয়, বাবা-মা অনেক বাছ-বিচার করে তবে সুধাময়কে ঠিক করেছিলো। ওই বা অমত করবে কেন? নামকরা ইঞ্জিনীয়ারিং কনসার্নের সার্ভিস ইঞ্জিনীয়ার। তার ওপর শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ দেওরে ভরা সংসার। প্রথম কয়েকটা বছর হৈ-হুল্লোড়ে মন্দ কাটে নি। বরং ভালোই লেগেছিলো।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও অফিসের গাড়ী এসে নিয়ে গিয়েছিলো। কোলকাতার বাইরে কোনো এক কোম্পানীতে সার্ভিস দেওয়ার জন্য। কিছুক্ষণ পরেই কোম্পানীর থেকে লোক এসে হাজির। সুধাময়দের গাড়ী নাকি অ্যাকসিডেন্ট করেছে। যে অবস্থায় ছিলো সেই অবস্থাতেই ছুটে গিয়েছিলো পরিপূর্ণা। হাসপাতালে। সুধাময় অজ্ঞান হয়ে বিছানার ওপর শায়িত। ডাক্তার নার্স ঘিরে রয়েছে। ব্লাড ট্রান্সফার করা হচ্ছে। কোম্পানি সমস্ত খরচ বহন করলেও পরিপূর্ণাকে কম ছোটাছুটি করতে হয় নি। ধীরে ধীরে সুধাময় সুস্থ হয়ে উঠলেও পা দুটো হারাতে হলো চিরদিনের জন্য। যেদিন পরিপূর্ণা শুনেছিলো ক্র্যাচ ছাড়া ওর আর চলাফেরা করার উপায় নেই, হাঁটুর নীচ থেকে পা দুটো এ্যামপুট করতে হয়েছে, ওকে বাঁচাতে—কান্নায় ভেঙে পড়েছিলো পরিপূর্ণা। কিন্তু উপায় তো নেই। তখনই সংসারের সত্যিকারের রূপ দেখেছিলো পরিপূর্ণা। এতো হৈ-হুল্লোড় সব যেন হঠাৎ একদিন থেমে গেলো। কয়েকটা মাস পরেই বুঝতে পেরেছিলো, সেটা যতো না সুধাময়ের অসুখের জন্য, তারচেয়েও বেশী মাসের প্রথমে সংসারে দেওয়া টাকাটায় টান পড়েছে বলে। সেই টাকা কটাই যেন এতোদিন ওদের আর সংসারের মধ্যে সুখের সেতু তৈয়ারী করে রেখেছিলো। জোয়ারের ধাক্কা লাগাতেই সব ধসে গেছে। কিন্তু একা সুধাময়ের রোজগারের ওপর তো সমস্ত সংসারটা চলতো না। এক দেওর, দুই ভাসুর তো ভালো চাকরীই করে। তার ওপর আছে বাড়ী ভাড়া আর শ্বশুরমশায়ের পেনসন। সেই সময়ই অনেক চেষ্টা চরিত্র করে চাকরীটা জোগাড় করেছিলো পরিপূর্ণা। নইলে—।

পরিপূর্ণা অফিসে চলে যাবার পর সুধাময় খাটের পাশে রাখা ক্র্যাচ দুটো হাত বাড়িয়ে নেয়। ভর দিয়ে মাটিতে নামে। মেয়েটা এখনো ফেরেনি। কোথায় ঘুরছে কে জানে? ক্র্যাচে ভর দিয়ে যে এদিক-ওদিক এক-আধটু চলাফেরা করতে না পারে তা নয়। কিন্তু রাস্তায় বেরোলে পরেই ছোট ছেলেপেলেগুলো এমনভাবে পেছনে লাগে যেন কোন আজব জানোয়ার চলেছে। পরিপূর্ণাও তা লক্ষ্য করেছে। যার জন্য ইদানিং ঘরের চৌকাঠের ওপারে সুধাময় আর যায় না। পরিপূর্ণাই বারণ করে দিয়েছে। কিন্তু এক এক সময় ইচ্ছের বিরুদ্ধেও ওকে বেরোতে হয়। সত্যি তো পরিপূর্ণাই বা একা হাতে আর কতোদিকে পরিশ্রম করবে? সেই সকালবেলা উঠে বাসী একপাঁজা বাসন মাজা, জল তোলা, তারপর ঘর পরিষ্কার করেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে বাজারে। ঘাম ঝরা অবস্থাতেই ফিরে এসে রান্না চড়ায়। কোনরকমে রান্নাটা নামিয়ে স্নান সেরে কয়েক মুঠো নাকে-মুখে গুঁজে ছোটে অফিসে। সন্ধ্যাবেলা অফিস ফেরত এসে যে একটু বিশ্রাম নেবে তারও কি উপায় আছে। পুরো একটা সংসারের ঝামেলা কি কম।

জানলা দিয়ে সুধাময় পাশের বাড়ীর অণিমাকে ডাকে। অণিমা উত্তর দেয়,—কি সুধাময়দা, আমায় কিছু বলছেন?

—হ্যাঁ বোনটি, রুমাকে একটু খুঁজে দাও না।

একটু পরে অণিমা রুমাকে খুঁজে বাড়ীতে ধরে নিয়ে আসে। তারপর সুধাময়কে বলে—দাদা, চা খাবেন?

আগে প্রচুর চা সিগারেট খেলেও ইদানিং নেশাগুলো অনেক কমিয়ে দিয়েছে। ওর নেশা করা মানে পরিপূর্ণার ওপর চাপ পড়া। তবু নেশাগুলো একেবারে ছাড়তে পারে নি। জীবনটার ওপর কেমন যেন বীতশ্রদ্ধা এসে গেছে। একটু চুপ করে থেকে অণিমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলে—তোমার সময় থাকলে করো।

কথাটা শেষ করে রুমাকে কাছে ডাকে। রোদে একফোঁটা কচি মেয়েটার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। গায়ের ফ্রকটা ঘামে ভিজে জাব্-জাব্ করছে।

রুমাকে কাছে ডেকে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে সুধাময়। তারপর বলে,—রুমা চকলেট্ খাবি?

—হ্যাঁ, খাবো বাবা।

পরিপূর্ণার দিয়ে যাওয়া টাকাটা বালিশের নীচ থেকে বার করে রুমার হাতে দিয়ে বলে,—আমার জন্য পাঁচটা সিগারেট আর তোর একটা চকলেট্। যা, দৌড়ে যাবি আর আসবি কেমন। দেরী করিস নে যেন।

রুমা গোটা টাকাটা হাতে নিয়ে কয়েকবার উল্টে-পাল্টে দেখে। তারপর বলে,—আর মামণির জন্য?

হেসে ফেলে সুধাময় রুমার কথায়।

—মামণির জন্য একটা মিষ্টি পান নিয়ে আসিস।

রুমা টাকাটা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।

বিছানার একটা পাশে বসে সুধাময় অণিমার চা করা দেখে। স্টোভটা জ্বলছে, শোঁ-শোঁ শব্দে নীল রঙের আগুনের শিখাগুলো বাতাসে কাঁপছে। অণিমার মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। একটা পাশের কিছুটা অংশ দৃশ্যমান। কতোই বা বয়েস হবে? বড়োজোর ষোল-সতেরো। কোমল নরম দেখাচ্ছে দৃশ্যমান মুখের পাশটা। পরিপূর্ণার চেহারায় যে কাঠিন্য, অণিমার তা নেই। থাকবেই বা কেন? ওর তো এখন উঠতি বয়েস। পরিপূর্ণাও বিয়ের পর এমনি নরম নরম ছিলো। বর্তমানে দশটা পাঁচটা অফিস, সংসারের ঝক্কি—ওর ভেতরের সব রসটুকু নিঙড়ে নিয়েছে।

রুমা ইতিমধ্যে রাস্তার পাশের দোকান থেকে ফিরে এসেছে। ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একমনে চকলেট্ খাচ্ছে। চা-টা ছেঁকে কাপটা সুধাময়ের সামনের বিছানার ওপর একটা পুরোন পত্রিকা টেনে নিয়ে তার ওপর রেখে অণিমা বলে,—চা খেয়ে

আপনারা স্নান খাওয়া সেরে নিন সুধাময়দা।

—তুমি চা নিলে না?

—না সুধাময়দা, এই অবেলায় আর চা খাবো না। আমি যাই। দরকার পড়লে রুমাকে পাঠিয়ে দেবেন কেমন।

অণিমা বেরিয়ে যায়। চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে চুমুক দেয় সুধাময়। একটা সিগারেট ধরায়। তবু অণিমা থাকায় বাঁচোয়া। পরিপূর্ণা অফিসে চলে গেলে সারাটাদিন বাপ-মেয়ের ডাক খোঁজ করে। ওর জন্যই পরিপূর্ণা অফিসে গিয়েও অনেকটা নিশ্চিন্ত পায়। গরীব ঘরের মেয়ে: এখানে এসেই পরিচয় হয়েছিলো। পয়সার অভাবে বিয়ে দেওয়া দূরে থাক, পড়াশোনাটাও চালিয়ে যেতে পারে নি।

অণিমা চলে গেলে সুধাময় চা সিগারেট শেষ করে ওঠে। রুমাকে ক্র্যাচে ভর দিয়েই স্নান করায়। নিজেও মাথায় কয়েক ঘটি জল ঢালে। ছুটির দিনে পরিপূর্ণা বাপ-মেয়েকে স্নান করিয়ে দেয়। স্নান সেরে মেঝেতে চাটাই পেতে বসে দুজনে খায়। তারপর বিছানার ওপর এসে বসে। সারাটা সকাল টই-টই করে ঘুরে ভাত পেটে পড়তেই মেয়েটা ঘুমে ঢুলতে আরম্ভ করেছে। সুধাময়ও রোজ দুপুরে একটু ভাত ঘুম দিয়ে নেয়। কিন্তু আজকে ঘুম আসে না।

এতোক্ষণে পরিপূর্ণা নিশ্চয়ই নিজেকে লেজারে সঁপে দিয়েছে। কতো আশা নিয়েই না ওর হাত ধরেছিলো। আর আজ? সংসারের চাকাটাকে চলমান রাখতে গিয়ে জীবনের সব রূপ রস ঢেলে দিতে হয়েছে। তবু এতোটুকু অভিযোগ নেই।

রোদের টুকরোটা অ্যাসফেল্টের রাস্তার ওপরে পড়ে চিক-চিক করছে। নিরালা নির্জন দুপুর। মাঝে মাঝে অলস পায়ে দু-একটা ফেরিওয়ালা যাচ্ছে। বাসনওয়ালার ঠং-ঠং, আইসক্রিমওয়ালার চিৎকার—মনটাকে বিষণ্ণ করে দেয়। উদাসীন করে তোলে আগামী জীবনটা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণাগুলোকে।

রাস্তাটার ওপারে বিরাট বাগানের ভেতর ব্রাইডন সাহেবের বাড়ী। গেটের পাশে নেম-প্লেটে, ঠিক তার ওপরে বড়ো বড়ো অক্ষরে 'হেভেন' শব্দটা খোদাই করা। সুধাময়রা এখানে এসে ব্রাইডন সাহেবকে দেখে নি। তবে পাড়ার লোকেদের কাছে শুনেছে অনেক-গুলো টি-এস্টেটের নাকি মালিক ছিলো ব্রাইডন সাহেব। স্বাধীনতার কিছু পরেই টি-এস্টেটগুলো একে-একে ইজারা দিয়ে 'হেভেনে'র গেটে তালা মেরে হোমে ফিরে গেছে।

একা-একা বসে থাকলে সামনের অতো বড়ো 'হেভেন' শব্দটা পড়ে হাসি পায় সুধাময়ের। ওর নিজের চারিদিকে যে জীবনের বলয় ঘিরে রয়েছে—সেটা যে চরম-তম নরক। যার হাত থেকে ওর অথবা পরিপূর্ণার কারো হয়তো বা এ জীবনে আর রেহাই নেই। এক-এক সময় পরি-পূর্ণার জন্য মনের ভেতরের গোপন কন্দরটা হু-হু করে কেঁদে ওঠে। ওকে বিয়ে না করে অন্য কারোর হাত ধরলে নিশ্চয়ই সংসারের স্নিগ্ধ ছায়ায় নিজেকে মেলে ধরতে পারতো, এমন করে অফিসের লেজারে তিল-তিল করে নিঃশেষ করে দিতো না। কিন্তু পরমুহূর্তে আবার মনে হয় তার জন্য সুধাময়ই বা কতোখানি দায়ী? হাসি-খুসী পরিপূর্ণার মতো স্ত্রী, মাখনের মতো কচি রুমার মুখ, যে কোন ছেলের পক্ষে লোভনীয় চাকরী—একটা দমকা হঠাৎ ঝড়ে যেন মূলে শুদ্ধে উপড়ে দিয়েছে। মনে পড়ে খুব ছোটবেলায় একবার কালবৈশাখী দেখেছিলো। বড়ো বড়ো গাছ-গুলো এক ঝড়েই হেলে প'ড়ছিলো, টিনের চাল উড়ে গিয়ে বাড়ীগুলো খাঁ-খাঁ কর-ছিলো। ঠিক আজকে যেন নিজের জীবনটাকে সেদিনের ঝড়ে বিধ্বস্ত সকালটার মতো মনে হয়।

পাশে রুমা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। টাকার অভাবে স্কুলে পর্যন্ত যেতে পারে না মেয়েটা। নীচু হয়ে ঘুমন্ত রুমার নরম কপালে চুমু খায় সুধাময়। বুকের ভেতরে একটা ব্যথা তির-তির করে কেঁপে ওঠে। নিজেদের যা হবার তা তো হবেই। মেয়েটাকে যদি কোনক্রমে এ দুর্ভাগ্যের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচানো যায়। 'হেভেনে'র বাগানের চার-পাশের বেড়ার ধারের শিমুল গাছগুলো ফুলে ফুলে লাল। বুকজ্বালা নিঃসঙ্গ দুপুরের ক্যানভাসে টুকটুকে লাল ফুল-গুলোকে তবু যেন ভবিষ্যতের আশা বলে মনে হয় সুধাময়ের।

এক সময় দুপুরের রোদের তেজটা কমে আসে। কয়েকটা তেরছা ফালি রাস্তাটার এদিকে-ওদিকে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। শিমুল গাছের ছায়াগুলো প্রলম্ব হতে হতে রাস্তাটাকে চিরে ফালা ফালা করেছে।

বাসস্ট্যান্ড থেকে বাড়ীটা বেশ কয়েক মিনিটের পায়ে হাঁটা পথ। জানালায় দাঁড়িয়ে সুধাময় দেখে দুপুরটা গড়িয়ে গেছে। বিকেল হয়েছে। দূরে একটা অবয়ব জোর পায়ে এগিয়ে আসছে। সারা গায়ে বিকেলের পড়ন্ত হলদে রোদের আলো মেখে। ধীরে ধীরে অবয়ব রূপ নেয়। হ্যাঁ, পরিপূর্ণা। কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ। অফিস ফেরত নেমে সংসারের জন্য কিছু টুকিটাকি বাজার করে এনেছে। 'হেভেনে'র পাশ বাওয়া রাস্তাটায় দ্রুত বাঁক নেয় পরিপূর্ণা। আর একটু এগিয়ে এসে দৃষ্টি তুলে তাকাবে জানালাটার দিকে। সুধাময়ের চোখে চোখ পড়লে সারাদিনের পরিশ্রম ক্লান্ত মুখটাতে একরাশ খুশীর হাসি ছড়িয়ে পড়বে।

পরিপূর্ণা এগিয়ে আসছে। সমস্ত গাছের ছায়াগুলোকে পেছনে ফেলে। রাস্তার ওপরের অ্যাসফেল্টের ওপর পড়া রোদের টুকরোগুলোর ওপর পা রেখে রেখে।

এতোক্ষণের একক নৈঃশব্দতার কালো হতাশা-সমুদ্দুর থেকে পরিপূর্ণার এই বাড়ী ফেরার মুহূর্তগুলো সুধাময়কে যেন আলোর উপকূলে তুলে এনে দাঁড় করায়।

পরিবার, সন্তান, সমাজ

পরিবারের আয়তন কেমন হবে সে নিয়ে দেশে দেশে নানা ভাবনা। সম্প্রতি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেমোগ্রাফিক সেন্টার থেকে সমীক্ষা-অভিযান হয়। পরিবারের আয়তন এবং সন্তানসংখ্যা সংক্রান্ত এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, রাশিয়ার যেসব জায়গায় প্রাকৃতিক নিয়মে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ চালু অর্থাৎ জন্মহার কম সেখানে মা-বাবাও সন্তান কমই চায়। আবার যেসব জায়গায় জন্মহার এমনিতেই বেশী সেখানে মা-বাবার সন্তান-আকাঙ্ক্ষাও বেশী, গড়ে তিন এবং ঊর্ধ্বে।

রাশিয়ার মতো সমাজতান্ত্রিক দেশে বেকার সমস্যা যেমন নেই তেমনি জীবন-ধারণের মানও অনেক উন্নত এবং সহায়ক। মানুষের গড় আয়ু এখন সে দেশে প্রায় সত্তর বছর। শুধু আয়ুই বাড়ে নি স্বাস্থ্যও উন্নত হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার সুবন্দোবস্ত এবং সংস্কৃতির বিকাশে সবাই পরিপুষ্ট। সমাজতান্ত্রিক দেশ যতই উন্নতি লাভ করে ডেমোগ্রাফিক সমস্যাও ততই প্রাধান্য পায়।

গত দশকে রাশিয়ার মৃত্যুহার বেশ হ্রাস পেয়েছে এবং জন্মহারের অস্থিরতায় জনসংখ্যা প্রায় স্থিতিস্থাপক রয়ে গেছে। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৮ এই নয় বছরে প্রতি হাজারে জন্মহার এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছে। জন্মহার ২৪·৯ থেকে দাঁড়িয়েছে ১৭·৩-এ। মৃত্যুহারের স্বল্পতার কথা মনে রেখে এই জন্মহার খুব একটা কম নয়। গত বছরে স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছিল হাজার-প্রতি দশজন, যে কোন আর্থিক বনিয়াদসম্পন্ন দেশের পক্ষেও এই সংখ্যা বেশী বলা চলে।

এই ক্রমহ্রাসমান জন্মহার অবশ্য অন্য দিক দিয়ে পুষিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়ার বিভিন্ন অংশে জন্মহার বিভিন্ন। কোন কোন প্রজাতন্ত্রে হাজার-প্রতি ৩০ থেকে ৩৬ এবং কোথাও আবার হাজার-প্রতি ১৪ থেকে ১৭। এই তফাৎ দীর্ঘকাল ধরে প্রায় একই রকম অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, জন্মহার যেখানে কম সেখানে জন্মহার বাড়ানো বা স্থিতি-স্থাপকতার কোনটাই অনুসৃত হয় নি। তাই কেন ডেমোগ্রাফারের পক্ষে একথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়, যেখানে জন্মহার এমনিতেই কম সেখানে জন্মহার আরো হ্রাস পাবে না। এই ধারা চলতে থাকলে এক অভূতপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হবে। যার ফলে দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ আহত হতে পারে। এহেন জাতীয় সংকট থেকে ত্রাণ পাবার জন্য সকলকে তাই উদ্যোগী হতে হবে, জন্মহার সংক্রান্ত সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে দেখতে হবে।

জন্মহার সংক্রান্ত এই সমস্যার মুখোমুখি হয়ে কেউ কেউ ভাবছেন, জনসংখ্যার বাড়বাড়ন্তে দেশ ভরে উঠুক এটাই বুঝি কাম্য। কিন্তু এ অবস্থা নিঃসন্দেহে কারো কাম্য হতে পারে না। এর বিপরীতে আবার জন্মহার কমতে কমতে সন্তান সংখ্যা মা-বাবার সংখ্যার চেয়ে কমে যাবে সেটা নিশ্চয়ই কাম্য হতে পারে না। এ দুয়ের মাঝামাঝি কোন রাস্তা খুঁজে নিতে হবে।

হাজার-প্রতি জন্মহারে দেখা গেছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির পথে অর্থাৎ শিশুসংখ্যা অন্ততপক্ষে দশজন হাজার-প্রতি বাড়ছে। এটাই হলো সামগ্রিক রূপ। এবার একটু গভীরে প্রবেশ করতে হবে। জনসংখ্যার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রতি পরিবারে সন্তানসংখ্যা কত তার একটা মোটামুটি চিত্র দরকার। ডেমোগ্রাফাররা জানিয়েছেন, পরিবারপিছু সন্তানসংখ্যা ২·২ থেকে ২·৫ এর মধ্যে। শিশুমৃত্যুসহ আর একটু বাড়িয়ে দেখলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২·৬ থেকে ২·৭এ। স্বাভাবিকভাবেই মোট পরিবারের অর্ধেকের দুটি সন্তান এবং বাকী অর্ধেকের তিনটি সন্তান প্রয়োজন।

স্বচ্ছল-সুন্দর জীবন সকলেই চায়। বিবাহিত জীবনে এই চিন্তা আরো বেশী প্রাধান্য পায়। তবু তাদের মনের কোণে সন্তানকামনা থাকে। প্রথম সন্তানের ব্যাপারে সকলেই বেশ উৎসাহ অনুভব করে। সন্তান চান না এরকম বিবাহিত নারী-পুরুষের সংখ্যা নেহাৎই কম। কিন্তু প্রথম সন্তানের বেলায় যে উৎসাহ থাকে দ্বিতীয়ের বেলায় সেরকম নিশ্চয়ই নয়। আর তৃতীয়ের বেলা তো নয়ই।

সামগ্রিক জীবন জন্মহারকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আর্থিক অবস্থা, বাসস্থান, সাংস্কৃতিক মান, জীবন ধারণের মান, শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি নানা ব্যাপার জন্মহারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সবকিছুর ঊর্ধ্বে হচ্ছে সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারা। যদিও পূর্ববর্তী অবস্থার উপরই সন্তানসংখ্যা নির্ভরশীল, কিন্তু সমসাময়িক চিন্তাধারাই সন্তানসংখ্যা নির্দিষ্ট করে। আর একবার যদি সন্তানসংখ্যা মনে মনে ঠিক হয়ে যায় তবে সেটাই হচ্ছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। অঞ্চল বিশেষে এর তফাৎ ঘটে। নারীর সামাজিক এবং কর্মক্ষেত্রে মর্যাদা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সন্তানসংখ্যা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেমোগ্রাফিক সেন্টারের সমীক্ষা অভিযানলব্ধ তথ্যে দেখা যায়, অনেক অঞ্চলেই পরিবারপিছু একটি সন্তানই কাম্য, খুব বেশী হলে দুটি। এই মনোভাবের যদি পরিবর্তন না হয় তবে অদূরভবিষ্যতে অর্থনীতি এবং সমাজ-নীতিতে প্রচণ্ড আঘাত আসতে পারে। এর ফলে শিশু এবং যুবকের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে বয়স্ক এবং বৃদ্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এই 'এজিং'-এর ফলে সর্বক্ষেত্রে জাতির অগ্রগতি ব্যাহত হবে। সর্বত্র যুবকদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। অথচ এদের কর্মদক্ষতা এবং বুদ্ধিপ্রভাবেই জাতির উন্নতি ঘটে এবং গৌরব বাড়ে।

রাশিয়াকে যদি আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হয় তবে সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধির উপযোগী পরিবেশ এবং মনোভাব জনমানসে জাগ্রত করতে হবে। বিশেষত যেসব অঞ্চল এই ব্যাপারে বরাবরই অনগ্রসর সেক্ষেত্রেই গুরুত্ব দিতে হবে সবচেয়ে বেশী।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ডেমোগ্রাফারদের পক্ষে এমন কোন রাস্তা বাতলানো সম্ভব কিনা যাতে এই অনগ্রসর অঞ্চলগুলি জনসংখ্যার উন্নতি লাভ করতে পারে। এ ব্যাপারে এক্ষুনি উদ্যোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরিবার-গুলি যেমন নিজেদের স্বার্থ-সুখ-সুবিধা দেখবে তেমনি তাদের দেশের কথাও ভাবতে হবে। বিশেষ দেশ হলো গর্ব তাই দেশের স্বার্থ সর্বাগ্রে। মানুষের মনের এই প্রসারতায় উন্মেষের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা প্রয়োজন। অঞ্চল হিসেবে ডেমোগ্রাফিকরা জন্মহার বাড়ানোর বিশেষ উদ্যোগ নিলে ফল ফলতে দেরী নাও হতে পারে।

এজন্য প্রয়োজন দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচীর। এক পা এক পা করে এগুনোই বুদ্ধিমানের কাজ। এতে লাভ হবে। পরিকল্পনা অনেকেরই মনে ধরবে। সন্তান-সংখ্যা বাড়বে। সন্তানকে মানুষ করার সুযোগও বাড়াতে হবে। সন্তানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারণের মান উন্নত হলে পারিবারও আদর্শ পরিবারের মর্যাদা পাবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সন্তানের জন্য স্থান সংকুলানও প্রয়োজন। পরিবার এবং মা-বাবার গুরুত্ব সমাক উপলব্ধি করতে হবে। শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে। যুব-মানসে শ্রম জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং সংস্কৃতি-সচেতনতাই যথেষ্ট নয় স্বাস্থ্য এবং অফুরান আনন্দও বিশেষ প্রয়োজন।

দেশের আর্থনীতিক পরিকল্পনায়ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা থাকা উচিত। একাজে মহিলা এবং পুরুষদের সমভাবে নিয়োগ বাঞ্ছনীয়। কারণ, মা-বাবা উভয়ে সচেতন না হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনাই কার্যকরী হবে না।

রমেশ দত্তের

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

৩৮

চিত্রকল্পনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে-চিত্রসেন

মানসিক দিক থেকে আপনি কতখানি পরিণত?

সুপরিণত সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা মোটেই সহজ কাজ নয়। জীবনধারার চারটি প্রধান ক্ষেত্রে সন্তোষজনকভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারলে তবেই সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে; সেই চারটি ক্ষেত্র হলো—সামাজিক আচরণ, কাজকর্ম, যৌন আচরণ এবং অবসর যাপন।

বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, ৩৫ কিংবা ৪০ বছর বয়সের আগে সত্যিকারের মানসিক দিক থেকে মানুষ সুপরিণত হয়ে ওঠে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই বয়সের আগে সুপরিণত ব্যক্তিত্ব দানা বেঁধে ওঠার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

মানসিক দিক থেকে আপনি কতখানি পরিণত ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পেরেছেন, তা যদি জানতে চান, তাহলে নীচের টেস্ট পরীক্ষায় বসুন। প্রত্যেকটি প্রশ্নে সুস্পষ্টভাবে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' জবাব দিতে হবে। সবশেষে জবাব হিসাব করবার নিয়ম দেখবেন।

১। যেসব ব্যাপারে হতাশা-ব্যর্থতার সম্ভাবনা আছে, সেগুলির মুখোমুখি হবার সময়ে আপনি কি মেনে নেন যে, জগতে কোনকিছুই নিখুঁত নয়?

২। কাজকর্ম না করেই দিন চলে যেতে পারে, সে রকম অঢেল টাকা-পয়সা যদি আপনার থাকে, তাহলে কি আপনি কাজকর্ম করবেন?

৩। আপনি কি সাধারণতঃ আপনার ছোটখাটো অসুখবিসুখ অগ্রাহ্য করেন?

৪। অন্য লোকের বিশ্বাস ধারণা যাতে নষ্ট হতে পারে, এমন সম্ভাবনাকে আপনি কি সযত্নে এড়িয়ে চলেন?

৫। আপনি কি এমন পোশাকপরিচ্ছদ ব্যবহার করতে ভালবাসেন, যা দেখে কেউ কোন মন্তব্য করবে না কিংবা কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না?

৬। 'কাজের থেকে কতখানি পেতে পারি' এই ধারণার থেকে 'কাজের মধ্যে কতখানি দিতে পারি' এই ধারণা নিয়ে কি আপনার কাজকর্ম করেন?

৭। আপনি যদি পুরুষ হন তাহলে মহিলা-অফিসারের অধীনে, কিংবা আপনি যদি মহিলা হন তাহলে পুরুষ-অফিসারের অধীনে কোন রকম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বোধ না করেই কাজ করতে পারেন কি?

৮। আপনার দেশ এবং সেই সঙ্গে সারা পৃথিবীর অবস্থার যাতে উন্নতি হয়, সে ব্যাপারে আপনি কি সত্যি সত্যি আগ্রহ বোধ করেন?

৯। আপনি কি অবিরাম চেষ্টা করেন জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তোলার জন্যে এবং মনকে তৈরী রাখেন নতুন চিন্তাধারা গ্রহণ করবার জন্যে?

১০। আপনার মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনও একটি ভাষার খানিকটা জ্ঞান আপনার আছে কি?

১১। যদি আপনার কোন লক্ষ্য বা আদর্শ সফল করতে না পারেন, তাহলে কি হতাশায় ভেঙে পড়েন এবং সবকিছু ত্যাগ করেন?

১২। ক্ষোভ এবং ঘৃণা জাগিয়ে রাখার প্রবণতা কি আপনার মধ্যে আছে?

১৩। কেউ সামান্য বিরক্তি ঘটালে আপনি কি সহজেই রেগে যান?

১৪। বিজ্ঞান, ইতিহাস, কবিতা কিংবা নাটক-অভিনয় ব্যাপারে আপনি কি খুব সামান্যই আগ্রহ প্রকাশ করেন?

১৫। আপনার সখের খেয়াল-খেলা অর্থাৎ 'হবি' ইত্যাদি যতটা গঠনমূলক বা শিল্পমূলক, তার চেয়ে অনেকখানি বিনোদনমূলক বলেই কি আপনি মনে করেন?

১৬। আপনি কি মাঝে মাঝে জঞ্জাল-আবর্জনা রাস্তাঘাটে কিংবা খোলা জায়গায় ফেলে দেন?

১৭। কোনও বিশেষ একজনের সম্মতি কিংবা উপস্থিতির ওপরে কি আপনার সুখশান্তি নির্ভর করে?

১৮। আপনি কি মনে মনে অনুভব করেন যে, আপনি কখনোই ভালবাসতে পারবেন না এবং কোন নারীকে (অথবা আপনি যদি নারী হন, তাহলে কোন পুরুষকে) সুখী করতে পারবেন না?

১৯। আপনার জীবনদর্শন এবং জীবনের নীতি সম্পর্কে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে গেলে আপনি কি কোনরকম অসুবিধা বোধ করেন?

২০। আপনি কি খেলাধুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন এবং সেইভাবে খেলেন?

প্রথমে ১০টি প্রশ্নের প্রত্যেকটি 'হ্যাঁ' জবাবের জন্যে পাঁচ পয়েন্ট করে হিসাব করবেন, এবং ১১ নং থেকে ২০ নং প্রশ্নের প্রত্যেকটি 'না' জবাবের জন্যে পাঁচ পয়েন্ট করে ধরবেন।

মোট ৭৫ পয়েন্টের বেশী পেলে বুঝতে হবে আপনার মানসিক ব্যক্তিত্ব অনেকখানি পরিণত হয়েছে। ৬০ থেকে ৭৫ পয়েন্টের মধ্যে পেলে বোঝা যাবে মানসিক দিক থেকে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে বেশ খানিকটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে। এবং জীবনের প্রতি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠেছে। ৪৫ থেকে ৫৫ পয়েন্ট পেলে ধরে নিতে হবে মোটামুটি পরিণত হয়েছে।

৩০ পয়েন্টের কম পেলে বলা যাবে, বয়স্ক জীবনের মধ্যে অনেকগুলি শিশু-সুলভ মনোভাব এখনো সক্রিয় রয়েছে, এবং সার্থক জীবনযাপনের প্রস্তুতির জন্যে এখুনি ঐ মনোভাবগুলির প্রচুর পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলার খুবই দরকার।

প্রশ্নগুলি যদি ভালোভাবে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখেন, তাহলে আপনার বড় বড় মানসিক অভাব এবং দোষত্রুটিগুলি সম্পর্কে বেশ খানিকটা ধারণা হবে। তবে, সেগুলো দূর করতে খানিকটা সময় লাগতে পারে। প্রথমেই এক বছরের জন্যে একটি 'আত্ম-উন্নয়ন পরিকল্পনা' খাড়া করে ফেলতে পারেন। আপনি যে বিষয়ে সবচেয়ে দুর্বল, মনের সেই দিকটা নিয়েই আগে সুরু করে দিন এবং সেই দুর্বলতা আস্তে আস্তে সংশোধন করে আপনার স্বাভাবিক আচরণের পর্যায়ে উঠতে চেষ্টা করুন। এর পরে আপনি আরও এক বছরের একটি 'প্ল্যান' তৈরী করে ধীরে ধীরে আত্ম-উন্নয়ন চালিয়ে যেতে পারবেন।

এই প্ল্যান তৈরীর ব্যাপারে যদি পথের সন্ধান চান, তাহলে একজন মনোবিদের পরামর্শও নিতে পারেন।

মানসিক দিক থেকে পরিণত হতে পারলেই সুখশান্তিভরা জীবনযাপন করা যায়। তবে, পরিণত মানসিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে হয় আপনা-আপনি গড়ে ওঠে না। এই পরিণত ব্যক্তিত্ব গড়তে হলে চাই প্রচুর ধৈর্য। প্রতিদিনের অতি সামান্য উন্নতি হবে এবং সেইটুকুতেই সন্তুষ্ট থেকে দিনের পর দিন চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আপনার যদি ছোট ছেলে-মেয়ে থাকে, তাহলে এই বয়স থেকেই তাদেরও পরিণত মন তৈরী করে দেবার জন্যে আপনি এইভাবে তাদের সহায়তা করুন। 'বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে' এই আশায় বসে থাকবেন না।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

শিল্পী অরুণ দত্ত

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জি কয়েক বছর যাবত সবিরাম শিল্পচর্চা করছেন। তাঁর স্কেচের প্রদর্শনী ইতিপূর্বে যৌথ চিত্র-প্রদর্শনের সঙ্গে করা হয়েছে। তবে ২৭শে নভেম্বর থেকে সপ্তাহব্যাপী একক প্রদর্শনী এই প্রথম আকাদমি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ খানি স্কেচের মধ্যে পুরীর দৃশ্য, গ্রাম্য চিত্র, ধানকাটা, ভিখারী, মা ও ছেলে ইত্যাদি বিষয়বস্তুর ওপর অনেকগুলি ক্ষিপ্রহাতের কাজ দেখা গেল। ফিনিশড ড্রয়িং-এর মধ্যে শিল্পীর পিতার একটি ড্রয়িং ছিল। তবে তবলা লহরার একটি মুহূর্তের ক্ষিপ্র আদল প্রশংসনীয়।

২৪ থেকে ৩০ নভেম্বর আকাদমির পশ্চিমের ঘরে বারানসীর শিল্পী অরুণ দত্তের ১৬ খানি জলরঙের ছবি দেখানো হয়। আধুনিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে করা এই আধ-ফিগারেটিভ ও অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবির মধ্যে জলরঙের প্রয়োগনৈপুণ্যে বিশেষ করে চোখে পড়ে। কখনো তরল কখনো বা ঘনভাবে রঙ চাপিয়ে কতকটা তেল রঙের কাজের এফেক্ট আনার চেষ্টা করা হয়। ফল মন্দ হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে বেশ গভীর ও উজ্জ্বল রঙ ফলেছে। 'এ ম্যান অব দি কামিং সেঞ্চুরী' ছবির গ্রাফিক গুণ, 'এগজিস্টিং সোসাইটি'র নীল ও হলুদের ব্যবহার এবং স্পেসের সৃষ্টি ও প্রতীকধর্মিতা এবং 'প্রব্লেম রিডন হিউম্যান' ছবির কালি ও কালোয় গড়া প্যাটার্নের বৈচিত্র্য কিছুটা নুতনত্বের স্বাদ এনেছিল।

উত্তরের গ্যালারিতে ১৯ থেকে ২৫ নভেম্বর জয়ন্তী সেন ও মরিস শেলিম-এর যৌথ প্রদর্শনীতে রঙ ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য দেখা গেল। শ্রীমতী সেন রাজস্থানের দৃশ্যের ওপর আধা ফিগারেটিভ কাজ করেছেন। রঙ কিছু ছড়ানো এবং কম্পোজিশন কিছুটা ঢিলেঢালা। তবে আধুনিক রীতি ঘেঁষা প্রতিকৃতিটি মন্দ নয়।

মরিস শেলিম নিসর্গ দৃশ্যের চর্চা করেছেন। ২৩ খানি ছোট ছোট ছবিতে ইতালী ও পূর্ব ইয়োরোপের নগর, সমুদ্র, গ্রাম এবং পথঘাটের দৃশ্য নিও-প্রিমিটিভ স্টাইলে উপস্থিত করেছেন। রঙের প্যাটার্নে বেশ মাধুর্য আছে। 'ব্রাউন সেল', ওমরেলোনি', 'ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার' ইত্যাদি ছবিতে বিভিন্ন স্টাইলের প্রভাব থাকলেও সব মিলিয়ে তাঁর কাজগুলিতে একটা বর্ণাঢ্য ছুটির দিনের আমেজ পরিস্ফুট।

ভিকি আবদ নুনান বোম্বাইয়ের ইউ. এস. আই. এস ওর প্রধান সাংস্কৃতিক অফিসারের পত্নী। লুইসভিল, সিনসিনাটি আর্ট আকাদমি, জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি বিভিন্ন শিক্ষায়তনে শিল্পশিক্ষালাভের সময় তান্ত্রিক শিল্পে আকৃষ্ট হন।২৬ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁর তান্ত্রিক প্রেরণায় সৃষ্ট পঞ্চাশ বাটখানি গ্রাফিকস ও পেন্টিং আকাদমির উত্তরের ঘরে প্রদর্শিত হয়। মূলত তিনটি ভাগে ছবিগুলিকে তিনি ভাগ করেছেন—কৃষ্ণ, তন্ত্র ও বর্তমান। কৃষ্ণ সিরিজে এবং বৃন্তে দুটি ফুলের মত একই রেখার আদলে দুটি মুখের গঠনের অনেকগুলি ভেরিয়েশন দেখানো হয়। তন্ত্র শ্রেণীর মধ্যে পদ্ম, ত্রিকোণ ইত্যাদি প্রতীকের মাধ্যমে কতকগুলি দীর্ঘ স্ক্রল—যার ডেকরেটিভ মূল্যটাই প্রধান হয়ে দেখা দেয়—এছাড়া একটিমাত্র রঙ ও ফর্ম নিয়ে অনেকখানি স্পেস ছেড়ে বেশ দর্শনযোগ্য কয়েকটি কম্পোজিশন দেখা গেল। বর্তমান সিরিজে তিনি প্রধানত রাগরাগিনীর চিত্ররূপ উপস্থিত করেছেন। আধা ফিগারেটিভ কতকগুলি চিত্রের রঙ রেখার মাধ্যমে মুডএর সৃষ্টি মন্দ হয়নি।

পঞ্চদশতম সর্বভারতীয় হস্তশিল্প সপ্তাহে ১ থেকে ৯ ডিসেম্বর আকাদমির মধ্যের ও দক্ষিণের ঘরে হস্তশিল্পের একটি নাতিবৃহৎ প্রদর্শনী এবং বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের ৩০।৩৫টি হস্তশিল্প কেন্দ্র থেকে, বাঁশ, শিং, কাঠ, শাঁখ, শোলা, মাদুর, কাপড়, চামড়া, চীনেমাটি, পিতল কাঁসা ইত্যাদির তৈরী নানারকম সুন্দর ব্যবহারদ্রব্য এবং গৃহসজ্জার সামগ্রীর নমুনা উপস্থিত করা হয়। ঢোকরা পুতুল, নতুনগ্রামের কাঠের মূর্তি, দার্জিলিং অঞ্চলের মুখোশ, কাঠের কাজ ও গহনা, বারুইপুরের শোলার সাজ-সজ্জা ও পুতুল, কাপড়ের পুতুল, মোষের শিং ও ঝিনুকের কাঁটা, চামচ, পুতুল ইত্যাদি বহুবিধ বর্ণাঢ্য ও নয়নমনোহর সমারোহ দেখা গেল। প্রদর্শনীতে ক্রেতাদের ভীড় দেখে বোঝা গেল যে উপযুক্ত মূল্যে হস্তশিল্পের কাজ যদি সকলের সামনে উপস্থিত করা যায় ত দেশের বাজারেও এর চাহিদা কম হবে না।

১ থেকে ২ ডিসেম্বর অমলেশ ঘোষ পশ্চিমের গ্যালারিতে ২৭ খানি জল রঙ এবং প্যাস্টেলের কাজ উপস্থিত করেন। নিসর্গদৃশ্যের নমুনাই বেশী। প্যাস্টেলের কাজগুলিতে অতিরিক্ত ঘষাঘষির ছাপ রয়েছে। খুব একটা সতেজ ভঙ্গী চোখে পড়ল না। জলরঙের দৃশ্যে কতকটা সতেজ ভাব কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা গেল।

বিড়লা আকাদমিতে ২ থেকে ৭ ডিসেম্বর দীপক ব্যানার্জির গ্রাফিকসের ৫০ খানি নিদর্শনের একটি বৃহৎ প্রদর্শনী হয়ে গেছে। শ্রীব্যানার্জির আঙ্গিকের ওপর দখল এবং ডিজাইনের বৈচিত্র্য এবং কম্পোজিশনের স্বাবলীলতা এই অ্যাবস্ট্রাক্ট কাজ-

গুলির মধ্যে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর রঙীন এচিংগুলির রঙের গভীরতা এবং জোরালো ভাব প্রশংসনীয়; বিশেষ করে ১৭, ১৮, ২৭ ও ৩০ নম্বরের কাজগুলি। তাঁর দুটি বুরিন স্টাডির প্যাটার্ন একরঙের কাজ হলেও একটা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল।

গত ২৬ নভেম্বর শুক্লাত্ত শিল্পী সংস্থার উদ্যোগে প্রকাশ কর্মকার, বিকাশ ভট্টাচার্য, রতন পাল, অসিত ব্যানার্জি, গোপাল সান্যাল, রবীন মন্ডল প্রমুখ কয়েকজন শিল্পী মেয়র প্রশান্ত শূরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্থায়ী আর্ট গ্যালারি স্থাপন ও তার মাধ্যমে শিল্পকর্মের বিক্রয়ব্যবস্থা, পার্ক বা ময়দানেতে ভাস্কর্য স্থাপনের ব্যবস্থা এবং গত বছরের মত শিল্পমেলার অনুমতি ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে স্মারকলিপি দেন। মেয়র তাঁদের প্রস্তাবে সহানুভূতি দেখিয়েছেন। মার্কেট স্কোয়ারটিকে শিল্পমেলার জন্যে ব্যবহারের অনুমতিও লাভ করা গিয়েছে। গত বছর একটু তাড়াহুড়ো করে আয়োজন করার ফলে এই শিল্পমেলায় যেটুকু ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল এবারে আশা করি সেগুলির সুব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। আগামী জানুয়ারী মাসে মেলাটি শুরু হবার কথা। কলকাতা শহরের কিছুমাত্র সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্যে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ যদি শিল্পীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন তবে শিল্পী ও নাগরিক উভয়পক্ষেরই মঙ্গল।

—চিত্ররসিক

"অখিল ভারতীয় কার্যক্রম" নামে আকাশবাণীতে একটা বস্তু আছে, এবং সেই বস্তুর মধ্যে নাটক নামে একটা উপবস্তু আছে। "অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে" যেসব নাটক প্রচারিত হয় তার অধিকাংশই নাটক পদবাচ্য নয়। নাটকের নামে একবস্তা কথা ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না তাদের ভিতর। অনেক সময় একটা নিটোল গল্পও থাকে না নাটকের নিজস্ব ধর্ম তো দূরের কথা। এইসব নাটকের রচয়িতা অনেকেরই বোধহয় ধারণা, ইঁটের প'রে ইঁট গেঁথে যেমন বাড়ি তৈরি হয়ে যায়, তেমনি কথার পরে কথা সাজালে নাটক হয়ে যায়। আর আকাশবাণী কর্তৃপক্ষও নির্বিচারে তা মেনে নেন।

অখিল ভারতীয় কার্যক্রমের অধিকাংশ নাটকের অনাটকোচিত 'আচরণের' জন্য খ্যাতিমান শিল্পীরা এইসব নাটকে অভিনয় করতে চান না। এবং শোনা গেছে, যদি কখনও কোনো খ্যাতিমান শিল্পীকে অখিল ভারতের কথা না জানিয়ে অভিনয় করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তিনি এসেছেন প্রথম দিন মহলায় এসে নাটকটি শুনে পরের দিন হঠাৎ "অসুস্থ" হয়ে পড়েছেন। তখন কর্তৃপক্ষকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছে।

কাজেই বেতার কর্তৃপক্ষ এখন সাবধান হয়ে গেছেন। "অখিল ভারতীয় কার্যক্রমের" নাটকে খ্যাতিমান শিল্পীদের বড়ো দেখা যায় না। উঠতি অথবা পড়তি শিল্পীদের নিয়েই এইসব নাটকের অভিনয় হয়ে থাকে। এবং তার ফল কর্ণেন্দ্রিয়ের বিলক্ষণ জানা আছে।

শ্রোতারা আগে "অখিল ভারতীয় কার্যক্রমের" নাটক নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতেন না, কারণ তখন বৃহস্পতিবারে এইসব নাট্যানুষ্ঠান হতো, শুক্রবারের উপর জবরদখল হত না। কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে, "অখিল ভারতীয় কার্যক্রমের" নাটক বৃহস্পতিবারের পরিবর্তে শুক্রবারেই প্রচারিত হচ্ছে। অর্থাৎ নিয়মিত বাংলা নাটককে উচ্ছেদ করে সেখানে নাটক নামধেয় উপবস্তুকে অধিষ্ঠিত করা হচ্ছে। শ্রোতারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, এবং বলেছেন, সপ্তাহে একটা দিন, শুক্রবার, নতুন পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক শোনার জন্য তাঁরা অপেক্ষা করে থাকেন—এই দিনটাতে যেন অখিল ভারতের নামে অবাংলা অনাটকের অনুবাদ শোনানো না হয়। এ বিষয়ে আকাশবাণীর সবিনয় নিবেদন আসরে অনেক চিঠি গেছে, কাগজেও অনেক চিঠি ছাপা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছু হয় নি। হবে, এমন ভরসাও পাওয়া যাচ্ছে না। (এবং আকাশবাণীর অনুষ্ঠান শ্রোতাদের পছন্দের দিকে দৃষ্টি রেখেই রচিত হয়ে থাকে।)

আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ খুব ভালো করেই জানেন, নাটকের শ্রোতৃসংখ্যাই সম্ভবত সর্বাধিক। এবং তার ক্রিয়াও অসাধারণ। দূরদূরান্তের এমন কি ভিন্ন রাষ্ট্রের শ্রোতারাও শুক্রবার রাত আটটায় কলকাতা রেডিওর প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেন, রেডিওর চাবি খুলে দিয়ে সাগ্রহে একটি ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করেন: "আকাশবাণী কলকাতা, আজকের নাটক...!" কিন্তু এই ঘোষণার মধ্যে যখন অখিল ভারত এসে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ শোনা যায়, "আকাশবাণী কলকাতা, এখন অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে নাটক..." তখন তাঁদের অনেকেরই সমস্ত আগ্রহ চুপসে যায়। কেউ রেডিও বন্ধ করে দেন, কেউ বা অন্যমনস্ক হয়ে শুনতে থাকেন, আবার কেউ স্বকর্মে মনোনিবেশ করেন। যাঁরা নাটকের পোকা তাঁরা হয়তো শেষপর্যন্ত শোনেন এবং শেষে হতাশার সুরে বলেন, এ কী হল।

"অখিল ভারতীয় কার্যক্রমের" নাটক শুনে খুশি হওয়া গেছে এমন দৃষ্টান্ত নিতান্তই কম—হয়তো আঙুলে গুনে বলা যায়। তার প্রধান কয়েকটি কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অবাংলা নাটকের অধিকাংশেই নাট্যবস্তু বিশেষ থাকে না, খ্যাতিমান গুণী শিল্পীদের দ্বারা এইসব নাটক অভিনীত হয় না, এইসব নাটকের প্রতি স্বাভাবিক কারণেই প্রযোজক, শব্দ সংযোজক শিল্পীদের খানিকটা উদাসীনতা দেখতে পাওয়া যায়, এবং দুতিনবার অনুবাদের পর মূলের রস(যদি কখনও কিছুটা থাকে) প্রায়শই বিনষ্ট হয়ে যায়।

অনেক সময় অহিন্দী ভাষায় রচিত নাটক প্রথমে হিন্দীতে অনূদিত হয়, তারপরে বাংলায়। কোনো অহিন্দী নাটকই বোধ করি সরাসরি সেই ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়না। কেন হয় না তার অনেক কারণই আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ দেখাতে পারেন, কিন্তু কারণ দেখালেই তো আর অনাটক নাটক হতে পারে না, অনূদিত মূলের রস সঞ্চারিত হতে পারে না, এবং শ্রোতারাও খুশী হতে পারেন না।

শ্রোতারা শুক্রবারে একটা নতুন পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক শুনতে চান। কর্তৃপক্ষ সেই ব্যবস্থা করুন। শুক্রবার বাংলা নাটকের জন্যেই নির্ধারিত থাক। আর কেন্দ্রীয় নির্দেশে "অখিল ভারতীয় কার্যক্রমের" নাটক যখন প্রচার করতেই হবে তখন তা শুক্রবার ছাড়া অন্য কোনো বারে হোক আগে যেমন হত।

আর, বেতার-নাটক লেখা যে খুব সহজ কর্ম নয়, বেতার কর্তৃপক্ষ সেটা বিলক্ষণ জানেন। উৎকৃষ্ট বেতার-নাটক রচনার জন্য বিশেষ শিক্ষণের দরকার হয়, বেতারের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা চাই কিন্তু সে সুযোগ খুব কম রচয়িতারই হয়। বাংলা ছাড়া ভারতের অন্যান্য ভাষায় সাধারণ নাটক রচনার ইতিহাসই খুব প্রাচীন নয়, অন্যান্য ভাষায় নাটকের প্রতি তেমন অভিনিবেশ এখনও সৃষ্টি হয়েছে এমন কথাও বোধ করি বলা যায় না।

কেন্দ্রীয় নির্দেশে সমস্ত ভাষায় রচিত নাটকের অনুবাদ প্রচার যখন বাধ্যতামূলক তখন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সমস্ত ভাষাতে বেতার-নাটক রচয়িতাদের বিশেষ শিক্ষণের এবং বেতার-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে তাঁদের পরিচিত করার ব্যবস্থা করলে ভালো হয় এবং বাংলা বেতার-নাটক যখন একটা লক্ষণীয় পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে এবং বাংলা বেতার-নাটক নিয়ে যখন নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে তখন ভালো ভালো কয়েকটি বাংলা বেতার-নাটকের পাণ্ডুলিপি অনুবাদ নমুনা হিসাবে অন্যান্য কেন্দ্রে পাঠানো যেতে পারে।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

১৬ই নভেম্বর বেলা ২টায় নাটক ছিল "মর্মরী"—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে শ্রীমনোজ মিত্র কর্তৃক রচিত।

নাটকটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির, ভিন্ন স্বাদের। সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। পরিবেশনাও মনোগ্রাহী, কিন্তু আর একটু মনোগ্রাহী হওয়া খুব কষ্টসাধ্য ছিল না। একটু আন্তরিক, একটু বেশি মহলা দিলেই হত।

অভিনয়ে রাজেশ্বরের চরিত্রটি ভালোই ফুটিয়েছেন শ্রীনির্মল চট্টোপাধ্যায়। সোনা মা'র ভূমিকাটিও শ্রীমতী গীতা দে'র অভিনয়ে সুন্দর ফুটেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ রায়চৌধুরীকে জেঠামশায় বলে গ্রহণ করতে আপত্তি নেই কিছু। সুনন্দারূপিনী শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়ও ভালোই কাজ চালিয়েছেন। "নারী কণ্ঠে" শ্রীমতী শাশ্বতী রায়ের কণ্ঠে অস্বাভাবিকতা ফুটেছিল মন্দ না, কিন্তু তেমন ভালো লাগে নি।

২২শে নভেম্বর সকাল সওয়া সাতটায় শ্যামাসংগীত গাইছিলেন শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ ভালো গাইছিলেন। কিন্তু ঘোষিকা অত্যন্ত আকস্মিকভাবে শেষ গানটি শেষ না হতেই কেটে দিলেন। মনে হ'ল যেন হঠাৎ শিল্পীর মুখের কাছ থেকে মাইক্রোফোনটি কেড়ে নেওয়া হ'ল অথবা টেপটা ছিঁড়ে গেল। কলকাতা কেন্দ্রে উদ্ধতভাবে, নিয়ম করে, নির্বিচারে সংগীত-হত্যা চললেও এমন নির্মম হত্যা বড়ো বেশি দেখা যায় না।

২৩শে নভেম্বর সকাল সওয়া সাতটায় ভজন শোনালেন শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। হিমেল সকালে, মিষ্টি গলায়, আন্তরিক সুরে তাঁর এই ভক্তিগীতি মনটাকে ভরে দিয়েছিল।

এইদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শ্রীভবনে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে জনৈক চিকিৎসকের একটি কথিকা শোনা গেল। বক্তা জন্মনিয়ন্ত্রণের অনেকগুলি উপায়ের কথা বললেন এবং সেগুলি অবলম্বনের পরামর্শও দিলেন। কিন্তু এই উপায়গুলির অধিকাংশেরই অবলম্বনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে চিকিৎসকদের মধ্যেই যে দ্বিমত দেখা যায়! এই অল্প কয়েকদিন আগেই একটি সংবাদপত্রে একটি বিশেষ প্রবন্ধে একজন খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ কতকগুলি উপায় সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন—এবং তাঁর মত সুচিন্তিত ও বাস্তবসম্মত বলেই মনে হয়। রেডিওর আলোচনাতেও আগে ভিন্ন মত শোনা গেছে।

এইদিন রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে গুরু নানক সম্পর্কে একটি কথিকা পড়লেন ডঃ শিশিরকুমার মিত্র। বেশ তথ্যপূর্ণ কথিকা—প্রয়োজনীয়। কিন্তু তিনি আর একটু ধীরে পড়লে ভালো হ'ত।

এইদিন রাত সওয়া দশটায় সংবাদ বিচিত্রাও ছিল গুরু নানক সম্পর্কে—গুরু নানকের জন্ম-পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানগুলির অংশ নিয়ে। অংশগুলি ছিল গান-বাজনা আর বক্তৃতায় সমৃদ্ধ। অনেক নেতা বক্তৃতা দিয়েছেন এইসব অনুষ্ঠানে—যেমন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায়, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান এবং পাঞ্জাবের সেচমন্ত্রী শ্রীসোহন সিং। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুসম্পাদিতই বলা চলে।

২৫শে নভেম্বর সকাল সাড়ে নয়টায় "কলকাতায় একদিন" শীর্ষক বিচিত্রাটি থেকে কলকাতার জীবনধারার মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া গেল—তার উজ্জ্বলতার, উদ্দামতার, সংকটের, বৈভবের; তার সুবিধার, অসুবিধার, কর্মব্যস্ততার ও কর্মহীনতার। অনুষ্ঠানের প্রযোজক কলকাতাকে বললেন, রূপসী ও ক্রন্দসী। কিন্তু কলকাতা কি ক্রন্দসী হতে পারে? ক্রন্দসী শব্দের অর্থ কী? বাংলায় ক্রন্দসী শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন রবীন্দ্রনাথ, সংস্কৃত রোদসীর অনুসরণে—অর্থ আকাশ। চলন্তিকায় ক্রন্দসী শব্দের অর্থ দেওয়া আছে—"আকাশ। আকাশ ও পৃথিবী।" ক্রন্দসী শব্দটি বেদেও আছে, কিন্তু সেখানে অর্থ—"চিৎকারকারী সেনাদ্বয়।"

তাই কলকাতা ক্রন্দসী হবে কোন্ অর্থে?

২৬শে নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার গল্পদাদুর আসরে "ইতিহাসের পাতায়" এই পর্যায়ে চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে বললেন শ্রীজ্যোতিভূষণ ঘোষ। বলাটা বড়ো দ্রুত, যাদের উদ্দেশে বলা তাদের বুঝতে খুব সুবিধে হয়েছিল বলা যায় না।

২৭শে নভেম্বর বেলা ১২টা ৫০য়ের খবরে একজনের নাম বলা হ'ল কৃষ্ণকান্ত শুক্লা। বাংলা খবরে বাঙালী ঘোষিকার মুখে এই উচ্চারণ ঠিক তো? বিশেষজ্ঞরা কী বলেন?

২৯শে নভেম্বর সকাল সওয়া সাতটায় শ্রীমতী বাণী দাশগুপ্তের শ্যামাসংগীত ভালো লাগল।

৩০শে নভেম্বর সকাল সওয়া সাতটায় ভজন শোনাচ্ছিলেন শ্রীমতী মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ২২শে নভেম্বর এই সময়ের শ্যামাসংগীত শেষ না হতেই অকস্মাৎ হেঁচকা টান দিয়ে কেটে দিয়েছিলেন যে ঘোষিকা, সেই ঘোষিকাই আবার শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের শেষ ভজনটি শেষ না হতেই ঠিক অমনিভাবেই কেটে দিলেন। এতটুকু মায়াদয়া দেখালেন না। কাটতে হলেই কি নির্মমভাবে কাটতে হবে? ফাঁসির আসামীকেও তো ফাঁসির আগে মিষ্টি কথা বলা হয়ে থাকে!

২রা ডিসেম্বর রাত সাড়ে আটটায় অতুলপ্রসাদের গান গাইলেন শ্রীমতী চন্দনা রায়। বেশ মিষ্টি গলা, গলায় দরদ ছিল। ভালো লাগল।

৩রা ডিসেম্বর রাত আটটায় সাহিত্য-বাসরে স্বরচিত গল্প পড়লেন শ্রীসন্দীপন চট্টোপাধ্যায়—রাজমোহন কেন আত্মহত্যা করতে পারে নি সেই বিষয়ে। গল্পটি একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির, পড়ার মধ্যেও একটু স্বাতন্ত্র্য ছিল। এটিকে একটি পরীক্ষামূলক গল্প বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, এবং গল্পলেখক সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণই হয়েছেন।

৪ঠা ডিসেম্বর রাত আটটায় শ্রীমতী শান্তা গুপ্ত অধ্যাপক শঙ্কর সুব্রহ্মণ্যমের মহাকাশ বিষয়ে একটি ইংরেজী কথিকার বাংলা রূপান্তর পাঠ করলেন। রূপান্তর শ্রীমতী গুপ্তরই। রূপান্তর সর্বত্র যথাযথ না হলেও কথিকাটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক—প্রয়োজনীয়ও। মহাকাশের বিস্ময় নিয়ে যাঁদের মনে কৌতূহল আছে তাঁদের সে কৌতূহল নিঃসন্দেহে কিছুটা মিটেছে। তবে শ্রীমতী গুপ্ত যদি আর একটু ধীরে পড়তেন তাহলে ভালো হ'ত।

—শ্রবণক

'সংহলের চিত্র-পরিচালক পল জিলস-এর সঙ্গে আলাপরত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় (দক্ষিণে)। ছবিতে অন্যান্যরা হলেন পি এন উপাধ্যায়, সৌম্যেন কুণ্ডু এবং নির্মল ধর।

... আরব সাধারণতন্ত্রের ছবি: টু-ইয়াং ফর দি লাভ

(ভারত সরকারের প্রচার দপ্তর প্রেরিত)
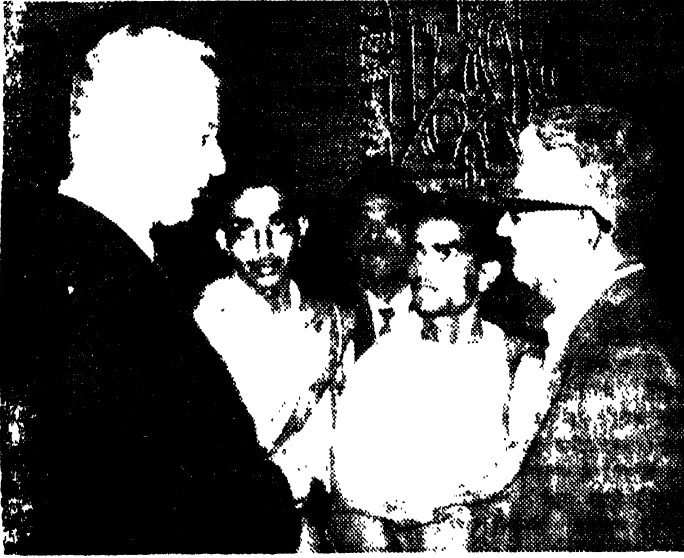
চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

(দিল্লী থেকে প্রেরিত)

৫ ডিসেম্বর নয়াদিল্লী স্টেশনে পৌঁছেই ছুটলুম ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোডস্থ **শাস্ত্রীভবন-এ;** ঐখানেই প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরোর অফিস। আমার সঙ্গে ছিলেন কলকাতার আর তিনজন চিত্র-সাংবাদিক বন্ধু : নির্মল ধর (ঘরোয়া), সৌম্যেন কুণ্ডু (উত্তম মাসিকপত্র) ও প্রেমনাথ উপাধ্যায় (হিন্দী স্ক্রীন)। কলকাতা থেকে পাওয়া নির্দেশমত সেখানে প্রথমে দেখা করতে গেলুম প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিক রিলেসান্স ইউনিট-এর বি এস বাওয়ার সঙ্গে। তাঁর ঘরে রীতিমত ভীড়; বেশীর ভাগই দিল্লীর লোক এবং তাঁদের নিয়েই তিনি ব্যস্ত। তবু ঐ ভীড় ভেদ ক'রেই এগিয়ে গেলুম তাঁর কাছে এবং কয়েকবারের চেষ্টায় তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে বললুম, 'আমরা কলকাতা থেকে আসছি।' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডান পাশে দাঁড়ানো একটি তরুণী জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ কাগজ?' আমাদের 'অমৃত' কাগজের নাম করতেই তিনি প্রায় নিমিষে বার ক'রে দিলেন একখানি বড়ো সাদা খাম, এবং ছোট্ট আকারের সাময়িকভাবে সাংবাদিক-স্বীকৃতি-পত্র (অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড), যাতে আঁটা ছিল কলকাতা থেকে পাঠানো আমার ছোট্ট একটি ফোটো। সাদা খামটির মধ্যে ছিল ঐদিন সন্ধ্যা ছটায় অশোকা হোটেলে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র, রাত্রি সাড়ে আটটায় বিজ্ঞান ভবনের ডেলিগেটস্ লাউঞ্জে অনুষ্ঠিতব্য 'ককটেল সাপার'-এর নিমন্ত্রণপত্র এবং ঐ রাত্রে সাড়ে নটায় বিজ্ঞান ভবন প্রেক্ষাগৃহে ফেস্টিভ্যালের প্রথম রাত্রের চিত্র প্রদর্শনী হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার ছবি "দি ওল্ড ক্রাফ্ট্সম্যান অব ড্রারস"-এর আড়ম্বরপূর্ণ প্রদর্শনীর নিমন্ত্রণপত্র। বলা বাহুল্য, এগুলি পেয়ে আমি অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করলুম, যদিও তখনও থাকবার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি।

কিন্তু বিপদ বাধল আমার বন্ধুদের নিয়ে। ওঁদের কারুরই নাম শ্রীবাওয়ার লিস্টে খুঁজে পাওয়া গেল না। উনি বললেন, নিশ্চয়ই ওঁদের কেস অ্যাপ্রুভড্

কোরিয়ার ছবি দি ওল্ড ক্রাফটসম্যান অফ দি জারস (ভারত সরকারের প্রচার দপ্তর প্রেরিত)

(আবেদনপত্র মঞ্জুর) হয়নি। 'কিন্তু ও'রা তো কলকাতার পি-আই বির (প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরোর) পরামর্শ মতই এসেছেন', আমি বললুম। উত্তরে উনি বললেন, 'আমি নাচার, আমি কিছুই করতে পারি না।' গেলুম মদনগোপালের কাছে; ভদ্রলোক অনেক দিন কলকাতা শাখার প্রেস ইনফর্মেশন অফিসার ছিলেন। আমাদের সংগে ও'র নামে লেখা বি-এফ-জে-এর বাগীশ্বর ঝার একটি চিঠিও ছিল। তিনি আমাকেও চিনতেন। এই চলচ্চিত্রোৎসবের ব্যাপারে তিনি আদৌ সংশ্লিষ্ট নেই, এই কথা জানিয়ে তিনি আমাদের ব'লে দিলেন কোথায় গেলে সুরাহা পাওয়া যাবে। তাঁরই পরামর্শমতো আমরা দেখা করলুম প্রতাপ কাপুরের সংগে। ভদ্রলোক সত্যিই ভদ্রলোক। তিনি আমার বন্ধুদের মুখ থেকে কলকাতার পত্রিকাগুলির নাম শুনে বললেন, 'আমার বেশ মনে পড়ছে, আমি এর প্রত্যেকটি কাগজের জন্যে সম্মতি দিয়ে দিয়েছি; তবু আপনাদের কাগজপত্র তৈরী হয়নি শুনে অবাক হচ্ছি।' তিনি শ্রীবাওয়াকে ডেকে পাঠিয়ে যতশীঘ্র সম্ভব ও'দের ব্যবস্থা করতে বললেন। আবার শ্রীবাওয়ার কামরায়। এবং সেখানে ঢুকেই শ্রীবাওয়া অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, আমার বন্ধুদের উপস্থিতির কথাও তাঁর মনে রইল ব'লে বোধ হ'ল না। আমি এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তিনি বললেন, 'ঘড়ির কাঁটার মতো চব্বিশ ঘণ্টা কাজ ক'রে যাচ্ছি, আর পেরে উঠছিনা।' অনেক চেষ্টার পর আবিষ্কৃত হ'ল আমাদের একজন বন্ধুর আবেদনপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যদিও তাঁর ফোটো আছে এবং অপর দু'জনের আবেদনপত্র আছে কিন্তু ফোটো অদৃশ্য। অতএব তাঁদের আবার ক'রে ফোটো তোলাতে হবে। তবে ৫ তারিখের তিনটি অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র শ্রীবাওয়া ও'দের দিলেন সম্ভবত করুণাপরবশ হয়ে। কাজেই একজনকে আবার ক'রে ছাপ-আবেদনপত্র ভর্তি করতে হ'ল এবং অপর দুজনকে নতুন ক'রে ফোটো তোলাতে হ'ল। ও'দের সাংবাদিক-স্বীকৃতিপত্র পাওয়া গেল পরদিন ৬ তারিখে বহু টানাপোড়েনের পর।

প্রথমেই গেলুম অশোকা হোটেলের কনভেনশন হলে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার অভিপ্রায়ে। যথাসময়ে হোটেলের প্রধান প্রবেশপথের কাছে পৌঁছে দেখলুম গাড়ী নিয়ে ঢোকা দায়, অতএব গাড়ীকে বিদায় দিয়ে পদব্রজেই হলের ভিতরে প্রবেশ করলুম। সাংবাদিকদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল ৯ নম্বর ব্লক। সেই দিকেই এগুচ্ছিলুম; কিন্তু অর্ধ পথেই পেলুম বাধা। ব্লকের সমস্ত আসন ভর্তি হয়ে গেছে। ভাবছেন, সাংবাদিকদের দ্বারা? না, আদৌ নয়। অর্ধেকের বেশী আসন অধিকার ক'রে ব'সে আছেন পুত্রকন্যাসহ মহিলারা। দেখলুম এসব ক্ষেত্রে দিল্লীর সরকারী কর্মচারীদের শৃঙ্খলা বোধ শূন্যের পর্যায়ে। সমস্ত অনুষ্ঠানটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হ'ল। প্রথমে, সমাগত অতিথিদের শুভ সম্ভাষণ জানিয়ে তথ্য ও বেতার মন্ত্রী সত্যনারায়ণ সিংহ বললেন, "চৌত্রিশটি দেশ এই উৎসবে যোগ দিয়েছে। উৎসবে ষাটটি কাহিনীচিত্র ও চল্লিশটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র দেখানো হবে। এই উৎসবকে ভারত পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনক্ষেত্রে পরিণত করতে উৎসুক।" অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে উঠে রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি আশা প্রকাশ করলেন, যাতে এই

ধরনের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব আমাদের ছবির কলাকৌশলগত, শিল্পগত ও সংস্কৃতিগত উন্নতিতে সহায়তা করে। শ্রীগিরি আমাদের চলচ্চিত্রকারদের গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, "আমাদের চলচ্চিত্র যেন প্রমোদের আবশ্যিকতার কাছে সামাজিক উদ্দেশ্যকে কখনও নতিস্বীকার করতে বাধ্য না করে। চলচ্চিত্রের কাজ শুধু মনোরঞ্জন করা নয়, দর্শককে শিক্ষিত ও তার মনকে উন্নত করাও এর কর্তব্য।"

রাষ্ট্রপতির ভাষণের পরে শুরু হয় পরিচিতির পালা। ফিল্ম আর্টিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে দেব আনন্দের ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়। তিনি এক এক ক'রে বিদেশাগত চলচ্চিত্র ঐতিহাসিক ও সাংবাদিক, প্রযোজক, পরিচালক, লেখক ও শিল্পীদের মঞ্চে আবির্ভূত হ'তে আহ্বান জানান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সভাকক্ষে হাজির থাকা সত্ত্বেও পৃথ্বীরাজ কাপুর, শর্মিলা ঠাকুর প্রভৃতি শিল্পীর ভীড় ঠেলে মঞ্চ পর্যন্ত এগিয়ে আসা সম্ভব হয় না। মঞ্চে দেশী বিদেশী যাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে চলচ্চিত্র বিশারদ অধ্যাপক জেরী টেপ্লিজ (পোল্যান্ড), অভিনেত্রী পরিচালিকা মিস মেরাই জেটারলিং (সুইডেন), পরিচালক আলেকজান্ডার জার্খি (ইউ-এস-এস-আর), চিত্রসাংবাদিক জন রাসেল টেলার (ইউ-কে), চিত্রপরিচালক পল জিলস্ (সিংহল), অ্যালবার্ট জনসন (ইউ-এস-এ), মিঃ ও মিসেস উম সামুথ (কাম্বোডিয়া), রাজকাপুর, আর কে নারায়ণ (ঔপন্যাসিক—গাইড-এর লেখক), সিম্মী, আই. এস. জোহর, ডেভিড আব্রাহাম প্রভৃতি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আন্ত বিখ্যাত নর্তকী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি অভ্যাগতদের আপ্যায়নের জন্যে কয়েকটি নৃত্য প্রদর্শন করেন।

রুশ ছবি লেট আস লিভ টিল মনডে

অশোকা হোটেলের কনভেনশন হল থেকে ছুটলুম বিজ্ঞানভবনের ডেলিগেটস্ লাউঞ্জ অভিমুখে সাড়ে আটটার ককটেল সাপারে যোগ দেবার জন্যে। গিয়ে দেখি, অতিথি অভ্যাগত ক্রমে ক্রমে এসে জুটছেন বটে, কিন্তু কর্মকর্তাদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না; আরও দেখা যাচ্ছে না আমাদের চিত্রজগতের শিল্পীদের। মনে হ'ল, কোথাও যেন একটু ভুল হচ্ছে। প্রায় পনেরো-বিশ মিনিট কেটে যাবার পরে বিজ্ঞানভবনের জনৈক কর্মচারীর কাছ থেকে জানা গেল, অনুষ্ঠানটির স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে শেষ মুহূর্তে বিজ্ঞানভবন থেকে হায়দরাবাদ হাউসে। অথচ অশোকা হোটেলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানেও এই স্থান-পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করা হয়নি। আশ্চর্য সুব্যবস্থার নমুনা! আমি সুধারসে বঞ্চিত; কাজেই প্রায় নটার সময়ে হুড়োহুড়ি ক'রে হায়দরাবাদ হাউসে যাবার চেষ্টা না ক'রে বিজ্ঞান ভবনেই "দি ওল্ড ক্রাফ্টস-ম্যান অব দি জারস্" নামে দক্ষিণ কোরিয়ার ছবি দিয়ে প্রদর্শনী উৎসবের শুরু হবার প্রতীক্ষায় রইলুম। সওয়া নটা নাগাদ প্রেক্ষাগৃহের দরজা খুলতে সাংবাদিকদের জন্যে নির্দিষ্ট সারিতে গিয়ে বসলুম। মিনিট পনেরোর মধ্যে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ ভরে গেল এবং ক্রমেই জলস্রোতের মতো জনস্রোত সারা হলের মধ্যে প্লাবন বইয়ে দিলে; যত লোক বসে তার চেয়ে বেশী লোক দাঁড়িয়ে। ঐ অবস্থাতে ঠিক সময়ে ছবি আরম্ভ হওয়া দায় হয়ে উঠল। ভিতরে বাইরে হট্টগোলের মধ্যে জাপানের তথ্যচিত্র "ভাস্কেরাইন গ্রেয়ার্স অব রুয়ানা" দেখানো শুরু হ'ল প্রায় দশটা নাগাদ। ওর পরে মূল কাহিনী চিত্রটিও আরম্ভ হ'ল। কিন্তু মিনিট পাঁচসাত দেখাবার পরেই আলো জ্বলে উঠল। ইনফর্মেশন দপ্তরের জনৈক ডেপুটি সেক্রেটারী মঞ্চে উঠে বললেন, "যে সব সরকারী কর্মী সপরিবারে প্রেক্ষাগৃহের আসন দখল ক'রে থাকার দরুণ বহু মাননীয় দেশী বিদেশী আমন্ত্রিত অভ্যাগত হলের ভিতরে বহু কষ্টে প্রবেশ করতে পেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাধ্য হয়ে, তাঁরা অনুগ্রহ ক'রে আসন ছেড়ে দিয়ে ঐ আমন্ত্রিতদের বসবার সুযোগ করে দিন।" কিন্তু কে করা কথা শোনে? বড় জোর জনদশ পনেরো আসন ছেড়ে উঠে গেলেন, আর নব্বইভাগই বসে রইলেন নিরাসক্তভাবে। আবার মিনিট দশের অপেক্ষা করবার পরে কাহিনী চিত্রটি গোড়া থেকে দেখানো শুরু হ'ল এবং কাজে কাজেই শেষ হ'ল রাত্রি পৌনে একটা নাগাদ।

আমরা বহু চেষ্টা ক'রে আস্তানা পেয়েছিলুম কেরলবাগ এলাকায়। ঐ অত রাতে বিজ্ঞানভবন থেকে কেরলবাগের বাসায় অসার অভিজ্ঞতা ভোলবার নয়।

প্রেক্ষাগৃহ

অরণ্যের দিনরাত্রি কাবেরী বসু এবং শর্মিলা

আর কত দিন?

গেল ১১ ডিসেম্বর সত্যজিৎ রায়কৃত "অরণ্যের দিনরাত্রি" ছবির মুক্তি উপলক্ষ্যে যে-লঙ্কাকাণ্ড হয়ে গেল, তার জন্য জবাবদিহি করবে কে? বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রায় আট মাস আগে যে চলচ্চিত্র পরামর্শ পরিষদ (ফিল্ম কনসালটেটিভ কমিটি) গঠন করেছেন, সেই সংস্থা বহু বিচার-বিবেচনার পরে অধিকাংশ সদস্যের মতানুকূল্যে সেন্সার তারিখের পারম্পর্য অনুযায়ী ছবির মুক্তি হওয়া উচিত বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। গেল সেপ্টেম্বর মাসের ২০ তারিখে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য এই সিদ্ধান্তে আনন্দ প্রকাশ ক'রে যাতে এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলা ছবির মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়, সেই মর্মে পশ্চিমবঙ্গের প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শকদের কাছে আবেদনও করেছেন ঐ সেপ্টেম্বর মাসেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা যা ঘটার তা ঘটে গেল।

'পশ্চিমবঙ্গে চা, পাট, কাপড়, লোহ কয়লা প্রভৃতি প্রতিটি বৃহৎ উৎপাদন-শিল্প সম্পর্কেই আজ পর্যন্ত বহু আইন-কানুন রচিত হয়েছে ; এইসব শিল্প-সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিরই যথেচ্ছভাবে চলবার অধিকার নেই। ধান, চাউল, গম, আটা, প্রভৃতি কৃষিপণ্যেরও সর্বোচ্চ মূল্য নিয়ন্ত্রণ এমন কি তাদের গতিবিধির পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণের অধিকার সরকার গ্রহণ করেছেন। কলকাতা শহরে বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণমূলক আইনও প্রচলিত রয়েছে। এইসব আইনের কোনো কোনোটি জন-স্বার্থে, কোনোটি বা শিল্পের স্বার্থে এবং অন্য কোনোটি বা শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত ও প্রযুক্ত হয়। ট্রাম-বাসে এবং সাধারণ প্রদর্শনী চলাকালে থিয়েটার ও সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে ধূমপান-রহিত ক'রে আইন প্রচলিত আছে। কাজেই ব্যক্তি-স্বাধীনতাই বলুন আর ব্যবসায়গত স্বাধীনতাই বলুন, বৃহত্তর প্রয়োজনে প্রতিটি বিষয়ই খর্ব করবার অধিকার সরকারের আছে এবং সরকার সেই অধিকার প্রয়োজনবোধে প্রয়োগও ক'রে থাকেন।

তবু রাজ্যসরকার পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সম্পর্কে একটি সর্বাত্মক আইন রচনার কথা চিন্তা করছেন না কেন? ফিল্ম কনসালটেটিভ কমিটির সদস্যদের 'সেন এনকোয়রী কমিটি'র রিপোর্ট অনুসরণ ক'রে বহু বিষয়ে মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যতদূর জানি কনসালটেটিভ কমিটি আইনমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে 'ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ড' (পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদ) গঠন সম্বন্ধে সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই স্বয়ংশাসিত ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ডকে অনতিবিলম্বে আইনগতভাবে চালু করবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। পশ্চিমবঙ্গের এই বিশিষ্ট শিল্পটি থেকে রাজ্যসরকার শুধু প্রমোদকর ও প্রদর্শনীকর (শো ট্যাক্স) বাবদই পাঁচ ছ' কোটি টাকা পরিমাণ রাজস্ব পেয়ে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র প্রযোজনাশিল্প শুধু পশ্চিমবঙ্গকেই নয়, ভারতকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনে সহায়তা' করেছে ; এই শিল্পে প্রত্যক্ষভাবে অন্তত দু-হাজারজন কর্মী নিযুক্ত আছেন, এবং হিসাব করলে দেখা যাবে, অন্তত দুশোটি শিল্প এই চলচ্চিত্র প্রযোজনাশিল্প থেকে প্রচুর অর্থ লাভ করে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার বিক্রয়কর, বিদ্যুৎকর, রেলওয়ে-ডাক-তার-মাশুল, আয়কর প্রভৃতি বহুবিধ খাতে বহু অর্থ এই শিল্প ও এই শিল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন। এবং সর্বোপরি এমন একটি ব্যাপক ও সুলভতম প্রমোদ-মাধ্যমের আবশ্যকতা সর্বজনস্বীকৃত, এইসব কথা চিন্তা ক'রে রাজ্যসরকার আর অযথা গড়িমসি না ক'রে হয় নিজেরাই শিল্পটির রক্ষণ এবং উন্নয়নকল্পে আইন প্রণয়ন করুন, আর না হয়, ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন ক'রে তার ওপর সকল দায়িত্ব অর্পণ করুন। নিশ্চেষ্ট দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে এমন একটি কল্যাণকর শিল্পকে রসাতলে এগিয়ে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না।

যাত্রার দাবি

বাংলার লোকনাট্য যাত্রা, গ্রাম-জীবনের সাংস্কৃতিক নিদর্শনের ঐতিহ্য হিসাবে আজও বর্তমান রয়েছে। এক সময় লোকশিক্ষা বিস্তারের অন্যতম মাধ্যমও ছিল যাত্রা। দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচয় এবং ইতিহাসকে দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরে যাত্রা হয়েছিল জনপ্রিয়। আজকের দিনে যাত্রা থিয়েটার এবং সিনেমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পৌঁছিয়ে পড়েছে সত্যি, কিন্তু সম্প্রতি এর পুনর্জাগরণ বিশেষ লক্ষ্যণীয়। যাত্রার অপবাদ ছিল অশিক্ষিত লোকের আখড়া। আজ আর সেকথা বলা যায় না। প্রতিভাবান নাট্যকার, শিল্পী ও প্রযোজকরা যাত্রার জগতকে নিয়ে এসেছেন আধুনিক বাস্তবতার সামনে। আজকের সমস্যাকে নিয়ে তৈরী হচ্ছে যাত্রাপালা। তাছাড়া বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন অবলম্বনে রচিত যাত্রাভিনয়ের প্রতি প্রবণতা বিশেষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। লোকশিক্ষা বিস্তারে এর ভূমিকা অস্বীকার করবার নয়। দেশগঠন ও জাতিগঠনে এগিয়ে এসেছেন তথাকথিত 'যাত্রাওয়ালারা'। কিন্তু এ'দের অসাধারণ ভূমিকা জনসাধারণ যেমন স্বীকার করে নিচ্ছেন বিপুলভাবে, সরকারকেও তেমনি স্বীকার করে নিতে হবে! লোকশিক্ষামূলক চলচ্চিত্রকে সরকার প্রমোদকর মুক্ত করে থাকেন। যাত্রার ক্ষেত্রেও সরকার নিশ্চয়ই এইভাবে সহযোগিতা করে লোকশিক্ষা প্রচারের পথকে আরও প্রশস্ত করবেন। আর একটি প্রাচীন সংস্কৃতিরূপও রক্ষা পাবে। বাংলার মঞ্চকে বাঁচাতে সরকার পেশাদার মঞ্চের ওপর থেকে কর তুলে নিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। যাত্রাও প্রমোদকর মুক্ত হোক। বিশেষ করে রাজা রামমোহন, সূর্য সেন, লেনিন-এর মত যাত্রাপালা বাংলা দেশের সর্বত্র বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে যখন অভিনীত হচ্ছে দিনের পর দিন, তখন সরকার যাত্রার এই দাবীকে স্বীকার করে নেবেন আশা করি।

বোম্বাই থেকে

সম্প্রতি বোম্বায়ে ইণ্ডিয়ান মোশন পিকচার্স প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং সিনে মিউজিক ডিরেকটার্স এ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ইণ্ডিয়ান পারফরমিং রাইটস সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। এ'দের উদ্দেশ্য হল সুরকার গীতিকার এবং সঙ্গীত প্রকাশকদের স্বত্ব রক্ষা করা। প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, চিত্রজগতে অমুক সঙ্গীত পরিচালক অমুক সুরকারের সুর বেমালুমে "মেরে" দিয়েছেন, কিন্তু এখন আর সেটা সম্ভব হবে না—যদি একান্তই প্রয়োজন হয় তাহলে আসল সুরকারকে উপযুক্ত 'রয়্যালটি' দিতে হবে। এখন গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানী এবং রেডিওতে প্রায় ফিল্মের সব ভাল গানই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুনো যায়। এখন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুনো যায়। এবার ফিল্মের গান বাজাতে গেলে ইণ্ডিয়ান রয়্যালটি দিতে হবে। এই সোসাইটি তাঁদের খরচা বাবদ কিছু অংশ কেটে নিয়ে শতকরা ৫০ ভাগ দেবেন চিত্রনির্মাতাদের, বাকী ৫০ ভাগ সুরকার ও গীতিকারদের দেবেন।

●

ছবির নামকরণ করা নিয়ে এখানকার প্রযোজকদের মহাসমস্যা। সেই জন্যে বেশীর ভাগ ছবিরই যখন স্যুটিং শুরু হয়, তখন ছবির নাম ঘোষণা করা হয় না। 'প্রোডাকশন নং...' বলে প্রচার করা হয়। তারপর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অনেক শলা-পরামর্শের পরে নামকরণ করা হয়। শেষকালে দেখা গেল যে, নামকরণেরও কোন মাথামুণ্ডু নেই। একটি সার্থক ছবির অনুকরণে বেশীর ভাগ সময় নামকরণ হয় যেমন ধরুন 'একহি রাস্তা' বি আর চোপরার একটি সার্থক ছবি, সম্প্রতি একটি ছবি হয়েছে তার নাম দো রাস্তে', নির্মাতা রাজ খোসলা। অসিত সেন এখানে করছেন 'সফর' (চলাচলের হিন্দি) অমনি সুরু হয়েছে 'সুহানা সফর' পরিচালনা করছেন বিজয়কুমার, শর্মিলা ও শশীকাপুরকে নিয়ে, রাজকাপুর করছেন 'মেরা নাম জোকার', অমনি ত্রিমূর্তি ফিল্মস ঘোষণা করেছেন তাঁদের প্রথম ছবির নাম হল 'জান মেরা নাম'; 'বিশ সাল বাদ' হেমন্ত মুখার্জির বিখ্যাত ছবি এবং এতে অভিনয় করেই বিশ্বজিৎ বম্বের বাজার জাঁকিয়ে বসেছেন এখন আবার একজন করছেন 'বারা সাল বাদ'; 'আনোখী রাত' হয়ে গেছে অসিত সেনের, 'আনোখা প্যার' হচ্ছে হৃষী মুখার্জির, এখন একজন করছেন 'আনোখী আদা'; ইত্যাদি ইত্যাদি। 'দিল আর প্যার' দিয়ে যে কত ছবি হয়েছে তার তো সংখ্যা নেই। তারপর মনে করুন হালে পানি না পেয়ে এরকম নামও হয় যেমন, 'এক শ্রীমান এক শ্রীমতী', 'এক কুমার এক কুমারী', 'এক আওরত চার আঁখে' (অর্থাৎ একটি ছেলে একটি মেয়ে কিংবা একটি মেয়ে দুটি ছেলেও হতে পারে)। যদি সেই মনীষী বাক্য মনে করা যায় যে, নামে কিবা যায় আসে, গোলাপকে আপনি যে নামেই ডাকুন, সে চিরকালই গোলাপ—তাহলে অবশ্য আমাদের কিছুই বলার নেই। তবে আমরা এটা নিশ্চয় বলব যে, হিন্দি ছবিতে চোখের খোরাক যথেষ্ট থাকলেও মস্তিষ্কের খোরাক কিছুই নেই।

●

একখানা ছবিতে অভিনয় করতে না করতে ডজনখানেক ছবির কন্ট্রাকট সই করা বড় চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু তা হয় এবং বম্বের চিত্রজগতেই তা সম্ভব। এই দেখুন না ব্রহ্মচারী নামক একটি অভিনেতার কথা। এই অভিনেতাটি 'এক ফুল দো মালী'তে একটি ছোট ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন। উক্ত ছবিটিতে তাঁর অভিনয় এত ভাল হয়েছিল যে, সঙ্গে সঙ্গেই সব প্রোডিউসার তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়লেন। এখন তাঁর হাতে প্রায় এক ডজন ছবি। অসিত সেনের 'সফর' ছবিতে তিনি একটি কৌতুক-রসাত্মক ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, কিন্তু একটি দৃশ্য আছে যেখানে দর্শকরা চোখের জল না ফেলে পারবেন না। একজন কমেডিয়ানের পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়। ব্রহ্মচারীর হাতে এখন এই ছবিগুলি পরদেশী, সফর, মুজরিম, তুম হাসীন মায় জওয়ান, ইলজাম, ইকরার ছাড়া আরও আছে যাদের নামকরণ হয় নি।

—প্রবাসী

মঞ্চাভিনয়

স্টার রংগমঞ্চে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ ডাইরেক্টরেট রিক্রিয়েশন ক্লাব-এর বাৎসরিক মিলনোৎসব উপলক্ষ ম্যাক্সিম গোর্কি'র 'মা' উপন্যাসের নাট্যরূপ (শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) মঞ্চস্থ করা হয় ৫ নভেম্বর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আই-জি শ্রীএম এ এইচ মাসুদ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন মাননীয় পরিবহণমন্ত্রী মহঃ আবদুল্লা রসুল। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সমন্বয় কমিটির বিশিষ্ট নেতা শ্রীসুকোমল সেন। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকুমারেশ সাহা, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও সভাপতি তাঁদের বক্তব্য রাখেন। তারপর নাটক সুরু হয়। শহর কলকাতার অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবগুলির গতানুগতিক নাটক নির্বাচন ও প্রয়োজনা ধারা বহির্ভূত এই সংস্থার নাট্যানুষ্ঠান

ও সি এস-এর ফেরারী ফৌজে সুভাষ রায় এবং ইরা মিত্র

সামগ্রিক বিচারে উপস্থিত দর্শকদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিস্ময়াভিভূত করে রাখে। এই নাট্যানুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় সম্পদ এ'দের সমষ্টিগত অভিনয় এবং গতিবেগ। অভিনয়ে প্রায় সকলেই তাঁদের নিজ দায়িত্ব সাফল্যের সংগে পালন করেছেন বলেই মনে হয়। তবুও ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন শিল্পী দর্শকদের বাহবা কুড়িয়েছেন। সর্বশ্রী অরুণময় চক্রবর্তী, কার্তিক মজুমদার, সনৎ চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ রায়চৌধুরী, গৌতম ভট্টাচার্য, পীযূষকান্তি কর, ননী বিশ্বাস, তিমির দাস, জ্ঞানরঞ্জন বিশ্বাস এছাড়াও পরিচালক সুনীল আচার্য এবং অরুণ মুখার্জী সীমিত পরিসরের মধ্যে সু-অভিনয়ে ছাপ রাখেন। মহিলাচরিত্রে চিত্রিতা মণ্ডল, দীপালি ঘোষ দর্শকদের প্রশংসা লাভ করেন। সাসার চরিত্রে এই অফিসেরই কর্মী নূপুর চ্যাটার্জির অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে। এক কথায় নূপুর চ্যাটার্জির অভিনয় নারীচরিত্রগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রশংসার দাবী রাখে। আলো ও মঞ্চসজ্জার বিষয়ে আরো যত্নের প্রয়োজন ছিল। রূপসজ্জা ও আবহ প্রশংসনীয়। পরিচালনা, সুর সংযোজনা ও সম্পাদনায় শ্রীসুনীল আচার্য মুন্সিয়ানার স্বাক্ষর রাখেন।

ওভারসীজ কম্যুনিকেশন সার্ভিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা গত নভেম্বরে মহাজাতি সদনে ক্লাবের একাদশ বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অভিনয় করেন প্রখ্যাত নাট্যকার উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ'। শ্রীশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপরিচালনায় নাটকটি রসোত্তীর্ণ হয় এবং সভ্যদের দলগত অভিনয় দর্শকদের বিশেষভাবে অভিভূত করে। বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে—অজিত কর, সুভাষ রায়, ভূপেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বলরাম চৌধুরী, পরীক্ষিৎ চক্রবর্তী, অমল বসু, অম্বর চট্টোপাধ্যায়, উমাশংকর ভট্টাচার্য, শচী দে, আশু দাস, অরবিন্দ দাস, রায় তালুকদার এবং শ্যামল রায়। স্ত্রী চরিত্রে সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়—বিশেষভাবে প্রশংসার দাবী রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি শ্রীশৈলেন গুপ্তের পরিচালনায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

একাংক নাটক অভিনেতা শাহাদৎ হোসেন

বিবিধ সংবাদ

পৌরভবনে জলবিভাগ কর্মচারীদের বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে ২৯ নভেম্বর পৌরভবনে একক অভিনেতা শাহাদৎ হোসেন পরিবেশন করেন 'কোলকাতার বুকে'। এই নাটকের আটটি চরিত্র ছিল এত বড় শহরে কি হয়েছে বা কি হয়ে আসছে তারই রূপ।

মালতী চিত্রমের 'প্রথম নিবেদন' 'নিভে আসা দীপ' ছবির কাজ কণিকা মজুমদার, অনুভা ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ, জহর রায়, অজয় দে ও নবাগতা সুলেখা চক্রবর্তীকে নিয়ে সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে শুরু হয়েছে। কাহিনী শীতলকুমার দাস, সংগীত অমল মুখার্জী, পরিচালনা সুমীত্র ব্যানার্জী।

গত ৩০ নভেম্বর একটি নতুন চিত্র প্রতিষ্ঠান 'নিবেদকে'র পতাকাতলে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিয়োতে পংকজ গুপ্তের সভাপতিত্বে ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের প্রধান আতিথ্যে 'উত্তরসূরী' ছবির শুভ মহরত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কাহিনী, চিত্রনাট্য, পরিচালনা করেছেন বরুণ কাবাসি, সুর রচনা করছেন অমল মুখোপাধ্যায়। ক্যামেরাম্যান শক্তি ব্যানার্জী, সম্পাদক অনিল সরকার। অভিনয়-শিল্পে রয়েছেন বসন্ত চৌধুরী, দিলীপ রায়, পদ্মা দেবী, সন্দীপ ও দীপা চ্যাটার্জী।

২৩ নভেম্বর বারাসাতের কাজিমপুরে স্থানীয় যুবকদের উদ্যোগে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মনোজ্ঞ শিল্পকর্মের সংগে যে বিষয় সকল দর্শককে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে তা হল মূকাভিনয়। পরিবেশন করলেন মূকাভিনেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। তিনি মোট দুটি বিষয়ের উপর মূকাভিনয় পরিবেশন করেন। তাঁর অভিনয়ে উপস্থিত দর্শকরা বেশ কিছুক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকেন। এ অনুষ্ঠানে কলকাতার নামী শিল্পীরা অংশ নেন।

মৃত্যুঞ্জয়ে উদয়শংকরকে আশীর্বাদ করছেন বয়োবৃদ্ধ শিল্পাচার্য শ্রীযামিনী রায়। ছবিতে আর রয়েছেন শ্রীমতী অমলাশংকর, রবিশংকর ও শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ।

জলসা

উদয়শংকরের জন্মদিনে

উদয়শংকরের ৭০তম জন্মদিবস ৮ ডিসেম্বর এবার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই পুণ্যমুহূর্তটিকে কেন্দ্র করে এক মধুর প্রভাত উপহার দেওয়ার জন্য রসিক ও শুভার্থীদের কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন লাভ করেছেন শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ। ৩৮নং গলফ ক্লাব রোডের অনাচ-কানাচ ফুলে ফুলে ভরে উঠেছিল। কে না সেদিন এসেছিলেন? শিল্পীকে আশীর্বাদ জানালেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীযামিনী রায়। সরস কৌতুকে পরিবেশ জমিয়ে তুললেন শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ তাঁর ভাষণে 'ইয়ংম্যান অফ সেভেনটি' সারা গৃহকে হাস্যরোল ধ্বনিত করে। সাংবাদিক নির্মলকুমার ঘোষ (এন কে জি) ভাষণেও সমদক্ষতার প্রমাণও সেদিন পাওয়া গেল। শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষের বিশেষ অনুরোধে শিশুর মত লাজুক উদয়শংকরও লজ্জা ত্যাগ করে মাইক হাতে নিয়ে বললেন, 'আজকের এই মুহূর্তে আমার আরো অনেকদিন বাঁচতে ইচ্ছে করছে। বয়সে প্রবীণ হলেও অন্তরে আমি আজও নবীন।'

উপস্থিত আর সকলের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী মন্মথ ঘোষ, পণ্ডিত রবিশংকর, লেডী রাণু মুখার্জি, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, পাহাড়ী সান্যাল, তিমিরবরণ, সুনীল বসু, কনকলতা, প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, বিশ্বজিৎ রায় (অমৃতবাজার পত্রিকার), বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, চন্দ্রাবতী দেবী, বিমান ঘোষ এবং আরো অনেকে।

এমনই এক উজ্জ্বল পরিবেশে আমরা মিলেছি। অমলাশংকরের পরিচালনায় উদয়শংকর কালচারাল সেন্টারের ছাত্রীদের উদয়-বন্দনা নৃত্যের সমাপ্তিতে এই বিরাট শিল্পীর চরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করার মুহূর্তে আমাদের চিত্তও এই মহাশিল্পীর চরণে প্রণত হয়েছে।

আর একটি ঘটনা অতি সামান্য। কিন্তু সব থেকে স্মরণযোগ্য।

উৎসবের আগে কানন দেবী একটি সিঁদুর কৌটো হাতে নীরবে শ্রীমতী অমলাশংকরের কাছে গিয়ে তার সিঁথি সিঁদুরে রঞ্জিত করে বললেন, 'তোমার সিঁথি চিরদিন এমনই রঙিন থাক'—পরে সিঁদুর কৌটোটি শ্রীমতী শংকরের হাতে দিয়ে বললেন, 'এ অধিকার জীবনভোর ভোগ কর আজকের দিনে এই আমার প্রার্থনা।' যে স্বল্প কয়েকজন উপস্থিত ছিল তাদের কারো চোখই শুষ্ক ছিল না—যখন দুই শিল্পী সজল চোখে আবেগভরে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন।

রবিশংকরের অনবদ্য অনুষ্ঠান

দীর্ঘদিনব্যাপী বিদেশ সফরের পর পণ্ডিত রবিশংকর ও ওস্তাদ আল্লারাখার সেতার ও তবলার অনুষ্ঠান শোনা গেল ৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর "প্রিয়া" ও "নিউ এম্পায়ার" প্রেক্ষাগৃহে। নিবেদক "কিংশুক" গোষ্ঠী ব্যবস্থাপনায় সর্বশ্রী অদ্রিজা মুখোপাধ্যায়, ভূদেবশংকর ও বিমান ঘোষ। প্রথম দিন রাত দশটা থেকে (যদিও ৯-১৫ বলে প্রচারিত) সাড়ে বারটা অবধি অনুষ্ঠানে রাত্রের রাগ এবং দ্বিতীয় দিন সকাল দশটা থেকে একটা অবধি প্রভাতী রাগ পরিবেশিত হয়।

রাতের অনুষ্ঠান শুরু হয় 'দরবারী কানাড়া'র আলাপ দিয়ে। সেতারে এ ধরণের ধ্রুপদাঙ্গের আলাপের অবতারণা রবিশংকরেরই অন্যতম সঙ্গীতকীর্তি। এবং সুরবাহার ও বীণের অঙ্গের এই আলাপে তিনি যে আজও অদ্বিতীয় সেদিনের অনুষ্ঠানই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। আলাপের বিলম্বিত গতিতে মীড় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য গান্ধার ধৈবতের আস্ফালন, রাগের মর্যাদাদীপ্ত নিরুদ্ধ বেদনার গমকে ওরা আলেখ্যকে যেন চিত্রসৌন্দর্যে মেলে ধরল। বিলম্বিত মধ্য ও জোড়ের অঙ্গে বিভিন্ন বাণীর বাজ কুন্তন, আশ জমজমা ও ঝটকা সমন্বিত অলংকার শিল্পীর আকাশচারী কল্পনা পরিব্যাপ্ত। বীণের ঢঙে বিভিন্ন তারে এবং খড়জ পঞ্চমে গমক জোড়ের সঙ্গে বিভিন্ন বোলের ও ঝালার সুর সমন্বয়ে অনুপ্রাস ছন্দের মত যেন মহাকাব্যের সৌন্দর্যদীপ্ত হয়ে ওঠে। পূর্বাঙ্গপ্রধান এই রাগের মন্দ্র ও অতিমন্দ্রের সকল বিস্তার দেখিয়েও রাগমূর্তিকে অন্তরা-অঙ্গে ক্ষণিক স্ফীতির মাধুর্যসিক্ত করতে পেরেছেন। এইখানেই পণ্ডিতজীর অতুলনীয় শিল্পকৃতিত্ব।

তান, বোলতান এবং বিভিন্ন গমকের পর আলাপভাবে ণ স র ধ ণ পসতে ফিরে আসার অননুকরণীয় কোমলতা ও কারুণ্য ভোলার নয়। রাগের বিষন্ন করুণ ব্যঞ্জনায় শ্রোতৃচিত্ত যখন ভারাক্রান্ত ঠিক সেই সময় আলাপ শেষ করে অকস্মাৎ পঞ্চম সওয়ারী তালে "নায়কী কানাড়া" ছন্দে সারা প্রেক্ষাগৃহকে শিল্পী যেন নাচিয়ে দিলেন। আবেগ উল্লাসের এই রসোত্তীর্ণ মুহূর্ত দুর্লভ বলেই বুঝি অবিস্মরণীয়। কিন্তু শত 'বাহবা'তেও অবিচলিত শিল্পী এই সৌন্দর্যব্যঞ্জনাকে ম্লান হতে দেননি। ঠিক চরম মুহূর্তে পৌঁছেই বাজনা থামিয়ে দিলেন যেন শ্রোতাদের মধ্যে একটা অতৃপ্তি ব্যঞ্জনা মাধুর্য ঘনিয়ে তোলার জন্য।

প্রিয়া সিনেমায় রবিশঙ্কর

সর্বশেষ ধরলেন স্বরচিত রাগ "তিলক শ্যাম"—ঠুংরী বাজাবার মত সময়ের প্রাচুর্য ছিল না বলেই সেই ক্ষোভ মিটিয়ে দিলেন ঠুংরী ও খেয়ালের অঙ্গ মেশানো এই অপূর্ব চলনে যে চলন শাস্ত্রসম্মত, সরস আবার সৃষ্টির সম্ভাবনাদীপ্ত।

প্রভাতী রাগ সুরু হয় "পরমেশ্বরী" দিয়ে। এ রাগও তাঁর স্ব-সৃষ্ট। এবং নট-ভৈরব, বিরাগী, রোশিয়া, পঞ্চমসেগাড়া ইত্যাদি রাগের মত জনপ্রিয় হবার সকল উপাদানই এতে আছে। আবেগ ও বুদ্ধির এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন ঘটানো রবিশঙ্করের মত শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। কন্যাকুমারিকার মন্দিরে দেবীদর্শনের পর প্রেরণা-উদ্বেল চিত্তের সৃষ্টি এই রাগ। আলাপ অলঙ্কার ছাড়াও যে বস্তুটি চিত্ত আকৃষ্ট করে সেটি হোল তাঁর স্বরস্থান নৈপুণ্য। একই কোমল রেখার বিভিন্ন স্বরের সমন্বয়ে কত রকমের শ্রুতিতে কত নতুন রূপে অনুরণিত হয়ে উঠতে পারে তার শুদ্ধ নিপুণ সম্পূর্ণ রূপে দেখা গেল 'পরমেশ্বরী'র আলাপে। রবিশঙ্কর যে শ্রুতিসিদ্ধ সে কথা নতুন করে অনুভব করা গেল। 'চার তাল কি সওয়ারী' ছন্দের গতে লয়কারী রীতিমত রুদ্ধনিশ্বাসে উপভোগ করবার মত। "সিন্ধু ভৈরবী"তেও ইনি পূর্ব সুনামে সু-প্রতিষ্ঠিত। আল্লারাখার তেহাই পরণ অঙ্গের সওয়াল জবাব ও সাথসঙ্গত আর এক আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল।

গত ৩ ডিসেম্বর 'কুচবিহার লোকগীতি ভাওয়াইয়া পরিষদ-এর উদ্যোগে গুড়িয়াহাটি ক্লাব প্রাঙ্গণে 'উত্তরবঙ্গ লোকসঙ্গীত সম্মেলন হয়। সম্মেলন-এ প্রধান অতিথি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং অধ্যক্ষ শ্রীরুক্মিণী রায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। লোকসঙ্গীতের গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং এরকম সম্মেলন-এর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে শ্রীচক্রবর্তী এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। উত্তর-বঙ্গ লোকসঙ্গীত সম্মেলন-এর আহ্বায়ক শ্রীনরেশ রায় সরকার ঘোষণা করেন যে, এটা লোকসঙ্গীত সম্মেলন-এর ১ম পর্যায় হিসেবে পালন করা হল। পরবর্তীতে উত্তর-বঙ্গের পাঁচটি জেলার লোকসঙ্গীত শিল্পী-দের নিয়ে পাঁচদিন ধরে উত্তরবঙ্গ লোক-সঙ্গীত সম্মেলন-এর ২য় পর্যায় করা হবে। শ্রীরায় সরকার উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। সম্মেলন-এ লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী সুরেন বসুনীয়া, কেদার চক্রবর্তী, দেশবন্ধু চক্রবর্তী, নারায়ণ রায়, প্যারীমোহন দাশ, অনিল নারায়ণ, প্রিয়-নাথ সরকার, রবীন্দ্র বর্মণ, সুনীতি রায়, সুলেখা চক্রবর্তী এবং আজিমুদ্দিন। লোক-নৃত্য পরিবেশন করেন সর্বশ্রী উৎপল দাশ, দুর্গা রায়, লিলি দাশ ও গৌরী রায়।

●

গত ২৫ অকটোবর নিউইয়র্কে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাকমিলিন থিয়েটারে নৃত্যশিল্পী মঞ্জুশ্রী চাকী সরকারের একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থা করেছিলেন টেগোর সোসাইটি অফ নিউইয়র্ক। শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা দিয়ে শুরু হয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নৃত্য রূপায়ণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় শ্রীমতী মঞ্জুশ্রীর নতুন নৃত্য পরিকল্পনা রিদম অফ লাইফ দিয়ে। অনুষ্ঠানটির অকণ্ঠ প্রশংসা করেন বিদেশী দর্শক ও সংবাদপত্রগুলি। এই অনুষ্ঠানের পর মঞ্জুশ্রী কয়েক মাসের জন্য স্বদেশে প্রত্যা-বর্তন করছেন। কলকাতায় তাঁর প্রথম অনুষ্ঠান হচ্ছে ২১ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সদনে শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্তের পরিচালিত শ্যামা নৃত্যনাট্য।

●

আলাউদ্দিন সঙ্গীত সমাজের ঊনিশ বার্ষিক সঙ্গীতানুষ্ঠান ও সমাবর্তন উৎসব ৯ ও ১০ জানুয়ারী মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হবে। যন্ত্রসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করবেন সর্বশ্রী নিখিল ব্যানার্জি (সেতার), ওস্তাদ আলি আহম্মদ খান (সেতার), ভি জি যোগ (বেহালা), বিমল মুখার্জি (সেতার), রেখা সেন (সেতার)। কণ্ঠ-সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করবেন—ওস্তাদ মজিদ হোসেন খান, নাসির হোসেন খান, গোলাম খজা নাজিম (বম্বে), পণ্ডিত সঙ্গীতকুমার নাহার, রামনরেশ মিশ্র, অঞ্জলি মুখার্জি, শিবকুমার চ্যাটার্জি। নৃত্য পরিবেশন করবেন—সুনয়না দেবী (বম্বে), সুস্মিতা ঘোষ ও জয়ন্তী মুখার্জি। তবলায় আছেন—ওস্তাদ কেরামতুল্লা খান, প্রঃ অনিল ভট্টাচার্য, পণ্ডিত নানক মহারাজ, আমিরুল আহম্মদ খান, জামিরুল আহম্মদ খান।

—চিত্রাঙ্গদা

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়া

তৃতীয় টেস্ট খেলা

অস্ট্রেলিয়া : ২৯৬ রান (চ্যাপেল ১৩৮, স্টাকপোল ৬১ এবং টেবার ৪৬ রান। বেদী ৭১ রানে ৪ এবং প্রসন্ন ১১১ রানে ৪ উইকেট)

ও ১০৭ রান (লরী নট আউট ৪৯ রান। বেদী ৩৭ রানে ৫ এবং প্রসন্ন ৪২ রানে ৫ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ২২৩ রান (মানকড় ৯৭ এবং ইঞ্জিনীয়ার ৩৮ রান। ম্যালেট ৬৪ রানে ৬ উইকেট)

ও ১৮১ রান (৩ উইকেটে। ওয়াদেকার নট আউট ৯১ এবং বিশ্বনাথ নট আউট ৪৪ রান)

প্রথম দিনের খেলা (নভেম্বর ২৮) :
অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৭টা উইকেট পড়ে ২৬১ রান দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় দিনের খেলা (নভেম্বর ২৯) :
অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ২৯৬ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৮৩ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় দিনের খেলা (নভেম্বর ৩০) :
ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা ২২৩ রানের মাথায় শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়া ৭৩ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ১০৭ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ খেলার বাকি সময়ে দ্বিতীয় ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ১৩ রান সংগ্রহ করে। এই অবস্থায় ভারতবর্ষের জয়লাভের জন্যে আরও ১৬৮ রানের প্রয়োজন ছিল।

চতুর্থ দিনের খেলা (ডিসেম্বর ২) :
ভারতবর্ষ চা-পানের দু' মিনিট আগে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৮১ রান পূর্ণ করে ৭ উইকেটে জয়ী হয়।

দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলা মাঠের তৃতীয় টেস্টে ভারতবর্ষ তীব্র উত্তেজনা এবং উদ্দীপনার মধ্যে ৭ উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে ১৯৬৯ সালের টেস্ট সিরিজের খেলার ফলাফল বর্তমানে সমান করেছে—দুই দেশেরই একটি করে খেলায় জয় এবং একটি খেলা ড্র। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সরকারী টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের এই নিয়ে তৃতীয় জয়লাভ। ইতিপূর্বে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতবর্ষের জয় ১৯৫৯-৬০ সালে কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে ১১৯ রানে এবং ১৯৬৪ সালে বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় টেস্টে ২ উইকেটে।

দিল্লীর এই তৃতীয় টেস্টে ভারতবর্ষের জয়লাভে সারা দেশে আনন্দ, উৎসাহ-

অজিত ওয়াদেকার
নট আউট ৯১ রান

বিষেণসিং বেদী
১০৮ রানে ৯ উইকেট
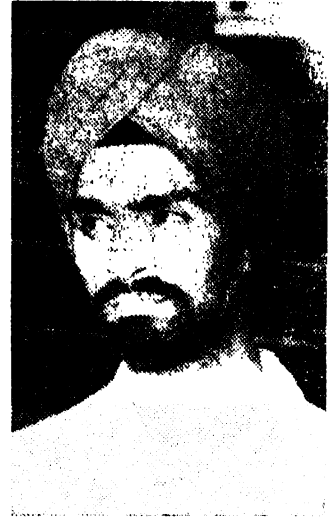
উদ্দীপনা এবং উত্তেজনা সহস্রগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। একাধিক কারণে ভারতবর্ষের এই জয়লাভের গুরুত্ব বেড়েছে—আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আসরে অস্ট্রেলিয়া বর্তমান সময়ে বে-সরকারীভাবে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান, টসে জয়ী হয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ব্যাট করার সুযোগ লাভ যা ক্রিকেট খেলায় অর্ধেক জয়লাভের সমান মনে করা হয়, খেলার চতুর্থ দিনেই ভারতবর্ষের জয়লাভ, যা এই প্রথম এবং ভারতীয় ক্রিকেট দলে তরুণ শক্তির অভ্যুদয়, যার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের ৭টা উইকেট খুইয়ে ২৬১ রান সংগ্রহ করে। দলের ১৩৩ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়লে সংকট খুবই ঘনিয়ে আসে। এই অবস্থায় ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি চ্যাপেল এবং উইকেটরক্ষক টেবার দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে দলকে সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেন। তাঁদের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ১২৮ মিনিটের খেলায় দলের ১১৮ রান উঠেছিল—চ্যাপেলের ছিল ৯০ রান এবং টেবারের ২৮ রান। নিছক সংখ্যার দিক থেকে টেবারের এই ২৮ রান এমন কিছু 'আহা মরি' নয়। কিন্তু খেলার পরিস্থিতি বিচার করলে এই রানের গুরুত্ব শতগুণে বেড়ে যায়। প্রথম দিনের খেলায় টেবার ৩৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। চ্যাপেল তাঁর ২৭৯ মিনিটের খেলায় যে ১৩৮ রান করেন, তাতে ছিল ২১টা বাউণ্ডারী।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ২৯৬ রানের মাথায় শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়া শেষ ৩ উইকেটে আরও ৩৫ রান সংগ্রহ করেছিল ৪৫ মিনিটের খেলায়। এইদিন ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৮৩ রান তুলেছিল। খেলায় অপরাজিত ছিলেন মানকাদ (৮৯ রান) এবং পতৌদি (০)।

তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২২৩ রানের মাথায় পড়ে গেলে অস্ট্রেলিয়া ৭৩ রানে অগ্রগামী হয়। এই দিন ভারতবর্ষ তাদের বাকি ৬টা উইকেটে মাত্র ৪০ রান সংগ্রহ করেছিল। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের খেলায় ৭৩ রানে অগ্রগামী হলেও দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়—মাত্র ১০৭ রানের মাথায় তাদের ১০ম উইকেট পড়ে যায়। এই অবস্থায় খেলায় জয়লাভের জন্যে ভারতবর্ষের যে ১৮১ রানের প্রয়োজন হয়, তার মধ্যে তারা ১টা উইকেটের বিনিময়ে তৃতীয় দিনেই ১৩ রান তুলে দেয়। ফলে জয়লাভের জন্যে তাদের আরও ১৬৮ রানের দরকার হয়। হাতে জমা থাকে ৯টা উইকেট এবং দু'দিনের খেলা। অস্ট্রেলিয়ার মত শক্তিশালী দলের বিপক্ষে এর থেকে আর কি বেশী সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তবুও ভারতীয় মহলে এই সন্দেহের প্রশ্ন ছিল—এই প্রয়োজনীয় রাণ ভারতবর্ষ শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে কি? তৃতীয় দিনের খেলায় উইকেটের কাণ্ডকারখানা দেখে অনেকেরই চোখ কপালে উঠেছিল—১৬০ রানে ১৭টা উইকেটের পতন। খেলার ঠিক এই অবস্থায় খেলোয়াড়দের মানসিক দৃঢ়তাই ছিল প্রধান মূলধন।

চতুর্থ দিনের খেলায় তিনজন ভারতীয় খেলোয়াড় সেই মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই দর্শকদের বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে ভারতীয় দলের জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান উঠেছিল। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৩ রানের মাথায় ১ম, ১৮ রানের মাথায় ২য় এবং ৬১ রাণের মাথায় ৩য় উইকেট পড়েছিল। এই সময় জয়লাভের জন্যে আরও ১২০ রানের প্রয়োজন ছিল। বেদী এবং ওয়াদেকারের

গাণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ
নট আউট ৪৪ রান

৩য় উইকেটের জুটিতে ৪৩ রান এবং ওয়াদেকার এবং বিশ্বনাথের অসমাপ্ত ৪র্থ উইকেটের জুটিতে দলের ১২০ রান উঠেছিল। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা শত চেষ্টাতেও ওয়াদেকার এবং বিশ্বনাথের ৪র্থ উইকেটের জুটি ভাঙতে পারেননি। বিশ্বনাথ একজন অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যানের ভঙ্গীতে খেলে ৪৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। অপরদিকে ওয়াদেকার নট আউট ছিলেন ৯১ রান করে। লাঞ্চের পর ৪র্থ উইকেট জুটি ওয়াদেকার এবং বিশ্বনাথ আক্রমণাত্মক খেলায় রান তুলে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেন। ভারতবর্ষের জয়সূচক এক রানটি সংগ্রহ করেন নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় বিশ্বনাথ। চা-পানের ঠিক ২ মিনিট আগে খেলা শেষ হয়। আনন্দধ্বনিতে সারা খেলার মাঠ কেঁপে ওঠে। তার সঙ্গে তাল রেখে বেতার-শ্রোতারাও জয়ধ্বনি করেন।

অস্ট্রেলিয়ান বনাম পূর্বাঞ্চল

অস্ট্রেলিয়ান : ২৫০ **রান** (মেইন ৭২ রান। ডোসী ৩৮ রানে ৪ এবং শুক্লা ৬০ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৩৪ **রান** (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। লরি ৩০ রান। ডোসী ২৭ রানে ৩ উইকেট)

পূর্বাঞ্চল দল : ১৫৭ **রান** (সুব্রত গুহ ৩১ রান। ম্যালেট ৩৭ রানে ৫ উইকেট)

ও ১৩১ **রান** (রাজা মুখার্জি ৩৩ রান। গ্লীসন ২৩ রানে ৫ উইকেট)

গৌহাটিতে অস্ট্রেলিয়ান বনাম পূর্বাঞ্চল দলের তিনদিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ান দল ৯৬ রানে জয়ী হয়। তৃতীয় দিনে খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের ১০ মিনিট আগে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়।

প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ান দল ৮ উইকেটের বিনিময়ে ২৪৬ রান সংগ্রহ করে। তাদের ১৩৫ রানের মাথায় ৮ম উইকেট পড়ে গেলে খুবই শোচনীয় অবস্থা দাঁড়ায়। শেষপর্যন্ত ৯ম উইকেটের জুটি মেইন এবং গ্লিসন দলের এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন করেন। তাঁরা এই দিন দলের ১১১ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন। দিলীপ ডোসী এবং আনন্দ শুক্লার স্পিন বোলিংয়ে

অশোক মানকড়
প্রথম ইনিংসে ৯৭ রান

অস্ট্রেলিয়ার এই কাহিল অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। পূর্বাঞ্চল দলের ফিল্ডিংয়ের দোষে ৯ম উইকেট জুটির দুজনেই আউট হওয়া থেকে অব্যাহতি পান।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ান দলের প্রথম ইনিংস ২৫০ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিনেই পূর্বাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ১৫৭ রানে শেষ হলে অস্ট্রেলিয়ান দল ৯৩ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ৪৩ রান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল, অস্ট্রেলিয়া দল ১৩৬ রানে অগ্রগামী এবং হাতে জমা ৮টা উইকেট।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে অস্ট্রেলিয়ান দল দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩৪ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই অবস্থায় খেলার বাকি ২১০ মিনিট সময়ে পূর্বাঞ্চল দলের পক্ষে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২২৮ রান সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের ১০ মিনিট আগে পূর্বাঞ্চল দলের ১৩১ রানের মাথায় দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া দল নাটকীয়ভাবে ৯৬ রানে জয়ী হয়।

ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়া
চতুর্থ টেস্ট খেলা

ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলার পরিস্থিতি তৃতীয় দিনের খেলার শেষে অস্ট্রেলিয়ার অনুকূলেই ঘুরে গেছে। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের ২১২ রানের প্রত্যুত্তরে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ৩৩৫ রান সংগ্রহ করে ১২৩ রানে অগ্রগামী হয়। তৃতীয় দিনের বাকী সময়ের খেলায় ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না-খুইয়ে ১২ রান সংগ্রহ করেছে। ঘাটতি পূরণ করতে ভারতবর্ষের আরও ১১১ রান দরকার। ভারতবর্ষের হাতে আছে দ্বিতীয় ইনিংসের দশটা উইকেট এবং দু' দিনের খেলা। বর্তমানে ভারতবর্ষের সামনে যে সংকট দেখা দিয়েছে, তা থেকে উদ্ধার পেতে হলে ভারতবর্ষকে রীতিমত ভাল খেলতে হবে। ১৪।১২।৬৯

দাবার আসর

ডায়াগোনাল অপোজিশন—ডায়াগোনাল অপোজিশনে কোণাকুণি মাত্র এক ঘরের ব্যবধানে দুই রাজা অবস্থান করে। এই অপোজিশন থেকে শেষ পর্যন্ত সোজাসুজি বা পাশাপাশি ডিরেক্ট অপোজিশনই আসতে বাধ্য, তবে অনেক সময় ডায়াগোনাল অপোজিশন ধরে রেখেও খেলা চলতে পারে।

চিত্রে সাদা রাজা রয়েছে রাজা নৌকা ২ ঘরে এবং কালো রাজা রয়েছে রাজা গজ ৫ ঘরে। ধরা যাক এখন কালোর চাল। তাহলে সাদা সব সময়ই অপোজিশন রাখতে পারছে। যেমন, (১)...রাজা—ঘোড়া ৫ (২) রাজা—ঘোড়া ২, (১)...রাজা—ঘোড়া ৪ (২) রাজা—ঘোড়া ৩, (১)...রাজা—গজ ৪ (২) রাজা—নৌকা ৩ (ডিরেক্ট অপোজিশন নেবার উপায় নেই বলে ডায়াগোনাল অপোজিশন নেওয়া হোল।), (১)...রাজা—রাজা ৪ (২) রাজা—ঘোড়া ৩, (১)...রাজা—রাজা—৫ (২) রাজা—ঘোড়া ২, (১)...রাজা—রাজা ৬ (২) রাজা—ঘোড়া ৩, (১)...রাজা—গজ ৬: (২) রাজা—নৌকা ৩ অথবা নৌকা ১।

কোন রকম অপোজিশন রাখতে পারা মানেই হচ্ছে ছকের যে কোন অংশের দিকে যেতে পারা। যেমন চিত্রের অবস্থা থেকে কালোর প্রথম চাল ধরে নিলে সাদার অপোজিশন থাকছে এবং সাদা ইচ্ছে করলেই মন্ত্রী নৌকা ৮ ঘরের দিকে যেতে পারবে। যদি কালোর প্রথম চাল (১)...রাজা—ঘোড়া ৫ হয়, তাহলে সাদা রাজা ঘোড়া ২ ঘরে যাবে এবং এইভাবে মন্ত্রী ঘোড়া ২ ঘর পর্যন্ত গিয়ে পরে হয় মন্ত্রী নৌকা ৩ অথবা মন্ত্রী গজ ৩ ঘর ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। কালো (১)...রাজা—গজ ৬ চাল দিলে সাদার চাল হবে (২) রাজা—নৌকা ৩ এবং এইভাবে নৌকা ৭ পর্যন্ত গিয়ে সাদা হয় ঘোড়া ৮ অথবা ঘোড়া ৬ ঘর ধরে এগুতে পারবে। কিন্তু কালো (১)...রাজা—রাজা ৫ চালও দিতে পারে। সেক্ষেত্রে (২) রাজা—ঘোড়া ২ : রাজা—মন্ত্রী ৫ (৩) রাজা—গজ ২ : রাজা—গজ ৫ (৪) রাজা—রাজা ২ : রাজা—ঘোড়া ৫ (৫) রাজা—মন্ত্রী ২ : রাজা—নৌকা ৫ (৬) রাজা—গজ ২: রাজা—নৌকা ৪ (৭) রাজা—গজ ৩ ইত্যাদি।

অপোজিশন-তত্ত্ব প্রত্যেক শিক্ষানবীশকেই ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। কারণ এর ওপর অনেক হার-জিত কিম্বা ড্র নির্ভর করে। ছকে একটি মাত্র বোড়ে অবশিষ্ট থাকলে অপোজিশনের দৌলতে তাকে মন্ত্রীতে রুপান্তরিত করা যায়। অন্যদিকে, বিপক্ষের চেয়ে ১টি বোড়ে কম থাকলেও অনেক সময় অপোজিশনের জোরে বিপক্ষের বোড়েটির মন্ত্রী হওয়া আটকে দেওয়া যায়। অথবা, বোড়ে সমান সমান থাকলেও রাজার অবস্থান এবং অপোজিশনের জন্যে খেলায় জিত হতে পারে। এর প্রত্যেকটিই উদাহরণ সহযোগে বুঝতে হবে এবং ক্রমে এগুলি সম্বন্ধে ঈষৎ বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

সাদা
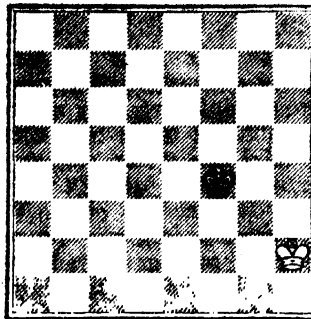
কালো

২১ দিনেরও বেশী লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত রাজ্য দাবা চ্যাম্পিয়নশীপ (১৯৬৯) প্রতিযোগিতার সমাপ্তি হোল। স্নায়ু-পীড়ন, স্ট্যামিনা এবং মানসিক পরিশ্রম—এই তিনের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে নুতন রাজ্য দাবা চ্যাম্পিয়ন হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার বিভাগের পঞ্চম বর্ষের ছাত্র শ্রীআনন্দকুমার ঘোষ।

শ্রীঘোষ প্রথম রাউণ্ডে একটি মাত্র খেলা হার (শ্রীদেবব্রত শেঠের সঙ্গে) এবং একটি মাত্র খেলা ড্র ছাড়া আর কোন পয়েন্ট বিসর্জন দেন নি। গত কয়েক বছর ধরেই তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবা চ্যাম্পিয়ান এবং সর্বভারতীয় আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় দাবা প্রতিযোগিতায় দুবার যাদবপুরের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

দুয়েকটি খেলায় ভাগ্য তাঁকে কিছু সহায়তা করলেও তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। খেলোয়াড় হিসেবে আমরা তাঁর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

গতবারের তুলনায় এবারে খেলার সাধারণ মান অনেক উঁচু ছিল। অনেক নতুন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন খেলোয়াড়ের সন্ধানও পাওয়া গেছে। সুজিত সেন, গৌতম সেন, নীহার ব্যানার্জি, অসীম রাহা এবং প্রশান্ত ঘোষ উঠতি তরুণ খেলোয়াড় হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। অন্যদিকে সি, কে, শুকুল, বীরেন বোস এবং শৈলেন্দ্রনাথ দত্তের ব্যর্থতা আমাদের হতাশ করেছে। আমরা আশা করব এঁদের এই ব্যর্থতা নিতান্তই সাময়িক।

প্রতিযোগিতার সবচেয়ে দুর্ভাগ্যসম্পন্ন খেলোয়াড় বোধহয় শ্রীদিলীপ ব্যানার্জি। শেষের দিকে তিনটি খেলার (একটি নিজের অপরটি অন্যের) যে কোনটিতে অন্য রকম ফলাফল হলে তিনি চতুর্থ স্থান দখল করতে পারতেন এবং সরাসরি বাংলা দলে স্থান পেয়ে যেতেন।

প্রতিযোগিতার সবচেয়ে দীর্ঘ গেম খেলেছেন শ্রীঅসীম রাহা শ্রীবীরেন বোসের সঙ্গে — মোট ১১৪ চাল এবং ফলাফল ড্র। হ্রস্বতম গেমও শ্রী রাহাই খেলেছেন শ্রীগৌতম সেনের সঙ্গে — মাত্র ১৪ চাল এবং এটির ফলও হচ্ছে ড্র। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীরাহাও আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় দাবা প্রতিযোগিতায় যাদবপুরের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

নীচে প্রতিযোগিতায় প্রথম দশটি স্থানাধিকারীর নাম এবং তাঁদের অর্জিত পয়েন্ট দেওয়া হোল। মোট ১২ রাউণ্ড খেলা হয়।

(১) সর্বশ্রী আনন্দকুমার ঘোষ ১০½, (২) নরেন মাজী ১০, (৩) পূর্ণেন্দুপ্রসাদ বোস ৯½, (৪) দেবব্রত শেঠ ৮½: (৫) দিলীপ ব্যানার্জি ৮½, (৬) সুজিত সেন ৮, (৭) নীহার ব্যানার্জি ৮, (৮) গৌতম সেন ৮, (৯) করুণা ভট্টাচার্য ৭½, (১০) প্রশান্তকুমার ঘোষ ৭।

—গজানন্দ বোড়ে

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৯ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৩শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 26th Dec. 1969. শুক্রবার, ১০ই পৌষ, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

উত্তরবঙ্গের পত্রিকা

সম্প্রতি সাপ্তাহিক 'অমৃতের' ৯ম বর্ষ, ৩০শ সংখ্যায় 'উত্তরবঙ্গের সাহিত্যপত্র প্রসঙ্গ' শীর্ষক কতগুলো চিঠি ছাপা হয়েছে। এযাবৎ প্রকাশিত প্রায় সব চিঠিতেই বিশেষ বিশেষ সাহিত্যপত্রিকার প্রতি পত্রদাতাদের প্রচ্ছন্ন অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের নিরপেক্ষ থাকাই শ্রেয়ঃ। শুধু 'শালবনী' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে 'শালবনী' সম্পর্কে তথ্যগত যে ভুলটুকু শ্রীনরেশ সরকার তাঁর পত্রে করেছেন, তার প্রতিবাদ করে সবিনয়ে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করতে চাই। পত্রলেখক মন্তব্য করেছেন—'কেবল উত্তরবঙ্গের একজন কবি বা লেখক ছাড়া আর কারো লেখাই এ পত্রিকায় চোখে পড়ে না।' পত্রলেখকের এ-হেন অজ্ঞতায় আমরা নিজেরাই বিস্মিত হয়েছি। 'শালবনী'র মাত্র তিনটি সংখ্যা এপর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, আমাদের মনে হয় পত্রলেখক তার একটিও নিজের চোখে দেখেন নি। কেননা এই তিনটি সংখ্যার লেখকদের মধ্যে আছেন—তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমান মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম মাহাত, রঞ্জিত দেব, নিত্যানন্দ দাশগুপ্ত, জীবন সরকার, নিখিল বসু, পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, নির্মলেন্দু গৌতম, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমুখ (শেষোক্ত দুজন সম্প্রতি জলপাইগুড়ি ছেড়ে চলে গেছেন)—এঁরা সবাই উত্তর বাঙলার লেখক বলেই তো পরিচিত। শ্রীনরেশ সরকারকে কোচবিহারের একটি সাহিত্যপত্রের সম্পাদক বলেই আমরা জানি। নিজে একজন সম্পাদক হয়ে অন্য একটি পত্রিকার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এমন একটি দায়িত্বজ্ঞানশূন্য উক্তি করতে পেরেছেন দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি।

'শালবনী' সম্পাদক উত্তর বাঙলার কিছু লেখক, পাঠক ও পত্রিকাসম্পাদকের মনে কিছু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, একথা ভেবেই আমরা আরও কিছু বক্তব্য নিবেদন করতে চাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন উত্তরবাঙলার প্রায় সমস্ত পত্রিকার প্রচলিত রচনাধারা থেকে 'শালবনী'র রচনাগুলি একটু স্বতন্ত্র ধরণের। শুধুমাত্র কতগুলি বিচ্ছিন্ন রচনা প্রকাশই 'শালবনী'র মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। সমকালীন আধুনিক সাহিত্যভাবনার মুখপত্ররূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক সাহিত্যসৃষ্টিতেই 'শালবনী' প্রয়াসী। উত্তরবাঙলার পত্রিকা হিসাবে একমাত্র শুধু উত্তরবাঙলার লেখকরাই এতে লিখবেন—এ ধরণের আঞ্চলিকতায় আমরা বিশ্বাসী নই। আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক রচনার প্রতিই আমরা মনোযোগী। তিনি উত্তরবাঙলার লেখক হলে তো কথাই নেই, বহির্ভারতের লেখক হলেও আমাদের আপত্তি নেই। 'আমি উত্তরবাঙলার লেখক এবং শালবনী যেহেতু উত্তরবাঙলা হইতেই বাহির হয়, অতএব আমি যাহাই লিখি না কেন, তাহাই ছাপিতে হইবেক—উত্তরবাঙলার এই প্রচলিত নিয়মকে সম্ভবত 'শালবনী'ই প্রথম লঙ্ঘন করার সাহস দেখাতে পেরেছে'

নিখিল বসু
পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত
সম্পাদক, শালবনী
ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি

(২)

আমি সাপ্তাহিক 'অমৃতের' একজন অনুরাগী পাঠক। সম্প্রতি 'অমৃতের' চিঠিপত্র বিভাগে উত্তরবঙ্গের সাহিত্যপত্র প্রসঙ্গে কিছু পত্র প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আশা করি আমার এ বক্তব্য প্রকাশ করে বাধিত করবেন। উত্তরবঙ্গে বর্তমানে অসংখ্য পত্রিকা বের হয়। সবগুলি দেখবার সৌভাগ্য আমার না হলেও বেশ কয়েকটি দেখেছি। একজন পাঠক হিসাবে আমার যা ধারনা—কোন পত্রিকা ভাল কিংবা খারাপ তা সেই পত্রিকার রচনাবলীর মান, পরিবেশনের নিজস্বতা, অঙ্গসজ্জা ইত্যাদি দ্বারাই নিরূপিত হয়। সম্পূর্ণ নতুন লেখকদের নিয়েই যদি সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকা করা যায়, তবে তা সম্পাদকের অতিরিক্ত কৃতিত্ব এবং তা স্বীকার করা উচিত। কিন্তু উত্তরবঙ্গের যে কয়েকটি পত্রিকা আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে, দুঃখের সঙ্গে বলব, দু-একটি ছাড়া প্রায় ক্ষেত্রেই কাঁচা লেখার পরিমাণ অত্যন্ত বেশী; পরিচ্ছন্নতা দূরে থাক মুদ্রন ত্রুটি এত বেশী যে চোখকে পীড়া দেয়। এগুলো নিশ্চয়ই ভাল সাহিত্যপত্রের পরিচায়ক নয়। সমস্ত পত্রিকার মধ্যে তুলনামূলকভাবে 'শালবনী'র আমাকে আকৃষ্ট করার কারণ তার মুদ্রন পরিচ্ছন্নতা তো বটেই (লক্ষণীয় যে পত্রিকার মুদ্রন কাজও উত্তরবঙ্গে), তা ছাড়াও সুনির্বাচিত রচনার পরিবেশন। জনৈক পত্রদাতা শ্রীনরেশ সরকার মন্তব্য করেছেন উত্তরবঙ্গের কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদক স্থানীয় কবি ও লেখকদের নিয়ে প্রবন্ধ লিখে পাঠক ও লেখকদের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছেন। এক্ষেত্রেও তাঁর সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। সেসব কিছু প্রবন্ধ পাঠ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। অবশ্যও দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, সেসব লেখায় লেখকের নিরপেক্ষতা প্রায় সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। উত্তরবঙ্গের কোন লেখকের সৃষ্ট রচনার যুক্তিবাদী বিশ্লেষণও কোন পত্রিকায় নেই! বরং পড়ে মনে হয় নিজেদের গোষ্ঠীর চেনাজানা লেখকদের পিঠ চাপড়ানোর মত করে লেখা। অথচ এই ধরনের দৃষ্টিকটু গোষ্ঠী তোষণ নীতি থেকে উত্তরবঙ্গের পত্রিকাগুলো অন্তত মুক্ত থাকবে আশা করেছিলাম।

ধীমান মজুমদার
শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।

(৩)

বিগত দু' সংখ্যা থেকে 'অমৃত'র চিঠিপত্র বিভাগে "উত্তরবঙ্গের সাহিত্যপত্র" প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের এক অঞ্চল অপর অঞ্চল সম্পর্কে নানা বিরূপ সমালোচনা করেছেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নরেশ সরকার মহাশয়ের গবেষণাধর্মী আলোচনাটি মাত্র এর ব্যতিক্রম। অবশ্য আমি কোচবিহার থেকে এই চিঠি লিখছি বলে শুধুমাত্র কোচবিহারের প্রশংসা করবার অহেতুক বাসনাও আমার নেই। তবে এটুকু সত্য যে আমি উত্তরবঙ্গের সবকয়টি পত্রিকার নিয়মিত পাঠক বলে দু'-একটি কথা পাঠক-পাঠিকাদের কাছে না জানিয়ে পারছি না।

উত্তরবঙ্গের সাহিত্যপত্র প্রসঙ্গে যে কয়টি পত্রিকার নাম উঠেছে তন্মধ্যে "ত্রিবৃত্ত" ও "মধুপর্ণী"ই সবচাইতে পুরনো কাগজ। এবং এঁদের দান উত্তরবাঙলার লেখক ও সুধীসমাজের কাছে কম নয়! এ দুটি পত্রিকায় উত্তরবাংলার খুব কম লেখকই আছেন যাঁরা লেখেন নি! এতে আমি এটা বোঝাতে চাইছি না যে যেসব পত্রিকার জন্ম ঘটেছে অতিসম্প্রতি তাঁদের মূল্য বিন্দুমাত্রও নেই। উত্তরবাংলার প্রেস, লেখক ও অর্থের অভাব উপেক্ষা করে যে পত্রিকা-দুটি নিয়মিত বেরিয়ে আসছে এবং যাকে কেন্দ্র করে আর দশটি পত্রিকার জন্ম, তাকে 'অপরিস্কার' বলে নাক সিঁটকানো কেন? বিদগ্ধ পাঠক যে কয়জন আছেন উত্তরবাংলা ও কলকাতার বুকে, তাঁরা সব পত্রিকাগুলো পাশাপাশি রেখে ভালো-মন্দ বিচার করবেন। কলকাতার কমার্শিয়াল কাগজগুলোর পিঠ-চাপড়ানোয় মফস্বলের সাহিত্যপত্রের উল্লম্ফন ভাল দেখায় কি! উত্তরবাংলার কয়জন পাঠক-পাঠিকা পয়সা দিয়ে পত্রিকা কেনেন তা উত্তরবাংলার সম্পাদক এবং পত্রিকাগোষ্ঠী হাড়ে হাড়ে টের পান। কিছুদিন আগে এ-ব্যাপারে ত্রিবৃত্ত ও

আধুনিক সাহিত্যপত্রের সম্পাদক শ্রীরণজিৎ দেব-এর একটি প্রবন্ধ শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক বাংলা কবিতা এবং অপর প্রবন্ধ অন্য একটি দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সংস্কৃতি বিভাগে পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার মনে হয়, যদি উত্তর-বাংলার পাঠক-পাঠিকারা এখানকার বিভিন্ন পত্রিকার বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা না করে গ্রাহক সংগ্রহ ও উত্তরবাংলার পত্রিকা প্রকাশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ পরিধি অতিক্রম করে ছোট কাগজগুলোর প্রতি আন্তরিক হয়ে উঠতে পারেন তবে প্রত্যেকটি সাহিত্য-পত্রই পরিচ্ছন্ন রুচিশীল কাগজ হতে পারবে।

অঞ্জনা ধর
ভিকটোরিয়া কলেজ
কুচবিহার

কুমার-মুরুকন

এবারকার পূজো সংখ্যা 'অমৃত' পত্রিকায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'কুমার-মুরুকন' একটি লক্ষণীয় রচনা। রচনাটি বাংলা সাহিত্যের পক্ষে একটি বিশিষ্ট সংযোজন।

বাংলাদেশে কার্তিক পূজা প্রচলিত, সেই হিসাবে কার্তিকেয় নামটি আমাদের পরিচিত; প্রাচীন ভারতে ইনি বিভিন্ন নামে পরিচিত বা প্রসিদ্ধ ছিলেন। যথা—কুমার, কার্তিকেয়, মহাসেন, বিশাখ, ব্রহ্মণ্যদেব, স্কন্দ, ষড়ানন, ষন্মুখ। এই রচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, খৃঃ পূঃ ৫০০-৪০০ বৎসর থেকে প্রায় সহস্র বৎসর ধরে পারস্য থেকে সমগ্র উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ ভারতে এবং সিংহলে এ'র পূজা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে একদিকে বাংলাদেশে এবং দক্ষিণ ভারতে তামিলদের দেশে এই দেবতার পূজা প্রচলিত। তামিলদেশে তাঁর নাম মুরুকন (মুরুগণ) আরুমুকন, বেলায়ুধন, সুব্রহ্মণ্য। বাংলাদেশে আমরা কার্তিকেয়কে চিরকুমার বলেই জানি, (তাঁর অপর নাম কুমার) কিন্তু এই রচনা থেকে জানা যাচ্ছে, কিন্তু তামিলদেশে তাহার দুই পত্নী, ইন্দ্র-কন্যা দেবসেনা ও কোরব (আর্যবিক) বা কৃষক-কন্যা বল্লী।

সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের এই প্রশস্তি থেকে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করে দিলে রচনার বিষয় এবং বিষয়ের ভাবরূপের ঐশ্বর্য ও ব্যাপকতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যাবে।

'প্রভু মুরুকন, তুমি দ্রমিড়জনের হৃদয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; তুমি আর্যজনের ধী (চিন্তন বা মনন) হইতেও সঞ্জাত।"

'তরুণ যুবত্বের প্রস্ফুটিত রূপ তুমি (তামিলদেশের 'মুরুকন শব্দের অর্থ তরুণ বা প্রস্ফুটিত) শ্রী ও সৌন্দর্যের নিলয় যে তারুণ্য, লাবণ্য ও মাধুর্যের শক্তি ও পৌরুষের আধার যে তারুণ্য। যে তারুণ্য সমস্ত অমঙ্গলের পাপ-রূপকে দূর করিয়া দেয়,'

'তুমিই হইতেছ তারুণ্য-কান্তির ও যুব-শক্তির তথা যুগপৎ প্রেমানুরাগ ও বল-বীর্যের উৎস এবং মূর্ত রূপ।'

'দেবতা মানব ও অসুরের চক্ষের সম্মুখে তোমাকে এই ভূলোকে আনিবার উদ্দেশ্যে বিশ্বমাতা...বিবাহিতা বধূ উমা-রূপে অবতীর্ণা হইলেন হিমবন্ত পর্বতের কন্যা উমারূপে।'

'কেবল তোমারই জন্য দানবের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধে যাহাতে তুমি প্রবৃত্ত হইতে পারো সেই হেতু...স্বয়ং মঙ্গলময় কল্যাণকৃৎ মহাযোগী শিব-শংকরের রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন ঃ...তুমি পাপ ও বিনাশ হইতে দেব-দানবকে উদ্ধার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলে।'

পরাৎপর পরম-শিবের পুত্র তুমি—দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে তাঁহার কন্যাকে দীপ্তি-ময়ী শুভ্রা দেবরাজ-কুমারীকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।'

'পৃথক পৃথক দেবতার বিভিন্ন মূর্তি, সমস্তই হইতেছে একই ঈশ্বরের...একই মূল দেবতার লীলা। হে মুরুকন, হে কুমার, প্রাচীন গ্রীসের আপোল্লোন (Apollo) সে তো তুমিই; তথা উত্তরাপথের জারমানিক জাতির ইধুনের duin পতি দেব বালদের (Balder)—সেও তুমি; রাধাদয়িত, গোপী-পূজিত বৃন্দাবনের কিশোরকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, সে-ও তুমি। বিষ্ণু-কৃষ্ণ, বিনু-কন্নন, তাহার প্রতিচ্ছায়া দ্রমিড়ক দেশে তোমাকেই দেখি।'

যাঁরা সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের বড় রচনাটি পড়তে পাননি (কারণ সকলে হয়তো পূজো-সংখ্যা সংগ্রহ করেননি) তাঁরা এই সংক্ষিপ্ত সারমর্ম পড়লে রচনা সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাবেন, এবং কতকটা রসাস্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন। তাঁদের মধ্যে কেউ হয়তো মূল রচনাটি পড়বার জন্যও আগ্রহ বোধ করবেন। সেই উদ্দেশ্যেই আমার এই প্রয়াস।

সত্যভূষণ সেন
গোহাটি—১১, আসাম

অন্ধকারের মুখ

আমি আপনাদের সাপ্তাহিক অমৃতের একজন নিয়মিত ও অনুরাগী পাঠ।

কারণ নানারকম বিভাগের মাধ্যমে অমৃততে যে বিভিন্ন বিষয়ের রচনা প্রকাশ করা হয় সেটা তার অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য অমৃতের সুস্থ চিন্তার পরিচায়ক। এতে বৈচিত্র্যের যথার্থতা প্রমাণিত। প্রতি সপ্তাহে এই কাগজ বিভিন্ন জনের প্রত্যাশা পূরণ করে এবং বিভিন্ন পাঠকের কাছে তার মনের চিন্তার সুস্থ প্রকাশের যে আবেদন সৃষ্টি করে সেখানেই তার সার্থকতা। আমি পত্রিকার বেশীর ভাগ বিষয়ই পড়ি। তার মধ্যে রহস্য উপন্যাস বেশী পছন্দ করি। পূর্ববর্তী উপন্যাসদ্বয়ের লেখকদ্বয় অদ্রীশ বর্ধন ও নির্মল সরকারকে তাঁদের বিশিষ্ট রচনার জন্যে অভিনন্দন জানাই। বর্তমানে প্রকাশিত দেবেন্দ্র দেববর্মার উপন্যাসও চমৎকারভাবে কাহিনীর সূচনা করেছে। কাহিনীর গতি ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পূর্ণ মন্তব্য এখন অবান্তর। উপন্যাসের সার্থক পরিণতির অপেক্ষায় থাকছি। তবে রহস্য উপন্যাসের ধারাবাহিকতা যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রবোধচন্দ্র দাস,
শক্তিনগর, বর্ধমান

কোয়েলের কাছে

সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার আমি একজন পাঠক। অনেকদিন ধরেই এই পত্রিকা পড়ছি। সম্প্রতি 'কোয়েলের কাছে' উপন্যাসটি অতি আগ্রহের সঙ্গে পড়ছি। লেখক শ্রীবুদ্ধদেব গুহর ঠিকানা জানি না। তাঁর লেখা পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছে। শহরে কোলাহলপূর্ণ জায়গায় ঐ উপন্যাসটি পড়তে পড়তে মনে হয়, নিজেকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছি। পাখীর ডাক, বনের ফুল, পাতা, ঘাস, মাটির সঙ্গী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু দু-পাতার লেখা বেশীক্ষণ সে অবস্থায় রাখে না। ক্ষণমুহূর্তে স্বপ্ন ভেঙে যায়। আমার ভালো লাগার কথাটি লেখককে জানালে বড়ই বাধিত হই। লেখকের উন্নতি ও অন্তর্দৃষ্টি প্রার্থনা করি।

অমল মুখার্জি
কলকাতা—২।

সাদা চোখে

একদিকে ফ্রন্টের অন্যতম প্রধান শরিক বাংলা কংগ্রেসের রাজ্যব্যাপী গণ-অনশন সত্যাগ্রহ চলছে হিংসার বিরুদ্ধে। আর অন্যদিকে প্রধানতম শরিক মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রচার অভিযান চলছে সভা, শোভাযাত্রা ও পোস্টারের মাধ্যমে বাংলা কংগ্রেস ও সহযাত্রী দল, যথা কম্যুনিস্ট পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে, ফ্রন্ট ভাঙার অভিযোগে। আর এই দুই বিবদমান শক্তির মধ্যে সমঝোতার প্রয়াসে শান্তির দৌত্য চালিয়ে যাচ্ছেন অন্য দুই শরিক দলের নেতা সর্বশ্রী বিভূতি দাশগুপ্ত ও মাখন পাল। শান্তির ললিতবাণী এখনো ব্যর্থ পরিহাসের মতই শোনাচ্ছে, এবং প্রকৃতপক্ষে চেষ্টাও চলছে বটে, তবে তা এখনো বন্ধ্যাই রয়ে গেছে। কিন্তু দুই যুধ্যমান শক্তির লড়াই ক্রমেই ভয়ংকর রূপ ধারণ করছে।

যে লড়াই এতদিন একটা আদর্শগত স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল, আজ তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে শুরু হয়ে গেছে। মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা সত্যাগ্রহের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে শুধু এতদিন বাংলা কংগ্রেসকেই শ্রেণী সংগ্রামের শত্রু ও জোতদারের দালাল পার্টি বলে আখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু ক্রমেই আক্রমণকে তীব্রতর করতে গিয়ে এখন বাংলা কংগ্রেস নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে এবং ঐ দলের সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়াকে জোতদারের দালাল বলে চিহ্নিত করছেন। এবং এই চরিত্র-হননের কাজ এখন পুরোদমে চলছে উভয় পক্ষের তরফ থেকেই। এখন আর রয়ে সয়ে নয়, একেবারে মুক্ত কৃপাণ হস্তে সরাসরি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন দুই দলের নেতারাই।

বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখার্জি সেদিন ব্যঙ্গাত্মক কন্ঠে ঘৃণা মিশ্রিত ভাষায় বলেছেন, যাঁদের বাড়ী-গাড়ী আছে আর যাঁরা বাড়ী ভাড়া দিয়ে মা লক্ষ্মীকে মনোমত করে ঘরে তুলছেন তাঁরাই আমাকে জোতদারের দালাল বলে অভিহিত করছেন। আমার বাড়ী গাড়ী ত দূরের কথা এই সসাগরা পৃথিবীর বুকে একটি পর্ণকুটীর নির্মাণ করে বাস করার মত সূচাগ্র মেদিনীও নেই। অনেকেরই হয়ত জানা নেই মুখ্যমন্ত্রীর এই আক্রমণ কার বিরুদ্ধে। তিনি এই উক্তি করেছেন তাঁরই সহকারী শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় সম্পর্কে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায় উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু ভূসম্পত্তি পেয়েছিলেন কিনা জানা নেই। তবে হলফ করে একথা বলা যায়, মুখ্যমন্ত্রী নিজে সম্পত্তি অর্জনের চেষ্টা করেন নি, কিম্বা আর দশজন সাধারণ ভোগী মানুষের মত জীবনে কোন নতুন প্রতিশ্রুতি সৃষ্টির সুযোগের অপেক্ষাতেও ছিলেন না। অকৃতদার মুখ্যমন্ত্রীর অবশ্য সুযোগের অন্ত ছিল না, একথা সত্যি।

ঠিক তেমনি শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয়ও ব্যারিস্টার হওয়া সত্ত্বেও অর্থোপার্জনের জন্য কোনদিন চেষ্টা করেছেন বলে শোনা যায় নি। বিলেতে থাকবার সময়ই তিনি কম্যুনিজমের মন্ত্রে দীক্ষিত হ'ন এবং সাগরপার থেকে ফেরার পর তিনি দলীয় কাজেই প্রায় আত্মাহুতি দিয়েছেন। অতএব, সম্পত্তি তাঁর উপার্জিত নয় এবং যা আছে তা তিনি বাড়িয়েছেন এমন অভিযোগও নেই। যা আছে তা থেকেই কোনক্রমে সংসার যাত্রা তিনি নির্বাহ করছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী যদি পরস্পরের চরিত্রহননের চেষ্টায় ব্রতী হয়ে ওঠেন, তবে দেশবাসী দাঁড়ায় কোথায়? কত সাধ করে আম-জনতা কংগ্রেসকে ছেঁড়া কাগজের মত দূরে ছুঁড়ে ফ্রন্টকে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁরাই আজ বেপথুমান হয়ে পড়ছেন। সন্দেহের বীজ পত্তন হচ্ছে তাঁদের মনে, আর ক্রমেই ভেঙে যাচ্ছে তাঁদের সোনালী প্রভাতের স্বপ্ন।

এই চরিত্রহননের প্রশ্নেই আক্রমণ শুধু সীমিত নয়। এতদিন আলতোভাবে যে সমস্ত অভিযোগকে স্পর্শ করা হচ্ছিল, এবারে নগ্নরূপে তা জনসমক্ষে উপস্থাপিত। দলগত আক্রমণ রাজনীতিতে অচল নয়। কিন্তু একই মন্ত্রিসভায় থেকে এখন যেভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন, এবং ক্রমাগতই গণ-দরবারে তা পেশ করে বিচারের প্রার্থনা করছেন তাতে শান্তির দৌত্য কতখানি সফল হবে সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কালনার সেই ব্রাহ্মণ মহিলার অবমাননার কাহিনী আজ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের গণ-অনশন সত্যাগ্রহের আরম্ভ দিবসে সেই বিপর্যস্তা লাঞ্ছিতা মহিলার কাহিনী যখন আলোকপ্রাপ্ত হলো, পরদিনই ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার কম্বুকন্ঠে ঘোষণা করলেন, সমস্ত ব্যাপারই সাজানো। এবং তিনি সাংবাদিকদের বললেন, কারা সেই মহিলাকে কলকাতা পর্যন্ত টেনে এনেছিলেন সেই গোপন তথ্যও তাঁর অজানা নেই। এবং ফাঁস করে দিয়ে বললেন, বাংলা কংগ্রেসের লোকেরাই সুকৌশলে ঐ 'চরিত্রহীনা' নারীর পক্ষে ওকালতি করার জন্য এবং ফ্রন্টকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ঐ নাটকে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল, শ্রীকোঙার ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। বর্ধমানের জেলা শাসক মহাশয়, যিনি সিপিএম্ ভক্ত হিসাবে হালে চিহ্নিত হয়েছেন অন্যান্য ফ্রন্ট শরিকের দ্বারা, সেই তরুণ জেলা-অধিকর্তাই শ্রীকোঙারকে 'অসত্যবাদী' প্রতিপন্ন করে ছাড়লেন। আর মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই শ্রীকোঙারকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই সর্বজনাদৃত নেতারা সব কিছুতেই এত অধৈর্য হয়ে পড়েন কেন? কোনো নারীর মর্যাদা হানি হয়েছে বলে কোনো দলের লোক অভিযোগ করলেই মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা অমনি যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত দেখতে পান, এবং সেটা তাঁদেরই হেয় প্রতিপন্ন করার কারসাজি বলে আঁচ করে নেন। যে কোন দক্ষ প্রশাসক একথাই বলবেন, তদন্ত করে দেখছি। আর দোষীকে সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, যে কোন আইন-শৃঙ্খলা বা নারীর মর্যাদা হানির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই কেউ কেউ সেই অভিযোগকে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ও ফ্রন্টের বিরুদ্ধে কুৎসা বলে অভিহিত করে উড়িয়ে দিতে চাইছেন, এবং সাধারণভাবেও সে সব অভিযোগ আমল দিতে প্রস্তুত নন। ফ্রন্টের অন্য শরিকরা কোন অভিযোগ উপস্থাপিত করলেই তা অসত্য বলে ধরে নিতে হবে, এমন কথা নিশ্চয় ফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচীর মধ্যে নিশ্চয় নেই। ঠিক তেমনি, অভিযোগ এলেই ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে স্বরাষ্ট্র ও পুলিশ দপ্তর থেকে বঞ্চিত করতে হবে তারও কোনো কথা নেই।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারা যায় না। রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনার পর চারিদিক থেকে সেখানে নারী নির্যাতন হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়েই সমস্ত ঘটনা যুক্তফ্রন্টের তথা বাঙালী যুবকদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার বলে ধরে নেওয়া হয়। যা হোক তারপর কমিশন গঠিত হয়ে রায় প্রকাশিত হয়েছে। বিচারক প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে বলেছেন, নারী নির্যাতন হয় নি। অবশ্য নির্যাতন বললে সঠিক কথাটি বলা হয় না, চার্জটা ছিল আরও গুরুতর। কিন্তু রায়ে এই মন্তব্যও করা হয়েছে যে, অশোককুমার নাইটের সংগঠকদের স্বেচ্ছাসেবকরা— বেশ কিছু সংখ্যক পানাসক্ত হয়ে দর্শকদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হয়েছিল। [illegible]

আলো ছিল না অনেকক্ষণ, আবার আসন সংখ্যার অনুপাতে দর্শকের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। সংগঠকরা আমোদকর ফাঁকি এবং অতিথি কার্ড বিক্রী করে কিছু কালো অর্থ সঞ্চয় করে নিয়েছেন বলেও বিচারপতি মন্তব্য করেছেন। জানা গেছে, পুলিশ লাঠি চার্জ এবং নিয়ন্ত্রাধিক বার কাঁদানে গ্যাসও ছুঁড়েছেন। সেই ভয়ংকর দিনে পুলিশের একজন প্রাণ দিয়েছেন, আর পাঁচ লোকের জল থেকেও দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল।

বোঝা গেল, নারীদের অবমাননা বা লাঞ্ছনা হয়নি। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকরা পানাসক্ত ছিলেন, এবং ট্যাক্স ফাঁকি, কালো অর্থ উপার্জন ও সম্বন্ধ গুণ্ডামি যে হয়েছিল এটাও ঠিক। যদি কমিশন না বসত তবে এ সমস্ত কুকীর্তি নিশ্চয় অন্ধকারেই থেকে যেত। আবার বিচারপতি সাক্ষীদের উপর হামলার কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এতে কি ইঙ্গিত আছে, তা জনসাধারণের বুঝতে কষ্ট হবে বলে মনে হয় না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে রায়ের যে অংশে কেবল নারী মর্যাদাহানি হয়নি বলা হয়েছে সেই অংশই প্রথমে সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ দিয়ে সহকারী মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বুর্জোয়া সংবাদপত্রের যদি এতটুকু লজ্জাও অবশিষ্ট থাকে তবে এই রায় থেকে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করবেন। [illegible] কারণ [illegible] উক্তি [illegible] সংবাদপত্র [illegible] কিন্তু [illegible] কাগজে [illegible] নিশ্চয়ই [illegible] দেখে পড়েন, শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের সেই [illegible] মহিলার কাহিনী সাংবাদিকরা সে খবর ছেপেছেন। কিন্তু তারা কি জানতেন, শ্রীকোঙারকেই তাঁর কর্মচারী ডুবিয়েছেন? তবে শ্রীকোঙার ইচ্ছে করলেই সত্য গোপনের অভিযোগে সেই কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। কারণ, ক্ষমতা তাঁর হাতে আছে। কিন্তু সংবাদিকরা কি করবেন? রাজনৈতিক নেতা কিম্বা জনসাধারণকে বয়কট করে সাংবাদিকদের চলে কি?

যা হোক, ঘোষ কমিশনের রায় বেরুবার পর কেউ কেউ বলেছেন, বাংলার কালিমা মোচন হয়ে গেল। বাংলার যুবশক্তি কলঙ্কমুক্ত হলেন। এই সমস্ত বক্তব্য থেকে একটি সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে, নারী নিগ্রহই [illegible]

করা, কালো উপায়ে অর্থ উপার্জন বা কর ফাঁকি দেওয়া ইত্যাদি মোটেই লজ্জাজনক নয়।

কাউকে আঘাত করবার জন্য এ প্রশ্নের অবতারণা নয়। কোনো অঘটন ঘটলে সাবধানতার সঙ্গে বিচার করে সংশ্লিষ্ট সকলেরই মন্তব্য করা উচিত। একথা প্রথমেই ধরে নেওয়া উচিত নয় যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার গদীতে আসীন হওয়ার পরই সমস্ত রত্নাকর বাল্মীকী হয়ে গেছেন। এবং একই দিনে সব নিত্য গঙ্গাস্নায়ী হয়ে নিরামিশাষি হয়ে উঠেছেন। যে পঙ্কিলতার মধ্যে সমাজ এখনো রয়েছে, তাতে দুষ্কৃতকারী থাকতে বাধ্য। তাই তো পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিবর্তনমূলক আটক আইন উঠে যাচ্ছে বলে "গুন্ডা আইন" চালু করতে চাইছেন। রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনার পরে যদি 'কিছুই ঘটেনি বলে না বলতেন' তবে ষড়যন্ত্রকারীরাও এত সুযোগ পেতেন না। কিম্বা তদন্ত হবে বলে ঘোষণা করলে এত বিবৃতি-প্রতিবিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশ হওয়ার সুযোগ থাকত না। বাড়বার সুযোগ দিলেই বস্তুবেরঙে পল্লবিত হয়ে ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। যা হোক, বিচারপতির রায় থেকে যেমন একটি সত্য ধরা পড়েছে তেমনি আরও একটা সত্য উপলব্ধি করা গেছে যে, শ্রীজ্যোতি বসুর মত বাঘা কম্যুনিস্টও বুর্জোয়া বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থাবান হলেন।

চরিত্রহননের কর্মকান্ড রাজনৈতিক স্তরে আছে বলে ধরে নিলেও যুক্তফ্রন্টের লড়াই এখন মন্ত্রী পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তাঁর কেবিনেট সহকর্মী শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায়কে অকর্মণ্যতা, দীর্ঘসূত্রতা ও চরম মিথ্যা ভাষণের দোষে দোষী সাব্যস্ত করে চার্জশীট দিয়েছেন। এই চার্জশীট দেওয়ার মূলে রয়েছে শিক্ষামন্ত্রীর ভাষণ, বিক্ষোভকারী অধ্যাপকদের সামনে। শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপকদের বেতন বৃদ্ধির দাবীকে মেনে না নিতে পারার জন্য অর্থমন্ত্রীকে অর্থাৎ শ্রীঅজয় মুখার্জিকেই নাকি সেদিন পরোক্ষে দায়ী করেছিলেন। ফলে একশ্রেণীর বিক্ষুব্ধ অধ্যাপক 'শ্রীঅজয় মুখার্জি মুর্দাবাদ' এই ধ্বনি তুলেছিলেন। ক্ষুব্ধ অর্থমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিয়ে শ্রীরায়কেই দায়ী করেছেন, এবং অধ্যাপকদের কাছে বিচারের দাবী করেছেন তথ্যের ভিত্তিতে।

এসব ঘটনা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে, মন্ত্রীমহোদয়রা একমত হয়ে কোন সমস্যাকেই সমাধানের জন্য এগিয়ে যেতে পারছেন না। বরঞ্চ, একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যেই শিল্পমন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়ার সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এক হাত হয়ে গেছে। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন নিজেদের দপ্তর চালানোর ব্যাপারে অযোগ্যতার নামে। মন্ত্রী পর্যায়ে চরিত্র হননের আর একদফা লড়াই হয়ে গেছে ফরওয়ার্ড ব্লকের শ্রীভক্তিমন্ডলের সঙ্গে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের। শ্রীমন্ডলের দল প্রস্তাব গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রীকে তদন্তের জন্য আবেদন করেছিলেন, এবং প্রস্তাবে একথাও বলা হয়েছিল যে, যদি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমন্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য বলে বোধ করেন তবে তিনি শ্রীমন্ডলকে মন্ত্রীসভা থেকে যেন বিদায় করে দেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্য একজন মন্ত্রী ডঃ কানাই ভট্টাচার্য মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রভাস রায়ের সঙ্গে খাদ্যোৎপাদনের সংখ্যাতত্ত্বের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু দুই মন্ত্রীই পরে পিছু হঠে গেছেন, কারণ তাঁরা হয়ত বুঝতে পেরেছেন তাঁদের এই অঘোষিত যুদ্ধ আখেরে পশ্চিমবাংলার মানুষেরই সবচেয়ে বড় সমস্যা: খাদ্যসমস্যাকে আরও জটিলতর করে তুলবে। আর এস-পি'র স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করেছেন মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির একজন পরিষদীয় সদস্য। যেভাবে একমন্ত্রী অন্য মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত নানা ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করছেন তা অচিন্তনীয়। এমন কি কংগ্রেস দল দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পরও এক দলের সদস্য অপরের বিরুদ্ধে এমনিতর অভিযোগ অদ্যাবধি উপস্থাপিত করেননি। কিন্তু এহেন ব্যবহার সত্ত্বেও এঁরা একে অপরের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেন, মন্ত্রিসভায় বসেন, আবার ফ্রন্টের সভাতেও মিলিত হন। অবস্থা দেখে মনে হয়, মান, লজ্জা, ভয়, এই তিন থাকতে রাজনীতি নয়।

কিন্তু এরকম ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা চলছে। তবে শান্তি প্রস্তাব সাফল্যের পথে যত না এগুচ্ছে তার চেয়ে বেশী দ্রুত এগিয়ে চলেছে বাংলা কংগ্রেসের আক্রমণ। একদিন যে মুখ্যমন্ত্রী নিজকে ঠুঁটো জগন্নাথ বলে অভিহিত করেছিলেন, সেই মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এখন সরাসরি বিভিন্ন দপ্তরের কার্যকলাপ সম্পর্কে রিপোর্ট চেয়ে পাঠাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, প্রায় প্রতিদিনই জনসভার মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কিছু শরিকের কার্যকলাপ সম্পর্কে গণদেবতাকে ওয়াকিবহাল করে চলেছেন। যে মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে 'ভ্যাবাগোবিন্দ' বলে আখ্যাত করেছিলেন, কার্যকালে দেখা যাচ্ছে তিনি মোটেই তা নন। বরঞ্চ, অন্য মানুষ।

কাজেই এমতাবস্থায় শান্তি কতটুকু স্থাপিত হবে তা মোটেই বলা যায় না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তাঁদের প্রতিরোধ আন্দোলন সফল না হলে অর্থাৎ শরিক দলগুলি হিংসাত্মক কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত না হলে তিনি ছেঁড়া জুতার মত মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে চলে যাবেন। কিন্তু হালে মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে সে সুর আর নেই। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমুখার্জি বলেছেন, যদি গণ অনশন সত্যাগ্রহ থেকে অভীষ্ট ফল না পাওয়া যায় তবে নতুনভাবে ঘটনার পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। "আপনি কি মন্ত্রীত্ব তা হলে ছেড়ে দেবেন", এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমুখার্জি বলেছেন, "এত সোজা জিনিস নয়"। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সাধারণ শান্তি প্রচেষ্টা এই ভয়ঙ্কর সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। সংবাদপত্রের পাতায় শান্তিকামীদের খবর বেরুচ্ছে বটে, আসলে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। অবশ্য একজন শান্তির দূত শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত বলেছেন, "বুঝলেন না, আমরা আশাবাদী, আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।" কিন্তু প্রচেষ্টা চালানোর জন্যে যাঁদের কাছাকাছি আনা একান্ত প্রয়োজন সেই দুদল, বাংলা কংগ্রেস ও মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি, ক্রমেই দুই বিপরীত মেরুর দিকে রকেটের গতিতে ধাবিত হয়ে চলেছেন। শুধু তাই নয়, ফ্রন্টের কোন শরিকই যেন সিরিয়াস নয়। কারণ অন্য যাঁরা এই কর্মকান্ড সমর্থন করেন না বলে বলছেন তাঁদের মধ্যেও বেশীর ভাগ দলই নীতিভঙ্গ করেই নীতি অনুসরণ করছেন, পালন করে নয়। যা বোঝা যাচ্ছে, নয়াদিল্লী থেকে যে ফল্গু ধারা প্রবাহিত হচ্ছে তা তলে তলে পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্টকেও সিক্ত করছে। অতএব, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে রাজনীতির খেলা শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গেও তার প্রতিফলন দেখা যাবে। জোড়াতালি দিয়ে থাকার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই। জনতারই কষ্ট মাত্র।

শান্তির দূতিয়ালী যাঁরা করছেন তাঁরা একথা বোঝেন না এমন নয়। তাঁরা যতই বলুন না কেন, শান্তির প্রয়াস সূতিকাগৃহেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। কেন না, শান্তির আওয়াজ ওঠবার পর থেকেই বস্তুত পক্ষে অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। পরস্পরের মধ্যে আক্রমণ তীব্রতর হয়ে পড়েছে। কাজেই যে যত জোরের সঙ্গেই বলছেন ফ্রন্ট ভাঙবেন না—আরও জবরদস্তভাবে ফ্রন্টের কাজ চালাবেন—মনে রাখবেন—ঐ সব উক্তি যুক্তফ্রন্টের অন্তিমদশার পূর্বাভাষ মাত্র।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

দুই শহর, দুই কংগ্রেস

এবারকার বর্ষশেষের সবচেয়ে জবর খবর হচ্ছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক জোড়া অধিবেশন। কংগ্রেস যখন দুটি তখন কংগ্রেসের বৈঠকও হবে দুটি তাতে আর আশ্চর্য কি! বৈঠকের স্থানও একটা থেকে আর একটা তেমন দূরে নয়—আমেদাবাদ আর বোম্বাই। একে অন্যের পড়শী শহর বললেও চলে। আগে আমেদাবাদ, পরে বোম্বাই। চাই কি, তেমন তেমন বুদ্ধিমান কংগ্রেস প্রতিনিধি আগে আমেদাবাদ সেরে পরে বোম্বাইয়ে এসে দুকূল রক্ষার চেষ্টা করতে পারবেন।

কিন্তু দুকূল কি একই সঙ্গে অটুট থাকবে? ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, এবার এক কূল ভাঙবে। কে আদি, কে দলছুট এবারই হয়তো তার শেষ বিচার হয়ে যাবে। আসল-নকলের দ্বন্দ্বের এবার আখেরি ফয়সালা হওয়ার কথা। সেজন্যই দুপক্ষের এত জোড়জোড়। একে অন্যকে টেক্কা দেওয়ার জন্য একেবারে কোমর বেঁধে লেগেছেন। নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির তলবী সভায় নিজেদের সপক্ষে কমিটির সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে হাজির করিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নয়া কংগ্রেস পয়লা বাজী জিতে নিয়েছে। কিন্তু, ইংরেজী প্রবাদবাক্যে যেমন বলে, "সে-ই সবচেয়ে ভাল হাসে যে সকলের শেষে হাসে।" ঐ প্রবাদবাক্যটির উপর ভরসা করে আছেন এখন শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার সাবেক কংগ্রেস। তাদের আশা, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশ সদস্য নয়া কংগ্রেসের সঙ্গে থাকলে কি হয়, "ডেলিগেট" অর্থাৎ প্রতিনিধিদের মধ্যে নিশ্চয়ই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে সংগঠনপন্থী সাবেক কংগ্রেসের। আর, যেহেতু ডেলিগেট সভা মাপে-বহরে এ-আই-সি-সির চেয়ে বড় সেহেতু ডেলিগেট সভার বাজীমাৎ করতে পারলে খাঁটি কংগ্রেসের তকমাটি অনায়াসেই পাওয়া যাবে—এই হচ্ছে সিন্ডিকেট-মার্কা সাবেক কংগ্রেসের যুক্তি ও আশা।

বলা বাহুল্য, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কংগ্রেসের যে অংশ রয়েছে তারা বসে নেই। পাল্লা চলছে প্রায় [illegible]। কংগ্রেস অধিবেশনের [illegible] [illegible] এবার জমবে একটার সঙ্গে আর একটার পাল্লা দিয়ে ডবল মাত্রায়। সাংগঠনিক কংগ্রেস গোষ্ঠীর শক্ত ঘাঁটি গুজরাট। সেখানে ২০ হাজার ডেলিগেট ও কর্মীর জমায়েতের আয়োজন হয়েছে আর প্রকাশ্য অধিবেশনে পৌনে দু[illegible] জায়গা করা হয়েছে। অন্যদিকে, বোম্বাইয়ের [illegible] কংগ্রেস গোষ্ঠীও ২০ হাজার ডেলিগেট ও কর্মীকে জায়গা দেওয়ার ব্যবস্থা করছে এবং প্রকাশ্য সভায় তিন লাখ লোক আসবেন বলে আশা করছে। মোরারজীর শহর যেমন আমেদাবাদ সদোবা পাতিলের শহর তেমনি বোম্বাই। শহর বোম্বাইয়ের কথা ধরলে জায়গাটা আদৌ ইন্দিরাগোষ্ঠীর ঘাঁটি গণ্য করা চলে না। তবে কিনা শহর বোম্বাই বাদে যে মহারাষ্ট্র প্রদেশ তার কংগ্রেস কমিটিতে ইন্দিরাবন্থীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট রয়েছে। স্বভাবতই, বোম্বাই কংগ্রেসের অভ্যর্থনার দায়িত্ব পড়েছে মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উপর বোম্বাই কংগ্রেস কমিটির উপর নয়।

আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ের জোড়া কংগ্রেস যখন সারা হয়ে যাবে, দুই তরফের প্রতিনিধিদের মাথাগুনতির কাজ যখন শেষ হয়ে যাবে তখন কংগ্রেসের এক অংশে দুই রূপের লীলা হয়ত ঘুচবে। হরিহরাত্মাদের কেবা হরি, কেবা হর তা হয়ত খোলসা হয়ে যাবে। কিন্তু এক পক্ষের গুনতির সঙ্গে অন্য পক্ষের গুনতির মিল হবে কি? আসলে কংগ্রেসের ডেলিগেট সংখ্যা কত তা নিয়েই ত মতের মিল হচ্ছে না। শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার দল বলেছে, কংগ্রেসের ৪৭০০ ডেলিগেটের মধ্যে ৩০০০ জন আমেদাবাদের বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন। শ্রীমতী গান্ধীর দল বলছে, "কে বলল, কংগ্রেস ডেলিগেটের সংখ্যা মাত্র ৪৭০০? আসলে ওটা হবে ৪৯১৭। বিহার থেকে কংগ্রেস ডেলিগেটের সংখ্যা কত? আমেদাবাদী কংগ্রেসের মতে ৪১৫ আর বিহার কংগ্রেসের মুখপাত্রের মতে ৪৯২। হরিয়ানা থেকে আছেন কতজন ডেলিগেট? আমেদাবাদী মতে ৮৬, বোম্বাইয়া মতে ৭৫ এবং হরিয়ানা কংগ্রেসের মতে ৮১।

ইতিমধ্যে উত্তর প্রদেশের "নয়া কংগ্রেস"-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রীবহুগুণা বলেই রেখেছেন যে, শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ডেলিগেট "উৎপাদন করে" ভুয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরী করার চেষ্টা করছেন। তাঁর কথা হচ্ছে, ফরিদাবাদ কংগ্রেসের ডেলিগেট তালিকাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার শক্তি-পরীক্ষার নামা উচিত ছিল; কিন্তু তিনি তা না করে "নির্বিচারে" ডেলিগেট বানিয়ে চলেছেন। শ্রীবহুগুণা বলেছেন, "নিজলিঙ্গাপ্পাজীর ডেলিগেট বানাবার কারখানায় ওভারটাইম কাজ চলেছে বলে মনে হচ্ছে। এই অবস্থায় আমেদাবাদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা [illegible] [illegible] কথা [illegible] [illegible] ...

আরও একটি আগাম গাওন গেয়ে রেখেছেন বহুগুণাজী। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, আমেদাবাদে যেটা হচ্ছে সেটা কিসের অধিবেশন? সেটা কি কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন? কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ত স্বাভাবিকভাবে হওয়ার কথা ফরিদাবাদ বৈঠকের দু বছর পরে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে কোন এক সময়ে। আমেদাবাদ অধিবেশনকে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনও বলা চলে না। কারণ, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুসারে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি। আর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেছে সেটা ত হচ্ছে বোম্বাইয়ে। আমেদাবাদে তবে কি হচ্ছে? বহুগুণাজী বলেন, "অনধিকারীদের তামাশা।"

একদিকে যেমন চলছে ভীড় জমাবার পাল্লা আর একদিকে তেমনি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে একের প্রস্তাব দিয়ে অন্যকে টেক্কা মারার চেষ্টার। কে খাঁটি কংগ্রেস কে মেকী, তার বিচারই শুধু এই লড়াইয়ের বাজী নয়, কে কার চেয়ে বেশী সমাজতন্ত্রী তার যাচাইয়েও নেমেছেন যেন দুই তরফ। অন্তত সেদিকে লক্ষ্য রেখেই যেন দুই তরফেই প্রস্তাবের খসড়া রচিত হচ্ছে।

বোম্বাই কংগ্রেসের জন্য শ্লোগান দেওয়া হয়েছে "গরীবী হঠো"। ২৭ বছর আগে একদিন এই শহর থেকেই কংগ্রেস আওয়াজ তুলেছিল, "ইংরেজ ভারত ছাড়"। সেকথা মনে রেখেই আজ নূতন শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে। ইংরেজ ভারত ছেড়ে গেছে; কিন্তু দেশ থেকে দারিদ্র্য আমরা দূর করতে পারিনি। সেই অসমাপ্ত কর্তব্য সম্পাদনের সংকল্প ঘোষণা করার জন্য ও সেই উদ্দেশ্যে কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্যই বোম্বাই কংগ্রেসের সামনে আওয়াজ রাখা হয়েছে "গরীবী হঠো।"

আমেদাবাদে যাঁরা কংগ্রেসের অধিবেশন করছেন তাঁরা বলছেন, বহুৎ আচ্ছা। তোমরা বলছ, "গরীবী হঠো", আমরা, যোগ করব, ১৯৭৫ সালের মধ্যে। শাসনক্ষমতাসীন কংগ্রেসের হাত তাঁরা বেঁধে দিতে চাইছেন। ১৯৭৫ সালের মধ্যে জনসাধারণের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করা হবে, এই প্রতিশ্রুতি তাঁরা চান। আশা এই যে, এরকম একটা তারিখের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আনলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দলকে বিপাকে ফেলা যাবে।

সমাজতন্ত্রের বড় শিরোপাটা নিজেদের মাথার পরার জন্য সংগঠন কংগ্রেস এমনই ব্যগ্র যে, তাঁরা অনেক মনের কথা মনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমে

লোকে অপরপক্ষকে বেশী সমাজতন্ত্রী ভেবে বসে, এই হচ্ছে ভয়। খবর এই যে, শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার শিবিরের বড় চাঁই শ্রীএস কে পাতিল আমেদাবাদ কংগ্রেসের খসড়া প্রস্তাবে গুটি কয়েক "কিন্তু, কিন্তু" ঢোকাতে চেয়েছিলেন। যেমন তিনি একজায়গায় এই বলে হুঁশিয়ার করে দিতে চেয়েছিলেন যে, "সমাজতন্ত্ররূপ গাছের ফল কাঁচা অবস্থায়ই পেড়ে নেওয়া চলে না।" আর এক জায়গায় তিনি বলতে চেয়েছিলেন, সমাজতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করবে "বাস্তব বিবেচনাসম্মত চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার উপর। সাদিক আলি সাহেব রাজীও ছিলেন খসড়ার মধ্যে কথাগুলি ঢোকাতে। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত কথাগুলি বাদ দেওয়াই সাব্যস্ত হয়েছে—পাছে লোকে সন্দেহ করে যে, সদোবাজীর কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রের রং তেমন গাঢ় নয়।

কংগ্রেসের যে পক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রয়েছেন সে পক্ষের চেয়ে তাঁরা যে কিছু কম মৌলিক সংস্কারকামী নন সে কথা প্রমাণ করার জন্যই অনুমান করা হচ্ছে, আমেদাবাদ কংগ্রেসে খুব জোর গলায় রাজন্য ভাতা বিলোপের, সাধারণ বীমা ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়করণের ও বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দাবী তোলা হবে। আর সেই সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর সরকারকে ভর্ৎসনা করা হবে, পরিকল্পিত অগ্রগতি চালিয়ে যেতে ব্যর্থতার জন্য, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে ব্যর্থতার জন্য এবং কম্যুনিস্ট ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সমর্থনের উপর নির্ভর করে শাসন চালাবার জন্য।

সমাজতন্ত্রের দুয়োরে এভাবে মাথা কুটবার ব্যাপারে আমেদাবাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া বোম্বাইয়ের পক্ষে মোটেই সহজ হবে না। আমেদাবাদের কংগ্রেসীদের কাজ বরং সহজ, তাঁরা আপাতত বলেই খালাস, যতক্ষণ তাঁরা সরকারে নেই ততক্ষণ কথায় ও কাজে সঙ্গতি রক্ষার দায় তাঁদের নেই। কিন্তু বোম্বাই কংগ্রেসের নির্দেশ বর্তাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের উপর। যা করলে ভাল হয় আর যা করা সম্ভব, এই দুয়ের মধ্যে চিরকালের আড়ি সেটা বোম্বাই কংগ্রেসের সামনে মস্ত বড় প্রশ্ন হয়ে ঝুলবে। আমেদাবাদ কংগ্রেস যা বলবে তার থেকে এক কাঠি চড়িয়ে বলতে না পারলে মান থাকবে না। আবার অবাস্তব আশা জাগিয়ে তুলে পরে তার ধাক্কা সামলান কঠিন হবে। এই সমস্যা বোম্বাই কংগ্রেসের সামনে।

সমস্যাটি যে এমন কি শ্রীমতী গান্ধীর নিজের শিবিরের ভিতর থেকেই উঠতে পারে তার লক্ষণও ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে। বোম্বাই কংগ্রেসের জন্য একটি অর্থনৈতিক কর্মসূচী তৈরী করার উদ্দেশ্যে শ্রীকেশবদেব মালব্যের সভাপতিত্বে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল তাঁরা একটি বৈপ্লবিক কর্মসূচি উপস্থিত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে সংবিধানের ধারাটি তুলে দিতে হবে, আগামী বছরের মধ্যে আমদানী বাণিজ্য ও ১৯৭৪ সালের মধ্যে রপ্তানী বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে, চাবাগিচাগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে, চিনিকলগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে অথবা আখচাষীদের সমবায় সমিতির মালিকানার অধীনে আনতে হবে, বেসরকারী শিল্পের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর করতে হবে, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের পরিধি আরও বাড়াতে হবে, যে সমস্ত দেশীয় ব্যাঙ্ক এখনও বেসরকারী মালিকানার অধীনে রয়েছে সেগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে, বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি নিয়ে নেওয়ার কথাও বিবেচনা করতে হবে, সাধারণ বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে, ৭৫ হাজার টাকার চেয়ে বেশী দামের বসত বাড়ী তৈরী করা বন্ধ করতে হবে ইত্যাদি। এই কর্মসূচীর কতটা শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বাধীনে কংগ্রেসের পক্ষে মেনে নেওয়া ও আন্তরিকতার সঙ্গে কার্যকর করা সম্ভব হবে বলা কঠিন। কিন্তু মুশকিল এই যে, মালব্য কমিটির রিপোর্টটি বেরিয়ে গেছে। এখন এই রিপোর্টের সুপারিশগুলিকে নরম করতে গেলে আমেদাবাদের কংগ্রেসীরা দুয়ো দেবেন না? শ্রীমতী গান্ধীর শিবিরের অভ্যন্তর আগুয়ানদেরই কি ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

১৮-১২-৬৯

শোকাবহ মৃত্যুর পর

কলকাতার ইডেন উদ্যানের গেটে ছয়টি তাজা তরুণ প্রাণের শোকাবহ মৃত্যুর কোনো সান্ত্বনার ভাষা আমাদের জানা নেই। যারা শুধু খেলা দেখতে চেয়েছিল খোলা জায়গায় এমনভাবে পদপিষ্ট হয়ে তাদের জীবনাবসান হবে এ যেন কল্পনারও অতীত। অথচ এত বড় একটা মর্মান্তিক ঘটনার পরও ইডেনে খেলা অনুষ্ঠিত হল এবং একজন মন্ত্রী বললেন, ভবিষ্যতেও খেলা হবে। কারণ, তাঁর মতে, পৃথিবী গোজ্ অন। একটা তদন্তের ব্যবস্থা করেই যেন আমাদের সব কর্তব্য শেষ। সভ্য, স্বাধীন দেশে বিনাকারণে খোলা জায়গায় ক্রীড়ানুরাগী ছয়টি তরুণ পদপিষ্ট হয়ে মারা গেল, তার জন্য সরকারের বা ক্রীড়াব্যবস্থাপকদের কোনো শোক নেই, অনুতাপ নেই। এ ভাবলেও নিজেদের প্রতি ধিক্কার জাগে। এদেশে সত্যিই মানুষের প্রাণের কোনো দাম নেই। মনে হয় যেন আমাদের এই শহর এক অন্ধ মৃত্যুমত্ততায় আক্রান্ত হয়ে এক ভয়ংকর পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। নিয়তির নিষ্ঠুর ইঙ্গিতে গোটা সমাজ আজ এক নির্মম তাণ্ডবে মত্ত।

এই ইডেন উদ্যানেই দু' বছর আগে আরেকবার খেলার দর্শকদের ওপর চলেছিল পুলিশের বর্বর অত্যাচার। তখন কারও মৃত্যু হয়নি। কিন্তু দু' বছর আগেও গোটা দেশ সেই অত্যাচারের প্রতিকারে গর্জে উঠেছিল। আজ যাদের প্রাণ গেল তা কাদের দোষে সে প্রশ্ন আমরা করছি না। কিন্তু এতগুলো তরুণ প্রাণের দাম কি, সে সম্পর্কে কি সমাজ এমন নির্বিকার হয়ে থাকতে পারে? প্রতিদিনই এমন সব ঘটনা ঘটছে যার ফলে মানুষ করুণতম ট্র্যাজেডি সম্পর্কেও যেন নির্লিপ্ত হয়ে পড়ছে। কারণে এবং অকারণে মানুষের প্রাণ আজ বিপন্ন। এ সম্পর্কে কি আমাদের সমাজের কোনো করণীয় নেই? ইডেনের শোকাবহ ঘটনার পর এটাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।

দু' বছর আগের কেলেঙ্কারীর পর তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী এবারে খেলার মাঠের ভিতরকার ব্যবস্থা ভাল হয়েছিল। সকলেই ভেবেছিলেন কলকাতার খেলার মাঠকে ঘিরে যে স্বার্থপরতার কারবার চলছিল তা শেষ হতে চলেছে। কিন্তু এবারেও টিকিট নিয়ে হাহাকারের অন্ত ছিল না। টেস্ট খেলা দেখবার জন্য বাংলাদেশের ক্রিকেট অনুরাগীরা কতদিন থেকে অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু টিকিট কোথায়? ভিতরকার বসবার ব্যবস্থার উন্নতি হলেও ভেতরে ঢোকবার সৌভাগ্য হয়েছিল ক'জনের। টিকিট সংগ্রহের জন্য তাই সর্বত্র ক্রীড়ানুরাগী মহলে উদ্বেগ ও আকুলতা দেখা গিয়েছিল। ইডেনের ট্র্যাজেডির মূলে ছিল সাধারণ দর্শকদের জন্য দৈনিক টিকিটের স্বল্পতা এবং তা সংগ্রহব্যবস্থার ত্রুটি।

বেশী টাকার টিকিট শেষ হয়ে গিয়ে সাধারণ দর্শকদের সম্বল ছিল এই দৈনিক টিকিট। তরুণ ক্রিকেট অনুরাগীরা এই টিকিট কেনার জন্য সারারাত্রি হিম মাথায় করে ইডেনের মাঠের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা তাদের অসীম। তবু এইভাবেই তারা খেলা দেখেছে। কারণ তাদের অভিযোগ করবার কোনো জায়গা ছিল না। প্রতিবারেই এইভাবেই তাঁরা টিকিট সংগ্রহ করে থাকেন। এইবারেও সেই আশাতেই তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন। তিনদিন নির্বিঘ্নে পার হয়ে যাবার পর সকলেই কলকাতার দর্শকদের ক্রীড়ানুরাগের উচ্চপ্রশংসা করেছেন। অস্ট্রেলিয়া দলের ম্যানেজারও বলেছেন, কলকাতার মাঠ ও কলকাতার দর্শকরা উত্তম। কিন্তু সব ভাল যার শেষ ভাল। সেই শেষরক্ষা আর হল না। ইডেনের খেলার এই মর্মান্তিক পরিণতি শুধু শোকের নয়, আমাদের গভীর কলঙ্কেরও বিষয়।

শ্রী কে, সেনের ওপর এই মর্মন্তুদ ঘটনার তদন্তের ভার অর্পণ করা হয়েছে। তিনি দু' সপ্তাহের মধ্যে তদন্তের রিপোর্ট পেশ করবেন। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা নিশ্চয়ই তিনি তদন্ত করবেন। দর্শক ও প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ এই যে, ভিড় সামলাবার নামে পুলিশের লাঠিচালনা এবং ঘোড়সওয়ার পুলিশের ঘোড়া চালনাই নাকি লাইনের লোকদের ভীতসন্ত্রস্ত করে দেয় এবং তার ফলেই আতঙ্কে পালাতে গিয়ে ছয়টি তরুণ পদপিষ্ট ও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। পুলিশের সম্পর্কে দেশের মানুষের অভিযোগ বহুদিনের। জনসাধারণের প্রাণ নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলে। পুলিশবাহিনীর চরিত্রের কোনো পরিবর্তন গত বাইশ বছরে হয়নি। আগে কংগ্রেসকে এর জন্য দোষ দেওয়া হত। বর্তমান সরকারও তো পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং এর প্রতিকার কী।

তদন্তের ফলে দুর্ঘটনার কী কারণ বের হবে তা জানি না। কিন্তু একটি বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, প্রশস্ততর মাঠের ব্যবস্থা এবং টিকিট বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হলে কলকাতার ক্রীড়াদর্শকদের জীবনের অভিশাপ দূর হবে না। স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য দুই দশক ধরে কত পরিকল্পনা, কত আশ্বাস, কত স্তোকবাক্য বাংলার মানুষ শুনেছে। ভারতের সমস্ত প্রধান নগরীতে স্টেডিয়াম তৈরী হয়ে গেল। কিন্তু যে-কলকাতায় সবচেয়ে বেশি দর্শক সেখানেই আজ পর্যন্ত স্টেডিয়াম নির্মিত হল না।

ইডেনের দ্বারপ্রান্তে ছয়টি ক্রীড়ানুরাগী যুবকের প্রাণদানের পরেও যদি সরকার কলকাতার স্টেডিয়ামের দাবি পূরণে টালবাহানা করেন তাহলে বুঝতে হবে এই শোকাবহ মৃত্যু থেকে আমাদের সমাজ এবং আমরা কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করিনি। ছয়জনের মৃত্যুর পরেও পৃথিবী ঠিকই চলবে, কলকাতার খেলাও বন্ধ হবে না। কিন্তু যে-মৃত্যু অকারণ, যে-মৃত্যু মানুষের প্রচেষ্টাতেই রোধ করা যেত তার জন্য কি আমাদের বিবেক এতটুকুও জাগ্রত হবে না? তা না হলে বুঝতে হবে, মত্ততায়, অহংকারে এবং স্বার্থবুদ্ধিতে আমাদের শুভবুদ্ধিরও অবসান ঘটেছে।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

মাঝে মাঝে চোখের উপর সেই দৃশ্যটা ভাসে—কেমন আনমনা হয়ে যাই—এক যুবক, হাতে তার খাঁড়া—নিয়ত নৃত্য করছে পথে ঘাটে, মিছিলের আগে, তাসাপার্টি নিয়ে, নির্বাচনে জয়ী মিছিলের সামনে। হাতে খাঁড়া, সে নৃত্য করছে। ব্যাগপাইপ যে বাজায় তার আগে অথবা যে ফ্লুট বাজায় তার পেছনে সেই যুবক হাতে তার খাঁড়া, —কেবল মাতালের মতো নৃত্য করছে। কেন যে সে এমন নৃত্য করে আমরা জানি না, জানলেও চোখ বন্ধ করে রাখি। চোখ খুললেই বুক কাঁপে। হাঁ মা কালী, পোড়া-কপালি, তোর পায়ে পাঁঠাবলি বলে সেই যে মাথায় খাঁড়া তুলে নিয়েছে আর নামাচ্ছে না। আমরা যারা ফ্লুট বাজাই মাঠে গঞ্জে এবং তাসাপার্টি নিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করি— এই খাঁড়ার বুকে রক্ত দেখলে হাই ওঠে।

এবার আমি একজন মানুষের গল্প বলি। জন্মের সঙ্গে তার কিছুই ছিল না। ছিল শুধু শক্ত হাত, চওড়া কাঁধ। শৈশবে সে আপনার আমার মতো ফ্লুট বাজাবে এমন স্বপ্ন দেখতো। তার কিন্তু ফ্লুট বাজনা শেখা হলো না। শৈশবে সে যাত্রাপার্টিতে রাম রাবণের যুদ্ধ দেখেছে। বরাবরই তার রাম সেজে সীতা উদ্ধারের আশা। পঞ্চবটী বনে সে রামের দোসর লক্ষ্মণ হয়ে নদীর পারে পারে হাঁটতে চায়। কিন্তু বড় হতে গিয়ে নিত্য তার জীবনের গ্লানি। শৈশবের স্বপ্ন পাখি হয়ে হাওয়ায় উড়তে থাকে। তারপর পাখিটা একদিন চলে গেলে থাকে শুধু মরুভূমি, এবং অন্ধকার। সে অন্ধকারে দুই হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। সংসারে সে কিছু পেল না, তার যা কিছু স্বপ্ন আপনি আমি অথবা যারা তাসাপার্টি নিয়ে বিজয়ের মিছিল বার করি, এবং যারা ফ্লুট বাজায় নদীর পারে পারে—হরণ করে নিয়েছে। চোখের সামনে তার এতসব উজ্জ্বল হরেক-রকম বিলাস উপকরণ, নানা পণ্য সামনে—দুধারে তাকালে ইট কাঠ রোশনাই—সে সবের সে কেউ নয়। তখন তার চওড়া কাঁধ, আরও চওড়া হতে থাকে, হাতের পেশী ফুলে উঠতে থাকে। দুহাত অন্ধকারে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে—যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কবিতা, এই যেমন টিয়াপাখি আঁখি-জল এবং প্রেম ভালবাসা সবাইকে সে দু-হাতে বিনষ্ট করে দিতে চায় এবং ভিতরে ভিতরে তার এক প্রলয়ংকর চেতনা—বুম বুম ফাঁস। সে তখন দুহাতে তুবড়িতে আগুন দিয়ে বলে দ্যাখো আমি এক মানুষ শৈশবে যে সীতাউদ্ধারের স্বপ্ন দেখত, যে লাল নীল পাখি ওড়াতে চাইত, আকাশে, সে এখন হাতে তুবড়ি জ্বালিয়ে রাখে, তাসাপার্টিতে ঢাক বাজায়। অথবা নেড়ি কুকুর অথবা যা কিছু অসহায় সংসারে সব কিছুর জন্য ভালবাসা তার। সে ইচ্ছে করলে যে বাবু গাড়ি চালিয়ে যায় এবং অলক্ষ্যে কুকুরকে চাপা দেয়, তাকে ধরে এনে কান মলে দিতে পারে— তারও কিছু করণীয় থাকে তখন। সে, হেলা-ফেলা মানুষগুলোর হয়ে তখন লড়াই করতে চায়, লড়াই বাধাতে চায়। দ্যাখো কোথায় কি আছে কে আর আছে আমাদের আলাদিনের প্রদীপ এনে দিতে পারে, বলে সে যেন হাঁক ছাড়ে।

একদিন সে আমাদের অফিসের সামনে খাঁড়া নিয়ে নৃত্য করল। সেই আবার অন্য-দিন যার হয়ে নির্বাচনে লড়াই করল, খুনজখম করল, অন্যপক্ষ নির্বাচনে জিতলে মিছিলের আগে আগে নাচতে নাচতে বের হয়ে গেল। কারণ তার কোন পক্ষই নেই, যে পক্ষ জেতে সেই পক্ষেই সে তাসাপার্টি বাজায়। তার খাঁড়া নৃত্য দেখে সেদিন আমরা দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। বন্ধ দরজার উপর খাঁড়া চালিয়েছিল। অপরাধ, নির্বাচনে ইস্তাহার লিখতে দিই নি। দেয়ালে দেয়ালে ইস্তাহার, নতুন দেয়াল, কি সাদা আর কবিতার মধ্যে [illegible] নতুন বাড়ি উঠছে, সেখানে কালো রঙে আল-কাতরায় পার্টির নাম, এবং নির্বাচনে জিতলে কি হবে এই দেশে, বাঙলা দেশে, সবুজ শ্যামল আভায় মাঠ ঘাট ভেসে যাবে—আরও সব নতুন নতুন কথা যা কোনদিন একমাত্র আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ এনে দিতে পারে। সেই সব কথা বলে নির্বাচনে জেতার কি প্রাণান্তকর ইচ্ছা— তারপর জেতা হয়ে গেলেই সব হয়ে গেল যেন, নিমেষে সেই প্রদীপ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়, এবং বলে, দ্যাখো আমি এক রাজার ছেলে—এখন নিয়ম কানুন সব আমার হাতে যখন তখন আর নদী পারাপার হবে না। সুতরাং বলি সেই মানুষটার আর দোষ কি। সেও তার সুবিধামতো নদী পারাপারের তাল খুঁজছে।

সে আমার কাছেও এসেছিল। সে অনেকদিন পর। সে একটা লিস্ট দিয়েছিল। এখন নদীতে কত জল আমি জানি না, জানি শুধু এভাবে নদী বেশি দিন জল বহন করতে পারে না। বন্ধ চড়া মুখ, কখন গতিপথ পাল্টে যায়। সে বলেছিল, এদের আপনার নিয়োগপত্র দিতে হবে। উপরে তার নাম লেখা। সে কাজ চায়। আমি কিন্তু কাজ দিতে পারিনি। কারণ আমার ক্ষমতা সীমিত। দিন দিন যা হচ্ছে কোনদিন আমি নিজেই বেকার হয়ে যাব। তবু বললাম, কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই আপনাদের কথা ভেবে দেখবেন। আমি তাঁদের কাছে আপনাদের খবর পৌঁছে দেব।

সে চলে গেলে মনে মনে হেসেছি মাত্র। ভিতরে ভিতরে যে ক্ষয় আরম্ভ হয়েছে তা রোধ করে কার সাধ্য। কারণ দেয়ালের লিখন আমরা সবাই পড়তে ভুলে গেছি। এতদিন আমরা নানাভাবে প্রবঞ্চনা করেছি তাকে। দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়লে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। নিজেকে চিনতে পারিনি। এবং সে আবার যখন আসবে, রুদ্রমূর্তি নিয়ে আসবে তাও আমি টের পেয়েছি। এবং সে যথার্থই এসেছিল। আমার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। কি ভয়ঙ্কর চেহারা। কাউ বয়দের মতো বেল্ট আঁটা কোমরে। যেন সে বেল্টের ফাঁকে রিভলভার পুরে রেখেছে এমন ভাবে দুহাত কোমরে রেখে বলেছিল, চাঁদা।

কিসের চাঁদা?

সে হেসে ফেলেছিল। একেবারে ছেলে-মানুষের মতো হাসি :—এই সামান্য টাকা দিতে হবে, [illegible] চাঁদা।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

—আপনাকে তো কোনদিন চাঁদা দিই নি।

—এখন দিতে হবে।

—দিতে হবে বললেইত দেওয়া যায় না। কোম্পানীর টাকা আমি ইচ্ছা করলেই হুট করে খরচ করতে পারি না।

—পারেন কিনা একবার দেখিয়ে দেব। সে যেন এবার কোমরে হাত রাখল। ইচ্ছা করলেই একটা কিছু বের করে আনতে পারে এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে ছুঁড়ে দিতে পারে। তার ছেলেমানুষের মতো হাসি আমার অন্তরাত্মায় শুকিয়ে দিল। সে কেন এমনভাবে কথা বলছে, ওর চোখে-মুখে নিদারুণ ঘৃণা— এই যে বাড়ি ঘর, আসবাবপত্র, চিত্র দেয়ালে বড় বড় মানুষের, এবং মহামানবদের ছবি, এরই বংশধর সে। মাথার উপর বিদ্যাসাগরের ছবি ছিল, এক-বার বলতে ইচ্ছা হল চেন এঁকে। তারপর মনে হল, সেই জগৎ এবং জীবন মানুষের ফুরিয়ে গেছে। তুমি বিলাসে ব্যসনে থাকবে আমি নিত্য দুঃখী লোক সেজে থাকব, রাস্তার জীবন কাটাব —সে আর হয় না। অনেকদিন সুখভোগ করেছ, অনেক-দিন ফ্লুট বাজিয়েছ। এবারে চাঁদ এসো পথে এসে দাঁড়াও। পথে নেমে একসংগে ফ্লুট বাজাই।

সে বলল, কি মুখ বন্ধ কেন?

আমি বললাম, হবে না। চাঁদা হবে না।

—স্যার খুব ভুল করছেন। ভাবছেন পুলিশ ডাকবেন।

—পুলিশ ডেকে কিছু হয় না।

সে এবার কেমন চোখ গোল গোল করে ফেলল। তারপর বলল, আপনাদের তো এতদিন পুলিশই ভরসাস্থল ছিল।

—তা হবে হয়তো।

—তবে দেখছি সব বুঝতে পারছেন। সে এবার কেমন আবদারের সুরে বলল, দিন স্যার, না দিলে হবে না। এ কাজটা আমাকে উদ্ধার করতেই হবে।

বলে সে ভালো মানুষের মতো চেয়ারে বসে পড়ল। মনে হল সহসা ওর ভিতর আবার সেই যাত্রাপার্টির ছবি ভাসছে, রাম-রাবণের যুদ্ধে সে সবসময় রামের পার্টই করতে চেয়েছিল—কিন্তু পারেনি। রাবণের পার্টে নেমে সে কেমন নিজেই নিজের একটা মুন্ডু কেটে অন্য মুন্ডুটা ঘাড়ে বসিয়ে দেয়। দশটা মুন্ডু তার যখন যেটা খুশি ঘাড়ে লাগিয়ে রাখে। এখন যেন সে ঘাড়ে রাবণের ভালবাসার মুন্ডু লাগিয়ে রেখেছে।

আমার আর ভয় করছিল না তাকে। মনে হয় না এই মানুষটা কথায় কথায় বোমাবাজী করতে পারে। সে একদিন একা দশটা বোমা নিয়ে বড় রাস্তায় সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো লাল-নীল বলের খেলা দেখিয়েছিল। আশ্চর্য একটা বোমা হাত থেকে ফসকে যায় নি এবং ফসকে গেলেই সে জানে এই খেলা নিত্য খেলার মতো সাঙ্গ করে দেবে জীবন—সে কি যে হয়ে যায় তখন—এখন এই মুখ দেখে ভালবাসার মুখ দেখে চেনাই যায় না। সে তখন রাবণের পার্ট মুখস্থ করতে করতে বড় বড় ইট কাঠের প্রাচীর এবং দৌলতখানা পার হয়ে যায়—সে আঁৎকে উঠে—আমার স্বর্ণলংকা কোথায়?

এসব কথা আমারও ভালো লাগে। মাঝে মাঝে দর্পণে নিজের মুখ দেখি। সময়ের দর্পণ প্রতিবিম্ব ধরে রাখে, কিন্তু এতদিনেও সে প্রতিবিম্ব ধরা পড়েনি। আশ্চর্য হয়ে বলি, নিয়ে যান। সবটা দিতে পারলাম না। আবার আসবেন সবটা দেবার চেষ্টা করব। কারণ সে যে টাকার অংকের রিসিট আমার টেবিলে রেখেছিল —সেটা দেবার ক্ষমতা আমার যথার্থই ছিল না।

—ঠিক আছে এখন তাই দিন। সে আমার দেবার সামর্থকে বিশ্বাস করে উঠে পড়ার সময় বলল, একটা কথা বললে রাগ করবেন না স্যার?

—কি কথা? মনে হল সে যেন কোন অপরাধের কথা এবার চুপি চুপি আমাকে বলবে। আমার ভিতরে ফের অস্বস্তি হতে থাকল।

সে যথার্থই শিশুর মতো বলল, সেই যে বলেছিলাম?

—কি বলেছিলেন?

—আপনি স্যার ভুলে গেলেন

আমি কিছুতেই কোন অপরাধের কথা এ সময় স্মরণ করতে পারলাম না।

সে বলল, চাকরির কথাটা। দিন না একটা চাকরি। এই যা হয়। এভাবে আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা হয় না। হাত জোড় করে বলছি, স্যার আর পারছি না। সারা-ক্ষণ মাথায় আগুন জ্বলে।

* * *

আমি ওর জন্য কিছু করতে পারি নি। বস্তুত আমার কোন ক্ষমতাই ছিল না করার। সে এখনও আশায় আশায় আসে। আবার চলে যায়। মিছিল বার হলে নাচে। দেখলে মনে হয় ফের কেউ যেন তাকে আলাদিনের প্রদীপ হাতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কবে যে কি হবে, কেউ কিছু সঠিক করে বলতে পারছে না। শুধু সন্তর্পণে অনুসরণ করতে বলছে।

আমরা কিন্তু ভুলে যাই, এভাবে বেশি-দূর নিয়ে যেতে পারি না। মাথার আগুনটা বেশি সময় জ্বললে, খেতে থামারে, কল-কারখানায় নতুন সূর্য উঠে আসে। বেশিদিন তাকে কিছুতেই আটকানো যায় না।

আর তখনই মনে হয় সময়ের দর্পণ প্রতিবিম্ব ধরে রাখে।

জগদীশকে ক্লাসে সহপাঠীরা 'জগা' বলে ডাকত, আদর করে বলত 'জগু'। জগদীশের আসল ডাক নাম কেউ জানত না—মাস্টারমশাইরা বলতেন 'জগমোহন'। লাস্ট বেঞ্চের সহপাঠীরা একটা নাম ধরে হাসাহাসি করতো কি, ক্ষেপাত, জংলী, না 'জংলু' কি একটা বলতো!

কিন্তু যে যাই বলুক জগদীশ জগদীশই ছিল, ক্লাসের ফার্স্ট বয়! এ্যানুয়েল পরীক্ষা কি প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে ওকে পিতৃদত্ত নামেই ডাকতে হত, শ্রীমান জগদীশচন্দ্র বসাক! জগদীশ প্রাইজের বইগুলো আঁকড়ে ধরে হাসতোঃ কেমন নাম খান্ত করবে এবার?

অর্থাৎ জগদীশচন্দ্র ছাত্র হিসেবে খুবই ভাল ছিল। এখনো ওর সহপাঠী কেউ যদি থাকে, বললেই চিনতে পারবে তিরিশ বছর

আগে সত্যেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল একাডেমীর জগদীশকে, যে নিচু ক্লাস থেকে উঁচু ক্লাস পর্যন্ত বরাবর ফার্স্ট হয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় জলপানি পেয়েছিল।

বাল্যকালের সতীর্থ বা সহপাঠীদের কারো কারো নাম মনে থাকা আর সেই নাম ধরে তাকে চেনা সম্ভব হলেও এতদিন পরে তাকে চাক্ষুষ দেখে চেনা অসম্ভব না হলেও চেনা শক্ত!

ডান হাতের বাজারের থলিটা বাঁ-হাতে নিয়ে কপালের ঘামটা জামার হাতা দিয়ে মুছে রমেশ রাস্তার মাঝখানে একটু যেন থমকে দাঁড়াল, নিজের মনে কেমন বিরক্ত হয়ে উঠলো, মাছওলার সংগে আজ বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেছে, আকাশ-ছোঁয়া দাম হয়েছে কিন্তু ওজনের বেলায় কম দেবে, বললেই বাবুদের আবার রাগ হবে, তর্ক করবে, চোট্‌পাট্‌ করবে যেন মাছ কিনতে এসে ওরাই চোর হয়ে গেছে।

মাথার ঘাম মুছে রমেশ নিজের মনে

গাল কেড়ে বললে, শালা সব চোর হয়ে গেছে। চোরের রাজত্ব!

রমেশ অতটা খেয়াল করেনি, বাজার করে ফেরবার সময় কোনদিন আশ-পাশও সে লক্ষ্য করেনি। মনে হয় যেন বোঝাটা এখনি নামিয়ে দিতে পারলে বেঁচে যায়—পাপের বোঝা যেন!

'রমেশ না?' প্রায় সামনে থেকে কে যেন জিজ্ঞেস করলে।

রমেশ মুখ তুলে চাইলে, কিন্তু লোকটিকে ঠিক চিনতে পারলে বলে মনে হল না। কেমন অপ্রস্তুতের মত চেয়ে রইল।

লোকটি এগিয়ে এসে বেশ অন্তরঙ্গতার সুরে বললে, কি হে, চিনতে পারছো না? আমি নিশ্চয়ই ভুল করিনি, ইউ আর রমেশ!

নিজের মুখটা ইদানিং আয়নায় দেখতে আর ভাল লাগে না, পাকা চুলে মাথা ভরে গেছে, কপালে টান ধরেছে, চিবুক সংলগ্ন গলায় অনেকগুলো খাঁজ পড়েছে, বার্ধক্য—

দৃশ্যত এ লোকটিও বৃদ্ধ, কিন্তু রমেশ মনে মনে যেন মিলিয়ে নিয়েছে, তার মত নয়, বেশ শক্তসমর্থ মনে হচ্ছে। মুখটা ভরাট, কলপ ব্যবহারে চুলের রং অস্বাভাবিক রকমে কালো, স্বাস্থ্য অটুট, বেশবাসও—

হঠাৎ যেন মুখটা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, রমেশ সঙ্গে সঙ্গে বললে, চিনতে পারবো না কেন, 'জগু'! কতকাল পরে—

ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, গলায়-চাদর দেওয়া ভদ্রলোকের মুখের ওপর যেন ছায়া খেলে গেল, আত্মপরিচয়ে খুব খুশী মনে হল না। একালের জগদীশকে কেউ জগু বলতে পারে তাঁর ধারণার বাইরে।

ভদ্রলোক বললেন, তা হলে মনে আছে! চিনতে পেরেছ?

তেমনি বিহ্বল, অপ্রস্তুত রমেশ, কালে ক্লাস-ফ্রেণ্ড 'জগা' যে এমনি জগদীশ হয়ে উঠবে তার কল্পনার বাইরে ছিল; হোক তার বয়সী তবু যেন কত জোয়ান মনে হচ্ছে, বেশ পুরন্ত মুখ-চোখ, কপাল চকচকে, চুল পাকলেও বেশ ঘন আর কাল দেখাচ্ছে।

হেসে জগদীশ বললে, তা হলে এখনো চিনতে পারনি, আই সি—

না-না, বাজারের থলিটা যেন আড়াল করতে যায় রমেশ, বললে, বলছি তো, তোমার চেহারাটা বেশ আছে, কিন্তু—

জগদীশ হেসে বললে, বুড়ো বয়সে আবার চেহারা! এখন আর কি দাম আছে!

রমেশ যেন প্রশংসা করলে, তোমাকে কিন্তু বুড়ো মনেই হয় না। বেশ খুশী হয় জগদীশ, সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলে, সত্যি?

চুল না পাকলে কে বলবে—

সহপাঠীকে থামিয়ে দিয়ে জগদীশ বললে, বাদ দাও, বাদ দাও! আর ক'দিন আছি বল!

তার মানে? দেখে তো মনে হয় পরিপূর্ণতা এখনি, এরমধ্যে মনের এ অবস্থা কেন। রমেশ ভাবলে, তার স্বাস্থ্যটাও যদি জগদীশের মত হতো তা হলে সে বুঝি আর কিছু চাইতো না। এই সামান্য পয়সার বাজারের জন্যে মনে কোন দুঃখও করতো না, জীবন সংগ্রামের অনিবার্য ক্ষুদ্রতাও কিছু সে গায়ে মাখতো না। বেশ হিংসে হচ্ছে বাল্য বন্ধু জগদীশকে দেখে।

জগদীশ বললে, তারপর কেমন আছ?

ভাল-মন্দ কিছু না বলে, কেমন করুণ মুখ করে রমেশ সহপাঠীর মুখের দিকে চাইলে তারপর যেন জোর করে অস্ফুটে বললে, ভাল।

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন জগদীশ করলে, কি করছো? ছেলেপুলে কটি? বাড়ী-ঘর?

তেমনি করুণ করে রমেশ বললে, কি আর, চাকরি! পাঁচটি! ভাড়া বাড়ি।

বেশ অন্তরঙ্গ মনে হয় জগদীশকে বহুকাল পরে সহপাঠী বন্ধুকে কাছে পেয়ে। বললে, ছেলে কটি? কি করছে? পড়াশোনা—

মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করেও যেন বন্ধুর সামনে সহজ হতে পারে না রমেশ, বারবার কেমন যেন নুয়ে পড়ে। চিঁচিঁ করে বললে, ছেলে নেই, সব মেয়ে ভাই। দুটির বিয়ে হয়ে গেছে, দুটি কলেজে পড়ছে, একটি বি-এ পাশ করে বসে আছে!

জগদীশ শুভানুধ্যায়ীর মত বললে, বসে থাকবে কেন, এবার ও-রও বিয়ে দিয়ে দাও!

রমেশ সঙ্গে সঙ্গে বললে, একটা পাত্তর দেখে দাও না ভাই দয়া করে!

জগদীশ ফুৎকার দিলে, ওরে বাবা, আজকালকার দিনে পাত্র পাওয়া আর বাড়ী পাওয়া মুখের কথা নয়!

তা হলে? সাধে কি আর বাপ-মা ঘরে মেয়ে পুষে রাখে! পায় না বলেই—তারপর প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটায় ফিরে গিয়ে রমেশ জিজ্ঞেস করলে, তোমার ছেলেপুলে কটি?

মুখ-চোখের অদ্ভুত ভাব করে জগদীশ বললে, দুটি! হেঁ হেঁ ফ্যামিলী প্ল্যানিং—বহুকাল আগেই, এখন বন্ধুদের টনক নড়েছে।

রমেশ নিজের লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে যেতে চায়, বললে, ভাগ্যবান!

জগদীশ হাসতে হাসতে বললে, ভাগ্য কি আর এমনি হয়েছে, অনেক কসরৎ—

অর্থাৎ! সে আলোচনা আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে করা যায় না এই বয়সে।

আপন ভাগ্যে উৎফুল্ল জগদীশ বললে, দুটিই ছেলে—একজন ডাক্তারী পড়ছে, একজন আই-এ-এস পরীক্ষা দিচ্ছে—

রমেশ যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায় বাল্য সহপাঠীর ভাগ্যে—যেমন ক্লাসে ভাল ছেলে ছিল, তেমনি সংসারটাও ভালভাবে দাঁড় করিয়েছে।

রমেশ বললে, তুমিও তো বড় চাকরি করছো, কাগজে যেন একবার নাম দেখলুম!

জগদীশ বিনয় করে বললে, ও কিছু নয়, কাগজওলাদের যেমন, খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই!

রমেশ বন্ধুর খ্যাতিতে যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আমাদের বেলায় তো কই খবরের কাগজওলারা খেয়ে-দেয়ে কাজ পায় না।

বে'চে থাকতে না জানুক মরলেও কি তাই কেউ জানবে?

জগদীশ বললে, থাকগে, থাকগে, বাদ দাও! খবরের কাগজ একটা জিনিষ তার জন্যে আবার এত!—এবার বল তুমি কি করছ?

যেন নিজেকে শেলষ করে রমেশ বললে, সবাই যা করে, মাছি মারছি!

জগদীশ বললে, তাতে কি, কাজ তো! ওকথা বলচো কেন?

ম্লান হেসে রমেশ বললে, না তাই বলচি! তারপর এদিকে এসেছিলে কেন? কোন কাজ-টাজ?—

জগদীশ হঠাৎ বড় আত্মসচেতন হয়ে ওঠে বললে, কাজের কি আর শেষ আছে! ছুটির দিনেও রেহাই নেই—

রমেশ ঠিক বুঝতে পারে না একদা সহপাঠী বন্ধুকে কাজের কথা জিজ্ঞেস করে অন্যায় করেছে কিনা! মুখ কাঁচু-মাচু করে বললে, এমনি জিজ্ঞেস করচি, যদি কিছু গোপনীয় বা গুরুতর হয় তো—

সহপাঠীর বন্ধুর বুকে এক ঠেলা দিয়ে পরম আত্মীয়তার সুরে জগদীশ বললে, আরে না-না, এই পাড়ায় এসেছিলুম লক্ষ্মণচন্দ্র লক্ষ্মীবাই স্কুলের একটা কমিটি মিটিং ছিল, স্কুলটা বাড়ান হচ্ছে কিনা, গার্লস সেকশনটা একসটেনড করা হবে।

রমেশের মনে পড়ল বটে, আজ ক'মাস ধরে লক্ষ্মণচন্দ্র লক্ষ্মীবাই স্কুলের হ্যান্ডবিল-গুলো পাড়ায় পাড়ায় বিলি হয়ে এবার পাড়ার মুদিখানা বা ভুজাওলার দোকানের সওদার মোড়ক হয়ে বাড়ী বাড়ী আসছে: দেওয়ালে-মারা পোস্টারগুলো এখনো আছে বোধ হয়।

প্রথম সুধারই চোখে পড়েছিল, হ্যান্ড-বিলটা বাবাকে দেখিয়েছিল ঃ এই তো পাড়ার মেয়ে স্কুলটা বড় হচ্ছে, ক্লাশ এইট পর্যন্ত হবে। নিশ্চয়ই শিক্ষক দরকার হবে—

রমেশেরও কথাটা মনে লেগেছিল, যেন পাড়ার লোক বলে তার শিক্ষিতা মেয়েকে স্কুল কর্তৃপক্ষ খুশী হয়েই নিয়ে নেবেন। আর ছুটে-হে'টে কোথাও যেতে হবে না, খুব সুবিধে পাড়ার মধ্যে, একেবারে বাড়ীর দোর গোড়ায়! আহা এমন সুযোগ—

তারপর বাপ মেয়েতে যুক্তি করে একটা দরখাস্ত লিখে দিয়ে এসেছে। খুব আশা আছে শিক্ষকতার কাজটা সুধার হয়তো হবে।

প্রায় গদ্‌গদ্‌ হয়ে রমেশ বললে, আরে তুমি কমিটিতে আছ! তা হলে তো—

জগদীশ হাসতে লাগল, যেন সহপাঠী বন্ধুকে একটা চমক দিয়েছে, অর্থাৎ জগদীশ এখন একটা যে-সে লোক নয়! আর সত্যিই, রমেশ যেন মুগ্ধ বিস্ময়ে জগদীশের পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। চেহারা তো এমনি ভালই, তার ওপর দামী ধুতি, পাঞ্জাবি, মুগার-পাড়-ওলা চাদর, পায়ে চকচকে জুতো! (হাতে একটা ছড়ি থাকলে জিজ্ঞেস না করেই চেনা যেত চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান বলে!)

দু'একটা কথার পর কাজের কথাটা এবার রমেশ বলে ফেললে, ভালই হলো তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে—তোমাক বলচি ভাই, তোমাদের স্কুল তো বাড়ছে, মাস্টার-টাস্টার নিশ্চয়ই নেবে, আমার মেয়েটাকে তোমার স্কুলে নাও তো ভাল হয়, দরখাস্ত করে রেখেছি!

কথা-দেওয়ার মত ভঙ্গি করে জগদীশ সাগ্রহে বললে, আচ্ছা দেখব, কি নাম বললে তোমার মেয়ের?

খুব যেন কানে কানে গোপনীয়ভাবে রমেশ বললে, সুধা বোস, তেত্রিশ-এর—

জগদীশ বললে, হয়েছে, হয়েছে— নাম হলেই হবে, ঠিকানা বলতে হবে না, তোমার মেয়ে তো, খুব মনে থাকবে!

তবু যদি মনে না থাকে, রমেশ পাড়ার স্কুল কমিটির সভাপতি বেপাড়ার লোককে বিশেষ করে বললে, মানে দরখাস্তটা হাতে লেখা, রুলটানা কাগজে, কি রকম জান লাল লাল রং—ফ্যাকাশে!

অনিবার্য কারণে এ সপ্তাহে **মানুষ গড়ার ইতিকথা** এবং **বইকুণ্ঠের খাতা** প্রকাশিত হোল না। আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হবে।

জগদীশ হাসলে, হয়েছে, হয়েছে আমার মনে থাকবে! এক গাদা দরখাস্ত এসেছে, সব বি-এ, এম-এ, বি-টি, অনার্স!

রমেশের মুখটা যেমন উজ্জ্বল হয়েছিল তেমনি আবার ম্লান হয়ে গেল। তাঁর সুধা তো মাত্র বি-এ, তাও কে'দে-কাঁকিয়ে!

রমেশ চিঁচিঁ করে বললে, ভাই আমার মেয়ে—তোমার জোরে—

রমেশকে কথা শেষ করতে না দিয়ে জগদীশ বললে, তোমার মেয়ে, আর কিছু বলতে হবে না। বি রেস্ট এ্যাসুওরড!

সুধার মাও তাই আশা করেছিলেন, যখন স্বামীর বন্ধুই নেওয়া-না-নেওয়া ব্যাপারে কর্তা, তখন ঘরের খেয়ে সুধা নিশ্চিন্তে মাস্টারীটা করতে পারবে। মেয়ে-দের আপিসের চাকরির চেয়ে স্কুলে পড়ান ঢের ঢের ভাল, আর ঐ তো সব চাকরিওলা মেয়েদের দেখছে, বাড়ীর কি উপকার হচ্ছে কে জানে, কি সব চালচলন, সাজগোজ, তারপর এক-একটা করে—

এ অনেক সম্মানের, ছেলে পড়ালে, চলে এলে! ফসটি-নসটি ইয়ারকি ফাজলামি নেই! বড়সাহেব নেই, ছোটসাহেব নেই, সহকর্মী বন্ধু নেই যে সন্ধ্যার সঙ্গে অল দিয়ে চলতে হবে! চাকরিতে উন্নতি হলো, কিন্তু—

সেদিন সুধার বাবা আপিসের মেয়েদের যে গল্প করেছিলেন সুধার মা জন্মে কখনো শোনেন নি, ছি-ছি আপিসে তাহলে মেয়েরা ওই করতে যায়! সুধার বাবা গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলেন ঠিকই, না হলে নিত্যি নতুন ফ্যাশান আসে কোত্থেকে? ক পয়সা মাইনে সব পায়?

'জান সুধার মা, সে তোমাকে কি বলবো, আমাদের আপিসের মেয়েগুলো যা আরম্ভ করেছে দেখলে ভয় হয়, আমার সুধারও যদি কোন আপিসে চাকরি হয় তা হলে?' সুধার বাবা অনেক দিন সুধা বি-এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে সুধার মাকে বলে-ছিলেন, 'আজকাল একেবারে ছ্যা-ছ্যা হয়ে গেছে! বুড়ো বুড়ো লোকগুলোও মেয়ে দেখলে যা করে তোমাকে কি বলবো, শুনলে কানে আঙুল দেবে!'

তখন সুধার মা কেবল বলেছিলেন, আমার সুধা তেমন মেয়েই নয়, চাকরি করবে বলে যে বেহায়াপনা করবে এমন শিক্ষা সে পায় নি, —

তবু বলা যায় না আপিসের চাকরি হলে সুধার মতিগতি কি হতো, যেন মেয়েদের সে-অধঃগতি থেকে সুধা খুব বেঁচে গেছে, এত চেষ্টা করে তার কোন আপিসে চাকরি না হয়েছে তো বয়েই গেছে।

উত্তেজনায় পথটা যে কিভাবে পার হয়ে এসেছিল রমেশ মনে করতে পারে না, তারপর বাজারের থলিটা যেন নেহাৎ অবজ্ঞা ভরে একধারে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলেছিল —সুধা! সুধা কই?

বাজার থেকে ফিরে কখনো এত উৎসাহ বা ব্যস্ততা রমেশের লক্ষ্য করা যায় না, বরং বেশির ভাগ দিন বড় বেজার আর বিরক্ত মনে হয়, মা বা মেয়ে কেউ-ই সামনে আসে না। তাছাড়া নিত্যনৈমিত্তিক বাজারের জিনিসগুলোর জন্যে আবশ্যকতা যতই থাক, ঔৎসুক্য কারো নেই—সেই তো থোড়-বড়ি-খাড়া! দেখবার কি আছে, বলবার কি আছে! চোখ বুজিয়ে বলে দেওয়া যায় বাজারের থলিতে কি আছে!

রমেশের ডাকটা বেশ উদ্দীপনা এবং উৎসাহব্যঞ্জক, সুধা, সুধার মা দুজনেই সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল—কিছু ঘটলো নাকি, মানে যে-লোক যেভাবে এই ছাব্বিশ বছর সংসার করছে!

উত্তেজনায় রমেশ বলেছিল, কবে যেন দরখাস্তটা দিয়েছিলি?

সুধা ঠিক বুঝতে পারেনি, রমেশ কোন্ দরখাস্ত, কোথায় দেওয়ার কথা জানতে চাইছে।

হঠাৎ মেয়েকে ধমকে দিয়ে রমেশ বলেছিল, এই জন্যে তোর কোথাও চাকরি জুটছে না, কোথাও কেউ ডাকছে না, যেন কাঠের পুতুল—

মেয়ের হয়ে সুধার মা বললে, স্পষ্ট করে না বললে ও বুঝবে কি করে, কত দরখাস্ত তো করেছে? কোনটা তাই বলবে তো!

আরো যেন ক্ষেপে গিয়েছিল রমেশ, চেঁচিয়ে বলেছিল, আর বলে কাজ নেই! যত সব হাঁ-করা মোদো!

সুধার চোখদুটো ছল-ছল করে উঠেছিল. আপন অপরাধটা কি. সে বুঝে উঠতে পারেনি। হাজারটা দরখাস্তর মধ্যে কোনটা কখন কোথায় পাঠিয়েছিল, সব সময় কি মনে থাকে? তাছাড়া বাবা কি জানেন না, সব দরখাস্তের মুসাবিদা উনিই তো করে দেন, দরখাস্তের ভাষা নিয়ে মাঝে মাঝে কত বকা-ঝকা করেন ঃ বি-এ পাশ করেছিস একটা সামান্য এ্যাপ্লিকেশন করতে পারিস না. কি লেখাপড়া সব আজকাল শিখছিস! কোয়ালিফিকেশন না কোয়ালিফিকেশনস্? নাঃ, চাকরি না হওয়াই উচিত।

প্রথম দিন কোন এক জায়গায় চাকরির প্রার্থী হয়ে দরখাস্ত লেখার অভিজ্ঞতার কথা সুধার মনে আছে. যেন বাবাই চাকরি দিচ্ছেন—নাকের জলে চোখের জলে করে ছেড়েছিলেন।

তারপর অবশ্য রমেশ নিজে থেকে ঠান্ডা হয়ে ব্যাপারটা মা-মেয়ের কাছে সগৌরবে ব্যক্ত করেছিল. তাহলে আর বলছি কি, আমরা ছেলেবেলা একসঙ্গে পড়তুম. জগু তখন হাফ-প্যান্ট পরে স্কুলে আসতো,

ক্লাসে সে চুপটি করে বসে থাকতো, খুব আঙুল চুষতো। সেই জগু, একেবারে চেনাই যায় না, ঐ স্কুলের আবার সভাপতি! বললে তো, তোমার মেয়ে আবার বলতে হবে?

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তারপর একমত হয়েছিলেন, আপিসের চাকরির চেয়ে মেয়েদের স্কুল-কলেজে চাকরি অনেক ভাল, মাইনে কম হোক সম্মান আছে, ইজ্জত আছে, কেউ বদনাম দিতে পারবে না—বলতে পারবে না, অত সাজ-গোজ, ফ্যাশান আসে কোথেকে! মা হয়ে বাপ হয়ে তো সে-সব কেচ্ছা শোনা যায় না।

কিন্তু লক্ষ্মণদাস-লক্ষ্মীবাই স্কুলের চাকরির তো কোন দেখা নেই। রোজই রমেশ বাড়ী ফিরে ভাবে, হয় ইণ্টারভিউ, নয় নিয়োগপত্র এসে গেছে, মা-মেয়ে তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছে।

খবরটা নিয়ে এল সুধার ছোট বোন ইরা, কইরে দিদি, তুই যে বলিছিলি লক্ষ্মণদাস স্কুলে তোর চাকরি হবে—তোর হল না!

সুধা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, কে বললে?

ইরা বললে, আমাদের কলেজে পড়ে গায়ত্রী, তার ছোট মাসীর ওখানে মাস্টারী হয়েছে!

কিন্তু বাবা তো বললেন, এখনো কাউকে নেওয়া হয়নি, কমিটির মিটিং হয়নি—সুধা সাতদিনের আগের খবর বললে, যেন এখনো আশা আছে লক্ষ্মণদাস লক্ষ্মীবাই স্কুলে মেয়ে টিচার যদি একজনও কাউকে নেয়, তাকে না জানিয়ে নেওয়া হবে না। স্কুল কমিটির সভাপতি নিজের মুখে কথা দিয়েছেন, তাছাড়া সুধার বাবার তিনি ছেলেবেলার বন্ধু, সহপাঠী।

খবরটা শুনে রমেশ স্থির থাকতে পারেনি, ছুটে স্কুলে চলে এসেছিল। প্রধানা শিক্ষিকাকে উত্তেজনা বশে কি যে বললে, নিজেই বুঝতে পারলে না। তারপর মাথা ঠাণ্ডা করে বললে, স্কুল বাড়ল, সব হল, কিন্তু আমার মেয়ের চাকরি হলো না কেন?

প্রধানা শিক্ষিকা রমেশকে প্রথমে এক-জন অভিভাবক ভেবে সম্ভ্রমে কিছু বলেননি, তারপর তার উষ্মার কারণ জানতে পেরে যথোচিত গাম্ভীর্য এবং আত্মমর্যাদার সঙ্গে বললো, চাকরি-বাকরির ব্যাপার তো কিছু জানি না, আমার কাজ—

রমেশ আবার মাথা গরম করে বললে, থামুন, কার কি কাজ আমার জানা আছে। এখন বলুন, সেই যখন মাস্টার নিলেন আমার মেয়েকে নিলেন না কেন, পাড়ার মেয়ে, বি-এ পাশ!

এতক্ষণে ভদ্রমহিলা ব্যাপারটা যেন বুঝতে পারলেন, বেশ ভদ্রভাবে বললেন, আপনার মেয়ে তো এম-এ পাশ নয়! আমরা দুঃখিত—

রমেশ দুঃখে রাগে কি যে বলবে ভেবে পেল না, বললে, ঠিক আছে, আমি আপনাদের সভাপতিকে বলবো, দেখি আপনারা কদ্দিন না নিয়ে থাকতে পারেন। সভাপতি আমার ন্যাংটা বেলার বন্ধু, একসঙ্গে আমরা পড়েছি।

প্রধানা শিক্ষিকা কিছুমাত্র বিচলিত হলেন বলে মনে হলো না, কেবল সবিনয়ে বললেন, বেশ তো, আপনি আমাদের সভাপতিকেই বলুন।

গজ গজ করতে করতে উঠে পড়ে রমেশ বললে, বলবোই তো, বলবোই তো, এম-এ পাশ মাস্টার নিয়েছেন, বুঝি না কিছু মনে করেছেন—

স্কুল থেকে বেরিয়ে রমেশের মনে হল, নিজেকে সে অনেক ছোট করে ফেলেছে। সামান্য একটা মেয়ে স্কুলে চাকরির জন্যে মেয়েকেও সে হীন করেছে। কোন দিকেই তার সম্মান বজায় থাকেনি। বিশেষ করে তার বাল্যের সহপাঠীটি তাকে স্তোক দিয়ে পথে বসিয়ে দিয়েছে। 'এখন যদি বেটাকে পাই—'

রমেশ ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবলে, গলার চাদরটা ফাঁস দিয়ে টেনে দিয়ে বলবে "পারবে না তো বলেছিলে কেন? জানি, আমাদের ছেলে-মেয়েদের চাকরি তোমরা দেবে না, কেননা তাতে তোমাদের কোন স্বার্থ নেই। মুখেই বল, বন্ধু, একসঙ্গে পড়েছি, কত খেলা করেছি—সব চালাকি!"

আশাভঙ্গের রাগ আর যায় না, কদিন ধরে স্ত্রীকে রমেশ বাল্যবন্ধুর নানা গুণের খবর জানাতে লাগল। বেটা স্কুল মাস্টারের ছেলে এখন মস্ত মাতব্বর হয়ে উঠেছে। পাঠ্য-পুস্তকের নোট লিখে লিখে ওর বাপ যা করে গিয়েছিল তার জোরেই, না হলে অমন ছেলে রমেশদের সময় ঢের ঢের ছিল। বাপ যদি নোটবই না লিখতো, তাহলে আজকের দিনে কি করতো একবার রমেশের দেখার ইচ্ছে করে। আরো, তখনকার দিনে এক মস্ত খয়ের খাঁর মেয়েকে বিয়ে করে ও ভেবেছে, কি যেন হয়েছি! শ্বশুরটা তো আশু মুখুজ্জের পা চাটতো। আবার পথম-বৈষ্ণব, ঐ তো আমাদের সময় পড়াতো তার একটা লেখা। বাপের জোরে পাশ, জলপানি আর শ্বশুরের জোরে চাকরি। ওদের আর চিনতে কারো বাকি নেই, স্বার্থ ছাড়া এক পা চলে না।

রমেশ স্ত্রী-কন্যার কাছে স্বীকার করলে একেবারে অতটা আশা করা তার উচিত হয়নি।

এদিকে রমেশ যেন তকে তকে রইল, কিছু না পারুক ছেলেবেলার বন্ধুকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দেবে দেখা হলে। খুব ভুল হয়ে গেছে তখন বাড়ীর ঠিকানাটা জেনে না নিয়ে। এখন গালটা রমেশ নিজেকে দিচ্ছে। স্ত্রী-কন্যার কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করছে—ছি ছি, সেদিন কি প্রশংসাটাই না করেছিল, যেন জগদীশ জীবনে উন্নতি করেছে তাদের ভাল করবার জন্যে, যেন কত আপনার লোক ওরা।

স্মৃতিচারণ করে রমেশ একদিন জগদীশদের পুরনো বাড়ীতে এসে হাজির হলো। অনেকদিন পরে গলিটা কেমন যেন মনের মধ্যে ভুলে-যাওয়া একটা স্বপ্নের মত মনে হল। জগদীশদের অনেককালের পুরনো বাড়ী; একটা পেয়ারা গাছ, দুটো নারকেল গাছ ছিল বাড়ীর মধ্যে। স্কুলের বন্ধুরা জগদীশকে ডাকতে এসে ঐ পেয়ারা গাছে উঠে বসত, জগদীশের বাবা প্রিয়নাথ বসাক বাড়ীতে থাকলে মহা চেঁচামেচি, চীৎকার আরম্ভ করতেন, ছেলেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন, হারামজাদার সঙ্গী দেখ না, যত সব বাঁদর! বেরো বেরো—হাফ-প্যান্ট-পরা জগদীশ আঙুল চুষতে চুষতে বাইরে এসে চোখ ছল ছল করে বলতো, বাবা থাকলে তোরা আসিসনি। স্কুলে তোদের জন্যে আমি পেয়ারা নিয়ে যাব।

আজ সে পেয়ারা গাছ নেই, নারকেল গাছদুটো বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রমেশ বাড়ীর মধ্যে ঢুকে চলনের পথে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে, কেমন যেন ভয় ভয় করল। দু-একবার সাড়া দেবার চেষ্টা করে হুঁ-হাঁ করলে। কিন্তু ওদিক থেকে কোন সাড়া এল না।

রমেশ বৈঠকখানা ঘরে উঁকি মারলে, ঘর অন্ধকার। তারপর বন্ধ দরজায় আঘাত করলে, সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে আওয়াজ হলো, ক্যাঁ-ও-য়া?

আমি!

ভেতর থেকে আওয়াজটা যেন ভেংচে উঠলো, কাকে চাই?

জগদীশ আছে?

না। ভেতরের আওয়াজটা যেন হঠাৎ-ই থেমে গেল। আর কিছু বলার দরকার নেই, আগন্তুক যে হোক, যে প্রয়োজনেই আসুক। ছেলেবেলাতেও এমনি ছিল, বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে ডেকে কখনো জগদীশকে পাওয়া যেত না, অনেক সুযোগ-সন্ধান করে তবে জগদীশকে বাড়ীর বাইরে বার করা যেত। জগদীশের পণ্ডিতবাবা ছেলের সহপাঠী বন্ধুদের সম্বন্ধে বড় সন্দিগ্ধ ছিলেন, ছেলের বাড়ী-থাকা সম্বন্ধে ভদ্রলোক বেমালুম মিথ্যে কথা বলতেন। এই নিয়ে বন্ধুরা জগদীশকে অভিযোগ করতো, তোর বাপটা কিরে, তুই বাড়ী আছিস আর তোর বাবা বললেন কিনা নেই! মাস্টার হয়ে মিথ্যে কথা বলেন কেন?

জগদীশ অপ্রস্তুত হয়ে কোন কথা বলতে পারতো না। বন্ধুদের তো আর বলতে পারে না, তোরা বদ ছেলে, তাই বাবা তোদের সঙ্গে মিশতে দিতে চায় না। পাছে খারাপ হয়ে যাই—

কে জানে ভেতর থেকে জগদীশের সেই বাবা আওয়াজ দিচ্ছেন কিনা। খুব বুড়ো

হয়ে গেছেন নিশ্চয়ই, উঃ, এককালে বসাকের ইংরেজী নোটের কি চলন ছিল! নোট লিখে অনেক টাকা করে নিয়েছেন! পাশ-টাশ করবার পর রমেশ শুনেছিল, ঐ নোট-লেখকদের সঙ্গে পরীক্ষকদের নাকি ভাগাভাগি আছে, যেমন ওষুধের দোকানের সঙ্গে ডাক্তারদের! 'অসৎ উপায়ের' কথা এখন যেমন শোনা যাচ্ছে, তখন তেমন শোনা যেত না যারা বড়লোক হতো ঐ করে, তাদেরও কেউ কিছু বলতো না, দিব্যি চুপি চুপি কাজ গুছিয়ে নিতো।

ছেলেবেলার তুলনায় জগদীশদের বেশ অবস্থাপন্ন মনে হতো। গাড়ি না থাক, লোক-জন দাস-দাসী, আত্মীয়-স্বজনে সব সময় বাড়ী ভর্তি থাকতো। বৈঠকখানা ঘরটাই যা ভয়ের ছিল, তাছাড়া আর সব জায়গায় অবাধ বিচরণ চলতো। ক'বছর যেন জগদীশদের বাড়ীতে রমেশরা দুর্গাপুজোও দেখেছে। বঁদে, নাড়ু, খই-মুড়কি খুব খেয়েছে।

এখন বাড়ীটা যেন নীরব হয়ে গেছে, তিন-মাথা এক করে বুড়োর বেঁচে থাকার মত অবস্থা হয়েছে। আশ্চর্য, এত ডাকা-ডাকিতে একজনও কেউ বেরিয়ে এল না, প্রতিধ্বনির মত শোনাল, কে? কাকে চাই? নেই!

রমেশ বেরিয়ে এসে দম ফেলে যেন বললে, ঠিক হয়েছে। এককালে নোট লিখে বড় রমরমারম ছিল। এখন বসাকের নোট আর বাজারে চলে না, একালের কোন ছাত্রই নাম জানে না প্রিয়নাথ বসাকের।

আর একবার তবু বাড়ীটাকে দেখবার ইচ্ছে করল, রমেশ ফিরে দাঁড়াল, দেওয়ালের চুনবালি খসে গেছে, দোতলার ছাদের কার্ণিশের ফাটলটা বেশ বড় করে একটা বটগাছের চারা মাথাচাড়া দিচ্ছে, সেকেলে বাড়ীর ছাদের পোড়ামাটির নলগুলো সব ভেঙে হয়ে গেছে।

রমেশ যেন মনে মনে কোথায় একটু সান্ত্বনা পায়! যতই বড় চাকরি করুক জগদীশ, এইখানেই তো থাকে, বাড়ীঘর-দোর মেরামত করতে পারে না, ভারি দরের মানুষ! তার চেয়ে রমেশ ভাড়া বাড়িতে ঢের ঢের ভাল আছে। বাইরে খুব মাতব্বর, ভেতরে এদিকে—

কথাটা ঠিক মনে পড়ছে না, ঐ যে বলে না ভেতরে ছুঁচোর—

হঠাৎ রমেশের চোখদুটো যেন বিস্ফারিত হয়ে উঠলো, জগদীশদের বাড়ীর পাঁচিলের গায়ে একধারে ছোট্ট একটা টিনের পাতে লেখা : জে বসাক, এম-এ, ডেপুটি ডিরেকটর ইত্যাদি, উনচাল্লিশ নম্বর গদাধর সেন লেনে উঠে গেছেন।

দুত্তর নিকুচি করেছে! রমেশ বিরক্ত হয়ে বললে, এ যেন বুনো হাঁসের পেছনে পেছনে ঘোর।

মেয়ের চাকরি হয়নি, হয়নি! এ নিয়ে বাল্যবন্ধুকে বলে আর কি হবে! বেশ তো বোঝাই যাচ্ছে, জগদীশের কোন হাত-ই নেই। আর থাকলেও বাল্যবন্ধু বলে কোন খাতির করেনি।

না, আর যাবে না, বলবে না, যেচে মান নষ্ট রমেশ করবে না। লাভ নেই কোনো, নিজেকে ছোট-করা কেবল।

কিন্তু পরাভূত ভাবটা কিছুতে মন থেকে ঠেলে রাখা যায় না। অপ্রস্তুত বা অপদস্থ রমেশ যেন কেবল নিজের কাছে হয়নি, স্ত্রী-কন্যার সবার কাছে হয়েছে। মনের কোথাও যেন একটা বাহবা পাবার আশা ছিল, যেটা মেয়ের চাকরি করে-দেওয়া নিয়ে প্রকাশ পেত অর্থাৎ সংসারে রমেশকে যত ছোট মনেই হোক না কেন, তার অনেক বেশি সে বড় প্রভাবশালী যে কার্যকালে, এইটাই যেন প্রমাণ করতে চেয়েছিল।

এমনি ছেলে-মেয়ের চাকরি হয় না, সেটা বোঝা যায়; কিন্তু চাকরি দেবার লোক থেকেও যদি কিছু না হয়, তাহলে অবহেলা বা উপেক্ষাটা যেন বেশি করে বাজে। জগদীশ হঠাৎ একদিন উদয় হয়ে রমেশের মুখটা যেন অনেক ছোট করে দিয়েছে। মিছিমিছি জগদীশকে সে নিজের সংসারে বড় করে দেখাবার চেষ্টা করেছে, হেড-মিসট্রেসের কাছে বৃথা আস্ফালন করেছে।...

আর শুধু জগদীশচন্দ্রকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, তার মেয়ের চাকরির ব্যাপারে সবাই প্রায় অনুরূপ ব্যবহার করে, মুখে বলে কিন্তু কাজের বেলা দেখা যায় ভোঁ-ভাঁ। কেবল আশাভঙ্গ। সুধা তো আর দরখাস্ত করতে চায় না, যে সামান্য দু-একটা টুইশনি পায় সে করে, যতটুকু সাহায্য সে বুড়ো বাপকে করতে পারে তার চেষ্টা করে।

মেয়ের না চাকরি, না বিয়ে, উভয় ক্ষেত্রেই অকৃতকার্যতা যেন রমেশের নিজেরই অকৃতকার্যতা, জীবনে অসফলতা! খেয়ে-বসে-শুয়ে সুখ নেই, কমন এক অস্বস্তি যেন। মেয়েকে দেখিয়ে দেখিয়ে যেমন হেরে গেছে, তেমনি চাকরির জন্যে দরখাস্ত ক'রে ক'রে এলে গেছে। মাঝে মাঝে রমেশের মনে হয় যেমন তার জীবন তেমনি এদের জীবন, উদ্দেশ্যহীন, ভবিষ্যৎহীন।

কিন্তু সুধার ভাগ্যটা বোধহয় ততটা মসীলিপ্ত নয়, যতটা রমেশ ইদানীং আশা-ভঙ্গ হয়ে হয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছে। তা না হলে এতদিন পরে ঠিক সেই প্রথম দিনের সাক্ষাতের স্থানটিতে লক্ষ্মণদাস-লক্ষ্মীবাঈ স্কুলের সভাপতির সঙ্গে রমেশের আবার দেখা হবে কেন, আর কেনই বা জগদীশ নিজে থেকে দুঃখ করে বললে, স্কুলের চাকরির ব্যাপারে তার যথেষ্ট হাত থাকলেও সে প্রভাব খাটায়নি, কেননা এইসব স্কুলের ব্যাপারে সে বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছে। মেয়েস্কুল হলে কি হবে, যত সব অবাঞ্ছিত লোকের যাতায়াত শুরু হয়ে গেছে। প্রধান শিক্ষিকাকে তাড়াবার বন্দোবস্তটা কিছুতেই পাকাপোক্ত করা যাচ্ছে না, ঐ লক্ষ্মণবাবু-দের পরিবারের কারসাজি আছে, সুরেজলাল ব্যাক করছে। একেবারে নোংরা।

রমেশ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে জিজ্ঞেস করলে, সুরেজলাল কে? স্কুলের কেউ?

সহপাঠী বন্ধুকে ঠেলা দিয়ে জগদীশ বললে, সে আর শুনে কি হবে! যাচ্ছেতাই ব্যাপার হে! আরে মেয়েমাস্টার নিবি তার আবার—

কথাটা সম্পূর্ণ না করে জগদীশ চোখে-মুখে হাসতে লাগল। তারপর বললে, ওখানে তোমার মেয়ের মাস্টারী না হয়ে ভালই হয়েছে, তাছাড়া মাইনেও একটা বেশি কিছু নয়, চল্লিশ টাকা।

সেকি! তাতেই এম-এ পাশ শিক্ষিকা পেয়েছে? রমেশ যেন আংকে উঠলো, আকাশ থেকে পড়ল।

আর বলো কেন, তাই দু' হাজার এ্যাপ্লিকেশন পড়েছিল। ঠিক আমাদের সময়ের মত, মনে পড়ে না, কুড়ি-বাইশ টাকা মাইনের চাকরির জন্যে কত হাজার দরখাস্ত পড়তো? আজকাল মেয়েদেরও সেই অবস্থা

হয়েছে! সব বাড়িতে বি-এ, এম-এ, আর সবাই চাকরি করতে চায়। ওদিকে ছেলেরা, এদিকে মেয়েরা—কি করে সামলাবে? জগদীশ এমনভাবে কথা বলছে যেন তার ওপর এ-সমস্যার সমাধানের ভার দেওয়া হয়েছিল। ইচ্ছে করলে সে-ই কিছু করতে পারতো, কিন্তু করেনি!

তবু আশার কথা যে, জগদীশ এবার নিজে থেকে বললে, তোমার মেয়ে আপিসে চাকরি করবে? বল তো—

রমেশ যেন প্রস্তাবটা লুফে নিলে, ওর চাকরি ছাড়া আর কোন পথ তো দেখতে পাচ্ছি না ভাই, মাস্টারীতে যদি তিরিশ-চল্লিশ টাকা পায় কি হবে!

জগদীশ বললে, ওর বেশি আর দেবে কি করে, মাস্টারও যেমন আগন্ডা, স্কুলও তেমনি অলিতে-গলিতে গজিয়েছে। এক সময় যেমন ক্লিনিক তৈরী হয়েছিল, এও তেমনি, ছেলেমেয়েদের পাশ করবার জন্যে ক্লিনিক! তার ওপর কোচিং ক্লাশ—দেশটা একেবারে উচ্ছন্নে গেল হে!

রমেশ অবশ্য ভেবে দেখেনি, কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়ে মেয়েদের তারা নির্দিষ্ট পথে নিয়ে যেতে পারছে না, সে-কথা হাড়ে হাড়ে বুঝছে। দুটো মেয়ের লেখাপড়া না শিখেই সহজে বিয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু লেখাপড়া শিখে আর তিনটের যে কি অবস্থা হবে, রমেশ ভাবতে পারে না।

জগদীশ বললে, একদিক থেকে চাকরি অনেক ভাল, দশটা পাঁচটা। সেক্রেটারী নেই, কমিটি মেম্বর নেই, নিজের কাজ করলে ফুরিয়ে গেল।

রমেশ আর কি বলবে, কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে বললে, পেলে তো ভালই! আজকাল চাকরির বাজারও তো খুব—

সে তোমায় ভাবতে হবে না, আমার আপিসে চাকরি, হয়ে যাবে! যেন হাতের পাঁচ, বলবার কিছু নেই এমনিভাবে জগদীশ বললে।

তা হলে তো খুবই ভাল হয়, তোমার আপিসে চাকরি— একদিক থেকে নিশ্চিন্ত, তুমিও যে আমিও সে, আপিসে গার্জেন থাকা কত ভাগ্য।

জগদীশ হাসতে লাগল। তারপর, চলে যেতে রমেশ যেন নিজেকে তিরস্কার করলে, ছি-ছি, এই সব হিতৈষী বন্ধুদের সম্বন্ধে কি যা তা সে ভবতে আরম্ভ করেছিল! মনে-মনে সুধার মা'র কাছে জগদীশের অপযশ করার জন্যে নাক-কান মলা খেলে। এই বাজারে কার এমন বন্ধু আছে?

যথা সময়ে সুধার আপিসে চাকরির দরখাস্তের উত্তরে ইন্টারভিউ লেটার এল। রমেশ অনেকক্ষণ ধরে চিঠিটাকে খুঁটিয়ে দেখেও যেন চোখকে বিশ্বাস করাতে পারছিল না, আর কি আশ্চর্য, সই করেছে জগদীশ নিজে। তা হলে তো—

রমেশ ধরে নিলে সুধার চাকরি হয়েই গেছে! মাইনেটাও মনে-মনে হিসেব করে নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, স্কুলের মাস্টারীর পাঁচ গুণ! জগদীশ ঠিকই বলেছে, স্কুল নয় তো যত সব ব্যবসা! দু-চারজন মাস্টারনী সামান্য হাত-খরচে রেখে যত অগা-বগা মেয়েদের পড়ানর নাম করে টিটিং-বাজি! বেঙ-ছাতার মত গজিয়ে-ওঠা ঐসব স্কুলে কি হয়, জানতে আর বাকি নেই! নামকরা, প্রতিষ্ঠিত স্কুল থেকে ঝাঁট দিয়ে বিদেয় করা যত ছাত্র-ছাত্রী!

রমেশ চিঠিটা নিয়ে নেড়েচেড়ে বললে, জান সুধার মা, আপিসের চাকরিই ভাল! স্কুলের চাকরিতে আজকাল পয়সাও নেই, সম্মানও নেই! মাস্টারনীগুলোও সব বদ, জগদীশ ঠিক বলেছে!

সুধার মা কেবল বললে, তুমিই বলতে আপিসের চাকরিতে আজকাল মেয়েদের চরিত্র—

স্ত্রীকে সম্পূর্ণ করতে না দিয়ে বেশ বিরক্ত হয়ে রমেশ বললে, আরে আমি বলতুম, তাতে কি হয়েছে! তখন কি এত কথা জানতুম, জগদীশ আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে! ঐ লক্ষ্মণ দাস স্কুলের ভেতরের সব খবর সে রাখে, বললে কি জান—চরিত্র নিজের কাছে—

মুখটা স্ত্রীর কাছে নিয়ে গিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে সরিয়ে নিয়ে রমেশ বললে, না থাক, সে-সব শুনে আর কাজ নেই। স্কুলের সেক্রেটারীই যদি ঐ হয়—

তারপর হঠাৎ খেয়াল হয় সুধা সামনে দাঁড়িয়ে আছে, খুব যেন মনযোগ দিয়ে তার কথা শুনেছে; রমেশ মুখ-ঝামটা দিয়ে বললে, আরে তুই দাঁড়িয়ে কি শুনছিস? যা-যা ইন্টারভিউ-এর জন্যে তৈরী হ! ইতিহাসটা ভাল করে দেখে নে, জেনারেল নলেজও ঠিক করিস! বলা যায় না কোন দিক থেকে কি প্রশ্ন করে। তোমরা তো আবার সব বিষয়ে পন্ডিত! সেন্টারের সব মন্ত্রীদের নাম মনে আছে তো?

রমেশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, সর্বত্রই নোঙরা কান্ড-কারখানা! যত শুনবে ঘেন্না ধরে যাবে! এ তবু জগদীশের নিজের আপিসে চাকরি, সুধার গার্জেনের মত! আমি বলে দিয়েছি খুব চোখে-চোখে রেখ ভাই, তোমার ভরসায়—

রমেশ লক্ষ্য করলে, আজ সুধার মা কেমন যেন অন্যমনস্ক, তার কথা তেমন মন দিয়ে শুনছেন না। চাকরিটা হাতের কাছে এনে দিয়েও কেমন যেন একটা হয়-হলো না-হয়-না-হলো ভাব। সুধাকেও তেমন খুশী বা উৎফুল্ল মনে হয় নি! কিন্তু কেন?

রমেশ আবার বন্ধুর গুণগান করলে, জগদীশ কি আর এমনি বড় হতে পেরেছে, খুব কড়া প্রিন্সিপেলের লোক—ছেলেবেলা থেকেই তো চিনি। আর তেমনি—

হঠাৎ কথাটা যেন মনে পড়ে নিজের মনে হেসে রমেশ স্ত্রীকে বললে, আর কি লাজুক ছিল তোমাকে কি বলবো সুধার মা, আমরা তখন একটু-আধটু উসখুস করতুম দুটো কথা বলতে, কিন্তু জগা একেবারে ধোয়া তুলসী পাতা—আমার ছোট বোন রমা, তখন কতটুকু, তাকে দেখলেই জগা সামনে থেকে ছুটে পালাতো। তেমনি বিয়েও হয়েছিল বাপ-মা'র পছন্দ-মত রায়সাহেব জাঁদরেল লোকের সঙ্গে, সে-মেয়েরও তখন বয়েস আট বছর না ন' বছর!

সুধার মা বললে, তখন তো ঐ নিয়ম ছিল, ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ের বিয়ে হতো।

রমেশ কৌতুক করে বললে, তোমারও হয়েছিল?

আমার কথা ছেড়ে দাও, বাবা ছেলে যোগাড় করতে পারেন নি।

তেমনি হেসে রমেশ বললে, কেন, আমি ছিলুম না?

এতদিন পরে নিজের বিয়ের কথা মনে পড়ে সুধার মা'র যেন রহস্য করতে ইচ্ছে করে, অভাগীর দশা! তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? —

রমেশ রহস্য করে বললে, জন্ম-জন্মান্তরের — সম্বন্ধ আগের জন্মেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল!

সুধার মা কুটনো-কোটা বঁটি থেকে হাতটা বাঁচিয়ে বললে, আহা-হা!

রমেশ হাসতে লাগল, এই বয়েসেও সুধার মা'র এসব বিষয়ে লজ্জা খুব। বিয়ের আগে দূর সম্পর্কে যে একটু চেনা-জানা ছিল তাও স্বীকার করতে চায় না!...

সুধার ইন্টারভিউও খুব ভাল হয়েছে। মেয়ের কাছে রমেশ যা শুনেছে তাতে আরো আশান্বিত হয়েছে। বাল্যবন্ধুর প্রতি
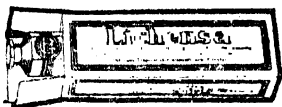
কৃতজ্ঞতাও বোধ করেছে। মেয়ের চাকরি-করার পয়সায় সংসারের কি কি সাশ্রয় হবে তারও একটা হিসেব সে মনে-মনে করে নিয়েছে। সুধাকেও বেশ খুশী-খুশী মনে হয়। প্রথম ইন্টারভিউ লেটার পেয়ে যে-মেয়েকে বেশ চিন্তিত মনে হয়েছিল, এখন তাকে দিব্যি প্রফুল্ল আর আত্মসচেতন মনে হচ্ছে। রমেশ জিজ্ঞেস করবার আগেই সুধা সবিস্তারে ইন্টারভিউ-এর বর্ণনা দিয়েছে। যেন ব্যাপারটা কিছু নয়, তাকেই নেওয়া হবে বলে সব ঠিক করা আছে।

বসাক সাহেবই বোর্ডে ছিলেন। জিজ্ঞেস করবার মধ্যে কেবল নাম জিজ্ঞেস করেছেন, আর সার্টিফিকেটগুলো দেখেছেন। সুধাকে দেখে নাকি হেসেছেন, সবার আগেই তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। শুধু শুধু সুধা এক গাদা জিনিস পড়ে মুখস্থ করে গিয়েছিল, কিছুই কাজে লাগে নি।

বন্ধুর জন্যে রমেশ নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে। যেন হৃত-মান পুনরুদ্ধার হয়েছে স্ত্রী-কন্যার কাছে তার দাম বেড়েছে, মুখ-রক্ষা হয়েছে!

ইতিমধ্যে ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে রমেশ মেয়ের আসন্ন চাকরির গল্প করেছে। কিন্তু কি জানি কি ভেবে রমেশ জগদীশকে মর্যাদার কি, তার আগ্রহ ইত্যাদির কথা চেপে গেছে। যে দিনকাল পড়েছে, কোনদিক থেকে আবার কেউ যদি লাগিয়ে-ভাঙিয়ে দেয়! কাউকে বিশ্বাস নেই।

রমেশের মত সহকর্মী বন্ধুরা ধরে নিয়েছে, সুধার চাকরি একেবারে নিশ্চিত, চিঠি আসতে যা দেরী!

কিন্তু আরো কত দিন দেরী হতে পারে? রোজই বাড়ি ফিরে রমেশ স্ত্রী-কন্যাকে জিজ্ঞেস করে, চিঠি এল?

না, চিঠি আসে নি। কেমন যেন সবাই মুষড়ে পড়েছে, এবারও আশাভঙ্গ হবে না তো? স্ত্রীকে রমেশ আশা দেয়, চিঠি ঠিক আসবে। তারপর মেয়েকে নিয়ে পড়ে, ইন্টারভিউ-এ তার বন্ধু জগদীশ ছাড়া আর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেছিল কি না।

সুধার উৎসাহটা যেন দিন-দিন কমে যায়, কেমন নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, না, যা জিজ্ঞেস করবার উনিই করেছেন, নাম কি, বাড়ীর ঠিকানা কি, ক' ভাই-বোন, বাবা কি করেন?

মনে-মনে রমেশ মিলিয়ে দেখে সুধা উল্টো-পাল্টা কিছু বলেছে কিনা, না, এত লেখাপড়া শিখে এসব বিষয়ে মেয়ের ভুল করার বা ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। বন্ধু জগদীশ বুঝে-সুজেই প্রশ্ন করেছে। চাকরি দেবার যদি ইচ্ছে না থাকতো, তা হলে অনেক কঠিন প্রশ্ন করতে পারতো, ভিয়েৎনামের যুদ্ধ কি, এশিয়ার শান্তি নিয়ে নানা প্রশ্ন করতে পারতো, তা নয়তো ইতিহাসের কত যুদ্ধের সন-তারিখ জিজ্ঞেস করে বেকায়দায় ফেলে দিতো!

এক-একদিন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই রমেশ মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, ইন্টারভিউ-এর সময় জগদীশের মুখটা কেমন দেখলি? হাসি-হাসি না রাগ-রাগ?

সুধা কিছু উত্তর দেবার আগেই রমেশ নিজের মনে বলে, নিজের আপিস তো, তার ওপর নিজের লোক, আট-ঘাট বেঁধে তো ব্যবস্থা করতে হবে! কত বড় রেসপন্সিবল পোস্ট, যদি কেউ জানতে পারে—

এদিকে স্ত্রীর উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করে রমেশ বলে, তুমি হয়তো ভাবলে আপিসের চাকরি কেমন হবে! আরে আমি কি সে কথা না ভেবেছি মনে কর? মেয়েকে তো হাজার বার দেখালুম, কারো পছন্দ হলো? এখন একটা চাকরির দোহাই দিয়ে যদি—আইবুড়ো মেয়ের রূপ-গুণ কিছু না আসলে আজকাল তার চাকরিটাই মস্ত গুণ, ওসব কালো-ফর্সা, সুন্দর-কুৎসিত কিছু না। অনন্তকে তো তোমার মনে আছে, পাঁচ-পাঁচটা মেয়ে তার, দেখতেও সব তেমনি, একটা করে চাকরি ধরলে আর পটপট করে বিয়ে হয়ে গেল, এখন অনন্ত তো আমাদের মধ্যে বড়লোক, জামাই-মেয়ে নিয়ে দিব্যি আছে। যখনকার যা বুঝলে না?

সুধার মা কি বোঝেন কে জানে, কোন সাড়া-শব্দ করেন না! কিন্তু রমেশ ছাড়ে না: তোমাদের সময় কি বলতো মনে নেই, মেয়েরা লেখাপড়া জানলে ছেলে-মেয়ে মানুষ করা সহজ হবে, মা-ই পড়াতে পারবে। তার পর কি হলো, একটা-দুটো পাশ করলে, কোন না জজ-বেরেস্টারের মনে ধরে যাবে! তার পর? এই তো লেখা-পড়ার হাল হলো, কোথায় ছেলে-মেয়ের মাস্টারী আর কোথায় বা জজ-বেরেস্টারের গিন্নী, এখন আবার লেখা-পড়ার সঙ্গে চাকরি না হলে কারো মেয়ে পছন্দই হয় না। নাও-ও কি করবে কর!

কে জানে সুধার মা হয়তো মেয়ের ভবিষ্যৎ পাত্রের কথাই ভাবেন। তাতে যেন তিনি আরো নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। মনে জানেন মেয়ে তাঁর দেখতে ভাল নয়, রংও বেশ ময়লা, দেখিয়ে-শুনিয়ে আর দুটির মত সুধাকে পার করতে পারবেন না।...

রমেশ আশা করেছিল, এতদিন পরে নিজে থেকে সে যখন বাল্যবন্ধুর বাড়ী এসেছে তখন যথোচিত অভ্যর্থনা লাভ করবে। জগদীশ বন্ধুকে খাতির করে নিয়ে গিয়ে ঘরে বসাবে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। ছেলেবেলার কথা বলে রহস্য করবে।

না, রমেশের মনের কোন আশাই পূর্ণ হল না। আধ ঘণ্টার ওপর রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলে, ভেতর থেকে কেউ যদি সাড়া দেয়, একবার মুখ বাড়িয়ে দেখে। কলিং বেল টিপতে-টিপতে হাতে ব্যথা ধরে গেল, কা কস্য পরিবেদনা। তারপর বিরক্ত হয়ে চলে আসবে কিনা ভেবে পিছন ফিরতে অবিকল সেই জগদীশের পুরনো বাড়ীতে বন্ধুকে খুঁজতে যাওয়ার মত অভিজ্ঞতা—সাড়া একটা হলো অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে, কে-এ-এ?

রমেশ থমকে পিছন ফিরে দাঁড়াতে দেখলে, জগদীশ দরজা খুলে বাইরে এসেছে, হাতে কিসের যেন একটা মোড়ক।

মেয়ের চাকরি-দাতাকে দেখে রমেশ এমনি অভিভূত হলো যে কি করবে না করবে বুঝতে না পেরে হাত তুলে বন্ধুকেই নমস্কার করলে। জগদীশ হাসতে-হাসতে এগিয়ে এসে বন্ধুর কাঁধে হাত রাখলে, আরে তুমি! কতক্ষণ?

সে-দুঃখের কথা আর রমেশ উত্থাপন করলে না, সহজ সুরে বললে, এই, এই—

কিন্তু জগদীশ বাড়ীর দিকে ফিরল না, সামনে এগোতে-এগোতে বললে, এর আগে আমার বাড়ি তুমি আস নি, নয়?

যেন না-এসে বড় অপরাধ করেছে, কাঁচু-মাচু হয়ে মাথা নেড়ে বললে, একদিন তোমাদের পুরনো বাড়ীতে গিয়েছিলুম। দেখলুম—

জগদীশ যেন শুনেও শুনলে না, বললে, এই কুঁড়ে মত করিচি একটা!

কুঁড়েই বটে, সদর রাস্তার ওপর দোতলা বাড়ী! রমেশ কি ভেবে বললে, অনেক টাকা খরচ হয়েছে? আজকাল বাড়ী করতে যা—

জগদীশ রমেশের কথার ওপর বললে, আর বোলো না! মেটিরিয়েলই পাওয়া যায় না, সব ব্ল্যাকের ব্যাপার!

রমেশ মাথা নাড়লে। চোখের সামনে রাস্তাটাও যেন কালো মনে হচ্ছে, ল্যাম্প-পোস্টে আলো নেই।

কথায় কথায় বাজারের কাছে এসে গেল, কিন্তু ভরসা করে বন্ধুকে রমেশ মেয়ের চাকরির কথা জিগোস করতে পারলে না। কেবল মনে হতে লাগল, খবর শুভ হলে জগদীশ নিজে থেকেই বলতো। আজকাল-কার দিনে কারো চাকরি করে দেওয়া কম কৃতিত্বের নয়।

বন্ধুর সঙ্গে বাজারের মধ্যে ঢুকে রমেশ জিজ্ঞেস করলে, বাজার করবে? সন্ধ্যেবেলা বাজার কর বুঝি?

কাগজের মোড়ক খুলে সুদৃশ্য থলিটি বার করে জগদীশ বললে, আরে না-না, এ হলো এস্পেশাল! শ্রীমতীর ঠাকুরের ফল-ফুল! এটা নিজেকেই করতে হয় রোজ। চাকর-বাকর দিয়ে চলে না!

রমেশ মনে-মনে বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি অনুরাগের প্রশংসা করে। একেই বলে সত্যিকারের ডিভোশন! না হলে কেউ আপিস থেকে এসেই স্ত্রীর পুজোর বাজার করতে ছোটে! রমেশ যেন নিঃশব্দ উচ্চারণে বললে, ধন্য, ধন্য জগদীশ তুমি! তোমার পত্নী-ভক্তি ধন্য! তোমরা আদর্শ!

বাজারের মধ্যে একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়াতে যেন হঠাৎ লক্ষ্য করে রমেশ বললে, আরে তোমার চুল এত পেকে গেছে? কিন্তু সেদিন তো বেশ কালো দেখলুম!

জগদীশ হেসে বললে, চুল পাকার আর অপরাধ কি? কত বয়েস হলো খেয়াল আছে! রানিং ফিফটি সিকস—

তা হলেও সেদিনের সঙ্গে হঠাৎ এত তফাৎ! তুলনায় নিজেকে সেদিন রমেশের অতিশয় বৃদ্ধ মনে হয়েছিল। চুলে কলপ দিয়ে দিব্যি বয়েস ভাঁড়িয়েছিল জগদীশ—ছোকরা না হোক, প্রৌঢ়যুবক!

বন্ধুর সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে এক-এক করে ফুল, বেলপাতা, ফল কেনা হয়ে গেলে বাজার থেকে বেরিয়ে রমেশ বললে, ইন্টারভিউ তো অনেক দিন হয়ে গেছে, এখনো কিছু এলো না ভাই?

এতক্ষণে যেন জগদীশের খেয়াল হলো রমেশ কেন তার কাছে এসেছে। জগদীশ বললে, এখনো ইন্টারভিউ কমপ্লিট হয় নি, কালও আছে!

রমেশ যেন আশ্বস্ত হলো, , যা ভয় করেছিল তা নয় তা হলে?

কি ভেবে রমেশ বন্ধুকে একটু ঘুরিয়ে দিয়ে বললে, খুকী বলছিল, যারা ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল তারা নাকি বলছিল, ডেপুটিই সব!

জগদীশ কোন উত্তর করলে না। নিজের মনে বলতে লাগল, এই এক ঝামেলা, ডিরেক্টার কিছু করবে না আমাকেই যত ঝামেলা পোহাতে হবে!

রমেশ বললে, তাই খুকীর অত সুবিধে হয়েছিল। বললে তো কিছু জিজ্ঞেস কর নি!

হঠাৎ জগদীশ যেন সচেতন হয়ে ওঠে, না-না, বোর্ড যা জিজ্ঞেস করবার করেছে! আমার এতে কোন হাত নেই, আমি কে?

এ আবার কি বৈরাগ্য, রমেশ বুঝতে পারে না—লোকে একরত্তি ক্ষমতা থাকলে কোথায় পাঁচকড়া করে বলে, কত বাগাড়ম্বর করে, এ যে একেবারে বিনয়ের অবতার!

অনেক চেষ্টা করেও রমেশ জিজ্ঞেস করতে পারলো না তার মেয়ের চাকরিটা হবে কিনা। ইন্টারভিউ-এ কি ঠিক করেছে।

পা ঘসে রমেশ বললে, কবে নাগাদ লোক নেবে, মানে কবে জানতে পারবো—

জগদীশ ওদিক দিয়েই গেল না, নিজের আপিসের নানা ঝামেলার বিবরণ দিতে লাগল। সে-যে খুব কড়া এবং নীতিপরায়ণ তার নানা উদাহরণ দিয়ে বললে, আই হেট, নেপোটিজম, হেট অল্ দিজ্—

শুনে রমেশের প্রায় হৃৎকম্প হতে লাগল, তা যদি হয়, তা হলে সুধার বেলাও কি—

না-না, তা কখনো হয়? নিজে থেকে যখন বলেছে, এক রকম কথাই দিয়েছে, এক কথায় ইন্টারভিউ দিয়েছে, সেখানে কোনো কুট-কচাল প্রশ্ন করে নি—এর চেয়ে আর নির্দেশ মানুষে কি দিতে পারে! মিছিমিছি জিজ্ঞেস করে বিরক্ত করা কেবল লোকটাকে—

তবু রমেশের জানতে কৌতূহল হয়, যাদের নেওয়া হবে তাদের মধ্যে সুধার পোজিশন কেমন, মানে ক' নম্বর মনোনীত ক্যান্ডিডেট সে!

কথাটা আমতা-আমতা করে জিজ্ঞেস করতে জগদীশ যেন কেমন হয়ে গেল, বেশ গম্ভীর হয়ে বললে, দেখ ভাই, এসব কথা এখন আমাকে জিজ্ঞেস করো না। আর চাকরি দেবার আমি কেউ নই, ডিরেকটরই সব!

বাড়ীর দোর গোড়ায় এসে রমেশ নিজের মনে বললে, শালা, দেবে তো কেরানীর চাকরি, তার আবার কত কথা! কত সব মর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির জানতে বাকি নেই!

এসব ব্যাপারে সুধার মা'র মনোভাবটাই ভাল। সব কিছু কপালের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। অত হাপাহাপি করবার কি আছে, চাকরি হবার হলে হবে। না হবার হলে না-হবে। বলেছো তো, আবার পায়ে ধরবে নাকি!

তা নয়, কিন্তু যত দিন যায় তত যেন নিজেকে অপমানিত অপদস্থ মনে করে রমেশ। এবারও বাল্যবন্ধু তাকে স্ত্রী-কন্যা সবার কাছে হেয় করে দিলে! মূর্খের মত একটা অসম্ভব আশাকে সে পোষণ করে রেখেছে!

সহকর্মী বন্ধুদের কাছে সহপাঠী বন্ধুর সম্বন্ধে যে-সব গল্প করেছে তার মর্মান্তিক পরিহাস যেন রমেশকে শয়নে-জাগরণে সুস্থির হতে দিচ্ছে না, ছি-ছি, কি বোকার মত একটা মিথ্যেকে আশ্রয় করে আত্মপ্রসাদ এবং গর্ববোধ করেছে এই ভেবে, সে যতই ছোট হোক, তার নিজস্ব মূল্য একটা এখনো অনেক বিশিষ্ট এবং কৃতী ব্যক্তির কাছে আছে। আজ জগদীশচন্দ্র কি কম কৃতী, কম নামী, তার সঙ্গে যে করেই হোক একটা বন্ধুত্বের সম্বন্ধে যোগাযোগ হয়েছে। সেই তাকে—

না, জগদীশ কখনো তাকে অবহেলা না, অবজ্ঞা করবে না।

কিন্তু আর যে মুখ থাকে না। আপিসের বন্ধুরা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, কি হে তোমার মেয়ের সে চাকরির কি হলো? চাকরি পেয়েছে?

রমেশ নানা অজুহাত দেখিয়ে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করে। চাকরি ঠিকই আছে, জগদীশের আপিসে এখন গোলমাল চলছে বলে লোক নেওয়া স্থগিত আছে। বলেছে যখন—

আর বলেছে—এতদিন পরে একজন সহকর্মী বন্ধু যেন কেমন সন্দেহ প্রকাশ করে বললো, কথাটা শেষ না করে একটু হাসলেও যেন।

তার মানে? সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলে।

সহকর্মীটি বললে, মানে যা তাই বলছি। আজ কমাস ধরে শুনছি কিনা, আপিসটার নাম। আবার পরশুদিন আর একজনের কাছে শুনলাম কিনা।

তাতেও রহস্যের কোন কিনারা হয় না। তাহলে কি বন্ধুটি জানতে পেরেছে সুধার চাকরি হয় নি?

আর আর বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলে, কি শুনলে?

বন্ধুটি হেসে বললে, সে অনেক কথা। ভদ্রলোকের নাম জে বসাক তো?

রমেশের বুকটা ধড়াস করে উঠলো, তাহলে তার সন্দেহই শেষ পর্যন্ত ফললো?

বন্ধুটি চাঁছাছোলা মুখটা আলু ছড়ান করে জিজ্ঞেস করলে, তোমার মেয়ে দেখতে কেমন? বয়েস কত? ফর্সা না কালো?

রমেশ রেগে বললে, ননসেন্স!

যাই বল ভাই, তোমার বাল্যপাঠী বন্ধুটি সুবিধের নয়। আমার বোনটির সব গুণই ছিল, ইন্টারভিউ ভাল দিয়েছিল, তবু সেখানে চাকরি হলো না, কি না সে দেখতে ভাল নয়। বসাক সাহেব মেয়ে খাবার যম!

কি বললে? রমেশ যেন তেড়ে উঠলো মারতে।

যা ঐ আপিসের সবাই বলে। তেমনি আলু ছড়ান মুখে বন্ধুর হাসিটি।

রমেশ প্রতিবাদ করলে, লোক এখনো নেওয়াই হয়নি, বললেই অমনি হলো যা তা কথা।

সহকর্মী বন্ধুটি কোন প্রতিবাদ করলে না।...

অন্যদিনের চেয়ে রমেশ আজ একটু সকাল সকাল আপিস থেকে ফিরে এল। তার কেমন ধারণা হয়েছে আজ হয়তো জগদীশের আপিস থেকে সুধার নামে চিঠি আসবে, কেউ তাকে বলবার আগেই সে নিজে গিয়ে সই করে সে চিঠি নেবে, তারপর কাল একবার নিজের আপিসে সবাইকে দেখাবে— ছি, ছি, এত বাজে কথা সব বলতে পারে!

চিঠি এসেছে ঠিকই, কিন্তু আগে এসে রমেশকে সই করে নিতে হয়নি, সুধাই চিঠিটা নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে খোলা জানালার দিকে চেয়ে আছে, অনেক দূরে আকাশে একটা ঘুড়ি উড়ছে।

পায়ের শব্দে সুধা চোখ ফিরে তাকাল। রমেশ তাড়াতাড়ি এসে চিঠিটা খুলে পড়লে 'তোমাকে মনোনীত করা যায়নি'......

বাবাকে দেখে সুধা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো।

রমেশ মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে যেন শিউরে উঠলো— একথাটা তো সে একবার ভাবে নি, বিয়ের ব্যাপারে যেমন চাকরির ব্যাপারেও তেমনি মেয়েদের রূপযৌবনের দাম অনেকখানি। সুধা লেখাপড়া শিখলে কি হবে, দেখতে ও সে—

না থাক, সুধাকে সে কথা বলে কাজ নেই।

কিন্তু নিজের মুখটা এখন রমেশ কোথায় লুকোবে? কালই সে সুধার মার সঙ্গে জগদীশের স্ত্রীভাগ্য নিয়ে কত আলোচনা করেছে, ওদের স্বামী-স্ত্রীর অনুরাগ, অনুগত্য এবং বিশ্বস্ততার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে কত প্রশংসা করেছে। আর জগদীশের উন্নতির মূলে যে তার স্ত্রীর ঠাকুর দেবতার প্রতি অচল ভক্তি, একথাও সুধার মাকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু জগদীশের এই বয়সে বিবাহিত স্ত্রীর দেব-ভক্তিকে দেখিয়ে দেখিয়ে প্রশ্রয় দেওয়ার উদ্দেশ্য যে ভিন্ন সে কথা নিজের স্ত্রীকে বলবে কি করে। আর এত করে শেষ পর্যন্ত সুধার চাকরি না হওয়ার আসল কারণটাও বলা যাবে না মুখে-ফুটে ঐ রাগ অভিমান আর ক্ষোভ প্রকাশ করা ছাড়া।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

॥ অমৃতলোকের বার্তা ॥

আমাদের বন্ধু অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী মিনতি গঙ্গোপাধ্যায় এক শীতের রাত্রে চক্রে বসেছিলেন বনফুল সাহিত্য সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনের কিছুক্ষণ পরে। ঐ দিন বনফুল সাহিত্য-সমিতির সভায় জর্জ বার্নার্ড শ'র জীবন ও সাহিত্য প্রসঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। সাহিত্য সাধক অমিয়কুমার সেদিন চক্রে বসে এক অত্যাশ্চর্য ফললাভ করেন। সেদিন চক্রে হাজির হয়েছিলেন জর্জ বার্নার্ড শ' স্বয়ং। সেদিনকার আলোচনার সম্পূর্ণ বিবরণ হয়ত অমিয়কুমারের কাছে এখনও আছে। আমরা সেই আলোচনা দেখেছিলাম এবং তার বিষয়বস্তু আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল।

কিছুকাল আগে লন্ডনের বিখ্যাত 'রেনলডস নিউজ' নামক পত্রিকায় বার্নার্ড শ'র মৃত্যুর কিছু পরে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিয়াঁসের (চক্র) বিবরণ প্রকাশিত হয়। পরলোকতত্ত্ব বিষয়ে ঐ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। বার্নার্ড শ' সংক্রান্ত আলোচনা এই পত্রিকা পেয়েছিলেন দু'জন মহিলা প্রেততাত্ত্বিকের কাছ থেকে, সম্পাদক মন্তব্য করেন সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে বা তার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে নিজেদের মনের মত ধারণা করে নেবেন। এই নিবন্ধ সম্পর্কে আমাদের পাঠকবর্গকেও অনুরূপ অনুরোধ করি, তাঁরা এই সব কথা বিশ্বাস করতেও পারেন অথবা মন থেকে মুছে ফেলতেও পারেন। তবে, এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তির আগ্রহ আছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে এই বছরের 'শারদীয় অমৃত' পত্রিকায় 'অন্য ভুবন অন্য জীবন' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশের পর। অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক ও শিক্ষাবিদ এই বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে পত্র দিয়েছেন।

যে দু'জন প্রেততাত্ত্বিক স্বয়ংক্রিয় কলমের মাধ্যমে এই আলোচনা সঙ্কলন করেছেন তার মধ্যে শ্রীমতী জেরালডাইন কামিনস হলেন মিডিয়ম এবং গ্রন্থকর্ত্রী আর তাঁর সহায়তা করেছিলেন মিস ই বি গিবস। মিস গিবস সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন।

চক্রে কি ঘটেছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রেততাত্ত্বিক দুজন বলেছেন যে চক্রের সূচনাতেই কলম সর্বপ্রথম যখন আন্দোলিত হল তখন কাগজের ওপর বিন্দু বিন্দু ফুটকি চিহ্ন অঙ্কিত হল। তারপর ধীরে ধীরে ভেসে উঠল একটি দাড়িওলা মুখ। এই ছবির তলায় মিডিয়ামের হাতে নিম্নবর্ণিত শিরোনামা লিখিত হল—

"The late lamented G.B.S. still masked by his beard".

মিস কামিনস লিখেছেন তাঁর বান্ধবী যে প্রশ্ন করতে শুরু করবেন তা তিনি জানতেন না। ক্রিসমাসের কাল। বাইরে ক্যারল গায়করা (খৃষ্ট কীর্তনের দল) গান করছে আর এদিকে স্বয়ংক্রিয় কলমে লেখা হচ্ছে। এই দুজন প্রেততাত্ত্বিক বলেছেন যে হাতের লেখা বার্নার্ড শ'রই বৈশিষ্ট্যসূচক। বিরামবিহীন গতিতে লেখা চলল, অনেক সময় কথার মাঝে যতিচিহ্ন পর্যন্ত নেই। বার্নার্ড শ' লিখলেন,—আমার ত সাথে পরিচয়পত্র নেই, এই স্কাউন্ড্রেল যে বার্নার্ড শ তা জানার কোনো উপায় নেই!

"I am told that no defunct soul is permitted to appear among Spiritualists unless he utters or signs his name. But you have no means of finding out whether the writer of these lines is that scoundrel, Bernard Shaw. I may be an impersonation. I carry with me no identity card".

মিস গিবস তখন প্রশ্ন করলেন : ভাবছি আপনার মৃত্যুর যে সব মন্তব্য লেডী এস্টর করেছেন এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তা শোনবার কৌতূহল আপনার আছে কি?

প্রেত বার্নার্ড শ'র কলমে লিখিত হল—লেডী এস্টর? আপনারা তাঁকে চেনেন নাকি? তিনি আমার অতিশয় হিতৈষী বান্ধবী, তিনি রিপোর্টারদের কাছে কি আর বলবেন। সাধারণের চোখে এক নবাবিষ্কৃত বার্নার্ড শ'র কথা হয়ত বলেছেন, হয়ত বলেছেন আমার অশেষ গুণাবলীর কথা। আমি আসলে নাকি ছিলাম একজন লজ্জানম্র ভীরু মানুষ, আর হৃদয়ে মানব সমাজের জন্য কিছু প্রেম ছিল। অথচ আমার এসব সদ্গুণ ছিল না। মানব সমাজ সম্পর্কে আমার মত, না, না বলাই ভালো, অতিশয় নিন্দাসূচক হবে। মানব সমাজ প্রসঙ্গে না বলাই ভালো।

মিস গিবস প্রশ্ন করলেন — আপনার উইলের কি সব আলোচনা চলছে শুনেছেন?

এইবার কলম অতি দ্রুত আন্দোলিত হল এবং কাগজের ওপর আড়াআড়িভাবে লিখিত হল—

এই বিষয়ে আমি একটি তিন অঙ্কের নাটক লিখতে পারি।

I could write a three act play about the horror and shock experienced by members of my public of having conserved my fortune in such a way it may serve a fine purpose that eventually benefits all the younger generation of Britons".

মিস গিবস—কিন্তু সমস্ত প্রিন্টিং প্রেস, টাইপ-রাইটার এবং বইপত্র সব কিছুই যে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন — আপনার পরিকল্পনানুসারে বর্ণমালার রূপান্তর সাধন যে অনেক হাঙ্গাম।

বার্নার্ড শ'র কলমে লিখিত হল—এই বিষয়ে দীর্ঘকাল প্রসারি পরিকল্পনা প্রয়োজন, এই রূপান্তর সাধিত হলে ইংরাজী ভাষার বাবদ অনেক কোটি পাউন্ড বেঁচে যাবে। পাউন্ড মানেই পরিশ্রম, অনেক পরিশ্রমে পাউন্ড পাওয়া যায়, বৃটিশ জনগণের অনেক পরিশ্রম বাঁচবে, আমার পরিকল্পনা কার্যকরী হলে অনেক বেশী সুখভোগ সম্ভব হবে।

এর পর শ' বলেন—কিন্তু ইংরাজ জাতির মনোবৃত্তি কাঁচা—

But the English are, I fear, a congenitally mentally deficient race when it comes to their benefiting themselves. They regret all offers of a life ameliorated by the use of common sense".

এইখানে কলম থেমে গেল। বাইরে

জানলার নীচে আরেক দল ক্যারল গায়কের কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল।

আবার লিখিত হল — না, যখন প্রতিবাদের সুর শুনি তখনি আমার রাগ হয়। তারপর একটু সরস ভঙ্গীতে লেখা শুরু হল—

আমি আপনাদের নাম জানি না, নতুন নামকরণ করতে হবে। মনে হয় আর এক দিন তোমাদের চক্রে নেমে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে হবে। মিসেস আর মিস একস্ নামকরণ করলে তোমাদের একটু তোষামোদ করা হবে। জানেন ত' স্ত্রীলোক ততক্ষণ পুরুষের কাছে রহস্যময়ী যতক্ষণ সে অপরিচিতা—একস্ মানেই আননোন, অপরিচিত বস্তু।

এর পর লেখা শেষ হল—আমিও কিন্তু—

প্রশ্ন — আপনি কি?

—আমিও ত এক অজানিত বস্তু। আননোন কোয়ানটিটি। আমিও আজ বিস্মৃতির পারাবারে প্রবঞ্চিত হয়ে আছি, আমার জীবনের শেষভাগে এই ছিল একমাত্র অনুরোধ। এর পর কলমের গতি ধীর হয়ে এল, লিখিত হল — জর্জ বার্নার্ড শ'।

প্রেততাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন যে এই মন্তব্য বার্নার্ড শ'র স্বহস্ত লিখিত। তাঁদের কাছে এই দিনকার চক্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মহিলাদ্বয় বলেছেন—

It demonstrates the advance and the acclimatization of Shaw only three days after death.

শ'র মৃত্যুর তিন দিন পরেই তাঁর উপস্থিতি ঘটেছিল মিস গিবসের অনুষ্ঠিত চক্রে। সহসা কলম থেমে যায় এবং একটি প্রশ্ন লিখিত হয়—কে তুমি প্যাচ নাকি?

শ্রীমতী প্যাচ ছিলেন শ'র সেক্রেটারী। তিনি বার্নার্ড শ' প্রসঙ্গে একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন।

স্বয়ংক্রিয় কলমে লিখিত হল—

—হে নারী! ঐ ভয়ঙ্কর পীড়াদায়ক নার্সটিকে তাড়াও। ডাক্তারটার সঙ্গে ওর একটা চুক্তি হয়েছে, ওরা দুজনে মিলে আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, যে কোনো রকমে বাঁচিয়ে তুলবে। আমি মৃত্যু চাই—নিশ্চিন্ত হতে চাই। মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতে চাই। অস্ত্রোপচারের ফলে সারা অঙ্গে নানা রকম কাট-কাটরা জুড়ে একটা চলমান কুশপুত্তল হয়ে আমার বাগানে ঘুরে বেড়াতে চাই না।

মিস গিবস কি বলতে উদ্যত হতে কলমের মুখে বেরিয়ে এল - প্যাচ কি বলছ? এমন বিশ্রী স্বপ্ন দেখছিলাম, যেন আমি মারা গেছি। অথচ ভাবলে জ্ঞান থাকে না, আমি এখনও জীবিত আছি দেখছি।

এর পর কলম জানতে চায়—তুমি কে...? মাদাম—আমি এখন কোথায়?

উত্তরে মিস গিবস বললেন—চেলসিয়ার একটি বাড়িতে।

——ননসেন্স—আমি ত' এ্যায়টে আমার বিছানায় শুয়ে আছি—না আবার স্বপ্ন দেখছি!

মিস গিবস উত্তরে বললেন—তিন দিন আগে আপনার মৃত্যু হয়েছে। আপনি মরতে চেয়েছিলেন, অন্তত সংবাদপত্রে তাই দেখলাম আপনি ত' এক রকম নিজেই মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছিলেন।

এইখানে কলম থামল, তারপর লিখিত হল—

That was my joke madam I recollect that at the hospital ...I said to some fool" "Tell them Bernard Shaw is dead—' quite a Correct Statement".

—আমিই ত কোনো মূর্খকে বলেছিলাম, বলে দাও বার্নার্ড শ' মৃত। এইখানে কলম থামল।

এর দু দিন পরে আবার বার্নার্ড শ' আবির্ভূত হয়েছিলেন কিন্তু সে বিবরণ বারান্তরে দেওয়া যাবে।

—অভয়ঙ্কর

সাহিত্যের খবর

বিদেশী ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে যে কিছুটা আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে, তার সংবাদ 'অমৃতে' মাঝে-মাঝেই প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি এরকম একটি সংবাদ এসেছে যুগোশ্লাভিয়া থেকে। যুগোশ্লাভিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ওদ্জেক'-এ (প্রতিধ্বনি) কয়েকজন বাঙালী কবির কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম কিস্তিতে যাঁদের কবিতা অনূদিত হয়েছে, তাঁরা হলেন জীবনানন্দ দাশ, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অলোক সরকার, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও আশিস সান্যাল। এ ছাড়া হুমায়ুন কবিরের লেখা 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা' নামক প্রবন্ধটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত যুগোশ্লাভ লেখক টভর্তো কুলনভিস। এই সংখ্যাটি আমাদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। দ্বিতীয় কিস্তি যে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, তার কপি এখনো দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। জানা গেছে, তাতে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, মণীন্দ্র রায়, তরুণ সান্যাল ও জগন্নাথ চক্রবর্তীর কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতীয় কবিতার আর একটি অনুবাদ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহর থেকে। বেদের মন্ত্র থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন প্রখ্যাত তরুণ কবি শ্রীমতী অলডেন। তিনি কিছুকাল এর জন্যে ভারতে এসেছিলেন এবং বিভিন্ন ভারতীয় কবি ও লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয় নি। আমরা সম্পাদিকাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই ভারতীয় কবিতার এরকম একটি বৃহৎ এবং সুন্দর ইংরেজি অনুবাদ সংকলন প্রকাশের জন্য। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের যথাযথ উপস্থাপনা সম্ভব হয় নি এতে ক্ষুণ্ণ হবার কারণ থেকে গেছে। বিষয়টি স্পষ্ট করবার জন্য আধুনিক বাংলা কবিতার যে পরিবেশনা হয়েছে, সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে যাঁদের কবিতা অনূদিত হয়েছে, তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, নরেশ গুহ, জ্যোতির্ময় দত্ত প্রমুখ। আশ্চর্য, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মত কবিদের বাদ দিয়ে বাংলা কবিতার কোন প্রতিনিধিস্থানীয় সংকলন হয় কিনা সাহিত্যরসিকমাত্রেই তা ভেবে দেখবেন। অন্যান্য ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধেও একই কথা। কোন একটি পত্রিকায় কোন বিশেষ সংখ্যায় ভারতীয় কবিতার সংকলন নিদর্শন হিসেবে কিছু-কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়, তাতে বিশেষ কিছু বলার থাকে না। কিন্তু ভারতীয় কবিতার সংকলন হিসেবে যখন কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তখন এ বিষয়ে প্রশ্ন থাকে বৈকি?

এই সপ্তাহের একটি অন্যতম উল্লেখ্য সংবাদ হল, সাহিত্য আকাদমি কর্তৃক প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাহিত্য আকাদমির সম্মানিত সদস্য নির্বাচন। গত ১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় জাতীয় গ্রন্থাগারে এক সাহিত্যিক সমাবেশে এই সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। এতে পৌরোহিত্য করেন, আকাদমির সভাপতি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রদত্ত প্রশস্তি ভাষণে বলেন—'বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মত তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা বাংলা ভাষার সীমা অতিক্রম করে আজ সারা দেশে বিকরিত। তাঁর ছোট গল্প ও উপন্যাস ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে দেশের তাবৎ সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। যারা সবার পিছে, সবার নীচে থাকে, যারা সবার অধম, দীনের থেকেও দীন, সমাজের সেই সব সর্বহারা,

ছন্নছাড়া নীচুতলার লোকেদের অন্তরের কথা, তিনি যেমন তাদের চোখে দেখে তাদেরই ভাষায় বলতে পেরেছেন — তেমন আর কে পেরেছে? শ্রদ্ধায় সবিনয়ে আকাদমির সর্বোচ্চ সম্মান তাঁকে নিবেদন করতে পেরে আমরা নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করছি।' উত্তরে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন —'আমার সাহিত্যকর্মের লৌকিক মূল্য যত সামান্যই হোক, আজ তার দক্ষিণ দৃষ্টির আশীর্বাদ পেয়ে আমি জীবিতকালেই অমরবৃন্দের মধ্যে পরিগণিত হলাম। আজ আমি ধন্য, আমি কৃতার্থ।' শ্রদ্ধেয় তারাশংকরের আগে আর মাত্র দুজন এই দুর্লভ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। এঁরা হলেন সর্বপল্লী ডঃ রাধাকৃষ্ণন ও শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। সভায় ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস রচনার জন্য সূর্যনারায়ণ দাসকে এবং অসমীয়া ভাষায় অলকানন্দ গ্রন্থটি রচনার জন্য অসমীয়া কবি নলিনীবালা দেবীকে সাহিত্য আকাদমির পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই সমাবেশে জানান হয় যে, তারাশংকরের 'রাইকমল' গ্রন্থটি ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'মাহফিলে'র একটি বিশেষ তারাশংকর সংখ্যা প্রকাশিত হবে বলে জানা গেছে।

'হাউয়ার্ড স্ট্রীট' নামে যে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে, তা ইতিমধ্যেই একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই গ্রন্থের লেখক নাথান সি হার্ড। তাঁর এই বত্রিশ বছরের জীবনের অর্ধেকটাই কেটেছে জেলে। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার মাত্র কিছুদিন আগে তিনি ডাকাতির অপরাধে জেল জীবন শেষ করে মুক্তি পেয়েছেন। এই উপন্যাসের সবচেয়ে যে দিকটা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা হল বাস্তব জীবনের নিখুঁত বর্ণনা। ছ' ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা এই লোকটির জীবনধারা মিশে আছে এই হাউয়ার্ড স্ট্রীটের সঙ্গে। ছোটবেলায় তিনি ছিলেন এ অঞ্চলের রাশ স্ট্রীটে। লিংকনের মূর্তির পাদদেশে কত দিন শুয়ে কেটেছে তাঁর রাত। উপন্যাসেও রয়েছে তার বর্ণনা। কোন সিম্বলিক অর্থে নয়, একেবারেই বাস্তবের দিক থেকে তিনি এই চিত্র এঁকেছেন। মাত্র নয় বৎসর বয়সে চুরির অপরাধে তাঁর জেল হয়। তের বছর পর্যন্ত সেখানেই কাটে। এখানেই প্রথম তাঁর মনে সাহিত্যরচনার ইচ্ছা জেগে ওঠে। সেলে বসে-বসে তিনি পড়তেন। এরকম পড়তে-পড়তেই একদিন তাঁর হাতে 'কেমন করে লিখতে হয়' নামে একটা বই এল। সেখানে আর একজন কয়েদীর কাছ থেকে তিনি রিচার্ড রাইট ও নর্মান মিলারের নাম শোনেন। এর পর এঁদের অনেক কটি গ্রন্থ তিনি পড়ে ফেললেন। তখন থেকেই 'হাউয়ার্ড স্ট্রীট' নামক এই উপন্যাসটি রচনার প্রেরণা তাঁর মনে জাগে। এর মধ্যে বইটির হাজার-হাজার কপি বিক্রীত হয়েছে। একজন সমালোচক বলেছেন, কোন মহত্তর উপলব্ধির জন্য নয়, একমাত্র বাস্তব ও নিখুঁত বর্ণনার জন্যই বইটি পাঠকসমাজে এত আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে।

'বিচিন্তা ভারতী' পত্রিকাটির দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়াও একটি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। যোগদানেচ্ছু তরুণ লেখকদের — সম্পাদক, বিচিন্তা ভারতী, ৭১এ নেতাজী সুভাষ রোড, রুম নং ডি-২৭, কলকাতা—১ এই ঠিকানায় যোগদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সব শহীদ মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের পরিচয় সম্বলিত একটি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক যুগ্মভাবে প্রকাশ করেছেন। বাসুদেব ফাদকে থেকে আরম্ভ করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পর্যন্ত(?) শহীদদের জীবনী এতে সংকলিত হয়েছে। এরপর আরও দু'খণ্ড এরকম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে অন্যান্যদের মধ্যে ক্ষুদিরাম বসু, যতীন দাস, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগত সিং, কস্তুরবা গান্ধী, লালা লাজপত রায়েরও জীবন কাহিনী আছে।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কলকাতা শাখার উদ্যোগে সম্প্রতি গান্ধী-জয়ন্তী পালন করা হয়। সভায় অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য প্রমুখ ভাষণ দেন। সভাপতিত্ব করেন শংকরপ্রসাদ মিত্র। তিনি বলেন—'আজ শুধু ভারতবর্ষই নয়, সমস্ত পৃথিবীই গান্ধীজীর স্মৃতি চারণ করছেন। গান্ধীজীর মূল বাণী, সত্যই ভগবান।' যুগ্ম-সম্পাদিকা রেখা চট্টোপাধ্যায় সকলকে অভিনন্দন জানান।

শ্রীমতী গিয়েন্দোলিন ব্রুকস সমকালীন আমেরিকান নিগ্রো কবিদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট নাম। সম্প্রতি তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ করেছেন হ্যাপার এণ্ড রো কোম্পানী। চিকাগো শহরে একটি ছোট্ট নিগ্রো মেয়েকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল, কবিতায় তাই পরিবেশন করা হয়েছে। হয়ত কাব্য-মূল্যের বিচারে এতে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আবিষ্কার করা সম্ভব, কিন্তু নিগ্রো জীবনের নিদারুণ অসহায়তার দিক থেকে গ্রন্থটি এরই মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

এই জন্ম, জন্মভূমি —মণীন্দ্র রায়। **মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা ১২। দাম দু টাকা।**

কবি মণীন্দ্র রায় আজ পঞ্চাশের দ্বার প্রান্তে উপনীত। এই সংবাদটুকু তাঁর সদ্য প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থের সমালোচনাসূত্রে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার কবিসমাজের তিনি অন্যতম প্রতিনিধি। তাঁর কাব্যসাধনার কাল তিনটি দশককে পরিব্যাপ্ত। এই তিনটি দশকের সঙ্গে কবি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই কালের কাব্য ও শিল্পচেতনার মধ্যে যে প্রাণস্পন্দন জেগেছে তাঁর পিছনে এই কবির অবদান অনুল্লেখ্য নয়। তাঁর উপলব্ধি ও উপলব্ধ বিষয়বস্তুর মেঘাবরণ কাটিয়ে আজ দেখা দিয়েছে এক রক্তরাঙা দিগন্তের আভাস। কবি মণীন্দ্র রায়ের একটি প্রধান পরিচয় তিনি বাঙালী। সেই কারণেই বিশেষ করে বাংলা দেশের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর যোগ। বাংলা দেশের ইতিহাসে বিগত তিনটি দশক এক সংকটের কাল। তিনি এই বিচিত্র বিপর্যয়ে অনুদ্বিগ্নমনা নন, তাঁর কাব্যসাধনার কাল যে এক মহা দুর্গতি ও দুঃখের কাল সে বিষয়ে তিনি সচেতন। তাই লক্ষ্য করা গেছে তাঁর সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত প্রতিটি কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে নতুন বক্তব্য, নতুন সুর।

মণীন্দ্র রায়ের নতুন কবিতার বই 'এই জন্ম, জন্মভূমি' নানাকারণে এক অনন্যসাধারণ কাব্যগ্রন্থ। শুধু বিষয়বস্তুর দিক থেকে নয়, আঙ্গিক ও কাব্যরীতির দিক থেকেও। তাঁর কাব্যশৈলী এইখানে নিছক নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তিতে আবদ্ধ নয়। ব্যক্তিমানসের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য। এই-সূত্রে বলা যায়, স্টেফান মলার্মের বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা "ফনের দিবাস্বপ্নে"র মধ্যে যে কাব্য-কৌশল দেখা যায়—'এই জন্ম, জন্মভূমি' তার সগোত্র। বাস্তবের রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে আছে কবির সুগভীর অনুভূতি। এক অস্থির যুগের কঠিন প্রশ্নকে উচ্চারণ করেছেন কবি বলিষ্ঠ কণ্ঠে।

জীবনঅনুভবের যন্ত্রণায় কবি অস্থির, এবং দুই বিচিত্র বেদনা-বোধই 'এই জন্ম, জন্মভূমি'কে সার্থক করে তুলেছে। প্রেম নয়, প্রার্থনা নয়, এ এক নবচেতনার কাব্য। ইতিহাস-সচেতন কবির 'এই জন্ম, জন্মভূমি' অন্তর-মন্থনসঞ্জাত নির্যাস।

৫৫৯ লাইনে সম্পূর্ণ এক সুদীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ কবিতা 'এই জন্ম, জন্মভূমি'। যে মাটিতে স্বয়ং কবি দাঁড়িয়ে, সেই মাটিতে দাঁড়াবার আমন্ত্রণ জানিয়ে কবি বলেছেন,

'আজকের এই দিনের স্নায়ুকেন্দ্রে কি সুতীব্র আলোড়ন। যে চীৎকার চারিদিকে, সে চীৎকার কি তোমার কানে যায়নি?'

কবির মনে সংশয় জেগেছে সবটুকুই কি চীৎকার, না বোবা প্রশ্ন? তারপর কবি বলেছেন—"প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্তে/দেশে ও বিদেশে, দেশে দেশে/ভেঙে পড়ছে স্থিতাবস্থা,/বদলে যাচ্ছে মনের ভূগোল,/জেগে উঠছে পাহাড়ের ক্রমচিহ্ন। ঊর্ধ্বে—/সময়ের জন্ম বিভাজিকা।"

এই সবের মাঝখানে রয়েছি তুমি আমি। রক্ত জেগেছে এরই কল্লোল, "এ একটা অস্থির দিনে/এ একটা উদাত্ত সম্ভাবনা!"—সেই অস্থির দিনের কেন্দ্রবিন্দুতে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে। আমরা নিশ্চিত বেঁচে আছি, কিন্তু সে বাঁচা কী রকম? এই অশান্তকালে চারদিকে একটা নিঃশব্দ চঞ্চলতা, উঠছে ঝড়, দেশে ও বিদেশে। কিন্তু সেই 'তাপমান যন্ত্রের 'পারদ-রেখার লিপি' কি আমাদের বুকে ধরা পড়ছে না?

যা কিছু আলোড়ন তা 'কেবলি হবার দিকে যেতে চায়', আর আমাদের বুকে প্রতিধ্বনি জাগাতে চায়। মধ্যবিত্তের র‍্যাশন-কেন্দ্রিক জীবন, বিদগ্ধ ছেলের পদ্য লেখার প্রয়াস, মধ্যরাতে ঘুষোঘুষি রক্তপাত—সবই আছে; আছে আইবুড়ো মেয়ের চুড়া বাঁধা চুল নিয়ে উড়ে বেড়ানোর রিক্ততা। চারদিকে বিকার—মদের গেলাসে আলোচনা সংসারে—কামু। এ সবই যেন মায়া, জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে পলায়ন। কিন্তু এ ছাড়াও আরো আছে—

"অথচ কাছেই আছে কিন্তু/আরো একটা গনগনে জীবন/আরো একটা পাদস্থল বিন্দু/ক্রমাগত ক'রে আক্রমণ।...

এই পরিস্থিতিতে সবই টাল খাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে মূল্যবোধ। সমুদ্রের তরঙ্গ-বিভঙ্গে ভেঙে পড়ছে সবকিছু। ওদিকে—

"স্বর্ণ অশ্রু ঘূর্ণি আর গ্রাসে/ওকে আসে দুরন্ত আকাশে—!"

কবির এই প্রশ্ন বর্তমানের কঠিনতম প্রশ্ন! রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন "তোরা শুনিস নি কি শুনিসনি তার পায়ের ধ্বনি—সে যে আসে আসে, আসে—' রবীন্দ্রনাথের মানসে তিনি হয়ত ঈশ্বর, বর্তমানের কবি মানসে এই স্থান গ্রহণ করেছে মানুষ। মানুষকে আজ দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এবং সেই মানুষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে দুরন্ত আকাশে।

তারপর কবি বলেছেন, 'জানতাম, জানতাম আমি এদিন আসছেই'—। পুরনো দিন আর থাকবে না, সময়ের দ্বিতীয় নিয়মে হবে উলোট-পালোট—"অথচ আমরা তো জানি/গঙ্গাহৃদি বঙ্গ, জানি নাকি/বড় বেশীদিন আছি/স্থিরতর এ মন্দিরে! জানি নাকি আজ/কালের বটের ঝুরির ভেঙেছে খিলান/ভিতের ফাটলে সাপ পেঁচা ও বাদুড়,জানি নাকি ঐ/গঙ্গার তরঙ্গ থেকে বড় বেশী দূরে/মুছে গেছে জীবনের টান!"

এখানকার এক একটি সকাল যেন "তাম্রশাসনের অনুলিপি।" যে কোনো গ্রামের ছবি, সেই শস্যের খেত, সেই বউকে শাক-তোলা শেষে খুঁজে না পাওয়ার আকুলতা, এ সবই আছে।

আর সেই সঙ্গে আছে, গঙ্গাহৃদি কাল-প্লাবী বঙ্গ'! আছে একটা অনুভূতি—ঝড়ের কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে কে জানে কখন হঠাৎ আসমুদ্র হিমাদ্রি ঝন্ ঝন্ করে উঠবে!

এক অশান্ত কলরোল। তাহলে প্রশ্ন থাকে, সেদিনে আমি কোথায়? "একজন মানুষ/দিনে দিনে, বছরে বছর/যুদ্ধে ও দুর্ভিক্ষ, বানে/ দাঙ্গায় উদ্বাস্তু স্রোতে/জীবনের আর্ত নিবীজনে/অ জ এইদিনে/একজন মানুষ, সে তো জানে—/বুকের পাথর ঠেলে জীবনেরই লাফ দিয়ে ওঠা।"

এই মহালগ্নে আমি কোথায় এই প্রশ্ন জেগেছে কবির মনে। আরো অনেকের মনেও এই প্রশ্ন। তাদের হয়ে তাদের মনের কথা তিনি বলছেন। আমরা 'চৌকোনা ইঁটের খাঁচায়' বেঁচে আছি, কিন্তু এ কোন ধরনের, বাঁচা? কবি তাই 'জীবনেরই শরণার্থী'! তিনি প্রশ্ন করেন, "আমি কবি, কী থাকে আমার/জীবনেরই পাশে আমি আর্তি/নির্বাচিত বীজের তোলপাড়!"

তোলপাড়! সময় ধনুরী যেন, আদিম আঘাত হানছে। আর আজকের দিকে এই সপ্তরথীর ব্যূহে তুমি অভিমন্যু, তোমার অঙ্গে রক্ত ঝরছে, কেন তুমি আজ এমন মরীয়া?—

'তবু কোন চক্রান্তের দায়ে/সাতটি নেকড়ের ফাঁদে নিরস্ত্র যৌবন/

ছিন্নজবা হৃদপিণ্ডের আত্ম বলিদানে/

মরীয়া এমন!"/

এই সূত্রে মহাভারতের কাহিনীর অদল কবি যেভাবে এই কাব্যের ৪০০-৪৫০ লাইনে ব্যবহার করেছেন, তা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

আজকের এই মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে জীবন যেন বলছে—জেগে ওঠো হে বীর, উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত। অশ্রুর বিলাসিতা তোমার সাজে না। ধনুকে টান দাও!

জীবনের দ্বিতীয় নিয়মে সেই কুরুক্ষেত্রে ছিন্নমস্তা সময়ের অস্ত্রে আজকের জীবন উৎক্ষিপ্ত। প্রশ্ন হতে পারে, এই শ্মশানের বুকে বেঁচে কি লাভ? এই উৎক্ষিপ্ত যুগ-সন্ধির দিনে কেবলই 'যায় যায়' শব্দের প্রতিধ্বনি। এ এক প্রচণ্ড আত্ম-পরিহাস।

তবু, আমরা এই শ্মশানের বুকেই গড়ে তুলি স্বপ্ন! কবি বলেছেন, "সে একটা উৎক্ষিপ্ত যুগসন্ধি/তবু আমি স্বপ্ন/আমি নিয়ত নির্মাণ/আগুনে পাথরে দ্রোহে খুঁজি শুধু সময়ের গ্রন্থি।"

শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে এগিয়ে চলেছে মানবযাত্রার এই মিছিল, রূপান্তরই সেখানে ধর্ম। তাই কবির কণ্ঠে জাগে শেষ প্রশ্ন—

'আমি কবি, কী থাকে আমার/এই জন্ম, জন্মভূমি, এই/চেতনারই বিস্ফোরণে তরঙ্গে তরঙ্গ—/ মানুষে মানুষ, প্রশ্ন, দিগন্ত উৎসার/।"

সম্পূর্ণ কবিতাটিতে ছন্দ, প্রকরণ ও পদ্ধতিতেও কবি যে পরীক্ষা করেছেন তা অভিনব। তাঁর স্বচ্ছন্দ, সরল এবং সরস ভঙ্গী কাব্যপাঠকের হৃদয়কে সহজে স্পর্শ করে। মণীন্দ্র রায়ের পরিণত মানসের ফসল 'এই জন্ম, জন্মভূমি'।

—ভবানী মুখোপাধ্যায়

রোমাঞ্চ (উপন্যাস) — **শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়।। পি সি বসু লেন, উকিলপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।। দাম দু টাকা।**

সম্ভবত শিশিরবাবুর এটি প্রথম উপন্যাস। রোমাঞ্চ নামেই উপন্যাস। উপন্যাসের বয়ান, লিপিকৌশল লেখকের মোটেই আয়ত্তে নেই। শিল্পকর্মের পেছনে যে পরিকল্পনা কাজ করে, শিশিরবাবুর উপন্যাসে তা খাপছাড়া। কেবলমাত্র কতকগুলো যৌনসম্ভোগের ঘটনাকে বিশৃঙ্খলভাবে গ্রথিত করা হয়েছে। উপন্যাসের মধ্যে লেখকের যে অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির পরিচয় থাকে, তা এই উপন্যাসে পাওয়া যাবে না। উপন্যাসের সবকটি চরিত্রই কলের পুতুলের মত পরিচালিত হয়েছে। চরিত্রগুলোর মধ্যে যৌনজীবনের আধিক্য দেখানো হয়েছে, কেউ কেউ উচ্চশিক্ষিতও বটে কিন্তু যে অমোঘ সামাজিক কারণে চরিত্রগুলো ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, তার সূত্র কোথাও নেই। অযথা সংলাপ আর ইংরাজি শব্দ দিয়ে ভাষাকে আরও দুর্বল ও হালকা করে ফেলা হয়েছে।

অবরে সবরে (কবিতা)—**রবি গুহ-মজুমদার। দাম** ৩·০০

খুঁজি খুঁজি নারি (কবিতা)—রবি গুহ-মজুমদার। ডাক পাবলিশার্স। ১।২।১, হাজরা রোড। কলকাতা—২৬। দাম ২·৫০ পয়সা।

রূপ-প্রকল্প এবং বিষয়চৈতন্যে বাংলা কবিতায় এমন একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যা অনুধাবন করতে যথেষ্ট অনুশীলন দরকার। বিশেষত বাংলা কবিতার ভাষাশরীরে চলছে নিত্যনোতুন পরীক্ষা এবং নিরীক্ষা। এসমস্ত সম্বন্ধে অবহিত না এলে কবিতা লিখতে যাবার বিপদ অনেক। আর এই বিপদ ঘটেছে রবি গুহমজুমদারের উপরোক্ত কাব্যগ্রন্থদুটিতে। মোট ঊন-আশীটি কবিতা নিয়ে এই দুটি কাব্য-সংকলন। যে বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতার জারক-রসে সার্থক কবিতা হয়ে ওঠে—এখানে তার যথেষ্টই অভাব। কিছু উজ্জ্বল চিত্রকল্প, কিছু তীক্ষ্ণ শব্দযোজনা মাঝে মাঝে পাওয়া যায় মাত্র।

প্রথম দশজন—স্কুল ফাইন্যাল (রেগুলার)—১৯৬৯।। প্রকাশক ঃ স্কলার্স সিন্ডিকেট। ১৭০এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৪। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থটি এক হিসাবে অভিনব। যে দশজন ছাত্র স্কুল ফাইন্যালে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছেন, প্রকাশক তাঁদের সচিত্র বিবরণ দান করেছেন। সেই সঙ্গে 'কীভাবে পড়বে', 'কি লিখব ও কি লিখব না', 'উত্তর কি করে লিখতে হয়', সবস্ট্যান্স, ট্রান্সলেশন, চিঠিপত্র কিভাবে লিখতে হয় প্রভৃতি পরিচ্ছেদগুলি ছাত্রদের কাছে বিশেষ

সহায়ক হবে। বর্তমান ছাত্র অসন্তোষের দিনে এই ধরনের গ্রন্থের একটা মূল্য আছে। যারা প্রথম দশজনের মধ্যে তাদের পারিবারিক পরিবেশ, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়ে জানার জন্য সাধারণের একটা স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে, এই গ্রন্থ সেই আগ্রহ পরিপূরণে সহায়ক হবে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

সপ্তদীপা—(বিহারের একমাত্র প্রগতিশীল সাহিত্যপত্র)—অক্টোবর ১৯৬৯।। সম্পাদক—রবীন দত্ত, এ।১২৪, কঙ্করবাগ কলোনী। পাটনা—১।। দাম পঞ্চাশ পয়সা।।

এই সংখ্যায় সম্পাদক লিখিত গল্পটি নূতন রীতির। অর্চনা চৌধুরী, শংকর সেন ও আনন্দ ভট্টাচার্যের গল্পগুলিও সুলিখিত। এই সংখ্যায় 'রম্যানি বীক্ষ্য' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক সুবোধ চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন জীবনময় দত্ত। এই সংখ্যায় কোনো প্রবন্ধ নেই। হো চি মিনের একটি কবিতা অনুবাদ করেছেন সুস্মিতা রায়। বাংলার বাহিরের বাঙালীদের এই সাহিত্য-প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা (১৯৬৮-৬৯)—সম্পাদক: বিশ্বরূপ রায়চৌধুরী ও ভবানীপ্রসাদ দে। মূল্য লেখা নেই।

আশুতোষ কলেজ ম্যাগাজিনের এইটি ৪৩তম সংখ্যা। এই পত্রিকাটির ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এই সংখ্যাতেও প্রাক্তন ছাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি সুন্দর কবিতা আছে 'শূন্যে'। এছাড়া আরেকটি কবিতা লিখেছেন প্রাক্তন ছাত্র শুদ্ধসত্ত্ব বসু। অধিকাংশ রচনা ছাত্রদের। কবিতাগুলির মধ্যে সবগুলি প্রশংসনীয় না হলেও কয়েকটি কবিতার মধ্যে শক্তিমত্তার পরিচয় আছে। রণদেব সরকারের কয়েকটি ভাঙাচোরা মুখ ও আন্তর্জাতিকতা, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিককালের উপন্যাস এবং যুবমানসে তার প্রতিক্রিয়া, ভবানীপ্রসাদ দে-র 'রাশি বিজ্ঞান' প্রবন্ধ তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রদীপ ভট্টাচার্য, দেবব্রত সিংহবিশ্বাস, চিত্তগোপাল সাহা, বিশ্বরূপ রায়চৌধুরীর ও অমৃতলাল সরকারের গল্পগুলির মধ্যে প্রতিভার পরিচয় আছে। ইংরাজী রচনার মধ্যে শশাঙ্কশেখর ঘোষের গান্ধীজীর বাস্তবতা সুলিখিত। এই সংখ্যায় কয়েকটি ছবি আছে।

ঢেউ (দেয়ালী সংখ্যা, ১৩৭৬)—সম্পাদক অলককুমার তালুকদার।। কে ১।৫১ সিন্দ্রী, ধানবাদ।। দেড় টাকা।

পাঁচমিশেলী পত্রিকা লিখেছেন পরমানন্দ সরস্বতী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য বিমলচন্দ্র ঘোষ, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, মনোজ বসু, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যাক এবং আরো অনেকে। প্রচ্ছদ এঁকেছেন নিতাই ঘোষ।

একাল (তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)—সম্পাদক নকুল মৈত্র ও ভরত সিংহ।। ২৪, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতা—৩৭। পঞ্চাশ পয়সা।

বিশেষ ছোটগল্পের সংখ্যা হিসেবে বেরিয়েছে একালের এই সংকলনটি। লিখেছেন সমীর রক্ষিত (তারের ওপর খেলা), অমল চন্দ (এক সঙ্গে), সুখেন্দু ভট্টাচার্য (হাসপাতাল), অখিল দত্ত (খণ্ড বাংলায় তিন ঋতু), অজু মুখোপাধ্যায় (অলৌকিক দর্শনের অভিজ্ঞতা) ভরত সিংহ (রোগ) সুবিমল মিশ্র (পার্ক স্ট্রীটের ট্রাফিক পোস্টে হলুদ রঙ), নকুল মৈত্র (মানুষের মানচিত্র)। প্রচ্ছদ এঁকেছেন কৃষ্ণকুম মুন্সী। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক গল্পের ক্ষেত্রে পত্রিকাটি নতুনত্বের আশ্বাসবাহী।

নীলার্ণব (৩য়, ৪র্থ সংকলন)—সম্পাদক প্রবীরকুমার দেব, প্রদীপ হাজরা, বিজনকুমার মজুমদার, সঞ্জয় ঘোষ ও দেবরঞ্জন বসু মল্লিক।। মুদ্রক: নিউ এজ প্রিণ্টার্স, ৫৯, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা—৯। এক টাকা।

লিখেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, নির্মলেন্দু গৌতম, দীপংকর সেন (পিয়ানোর কবি শোপাঁ ও জর্জ স্যাণ্ড), গোপাল সান্যাল (আধুনিক চিত্রকলা প্রসঙ্গে), সরল দে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, রঞ্জন বসু এবং আরো কয়েকজন। লেখা নির্বাচন উন্নত মানের।

মধ্যাহ্ন (বিশেষ প্রবন্ধ সংখ্যা)—সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ বসু ও সুখেন্দু ভট্টাচার্য।। ৬৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯।। দাম: এক টাকা।

কবিতা - উপন্যাস - ছোটগল্প - নাটক সম্পর্কিত আলোচনা সমালোচনায় মধ্যাহ্নের এ-সংখ্যাটি মূল্যবান। লিখেছেন হরপ্রসাদ মিত্র, গৌরীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অচ্যুত গোস্বামী, সত্য গুহ, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত ও দিলীপকুমার মিত্র। চিত্র ও চলচ্চিত্র সম্পর্কে লিখেছেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা আদিত্য ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে একটি ছোটগল্প কোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিভা—সম্পাদক: প্রদীপকুমার বসু মজুমদার। বাবুরাম ঘোষ রোড, টালিগঞ্জ কলকাতা-৪০। পঞ্চাশ পয়সা।

শারদ সাহিত্যের উৎসবে কেবল প্রবীণের দল আধিপত্য করবেন—এটা বাঞ্ছিত নয়, নবীনদেরও জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। 'প্রতিভা' ব্যবসায়ীবুদ্ধিসম্পন্নদের কাগজ নয়। তবু আন্তরিকতা উৎসাহ ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় সর্ব-অবয়বে। লিখেছেন কুমারেশ ঘোষ, মানবেন্দ্র পাল, সুভাষ সমাজদার, প্রশান্ত চক্রবর্তী, অজিত সরকার, সুব্রত ঘোষ স্বপন দত্ত, চারু দত্ত প্রমুখ নবীন-প্রবীণ লেখকেরা।

ধৃতিদীপা—সম্পাদক: বিবেকারঞ্জন চক্রবর্তী। ৬৭বি, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৫। দু' টাকা।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আশীর্বাদধন্য কাগজ। লিখেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ চক্রবর্তী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মসউদ আর রহমান, কুমার মিত্র, শুভাশিস গোস্বামী, সত্য গুহ, সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। পত্রিকাটির লেখা নির্বাচনে একটা অসাম্প্রদায়িক চেহারা আছে।

শিলীন্দ্র (৩য় সংকলন)—সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত। ১৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯। দাম: পঞ্চাশ পয়সা।

লিখেছেন শান্তনু চট্টোপাধ্যায়, কমল বসু, প্রণব চক্রবর্তী, কণাদ গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, কালীনাথ চক্রবর্তী, উদয় ভট্টাচার্য, অমল মুখোপাধ্যায়, বিমলেন্দু চক্রবর্তী, অপূর্ব মুখোপাধ্যায়।

আত্মণ—সম্পাদক সুধীরকুমার পোদ্দার।। ৫৩।৮এ গৌরীবাড়ী লেন, কলকাতা-৪। এক টাকা।

প্রচ্ছদে, মুদ্রণে ও অঙ্গসজ্জায় আধুনিক মেজাজের পত্রিকা। সম্পাদক একজন ধন্যবাদের যোগ্য। রচনা নির্বাচন উন্নত মানের। লিখেছেন বিকাশ চৌধুরী, ললিতা কুণ্ডু, নিতাই দোলাই, সুধীর পোদ্দার, তাপস আঢ্য, আনন্দ সেন, সৌরীন ভট্টাচার্য, ছবি বসু, অনিল নন্দী এবং আরো কয়েকজন।

রাণার—সম্পাদক মিলনকুমার দাস।। ১৪বি রুড স্ট্রীট, বালিগঞ্জ, কলকাতা-১৯।। দাম: এক টাকা।

গল্প প্রবন্ধ নাটক নিয়ে রাণারের এ সংখ্যাটি আকর্ষণীয়। লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, কবিরুল ইসলাম, শ্যাম পাল চৌধুরী, বাসুদেব পাল, সত্য গুহ, নচিকেতা ভরদ্বাজ, সমীর চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

ছোট গল্প—সম্পাদক অজু মুখোপাধ্যায়। ১৩ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি:-৯। দাম: পঁচাত্তর পয়সা।

পরিচ্ছন্ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ছোট গল্পের পত্রিকা। অনুবাদ ও মৌলিক গল্পে সমৃদ্ধ। লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ভরত সিংহ, অজু মুখোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভলতেয়ার ও জেরোম ওয়েইম্যান-এর দুটো গল্পের অনুবাদ ছাপা হয়েছে। গল্পরসিকদের কাছে পত্রিকাটি ভালো লাগবে।

দৈনিক সাহিত্য—সম্পাদক: দীপককুমার সেন। ৪৪এ, সাহেবান বাগিচা, দমদম কলকাতা-২৮। দাম: নেই।

নমুনার যদি এ-দশা হয়, আসল সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকারা আতংকিত হবেন। পুরনো লেখার দু'-একটা পুনর্মুদ্রণসহ নতুন লেখা আছে কয়েকটা। পত্রিকাটির নাম দৈনিক সাহিত্য কেন—তাই বা কে জানে!

লেখার আগে

অতুল চক্রবর্তী

'রবিন্সন ক্রুসো' বইখানির কথাই ধরা যাক। বইটির বিপুল জনপ্রিয়তা ও সংখ্যাতীত পাঠকদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অথচ রচনাটি নিরেট বাস্তব ঘটনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ১৭০৪ খৃঃ আলেকজান্ডার সেলকার্ক নামক মাত্র আটাশ বৎসর বয়স্ক এক স্কটল্যান্ডবাসী নাবিক তার অবাধ্য আচরণের জন্য চিলির প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল থেকে প্রায় চারশত মাইল দূরবর্তী এক ক্ষুদ্র পর্বতসংকুল নির্জন দ্বীপে ক্যাপ্টেন কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়।

সেলকার্কের সকল অনুনয়-বিনয় কঠোরচিত্ত ক্যাপ্টেনের বিচারে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। সেকালে জাহাজের ক্যাপ্টেনরা ছিলেন নাবিকদের দন্ডমুণ্ডের কর্তা। সামান্য কিছু আহার্য, কিছু যন্ত্রপাতি এবং একটি বন্দুকসহ সেলকার্ককে একাকী নির্জন দ্বীপে পরিত্যাগ করা হয়। প্রথম কিছুদিন সেলকার্ক নৈরাশ্যে একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু জীবনধারণের তাগিদে ক্রমশই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তাকে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। পাহাড়ী ছাগল হত্যা করে ক্ষুধার আহার এবং পশুচর্ম দিয়ে পরিধানের আচ্ছাদন নির্মাণ করতে থাকে। আর সারাদিন ব্যাকুল প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকে সমুদ্রের পানে যদি কোন জাহাজের পাল চোখে পড়ে এই আশায়।

এইভাবে একে একে দীর্ঘ চারটি বৎসর অতিক্রান্ত হয় কিন্তু উদ্ধারকারী কোন জাহাজই তটে এসে ভেড়ে না। দৈবাৎ সুদূরে সমুদ্রে হয়তো কখনও কখনও জাহাজের পাল দেখা গেছে। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য সেলকার্ক হয়তো বন্দুকের আওয়াজ করেছে, অথবা পাহাড়ের চূড়ায় আগুন জ্বালিয়েছে, কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল। কেউ সাড়া দেয় নি সেই ব্যাকুল আহ্বানে। নির্জন দ্বীপে নিঃসঙ্গ নির্বাসনের ফলে সেলকার্ক তার মাতৃভাষাও ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছিল।

অবশেষে সৌভাগ্য বশতঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হলো। দুখানা ইংরেজ জাহাজ সম্বলিত এক নৌবহরের নায়ক ক্যাপ্টেন রজার্স উডস্ ১৭০৯ খৃঃ পয়লা ফেব্রুয়ারী সায়াহ্নে পাহাড়ের চূড়ায় আগুনের সঙ্কেত দেখতে পেয়ে দ্বীপের নিকটবর্তী হন এবং আলেকজান্ডার সেলকার্ককে উদ্ধার করে আনেন।

কিন্তু নিঃসঙ্গ দীর্ঘ নির্বাসনের ফলে সেলকার্কের স্বভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। নিজগৃহে ফিরে এসেও সে আর সহজ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে নি। জনহীন পর্বতে অথবা হ্রদের ধারে সে একাকী ঘুরে বেড়াতো অথবা মৎস্য শিকার করতো এবং বারংবার বিড় বিড় করে অনুতাপ প্রকাশ করতো—'হা ভগবান, কেন আমি আমার নির্জন দ্বীপ পরিত্যাগ করে এখানে ফিরে এলুম।'

এই সময়ে সোফিয়া ব্রুস নাম্নী এক তরুণীর প্রতি সেলকার্ক প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে এবং লন্ডনে এসে সংসার পেতে বসে। কিন্তু তার মাথায় তখন ভবঘুরের ভূত চেপে বসে আছে। লন্ডনে এসেও সে গৃহবাসী হতে পারল না। আবার একটি ব্রিটিশ রণতরীতে নাবিকের কাজ গ্রহণ করে সমুদ্র পাড়ি দিল। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে আফ্রিকার উপকূলের অদূরে জাহাজেই সেলকার্কের মৃত্যু ঘটে।

উপরোক্ত ঘটনা আশ্রয় করে ড্যানিয়েল ডিফো তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'রবিন্সন ক্রুসো' রচনা করেছেন।

নৌ-বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত অপর একখানি বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসের দৃষ্টান্ত ধরা যাক। ১৭৮৯ সালের ২৮ এপ্রিল ভোর রাত্রিতে ব্রিটিশ জাহাজ 'বাউন্টি'তে বিদ্রোহ হয়। জাহাজ তখন প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য অঞ্চলে টফুয়া দ্বীপের অনতিদূরে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অভিমুখে যাত্রায় ব্যস্ত। বিদ্রোহী নায়ক ফ্লেচার ক্রিশ্চিয়ান ক্যাপ্টেন ব্লাই সহ আঠারজন অনুগত নাবিককে বন্দী করে। যে কোন কারণেই হোক ফ্লেচার জাহাজের ওপরেই বন্দীদের হত্যা না করে মাত্র তেইশ ফুট দীর্ঘ ক্ষুদ্র একটি নৌকাতে সামান্য কিছু আহার্য দিয়ে নিরস্ত্রভাবে তাদের অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। বন্দীদের যে অচিরেই সলিল সমাধি হবে সে বিষয়ে ফ্লেচারের মনে বিন্দুমাত্রও সংশয় ছিল না।

অসহায় বন্দীরা প্রথমেই চেষ্টা করল অদূরবর্তী টফুয়া দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ দ্বীপের বর্বর অধিবাসীরা নাবিকদের অসহায় অবস্থায় সুযোগ নিয়ে তাদের আক্রমণ করে বসে এবং একজনকে নিহত করে। নিরস্ত্র নাবিকদল শেষপর্যন্ত ব্লাই-এর নির্ভীক নেতৃত্বে বর্বরদের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয় এবং পুনর্বার সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়ে দেয়। এই ঘটনার পর তারা আর কোন অপরিচিত দ্বীপে আশ্রয় নিতে সাহসী হয় না।

এর পর শুরু হলো একচল্লিশদিনব্যাপী সমুদ্রের সঙ্গে জীবন মরণ সংগ্রাম। বিপুল ঝড় ঝঞ্ঝা ও বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ রাশির মধ্যে অবিশ্বাস্য দক্ষতার সঙ্গে ৩৬০০ মাইল দূরবর্তী ওলন্দাজ উপনিবেশ 'তিমোর' দ্বীপপুঞ্জের অভিমুখে তারা এক অভিনব অভিযান শুরু করলো। আকাশের বর্ষণ থেকে ওরা আহরণ করতো তৃষ্ণার জল আর সামান্য যেটুকু খাদ্য ভান্ডার ছিল তা কঠোর মিতব্যয়িতার সঙ্গে বন্টন করা হতো নিজেদের মধ্যে প্রতিদিন। তাতে ক্ষুধা নিবৃত্তি হতো না, কিন্তু তবু অদম্য সংকল্পে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে তারা দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছে জয়যাত্রার পথে কখনও রুদ্দুরে পুড়ে কখনও জলে ভিজে। কখনও বা ঢেউ-এর ঝাপটায় নৌকা বানচাল হবার দশা দেখা দিয়েছে কিন্তু ব্লাই ছিলেন অপূর্ব দক্ষ কর্ণধার। কোন বাধাই তাঁকে পরাজিত করতে পারে নি।

অবশেষে বিপদসংকুল সুদীর্ঘ সমুদ্র পথ ক্ষুদ্র তরণীযোগে অতিক্রম করে গন্তব্যে উপনীত হয়ে ব্লাই জগতে এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। উত্তরকালে ব্লাই ইংরেজ নৌ-বাহিনীতে অ্যাডমিরালের পদে উন্নীত হয়েছিলেন এবং প্রধান সেনাপতি নেলসনের নেতৃত্বে বহু নৌ-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নির্ভীক রণকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে নেলসন ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রশংসা করেছেন।

ওদিকে কিন্তু অচিরেই বিদ্রোহীদের মধ্যে আত্মকলহ শুরু হয়ে গেল। এর ফলে ফ্লেচার ক্রিশ্চিয়ান জাহাজ নিয়ে উপস্থিত হয় তাহিতি দ্বীপে। সেখানে অসন্তুষ্ট বিদ্রোহীদের নামিয়ে দিয়ে অবশিষ্ট আটজন বিদ্রোহী এবং দ্বীপের ছয়জন পুরুষ ও নয়জন নারী আদিবাসী সঙ্গে নিয়ে পুনর্বার নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। প্রায় আঠারো বছর বিদ্রোহী নায়ক ফ্লেচার ক্রিশ্চিয়ান অথবা বাউন্টি জাহাজের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

ইতিমধ্যে ব্লাই-এর নিকট থেকে বিদ্রোহের সংবাদ অবগত হয়ে ব্রিটিশ নৌবহর তাহিতি দ্বীপের পরিত্যক্ত বিদ্রোহী নাবিকদের গ্রেপ্তার করে এবং বিচারে তাদের মৃত্যুদন্ড হয়। এর পর ১৮০৮ খৃঃ এক মার্কিন জাহাজ দৈবাৎ অস্ট্রেলিয়ার প্রায় পাঁচ হাজার মাইল পূর্বে পিটকাইরিন নামক এক অখ্যাত দ্বীপে অর্ধ-শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের এক ক্ষুদ্র উপনিবেশ আবিষ্কার করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় শ্বেতাঙ্গ বিদ্রোহী ও পোলিনেশীয় রমণীদের রক্ত সংমিশ্রণের ফলেই উক্ত অর্ধ-শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশের সৃষ্টি। বিদ্রোহীদের মধ্যে তখন একমাত্র জন অ্যাডামস্‌ই জীবিত ছিল, তার বয়স তখন বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে এবং সেই ছিল দ্বীপের শাসনকর্তা। ইংরেজ সরকার

অ্যাডমাস্‌-এর বয়সের কথা চিন্তা করে তাকে আর বিচারালয়ে হাজির করে নি।

অনুসন্ধানের ফলে আরও জানা যায় দ্বীপে পুরুষ এবং রমণীর সংখ্যার মধ্যে সমতা না থাকায় অচিরেই বিদ্রোহীদের মধ্যে নারীসঙ্গ লাভের জন্য হিংস্র সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এর ফলে জন অ্যাডামস ভিন্ন অন্যান্য বিদ্রোহীরা সকলেই একে একে নিহত হয়। ১৯৫৭ সালে পিটকাইরিন দ্বীপের অনতি দূরে বাউন্টি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

উপরোক্ত ঘটনা অবলম্বনে দুজন মার্কিন সাহিত্যিক চার্লস নর্ডফ এবং জেমস্ হল 'মিউটিনি অন দি বাউন্টি' নামক এক অপূর্ব বই লিখেছেন এবং বিশ্ব-সাহিত্য ক্ষেত্রে বইটি বিপুল সাড়া সৃষ্টি করেছে। এই বই পড়লে ইংরেজি প্রবাদ 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন'-এর যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করা যায়।

'রবিন্সন ক্রুসো' অথবা 'মিউটিনি অন দি বাউন্টি' জাতীয় উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে নাই। এ রকম বই লেখার সম্ভাবনাও খুব কম। কারণ অনুরূপ পটভূমির অবকাশ বাঙ্গালী জীবনে বিরল।

উপরোক্ত বই দুটির কেবল পটভূমি নয় চরিত্রগুলিও বাস্তব সত্য হতে সংগৃহীত। এমন অনেক উপন্যাস আছে যাদের চরিত্র-গুলি ছদ্মবেশী কিন্তু বিষয়বস্তু বাস্তব পটভূমি থেকে গৃহীত, যথা, শ্রীমতী হ্যারিয়েট স্টোয়ে বিরচিত 'আঙ্কল টমস কেবিন'। বইটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাস-প্রথার প্রতিবাদকল্পে রচিত এবং ১৮৫২ সালে প্রথম প্রকাশিত। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সকল দেশে বিপুল সাড়ার সঞ্চার করে এবং অচিরাৎ অন্যূন তেইশটি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়। দাসপ্রথা উচ্ছেদের জন্য ১৮৬০ খৃঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, আঙ্কল টমস কেবিনের প্রকাশ ও জনমানসে গভীর প্রতিক্রিয়া তার অন্যতম কারণ হিসাবে পরিগণিত।

এই বই রচনার জন্য লেখিকা দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের দাস-স্বত্বাধিকারী রাজ্যগুলির নিকট যৎপরোনাস্তি অপ্রীতিভাজন হয়েছিলেন এবং পত্রপত্রিকার মাধ্যমে তাঁকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর বিরুদ্ধে দক্ষিণ রাজ্যগুলির প্রধান অভিযোগ এই ছিল যে দাস সম্প্রদায়ের ওপর অমানুষিক উৎপীড়ন এবং সামান্য-মাত্র অজুহাতে পারিবারিক সম্পর্ক অগ্রাহ্য করে গৃহপালিত পশুর মত তাদের বিক্রয় করবার যে বর্বর চিত্র লেখিকা অঙ্কিত করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অলীক কল্পনামাত্র এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

এই অভিযোগের উত্তরে শ্রীমতী স্টোয়ে ১৮৫৩ খৃঃ 'কী টু দি আঙ্কল টমস কেবিন' নামক দ্বিতীয় একখানি বই প্রকাশ করেন। তাতে তিনি অবিসংবাদিত নজীর, অকাট্য যুক্তি ও বহু নিরেট সত্য ঘটনার সমাবেশ দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে আঙ্কল টমস কেবিন বইখানি অলীক কল্পনাপ্রসূত নয় তার ভিত্তি দৃঢ় বাস্তবের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের নীল-দর্পণ আঙ্কল টমস কেবিনের সমগোত্র। নীলকুঠির সাহেবদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এটি প্রথম সার্থক প্রতিবাদ এবং তৎকালীন বঙ্গসমাজে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। এটা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে। মূলতঃ নাটক হলেও এরমধ্যে ঔপন্যাসিক উপাদান প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

কেউ কেউ মনে করেন সার্থক উপ-ন্যাস রচনা করতে হলে চমকপ্রদ ও অভি-নব বিষয়বস্তুর একান্ত প্রয়োজন। কথাটি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার্য নয়। রচনা হৃদয়-গ্রাহী করতে হলে বিষয়বস্তু ও রচনা-শৈলী উভয়েই সমান মূল্যবান। বিষয়বস্তু চমকপ্রদ না হলেও যে রচনাশৈলীর গুণে বই অসামান্য সফলতা অর্জন করতে সক্ষম তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত জেন অস্টেন। তাঁর রচিত 'প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস' ও "এম্মা' ইংরেজী সাহিত্যের দুটি শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে সর্ববাদী সম্মত। অথচ বই-এর নায়কনায়িকা মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ এবং কাহিনী তাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

ইংরেজ সমালোচক উইলিয়াম বুস্টার এই প্রসঙ্গে বলেছেন—জেন অস্টেন যে-যুগের সাহিত্যিক সেটা ছিল মহাবীর নেপোলিয়ানের যুগ এবং সেই সময়ে সারা ইউরোপে যুদ্ধের মহড়া চলছিল। এই পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে কাহিনীর নায়ক-নায়িকাকে অতুলনীয় বীরত্ব, অপূর্ব দেশপ্রেম, নির্ভীক আত্ম-ত্যাগ ইত্যাদি নাটকীয় গুণে বিভূষিত কর-বার লোভ সংবরণ করা সহজ সাধ্য ছিল না। অথচ জেই অস্টেন সেই দুঃসাধ্যই সাধন করেছেন। রণভেরী ও দেশপ্রেমের উন্মাদনার প্রভাব পরিহার করে তাঁর একান্ত পরিচিত চেনাজানা মহলের ঘরোয়া গন্ডীর মধ্যেই নিজের রচনাক্ষেত্র নির্বাচন করে-ছেন এবং তাতেই বিপুল সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

সকল লেখকই আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁর রচনা হৃদয়গ্রাহী ও সর্বজন সমাদৃত হবে। কিন্তু সাফল্য লাভের গোপন রহস্য আজও দুর্জ্ঞেয়। এমন কি রীতিমত প্রতিষ্ঠাবান লেখকও অনেক সময়ে বলতে পারেন না তাঁর কোন রচনা কখন সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবে। জেন অস্টেন তাঁর মৃত্যুর পর যতটা সুখ্যাতি লাভ করেছেন জীবদ্দশাতেও ততখানি নয়। উত্তরকালে যে 'প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস' এতো সমাদর লাভ করেছে, তা যখন তিনি ১৭৯৭ সালে প্রথম প্রকাশের জন্য উপস্থাপিত করে-ছিলেন প্রকাশকেরা তা তখন প্রত্যাখ্যান করে। তাঁর মৃত্যুর মাত্র চার বৎসর পূর্বে ১৮১৩ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

জেন আজীবন চিরকুমারী ছিলেন। পিতামাতার আটটি সন্তানের মধ্যে তিনি সপ্তম। বিরাট পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত সাধারণভাবেই তিনি মানুষ হয়েছেন, ঐশ্বর্যের ছত্রছায়া লাভ করেন নি। দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে যে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাতেই বোঝা যায় তিনি সত্যই প্রতিভাবতী নারী ছিলেন।

হাজার প্রতিভাশালী হলেও সাফল্যের পথ চিরদিন দুরধিগম্য। নিজের জীব-নের অভিজ্ঞতা থেকে এ বিষয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে যে অকপট স্বীকারোক্তি করেছেন তা মনে রাখার মত।— 'আমি যখন প্যারীতে মংট পার্নেস করাত-কলের ওপরে একটা ঘর ভাড়া করে থাকতাম তখন অনেকদিন ঘন্টার পর ঘন্টা সম্পাদকের প্রত্যাখ্যানপত্র যুক্ত ফিরে আসা রচনাগুলোর দিকে চেয়ে থাকতাম এবং অশ্রুসংবরণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠতো। আরও দুঃখের বিষয় এই যে রচনাগুলো মোটেও অবহেলায় রচিত হতো না। তার পেছনে অনেক আশা বহু পরিশ্রম ও গভীর মননশক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল।' তিনি আর এক জায়গায় লিখেছেন 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' বইটির পূর্ণ-রূপ দান করবার পূর্বে তিনি উনচল্লিশবার পান্ডুলিপি এবং ত্রিশবার প্রুফ সংশোধন করেছেন।

অন্ধকারের মুখ

দেবল দেববর্মা

— আট —

রাত ন'টার পর অম্বর বাড়ি ফিরল।

দুঃখহরণ রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত। শোবার ঘরে খাটের উপর বসে নীপা একটা চিঠি লিখছিল। কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পত্র নয়। সাদামাটা চিঠি। ইসারা, ইঙ্গিতের একটি আঁচড়ও নেই। তবু পত্র মুসাবিদা করতে বসে নীপা দু-তিনবার হোঁচট খেল। কাটা-কুটি করল, লেটার-প্যাডের কাগজ নিয়ে ফের কালি-কলম আর মন একসূত্রে বাঁধল।

চিঠি লিখতে শুরু করার আগে অনেক কথাই নীপা চিন্তা করল। তার ব্যাপারটা অনিমেষ দত্তের কাছে স্পষ্ট করা ভালো। সে কলেজ ছেড়ে দিচ্ছে, লেখাপড়া ছাড়ছে। ঘরসংসার নদীতে ঘট বিসর্জনের মত ভাসিয়ে দিয়ে পলাশপুর থেকে চলে যাবে। তবু যার কাছে সে এতদিন পড়ল, তাকেই কিছু জানাবে না নীপার মন কিছুতেই সায় দিল না। কেন সে এমনিভাবে যাবে? নিঃশব্দে, সংগোপনে, কাউকে কিছু না জানিয়ে চোরের মত পালাবে কেন?

প্রফেসর দত্তের সঙ্গে রবিবার সন্ধ্যার পর তার দেখা হয়নি। সোমবার সে কলেজ কামাই করেছে। বিকেলে অনিমেষ দত্তের বাড়িতে তার পড়তে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেখানেও সে যায়নি। আজ মঙ্গল-বার। আজও সে কলেজের পথে হাঁটল না। পর পর দু'দিন তাকে অনুপস্থিত দেখে ক্লাসের ছেলেমেয়েরা নিশ্চয় তার সম্বন্ধে কানাঘুষা করতে শুরু করেছে।

চিঠি লেখা শেষ করে নীপা সেটি খামের মধ্যে ভরল। লেফাফার উপর ইংরাজীতে গোটা গোটা অক্ষরে প্রফেসর দত্তের নাম-ঠিকানা লিখল। চিঠি-ভর্তি খামটাকে এবার সে সযত্নে তুলে রাখল। প্রথমে তার টেবিলে, পরে একটা বই খুলে খামটাকে রেখে বই বন্ধ করল। চিঠিটাকে টেবিলে রাখা ঠিক নয়। এখন অম্বরের যা মন,—কখন কি ভেবে বসে। সকালবেলায় দুঃখহরণকে দিয়ে পাঠালেই চলবে।

প্রফেসর দত্তের প্রাতঃভ্রমণে বেরোনো অভ্যেস। মর্ণিং-ওয়াক সেরে বাড়ি ফিরতে হয়ত একটু দেরি হবে। কাজেই সাতসকালে দুঃখহরণকে পাঠাবার কোনো মানে হয় না। বরং বিলম্বে কাজ হবে।

অবশ্য একটা শূন্যস্থান রয়ে যাচ্ছে। সেটি পূরণ করতে না পারলে তার এই প্ল্যান-ফন্দি অচল হয়ে রইবে। প্রফেসর দত্তের বাড়িটা দুঃখহরণ চেনে কিনা সে জানে না। তবে চিনতে না পারবার মত কোন কারণ নেই। সোজা, নাক-বরাবর পথ। ঠিকমত নির্দেশ দিলে হাবা-কালাও গন্তব্য-স্থলে পৌঁছে যায়।

দরজায় টোকা শুনেই নীপা উঠে দাঁড়াল। শোবার ঘর থেকে রান্নাঘরটা কিছু দূরে। মাঝখানে এক ফালি উঠোন। দরজায় টোকা পড়ার শব্দ নিশ্চয় দুঃখহরণের কানে যায়নি। সুতরাং নীপা গিয়ে দরজা খুলল। সে যা আন্দাজ করেছিল তাই। এতক্ষণে অম্বর ফিরল। হাসপাতালে আজ ওর নাইট-ডিউটি। সুতরাং সেখানে ও ছিল না। কোথায় এতক্ষণ আড্ডা দিচ্ছিল কে জানে।

ঘরে পা দিয়ে অম্বর তার দিকে এক-বার তাকাল। ঠিক তাকাল বলা চলে না। এক ঝলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। একটি কথাও না বলে গটগট করে অম্বর ভিতরে ঢুকল। খুব ব্যস্তভাব। স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরবার আগে কেউ কেউ যেমন তাড়াহুড়ো করে, তেমনি চঞ্চল ছটফটে ভঙ্গি।

রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে অম্বর বলল, 'দুঃখহরণ, আমাকে তাড়াতাড়ি খেতে দে। এখুনি হাসপাতালে যেতে হবে।' কথা শেষ হলে অম্বর গিয়ে বাথরুমে ঢুকল। চৌবাচ্চায় মগ ডুবিয়ে জল ভরল। চোখ-মুখ ধুতে লাগল।

বারান্দায় একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে নীপা সব লক্ষ্য করল। রাগে তার হাত-পা জ্বলছিল। ক্ষোভে দুঃখে চোখ ফেটে জল আসবার উপক্রম। অম্বর যেন তাকে ইচ্ছে করে অপমান করছে। স্বামীর গালমন্দ, ধমক-ধমক, অন্যায় বকুনী,—মেয়েমানুষের সব সহ্য হয়। কিন্তু অবহেলা আর ঔদাসীন্য সয় না। ছুরির একটা তীক্ষ্ন ফলার মত বুকের মধ্যে বেঁধে। নীপার ইচ্ছে হল, স্বামীর মুখোমুখি হয়। স্পষ্ট একটা কৈফিয়ৎ চায়। এমনি করে চাকর-বাকরের সামনে তাকে অপমান না করালেই কি নয়? বিশেষ করে স্বামীর ঘর-সংসার ছেড়ে তার দূরে চলে যাওয়াই যখন পাকাপোক্ত, এবং ঠিক। অল্প দু-একটা দিন স্থিতাবস্থা বজায় থাকলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হত?

তবু স্বামীকে সে ঘাঁটাতে চাইল না। অম্বরকে সে ভালো করে চেনে। তার চোখের দুই ভুরুর দিকে তাকালেই নীপা অনেক কিছু টের পায়। বঙ্কিম দুই ভুরু কখন মুহূর্তে গলা-ফোলান মোরগের মত তেজী হয়ে ওঠে। নীপা ঠিক আঁচ করতে পারে। স্বামীর মনের আকাশের এখন অন্য চেহারা। ঈশান কোণে ঝড়ের মেঘ। থে-

কোনো সময় লণ্ডভণ্ড কাণ্ড শুরু হতে পারে। অম্বর এমনিতে ঠাণ্ডা। ভালো-মানুষ,—আত্মচিন্তায় সর্বদা অস্থির। কিন্তু একবার মাথায় রাগ চাপলেই আর রক্ষে নেই। তখন সে মরিয়া—শিং-ওঁচানো শিবের বাহনের মত ভয়ঙ্কর।

হাতমুখ ধুয়ে অম্বর এসে খাবার টেবিলে বসল। দুঃখহরণ জলের গ্লাস নিয়ে এল, ভাতের থালা এনে সামনে রাখল। অম্বর দেরি করল না। মুখ নামিয়ে খেতে শুরু করল।

দুঃখহরণ রান্নাঘরে ফিরে গেছে দেখে নীপা সামনে এসে দাঁড়াল। তার উপায় নেই। নইলে উপযাচিকার মত কেউ এমন করে সামনে আসে? লজ্জায় নীপা প্রায় মরে যাচ্ছিল। কি বিশ্রী, অসহনীয় অবস্থা। শিমুলপুর ছেড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এ লজ্জার হাত থেকে তার রেহাই নেই।

ঘাড় তুলে অম্বর ওকে দেখল। কিন্তু কোন কথা বলল না। নীপা আশা করছিল, অম্বর কিছু বলবে। অন্তত তার সাজগোজ, বেশবাস দেখে সে কোন মন্তব্য করবে। সাজে-পোশাকে নীপার আজ ভিন্নমত, অন্য রুচি। শ্বশুর-ভাসুর ঘরে এলে বউ-মেয়েরা যেমন সলজ্জ হয়ে ওঠে, মাথায় ঘোমটা দেয়, কাপড় টেনেটুনে শরীরের অংশ-বিশেষ ঢাকে আজ হঠাৎ নীপাও তেমনি সাবধানে আটপৌরে। বেশবাস খুবই শালীন। পর্দা-ঢাকা ঘরের মত সুরুচিপূর্ণ এবং সুন্দর।

কিন্তু অম্বর চুপচাপ। নৈশ আহার সমাধা করতে সে যেন খুবই ব্যস্ত। দুটো কথা বলার অবকাশ পর্যন্ত নেই তার। টেবিলের সামনে সুন্দরী স্ত্রীর উপস্থিতি অনায়াসে অগ্রাহ্য করছে।

গম্ভীর মুখ করে নীপা বলল,—'তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল আমার।'

থালা থেকে মুখ না তুলেই অম্বর জবাব দিল—'কি কথা? বলে ফেল—'

নীপা আহত হল। কি রকম মানুষ! বউয়ের সঙ্গে এ কি ধরনের ব্যবহার? গায়ে পড়ে কথা বলতে গিয়ে তাকে আরো না কত অপমান কুড়োতে হবে। তাই ভূমিকা না করে সে আসল কথায় এল।

—'একটু আগে কাকাবাবু এসে-ছিলেন।' নীপা ধীরে ধীরে বলল।

—'কাকাবাবু?' অম্বর এবার ভাতের থালা থেকে মুখ তুলল। অবাক হয়ে বলল, —'কাকাবাবু মানে—'

নীপার মুখটা মরা মাছের মত শক্ত দেখাল। ইচ্ছে হল স্বামীকে প্রশ্ন করে। তার সম্পর্কের আত্মীয়-বন্ধুদের এখনই কি চিনতে অসুবিধে হচ্ছে? তবু তো নীপা পলাশপুর ছেড়ে যায়নি। এখনও স্বামীর ঘরে।

কিন্তু এসব কথা বলা মানেই বাক-বিতণ্ডা। উল্টে অম্বরই তাকে আঘাত করবে। মিছিমিছি কথা কাটাকাটি। তাই নীপা আর ও-পথ মাড়াল না।

একটু পরিহাসের সুরে সে বলল,—'কাকা তো আমার একটিই। সে-কথা তুমিও ভাল করে জান। আর তিনি কেন এসে-ছিলেন, তাও তোমার অজানা নয়।'

অম্বর তাড়াতাড়ি বলল,—'সে-কথা হচ্ছে না। আমি বলছিলাম, তিনি গেলেন কোথায়? এসেই কি আবার কলকাতা ফিরে গেলেন?'

নীপা একটু হাসল। বলল,—'কলকাতা ফিরে যাবেন কেন? তিনি এই শহরেই আছেন। তবে এবার আর এ-বাড়িতে ওঠেননি।'

অম্বর বিস্ময় প্রকাশ করল। 'তার মানে? কোথায় উঠেছেন তাহলে?'

—'একটা হোটেলে।' নীপা অন্য দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল। ছোট্ট একটা খোঁচা দেবার লোভ না সামলাতে পেরে সে ফের বলল,—'এ-বাড়িতে উঠবার মত জোর কোথায়? তাই হোটেলে উঠেছেন।'

অম্বর কোনো জবাব দিল না। মুখ নীচু করে সে আহারে মন দিল।

নীপা বলল,—'কাল সকালেই তিনি আসবেন বলে গেছেন। সঙ্গে একজন ভদ্র-লোকও থাকবেন। তোমার কি একটু সময় হবে কথা বলবার?'

—'কাল সকালে মানে, কখন?'

—'এই আটটা নাগাদ—'

—'ভদ্রলোকটি কে আবার?' অম্বরকে সন্দিগ্ধ মনে হল।

ঠোঁট কামড়ে নীপা কি ভাবল। বলল,—'বাড়িটা উনিই কিনতে চান। কথাবার্তা পাকা করবেন বলে কলকাতা থেকে এসেছেন।'

—'তা আমাকে কেন দরকার?' অম্বর মুখ উঁচু করে কথা কইল। 'তোমার বাড়ি, তুমি নিজেই বিক্রী করবে। কথাবার্তা, দরদাম তোমার কাকাবাবুর সামনেই হতে পারে। খামোকা আমাকে কেন জড়াচ্ছ?'

নীপা বুঝতে পারল অম্বর দূরে সরে থাকতে চাইছে। বাড়ি বিক্রীর ব্যাপারে সে মাথা গলাতে অনিচ্ছুক। কিন্তু তার নেহাৎ অবস্থা। সাত তাড়াতাড়ি কাকার কাছে এ-সব কথা বলা যায় না। স্বামীর সঙ্গে তার খিটিমিটি, নিত্য বিরোধ। মনে মনে দুজনের আকাশ-জমিন ফারাক। তাই ঘর-বর সে চিরদিনের মত ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এমন কথা আত্মীয়জনের কাছে ঠিক ঘোষণা করা যায় না। ধীরে ধীরে সবাই জানবে। সংসারে তাই হয়, গলা বাড়িয়ে কেউ বড় মুখ করে বলে না। তাছাড়া একটা অসু-বিধেও রয়েছে। এখনই কাকার কাছে তার সংকল্পের কথা বলা নিজের স্বার্থেই উচিত হবে না।

নীপা বলল,—'তোমার সঙ্গে কথা বলবেন বলেই ভদ্রলোক এতদূর এসেছেন। আর এখন তুমি বেঁকে বসলে সমস্ত ব্যাপারটাই একটু বিসদৃশ দেখায় না? ভদ্রলোক অন্য কিছু ভাবতে পারেন। কাকাই বা কি মনে করবেন। এখনও তাকে কিছু বলিনি।'

অম্বরের কপালে দু-একটি কুঞ্চিত রেখা ফুটে উঠল। —'সমস্যাই বটে।' সে একটু হেসে মন্তব্য করল।

নীপা বলল,—'ইচ্ছে না হয়, বেশি

কথাবার্তার মধ্যে যেও না। একটু হুঁ—না করে চালিয়ে নিও। দরদাম সব কাকাই ঠিক করেছেন। আমাদের মতামত পরে জানালেই হবে।'

চোখ তুলে অম্বর বলল,—'তোমার মত অভিনয় করতে বলছ?' সে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইল।

নীপা জোর করে হাসল। তার ঠোঁটের ডগায় একটা শক্ত কথা এসেছিল। হাসি দিয়ে নীপা সেটিকে কোনমতে চাপল। —'একে যদি তোমার অভিনয় বলে মনে হয়, তাহলে তাই করবে। স্ত্রীর স্বপক্ষে দুটো কথা বলাতে বড়জোর ওকালতি বলতে পার, অভিনয় কেউ বলবে না।'

অম্বরের খাওয়া শেষ হয়েছিল। টেবিল থেকে উঠে সে বাথরুমে হাতমুখ ধুতে গেল। শ্রাবণ মাস হলেও আজ পরিষ্কার রাত্রি। ধোয়ামোছা আকাশের বুকে অতীত যুগের কোনো দক্ষ পটুয়ার হাতের কাজের মত একরাশ উজ্জ্বল ঝিকিমিকি তারা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীপা আকাশটাকে লক্ষ্য করছিল। এখন মেঘ নেই।—মাথার উপর তারা ঝিলমিল শ্লেট রঙের আকাশ। বিস্তীর্ণ দুধশাদা ছায়াপথ। আবার মেঘ এসে ঢাকলেই অন্য রূপ। বুক-কাঁপানো মেঘের ডাক, তরবারির তীক্ষ্ম ফলার মত ভয় দেখানো বিদ্যুৎ।

অম্বর ডিউটিতে বেরিয়ে গেলে নীপার চোখ ছলছলিয়ে এল। দুঃখহরণ তাকে খেতে ডাকল। কিন্তু ভাতের থালার সামনে গিয়ে বসতে তার রুচি হল না। মনের ভিতর একটা শ্লথ অবসাদ মাকড়সার জাল বিছনোর মত তার চেতনার স্নায়ুগুলিকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছিল। নীপা ভাবছিল এই বাড়িতে বড়জোর আর একটা দিন সে থাকবে। হয়তো আরো এক রাত্তির মেয়াদ। তার বেশী নয়। যে-কোনো ছলছুতো করে সে কাকার সঙ্গেই যেতে পারে। কেউ টের পাবে না।...আশ্চর্য। এত তাড়াতাড়ি তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ছেদ পড়বে তা কি সে এর আগে ভাবতে পেরেছিল?

হঠাৎ একটা মধুর স্বপ্নের মত তার বিয়ের রাতের কথা মনে পড়ল। বাসরঘরে মেয়েরা কারণে-অকারণে খিলখিল করে হাসছিল। এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছিল। তার এক অল্পবয়সী মাসী কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে বলল,—'তোর বিয়ের রাতটা বড্ড ছোট নীপা।'

মাসীর কথার অর্থ তার বোধগম্য হয়নি। সে অবাক হয়ে তাকাতেই মাসী ওর গাল টিপে দিয়ে বলল,—'ন্যাকা মেয়ে। কিছু বোঝ না। শেষ রাত্তিরে বিয়ের লগ্ন। এক-ঘণ্টা মোটে বাসর। তা বিয়ের রাত্তিরকে ছোট বলব না? এক রাত্তি বাসর হলে মন ভরে?' আজ সে-কথা মনে হতেই নীপা ম্লান হাসল। শুধু বিয়ের রাতটাই নয়, তার বিবাহিত জীবনটাও খুব ছোট্ট। মেসিন বিগড়ে হঠাৎ বন্ধ হওয়া ছায়াছবির শোয়ের মত অসম্পূর্ণ।

বিয়ের কথা মনে করতেই তার মায়ের কথাও মনে হল। মা তখন বেঁচে। ছোট-বেলায় সে খুব সুন্দর দেখতে ছিল। এক-মাথা বব-ছাঁট চুল। ফুটফুটে গোলগাল বেবী,—ঠোঁটদুটো গোলাপী লাল। ঠিক একটা বড় সাইজের ডল পুতুল। আদর করে মা বলতেন,—'ও আমার গোলাপরানী।' তাকে দেহের সঙ্গে চেপে ধরে কত আদর করতেন। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতেন। ঠিক যেন একটা গোলাপ ফুলের গন্ধ শুঁকতেন।

গোলাপরানী কথাটা মনে হতেই তার হাসি পেল। তার সঙ্গে গোলাপ ফুলের তুলনা? সে গোলাপই বটে। কার কাছে কথাটা শুনেছিল, নীপার তা মনে নেই। হয়ত নীলাদ্রি, কিংবা অন্য কেউ হবে। লণ্ডনের বাজারে গোলাপ ফুল বিক্রী হয়। বেশ তাজা, বড় সাইজের ফুল। এক শিলিং দাম। ফুলের কি সৌরভ আর বাহার। কিন্তু সবাই জানে, এক শিলিং-এর ফুলের আয়ু মাঝ-রাত্তিরেই কাবার।...

* * *

ঠিক আটটা নয়। তার একটু পরেই কাকা এলেন। সঙ্গে সেই অবাঙালী ভদ্রলোক।

বাইরের ঘরে বসে অম্বর খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলোচ্ছিল। এই মাত্র আরো এক কাপ চা সে শেষ করল। কাগজ পড়া হলেই দাড়ি কামাবে। তারপর বাথ-রুমে ঢুকবে। স্নানটান সেরে টানা ঘুম। ফের নাইট-ডিউটি। দিনের বেলায় ভালো করে না ঘুমুলে শরীরের ম্যাজম্যাজানি কাটবে না।

কাকাকে দেখেই অম্বর উঠে দাঁড়াল। 'আসুন, আসুন। কাল সন্ধ্যেবেলায় এসে-ছিলেন শুনলাম।' একটু থেমে ফের বলল, —'মিছিমিছি হোটেলে উঠতে গেলেন কেন?'

একগাল হেসে কাকা বললেন,—'তুমি দুঃখ পেয়েছ জানি। কিন্তু কি করব বল বাবাজী। এই চন্দ্রবদনবাবু কিছুতেই ছাড়লেন না। হোটেলে উনি একা থাকতে নারাজ। আমি বললাম, তাই সই। এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন আর—।'

নিজে আসন গ্রহণ করেই কাকা তাঁর সঙ্গীকে বললেন,—'বস হে চন্দ্রবদনবাবু।' তারপর গলার স্বর এক খাদ তুলে নীপার উদ্দেশ্যে বললেন,—'তাড়াতাড়ি চলে আয় মা। ভদ্রলোকের সঙ্গে কাজের কথাবার্তা-গুলো আগে ভালোয় ভালোয় শেষ হয়ে যাক।'

কাকা আসবার আগেই নীপা তৈরি হয়ে বসেছিল। অম্বর কেমন করে কথা-টথা বলে, তাই নিয়ে তার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর তার মুখ রেখেছেন। স্বামীর কথাবার্তায় আন্তরিকতার এতটুকু অভাব নেই। পরিচ্ছন্ন, মিষ্টি ব্যবহার। অন্তরে আগুন জ্বললেও সে-আগুনের উত্তাপ বাইরে ছড়ায়নি। মনে মনে অম্বরকে সে তারিফ করল। তাদের জোড়াতালি দেওয়া সম্পর্কটা কাকার পক্ষেও আঁচ করা কঠিন।

দুঃখহরণকে বলা ছিল। নীপা ঘরে ঢুকবার আগে জলখাবার আর চায়ের কাপ যেন অতিথিদের সামনে সাজিয়ে দেয়।

কাকার ডায়াবেটিস আছে। তিনি মিষ্টি ছোঁবেন না। তার জন্য চারখানা ফুলকো লুচি, একটু বেগুনভাজা, প্লেটের একপাশে সামান্য নুন। শর্করাবিহীন এক কাপ চা। অন্য লোকটির জন্য নীপা ডিসে করে মিষ্টি সাজিয়ে পাঠাল।

খাবার দেখে কাকা সহাস্যে বললেন,—'দেখেছ চন্দ্রবদনবাবু, ভাইঝির আমার কেমন সব কথা মনে থাকে। আমার অসুখের কথা পর্যন্ত বেটি ভোলেনি।'

চন্দ্রবদন কোনো উত্তর দিল না। শুধু একটুকু হাসল। অম্বর বলল,—'ভালো কথা, আপনার শরীর এখন কেমন? ব্লাড-সুগার আর করিয়েছিলেন নাকি?'

—'নিশ্চয়। এই তো সেদিন এক প্রস্থ ব্লাড-সুগার ইত্যাদি সব হল। তা আগের চেয়ে এখন অনেক ভালো আছি।' কাকা তার দেহের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইলেন।

—'পার্সেণ্টেজ কত এখন?' অম্বর প্রশ্ন করল।

—'একশ আশী মিলিগ্রাম।' কাকা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। 'আগে তো তিনশ মিলিগ্রাম পর্যন্ত উঠেছিল। কম ইনজেকশন কি নিতে হল বাবাজী।'

অম্বর হাসল। 'তা ইনজেকশন না নিয়ে উপায় কি বলুন? তিনশ মিলিগ্রাম পার

বুঝলি খুকু, কুসুম দিয়ে
রাঁধবি, পাঁচ পদে খাওয়াবি,
তবেই বরের মন পাবি।

হানড্রেড সি-সি। রীতিমত অ্যালার্মিং কেস।'

কাকা হেসে বললেন,—'বুঝলে বাবাজী, ও ইনজেকশনগুলো। আমার কাছে এখন ডাল-ভাত। শেষের দিকে তো নিজেই ছুঁচ ফুটিয়েছি,—ডাক্তার-বদ্যির ভরসায় আর থাকিনি। তা এই ফাঁকে ইনজেকশন দেবার বিদ্যেটাও রপ্ত হয়ে গেল আমার।'

—'তাই নাকি?' অম্বর কৌতুক করে বলল,—'তাহলে আপনি তো এখন হাফ-ডাক্তার।'

অম্বরের কথা শেষ হতেই নীপা ঘরে ঢুকল। একটু আগেই সে স্নান করেছে। ভেজা চুল, পিঠের উপর ছড়ানো। কপালে ছোট্ট একটি টিপ। মুখে পাউডারের পাফটা এক-আধবার বুলিয়েছে বোঝা যায়। চোখের কোণে অল্প একটু কাজলের রেখা। পরনে জংলী ফুল-টুল আঁকা ছাপা শাড়ি। গায়ে গোল-গলা প্রমাণ সাইজের জামা। পেট-কাটা নয়...পিঠের শেষপর্যন্ত নেমে-আসা ব্লাউজ।

তার দিকে তাকিয়ে কাকা বললেন,—'আয় মা, আয়। বুঝলেন চন্দ্রবদনবাবু, এই হল আমার ভাইঝি নীপা। এরই বাড়ি আপনি কিনবেন।'

লোকটাকে দেখেই নীপা চমকে উঠল। ভয়ে এবং বিস্ময়ে তার মুখখানা অদ্ভুত দেখাল। মনে মনে নীপা বলছিল,—ধরণী, দ্বিধা হও। কার মুখ দেখে আজ সে উঠে-ছিল কে জানে? নইলে বাড়ি কিনবার জন্য এদেশে আর লোক পাওয়া গেল না। বেছে বেছে কাকা এই লোকটাকেই তার সামনে এনে হাজির করলেন।

চন্দ্রবদন অবাক হয়ে দেখছিল। এই মেয়েটাই নরেশবাবুর ভাইঝি? তার সামনে উপবিষ্ট ছোকরামতন লোকটাই ওর হাজ-ব্যাণ্ড? চন্দ্রবদনের কপালের কুঞ্চিত রেখা-গুলি মিলিয়ে যেতে বেশ একটু সময় লাগল।

অম্বরের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই নীপা বুঝতে পারল। গণ্ডগোলটা স্বামীর চোখে ধরা পড়েছে। লোকটার সঙ্গে আচমকা দেখা হতেই নীপা খুব অবাক হয়েছিল। তার হাসি হাসি মুখে প্রথমে বিস্ময় এবং পরে ভয় ধরা পড়ল। শেষদিকে তার মুখখানা রীতিমত শুকনো দেখাল। নীপার নিজেরই তা মনে হয়েছে।

অমন ত্রস্ত বিহ্বল মুখ দেখে কাকা কি ভাবলেন কে জানে। শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'অমন করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন। আয়, এখানে এসে বস।'

কাকার কথায় নীপা যেন মুক্ত বায়ুর স্পর্শ পেল। এতক্ষণ তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এমন একটা বিশ্রী পরিস্থিতি। কি করবে নীপা ভেবে পাচ্ছিল না। হঠাৎ পা পিছলে গেলেও কোনোমতে সে সামলে নিয়েছে। কাকা আদেশ করতেই নীপা আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। বাধ্য মেয়ের মত টুপ করে তাঁর পাশে বসে পড়ল।

জামাইয়ের দিকে তাকিয়ে কাকা বললেন,—'বুঝলে বাবাজী, বাড়ির দরদাম নিয়ে চন্দ্রবদনবাবুর সঙ্গে আমি কথা বলেছি। উনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম দিতে রাজি। এখন তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে বিবেচনা করে দেখ। এই টাকা পেলে সম্পত্তি বিক্রী করতে পার কিনা—'

অম্বর হেসে বলল,—'বাড়িটা ঠিক আমাদের দুজনের নয়। এটা আপনার ভাইঝিরই। দামের কথা ওকে বলেছেন?'

কাকা একটু হাসলেন। বাবাজীবন ভীষণ চতুর। বিয়ের সময় বাড়িটা যে যৌতুক হিসাবে দেওয়া হয়নি, সেই কথাটা জামাই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল।

কাকা বললেন,—'আইনত বাড়িটা অবশ্য নীপারই। কিন্তু আইনের কথা থাক। টাইটেল নীপার হলেও তুমি তার স্বামী। স্ত্রীর সম্পত্তি যদি বিক্রী হয়, তাতে স্বামীর মতামতের একটা মূল্য আছে বৈকি।'

অম্বর এই নিয়ে তর্ক করল না। মৃদু হেসে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল।

এতক্ষণ নীপা চুপচাপ ছিল। কোনো কথা বলেনি। কিন্তু এবার সে মুখ খুলল। কাকার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল,—'কাল সন্ধ্যায় তুমি যেন আরো কিছু বলছিলে।'

—'আর কি বলছিলাম? ও, হ্যাঁ। মনে পড়েছে বটে।' কাকা প্রসন্ন দৃষ্টিতে অম্বরের দিকে তাকিয়ে বলে গেলেন। 'এ-কথাটাও তোমাকে বলা দরকার বাবাজী। চন্দ্রবদনবাবুর একটা ছোট্ট আর্জি আছে। ব্যবসাদার মানুষ, টাকাকড়ি সব ব্যবসাতেই খাটছে। এতগুলো সাদা টাকা বের করে দিলে কারবারের খুব ক্ষতি হবে। তাই উনি বলছিলেন, যদি হাজার-দশেক টাকা তোমরা একটু হেরফের করে নাও। মানে, বাড়িতে ও'র কিছু গোপন টাকা আছে। বাকি টাকাটা অবশ্যই উনি চেকে পেমেণ্ট করবেন।'

অম্বর মুচকি হাসল। 'বুঝতে পেরেছি। দশ হাজার টাকা ব্ল্যাক-মানি দিতে চান, এই তো?' একটু থেমে সে ফের বলল,—'তা ঠিক আছে। আমরা একবার ভেবে দেখি। আপত্তির তেমন কোনো কারণ নেই। সাদা হোক আর কালো হোক, যে বিক্রী করবে, তার টাকা পেলেই হল।' কথা শেষ করে সে স্ত্রীর দিকে তির্যক ভঙ্গিতে তাকাল।

চন্দ্রবদন এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। অম্বরের মুখের দিকে শুধু ঘন ঘন তাকাচ্ছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল,—'একটা বাত্ শুনিয়ে বাবুজী। নরেশবাবু হামার বহুৎ জান-পয়ছান আদমী। কথাটা একটু ভেবে দেখবেন। ব্যাঙ্ককা রুপেয়া আউর ঘরকা রুপেয়া এক হি চীজ্। আপনার কুছু তকলিফ্ হোবে না। লেকিন হামার বহুৎ উপকার হোবে।'

কাকা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'ঠিক আছে। তোমরা তাহলে একটু চিন্তা করে দেখ। সন্ধ্যের দিকে আমি একবার ঘুরে যাব। চলি তাহলে এখন—'।

প্রথমে চন্দ্রবদন এবং তার পিছু পিছু কাকাও দরজা পেরিয়ে পথে এসে দাঁড়ালেন। দুজনে রওনা হতেই নীপাও মুখ ফেরাল।

বাইরের ঘরে অম্বর নেই। কখন এক ফাঁকে উঠে গেছে। নিশ্চয় দাড়ি কামাতে ব্যস্ত, কিংবা বাথরুমে ঢুকেছে। শোবার ঘরে ঢুকে নীপা প্রায় আঁতকে উঠল। বিছানার উপর অম্বর টান-টান হয়ে শুয়ে রয়েছে। তার খালি পা, হাতে চকচকে খোলা ক্ষুর। ক্ষুরের ধারালো দিকটা গালের উপর নয়,—গলার উপর চেপে ধরে অম্বর কি যেন চিন্তা করছে।

ভয়ে, আতঙ্কে নীপার চোখদুটো ছোট হয়ে এল। চিৎকার করে সে বলল,—'ওগো, এ তুমি কি করছ!'

(চলবে)

পারমাণবিক হৃদযন্ত্র

আজ পারমাণবিক যুগে বাস করেও মানুষ যে দুটি প্রধান ব্যাধিকে পরাভূত করতে পারে নি তার একটি হল হৃদরোগ এবং অপরটি ক্যানসার। এই দুটি ব্যাধি মানুষের কাছে আজ বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ পীঠভূমি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও বছরে প্রায় দুই লক্ষ লোক মারা যান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। তারপর সর্বাধিক মৃত্যুসংখ্যা হল ক্যানসারে। আমাদের দেশেও কত সম্ভাবনাময় জীবনের কত মনীষীর অকালপ্রয়াণ ঘটেছে হৃদরোগে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, হৃদযন্ত্রের রক্তবাহী সূক্ষ্ম নালের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণ চর্বিজাতীয় বা ক্যালসিয়াম জাতীয় পদার্থ জমার ফলে যথাযথ রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয় এবং রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে হৃদস্পন্দনে বিঘ্ন ঘটে। যাঁদের বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে, তাঁদের মধ্যেই সাধারণত হৃদরোগের প্রকোপ দেখা যায়। কিন্তু আজকাল অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্কদেরও মধ্যে হৃদরোগ দেখা যাচ্ছে।

হৃদযন্ত্র বিকল বা অচল হলে নতুন হৃদযন্ত্র সংযোজনের দ্বারা জীবনধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা বিজ্ঞানীরা আজকাল করছেন। কিন্তু হৃদযন্ত্র সংযোজনের পরীক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল হলেও দীর্ঘকাল জীবনরক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। বিজ্ঞানীরা তাই কৃত্রিম উপায়ে হৃদযন্ত্রের কার্যধারা অব্যাহত রাখার উপায় উদ্ভাবন করেছেন। যদের হৃদযন্ত্র অত্যন্ত দুর্বল এবং যে কোন সময়ে তার ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবার আশংকা আছে, তাঁদের স্বাভাবিক জীবনধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ব্যাটারিচালিত একরকম যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। এই অভিনব যন্ত্রকে বলা হয় পেসমেকার।

বর্তমানে যে পেসমেকার তৈরী করা হয়েছে তাতে দুটি ত্রুটি দেখা যায়। প্রথমত তার ব্যাটারি অকস্মাৎ অচল হয়ে যায়, আর নয়ত দু'তিন বছর অন্তর বদল করতে হয়। রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করে যন্ত্রটি দেহভ্যন্তরে সংস্থাপন করা হয়। বারবার অস্ত্রোপচার করা যেমন ব্যয়সাধ্য, তেমনি জীবনাশংকাও থাকে তাতে।

তাই আরও নির্ভরযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী কৃত্রিম হৃদযন্ত্র উদ্ভাবনের জন্যে বিজ্ঞানীরা কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করে আসছেন। সম্প্রতি মার্কিণ বিজ্ঞানীরা পরমাণুশক্তি চালিত এক রকম পেসমেকার উদ্ভাবন করেছেন, যা যেমন নির্ভরযোগ্য তেমনি দীর্ঘস্থায়ী।

বর্তমানে পশুর দেহে পারমাণবিক হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। বিশেষ একজাতের শিকারী কুকুরের বুকে এই যন্ত্র লাগানো হয়েছে। কুকুরের হৃদযন্ত্র আকারে মানুষের হৃদযন্ত্রের প্রায় সমান। পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে আরও ১৫টি কুকুরের দেহাভ্যন্তরে এই যন্ত্র বসানো হবে। যদি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়, তা হলে ১৯৭১ সাল থেকে মানুষের দেহে পারমাণবিক হৃদযন্ত্র লাগিয়ে পরীক্ষা চালানো হবে।

বর্তমানে প্রচলিত পেসমেকার বা কৃত্রিম হৃদযন্ত্রে পারদ-তাড়িৎকোষ ব্যবহার করা হয়। নতুন পারমাণবিক হৃদযন্ত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে প্লুটোনিয়াম-২৩৮। এই পেসমেকারের আয়তন সিগারেট প্যাকেটের দুই তৃতীয়াংশের সমান এবং ওজন ১০৮·৯ গ্রাম। প্লুটোনিয়াম রাখা হয় ছোট একটি কৌটায় এবং কৌটি দেখতে ছোট্ট একটি ফিল্ম রোলের মতো। ঐ রোলারের সংগে ছ' জোড়া কাচের টেপ থাকে। এ গুলিকে বলা হয় থার্মোকাপল। প্লুটোনিয়াম থেকে যে তাপ সৃষ্টি হয় থার্মোকাপল তা বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে। ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহ একটি অতি ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক যন্ত্রে গিয়ে হৃদপিণ্ডকে সচল করে। যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণুশক্তি কমিশন এই নতুন হৃদযন্ত্রটি উদ্ভাবন করেছেন এবং তাঁদের কাজে সহযোগিতা করেছেন পেনসিলভানিয়ার নিউক্লিয়ার মেটেরিয়ালস অ্যাণ্ড ইকুইপমেন্ট করপোরেশন।

সাধারণ ব্যাটারিচালিত কৃত্রিম হৃদযন্ত্রের তুলনায় পারমাণবিক হৃদযন্ত্রের সুবিধা হচ্ছে : (১) সাধারণ ব্যাটারিচালিত যন্ত্রের মতো এটি হঠাৎ থেমে যাবে না, অন্তত দশ বছর যাতে কার্যকর থাকে সেইভাবে এটিকে নির্মাণ করা হয়েছে। (২) তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়ামের শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা কমে যাওয়ার পর যখন যন্ত্রটি ঠিকমতো কাজ করতে পারবে না তখন আপনা থেকেই রোগীর হৃদস্পন্দনে গোলযোগ দেখা দেবে এবং রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করে অবস্থা কেমন দাঁড়িয়েছে তা অনেক আগে থেকেই জানতে পারা যাবে। ফলে হঠাৎ কোনো বিপদ ঘটবার আগে চিকিৎসকদের সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

ক্যানসারের বীজাণু আবিষ্কার

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জুলিও ওসাপনা এবং ডঃ এফরাইম ওবটেরোর নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী মানবদেহে ক্যানসারের বীজাণু আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন বলে সম্প্রতি জানা গেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। এই বীজাণুটি ভাইরাসজাত। ক্যানসার হওয়ার মূলে ভাইরাসের ভূমিকা কি তা এখনও সুস্পষ্টভাবে জানা যায় নি। তাই ভাইরাসঘটিত ক্যানসার রোগ চিকিৎসায় ভাইরাস প্রতিরোধক ভেষজ বা টিকার প্রয়োগ তেমন কার্যকর হতে পারে নি, যদিও তত্ত্বীয় দিক থেকে তার সম্ভাব্যতা যথেষ্টই আছে।

সম্প্রতি ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে দুজন মার্কিণ বিজ্ঞানী মর্টন এবং ডঃ ফ্রেডারিক এলবার্ট জানান, তাঁরা মানবদেহের সারকোমা কোষ (টিসুজাত এক ধরনের ক্যানসার) কালচার করেন এবং সেই ক্যানসার থেকে কোষমুক্ত নির্যাস নিয়ে সুস্থ মানবকোষে ইঞ্জেকশান দেন। ফলে দেখা যায়, সেই সুস্থ কোষগুলি ক্যানসার আক্রান্ত হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে স্বভাবতই সিদ্ধান্তে আসা যায়, এক শ্রেণীর ভাইরাস এই

আমেরিকান-বিজ্ঞানীদের এই দলটি ক্যান্সারের বীজাণু বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। মানুষ যেভাবে হাম ও জ্বরের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পেরেছে, ঠিক সেইভাবেই ক্যান্সারের কষ্ট থেকেও মানুষ নিষ্কৃতি পাবে এই আবিষ্কারের ফলে।
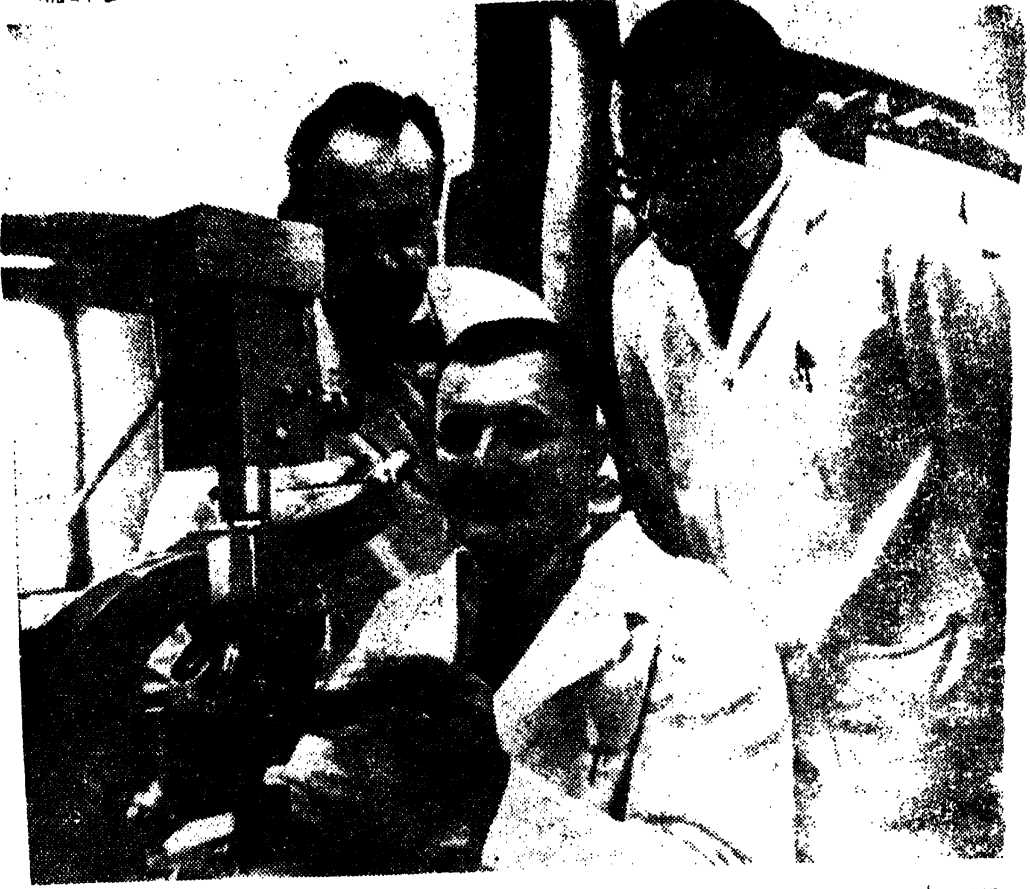
ক্যানসার ঘটিয়েছে। পরবর্তীকালে ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই ভাইরাস সনাক্তও করা গেছে।

যে পদ্ধতি তাঁরা অনুসরণ করেছেন সেটা এমন কিছু নতুন নয়। এক্ষেত্রে নতুনত্ব হল শুধু এই যে, মানবদেহের কোষে এই প্রথম পর্যবেক্ষণের ফল দেখা গেল এবং মানবদেহের ক্যানসারের সঙ্গে এক শ্রেণীর ভাইরাসের সম্পর্ক জানা গেছে। এক প্রাণীর দুষ্ট টিসু সেই প্রজাতির অপর এক সুস্থ প্রাণীর দেহে সংযোজিত করার ফলে যে ক্যানসার হয়—এই ঘটনা বিজ্ঞানীরা অনেক বছর আগেই লক্ষ্য করেছেন। যা এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ধরতে পারেন নি তা হচ্ছে কোন ক্যানসারদুষ্ট বৃদ্ধির কোষ-মুক্ত নির্যাস অপর সুস্থ প্রাণীর দেহে অনুপ্রবিষ্ট করার ফলে শেষোক্ত প্রাণীর দেহে ক্যানসারের আক্রমণ। কোন সুস্থ মুরগীর দেহে (উদাহরণ হিসাবে ধরা হচ্ছে) পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত কোষ-মুক্ত নির্যাস অনুপ্রবিষ্ট করার ফলে যদি তার দেহে ক্যানসার দেখা যায়, তা থেকে দুটি সম্ভাব্য উপসংহারে আমরা আসতে পারি : সেই নির্যাসে ক্যানসার-উৎপাদক হয় কোন রাসায়নিক পদার্থ অথবা কোন ভাইরাস ছিল যা পূর্ণাঙ্গ কোষের তুলনায় ক্ষুদ্রতর হওয়ায় নির্যাস পরিস্রবণ করার সময় পরিস্রাবকের ভেতর দিয়ে গলে বেরিয়ে গেছে। পর্যবেক্ষণে ক্যানসার-উৎপাদক কোন রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কাজেই অনুমান করা হয়, এই ক্যানসার সংঘটনের মূলে আছে ভাইরাস।

মুরগীর দেহে ভাইরাস সংক্রামিত ক্যানসারের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় ৬০ বছর আগে। পরবর্তী বহু পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বহু প্রজাতির প্রাণীদেহে এই আনুবীক্ষণিক বীজাণু টিউমার বা অর্বুদ সৃষ্টি করতে পারে। ১৯৩০-৪০ সালে দেখা যায়, ইঁদুরের দেহে মাতৃদুগ্ধে প্রাপ্ত একটি বস্তু সন্তান-সন্ততির দেহে ক্যানসার ঘটায়। ১৯৫০ সাল থেকে টিসু কালচার পদ্ধতির সাহায্যে ভাইরাস পর্যবেক্ষণের দ্বারা এবং ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতির ফলে আক্রান্ত কোষে ভাইরাসের গতি-প্রকৃতি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়।

মনুষ্যেতর প্রাণীদের দেহে ক্যানসার ও ভাইরাসের সম্পর্কের উত্তরোত্তর প্রমাণাদি পাওয়ার ফলে মানবদেহে ভাইরাসের দ্বারা ক্যানসার সংঘটিত হয় কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু হয়। মানবদেহে কোন কোন শ্রেণীর ক্যানসারে যে ভাইরাসের হাত আছে সে বিষয়ে কয়েক বছর ধরে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ভাইরাসকে সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি। কারণ সুস্থ মানবদেহে ক্যানসার-উৎপাদক সন্দেহজনক ভাইরাসের ভূমিকা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় না। যেসব ভাইরাস মানবদেহে ক্যানসার ঘটাতে পারে, তাদের দ্বারা গবেষণাগারে পরীক্ষামূলক প্রাণীর দেহে যদিও ক্যানসার ঘটানো যায়, তবু এবিষয়ে একটা সন্দেহ থেকে যায় যে উক্ত প্রাণীর দেহে ইতিপূর্বে যেসব ভাইরাস ছিল তারাও এই ক্যানসার ঘটাতে পারে। তবে সম্প্রতি যে সাক্ষ্য-প্রমাণাদির সংবাদ পাওয়া গেছে সেগুলি বিশেষ নির্ভরযোগ্য।

তবে ক্যানসার এবং ভাইরাসের সম্পর্ক এখনও পরিপূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হয়নি। ক্যানসার-উৎপাদক রাসায়নিক পদার্থগুলি এবং বিকিরণ কোষের এমন ক্ষতি সাধন করে যাতে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে। পক্ষান্তরে ভাইরাস কোষে অনুপ্রবেশ করে এবং সম্ভবত কোষের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে এমনভাবে চালিত করে যে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। অন্তত একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মনে করেন, সবরকম ক্যানসারের মূলে আছে ভাইরাস। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এই ধারণা পুরোপুরি মেনে নেওয়ার মতো সাক্ষ্য-প্রমাণাদি এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যাক, এদিকে অনাদিবাবু তখন নবগঠিত মনোমোহন নিয়ে ব্যস্ত। নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সরযূবালা—এ'রা তখন 'টুরিং' থিয়েটার করে বেড়ান। ও'রা তখন রেঙ্গুন থেকে চট্টগ্রামে এসে অভিনয় করছেন। এই নবগঠিত মনোমোহনের জন্যে ও'দের আনিয়ে নিলেন এখানে। ম্যানেজার ও নাট্যাচার্য হিসাবে যোগদান করলেন দানীবাবু। সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—যিনি ছিলেন তখনকার দিনের একজন নামকরা নাট্য-সমালোচক—পরে দীপালি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন এবং দীর্ঘদিন তা চলেছিল—তাঁর লেখা 'মীরাবাঈ' দিয়ে এই নতুন মনোমোহনের উদ্বোধন হয়েছিল। ১১ আগস্ট ১৯২৮। নাম-ভূমিকায় নেমেছিল গায়িকা সুবাসিনী। রাণা কুম্ভ করেছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী।

একটি পুরাতন বিজ্ঞপ্তিতে দেখেছি :

"In 1928 Monomohan Theatre was leased to Babus Anadi Bose of the Aurora Film and Probodh Ch. Guha who re-opened Monmohan Theatre with Mirabai on 11th Aug. 1928".

এই 'মীরাবাঈ' যখন হয় তখন অনাদিবাবুর সঙ্গে আমার সেই ঝগড়ার পালা চলছিল। এরপর ও'রা খুললেন জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রাণের দাবী'। তখনও আমাদের ঝগড়ার পালা শেষ হয়নি। এ বইও আমি দেখিনি, তবে শুনেছি বেশীদিন চলেনি ওটা। এর ভূমিকালিপিতে ছিল কেশব— নির্মলেন্দু, বাচলা— সরযূবালা, শশাঙ্ক—রবি রায়।

জমল এর পরের বইটা। বাগেরহাটের উকীল নিশিকান্ত বসুরায়—যাঁর কথা আগে বলেছি—এ'র লেখা 'পথের শেষে' নাটক আসর জাকিয়ে তুলল। ঠিক বড়দিনের আগে ১৫ ডিসেম্বর ১৯২৮ এর উদ্বোধন হল। এতে 'দুর্গাশঙ্করে'র ভূমিকায় দানীবাবু অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। বয়সের সঙ্গে যেমন মানিয়েছিল তেমনি একাত্ম করে নিয়েছিলেন নিজেকে ভূমিকাটির সঙ্গে। অদ্ভুত সাবলীল অভিনয় করেছিলেন এই ভূমিকায়। বস্তুত এই অভিনয় থেকেই দানীবাবুর নাম আবার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় বৃদ্ধবয়সে উনি যেন আবার দপ করে জ্বলে উঠলেন। আর অভিনয় করেছিলেন 'শুভদা'র ভূমিকায় প্রভা...—অপূর্ব। মণি ঘোষের 'যোগেশ' ও সত্যেন দে-র 'অনাদি' চমৎকার, নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও সরযূবালাও মোটামুটি ভালোই অভিনয় করেছিলেন।

এই 'পথের শেষে'র সময়েই অনাদিবাবুর সঙ্গে আমার মান-অভিমানের পালা শেষ হয়ে যায়। আবার আমাদের মধ্যে মিল-মিশ হয়ে যায়—এবং এই সময় বা এরই কাছাকাছি কোনসময়ে উনি আমার স্টুডিওতে বেড়াতে আসেন—সেটা আগেই বলেছি।

আমার সেই 'ওভারল্যান্ড' গাড়ী করে নারাণ-ড্রাইভার নিজে থেকে বাড়ী গিয়ে বাবাকে উঠিয়ে নিয়ে আসত। বাবা তাঁর নাতি-নাতনীকেও সঙ্গে নিতেন। গাড়ীতে করে যেতেন বালাখানা তামাক কিনতে।

একদিন এই গাড়ীর 'অ্যাকসেল' ভেঙে ফেলল ড্রাইভার। থিয়েটার থেকে আমাকে নিয়ে আসতে যেতো গাড়ী, কিন্তু সেদিন না যাওয়াতে ট্রামেই বাড়ী ফিরলাম। বাড়ী ফিরে দেখি বাড়ীর সামনে একটা জোরালো আলো পড়েছে। গাড়ীর সব অংশ খোলা—ওরা নিজেরাই মেরামত করছে।

আমি বিরক্ত হয়ে নারাণকে ছাড়িয়ে দিলাম। পাড়ারই একটি ছেলে এবার গাড়ীটা চালাতে লাগল। এও বাবাকে এই রকম বেড়িয়ে আনত—যেটা আমার কাছে ছিল পরম সান্ত্বনার বিষয়।

এই রকম সময়ই আমি শচীন সেনগুপ্ত মশায়ের গল্প নিয়ে শুটিং আরম্ভ করি। গল্পটা সেই 'সতী-তীর্থ'র নাটকটা নয় কিন্তু। ক্যামেরা চালাতেন দেবী ঘোষ, অনাদিবাবু আসতেন দুই-একদিন অন্তর-অন্তর। পরিচালনা করছি আমিই। ভূমিকায় ছিলাম—আমি, রবি রায়, তারকবালা (লাইট) এই সব আর কী! 'সেটিংস' বা দৃশ্যসজ্জার ভার নিয়েছিল স্টারের মানিকলাল দে।

১৯২৮ সাল তখন বিদায় নেবার মুখে, বড়দিনের সময় শিশিরবাবু নাট্যমন্দিরে খুললেন নতুন নাটক 'দিগ্বিজয়ী', যোগেশ চৌধুরীর লেখা নাদির শাহকে কেন্দ্র করে নাটক। গানগুলির সুর দিয়েছিলেন বিখ্যাত ক্ল্যারিওনেট বাদক নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার—যিনি পরে কলিকাতা রেডিও স্টেশনের কর্তাব্যক্তি হয়েছিলেন। পরিচালনা ও নাদির শাহের ভূমিকায় ছিলেন শিশিরবাবু স্বয়ং, অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন : সালেহ বেগ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, আলি আকবর—যোগেশ চৌধুরী, আহমদ খাঁ—জীবন গাঙ্গুলী, রহমৎ খাঁ—রবি রায়, সিতারা—কৃষ্ণভামিনী, সিরাজী বেগম—চারুশীলা। পরে ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভারতনারীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হতে লাগলেন কঙ্কাবতী সাহু বি-এ।

এই কঙ্কাবতীকে নিয়ে একটা কাহিনী আছে—যেটা বলতে আমাকে একটু পিছিয়ে যেতে হবে। ১৯২৮ সালের জুন-জুলাই মাসে শহরে মোড়ে-মোড়ে প্রাচীরপত্র ছেয়ে গেলো—'স্টারে শ্রীমতী কঙ্কাবতী সাহু বি-এ'। গ্র্যাজুয়েট তো দূরের কথা, ম্যাট্রিক পাশ করা মেয়েই থিয়েটারে এর আগে কেউ আসে নি। সুতরাং শহরের সর্বত্রই বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। যাই হোক, এ'কে নিয়ে স্টার ও নাট্যমন্দিরের মধ্যে একটা মামলার সূত্রপাত ঘটে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কঙ্কাবতী নাট্যমন্দিরেই যোগদান করেন এবং মামলাটা আপোষে মিটে যায়।

১৯২৮ সালের শেষের দিকে শুধু 'দিগ্বিজয়ী' নয়, আর একখানি নতুন নাটক খুললেন নাট্যমন্দির। সেটি হল রবীন্দ্রনাথের 'শেষ-রক্ষা'। কবি নিজেই তাঁর 'গোড়ায় গলদ' নাটকখানিকে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করে 'শেষ-রক্ষা' নাম দিয়েছিলেন, এই কৌতুক-নাট্যটি হত 'ষোড়শী'র সঙ্গে। এই বছরেই বাংলার নাট্যজগতে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে।

ওরা অক্টোবর দানীবাবুকে নিয়ে এসে শিশিরকুমার 'প্রফুল্ল' করলেন। গিরীশবাবুর মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে গিরীশ পার্কে, তারই জন্যে চাঁদা তুলতে হবে, তারই জন্যে এই সম্মিলিত অভিনয়। ভূমিকালিপি ছিল এই রকম—যোগেশ—দানীবাবু, রমেশ—শিশিরবাবু, ভজহরি—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মোক্ষদা — তারাসুন্দরী, জ্ঞানদা — কুসুমকুমারী, প্রফুল্ল—প্রভা। টিকিটের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন—'প্রায় চার হাজার টাকা ওঠে।'

হ্যাঁ, আগের কথায় আবার ফিরে আসি—মানে 'দিগ্বিজয়ী'র কথায়। নাট্যমন্দিরে

অর্থাৎ কর্ণওয়ালিশ স্টেজের পেছনে প্রকাণ্ড একটা হলঘরের মতোই ছিল, ওখানে তক্তপোষ পাতা থাকত। আর্টিস্টরা বসে বিশ্রাম করতেন। দেখলাম ঐ ফাঁকা জায়গা-টিকেও স্টেজের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে—তাতে স্টেজের ডেপথ বা গভীরতা অনেকখানি বেড়ে গেছে। বস্তুত এই প্রোডাকশনটি হয়েছিল যেমনি ব্যয়বহুল, তেমনি জাঁকজমকপূর্ণ। অনেকের মতে 'দিগ্বিজয়ী'তে যা খরচ হয়েছিল সেরকম খরচ বোধহয় আর কোনও নাটকে শিশির-বাবু করেন নি।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে আমার ব্যক্তিগত মতে প্রত্যেকেই ভাল অভিনয় করে-ছিলেন। টিম-ওয়ার্ক সুন্দর। কোন কোন সমালোচক মন্তব্য করেন যে 'নাদির শাহে' কোন কোন জায়গায় 'আলমগীরে'র ছাপ পড়েছে। ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে 'নাদির-শাহ' এবং 'আলমগীর' এক ধরনের চরিত্র নয় অবশ্যই। 'আলমগীর' যাঁরা দেখেন নি, তাঁদের হয়ত খুবই ভাল লেগেছিল, কিন্তু তাঁদের ততটা লাগে নি, যাঁরা 'আলমগীর' দেখেছিলেন।

অবশ্য তাঁদের সমালোচক মন খুঁত-খুঁত করলেও শান্ত হয়ে যদি তাঁরা ভেবে দেখতেন, তাহলে তাঁরা শিশিরবাবুকে বিশেষ দোষ দিতে পারতেন না। আর্টিস্টের বিখ্যাত ভূমিকার ছায়া অন্য ভূমিকার অভিনয়ে এসে পড়াটা খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে এটুকু তাঁদের স্বপক্ষে বলা যায় যে শিল্পী যদি এ বিষয়ে একটু বেশী সচেতন থাকেন তাহলে তাঁর ভাগ্যে দ্বিগুণ যশোলাভ হয়।

যাই হোক নাট্যমন্দিরে চলতে লাগল 'দিগ্বিজয়ী', সঙ্গে-সঙ্গে 'শেষরক্ষা'ও চলতে লাগল অন্য নাটকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে—কখনও কখনও 'দিগ্বিজয়ী'র সঙ্গেও।

এইভাবে শেষ হল নাট্যজগতের ১৯২৮ সাল। শুরু হল ১৯২৯ সাল, ব্যক্তিগতভাবে আমার জীবনে এনে দিয়েছে যুগপৎ বিষ ও অমৃত, শোক ও সুখ, বিষাদ ও আনন্দ।

১৯২৯ সালে বাধ্য হয়ে আমাকে ম্যাডানের কাজ ছেড়ে দিতে হল। অবশ্য আমরা যে ম্যাডানে কাজ করতাম, সেই ম্যাডানই আর রইল না। ব্যবসায়ে ওঁদের প্রচুর দেনা হয়ে গিয়েছিল, সেই দেনার দায়ে রিসিভার বসল। এ অবস্থাতেও ম্যাডান কোম্পানী চলেছিল কিছুদিন, কিন্তু তার-পরে এঁদের স্টুডিও প্রভৃতির দখল নিলেন রায়বাহাদুর শুখলাল করনানী। ইনি নতুন নিয়ম করলেন যে প্রত্যেক শিল্পী এবং কলাকুশলীকে (যারা এই স্টুডিওর বেতন-ভূক) প্রত্যহ বেলা দশটায় স্টুডিওর হাজিরা দিতে হবে, কাজ না থাকলেও। ম্যাডানের সময় নিয়ম ছিল, কর্মীদের শুটিং-এর সময় উপস্থিত থাকতে হবে।

আমি দেখলাম—এ আমার দ্বারা হবে না। অতএব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলাম। তখন আমি ম্যাডান থেকে পেতাম মাসিক ৪০০্ টাকা, আর স্টার থেকেও পেতাম ৪০০্ টাকা। এই প্রসঙ্গে ফ্রামজী ম্যাডানের উক্তিটি মনে পড়ে—আপনাকে স্টার যা দেয়—আমিও তাই দেবো—ওই চারশো টাকা।

ম্যাডানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ফলে আমার আয়ের অর্ধেক কমে গেল। তার ওপর গাড়ীখানার মেরামত তো প্রায় লেগেই আছে। তাতে একটা মোটা খরচের ধাক্কা। তারপর আমার সিনেমা কোম্পানীর কাজ বাধা পেল। অনাদিবাবু ছবি নির্মাণের দিকে আর উৎসাহ রাখলেন না, তিনি মন দিলেন পরিবেশন বা ডিস্ট্রিবিউশনের দিকে। ওঁর কোম্পানীর নতুন ম্যানেজার হয়ে এসেছেন জি রামাশেষণ বলে এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক। তিনি হিসাবপত্রে খুব সুদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন, প্রথমেই অরোরার বাকী-বকেয়া নিয়ে পড়লেন। খাতাপত্র দেখতে-দেখতে ওঁর চোখে পড়ল যে, আমার কাছে অরোরা সাতশো টাকা পাবে।

মিঃ রামাশেষণ আমাকে টাকার তাগাদা দিলেন, এবং সেটা খুবই স্বাভাবিক।

অনাদিবাবুকে বললাম, আমার অবস্থার কথা। একটু ভাবলেন তিনি। তারপর হেসে বললেন, আচ্ছা আমি দেখবখন। ঠিক আছে আপনাকে দিতে হবে না।

তখন আমার বাস্তবিকই টাকার খুব টানাটানি যাচ্ছে। গাড়ীটাকে বিক্রি করে দিলাম। পুরনো গাড়ী কিনেছিলাম চারশো টাকায় বিক্রিও করলাম সেই চারশো টাকায়। লোকসান হলো না।

প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল আমার পক্ষে পরম দুর্বৎসর। বাবার শরীর খারাপ, বেড়াতে যেতে পারেন না। তাঁর জন্যও যে গাড়ীটা রাখব তারও উপায় ছিল না। আমি থিয়েটারে যাই-আসি থিয়েটারেরই গাড়ীতে।

আগেই বলেছি যে বাবা শেষের দিকে করতেন ফাটকার ব্যবসা। সেই ব্যবসায়ে লোকশান-টোকশান যা যখনই হয়েছে, তা কাউকে জানতে দেন নি। নিজের বেদনা নিজের মনেই চেপে রাখতেন। কিন্তু তাঁর অসুস্থতা বেড়ে গিয়ে এমন পর্যায়ে এলো যে তিনি আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না— তখন আর চেপে রাখতে পারলেন না ব্যবসার বিপর্যয়ের কথা। জানা গেল বহু টাকা শুধু ঋণই হয় নি, উপরন্তু কোন কোন মহাজন নালিশ পর্যন্ত করেছে।

জিজ্ঞাসা করলেই তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসি হেসে বলতেন—কিছু ভেবো না।

ঐ ট্রাঙ্কে সব কাগজপত্র আছে, ওসব নিয়ে একটু বসতে পারলেই হয়। দাঁড়াও একটু সুস্থ হয়ে নেই।

এ গেল একদিক। অন্যদিকে বাড়ীতে চার-পাঁচটা গরু, কলকাতায় রেখে তাদের খরচ যোগানো কঠিন। তাই তাদের নিয়ে গিয়ে রাখলাম উল্টোডাঙার বাড়ীতে। বর্ষার জল পেয়ে কচি-কচি ঘাস হয়েছে প্রচুর, ওরা খেয়ে বাঁচবে, খোলা হাওয়ায় চরে বেড়িয়ে বাঁচবে। মালী ছিল, সে ওদের ছেড়ে দিত, তারা চরে বেড়াতো মনের আনন্দে।

কিছুদিন পরে বাবা একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। আমি একদিন দেখি ট্রেন থেকে নেমে বাবা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে স্টুডিওর বাড়ী খুঁজতে-খুঁজতে আসছেন।

ব্যাপারটা বুঝতে আমার দেরী হল না। আসলে গরুগুলোকে উনি ভীষণ ভালবাসতেন। না দেখে থাকতে পারছিলেন না বলে একটু সুস্থ হতেই কাউকে কিছু না বলে সোজা ছুটে এসেছেন এতদূরে—এদের দেখতে।

মালীকে ডেকে বললাম—বাবা রাস্তায় বাড়ী খুঁজছেন—যাও-যাও শিগগীর ওঁকে নিয়ে এস। মালী তৎক্ষণাৎ ছুটল উর্ধশ্বাসে।

বাবার মধ্যে একটি প্রকৃতি-পাগল মানুষ বাস করত। সাধারণভাবে তিনি ছিলেন বিষয়ী মানুষ, ব্যবসা-ট্যাবসাই করেছেন, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি তাঁর একটা দারুণ আকর্ষণ ছিল। সেদিনকার ছবিটি আমার মনে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হয়ে থাকবে।

ছেলের ভাড়াবাড়ী দেখতে এই প্রথম এসেছেন—কিন্তু সে সবের দিকে তাঁর মনোযোগ প্রথম গেল না। ঘাটের পাশে যে ঝাঁকড়া-মাথা পল্লবিত বকুল গাছ দুটি ছিল, তার তলার চাতালে এসে বসলেন আগে। বকুল গাছটির পিছন দিকে বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসে-ঢাকা জমিতে তাঁর গরুগুলি মনের আনন্দে চরছে দেখে তাঁর মুখে যে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল—এরকম একখানি প্রসন্ন মুখ আমি জীবনে কোনদিন ভুলতে পারব না। সত্যিই অদ্ভুত সে তৃপ্তির হাসি।

তারপর সব ঘুরে-ফিরে দেখলেন, তাঁর প্রিয় গরুগুলিকে আদর করলেন। এদের জন্যে বাবা বুরুশ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, মালীকে বলে দিলেন এদের গা ঝেড়ে দিতে। মালীরা বাবার সামনেই গরুগুলোর গা বুরুশ করে দিল। বাবা শেষবারের মত গরুদের আদর করলেন। বাবা বেশ খুশী হয়েই বাড়ী ফিরে গেলেন। বাবার সঙ্গে মালীকেও পাঠিয়ে দিলাম। একলা মানুষ অনেক দিন রাস্তাঘাটে একা চলেন নি। যাতে তাঁর কোন অসুবিধে না হয়।

এদিকে আমি তখন খরচান্তের একশেষ। সবদিক সামলে উঠতে পারছিলাম না। কিছু খরচ কমানো খুব দরকার হয়ে পড়ল। উল্টোডাঙ্গার বাড়ীতে দুজন দারোয়ান ছিল—একজনকে ছাড়িয়ে দিলাম। রইলো একজন দারোয়ান আর একজন মালী। আমি মাঝে-মাঝে যাই আর চলে আসি।

তা সত্ত্বেও বাড়ীভাড়া, বিদ্যুৎ-খরচ ইত্যাদি খরচে আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। মানসিক শান্তিও নষ্ট হতে লাগল। কাজের মধ্যে শুধু থিয়েটার। আর কোন দিক থেকে কোন আয় নেই। এইভাবেই চলতে লাগল।

এই সময় স্টার থিয়েটারে ঘটল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৬ জানুয়ারী ১৯২৯ প্রবোধ গুহ মশায় পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। প্রবোধবাবু ছিলেন কর্তৃপক্ষ-স্থানীয়—যা কিছু ব্যবস্থা-পত্তর তিনিই করতেন। সুতরাং তাঁর পদত্যাগে যে চারিদিকে একটা সোরগোল পড়ে যাবে এ তো স্বাভাবিক। এই নিয়ে থিয়েটারে নানা জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল।

সেই সময় বর্ধমানের মহারাজকুমারের বিবাহ উপলক্ষে আমরা স্টার থিয়েটারের শিল্পীরা সব গেলাম বর্ধমানে অভিনয় করতে। মহারাজা বিজয়চাঁদ বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন 'চিরকুমার সভা' করার জন্য। আমি শুধু 'চিরকুমার সভা' করার জন্যেই বর্ধমান গিয়েছিলাম, তারপর অভিনয় শেষে চলে আসি—আমরা তিনজন — আমি, তিনকড়িবাবু ও অপরেশবাবু। আমাদের পার্টি অবশ্য আরও ২।৩ দিন ছিল, তারা অন্য নাটক অভিনয় করেছিল। 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় হয়েছিল অপূর্ব—রাজবাড়ীর ভেতরে সুসজ্জিত মঞ্চে বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের সামনে অভিনয় হয়েছিল। আদর-আপ্যায়নও হয়েছিল রাজকীয় ধারায়। প্রত্যেকটি লোকের সুখ-সুবিধার দিকে এবং থাকা-খাওয়া-শোওয়ার ব্যাপারে তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল কর্তৃপক্ষের। সে কি এলাহী ব্যাপার বলে শেষ করা যায় না। এই রাজকুমারই পরবর্তী কালে রাজাবাহাদুর হয়েছিলেন এবং এই বধূরাণীই পরবর্তীকালে আমাদের কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীতে একজন সদস্যা হয়েছিলেন। কিছুদিন হল তিনি পরলোকগমন করেছেন।

হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। তখনও প্রবোধবাবু স্টারের কাজে ইস্তফার নোটিশ দেন নি। উল্টাডাঙার বাড়ীতে যে স্টুডিও করেছিলাম—সেখানে যে শুটিং করা বন্ধ হয়ে গিয়েছে সে ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি—আমি তখন ল্যাবরেটরী নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। ব্যাটারীর সেল কেনার জন্যে তখন তিন-চারশো টাকার খুব দরকার হয়ে পড়েছিল, অথচ হাতে কিছু নেই।

প্রবোধবাবুকে গিয়ে বললাম কথাটা। প্রবোধবাবু সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিলেন—নিয়ে যাও।

সেই টাকায় ব্যাটারীর সেলের ডেলিভারী নিলাম। কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল। এবার দরকার পরিশ্রুত জল। পুকুরের জল পরিশ্রুত করে নেওয়া যেত, কিন্তু তাতে অসুবিধা দেখা দিল অনেক। তাই 'টিউব-ওয়েল' বসিয়ে তা থেকে জল নেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বেশী দূর এগুনো গেল না অর্থাভাবে। এদিকে ম্যাডানের কাজটাও আর তখন নেই। অতএব তখন একমাত্র ভরসা থিয়েটার।

থিয়েটারে তখন ধরা হলো বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' — আমি পশুপতি আর দুর্গাদাস হেমচন্দ্র।

অন্যান্য পুরোনো বইয়ের সঙ্গে 'মৃণালিনী' চলতে লাগল। কিন্তু নতুন বই না হলে তো আর চলে না।

এল মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটক 'শ্রীবৎস'—অভিনয় হলো ৮ জুন। ভূমিকালিপি ছিল এইরূপ — শ্রীবৎস — আমি,

বাসুদেব—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, শনিদেব—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বণিক — ননীগোপাল মল্লিক, নগরপাল—তুলসী চক্রবর্তী, মালিনী—তারকবালা (লাইট), চিন্তা—শান্তবালা, ভদ্রা — সুশীলাবালা (ছোট), লক্ষ্মী—ঊষারাণী, রাখাল—সরস্বতী, নন্দিনী—নীহারবালা।

শনি ও লক্ষ্মীর বিবাদকে কেন্দ্র করে 'শ্রীবৎস'র দুর্ভাগ্য ও জীবন-সংগ্রাম হল এর বিষয়বস্তু। সহজেই লোকের মনে ধরলো, বিশেষ মেয়েদের। আমার ভূমিকাটি ছিল সিমপ্যাথেটিক। আমার একটা উন্মাদ দৃশ্য করেছিলেন মন্মথবাবু। চিন্তাকে হারাবার পর শ্রীবৎস চলেছেন রাস্তা দিয়ে—ছেলেরা পাগল দেখে পিছনে হাত-তালি দিচ্ছে। আর উনি রাস্তা থেকে ধুলো কুড়িয়ে ছিটোচ্ছেন আর বলছেন—নেই—নেই—

এই দৃশ্যটি এত করুণ হয়েছিল যে, দর্শকরা চোখের জল রাখতে পারতো না।

প্রথম রাত্রি থেকেই বইটা খুব জমে উঠল। দর্শকদের ঘন-ঘন হাততালিতে প্রেক্ষাগার যেন ফেটে পড়তে লাগল। একটা ড্রপের সময় হরিদাসবাবু ভেতরে এসে পরিহাস করে বললেন, কতগুলো পাশ দিয়েছেন মশাই যে হাউস একেবারে ফেটে পড়ছে?

পাশে দাঁড়িয়েছিলেন অপরেশবাবু—আমি ও'র কথার উত্তরে বললাম — সে আপনারাই জানেন। মানে পাশ নিলে তো

আপনাদের কাছেই নেবো—সুতরাং হিসেবটা আপনারাই করে দেখুন।

তখনকার দিনে একটা প্রচলিত পরিহাস ছিল। শোনা যায়, কোন কোন অভিনেতা, পাশ দিয়ে কিছু নিজের লোক ঢুকিয়ে দিতেন—এবং যখনই নিজের 'সীন' আসত তখনই হাততালি দিয়ে হাউস গরম করে দিয়ে নিজের অভিনয়ের উৎকর্ষ জাহির করত এবং সঙ্গে-সঙ্গে সহ-অভিনেতাকে ঘাবড়ে দিত। হাততালির ব্যাপারটাও হল সংক্রামক — একজন বা দুজন দিলে অনেকেই দিতে আরম্ভ করে।

এই নাটকখানি চলাকালীন অনেকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল — থিয়েটার এবং সঙ্গে-সঙ্গে নিজেদের পারিবারিক জীবনেও।

প্রথমেই একদিন শুনলাম যে নীহার-বালা হঠাৎ স্টার ছেড়ে দিচ্ছে। কোথায় যোগ দেবে—কি বিশ্রাম নেবে—কি বাইরে যাবে—কিছু জানা গেল না। তাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোন ফল হল না।

প্রসঙ্গত 'শ্রীবৎস' নাটকের ভূমিকায় মন্মথ রায় যে মন্তব্য করেছেন তার থেকে একটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি ঃ 'গত (১৯২৮) বড়দিনের উৎসবে স্টার থিয়েটার কর্তৃক অভিনয়ার্থ একটি নাটক লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়া গত ৫ নভেম্বর হইতে ১৯ নভেম্বরের মধ্যে 'শ্রীবৎস' রচনা করি, কিন্তু ইতিমধ্যে আমার পিতৃদেব জটিল রোগে পীড়িত হইয়া পড়ায় যথাসময়ে অভিনয়োপযোগী করিয়া দিতে না পারায় এতদিন অভিনীত হইতে পারে নাই।'

'শ্রীবৎস' লিখবার সময়ই প্রথম বাধা পড়ল, তারপর অভিনয়ের সময়ও ক্রমাগত একটার-পর-একটা বাধা পড়তে লাগল। প্রবোধবাবু ছেড়ে গেলেন ১৬ আগস্ট—তারপরই নীহারবালা চলে গেল এক সপ্তাহ পর—২২ আগস্ট। অবশ্য এর আগে ১৫ জুলাই কৃষ্ণভামিনী ও সুবাসিনী এসে যোগদান করেছিল। কিন্তু নাটক জমবার মুখেই এই সব বাধা এসে পড়ায় আমাদের সকলের মনই একটা অস্বস্তিতে ভরে গেল। কিন্তু সবথেকে বড় বাধা এসেছিল আমারই দিক থেকে—সেইটাই বলব এবার।

বাবার অসুখ আবার বেড়ে গেছে ইতি-মধ্যে। এবার একেবারে শয্যাশায়ী বলা যায়। কোনক্রমে উঠতে পারেন, কিন্তু বসতে পারেন না—একটা কিছুতে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রাখতে হয়। ও'র শরীরের এদিকে এই অবস্থা, তার ওপর মামলা চলছে, তার কতদূর কী হয়েছে কে জানে।

একদিন ও'কে জিজ্ঞাসা করায় উনি বললেন—বাক্সে কাগজপত্র সবই আছে—ভাবনার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কয়েকদিন যায়। শরীর ও'র সারে না। রীতিমত দুর্বল, অশক্ত। আবার ও'র কাছে বসে কথাটা তুললাম। উনি এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন ধীরে-ধীরে—অ্যাটর্ণীকে গিয়ে বলো।

অ্যাটর্ণীর বাড়ী ছিল কাছেই। আমি একদিন গিয়ে দেখা করলাম। আমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলেই উনি বুঝলেন যে, মামলাটার ব্যাপারে আমি বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানি না।

উনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—আপনাকে উনি কিছুই বলেন নি?

—না।

উনি গম্ভীর মুখে বললেন—ব্যাপারটা খুব সিরিয়স।

যাই হোক মামলা চলতে লাগলো।

এতদিন সংসারের কথা একেবারেই ভাবি নি—থিয়েটার, সিনেমা আর অভিনয় নিয়েই মত্ত থাকতাম, আজ এসব দিকে নজর দিতে কেমন যেন দিশেহারা করে তুলল আমাকে।

এই জুলাই মাসে বাংলার নাট্যাকাশের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসে পড়ল—৩ জুলাই আমরা স্তব্ধ বিস্ময়ে কাগজে দেখলাম, রসরাজ অমৃতলাল বসু আর ইহজগতে নেই। অর্থাৎ ১ কিম্বা ২ জুলাই তিনি মহাপ্রয়াণ করেছেন। আনন্দবাজারে স্টারের বিজ্ঞাপনে বেরুল—অদ্য বুধবার অভিনয় বন্ধ রহিল। শুধু স্টার নয়, সব থিয়েটারই বন্ধ ছিল সেদিন এই উপলক্ষ্যে।

বাবার সঙ্গে অমৃতলালের নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। সমবয়সী অবশ্য ছিলেন না দুজনে, বাবার থেকে অমৃতলাল ২।৪ বছরের বড়ই ছিলেন বোধহয়—কিন্তু ও'দের বন্ধুত্ব ছিল নিবিড়। একে বাবার অসুস্থ শরীর, তারপর এই দুঃসংবাদ দিলে তিনি খুবই মুষড়ে পড়বেন—এই ভয়ে সংবাদটা আর তাঁকে জানালাম না।

এদিকে প্রবোধবাবু স্টার ছেড়ে যাবার পর তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয় নি—তবে খবর পাওয়া গেল মনোমোহনের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। নীহার তখন পর্যন্ত অন্য কোন স্টেজে যোগদান করে নি।

একদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন—সে-দিনটা হলো ২রা শ্রাবণ ১৩৩৬ (২৫শে জুলাই ১৯২৯)। মৃত্যুর ঠিক সময়ে আমি বাবার কাছে ছিলাম না কিন্তু খবরটা কিভাবে পেলাম তাই বলছি।

দুর্ঘটনা যখন আসে, তখন একা আসে না—অনেকগুলোকে পর পর টেনে নিয়ে আসে। বাবার মৃত্যুর দু'দিন আগে আর একটি দুঃসংবাদ পেলাম। সেটি হল মামলার ফল বেরিয়েছে এবং তাতে অপর পক্ষই ডিগ্রী পেয়েছে। অ্যাটর্ণী জানালেন যে, আমাদের বাড়ী আর জমি অ্যাটাচ করবে, 'সেল'-এ উঠবে।

কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। অ্যাটর্ণী বললেন—বসুন।

বসতে ইচ্ছে হল না—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললাম নিম্নকণ্ঠে—বাড়ীটা তার আগে বাঁধা দেবো, আপনি একটা পার্টি দেখে দেবেন?

উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সংক্ষেপে বললেন—বেশ দেখছি।

বাড়ী গিয়ে এ-খবরটা কাউকেই দিতে পারলুম না—নিজের মনের মধ্যেই দুশ্চিন্তাটা গুমরে গুমরে ফিরতে লাগল। রাত্রে ঘুমুতে পারি না। স্ত্রী কিছু জিজ্ঞেস করলে বাবার অসুখের দোহাই দিয়ে কথাটা এড়িয়ে যাই। শুধু তখন একমাত্র চিন্তা—বিরাট নৈরাশ্যের অন্ধকারে একমাত্র আশার আলো—যদি বাড়ীটা মর্টগেজ দিতে পারি। অন্ততঃ এবারকার মতো তো বাড়ীটা তাহলে বেঁচে যায়।

সেই স্মরণীয় ২রা শ্রাবণও গেছি অ্যাটর্ণীর অফিসে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। আমার মা তখন এখানে ছিলেন না—তীর্থ-ভ্রমণে গেছেন। বাবার অসুখ করেছে, চিকিৎসা হচ্ছে, সেরে যাবেন—এইটাই জানি, কিন্তু উনি যে হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন এ তো এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবিনি।

সেদিন বাবা সুধীরাকে বলেছিলেন—ও কি এখন বেরুবে? বেরুবার আগে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।

আমি সেই কথাটা সুধীরার কাছ থেকে জেনে বেরুবার আগে বাবার ঘরে গেলাম। মেঝের ওপর বিছানা পাতা। সেই বিছানায় তাকিয়া উঁচু করে হেলান দিয়ে আধ-শোওয়া আধ-বসা অবস্থায় তিনি রয়েছেন। ইসারা করে আমাকে কাছে ডাকলেন।

আমি কাছে গিয়ে বসতেই কাঁধের ওপর হাত রাখলেন বন্ধুর মতো। মুখে কিছু বললেন না, শুধু কাঁধটা ধরেই রইলেন নিবিড় আলিঙ্গনের মতো—আর তাঁর দু' চোখ দিয়ে শ্রাবণের ধারার মতো জল গড়িয়ে পড়ছে। কি যেন বলতে চান, অথচ বলতে পারছেন না। বলতে না পারার বেদনাটা যেন গলে গলে অশ্রু হয়ে ঝড়ে পড়ছে।

আমি বললাম—আমাকে কিছু বলবে? বলো!

ঘাড় নেড়ে যেন অতিকষ্টে বললেন—না, তুমি যাও।

না গিয়েও আমার উপায় ছিল না—এ্যাটর্ণীর সঙ্গে দেখা আমার করা খুব দরকার, অতএব আমি উঠে দাঁড়ালুম। ইতি-মধ্যে সুধীরা এসে ও'র গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

আসলে কথাটা বাঁচা ॥

মণীন্দ্র রায়

কথাটা এ নয়, আমি একা আছি,
কথাটা বরং এই—
আমি খুবই আসঙ্গ-পীড়িত।
রয়েছে স্বজন বন্ধু আত্ম-পরিজন
পরিচিত হাজার মানুষ,
নিজের পাড়া ও পথ, প্রতিষ্ঠান, জীবিকা এবং
গাছপালা, মেঘবৃষ্টি, সকাল বিকেল,
ঘটনা ও ঘটনার আড়ালে জটিল
বহু টানাপোড়েনের তাঁতে বোনা এই
প্রত্যহ আমারো আছে—মনের উপরে
পোষাকী সাজের মতো,
তবু আমি মনের ভিতরে
কতোদিন আছি একা, অর্ধ-নির্বাসিত।

আসলে কথা তো এই—
বেঁচে থাকা? বন্ধুকে বলুন।
কৈশোর ডিঙিয়ে ওরা
যৌবন ডিঙিয়ে ওরা
প্রৌঢ়তা ডিঙিয়ে ওরা
যেন এক দমফাটা হার্ডল রেসের
মৃত্যুর খুঁড়িটা ছুঁতে প্রতিযোগী রোজ!
প্রতিষ্ঠান, ভালোমন্দ ধারণারও তাই—
সব মৌল সদিচ্ছার ক্লান্ত ভূমিক্ষয়ে
বাজেটের অডিটের বছরে বছরে
খাঁচাটাই দোলে শুধু বারান্দায়, তার
পাখিটা নিখোঁজ।

না আমি একাকী নই, বুকের ভিতরে
অনেক বাইসন-মুণ্ড, বাঘ-ছাল, হরিণের শিঙ;
অনেক কবরখানা, স্মৃতিস্তম্ভ, সমাধিফলক;
একেকটি দিনের শেষে পরিচিত পৃথিবীটা যেন
বুকের ভিতরে রাখে একেকটি ফসিল;
পাথরের ভার বয়ে দিনেরাতে তাই
সুদূরে বাস্তিলে চোরা-কয়েদে এখন
খুঁজে ফিরি খিল।

আসলে কথাটা বাঁচা, প্রতিটি মিনিটে
নিবিড় গভীর চাষে নিজের ভিতরে
ফসল ফলানো, আর তোলা বীজধান;
আসলে কথাটা বাঁচা, বছরে বছরে
সব নবযুবকের, বালকের, শিশুদের ঘরে
তাদেরই পায়ের নিচে মাটি চিনে চিনে
বাঁচা—মানে নিয়ত নির্মাণ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সমীমতারোদি, যশোবন্তের শিরিণ-বুরুর প্রেয়সীকে ও'র একটি শান্তি-নিকেতনী ফুলতোলা কাপড়ের শাল দিলেন। মেয়েটা হাসতেও পারে। বসন্ত-কালের হাওয়ায় দোলা লাগা মাধবীলতার মত কেবলি নুয়ে নুয়ে হাসে পুষ্পভারানত স্তবকের মতো শরীরটা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হাসে।

যশোবন্ত আমাকে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, কী হে লালসাহেব, হরিণটা মারার জন্যে আমাকে ক্ষমা করেছ ত ? বল, একটি বীভৎস দৃশ্যের বিনিময়ে এতগুলো আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখতে পেলে কি না ? ওরা বছরে ভাত এবং মাংস যে ক'বার খায় তা গুনে বলা যায়।

সত্যি সত্যি ক্ষমা করতে পারলাম কি না জানি না, তবু মনে হলো যশোবন্তই ঠিক। ওকে যেমন করে বলেছিলাম সকালে তেমন করে বলা ঠিক হয় নি। তবে সেই হরিণের রক্তাক্ত দুঃখে যদি কোনো ফাঁকি না থাকে এদের আজকের আনন্দেও কোন ফাঁকি নেই।

[সাত]

ফিরে এসে রুমান্ডিতে আবার বেশ গুছিয়ে বসেছি। তবে আমরা এখান থেকে ফেরার পরদিনই যশোবন্ত গেল টৌলিগ্রাম। ওর মার স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি ঘটছে। সুতরাং চলে যেতে হল হাজারীবাগ। দেখতে দেখতে তিনটে দিনও কেটে গেল। অথচ কোনো খবর পাঠাল না। বেশ চিন্তায় আছি।

কোয়েলে ঢল নেমেছে। অনেক মাছ ধরা পড়ছে। বাগেচম্পা থেকে প্রায়ই নানা-রকম ছোট বড় মাছ ধরে গ্রামের লোকেরা আমার জন্যে পাঠায়। দাম দিই। খুশী হয়ে নেয়। পাহাড়ী নদীর মাছের বড় স্বাদ।

টাবড়কে সেই যে বলেছিলাম, শিকারে যাবার কথা, তা সে মনে করে রেখেছে। শিরিণবুরু থেকে ফিরে আসার পর থেকেই বার বার আমাকে বলছে চালিয়ে হুজৌর এক রোজ বরা মারকে আয়ে।

গাঁয়ের লোকেরা শুয়োর বড় আনন্দ করে খায়। কিন্তু এদিকে আমার গুরুও হাজারীবাগে। গুরু ছাড়া শিকারে যাই-ই বা কি করে। শেষে একদিন না থাকতে পেরে বলেই ফেললাম, যশোবন্ত না থাকলে আমার ভয় করে। টাবড় ত হেসেই বাঁচে না। বলে যশোবন্তবাবু বড় শিকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তা বলে টাবড়ই বা কম কিসে ? তার এই মুঙ্গেরী গাদা বন্দুক দিয়ে সে মারেনি এমন জানোয়ার ত নেই জঙ্গলে, এক হাতী ছাড়া।

ভাবলাম, যাব ত শুয়োর মারতে ভয়ের কি ? সে কথাটা কিঞ্চিত সাহস সঞ্চয় করে বলতেই, বুড়ো তো মারে আর কি। বলে, 'বরা কোনসা ছোটা জানোয়ার হ্যায়'। শুয়োরকে নাকি ওরা বাঘের চেয়ে কম ভয় করে না। শুয়োর আর ভাল্লুক নাকি ওদের সব চাইতে বড় শত্রু। বিনা প্ররোচনায়, বিনা কারণে এরা যখন তখন আক্রমণ করে বসে। শুয়োর তাড়া ক'রে মাটিতে ফেলে মানুষের উরু থেকে আরম্ভ করে সোজা পেট অবধি ধারালো দাঁতে চিরে ফালা ফালা করে দেয়। সে রকমভাবে শুয়োরে চিরলে মানুষকে বাঁচানোই মুস্কিল হয়। আর ভাল্লুক ত আরোও ভাল। যখন দয়া করে প্রাণে না মারে তখন সে এক থাবলায় হয় নাক ঠোঁট, নয় কান ইত্যাদি খুবলে নেয়, তাছাড়া নখ দিয়ে একেবারে ফালা ফালা করে দেয়।

এতদিনে বুঝলাম এই জঙ্গলে পাহাড়ে, যেসব ভয়াবহ বিকৃত মূর্তি দেখি যাদের আধো অন্ধকারে দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠতাম প্রথম প্রথম, তারা সবাই ভাল্লুক কবলিত হতভাগ্য মানুষ।

টাবড় আবার বলল, নয়া তালাওর পাশের শটী ক্ষেতে শুয়োরের দল রোজ সন্ধ্যে হলেই নামে। ইয়া ইয়া বড়কা বড়কা দাঁতাল শুয়োর। গেলে নির্ঘাৎ মারা যাবে।

আমি বললাম, মাচাটাচা বাঁধা আছে ? টাবড় বলল, মাচা কি হবে হুজুর ? মাটিতেই লুকিয়ে বসে মারব। —

শুনেই ত অবস্থা কাহিল। বললাম, না বাবা এই বৃষ্টি বাদলায় মাটিতে বসে শিকার টিকার আমি করি না।

টাবড় মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল।

ইদানীং কিন্তু সকালে বিকেলে একা একা বন্দুক হাতে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এদিক ওদিক যাই। তবে বড় রাস্তা ছেড়ে খুব একটা অন্যত্র ঢুকি না। গা ছম ছম করে। বড় রাস্তার আশেপাশে যা পাখিটাখি পাই তাই মারি। যশোবন্ত বলেছিল এই রকম শিকারকে বলে pot hunting খাদ্য সংস্থানের জন্যে।

সুহাগী নদীর রেখায় যশোবন্তের বসবার প্রিয় জায়গাটার কাছেই একটি বড় গাছে সন্ধ্যের মুখে মুখে প্রচুর হরিয়াল এসে বসতো। ওখানে গিয়ে প্রায়ই মারতে লাগলাম হরিয়াল। ভাল করে নিশানা করা যায় না—পাখিগুলো বড় চঞ্চল, এক জায়গায় মোটে বসে থাকে না, কেবলি এ ডাল থেকে ওডালে তিড়িং তিড়িং করে লাফায় আর কিচির মিচির করে। তবে বড় ঝাঁক থাকলে এক গুলীতে আমার মত শিকারীও তিন চারটে ফেলে দিত। পাখি-গুলোর ঘন সবুজ রঙ। বুকের কাছে যেন একটু হলদেটে সাদাটে। মাংস ভারী ভাল। আর আমার জুম্মান যা রোস্ট বানাত, সে কি বলব।

বন্দুকের ফাঁকা টোটার বারুদের গন্ধ শুঁকতে ভাল লাগত, মরা পাখির ঝপ্ করে গাছ থেকে পড়ার আওয়াজ ভাল লাগত। বুঝতে পারতাম যে, আরও কিছুদিন থাকলে আকৃতিগত পার্থক্য ছাড়া যশো-বন্তের সঙ্গে প্রকৃতিগত পার্থক্য বলে কিছু থাকবে না। যাকে একদিন ঘৃণাও করতাম, সেই জংলীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাব।

যশোবন্ত চলে যাবার পরই আমার বাংলোর পেছনের পিটীস ঝোপে একটি বড় খরগোস মেরে তাকে যশোবন্তের মত বাঁশ পোড়া করে খেয়েছি। এমনি খরগোসের মাংসে যে একটা মেটে মেটে আঁশটে গন্ধ থাকে, সেটা এভাবে রান্না করলে একেবারে থাকে না। গুরুর অবর্তমানে আমি নিজের চেষ্টায় যে কতদূর এগিয়ে গেছি, তা ভাবলে নিজেরই আশ্চর্য লাগে। গুরু কবে ফিরবে এবং তাকে এসব গল্প করব সেই ভাবনায় বিহ্বল হয়ে আছি।

শুয়োর মারতে পারমিট লাগে না।

বছরের সব সময়েই মারা চলে। সেই জন্যেই ত এত বিপত্তি। ইতিমধ্যে আবার একজন লোককে ঐ নয়া তালাওর কাছে শুয়োরে ফেড়েছে। কাল আবার এসে টাবড় বলল। বললাম, তুমি নিজে গিয়ে মারছ না কেন টাবড়? টাবড় বলল, আমার বন্দুক বিগড়ে আছে। ঘোড়াটা ঠিকমত পড়ে না। তাই ওরকম বন্দুক নিয়ে অতবড় দাঁতাল শুয়োরের সামনে যেতে ভরসা পাই না। ভাবলাম আমার বন্দুকটা টাবড়কে দিয়ে দিলেই ত কার্যসমাধা হয়, কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল যশোবন্তের কথা। কোলকাতার শিকারীরা এখানে এসে তাস খেলে আর বীয়ার খায়, এবং তাদের বন্দুক নিয়ে জংলী শিকারীরা শিকার করে। তারপর সেইসব জানোয়ারের চামড়া ও মাংস কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে নিজেরা মেরেছে বলে জাহির করে আর ড্রইংরুমে বসে ন্যাকা মেয়েদের কাছে রোমহর্ষক শিকারের গল্প করে। মেয়েরা শোনে, আর উঃ, আঃ, উম—ম—ম—ম্ ইত্যাদি নানারকম গা-শিরশিরানো আওয়াজ করে।

অতএব বন্দুক দেওয়া যাবে না।

টাবড়কে বললাম, তবে চলো, কাল যাওয়া যাবে।

সকালে যশোবন্তের চিঠি এলো হাজারীবাগের ছাপ মারা। লিখেছে মার নিউমোনিয়া হয়েছে। আরো সাত দিনের আগে আসতে পারছে না। একটু সুস্থ করে আসবে। আমি যেন অবশ্য অবশ্যই একদিন ছিহারে গিয়ে ওর বাংলোর তত্ত্বতাল্লাস করে ওর চাকরকে কিছু নির্দেশাদি দিয়ে আসি। খবর অবশ্য ওর অফিস থেকেও দেবে। তা ছাড়া দু' রকম শম্বরের মাংসের আচার তৈরি করে রেখেছে ও। তারই একরকম যেন আমি নিয়ে আসি এবং অন্যরকম আচারটা যেন ঘোষদা-সুমিতা বৌদিকে ডাল্টনগঞ্জে পৌঁছে দিই। চাকরটা ওর ভাল্লুকের বাচ্চাটার ঠিকমত যত্নআত্তি করছে কিনা তাও যেন দেখে আসি। ইত্যাদি ইত্যাদি। যেতে হবে একদিন যশোবন্তের ছিহারে।

বেলা থাকতে থাকতে টাবড় এসে পৌঁছল। বলল, 'চালি'য় হুজৌর, আভি ভি চলু, দেনেসে সামকো পহলে পইলোহ্ পৌঁছ যাইগে।' আমি বললাম, এত তাড়াতাড়ির কি? জিপ নিয়ে গেলেই ত হল। পরেই যাব। টাবড় এক গাল হেসে বলল, 'তুহরু জীপোয়া না যালথু'।

দুটো পৌণে তিন ইঞ্চি অ্যাসকাম্যাক্স এ জি এবং দুটি স্ফেরিক্যাল বল নিয়ে টাবড়ের সঙ্গে বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে রওনা হলাম। টাবড় নিজের বন্দুকটাও নিয়েছে। দেগে ত দেবে, তারপর ফটুক ছাই না ফটুক। আমি হেন বড় শিকারী ত আছেই। সঙ্গে চণ্ডয়া বলে সুহাগী গ্রামের আর এক বুড়োও চলল, কাঁধে একটা ঝকমকে টাঙ্গি নিয়ে।

শেষ বিকেলের সোনালি আলো বর্ষার ঝকমকে বন জঙ্গলে ঝিকমিক করছে। আমার বাংলো থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে রাস্তাটা বেশ ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। রোদ এসে পড়েছে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে। গাছের গোড়াগুলোতে একটু আধটু জলও আছে কোথাও কোথাও। পাহাড়ের ঢালের গায়ে গায়ে খাঁজ কেটেও ফসল ফলেছে অনেক জায়গায়।

পথে এক জায়গায় একসঙ্গে প্রায় একশো—দেড়শো বিঘা জায়গা নিয়ে আম বাগান। গঞ্জের কোন জমিদার নাকি এখানে সখ করে আম লাগিয়েছেন। এখানের আমে পোকা হয় বেশ। গরমের দিনে ভালুকদের এটা একটা আড্ডাখানা হয়ে ওঠে সন্ধ্যের পর। নয়া তালাও থেকে ফেরার মুখে কত লোক যে এই পথে এইখানে ভাল্লুকের মুখে পড়েছে তার লেখাজোখা নেই।

গরমের দিন ফুরফুরে হাওয়া দিয়েছে শালবনের পাতায় পাতায়। মহুয়ার গন্ধে সমস্ত প্রকৃতি মাতাল হয়ে উঠেছে। শাল ফুলের সুগন্ধি রেণু জঙ্গলময় উড়ে বেড়াচ্ছে হাওয়ার সঙ্গে।

আমি আর ঝুমরু বসে আছি একটি পাঁইসার গাছের ডালে। গাছের নিচে দিয়ে বয়ে চলেছে লুকুইয়ানামহা। পাহাড়ি ঝর্ণা। এখন জল সামান্যই আছে। নদীরেখার এখানে সেখানে বড়-ছোট কাল-সাদা পাথর। নদীর দুপাশের বড় বড় শাল গাছের ছায়া ঝুঁকে পড়ে জলের আরসিতে মুখ দেখছে। আমরা বসে আছি ভাল্লুকের আশায়। আমাদের প্রায় হাত পঁচিশেক দূরে নদীর কিনার ঘেঁষে একটি ঝাঁকড়া মহুয়া গাছ। ঝুমরু গ্যারান্টি দিয়ে নিয়ে এসেছে যে ভল্লুক মহুয়া খাবেই।

বসে আছি। চাঁদটা আরো বড় হল। চারদিকের বন পাহাড়ও ধীরে ধীরে আলোকিত হচ্ছে। নদীরেখায় পাথরের ছায়াগুলোকে এক একটি থাবা গেড়ে বসা কালো শোনচিতোরা বলে ভুল হতে লাগল। বাঁয়ে গাড়ুর বিখ্যাত পাহাড়। ডাইনে রাতের মোহাবরণে মুণ্ডুর জঙ্গলের সীমানা দেখা যাচ্ছে।

আটটা প্রায় বাজে। তবু ভাল্লুকের ভয় নেই। রাইফেলটা আড়াআড়িভাবে পায়ের উপর করে বসার চেষ্টা করছি। ঝুমরুর মুখ দিয়ে মহুয়ার তাড়ির এমনই খুশবু বেরুচ্ছে যে, আমার মনে হলো, ভাল্লুক যদি আদৌ আসে ত মহুয়া গাছে না এসে ঝুমরুর মুখ চাটতে আসবে। পা-টাও টনটন করছে এভাবে এতক্ষণ বসে থেকে।

'আভ্‌ভি বাৎচিৎ বিলকুল বন্ধ হুজৌর। হামলোক পৌঁছ চেকে হে'' বলল টাবড়।

অস্তগামী সূর্যের বিষণ্ণ আলোয় নয়াতালাওর উঁচু বাঁধ দেখা যাচ্ছিল। এক ঝাঁক হুইসলিং টীল চক্রাকারে তালাওর উপর উড়ছিল শিস দিতে-দিতে। একটি ধূসর জাঙ্গিল মন্থর পাখায় উড়ে চলেছিল রুমাণ্ডির দিকে।

তালাওটি খুব যে বড় তা নয়। ঘোলা বর্ষার জলে ভরা। অনেকগুলো নালা এসে পাহাড়ের এদিক-ওদিক থেকে এতে মিশছে। মধ্যেকার জল অপেক্ষাকৃত কম ঘোলা। পাশে-পাশে নানা রকম জলজ উদ্ভিদ আছে। শরবনের মত ছিপছিপে ডাঁটা গাছ, স্পাইডার লিলির মত ছোট-ছোট ফুল; হিঞ্চে কলমির মত অনেক নাম-না-জানা শাক। অনেক রঙের।

তালাওর একটা পাশে আগাগোড়া শটী আর কচু লাগান। টাবড় দেখাল শুয়োরের দল গর্ত করে আর সেগুলো লাঠ করে আর কিছু বাকী রাখে নি। কচু বন আর শটীবনের গা ঘেঁষে একটি বিরাট বাজ-পড়া বট গাছ। আসন্ন সন্ধ্যার রক্তিম আকাশের পটভূমিতে প্রেতাত্মার মত অসংলগ্ন ভঙ্গীতে আকাশের দিকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আর টাবড় সেই গাছের গোড়ায় ফোকরের মধ্যে ঢুকে বসলাম প্রায় মাটির সমান্তরালে। বসবার আগে টাবড় পাথর ছুঁড়ে তার ভিতরে শঙ্খচূড় কি গোখরো সাপ যে নেই সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিল। চওয়া বুড়োকে টাবড় তালাওর অন্য পারে পাঠাল ওদিকের জঙ্গলের ভিতর কোন গাছে উঠে বসে থাকতে বলল। গুলির শব্দ শুনলে যেন আসে।

একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। সোঁদা মাটির গন্ধ উঠছে। চারদিকে এমন একটা বিষণ্ণ শান্তি; এমন একটা অপার্থিবতা যে কি বলব। শাল-সেগুনের চারারা বর্ষার জলে একেবারে সতেজ সরস হয়ে পত্র-পল্লব বিস্তার করেছে। একটা টি-টি পাখি কোথা থেকে উড়ে এসে বেশ কিছুক্ষণ টিটিরটি-টিটিরটি করে জলের ধারে-ধারে ডেকে বেড়াল। তারপর হঠাৎ ডুবন্ত সূর্যটাকে ধাওয়া করে জঙ্গলের অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

এখন সম্পূর্ণ অন্ধকার। তবে শুক্লপক্ষ ছাড়া জঙ্গলে কখনো নিশ্চিদ্র অন্ধকার হয় না। বিশেষ করে জলের পাশে থাকলে ত অন্ধকার বলে মনেই হয় না। তাছাড়া আজ অষ্টমী কি নবমী হবে।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই এখানে যা চোখে পড়ে তা হচ্ছে সন্ধ্যাতারা। অমন শান্তিতে ভরা পান্নার মত সবুজ, কান্নার মত টলটলে তারা বুঝি আর নেই। সমস্ত দিনের ক্লান্তি অপনোদন করে ঠিক সময়মত সে উঠবেই। দপ-দপ করে জ্বলবে। নিঃশব্দে কত কি কথা বলবে হাওয়ার সঙ্গে, বনের সঙ্গে।

জলের পাশে কটকটে ব্যাঙগুলো ডাকতে লাগল কটর-কটর করে। ওপাশের জঙ্গল থেকে একটা হায়না বিকট অট্টহাসি হেসে উঠল।

হঠাৎ আধো-অন্ধকারে দেখলাম এক জোড়া অ্যালসাশিয়ান কুকুরের মত শেয়াল

আমাদের থেকে বড়-জোর তিরিশ গজ দূরে চকচক করে জল খাচ্ছে। নিস্তব্ধ জলের উপর সন্ধ্যাতারার ছায়াটা এতক্ষণ নিষ্কম্প ছিল; এখন জলে ঢেউ লাগতে, কাঁপতে-কাঁপতে সবুজ ছায়াটা তালাওর মধ্যে চলে যাচ্ছে।

এ জঙ্গলে অ্যালশাসিয়ান কুকুর কোত্থেকে আসবে? নিশ্চয় শিয়াল। জল খেয়ে শিয়াল দুটো চলে গেলে টাবড় ফিস-ফিসিয়ে কানে-কানে বলল, 'ডবল সাইজকা থা হুজৌর।' আমি শুধোলাম, ক্যা থা? ও বলল 'হুণ্ডার'। অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ। আমি বললাম, ওগুলো যে নেকড়ে তা আগে বললে না কেন? মারতাম। টাবড় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'ছোড়িয়ে! উ-মারকে ক্যা হোগা? দোনো শুয়ার পীটা দিজিয়ে, খানেমে মজা আয়গা।'

রাত প্রায় এক প্রহর হল। বেশ মশা। হাওয়ার বেগটা একটু কম হলেই মশার প্রকোপ বাড়ে। শুয়োরের বাচ্চাদের পাত্তা নেই। অন্ধকারে কচু গাছগুলোকে শুয়োর কল্পনা করে চোখে ব্যথা ধরে গেল। এমন সময় আমাদের পেছনে জঙ্গলের দিকে মাটিতে ঘৃণায় পদাঘাত করলে যেমন শব্দ হয়, তেমন আওয়াজ হল এবং একাধিক শক্ত পায়ের ধ্বনি ভেসে এল।

টাবড় আমার গায়ে আঙুল ছুঁইয়ে হুঁশিয়ার করে দিল। দেখতে-দেখতে প্রায় গাধার সমান উঁচু একটা দাঁতওয়ালা শুয়োর আমাদের সামনে বেরিয়ে এল জঙ্গল ছেড়ে। মাঝে-মাঝে থেমে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে এমন জোরে জোরে মাটি খুঁড়তে লাগল যে বলার নয়। ফুলঝুরির মত চারদিকে ছিটকে পড়তে লাগল সেই মাটির গুঁড়ো। শুয়োরের চেহারা দেখে আমার বড়ই ভয় হল। আমরা প্রায় মাটির সমান্তরালে বসে থাকতে শুয়োরটাকে আরো বেশী বড় বলে মনে হচ্ছিল। তার পেছনে চার-পাঁচটি শুয়োর দেখা গেল।

বড় শুয়োরটা আমাদের দিকে কোণা-কুণি করে একবার দাঁড়াল। কানটা দেখা যাচ্ছে। ধীরে-ধীরে পুরো শরীরটা দেখা যাচ্ছে; পাশ থেকে। ভাবলাম এই মহেন্দ্রক্ষণ। তারপর গুরুর নাম স্মরণ করে বন্দুক তুলে, বন্দুকের সঙ্গে ক্যাম্পে লাগান টর্চের বোতাম টেপামাত্র ঘোড়া টেনে দিলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে ধপ করে একটা আওয়াজ এবং এমন গগন-নিনাদি এমন চিৎকার হল যে বলার নয়। তা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল। সবিস্ময়ে ও সভয়ে দেখলাম যে বড় দাঁতাল শুয়োরটি পড়ে গেছে মাটিতে এবং অন্য শুয়োরগুলো 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' বলে তেড়ে ছুটছে জঙ্গলমুখো।

বেশ আত্মতৃপ্তির সঙ্গে ফোকর থেকে বেরিয়ে টাবড়ের সঙ্গে কথা বলতে যাব, এমন সময় অতর্কিতে সেই সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্কের মত শুয়োর নিজ চেষ্টায় উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় হাওয়ায় উড়ে আমাদের দিকে তেড়ে এল। সে যে কি ভয়াবহ দৃশ্য তা কল্পনা করা যায় না। প্রথমেই মনে হল বন্দুকটা ফেলে দৌড়ে প্রাণ নিয়ে পালাই। কিন্তু সে সময়টুকু কোথায়? আমার এই মুহূর্তের চিন্তার মধ্যে কানের পাশে কামান দাগার মত একটা শব্দ হল। 'বাবা-গো' বলে ধপ করে বসে পড়লাম।

বেঁচে আছি যে, তা বুঝলাম সে সময়েই যখন আমাদের পায়ের কাছে এসে অত বড় বরা-বাবাজী হুড়মুড়িয়ে মাটি ছিটকিয়ে গুচ্ছের কচু গাছ ভেঙে ধপাস করে আছড়ে পড়ল।

টাবড় বত্রিশ পাটি বিগলিত হয়ে বলল, 'তুহর হাত ত বাঁড়িয়া বা, একদম কান-পাট্টিয়ামে লাগলথু।'

শুয়োরটার দাঁতটি বেশ বড়। ভয় লাগে চাইলে। টাবড় শুয়োরটার কাঁধে উল্টো মুখে ঘোড়ার মত বসে লেজটাকে আঙুলে করে উঁচু করে দেখাল। বেশ কালো পুরুষ্টু লেজ। ডগার দিকে খোঁচা-খোঁচা, বিচ্ছিরি দেখতে লোমের গুচ্ছ। টাবড় বুনো শুয়োর আর পোষা শুয়োরের পার্থক্য বোঝাল। পোষা শুয়োরের লেজ শোয়ান থাকে আর জংলী শুয়োরের লেজ একটি জাজ্বল্যমান দুর্নিবারের প্রতীকের মত উত্তুঙ্গ হয়ে শোভা পায়।

আমরা কথা বলতে-বলতে চওয়া বুড়ো অন্ধকারে টাঙ্গী ঘোরাতে-ঘোরাতে কাঁড়িয়া-পীরেতের মত জঙ্গল ফুঁড়ে বেরুল। শুয়োরটাকে দেখে তার কী আনন্দ। শুয়োরের মুখটাকে দু হাতের পাতার মধ্যে নিয়ে, লোকে যেমন প্রেমিকাকে আদর করে তেমনিভাবে আদর করছিল।

জানি না, কত দিন যশোবন্তের কাছে শিকার করার বিপক্ষে বক্তৃতা করতে পারব। আমার বক্তব্যই ঠিক কিম্বা যশোবন্ত এবং যশোবন্তের সাগরেদ এই টাবড়, চাওয়া এদের সকলের সরব ও নীরব বক্তব্যই ঠিক তা নিয়ে ভাববার অবকাশ ঘটেছে। সেই শিরশিরে হাওয়ায় নয়াতালাওর ধারে মৃত শুয়োরের পাশে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হল আজ থেকে ক' মাস আগে যে শহুরে ছেলেটি রুমাডিহর বাঙলোয় এসে জিপ থেকে নেমেছিল, সেই ছেলেটিতে এবং আজকের আমিতে যেন বেশ অনেকখানি ব্যবধান রচিত হয়ে গেছে। তাকে যেন পুরোপুরি খুঁজে পাচ্ছি না আজকের আমার মধ্যে।

ভাল-মন্দর বিচার করবার যোগ্যতা বা ইচ্ছা আমার নেই। যশোবন্তের জীবনই ভাল, না যে জীবনে আমি কলকাতায় অভ্যস্ত ছিলাম সেই জীবনই ভাল তার উত্তরও আমার কাছে নেই। শুধু বুঝতে পাচ্ছি যে, একটি জীবনের মধ্যে দিয়ে এসেছি এবং অন্য জীবনের চৌকাঠ মাড়িয়ে তাতে প্রবেশ করেছি। ভাল করলাম কি মন্দ করলাম, জানি না।

নইহারে ছোট্ট অফিস। তার পাশে রেঞ্জারের কাঠের দোতলা বাংলো। রাস্তার বিপরীত দিকে অনেকখানি ধু-ধু মাঠ—ওরা বলে টাঁড়। যশোবন্ত বলে কিম্ব-টাঁড় জায়গা, কোন নির্জন স্থান বোঝাতে হলেই যশোবন্ত এই কথাটা ব্যবহার করে।

(ক্রমশঃ)

মধ্যমগ্রামের সাহেব ডাক্তার

হেমচন্দ্র ঘোষ

মধ্যমগ্রামের চৌমাথা। পশ্চিম দিকে একটা বেশ বড়সড় বাগান। আম, কাঁঠাল, সবেদার গাছ লাইন করে বসান। এছাড়া আরও অনেক রকম ফলের গাছে ভর্তি বাগানটা। দক্ষিণ কোণে একখানা দোতলা বাড়ী—গথিক স্টাইলের। সামনে পুকুর—বড় না হলেও একেবারে ছোট নয়। বাড়ীর সামনে বাঁধান ঘাট। পুকুরটার তিনদিকে গোলাপ, যুঁই, বেল কেয়ারী করে বসান। ঘাটের দুপাশে রজনীগন্ধার ঝোপ। বাগানটার কিছু দূরে নদী লাবণ্যবতী। চক্রঘাটায় ঘূর্ণিজলের স্রোত। সেখানে পারাপারের ঘাট। লাবণ্যবতীর বর্তমানের বিশুষ্ক নগ্নতা স্থানে স্থানে তার অবলুপ্তি মিঃ রেনেলের এ্যাটলাসের লাবণ্যবতী নদীকে যেন পরিহাস করছে। বাংলার নদীগুলির সর্বত্র এই অবস্থা।

আঠার শতকের শেষের দিক। গোটা বাংলায় অশান্তির আগুনে মানুষের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে তুলেছে। নীল-কর সাহেবদের নির্মম অত্যাচারে রয়েছে শাসকগোষ্ঠীর পরোক্ষ সমর্থন। হিন্দু পেট্রিয়টের তীব্র সমালোচনায় শাসকগোষ্ঠীর আশ্রয়পুষ্ট নীলকর সাহেবদের বর্বরতা এতটুকু স্তিমিত হওয়া দূরে থাকুক, যেন দশগুণ বেড়ে যায়। বেঙ্গল ইন্ডিগো কনসার্ণ বাংলার মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টরী। তিয়াত্তর হাজার বিঘে জমি নিয়ে তারা নীল চাষ করে। এদের জেলাওয়ারী হেড-কোয়াটার বারাসাতে। মিঃ জে এইচ মিংগিলস বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট। নীলকর সাহেবদের সাহায্য করার জন্য সরকারী গোপন নির্দেশ এলো। তিনি এ আদেশ মানলেন না। লেঃ গভর্ণর মিঃ হ্যালিডে তাঁকে বদলী করে দিলেন। তারপর যিনি এলেন তাঁকেও এই অজুহাতে সরানো হল। হ্যালিডের পর স্যার পিটার গ্রান্ট হলেন ছোটলাট—সদাশয় সৎপুরুষ। বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট তখন এ্যাসলি ইডেন—লর্ড অকল্যান্ডের ভাগ্নে। ইডেন শক্ত মানুষ। নীলকরেরা তাঁকে দলে টানার চেষ্টা করতে থাকে। তখন অত্যাচার চরমে উঠেছে। ইডেন বরদাস্ত করার লোক নন। ঘোলার কাছারীতে হানা দিয়ে পাঁচশ গরু মুক্ত করলেন। নদীয়ার কমিশনার মিঃ গ্রোট ইডেনের কাজ সমর্থন তো করলেন না-ই বরং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলেন। ইডেনের বিরুদ্ধে চললো গোপন রিপোর্ট—তাঁকে বদলী করার পরামর্শ দিলেন মিঃ গ্রোট। কিন্তু গ্রান্ট তা অগ্রাহ্য করেন। ইডেনকে তো বাধা করা গেল না উপরন্তু ইডেন নীলকরদের অন্যায় কাজের ওপর সদাসর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগলেন।

ঘোলা তখন বারাসাতের কাছেই একটা গণ্ডগ্রাম। পাশ দিয়ে চলেছে স্বচ্ছসলিলা সুবর্ণবতী। নীল পরিষ্কার করতে হলে সুপেয় জল চাই। তাই ঘোলাতে হল নীলকরদের আড্ডা। তাদের সেখানে একটা কাছারীও ছিল। কাছেই এক বিরাট দীঘি মধুমুরারী। এর চার কোণে ছিল আকাশছোঁয়া চারটে মিনার। দক্ষিণ দিকের মিনারের নীচে সাহেবদের হাওয়াখানা। ঘোলার কাছারীবাড়ী সাহেবদের লোক-লস্কর পিয়াদা পাইকে ভরা। সেখানে একটা কয়েদখানাও ছিল।

মধ্যমগ্রামের বাড়ীটা ম্যাকলীন সাহেবের। নীল চালানি ফার্মের তিনি বড়-কর্তা। নীলকরদের সঙ্গে যোগসূত্র রাখার উদ্দেশে ম্যাকলীনের মধ্যমগ্রামের বাড়ী।

জ্যৈষ্ঠ মাস। কলকাতায় অসহ্য গরম। গঙ্গার বুক থমথমে—একটু বাতাস নেই। নেটিভ টাউনের গোলপাতার ঘরগুলো প্রায়ই বৈশ্যানরের কোপে ছাই হয়ে ধুলোর সঙ্গে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। মুক্ত হাওয়ার লোভে প্রতি শনিবারে তাই ম্যাকলীনের মধ্যমগ্রামে আসা।

শনিবার। ম্যাকলীন সকাল সকাল আপিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন। মধ্যমগ্রামের বাড়ীতে আজ ডিনার। নীলকর সাহেবরা আসবে। দু-চারজন লেডিরও আসার সম্ভাবনা। বারাসাতের রাস্তা তো দুর্গম—কাঁচা রাস্তা। বর্ষায় হাঁটু-ভোর কাদা। যানবাহন শুধু পাল্কী। পঞ্চাশ হাজার সেনা নিয়ে নবাব সিরাজদ্দৌলা এই রাস্তা ধরে কলকাতায় এসেছিলেন। তাই বারাসাতের এই রাস্তার নাম নবাবী সড়ক। ম্যাকলীনের ছিল দুজন দিশী বাবুর্চি। দুজন মালী বাগানের কাজ করতো। ম্যাকলীন ভীষণ উদ্বিগ্ন। মধ্যমগ্রামে তাড়াতাড়ি যাওয়ার দরকার। বেহারাদের তাড়া দিলেন।

—যাচ্ছি না তো কি! দেখছো না সাহেব, গৌরীপুরের জলায় কোমর ডুবে যাচ্ছে।

পাল্কীর দরজা ফাঁক করে ম্যাকলীন উঁকি মারলেন।

বেহারাদের কথাটা তো মিথ্যে নয়—জল—চারদিকেই জল—যেন এটা সমুদ্দুর।

ম্যাকলীন আর কিছু না বলে একটা চুরুট ধরালেন। তার চিন্তা সময় মতো না পৌঁছুলে ভীষণ লজ্জায় পড়তে হবে। ডিনারটার দেরী হয়ে যাবে—লেডিরা নাক সিঁটকুবে।

নদী পার হয়ে সাহেবের পাল্কী চলল হন-হন করে।

সন্ধ্যা তখন নেমে আসছে। গাছের মাথার ঘন পাতাগুলো জড়িয়ে জোনাকির সবুজ আলো চুমকীর মতো চিকচিক করছে।

দু ধারের জলাজলা ধানের ক্ষেতে ঝিঁ-ঝিঁ আর ব্যাঙের ডাক শুরু হয়ে গেছে।

—কোথায় এলাম?

—হুজুর, মাহাড়া!

ম্যাকলীন একটু নিশ্চিন্ত হলেন। মধ্যমগ্রাম পৌঁছুতে আর বিশেষ দেরী হবে না।

ডিনারের মজলিস। বারাসাতের নীলকর সাহেবরা সবাই এসেছেন। বেঙ্গল ইন্ডিগো কনসার্ণের বড়কর্তা লারমুর, হাবড়ার প্রেস্টউইচ, ছোট সাহেব ওয়ারনার, ঘোলার সাহেবরা সবাই এসেছেন। লেডি হোপ এসেছেন ঘোলা থেকে। মিসেস ওয়ারনার হাবড়া থেকে। টানা পাখা চলছে। লেডি হোপ হাত-পাখাটা একটু নেড়ে বললেন, কি গরম! ভাগ্যে ডাচরা টানা পাখার ব্যবস্থাটা করেছিল নইলে গরমে মরতে হতো!

লারমুর একটু হাসলো।

—ডাচরা অনেক কিছুই এদেশে এনেছে—টেবিল, চেয়ার, আলমারি আরও কত কি!

লেডি হোপের দিকে তাকিয়ে লারমুর বলল—ঘোলাটা আপনার লাগছে কেমন।

—চমৎকার। চারদিকে সবুজ, মনোরম দৃশ্যে ভরা। সুন্দর—মনোরম! মধুমুরারীর হাওয়া খানা আরও চমৎকার, যেন একটা স্বর্গরাজ্য।

লেডি হোপ স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি মরলে, হিন্দুদের মত দেহটা পুড়িয়ে দিও, কিছু ছাই হাওয়াখানায় পুতে রেখো।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালো জন। তার মনটা হঠাৎ ভারী হয়ে গেল।

—মরার কথা কেউ কি কিছু বলতে পারে! আমিও তো আগে মরতে পারি।

হোপ হেসে উঠল—তুমি যে আমার চেয়েও ত্রিশ বছরের ছোট!

ম্যাকলীন প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিল।

—লেডি হোপ! আপনি তো কত জায়গায় ঘুরেছেন। আপনার কথা শুনলে আমরা খুশী তো হবই অনেক কিছু শিখতেও পারবো।

লেডি হোপ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। মুখখানা তাঁর ভারী হয়ে উঠেছে। রুমাল দিয়ে চোখটা মুছে বললেন—ইংলণ্ডের অভিজাত বংশের মেয়েরা যে গন্ডীর বাইরে আসতে সাহস করে না—ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠে, আমি সে বাধা এতটুকু না মেনে কর্ণেলের সঙ্গে এদেশে চলে এলাম। দেশটা বেশ লাগলো—দিনগুলো ভালই কাটছিলো। স্বামীর পোস্টিং কানপুরে—আমরা একটা থাকার বাংলো পেলাম। পুব দিকে নীল আকাশটার গায়ে সূর্যের এতটুকু ছোঁয়াচ লাগলেই

বেরিয়ে পড়তাম দুজনে। কর্ণেলের ঘোড়াটা খুব বড়। আমার ছিল একটা ছোট্ট পনি। শহরের বাইরে অনেক দূরে—দেহাতে চলে যেতাম। দেহাতীরা আমাদের অবাক হয়ে দেখতো—আমাদের উদ্দেশ্যে সেলাম দিত। দু-চারটে পয়সা দিলেই তারা খুশী। এইভাবে দিনগুলো ভালই কাটছিলো। একদিন কর্ণেল ঘরে ফিরলো অনেক রাতে। জিজ্ঞাসা করলাম—এত রাত তো তোমার কখন হয় না?

কর্ণেলের মুখখানা পাংশু—অস্বাভাবিক গম্ভীর। পাশে এসে চুপ করে দাঁড়ালো। একটা কোথাও যে কিছু ঘটেছে এই সন্দেহে মনটা অশান্ত হয়ে উঠলো—উৎকণ্ঠায় বুকটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে! মুখে হাসি নেই, যেন একটা নতুন মানুষ হয়ে গেছ।

গম্ভীর স্বরে কর্ণেল বলল—এই ভোরেই আমাকে রওনা হতে হবে। সিপাহীরা সব বিদ্রোহ করেছে, জোট বেঁধেছে, তারা বলছে—এদেশে একটা ইংরেজও রাখবো না।

আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম, বললাম—তুমি তো যাচ্ছ—আমি একা কি করবো! ভীষণ ভয় লাগছে!

কর্ণেল বলল—আমাদের বাবুর্চি-খানসামারা নিমকহারাম নয়—তারাই তোমায় রক্ষা করবে।

কর্ণেল বলল—ডার্লিং! প্রার্থনা করো আবার যেন আমাদের দেখা হয়!

তখন কি ভেবেছিলাম সেটাই কর্ণেলের শেষ যাত্রা। কয়েকটা দিন গোপনে কাটলো কিন্তু আর লুকিয়ে থাকা চললো না—একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠলো। শেষে খানসামা হামিদুদ্দিন একটা নৌকায় উঠিয়ে দিল। সোজা চলে এলাম কলকাতায়। না খেয়ে না ঘুমিয়ে কদিনের মধ্যেই যেন আদিকালের বুড়ি বনে গেলাম। কলকাতায় এসে জনের সঙ্গে দেখা। সে আমাকে বারাসাত নিয়ে এল।

লারমুর হোপের দিকে তাকিয়ে বলল—সিপাহীরা ক্ষেপেছিল শুনেছি কিন্তু তারা যে এতখানি হিংস্র হয়ে উঠেছিল—তা তো শুনিনি।

মিসেস ওয়ারনার কথাগুলো শুনে যেন ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

—যদি এখানে ওরকম কিছু ঘটে! আমরা কি করবো!

মেঝেতে পায়ের একটা দাপট দিয়ে লারমুর বললো—নেটিভগুলোকে পিপ-স্টিকিং করবো, পেয়াদা পাইক দিয়ে তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেবো, তাদের ঘরের বৌ টেনে বার করব—

বাধা দিয়ে লেডি হোপ বললেন—মিঃ লারমুর! ওকথা মুখে না আনাই ভাল।

লর্ড ক্যানিং বলেছেন—অযথা গোলযোগ হলে কারবার বন্ধ হবে নীলকরদের। ক্ষোভ বাড়িয়ে দেশিকদের ক্ষেপিয়ে রাখা যায় না। —বেঙ্গলের লোক অত্যন্ত নিরীহ। তারা বড় একটা গোলযোগ কখনও চায় না কখন করেওনি। তাহলে কি গোটা ভারতবর্ষ আমাদের কপালে জুটতো! ইউপিতে যারা অন্যায় করছে সরকার তো তাদের শাস্তি দিয়েছেন। এখন সেকথা আর উঠিয়ে লাভ নেই।

লারমুর একটু বিরক্তিভরে বলল—আমরা বিদেশী—এই বিদেশীরাই আবার আমাদের শত্রু। নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেল আমাদের নামে মিথ্যে কলঙ্ক দিয়ে লাট সাহেবের কাছে রিপার্টের পর রিপোর্ট পাঠিয়েছে। হার্সেল নীলকরদের মহাশত্রু। লেডি হোপের কাহিনী সকলকে যেন বিমর্ষ করে তুলল। ডিনারটা আর ভাল জমলো না।

ম্যাকলীনের মনটা খারাপ—এত আয়োজন সবই বৃথা হয়ে গেল। হুইস্কির বোতলগুলো তেমনি রয়ে গেল। ম্যাকলীন মনে মনে স্থির করলো সে আর কখন কাউকে ডিনারে ডাকবে না। সকালে অভ্যেস মত ম্যাকলীন বাগানে ঘুরছে। তখনও ব্রেক ফাস্ট হয়নি। তার ভয় হচ্ছিল কি জানি লারমুর একটা যদি গোল বাধিয়ে বসে তাহলে কি উপায় হবে! দুশ্চিন্তায় ম্যাক-লীন খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। গোলাপ গাছগুলোয় অজস্র ফুল ফুটেছে। আধফোটা একটা ফুল—লেডি ক্যান্ট বাটন-হোলে গুঁজে নিল ম্যাকলীন ভাবলো কি করবো! সুবিধে নেই তাহলে এক বাড়ি সুন্দর গোলাপ বিলেতে পাঠাতাম—ডার্লিং কি যে খুশী হতো।

—হুজুর! ছোট হাজারী!

একটু এগুতেই একদল লোক গেটের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ময়লা চিরকুটে কাপড় পরা।

—সাহেব ও সাহেব! মোদের ওষুধ দেবে না!

সাহেব হাত নেড়ে অপেক্ষা করতে বলে ডাইনিং-এ চলে গেল।

চাঁপা আর ডলি—দুই নর্তকী। তারা রূপের ভাণ্ডার। লারমুরের ভারী প্রিয়। সাহেবের মতে তারা 'এরিং হার্টের' সবল ওষুধ। সাহেবের কুটীরের কাছেই তাদের বাসা।

বিকেলে লারমুর নদীয়ায় চলে যাবে। মুল্লনাথের হেড অপিসে। রাণাঘাটের শ্রীগোপাল ও তাঁর ভাই শ্যামাচরণ পাল-চৌধুরীর সঙ্গে লারমুরের লাঠির লড়াই। মামলায় হেরে গিয়েও পালচৌধুরীরা জমির দখল ছাড়ছে না। দুদলেরই লাঠিয়াল এসেছে ফরিদপুর থেকে। পাল চৌধুরীদের গোমস্তা নবীন বিশ্বাস খুব দুঁদে লোক। মুল্ল-নাথের ছোট সাহেবকে তাড়িয়ে দিয়ে

ছাড়িতে দেওয়া মনে আছে। লারমুর এই রিপোর্ট পেয়েছে, তাই তাড়াতাড়ি রাণাঘাট থেকে যেতে হচ্ছে।

চাঁপা আর ডলি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে তাদের আয়গোকের তাড়া।

ডলি চাঁপার পিছনে দূরে দাঁড়ালো।

—ধ্যাৎ, এ আবার কি খোঁপা?

চাঁপা হেসে বলল—এটা যে প্যারিস ফ্যাসান! সাহেবের ভারী পছন্দ।

এরি মধ্যে একদল লোক তাদের উঠোনে ঢুকে পড়েছে। তাদের দেহ কঙ্কালসার—পরণের কাপড়টুকু শুধু নগ্নতাকে ঢেকে রেখেছে।

চাঁপা এগিয়ে এল।

—কে তোরা?

—মোরা ছিকিস্টীপুরের পেরজা।

—এখানে কেন?

—মোদের কথা সাহেবেরে বোলো, মোরা আর নীল বুনবো না।

—নীল বুনবে না—সাহেবরা এদেশে আর থাকবে না—এই তো কথা! চলে গেলে অন্ন জুটবে কোথেকে?

—এমনি তো মোদের অন্ন জোটে না, তবু পিঠের চামড়া তো বাঁচবে!

ডলির মনটা খুবই নরম।

—পেটে যাদের ভাত নেই তাদের পিঠে আবার লাঠি! এত অত্যাচার ভগবান কখখনো সহ্য করবেন না!

—তুই আর ধর্ম আওড়াস না, ডলি! সাহেবরা চলে গেলে আমাদের কি হবে ভেবেছিস কি?

—কি আর হবে! যা হবার হবে—এত অত্যাচার কিন্তু চোখে দেখা যায় না।

গাঁয়ের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে চাঁপা বলল—

—তোরা নিজেরাই সাহেবকে বল—আমরা পারবো না।

—একটু দয়া কর মা!

চাঁপা যেন ক্ষেপে গেল, কড়া স্বরে বলল—বেরোও এখান থেকে—নইলে খুব অন্যায় হবে!

চাঁপা আর ডলি সাহেবের কুঠীতে। লারমুর দক্ষিণের বারান্দায়— জরুরী কাগজ দেখছে।

চাঁপা ও ডলির দিকে তাকিয়ে লারমুর উৎফুল্ল কন্ঠে ডাকলো—ডলি! মাই ডারলিং।

ডলি এগুলো। সাহেব ডাকলো না—সাহেবের অনাদরে চাঁপার কান দুটো লাল হয়ে উঠেছে। প্রতিশোধ নিতে হবে এই চিন্তাই সে করলো।

লারমুরের তখনও কাগজ দেখা শেষ হয়নি। চাঁপা একটু এগুলো। চোখ একটা ছোট করে লারমুর চাঁপার দিকে নজর দিল।

—কি চম্পা বিবি! এগিয়ে এলে—কিছু বলবে নাকি!

শ্রীকৃষ্ণপুরের প্রজারা আজ আমাদের বাড়ীতে হামলা করেছিল।

লারমুর মুখ না তুলেই বলল—হুঁঃ

—তারা বলে তারা আর কিছুতেই নীল বুনবে না!

—তোমরা কিছু বলচে না!

—আমি তো তাড়িয়েই দিলাম ডলি কিন্তু তাদের দুঃখে গলে পড়লো। ডলি বলে—আহা ওদের কি কষ্ট!

রুক্ষ দৃষ্টিতে লারমুর ডলির দিকে তাকালো?

—আমরা চলে গেলে পেট চলবে কি করে ডলি?

ডলি চুপ করে রইল, মনে মনে বলল—দেহটাকে বিকিয়ে দিয়ে পেটের ভাত-এর চেয়ে মৃত্যুই ভাল!

লারমুর বনমালি দেওয়ানকে ডেকে পাঠালো। ওয়ারনার হাবড়া থেকে এসে গেছে, বিশেষ জরুরী দরকার।

—গুড মর্ণিং স্যর!

—কি খবর ওয়ারনার? এত সকালে যে?

—খবর খুবই খারাপ স্যর! প্রজারা আর নীল বুনবে না—জোট বেঁধেছে।

চাঁপার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—এক্ষুনি ও এই কথাই বলছিলো। ছিরাকিষ্ট-পুরের প্রজাদের কথা। ঝিঙ্গকারগাছার ম্যাকেঞ্জিরও ঐ একই রিপোর্ট! যশোরের শিশির ঘোষ নাকি প্রজাদের ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি ভাবি ওয়ারনার—যশোরের ম্যাজিস্ট্রেটগুলো ড্রিংক করে কি ঝিমিয়ে পড়লো! শুনিছি শিশির ঘোষ নাকি একটা রোগা ডিগডিগে লোক—তাকে জেলে পুরছে না—তার ওপর ম্যাজিস্ট্রেটদের এত দরদ কিসের! গিরীশ দারোগা সেও কি মরে গেছে! সে তো আমাদেরই লোক!

—বনগাঁতেও ভারী গোলমাল স্যর!

লারমুর হুঙ্কার দিয়ে বলল—তোমাদের ঐ একই কথা। তোমরা অপদার্থ! এবার থেকে আমি নিজেই সব ব্যবস্থা করবো—তোমাদের অপেক্ষায় আর থাকছি না। কি বনমালি! দেওয়ানী তো করছো কিছু খবর রাখ? ছিরাকিষ্টপুরের প্রজারা বলেছে তারা আর নীল বুনবে না! এখন কি করবে বল?

বনমালি চাটুয্যে বেঙ্গল ইন্ডিগো কনসার্ণের দেওয়ান—বৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ। বনমালি চাটুয্যের নামে মৌজা—তার নামে বনমালিপুর তালুক। সব নীলকর সাহেব-দের দান। এখানে লারমুরের বসত-প্রসাদ। পাশে বাবুর্চি খানসামাদের ঘর। তার সামনে একটা বিরাট আস্তাবল।

—বনমালি! যারা বলছে নীল বুনবে না তাদের সায়েস্তা করার দরকার। পাইক-দের খবর দাও। ওদের মধ্যে রঘু খুব মজবুদ। ওকে বলো তার দলবল নিয়ে যেন ছিরাকিষ্টপুর যায়। তুমিও যাবে।

চম্পার দিকে ফিরে লারমুর বলল—বনমালি বুড়ো হয়ে গেছে! সব সময়ে ঠিক ঠিক কাজ করে না। তার কাজটা তুমি দেখবে! তোমার ওপর ভার। মুলনাথে রিপোর্টটা যেন যায়।

লারমুর চলে গেছে। ওয়ারনারও হাবড়া কনসার্ণে ফিরে গেল। রঘুকে খবর দেওয়া হল। পরদিন সকালে তাদের সঙ্গে নিয়ে বনমালি শ্রীকৃষ্ণপুরে গেল। দেওয়ান গ্রামে এসেছে সঙ্গে বিখ্যাত লাঠিয়াল রঘু। গ্রামের লোকেরা আতঙ্কগ্রস্ত। কিন্তু কোন কারণ ঠিক করে উঠতে পারলো না। দু-একজন বনমালির সামনে এসে হাতজোড় করে দাঁড়ালো।

—হুজুর! এ গাঁয়ে পদার্পণ কেন?

বনমালি চোখ পাকিয়ে বলল—তোরা নাকি আর নীল বুনবি না বলেছিস?

হাতজোড় করে করিম বলল—হুজুর!

বনমালির ইশারায় লাঠি চলল।

বনমালি তখন একটা কাঁঠাল গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে।

করিমের মা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল।

—ঠাকরমশাই! মোর পোলারে আর মেরো না। ও নীল বুনবে—মুই বলছি ও নীল বুনবে!

বনমালি কোন উত্তর না দিয়ে ভিন্ন-দিকে মুখ ফেরালো। রঘুকে ডেকে গম্ভীর স্বরে বললো—রঘু! আর না ঢের হয়েছে। এক্ষুনি পুলিশ এসে পড়বে। ইডেন সাহেব ভারী দুঁদে—কাউকে ছাড়বে না।

শ্রীকৃষ্ণপুরের ঘটনা নিয়ে কোন কথাই উঠলো না। বনমালি ভেবেছিল—গাঁয়ের লোকে ইডেনের কাছে নালিশ করবে। কিন্তু কিছুই হল না দেখে বনমালি কতকটা নিশ্চিন্ত হল। সেদিন শুক্রবার—জুম্মার নামাজ! গাঁয়ের সব লোক দলে দলে মসজিদে এসে হাজির।

—মারের শোধ নিতে হবে—মোড়ল।

গাঁয়ের মোড়ল মধু মিয়া, একটা চৌকির ওপর চুপ করে বসে।

—কি মোড়ল কথা বলছো না যে! মোরা শুনবো না—শোধ নেবোই।

বিস্তৃত পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে মধু বলল—

—মুই ভাবতিছি কেউটে সাপ নিয়ে খেলবি ছোবল সামলাতে পারবি কি?

—মোরা তো মরাই ধর—শোধটা নিয়ে না হয় কবরে যাব।

মধু কোন উত্তর দিল না।

রহিম বলল—চৌমাথার সাহেবটারে বাদ দাও—ওটা ভাল। গরীবদের ওষুধ-বিষুধ দিয়ে বাঁচাচ্ছে।

হাসেম তড়াং করে লাফিয়ে উঠলো—সাদা চামড়ার কেউ ভাল না। মুখে ভাল মানষে দেখায়, তলে তলে তারা মোদের যম। সুবিধে পেলে মোদের ছাড়বে না। গলা টিপে ধরবে। আগেই ওটা—ওটা পালালে সব ঠান্ডা!

প্লান ঠিক হয়ে গেল। ম্যাকলীন হবে তাদের প্রথম বলি।

বুধবার। সেদিন মধ্যমগ্রামের হাট। হাট ভেঙে গেছে।

লোকজন সব ফাঁকা। অমাবস্যা রাত। তিনজন লোক পিছন দিক থেকে ওপরে উঠে জানালা খুলে ফেললো। ঘরের মধ্যে বিকট আওয়াজ হুড়ুম-দুড়ুম। বাড়ীটা যেন ভেঙ্গে পড়ছে। বাবুর্চিরা, মালী সবাই ভয়ে কাঁপছে—এ ভূত ছাড়া আর কিছু না। কয়েকটা রাত্তির এইভাবেই চলল। শনিবার সাহেব এসেছে। মালী হাতজোড় করে বলল—মু আউর কাম করি পারিবি নই।

সাহেব চোখটা আড় করে বলল—কেন?

—এ বাড়ীরে ভূ-উ-ত আছি সাব।

—ননসেন্স

সাহেব ওপরে উঠে গেল। চারিদিকে বিছানাপত্র ছড়ানো—জিনিসপত্র ভাঙ্গাচুরো, মেঝের ওপর কাচের সরঞ্জাম গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বিছিয়ে আছে!

বাবুর্চি এলো।

—কেয়া হুয়া র‍্যামান?

—হুজুর এ কুঠীতে জীন এয়েছে! তিন রাত এই হাল হুজুর।

সাহেব একটা চুরুট ধরালো। বাড়ীটার চারপাশ একবার ঘুরে এল। ম্যাকলীনের হাতে গুলিভরা পিস্তল। রাত বারোটা হবে।

পাশের ঘরে হুটোপুটি শব্দ—বিকট বিরাট শব্দ। সাহেব যেন একটু ভড়কে গেল। গুলি ছুঁড়লো। আবার বিকট হাসি। ম্যাকলীনের হাত তখন কাঁপছে। আবার গুলি কিন্তু সেটা জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরে চলে গেল। ম্যাকলীন তখন রীতিমত ভীতিগ্রস্ত। সে এলো বারান্দায়। হঠাৎ শোবার ঘরের ঝাড়টা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে মেঝেতে পড়ে গল। আবার গুলি। আবার বিকট হাসির রোল। সাহেবের দেহ ঝিম-ঝিম করছে কব্জি যেন শিথিল হয়ে আসছে। কি করবে স্থির করতে না পেরে ঘরের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। পিস্তলটা যেন খসে পড়ে যাবার মত হয়েছে।

সাহেব ডাকল—মালী!

কোন উত্তর নেই।

—র‍্যামান!

কোন উত্তর নেই।

—ভূত কখখনো না! ভূত আমি বিশ্বাস

করি না। এটা লারমুরের দুষ্কার্যের প্রতিফল। হাঁ—তাই!

ঘরের মধ্যে যেন তাকে দম আটকে দিচ্ছে। ম্যাকলীন দাঁড়াল বাহিরের বারান্দায়। চারিদিক নীরব—নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে রাস্তার দু-একটা কুকুর তাদের বিবাদের সূত্র নিয়ে ডাক সুরু করে দিয়েছে। দূরে শিয়ালের ডাকও শোনা যাচ্ছে। গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদের কোমল আলো বারান্দাটায় যেন আছড়ে পড়ছে। দেয়ালের গায়ে ম্যাকলীন নিজের ছায়া দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। ভীষণ ক্লান্ত—চোখে এতটুকু ঘুম নেই।

সাহেব আবার ডাকলো।

—র‍্যামান

কোন সাড়া নেই।

তখন পূর্বদিকটা ফর্সা হয়ে এসেছে। সাহেব নীচে নেমে এল।

বেহারাদের ডেকে বলল—তৈরী হও! কলকাতায় যাব এক্ষুনি!

রহমান ছুটে এলো—হুজুর ছোট হাজারী!

সাহেব হাত নেড়ে বলল—কিছছু না!

গেটের সামনে বড় বড় হরফে হাতে লেখা কাগজ 'ফর সেল' টাঙিয়ে দিল।

সাহেব পাল্কীতে। গেটের পাশে শিশি হাতে অনেক লোক দাঁড়িয়ে।

—সাহেব! মোদের ওষুধ দেবা না!

ম্যাকলীন মুখটা ফিরিয়ে নিল। তার বিশুষ্ক গণ্ড চোখের জলে ভিজে উঠেছে।

নিমাই ভট্টাচার্য

।। তেরো ।।

শুক্রবার অফিসে গিয়েই তরুণ খবর পেল, ইন্দ্রাণীকে খুঁজে বার করার জন্য ফরেন মিনিস্ট্রী যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

খবরটা পাঠিয়েছেন 'বন' এম্বাসী থেকে ফার্স্ট সেক্রেটারী মিঃ কাপুর।

মেসেজটা পেয়ে খুশীতে ভরে গেল সারা মন। বার বার পড়ল কেবলগ্রামটা। ফরেন অ্যাসিওরড এভরি পসিবল অ্যাকসান ট্রেস ইন্দ্রাণী।

বুঝতে অসুবিধা হলো না, মিঃ ট্যান্ডনের জনাই এত চটপট বন থেকে আর্জেন্ট মেসেজ গেছে দিল্লীতে। অ্যাম্বাসেডরও নিশ্চয়ই বেশ ভাল করে লিখেছিলেন। তা নয়ত এত চটপট উত্তর?

ফরেন মিনিস্ট্রীর অনেক অসুবিধে। সারা দুনিয়ায় 'পঞ্চশীল' প্রচার করতে অনেকের দ্বিধা থাকলেও সহকর্মীদের এসব সাহায্য সহযোগিতা করতে কারুর দ্বিধা নেই। বরং আগ্রহই বেশী।

পাকিস্থান এক বিচিত্র দেশ। রাজনৈতিক ব্যাপারে পাকিস্থানের মতিগতি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কিন্তু অরাজনৈতিক ব্যাপারে সাধারণত সাহায্য করার চেষ্টা করে। তার অবশ্য কারণ আছে। যে কোন পাকিস্থানীর বিপদ-আপদে ভারত সরকার সাহায্য করতে শুধু আগ্রহী নয়, উন্মুখ। দিল্লীর পাকিস্থান হাই-কমিশন থেকে হরদম এই ধরনের অনুরোধ আসছে এবং সর্বশক্তি দিয়ে ভারত সরকার সেসব অনুরোধের মর্যাদা রাখতে চেষ্টা করে।

দেশটা দুটো টুকরো হলেও আত্মীয়-স্বজন ছড়িয়ে দু দেশেই। বিয়ে-সাদীতে যাতায়াত করতেই হয় ওদের। লক্ষ্ণৌতে শ্বশুরের মৃত্যু হলে লাহোর থেকে ছুটে আসতে হয় মেয়ে-জামাইকে।

আরো কত কি হয়। এইত সেবার পাকিস্থান হাই-কমিশনের এক থার্ড সেক্রেটারীর স্ত্রী সন্তানপ্রসবের পর পরই ভীষণ অসুস্থা হয়ে পড়লেন। ভদ্রমহিলা তাঁর মাকে কাছে পাবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। ভারত সরকারের সাহায্যে একদিনের মধ্যে তাঁকে আনা হয় পেশোয়ার থেকে দিল্লী। ভারত সরকারের ঔদার্যে ও তৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে কয়েকদিন পর পাকিস্থানের ফরেন সেক্রেটারী নিজে ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন।

পাকিস্থানের বহু বড় বড় অফিসারের অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে আছেন। ভারত সরকারের ঔদার্যে ও সহযোগিতায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পাকিস্থানীরাই বেশী উপকৃত হন। সেজন্য ভারত সরকার থেকে সাধারণ কোন অনুরোধ গেলে এঁরাও যথাসাধ্য সাহায্য করতে চেষ্টা করেন।

তরুণ এসব জানে। দিল্লীতে থাকতে ওর কাছেই কত অনুরোধ এসেছে। তাইতো বন থেকে মেসেজটা পেয়ে মনে হলো, বোধহয় অন্ধকার রাত্রির মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে, নতুন দিনের আলো আত্মপ্রকাশ করার সময় সমাগত।

মিঃ দিবাকর কতকগুলো ফাইল নিয়ে এলেন কিন্তু তরুণের ইচ্ছা করল না ওগুলোয় হাত দিতে।

'এক্সকিউজ মী মিঃ দিবাকর, আজ ওগুলো রেখে দিন। সোমবার দেখব। আজ আমি উইকলি রিপোর্টটা রেডি করে দিচ্ছি। আপনি ঐটা আজই পাঠিয়ে দিন।'

সব দেশের সব ডিপ্লোম্যাটিক মিশনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে উইকলি পলিটিক্যাল ডেসপ্যাচ পাঠানো। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে, ডিপ্লোম্যাট মরুক বাঁচুক, উইকলি রিপোর্ট ঠিক সময় যাবেই। তাছাড়া বার্লিনের গুরুত্বই আলাদা। বন-এ এম্বাসী এই রিপোর্টের ভিত্তিতে দিল্লীতে রিপোর্ট পাঠাবে এবং তার ভিত্তিতেই দিল্লী তার নীতি ও কার্যধারা ঠিক করবে। সুতরাং ইন্দ্রাণীর স্বপ্নে মশগুল হয়েও তরুণ পলিটিক্যাল রিপোর্ট পাঠাতে দেরী করল না।

রিপোর্টটা ফাইনাল চেক আপ করে নিজে হাতে শীল করে তরুণ তুলে দিল মিঃ দিবাকরের হাতে। হাসতে হাসতে বলল, এই নিন। 'আই হোপ আই উইল নট সী ইউ বিফোর মনডে!

দিবাকর বিদায় নেবার পর তরুণ আবার কেবলগ্রামটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ কি মনে হলো। চিঠি লিখতে বসল চন্দনাকে।

...প্রায় তিন সপ্তাহ আগে তোমার চিঠি পেয়েও জবাব দিতে পারিনি। প্রিয়জনের চিঠির উত্তর আমি চটপট দিই না, তা তুমি জান। যাদের ভালবাসি অথচ কাছে পাই না, তাদের চিঠি পেলে বড় ভাল লাগে। বার বার পড়ি সেসব চিঠি। একদিন নয়, পর পর কয়েকদিন ধরে পড়ি। তোমার চিঠিটাও পড়েছি বেশ কয়েকদিন ধরে। উত্তর দিলেই তো সব শেষ! যতক্ষণ উত্তর না দিই ততক্ষণ মনে হয় চিঠির মধ্য দিয়ে তোমাদের দেখতে পাচ্ছি, কথা শুনতে পাচ্ছি। আমি উত্তর দিলেই তো তোমাদের আর দেখতে পাব না, কথা শুনতে পাব না! তাই সেই ভয়ে উত্তর দিতে দেরী করি।

তবুও এত দেরী হওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু এমন কতকগুলো আজে-বাজে লোকের উৎপাতে বিব্রত ছিলাম যে অফিসের কাজ-কর্মও ঠিক করতে পারিনি। তবে আজ আর চিঠি না লিখে পারলাম না। আজই এম্বাসী থেকে খবর পেলাম ফরেন মিনিস্ট্রী ইন্দ্রাণীর খোঁজ নেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে রাজী হয়েছে। খবরটা পেলে তুমি অনেকটা আশ্বস্ত হবে, খুশী হবে, তাই আর দেরী করলাম না।

চিঠির শেষে তরুণ একথাও লিখল, জানি না ইন্দ্রাণীকে পাওয়া যাবে কিনা; জানি না তাকে আর কোনদিন দেখতে পাব কিনা। তবে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে

এইটুকু মনে হয় তার সঠিক খবর হয়ত এবার পাওয়া যাবে।...

এই পৃথিবীটা মহাশূন্যের মাঝে থেকেও ঠিক নিয়মমাফিক নিত্য চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরপাক খাচ্ছে। নিয়ম মত চন্দ্র-সূর্য উঠছে, অস্ত যাচ্ছে। গঙ্গায় জোয়ার-ভাঁটা খেলছে, অমাবস্যা-পূর্ণিমা হচ্ছে। দুনিয়াটা এমনি করেই চলছে। এই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত মানুষ ও প্রকৃতিরও একটা কোন অদৃশ্য শক্তি আছে। পাহাড়ের কোলে জন্ম নেয় যে নদী, সে ছুটে যায় সমুদ্রের কোলে। মহাসমুদ্রের অনন্ত জলরাশির মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেওয়াই তার সাধনা, তার ধর্ম। সমুদ্রের আকর্ষণেই নদী ছুটে আসে, ছেড়ে আসে তার শ্বেত-শুভ্র পবিত্র হিমালয়-শৃঙ্গের আসন। যে হিমালয় সবাইকে হাতছানি দেয়, সেই পর্বতরাজকে ত্যাগ করতে নদীর দ্বিধা নেই, কুণ্ঠা নেই। বরং আনন্দ আছে, আছে পরিতৃপ্তি। তাইতো সে ক্ষীণধারা নাচতে নাচতে নেমে আসে, হাসতে হাসতে সমতল-ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়। সে ক্ষীণধারা হিমালয়শৃঙ্গে বা তরাই'এর জঙ্গলে প্রায় পরিচয়হীন থাকে, সমতল-ভূমিতে অসংখ্য মানুষের স্পর্শে সে অনন্য হয়, সে বিরাট বিশাল হয়। সমুদ্রের মুখোমুখি এসে সে দিগন্তবিস্তৃত হয়।

তরুণও ছুটে চলেছে সেই অনন্ত-বিস্তৃত অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে। ইন্দ্রাণীর আকর্ষণে। হয়ত বা মিথ্যা প্রত্যাশা, মরীচিকা। জানে না। অন্ধকার ভবিষ্যৎ তার জানা নেই। তবুও এই একটু ক্ষীণ আলোয় সে যেন বিভোর হয়ে গেছে। তাই তো বন্দনাকে চিঠি লিখতে বসে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

...বন্দনা, তোমার বয়স হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে। তার চাইতেও বড় কথা তুমি আমাকে ভালবাস, আমার মঙ্গল কামনা কর, আমাকে দাদা বলে প্রণাম কর। তোমাকে না বলার কিছু নেই। আর পাঁচজন মেয়েদের মত ইন্দ্রাণী ঠিক সাধারণ মেয়ে ছিল না। সে বড় বেশী স্বপ্ন দেখত। বড় বেশী প্রত্যাশা করত আমার কাছ থেকে। বুড়ী গঙ্গার পাড়ে বাস করে আমি ঠিক অত স্বপ্ন দেখতে পারতাম না, সাহস করতাম না। বাবা কোর্টে গেলে, মা বুড়ো শিব-বাড়ীতে পুজো দিতে গেলে ও আসত আমার কাছে। বার বার করে বলত, বিশে-কাকার মত তুমি চমকে দিতে পার না সবাইকে?

সেদিন কল্পনা করতে পারিনি ঢাকা বা কলকাতার বাইরে পা দেব, ভাবতে পারিনি কর্মজীবনের তাগিদে সাত-সমুন্দর তেরো নদী পাড়ি দেব বার বার। ভাবতে পারিনি আরো অনেক কিছু। তাইতো আমি বলতাম, ভবিষ্যৎ কি আমার হাতে ইন্দ্রাণী?

ও প্রতিবাদ করত, পুরুষমানুষ হয়ে এমন কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না?

ঐ কটা কথা বলতেই বেশ উত্তেজিতা হয়ে পড়ত। এলো করে বাঁধা খোঁপাটা আরো ঢিলে হয়ে যেত।

খোঁপার কাঁটাগুলো ঠিক করতে করতে বলত, তুমি এবার বি-এ পরীক্ষা দেবে, আমিও কলেজে ভর্তি হলাম। এখনও কি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটু সচেতন হবার সময় আসেনি?

কত কথা আর লিখব? আমাকে নিয়ে যার বুকভরা আশা ছিল, সে যে যদি বেঁচে থাকে তবে কিভাবে যে দিন কাটাচ্ছে, তা চিন্তা করতেও কষ্ট লাগে।

বন্দনাকে আর কিছু লিখল না। লিখতে পারল না। লেখা সম্ভবও নয়। সব সব মেয়েই স্বপ্ন দেখে। কেউ বেশী, কেউ কম। কিন্তু ইন্দ্রাণী যেন অসম্ভবকে প্রত্যাশা করত।

ঢাকা থেকে অনেক দূরে বসে বার্লিনের ইন্ডিয়ান কন্সুলেটে বসেও তরুণের মন উড়ে যায় সেই সোনালী দিনগুলিতে।...

বেশ বেলা হয়েছিল। তরুণ তবুও শুয়েছিল। টেস্ট পরীক্ষা যখন শেষ হয়েছে, তখন একটু বেলা করে উঠলেই বা কি? ওপাশের বড় জানালা দিয়ে রোদ্দুর আসছিল বলে পাশ ফিরে শুয়ে আর একবার চাদর মুড়ি দিল। তাছাড়া বাবা যখন ঢাকায় নেই, তখন চিন্তার কি?

কে যেন দৌড়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকল? এক গোছা কাচের চুড়ির আওয়াজ হলো না? শুয়ে শুয়েই মুচকি হাসে তরুণ। এসেছে তাহলে ডাকাত মেয়েটা?—

মুহূর্তের মধ্যেই কানে ভেসে এলো, 'মাসিমা।'

কোণার ঘর থেকে তরুণের মা জবাব দিলেন, আমি এই কোণার ঘরে।

পরের কয়েক মিনিট আর কিছু শোনা গেল না ওদের কথাবার্তা। একবার পাশ ফিরে বারান্দার দিকে তাকাল। নাঃ, এখনও এদিকে আসার সময় হয়নি।

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল। তবুও ইন্দ্রাণীর কথা শুনতে পায় না। তবে কি চলে গেল? না, তা কেমন করে হয়? একবার দেখা না করে কি যেতে পারে?

এতক্ষণ পর তরুণের হুঁস হলো, বেশ রোদ্দুর উঠেছে। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতেও বিশ্রী লাগল।

দু-চার মিনিট আরো কেটে গেল। না, আর দেরী করে না। উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। গায় চাদরটা জড়িয়ে বারান্দায় গিয়ে একবার এপাশ-ওপাশ দেখল। পটলের মাকে না দেখে বুঝল, সে রান্নাঘরে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল কোণার ঘরের দোর-গোড়ায়। তরুণ বেশ বুঝল, হঠাৎ দুজনের কথাবার্তা থেমে গেল।

'কি ব্যাপার? সকালবেলায়ই তোমরা ফিস-ফিস করছ? চোখ রগড়াতে রগড়াতে তরুণ জানতে চায়।

মাথাটা দুলিয়ে বিনুনীটা ঘুরিয়ে ইন্দ্রাণী ঘাড় বেঁকিয়ে তরুণকে দেখে একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'একি মাসিমা, খোকনদা এখন উঠল?'

ইন্দ্রাণী কথা বলতে না বলতেই তরুণ ভিতরে ঢুকে চেয়ারটা টেনে নেয়। 'ভাগ্যবান মাত্রেই বেলা করে ওঠে; তাতে এত অবাক হবার কি আছে?' নির্বিকার-ভাবে উত্তর দেয় তরুণ।

হাজার হোক একমাত্র সন্তান। শাসন করার ভাষাটাও যেন স্বতন্ত্র। 'ওর কথা আর বলিস না মা!'

একটা যেন চোরা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে তরুণের অজ্ঞাতে। ইন্দ্রাণীকে লক্ষ্য করে বলেন, 'তোর মত একটা মেয়ে পেতাম! তবে ও জব্দ হতো।'

মুহূর্তের জন্যে দুজনে দুজনকে দেখে। দুজনের চোখগুলো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। ইন্দ্রাণী যেন একটু লজ্জাবোধ করে।

তরুণ একটু মোড় ঘোরাতে চেষ্টা করে। 'যদি পেতাম আবার কি? তোমার পাশেই তো বসে আছে।'

একটু থেমে আবার বলে, 'আচ্ছা মা, তুমি কি মনে কর বলো তো? এই রকম একটা মেয়ে আমাকে জব্দ করবে?'

হঠাৎ পটলের মা'র গলার আওয়াজ শোনা গেল। তরুণের মা ছেলের কথার জবাব না দিয়ে হাতের সেলাই নামিয়ে রেখে সোজা রান্নাঘরে চলে গেলেন।

তরুণও উঠে দাঁড়াল। ইন্দ্রাণীকে বলল, 'দেখো তো, এক কাপ চা খাওয়াতে পার কিনা!'

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ইন্দ্রাণী বলল, মুখ ধুয়েছ?

'তোমার হাতের চা খেলেই মুখ ধোওয়া হয়ে যাবে।'

'এ মাসিমা পাওনি যে একমাত্র ছেলের সব আব্দার সহ্য করবেন।'

তরুণ একটু মজা করার জন্য বলে, 'মাসিমার একমাত্র ছেলের মত আমিও তো তোমার একমাত্র ধ্যান-ধারণা!'

ঠোঁট উল্টে একটু চাপা হাসি হাসতে হাসতে ইন্দ্রাণী বলে, 'তা তো বটেই! যে ছেলে মুনসেফ কোর্টে ওকালতি করার স্বপ্ন দেখে, সে ছেলে আমার ধ্যান-ধারণা?'

ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে তরুণ উত্তর দেয়, মুনসেফ কোর্টে প্রাকটিশ করবো আমি?'

'তোমার দ্বারা তার বেশী কি হবে?'

হাজার হোক বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনদিনই বিশেষ চিন্তার গরজ ছিল না। ম্যাট্রিকের পর আই-এ; আই-এ-এর পর বি-এ, বি-এ' এরপর এম-এ।

তারপর?

তারপর দেখা যাবে। মা আছেন, বাবা আছেন। তারপর ইন্দ্রাণী আছে। অত শত চিন্তার কি আছে।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তরুণের ঔদাসীন্যই ইন্দ্রাণীর অসহ্য। কল্পনাতীত। ছোটবেলায় যার সঙ্গে খেলা করেছে, যৌবনে যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শিখেছে, সে তো শুধু ওয়াড়ীর মাঠে ফুটবল খেলবে না, সে তো শুধু বুড়ী গঙ্গার পাড়ে আড্ডা দেবে না, শুধু চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করবে না।

তবে?

তবে আবার কি? সে বড় হবে। অনেক বড় হবে। দশজনের মধ্যে একজন হবে। সে বিনেকাকা হবে। দেশ-বিদেশ পাড়ি দেবে, ঢাকার মানুষকে চমকে দেবে!

সেই ছোটবেলায় টফি-চকোলেট খাওয়াতে খাওয়াতে বিনেকাকা হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। শিশু ইন্দ্রাণী বিস্মিতা না হয়ে পারেনি। যত বড় হয়েছে, তত বেশী মনে পড়েছে ঐ বিনেকাকাকে। ঢাকার আর সবাই তো ঠিক একই রকম আছে! গংগা-জলি আর ইলিশ মাছ খেয়েই ওরা খুশী, সুখী। মনের মধ্যে একটা বিরাট শূন্যতা অনুভব করত। কাউকে প্রকাশ করত না। তরুণের কাছেও না। বড় হবার পর সেই শূন্যতা পূর্ণ করতে চেয়েছে কাছের মানুষকে দিয়ে।

তাইতো কথায় কথায় খোঁচা দিয়েছে তরুণকে।

ইন্দ্রাণী চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

তরুণ হাত-মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে ঢোকার পর পরই চা নিয়ে ইন্দ্রাণী এলো। চায়ের কাপটা ওর হাতে তুলে দিতে দিতে ইন্দ্রাণীই বেশ একটা মিষ্টি হাসি কিছুটা চেপে রেখে বলল, 'জানো এই সাতসকালে মাসিমা কেন ডেকেছিলেন?'

চেয়ারে পর পা দুটো তুলে বসতে বসতে তরুণ বলল, 'কেন?'

'মা বুঝি মাসিমাকে বলেছেন যে, ময়মনসিংহের কোন এক ডাক্তারের ছেলের সংগে আমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে...!'

ভ্রু দুটো কুঁচকে তরুণ বলে, 'কই সে কথা তো আমাকে বলোনি।'

''আমিও ঠিক জানতাম না। মাসিমার কাছেই শুনলাম।'

'মা কি বললেন?'

'জানো আমার বিয়ের সম্বন্ধের কথা শুনে মাসিমার ভীষণ রাগ।'

'কেন?'

'তা জানি না। তবে বেশ বুঝলাম যে আমি অন্য কোথাও চলে যাই, তা উনি চান না।'

এবার পরম পরিতৃপ্তিতে চায়ের কাপে চুমুক দেয় তরুণ, 'আঃ! ফাস্ট ক্লাশ!'

প্রায় মুখোমুখি টেবিলে হেলান দিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রাণী জানতে চায়, 'কি ফার্স্ট ক্লাশ?'

মুখ না তুলেই জবাব দেয়, 'তুমি, মা, চা—সবাই ফার্স্ট ক্লাশ!'

চন্দনাকে চিঠি লেখার পর আপন মনে বসে থাকতে থাকতে এসব মনে পড়ছিল তরুণের। মনে পড়ছিল মা'র কথা। বড় ভালবাসতেন ইন্দ্রাণীকে। নিজের মেয়ের মত ভালবাসতেন। বড় ইচ্ছা ছিল মেয়েটাকে কাছে রাখার।

দু' চারটে আজেবাজে বিয়ের সম্বন্ধ আসার পর আর থাকতে না পেরে শেষে ইন্দ্রাণীর বাবাকেই বলেছিলেন, 'দেখুন ঠাকুরপো, আমাকে না জানিয়ে মেয়েটাকে যেখানে সেখানে পার করবেন না।'

'আপনাকে না জানিয়ে কোথায় মেয়ের বিয়ে দেব?'

'তা জানি না। তবে ঐসব আজেবাজের ছেলের খবর পেয়েই আপনারা যা মাতামাতি করছেন!'

'তা আপনার ছেলের মত ছেলে পাব কোথায়?'

'সে পরে দেখা যাবে। মোট কথা আমাকে না জানিয়ে হঠাৎ কোথাও—!'

সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। দুনিয়াটা ওলট-পালট হয়ে গেল। শাঁখা-সিঁদুর, মুখের হাসি, চোখের স্বপ্ন—সব কিছু একসংগে হারিয়ে গেল।

তারপর কত কি হলো! ভেড়ার পালের মত সর্বহারাদের সংগে এলেন এপারে।

রানাঘাট, শিয়ালদা, পটলডাঙা। পিসতুতো ননদের বাড়ী, মামাতো দেওরের বাড়ী। আরো কত কি!

সুদীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি! নবীন কুণ্ডু লেনের ঐ অন্ধকার ঘর একদিন হঠাৎ সূর্যের আলোয় ভরে গেল! তরুণ আই এফ এস হলো।

যে সূর্য প্রায় দুপুরবেলায়ই অস্ত গিয়েছিল, সেই তার জন্য মা খুব খানিকটা কেঁদেছিলেন সেদিন। খোকার এই কৃতিত্বে সবচাইতে উনিই তো খুশী হতেন!

তরুণ কোন সান্ত্বনা জানাতে পারেনি। অত বড় কৃতিত্বের পরও কেমন যেন পরাজিত মনে হচ্ছিল নিজেকে। চৌকির পর মাথা নীচু করে বসে চুপচাপ ভাবছিল।

হঠাৎ একটা বিরাট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন তরুণের মা। আপন মনেই যেন বললেন, 'হতচ্ছাড়ী মেয়েটাও যদি কাছে থাকত!'

এসব কথা, স্মৃতি ভাবতে ভাবতে তরুণের চোখটা কেমন ঝাপসা হয়ে উঠেছিল সেদিন। ভুলে গিয়েছিল সে বার্লিনে বসে আছে, ভুলে গিয়েছিল অফিসের কথা।

মিঃ দিবাকর হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললেন, 'স্যার! প্রায় ছ'টা বাজে। আমরা কি যাব?'

তরুণ বড় লজ্জিত বোধ করে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সার্টেনলি যাবেন। চলুন, চলুন, আমিও যাচ্ছি।' (ক্রমশ)

(৩)

১৯২০ এর স্পেশাল কংগ্রেসে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হবার আগেই খেলাফৎ আন্দোলনের ঢেউ লেগেছিল এদেশে। এবং অল্প-বিস্তর শিক্ষিত মুসলমান মাত্রই বিলক্ষণ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২১ এর আইন অমান্য আন্দোলনে যারা বন্দী হয়েছিল, তাদের একটি বড় অংশ ছিল মুসলমান।

গান্ধীজী অসহযোগের সঙ্গে খেলাফৎ সমস্যা জুড়ে দিয়ে খুব সহজে ও সস্তায় এদেশের মুসলমানের অন্তর জয় করতে চেয়েছিলেন এবং সাময়িকভাবে খানিকটা সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু খেলাফৎ সমস্যা যে আদৌ মুসলমান মাত্রেরই সমস্যা নয়, বিশেষ করে ওটার মূল ভিত্তি যে বিদেশে ও বিশেষ একটি দেশে, এই তত্ত্ব কথাটা এদেশের মুসলমানতো বোঝেই নি, গান্ধীজিও হিসেবের বাইরে ছিল।

আফগানিস্তান, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, মালয় ইজিপ্ট এবং আফ্রিকার বহু অঞ্চল মূলত মুসলমান অধ্যুষিত। তথাপি ভারতবর্ষের মুসলমানের ন্যায় তারা খেলাফৎ নিয়ে মাতামাতি করেন। মুসলমানের কিছু অংশ সেদিন তরকে মওলাৎ বা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ-দেবার ফলে দেশ স্বাধীনতার পথে কতটা এগিয়েছিল, তার অপক্ষপাত সমীক্ষা হয়তো কোন দিনই করা সম্ভব হবে না, কিন্তু প্রতিক্রিয়ার যে-বিষ সেদিন অলক্ষ্যে মুসলমান সমাজে অনুপ্রবেশ করেছিল, তার পরিণাম শুভ হয়নি। খেলাফৎ আন্দোলনের মধ্যেও ইংরেজ বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু ইংরেজ ভারতবর্ষকে পরাধীন করে রেখেছে সুদীর্ঘ দিন, এর বিরুদ্ধে খেলাফৎ আন্দোলন মুসলমানদের সজাগ করেনি। ইসলাম ধর্মের প্রতি ইংরেজ অবিচার করেছে, খেলাফৎ আন্দোলনের মূল আবেদন ও বক্তব্য ছিল তাই। ফলে, মুসলমান, —বিশেষ করে অল্পাধিক শিক্ষিত মুসলমানের মনে তার ধর্মীয় ভাবালুতা ও আবেগকেই উস্কে দেওয়া হয়েছিল। এবং অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হতেই এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।

বহরমপুরে মুসলমান রাজনৈতিক কয়েদী ছিল জনা আটেক। এর মধ্যে দুজন ছিল অবাঙালী। এক কাজী ও আবতাবুল ইসলাম ছাড়া আর সবাই ছিল খেলাফৎ কমিটির সভ্য। সুতরাং তদনুযায়ী আচার ও ব্যবহারেও তারা ছিল পাকো মুসলমান।

আমাদের রন্ধনশালার সমুদয় দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এদের ওপর। নোয়াখালি ও ঢাকার যারা ছিল, তারা একাজে পারদর্শী ছিল। খাসির মাংস কসাইখানা থেকে আসত বরাবর। কিন্তু মুরগির বরাদ্দ থাকলে মুরগি আসত জ্যান্ত। মুসলমান বন্ধুরা দস্তুর মতো 'অজু' করে এবং শুদ্ধ মনে অল্লার নামে মুরগির কোরবানি কার্য সমাধা করত। নমাজ ও রোজার দিকে এদের তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। কতখানি দাড়ি কমানো ও গোঁফ ছাটাই করা 'হাদিস' নির্দেশ সম্মত, তার দিকে এরা সজাগ থাকত অনুক্ষণ।

হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা বড় কম ছিল না। কিন্তু কে ব্রাহ্মণ আর কে অব্রাহ্মণ, এক নাম ছাড়া আর কোন মতেই স্থির করবার উপায় ছিল না। উপবীত ধারণ করবার বালাই কারো ছিল না, —এক বরিশালের নরেন দাশগুপ্ত ছাড়া। ওঁর মাথায় ছিল মস্ত বড় টিকি এবং গলায় ছিল গোছাভরা পৈতে। নিয়মিত সন্ধ্যা-আহ্নিকেও নরেনবাবুর অনুরাগ ছিল। এ সব সত্ত্বেও নীতিগতভাবে মুসলমানের হাতে খেতে ওঁর আপত্তি ছিল না। তবে উনি খেতেন নিরামিশ।

প্রথমেই কথাটা খুলে বললেন বেহারের মঞ্জুর আলম। কাজীর সঙ্গে আলোচনা চলছিল গভীর ও গম্ভীর ভাবে। আলোচনার মধ্যে অকস্মাৎ কাজী প্রশ্ন করে বসলেন যে, মুক্তি পাবার পরও কি মঞ্জুর আলম দেশের কাজেই লেগে থাকবেন?

মঞ্জুর আলম বাঙলা জানতেন না। চোস্ত উর্দুতে বললেন, —"মুলুকের কাজ বা আজাদীর জন্য আমি জেলে আসিনি। এসেছিলাম খেলাফৎ সমস্যার সমাধান করতে। খুব সম্ভব ওটা বরবাদই হয়ে গেল। কাজেই আমার খতম।"

কাজী,— "আপনি ভারতবাসী না?"

মঞ্জুর আলম, —"আমি মুসলমান।"

কাজী আর দ্বিরুক্তি করেন নি। স্থির অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মঞ্জুর আলমের মুখের ওপর। তারপরই অট্টহাসিতে ঘর কাঁপিয়ে কাজী নেমে গেলেন খেলার মাঠে। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও।

নিপুণ হয়ে কাজ করবার অসাধারণ দক্ষতা ছিল অমরেশবাবুর। দুদিকে দুখানা লোহার খাট। একখানা কাজীর, অন্যখানা অমরেশবাবুর। মাঝখানে কম্বল বিছিয়ে, চাদর পেতে ঢালা ফরাস। অমরেশবাবুর আস্তানা। দেয়াল ঘেঁষা তাঁর পানের সরঞ্জাম। বেশ তরিবৎ করে পান খেতেন অমরেশবাবু। মাঝে মাঝে কাজীও খেতেন। অমরেশবাবু কাজীকে ডাকতেন নুরু বলে। কাজী ডাকতেন অমরেশদা। অন্য সবাই বলত কাজী সাহেব। আমি একা ডাকতাম কাজী মশাই।

এনিয়েও কথা উঠেছিল। মুসলমান বন্ধুরা মশাই বলা পছন্দ করতেন না। কোন হিসেব বা গূঢ়তত্ত্বের বিচারে আমি মশাই বলতাম না। অমনি নিছক খেয়ালে। কাজী কিন্তু খুশি হতেন। একদিন তো বলেই ফেললেন, —"আমি মানি ওঁরা পছন্দ করেন না। আমার কিন্তু ভালো লাগে। সাহেব শুনলেই মনে হয়, আমি বুঝি বা বিদেশী।"

"শ্বেতাঙ্গদেরও তো আমরা সাহেবই বলে থাকি।" —বলেছিলাম আমি।

"সেই তো। সাহেব বললে যে-সব মুসলমান খুশি হয়, তাদের মনে বোধ হয় এখনো ধারণা যে, তারা 'বাদশাই।"

কাজী সেই ঢালা ফরাশে বসে পান খেতেন। মাঝে মাঝে গেয়ে উঠতেন দুএকটা গানের কলি। আফিসে বাড়তি জিনিস কেনবার দরকার হলে আমাদের ফর্দ পাঠাতে হত। টাকা জমা রাখতে হত আফিসের ভাণ্ডারে। তাই থেকে জিনিস কিনে ওরা পাঠিয়ে দিত। কাজীরও কিছু টাকা জমা ছিল। অমরেশবাবুর ভাঁড়ে মা-ভবানী। অমরেশবাবু এক ফালি কাগজে ফর্দ লিখে এগিয়ে ধরলেন কাজীর সামনে। সই চাই। তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন কাজী। চোখ পাকিয়ে অমরেশবাবুর দিকে চেয়ে হরবর করে যা মুখে এল বলে গেলেন।

"দিলেন সব মাটি করে। মুড়ের কথা আপনি কী বুঝবেন। ভাঙ্গা পিস্তল দেখিয়ে একদিন হয়তো ডাকাতি করেছেন।

এখন বেড়াল তপস্বী সেজে খাচ্ছেন পান...।" দৌড়ে চলে গেলেন নিচ তলায়। পরক্ষণেই গান শোনা গেল, —"বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ নব যুগ ঐ এল ঐ..."

অমরেশবাবু হাসতে হাসতে বললেন, —'একটা আস্ত পাগল।' স্নেহ ও মিষ্টি মমতা ঝরে পড়ছিল অমরেশবাবুর ঠোঁট বেয়ে।

আমাদের জন্য ফুটবল তৈরি করে দিলেন অমরেশবাবু। নারকেলের বল। তাই নিয়েই আমরা মেতে উঠলাম। ছুটলাম মাঠে। দল ভাগ করে খেলা শুরু হয়ে গেল। পূর্ণবাবু রেফারি। বাঁশি বাজানো চলবে না। ওটা পাগলা ঘন্টীর সংকেত। তাই হাততালি। তালি বাজিয়ে পূর্ণবাবু নির্দেশ দিলেন। কাজী উদ্দাম হয়ে খেলছিলেন। খেলার মানদণ্ড কিছু উচ্চাঙ্গের ছিল না। অভাব পূর্ণ হয়ে গেল কাজীর অফুরন্ত উদ্দীপনায়। একাই একশো। কাজী ছুটছেন, বল মারছেন। আবার ওরই মধ্যে চেঁচিয়ে উঠছেন, দে গরুর গা ধুইয়ে। দিন তিনেকের মাথায় বলটা ছিঁড়ে গেল। খেলাও আমাদের সাঙ্গ হল।

প্রচণ্ড সীমাহীন এই প্রাণপ্রাচুর্য কাজী পেলেন কোথা থেকে? মানি, খানিকটা হয়তো সামরিক শিবিরের সংস্পর্শে এসে থাকবে। কি সামরিক শিক্ষা সেদিন আরো অনেকে নিয়েছিলেন। তাদের এই প্রাণপ্রাচুর্য ছিল না। একদিকে মধুর মরমী ভাবপ্রবণতা, তার সঙ্গে মিশেছে অঢেল প্রাণ-প্রবাহ। একটা জ্যান্ত ঘূর্ণি হাওয়া। বিদ্রোহী কবিতার—

মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ,
আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস।
আমি শাসন ত্রাসন সংহার,
আমি উষ্ণ চির অধীর।...শরীরী হয়ে ফুটে উঠেছে কাজীর দেহে এবং মনেও!

রবীন্দ্রনাথ নাকি ও'কে ডাকতেন উদ্দাম বলে: নির্ভুল নামকরণ। কাজীকে একটি কথায় ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দাম। কাজী লেখায় ছিলেন উদ্দাম। হাসিতে উদ্দাম। গানে উদ্দাম। আর সর্বোপরি অপরিমেয় প্রাণশক্তিতেও উদ্দাম।

উদ্দামতার সঙ্গে হয়তো উচ্ছৃঙ্খলতার একটু ছোঁয়াচ থাকেই। তা থাক। মানুষ কাজীকেই সেদিন আমরা দেখেছি। শুধু কবি নয়। লেখক নয়। গাইয়ে নয়। আদর্শবাদী রাজনৈতিক বন্দীও নয়। সব মিশিয়ে কাজী। সব নিয়ে কাজী। মায় উচ্ছৃঙ্খলতায়।

আমি দুর্বার
আমি ভেঙে করি সব চুরমার।
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন,
যত নিয়মকানুন শৃঙ্খল।

আমাদের ঘর থেকে এবং বড় হল ঘর [illegible] অনেক বাড়ির ছাদ দেখা যেত। ছাদে উঠত ছোট ছেলে মেয়েরা, আবার যৌবনবতী মেয়েরাও। সকাল বেলা পূব দিকের সূর্যরশ্মি ছিটকে এসে পড়ত আমাদের ঘরে আর হল ঘরেও। গরাদের মধ্য দিয়ে তির্যক হয়ে ছুটে আসত আলোর ঝর্ণা। কাজী জানলার ধারে আরশি নিয়ে বসতেন। আরশিতে ফেলতেন সূর্যের আলো। প্রতিবিম্ব চালিয়ে দিতেন ওপারের ছাদের দিকে। মেয়েদের মুখে। হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি ওরা চোখ মুখ ঢেকে ফেলত। হাতে তালি বাজিয়ে কাজীর নৃত্য শুরু হত।

আমাদের মধ্যে দু-একজন কটর নীতিবাগীশ ছিলেন। তাঁরা বিরক্ত হতেন। আপত্তির গুঞ্জনও শোনা যেত। কাজীর ভ্রূক্ষেপ নেই। নিছক খেলা। ওরা কি আর অতদূর থেকে কাজীকে চিনতে পেরেছিল? কবির হাতের আলোর ছোঁয়াচ পেয়ে ওরা শিউরে উঠেছিল? না, কবির এই অনাহূত অহেতুক ইশারায় পুলকিত হয়ে কাজীকে বিশেষ করে আমন্ত্রণই জানিয়েছিল?

ভাদুরে অপরাহ্ন। আকাশের কালো মেঘ হালকা হয়ে গেছে। উঠে গেছে ওপরে। মাঝে মাঝে নীল আকাশ বেরিয়ে পড়েছে। তার ওপর দিয়ে ভেসে বেড়ায় থোকা থোকা সাদা মেঘ। কোন বার্তা না জানিয়ে অকস্মাৎ দু-এক পশলা বৃষ্টিও ঝরে পড়ে। বিচিত্র রং-এর বাহার খুলেছে পশ্চিমে।

আমরা প্রায় সবাই ছিলাম ছাদে। মায় জিতেনবাবু। ওঁর মুক্তির দিন সমাগত। ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯২৩) ওঁর খালাস পাবার দিন।

কাজী বলছিলেন রবীন্দ্রনাথের কথা। ভারতবর্ষ কোন দিনই কবির কাঙাল নয়। স্মরণাতীত কাল থেকে এদেশে জন্মেছে প্রথম ও কবিকুল। দুরূহ দর্শন শাস্ত্রকে এদেশ কাব্যে রূপান্তরিত করেছে। অমন কাঠখোট্টা অঙ্কশাস্ত্র বা জ্যোতির্বিজ্ঞানকেও এদেশ কবিতার মাধ্যমে রূপ দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চাইতেও বড় কবি এদেশে ছিলেন। ছিলেন বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস। কবি আরো অনেকে ছিলেন,—ভারবি, ভবভূতি, ধোয়ি, উমাপতি এবং জয়দেব। ছিলেন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। কিন্তু ব্যাস ও কালিদাস ছাড়া আর সবাই ছিলেন নিছক কবি। কালিদাস ছিলেন কবি ও নাট্যকার। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন একমাত্র ব্যাস। মহাকাব্যে, কাব্যে, দর্শনে ও কথাসাহিত্যে অদ্বিতীয়। 'তবুও', বলে চললেন কাজী,—"রবীন্দ্রনাথের সমতুল সম্ভবত কেউ নয়।"

"কেউ নয়? কেন?" প্রশ্ন করলেন কেউ।

"কেউ নয়, কারণ, এরা সবাই ছিলেন শুধু সাহিত্যিকই। কেউ কবি, কেউ বা আর কিছু।" বাস্তব জীবন,— রূঢ়, নিষ্ঠুর, ভালো-মন্দ মেশানো এই পৃথিবীর সঙ্গে, কিম্বা দেশ, বা জাতির সঙ্গে এঁদের কারো বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। রবীন্দ্রনাথও একাধারে কবি, নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক ও দার্শনিক। তিনিও তপোবন গড়েছেন। কিন্তু তার সঙ্গে গড়েছেন শ্রীনিকেতন। শান্তি ও রূপ খুবই উচ্চাঙ্গের সম্পদ, সন্দেহ নেই। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও রূপের আরাধনায় একটা জাত গড়েও না, বাঁচেও না। রবীন্দ্রনাথ তাই তা চান নি। শান্তি নিকেতনের পাশাপাশি গড়েছেন শ্রীনিকেতন। সে-শ্রী ধনপতি সওদাগরের বা বণিকের শ্রী নয়। এ-শ্রীর অঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের আভরণ পরিয়েছেন।

কাজীর কথা শেষ হতেই পূর্ণবাবু বলে উঠলেন,—"তাই ও-শ্রী বেশিদিন টিকবে না। ধোপে ধুয়ে যাবে।"

"হয়তো যাবে। সবই একদিন যায়। চিরদিনের কিছুই নয়। তবুও এর একটা বিস্ময়কর নতুনত্ব আছে। কবির এই চেষ্টা শুধু অভিনব নয়,—রূপহীন, গানহীন, আনন্দহীন দেশের বুকে এই নতুনত্ব হয়তো আবার নবীনতাও এনে দেবে।" জবাব দিলেন কাজী।

"দেবে, যদি দেশ স্বাধীন হতে পারে।" বলেছিলাম আমি।

"খুবই সত্যি কথা।"—কাজী আরো কিছু বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এসে দাঁড়ালেন জিতেনবাবু আমাদের আলোচনা-চক্রের পাশে। বলে উঠলেন তিনি,—"যুদ্ধের পটভূমিকায় ব্যাস গীতার মতো একাধারে কাব্য, নাটক ও দর্শন বলতে পেরেছিলেন এই কথা ভেবে যে, সেই মুহূর্তে না হলেও হয়তো,—সবাই না হোক, কিছু লোক একদিন গীতার পথ শ্রেয় বলে মনে করতেও পারে।"

বৃহৎ মানবমন কোনো দিনই নিছক বর্তমান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। বর্তমানের বুকে দাঁড়িয়ে সে দৃষ্টিপাত করে দূরের রহস্যভরা ভবিষ্যতের দিকে। রবীন্দ্রনাথ আকারে ও আয়োজনে কোন কিছুই হয়তো বিপুল করে গড়ে তুলতে পারবেন না। সে সঙ্গতি তাঁর নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে জাতি যা যা চাইবে,—কোনোটাই তিনি উপেক্ষা করেন নি। অর্থনীতি ও কারিগরি বিদ্যা থেকে সঙ্গীত, নৃত্য ও সুকুমার কলা দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যে গভীর অনুরাগে লুপ্ত বৈভব পুনরুদ্ধারের কাজে আত্ম ব্রতী হয়েছেন,—হয়তো শান্তিনিকেতন বা শ্রীনিকেতন একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে,—যাক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই চাওয়া—তাঁর এই দূরাগত স্বপ্নভরা কামনা কোনোদিন ধ্বংস হবে না। জিতেনবাবু কথা বলেন একটু তাড়াতাড়ি। তবু কথা গাঢ় হয়ে উঠেছিল। তিনি শেষ করলেন এই বলে,—"ব্যাসের 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'—চাক্ষুস কে কবে দেখল? এমন কি যাঁর মুখ দিয়ে কথাটা বলিয়েছিলেন, তিনিও দেখে যেতে পারেননি।"

অনেকক্ষণ বাদে কাজী ও আমি বসেছিলাম হল ঘরের এক কোণে। কাজীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,—"আপনার বিদ্রোহী কবিতায়, "মহা বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না" ইত্যাদি কি গীতার আদর্শের সংগে একটু মেলে না?"

"গীতা আজো আমি পড়ি নি।"

বহরমপুর জেলে আমি 'বিদ্রোহী আয়ারল্যাণ্ড' লিখতে শুরু করেছিলাম। জিতেনবাবুর সাহায্য পেয়েছিলাম অঢেল। ইংরেজী ইতিহাস, কাব্য, সাহিত্য ওঁর মগজের ভেতর ঠাসা। কিছু জিজ্ঞেস করলে ভাবতে হত না এক লহমা। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর। হয়তো, প্যাট্রিক সারসফিল্ড বা ফিৎজেরাল্ড উলফটোন বা ড্যানিয়েল ও কোনেল সম্বন্ধে কোন কথা জানতে চেয়েছি, জানতে চেয়েছি সাল বা সময়,—যথাযথ উত্তর পেয়েছি মুহূর্তের মধ্যে। কোন ঘটনা একটু আধটু থাকলে বলে দিতেন 'লেকী'র আঠারো শতকের ইংলণ্ডের ইতিহাসখানা দেখে নিতে। মিলিয়ে দেখেছি কদাচিৎ গরমিল হয়েছে।

জিতেনবাবু চলে যাবেন দুদিন বাদেই,—সত্যিই মনটা দমে গিয়েছিল। জেলে আর কেউ ছিল না যার কাছে কিছু পেতে পারি। শুধু দিতে পারতেন ঐ একটি মানুষ। জ্ঞানের পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির প্রাখর্যে সত্যিই জিতেনবাবু ছিলেন অনন্য। জিতেনবাবুর পর বন্ধু হবার মতো ছিলেন আরো দুটি লোক। কাজী ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। কাজী স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণ চঞ্চলো, অদম্য ও অনিবার্য উদ্দীপনায় সর্বক্ষণ মাতিয়ে রাখতেন। ডুবিয়ে রাখতেন গানের সুরে, কবিতার ছন্দে, কথার ফুলঝুরিতে। বিজয়বাবু তখনো কবি হন নি। মশ্‌ক করে যাচ্ছিলেন। উৎসাহ ছিল, ছিল প্রাণে প্রত্যয়ও। বিজয়বাবু আর আমি মেতে উঠলাম টেরেন্স ম্যাকসুইনীর লেখা বই এর অনুবাদে।

একা নিভৃতে কাজীকে পাওয়া সহজ ছিল না। দুরন্ত চাঞ্চল্য ওঁর নিজের তো ছিলই, যে বা যারা ওঁর সান্নিধ্য পেত, তারাও সংক্রামিত হয়ে পড়ত নিমেষের মধ্যে। ওরই কোন ফাঁকে মাঝে মাঝে পূর্ণবাবু, কাজী ও আমি বসতাম নিচের মাঠে। সেদিনও বসেছিলাম হাসপাতালের পেছন দিকটায়। নির্জন তো ছিলই, ছিল সুন্দরও। আশেপাশে দুচারটি ছোট ছোট গাছ। লেবু বা বেল গাছের পাশেই দুচরটি লতাফুলের ঝাড়। সবুজ মাঠের বুকে ওদের বিচিত্র দেখাত। আমরা বসে বসে ভবিষ্যতের কল্পনা ও স্বপ্নের জাল বুনতাম। বন্দী জীবনের নিত্যসংগী এই কল্পনা ও স্বপ্ন। সেদিন প্রাণে অকারণ পুলক জাগত। জাগত অকারণ বুকফাটা তৃষ্ণা। পরক্ষণেই অবসাদ, আর হতাশা আসতেও দেরি হত না।

আমাদের তিনজনের মুক্তির দিন ছিল আগে-পিছে। বাইরে গিয়ে আমরা তিনজনে গড়ে তুলব চারণ দল,—এ সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় ছিল না। বন্দী জীবনে এই প্রকার সাধু সঙ্কল্প অল্পবিস্তর প্রায় সব কর্মীর মনে দানা বেঁধে ওঠে। কিন্তু বাইরে যাবার পর ওদের আর খোঁজ মেলে না। একথা অজানা ছিল না কারোই। তবু কল্পনায় ছবি আঁকার বিরামও ছিল না।

মুকুন্দ দাসের যাত্রার কথা উঠল। ঐ ধাঁচে না হলেও ওরই সমগোত্রীয় কিন্তু আরো উন্নত ধরনের দল গড়ে তুলতে হবে। আমরা যাব গ্রাম বাংলার অনাচে কানাচে। বিদ্রোহের বাণী ছড়াব মরা বাংলার কানে। গানে, অভিনয়ে, বক্তৃতায় ভরে দেব মরা গাঙ-এর দুকূল। গান আর পালা গাঁথবেন কাজী, আমার অভিনয়, পূর্ণবাবুর সংগঠন-প্রতিভা। মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটবে।

চাষী-মুটে মজুর ভরা বাংলাদেশ। আবদ্ধ হয়ে আছে সংস্কার, দারিদ্র্য আর বাধা নিষেধের অন্ধকূপে। যুগ যুগান্তের। জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, জাড্য মাখা চোখ খেয়েছে শতাব্দির পর শতাব্দি। সব ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে। জঞ্জাল সরিয়ে গড়ে তুলতে হবে নতুন বাংলা। যার পথে ধ্বনিত হবে মহা মুক্তির অনাহত ধ্বনি।

কল্পনা সেই ছবিকে ঘিরে বিচিত্র বিপুল ও মহৎ স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে প্রাণ। কাজী হাত তুলে নাচতে নাচতে গাইতে থাকেন,—"মোরা ভাই বাউল চারণ মানি না শাসন বারণ, শাসন বারণ মোদের অনুচর রে।"

ওখান থেকে কাজীকে হাত ধরে আমাদের ঘরে নিয়ে এসেছিলাম। আমার খাটে বসেছিলাম দুজনে পাশাপাশি। জিতেনবাবু মাদুর বিছিয়ে শুয়ে ছিলেন ঘরের অন্য প্রান্তে। পড়ছিলেন।

খুব নিচু স্বরে কাজীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের কথা। কখন পরিচয় হল? কেমন করেই বা হল? সম্পর্ক গাঢ় না, ফিকে? কাজী খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। পরে বললেন—"মনে হত কবি আমাকে স্নেহ করেন। হয়তো আমার মনেরই ভুল। নইলে অনশনের সময় একটা খোঁজও নিলেন না কেন?"

কাজীর কণ্ঠ হয়ে উঠেছিল ভারি। বেদনার্ত। অভিমান ঝরে পড়ছিল কথার গা বেয়ে। সহসা বলে উঠলেন—"উনি বড়। অনেক বড়। বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।"

কাজী জানতেন না যে, কাজীকে উপোস ভাঙার অনুরোধ করে রবীন্দ্রনাথ তার করেছিলেন। ঠিকানা ভুল হয়ে গিয়েছিল। চলে গিয়েছিল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। সে-তার আর কাজীর কাছে আসেনি। পরে অবশ্য কাজীর ভুল ভেঙেছিল।

আমার রোজনামচা: 'তারিখ ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৩। আজ সব স্থির হয়ে গেল। বাইরে গিয়ে আমরা,—পূর্ণবাবু, কাজী ও আমি চারণদল গড়ে তুলব। কাজী পালা গাঁথবেন, গানের সুর দেবেন, গান গাইবেন। আমার উপর থাকবে অভিনয়ের দায়িত্ব। পরিচালনার ভার থাকবে পূর্ণবাবুর উপর। সংগঠনের কাজে পূর্ণবাবুর জুড়ি নেই। অসহযোগ আন্দোলনের সময় হাজার হাজার ছেলে নিয়ে উনি গড়ে তুলেছিলেন 'শান্তি সেনা'। তাছাড়া আছে পূর্ব-জীবনের ইতিহাস। এই পূর্ণ দাসের হাতেই তৈরি হয়েছিলেন নীরেন, চিত্তপ্রিয় আর মনোরঞ্জন। মরণজয়ী যতীন মুখার্জি'র সঙ্গী। জীবনে তাঁর বন্ধু ছিলেন, আবার মৃত্যুর পরমক্ষণেও এঁরাই তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন।

কাজী মেতে উঠেছেন। আমারও মনে উৎসাহের অন্ত নেই। আর পূর্ণবাবু? স্বল্পবাক পূর্ণবাবু মনের সঙ্গে হিসাব মেলাচ্ছেন। ছিলেন বিপ্লবী। হলেন অহিংস অসহযোগী। এবার? কোন্ অজানা ভবিষ্যৎ তাঁকে কোথায় নিয়ে যাবে, হয়তো তারই জমা-খরচ কষে দেখছেন।'

পরের দিন বিকেলে আমরা বসেছিলাম গোল হয়ে। সামনের মাঠে। ডিম্বাকার বেল-ফুল গাছের সারির মাঝখানে। উঠল কাজীর সামরিক শিক্ষা শিবিরের কথা। পাঞ্জাব আর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের চাষীদের ঘর থেকে ইংরেজ তাগড়া জোয়ান সংগ্রহ করত সৈনিক দলে। ওরা ইংরেজী জানত না। লেফ্‌ট-রাইট বুঝত না। ওদের এক পায়ে বেঁধে দেওয়া হত ঘাস, অন্য পায়ে বিচালি। কুচকাওয়াজের সময় শিক্ষক প্রথমে বলত লেফ্‌ট, রাইট, লেফ্‌ট। পরক্ষণেই বলে উঠত ঘাস, বিচালি, ঘাস...। পায়ের দিকে নজর রেখে ওরা পা ফেলত, আর মুখে বলত, ঘাস বিচালি, ঘাস...

শোনবামাত্র দমকা হাসির বান ডাকল।

মেডিকেলের সময় হত আরো মজা। গা দেখে, বুক মেপে সবশেষে কোমরের স্বল্প বসন অনাবৃত করবার সময় প্রত্যেই বেঁকে বসত এই সরল সোজা কৃষক-তনয়রা। শরম তখনো ওরা হারায়নি। এতগুলি ড্যাবডেবে চোখের সামনে কেমন করে ওরা শরমের নিভৃত অঞ্চল শুধু খোলা নয়, হস্তপ্রলেপেও সম্মতি দেয়। কুঁকড়ে যায় ওরা। ভুলিয়ে-ভালিয়ে ডাক্তার টিপে টিপে সব দেখে নেয়। হাসতে হাসতে ডাক্তার চলে যেতে বলে। বসন পরে ছুটে ওরা বাইরে আসে। সঙ্গীদের চোখের কোণে আর ঠোঁটের রেখায় মুচকি হাসি ফুটে ওঠে। তারপর একসঙ্গে কল-কল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তে ওরা চালাক হয়ে গেছে।

এই দুরন্ত সদাচঞ্চল প্রতিভাধর মানুষটির নিছক বর্তমান জীবন আমাকে আদৌ সন্তুষ্ট রাখতে পারেনি। ওঁর সব জানবার জন্য মন আমার উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। কেমন করে, কখন কোন্ সুবাদে এঁর এই কবিত্বশক্তি প্রকাশ পেল? পারিবারিক ঐতিহ্য ও পরিবেশ কি ওঁর খুবই অনুকূল ছিল? পারিপার্শ্বিকতা এবং জ্ঞানী-গুণীর সাহচর্য ও সাহায্য কি অঢেল পেয়েছিলেন? পেয়েছিলেন কি এমন কোন বন্ধু-বান্ধবের প্রেরণা যা ওঁকে সাহিত্যের এই শুচিশুভ্র দিব্যাঙ্গনে অব-

লীলায় আসন দেবার অধিকার দিল? নাকি কর্ণের সহজাত কবচ-কুন্ডলের মতো জন্মেই উনি লাভ করেছিলেন কাব্য ও কবিতা-লক্ষ্মীর দাক্ষিণ্য? মন আমার উসখুস করতে লাগল। এই বন্দীশালার সীমাবদ্ধ ও শাসন-সংযত পরিবেশেও কত সহজেই-না কাজী গান লেখেন, সুরারোপ করেন, লেখেন দীর্ঘ কবিতা। অতিসাধারণ আলাপ-আলোচনার মধ্যেও কথায় কথায় কেমন ছন্দ-মিলের খেলা দেখান।

জিতেনবাবু মুক্তি পেলেন ৭ই সেপ্টেম্বর। সকালবেলা সবাই মিলে একসঙ্গে চা খেলাম। জিতেনবাবুর বিদায় অভ্যর্থনার জন্য সামান্য একটু আয়োজনও হয়েছিল। ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হল। বাইরের ভালো মিষ্টিও আনানো হয়েছিল। বহরমপুরের লেডিকেনী বাদ পড়েনি। জেল-গেট পর্যন্ত আমরা জিতেনবাবুর সঙ্গে গিয়েছিলাম।

ভেতরে এসেই কাজী শুয়ে পড়েছিলেন টান টান হয়ে। চোখ বুজে, কপালে হাত রেখে অনেকক্ষণ কাজী শুয়েই থাকলেন। আমি ও'দের সঙ্গেই হলঘরে ঢুকেছিলাম। বসেছিলাম কাজীর পাশেই। অকস্মাৎ কাজী উঠে বসলেন। আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন নিচে। বড় একটা বটগাছ,—গোড়াটা উঁচু করে বাঁধানো—ওরই নিচে। নিজে বসে আমাকেও টেনে বসালেন। চনমনে রোদ উঠেছিল। বটের নিবিড় ছায়ায়, শরতের মেঘশূন্য নীলাকাশের স্তব্ধগাম্ভীর্য সমস্ত পরিবেশটি মেদুর হয়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে ছিল সদ্য বিয়োগ-ব্যথা। কারাগারের সঙ্গীরা মুক্তি পেলে আনন্দও হয়, কিন্তু বেশি জাগে বেদনা।

কাজী কি আমাকে ভোলাবার জন্য নিয়ে এলেন? প্রশ্ন জেগেছিল মনে। জিতেনবাবুর সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক আমার। সেই আলিপুর জেল থেকে। এখানে এসেও বহুদিন কেটেছিল একসঙ্গে। একসঙ্গে কারাগারে ছিলাম, এই কথাটাই বড় হয়ে সেদিন দেখা দেয়নি, জিতেনবাবুর কাছে আমার ঋণের পরিসীমা ছিল না। কাজী জানতেন। বুঝতেনও। তিনিও সেই আলিপুরের সঙ্গী।

কাজী গান ধরলেন—'বিদায় করেছ যারে নয়নজলে, এখন ফিরাবে তারে কিসেরি ছলে।' রবীন্দ্রনাথের গান। কাজীর কণ্ঠ খুব সুরেলা ছিল, এ-কথা বলব না। আমি আদৌ সংগীতজ্ঞ নই। কিন্তু কাজীর অতুল্য কণ্ঠ-দরদ দুর্লভ, এ-কথা মুক্তকণ্ঠে বলতে আমার বাধাও নেই। নিমেষে বিচ্ছেদের গোটা ছায়া আকাশের অপসৃয়মান লঘু মেঘের মতোই দূর হয়ে গেল।

কাজীর সঙ্গীতমুখর কণ্ঠ, ও'র চোখ, মুখ, গোটা অবয়ব আমি দেখছিলাম তন্ময় হয়ে। সেই মুহূর্তে মনে হল কাজীকে আমি ভালোবাসি। গান থেমে গেল। আমি ধীরে কাজীর ডান হাতখানা নিজের হাতে টেনে নিলাম। করতল প্রসারিত করে ও'র হাতের রেখা দেখছিলাম।

জিতেনবাবুর হাত দেখার বাতিক ছিল। কিরোর বই আগাগোড়া পড়েছিলেন। নিজের বুদ্ধি-প্রাখর্য মিশেল দিয়ে অনায়াসে তাক লাগাবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। কত মজার গল্প তাঁর মুখে শুনেছি। কংগ্রেস অধিবেশন বোম্বাইতে। বড় বড় নেতারা মঞ্চে বসে। ছিলেন চিত্তরঞ্জন, জিন্না, সরোজিনী, আরো সব মহারথীরা। কেউ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। কেউ শুনছিলেন। এরই মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়েছিলেন জিন্নাসাহেব জিতেনবাবুর কোলের ওপর। 'চট করে বলুন তো মিঃ ব্যানার্জি, কতদিনের মধ্যে বিলেত যাচ্ছি?'

কলকাতার বিশেষ অধিবেশন। লাজপৎ রায় সভাপতি। গান্ধী বক্তৃতা করছিলেন। সভাস্থল নিস্তব্ধ। সরোজিনী জিতেনবাবুর পাশেই বসেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভিক অধিবেশন। উৎসুক নরনারী। এরই মধ্যে সরোজিনী সহসা অন্তরঙ্গ হয়ে এবং ঘন হয়ে বসেছিলেন জিতেনবাবুর গা ঘেঁষে। বাঁ হাতখানা মেলে ধরেছিলেন জিতেনবাবুর চোখের সামনে। ফিসফিস করে বলেছিলেন—'ঠিক করে বলুন মিঃ ব্যানার্জি, কবে জেলে যাচ্ছি।'

বহরমপুরের প্রায় সবাইর হাত দেখা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাজী ও আমি শুধু হাত দেখিয়ে পরিতৃপ্ত হইনি। নিয়মিত পাঠও নিচ্ছিলাম গুরুর কাছে। বাইরে এসে আমিও কম তাক লাগাইনি। কাজী তো শুনেছি, মেতেই উঠেছিলেন।

হাতের আঙুলগুলো ছিল কাজীর লম্বা লম্বা। ওটা নাকি শিল্পীর চিহ্ন। কাজী তো শিল্পীই। রবিরেখা গোড়ায় কাটাকুটি হয়ে নেমে এসেছে অনেকটা। বেশ সরল হয়ে। আমি বললাম,—'ধাক্কা তো কম খাননি জীবনে। কিন্তু শোধ তুলে নেবেন শেষটায়। সব ভালো যার শেষ ভালো।'

কাজী একটু হাসলেন। পাতলা হাসি। চোখদুটো চলে গেছে কোন সুদূরে। আকাশের গায়ে। কী দেখছেন? নিজের বিগত জীবনের ফেলে-আসা দিন? তাঁর গায়ের সংখ্যাতীত ক্ষত? না, কোন বিস্মৃত-প্রায় রোমাঞ্চের স্মৃতিভরা ছবি?

চোখ নামিয়ে আনলেন আমার মুখের ওপর। শান্ত দুটি চক্ষু। স্বচ্ছ। বিস্তৃত। গভীর।

(ক্রমশঃ)

শীতের রাত্রি। বাইরে অশান্ত ঝোড়ো হিমেল হাওয়ার শন্ শন্ শব্দ। চারিদিকে অসীম নীরবতা।

হাসপাতাল সংলগ্ন নার্সদের কোয়ার্টার-টার সব দরজা-জানালা বন্ধ। বাইরে জমাট অন্ধকার, থমথমে ভাব।

শ্যামলী তখনো গুমরে গুমরে কাঁদ-ছিল। জানালার রন্ধ্রপথ দিয়ে ওর কান্নার শব্দটা ইথারে ভর করে, অদূরের 'অ্যালবার্ট ওয়ার্ডে' হয়তো রাজীব মল্লিকেরও ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। তাই সে-রাত্রে ওর চোখেও ঘুম ছিল না। একদৃষ্টে তাকিয়েছিল দেয়ালঘড়টার দিকে।

'একটু বিষ এনে দিতে পারেন সিস্টার? একটু বিষ!'

কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না শ্যামলী. সত্যি সে হেরে গেছে! রাজীব মল্লিকের কাছেও হেরে গেছে। আবার অব্যক্ত বেদনায় কেঁপে কেঁপে উঠলো শ্যামলী। চোখে ওর অশ্রুর বন্যা: 'বিষ। একটু বিষ এনে দিতে পারেন সিস্টার!' কথাটা ভুলতে পারছে কই শ্যামলী? মনের মধ্যে ঘুরেফিরে সেই একই কথার প্রতি-ধ্বনি। শ্যামলী কাঁদছিল, কিন্তু ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় প্রতিফলিত ওর প্রতি-বিম্বের চোখে বিস্ময়। মুখে কথা নেই, কায়াহীন ছায়াটার দু'চোখে অনন্ত কৌতূহল। সে যেন চোখের ভাষাতেই বলতে চাইছে, 'ছিঃ শ্যামলী, কেঁদে না! কাঁদছ

বেঁচে থাকার গল্প

রজত চক্রবর্তী
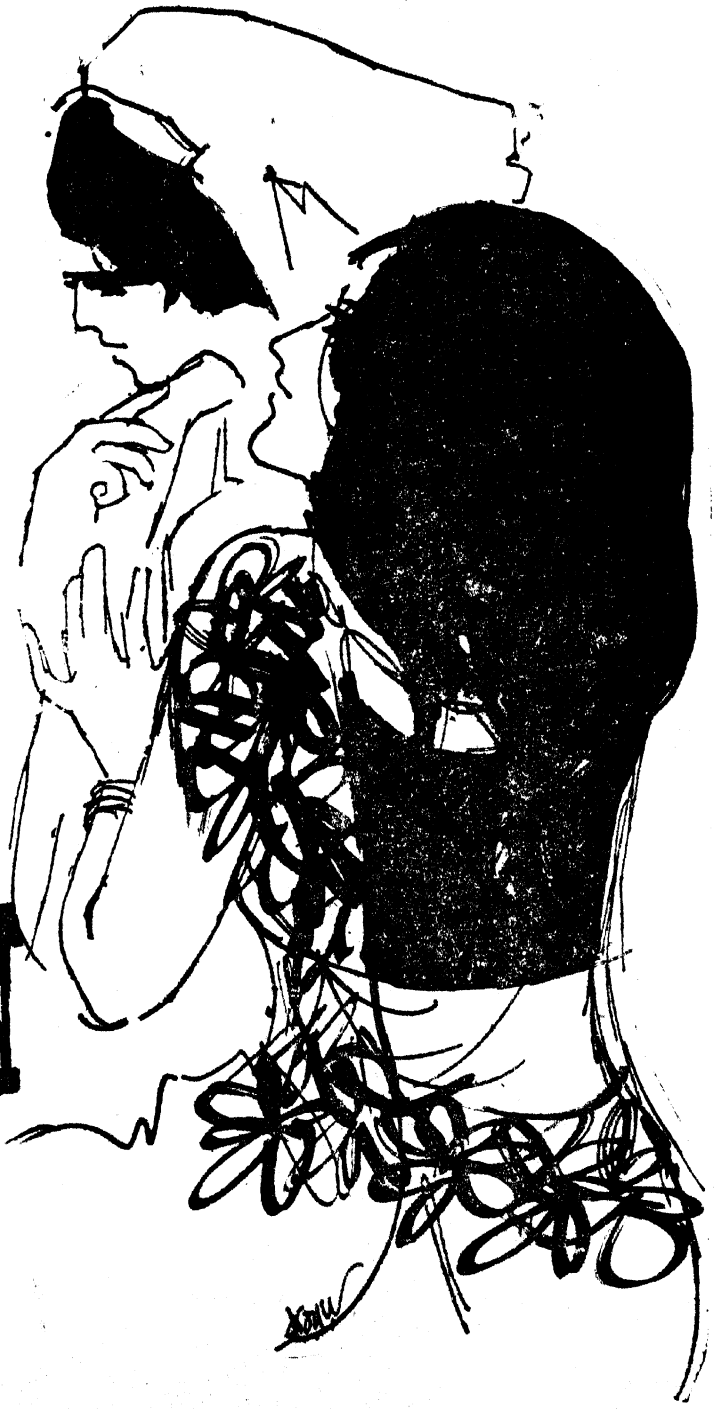
কেন? তুমি যে নার্স, ধৈর্যের প্রতীক। কে বলে তুমি হেরে গেছ?'

জীবনের এই তো শুরু। অনাগত-ভবিষ্যতে আরও অনেক কঠিন কাজের সম্মুখীন হতে হবে। এ আবার এমন কি? রুবি মল্লিকের মতন এমন কত নারী অকালে শুকিয়ে গেছে। ঠিক কথাই বলেছ অনিমেষ। 'রুবি, তুমি আজ অতীত! তুমি ফুরিয়ে গেছ রুবি! তুমি ফুরিয়ে গেছ! শুধু আমাকে আমার প্রাপ্য সুখ থেকে বঞ্চিত করছ কেন? আমাকে তুমি মুক্তি দাও রুবি! আমাকে তুমি মুক্তি দাও!'

শ্যামলী হেরে গেছে। রুবি মল্লিকের মত হাসতে হাসতে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে অরুণের সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারেনি। চোরের মত রাতের অন্ধকারে অরুণ বোসের নাগালের বাইরে পালিয়ে এসেছিল শ্যামলী। সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা।

দীর্ঘ পাঁচ বছর আগেকার পুরানো ইতিহাস বিস্মৃতির অতল থেকে বার বার শ্যামলীর স্মৃতির দরজায় ধাক্কা দিয়ে চলেছে। মনে পড়ে শ্যামলীর জগদীশ সরকারের কথা। পৈতৃক ভিটেটা পর্যন্ত মহাজনের হাতে বন্ধক দিয়ে জগদীশ সরকার মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছিলেন। বিমাতার চোখের জল তাঁকে সংকল্পচ্যুত করতে পারেনি। কিন্তু সহ্য করতে পারেনি শ্যামলী। বিমাতার কটু কথা শুনে, কাঁদতে কাঁদতে জগদীশ সরকারের মুখের ওপরেই বলেছিল, 'আমি বিয়ে করবো না, বাবা।'

'বোকা মেয়ে! বিয়ে করবি না কেন?' জগদীশ সরকারের চোখে বিস্ময়।'

'বার বার এই কালো মুখে স্নো, পাউডার ঘষে একদল কৌতূহলী অচেনা নারী ও পুরুষের সামনে আমাকে অপদস্থ না করলেই কি নয়, বাবা? জানো তো সবই। মুখের উপর না বললেও, কেউ কেউ ভদ্রতা করে একটা চিঠি লিখবে, 'অমুক মহাশয়! পাত্রী আমাদের পছন্দ হয়নি, নমস্কার!' আবার কোন কোন দল, বিশেষ করে মহিলারা, যেন এঁটো পাতা ফেলে উঠতে পারলেই বাঁচেন। মনে মনে ভাবেন, 'এ যে সিঙি মাছের বাচ্চা! ওঠ্, ওঠ্, ঢের মেয়ে দেখা হয়েছে।'—এতো দুঃখেও জগদীশ সরকারের মুখের হাসিটুকু অম্লান আছে দেখে বিস্মিত হয়েছিল শ্যামলী। —'একি বাবা, তুমি হাসছো?'

'পাগলী মেয়ে! হাসবো না কেন? তোর বিয়ের যে সব ঠিক হয়ে গেছে মা।' জগদীশ সরকারের চোখে রহস্যময় হাসি।

'সেকি! আমাকে না দেখেই বিয়েতে মত দিল কে বাবা?'

'আছে রে মা আছে। সংসারে এখনো ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। ছেলে তো নিজে দেখলই না, এমনকি রায়বাহাদুর পর্যন্ত ফোটো দেখেই বললেন, বাঃ বাঃ, বেশ চেহারা! কি মিষ্টি মুখ! কি সুন্দর ডাগর ডাগর দুটি চোখ। মেয়ে আমার দেখা হয়ে গেছে, সরকারমশাই।—বললাম, ছবি দেখেই পছন্দ করে, পরে যেন আমাকে দোষ দেবেন না রায়বাহাদুর। আপনি না দেখলে, ছেলেকে একবার পাঠিয়ে দেবেন।—হো-হো করে হাসতে হাসতে রায়বাহাদুর বললেন, কিছুই করতে হবে না, সরকারমশাই, কিছুই করতে হবে না। তবে টাকাটা আমার আগাম চাই।'

'টাকাটা!'—শ্যামলী চেয়েছিল জগদীশ সরকারের মুখের দিকে।

'হ্যাঁ মা, টাকা। পণ বলে তো কিছু দিতেই হবে।'

'কিন্তু কত টাকা, বাবা?'

'তোর অত খবরে কাজ নেই মা। তুই সুখী হলেই আমি সুখী হব। ওপারে গিয়ে সুরবালাকে অন্ততঃ বলতে পারবো, সুরো, তোমার মেয়েকে রায়বাহাদুরের ছেলের হাতে দিয়েছি। সে রাজরানী হয়েছে। সুখী হয়েছে সে।'

গোধূলির রক্তরাঙা স্তিমিত আলোর রেখা, জগদীশ সরকারের মুখের উপর ক্ষণিকের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জগদীশ সরকারের সারা মুখ একটা অনির্বচনীয় শান্তিতে জ্বলজ্বল করছিল।

সেই মুহূর্তে বিস্মিত শ্যামলীর মনে হয়েছিল, সে হয়তো স্বপ্ন দেখছে। এমন ছেলেও আছে নাকি সংসারে? অচেনা সেই পুরুষটিকে মনে মনে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল শ্যামলী।

কিন্তু বিয়ের পর দুটো মাস যেতে না যেতেই শ্যামলী বুঝতে পারলো, অরুণ যেন কেমন শ্যামলীকে এড়িয়ে চলে। কোথায় যেন একটা বিরাট বাধা। তবে কি ও কালো বলে অরুণের এই অবহেলা! তাই হবে। আর তা না হলে শ্যামলীর কৌমার্য এখনো অক্ষুণ্ণ কেন? লোকটা কেন এতো দূরে সরে আছে?

মনে পড়ে শ্যামলীর কত বিনিদ্র রাতের কথা। পাশাপাশি শুয়ে থাকতো একটি পুরুষ ও মেয়ে। স্বামী আর স্ত্রী! কিন্তু রক্তমাংসে গড়া সুঠাম দীর্ঘদেহী পুরুষটা যেন একটা নিশ্চল পুতুল! একটা জড়-পদার্থ। অথচ প্রতি রাতেই শ্যামলী ভাবতো, আজই ওর নারী-জীবন একটা পুরুষের স্পর্শে ধন্য হবে।

হাসি পায় শ্যামলীর। সেই স্পর্শ-সুখের চিন্তা মনে এলেই ওর এখনো হাসি আসে। মনে পড়ে যায়, শেষ বিদায়ের অস্পষ্ট লজ্জাটুকুর কথা।

সেদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই বৃষ্টি আরম্ভ হল। তারই সঙ্গে ঝড়ো হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ। সন্ধ্যার অবসানে রাত্রি ঘনিয়ে এলো। যথারীতি পাশাপাশি একই বিছানায় শুয়ে পড়ল দুজনে। একটু পরেই শ্যামলী অনুভব করল, অরুণ গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। দিব্যি নাক ডাকছে। এদিকে বৃষ্টির বিরাম নেই। নিদ্রাহীন অপলক-দৃষ্টিতে জানালার রন্ধ্রপথ দিয়ে বিদ্যুতের মুহুর্মুহু শিহরণ অনুভব করছিল শ্যামলী। ঘুম যেন সেদিন ওর চোখ থেকে অনেক দূরে পালিয়ে গেছে। হঠাৎ নিকটে বাজ পড়ার একটা তীব্র কড়-কড় শব্দ ভয় পেয়ে পাশের ঘুমন্ত মানুষটাকে সবলে জড়িয়ে ধরেছিল শ্যামলী।

দীর্ঘ ছ'মাস পরে অরুণের স্পর্শ যে এত মাদকতায়, এত সুখের, সেই মুহূর্তেই তা উপলব্ধি করেছিল শ্যামলী।

মন চাইলো, লোকটা ওকে সবলে জড়িয়ে ধরুক। চুরমার করে দিক ওর কুমারী মন।

কিন্তু বিস্মিত শ্যামলী দেখল, অরুণ তন্দ্রাজড়িত চোখে ওর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে।

একটু হেসে স্বামীর ভয়-বিহ্বল অধরে এঁকে দিয়েছিল প্রথম সোহাগ-চিহ্ন।

মানুষটা কিন্তু এক ঝটকায় শ্যামলীর হাত ছাড়িয়ে দূরে সরে গেল। চোখেমুখে স্পষ্ট আতঙ্কের চিহ্ন! থরথর করে কাঁপছিল অরুণ।

দুষ্টু বেহায়ার মত, বিছানা থেকে নেমে মানুষটাকে আবার ওর বাহুর বন্ধনে বন্দী করতে চেয়েছিল শ্যামলী।

তখনি সেই ঘটনাটা ঘটলো—চিৎকার করে অরুণ বললো 'না-না, এ হতে পারে না। দিদি তুমি, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না শ্যামলী দেবী। আমি, আমি...।'

'কী আপনি? বলুন? জবাব দিন?' উত্তেজনায় শ্যামলী চিৎকার করে উঠেছিল।

'আমি, আমি পুরুষ, কিন্তু না ও, সে পারব না বলা হ। পারব না—।'

'কি বলছেন? বলছেন কী আপনি?' আবার চিৎকার করে উঠেছিল শ্যামলী। হয়তো বা অরুণের ইঙ্গিত তার বিশ্বাস হয়নি।

'আমি ঠিক কথাই বলেছি শ্যামলী দেবী। আমি একটা জড়পদার্থ।' নিজেকে সামলে নিল অরুণ, 'তবে আপনাকে আমি স্নেহ করি। নাই বা হোল আমাদের তেমন সম্পর্ক। আত্মার সঙ্গে আত্মার, মনের সঙ্গে মনের মিলনটা কি কম কথা!'

শ্যামলীর মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল, সে চিৎকার করে উঠল, 'না, না, না, এ হতে পারে না। আপনি ডাকাত। আপনি একটা নারীর জীবন নিয়ে পুতুল খেলতে চেয়েছেন। কিন্তু আপনি ভুলে যাবেন না, রক্তমাংসে তিলে তিলে গড়া আমার এই দেহ, আমি কোনো কিছু থেকেই বঞ্চিত হতে রাজি নই। আর কেনই বা হব? আমি তো আপনার মত জড়পদার্থ নই। নিছক মন-জানাজানির খেলা করে, আমি বন্দী হয়ে থাকতে রাজী নই, আমাকে আপনি

মুক্তি দিন। প্লিজ, আমাকে মুক্তি দিন।'—বলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

মুক্তি দিয়েছিল বৈকি। সেই ঝড়-জলের রাত্রিতেই শ্যামলী বোসকে শ্যামলী সরকারে রূপান্তরিত করেছিল অরুণ বোস। ফিরে আসার আগে বার বার ক্ষমা চেয়ে, রায়বাহাদুরের ছেলে বলেছিল, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ-বাড়ীর দরজা শ্যামলী সরকারের জন্য খোলা থাকবে। বেহায়া লোকটা বলেছিল, এই ঝড়-বাদলের মধ্যে কোথায় যাবেন? সকালে আমি নিজে আপনাকে পেঁৗছে দিয়ে আসবো।

অরুণের অনুরোধ রাখেনি শ্যামলী। ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে সেই রাত্রিতেই ফিরে গিয়েছিল সুদূরে বেহালার বৈকুণ্ঠ সেন লেনে। তবে জগদীশ সরকারের সঙ্গে দেখা হয় নি। সদ্যবিধবা সৎ-মা করুণাময়ী ওর মুখের উপরেই দরজার আগল বন্ধ করে দিয়েছিল।

আবার পথ।' তারপর আজকের এই সিস্টার শ্যামলী সরকার। মনেই ছিল না শ্যামলীর, ওর একদিন বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু আজ একি কথা শুনলো। ও যা মেনে নিতে পারেনি, রুবি হাসিমুখেই সে-কাজ করলো।

'সিস্টার শ্যামলীদি, এক ফোঁটা বিষ!'

মনের মধ্যে ঘুরে সেই একই কথার প্রতিধ্বনি।

ডিউটি শেষে ফিরে আসার মুহূর্তেই চার নম্বর বেডের পেসেন্টের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনে থমকে করিডোরেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল শ্যামলী।

বেচারা রুবি। সারা এবডোমেন ভর্তি ক্যানসার। ধপধপে ফর্সা রঙটা ওই তিন মাসেই বীভৎস হয়ে উঠেছে। আজ কদিন হলো, মৃত্যুপথযাত্রিনী রুবি মল্লিক কারো সঙ্গে কথা বলে না। চোখের দৃষ্টিও বোবা। মনে হয় সারাক্ষণ কী যেন চিন্তা করে ও। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে রুবি মল্লিকের কাছে গিয়ে শ্যামলী জিজ্ঞাসা করলো, 'আমাকে ডাকছিলে ভাই?'

উদাসদৃষ্টিতে শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে রুবি বলল, 'আপনি এসেছেন শ্যামলীদি? আমি ভেবেছিলাম আপনি চলে গেছেন।'

'হ্যাঁ ভাই ফিরেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু তোমার গলা শুনে ফিরে এলাম। কিছু বলবে ভাই?'

—'শ্যামলীদি—!'

'কী ভাই?'

'আমার একটা উপকার করবেন শ্যামলীদি?'

'কী আবার উপকার করতে হবে?' শ্যামলীর চোখে বিস্ময়!'

'একটু আমাকে বিষ এনে দিতে পারেন শ্যামলীদি? একটু বিষ!'

চমকে উঠেছিল শ্যামলী—বিস্ময়ে রুবিকে বলেছিল, —'কী সব আজেবাজে কথা বলছো ভাই? বিষ নিয়ে কী করবে?'

'খাবো।' রুবি মল্লিকের গলা যেন কেমন অদ্ভুত শোনালো।

'বিষ খাবে?'

'হ্যাঁ শ্যামলীদি, বিষ খাবো। প্লিজ সিস্টার এক কণা সায়নাইড। বাস, আর কিছুই চাইনে। শোনেননি, কাল সকাল আটটার মধ্যেই যে আমাকে বেড খালি করে দিতে হবে? আমার যে ছুটি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যত-দিন না মরি, কোথায় আমি যাই বলতে পারেন সিস্টার? বলতে পারেন?'

'পাগলি মেয়ে, কোথায় আবার যাবে? বাড়ি ফিরে যাবে।'

'কিন্তু সে বাড়ীতে তো আমার জায়গা হবে না শ্যামলীদি—!'

'সে কী!'

'হ্যাঁ শ্যামলীদি, আমি ঠিক কথাই বলছি। সে বাড়িতে আমার জায়গা হবে না। অনিমেষ যে আবার বিয়ে করেছে।'

কথাটা বিশ্বাস হয়নি শ্যামলীর, এও কী সম্ভব? রুবি মল্লিক তো এখনো বেঁচে আছে। না-না এতো বড় অন্যায় কখনো অনিমেষবাবু করতে পারেন না।

এবারে হাসি-হাসি মুখে রুবি বলল, আমি নিজেই ওদের বিয়েতে মত দিয়েছি। দুরারোগ্য অসুখ। আমার 'কনসেন্ট' লেটারটা এখনো আছে।'

'ভুল করেছো ভাই। মস্ত বড় ভুল করেছো।'

'না না আমি ভুল করিনি সিস্টার। আমি মোটেই ভুল করিনি। শুনবেন সিস্টার শুনবেন আমার কাহিনী? শুনুন বলি—

'বছরখানেক আগেকার কথা। তখন আমার রোগের বেশ বাড়াবাড়ি। বাড়ীতেই চিকিৎসা চলছিল। অনিমেষ একদিন অফিস থেকে এসেই বলল—একটা কথা বলবো রুবি—।

'বললাম, কী?'

'অনিমেষ বলল, আমাকে তুমি মুক্তি দাও রুবি। আজ দীর্ঘ দু বছর তুমি শয্যাশায়ী। এই ব্যাধিতে মানুষ বাঁচে না। আজ হোক কাল হোক, তাকে ইহজগতের মায়া ছাড়তেই হবে। শুধু শুধু আমি কেন, আমার সাধ-আহ্লাদ জীবন নষ্ট করব? তোমার জীবন আমার জীবন এই তো সবে শুরু। একটিবার আমার দিকটা ভেবে দ্যাখ?

'অতি দুঃখেও চোখের জল মুছে বললাম, কী করতে হবে আমাকে?'

বোকার মতন হেসে অনিমেষ বলল, এমন কিছুই নয়।

কথা?' অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে।

'আমার আর সুলতার, এই বিয়ের দরখাস্তের উপর তোমার একটা কনসেন্ট দরকার। বুঝেছো রুবি?

'হেসে বললাম, আমি মরার আগে বিয়ে করলে 'সুলতা'কে নিয়ে উঠবে কোথায়?

'অনিমেষ হেসে বলল, সে ব্যবস্থা আমি ঠিক করে রেখেছি। তোমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেবো। সব ঠিক হয়ে যাবে।

'অনিমেষের কথা শুনে হেসে বললাম, তাহলে সব ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে গেছে কী বলো?

'ও আবার বোকার মতন হাসবার চেষ্টা করে বলল, এক রকম ঠিক। এখন তুমি এই কাগজে সই দিলেই সব দিক বজায় থাকে।'

'এবারে একটু গম্ভীর কণ্ঠে বললাম, কিন্তু অনিমেষ—। আমাকে শেষ করতে না দিয়ে, অনিমেষ বলল, এতে কিন্তুর কী আছে রুবি? আজ যদি তোমার মত একজন উদ্ভিন্নযৌবনা স্ত্রীকে রেখে আমিই দিনের পর দিন শয্যাশায়ী থাকতাম তাহলে কী হত ভাব তো? যদি সেই সময়ে তোমার ফেলে-আসা জীবনের পুরুষবন্ধু বলতো,—রুবি ইয়ু আর এ সেন্টিমেন্টাল ফুল। কী আছে ওই অনিমেষ মল্লিকের মধ্যে। ওর বেঁচে থাকা আর মরা একই কথা। এটা কী সাবিত্রী-সত্যবানের যুগ, না বেহুলা-লক্ষিন্দরের যুগ? সে সব যুগ সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজ কিংবদন্তী মাত্র! সামনের দিকে তাকাও। স্বপ্ন দ্যাখ একটা অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভবনাময় উজ্জ্বল পথের। ভুলে যাও ওই পঙ্গু লোকটার কথা। মনে রেখ, তুমি অনন্ত-যৌবনা উর্বশী নও। তুমি সামান্যা মানবী। তুমি রুবি মল্লিক। তোমার এই সুঠাম দেহ অচিরেই কালের নির্মম পেষণে শুকিয়ে যাবে। কেউ তোমার দিকে তখন ফিরেও তাকাবে না। তোমার চোখের লেলিহান শিখা স্তিমিত হয়ে, ঝরে পড়বে অবিশ্রান্ত শ্রাবণের ধারা। তাহলে? তাহলে কেমন হতো রুবি? বল, জবাব দাও?

'জানেন শ্যামলীদি, ওর কথায় ক্ষণেকের জন্য আমি বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। তবে একটু সামলে নিয়েই অনিমেষকে বললাম, তুমি যে আমাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলে অনিমেষ। বলতে, রুবি, রুবি তুমি আমার চোখের আলো—?

'জানেন শ্যামলীদি—আমাকে শেষ করতে না দিয়ে চিৎকার করে ও বলল, 'নিভে গেছে। সে আলো নিভে গেছে রুবি। অনিমেষের সামনে শুধু জমাট অন্ধকার। তাইতো আমি দিশেহারা হয়ে নতুন আলোর সন্ধানে ঘুরছি! আমি বাঁচতে চাই রুবি। আমি সুলতাকে নিয়ে আবার প্রথম থেকে জীবন শুরু করবো।

'খানিকক্ষণ বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, যদি কনসেন্ট না দি তাহলে?

'তাহলে? অনিমেষের চোখ দুটো যারেকের জন্য হিংস্র শ্বাপদের মতন জ্বলে উঠেছিল।

'ও'র সুরে-সুর মিলিয়ে বললাম, হ্যাঁ, তাহলে কী করবে অনিমেষ।

'আমার এই বলিষ্ঠ হাত দুটো দিয়ে তোমার কন্ঠনালী টিপে ধরবো। এক লহমার সব শেষ হয়ে যাবে। এইভাবে বেঁচে থাকার থেকে ফাঁসির দড়ি অনেক বেশি 'রোমান্টিক।'

'তারপর? তারপর কী হলো ভাই?' শ্যামলী বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল রবি মল্লিকের দিকে।

তারপর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না সিস্টার। বুঝতে পারলাম, অনিমেষ আজ অনেক দূরের মানুষ। তবু বেঁচে থাকার আশায় সেদিন অনিমেষের প্রস্তাবে রাজি হলাম না। এদিকে অনিমেষ আমার চিকিৎসা প্রায় বন্ধ করে দিল। আমার চোখের সামনেই সুলতাকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে লাগলো। নাই বা হলো ওদের বিয়ে।

মাঝে মাঝে মনে হতো, ছুটে বাইরে গিয়ে চিৎকার করে বলি, কেন? কেন এই অবিচার। ওমনি বিবেক গলা টিপে ধরতো।

এমনিভাবেই আরও কিছুদিন কেটে গেল। ক্রমে ক্রমে ওপারের ডাক শুনতে পেলাম। তাই শেষপর্যন্ত হাসপাতালে আসতেই রাজি হলাম। প্রথম প্রথম অনিমেষ রোজ একবার আসতো, তবে ফিরে যাবার আগে সেই একই কথা শুনতে হতো—।

'আমার দিকটা একটু ভেবে দেখলে না রবি? আমি কী নিয়ে থাকি বলতো? তখন কত বলেছি, রবি এবারে আমাদের সংসারে একটা বাচ্চা-কাচ্চা প্রয়োজন, অনেকদিন তো হলো।

'তুমি ধমকে উঠতে। বলতে, না বাপু এই সাত তাড়াতাড়ি আমি মা হতে চাই না। আমাদের জীবন কি শেষ হয়ে গেল? এই তো শুরু। তুমি অন্তত পাঁচটা বছর আমাকে এ সব কথা বলো না কেমন? লক্ষ্মীটি—।

'একি ভাই তুমি কাঁদছো? শ্যামলীর চোখেও ইতিমধ্যে শ্রাবণের ধারা নেমেছিল।

চোখের জল মুছে রবি বলল, 'জানেন শ্যামলীদি, সেদিন অনিমেষ আসতেই বললাম, দরখাস্তটা এনেছো অনিমেষ?

'ও চমকে উঠে বলল, হঠাৎ?'

'বললাম, তোমার কথাই ঠিক অনিমেষ। আমি আর বাঁচবো না। দাও সই করেদি। তোমরা সুখী হও।'

'তারপর?—শ্যামলীও হয়তো কারও কথা ভাবছিল, তবু প্রশ্ন করেছিল, তারপর! কী হলো ভাই?'

'অনিমেষ আসা বন্ধ করে দিল। বুঝতে পারলাম, ও সুলতাকে নিয়ে আবার নতুন করে খেলাঘর তৈরি করেছে। কিন্তু—।'

'কিন্তু কী ভাই!'

'আমি কোথায় যাই বলতে পারেন সিস্টার? ডাঃ সেন যে আজ আমাকে ছুটি দিয়ে দিলেন, বললেন, বাড়ি ফিরে যেতে। কাল সকাল আটটায়—অ্যালবার্ট ওয়ার্ডের চার নম্বর বেডে অন্য পেসেন্ট আসবে। যে কটা দিন বাঁচি, বাড়িতেই চিকিৎসা চলবে। এখানে আর করার কিছুই বাকি নেই।' কিন্তু বাড়ি তো আমার নেই শ্যামলীদি। অনিমেষ যে আবার বিয়ে করেছে। সে কেন এই পেতিয়াটার বোঝা বইবে—আমিই বা কোন মুখে ওদের সংসারে ফিরে যাবো। এত বড় পৃথিবীতে আমার কোথাও ঠাঁই নেই শ্যামলীদি অথচ কাল সকাল আটটায় এই বেড খালি করে দিতে হবে।'

একটু থেমে শ্যামলী আবার বলল, কিন্তু আমি কোথায় যাই বলতে পারেন সিস্টার? তাই তো অনুরোধ করছি। রবি মল্লিকের এই শেষ অনুরোধটুকু আপনাকে রাখতেই হবে প্লিজ সিস্টার মাত্র এক কণা সায়নাইড।'

শ্যামলী বোবা। কিন্তু আয়নায় প্রতিফলিত ও'র প্রতিবিম্বের চোখে জল! ঝরছে তো ঝরছেই।

বাইরে হিমেল হাওয়া বইছে তো বইছেই। আলবার্ট ওয়ার্ডে দেওয়ালঘড়ির কাঁটাটা আপন মনে টিক-টিক করে ঘুরছে তো ঘুরছেই।

ও ভাবছিল, মানুষ কি কেবল বিষ খেয়েই মরে? বেঁচে থেকে মরে না? আয়নায় ঐ যার ছায়া পড়েছে সে কি বেঁচে আছে? শ্যামলী সরকারও প্রতিদিন নিজের ভেতরে বয়ে বেড়াচ্ছে শ্যামলী বসুর মৃতদেহ!
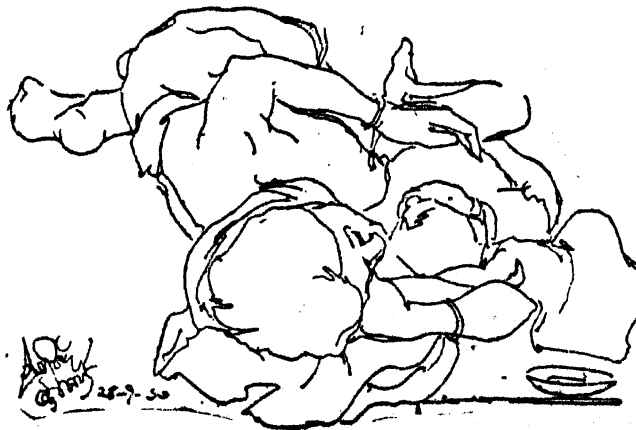
রমেশ দত্তের

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

৩৯

চিত্রকল্পনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র

রূপায়ণে-চিত্রসেন
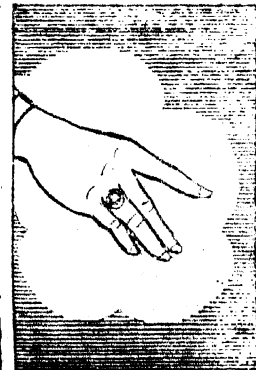
আপনার ব্যবসা-বুদ্ধি কেমন?

আপনি যদি ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চান, নিজেই নিজের অফিসের কর্তা হয়ে বসতে চান এবং সফল হতে চান, তাহলে একান্ত দরকার আপনার বেশ ভালো ব্যবসা-বুদ্ধি।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজার বা ছোট-কর্তা হয়ে যিনি কাজ করছেন, তাঁরও সাফল্যের মূলে এই ব্যবসা-বুদ্ধি খুব দরকার।

তাছাড়া, ব্যবসা-বুদ্ধি বলতে যে বিশেষ দক্ষতা বোঝায়, তা আমাদের প্রত্যেকেরই দৈনন্দিন জীবনেও অত্যন্ত মূল্যবান—ব্যবসাদার হই বা না হই।

তাহলে নীচের মনোপ্রশ্ন চর্চাটি কাজে লাগান। প্রত্যেকটি প্রশ্নে সত্যি সত্যি "হ্যাঁ" কিংবা "না" জবাব দিয়ে চলুন। তারপর সবশেষে সঠিক জবাবের হিসাব দেখে মিলিয়ে নেবেন।

১। কোনো জায়গায় যাওয়ার কথা থাকলে আপনি কি প্রায়ই দেরী করেন?

২। কঠিন কোনো সমস্যার সমাধানে আপনি কি সাধারণতঃ অনেক সময় নেন?

৩। আপনি কি প্রায়ই কাজকর্ম অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছেড়ে দেন?

৪। দেহমন হাল্‌কা করে বিশ্রাম নিতে কিংবা কাজের চিন্তা থেকে মনকে সরিয়ে আনতে আপনি কি কষ্টবোধ করেন?

৫। আপনি কি ধীরে ধীরে বিল পেমেন্ট করতে চান?

৬। লোকের নাম এবং মুখ মনে রাখার ব্যাপারে আপনি কি ভারী অপটু?

৭। জরুরী অবস্থায় আপনার আতঙ্কিত হয়ে পড়ার স্বভাব আছে কি?

৮। আপনি কি মাঝে মাঝে এমন জিনিস কেনেন, যা আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না?

৯। লোকজনের কাছ থেকে সমালোচনা এবং নিন্দা শুনলে আপনি কি ক্ষুব্ধ হন?

১০। লোকজনের প্রশংসা করতে গিয়ে আপনি কি ইতস্তত করেন?

১১। কোনো দরকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনি কি সমস্ত খবরা-খবর ভালভাবে জানবার চেষ্টা করেন?

১২। কাজকর্মে সহকর্মীদের সঙ্গে আপনি কি বনিবনা রেখে চলতে পারেন?

১৩। যা নিয়ে আপনার ব্যবসা, তা নিয়ে কি আপনি মাঝে মাঝে বইপত্র পড়েন?

১৪। ভালভাবে পড়ার পর কি আপনি দলিলপত্রে সই করেন?

১৫। আপনি কি কোনো উইল করেছেন?

১৬। আপনি কি মাঝে মাঝে নতুন নতুন 'আইডিয়া' নিয়ে 'এক্সপেরিমেন্ট' করেন এবং কাজকর্মের নতুন কোনো পদ্ধতি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেন?

১৭। যখনই সম্ভব হয় আপনি কি লোকের মনে আঘাত দেওয়ার সম্ভাবনা এড়িয়ে চলেন?

১৮। আপনার যা রোজগার, তার মধ্যে আপনি কি স্বচ্ছন্দভাবে থাকেন?

১৯। যে ব্যাপারে আপনার নিজের আগ্রহ আছে, অন্য লোককে আপনি কি সেই ব্যাপারে উৎসাহী করতে পারেন?

২০। যখন কাজ করেন, তখন কি বেশির ভাগ সময়েই আপনি প্রফুল্ল থাকেন?

প্রথম দশটি প্রশ্নে "না" জবাব দিলে পাঁচ পয়েন্ট করে পাবেন, এবং ১১নং থেকে ২০নং প্রশ্নগুলিতে 'হ্যাঁ' জবাব দিলে পাঁচ পয়েন্ট করে পাবেন।

মোট ৭৫ পয়েন্ট পেলে ভালো; ৬০ পয়েন্ট পেলে মন্দ নয়।

৫০ পয়েন্টের কম পেলে বুঝতে হবে, আপনার জীবনধারার বেশ কিছু পরিবর্তন দরকার, তবেই আপনি ঠিকমত নিজের টাকা খাটিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ভালোভাবে চালাতে পারবেন।

যেমন ধরুন, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে আপনি যদি অপটু হন, তাহলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কৌশলগুলি আপনাকে শিখতেই হবে। যে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সে-সম্পর্কে সব রকম সম্ভাব্য তথ্য কেমন করে জোগাড় করতে হয়, তা নিয়ে চর্চা করতে হবে। দরকার হলে খুব নির্ভরযোগ্য লোকের কাছে পরামর্শ নিতে হবে। আকাশ-কুসুম কল্পনার মধ্যে সমস্যা সমাধানের অভ্যাস একেবারে ছেড়ে দিতে হবে। সমস্যাটির পক্ষে এবং বিপক্ষে যতগুলি পয়েন্ট মনে আসে, সেগুলি ভেবে নিন, এবং তারপরে নিজের মনেই খুব তাড়াতাড়ি দুটি পক্ষের মধ্যে তর্ক-মীমাংসা করে নিয়ে সিদ্ধান্ত করে ফেলতে চর্চা করুন। এ সবই অভ্যাসের ব্যাপার।

আর একটি দরকারী বিষয়, খুঁটিনাটি জিনিসের কথা ঠিক মনে রাখা। লোকের নাম, পরিচয় তো বটেই, কাজকর্মেরও কথা সঠিকভাবে মনে রাখার চর্চা করতে পারলে তবেই ব্যবসাক্ষেত্রে সফল হতে পারা যায়; অবশ্য মনে রাখার অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারলে ব্যবসায়ী না হলেও জীবনে অনেক কাজে লাগে, সে-কথা না বললেও চলে।

খুঁটিনাটি ব্যাপার যথাযথভাবে মনে রাখার চর্চা করতে হলে বিষয়টিকে কয়েকবার মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে নিয়ে 'মনে রাখতেই হবে' এমন একটা প্রতিজ্ঞা করলে দেখা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যায়। অবশ্য, মনে রাখবার প্রবল ইচ্ছাটাই আসল কথা। কেবলমাত্র বার কয়েক মনে মনে আওড়ালেই কোনো বিষয় মনে রাখা সম্ভব হয় না। স্মরণশক্তি বাড়িয়ে তোলার আরও অনেক রকম মনো-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে, সেগুলিরও চর্চা করতে হয়। এ জন্যে দরকার হলে অভিজ্ঞ মনোবিদের পরামর্শ নিতে দোষ নেই।

অসম্পূর্ণ অবস্থায় কোনো কাজ ছেড়ে দেবেন না; অবশ্য অবসাদ-ক্লান্তি মাথায় নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়াও ঠিক নয়। দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ এক নিমেষে মন থেকে হটিয়ে দিয়ে সহজ স্বচ্ছন্দভাবে দেহমন হালকা করে বিশ্রাম নিয়ে অবসাদ জয় করবার চর্চাও করতে হবে।

তবেই সজীব তৎপরতা এবং প্রফুল্ল ব্যক্তিত্ব আপনার ব্যবসা-বুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলবে।

সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা

এবার বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় এক-দল সুন্দরীর বিক্ষোভ রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। তাদের প্রতিবাদ ছিল, পণ্য হিসাবে সৌন্দর্য বেচাকেনা করা চলবে না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, বিশ্বসুন্দরী রীতা ফারিয়ার কথা। বিশ্বসুন্দরীর নির্দিষ্ট বৎসরকাল মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে তিনি সখেদে বলেছিলেন, এই সম্মান খুবই দুর্ভাগ্যের।

বিশ্বসুন্দরী বা নানা সৌন্দর্য প্রতি-যোগিতায় যারা যোগদান করে, তারা সকলেই এটুকু জানে। তবু সুন্দরীরা ভিড় জমায়। একটা অদ্ভুত মোহ তাদের তাড়া করে ফেরে। জনৈক সুন্দরী এসম্পর্কে বলেছেন, কোনমতে একবার নাম করে নিতে পারলে পৃথিবীতে চলার পথ অনেক সোজা হয়ে যায়। আর এজন্যই এখানে আমার আসা। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আসর থেকেই জিন, লোলোব্রিগিডা ফিল্মে জমজমাট। এ দৃষ্টান্ত তো আমাদের চোখের সামনে।

নিতান্তই মধ্যবিত্ত ঘরের ২১ বছরের এই মেয়েটির মাথায় এই চিন্তা সহসা আসেনি। শান্ত-নির্বিরোধ জীবনেই সে অভ্যস্ত ছিল। অর্থনীতির পড়ুয়া। নিজের হাত-খরচ চালানোর জন্য একটা ডিপার্ট-মেন্টাল স্টোরে কাজ করতো। নিজের কাজে ক্রেতাদের খুশি করতে পারলে সেও খুশি হতো। ক্রেতারাও তার প্রশংসায় সব সময়ই পঞ্চমুখ। এর পেছনে যে তার সৌন্দর্য কিছু পরিমাণে সক্রিয় তা সে জানতো। কিন্তু সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় যোগদানের ব্যাপারটা তখনো তার মাথায় আসেনি। বন্ধু-বান্ধবরা প্রায়ই তাকে উৎসাহিত করতো সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতায় নেমে পড়তে। তবু প্রথম দিকে সে এ-প্রসঙ্গ আমল দিতো না। কিন্তু আস্তে আস্তে নেশা ধরলো। অজস্র লোকের প্রশংসা এবং একটা খেতাব তাকে ঘিরে দাঁড়ালো।

সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় সে নাম লেখালো। দশ হাজার প্রতিযোগীর সে একজন। এই প্রতিযোগিতার প্রধান সর্ত ছিল বয়স, যা কিনা ১৮ থেকে ২৮-এর মধ্যে হওয়া চাই। সর্ত আরো কিছু ছিল। অবি-বাহিত, আর চারিত্রিক কৌলীন্য। প্রতি-যোগিতার প্রাথমিক পর্বে ফটো পাঠানোর নিয়ম। অনেকে অনেক রকম ফটো পাঠায়। কেউ কেউ পেশাদার ফটোগ্রাফারের তোলা নয়নাভিরাম ফটো পাঠায়, আবার কেউ বা পাঠায় স্ন্যাপসটস। খুব কম হলেও কেউ কেউ নগ্ন ফটোও পাঠায়। কিন্তু প্রতি-যোগিতার সর্ত অনুযায়ী এরা নাকচ হয়ে যায়।

এবার শুরু হয় প্রাথমিক বিচার। ফটো-গ্রাফ দেখেই এ কাজটা সেরে নেওয়া হয়। দশ হাজার প্রতিযোগীকে সামাল দেওয়ার এ-ছাড়া অন্য কোন বিকল্পও নেই। ফটো বাছার কাজে নিযুক্ত হন দশজন বিশেষজ্ঞ বিচারক। কাট-ছাট করে তাঁরা মোট ষাট-জনকে মনোনীত করেন। এদের নিয়ে শুরু হয় আসল সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা।

একজনের ভাগ্যেই জয়মুকুট। তাই বিচারপর্ব আরো অনেক দূরে গড়ায়। এখানে নিযুক্ত হন ১৮ জনের বিচারকমণ্ডলী। তাঁরা বিচার-বিবেচনা করে পঞ্চাশজনকে বাদ দেন। বাকি থাকে দশজন। এদের নিয়ে আবার প্রতিযোগিতার আসর বসে। উদ্যোক্তারা চান, পক্ষপাতহীন উপযুক্ত বিচার হোক। বিজয়ী নির্ধারণ যেন পূর্বাহ্নেই না হয়ে যায়। কিন্তু ওদের দশজনকে দেখে বলার উপায় ছিল না, কার ভাগ্যে বিজয়মাল্য দুলবে। সকলে সৌন্দর্যে প্রায় একইরকম। কেউ কারো দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল না। সবাই বেশ সহজ, স্বাভাবিক। এই সুযোগে চূড়ান্ত নির্বাচনের আগে ওদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে। হলে তখন বাজনা বাজছে, স্টেজে লোকনৃত্য।

দর্শকরা নানা মন্তব্য করতে শুরু করেছেন। যাঁরা ইতিপূর্বে সৌন্দর্য প্রতি-যোগিতার আসরে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের এবার একটু নিরাশ মনে হলো। কেউ কেউ বলেই বসলেন, ইতিপূর্বে সৌন্দর্য প্রতি-যোগিতায় এরকম বাজে দেখতে মেয়ে কেউ আসেনি। এমনকি যে বাসে ওরা হল পর্যন্ত আসে, সেই বাসের ড্রাইভার মন্তব্য করল, আমার মতে ওদের সৌন্দর্য খুবই নীচু মানের। এরই মধ্যে সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নের উত্তরে উদ্যোক্তাদের একজন জানালেন প্রতিযোগীরা সকলেই সম-মানের। এদেরই মধ্য থেকে একজনকে বের করে নিতে হবে যাকে দিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ সম্ভব। এমন একজন এই প্রতি-যোগিতায় বিজয়ী হবে যে আমাদের প্রাত্যহিক পরিচয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অফিস, কলেজ বা বিপণন কেন্দ্রে যার হাসি-হাসি মুখটি আমাদের নজর কাড়ে। আর দশজনের সঙ্গে তার ব্যতিক্রম শুধু সৌন্দর্যে। সে সুন্দরী হবে অথচ তাকে দেখে চোখে ধাঁধা লাগবে না। কথাবার্তায় সবদিক থেকেই আমাদের সহজ-সীমার মধ্যে হবে। যে ঠাকুমা তার নাতনীর জন্য তার স্বাক্ষর-সংগ্রহে যাবেন, তিনি যেন সব সেরা সুন্দরীর রূপে আতঙ্কিত না হন। এতে মনে হতে পারে, উদ্যোক্তারা সুন্দরীদের দিক থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে দিচ্ছেন। অন্য দিক দিয়ে বিচার করলে আবার দেখা যাবে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মেয়েদের আরো বেশি মাত্রায় রূপ-সচেতন করা, পুরুষকে আকর্ষণ করা নয়।

সে যা হোক, প্রতিযোগীরা এবার দুটি রাউণ্ডে মঞ্চে আসবে। তাদের পরণে থাকবে সান্ধ্য-পোশাক। তারপর বেদিং কস্ট্যুম পরে আরেকবার মঞ্চে এসে দাঁড়াবে। ইতিমধ্যে পাঁচজন বাদ পড়ে গেছে। বাকী পাঁচজনকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। নিতান্তই নির্দোষ প্রশ্ন। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে আগেই ঘোষণা করা হয়, এটা কোন পরীক্ষা নয়, যাতে প্রতিযোগীরা সহজ, স্বচ্ছন্দভাবে উত্তর দিতে পারে। আবার এমন কোন প্রশ্ন করা হয় না, যাতে দর্শকদের উচ্ছ্বসিত কৌতুকে প্রতিযোগী ঘাবড়ে যাবে।

কেউ কেউ মনে করেন সৌন্দর্য প্রতি-যোগিতায় দেহ-মাপ বুঝি খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে এবং প্রায় অধিকাংশ প্রতিযোগিতায় দেহের মাপ নেওয়া হয়, তাহলেও সামগ্রিক আবেদনটি চূড়ান্ত রায় নির্ধারিত করে। তিনটি স্টেজে ভাগ করে এটিই পরীক্ষা করে নেওয়া হয়। এরই একটি হচ্ছে, মূল প্রতিযোগিতার আগে এক সপ্তাহ কড়া তত্ত্বাবধানে থাকা। এসময় তাদের হাঁটা-চলা অভ্যাস করতে হয়। বাইরের কারো সঙ্গে মেলামেশা বারণ। এসময় সাধারণতঃ প্রতিযোগীর সঙ্গে তার মা-বাপকে থাকতে অনুরোধ করা হয়।

বছরের পর বছর এমনি প্রতিযোগিতা হচ্ছে। প্রতি বছরই বিজয়ীকে ছোট-বড় অজস্র পুরস্কার দানের ব্যবস্থা থাকে। হাসতে হাসতে অথচ উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে পুরস্কার নেয় বিজয়ী। সবসেরা সুন্দরী। মুহুর্মুহু ক্যামেরা ঝলসে ওঠে। তার পুরস্কারের শেষ কিন্তু এখানেই নয়। বরং বলা যায়, এ হোল শুরু। এরপর সে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াবে। সেরা হোটেলে থাকবে আর মজাদার লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে। বিশ্ব-সুন্দরী প্রতি-যোগিতায় দেশের সম্মান নির্ভর করবে তার উপর। অসংখ্য ফটোগ্রাফে সে সই দেবে। এই এক বছরে সে অতুলনীয়। আর সময়-সীমা শেষ হলে সে হাসিমুখে বিদায় নেবে, পরবর্তী সুন্দরী-শ্রেষ্ঠাকে আমি স্বাগত জানাই

এবার আমরা ফিরে যাবো আবার তার কথায় যার জবানীতে এই আলোচনার সূত্রপাত।

মেয়েটি অনেক ভেবে-চিন্তেই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলো। কঠিন মাটির উপর দাঁড়িয়েই সে সুন্দর ভবিষ্যতের

স্বপ্ন দেখছিলো। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে অত্যন্ত আশাবাদী। তার অগ্রবর্তীরা যে স্বপ্নে একদা বিভোর ছিল এখন সে একই স্বপ্নে মশগুল। বিজয়ীর মুকুট যখন একবার মাথায় উঠেছে, তখন আর তাকে পায় কে? তার সামনে এখন তিনটি ভবিষ্যৎ-জীবনের হাতছানি। ম্যানিকিন, ফটোগ্রাফিক মডেল অথবা অভিনেত্রী। টাকা-পয়সা আর বিলাস-বহুল জীবন যাপন সে এখন ভুগছে।

তার চিন্তাধারায় কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে আবার ইদানীং। প্রতিযোগিতায় যোগদানের আগে সে সংগীত শিক্ষা করতো। কিছুদিন তা ব্যাহত ছিল। এবার সে সঙ্গীত-চর্চা শুরু করতে ইচ্ছুক। সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতেই সে বেশি আগ্রহ।

খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের মানও বেড়ে যায়। বিজয়ীর মুকুট মাথায় ওঠবার দিন থেকেই এই ঘটনা ঘটে। প্রায় রাতা-রাতি। একটি বছর এমনিভাবে কাটে। বছর শেষে সেই উঁচুতলা থেকে পুরনো জীবনে ফিরে আসা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই ইতি-মধ্যেই অনেকে জীবনের গতি নির্ণয় করে ফেলে। কেউ কেউ ফিল্মে ঝোঁকে আবার কেউ বা বিরাট ধনীকে বিয়ে করে সুখী দাম্পত্য-জীবন যাপন করে। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী সবাই একথা জানে আর জেনেও প্রতি বৎসর অধিক সংখ্যায় প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

দেশে দেশে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। তাদের উদ্দেশ্য পণ্যের প্রচার। এতে ব্যবসার কতটা সুবিধা হয় ঠিক জানা যায় না। তবু প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থব্যয়ে এরা প্রতি-যোগিতার আসর বসায়। পাছে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান তাদের দুর্বলতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, তাই দেশে দেশে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা ক্রম-বর্ধমান। বিক্ষোভও ধ্বনিত হচ্ছে। তবে তা হালে ফল। ভবিষ্যতে এটা কি রূপ নেবে তা জানা যাবে আগামী দিনগুলিতে।

লন্ডনে পুজো

বিলেতে এলামই তো মাস পাঁচ-ছয় হল 'লিংকনস ইন'-এর ছাত্রী হয়ে। বিলেতে পুজো দেখা এই প্রথম। খোদ লন্ডনেই গোটা তিনেক দুর্গাপুজো হল এবার। মহালয়ার সন্ধ্যেবেলা আমরা রামকৃষ্ণ মিশনে গেছিলাম—এটা আমাদের বাড়ি থেকে মিনিট দশেক। এখানে পুরুষের সব সময় প্রবেশ-অধিকার নেই। গিয়ে এত ভাল লাগল—ভাষায় তা ঠিক বোঝাতে পারব না। উপলব্ধির ব্যাপার। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরাট ছবির সামনে দুটি বাঙালী মেয়ে এবং একজন বিদেশিনী ধ্যান-নিমগ্না। আশ্রম-অধ্যক্ষ খুব অসুস্থ কিন্তু ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাবেন না। তাই আশ্রমের দুর্গাপুজোর প্রতিমাদর্শনের জন্যে মাত্র একদিন সাধারণ মানুষজনের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল।

লন্ডনে সার্বজনীন পুজো হয় দুটো; বার্মিংহামেও তাই। হিন্দু সেন্টারে পুজোর আয়োজন করেছিল বেঙ্গল ইন্সটিটিউট। আর একটা হল হ্যামস্টেড টাউন হল-এ। হ্যামস্টেডের পুজো দেখে সত্যি ভালো লাগল। ঠাকুরমশায় অ্যাকাউন্টেন্সী পড়েন—খুব ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে পুজো করলেন। অষ্টমী-নবমী দুদিনই অঞ্জলি দিলাম। প্রসাদও পেয়েছি। এই দুদিন আমরা দুবেলা পুজোবাড়িতে গেছি ছুটির দিন ছিল বলে। অষ্টমীর দিন কি ভীড়—ঠিক যেন কলকাতা। রাস্তায় ছেলেমেয়েদের জটলা, দরজার গোড়া থেকেই থইথই করছে লোক—একেবারে কলকাতার ছবি। বার বার মনে পড়ছিল আর কলকাতার জন্যে মন কেমন করছিল। দোতলার ওপর মস্ত হলঘরে পুজো হচ্ছিল। ভীড়, ঠেলাঠেলি, আনন্দউল্লসিত জনতার খুশীভরা সুখী সুখী মুখ—বিলেতে মিনিয়েচার কলকাতা! দেখে খুব ভাল লাগছিল। এই ভিন দেশে এত বাঙালী আছেন ভাবতেই পারা যায় না। এই ভীড় দেখে পালিয়ে হিন্দু সেন্টারের পুজোতে গেলাম—হিন্দু সেন্টারে ডিম-পেঁয়াজের গন্ধে একটু চমকে উঠলাম—পুজোবাড়িতে ডিম-পেঁয়াজ কেন? একদম ভাল লাগছিল না। জানা গেল স্ন্যাকস বিক্রি করা হচ্ছে অর্থ-সংগ্রহের জন্যে। নবমীর দিন মামণি জ্যাঠা-মণিরা ওখানে গেল। আমি আর স্বপন হ্যামস্টেডের পুজোবাড়িতে। অনেকের সঙ্গে আলাপ হল। পুজোর ক'টা দিন কলকাতার জন্যে মন কেমন করলেও আনন্দ কিছু কম করিনি।

আবার বেঙ্গলী ইনস্টিটিউট বিলেতের আর একটা পুজোর ব্যবস্থা করে পথিকৃতের সম্মান লাভ করল। বিলেতে আর একটা পুজো শুরু হল এবছর। কালীপুজো। উদ্যোক্তা বেঙ্গলী ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তারা। পাঁজিতে দেখলাম রবিবার (৯ই নভেম্বর) পুজো। অথচ এখানে হল শনিবার। খুঁত ধরবেন না প্লিজ! আত্মীয় নিয়ম নাস্তির মতো বিদেশেও নিয়ম নাস্তি আর কি। গঙ্গাজলের বদলে টেমস-এর জল দিয়ে যদি পুজো হতে পারে তাতেও মা আমাদের দোষ নেবেন না। যাক, মায়ের বারেই (শনি-মঙ্গলবার তো 'মায়ের বার') মানে শনিবার পুজো হল। পুরোহিতমশাই তন্ত্রধারক নন—নাম শ্রীদিলীপ চট্টোপাধ্যায় ধুতি পরে খালি গায়ে পুজো করলেন। সত্যি! ভক্তিমান বটে। সেদিন এখানে দারুণ ঠান্ডা পড়েছিল। ওয়াই-এম-সি-এর সেন্ট জর্জেস হল-এ। স্টেজের ওপর পুজো। গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন রাত আটটা। পুজো তখনও চলছে। রাত এগারোটার মধ্যে হল ছেড়ে দিতে হবে। আঃ আপনারা বড় খুঁত ধরেন। প্রতিমা এসে পৌঁছয় নি—তাতে কি হয়েছে! অর্ডার তো যথাসময়ে দেওয়া হয়েছিল—তবে? শোনা গেল অর্ডার মত প্রতিমা পাঠানোও হয়েছে তবে এখনও এসে পৌঁছয়নি—দেরি একটু হবেই পথটা তো কম নয় সাত হাজার মাইল—সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার। প্রতিমা এসে পৌঁছয়নি তাতে উদ্যোক্তারা ঘাবড়ে যাননি। আকাশবাণী কলকাতার সেই অতিপরিচিত ঘোষণাকে ('নির্ধারিত শিল্পীর পরিবর্তে...') অনুসরণ করে তাঁরা কালীমায়ের খুব চমৎকার একটি ছবিকে মৃন্ময়ী মূর্তির বদলে স্থাপন করলেন। তার চারিদিকের চালচিত্রের মতো করা হয়েছিল—তার ওপর চমৎকার আলপনা আঁকা। জনসমাবেশ তখনও ঘন হয়ে ওঠেনি। ধূপের স্নিগ্ধ গন্ধে বেশ পুজোবাড়ি-পুজোবাড়ি পরিবেশ। তার ওপর ধুতিপরা নগ্নগাত্র মায়ের সাধক পুজারী শ্রীচট্টোপাধ্যায় সেই পুজো পরিবেশ আরো বাস্তব করে তুলেছিলেন। তবে পুজারীকে সাহায্য করছিলেন যে ভদ্রলোক তাঁকে বরকর্তার মতোই মনে হচ্ছিল ধুতি পাঞ্জাবি (গরম বা সিল্কের হতে পারে) আর শাল আলোয়ানে।

মা-কে আমি একটু বেশিই ভয় করি তাই ভরপেট আর অঞ্জলি দিতে সাহস করলাম না। তবে মন দিয়ে শোনবার চেষ্টা করলাম কি মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে। সত্যি বলতে কি কালী পুজো হতে দেখেছি মাত্র একবারই। তাই ভুলে বসে আছি কি মন্ত্র পাঠ হয় পুষ্পাঞ্জলির সময়। আর সার্বজনীন দুর্গা-পুজোর পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র জানি না। আমি অকপটে স্বীকার করছি—আমি ফুল নিতাম, নিজের মনে যা আসে তাই বলতাম—তারপর সবার সঙ্গে ফুল ফেলতাম মায়ের পায়ে।

ইতিমধ্যেই ভীড় বাড়তে শুরু করেছে। মাইকে অনুরোধ ভেসে এলো: 'ডান দিকে লাইনে দাঁড়িয়ে প্রসাদ নিন।' জ্যাঠামণি বললেন: 'যাও, প্রসাদ নিয়ে এসো।' মামণি বলে উঠলেন: 'যাবে কেন—দাঁড়াও না, ঠিক যাবেখন।' স্বপন সেই সঙ্গে যোগ করল: 'ভীড় আগে একটু কমুক তারপর যাব।' জ্যাঠামণির উৎসাহ বেশি—চুপ করে থাকতে পারেন না—বলে উঠলেন: 'বলবে দুজনের জন্যে।' এখানে এই ভিন দেশে প্রসাদ 'কণিকা মাত্র' নয়। কৌটো ভর্তি—সরি। রুমাল ভর্তি। এখানে—এই পুজোবাড়িতেও লাইন! লন্ডনের সর্বত্রই এই। যেখানেই যাও লাইন লাগাও। লাইনের পরিধিটা একটু কমতে গিয়ে দাঁড়ালাম। যাঁরা প্রসাদ বিতরণ করছেন তাঁদের মধ্যে আমার একজন পরিচিতা ছিলেন। প্রসাদের বড় অংশটা হল চারটে নাড়ু, চারটে সন্দেশ আর আপেল। তারওপর হোমের ফোঁটা। বিশেষ মহলে চেনাজানা থাকলে যা হয় লন্ডনেও তার ব্যতিক্রম হল না। পরি-চিতা বান্ধবী আমাকে ফাউ হিসেবে আরো দুটো করে বেশি দিলেন—ক্রিকেটের ভাষ্যকার শ্রীঅজয় বসুর ভাষায়: 'একেবারে ছক্কা একবার ব্যাটে-বলে হয়েই, একেবারেই ছয়!' নাড়ু আর সন্দেশে এক ডজন দাঁড়িয়েছে তখন কি করে বলি 'আমরা দুজন।' প্রসাদের বহর দেখে আর বললাম না, আমরা দুজন। আপেল একেবারেই নিইনি—বাড়ির গাছের আপেল পচে যাচ্ছে যখন! আমার মার ভাষায়, আবার এনে জড়ো করা!

মাইকে আবার ঘোষিকার কণ্ঠস্বর: 'প্লিজ, আপনারা প্রসাদ নিয়ে যান—আমাদের প্রচুর প্রসাদ পড়ে আছে।' 'প্রসাদ পড়ে আছে' কথাটা আমার কানে কেমন বেসুরো বাজল। কেমন যেন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব জড়ানো

এই কথাগুলোয়। মনে পড়ল বাবার কথা—'পড়ে আছে কি! বলতে পার না—রয়েছে!!' আমিও এই ধরনের কথা বলতাম বলে বাবার সস্নেহ বকুনি খেয়েছি কিন্তু এখানে ঘোষিকাকে ধমক দেবে কে!

পুজোবাড়িতে নতুন করে দেখা হল অনেকের সঙ্গে, আবার পরিচয় হল। এর মধ্যে একজন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের অধ্যাপক। আমায় বললেন : 'এমন সময় এদেশে এলেন! এদের অবস্থা খুব খারাপ।' কণ্ঠে খেদের সুর। আমি জিজ্ঞেস করি : 'খারাপ? রাজনৈতিক না অর্থনৈতিক?' জবাব হলো : 'দুটোই। আমরা আগে যার জন্যে ব্রিটিশদের শ্রদ্ধা করতাম—প্রশংসা করতাম—কি সহিষ্ণুতা, কি শৃঙ্খলাবোধ, কি নিয়মানুবর্তিতা! এখন ওদের সব চলে যাচ্ছে। নৈতিক মান বড় নিচের দিকে। যে দেশ এককালে কার্ল মার্কসকে লাইব্রেরীতে বসে লিখতে দেখেও কিছু বলেনি আজ তারা পান থেকে চুন খসলেই লাফালাফি করছে!'

পুজো শেষ হবার পর সংগীতানুষ্ঠান শুরু হয় মিঃ ভর্তার গান দিয়ে। তৃপ্তি দাসের গাওয়া শ্যামাসংগীত সত্যিই মনে রাখবার মতো। জলসা চলছে এই সময়েই আমরা চলে আসি।

সেদিন আবার কনওয়ে হলে আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য ও সংসদের উদ্যোগে 'বাংলা মেলা' ছিল—কিন্তু সে খবর আজ নয়—অন্য একদিন। —শিবানী বসু

গতবারে "অখিল ভারতীয় কার্যক্রমের" নাটক নিয়ে লেখা হয়েছে। "অখিল ভারতীয় কার্যক্রম"—নামটা শুনেই মনে হয়, এই অনুষ্ঠানে সারা ভারতের বাছা বাছা সব নাটক শোনানো হয়। হয়তো হয়। হয়তো ভারতের সমস্ত বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত নাটকগুলির মধ্যে থেকে বাছাই করে এই সর্বভারতীয় অনুষ্ঠানে প্রচার করা হয়। কিন্তু সে সব নাটক বাছাই করা হলেও তার অধিকাংশই যে সেরা নাটক নয়, বাংলা নাটকের শ্রোতারা তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারেন।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাষায় রচিত ভালো ভালো নাটকের সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের অন্যান্য ভাষাভাষীর পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই তো অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে এই নাটক প্রচার! কিন্তু অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে প্রচারিত নাটকগুলির মধ্যে ক'টির সর্বভারতীয় অনুষ্ঠানে প্রচারিত হবার যোগ্যতা থাকে? ক'টি সর্ব-ভারতীয় মঞ্চে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলতে পারে—'আমি অমুক ভাষায় রচিত নাটকের প্রতিনিধি।'"

এ কথা অনস্বীকার্য যে, অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে নাটক প্রচারের পরিকল্পনা একটি প্রশংসনীয় পরিকল্পনা, এবং এর পিছনে একটি সৎ উদ্দেশ্য আছে: বাংলা দেশের বেতার কেন্দ্র থেকে কেবল বাংলা নাটকই প্রচারিত হবে, মহারাষ্ট্রের বেতার কেন্দ্র থেকে কেবল মরাঠী এটা কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা হতে পারে না। বাঙালী শ্রোতাদেরও জানতে ইচ্ছে করে, তামিল ভাষায় কেমন নাটক লেখা হয়; মরাঠী শ্রোতাদেরও কৌতূহল হয়, অসমীয়া ভাষায় রচিত নাটকের স্বরূপ কী? কিন্তু তামিল ভাষা না জানা থাকার দরুণ তামিলনাড়ুর বেতার কেন্দ্র ধরে সে জানার উপায় থাকে না; অসমীয়া ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় আসামের বেতার কেন্দ্রের নাটক শুনে সে কৌতূহলও মেটে না। তাই অনুবাদের দরকার হয়, [illegible] অনুষ্ঠানটি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রচার করার জন্য চাই একটা সর্বভারতীয় পরিকল্পনা। আর, এখানেই অখিল ভারতীয় কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা।

অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান ভাষায় রচিত নাটক প্রচারিত হয়। প্রথমে মূল ভাষা থেকে হিন্দীতে অনুবাদ করা হয়, তারপর হিন্দী থেকে অন্য সব আঞ্চলিক ভাষায়। এটাকে রেডিওর ভাষায় মাস্টার-স্ক্রিপ্ট প্যাটার্নে অনুষ্ঠান প্রস্তুত করা বলে। ঐ হিন্দী স্ক্রিপ্টটা হ'ল মাস্টার-স্ক্রিপ্ট, কারণ মূল ভাষা থেকে হিন্দীতে অনুবাদ করার পর ঐ হিন্দী স্ক্রিপ্টই সমস্ত বেতার কেন্দ্রে পাঠানো হয় এবং সেখানে নিজস্ব ভাষায় অনুবাদ করে নেওয়া হয়। এই পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করার জন্য আকাশবাণীর একজন ভূতপূর্ব ডিরেক্টর জেনারেল শ্রী জে সি মাথুর "দি আর্ট অভ্ ট্রানস্লেশন" শীর্ষক একটি আলোচনা-চক্রে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে: তাতে জানবার অনেক তথ্য আছে।

শ্রীমাথুর যা বলেছিলেন তা শুনতে সহজ, কিন্তু করা কঠিন। এই যে একের পর এক অনুবাদকর্ম, এ বড়ো সহজ জিনিস নয়। সৃজনী সাহিত্যের অনুবাদে অনেক দুস্তর বাধা আছে। সমস্যাও। কোনো অনুবাদকর্মের গোড়াতেই দুটি প্রশ্ন ওঠে: এ কি অনুবাদযোগ্য? অনুবাদের জন্য যোগ্য লোক কি হাতের কাছে আছে?

সবকিছুই আর অনুবাদযোগ্য হয় না। জোর করে অনুবাদ করতে গেলে রস তো ব্যাহত হয়ই, মূলের জিনিসটাও অনেক সময় বিকৃত হয়ে যায়। আর, দুটি ভাষায় সমান দক্ষতা আছে, এমন লোকও খুব সুলভ নয়। তাই মূল ভাষায় দক্ষ লোকের চেয়ে যে ভাষায় অনুবাদ করা হবে সেই ভাষা ভালো জানেন এমন লোককেই অনুবাদকর্মের জন্য নির্বাচন করা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে উলটোটাই হয়—যে ভাষায় মূল স্ক্রিপ্ট সেই ভাষা ভালো জানেন এমন লোকেরই সন্ধান করা হয়, যে ভাষায় অনুবাদ করা হবে সেই ভাষার উপর তাঁর দখল কতখানি সে খোঁজ বড়ো নেওয়া হয় না। আর তাই সেই ফল হয় মন্দ।

সাহিত্যকর্মের ভালো অনুবাদের জন্য প্রয়োজন গভীর আন্তরিকতা। অনুবাদকের অন্তরে প্রগাঢ় বাসনা থাকবে অনুবাদটাকে তিনি তাঁর নিজের রচনার পোশাক পরাবেন। অনুবাদকে অনুবাদ বলে মনে হলে চলবে না—তাকে আসলের রূপ ধরাতে হবে, তার গা থেকে অনুবাদের গন্ধ তাড়াতে হবে।

একটা ভাষার চিন্তা ও অর্থকে অন্য ভাষায় প্রকাশ করা কিংবা একটা ভাষার চিন্তাকে অন্য ভাষায় পরিবর্তিত করা—এ বড়ো সহজ নয়। কোনো দুটি শব্দের কি সম্পূর্ণ এক অর্থ হয়? আর তাই সমস্যাটা কেবল শব্দের অনুবাদ নয়, এক ভাষার চিন্তাকে অন্য ভাষায় প্রকাশের জন্য ঠিক উপযুক্ত শব্দের সন্ধান।

আর এই কারণেই অনুবাদকর্মের জন্য উভয় ভাষায় দক্ষতা আছে, এমন লোকের দরকার—অন্তত যে ভাষায় অনুবাদ করা হবে সেই ভাষায়। কিন্তু দক্ষ আর যোগ্য লোকেরা খুব বেশি আকাশবাণীর দক্ষিণার প্রতি আকৃষ্ট হন না, এবং মূল রচনা যদি চিত্তাকর্ষী না হয় তাহলেও তাঁরা অনুবাদে আগ্রহ বোধ করেন না। তাই বেশির ভাগ সাধারণ লোকদের দিয়েই আকাশবাণীকে অখিল ভারতীয় কার্যক্রমের নাটকগুলি অনুবাদ করতে হয়।

আবার মূল নাটক জ'লো হওয়ায় আর সুষ্ঠু অনুবাদ না হওয়ায় নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও অখিল ভারতীয় কার্যক্রমের নাটকে অভিনয় করতে চান না। ফলে অখিল ভারতের সলিল সমাধি ঘটে, যে উদ্দেশ্যে অখিল ভারতীয় কার্যক্রমের প্রচার তা ব্যর্থ হয়।

কিন্তু আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ যদি এই উদ্দেশ্যপূর্ণ অনুষ্ঠানটির প্রতি একটু আন্তরিক হন, একটু সচেষ্ট,—এবং একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন তাহলে অবস্থার অনেক উন্নতি হতে পারে।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

ইলিনিওস উচ্চারণ কি ইলিনিওস? ৫ই ডিসেম্বর বেলা ১২টা ৫০ মিনিটের খবরে তা-ই তো শোনা গেল—"ইলিনিওস বিশ্ববিদ্যালয়।" অ্যামেরিকার এই জায়গাটার নামের উচ্চারণ অ্যামেরিকানদের মুখেই শুনেছি ইলিনয়।

৬ই ডিসেম্বর রাত ৮টায় বিচিত্রায় "সীমান্তরক্ষী বাহিনী সম্পর্কে একটি অনুষ্ঠান" প্রচারিত হ'ল। অনুষ্ঠানটিতে সীমান্ত রক্ষার সমস্যা; সীমান্তরক্ষা করতে গিয়ে রক্ষীদের কী কী ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়; সীমান্তে দুর্নীতি, চোরাকারবার ও ডাকাতি কীভাবে চলে প্রভৃতি বিষয়ে জানা গেল। বেশ জ্ঞাতব্য অনুষ্ঠান ছিল এটি—প্রয়োজনীয়ও। অনুষ্ঠানটি সম্পাদিতও হয়েছে ভালো।

৭ই ডিসেম্বর বেলা ১টার নাটক "পরাজয়", শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

কাহিনী অবলম্বনে শ্রীক্ষিতি মুখোপাধ্যায় রচিত।

একজন বঞ্চিত নারী ও একজন বঞ্চিত পুরুষের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই নাটকে।

নীলিমা আর সমর পরস্পরকে ভালো-বাসে, বিয়ে করতে চায়। কিন্তু সেই বিয়েতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন সমরের মা। সমর মা'র বাধা অগ্রাহ্য করে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত। নীলিমাকে রেজিস্ট্রেশনের দিন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকতে বলল। কিন্তু তার আগেই সমরের মা নীলিমার কাছে এসে তাঁর ছেলেকে ভিক্ষা চাইলেন। বললেন, আমরা নারীরা যাকে ভালোবাসি তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই, তার মঙ্গল কামনা করি।

নীলিমার বুক ফেটে যাচ্ছে; কিন্তু সমরের মা'র প্রার্থনা ফেরাতে পারছে না। শেষে বলল, ঠিক আছে, তা-ই হবে।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে সমর এসে দেখল নীলিমা আসে নি। অনেকক্ষণ পরে নীলিমা এসে জানাল, এ বিয়ে হবে না। সমর তাকে বিয়ে করলে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে, নিঃসম্বল কোনো পুরুষকে বিয়ে করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ঝাঁপ দিতে সে রাজী নয়।

কথাগুলো বলতে তার যে কী কষ্ট হ'ল! তবু বলল, বলতে হ'ল। কারণ, সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তারপর...তারপর সমর চলে গেল বিলেতে, নীলিমার বিয়ে হয়ে গেল অন্যত্র।

অনেককাল পরে বিলেত থেকে ফিরে সমর তার বাল্যবন্ধু শিশিরের বাড়ি এসে দেখে নীলিমা তার স্ত্রী। নীলিমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়টা সুখের হ'ল না। সমর নীলিমার কাছে আঘাত পেয়ে এখন ঘোর নারীবিদ্বেষী, নীলিমাকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে নি। কিন্তু পরে ঘটনা-ক্রমে যখন জানল, কী নিদারুণ যন্ত্রণায় তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল নীলিমা তখন আর হৃদয় মথিত হতে লাগল, নীলিমার প্রতি বেদনার্ত ভালোবাসা উথলে উঠল।

নাটকটির মধ্য দিয়ে সারাক্ষণ একটা শিরশিরে ব্যথা বয়ে গেছে, মনটাকে আবিষ্ট করেছে। নাট্যরূপ পরিচ্ছন্ন, সংলাপ সুন্দর। সমরের মা কেন বিয়েতে অমত করেছিলেন, স্পষ্ট হয় নি। সেখানে একটা মস্ত জিজ্ঞাসা রয়ে গেছে। আর, শেষটায় যেন রেশ কেটে গেছে। সমর বিদায় নিয়ে চলে গেল, ঐখানেই শেষ করলে বোধহয় রসের দিক দিয়ে ঠিক হ'ত।

অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় নীলিমার ভূমিকায় শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রের। নীলিমার অব্যক্ত যন্ত্রণা তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন। সমরের ভূমিকায় শ্রীশম্ভু মিত্রও ভালো অভিনয় করেছেন। শিশিরের চরিত্রটিও শ্রীরবীন মজুমদারের অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সমরের মা'র ভূমিকায় শ্রীমতী সীতা মুখোপাধ্যায় দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি।

৭ই ডিসেম্বর রাত ৮টার সবিনয় নিবেদনের আসরে জানা গেল, একজন শ্রোতা আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের কাছে পত্র লিখে অনুরোধের আসরে হিন্দী গান প্রচারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।... হিন্দীর প্রতি এমন প্রগাঢ় অনুরক্তি আর কোনো অহিন্দীভাষী শ্রোতা দেখিয়েছেন বলে জানা নেই। কলকাতা ক, খ ও গ-য়ে এত হিন্দী থাকতেও পত্র লেখকের হিন্দীর আশা মিটল না! কলকাতা গ-য়ে তো হিন্দী রাণীই রাজত্ব করছেন, ক-য়ে আর খ-য়েও তাঁর নিয়মিত হানা আছে। কলকাতা গ-য়ে হাত দিলেই হৈ হৈ করে হিন্দী গান বেজে ওঠে। ক আর খ-য়েও নিয়মিত হিন্দী গান প্রচারিত হয়। গ-য়ে হিন্দী গানের আলাদা অনুরোধের আসরও আছে। তবু তাঁর হিন্দী গানের সাধ মিটল না! এখন বাংলা গানের অনুরোধের আসরে হিন্দী গান না ঢোকাতে পারলে তাঁর শান্তি হচ্ছে না!

ঐইদিন রাত সাড়ে ৮টায় ছিল সংবাদ বিচিত্রা—হলদিয়া তৈল শোধনাগারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন, রমেশচন্দ্র দত্ত স্মরণ ও রাজেশ্বর দাসগুপ্তের মৃত্যুবার্ষিকী বিষয়ে। হলদিয়া তৈল শোধনাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে ভাষণ দিলেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও একজন রুমেনীয় প্রতিনিধি। তাঁদের ভাষণ থেকে এই শোধনাগারের গোড়াপত্তন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া গেল।

রমেশচন্দ্র দত্তর স্মরণে বললেন জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন ও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। তাঁরা সকলেই রমেশচন্দ্র দত্তর মনীষা ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর দানের কথা উল্লেখ করলেন। রমেশ-চন্দ্র দত্ত বাংলা সাহিত্যে এখন একটা বিস্মৃতপ্রায় নাম, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে সত্যিকারের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার তিনিই যে পুরোধা, বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনেক পাঠকের কাছেই তা অজ্ঞাত। এই অনুষ্ঠানে তাঁদের সেই কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, রমেশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

রাজেশ্বর দাসগুপ্তের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভাষণ দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রীবিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত। তিনি কৃষিজগতে রাজেশ্বরের দানের কথা উল্লেখ করেছেন। রাজেশ্বরও আজ একটা বিস্মৃত-নাম।

সমগ্র সংবাদ বিচিত্রাটি সুষ্ঠুরূপে প্রস্তুত। সুখশ্রাব্য।

৮ই ডিসেম্বর রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে শ্রীমতী পুতুল চক্রবর্তীর রাগপ্রধান গান ছিল। কিন্তু প্রারম্ভিক ঘোষণায় তাঁর নাম শোনা যায় নি। ঘোষণা আরম্ভ হয়েছিল, এই বলে—"গান দুখানি লিখেছেন..., প্রথম গান বিরহিনী রাধা ঘুমায়।" ঘোষক নিশ্চয় এইভাবে ঘোষণা আরম্ভ করেন নি! তাহলে? কন্ট্রোল রুম ঘোষণা কন্ট্রোল করেছিলেন? ঘোষণার গোড়াটা বাদ দিয়েছিলেন?

—শ্রবণক

নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী-চিত্র বলে প্রথম পুরস্কার বিজয়ী ইতালীয় 'দি ডায়মণ্ড'-এর নায়িকা ইনগ্রিড থুলিন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহের কাছ থেকে সোনার ময়ূর গ্রহণ করছেন। (বামে) ভারতীয় কাহিনী-চিত্র 'ভুবন সোম'-এর পরিচালক শ্রীমৃণাল সেন প্রশংসা-পত্র নিচ্ছেন।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব......প্রতিযোগিতার ছবি

ফেস্টিভ্যাল কমিটির তরফ থেকে যে মাইক্রোস্টাইলড্ চিত্র-তালিকা প্রকাশিত করা হয়েছিল, তা থেকে জানা যায় যে, একুশটি দেশের কাহিনী-চিত্র প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই তালিকায় কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। ইউ এ আর (ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক)-এর 'আর্থ' ছবিটি আদৌ এসে পৌঁছায়নি। তার পরিবর্তে এসেছে ইস্রাইল-এর 'জেরুজালেম মন আমুর' বা 'মাই লাভ ইন জেরুজালেম'। উৎসব কমিটি গ্রীস-এর 'প্রিজন ফ্রণ্ট' এবং ইউ এস এস আর-এর 'দি আনফরগেটেবল' ছবিদুটিকে বিভিন্ন কারণে প্রতিযোগিতা করতে দেবেন না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু, বোধ করি, বহু কূটনৈতিক শলাপরামর্শের পরে জুরীর সামনে ছবি দু'খানি প্রদর্শিত হয়েছে শেষ-পর্যন্ত মাত্র ১৬ ও ১৭ তারিখে। 'আনফরগেটেবল'-এ কোনোরকম ইংরাজী সাবটাইটেল নেই (যা না-থাকা নিয়মাবলীর বিরোধী) এবং মূল রুশ-সংলাপের মাধ্যমে এটি দেখানো হয়েছে; আমরা কিন্তু ১৭ তারিখের রাত্রি পর্যন্ত অনুসন্ধান করে জানতে পারিনি, ছবিটিকে প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে কিনা। আর গ্রীসের ছবি 'প্রিজন ফ্রণ্ট'-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, এতে কোনো এক প্রতিযোগী দেশের প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। আসলে ছবিটি হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক স্পাই ড্রামা বা গোয়েন্দা-কাহিনী এবং এতে এমন একটি চরিত্র আছে, যে রুশ-দেশাগত; কিন্তু শেষপর্যন্ত জানা যায়, সে আসলে গ্রীক, ছোটবেলায় সে অপহৃত হয়ে রুশ দেশে গিয়েছিল। উৎসব সমিতির পক্ষ থেকে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার পরে গ্রীক ছবিটিকে শেষপর্যন্ত প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়।

প্রতিযোগী ছবি ও দেশের তালিকা হচ্ছে এই ঃ (১)ব্রুনো (বেলজিয়াম); (২) কোয়েলে দু পাজ্যু (ব্রেজিল); (৩) মিঃ নোবডি (বুলগেরিয়া); (৪) গোলু হাদা-ওয়াথা (সিলোন); (৫) এ ফানি ওল্ড ম্যান (চেকোশ্লোভেকিয়া); (৬) অ্যাট দি হাইট অব দি মুন (ফেডারাল রিপাবলিক অব জার্মানী); (৭) বেলস্ অব ডেথ (হংকং); (৮) জেরুজালেম মন আমুর বা মাই লাভ ইন জেরুজালেম (ইস্রায়েল); (৯) দি

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়
(দিল্লী থেকে)

ড্যামড্ (ইতালী); (১০) টানেল টু দি সান (জাপান); (১১) দি ওল্ড ক্র্যাফট্‌স্‌ম্যান অব জারস্ (রিপাবলিক অব কোরিয়া); (১২) রেড অ্যাণ্ড গোল্ড (পোল্যাণ্ড); (১৩) দি আনফরগেটেব্‌ল (ইউ এস এস আর); (১৪) হিয়েরোনিমাস মারকিন (ইউ কে); (১৫) স্টেয়ারকেস (ইউ এস এ); (১৬) লে ডায়াবেল পারলা কুয়ে (ফ্রান্স); (১৭) ভুবন সোম (ইণ্ডিয়া); (১৮) রেমিনিসেন্স (রিপাবলিক অব ভিয়েতনাম); (১৯) জুর্টেজেঙ্কা (স্পেন); (২০) প্রিজন ফ্রণ্ট (গ্রীস) এবং (২১) টাইম টু লীভ (জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক)।

আমরা এই একুশখানি ছবির মধ্যে দু'খানি দেখবার সময় করে উঠতে পারিনি; এক, ফ্রান্সের 'লে ডায়াবেল পারলা কুয়ে' এবং দুই, গ্রীসের 'প্রিজেন ফ্রণ্ট'। বাকি উনিশখানির মধ্যে ভারতের 'ভুবন সোম' ও জাপানের 'টানেল টু দি সান' ছবি-দু'খানি আমরা কলকাতাতেই দেখেছি এবং ছবিদু'টি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যও যথা-সময়ে পেশ করা হয়েছিল। বাকি সতেরো-খানির মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বহু বিচিত্র ধারা, বিভিন্নমুখী চিন্তার প্রতিফলন, বিভিন্ন দেশের আচার, ব্যবহার, জীবন-যাত্রার প্রণালী। চলচ্চিত্র-শিল্পরীতিও কত বৈচিত্র্যময় হতে পারে, তাও আমরা অনুভব করেছি। সোভিয়েত রাশিয়ার 'আনফর-গেটেব্‌ল'-এ দেখলুম, ঘটনা ও ভাবের তারতম্যের সঙ্গে রঙের ব্যবহারেরও পার্থক্য রয়েছে। যেখানে শান্তি বিরাজ করছে, সেখানে রঙের বৈচিত্র্য আনন্দময় জীবনের প্রতীক হয়েছে; আবার যেখানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে শত্রুর আক্রমণে, সেখানে রঙ গিয়েছে হারিয়ে। যখন শত্রুর অত্যাচার নির্মম হয়ে উঠেছে, তখন রুশ গ্রামবাসীর জীবনে এসেছে কালো আঁধার এবং ছবিও হয়েছে কালি-বর্ণ। কোনো ছবিতে দেখেছি, যেখানে নর-নারীর যৌন-মিলন ঘটতে চলেছে, সেখানে মানুষের মূর্তি হয়েছে অন্তর্হিত, তার পরিবর্তে রঙে রঙে একাকার হয়ে গেছে—সে এক বৈচিত্র্যময় অনুভূতি। আবার কোনো ছবিতে ঐ যৌন-মিলন দেখানো হয়েছে নর-

নারীর মুখ, হাত, পা, আঙুল প্রভৃতিকে খণ্ড খণ্ডভাবে রঙের পরিবর্তনের মাধ্যমে উপস্থাপিত করে। এইখানে বলা দরকার, ভারত, কোরিয়া। চেকোশ্লোভাকিয়া, রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের ছবি ছাড়া প্রায় প্রতিটি দেশের ছবিতেই কারণে-অকারণে নরনারীর নগ্নতা ও যৌন-সম্পর্ক স্থাপনের দৃশ্যের ছড়াছড়ি দেখেছি এবং দেখে ভাবিত হতে বাধ্য হয়েছি।

(১) বেলজিয়ামের 'ব্রুণো'র মধ্যে আছে বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে সন্তানের জীবন কতভাবে বিপন্ন হতে পারে, তারই প্রতি অঙ্গুলিসংকেত। স্বামী-স্ত্রী-র মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের সকল আয়োজন সম্পূর্ণপ্রায়; উভয়ে আলাদা বাস করতে শুরু করে দিয়েছে; ওদের একমাত্র ছেলে থাকে মায়ের কাছে। এরই মধ্যে তাদের বছর দশ-বারো বয়েসের ছেলে এল বাপের সঙ্গে সপ্তাহের শেষ তিনদিন কাটাবার জন্যে। মিষ্টি চেহারা, মিষ্টি স্বভাবের ছেলেটি তার বয়েসের তুলনায় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। সে তার বালক-বুদ্ধি দিয়েই দেখে তার বাপ-মায়ের ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে তার বাপেরই দোষ বেশী, সে-কথা সে বাবাকে খোলাখুলিভাবে বলেও। দুই তীরের মাঝে সে সেতুবন্ধের চেষ্টাও করে; বুঝি সফলও হতে চলে। কিন্তু না, টেলিফোনের মাধ্যমে বাপ-মা কথা কইতে গিয়ে তফাতে সরে যায়; ছেলের মনে নেমে আসে হতাশা।

সুন্দর ছবি, প্রাণস্পর্শী অভিনয়, বিশেষ ক'রে ছেলেটির। অসামান্য সুন্দর রঙীন ফোটোগ্রাফী বিষয়বস্তুর রসরূপ প্রকাশে সহায়ক। (২) আনসেলমো দুয়ার্তে পরিচালিত 'গেলে দ্য পাঞ্জু' (ব্রেজিল) একটি মানবিক মহিমার দ্যোতক 'ওয়েস্টার্ণ' চিত্র। একটি গ্রাম্য যুবক গরু চরিয়ে ঘরে ফিরে এসে তার মার মুখে শুনল, জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি দ্বারা তার সদ্য উদ্ভিন্নযৌবনা ভগ্নী ধর্ষিতা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে গুলি-বন্দুক নিয়ে ঘোড়ায় চেপে সেই দুষ্কৃতকারীর সন্ধানে বেরুল। যাবার আগে বোনের কাছ থেকে জেনে নিল, লোকটির বাম কপালে খাড়া একটি ক্ষতচিহ্ন আছে এবং তার ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুলটি নেই। যুবকের পথ পরিক্রমার শেষ নেই যেন। এক জায়গায় একজন ডানপিটে গ্রাম্য সুন্দরী তার প্রেমে পড়ে তার সঙ্গ নিল। যুবকটি বহু চেষ্টা করল মেয়েটিকে তাড়াতে; কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। একদল লুঠেরার সর্দারের সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় সফলকাম হয়ে তার সুনজরে সে পড়ে গেল; সর্দার তাকে দলভুক্ত করতে চায়। যুবক বলে, যে-কাজে সে বেরিয়েছে, তা' সম্পন্ন করবার পরে সে তার দলে যোগ দেবে। শেষপর্যন্ত শিকারের সন্ধান সে পেল; দুর্বৃত্ত তখন একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে। সেখান থেকে তাকে পুরোহিতসমেত ধরে এনে যুবক তাকে তার ভগ্নীর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে ভগ্নীর মান রক্ষা করল। কিন্তু পরক্ষণেই যখন তার একটি গুরুতর অপরাধের জন্যে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী তাকে আক্রমণ করল, তখন দুষ্কৃতকারী যুবকও তার সহায় হ'ল। পরে সেই লুটেরা দলও এসে প'ড়ে পুলিশকে বিপর্যস্ত করল। এই খণ্ডযুদ্ধে যুবকের ভগ্নীপতি প্রাণ হারাল এবং শান্তি ফিরে আসতে যুবক সেই নাছোড়বান্দা মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে লুটেরা দলে যোগ দিল। শত্রুর গুলিতে মেয়েটি যখন মরণ বরণ করল, তখন এবং মাত্র তখনই যুবকটি হ'ল সত্যি দুর্ধর্ষ লুটেরা।

ব্রেজিলীয় রীতিনীতির একটি জীবন্ত দলিল হচ্ছে ছবিটি এবং নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন, সেই ক্রিস্টোফার স্যান্ডফোর্ড ও লুসিয়া বোসে-র অনবদ্য অভিনয়-দীপ্ত ছবিটি আশ্চর্যভাবে গতিসম্পন্ন ও মনোহারী। (৩) বুলগেরিয়ার "নোবডি" একটি মন্থর গতিসম্পন্ন সাস-পেন্স চিত্র এবং আলোচনার অযোগ্য।

(৪) সিংহলের লেস্টার জেমস্ পেরীজ-কৃত 'গাম্‌প্যারেলিয়া' ভারতের তৃতীয় আন্ত-র্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে সুবর্ণ ময়ূর (গোল্ডেন পিকক) জয় ক'রে শ্রেষ্ঠতম চিত্র বলে স্বীকৃত হয়েছিল। তার এবারের ছবি "গোলু হাদাওয়াথা" সহশিক্ষাদায়ী বিদ্যা-লয়ের দুই তরুণ-তরুণীর প্রেমকে উপজীব্য ক'রে রচিত। নায়িকার মন নায়কের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন প্রেমে আপ্লুত হ'লেও তাকে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ সে অত্যন্ত বাল্যকাল থেকেই বাগদত্তা। নায়িকা তাই চায়, নায়কের সঙ্গে ভ্রাতা-ভগ্নীর পবিত্র-বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে; কিন্তু নায়ক এই প্রস্তাবে সম্মত নয়। সে নায়িকাকে না পেয়ে যখন দেবদাসের মতো জীবন সম্বন্ধে নিস্পৃহ হয়ে উঠল, তখন নায়িকা তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করল সুস্থভাবে জীবন-যাত্রা করবার জন্যে। নায়ক তার কাছে এই ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করল।

এর পরে নায়িকা যখন আপন মনে 'কেন সে নায়ককে তার জীবনসঙ্গী করতে পারল না', এই কথা নিয়ে স্মৃতিচারণ করছে তখনই ছবিটির ঘটেছে অপমৃত্যু। অত বড়, প্রায় ছবির অর্ধেক পরিমাণ স্থান ঘটনার পুনরুক্তি দর্শকদের কাছে মনোহারিত্বের প্রকাশক না হয়ে বিরক্তিকরই হয়ে ওঠে।

[আগামী বারে বাকী প্রতিযোগী চিত্র-গুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও মন্তব্য প্রকাশিত হবে।]

মার্কিনী-ফরাসী ছবি বেঞ্জামিন (ভারত সরকারের প্রচার দপ্তর প্রেরিত)

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব......প্রতিযোগিতার বাইরের ছবি

নির্মল ধর

উৎসবে দেখা ছবির মধ্যে নির্দ্বিধায় বলব টনি রিচার্ডসনের 'ইফ্' সবার সেরা। তারপর আছে জের্জি স্কোলিওমস্কির 'ব্যারিয়ার' (পোল্যাণ্ড), জ্যাক কার্ডিফের 'গার্ল অন দি মটরসাইকেল' (ফ্রান্স), রবিন স্প্রাই-এর 'প্রোলগ' (কানাডা) পিটার হলের 'থ্রি ইনটু টু ওনট গো' (ইউ কে) এবং কার্ল রেইজের 'ইসাডোরা' (ইউ-কে) ও আরও কয়েকটা।

রিচার্ডসন যদিও ছবির সব অংশটাকেই 'যদি'র পর্যায়ে রেখে একটা আবছা পর্দা টানার চেষ্টা করেছেন। সারা পৃথিবী জুড়ে যে ছাত্র আন্দোলন, ছাত্র বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে তার পরিণতি কিসে বা কোথায় তা কারও জানা নেই। তবে পরিচালক এখানে 'যদি'র ফাঁস আটকে সশস্ত্র বিপ্লবকেই দেখিয়েছেন। রক্ষণশীল স্কুল কর্তৃপক্ষের পাশবিক অত্যাচার থেকে তারা মুক্তির আর কোনো পথ খুঁজে পায়নি, নির্মম পশুর মত তারাও বন্দুক হাতে শুধু দাঁড়িয়ে থাকেনি লাফিয়ে পড়েছে হুংকার দিয়ে। প্রধান শিক্ষক নিহত হয়েছে। ছবির গল্প এটুকুই। কিন্তু পরিবেশনার গুণে তা অভাবনীয় সুন্দর ও শিল্পের রূপ নিয়েছে। অন্ধ ক্রোধ, যৌনতা, যুগ যন্ত্রণার শিকার ছাত্র সমাজকে রিচার্ডসন একজন সাধারণ দর্শকের চোখ দিয়ে দেখেছেন। স্নেহ ভালবাসা তার মধ্যে নেই। নিরালম্ব অপলক দৃষ্টি শুধু ছাত্রদের কার্যকলাপ দেখে গেছে, সহানুভূতিও জানায়নি। রিচার্ডসন এখানেই যথার্থ শিল্পীর মত শুধু দেখে গেছেন আর দেখিয়েছেন। যৌনদৃশ্য ছবিতে এসেছে পুরোপুরি প্রয়োজনের খাতিরেই।

এ ব্যাপারে অবশ্য জ্যাক কার্ডিফ 'দি গার্ল অন সি মটরসাইকেল' ছবিতে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নাড়ে সিনু দেখতে দেখতে যখন প্রায় ক্লান্ত, কার্ডিফের এ ছবি তখন নতুনভাবে দেখা দিয়েছে। (দিল্লীর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এ ছবির বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছেন) ত্রিভুজ প্রেমের গল্প। নায়িকার বিয়ের সময় প্রেমিক তাকে একটা 'বাইক' উপহার দেয়। বিয়ের পরও প্রেমিকের সঙ্গে তার সম্পর্ক আগের মতই থাকে। একদিন ভোর রাতে স্বামীকে ছেড়ে সে 'বাইক' নিয়ে রওনা হয় প্রেমিকের উদ্দেশ্যে। পথে যেতে যেতে ফ্ল্যাশব্যাকে ছবির গল্প বলা। প্রেমিকের স্মৃতিচারণ ধীরে ধীরে তাকে উত্তেজিত করে তোলে। উন্মাদপ্রায় অবস্থায় বাইক দুর্ঘটনায় মারা যায় নায়িকা। স্মৃতিচারণের সঙ্গে সঙ্গে ছোটো ছোটো এপিসোডের মধ্য দিয়ে বহুবার যৌনদৃশ্য এসেছে। প্রতিবারই কার্ডিফ ডিউপ্ পদ্ধতিতে ডবল প্রিন্টের সাহায্যে প্রত্যংগ হাত পা-এর ফ্রেম দিয়ে তাকে বুঝিয়েছেন। পর্দায় কিছুটা সিল্কেন রংয়ের এফেক্ট এসেছে। একটিবারও অশ্লীল মনে হবার সুযোগ তিনি দেননি। খোলাখুলি যৌনদৃশ্যের চাইতে এ পদ্ধতি অনেক বেশী রুচিসম্মত হয়েছে। নায়িকার মানসিক যন্ত্রণাকে কার্ডিফ শুধুমাত্র কয়েকটা ফ্রেমে অপূর্ব দক্ষতায় বেঁধেছেন।

কার্ল রেইজের 'ইসাডোরা' আত্মজীবনীমূলক ছবি হলেও ইসাডোরার জীবনের যন্ত্রণাকাতর দিকটাকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিফলিত করতে পারেননি। যে ইসাডোরা মা-বাবার ম্যারেজ সার্টিফিকেট পুড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল তার জীবন সত্য ও সুন্দরের জন্য উৎসর্গ করা হল—জীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে তার সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়নি। নাচের আধিক্য আছে, আর শেষপর্যন্ত ইসাডোরা অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছে যেন। রেইজ অবশ্য ইসাডোরার যৌবনকালটার ওপরই প্রাধান্য দিয়েছেন বেশী। তবে প্রধান চরিত্রে ভ্যানেসা রেডগ্রেভ অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পরিচালক রেইজের চাইতে চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তুলতে ভ্যানেসার দক্ষতাই বেশী। নাটকীয় দৃশ্যগুলোতে তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। অবশ্য পরিচালক 'নাটক' বস্তুটিকে এড়িয়ে গেছেন অনেক ক্ষেত্রেই।

এ ব্যাপারে অবশ্য স্কোলিওমস্কির 'ব্যারিয়ার' পূর্ণ মৌলিকতার দাবী করতে পারে। ইতালীর বেক্রোলুসির মত পোল্যাণ্ডের স্কোলিওমস্কি বিদ্রোহী শিশু। 'লজ' ফিল্ম স্কুল থেকে বেরোনোর পর এ ছবিই বুঝি ওঁর প্রথম কাহিনী চিত্র। আপাত দুর্বোধ্য হলেও এ ছবি প্রয়োগশিল্পের দিক থেকে নতুন নিশ্চয়ই। সমাজতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিক স্বার্থ সবকিছুর নীচে, সামগ্রিক স্বার্থ সবার ওপরে—এ বাণীই ছবির মূল কথা। বিমূর্ত চিত্রকলার মত কয়েকটা দৃশ্য যেমন ছবির বক্তব্যকে দুর্বোধ্য করে তুলেছে, আবার বুনুয়েলের 'নাজারিনে'র মত সুররিয়্যালিস্টিক ধাঁচে তোলা কয়েকটা ফ্রেম তেমনি খুব জোলো সাধারণ মনে হয়েছে। সব মিলিয়ে স্কোলিওমস্কি বিদ্রোহী শিশুর রূপ পুরোপুরি নিতে না পারলেও আত্মপ্রকাশ করেছেন কিছুটা

পরের ছবি 'আইডেন্টিফিকেশন মার্ক নান্' তাঁর সেই ভিতরের স্কোলিমোওস্কিকে দেখিয়েছে। ওয়াইদার পর পোল্যান্ডের আর কারো কথা ভাবতে গেলে নতুনদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এঁর কথা মনে আসবে।

কানাডার স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবির খ্যাতি বিশ্বজোড়া। কাহিনীচিত্র খুব কম সংখ্যায় তৈরী হয়। নর্মান ম্যাকলারেন এখনও বেসরকারীভাবে সেরা শর্ট ফিল্ম মেকার। ডন শ্যেবিও এতদিন ছোট ছবি তৈরী করতেন। কাহিনী নির্বাচন ও তার উপস্থাপনায় শ্যেবি-এর মৌলিকতা অনস্বীকার্য। ফিচার ফিল্মেও সেই বিশেষত্ব একটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। 'প্রোলেগ' শ্যেবি-এর অন্যতম উল্লেখ্য ছবি শুধু বক্তব্যের দিক থেকে নয়, প্রয়োগকলার দিক থেকেও। ঘটনার শুরু রাশিয়ার চেকোস্লোভাকিয়ায় হস্তক্ষেপের কাছ থেকে। প্রধান চরিত্র জেসি বিপ্লবী, বেপরোয়া, সামাজিক অর্থনৈতিক জগতে ভাবনায় অন্যায় একমাত্র উপায় সশস্ত্র বিপ্লব—এই তার মত। স্ত্রী কারিনের প্রথমে এ বিশ্বাসে আস্থা থাকলেও পরে মতভেদ দেখা যায়। ডেভিড নামে এক বন্ধুর আদর্শে সে আস্থা প্রকাশ করে। সবশেষে অবশ্য শ্যেবি বিশেষ কোনো মতবাদের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেননি। বেপরোয়া বিপ্লবীর সঙ্গে শান্ত বুর্জোয়ার মিল হয়নি সেখানে। কিন্তু স্ত্রী কারিন আবার ফিরে এসেছে স্বামীর কাছে। হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়েছে দুজনে। এটা অবশ্যই কোনো সমাধান নয়, কিছুটা বাস্তব সমস্যার সরলীকরণ। তবু হোল, কানাডার এ ছবি যথেষ্ট চিন্তার গভীরতার পরিচয় দেয়।

পুরোপুরি বাস্তব সমস্যাকে নিয়ে তোলা পিটার হলের 'দি ইনসাইড আউট' যেন আধুনিক কবিতার মত স্বাদু। নিঃসন্তান দম্পতি, স্বামীর অন্য মেয়ের প্রতি আসক্তি উদ্ভূত সাংসারিক বিপত্তি, শূন্যে সমাধান। ছবির গল্প এই। সমস্ত গল্পকে আরো সরলভাবে পিটার হল পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রেমিক এবং স্ত্রী দুজনেই শেষ-পর্যন্ত নায়ককে ছেড়ে চলে গেছে। শূন্য বাড়ী অন্ধকারে কয়েকটা আলো জেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে শেষে। সাংসারিক ও প্রেমের জীবনে সে মুহূর্তের জন্য সুখী হতে পারেনি। প্রধান তিনটি চরিত্রে ডড স্টেগার, ক্রেয়ার ব্লুম ও জুডি গীসন অপূর্ব অভিনয় করেছেন। বিশেষ করে গীসন উচ্ছল, উচ্ছৃঙ্খল প্রেমিকা ইলার চরিত্রে অভাবনীয়। পিটার হল নায়কের সমস্যাকে পুরোপুরি সংসারের চার দেয়ালের মধ্যেই বেঁধে রেখেছেন। তার সমাধানও সেইখানে। দিনের আলোয় চটুল সঙ্গীতে ছবির শুরু, আর রাতের অন্ধকারে জ্যাজের খাদের সুরে ছবির সমাপ্তি। ইউকের পাঠানো ছবিগুলোর মধ্যে 'ইফ' এর পরেই এটি।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব বলতেই সাধারণ দর্শকের মধ্যে এক ধরনের নেশা জাগে ব্লু ফিল্ম দেখার। যে-নেশা দিল্লীর দর্শকের মধ্যেও কম নয়। 'হেরোনিমাস মার্কিন' ছবির তিন টাকার একখানা টিকিট তাই একশ' টাকায় পর্যন্ত বিক্রী হয়েছে। বিজ্ঞানভবনে রাত্রি ন'টায় যেদিন 'বেঞ্জামিন' দেখানো হয়, হলের সামনে সেদিন একখানা টিকিট পাওয়ার আশায় দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকশ' লোক।

উৎসবের শেষ প্রদর্শনীর ছবি 'বেঞ্জামিন' নির্দ্বিধায় বলা যায় সবচাইতে ব্লু ফিল্ম। (ওদের দেশের সেন্সর বোর্ডের মতে 'এক্স' সার্টিফিকেট পাওয়া।) বেঞ্জামিন নামে এক কিশোরের যৌবনে পা দেওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে ছবির গল্প। মাস্টারের সঙ্গে সে গাঁ ছেড়ে শহরে এসেছিল তার এক মাসির কাছে সামাজিক ধোপদুরস্ত হতে। মাসির প্রেমিক তাকে হাতে-কলমে শুধু প্রেমের কাজটাই শিখিয়ে দিয়েছে। গয়েমারা বিদার মত বেঞ্জামিন শেষপর্যন্ত হাত বাড়িয়েছে গুরুর প্রেমিকার দিকেই। প্রেমের পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে ছবিরও শেষ। (ডায়েরীর ছেঁড়া পাতায় লেখা 'দি এন্ড অফ এ সেভেন্টিন ইয়ার ওল্ড ভার্জিন'।)

ছবিতে নগ্নদৃশ্য বিশেষ নেই বটে, কিন্তু সংলাপই এত স্থূলরুচি, যে, এটাই উৎসবের ব্লুয়েস্ট ফিল্ম ('ল্যান্ড মেকিং কি' ইত্যাদি সংলাপ।) বললে আপত্তি নেই। প্রাপ্তবয়স্কদের দৃষ্টি নিয়ে ছবি দেখার পরিচালক মাইকেল ডেভিলকে অন্তত একটা কারণে ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে, তা হলো ছবির এই গল্পকে অত্যন্ত সাধারণ ও সহজ ভঙ্গীতে চিত্রায়ণ। প্রধান ভূমিকায় পিয়ের ক্লেমেন্ট চরিত্রানুগ শুধু নয় বরং একটু বেশীই।

অভিনয়, পরিচালন-সৌকর্য ও নৈপুণ্যের দিক থেকে আলেকজান্ডার জার্খির 'অ্যানা কারেনিনা' (রাশিয়া) টলস্টয়ের ক্লাসিক সাহিত্যকর্মের ক্লাসিক চিত্ররূপ বলা যায়। কাউন্ট ভ্রনস্কি, অ্যানা কারেনিনা আর আলেকজান্দ্রোভিচকে নিয়ে ত্রিভুজ প্রেমের গল্প পরিচালক জার্খি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় প্রতিটি দৃশ্যের পরিকল্পনা ও সঙ্গীতে জার্খির যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দেয়।

সমাজতান্ত্রিক চেকোশ্লাভিকায় সিনেমা নিয়ে যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, পূর্ব ইউরোপের কোনো দেশে ততটা নয়। যাঁরা এই পরীক্ষা চালিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মিলোস্ ফোরম্যান, জিরি মেনজেল, কার্ল কাচায়েনা, জেরোমিল্ জোরিস্, ওত্‌কার ভাবরা ইত্যাদির নাম এক নিঃশ্বাসে বলা যায়। দিল্লীর চিত্রমেলায় চেকোশ্লোভাকিয়া যে ছবিদুটো পাঠিয়েছে, তার একটি হোল জেরোমিল জোরিসের 'দি জোক'। প্রতিযোগী ছবি 'দি ক্যানি ওল্ড-ম্যান'-এর চাইতেও বক্তব্যমুখর, স্বচ্ছ ও প্রত্যায়িত ছবি এটা। দ্রুতগতি ফ্ল্যাশব্যাকে পরিচালক প্রধান চরিত্রের অতীতের ঘটনার পাতা উল্টে গেছেন। একের পর এক এসেছে সামরিক স্কুলের শিক্ষা, কয়লাখনিতে কাজের সেই গা-মরা ঘামের স্মৃতি ইত্যাদি। ছবির নায়ক তার বন্ধবীকে

চিঠিতে একবার লিখেছিল ট্রটস্কি জিন্দাবাদ, কম্যুনিজম আফিঙের নেশা ইত্যাদি। রাজনৈতিক দল তখন তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিয়েছে, বিতাড়িত করেছে তাকে দল থেকে। এক ধরনের প্রসিকিউশন আর কি! সুসম্পাদনার দরুনই ছবিটা যেন আরও বেশী মুখর হয়ে উঠেছে।

উৎসবে প্রতিযোগিতার বাইরে পোল্যাণ্ডের ছবি হলো 'দি লাইফ অফ ম্যাথু'। পরিচ্ছন্ন, একটুকরো ল্যাণ্ডস্কেপের মত। পুরোটাই আউটডোরে তোলা। ম্যাথু এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুবক, জাতে সে নাবিক।

চেক্ ছবি দি জোক্ (ভারত সরকারের প্রচার দপ্তর প্রেরিত)

বোন ওলগাকে নিয়েই তার সংসার। তার জগৎ ছোট্ট খামার বাড়ী, সামনের সবুজ বন আর লেকের সবুজ জল। এদের সুখের সংসারে একদিন তৃতীয় ব্যক্তি এসে সব সুখ তছনছ্ করে দিল। অন্ততঃপক্ষে ম্যাথুর তাই মনে হয়েছে। সে তাই একদিন ভোরবেলা নৌকো নিয়ে বেরিয়ে লেকের জলে আত্মহত্যা করেছে। মানুষের মধ্যে এক ধরনের একাকীত্ব বোধ সব সময়েই থাকে, নিজের মনের লোক যখন দূরে সরে যায়, তখন সে একা। এই একাকীত্ব মানুষকে পাগল করে তোলে। ওয়াল্দা ইস্‌জি নিকির এ-ছবি বাংলার গাঁ নিয়ে লেখা জীবনানন্দের কবিতার মত প্রাণময়। পোলিশ গ্রামের ছোঁয়া যেন ছবির প্রতিটা অংশে।

উৎসবে প্রদর্শিত কিউবার একমাত্র ছবি 'লুসিয়া' মনে রাখার মত। পরিচালক উমবার্তো সোলাস্ কিউবার নারী প্রগতির ওপর ভিত্তি করে এ-ছবি তুলেছেন। তিরিশ দশক, প্রথম দশক ও বর্তমান কিউবার তিনটে নারী-চরিত্র (প্রত্যেকেরই নাম লুসিয়া) নিয়ে তাদের সামাজিক পরিস্থিতি, দারিদ্র, কর্তাকে তৎকালীন দৃষ্টি দিয়ে দেখিয়েছেন। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে কিউবার স্ত্রী-জাতি কিভাবে এগিয়ে চলেছে, এটা দেখানোর মাঝে যেমন প্রামাণিকতা আছে, তেমনি পরিচালক সোলাস্ তাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নাটকের আশ্রয় নিয়েছেন। বিশেষ করে ছবির শেষ খণ্ডে লুসিয়া আর তার স্বামীর চরিত্রের বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে আধুনিক ও অতীত সমাজের এক সুন্দর বাস্তব রূপই তুলে ধরেছেন। সম্পাদনা ও সঙ্গীত ছবিকে আরও বেশী বাঙ্ময় করেছে।

জিভোজিন পাভলোভিক্ বর্তমান যুগোশ্লাভিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক। ও'র 'দি অ্যামবুশ' ছবি উৎসবে প্রদর্শিত। জিভোজিনের প্রথম দিককার ছবি এটা। তবুও ক্যামেরা কম্পোজিশন ও সম্পাদনার কাজে মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য প্রতিযোগিতার বাইরের ছবির মধ্যে দেখানো হয়েছে রিচার্ড বার্টনের 'ডঃ ফাউস্টাস' (অত্যন্ত ব্যর্থ চিত্রায়ণ), বেলজিয়ামের 'টু রয়ো', কানাডার 'ভেলভেট লোট', 'দি এঞ্জেলস ফল', কাম্বোডিয়ার 'টুইলাইট', ডেনমার্কের 'ব্যালাড অফ কার্ল হেনিং', হাঙ্গেরীর 'দি ফরবিডন গ্রাউন্ড', কোরিয়ার 'আইল্যাণ্ড চিলড্রেন গো টু সিটি', নেদারল্যাণ্ডের 'দি ভয়েস অফ দি ওয়াটার', রাশিয়ার 'টিল মনডে', আমাদের টু ইয়ং [illegible]', রুমানিয়ার 'দি [illegible]' ইত্যাদি।

জুলিয়া সোলন্‌ৎসেভা পরিচালিত দি [illegible]

সাম্প্রতিক সোভিয়েত চলচ্চিত্র

আজকের দিনে সোভিয়েত ইউনিয়নে ২০টি ফিচার ফিল্ম স্টুডিওতে নির্মিত ১২০টিরও বেশি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চিত্র ১৫টি ভাষায় প্রতি বছর মুক্তি লাভ করে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ফিল্ম তোলার জন্যে ৪০টি স্টুডিও বছরে ১০০০-এরও বেশি ডকুমেন্টারী, গবেষণা-সংক্রান্ত ও সর্বজনবোধ্য বিজ্ঞানের ফিল্ম তৈরি হয়। সোভিয়েত ফিল্ম-শিল্পের শিক্ষানবীশদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে আছে দুটি ইনস্টিটিউট।

পঞ্চাশ দশকের শেষ থেকে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের নতুন যুগ বলা যায়। এই সময় থেকে এই শিল্পকলা জীবনের নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে থাকে। নতুন নতুন সমস্যাকে তুলে ধরে পরদায়। অবশ্য এর মধ্যে সব থেকে লক্ষ্যণীয় অতীতের যা কিছু মূল্যবান ছিল তা মুছে যায়নি। বরং ফার্গেই আইজেনস্টাইন, ভি পুদোভকিন, আলেকজান্ডার দভ্‌শেঙ্কো, দাইগা ভার্তেফ আরও গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। চলচ্চিত্র শিল্পকলায় চলচ্চিত্র ইনস্টিট্যুটের বিরাট একদল তরুণ স্নাতকের আবির্ভাবে এই জগদ্বিখ্যাত চিত্র-পরিচালকদের সৃষ্টি নতুন করে জন্ম নেয়। সমসাময়িককাল ও মানুষের সত্যনিষ্ঠ বিবরণ যেমন এদের ছবিতে স্থান পেল, তেমনি নতুন যুগের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন এরা। নতুন চলচ্চিত্রের নায়করা ছিলেন অপরূপ মহিমা মণ্ডিত এবং তাঁদের প্রতিপক্ষদের চরিত্র-চিত্রণও ছিল সুস্পষ্ট। ক্রমে ক্রমে সোভিয়েত চলচ্চিত্র শিল্পকলা পরিবর্তিত হতে থাকে। অবশ্য একাজ খুব সহজে ঘটেনি। এই পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল আধুনিক উপজীব্যকে নিয়ে তোলা ছবিগুলিতে এবং ঐতিহাসিক-বৈপ্লবিক উপজীব্য নিয়ে যেসব ছবি তোলা হচ্ছিল সেগুলিতেও। এরকম কয়েকটি ছবি হল আলেকজান্ডার আলোফ ও ভ্লাদিমির নাউ সোফ-এর প্রযোজিত '**বিচলিত যৌবন**', গ্রিগরি চুখরাই-এর **ফোরটি ফার্স্ট**, ইয়েভগেনি গাব্রিলোভিচ ও ইউরি রাইসমান-এর **কমিউনিস্ট** ও ইয়েভগেনি গাব্রিলোভিচ ও শার্গেই উৎকেভিচ-এর **লেনিনের কাহিনী**। বিপ্লব সম্পর্কে নতুন ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য কি ছিল? প্রথমত, অতিপ্রচলিত থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা এবং বিশেষ করে বিপ্লবের মানুষের অন্তর জগতকে খুঁজে বের করা, বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের সময় উদ্ভূত বিরোধের প্রকৃত নাটকীয় চরিত্রকে উপস্থাপিত করা।

দি ক্রেনস আর ফ্লায়িং, ব্যান্ড অফ এ এসোভনজগ দেখে একালের দর্শক মুগ্ধ। কিন্তু ফ্রিদরিখ এর্মলার ও সের্গেই ইউৎকেভিচের প্রথম সবাক ছবি **কাউন্টার প্লান**, বোরিস বার্নেতের **সাবার্বস**, ভাসিলিয়েফ ভ্রাতাদের **চাপায়েফ**: ইয়েফিম দুজিগানের **উই আর ফ্রম ক্রনস্টাডট্**, আলেকজান্ডার দভঝেঙ্কোর **শকরস্**—এইসব বিভিন্ন রীতির ছবি প্রাক্ যুদ্ধের বছরগুলিতে সমাজতান্ত্রিক চলচ্চিত্র শিল্পবিকাশের সম্পূর্ণ চেহারা মেলে ধরে—তা দর্শকের কাছে হয়ত ততটা বিস্ময় সৃষ্টি করবে না, যতটা ইতিহাসের বিস্ময় হয়ে আছে। ভসেভোলদ ভিশনেভস্কির চিত্রনাট্য অবলম্বনে ইয়েফিম দুজিগানের উই আর ফ্রম ক্রনস্টাডট্ গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লবের সৈনিকদের নিয়ে তোলা। কিন্তু তা অন্য রীতির। এ হচ্ছে একটি ফ্রেস্কোফিল্ম। খাঁটি ও সুন্দর চরিত্র রূপায়ণ বিপ্লব বিষয়ক আরো কয়েকটি চমৎকার ফিল্ম দেখতে পাওয়া যায়। যেমন কোজিনৎসেফ ও লিওনিদ ত্রাউবার্গের **ট্রিলজি অফ ম্যাক্সিম**, সের্গেই ইউৎকেভিচের **দি ম্যান উইথ দি গান**, ইয়োসিফ খেইফিৎজ ও আলেকজান্ডার জারখি্র **বাল্টিক ডেপুটি** ও ইউলি রাইজমানের **দি লাস্ট নাইট**।

যুদ্ধপূর্ববর্তী কালের ফিল্মগুলি বিষয়রীতি এবং জীবনের উপাদানের ব্যবহারে বিভিন্ন ধর্মী ছিল। অক্টোবর বিপ্লবের ঘটনাবলী এবং তার নায়ক ভি আই লেনিনকে চলচ্চিত্রের পর্দায় রূপায়িত করার মত দুরূহতম কাজও সম্পাদিত হয়েছিল। এই সময়েই ইতিহাস অবলম্বনে তোলা সোভিয়েত ফিল্মের ধারণাটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুদূর অতীতের ঘটনাবলম্বনে বহু উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ফিল্ম নির্মিত হতে থাকে। সের্গেই আইজেনস্টাইনকেও

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু পেয়ে বসেছিল। কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক ফিল্মগুলি নিগূঢ় অর্থে আধুনিক—তাদের সমস্যা আধুনিককালের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত।

ন্যায় বিচারের খাতিরে বলতেই হবে **ক্রেনস আর ফ্লাইং** ছবিটি সারা দুনিয়ায় যে সুবিপুল সাফল্য অর্জন করেছে আর কোন একটি ছবিও তেমন পারেনি। নাট্যকার ভিক্টর রসোফ, পরিচালক মিখাইল কালাতজোফ ও ক্যামেরাম্যান সার্গেই উরুসেভ্‌স্কির এই ছবিটির এমন এক নতুন, বৈশিষ্ট ও সর্বজয়ী গুণ ছিল যা এটির সুবিপুল সাফল্যের কারণ। প্রযোজক, ক্যামেরাম্যান ও অভিনেতারা প্রতিটি ডিটেলে প্রতিটি দৃশ্যে ও প্রতিটি কথায় এক বিশেষ তাৎপর্য আরোপ করতে পেরেছেন। প্রেমে পড়া মেয়েটি সেই যুদ্ধের নিষ্করুণ দিনে মস্কোর রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে যুদ্ধযাত্রী প্রিয়তমকে বিদায় জানাতে। ছবিতে এও দেখা যায়, এই প্রথম প্রেম কোমল হলেও কতটা দৃঢ়পণ, কিরূপ দুঃখ, ত্রাস ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে এই প্রেম বয়ে চলেছে, দেখা যায় এই প্রেম ধাতুর কঞ্চন। বোমার গর্জন ও সাইরেনের আওয়াজে কিভাবে ঠোক্কর খাচ্ছে, কিন্তু এগিয়ে চলেছে।

কিংবা মিখাইল শলোকোফ-এর কাহিনীভিত্তিক সার্গেই বন্দরচুকের **একটি মানুষের ভাগ্য** ছবিটি। এটি এমন একজন মানুষের জীবন-বৃত্ত ও অবিশ্বাস্য দৃঢ়তার ছবি, যিনি সম্ভাব্য সবরকম অসুবিধার মধ্যে পড়েও হাল ছেড়ে দেননি।

বিভিন্ন শিল্পী ও টেকনিসিয়ান পর্দায় যুদ্ধের অর্থকে তুলে ধরেছেন নানাভাবে। কিন্তু বৈচিত্র্য সত্ত্বেও জীবন সম্পর্কে মনোভাব, জীবনপ্রেম, মানুষ ও স্বদেশের প্রতি ভালবাসা এঁদের সবারই একরূপ। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে দেখা দিল সহজ ঘটনার ও গভীর অনুভূতির ছবি, দেখা দিল নতুন প্রবণতার ছবি। এর পুরোভাগে প্রতিমূর্তি হল মিখাইলরম ও দানিল জারেভিৎস্কির **একটি বছরের নয়টি দিন** এবং ইউলি রাইস্‌ও ইয়েভগেনি গাব্রিলোভিচ-এর **আপনার সমসাময়িক।**

চলচ্চিত্র পরিসংখ্যানের মৃত জগৎ থেকে আরও সরে এসেছে। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব আরও বেশি বেশি তাৎপর্য পরিগ্রহ করেছে, তার দায়িত্ব ক্রমে বেড়ে চলেছে। ইলিয়া ওলশানস্কি, নিনা রুসলানোভা ও ইউলি রাইসমান-এর **এ যদি প্রেম হয়?** ভ্লাদিমির [illegible] ও মিখাইল [illegible]-এর **অন্য লোকেদের আত্মীয়রা** ছবি দুটিতে এটা প্রধান কথা। ছবি দুটিতে মানুষকে অবিশ্বাস করার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, যে পুরোনো নিষ্প্রাণ বিবেচনা এখনো চলছে, তার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অ্যাডভেঞ্চারধর্মী ছবিও তোলা হয়েছে। দুঃসাহসিক, অ্যাডভেঞ্চার, অভিযাত্রীদের নিয়ে ছবি হয়েছে। এগুলির অধিকাংশ সাধারণ মানের। তবু এগুলি জনপ্রিয় হয়েছে। অবশ্য কয়েকটি ছবি বেশ [illegible] যেমন **দ্য ইন স্পিরিট, হেড ম্যান আপ; শীলড অ্যান্ড দি সোর্ড, ডেড সীজন।** আর [illegible] সম্পর্কে [illegible] গ্রহণ করেছিল **একটি বছরের নয়টি দিন** ছবিটি।

[illegible] আলেকসেই বাতালোফ ও আই. স্মোকতুনোভ্‌স্কি সংক্রান্ত নায়ক চরিত্রগুলি কিছু কিছু গুরুত্বের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল এবং সেজন্যই চরিত্রগুলির [illegible] রূপায়ণ দরকার ছিল। [illegible] এসবই [illegible] মিখাইল রম-এর [illegible] সাধারণ [illegible] এই ছবিটি [illegible] সেই ছবিটি [illegible] ও [illegible] [illegible] প্রেমের কাহিনী [illegible] এই ছবিটিতে [illegible] ছিল [illegible] কাছে সহানুভূতি [illegible] বক্তব্য রাখতে পেরেছে। আলেকসেই সালতিকোফ ও ইউরি নাগিবিন-এর **সভাপতি** ছবিটি হচ্ছে আমাদের সময়ের উল্লেখযোগ্য ছবি। এর প্রথম কারণ ছবিটিতে যে সাহসিকতা ও সত্য ফুটে উঠেছে তার প্রতি শ্রদ্ধা। একেবারে নিরলঙ্কার ভাবে জীবনকে এই ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র দেশে যেকোন প্রত্যেকটি দিকেই তা বিকশিত হয়ে উঠছে। নবীন-প্রবীণ সব বয়সের সোভিয়েত পরিচালক ও চিত্রনাট্যকাররা তাঁদের শিল্পের জন্য নতুন বিষয়বস্তু ও প্রকরণ খোঁজেন এবং তা আবিষ্কারও করেন। সিনেমাটোগ্রাফারদের ইউনিয়নের মত সৃষ্টিশীল সংস্থায় চলচ্চিত্র-শিল্পকে উন্নত করার পথ ও উপায় এবং নতুন ফিল্ম সম্বন্ধেও শিল্পের এই সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যমের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে নিয়মিত আলোচনা ও বিতর্ক-সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

—আলোচক

প্রেক্ষাগৃহ

উৎসবের শ্রেষ্ঠ ছবি

দিল্লীতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শেষ হয়েছে। বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনার পর রাজধানী দিল্লী যেন অনেকটা ম্লান। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ ছবির সম্মান পেয়েছে ইতালির দি ড্যামভ্। পরিচালক লুসিনো ভিসকন্তি। 'সোনার ময়ূর' পেয়েছে দি ড্যামড্। প্রধান নারী-চরিত্র অভিনয় করেছেন সুইডেনের মঞ্চ ও চিত্রাভিনেত্রী ইনগ্রিড থুলিন। তার বিপরীতে আছেন ডারক বোগারডে। নাৎসী জার্মানীর প্রথম যুগে এক জার্মান পরিবারকে ঘিরে কাহিনী। নাৎসী বর্বরতার প্রতি প্রচন্ড বিদ্বেষ আর ঘৃণার ভাব ছড়িয়ে আছে ছবিতে। উচ্চমানের পরিচালনা ও অভিনয় চিত্র-সমালোচকদের বিস্মিত করেছে।

কলকাতায় চলচ্চিত্র সপ্তাহ

চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত কলকাতা চলচ্চিত্র সপ্তাহের উদ্বোধন করতে গিয়ে গত ১৮ ডিসেম্বর মেট্রো সিনেমায় রাজ্যপাল শ্রী এস এস ধাওয়ান মন্তব্য করেন, কলকাতার মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরে উৎসবের কয়েকটি মাত্র ছবির প্রদর্শন খুবই বেদনার। ১৯১১ সালে কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরের পরও এ-শহর সম্পূর্ণ প্রাণবন্ত হয়ে বেঁচে আছে। দিল্লীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। রাজধানী ছাড়া দিল্লীর আর কোন বিশেষ গুরুত্বই নেই। এই স্বল্প সুযোগে খুব কম চিত্রামোদীই বিদেশী ছবিগুলি দেখতে পাবেন।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে স্বর্ণময়ূরপ্রাপ্ত ইতালির ছবি দি ড্যামড্ (ভারত সরকারের প্রচার দপ্তর প্রেরিত)

ভারতীয় চলচ্চিত্রে চুম্বন দৃশ্যের বিরোধিতা করে রাজ্যপাল বলেন, চুম্বন অভিনয়ের কোন অংশ নয়। বক্স অফিসের দিকে তাকিয়েই চলচ্চিত্রে চুম্বন রাখা হয়। সামাজিক স্বীকৃতি ব্যতীত চলচ্চিত্রে এ-বস্তুর প্রচলন খুবই অহিতকর হবে। তাছাড়া সামাজিক অবস্থার উন্নয়নই সর্বাগ্রে কাম্য।

প্রারম্ভে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর দিক থেকে এই উৎসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতাবাসীরা এই বিদেশী ফিল্ম দেখে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পাবেন।

সকলকে ধন্যবাদ দেন ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী এস এল জালান।

এরপর নেদারল্যাণ্ডের 'টু গ্র্যাব দি রিং' প্রদর্শিত হয়।

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার

সত্যজিৎ রায়ের ছবি গুপী গাইন বাঘা বাইন ১৯৬৮ সালের শ্রেষ্ঠ কাহিনী-চিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছে। শ্রীরায় শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মানও পেয়েছেন তাঁর এই ছবির জন্য। মালয়ালম ছবি থুলোভরম কাহিনী-চিত্রের দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর স্বীকৃতি পেয়েছেন যথাক্রমে অশোককুমার এবং সারদা। শ্রেষ্ঠ শিশু-শিল্পী বেবীরানী (নানহা ফারিস্তা),
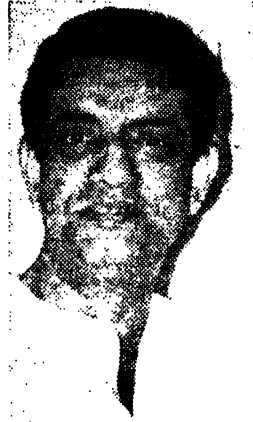
শ্রেষ্ঠ প্লে-ব্যাক শিল্পী মান্না দে (মেরে হুজুর), শ্রেষ্ঠ সংগীত-পরিচালক কল্যাণজী আনন্দজী। শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্রের পুরস্কার পেয়েছে বাংলা ছবি হীরের প্রজাপতি।

●

'ভারতী অপেরা'র মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য সেন

বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক সর্বদিক দিয়েই আজ রূপান্তরের দোলা লেগেছে পালা-নাটকে। যে-ক'টি দল সম্প্রতিক পরিবর্তনের ধারাটিকে নিষ্ঠার সঙ্গে সমন্বিত শিল্পচর্চায় রূপ দিতে পেরেছে, তার মধ্যে 'ভারতী অপেরা'র নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এ'দের নবতম প্রয়াস 'মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য সেন' নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিককালের এক বলিষ্ঠতম সৃষ্টি। চট্টগ্রামের সেই সশস্ত্র বিপ্লবের রক্তাক্ত অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি প্রোজ্জ্বল নাম 'সূর্য সেন' বা 'মাস্টারদা'। এ'কে কেন্দ্র করে যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম তার ইতিহাস বোধহয় আমাদের সবারই জানা। এই চেনা-জানা ইতিহাসের ঘটনাটিকে আশ্চর্য সুন্দরভাবে পালাকার ব্রজেন দে 'মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য সেনে' বিধৃত করেছেন। ইতিহাসের ঘটনাকে এতোটুকু বিকৃত তিনি কোথাও করেননি। মাস্টারদার সঙ্গে এসেছে অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন ও গণেশ ঘোষ প্রভৃতি বিপ্লবীদের কথা। ঘটনা ও সংলাপে প্রাণবন্ত 'মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য সেন' স্বদেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে সবাইকে আন্দোলিত করবে। পালাটি নিখুঁতভাবে পরিচালনা করেছেন প্রখ্যাত অভিনেতা জ্ঞানেশ মুখার্জি। যাত্রার নাটক পরিচালনা এই তাঁর প্রথম। সুরারোপ করেছেন সুপরিচিত সবিতাব্রত দত্ত, আলোকসম্পাতে রয়েছেন তাপস সেন। বলা যায় নবনাট্য আন্দোলনের এই তিন কর্ণধারের মিলিত প্রচেষ্টায় ও শিল্পীদের আন্তরিকতায় 'মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য সেন' একটি সার্থক শিল্প-সৃষ্টি হতে পেরেছে।

প্রতিটি শিল্পীই অভিনয় করেছেন অসাধারণ। 'মাস্টারদা'র ভূমিকায় সুজিত পাঠকের আশ্চর্য স্বাভাবিক সংযত অভিনয় আমাদের বিমুগ্ধ করেছে। [illegible] কয়েকটি মুহূর্তে তিনি যেভাবে প্রকাশ করেছেন তার তুলনা বিরল। [illegible] রায়ের 'হোয়াইট স্কীন' (একটি রূপক চরিত্র) সম্প্রতিকালের একটি স্মরণীয় চরিত্রচিত্রণ। শিল্পীর বচনভঙ্গী অতি সুন্দর। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ভূমিকায় বলিষ্ঠ অভিনয় করেছেন গীতা দত্ত। 'লোকনাথ বল' ও 'নির্মল সেনের' চরিত্রদুটি প্রাণ পেয়েছে পান্নালাল নস্কর ও গুরুদাস মিত্রের স্বাভাবিক সংযত অভিনয়ে। আলো আর সংগীত পালাটির শিল্পসৌন্দর্য নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধতর করেছে।

প্রতিদান/অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত কাজল গুপ্ত এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়

টেস্ট ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড

ক্ষেত্রনাথ রায়
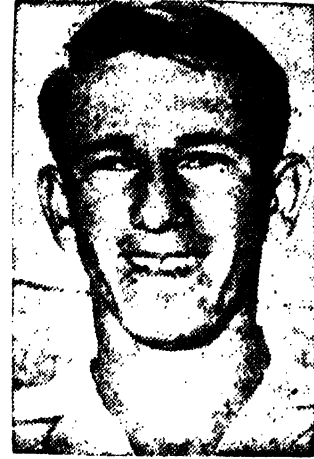
ডগ ওয়ালটার্স

আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে এ পর্যন্ত (ডিসেম্বর ২২, ১৯৬৯) অস্ট্রেলিয়া ৩০৩টি এবং ভারতবর্ষ ১১৫টি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলার সূত্রে যে-সব বিশ্ব রেকর্ড করে আজও তা অক্ষুণ্ণ রেখেছে তারই খতিয়ান নীচে দেওয়া হল।

(১৯৬৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত)

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে

এক সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান

৯৭৪ রান—ডন ব্র্যাডম্যান, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৩০ খেলা ৫, ইনিংস ৭, নট-আউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৩৪, সেঞ্চুরী ৪ এবং গড় ১৩৯.১৪।

একদিনের খেলায় সর্বাধিক রান

৩০৯ রান—ডন ব্র্যাডম্যান, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, লিডস ১৯৩০ সালের ১১ই জুলাই।

লাঞ্চের পূর্বে সেঞ্চুরী

(খেলার প্রথম দিনে)

ভিক্টর ট্রাম্পার (১০৩ রান), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯০২।

চার্লস ম্যাকার্টনি (১৫১ রান), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, লিডস, ১৯২৬।

ডন ব্র্যাডম্যান (৩৩৪ রান), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, লিডস, ১৯৩০।

দ্রষ্টব্য—টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার উপরের তিনজন খেলোয়াড় প্রথম দিনের খেলায় লাঞ্চের পূর্বে সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেছেন। খেলোয়াড়দের নামের ডান দিকের বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে তাঁদের পুরো ইনিংসের রান সংখ্যা।

এক ইনিংসে সর্বাধিক সেঞ্চুরী

৫টি—অস্ট্রেলিয়া (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ), কিংস্টন, ১৯৫৫ (সি সি ম্যাকডোনাল্ড ১২৭, নীল হার্ভে ২০৪, কিথ মিলার ১০৯, রন আর্চার ১২৮ এবং রিচি বেনো ১২১। অস্ট্রেলিয়া এই ইনিংসে ৮ উইকেটের বিনিময়ে ৭৫৮ রান তুলে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে এবং টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এই ৭৫৮ রানই অস্ট্রে-

স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান

জে এইচ ফিঙ্গলটন

গ্রিল ম্যাকেঞ্জী

ওয়ালী গ্রাউট

লিয়ার পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক রানের রেকর্ড)।

একটি সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী

১২টি—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে, ১৯৫৪-৫৫ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে।

দ্রুততম সেঞ্চুরী

৭০ **মিনিটে :** জ্যাক গ্রেগরী, বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, জোহানেসবার্গ, ১৯২১-২২।

এক ইনিংসে সর্বাধিক বাউণ্ডারী

৪৬টি (৩৩৪ রানের মধ্যে)—ডন ব্র্যাডম্যান, বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, লিডস, ১৯৩০।

একটি টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী
(ডাবল সেঞ্চুরী এবং সেঞ্চুরী)

২৪২ ও ১০৩ রান — ডগলাস ওয়াল্টার্স, বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, সিডনি, ১৯৬৮-৬৯।

একটি সিরিজে সর্বাধিক ডবল সেঞ্চুরী

৩টি—ডন ব্র্যাডম্যান : **২৫৪** (লর্ডস), ৩৩৪ (লিডস) এবং **২৩২** (ওভাল), ইংল্যাণ্ড-এর বিপক্ষে ১৯৩০ সালে।

এক ইনিংসে সর্বাধিকবার 'ট্রিপল' সেঞ্চুরী

২বার—ডন ব্র্যাডম্যান : ৩৩৪ (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, লিডস ১৯৩০) এবং ৩০৪ (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, লিডস, ১৯৩৪)।

টেস্টে সর্বাধিক সেঞ্চুরী

২৯টি সেঞ্চুরী (৫২টি খেলায়)—ডন ব্র্যাডম্যান (ইংলণ্ডের বিপক্ষে ১৯টি, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৪টি, ভারত-বর্ষের বিপক্ষে ৪টি এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ২টি)।

একটি খেলার উভয় ইনিংসে 'হ্যাটট্রিক'

টি জে ম্যাথুজ (বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯১২)।

একটি খেলায় সর্বাধিক 'ডিসমিসাল'

৯টি (কট ৮ ও স্টাম্পড ১)—গিল ল্যাংলী (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, লর্ডস, ১৯৫৬)।

এক ইনিংসে সর্বাধিক 'ডিসমিস্যাল'

৬টি (কট ৬) : ওয়ালী গ্রাউট (বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, জোহানেসবার্গ, **১৯৫৭-৫৮**)।

পার্টনারশিপ রানের বিশ্বরেকর্ড

উইকেট	রান	
২য়	৪৫১	পন্সফোর্ড এবং ব্র্যাডম্যান (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড), ওভাল, ১৯৩৪।
৫ম	৪০৫	বার্ণেস এবং ব্র্যাডম্যান (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড), সিডনি, ১৯৪৬-৪৭
৬ষ্ঠ	৩৪৬	ফিঙ্গলটন এবং ব্র্যাডম্যান (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড), মেলবোর্ণ, ১৯৩৬-৩৭।

ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষ ১১৫টি টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ **খেলেছে। ভারতবর্ষের** নিম্নলিখিত দুটি বিশ্বরেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

প্রথম উইকেট জুটি **:** ৪১৩ রান — ভিনু মানকাদ এবং পঙ্কজ রায় (বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, মাদ্রাজ, ১৯৫৫-৫৬)।

ভিনু মানকড়

পঙ্কজ রায়

একটি সিরিজের পাঁচটি খেলারই কোন-না-কোন ইনিংসে ৪০০ বা তার বেশী রান : ১৯৫৫-৫৬ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষ এই রেকর্ড প্রথম করার গৌরব লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য, ভারতবর্ষ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চম টেস্টে মাত্র প্রথম ইনিংসই খেলেছিল। নীচে স্কোর দেওয়া হল :

১ম টেস্ট : ৪৯৮ (৪ উইঃ ডিক্লেঃ)
২য় টেস্ট : ৪২১ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ)
৩য় টেস্ট : ৫৩১ (৭ উইঃ ডিক্লেঃ)
৪র্থ টেস্ট : ১৩২ ও ৪৩৮ (৭ উইঃ ডিক্লে)
৫ম টেস্ট : ৫৩৭ (৩ উইঃ ডিক্লেঃ)

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়া

চতুর্থ টেস্ট খেলা

ভারতবর্ষ : ২১২ রান (বিশ্বনাথ ৫৪ এবং সোলকার ৪২ রান। ম্যাকেঞ্জী ৬৭ রানে ৬ এবং ম্যালেট ৫৫ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৬১ রান (ওয়াদেকার **৬২** রান। কনেলী ৩১ রানে ৪ এবং ফ্রিম্যান ৫৪ রানে ৪ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ৩৩৫ রান (চ্যাপেল ৯৯ এবং ওয়াল্টার্স ৫৬ রান। বেদী ৯৮ রানে ৭ এবং সোলকার **২৮** রানে ১ উইকেট। দুজন রান আউট হন)

ও ৪২ **রান** (কোন উইকেট না পড়ে)

প্রথম দিনের খেলা (ডিসেম্বর ১২) : ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের ৭টা উইকেট খুইয়ে ১৭৬ রান সংগ্রহ করে। খেলায় অপরাজিত থাকেন সোলকার (৪১ রান) এবং প্রসন্ন (৫ রান)।

দ্বিতীয় দিনের খেলা (ডিসেম্বর ১৩) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস **২১২** রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ৯৫ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলায় অপরাজিত ছিলেন চ্যাপেল (১০ রান) এবং ওয়াল্টার্স (৫ রান)।

তৃতীয় দিনের খেলা (ডিসেম্বর ১৪) : অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩৩৫ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের রান থেকে তারা ১২৩ রানে অগ্রগামী হয়। খেলার বাকি সময়ে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ১২ রান সংগ্রহ করে। খেলায় অপরাজিত থাকেন ইঞ্জিনীয়ার (৫ রান) এবং মানকড় (৭ রান)।

চতুর্থ দিনের খেলা (ডিসেম্বর ১৬) : ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ১৬১ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩৯ রান তুলতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ৪২ রান তুলে ১০ উইকেটে জয়ী হয়।

কলকাতার ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে জয়ী হয়ে ১৯৬৯ সালের টেস্ট সিরিজে বর্তমানে ২—১ খেলায় (ড্র ১) অগ্রগামী হয়েছে। মাদ্রাজের পঞ্চম টেস্ট খেলা ড্র রাখতে পারলে

অস্ট্রেলিয়া 'রাবার' জয়ী হবে। এখানে উল্লেখ্য, ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ১০ উইকেটে জয়লাভ এই প্রথম।

ভারতীয় ক্রিকেট দল দিল্লীর তৃতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়াকে ৭ উইকেটে পরাজিত করে স্বদেশবাসীর মনে যে আশা, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং উত্তেজনা জাগ্রত করেছিল কলকাতার চতুর্থ টেস্টে ভারতবর্ষের শোচনীয় পরাজয়ে তা বিলুপ্ত হয়েছে। খেলায় জয়-পরাজয় থাকবেই—এই ধ্রুব সত্যকে স্বীকার করে নিলেও ভারতবর্ষের এই পরাজয়কে সহজভাবে কেউ গ্রহণ করতে পারছেন না এই কারণে যে, পরাজয়েরও তো একটা ধরন আছে। ভারতবর্ষের পরাজয়ের চেহারাটা যেখুবই হতাশাব্যঞ্জক। কোন্ বল মারতে হবে এবং কোন্ বল ছেড়ে দিতে হবে—খেলার এই প্রাথমিক জ্ঞানের পরিচয় ভারতীয় খেলোয়াড়রা যেভাবে দিয়েছেন তা দেখে দর্শকদের চোখ কপালে উঠে গেছে। তাড়াতাড়ি প্যাভিলিয়নে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা যেন মাঠে নেমেছিলেন, খেলতে নয়।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরী ইডেন উদ্যানের উইকেটের নাড়ীর স্পন্দন ঠিকই ধরেছিলেন। তাই টসে জিতেও ভারতবর্ষকে ব্যাট করতে পাঠান। ভারতবর্ষের কোন রান হওয়ার আগেই দুটো উইকেট পড়ে যায়। দলের এই সঙ্গীন অবস্থায় বিশ্বনাথ খেলতে নেমে শেষ পর্যন্ত পরিত্রাতার সার্থক

ইডেন উদ্যানে আয়োজিত ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট খেলার চতুর্থ দিনে রঞ্জি স্টেডিয়াম ছেড়ে দর্শকদের দলে দলে মাঠে নামার দৃশ্য বিহ্বল দৃষ্টিতে অবলোকন করছেন উইকেট কিপার ফারুক ইঞ্জিনিয়ার এবং অধিনায়ক পতৌদি

ভূমিকা গ্রহণ করেন। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ৪ উইকেট পড়ে ৭৫। উইকেটে ছিলেন বিশ্বনাথ (৩৮ রান) এবং অম্বর রায়। দলের ১০৩ রানের মাথায় বিশ্বনাথ (৫ম উইকেট) আউট হন। তিনি ১৩২ মিনিট খেলে তাঁর ৫৪ রানে ৬টা বাউন্ডারী করেছিলেন। আলোর অভাবে খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের একঘণ্টা আগে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের ১৭৬ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের আধঘণ্টা আগে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২১২ রানের মাথায় শেষ হয়। প্রসন্ন বোকার মত রান নিতে গিয়ে শেষ আউট হন। লাঞ্চের সময় অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল ২০ (কোন উইকেট না পড়ে)। চা-পানের সময় তাদের রান দাঁড়ায় ৮৫ (২ উইকেটে)। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৯৫ রানের (২ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনের খেলায় মোট ১৩১ রান উঠেছিল—ভারতবর্ষের ৩৬ রান (৩ উইকেটে) এবং অস্ট্রেলিয়ার ৯৫ রান (২ উইকেটে)। প্রথম দিনের মতই দ্বিতীয় দিনেও সূর্যদেব মুখ ঢেকে রেখেছিলেন। খেলাও হয়েছিল তেমনি—নির্জীব।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩৩৫ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ১২৩ রানে এগিয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৭টা ওভার-বাউন্ডারী ছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলায় একটা করে 'ছক্কা' মেরেছিলেন স্ট্যাকপোল এবং লরী; তৃতীয় দিনে কনোলী একাই চারটে এবং ওয়ালটার্স একটা। অস্ট্রেলিয়ার ৩০২ রানের মাথায় ৯ম উইকেট পড়ে এবং কনোলী শেষ খেলোয়াড় হিসাবে খেলতে নেমে ২২ মিনিটে যে ৩১ রান করেন তার মধ্যে ছিল চারটে 'ছক্কা'। প্রসন্নর মত বিশ্ববিশ্রুত বোলারের বলে তিনি তিনটে ওভার-বাউন্ডারী করেন—তার মধ্যে উপর্যুপরি দুবার। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ওয়ালটার্স এবং চ্যাপেল দলের অতি মূল্যবান ১০১ রান সংগ্রহ করে দেন। ওয়ালটার্স ১২৭ মিনিটে তাঁর ৫৬ রানে তিনটে বাউন্ডারী এবং একটা

ইডেন উদ্যানে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলার চতুর্থ দিনে জনৈক ফটোগ্রাফার ছবি তুলতে এলে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরী (বাঁদিকে) তাঁর ব্যাটের ঘায়ে ফটোগ্রাফারকে ভূতলশায়ী করেছেন।
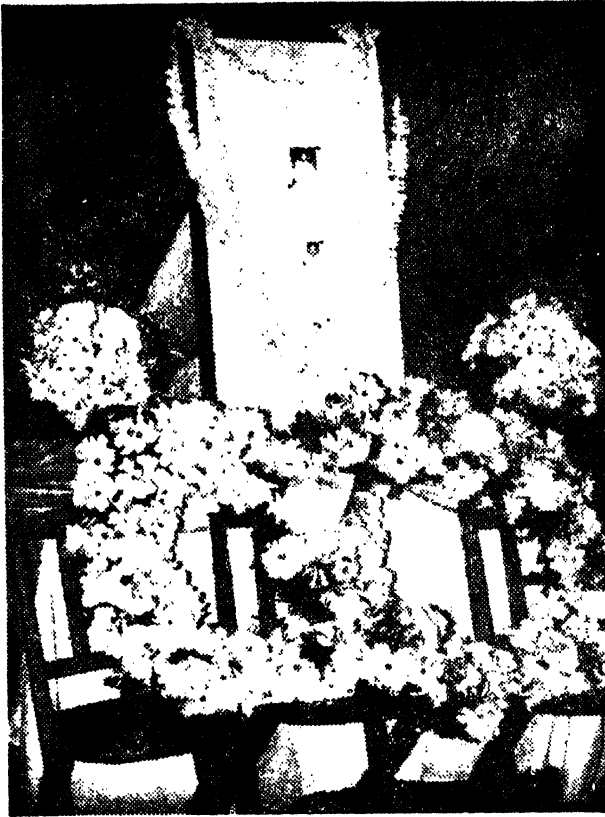
ইডেনে শহীদ বেদী : ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট খেলার চতুর্থ দিনে (ডিসেম্বর ১৬, ১৯৬৯) ইডেন উদ্যানের ১২নং গেটের সামনে দৈনিক টিকিট সংগ্রহ করতে গিয়ে যে ৬ জন যুবক অকাল মৃত্যু বরণ করেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত শহীদ বেদী। ১২নং গেটের সামনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত এক শোকসভায় এই বেদীটি নির্মিত হয়। এই শোকসভায় পৌরহিত্য করেন কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। মৃত যুবকদের নাম : প্রদীপ ঘোষ, মণীষ নন্দী, অরুণ চক্রবর্তী, অনিল হুগান, পিনাকী চ্যাটার্জি এবং বিশ্বনাথ পাল।

ওভার-বাউন্ডারী করেন। ৫ম উইকেটের জুটিতে সিহান এবং চ্যাপেল দলের ৭২ রান যোগ করেন। দলের ২৭৯ রানের মাথায় চ্যাপেল তাঁর ৯৯ রান করে আউট হন। তাঁর দুর্ভাগ্য যে, মাত্র এক রানের জন্যে বর্তমান টেস্ট সিরিজে তিনি দ্বিতীয় সেঞ্চুরী করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। চ্যাপেল ৩০৫ মিনিট খেলে তাঁর ৯৯ রানে ১৬টা বাউন্ডারী করেছিলেন। সেঞ্চুরী করার মুখে দাঁড়িয়ে দর্শকদের চিৎকারে তিনি শেষ পর্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে বেদীর বল খেলেন এবং ওয়াদেকারের হাতে 'ক্যাচ' দিয়ে আউট হন। তৃতীয় দিনে লাঞ্চের সময় অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল ১৮৭ (৪ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ২৭৯ (৬ উইকেটে)। বিষেণ সিং বেদী ৯৮ রানে ৭টা উইকেট পান—টেস্ট ক্রিকেটের এক ইনিংসের খেলায় তাঁর সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার নজির।

তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ১২ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলার এই অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৩৩৫ রানের থেকে ভারতবর্ষ ১১১ রানের পিছনে পড়েছিল।

চতুর্থ দিনে তিনটে একত্রিশ মিনিটে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ১৬১ রানের মাথায় শেষ হয়। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে সোলকার এবং ওয়াদেকার দলের ৫০ রান তুলেছিলেন। ভারতবর্ষের রান ছিল লাঞ্চের সময় ৯২ (৪ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১৫৪ (৮ উইকেটে)। চা-পানের সময় ওয়াদেকার ৫৮ রান এবং বেদী ৫ রান করে অপরাজিত ছিলেন। দলের ১৫৯ রানের মাথায় ওয়াদেকার (৯ম উইকেট) নিজস্ব ৬২ রান করে আউট হন। তিনি ২২৪ মিনিট খেলে তাঁর ৬২ রানে ৫টা বাউন্ডারী করেন।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়া ৫৫ মিনিটের খেলা হাতে নিয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩৯ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। কিন্তু তারা কোন উইকেট না খুইয়ে মাত্র ১৭ মিনিটে ৪২ রান তুলে ১০ উইকেটে জয়ী হয়।

অশোভন আচরণ

খেলার চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা যখন সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল সেই সময় জনৈক প্রেস ফটোগ্রাফার অস্ট্রেলিয়ার প্রথম উইকেট জুটির ছবি তুলতে গেলে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরী তাঁর হাতের ব্যাট দিয়ে ফটোগ্রাফারকে আঘাত করে ভূতলশায়ী করেন এবং গালি-গালাজ করেন। খেলার পরের দিন কলকাতার কোন একটি সম্ভ্রান্ত হোটেলে কোন একজন প্রেস ফটোগ্রাফার অস্ট্রেলিয়ার ডগ ওয়ালটার্সের অনুরোধ অনুযায়ী তাঁকে কয়েকটি ছবি পৌঁছে দিতে গেলে অস্ট্রেলিয়ার দুই খেলোয়াড় আয়ান রেডপাথ এবং গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ফটোগ্রাফারের পেটে আঘাত করে গালমন্দ করেন। ইতিপূর্বে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল পাঁচবার ভারত সফরে এসেছিল। সেইসব দলের খেলোয়াড়দের কেউই অভদ্র আচরণে দেশের মুখে চুনকালি দেননি।

অভিশপ্ত টেস্ট খেলা

ইডেনের ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার এই চতুর্থ টেস্ট ম্যাচটি 'অভিশপ্ত খেলা' আখ্যা লাভ করেছে। চতুর্থ দিনের খেলার দৈনিক টিকিট কিনতে ১২ ও ১৩নং গেটের সামনে যাঁরা দীর্ঘ লাইন দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ৬ জন যুবক সকালের দিকে গেটের সামনে অকাল মৃত্যুবরণ করেছেন। তাছাড়া এই দিনের দুর্ঘটনায় শতাধিক ব্যক্তি আহত এবং অনেকে নিখোঁজ হয়েছেন। টিকিট কেনার জন্যে যাঁরা লাইন দিয়েছিলেন তাঁদের তরফ থেকে নানা গুরুতর অভিযোগ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। গত একশত বছরের ইতিহাসে ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে পৃথিবীর কোথাও এই রকমের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে লোকের জানা নেই। গত কয়েক বছর ধরে টেস্ট ক্রিকেট খেলা কলকাতার নাগরিক জীবনে যে রকম গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে রাজ্য সরকারের পক্ষে হাত গুটিয়ে থাকা আর মোটেই সমীচীন নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত চতুর্থ টেস্ট খেলার চতুর্থ দিনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার তদন্ত করার জন্য রেভিনিউ বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য শ্রীকরুণাকেতন সেনকে নিযুক্ত করেছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৯ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৪শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 2nd January, 1970 শুক্রবার, ১৭ই পৌষ, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীতুষার সান্যাল

'সাহিত্যিকের চোখে' প্রসঙ্গে

বহুদর্শী প্রবীণ সাহিত্যিকদের চোখে আমাদের আজকের সামাজিক দৈন্য-দশা অবশ্যই পীড়াদায়ক। কিন্তু বর্তমান সামাজিক অবক্ষয় যদি নিশ্চিত সত্য হয়, তবে এখন প্রকৃত প্রয়োজন বিশ্লেষণ এবং পথ-নির্দেশের। আমাদের স্বাধীনতালাভ পৃথিবীর ইতিহাসের অপ্রতিহত অখণ্ড স্রোত-প্রবাহের একটি নগণ্য উৎক্ষেপ মাত্র—প্রকৃতপক্ষে ঐ সময়ে আমাদের দেশ তথা সমাজ, বিশাল বিশ্বের সামগ্রিক পটভূমিকায় সর্বপ্রথম স্ব-মর্যাদায় আত্মপ্রকাশ করল।

আজকে যারা' তরুণ অথবা নব-যুবক, তাদের পিতা-মাতারা স্বাধীনতার মুহূর্তে ছিলেন পূর্ণ যৌবনের অধিকারী; অবশ্য আজ যাঁরা ষাট-সত্তর, তাঁদেরও শেষদিকের সন্তান-সন্ততি বর্তমানে যৌবনের দ্বারে উপনীত। এ-যুগের তরুণ-শক্তির পিতা-মাতার চরিত্র গঠন করেছিলেন সে যুগের দম্পতিরা, তাঁরা এক্ষণে সুপ্রাচীন। যদি বলি, সেই গতানুগতিকতার যুগের বাপ-মারা তাঁদের পুত্র-কন্যাদের সেদিন সামাজিক ও নাগরিক কর্তব্য শিক্ষা দিতে পারেন নি বলেই আজকের সমাজে এই অবক্ষয়, এই উচ্ছৃঙ্খলতা! আজ জনক-জননীরাও বিভ্রান্ত অপ্রস্তুত,—যুব-সমাজ নয় শুধু।

আজকের দিনে নবজাত শিশুকে জন্ম-ক্ষণ থেকেই নাগরিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। কিছু বৎসর পরেই সে ভোটাধিকার প্রাপ্ত হবে, তাকে সেই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা সংগ্রহ করে নিতে হবে। (শিক্ষাটা আমাদের সংবিধান অনুযায়ী ভোটাধিকারের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়।। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে লালিত-পালিত পিতামহ-পিতামহীরা কি তাঁদের নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে এই নাগরিক দায়িত্ব সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার পাঠ দিতে পেরে-ছিলেন, যে আজকের পিতামাতারা তাঁদের ছেলেমেয়েদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে পারবেন? যদি সর্ববিধ সামাজিক রাজ-নৈতিক ঝঞ্ঝাট থেকে শতহস্ত দূরে থাকাই সুনাগরিকতার লক্ষণ হয়, তবে অবশ্যই বৃদ্ধ পিতামহের দল বলতে পারে, আমাদের সন্তানেরা ছিল সুবোধ সুশীল, কিন্তু আজকের পটভূমিকায় কি সেটা সম্ভব না বাঞ্ছনীয়? আমি বলব এ-যুগের পিতা-মাতারাই স্বাধীন নাগরিকত্বের দাবী পূর্ণ করতে পারছেন না, তাই তাঁরা সুনাগরিক সৃষ্টি করতেও অপারগ হচ্ছেন। পুরোন পৈত্রিক অনুশাসন এবং নব-যুগের হঠাৎ আলোর ঝলকানির মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে পারছেন না তাঁরা; বৈষয়িক ব্যাপারেও তাঁদেরই এখনও অগ্রাধিকার, অন্যায়-অনা-চারও তাঁদেরই আশ্রয় করেছে। তরুণসমাজ তাদের আদর্শ নিজেরাই খুঁজে নিতে বাধ্য হচ্ছে—ঠেকে শিখছে বলে ভুলও করছে। স্বাধিকার এবং স্বাধীন চিন্তাই আজকের মূলমন্ত্র। পিতামহ কোন একান্নবর্তী পরি-বারের শিরোমণি ছিলেন, নিয়মিত চাকরী করেছেন, ছেলেপুলে মানুষ করেছেন, সেই ছেলেমেয়েরা আবার নিরুপদ্রবে লেখাপড়া শেষ করে সংসারের গড্ডালিকা প্রবাহে মিশে গেছে, সেই পুরোন নজির এখন আর খাটছে না (দোহাই! সর্বযুগেই দু-চারজন যুগান্তকারী অতি-মানবের আবির্ভাব হয়, সেকথা ভুলবেন না)।

আজকের ছেলেমেয়েদের চেতনা খোলা তরবারির মত শাণিত, উদাত্ত। সারা পৃথিবীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজ-নৈতিক চিন্তাধারার অগণিত স্রোত অবিরাম আছাড় খাচ্ছে এসে তাদের হৃদয়-উপকূলে। জন-সংযোগের যন্ত্রগুলির মাধ্যমে নতুন চিন্তা-ভাবনা, রুচি, নীতির সংঘাত মুহূর্তে মধ্যে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে। সর্বোপরি অস্বীকার করলে চলবে না এ-যুগে রাজ-নীতি সংবিধানসম্মত অন্যতম উত্তম বৃত্তি, গুরু সৃষ্টি হলে চেলারও আবশ্যক হয়। তাই নব-যুগের এই অস্থিরতার, চিরন্তন মূল্যবোধের অনিয়মের জন্য দায়ী সকলেই, ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই। আবার হয়তো এই বিভ্রান্তির মধ্য থেকেই অঙ্কুরিত হবে নবীন আশা।

উষা মুখোপাধ্যায়
কোরাপেট, গুন্টুর (অন্ধ্রপ্রদেশ)

কারাগারে নজরুল প্রসঙ্গে

আপনার বহুলপ্রচারিত 'অমৃতে' নজরুল সম্পর্কে যে রচনাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কবি-সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত জীবনের দুষ্প্রাপ্য তথ্যগুলির মানবিক মূল্য ছাড়াও একটি সাহিত্যগত মূল্য আছে। কোন্ ঘটনাটি কবি-জীবনের কোন্ দিকটিকে উজ্জ্বল করেছে, কোন্‌টির প্রভাব তাঁর সমস্ত কবি-সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে—এসব জানার জন্য কবির ব্যক্তিগত জীবন-চরিতের মূল্য অপরিসীম। সেদিক থেকে অজ্ঞাত-দিকের উপর আলোকপাত করার যে ব্যবস্থা আপনি করেছেন, তার জন্য সাহিত্য-প্রিয় প্রতিটি ব্যক্তিই আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকবে। লেখককেও ধন্যবাদ জানাই—তিনি একটি সাহিত্যিক দলিল সৃষ্টি করছেন।

আবুল হাসনাত
মাড়গ্রাম, বীরভূম।

(২)

আমি আপনার বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'অমৃত"র একনিষ্ঠ পাঠক। 'অমৃত'র গল্প, কবিতা, ধারাবাহিক রচনাদি সাগ্রহে পড়ি। 'অমৃতে'র প্রতিটি বিভাগের রচনা পড়ে আমি খুবই মুগ্ধ হই। আপনার এই পত্রিকা একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সার্থক সাহিত্য-পত্রিকা একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই।

'অমৃত' ছাড়াও আমি আরো কয়েকখানি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা পড়ি। কিন্তু 'অমৃত'কেই আমি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রগতি-শীল, প্রীতিদায়ক বলে মনে করি।

সম্প্রতি সাপ্তাহিক 'অমৃতে' ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর "নজরুলের সঙ্গে কারাগারে" শীর্ষক ধারা-বাহিক রচনাটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক লাগলো। তিনি নিজে কাজীর সঙ্গে কারাগারে ছিলেন। তাই সুনিপুণরূপে কাজীর উদার অন্তহীন প্রাণপ্রাচুর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। কাজী প্রকৃতই ছিলেন "বাঙালী কবি, কাজী বাঙালী মরমী প্রেমিক, কাজী বিদ্রোহী বাঙলার মুখর বন্দনা"। আডি সাহেব (ডব্লিউ এস আডি) আই-সি-এস এবং বাঙলার—জাতিতে আইরিশ। বাঙালীর প্রতি তাঁর যে দরদ তা দেখে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। বাঙালী মরমী কবির একটি অধ্যায় লেখক দরদী মন নিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তাঁকে আমি অভি-নন্দন জানাই। লেখকের রচনাভঙ্গী প্রশংসনীয়।

রাধানাথ রায়
ঝাণ্ডাপাড়া, পুরুলিয়া।

ভুবন সোম

'ভুবন সোমের' মত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছবি এদেশে সাম্প্রতিক কালের মধ্যে নির্মিত হয় নি। ছবিটি মূলতঃ হিন্দী ছবি হলেও গুজরাটী ও বাংলা ভাষা যত্র-তত্র ব্যবহৃত হয়েছে। হিন্দী ছবি হলেও হিন্দী চলচ্চিত্র-শিল্পের ওপর এর কতটা প্রভাব পড়বে বলতে পারি না, তবে একথা বোধহয় নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে বাংলা ছবির ওপর ভুবন সোমের ব্যাপক প্রভাব পড়বে। এমনকি বাংলা ছবির ক্ষেত্রে যদি যুগান্তর আনে তাও আশ্চর্য হবার নয়। যে অর্থে বড়ুয়ার 'দেবদাস' বা সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'কে যুগান্তকারী ছবি বলা হয়ে থাকে, 'ভুবন সোম'ও সে অর্থে একটি যুগান্তকারী ছবি।

পথের পাঁচালীর পর থেকে শিল্পরস-সমৃদ্ধ বাংলা ছবিগুলি একটি বিশেষ ধারা অনুসরণ করে আসছিল। 'বাইশে শ্রাবণ' থেকে মৃণাল সেনও মোটামুটি ভাবে সেই ধারারই অনুসারী ছিলেন। ভুবন সোমে তিনি সেই ধারা থেকে মুক্ত হয়ে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন বলা চলে। অবশ্য হয়ত তাঁর আগের ছবি উড়িয়া ভাষায় তোলা 'মাটির মনিষ' থেকেই এই প্রতিসরণ ঘটেছে। কিন্তু সে ছবিটি দেখার সুযোগ হয়নি।

কার্টুনের মাধ্যমে সোম সাহেবের কর্ম-ব্যস্ততা দেখানো বা পক্ষীতত্ত্ব পড়ার সময় পাখীর ঝটপটানি বেশ বলিষ্ঠ এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রকাশের পদ্ধতি মনে হ'ল। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করেছেন। যেমন সূত্রধরের নেপথ্যকন্ঠ দর্শকদের উদ্দেশ্যেই সোচ্চার হয়, চিত্রের চরিত্রদের সে কন্ঠ শুনতে পাবার কথা নয়। কিন্তু ভুবন সোমে দেখি নেপথ্য কন্ঠ যখন হিন্দীতে বলতে থাকে যে সোম সাহেবের শিকারের শখ হয়েছে, তখন সোম সাহেব বলে ওঠেন 'শখ না শৌখ'। অথচ পরি-স্থিতিটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মনে হয় না কারণ তৎক্ষণাৎ দর্শকরা ঢুকে পড়েছেন ছবির মধ্যে আর সোম সাহেব এসে গেছেন দর্শকদের মধ্যে।

চলচ্চিত্রের জন্মকাল থেকেই বোধহয় এই রীতি পালন করা হচ্ছে যে ছবির কাহিনীতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন দেখাতে হবে। এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না, যে-ধরণেরই কাহিনী হোক। প্রথম ব্যতিক্রম বোধহয় ভুবন সোম। দুষ্টের পালনের মাধ্যমেই কট্টর নিষ্ঠাবান দৃঢ়চরিত্র এবং ভীষণরকম সৎ অফিসার সোম সাহেব তাঁর চরিত্রের সমতা ফিরে পাওয়ায়, ব্যালান্স ফিরে পাওয়ায়, পূর্ণতর হয়ে ওঠার সম্ভা-বনার প্রমাণ দিল্যে।

বাংলাদেশের পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্র-নাথ, বিবেকানন্দ, রবিশঙ্করের সঙ্গে সম-সাময়িক সহযোগী চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভার স্বীকৃতিও শ্রীসেনের প্রকৃত শিল্পী-সুলভ মনের পরিচয় বহন করে।

শ্রীমৃণাল সেন আবার বাংলা চিত্রজগতে ফিরে আসবেন এই কামনা করব।

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা—১৯।

মানুষ গড়ার ইতিকথা

অমৃতের **২১শে নভেম্বর '৬৯** সংখ্যায় মানুষ গড়ার ইতিকথা এই পর্যায়ে লেখায় বিস্মৃতপ্রায় স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের মহান্ আদর্শ, এ দেশীয় লোকের প্রতি সুগভীর মমত্ব এবং মানুষগড়ায় তার সার্থক প্রচেষ্টার কথা এমন সুন্দরভাবে আপনারা তুলে ধরেছেন, এতে যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা লিখে জানাতে পারছি না। আজকের দিনে স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনকে ও তাঁর সুমহান কর্মকান্ডকে সকলে জানুক, এ আকাঙ্ক্ষা বহু লোকের। তাই আপনাদের অনুরোধ জানিয়েছিলাম পত্র মারফত। আশংকা ছিল, উত্তর পাবনা। কিন্তু অপরিচিতির গন্ডী এড়িয়ে অশেষ কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে এই দুর্গম অঞ্চলে আপনাদের প্রতিনিধি এসেছিলেন এবং স্বল্প সময়ের আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে স্যার ড্যানিয়েলের আদর্শময় কর্মযজ্ঞের সঠিক মূল্যায়ন তাঁর লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, এ সত্যি বিস্ময়কর। ধন্যবাদ জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

ঋষিকল্প শিক্ষাব্রতী, যাঁরা উৎসর্গীকৃত জীবন নিয়ে এ স্কুলে গোড়ার দিকে কাজ করে গেছেন—প্রমোদবাবু, গোপালবাবু—তাঁদের কথা আপনারা চমৎকার করে তুলে ধরেছেন। তাঁরা তো হারিয়েই গিয়েছিলেন। কী স্বীকৃতি তাঁরা পেয়েছিলেন? তাঁরা সে সময় যে মালমসলা নিয়ে মানুষগড়ার কাজে হাত দিয়েছিলেন, তাতে স্কুলে কোন মেরিট বোর্ড স্থাপন করা সম্ভবপর হয়নি, হতে পারেও না। শিক্ষার ঐতিহ্য গড়ে উঠতে সময় লাগে। (তবে এখানেও ফুল ফুটবে সে সূচনা আমি দেখেছি। গত ১৯৬৬ সনে সর্বপ্রথম এই স্কুলের, এখানকার কৃষক পরিবারের একটি ছেলে জাতীয় বৃত্তি লাভ করেছে)। শ্রীসন্দিৎসুর এই পর্যায়ের প্রতিটি লেখায় লক্ষ্য করেছি, বিস্মৃতির নিঃসীম অন্ধকার থেকে এসব অমূল্যনিধি মানুষ-গড়ার কারিগরদের তিনি খুঁজে বের করেছেন। ভবিষ্যতে আমাদের দেশ এসব রত্ন আর কোন দিন পাবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। তাই মনে করি, তাঁর এই পর্যায়ের সমস্ত লেখা গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং সে বই উপ-পাঠ্যরূপে বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া উচিত।

তাঁর লেখায় সাংবাদিকতা ও সাহিত্যি-কতার অপূর্ব সংমিলন হয়েছে। এই পর্যায়ে এত লিখেছেন, তবু একঘেয়েমি তো নেইই, বরং প্রতিটি লেখাই সাহিত্যিকতার রসায়নে অভিনব বস্তু হয়ে উঠছে। তাঁর সার্থক লেখনীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সর্বশেষে অমৃতের সম্পাদক মহাশয়কে পুনরায় শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তাঁর পত্রিকাকে এভাবে বৈচিত্র্যময় বস্তুসম্ভারে ভূষিত করে তুলেছেন বলে।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রধান শিক্ষক,
গোসাবা আর আর আই, গোসাবা, ২৪ পরগণা।

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

'অমৃত'র মাধ্যমে 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি'র মত উপভোগ্য স্মৃতিচারণ উপহার দেবার জন্য নাট্যামোদী মাত্রেই পত্রিকা-কর্তৃপক্ষ এবং লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। নাট্যশালার ইতিহাসের উপাদান হিসাবেও রচনাটি মূল্যবান, সেই কারণে স্মৃতিচারণে উল্লেখিত একটি তথ্যের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

২৯শ সংখ্যা (১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬)-য় শ্রীযুক্ত চৌধুরী লিখেছেন :—"'পরদেশী' নাটকটি লিখেছিলেন পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বলে এক ভদ্রলোক।...... ইটালিয়ান অপেরা 'রিগোলিটো'র গল্প বললাম কথায় কথায়।...... পঞ্চাননবাবু ঐ 'রিগোলিটো'র গল্পকেই অনুসরণ করে নাটক লিখলেন 'আরবী হুর'।"

কিন্তু আমরা যতদূর জানি, ১৯১৮ ২৫শে ডিসেম্বর মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত অপেরা 'পরদেশী'র নাট্যকার পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—পঞ্চানন বন্দ্যো-পাধ্যায় নন। আর এই পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় ভিক্টর হুগো'র 'The King's Amusement' নাটকের অনুসরণে 'আরবী হুর' লিখে-ছিলেন—'রিগোলিটো'র গল্প অবলম্বনে নয়। ২৮শে পৌষ, ১৩৩৪ তারিখের 'নাচঘর' পত্রিকার অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে পরিষ্কার বলা হয়েছিলঃ— "হুগোর" 'The King's Amusement' নামক পৃথিবী-বিখ্যাত নাটকখানি অবলম্বন করে "আরবী হুর" রচিত।" সেকালে কেউ কেউ অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কেই এই নাটকের রচয়িতা বলে অনুমান করেছিলেন। 'নাচঘর', 'আত্মশক্তি' প্রভৃতি অধুনালুপ্ত পত্রিকার পুরনো ফাইল ঘাঁটলে এসব তথ্যের সন্ধান মিলবে। সে যাইহোক, 'আরবী হুর'-এর স্রষ্টা হিসাবে কোন পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় নন—পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ই সেকালের পত্র-পত্রিকায় উল্লেখিত।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী একজন পাঠক হিসাবে প্রকৃত তথ্য জানতে ইচ্ছা করি। কেবল অভিনেতারূপেই নয়, নাট্যবোদ্ধার পরিচিতিতে শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী আমাদের শ্রদ্ধাভাজন। তাঁর মনীষা আমাদের জ্ঞান-ভান্ডারকে সমৃদ্ধতর করুক—এই প্রার্থনা।

শিশির বসু,
কাঁচরাপাড়া,
২৪ পরগণা।

সাদা চোখে

আবার ট্রাম-বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব উঠেছে। উদ্দেশ্য — সরকারী পরিবহণ ব্যবস্থায় ক্রমশ যে ঘাটতি বেড়ে চলেছে তা পূরণ করা। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় এক দফা আলোচনা হয়েছে। সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন হয়েছে বলে আলোচনা গড়িয়ে যুক্তফ্রণ্ট কমিটিতে এসেছে। ক্রমবর্ধমান ঘাটতি পূরণ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে পরিবহণমন্ত্রী শ্রীআবদুল্লা রসুল স্বয়ং তিন দফা প্রস্তাব ফ্রণ্টের বৈঠকে পেশ করেছেন। রসুলসাহেব প্রথমে সরকারী তহবিল থেকে সাহায্য দিয়ে সমস্ত ঘাটতি পূরণের কথা বলেছেন, না হলে প্রতি স্তরে পাঁচ পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি করে এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের উপায় নির্দেশ করেছেন। এই দুই ওষুধের কোনটাই প্রয়োগ না করা গেলে ধার নেবার কথা বলেছেন।

প্রথম প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয় বলে অর্থমন্ত্রী হিসাবে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি দৃঢ়তার সঙ্গে ফ্রণ্ট ও মন্ত্রিসভার বৈঠকে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হল, ইতিমধ্যেই অর্থের অভাবে বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজ সীমিত করতে হয়েছে। আর যে পরিমাণ অর্থ রাজ্যের উন্নয়ন কাজের জন্যে বরাদ্দ আছে তা যদি কলকাতা মহানগরীর রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ব্যবস্থার ঘাটতি পূরণের জন্য ব্যয়িত হয়ে যায় তবে পল্লীবাংলার আমজনতা ফ্রণ্টের অস্তিত্ব বিলোপ করে দিতে কোমর বেঁধে এগিয়ে আসবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন ফ্রণ্টের বিভিন্ন শরিকগণ। করারই কথা। কারণ, এক পয়সা ট্রাম-ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কী তুলকালাম কাণ্ডই না এঁরা করেছিলেন। সেদিনের শহীদের নামে শপথ নিয়েই ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গদীতে আসীন হয়েছেন। তদুপরি রাজ্যপালের শাসনকালে ট্রাম-ভাড়া বৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করেছিল বর্তমান যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রীরাই। মধ্যবর্তী নির্বাচনে গভর্নরকে জনতার পকেট কাটতে দেবেন না বলে এই ত সেদিন মুষ্টিবদ্ধ হাত নীলাকাশে ছুঁড়ে দিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন এই যুক্তফ্রণ্ট নেতৃবৃন্দ। গভর্নর অবশ্য ভাড়া বৃদ্ধি করেছিলেন। তবে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য গদীতে বসে ফ্রণ্ট ভাড়ার হার একটু কমিয়ে দিয়েছিলেন। নিয়তির পরিহাস এই যে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য-মন্ত্রী শ্রীআবদুল্লা রসুলকেই অবশেষে একেবারে প্রতি স্তরে পাঁচ পয়সা করে ভাড়া বৃদ্ধি করার জন্য প্রস্তাব রাখতে হয়েছে। যদিও সমদর্শী আগেই মন্তব্য করেছিল, তবু আবার শ্রীজ্যোতি বসুর অনুসরণে বলা যাক— বিচিত্র এই দেশ, সেলুকাস!

এই সব প্রস্তাবের মধ্যেও রাজনীতি আছে। কারণ যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে বর্তমানে যে লড়াই চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর সরকারী তহবিল থেকে অনুদানের অস্বীকৃতি কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির কাজে অনেকখানি সহায়তা করবে। মন্ত্রিমণ্ডলী যে যৌথ দায়িত্ব পালন করেন এ-কথা বুঝেও না বোঝার ভান করে প্রচার চালালে সমস্ত অসত্যই কালে সত্যের রূপ নিয়ে দাঁড়াবে। ইতিমধ্যেই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করার ফ্রণ্টের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এবং শিক্ষকদের পরিবর্তিত বেতন-হার চালু করার প্রশ্নে অর্থমন্ত্রীকেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। সোজাসুজি না হলেও পরোক্ষভাবে তহবিল জোগানোর ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে গড়িমসি করার দায়ে সোপর্দ করা হয়েছে। অবশ্য এ-জিনিস ঘটত না, বা এই অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হত না, যদি যুক্তফ্রণ্টের আভ্যন্তরীণ কলহ তুঙ্গে গিয়ে না পৌঁছত। বর্তমানে ফ্রণ্ট ভেঙে যাবে এই ভয়ে অনেক শরিক ভীত হয়ে পড়েছেন। ফলে কৌশল করে বোধহয় মুখ্যমন্ত্রীকে সঠিক পথে চালাবার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে।

সহৃদয় পাঠকরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, প্রবীণ কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীআবদুল্লা রেজ্জাক খাঁ ইতিমধ্যে আমেরিকান সেবা-সংস্থা Care -এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে সাহায্য বন্টনের প্রস্তাব করেছেন। অন্য কোন মন্ত্রী এই প্রস্তাব করলে এতদিনে আন্দোলনের ঝড় বয়ে যেত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, আমেরিকাবাসী আকাশপথে উড়ে গেলে মাটিতে দাঁড়িয়ে বামপন্থীরা মুষ্টিবদ্ধ হাত আন্দোলিত করে ভয় দেখাতে কসুর করেন না, অথচ সেই বামপন্থীদেরই অগ্রজ-প্রতিম খাঁসাহেব এমনি একটি প্রস্তাব করে বসলেন কেন? Care -কে যে পরিমাণ সরকারী অর্থ দেওয়া হয়, সেই পরিমাণ অনুদান তাঁরা নিজস্ব তহবিল থেকে দিয়ে নাকি সেবাকার্য করে থাকেন ঐ সংস্থা। খাঁসাহেব বলেছেন, এবারে গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতমজুর বা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বেকারী নাকি অসম্ভব বেড়ে গেছে। ফসল কাটার মরশুমে আগে জন-মজুরদের সাময়িকভাবে অন্তত কাজের অভাব হত না। যুদ্ধের সময় সাধারণত বেকারী থাকে না। সকলেরই কাজের সংস্থান হয়ে যায়। কিন্তু এবার গ্রামাঞ্চলে যে শ্রেণীসংগ্রাম হল তাতে নাকি বেকারীর সংখ্যা সীমাহীনভাবে বেড়ে গেছে। অর্থাৎ যাদের সামান্য জমিও আছে তাঁরা জনমজুরের উপর নির্ভর না করে নিজেরাই ফসল কেটে গোলাজাত করেছেন। কেননা, তাঁদের মধ্যে নাকি এই ভয় হয়েছিল যে, অন্য লোককে ফসল কাটতে দিলেই প্রকৃত মালিককে তা জমা না দিয়ে নিজেরাই ঘরে তুলে ফেলবে। খাঁসাহেব বলেছেন, জেলা-অধিকর্তাদের কাছ থেকে প্রচুর তারবার্তা বা 'Sos' এসেছে অবিলম্বে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য। খাঁসাহেব তাই ত্রাণমন্ত্রী হিসাবে এই প্রস্তাব করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এই খাতে যে সরকারী অর্থ বরাদ্দ করা আছে তা এই অভাবনীয় অবস্থার নিরসনের পক্ষে নিতান্তই সামান্য। তদুপরি সরকারী তহবিলের এমনই দৈন্যদশা যে বাড়তি সাহায্য পাওয়া একেবারে অসম্ভব। কিন্তু Care-এর সাহায্য পেয়ে যদি প্রলিতেরিয়েতরা আমেরিকামুখী হয়ে পড়েন, তবে 'দেশের হইবে কি'?

এদিকে আবার সরকারী কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ কমিশনের রায় বেরুবার দিন সমাগত। এই নিবন্ধ প্রকাশিত হবার কয়েকদিনের মধ্যেই কমিশন-রিপোর্ট আলোকপ্রাপ্ত হবে বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল। সেই রায়ে নাকি আর এক দফা বেতন বাড়াবার সুপারিশ করা হয়েছে। অনেক আগেই এই রায় বেরুবার কথা ছিল। কিন্তু হয়নি। যতদূর জানতে পারা গেছে প্রথমে নাকি একটি খসড়া প্রস্তুত হয়েছিল এবং সেই খসড়া প্রস্তাবে মনোহারী বেতন-হার নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল নাকি যদি ফ্রণ্ট মধ্যবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতায় না আসতে পারে তবে রায় প্রকাশ করে দিয়ে সরকারকে কার্যকর করার জন্য চাপ দিয়ে নাজেহাল করা যাবে এবং কর্মচারীদের মধ্যেও সংগঠনকে আরও মজবুত করে সংগ্রামের হাতিয়ারকে অধিকতর শাণিত করা যাবে। কিন্তু ফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার ফলে কমিশন সদস্যদের নাকি দ্বিতীয়বার চিন্তা করে রায়ের সুপারিশ অনেকটা পরিবর্তন করতে হয়েছে। কেননা, এখন রায় কার্যকর করার ভার তাঁদেরই উপর যাঁরা উত্তাল আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নেপথ্যে কোমর বাঁধছিলেন। তবে শোনা যাচ্ছে যে সুপারিশ আলোকে আসার অপেক্ষায় আছে তা চালু করতেও সরকারকে হিমসিম খেতে হবে। অবশ্য, অর্থমন্ত্রী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী যদি আরও কোটি কোটি গ্রাম-বাংলার

মানুষ ও অ-সরকারী শ্রমজীবীর কথা ভেবে বেতন কমিশন সুপারিশ চালু করতে কোন দ্বিধা করেন তবে কর্মচারীরা অন্য সমস্ত মন্ত্রীদের রেহাই দিলেও তাঁকে ছাড়বেন না। এ-কথা বর্তমান ফ্রন্ট রাজনীতির অবস্থা বিশ্লেষণ করে হলফ করে বলা যায়।

একদিকে ক্রমাগত ব্যয় বাড়ছে, আর বাড়বার ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে চলেছে। অন্যদিকে তহবিল বাড়ন্ত। এই উভয়সংকট থেকে মুক্তি পাবার আপাতত দুটি রাস্তা। এক, করবৃদ্ধি করে তহবিল বৃদ্ধি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে সাহায্যের অঙ্ক বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান করা। কিন্তু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে দুটিই প্রায় অসম্ভব।

প্রথমেই রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করা যাক। সকলের অবশ্যই মনে আছে, যুক্তফ্রন্ট গদীতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সকল শরিক কেন্দ্র থেকে সাহায্য আদায়ের ও কিছু সংবিধানগত পরিবর্তনের দাবী তুলে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছিলেন। সংবিধানগত পরিবর্তনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল যাতে রাজ্য সরকার আভ্যন্তরীণ ধন সৃষ্টি করে জনকল্যাণের জন্য অর্থ সংগ্রহে সক্ষম হতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে শরিকী লড়াই যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, তাতে একযোগে আন্দোলন গড়ে তোলা খুবই কঠিন। তাছাড়া সর্বভারতীয় রাজনীতিতে পটপরিবর্তনের ফলে ফ্রন্টের সমস্ত শরিক এই প্রশ্নে ঐক্যমতে আসতে পারবেন কিনা সন্দেহ। অনেক অংশীদার ইতিমধ্যেই ইন্দিরাজীর গাড়িতে উঠে পড়েছেন। কাজেই তাঁরা ইন্দিরাজীর সরকারের 'ভ্রাতৃত্বমূলক' সমালোচনার স্তর পর্যন্ত যেতে পারেন। একেবারে আন্দোলনে নেমে পড়া একেবারেই সম্ভব নয় বলে অনুমিত হয়। কারণ আন্দোলনের একটা গতিপ্রকৃতি বা মেকানিজম থাকে। একবার শুরু করলে বাধা দিলেও একটি সফল পরিণতির দিকে এগুতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সমস্যারও সৃষ্টি করে। পশ্চিমবাংলার স্বার্থে এই আন্দোলন সৃষ্ট হলে লোকসভায় এর প্রভাব পড়তে বাধ্য। কাজেই ইন্দিরাজীর সরকার যদি পশ্চিমবঙ্গের দাবী অগ্রাহ্য করেন তখন ফ্রন্টের শরিকদের লজিক্যাল কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে ইন্দিরাজীর সরকারকে গদীচ্যুত করা। ঐখানেই যত গণ্ডগোল। কারণ, ইন্দিরাজীর সরকারকে গদীতে আসীন রাখবার জন্য অনেকেই ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছেন। তবে অবশ্য অনেকে বলতে পারেন সেই প্রতিশ্রুতি একেবারে শর্তহীন নয়। কিন্তু একথাও সত্য, একটা রাজ্যের দাবী-দাওয়ার জন্য গোটা ভারতের বুকে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার সুযোগ করে দেওয়া যায় না। এবং এই তত্ত্বগত বক্তব্য পেশ করেই অনেক শরিক আন্দোলনের সেই সিংহদ্বার থেকে ফিরে আসবেন। এসত্ত্বেও যদি আন্দোলন হয়, তবে তা 'ছায়া মুষ্টিযুদ্ধ' ছাড়া আর কিছুই হবে না। যাতে বামপন্থার মর্যাদাও রক্ষিত হয়, আর অন্যদিকে জনসাধারণকেও বোঝান যায়। কাজেই এই পন্থায় বিশেষ কিছু হবে বলে মনে করা ঠিক হবে না। অবশ্য কেন্দ্র থেকে কিছু পাওয়া যাবে না এমন নয়। কারণ ইন্দিরাজীকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য কিছু কিছু অনুদান দিতে হবে, যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে। আর আর্থিক সাহায্য কিছু এলেও তা কোনক্রমেই তামিলনাড়ুর সমতুল্য হবে না, ডি এম কে দল সেইদিক থেকে একটু সুবিধাজনক অবস্থায় আছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন রয়ে গেল, কর বৃদ্ধি করে তহবিল বাড়ানো। সেই পরিকল্পনা সফল করা যেত যদি সব শরিকরা ঐক্যবদ্ধ থাকতেন। প্রস্তাব এলেই সস্তায় বাজীমাৎ করার জন্য তখনই অনেকে প্রথমে বিবৃতি —পরে ময়দানে নেমে পড়বেন। কর আদায় করে আনুপাতিক মঙ্গলজনক কর্মকাণ্ড যদি সরকারের তরফ থেকে করা হতো, কিম্বা হবে এমনিতর আশা জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি করা যায়, তবে করবৃদ্ধির প্রস্তাব কোনক্রমেই আম-জনতার আশীর্বাদ লাভে বঞ্চিত হবে না। এখন পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার মানুষ মোটামুটি ঐক্যবদ্ধও আছে। যুক্তফ্রন্টের গদীলাভ তারই সার্থক নিদর্শন। কাজেই ফ্রন্ট সরকার যদি জনতার এই বিশ্বাসকে মূলধন করে এগিয়ে যান ঐক্যবদ্ধভাবে তবে মানুষ যে আরও দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নেবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তদুপরি বাধা দেওয়ার মত অন্য কোন রাজনৈতিক দলও এই রাজ্যে নেই। দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেস প্রতিশোধ গ্রহণে অক্ষম। নতুবা বামপন্থীরা এরকম প্রস্তাব আগে এলে যেভাবে ময়দানে মহড়া নিতেন, কংগ্রেসও সেইভাবে নেমে প্রতিপক্ষকে পুরোপুরি না হোক অন্তত কিছুটা বেকায়দায় ফেলতে পারতেন। কিন্তু বর্তমানে তা আদৌ সম্ভব নয়। মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর কংগ্রেস এই রাজ্যে হীনবল হয়ে পড়েছিল। এখন তো আর কথাই নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফ্রন্ট নতুন কর বসাবার ব্যাপারে অগ্রণী হতে পারবেন না। কারণ অন্তর্দ্বন্দ্ব। অবশ্য চক্ষুলজ্জাও খানিকটা বাধ সাধবে বইকি! এতদিন কর বাড়ানোর বিরুদ্ধে এত আন্দোলন করে, এত শহীদ বানিয়ে, এখন নিজেরাই তা আর কোন্ মুখে করতে যান!

অন্যদিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আম-জনতারও নাভিশ্বাস উঠেছে। চালের দাম একটু কমলেও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম একেবারে আকাশচুম্বী। এমন জমানো শীতের মরশুমেও তরি-তরকারির দাম আগের বছরগুলোর চাইতে অনেক বেশী। আবার মশলা, লঙ্কা মায় হলুদ পর্যন্ত এখন সর্বকালের রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছে। কাজেই শ্রমজীবী মানুষ আন্দোলন করে হোক বা যুক্তফ্রন্টের দৌলতেই হোক যে-কয়টি পয়সা পেয়েছে তা আবার গড়গড়িয়ে অন্যের পকেটে চলে যাচ্ছে। আর সেই খেটে-খাওয়া মানুষেগুলোর অবস্থা যথাপূর্বং তথা পরম্। অন্যদিকে যাঁরা মধ্যবিত্ত বলে পরিচিত তাঁদের ত আর কথাই নেই। একটু যদি মাইনের অঙ্ক মোটা হয় অমনি একেবারে আয়করের খাঁড়া গোড়াতে নেমে আসছে। একটু যে ফাঁকি দিয়ে দুটো বাড়তি পয়সা আনবে সেরকমও সুবিধে নেই। অবশ্য আশার কথা এই যে এঁরাও শ্রেণীগত চরিত্র হারিয়ে ক্রমেই সেই একই শ্রেণী অর্থাৎ সর্বহারা হয়ে পড়ছেন। এর উপর যদি ট্রাম-বাসের ভাড়া বৃদ্ধি হয় এবং নতুন করের বোঝা চাপে তবে ত সোনায় সোহাগা।

চিন্তা করবার বিষয়, সত্যিই কিভাবে এই গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে 'কৃষক বিপ্লবের' কথা বলে সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া যেত যদি যুক্তফ্রন্ট গদীতে আসীন না থাকতেন। কিন্তু গদীতে থাকার অর্থই হচ্ছে জন-মঙ্গলের জন্য কিছু না কিছু করা। তা যদি করতে না পারা যায় তবে গণদেবতা বিমুখ হতে বাধ্য। আর আম-জনতা মুখ ফেরানোর অর্থই হচ্ছে নির্বাচনে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া। আর গণ-আশীর্বাদপুষ্ট না হয়ে অন্য কিছু করার অর্থই হচ্ছে হঠকারিতার প্রশ্রয় দেওয়া।

কাজেই পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্টের সামনে ঘটনার পরিবেশ এক ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যখন ফ্রন্টের মধ্যে লৌহকঠিন ঐক্য প্রয়োজন তখন হানাহানিতে মেতে উঠেছেন অংশীদারগণ। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করলে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক দলের পক্ষেও এর মোকাবিলা করা যে শক্ত তা বিলক্ষণ বোঝা যায়। কিন্তু চৌদ্দটা দলের যেখানে সরকার সেখানে যদি একটুও ঐক্য বজায় না থাকে তবে রাজ্যে মাৎস্যন্যায় ছাড়া আর কি ঘটতে পারে? পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা যে দ্রুত সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যই তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন জানেন। যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মনে রাখা ভালো, জনতা কারও মৌরসী পাট্টার দখলে নয়। তাদেরও বিবেকবুদ্ধি আছে। শুধু ফ্রন্টই যা করছেন তাই ঠিক একথা আর কিছুদিন গেলে মানুষ শুনতে রাজী হবে কিনা তাতে সন্দেহ আছে। কারণ রিহার্সাল থেকেই বোঝা যায় অভিনেতার কতটুকু পটুতা আছে। স্টেজে মেরে-দেওয়া অত সহজ ব্যাপার নয়! সময় এখনও আছে। ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে সমস্যার সম্মুখীন হলে সমাধান না করতে পারলেও জনসাধারণ ক্ষমসুন্দর চোখে অকৃতকার্যতাকে মেনে নেবে। কিন্তু আদর্শের বাগাড়ম্বরের মাধ্যমে আন্তরিকতার অভাব ও অকর্মণ্যতাকে ঢেকে রাখা যায় না। সত্য আলোকে আসবেই। প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনতাকে সঙ্গে নেওয়ার পর তাদের জীবনকে আরো বেশি সমস্যাসঙ্কুল করে তুললে ইতিহাস ক্ষমা করবে কি?

—সমদর্শী

দেশেবিদেশে

গান্ধীনগরে ধূলিঝড়

গুজরাটের বর্তমান রাজধানী আমেদাবাদ থেকে প্রায় ১৮ মাইল দূরে নূতন যে রাজধানী শহর গড়ে উঠছে তার নাম দেওয়া হয়েছে গান্ধীনগর। ঐ গান্ধীনগরে এবার বিরোধী কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল—যাকে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার গোষ্ঠী অভিহিত করেছেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৭৩তম অধিবেশন বলে।

খবরে প্রকাশ যে, নির্মাণাধীন এই শহরে লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েৎ বলতে গেলে একটা ধূলিঝড়ের সৃষ্টি করেছিল। পায়ে পায়ে ধূলো উড়ে এমন একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল যার মধ্য দিয়ে নজর করাই কঠিন হয়ে পড়েছিল। ঐ বিশাল, অপ্রত্যাশিত জনসমাবেশ গান্ধীনগর কংগ্রেসের উদ্যোক্তাদের সাফল্যের আনন্দে বিভোর করে রেখেছে আর সেই ধূলোর ঝড়ের মধ্য দিয়ে গান্ধীনগর কংগ্রেসের সঠিক মূল্যায়ণ করাও এখন পর্যন্ত কঠিন হয়ে রয়েছে।

তবে, যেটুকু লক্ষ্য করা গেছে তার ভিত্তিতে গান্ধীনগরের কংগ্রেস অধিবেশন সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় ইতিমধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। প্রথমত, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর এই প্রথম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নামে একটি অধিবেশন হল যার

জগজীবন রাম

মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা এবং জনতাকে আকৃষ্ট করার স্বাভাবিক ক্ষমতাসম্পন্ন নেতারা উপস্থিত ছিলেন না। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বার্ষিক কংগ্রেস অধিবেশনের জাঁকজমক যে অনেকখানি পরিমাণে সরকারী আনুকূল্য ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল হয়েছে সেটা কিছু গোপন কথা নয়। গান্ধীনগরের কংগ্রেস অধিবেশন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্য সম্পর্কে প্রশ্ন ছিল না আর শ্রীহিতেন্দ্র দেশাইয়ের রাজ্য সরকার যে এই অধিবেশনের আয়োজনে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। এই প্রথম প্রমাণ হল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়া শুধু রাজ্য সরকারের সাহায্য নিয়েই চিরাচরিত আড়ম্বরের ঐতিহ্য বজায় রেখে কংগ্রেসের অধিবেশন সম্পন্ন করা যায়। ভবিষ্যতের পক্ষে এই শিক্ষার একটা তাৎপর্য রয়েছে। আর জনসমাগমের দিক দিয়ে এই অধিবেশন যে সাফল্যলাভ করেছে তাতে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত হওয়ার কারণ আছে। পূর্ণোক্ত অধিবেশনে তিন লাখ মানুষ এসেছিলেন অথবা দশ লাখ মানুষ এসেছিলেন সেই বিতর্কটা কিছু বড় কথা নয়। এই অধিবেশনে যে একটা বৃহৎ জনসমাবেশ হয়েছিল তাতে কোনই সন্দেহ নেই। একথা অবশ্য ঠিক যে, যাঁরা ঐ অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছিলেন তাঁদের অনেককে উদ্যোক্তাদের অব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল এবং যানবাহনের অভাবে ফিরতে না পেরে যাঁরা খোলা জায়গায় শীতের রাত্রি কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা "মুর্দাবাদ" ধ্বনি দিয়েছিলেন। তাহলেও একথা মনে করার কারণ আছে যে, গান্ধীনগরে জনসমাগম সাংগঠনিক কংগ্রেসের নেতাদের প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। উৎসাহের আতিশয্যে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেছেন যে, তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এত বড় ও এতখানি উৎসাহদীপ্ত জনসমাবেশ আগে আর কখনও দেখেন নি। গুজরাট নিঃসন্দেহে পুরোনো কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। কিন্তু সেখানেও যে সাংগঠনিক কংগ্রেসের নামে লোক জমাবার এতখানি ক্ষমতা সংগঠনের নেতারা রাখেন তার চাক্ষুষ প্রমাণ হওয়ার দরকার ছিল।

দ্বিতীয়ত, গান্ধীনগর কংগ্রেসের অধিবেশন দেখিয়ে দিয়েছে যে, কতকগুলি রাজ্যে ঘাঁটি গাড়বার জন্য নয়া কংগ্রেসকে বিশেষ উদ্যোগী হতে হবে। তামিলনাড়ুর কংগ্রেসকর্মীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরাই লক্ষ্য করেছেন। তামিলনাড়ু থেকে প্রায় ৮০টি বাসে বোঝাই হয়ে হাজার পাঁচেক কংগ্রেসকর্মী গান্ধীনগরের অধিবেশনে এসেছেন। এতখানি দীর্ঘ পথ বাসে করে আসার যে ক্লেশ ও অসুবিধা তা অগ্রাহ্য করে এত অধিকসংখ্যক মানুষ যে এসেছেন তাতে তামিলনাড়ু কংগ্রেসের উপর শ্রীকামরাজের আধিপত্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। গান্ধীনগর কংগ্রেসে উপস্থিতি থেকে একথা প্রমাণ হয়েছে যে, মহীশূরে ও গুজরাটে কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নয়া কংগ্রেসের পক্ষে দন্তস্ফুট করা সহজসাধ্য হবে না।

তৃতীয়ত, গান্ধীনগর কংগ্রেসের পর একথা আরও জোর দিয়ে বলা সম্ভব হবে যে, কংগ্রেসের দ্বিখন্ডীকরণ চূড়ান্ত হয়ে গেল। যদিও দুই তরফেরই কোন কোন মহল থেকে ভাসাভাসাভাবে ঐক্যের কথা বলা হবে (যেমন গান্ধীনগর বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেছেন) তাহলেও সেসব কথার অতঃপর আর কোন দাম থাকবে না। অবশ্য এমন নয় যে, সাধারণ

কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশ কোন্ পক্ষের সঙ্গে আছেন গান্ধীনগর কংগ্রেসে তা চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। গান্ধীনগর কংগ্রেসের উদ্যোক্তারা দাবী করেছেন যে, ৪৬০০ জন কংগ্রেস প্রতিনিধির মধ্যে প্রায় ২৭০০ জন তাঁদের বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু অন্য পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে ঐ হিসাব চ্যালেঞ্জ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, গান্ধীনগর কংগ্রেসের প্রাক্কালে অনেক ভুয়া "ডেলিগেট" বানানো হয়েছে। নয়া কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ শঙ্করদয়াল শর্মার হিসাব হচ্ছে, এ-আই-সি-সি সদস্য-দের মধ্যে শ' তিনেকের কম এবং মাত্র প্রায় হাজার দেড়েক ডেলিগেট গান্ধীনগর কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। মধ্যপ্রদেশ থেকে ৭০ জন ও দিল্লী থেকে ২৬ জন ডেলিগেট গান্ধীনগরের কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন বলে সাবেক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে দাবী করা হয়েছে তার জবাবে ডাঃ শর্মা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন যে, ঐ দুটি রাজ্য থেকে উপস্থিত দশজন ডেলিগেটের নাম বলা হোক। গান্ধীনগর কংগ্রেসের পর হচ্ছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর তরফের বোম্বাই কংগ্রেস অধিবেশন। খুব সম্ভবত ঐ অধিবেশনের উদ্যোক্তারাও দেখাবার চেষ্টা করবেন যে, ফরিদাবাদ কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় কংগ্রেস ডেলিগেটদের যে তালিকা ছিল তার ভিত্তিতে অধিকাংশ ডেলিগেট তাঁদের দিকে আছেন। এইসব দাবী ও পাল্টা দাবীর মধ্য দিয়ে প্রকৃত সত্যের নিরপেক্ষ যাচাই করার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। একমাত্র যে সম্ভাবনাটা প্রকট হয়ে উঠছে সেটা হল, অতঃপর দুই কংগ্রেস একে অপরের থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাবে এবং দলের পতাকা বা প্রতীক পরিণামে যার কাছেই যাক না কেন এই বাস্তবকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, দুই কংগ্রেসের মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক তাজাপুত্র ও পিতার নয়, বরং এক পরিবারের দুই পৃথগন্ন ভাইয়ের মত।

গান্ধীনগর কংগ্রেসের চতুর্থ যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে সেটা হল এই যে, সিন্ডিকেট গোষ্ঠীর দৃষ্টি ইন্দিরা বিরোধিতায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার বক্তৃতার অনেকটাই জুড়ে আছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উপর দোষারোপ। অধিবেশনের বক্তারাও একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শ্রীমতী গান্ধীকে এবং কেবলমাত্র শুধু তাঁকেই দেশের যাবতীয় দুর্ভোগ ও দলের যাবতীয় বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করেছেন। যিনি সেদিনও অবিভক্ত দলের মান্য নেত্রী ছিলেন তাঁকে কোন্ সম্ভাষণ করতেই বা বাকী রাখা হয়েছে। তাঁকে কম্যুনিস্ট বলা হয়েছে আবার ফ্যাসিস্টও বলা হয়েছে। (একই সঙ্গে এই দুটো হওয়া যায় কি করে?) তাঁকে নারী হিটলার বলে অভিহিত করা হয়েছে, মক্ষিরাণী বলা হয়েছে, সূর্পণখা, ক্রুশ্চেভ ও ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কংগ্রেসের বিভাগের জন্য তিনি

বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভায় ভাষণ দিচ্ছেন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম। চিত্রে শ্রীঅশোক সেন এবং শ্রীতরুণকান্তি ঘোষকেও দেখা যাচ্ছে।

দায়ী, কংগ্রেসের গৃহীত কার্যসূচীগুলি আঁকড়ো করে রাখার জন্যও তিনি দায়ী। তাছাড়া, তাঁর সম্পর্কে এমন কিছু মন্তব্য করা হয়েছে যেগুলি সম্পর্কে মহিলা সদস্যারা আপত্তি করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিতা জওহরলালেরও নিন্দা করা হয়েছে, তাতে কয়েকজন প্রতিনিধি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মাত্র একজনের আচার-আচরণ নিয়ে একটা রাজনৈতিক দলের বার্ষিক সম্মেলনের এতখানি সময় ব্যয় করা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। পৃথিবীতে আর কোথাও একজন প্রধান-মন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে এত কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিনা সন্দেহ। নয়াদিল্লীর 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকা নিজলিঙ্গাপ্পা গোষ্ঠীর প্রতি সাধারণভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েও গান্ধীনগর কংগ্রেসের এই নেতিবাচক সুর লক্ষ্য না করে পারেন নি। এই পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছে, 'আমেদাবাদের কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ দিতে গিয়ে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা যে ব্যক্তিগতভাবে শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে দোষারোপ করার বেশী আর বিশেষ কিছুই করেন নি এটা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। শ্রীমতী গান্ধী যা করেছেন বা যা করেন নি সেসবের জন্যই কংগ্রেস বিভক্ত হয়েছে কি না, এটাই যদি আমেদাবাদে একমাত্র বিচার্য বিষয় হত তাহলে ঐ অধিবেশনের আয়োজনের জন্য এই ক্লেশস্বীকার ও এই পরিমাণ অর্থব্যয়ের সার্থকতা থাকত না।' গান্ধীনগরে এই ইন্দিরা-বিদ্বেষ নিতান্ত ক্রোধের বশেই ছড়ান হয়ে থাকতে পারে অথবা বিরোধী কংগ্রেসের একটি বিশেষ কৌশল হিসাবে অন্য সকলকে বাদ দিয়ে যাবতীয় বিভ্রাট ও বিপর্যয়ের জন্য একমাত্র ঐ মহিলাকেই দায়ী করা হয়ে থাকতে পারে। এই দুই অনুমানের কোন্‌টি সত্যের নিকটতর তা বলা কঠিন। একটি ভাষ্য হচ্ছে এই যে, সিণ্ডিকেট নেতারা মনে করেন, বিপক্ষের শিবিরে যদি শ্রীমতী গান্ধী সম্পর্কে সংশয় ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ঐ শিবির তাসের ঘরের মতই ভেঙ্গে পড়বে। ইন্দিরাকে বাদ দিয়ে তাঁর দলবল শূন্য ছাড়া কিছুই নয়, এই হচ্ছে সাংগঠনিক কংগ্রেসের নেতাদের গণনা। তাই তাঁদের সমস্ত চেষ্টার লক্ষ্য, কি করে শ্রীমতী গান্ধীর অনুগামীদের কাছ থেকে তাঁকে পৃথক করা যায়। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, এতটা ভেবেচিন্তে গান্ধীনগরে শ্রীমতী গান্ধীকে গালমন্দ করা হয় নি, নেহাৎই উত্তেজনা অথবা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশে এটা করা হয়েছে।

পঞ্চম যে বিষয়টি গান্ধীনগর কংগ্রেস থেকে পরিস্ফুট হয়েছে সেটা হল এই যে, বিরোধী কংগ্রেস অতঃপর সুস্পষ্টভাবে দক্ষিণে ঝুঁকবে। জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির মত দক্ষিণপন্থী দলের সঙ্গে খোলাখুলি আঁতাত গড়ার কথা বলার সম্পর্কে কিছুকাল আগেও সিণ্ডিকেট নেতাদের মধ্যে যে দ্বিধা ছিল সেটা তাঁরা এখন কাটিয়ে উঠেছেন। গান্ধীনগর অধিবেশনের প্রাক্‌কালে একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমোরারজী দেশাই বলেছিলেন, 'আমরা যদি একটা অভিন্ন কর্মসূচীতে একমত হতে পারি তাহলে আমি নিশ্চয়ই তা করব (অর্থাৎ নির্বাচনী বোঝাপড়া বা আঁতাত করব)। কারণ, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সংখ্যা যত কম হবে গণতন্ত্রের পক্ষে ততই ভাল।' শ্রীদেশাই বিশেষ করে জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির সঙ্গে সমঝোতায় আসার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। জনসঙ্ঘ প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কার্যসূচীর কথা বলছে এবং এমন কি স্বতন্ত্র নেতা শ্রীমিনু মাসানির মুখেও সমাজতন্ত্রের কথা শোনা যাচ্ছে, একথা উল্লেখ করে শ্রীদেশাই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, এই সব দলের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসা কঠিন হবে না। এটা পরিষ্কার যে, মধ্যবর্তী নির্বাচনের সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই বিরোধী কংগ্রেস নেতারা এই সব সমঝোতার কথা বলছেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে, বিরোধী কংগ্রেসের এই লক্ষ্যের কথা গান্ধীনগর কংগ্রেস অধিবেশনের মঞ্চ থেকে কোন অস্পষ্টতা না রেখেই প্রকাশ করা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, গান্ধীনগর কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত ভারতীয় জনসঙ্ঘের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন থেকেও একই লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, এখনই বিরোধী কংগ্রেস ও জনসঙ্ঘের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সমঝোতা বা আঁতাত গড়ে উঠতে যাচ্ছে। প্রথমত, গান্ধীনগর কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে দলের নেতারা এবিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ নেন নি। দ্বিতীয়ত, এই বিষয়ে দুই পক্ষেই কিছু প্রশ্ন, দ্বিধা বা মতপার্থক্য আছে বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য দুই দলের ব্যাপক কোন সমঝোতা হোক বা না হোক স্থানীয় ভিত্তিতে বিভিন্ন অঞ্চলে দুই দল অতঃপর কতকটা একযোগে কাজ করবে এমন সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, এই দুই দল এখন থেকে একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাবে। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে কত তাড়াতাড়ি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়।

২৫-১২-৬৯

নববর্ষ, নতুন দশক

বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের দরজায় আমরা পা দিলাম। ষাটের বিষণ্ণ ব্যর্থতার দশক শেষ হল। চন্দ্রবিজয়ের অসামান্য দীপ্তিতে উজ্জ্বল হলেও বিগত বৎসর এমন কোনো আশার বাণী শোনাতে পারেনি পৃথিবীর মানুষকে যা নিয়ে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। প্রতি বৎসরের শেষে নব বর্ষারম্ভের সময়ে আমরা হয়তো এই কথাই বলি। পুরাতনকে বিদায় দিয়ে সাগ্রহে, আনন্দে এবং আশায় বরণ করে নিই নতুন বৎসরকে। নববর্ষ শুভের সূচনা নিয়ে উপস্থিত তাকে মঙ্গলারতি করে গ্রহণ করাই রীতি। সকলের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে আমরাও সেই নবীন বরণ উৎসবে যোগ দিই। সকলের শুভ হোক। বিশ্বমানবের শুভ হোক। এই অশান্তিবিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে ১৯৭০ সাল শান্তির আলোকবর্তিকা হাতে দিয়ে আমাদের পথ দেখাক।

১৯৭০ সালের নববর্ষ আরও স্মরণীয় এই কারণে যে, শুধু একটি বৎসরের সমাপ্তির পরই তার আগমন নয়, একটি দশকেরও সমাপ্তির সূচনা। শুরু হল এবার শতাব্দীর সপ্তম দশক। আর তিনটি দশক পরেই সভ্যতার ইতিহাসে জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, সাফল্যে ও সর্বনাশে চিহ্নিত বিংশ শতাব্দীর অবসান। বিগত বৎসরের পৃথিবীর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব তার সমস্যার কোনো সুরাহা হয়নি। পৃথিবীর আশার প্রতীক রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্তিমিতজ্যোতি। বড়রকমের সংঘর্ষ না হলেও আঞ্চলিক সংঘর্ষ এখনও পৃথিবীতে লেগে আছে। ভিয়েতনামের রক্তক্ষরা যুদ্ধের অবসান হয়নি। পাইকারী মানুষ হত্যার কলঙ্কে এই যুদ্ধ চিহ্নিত। আমার কথা শুধু এই যে, মার্কিন সরকার ক্রমান্বয়ে ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হয়তো এই পথেই শান্তির সূত্র পাওয়া যাবে। ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠা গোটা এশিয়ায় উত্তেজনা হ্রাসে সহায়ক হবে। আরও আশার কথা এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে কড়াকড়ি হ্রাসের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। যদিও এ বছরেও চীনের রাষ্ট্রসঙ্ঘে আসন গ্রহণের প্রয়াসে তারা বাধা দিয়েছে তবু বাণিজ্যিক সম্পর্ক উদারতর করার এই সিদ্ধান্ত হয়তো ভবিষ্যতে এই দুই দেশের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনে সাহায্য করবে। কারণ এশিয়া ভূখণ্ডে চীনের সঙ্গে আমেরিকার সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা অনেকখানি হ্রাস পাবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আরেকটি উত্তেজনার কাঁটা বিঁধে আছে পশ্চিম এশিয়ায় ইস্রায়েল-আরব সম্পর্কে। আরবভূমির এক বিস্তৃত ভূখণ্ড জবরদখল করে রেখে ইস্রায়েল আন্তর্জাতিক জনমতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে। সামরিক জোরে একটি জাতিকে দমন করে রাখার এই প্রচেষ্টা নিন্দনীয়। আরও দুঃখের কথা এই যে, যে-ইহুদী জাতি ফ্যাসিস্তদের হাতে এত নির্যাতন সহ্য করেছে তারাই আজ সামরিক শক্তির উপর ভরসা করে বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করতে কোনো লজ্জা বা কুণ্ঠাবোধ করছে না। বিগত বৎসরে ইয়োরোপ আমেরিকায় দেখা দিয়েছিল এক অভূতপূর্ব ছাত্রবিক্ষোভ। সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারুণ্যের এই বিদ্রোহ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজনিয়ন্তাদের শাসনের ভুলত্রুটি ও গলদের বিরুদ্ধেই এই বিক্ষোভ। সচ্ছল সমাজে মানুষের ব্যবহারিক সুখ-সুবিধার অন্ত নেই। তা সত্ত্বেও এক অশান্তি গোটা পাশ্চাত্য দেশের সমাজকে হাহাকারে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। নতুন প্রজন্মের তরুণরা তার পরিবর্তন চায়। জাতিতে জাতিতে বিভেদ, কালো ও ধলায় বিভেদ, অনগ্রসর ও অগ্রসরে বিভেদ আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অভিশাপ। যতই মানুষ গ্রহান্তরে যাক না কেন, মহাকাশ যতই তার হাতের মুঠোয় চলে আসুক না কেন, এই পৃথিবীর সংঘাত অবসানের কোনো জাদুমন্ত্র তার আয়ত্ত হয়নি। সেই স্বর্ণসূত্রের সন্ধান যতদিন পাওয়া না যাবে ততদিন পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তির কোনো আশা নেই।

আমাদের ভারতবর্ষে বিগত বৎসরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা হল কংগ্রেস পার্টির বিভাগ। একক পার্টি হিসাবে কংগ্রেস ভারতবর্ষে রাজনৈতিক স্থায়িত্বের প্রধান দায়িত্ব পালন করে এসেছে এতকাল। পৃথিবীর আর কোনো গণতান্ত্রিক দেশে আর কোনো একটি পার্টি এত দীর্ঘকাল একটানা শাসনকর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারেনি। এখনও ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন কংগ্রেসেরই হাতে। কিন্তু রাজ্যগুলিতে তার কর্তৃত্ব আর একচ্ছত্র নয়। কেন্দ্রেও কংগ্রেস পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একটি অংশ প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আদর্শগত বিরোধ থেকেই এই বিভাগ। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক পরীক্ষা আজ এক কঠিন সময়ের সম্মুখীন। কংগ্রেস ও কংগ্রেসবিরোধীদের মধ্যে এবার শুরু হবে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব দখলের লড়াই। বর্তমান বৎসর সেদিক দিয়ে ভারতের পার্লামেণ্টারি ইতিহাসে এক বাঁক পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

আমরা অনেক প্রত্যাশা নিয়ে তাই নতুন বৎসরকে স্বাগত জানাই। নতুনের গর্ভে কী আছে তা আমরা জানি না। তবু এই বিশ্বাস আমাদের আছে যে সার্বিক শুভবুদ্ধি পৃথিবীর মানুষকে মহত্তর সাফল্যের দিকেই এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা জানি মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা শেষ হয়নি। আমরা জানি আদর্শের সংঘাতে পৃথিবী আজ বহুধাবিভক্ত। তা সত্ত্বেও এই আশা আমরা করি, চরমতম সংকটের মুহূর্তকে আমরা এড়িয়ে চলতে পারব। মানুষের যে-মনীষা চন্দ্রবিজয়কে সম্ভব করেছে, যে-মনীষা আজ দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের জীবাণু আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে সেই মানব-মনীষাই সভ্যতার আশা, তার আলোকের নিশানা। সংঘাত নয়, যুদ্ধ নয়, বিদ্বেষ নয়, মৈত্রী ও ভালবাসাই সভ্যতার আশা। অস্ত্রবলে নয়, আদর্শের বলেই পৃথিবী সুন্দর হবে, সমৃদ্ধ হবে। মানুষের দুঃখের দিনের হবে সমাপ্তি। নববর্ষ, নতুন দশক সেই আশা আমাদের পূর্ণ করুক।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

(১)

বন্ধুবর একটু হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত হলেন, বললেন—"এ যে একে একে সবই রসাতলে যেতে বসল! কি করা যায় বল দিকিন?"

ও'র ঐ রীত; মনটা এমনিই সাধারণত চড়া পর্দায় বাঁধা থাকে, তার ওপর হাতে একটা খবরের কাগজ দেখে বুঝলাম একটু বড় গোছেরই ঝাঁকানি খেয়ে থাকবে।

দাঁড়িয়েই আছেন।

মোটামুটি মতের মিল আছে দুজনের; খানিকটা আন্দাজও করেছি; কিন্তু ইন্ধন জোগালে তো চলে না; ব্লাড প্রেসারের রুগী, তাহলেই রাত্রের ঘুমটুকুর গয়া। নরম করে আনতে হয়।

একটু হেসেই বললাম—"'বোস', দাঁড়িয়ে রয়েছ। 'সব'-এর মধ্যে একটারও নাম করবে তো। নৈলে উপায় বাৎলাব কি করে?"

"কোনটা নয় বলো?"—সামনের চেয়ারটায় বসতে বসতে প্রশ্ন করলেন। "এই একখানি কাগজেই যা ফিরিস্তিটা রয়েছে তাতে তোমার দেশের—সমাজের চেহারা নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে। রাজ্যসভায় হুমকি, চেয়ার আছড়া-আছড়ি, একটা প্রবল রেল সংঘর্ষ, তিন দিনের বাসি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাটার জের মেটেনি। ওদিকে 'রবীন্দ্র-সরোবর'। নামটাই যে কী কুক্ষণে দিয়েছিল! শিয়ালদায় এসো; ভেতরে ট্রেন আটকে লাইনে বসে আছে, বাইরে artificial rain...

পাতা আছে— গল্প-প্রবন্ধের জন্যে। তাতে একটি গল্প বেরিয়েছে যাতে করে রসাতলের পথটা খুব সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবারে মেয়েদের। আদর্শ গৃহিণীকে বাড়িতে পুজোআচাও করতে হবে ধূপধুনো দিয়ে, আবার রাত্রে Night Club—এ গিয়ে বিধিমতে মদোন্মত্তো কর্তার বস্-এর মনোরঞ্জন করাতে হবে। গিন্নির জবানিতেই গল্প, বলছেন, এ না হলে আমাদের চলে না। অবশ্য কর্তাও অফিসার ক্লাসের।...না, না, তুমি যে ভাবছ অতি আধুনিকার প্রতি বিদ্রূপ-কটাক্ষ, তা মোটেই নয়,—পূর্ব-পশ্চিমের মিলনের জয়-গাথা। না হয় পড়েই দেখবে? দীর্ঘ কুড়ি বছরের অভ্যাসে আর সব বরদাস্ত হয়ে আসছে বলতে পার, কিন্তু এর পরিণাম যে ভেবে ওঠা যায় না!"

লেখাটা পড়াই আমার। ব্যঙ্গ নয়, এক ধরণের যে অপ-প্রচারের ঢেউ উঠছে তারই নমুনা। ছদ্মই হোক, স্বকীয়ই হোক, মেয়ের নাম দিয়ে লেখা দেখে আমিও স্তম্ভিতই হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু উপস্থিত সুরে সুর মেলাতে গেলেই অনর্থ। আমি আলা-

ইতিহাসের সাক্ষ্য, মানুষ নামতে নামতে নিজের দুষ্কৃতির ভয়াবহতায় নিজেই স্তব্ধ হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, আবার উঠে এসে শোধনের তপস্যায় লেগে গেছে। ভালমন্দের অন্তর্দ্বন্দ্ব কাটিয়ে ওঠবার এই শক্তিটুকু আছে বলেই মানুষ সেই বন্য যুগ থেকে আজকের এই চান্দ্র যুগে এসে পৌঁছুতে পেরেছে। এক কথায় বলা যায়, সব মানুষের মধ্যেই রত্নাকর থেকে বাল্মীকিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।'

'কি বলছ তুমি!' ভ্রু কপালে তুলেছেন বন্ধু, বললেন—'যারা চেয়ার ভাঙল, ট্রামবাসে আগুন ধরালো তাদের কথা বাদ দিতে চাও তো দাও, কিন্তু যারা সাহিত্যের মাধ্যমে এইরকম সূক্ষ্মভাবে সমাজদেহ পচিয়ে দেওয়ার ব্রত নিয়েছে তারা একদিন রামায়ণ সৃষ্টি করবে!'

বললাম—'করবে বৈকি; অর্থাৎ করবার শক্তি আছে বৈকি। তুমি ট্রামবাস, আইনসভা, দাঙ্গা—ওগুলোর কথা বাদ দিয়ে ভালই করছ। আমি কি বলি জান?—ওগুলো স্থূল, চেনা যায়; সাময়িকী সাময়িক উপায়ে ওগুলোর প্রতিকার করা যায়, কেননা, ওগুলো বেশীরভাগই গড্ডালিকা-প্রবাহ বা mass mentality বহিঃপ্রকাশ। একটা আবেগ উন্মাদনা, স্লোগান যার বীজমন্ত্র। দীর্ঘ এক মাইলের মিছিলের মধ্যে যার অর্থ, বলতে গেলে, কেউই বোঝে না। এই জন্যে এদের ঘুরতেও দেরী হয় না, স্লোগান পালটে দিলেই মিছিল একেবারে [illegible] ছেড়ে ও বেলায় গোলাপজলের [illegible] ছড়াতে থাকে, এ দৃশ্য এই কলকাতাতে বসেই এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় দেখেছ।

"Artificial rain!"—ধাঁধা খেয়ে চকিত হয়ে মুখের দিকে চাইলাম। প্রচণ্ড খরা চলেছে...যদিও ফিরিস্তিটার সঙ্গে খাপ খায় না।

বললেন—"হ্যাঁ, artificial rain. একটা ট্রাম জ্বলছে, তাতের চোটে ত্রিসীমানার মধ্যে যাওয়া যায় না, খানিকটা এগিয়েই কাঁদুনে গ্যাস, চোখের জলে পথ পেছল।...তুমি হাসছ, কিন্তু হাসবার জন্যে বলিনি। সমস্ত কাগজখানি জুড়ে এই!"

একটু হেসেই বললাম—"তা কাগজওলাদের কি দোষ? নিউজ ছাপতেই হবে—!"

'এতেও কুলোয়নি' কাগজটা নিজের দিকেই বলে চললেন—"এটা রবিবারের সংখ্যা, চারটে অতিরিক্ত

চনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললাম—"ওসব হচ্ছেই, কত মাথা ঘামাবে?......কিন্তু আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি—একেবারে রসাতলে দেওয়াটা কি এতই সহজ?"

'কি বলছ তুমি!'—বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার পানে চাইলেন, বললেন—'সমস্ত রসাতলটা উপড়ে ওপরতলায় নিয়ে এল তুমি এখনও নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে পারছ ঐ কথা!'

বললাম—'পারছি বৈকি বলতে, যদিও যতটা নিশ্চিন্ত মনে করছ ঠিক ততটা নয়। আমার বিশ্বাস কি জান? রসাতলে দিতে এক সেইরকমই কোনও অমানুষ জীব পারে—কিন্তু দমন শয়তান ইবলিস—যাই নাম দাও, যা মানুষে কখনও হয়ে উঠতে পারে না। মানব-সভ্যতার ভরসা এইখানে।

এখন, যদি একটা স্থূল, আবেগ ব্যাপারের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব তো যারা সাহিত্যের মতন একটা সূক্ষ্মশক্তির অধিকারী তারা পারবে না কেন? স্বীকার করি, যুগ-প্রভাবে তাদের মধ্যেও যেন কী একটা স্লোগানের উৎপাত চলেছে, মনে হচ্ছে যেন গড্ডালিকা-প্রবাহই, ঐ mass mentality; সাহিত্যিক বলেই এঁদের ওপর ভরসা, কেননা সাহিত্যিক বলেই তাঁদের দিয়ে চিরকাল স্লোগান আওড়ানো চলে না। Mass Conscience নয় যদি কথাটা কদর্থে ব্যবহার করতে দাও। তাঁদের রয়েছে দল দল Individual Conscience ব্যক্তিগত বিবেক।

এর আর একটা দিক আছে। অন্য এক ধরনের Mass Conscience ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়ে উঠছে।

যারা রাজ্যসভায় তাণ্ডবের আবতারণা করল, কি চিৎপুরের গ্রামবাস জ্বালাল, তাদের দুষ্কৃতির প্রভাব যে খানিকটা ছড়িয়ে পড়ে না, একথা বলি না, তবু একথাও ঠিক যে, তা অনেকটা অ্যাসেম্বলি-চেম্বার বা চিৎপুরেই সীমাবদ্ধ।

অপরদিকে, সাহিত্যের সূক্ষ্ম শক্তির অনুপ্রবেশ ঘরে ঘরে, জনে জনে; বিশেষ করে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। সুতরাং সৎ হলে বা শুভ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হলে একখানা বইয়ের সমাজদেহে শুভ করবার সম্ভাবনা যেমন বেশী, অসৎ বা অশুভ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হলে তার অশুভ প্রভাব বিস্তার করবার সম্ভাবনাও তেমনি বেশি। বরং তার চেয়েও বেশি, যেহেতু একটা বয়সে—যে বয়সের পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা বেশি, জৈবিক ধর্মেই, যাকে অশুভ সাহিত্য বলছি তার আকর্ষণ বেশী হবে।

এই মোটামুটি একটা দশকেই এই জাতীয় সাহিত্যের বিস্ময়কর সম্প্রসারণ আর অনুপ্রবেশ দেখে সমাজ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। বেশ বোঝা যায়, জনমত—অর্থাৎ শুভ জনমত যা যুগে যুগে এই ধরনের অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে, তা যেন, একটা প্রচন্ড আঘাতে বাকশক্তি হারানর পর আবার সোচ্চার হয়ে উঠছে। আমি এটা দেখতে পাচ্ছি, আশান্বিত হচ্ছি। তোমারও নিশ্চয়ই চোখ-কান এড়িয়ে যাচ্ছে না।'

'পাচ্ছি টের কিছু কিছু,!'

—একটু যেন টেনে টেনে অন্যমনস্কভাবে বলতে বলতে একটু সচকিত হয়ে উঠেই বললেন—'কিন্তু তুমি যেন সাহিত্যের ওপরই বড় বেশি জোর দিচ্ছ। চারিদিকে এই দারুণ অব্যবস্থা—অরাজকতা—রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজ, বাণিজ্য, কোনটা নয়?—এই একখানা কাগজ গলা ফাটিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না—এসময় সব ছেড়ে শুধু সাহিত্য নিয়ে, সাহিত্যের ভরসায় থাকলে......'

বললাম—'সাহিত্যের ওপর জোর পড়বার অনেকগুলোর মধ্যে একটা কারণ, তুমিই সাহিত্যের ওপর জোর দিয়ে শুরু করেছ—বললে, আর সব কুড়ি বছরে গা-সওয়া হয়ে এসেছে, মাথাব্যথা ধরায় না বড়—ঐ গল্পটার সূক্ষ্ম, নতুন চালে বিভ্রান্ত হয়ে তুমি ছটফটিয়ে ছুটে এসেছ।

এছাড়া আরও একটি মনোবৃত্তি কাজ করে থাকবে। সেটা হচ্ছে, আমি এই ক্ষেত্রে রয়েছি, অ্যাসেম্বলি-চেম্বার, কি মিল-মালিকদের কর্মবিধির চেয়ে এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে বেশি ওয়াকিবহাল, সুতরাং মনটা এই দিক থেকেই বেশি সাড়া দিয়ে উঠে থাকবে।

তবে এর চেয়েও একটা বড় কারণ আছে একটু তলিয়ে দেখতে গেলে—এ পর্যন্ত পৃথিবীকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে দুটি জিনিষ, সাহিত্য আর স্লোগান, অবশ্য আমি সৃষ্টধর্মী সাহিত্যের কথাই বলছি। অবোধ স্লোগান ধ্বংস করেছে, আজকের মতন করেই; জ্বালিয়েছে, পুড়িয়েছে, ধূলিসাৎ করেছে, বড় বড় গ্রন্থশালা, শিল্পসংস্কৃতি কেন্দ্র, দুর্লভ ভাস্কর্য-নিকেতন; সেই ধ্বংস-স্তূপের ওপর সাহিত্যই আবার নবজীবনের সঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করে গেছে। সাহিত্য অবশ্য ব্যাপক অর্থেই বলছি, ধর্ম-সাহিত্য, কাব্য, উপাখ্যান, উপন্যাস—যা শত বিক্ষোভের মধ্যে সুন্দরকে, কল্যাণকে শাশ্বতকে রয়েছে আগলে। সাহিত্য হচ্ছে মানবতার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি—এই দারুণ দুর্দিনে সাহিত্যের দিকে চাইব না তো কিসের দিকে চাইব বল? এই জন্যেই না এই সাহিত্যের বিকৃতিতে তুমি এভাবে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছ; ভুলছ কেন সে কথা?'

সেই উত্তেজিত বিপর্যস্ত ভাবটা অনেকখানি কেটে গিয়ে চেহারাটা বেশ কিছুটা নরম হয়ে এসেছে ওঁর। একটু অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে চেয়ে গল্পসুদ্ধ ক্রোড়-পত্রটা হাতের মধ্যে পাকাচ্ছিলেন, ঘুরে শান্তকণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন—'কিন্তু সে সাহিত্য আসবে কবে?......'

—প্রশ্নটা করেই ওঁর ঠোঁটে একটু হাসিও উঠল ফুটে, রসিক লোক, আবেগ-উত্তেজনা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেন না। বললেন—'ওহে, 'কবে আসার' কথায় ওঁর সেই ভবিষ্যৎবাণীর কথাটা মনে পড়ে গেল—সেই 'যদা যদাহি ধর্মস্য......' আর কবে আসবেন বল দিকিন?' আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ যে টাটিয়ে গেল!'

উচ্ছ্বাস ধরে রাখতে আমিও বেশিক্ষণ পারি না—একটু হেসেই বললাম—'ভালো করেছ কথাটা এনে ফেলে, এই বিরাট ডামা-ডোলের মধ্যে আপনিই এসে পড়ে প্রশ্নটা। তবে আমার কথা যদি জিজ্ঞেস করো, আমি ওটুকু—'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং' করে ঠেলে রেখেছি, বড় একটা ভরসা পাই না। এলে তো এক ঝাপটেই বিলকুল সাফ হয়ে যেতে পারত।'

চাকর চা রেখে গেল, তুলে নিলাম।

উনিও কাপটা তুলে নিয়ে বললেন—'আমার কি মনে হয় জান?—যখন বড় গলা করে কথাটা বলেছিলেন তখন কল্পনাতেও আনতে পারেন নি যে, কলির কুরুক্ষেত্র—এটা আবার এরকম ফলাও আর জটিল হয়ে দেখা দেবে, নামতেই ভরসা পাচ্ছেন না।' চা-য়ে চুমুক দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে মিঠে মিঠে হাসতে লাগলেন।

দুইমেরু

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে ভুবনমাস্টার মুখে-চোখে ঝাপটা দিলেন।

কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। সারা মুখ রক্তবর্ণ। সর্বাঙ্গ কাঁপছে।

আজ বিশ বছরের ওপর আছেন এ-স্কুলে, এমন অবস্থা কোনদিন হয়নি। মাঝখানে বছর-তিনেক ছিলেন না। ছেলে টেনে শহরে নিয়ে গিয়েছিল। তার কাছে রাখতে চেয়েছিল।

কিন্তু ভুবনমাস্টার ছটফট করেছেন। বারবার চলে আসতে চেয়েছেন। ছেলে ছাড়েনি।

তারপর ছেলে হঠাৎ বম্বেতে বদলি হতে নাতিকে নিয়ে আবার এখানে পালিয়ে এসেছেন।

নাতি মানে দৌহিত্র। মেয়ের ছেলে। মেয়ে-জামাই কেউ নেই। অকালে চোখ বুজিয়েছে, তাই প্রৌঢ় বয়সে নাতির বোঝা তাঁর ওপর এসে পড়েছে।

এখানে এসে পুরানো স্কুলেই ঢুকেছিলেন। রতনপুর হাই স্কুলে।

সেক্রেটারী বিজনবাবু নিজে সেধে ভুবনমাস্টারকে নিয়ে গেছে।

ভুবনমাস্টার ইতিহাস পড়ান। তিনি থাকতে প্রত্যেক বছরই এই স্কুলের দুই-একটা ছেলে ইতিহাসে লেটার পেত।

ভুবনমাস্টার তিন বছর ছিলেন না। এই তিন বছর স্কুলে ইতিহাসের ফল ভাল হয়নি। অথচ ইতিহাস পড়াতেন দীননাথ বক্সি। ইতিহাসে ডবল এম-এ।

শুধু তিন বছরের ব্যবধান। তার মধ্যে রতনপুর স্কুলের ছেলেরা এত বদলে গেল। রোজকার মতন সেদিনও ভুবনমাস্টার ক্লাশে ঢুকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছিলেন ঃ

প্রথমেই রাজীবকে।

রাজীব, মারাঠা সাম্রাজ্যের পতনের কাহিনী বিশ্লেষণ কর।

রাজীব একবার সামনে খোলা ইতিহাসের বইয়ের দিকে দৃষ্টি দিল, তারপর সোজাসুজি দেখল কড়িকাঠের দিকে।

না, কোথাও উত্তর লেখা নেই।

জানি না স্যর।

রাজীব স্পষ্ট কথা বলল।

স্ট্যান্ড আপ অন দি বেঞ্চ। বেঞ্চের ওপর দাঁড়াও।

ফাইনাল ক্লাশের ছাত্র। এ-বছর পরীক্ষা দেবে।

এরকম শাস্তির জন্য এরা মোটেই তৈরি ছিল না।

তাছাড়া রাজীব শহর থেকে বছর-দুয়েক হল ভর্তি হয়েছে। ভুবনমাস্টারের সঙ্গে তার কোন পরিচয় ছিল না।

রাজীব আড়চোখে একবার ক্লাশের ছেলেদের দিকে দেখল, তারপর ঘাড় নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

কি হল?

ভুবনমাস্টার হুংকার ছাড়লেন।

অন্য সময় অর্থাৎ আগের দিন হলে ক্লাশসুদ্ধ ছেলেরা চমকে উঠত, কিন্তু এখন সেরকম কিছুই হল না। সবাই চুপচাপ বসে রইল।

একটু পরে, ভুবনমাস্টারের চোখে চোখ রেখে একটি ছেলে বলল।

সিনিয়র ক্লাশে ওসব শাস্তি চলবে না স্যর।

চলবে না?

ভুবনমাস্টার ঠিকভাবে কথা বলতে পারলেন না। তাঁর স্বর কেঁপে উঠল।

না স্যর। কোন ক্লাশেই ওসব শাস্তি আর চলবে না।

এ-ঔদ্ধত্য শুধু অমার্জনীয় নয়, অকল্পনীয়। তাঁর মুখের ওপর এভাবে কেউ কথা বলতে পারে, তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। ভাবতে পারেননি।

তুই রাধাচরণ না?

নিজের চেয়ারে বসতে বসতে ভুবনমাস্টার প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ স্যর।

কালীচরণের ভাই?

এবারও রধারমণ ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ।

কালীচরণের কথা ভুবনমাস্টারের খুব মনে আছে। একদিন পড়া করে আসেনি বলে ভুবনমাস্টার তাকে ক্লাশের বাইরে নীল ডাউন করে রেখেছিলেন।

একটি কথা বলেনি কালীচরণ। নতমুখে আদেশ পালন করেছিল।

আর আজ তার ছোট ভাই ফণা তুলছে। এত সাহস, এত তেজ সে সংগ্রহ করল কোথা থেকে?

শাস্তি চলবে না? পড়া করবি না, তার শাস্তি চলবে না? দাঁড়া বেঞ্চের ওপর।

না, দাঁড়াবে না।

এবার শুধু রাধাচরণ নয়, ক্লাশের সবাই একযোগে চীৎকার করে উঠল।

বিস্ময়ে ভুবনমাস্টার অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না।

মাত্র তিনটে বছর, এর মধ্যে দিনকাল এত পালটে গেল।

শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্ররা এভাবে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। তাঁর আদেশ অমান্য করছে।

ক্লাশের সকলের ওপর ভুবনমাস্টার একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

চকচকে চোখের সার। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একরাশ মুখ।

কঠিন, দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতন।

ভুবনমাস্টারের মনে হল, মুখে যেন আগুনের ঝাপটা লাগছে। বসবার চেয়ারটাও দুলছে।

খুব আস্তে পা ফেলে তিনি ক্লাশ থেকে বেরিয়ে এলেন।

শিক্ষকদের বিশ্রামঘরে নয়, সিঁড়ির নীচে ছোট একটা বাড়তি ঘর। একটা চেয়ার পাতা আছে। বছরের প্রথমদিকে বইয়ের ক্যানভাসাররা এসে অপেক্ষা করে। কোণের দিকে একটা কুঁজোও আছে।

মুখে চোখে জল ছিটিয়ে ভুবনমাস্টার একটু ধাতস্থ হলেন।

বাইরে কে একজন যাচ্ছিল।

ভুবনমাস্টার ডাকলেন।

কে?

আমি, ভুবনদা।

অঙ্কের শিক্ষক নিরাপদ এসে দাঁড়াল।

কে, নিরাপদ, শোন একবার।

নিরাপদ ভিতরে এল।

তোমার এখন ক্লাশ আছে নাকি?

না, এ-পিরিয়ডে কোন ক্লাশ নেই। চা খেতে যাচ্ছিলাম।

বস একটু।

ভুবনমাস্টার হাত দিয়ে সামনের চেয়ার দেখিয়ে দিলেন।

নিরাপদ বসল।

একটু একটু করে থেমে থেমে যেন কঠিন একটা রোগের কথা বলছেন, এই-ভাবে ভুবনমাস্টার সেদিনের ক্লাশের ঘটনাটা বললেন। দুর্বিনীত ছাত্রদের ব্যবহার।

নিরাপদকে খুব বেশী বিচলিত বোধ হল না।

একটু থেমে বলল :

এ আর এমন কি ঘটনা মাস্টারমশাই। এর চেয়ে মারাত্মক কত কিছু হয়েছে।

এর চেয়ে মারাত্মক?

হ্যাঁ, নিরাপদ ঘাড় নাড়ল, আমাকেই তো ছুটির পরে ঘণ্টাদুয়েক আটকে রেখেছিল।

তোমাকে আটকে রেখেছিল?

বিস্ময়ে ভুবনমাস্টারের দুটি চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল, তারপর মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

তোমার অপরাধ?

অপরাধ, ক্লাশে গোটা-দশেক অংক কষতে দিয়েছিলাম। একজন ছাড়া কেউ করে উঠতে পারেনি।

তুমি হেডমাস্টারকে বলে দিলে না কেন?

এবার নিরাপদ উঠে দাঁড়াল।

বলে কিছু লাভ হত না মাস্টারমশাই। চলি, একটু চা খাব।

নিরাপদ বেরিয়ে গেল।

ভুবনমাস্টার গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন।

বাইরের গাছপালা সব অদৃশ্য। এ-পরিবেশ যেন চেনাজানা নয়। একেবারে নতুন। এই তিন বছরেই গোটা জগৎ বদলে গেছে। শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা সব তিরোহিত।

এমন যদি হয়, শিক্ষক আর ছাত্রের মধ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধার সম্পর্কই না থাকে, তাহলে শিক্ষাদান কি করে হবে?

একজন ভক্তিভরে দান করবে, আর একজন গ্রহণ করবে শ্রদ্ধাসহকারে, তবেই তো শিক্ষাদান সম্পূর্ণ।

ভুবনমাস্টার উঠলেন। আর একটা ক্লাশ আছে।

সারাদিনে গোটা-তিনেক ক্লাশ শুধু তিনি নেন। তার বেশী আর পারেন না। তাঁর সঙ্গে শর্তও সেই রকম।

ভুবনমাস্টার নিজের দেহটা অতিকষ্টে টেনে টেনে ক্লাশে ঢুকলেন।

এ-ক্লাশে কোন গণ্ডগোল হল না। চুপচাপ ছেলেরা তাঁর পড়ানো শুনে গেল। তিনি কোন প্রশ্নও করলেন না। ভাল লাগল না করতে।

মনের মধ্যে বহু বছর ধরে তিল তিল করে আঁকা একটা উজ্জ্বল চিত্র যেন ম্লান, বিবর্ণ হয়ে গেছে।

ছুটির পর তিনি হেডমাস্টারের কামরায় ঢুকলেন।

হেডমাস্টার সতীশবাবু একলাই ছিলেন। কেতাদুরস্ত লোক। বাড়ির অবস্থা ভাল। নিজে ওপর ক্লাশে ইংরাজী পড়ান।

কি খবর ভুবনবাবু?

কি খবর ভুবনবাবু বললেন।

সতীশবাবু একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। মাথা নীচু করে টেবিলের কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললেন ঃ

এই তো কলির শুরু ভুবনবাবু। শহরে যা কাণ্ড হচ্ছে বলবার নয়। ছাত্ররা শিক্ষকদের মারধোর পর্যন্ত করছে।

বলেন কি?

হ্যাঁ, পরীক্ষায় নকল করছিল। এক শিক্ষক ধরে ফেলাতে সবাই মিলে তাঁকে মার।

ভুবনমাস্টারের চোখেমুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল। মনে হল, সব নির্যাতনটুকু যেন তাঁর দেহের ওপরই হচ্ছে।

সতীশবাবু থামতে ভুবনমাস্টার বললেন ঃ

এ-চাকরি আমার দ্বারা হবে না। আমি বরং ছেড়েই দেব।

সতীশবাবু মাথা নাড়লেন।

তাতে আর লাভ কি। সে তো হেরে যাওয়াই হল। এতে কি ওদের স্বভাব বদলাবে! তার চেয়ে বরং ওদের সঙ্গে মিলেমিশে যাতে ওরা শোধরায়, সে-ব্যবস্থা করতে হবে।

মাস-দুয়েক কিছু হল না।

ভুবনমাস্টার ক্লাশে যথারীতি পড়াতে আরম্ভ করলেন। দু-একটা প্রশ্নও করলেন। কিন্তু যারা পারল না, তাদের কোন শাস্তি দিলেন না।

সতীশবাবুরেই নিষেধ ছিল।

তিনি বলে দিয়েছিলেন, ওসব শাস্তি-টাস্তি দিতে যাবেন না। ওসবের রেওয়াজ আজকাল নেই। তাতে অশান্তি বাড়বে। যে পারে পারবে, যে না পারবে, সেই বুঝবে। আপনার কাজ আপনি করে যান।

কিন্তু মাস-দুয়েক পরে যা হল, তার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না।

ভুবনমাস্টার তো নয়ই।

ভুবনমাস্টার স্কুলের কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন।

সাড়ে দশটা প্রায় বাজে। অথচ সারা স্কুলের ছেলে কেউ স্কুলের মধ্যে ঢোকেনি। সবাই সামনের মাঠে জড় হয়েছে। উঁচু ক্লাশ থেকে নীচু ক্লাশ।

ভুবনমাস্টার ভিতরে ঢুকলেন।

এক জায়গায় কয়েকজন শিক্ষক জটলা করছেন, ভুবনমাস্টার সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কি ব্যাপার?

ব্যাপার গুরুতর। ছেলেরা কাল হেড-মাস্টারের কাছে গিয়েছিল, পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার জন্য। হেডমাস্টার রাজী হননি, তাই সবাই বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। তাদের কথা না-মানা পর্যন্ত কেউ ক্লাশে ঢুকবে না।

কবে পরীক্ষা হবে তাও ছাত্ররা ঠিক করবে?

ভুবনমাস্টার যেন ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছেন না।

বাংলার মাস্টার সুহাসবাবু হাসল।

এরপর খাতাও ছাত্ররা দেখতে চাইবে মাস্টারমশাই। এ আর হয়েছে কি! বেঁচে থাকলে অনেক কিছু দেখতে পাবেন।

ভুবনমাস্টার জানলার গরাদ ধরে দাঁড়ালেন।

এখান থেকে মাঠের ওপর ছাত্র-সমাবেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন।

একজন ছাত্র হাতমুখ নেড়ে কি বলছে আর সকলে তাকে গোল হয়ে ঘিরে সব শুনছে।

চোখ কুঁচকে দেখার চেষ্টা করলেন।

বক্তৃতা করছে রাজীব। জন-নেতার ভঙ্গীতে। দুটো হাত নেড়ে।

দেখতে দেখতে ভুবনমাস্টারের একটা কথা মনে এল।

তা যদি করা সম্ভব হত।

বিস্তীর্ণ মাঠ। রোদও বেশ চড়া। এই মাঠে সবক'টাকে নীল-ডাউন করে যদি রাখতে পারতেন।

মাটিতে দুটো হাঁটু ছড়ে যেত। প্রচণ্ড উত্তাপে তেতে উঠত মাথা। ছেলেগুলো ঢিট হতে মোটেই দেরী হত না।

স্কুলের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের চীৎকার আরো প্রচণ্ড হয়ে উঠল।

হেডমাস্টার সতীশবাবু সব শিক্ষকদের নিয়ে এক জরুরী সভা আহ্বান করলেন।

ছাত্র-বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে কি করা যায়।

ভুবনমাস্টার সভায় গেলেন। চুপচাপ এক কোণে বসে রইলেন।

তাঁর মতামত কেউ জিজ্ঞাসাও করল না।

প্রায় সব শিক্ষকদের অভিমত হল, পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়াই ছাত্ররা যখন তৈরি নয় বলছে।

অতএব।

নিরাপদ ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করল। হেডমাস্টারের প্রতিভূ হিসাবে।

পরীক্ষা পিছিয়ে যাবে এইটুকুই এখন জানানো হল। কবে, কখন পরীক্ষা হবে—সেটা পরে ঠিক করা হবে। ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করে।

ছাত্রদের মধ্যে জয়ধ্বনি উঠল।

বিধ্বস্ত নগরীতে জয়ী সৈনিকরা যেভাবে প্রবেশ করে, ঠিক সেইভাবে ছাত্রের দল জয়োল্লাস করতে করতে স্কুল-প্রাঙ্গণে ঢুকল।

তখনও ভুবনমাস্টার চুপচাপ শেষের সারির একটা চেয়ারে বসেছিলেন। সভা শেষ হয়ে গেছে। হেডমাস্টার সতীশবাবু আর অন্য অন্য শিক্ষকরা চলে গেছেন।

কিন্তু ভুবনমাস্টার ওঠেননি। উঠতে পারেননি।

বারবার নিজেকে চিমটি কেটে দেখেছেন, এসব স্বপ্ন, না সত্য! ইজ্জতই যদি ধুলোয় লুটোল, তবে আর মানুষের কি অবশিষ্ট থাকে! এভাবে বে-ইজ্জৎ হয়ে কি করে শিক্ষাদান সম্ভব!

ছেলেরা চীৎকার করে স্কুলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভুবনমাস্টার দু' হাতে মুখ ঢেকে ছেলেমানুষের মতন উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠলেন।

সমস্ত শরীর কান্নার বেগে কুঁকড়ে গেল।

মনে মনে ভুবনমাস্টার একটা হিসাব-নিকাশ করলেন।

এমন অমর্যাদার চাকরি তার পক্ষে জীর্ণবস্ত্রের মতন ত্যাগ করা কি সম্ভব নয়?

কিন্তু এ ছাড়া তাঁর উপায়ই বা কি!

আবার ফিরে যাবেন ছেলের কাছে? দৌহিত্রের হাত ধরে?

তিন বছর ছেলের আগ্রহে তার কাছে কাটিয়েছেন বটে, কিন্তু স্বস্তি পান নি।

পুত্রবধূর ব্যবহারে কিছুটা মনক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

সোজাসুজি কোন দুর্ব্যবহার করে নি সত্যি কথা, কিন্তু বুঝতে ভুবনমাস্টারের কোন অসুবিধা হয় নি।

শুধু তার ওপরই নয়, মাতৃপিতৃহীন দৌহিত্রের প্রতিও।

অন্য কোন স্কুলে যাবেন?

সব জায়গায়ই তো একই অবস্থা। বরং এখানকার ছাত্ররা নাকি কথঞ্চিৎ শান্ত। মারধোর করে না।

অবশ্য এমন আচরণের চেয়ে মারধোর আর এমন কি বেশী অপমানজনক।

এ বয়সে তাঁকে অন্য কেউ নেবে কিনা তাও একটা প্রশ্ন।

মাস্টারমশাই ক্লাশে যাবেন না?

কে একজন বাইরে থেকে বলে গেল।

মাথা নীচু করে ভুবনমাস্টার ক্লাশে ঢুকলেন।

কি যে পড়ালেন, নিজেই জানেন না। বই থেকে মুখ তুললেন না। ক্লাশে কারো দিকে ফিরেও দেখলেন না। কোন প্রশ্ন নয়। কোনরকমে শিবাজীর রাজ্যশাসন প্রণালী পড়িয়ে গেলেন।

ঘণ্টা বাজতে যেন পালিয়ে বাঁচলেন।

এইরকম করতে হবে দিনের পর দিন। পান থেকে চুন খসলেই ছেলেরা ফণা তুলবে। ছোবলে ছোবলে অস্থির করে তুলবে। এই বিষটুকুই তাদের গুরুদক্ষিণা।

অসহ একটা যন্ত্রণায় ভুবনমাস্টার ছটফট করতে লাগলেন।

পৌরাণিক এক কাহিনীর কথা মনে পড়ে গেল। কোন এক শিষ্য গুরুর কথায় বুক দিয়ে বন্যার জল আটকাবার চেষ্টা করেছিল।

সে সব শিষ্য আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সে সব আদর্শও তিরোহিত।

বাড়ীর সঙ্গে লাগাও ছোট একটু জমি।

আগাছায় পরিপূর্ণ।

ভুবনমাস্টার ভাবতে লাগলেন যদি ক্ষমতা থাকত, যৌবনের শক্তি, তাহলে এই জমিতে ফসল ফলাতেন, তারপর সেই ফসল মাথায় করে নিয়ে বাজারে গিয়ে বসতেন।

শিক্ষকতা আর করতেন না।

এর চেয়ে লজ্জাকর জীবিকা বোধ হয় আর নেই।

মনে আছে আগে ছুটির পরেও কয়েকজন ছাত্র তাঁর কাছে এসে দাঁড়াত। কোন প্রশ্ন বা ইতিহাসের কোন ঘটনা নিয়ে আলোচনা করত।

ভুবনমাস্টার মহা উৎসাহে তাদের বোঝাতেন।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত পার হয়ে যেত তাঁর জ্ঞান থাকত না।

আজকাল আর কেউ আসে না। ক্লাশের ভাল ছেলেরাও নয়।

শিক্ষকের কাছে কোন কিছু জানতে আসা বোধ হয় এরা অমর্যাদাকর মনে করে।

ভুবনমাস্টার লক্ষ্য করেছেন, এদের চোখের দৃষ্টিতে কাঠিন্য। ভাবগতিক দেখে মনে হয় যেন এদের ধারণা শিক্ষকরা আলাদা জাত। তাদের সঙ্গে কোথাও কোন মিল নেই।

শিক্ষকরা শিক্ষাদান করার যন্ত্র। প্রয়োজন হলে সে যন্ত্র তারা ভেঙে মুচড়ে দেবে।

কয়েকদিন পরেই নোটিশবোর্ডে বিজ্ঞপ্তি আটকানো হল।

পরীক্ষা কবে হবে তার সঠিক তারিখ।

ভুবনমাস্টার নিরাপদকে বললেন।

এ তারিখ ছাত্রদের মনঃপূত হবে তো? এ নিয়ে কোন গোলমাল হবে না?

নিরাপদ মাথা নাড়ল।

না, গোলমাল হবে কেন? এবার তো ছাত্রসদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে তারিখ ঠিক করা হয়েছে।

ভুবনমাস্টার বললেন,

প্রশ্নপত্রও কি ছাত্রসদস্যদের সঙ্গে আলাপ করে করতে হবে নাকি?

নিরাপদ হাসল।

তা করলেই ভাল হয়।

তারপর ভুবনমাস্টারকে যেন সৎপরামর্শ দিচ্ছে এমনভাবে বলল,

তবে মাস্টারমশাই, প্রশ্ন বিশেষ কঠিন করবেন না, তা হলেই বিপদ।

ভুবনমাস্টার একদৃষ্টে নিরাপদর দিকে চেয়ে রইলেন।

সে দৃষ্টিতে কোন কটাক্ষ নেই। মার্বেলের মতন স্বচ্ছ চোখের তারা।

নিরাপদ বলে চলল।

চেয়ার টেবিল ভেঙে কেলেঙ্কারি করবে। স্কুল বিল্ডিং-এ আগুন ধরানোও বিচিত্র নয়।

ভুবনমাস্টার অন্যমনস্কের মতন বললেন,

তাই করুক। সব পুড়িয়ে ছাই করে দিক। তারপর সেই ছাই থেকে নতুন কিছুর সৃষ্টি হোক। সৎ, কল্যাণকর কিছু।

নিরাপদ আর দাঁড়াল না। বুঝতে পারল ভুবনমাস্টারের মন এখানে নেই। অনেক দূরে চলে গেছে। এই পঙ্কিল অসামাজিক পরিবেশ থেকে অনেক দূরে।

দিন পনেরো পরেই ব্যাপারটা ঘটল।

ছুটির পর ভুবনমাস্টার স্কুল থেকে বের হচ্ছিলেন, অমল এসে দাঁড়াল।

অমল লেখাপড়ার ধার দিয়েও যায় না। ক্লাশে একেবারে পিছন দিকে বসে। শিক্ষকদের সঙ্গে একটা অলিখিত চুক্তি আছে, তাকে কেউ প্রশ্ন করে বিরক্ত করবে না।

খেলার মাঠে অমল কিন্তু একচ্ছত্র সম্রাট। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি তিনটেতেই।

স্যার আমাদের ক্লাশের কোয়েশ্চেন হয়ে গেছে?

ভুবনমাস্টার মুখ তুলে একবার দেখলেন। অমলের কথায় বিশেষ কান দিলেন না।

অমল ছাড়বার পাত্র নয়।

ভুবনমাস্টারের পিছন পিছন গিয়ে বলল,

কোয়েশ্চেন শক্ত করবেন না স্যার, তাহলে বিপদ হবে।

হাতের ছাতাটা শক্ত করে মাটির ওপর ঠুকে ভুবনমাস্টার বললেন,

কিসের বিপদ? কি বিপদ হবে?

মিছামিছি স্কুলের কতকগুলো বেঞ্চ টেবিল নষ্ট হবে স্যার। উত্তর দিতে না পারলেই ছেলেদের মেজাজ বিগড়াবে।

উত্তর যাতে দিতে পারে, সেইভাবে পড়াশোনা করলেই পারে।

ভুবনমাস্টার প্রত্যেকটি শব্দের ওপর জোর দিলেন।

এই ভেজাল খেয়ে কি আর পড়াশোনা করা যায়, না মনে থাকে। যাক, কোয়েশ্চেনের কথাটা মনে রাখবেন।

অমল পিছিয়ে গেল।

সেই মুহূর্তে ভুবনমাস্টার শপথ নিলেন, কথাটা তিনি মনে রাখবেন। খুব ভাল করেই মনে রাখবেন।

অমল দশম শ্রেণীর ছাত্র। তাদের ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে ভুবনমাস্টার সবে হাত দিয়েছেন। এখনও সময় আছে। প্রশ্নপত্র এমনভাবে তৈরি করবেন যাতে খুব মেধাবী ছাত্র ছাড়া কেউ দন্তস্ফুট করতে না পারে।

যা হবার হোক। হুমকি দিয়ে ভুবনমাস্টারকে কাবু করা চলবে না।

বাড়ী গিয়েই ভুবনমাস্টার বিপদে পড়লেন।

কদিন ধরে নাতিটার অল্প অল্প জ্বর চলছিল। দেখাশোনা করছিল বুড়ো চাকর দীনু। সেদিন ফিরে দেখলেন, জ্বর খুব বেশী। বিকারের ঘোরে নাতি আবোল-তাবোল বকছে। দুটি চোখে জবাফুলের রং।

দীনুই বলল, মাস্টারবাবু এখনই একবার ডাক্তারকে খবর দিতে হবে।

ডাক্তার! ডাক্তার বলতে বাস রাস্তার মোহন চৌধুরী। বয়সে ছোকরা কিন্তু ইতিমধ্যেই হাতযশ খুব।

ভুবনমাস্টার উঠে দাঁড়ালেন। এখান থেকে মাইল আড়াই। গিয়ে আবার ডাক্তারকে না পেলেই মুস্কিল।

ডাক্তার ভাল কিন্তু হাতে টাকা না পেলে ওঠে না।

হাতবাক্স হাতড়ে ভুবনমাস্টার গোটা-চারেক টাকা তুলে নিলেন।

তাঁরও বয়স হয়েছে। এখন চলতে গেলে হাঁপ লাগে। থেমে থেমে চলতে হয়।

চৌরাস্তার মোড়ে গিয়ে ভুবনমাস্টার দাঁড়িয়ে পড়লেন। দুটো পা-ই কনকন করছে। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। একটু বিশ্রাম না করে নিলে উপায় নেই।

একটা দোকানের সামনের বেঞ্চের ওপর ভুবনমাস্টার বসলেন।

এখানে বসে আছেন কেন স্যার?

আচমকা কণ্ঠস্বরে ভুবনমাস্টার মুখ তুললেন।

সাইকেল হাতে রাজীব। তার পিছনে রাধাচরণ আর অমলও রয়েছে।

সর্বনাশ, এখনই হয়তো টিটকারি দেবে, কিংবা ইতিহাসের প্রশ্নের কথা জিজ্ঞাসা করবে।

মনের এই অবস্থায় এদের সঙ্গে কথা বলতে ভুবনমাস্টারের ভাল লাগবে না।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আস্তে আস্তে এগোতে লাগলেন।

ছেলের দল ছাড়ল না।

ঘিরে ধরল তাঁকে।

কি হয়েছে স্যার, আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

অসহায় দুটি চোখ তুলে ভুবনমাস্টার দেখলেন। একজনের মুখ থেকে আর একজনের মুখ।

এদের কথার মধ্যে ব্যঙ্গের সুর আছে, এমন মনে হচ্ছে না।

তিনি খুব মৃদুকণ্ঠে বললেন,

বাড়ীতে অসুখ।

কার অসুখ?

আমার নাতির। সেইজন্যই ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।

ডাক্তারের কাছে মানে সেই চণ্ডীতলা। সে তো বহুদূর।

উপায় কি।

ভুবনমাস্টার চলতে শুরু করলেন।

আপনি বাড়ী যান স্যার। ডাক্তার চৌধুরীর কাছে যাচ্ছিলেন তো? আমি তাঁকে নিয়ে যাচ্ছি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে রাজীব লাফিয়ে সাইকেলের ওপর উঠল।

শোন, শোন টাকা নিয়ে যাও।

ভুবনমাস্টার চেঁচিয়ে উঠলেন।

পরে হবে স্যার।

রাজীব তীরবেগে বেরিয়ে গেল।

অসুখটা কি স্যার?

রাধাচরণ আবার জিজ্ঞাসা করল।

খুব জ্বর। ভুল বকছে।

চলুন আমরা আপনার বাড়ী যাই। রাজীব এখনই ডাক্তার নিয়ে আসবে।

ভুবনমাস্টার মাঝখানে, একপাশে রাধাচরণ, একপাশে অমল, বাড়ীর পথ ধরল।

পথে কোন কথা হল না। কি কথা বলবেন ভুবনমাস্টার ভেবে পেলেন না।

ডাক্তার চৌধুরী দেখে ওষুধ দিল। বলল, জ্বরটা একটু বাঁকা ধরনের। সারতে সময় নেবে।

ভুবনমাস্টারকে শুতে পাঠিয়ে রাজীব আর অমল রোগীর দুপাশে বসল। মাথায় জলপটি দিল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়াল। হাতপাখা দিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করতে লাগল।

রাধাচরণ খেতে গেছে। সে খেয়ে এসে বসবে। তখন এরা দুজন বাড়ী ঘুরে আসবে। সারাটা রাতই জাগতে হবে।

ভুবনমাস্টার শুতে গেলেন বটে, কিন্তু ঘুমাতে পারলেন না।

মশারির মধ্য দিয়ে একদৃষ্টে ছেলেদের দিকে চেয়ে রইলেন।

মনে মনে বার বার একটা অঙ্ক কষবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হিসাব মিলল না, মেলাতে পারলেন না। কোথায় একটা ভুল থেকে গেল।

ক্লাশে দুর্বিনীত, দুর্ধর্ষ, উচ্ছৃঙ্খল যে ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, এই ম্লান আলোর নীচেয় বসা সেবাপরায়ণ, শান্ত, পরোপকারী ছেলেদের সঙ্গে তার মিল কোথায়!

কোন ছবিটা সত্যি ভেবে ভেবে ভুবনমাস্টার কূল পেলেন না।

এই সামনের নয়নাভিরাম চিত্রটি চিরন্তন করার পদ্ধতিই হয়তো ভুবনমাস্টারদের জানা নেই।

জে সি হোর্সলে কর্তৃক ১৮৪৯ খৃঃ চিত্রিত পৃথিবীর প্রথম খৃস্টমাস কার্ড।

অভিনন্দন নববর্ষের

মধ্যশীতের তীক্ষ্ম শিহরণে শুকনো পাতার মত ঝরে পড়ে পুরোন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি। নববর্ষের নতুন আকাশে প্রথম ওঠা শিশুসূর্যের মিঠে উত্তপ্ততায় শীতের তীব্রতা ক্ষয় করে। শীতার্ত মনে আসে আনন্দের আমেজ, প্রকৃতির বুকে এমনিধারা ঋতু পরিবর্তনের মত মানুষের হিসাবে বাঁধা ৩৬৫ দিনের গোনা বছর শেষ হয় এক শীতপীড়িত মধ্যরাতের মুহূর্তে। আগামী দিনের সূর্যের উত্তপ্ততাকামী মন সবার সঙ্গে মিলেমিশে নতুন দিনের প্রত্যূষের অপেক্ষায় একজোট হয়ে প্রতীক্ষা করে ভোরের সূর্যের উত্তপ্ততাকে সমান-ভাবে ভাগ করে নেবে বলে। নতুন দিনের নতুন আশা নিয়ে আসে নববর্ষ। তার তাকে অভিনন্দন জানায় বিগত জীর্ণ-শীর্ণ ক্লান্তিভরা মুহূর্তগুলির পেরিয়ে আসা যুগযাত্রী মানুষ।

যুগ-যুগান্তে ফেলে আসা দিন-গুলিতেও বর্ষবিদায় ও বর্ষাভিনন্দনের রীতিপ্রকৃতি দেশবিদেশ দিনক্ষণের বা ঋতুভেদে গরমিল থাকলেও তাদের একটা মোটামুটি মিল খুঁজে পওয়া যায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে। পাশ্চাত্যে পৌষের মাঝামাঝি অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষে বর্ষশেষ হলেও, আমাদের দেশে চরম নিদাঘের মধ্যবর্তী চৈত্রের শেষে বর্ষ শেষ ঘটে। যদিও একদিন সূর্যের উত্তরায়ণের দিনটিকে স্মরণ করে নববর্ষের সূচনা হতো এদেশ ওদেশ সর্বত্রই। সেই হিসাবে ২৩ ডিসেম্বর নববর্ষ শুরু হওয়া উচিত ছিল ওদেশে, কিন্তু ভুল করে ১লা জানুয়ারী থেকে নববর্ষ শুরু হয় পাশ্চাত্যে। মাত্র ষোলশ বৎসর আগেও পৌষ সংক্রান্তির দিনে উত্তরায়ণ অারম্ভ হোত, এবং পরের দিন ১ মাঘ নববর্ষ শুরু হোত। সম্ভবতঃ সে দিনকে স্মরণ রেখেই মকরস্নানের রেওয়াজ চলেছে আজও আমাদের দেশে। "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং" একথা ভাগবত গীতায় বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ আমি দ্বাদশ মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ। বাংলাদেশে এ মার্গশীর্ষ বা মৃগশির্ষ অথবা মৃগশিরা নক্ষত্রসংলগ্ন মার্গশির্ষে পূর্ণিমা যে মাসে ঘটে সেই মাসকে আমরা অগ্রহায়ণ বলি। এই অগ্রহায়ণ কথার মানে—হায়ন অর্থে বর্ষ, অগ্র অর্থাৎ প্রথম। স্বভাবতঃই এ নামটি নির্দেশ করে বৎসরের প্রথম মাসকে।

শিপ্রা আদিত্য

এই অগ্রহায়ণে নববর্ষকে স্মরণ করে আজও যেসব পালা-পার্বণ চলে তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যটি হল নবান্ন। তারপর আছে বছরভরা সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে ইতুপুজো। উমনো-ঝুমনোর কাহিনীতে আছে ইতুলক্ষ্মীর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা, তুষ-তুষালির ব্রত। ব্রতের মাধ্যমে বছর ভরা সৌভাগ্যের কামনা।

নববর্ষ উপলক্ষ্য নতুনের আহ্বানকে স্মরণীয় করে তোলবার জন্য অভিনন্দন লেন-দেনের রেওয়াজ চলে আসছে ওদেশে অনেককাল ধরে। আমাদের এখানে এমন প্রথায় প্রাচীনতার প্রত্যক্ষ নজির না থাকলেও সাধু-সওদাগরদের নতুন খাতার পত্তন উপলক্ষ্য দেশব্যাপী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও সমঝোতা সৃষ্টির প্রথা ছিল। বর্তমানে এভাবেই এক জাতীয় উৎসবের আকার নিয়েছে নববর্ষের দিনটি। বাংলাদেশে যেমন এ উৎসব ঘটে ১ বৈশাখ, উত্তর ও পশ্চিম ভারতে তেমনি দেওয়ালীর লক্ষ্মী-পুজোর পরদিন অর্থাৎ কার্তিকের শুক্লা প্রতিপদে নববর্ষ ও নতুন খাতা অনুষ্ঠিত হয়। ঋতু অনুসারী এই উৎসব আজ প্রায় সব দেশেই ধর্মানুসারী হয়ে উঠেছে। স্বভাবতঃই খৃস্টধর্ম বিশ্বাসীদের কাছে খৃস্টজন্মের দিনটিকে উপলক্ষ্য করে যে উৎসব শুরু হয়—তারই জের টানা (২৫ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারী) শেষ হয় এই নববর্ষের উৎসবের দিনে।

নববর্ষ উৎসব আমাদের দেশের ব্যবসায়ী মহলে হিসেব-নিকেশ চুক্তির দিন। স্বভাবতঃই লেনদেনের ব্যাপার ঘটে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে। ওদের দেশেও এমন লেন-দেনকে উপলক্ষ্য করে এ দিনটি উদযাপিত হত সেই রোমক সভ্যতার যুগে, তবে তার পাত্র-পাত্রী ভেদ ছিল। সেখানে লেনদেন হত শাসক, শোষক, ও শোষিতদের মধ্যে। অমাত্যরা নজরানা পেশ করত সম্রাটের পদ-মূলে, জনসাধারণ 'পেশকর' দিতে বাধ্য হত শোষক অমাত্যদের দরবারে। নববর্ষের দিন এমন লেনদেনকে কেন্দ্র করে সেদিন যে উৎসব গড়ে উঠেছিল পরবর্তীকালে জনসাধারণের মধ্যেও ঐ রেওয়াজ চালু হয়। স্বভাবতঃই মহামূল্য অথবা নগদানগদি উপহার দেওয়া-নেওয়ার পরিবর্তে জনসাধারণ আপন সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতীকরূপী উপহার দেওয়া শুরু করল নিজেদের মধ্যে। পোড়া মাটির প্রদীপ, অথবা ফল-ফুল বা শুভ চিহ্ন প্রভৃতির মধ্যে নববর্ষের অভিনন্দন—লেখমালাযুক্ত উচ্চাবচ ফলক প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আদান-প্রদানের আদর চালু হল।

পনের শতকে জার্মানদের মধ্যে স্ব-রচিত তাম্রফলক ও কাঠ খোদাইয়ের রঙীন ছাপ-চিত্র নেওয়া দেওয়ার প্রচলন হয়েছিল নববর্ষের অভিনন্দন উপলক্ষ্যে। প্রাচীন এই নববর্ষ উৎসবটিকে কেন্দ্র করে। খৃস্টধর্ম বিশ্বাসীরা খৃস্টের জন্মদিন উৎসব পালন করতে শুরু করলেন।

স্বভাবতঃই তখন এ দুটি উৎসব একই সঙ্গে পালিত হত। খৃস্ট জন্মদিন উপলক্ষ্যে পালনীয় ধর্মাচারণগুলির কতকগুলি প্রধানত প্রাচীন নববর্ষ উৎসবে পালিত প্রথার রূপান্তর। যেমন রোমক সভ্যতায় প্রচলিত এই নববর্ষ উপহার লেনদেনের প্রথাটি "অবিশ্বাসীদের" ব্যবহৃত প্রথার জন্য পরিত্যাজ্য হওয়ায় পনের শতকের খৃস্টীয় ধর্মযাজকদের দ্বারা পরিচালিত সমাজব্যবস্থায় ধর্মের আবরণে নবরূপ দান করা হল। সেদিনের এইসব তাম্রফলক বা কাঠখোদাইয়ের ছবিগুলিতে ধর্মীয় বিষয়-বস্তু নতুনরূপে সংযোজিত হল—ক্রুশবাহী যীশুখৃস্ট, শিশুখৃস্ট এবং কুমারী মেরীর চিত্রযুক্ত সমুদ্রপোত—অর্থাৎ আশার প্রতীক চিত্রাবলী। সমকালীন বড়দিন উপলক্ষে ইংরাজী ভজন গানে রচিত "পালতোলা ঐ তিনটি জাহাজ, যায় ভেসে" এমন পংক্তি ঐ আশার প্রতীককে প্রতিভাত করে। সেদিনের প্রচলিত পঞ্জিকাগুলিতেও নববর্ষের অভিনন্দন জানানোর রীতি ছিল। পরবর্তী ষোল ও সাতের শতকে এমন অভিনন্দন জ্ঞাপনার চিত্রাবলী লেনদেনের ভাবপ্রবণ রীতি রূপ সামাজিক প্রতিঘাতে ব্যাহত হল।

আঠার শতকের শেষের দিকে এই প্রথা এক নতুন সামাজিক প্রয়োজনে নতুনরূপে দেখা দিল ইউরোপের কয়েকটি দেশে। যেমন, অস্ট্রিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি অঞ্চলে নববর্ষ উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন লেনদেনের প্রয়োজনে সেদিনের জনসাধারণ এবাড়ী ওবাড়ী আনাগোনা করত নববর্ষের দিনটিতে। অনেক সময়ই আগন্তুক আকাঙ্ক্ষিত গৃহে পৌঁছে দেখত যে গৃহস্বামী অনুপস্থিত, স্বভাবতঃই সেদিকের রেওয়াজমত আপন নামধাম লেখা পরিচয়পত্র রেখে আসত গৃহস্বামীর উদ্দেশ্যে। এই সামাজিকতাটুকুই সুন্দর করার আগ্রহে সেদিন অনেক সুরুচি-সম্পন্ন নাগরিক আপন পরিচয় পত্রটিকে সুদৃশ্য লেখমালা ও অলংকরণে সুসজ্জিত করে রেখে আসত প্রত্যাশিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে। স্বভাবতঃই এই ব্যবস্থাটি ব্যক্তিগত অনুপস্থিতির দোষস্খালনের জন্য এবং উপহারটিকে আরও সুমণ্ডিত করার জন্য সুন্দর থেকে সুন্দরতরের প্রচেষ্টা চলতে লাগল। নিছক অলংকরণ ও লেখমালার পরিবর্তে সুচিত্রিত ভাববাহী চিত্ররূপ পেতে লাগল নিঃসঙ্গ কুমার, প্রেমিক-প্রেমিকা, বিদ্যালয়-সুহৃদ প্রমুখের ভাবাবেগের ছোঁয়ায় অথবা বিত্তবান আত্মীয়দের মনোরঞ্জনের ইচ্ছায়। বর্ষাভি-নন্দনের এই প্রথার জনপ্রিয়তার সঙ্গে সমতালে সহযোগিতা করল সমকালীন মুদ্রণরীতির বিচিত্র উন্নতি। ভিয়েনা, বার্লিন, প্যারী প্রভৃতি নগরে উন্নত রেখাচিত্র মুদ্রণ প্রক্রিয়ায় মুদ্রিত হতে লাগল এমন কত বিচিত্র নববর্ষের অভিনন্দনপত্র। রেশমী কাপড়ে ছাপা অভিনন্দনপত্র থেকে শুরু করে কাঠখোদাই বা তাম্রফলক খোদিত রেখাচিত্রের মহার্ঘ্য অভিনন্দনপত্রগুলির

ডবলু. এস. কোলম্যান কর্তৃক ১৮৮১(?) খৃঃ চিত্রিত স্নানরতা বালিকার এক খৃস্টমাস কার্ড। যে সময়ের পাঞ্চ পত্রিকা এই আদিরসাত্মক চিত্রটিকে নিয়ে যথেষ্ট ব্যাঙ্গাত্মক সমালোচনা করেছিলেন।

সঙ্গে দপ্তরীদের কারিগরী বিদ্যাসংযুক্ত হয়ে চিকনের কারুকার্যশোভিত বা চিত্রিত কাটা কাগজ প্রভৃতির সুসংযুক্ত নানাধরনের অভিনন্দনপত্রের প্রচলন হয়েছিল সেদিন। এমনকি বার্লিনের এক লোহার কারখানা ঢালাই লোহা দিয়ে অভিনন্দনপত্র রচনা করে আপন প্রতিষ্ঠানের কারিগরী বিদ্যার বাহাদুরী দেখিয়েছিলেন। 'মৌক্তিক' ঝিনুককে রাজকীয় পোশাকের উপর সূচীকর্মের দ্বারা অথবা বিভিন্ন রংয়ের কাঠের সমন্বয়ে রচিত কারুকারী বা মোজাইক করা ফলকে মহার্ঘ্য অভিনন্দনপত্র দেওয়ার রেওয়াজ তখনকার বিত্তবান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

ইউরোপের এই নববর্ষ অভিনন্দন রীতি ইংলণ্ডে তখনও কিন্তু জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। তবে খৃস্টমাস বা বড়দিন অথবা জন্মদিন উপলক্ষে ইংল্যাণ্ডে শিশুদের মধ্যে অলংকৃত কাগজের উপর লিখিত অভিনন্দন-পত্র দেওয়া-নেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়ে ছিল তখন। এর মধ্য দিয়ে শিশুদের উন্নত হস্তাক্ষর ও নির্ভুল বানানে অভিনন্দনপত্র রচনা ইত্যাদি দ্বারা তাদের বিদ্যার্জনের সার্থকতা প্রমাণিত হতো অভিভাবকদের কাছে। স্বভাবতই তাঁরা সেগুলি প্রথমত সযত্নে বিদ্যালয়কক্ষে টাঙিয়ে রাখতেন কিছুদিন। তারপর গৃহকক্ষে, চুল্লী-শীর্ষ অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে সেগুলি সযত্নে রক্ষিত হতো। উৎসবের দিনগুলি সম্ভবত এই দুই প্রচলিত রীতির প্রেরণাতেই ইংলণ্ডে খৃস্টমাস বা বড়দিন এবং নববর্ষ উপলক্ষ্যে অভিনন্দনপত্রের আদান-প্রদানের প্রথা জন্মলাভ করে সেই ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে।

মহারাণী ভিকটোরিয়ার যুগে অবিশ্বাস্য শিল্প উন্নয়নের রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে সম-ঝোতা করার প্রেরণায় ইংলণ্ডের কল্পনা-বিলাসী শিক্ষিত সমাজ যে সব ভাবালুতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, বড়দিনের অভিনন্দনপত্রের আদান-প্রদান রীতি তার অন্যতম একটি। 'খৃস্টমাস-বৃক্ষ' প্রচলন রীতির মতোই এই খৃস্টধর্মাশ্রয়ী শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপক পত্রাবলীর আদান-প্রদানের রেওয়াজ একান্তভাবে ইংরেজদের সৃষ্টি। ১৮৪৬ খৃঃ আগে এ প্রথার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ওদেশে কোথাও পাওয়া যায়নি। এবং আজকের এই জগৎজয়ী প্রথাটি ওদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে প্রায় ১৮৬৬ খৃঃ নাগাদ। এই জনপ্রিয়তার হিসেব ধরলে এ প্রথা চালু হবার শতবার্ষিকী বিগত হয়েছে মাত্র তিন বছর আগে।

সমকালের প্রচলিত যন্ত্রযুগের বিচিত্র পরিস্থিতিতে বিপন্ন মানুষ—প্রতিবেশীদের সংস্কৃতির জগতে পুনর্বাসনের চেষ্টায় সেদিনের ইংল্যাণ্ডে বেশ কিছু সংস্কৃতিবান ব্যক্তি কর্মঠ হয়ে উঠেছিল। দেশবাসীকে সংস্কৃতিবান করবার প্রচেষ্টায় স্যর হেনরী

কোলে আজকের জগৎখ্যাত ভিকটোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়ম সংগঠন করে তার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হ'ন। স্যার কোলের দিনপঞ্জীতে একটি পংক্তি লিখে গেছেন ঃ

"মিঃ হোর্সলে এসেছিলেন খৃস্টমাসের অভিনন্দনপত্রের খসড়াসহ।" সম্ভবত এই লেখাটি পৃথিবীতে অভিনন্দনপত্র প্রচলনের প্রথম হদিশ। তারপর প্রখ্যাত চিত্রকর ও পুস্তক অলংকরণাদি রয়্যাল আকাদেমিসিয়ান জন ক্যালকট হোর্সলে রচিত অভিনন্দন-পত্রের খসড়াটি লিথো পদ্ধতিতে ১০০০টি মুদ্রিত হয় ১৮৪৬ খৃঃ। তারপর সেগুলি হাতে রং করে স্যার কোলে স্থাপিত কলা-বিপণী 'ফেলিকস সামেরলিস ট্রেজার হাউস' নামে ইংল্যান্ড শহরে বন্ড স্ট্রীটের দোকান থেকে বিক্রী করা হয়েছিল। জার্মান রাজপুত্র এবং ইংল্যান্ডের প্রিন্স কনসর্ট-এর বন্ধু ছিলেন স্যার কোলে (যিনি স্বদেশ থেকে সংগৃহীত গাছ এনে খৃস্টমাস বৃক্ষ রচনা পদ্ধতি প্রচলন করেন) স্বভাবতই কোলের পক্ষে এই নতুন রীতির প্রচলন কিছুটা সহজ হয়েছিল। সাধারণত পোস্টকার্ডের মাপেই রচিত হয়েছিল কোলে প্রচলিত সেদিনের অভিনন্দনপত্রটি। ছবিটি তিন অংশে বিভক্ত, আয়তকার ক্ষেত্রে আইভিলতা ও কাঠের মাচার অলংকরণ দিয়ে বিভক্ত হয়েছিল চিত্রাংশগুলি। দুই পাশে দুই ক্ষুদ্র অংশে আঁকা ছিল খৃস্টমাস উপলক্ষ্যে অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় রীতি—ক্ষুধার্তকে অন্ন দান, নগ্নকে বস্ত্র দানের চিত্রাবলী। মধ্যের বড় অংশটিতে ছিল উৎসব আনন্দে বিভোর এক সমবেত পরিবার এবং তার নীচে প্রলম্বিত বস্ত্রখন্ডে লেখা ছিল 'এ মেরী খৃস্টমাস অ্যান্ড এ হ্যাপী নিউইয়ার টু ইউ।' ভিকটোরিয়ার যুগে খৃস্ট জন্মানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রচলিত বিধিগুলি ছিল অভিনন্দন-পত্রের বিষয়বস্তু। অর্থাৎ ভাল কাজ ও ভাল পান এবং ভোজন। এই চিত্রটির অলংকরণ রীতির অবশ্যম্ভাবীরূপে মধ্যযুগে প্রখ্যাত জার্মান শিল্পী দুয়েরার কর্তৃক সম্রাট ম্যাকিসমিলিয়নের জন্য চিত্রিত প্রার্থনা পুস্তকের সীমান্ত অলংকরণ থেকে সংগৃহীত. এমন কি হোর্সলে এই অভি-নন্দনপত্রের চিত্রাংশটুকুও সমকালীন প্রখ্যাত জার্মান শিল্পী লুডুইক খুস্টের রচিত পুস্তক চিত্রায়নের অনুসরণে চিত্রিত করে-ছিলেন।

সেদিনের ইংল্যান্ডের প্রচলিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হত সমকালীন অভিনন্দনপত্রের নিয়মিত সমালোচনা। ১৮৫৫ খৃঃ 'ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ' প্রথম খৃস্টমাস উপলক্ষ্যে রঙিন বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন এবং তাতে চারটি পূর্ণ পৃষ্ঠা ছবি ছেপে খৃস্টমাস কার্ডের নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করেন। টাইমস্, পাঞ্চ, লন্ডন চেরীভেরী প্রভৃতির পত্র-পত্রিকার প্রাচীন সংখ্যাগুলি খুঁজলে এমন সমালোচনার হদিশ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। মূল ছবি কিনতে অপারগ মধ্যবিত্তদের মধ্যে হঠাৎ জনপ্রিয় বাৎসরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের এই ব্যবস্থাকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাজে লাগাতে শুরু করলেন প্রকাশক ও চিত্রকরবৃন্দ, স্বভাবতই চরম প্রতিযোগিতার ফলে ১৮৭০ খৃঃ নাগাদ আদিরসের আম-দানী হল এই চিত্র ব্যবসায়। এমন সমা-লোচনা সেদিন সম্ভব করেছিল অভিনন্দন-পত্রের বিস্ময়কর ক্রমোন্নতিকে। অবশ্য খৃস্ট-মাস কার্ড বা নববর্ষ অভিনন্দন আদান-প্রদান রীতিকে জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করেছিল সেদিনের ইংল্যান্ডের প্রচলিত সস্তা ডাক লেনদেনের ব্যবস্থা। স্যার রোল্যান্ড হিল কৃত 'পেনি পোস্ট' ব্যবস্থা চালু হবার আগে সাধারণত লন্ডন থেকে উইন্ডসর পর্যন্ত ঘোড়ার গাড়ীর ডাক এ প্রতিটি চিঠি পাঠাতে খরচ পড়ত পাঁচ পেন্স করে। লন্ডন থেকে ডারহামে পৌঁছুতে প্রতি চিঠির জন্য খরচ পড়ত প্রায় এক শিলিং করে। তারপর রেলগাড়ী চালু হওয়ায় এবং ১৮৭০ খৃঃ আধ পেনির ডাক টিকিটের পোস্ট কার্ড চালু হওয়ায় হঠাৎ খৃস্টমাস বা নববর্ষ উৎসবের লেনদেন প্রথা এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে ১৮৭৯ খৃঃ ইংল্যান্ডের পোস্টমাস্টার জেনারেল খৃস্ট-মাসের দিন, রাতের ডাক বাছাইয়ের কাজে গুরুতর চাপবৃদ্ধির কথা জানালেন কর্তৃ-পক্ষকে। সেই অনুসারে ১৮৮০ খৃঃ প্রথম খৃস্টমাস উপলক্ষ্যে দ্রুত চিঠিপত্র ডাকে দেওয়ার অনুরোধ বিজ্ঞাপিত হল সরকারী ভাবে। এই সময় প্রায় ৪০।৫০ লক্ষের অধিক চিঠি খৃস্টমাস উপলক্ষ্যে লেনদেন হওয়া শুরু হয়েছিল। ১৮৭৭ খৃঃ দি টাইমস পত্রিকার একজন সংবাদদাতা গাড়ী ভর্তি এই কার্ডগুলির জন্য জরুরী চিঠিপত্র আদান-প্রদানের অসুবিধা নিয়ে এক সমালোচনা প্রকাশ করে এবং এই রচনায় তিনি এই প্রথাকে 'এক বিশাল সামাজিক দুর্নীতি' বলে অভিহিত করেন। এমন কি তিনি রাজকীয় শুল্ক-দপ্তরকে উপদেশ দিয়েছিলেন এই অবিশ্বাস্য রকমের নতুন জনপ্রিয় প্রথাটির উপর প্রয়োজনীয় শুল্ক ধার্য করার বিষয়।

খৃস্টমাস কার্ডের জন্মদাতারূপে ইংল্যান্ড চিহ্নিত হলেও উন্নত মুদ্রণ প্রক্রিয়ায় বিশেষত দেশগুলি থেকে মুদ্রিত হয়ে আসতো সেদিনের জনপ্রিয় ব্রিটিশ খৃস্টমাস কার্ড গুলি। প্রধানত জার্মানীর ক্রমো লিথো প্রক্রিয়ায় মুদ্রণ বিশেষজ্ঞরাই ঐ কাজে সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। জার্মান 'ক্রেমজ' বা লিথো মুদ্রিত চিত্রাবলী সেদিন সমস্ত ইয়োরোপকে প্লাবিত করে ভারত পর্যন্ত এসে পৌঁচে-ছিল। এমন কি ইংল্যান্ডের প্রকাশকরা জার্মানদের মুদ্রিত চিত্রাবলী দিয়েই খৃস্ট-মাস কার্ডের ব্যবসা চালাতো। প্রথম মহা-যুদ্ধের আগে পর্যন্ত এ রীতি প্রচলিত ছিল ওদেশে তারপর মহাযুদ্ধ উপলক্ষ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ব্যাহত হওয়ায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ আপন আপন মুদ্রণ শিল্পীদের উপর নির্ভর করেই স্বদেশী অভিনন্দনপত্র রচনার কাজ সাফল্যের সঙ্গে শুরু করেন। আজ দেশবিদেশের বিচিত্র অভিনন্দনপত্র-সম্ভারের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য দেখে বিস্মিত হয়ে ভাবতে হয় কতরূপে, কতভাবে কত বিস্ময় নিয়ে অপেক্ষমান আগামী দিনের অলিখিত অভিনন্দনপত্র।

এই পৃথিবীতে হরেক রকমের কারবার আছে এমন কি মরা মানুষের শবদেহটাও বিক্রী করার জন্য একদল লোক তাদের সদা-জাগ্রত দৃষ্টি মেলে রেখেছে, কোনো-রকমে একটা দেহ পেলে হয়, তারপর তাকে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রী করে দু-পয়সা লাভ করা যায়। এমনকি কবর থেকে সদ্য কবরস্থ দেহকে রাতের অন্ধকারে চুরী করে বিক্রী করার সংবাদ প্রায়ই সংবাদপত্রে পাওয়া যায়।

এমনই একজন বড় ব্যবসাদার মৃত্যুর কারবার করে প্রচুর সম্পদ, প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন। তাঁর প্রভাবে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের রথচক্র আবর্তিত হয়েছে। জার্মাণীতে একটি কথা প্রচলিত ছিল—

"Wenn Deutschland bluht, bluht Krupp" অর্থাৎ জার্মাণীর প্রতিপত্তিতে ক্রুপেরও প্রতিপত্তি। এই ক্রুপেরা অস্ত্র-ব্যবসায়ী। প্রায় হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী এক বিরাট গ্রন্থে উইলিয়াম ম্যানচেষ্টার দেখাবার চেষ্টা করেছেন। জার্মাণীর ভাগ্য কিভাবে ক্রুপদের ব্যবসার সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত হয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে। এই ক্রুপেরা ছাড়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গোলা-বারুদের কারখানার মালিক। হাতিয়ার বানাবার কাজে এদের জুড়ি ছিল না।

মধ্যযুগ থেকে এই ক্রুপ-যুগের সূচনা এবং মাত্র গত বছর তার অবসান ঘটেছে। রুঢ় অঞ্চলের এসেন শহরে প্রথমতম ক্রুপ— আরনল্ডের নাম শোনা যায় ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে। এই অঞ্চলটিতে জার্মাণীর প্রচুর কয়লা উৎপন্ন হয় আর সারা য়ুরোপের মধ্যে উৎকৃষ্ট ইস্পাত এখানেই মেলে। তাই জার্মাণীর সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির প্রধানতম উৎস ছিল এই অঞ্চল।

১৯৬৭-তে আলফ্রিড ক্রুপের মৃত্যু হয়। ক্রুপ পরিবারের ইনি সবচেয়ে কুখ্যাত ব্যক্তি। অদৃষ্টের পরিহাস বলতে হবে, এই ক্রুপের পুত্রটি বিচিত্র। যে ঐতিহ্যবাহী কারবার তাঁরই নামাঙ্কিত সেই কারবারের প্রতি তাঁর কোন মোহ নেই. এবং এই গোলা-বারুদের কারখানা যা প্রায় তিন শতাব্দীকাল ধরে বিরাম-বিহীন গতিতে মারণাস্ত্র বানিয়েছে তার ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ পেল এবং এই কারখানা বর্তমানে রাষ্ট্রীয় পরিচলনাধীন।

এই কারখানার ক্রমবিকাশ ঘটেছে ধীর গতিতে, অতি ধীরে ধীরে।

এই কারখানা জার্মাণীর রাজনৈতিক শক্তির উৎস হয়ে উঠেছিল, এর শেষ অঙ্কের যবনিকা পতন কিন্তু অতি দ্রুতগতিতেই হয়ে গেল। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্ট জার্মাণীর অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিৎ নড়ে যাওয়ার ফলে এই কারবারটি নষ্ট হয়। ইনসিওরেন্স কোম্পানী ও ২৬৩টি ব্যাঙ্কের কাছে এই কারবারের প্রায় ৭০০ কোটি ডলারের মত ঋণ ছিল। এছাড়া সরবরাহ ঋণ খোলা বাজারের ধার প্রভৃতির পরিমাণ এত বেশী যে তার সংখ্যা লিখে শেষ করা যায় না। কয়েক নিযুতের মত এই ঋণের দায়ে কারবার লালবাতী জ্বালালো। মুমূর্ষুকে রক্তদানের মত, কিছু টাকা অবশ্য ঋণ হিসাবে মহাজনরা দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু তার দ্বারা বাঁচানো সম্ভব হল না এই কারবার। এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত করা হল। এই ইতিহাস লিখেছেন উইলিয়াম ম্যানচেষ্টার।

১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৮—এই কালের মধ্যে ক্রুপ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস আর জার্মাণীর ইতিহাস সমান্তরাল গতিতে চলেছে। ১৬১৮ থেকে ১৬৪৮-এর ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধকালে আরণ্দতের পুত্র এনটন ক্রুপ বছরে ১০০০ কামানের নল বানিয়েছেন। অস্ত্র নির্মাণে এ তাঁদের প্রথম প্রচেষ্টা। নেপোলিয়নের যুগে যে অস্ত্র সরবরাহ হয়েছিল তার বৃত্তান্ত লিখিত আছে পারিবারিক ইতিহাসে।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে আলফ্রেড ক্রুপ প্রাসিয়ার জন্য প্রথম কামান প্রস্তুত করেন। এর দুই দশকের মধ্যে প্রাসিয়া অষ্ট্রিয়াকে আক্রমণ করল ক্রুপসদের বানানো কামান নিয়ে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধ শুরু হল তখন সেডানে দ্বিতীয় নেপোলিয়ানকে পরাজিত করার ব্যাপারে ক্রুপসদের নির্মিত কামান যথেষ্ট সহায়তা করে। নতুন ধরনের ক্রুপস কামান দিয়ে প্যারিসের ওপর অবিরাম গোলা নিক্ষিপ্ত হল, তাদের নতি স্বীকার করতে হয়, তখন এই বোমা-বাজি বন্ধ হল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ফ্রিৎস ক্রুপ কাইজারের নৌবহর গড়ে দিলেন আর তারই চোদ্দ বছর পরে বিরাটাকৃতি 'বিগ বার্থা' তৈরী হল এবং এই কামানেই বেলজিয়াম ধ্বংস করা সহজ হয়।

॥ মরণের সওদাগর ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত এই ছিল পদ্ধতি। প্রতিটি নতুন অস্ত্র, সামরিক হাতিয়ারের যা কিছু নতুন আবিষ্কার ক্রুপ প্রতিষ্ঠান বানিয়েছেন জার্মান নেতৃবৃন্দ তাই কাজে লাগিয়েছেন। বিসমার্ক, কাইজার, হিটলার সকলেরই সেই এক ধারা। তারা সবাই জার্মানীর গৌরববৃদ্ধি মানসে অবলীলাক্রমে এই ক্রুপস কারখানার হাতিয়ার ব্যবহার করেছেন। মৃত্যু-বেপারী ক্রুপসদের সঙ্গে জার্মানীর রাষ্ট্রনেতাদের এমনই মাখামাখি যে জার্মানীর সাধারণ মানুষের কাছে দেশের নেতৃবৃন্দ আর ক্রুপস প্রতিষ্ঠানের মালিকরা একই বস্তু হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন, অর্থাৎ উভয় পক্ষের ব্যক্তিরাই মহা দেশপ্রেমিক।

মিঃ ম্যানচেস্টারের কাছে হামবুর্গের জনৈক সম্পাদক স্বীকার করেছেন—

> There's always been a feeling here that other Companies make profits, but the **Krupp** is doing Something for Germany."

ক্রুপস প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে জঘন্যতম সংযোগ হল নাৎসী যুগের কর্তাদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। গুস্তাভ ক্রুপ প্রথম মহাযুদ্ধের পর যুদ্ধ-অপরাধী ঘোষিত হন, এই ব্যক্তিই ১৯৩৩-এর হিটলারের 'কল্যাণকর নির্বাচনে' অর্থ সাহায্য করেন। এই বছরেই হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এই কর্মের বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা ভরে হিটলার গুস্তাভকে 'ফুরার অব ইনডাস্ট্রি' উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৯৩৮-এ নিরর্থক অস্ট্রিয়ান 'পুৎস' বিফল করার পর তাঁকে আবার পুরস্কৃত করা হল। ইতিমধ্যে গুস্তাভতনয় আলফ্রিড রীতিমত কট্টর নাৎসীতে পরিণত হয়ে ওঠেন। ১৯৩১-এ গুস্তাভ স্টরম ট্রুপার দলে যোগদান করেন। পিতার মৃত্যুর আট বছর আগে ১৯৪২-এ আলফ্রিড তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সর্বাধ্যক্ষ হলেন।

যুদ্ধাবসানে বিশেষ যুদ্ধ-অপরাধের দায়ে ওয়ার ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক চারটি প্রধান অপরাধের জন্য তাঁর বিচার হয়। শান্তি, লুন্ঠন, মানবিকতার বিরুদ্ধে অপরাধ প্রভৃতির জন্য তাঁকে দায়ী করা হয়—তাঁর কারখানায় জোর করে বিনা পারিশ্রমিকে লোক খাটানো হত, এক রকম বেগার প্রথা। তিন বছর ধরে এই বিচার চলল এবং বিচার শেষে রায়দান সূত্রে বলা হল :

> This huge octopus, the Krupp firm, with its body at Essen, swiftly unfolded one of its tentacies behind each new aggressive push of the Wehrmacht and sucked back into Germany much that could be of value to Germany's war effort and to the Krupp firm in particular.... The close relationship between Krupp on the one hand and the Reich Government... on the other hand, amounted to a veritable alliance. The wartime activities of the Krupp Concern were based in part upon spoliation of other countries and on exploitation and maltreatment of large masses of forced foreign labour."

এই কারণে আলফ্রিডের বার বছরের কারাদন্ড হল এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়া হল।

কিন্তু এই কালে মিত্রপক্ষগুলির চিত্তে যে উচ্চতর নৈতিক মান ছিল তা কিন্তু এই দণ্ডদানের তিন বছরের মধ্যেই হ্রাস পেল এবং যুক্তরাষ্ট্রের হাই-কমিশনার জন জে ম্যাকক্লয়ের চেষ্টায় আলফ্রিডকে মুক্তি দেওয়া হল। এর কারণ, কেউ কি স্পষ্ট করে বলে? তবে তার মধ্যে কোল্ড ওয়ারের হিম-প্রবাহ বইতে শুরু হয়েছে—১৯৪০-এ ন্যাটো গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে এবং মিত্রপক্ষের স্বপক্ষে রুঢ় অঞ্চলের প্রতি আধিপত্য থাকা প্রয়োজন ছিল, রুঢ় মানেই ক্রুপ, আর সোভিয়েট ইউনিয়নকে কব্জা করতে কত কি না করতে হয়, তখনকার মত সুনীতি শিকেয় তোলা রইল।

নাৎসী উৎপাতের অন্যতম এই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ও তার কর্তাদের কথা অমৃতে সমান না হলেও এই গরলের সঙ্গে একালের মানুষের পরিচয় থাকা প্রয়োজন তাই উইলিয়াম ম্যানচেস্টারের 'দি আর্মস অব ক্রুপ' গ্রন্থটির অবশিষ্ট অংশের আলোচনা আগামীবারে প্রকাশ করা যাবে।

—অভয়ংকর

সাহিত্যের খবর

দুই বাংলার মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আজ প্রায় নেই বললেই চলে। সীমান্তের ওপারের বাংলার সাহিত্য, শিল্প, পত্র-পত্রিকা সম্বন্ধে এপারের বাংলার মানুষেরা বিশেষ কিছু জানতে পারে না। অথচ দুই পারের মানুষের ভাষা এক, সংস্কৃতি এক। এই দুই পারের বাংলার সাংস্কৃতিক মৈত্রীকে দৃঢ় করবার জন্য সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর একান্ত প্রয়োজন। পূর্ব ও পশ্চিমবাংলা সম্প্রীতি সমিতি সম্প্রতি এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছেন। এবং সাংবাদিক সম্মেলনে এই সমিতির উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, তাঁরা শীঘ্রই সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সর্বস্তরে দুই বাংলার মানুষের সঙ্গে যোগসাধনের চেষ্টা করবেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির যে একটা ব্যাপক প্রসারণের সুযোগ আসবে, তাতে সন্দেহ নেই।

প্রখ্যাত হিন্দি কবি সুমিত্রানন্দন পন্থ এবারের 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার লাভ করেছেন। গত ১৯ ডিসেম্বর দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে তাঁকে সেই পুরস্কারটি প্রদান করা হয়। এই পুরস্কারের মূল্য নগদ এক লক্ষ টাকা। ১৯৪৫ সাল থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত রচিত গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে তাঁর 'চিদাম্বরা' কাব্যগ্রন্থটি এর জন্য নির্বাচিত হয়েছে। পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে কবি বলেন—"আজ মানবসমাজে নতুন মূল্যবোধ সঞ্চার করতে হবে। কেননা আজ বিজ্ঞান বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে অনেকখানি। মানুষ চায় তার অনুভূতির আরো ব্যাপক প্রসার।" শ্রীপন্থ দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করেন যে, ভারতের বর্তমান রাজনীতিবিদেরা দেশের ভাষার সঙ্গে যেমন যোগাযোগ রাখেন নি, তেমনি দেশের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ নেই। রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি, ভি, গিরি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন—"বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যে কোন জাতির বেঁচে থাকবার পক্ষে নিঃসন্দেহেই প্রয়োজনীয়। কিন্তু কোন জাতিই শিল্প ও সাহিত্য ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। তাই শিল্প সাহিত্যের উন্নতি জাতীয় উন্নতির জন্য একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়।" ডঃ গোপাল রেড্ডি পুরস্কারটি প্রদান করেন।

চেকভের নামের সঙ্গে পরিচিতি একালের প্রায় প্রতিটি সাহিত্যরসিকেরই আছে। সম্প্রতি ডেনিয়েল গিলি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও চিঠিপত্র নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়, চেকভ তাঁর পরিবারের প্রতি খুব সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর পারিবারিক দায়িত্ব তিনি কখনও ভোলেন নি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল অমায়িক। একবার যখন রাশিয়াতে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেয়, তখন বিভিন্ন গ্রামে সেবামূলক কাজ করে বেড়িয়েছেন তিনি। এ ছাড়াও একটি যক্ষ্মা হাসপাতালের জন্য তিনি গ্রামে গ্রামে চাঁদা সংগ্রহ করে বেড়িয়েছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কয়েকটি ব্যাপারে চেকভ ভিন্ন ধরনের ছিলেন। একবার তাঁর স্ত্রী ওলগা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন—'জীবনের অর্থ কি?' তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, "এটা ঠিক সেরকম, যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞেস কর, "গাজর কি?" "গাজর মানে গাজরই।" গিলির বইতে এরকম আরো অনেক তথ্য ছড়িয়ে

আছে। এ ছাড়াও কয়েকটি চিঠি থেকে নারী-পুরুষের জটিল সম্পর্ক সম্বন্ধে চেকভের মনোভাব, গোর্কি ও টলস্টয়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের অনেক উল্লেখ্য ঘটনা জানতে পারা যায়।

আধুনিক ইতালীয় লেখকদের মধ্যে একমাত্র মোরাভিয়াই ইতালীর বাইরে বিশেষ পরিচিত। এর কারণ, খুব বেশি লেখা অন্য ভাষায় অনূদিত হয়নি। তবু ইতালীয় সাহিত্য সম্বন্ধে পৃথিবীব্যাপী যে ক্রমাগত একটা আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার কারণ ইতালীয় সাহিত্যের ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি। আর, ডব্লু. ফ্লিট সম্প্রতি সিজারে পাভিসির চারটি উপন্যাস ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। গত বছর বেরিয়েছিল প্রখ্যাত কবি মনতালের অনুবাদ। সম্প্রতি ইতালীর তিনজন ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে একটি আলোচনা গ্রন্থ ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে। এই তিনজন ঔপন্যাসিক হলেন—আলবার্তো মোরাভিয়া, পাভেসি এবং এলইয়ো ভিত্তোরিনি। লিখেছেন ডোনাল্ড হেইনি। লেখক নিজেও একজন ঔপন্যাসিক। কিন্তু বইটি সম্বন্ধে খুব বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। বইটি নাকি সুপরিকল্পিত নয়।

প্রখ্যাত পাঞ্জাবি ঔপন্যাসিক রাজিন্দর সিং বেদির একটি ছোট উপন্যাস সম্প্রতি ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন খুশবন্ত সিং। উপন্যাসের কাহিনীটি খুবই ভালো। তা সত্ত্বেও খুশবন্ত সিংয়ের মত ব্যক্তি কেন যে এটি অনুবাদ করলেন, তা বোঝা মুস্কিল।

গত শনিবার কলকাতায় সন্ধ্যায় প্রখ্যাত তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর ৮৮তম জন্মদিন পালিত হয়। জাস্টিস অমরেশচন্দ্র রায় এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, "ভারতী হলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম স্থপতি।"

বাঙলাদেশে জীবনধর্মী নতুন সাহিত্যের যিনি অন্যতম প্রবর্তক সেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে জন্মোৎসব বা স্মৃতিসভা, কোন কিছুরই অনুষ্ঠান আজকাল ঘটে না। সেদিক থেকে ইয়ং পোয়েটস ফোরামের তরুণ কবিরা একটি অভিনন্দনযোগ্য স্মরণ-সভার ব্যবস্থা করেছিলেন গত ২৩ ডিসেম্বর ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মানি মৈত্রি সমিতি ভবনে। সভাপতিত্ব করেন নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়। চিন্মোহন সেহানবীশ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, যুগান্তর চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় দাশ, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সত্য গুহ, দীপক রায়চৌধুরী প্রমুখ আলোচনা ও কবিতা পাঠে অংশ নেন। কলকাতার কোন একটি রাজপথকে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরণীতে রূপান্তরিত করার জন্য কর্পোরেশনকে অনুরোধ জানিয়ে, এবং পশ্চিমবাঙলার শিক্ষামন্ত্রীর কাছে সমগ্র মানিক গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়ে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দেবেশ রায়ের গল্প প্রকাশক: সারস্বত লাইব্রেরী। ২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা—৬। দাম : ছ টাকা।

কল্লোল যুগের লেখকরা ছোটগল্পে কাহিনী বলতেন এবং তারই মধ্যে তাঁদের বক্তব্য ও চরিত্রদর্পণ স্বভাবী পাঠককে কখনো মুগ্ধ, কখনো বা তৃপ্ত করত। আজকের তরুণ গল্পলেখকদের অধিকাংশই সেই কাহিনীকে একেবারে বর্জন করতে চান। শ্রীদেবেশ রায় বাংলা সাহিত্যে এই ধারার অনুসারী একজন অত্যন্ত ক্ষমতাবান তরুণ গল্পলেখক। কথাটি মনে হয়েছে তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গল্প সংকলন পড়ে—যে সংকলন সম্ভবত আজ থেকে আট-নয় বছর আগে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল।

এই বইয়ের গল্পগুলি ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। একসঙ্গে পড়ার পর লেখককে সামগ্রিকভাবে বোঝা গেল। আলোচ্য তরুণ লেখকের দৃষ্টিতে যে বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তিচিত্ততা সদা-স্বীকৃত, গ্রন্থের গল্পগুলির মধ্যে সেই অভিজ্ঞতারই শিল্পসম্মত প্রকাশ দেখা গেল। গল্প রচনার মুহূর্তে লেখক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে ভুলতে চান না। বক্তব্য, বলার ভঙ্গি, গদারীতি যে কোন একটি ছোটগল্পের সমস্ত দিকেই 'অবজারভেশনে'র পরীক্ষামূলক রীতি গ্রহণে তিনি সচেষ্ট।

প্রথম দিকের গল্পে লেখক গল্পের বিষয়ে নতুনত্ব ও পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। শেষদিকের গল্পগুলিতে বিষয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির সঙ্গে বুদ্ধিগ্রাহ্য চিন্তাকে উজ্জ্বল করেছেন, আবার সেইসঙ্গে বসে সতর্ক বিশ্লেষণ করার মত আঙ্গিকের পরীক্ষায় মগ্ন হয়েছেন। অবাক হতে হয় এই ভেবে, লেখক কোথাও পরীক্ষাকে এক মুহূর্তের জন্যও চাপিয়ে দেন নি। এখানেই দেবেশ রায়ের পরীক্ষামূলক আধুনিক ছোটগল্প রচনার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

দেবেশ রায় গল্পে সুচিন্তিত তত্ত্বকথাকে বাদ দিতে চান না, কেননা তত্ত্বও তো মানুষের দেহে রক্তের মতই জীবনের অঙ্গ। আলোচ্য সংকলনে 'আহ্নিকগতি ও মাঝের দরজা' এবং 'দুপুর' গল্পে সেই তত্ত্ব গৌণ, মুখ্য হল লেখকের পরিবেশতন্ময়তা। সেই সঙ্গে চোখে পড়ে, প্রাত্যহিক সংসার-জীবনের কয়েকটি ছোট ছোট পরিচিত চিত্রে জীবনের অর্থ অনুসন্ধান প্রয়াস, এবং তা-ও ব্যঞ্জনায় ও প্রতীকে। 'কলকাতা ও গোপাল', 'পশ্চাদভূমি', 'নিরস্ত্রীকরণ কেন?' ও 'উদ্বাস্তু' গল্পে লেখক তত্ত্বের উপরেই স্থির হয়ে থেকে ছোটগল্পের একটি রসকেন্দ্র আবিষ্কারে তৎপর হয়েছেন। গল্পগুলি পড়ে স্বীকার করতে হবে, জীবনের রূঢ় সত্তার সঙ্গে ও সূক্ষ্ম অনুভূতির ব্যঞ্জনা মিশিয়ে দেওয়ার দুর্লভ ক্ষমতা দেবেশ রায়কে সার্থক এবং অনন্য করে তুলেছে। আলোচ্য সংকলনটি যে কোন চিন্তাশীল ছোটগল্প পাঠকের সংগ্রহ করার মত।

কবিতা কখনো নয়—(কবিতা পুস্তিকা) **রতন বিশ্বাস। ভারতী প্রিন্টিং প্রেস**, শিলিগুড়ি। দাম : এক টাকা।

সাম্প্রতিক কবিতার বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান অভিযোগ, অস্পষ্টতা। রতন বিশ্বাস সেরকম কবি নন। তাঁর কাব্যভাষা সাবলীল, নমনীয়, রোমান্টিক। অকারণ জটিলতার পথ তিনি অনায়াসে বর্জন করেছেন। স্মরণ করা যায় 'পাখি মন' কবিতার কয়েকটি পংক্তি :

টিয়া জন্ম নিয়েছিল
সদ্যপ্রস্ফুটিত পদ্মের মতো ডিমের
আবরণ হতে

নয়ন মেলেনি তখনো—
সূর্য-উদয়ের সোনালী আলোর
প্রভাতে......।

তাঁর সমগ্র চেতনায় স্বপ্নের আশ্বাস, বাস্তবের চেয়ে অতিকল্পনার উজ্জ্বলতায় লিরিক্যাল। জ্যোৎস্না, চাঁদ, ঘুম, চা পাতার কান্না, স্মৃতি প্রভৃতি শব্দ ও ভাবানুষঙ্গে তিনি নিম্নকণ্ঠ।

অনুশীলন অব্যাহত থাকলে, রতন বিশ্বাস ভবিষ্যতে ভালো কবিতা লিখবেন বলে মনে হয়।

আন্তর্জাতিক বইয়ের মেলায়

সৈকত ভট্টাচার্য

প্রতিবছর শরৎকালীন ফ্রাঙ্কফুর্টের আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনী পশ্চিম জার্মাণীর সাংস্কৃতিক জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। এই উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিক, নাট্যকার, কবি, সাংবাদিক অনুবাদক ও প্রকাশকদের এক বিচিত্র সমাবেশ হয়।

"সাহিত্যিকরা মোটেই অসহায় নন, যদি তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে দাবি পেশ করতে পারেন" —বলেন ডিটার লাটমান কয়েকমাস পূর্বে কোলনে অনুষ্ঠিত পশ্চিম জার্মাণীর জাতীয় সাহিত্যিক সমিতির উদ্বোধন উপলক্ষে। গত ২৫ বছরে এই সর্বপ্রথম পঃ জার্মাণীতে এমন একটি প্রগতিশীল সমিতি স্থাপন হল যার মাধ্যমে কবি, সাহিত্যিক, অনুবাদক, সাংবাদিক ও সমালোচকরা তাঁদের দাবী পেশ করতে সক্ষম হবেন। এই সম্মেলনে মূলতঃ লেখকদের কয়েকটি বিশেষ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়- যেমন বৃদ্ধ লেখকদের অবসর-বৃত্তি, কপিরাইট আইনের আমূল পরিবর্তন, গ্রন্থাগারে বই পিছু লেখককে সামান্য দক্ষিণা। উদাহরণ স্বরূপে বলা হয় গত বছর জন-গ্রন্থাগার থেকে সুইডেনের সাহিত্য-সমিতির আয় হয়েছে প্রায় সাত মিলিয়ন ডলার। প্রখ্যাত সাহিত্যিক হাইন-রিস বোয়ল তাঁর ভাষণে বলেন "লেখক-দের আর্থিক অবস্থার মানোন্নতির আশু প্রয়োজন এবং সরকারের কর্তব্য এবিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা। অর্থনৈতিক অব্যবস্থা আমাদের মার্জিত ইডিয়ট করে তুলেছে এবং ক্রমশই আমরা ফসিল হয়ে যাচ্ছি, যার স্থান শুধুমাত্র যাদুঘরে। সরকার ও সমাজের অগোচরে আমরা হলাম অদ্ভুত এক শ্রেণীর প্রাণী। মাঝে মাঝে সমাজের উচ্চমহলে আলোচিত হলেও এই আমরা আমাদের অনেকেই যে জীবন-ধারণের ন্যূনতম আর্থিক প্রয়োজনটুকু মেটাতেও অক্ষম তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কুড়ি-বাইশ মার্ক মূল্যের গ্রন্থে লেখকদের অধিকার মাত্র দুই মার্ক। আর পেপারব্যাকের বেলায় ত কথাই নেই। বইপিছু সাত থেকে আট ফেনিগ (ষোল পয়সা)। অনুবাদকেরা বিক্রীর উপর কোন দক্ষিণা পান না। হ্যাঁ, যদি সদাশয় প্রকাশক হন তাহলে বইপিছু এক ফেনিগ (দুই পয়সা) দক্ষিণা পান। আয়কর অফিসের কাছে অসাধু ব্যবসায়ী ও লেখকের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। লেখককে তার দমূল্য অধ্যয়ন গ্রন্থ ক্রয় নিমিত্ত আয়-করের কিছুটা অংশ রেহাই দেওয়া হবে কিনা সেটাও নির্ভর করে আয়কর অফিসের খেয়াল-খুশির উপর। লেখকদের কোন ট্রেড-ইউনিয়ন নেই, তাঁরা ধর্মঘট করতেও অক্ষম, কারণ আর্থিক কারণে শতকরা ৯৯জন লেখকের পক্ষে একমাসের বেশী ধর্মঘট চালানো সম্ভব নয়।" হাইনরিস বোয়লের এই বক্তৃতায় এতটুকুও অতিরঞ্জন নেই। পশ্চিম জার্মাণীর মত শিল্পোন্নত দেশ যার আর্থিক স্বাচ্ছল্য আজ ইওরোপের অন্যান্য দেশের ঈর্ষার কারণ সে দেশেও বুদ্ধি-জীবীদের যে কতটা আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে হয়, তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন হাইনরিস বোয়ল।

কয়েকমাস ধরে শুধু পশ্চিম জার্মাণীতে নয়, ইওরোপের অন্যান্য দেশেও সমিতি গঠন করে তার মাধ্যমে কবি, সাহিত্যিক ও নাট্য-কারদের আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাবের বিকাশ ঘটছে, আর অন্যদিকে ছোট ছোট প্রকাশক সংস্থা নিজেদের অস্তিত্বে ক্রমশই সন্দিহান হয়ে বৃহত্তর গ্রন্থ-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মার্জার শুরু করেছেন। সম্প্রতিকে লেখকগণ লেখার জন্যে যা সময় দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী সময় ব্যয় করেছেন সমিতি স্থাপনে। তারই রূপ প্রতিফলিত হয়েছে এবারের আন্তর্জাতিক পুস্তক-প্রদর্শনীতে। এর অবশ্য একটা কারণও রয়েছে। পাশ্চাত্য জীবনের গতি দ্রুত হতে দ্রুততর হচ্ছে প্রতিদিন, উপন্যাসের মূল্য আজ পাঠকদের কাছে আগের চেয়ে অনেক কম। সময়াভাব অবশ্যই এর অন্যতম কারণ। কম্পিউটারের যুগে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে প্রেমোপাখ্যান পড়ার সময় আজ অনেকেরই নেই। এবারের পুস্তক-প্রদর্শনীতে চোখ বুলোলেই প্রথমে নজর পড়ে উপন্যাসের অভাব।

তবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গুইন-তার গ্রাস একটি উপন্যাস উপহার দিয়েছেন। বইটির নাম 'লোকাল এনেসথেটিক'। গ্রাসের কাছে স্বাভাবিক কারণেই বুদ্ধিজীবী পাঠকদের প্রত্যাশা অনেক। গ্রাস শুধু লেখকই নন, রাজনীতিতেও তিনি একজন বিশেষ ব্যক্তি। এবারের নির্বাচনে প্রগতিশীল সোস্যালিস্টদের বিজয়ের মূলে তাঁর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় দশ বছর আগে তাঁর প্রখ্যাত উপন্যাস 'টিনড্রাম' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জার্মাণীতে বিশেষ জনপ্রিয় হন এবং কয়েক বছরের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে তার খ্যাতি সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়। তারপর তিনি লেখেন 'ডগইয়ার্স'। তিনি কয়েকটি নাটকও লিখে-ছেন, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল 'আংকেল আংকেল'। নাটকটি প্রথমে বার্লিনে এবং পরে অন্যান্য জায়গায় অভি-নীত হয়ে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। এবছরের গোড়ার দিকে তাঁর বহুবিতর্কিত সাম্প্রতিক নাটক 'দাফর' পশ্চিম বার্লিনের শিলার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। 'দাফর'-এর অর্থ হ'ল 'তার আগে' অর্থাৎ কোন বিশেষ ঘটনা ঘটবার আগে, যখন কোন দেশে বিশেষ দলের রাজনৈতিক কর্মকান্ড অনুষ্ঠিত হয়, যা দেশের ও জাতীর বিপর্যয়

ডেকে আনে, তার প্রতিবিধান স্বরূপ প্রতিবাদের প্রয়োজন সেই কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হবার আগে পরে নয়। এইরূপে একটি বক্তব্যকে নাটকে উপস্থিত করতে গিয়ে তিনি কতগুলি ইঙ্গিতধর্মী ঘটনার আশ্রয় নিয়েছেন। নাটকটির কাল '৬৭র শেষের দিক। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঃ স্বর্গ হতে নেপোলিয়ানের ভিয়েতনামে অবতরণ, বৌদ্ধ মঠবাসীদের আত্মাহুতি, তরুণ সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ, পঃ জার্মানীর সি ডি ইউ ও এস পি ডি-এর মধ্যে গ্রান্ড কোয়ালিশন ও নতুন সরকার গঠন।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সতের বছরের স্কুলের ছাত্র ফিলিপ বার্লিনের অভিজাত অঞ্চল কুরফুর্স্টেনডামে জনৈক হাই-সোসাইটি লেডির চোখের সম্মুখে একটা কুকুরকে পোড়াতে চাইল। এহেন অসামাজিক কার্যকলাপে হাই-সোসাইটি লেডির মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম। ফিলিপ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে হাই-সোসাইটি লেডির কাছে ভিয়েতনামে সন্ন্যাসীদের আত্মাহুতি অনুন্নত এশিয়ার কুসংস্কার হলেও নিজের দেশের একটি কুকুরের প্রাণ অনেক মূল্যবান, নাটকটিকে তিনি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে মঞ্চস্থ করেছেন, যার ফলে উঠেছে বিতর্কের ঝড়। গুইনটর গ্রাস এসকেপিস্ট লেখক নন, তিনি প্রগতিশীল এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত। কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিতদের প্রতি তাঁর একান্ত অনাস্থা। কলম ধরার শুরু থেকেই চালিয়েছেন তিনি আপোষহীন সংগ্রাম। এবারের পশ্চিম জার্মানীর নির্বাচন সফরে ও বিভিন্ন সম্মেলনে তিনি যা ভাষণ দিয়েছেন তা এদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর সাম্প্রতিক লেখায় রাজনীতি বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। এই রাজনৈতিক সচেতনতা তাঁর লেখাকে দিয়েছে বিশেষ স্টাইল। গ্রাসের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা হ'ল 'ক্যাট এন্ড মাউস', 'সি সলটলেক লাইন', 'টিল টেন মিনিটস টু বাফেলো'।

সুইজারল্যান্ডের লেখক মাক্সফ্রিস এবারের প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন না। মাক্সফ্রিসের 'স্টিলার', গান্টেনবাইন প্রভৃতি উপন্যাস চার-পাঁচ বছর আগে বেস্ট সেলার তালিকার শীর্ষে ছিল। তাঁর সাম্প্রতিক নাটক 'বায়োগ্রাফি' একটি স্মরণীয় সৃষ্টি। ইউভে জনসনের লেখার জন্যে বুদ্ধিজীবীরা বিশেষ আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু প্রকাশক শুরকাম্ফ জানিয়েছেন আগামী বসন্তের আগে জনসনের লেখা প্রকাশিত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। পূর্ব জার্মানীর লেখিকা ক্রিস্টাওলফের নবতম গ্রন্থ 'রিফ্লেকসন অন ক্রিস্টাট্টি' বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। নবাগত লেখক ওলফগাং জর্জ ফিসার তাঁর উপন্যাস 'ডুর্য়েলিং'-এর মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ভিয়েনার সমাজ-জীবনের উত্থান-পতন নিয়ে 'ডুর্য়েলিং'-এর কাহিনী আবর্তিত হয়েছে।

প্রতিবারই ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করে আসছে বম্বের পপুলার বুক প্রকাশন। গান্ধী, নেহরুর জীবনী ছাড়া অন্য ধরণের কোন বই পপুলার বুক প্রকাশনের স্টলে দেখিনি। কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। সরকারি সংস্থা ন্যাশনেল বুক ট্রাস্ট এবারই প্রথম অংশ গ্রহণ করল। বিভিন্ন বিষয়ক প্রায় তিন শ বইয়ের একটি তালিকা ইংরেজী ও জার্মাণ ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে কিছু বাংলা বইয়ের অনুবাদও ছিল।

তারাশংকরের 'বিচারক' ও 'গণদেবতা'র ইংরেজী অনুবাদ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র ইংরেজী অনুবাদ, বিমল মিত্রের 'বেগম মেরী বিশ্বাসে'র হিন্দী অনুবাদ, ইংরেজীতে যাঁরা লেখেন তাঁদের মধ্যে আর কে নারায়ণ, ভবানী ভট্টাচার্য, মুলকরাজ আনন্দ, খুশবন্ত সিং ও কে এ আব্বাসের নাম উল্লেখযোগ্য। উপন্যাস, কবিতা, গল্প সংকলন ছাড়াও ধর্ম, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, আত্মজীবনী বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্থ দেখতে পাওয়া গেল, ন্যাশনেল বুক ট্রাস্টের এই উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসনীয়।

ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্ব করেছেন দুজন বিখ্যাত সম্প্রতিক ঔপন্যাসিক। প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। মিসেবুতোর 'ইলাসট্রেশন' ও নাটালি সারতের 'বিটুইন লাইফ এন্ড ডেথ' উপন্যাস। তবে এর মধ্যে কোন নতুন স্বাদ পাওয়া গেল না। তাঁরা যে ধারায়, যে শৈলিতে লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন, উপন্যাসদ্বয়ে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

অ্যালেন সিলেটোর 'ডেথ অফ উইলিয়াম পোস্টার' ও এনগাস উইলসনের 'নো লাফিং মেটার' বৃটেনের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

জেমস্ জয়সের ১৯০১ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত লিখিত চিঠির একটি উল্লেখযোগ্য সংকলনের পঞ্চম অধ্যায় প্রকাশিত করেছে জার্মাণীর শুরকাম্ফ প্রকাশক।

সুইডিশ লেখকদ্বয় এবারের শরৎকালীন বইয়ের মেলায় বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পেরওলফ সুন্ডমানের 'দি ফ্লাইট অফ আন্দ্রে দি ইঞ্জিনীয়ার' একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে অভিনন্দিত হয়েছে। তাঁর সমসাময়িক লেখক পেরওলফ ইনকুইস্ট রচিত নবতম ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'হেডেভভার', এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গতবার চেক লেখকগণ যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন এবার সে তুলনায় তাঁরা অনেক নিষ্প্রভ মনে হল। অনিশ্চিত রাজনৈতিক আবহাওয়ার প্রতিফলন সাহিত্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট। তবে নতুন লেখা একরকম ছিলই না। তবু সম্প্রতি প্রকাশিত ভটা ফিলিপের 'এ ফুল ইন এভরি টাউন' ও জিরি মুখার 'কোল্ড-সান' গ্রন্থের নামোল্লেখ করতে হয়। ইতালির সর্বজনপ্রিয় কথা-সাহিত্যিক আলবার্টো মোরাভিয়ার নবতম গ্রন্থ 'এ থিং ইজ এ থিং' সাংবাদিকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ছাত্র আন্দোলন নিয়ে লেখা বইয়ের সংখ্যা গত দু-তিন বছরের তুলনায় এবার অনেক হ্রাস পেয়েছে। আন্ডারগ্রাউন্ড লেখকেরা এবার বেশ শক্তিশালী মনে হল। যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডারগ্রাউন্ড সাহিত্য আন্দোলনের দুজন বিশেষ সদস্য ব্রিংকম্যান ও রেগালার যুগ্ম সংকলন 'এসিড' তার উদাহরণ। আন্ডারগ্রাউন্ড লেখকদের চিন্তাধারা থেকে ভিন্ন হয়েও জেমস বল্ডউইন রচিত 'টেল মি, হাও লং এগো দি ট্রেন হ্যাজ লেফট' মার্কিন সমাজ-জীবনের তিক্ত বিশ্লেষণ। জন অ্যাপডাইকের 'কাপলস' ও ডোনাল্ড বেথহেমের 'আনমেনসনেবল প্র্যাকটিস' দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। আজকের আমেরিকার তরুণ লেখকরা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মৌলিকত্বের অভাব বড় বেশী চোখে পড়ে। আন্ডারগ্রাউন্ড লেখকদের দু-একটা লেখা প্রথম প্রথম ছিল রীতিমত বৈপ্লবিক। কিন্তু তারপরই শুরু হয় ধরাবাঁধা ছক। আর যদি লেখা ভাল না চলে তখন শুরু করেন টি ভি-র জন্য স্পাই সিরিজ লিখতে। তাতে ভাল আয় হয়। যদি দু-একটা গল্প হিট হয়ে যায়, তাহলে ত কথাই নেই। আন্ডারগ্রাউন্ডের বিদ্রোহী লেখক তখন এসটাবলিসমেন্টের জগতে পদার্পণ করেন।

সায়েন্সফিকশন বইয়ের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। অনেক অল্পখ্যাত লেখক গল্প, উপন্যাস ছেড়ে সায়েন্সফিকশন লিখতে শুরু করেছেন। কবিরা যাঁরা চাঁদের সৌন্দর্য নিয়ে কবিতা লিখতেন, তাঁরা এবার চাঁদের রহস্য নিয়ে সরস কাহিনী রচনা করতে আরম্ভ করেছেন। প্রদর্শনীতে দেখলাম প্রায় কয়েক ডজন বই রয়েছে শুধু অ্যাপলো নিয়ে লেখা।

তথ্যসম্বলিত গ্রন্থ হিসাবে অভিনন্দন পাবে এন্থোনি সিম্পসনের 'দি নিউ ইউরোপিয়ান' ও স্টোকান বার্মিংহাম রচিত 'হিস্ট্রি অফ দি জুইস ফায়নানসিয়াল অ্যারিসট্রোক্রেসি অফ নিউইয়র্ক'। দর্শন-গ্রন্থের তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন আরনোল্ড গেলেন রচিত 'মরালিটি অ্যান্ড হেপিনেস'। রাজনীতি ও সাহিত্যবিষয়ক উল্লেখযোগ্য রচনা 'মার্কসিজম অ্যান্ড লিটারেচার'। লেখক ফ্রিৎস রাডাৎস। ডিটার ভেলারসফের 'লিটারেচার অ্যান্ড চেঞ্জ' ও হাইনেল বুইটেনের 'কোরেসপন্ডেন্স অফ লিটারেচার' অপর দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা হিসাবে সমাদৃত হয়েছে। এবারের প্রদর্শনীতে কবিতার বইয়ের একান্ত অভাব দেখলাম। বিনেকের 'ডিসকার্ডার্ড পয়েমস' ও ভোলিউসের 'হোয়েন উই' ছাড়া উল্লেখযোগ্য কবিতার বই দেখলাম না।

হ্যারল্ড নিকলসনের রোজনামচা এবং আইনস্টাইন ও ম্যাক্সবর্ণের মধ্যে ১৯১৬ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত পত্র-বিনিময়ের একটি মূল্যবান সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। ঐতিহাসিক গ্রন্থের পাঠকগণ অবশ্যই আনন্দিত হবেন স্বল্পমূল্যে মার্টিন রোজার্ট রচিত 'টোয়েনটিয়েত সেনচুরি ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রির' পকেট সংস্করণ প্রকাশনে।

প্রদর্শনীতে শুধু যে গুরুগম্ভীর বই-ই ছিল তা নয়, কলিনসের 'লুইসিলা' ও ডানেটের 'রয়েল গেম' হাল্কা রসের বই হিসাবে পাঠককে অবশ্যই আনন্দ দান করে।
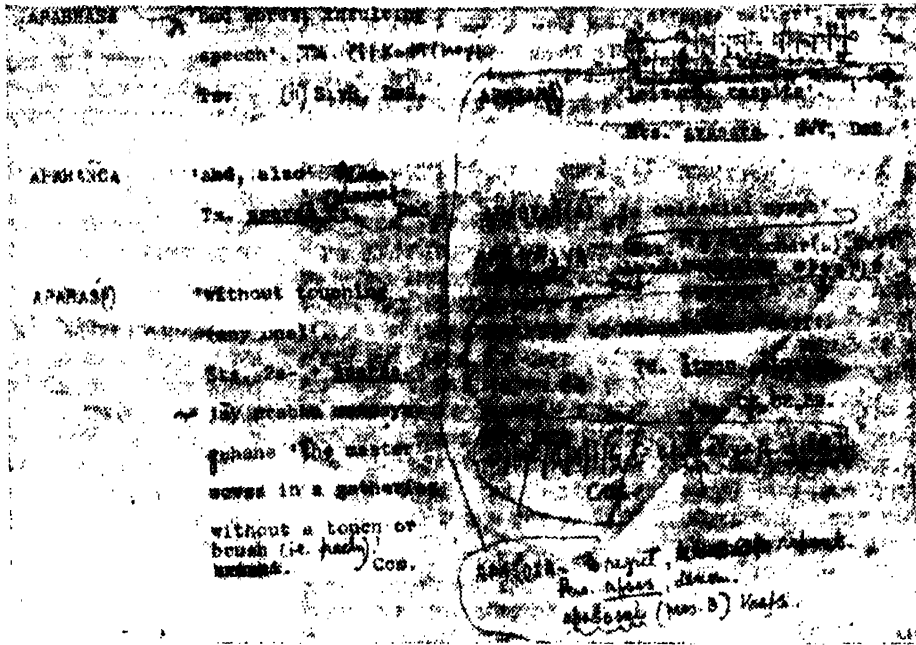
সত্যাদ্রষ্টা প্রবীণ আচার্য

গিয়েছিলুম নেহাৎ-ই কৌতূহলের বশে। আচার্য সুকুমার সেনের বই ছাত্র-জীবনে পড়েছি। গত দু-তিন বছর ধরে 'অমৃতে' লিখছেন সেকালের আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলো, সামাজিক আচার আচরণের ওপর দু-একটি লেখা। জানতুম, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের জগতে ডুবে আছেন দীর্ঘকাল। ভাষাতত্ত্বে তিনি পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য। খোঁজখবরে জানা গেল, শীঘ্রই বেরোচ্ছে তাঁর একটি অনন্য গ্রন্থ 'ইটিমোলজিক্যাল লেক্সিকন অব বেঙ্গলী ১০০০-৮০০ এ· ডি·"।

জিজ্ঞেস করলুম, কি উদ্দেশ্যে আপনি এ বই লিখছেন?

সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলেন ডঃ সেন : বাংলা ভাষায় এমন শব্দ আছে, যা বিভিন্ন সময়ে ভেঙেছে, গড়েছে, অর্থান্তরিত হয়েছে—কিন্তু আমরা অনেকেই সেসব শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং ব্যবহার কিছুই জানি না। আমি এ বইতে উনিশ শতকের পূর্ববর্তী বিভিন্ন গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে অধুনা লুপ্ত এবং অনবলুপ্ত শব্দের উৎপত্তি, অর্থ ইত্যাদি দেবার চেষ্টা করেছি। কোথায় কোন্ শব্দ আছে—কোন্ বই কিংবা পুঁথিতে—তারও উল্লেখ করেছি পাঠকদের সুবিধার জন্যে।

প্রথম কয়েক ফর্মার পাণ্ডুলিপি দেখলাম। ইংরেজী হরফে টাইপ-করা। বাংলা শব্দগুলি রোমান হরফে লেখা হয়েছে। সঠিক উচ্চারণের নির্দেশক হিসেবে প্রায় প্রতিটি শব্দের ওপরে নিচে বেশ কিছু ফুটকি, মাত্রাচিহ্ন ইত্যাদি। ডঃ সেন তার ওপরে আবার কাটাকুটি করেছেন অনেক। ছাপা ফর্মাও দেখলুম। ধৈর্য ও স্নেহের সঙ্গেই তিনি আমাকে দেখালেন।

বললুম, কোন্ প্রেস থেকে ছাপছেন? সাধারণ প্রেসে তো এ টাইপ থাকে না!

কৃতজ্ঞ গলায় বললেন ডঃ সেন : 'ছাপা হচ্ছে একটা ছোট প্রেসে। টাইপ ছিল না। তৈরী করাতে হয়েছে বহু টাইপ। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে ছাপা যেতো। কিন্তু এতো টাকা কে দেবে?

এ বই লেখার পরিকল্পনা নেন কবে?

বললেন : তার একটা ইতিহাস আছে। সেটা ১৯২৮-২৯-৩০ সালের কথা। স্বর্গত বসন্তরঞ্জন রায় ছিলেন বাংলার অধ্যাপক। আমি বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করলে তাঁর ছাত্র হতুম। আমার ছিল তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব। তখন তিনি থাকতেন গড়পারে। একদিন গেলুম তাঁর বাড়ীতে। তাঁর ঘরে বহু প্রাচীন পুঁথি ছিল। তিনি আমাকে একটা বই দেন, মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল। এখনো আমার কাছে বইটি আছে। তাতে দেখলুম, বহু শব্দের নিচে আন্ডারলাইন করা। জিজ্ঞেস করলুম, এসব কেন? তিনি আমাকে সেসব শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তির কথা বললেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, এরকম একটা অভিধান করার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত করে উঠতে পারেননি। আমাকে বললেন, আমার দ্বারা হলো না। চেষ্টা করে দেখো তুমি পারবে। বাংলা ভাষায় পুরনো শব্দের একটা অভিধান দরকার।

আপনি কবে থেকে লিখতে সুরু করেন?

—ভাবছি তখন থেকেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময় পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করি। ১৯৫২ সাল নাগাদ কাজে লেগে যাই। কিন্তু সব সময় এর জন্যে খাটাখাটুনি করতে পারতুম না। কখনো কাজ হয়, কখনো বন্ধ থাকে। ১৯৬৪ থেকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছি।

কেউ কি এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করেছেন?

—আমার যথেষ্ট উপকারে এসেছেন ডঃ ভবতারণ দত্ত। কার্ড-করা, কার্ড গোছানো ইত্যাদি কাজ করেছেন তিনি। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন আমাকে একজন রিসার্চ এ্যাসিস্টান্ট দিয়েছেন দু-বছরের জন্য তাঁকে না হলে কাজ শেষ করতে পারতুম না

আপনি কি পুরনো বই, পাণ্ডুলিপি সব সংগ্রহ করতে পেরেছেন?

--সব পারিনি। আগেকার ম্যানস্ক্রিপ্ট বই,—কিছু সংগ্রহ করেছি, কিছু দেখেছি এ তো আমার সারাজীবনেরই সাধনা বিলেত থেকে কিছু কিছু বইয়ের ফটোগ্রা আনিয়েছি। তবু কিছু দুর্বলতা রয়ে গেল প্রতিকারও কিছু নেই।

প্রাচীন যেসব শব্দ এখনো প্রচলি সেসব শব্দ কি আপনি এ বইতে দিয়েছেন

—দিয়েছি। প্রথমে ভেবেছিলাম বইটা নাম দেবো "লেক্সিকন অব ওল্ড অ্যা মিডল বেঙ্গলী।" পরে সেই ভাবনা থে

সরে আসতে হলো। কেননা, এ' বইয়ে এমন বহু শব্দ রয়েছে, যা এখনো বাংলা ভাষায় চলছে। যেমন ধরুন, 'গদ্য' একটা শব্দ। অষ্টাদশ শতকে ঠাট্টা, মস্করা অর্থে ব্যবহৃত হতো শব্দটা। গদ্য মানে কর্কশ—কিছুটা নীরস। পদ্যের বিপরীতে ভাবা হতো তাকে। পদ্য মানে সুইট, পোলাইট।

সেই সময়ে বিদেশী শব্দ বাংলায় কেমন ছিল?

—পার্সো-অ্যারাবিক শব্দের সংখ্যা মনে হয় কম ছিল না। সুনীতিবাবু ক্যালকুলেশন করে যে সংখ্যাটি আমাদের জানিয়েছেন, মনে হয় তার চেয়ে বেশী হবে। তবে সঠিক কতো, না গুণে বলতে পারব না।

বইটি বাংলায় লেখেননি কেন?

—বাংলায় লিখিনি, কারণ, অবাঙালীরাই আমার লক্ষ্য। বাঙালীরাও পড়তে পারবেন। তবে আজকাল বাঙালীরা এই জাতীয় বই বেশী পড়েন না। পড়তেন চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে। যাঁরা সংস্কৃত, কিংবা অন্য কোনো ভাষার চর্চা করেন তাঁরাও উপকৃত হবেন এ বই থেকে। ইংরেজ-ভাষী অভারতীয়রা তো হবেনই। বিদেশে অনেকেই এ বিষয়ে আগ্রহী।

লেখেন কখন?

—সব সময় লিখি। আমার তো আর কোনো অকুপেশান নেই। মাঝে মাঝে সভা-সমিতিতে যেতে হয় অবশ্য। তাছাড়া যখন মনে ইচ্ছে জাগে, লিখি।

আপনি কি এতে কোনো আনন্দ পান?

—খুব আনন্দ পাই। এটাই তো আমার একমাত্র ধ্যান। একমাত্র কাজ।

বইটি বের করছেন কারা?

—আমার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা ছাপেন—ইস্টার্ণ পাবলিশার্স—তাঁদেরই একটা প্রেস আছে। ব্যবস্থা ও'রাই করেছেন। হয়তো আমিই প্রকাশক হবো। দামটা একটু বেশী করতে হবে। কিছুই অবশ্য ঠিক করিনি এখনো।

সরকারী সাহায্য কিছু কি পেয়েছেন?

সরকারী সাহায্য কিছুই পাইনি। ভারত সরকার যদিও বা আমাকে কিছুটা জানেন, বঙ্গ সরকার আবার তাও জানেন না। সুনীতিবাবুর পর পশ্চিমবঙ্গ পরিভাষা পর্ষৎ-এর সভাপতি হয়েছি আমি। ওটা নামে মাত্র।

রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট পেলেন কি করে?

—যখন আমার স্লিপ লেখা শেষ হলো, তখন একজন টাইপিস্টের অভাব বোধ করলুম। একদিন সুনীতিবাবুর ওখানে গিয়েছিলুম একটা উপলক্ষ্যে। ভবতোষ দত্ত উপস্থিত ছিলেন সে সভায়। সুনীতিবাবুকে বললুম, আমার কাজের কথা। তিনি আমাকে বললেন একটা চিঠি দিতে। তাঁর নির্দেশ মতো চিঠি দিলুম। তিন রিকমেন্ড করে পাঠালেন পরিকল্পনা কমিশনের কাছে। মিঃ কোঠারী গ্র্যান্ট করেন একজন মাসিক তিনশ টাকা মাইনের টাইপিস্ট। দু-বছরের জন্য। আমি আমার কথা রেখেছি। দু বছরের আগেই বই ছাপা শুরু করেছি।

বইটি কত বড় হবে?

—ম্যানাসক্রিপট দেখে আন্দাজ করছি ৪৫ থেকে ৫০ ফর্মার মধ্যে হবে। সামান্য কম বেশী হতে পারে। ডবল ডিমাই ষোল পৃষ্ঠার ফর্মা। সবে তো সাত ফর্মা ছাপা হয়েছে।

এ বইতে এমন কোনো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে, যা স্মরণ করা যায়?

—সবই ইন্টারেস্টিং। শব্দ নিয়ে কারবার। তবে আজকাল অকারণ শব্দ বানিয়ে নেবার একটা ঝোঁক লক্ষ্য করা যায় বাংলা ভাষায়। অথচ এর কোনো দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। রবীন্দ্রনাথ শব্দ 'কয়েন' করতেন হাসি-ঠাট্টার সময়ে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত করতেন অকারণে। অনেকে লেখেন 'কাব্যিক গুণ'। কিন্তু কেন 'কাব্যিক' হবে বুঝতে পারি না। 'কাব্যগত' বা 'কাব্যোচিত' লেখা উচিত। কোনো শব্দ বিকল্প না পেলে এ জাতীয় ব্যবহার চলে ভাব-প্রকাশের প্রয়োজনে। শুধু শুধু এরকম লেখাটা লেখকের পক্ষে গুণের নয়, অক্ষমতার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

একটা উদাহরণ দিয়ে বললেন, কোনো একটি ইউনিভার্সিটির প্রশ্নপত্রে দেওয়া হয়েছে "বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির পূর্বসূরী"। এখানে লক্ষ্য করুন 'পূর্বসূরী' শব্দটা। কালিদাস প্রথম ব্যবহার করেছিলেন এক অর্থে। এখন তথাকথিত পন্ডিতেরা কিভাবে ব্যবহার করছেন তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।

আপনি কি এখন আর কিছু লিখছেন?

—আপনাদের কাগজে লিখছি মাঝে মাঝে দু' একটি লেখা। আর বিশেষ কিছু লিখতে পারছি না। এই নিয়েই ব্যস্ত আছি। সাহিত্য পরিষদে একটা বক্তৃতা দিতে হবে। মাঝে মাঝে তা নিয়েও ভাবছি। পুণায় ভিজিটিং প্রফেসার হয়ে গিয়েছিলাম ১৯৬৭ সালে। দু-মাসের জন্য। এক বছরের টার্ম। তাও রক্ষা করিনি। মাসে হাজার বারো-শ' টাকা ক্ষতি হলো। তা হোক। বইটা শেষ করতে হবে। পুজোর সময়ে আমি বর্ধমানে গিয়ে মাসখানেক থাকি। এবার লক্ষ্মী-পুজোর পরেই চলে এসেছি বইয়ের জন্যে।

বললাম, বিদেশে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয় সাহিত্যের খবরাখবর—কোন্ সাহিত্যিক কি করলেন, তাই নিয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ। আমাদের দেশটা এ ব্যাপারে কেমন যেন উদাসীন।

কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গে বললেন ডঃ সেন, আমার এই কাজের প্রতি কারো কোনো আগ্রহ নেই। আমি কাজ করে যাচ্ছি নিজের আনন্দে। একমাত্র 'অমৃত'ই যথেষ্ট কৌতূহল দেখিয়েছে। আপনি লিখছেন। কই, আর কেউ তো আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি! বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখার সময় আমার খুব অভিমান হয়েছিল। তখন বলেছিলাম, বিদেশে এর জন্যে অর্ডার অব মেরিট না হোক, লেখককে নাইটহুড দেওয়া হতো। আমাকে নিজের দেশে একজন এমেরিটাস অধ্যাপক পর্যন্ত করেনি। এখন আমার কোনো দুঃখ নেই। ক্ষোভ নেই। আমি সত্যদ্রষ্টা। পুরো সত্য কোনো কালেই জানা যায় না। কিন্তু তাকে জানবার, তাকে বোঝবার জন্য চেষ্টা করেছি। কোথাও কোনো আপোষ নেই। এই চেষ্টার জনাই আমি বেঁচে থাকবো।

সবশেষে রবীন্দ্রনাথের লাইন উদ্ধৃত করে বললেন, আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ!

লক্ষ্য করলাম, বয়সে তিনি প্রবীণ আচার্য হলেও, মনের দিক দিয়ে তিনি সজীব, অভিজ্ঞতার দিক থেকে ঐশ্বর্যময়, চিন্তার দিক থেকে অমলিন— নিরাসক্ত। প্রাত্যহিকতার উত্তেজনা তাঁকে আলোড়িত করে না, আজীবন জ্ঞানের অনুশীলনে তিনি সত্য-সন্ধানী। —শ্রুতধর্মী

অন্ধকারের মুখ

দেবল দেববর্মা

— নয়—

স্ত্রীর ছটফটে, ব্যাকুল কণ্ঠস্বর কানে যেতেই অম্বর উঠে বসল। কিন্তু চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। নীপার মুখের উপর একবার চোখ বুলোল। একটা আঙুলের সাহায্যে ক্ষুরের ধার পরীক্ষা করে বলল,—'কি, ভয় পেলে নাকি?'

এমন কথার স্পষ্ট উত্তর দেওয়া যায় না। নীপা অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখল। স্বামীর ঠোঁটে বাঁকা হাসি ক্ষুরটা খোলা,—এখনও বন্ধ করেনি। জানালার ফাঁক দিয়ে সকালের সোনা রোদ বিছানার উপর এসে পড়েছে। রৌদ্রকিরণে ধারালো ক্ষুরটা মারাত্মক ঝকঝকে, চকচকে দেখাচ্ছে।

স্বামীর কথার জবাব না দিলে তার প্রশ্নটাই মেনে নিতে হয়। একটু হেসে নীপা তাই উত্তর দিল,—'বারে, ভয় পাব কেন? আমি খুব চমকে উঠেছিলাম। তোমার কান্ড দেখে কেউ অবাক না হয়ে পারে? ক্ষুরের ধার পরীক্ষা করবার আর জায়গা পেলেনা? তাই নিজের গলার উপরেই ক্ষুরটা চেপে ধরেছ।'

'—হ্যাঁ' অম্বর গম্ভীর মুখ ক'রে বলল। 'ক্ষুরটা নতুন। নিজের গলায় ঠিক পরীক্ষা করা গেল না।' স্ত্রীর মুখের উপর চোখ রেখে সে ফের বলল,—'পরে অন্য কোথাও চেষ্টা করা যেতে পারে।'

অম্বরের কথা শুনে নীপার বুকের ভিতরটা হঠাৎ ভূমিকম্পের মত অল্পক্ষণ কেঁপে উঠল। বাসি গোলাপের মত মুখটা শুকনো দেখাল। প্রায় জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে সে বলল,—'এখনই তো দাড়ি কামাবে। আজ না হয় নতুন ক্ষুরটাই ব্যবহার করলে। তাহলেই তো তোমার সমস্যা মিটে যায়।'

অম্বর কোনো কথা বলল না।

ক্ষুরটা ভাঁজ করে সে তুলে রাখল। নীপা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও যাচ্ছিল। অম্বর তাকে ডেকে বলল,—'যেও না নীপা। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

নীপা থমকে দাঁড়াল। স্বামীর কণ্ঠস্বরে অনুরাগের ছিটেফোঁটাও নেই। কেমন একটা হুমকির ভাব। কড়া ঝাঁঝালো গন্ধ। ঠোঁট কামড়ে এক মুহূর্ত সে চিন্তা করল। অম্বর তাকে কি বলতে চায়?

স্বামীর দিকে তাকিয়ে নীপা ফিক করে হাসল। সুন্দর একটি ভঙ্গি করে সে দাঁড়াল। ভ্রূ নাচিয়ে বলল,—'কি কথা বলবে আবার?'

অম্বর দু'পা ফেলে স্ত্রীর দিকে এগিয়ে গেল। নীপার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই স্থিরদৃষ্টিতে বেশ কয়েক সেকেণ্ড সে তাকিয়ে রইল।

—'অমন করে কি দেখছ?' নীপা একটা অস্বস্তির ভাব প্রকাশ করে বলল। 'আমার কাজ আছে। কি কথা বলবে তাড়াতাড়ি বল।'

স্ত্রীর মুখের দিকে তেমনি একনাগাড়ে তাকিয়ে সে বলল,—'লোকটা কে?'

নীপার বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল। এতক্ষণ বিছানায় চুপচাপ শুয়ে গলার উপর ধারালো ক্ষুরটা ফেলে এই কথাটাই তাহলে সে চিন্তা করছিল? নীপা জানত অম্বর তাকে প্রশ্নটা করবে। এখনই, কিংবা অন্য কোনো সময়। স্বামীর গোমড়া মুখ, চকচকে ধারালো ক্ষুরের পিছনে জিজ্ঞাসার চিহ্নটিকে অনেক আগেই সে দেখতে পেয়েছে। মনে মনে তাই সে তৈরি হয়েছিল।

প্রশ্ন শুনেই ঘাড় বেঁকিয়ে নীপা উত্তর দিল।' 'কোন্ লোকটা? তুমি কার কথা বলছ?'

—'ন্যাকামি রাখ।' অম্বর মুখ ভেংচাল। 'কোন্ লোকটা তাও তোমায় বলে দিতে হবে?'

—'বারে! বলে না দিলে আমি বুঝব কেমন করে? তুমি কার কথা জিজ্ঞেস করছ?'

—'খুব সেয়ানা হয়েছ দেখছি।' অম্বর ব্যঙ্গ করল। স্ত্রীর মুখের উপর চোখ রেখে সে ফের বলল,—'একটু আগেই তো সে এসেছিল। তোমার মুখ দেখে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঢেলে বাড়ি কিনতে রাজি।'

—'কি আজেবাজে কথা বলছ।' নীপা প্রতিবাদ জানাল। 'তোমার মুখে দেখি কিছুই আটকায় না।'

—'আমার কথার উত্তর দাও। ও লোকটা কে?'

—'তুমি কি বলতে চাও। ও কে তা আমি কেমন করে জানব?' একটু থেমে সে ফের বলল, —'ভদ্রলোকের নাম চন্দ্রবদনবাবু। কলকাতায় থাকেন। বাড়ি কিনবেন। তাই কথাবার্তা বলতে পলাশপুরে এসেছেন। এই পর্যন্ত আমি জানি, হয়ত তুমিও জান। এর বেশী আমরা কেউ জানি না। তোমার কৌতূহল থাকে, তুমি কাকার কাছে চলে যাও। এর বেশী তাঁর জানা থাকতে পারে।'

অম্বর বাঁ হাতের করতলে ডান হাতের পাকানো মুঠিটা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বার-দুই-তিন ঠুকল। ধীরে ধীরে তার চোখদুটি ঈষৎ ছোট হয়ে এল। মুখখানা শক্ত করে সে বলল, —'তুমি বলতে চাও, লোকটাকে এর আগে তুমি চিনতে না? ওর সঙ্গে তোমার পূর্ব-পরিচয় ছিল না?'

নীপা সরাসরি অগ্রাহ্য করল। 'কোনোদিন না। ওর পরিচয় আমি কেমন করে জানব?'

অম্বর উত্তেজিত হয়ে বলল, —'মিথ্যে কথা। তুমি ওকে চেন। তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় ছিল। নইলে—' এক মুহূর্তের জন্য সে থামল। স্ত্রীর মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে কি যেন খুঁজল। তারপর সহসা পিছন ফিরে সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে অম্বর বলতে লাগল,—'পুকুরের শান্ত জলে কখনও ঢিল ছুঁড়েছ নীপা? নিশ্চয় দেখেছ, ঢিলটা পড়লেই কেমন ছলাৎ করে একটা শব্দ হয়। তারপর ছোট ছোট তরঙ্গের সৃষ্টি হয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য সেগুলো মিলিয়ে যায়। তখন পুকুরের জল আবার শান্ত দেখায়।' কথা শেষ করেই অম্বর এদিকে ফিরল। পুনরায় স্ত্রীর মুখোমুখি হল।

নীপা বলল,—'তুমি কি বলতে চাও? লোকটার সঙ্গে আমার পূর্ব-পরিচয় ছিল? ওকে আমি চিনতাম?—' শেষদিকে তার কণ্ঠস্বর দুর্বল শোনাল।

—'নিশ্চয়।' অম্বর অনুত্তেজিত গলায় উত্তর দিল। 'লোকটাকে বোধহয় তুমি এখানে ঠিক আশা করনি। তাই তোমার চোখমুখ, হাবভাবের পরিবর্তন এত সহজে আমার চোখে ধরা পড়ল। একটু আগে তোমায় বলিনি নীপা? পুকুরের শান্ত জলে ঢিল পড়লে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। তোমার মুখেও দুশ্চিন্তার ছোট ছোট তরঙ্গ আমি লক্ষ্য করেছি। অতর্কিতে লোকটাকে এখানে দেখেই তুমি বেশ চমকে উঠেছিলে।'

নীপা কিন্তু হার স্বীকার করল না। ব্যঙ্গ করে সে বলল,—'বাঃ! তুমি দেখছি আজকাল থট্ রিডিং করতে শিখে গেছ। মুখ দেখে যখন মনের ভাষা পড়তে পার, তখন তুমি একজন যাদুকর ছাড়া আর কি?'

অম্বর বিরক্ত হল। 'বাজে কথা রাখ। লোকটা কে তা বলতে তুমি তাহলে রাজি নও?'

—'যতটুকু জানি, তা বলেছি। এর বেশী আমার জানা নেই।' নীপা স্পষ্ট জবাব দিল।

—'ঠিক আছে।' অম্বর একটা বিকৃত মুখভঙ্গি করে বলল।

—'ওর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক ছিল, তা আমি খুঁজে বের করবই। এই আমার প্রতিজ্ঞা।' কয়েক সেকেন্ড পরে অনেকটা আপনমনে সে ফের বলল,—'লোকটাকে দেখে তোমার মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল কেন? এর পিছনে নিশ্চয় কোনো গূঢ় রহস্য আছে।'

একটুও না দমে নীপা পাল্টা জবাব দিল,—'সন্দেহ-বাতিক মন হলে অমন ছায়া-টায়া দেখার ভ্রম হয়। হঠাৎ উটকো লোককে ঘরে দেখলে বাড়ির মেয়েরা কি হেসে গড়িয়ে পড়বে? না, তুমি কি তাই আশা করেছিলে?'

স্ত্রীর কথার কোন উত্তর দেওয়া অম্বর প্রয়োজন মনে করল না। গ্রীষ্ম দিনের নির্জন মধ্যাহ্নের মত একটা আশ্চর্য নিঃসঙ্গতা এবং একাকীত্ব সে মনে মনে অনুভব করল। আলনা থেকে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে সে কাঁধের উপর রাখল। দ্রুতপায়ে অম্বর গিয়ে বাথরুমে ঢুকল।

বাথরুমের দরজা বন্ধ হতেই নীপা শোবার ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিল। দুই করতলের সাহায্যে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সমস্ত পৃথিবী যেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। স্বয়ং ঈশ্বরও

বুঝি তার বিপক্ষে। নইলে দুনিয়ার এত মানুষ থাকতে এই লোকটাই কেন তার বাড়ি কিনতে আগ্রহী হবে? বুদ্ধি করে নীপা যদি একবার কাকার বাড়িতে ওর সঙ্গে দেখা করত! তাহলে কখনও লোকটাকে এ-বাড়ির দরজায় সে আমন্ত্রণ জানাত না। কাকাকে স্পষ্ট বলত। অত কম দামে সে বাড়ি বিক্রী করতে রাজি নয়। ছোট্ট এক-কথায় সমস্ত ব্যাপারটা সুন্দর কেঁচে যেত।

কিন্তু এখন তার জালে-বন্দী মাছের অবস্থা। তাকে দেখে চাঁদবদনও খুব অবাক হয়েছে। ইতিমধ্যে তার কাকার কাছে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা কি সে সবিস্তারে ব্যক্ত করেনি? আর অম্বরও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবার পাত্র নয়। আজই সে চাঁদ-বদনের সঙ্গে দেখা করবে। এবং ছলে কিংবা কৌশলে স্ত্রীর গোপন দুর্বলতাটুকু জানবার জন্য সে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

আর একজনের কথাও নীপার মনে হল। দিনটা বুধবার। রাত একটু বাড়লে তারও আসবার কথা। নীপা সে-কথা ভোলেনি। কিন্তু তার হাতে টাকা কই? দু' হাজার টাকা। যা সে দাবি করেছে। কেমন করে, কি উপায়ে সে ওই লোকটার মুখ বন্ধ করবে?

পরদিন সকালের কথা ভাবতেই নীপার তালু পর্যন্ত শুকিয়ে এল। লোকটা তাকে রেহাই দেবে না। টাকা না পেলেই সে অম্বরের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। অনেক রং-চড়ানো একটি কেলেংকারীর কাহিনী সবিস্তারে তার স্বামীকে শোনাবে।

হঠাৎ চকচকে, ধারালো ক্ষুরটার কথা মনে হতেই নীপার চোখদুটো ভয়ে বন্ধ হয়ে এল।

• • •

অনিমেষ দত্ত পলাশপুরে ছিলেন না। মঙ্গলবার সকালেই তিনি কলকাতা গিয়ে-ছিলেন। সোমবার দিন ঘুম থেকে উঠে তিনি আর প্রাতঃভ্রমণে বের হন নি। সকাল থেকেই তার দেহ-মন ভাল ছিল না। মস্তিষ্কের কোথাও একটা উত্তেজনার কেন্দ্র হয়েছে। সমস্ত দেহে তাই অস্বাচ্ছন্দ্য। পাকানো তারের মত একটা সর্পিল পথে মনটা কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছে।

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল জানেন, প্রফেসর দত্তের মাঝে মাঝে রক্তচাপের আধিক্য হয়। তখন দু'-পাঁচ দিন ভদ্রলোক কলেজ কামাই করেন। কলকাতা যান, ডাক্তার-বদ্যির সঙ্গে শলা-পরামর্শ করেন। কয়েকদিন চিন্তাবিহীন পরিপূর্ণ বিশ্রাম, ওষুধপত্র ইত্যাদি চলে। রক্তচাপ একটু কমলেই ভদ্র-লোক আবার স্বাভাবিক হন। নিয়মিত কলেজ যাতায়াত শুরু করেন।

অনিমেষ দত্ত ভেবেছিলেন, সোমবার দুপুরের ট্রেন ধরেই কলকাতা যাবেন। মন-মর্জি জং-ধরা লোহার মত অচল। যত তাড়াতাড়ি কলকাতা রওনা হতে পারেন, ততই তাঁর পক্ষে মঙ্গল। খুব শীঘ্র কোন ব্যবস্থা না হলে তাঁর মস্তিষ্কের উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে। দেহযন্ত্র বিকল হওয়া কিছু-মাত্র অসম্ভব নয়।

সোমবার দিন তিনি আর কলকাতা যেতে পারেননি। বিকেলের দিকে তাঁর ছাত্রী নীপা রায়ের পড়তে আসবার কথা। সপ্তাহে মাত্র দুটি দিন সে পড়তে আসে। তিনি কলকাতা চলে গেলে নীপাকে মিছি-মিছি ফিরে যেতে হবে। প্রফেসর দত্ত তা চান না। চুক্তি অনুযায়ী সোম এবং শুক্রবার তাঁর পড়ানোর কথা। নেহাৎ অসমর্থ না হলে এই দুটো দিন তিনি গরহাজির থাকতে রাজি নন।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামল। আকাশে একটি দুটি করে তারা ফুটে উঠল। অনিমেষ দত্ত ছাত্রীর প্রতীক্ষায় দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। কিন্তু অধ্যাপকের কাছে নীপা রায় পড়তে এল না। পলাশপুরের ঘরে ঘরে গেরস্থবধূরা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে শাঁখে ফুঁ দিল। অনিমেষ দত্ত খুব অবাক হলেন। হঠাৎ নীপা কেন কামাই করল, এর কার্য-কারণ নির্ণয় করতে তিনি বহু সময় ব্যয় করলেন। রাত বেশী হলে তাঁর মস্তিষ্কের উত্তেজনাও বাড়ল। ঘাড়ের কাছে একটা দপ্দপে বেদনা। মাথাটা খুব ভারী মনে হল। রাত্রে বেশ কয়েকবার জেগে উঠলেন, —কিছুতেই সুনিদ্রা হল না।

বুধবার দিন প্রথম ট্রেনেই অনিমেষ দত্ত পলাশপুরে ফিরে এলেন। সকাল নটা নাগাদ ট্রেনটা এসে শিমুলপুরে পৌঁছল। স্টেশনের চৌহদ্দি থেকে বেরোতেই একটা পলাশপুরগামী বাস তাঁর চোখে পড়ল। স্ট্যান্ড ছেড়ে বাসটা সদ্য এগিয়েছে। নানা বুকনি আউড়ে আর হাত-পা ছুড়ে কন্ডাকটরটা যাত্রী সংগ্রহের শেষ চেষ্টা করছে। তাঁকে দেখে বাসটা প্রায় থামল। কিন্তু প্রফেসর দত্ত ইশারা করে ড্রাইভারকে এগিয়ে যেতে বললেন। গতকাল কলকাতায় তাঁকে ছোটখাটো একটি দুর্ঘটনায় পড়তে হয়েছিল। সময় খারাপ হলে বিপদ-আপদ ছায়ার মত মানুষকে অনুসরণ করে। দুঃসময় এমনি জিনিস। তিনি এক ভেবে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছিলেন। পরে দুর্ঘটনায় পড়ে তাঁকে দ্বিতীয়বার চিকিৎসকের শ্বারস্থ হতে হল।

ট্রেনে আসবার সময় দু-একজন সহ-যাত্রীর কৌতূহল মেটাতে তাঁকে এই বৃত্তান্তও বলতে হয়েছে।

সামান্য ঘটনা। রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় কলার খোসায় পা শ্লিপ করে তিনি সজোরে পড়ে যাচ্ছিলেন। ডান হাতের উপর ভর করে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়েছেন অবশ্য। কিন্তু আচমকা সমস্ত দেহের ভার পড়ায় ডান হাতটি জখম। ফলে তখনই চিকিৎসকের কাছে ছুটতে হল। যথারীতি এক্স-রে, রণক্ষেত্রে আহত সৈনিকের মত ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত নিয়ে তিনি পলাশ-পুরের যাত্রী। অন্তত দিন সাতেক পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে ডাক্তার উপদেশ দিয়েছেন। এক হপ্তা পরে আবার তার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

বাসে নয়, ট্যাক্সি করে অনিমেষ দত্ত পলাশপুরে পৌঁছলেন। তখন ঘড়ির কাঁটায় সাড়ে নটার মত। তাঁর ভৃত্য রামহরিকে নির্দেশ দেওয়া ছিল। বুধবার সকালেই তিনি ফিরবেন। সে যেন সকালে এসেই ঘরদোরে ঝাটপাট দেয়। রাঁধাবাড়ার আয়োজন করে।

মনিবের ব্যান্ডেজ বাঁধা ঝোলান হাত দেখে রামহরি প্রায় চেঁচিয়ে বলল,—'কি হল গো বাবু? হাতটা ভেঙেছে নাকি?'

অনিমেষ দত্ত গম্ভীর মুখে বললেন,—'হ্যাঁরে, এই এক ফেরো হল। এখন কদিন ভোগাবে কে জানে?'

নিজের ঘরে এসে ট্রেনের জামাকাপড় তিনি বদলে ফেললেন। ডান হাতটা অকেজো। অনভ্যাস বলেই অসুবিধে হল সবচেয়ে বেশী। দু' মিনিটের কাজ দশ মিনিটে সমাধা হল।

হঠাৎ রামহরি ঘরে ঢুকে বলল,—'একটা লোক সকালে আপনার খোঁজে এসেছিল।'

—'কে লোক? কি বলছিল?' অনিমেষ ব্যগ্র হয়ে তাকালেন।

—'ওই যে দিদিমণি পড়তে আসেন,—ছোকরা তাঁর বাড়িতেই কাজ করে। একখানা চিঠি দিয়ে গেছে।'

—'চিঠি? কই চিঠি?'

মনিবের ব্যস্ততা দেখে রামহরি এক দৌড়ে চিঠিখানা নিয়ে এল। খাম ছিঁড়ে পত্রখানা বের করতে যা একটু দেরি হল। অনিমেষ দত্ত অবাক হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর ছাত্রী নীপা রায় চিঠিখানা লিখেছে। কালো কালো অক্ষরগুলির উপর দিয়ে চপলমতি বালকের মত তিনি প্রায় দৌড়ে গেলেন। শিরোনামায় মঙ্গলবারের তারিখ। নীপা লিখেছে—

মাস্টারমশায়,

গতকাল আপনার কাছে পড়তে যাইনি। যাইনি লিখলাম এই অর্থে যে অনুপস্থিতি আমার ইচ্ছাকৃত। আপনার কাছে পড়াশুনো করা আর হল না। এর কারণ সম্ভবত আপনি জানতে চাইবেন। কিন্তু মাস্টারমশায়, ছাত্রী হয়ে আপনাকে তা জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য চিঠিতে না লিখলেও সে কারণ নিশ্চয়ই আপনার অজানা থাকবে না।

আপনার কাছে আমার একটা জিজ্ঞাসা ছিল। কিন্তু আজ সেই প্রশ্ন করা এবং তার উত্তর জানা দুই আমার কাছে নিরর্থক। সুতরাং সে কৌতূহল আর প্রকাশ করলাম না।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।

ইতি—
নীপা রায়

চিঠি পড়া শেষ করে অনিমেষ দত্ত অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। মাস গেলে নীপার কাছ থেকে তিনি দেড়'শ টাকা করে পেতেন। সদ্য খোয়ানো মোটা টাকার টুইশানীর জন্য শোক, কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হোক অনিমেষের দুটি চোখে একটা অস্থির উত্তেজনা চকমকি ঠোকা আগুনের ফুলকির মত মাঝে মাঝে ফুটে উঠছিল। ছাত্রীর পত্রখানি আর তিনি খামে ভরলেন না। বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে চিঠিখানা ধরে কটা অপ্রয়োজনীয় কাগজের মত সেটিকে দলা পাকিয়ে ফেললেন। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে ধীর শান্ত চরণে তিনি রান্নাঘরে এসে ঢুকলেন।

উনুন খালি, গনগনে কয়লার আঁচ। রামহরি এক কোণে বসে কুটনো কুটছিল। অনিমেষ দত্ত উনুনের উপর একটু ঝুঁকে দলা পাকানো কাগজটিকে অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপ করলেন। উনুনের আঁচে তাঁর ফর্সা মুখখানা বেশ রক্তাভ দেখাচ্ছিল। চিঠিখানা পুড়ে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত অধ্যাপক তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

* * *

পরের ট্রেনেই অবিনাশ শিমুলেপুরে নামল। তার ইচ্ছে ছিল ফার্স্ট লোকালটা ধরে। কিন্তু মনের বাসনা আর ট্রেনের সময়কে সাড়িশীর দুই দাঁড়ার মত এক করা অবিনাশের পক্ষে কঠিন হল। ফার্স্ট লোকাল ধরতে হলে তাকে সেই কাক-ডাকা ভোরে উঠতে হত। অথচ ভোরের আলোর সঙ্গে অবিনাশের চিরকালের বৈরিতা। ফলে যা হয় তাই। তার ঘুম ভাঙল দেরিতে, তখন আর ট্রেনের সময় নেই।

স্টেশনের বাইরে এসে অবিনাশ আর বাসের জন্য অপেক্ষা করল না। ব্যাগে অতগুলি কড়কড়ে টাকা। মনমেজাজ এখন গ্যাস বেলুনের মত হাল্কা। এদিকে গরমও বেশ। এরই মধ্যে অবিনাশ ঘামতে শুরু করেছে। টাউন বাস ডাকপিওনের মত দশ বাড়ির দরজা ঘুরে যাবে। মিছিমিছি বাসে গিয়ে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।

ট্যাক্সি থেকে নামার মুখেই অবিনাশের চোখে পড়ল। দেবরাজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে চৈতি হন হন করে পূবমুখে চলেছে। ওর হাবভাব আর ব্যস্ততা দেখে মনে হবে যে জরুরী কাজের নির্ঘাৎ কোনো তাড়া আছে। অবিনাশ চটপট ভাড়া চুকিয়ে চৈতির পিছু নিল। মেয়েটার মুখ দেখেই ব্যাপারটা সে আন্দাজ করেছে। একটু আগেই চৈতি দেবরাজের কাছে গিয়েছিল এবং সম্ভবত সেখানে সে আমল পায়নি। হয়ত দেবরাজ ওকে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছে। অসম্ভব নয়, প্রত্যাখ্যাত প্রেমের জ্বালায় সে এখন জ্ঞানশূন্য, দিশাহারা।

চৈতি বেশীদূর যেতে পারেনি। হাজার হলেও, মেয়েমানুষ। কত জোরে আর হাঁটবে? অবিনাশ ওকে মিনিট কয়েকের মধ্যেই ধরে ফেলল।

—'চৈতি দেবী, দাঁড়ান। আপনার সঙ্গে কথা আছে।' সে ক্লান্তভাবে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছিল।

চৈতি ঘুরে দাঁড়াল। অন্যদিন হলে অবিনাশকে দেখে নিশ্চয় সে হাসত। খুব অবাক হয়েছে এমনি একটা ভাব করে বলত,—'ওমা! আপনি বুঝি?' শেষকালে একটু টেনে টেনে যোগ করত,—'আমি ভাবলাম, কে আমায় ডাকছে।'

আজ কিন্তু চৈতির মুখে এক চিলতে হাসির রেখাও দেখা গেল না। কাঠের পুতুলের মত শক্ত, ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে শুধু বলল,—'কি কথা আছে, বলুন।'

অবিনাশ ফ্যাসাদে পড়ল। সে যা আন্দাজ করেছিল ঠিক তাই হয়েছে। মেয়ে এখন রাগে ফুঁসছে। বেফাঁস একটি কথা বললেই আর রক্ষা নেই। উচ্চিংড়ের মত তিড়বিড় করে লাফিয়ে উঠবে। বেলুনের গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার মত ওর রাগ-রোষ কিছুটা নির্গত হলেই মেয়েটা স্বাভাবিক হয়।

অবিনাশ হেসে বলল,—'দেবরাজের সঙ্গে দেখা হল আপনার?'

ভ্রূ কুঁচকে চৈতি ওর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা কামড়ে ধরে সে ভাবছিল। খানিক পরেই তার মুখ থেকে কথা বেরুল,—'দেখা হল বৈকি, তবে কথা হল না।'

—'তার মানে?' দেখা হল বলছেন অথচ—' অবিনাশ ইচ্ছে করেই কথাটা শেষ করল না।

মনের ঝাঁজ আর উত্তাপ চেপে রাখতে না পেরে চৈতি বলল,—'কথা হবে কেমন করে বলুন? তিনি এখন ভাবে বিভোর। হেলান চেয়ারে বসে শ্রীমতীর মুখপদ্ম ধ্যান করছেন।'

অবিনাশ খুশী হল। কিন্তু আনন্দ বা হর্ষ প্রকাশ করল না। বিস্ময়ের ভঙ্গি করে বলল,—'কি বলছেন আপনি? শ্রীমতী আবার কে? দেবরাজ কার ধ্যান করছিল?'

—'আহা!' চৈতি চোখ ঘুরিয়ে বলল,—'সব জেনেশুনে আপনি এমন ন্যাকা সাজতে পারেন।' একটু থেমে সে যোগ করল,—'বন্ধুর মাথাটি যে রাক্ষুসী চিবিয়ে খাচ্ছে, সেদিকে আপনার দৃষ্টি নেই।'

অবিনাশ হি-হি করে হাসল। 'ইস্! আপনি দেখছি ভীষণ রেগে গেছেন।'

—'রেগেছি তো আপনার কি?' চৈতি চোখ পাকিয়ে জবাব দিল 'আপনার বন্ধুকে বলে দেবেন, চৈতি চাকলাদার কিছু ফেলনা মেয়ে নয়। তারও একটা মর্যাদা আছে। বাড়িতে লোক এলে ভদ্র ব্যবহার করা শিষ্টাচার। যারা করে না, তারা ভদ্রলোক নয়,—ছোটলোক।'

অবিনাশ তাড়াতাড়ি বলল,—'মাই গড্! এসব কথা কি বলছেন আপনি? দেবরাজ আপনাকে অপমান করতে পারল?'

চৈতির চোখে জ্বালা। সে বাঁকা হেসে বলল,—'পারল বৈকি। কিন্তু পিছনে বসে

যিনি কলকাঠি নাড়ছেন, তার বাড়া ভাতে আমি ছাই দেব। আপনি দেখে নেবেন অবিনাশবাবু—'

কথা শেষ করে চৈতি আর দাঁড়াল না। আগের মতই হন হন করে হাঁটতে শুরু করল। পিছনে থেকে অবিনাশ চেঁচিয়ে বলল,—'শুনুন, শুনুন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

কিন্তু চৈতি এবার আর ফিরে তাকাল না।

ঘরে ঢুকে অবিনাশ অবাক হয়ে তাকাল। চৈতি যা বলেছে, তা বর্ণে বর্ণে সত্যি। হেলান চেয়ারে বসে দেবরাজ গভীর-ভাবে কিছু চিন্তা করছে। আধবোজা চোখ, বিমর্ষ মুখ।

অবিনাশ সহাস্যে বলল,—'ব্যাপার কি সুরপতি? দুশ্চিন্তা কিসের? রাক্ষসেরা কি ফের অমরাবতী আক্রমণ করবে?'

দেবরাজ চোখ মেলে তাকাল। 'মস্করা রাখো। এলে কখন?'

—'এই তো আসছি। কিন্তু কৃষ্ণকলিকে খামোকা অপমান করলে কেন?'

দেবরাজ ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। 'তুমি কেমন করে জানলে? ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে বুঝি?'

মুখ দেখে অবিনাশ বুঝতে পারল। প্রসঙ্গটা টেনে এনে সে মহা ভুল করেছে। চৈতিরানীর কথা শুনতে দেবরাজ আগ্রহী নয়। সুতরাং ও পথ মাড়ালে কণ্টকে পা পড়বে।

—'তোমার খবর কি বল?' অবিনাশ প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইল?

—'খবর ভালো নয়। কাল শুধু শুধু অপমানিত হলাম।'

—'সে কি?' অবিনাশ সত্যিকার বিস্ময় প্রকাশ করল।

দেবরাজ বিরস মুখে বলল,—'কাল বিকেলে একটা খবর দেব বলে মিসেস রায়ের ওখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমার সঙ্গে দেখাই করল না। চাকর দিয়ে বলে পাঠাল,—শরীর খারাপ। এখন দেখা হবে না।'

বন্ধুর মন-মরা, নিরুৎসাহ ভাবের কারণ এতক্ষণে অবিনাশের হৃদয়ঙ্গম হল। সে হেসে বলল,—'আরে ধ্যেৎ। এই নিয়ে তুমি আকাশ-পাতাল চিন্তা করছ। মেয়েদের মন মানেই জোয়ার-ভাটার নদী। কখনও তুমি আকাশের চাঁদ বন্ধু, কখনও মাটির ঢেলা। কাল তোমার সঙ্গে কথা বলেনি, আবার আজই হয়ত তোমাকে ডেকে পাঠাবে। এই নিয়ে মন খারাপ করলে চলে?'

*　　*　　*

বুধবার দিন দুটো নাগাদ নীলাদ্রি কলেজে এল। সকালের এক্সপ্রেসটায় সে ফিরেছে। তিনটের সময় তার একটা ক্লাস। কিন্তু শুধু ক্লাস নেবার জন্যই ভরদুপুরে সে কলেজে আসে নি। তার উদ্দেশ্য ভিন্ন। আড়ালে নীপার সঙ্গে সে দু-চার মিনিটের জন্য কথা বলতে চায়। ছুটি হবার মুখে অধ্যাপকদের কমন রুমটা প্রায় ফাঁকাই থাকে।

কলেজে আসবার পরই নীলাদ্রির উৎসাহে ভাটা পড়ল। কমনরুমের বুড়ো বেয়ারা হলধর নীপাকে ভালো করে চেনে। খোঁজ নিয়ে সে জানাল দিদিমণি তিনদিন ধরে কলেজ কামাই করছেন। নীলাদ্রি রীতিমত আশ্চর্য হল। তিনদিন নীপা কলেজে আসেনি? কি এমন অনিবার্য কারণ? হঠাৎ কোনো অসুখ-বিসুখ হল নাকি ওর?

তার গলা শুনে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বেয়ারা বিষ্টুচরণ এসে হাজির। নীলাদ্রি ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। কি বলবে বিষ্টুচরণ? ফের কোনো ভুতুড়ে কল এল নাকি?

টেলিফোন নয়—চিঠি। বিষ্টুচরণ তার হাতে দিয়ে বলল,—'কালই এসেছে স্যার। আপনি ছিলেন না, তাই দিতে পারিনি।'

নীলাদ্রি তাকিয়ে দেখল, খামের উপর টাইপ করে লেখা তার নাম এবং ঠিকানা। কৌতূহলী মন নিয়ে সে তাড়াতাড়ি খামখানা খুলল। বিস্ময়ের পর বিস্ময়। খামের মধ্যে ছোট্ট একটুকরো চিঠি। সেটিও টাইপ করা,—কালির একটি আঁচড়ও তার মধ্যে নেই। এবং হয়ত সে কারণেই পত্র-লেখকের নাম পর্যন্ত সেখানে অনুপস্থিত।

চিঠিতে লেখা—

ডিরেক্টর সাহেব,

খবরটা হয়ত আপনার জানা নেই। থিয়েটারের নায়িকা যে এবার ফিল্মের হিরোইন হতে চলল। কিন্তু এই নায়িকা-হরণ পালায় আপনার কি শুধু মৃত সৈনিকের ভূমিকা? যে নায়িকা আপনার প্রেমকে এমনিভাবে পায়ে দলে অপমান করে গেল, তার যোগ্য শাস্তি কি? এর উত্তর একটিমাত্র কথায় দেওয়া যায়। তা হল আপনার নাটকের নাম,—নায়িকা-সংহার। কথাটা ভেবে দেখবেন।

*　　*　　*

সন্ধ্যের পর অবিনাশ ফিরতেই দেবরাজ ওকে জড়িয়ে ধরল।

—'আরে ছাড়ো, ছাড়ো। আমি অবিনাশ, তুমি পাগল হলে নাকি?'

দেবরাজ ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে কথা বলল।

অবিনাশ প্রায় চমকে উঠল। 'বল কি? এতদূর তো আমিও ভাবতে পারিনি। দেখি কাগজখানা—'

বন্ধুকে ছেড়ে দিয়ে দেবরাজ কাগজটা নিয়ে এল। পড়া শেষ করে অবিনাশ হেসে বলল,—'বলেছিলাম না? এ হল জোয়ার-ভাটার খেলা। নদীতে এখন ভরা-কোটাল, বুঝলে?'

—'আমার কিন্তু ভয় করছে মাইরি। সাড়ে নটার পর যাব। শেষে একটা কেলেংকারী না হয়। ও যদি হঠাৎ বিগড়ে বসে,'—

এবার অবিনাশ হাসল না। দুর্গা প্রতিমার অসুরের মত তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড় দেখাল। গম্ভীর মুখে সে বলল,—'তোমার ভয় নেই। আমি বাইরে প্রহরা থাকব। বিগড়ে বসলে আমাদেরও যন্তর বের করতে হবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না।'

রাত নটার পরই হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামল। হু-হু পুবে হাওয়া। কালো আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা গতি। রিম-ঝিম শ্রাবণের ধারা বর্ষণ। বৃষ্টি যখন ধরল, তখন ঘড়িতে এগারোটা বাজে। জল থামলেও ঘন সন্নিবদ্ধ পাতার ফাঁক দিয়ে গাছের উপর জমা বৃষ্টিকণা অনেক রাত পর্যন্ত টুপটাপ ঝরছিল।

অত ভোরে মানুষটাকে দেখে পলাশ-পুর থানার ও-সি সুব্রত সরকার খুব অবাক হল। উস্কোখুস্কো চুল, চোখ দুটো প্রায় লাল। ফ্যাকাশে মুখ, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি,—বিশ্রী রাত-জাগা চেহারা।

—'খবর কি ডাক্তার রায়? এত ভোরে হঠাৎ?—বাড়িতে আর চিল পড়েছে নাকি?'

দীর্ঘদিন অসুখে ভুগে-ওঠা রোগীর মত করুণ মুখ করে অম্বর বলল,—'আমার স্ত্রী নীপা রায় আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশের একবার যাওয়া দরকার।'

(চলবে)

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৭তম অধিবেশন

ইংরাজি নতুন বছরের সূচনায় আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে পশ্চিম বাংলার খড়্গপুরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৭তম অধিবেশন শুরু হচ্ছে। এবারের বার্ষিক অধিবেশনে মূল সভাপতির পদে বৃত হয়েছেন ভারতীয় মানক সংস্থার (ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউশন) প্রাক্তন ডিরেক্টর-জেনারেল ডঃ লালচাঁদ ভার্মন। এ ছাড়া, বিজ্ঞানের তেরটি বিভিন্ন শাখার যাঁরা সভাপতিত্ব করবেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ গণিতবিদ্যায় কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রধান ডঃ এস ডি চোপরা, সংখ্যায়নে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অনাদিরঞ্জন রায়, পদার্থ বিজ্ঞানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ এন কে সাহা, রসায়ন শাস্ত্রে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ অরুণকুমার দে, ভূতত্ত্ব ও ভূগোলে ভারতের ভূতত্ত্ব সমীক্ষার ডিরেকটর-জেনারেল শ্রীজি সি চ্যাটার্জি, উদ্ভিদবিদ্যায় মীরাট কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ভি পুরী, প্রাণীবিদ্যা ও কীটতত্ত্বে ভারতের প্রাণীবিদ্যা সমীক্ষার ডিরেকটর ডঃ এ পি কাপুর, নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বে পুণার ডেকান স্নাতকোত্তর গবেষণা কলেজের অধ্যাপক এইচ ডি শানকালিয়া, ভেষজ ও পশুবিজ্ঞানে নয়াদিল্লীর স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পুষ্টি উপদেষ্টা ডঃ কমলাপ বাগচী, কৃষিবিজ্ঞানে ভারতের উদ্ভিদবিদ্যা সমীক্ষার ডিরেকটর ডঃ এস কে মুখার্জি, শারীরবিজ্ঞানে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জে নাগ চৌধুরী, মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞানে নয়াদিল্লীর শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণের জাতীয় সংস্থার যুগ্ম অধিকর্তা ডঃ শিবকুমার মিত্র এবং যন্ত্রবিদ্যা ও ধাতুবিজ্ঞানে বাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর অধ্যাপক এস ভি চন্দ্রশেখর আইয়া।

মূল সভাপতি ডঃ ভার্মনের শিক্ষা ও কর্মজীবন নানা কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। তিনি ১৯২৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সসহ যন্ত্রবিদ্যায় স্নাতক হন এবং ১৯২৮ সালে করনেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এস ডিগ্রী ও দু বছর পরে ১৯৩০ সালে শেষোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ডকটরেট ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং বা যন্ত্রবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় বিশেষত মানায়নে ব্যাপক গবেষণা করেন। ১৯৩১—৩৩ সালে তিনি বাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এ গবেষকরূপে যোগদান করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি লন্ডনের শেলাক

বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি ডঃ লালচাঁদ ভার্মন

রিসার্চ ব্যুরোতে গবেষক পদার্থবিদরূপে যোগদান করেন। ১৯৩৬ সালে স্বদেশে ফিরে এসে তিনি কলকাতায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ব্যুরোতে গবেষক অফিসারের পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৪০ সালে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদের সহকারী ডিরেকটরের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৪-৪৭ সালে তিনি নয়াদিল্লীর জাতীয় পদার্থবিজ্ঞান মন্দিরে অস্থায়ী অধিকর্তারূপে কাজ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ভারতীয় মানক সংস্থার অধিকর্তাপদে যোগদান করেন এবং পরবর্তী কালে ডিরেকটর-জেনারেলের পদে উন্নীত হন। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

মানায়নের (স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন) ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিতে ভারত সরকারের ১৯৫১ সালে ডঃ ভার্মনকে মানায়ন সম্পর্কে অবৈতনিক উপদেষ্টারূপে মনোনীত করেন। মানক সংস্থার অধিকর্তার পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি শিল্পগত মানায়ন সম্পর্কে 'ইকাফে'-র আঞ্চলিক উপদেষ্টাপদে নিযুক্ত হন এবং বর্তমানে ঐ পদেই অধিষ্ঠিত আছেন। এই পদাধিকারে তিনি ইরান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, আফগানিস্থান এবং সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের শিল্পগত গবেষণা ও মানায়ন সমস্যা বিষয়ে উপদেষ্টারূপে কাজ করছেন।

ডঃ ভার্মনের শতাধিক গবেষণাপত্র ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং বহু পেটেন্ট তিনি গ্রহণ করেছেন। তিনি বিদেশের বহু সম্মাননা ও পুরস্কার লাভ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যান্ডার্ড ইঞ্জিনীয়ারস সোসাইটির ফেলোরূপে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন এবং উক্ত বিদগ্ধ সমাজ ১৯৬৪ সালে তাঁকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক লিও বি মুরে পুরস্কার প্রদান করেন (এই আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রথম প্রদান করা হয় বিশ্বব্যাঙ্কের বর্তমান সভাপতি মিঃ রবার্ট ম্যাকনামারাকে।) ডঃ ভার্মন বিদেশের একাধিক মানক সংস্থার সম্মানিত সদস্য এবং বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

প্রতি বছরের মতো এবারও বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বহু বিশিষ্ট বিদেশী যোগদান করবেন, তাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী লর্ড আলেকজেন্ডার টড। এবারের অধিবেশনে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে অ্যাপোলো—১১ অভিযাত্রীদের আনীত চান্দ্রশিলার প্রদর্শনী। এই উপলক্ষে ভারতীয় ভূপদার্থ বিজ্ঞানী ডঃ কে গোপালন (বর্তমানে লস অ্যাঞ্জেলস-এ অবস্থিত ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-পদার্থবিজ্ঞান ও গ্রহসংক্রান্ত পদার্থবিজ্ঞান গবেষণা মন্দিরে গবেষক) চান্দ্রশিলা গবেষণায় নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ৮ জানুয়ারি একটি বিশেষ বক্তৃতা দেবেন।

জীবকোষের রহস্য সন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা

একটি মাত্র কোষ থেকে মাতৃগর্ভে ভ্রূণ কিভাবে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর রূপ পায় এবং কিভাবেই বা তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গড়ে ওঠে—জীবকোষের এই পরম রহস্য যুগে যুগে মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে আমরা এই রহস্যের অনেক কিছু আজ জানতে পেরেছি, কিন্তু এখনও রহস্য সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় নি। সবচেয়ে রহস্যময় হচ্ছে সামান্য পরিমাণ পীত-শুভ্র নিষ্ক্রিয় বস্তু ডিম থেকে কি করে এক সুবিন্যস্ত জীবন্ত দেহ গড়ে ওঠে।

আজ আমরা জানি, একটিমাত্র কোষ ক্রমান্বয়ে বিভাজিত হয়ে লক্ষ লক্ষ কোষ গঠিত হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ গড়ে তোলে মস্তিষ্ক, কেউ বা হৃদযন্ত্র বা দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কয়েক বছর ধরে বহু প্রাণরসায়নবিজ্ঞানীরা প্রাণবিকাশের রাসায়নিক রহস্যের সন্ধান করছেন। তাঁদের নিরলস গবেষণার ফলে আজ জানা গেছে, কোষের কেন্দ্রস্থ ক্রোমোজোমের ডি-এন-এ'র মধ্যে সঞ্চিত থাকে জীবনরহস্যের বার্তা এবং আর-এন-এ এই বার্তা বহন করে নিয়ে যায় সাইটোপ্লাজমে। তারপর এরাই রূপ নেয় প্রোটিনে। এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, প্রাণীর প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠনের বার্তা নিহিত থাকে ডি-এন-এ'র মধ্যে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—কখন, কিভাবে ও কেন বিশেষ বার্তা গড়ে ওঠে। এই পরম রহস্য যদি জানা যায়, তাহ'লে কৃত্রিম উপায়ে বিশেষ বিশেষ বার্তার কার্যকারিতা বন্ধ করে বিশেষ বিশেষ অঙ্গের অবদমন করা যেতে পারে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ভ্রূণের কোন কোন বিশেষ পর্যায়ে অ্যান্টি-বায়োটিক ব্যবহার করে এই অবদমন সম্ভব হয়। এর ফলে এমন সব প্রাণীর জন্ম দেওয়া সম্ভব হবে, যাদের সমস্ত কিছুই স্বাভাবিক প্রাণীর মতো হবে, কেবল দু-একটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়া—যা ইচ্ছা করেই অবদমিত করা হয়েছে। কখন কোন্ বার্তাবহ আর-এন-এ কোন্ বার্তা বহন করে নিয়ে যায় এবং কিভাবেই বা শরীরের কোন মনোনীত অঙ্গের অবদমন করা যায়, সে সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চলছে কলকাতার কাছে বরানগরের ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট বা ভারতীয় পরিসংখ্যান মন্দিরে তরুণ বিজ্ঞানী শ্রীরতনলাল ব্রহ্মচারীর তত্ত্বাবধানে।

ভূমধ্যসাগরে প্রাপ্ত 'ছিওনা' নামে একটি জলচর প্রাণীর ওপর তাঁরা এই বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা এবিষয়ে বেশ কিছুটা ফলও পেয়েছেন। ছিওনা প্রাণীটির জীবনেতিহাস বড় বিচিত্র। এর ডিম থেকে যে ব্যাঙাচি জন্মায়, অনুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে তা পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেটি এক নিমাঙ্গ অস্তিত্ব। তার মাথায় থাকে দুটো কালো বিন্দু যার একটি হল চোখ। প্রথমে চোখ অবলুপ্ত হয় এবং তারপর ধীরে ধীরে প্রাণীটি হয়ে যায় উদ্ভিদের মতো। তার দেহকে ঢেকে রাখে সেলুলোজের একটি আবরণ।

পরিসংখ্যান মন্দিরের এই বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন—ডিমটি নিষিক্ত হওয়ার আধঘণ্টা পরে দুটি অ্যান্টি-বায়োটিক প্রয়োগ করলে প্রাণীটির মাথার সেই কালো বিন্দু দুটোর (যার একটি হল চোখ) কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। এ থেকে তাঁরা অনুমান করেছেন, এই কালো রঞ্জন পদার্থ তৈরী করার পেছনে যে এনজাইম আছে তার বার্তা ঐ বিশেষ আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হয়। অ্যান্টিবায়োটিকের সাহায্যে ঐ বার্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে ঐ বিশেষ অঙ্গের অবদমন সম্ভব হয়েছে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবদমন নিয়ে আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানীমহলে ব্যাপক গবেষণা চলেছে। বার্তাবাহী অণুগুলিকে হাতেনাতে ধরার কাজে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব অর্জন করেছেন গ্রস, মনরয়, ব্রাউন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। এ প্রসঙ্গে কলকাতার তরুণ বিজ্ঞানীদের গবেষণাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে এ বিষয়ে এখনও অনেক কিছু জানার বাকি আছে। কি করে ডিমের নিষ্ক্রিয়তা থেকে জীবন্ত সত্তার আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং দেহের কোন্ অঙ্গের বার্তা কোন্ বার্তাবহ আর-এন-এ কখন বহন করে নিয়ে যায়—সে রহস্য আজও সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয়নি। যেদিন সে পরম রহস্য উদ্ঘাটিত হবে, সেদিন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা ঘটবে।

ভি ডোসন যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হচ্ছে

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিস্ময়কর যন্ত্র ভি ডোসন

সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীতে 'ভি ডোসন' নামে একটি বিস্ময়কর যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে, যা স্ত্রীরোগ চিকিৎসক ও শারীর-বিজ্ঞানীদের কাজে বিশেষ সহায়ক হবে। এই রোগনির্ণয় যন্ত্রের ঘূরন্ত অক্ষের সঙ্গে একটি গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র লাগানো থাকে। এই অভিনব যন্ত্রের সাহায্যে মাতৃগর্ভে অজাত শিশুর অবস্থান জানা যাবে এবং শরীরে টিউমার ও মলকোষ থাকলে ধরা পড়বে। এই যন্ত্রের বিশেষ সুবিধা হচ্ছে, রুগীকে ক্ষতিকর রশ্মি না লাগিয়েও যকৃৎ পরীক্ষা করা যাবে।

ঘুম পাড়ানি যন্ত্র

যাঁরা অনিদ্রায় ভোগেন তাঁরা অনেক সময় ঘুমের বড়ি খেয়ে থাকেন। কিন্তু ঘুমের ওষুধ স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ এবং বেশিমাত্রায় খেলে মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে। তাই বিশেষজ্ঞরা আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে 'ঘুমপাড়ানি কল' সৃষ্টি করেছেন। পশ্চিম জার্মানীর বিশফস্ গ্রীন এ একটি 'বৈদ্যুতিক চিকিৎসা নিদ্রাকেন্দ্র' স্থাপিত হয়েছে। এখানে অনিদ্রা রুগীদের চোখে ইলেকট্রোড ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক স্পন্দন পাঠানো হয়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ভয় কেটে গেলেই রুগীর মনে একটা ভারি তৃপ্তিকর ভারহীনতার ভাব জেগে ওঠে ও তার ঘুম এসে যায়। গোড়ায় কুড়ি মিনিট ধরে এই ঘুমপাড়ানি স্পন্দন দেওয়া হয়, কিন্তু পরে তা বাড়িয়ে এক এমন কি দু-ঘণ্টা পর্যন্ত করা হয়। এই চিকিৎসায় শতকরা ৬৬·৬ জনের অনিদ্রা রোগ সেরে গেছে। ২১·২ জনের ক্ষেত্রে খুব ভালো ফল পাওয়া গেছে, কিন্তু ১২·২ জনের কোন উপকার হয় নি। তবে চিকিৎসাটি ব্যয়সাপেক্ষ, কারণ মাথাপিছু খরচ পড়ে প্রায় তিন হাজার টাকা। কাজেই বিত্তবান-দের পক্ষেই এই চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দুর্ভাগ্য, যে কোর্টে গিয়ে এ্যাটর্ণীর সঙ্গে দেখা হল না—তিনি কি কাজে যেন বেরিয়ে গেছেন, ফিরতে অনেক দেরী হবে।

কী আর করি, চলে গেলাম স্টারে। ওখানেও মন বসলো না—কি যেন, একটা অনাগত আশঙ্কায় ছটফট করছিল মনটা। চলে গেলাম সোজা রিকশা করে উল্টো-ডাঙ্গার বাড়ীতে।

ইতিমধ্যে বাড়ীতে যা অবধারিত তাই ঘটে গেছে।

সুধীরা এক সময় দুধ গরম করার জন্য উঠে গেছে। দুধ গরম করে ফিরে এসে দেখে বাবার মাথাটা বাঁদিকে হেলে পড়ে আছে।

সুধীরা খুব কাছে এসে ডাকতে লাগল—বাবা, বাবা!

কিন্তু আর কাকে ডাকা? তিনি তখন সমস্ত ডাকাডাকির উর্ধ্বে চলে গেছেন—যেখান থেকে এখানকার কোন ডাক পেঁছয় না।

আমাদের প্রতিবেশী উমেশবাবু ছিলেন অতি সজ্জনব্যক্তি। ও'র বাড়ীতেই সুধীরা ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিল সর্বাগ্রে। একা এই বিপদের মধ্যে ভেঙে না পড়ে অসম্ভব দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেকে ধরে রাখল—আর এক এক করে সমস্ত প্রাথমিক কাজগুলি করে যেতে লাগল। আমার জন্য ফোন করালে স্টারে। ফোন থেকে উত্তর এলো—উনি এখানে নেই—এখানে একবার এসে-ছিলেন, এখন উল্টোডাঙ্গায় গেছেন। এখুনি লোক পাঠাচ্ছি।

আমার সেই চাকর নীলু তখন স্টারে এসেছিল স্নান করার জন্যে। দুপুরে নীলু রোজই আসত স্নান করার জন্য, তারপর স্নান সেরে বাসায় খেতে যেতো। তাই যখন ফোন এল তখন বুকিং অফিস থেকেই ধরে-ছিল। তারা নীলুকে ডেকে পাঠাল। নীলু তখন স্নান শেষ করে খেতে যাবে আর কি!

বুকিং-এর লোকটি তাকে বলল—এই নীলু, শীগ্গির একটা ট্যাক্সি নিয়ে উল্টোডাঙ্গায় চলে যা। বাবুর বাবা মারা গেছেন। নীলু আর দ্বিরুক্তি না করে সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এসেছিল উল্টোডাঙ্গার বাড়ীতে।

আমি সবেমাত্র পেঁছেচি—রিকসাটা তখনও গেট ছেড়ে যায় নি—এমন সময় দেখি একটা ট্যাক্সি গেটের মধ্যে ঢুকছে।

দাঁড়িয়ে পড়লাম। এমন অসময়ে কে এল ট্যাক্সি করে? অনাদিবাবু মাঝে মাঝে আসতেন কিন্তু ইদানিং বেশ কিছুদিন আসেন নি—তবে কি অনাদিবাবুই এলেন নাকি?

ট্যাক্সিটা কাছে এসে দাঁড়াতেই দেখি নীলু নামছে গাড়ী থেকে, সঙ্গে আর কেউ নেই।

অবাক হয়ে বললাম—কিরে তুই?

নীলু মুখ নীচু করে বললে—বাবু, থিয়েটারে টেলিফোন এসেছিল—কর্তাবাবু আর নেই।

সে মুহূর্তটির কথা জীবনে ভুলব না। মনে হল পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন দপ্ করে নিভে গেল। পৃথিবীর যাবতীয় রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ যেন একেবারে একাকার হয়ে একটা বিরাট ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম, কয়েক মুহূর্তের জন্য মনটা অসাড় হয়ে গেল। চোখ দিয়ে এক-ফোঁটা জল এল না—আমি শূন্য দৃষ্টিতে বাঁধানো চত্বরটার ওপর বসে পড়লাম। আমার মন যেন চলে গেছে বাস্তবের সীমানা ছাড়িয়ে কোন দূর রাজ্যে।

নীলু ডাকলো,—বাবু!

এই ডাক শুনে আমি আবার ফিরে এলাম যেন এই পৃথিবীতে। আমি আর কিছু না বলে জুতোটা খুলে ফেলে দিয়ে ঐ ট্যাক্সিতেই উঠে বসলাম।

ট্যাক্সি ছুটে চললো। আমাদের দুজনের কারোরই মুখে কোনো কথা নেই। গাড়ী সার্কুলার রোড থ্রে স্ট্রীটের মুখে আসতেই নীলুকে বললাম—তুই নেমে যা।

নীলু বললে—না বাবু, আমি আপনার সঙ্গে যাই।

আমি বললাম—না না, তুই যা, খাওয়া-দাওয়া কর গিয়ে। বেলা অনেক হয়েছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীলু নেমে গেল—আমি সোজা চলে এলাম বাড়ী

বাবার ঘরে ঢুকে দেখি—বাবা শুয়ে আছেন শান্ত সমাহিত ভাবে। সুধীরা তাঁর বিছানার পাশে মূর্তিমতী বিষাদ প্রতিমার মত বসে আছে। আত্মীয়-স্বজন কয়েকজন এসেছেন, শ্মশান যাত্রার আয়োজন করছেন। আমি জানালার গরাদ ধরে দাঁড়ালাম। আমি জীবনে কোন দিন কাঁদিনি—এতক্ষণ পর্যন্ত কোন রকমে নিজেকে সামলে রেখেছিলাম—কিন্তু এবার মনে হলো চীৎকার করে কেঁদে উঠি। প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু চোখের জল আর কোন বাধা মানল না—অন্তরের রুদ্ধ আবেগ যেন সহস্রধারায় ফেটে পড়লো।

স্ত্রীর কাছে শুনলাম—মৃত্যুর আগে বাবা খেদ প্রকাশ করে গেছেন, কিছু রেখে যেতে পারলুম না, ও ঘোরাঘুরি করছে বটে কিন্তু আমি জানি আর কিছু হবার নয়। আমি সবই শেষ করে খেয়ে গেলুম। স্ত্রী ও'কে সান্ত্বনা দিতে উনি বলেছিলেন—তোমার সেবা কখনো ভুলতে পারব না মা, আমি আশীর্বাদ করে যাচ্ছি—যা গেলো তার দ্বিগুণ তিনগুণ হয়ে ফিরে আসবে।

এদিকে ঘটনার কী অদ্ভুত যোগাযোগ। মা গিয়েছিলেন তীর্থ করতে। তিনি সেই-দিনই ফিরলেন। শিয়ালদহের কাছেই মামার-বাড়ী, স্টেশন থেকে সোজা মামারবাড়ীতেই চলে গিয়েছিলেন। ও'কে দেখামাত্রই দাদা-মশায় বললেন—তুমি এখনই ভবানীপুরে জামাইয়ের কাছে যাও—ও'র খুব অসুখ।

মা চেয়েছিলেন সেদিনটা ওখানে থেকে পরদিন আসতে, কিন্তু দাদামশায় জোর করে মামাকে সঙ্গে দিয়ে মাকে আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন।

এত বড় বিপর্যয়ের কথা মা কিছুই জানতেন না, বাড়ীতে পা দিয়েই দেখেন শবযাত্রার প্রস্তুতি। বাইরে খাট সাজানো হচ্ছে। বারান্দায় পেঁছেই বাবার মৃতদেহ দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন—আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললাম—না ধরলে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেত।

যাই হোক, বাবার শবদেহ নিয়ে আমরা শ্মশানে গেলুম দাহ করাতে। সেখানে প্রবোধবাবু আর অনাদিবাবু এসেছিলেন। অনাদিবাবু কাছে এসে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন—টাকাকাড়ি দরকার?

আমি বললাম—না।

না বললাম বটে, তবে মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। মনে পড়ে গেল সেই বিখ্যাত শ্লোকটা—'রাজদ্বারে শ্মশানে চ—য তিষ্ঠতি সঃ বান্ধব।' বন্ধুত্বের এ স্নেহস্পর্শ কখনো ভুলব না।

অবশ্য এঁদের আসার একটা কারণও ছিল। শহরে পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে 'প্রফুল্ল' অভিনয় হবে—মনোমোহনে 'কম্বিনেশন' নাইট। দানীবাবু যোগেশ,

আর আমি রমেশ। ঠিক পরের দিনই অভিনয়।

স্পষ্ট মনে আছে সেদিনের কথা। 'এক-বাড়ি' বিক্রি—ন স্থানং তিল ধারণং— আমি অশৌচ অবস্থাতেই থিয়েটারে গেছি, অভিনয় করতে নয়, অভিনয় থেকে ছুটি নেবার জন্যে। বাড়ীতে কিছু ভাল লাগছিল না, তাজা দগদগে বেদনাটাকে খানিক ভুলে থাকার জন্যেই ওঁরা আমাকে জোর করে থিয়েটারে নিয়ে গেলেন। আমি যে আজ নামতে পারব না এর একটা কৈফিয়ৎ তো দর্শকদের দিতে হবে—তাই ম্যানেজার হিসেবে অভিনয়ের আগে দানীবাবু আমাকে নিয়ে মঞ্চে গিয়ে হাজির হলেন। দর্শকদের জানালেন আমার পিতৃবিয়োগের জন্য আমি আজ মঞ্চাবতরণে অক্ষম।

আমি হাতজোড় করে বললাম ঃ এ অবস্থায় আপনারা দয়া করে আমায় ছুটি দিন, আজকে মঞ্চে নামতে না পারায় ক্ষমা করুন।

দর্শকরা নির্বাক হয়ে রইল। যবনিকা ধীরে ধীরে আমাদের দুজনকে ঢেকে দিল।

তার কিছুক্ষণ পরে অনাদিবাবু তাঁর গাড়ী করে আমায় বাড়ী পেণছে দিলেন। বাড়ী পেণছে দিয়ে অনাদিবাবু বহুক্ষণ বসে বসে গল্প করলেন, তারপর অনেক রাতে বাড়ী গেলেন।

শুধু 'প্রফুল্ল' কেন, সে সপ্তাহে 'শ্রীবৎস' নাটকেও নামতে পারলুম না।

এদিকে মামলায় যা অবশ্যম্ভাবী তাই হল। বাড়ী 'সেল'-এ উঠেছিল এবং বিক্রীও হয়ে গিয়েছিল। আমার প্রথম এবং প্রধান চিন্তা হল বাড়ীর সকলকে নিয়ে গিয়ে রাখব কোথায়?

বন্ধুরা সব বললেন—যাঁর বাড়ী তাঁকে গিয়ে বলুন, তিনি নিশ্চয়ই কিছু বিবেচনা করবেন।

অগত্যা তাই করলাম। যিনি বাড়ী কিনেছিলেন তাঁর এ্যাটর্ণীর বাড়ীটা চিনতাম। ভবানীপুরে যেখানে আমাদের যাত্রার ক্লাব-ঘরখানা ছিল, সেখান থেকে আরও খানিকটা এগিয়ে নর্দার্ণ পার্কের শেষপ্রান্তে আমাদের হরিমোহনবাবুর প্রতিবেশী। হরিমোহনবাবুই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

ভদ্রলোক আমাকে চিনলেন। তাঁকে অনুনয় করে বললাম—শ্রাদ্ধশান্তি পর্যন্ত থাকা যায় না?

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন—সে তো একমাস, তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিনি বললেন—ভাদ্রমাস পড়ে যাবে—'পজেসন' নিতে দেরী হবে। তারপর একটু থেমে বললেন—আচ্ছা ঠিক আছে, তাই হবে। তবে কথা দিন, পয়লা আশ্বিনই আপনারা উঠে চলে যাবেন বাড়ী ছেড়ে।

—কথা দিলুম।

যাক্, কয়েকটা দিনের জন্যে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল!

যথাসময়ে শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে গেল। এই উপলক্ষ্যে যা খরচপত্র হয়েছিল সেটা থিয়েটার থেকে নিয়েছিলাম অবশ্য। বন্দোবস্ত হলো যে মাইনে থেকে মাসে মাসে কেটে নেবে।

উল্টোডাঙ্গার বাড়ীতেই গিয়ে উঠব ঠিক করলাম—ওখানে দারোয়ান, মালী এরা সব রয়েছে। এ বাড়ী থেকে জিনিষপত্র সব পাঠাতে লাগলাম একে একে।

দেখতে দেখতে পয়লা আশ্বিন এসে গেল। ভাদ্রমাসের শেষ দিন অনাদিবাবুর গাড়ীটা চেয়ে রাখলুম। গাড়ী নিয়ে তাঁর সেই পুরনো ড্রাইভার জহুরী আগের দিন রাত্রি থেকেই আমার ওখানে রইল। তারপর ১লা আশ্বিন সূর্যোদয়ের আগেই মা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে আর পঞ্চুর একটা পোষা কুকুর—সেটা দেখি আগেভাগেই গাড়ীতে উঠে বসে আছে—সব নিয়ে এবাড়ীর সমস্ত মায়া পরিত্যাগ করে ছেড়ে চললুম। যখন উল্টোডাঙ্গা গিয়ে পৌঁছলুম, তখন দেখি যে, পূর্বাকাশ লাল হয়ে উঠেছে, সূর্যদেব তাঁর দৈনন্দিন পথ পরিক্রমায় বেরুচ্ছেন।

মা অবশ্য ওখানে থাকলেন না, কয়েকদিন পরেই উনি আবার তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

সুধীরা রইল ছেলেমেয়েদের নিয়ে একলাই ওখানে। নেপালী দারোয়ান ছিল—খুব বিশ্বাসী, আর ছিল মালী। আমরা পৌঁছেই দেখি সে উনুন-টুনুন সব তৈরী করে রান্নাঘরের ব্যবস্থা করে রেখেছে, ঘর-দোর পরিষ্কার করে রেখেছে।

সেখানেই বাস করতে লাগলাম। চারদিক ফাঁকা—মাঝখানে জেগে আছে দ্বীপের মতো বাড়ীটা। ওখান থেকেই যাতায়াত করি থিয়েটারে একটা রিকসা নিয়ে। ফিরতে রাত হয়, একটা-দেড়টার কম নয়।

মামারা দেখতে এলেন। সুধীরাকে বলেছিলেন, এখানে কি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকা যায়! আমাদের বাড়ীতে এসে থাকো।

সুধীরা সংক্ষেপে বলেছিল—না, এই তো বেশ।

আমার শ্বশুরমশাইও এসেছিলেন। তিনি তাঁর মেয়েকে বলেছিলেন,—আমার ওখানে চল। এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় তুই একলা থাকবি কি করে? কোন দিন শুনবো ডাকাতে মেরে রেখে গেছে।

সুধীরা তাতে বলেছিল—তোমার কোন ভয় নেই বাবা, আমি এখানেই বেশ থাকবো।

(১০)

হ্যাঁ, একটা ব্যাপার বলতে ভুলে গেছি। আমার তখন অশৌচের কাল চলেছে—এমন সময় দেখলাম প্রাচীরপত্র পড়েছে স্টারে 'চিরকুমার সভা'। এ অবস্থায় আমার তো মঞ্চে নামা সম্ভব নয়। শুনেলাম চন্দ্রবাবু করবেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

ব্যাপারটা কি রকম যেন ঠেকল। শিশিরবাবু নিজের থিয়েটার ছেড়ে এখানে আসছেন অভিনয় করতে! কি উদ্দেশ্য কে জানে!!

কৌতূহলী হয়ে আমি অভিনয়ের দিন গেলাম থিয়েটারে। উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ অভিনয়টা দেখলাম।

অভিনয়ের পর ডিরেকটররা আমায় জিজ্ঞেস করলেন—কেমন দেখলেন?

বললাম—ভালোই, আপনারাও তো দেখলেন।

ওঁরা কিছু বললেন না, শুধু একটু হাসলেন।

অভিনয়ের পরে অবশ্য শিশিরবাবু আমাকে বলেছিলেন, তোমার একটা ফরম্যাল পারমিশান নেওয়া আমার উচিত ছিল। তোমায় খুঁজেছিলুম, পাইনি।

আমি বললাম—আমি তো উইংসের পাশেই ছিলাম দাঁড়িয়ে সর্বক্ষণ। এই কথা শুনে উনি আর কিছু না বলে অন্য দিকে চলে গেলেন।

আমার বিস্ময় ওঁর চন্দ্রবাবু করার জন্য নয়—আমার বিস্ময় ওঁর নিজের থিয়েটার ছেড়ে স্টারে আসার জন্য। বুঝলাম যে ওঁর নাট্যমন্দিরের খেলা বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে।

যাক, শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে গেল—অশৌচের শেষ হল।

স্টারে একদিন অপরেশবাবু হাবুলকে ডেকে বললেন—হাবুল, 'শ্রীবৎস'র সাটটা নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় দিয়ে এসো। প্রবোধ চলে গেল, অহীনের পিতৃবিয়োগ হল—আরও ভবিষ্যতে কি হবে কে জানে? এ বই আমাদের ধাতে সইবে না। ও গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়াই ভালো।

এরপর নানা বই হতে লাগলো, নতুন পুরনো। এবার ধরা হলো গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা'—প্রথম অভিনয়ের তারিখ হলো জন্মাষ্টমী, ২৭ আগস্ট, ১৯২৯। কৃষ্ণকামিনী—নিমাই, সুবাসিনী—নিতাই, মনোরঞ্জনবাবু—জগাই, আমি—মাধাই।

এরপর হলো অপরেশবাবুর 'ছিন্নহার'। আমি করেছিলাম মিঃ রায়, কালাচাঁদ—তিনকড়িবাবু, চিরঞ্জীব—কুঞ্জবাবু।

এইভাবেই চলতে লাগলো—এদিকে শীতকাল এসে গেল,—নতুন বই ধরতে হয়। শুনলাম, অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি'র নাট্যরূপ দিচ্ছেন অপরেশবাবু। নতুন বই-এর নামে একটা উৎসাহের সঞ্চার হলো থিয়েটারে। প্রবোধবাবু স্টারে নেই, গদাইবাবু বা গদাধর মল্লিক সব দেখাশোনা করছেন। গদাইবাবু ধনী ব্যক্তি। আমাকে ডেকে বললেন—খুব বেশী খরচ করবেন না মশাই—স্টারের অবস্থা তো দেখছেন।

অপরেশবাবু ম্যানেজার, কিন্তু নাটক প্রোডাকশনের সমস্ত দায়িত্ব আমারই ওপর এসে পড়ল।

গদাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কী কী সিন চাই?

আমি বললাম—অন্য সব পুরনো যা-কিছু আছে তাতে রং-চং ফিরিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে, কিন্তু একটা সিন তৈরী করতেই হবে। রেলস্টেশনের দৃশ্য। শেয়ালদাতে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে, কামরায় বসে আছে 'বাণী'। পিতা রমাবল্লভ প্ল্যাট-

ফর্মে পায়চারি করছেন। লোকজনের আনা-গোনা, হকারের চীৎকার, কুলীদের মাল-পত্তর বওয়া—চারিদিকে একটা দারুন ব্যস্ততা। ট্রেন ছাড়তে তখনো বেশ দেরী আছে। এমন সময় স্টেশন কাঁপিয়ে আসাম মেল এসে পড়ল। অসুস্থ অম্বরকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসতে আসতে বাহকরা একটু থামল বিশ্রাম নিতে। আর থামলো ঘটনা-চক্রে সেই কামরারই সামনে।
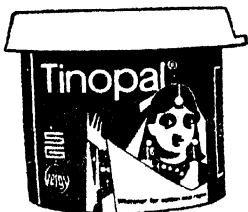
অম্বরকে চেনা যায় না—শীর্ণ রোগ-জীর্ণ দেহ, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি। তবু তার দিকে দৃষ্টি পড়ামাত্র কেঁপে উঠল বাণীর অন্তর। সে আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো—ও কে? ও কে বাবা?

রমাবল্লভ বুড়োমানুষ, তিনিও চিনতে পারেন নি, বললেন—অসুস্থ কোনো প্যাসেঞ্জার-ট্যাসেঞ্জার হবে—ও কিছু না।

কিন্তু তার দিকে ভাল করে দেখতেই বাণীর সব সন্দেহ কেটে গেল—সে পাগলের মত কামরা থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে কাঁদতে কাঁদতে আছড়ে পড়ল স্বামীর বুকের ওপর।

এর পরেই পড়তো যবনিকা। নাট্যকার গল্পটা মেলাবার জন্য আরও একটা 'সিন' করেছিলেন। কিন্তু 'এ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স' নাটক শেষ করতে মন চাইছিল না। তাই এখানেই সমাপ্তিসূচক যবনিকা পড়ত।

এই একটিই 'সেট' তৈরী হয়েছিল নতুন—সেট, সাউন্ড এফেক্ট ও আলোক-নিয়ন্ত্রণ সব মিলে দৃশ্যটি অদ্ভুত বাস্তবা-নুগ হয়েছিল এবং দর্শকদের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিল।

'মন্ত্রশক্তি'র প্রস্তুতিতে পুরোদমে লেগে গেলাম। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায় বুঝতে পারি না। ফিরতে রোজই বেশ রাত হয়। স্ত্রী প্রায়ই অনুযোগ করেন—এত রাত্রে রোজ রিকশা করে এই রাস্তা দিয়ে ফেরো—কোন দিন কিছু বিপদ-আপদ না ঘটে। জায়গাটা তো ভালো নয়।

কথাটা আমার মনে লাগলো, রাত্রে আসতে আমারও যে ভয় করত না, তা নয়। গুন্ডার জায়গা—যদি সত্যিই কিছু ঘটে।

একদিন চলে গেলাম উল্টোডাঙ্গার থানায়। গিয়ে দেখি ওখানকার ও-সি হলেন আমার খুব পরিচিত ব্যক্তি—বিনয়দা।

তিনি আমায় দেখে বললেন—কী ব্যাপার হে?

বললাম সব কথা খুলে—বাড়ী ফিরতে রাত হয়, স্ত্রী একা থাকে বাচ্চাদের নিয়ে। একটু দেখবেন।

বিনয়দা অল্প একটু হেসে বললেন—না দেখলে চলছে কি করে?

বিস্মিত হয়ে বললাম—তার মানে?

উনি বললেন—পুলিশের লোক আমরা—সব খবরই রাখি। জায়গাটা যে ভালো নয় সে তো বুঝতেই পেরেছ। গুন্ডাদের সব ডেকে বলে দিয়েছি—বাবু আমার লোক—ওর যেন কোনো বিপদ-আপদ না হয়। এবার বুঝলে? তুমি যে রাত-বিরেতে যাতা-য়াত করো তাতে কোনো দিন কোনো অসু-বিধে ঘটেছে কি?...ঘটে নি তো। ঘটবেও না কোনো দিন। যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যাও, কোনো ভয় নেই।

যাক এদিকটা থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

উল্টোডাঙ্গার বাড়ীর কথা আজও সব স্পষ্ট মনে পড়ে। বৃষ্টির দিনে একটু বেশী বৃষ্টি হলে—উঠোনে জল জমে যেতো, আর সেই জলের সঙ্গে পুকুরের জল মিশে একা-কার হয়ে যেতো। যখন ল্যাবরেটরী ছিল তখন ছোকরা ইলেকট্রিশিয়ানের দল এই পুকুরের জল থেকে ভেসে আসা ছোট ছোট কাছিম ধরতো। আমার ওতে মোটে রুচি ছিল না, কিন্তু ওরা বলত যে ওর মাংস নাকি অত্যন্ত উপাদেয়।

এসব অবশ্য আমার ওখানে সস্ত্রীক ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসার আগের কথা।

এখন এরা এখানে আসার পর একটা সমস্যা দেখা দিল। মেয়ে এতো সব খোলা-মেলা জায়গা পেয়ে চারিদিকে বেশ ঘুরে বেড়ায়। ভয় হয়, কোন সময় পুকুরধারে পা হড়কে জলে পড়ে না যায়। পুকুরে হাঁস ছিল—সেই হাঁস দেখতে যাওয়া শিশুমনে খুব স্বাভাবিক।

ছেলে অবশ্য অন্যদিকে মন দিতে পারে না। সে ছিল বাবার খুব 'ন্যাওটা'। বাবাকে 'বাবুজী' বলতো—সে প্রায়ই 'বাবুজী'কে খুঁজত। তখনকার দিনে পাঞ্জাবীরা নতুন ব্যবসা করতে আসছে কলকাতায়। হরনাম সিং বলে একজন পাঞ্জাবী আসতো বাবার কাছে, আবশ্যক মতো টাকা-পয়সা নিত। সে এসে বাবাকে বলতো 'বাবুজী'। সেই থেকে আমার ছেলেমেয়েও বাবাকে ডাকতে আরম্ভ করেছিল বাবুজী বলে। সেই 'বাবুজী'কে ওরা ভুলতে পারছিল না কিছুতেই।

বলত—ভবানীপুর যাবো। এক-একদিন মনের ভুলে বাবার মত কাউকে দেখলে ঐ বাবুজী বলে ছুটে যেতে চাইতো।

একদিনের কথা বলি। সকাল থেকেই সেদিন ছেলের শরীরটা ভাল ছিল না। ঐ অবস্থায় ওকে দেখে আমি বেরিয়ে যাই। সেদিন সুরু হয়েছিল বৃষ্টি—অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। সমস্ত রাত ধরে এমন বৃষ্টি যে থিয়েটারেই আটকে গেলাম—কোন মতেই বেরুতে পারলাম না। বাড়ী ফিরলাম পরদিন সকালে।

ছেলের এদিকে ভয়ংকর পেট খারাপ। ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস আকার নিয়েছিল। ছেলে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে—সুধীরা কিন্তু নার্ভাস হয়ে পড়ে নি। আমার ভাই-এর এক বন্ধু ছিল ডাক্তার। স্ত্রী তার কাছে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন আর কোনো উপায় না দেখে। ডাক্তার বৃষ্টির জন্যে আসতে পারেন নি—তবে অসুখ শুনে ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের কৃপায় অসুখটা আর বাড়ে নি। ওই ওষুধেই কাজ দিয়েছিল।

এইসব কারণে ভেবে দেখলাম, এ বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও বাসা নেওয়াই ভালো কাছে-পিঠে। কিন্তু চট্ করে বাড়ী পাই-ই বা কোথায়?

কিন্তু আমার তখন সীমিত আয়, অর্থের অনটন প্রকট হয়েই দেখা দিতে লাগলো। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে—লেখা-পড়ার দিকটা ওদের মা-ই এখন দেখাশোনা করছে—কিন্তু আজ বাদে কাল তো ওদের স্কুলে দিতে হবে।

মা তো আমার তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়োচ্ছেন।

সুতরাং সংসার এবার তার সব সমস্যা নিয়ে আমাকে পাকে পাকে জড়াতে লাগলো। কিন্তু যার জীবন ও জীবিকা নাট্যলক্ষ্মীর পায়ে নিবেদিত তার কাছে সাধারণ যে-কোন সমস্যাই অসাধারণ হয়ে দেখা দেয়।

এদিকে 'মন্ত্রশক্তি'র উদ্বোধনের তারিখ যত এগিয়ে আসতে লাগলো তখন কোথায় রইল সংসার আর তার সমস্যা। পাগলের মত খেটেই চলেছি দিনরাত।

পোশাক-পরিচ্ছদে খরচ করা হয়েছিল মোটামুটি। আমি পরেছিলাম খড়কে ডুরে আদ্দির পাঞ্জাবী, যাকে বলে 'ব্যায়লা-কাট'। এছাড়া অন্য 'সিনে'র জন্য সিল্কের ওপর লম্বা সুতিকাটা পাঞ্জাবীও ছিল, আর ছিল একটা গোলাপী রং-এর গেঞ্জী। আরও একটি গেঞ্জী আমি পরতাম—সেটি আমার বাড়ী থেকে আনা—স্ত্রীর হাতে বোনা—'পারফোরেটেড' করা।

কুমারবাবু একটি চমৎকার ছড়ি দিয়ে-ছিলেন—বিলিতি। আমি অনেক দিন ব্যব-হার করেছিলাম সেটা তারপর একদিন আমারই অসাবধানতায় সেটা ভেঙে যায়।

'মন্ত্রশক্তি' জমে গেল। শুধু জমে গেল নয়, আজকের ভাষায় যাকে বলে 'সুপার-হিট'। বহু দিন ও নাটক চলেছিল—প্রচুর পয়সা দিয়েছিল স্টারকে। ভূমিকালিপি ছিল এই রকম—রমাবল্লভ—কুঞ্জবাবু, মথুরো—তিনকড়িবাবু, মৃগাঙ্ক—আমি, অম্বর—ইন্দু মুখুজ্যে, পরাণ—তুলসী চক্রবর্তী, বাণী—কৃষ্ণভামিনী, তুলসী—সুবাসিনী, কৃষ্ণপ্রিয়া—কুসুমকুমারী, অম্বা—সুশীলা-বালা, জহরা—রাজলক্ষ্মী, অভিনয়ের তারিখ হলো—২৩ নভেম্বর ১৯২৯ সাল।

মনে আছে এই প্রথম অভিনয়ের দিনই এক অঘটন ঘটে গেল। শান্তবালার করার কথা ছিল কৃষ্ণপ্রিয়ার পার্ট। এই পার্টেই সে শেষদিন পর্যন্ত রিহার্সাল দিয়েছিল অপরেশবাবুর কাছে। সে যথারীতি সাজতেও এলো অভিনয়ের দিন। থিয়েটারে প্রচুর ভীড়, সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। 'ড্রপ' উঠবার সময় দেখা গেল শান্তবালা জ্বরে বেহুঁস। মাঝে মাঝে বমি করছে, সাজতে সাজতে শুয়ে পড়ছে, উঠতে পারছে না একেবারেই।

তার যে শরীর এতখানি খারাপ হয়ে পড়েছে একথা আগে কাউকে জানায় নি—অভিনয়ের প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠার জন্যেই সে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল অভিনয়টা চালিয়ে নিতে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না।

(ক্রমশঃ)

।। মেলার পথে ।।

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

মেলায় যাবো
সামনে রূপকথার অজস্র রাস্তা
কিন্তু আমাদের জন্যে কোন নিশানা নেই।

সূর্যগ্রহণের প্রথম সকালে
ভাঙা কাঁচের টুকরোয় কালি মাখিয়ে
আকাশে তাকিয়েছিলাম
তারপর ভোরের অন্ধকারের মত আলোহীনতায়
পাখী ডেকে উঠলো।

শান-বাঁধানো প্রাঙ্গনে তখন পায়ের শব্দ
তার প্রতিধ্বনি
গম্বুজে — খিলানে
চত্বরে।

দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তিতে অবশ পায়ে
কোন স্থিরতা নেই
রোদ ভাঙতে ভাঙতে
মেলায় যাবো
চোখের বাইরে
রূপকথার অজস্র রাস্তা
কিন্তু আমাদের জন্যে কোন স্থির নিশানা নেই।

।। পাপীয়সী মন আমার দেউল ।।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

পাপীয়সী মন আমার দেউল,
এবং মিথ্যুক চোখ মস্ত সুখ,
মোমবাতি-নগ্ন এই স্বপ্ন ভুল
ভাল না লাগলেও ভালবাসুক।

ঢেউয়ের মধ্যে এক গোপন ঢেউ
জ্বলুক, মন পুড়ুক, দগ্ধ জুন—
দস্যু হানা দিক, করুক কেউ
খুনের মধ্যে এক পবিত্র খুন।

ঈশান কোণে মেঘ শমিত সেও,
আকাশ কালো দিঘি, পাখির কৌতুক
স্তব্ধ, উৎসব ভগ্ন, কেউ
ভাল না লাগলেও ভালবাসুক।

অপরিসীম বুক থেকে অথৈ ঘৃণা
দুহাতে তুলে নিক, এবং মুখ,
বাসুকিবাহু বীণা বেদনালীনা,
ভাল না লাগলেও ভালবাসুক।

আকাশ রিমঝিম খেলা না অবহেলা?
মুক্ত মন স্পঞ্জ জানি শরীরভুক,
জলমোছা চোখ শোক, পথ মাটির ঢেলা,
ভাল না লাগলেও ভালবাসুক।

পাপীয়সী মন আমার পুণ্য
এবং মিথ্যুক অশ্রু মস্ত সুখ,
অন্ধ আবেগ গ্লানিশূন্য,
ভাল না লাগলেও ভালবাসুক।

।। যদি খবর দিতে চাও ।।

নূপুর গুপ্ত

এ এক অদ্ভুত রহস্য!
চীৎকার করে চাও কিছু ঈশ্বরের কাছে,
কানেও ঢুকবে না তার সে-সব কথা।
হাতুড়ির ঘা মেরে প্রত্যেকটি শব্দকে বের করো,
কিছু বলো গভীর আকিঞ্চন মিশিয়ে
ফিরে আসবে তোমারই কাছে সেই আকুতিগুলো
তার শ্রবণে ঘা দিয়ে অক্ষরে অক্ষরে।
কিন্তু যখন নম্র শান্তিতে বেড়ে ওঠে কোন বাসনা
মনের অতল গভীরে,
চাওয়ায় থাকে লজ্জা, পাওয়া না পাওয়ার স্পন্দন,
তখন কিন্তু ঠিক সে শুনতে পায় কি ভাবে যেন।
সেই বাকহারা কামনা বোধহয় এনে দেয়
স্নিগ্ধতার প্রশান্ত আরাম তার কাছে।
যদি তাকে খবর দিতে চাও,
চীৎকার করে বের করে দেওয়ার বৃথা চেষ্টা না করে
রেখে দাও ইচ্ছেগুলো উষ্ণতার কোরকে মুড়ে।
ঈশ্বর তাদের ফিরিয়ে দেবে
ঠিক ঠিক অনুবাদ করে
বাসনা থেকে মূর্তিতে।।

দূরে কাঁসাই-এর বাঁকে সূর্য তখন অস্ত যাওয়ার আয়োজনে মত্ত। বাঁধের ধারে ধারে সবুজ মাঠ ছেয়ে গেছে দুধসাদা মুলোফুল আর সর্ষে ফুলের হলুদে। নীল আকাশের গায়ে আধফালি চাঁদ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একটু পরেই বাজারের পথ কেমন নির্জন হয়ে পড়বে। ব্যাপারীরা বোঝাই মোট শূন্য করে খালি ঝুড়ি হাতে ঝুলিয়ে কাঁসাই পেরিয়ে ওপারের দাসপুর, শ্যামনগর বা হাঁটাপথে এপারের গৌরাঙ্গচক, নিতাইচক বা মুকাডাঙ্গী চলে যাবে। নির্জন নদীতীরে ঝম-ঝম করে বাজবে তখন ঝিঁঝিঁর বাজনা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাঁধের উল্টোদিকে বৈষ্ণবচক মহেশচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ের রজনীকান্ত ছাত্রাবাসের ঘরে ঘরে জ্বলে উঠবে লণ্ঠন। লণ্ঠন জ্বলে উঠবে যশাড়, কুলহান্ডা, কলাগাছিয়া, ভোড়দহ, দুর্বাচটি, বৈষ্ণবচক, গৌরাঙ্গচক, নিতাইচক, কিসমৎ-খয়রা, নিজখয়রা, রায়চক, মাচিনান, কাশীগোড়ি, পদিমাচক, বাহারজলা, পশ্চিম মানিকা, সাফুল্লাপুর, শুলুনী, কাঞ্চনাচক, মাধবপুর, মুকাডাঙ্গী, সজনেগাছিয়া, পাকুড়িয়া, মনোহরপুর, খন্যাডিহি, ডোঙ্গাডাঙ্গা, নারায়ণচক, জোৎ-ঘনশ্যাম, শ্যামগঞ্জের ঘরে ঘরে। আজ এই ছাত্রাবাসে আর ঐ সব গাঁয়ের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে আছে মহেশচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ের শত শত ছাত্র। কিন্তু একদিন, পঞ্চাশ বছর আগে এই মাহিষ্যপ্রধান কৃষিনির্ভর গ্রামগুলি সন্ধ্যার আগমনী আভাসেই তন্দ্রায় অতলে যেত তলিয়ে। সেদিন গোটা তল্লাটে শিক্ষার কোন পরিবেশই ছিল না। স্কুল বলতে সবেধন নীলমণি গোপালনগর হাইস্কুল আর ভোড়দহতে একটি প্রাইমারী স্কুল, আর ছিল না কিছুই।

কিন্তু পঞ্চাশ বছরে কি মিরাক্যাল ঘটে গেল যে একদিন যেখানে একটিমাত্র হাইস্কুল ছিল আজ সেখানে গড়ে উঠছে চার-চারটি হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল, একটি হাইস্কুল, দুটি জুনিয়ার হাই ও গোটাকুড়ি প্রাইমারী স্কুল। এই মিরাক্যাল কিভাবে কেমন করে ঘটেছে তাই বুঝতেই সেদিন গিয়েছিলাম বৈষ্ণবচকে।

এপারে হাওড়া ওপারে মেদিনীপুর। মাঝে বয়ে চলেছে শান্ত শীতার্ত রূপনারায়ণ। সকাল যখন ইংরেজী মতে দুপুরের গায়ে গড়িয়ে পড়ে সে সময় হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপেছিলাম। দুপুর ঘুরে বিকেল এসে গেল, ট্রেনও রূপনারায়ণের ব্রীজ পেরিয়ে ঢুকল কোলাঘাট স্টেশনে। স্টেশনের উঁচু প্ল্যাটফর্ম সড়সড়ির মত গড়িয়ে যেখানে এসে পিচরাস্তায় মিশেছে সেখানেই যত রাজ্যের রিকসার ভিড়। আমায় যেতে হবে উত্তরে প্রায় মাইল আটেক। রিকসা ছাড়া গতি নেই। আড়াই না দুই, রিকসাওয়ালাদের সঙ্গে দরদাম করছি, কানে এল—কোথায় যাবেন? বললাম, বৈষ্ণবচক। আপনি কি কোলকাতা থেকে আসছেন? সবিনয়ে জানালাম—আজ্ঞে হ্যাঁ। যাব মহেশচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নকর্তা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। হেডমাস্টারমশাই আমায় পাঠিয়েছেন। আমার নাম বিভূতিভূষণ পাড়ুই। এই রিকসায় উঠুন। হরিসাধন, বাবুকে একেবারে হেডমাস্টারমশায়ের ঘরে নিয়ে যাবি। তাহলে আপনি আসুন। আমার এখানে একটু কাজ আছে। সন্ধ্যেবেলায় নিশ্চয়ই দেখা হবে।

মিনিটখানেকের মধ্যে আমায় রিকসায় তুলে দিয়ে, হরিসাধনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ছোট্ট নমস্কারে বিদায় জানিয়ে ভোজবাজির মত উধাও হয়ে গেলেন পাড়ুইমশাই। ততক্ষণে রূপনারায়ণের পাড় ধরে তর-তর করে হাওয়া কেটে ত্যেকা যান এগিয়ে চলেছে বৈষ্ণবচকের দিকে।

সোয়া ঘণ্টা প্রায় লাগল পৌঁছোতে। দুপুরের আলগা শীত গাঁয়ের খোলামেলা মাঠ ও নির্জন নদীতীরে ততক্ষণে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। কোটের শেষ বোতামটা আটকে নিত্যসঙ্গী ফাইলটা বগলদাবা করে রিক্সা ছেড়ে, কাঁসাই নদীর বাঁধ-রাস্তা থেকে নেমে যখন লাল, নীল, গোলাপী, হলুদ ফুলে ফুলে ছাওয়া স্কুলের লনে পা দিলাম বহুদূর থেকে ভেসে এল পরিচিত কিশোর গলার উল্লাস : হাউজ দ্যাট। বাঁধ-রাস্তা থেকেই চোখে পড়েছিল স্কুল বিল্ডিংয়ের পেছনে পরিচ্ছন্ন এক ফালি মাঠে ধুতি-সার্টের ওপর প্যাড বেঁধে ব্যাট করছে দুটি ছেলে, চারপাশে গোল হয়ে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে হাফ-প্যাণ্ট ও ধুতির দল। বুঝলাম, একটি ধুতি আউট হয়ে গেল।

চারধারে চোখ বুলিয়ে আমিও হলাম নক আউট। শহরে থেকে থেকে আকাশছোঁয়া বাড়ীর মিছিলে পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের যে-সংজ্ঞা বহুদিনে মনে মনে

বৈষ্ণবচক মহেশচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়

গড়ে উঠেছিল, দৃশ্যপট পরিবর্তনে মুহূর্তেই তা গুঁড়িয়ে খান খান হয়ে গেল। সান-বাঁধানো পথের দুধারে শুধু সবুজ আর সবুজ। আর সেই সবুজ জাজিমের গায়েই কোন অজানা কাশ্মীরী যাদুকর তার আঙুলের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় ফুটিয়ে তুলেছে আশ্চর্য সব রংবাহারী লতাপাতা ফুলের ফলের কাজ। কোন স্কুলের পরিবেশ যে এত সুন্দর হতে পারে সে-ধারণাই আমার ছিল না। আজ এই প্রবন্ধ যখন লিখছি তখন মনে হচ্ছে এরকম পরিবেশ যদি এদেশের প্রতিটি স্কুলে আমাদের ছেলেমেয়েরা পেত তাহলে শিক্ষার বর্তমান করুণ চেহারা নিশ্চয়ই এতদিনে আমূল বদলে যেত।

কি হলে কি হত সে-কথা বলে হা-হুতাশ করে লাভ কি! তার চেয়ে যা পেয়েছি, সেই পাওয়াটুকুই বরং ভাল করে যাচাই করে নি এই সুযোগে। সামান্য ক'টি লাইনের উচ্ছ্বাসে যে-পরিবেশের গুণ-কীর্তন করলাম, তার রচয়িতাদের মুখোমুখি বসে সেদিন শুনেছি পটপরিবর্তনের এক অসামান্য কাহিনী। যাকে কেন্দ্র করে এই কাহিনীর সূত্রপাত, সেই মহেশচন্দ্র ছিলেন বৈষ্ণবচকের এক অতি দরিদ্র চাষীর সন্তান।

পুরো নাম মহেশচন্দ্র বেরা। মহেশ-চন্দ্ররা আসলে পাশের মুকাডাঙ্গীর বাসিন্দা ছিলেন। সম্ভবত মহেশচন্দ্রের ঠাকুর্দা মুকা-ডাঙ্গী ছেড়ে বৈষ্ণবচকে এসে নতুন করে ঘর বাঁধেন। যে-বয়সে হাতে শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে ছেলেরা যায় গাঁয়ের পাঠশালায় গুরু-মশায়ের কাছে পড়তে সেই বয়সে মহেশচন্দ্র কোদাল হাতে গিয়েছিলেন রূপনারায়ণের উপর রেলের আদি ব্রীজের মাটি কাটতে। তথাকথিত পড়াশোনার সুযোগ ঐ দরিদ্র শিশুটির ভাগ্যে সেদিন জোটেনি।

নিজের শৈশবে যে-সুযোগ পাননি মহেশচন্দ্র, জীবন-সায়াহ্নে সেই সুযোগের দুয়ারই তিনি অবারিত করে গেছেন তাঁর গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের জন্য। যৌবনে চিরুনির ব্যবসা করে ঘরের অবস্থা তিনি ফিরিয়েছেন। মোষের শিং থেকে চিরুনি বানানোর কুটির-শিল্প মহেশচন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন বৈষ্ণবচকে। কাঁচামালের চালান আসত কোলকাতা থেকে। মাঝে মাঝে চালানী মালের সঙ্গে মহাজন নিজেও আসতেন বৈষ্ণবচকে কাজকারবার দেখাশোনা করতে। বোম্বেওয়ালা মুসলিম মহাজন জাফরউল্লা (না কি জাফর লাধা?) মহম্মদ অত্যন্ত বিশ্বাস ও স্নেহ করতেন এই বাঙালী ব্যবসায়ীটিকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সে-বছরই শেষ হয়েছে। ১৯১৮ সাল। জাফরুল্লা সাহেব ফি-বারের মত সেবারও এসেছেন বৈষ্ণবচকে। উঠেছেন মহেশচন্দ্রের বাড়ীতে। ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা সব মিটে গেলেও জাফরুল্লার মনে হোল মহেশচন্দ্র যেন আরো কিছু বলতে চান। কৌতূহলী হয়ে উঠলেন মহাজন—কি ব্যাপার, কিছু বলবেন বলে মনে হচ্ছে অথচ বলছেন না। এবার আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না রেখেই সবিনয়ে তাঁর আর্জি পেশ করলেন—গাঁয়ে কোন স্কুল নেই। ছেলে-মেয়েদের বড় অসুবিধে হয়। তাই বলছিলাম, আপনি যদি একটা...। মহেশচন্দ্র তাঁর বক্তব্য শেষ করারও সুযোগ পেলেন না। তার আগেই জাফরুল্লা সাহেব বলে উঠলেন—এই ব্যাপার! একটা স্কুল করবেন? বেশ তো। আমি সবরকম সাহায্য দেব। আপনারা স্কুল খুলুন। না না, চালাঘর-টালাঘর নয়, রীতিমত পাকাবাড়ী চাই স্কুলের। টাকা দেব আমি।

মহাজন প্রতিশ্রুতি দিলেও, পাকাবাড়ী তুলতে সাহস করেননি মহেশচন্দ্র। যদি কোন-কারণে সাহায্য মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। তার থেকে মাটির চালাঘরই ভাল। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা পড়ার সুযোগ পেলেই খুশী হবে। বাড়ী পাকা কি কাঁচা এটা কোন সমস্যা নয়।

গাঁয়ে স্কুল হবে শুনে সবাই খুশী হলেন। গাঁয়ের অন্যতম স্বচ্ছল গৃহস্থ উত্তরপাড়ার মুখুজ্যেদের গোমস্তা বরদাকান্ত সামন্ত তক্ষুনি কাঁসাই নদীর বাঁধের গায়ে সাড়ে দশ কাঠা জমি দান করলেন। দানের একটিমাত্র শর্ত ছিল, বরদাবাবুর বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা চিরকাল বিনা পয়সায় পড়বার সুযোগ পাবে এই স্কুলে।

জমি পাওয়া গেছে, স্কুলের খরচ যোগানোর প্রতিশ্রুতিও মিলেছে। খবর পেয়ে গাঁয়ের অন্যান্য মাথা প্রসন্নকুমার সামন্ত, রাখালচন্দ্র বেরা, সদয় সাউ, হরিপদ মণ্ডল ও বিক্রম সামন্তরা এসে দাঁড়ালেন মহেশ-চন্দ্রের পাশে। সবাই মিলে গাঁয়ের ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে চাঁদা সংগ্রহ করলেন। কেউ দিলেন নগদ টাকা, কেউবা প্রয়োজনীয় বাঁশ, খড় ও তালখুঁটি।

সকলের সাহায্য ও দানে স্কুলের জমিতে একটা পাঁচ কামরাওয়ালা মাটির চালাঘর উঠল। এই চালাঘরেই বৈষ্ণবচক মিডল ইংলিশ স্কুল শুরু হয়ে গেল পরের বছর ১৯১৯ সাল। স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব স্বহস্তে নিয়ে সেক্রেটারী হলেন মহেশচন্দ্র স্বয়ং। প্রধান সাহায্যদাতার ইচ্ছানুসারে স্কুলের নাম রাখা হোল 'বৈষ্ণবচক নকলঙ্কী ধার্মিক বিদ্যালয়'। এই স্কুল যেন কলঙ্ক-শূন্য ধার্মিক চরিত্রবান ছাত্র গড়ে তোলে—এইটুকুই শুধু প্রার্থনা ছিল ধর্মপ্রাণ জাফরুল্লা মহম্মদ সাহেবের।

বাড়ী উঠতে মহেশচন্দ্র মাইল-পনেরো-ষোল দূরের ধুলিয়াপুর গ্রামের এফ-এ পাশ রাখালচন্দ্র ডোগরাকে স্কুলের হেড-মাস্টার করে নিয়ে এলেন। ডোগরামশায়ের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা হোল মহেশচন্দ্রের বাড়ীতেই। হেডমাস্টারের সঙ্গে সঙ্গে আরো জনা-চারেক মাস্টারমশাই এলেন। এলেন সেকেণ্ডমাস্টার ভূপতি করণ, পণ্ডিতমশাই রাজকুমার চক্রবর্তী, নবদ্বীপবাবু ও আরো একজন। মাস্টারমশাইদের মাইনে জোগাতেন জাফরুল্লা সাহেব।

স্কুল খুলল জনা-দেশক ছাত্র নিয়ে। স্কুলের প্রথম ছাত্র দলের মধ্যে ছিলেন মহেশচন্দ্রের বড় ছেলে সত্যেশ্বর। সত্যেশ্বরের সঙ্গে সেদিন যাঁরা এই স্কুলে ভর্তি হয়ে-ছিলেন, তাঁরা হলেন সুরেন্দ্রনাথ সাউ, বিভূতিভূষণ সামন্ত, বলাইচরণ সিংহ প্রভৃতি।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই স্কুল সরকারী অনুমোদন পেয়ে গেল। অনুমোদন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-সংখ্যাও বেড়ে চলল স্কুলের। বৈষ্ণবচক ছাড়াও অন্যান্য আশপাশের গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা আসতে শুরু করল। শুরু থেকেই এটি একটি কো-এডুকেশন্যাল স্কুল।

সবই চলছিল বেশ স্মুথলি। হঠাৎ এক দারুণ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হল স্কুল। দু' বছর ধরে এই স্কুলের যাবতীয় খরচ-খরচা জাফরুল্লা মহম্মদ একাই বয়েছেন, হয়তো বা আজীবন বইতেন। কিন্তু এক ধাক্কায় সব ওলটপালট হয়ে গেল। লবঙ্গ, দারুচিনি, চামড়া বোঝাই একটি জাহাজ সমুদ্রে ডুবে যাওয়ায় সর্বস্বান্ত হলেন জাফরুল্লা সাহেব। সতেরো লাখ টাকা লোকসান হওয়ায় লক্ষপতি ব্যবসায়ী নিমেষে পরিণত হলেন কপর্দকশূন্য দেউলিয়ায়। দেউলিয়া হয়েও কিন্তু স্কুলের কথা ভোলেননি জাফরুল্লা। প্রায় এক বছর ধরে মাস মাস কুড়িটি টাকা সাহায্য পাঠিয়ে-ছেন স্কুলের নামে। তারপর আর পারেননি।

সাহায্যস্রোত ক্ষীণ হয়ে আসায় স্কুল প্রায় উঠে যাওয়ার যোগাড় হল। যতদিন জাফরুল্লা সাহেব খরচ জুগিয়েছেন ততদিন স্কুল ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। এবার থেকে চার-ছ' আনা বেতন ছাত্রপিছু ধার্য হোল। টিউশন ফি হার যত সামান্যই হোক কৃষি-জীবী গ্রামবাসীদের অধিকাংশেরই সেদিন এই সামান্য বোঝা বহনেরও ক্ষমতা ছিল না। একথা মহেশচন্দ্র জানতেন। তাই কাগজে-কলমে টিউশন ফি ধার্য হলেও স্কুলের যাবতীয় খরচ-খরচা জোগাতেন মহেশচন্দ্র নিজে।

ইতিমধ্যে বাইশ সালের মাঝামাঝি রাখালচন্দ্র স্কুলের হেডমাস্টারী পদে ইস্তফা দেন। তাঁর জায়গায় হেডমাস্টার হলেন অনঙ্গমোহন দাস। মাত্র মাস-ছয়েক তিনি ছিলেন এ-স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তেইশ সাল নাগাদ শচীনন্দন শাসমল হলেন হেড-মাস্টার।

তেইশ থেকে তেতাল্লিশ, দীর্ঘ কুড়ি বছর শচীনন্দন এই স্কুল চালিয়েছেন। তাঁর সময়ে অনেক পরিবর্তন এসেছে স্কুলের জীবনে। সেই পরিবর্তনের কাহিনী শোনালেন শ্রীদাম বেরা। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মহেশচন্দ্রের ছেলে শ্রীদাম আজ এই স্কুলের হেডমাস্টার। মহেশচন্দ্র তাঁর পাঁচ-পাঁচটি ছেলেকেই ভর্তি করেছিলেন নিজের স্কুলে। বড় সত্যেশ্বর ছিলেন প্রথম ব্যাচের ছাত্র। মেজ গৌরহরি ও সুবলচন্দ্র পড়েছেন বিশের যুগে। উনত্রিশ সালে সুবলচন্দ্র স্কুল ছাড়ার মুখে মুখেই ক্লাশ ওয়ানে ভর্তি হলেন চতুর্থ শ্রীদাম। যতদূর মনে পড়ে, শ্রীদাম বললেন, ঐ বছরই কি তার আগের বছর এক গ্রাম্য রেষারেষির ফলেই আমাদের স্কুলবাড়ী আগুনে পুড়ে যায়। একদিক থেকে ভালই হোল বলা যেতে পারে। আগুন লেগে খড়ের চাল পুড়ে গেলেও, মাটির দেয়ালের বিশেষ ক্ষতি কিছু হয়নি।

এবার খড়ের বদলে টিনের চাল লাগালেন মহেশচন্দ্র। সেদিন যাঁরা মহেশচন্দ্রকে এই কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁরা হলেন হরিপদ মণ্ডল, হরিপদ বেরা, ঈশ্বরচন্দ্র সাউ ও রাধানাথ সাউ। এছাড়া পূর্বোল্লিখিত প্রতিষ্ঠাতা-সাহায্যদাতারাও যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। বলাই বাহুল্য, মেরামতি খরচের সিংহভাগ মহেশচন্দ্র নিজেই সেদিন বহন করেছিলেন।

টিনের চালায় স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা আরো অনেক বেড়ে গেল। যাঁরা ঈর্ষাবশে এই স্কুলটিকে আগুনে পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি তাঁদেরই মনে আগুন জ্বালিয়ে দিল। প্রায় সোয়াশ' ছাত্র ত্রিশের যুগে ফি বছর এই স্কুলে পড়ত। সরকারী রেট অনুযায়ী মাইনে ছিল ক্লাশপিছু বারো আনা থেকে আড়াই টাকা। কিন্তু আদায় কিছু হত না বললেই চলে। গড়ে প্রতি মাসেই মহেশচন্দ্র সত্তর-আশী টাকা করে স্কুলকে সাহায্য দিতেন। শুধু যে নিজে সাহায্য দিয়েছেন তাই নয়, বড় ছেলে সত্যেশ্বরকেও সেই নির্দেশই দিয়ে গিয়েছিলেন।

বত্রিশ সালে মহেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর সত্যেশ্বরই হলেন স্কুলের সেক্রেটারী। সেজ ও চতুর্থ ভাই উচ্চশিক্ষার দিকে গেলেও, বড় সত্যেশ্বর ও মেজ গৌরহরি সাংসারিক প্রয়োজনেই ঝুঁকলেন পৈতৃক ব্যবসায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিদেশ থেকে চিরুনির চালান আসা বন্ধ হওয়ায় স্বদেশী চিরুনির চাহিদা হঠাৎ দারুণভাবে বেড়ে গেল। সেই সুযোগে এদেরও বেশ দু'পয়সা লাভ হল ব্যবসায়।

ব্যবসায়ে লাভ হতেই সত্যেশ্বরের মাথায় ঢুকল এবার এম-ই স্কুলকে হাই-স্কুল করে তুলতে হবে। যেমনি ভাবা তেমনি কাজও শুরু হয়ে গেল। পুরোনো মেঠো বাড়ীর টিন ও কাঠ বেচে দিয়ে প্রায় আঠারো শ' টাকা পাওয়া গেল। এই টাকার সংগে নিজে আরো অনেক টাকা যোগ করে দোতলা বাড়ীর ফাউণ্ডেশনসমেত পাঁচ-কামরার একটি একতলা পাকাবাড়ী বানালেন সত্যেশ্বর। প্রায় এক বছর (১৯৩৯-'৪০ সাল) লেগেছিল এই বাড়ী বানাতে। সে-সময় সাময়িকভাবে স্কুল উঠে গিয়েছিল বর্তমান স্কুল বিল্ডিংয়ের পশ্চিমে কাঁসাই নদীর ধারে গ্রাম্য আটচালায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকা ভাল যে ইতিমধ্যে পাশের জোৎ-ঘনশ্যাম ও শ্রীবরা গাঁয়ে দু-দুটি এম-ই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে চল্লিশের যুগের শুরুতেও বৈষ্ণবচক এম ই স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা সোয়াশ থেকে দেড়শোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

চল্লিশ সাল নাগাদ নতুন পাকা-বাড়ীতে স্কুল বসতে শুরু করল। কিন্তু বাড়ী পাকা হলেও স্কুল কমিটি লক্ষ্য করলেন স্কুলের ভেতরের পরিচালন ব্যবস্থা নিতান্তই কাঁচা রয়ে গেছে। শচীনন্দনবাবু বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। কানে শোনেন না। সবদিক দেখতে শুনতেও পারেন না। তাই তেতাল্লিশ সালে তাঁকে পদত্যাগ করতে অনুরোধ করা হোল। শচীনন্দনের জায়গায় হেডমাস্টার হলেন শ্রীদামেরই বাল্যবন্ধু সন্তোষকুমার সামন্ত। শ্রীদাম তখন পুরোমাত্রায় স্বদেশী। দিন নেই রাত নেই ইংরেজ বিতাড়ন আন্দোলনে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন। শুধু জীবিকার প্রয়োজনেই বি এস-সি পাশ করার পর পাশের গোপালনগর হাইস্কুলে অঙ্কের টিচারের পদ গ্রহণ করেছিলেন।

মেজভাই সুবলচন্দ্র এরই মাঝে এম-বি পাশ করে পুরোদস্তুর ডাক্তার হয়ে উঠেছেন। একদিন মাইনিং স্কুলের একটা ফর্ম নিজেই ফিল আপ করে এনে ভাইকে দিয়ে বললেন—সই করে পাঠিয়ে দাও। লাস্ট ডেটের আর বেশী দেরী নেই। অত্যন্ত বিনীতভাবে শ্রীদাম দাদাকে জানালেন, মাইনিং পড়ার ইচ্ছা তাঁর নেই। ইচ্ছা নেই শুনে অবাক হয়ে সুবল জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কি করবে? কেন মাস্টারী করব। চারপাশে মাস্টারমশাইদের অপরিসীম দারিদ্র্য দেখে, নিজের ভাই সেই পথেই যাবে শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে সুবল সেদিন বলেছিলেন—দেন ইউ শ্যাল হ্যাড টু স্টারভ।

বড় সত্যেশ্বরের কানে যখন কথাটা উঠল, উনি মনে মনে খুশীই হলেন। বাইরে খুশীর ভাব প্রকাশ না করে একদিন শ্রীদামকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—শুনলাম তুই মাস্টারী করতে চাস। জবাবে শ্রীদাম

বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি মাস্টারী করব। বৈষ্ণবচকে একটা হাইস্কুল গড়ব। ভাইয়ের মুখের কথায় নিজের ইচ্ছার প্রতিফলন দেখতে পেয়ে আনন্দে যেন লাফিয়ে উঠলেন সত্যেশ্বর : তবে তুই বি-টি পড়তে যা। এদিকে স্কুলের ব্যাপার আমিই সব গুছিয়ে নেব।

পঁয়তাল্লিশ সালে বি-টি পাশ করে এসে শ্রীদাম দেখেন এম-ই স্কুলকে হাইস্কুলে পরিণত করার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। ঐ বছরই অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখে স্কুলে অনুষ্ঠিত বাইশ-তেইশটি গাঁয়ের গ্রাম-প্রধানদের একটি সভায় নীচের সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয় : "(১) বৈষ্ণবচক মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টিকে আগামী বৎসর হইতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। (২) বৈষ্ণবচক মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ভূতপূর্ব সম্পাদক পরলোকগত বাবু মহেশচন্দ্র বেরা উক্ত বিদ্যালয়টিকে বহু বিপদের মধ্য দিয়া চালাইয়া আসিয়াছেন এবং তদীয় সুযোগ্য পুত্র ও বর্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেশ্বর বেরা মহাশয়ও এই বিদ্যালয়টিকে পৃষ্ঠ-পোষকতা করিতেছেন এবং তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে বিদ্যালয়টি ৫টি কোঠাযুক্ত একটি দালানগৃহে পরিণত হইয়াছে। গ্রামবাসী তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছে। (৩) পরলোকগত বাবু মহেশচন্দ্র বেরা মহাশয় বর্তমান মধ্য ইংরাজী স্কুলের প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন। এই জন্য তাঁহার নাম চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য প্রস্তাবিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টি 'মহেশচন্দ্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়' নাম দিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।"

গ্রামের মাথা মাথা লোকেরা সবাই মিলে যে সিদ্ধান্ত নিলেন তারই সার্থক রূপায়ণে মেতে উঠলেন সত্যেশ্বর। পাঁচ কামরার বাড়ীতে জায়গায় কুলোয় না অথচ প্রস্তাবিত হাইস্কুলের জন্য বাড়তি ঘর দরকার। নিজের টাকাতেই সত্যেশ্বর মেন বিল্ডিংয়ের পশ্চিমে আর একটি ঘর ওঠালেন। সেই ঘরে ছেচল্লিশের জানুয়ারীতে কয়েকটি মাত্র ছেলে নিয়ে ক্লাস সেভেন খোলা হল স্কুলে। হাইস্কুলের হেডমাস্টার নিযুক্ত হলেন শ্রীদাম। মিডল ইংলিশ ও হাইস্কুল দুটিকে সরকারীভাবে গোড়ার দিকে আলাদা করে রাখা হোল। নইলে এম ই স্কুলের জন্য দেয় সরকারী গ্রান্ট বন্ধ হয়ে যেত। এ ব্যবস্থা আটচল্লিশ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। এ সময়ে দুটি স্কুলের দুজন হেডমাস্টার—মিডল ইংলিশে সন্তোষ সামন্ত, হাইস্কুলে শ্রীদাম বেরা।

উনপঞ্চাশ সালে দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটল। ঐ বছরই হাইস্কুল একই সঙ্গে পেল ইউনিভার্সিটির অনুমোদন ও সরকারী অনুদান। যুক্ত স্কুলের হেডমাস্টার হলেন শ্রীদাম বেরা ও সহকারী প্রধান শিক্ষক সন্তোষ সামন্ত। গত বিশ বছর ধরে এই দুই বন্ধু মিলেমিশে স্কুলটিকে চালিয়ে এসেছেন। শুধু চালিয়ে এসেছেন বললে ভুল বলা হবে তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টায় মহেশ-চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় আজ এদেশের অন্যতম সেরা স্কুলের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কেন এই স্কুলটিকে এদেশের অন্যতম সেরা স্কুল বলছি তার খতিয়ান পেশ করার আগে জানা দরকার আরো কিছু ভেতরের খবর। ছেচল্লিশে ক্লাস সেভেন খোলার মুখে মুখেই স্কুল ইউনিভার্সিটির অনুমোদনের জন্য আবেদন পাঠায়। তারপর থেকে ফি বছরই একটি করে ক্লাস বেড়েছে, সেই সঙ্গে বেড়েছে স্কুলের একটি করে ঘর। একতলার মাথায় উঠেছে দোতলা। উনপঞ্চাশের মধ্যে স্কুলের দোতলার কাজ প্রায় কমপ্লিট। ছ' ছ'খানা ঘর দোতলায়। সামর্থ্যে ঘাটতি পড়ায় পাকাবাড়ীর ছাদ বানাতে পারেন নি সত্যেশ্বর। বদলে ত্রিপল ও হোগলার ছাউনী বানিয়ে দিয়েছিলেন। ইন্সপেকটর অব স্কুলস কিন্তু ঐ ত্রিপল ও হোগলার ছাউনী দেখে মুখ ব্যাজার করে ফিরে যান নি বরং ছেলেদের শৃঙ্খলাবোধ ও ভদ্র আচরণে তৃপ্ত হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তাঁর রিপোর্টে। ফলশ্রুতি—স্কুল পেল রেকগ-নিশন ও গ্রান্ট। রেকগনিশন পাওয়ার মুখে মুখেই বৈষ্ণবচক মকতুংকী ধার্মিক বিদ্যা-লয়ের নাম পাল্টে রাখা হোল বৈষ্ণবচক মহেশচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়।

ত্রিশ বছরের পুরোনো মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় পরিণত হোল উচ্চ বিদ্যালয়ে। এই ত্রিশ বছরে এ অঞ্চলের যে সব কৃতী ছাত্র এই স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এ কটি নাম—ডঃ সুবলচন্দ্র বেরা, জীবনকৃষ্ণ মাইতি, মহানন্দ দে, কানাইলাল সামন্ত ও ভক্তি-বিনোদ অধিকারী। এঁদের মধ্যে এক কানাইবাবু ছাড়া আর কজনই বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেন।

পঞ্চাশ সালে স্কুলের ছেলেরা প্রথম ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসল। প্রথম বছরে মোট আঠারোটি ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছিল, পাশ করে ন' জন। রেজাল্ট খুব সাধারণ হলেও বৈষ্ণবচক হাইস্কুল স্থানীয় অন্যান্য হাই স্কুলকে সে বছর গড় পাশের হারে টেক্কা মেরে যায়। পরবর্তী উনিশ বছরের রেজাল্ট রেকর্ডে একবার চোখ বুলুলে একথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এদেশের শ্রেষ্ঠ স্কুল-গুলির পাশে আজ মহেশচন্দ্র উচ্চ বিদ্যা-লয়ের আসন পাকা হয়ে গিয়েছে।

গ্রামবাংলার একটি অজ্ঞাত অখ্যাত স্কুল কোন শক্তিবলে এই অসাধ্য সাধন করেছে এই প্রশ্নই সেদিন রেখেছিলাম স্কুলের সম্পাদক সত্যেশ্বরবাবু, প্রধান শিক্ষক শ্রীদামবাবু ও অন্যান্য মাস্টারমশাইদের কাছে। জবাব দেওয়ার আগে সাড়ে দশ একর জায়গা জুড়ে সাজানো স্বপ্নোদ্যানটিকে ঘুরে ঘুরে মাস্টারমশাইরা আমায় দেখিয়েছেন। বাঁধরাস্তা ছেড়ে স্কুলের প্রবেশপথের মুখেই বাঁধারে স্কুলের একতলা আনন্দ ভবন। সাত কাঠা জায়গার ওপর এই বাড়ীটি উঠেছে উনষাট সালে। অর্ধেকটা জমি স্কুল নিজেই কিনেছে। বাকীটা দান করেছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক সন্তোষবাবুর বাবা ঈশ্বর সামন্ত। আনন্দ ভবনের হলঘরে প্রতিদিন দুপুরে স্কুল বসার আগে প্রতিটি ক্লাসের ছেলেরা নীরবে সারিবদ্ধভাবে সমবেত হয় প্রার্থনার জন্য। মাস্টারমশাইরাও যোগ দেন এই প্রার্থনায়। প্রার্থনাসঙ্গীতের রেশ আনন্দ ভবন ছাড়িয়ে দূরে দূরান্তে কাঁসাইয়ের এপারে ওপারে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন একটি ছাত্র পড়ে শোনায় দিনের বাণী হিসেবে কোন মহাপুরুষের রচনাংশ। তারপর আসে শপথ গ্রহণের পালা। জন্ম-ভূমির নামে প্রতিটি ছাত্র প্রতিদিন গ্রহণ করে শপথ। শপথ শেষে কোন মাস্টারমশাই সময়োপযোগী কোন বিষয়ের উপর মিনিট দশেক ধরে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য ছাত্রদের কাছে বিবৃত করেন। এভাবেই শুরু হয় প্রতিটি দিন এই স্কুলে।

তারপর পড়াশোনার পালা। এগারোটার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য নীরবতা নেমে আসে এই স্কুলের প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি মানুষের মনে মনে। যে যেখানেই থাকুন এ সময় দু' মিনিট তিনি কারুর সঙ্গেই কথা বলবেন না। কারণ এ যে মৌন পালনের সময়। কত শোকসভায় দেখেছি নীরবতা পালনের সময় ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপকদের ঘাড় মাথা হাঁটু টনটনিয়ে ওঠে, হাই ওঠে। যেন মনে হয় সময়ের কোন শেষ নেই। দুটি কি একটি মিনিট যেন দুটি-একটি দিন, চব্বিশ কি আটচল্লিশ ঘণ্টায় যা বিস্তৃত। কিন্তু এ স্কুলের প্রতিটি ছাত্র, শিক্ষক, কর্মীর মিলিত কর্মপ্রবাহের পটভূমি জুড়ে রয়েছে নীরবতার সুরসমৃদ্ধি। তাই প্রতিটি পিরিয়ডের শেষে ক্লাসের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ স্কুলে যে মেছোহাটার তাণ্ডব উল্লাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এই স্কুলে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রতিটি ক্লাসের শুরুতেই শিক্ষক ও ছাত্ররা যৌথভাবে দু' মিনিট ধরে নীরবতা পালন করেন।

অধিকাংশ স্কুলে যেখানে মাঝদুপুরে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের একটুকরো টিফিনের অবসর পায় ছেলেরা সেখানে এ স্কুলে ঐ সময়টুকুই তিন ভাগে ভাগ করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ পিরিয়ডের শেষে দশ মিনিটের রিসেস। মাঝে ফোর্থ পিরিয়ডের শেষে পঁচিশ মিনিটের সাময়িক ছুটি পায় ছেলেরা। ফলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় জল খাব স্যার, বাথরুমে যাব স্যার ইত্যাদির কোন বালাই নেই এই স্কুলে। দশ মিনিটের তৃতীয় বা শেষ রিসেসের সময় মাস্টার-মশাইরা ক্লাসে বসে ছেলেদের সেদিনের প্রয়োজনীয় সংবাদকণাগুলি পরিবেশন করেন। না, সঙ্গে তাঁদের নিজস্ব মন্তব্য বা টীকাটিপ্পনী কখনোই জুড়ে দেন না। ফলে ছাত্ররা একদিকে যেমন দুনিয়ার জরুরী প্রতিটি খবরের সন্ধান পায় তেমনি প্রতিটি বিষয়ে নিজস্ব মতামত ও দৃষ্টিকোণ গড়ে তুলতে হয় সক্ষম। দিনের কাজ শেষ হয়

জাতীয় সঙ্গীতের সুরে সুর মিলিয়ে। এখন বিকাল সাড়ে চারটা। এবার ছাত্রছাত্রীরা অধিকাংশই ফিরে যাবে তাদের বসায়। সাতশো ছাত্রছাত্রী আজ এই কো-এডুকেশন্যাল স্কুলে পড়ে। এদের মধ্যে পৌনে দুশ আবাসিক।

আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে স্কুলের নিজস্ব তিনটি হোস্টেল। দূর দূরান্ত থেকে ছেলেমেয়েরা আজ পড়তে আসছে। ক্লাস ইলেভেনের বিজ্ঞানের ছাত্র পরেশনাথ চৌধুরীর বাড়ী বনগাঁ লাইনে গাইঘাটায়। পরেশের ক্লাসমেট সুভাষচন্দ্র বোস এসেছে শ্রীরামপুর থেকে। ওদের চেয়ে এক ক্লাস নীচে পড়ে শ্যামাপ্রসাদ শিকদার। শ্যামাপ্রসাদের বাড়ী জলপাইগুড়ি জেলায় ময়নাগুড়িতে। শুধু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নয়, ছাত্র-ছাত্রীরা আসে এই স্কুলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে। আসে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এমন কি দিল্লী থেকেও।

স্কুল ছুটি হলেও ছেলেমেয়েরা বাড়ী যেতে চায় না। কেউ যায় পাশের প্রমাণ-সাইজ মাঠে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলতে। আবাসিক ছাত্ররা সকাল সন্ধ্যায় সানবাঁধানো তিন বিঘার বিশাল পুকুরে ঝাঁপিয়ে জুড়ে দেয়। প্রাইমারীর কচিকাঁচারা শিশুউদ্যানে ঢেঁকি পাড়ে, দোলনায় দোল খায়, দিদি-মণিদের সঙ্গে গোল্লাছুট, চোর চোর খেলায় ওঠে মেতে। আর নাইন, টেন, ইলেভেনের গম্ভীর গম্ভীর ছেলেমেয়েরা তখন স্কুলের ওপেন সেলফ লাইব্রেরীর দশ হাজার বই, পত্র-পত্রিকার মধ্যে অনুসন্ধান করে ফেরে তাদের কিশোর মনের শতসহস্র প্রশ্নের মীমাংসা। লাইব্রেরী বা ক্লাসে বসে লিখতে লিখতে যদি কারুর পেন্সিল, কাগজ বা কালি ফুরিয়ে যায় কোন চিন্তা নেই। সায়েন্স ও কমার্স ব্লকের দোতলায় বারান্দার এক কোণে রয়েছে "বিক্রেতাবিহীন বিপণি", চার থাকের একটি আলমারী। থরে থরে কাগজ, খাতা, পেন্সিল, রবার, কলম টুকিটাকি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় জিনিস রয়েছে সাজান। প্রতিটি জিনিসের দাম রয়েছে লেখা। যার যা দরকার তুলে নিয়ে কৌটোয় দাম ফেলে দিলেই হোল। কেউ খোঁজ নেবে না যে নির্দিষ্ট দাম পড়ল কি না। এখানে কেউ কাউকে ঠকায় না। ঠকানোর প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এত ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব দোকান।

যদি লাইব্রেরীর বইয়ের পাতা ঘেঁটে সব প্রশ্নের জবাব না মেলে বা লজ্জায় ক্লাসে শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ হয় তাহলেও ঘাবড়াবার কিছু নেই। কোশ্চেন বাক্সে যার যা জানার দরকার সেটুকু এক-টুকরো কাগজে লিখে ফেলে দিলেই হোল। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে মাস্টারমশাইরা সব ছাত্র-ছাত্রীর সামনে সে সব প্রশ্নের জবাব খোলসা করে দেন। ক্লাসে বা ক্লাসের বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্ভব অসম্ভব যাবতীয় প্রশ্নের জবাব প্রতিদিন শিক্ষকরা দিয়ে চলেছেন। তাই পরীক্ষার খাতায় অসাধু উপায় অবলম্বনের কোন প্রচেষ্টাই ছাত্ররা করে না। স্কুলও পরীক্ষা-হলে গার্ড মোতায়েন করার প্রয়োজন আদো অনুভব করে না। দরকার কি—শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি মানুষ গড়া হয় তাহলে সম্বৎসরের ফসল নিশ্চয়ই চুরির মশলায় তৈরী হবে না।

ছাত্র-ছাত্রীরা শৃঙ্খলাপরায়ণ। তাদের শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় মেলে তাদের সংসদ নির্বাচনে ও দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতিতে। স্কুলের সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার দায়িত্ব তাদেরই। সাফাইয়ের কাজও তারাই করে। আর করে বলেই এ স্কুলের ফুল-বাগানে মাইক্রোস্কোপ লাগিয়ে খুঁজলেও কোন ছিন্ন কুসুমের অপঘাত মৃত্যুর স্বাক্ষর মিলবে না।

এইভাবেই নিরন্তর ছাত্র-ছাত্রীদের মনে আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদাবোধ জাগ্রত করার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে জ্ঞানবিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখার সঙ্গে পরিচিতি ঘটানোর পরিচ্ছন্ন প্রয়াস। উনপঞ্চাশে যে স্কুল হাইস্কুলে উন্নীত হয়েছিল, আট বছর বাদে তাই পরিণত হল হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে। সাতান্ন সালে সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ ও কমার্স, এই তিনটি স্ট্রীম নিয়ে চালু হোল হায়ার সেকেণ্ডারী ব্যবস্থা। মেদিনীপুর জেলায় সর্বপ্রথম যে চারটি স্কুল উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয় মহেশচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় তার অন্যতম।

হায়ার সেকেণ্ডারীর জন্যই স্কুলের বাড়তি জমি জায়গার প্রয়োজন দেখা দিল। এতদিন স্কুল বরদাবাবুর দেওয়া সাড়ে দশ কাঠা জায়গায় একটিমাত্র দোতলা বিল্ডিংয়ে ছিল সীমাবদ্ধ। এবার আরো বেশী জায়গা ও ঘরের প্রয়োজন হল। এই প্রয়োজন থেকেই সরকারী সাহায্যে স্কুল মেন বিল্ডিংয়ের আশপাশে সাড়ে ছ' একর জায়গা সংগ্রহ করেছে বর্তমান দশকে। সেই সঙ্গে বাষট্টি-তেষট্টি সালে আরো তিন একর জায়গা কিনেছে স্কুল। দাতব্য ও সরকারী আনুকূল্যে সংগৃহীত জমিতে একে একে উঠেছে স্কুলের দোতলা সায়েন্স ও কমার্স ব্লক, আনন্দ ভবন, পাঠাগার, বুনিয়াদী ও প্রাক-বুনিয়াদী বিদ্যালয় ভবন, অতিথিশালা, ও তিনটি দোতলা ছাত্রাবাস।

একদিকে স্কুল যেমন স্তরে স্তরে বিকশিত হয়েছে, আয়তনে ও সংখ্যায় বেড়েছে তেমনি তার ফলাফলের মানও ভালো, আরো ভালো থেকে শ্রেষ্ঠতার শিখর ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিন দিন এগিয়ে চলেছে। ম্যাট্রিক ও স্কুল ফাইন্যালের নটি বছরে মোট একশো চুয়াত্তরটি পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে একশো আঠারোজন। আর হায়ার সেকেণ্ডারীর দশ বছরে এপর্যন্ত চারশো আটত্রিশজন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে চারশো বারোজন। তিনজন পেয়েছে স্কলারসিপ। তিনজনই বিজ্ঞানের ছাত্র। একষট্টি সালে সুদর্শন সামন্ত পেয়েছিল প্রথম শ্রেণীর জলপানি। পঁয়ষট্টিতে অরবিন্দ সামন্ত ও গত বছর সুভাষ সাউ ডিস্ট্রিক্ট স্কলারসিপ পেয়ে স্কুলের গৌরব বাড়িয়েছে।

ঘুরেফিরে সব দেখেশুনে বার বার মনে হয়েছে স্কুলের ফলাফলের রেকর্ড যত উজ্জ্বলই হোক না কেন, এর আসল কৃতিত্ব নিহিত রয়েছে ছাত্রদের মনে প্রেম, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও মমত্ববোধ জাগরণের মধ্যেই। জাফরুল্লা ও মহেশচন্দ্রের মনোবাসনা অক্ষরে অক্ষরে ফুটিয়ে তুলেছেন শ্রীদাম, সন্তোষ ও তাঁদের ত্রিশ বত্রিশজন মিশনারী সহকর্মী। পরনের বসনে নেই গেরুয়ার ছোপ, এদের মনোজগত জুড়ে রয়েছে স্বদেশহিতৈষণা। আর তাই যদি এই স্কুলকে আজ এদেশের অন্যতম সেরা স্কুল বলি তাহলে কি কেউ আপত্তি করবেন? রাজধানী কলকাতার পথে পথে দিনের পর দিন মাসের পর মাস ঘুরে ঘুরে যা খুঁজে বেড়িয়েছি তাই যেন সেদিন হঠাৎ পেয়ে গেলাম শহরের কোলাহল থেকে দূরে অনেক দূরে গ্রামবাংলার স্নেহাঞ্চলের আশ্রয়ে। ফিরতি পথে ফুলে ফুলে সাজানো স্কুল, শস্যেভরা নদীর চর, ধানকাটা দিগন্ত-বিসারী উদার মাঠ, রজনীগন্ধার ছোট ছোট বাগান সব ফেলে আসতে আসতে বার বার মনে হতে লাগল এই আশ্রয়টুকু অক্ষয় হোক। অক্ষয় হোক দীনদরিদ্র চাষীর সন্তান মাটিকাটা মজুর মহেশ-চন্দ্রের বিনীত প্রচেষ্টাটুকু। যুগ যুগ ধরে শত সহস্র কৃতী সন্তান স্বদেশকে উপহার দিক মহেশচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়।

ভাবতে ভাবতে যেন ঘোর লেগে গিয়েছিল। হঠাৎ রাস্তার সাইনবোর্ড পড়ল চোখে, কোলাঘাট আর তিন মাইল। হরিসাধনের পা নয় যেন ইঞ্জিনের পিস্টন। প্যাডেল উঠছে আর পড়ছে। আর ভীষণ দ্রুত এগিয়ে আসছে শহর, কোলাহল, মাইকের উচ্চকিত উল্লাস। সামনেই রেলব্রীজ। বাঁ ধারে শান্ত রূপনারায়ণ। এসে গেছি কোলাঘাট স্টেশনে।

—অনিন্দ্য

পরের সংখ্যায় : সুরেন্দ্র চক্রবর্তী ইনস্টিটিউশন।

[আট]
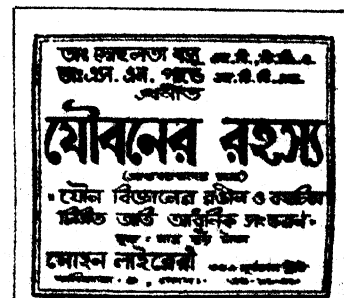
একতলায় বসবার ঘর একটি—তাতে হাতীর পায়ের টিপয়, বাঘের চামড়ার গালচে, মোটা সেগুন গাছের গুঁড়ির মোড়া, টেবিলের উপর ব্যাম্বুসো আরুন্ডেনাসিয়ার ফুলদানীতে এক গুচ্ছ ফিকে, হালকা-রঙা নাম-না-জানা ফুল। দেওয়ালে টানানো বাইসনের মাথা, ভাল্লুকের মুখ, শম্বরের শিং, বুনো-মোষের শিং, দরজার সামনে চামড়ার পা-পোষ এবং আরো কত-কি। ঘরের বাইরে একপাশে একটি নেয়ারের চৌপাই—তার উপরে একটি চিতল হরিণের চামড়া বিছানো।

ঘরে ঢোকার আগেই চোখে পড়ল, যে ছোট ছেলেরা যেমন করে বাতাবী লেবু দিয়ে ফুটবল খেলে তেমনি করে একটা ভাল্লুকের গাবলু-গুবলু, কেলে-কুচকুচে বাচ্চাকে নিয়ে যশোবন্তের চাকর সামনের মাঠের করবী গাছগুলোর পাশে ফুটবল খেলছে।

কিছু বলার আগেই সে আমার কথা কেড়ে নিয়ে বল্ল, "ইসকো কুচ্ছি তকলিফ নেই হো রহা হ্যায় হুজৌর—এ্যাহি সৌহ রোজ সুবে যশোবন্তবাবু ইসকা সাথ খেল করতে থে।

আমি সভয়ে বল্লাম, এই কি খেলা?

ও বল্লে, হ্যাঁ।

বুঝলাম যশোবন্ত নিশ্চয়ই বলেছে, ভাল্লুকেরা খুব একসারসাইজ করনেওয়ালা জানোয়ার—বাড়ীতে বেশীদিন বসে খেলে শিটভেডরের বাড়ীর মেয়েদের মত নাদুস-নুদুস হয়ে যাবে; সুতরাং রোজ সকালে উঠে গুনে গুনে ওকে পঞ্চাশবার লাথি মারবে। নইলে ওর গায়ে ব্যথা হবে। কিন্তু তারপর নিজের পায়ের ব্যথা সারাবার জন্যে বেচারা চমনলাল যে কুয়োতলায় বসে কাড়ুয়াতেল গরম করে পায়ে লাগাবে এটা আর যশোবন্ত ভাবেনি হয়তো। সেটা আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পেলাম।

শোবার ঘরেও একটি নেওয়ারের খাট। তার উপর ভাগলপুরী চাদর বিছানো। মাথারের একজোড়া সাওতাল বালিশ। একজোড়া গামবুট। দেওয়ালের পাশে কাঠের স্ট্যান্ডে পর পর বন্দুক, রাইফেল সাজানো। একটি ১২ বোরের দোনলা বন্দুক, একটি ফোর-ফিফটি-ফোর হান্ড্রেড ডাবল ব্যারেল রাইফেল অন্যটি থার্টি ও সিক্স ম্যানলিকার যা দিয়ে ও গাড়ুয়া-গুরাং-এর ঢালে হরিণ মেরেছিল। তাছাড়া পয়েন্ট টু টুও একটি।

জানালার পাশে একটি আয়না, তার নীচে একটি ব্রাশ এবং চিরুনি। কোনোরকম কসমেটিক বা অকটার শেভ লোশন ইত্যাদি ব্যবহার করে না যশোবন্ত। আয়নার পাশে একটি কালী-মায়ের ছবি। ছবির নীচে দুটি শুকনো রক্তমুখী জবা।

যশোবন্তের ঘরটা ওর মনেরই প্রতীক। নিরাভরণ। বই-পত্র ইত্যাদির বালাই নেই। দেওয়ালের মধ্যে একটি ছোট কুলুঙ্গী মত। তাতে নানারঙের নানা সাইজের নিভোর্স পর বোতল সাজানো।

ঘরের সংলগ্ন বাথরুম। কাঠের দরজা ঠেলে ঢুকলাম। জানালা দিয়ে রাস্তাটা চোখে পড়ে। লাল ধুলোর রাস্তাটা সকালের রোদে শুয়ে আছে। ডাক-হরকরা চিঠির ঝুলি ঝুলিয়ে ধুলো উড়িয়ে সাইকেল চালিয়ে আসছে। বাথ-রুমের জানালায় শিক অথবা পর্দা নেই। একটা বড় টার্কিশ তোয়ালে মেলা রয়েছে। মুখখোলা জবাকুসুমের শিশির গন্ধ ভুর ভুর করছে। পরিষ্কার না-করা অবস্থায় সেফটিরেজারটা পড়ে রয়েছে কাঠের বেসিনের উপর। সামনের দেওয়ালে আয়নার নীচের লাগানো ফ্রেঞ্চ-উইণ্ডো জানালার বসে বড় বড় কালো ঠোঁট হাঁ করে করে যে দাঁড়কাকটা ডাকছে, তার ছায়া পড়েছে।

রেঞ্জ অফিসে নানান জায়গা থেকে ফরেস্ট গার্ডরা এসে হাফ-প্যান্টের নীচে খাকী শার্ট গুঁজে হাত নেড়ে নেড়ে কি-সব আলোচনা করছে। দু-একজন ফরেস্টার বাবুরাও আছেন। যশোবন্তের ঘোড়া 'ভয়ংকর'কে আস্তাবলে সহিস দলাই-মালাই করছে। তার চটাং-ফটাং আওয়াজ ভেসে আসছে।

যশোবন্তের এই ছোট বাংলোয় বেশ কেমন একটা শান্ত, তৃপ্তি আছে। বুদ্ধিমতী মধ্যবিত্ত মিষ্টি মেয়েদের মুখে যেমন দেখা যায়। যশোবন্ত যেন বুঝেছে সুখ কোথায় আছে। সুখকে যেন ও হাত দিয়ে ছুঁয়েছে—ছুঁয়ে, মুঠি ভরে, কারো মসৃণ স্তনের মত নেড়ে চেড়ে দেখেছে। ভরা-মুঠি, দীর্ঘশ্বাস নিয়ে নিজেকে টুকরো টুকরো করে দূরে ছুঁড়ে ফেলেনি। সে সুখ ও জঙ্গলে পাহাড়ে, ঘুরেই পাক, কি হুইস্কির বোতল ছুঁয়েই পাক। কি করে সে যে পেয়েছে তা জানিনে, কিন্তু সুখকে যে নিঃসন্দেহে পেয়েছে তা আমি নিশ্চিত বুঝতে পাই।

একদিন সন্ধ্যার মুখে মুখে নয়াতালাও থেকে একজোড়া হাঁস মেরে টাবড়ের সঙ্গে ফিরছি। অন্ধকার প্রায় হয়ে এসেছে। এমন সময় পায়ের পাশে একটি পত্র-বিরল নাম-না-জানা গাছে আকাশের পটভূমিতে স্পষ্ট হয়ে একটি হাঁসের মত পাখী, দেখি, গাছের প্রায় মগডালে বসে আছে।

পাখীটাকে হাঁসের মত দেখতে অথচ এ কেমন হাঁস? যে জল ছেড়ে রসিকতা করবার জন্য গাছের মগডালে বসে থাকবে? তাছাড়া জংলা এক হাঁস গাছে বসে, এমন কথা ত শুনিনি।

নতুন শিকারী। বাছ-বিচার পরে করি। গুলী করি, পাখী মাটিতে পড়ুক, তারপর চেনা যাবে কি পাখী এবং আদৌ পাখী কিনা।

গুলী করলাম। ওঃ আজকাল যা মারছি, সে কি বলব। একেবারে গুরুর মতন, গোলি অন্দর-জানবাহার একদম সাথে সাথ।

ধপ্পাস করে পড়ল পাখীটা নীচে। এ যে দেখি, হাঁসেরই মত। জোড়া ঠোঁট, জোড়া পা। আশ্চর্য।

বাংলোর হাতায় ঢুকেই দেখি যশোবন্ত বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে। কখন এলে? কবে এলে? বলে ওকে আপ্যায়ন করতে না করতে ও টাবড়ের হাতে ঝোলান পাখীটাকে দেখে আমার দিকে চোখ কটমটিয়ে বল্ল, এ পাখীটা মারলে কেন? এটা কি পাখী জান?

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বল্লাম, 'না।'

যশোবন্ত বেশ রাগ-রাগ গলায় বল্ল, কি পাখী জানো না, ফটাস করে মেরে দিলে। এ একরকমের word-duck। অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য পাখী। একে আমি আজ দুমাস হল লক্ষ্য করছি—ভাবছিলাম অন্য কোথা থেকে আর একটা উড়ে এলে আমার রেঞ্জে একজোড়া পাখী হবে। আর তুমি মেরে বসলে পাখীটাকে।

টাবড়ুকে খুব ধমকালো, যশোবন্ত। আমাকে মারতে বারণ করেনি বলে। মানে, ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো। তারপর বেশ বিরক্তির সুরে টেনে টেনে আমাকে বল্ল, আগে জঙ্গলকে চেনো, জানোয়ার, পাখীদের চেনো, তাদের ভালবাসতে শেখো, তারপর দুম-দুম করে গুলি চালিও। গাছে-বসা পাখীকে গুলী করে মারতে কোনো বাহাদুরী নেই—যে কেউ মারতে পারে—

কিন্তু মারতে গেলে যে পাখীর প্রাণটা নিচ্ছ সে কি পাখী সেটা অন্ততঃ ভাল করে জেনে নিও। তাকে আদপে মারা উচিত কিনা, সেটা জেনে নিও। গাছ চেনো, পাখী চেনো, ফুল চেনো। জংগলের এই শিক্ষাটাই বড় শিক্ষা। বুঝলে, লালসাহেব। গুলি করাটা কোনো শিক্ষার মধ্যেই পড়ে না। ওটা সবচেয়ে সোজা। গুলি করার মধ্যে কোনো বাহাদুরী নেই।

জুম্মান কফি করে নিয়ে এল।

খুব লজ্জিত হয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর শুধোলাম, 'তোমার মা কেমন আছেন?' যশোবন্ত বল্ল, এখন নর্মাল। মা তোমাকে একবার হাজারীবাগে নিয়ে যেতে বলেছেন।

আমি বল্লাম, যাব, নিশ্চয়ই যাব।

যশোবন্তকে এমন খারাপ মেজাজে আমি কোনদিন দেখিনি। সাত্যই-ত। ও রেঞ্জার জংগলের। কোনোরকম অনুমতি টনুমতি নিই না, তার উপর এমনি সন্দেহভাবে যা মারবার নয় তাই মেরে বেড়াই। রাগ হওয়া স্বাভাবিক। আমি হলেও রাগ করতাম।

কফি আর চিঁড়ে ভাজা খেতে-খেতে যশোবন্ত হয়ত ভাবল যে ওরও আমার প্রতি ব্যবহারটা একটু বেশীরকম রূঢ় হয়ে গেছে। জানিনে সেজন্যে কিনা, কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বল্ল, জানো লালসাহেব আমি যখন তোমার মত জংগলে নতুন ছিলাম তখন এমনি ভুল করে আমিও একটা হলুদ-বসন্ত পাখী মেরেছিলাম।

আমি তখন একটি মেয়েকে ভালো-বসতাম। ডি এফ ও সাহেবের মেয়ে। আমি তখন ছোকরা বেহায়। মেয়েটির নাম ছিল নির্না। শুধু এই হলুদ-বসন্ত পাখী মারার অপরাধে সে আমার সংগে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিল। তা নইলে আজ আমার জীবন হয়ত অন্যরকম হত।

আমি বল্লাম, আমার খুবেই অন্যায় হয়েছে word-duck টা মেরে। বিশ্বাস করো যশোবন্ত। আমি জানতাম না।

যশোবন্ত বল্ল, তোমার ত অন্যায় হয়েইছে, কিন্তু তোমার চেয়ে বেশী অন্যায় টাবড়ের। ও জানত ওটা কি পাখী এবং আমি ও পাখী কতবার দেখতে পেয়েও মারিনি। ভারী বদমায়েস শালা।

তারপর আমরা দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

আমি বল্লাম, বহুদিন পর আজ এলে, আজ রাতে আমার কাছে থেকে যাও যশোবন্ত; বেশ গল্প-গুজব করা যাবে— তুমি হাজারীবাগ যে-কদিন ছিলে সে কদিন ভারী একা-একা লেগেছে। তোমার-আমার বন্ধুত্বটা যে রীতিমত সলালা হয়ে উঠেছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। যশোবন্ত বল্ল, কথাটা মন্দ বলনি। থেকে গেলেও হয় আজ। তবে একটু চাইল্কি খেতে হবে। আর একটা শর্ত। কাল ভোরে উঠেই চলে যাব আমি।

অনেকদিন ছুটিতে ছিলাম। অফিসে কাগজ-পত্র বহু জমে আছে। তাছাড়া পরশু আমাকে পাটনা যেতে হবে একটা এক্সেন্ট-ফোলিং-এর কেসে। কেস উঠবে পরশুর পরদিন। কদিন থাকতে হবে পাটনা কে জানে? জুম্মানকে বলত তোমার ঐ word-duck টাকেই তাড়াতাড়ি রোস্ট করুক। শালাকে খেয়ে শালার দুঃখ মোচন করা যাক। এই বলে যশোবন্ত উঠে গিয়ে 'ভয়ংকরের' পিঠে ঝোলানো রাইফেল ও একটা ঝোলা নিয়ে এল। রাইফেলটাকে ঘরে রেখে এল'; ঝোলা থেকে একটা হুইস্কির বোতল বের করল, তারপর ঝোলাটাও ঘরে রেখে এল। তারপর ভয়ংকরকে লাগাম খুলে পেছনের মহুয়া গাছের নীচে বেঁধে রেখে এল। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমার গ্যারেজে জীপের পাশে থাকবে ভয়ংকর।

বাইরেটায় বেশ জমাট বাঁধা অন্ধকার। আকাশটা মেঘলা আছে বলে। মাঝে মাঝেই মেঘ ফুড়ে সদ্য-বিধবার শ্বেতা বিষন্নতা নিয়ে শ্রাবণ মাসের চাঁদ উঁকি মারছে। ঝিঁ-ঝি ডাকছে একটানা ঝুম-ঝুম ঝুম-ঝুম। অনেকরকম ব্যাঙ, পোকা, জংলী ইঁদুর সবাই ডাকছে; চলা-ফেরা করছে।

আমার বাংলোর চারপাশে কার্বলিক এ্যাসিড ভাল করে ছিটোই প্রতি সপ্তাহে। গরম আর বর্ষায় সাপের উপদ্রব বড় বেশী। এ-অঞ্চলে শঙ্খচূড় আর বাদামী গোখরোই বেশী। একবার কামড়ালে আর রক্ষা নেই। মাঝে মাঝে তারা আবার শর্ট-কাট করার জন্য বাংলোর হাতার মধ্যে দিয়ে এমনকি কখনো সখনো আমার বারান্দার উপর দিয়েও যাতায়াত করে থাকেন। প্রথম প্রথম কি যে অস্বস্তি লাগত, কি বলব। আজকাল গা-সওয়া হয়ে গেছে।

গেটের পাশের নালায় প্রায় রোজই সন্ধ্যে-রাত্তিরে সাপে ব্যাঙ ধরে আর সে এক উৎকট আওয়াজ। আজকাল আর মাথা ঘামাই না। শব্দ শুনে বুঝতে পারি পুরোটা গেলা হল কিনা। মনে মনে বলি, গেলা হয়েছে, এখন যাও বাবা আর জ্বালিও না।

জুম্মান বারান্দায় আরো চেয়ার বের করে দিল। আমরা দুজনে বসলাম। যশোবন্ত হুইস্কির বোতলটা খুলল। মাঝে মাঝে শালপাতার চুট্টায় টান লাগাতে লাগল।

আমি বল্লাম, যশোবন্ত একটা গল্প বলো। তোমার অভিজ্ঞতার গল্প। বলব বলব কর কিন্তু বলো না কোনোদিন। তোমার ত কতরকম অভিজ্ঞতা এই জঙ্গল পাহাড়ে।

যশোবন্ত কি বলতে গেল, এমন সময় হঠাৎ দূরাগত মাদলের শব্দ কানে এসে পৌঁছল।

রাস্তাটা বাংলোর গেট পেরিয়ে কিছু-দূর গিয়ে যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখান থেকে। তারপরেই একটি আলোর রেশ নাচতে নাচতে এগিয়ে এল। তারপর রোশ-নাই। হ্যাজাক জ্বালিয়ে বরযাত্রীরা চলেছে। মধ্যে ডুলিতে বর। সব বরযাত্রীর হাতে একটি করে লাঠি। দুজনের কাঁধে গাদা-বন্দুক। পায়ে নাগরা। মালকোচা মারা, সাজিমাটিতে কাচা ধুতি কুর্তা। মাদল বাজিয়ে হাঁড়িয়া খেয়ে আনন্দ করতে করতে সকলে চলেছে।

ধীরে ধীরে বরযাত্রীর প্রশেসান আমাদের চোখের বাইরে চলে গেল; মাদলের আওয়াজ আবার ঝিঁঝিদের আওয়াজে ডুবে গেল। হ্যাজাকের আলোটা যেন লক্ষ লক্ষ ভাগে বিভক্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ জোনাকি হয়ে এই বর্ষণসিক্ত পাহাড় বনে ছড়িয়ে গেল। পিট্-পিট্ মিট-মিট করতে লাগল। কাছে আসতে লাগল, দূরে যেতে লাগল। দলবদ্ধ হতে লাগল, দলছুট হতে লাগল।

যশোবন্ত বল্ল, এই জংগলেই এক অদ্ভুত ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিলাম, তার গল্পই শোনাই। আজকের রাতটা, কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে গল্প শোনাবার মতই রাত।

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে যশোবন্ত গল্প আরম্ভ করল। যশোবন্তের সে গল্প আজ আর হুবহু মনে নেই—তাই আমার জবানীতেই বলি—

গরমের দিন। ফুরফুরে করে হাওয়া দিয়েছে শালবনের পাতায় পাতায়। মহুয়ার গন্ধে সমস্ত প্রকৃতি মাতাল হয়ে উঠেছে। শাল ফুলের সুগন্ধি রেণু জংগলময় উড়ে বেড়াচ্ছে হাওয়ার সংগে।

আমি আর রুমরু বসে আছি একটা পাইসার গাছের ডালে। গাছের নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে লুকুইয়া-নালহা। পাহাড়ী ঝরনা। এখন জল সামান্যই আছে। নদী-রেখায় এখানে ওখানে বড়-ছোট, কালো-সাদা পাথর। নদীর দুপাশের বড় বড় শাল গাছের ছায়া ঝুঁকে পড়ে জলের আরশিতে মুখ দেখছে। আমরা বসে আছি ভালুকের আশায়। আমাদের প্রায় হাত-পঁচিশেক দূরে, নদীর প্রায় কিনার ঘেঁসে, একটি ফল ভারাবনত ফাঁকড়া মহুয়া গাছ। রুমরু গ্যারান্টি দিয়ে নিয়ে এসেছে, যে ভালুক মহুয়া খাবেই। অতএব জুয়াড়ীর মত বসে আছি।

বসে আছি। চাঁদটা আরো বড় হল। চাঁপাফুলের রঙ ছিল এতক্ষণে। এবার সেই প্রথম যৌবনের হরিদ্রাভা ঝরিয়ে দিয়ে অকলংক সাদা হল। তারপর ঝুরঝুরিয়ে ঝরতে লাগলো চাঁদ, এই পালামো জংগলের আনাচে-কানাচে।

(ক্রমশঃ)

।। ৪ ।।

ঝড়ের বেগে বলে চললেন কাজী তাঁর জীবনের কথা। আদ্যন্ত। কিছুই প্রায় বাদ দিলেন না। ঘর তাঁর ছিল না। কোনদিনই। জন্মেছিলেন কোনো ঘরে নিশ্চয়ই। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ঘর ছাড়া নীড় ভাঙা চির পলাতক। জ্ঞান হবার পর থেকেই পথে দাঁড়িয়েছিলেন। চিরদিনের পথিক। পথেই মিলত বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন। পথের খেলাঘরে রাত কাটিয়ে, দিনে পাড়ি দিয়ে নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তেন। বিপুল বিশ্বের হাতছানি ডাকত ওঁকে অহরহ। ক্ষুদ্র অপরিসর গৃহকোণ বাঁধতে পারল না চিরদিনের এই যাযাবরকে। মনের কোণে বাসা বেঁধেছিল এক চিরন্তনের বৈরাগী। প্রচলিত ধর্মের অনুশাসন, তার সংস্কার-বন্ধনের অচলায়তন কিম্বা ক্ষুদ্র স্বার্থ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, পথ আগলে যাত্রার বিঘ্ন ঘটাতেও চেয়েছে। পারেনি। সব বাধা, সকল বিপত্তি কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছেন এই চিরপথিক তাঁর একতারাটি হাতে নিয়ে। মুক্ত বিহঙ্গের মতো মনের খুশিতে পথে পথে গান গেয়েছেন। পেলে খেয়েছেন। নইলে খালি পেট বাজিয়ে গানেই পেট ভরিয়েছেন।

জন্মদাতা পিতাকে চেনেননি। গর্ভধারিণীর কথা একরকম ভুলে গেছেন। সংসার আত্মীয় স্বজন হারিয়ে ফেলেছেন শ্যামা বাঙলার জনারণ্যে। তাঁকে টেনেছে বাঙলার নদ-নদী, তার শ্যামল পেলব বনছায়া, তার পাখ-পাখালির মন মাতানো সুরে আর সর্বোপরি তার মানুষ। সে-মানুষের গায়ে আঁকা থাকে না কোনো বিশেষ ধর্মের নামাবলি। কথা বলে এক-সুরে। দুঃখ পায় এক সঙ্গে। মার খায়। মরে। প্রতিবাদ করে না। মৌন মূক বাঙলার অসহায় মানুষ।

লেটোর দলে, কবিগানের আসরে, যাত্রার ভিড়ে ঘুরেছেন। বেড়িয়েছেন। তাদের সঙ্গী হয়েছেন। সুখ-দুঃখের অংশ নিয়েছেন আউল-বাউল-দরবেশ সাধু-সন্ন্যাসী বৈরাগীর পেছন পেছন ছুটেছেন। বাঙলাকে চিনতে চেয়েছেন। বাঙালীকে আপনজন ভেবেছেন।

কিন্তু এই অনির্দেশ যাত্রার অন্তরালে ছিল একটি বুভুক্ষু অন্তর। সর্বক্ষণ সে কাঁদত। কাঁদত স্নেহের আদর পেতে। ভালোবাসায় গলে যেতে। মায়া ও মমতার বন্ধনে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে।

পেল না। বাঙলায়, বাঙালীর ঘরে ঠাঁই সে পেল না। যা যৎকিঞ্চিৎ পেল, মন ভরল না। এক বিস্ময়কর অতৃপ্তি ভিড় করে দাঁড়াল। ভয় দেখাল। অস্থির করে তুলল। লেখাপড়া শিকেয় উঠল। দূরের,— বহুদূরের ডাক এসে হানা দিল জীবনের দুয়োরে। অজানা ভয়ংকর হাতছানি দিয়ে ডাকল। মৃত্যুর আর নবজীবনের রহস্য গায়ে মেখে সমাদরে ডেকে নিল ঘরছাড়ারে। নজরুল যুদ্ধে নাম লেখালেন।

করাচীর রূপও বড় কম নয়। সাগর-সৈকতে করাচী। রুক্ষ কঠোর বিশুষ্ক মরুপ্রান্তর পেরিয়ে যেদিন কাজী করাচী পৌঁছেছিলেন, ভেবেছিলেন বাঙলাকে বুঝি ভুলতে পারবেন। নতুন শহর গড়ছে। শহরের পাশ কাটিয়ে সাগর উপকূল। ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাড়। বিচিত্র নুড়ি আর শামুক ঝিনুকের ছড়াছড়ি। নিস্তরঙ্গ সাগর বক্ষ। বহুদূরে অগভীর নীল জল।

বাঙালী সঙ্গীরা ছিল। আরো ছিল বিভিন্ন প্রদেশের নওজোয়ান। আরব সাগর থেকে হা-হা করা হাওয়া ছুটে আসে। দূরে গর্জন শোনা যায়। ঢেউ ভাঙছে।

"কাছে থেকেও যাকে চিনতে পারিনি, দূরে বসে সে যেন মূর্ত হয়ে দেখা দিল আমার চোখে।" বলছেন কাজী। "আমার সোনার বাঙলা। তার আকাশ বাতাস সত্যিই আমার কানে বাঁশী বাজাত অহরহ। আমার দৃষ্টির সম্মুখে ফুটে উঠত দিব্য রূপে নিয়ে। অন্য ভাষা শুনে আর কথা কয়ে হাঁপিয়ে উঠত প্রাণ। নিজের ভাইএর সংগে বাংলায় কথা কয়ে ধড়ে প্রাণ ফিরে পেতাম।"

কাজী পূব বাঙলার মৈমনসিংএ ছিলেন কিছুদিন। রাঢ়ের বাসিন্দা। পূব বাঙলার সেই অবিনাস্ত অপরূপ রূপের রাশি, আর রাঢ়ের বাউল-বৈরাগীর গৈরিক রূপ দেখেছেন দুচোখ ভরে।

দূরের সেই ভুলতে না পারা বাঙলা তাঁকে টানতে লাগল দুহাতে। শ্যামলা মেয়ের সেই নিরাভরণ নিটোল হাতের বাঁধ ছেড়ে আর কোথাও তাঁকে থাকতে দিল না। ফিরে এলেন কাজী মায়ের কোলে।

এসে পেলেন মুজফফরকে। আগে পেয়েছিলেন শৈলজানন্দ। তাঁর শৈশব আর কৈশোরের বন্ধু। তারপরই মুজফফর। দুই বন্ধু দুধারার। একজন সংসারী, স্বাপ্নিক, সুন্দরের পূজারী। আরেকজন দেশপ্রেমে বিভোর আত্মভোলা এক দুর্ধর্ষ আদর্শবাদী। দুজনেই খাঁটি বাঙালী। একজন রুক্ষ রূঢ় রাঢ়ের। তিনি বেছে নিলেন সুকুমার পথ। মসৃণ, সরল, সুন্দর। আর ভাব-কোমল রূপের খনি পূব বাঙলার মুজফফর বেছে নিলেন দাহভরা বন্ধুর পথ। যে পথের আগুন কোনদিনই নেবে না। অনির্বাণ লাল শিখায় লাল করে দেয় যাত্রাপথ।

কলকাতায় আস্তানা নিয়েছিলেন কাজী। কিন্তু কলকাতায় নিখাদ বাঙালী কৈ? বাঙলার স্নিগ্ধ পরিবেশ, ওর আম-জাম-নারিকেল কুঞ্জ, ওর পাখির কাকলি কোথায়? কোথায় পুরাঙ্গন? কোথায় ওর গোবরলেপা উঠোন? ঢেউ খেলানো ধানভরা মাঠ? পাকা ধানের পালা? মরাই? ওর তুলসীমঞ্চ?

চললেন কুমিল্লা। খুঁজে বের করে নেবেন নিখুঁত বাঙালীর অন্তর। বাঙালীর স্নেহ মমতা আর মোমগলা সারল্য। দেখা হল বীরেনের সঙ্গে। সামনে এসে দাঁড়ালেন বিরজাসুন্দরী। কলকাকলিতে ভরে উঠল ছেলে-মেয়েদের কাঁচ কন্ঠ। মূর্তিমতী বাঙলা এসে কাজীর দৃষ্টির সামনে দাঁড়াল। আবির্ভাব। কাজী মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

কাজী প্রাণভরে দেখলেন বাঙলার মরমী রূপ। কাজী পেলেন বাঙলার একটি শুচিস্নিগ্ধ পরিবারের সান্নিধ্য। কাজী এই প্রথম শুনলেন বাঙলার মেয়েদের অনাবৃত সংযত কন্ঠের মধুমাখা গান। ছন্নছাড়া বৈরাগী খেয়ালি কাজীর চোখ ও মন মদির হয়ে উঠল।

কাজী মা পেলেন। পেলেন রাঙাদা। পেলেন বোন। কাঙাল অন্তর খুঁজে বেড়িয়েছে কত আনাচ-কানাচ। কত গৃহ। তৃষিত বক্ষ হাহাকার করে ফিরে এসেছে। মেলেনি। অকস্মাৎ বুকভরা অফুরন্ত মমতা আর দৃষ্টির মধুমৌন মাধুর্য দিয়ে তাকে ডাক দিল বাঙলা দেশের এক অজানা অখ্যাতা নারী। কাজী দেখলেন। শুনলেন। 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান',—আর কিছু নয়। শুধু মধুক্ষরা মা। বিরজাসুন্দরী।

ঘোড়েল লোক ছিল আলি আকবর। সেদিনকার বাঙালী মুসলমান পরিবারে শিক্ষিতের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। আলি আকবর ছিল গ্র্যাজুয়েট। ঘরে ছিল সঙ্গতি। টাকা রোজগারের ফিকিরে এসেছিল কলকাতায়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য অপাঠ্য বই নিজে লিখত, আবার অন্যকে দিয়েও লিখিয়ে নিত। ধরাধরি করে আর দালাল রেখে বই গছিয়ে দিত ঘরে ঘরে।

নজর পড়েছিল নজরুলের দিকে। নাম-করা কবি। ভাব আর খেয়ালের পশরা সেও ফিরি করে পথে-ঘাটে আড্ডায়। ঘর নেই। নেই কোন মায়ার বন্ধন। রোজগারের ধান্ধা নেই। স্থায়ী অর্জনের কোন বালাই নেই। মূর্তিমন্ত লক্ষ্মীছাড়া। নাগা সন্ন্যাসী।

নজরুলকে দোহন করতে অসুবিধে হবার কথা নয়। স্বভাবতই দোহ্য। ও'রই হাত দিয়ে যদি একবার কোনমতে গন্ডা-কয়েক কবিতা বের করে নেওয়া যায়, এবং তার সঙ্গে যুক্ত থাকে নামটা,—দেখতে হবে না। হু-হু করে বাজার মাত করে দেবে আলি আকবর। আলি লুব্ধ হয়ে ওঠে।

কিন্তু। এই ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে মানুষটিকে দীর্ঘদিন সে ধরে রাখবে কী দিয়ে? অর্থে সে বশীভূত হয় না, গৃহের সব আকর্ষণ অনায়াসে সে কাটিয়ে ঘুরে বেড়ায় যাযাবরের জীবন নিয়ে, মৃত্যুকে বন্ধু ভেবে হাসিমুখে স্বীকার করে নিল রণক্ষেত্রের ভীষণ ভয়াল আমন্ত্রণ, তাকে,—চিরদিন না হোক,—দীর্ঘদিন সে বেঁধে রাখবে কোন্ অধিকারে?

আলি আকবরের লুব্ধতা শূন্যগর্ভ নয়। লুব্ধতার সঙ্গে দূরদর্শিতাও ছিল। সহসা তার চোখে ভেসে উঠল বিধবা বোনের রূপ। বিধবা এবং দরিদ্র। একই গ্রামের বাসিন্দা। বোনের পাশে ভেসে উঠল আরো একখানি মুখ। বোনের মেয়ে। ভাগ্নি।

একঢিলে দুটো পাখী মারা বেশি লোকের পক্ষে সহজসাধ্য হয়তো নয়। কিন্তু ধুরন্ধর আলি আকবরের কাছে কিছু কঠিনও হয়তো নয়। পুলকিত আলি এগিয়ে চলে। দরিদ্র বোনের দায়-দায়িত্ব আর থাকবে না। আর তার সঙ্গে ঐ ভাগ্নিটির চিন্তা। রূপ খানিকটা আছে। কিন্তু শিক্ষা? কোনো খানদানী ঘর তাকে কি নেবে? কাজীর আর্থিক সম্পদ নেই, সত্য কথা। কিন্তু হবে। আলিই করে দেবে। নিজের ভাঁড়ার গুছিয়েও কাজীকে যা দেবে, তাও বড় কম হবে না। তখন? তার গরীব বোনকে কাজী ফেলবে না। এরা কাউকে ফেলে না। বরং বাইরের আবর্জনা সযত্নে ঘরে তুলে আনে। ঠাঁই দেয়। আপন করে নেয়। করে নেয় পরমাত্মীয়।

মাজা ছক। আলি আকবর ঘনিষ্ঠ হতে থাকে নজরুলের সঙ্গে। তারপর একদিন তাঁকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ে কুমিল্লার পথে। কাজীকে নিয়ে যাবে তার নিজের গ্রামে। দৌলৎপুরে।

গেল। বাঁধা ছক। বাঁধা কাজের ফিরিস্তি। আশাভরা প্রাণে আলি আকবর এগুতে লাগল। নজরুলকে দিয়ে গান গাওয়াল। তাঁর নিজের লেখা গান। নজরুলের লেখা কবিতা শোনাল। এবং সবশেষে মুসলমান পরিবারের প্রথা লঙ্ঘন করে ভাগ্নীর সঙ্গে নজরুলের নিভৃত পরিচয়ের সুযোগ করে দিল।

সদ্য তরুণ নজরুল। তারুণ্যের দুকূল ভাসানো বন্যাবেগে তিনি তখন তর তর করে ভেসে চলেছেন। চির খেয়ালীর খেয়াল নেই। নেই ভালোমন্দের বিচার। বুভুক্ষু অন্তর চাইছিল ঘর, স্নেহ, মমতা। চাইছিল একটি অনাঘ্রাত অন্তরের সান্নিধ্য। চোখে তখন স্বপ্নের মোহকাজল দাগ কেটেছে। চিরদিন কি কাটবে তার বনবাদাড়ে আর পথেঘাটে? ঘর কি সে কোনদিনই বাঁধবে না? যেমন বাঁধে আর সকলে?

কুমিল্লার কথা নজরুলকে অহরহ দোলা দেয়। নবোদ্ভিন্না অবরোধহীন চঞ্চলা তরুণী বাঙালী তিনি দেখেছেন। তাদের সঙ্গে মিশেছেন। একসঙ্গে গান গেয়েছেন। দিন কাটিয়েছেন। শান্ত শুভ্র অন্তঃপুরের লক্ষ্মীশ্রী তাঁর সত্তা ধরে আকর্ষণও কম করেনি।

কিন্তু। হবার নয়। তিনি মুসলমান। অপাঙক্তেয়। দাক্ষিণ্য আর করুণায় কিছুদূর যাওয়া যায়,—কিন্তু কতদূর? গন্ডীঘেরা সংকীর্ণতার পরিধি তাঁর অজানা নয়। ক্ষণিকের স্বপ্ন স্বপ্ন হয়েই থাক। আলেয়ার হাতছানির মাধুর্য আছে কিন্তু তা বাস্তব নয়। বাস্তব কঠোর, নিষ্ঠুর, প্রত্যক্ষ। সেই বাস্তবকেই স্বীকার করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই। তিনি কবি। শিল্পী। শূন্যকে পূর্ণ করে দেন গানে, কবিতায়, কথায়। কল্পনার অমূর্ত কায়া শরীরী হয়ে দেখা দেয় তাঁর ছন্দে। সেবা দিয়ে, প্রাণ ঢেলে, মমতার অচ্ছেদ্য বন্ধনে পারবেন না এই বনফুলকে নিজের গন্ধে রজনীগন্ধার সমতুল করে নিতে?

তবু মনে দ্বিধা জাগে। জাগে সংশয়। দেখা দেয় অমিল আর গোঁজামিলের হাজারো প্রশ্ন। সত্যিই কি এরা বাঙালী? সেদিনের শিক্ষিত বিত্তবান মুসলমান অন্তঃপুরের সঙ্গে কাজীর পরিচয় ছিল না। এরাও বাঙালী। কিন্তু কথা ওদের পুরো বাঙলা নয়। এদের ঘরে বাঙালীর বাবা নেই, মা নেই, মাসিমা নেই, জেঠিমা নেই, পিসিমা নেই। নেই দাদা, দিদি, বৌদিদি। এরা মেহেদি পাতায় হাত-পা রাঙায়। অলক্ত-রঞ্জিত নগ্ন সুঠাম পায়ের নিটোল শ্রী কি ওতে ফুটে বেরোয়? সিঁথিতে সেই আলোর শিখা সিঁদুর কই? কই সেই ভ্রূযুগলের মধ্যবর্তী আরক্তিম ফোঁটা?

ওসব কি হিন্দুর চিহ্ন? ভারতবর্ষের সব হিন্দু নারী সিঁদুর পরে না। রাঙা জবার মতো করে পাও আলতায় রাঙায় না তবে?

তবু মোহ জাগে। প্রাণ টানে। দোলা লাগে তরুণ কাজীর মনে। নজরুল সম্মতি দেন। আলি আকবরের ভাগ্নী হবে তাঁর জীবনসঙ্গিনী। ভয় ছিল। মানসিক দ্বন্দ্বও কম ছিল না। মনের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে কাজী সংকল্প স্থির করে ফেলেন।

পেছনে দাঁড়িয়েছিল আলি আকবর। সতর্ক দোকানদার আলি আকবরের হাতে ছিল নিষ্ঠুর জমা-খরচের খাতা। সে খাতায় কাব্য ছিল না। গান ছিল না। ভাবলুতা ছিল না। ছিল নিয়তির চাইতেও কঠোর ও বাস্তব সালতামামি। লাভ লোকসানের নির্ভুল খতিয়ান। বিবাহের পূর্বক্ষণে কাজীকে শুনিয়ে দেওয়া হল কাবিন-নামার সর্ত। কাজীকে থাকতে হবে দৌলতপুরে। আলি আকবরের গৃহে। ঘর-জামাই হয়ে। নব বধূকে নিয়ে তাঁর আর কোথাও যাওয়া চলবে না।

বন্দীর বন্ধন বেদনায় কাজী নীল হয়ে গেলেন। চিরদিনের মুক্ত বিহঙ্গ। তাঁর চির আদরের বাঙলার মুক্ত আকাশ আর দেখবেন না? গাইবেন না মনের খেয়ালে প্রাণ-হরা খুশির কল-কাকলি? তাঁর বন্ধু, বান্ধব, শত পরিচয়, অজস্র কামনা,—ভুলে যেতে হবে সব? সবই যাবে মরে? ক্রীত-দাসের এক পঙ্কিল জীবন বহন করতে হবে জীবনভর! আর এই অনড় দাসত্বের বিনিময়ে যে আসবে তাঁর অঙ্ক-লক্ষ্মী হয়ে, সেই হবে তাঁর সহধর্মিণী? সঙ্গী? আত্মার আত্মীয়া?

রাত্রির অন্ধকারে কাজী পালিয়ে গেলেন।

পাগলা ঝড়ো হাওয়ার মতো ছুটে এল মুক্তির ডাক। ১৯২১। কুমিল্লায় এসেই কাজী মেতে উঠলেন। গানে আর কবিতায় মাতিয়ে দিলেন, রাঙিয়ে দিলেন সবার মন। রক্ত নিশি ভোরে একি এ শুনি ওরে

মুক্তি কোলাহল বন্দী শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে মুক্তি হাসি হাসে
টুটেছে ভয় বাধা স্বাধীন হিয়াতলে।।
ললাটে লাঞ্ছনা রক্তচন্দন,
বক্ষে গুরুশীলা, হস্তে বন্ধন,

নয়নে ভাস্বর সত্য জ্যোতি শিখা,
স্বাধীন দেশবাসী কণ্ঠে ঘন বোলে—
সে ধ্বনি ওঠে রণি ত্রিংশ কোটী
ঐ মানব কল্লোলে।

হারমোনিয়াম কাঁধে ঝুলিয়ে কাজী বেরিয়ে পড়লেন পথে। পেছনে অগণিত ছেলের দল। মুখে জয়ধ্বনি। কণ্ঠে প্রাণ-ভরা গান। কুমিল্লা শহরের বুকে ফুটে উঠল সহসা আলোর ঝলকানি। কাজী নিমেষে জীবনের সকল গ্লানি, সকল বঞ্চনার বেদনা ভুলে এই নতুন মহোৎসবে প্রাণ-মন ঢেলে দিলেন। গেয়ে উঠলেন,—

"এ কোন্ পাগল পথিক ছুটে এল
বন্দিনী মার আঙিনায়,
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ হরণ
গান গেয়ে তার সঙ্গে যায়।"

গৃহেও লাগল নিত্য মহোৎসব। মাতা বিরজাসুন্দরী ন্যূনতম পার্থক্যও রাখলেন না। ছেলেমেয়ের সঙ্গে কাজীকেও ডেকে নিলেন শুধু নিজের অন্দরমহলে নয়, অন্তর-মহলেও। পুত্র বীরেন হল কাজীর রাঙাদা, কন্যা কমলা আর অঞ্জলি হল বোন্। আর দুলি? দোলন চাঁপা? প্রমীলা?

প্রমীলা ছিল বীরেনের জ্যেঠতুত বোন। মেয়ের দলের পান্ডা। পড়াশুনো শেষ করে দিয়েছে। স্কুল ছেড়েছে অসহযোগের শুরুতেই। ভাই-বোনদের আর পাড়া-পড়শীর ছেলেমেয়ে নিয়ে দল গড়ে প্রমীলা। বিরজাসুন্দরীর গৃহ হয়ে ওঠে উৎসব অঙ্গন। নব উৎসব মুখরিত এই অঙ্গনের ভেতর থেকে নিত্য নতুন সুরে ও স্বরে কাজী দেশ-জননীর বন্দনা-গীত লিখলেন। সুর দিলেন। গান গেয়ে জাগিয়ে দিলেন ঘুমিয়ে-পড়া অনেকের প্রাণ। সে গানের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাল কমলা, অঞ্জলি আর প্রমীলা।

কালরাত্রির এক দুঃসহ দুঃস্বপ্ন কাজীর শ্বাস রোধ করতে চেয়েছিল। ঘুম ভেঙেছে এক লহমার ধাক্কায়। চোখ রগড়ে, ঘুমের ঘোর কাটিয়ে কাজী চলে গেলেন কলকাতা।

কিন্তু বুকের ঐ দাবদাহ? প্রথম জীবনের একটি মরমী কামনা লুব্ধ হয়ে ফুটতে চেয়েছিল অনাস্বাদিত রসে আর রঙে। ডাকাতের বেশে এল দুর্বার নিয়তি। বীণার তারে যে গান বাজতে চেয়েছিল মধুক্ষরা প্রভাতিরাগে, নিষ্ঠুর ভাগ্য তার,—হাতের বীণার তার ছিঁড়ে গেল। গান থেমে গেল। বীণা ফেলে কাজী ছুটে যেতে চেয়েছিলেন লোকালয়ের বাইরে। দূরে। অনেকদূরে। মানুষের লোল-লালসা আর বঞ্চনার নির্মম প্রতিহিংসা সেখানে পৌঁছুবে না। হল না। বীণা নতুন করে বাঁধলেন কাজী। ঝঙ্কার উঠল নতুন করে। "আমার পথিক জীবন এমন করে

ঘরের মায়ায় মুগ্ধ করে বাঁধন পরালি,
আমার ভাঙা ঘরের শূন্যতারি বুকের পরে রে
কোন পাগল স্নেহ-সুরধুনীর
আগল ভাঙালি।"

নতুনের আমন্ত্রণ কাজী উপেক্ষা করেন নি। কিন্তু ঐ ফেলে আসা নির্মম আঘাত? তার দুঃসহ কাতরানি? কাজীকে খুঁড়ে খেতে লাগল অহরহ। মানুষের ওপর কি অবিশ্বাস জাগল? জাগল কি মনে প্রতিশোধ স্পৃহা? জীবনের এই ক্ষয় ও ক্ষতি, এই অপচয় ও অপচিকীর্ষার হীন ও উদ্ধত আমন্ত্রণকেই তিনি কি বিনা প্রতিবাদে জীবনে অঙ্গীকার করে নেবেন? এই নিষ্ঠুর পীড়নের ঊর্ধ্বে আর কিছু কি নেই? একে অতিক্রম করে যাওয়া যায় না বৃহত্তর ধর্মের সান্নিধ্যে? এই সমাজ, তার গোপন উপদংশ, তার সুঠাম মুখোশের নীচের ক্লেদাক্ত স্বরূপ দেখানো যায় না? দেওয়া যায় না ভেঙে গুঁড়িয়ে? যুগ যুগ সঞ্চিত জড়তার পাহাড় গড়ে উঠেছে জাতির বুকে। জাতিকে করে রেখেছে পঙ্গু। অথর্ব। শুধু কি নজরুল? শত নজরুল আজ বঞ্চিত। পীড়িত। লাঞ্ছিত। নাকি সুরের মেকি কান্নায় ঐ নির্দয় দানবের অন্তর কি ভয় পাবে? জাগবে ওর কলুষ-কঠিন অন্তরে মানবিক অনুভূতি?

"সারা রাত জ্বরে বেহুঁশ হয়েছিলুম। সঙ্গে ছিল হাড় কাঁপানো শীত। আমাকে স্থির হয়ে শুয়ে থাকতে দিল না। উঠে বসলুম। কলম হাতে তুলে নিলুম। লিখে চললুম সারা রাত একটানা। ভোরের পাখি ডেকে উঠলো। কলম ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়লুম। সকাল হল। জানতে পারিনি। জাগিয়ে দিলেন যিনি, তিনি আর কেউ নন, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। চনচনে রোদে চারদিক ভরে গেছে। ঘুম ভাঙতেই মনে পড়লো লেখার কথা। খাতা টেনে নিলুম। পড়ে গেলুম একটানা। 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রথম শ্রোতা আমার ক্ষীরোদ-প্রসাদ।"

কাজীর কথা শেষ হল। মধ্যাহ্ন গড়ে গেছে। অন্যান্য সঙ্গীদের স্নানাহার শেষ। কাজী ও আমি ঢুকে পড়লাম খাবার ঘরে।

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী পরিক্রমা

ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটির উদ্যোগে ইউ এস আই এস অডিটোরিয়ামে ১২ থেকে ১৯ ডিসেম্বর সুনীল দাসের একটি উজ্জ্বল ও কৌশলতাপূর্ণ চিত্র-প্রদর্শনী হল। ৩১ খানি মাঝারি মাপের ছবিতে এবার সুনীল দাস একটা নূতনত্বের ছাপ আনবার চেষ্টা করেছেন। ছবির জমি হিসেবে তিনি খবরের কাগজের ব্যবহৃত ম্যাট—যার ওপর টাইপ ঢালাই করে, সেই ঢালাই টাইপ থেকে কাগজ ছাপা হয়—তাই ব্যবহার করেছেন। সেই উঁচু-নীচু টাইপ ও ব্লক চিহ্নিত নীলাভ ম্যাটের ওপর উজ্জ্বল জল রঙে কতগুলি চমৎকার ডিজাইন সৃষ্টি হয়েছে, যার মধ্যে কোথাও কোথাও পপ্ শিল্পের ছাপ পাওয়া গেলেও নিছক পপ্ হিসেবে হয়ত একে গোষ্ঠিভুক্ত করা চলে না। জমির ব্লক এবং টাইপগুলিকে তিনি সমগ্র ছবির ডিজাইনের মধ্যে অতি সুন্দরভাবে অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। কাগজের সংবাদের শিরোনামার ওপর কোথাও রং চড়িয়ে, কোথাও বা রং ছেড়ে অক্ষর ও ডিজাইনের মিলনে একটা নাটকীয়তার আভাস আনার চেষ্টা প্রায়ই সাফল্য লাভ করেছে। আবার কোথাও কোথাও যে বিজ্ঞাপনের লে আউটের ভাব এসে যায়নি তাও নয়। তবু সব মিলিয়ে একটা সৃষ্টির উচ্ছলতা দেখা যায় এবং সেটা বেশ ভালই লাগে। তাঁর চিরাচরিত সাপ, তীর বা তান্ত্রিক প্রতীকের প্রয়োগ ত আছেই, তাছাড়া অনেক জায়গায় ফিগার উপস্থিত করে একটা বৈচিত্র্য আনার প্রয়াস প্রশংসার যোগ্য হয়েছে। ছবিগুলির বর্ণ প্রয়োগ কোথাও একঘেঁয়ে হয়ে যায়নি। একটা সতেজ এবং উৎসাহী মন যে ছবি তৈরীর পেছনে কাজ করছে তার সাক্ষ্য প্রদর্শনীর যে-কোন ছবিতেই পাওয়া যায়।

●

শীতের কলকাতার বৃহত্তম সর্বভারতীয় শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ১৬ ডিসেম্বর চিরাচরিত সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হল। এটি অ্যাকাডেমির ৩৪তম প্রদর্শনী। ২৯২খানি চিত্র, ভাস্কর্য, গ্রাফিকস্ ইত্যাদির নিদর্শনের মধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, উড়িষ্যা, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, কাশ্মীর, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বারাণসী, আমেদাবাদ, দিল্লী প্রমুখ বিভিন্ন কেন্দ্রের শিল্প-নিদর্শন দেখা গেল। অবশ্য এ-ধরনের প্রদর্শনীর নির্বাচন ব্যাপারে সকলকে সন্তুষ্ট করা হয়ত সম্ভব হয় না। অ্যাকাডেমির ক্ষেত্রেও তা হয়নি। তবু মোটামুটি একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেল যে, এবারে কোন বিশেষ শিল্পরীতির প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। বর্তমানে এদেশে

শিল্পী : অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী

শিল্পী : সুনীল দাস

যতরকম রীতির শিল্পচর্চা হচ্ছে তার প্রায় সবরকমেরই নিদর্শন এখানে দেখা যাবে। সারা ভারতের ১৪ জন শিল্পী পুরস্কার লাভ করেছেন, তবে সে-বিষয়েও সকলে হয়ত একমত নাও হতে পারেন। এবারে রিপ্রেজেণ্টেশনাল কাজের মধ্যে কয়েকটি দৃষ্টি আকর্ষণকারী কাজ দেখা গেল। তার মধ্যে বিনোদ কর্মকারের শিমুলতলার দুটি দৃশ্য তেল রঙের কাজের মধ্যে লক্ষণীয়। ফর্মের সরলতা টোনের মিল ও রঙের ঔজ্জ্বল্যে ছবিদুটি সহজেই নজরে আসে। বোম্বাই-এর লক্ষ্মণ বিশ্বনাথ শেনভীর 'হোলি ঘাটস্ (বেনারস)' তুলি চালানোর কায়দা হিসেবে লক্ষ্য করার মত। একটু চড়া পর্দার কাজ। বোম্বাইয়ের এস ইউ নায়কের 'সী-স্কেপ' এবং সুনীলমাধব সেনের একটি মুখমণ্ডলও উল্লেখযোগ্য কাজ।

জল রঙের নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যে বি আর পানেসরের 'দি টুইলাইট ফেস্টিভাল' ছোট এবং উজ্জ্বল কাজ—এটি তাঁর আগের প্রদর্শনীতে দেখা গিয়েছে। বসন্ত পণ্ডিতের দুটি নিসর্গ দৃশ্য মন্দ নয়। অমলনাথ চাকলাদারের পূর্ব-প্রদর্শিত 'ব্রেক ফাস্ট' এবং 'কুইন অব ফ্লাওয়ার' এই মাধ্যমে একটু ভিন্ন ধরনের কাজ। প্রথমটিতে অজন্তার ঢং এবং দ্বিতীয়টিতে গগনেন্দ্রনাথের রীতি শিল্পীর নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রয়োগ করা হয়েছে। অনিল পালের দুটি মুখমণ্ডল প্রশংসনীয় কাজ।

আধুনিক রীতির কাজের মধ্যে আধা ফিগারেটিভ ও নন্-ফিগারেটিভ ছবির মধ্যে জি কে পণ্ডিতের 'রেড রুফ' (পূর্বে প্রদর্শিত), আর এস ধীর-এর 'দি ব্লু কাশী' (রেখা-প্রধান অ্যাবস্ট্রাকশন), অমিতাভ ব্যানার্জির অ্যাক্রাইলিকে আঁকা সূক্ষ্ম রঙের 'দি নুড', চরণসিং গিল-এর বর্ণাঢ্য 'রেড সান', পি গোরীশংকরের 'পেণ্টিং নম্বর রেড', কে শ্রীধর রাও-এর 'ভগবতী', মহিম রুদ্রের সংযত উষ্ণ বর্ণের 'দি সঙ অব দি ডেজার্ট' ও মুরলীধর টালির সূক্ষ্ম বর্ণের দুখানি অ্যাবস্ট্রাকশন উল্লেখযোগ্য। অশ্বিন মোদীর পুরস্কারপ্রাপ্ত কাজের চাইতে ভাল ছবি গত বছর এখানেই দেখা গিয়েছে। অমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর দুখানি পুষ্পপত্রের ডিজাইনে চোখের তৃপ্তিটাই বেশী। এবারে শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের মধ্যে তেল রঙের ব্যবহার এবং অ্যাবস্ট্রাকশনের চর্চা বেশী করে চোখে পড়ল। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে গণেশ হালোই, সমর ভৌমিক, মোহাম্মদ আলি খান, কাতায়ুন শাকলাত, জীবেন্দ্রকুমার সেন (গ্রাফিক্স), জয় কৃষ্ণ (গ্রাফিক্স) প্রভৃতির কয়েকটি কাজ প্রশংসনীয়। রঙ্গগোপালের কালিকলমে আঁকা কলকাতার সুদীর্ঘ দৃশ্যটি তারিফ করার মত কাজ।

ভাস্কর্য বিভাগে বলবীরসিং কাট-এর 'রামকিংকর' প্রতিকৃতিটি উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। বিশেষ বলিষ্ঠতার সঙ্গে শিল্পীর মুখমণ্ডলটি গঠিত হয়েছে। ফুলচাঁদ পাইনের পেঁচার মূর্তিটি ইণ্টারেস্টিং কাজ। অ্যাবস্ট্রাকশন ঘেঁষা কাজের মধ্যে

শিল্পী কানু পালের মাটির তৈরি রক্তে বোনা ধান

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'রিক্লাইনিং ফিগার', এন জে সাবুর ছোট কিন্তু বলিষ্ঠ কাজ 'উয়োম্যান' ও মীরা মুখার্জির 'থট স্ট্রীম' (পূর্বে প্রদর্শিত) ও মৈত্রেয়ী বিশেষ ব্যক্তিত্ব-পূর্ণ সৃষ্টি। প্রদর্শনী ১৮ জানুয়ারী পর্যন্ত খোলা থাকছে।

●

বোম্বাই যাবার আগে সোসাইটি অব কণ্টেম্পরারি আর্টিস্টস্-এর একটি পেণ্টিং এবং গ্রাফিকসের প্রদর্শনী ১৯ থেকে ২৮ ডিসেম্বর অবধি বিড়লা অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত হল। এটি সোসাইটির ১১শ বার্ষিক প্রদর্শনী। এবারে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন সুহাস রায়, মনু পারেখ, শৈলেন মিত্র, লালুপ্রসাদ শা, সুনীল দাস, সনৎ কর, সোমনাথ হোড়, শ্যামল দত্তরায়, গণেশ পাইন, দীপক ব্যানার্জি, বিকাশ ভট্টাচার্য এবং অনিল সাহা। এঁদের সকলের কাজেই এঁদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে পাওয়া গেল। স্টাইলের দিক থেকে কারো কাজের খুব একটা বেশী পরিবর্তন লক্ষিত হয়নি।

অনিল সাহা তাঁর জল রঙের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধরন এবার তেল রঙের ছবিতে প্রয়োগ করেছেন। কিছুটা লোকশিল্প ও প্রতীক থেকে ডিজাইন সৃষ্টি করে যে কম্পোজিসনগুলি তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে ২ নম্বরের 'এজিং সান' ছবিটি একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিকাশ ভট্টাচার্যের কলাজ ও পেণ্টিং-এর মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতীক ব্যবহার তাঁর চিরাচরিত প্রথায় করেছেন। 'শী' ছবিতে রমণী-দেহের একসরে চিত্র অন্ধকার ঘর থেকে মুক্ত দ্বারের সামনে এগিয়ে আসতে থাকে যেন কোন ভৌতিক কাহিনীর নাটকীয় মুহূর্তে। 'পার্টি' ও 'অন-লুকার' ছবিতে কলাজ ব্যবহারে একসঙ্গে অনেক-গুলি ইমেজ সৃষ্টি হয়েছে। তবে 'রয়্যাল ভিজিটার' ছবির পেচক মূর্তির অবস্থান সামগ্রিকভাবে একটা নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পেণ্টিং-এর কুশলতা প্রশংস-নীয়। দীপক ব্যানার্জির সাবলীল রেখার রঙীন এচিংগুলি তাঁর পূর্বেদৃষ্ট কাজেরই অনুরূপ। গণেশ পাইনের তিনটি টেম্পারার ইমেজ সৃষ্টির কাজ সুদক্ষ এবং তিনটি ছবিতেই সূক্ষ্ম কলম চালনার কায়দায় তুলি চালিয়ে আলো এবং টেক্সচার সৃষ্টি প্রশংসনীয়। 'দি সুইম' এবং 'ভয়েজ ইন দি রেন' ছবিদুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্যামল দত্তরায়ের চারখানি ছবির মধ্যে 'ডিপার্চার' ছবিটিই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। ফ্ল্যাট রঙের প্রয়োগে ফ্ল্যাট ডিজাইনের ভেতর আলো-আঁধার সৃষ্টির বাহাদুরী প্রশংসার যোগ্য। তাছাড় ছবিতে গগনেন্দ্রনাথের ধরনে একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সৃষ্টি বিশেষ আনন্দ দায়ক হয়েছে। 'ওয়াল' ছবিতে একটা সম-কালীনতা রয়েছে, যার ফলে আপাত-দৃষ্টিতে নাটকীয়তার চমক সৃষ্টি করলেও এই অনুভূতির স্থায়িত্ব কতটা সেটা ভেবে দেখবার? সোমনাথ হোড়ের বড় এবং ছোট উডপ্রিণ্টগুলিতে শিল্পীর প্রকরণ কৌশল, রং ও ডিজাইনের বাহার সুন্দর। কাঠের গ্রেণ ডিজাইনের সঙ্গে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ডিজাইনের পরিমাণ বোধও ১৯, ২০ ও ২২ নম্বরের ছবিতে লক্ষ্য করবার মত। সনৎ করের চারখানি ছবিতে অল্প রঙীন জমির মধ্যে শুধু রেখার ক্যালিগ্রাফিতে একটা ফিগারের আমেজ আসে কিন্তু যথেষ্ট তৃপ্তিকর মনে হল না। তবে "সুইপ" ও "নন-পার্সন" উল্লেখযোগ্য। সুনীল দাসের "মাইন্ডস্ আই" নামে চারটি ছবিতে ধূসর বা অন্য কোন বর্ণের টেক্সচারের ওপর তান্ত্রিক বা অন্য কোন প্রতীকে অতি পরিমিত ব্যবহার দেখা গেল —তবে এই 'মাইন্ড'টি সকলের পছন্দ হবে কিনা জানি না। লালু শার ছবিতে রথ বা সিংহাসনের প্রতীকের রেখাময় ব্যবহার এবং আগের বারের চেয়ে একটু বেশী সরলীকৃত ফর্ম দেখা যায়। শৈলেন মিত্রের চারখানি অ্যাবস্ট্র্যাকশনে উষ্ণ ও শীতল বর্ণের তীব্র বৈপরীত্য এবং স্বতস্ফূর্ত রঙের আলপনা মন্দ লাগে না।

—চিত্ররসিক

কাঁচের আলমারী ভর্তি পুতুল—নানা-রঙের ঝকমকানি নিয়ে সেজেগুজে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে।

বিছানায় শুয়ে ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে ভারী পাথরের মত নড়তে না চাওয়া সকাল, দুপুর, বিকেলগুলোকে ঠেলে ঠেলে সরাতে চান সুচরিতা।

চিরকাল পুতুলের ভারী সখ সুচরিতার। দীর্ঘদিন ধরে একটি একটি করে সংগ্রহ করেছেন সকলের ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ উপেক্ষা করে। এখনও সুন্দর, বাহারে পুতুল দেখলেই বোধ হয় হাত বাড়াবেন সুচরিতা—যাঁর বয়স পঞ্চাশের কোঠা পার হয়েছে অনেকদিন। যাঁর চুলে রুপোলী রেখা ফেলে, দু'দুবার হার্ট অ্যাটাক করে জরা ও মৃত্যু এগিয়ে এসেছে নিজেদের অনিবার্য অধিকার বিস্তার করতে।

সকালের রোদ এসে পড়েছে আলমারীর কাঁচে। ওপর তাকের মস্ত সেলুলয়েডের খোকা পুতুলটা হেসে উঠল যেন। সুচরিতাও নিজের মনে হাসলেন। জীবনটাই তো পুতুলখেলা, মিথ্যে খালি সাজাবার, সাজবার আর সুখ পাবার একটা মজার খেলা। সুখ যাকে মনে হয় সে হাত ফসকে খালি পালায় আর হাতছানি দিয়ে ডাকে। তার পিছনে বৃথা ছুটে ছুটে একদিন মুখ থুবড়ে এই সুচরিতার মত বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকতে হয়। আশ-পাশের সজীব মানুষগুলো যাদের পরমাত্মীয় মনে হয় তারা তখন দূরে সরে গিয়ে ঐ পুতুলদের মতই সুচরিতার হাসি-কান্নামাখা জীবনখেলার শেষদৃশ্য নিষ্পলকে প্রত্যক্ষ করে।

সারাজীবন যত পুতুলখেলা করেছেন সুচরিতা তার মধ্যে এই প্রাণহীনেরাই তো সুবোধ সুশীলের মত সুচরিতা যেমন সাজিয়েছেন, যেমনভাবে গুছিয়ে সুন্দর করে রেখেছেন সব মেনে নিয়ে ওঁর বাধ্য অনুগত সঙ্গী হিসাবে বিরাজ করছে, আর হাত-পাওলা শরীরসর্বস্ব প্রাণবন্ত মানুষ পুতুলেরা? কেউ মৃত্যুর আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়ে সুচরিতার বুক ভেঙে কোথায় হারিয়ে গেছে, কেউ বা তাঁর জীবনের সবখানি জুড়ে থেকেও এমনভাবে নড়ে চড়ে, কথা বলে, কাজ করে যে সুচরিতার মনে হয় এদের নিয়ে যত কিছু করলেন বা করতে চাইলেন সবই পুতুল-খেলার চেয়েও অসার, মিথ্যে। ওরা সব তাঁর অন্তরের মাধুর্য, মমতা আর অপরিসীম স্নেহ, ভালবাসা তিল তিল করে আহরণ করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু গঠনে, ভঙ্গীতে কোথাও সুচরিতার হাতের ছাপ একটুও মাখেনি। শ্রান্ত জীবনের শেষ পাদে পৌঁছে অচঞ্চল, অখন্ড অবসর নিয়ে সুচরিতা ওদের লক্ষ্য করেন আর বেশী পরিশ্রান্ত বোধ করেন। মনে হয় এই খেলনা পুতুলরাই ভাল, ওরা এক একজন জীবনের এক একটি স্মৃতিকে আলো দিয়ে যেন উজ্জ্বল করে রেখেছে।

যুগ-যুগান্ত আগে পাওয়া ওই সেলু-লয়েডের খোকা পুতুলটা! সুদূর অতীতের আবছা স্মৃতির ঘরে যেন একটুকরো সূর্যের আলোর মত জ্বলজ্বল করছে। তখন তো সুচরিতা নিজেই তাঁর বাবা মার চোখের মণি একটা খুকী ডল পুতুলের মত। অলস দুপুরে মা মাটিতে মাদুর পেতে বালিশের ওপর ভিজে চুলের রাশ বিছিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হতেন, পাশে শুয়ে থাকা ছোট্ট মেয়ে সুচরিতার চোখের সঙ্গে ঘুমের আড়ি ছিল, তার কান সজাগ হয়ে প্রতীক্ষা করত কতক্ষণে সেই মোহন বাঁশীর সুরের মত 'সাবান তরল আলতা চাই, মাথায় ফিতে কাঁটা চাই' ইত্যাদি ডাকটি শোনা যাবে। যেই মাত্র শোনা আর অপেক্ষা নয়

—ফেরিওলার ডালার ওপর বসে থাকা মধ্যমণি খোকা পুতুলটার জন্য মায়ের কাছে চোখের জলমেশানো আবদার! যেদিন সত্যি সত্যি হাতে এল সেদিন সুখের অন্ত রইলো না। ওর সংগে জোড় মিলিয়ে একটা খুকী পুতুলও পাবার বড্ড সখ হয়েছিল সুচরিতার। কিন্তু ইচ্ছেটা ব্যক্ত করতেই মা গম্ভীরভাবে মনে করিয়ে দিলেন মাত্র কয়েকদিন আগেই স্বদেশী বক্তৃতার সভায় মায়ের সংগে উপস্থিত হয়ে সুচরিতা প্রতিজ্ঞা করে বসেছে বিলিতি জিনিস সে কখনও কিনবে না। পুতুলরা বিলিতি হয়। সুচরিতা চুপসে এতটুকু! বাবা চরকা কাটছেন, মা তকলী। সে যুগের বাঁধভাঙা স্বদেশী আন্দোলনের ছোট্ট একটু ঢেউ সুচরিতাদের সংসারকেও দুলিয়ে দিয়েছিল। না—একফোঁটা মেয়ে সুচরিতা লোভ সম্বরণ করেছিল, প্রতিজ্ঞা ভংগ হয়নি।

মা হেসে হেসে বাবাকে বললেন একদিন, "তোমার মেয়ের পুতুলের জন্য আবদার একদম বন্ধ হয়ে গেছে। ফেরিওলা গেলে দৌড়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে কিন্তু কখনও বলবে না কিনে দাও।"

বাবা বললেন—"ও আমার সংযমী ধীর স্থির মেয়ে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' থেকে মেয়ের নাম রেখেছি। সব দিক দিয়ে সুন্দর চরিত্র যে মেয়ের সেই সুচরিতা।"

আদর, প্রশংসা, অগাধ ভালবাসা—সুখের সরোবরে পদ্মপাতার মত ভেসে থাকা সে সব দিন স্থায়ী হয় না। এক-একটা স্মৃতি দামী জিনিসের মত শুধু মনের সিন্দুকে চাবি দেওয়া থাকে। মাঝে মাঝে খুলে দেখলে বড় সুখ পাওয়া যায়। বিয়ের দিনটা এরকম একটা স্মৃতি। স্বামী নামে মস্তবড় জীবন্ত পুতুলটির সংগে সেদিন গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছিল। তাকে ঘিরেই সংসাররংগমঞ্চে পুতুলখেলার আয়োজন। শ্বশুরবাড়ীর মেজবৌ হয়ে সুচরিতা কিছুদিন সুখের ঘোরে ডুবে ছিলেন। চব্বিশ বছরের নবযুবক শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় তখন তাঁর মনের সবখানি জুড়ে বিরাজিত। আদরে, সোহাগে ঘেরা মোহময় রাত্রিগুলো যেন স্বপ্নের মত। দিনের বেলায় কটুভাষিণী শাশুড়ী, ঈর্ষাপরায়ণ ননদ-মণ্ডলী, সংসারের শতচক্ষু ক্ষমাহীন দৃষ্টিতে সুচরিতাকে বিদ্ধ করেছে কিন্তু ব্যথা লাগেনি গায়ে, শান্তির প্রলেপের মত স্বামী ছিলেন পাশে।

মানুষের তৈরী পুতুলরা বেশী বদলায় না কিন্তু রসিক বিধাতা জীবনের এক একটা পর্যায়ে দফায় দফায় মানুষের রং বদলান। দেহের ও মনের আমূল পরিবর্তন সাধন করে নিজের সৃষ্টির বৈচিত্র্য বজায় রেখে সকৌতুকে হাসেন বোধহয়। সেই বত্রিশ বছরের আগের শরদিন্দু এখন চেহারায় বিরলকেশ, বিগতশ্রী, হৃতস্বাস্থ্য আর মেজাজে খিটখিটে, ছিদ্রান্বেষী, আত্মকেন্দ্রিক।

সুচরিতা রাতে প্রায়ই ঘুমোতে পারেন না, মাঝে মাঝে দমকা কাশির আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। শরদিন্দুরও ঘুমের ব্যাঘাত হয়। সুচরিতা বললেন—"তোমার বিছানা ছোট ঘরে পেতে দিতে বোল।" শরদিন্দু সংগে সংগে রাজী। ঝি মানদা এল মেজেতে শুয়ে সুচরিতাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে। রাত্রে বিনিদ্র সুচরিতার অভিমান অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ল, অসুস্থ মনে তিনি হয়ত আশা করেছিলেন শরদিন্দু ব্যস্ত হয়ে প্রতিবাদ করবেন—বলবেন তোমার কষ্টের চেয়ে আমার ঘুমই কি বড় হল রিতা? রিতা! দূর—ও নাম তো আদর করে যৌবনেই ডাকা যায়, জীবনের শেষবেলায় সেকথা মনে করা কেন? কত যুগযুগান্ত আগে রিতা বলে ডাকতেন প্রেমিক শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় তখন গায়েহলুদের তত্ত্বে পাওয়া চমৎকার বৌ পুতুলটার মত সৌন্দর্যে, সুষমায় ঝলমলে ছিলেন সুচরিতা। সেই পুতুল সেই একই সুন্দর শাড়ী, গহনায় এখনও মনোহারিণী হয়ে আলমারীতে সাজান রয়েছে—সুচরিতাই দেহে মনে শীর্ণ শুষ্ক হয়ে বাসী ফুলের মালার মত বিছানায় শুয়ে বিসর্জনের অপেক্ষা করছেন প্রতিক্ষণ।

বাতাসে টেবিল থেকে চিঠিটা উড়ে মাটিতে পড়ল। প্রণব লিখেছে লণ্ডন থেকে। প্রণব সুচরিতার বড় ছেলে। বিয়ের পুরো পাঁচ বছর পরে জন্মেছিল। ওর শিশু-বয়সের আধো বুলি, টলে টলে হাঁটা, মন-কাড়ানো দুষ্টুমি আর দুরন্তপনা—স্মৃতি নয় আজকের এই বাস্তব সকালটার মতই স্পষ্ট আর দৃপ্ত হয়ে আছে সুচরিতার কাছে। তারপর আরও সন্তান এসেছে সুচরিতার কোলে কিন্তু প্রথম মাতৃত্বের সুখ আর গৌরব দিয়েছে যে প্রণব সে সুচরিতার হৃদয়ের কতটা অধিকার করেছিল তার মাপ কে করবে! ভাল করে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে বেরিয়েছিল প্রণব সুচরিতার আশার সৌধকে আকাশছোঁয়া করে। বিদেশে পাঠিয়ে ছেলেকে আরও কৃতী করার পণ করে বসলেন সুচরিতা। কিন্তু সাধ যত সাধ্য তত নয়। শরদিন্দুর বহু কটুবাক্য হজম করে নিজের গায়ের গহনা ও সামান্য ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স নিঃশেষ করে বিদেশে পাঠালেন ছেলেকে। ছেলে কৃতী হয়েছে ঠিকই কিন্তু মায়ের কাছে আর আসেনি সেখানে বিদেশিনী পত্নী গ্রহণ করে সুখে আছে! বুক ভেঙে গেছে সুচরিতার—মর্মভেদী দুঃখের সমুদ্রে কোনও অবলম্বন মেলেনি, সমবেদনার বদলে সমস্ত সংসার সুচরিতাকে এই অঘটনের জন্য দায়ী করেছে। চোখা চোখা বাক্যবাণে শরদিন্দু তাঁর রক্তাক্ত হৃদয়ে আরও রক্ত ঝরিয়েছেন। পরে শক্ত ভাষায় ছেলেকে চিঠি লিখে দিয়েছেন এ বাড়ীর দরজা তার কাছে চিরদিনের জন্য বন্ধ।

সেই প্রণব মায়ের অসুখের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে চিঠি দিয়েছে, মাকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে ভাল করে চিকিৎসা করাতে চায়। বারে বারে পড়ছেন সুচরিতা আর বারে বারেই চোখের জলে বালিশ ভিজে যাচ্ছে। আরও একটি জিনিস পাঠিয়েছে প্রণব—একটি খোকার সুন্দর ছবি যার সংগে ঐ আলমারীর সেলুলয়েডের পুতুলটার ভারী সাদৃশ্য। সুচরিতার বংশধর! জীবন্ত খোকা পুতুল—যাকে নিয়ে সুচরিতার কোনদিন খেলা হবে না। ছোটবৌ দীপা পুতুলের আলমারীর মধ্যেই ছবিটা একটা সুন্দর ফ্রেমে সাজিয়ে রেখেছে। সুচরিতা তো শরদিন্দুর বাক্যযন্ত্রণার ভয়ে ভাল করে দেখতেই ভরসা পাচ্ছিলেন না, দীপার ওপর কৃতজ্ঞ বোধ করেছেন পরে। দীপাকে শরদিন্দু ভালবাসেন—বড় লক্ষ্মী সেবা-পরায়ণ মেয়ে।

প্রণব! প্রণবের ছেলে! বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সুচরিতার। কোনদিন কি কল্পনাও করেছিলেন প্রণব মাকে ছেড়ে দূরে থাকবে? হায় ভগবান! সংসারের চেহারা কি নিষ্করুণ, কি ভয়ংকর! মা ছেলে, স্বামী স্ত্রী, স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা যা ভাষায় মধুক্ষরা সম্পর্কে আবেগমন্দ্রিত তাই কত সময় বিষে বিষময়, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মানুষকে জীবন্ত অবস্থায় চিতা দহনের অনুভূতি এনে দেয়।

দীপা এল ঘরে। "মা আপনার খাবার এনেছি। মানদা মুখ ধুইয়ে দিয়ে গেছে? একি! চোখ মুখ ফোলা ফোলা দেখাচ্ছে! শরীর বেশী খারাপ হয়েছে মা?"

বৌ পাশে বসে সস্নেহে মাথায় হাত রাখল। পরের মেয়ে—কিন্তু এখন সুচরিতার নিজের মেয়েদের থেকে এই পরের মেয়েই সান্ত্বনায়, সাহায্যে সুচরিতার কাছে দারুণ গ্রীষ্মে ভেসে আসা একটু ঠাণ্ডা বাতাসের মত।

ওর দুটি হাত নিজের বুকে রাখলেন সুচরিতা। আজ সকাল থেকেই বুকে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু সেকথা প্রকাশ করলেন না। দীপার সহানুভূতিমাখা মিষ্টি মুখের দিকে চেয়ে খুব আস্তে বললেন—"দীপা, তুমি দুদিন পরে মা হবে। যদি আমি তার আগেই চলে যাই তাহলে আমার দাদুভাই কি দিদিভাই যে আসবে তাকে ঐ বড় সেলুলয়েডের পুতুলটা খেলতে দিও—ওটা আমার ছোটবয়সের খেলনা। আমার গয়নাগাঁটি কিছু নেই মা—নিজের বলতে শুধু ঐ পুতুলের আলমারীটা—ওটাই তাকে দিলাম। ওর মধ্যে যত পুতুল আছে সবাই আমার জীবনের ফেলে আসা দিনের এক-একটি নিশানা, ওদের দিকে চেয়ে আমি তাদের কুড়িয়ে পাই। দিন শেষ হয়ে আসছে তবু পুতুলের সখ গেল না। তোমার গর্ভে আমার শেষখেলার পুতুলটি রয়েছে দীপা। তাকে আমি চোখে দেখব না হয়ত, তার সঙ্গে আমার খেলা হবে না। তবু সে যখন ওই পুতুলগুলো নিয়ে খেলবে তার সংগে অনেক যুগ আগের এক পুতুলপাগলা মেয়ের খেলার স্মৃতির রেশ লেগে থাকবে একটু।"

দীপা নিঃশব্দে শাশুড়ীর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল—প্রত্যাশায় উন্মুখ এক ভাবী মায়ের চোখের জলে সুচরিতার মুখ ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে।

রমেশ দত্তের
রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

চিত্রকল্পনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে-চিত্রসেন
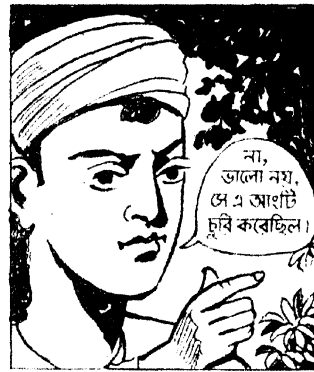
একটা চাকরি

হ্যাণ্ডিক্রাফট সেণ্টারের সেই মেয়েটির কথা সব শোনা হয়নি। যা শুনেছিলাম তাতেই অনেকখানি বোঝা গিয়েছিল। বাবার চাকরিই সংসারের একমাত্র সম্বল। খাওয়ার লোক বেশ কয়েকজন। নিশ্চিন্তে পড়াশুনাও তাই হয়ে ওঠেনি। প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করার পরও ক্লাস ফাইভে ভর্তি করানোর সামর্থ্য ছিল না বাবার। আরো পড়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু উপায় নেই। তাই ইতি টানতে হলো।

তারপর পাড়ার এই শিল্পকেন্দ্রে হাতের কাজ শিখতে ভর্তি হয়ে গেল। দেখতে দেখতে অনেকদিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে সে হাতের কাজও শিখেছে ভাল। হাতের কাজ শিখতে শিখতে সে স্বপ্ন দেখতো, একটা চাকরি-বাকরি পেয়ে যাবে। সংসারে দুটো পয়সা দিতে পারবে। বাবার ভার অনেকটা হালকা হবে। তারপর সেই চেপে রাখা সাধটাও পূর্ণ হবে। স্কুলে ভর্তি হওয়া হয়তো আর হবে না। তা বলে সে দমবে না মোটেই। প্রাইভেটেই পরীক্ষাটা দিয়ে দেবে।

আজ তার স্বপ্ন ফানুস হয়ে উড়ে যাচ্ছে। তাদের ধরে রাখার সাধ্য আর তার নেই। হাতের কাজে তালিম দেবার পর সে এখানেই কাজ করছে। বিনিময়ে পারিশ্রমিক কিছু পায়। সে যৎসামান্য। সে যা আশা করেছিল তার তুলনায় কিছুই নয়। পড়াশোনা দূরের কথা, সংসারেই কিছু দিয়ে উঠতে পারে না। বাবার ভার একইরকম রয়ে গেছে। নিজের কথা ছেড়ে দিলেও ছোট ছোট ভাইবোনদের কথা ভেবে তার চোখের ঘুম ছুটি নিয়েছে। সে শুধু ভাবে, তার মতো ওদেরও পড়াশোনা হবে না। তারপর সে আর ভাবতে পারে না। ইচ্ছে করেই ভাবতে চায় না। চুপচাপ নিঃশব্দ প্রহর গুনে যায়।

তবু সে আমার কাছে দুঃখের ঝাঁপি খুলে বসেনি। সেখানে বসে সামান্যই কথা হয়েছিল। অনেক মেয়ের মধ্যে সেই আমার দৃষ্টি কেড়েছিল। তার দৃষ্টি কিরকম গভীর। হঠাৎ সে কথাটা বলে ফেললো, একটা চাকরি দিতে পারেন? নিরুপায়ের মতো হেসেছিলাম। আর কিই বা করতে পারি! তারপর ওর কাছাকাছি হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, চাকরি তো এখান থেকেই হবে। এতো মেয়ে এখানে কাজ শিখছে সেই আশায়। আলাদীনের মায়াপ্রদীপের মতো চাকরির ছোঁয়ায় একদিন এদের অন্ধকার মুখগুলো আলোয় ঝকমকিয়ে উঠবে। সেই আশায়ই তো এরা দল বেঁধে এখানে এসে শিখছে।

আমার এতগুলো কথার উত্তরে মেয়েটি ম্লান হেসে বললো, একদিন এই আশায় আমিও কাজ শিখতে এসেছিলাম। কাজ শিখেছিও। কিন্তু চাকরি হয়নি। আর কবে হবে তাও জানি না। এখন যা করছি তা চাকরি নয়। আবার বেগারও দিচ্ছি না। সামান্য যা পাই তাতে কোনরকমে ঠেকা দেওয়া চলে। তার বেশি কিছু নয়। অথচ মা-বাবা, ভাইবোনেরা এখন আমার দিকে আশায় তাকিয়ে থাকে। আমি নিরুপায়। ওদের দিকে তাকিয়ে ভীষণ কষ্ট হয়। নিজেকে অপরাধী মনে করি। বেশিক্ষণ বাড়ি থাকতে পারি না। বেশির ভাগ সময় এখানেই পড়ে থাকি। অনেকের কাছেই চাকরির কথা বলেছি। এই বলা পর্যন্তই। এখন আর কাউকে কিছু বলি না। আপনি আমার অনেক কথা শুনলেন। তাই মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেল। জানি, কিছু হবে না।

বাংলাদেশে অনেক হ্যাণ্ডিক্রাফ্ট সেণ্টার। অনেকগুলোয় গেছি। সুযোগ-সুবিধার অভাবে বাকিগুলোয় যাওয়া হয়নি। সরকারী উদ্যোগও কিছু কিছু আছে। তবে বেশির ভাগই ব্যক্তিগত উদ্যোগ। সমাজসেবীর দল নিজেরাই এ-ধরনের অনেক সেণ্টার খুলেছেন। এখানে মেয়েরা কাজ করে দু' পয়সা পায়। সংসারের ফাঁকে এরকম কাজ পরিবারের যথেষ্ট সহায়ক। সাধারণত মায়েরাই এ-কাজ করে থাকেন। কোথাও কোথাও এমনও শুনেছি, এখানে কাজ করে অনেক মা ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচটা চালিয়ে নেয়। বিরাট দায়িত্ব পালন এখান থেকে সম্ভব নয়। সহায়কের ভূমিকায় হ্যাণ্ডিক্রাফ্ট সেণ্টারের কর্মীরা দক্ষ।

কলকাতার উপকণ্ঠে একটি হ্যাণ্ডি-ক্রাফ্ট সেণ্টারে গিয়েছিলাম কিছুদিন আগে। বাংলাদেশের লুপ্তপ্রায় একটি শিল্পের চর্চা এখানকার বৈশিষ্ট্য। সেই গৌরবজনক বস্তুটি হলো কাঁথাশিল্প। কাজ খুবই প্রশংসাজনক। দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও এই শিল্পের গুণগান। এবং অনেকটা এই কেন্দ্রেরই দৌলতে। এরা আমেরিকায়ও নানারকম কাঁথা এবং কাঁথাজাত দ্রব্য রপ্তানি করে।

লক্ষ্ণৌ চিকন-এর শিল্পকেন্দ্রও আছে। লক্ষ্ণৌ থেকে এ-কর্মে বিশারদ একজন শিক্ষাদান করেন। কাজ উন্নত মানের। শিক্ষার্থীদের নিষ্ঠা আছে। তবে পরিশ্রম যত আয় তেমন নয়। তাই এর সঙ্গে পাশাপাশি অন্য কিছুর চেষ্টাও হচ্ছে।

একটি শিল্পকেন্দ্রে মেয়েরা নানারকম ব্রাশ তৈরি করে। এটি সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। যাঁরা কাজ করেন তাঁরা এখানেই কাজ শিখেছেন। শিক্ষার্থীজীবন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পেয়েছেন সবাই। খুশি খুশি মনে তাঁরা আমাদের কত রকমের ব্রাশ দেখালেন। জুতো পালিশের ব্রাশ থেকে শুরু করে নানারকম ব্রাশ। আরো জানালেন, বাজারে তাদের ব্রাশের চাহিদা খুব।

এমনি আর একটি জিনিসের কথা আমি জানি। বাজারে যার চাহিদা খুব। কিন্তু খুব কম লোকই সে-ব্যাপারে মাথা ঘামায়। অথচ একটা গোটা পল্লীকে এই শিল্পে মুখর দেখেছিলাম। ঘরে ঘরে সবাই ব্যস্ত। সেই জিনিসটা হলো ব্যাডমিণ্টনের ফেদার। শীতকালে এর চাহিদা এত বেশি যে, এদের সরবরাহ সে-তুলনায় নিতান্তই স্বল্প। তৈরি করার মধ্যেও বিশেষ কোন অসুবিধা নেই। শিখে নিতে পারলে ঘরে বসেই তৈরি করা যায়। আবার সারা বছর ধরে তৈরি করে রাখলেও শীতকালে বিক্রী হয়ে যায়। এঁরা সবাই তাই করেন। মুরগীর পালক এর প্রধান উপকরণ—সবাই নিউ মার্কেট থেকে তা কিনে এনে সাইজ করে নেন। কিন্তু এর কোন বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রের পরিচয় আজো পাইনি। এরকম একটি শিল্প আরো বেশি পর্যায়ে শুরু করা যেতে পারে। এতে কর্মীদের পাকাপাকি কর্মসংস্থানও হবে।

প্রায় অধিকাংশ শিল্পকেন্দ্রেই চামড়ার কাজ শেখানো হয়। সেলাই-এর বিভাগ তো আছেই। আর আছে সর্বরোগের বটিকা-স্বরূপ লোড ব্রাণের্ণ ডিপ্লোমা কোর্স। প্রতিটি হ্যাণ্ডিক্রাফ্ট সেণ্টারে অধিকাংশই এই বিভাগের পড়ুয়া। সবাই আশা করে, এই কোর্স পেরোতে পারলেই স্বর্গ। কেউ কেউ চাকরি অবশ্য পান। সকলে তো নিশ্চয়ই নয়। সকলকে চাকরি দিতে হলে বাংলাদেশে গড়ে প্রতি বছর কয়েক শো হ্যাণ্ডিক্রাফ্ট সেণ্টার প্রয়োজন। সেটা সম্ভব কিনা তা অবশ্য আমার জানা নেই।

অনেকে বলতে পারেন, সকলকে চাকরি দেওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী সকলেরও চাকরি হচ্ছে না। এ-তর্ক হবে নেহাতই তর্কের খাতিরে। তাই কাজ শেখার পর চাকরির ব্যবস্থা হবে—এ-আশা সকলের। ব্যর্থ হলেই বেদনা বাড়ে। তাছাড়া পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে হাতের কাজের দাম অনেক বেশি। চাহিদা যখন আছে তখন এদের পাকাপাকি কর্মসংস্থানের দিকে লক্ষ্য রেখে শিল্পকেন্দ্র খোলাই ভাল। সরকারী উদ্যোগ হলে তো কথাই নেই, বেসরকারী উদ্যোগও সফল হবে।

সেই মেয়েটিকে সেদিন কোন উত্তর দিতে পারিনি। মেয়েটি সত্যি কথাই বলেছিল, চাকরির কথাটা নেহাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। এরপরও অনেক শিল্পকেন্দ্রে গেছি। সেখানেও অনেক মেয়ের সংগে কথা বলেছি। ওরা হেসে হেসে সব কাজ দেখিয়েছে। তবু মনে হয়েছে ওরা হাসি দিয়ে দুঃখকে ঢেকে রেখেছে। সকলের মধ্যেই দেখেছি সেই মেয়েটিকে। যে মনের কথা বলে ফেলেছিল। ওরা সবাই সেই মেয়েটির প্রতিমূর্তি। নির্বাক ভাষণে ওরা মুখর, একটা চাকরি দিতে পারেন?

—প্রমীলা

কিছুদিন আগে ছায়াছবির গানের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলাম, ১৯৫২ সালে তদানীন্তন তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রী ছায়াছবির গানকে শস্তা ও স্থূল বলে আকাশবাণী থেকে তার প্রচার একরকম নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই বলে সরকারীভাবে কিন্তু কখনই বলা হয়নি যে, আকাশবাণীতে ছায়াছবির গানের উপর কোনোরকম বাধানিষেধ আছে। বরং উলটোটাই বলা হয়েছে সব সময়।

যা-ই হোক, আকাশবাণী থেকে ছায়াছবির গানের প্রচার সাংঘাতিকভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, আকাশবাণী থেকে ঘোষণাও করা হয়েছিল যে, তারা নিজেরাই ছায়াছবির গানের স্থান দখলের জন্য উন্নত মানের হালকা গান প্রস্তুত করবেন। আকাশবাণীর সেই হালকা গানের রচনা যেমন উচ্চ সাহিত্যিক ও নৈতিক গুণবিশিষ্ট হবে তেমনি তার সুর হবে রাগ অথবা লোকগীতির সুরভিত্তিক, এবং ছায়াছবির গানে যে চড়া মাত্রায় পাশ্চাত্য জ্যাজের প্রভাব থাকে তা-ও পরিহার করা হবে।

কিন্তু এই সুনিনাদিত ঘোষণা সত্ত্বেও আকাশবাণীর হালকা গান প্রস্তুত করার সঙ্গতি ছিল না। কিন্তু তবু উপর মহল থেকে সমস্ত বেতারকেন্দ্রে নির্দেশ গিয়েছিল, খুব তাড়াতাড়ি হালকা গানের শাখা খুলে যে-কোনো উপায়ে ছায়াছবির গানের ফাঁক ভরাট করতে হবে।

ঘটনাক্রমে তখন রেডিও সিলোন খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল, এবং আকাশবাণী দু বছরের মধ্যে তাঁদের লাইসেন্স-সংখ্যা সাড়ে ছ' লক্ষ থেকে বাড়িয়ে দশ লক্ষ করার একটা অভিযান শুরু করেছিলেন। কিন্তু আকাশবাণীর এই চিন্তাধারার ফলে ছায়াছবির প্রযোজকরা রুষ্ট হলেন। এবং তাঁদের অনেকে আকাশবাণী থেকে তাঁদের গান প্রচার করতে দিতে অসম্মত হলেন। ফলে আকাশবাণীর বহু শ্রোতা রেডিও সিলোনের দিকে চলে গেলেন, এবং আকাশবাণী যে দু' বছরে তাঁদের লাইসেন্স-সংখ্যা বাড়িয়ে দশ লক্ষ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, চার বছর পরেও সেই পরিকল্পনা সফল হল না।

ছায়াছবির প্রযোজকদের সঙ্গে ব্যাপারটা মিটতে বেশ কয়েক বছর লাগল। তাঁদের বলা হল যে, ছায়াছবির গানকে কখনও ঢালাওভাবে গালমন্দ করা হয়নি, আকাশবাণী শুধু কোন্ গান তাঁরা প্রচার করবেন তা নির্বাচনের অধিকার সংরক্ষণের উপর জোর দিয়েছিলেন।

ওদিকে জনসাধারণকে বোঝানো হল, আসলে ছায়াছবির প্রযোজকদেরই দোষ, তাঁরা আকাশবাণীর সঙ্গে তাঁদের চুক্তি 'রিনিউ' করেননি।

যা-ই হোক, ছায়াছবির প্রযোজকদের সঙ্গে আবার নতুন করে চুক্তি হল, এবং ছায়াছবির গানও প্রচারিত হতে লাগল।

কিন্তু তাই বলে আকাশবাণী যে তাঁদের নিজস্ব তরফে উচ্চ সাহিত্যিক ও নৈতিক গুণবিশিষ্ট এবং রাগ অথবা লোকগীতির সুরভিত্তিক হালকা গান প্রস্তুত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রত্যাহার করে নেননি। তড়িঘড়ি করেই বড়ো বড়ো সমস্ত বেতারকেন্দ্রে হালকা গানের শাখা খোলা হয়েছিল—রম্যগীতি শাখা বা লাইট মিউজিক প্রোডাকশন ইউনিট। কিন্তু গোড়ার দিকে অসুবিধা দেখা দিয়েছিল প্রযোজক আর গীতিরচয়িতা পাওয়া নিয়ে, যাঁরা এই শাখাটিকে চালাবেন। চিত্রজগতের হালকা গানের দক্ষ প্রযোজকরা তো আগেই আকাশবাণী কর্তৃক নিন্দিত হয়ে আছেন। তাই আকাশবাণী প্রধানত দু শ্রেণীর লোকের দিকে ঝুঁকলেন: রম্যগীতির ভার গ্রহণে প্রস্তুত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতবিৎ (ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিসিয়ান), আর গীতিকার। খ্যাতনামা সেতারী ও এনায়েৎ খাঁর শিষ্য শ্রীডি টি যোশী, লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজের তদানীন্তন শিক্ষক বেহালাবাদক শ্রী ভি জি যোগ এবং কলকাতার বিশিষ্ট তবলাবাদক শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের মতো লোকেরা আকাশবাণীর নবপ্রতিষ্ঠিত রম্যগীতি শাখায় যোগ দিলেন। আর গীতিকারদের মধ্যে দিল্লীর শ্রীভগবতীচরণ বর্মার নাম করা যেতে পারে।

জনা ছয়েক করে স্টাফ আর্টিস্ট দিয়ে রম্যগীতি শাখাগুলিকে কাজ চালিয়ে যেতে বলা হল, এবং প্রত্যেক শাখার কাছ থেকে সপ্তাহে দুটি করে গান আশা করা হল। সাধারণভাবে অন্য কতকগুলি নির্দেশও দেওয়া হল—যেমন, গানের ভাষা ও মর্ম সম্বন্ধে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, যাতে সাহিত্যিক ও নৈতিক বিশুদ্ধতা বিদ্যমান থাকে; বাজনা খুব কম রাখতে হবে, যাতে ছায়াছবির গানের 'অর্কেস্ট্রার' ভাব আর পাশ্চাত্য জ্যাজ পরিহার করা যায়; এবং সুর, রাগ ও লোকগীতি ভিত্তিক হতে হবে।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতো অত সহজে ও অত তাড়াতাড়ি শিল্পগুণসমন্বিত কিছু প্রস্তুত করা খুব সুসাধ্য নয়। সাহিত্যিকগুণবিশিষ্ট গানগুলি তাল ও লয়ের দাবি মানতে চাইল না। সপ্তাহে দুটি করে গান প্রযোজক, গীতিকার ও অন্যান্য স্টাফ আর্টিস্টের কাছে অত্যধিক দাবি বলে মনে হল। আকাশবাণীর দক্ষিণায় শীর্ষস্থানীয় শিল্পীরা আকৃষ্ট হলেন না, চিত্রজগতে তাঁরা অধিক দক্ষিণা পেয়ে থাকেন। এবং ঐ দক্ষিণাতেই যাঁদের পাওয়া গেল, প্রযোজকদের মতে তাঁদের কণ্ঠ এমন নয় যে, তাঁরা খুব বেশি 'অর্কেস্ট্রা' বাজনা ছাড়া শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতে পারেন। অবশেষে রম্যগীতি শাখা রম্যগীতির বাইরের লোকদের কাজে লাগাতে শুরু করলেন। বোম্বাইয়ে এই শাখা, বিশেষ করে চিত্রজগতের দিকে ঝুঁকলেন, এবং অপেক্ষাকৃত কম সফল সঙ্গীত পরিচালক ও গীতিকাররা সহজেই আকাশবাণীতে প্রবেশাধিকার পেলেন। তার ফল দাঁড়াল, আকাশবাণী যা পরিহার করতে চাইছিলেন, ঘুরেফিরে তার সবকিছুই কিছুটা তরল আকারে আকাশবাণীতে স্থান করে নিল। আকাশবাণীর রম্যগীতি শাখা স্থূল কিছুই বর্জন করলেন না, নিজস্ব কোনো 'হিট' সুরও তৈরি করতে পারলেন না। এবং ছায়াছবির সবচেয়ে শস্তা আর স্থূল গানের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণই রইল। আকাশবাণীর নিজস্ব ছাপ-মারা রম্যগীতি প্রস্তুত করতে তাঁরা যে ব্যর্থ হয়েছেন, সে-কথা কর্তৃপক্ষও পরে স্বীকার করেছেন। এবং এ-কথাও স্বীকার করা হয়েছে যে, স্বয়ং চিত্রজগতেই প্রতিভাবান্ প্রযোজকেরা নতুন হাওয়া আনতে পেরেছেন।

এবং তার থেকেই আকাশবাণীর 'বিবিধ ভারতী' অনুষ্ঠানের জন্ম। 'বিবিধ ভারতী' অনুষ্ঠানের মর্মকথাই তো হালকা গান, এবং আর হালকা গানের মজ্জা ছায়াছবির গান।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করার এবং ছায়াছবির গানের স্থলে বিশেষ রম্যগীতি প্রচারের এত চেষ্টা সত্ত্বেও তখন রেডিও সিলোনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আকাশবাণীর অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা

নির্ধারণে একবার এক 'লিস্‌নার্স' রিসার্চ' চালানো হয়েছিল। তাতে দেখা গিয়েছিল, প্রতি দশটি বাড়ির মধ্যে ন'টি বাড়িতে অবশ্যম্ভাবিরূপে রেডিও সিলোন খোলা থাকে, আর বাকি একটি বাড়ির রিসিভার হয় খারাপ নয় অচল।

কর্তৃপক্ষ এতে বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন এবং রেডিও সিলোন বন্ধ করে দেবার জন্য কূটনৈতিক পর্যায়ে চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু সিংহল সরকার ভারতের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলে এক সুন্দর সকালে সংসদে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, রেডিও সিলোন কেবল অল্পবয়স্কদের কাছেই প্রিয়, যাদের রুচি এখনও উন্নত হতে পারেনি। ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়নি। মর্যাদার প্রশ্নে আকাশবাণীর নীতি কাগজেপত্রে অপরিবর্তিতই রইল, কিন্তু হালকা গানের জন্য আর একটা বিভাগ খোলা হল—'বিবিধভারতী'। বোম্বাইয়ে আর মাদ্রাজে একটি করে দুটি হাই-পাওয়ার ট্রান্সমিটার 'বিবিধ ভারতী'র জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হল।

বোম্বাই আর মাদ্রাজ ছাড়া 'বিবিধ ভারতী' এখন অন্য অনেক কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হচ্ছে। কলকাতা থেকেও। কলকাতা থেকে অনেক দিন ধরেই 'বিবিধ ভারতী' প্রচারিত হচ্ছে। এখন চলছে 'বিবিধ ভারতীর বিজ্ঞাপন কার্যক্রম'।

আবার যথারীতি রম্যগীতির অনুষ্ঠানও আছে। কিন্তু রম্যগীতির সে টান কই? মাঝে কলকাতার রম্যগীতি যে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পেরেছিল তা-ও যেন এখন নেই। এখন কোনমতে ধরাবাঁধা পথে কাজ চলছে। দায় সারা হচ্ছে। 'এ মাসের গানকে' এই অনুষ্ঠানে চালান করা হচ্ছে। তাহলে এই অনুষ্ঠানটি রেখে লাভ কী? এত বছর পরেও যদি কলকাতার মতো কেন্দ্রে রম্যগীতি অনুষ্ঠানে নতুন নতুন ভালো ভালো গান শোনা না যায় তাহলে অকারণে এই অনুষ্ঠানটিকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

যে রম্যগীতির ব্যর্থতার জন্য 'বিবিধ ভারতী'র জন্ম, সে তো বিশেষ করে হিন্দী রম্যগীতি। 'বিবিধ ভারতী' মানে তো 'হিন্দী ভারতী'। 'বিবিধ ভারতী'তে তো হিন্দী ফিল্মী গানই বাজে প্রায় সারাক্ষণ। বাংলা গান অবশ্য এখন শোনা যাচ্ছে ছিটেফোটা। কিন্তু আসল বাংলা ফিল্মী গানের অনুষ্ঠান রবিবারের আধ ঘণ্টার ছায়াছবির গানের আসর। সারা সপ্তাহের সবেধন নীলমণি এই আসরটি আবার মাঝে মাঝে কারণে-অকারণে কোতল হয়ে যায়। তাহলে শ্রোতারা ফিল্মী ধরনের হালকা বাংলা গান শুনতে যাবেন কোথায়? শ্রোতাদের অনেক অনুরোধ-উপরোধ আর কাগজে লেখালেখি সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ ছায়াছবির গানের সময় বাড়াতে রাজী নন। সপ্তাহে আর একটা দিন এই আসর প্রচার করতেও ইচ্ছুক নন। তাহলে রম্যগীতির অনুষ্ঠানটিকে অন্তত একটু জাগিয়ে তোলা হোক! এর প্রতি একটু দৃষ্টি দেওয়া হোক! এতে একটু প্রাণ সঞ্চার করা যাক না কেন!

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

১৫ ডিসেম্বর সকাল ৮টায় লোকগীতি শোনালেন শ্রীবুদ্ধদেব রায় ও তাঁর সহ-শিল্পিবৃন্দ। লোকগীতি পরিবেশনে এই শিল্পিগোষ্ঠী ইতিমধ্যেই বেতারে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। লোকগীতির প্রতি এ'দের আন্তরিকতা আর দরদই হল বড়ো কথা। এদিনের অনুষ্ঠানে তা সম্যকরূপেই পাওয়া গেছে।

২০ ডিসেম্বর রাত ৮টায় বিচিত্রায় শীতের কলকাতার একটা চিত্র পাওয়া গেল। চিত্রটা কলকাতাবাসী অনেকেরই দেখা, তবু নতুন করে বিচিত্রার মধ্যে দিয়ে দেখতে ভালো লাগল। প্রযোজক শ্রীআশিসতরু মুখোপাধ্যায় এই চিত্র পরিবেশনে নিষ্ঠার পরিচয়ই দিয়েছেন।

২৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ছোটোদের আসরে 'ভারতের ইতিহাসে বীর যোদ্ধা' এই পর্যায়ে পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিং সম্পর্কে বললেন শ্রীহেমেন্দ্র বসু রায় চৌধুরী। বেশ লাগল। ইতিহাসের পাতা থেকে নিষ্ঠাভরে অনেক কথাই তুলে এনে তিনি শ্রোতাদের শোনালেন। কিন্তু ঐ যে বললেন, "...এজন্য এদেশের নাম হয়েছে পাঞ্জাব বা পঞ্চনদ"—কথাটা কি ঠিক? দেশটার নাম কি সত্যিই পাঞ্জাব? ঐ দেশের লোকেরা কিন্তু তাদের দেশকে পঞ্জাব বলে জানে, পাঞ্জাব বলে নয়। বাঙালীরা ছাড়া আর কেউ-ই বোধ হয় ঐ দেশটাকে পাঞ্জাব বলে না।

আর, তিনি যে মারাঠা বললেন, এটাও আসলে মারাঠা নয়—মরাঠা।

এই কথিকাটির শেষে পরিচালক বক্তার নাম ঘোষণার সময় যে ক্ষুদ্র পরিশিষ্ট যোগ করলেন, তাতে বললেন, "বড়ো হয়ে তোমরা সব জানবে, পড়বে..." ইত্যাদি। এই কথাগুলি বলার কি খুব দরকার আছে? এতে কি কোনো কাজ হয়? অথচ এই ধরনের প্রায় প্রতিটি কথিকার শেষে এই জাতীয় কথা শোনা যায়। এতে কোনো উদ্দেশ্য সাধন তো হয়ই না বরং যেন কিছুটা রসহানি হয়, একঘেয়ে লাগে।

এই আসরে সেতার বাজিয়ে শোনাল ছোট্ট শিল্পী শাশ্বতী ঘোষ। বেশ সুন্দর লাগল। ধৈর্য ধরে সাধনা করে যেতে পারলে এককালে নামী শিল্পী হতে পারবে বলেই বিশ্বাস। ...পরে রবীন্দ্রসংগীত গাইল আর এক ছোট্ট শিল্পী শ্যামলী রায়। মন্দ লাগল না। কিন্তু এখনই আরও অনুশীলনের দরকার আছে বলে মনে হল।

২৪ ডিসেম্বর সকাল ৮টায় লোকগীতি শোনালেন শ্রীঅমলকৃষ্ণ পাল। ভালো লাগল। লোকগীতির মেজাজটা ছিল।

এইদিন বেলা ১২টা ৫০ মিনিটে দিল্লীর বাংলা খবরের একটা বাক্যের অংশ, "...সব সদস্যরা উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন।"... কী চমৎকার বাংলা! মনে হচ্ছে না, 'আ মরি বাংলা ভাষা'? সত্যি, কী করে যে এ'রা এখনও টিকে আছেন, ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

রাত ৮টায় যুবগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে শোনা গেল যুবজীবনে গান্ধীজীর প্রভাব সম্পর্কে তরুণ-তরুণীদের একটি আলোচনা। পরিচালনা করলেন শ্রীমোহিত রায়। এই আলোচনায় যেটা বেশি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করল, সেটা হচ্ছে একটি বিরুদ্ধ মতের প্রকাশ। এই ধরনের আলোচনায় প্রায় সকলেই গান্ধীজীর প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে থাকেন, এবং এটাই এখন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিনের আলোচনায় একজন তরুণ যেন এই রেওয়াজ ভাঙলেন। তিনি নিঃসঙ্কোচে জানালেন, গান্ধীজী সামগ্রিকভাবে তাঁকে আকৃষ্ট করলেও তাঁর একটি পথ তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি।

সমগ্র আলোচনাটি থেকে আধুনিক তরুণ-তরুণীদের জীবনে গান্ধীজীর প্রভাবের কথা মোটামুটিভাবে জানা গেলেও অনুষ্ঠানটি তেমন চিত্তাকর্ষী হতে পারেনি। তার সবচেয়ে বড়ো কারণ বোধহয় স্ক্রিপ্ট পড়ার ভঙ্গি আর লেখা ভাষা। আলোচনায় সাধারণ কথাবার্তার ভঙ্গি আর কথ্য ভাষাই তো ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

—শ্রবণক

সুরের সুরধুনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

কলকাতার বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ ও সংগীতরসিক গোবরবাবু প্রসিদ্ধ গুহ-পরিবারের অন্যতম প্রতিভূ। এই পরিবারের একটি শাখা উত্তর কলকাতার পাথুরিয়া-ঘাটার নিকটবর্তী কোন স্থানে ভদ্রাসন স্থাপন করেছিলেন। গোবরবাবুর ন্যায় এঁরাও (অম্বিকা গুহ, ক্ষেত্র গুহ প্রভৃতি) উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সঙ্গীতের সেবায় এঁরা অনেক অর্থব্যয়ও করেছেন; এঁদের বাড়ীর একটি জলসাতেই নিমন্ত্রিত হয়ে ক্ষিতীশ লাহিড়ীর সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে সমঝদার ব্যতীত কোন আগন্তুক উপস্থিত ছিলেন না। সেদিন এক আসরে সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী নানা গুণীর যন্ত্রসঙ্গীত শ্রবণের সুযোগলাভ আমি করেছিলাম। ১৯২৮ খৃঃ কলকাতায় এখনকার দিনের মত ছোট-বড় অসংখ্য সঙ্গীত সম্মেলনের রেওয়াজ গড়ে ওঠেনি। তখন গুণগ্রাহী ধনীদের গৃহেই সঙ্গীতের নানা বিচিত্র অনুষ্ঠানের নিয়মিত ব্যবস্থা ছিল। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন হরেন শীল, নাটোরের মহারাজা, ঠাকুর মহারাজা, গুহ পরিবারের সৌখিনরা ও আমাদের শ্রেণীর জমিদাররা নিজ নিজ বাড়ীর বৈঠকখানায় কিম্বা বাগানবাড়ীতে উপযুক্ত পরিবেশে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী কলাকারদের সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। এই-সব ক্ষেত্রে সমঝদার ব্যতীত শ্রোতাদের ভিড় হতো না, এবং সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনের কোন প্রশ্নই কারো মনে উদিত হতো না। চারুকলার উপভোগের জন্য প্রতি কলাবিদ্যার সম্বন্ধে খানিকটা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এইসব স্বতঃসিদ্ধ কথা বর্তমানে যুক্তিতর্কের সাহায্যে বোঝানোর প্রয়োজনীয়তা পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। কিন্তু পূর্বে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রসিকরাই সঙ্গীতানুষ্ঠানে ব্রতী থাকতেন। এরূপ পরিবেশ গুহদের বাড়ীতে আমি পেয়ে-ছিলাম এবং সেদিনকার সান্ধ্য অনুষ্ঠানে তাই আমীর খাঁ (স্বরোদী), এনায়েৎ খাঁ (সেতারী), হাফিজ আলী (স্বরোদী) ও প্রবীণ কলাকার স্বরোদী কেরামৎউল্লা খাঁর যন্ত্রসঙ্গীতের আসর যথেষ্ট জমে উঠেছিল।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে আসর শুরু হোল। প্রথমতঃ আমীর খাঁ সাহেব তাঁর ঘরাণার ইমন রাগে আলাপ শুরু করলেন, আলাপের পর গৎকারীতেও তাঁর প্রিয় ইমন-কেদারা বাজাবার পর খাম্বাজের ঠুংরী গতে তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করলেন। আমীর খাঁর বাজনা রাগের বিশুদ্ধি, তালের নিখুঁৎ লয়কারী এবং ঠোক্‌ঝালা ও পড়নে চির-দিনই হৃদয়গ্রাহী ছিল। তিনি তাঁর পিতার গুরু দ্বারভাঙ্গার মোরাদ আলী খাঁ সাহেবের স্বরোদ ঘরাণার তালিম যথেষ্ট আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর পিতা আমদল্লা খাঁ বিলম্বিত আলাপে বিস্তারের কাজে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন; স্বরোদেই তিনি সাধ্যমত সুরশৃঙ্গারের অনু-করণ করতেন। এবং বড় বড় রাগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাগের বহুমুখী প্রসার দেখাতে পারতেন। কিন্তু বাতের প্রকোপে জোড় ও দ্রুত অঙ্গে বেশীক্ষণ বাজানো তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হতো না। আমীর খাঁ আমাকে বলেছেন যে, মোরাদ আলী খাঁ সাহেব বিলম্বিত, জোড়, ঠোক্‌ঝালা, তারপড়ন ও গৎকারীতে সমান সুদক্ষ ছিলেন। আমীর খাঁ মোরাদ আলীর নিকটেই শিক্ষালাভ করেছেন—তবে তাঁর প্রথম যৌবনে মোরাদ আলীর দেহান্ত হওয়ায় আমীর খাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারেনি। তথাপি তিনি মোরাদ আলীর সব অঙ্গের কাজই খানিকটা দেখাতে পারতেন। আমীর আমাকে স্পষ্ট-রূপে বলেছেন যে, মোরাদ আলীর পিতা গোলাম আলী খাঁ গোয়ালিয়রে স্বরোদ যন্ত্রের প্রধান প্রতিভূরূপে দরবারে স্থান পান। হোসেন খাঁ, মোরাদ আলী খাঁ ও হাফিজ আলীর পিতা নান্নে খাঁ, (গোলাম আলীর তিন পুত্র) এঁদের মধ্যে হোসেন খাঁ, ভারতের বিখ্যাত সুরবাহার বাদক গোলাম মহম্মদ খাঁর কাছে নাড়া বেঁধে সেনী ঘরের আলাপ শিক্ষা করেন এবং অধিকাংশ সময়েই স্বরোদের পরিবর্তে সুরচয়ন যন্ত্র বাজাতেন। দ্বিতীয় পুত্র মোরাদ আলী খাঁ স্বরোদ যন্ত্রেই সুরশৃং-গারের অনুকরণ করতেন এবং এজন্য সেনী ঘরের নাড়া না বাঁধলেও উজির খাঁর পিতা আমীর খাঁ বীণকারের সাহচর্যে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলেন। কনিষ্ঠ নান্নে খাঁ গোলাম আলীর শিক্ষা অনুযায়ীই বাজা-তেন; তাঁর বাজনা যথেষ্ট পরিষ্কার ও দ্রুত ছিল এবং তবলা ও পাখোয়াজের সঙ্গতে বহু প্রকার তালের লয়কারীতে তাঁর তুল্য স্বরোদী তখন খুব কমই ছিল। আলাপ অঙ্গে হাফিজ আলী খাঁ সাহেবের সুরবিহার বাল্যকালে গোয়ালিয়রের সেনী গুণী আমীর খাঁ সেতারী ও পরে রামপুরে তাঁর শ্বশুরালয়ে অবস্থানের সময়ে উজির খাঁ সাহেবের নিকট দীক্ষা ও শিক্ষালাভেরই ফলস্বরূপ। আমীর খাঁ একথাটি সর্বদাই বলতেন যে তাঁদের পূর্বাচার্যদের একটি প্রধান আদর্শ ছিল এই যে আলাপের সময় কদাপি খেয়ালের গিটকারি ও তান বা ঠুমরীর মুর্কি ও ফান্দার প্রয়োগ যেন না ঘটে; ধ্রুপদ অঙ্গেও স্বরমাধুর্যের কোন অভাব নেই। অবশ্য এই শিক্ষা ও আদর্শ যাঁরা অনুসরণ করেছেন, তাঁরা সবাই তান-সেন ঘরাণায় দীক্ষিত বা শিক্ষিত কলাকার। আমীর খাঁর বাজনায় সরসতা ও বিশুদ্ধি উভয়ই পরিলক্ষিত হতো; এজন্য অন্যান্য ওস্তাদরা তাঁকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। তাছাড়া তিনি এত বিনয়ী ও অমায়িক ছিলেন যে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত বিরোধ কখনো কারুর ঘটেনি। আমীর খাঁর বাজনা শেষ হলে, তাঁরই গুরু-ঘরের বিখ্যাত ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ সাহেব যন্ত্র ধরলেন। তিনি প্রথমতঃ তাঁর প্রধান গুরু উজির খাঁ সাহেবের শিক্ষানুযায়ী দরবারী কানাড়া ও তিলক কামোদ বাজালেন। সুরশৃংগারের সম্পূর্ণ আঙ্গিক এই পদ্ধতির মাধুর্যে প্রসারিত করে দিলেন। মুদারার নিখাদ থেকে তারার 'সা'তে ঘর্ষণের দ্বারা তিনি যখন তারা গ্রামের সুরগুলি ক্রমে ক্রমে 'রা' বোল দ্বারা প্রকাশ করতেন,—তাঁর সেই বাজনার কোনো তুলনা ছিল না। যাঁরা জ্ঞান গোস্বামীর গান শুনেছেন, তাঁরা জানেন যে জ্ঞান গোস্বামী যখন তারা গ্রামের 'সা'তে দাঁড়াতেন, তখন তাঁর সুরের রেশে, সমগ্র পরিবেশ এক অপূর্ব রস সঞ্চারে মানুষের চিত্ত মোহবিষ্ট করে তুলত। হাফিজ আলীর স্বরোদ সম্পর্কেও ঐ কথা খাটে। অতীতের ফিদা হোসেন ও বর্তমানে আলী আকবর সুরেলা স্বরোদীদের শীর্ষ স্থানীয়। তবু এঁদের হাতে ঘাসিটের দ্বারা তারা গ্রামে গিয়ে দাঁড়ানোর সেই মাধুর্য কখনো শুনিনি। হাফিজ আলীর আগাগোড়া বাজনাই নখের ঘর্ষণের ফলে এক অপূর্ব রসাপ্লুতায় পূর্ণ থাকতো। বিলম্বিতের পর মধ্য, দ্রুত জোড় এবং ঝালায় হাফিজ আলী এক অপার্থিব মাদুর সৃষ্টি করতে পারতেন। তখনকার দিনে তিনি প্রায়ই রাগের আলাপ আধ ঘণ্টায় শেষ করতেন। ঝালার পূর্বে বাঁ হাতে কৃন্তন ও ডান হাতে জবার দ্রুত প্রয়োগ তিনি এক ধরনের দ্রুত জোড় বাজাতেন,—যা অন্য কোন স্বরোদীর হাতে শুনিনি। এই দ্রুত তান তাঁর পুত্রেরাও বাজাতে পারে না। হাফিজ আলী আমাকে বলেছেন যে, প্রথম যৌবনে গোয়ালিয়রে সেনী ঘরাণার বিখ্যাত সেতারী আমীর খাঁর বাজনা ক্রমাগত শোনবার ফলে স্বরোদে এই দ্রুত তান বাজানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। বস্তুতঃ এটা সেতারেরই অনুকরণ।

তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে ওস্তাদ আলি আকবর এবং ইমরাৎ খান

জলসা

তানসেন সংগীত সম্মেলন

সর্বভারতীয় তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্বোধন সভায় সংঘসচিব শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংঘের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের প্রচার ও জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীসমন্বয়ে বাৎসরিক সঙ্গীত সম্মেলনের অবতারণা ছাড়াও তানসেন মিউজিক কলেজ, তানসেন সঙ্গীত সঙ্ঘ পরিচালিত ব্যাপক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, কাউন্সিল ফর প্রমোশন অফ ইণ্ডিয়ান ক্লাসিকল মিউজিক সংস্থার মাধ্যমে মহাজাতি সদনের সেমিনার হলে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের নিয়মিত একটি আনুষ্ঠানিক ধারাবাহিক মাসিক সঙ্গীতানুষ্ঠান ইত্যাদি পঞ্চমুখী পরিকল্পনা দ্বারা উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের অনুশীলনী ও প্রসারতার চেষ্টায় সঙ্ঘ-সভ্যেরা ব্রতী বলে জানালেন। কলকাতার আশপাশের শহরতলী এলাকায় সঙ্গীতপিপাসু শিক্ষার্থীরা যাতে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পান সেই উদ্দেশ্যে মধ্যমগ্রামে তানসেন কলেজের একটি শাখা খোলা হয়েছে। প্রবেশপত্র কেনার সঙ্গতিহীন ছাত্রছাত্রীদের বিনা দক্ষিণায় সঙ্গীত সম্মেলনের অনুষ্ঠান শোনার ছাড়পত্র দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর প্রায় সকল শিল্পীই তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের পরিবেশন তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। যন্ত্রসঙ্গীতে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ, ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কণ্ঠসঙ্গীতে ওস্তাদ আমীর খাঁ, সঙ্গীত-অলঙ্কার সুনন্দা পট্টনায়ক ছাড়াও বহু প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী এবং উদীয়মান শিল্পীকে কর্মকর্তারা সঙ্গীতানুরাগী শ্রোতাদের উপহার দিয়েছেন। ধ্রুপদাঙ্গের সঙ্গীত পরিবেশনার ব্যবস্থাও ছিল। "বেদসঙ্গীত" দিয়ে সঙ্গীতাসর শুরু হয়। তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে এবারেই সর্বপ্রথম এক উজ্জ্বল সংযোজন হোল বেলা ১২টা থেকে শুরু করে রাত সাড়ে ৯টা অবধি সারাদিন ও সন্ধ্যাব্যাপী এক আসরের আয়োজন। আজকাল সঙ্গীত সম্মেলনগুলি সাধারণত সন্ধ্যা ও রাত্রের মধ্যে আসর সীমিত হওয়ায় দিনের রাগ প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছে। এই আসরে আবার বহুদিন বাদে দ্বিপ্রাহরিক রাগ শোনা গেল এবং এই ধরনের সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকলে ভবিষ্যতেও শোনা যাবে বলে আশা করা যায়। সারাদিনের আসরে দুই তরুণ শিল্পী সুস্মিতা মিত্র এবং জয়ন্তী রায়চৌধুরীর কথক নৃত্য এবং খেয়াল প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। প্রবীণ শিল্পী শ্রীশ্যাম গাঙ্গুলী 'নট-বিলাবল' রাগে সরোদ বাজিয়ে শোনান। দুটি রাগের আরোহী অবরোহী মিলন শুদ্ধ স্বর ও কোমল নিখাদের পরিমিত সুন্দর প্রয়োগে শিল্পীর অভিজ্ঞতাজাত পরিণতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর ছিল। তানের অঙ্গ উপভোগ্য। শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "ভীমপলশ্রী" জমে উঠেছিলো তাঁর গাইবার আন্তরিকতায়। "টপ্পা" দিয়ে ইনি অনুষ্ঠান শেষ করলেন। পঞ্জাব ও বাংলার সম্মিলিত অবদানসমৃদ্ধ টপ্পা বিশেষ এক মজলিশী পরিবেশ সৃষ্টি করে শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছে।

বাংলার প্রথিতযশা সেতারী বলরাম পাঠকের বাজনা, আর একবার তাঁর বাঁ-হাতের কারিগরী সম্বন্ধে শ্রোতাদের অবহিত করেছে। ইনি বাজান "হংস-কিঙ্কিনী"। রেখাব-বর্জিত এই রাগের দুটি গান্ধার ও নিখাদের প্রয়োগসৌন্দর্য লক্ষ্য করবার মত। ডানহাতের বাজ আর একটু জোরালো হলে সম্মেলনে প্রতিষ্ঠিত হতে ওঁর দেরী হবে না। এ আসরের সর্বশেষ শিল্পী ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ। সন্ধ্যা ও দিনের সন্ধিকালে ইমন ধরেন তাঁর একা শিল্পীর নিজস্ব ভঙ্গী মীড়, সাপট তান এবং অন্যান্য অলংকারের অনবদ্য আবেদন সম্বন্ধে নতুন করে বলবার কিছু নেই। কিন্তু সম্মেলনের এই রাগের অতি কোমল রেখাবের শ্রুতির নিজস্ব যে একটি বিশেষ মাধুর্য, তার অভাবে ওয়াকিবহাল শ্রোতাদের একটু ক্ষুণ্ণ করেছে। সমাপ্তির ঠুংরী অঙ্গ স্বরপরিসরেও তাঁর রঙিন মনটি মেলে ধরতে পেরেছে। কণ্ঠসঙ্গীতের আসরে আমীর খাঁ সাহেবের "বাগেশ্রী কানাড়া" সুবিখ্যাত বোল "গড় গড় মো" নিজস্ব আকর্ষণে শ্রোতাদের মনোযোগ করলেও শিল্পীমনের যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে "আড়ানা" ও "বিরাগী ভৈঁরো"তে। খাঁ সাহেবের আত্মসমাহিত ধ্যান, ভাবগাম্ভীর্য ও আরাধনার সাত্ত্বিকতায় এ অনুষ্ঠান যেন এক পুণ্যলগ্ন হয়ে উঠেছিল। বারবার মনে হয়েছে কণ্ঠের সীমাবদ্ধতা এবং তানের বৈচিত্র্য ছাড়াও যে শিল্পী শ্রোতাদের এমন আবিষ্ট করে রাখতে পারেন কি বিস্ময়কর তাঁর গহনসঞ্চারী শক্তি। সুনন্দা পট্টনায়ক সঙ্গীতানন্দিন খাঁর বিশেষ অনুরোধে সদারঙ্গ সম্মেলনে গাওয়া স্বরচিত রাগ "সুবর্ণ-মুখী" গেয়ে শোনান। তিনটি সপ্তকে কণ্ঠের অসাধারণ বিস্তার, রকমারী তানের বাহার, ধ্রুপদী বিস্তার তারানা সর্বোপরি পরমাত্মার চরণে আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতা তাঁর অনুষ্ঠানকে যথোচিত মর্যাদামণ্ডিত করেছে। কিন্তু পাশাপাশি দুটি সম্মেলনে একই রাগ পরিবেশনা, (যে কারণেই হোক) আমরা ক্ষমা করতে পারিনি এবং এটা অত্যন্ত অনুচিত বলেই মনে করি। শিল্পীর

ভজনের খ্যাতি তো ভারতবিখ্যাত, এ নিয়ে আর কি বলব? মানিক বর্মা দুদিনের অনুষ্ঠানে 'শ্যামকল্যাণ', 'দেশ' ও 'ঠুংরী' পরিবেশন করেন। রাগশুদ্ধতা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্য ইনি দেখাতে পারেননি। সংগীতাচার্য শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাগেশ্রী" রাগে খেয়াল ও তারাণায় লয়ের বিভিন্ন কাজ ছাড়াও আলাপ ও সুরের বিস্তার প্রদর্শনে সঙ্গীত-শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় বহু বিষয় ছিল। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় "মালকোষ" রাগে খেয়াল ও পরে ঠুংরী গেয়ে শোনান। খেয়ালের বিলম্বিত অঙ্গের বিস্তারে বোলতানে এবং রাগ উন্মোচনে ইনি অগ্রগতি এবং ক্রমোন্মেষিত পরিণত শিল্প-বোধের প্রকাশ সত্যিই আনন্দদায়ক।

আরতি মুখোপাধ্যায় গীত "শুদ্ধ-কল্যাণ" রাগে খেয়াল ও তারাণায় শিক্ষা ও অনুশীলনীর স্বাক্ষর ন্যায্য প্রশংসা আদায় করে নিয়েছে। তপতী সরকারের আলাপ ও ধ্রুপদ এবং শচীন সাহার খেয়াল সুশিক্ষাজাত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, উপরোক্ত তিনজনই তানসেন মিউজিক কলেজ তথা শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য ও শিষ্যা। ওস্তাদ নিসার হোসেনের পুত্র হাফিজ আহামদ খাঁর দুদিনের অনুষ্ঠানে বেহাগ দরবারী কানাড়াতে পিতার গায়কীর প্রশংসাযোগ্য আভাস পাওয়া গেল। তারাণায় উর্দু কবিতার বিস্তার এক নতুনত্ব। অবশ্য এ নতুনত্ব কতটা রসসৃষ্টি করতে পেরেছে বা আদৌ পেরেছে কিনা সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। যন্ত্রসংগীতের এমন চিত্তহারী সমন্বয় বহুদিন দেখা যায়নি। পণ্ডিত রবিশঙ্কর ছাড়া ভারতীয় যন্ত্রসংগীতের প্রায় সকল উজ্জ্বল তারকাই এ বিষয়ের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছেন। ওস্তাদ আলি আকবর, ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ, পদ্মশ্রী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও শ্যাম গাঙ্গুলী, বলরাম পাঠক, বিমল মুখোপাধ্যায়, ইমরাৎ খাঁ, কল্যাণী রায়, আলি আহমেদ খাঁ, রবীন ঘোষ এবং অনেক প্রবীণ ও নবীনের সমন্বয় আনন্দের নিশ্চয়। ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ প্রথমদিন 'মারবা' রাগে আলাপের পর মালাগোরী মাঝখাম্বাজ ও শোভাবতী রাগে গৎ বাজিয়ে শোনান। শেষোক্ত রাগ গুরু আলাউদ্দিনের অন্যতম সৃষ্টি।

"মারবা"র আলাপে ভক্তিভাব ও "সা"-এর সাসপেন্স খাঁ সাহেবের স্বভাবজাত শিল্পকৌশলে প্রদর্শিত। মালাগোরী ও মারবা একই ঠাটে এবং মাঝখাম্বাজ ও শোভাবতীও তদ্রূপ। কাজেই অবশ্যম্ভাবী একঘেয়েমোর হাত আলি আকবর খাঁ সাহেবের মত শিল্পীও এড়াতে পারেননি। ছন্দ ও লয়কারীর পাণ্ডিত্য সশ্রদ্ধ স্মরণীয়। কিন্তু রসের অভাব শ্রোতাদের কিছু ক্ষুন্ন করেছে। হয়ত এ সম্বন্ধে শিল্পীও অবহিত ছিলেন। তাই দ্বিতীয় দিনের বাজনায় অকৃপণ ধারায় এ অতৃপ্ত ক্ষোভ তিনি মিটিয়ে দিয়েছেন। "দরবারী কানাড়া" রাগের আলাপ সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যেও রাগের অন্তর্নিহিত রুদ্ধ বেদনা ও

তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে
ওস্তাদ বিলায়েত খান

রাজকীয় মর্যাদাকে এক ভাবগম্ভীর রূপদান করেছে। বিশেষ জোড়, জোড়, ঝাড়্‌লাপেট ও ঠোকঝালার অপরূপ ধ্বনি-সংহতি অন্তরের গভীরে যেন ধাক্কা দেয়। কণ্ঠসঙ্গীতে স্বর্গত ফৈয়াজ খাঁ সাহেব এবং যন্ত্রে আলি আকবরের 'দরবারী কানাড়া'র কিংবদন্তীতুল্য ঐতিহ্য সেদিনের হজনা যেন নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। স্ব-সৃষ্ট রাগ চন্দ্রনন্দনের ভক্তি, রোমান্স ও বেদনা সারা প্রেক্ষাগৃহে অনুরণিত হয়। ভাব, সুর ও লয়ের যাদুকর আলি আকবর সেদিন যেন নতুন করে জেগে উঠেছিলেন। তবে বিশেষ অনুরোধে বাজানো মান্দর ওপর ঠুংরি সেদিনের উচ্চগ্রামী ভাবের সঙ্গে সংগতি রাখতে পারেনি।

ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ দ্বিতীয় দিনে বজান স্ব-রচিত রাগ "মান্দভৈরো"। ঠুংরী অঙ্গের 'মান্দ' ইনি খেয়াল অঙ্গে বাজিয়ে শোনান বলে জানান। রাজপুতানার লোক-সংগীতভিত্তিক 'মান্দ' রাগের গৎ ও বিস্তার সৃষ্টি করে যোধপুরের দরবারে ইনাম পেয়েছিলেন আলি আকবর খাঁ। তারপর ক্রমাগত বাজিয়ে এবং গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করেও এ রাগ তিনি জনপ্রিয় করে তুলেছেন। অবশ্য ঠুংরী অঙ্গেই। এ রাগের একটা চিত্রসৌন্দর্য অবশ্যই আছে তবে তা ঠিক 'ধ্রুপদী' নয়। 'ভৈরব' রাগ ধ্রুপদী গাম্ভীর্যমণ্ডিত মহাদেবস্তুতি। তাই এই দুই বিভিন্ন রসাত্মক রাগ স্বাভাবিক কারণেই রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি। যেটুকু উপভোগ্য সেটা বিলায়েত খাঁ সাহেবের হাতের যাদুতে সৃষ্ট সুরের মায়াজাল।

বিলায়েত পুত্র সুজাদ খাঁ স্বল্পকালের বাজনায় চাইল্ড-প্রজিডির এক উজ্জ্বল উদাহরণ পেশ করেন। এনায়েৎ খাঁ ঘরাণার দুই শিল্পী ইমরাৎ খাঁ ও কল্যাণী রায় উভয়েই ঘরাণার বিশ্বস্ত অনুসারী হয়েও আপনাপন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

ইমরাৎ খাঁ অসাধারণ তৈরী ও দুঃসাধ্য রেওয়াজ-জাত তান ও ঝালা প্রদর্শনে ব্রতী হয়েছেন। কল্যাণী রায়ের "মালগুঞ্জি" শান্ত করুণ ভাবের আলেখ্য মেলে ধরেছে। 'জয়জয়ন্তী' এবং অন্যান্য কাছাকাছি রাগের থেকে বাঁচিয়ে রাগের শুদ্ধতা রক্ষা প্রশংসা করবার মত। বিশেষ সাপট তানের সময়ে তার 'পিলু' অঙ্গের ঠুংরী মনোহারী।

বেহালায় রবীন ঘোষের "পূরিয়া কল্যাণ" রাগশুদ্ধতা ও দীর্ঘ তেহাইযুক্ত তানে উপভোগ্য হয়। পদ্মশ্রী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় 'রাগেশ্রী' রাগের আলাপ ও আলাউদ্দিন খাঁ সৃষ্ট "হেমন্ত" রাগে গৎ বাজান। ধ্রুপদাঙ্গের পূর্ণ আলাপে ঘরাণার ঐতিহ্য ও ধ্যানের তন্ময়তার কোথাও কোন খাদ ছিল না। হেমন্ত রাগে বিস্তার, বোলতান এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তেহাই ও মীড়ের অনবদ্য কারুকার্য করতালির অভিনন্দন পেয়েছে। মূলত আলাউদ্দিন ঘরাণভিত্তিক হলেও অন্যান্য ঘরাণার 'বাদনশৈলী' বিদ্যুদ্দীপ্তের মত ঝলকে তার অসাধারণ স্বীকরণ ও সৃষ্টির নিদর্শন মেলে ধরেছে। বিমল মুখোপাধ্যায়ের সেতার আমরা শুনতে পারিনি। তবে তাঁর বাজানো 'বেহাগ'-এর খ্যাতি লোকপরম্পরায় কানে এসে পৌঁছেছে। তরুণ সানাইবাদক আলি আহমেদ খাঁর 'পূরিয়া ধানেশ্রী'র শান্ত কোমল রূপ শিল্পীর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমাদের নিঃসংশয় করেছে। কানাই দত্তর একক তবলা লহরার বোল, গৎ, পেশকার, কায়দা ও রেহাই খুবই প্রাণবন্ত হয়।

সংগতের মধ্যে তবলায় কেরামৎ খাঁ, কানাই দত্ত, শঙ্কর ঘোষ, মহাপুরুষ মিশ্র, শ্যামল বসু, অনিল ভট্টাচার্য, শঙ্খ চ্যাটার্জি, নানকু মহারাজ, সারেঙ্গীতে সগীরউদ্দিন ছাড়ও লচ্ছন খাঁ, রামনাথ মিশ্র এবং আরো অনেকে আপনাপন ক্ষমতানুযায়ী দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। এবারে আলি আকবর খাঁর নতুন অবদান তরুণ তবলাবাদক স্বপন চৌধুরী বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন এক প্রতিশ্রুতি। বাঁয়ার কাজে আর একটু অনুশীলন করলে এবং রেওয়াজে অবিচলিত থাকলে উন্নতমানে পৌঁছতে এঁর অল্পই সময় লাগবে।

ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের উৎসব

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্যুরিস্ট বিভাগের উদ্যোগে ২৫ ডিসেম্বর রবীন্দ্রসদনে সন্ধ্যা ৬টায় লোকসংগীত ও নৃত্যের এক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছেন। ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের শিল্পীরা। অন্যানাবারের মত এবারেও তবলা, ঢোল ও খোলের এক বিশেষ অনুষ্ঠান "ড্রামস্ অফ্ ইণ্ডিয়া" শিরোনামায় পরিবেশন তালিকার অন্তর্ভুক্ত। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এ উৎসবের এক সুন্দর নাম দেওয়া হয়েছে "উইণ্টার ইজ্ দি সিজন অফ্ ক্যালকাটা"।

পোলিশ ছবি রেড অ্যান্ড গোল্ড

(৫) পরিচালক কারেল কাচনা চেকোস্লোভাকিয়ার ছবি **"দি ফানি ওল্ড ম্যান"**-এর জন্যে শ্রেষ্ঠ পরিচালনার পুরস্কার রৌপ্যনির্মিত ময়ূর লাভ করেছেন। একজন বৃদ্ধ হৃদরোগাক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আসে। সেখানে শল্য চিকিৎসা দ্বারা তার অকেজো হৃদপিণ্ডকে ফেলে দিয়ে অন্য তেজী হৃদপিণ্ড বসানো হয় (যাকে ইংরেজিতে 'হার্ট ট্রান্সপ্লান্টেশন বলে)। অনেক উৎকণ্ঠাপূর্ণ মুহূর্ত কেটে যাবার পরে রোগী ভালোর দিকে আসে। ক্রমে তাকে অল্প অল্প চলবার অনুমতি দেওয়া হয়। বৃদ্ধ চলতে চলতে হাসপাতালের এক জানলার সামনে এসে দাঁড়ায়। যেখান থেকে আকাশ ও বহির্জগতের প্রতি দৃষ্টিকে প্রসারিত করা চলে। বৃদ্ধ ঐ জানলার কাছে এসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে; হঠাৎ তার নজরে পড়ল দূরে একটি নীল গম্বুজওয়ালা বাড়ীর কাছের ছাদ থেকে একটি তরুণী কিছু কাপড়-জামা শুকুতে দেবার পরে এক ঝাঁক পায়রা উড়িয়ে দিল। এই দৃশ্য দেখে বৃদ্ধ যেন কেমন হয়ে গেল। একদিন, দুদিন, তিন দিন—রোজই একই দৃশ্য। বৃদ্ধ দেখে, আর দেখে, তন্ময় হয়ে দেখে। কিন্তু পরের দিন আর পায়রা উড়ল না, মেয়েটি ছাদেও এল না কাপড়-চোপড় শুকুতে দেবার জন্য। বৃদ্ধ চঞ্চল হয়ে উঠল, সে যেন দিশেহারা হয়ে গেল। সে জিজ্ঞেস করল জনে-জনে, ঐ যে দূরে গম্বুজওয়ালা বাড়ী, ওটা কোথায়; ওখানকার ছাদ থেকে পায়রা উড়তে কেউ দেখেছে কিনা। হদিস মেলে না। বৃদ্ধ শেষ পর্যন্ত অধীর হয়ে উঠল; ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বললেন, বৃদ্ধের চলা-ফেরা করা চলবে না, শয্যায় থাকতে হবে। কিন্তু তা কি হয়! সকলের অগোচরে বৃদ্ধ বেরুলেন, বাড়ীর সন্ধানে তরুণীটির সন্ধানে। বহু অন্বেষণের পরে বৃদ্ধ যখন তরুণীটির ঘরে পৌঁছুলেন, তখন দেখা গেল তরুণীটি আত্মহত্যা করে ভুলুণ্ঠিতা। বৃদ্ধও এ-দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না; হৃদয়ের অবস্থা তো খারাপই ছিল, বৃদ্ধও মৃত্যুপথযাত্রী হলেন। জানা গেল, তরুণীটি বৃদ্ধের একমাত্র কন্যা। বহুদিন আগে রাজনৈতিক অপরাধে পিতা ও কন্যা পরিত্যাগ করে; পরে অনুশোচনাদগ্ধ তরুণীটি আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হয়।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

তরুণী ও বৃদ্ধের অতীত বৃত্তান্ত ও সম্পর্ককে দর্শকদের কাছ থেকে গোপন রেখে তরুণীটি সম্পর্কে বৃদ্ধের উৎসাহকে দর্শকের চিত্তে 'অন্য দৃষ্টিকোণ' থেকে উদ্ঘাটিত করায় বৃদ্ধের কার্যকলাপকে দুর্বোধ্য ও কিছুটা হাস্যকর বলে বোধ হয়। পরিচালকের এই বিশেষ রীতি গ্রহণের ফলে সমস্ত ছবিটাতে একটা 'ক-জানি-কেন' গোছের পরিহাস-সুলভতা উৎসারিত হয় এবং এই রীতি জুরী সদস্যদের মুগ্ধ করেছে। কিন্তু যদি গোড়াতেই কন্যা ও পিতার মধ্যে বিবাদ ও বিচ্ছেদের দৃশ্যটি চিত্রিত হত এবং পরে কন্যার জন্যে পিতার মানসিক উদ্বেগ ও যন্ত্রণাকে রূপায়িত করা হত তাহলে আকস্মিকভাবে হাসপাতাল-জানালা থেকে তরুণী দ্বারা পায়রা উড়ানোর ঘটনা নিয়ে বৃদ্ধের চিত্ত-বিক্ষেপ অধিকতর মর্মাজ্ঞ ও অন্তরস্পর্শী হতো কিনা, তা বিশেষ চিন্তাসাপেক্ষ।

(৭) দি বেল্‌স্‌ অব ডেথ (হংকং) : ইয়ে ফাং পরিচালিত এই রঙীন ছবিটির উপজীব্য হচ্ছে প্রতিহিংসা। তিনটি দস্যু ওয়াই ফুর বাড়ীতে লুঠতরাজ করে তার সুন্দরী বোনকে নিয়ে চম্পট দেয়। বাধা দিতে গিয়ে ওর মা সাংঘাতিকভাবে আহত হন এবং ছেলের চোখের সামনে মারা যান।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

ওয়াই ফ্ প্রতিজ্ঞা করে, সে এই দুষ্কর্মের প্রতিশোধ নেবে। প্রতিশোধ সে নেয় মায়ের দেওয়া ঘণ্টা-গহনা গলায় পরে। কিন্তু যে-ভাবে সে শত্রুব্যূহের মধ্যে প্রবেশ ক'রে একের পর এক ঐ তিন দস্যুর প্রাণান্ত ঘটায়, তাতে মনে হয়, দৈবশক্তিতে বলীয়ান হয়েই সে অজেয় হয়ে উঠেছে। তার গললম্বিত অলংকারের ঘণ্টাধ্বনি শত্রুর পক্ষে অমঙ্গলের সূচকস্বরূপ। নায়কের কাণ্ডকারখানা হলিউডের নির্বাক যুগের বাহাদুর 'ডগলাস ফেয়ারব্যাংকস্'কে স্মরণ করিয়ে দেয়। মধ্যযুগীয় কাহিনীটির চিত্রণে জাপানী চলচ্চিত্রের প্রভাব স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

(৮) দি ড্যামড্ (ইতালী এবং আমেরিকা) : এই টেক্‌নিকলার ছবিটির কাহিনী ১৯৩৩-৩৫ সালে নাৎসী অভ্যুদয়-কালে জার্মানীর রুর অঞ্চলের একটি বৃহৎ ইস্পাত কারখানার মালিক পরিবারকে অবলম্বন ক'রে রচিত। পরিবারের বৃদ্ধ কর্তা এসেনবেক পরিবারস্থ দুজনের দাবিকে অস্বীকার ক'রে ফ্রেডেরিক বুকম্যানকে কারখানার কার্যনির্বাহক ডিরেক্টার পদে নিযুক্ত করেছেন; এতে তাঁর বিধবা পুত্রবধূ সুন্দরী সোফিয়া অত্যন্ত খুসী; কারণ, তাঁর গোপন ইচ্ছা, একদিন তিনি তাঁর প্রণয়ী ফ্রেডেরিককে বিবাহ ক'রে তাকেই এই পরিবারের সর্বেসর্বা করবেন। কিন্তু বৃদ্ধের ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যারণ কনস্ট্যানটিন প্রবল প্রতিপক্ষরূপে এ-ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি নিজে কারখানাটিকে গ্রাস ক'রে তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান গুন্থারের পথ পরিষ্কার রাখতে চান। নাৎসী এস্-এ কোরের অফিসার কনস্টানটিন আরও চান যে, কারখানাটি পুরোপুরিভাবে যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করুক। বৃদ্ধ জোয়াচিম ভন্ এসেনবেক-এর জন্মদিনের ভোজসভার দৃশ্য দিয়ে ছবিটির আরম্ভ। এই ভোজসভায় বৃদ্ধের জ্ঞাতিভাই আস্কেনবেকও যোগ দিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন হিমলারের নাৎসী এস্-এস্ বাহিনীর একজন সদস্য এবং একটি রহস্যপূর্ণ চরিত্র।

ভোজসভা যখন চলছে, তখন হঠাৎ খবর এল, বার্লিনের রাইখ্‌স্টাগে (ব্যবস্থাপক সভায়) অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এর অর্থ হিটলার জার্মানী অধিকারে তৎপর হয়ে উঠেছেন, এই সত্য অনুভব করা মাত্র আস্কেনবেগ ফ্রেডেরিককে সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হ'তে উৎসাহিত করলেন। সোফিয়ার কাছ থেকে এ-ব্যাপারে সমর্থন পেয়ে ফ্রেডেরিক সেই রাত্রেই বৃদ্ধ এসেনবেককে গোপনে গুলী দ্বারা হত্যা করলেন এবং অন্যের স্কন্ধে দোষ চাপালেন। সোফিয়ার প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র মার্টিন মায়ের অনুরোধে ফ্রেডেরিককেই তাঁদের কারখানার সর্বময় কর্তা নিয়োগ করলেন। এস-এস বাহিনী এবং এস-এ বাহিনীতে লাগল দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের সুযোগে ফ্রেডেরিক তাঁর ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী কনস্টান্টিনকে হত্যা করলেন। একদিকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপরদিকে নিজের মায়ের প্রণয়-

দি ড্যামড্-এর একটি দৃশ্য

লীলা—এই দুয়ের মাঝে প'ড়ে মার্টিন বিহ্বল, দিশাহারা। তার মন হ'ল বিকারগ্রস্ত; সে একদিন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিবস্ত্র ক'রে মায়ের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে উপস্থিত হ'ল এবং ভয়চকিতা সোফিয়াকেও বিবস্ত্র করতে উদ্যত হ'ল। এর পরের ঘটনা আরও দুঃখব্যঞ্জক। সদ্য পরিণয়ের পরে সোফিয়া ও ফ্রেডেরিক সায়ানাইড পানে বাধ্য হয়ে মৃত্যু বরণ করল।

নাৎসী অভ্যুত্থানের প্রথম যুগের রাজনৈতিক ও চারিত্রিক বৈষম্যকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও জ্বলন্তভাবে চিত্রিত করেছেন পরিচালক লুচিনো ভিস্কন্টি। চলচ্চিত্রের শৈল্পিক সাফল্যই ছবিটিকে চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে সমবেত আন্তর্জাতিক জুরীকে প্রথম পুরস্কার স্বর্ণময়ূর দানে উদ্বুদ্ধ করেছে ব'লে মনে হয়। কিন্তু শয্যায় শায়িত অবস্থায় বহু যৌন আকৃতির দৃশ্যের সবগুলিই কি অত্যাবশ্যক ছিল? এবং নগ্নদেহে সন্তানের নিজের মায়ের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে তাঁকেও বিবস্ত্র করবার চেষ্টার দ্বারা মায়ের মনে যে-আতঙ্ক সৃষ্টির প্রয়াস, তার নিহিতার্থ যাই হোক না কেন, তা কি শিল্পগত চমৎকারিত্বের পর্যায়ে উন্নীত হ'তে পেরেছে? এই প্রশ্ন দুটি আমাদের মনকে অত্যন্ত পীড়িত করেছে ব'লেই আমরা ছবিটির প্রথম পুরস্কার লাভকে সমর্থন করতে পারিনি ও পারি না।

(৯) টানেল টু দি সান (জাপান) তথ্যচিত্রের প্রণালীতে নির্মিত এই বিরাট কাহিনী চিত্রের মধ্যে মানুষের মানবধর্মিতা, আদর্শনিষ্ঠা এবং প্রকৃতিকে জয় করবার অদম্য আগ্রহকে যে আশ্চর্যভাবে [illegible] হয়েছে, এ [illegible] আমরা কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাপানী চলচ্চিত্রোৎসবের সময়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

(১০) দি ওল্ড ক্র্যাফ্‌টস্‌ম্যান অব দি জারস্ (কোরিয়া) : স্ত্রী পাতিব্রত্য ধর্মচ্যুত হয়ে স্বামীর কাছে অবিশ্বাসিনী হ'লে সুখের সংসার কিরকম ছারেখারে যায়, তারই রসঘন চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে কোরিয়ার এই রঙীন ছবিটির মাধ্যমে। অক্‌তোর সং ছিল একজন ওস্তাদ কুম্ভকার। এক ঝড়ের রাতে তুষারাচ্ছন্ন পথ থেকে সে উদ্ধার করে মৃতকল্প সুন্দরী ওক্‌সুকে। কৃতজ্ঞ ওক্‌সু সংকে সানন্দে বিবাহ করে এবং তাদের যে পুত্রসন্তান জন্মায়, তার নাম রাখে ড্যাংসন। ছেলের বয়েস যখন সাত বছর, তখন কুগ্রহের মতো আবির্ভূত হয় সোখিয়ন, যার সঙ্গে ওক্‌সুর পূর্বপ্রণয় ছিল। সে সংয়ের সহকারীরূপে যখন চাকরী নেয়, তার আগেই ওক্‌সু তাকে ওই স্থান ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে অনুরোধ করেছে। কিন্তু সোখিয়ন তার কথায় কর্ণপাত করেনি। এক গ্রীষ্মের রাতে গায়ের জ্বালা জুড়োতে ওক্‌সু জলের ধারে যায়; সেখানে সঙ্গে সঙ্গে সোখিয়নও গিয়ে উপস্থিত হয়। ওক্‌সুর প্রবৃত্তি আর বাধা মানে না; সে সোখিয়নের কাছে ধরা দেয়। তাদের রাতের পর রাত গোপন প্রণয়ের কথা জানতে পেরে প্রৌঢ় সং ওদের দুজনকেই কুঠারাঘাতে হত্যা করতে কৃতসংকল্প হন। কিন্তু ঘুমন্ত ছেলের মুখের পানে চেয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত ওদের ছেড়ে দেন। ওরা পালিয়ে বাঁচে। প্রৌঢ় স্ত্রীর বিরহব্যথা সহ্য করতে না পেরে পরে আত্মহত্যা করেন। বালক সন্তান ক্রন্দনে আকাশ

কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আই কে গুজরালের সঙ্গে কথোপকথনরত রুমানিয়ার চলচ্চিত্র সাংবাদিক মিস ম্যানুয়েলা গিয়োরগুই।

ভরিয়ে তোলে। প্রতিবেশীরা এসে ওকে সান্ত্বনা দেয়।—কাহিনীটি ফ্ল্যাশ-ব্যাকে বিবৃত। কোরিয়া জাপানীর আধিপত্য থেকে মুক্ত হবার পরে কোরিয়া সৈন্যদলভুক্ত ড্যাংসন (এখন সে জোয়ান) ঘুরতে ঘুরতে নিজের গ্রামে এসে পড়ে এবং জনৈক গ্রামবাসী বৃদ্ধের মুখ থেকে নিজের বাপ-মায়ের কাহিনী শোনে। কাহিনী শেষ হবার পরে বৃদ্ধা ও প্রায় পাগলিনী ওকসু সেখানে এসে পড়ে এবং নিজের সন্তানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে তারই কোলে মারা যায়।

ছবির কাহিনীটিকে অত্যন্ত হৃদয়-স্পর্শীভাবে চিত্রিত করেছেন পরিচালক জংবয়েকলী। বালক-অভিনেতাটি ড্যাংসনকে জীবন্ত করে তুলছেন। ছবির বহির্দৃশ্য—যা শতকরা নব্বইভাগ—চমৎকার।

(১১) রেড অ্যান্ড গোল্ড (পোল্যান্ড): কালো-সাদা ফিল্মে তোলা পোল্যান্ডের এই প্রতিযোগিতামূলক ছবিটিকে বর্তমানের যৌন বুভুক্ষাপীড়িত চলচ্চিত্রজগতে একটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম বললেও অত্যুক্তি হয় না। এমন একটি ছোট্ট শহরকে কেন্দ্র ক'রে এর কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে, যেখানকার বেশীর ভাগ বাসিন্দাই বার্ধক্যের কোঠায় গিয়ে পৌঁছেচে। এই শহরের যুবক-যুবতীরা হয় পড়ার জন্যে, নয় কাজের জন্যে কোনও সমৃদ্ধ নগরীতে গিয়ে বসবাস করছে। কাহিনীর নায়িকা বারবারাও একজন প্রৌঢ়া; তাঁকে বিধবাও বলা যায় না, সধবাও বলা যায় না। কারণ, বছর পঞ্চাশেক আগে তাঁর স্বামী ইগ্‌নাক্ নিরুদ্দেশ হয়েছেন এবং তাঁর সম্বন্ধে ভালোমন্দ কোনো খবরই কেউ কোনোদিন শোনে নি। হঠাৎ একদিন যখন প্রথম শরতের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনে প্রকৃতি দাক্ষিণ্যে লালে লাল, তখন সেই ছোট্ট শহরটিতে আবির্ভূত হ'লেন একজন প্রৌঢ় যাঁর নাম নাকি ইগ্‌নাক্। বারবারা তাঁকে না চিনেও চিনলেন, গ্রহণ করলেন নিজের স্বামী হিসেবে। প্রথমটা কানাকানি, কিছুটা অবিশ্বাস; ভদ্রমহিলার ভীমরতি হ'ল নাকি! কোথাকার কে, তাকে স্বামী ব'লে মেনে নেওয়া? কিন্তু ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতা প্রচুর; শহরের আগেকার দিনের সমস্ত ব্যাপার খুঁটিনাটি জানা। আর আমাদের বারবারাই যখন তাঁকে স্বামী ব'লে মেনে নিয়েছে, তখন 'অন্যে পরে কা কথা'? শহরের গতি চলল ঐ দু'জনকেই কেন্দ্র ক'রে; ওঁরাই সব থেকে গণ্যমান্য। বার্ধক্যে বারবারা যখন নিজের জীবনকে সার্থক বিবেচনা ক'রতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই মিথ্যার বেড়া কেটে আবার বহির্জগতে পা বাড়াতে চাইলেন ঐ ইগ্‌নাক্ নামধারী ব্যক্তিটি। তিনি বারবারার কুড়ি বছর বয়স্কা ভাগ্নীটিকে — শহরে ঢোকবার পথে এরই সঙ্গে ওঁর প্রথম পরিচয় হয়েছিল—জানালেন, তিনি আসলে হচ্ছেন ইগ্‌নাকের বন্ধু; সে যুদ্ধে মারা যাবার সময়ে অনুরোধ জানিয়েছিল, সম্ভব হ'লে তিনি যেন তাঁর স্ত্রীর খবর নেন এবং তাঁর লেখা চিঠিটি তাঁকে দেন। সেই চিঠি দিতেই তিনি শহরে এসেছিলেন; কিন্তু ইগ্‌নাকের নাম করতেই তাঁকেই ইগ্‌নাক্ মনে করাতে তিনি বিপন্ন বোধ ক'রে মৌন ছিলেন।—বুদ্ধিমতী ভাগ্নী: সে বললে, 'আপনি যদি ইগ্‌নাক্ নাই হন, তবু ইগনাক সেজে থাকতে আপনার আপত্তি কিসের? এতে তো কারুর কিছু ক্ষতি হচ্ছে না; অথচ বার্ধক্যে আমার পিসীমা কত মানসিক শান্তি পেয়েছেন।' কিন্তু ভদ্রলোক এই মিথ্যার বর্ম এঁটে থাকতে আর রাজী না হয়ে শহর ছেড়ে চললেন। বারবারা তাঁর যাত্রার খবর পেয়ে ছুটে এসে তাঁর পথ রোধ করলেন এবং ঐ বয়সে দু'জনে বিবাহিত হয়ে শান্তিময় জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করলেন।

আন্তর্জাতিক জুরী সদস্যরা এই ছবিটির পরিচালককে কেন যে উপেক্ষা করেছেন, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

(১২) দি আনফরগেটেবেল (ইউ-এস-এস-আর): সোভিয়েত দেশ থেকে প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী এই ছবিটি ইউক্রেনের একটি গ্রামাঞ্চলে ফ্যাসিস্ট জার্মানীর আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত। পেট্রো-চাবানের পারিবারিক সুখশান্তি জার্মান সৈন্যদের দ্বারা কিভাবে বিনষ্ট হ'ল; ওঁর ছেলেরা সৈন্যদলে যোগ দিয়ে কেমন করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, মেয়েটি শত্রুর হাত থেকে পালাবার চেষ্টা করেও কেমন করে ধরা প'ড়ে বন্দী হ'ল, ভদ্রলোক নিজে কন্‌সেনট্রেসন ক্যাম্পে বন্দী থাকতে থাকতে শেষ পর্যন্ত কেমনভাবে দল গ'ড়ে ক্যাম্পের কাঁটাতার কেটে বেরিয়ে এলেন এবং রুশসৈন্য দ্বারা জার্মানরা বিতাড়িত হবার পর আবার নিজের বিধ্বস্ত গাঁয়ে ফিরে এসে নতুন ক'রে সংসার পাতবার যোগাড় করলেন, এ সমস্ত ঘটনাই বাস্তবভাবে দেখানো হয়েছে। ছবিতে রঙের ব্যবহারে বৈচিত্র্য আছে। যখন শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া, তখন দৃশ্যগুলিও রঙে রঙীন। আবার যখন দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা, তখন চিত্রও মসীলিপ্ত। তবে ছবিটিতে ইংরাজী সাব-টাইটেল না থাকায় সংলাপ আনুপূর্বিক বোঝা কঠিন। এবং মনে হয়, এই কারণে ছবিটিকে প্রতিযোগিতার মধ্যে বিচার করা হয় নি।

(আগামীবারে সমাপ্য)

প্রেক্ষাগৃহ

জনপ্রিয় অভিনেতা উত্তমকুমার   ফটো : অমৃত

আন্তর্জাতিক উৎসবের শেষ সন্ধ্যা

১৮ ডিসেম্বর, সন্ধ্যা ৬টা। নয়াদিল্লীর মৌলানা আজাদ রোডস্থ বিজ্ঞানভবন। পুষ্পদলশোভিত সুবিস্তৃত মঞ্চে কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য, বেতার ও যোগাযোগমন্ত্রী সত্যনারায়ণ সিংহ সভাপতির পদে আসীন। তাঁর দুপাশে ঐ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল, উৎসব সমিতির অধিকর্তা হরিশ খান্না, আন্তর্জাতিক জুরীর সভাপতি রাজকাপুর, ইউনিক্রিট (ইউনিয়ন অব ইন্টারন্যাশনাল ক্রিটিক্স)-এর সভাপতি ডঃ ফ্রান্সিস কোভাল (ইউ-কে), সিডালক্ জুরীর সভানেত্রী মিস ব্রেমা (ফ্রান্স) গান্ধী পুরস্কার জুরীর সহ-সভাপতি মিঃ পল জীলস্ প্রভৃতি সমাসীন। সভাকক্ষ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রস্রষ্টা, শিল্পী, সাংবাদিক, অধ্যাপক প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ।

অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী আই কে গুজরাল সকলকে স্বাগত জানিয়ে। উঠলেন ডঃ ফ্রান্সিস কোভল এবং প্রতিযোগিতামূলক ও প্রতিযোগিতার বাইরে যে পঞ্চাশখানি কাহিনীচিত্র দেখানো হয়েছে, তাদের মধ্যে মৈত্রীর আদর্শ, শিল্পচাতুর্য প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে ইউনিক্রিট জুরী চেকোশ্লোভাকিয়ার 'দি জোক'কে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেছেন বলে ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃণাল সেন প্রযোজিত ও পরিচালিত 'ভুবন সোম' ছবির বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন। অতঃপরে সিড্যাল্ক-জুরীর সভানেত্রী মিস ব্রেমো জানালেন, তাঁদের বিচারে ভারতের 'ভুবন সোম' প্রথম হয়েছে এবং দ্বিতীয় হচ্ছে সিংহলের লেস্টার জেম্স্ পেরীজ-এর সমগ্র সৃষ্টি। গান্ধী পুরস্কার সমিতির সহ-সভাপতি মিঃ পল জীলস্ ঘোষণা করলেন, গান্ধী সম্পর্কীয় ছবিগুলির মধ্যে তথ্যচিত্র হিসেবে শ্রেষ্ঠ হয়েছে ভাভেরীকৃত বিরাট তেত্রিশ রীলের তথ্যচিত্র 'মহাত্মা' এবং কাহিনীচিত্রগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে 'ফাইভ পাস্ট ফাইভ' (পাঁচটা বেজে পাঁচ মিনিট)। সবশেষে উঠলেন আন্তর্জাতিক জুরীর সভাপতি রাজকাপুর। তিনি ঘোষণা করলেন, প্রতিযোগিতামূলক কুড়িখানি ছবি (রাশিয়ার 'আনফরগেটেবল ইংরাজী সাবটাইটেল না থাকায় বিবেচিত হয় নি) অত্যন্ত বিবেচনা-সহকারে নিবিষ্টচিত্তে দেখবার পরে জুরীর সদস্যেরা একমত হয়ে প্রথমেই বিশেষ গুণসূচক পুরস্কার (স্পেশ্যাল মেরিট অ্যাওয়ার্ড) দিয়েছেন ভারতের 'ভুবন সোম' ছবিটিকে। স্বল্প দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ছবিগুলির মধ্যে ব্রোঞ্জ নির্মিত ময়ূর পুরস্কার দিয়েছেন ভারতের 'টেগোর পেন্টিংস'কে। রৌপ্য-নির্মিত ময়ূর পুরস্কার দেওয়া হয়েছে সিংহলের স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্র 'এ ম্যান অ্যান্ড ক্রো'কে। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার জন্যে রৌপ্য-নির্মিত ময়ূর পুরস্কার পেলেন স্পেনের 'জুর্টজেঙ্কা' ছবির নায়ক ক্রিস্টোফার স্যান্ডফোর্ড এবং শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরূপে রৌপ্য নির্মিত ময়ূর পুরস্কার দেওয়া হল এ ছবিটিরই (জুর্টজেঙ্কার) নায়িকা লুসিয়া বোসে-কে। শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্যে রৌপ্য-নির্মিত ময়ূর দ্বারা পুরস্কৃত হলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার 'ফানি ওল্ডম্যান' ছবির পরিচালক কারেল কাচনা। শ্রেষ্ঠ স্বল্প-দৈর্ঘ্য চিত্র হিসেবে স্বর্ণনির্মিত ময়ূর পুরস্কার পেয়েছে কিউবার ছবি 'টেকিং অফ অ্যাট ১৮০০ আওয়ার'। সবশেষে শ্রীকাপুর ঘোষণা করলেন শ্রেষ্ঠ কাহিনী-চিত্ররূপে স্বর্ণ নির্মিত ময়ূর পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছে ইউ এস এ এবং ইতালীর যুগ্মপ্রযোজনায় নির্মিত 'দি ডায়মন্ড'। এই ঘোষণার সময়ে সভাকক্ষের এক অংশ থেকে সমর্থনবিরোধী ধিক্কার ধ্বনি শোনা গিয়েছিল।

ঘোষণা শেষ হবার পর মন্ত্রী শ্রী সিংহ পুরস্কারগুলি বিতরণ করেন। পরে শ্রীখান্না র অনুরোধে শিল্পী দেবআনন্দ উদ্বোধন-দিবসে যেসব বিশিষ্ট অভ্যাগত উপস্থিত থাকতে পারেন নি, তাঁদের মঞ্চের উপর একে একে উপস্থাপিত করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ডিরেক্টার সার্জেই গেরাসিমভ, ব্রেজিলের অভিনেত্রী মিস্ রোজানা গার্সিস [illegible] ডের মিস মায়া, ইউ এস এস আর-এর

মিসেস তামারা মাকারোভা, দক্ষিণ কোরিয়ার মিস চুং হী উম (ওল্ড ক্র্যাফ্‌টসম্যান অব দি জোরস্‌-এর নায়িকা), ফ্রান্সের মিস মেরী জোসেনা, ভিয়েনামের মিস তানিয়া, ফেডারেশন অব ফিল্ম ফেস্টিভ্যালস্‌-এর সভাপতি মিঃ তাভাদে, সুইডেনের মিস ইনগ্রিড থুলিন (দি ডামড্‌-এর নায়িকা), সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, শশী কাপুর, অরুন্ধতী দেবী ও হেমেন গাঙ্গুলী। মাজভাঙা সত্ত্বেও শ্রীমতী তনুজা ও তাঁর মা শোভনা সমর্থ মঞ্চে আসেন নি।

পরিচয়পর্ব সমাপ্তির পরে সভাপতি সত্যনারায়ণ সিংহ সময়োচিত ভাষণ দেন। সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ফিল্ম ফেডারেশনের সভাপতি সুন্দরলাল নাহাতা।

পরিশেষে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে 'টেগোর পেন্টিংস', 'ম্যান অ্যান্ড দি ক্রো' প্রভৃতি কয়েকখানি স্বল্পদীর্ঘ চিত্র দেখানো হলে ভারতের চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের ওপর যবনিকা পতন হয়।

চিত্র সমালোচনা

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবির বিলম্বিত মুক্তি

অবশেষে আরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন নিবেদিত ও পরিবেশিত চিত্র "আরোগ্য নিকেতন" দীর্ঘকালব্যাপী টাল-বাহানার পরে মিনার-বিজলী-ছবিঘর চেনেই মুক্তি-লাভ করল। পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির কুড়ি মাসেরও অধিক সময় ধরে লড়াইয়ের অন্যতম দাবী এতদিনে পূর্ণ হল। অবশ্য এ-ব্যাপারে বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত ফিল্ম কনসালটেটিভ কমিটির সহায়ক হস্ত প্রসারিত না হলে কোথাকার জল শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছুত, তা সঠিকভাবে বলা যায় না।

বর্তমান বাঙলা সাহিত্যজগতের দিকপাল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে আরোগ্য নিকেতন। নাড়ী দেখে রোগীর মৃত্যুর সন-তারিখ আগে থাকতে ঘোষণা করায় তথা নিদান-হাঁকায় বাক্‌সিদ্ধ কবিরাজ জীবন মশায়ের সঙ্গে তাঁরই ত্যাজ্যপুত্রের একমাত্র সন্তান, আধুনিক এলোপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যায় সুনিপুণ প্রদ্যোতের আদর্শগত সংগ্রামের যে-প্রোজ্জ্বল চিত্র তিনি অক্ষরের মাধ্যমে রচনা করেছেন, তা রসিক পাঠকের মনকে করে একান্তভাবে আপ্লুত।

চিত্রনাট্য রচনাকালে পরিচালক বিজয় বসু তারাশঙ্করের কাহিনীর মূল সুরটুকুকে যে পুরোপুরিভাবে বজায় রাখতে পেরেছেন, এটা অল্প কৃতিত্বের কথা নয়। সুবৃহৎ উপন্যাসের অনেক অংশ বর্জন করে এবং বিশেষ বিশেষ অতীত ঘটনাকে বিভিন্ন ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে উপস্থিত করে তিনি চিত্রনাট্যকে শুধু একটি সম্ভাব্য পরিমিতির মধ্যেই আনেননি, এতে চলচ্চিত্রোপযোগী একটি গতি সংযোগও করতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য চিত্রনাট্যটি যে একেবারে ত্রুটিহীন, এমন কথা বলা যায় না। যে অসবর্ণ বিবাহের জন্যে একদিন জীবনমশায় তাঁর পুত্র সত্যবন্ধুকে ত্যাগ করেছিলেন, এবং যার জন্যে পৌত্র প্রদ্যোতের মনে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ, সেই অসবর্ণ বিবাহের পত্নীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করতে তিনি তাঁর শেষ জীবনে কেন উদগ্রীব হয়েছিলেন, তার সঙ্গত কারণটি ছবিতে অনুক্ত থেকে গেছে। ছবিটিকে অতিরিক্ত হৃদয়াবেগপূর্ণ করবার উদগ্র আগ্রহের ফলে কার্যকারণ জ্ঞান বা লজিককে একাধিকবার উপেক্ষা করা হয়েছে। এ ছাড়া চিত্রকাহিনীটিতে 'বন কোয়েলা ডাকে'-গোছের গানের অনুপ্রবেশ না ঘটিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সর্বাত্মক ব্যবহার অধিকতর সঙ্গতি রক্ষা করতে পারত।

"আরোগ্য নিকেতন"-এর অন্যতম সম্পদ হচ্ছে এতে অবতীর্ণ শিল্পীদের সামগ্রিক সুঅভিনয়। জীবন মশাইয়ের চরিত্রচিত্রণ বিকাশ রায়ের শিল্পী-জীবনের অন্যতম স্তম্ভ হয়ে থাকবে। কি আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে, কি অদ্ভুত দরদ দিয়ে তিনি চরিত্রটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন! অত্যন্ত খুশী হতুম, যদি তাঁর রূপসজ্জায় আর একটু যত্ন নেওয়া হত, তাঁর দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রুকে অধিকতর স্বাভাবিক করে তোলা হত। জীবন মশায়ের পৌত্র, নব্য ডাক্তার প্রদ্যোতের ভূমিকায় শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় দীপ্ত অভিনয়ের মাধ্যমে আমাদের প্রশংসনীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অনায়াসে বলা যেতে পারে, চিত্রশিল্পীরূপে আজ পর্যন্ত তিনি যত অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে এইটিই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। প্রদ্যোতের মা এবং জীবনমশায়ের পরিত্যক্তা পুত্রবধূ সুধার ভূমিকাটিকে সুধায় ভরিয়ে তুলেছেন রুমা গুহঠাকুরতা। প্রীতি ও মাধুর্যেভরা, শ্বশুরের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনতা এই চরিত্রটি মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর অভিনয়নৈপুণ্যে। আতরবৌয়ের নাতিবৃহৎ চরিত্রটিকে অত্যন্ত স্বাভাবিক দরদী অভিনয়ের মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন ছায়া দেবী। শশী কম্পাউন্ডারের হাল্কা চরিত্রটি রবি ঘোষের অভিনয়গুণে অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে। ভোজনসর্বস্ব
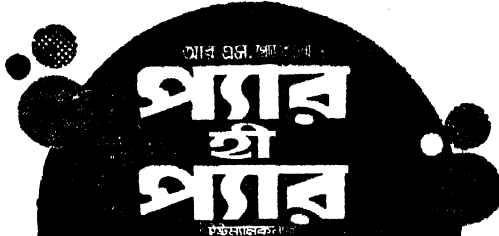
ফানি গার্ল/ওমর শেরিফ এবং বারবারা স্ট্রিস্যান্ড

ঘোষালের চরিত্রটিও অতিবাস্তব রূপে চিত্রিত হয়েছে বঙ্কিম ঘোষের দ্বারা। মদ্যাসক্ত ধনী ভুবনেশ্বরের চরিত্রটিতে জহর গাঙ্গুলী তাঁর চিরাচরিত নিজস্ব ভঙ্গীতে অভিনয় করেছেন। দুঃখ, এই প্রিয় অভিনেতাটি আর আমাদের মধ্যে নেই। রোগী মকবুলের চরিত্রে সার্থক অভিনেতা কালী সরকারও বহুদিন হল পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন ভূমিকায় সু-অভিনয় করেছেন সন্ধ্যা রায় (মঞ্জু), দিলীপ রায় (সত্যবন্ধু), শিশির মিত্র (রেভারেণ্ড বিশ্বাস), ছন্দা দেবী (বালক-রোগীর আর্ত মা) প্রভৃতি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। অধিকাংশ স্থানে ক্যামেরাকে নীচুতে রেখে চিত্রগ্রহণ করে **কৃষ্ণ** চক্রবর্তী ছবির মধ্যে নাটকীয়তা সঞ্চারে সাহায্য করেছেন। সম্পাদক ছবির টেম্পো বা গতিবেগকে কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখেছেন। বালক-রোগীর চিকিৎসা-দৃশ্যটি রীতিমত সাসপেন্সপূর্ণ এবং স্মরণ রাখার যোগ্য। ছবিটিতে মাত্র তিনখানি গান আছে। প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত —"জীবন যখন শুকায়ে যায়" একটি বেদনাবিধুর আবহের সৃষ্টি করে। শেষ গান "বাজে না নূপুর পায়ে"টিও ভাবদ্যোতক। দ্বিতীয় গান "বনকোয়েলা ডাকে" মঞ্জুর মানসিকতা প্রকাশের জন্যে ব্যবহৃত; কিন্তু এখানেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার অধিকতর সঙ্গত হত, এ-কথা আগেই বলা হয়েছে।

অরোরা নিবেদিত ও বিজয় বসু পরিচালিত "আরোগ্য নিকেতন" বাঙলা চলচ্চিত্র জগতের একটি স্মরণীয় অবদানরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

দুর্বল কাহিনীর দুর্বলতর চিত্ররূপ

ছোট ভাইয়ের জন্যে বড়ো ভাইয়ের আত্মত্যাগকে উপজীব্য করে বৈকুণ্ঠের উইল, প্রতিশ্রুতি থেকে শুরু করে বহু কাহিনীই আজ পর্যন্ত বাঙলা চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। সেদিক থেকে **পাম্প ফিল্মস নিবেদিত এবং অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত "প্রতিদান"** কোনো অভিনবত্ব দাবি করতে পারে না। তা ছাড়া বালক-কাশীনাথ বড়ো হয়ে এস. ডি. ও (সাবডিভিশনাল অফিসার) হবার পর বড়োভাই ভূতনাথকে দিয়ে যে-সব পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে, তা এমনই কষ্টকল্পিত ও কার্যকারণ বহির্ভূত যে, দর্শক চেষ্টা করেও কাহিনীর সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না। ছবির শেষ পর্যায়ে হঠাৎ এক মালিক-শ্রমিক বিরোধের মধ্যে এস-ডি-ও সাহেব এবং তাঁর নিরুদ্দিষ্ট বড়ো ভাইকে হাজির করে প্রথম জনের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত ছুরিকা দ্বারা বড়োভাইকে আহত করানোর মধ্যে কাকতালীয়তা ছাড়া আর এমন কিছুই নেই, যা দর্শকদের করুণ রসে আচ্ছন্ন করতে পারে।

দুর্বল কাহিনীও চিত্রনাট্য ও পরিচালনার গুণে মোহনীয় চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হতে পারে, এমন নজীর বাঙলা চলচ্চিত্রজগতেও আছে। পরিচালক নীতীন বসু কৃত জীবন-

মরণ (বাঙলা) ও দুষমন (হিন্দী) এমনই একখানি চিত্র। কিন্তু পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী নিজেই কাহিনীকার বলে সম্ভবত এর দুর্বলতা তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি এবং সেই কারণেই তিনি এমন চিত্রনাট্য রচনা করেননি, যা মূলে কাহিনীর ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ঢেকে ছবিটিকে দর্শকগ্রাহ্য করে তুলবে।

এমন যেখানে অবস্থা, সেখানে শিল্পীদের সমূহ বিপদ। তাই ভূতনাথরূপে প্রথমে সুখেন দাস ও পরে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বড়ো কাশীনাথবেশে অনিল চট্টোপাধ্যায়, কাশীনাথের স্ত্রী মালার ভূমিকায় কাজল গুপ্ত, অবিবাহিতা মামীরূপে অনুভা ঘোষ, কারখানা-মালিকবেশে কালী চক্রবর্তী, ননীকাকা বেশে প্রীতি মজুমদার, তাঁর কন্যা সরলারূপে রুমা গুহঠাকুরতা প্রভৃতি কৃতী শিল্পীরাও প্রচুর প্রয়াস সত্ত্বেও আমাদের মনে কিছুমাত্র দাগ কাটতে পারেননি। এবং এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা।

স্টুডিও থেকে

গত বুধবার প্রেস ক্লাবে পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির জনৈক মুখপাত্র সানন্দে অভিনন্দন জানান যুক্তফ্রন্ট সরকার ও তৎ-নিয়োজিত ফিল্ম কন্সালটেটিভ কমিটিকে। কারণ বহু আলোচিত সেন্সর তারিখভিত্তিক ছবির মুক্তির ব্যাপারে কমিটি বিশেষ সক্রিয় হয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে তাঁরা 'অরণ্যের দিন রাত্রি' ছবির কথা উল্লেখ করেন। সম্প্রতি এ ছবির মুক্তির সময় যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার জন্য দুঃখ প্রকাশও তাঁরা করেন এবং সমস্যার অতর্কিতে সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

সমিতির আশা এভাবেই চিত্র শিল্পে শান্তি ফিরে আসবে। বাংলা চিত্র-জগতে চিত্র-মুক্তির সমস্যা আজকের নতুন নয়, বহু পুরোনো। এ সমস্যার একমাত্র বৈজ্ঞানিক সমাধান সেন্সর তারিখভিত্তিক মুক্তি। বিশেষ করে যতদিন না পর্যাপ্ত রিলিজ চেইন পাওয়া যায়। এ নিয়ে সমিতি একটা তালিকাও করেছেন। তার মধ্যে 'আরোগ্য নিকেতন', 'বালক গদাধর' নির্দিষ্ট হলে (মিনার, বিজলী, ছবিঘর ও শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরায়) গত সপ্তাহেই মুক্তি পেয়েছে। এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে অজিত গাঙ্গুলীর বহু পুরোনো ছবি 'প্রতিদান' রূপবাণী, অরুণা, ভারতী চেইনে। একমাত্র বাকী থাকছে নাবিক প্রোডাকসনের 'দিবা-রাত্রির কাব্য'। 'মন নিয়ে'র পরই সম্ভবত বীণা, বসুশ্রী, মিত্রায় মুক্তি পাচ্ছে এ ছবি।

সমিতি অবশ্য সেদিন শুধুমাত্র ছবির মুক্তির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেন নি। কিছু দাবী-দাওয়ার কথাও তাঁরা বলেছেন। সরকারের ফিল্ম কন্সালটেটিভ কমিটি চিত্র ব্যবসায়ের নানা গলি-ঘুঁজিতে তদন্ত করে বিভিন্ন সমস্যার ব্যবহারিক সমাধানের পথ নাকি বার করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সমিতি সেই সঙ্গে তাঁদের দাবী-দাওয়াগুলোকে কমিটির সামনে তুলে ধরতে চান সমাধানের আশায়।

সমিতির দাবীর মধ্যে আছে : (ক) কুশলীদের জন্য যথাশীঘ্র ন্যূনতম বেতন চালু করা, (খ) ব্যক্তিগত সুবিধে দেওয়ার চাইতে ডকুমেন্টারী ছবি তৈরীর কাজে বিভিন্ন রেজিস্টার্ড সমিতি ও সংস্থাকে বেশী সুযোগ দেওয়া, (গ) চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্য একটা বিশেষ ফিল্ম ডেভেলপমেণ্ট বোর্ড তৈরী করা, (ঘ) সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রসারের কাজে তথ্যচিত্র তৈরী করা ও ষোল মিলিমিটারে ছবি তৈরীর ব্যবস্থা করা, (ঙ) শিল্পের উন্নতির জন্য বোম্বাইতে যেমন কেন্দ্রীয় সংগঠন ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন আছে, সেই ধরনের স্থানীয় ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা, (চ) আধুনিক যন্ত্রপাতি আনিয়ে টালিগঞ্জ স্টুডিওগুলোর উন্নতি করা, (ছ) বেকার কুশলীদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি।

সমিতি এই সাত দফা দবীর কথা উল্লেখ করে আশা প্রকাশ করেন রাজ্য সরকার তাঁদের এই ন্যায্য দাবীর প্রতি সুবিবেচনাই করবেন।

●

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের অন্যতম হোতা শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত বহুদিন ধরেই বিভিন্ন ধরনের অ্যান্ড-সর্ট করে আসছিলেন। ছোট ছবি তৈরীর কাজে তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। নিজের প্রতিই আস্থাশীল হয়ে শ্রীদাশগুপ্ত বাংলা দেশের নাট্য আন্দোলনের পট-ভূমিকায় একটি বিশেষ ধরনের ডকুমেন্টারী ছবি করায় উৎসাহী হয়েছেন। নাটক নিয়ে মাতা কথা বাংলা দেশের মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভারতের আর কোন শহর বা প্রদেশে হয় না। গত কয়েক বছর ধরে নাট্য আন্দোলন নতুন পথে বাঁক নিয়েছে। 'নবান্ন' দিয়ে যে ধারার শুরু হয়েছিল সে গতি এখন বহুমুখী হয়ে বিচিত্র রূপ ও বিচিত্র গতি পেয়েছে।

ভারতচিত্রের **কুহেলী-র** সংগীতশিল্পীদের সঙ্গে তরুণ মজুমদার, লতা মঙ্গেশকর, হেমন্ত মুখার্জি, মঙ্গেশ দেশাই।
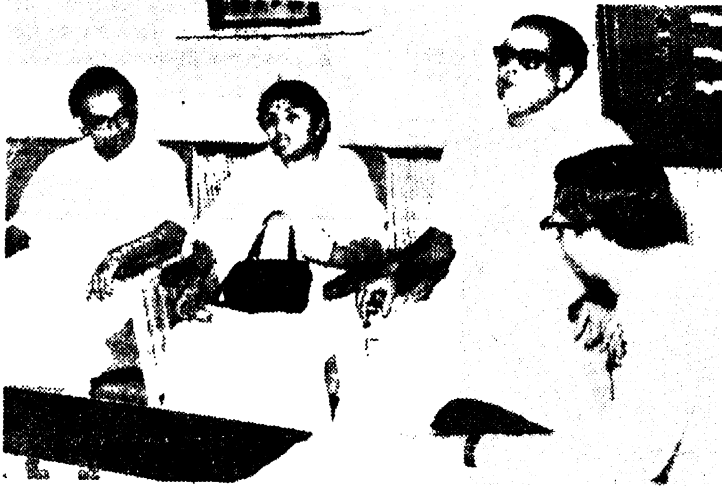
ছবির প্রথম পর্যায়ের দৃশ্যগ্রহণ হিসাবে কদিন আগে এন-টি'র এক নম্বর স্টুডিওতে বাংলা দেশের বিরাট এক শিল্পী সমাবেশ ঘটেছিল। প্রকাশ্য সেই আলোচনা সভায় বাংলা দেশের নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, সত্য সেন, উৎপল দত্ত, পার্থপ্রতীম চৌধুরী, বাদল সরকার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, কিরণ মৈত্র, শোভা সেন প্রমুখেরা।

আলোচনা সভার বিভিন্ন দিকে বসে চারজন ক্যামেরাম্যান সুদীর্ঘ সেই আলোচনা সভার প্রায় পুরোটাই ধরে রাখেন।

●

কলকাতার রাস্তাঘাটে শিল্পীদের নিয়ে স্যুটিং করা যে কি ধরনের বিরক্তিকর ও অসুবিধাজনক তা কারও অজানা নয় তার ওপর যদি শিল্পীরা জনপ্রিয় হন তাহলে তো কথাই নেই। অনেকটা সেই কারণেই সত্যজিৎবাবু তাঁর নতুন ছবি 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র কাজ সব নতুন শিল্পীদের দিয়েই করাবেন ঠিক করেছেন। কলকাতা শহরের ওপর বিশেষ কোন ছবি এখনও হয় নি। সত্যজিৎবাবু এই 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র মধ্য দিয়ে সে ধরনের কিছু করার প্রয়াস পাবেন।

জানলাম মৃণাল সেনেরও এই শহরের পটভূমিকায় যুব সমাজকে নিয়ে ছবি করার বড় ইচ্ছা। ওঁর 'ইচ্ছা পূরণে'র কাজ প্রায় শেষ। এর পরই নতুন ছবিতে হাত দেবেন। ছবিটা কোন ভাষায় করবেন জিজ্ঞেস করায় বলেছিলেন—'কোলকাতার ওপর ছবি করলে বাংলা ছাড়া ভাবতেই পারি না।' যদি সত্যিই এ ছবি হয় তাহলে মৃণালবাবুকে আবার বহু দিন বাদে বাংলার দর্শকেরা আবার কাছের করে পাবে। ওঁর শেষ ছবি 'ভুবন সোম' হিন্দীর উৎসবে স্বর্ণময়ূর পায় নি বটে, তিনটি পুরস্কার পেয়েছে। তাই-বা কম কিসে? সত্যজিৎ রায়ের পর মৃণাল সেনের মাথায় যে পরিমাণ অ্যাপ্রিসিয়েশন ও সম্মান জুটেছে দেশে ও বিদেশে তার প্রমাণ দিল্লীতে গিয়ে চাক্ষুষ দেখেছি। সুতরাং তাঁর নতুন ছবি তৈরীর খবর শুধু 'খবরই' নয়, কিছু নতুন পাওয়ার আশাও বটে।

বোম্বাই থেকে

সম্প্রতি দিল্লীতে ৪র্থ আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষ্যে যে তিন ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা-সভা বসেছিল ফিল্ম সেন্সরশিপ উপলক্ষে, তাতে যেসব বক্তা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের কিছু কিছু মন্তব্য নীচে উদ্ধৃত করছি। এই বক্তব্যগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীকে এ আব্বাস বলেন : সেন্সর কর্তৃপক্ষ মনে করেন সমাজ ও জনগণের নীতি ও চরিত্রগঠনের দায়-দায়িত্ব একমাত্র তাঁদেরই, কিন্তু আসলে সমাজগঠন ও চরিত্রগঠনের দায়িত্ব আমাদেরই হাতে। দেশ এখন সোস্যালিজমের পথে অগ্রসর হচ্ছে কিন্তু সোস্যালিজমের ভাবধারা ছবিতে প্রকাশ পেলেই সেন্সর কর্তৃপক্ষ আপত্তি করেন। যখনই কোন দুর্নীতি বা ধনীদের স্বার্থের প্রতি আঘাত করা হয়েছে তখনই তার ওপর সেন্সর কর্তৃপক্ষের খড়্গ পতন ঘটেছে।

শ্রীএম আর দেশাই, সেন্সর বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান বলেন : প্রেমের দৃশ্যগুলি খুব সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচায়ক না হয়ে দেখানো হয় অত্যন্ত স্থূল এবং অশ্লীলভাবে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল অর্থোপার্জন। প্রধান শিল্পীরা অত্যধিক টাকা দাবী

ইউকো ব্যাঙ্ক বড়বাজার শাখার চলাচল নাটকে নির্মল মাল্লাকার এবং বাসন্তী চ্যাটার্জি

করেন, চিত্রনির্মাতারা তাতে রাজী হয়ে **বেশীর** ভাগ টাকা দেন গোপনে। এইসব **অসাধু শিল্পী** এবং অর্থলোলুপ চিত্র-**নির্মাতা যাঁদের** কৃষ্টি ও ঐতিহ্য বলতে **কিছুই** নেই, তাঁদের কি এই ধরনের ছবি **করতে** পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত।

খোসলা কমিশন রিপোর্টের সমর্থক **শ্রীআব্বাস** এর উত্তরে বলেন যে, এর জন্য **সাধারণ** ব্যবসায়ীদের ধরা উচিত, চিত্র-**নির্মাতাদের** নয়।

পশ্চিম জার্মানীর সেন্সর বোর্ডের **মিঃ এডমান্ড লুফাত্** বলেন : তাঁদের দেশে **সেন্সর** বোর্ডের সভ্যরা হলেন ডাক্তার, **সমাজসেবী**, গৃহিণী এবং ছাত্ররা। যৌন **সংক্রান্ত** কোন দৃশ্যে আপত্তি করা হয় না, **তবে** সেন্সরের কঠোরতা প্রকাশ পায় নৃশংস কীর্তিকলাপে, বিশেষ করে যেখানে **যৌনতার** সঙ্গে বর্ণবৈষম্য দেখা যায়।

অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য বিশেষভাবে ভেবে দেখার মতো। তিনি বলেন : সেন্সর বোর্ডে থাকা উচিত সমাজ-সেবী, সমাজ মনস্তত্ত্ববিশারদ, সাহিত্যিক এবং জনসাধারণের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী ও গুণী। তিনি আরও বলেন : ভারতীয় দেব-দেবীদের মধ্যে অর্ধেকই হলেন অর্ধনগ্ন। 'মিথুন' বা যৌনমিলন হল ভারতীয় শিল্প ভাস্কর্যের একটি প্রধান অঙ্গ। এটা সত্যিই খুব আশ্চর্যের বিষয় যে, যখন অশিক্ষিত চাষা-ভূষোর দল সপরিবারে খাজুরাহো বা কোনারকের মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য দেখে সুস্থচিত্তে মেনে নিতে পারে, তখন শিক্ষিত-সমাজ ছবির পর্দায় এই ধরনের যৌন-সংক্রান্ত দৃশ্য সুস্থভাবে দেখে মেনে নিতে পারেন না কেন? আকারে-প্রকারে অশ্লীলতা নয়, অশ্লীলতা হল তার অন্তর্নিহিত অর্থে।

আরও কয়েকজন মন্তব্য করেন দর্শক নিজেই নিজের সেন্সর হতে পারে কোন **ছবি দেখা উচিত এবং কোন্ ছবি দেখা উচিত নয়—এ বিচার দর্শকের নিজের ওপরই থাকা উচিত। এমতক্ষেত্রে সেন্সরশিপ থাকার প্রয়োজনটাই বা কোথায়?**

ডাঃ মহাবীর, এম পি (জনসংঘ) বলেন **ভারতে** ঐতিহ্য অনুযায়ী সিনেমার **উদ্দেশ্যই হল** যা কিছু সত্য, সুন্দর ও মানুষের মহান গুণাবলীকে রূপায়িত করা।

ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা এবং এশিয়ান থিয়েটারের ডিরেকটার **মিঃ ই আলকাজি বলেন** : শুধু শুধু শাস্ত্র আউড়ে কোন লাভ নেই। আমাদের পুরাণ অনুযায়ী গান্ধারী, দ্রৌপদী এবং সীতা ভারতীয় নারীত্বের তিনটি দিকে আলোকপাত করে—এদের কোনটিকে আমরা গ্রহণ করব? সমাজের ধারা এখন দ্রুত পরিবর্তনশীল, শুধু বুলি আউড়ে কিছু হবে না, অভি-জ্ঞতার দ্বারা এর সত্য সন্ধান করতে হবে।

মিঃ আলকাজির মতে সেন্সরশিপ তুলে দেওয়া উচিত। তিনি বলেন : ছেলেমেয়ে-দের সব ছবিই দেখতে দেওয়া উচিত, কোন ছবি দেখতে বারণ করা উচিত নয়। কোন তের বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়ে যখন কোন মিউজিয়ামে গিয়ে ভাস্কর্য দেখে বা নগ্ন নারীদেহের ছবি দেখে বা কোন বেশ্যাপল্লীতে যায়, তখন তো তাদের আট-কানো যায় না। ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলতে হলে এইসব বিধিনিষেধে কিছু হয় না—ছেলেদের সুস্থ সবল করে গড়ে তুলতে হলে পিতামাতার কর্তব্যই সর্বাধিক—তাদের চিন্তাধারা সহানুভূতি এবং সংবেদনশীলতাই এখানে প্রথম ও প্রধান।

খোসলা কমিশনের সেক্রেটারী **শ্রীহরিশ** খান্না বলেন যে, খোসলা কমিশনের সমস্ত রিপোর্টটাকে বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করা হচ্ছে যার জন্যে আর এই দেশব্যাপী তুমুল বিতর্কের ঝড় বয়ে চলেছে।

সভাপতি ডঃ **মুলকরাজ আনন্দ** বলেন : শিল্পীরা জনগণের সামাজিক এবং নৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করতে পারেন কিনা। এদেশে সেন্সরশিপের তিনটি প্রধান লক্ষ্য হল—যৌনতা, রাজনীতি এবং বীভৎসতা। অনেক দেশে শুধু রাষ্ট্রের তরফ থেকে সেন্সরশিপ প্রয়োগ করা হয় না—উপরন্তু পুলিশ, গির্জা এবং ধর্মসম্প্রদায়ের তরফ থেকেও সেন্সরশিপ প্রয়োগ করা হয়।

বেলজিয়ামে কোন সেন্সরশিপ প্রয়োগ করা হয় না—শুধু ষোল বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের দেখার উপযুক্ত কিনা সেটাই বিচার করা হয়। এখানকার লোকে যৌন-বোধকে জীবনের সাধারণ অঙ্গ, যেমন খাদ্য ও পানীয়ের মতোই মেনে নিয়েছে। এখান-কার লোকেরা মনে করে যে ছবির পর্দায় যৌনমিলন দেখানোয় লজ্জার কিছু নেই। তাঁর বক্তব্যের মূল সুরই হল : সেন্সরশিপ হটাও।

—প্রবাসী

ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব পরিবেশিত দ্বীপান্তর নাটকের একটি দৃশ্য।

মঞ্চাভিনয়

বিশ্বরূপার আগামী আকর্ষণ বিমল মিত্রের 'বেগম মেরী বিশ্বাস'। নাটক ও নির্দেশনা রাসবিহারী সরকার। আলো তাপস সেন। সঙ্গীত ঃ অনিল বাগচী। মঞ্চ ঃ সুরেশ দত্ত।

১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় স্টার রঙ্গমঞ্চে 'শর্মিলা' (রচনা ঃ দেবনারায়ণ গুপ্ত) নাটকের দ্বিশততম অভিনয়ের স্মারক-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রধান অতিথি শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী বলেন, নাটকের ভাববস্তুকে প্রাণবান করেন কলাকুশলী ও শিল্পীরা। তাঁদের অভিনয়ের গুণেই 'শর্মিলা' দর্শকের মনে রেখাপাত করেছে। বর্তমান সমাজের সমস্যা, সংকট ও জটিলতার কথা যেমন নাট্যকার বলেছেন, তেমনি আনন্দের খোরাকও জুগিয়েছেন। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন, স্টার ঐতিহ্যপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। আজকাল অ্যামেচার নাটকের দল যেমন নাটক নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, স্টার তার থেকে দূরবর্তী নন। এখানেও যুগোপযোগী নাটকই অভিনীত হয়। জল থেকে জলে এবং হাওয়া থেকে হাওয়ায় লাফ দেওয়া যায় না। তার জন্যে শক্ত মাটি দরকার। স্টার হলো সেরকম পা রাখবার জায়গা। মধ্যবর্তী পটভূমি। এই উপলক্ষে স্টারের সত্ত্বাধিকারী শ্রীসলিল মিত্র নাট্যকার-কলাকুশলী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ও অন্যান্য কর্মীদের নগদ ষোল হাজার আটশ দশ টাকা পুরস্কার দেন। পরিবেশন করেন, আশাপূর্ণা দেবী। নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত ঘোষণা করেন, এটি শর্মিলা নাটকের ২৬৫তম অভিনয় রজনী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায়, সাহিত্যিক মনোজ বসু, শক্তিপদ রাজগুরু, কবি দুর্গাদাস সরকার, গৌরাঙ্গ ভৌমিক ও বহু নাট্যানুরাগী মানুষ।

সায়ন্তনী এবার তিনটি একাঙ্ক নাটক নিয়ে পর পর কয়েকটি অভিনয় করার আয়োজন করেছে। তারই প্রাথমিক পর্যায় সায়ন্তনী দক্ষিণ কলকাতার থিয়েটার সেণ্টার হলে আগামী জানুয়ারী মাসের ৯ই ও ২৬শে দুইটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছে। নাটক তিনটি হোল সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে মিহির সেন নাট্যরূপায়িত, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জেহাদ 'আদাব', জমিদারের বিরুদ্ধে বাগদীদের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম 'বাগদীপাড়া দিয়ে' এবং সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় প্রভাবান্বিত দুটি চরিত্রের সংঘাতের পটভূমিকায় একটি প্রহসন 'বিরহী'। শেষোক্ত নাটক দুটি যথাক্রমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আন্তন শেকভ অবলম্বনে নাট্যরূপ দিয়েছেন মিহির চট্টোপাধ্যায়। নাটক তিনটির নির্দেশনার দায়িত্বে আছেন শ্রীমিহির চট্টোপাধ্যায় এবং রূপ দিচ্ছেন সায়ন্তনীর শক্তিশালী শিল্পী-গোষ্ঠী।

গিরিশ নাট্য সংসদ আগামী গিরিশ জন্মোৎসব উপলক্ষে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকটি যাত্রার আঙ্গিকে অভিনয় করবেন এবং গিরিশ রচনা থেকে আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। গত ২১ ডিসেম্বর রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটে সঙ্গীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে এঁদের প্রফুল্ল নাটকের শুভ-মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সংসদের গিরিশ চর্চার প্রচেষ্টাকে তিনি অভিনন্দিত করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল মহাশয় গিরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন যে, যাতে গিরিশ নাট্যাভিনয়ের প্রসার ঘটে, রচনার প্রচার করা যায় সে রকম ব্যবস্থা অবশ্যই করা প্রয়োজন। সংসদ সচিব শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গিরিশ রচনার প্রচারে ও প্রসারে এবং নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে জন-চিত্তকে উদ্বোধিত করতে সংসদ যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন তা বিবৃত করে আসন্ন গিরিশ জন্মোৎসব অনুষ্ঠান সফল ও সার্থক যাতে করা যায় সেজন্য সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা কামনা করেন। প্রফুল্ল নাটকের একটি দৃশ্য পাঠের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা সম্প্রতি তাঁদের দ্বিতীয় বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দ্বীপান্তর' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন রঙমহলে। নাটকটি পরিচালনার
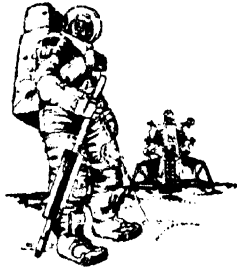
দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত।

দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বহন করেন নরেশ গঙ্গোপাধ্যায়। সুঅভিনীত এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন : মৃত্যুঞ্জয় দাস, প্রণব নন্দী, লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়, ননীগোপাল মুখার্জি, শ্যামল গুহ, সৌরেন ব্যানার্জি, তুষর দাশগুপ্ত, রথীন্দ্রনাথ বোস, দীপককুমার বসু, রতনলাল মুখার্জি, শ্যামসুন্দর দাস, অনুপকুমার ঘোষ, নিমাইচাঁদ দেবরায়, মানিক মুখার্জি, সবিতা রায়, অঞ্জলি চ্যাটার্জি, সাধনা পাল, অন্নপূর্ণা দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রবোধরঞ্জন রায় ও ভূপেন রায়।

স্টার থিয়েটার মঞ্চে ইউকো ব্যাঙ্ক অ্যামেচার ক্লাব (বড়বাজার শাখা) মঞ্চস্থ 'চলাচল' সম্প্রতিকালের অ্যামেচার থিয়েটার গোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য নাট্যনিবেদন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'চলাচল' উপন্যাসটির মোটামুটি এক প্রশংসাযোগ্য নাট্যরূপ মেলে ধরতে পেরেছেন পরিচালক প্রেমাংশু বসু। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় অবিনাশের ভূমিকায় নির্মলেন্দু মালাকরের সুষ্ঠু সুন্দর অভিনয়ের। অবিনাশের জীবন-বেদনা, নিস্পৃহ জীবনদর্শন এবং করুণ জীবন-সমস্যার এক মর্মস্পর্শী রূপ তিনি মেলে ধরতে পেরেছেন। কয়েকটি আবেগোদ্বেল মুহূর্তে অতিনাটকীয়তা বর্জন করতে পারলে তাঁর অভিনয় আরো অনেক উচ্চমানের হতে পারত। সরমার ভূমিকায় বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় সার্থক। একজনের পত্নী অপরজনের প্রেমিকার দ্বন্দ্বে দোলায়িত চিত্তের বেদনার এক সহজ সুন্দর রূপ তাঁর অভিনয়ে মূর্ত।

বিবিধ সংবাদ

মিস ম্যানুয়েলা গিয়েরঘুই হচ্ছে একজন চিত্র-সাংবাদিকের নাম। রুমানিয়ার মেয়ে; বয়েস বড় জোর ২৫।২৬। কিন্তু এই বয়সেই তিনি চলচ্চিত্রের একজন কৃতী সমালোচক হিসেবে সারা ইয়োরোপ দেশে অভিনন্দিত। ভারতের চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে তিনি বিশেষ আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। এবং এখানে তিনি সিডালক্ (ইণ্টারন্যাশানাল কমিটি ফর ডিফিউশন অব আর্ট, লিটারেচার অ্যান্ড কালচার) জুরীর একজন বিশিষ্ট সদস্যরূপে কাজ করেছেন। চলচ্চিত্র সম্বন্ধে রুমানিয়ার একমাত্র মাসিকপত্র 'সিনেমা' সম্পাদন করা ছাড়াও তিনি নিয়মিতভাবে 'আর্ট অ্যান্ড কালচার' সাপ্তাহিকে লিখে থাকেন এবং রেডিও ও টেলিভিশানে চলচ্চিত্র সমালোচনা করে থাকেন। ইয়োরোপের বহু চলচ্চিত্রোৎসবেই তিনি জুরীর কাজ করে থাকেন। শ্রীমতী গিয়েরঘুই দিন তিনেকের জন্যে কলকাতায় বেড়াতে এসে বি-এফ-জে-এর (বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের) সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং বাঙলা চলচ্চিত্র সম্বন্ধে তাঁর উচ্চ ধারণার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, ভারত ইউনিয়নে কম করে পাঁচ হাজার চিত্র-সাংবাদিক আছেন শুনে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। "দি ডায়মন্ড" ছবি প্রথম পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপার নিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, ছবিটি তাঁকে হতাশ করেছে।

ভি আই পি রোডের পাশে গড়ে-ওঠা নতুন জনপদের মানুষদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাঁকুড়গাছির ডাকঘর সংলগ্ন মঠে সুসজ্জিত মণ্ডপে আট দিনব্যাপী নতুন কলকাতা সাংস্কৃতিক উৎসব বিরাট সমারোহে সুসম্পন্ন হয়েছে। ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় মূল সাংস্কৃতিক সম্মেলন এবং ১৪ ডিসেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর প্রতিপালিত হয় যুব সংস্কৃতি উৎসব।

উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে সম্মেলনের প্রথম দিনটি উদ্‌যাপিত হয় নজরুল ইসলাম এভিনিউ স্মরণোৎসবরূপে। এ-দিন ভি আই পি রোডের পরিবর্তে 'নজরুল ইসলাম এভিনিউ' নাম-ফলকের উদ্বোধন করেন সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এবং এই অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন অধ্যাপিকা ইলা মিত্র। কাজী সব্যসাচীর পরিচালনায় 'অগ্নিবীণা কর্তৃক বিভিন্ন শিল্পীর গানে ও আবৃত্তিতে নজরুল-সন্ধ্যা মুখর হয়ে ওঠে। এ-দিনের অন্য দুটি উপভোগ্য অনুষ্ঠান হল রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপিকা মায়া সেনের রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও থিয়েতর লাইব্রেরর 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটকাভিনয়।

সম্মেলনের বিভিন্ন দিনে সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক শ্রীকুমারেশ ঘোষ, কবি ধনঞ্জয় দাস, অধ্যাপক অধীর চৌধুরী, শ্রীগৌতম সেন ও প্রবীণ শ্রমিক নেতা শ্রীবাচ্চু সিং। এই উৎসবে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিখ্যাত ঢোলবাদক শিল্পী ক্ষীরোদ নট্টকে সম্বর্ধনা জানান হয়। উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে কবি শ্রীধনঞ্জয় দাশ এই সব গুণীজনকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা করেন।

এই উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত কবি সম্মেলনে স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, সতীন্দ্র মৈত্র, ধনঞ্জয় দাশ, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, গণেশ বসু, শিশির সামন্ত, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য গুহ, তুলসী মুখোপাধ্যায়, রমেন আচার্য, ভবতোষ আচার্য, অনন্ত দাশ, শিলেন চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সেন প্রমুখ আরও অনেক প্রবীণ ও তরুণ কবি।

'বামপন্থী দলগুলির ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে সমর্থন করা উচিত নয়, — এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে যে মনোজ্ঞ বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সমীর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমলেন্দু রায়চৌধুরী। উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের প্রতিনিধিদের কলকাতা আগমনকে অভিনন্দিত করে বক্তৃতা করেন যুব নেতা পল্টু দাশগুপ্ত। এ ছাড়া অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-সঙ্গীত, নির্মলেন্দু চৌধুরীর লোকসঙ্গীত, থিয়েতর লাইব্রের 'লেনিন', মালঞ্চের 'মহড়া' ও 'লড়াই', অগ্নির 'স্বাক্ষিক' প্রভৃতি নাটকাভিনয় ছিল অতিরিক্ত আকর্ষণ।

মাদ্রাজে ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্ট খেলার শেষে জয়ের আনন্দে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা পরস্পরকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।
ফটো : ল্যান্ড এ্যান্ড লাইফ

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়া

পঞ্চম টেস্ট খেলা

অস্ট্রেলিয়া : ২৫৮ রান (ওয়াল্টার্স ১০২ এবং স্ট্যাকপোল ৩৭ রান। প্রসন্ন ১০০ রানে ৪ এবং ভেংকটরাঘবন ৭১ রানে ৪ উইকেট)।

। ১৫৩ রান (রেডপাথ ৬৩ রান। প্রসন্ন ৭৪ রানে ৬, অমরনাথ ৩১ রানে ২ এবং ভেংকটরাঘবন ২৬ রানে ২ উইকেট)।

[ভা]রতবর্ষ : ১৬৩ রান (নবাব পতৌদি ৫৯ রান। ম্যালেট ৯১ রানে ৫ এবং ম্যাকেঞ্জি ১৯ রানে ২ উইকেট)।

১৭১ রান (বিশ্বনাথ ৫৯ এবং ওয়াদেকার ৫৫ রান। ম্যালেট ৫৩ রানে ৫, ম্যাকেঞ্জি ৪৫ রাণে ৩ এবং মেইন ৩২ রানে ২ উইকেট।)

মাদ্রাজে অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষের [প]ঞ্চম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৭৭ [রা]নে জয়ী হয়ে ১৯৬৯ সালের টেস্ট [সি]রিজে ৩—১ খেলায় (ড্র ১) ভারতবর্ষকে [প]রাজিত করেছে। খেলার চতুর্থ দিনে জয়-[প]রাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। খেলার [তৃ]তীয় দিনে অস্ট্রেলিয়াকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ১৫৩ রানের মাথায় নামিয়ে দিয়ে এবং তৃতীয় দিনের চা-পানের ২০ মিনিট আগে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৪৯ রান সংগ্রহ করতে পারে নি। প্রধানত দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস এবং নিষ্ঠার অভাবেই ভারতীয় দল ব্যাটিংয়ে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করেছে। ভারতীয় খেলোয়াড়রা তাঁদের উইকেটের বদান্যতা করছেন বললেই বোধহয় খেলার সঠিক চিত্র দেওয়া হয়।

প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটের বিনিময়ে ২৪৩ রান সংগ্রহ করে। তাদের ৮২ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়েছিল। দলের এই সংগীন অবস্থায় ৫ম উইকেটের জুটি রেডপাথ (৩৩ রান) এবং ওয়াল্টার্স ১০৫ মিনিটের খেলায় দলের ১০২ রান তুলে দিয়ে দলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। ওয়াল্টার্স তাঁর ১০২ রানে ১৪টা বাউন্ডারী এবং দুটো ওভার-বাউন্ডারী করেছিলেন। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ওয়াল-টার্সের এই প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ২৫৮ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন তারা তাদের বাকী দুটো উইকেটে ১৫ রান যোগ করেছিল। দ্বিতীয় দিনেই ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা ১৬৩ রানে শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ৯৫ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ১৪ রান সংগ্রহ করে। অসুস্থতার কারণে বিষেণ সিং বেদী ভারত-বর্ষের প্রথম ইনিংসে ব্যাট করেন নি।

তৃতীয় দিনের খেলা নাটকীয় ঘটনায় ভরা ছিল। সাত সকালেই মাত্র ১০ রানের বিনিময়ে এই চারজন আউট হলেন—ওয়ালটার্স, লরী, সিহান এবং টেবার। সকলেই প্রসন্নর বলে। এই সময় স্কোর-বোর্ডে অস্ট্রেলিয়ার রান দাঁড়ায়—৬টা উইকেট পড়ে ২৪। প্রসন্নর বোলিং এই রকম : ওভার ৩-২, মেডেন ২, রান ৮ এবং উইকেট ৪। শেষ পর্যন্ত রেডপাথ (৬৩ রান), ম্যাকেঞ্জী (২৪ রান), মেইন (১৩ রান) এবং ম্যালেটের (নট-আউট ১১ রান) দৃঢ়তায় অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৩ রান করে। ৭ম উইকেট জুটিতে ম্যাকেঞ্জি এবং রেডপাথ ৩৩ রান, ৮ম উইকেটের জুটিতে মেইন এবং রেডপাথ ৫০ রান এবং ৯ম উইকেটের জুটিতে রেডপাথ এবং ম্যালেট ৩৪ রান সংগ্রহ করেন। লাঞ্চের সময় অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল ৯৪ (৭ উইকেটে)। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের থেকে তখন অস্ট্রেলিয়া ১৮৯ রানে এগিয়ে। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৪৯ রান তুলতে ভারতবর্ষ চা-পানের ২০ মিনিট আগে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ভারত-বর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের ৮২ রানের (২ উইকেটে) মাথায় তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হয়। খেলার এই অবস্থায় ভারতবর্ষের জয়-লাভের জন্যে আরও ১৬৭ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে ছিল ২য় ইনিংসের ৮টা উইকেট এবং [illegible]

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের ৫৫ মিনিট পর ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ১৭১ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ৭৭ রানে জয়ী হয়।

টেস্টের ব্যাটিং এবং বোলিং

ভারতবর্ষের খেলোয়াড়দের মধ্যে মোট ৩০০ বা তার বেশী রান করেছেন এই তিনজন—মানকাদ (৩৫৭ রান, গড় ৩৫·৭০), ওয়াদেকার (৩৩৬ রান গড় ৩৭·৩৩) এবং বিশ্বনাথ (৩৩৪ রান, গড় ৪৭·৭১)।

অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের মধ্যে মোট ৩০০ বা তার বেশী রান করেছেন এই দুজন—কিথ স্ট্যাকপোল (৩৬৮ রান, গড় ৪৬·০০) এবং আয়ান চ্যাপেল (৩২৪ রান, গড় ৪৬·২৯)। এঁদের পরই ডগ ওয়ালটার্সের ২৮৬ রান উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন এরাপল্লী প্রসন্ন—৬৭২ রানে ২৬টি উইকেট (গড় ২৫·৮৫)। বিষেণ সিং বেদী পেয়েছেন ৪৩২ রানে ২১টি (গড় ২০·৫৭)।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন অ্যাসলে ম্যালেট—৫৩৫ রানে ২৮টি উইকেট (গড় ১৯·২১)—উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট। বর্তমান সময়ের বিশ্ববিশ্রুত ফাস্ট বোলার গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি পেয়েছেন ৪৪৩ রানে ২১টি উইকেট। ম্যাকেঞ্জির টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে উইকেট পাওয়ার সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়াল—২৩৮টি (৫৪টি টেস্টে)। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে টেস্টে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন রিচি বেনো—২৪৮টি। সুতরাং ম্যাকেঞ্জি আর ১১টি উইকেট পেলেই বেনোর রেকর্ড ভাঙবেন। ম্যাকেঞ্জির বর্তমান বয়স ২৭।

ক্রীড়ারত ডগ ওয়ালটার্স—৫ম টেস্টে সেঞ্চুরী (১০২) করেন। ফটো : ল্যান্ড এ্যান্ড লাইফ

টেস্ট সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া (৪টি) : আয়ান চ্যাপেল—১৩৮ (দিল্লী); পল সিহান—১১৪ (কানপুর); কিথ স্ট্যাকপোল—১০৩ (বোম্বাই); ডগ ওয়ালটার্স—১০২ (মাদ্রাজ)

ভারতবর্ষ (১টি) : জি আর বিশ্বনাথ—১৩৭ (কানপুর)

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

(ডিসেম্বর ২৯, ১৯৬৯ পর্যন্ত)

		অস্ট্রেলিয়া	ভারতবর্ষ	
স্থান	খেলা	জয়ী	জয়ী	ড্র
অস্ট্রেলিয়া	৯	৮	০	১
ভারতবর্ষ	১৬	৮	৩	৫
	২৫	১৬	৩	৬

টেস্ট সিরিজের ফলাফল

অস্ট্রেলিয়ার জয় ৪, ভারতবর্ষের জয় ০ এবং সিরিজ ড্র ১

জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

বাঙ্গালোরে আয়োজিত জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের দলগত বিভাগে মহীশূর বার্ণা-বেলাক কাপ জয়ী হয়েছে। মহীশূরের পক্ষে বার্ণা-বেলাক কাপ জয় এই প্রথম। মহারাষ্ট্র মহিলা
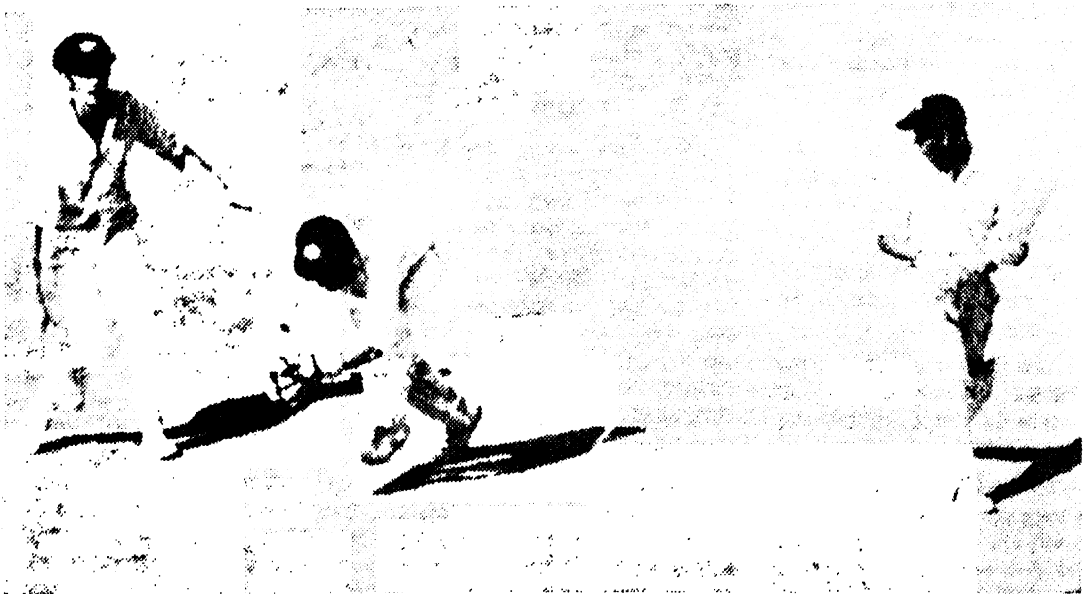
মাদ্রাজে ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে সোলকার ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলায় ম্যালেটের বলে 'ক্যাচ' তুলে টেবারের হাতে ধরা পড়ে আউট হয়েছেন। ফটো : ল্যান্ড এ্যান্ড লাইফ

বিভাগের জয়লক্ষ্মী কাপ এবং জুনিয়র বিভাগে রামানুজন কাপ জয় করেছে।

পুরুষ বিভাগ (বার্না-বেলাক কাপ) : মহীশূরে সর্বাধিক পয়েণ্ট লাভের সূত্রে গত দু' বছরের চ্যাম্পিয়ান রেলওয়েকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ (জয়লক্ষ্মী কাপ) : গত দু বারের বিজয়ী মহারাষ্ট্র ('এ' দল) ৩—০ খেলায় মহীশূরকে পরাজিত করে।

জুনিয়র বিভাগ (রামানুজন কাপ) মহারাষ্ট্র ৩—১ খেলায় গত দু'বারের বিজয়ী অন্ধ্রপ্রদেশকে পরাজিত করে।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নসীপ

জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যক্তিগত বিভাগে মহারাষ্ট্রের কেটি চার্জম্যান মহিলাদের সিংগলস, মহিলাদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে 'ত্রিমুকুট' খেতাব লাভ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, এ বছরের জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মোট ৮টি খেতাবের মধ্যে মহারাষ্ট্র ৬টি খেতাব জয় করেছে—দলগত বিভাগে ২টি এবং ব্যক্তিগত বিভাগে ৪টি। অরও উল্লেখযোগ্য, মহিলাদের সিংগলস, মহিলাদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে কেবল মহারাষ্ট্রের খেলোয়াড়রাই খেলেছিলেন।

পুরুষদের সিংগলস : গত বছরের বিজয়ী মীর কাশেম আলী (অন্ধ্রপ্রদেশ) ১৮—২১, ২২—২০, ২১—১৭, ১৯—২১ ও ২১—১৬ পয়েণ্টে কাবাদ জয়ন্তকে (মহীশূর) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : কেটি চার্জম্যান (মহারাষ্ট্র) ২১—১৪, ২১—১৭ ও ২১—১৪ পয়েণ্টে শৈলজা সোলককে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : ফারুক খোদাজী এবং এন এস ভাস (মহারাষ্ট্র) ২৫—২৩, ২৩—২১ ও ২১—১৯ পয়েণ্টে কাবাদ জয়ন্ত এবং বি সইকুমারকে (মহীশূর) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : কেটি চার্জম্যান এবং উষা মুকুন্দ (মহারাষ্ট্র) ২১—১৪, ২১—১১ ও ২১—১১ পয়েণ্টে শৈলজা সোলক এবং নিতা নওয়াথকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : কেটি চার্জম্যান এবং ফারুকে খোদাজী (মহারাষ্ট্র) ২১—১৮, ২১—১৫ ও ২১—১২ পয়েণ্টে উষা মুকুন্দ এবং ডি ভি লাখানিকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

রোভার্স কাপ

রোভার্স কাপ

বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৩—০ গোলে গত বছরের বিজয়ী মোহনবাগানকে পরাজিত করে চারবার রোভার্স কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এর আগে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব রোভার্স কাপ পায় তিনবার—১৯৪৯, ১৯৬২ (অন্ধ্র-প্রদেশের সংগে যুগ্মভাবে) এবং ১৯৬৭ সালে। রোভার্স কাপের ফাইনালে এই নিয়ে মোহনবাগানের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল দলের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ এবং দ্বিতীয় জয়। ১৯৬৭ সালে উভয় দলের প্রথম সাক্ষাতে ইস্টবেঙ্গল ২—০ গোলে জয়ী হয়েছিল।

আলোচ্য বছরের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল দল প্রথমার্ধের খেলাতেই তিনটি গোল দেয়। প্রথম গোল দেন কাজল মুখার্জি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোল করেন সুভাষ ভৌমিক। ইস্টবেঙ্গল দলের এই জয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, মোহনবাগান গতবারের রোভার্স কাপ জয়ী এবং এই নিয়ে উপর্যুপরি ৬ বার মোহনবাগান রোভার্স কাপের ফাইনালে খেললো। তা ছাড়া ১৯৬৯ সালের ফুটবল মরসুমে মোহনবাগান প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে তারা ৩—১ গোলে ইস্ট-বেঙ্গল দলকে পরাজিত করে একই বছরে লীগ ও শীল্ড জয়ের গৌরব লাভ করেছিল। মোহনবাগান রোভার্স কাপ পেয়েছে তিনবার—১৯৫৫, ১৯৬৬ ও ১৯৬৮ সালে।

দক্ষিণাঞ্চল বনাম অস্ট্রেলিয়া দল

দক্ষিণাঞ্চল : ২৩৯ রাণ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ভেঙ্কটরাঘবন নট আউট ৪২, জয়ন্তীলাল ৪১ এবং আবিদ আলী ৪০ রাণ। মেইন ৬৭ রাণে ৪, কনোলী ৫২ রাণে ২ এবং গ্লিসন ৫১ রাণে ২ উইকেট)

ও ১৫৫ রাণ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বিশ্বনাথ ৩৮ রাণ। কনোলী ২৯ রাণে ২ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়ান দল : ১১৫ রাণ (লরী ১২০ রাণ। চন্দ্রশেখর ৫৫ রাণে ৪ উইকেট)

ও ৯০ রাণ। (৮ উইকেটে। রেডপাথ ২৪, লরী নটআউট ১৩ এবং গ্লিসন নটআউট ১৮ রাণ। প্রসন্ন ১১ রাণে ৬ উইকেট)

ব্যাংগালোরে দক্ষিণাঞ্চল দলের হাতে অস্ট্রেলিয়ান দল পরাজয় থেকে খুব জোর ছাড়ান পেয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসের ৯ম উইকেট জুটি অধিনায়ক বিল লরী এবং জন গ্লিসন ৯০ মিনিট ধরে দক্ষিণাঞ্চল দলের আক্রমণ ঠেকিয়ে রেখে খেলা শেষ-পর্যন্ত ড্র রাখেন।

জয়সীমার অধিনায়কত্বে দক্ষিণাঞ্চল দল প্রথম দিনের খেলায় ৭ উইকেট খুইয়ে ২০৪ রাণ সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণাঞ্চল দল ২৩৯ রাণের (৯ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। দ্বিতীয় দিনেই অস্ট্রেলিয়ান দলের প্রথম ইনিংস ১৯৫ রাণের মাথায় শেষ হলে দক্ষিণাঞ্চল ৪৪ রাণে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের ২ উইকেট খুইয়ে ১৩ রাণ সংগ্রহ করে। অস্ট্রেলিয়ান দলের প্রথম ইনিংসের গোড়াপত্তন খুব শক্ত হলেও তা কোনই কাজ দেয়নি। প্রথম উইকেট জুটি রেডপাথ এবং লরী দলের ৯০ রাণ তুলেছিলেন। কিন্তু রেডপাথের বিদায়ের পর একমাত্র লরী ছাড়া আর কেউই খেলতে পারেন নি। লরীর ব্যক্তিগত ১২০ রাণ দলকে শোচনীয় অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে দেয়। দলের প্রথম ইনিংসের ১৯৫ রাণের মধ্যে লরী একাই ১২০ রাণ করে-ছিলেন এবং বাকি ১০ জনে মাত্র ৭৫ রাণ। অস্ট্রেলিয়ান দলের প্রথম ইনিংস ২৪০ মিনিট স্থায়ী ছিল। লরী ২১৬ মিনিট খেলেন এবং তাঁর ১২০ রাণে ৫টা ওভার বাউণ্ডারী ছিল।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনের খেলায় দক্ষিণাঞ্চল দল ১৫৫ রাণের (৬ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে ১৯৯ রাণে অগ্রগামী হয়। এই অবস্থায় খেলার বাকি ১৬৫ মিনিটে অস্ট্রেলিয়ান দলের জয়লাভের জন্যে ২০০ রাণের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু জয়লাভ দূরে থাক, প্রসন্ন মাত্র ১১ রাণে ৬টা উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান দলকে পরাজয়ের দোরগড়ায় দাঁড় করিয়ে-ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ান দলের ৩৬ রাণের মাথায় ৩য় ও ৪র্থ এবং ৪৩ রাণের মাথায় ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম উইকেট পড়ে যায়। ৫৩ রাণের মাথায় ৮ম উইকেট পড়লে দলের এই শোচনীয় অবস্থায় লরীর সংগে গ্লিসন ৯ম উইকেটের জুটি বাঁধেন এবং ৯০ মিনিট লড়াই করে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চল দলের জয় ঠেকিয়ে দেন।

দাবার আসর

ডিসট্যাণ্ট অপোজিশন :—

একই ফাইল বা র‍্যাংকে দুই রাজার মধ্যে তিন অথবা তার বেশী ঘরের ব্যবধান থাকলে আমরা বলতে পারি দুই রাজার মধ্যে ডিসট্যাণ্ট অপোজিশন রয়েছে। এই ডিসট্যাণ্ট অপোজিশনও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং সহজেই ভুল করে ডিসট্যাণ্ট অপোজিশন হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনাও অত্যন্ত বেশী।

একটি কথা মনে রাখবেন, দুই রাজা যখন একই ফাইল অথবা র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, তখন তাদের মাঝখানের ঘরগুলি যদি জোড়সংখ্যক হয়, তাহলে যার চাল হবে সেই অপোজিশন রাখতে পারছে। যদি বেজোড়সংখ্যক হয়, তাহলে যার চাল সে অপোজিশন হারাচ্ছে।

ধরা যাক, সাদা রাজা রয়েছে মন্ত্রী গজ ২ ঘরে এবং কালো রাজা রয়েছে মন্ত্রী গজ ৩ ঘরে। দুই রাজার মধ্যে ঘরের ব্যবধান ৩। সুতরাং পূর্বোক্ত সূত্র অনুসারে, এখন যার চাল সে অপোজিশন হারাবে। ধরা যাক এখন কালোর চাল। তাহলে, (১)......রাজা—ঘোড়া ৪ (২) রাজা—ঘোড়া ৩; (১)...রাজা—গজ ৪ (২) রাজা—গজ ৩; (১)...রাজা—মন্ত্রী ৪ (২) রাজা—মন্ত্রী ৩ এবং সব সময় সাদা অপোজিশন নিতে পারছে।

ধরুন ১নং চিত্রের অবস্থা থেকে সাদা নিজের রাজা নৌকা ৮ কোণের দিকে যেতে চাইছে। কালোর চাল, এবং কালো ওপরের তিনটি চালের কোনটাই না দিয়ে রাজাকে মন্ত্রী ৩ ঘরে বসাল। এক্ষেত্রে আপনি সাদার হয়ে কি চাল দেবেন? সাদা যদি কালোর (১)...রাজা—মন্ত্রী ৩ চালের জবাবে নিজের রাজাকে তৃতীয় র‍্যাংকের কোন ঘরে চালে, তাহলে সাদা সঙ্গে অপোজিশন হারাবে এবং কালো অপোজিশন পেয়ে যাবে। যেমন (২) রাজা—ঘোড়া ৩ : রাজা—মন্ত্রী ৪ (ডায়াগোনাল অপোজিশন); (২) রাজা—গজ ৩ : রাজা—গজ ৪; (২) রাজা—মন্ত্রী ৩ : রাজা—মন্ত্রী ৪। সুতরাং কালো যদি প্রথম চাল (১)...রাজা—মন্ত্রী ৩ দেয়, এবং সাদাকে যদি রাজাকে যদি রাজা নৌকা ৮ কোণের দিকে যেতে হয়, তাহলে প্রথম চালে সাদাকে ডিসট্যাণ্ট অপোজিশন ধরে রেখে দ্বিতীয় র‍্যাংকেই নিজের রাজাকে চালতে হবে, ওপরের র‍্যাংকে ওঠা চলবে না। অর্থাৎ সাদার প্রথম চাল হবে (১) রাজা—মন্ত্রী ২ এবং তাহলেই ছকের স্থিতাবস্থায় সত্যিকারের কোন হেরফের ঘটল না।

এই যে অবস্থাটা আমরা দেখলাম, অর্থাৎ কালোর রাজা রয়েছে মন্ত্রী ৩ ঘরে, সাদার রাজা রয়েছে মন্ত্রী গজ ২ ঘরে, এই অবস্থায় সাদার চাল হলে সাদা অপোজিশন রাখতে পারছে একটু হিসাব করে চাল দিলে। চিত্রের অবস্থায় কালো রাজা যদি মন্ত্রী ৩ ঘরে থাকত (সাদা রাজা মন্ত্রী গজ ২ ঘরেই), তাহলে দুই রাজার মধ্যে যে অপোজিশন রয়েছে তাকে আমরা বলতে পারি অবলিক্ অপোজিশন (অর্থাৎ ডিরেক্ট এবং ডায়াগোনাল অপোজিশনের সংমিশ্রণ।) এই অবলিক্ অপোজিশন রয়েছে কি নেই, তা সহজে বোঝার জন্যে ২নং চিত্রে ছকের

১নং চিত্র

ঘরগুলিকে 'এ', 'বি', 'সি', এবং 'ডি' এই চাররকম ঘরে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। যদি বিপক্ষ রাজা কোন 'এ' চিহ্নিত ঘরে অবস্থান করে, তাহলে স্বপক্ষের রাজাকে ছকের যে কোন জায়গায় যে কোন 'এ' চিহ্নিত ঘরে বসালেই অবলিক্ অপোজিশন থাকবে। সেইরকম, বিপক্ষ রাজা কোন 'বি' চিহ্নিত ঘরে থাকলে স্বপক্ষের রাজাকে যে কোন 'বি' চিহ্নিত ঘরে বসাতে পারলেই কোন না কোনরকম অপোজিশন থাকবে। 'সি' এবং 'ডি' চিহ্নিত ঘরগুলি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

এইবারে লক্ষ্য করে দেখুন ১নং চিত্রের অবস্থা থেকে কালো (১)...রাজা—মন্ত্রী ৩ ঘরে চাল দেবার পর সাদা হয় (২) রাজা—

২নং চিত্র

ঘোড়া ২ অথবা (২) রাজা—মন্ত্রী ২ দিলেই অপোজিশন রাখতে পারছে, কারণ এই সবগুলি ঘরই 'বি' চিহ্নিত ঘর। অন্য কোন ঘরে সাদা রাজা চাল দিলেই অপোজিশন হারাবে, কারণ তাদের একটিও 'বি' চিহ্নিত ঘর নয়।

১নং চিত্রের অবস্থা থেকে কালোর চাল হলে সাদা মন্ত্রী নৌকা ৮ কোণের দিকে কিভাবে এগুবে সেটাও দেখে নিন।

(১)......রাজা—মন্ত্রী ৩। কালো রাজা এগিয়ে এলে সাদা ডিরেক্ট অপোজিশন নেবে, কালো রাজা পিছিয়ে গেলে সাদা ডিসট্যাণ্ট অপোজিশন ধরে রেখে এগুবে, এবং কালো রাজা যদি পাশে সরে যায়, তাহলে সাদা ও অন্য পাশ দিয়ে এগিয়ে যাবে। কালো রাজা যে চালই দিক, সাদা রাজার এগুনো বন্ধ করতে পারবে না।

(২) রাজা—ঘোড়া ৩ : রাজা—গজ ২ (৩) রাজা—নৌকা ৪। সাদা ৩নং চাল রাজা—গজ ৩ অথবা রাজা—নৌকা ৩ দিতে পারত কিন্তু রাজা—ঘোড়া ৪ চালটা নয়, কারণ তাহলেই কালো রাজা—ঘোড়া ৩ চাল দিয়ে অপোজিশন নিয়ে নেবে। ২নং চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝে নিন।

(৩)......রাজা—ঘোড়া ১। যদি (৩)...রাজা—গজ ৩, তাহলে (৪) রাজা—নৌকা ৫।

(৪) রাজা—ঘোড়া ৪ (সাদা ফের ডিসট্যাণ্ট অপোজিশন নিল।) (৪)......রাজা—গজ ১ (৫) রাজা—নৌকা ৫ : রাজা—ঘোড়া ২ (৬) রাজা—ঘোড়া ৫ এবং সাদা ডিরেক্ট অপোজিশন পেল।

ডিসট্যাণ্ট এবং অবলিক অপোজিশন জেনে রাখা খুবই প্রয়োজনীয়, যদিও কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় এই অপোজিশন কাজে লাগানো যায় না, কারণ স্বপক্ষের বা বিপক্ষের বোড়ের অবস্থান রাজার চলাফেরায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

—গজানন্দ বোড়ে

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত

৯ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৭শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 23rd January, 1970 শুক্রবার, ৯ই মাঘ, ১৩৭৬ 40 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীমানব বড়ুয়া

সাহিত্যিকের চোখে : সাংবাদিকতার রীতি

অমৃতে বেশ কিছুকাল ধরে 'সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ' নামে একটি ফিচার চলছে। ফিচারটি খুবই কৌতূহল নিয়ে পড়ছি, এবং এ ধরনের ফিচার চালু করার জন্যে সম্পাদকীয় পরিকল্পনার তারিফ করছি।

কিন্তু এই সপ্তাহে অন্য একটি সাপ্তাহিকে 'অমৃতে'র এই ফিচারটির বিষয়ে সুদীর্ঘ এক আলোচনা দেখে অবাক হলাম। ঐ আলোচনায় শ্রীপুলকেশ দে সরকার যা বলেছেন, তার যৌক্তিকতা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। কারণ যে কোনো আলোচকই নিজের মত পোষণ করতে পারেন এবং প্রকাশও করতে পারেন। আমার শুধু বক্তব্য এই যে, সাংবাদিকতার একটি প্রচলিত রীতি হল—কোনো কাগজে কোনো প্রসঙ্গ প্রকাশিত হলে সে বিষয়ে পাঠকের যা কিছু বক্তব্য তা সেই কাগজেই জানাতে হয়। তারপর, যদি সেই কাগজ প্রতিবাদ বা আলোচনা প্রকাশে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন, তখন অবশ্য লেখক অন্য কাগজেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে শ্রীদে সরকার কি তাঁর ঐ আলোচনাটি আপনাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন? এবং আপনারা তা ছাপবেন না জানিয়েছেন?

তা যদি না হয়ে থাকে, তাহলে শ্রীদে-সরকারের পক্ষে এইভাবে অন্য কাগজে অমৃতের ফিচার এবং (তার লেখকদেরও বটে) উপর কটাক্ষপাত করা কি সাংবাদিকতার রীতি-বিরোধী এবং ফলত অনৈতিক আচরণও (আন-এথিক্যাল) নয়?

প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
দুর্গাপুর

[শ্রীপুলকেশ দে সরকার 'অমৃতে' পূর্বোক্ত বিষয়ে কোনো লেখা পাঠান নি, কাজেই 'অমৃত' কর্তৃক তা প্রকাশ করতে অক্ষমতা জ্ঞাপনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।]

অ-স

'বইকুন্ঠের খাতা'

'অমৃতে' আমার বই-এর সমালোচনার জন্য আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ ও প্রীত। তবু দু-একটি ভুল সংশোধন না করে পারছি না। Children's Book Trust আমার যে বইটি প্রকাশ করেছেন, তার নাম Tiger Tales, ছোটবেলায় শোনা সত্যিকার বাঘের গল্পের বই। শ্রীশঙ্কর পিল্লে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। National Book Trust, India-র সভাপতি হলেন ডাঃ কেশকর। এঁরা শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী সম্পাদনার জন্য জওহরলাল নেহরুর স্মৃতিতে নেহরু বাল পুস্তকালয়ের পরিকল্পনা করেছেন। এঁরাও Children's Book এর মতো মুনাফাবিহীন কাজ করেন। একেকটি বই একই lay-out দিয়ে, এঁরাও সর্ব ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করবেন। ইংরেজীতে এই পরিকল্পনার নাম হয়েছে Nehru Library of Booys for children. এই পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে ১৯৬৮-এর শেষ দিক থেকে। এখন প্রথম কয়েকটি বইয়ের ছাপার কাজ আরম্ভ হয়েছে।

প্রথম বইগুলি হবে ১২—১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য, তথ্যমূলক অথচ সরস। পরে এঁরা সব বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য সব রকম বই সম্পাদনা করার ইচ্ছা রাখেন। আমার River story এঁরা প্রকাশ করেছেন। উত্তর ভারতের নদী সম্বন্ধে বই। একটু বড় আকারের, ৬৪ পৃষ্ঠার বই হবে। ছবি থাকবে প্রচুর, দাম হবে কম। সব বই-ই মোটামুটি এই ধরনের হবে। ভারতের সব রাজ্যের ছোটদের জন্য যাঁরা লেখেন, তাঁদের এঁরা আহ্বান জানিয়েছেন। এ পরিকল্পনা সুসম্পন্ন হলে ছোটদের জন্য একটা কাজের মতো কাজ হবে।

আমার এই চিঠিখানি বা তার অংশ-বিশেষ আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশ করে আমাকে বাধিত করবেন।

লীলা মজুমদার

নাটকের পাণ্ডুলিপি এবং বিসর্জনের মুক্তি

'অমৃতে'র ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 'নাটকের পাণ্ডুলিপি এবং বিসর্জনের মুক্তি' শীর্ষক রচনায় বহু বিভ্রান্তিকর তথ্য স্থান পেয়েছে, যেগুলির সংশোধন হওয়া একান্ত দরকার। সংক্ষেপে কয়েকটির উল্লেখ করছি।

যেমন, লেখকের অজ্ঞতাবশতঃ অধিকাংশ নাটকের নাম বিকৃতরূপে পরিবেশিত হয়েছে! রক্ষ ও রমণী, বরেজ, মিডিয়া, সপ্তম প্রতিমা, অভিনেত্রীর রূপ এবং সুভদ্রাহরণ নাটককে লেখা হয়েছে যথাক্রমে রমা ও রমণী, রঙ্গরাজ, মেদিনা, সপ্ত-প্রতিমা, অভিনেত্রীরূপ ও সুভদ্রা।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং বরদা-প্রসন্ন দাশগুপ্ত কোথাও কোথাও কিশোরী-প্রাসদ, বরোদাপ্রসাদ এবং বরেদাপ্রসন্ন বেশে দেখা দিয়েছেন।

'ভূপেন্দ্রনাথের 'সওদাগর' এবং বরদা-প্রসন্নের 'মতির মালা' নাটক দুটি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ'।—সাংবাদিকের এই মন্তব্য অভিনব এবং হাস্যকর। কেন না, প্রথম নাটকটি সেক্সপীয়রের Merchant of Venice এর বিশেষত্বহীন ভাবানুবাদ (অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অসাধারণ অভিনয়ের গুণেই যা কেবলমাত্র স্মরণীয়), দ্বিতীয়টি নাট্যানুরাগীদের নাম-না-জানা এক অজ্ঞাতকুলশীল নাটক এবং সবচেয়ে বড় কথা সমলোচক ও সাধারণ পাঠক কেউই এঁদের প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের স্বীকৃতি দেন না।

নাটক সম্বন্ধে লেখকের শোচনীয় জ্ঞানা-ভাব, বাংলা ভাষার প্রথম একাঙ্ক 'মুক্তির ডাক'কে অপরেশচন্দ্রের নাটক-তালিকাভুক্ত করার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত। স্টারে তথা বাংলা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত এবং প্রমথ চৌধুরী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, নজরুল ইস-লাম প্রভৃতি কর্তৃক মৌলিকতার কারণে উক্ত প্রশংসিত ও বিখ্যাত এই একাঙ্কটি রচনার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে মন্মথ রায়ের, সৌভাগ্যক্রমে তিনি এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছেন।

নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য 'চিত্রাঙ্গদা' রবীন্দ্রনাথই রচনা করে গেছেন—কেন 'বরদাপ্রসাদ' নয়। ১৯৩৩ এর ২৫শে ডিসেম্বর অপেরা-নিউ-এর রঙ্গমহল থিয়েটারে অভিনীত 'চিত্রাঙ্গদা'র রচয়িতা বরদাপ্রসন্ন হতে পারেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সে নাটকের কোনো মূল্য নেই।

পরিশেষে সাংবাদিক বলেছেন, অপরেশ-চন্দ্র উইলসন ব্যারেটস্-এর নাটক অবলম্বনে 'আহুতি' লিখেছিলেন। তাহলে এতকাল যে সমালোচকরা বলে এসেছেন নাটকটি Sign of the cross গল্পের বাংলা ভাবানুসরণ, তা কি ভুল?

শিশির বসু,
কাঁচড়াপাড়া
২৪ পরগণা,

ছোট পত্রিকা প্রসংগে

গত ২৯শে ডিসেম্বরের অমৃতে প্রকাশিত শ্রীসুনির্মল চট্টোপাধ্যায় লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, শ্রীজীবনময় দত্ত তা সমর্থন করেছেন (৯ই জানুয়ারী, ৭০)। আমিও ওঁদের সংগে একমত।

একখানা লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে গেলে যে কি ধরনের বাধা অসুবিধে এবং দুঃখ-বেদনার তিক্ত অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়, তার খবর অনেকের মতো আমারও জানা আছে। বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যায় ভাটা পড়ছে, এরকম অভিযোগ আজকাল প্রায় শোনা

যাচ্ছে। এই স্বল্পতার জন্যে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শাসনব্যবস্থাকে দায়ী করা যেতে পারে।

প্রবাসী বাঙালীরা তবুও শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও অনেকেই লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছেন। জীবনময়বাবু শুধু সপ্তদীপার নামোল্লেখ করেছেন—সম্পাদক-সূত্রে।

কিন্তু এমন তো অনেকেই আছেন যাঁদের এই লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করার আগ্রহ ও উৎসাহ আছে, অথচ নানারকম প্রতিকূলতার চাপে পড়ে তাঁদের ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না। তার ওপর আছে, জাতীয় ভাষার দাপট।

সুতরাং অফিস-কাছারির শেষে, কর্মক্লান্ত অবসর মুহূর্তে সেই উৎসাহী মানুষগুলো যখন বৃহত্তর উদ্দেশ্যের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে কিছু গল্প-উপন্যাস লিখে বাংলা পত্র-পত্রিকাতে পাঠান, পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরা অমনোনীত ছাপ মেরে লেখা ফেরত পাঠান। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলোর চেয়ে ফেরত পাঠানো গল্পগুলো কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়, অনেক সময় উৎকৃষ্ট হয়।

আজকাল প্রায় চোখে পড়ে প্রবাসী বাঙালীরা মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষা পড়ছে। বড় দুঃখ হয়। কিন্তু প্রবাসী বাঙালীরা কেন যে মাতৃভাষা শিখছে না, এ প্রশ্নের সঙ্গে বাংলা পত্র-পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রবাসী বাঙালীদের প্রতি উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যও জড়িত।

সুতরাং লিটল ম্যাগাজিনের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি যে আরো সংকটপূর্ণ হবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত না হলেও সন্দেহ নাই।

কল্যাণ সিংহ
পাটনা-৬

পশ্চিমবঙ্গে আসুন

অমৃতে ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীগৌরাঙ্গ ভৌমিকের 'পশ্চিমবঙ্গে আসুন' প্রবন্ধটির জন্য লেখক এবং আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এই প্রবন্ধ যেমন সময়োপযোগী তেমনি বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। অমৃতের মতন একটি বহুল পঠিত পত্রিকার মাধ্যমে এই যে মহৎ প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের দর্শনীয় স্থানগুলির ওপর যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করা হচ্ছে এর জন্য সমগ্র বাংলাদেশ কৃতজ্ঞ থাকবে।

বর্তমানে সর্বত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশকে হীন করার চেষ্টা। কেন্দ্রীয় পর্যটন বিভাগেরও রয়েছে বিমাতৃসুলভ ব্যবহার। এখন সময় এসেছে আমাদের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার। ভারতবর্ষের যেখানেই যাওয়া যায় দেখতে পাওয়া যায় পর্যটন বিভাগের নানা রকম বিজ্ঞাপন। কিন্তু কোথাও আপনার চোখে পড়বে না পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞাপন। কিন্তু সত্যিই কি পর্যটকদের দেখার মতো পশ্চিমবঙ্গের কিছুই নেই? শ্রীভৌমিকের এই অল্প পরিসর লেখার মধ্যে দিয়ে নিখুঁতভাবে লেখক দেখিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ।

প্রকৃতি পশ্চিমবঙ্গকে অপর্যাপ্ত দিয়েছে সত্য, কিন্তু আমরা কি যথার্থভাবে আমাদের কর্তব্য পালন করছি? লেখক আক্ষেপের সুরে যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো করা কি খুবই কষ্টসাধ্য? এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার, কলকাতা পৌরসংস্থা এবং রাজ্যের ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি কি একেবারেই কিছু করতে পারেন না?

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেখা যায় পর্যটনকে রীতিমত শিল্প হিসাবে গ্রহণ করেছে অন্যান্য জাত। আর ফলস্বরূপ সেসব দেশ পাচ্ছে বিদেশী মুদ্রা এবং পর্যটকরা পাচ্ছে সুখ-সুবিধা এবং আরাম। পর্যটকরা দেখছেন ও জানছেন পরের দেশকে নিজের মত করে। দেশে ফিরছেন বিদেশের সুখ-স্মৃতি নিয়ে।

কিন্তু এর ব্যতিক্রম ভারতবর্ষের বেলায়; বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে। সেই জন্য আজকের দিনে প্রত্যেকটি সুপ্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকার উচিত বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের প্রকৃত ছবি তুলে ধরা। পরিশেষে অমৃত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তাঁরা যেন এই রকম ছোটখাটো প্রবন্ধেই থেমে না যান। প্রকাশ করুন 'ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যার মত 'পর্যটন সংখ্যা' যার মাধ্যমে বিভিন্ন লেখক প্রকাশ করতে পারেন নানা রকম পরিকল্পনা এবং যার ফলে খুলে যাবে নতুন দিক।

সুভাষ বসু
কলকাতা ২৫

কলকাতার ট্রাম

বেলজিয়ামের রাজধানী শহর ব্রাসেলসের পরিবহন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত চার ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ ০·৩৮ নয়াপয়সার একটি পুস্তিকা কিনতে পাওয়া যায়। ট্রামের বিভিন্ন রুটের ম্যাপ তো আছেই, তাছাড়া এক স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়ার কত ভাড়া, কোথায় কত নম্বর ট্রামে উঠতে হবে এবং নামতে হবে কোথায়, যদি ট্রাম বদল করার প্রয়োজন হয় তাহলে কোথায় ট্রাম বদল করে কত নম্বর নতুন ট্রামে উঠতে হবে ইত্যাদি বহু প্রয়োজনীয় নির্দেশ আছে সেই পুস্তিকায়। ট্রামের পুরোভাগের বোর্ডে কেবল যে বিভিন্ন রুট নির্দেশক ভিন্ন ভিন্ন নম্বর ও গন্তব্যস্থানের নাম থাকে তাই না, ভিন্ন ভিন্ন রঙও হয় তাদের।

অবশ্য এসব ব্যবস্থাই এককালে ছিল কলকাতাতেও, কিন্তু আমাদের সদাশয় ট্রাম কোম্পানী, কি গূঢ় কারণে জানি না, যাত্রীদের প্রতি বিরূপ হয়ে সেসব ব্যবস্থাই দিয়েছিলেন বাতিল করে। তাই আপসোস হয় অন্যান্য বহু দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে আমরা ছোট বড় সর্ব ক্ষেত্রেই তখন পেছু হটছি।

আমরা একজন টুরিস্টের কাছ থেকে জানতে পারলাম, আমাদের কলকাতার ট্রাম সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও আরামদায়ক। প্রতিবছর হাজার হাজার বিদেশী পর্যটক কলকাতায় আসেন। সুতরাং টুরিস্টদের সুবিধার জন্য কলকাতা ট্রাম কোম্পানী যদি ব্রাসেল পরিবহন সংস্থার মত ট্রামের যাতায়াতের সব খুঁটিনাটিসহ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন তবে টুরিস্টদের অনেক সুবিধা হয়। টুরিস্টদের আর আপসোস থাকবে না।

নারায়ণচন্দ্র অধিকারী
হিরাকুন্দ, ওড়িশা

অন্ধকারের মুখ

শ্রীদেবল দেববর্মা লিখিত 'অন্ধকারের মুখ' শীর্ষক রহস্যোপন্যাস 'অমৃতে' পড়ে প্রচুর আনন্দ পাচ্ছি। এই লেখকের অন্য রহস্য-কাহিনী যথা 'রাত তখন দশটা' ও 'অথৈ জলে মানিক' ও পড়েছি। এই নবীন লেখকের রহস্য-কাহিনীগুলিতে রহস্যের ও ষড়যন্ত্রের জাল সুন্দর বিস্তৃত এবং এগুলি বাজারে প্রচলিত তোলো রহস্য-কাহিনীগুলি থেকে স্বকীয়তায় স্বতন্ত্র। শ্রীদেববর্মার কাহিনীগুলিতে ঘটনাপ্রবাহের মন্থরতা নেই—ঘটনাগুলি রহস্যকে ঘনীভূত করতে করতে শেষ পরিণতির দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছে। তাঁর রহস্য-কাহিনীগুলি পড়তে শুরু করলে শেষ না করে পারা যায় না। একজন নবীন রহস্য-লেখকের পক্ষে এটা নিশ্চয়ই কৃতিত্বের বিষয়। এঁর লেখায় সমসাময়িক সমাজচিত্রের প্রতিফলনও সুন্দরভাবে হয়েছে। লেখকের ভাষাও ঝরঝরে। ভবিষ্যতে ভাল ভাল আরও রহস্য-কাহিনী এঁর কাছ থেকে পাবো—এই আশা করছি। পরিশেষে, এই লেখক ও অমৃতের সম্পাদক-মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

নীলাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা-৪০

শাদা চোখে

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী রাজনীতির ভবিষ্যৎ সংহতি কি আকার নেবে ১৪ই জানুয়ারীর ব্যর্থ শান্তি বৈঠকে দলীয় উপস্থিতির চিত্র পর্যালোচনা করলে তার পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। 'সমদর্শী' এর আগে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য শক্তি শিবিরের যে চিত্র হাজির করেছিল বুধবারের দুই জায়গার দুই সভা তার সাক্ষী দিচ্ছে। যেটুকু ব্যতিক্রম দেখা গেছে তা আর কিছু নয়, বিরোধী শিবিরের তথ্য ও কৌশল জানবার জন্য সাময়িক অনুপ্রবেশ মাত্র।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যাঁরা সংবাদপত্রের কলমে দৃষ্টি রেখেছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, শান্তি বৈঠকের দিন নির্দিষ্ট করার জন্য দুই শান্তিদূত সর্বশ্রী বিভূতি দাশগুপ্ত ও মাখন পাল কি চেষ্টাই না করেছেন। যে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে রাজনৈতিকভাবে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই দুই পুরুষের মিলিত সভা থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, ১৪ই জানুয়ারী বৈঠক বসবে। কোনো শর্তের কথা সেদিন বলা হয় নি।

উল্লেখ্য, সেদিন থেকেই দুই শান্তিদূত একটি সর্বসম্মত আলোচ্য বিষয় নির্ধারণের কাজে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ যুক্তফ্রন্টের অন্যতম আহ্বায়ক শ্রীসুধীন কুমার ঘোষণা করলেন, শান্তি বৈঠকের কোনো বিষয়সূচী থাকবে না। সদস্যরা সভায় মিলিত হয়ে আলোচনা করে স্থির করবেন আলোচ্য বিষয়বস্তু কি হবে। কিন্তু শ্রীকুমারের ঘোষণার আগেই ফ্রন্টের যে বৈঠক হয়েছিল তাতেই ঠিক হয়েছিল ফ্রন্টের সাধারণ সমস্যা নিয়েই শান্তি বৈঠক বসবে।

শ্রীকুমারের ঘোষণার কথা শুনে গঙ্গাসাগর সঙ্গম থেকে ফেরা কঠোর মার্কসিস্ট শ্রীমাখন পাল একেবারে থ বনে গেলেন। সখেদে মন্তব্য করলেন, ফ্রন্টের কাজ এভাবেই চলছে!

যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, বাংলা কংগ্রেস ও মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের জন্যেই ফ্রন্টের এই মরণাপন্ন অবস্থা, কিন্তু আসলেও অনেক দলের এতে ভূমিকা রয়েছে। আর সেই ভূমিকা নির্ঝরী থেকে অন্তঃসলিলার ধারার মতই সমস্ত রাগ অন্তঃসলিলা হয়ে বয়ে চলেছে। মার্কসবাদীদের দল বাড়ানোর জন্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও শরিকদের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে উচ্ছেদের প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে নৈরাজ্য সৃষ্টি হচ্ছিল বলে অভিযোগ করে বাংলা কংগ্রেস রুখে দাঁড়ায়। এবং তাঁদের সেক্টরের প্রতিবাদ রাজ্যব্যাপী গণ-অনশনের মাধ্যমে প্রতিরোধের রূপ নেয়। তারপর ডামাডোলের মত আসে মুখ্যমন্ত্রীর উক্তি, আর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আদেশ বাতিলের আদেশ। এই সব মিলিয়ে যে ঘূর্ণিঝড় শুরু হয় তাকে আরও প্রচণ্ডতর করে তোলেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত। শ্রীদাশগুপ্তের দল এতদিন কিছু শরিককে জোতদারের দালাল, ষড়যন্ত্রকারী আখ্যা দিয়ে যে রাজনৈতিক বাণ তূণীর থেকে ছাড়ছিলেন, হঠাৎ তাতে ইস্তফা দিয়ে সেকেণ্ড ফ্রন্ট খুলে দিলেন। শ্রীদাশগুপ্ত ঘোষণা করলেন, মুখ্যমন্ত্রীকে 'বর্বর সরকার' বলার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। নতুবা শান্তি বৈঠক হবে না। এই দ্বিতীয় বক্তব্যের উপর শ্রীদাশগুপ্ত এত বেশী জোর দিতে লাগলেন যে মনে হচ্ছিল ফ্রন্টের আসল সমস্যা কেবল মুখ্যমন্ত্রীর সেই বক্তৃতা, আর কিছুই নয়। মানুষের স্মৃতিশক্তি অতীব দুর্বল। কাজেই মুখ্যমন্ত্রী কেন বর্বর সরকার বললেন সে কথা বাদ দিয়ে শুধু ঐ কথার উপর প্রতিনিয়ত জোর দিতে থাকলে পটভূমিকার কথা ভুলে গিয়ে লোকে বলবে, সত্যিই তো, এ রকম অন্যায় কথা বললে কি করে একসঙ্গে চলা যায়! কিন্তু কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্ত অতীব নিপুণতার সঙ্গে এর মধ্যে একটা গোঁজ ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, মুখ্যমন্ত্রী ও রকম উক্তি করেন নি। ফলে ঘটনার মোড় ঘুরে গেল।

এই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে শান্তিদূতেরা চেষ্টা করলেন ফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের উপর জোর দিয়েই যাতে শান্তি আনা যায়। অন্যান্য শরিকদের সঙ্গেও এই মর্মে আলোচনা হল। অনেকেই আশা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ব্যাখ্যা করে দেবেন বলবেন, কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই উক্তি করলেন।

অবস্থা যখন আবার একটু স্বাভাবিক হতে শুরু করল, বাংলা কংগ্রেস তখন এক ষড়যন্ত্রের টেপ-করা কাহিনী বাজারে ছাড়লেন। এই টেপ রেকর্ডের বক্তব্যে আছে, কি করে মার্কসবাদী ও আর এস পি নেতারা বাংলা কংগ্রেসের লোকজনদের সঙ্গে গোপন আঁতাত করে শ্রীঅজয় মুখার্জি ও শ্রীসুশীল ধাড়াকে বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য পরিকল্পনা করছিলেন। আর দক্ষিণপন্থী বলে, নচেৎ বিরোধিতা করলে তাঁদের 'ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার' কথাও নাকি এই টেপ রেকর্ডে ধরা পড়েছে। এ ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার আগে যতদূর জানা যায়, সি পি আই নেতা শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীঅশোক ঘোষ এ খবর জানতেন। যাতে করে এই মন্ত্রিসভা গড়বার পরিকল্পনা "ফাঁস" হবার পর মার্কসবাদী নেতা শ্রীসরোজ মুখার্জি বলেছেন, "অজয়বাবু গদী ছাড়বেন বলাতেই ঐ সব আলোচনা হয়েছিল।" শ্রীমুখার্জি যদিও আগে এ খবর বলেন নি, তবে তাঁর ভাষণের কোন বিকৃত ব্যাখ্যা না করেই মন্তব্য করা যায়—"ছেড়ে দেওয়া" আর "বাদ দেওয়া" নিশ্চয়ই এক কথা নয়। আসলে ভবিষ্যৎ সংহতির অন্য ভাবমূর্তিই যে ভেতরে ভেতরে চিত্রায়িত হয়ে উঠছিল, এটা তারই সাক্ষী। এতে অবশ্য দোষের কিছু নেই। কারণ মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের বাদ দেওয়ার জন্য কেউ যদি ষড়যন্ত্র করতে পারেন,—পাল্টা ষড়যন্ত্র করবার পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত অধিকার মার্কসবাদীদেরও আছে।

এ ষড়যন্ত্র আলোকে আসার পর শান্তির দূতগণ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আপসের সূত্র নির্ধারণের চেষ্টা করছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে একটু পেলবতা দেখালেও শেষে নাকি গর্জে উঠে বলেছেন, "আমি ওদের expose করে ছাড়ব।" শান্তিদূতেরা এতে প্রমাদ গুনলেন। কিন্তু তবুও তাঁরা আশা করছিলেন, সব দল জোর করে বললে হয়ত "অজয়দা" নির্মম হতে পারবেন না। কিন্তু সকল দলই হতচকিত হয়ে উঠলেন যখন মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পত্র এলো সকলের দপ্তরে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা বললেন, মুখে নয়, এবার একেবারে কাগজে কলমে দলিল তৈয়ার করে মুখ্যমন্ত্রীর উক্তি প্রত্যাহৃত না হলে আপোস-আলোচনা আত্মপ্রবঞ্চনাই হবে। মুখ্যমন্ত্রীর উক্তি, মার্কসবাদী দল বললেন, জনশক্তির পক্ষে অমর্যাদাকর। শুধু এ কথা বলে তাঁরা ক্ষান্ত হন নি বাংলা কংগ্রেস ও মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে আসছেন তার একটা ইতিহাসও ঐ লিপিতে তাঁরা সংযোজন করে দিলেন। হঠাৎ এই পত্রাঘাতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে রাজনীতির অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বললেন, টেপ রেকর্ড ধরা-পড়া চক্রান্তের বক্তব্যকে ভোঁতা করে দেওয়ার জন্যই মার্কসবাদী দল লিখিত বক্তব্য পেশ করলেন। মুখে বললে সে কথার গুরুত্ব কমই হয়। কাজেই লিখিতভাবে বাংলা কংগ্রেসের চক্রান্তের অভিযোগ করে মার্কসবাদীরা ঘটনার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন। অলিখিত বক্তব্য ঠিক নয় বলা অতীব সহজ। তারপর যত দোষ নন্দ ঘোষ "বুর্জোয়া" সংবাদপত্র তো আছেই। ফ্রন্টের কি হবে জানি না—বাংলা কংগ্রেসের ও সি পি এমের লিখিত বক্তব্য থেকে এবার নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল, সাংবাদিকরা মিথ্যা কথা লেখেন না। যাহোক, সি পি এমের এই পত্রাঘাত অন্যান্য শরিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। ফরওয়ার্ড ব্লক, ফ্রন্টভুক্ত পি এস পি তাঁর ভাষায় এই

নয়া কৌশলের নিন্দা করল। এমন কি এস ইউ সিও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

এরকম একটা মারমুখী অবস্থায় শান্তি বৈঠকে যে অশান্তি আরও তীব্রতর হয়ে উঠত, এতে আর সন্দেহ কি? কাজেই ভেতরে ভেতরে একটা "ভুল বুঝাবুঝি খেলা' আর সত্যিই সেই 'আখেরি দিনে' কোন দল কোন শিবিরে থাকবে তা পুরোপুরি ভাবে জেনে নেবার জন্যে একটা চাল দেওয়া হল। যাকে বলে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, ১৪ই জানুয়ারীর বৈঠকে তাই ঘটল।

দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদের বৌবাজার অফিসে সাধারণত ফ্রন্টের বৈঠক বসে। সেখানে গিয়ে হাজির হলেন বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, গুর্খা লীগ ও এস ইউ সির প্রতিনিধিবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন—সর্বশ্রী অজয় মুখার্জি, সুশীল ধাড়া, ডাঃ রণেন সেন, বিশ্বনাথ মুখার্জি, নির্মল বসু, ভক্তি মন্ডল, দেওপ্রকাশ রাই, সুবোধ ব্যানার্জী আর নীহার মুখার্জি।

আর লোকসেবক সংঘ অফিসে গিয়ে হাজির হলেন মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দল, আর এস পি, লোকসেবক সংঘ, ওয়ার্কার্স পার্টি। নেতারা উপস্থিত ছিলেন—যথাক্রমে সর্বশ্রী জ্যোতি বসু, সরোজ মুখার্জি, মাখন পাল, যতীন চক্রবর্তী, নিখিল দাশ, বিভূতি দাশগুপ্ত, অরুণ ঘোষ, জ্যোতি ভট্টাচার্য।

যুক্তফ্রন্টের দুই আহ্বায়কের মধ্যে শ্রীবরদা মুকুটমণি ছিলেন সি পি আই অফিসে, আর শ্রীসুধীন কুমার ছিলেন লোকসেবক সংঘের অফিসে। এস এস পির বিমান মিত্র ও শৈলেন অধিকারী ছিলেন সি পি আই অফিসে, আর নরেন দাস ও ভূপাল বসু গিয়েছিলেন লোকসেবক সংঘের দপ্তরে। এস এস পির নেতাদের উপস্থিতি দেখে হয়ত অনেকে মনে করবেন সত্যিই বুঝি সভার স্থান সম্পর্কে ভুল বোঝার ফলেই এহেন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু আসলে মোটেই তা নয়। গুণী পাঠকরা জানেন, রাজ্য এস এস পির দুই দলে ঝগড়া আছে। ইদানীং রাজ্য কমিটি ভেঙে দেওয়ার পর বিরোধ আরও তীব্র হয়ে উঠেছে! ডঃ ভূপাল বোস মার্কসবাদীদের একজন কঠোর সমালোচক এবং তিনি বাংলা কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের একজন সৈনিকও বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সি পি আই অফিসে না গিয়ে লোকসেবক সংঘ অফিসে গেলেন কেন? উত্তর হচ্ছে, শ্রীনরেন দাশ ভূপালবাবুকে নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীদাশ ভূপালবাবুর সঙ্গে সব ব্যাপারে সহমত পোষণ করেন না। শ্রীদাশের দলের লোকেরা বলেন, শ্রীদাশ মার্কসবাদী কম্যুনিস্টমুখী। অর্থাৎ দলে তিনি ভূপালবাবুর সঙ্গে হলেও দলের বাইরে তিনি অন্যরকম। কাজেই তিনি লোকসেবক সংঘ অফিসে গিয়েছিলেন। এবং যাবার সময় ভূপাল বসুকেও তিনি সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর শ্রীবিমান মিত্র ও শ্রীশৈলেন অধিকারী সি পি আই অফিসে গিয়েছিলেন। ফ্রন্ট ভাঙলে শ্রীমিত্র ও অধিকারী মশাই কোন দিকে যাবেন সেটা তাঁদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই ঠিক করবেন বলে তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠমহল থেকে খবর পাওয়া গেছে।

পি এস পির শ্রীস্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য ছিলেন সি পি আই অফিসে। ভট্টাচার্যমশাই এখন যতদূর জানা যায় দলের বক্তব্য রাখেন। আর শ্রীবিদ্যুৎ বসু ও শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত, যাঁরা তীক্ষ্মবুদ্ধি ধরেন, তাঁরা লোকসেবক সংঘের দপ্তরে হাজির ছিলেন। যদি কথাবার্তা বা অন্য সভা হয় তবে তাঁরা ওয়াকেবহাল থাকতে পারবেন। একজন এম এল এ—বিশিষ্ট মার্কসিস্ট ফরওয়ার্ড ব্লক লোকসেবক অফিসেই দুই নেতা শ্রীরাম চ্যাটার্জি ও শ্রীসুহৃদ মল্লিককে পাঠিয়েছিলেন। ওঁদের দলের যিনি সি পি আই অফিসে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তিনি ভুল ক্রমেই গিয়েছিলেন ঐ দিকে। এবার ধরুন এম এল এ বিহীন আর সি পি আই দলের কথা। এই দলেরই শ্রীসুধীন কুমার ফ্রন্টের একজন আহ্বায়ক। এবং তাঁরই সহযোদ্ধা দুরন্ধর কমরেড শ্রীবিমলানন্দ মুখার্জি গিয়ে উপস্থিত হলেন সি পি আই অফিসে। জনতা কি মনে করবে, সুধীনবাবু তাঁর দলের সদস্যকেই লোকসেবক সংঘের অফিসে বৈঠক বসবে এ খবর দেন নি?

সুধীনবাবু সাংবাদিকদের বলেছেন, ফ্রন্টের অন্য আহ্বায়কশ্রীবরদা মুকুটমণিকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন কিছু কিছু শরিককে সভার স্থানপরিবর্তনের কথা জানাতে। অথচ শ্রীমুকুটমণির সঙ্গে ছায়া ও কায়ার মত যিনি সর্বদা বিরাজ করেন সেই তাঁরই দলের শ্রীসত্যকাম ভট্টাচার্য মহাশয় লোকসেবক সংঘ অফিসে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। আরও জানা গেছে, মুকুটমণি মশায় কিছু দলকে ঐ মর্মে খবরও দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, সুধীনবাবুই সব সময় ফ্রন্টের কাজকর্ম চালান। মুকুটমণিমশায় মণির মতই শোভাবর্ধন করেন মাত্র। সুধীনবাবু বলেছেন তাঁর বাড়ীর টেলিফোন যন্ত্র অচল ছিল। তিনি টেলিফোন করতে পারছিলেন না। তাই মুকুটমণির উপর ভার দিয়েছিলেন। আর মুকুটমণিই দেখা যাচ্ছে সব বন্দোবস্ত করে উঠতে পারেন নি। নতুবা শান্তি বৈঠক বসত। হয়ত শান্তির পারাবত উড়ত। আর যুক্তফ্রন্টের ঐক্য আছে, ঐক্য থাকবে, হয়ত এই ধ্বনি উঠে দিকদিগন্ত মুখরিত হয়ে উঠত।

কিন্তু গোটা বিষয়টা দেখলে, প্রশ্ন ওঠে এই অঘটন ঘটালো কে—? সমস্বরে সকলেই বলবেন, মন্ত্রীপদহীন শ্রীমুকুটমণি—আবার কে। কিন্তু আসলে কি তাই? মোটেই তা নয়। বৈঠক বসবার বহু আগেই মহাকরণে খবর পাওয়া গিয়েছিল,—দু জায়গায় দুটি বৈঠক বসবে। তাইতো ফটোগ্রাফার আর সাংবাদিকরা বিভক্ত হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই দুই অফিসের সামনে ধর্ণা দিচ্ছিলেন। আর ঐ দুই বৈঠকের খবর দিয়েছিলেন, স্বয়ং একজন মন্ত্রী।

তারপর নির্দিষ্ট সময়ের আগে দুই অফিসে জমায়েৎ হয়েও নেতারা এক জায়গায় জড় হতে পারলেন না যদিও তাদের গাড়ি ছিল। মর্যাদার প্রশ্ন নাকি তাঁরা অবিচল থেকে গেলেন। আর বসে বসে সি পি আই অফিসে একদল চা টোস্ট খেয়ে, আর, লোকসেবক অফিসে অন্য দল চিঁড়ে ভাজা ও তেলে ভাজা খেয়ে শীতের সন্ধ্যা আমেজে কাটিয়ে দিলেন। তবে সুখের কথা এই, টেলিফোনে কথাবার্তা বলে দুই জায়গা থেকেই যুগপৎ ঘোষণা করলেন—আমরা আবার বসব। সেই একই জায়গায় যেখানে ওঁরা পৌরসভা স্টাইলে ফি বুধবার বসেন। অতএব, বিযুক্ত হয়েও যুক্তফ্রন্ট ভাঙল না।

কিন্তু ঘটনার পরিবেশ থেকে কি বোঝা যায়? প্রকৃতিতে যেমন আপাতদৃষ্টিতে একটা অনিয়ম দেখা যায় অথচ প্রকৃতি নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা, যুক্তফ্রন্টেও সেই নিয়মমাফিক সবই ঘটছে। ঘটনার সমীকরণ করলে সূত্র দাঁড়াবে, যুক্তফ্রন্ট= বাংলা কংগ্রেস+ সি পি আই+ফরওয়ার্ড ব্লক+এস ইউ সি+ গুর্খা লীগ+পি এস পি+ ই এস এস পি+ বলশেভিক - সি পি এম+ আর এস পি+ লোকসেবক + ওয়ার্কার্স পার্টি + আর সি পি আই + ফবম + ইএস এস পি। অবশ্য এর মধ্যে একটু হেরফের ঘটতে পারে। কারণ, রাজনীতি একেবারে ফরমুলা মত চলতে পারে না।

অবস্থা অনুকূল করবার উদ্দেশ্যে যদি এ ভুল বোঝাবুঝি হত তবে আবার নতুন করে আক্রমণের পালা শুরু হত না। বাংলা কংগ্রেস প্রমোদবাবুর চিঠির জবাবে আবার ওঁদের অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করছেন। আর প্রমোদবাবু সুশীলবাবুকে এতই হেয় মনে করছেন যে উত্তর দেবার যোগ্যপাত্র হিসাবে বিবেচনা করতেও প্রস্তুত নন।

ওদিকে শ্রমিক সংস্থার ঝগড়া তুমুল হয়ে উঠেছে সি পি আই, সি পি এমের মধ্যে। মার্কসবাদীরা ডাঙ্গে কোম্পানীকে ওঁদের ভাষায় বলছেন—ধনীস্বার্থ রক্ষণকারী শ্রেণীসমন্বয়বাদী। আবার ফরওয়ার্ড ব্লক সিদ্ধান্ত করে আছেন, এ আই টি ইউ সি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলেই সি পি আই অধ্যুষিত অংশে ফরওয়ার্ড ব্লক তাঁর শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে ভিড়ে পড়বেন। কাজেই শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রেও শিবির রচনা যখন পুরোদমে চলছে তখন অশুভ ছায়া যে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে সংকট ঘনীভূত করে তুলেছে এতে আর সন্দেহ কোথায়?

শুধু কবে অঘটন ঘটবে ওই আশংকায় অনেকে দিন কাটাচ্ছেন। তবে কখন যে তা ঘটে যাবে কেউ টেরও পাবেন না। নাভিশ্বাস উঠলেও অনেকে আন্দাজ করা সময়ের চেয়েও বেশী বাঁচে, যুক্তফ্রন্টেরও চলছে ঐ দশা।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

কেরলে সি পি আইর নেতৃত্বে গঠিত 'মিনি মন্ত্রিসভা' বাজেট অধিবেশনের প্রথম শক্তিপরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের ১৪ই জানুয়ারীর যে বহু-বিঘোষিত বৈঠক রাজ্যকে এক নতুন সংকটের সম্মুখীন করবে বলে প্রায় সকলেই আশংকা করছিলেন, ফ্রন্টের নেতারা সম্ভবতঃ সুচিন্তিত অনবধানতার আশ্রয় নিয়ে আপাততঃ নিতান্ত নির্ঝঞ্ঝাটে তা এড়িয়ে গিয়েছেন, উত্তর প্রদেশের সি বি গুপ্ত মন্ত্রিসভা এখন পর্যন্ত দাবী পাল্টা দাবীর অন্তরালে আত্মরক্ষা করছেন, পাঞ্জাবে সন্ত ফতে সিং-এর আত্মাহুতির হুমকি সামনে রেখে চন্ডীগড় সমস্যার সমাধান যে এগিয়েছে তার কোনো প্রমাণ নেই এবং বিহার রাজ্যে কংগ্রেসের উভয়পক্ষ এবং এস এস পি তিনটি দলই মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য তোড়জোড় করায় রাজ্যপালের শাসনের অবসান এগোবার বদলে বরং পিছিয়ে যাচ্ছে। বিধানসভার অধিবেশনের কালে বা প্রাক্কালে ভারতের দক্ষিণ, পূর্ব, উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের পাঁচটি সমস্যাকণ্টকিত রাজ্যের অবস্থা মোটামুটি এই। এর ওপর আসামেও নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে চালিহার পদত্যাগের ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে।
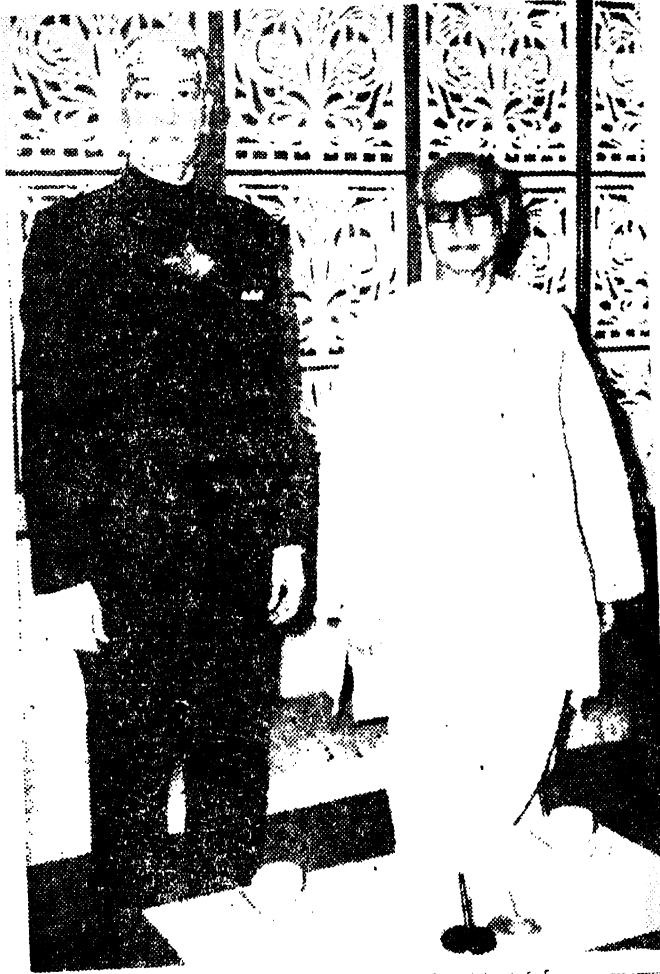
হরিয়ানার রাজ্যপাল শ্রী বি এন চক্রবর্তী ১৬ জানুয়ারী রাইটার্স বিল্ডিং-এ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

কেরল

নাম্বুদ্রিপাদ তাঁর দলের পিছনে যে সমর্থন লাভের আশা নিয়ে রাজ্যপালের কাছে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বানের জন্য ক্রমাগত দাবী জানাচ্ছিলেন তা অন্ততঃ সাময়িকভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে এবং বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের ওপর মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা যে সংশোধক প্রস্তাব এনেছিল তা ১৮ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। মার্কসিস্টদের প্রস্তাবের পক্ষে তাঁদের দল ছাড়া শুধু চারজন এস এস পি সদস্য ভোট দিয়েছেন। কংগ্রেসের দু'দল সমেত অন্য সমস্ত দলই (এঁদের মধ্যে আছেন ৬ জন আর এস পি সদস্য যাঁরা সরকারে যোগ না দিলেও বর্তমান ক্ষেত্রে মার্কসিস্ট সংশোধক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন এবং দুজন এস এস পি সদস্য যাঁদের বিরুদ্ধে তাদের আইনসভা দল কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে) মার্কসবাদীদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। ভোটের ব্যবধান থেকে মনে হয় বিধানসভার বর্তমান অধিবেশন অচ্যুৎ মেননের মন্ত্রিসভার পক্ষে খুব সংকটময় নাও হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের ফ্রন্ট মন্ত্রিসভাও যেভাবে সুকৌশলে অথবা দৈববলে তাদের ১৪ই জানুয়ারীর সংকট উত্তীর্ণ হয়েছে তাতে মনে হয় বাজেট অধিবেশনটা তারা নিঃসংকটে উত্তীর্ণ হতে পারবে, যদিও মন্ত্রিসভার মধ্যে দলগত সংঘাতের অবস্থার কোনো উন্নতি হবে এরকম আশা আপততঃ করা যায় না। তবুও ফ্রন্টের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংঘর্ষ অমীমাংসিত থাকলেও এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে 'ফ্রন্ট চলছে এবং চলবে'। ফ্রন্টের পটভূমিকা যে দিগন্তব্যাপী ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন তার মধ্যে বোধহয় এইটুকুই শুধু আশার বিজলীরেখা।

তবুও ফ্রন্ট চলার বর্তমান আশা ও ভবিষ্যৎ আশ্বাসের সঙ্গে, ফ্রন্টের বর্তমান আভ্যন্তরীণ অবস্থাও অব্যাহত থাকার সম্ভাব্যতা জনসাধারণকে কতোখানি উৎসাহিত করবে সে বিষয়ে ভিন্নপ্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ, রাজ্যবাসীদের সামনে সমস্যা কম নয় এবং ফ্রন্ট চলার অর্থ এই নয় যে

তাদের সমস্যাগুলিও অচিরে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হবে। ধানক্ষেতের বিরোধ সামান্য সংঘর্ষ ও কিছু রক্তপাতের মধ্য দিয়ে মেটার ফলেই যে মানুষ ধানের সমস্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলো এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই এবং ধানের সরবরাহ যদি বা অব্যাহত থাকে তাহলেও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য প্রভৃতির মূল্যের ঊর্ধ্বগতি মানুষের জীবিকাকে ক্রমাগতই উৎপীড়িত করে চলবে। ফ্রণ্টের শ্রমনীতির ফলে সরকারী কর্মচারী এবং সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের কিয়দংশ আর্থিকভাবে উপকৃত হলেও রাজ্য যে গুরুতর বেকারী সমস্যার সম্মুখীন তার কোনো সম্ভাব্য সমাধান দৃষ্টির গোচর নেই। বহু কারখানায় এখনো ধর্মঘট বা লক আউট বিদ্যমান। শ্রমিক অশান্তি পূর্বের তুলনায় কম হলেও লগ্নীর আবহাওয়া সৃষ্টির সহায়ক নয়। ফলে রাজ্যে যে পরিমাণ বেকারী, সেভাবে নতুন কল-কারখানা গড়ে উঠছে না, বরং চালু কল-কারখানাও কিছু কিছু অন্যত্র অপসারণের চেষ্টা চলছে। চারটি বড় কারখানা নাকি ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্রে চলে গেছে এবং দুটি কারবার গুটোচ্ছে। আরো কয়েকজন শিল্প-পতিও নাকি মহারাষ্ট্র, দিল্লী বা হরিয়ানায় কারখানা স্থানান্তরিত করার জন্য পঃ বঙ্গ সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে ফ্রণ্টভুক্ত দলগুলো ভিন্নমত হলেও রাজ্য-পালের ভাষণে তার অবনতির আভাসের উল্লেখ সম্পর্কে নাকি একমত না হয়ে পারেননি। রাজ্যের এই সামগ্রিক চিত্র জন-সাধারণকে তাদের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতোখানি আশান্বিত করবে সে বিষয়ে সন্দেহ অহেতুক নয়।

অন্যান্য রাজ্য

কংগ্রেসের মধ্যে সাম্প্রতিক বিরোধ ও বিভাগের পরিণতিতে উত্তরপ্রদেশের রাজ-নীতি কি রূপ পরিগ্রহ করে, তা বিধানসভার অধিবেশন বসার আগে বলা সম্ভব নয়। তবে কেন্দ্রের সঙ্গে বিরোধে সি বি গুপ্ত যে জনসংঘ ও এস এস পির সমর্থন লাভ করবেন তা প্রায় সুনিশ্চিত।

দিল্লীতে চণ্ডীগড় প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে তৎপরতা বিদ্যমান থাকলেও সেই সিদ্ধান্ত কবে আসে তার যেমন নিশ্চয়তা নেই, তেমনি সেই সিদ্ধান্ত উভয়পক্ষকে সন্তুষ্ট করতে পারবে এরকমও কোনো আশ্বাস নেই। একদিকে সন্ত ফতে সিং-এর আত্মাহুতির সংকল্পের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অকালী মন্ত্রীরা সন্তের হাতে পদত্যাগ পত্র পেশ করায় গুরুনাম সিং-এর মন্ত্রিসভার সংকট যেমন আসন্ন হয়ে উঠেছে, তেমনি হরিয়ানাও সফল বন্ধের মধ্য দিয়ে পাঞ্জাবের মনোভাবের জবাব দিচ্ছে। এই দুই হুমকির সামনে দাঁড়িয়ে চণ্ডীগড় সম্পর্কে যে কোনো সিদ্ধান্ত অন্তত আপাতত ব্যর্থ হতে বাধ্য।

বিভিন্ন রাজ্যের এই সমস্যার সঙ্গে কংগ্রেসের পক্ষে এযাবত নিরাপদ রাজ্য আসামও চালিহার পদত্যাগের সম্ভাবনা নিয়ে নতুন এক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। চালিহা যদি স্বাস্থ্যের কারণে সত্যিই বিদায় নেন তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর পদের জন্য দুজন প্রার্থী অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবেন, যার একজন বর্তমান আইনসভা দলের উপনেতা ও রাজস্বমন্ত্রী মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী এবং অপরজন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিজয় ভগবতী। মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী বোম্বাই বা আমেদাবাদে—কংগ্রেসের কোনো সভায়ই যাননি বলে তাঁর ভাবগতি এখনো প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর কাছে রহস্যাবৃত। অপরপক্ষে বিজয় ভগবতী কংগ্রেসের বিরোধে শ্রীমতী গান্ধীকেই সমর্থন করেছেন। আসাম যাতে অবিলম্বে সংকটের সামনে না পড়ে তজ্জন্য রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রী কে পি ত্রিপাঠী অবশ্য এক নতুন ফরমুলা বাতলেছেন। তিনি প্রস্তাব করেছেন যে, চালিহা বর্তমানে পদত্যাগ পত্র গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি না করে কিছুদিনের জন্য ছুটিতে যান। তা হলে আসামকে অন্তত অবিলম্বে নতুন মুখ্যমন্ত্রী মনোনয়নের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। চালিহা গত এপ্রিল মাসেও একবার অসুস্থ হয়ে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবার তিনি তাতে সম্মত হবেন কিনা তার ওপরই রাজ্যের রাজনীতির স্থিতিশীলতা নির্ভর করবে।

বিয়াফ্রার আত্মসমর্পণ

বিয়াফ্রার আত্মসমর্পণের ফলে আধুনিক ইতিহাসের এক বর্বর ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলো, যাতে স্বাতন্ত্র্যকামী বিয়াফ্রার আশি লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে অন্তত শতকরা বারজন বোমাবর্ষণ ও খাদ্যাভাবের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে এবং আরো অসংখ্য মানুষ পুষ্টির অভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে।

প্রায় তিন বছর আগে নাইজেরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের দাবী নিয়ে বিয়াফ্রার নেতা ওজুকিউ যুদ্ধ আরম্ভ করেন। বৃটেন অখণ্ড নাইজেরিয়ার সমর্থক বলে যুক্তরাষ্ট্রের নেতা গাওয়ানকেই সমর্থন করে। এছাড়া, সুইডেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার কাছ থেকেও নাইজেরিয়ার অস্ত্র বিমান প্রভৃতির সাহায্য লাভ করে। এই তিন বছর-ব্যাপী অবরোধ ও যুদ্ধে বিয়াফ্রাবাসীরা যে অভূতপূর্ব মনোবল ও সাহস দেখিয়েছে তা তাদের পরাজয়কেও গৌরবান্বিত করবে। যুদ্ধে নাইজেরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যরা যে বর্বরতা দেখিয়েছে সমকালীন ইতিহাসে একমাত্র কঙ্গোর যুদ্ধ ছাড়া তার আর তুলনা মিলবে না। বাইরের সাহায্য বঞ্চিত খাদ্যাভাবে বিয়াফ্রার পরাজয় প্রায় অনিবার্যই ছিল।

বিয়াফ্রার পরাজয়ে নাইজেরিয়ায় শান্তি এলো বটে কিন্তু সেই শান্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতা গাওয়ান কতোখানি স্থায়ী করতে পারবেন তা তাঁর ক্ষমাশীল নেতৃত্বের ওপরই নির্ভর করবে। আর যদি তিনি প্রতিহিংসা-পরায়ণ সেনানায়কদের দ্বারা চালিত হয়ে বিয়াফ্রাবাদী ইবোদের দমনে কঠোর পন্থার আশ্রয় নেন তাহলে নাইজেরিয়াকে একসূত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা হয়তো ব্যাহত হবে। যুদ্ধবিক্ষত বিয়াফ্রার খাদ্য, আশ্রয় ও কর্মের সংস্থানই হবে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সমাধানের মধ্যেই নাইজেরিয়ার শান্তির পথের সন্ধান মিলবে।

●

লেখক ও সাংবাদিক লুই ফিসার গত ১৭ জানুয়ারী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন।

৭৩ বছর বয়স্ক লুই ফিসার ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৪ বছর রাশিয়ায় ছিলেন। লেনিনের মৃত্যু সংবাদ ও স্ট্যালিনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার গোপন সংবাদ পরিবেশন করে তিনি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি কয়েক বছর ভারতে ছিলেন এবং মহাত্মা গান্ধীর জীবনী লিখেছিলেন। তাঁর লেখা ২০টি বইয়ের মধ্যে 'গ্রেট চ্যালেঞ্জ' অন্যতম।

প্রতিবেশীর সংগে মৈত্রী

তাসখন্দ ঘোষণার চতুর্থ বার্ষিকী হয়ে গেল জানুয়ারির ১০ তারিখে। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬৫ সালে যে-সংঘর্ষ হয়েছিল তা বন্ধ করার জন্য সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের মধ্যস্থতায় তাসখন্দে মিলিত হয়েছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী আর মহম্মদ আয়ুব খাঁ। এঁদের দুজনের কেউই আর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেই। লালবাহাদুর তাসখন্দ থেকে আর ফিরতে পারেন নি। তাসখন্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর করার কয়েকঘণ্টা পরেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আয়ুব খাঁ পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে অপসৃত। সশস্ত্র সংঘর্ষ না থাকলেও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। এই দুই দেশের মধ্যে অবাধ যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই। বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই। কূটনৈতিক সম্পর্ক যদিও বা আছে তা মোটেই মধুর নয়। অথচ একই উপমহাদেশ ভাগ করে তৈরী হয়েছে দুটি রাষ্ট্র। একই জাতিগোষ্ঠির বাস দুই দেশে। যে ভাষাগোষ্ঠি নিয়ে পাকিস্তানের অধিবাসীরা গঠিত, ভারতেও সেই ভাষাগোষ্ঠির অধিবাসী আছে। তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এই দুই দেশের মধ্যে সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হল না।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাসখন্দ ঘোষণা বার্ষিকী উপলক্ষে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে যে-বাণী পাঠিয়েছেন তাতে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, তাসখন্দ ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তানের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে ভারত অবিচলভাবে কাজ করে যাবে। অনুরূপ বাণী তিনি পাঠিয়েছেন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর কাছেও। পাকিস্থান আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। তার সঙ্গে ভারত গোড়া থেকেই সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছে। তার জন্য ভারতকে প্রভূত আর্থিক ক্ষয়ক্ষতিও স্বীকার করতে হচ্ছে। কিন্তু তার প্রতিদান পায়নি ভারত। বরং দুই দুইবার পাকিস্তানের কাছ থেকে পেয়েছে সশস্ত্র হামলা। দেশভাগের অব্যবহিত পরেই হানাদার লেলিয়ে দিয়ে পাকিস্তান ভারতের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ জবরদখল করে নেয়। এখনও ভারত তা উদ্ধার করতে পারেনি। ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে আবার তারা একই উদ্দেশ্যে কাশ্মীরের ওপর আক্রমণ চালায়। ভারতীয় বাহিনী তাদের সেই আক্রমণ প্রতিহত করে যখন লাহোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখনই সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় তাসখন্দ আলোচনা এবং সংঘর্ষের সমাপ্তি।

চার বছর পার হবার পরও কিন্তু পাকিস্তানের তরফ থেকে ভারতের সংগে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার কোনো চেষ্টা হয়নি। ইতিমধ্যে আয়ুব খাঁ বিতাড়িত হয়েছেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। তিনিও ক্ষমতায় এসে পুরনো ভারত-বিরোধী জিগিরই তুলেছেন। পাকিস্তানের সংগে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রবল বাধা হচ্ছে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি। স্বাধীনতালাভের পর কিছুকাল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকার সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলেও পাকিস্তানী জনগণ এখন পর্যন্ত কোনো গণতান্ত্রিক সংবিধান পায়নি। প্রাপ্তবয়স্কের সর্বজনীন ভোটাধিকারও স্বীকৃতি পায়নি পাকিস্তানী শাসককুলের কাছে। গত বারো বছর ধরে পাকিস্তানে চলেছে সামরিক শাসন। পাকিস্তানের জনগণের আসল বক্তব্য কোনোদিনই তার রাষ্ট্রনীতিতে প্রতিফলিত হবার সুযোগ পায়নি। পূর্ব পাকিস্তানের জননেতা শেখ মুজিবর রহমান সম্প্রতি এক বিবৃতিতে দাবি করেছেন যে, ভারতের সংগে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করা হোক। এই দাবী পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দীর্ঘকাল ধরে স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রামরত। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তারা প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চান। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য কিছুতেই পূর্ব পাকিস্তানের এই দাবি স্বীকার করছেন না। পশ্চিমবাংলার মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের সংগে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানে আগ্রহী। একই ভাষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারে দুই বাংলা গরীয়ান। রাজনৈতিক কারণে দেশভাগ হলেও দুই বাংলা পরস্পরের সংগে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। আজ দুই জার্মানীর মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা চলছে। দুই ভিয়েতনাম ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতায় নিজেদের জাতিগত ঐতিহ্য বজায় রাখতে চায়। অথচ দুই বাংলার মাঝখানে গড়ে উঠেছে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। এই প্রাচীর পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির স্বার্থে তাদের দ্বারাই সৃষ্টি। কারণ, পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে তার সংগে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনই ভারতের উদ্দেশ্য। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও তাই চায়। আজ পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তাকে স্বাগত জানায় ভারতের গণতান্ত্রিক মানুষ। এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে দুই দেশের মানুষই উপকৃত হবে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে দুই দেশের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা যে কত প্রয়োজন তা পাকিস্তান সরকার কি জানেন না? ভারতের দেওয়া অর্থেই পাকিস্তান সিন্ধুনদের জল সরবরাহের বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। দেশবিভাগের অব্যবহিত পরে ভারত পাকিস্তানকে থোক ৫৫ কোটি টাকা দিয়ে তার অর্থনীতিকে চালু রেখেছিল। এখনও অবিভক্ত ভারতের দেনার যে-অংশ পাকিস্তানের দেয় তা পাকিস্তান ভারতকে দেয়নি। ভারতই বছরের পর বছর, সেই ঋণের বোঝা বহন করে চলেছে। এ সবই ভারত করেছে প্রতিবেশীর সংগে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য। তাসখন্দ ঘোষণা তো শুধুমাত্র কতকগুলো সদিচ্ছার প্রকাশ নয়। তাকে রাষ্ট্রনীতিতে যথাযথভাবে প্রয়োগ না করলে এ ঘোষণা অর্থহীন। পাকিস্তান সরকার যদি তা না করেন তাহলে একতরফা ভারতের পক্ষেও কার্যকরী হতে পারে না। পাকিস্তানের জনগণই পারে তাদের সরকারকে ভ্রান্তবুদ্ধি থেকে ফিরিয়ে এনে প্রতিবেশী ভারতের সংগে মৈত্রী স্থাপনে বাধ্য করতে। নতুবা ক্ষতি উভয়েরই।
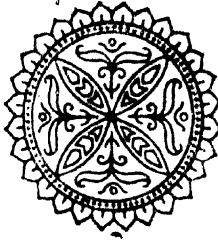
নতুন দশক, নতুন সূচনা

সুধীরকুমার সেন

যে দশক চলে গেলো তার শেষ বছরে ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ১০ কোটি টন ছাড়িয়ে যাবে, এইটাই বোধ হয় নতুন দশকের সূচনায় সবচেয়ে বড় সুসংবাদ। বিগত দশকের গোড়ার দিকে উৎপাদন কখনো আট কোটি টনের মাত্রা ছাড়াতে পারেনি এক ১৯৬৪-৬৫র বছর ছাড়া। '৬৪তে উৎপাদন ভাল হয়েছিল—৮ কোটি ৯০ লক্ষ টন। কিন্তু তার পরের বছরই আবার প্রধানত খরার জন্য শস্য উৎপাদন আগের বছরে তুলনায় প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ টন কমে যায়।

শুধু খাদ্য নয়, শিল্পোৎপাদনের দিক থেকেও ষাটের দশক খারাপ গেছে। পাঁচের দশকে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির যে দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা গেলো তা পরের দশকে এক গভীর সংকটের আবর্তে পড়ে। ফলে যোজনার কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং বেসরকারী শিল্পগুলোর বেশির ভাগ যোজনানির্ভর বলে সেগুলোও অল্পবিস্তর অচল হয়ে পড়ে। খাদ্যোৎপাদনে ব্যর্থতার সঙ্গে শিল্পসংকট মিলে দেশব্যাপী যে নৈরাশ্যের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল তার থেকে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা গেল ১৯৬৭র পরে। এই বছরে ভারতে শিল্পোৎপাদনের হার ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এর আগে ষাটের দশকের গোড়া থেকেই জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল বছরে তিন শতাংশ। এই অবস্থা ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত চলে। অবশ্য এই সামগ্রিক উৎপাদনের তুলনায় শিল্পোৎপাদনের হার অনেক বেশী ছিল। ১৯৬০এর শিল্পোৎপাদনকে ১০০ ধরে ১৯৬৫ সালে এই উৎপাদন বছরে ৯ শতাংশ হারে ১৫৩-৭এ দাঁড়ায়। এর পরের দুবছর শিল্পে গুরুতর মন্দা আসে, যোজনার কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং ভারত এক নতুন সংকটের সম্মুখীন হয়। এই সময় শিল্পোৎপাদন হ্রাস পেয়ে ১৫২-৪ শতাংশে পৌঁছোয়। ১৯৬৮ থেকে আবার উৎপাদন বাড়তে থাকে এবং পর পর দুবছর ৬ ও ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়।

এখানে লক্ষণীয় যে ১৯৬০ সাল থেকে ৬৭ পর্যন্ত জাতীয় আয় শতকরা ৩ ভাগ হিসেবে বৃদ্ধি পেলেও ভারতীয়দের মাথাপিছু আয় বছরে অর্ধ শতাংশের বেশী বাড়েনি। ভারত প্রধানত কৃষিনির্ভর বলেই জাতীয় উৎপাদনের হারের সঙ্গে মাথাপিছু আয়ের হারে এই অসামঞ্জস্য। শুধু গত দশকে নয়, তার আগের দশকেও—যখন ভারতীয় অর্থনীতির ভিৎ অত্যন্ত মজবুত বলেই শুধু দেশের লোকের নয় বিদেশেও ধারণা ছিল, তখনও শিল্পোৎপাদনের হার ও মাথাপিছু আয়ের মধ্যে এই বৈসাদৃশ্য দেখা গেছে। তার কারণ, আমাদের দেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকেই কৃষিকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ভারতকে দ্রুত একটা শিল্পায়িত দেশে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। শিল্পের এই লক্ষ্যে দ্রুত পৌঁছুবার চেষ্টার ফলে স্বভাবতই কৃষি অবহেলিত হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের প্রসারের উদ্দেশ্যে আমাদের পাঁচসালা যোজনাগুলো যে বিরাট বিরাট নদীউপত্যকাউন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে হাত দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোর ফল খুব অল্প সময়ে দেখতে পাওয়ার কোনো আশা ছিল না। মধ্যবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে ছোটোখাট সেচ প্রকল্প, সার উৎপাদন এবং উন্নত ধরনের বীজের যোগান প্রভৃতি যে সব ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক ছিলো সেগুলো বিরাট বিরাট প্রকল্পের তলায় চাপা পড়ে যায়।

প্রায় একই সময়ে ভারতে উন্নতধরনের ধান ও গমের বীজ উৎপাদনে যে বিরাট প্রচেষ্টা শুরু হয় তাই দেশে কৃষিবিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে। ফিলিপিন ও তাইওয়ান থেকে উচ্চফলনের ধান ও মেক্সিকোর খর্বাকৃতি গমচারার বীজই ভারতে বিরাট পরিবর্তন আনে।

এই কথা বলার অর্থ এই নয় যে ভারতের সর্বত্র এই উন্নত ধরনের কৃষিরীতি প্রবর্তিত হয়েছে। বীজ, চাষের যন্ত্রপাতি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মান্ধাতার আমলের, সেচের জল অনেক জায়গায়ই পৌঁছোয় না। কিন্তু তবু একথা সত্য যে অন্তত দেশের এক-তৃতীয়াংশ ধানজমি এবং আধাআধি গম চাষের জমিতে নতুন কৃষিরীতির হাওয়া লেগেছে। হায়দরাবাদে নিখিল ভারত চাউল উন্নয়ন সংস্থার অধিকর্তা শ্রীআর এস শাস্ত্রী বলেছেন যে ভারতের এক-তৃতীয়াংশ ধানজমিতেও যদি ১৫ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় তাহলে দেশে প্রতি বছর ৯০ লক্ষ টন উৎপাদন বাড়বে। শ্রীশাস্ত্রী আমেরিকার উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পি এইচ ডি।

কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধির আর একটি পন্থা হচ্ছে একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল উৎপাদন। এখন অনেক ক্ষেত্রে চাষীরা এই ধরনের চাষে মন দিয়েছেন এবং গম ও ভুট্টা তুলে নেওয়ার পর সেই ক্ষেতে আবার ধান বা সয়াবিন বুনছেন। অবশ্য এই ধরনের কৃষির সাফল্য প্রধানত নির্ভর করবে সেচের প্রসারের ওপর। দেশের যে ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষ হয় তার মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ৭০ লক্ষ হেক্টর জমিতে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ৭৫০ মিলিমিটার। এই সকল জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে কিভাবে সাহায্য করা সম্ভব তাই নিয়ে বর্তমানে গবেষণা চলছে।

কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহদানের জন্য আর যে দুটি ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে তাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর একটি হচ্ছে গত নভেম্বরে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত। এতে ঠিক হয়েছে যে ১৯৭০-৭১ সাল পর্যন্ত দেশের সর্বত্র মধ্যস্বত্ব প্রথার বিলোপ করা হবে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় গত অক্টোবরে দার্জিলিং-এ এক সম্মেলনে। এতে ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন সংস্থা নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে তা বর্তমানে দেশের কুড়িটি কেন্দ্রে তাদের শাখা স্থাপন করে ক্ষুদ্র চাষীদের সাহায্যদানের ব্যবস্থা করবে। চতুর্থ যোজনায় কুড়িটি জেলার প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছোট চাষীকে সাহায্য দেওয়া হবে।

উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর পরিমাণও ক্রমশ কমে আসছে। ১৯৬৬ সালে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করা হয়েছিল এক কোটি চার লক্ষ টন। পর বছর আমদানী হয় ৮৭ লক্ষ টন। এ বছর আমদানী আরো কমবে। এখন বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য যা আমদানী করা হবে তা শুধু মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য।

বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়

১৯৭০-এর দশক আরো আশাব্যঞ্জক এই জন্য যে আমরা এবার থেকে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় দেখতে পাচ্ছি। এই সাশ্রয়ের কারণ তিনটি—খাদ্য ঘাটতি হ্রাস, রপ্তানী বৃদ্ধি এবং আমদানী হ্রাস। এর মধ্যে রপ্তানী বৃদ্ধির চেয়েও আমদানী হ্রাসই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ যাবত আমাদের দেশীয় কলকারখানার চাহিদা পূরনের জন্য বছরে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও উৎপাদনের উপকরণ আমদানী করতে হতো। এই পণ্য আমদানীর দায়িত্ব ছিলো ডাইরেক্টর জেনারেল অব সাপ্লাইজ অ্যান্ড ডিসপোজালসের ওপর। কিছুদিন যাবত এই সংস্থার দায়িত্ব হয়েছে দেশের মধ্যে আমদানীর বিকল্প সন্ধান এবং তার জন্য দেশীয় উপাদান ও কারিগরি কুশলতার উপযুক্ত ব্যবহার। এই সংস্থার তৎপরতার ফলে পি আই এল সি তার তৈরীর জন্য শিসা আমদানীর এখন আর দরকার হয় না, ব্রোঞ্জের ও বিকল্প ধাতুর তাঁরা সন্ধান দিয়েছেন। তাছাড়া, ক্রলার ট্রাক্টর, টেস্টিং যন্ত্রপাতি, সিংক্রোনস মোটর, সিলিং মেসিন, হাইড্রলিক পাম্পও বিদেশ থেকে কেনা বন্ধ।

আলো-অন্ধকারের খেলা

তবুও '৭০-এর দশকে আশার আলো ঝিকিমিকিও, তার পটভূমিতে অন্ধকারও কম নয়। দেশে লোকবৃদ্ধি সমস্যার এখনো কোনো সমাধান হয় নি, যদিও চেষ্টা আছে।

ফলে প্রতি শতে আড়াইজন করে বাড়ছে, বছরে বাড়ছে এক কোটি কুড়ি লক্ষ জন। কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাও ঠিক এই হারের সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চলে বেকারের দল বৃদ্ধি করছে। কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে সমানভাবে সুযোগ উন্মুক্ত না করতে পারলে এই সমস্যা ক্রমশ মারাত্মক আকার ধারণ করবে।

জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের দিক থেকেও আমরা এখনো অনেক পিছনে। দরিদ্র জনের দৈনিক মাথাপিছু আয় তিন আনা না পনের আনা—পার্লামেন্টে লোহিয়া ও নেহরুর মধ্যে সেই বিখ্যাত বিতর্কের সময় থেকে আমরা অনেক এগিয়ে এলেও দরিদ্রের দারিদ্র্য এখনো প্রায় সেই স্তরেই রয়ে গেছে। এখনো ভারতের এক-তৃতীয়াংশ লোক শহরে মাসে মাথাপিছু ২৪ টাকা ও পল্লী অঞ্চলে ১৫ টাকার বেশী উপার্জন করে না। কিন্তু এদের সংজ্ঞা হচ্ছে 'দরিদ্র' বলে। ভারতে অবশ্য এর নীচেও আর একটি শ্রেণী আছে যাদের বর্ণনা করা হয় 'নিঃস্ব' বলে। এরা শহরাঞ্চলে মাথাপিছু ১৮ টাকা ও গ্রামাঞ্চলে ১৩ টাকার বেশী ব্যয়ে সমর্থ নয়। এই শ্রেণীর লোকও ভারতে কম নয়, জনসংখ্যার এরা এক-পঞ্চমাংশ। জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এদের জীবনযাত্রার পরিবর্তনে এখন পর্যন্ত বিশেষ সহায়ক হয় নি। ফলে শুধু জাতীয় আয় বৃদ্ধি নয়, বন্টন-নীতিও আজ আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের প্রতি ন্যায় বিচার হবে কিনা তাও বিচার করবে এই দশক।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

রেখে ঢেকে বলব না, অবস্থাটা লজ্জার-জনক—সাহিত্যের ও তার সমাজের। অর্থাৎ আমাদের সাহিত্যের ও আমাদের সমাজের। এবং মুখ্যত যেহেতু সাহিত্য মালমশলা পায় সমাজ হতে ও একবার সৃষ্ট হলে সাহিত্যের ধারণ বা ভরণপোষণের ভার পড়ে একমাত্র সমাজেরই উপর, সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ মানে অনিবার্যভাবে সাহিত্যের সমাজ সম্পর্কিত বক্তব্য। সাহিত্যিক হিসেবে এখানে এ-প্রশ্নগুলো এড়ানো তাই শক্ত হবে : কোন সমাজ আমার সাহিত্যকে জন্ম দিচ্ছে, কোন সমাজের জন্য লিখছি, এবং যা লিখছি তার সঙ্গে সেই সমাজের সম্পর্কটা কেমন দাঁড়াচ্ছে। প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দিতে গেলে যে-জ্ঞান, বিনয় ও নিরপেক্ষতা দরকার, তা হয়তো আমার নেই, তবু সাধ্যমতো চেষ্টা করব। আর যখন লিখতে বসেছি, এটাও জানি, লেখা দেখে কেউ কেউ নিশ্চয় নাক সিঁটকাবেন—ভাববেন, এটা আবার কে, কখনো তো নাম শুনিনি? তাঁদের প্রতি করজোড়ে আমার নিবেদন, এ-প্রশ্নটাও এক অর্থে আমাদের আলোচ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কারণ এমনই আশ্চর্য সমাজে বাস করি ও এমনই নামহীন সমাজে লিখি যে নিজের নামটা আমার নিজেরই কাছে কখনো কখনো অপরিচিত ঠেকে মনে হয়, কই, এ-নামটা তো শোনার মতো নয়?

আজ সকল স্থিতাবস্থার এই দুমদাম ভাঙনের মুহূর্তটা যেহেতু আসলে হয়তো অসম্ভব ভালো নাটকেরই সময়, তাই নাটকের প্রসঙ্গ তুলে বলতে চাই যে দর্শক ব্যতীত যেমন নাটক দাঁড়ায় না, পাঠক ব্যতীত সাহিত্য হয় না। পাঠক কে, সে-প্রশ্নে যাওয়ার আগে অবশ্য এটাও বলে নেওয়া চলে যে সাহিত্যের দুরবস্থা আজ শুধু আমাদের দেশেই নয়, খানিকটা সর্বত্রই। শুনতে পাই, সাহিত্যের জন্য এককালীন বিরাট প্রসিদ্ধ যে-কয়েকটি দেশের, সেখানেও নাকি আজকাল ক্রমশই সাহিত্য-বিরোধী ধ্বনি উঠতে শুরু করেছে—এবং কথাটা একটু কৌতুকোদ্দীপক ঠেকলেও সত্য, সেখানেও কবিতায়-উপন্যাসে-নাটকে এক ধরনের সাহিত্যবিরোধী সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছে। অন্যতম আর্ট হিসেবে সাহিত্য নাকি তার উঁচু আসনে আর বসে উঠেছে নতুন নতুন আর্ট ফর্ম কিছু পুরোনো থাকতে পারছে না, ইতিমধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে আর্টও নব সাজে সজ্জিত হয়ে আসর জমাতে এগিয়েছে। সকল সাহিত্যসৃষ্টির আদি ও সর্বপ্রধান লক্ষ্য যেটা, সেই অন্যের সাহিত্য লাভ করা, অর্থাৎ সাহিত্যের সেই ভাবটা, যেটা আমার সেটাকে ক্রমাগতই তোমার ও তোমাদের করে তোলা, সেটার প্রয়োজন যে আজ কিছু মিটেছে, তা নয়—বরং ঘরে-ঘরে-দেশে-বিদেশে নিরন্তর দেয়াল ভাঙার পর্বে একের সঙ্গে অন্যের মিলনের সে-চাহিদা আজ হয়তো আরো অনেক গুণে আকুল। এবং গল্প যে মানুষ আজ আর শুনতে চায় না, এক-যে-ছিল-রাজার সব মোহ নিঃশেষে ফুরিয়েছে, তাও নয়—শুধু সে-গল্প শোনানোর বা সাহিত্যের সে-ভাবটা যোগানোর বহু সার্থকতর উপকরণ আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে, এবং প্রতিযোগিতায় সাহিত্য পিছু হটছে। বছরে বছরে প্রকাশিত বইয়ের তালিকা দেশে-বিদেশে যতই বাড়তে থাকুক, সাহিত্য যে হাঁপাতে শুরু করেছে, সে-লক্ষণ সুস্পষ্ট।

এটার একটা মুখ্য কারণ হল এই যে সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য যা, লিখিত অক্ষরযুক্ত ভাষা, তার সম্ভব বিবর্তনের অবকাশ অতি সীমাবদ্ধ। নিছক দৈহিক পরিবর্তনের কথা বলছি না, সেটা সাধ্যের আয়ত্তের মধ্যে, কারণ এক শব্দ হতে আরেক শব্দের সৃজন যুগে যুগে সম্ভব হয়েছে ও আজও হচ্ছে, স্টাইলকেও সমাজ নিত্যনতুন বদলে চলেছে, কিন্তু ভাষার অলঙ্ঘ্য সীমাটাকে তার দ্বারা কোনোদিন অতিক্রম করা যাবে না। অর্থাৎ দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে হাতল কথাটা বোঝাতে হয়তো নতুন একটা কথা আবিষ্কার করতে পারি, কিন্তু সে-কথাটা আমায় লিখতে হবে ও সেটা পড়ার পর অভ্যাসের বশে হাতল সম্বন্ধে পাঠকের মনে একটা প্রতীতি জন্মাবে—ভাষার মাধ্যমে লেখক ও পাঠকের মধ্যে সরাসরি আদান-প্রদানের ব্যাপারটায় কিছু কিছু ফাঁক থেকে যেতে বাধ্য। সে-ফাঁকের চেতনা বিশেষ করে প্রকট হয় তখনই, যখন ভাষা কোনো গতিকে রূপায়িত করতে চায়, যেমন সে হাঁটছে বা হেঁটে চলেছে—কথাটা লেখায় হেঁটে চলার সকল অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আমেজ ফোটানো যায় না। আরো এক প্রকাণ্ড মুশকিল, ভাষা জানে না নীরব হতে, পারে না নীরবতাকে প্রকাশ করতে। এদিকে আজকের জটিল জীবনের চাহিদা ভয়ংকর, অল্প সময়ের মধ্যে দর্শন-শ্রবণ-মনোন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটিকে সে যুগপৎ কাজে লাগায় নতুন অভিজ্ঞতার হৃদয়ঙ্গমে—এককালে সাহিত্য হতে সে যা পেত বা পাওয়ার আশা রাখত, আজ তা-ই সে পেতে পারে আরো সম্পূর্ণভাবে ও আরো অনেক সহজে আর্টের অন্য কোনো মাধ্যমে, যেমন ফিল্মে। যে-পরিস্থিতি বোঝাতে সাহিত্য নেবে তিন হাজার শব্দ, ফিল্ম সেটাকে মাত্র দু মিনিটে আরো অনেক সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করতে পারবে। সস্তা চিত্ত-বিনোদন যাঁরা চান, তাঁদের জন্য যেমন রয়েছে বোম্বাই-এর ও সমগোত্রীয় ফিল্ম, আর্টে নাকউঁচু যাঁরা, তাঁদের কাছেও তেমনি সহজলভ্য সত্যজিৎ-বেগমান-গদার-অন্তোনিওনির কীর্তি।

কথাটা তুলে সাহিত্য সম্পর্কিত সমস্যাটাকে ঘোলা করতে চাই না, শুধু বলতে চাই, যে-সমাজ যত উন্নত, তার পক্ষে সাহিত্যের ভবিষ্যৎও তত সীমাবদ্ধ। এটা সমানই প্রযোজ্য আমাদের এই চাকরি-না-পাওয়া না-খেতে-পাওয়া অবিচারের-কবলে জর্জরিত দেশেও, কারণ হাজার হলেও আদিম কোনো সমাজ তো আমাদেরও নয়। এবং জগতের কোনো কোনো সমস্যা তো আমাদেরও সমস্যা বটেই, নানান বৈষম্য সত্ত্বেও দেশে-বিদেশে যে মানুষ ক্রমশই এক হচ্ছে, পৃথিবী ছাড়িয়ে চাঁদে পর্যন্ত ঘন ঘন পাড়ি দিতে শুরু করেছে। এ-পৃথিবীটা এক, এ-পৃথিবীটা এক, এ-পৃথিবীটা এক—এই ধ্বনিতে কান ফাটতে চলেছে।

ঘরমুখো যদি হই তো দেখি এখানে সমস্যাটা আরো অনেক ভয়াবহ, কারণ বাংলা সাহিত্যের আজ এমন কোনো পাঠক-গোষ্ঠী নেই যাকে কেন্দ্র করে সেই সাহিত্য সঞ্জীবিত বা সমৃদ্ধ হতে পারে। বড় বড় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতা যদি পাওয়া যায় তো দুম দুম দামামা বাজিয়ে কোনো বই কিছু চলল, এই পর্যন্ত। অথবা তুমি কবি, আমি আরেক কবি, আমরা দুজন দুজনের কবিতা পড়ি; কিম্বা আমি গল্প-লেখক, তুমিও গল্প-লেখক, আমরা একে অন্যের পিঠ চুলকাই, এবং চুলকে ভাবি কেউ-কেটা হলাম — কিন্তু এ-পিঠ চুলকানো

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আসলে সাহিত্যের বগলে কাতুকুতু দেওয়া, অন্য কিছু নয়। দ্বিতীয়ত, আমাদেরও সাহিত্যের জগতে বাংলাদেশ বলতে আজ পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ বলতে অনেকখানিই কলকাতা, কলকাতা বলতেও অতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রাণী যাঁরা তথা-কথিত সাহিত্যপ্রেমিক। এই শেষোক্ত শ্রেণীর সময়, সামর্থ্য ও রুচি পরীক্ষা করলে লেখকের হতাশা বাড়বে বই কমবে না। বাংলা বই কেন বিক্রী হয় না, এ-সম্বন্ধে ইদানীং বহু তথ্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা হচ্ছে, তাতে যোগ করার মতো আমার কিছু নেই। শুধু এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ছে এক বন্ধুর কথা — শিক্ষিত সজ্জন তিনি, এবং দুর্ধর্ষ সাহিত্যপ্রেমিকও—তবু বাঙালী হয়েও বাংলা বই ভুলেও ছোঁন না। যদিও বন্ধুত্ব তাঁর সঙ্গে, এখনো তাঁর মাথায় কথাটা ঢোকাতে পারিনি যে আমাদের মতো কেউ-কেউ বাংলায় লেখার চেষ্টা করতে পারে, সে-সম্বন্ধে তাদের একটা আবেগ থাকতে পারে কিন্তু দৈবাৎ যদি এক-আধটা ইংরেজী প্রবন্ধ কোনো সংবাদপত্রে বার করি—যত বাজেই হোক না সে-লেখা—সেটা তাঁর নজরে পড়বেই এবং গদগদ মুখে তিনি জানাবেনই, 'তোমার লেখাটা পড়লাম।'

গোড়ায় নামহীন সমাজের উল্লেখ করি—এবার বুঝুন, কিসের কথা বলছিলাম।

বহুকথিত স্বাধীনতালাভের পর হতে দেশে এক অদ্ভুত অবক্ষয়ের ধারাবাহিক সূত্রপাত হয়েছে, সর্বগ্রাহী হতাশার বোধ দিগন্তে হাত তুলছে। আমি অতি অর্বাচীন, তবু এ-ধারণা হয়তো ভুল নয় যে এখনো কোনো উল্লেখযোগ্য প্রস্তুতি নেই কোথাও, সততার আবেগ নেই, আদর্শ নেই, নেতৃত্বের চরম অভাবে দিনরাত্রি শ্বাসরুদ্ধ। এবং এই অবস্থার মধ্যেই ভদ্দরলোকেরা ভদ্দরলোকের জন্য সাহিত্য রচনা করছে, অনেক ঔপন্যাসিকই এলোচুল গিন্নীবান্নী পাঠিকা-গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে গল্প ফাঁদছেন। আর সেই ভদ্দরলোকেরই জাত যেহেতু আমরাও, জানি এ-বাংলাদেশে ভদ্দরলোকের 'বন্দরের কাল হল শেষ,' ইতিহাসের অমোঘ অনুশাসনে তারা অনিবার্যভাবে 'ছোটলোক' হয়ে যাচ্ছে।

তবে দাঁড়াই কোথায়—পড়ি-কি-মরি করে কিছু একটা তো করার দরকার? একটা কিছু হচ্ছেও। মুখ্যত তিন রকমের সাহিত্য দেখছি। এক, সাহিত্যের নামে চুটিয়ে মেয়েবাজি, উচ্ছৃঙ্খল অশ্লীলতার দাপা-দাপি, মানুষের আদিম রোমকূপে সুড়সুড়ি লাগানো। এবং প্রজননে আমরা এখনো উল্লাসী বলেই এ-ধরনের সাহিত্য কাটতে বাধা, কাটছেও, এমন-কি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতাও সে পাচ্ছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য বক্তব্যহীনতাকেই একমাত্র বক্তব্য বলে মেনে নিয়েছে—বোঝাতে চায়, জীবন একটাই, ঝামেলায় দরকার কী? এও এক চটুল পলায়ন।

তৃতীয় শ্রেণীর যাঁরা, যাঁরা সততায় অর্থপূর্ণ হতে চান, জীবন ও ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান, কোনো কোনো প্রকাশক তাঁদের বই ছেপে দয়া করেন কিন্তু সেই করুণাময় প্রকাশকদের করুণাভাজন হয়ে থাকার প্রচেষ্টা তাঁদের প্রায়ই দুর্বিষহ ঠেকে। অন্য পরীক্ষাও কম নিদারুণ নয় তাঁদের, কারণ ঘরে-বাইরে তাঁরা পরবাসী। তাই শান্তিবাদী হয়ে বাছুরের হাম্বা-হাম্বা রবই তুলুনে অথবা ন্যায়বিচার চেয়ে ব্যাঘ্রোচিত হুংকারই ছাড়ুন, তাঁরা না এ-কূলে, না ও-কূলে, মাঝনদীতে হাবুডুবু খাচ্ছেন। কারণ ন্যায়-বিচার চাচ্ছেন যাদের জন্য, তাদের আত্মীয় তাঁরা কোনো দিন হতে পারবেন না, তাঁদের সাহিত্যও তারা কখনো পড়বে না—তারা অর্ধপুষ্ট, রোগজীর্ণ, অশিক্ষিত, অন্য এক আগুনে তাদের ভিতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। সকল ভদ্দরলোকের নাগালের বাইরে তারা, লুপ্ত শহরের নোংরা দুর্গন্ধ অন্ধকার কোণে, ফাঁকাশে গ্রামে-গ্রামান্তরে। যে-অকল্পনীয় রিক্ততা এদের, তার সামনে চোখ তুলে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারবেন না এই তৃতীয় গোষ্ঠীর ভদ্দরলোক সাহিত্যিকেরা, অর্থাৎ আমরা সবাই। মানছি, সেই অর্ধপুষ্ট-অশিক্ষিতদের মধ্যেও জাগরণের ধ্বনি আজ, এবং সে-ধ্বনি ক্রমশই সোচ্চার হবে, তবে তার সঙ্গে আজকের সাহিত্যের কোনো সম্পর্কই নেই, কখনো থাকবে না।

এই সমাজ আজকের ও এই অসহায় সাহিত্যও, এবং এমন একটি প্রহসনের পরিপক্ক মুহূর্তে আমরা হাত-পা নেড়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে কলম চালিয়ে বেঁচে আছি। তবু জীবন যেহেতু জীবনই, বাঁশিটা আশাবাদী সুর যেন কিছুতে ছাড়তে চায় না।

পশ্চাদভূমি

মাত্র আটচল্লিশ বছরে একজন সাহিত্যিকের মৃত্যু একটি অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতা। এবং বস্তুতই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা। আপনাদের প্রদত্ত রচনার তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় গোটা চারেক উপন্যাস আর শ'দেড়েক ছোটোগল্প লিখে গেছেন। তালিকা সম্পূর্ণ কী অসম্পূর্ণ সে-তর্কে আপাতত যাবার প্রয়োজন দেখিনে।

যে কারণে আপনাদের দপ্তরে এই পত্রাঘাত তা এই : গত সংখ্যায় শ্রীসুকুমার দত্ত সাহিত্যিকের রচনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে রঞ্জন সম্পর্কে এমন খবর দিয়েছেন যা সাহিত্যবিচারে অবান্তর তো বটেই উপরন্তু ভ্রমাত্মক। সুকুমারবাবু লেখকের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ পরিচয়ের দোহাই দিয়েছেন।

আমি যতদূর জানি রঞ্জন তার সাহিত্যিক আড্ডায় কখনোই সাহিত্যের বাইরে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নাড়াচাড়া করেনি। কারণ এ ব্যাপারে ওর একটা স্থির গণ্ডী ছিল, যা সে কোনোদিন অতিক্রম করেনি।

রঞ্জন বেঁচে থাকলে হয়তো আমাকে এইভাবে এগিয়ে আসতে হত না। কিন্তু মৃত রঞ্জন এখন ইতিহাস হয়ে গেছে। তাই ঐতিহাসিক সত্যতা প্রতিষ্ঠা করাই আমার লক্ষ্য। বুঝতেই পারছেন সাহিত্যিক রঞ্জনের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি ওকে যত সহজে বুঝতাম ওর স্ত্রী সুকুমারীও তা বুঝত না। বোধহয় কারণটা এই হবে রঞ্জনের দাম্পত্যজীবনের আকৃতিটা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সরল। কিন্তু সাহিত্যিক রঞ্জন, তার রচনাবলির জটিলতা দেখেই বোঝা যায়, শিল্পীজীবনটা তার কাছে যথেষ্ট কঠিন অংকের মতো ছিল। আমার বিশ্বাস এখানে সে নিজের জীবন দিয়ে বিপজ্জনক এক্সপেরিমেন্ট করে গেছে। ওর এই ঝোঁকই পদ্মার ঘূর্ণির মতো আমাকে টেনেছে, একই কেন্দ্রে আবর্তিত করেছে।

আমরা পরস্পরের কাছে অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিলাম। যেন মনে হত আমরা দুজনে মিলে হাতেকলমে নিত্যনতুন কোনো তত্ত্বের রূপ দেবার জন্যে দুঃসাহসিক।

রঞ্জন হাতেকলমে পরীক্ষা করে যেটুকু সঞ্চয় করত তাই হুবহু তার রচনায় পরিবেশন করত। আমি হলপ করে' বলতে পারি : যা তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা সিদ্ধ না হত তা সে কখনোই লেখেনি। হয়তো লিখতেও পারত না। সম্ভবত এর মনের কাঠামোটাই এমন ছিল।

আমি প্রথম দিকে ওকে প্রশ্ন করেছি : 'একটা সুখী ঘরসংসার থাকতেও সে আমাকে জড়িয়ে কেন জীবনটাকে জটিল করছে!'

রঞ্জন বলত : 'ফুটপাথ থেকে তো জীবন দেখা যায় না। জীবনের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। যুগের জটিলতাকে যখন মানি তখন জীবনে তার স্বাদও পেতে হবে।'

আমার থেকে বছর আটেকের বড়ই হবে রঞ্জন। ওর শীর্ষাবলম্বী ভাবনারাশির সঙ্গে আমার ভাবনা সঙ্গত করার কথা নয়। কিন্তু ওই বয়েসে একজন সাহিত্যিকের সঙ্গ আমাকে অনন্য, অসাধারণ করে তুলেছে।

একেক সময় নিজেকে মনে হত গিনি-পিগের মতো। কিন্তু সেই হীনমন্যতাও বেশিক্ষণ স্থায়ী হত না। কারণ রঞ্জন আমাকে সে-ভাবে ব্যবহার করেনি। যতক্ষণ আমার কাছে থাকত ততক্ষণ সে আমারি থাকত। কথাবার্তায় আচরণে আমাকে নিয়ে সে খেলা করছে মনে হয়নি।

আমি ভাবতাম : এর নাম ভালোবাসা। কিন্তু একজন লোক জীবনে কজনকে ভালোবাসতে পারে! রঞ্জন কী সুকুমারীকে ভালোবাসে না? কিন্তু ওদের সংসারের সুখ দেখে তো সে-সন্দেহ হয় না। আমার চোখে এদের সুখের আকৃতিটা সত্য ছিল। ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন অগাধ বিশ্বাস আমি বেশি দেখিনি।

নারীর চোখ দিয়ে আমি ভাবতে বসতাম : আমার স্থানটা যথার্থ কোথায়। বুঝতে পারিনি। আজো নয়।

একেক দিন পরীক্ষা করবার জন্যে বলেছি : 'ধরো, এমন দিন এল, একটা পক্ষকে ছাড়তে হল। তুমি কোন্ পক্ষকে ছাড়বে?'

রঞ্জন হেসে বলল : 'দেখো এ-প্রশ্ন তাকেই করা যায় যার পক্ষে দুটোর মধ্যে একটি পক্ষই সত্য হয়ে ওঠে। আমার কোনোটাই মিথ্যে নয়। কাজেই ছাড়বারও কোনো প্রশ্ন নেই।'

বলি : 'তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

রঞ্জন বলে : 'বাসি।'

'দিদিকে?'

'তাকেও।'

'একী সম্ভব হয়?' আমার সংশয়।

রঞ্জন বলে : 'হয়েছে তো।'

'কী জানি', আমি নাকের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে বলি : 'দিদি আমাদের ব্যাপারটা কতদূর জানে। দিদি তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে বলেই...'

রঞ্জন বলে : 'ওর বিশ্বাসের ব্যাপারটা ওর কাছে। সে নিয়ে তোমার বা আমার মাথা না-ঘামালেও চলে।'

চিন্তা করে বলি : 'কী জানি, একেক সময় মনে হয় দিদির সরলতা নিয়ে আমি, আমরা...'

রঞ্জন গম্ভীর হয়ে বলে : 'আরো আগে এ সকল প্রশ্ন ভাবা উচিত ছিল। এতদিন কী না-ভেবেই...'

'কী জানি, বুঝতে পারিনে।'

বস্তুত আমি পরিষ্কার করে বুঝতেও পারতাম না। সেবার শিমুলতলায় যখন রঞ্জনকে সস্ত্রীক দেখলাম সেই প্রথমদিন থেকে ওর সাহিত্যিক জীবন আমার হৃদয়ে বিমুগ্ধ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। প্রান্তরে দাঁড়িয়ে দূরের দিগন্তের গোধূলির দিকে তাকালে যেমন হয়। এই কৌতূহল আমার ওই বয়েসে অসম্ভবের বাধাগুলোকে ডিঙোতে শিখিয়েছিল। বাইরের ওই গ্রাম্য-প্রকৃতির মধ্যেই বোধকরি এই অসংকোচ দৃপ্ত হয়ে উঠেছিল। এবং হয়তো মানব-মনের কারুবারি রঞ্জনের আচরণেও আমাকে উৎসাহিত করবার প্রশ্রয় ছিল। তারপর... বিকেলের ভ্রমণসূচীর মধ্যে অনিবার্যভাবে কী করে রঞ্জন একা কিংবা সস্ত্রীক আমার পরিক্রমার ছন্দে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

কলকাতায় ফিরে এসে ওর স্মৃতি ভুলে-যাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু একদিন কলেজ স্কোয়ারের সামনে হঠাৎ কী করে দেখা হয়ে গেল। এবং

তার দিনকয়েক পরেই রঞ্জনের আমন্ত্রণে আমি পাবলিক রেস্তোরাঁর কেবিনে ওর সঙ্গে চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসলাম।

ভারি পরদাটা হাওয়ায় দাপাদাপি করছিল। রঞ্জন বেশি কথা বলছিল না, চায়ের পেয়ালায় ওর মুখ, আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। হঠাৎ ওর ডান হাতটা আমার কাঁধের ওপর নেমে এল। আমি কাঁপছিলাম। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। তারপর ওর চোখের তারায় আমার মুখটাকে আমি ভাসতে দেখলাম, ওর মুখের অন্ধকারটা নিকটে ঘনিয়ে এল, আমার চাপা নিশ্বাসগুলো যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল, রঞ্জন আমার সমস্ত স্পন্দন-সংশয় অবিশ্বাসকে মুছে নিয়ে আমার অরক্ষিত দুর্গকে অধিকার করে নিল। আমি শুধু ভাঙা গলায় মুমূর্ষু আর্তনাদ করে অসহায়ের মতো বলেছিলাম : 'আমাকে ছেড়ে যেও না।'

কিন্তু না, এই সকল আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আমি এই পত্রাঘাত করতে বসিনি।

আমি শ্রীসুকুমার দত্তের প্রতিপাদ্য সম্পর্কে মৌলিক ভুল সম্পর্কে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। ইতিহাসের মোড়কে অসার কিংবদন্তির সূত্রপাত করে লাভ কী।

সুকুমার দত্ত লিখেছেন : "সাহিত্যিক রঞ্জন জীবন সম্পর্কে নিজস্ব একটি দার্শনিকতা তাঁর রচনায় আরোপ করে-ছিলেন। যা তাঁর মানসিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য।"

সুকুমার দত্ত এখানেই শেষ করলে আমার কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু ওই সঙ্গে তিনি আরো লিখেছেন : "রঞ্জনের রচনায় ঘুরেফিরে এক শাশ্বত নারীকে দেখতে পাওয়া যায়। দ্যাট্ এটারনাল শী। যিনি মানুষের জীবনে অপ্রাপনীয়া, অথচ আকাঙ্ক্ষিত। আমাদের শাশ্বত অনন্ত জীবনের তৃষ্ণা" ইত্যাদি।

এইখানেই আমার ভীষণ হাসি পেল। মনে হল সুকুমারবাবু পরীক্ষায় প্রশ্ন-লেখার সুযোগ করে দেবার জন্যে ছাত্রদের সামনে নোট্ দিচ্ছেন।

আমি জোর করে বলতে পারি : রঞ্জন কখনোই তার রচনায় এই ধরনের গতানু-গতিক আইডিয়া প্রচার করতে উদ্যত হয়নি। আমাদের গোটা দেশটা এই ধরনের মান্ধাতা আমলের প্রতীকসর্বস্বতার পায়ে নিশ্চিন্তে মাথা খুঁড়ে মরছে।

'শাশ্বত নারী' কথাটা বাঁধা গতের মতো তারাই বারবার আবৃত্তি করে যারা শাশ্বত কেন, একালীন একটি নারীকেও দ্যাখেনি।

সাহিত্যিক রঞ্জনের কাছে এ বস্তু বাস্তবকান্ডজ্ঞানহীন কোনো আইডিয়া ছিল না। আগেই বলবার চেষ্টা করেছি রঞ্জন বাস্তব অভিজ্ঞতাশূন্য কোনো কিছুই লিখতে উৎসাহিত হয়নি।

এ নারী আমি। যাকে রঞ্জন বিভিন্ন পরিবেশ, ঘটনার আলোকে ফেলে কাছে থেকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছে। ফলে তার একেকটি রচনায় ভিন্নপ্রকৃতি নিয়ে মেয়ে চরিত্র উপস্থিত হয়েছে। তার নায়িকা অনুভা, নির্মলা, দীপ্তি, কী কাজল, বনানী নিশ্চয়ই একই ধরনের মেয়ে নয়। এবং সমস্ত চরিত্রের যোগফলেও কোথাও সেই শাশ্বত নারী-কে খুঁজে পাওয়া যায় না।

বুঝতে পারি, এই সকল নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে তথাকথিত যৌন উত্তাপ কোথাও না-পেয়ে সুকুমারবাবু এর মধ্যে কামগন্ধহীন এক আইডিয়াকে খুঁজে পেয়েছেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপে সুকুমারবাবু রঞ্জনের বিখ্যাত গল্প 'তৃষ্ণা'-র উল্লেখ করেছেন।

গল্পটি সকলের পড়া। তবু সংক্ষেপে একবার বলে নিলে আলোচনার সুবিধে হবে।

ক্রমাগত তাগিদের পর বনানী সত্যিই একদিন রাজি হল দিনেনের সমুদ্রভ্রমণের সঙ্গী হতে। এক বর্ষায় যুগলে পুরীর এক হোটেলে সপ্তাহখানেকের জন্যে আশ্রয় নিল।

বনানী দিনেনের তাগিদের অর্থ বুঝেছিল। দিনেন তো নিশ্চয়ই। বনানীর মনে সংকোচ ছিল, ভবিষ্যতকে সে ভাবতে পারে নি, এমন নয়। হয়তো সেও আর

নিজের সঙ্গে যুঝতে পারছিল না। কুড়ি বছরের যৌবন বিপদের থেকেও সম্ভাবনাকেই অধিক লালন করে। বনানী উদ্‌বিগ্ন ছিল, কিন্তু কৌতূহলীও কম নয়। প্রথমত সে সমুদ্র দ্যাখেনি। দ্বিতীয়ত দিনেনের সঙ্গে তার দৈনন্দিন সম্পর্ক এমন একটি পর্যায়ে উঠেছিল যখন তাকে বাধার পাঁচিলটাকে এক সময় ভাঙতেই হবে। বনানী জানে সম্পর্ক তার নিজস্ব প্রকৃতিতেই, এক সময় দুকূল প্লাবিত করে দেবে।

অবশ্য বনানী মুখে অনেকবার দিনেনকে সাবধান করে দিয়েছিল : সে যেন সংযমের বাঁধ না ভাঙে। যদিও এই সাবধানের কোনো অর্থ নেই। বনানীও জানে, দিনেনও। যেহেতু নির্জন সমুদ্রতীরে তারা দুজনের স্বাভাবিক কামনাকেই গোপনে লালন করেছিল।

প্রথম দিন প্রচণ্ড সমুদ্রস্নানের পর দুজনেই রাত্রে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে আকাশ ভেঙে ঘোর বর্ষা নেমে এল।

রঞ্জনের গল্পটা হাতের কাছেই রয়েছে।

সেখান থেকেই শেষাংশটুকু তুলে দিই।

...দিনেন আলো নিবিয়ে দিল। বাইরের দামাল পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ঘরটা তরল অন্ধকারের স্রোতে তিমিমাছের পিঠের মতন ভাসতে লাগল। অন্ধকার। ঠান্ডা পাথরের মতন ভারি অন্ধকার দিনেনের নিশ্বাস বন্ধ করে দিতে চাইল। দিনেনের মস্তিষ্কে প্রদাহ। আক্রোশ হিংসা-ব্যর্থতা-হতাশা-নৈরাশ্য-শূন্যতা তার সমস্ত শরীরচেতনায় যেন সূঁচ হয়ে বিঁধতে লাগল। তার ফুশফুশে যেন খোলা প্রান্তরের অনর্গল হাওয়া প্রবেশ করে মস্তিষ্ককে হাহাকারের আর্তিতে ভরে দিচ্ছে। দিনেন একটা ভয়াবহ চিৎকার শুনল, যেন কোনো গভীর কূপ থেকে একটা নির্জন চিৎকার ভেসে আসছে। প্রকাণ্ড নির্জনতা, অর্থহীন, দুর্বোধ্য, তাকে গ্রাস করছে। দিনেন কথা বলতে পারছে না। তার মনে হল সভ্যতার প্রথম ঊষায় তারা ফিরে গেছে, যখন মানুষ কথা বলত না, আকারে-ইঙ্গিতে জান্তব-ধ্বনিতে তাদের প্রয়োজন পূরণ করত। দিনেন নির্মম নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করল। বনানীর কঠিন ভারি অস্তিত্ব তাকে গ্রহণ করেছে (ইচ্ছাগুলি শরীর চায়), দ্বিগুণতর আত্মঘাতী ইচ্ছায় বনানী তার অধরে-ওষ্ঠে মরণকে তীব্র করে জ্বালিয়েছে। দিনেন ফেটে পড়বে, বিদীর্ণ হয়ে পড়বে আগ্নেয় পাহাড়ের মতন। মুঠো মুঠো আগুন ছুঁড়ে মারছে বনানী তার দেহে।

'বুনো—'

'কী?'

'বুনো আমি পারছি নে...'

'কে পারতে বলছে—'

'আমার কষ্ট হচ্ছে।'

'আমারো।'

'এ-নির্জনতা আমরা চাইনি। আমরা ইচ্ছার কাছে খুন হচ্ছি, রক্তাক্ত হচ্ছি।'

'তুমি তো এই চেয়েছিলে। কেন মিছি-মিছি কষ্ট পাচ্ছ?'

'বুনো—'

'কেন?'

'আমি কী চাই নিজেই জানি নে—'

'জানি। তুমি ঘুমোও। আমি তোমার চুলে হাত বুলিয়ে দিই।'

দিনেন ঘুমে টলছে।

যতবার ঘুমের আচ্ছন্নতা ছিঁড়ে যায় দিনেন দ্যাখে বনানীর মুখ, ওর কালো গভীর চোখ, ওর ছড়ানো চুল, উষ্ণ নিশ্বাস।

বনানীর চোখে ঘুম নেই। বনানী ভাবে : ও এমন করবে জানলে আমি ওকে এতদূরে নিয়ে আসতাম না। আমি ভুল বুঝেছিলাম। আমার নিজেরি লোভ আমাকে দুর্বল করে দিয়েছে। আমার ভেতরে এত লোভ রয়েছে আমি জানতাম না। আমার লোভ কৌতূহল আমি ওকে দিয়ে মিটিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। ও লোভী হতে পারে না। হয়তো পারত যদি-না আমি ওর সান্নিধ্যে এমন প্রচণ্ড রকমের কাঙাল হয়ে উঠতাম। আমি এখন কী করব, আমার লজ্জা, অপমান।...

উদ্‌ধৃতি দীর্ঘ করে লাভ নেই। মোটামুটি এই হল রঞ্জনের 'তৃষ্ণা' গল্পটি।

এই গল্পে লেখকের যৌনতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিটি কী যথেষ্ট পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি? এর মধ্যে সুকুমারবাবু কামগন্ধ-হীনতার অতিরিক্ত প্রসঙ্গটি কী করে আবিষ্কার করলেন! নাকি এও তাঁর শাশ্বত নারী-জাতীয় প্রতীক অন্বেষণ?

গল্পকে যথাযথ নিতে আমরা ভয় পাব কেন? এ গল্প অবশ্যই যৌনতার গল্প। কিন্তু লেখক রঞ্জন প্রশ্নটাকে জীবনের সামগ্রিক বোধের সঙ্গে যুক্ত করেই গ্রহণ করতে চেয়েছেন, জীবনের সম্পূর্ণাঙ্গ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাটা এক ধরনের অসুস্থতা এবং অমানবিক। যেমন অর্কেস্ট্রার বাড়াবাড়ি হলে সুরের সমন্বয় হারিয়ে যায় এবং সমস্ত ব্যাপারটা প্রচণ্ড নারকীয় হয়ে ওঠে, তেমনি।

জানিনে এটা সার্বিক সত্য কিনা। তবে স্বীকার করতে বাধা নেই যে এটা ব্যক্তি-মানসের হাতে-কলমে পরীক্ষার ফল।

আজ আর বলতে সংকোচ নেই সমুদ্র-তীরের সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতায় সেদিন আমি অত্যন্ত মৃত্যুর মতন হতাশ বোধ করেছিলাম। মনে মনে ক্ষুব্ধও হয়েছিলাম। কিন্তু পরে বুদ্ধি দিয়ে, ভেবে দেখেছি সেদিন যদি ঘটনাটা ঘটতে পারত, তাহলে সেটা পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদের কাছে খাপছাড়া অসহায়ের মতো লাগত। এবং সে অর্থহীন লজ্জা আমরা সারাজীবনেও বইতে পারতাম না। প্রবৃত্তি যে আমাদের সুস্থ জীবনবোধের কাছে মার খেয়েছে তার জন্যে সম্পর্কে চিড় খায় নি। দেখুন, শেষ পর্যন্ত চোরের অপরাধবোধ আমাদের পীড়িত করত-ই।

এরপর আর কখনো আমরা ওই বিপজ্জনক অন্তরঙ্গতার রাজ্যে প্রবেশ করিনি। যেখানে আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে একটা বিকলাঙ্গ শবে পরিণত হতে বাধ্য।

'তৃষ্ণা' পত্রিকায় বেরুবার আগে রঞ্জন আমাকে পান্ডুলিপি পড়তে দেয়নি। প্রথমে গল্পটা পড়েছিলেন ওর স্ত্রী।

আমাকে হেসে বলেছিলেন : 'দ্যাখো, তোমার সাহিত্যিক কী সব গল্প লিখেছেন? কী যে মাথামুণ্ডু ভাবেন...'

গল্পটা সেদিনই পড়লাম। পড়ে কী জানি দারুণ রাগ হয়েছিল, নিজের ওপর অথবা রঞ্জনের সম্পর্কে।

ব্যঙ্গ করে বলেছিলাম : 'এই গল্প লেখবার জন্যে কী সেদিন ঘটনাটা অমন হয়েছিল।'

রঞ্জন হেসে বলেছিল : 'চুপ চুপ।'

আশ্চর্য, রঞ্জন কী করে অমন নিখুঁত পর্যবেক্ষণ করে? হুবহু আমার মনের কথাটাও দর্পণের মতন তুলে ধরে?

বিস্ময় মানলেও, আমার ক্ষোভ কিছুতে যেত না। আমি তো লেখক নই, আমি সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ। একটা শক্ত পাথরের মতন অনুভূতি আমাকে পীড়িত করে রাখত।

রঞ্জন আমার সেদিকটা বোঝেনি। কিংবা বুঝেও চুপ করে থাকত। আর, আমি হারব না বলে একরকম রুদ্ধ জেদী হয়ে উঠতাম। মাঝে মাঝে ঝগড়া হত। দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করে দিতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারতাম না। এ যে কী নেশা বোঝাতে পারব না। যেন অন্যের আঁকা ছবিতে নিজেকে দেখবার জন্যে পাগল হয়ে উঠতাম।

রঞ্জন আমার মোহ, আমার আকাঙ্ক্ষা, বেদনা এবং প্রেম।

কিন্তু আমার কথা থাক। সাহিত্যিক রঞ্জনের কথাই বলি।

ক্রমশ এই মেনিতার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ওর প্রিয় বিষয় হয়ে উঠল। এবং অনেক গল্পে বিভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করে সে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করে চলল।

এই জাতীয় তার আরেকটি গল্প জলপ্রপাত। এখানেও সে নায়কের প্রতীক্ষাতে ধৈর্যের শেষ সীমানায় গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে নায়িকাকে তার কোয়ার্টারে ছুটিয়ে এনেছে। রোদ্দুরে গলা তেলকালের কুলির মতো রুদ্ধনিশ্বাস মাধবীকে দেখে প্রণবেশের কাঙ্ক্ষিত লালসা যেন ভয়ংকর একটা বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

আমি খুবই বিরক্ত হচ্ছিলাম। এ যেন ওর একটা খেলা হয়েছে। এবং সে খেলার দাম নির্বোধের মতো আমাকে দিতে হচ্ছে।

একদিন রাগ করে বললাম : 'আমাকে নিয়ে তোমার এই অমানুষিক পীড়ন এবার থামাও। আমি আর আসব না।'

রঞ্জন কী বলতে চেয়েছিল আমি শুনিনি।

আমি রাগে কাঁপছিলাম। ওর এই নিষ্ঠুরতা আমাকে দগ্ধ করছিল।

তারপর ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন বাড়িতে আটকে রইলাম। রিক্ততার গ্লানি আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। আমি ভেতরে ভেতরে শক্ত হচ্ছিলাম, তৈরি হচ্ছিলাম। আমার সামনের এই কৃত্রিম বাধার আস্তরণটাকে নখ দিয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিতে হবে। রক্তাক্ত অনুভূতির মধ্যে দিয়ে আমাকে প্রমাণ করতে হবে : আমি কারুর ইচ্ছার দাস নই।

আর, এই অন্ধ প্রতিহিংসাই আমাকে পাগল করে দিল।

একদিন নির্জন বাড়ির খাঁ খাঁ দুপুরে আমার ছোটো ভায়ের বন্ধু সনাতনকে গায়ে পড়ে কারম খেলতে আমার দোতলার ঘরে ডেকে আনলাম। বাইরে খাঁ খাঁ রোদ্দুর। ছাদের কার্নিসে চিলের ভয়ংকর শব্দ।

সনাতন অকস্মাৎ দরজা জানলা বন্ধ অন্ধকার ঘরে কেমন হকচকিয়ে উঠেছিল। আর সেই সময় আমি চেতন-অচেতনের দোলায় দুলতে দুলতে আমার সামনের ওই নির্বোধ বাধার জঞ্জালটাকে আক্রোশে নিক্ষেপ করে সাহিত্যিক রঞ্জনের গল্পের প্রতিপাদ্যকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলেছিলাম।

আস্তে আস্তে রঞ্জনের সঙ্গে সম্পর্কের বাঁধন আমার আলগা হচ্ছিল। ওই একদিনের পাগলামোর সাজা আমাকে জীবনভর বইতে হচ্ছিল। কারণ সনাতন আমার ওপর ওর দাবি প্রত্যাহার করেনি।

আমি এখনো ভাবি রঞ্জনকে শাস্তি দিতে গিয়ে আমি কী করে ওই শস্তা পথ বেছে নিলাম! আমার রুচি শালীনতা আমাকে বাধা দিল না কেন? নাকি আমার ভেতরে, আমার নিজের সম্পর্কেই একটা সন্দেহ অবিশ্বাস জমে উঠেছিল। রঞ্জনের প্রতিপাদ্যটা প্রকারান্তরে আমারি শারীরিক অক্ষমতা কী না, কে বলতে পারে।

আমি প্রচণ্ড হতাশায় ভয় পেয়েছিলাম। এবং এই ভয়ই আমাকে এ পথে টেনে নামাল। এটি এমন একটি প্রসঙ্গ যেখানে আমার হীনমন্যতা প্রকাশ পাচ্ছে। অন্যদিকে রঞ্জনের সে-বালাই নেই। কারণ পারিবারিক সাম্রাজ্যে সে স্বীকৃত পুত্রকন্যার জনক। তাহলে আমার ওপর এক ধরনের পরীক্ষা, আর নিজের পারিবারিক জীবনে ভিন্ন সত্য প্রমাণিত হবে কেন? এটা কী আমাকে বেঁধে অপমান করা নয়!

আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস রঞ্জন আমার হালের এই পরিবর্তনকে ধরতে পেরেছিল। কারণ ও আমাকে আমার চেয়েও বেশি বোঝবার ক্ষমতা রাখে।

কিন্তু ও আমাকে কোনোদিনও কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। ওর চুপ করে যাওয়াটা আরো ভয়ংকর। আমি দিনের পর দিন দেখছিলাম ও শুকিয়ে যাচ্ছে। ওকে আমার হৃতসর্বস্ব মনে হচ্ছিল। অথচ ওর হেরে-যাওয়া মনোভাবটা আমাকে কোনোদিনও বুঝতে দেয়নি।

কে জানে আমিই ওর অকালমৃত্যুর জন্যে দায়ী কিনা।

রঞ্জন চলে গিয়ে আমার ওপর অনেক দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে গেছে। ওর ব্যক্তিগত জীবনটা মুছে গিয়ে শিল্পীসত্তাটাই বিশদ হয়ে উঠেছে। এবং যেটা ইতিহাসের সম্পত্তি। ওর সাহিত্যসঙ্গী হিসেবে আমার ভূমিকাটিও ইতিহাসের মালমশলা হয়ে গেছে।

কাজেই রঞ্জনকে রক্ষা-করা আমার কর্তব্য হয়ে পড়েছে। যেন ওর সম্পর্কে কোনো ভুল না হয়। ওকে যেন আমরা যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারি।

আশা করি আপনারাও আমাকে সমর্থন করবেন। সেই কারণেই এই বিনীত পত্রোত্তর।

আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

মুজফ্‌ফর আহমদ

স্মৃতিচারণে সমসাময়িক চিত্র

কয়েক বছর আগে অমৃতবাজার পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যায় আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট পার্টির একটি ইতিহাসের খসড়া প্রকাশ করেন। সেই খসড়াটি বলাবাহুল্য, যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ এবং তার মধ্যে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির ক্রমবিকাশের ধারা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণে বিধৃত হয়েছিল। কিছুকাল আগে রমেশচন্দ্রের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জেনেছিলাম যে, তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার কাজে উদ্যোগী হয়েছেন। সম্ভবতঃ তাঁর গ্রন্থ এতদিনে প্রকাশিত হয়েছে। রমেশচন্দ্রের এই গবেষণাধর্মী ইতিহাসের বাইরে মাঝে মাঝে কিছু আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বা এখনও আছেন তাঁরা তাঁদের কথা বলেছেন। শ্রীযুক্ত মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ একজন প্রবীণ কম্যুনিস্ট নেতা, দীর্ঘদিন তিনি নানা সূত্রে কম্যুনিস্ট পার্টির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য রেখেছেন এবং বর্তমানে তাঁর বয়স আশী পার হয়েছে। নানাভাবে স্বীয় কর্মদক্ষতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন এবং কম্যুনিস্ট চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছেন। এখনও তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির একটি দলের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন এবং কর্মপরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সম্প্রতি তাঁর 'আমার জীবন ও ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি' নামক স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটিতে স্মৃতিচারণের মাধ্যমে সমসাময়িক চিত্র তিনি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে রচনা করেছেন। বলাবাহুল্য এই গ্রন্থ শুধু স্মৃতিনির্ভর নয়, এর জন্য তাঁকে রাশি রাশি দলীল পড়তে হয়েছে, তিনি দলীলের সাহায্যে স্মৃতিকে সতেজ করে নিয়েছেন। কৈফিয়ৎ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

'এই পুস্তকখানি ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকথা, কোনো অবস্থাতেই এ পুস্তক ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাস নয়। ইতিহাস লেখার জন্যে আমি পার্টির দ্বারা নিয়োজিত হইনি। তবে, লেখকেরা আমার পুস্তক হতে প্রচুর মাল-মসলা পাবেন।'

শ্রীযুক্ত মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ যথার্থই প্রচুর তথ্য সমাবেশ করেছেন এবং ধারাবাহিকভাবে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। যেখানে মূল ইংরাজী উদ্ধৃতিদান করা হয়েছে তার বঙ্গানুবাদও দেওয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদটির নামকরণ করা হয়েছে 'কথা শুরুর আগে'—এই অংশে তিনি কিভাবে ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে নেমেছিলেন তার স্মৃতিকথা বিধৃত করেছেন। সন্দ্বীপের অন্তর্গত মুসাপুর গ্রামে ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা মনসুর আলী সাহেব সন্দ্বীপের আদালতে মুখতারী করতেন। যদিও কুরআনের একটি আরবী বাক্য উচ্চারণ করে তাঁর পাঠারম্ভ হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে আরবী পড়তে হয়নি, তাঁর পাঠারম্ভ হয়েছিল মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা প্রথমভাগ দিয়ে। উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়ার সময় তাঁকে পড়া ছাড়তে হয়। পরে অবশ্য মাদ্রাসায় আরবী ব্যাকরণ ও গুলিস্তান ও বুস্তান পাঠ করেছেন। তখন ১৯০৫ সাল। দেশে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন চলেছে, কিশোর মুজফ্‌ফর ইংরাজী স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ না পেয়ে বাকরগঞ্জ জিলার উদ্দেশে যাত্রা করেন। লেখক বলেছেন—

'মনে পড়ে পাতারহাট স্টীমার স্টেশনে একখানা পয়সা কম পড়ে যাওয়ায় আমি বরিশালের টিকেট কিনতে পারছিলেম না। তখন একজন আদালতের হিন্দু

চাপরাশি দয়াপরবশ হয়ে আমায় একখানা পয়সা দিয়েছিলেন।'

তিনি যখন কষ্টসহকারে কিছু অর্থ-সংগ্রহ করছিলেন তখন তাঁর বড়ভাই এসে তাঁকে বললেন, বাড়ি চল, হাইস্কুলেই তোমায় পড়তে দেব।

লেখক ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে নোয়াখালি জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর তিনি হুগলী মহসীন কলেজে ভর্তি হন, সেখান থেকে আসেন বঙ্গবাসীতে এবং সেই থেকেই তিনি কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। ১৯০৭-এ বিবাহ হয়েছিল, লেখক বলেছেন—'কিন্তু বিয়ে কোনোদিন আমায় ঘর-সংসারে বাঁধতে পারেনি।'

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি জড়িয়ে পড়েননি, তবে তাঁর মনে ধীরে ধীরে সংগ্রামী মনোভাব জেগেছে। সন্ত্রাসবাদীদের কর্মকাণ্ডের ভিতর তিনি হিন্দু-পুনরুত্থানের প্রয়াস লক্ষ্য করেছেন তবে বলেছেন—

'আমি কিন্তু ধর্মনিঃশাসিত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনকে দোষ দিই না, এই কারণে যে তার আগে মুসলমানরাও তো এই রকমই করেছিলেন। তাঁরাও চেয়েছিলেন মুসলিম রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। মুসলিম আন্দোলন আরও বেশী প্রসারিত ছিল।'

১৯০৬ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত লেখক গৃহশিক্ষকের কাজ করেছেন। এছাড়া বছরখানেক বাঙলা সরকারের ছাপাখানায় ও সামান্য কিছুকাল কর্পোরেশনের স্লটার হাউসে কাজ করেছেন। ইতিমধ্যে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে। এখান থেকে প্রকাশিত হত 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' এবং সেই পত্রিকায় হিন্দুদেরও লেখা ছাপা হত, হিন্দু প্রকাশকেরা সমিতির লাইব্রেরীতে তাঁদের বই দান করতেন। এই সাহিত্য সমিতির সহকারী সম্পাদক ছিলেন লেখক। সাহিত্য পত্রিকা এঁকেই বার করতে হত। শহীদুল্লাহ সাহেব ও মোজাম্মেল হক সাহেব পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু বেশী কাজ তাঁরা করতেন না। কাগজ ছাপানো, লেখা সংগ্রহ করা ও ডাকে দেওয়া প্রভৃতি সব কাজ লেখকই করতেন। লেখক বলেছেন—

'১৯১৮-র শেষাশেষিতে আমার যে সব সময়ের কর্মীর জীবন আরম্ভ হয়েছিল সেই জীবন আমার আজও অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে এই বইয়ের লেখার সময়েও চলেছে।' ১৯১৯-এ লেখক ভেবেছেন জীবনের পেশা কি হবে—সাহিত্য না রাজনীতি, এই নিয়ে তাঁর মনে দ্বন্দ্ব জেগেছে। ১৯২০-র সূচনায় তিনি মনঃস্থির করে ফেললেন এবং রাজনীতিই হবে লেখকের জীবনের পেশা। ১৯১৬ থেকে প্রস্তুতি চলছিল মনে মনে, তিনি রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে এবং মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন এই কাল থেকে।

এই গ্রন্থটিও ১৯২০ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যবর্তী কালকে ঘিরে রচিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের তাশকন্দ শহরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ভিত্তি স্থাপন হয়। এই ব্যাপারে লেখকের প্রত্যক্ষ যোগ সেদিন ছিল না, তবে পরবর্তীকালে এর প্রভাব তাঁর এবং তাঁর অন্য সহকর্মীদের ওপর পড়েছে, এবং সেইখান থেকেই শুরু হয়েছে তাঁর রাজনৈতিক স্মৃতিচারণা।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি স্থাপন করেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। পরবর্তীকালে তিনি ১৯২৯-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট ইন্টারনাশনালের অন্যান্য সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। পূর্ব-জীবনে যিনি অনুশীলন পার্টির সদস্য নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যিনি ভারতের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে চীন, জাপান প্রভৃতি ঘুরেছিলেন তিনি, শেষপর্যন্ত আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া শহরের ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের অনুজ বিখ্যাত সাহিত্যিক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে গিয়েছিলেন। সেইখানেই তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল মানবেন্দ্রনাথ রায়—এই নামেই তিনি পরবর্তী-জীবনে খ্যাত হন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনের অনেক কথায় এই গ্রন্থটি পরিপূর্ণ, তাঁর কথা বহুবার উল্লিখিত হয়েছে এই গ্রন্থে এবং তাঁর স্মৃতিকথা থেকেও প্রচুর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রথমা স্ত্রী এভেলিন ট্রেন্টের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় থেকে বিচ্ছেদের কাহিনী পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে লিখিত হয়েছে এই গ্রন্থে। এরপর মাইকেল বোরোদিনের সঙ্গে রায়ের কি সূত্রে পরিচয় হয় এবং কিভাবে মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয় ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে বইতে। এই সময়ে বিপ্লবী অবনী মুখার্জির সঙ্গে রায়ের পরিচয় হয়। অবনী মুখার্জি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে ৩১৬ থেকে ৩২৪ পৃষ্ঠায়। অবনী মুখার্জি প্রসঙ্গে এত বেশী তথ্য ইতিপূর্বে সম্ভবত প্রকাশিত হয়নি।

এই গ্রন্থে আরেকজন প্রবীণ বিপ্লবীর বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে তাঁর নাম নলিনী গুপ্ত (ইনি পণ্ডিচেরীর নলিনীকান্ত গুপ্ত নন)। কমিউনিস্ট পার্টির গোড়ার যুগে নলিনী গুপ্তের নানা ভূমিকা ছিল। তবে এই গ্রন্থে তাঁর যে আকৃতি পাওয়া যায় তা একটি চতুর ধাপ্পাবাজের। মনে হয় আমরা এই নলিনী গুপ্তকে কয়েক বছর আগে কলকাতার কফি হাউসে দেখেছি এবং আলাপ আলোচনার মধ্যে তাঁর ভেতর চমকপ্রদ কিছু লক্ষ্য করিনি। নলিনী গুপ্তের বিবরণ যা এই গ্রন্থে পাওয়া গেল তা অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক। সেকালে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক এডভেঞ্চারার গজিয়ে উঠেছিলেন, নলিনী গুপ্ত সেই জাতীয় মানুষ। নলিনী গুপ্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়কেও অনেক মিথ্যার শিকারে পরিণত করেছেন। নলিনী গুপ্তকে নাকি দেশবন্ধু তনয় চিররঞ্জন বলেছিলেন :

"তিনি সুভাষচন্দ্র বসু সহ আমাদের প্রোগ্রাম মেনে কাজ করবেন। হয়ত বাংলার মতও করাবেন একথাও বলে থাকবেন।"

নলিনী গুপ্ত বার্লিনে ফিরে গিয়ে রায়কে আর একবার ভাঁওতা দিলেন। ফলে রায় চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসুর নামে বড় বড় চিঠি পাঠান। সুভাষ বসুর নামীয় পত্র এসেছিল লেখকের কাছে। তিনি সেই পত্র ভূপেন্দ্রকুমার দত্তকে দেখান। একদা তিনি সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন তাই চিঠিখানি তিনি স্বহস্তে তাঁকে দেবেন বলে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে চিঠি ফেরৎ দিয়ে বললেন, সে পত্র নিল না। লেখকের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরিচয় ছিল না। তিনি লিখেছেন—

"তবুও আমি একদিন সুভাষের নিকটে গেলাম। তিনি বললেন—যাঁরা তাঁকে পত্র দিতে চান তাঁরা যেন সোজাসুজি লেখেন। সিভিল সার্ভিস পাস করে চাকরী গ্রহণ না করার অহংকার তাঁর তখন মাটিতে পা পড়ছিল না, তাছাড়া হয়তো একথাও ভেবেছিলেন যে এরকম সময়ে চিঠিপত্র গ্রহণ করে কেন তিনি মিছামিছি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে যাবেন।"

সুভাষচন্দ্রের অহংকার বিষয়ে অন্য কোনো সমকালীন নজীর আর দেখা যায়নি।

এই গ্রন্থে শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের কয়েকটি পত্র মুদ্রিত হয়েছে। এইসব দরখাস্ত ডাঙ্গে গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিলকে লিখেছিলেন মার্জনা ভিক্ষা করে। লেখক বলেছেন—

"ডাঙ্গে যে ভাষায় দরখাস্ত করেছিল সেই অনুযায়ী তাকে যদি তখনই মুক্তি দেওয়া হত তাহলে তার রাজনৈতিক জীবন বরাবরের জন্য শেষ হয়ে যেত। সে যে সংগোপনে ভারত গভর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের গোয়েন্দার কাজ করার কড়ারে মুক্তি পেতে চেয়েছিল সে কাজ সে কখনও করতে পারত না। রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত থেকেই শুধু গোপনে ভারত গভর্নমেন্টকে খবর সরবরাহ করতে পারত। একথা ভারত গভর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্ট বুঝেছিল, ডাঙ্গে বোঝেনি। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে এই ভেবে ভারত গভর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্ট তখন ডাঙ্গেকে মুক্তি দেয়নি।'

ডাঙ্গে সম্পর্কে এমনই আরো অনেক সংবাদ এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

সুদীর্ঘ সাড়ে ছ' শ' পৃষ্ঠার গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। শুধু যেসব চমকপ্রদ তথ্য আছে তার কথা উল্লেখ করা গেল। মানবেন্দ্র রায়কে নিয়ে এই গ্রন্থের শুরু এবং তাঁর প্রসঙ্গ দিয়েই

গ্রন্থ শেষ হয়েছে। ১৯২৯-এর জুলাই মাসে রায়কে বহিষ্কার করা হলেও সেই সংবাদ ১৯২৯-এর ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত চাপা থাকে। সেই বছর ৪ঠা ডিসেম্বর কমিনটার্ন থেকে এই সংবাদ ঘোষণা করা হয়। রজনীপাম দত্ত এবং তাঁর ভাই ক্লেমেন্সের পত্রাংশ উদ্ধৃত করে রায় চীনের ব্যাপারে যে ভুল করেছিলেন তার জন্য তাঁর সুতীব্র সমালোচনা হয়। ২৭শে এপ্রিল ১৯৬০-এ একটি চিঠিতে লেখককে ক্লেমেন্স লিখেছেন—

"Then came his discrediting in connection with India. Apart from the decolonisation theory, he was attacked, firstly, because he had given what were regarded as exaggerated reports about the strength of the Communist Party in India and his influence there and, secondly, because he was attempting to build a Workers and Peasants Party as a kind of alternative to the Communist party."

লেখক বলেছেন—"এম এন রায়ের সাহিত্য প্রচারের ভিতর দিয়ে আমাদের দেশে আন্দোলনের অনেক উপকার হয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর খ্যাতিও বেড়েছে। কিন্তু এম এন রায়ের অবিবেচনা ও অর্থ-লোভের জন্যেই দেশে বড় পার্টি গড়ে উঠতে পারল না।"

লেখকের মনে প্রশ্ন জেগেছে—"আমার ভাবতে অবাক লাগে যে এত করে নিজেকে যিনি বিপ্লবের কাজের জন্য প্রস্তুত করলেন সেই তিনি কি করে সেই বিপ্লবের টাকা আত্মসাৎ করলেন?"

এই প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগবে এবং হয়ত একদিন প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হবে। তখন জানা যাবে এম এন রায় নিজের ব্যক্তি-গত প্রয়োজনে বিপ্লবের টাকা আত্মসাৎ করে-ছিলেন কি করেন নি? যারা এম এন রায় প্রসঙ্গে গবেষণায় লিপ্ত, তাঁরা হয়ত এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন।

শ্রীযুক্ত মুজফ্ফর আহ্‌মদ যে অক্লান্ত সাধনায় এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন তার জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য। গ্রন্থটির মুদ্রণ-পারিপাট্য তুলনাহীন।

—অভয়ঙ্কর

আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি

মুজফ্ফর আহমদ প্রণীত। প্রকাশক : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা—১২। দাম : ষোল টাকা মাত্র।

সাহিত্যের খবর

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় যে বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু অনুবাদ হচ্ছে, তার সংবাদ মাঝে মাঝেই 'অমৃতে' প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি এরকম আর একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। জানা গেছে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করছেন ইউনেস্কো। ফরাসী ভাষাতেও 'রাইফেল' উপন্যাসটির অনুবাদের কাজ চলছে। লোকনাথ ভট্টাচার্যের সহধর্মিণী শ্রীমতী ফ্রান্স ভট্টাচার্য এই অনুবাদ করছেন। এর আগে শ্রীমতী ভট্টাচার্য ফরাসী ভাষায় 'পথের পাঁচালী'র অনুবাদ করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায়ের নাকি আরো তিনটি উপন্যাস ফরাসী ভাষায় অনুবাদের কথা ইউনেস্কো চিন্তা করবেন। আশা করব, ইউনেস্কো আরো উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা ইত্যাদি অনুবাদে সচেষ্ট হবেন এবং প্রতিষ্ঠিত লেখকদের আরো উল্লেখ্য গ্রন্থ অনুবাদে অগ্রণী হবেন। যতদূর জানা আছে, কোন কোন গ্রন্থ অনূদিত হবে তার প্রাথমিক নির্বাচন অনুবাদকরাই করেন। তাই অনুবাদকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন যথার্থ গ্রন্থ নির্বাচন করে অনুবাদ করেন। বাংলা দেশ চিরকাল তাঁদেরকে তাহলে অভিনন্দন জানাবে।

গত ২৬-২৮ ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত মৈথিলি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল, এতে মৈথিলি সাহিত্য ও ভাষার সাম্প্রতিক সমস্যা সম্বন্ধে একাধিক সাহিত্যিক এবং সমাজতত্ত্ববিদের মতামত সংকলন করে একটি 'স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশ। পাঠকদের অবগতির জন্য প্রশ্ন-গুলি তুলে ধরা যাচ্ছে। (ক) মৈথিলি ভাষী সরকারী কর্মচারীদের অনেকে মৈথিলি ভাষার উন্নতি এবং সরকারী স্বীকৃতির বিরোধিতা করছেন— এসম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? (খ) বিহার সরকারের উদ্যোগে হিন্দিতে অনেক পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু মৈথিলিভাষী ছাত্ররা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। আপনি কি মনে করেন না, সরকারী উদ্যোগে মৈথিলি ভাষায় পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশ করা উচিত? (গ) মৈথিলি সাহিত্যের গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশের জন্য মৈথিলি আকাদেমী গঠন করা কতদূর যুক্তিযুক্ত? এছাড়াও আরো কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সাহি-ত্যিকরা। প্রায় সকলেই মৈথিলির সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

সম্প্রতি ভারতীয় সাহিত্যের আরো কয়েকটি ইংরাজী অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় প্রখ্যাত হিন্দি কবি ও ঔপন্যাসিক 'অজ্ঞেয়'র 'টু ইচ হিজ স্ট্রেনজার'। অনুবাদ করেছেন লেখক স্বয়ং। এতে অস্তিত্ববাদ সম্বন্ধে কয়েকটি মৌল প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটি হল একটি পাঞ্জাবি উপন্যাস। এর লেখক হলেন রাজিন্দর সিং বেদি। অনুবাদ করেছেন খুশবন্ত সিং। তৃতীয় গ্রন্থটি হল ভারতীয় লোককথার ইংরেজী অনুবাদ সংকলন। প্রখ্যাত মালয়ালম লেখক মুর্খোটি কুনহাপ্পা। গ্রন্থটির নাম "থ্রি ব্যাগস এন্ড আদার ইন্ডিয়ান ফোক-টেলস"। দেবেন ভট্টাচার্য অনুবাদ করেছেন বিদ্যাপতির কবিতা। এতে বিদ্যাপতির একশটি কবিতার অনুবাদ সংকলিত হয়েছে। চতুর্থ গ্রন্থটির নাম 'কবিতাবলী' তুলসী-দাসের কবিতার অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন র‍্যামন্ড অলচিন। ভবানী ভট্টাচার্য প্রকাশ করেছেন 'সমকালীন ভারতীয় গল্পে'র অনুবাদ। প্রথম খণ্ড অনুবাদ করে এর আগেই তিনি প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে বাইশ জন লেখকের বাইশটি গল্প। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে ইদানিং বিদেশে কিছুটা আকর্ষণ বৃদ্ধি হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার তরুণ কবি নর্মাণ টেল-বেটের প্রথম কবিতাগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির নাম "পোয়েমস ফর এ ফিমেল ইউনিভার্স"। টেলবেটের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তিনি মননশীলতার সঙ্গে সঙ্গীতের সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'মাহ্‌ফিল' পত্রিকায় বর্তমান সংখ্যায় কয়েকজন ভারতীয় সাহিত্যিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি সাক্ষাৎকার সাহিত্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। যেমন খুশবন্ত সিংকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি কেন পাঞ্জাবিতে না লিখে ইংরেজিতে লিখতে আরম্ভ করেন। তিনি উত্তরে বলেছেন—"প্রথম কারণ, ইংরিজিই একমাত্র ভাষা, যে ভাষায় আমি লিখতে পারি। আমি পাঞ্জাবি, হিন্দি, উর্দু জানি—কিন্তু এই সব ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। যখন আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আমার মাতৃ-ভাষা কি, আমি দ্বিধাহীন ভাবে বলি, 'ইংরেজি'। আমি মনে করি, ইংরেজি সবচেয়ে উন্নত ভাষা, হিন্দি, উর্দু বা পাঞ্জাবির চেয়ে এর সাহিত্য উন্নততর। তাই এই সব ভাষা থেকে আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করি। ......তাছাড়া একটা অর্থনৈতিক কারণও আছে। আমি যা কিছু অল্প-স্বল্প লিখেছি, তাতে আমি যা অর্থ বা সম্মান পেয়েছি, তা অন্য ভারতীয় ভাষায় লিখলে পেতাম না"। শ্রীসিংয়ের মন্তব্য কতদূর সত্য তা জানি না। তবে হ্যাঁ, ভারতে না হলেও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনি।

নতুন বই

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি : (আলোচনা)—অবন্তীকুমার সান্যাল। সারস্বত লাইব্রেরী। ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা—৬। দাম পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। আরো হবে। দিন যত এগোবে, নতুন নতুন চিন্তার যত বিকাশ ঘটবে, ততই রবীন্দ্রনাথের ওপর নতুন আলোক পাত হবে। এটা আনন্দের।

কবি রবীন্দ্রনাথ বড় না গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ বড়, এ চিন্তা অনেকেরই মনে জাগে। উত্তর খুব সহজ নয়। কবি রবীন্দ্রকে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু গদ্যকবি রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য কোথায়? ভাষা ও রীতিতে তিনি কি এমন অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন, যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে হবে? অত্যন্ত সহজ এবং সুন্দরভাবে এই প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছেন অবন্তীকুমার সান্যাল 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি' বই-এ।

আমরা জানি, বাঙলা গদ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্য বিরাট। গল্প, উপন্যাস, সমাজনীতি, রাজনীতি, সাহিত্যসমালোচনা, বিজ্ঞান, শব্দতত্ত্ব, আত্মজীবনী, কোন বিষয়েই বা না লিখেছেন তিনি। বিচিত্র বিষয়ের জন্যে তাঁকে উপযোগী ভাষা ও রীতির অনুশীলন করতে হয়েছে। নতুন রীতি অনুসরণ করেছেন। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ত্যাগ করেছেন আবার। পুনরায় নতুন রীতির জন্যে অন্বেষণ করেছেন। কখনো ফিরে গেছেন পুরোন রীতিতে। তাঁর গদ্যরীতি "নানা অগ্র-পশ্চাৎ গতির অসম ছন্দে আন্দোলিত"। রবীন্দ্রনাথ পদ্য ও গদ্য চর্চা করেছেন সমান্তরালভাবে। পদ্যের তুলনায় গদ্য চর্চা ছিল গৌণ। "কাব্যবস্তু গদ্যের চেয়ে পদ্যের মাধ্যমেই মানুষকে বেশি আকর্ষণ ও অভিভূত করে থাকে, তাই পদ্যকার রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনে গদ্যকার রবীন্দ্রনাথকে আড়াল করে রাখে। কিন্তু গদ্যকার রবীন্দ্রনাথকে বিচার করতে হবে একটি সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ হিসাবেই; তাঁর কাব্য, তাঁর সংগীত, তাঁর চিত্র সমস্ত সৃষ্টিকেই দেখতে হবে সমান্তরালভাবে। এটি বড়ই বিস্ময়কর যে, রবীন্দ্রনাথের কোনো সৃষ্টিই একে অপরের পরিপূরক নয়। প্রকাশের যত মাধ্যম আছে, সৃষ্টির কাজে রবীন্দ্রনাথ তাদের প্রায় সব কটিকেই চূড়ান্ত ব্যবহার করেছেন, এবং তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সমগোত্রীয় শিল্পী পৃথিবীতে আজো জন্মান নি"। (শ্রীসান্যাল)

তবুও রবীন্দ্রনাথের গদ্যের রীতি ও ভাবের একটি সূত্র পদ্যের বিচরণভূমিতে পাওয়া যায়। ভাষা ও রীতির দিক থেকে তাঁর গদ্য মনে হয় পদ্যের চেয়েও সার্থক।

শ্রীসান্যাল ভাষা ও রীতির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গদ্যরচনাকে চারভাগে ভাগ করেছেন। ১৮৭৯ খৃঃ ভারতীতে য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র ছাপার পূর্বে পর্যন্ত প্রথম পর্ব; তারপর থেকে ১৮৯৮ খৃঃ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব; তখন থেকে আরম্ভ করে ১৯১২ খৃঃ জীবনস্মৃতি প্রকাশ পর্যন্ত তৃতীয় পর্বকাল। ১৯১৬ খৃঃ ঘরে বাইরে উপন্যাস প্রকাশ থেকে চতুর্থ পর্বের শুরু।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির বিবর্তনের রূপরেখাটি স্বচ্ছ এবং সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে শ্রীসান্যালের আলোচনায়। তাঁর গদ্যরীতির অন্তরঙ্গ রূপটির পরিচয় দিয়েছেন লেখক। ভাষারীতির বহিরঙ্গের অর্থাৎ বাক্যগঠন, শব্দপ্রয়োগ, অলংকরণ এসবের ওপর নজর দেননি। কারণ এ ধরণের সতর্করীতির সমালোচনা বাংলা দেশের গবেষকরা সব সময়ই করেছেন। "ভাষার রীতির রূপ পরিবর্তন যে কখনই লেখকের খেয়াল খুশির পরিণাম নয়, ভাববস্তুর প্রকাশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত এইটি মনে রেখে তাঁর গদ্যরীতির রূপ পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা এবং চরম পরিণতির গতিরেখাটি" স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন লেখক। তাঁর সে চেষ্টা খুবই সার্থক হয়েছে।

সূর্য পতনের দৃশ্যে (কাব্যগ্রন্থ)—শিবেন চট্টোপাধ্যায়।। বিচিত্রা প্রকাশনী, ৭, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯।। দামঃ দু টাকা।।

প্রকৃত সৎ কবি কখনো দায়িত্বহীন হতে পারেন না। কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীক শব্দের ওজন, ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তিনি নিজেও সংশ্লিষ্ট হতে বাধ্য। শিবেন চট্টোপাধ্যায় সেরকম কবি, যাঁর আলো-অন্ধকারময় অন্তর্লোকের জাগরণ কবিতার প্রত্যক্ষ শরীরে শুধু রূপগত পরিবর্তন ঘটায়নি, গুণগত সম্ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছে।

এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'আগুনের শব্দে' বহির্জগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের সাযুজ্য লক্ষণীয়। বর্তমান কাল, পরিবেশ ও সংসার যেন আর্তনাদময়।

হঠাৎ ঝড়ের বেগে আগুনের সশব্দ
চীৎকারে উন্মত্ত অরণ্য—
স্থির জনপদ—
লালিত সংসার কাঁপা নিদারুণ গ্রাস
সমতল - উপত্যকা - গিরিখাদ-গিরিবর্ত
সমূলে নাড়িয়ে আগুন। আগুন। শব্দ
পর্বতের সহস্র চূড়ায়।

কোনো কোনো কবিতায় অবশ্য তাঁর কবিতায় অস্থিরতাহীন মৌনজীবনের দিকে প্রত্যাবর্তনের অভিপ্রায় প্রত্যক্ষ। কিন্তু অধিকাংশ কবিতাতেই তিনি সংগ্রামী, উদ্দীপ্ত, আশাবাদী ও নির্মম আত্ম-পর্যবেক্ষক। নৈসর্গিক ভীষণতা ও অস্থিরতার মধ্যে তাঁর কবি-মন প্রতীকস্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের অভিলাষী। শিবেনবাবুর কবিতায় দেখা যায়, একদিকে প্রত্যক্ষ বাস্তবজগতের আয়তন-সংক্ষিপ্ত পটভূমি, অন্যদিকে বিপুল বিশাল মহাশূন্যের আর্ত-অস্থিরতা। কিন্তু তিনি এসবের উর্ধ্বে ওঠার শপথে দীপ্ত। পথের নিশানা জানেন—

সামনে দুরন্ত নদী খরধার
জ্বলন্ত রৌদ্রের তেজে
জেগে উঠছে সূর্যমুখী পথ।

এখানেই শিবেন চট্টোপাধ্যায়ের সার্থকতা। এভাবেই তিনি সাম্প্রতিক কবি ও কবিতা-পাঠকের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ও সংশ্লিষ্ট। তিনি যে শক্তিমান কবি তাতে কোনো সংশয় নেই। এ-বইয়ের অনেকগুলি কবিতাই রীতিমতো মনে রাখবার মতো।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

রবীন্দ্র-ভারতী পত্রিকা (কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৬)—সম্পাদকঃ রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। ৬।৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা—৭। দাম ঃ এক টাকা।

এই সংখ্যায় লিখেছেন হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন দত্ত, সাধনকুমার ভট্টাচার্য, শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা চৌধুরী, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনারায়ণ দাস, ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, অজিতকুমার ঘোষ ও রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। কাগজটির রচনামান উন্নত করার ব্যাপারে সম্পাদক অধিকতর যত্নশীল হলে পাঠক-পাঠিকারা উপকৃত হবেন।

দি ইস্ট-ইকো (অকটোবর ১৯৬৯)—সম্পাদক ঃ ক্ষিতীশচন্দ্র পাল। দি কিওর, ফতেগড়, উত্তরপ্রদেশ। দাম ঃ দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক পত্রিকা। প্রচ্ছদে উদীয়মান সূর্যের ছবি—জ্ঞান ও বিকীরণের প্রতীক। প্রাচ্য বিষয়ে আগ্রহী। লিখেছেনঃ যতীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এ কে সিনহা, গায়ত্রী পাল, এ কে ঘোষ, এম এল চক্রবর্তী, কে সি পাল ও সি পি আগরওয়াল। সম্প্রতিকালে ধর্ম-দর্শনের গতিপ্রকৃতি আলোচনা করা হয়েছে। কারো কারো কাছে পত্রিকাটি মূল্যবান বলে মনে হতে পারে।

অন্ধকারের মুখ

দেবল দেববর্মা

— বারো —

অম্বরের মুখ দিয়ে চট করে কোনো কথা বেরোল না। সংবাদটা শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, প্রায় অভাবনীয়। রাজীব তাকিয়ে দেখল। ডাক্তারের মুখখানাই যেন পাল্টে গেছে। বিস্ময়ে চোখ দুটো বড়-বড়। ভয়ে, ভাবনায় মুখটা ছোট্ট এতটুকু, ঠোঁট দুটো অল্প-অল্প নড়ছে। ছাইবর্ণ হতে চোখের পাতা কাঁপছে। মুখের রঙ প্রায় ফ্যাকাশে, ছাই-বর্ণ হতে বাকি নেই। দেখলেই বোঝা যায় ডাক্তার ভয় পেয়েছে।

অনেকক্ষণ পরে অম্বর কথা বলল,—'মরফিন! আপনি কি বলছেন ইন্সপেক্টর?' তার কণ্ঠস্বর কাঁপা-কাঁপা শোনাল।

রাজীবের দৃষ্টি সার্চলাইটের আলোর মত অম্বরের মুখের উপর ঘোরাফেরা করছিল। এবার অন্য দিকে তাকিয়ে সে বলল,—'ফরেনসিক ল্যাবরেটরী থেকে সেই রিপোর্টই দিয়েছে। অবশ্য ডেড-বডি পরীক্ষা করে আমার মনে একটু সন্দেহ হয়েছিল ডাক্তার রায়। কথাটা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম।'

—'কি কথা বলুন তো মিঃ সান্যাল?' অম্বর তাড়াতাড়ি বলল, তাকে খুব চিন্তিত এবং চঞ্চল দেখাল।

ওর ছটফটানি দেখে রাজীব মনে-মনে হাসল। লোকটা ঘেমেছে। সে বলল,—'ব্যস্ত হবেন না ডাক্তার রায়। সমস্ত কথা আপনার সঙ্গে আলোচনা করব বলেই আমি এসেছি। ডেড-বডি দেখে আমার মনে একটা খটকা লেগেছিল। মিসেস রায়ের বাঁ পায়ের গোড়ালির একটু উপরে আমি একটা দাগ লক্ষ্য করি।'

মানে আপনাকে কোনো কষ্ট করতে হবে না। পুলিশ আপনার কাছ থেকে বিশেষ কিছু জানতে চায় ডাক্তার রায়। আপনি যদি মন খুলে কথা বলেন, তাহলে আমি এখনই শুরু করতে পারি।'

ডুবন্ত মানুষ যেমন সামনে একটা কিছু ধরবার পেলেই দু হাত বাড়িয়ে দেয়, অম্বর ঠিক তাই করল। উটপাখির মত গলাটা রাজীবের দিকে এগিয়ে দিয়ে সে বলল,—'কি বিশেষ কথা জানতে চান বলুন? আমি আপনার সব প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি।'

রাজীব মনে-মনে হাসল। তার কথার প্যাঁচে কাজ হয়েছে দেখে সে খুশী হল। চেয়ারে ভালো করে হেলান দিয়ে রাজীব বসল। সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে ফের ধূমপান শুরু করল।

—'কিছু মনে করবেন না ডাক্তার রায়। আমি হয়ত একটু অনধিকার চর্চা করছি।' রাজীব বেশ ভনিতা করেই শুরু করল, সিগারেটে একটা ছোট্ট টান দিয়ে সে পুনরায় বলল,—'অথচ অন্য উপায় নেই। খুব আবশ্যক না হলে একান্ত ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় এই প্রসঙ্গ আমি কখনও তুলতাম না।' অম্বরের চোখের দিকে তাকিয়ে রাজীব ধীরে-ধীরে বলল,—'আমার প্রশ্নটা নীপা দেবীর সম্বন্ধে। আপনাদের দাম্পত্যজীবন এবং অন্যান্য বিষয়েও আমার কিছু জানবার আছে।'

—'বেশ তো। কি জানতে চান বলুন?' অম্বর প্রায় পরীক্ষার্থীর মত কথা বলল।

—'আপনাদের বিবাহ কত দিন আগে হয়েছিল?'

—মানসাংকের উত্তর দেওয়ার মত দ্রুত হিসেব করে নিয়ে অম্বর বলল,—'সাত বৎসর আগে আমাদের বিয়ে হয়। তখন আমি সবে চাকরিতে ঢুকেছি।'

—'বিয়ের পর থেকে মিসেস রায় আপনার সঙ্গেই ঘুরছেন তো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। অবশ্য বিয়ের পর প্রথম দিকে ও একটু ঘন-ঘন বাপের বাড়ি যেত। একবার গেলে দশ-পনেরো দিন কিম্বা মাস-খানেকও বাপের বাড়িতে থেকে এসেছে। তারপর আমার শ্বশুর-শাশুড়ি মারা গেলেন। সেও আমার বিয়ের বছর দু-এর মধ্যেই। ব্যস, বাপের বাড়ি যাওয়া ওর এক রকম বন্ধ হল। মাঝে-মাঝে অবশ্য কলকাতায় যেত। কাকার বাড়িতে দু-এক রাত্তির কাটিয়ে আবার ফিরে এসেছে।'

—'আচ্ছা, এখানে তো আপনি বছর-খানেক হল এসেছেন?

—'ঠিক এক বৎসর নয়, তার একটু বেশীই হবে। আমি হাসপাতালে জয়েন করি লাস্ট এপ্রিলে।'

—'এর আগে কোথায় ছিলেন?'

—'সোনাডাঙ্গা থানা হেলথ সেন্টারে। প্রায় দু বছর ছিলাম। ওখান থেকেই পলাশ-পুরে ট্রান্সফার হই।'

—'আচ্ছা ডাক্তার রায়, বিয়ের পর থেকে এই সাত বছরে আপনাদের কোনো ইস্যু হয় নি?' রাজীব প্রশ্ন করল।

অম্বর ম্লান হাসল। দু-এক সেকেণ্ড পরে সে বলল,—'আমাদের বিবাহিত জীবনে ওটাই প্রথম ট্র্যাজেডি মিঃ সান্যাল। নীপা দেখতে সুন্দরী ছিল বলে মেয়েরা ওকে নাকি হিংসে করত। একটা কথা ওরা জানত না। বাইরে থেকে আমার স্ত্রীর সুঠাম শরীর এবং দেহের সম্পূর্ণতাই সকলের চোখে পড়ত। কিন্তু ওর ভিতরটা ছিল ঠিক বিপরীত। ছোট্ট মেয়ের মত অপরিণত, অসম্পূর্ণ। এবং এই কারণেই ওর পক্ষে মা হওয়া কোনদিন সম্ভব হত না ইন্সপেক্টর।'

রাজীব দুঃখ প্রকাশ করল। বলল,—'নীপা দেবী একথা জানতেন ডাক্তার রায়?'

—'হ্যাঁ, সে জানত। কলকাতায় স্পেশা-লিস্ট দেখিয়েছিলাম। তারই অভিমত আপনাকে বললাম। নীপার কাছেও গোপন করিনি।'

—'এই নিয়ে মিসেসের মনে কোনো খেদ ছিল না ডাক্তার রায়?'

—'নিশ্চয় ছিল।' অম্বর একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বলল—'কিন্তু মনে খেদ থাকলেও নীপা তা কখনও প্রকাশ করেনি। ও একটু অন্য ধরনের মেয়ে ছিল মিঃ সান্যাল। কারো কাছে অন্তরের দীনতা প্রকাশ করতে চাইত না। এমন কি আমার কাছেও সংকোচ বোধ করত।'

—'তাহলে সন্তান না হওয়ার জন্য আপনাদের দাম্পত্যজীবনে কোনোদিন অশান্তির ঝড় ওঠেনি?'

—'না।' অম্বর দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল। বলল,—'আমি নিজে ডাক্তার। এমন কেস জানি। দেহের ভিতরে যদি কোনো খুঁত থেকে যায়, তার জন্য মানুষ দায়ী নয়। অনভিপ্রেত হলেও তা স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়াই শিক্ষিত মনের পরিচয়।'

—'এ কথা ঠিক।' রাজীব মন্তব্য করল। একটু চিন্তা করে সে বলল,—'নীপা দেবীর থিয়েটার-নাটকের উপর খুব ঝোঁক ছিল, তাই না ডাক্তার রায়?'

—'হ্যাঁ, আমি শুনেছি বিয়ের আগে একটা অ্যামেচার থিয়েটার ক্লাবে ও মাঝে-মাঝে যেত। নিশ্চয় ক্লাবের মেম্বারও হয়েছিল।'

—'বিয়ের পরে তাদের সংগে কোন যোগাযোগ ছিল?'

—'আমি ঠিক জানি না।'

—'পলাশপুরে এসেই উনি থিয়েটার-নাটক নিয়ে মেতে উঠলেন, তাই না?'

—'দেখুন, সমস্ত ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলি। পলাশপুরে এসে নীপা কলেজে ভর্তি হতে চাইল। বিয়ের আগে ও প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় পাশ করেছিল, ডিগ্রী কোর্সে আর ভর্তি হয় নি। স্ত্রীকে কলেজে ভর্তি করতে আমার খুব আগ্রহ ছিল না। কিন্তু নীপা এমন জিদ ধরল যে, আমি রাজি না হয়ে পারি নি। অনিচ্ছুক হলেও অবচেতন মনে আমি এমনি কিছু চেয়েছিলাম। ছেলেপুলে না হওয়ার জন্য নীপার অন্তরে একটা শূন্যতা ছিল। ও যদি লেখাপড়া করে শূন্যতাকে কিছু অংশ পূর্ণ করতে চায় তাতে আমি বাধা দেব কেন? আমার সংগে জিদেই নীপা একদিন কলেজে ভর্তি হল। ইতিহাসে অনার্স নিল। পড়া-শুনোর সুবিধে হবে ভেবে একজন প্রফে-সরের কাছে সপ্তাহে দুদিন টুইশানি পড়বারও বন্দোবস্ত করে দিলাম।'

কথার মধ্যেই রাজীব বলল,—'কিন্তু অনার্সের ছাত্রী হয়েও থিয়েটার-নাটকের উপর ওর ঝোঁক বেড়ে গেল কেন?'

—'তার কারণও আপনাকে বলছি। অভিনয়ে নীপার বরাবরই আগ্রহ। আমি যখন গ্রামের দিকে ছিলাম, তখন ছোট ছেলে-মেয়েদের শিখিয়ে-পড়িয়ে ও বেশ সুন্দর ফাংশন করত। কলেজে ঢুকেই নীপার খ্যাতি হল। ওদের থিয়েটার হয়। ছেলে-মেয়েরা মিলে অভিনয় করে। বইটার নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি। কিন্তু নীপার অভিনয় দেখে সবাই খুব প্রশংসা করল। মাস কয়েক পরে কলেজে ফের থিয়েটার হল এবং সেবারেও নীপা একাই আসর মাত করল। অভিনয়ে কেউ ওর ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারে নি।'

রাজীব ঈষৎ হাসল। সিগারেটে একটা টান দিয়ে সে বলল,— 'ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। তারপরই বোধহয় উনি টাউন ক্লাবের থিয়েটারে পার্ট নিলেন?'

—'ঠিক বলেছেন। কলেজে ওর অভিনয় দেখে অনেকেই প্রশংসা করে। তাই টাউন ক্লাবের নাটকে চট করে ওর ডাক পড়ল।'

—সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে রাজীব অনেকক্ষণ চিন্তা করল, তার চোখের দিকে তাকিয়েই অম্বর বুঝতে পারল। মানুষটা গভীরভাবে কিছু ভাবছে। অনেক-ক্ষণ পরে রাজীব কথা বলল, 'আচ্ছা ডাক্তার রায়, মিসেসকে টাউন ক্লাবের নাটকে নামতে দিতে আপনি আপত্তি করেন নি?'

'আপত্তি? মানে,—' অম্বর ঢোক গিলল। ভ্রূ কুঁচকে রাজীব বলল,—'গোপনীয় এবং ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও আমার কাছে তা লুকোবেন না ডাক্তার রায়, তাতে আপনারই ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।'

—'না, না। লুকোব কেন?' অম্বর তাড়াতাড়ি বলল, কিন্তু তবু তার কণ্ঠস্বরে দ্বিধা এবং সংশয় প্রকাশ পেল।

রাজীব বলল, — 'আমি জানি ডাক্তার রায়, টাউন ক্লাবের নাটকে নীপা দেবীকে অভিনয় করবার অনুমতি আপনি দিতে চান নি। আপনার সম্পূর্ণ অমতেই মিসেস এ কাজ করেছিলেন।'

অম্বরকে খুব বিস্মিত মনে হল। মুখ তুলে সে বলল,—'একথা আপনি কেমন করে জানলেন?'

রাজীব একটুও চঞ্চল হল না। অম্বরের চোখের দিকে সে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। 'আমি আরো একটা ব্যাপার জানি ডাক্তার রায়।' একটু থেমে সে যোগ করল, —'নীপা দেবী ফিল্মে নামতে চেয়েছিলেন। এবং স্ত্রীকে সিনেমায় নামতে দিতে আপনি রাজি হন নি। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে মন কষাকষিও চলছিল।'

অম্বর প্রায় লাফিয়ে উঠল। 'সিনেমায় নামার কথা আপনাকে কে বলল মিঃ সান্যাল? এ নিশ্চয় সেই অবিনাশ সমাদ্দারের কাজ। বজ্জাতটা ছিনে-জোঁকের মত কদিন আমার পিছনে লেগেছিল। খালি বলত, প্রতিভাকে তার বিকাশের পথ করে দিন। নইলে শিল্পীর অপমৃত্যু হবে। শেষ পর্যন্ত ওর কথাই ফলল ইন্সপেক্টর। লোকটা পাজী,—এক নম্বরের শয়তান।'

বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করে রাজীব বলল—'অবিনাশ থাকে কোথায় জানেন?'

অম্বরকে খুব উত্তেজিত মনে হল। 'কোথায় আবার থাকবে? সিনেমা-থিয়েটার করে বেড়ায়। ওদের কি চালচুলোর ঠিক আছে? এখানে শুনেছি দেবরাজ মিত্তিরের বাড়িতে থাকত। দুজনে একেবারে হরিহর আত্মা।'

—'দেবরাজ মিত্রও কি আপনার বাড়িতে আসত?' রাজীব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল।

মুখ নামিয়ে অম্বর বলল,—'এসেছে দু-একবার।'

—'একটা কথা বলব ডাক্তার রায়।' রাজীব রহস্য করে তাকাল। 'সুন্দরী স্ত্রী হলে স্বামী বেচারার এক জ্বালা। মনে সোয়াস্তি নেই,—নানা রকম সন্দেহের আনাগোনা। আমার প্রশ্নটও তাই। নীপা দেবীর হাবে-ভাবে, ব্যবহারে আপনার মনে কখনও সন্দেহ দানা বেঁধেছিল?'

অম্বর নিরুত্তর।

রাজীব বলল,—'চুপ করে থাকবেন না ডাক্তার রায়। পরিকল্পনা করে, ফন্দি এঁটে হত্যা করলে খুনীকে ধরা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। এই কেসে খুনী যথেষ্ট চতুর। রীতিমত বুদ্ধিমান বলেই আমার বিশ্বাস। তার সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় এঁটে উঠতে হলে, আমাদেরও কৌশল চাই। ফন্দি তৈরি করতে হবে। কাজেই আপনি আর সঙ্কোচ করবেন না। পরিষ্কার করে সব কথা বলুন।'

রাজীবের কথায় মন্ত্রের মত কাজ হল, অম্বর মাথা নীচু করে ছিল। এবার সোজা হয়ে বসল, 'আমি সব কথা বলব ইন্সপেকটর। কিছুই গোপন করব না।' সে ঘাড় সোজা করে তাকাল। এদিকে-ওদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে অম্বর গলা নামিয়ে বলল, 'আমি স্বীকার করছি ইন্সপেকটর, নীপাকে আমি সন্দেহ করতাম, পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে ওর মাখামাখি, ঘনিষ্ঠতা আমার বুকে ক্ষতের যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছে। দিনে-দিনে আমার সন্দেহ বাড়ছিল। সত্যি বলছি, এমনিভাবে চললে, হয়ত একদিন ওকে আমি গলা টিপে মারতুম। কিন্তু বিশ্বাস করুন মিঃ সান্যাল, নীপাকে আমি খুন করি নি। ওকে মরফিন ইঞ্জেকশন দিয়ে আমি মারি নি।'

রাজীব আশ্চর্য হল। ডাক্তার পাগল হল নাকি? উত্তেজনার ঝোঁকে ওর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে। মনে যা আসছে তাই বলছে। নইলে বউকে খুন করবার ইচ্ছে হয়েছিল, এমন কথা কেউ পুলিশকে বলে?

—'কার সঙ্গে মিসেস রায়ের সবচেয়ে বেশী বন্ধুত্ব ছিল বলতে পারেন?' রাজীব প্রশ্ন করল।

—'নিশ্চয় পারি। সে ছোকরা এই কলেজেরই প্রফেসর। নাম নীলাদ্রি সেন। থিয়েটারের সেই নাকি ডিরেকটর। নীপাকে নায়িকার রোলে ওই নামিয়েছে।'

—'আই সী।' রাজীব সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে বলল, 'আর দেবরাজ মিত্র? তার সঙ্গেও তো নীপা দেবীর যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল?'

—'নিশ্চয় ছিল, দেবরাজই তো এই বইয়ের হিরো—'

—'তাই নাকি?' রাজীব একটু হাসল, 'তাহলে হিরো-হিরোইন আর ডিরেকটর। আপাতত তিনজনকে পাওয়া যাচ্ছে, আর একজন হল অবিনাশ সমাদ্দার। লোকটা নীপা দেবীকে ফিল্মে নামাতে চেয়েছিল।' রাজীব ঠিক অঙ্ক কষবার মত হিসেব করল।

বাঁ হাতের করতলের সাহায্যে কপালটা চেপে ধরে রাজীব ফের বলল,—'আচ্ছা, মিসেস রায় কার কাছে পড়তেন?'

—'হিস্ট্রির প্রফেসর অনিমেষ দত্তের কাছে। সেও একটি চীজ। অদ্ভুত ধরনের লোক মশায়। এখানে কোনদিন টুইশানি করে নি। অনেকে গিয়েছে, অনিমেষ দত্ত পড়াতে রাজি হয় নি। অথচ আমরা একটু চেপে ধরতেই লোকটা একবার নীপার মুখের দিকে তাকাল। আর তারপরই পড়াতে রাজি হল।'

একটু হেসে রাজীব উঠে দাঁড়াল। 'এখন চলি ডাক্তার রায়, বিকেলের দিকে আমি একবার আসতে পারি। আপনি কি তখন থাকবেন?'

—'নিশ্চয় থাকব।' অম্বর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কিন্তু আবার আসবেন কেন?' তার কণ্ঠস্বর স্যাঁতসেঁতে, ঠাণ্ডা মনে হল।

রাজীব কথা বলল না। ওর ভীত, নার্ভাস মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

ইতস্তত করে অম্বর কথাটা বলল,—'পুলিশ কি আমাকেই খুনী বলে সন্দেহ করছে?'

রাজীব ফের হাসল। লোকটা ভীষণ দুর্বলচিত্ত আর তেমনি ছটফটে। সে বলল, —'সন্দেহ করা খুব সহজ কাজ। পুলিশ তা ভাবলেও আপনার কি আসে যায়?' একটু থেমে আবার বলল রাজীব,—'সন্দেহ করা সহজ হলেও অভিযোগ প্রমাণ করা খুব কঠিন। পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার মতই দুরূহ কাজ। সুতরাং মিথ্যা চঞ্চল হবেন না।'

●

অফিসে ফিরে রাজীব দেখল চাঁদবদনকে নিয়ে সুব্রত অপেক্ষা করছে। কাল রাত্তিরেই ওকে নির্দেশ দেওয়া ছিল। সুব্রত ঠিক ডিউটি করেছে।

লোকটার মাথার চুল বিপর্যস্ত ধানক্ষেতের মত উস্কোখুস্কো। শুকনো আমসী মুখ। ভীত, সন্ত্রস্ত চাউনি। দেখলে মনে হয় মানুষটা পুলিশের হেফাজতে নেই। ওকে জহ্লাদের হাতে সমর্পণ করা হয়েছে।

কোন রকম ভূমিকা না করেই রাজীব বলল—'নীপা দেবীকে আপনি চিনতেন?'

'নীপা দেবী মানে নরেশবাবুর ভাতিজি হুজুর?'

—'হ্যাঁ, ওকে আপনি আগে চিনতেন?'

—'চিনতাম মানে কি—' লোকটা আমতা আমতা করল।

—'মানে-টানে রেখে আসল কথা বলুন।' রাজীব ধমক দিল।

—'বলছি হুজুর।' লোকটা সভয়ে থাকল, 'নরেশবাবুর ভাতিজিকে হামি একবার দেখেছিলাম।'

—'কোথায়?'

— —'ট্রেনের ডিব্বায়,—মানে কি গাড়ির কামরায়'

রাজীব ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।

চাঁদবদন বলল,—'জামশেদপুরসে কলকাত্তা ফিরছি হুজুর। শিমুলপুরে গাড়ি খালি,—সব কোই উতরে গেল। হামি একেলা রইলুম। আউর ওহি স্টেশনমে নরেশবাবুর ভাতিজি কামরামে উঠল। উস কি সাথ এক ছোকরা। হামি শোচলাম কি, দোনো হাজব্যান্ড ঔর ওয়াইফ হোবে। গাড়ি ছাড়ল। ও লোগ বাতচিত শুরু করল। লেড়কি কা কিতনা মিঠি-মিঠি বুলি। পাহারে কা বাত্ দরবাজী। হামি বাঙলা জানি সমঝতে পারি। লেকিন বাতচিত শুনে হামি তো তাজ্জব হুজুর। মালুম হোল কি ও লোগ হাজব্যান্ড-ওয়াইফ নেহি হায়। দোনো স্রেফ লাভার হায় হুজুর।'

উৎসাহ দিয়ে রাজীব বলল,— 'তারপর?'

'উস কি বাদ? সেই কথাই তো বলছি হুজুর। আধা ঘণ্টা বাদ হামি একবার বাথরুমে ঘুসলাম। দরওয়াজা বন্ধ করে চুপচাপ দাঁড়ালাম। হঠাৎ মনমে কি হল হুজুর। দরওয়াজা থোড়া খুলে হামি দেখলাম—'

—'কি দেখলেন? রাজীব প্রশ্ন করল।

—'বহুৎ শরম্ কি বাত হুজুর!' লোকটা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সলজ্জভাবে তাকাল।

—'বলে ফেলুন চটপট! দেরি করছেন কেন?'—রাজীব ধমক দিল।

এক গাল হেসে চাঁদবদন বলল,—'দেখলাম কি, ও ছোকরা নরেশবাবুর ভাতিজিকে কিস্ করছে হুজুর!' [illegible]

রামকৃষ্ণদেব ও কল্পতরু উৎসব

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাসে — বাংলাদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসই বোধ করি উজ্জ্বলতম অধ্যায়। একাল পর্যন্ত অর্থাৎ আজ এই ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তো বটেই, আগামীকালে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ যুগেও কখনও এই শতাব্দীর ইতিহাস অপেক্ষা উজ্জ্বলতর ঐতিহাসিক অধ্যায় সৃষ্টি করার মত ঘটনাবলী ঘটবে কিনা বা এই শতাব্দীর মহৎ এবং বৃহৎ—কোমল হতে কোমলতর দৃঢ় হতে দৃঢ়তর চরিত্রের মানুষ—যারা ঘটনাবলী ঘটায়, তারা আবির্ভূত হবে কিনা এ সম্পর্কে ঘোরতর সংশয় আছে। সতীদাহ প্রথা নিবারণ, ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন বা অভ্যুদয়—বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে ও জাতীয় জীবনে এক আশ্চর্য সংঘটনা। এ ঘটনার পুরোধা ছিলেন রামমোহন রায়।

হয়তো বা স্বাভাবিকভাবেই অথবা হয়তো সেই মহাবিস্ময় ও মহাবিচিত্রের অভিপ্রায়ে আর একটি ধারা বা গতিরও সৃষ্টি হয়েছিল; এই ধারা বা গতি ঠিক বিপরীতমুখী ছিল না—ছিল সমান্তরালভাবে একই মুখে প্রবহমানা।

সতীদাহ প্রথা রহিত আন্দোলন বা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়ায়, বাংলার রক্ষণশীল পণ্ডিত সমাজ স্বর্গীয় রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নেতৃত্বে সমবেত হয়ে যে আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন তাকে ক্রিয়ার সৃষ্টিতে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব বলে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু আকস্মিকভাবে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংঘাত সংঘর্ষের মধ্যস্থলে সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর পরম রহস্যময় পুরুষ রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের ঘটনাটির মূল্য এই বিশ্লেষণে নির্ণয় করা যায় না।

রামমোহনের সাধনার ফল মহাকবি রবীন্দ্রনাথ। এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনার সৃষ্টি বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। এই দুটি তথ্যকে সম্মুখে রেখে বিচার বিশ্লেষণ করলে এ কথা বলতেই হবে যে রামমোহনের পর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত একে একে দুই—দুই একে তিন—দুই দুইয়ে চার এই অঙ্কের ধারায় কোনখানে কোন ব্যতিক্রম হয় নি। যেখানে হয়তো যোগের নিয়মে নাগাল পাওয়া যায় না সেখানে গুণের নিয়মে খাটে। রামমোহনের কাল থেকে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছানো যায় অঙ্কের নিয়মে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব থেকে বিবেকানন্দ—সিমলের দত্তবাড়ীর ছেলে নরেন্দ্রনাথে ও নরেন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দে পৌঁছুনো অঙ্কের নিয়মে হয় না বা যায় না। এ এক পরম রহস্য; আশ্চর্য না বলে ইচ্ছা করেই পরম শব্দ ব্যবহার করলাম। দরিদ্র ব্রাহ্মণঘরের সন্তান, শৈশব থেকেই ঠিক সুস্থবুদ্ধি বা সহজবুদ্ধি নন—তা বলে কেউ যদি বলে জড়বুদ্ধি তাহলে আপত্তি অবশ্যই করব এবং বলব জড়বুদ্ধি কখনওই নয় বরং তার বিপরীত বিচিত্রবুদ্ধি বা দিব্যবুদ্ধি। শৈশবে বাল্যে পঠনপাঠনও যৎসামান্য—কিন্তু পরমাশ্চর্য এই যে এই মানুষটি সারাজীবন ধরে যা বললেন, বলে গেলেন তার সবই মানবকল্যাণের কথা এবং পরমতত্ত্বের বার্তা। অথচ অতিসহজ অতিসরল একান্ত সহজ ছন্দে জটিল মানবজীবনের গ্রন্থি মোচিত হয়েছে এই কথার মধ্যে। আরও আছে—কোথাও শাসন নেই কথার মধ্যে, কোথাও তিরস্কার নেই, কোথাও অপরিচ্ছন্নতা বা রূঢ়তা নেই; আছে আশ্চর্য মাধুর্য আশ্চর্য সরলতা এবং পবিত্রতা। দাম্ভিকতা নেই, জ্ঞানৈশ্বর্যের ছটা ছড়ানো নেই, আছে শিশুর মত সরলতা, মিষ্টতা এবং প্রাণ জুড়িয়ে দেওয়া এমন একটা কিছু যার জন্য নিরন্তর মানুষ অতৃপ্ত এবং উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারও চেয়ে বড় আশ্চর্য এই যে, যে শোকে সান্ত্বনা জ্ঞানে নেই বিদ্যায় নেই বুদ্ধিতে নেই ব্যক্তিত্বে নেই তেমনি দুঃখ শোক নিয়ে মানুষে তাঁর কাছে এসে চোখের জল মুছেছে। সান্ত্বনা পেয়েছে।

এই মানুষটির আজীবনের কথাবার্তাগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। যদি কেউ দেখতে চান দেখতে পাবেন কোথাও অসংগতি নেই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই একই মানুষের কণ্ঠস্বর, জিহ্বায় উচ্চারিত বাণী, বাণীর ভঙ্গি ও অর্থের মধ্যে সেই এক পরম রহস্যময় পুরুষকে পাওয়া যাবে যিনি জীবনে বিদ্যাভ্যাস করেন নি অথচ সকল বিদ্যাই যেন তাঁর আয়ত্ত। যাঁর কাছে সংসারের কোন সমস্যাই নেই সকল সমস্যার সমাধানকে নিয়েই তিনি যেন জন্মেছেন। এমনকি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের দ্বন্দ্ব যা পৃথিবীতে আজও মেটেনি, এবং যা নিয়ে সংঘর্ষের রক্তাক্ত এবং সর্বনাশা ঘটনাবলীই ভারতের ইতিহাস রচনা করেছে তার সমাধানও তিনি এক কথায় করে গেছেন। বলে গেলেন, **যত মত তত পথ**। সব পথই সেই পরম তত্ত্বে বা পরম সত্যে বা পরম আস্তিক্যে পৌঁছে দেয়। তাঁর কথাতে বলি, একটা পুকুর, তার চার পাড়ে ঘাট, যে ঘাটেই কুম্ভে জল ভর পূর্ণকুম্ভ হবে আর যে কুম্ভেরই জল খাও সেই এক স্বাদ পাবে এক জল খাবে।

আমাদের দেশের এই মানুষটির কথাগুলি পড়ে তাঁর জীবনকথা শুনে ফরাসী মনীষী রোমাঁ রলাঁ বিস্মিত হলেন। শুধু বিস্মিত হওয়াই নয় তাঁর মহিমাকে স্বীকার করে তাকে প্রচার করলেন।

আমাদের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি বিশ্ববন্দিত পণ্ডিত ও দার্শনিক ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বলেছেন—

"Sree Ramkrishna is the symbol of the message of India for mankind,—the message of unity and reconciliation. From the beginning of our history many races and many releeions met on this sacred Soil in our Supreme attempt to reconcile them all to make out that the world consists of our people—though different peoples are merely the branches of that one Universal human race. That was the theory to which was given visible embodiment in the life and work of Sri Ramkrishna."

নবভারতের চাণক্যের মত ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং মনীষী রাজাজী (সি রাজাগোপালচারী) বলেছেন—

"There is no commentory of the Bhagbat Gita or Upanishads which can sarpuss the sayings of Ramkrishna Dev. He was the Upanishadas in flesh and blood, he was the Bhaghat Gita in flesh and blood."

এই কারণেই এই ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব পরম বিস্ময়কর; এঁর আবির্ভাব অভ্যুদয় বিকাশ এবং সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তার মানুষের বুদ্ধি এমনকি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির হিসাবের নাগালের বাইরে।

স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মসভায় যে চিরস্মরণীয় বক্তৃতা করেছিলেন এবং সমগ্র নবীনকালের পৃথিবীতে ধর্ম ও সভ্যতার ক্ষেত্রে সম্মুখ সারিতে ভারত মহিমাকে বসিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তিনি বলে গেছেন—সমস্ত দীপ্তি সমস্ত উক্তি ও বক্তব্যের উৎস ছিলেন আমার গুরু আমার প্রভু my master.

আরও আশ্চর্যের কথা এই যে এই একটি ব্যক্তির আবির্ভাবকে অবলম্বন করে সমগ্র দেশজোড়া বিপুল আলোড়ন এবং বিপর্যয় শান্ত একটি স্রোতোধারার

প্রবাহিত হয়ে সম্মুখের পথে অগ্রসর হল; নবজীবন—নতুন কাল আরম্ভ হল সে কালে।

দরিদ্র নারায়ণ পর্যায়ে উন্নীত হল।

মানুষের মধ্যে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দিয়ে পূজা চাইলেন।

মানুষের ব্যক্তিগত এবং জাতির সম্প্রদায়গত শাস্ত্রগত ধর্মারাধনার পদ্ধতির পরিবর্তন হল। ফুল বিল্বপত্র তুলসীপত্র গঙ্গাজল চন্দন সহযোগে বিগ্রহ পূজার চেয়ে আর্তের সেবা দরিদ্রের অর্চনা পবিত্রতর বা উচ্চতর পদ্ধতি বলে অনুভূত ও উপলব্ধ হল। সুতরাং মানুষ অকুণ্ঠিতচিত্তে এই আবির্ভাবকে পরম আবির্ভাব বলে স্বীকার করে এই ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিব্য এবং অলৌকিক সত্তার আভাস অনুভব করে নৈরাশ্যের মধ্যে আশ্বাস পায়। বিশ্বাস যেন ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে উঁকি মেরে বলে, বস্তুময় জগতের সকল প্রমাণাতীত প্রমাণ এইভাবেই যুগে যুগে ভারতের মৃত্তিকায় পরম আবির্ভাবকে সত্য করে গেছে। অথচ এই আবির্ভাব কত সহজ ও কত সাধারণ। আবার বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর মত এর অতলান্ত গভীরতা। তাঁর সারজীবনই এমন অসংখ্য উক্তিতে সমৃদ্ধ যার সবই তাঁর প্রসন্ন আশীর্বাদে ধন্য ও জীবনের সকল গ্লানি ও মালিন্য থেকে মুক্ত ও উজ্জ্বল। প্রতি ১লা জানুয়ারী আসে আর এমনই একটি মহান আশীর্বাদ যেন আকাশ বাতাস থেকে সারা জাতির মাথার উপর বর্ষিত হয় মুখর হয়ে ওঠে।

১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী রোগ-কাতর দেহে সামান্য বেশভূষায় এই অসামান্য মানুষটি তাঁর ভক্তদের অতি সাধারণ সহজ কথায় আশীর্বাদ করেছিলেন—আমি তোদের সকলকে আশীর্বাদ করি তোদের চৈতন্যোদয় হোক—তোরা দিব্যজ্ঞান লাভ কর।

এই সামান্য কটি কথা যত সহজ ও সাধারণ তত প্রশান্ত ও গম্ভীর। এই সামান্য কটি কথার অভিঘাতে তাঁর ভক্তেরা সেদিন কেউ কেঁদেছিল কেউ উল্লসিত উল্লাসে হেসেছিল, কেউ বা ধ্যানস্থ হতে চেয়েছিল বা হয়েছিল। এই অসামান্য রহস্যময় পুরুষটির দ্বারা উচ্চারিত শব্দ-কটির মহিমা ও তীব্রতা কতখানি তা ভক্তদের এই অভিনব আচরণ থেকেই সকল কালেই মানুষ অনুমান করতে পারবে। এবং চৈতন্য ও দিব্যজ্ঞানের ফল যদি জীবনে চরিত্রের মহাপ্রকাশ হয়, তা হলে ১৮৮৬ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বাঙালীর জাতীয় জীবনে চরিত্রে বিদ্যুদ্দীপ্তির আগ্নেয় প্রকাশে তা সত্য বলে সপ্রমাণিত হয়েছে। স্বামীজীর আবির্ভাবে যে চৈতন্য-মহিমার উদয় হয়েছে—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তার অস্ত ঘটেছে। এই দুটি চরিত্রের কত সাদৃশ্য। এর দ্বারা এ কথা আমি অবশ্যই বলছি না যে, বাঙালী চরিত্রের এই আগ্নেয় প্রকাশ একমাত্র তাঁর আশীর্বাদেই সম্ভবপর হয়েছিল। আমি বলছি বাঙালী চরিত্রে এইকালে যে মহিমার প্রকাশ হয়েছে তার পশ্চাতে রামকৃষ্ণ দর্শনের যে সাধনা স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর অনুবর্তীগণ করেছেন তাকে অবনতমস্তকে ইতিহাসকে স্বীকার করতে হবে।

প্রমাণ থাক—তার প্রয়োগ থাক। এখন তিনি যে আশীর্বাদ করেছিলেন তার কথাই বলি। তিনি বলেছিলেন তোদের দিব্যজ্ঞান হোক—চৈতন্যোদয় হোক। যে লাভের জন্য যে লোভের জন্য আমরা প্রাত্যহিক জীবনে জীবনযাত্রার অমোঘ তাড়নায় অহরহ পীড়িত ও তাড়িত অথচ যা লাভ করলেও শুষ্ক হৃদয় শুষ্কই থেকে যায় প্রাণের আত্যন্তিক তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না তার ইঙ্গিত মাত্রও তাঁর এ উক্তির মধ্যে নেই। সেই মহাসাধক সেদিন তাঁর ভক্তদের যে দিব্য ধন ও দিব্য আশীর্বাদ দান করেছিলেন তারই আস্বাদ গ্রহণের জন্য আজও প্রায় এক শতাব্দীর এপারেও তৃষ্ণার্ত মানুষ প্রাণের আকুতি নিয়ে ছুটে আসেন। যে যেমন পারেন অক্ষয় অমৃতকুম্ভের তীর্থ-বারি থেকে আপনার অন্তরের তৃষ্ণার নিবৃত্তি করতে চান। বা নিবৃত্তি করে নেন।

যাচ্ঞামাত্রেই অমৃতকুম্ভের পানীয়ে এই যে তৃষ্ণা-মোচন, এই অমৃতকুম্ভ কি সেই মহাসাধক জন্মসূত্রেই বিধাতার চিহ্নিত পুরুষ হিসাবে লাভ করেছিলেন না তাকে দীর্ঘ তপস্যায় আয়ত্ত করেছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া সুকঠিন। কারণ যে তপস্যা ও শক্তি থাকলে এর উত্তর দেওয়া যায় তা আমার নেই, এ কথা সবিনয়ে স্বীকার করি। তবু এই প্রশ্ন আমাকে পীড়িত করে আমার সম্মুখে অজও নিরুত্তর রয়েছে। তবু বার বার মনে হয়েছে হয়তো প্রশ্নের দুটি অংশেই সত্য আছে। তিনি জন্মসূত্রেই বিধাতার চিহ্নিত পুরুষ কালধর্মে কালোচিত মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করবার জন্যই তাঁর এই কালোচিত সাধনার প্রয়োজন হয়েছিল।

তখন ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে ও প্রভাবে তখন আমাদের দেশের সংস্কৃতি ও হৃদয় পরস্পর বিবদমান সমস্ত ধর্ম, সংস্কৃতি ও চিন্তার এক সমন্বিত মূর্তির জন্য সতৃষ্ণ ও আকুল। প্রাচীন হিন্দুধর্ম অদ্বৈতবাদী, যোগী থেকে ভক্তিবাদী, বৈষ্ণব ও শাক্ত-চিন্তা পর্যন্ত বিস্তৃত; মুসলমান ধর্ম তখন হিন্দুধর্মের মতই এই দেশের এক স্থায়ী বৃহৎ অংশের ধর্ম; খৃস্টধর্ম ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি তখন নবীনের জয়ধ্বজা নিয়ে সগৌরবে অবতীর্ণ হয়েছে। এই লৌকিক ও আত্মিক পটভূমিতে এক সমন্বিত মনন, ধ্যান ও তত্ত্বের জন্য এক বৃহৎ উদারতা, এক অমেয় দৃঢ়তা ও কঠিন সাহসের প্রয়োজন ছিল। এই সমন্বয়ের ধ্যানে তখনকার সমস্ত মনীষিরা মগ্ন। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ তার সম্মুখীন হওয়া মাত্র তাকে একান্ত সহজে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। আপনার সাধনার ধারায় একে একে সমস্ত সাধনপন্থাকে গ্রহণ করে অনায়াসে অতি স্বল্পকালের মধ্যে এক এক সাধনকে সমাপ্ত করে, তার পূর্ণ ফল নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। অথচ মহা মহা সাধকরা এই এক এক মার্গে সাধনা করে সমগ্র জীবনব্যাপী তপস্যার অন্তেও সেই বিশেষ সাধনপন্থার পূর্ণ ফল লাভ করতে পারেন না। এই পুরুষ সামান্য সংক্ষিপ্তকালের মধ্যে সমস্ত সাধন সমাপ্ত করে আবার স্নেহভিক্ষু বালকের মত সর্বশেষে, যেখান থেকে সাধনা আরম্ভ করেছিলেন সেইখানেই সেই জননী ভবতারিণীর অঞ্চলতলে আশ্রয় গ্রহণ করে সপ্রেমে, সস্নেহে, একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে, সেই বিচিত্রের সমন্বয়ে সমন্বিত সাধনার শেষ বাক্য গদগদ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন—মা, আমার মা। এর দ্বারা তিনি আমাদের সম্মুখে ধর্মজীবনের এক রাজপথ উন্মোচিত করেছিলেন। ধর্ম-নিরপেক্ষ অথবা সর্বধর্মের পূর্ণ প্রকাশে মহিমান্বিত ভারতবর্ষের পরিকল্পনার এখানেই বনিয়াদ কাটা হয়েছিল। এমন মহিমার যে অনাড়ম্বর জীবনময় প্রকাশ সে প্রকাশের নাম বা অভিধা 'কল্পতরু' ছাড়া আর কিছু হয় না বা হতে পারে না।
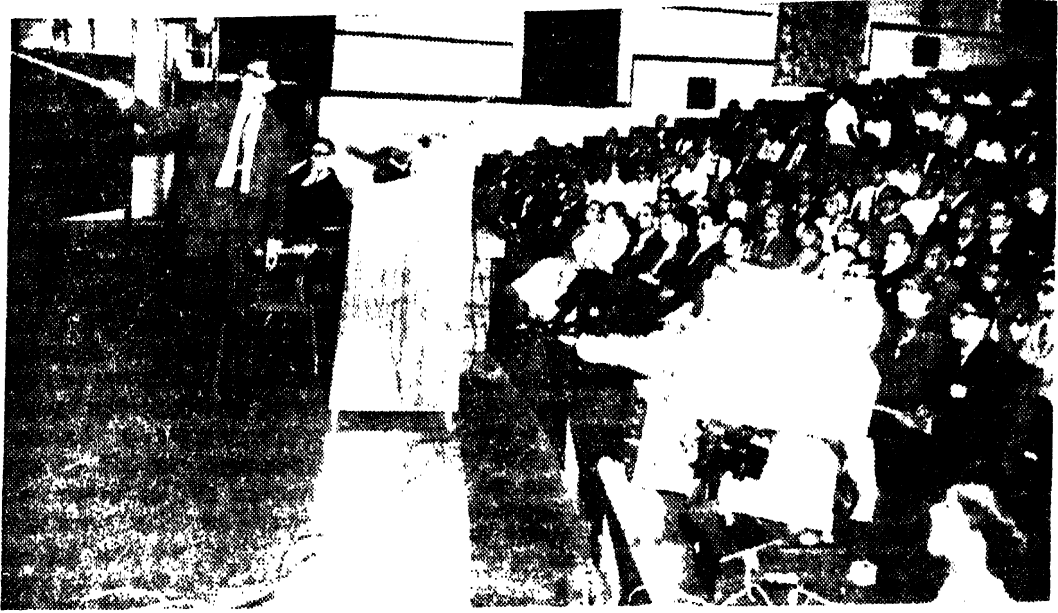
বিজ্ঞান কংগ্রেসে ডঃ কে গোপালন চান্দ্রাশনা সম্পর্কে বক্তৃতা করছেন।

খড়্গপুরে বিজ্ঞান কংগ্রেস

একদিন যা ছিল বাংলাদেশে হিজলী বন্দীশালা বা আটক-শিবিররূপে পরিচিত এবং ১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর যেখানে শহীদ সন্তোষকুমার মিত্র এবং তারকেশ্বর সেনগুপ্ত বৃটিশ শাসকের গুলীতে নিহত হন, আজ সেখানে গড়ে উঠেছে ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার এক নব তীর্থক্ষেত্র। সে তীর্থক্ষেত্র হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষণের কেন্দ্র ইন্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অফ টেকনোলজি। এই নামে আজ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে উচ্চতর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার যে পাঁচটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, খড়্গপুরের আই আই টি হচ্ছে তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম। এবছর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৮তম বার্ষিক অধি-বেশনের আসর বসেছিল খড়্গপুরের এই আই আই টি-র অঙ্গনে, গত ৩-৯ জানুয়ারী।

তেসরা জানুয়ারী সকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই অধিবেশনের উদ্বোধন করলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় স্বাগত জানালেন সমবেত দেশী ও বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং প্রতিনিধিদের। তার আগে স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আই আই টি-র অধিকর্তা অধ্যাপক এস কে বসু সমবেত সকলকে অভ্যর্থনা জানান।

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমতী গান্ধী বলেন : বিজ্ঞান সামাজিক পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। উৎপাদন ও বন্টন উভয়ের সঙ্গেই এর যোগ রয়েছে। দেশ ও দেশের বিজ্ঞানীদের সামনে একই চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। তা হল—সম্পদ সীমিত, যন্ত্রপাতি পুরোনো; তবু কাজ চালিয়ে যেতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে। তাই বিজ্ঞানীদেরও সমাজচেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ যে দেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত, একথা প্রতিটি বিজ্ঞানীকে আজ অনুধাবন করতে হবে। শুধু বিজ্ঞান নয়, প্রগতিকামী যুক্তিশীল এক সম্পদ গড়ে তোলার কাজেও তাঁদের অবদান চাই।

শ্রীমতী গান্ধী আরও বলেন : দেশে বিজ্ঞানচর্চা বাড়ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু সমস্যাও সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক বিজ্ঞানকর্মীর মনে হতাশা দেখা যাচ্ছে। এর জন্যে প্রয়োজন বিজ্ঞান সংস্থাগুলির বিকেন্দ্রীকরণ। প্রাথমিক কিছু সাহায্য পাওয়ার পর সেগুলি স্বয়ম্ভর হয়ে উঠলে সমস্যা সমা-ধানের সহায়ক হবে।

আর একটি বিষয়ের ওপর তিনি গুরুত্ব দেন। তা হল 'অফিসারী মনোভাব' বর্জন। তরুণদের মনে নিজের হাতে কাজ করার আগ্রহ ও তাতে শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলার জন্যে তিনি আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন : আজ যেখানে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে, একদা সেখানে রাজবন্দীদের আটক শিবির ছিল। একদা যে প্রেরণা স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল, এখন সেই প্রেরণার দ্বারা স্বপ্নের ভারত গড়তে হবে। এই কাজে বিজ্ঞানী-দেরও সহযোগিতা চাই।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি ডঃ লালচাঁদ ভার্মা এরপর তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন : মান অনুযায়ী পরিভাষা রচনা নিশ্চয়ই একান্তভাবে দরকার। সেই সঙ্গে দরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির জন্যে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মান নির্ণয়। তা হলে তা থেকে শিল্প ও বাণিজ্য লাভবান হবে, দেশের অর্থনীতি উপকৃত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অন্য দেশের বিজ্ঞানীদের মতো ভারতের বিজ্ঞানীরা এ-ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি।

এরপর বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অজিতকুমার সাহা বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের পরিচয় দেন। এবারের অধিবেশনে এসেছিলেন আফগানিস্থানের ডঃ এ জি কেয়াই সুয়ানি বুলগেরিয়ার আকাডেমিশিয়ান ই জি কামনফ এবং আকাডেমিশিয়ান কে টি ব্রাতা-নফ, সিংহলের মিঃ এ এন এস কুলসিংহা,

চেকোশ্লোভাকিয়ার ডঃ জে টমকো, হাঙ্গেরীর অধ্যাপক এফ সিসাকি এবং অধ্যাপক এফ স্নগর, জাপানের সিগেরু সুৎস্মি, পোল্যান্ডের অধ্যাপক এম নালেজ, রুমানিয়ার অধ্যাপক ডি জর্জিওরেসকু, ব্রিটেনের লর্ড আলেকজান্ডার টড, ডঃ এইচ ডি টারনার, অধ্যাপক এইচ গ্রুনবার্গ, অধ্যাপক জে হাচিনসন এবং অধ্যাপক এইচ ডবলু পিরি, ফ্রান্সের ডঃ এম আর কালেৎ, সোভিয়েত রাশিয়ার মিঃ জি এইচ বুনিয়াতিয়ান এবং ডঃ (শ্রীমতী) টি ভি ভেচ্‌চিকোভা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক জেমস সিনক্লেয়ার। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় দেড় হাজার প্রতিনিধি ও বিজ্ঞানী এবারের অধিবেশনে যোগদান করেন।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ৪ঠা জানুয়ারি থেকে বিজ্ঞান কংগ্রেসের তেরোটি বিভিন্ন শাখার পৃথক পৃথক অধিবেশন শুরু হয়। সংখ্যায়ন, রসায়ন, ভূতত্ত্ব ও ভূগোল, প্রাণিবিদ্যা ও কীটতত্ত্ব, যন্ত্রবিদ্যা ও ধাতুবিদ্যা, গণিত, উদ্ভিদবিদ্যা, নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসা ও পশুবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান এই তেরোটি শাখার সভাপতিগণ তাঁদের ভাষণে নিজের নিজের গবেষণার বিষয় ও তার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেইসঙ্গে প্রত্যেক শাখায় আলোচনা চক্র, বিশেষ বক্তৃতা ও গবেষণা-পত্র পাঠ হয়। বিভিন্ন শাখায় যাঁরা বিশেষ বক্তৃতা দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক জেমস সিনক্লেয়ার, ডঃ সত্যকিঙ্কর শংকর, অধ্যাপক এম নালেজ, ডঃ পি কে ভট্টাচার্য, মিঃ এ এন কল্লাসংঘী, অধ্যাপক ডি পি পাটিল, অধ্যাপক এম কে সিংহাল, অধ্যাপক এস কে ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা অসীমা দেবী, অধ্যাপক আর শ্রীধরন, অধ্যাপক আর এস মিশ্র, অধ্যাপক জি ডি সিং, ডঃ এস চ্যাটার্জি, অধ্যাপক ডি এন মিত্র প্রমুখ। এছাড়া দেশের ও বিদেশের অনেকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কয়েকটি লোকরঞ্জন বক্তৃতাও প্রদান করেন। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী লর্ড আলেকজান্ডার টড বক্তৃতা দেন 'রসায়নের পরিবর্তনশীল ধারা', ডঃ বি ডি নাগচৌধুরী বলেন, 'দেশের জন্যে একটি বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা', ডঃ ডবলু ডি ওয়েস্ট আলোচনা করেন 'ভাসমান মহাদেশ ও গতিশীল পৃথিবী', অধ্যাপক টি এস সদাশিবন বলেন, 'উদ্ভিজ্জ ভাইরাস ও ভাইরাস ব্যাধি,' ডঃ এ এন ঘোষ আলোচনা করেন 'যুগে যুগে মাননির্ণয়', অধ্যাপক নীলরতন ধর বলেন, 'ধর্ম ও বিজ্ঞানের সহযোগিতা,' ডঃ এইচ ডি শংকালিয়া বক্তৃতা করেন 'কাশ্মীরে প্রস্তরযুগের অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার,' অধ্যাপক এস কে ভট্টাচার্য বলেন, 'রাসায়নিক শিল্পে অনুঘটক বিক্রিয়ার উপযোগিতা,' ডঃ সিগেরু সুৎস্মি আলোচনা করেন 'জাপানের পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পের সাম্প্রতিক অগ্রগতি' এবং ডঃ কে এন কাশ্যপ বলেন, 'ভারতে জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে।

প্রতি বছরের মতো এবারও কয়েকটি স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট অফ সায়েন্স-এর রজত-জয়ন্তী স্মারক বক্তৃতা দেন অধ্যাপক এস রঙ্গস্বামী 'হৃদরোগে ভারতীয় ভেষজের অনুসন্ধান' বিষয়ে। কে এস কৃষ্ণান স্মারক-বক্তৃতা দেন অধ্যাপক আর কে আসুন্দি, তাঁর বিষয়বস্তু ছিল 'আইসোটোপ ও স্পেকট্রোস্কোপ'। মেন্ডেল স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক সার জোশেপ হাচিংসন। মেঘনাদ সাহা স্মারক বক্তৃতা দেন অধ্যাপক সি আর রাও 'বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কম্প্যুটার' প্রসঙ্গে। বীরেশচন্দ্র গুহ স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন ডাঃ জে বি চ্যাটার্জি, তাঁর বিষয়বস্তু ছিল 'মানবদেহে লোহার ভূমিকার কয়েকটি দিক'। এই সঙ্গে কয়েকটি বিশেষ আলোচনারও ব্যবস্থা করা হয়। 'ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া' বিষয়ে একটি মূল্যবান আলোচনার উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন। 'সমাজে কম্প্যুটারের স্থান' এবং 'বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও মানবকল্যাণ' সম্পর্কে আরও দুটি মূল্যবান আলোচনা হয়। ভারতের বিজ্ঞান-লেখক সমিতির উদ্যোগে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার এবং বিজ্ঞান-রচনার নানা দিক সম্পর্কে আর একটি মনোজ্ঞ আলোচনা হয় এবং তাতে অংশ গ্রহণ করেন ডঃ স্বামীনাথন, ডঃ নায়ার, ডঃ দিবাকর মুখোপাধ্যায়, ডঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকমলেশ রায় এবং বর্তমান লেখক।

প্রতি বছরের মতো এবারও বিজ্ঞান কংগ্রেসের সঙ্গে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থার বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞান সমিতির বিশেষ অধিবেশনে বীরবল সাহানী স্বর্ণপদক প্রদান করা হয় ডঃ এস এম সরকারকে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের অঙ্গ হিসাবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞান পুস্তকের প্রদর্শনী এবারও আয়োজিত হয় এবং এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ ভি কে আর ভি রাও। গত বছর পাওয়াই অধিবেশনের তুলনায় এবারের প্রদর্শনী হয়েছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

এবারের অধিবেশনে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল দুটি জিনিস। তার একটি হল সারা ভারত ছাত্রছাত্রীদের আয়োজিত বিজ্ঞান মেলা। এই মেলায় রাজস্থানের মাহেশ্বরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মহারাণী গায়ত্রী দেবী বালিকা বিদ্যালয়, গৌহাটির কটন কলেজ, মুগবেড়িয়া গঙ্গাধাম হাই স্কুল, হিজলী হাই স্কুল এবং কলকাতার সায়েন্স ফর চিলড্রেন, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক কলেজ, এন্ড্রুজ স্কুল, লরেটো কলেজ এবং জগদীশচন্দ্র বসু জাতীয় মেধা বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজেদের হাতে তৈরী নানারকম বৈজ্ঞানিক মডেল ও পরীক্ষা প্রদর্শন করে। অধ্যাপক টি আর শেষাদ্রি এই বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করে তরুণ বিজ্ঞান-প্রতিভাদের উৎসাহিত করার এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করেন। তিনদিনব্যাপী এই মেলা দেখতে প্রচুর জনসমাগম হয় এবং ছাত্রছাত্রীরা সুন্দরভাবে তাদের মডেল ও পরীক্ষা ব্যাখ্যা করে।

দ্বিতীয় আকর্ষণীয় বিষয়টি ছিল অ্যাপোলো—১১ অভিযানের মহাকাশচারীদের আনীত একখণ্ড চান্দ্রশিলার প্রদর্শনী। ৮ জানুয়ারী মাত্র একদিনের জন্যে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই চান্দ্রশিলাটিকে দেখার জন্যে খড়গপুর ও আশেপাশে থেকে বহু নরনারী ও ছেলেমেয়ে এসেছিল। এই উপলক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চান্দ্র অভিযানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় তরুণ বিজ্ঞানী ডঃ কে গোপালন দুটি বিশেষ বক্তৃতা দেন। একটি বক্তৃতা তিনি দেন সকালে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং ভূগোল ও ভূতত্ত্ব শাখার যৌথ অধিবেশনে। এই বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল অ্যাপোলো—১১ অভিযানের চান্দ্রশিলার বিশ্লেষণ ও বয়স। দ্বিতীয় বক্তৃতাটি তিনি দেন সন্ধ্যায়। এটি ছিল লোকরঞ্জন বক্তৃতা এবং এর বিষয়বস্তু হল অ্যাপোলো—১১ অভিযানের আগে ও পরে চন্দ্র। তাঁর এই দুটি বক্তৃতা-সভায় প্রচুর শ্রোতা সমবেত হয়েছিলেন। চান্দ্রশিলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি ডঃ আলচাঁদ ভার্মন।

সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রতিদিন গুরুগম্ভীর বৈজ্ঞানিক আলোচনার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে আই আই টি-র ছাত্রছাত্রীরা সঙ্গীতালেখ্য, লোকগীতি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রা পরিবেশন করে। তারপর ক্রমান্বয়ে শ্রীমতী অমলাশংকরের পরিচালনায় উদয়শংকর সংস্কৃতি কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীরা 'বাসবদত্তা' নৃত্যনাট্য, উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত, টি এল টি-র 'রামায়ণ' নৃত্যনাট্য, শ্রীমতী সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর ওড়িশী নৃত্য, ডঃ রমা চৌধুরীর পরিচালনায় প্রাচ্যবাণীর 'মেঘ-মেদুর-সৌদামিনী' সংস্কৃত নাটক এবং শেষদিনে আই আই টি-র ছাত্রছাত্রীদের অভিনীত ইংরেজি নাটক পরিবেশিত হয়।

অভ্যর্থনা সমিতি প্রতিনিধিদের জন্যে দীঘার সমুদ্রসৈকত, হলদিয়া বন্দর এবং জামসেদপুরে টাটার লোহার কারখানা দেখার ব্যবস্থাও করেছিলেন। আমরা একদল দীঘায় গিয়েছিলুম। সেখানে জাতীয় ধাতু গবেষণাগারের অধীনে পরিচালিত সামুদ্রিক মরিচা গবেষণা-কেন্দ্রটি পরিদর্শনের সুযোগ আমরা পেয়েছিলুম। অভ্যর্থনা সমিতি বিদেশাগত বিজ্ঞানী ও এ-দেশের প্রতিনিধিদের একদিন প্রীতিসম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। এই সম্মেলনে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পেয়ে বিশেষ আনন্দ অনুভব করেছিলাম।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বট।।

রাম বসু

কী বলবে আর
থাক, বুঝতে পারি,
জলের ওপর সরু, লম্বা আলো সময়ের শান-দেওয়া নখ ও নিয়তি
সন্ধ্যার আকাশ খান পরে কেঁদে উঠবে এয়োতির শেষ চিহ্ন মুছে
ঋতুমতী পাখিদের বর্ণালী আলাপ, স্তব্ধ হবে
পাল তোলা নৌকার সারিতে
আমি ঝরিয়ে দিয়েছি সেই সব কুঁড়ি
যারা অঙ্গীকৃত ছিল মাটির নুনের কাছে

যা ছিল তা আর থাকবে না তো
আবার বিন্যাস, পুনর্বিন্যাস, আবার
চিতাবাঘিনী সময়
গৌরবের অন্তিম শিয়রে রেখে আসা শাদা পালক, আবার
হাল-দেওয়া মাটির ফাঁকে ফাঁকে
আর ফেনার সাঁই-এর কুঞ্জে লুকিয়ে রাখা
আমাদের শরীরের গন্ধ, আমাদের অন্তর্লীন স্বপ্ন,
স্বপ্নের শিশির, আর্তি

কি বলেছিলাম মনে নেই
মনে আছে যা বলতে চেয়েছি তা তোমাকে বোঝাতে পারিনি
কি লিখেছিলাম মনে নেই
মনে আছে যা লিখতে চেয়েছি তা লেখা হয়নি এখনো
অনুপম নিঃসঙ্গ নদীটি, করুণ রাগিনী, অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে
ভিনসেন্ট আলো, আলোর আলেয়া, ছিঁড়ে ছিঁড়ে,
যেতে চায় একা
তোমার নিবিড়ে, ইথারে, নৈঃশব্দ্যে,
যেখানে একটি মুক্তা জ্বলে জ্বলে করে

নির্মাণ করবো বলে ভেবেছি, অথচ নির্মিত হয়নি স্বপ্নের অসুখে
অনুশোচনা আমার কেউ তো বোঝেনি, এমন কি তুমিও না
এখুনি সূর্যের আলো ডুবে মরবে বরানগরের গঙ্গার অতলে

আমার সামনে এক গ্লাশ জল টলটল করছে
মুক্তির আশায় মৃত নীলিমা এখন মাথা কুটছে বিবর্ণ বিস্তারে
হারাতে হারাতে ভাগিনী
এখনো বোঝ নি দহনের এক বিন্দু উজ্জ্বল শুভ্রতা
কোটি কোটি টন মলিনতার চেয়েও মহার্ঘ

কী বলবে আর
থাক, বুঝতে পারি
প্রাচীন বটের মতো আমি
সব পাতা উড়িয়ে দিয়েছি বরানগরের গঙ্গার অতলে.

যূপকাষ্ঠে।।

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন গভীর এক রাত্রির মশানে
বেঁধে আনে ঘুমচোখে কৃপাণ করাল।
ভূলুণ্ঠিত শিরস্ত্রাণে দুর্বল মুঠিতে
এ জন্মের যতগুলি উৎকৃষ্ট সকাল
ধরে রাখি। সারি সারি সে বধ্যভূমিতে
ভিড় করে কবন্ধেরা, নিয়তির জাল
ঘন হয়। উদিত আকাশে হাসে
আলোর রমণী।
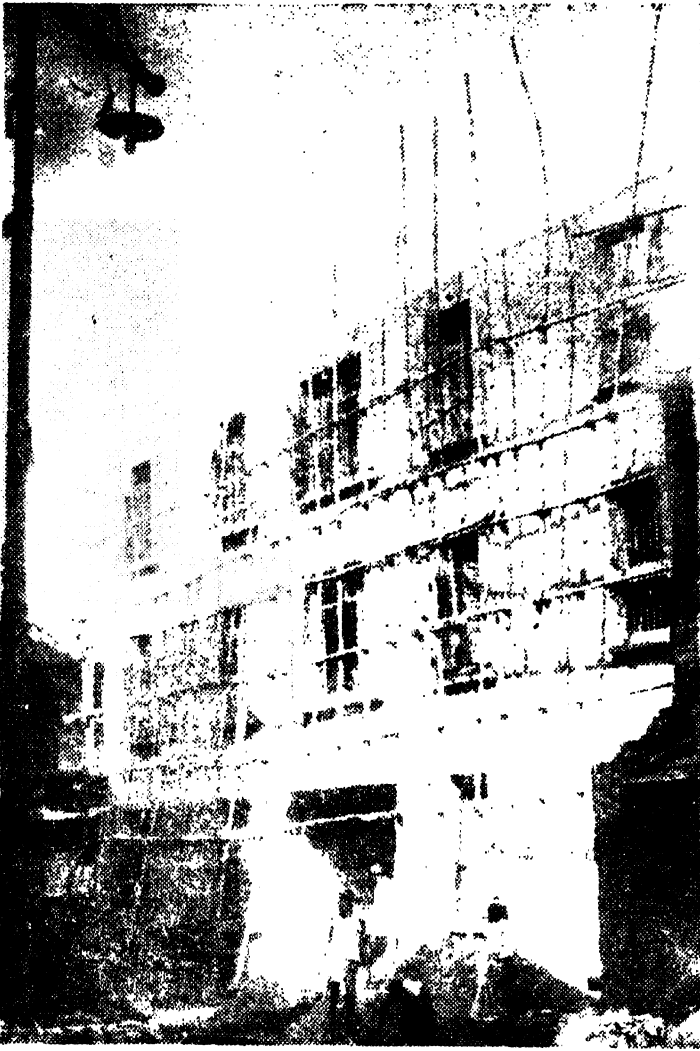
অতীত জেনে কি হবে? তার চেয়ে বর্তমানের কথা শুনুন, বর্তমানের কথা লিখুন। লিখুন আমাদের সমস্যা ও অসুবিধের কাহিনী। লোকে জানুক কত কষ্ট করে এই সংস্থাকে আমরা আজও বাঁচিয়ে রেখেছি। এই সংস্থা বাঁচিয়ে রেখেছে শত শত অনাথ ছেলেমেয়েকে। হয়তো এই অরফ্যানেজ না থাকলে এরা জীবনে কোনদিনই স্কুলে পড়বার, চাকরী পাওয়ার, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগই পেত না। তাই আপনাকে অনুরোধ করব, অতীতের কথা ছেড়ে দিন, লিখুন শুধু আজকের কথা আগামীকালের কথা। অরফ্যানেজের গত ত্রিশ বছরের সেক্রেটারী প্রাক্তন আইনজীবী আবদুল্লা আনসারী সাহেব ভাঙা ভাঙা বাংলায় কিছু উর্দু ও কিছু ইংরেজী মিশিয়ে থেমে থেমে আস্তে আস্তে তাঁর মনের ইচ্ছা আমায় জানালেন। উজ্জ্বল গৌরকান্তি, সবল দৃঢ় দেহযষ্টি, বিরলকেশ, এই বৃদ্ধের প্রশান্ত মুখে করুণার স্নিগ্ধ আভাস উজ্জ্বল হয়ে আছে। কথা বলেন কম, যতটুকু বলেন তার প্রতিটি শব্দে আভিজাত্যের বিদ্যুৎচ্ছটা। ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ছাপ প্রতিটি বাক্যে সুপরিস্ফুট। তাই প্রতিবাদ করে আঘাত করার ইচ্ছা হল না। সবিনয়ে জানালাম: আজকের দিনে আপনার অরফ্যানেজের, স্কুলের সমস্যার কথা লিখতে গেলেও তো আমাকে অতীত জানতে হবে। তবেই তো বুঝব পায়ের ঠিক কোথায় কাঁটা ফুটছে। এবার হাসিতে ফেটে পড়লেন আনসারী সাহেব: আপনি নাছোড়বান্দা। ঠিক হ্যায়, সব জেনে নিন। লেকিন আমাদের প্রবলেমের কথাও লিখবেন। শুরু হয়ে গেল অতীতের ধূসর বিলীয়মান সড়কে প্রাচীন পুঁথি-পত্র, রেকর্ড বুক আর ভিজিটার্স বুকের ক্ষীণ আলোয় সতর্ক ধীর পদচারণা।

আজ থেকে আটাত্তর বছর আগের কথা। কলকাতা স্মল কজেস কোর্টের রিটায়ার্ড বিচারপতি আবদুল হাসান সাহেব হঠাৎ ঠিক করলেন শহরের দুস্থ দরিদ্র অনাথ মুসলিম ছেলেমেয়েদের জন্য একটি আশ্রয় গড়ে তুলবেন। 'হঠাৎ' বলাটা বোধহয় ঠিক হল না। সারা জীবন ধরে অসংখ্য মামলার নিষ্পত্তি করতে গিয়ে বার বার তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এই অনাথদের দুষ্টুমি বা ফিচলেমির জন্য তথাকথিত ভদ্রলোকেরা বিরক্ত হন, থানা-পুলিশ কোর্ট-কাছারি করেন। ভদ্র সমাজের এরা অনাত্মীয়। কে কেউ তো এদের দিকে একবার ফিরেও তাকান না, বুঝতেও চেষ্টা করেন না যে কেন এরা এ রকম করে, কেন বিপথে যায়? শাস্তির মুগুর মেরে এদের ঠান্ডা করাই সবার লক্ষ্য। বয়স বাড়লে এদের অভিভাবক হয় লোকাল থানার জমাদার আর জেলের ওয়ার্ডার। যদি একটু সুযোগ, একটু সুবিধা এরা পায় তাহলে তো এরাও মানুষ হয়ে উঠতে পারে, ভদ্র সমাজে স্থান পেতে পারে। সেই সহৃদয় বিবেচনা থেকেই জন্ম-লাভ করল ক্যালকাটা মুসলিম অরফ্যানেজ, ১৮ ডিসেম্বর, ১৮৯২। সংক্ষেপে যা আজ পরিচিত সি-এম-ও নামে।

সি-এম-ওর কাছে সেই শিশুই অরফ্যান যার বাবা নেই। মা চালাতে নিতান্তই অসমর্থ। দরিদ্র মুসলিম ঘরের ছেলেমেয়েরাই সাধারণত আশ্রয় পায়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য সম্প্রদায়ের অনাথ ছেলেমেয়েদের আশ্রয় দানে কোন বাধা-নিষেধ নেই। এই অনাথ শিশুদের খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষিত করে তোলা ও জীবিকার সুযোগ জুটিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও বহন করে সি-এম-ও। তবে এই সুযোগ ছেলেদের বেলায় আঠারো বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মেয়েদের পাত্রস্থ করার ব্যবস্থাও করে সি-এম-ও।

বাইশটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে বেনিয়া-পুকুর রোডে প্রতিষ্ঠিত হল অরফ্যানেজ। বছর ঘুরবার আগেই শিশু সদস্যদের সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য হাসান সাহেব তাঁর সদ্য প্রতিষ্ঠিত অনাথ আশ্রমটিকে তুলে নিয়ে

ক্যালকাটা মুসলিম অরফ্যানেজ স্কুল

এলেন ম্যাকলাউড স্ট্রীটের একটি বড় বাড়ীতে। কিন্তু সেখানেও জায়গায় কুলোয় না। তখন আবেদন জানালেন কলকাতার ধনী মুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছে : আপনারা সাহায্য করুন।

হাসান সাহেবের আবেদন ব্যর্থ হয় নি। রইস ব্যবসায়ী ইসমাইল আরিফ বর্তমান হ্যারিসন রোড আর সেন্ট্রাল অ্যাভিনুর পশ্চিমে সৈয়দ সালে লেনে ষোল কাঠা জায়গা দান করলেন আশ্রমের জন্য। আরিফ সাহেবের দানব্রতে উৎসাহিত হয়ে কলুটোলা আর আমড়াতলার মুসলিম ব্যবসায়ীরা আশ্রম ভবনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ চাঁদা করে তুলে দিলেন। সেই টাকায় ১৮৯৫ সালে ৮ সৈয়দ সালে লেনে অরফ্যানেজের বিশাল বিল্ডিং গড়ে উঠল। বাড়ীটির কিছুটা অংশ তিনতলা, কিছুটা চারতলা।

ইতিমধ্যে ১৮৯২ সালে অরফ্যানেজের শিশু বাসিন্দাদের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য বেনিয়াপুকুর রোডের বাড়ীতেই একটি উর্দু মিডিয়ামের মিডল স্কুল (ক্লাস সিকস পর্যন্ত) শুরু হয়ে গিয়েছিল। মাঝে ম্যাকলাউড স্ট্রীট ঘুরে অরফ্যানেজের নতুন বাড়ীতে স্কুলও উঠে এল পঁচানব্বই সালে।

অতি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে অরফ্যানেজ। বিশেষ করে স্থানীয় সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত দরিদ্র মুসলিম অধিবাসীদের কাছে সি-এম-ও হয়ে ওঠে আশ্রয় ও সাহায্যের প্রতীক। সহৃদয় ধনবান ও আশ্রয়হীন দরিদ্রের মাঝে যোগসূত্র হয়ে ওঠে অরফ্যানেজ ও অরফ্যানেজ চালিত এই স্কুল। বাইশটি অনাথ নিয়ে যে আশ্রম শুরু হয়েছিল মাত্র তিন যুগের ব্যবধানেই তার আশ্রিতের সংখ্যা তিনশোর কোঠায় গিয়ে পৌঁছোল।

ততদিনে অরফ্যানেজ আরো প্রসারিত হয়েছে। ছেলেদের মিডল স্কুলের পাশাপাশি মেয়েদের জন্যও শেরিফ লেনে আর একটি মিডল স্কুল খুলেছে সি-এম-ও। দুটি স্কুলেই পঠন-পাঠনের মাধ্যম উর্দু। বাংলা ভাষাভাষী ছেলেদের সি-এম-ও নিজের খরচেই পড়তে পাঠাতো ক্যালকাটা মাদ্রাসা বা জুবিলী স্কুলে। এছাড়া যাদের লেখা-পড়ায় বিশেষ মন নেই তাদের জীবনে করে খাওয়ার মত সুযোগ করে দিল আশ্রম শিল্প বিদ্যালয় খুলে। সেখানে তারা শিখত দর্জির কাজ, ছুতোর মিস্ত্রির কাজ। বিভিন্ন পেশায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিজে-দের পায়ে দাঁড়াতে শিখত। এই উদ্দেশ্য নিয়েই একটির পর একটি বিভাগ খুলে চলেছে সি-এম-ও। একটি হাসপাতালও খুলেছে অরফ্যানেজ যেখানে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধপত্র দেওয়া থেকে ছোটখাট অপারেশন পর্যন্ত সবই চলতে পারে।

অরফ্যানেজের সুস্থ ব্যবস্থাপনায় এক নতুন জগতের সন্ধান উন্মোচিত হল এদেশের অনাথ মুসলিম ছেলেমেয়েদের কাছে। বিশেষ করে স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ পেয়ে হাজার হাজার দরিদ্র ছেলে-মেয়ের জীবনের মোড় ঘুরে গেল। স্থানীয় অধিবাসীরাও তখন আশ্রমের কাছে অনুরোধ জানালেন তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও সুযোগ দেওয়া হোক স্কুলে পড়বার। এই সুযোগে সমাজ জীবনের সর্বস্তরের ছেলেমেয়েদের মিলন কেন্দ্র হয়ে উঠল এই দুটি স্কুল।

১৯২২ সালের ১৩ ডিসেম্বর সৈয়দ সালে লেনের সি-এম-ও মিডল স্কুল ফর বয়েজ পরিদর্শনে এসে অস্থায়ী ডি-পি-আই ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেব ভিজিটার্স বুকে মন্তব্য করেন : "স্কুলটি পরিচ্ছন্ন ও ছাত্ররা শৃঙ্খলাপরায়ণ। সর্বত্র কর্মগুঞ্জনে মুখরিত। ছেলেদের দেখে ভাল লেগেছে। স্কুলের একতলার ঘরগুলি সাধারণত ক্লাস রুম হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং প্রার্থনাগৃহে (মসজিদ) অনুষ্ঠিত হয় হাফিজ ক্লাস। দোতলায় সেলাই শেখার ক্লাস ও শিল্প বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রদের জন্য থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। তেতলায় থাকে তারাই যারা হাইস্কুল বা কলেজে পড়ে। ...ছাত্ররা অপরিসীম সৌভাগ্যের অধিকারী। কারণ ইংলন্ডেও ওয়ার্কহাউসের শিশুদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার ঘটনা অতি বিরল—অথচ এখানে তা কত সহজেই এরা পেয়ে থাকে।... আশা করব এদের সৌভাগ্যক্ষেত্র আরো প্রসারিত হবে যখন অরফ্যানেজের বেহালা পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত হবে।"

বেহালা পরিকল্পনা অরফ্যানেজের বহুদিনের। কিন্তু এই উনিশ শো সত্তর সালেও তা সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। কেন পারে নি সে কথা যথাসময়েই বলব। তার আগে বলে নি বিশের যুগে স্কুলের ও সেই সঙ্গে অরফ্যানেজের ভেতরের কিছু কথা। ছাব্বিশ সালে মুসলিম শিক্ষার সহকারী ডিরেক্টার অব পাবলিক ইন-স্ট্রাকশনের নোট থেকে জানতে পারা যায় যে তখন অরফ্যানেজের সদস্য সংখ্যা মোট তিনশো তিন। মুসলিম ওয়াকফ সম্পত্তির আয় থেকেই তখন অরফ্যানেজের বিপুল ব্যয় মেটানো হত। বহু ধনী মুসলমান তাঁদের সম্পত্তি দান করেছিলেন অরফ্যানেজকে। এইসব সম্পত্তির রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য পাঁচজন সদস্যের একটি ট্রাস্ট বোর্ড ছিল অরফ্যানেজের। এ-ছাড়া অনাথ আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগের সুপরিচালনার জন্য স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে নির্বাচিত পঞ্চাশজন সদস্যের একটি কার্যকরী সমিতি ছিল। প্রতিটি বিভাগের পরিচালন দায়িত্ব বহন করত কার্যকরী সমিতির দ্বারা মনোনীত বিভাগীয় উপ-সমিতি। অরফ্যানেজের শিক্ষা বিভাগের পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল ন'জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি সমিতির উপর। তখন স্কুলের মোট ছাত্র সংখ্যা একশো পঞ্চান্ন।

ঐ নোট থেকে আরো জানা যায় যে তেইশ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী সৈয়দ সালে লেনের বাড়ীটির একটি অংশ ধ্বসে পড়ায় তেতাল্লিশটি শিশু প্রাণ হারায়। অরফ্যানেজের এই বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্য সেদিন আবার মুসলমান ব্যবসায়ীরা এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের সকলের দানে বছর কয়েকের মধ্যে ধ্বসে পড়া অংশটির জায়গায় একটি নতুন চারতলা বিল্ডিং গড়ে ওঠে। এ জন্য সেদিন ব্যয় হয়েছিল প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকা। সবই এসেছে ডোনেশন থেকে।

বয়েজ স্কুলে উর্দু মিডিয়ামের পড়ানো হলেও ক্লাস ফোর পর্যন্ত আলাদা সেকশনে বাংলার মাধ্যমে পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। শিশু শ্রেণীর তিনটি সেকশন মিলিয়ে তখন এই মিডল স্কুলে সব সুদ্ধ ছিল ন'টি ক্লাস। ন'টি ক্লাসের জন্য ছিলেন এগারোজন মাস্টারমশাই। মাস গেলে শিক্ষকদের বেতন বাবদ অরফ্যানেজের ব্যয় হোত সোয়া চারশো টাকা। এর মধ্যে সরকারী সাহায্য হিসাবে স্কুল পেত মাত্র পঁচাত্তরটি টাকা।

অ্যাসিস্টান্ট ডি-পি-আই তাঁর নোটে লিখেছেন এ সময় অরফ্যানেজের ভান্ডারে প্রায় দেড় লাখ টাকা জমা ছিল। এছাড়া ফি বছরই প্রায় তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা আয় হত অরফ্যানেজের। এই আয়ের মোটা অংশই আসত বিভিন্ন সংস্থা বা ব্যক্তির দান থেকে। কলকাতা করপোরেশনের সাহায্যের বার্ষিক পরিমাণ ছিল প্রায় পৌনে দু হাজার টাকা।

এই বিশের যুগেই এম-ইউ স্কুল সরকারী অনুমোদন পেয়ে এক্সটেনডেড এম-ইউ (ক্লাস এইট পর্যন্ত) স্কুলে পরিণত হয়। সাতাশ সালে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল

দুশো তিরিশ। এর মধ্যে ছাব্বিশজন ছাড়া বাদবাকী সব ক'টি ছাত্রই ছিল অরফ্যানেজের আশ্রিত। চৌদ্দজন শিক্ষক তখন স্কুলে পড়াচ্ছেন। হেডমাস্টার মৌলভী আবুল কাশিম। স্কুলের লাইব্রেরী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কলকাতার সাব-ডিভিশনাল ইনস্পেকটর অব স্কুলস্ মহম্মদ বসির হোসেন সাতাশ সালে মন্তব্য করেন—"এই পাঠাগারের দশা অতি জীর্ণ। বই আছে মোটে দুশো আশীখানি; এর মধ্যে উর্দু বই নব্বইটি, আরবী ভাষার বই উননব্বইটি ও ইংরেজী একশো একটি।

বসির সাহেবের এই মন্তব্যের ছ' বছর বাদে দেখা যায় স্কুলের আভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। স্কুল কমিটি ন'জনের জায়গায় দশজন সদস্য নিয়ে হয়েছে গঠিত। আর আগের মত এই কমিটি অরফ্যানেজের একজিকিউটিভ কমিটির অধীনস্থ নয়। তবে নতুন সংবিধান বলে অরফ্যানেজের সাধারণ সম্পাদক হলেন এই সমিতির একজন সদস্য। স্কুল কমিটির চেহারা যেমন পাল্টাচ্ছে সেই সঙ্গে স্কুলের চেহারাও ক্রমশ বদলাতে শুরু করেছে। এই পরিবর্তন কতখানি গুণগত বলা মুস্কিল, কারণ তার কোন হদিস আমি পাই নি। তবে সংখ্যাগত পরিবর্তনের যে হিসাব পেয়েছি তাই এখানে তুলে ধরছি। ত্রিশ সালের পর থেকে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ধাপে ধাপে কমে যায়। একত্রিশ সালে যেখানে পড়াত দুশো বিয়াল্লিশটি ছেলে, বত্রিশ সেখানে ছাত্র সংখ্যা দাঁড়াল দুশো চৌদ্দ। পরের বছর আরো কমে গিয়ে হল একশো চুয়াত্তর। সেই সঙ্গে শিক্ষক সংখ্যাও দেখা যায় কমে গেছে স্কুলের। বিশের যুগের চোদ্দজন শিক্ষকের জায়গায় তেত্রিশ সালে এগারোজন শিক্ষক পড়াতেন এই স্কুলে। শিক্ষক সংখ্যা কমে গেলেও স্কুলের ব্যয় কিন্তু কমে নি বরং বেড়েছে যথেষ্ট। তখন মাস গেলে খরচ হয় প্রায় চারশো সত্তর টাকা। অবিশ্যি এর জন্য অরফ্যানেজের দুশ্চিন্তার কোন কারণ ঘটে নি। সরকারী সাহায্যের পরিমাণ পঁচাত্তর টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে দুশো।

পরবর্তী চৌদ্দ বছরে স্কুলের ইতিহাসে বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রতিষ্ঠা ইস্তক এই স্কুল ও অরফ্যানেজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাংলাদেশের তাবৎ প্রধান মুসলিম নেতা—ফজলুল হক, নাজিমুদ্দীন, সুরাবর্দী কেউই বাদ ছিলেন না। কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে পার্টিশনের অভিশাপ শুধু গোটা দেশের ওপরেই নয়, নেমে আসে এই স্কুলের ওপরেও। পৃষ্ঠপোষকদের অধিকাংশই তখন দেশান্তরী অথচ স্কুলের ও অরফ্যানেজের অবস্থা তখন টলটলায়মান। শুধু স্কুলেই পড়ে তখন পৌনে তিনশ ছাত্র। এর মধ্যে অনাথের সংখ্যা ছিয়ানব্বই। এছাড়া গার্লস স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল, রেসকিউ হোম, অনাথ আশ্রম সবকিছু মিলিয়ে এক বিরাট দায়িত্বের বোঝা বহন করতে হচ্ছে অরফ্যানেজকে। তবু একথা ঠিক, আনসারী সাহেব বললেন, স্বাধীনতার আগে লীগ আমলেও স্কুলের বা অরফ্যানেজের এত সমৃদ্ধি ছিল না যা হয়েছে স্বাধীনতার পর।

বিশের যুগে যে অরফ্যানেজের বার্ষিক আয় ছিল মোটে চল্লিশ-প'য়তাল্লিশ টাকা আজ তার আয় তিন লাখের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে। এর মূলে কারণ, বহু বিত্তবান মুসলমান তাঁদের সম্পত্তি দান করেছেন অরফ্যানেজকে। আজ অরফ্যানেজ কলকাতায় ও শহরতলীতে প্রায় গোটা দশেক বাড়ীর মালিক। এই বাড়ীগুলি ভাড়া খাটিয়ে বছরে প্রায় দেড় লাখ টাকা আয় হয় অরফ্যানেজের। বাদবাকী টাকা আসে সরকারী ও বে-সরকারী নিয়মিত ও অনিয়মিত সাহায্য ও দান থেকে। তাতেই এই বিপুল কর্মযজ্ঞের খরচ-খরচা মেটে।

ইতিমধ্যে পঞ্চাশ সালে পুরানো বাড়ীতে স্থান অকুলান হওয়ায় স্কুল তার দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছরের পুরানো ভিটে ছেড়ে ১১ পিটার লেনের একটি ভাড়া বাড়ীতে উঠে যায়। এই বাড়ীতে উঠে আসার তিন বছর বাদে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে একসটেনডেড মিডল স্কুল রূপান্তরিত হয় হাইস্কুলে। চুয়ান্ন সালে স্কুলের প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় অ্যাপীয়র হয়। গত ষোল বছরে এদের প্রায় শতকরা ষাটটি ছেলেই পাশ করেছে।

ফলাফলের দিক থেকে এই স্কুলের রেকর্ড নিশ্চয়ই শহর কলকাতার বহু নামী দামী স্কুলের রেকর্ডের পাশে নিষ্প্রভ মনে হবে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে এই স্কুলের ছেলেরা আসে সমাজের এমন স্তর থেকে যেখানে খাদ্য, আশ্রয় ও বাসস্থানের সামান্যতম সুযোগও জোটে না। অন্য স্কুলের সঙ্গে এই স্কুলের কোন তুলনাই বোধহয় চলে না। কারণ এটি কোন সাধারণ

বিদ্যালয় নয়, বরং আমাদের সমাজের সর্বাপেক্ষা অবহেলিত অনাদৃত শিশুদের একটি পরম নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল।

সেদিক থেকে এই স্কুল অনায়াসে আজ গর্ব করে বলতে পারে, যাদের কথা কেউ কোনদিনও চিন্তা করে নি, সমাজের আবর্জনাকুণ্ডে যাদের ভাগ্য ছিল সমর্পিত সেখান থেকে তুলে এনে আমরাই তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছি জীবনে। আন্সারী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলুন আপনার এই আশ্রম-স্কুলের সেই সব জীবনে প্রতিষ্ঠিত ছাত্রদের নাম যাঁরা একদিন সম্পূর্ণ অনাথ অবস্থায় এই আশ্রমে ঠাঁই পেয়েছিলেন। সসঙ্কোচে যেন পিছিয়ে গেলেন বৃদ্ধ মানুষটি আমার অনুরোধে : তোবা তোবা বলেন কি? নাম ধামের প্রয়োজন কি? হয়তো নাম প্রকাশিত হলে অনেকেই লজ্জা পেতে পারেন। তারপর কি ভেবে বললেন : লজ্জা যদি তাঁরা পানও তবু সবাইকে জানানো দরকার কোন জীবনই অসার্থক নয়। জন্ম যে কুলে বা যে পরিবেশেই হোক না কেন মানুষের ভাগ্য মানুষই গড়ে। তার জন্য প্রয়োজন সামান্য সাহায্য বা সহযোগিতার। এই আশ্রম সেই সাহায্য দানে কখনো কোনদিন কুণ্ঠিত হয় নি। আপনি লিখে নিন—হাওড়া স্টেশনের প্রথম ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার খানসাহেব ফজলুল হক একদিন এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। কলকাতার মৌলানা আজাদ কলেজের অধ্যাপক মজিবুর রহমান, পাকিস্থানের জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনার ডিরেক্টর কাজী আউলাদ হোসেন, সলিসিটর এ রসিদ, ডাক্তার নুরুল হুদা, ডাক্তার মামুদ আলম, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন আব্বাস মিরজা সবাই এই স্কুলেই একদিন পড়েছেন। এ বছর ডবলিউ সি-সি-এস পরীক্ষায় মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হয়েছে আমাদেরই এক প্রাক্তন ছাত্র মহম্মদ আসলাম। বহু ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক, উকিল, বড় বড় সরকারী কর্মচারী এই স্কুল ও অরফ্যানেজের দৌলতে আজ সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধু দুঃখ কি জানেন আজ যাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের অনেকেই নিজ [illegible] এই স্কুলো অরফ্যানেজের প্রাক্তন পরিচালককে দেখলে অতীত পরিচয় বেরিয়ে পড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরিয়ে পালিয়ে যান। আপনাদের পত্রিকার সুযোগে আমি এই অরফ্যানেজের, এই স্কুলের সব প্রাক্তন ছাত্রকেই আহ্বান জানাতে চাই : আপনারা আসুন। ওল্ড-বয়েজ ক্লাব গড়ে তুলে আপনাদের ধাত্রী-জননীকে সাহায্য করুন।

সাহায্য কি শুধু প্রাক্তন ছাত্ররাই করতে পারেন, সরকার পারেন না? যখন দেখি সরকার অন্যান্য সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের জন্য অকাতরে জমি, বাড়ী, অর্থ সাহায্য করেন, তখন কেন এই অরফ্যানেজ ও স্কুলের বেলায় এত কাতর? সরকার কি কখনো খোঁজ নিয়েছেন এদের এত সাধের বেহালা স্কীমের আজ অবস্থা কি? মাঝেরহাট ব্রীজ থেকে নেমে মিন্টের উল্টোদিকে নিউ আলিপুরের গা ঘেঁষে এই অরফ্যানেজের আট বিঘা জমি ও একতলা একটি বিশাল বাড়ী আজ প্রায় পঁচিশ বছর পরে বেওয়ারিশ মালের মত পড়ে আছে। অন্য লোকে তার সুবিধা ভোগ করছে অথচ অরফ্যানেজ বঞ্চিত হচ্ছে তার ন্যায্য অধিকার থেকে।

এই জায়গায় বয়েজ স্কুল, গার্লস স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল, রেসকিউ হোম ও হাসপাতাল, অরফ্যানেজের সবকটি ইউনিটের জন্য স্বতন্ত্র বাড়ী বানিয়ে একটি সুন্দর আশ্রম গড়ে তোলার প্ল্যান ছিল এদের। প্ল্যানমাফিক বাড়ী বানানোর কাজও হয়েছিল শুরু। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে সব ওলটপালট করে দেয়। সরকার সামরিকভাবে ঐ জমি ও বাড়ী দখল করে নেন মিলিটারীর জন্য। চুক্তি ছিল, যুদ্ধ শেষ হওয়ার ছ' মাস বাদেই অরফ্যানেজ তার প্রপার্টি ফেরৎ পাবে।

যুদ্ধ শেষ হল, দেশ স্বাধীন হল, কিন্তু অরফ্যানেজ ফেরৎ পেল না। তারপরে আরো একুশটি বছর কেটে গেছে। বর্তমানে ঐ জমি-জায়গা দখল করে আছেন উদ্বাস্তুরা। বিনিময়ে মাস গেলে সাড়ে যোলশ' টাকা সরকার ভাড়া দেন অরফ্যানেজকে। ভুল হোল, ভাড়া দেওয়ার কথা কিন্তু গত চার বছরে একটি পয়সাও দেন নি গভর্নমেণ্ট।

অরফ্যানেজের বক্তব্য সরকার যখন সকল উদ্বাস্তুরই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছেন, তখন কেন এই কয় ঘর উদ্বাস্তুর সুষ্ঠু পুনর্বাসনের আয়োজন করে এই দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটাবেন না? তাই নিজের বাড়ী-জমি থাকা সত্ত্বেও স্কুল পরবাসী। তবে সম্প্রতি তার সেই প্রবাসদশার অবসান হতে চলেছে। পিটার লেনের ভাড়া বাড়ীটির জায়গায় অরফ্যানেজ গত বছর একটি তেতলা নতুন বাড়ী তুলেছে। এই কারণে গত এক বছর ধরে সি এম ও হাই স্কুল সৈয়দ সালে লেনের পুরোনো ভিটেয় উঠে এসেছে। নতুন বাড়ী, দেখে এসেছি, প্রায় কমপ্লিট। সম্ভবত আগামী মাসেই স্কুল এই নতুন বাড়ীতে উঠে যাবে।

নতুন বাড়ীতে স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা এ-বছর সম্ভবত সাড়ে চারশোরও বেশী হবে। তবে বর্তমানে অনাথের সংখ্যা খুব বেশী নয়। বড়জোর ত্রিশ-বত্রিশ। তার কারণ অতি স্পষ্ট। সি এম ও স্কুলে উর্দু মিডিয়ামে পড়ানো হয়। আর অরফ্যানেজের অধিকাংশ বাসিন্দাই বাঙালী। অতীতের মত আজো অরফ্যানেজ তাদের পড়তে পাঠায় ক্যালকাটা মাদ্রাসা বা অন্যান্য স্কুলে। সমস্ত খরচ-খরচা অরফ্যানেজের।

আজকাল খুব কম অরফ্যান আমাদের স্কুলে পড়লেও, অধিকাংশ ছাত্রই আসছে স্থানীয় অতি দরিদ্র সব ফ্যামিলী থেকে—যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, বললেন স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক একরাম হোসেন মণ্ডল। মণ্ডল সাহেবের বাড়ী বর্ধমানে গলসী থানায় [illegible]। [illegible] বছর এই স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। ম্লান মুখে বললেন, আমাদের স্কুল চলে গ্রান্ট-ইন-এডের টাকায়। বছরে ডেফিসিটের পরিমাণ প্রায় ষোল-সতেরো হাজার টাকা। ফাইনান্সিয়াল ইয়ার শেষ হয়ে এল প্রায় অথচ এখনো মোটে সাত হাজার টাকা পেয়েছি আমরা। বারোজন শিক্ষক কাজ করছেন স্কুলে। [illegible] থেকে দেওয়া হয়। যদি সরকার নিয়মিত সাহায্য না পাঠান, তাহলে এই স্কুলের ভবিষ্যৎ কি হবে বলতে পারেন?

এর জবাব আমি কি দেব?

—সন্ধিৎসু

পরের সংখ্যায় : সাউথ পয়েন্ট স্কুল

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

এদিকে 'রাজারাণী' ভালই চলছিল কিন্তু এর পর তো নতুন বই দরকার। ভূপেনদা তাঁর বইয়ের জন্যে তাগিদ দিচ্ছেন, কিন্তু উপেনবাবু তখনো সেটা বার করতে রাজী হচ্ছেন না। তিনি তখন অন্য ধরনের বই ধরার পক্ষপাতী। ওঁর কথাবার্তায় যা বোঝা গেল তা হচ্ছে উনি কোনো পৌরাণিক বই ধরার পক্ষপাতী। বিশেষ করে বেহুলো-লখিন্দরের কাহিনীর দিকে ওঁর খুব ঝোঁক। স্টারে 'চাঁদ সদাগর' খুব সাফল্যের সঙ্গে চলার জন্যেই বোধহয় ওঁর মাথায় এই আইডিয়াটা এসে থাকবে। অথচ 'চাঁদ সদাগর' করবার উপায় নেই, কারণ ওটা স্টারের কপিরাইট।

আমি তখন একটু ভেবে বললাম—দাঁড়ান, দেখছি।

আমার মনে পড়ে গেলো—অনেকদিন আগে হরনাথ বসুর লেখা 'বেহুলো' নাটক আমরা অভিনয় করেছিলাম অ্যামেচারে কয়েকবার। সে প্রায় ১৯১৮ সালের কথা।

সেই নাটকখানি হল মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগরের' সম্পূর্ণ বিরোধী জিনিস। ঐ স্টারেই অমর দত্ত মশাই এই নাটকখানি অভিনয় করেছিলেন—সেটা অবশ্য অনেকদিন আগের কথা।

আমি করলাম কি—নাট্যকার হরনাথবাবুকেই ধরে তাঁকে দিয়েই অনেক কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে একটা নতুন রূপ দেওয়ালাম। তারপর উপেনবাবুকে সেই নতুন পাণ্ডুলিপি দিয়ে বললুম—পড়ুন এটা এইবারে। নতুন করে লিখিয়ে এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে দর্শকদের কাছে নতুন নাটক বলেই মনে হবে।

উপেনবাবুকে পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনানো হলো। তাঁর খুব পছন্দ হলো। তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন—ঠিক আছে। এইরকম জিনিসই খুঁজছিলাম আমি। দিন, লাগিয়ে দিন।

মেতে গেলাম 'বেহুলা' নিয়ে। শুধু অভিনয়ই করব না—বইখানার প্রযোজনাও করতে হবে আমাকে। সমস্ত দায়িত্ব আমার মাথার ওপর। বইখানা নিজেই নিয়েছি—দুশ্চিন্তা হলো যদি লোকে না নেয়!

আপ্রাণ খেটে তৈরি করতে লাগলুম বইখানাকে। প্রধান ভূমিকা ছিল আমাদের চারজনের। চন্দ্রধর—আমি, লখীন্দর—শরৎ চট্টোপাধ্যায়, বেহুলা—আসমানতারা, মণিভদ্রা—চারুশীলা।

নাটকে 'বেহুলা' নাম-ভূমিকা হলেও প্রকৃত নায়িকা হল মণিভদ্রা। প্রথমে আমি যখন যাই তখন নীহারবালা ছিল এখানে—কিন্তু মাসখানেক পরেই সে চলে গেল এ-মঞ্চ ছেড়ে। তার জায়গায় এলো চারুশীলা। সেই নামল মণিভদ্রার ভূমিকায়।

মণিভদ্রার কথা বিশেষ করে বলছি এই জন্যে যে, ভূমিকাটি নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টি। নাট্যকার মনসার প্রসঙ্গ সামান্যই এনেছেন এ-নাটকে, আসল নাট্যবস্তু গড়ে তুলেছেন মণিভদ্রাকে নিয়ে। মণিভদ্রা হচ্ছে এক পার্বত্য রমণী, নাগপর্বতে সে পালিয়ে যেতে চায় লখীন্দরকে নিয়ে। মণিভদ্রার নৃত্য ছিল একটি—সর্পনৃত্য। বলা বাহুল্য চারুশীলা ভূমিকাটি ভালোই করেছিল।

এ-নাটকে আরও দুটি চরিত্র ছিল—'নেড়া' আর 'নেড়ি'। করতো যথাক্রমে হীরালাল চট্টোপাধ্যায় ও রেণুবালা (সুখা)। এ-চরিত্রও স্টারের 'চাঁদ সদাগরে' ছিল না। তারা নাচে-গানে আর কৌতুক-রসে খুব জমিয়ে রাখত। বেহুলার ভূমিকায় আসমানতারাও খুব নাম করেছিল। চরিত্রটি যদিও পুরোনো প্রচলিত কাহিনী অনুসারেই গড়ে উঠেছিল, তবে নাট্যকারের একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যেতো।

'বেহুলা' নাটকখানির উপক্রমণিকায় নাট্যকার তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ব্যাখ্যা করেছেন। আমি অবশ্য তাঁর প্রকাশিত নাটকের কথাই বলছি। যদিও নাটকটি আমি প্রয়োজনমত অদলবদল করে নিয়েছিলাম অনেক জায়গা নাট্যকারকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েছিলাম—আমাদের অভিনীত পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তাঁর প্রকাশিত নাটকের প্রভেদ অনেক, তবু নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গীর কোনরকম পরিবর্তন আমি করিনি। নাট্যকার এ কাহিনী গ্রন্থনে প্রচলিত মঙ্গলকাব্যগুলিকে অনুসরণ না করে 'ভক্ত'কে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন। 'মনসা'র লোকপালিনী দেবী-ভাবকে কল্পনা করেছেন নাট্যকার, তাঁর কল্যাণময়ী মাতৃমূর্তিকেই মানসচক্ষে দেখেছেন এবং সেইভাবেই গড়ে তুলেছেন বেহুলা চরিত্রটি। এর ফলে এই বেহুলার পরিপ্রেক্ষিতে চন্দ্রধরের চরিত্রও গড়ে উঠেছে ভিন্নতররূপে। নাট্যকার তাঁর নাটকের উপক্রমণিকায় বলেছেন, "বেহুলার অলৌকিক সাধনপ্রণালী দেখিয়াই চন্দ্রধর নিজের পন্থার ত্রুটি বুঝেন এবং সতীর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সতীশক্তির নিকট মস্তক অবনত করেন। সতীরূপে মনসা ও বেহুলা একই সম্পদে দাঁড়াইয়া বেহুলার মহিমা স্বীকার করিয়া চন্দ্রধর মনসার মহিমাই স্বীকার করিয়াছেন। ইহাই আমার ধারণা।"

এর পরে প্রশ্ন থেকে গেল 'চন্দ্রধরের' জটিল চরিত্রটি নিয়ে। 'চাঁদ-সদাগরে'ও যে 'মেক-আপ' করতাম এখানেও প্রায় তাই সামান্য একটু-আধটু এদিক ওদিক করা হোল মাত্র। কিন্তু অভিনয় ঠিক একরকম করা যায়নি কারণ দুজন নাট্যকারের দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন এবং কাহিনীও ঠিক এক নয়, সুতরাং চরিত্রায়ণেও পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। এ নাটকে 'অনকা'র প্রাধান্য তত ছিল না। চন্দ্রধরের চরিত্রের যে অংশটুকু এখনকার নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে, তা হলো তার চরিত্রের শান্ত অর্থাৎ 'ভ্রান্তি' দিক। এখানে চরিত্রানুযায়ী emotion বরং একটু কমই করতে হয়েছিল।

না, দুশ্চিন্তার কিছু রইলো না। লোকে নাটকখানি নিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে আমার

মা নাটকে অরবিন্দের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী

নতুন চন্দ্রধরকেও। সব পত্রিকাতেই সমালোচকরা প্রচুর প্রশংসা করেছিল। এখানে 'স্টেটসম্যান' যা লিখেছিল সেইটি উদ্ধৃত করছি :

Mr. Ahindra Chowdhury, who played the role of Chandradhar or Chand Sadagar kept the audience almost spell-bound....He is second to none in India in the technique of make-up and has established his fame as the 'Indian Lon Chaney'.

দীপালী বলেন সাজসজ্জা, দৃশ্যপট সর্বোপরি প্রয়োজন হয়েছিল তারিফ করবার মতো।

দর্শকদের মুখ চেয়ে এ বইতেও একটি ইল্যুশান সিন রাখতে হয়েছিল—সেটা ছিল একেবারে শেষ দৃশ্যে। দেবতাদের বর ও আশীর্বাদ লাভ করে বেহুলো ফিরে পেলেন মৃত স্বামী লখীনদরকে—এই ছিল দৃশ্যটির বিষয়বস্তু। জলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া, অগ্নির মধ্যে দিয়ে যাওয়া—এসব তো ছিলই, কিন্তু সব থেকে তাকলাগানো ব্যাপার ছিল সেখানে শেষ দৃশ্যে মেদ-মাংস গলে-পচে যাওয়া কঙ্কালটির বদলে উঠে বসলেন লখীনদর পুনর্জীবিত হয়ে।

পরেশবাবু তখন মিনার্ভা ছেড়ে চলে গেছেন, ওখানকার মিস্ত্রীরা মিলে এই ইল্যুশানটি তৈরী করেছিল। এই ট্রান্সফরমেশনের ব্যাপারটা আমি আগে ঠিক ধরতে পারতুম না। এসব ব্যাপারে তখনকার পার্শী থিয়েটার ছিল ওস্তাদ। পরেশবাবুও ওদের কাছ থেকেই শিখেছিলেন। পার্শী থিয়েটারে আমি 'সতী লীলা' দেখেছিলাম দারুণ ইন্দ্রজাল ছিল তাতে। প্রসঙ্গ যখন এসেই পড়ল তখন ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলে নিই। অত্রি মুনির স্ত্রী ছিলেন অনুসুয়া। তাঁর সতীত্বের পরীক্ষা করতেই একদিন দেবতারা এলেন ছদ্মবেশে ওঁর দুয়ারে অতিথি হয়ে। অত্রি মুনি তখন গৃহে ছিলেন না, বাধ্য হয়ে অনুসুয়াকেই অতিথিসম্ভাষণ করতে হলো। পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে ওঁদের আহারে আমন্ত্রণ জানালেন সতী অনুসুয়া।

ছদ্মবেশী দেবতারা বললেন—আতিথ্য গ্রহণ করতে পারি এক সর্তে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে আমাদের সামনে এসে পরিবেশন করতে হবে আহার্য সামগ্রী।

কি সাংঘাতিক অনুরোধ! একদিকে অতিথি—তার উপর দেবতা! অতিথিকে বিমুখ করা মহাপাপ—তাই বাধ্য হয়ে সর্ত মেনে নিতে হল সতী অনুসুয়াকে। তিনি এলেন খোলা চুলের রাশি বুকের ওপর ফেলে দিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে অতিথিরা সব দুগ্ধ পোষ্য শিশু হয়ে গেলেন। সতী ছিলেন ছায়ারূপে অর্থাৎ শ্যাডোতে সেটা না হয় বুঝি—কিন্তু বিরাট বিরাট মানুষগুলো সব মুহূর্তের মধ্যে শিশুতে পরিবর্তিত হয়ে গেল কী করে সেটা কিছুতেই মাথায় এলো না।

পরে আত্মদর্শনেও এই রকম ট্রান্সফরমেশন দৃশ্যে অবাক হয়ে গিছে। আমি 'মন' রাজা—আমিই শেষ দৃশ্যে পরিবর্তিত হয়ে

দেবী ফুল্লরায় কালকেতু বেশে অহীন্দ্র চৌধুরী

যাচ্ছি—আমিই ঠিক ধরতে পারতাম না—কী করে হচ্ছে! আমাকে শুধু বলা হয়েছিল নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে চলে যেতে। আমি তাই করতাম। কিন্তু বুঝতাম না, 'মন' রাজা উধাও হয়ে যেত কি করে?

বেহুলোর শেষ দৃশ্যে এসে অবশেষে ব্যাপারটা বুঝলাম। ওরা যখন 'সিনটা' সেট করতো, তখন আমি উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ্য করতাম।

আসল মায়াটা হতো দুটি জিনিস দিয়ে। বড়ো বড়ো তিন পিস কাঁচ আনা হয়েছিল, আর টিন দিয়ে গোলাকার একটা বস্তু তৈরি হয়েছিল। যেটা লম্বা পাঁচ-ছয় ফুট হবে। এর মাঝখানে লম্বা একফালি ফাঁক থাকতো। যাই হোক জিনিসটা অদ্ভুতভাবে ঘোরানো যেত। টিনের ফালিটার ভিতরে লাগানো থাকতো সারি সারি কয়েকটা বালব, ওপর থেকে নীচে। পিছনে থাকতো কালো পর্দা। এই আলোটা আমার ওপর দিয়ে মিলিয়ে যেতো ধীরে ধীরে। সেই সঙ্গে আমিও মিলিয়ে যেতাম। আর একটি স্থান চিহ্নিত থাকতো, যেখান দিয়ে লখিনদরের আবির্ভাব ঘটতো ধীরে ধীরে। অর্থাৎ তার ওপর ধীরে ধীরে আলোক নিক্ষেপ করা হতো। আর দর্শকেরা এই দৃশ্য দেখে অভিভূত হতো।

যখন বেহুলো অভিনয় চলছে সগৌরবে, সেই সময়েই একদিন শুনলাম, শিশিরকুমার ভাদুড়ী সদলে আমেরিকা যাত্রা করছেন। এর আগে এ সম্পর্কে কানাঘুসো শুনেছি, তবে এবারে শুনলাম যাওয়ার ব্যবস্থা পাকাপাকি। আসছে ১০ই সেপ্টেম্বর তাঁদের শুভযাত্রার দিন।

একদিন মনোরঞ্জনবাবু মিনার্ভায় আমার ড্রেসিংরুমে এসে খুশির সুরে বললেন, আমারও হয়ে গেল অহীনবাবু!

—কি হয়ে গেল?

—আমেরিকা যাওয়া, শিশিরবাবু সব ঠিক করে দিয়েছেন।

আমি একটু রহস্যচ্ছলে বললাম, তাহলে পোশাক আশাক? না কি এই খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী পরেই যাবেন?

মনোরঞ্জনবাবু বললেন, সে সবের জন্যে আমার ভাবনা নেই। বড়বাবু বলেছেন।

আমি আবার বললাম, সে কী! আমেরিকা হল ফ্যাশানদুরস্ত জায়গা, তারপর আপনি হলেন অভিনেতা, ওখানে কি চাঁদনীর তৈরি কোটপ্যাণ্ট পরে যাওয়া চলে?

মনোরঞ্জনবাবু বললেন, নতুন পোশাক করার পয়সা কোথায়? বন্ধুবান্ধবদের বলেছি, তাদের কাছ থেকে প্যাণ্ট আর গলাবন্ধ কোট যোগাড় করে নেবো। যাব, আর অভিনয় করে চলে আসবো।

বুঝলাম ব্যাপারটা। আমি আর এ নিয়ে বেশি কিছু বললাম না। এবারে যাত্রাপর্বের গোড়ার ইতিহাসটা বলি।

১৯২৯ সাল।

সতু সেন এই সময় আমেরিকায় ছিলেন। সেখানে তিনি গিয়েছিলেন রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে কিছু পড়াশুনা এবং হাতে-কলমে কিছু শেখার উদ্দেশ্যে। সেখানে তাঁর সঙ্গে এলিজাবেথ মারবেরী নাম্নী এক ধনাঢ্য মঞ্চানুরাগী মহিলার আলাপ-পরিচয় হয়। এই মহিলার ওদেশে যথেষ্ট নামডাক। এঁরই প্রভাব ও অর্থানুকূল্যে এবং উদ্যোগে মস্কো আর্ট থিয়েটারের মত বিখ্যাত নাট্য-সম্প্রদায়কে আমেরিকায় আনা সম্ভব হয়েছিল। তিনিই সতু সেনকে বলেছিলেন, যে ভারতের এক হিন্দুনাট্যগোষ্ঠীকে আমেরিকায় নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করতে।

এরপরেই সতু সেন আমেরিকা থেকে শিশিরবাবুর সঙ্গে পত্রালাপ করেন। শিশিরবাবুর সম্মতি পেয়ে শ্রীমতী মারবেরী এরিক এলিয়টকে টাকাকড়ি এবং উপযুক্ত ক্ষমতা দিয়ে কলকাতায় পাঠান সব বন্দোবস্ত পাকা করতে। এরিক এলিয়ট নিজে ছিলেন একজন অভিনেতা। তিনি কলকাতায় এসে শিশিরবাবুকে বন্ধুত্বসূত্রে গেঁথে সব বন্দোবস্ত পাকা করলেন, টাকাকড়ি দিলেন এবং বললেন যে ফাইনাল চুক্তিপত্র সই হবে আমেরিকা গিয়ে।

এই কথাটা শুনেই আমার মনে হল—এটা কি রকম হল? ওখানে গিয়ে যদি কোন কারণ ওঁদের পছন্দ না হয় তাহলে এতগুলো লোক ফিরে আসবে কি করে? এতো দেখছি এতগুলো লোক যাচ্ছে শুধু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। ওখানে কি হবে কেউ কিছুই জানে না।

শিশির সম্প্রদায় আমেরিকা যাবার আগে ওখানকার বিভিন্ন কাগজে কি রকম বিবরণ বেরিয়েছিল তার একটু নমুনা দিচ্ছি তুলে:

The Hindus are coming

"He has secured a company of beautiful nautch girls, maidens trained in the service of religion whose homes have been in the temples of India and who, save for some special dispensation which Bhadury must have arranged, would inevitably suffer loss of caste for leaving their Gods behind......Many of these wonderful Nautch girls whom Bhaduri is bringing to America come from Benares, where it has been their task to perform twice daily before their idols for the atonement of their own souls and then in their intercessions through the rhythm of religious dancing for the sins of others.

এই দলে ছিলেন সর্বসাকুল্যে ২৩ জন যথা: শিশিরকুমার, প্রভা, কঙ্কাবতী, সরলা (বেঁাকি), পরিমল, বেলারাণী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তারাকুমার ভাদুড়ী, অমলেন্দু লাহিড়ী, শৈলেন চৌধুরী, রাধাচরণ ভট্টাচার্য রমেন চট্টোপাধ্যায় (দেবু), বেচা চন্দ্র, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ বসু, পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিশিরবাবুর খাসচাকর ভিখা।

শিশিরবাবুরা দুটি দলে যাত্রা করলেন—শিশিরবাবু মেয়েদের নিয়ে সাতজন গেলেন ট্রেনে করাচী হয়ে আর বাকী সকলে খিদিরপুর থেকেই জাহাজে উঠলেন ১০ সেপ্টেম্বর। যাবার আগে বহু সংস্থা থেকে শিশির সম্প্রদায়কে অভিনন্দন জানানো হল, স্টারে এক বিরাট সভায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায়ের সভাপতিত্বে অশোক শাস্ত্রী মশায় সংস্কৃতে অভিনন্দন পাঠ করলেন। হাওড়া স্টেশনে তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে সে কি বিরাট জনতা। প্রত্যেকেই পুষ্পমাল্যে ভূষিত করলেন শিশিরকুমার ও সম্প্রদায়কে। মনে আছে সেদিন গাড়ীতে এত ফুলের মালা জড়ো হয়েছিল যে কম্পার্টমেণ্ট বোঝাই হয়ে গেল। শিশিরবাবু তখন কামরার ছাদের ওপর সেগুলো তুলে দিলেন।

তাঁরা নিউইয়র্ক পৌঁছালেন ২৫শে অকটোবর অর্থাৎ পুরো ৪৫ দিন লাগল জাহাজে যেতে।

নিউইয়র্কে পৌঁছে প্রচারের গুণে শিশির সম্প্রদায়কে এমন একটা স্তরে ওঠানো হয়েছিল যে সেখানে সিটি হলে ডেপুটি মেয়রের পৌরোহিত্যে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হল। এত বিরাটভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল যে সে সম্মান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও পাননি সেখানে। রবীন্দ্রনাথ সে সময় নিউইয়র্কেই ছিলেন। অসুস্থতাবশতঃ সে সম্বর্ধনা সভায় তিনি যোগ দিতে পারেননি। স্থানীয় বিল্টমোর

থিয়েটারে ২৮ অকটোবর উদ্বোধনের দিন ধার্য হল। প্রত্যেকটি আসন আগে থেকেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। আসনগুলির সর্বনিম্ন মূল্য ছিল ১২ ডলার অর্থাৎ তখনকার দিনে প্রায় ৩৬ টাকার মতো।

এদিক দিয়ে তো সব ঠিকই হলো। কিন্তু বিপদ বাধলো ড্রেস রিহার্সালের সময়।

শ্রীমতী মারবেরি তো অভিনয় দেখে, অভিনেতা, অভিনেত্রীদের দেখে চটে লাল। অভিনেতাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন যাঁরা কোনদিন স্টেজে নামেননি—তাঁরা স্টেজে দাঁড়িয়ে রীতিমত কাঁপছিলেন একমাত্র শিশিরকুমার ও প্রভা দেবী ছাড়া আর কারুর অভিনয়ই মিস মারবেরীর পছন্দ হল না। তিনি চুক্তিপত্রে সইই করলেন না এবং কোনোরকম টাকাকড়ি দিতেও অস্বীকার করলেন।

এ'রা তো অকূল পাথারে পড়লেন। তখন সতু সেন বহু চেষ্টার পর সাতদিনের শো করবার একটা বন্দোবস্ত করলেন—এবং সে সমস্ত খরচা বহন করলেন ইরা ক্যাম্পবেল নাম্নী আর একজন মার্কিন মহিলা। কিন্তু তার আগে নিউইয়র্ক থেকেই সংগ্রহ করতে হোল ব্যালে গার্লদের। এদের শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলেন রাধাচরণ ভট্টাচার্য। দৃশ্যপটাদি সব জাহাজে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার ওপর মাপেও ছোট হল। সুতরাং সেগুলো ওখানে আবার নতুন করে আঁকাতে হোল।

এই সব বন্দোবস্ত করতে এবং নর্তকীদের শেখাতে প্রায় মাস তিনেক সময় চলে গেল—তারপর জানুয়ারী মাসে একটি থিয়েটারে সাতদিনের জন্য 'সীতা' অভিনয় হোল। তাতে সংবাদপত্রে শিশিরকুমার ও প্রভার কিছু কিছু সুখ্যাত বেরিয়েছিল।

তারপর চুপি চুপি তাঁরা ভারতবর্ষে ফিরে এলেন প্রায় ছ'মাস পরে। জাহাজে কাটল তিনমাস, আমেরিকার বসে বসে কাটল তিনমাস—অভিনয় হোল মাত্র সাতদিন।

সেই সময় আর একজন ভারতীয় শিল্পী তখন সারা ইয়োরোপ ও আমেরিকায় নিজের নৃত্যকলা প্রদর্শন করে প্রতীচ্যবাসীদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন—তিনি হচ্ছেন উদয়শঙ্কর। সুতরাং এক ভারতীয় শিল্পীর গৌরবে যেমন আমাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তেমনি আবার শিশিরবাবুর বেহিসাবী ও অব্যবসায়ী বুদ্ধির ফলে লজ্জা ও অপমানের কলঙ্ক যেন আমাদেরও মুখে এসে লাগলো।

যদিও আমার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে এই আমেরিকা সফরের কোনো যোগাযোগ নেই, তবু একই পেশার শিল্পী আমরা—একের কলঙ্কের কালি অন্যের গায়ে এসে লাগে। কোনো বিশেষ শিল্পীর অপমান নয়, সমগ্র দেশের, সমগ্র জাতির অপমান। আমাদের এতবড় আশার মূলে কুঠারাঘাত করা হলো—এইখানেই যা ক্ষোভ বা অভিমান।

আমি আবার আমার নিজের কথায় ফিরে আসি। 'বেহুলা' পূজার কিছু আগে খোলা হল এবং তা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে চলতে লাগল। অবশ্য এই সঙ্গে মিশরকুমারী, আলমগীর, আত্মদর্শন প্রভৃতির সঙ্গে মাঝে মাঝে প্রতাপাদিত্যও হতো। এতে আমি করতাম ভবানন্দ।

তারপর আবার বড়দিন এসে পড়ল—চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী নতুন নাটক খোলা দরকার। এইবার ভূপেনদার 'লক্ষ্মীলাভ'-এর পাণ্ডুলিপি যা অনেকদিন থেকে উপেনবাবুর কাছে পড়েছিল, সেখানি বার করে দিলেন। যদিও নাটকখানি দেশাত্মবোধক তবু প্রথমে এর নাম ছিল "গুণ্ডা-কি গুণ্ডা?" তারপর হলো 'লক্ষ্মীলাভ'। আমি ভূপেনদাকে প্রথমেই বললাম—দাদা, বইখানির নামটা বদলানো দরকার।

ভূপেনদা বললেন—কি নাম দেওয়া যায় বলো দেখি?

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম : 'দেশের ডাক' কেমন লাগে?

ভূপেনদা সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলেন, বললেন—খুব ভাল, এইটাই থাক।

'দেশের ডাক' মঞ্চস্থ হল মিনার্ভায় ডিসেম্বর ১৯৩০। বইখানি সত্যিই খুব জমেছিল, প্রত্যেকের অভিনয়ও হয়েছিল চমৎকার। ভূমিকালিপি ছিল এই রকম : গুণধর—আমি, কানাইলাল— শরৎ চট্টো, গোপীনাথ—রঞ্জিত রায়, পরেশ—গণেশ, অদ্ভুতকুমার—ব্রজেন সরকার, নিরঞ্জন—সুরেন রায়, লছমী—আঙ্গুরবালা, সুনীতি—আসমান, ভন্ডুল—রেণুবালা।

এরপর প্রায় মাসছয়েক আর কোন নতুন বই ধরা হলো না। পরবর্তী নাটক মিনার্ভা কর্তৃপক্ষ যা ধরলেন, সেটি হলো শরৎচন্দ্র ঘোষের 'অভিজাত'। শরৎবাবু নতুন নাট্যকার, এর আগে তাঁর 'জাতিচ্যুত' নামে একটি নাটক মিনার্ভাতেই অভিনীত হয়েছিল। সে নাটক সব দিক থেকেই সফল নাটক, যার জন্যে উপেনবাবু একটু বেশি খাতিরও করতেন।

যাই হোক, 'অভিজাত' নাটকটি বেশ উঁচুদরের হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ দর্শকের কাছে এ নাটক সমাদর পেল না। তবে নাট্যরসিক এবং বিদগ্ধ সমাজ এই নাটকটি সম্পর্কে উচ্চ অভিমত ব্যক্ত করলেন।

অভিজাত অভিনীত হয় ১৩৩১ সালের জুন মাসে। এর বিশেষত্ব ছিল এক সেটে সমগ্র নাটক অভিনীত হতো। চার অংকে এই সেটের কিছু রকমফের হতো। প্রথমে আভিজাত্যের চরম দিকটা দেখানো হতো, এমনি করে পর্যায়ক্রমে শেষ অংকে দেখানো হতো দারিদ্র্যের চরম অবস্থা।

একদিন সিন-সিফটার প্রথম দৃশ্যের ঝাড়লণ্ঠনটি শেষ দৃশ্যে সরিয়ে নিতে ভুলে গিয়েছিল। প্রতিদিনই সেটি সরানো হতো, কিন্তু যে কারণেই হোক সেদিন ভুল হয়েছিল। এই ভুলটা চোখে পড়লো স্বর্গত নাট্যসমালোচক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের। তিনি এই ঘটনা নিয়ে ফলাও করে লিখলেন 'নাচঘর'এ। টিপ্পনী কাটলেন প্রযোজকের বিরুদ্ধে। এই টিপ্পনীটা আমাকেই লক্ষ্য করে করা হয়েছে, তা বুঝতে বাকি রইলো না। যদিও প্রযোজক হিসেবে নিজেকে কোথাও আমি জাহির করিনি। যদিও প্রযোজকের দায়িত্বটা যে আমারই ছিল, তা অস্বীকার করি না।

'অভিজাত'-র ভূমিকালিপি ছিল এই রকম : রুদ্রপ্রতাপ —অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রশান্ত —শরৎ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, উদয়—গণেশ গোস্বামী চুণীলাল — ব্রজেন সরকার, অনুরাধা—চারুশীলা, চন্দ্রা — আঙ্গুরবালা, সর্বাণী—আসমানতারা।

এই অভিজাত সম্পর্কে তখনকার শিশির লিখেছিলেন, 'প্রযোজনার দিক দিয়া নাটক একেবারে নিখুঁত হইয়াছে বলা যায়। যে ধরনের নাটক অদ্যাবধি রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়া আসিতেছে, অভিজাত ঠিক সে ধরনের নাটক নয়।'

ভগ্নদূত লেখেন, 'আভিজাত্যাভিমানী রুদ্রপ্রতাপের সবখানি মহিমাই তিনি বজায় রেখেছেন সর্বতোভাবে। তাঁর অভিব্যক্তিগুলি সর্বত্রই অতি সুন্দর। স্ত্রীভূমিকার মধ্যে আসমানতারার সর্বাণী সকলের আগে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী চারুশীলার অনুরাধা ও আঙ্গুরবালার চন্দ্রাও ভালোই হয়েছে।'

এরপর একদিন 'অভিজাত' অভিনয় শেষ হবার পরই আমি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম। কদিন আগে থেকেই জ্বর-জ্বর ভাব হয়েছিল। ভেবেছিলাম, যাহোক করে চালিয়ে যাবো। কিন্তু 'অভিজাত' শেষ হতে মনে হলো, এরপর প্রতাপাদিত্যে ভবানন্দ করতে পারবো না। শরীর এতোই দুর্বল। কর্তৃপক্ষকে জানালাম সেকথা।

কর্তৃপক্ষ বললেন, কিন্তু করবে কে! আর দর্শকরা কি শুনবে।

বললাম, ভাবনার কিছু নেই, আমি হীরালাল দত্তকে অনুরোধ করছি।

যা হোক কর্তৃপক্ষ রাজী হলেন। কিন্তু সকলের চিন্তা—আমি ভবানন্দ করবো বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, দর্শকরা অন্যের ভবানন্দ দেখবে কিনা। ভাবলাম, দেখা যাক কী হয়।

কিন্তু হীরালালবাবু তো এখানে নেই। তিনি থাকেন বৌবাজারে। আমি তাঁকে চিঠি লিখে অনুরোধ করে পাঠালাম। যেন পত্রপাঠ চলে আসেন।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, হীরালালবাবুই অরিজিন্যাল ভবানন্দ। আমার আগে তিনিই এই চরিত্র অভিনয় করতেন। এবং ভালোই করতেন।

হীরালালবাবু আসতে তাঁকে অনেক বলে কয়ে রাজী করালাম। তারপর হীরালালবাবুকে মেক-আপে বসিয়ে মঞ্চের মাইক থেকে ঘোষণা করা হলো, যে আজ আমার অসুস্থতার জন্যে হীরালাল দত্ত অবতীর্ণ হবেন ভবানন্দের ভূমিকায়।

কিন্তু বিপদ হলো বেরোবার মুখে। সিঁড়ির নীচেই দেখলাম বেশকিছু মানুষের ভিড়। ছোটখাটো জনতা বললেও ভুল হবে না। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা এখানে ভিড় করেছেন কেন?

(ক্রমশঃ)

চিত্রশিল্পে মিকেলানজেলো বুয়োনারতি

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

রেনেসাঁস যুগের দুই জ্যোতিষ্ক লিওনার্দো-দা-ভিন্‌চি এবং মিকেলান্‌জেলো বুয়োনারতি। চিত্রশিল্পের ইতিহাসে দুই জ্যোতির্ময় নাম প্রায় অবিচ্ছেদ্যভাবে উল্লেখিত। অথচ সমকালের, সমসাধনার দুটি মানুষের মধ্যে যতখানি বৈপরীত্য থাকা সম্ভব, উভয়ের মধ্যে তা ছিল।

বয়সে মিকেলানজেলো (১৪৭৫—১৫৬৪ খৃঃ) লিওনার্দোর চেয়ে তেইশ বছরের ছোট এবং লিওনার্দোর মৃত্যুর পর তিনি আরো পঁয়তাল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। লিওনার্দোর মত তাঁরও জন্ম স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারে। তাঁর পিতা ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। লিওনার্দোর পিতার মত তাঁর পিতাও চেয়েছিলেন যে, তিনি গ্রীক ও লাটিন শিখবেন এবং কোন 'সম্মানিত পেশা' গ্রহণ করবেন। কিন্তু সেই দুটি বালকই অমৃতের বার্তা নিয়ে এ-পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাই চিরাচরিত পথ তাঁদের নয়। অতএব লিওনার্দোর পিতার মতই মিকেলান্‌জেলোর পিতা বালক পুত্রের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে ফ্লোরেন্‌সে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে ডমেনিকো গিয়ারলান-দোয়ার কাছে তাঁর শিক্ষানবীশী শুরু হয়।

লিওনার্দো ছিলেন বিলাসী, আনন্দময় জীবনের পক্ষপাতী। পারিবারিক জীবনের সঙ্গে তাঁর প্রায় কোন সম্পর্কই ছিল না। দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরেছেন, অথচ কোন দেশকেই আপন করে নেননি। এমনকি স্বদেশের বিরুদ্ধে তিনি সীজার বর্জিয়ার মত পিশাচের সৈন্যদলে যোগ দিতে কুণ্ঠিত হননি। শিল্প ছাড়াও বিজ্ঞানের বিবিধ অনুশীলনে উৎসাহী। বিশ্ব-প্রকৃতির অতল অন্তরে নিহিত রহস্য উদ্ঘাটনই ছিল তাঁর মৌল অন্বীষ্ট। তিনি যদি তাঁর সেই অনন্ত জিজ্ঞাসা ও সংশয় নিয়ে উনিশ শতকে বেঁচে থাকতেন, তবে সম্ভবত তিনি ডারুইনপন্থী অজ্ঞাবাদী হতেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের কাছে শিল্পসাধনা অনেক সময়েই গৌণ হয়ে গেছে। জীবনে প্রতিষ্ঠা তাঁর পক্ষে ছিল প্রায় অনায়াসলভ্য। দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া, ঘটনাচক্র নয়, নিজের খেয়াল ও দীর্ঘসূত্রতাই তাঁর সাফল্যের পথে বাধাসৃষ্টি করেছে।

কঠোর কৃচ্ছ্রসাধক মিকেলানজেলোর কাছে শিল্প ছিল অননাধ্যান। লিওনার্দোর প্রায় অনায়াসলব্ধ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয় তিনি যেন ভাগ্যের হাতে নিষ্ঠুর ক্রীড়নক। সারাটা জীবন ধরে এত জবরদস্তি, প্রবঞ্চনা ও উৎপীড়ন সহ্য করার পরেও একজন মানুষ যে কি করে অমন অনুপম শিল্পসৃষ্টি করতে পারেন, তা ভেবে কোন কূল পাওয়া যায় না। জীবনসায়াহ্নে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে গেছেন, "চিত্রশিল্প ভাস্কর্য, শ্রম ও সৎ বিশ্বাসই আমার সর্বনাশের কারণ। এর চেয়ে ভালো হোত যদি আমি ছোটবেলা থেকে গন্ধকের দেশলাই বানাতে শিখতাম। শিল্পসাধনার প্রতিকূল এই অকালকে ধিক!" লিও-নার্দোর মত তিনিও ছিলেন আমৃত্যু অকৃতদার। কেউ তাঁকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিতেন, "আমার পরিণয় হয়েছে শিল্পের সঙ্গে, তাঁর জ্বালাতেই আমি অস্থির। এরপর আবার বন্ধন?" তবু প্রকৃতপক্ষে তিনি লিওনার্দোর মত সর্ববন্ধনছিন্ন, সাংসারিক দায়দায়িত্ব বিরহিত ছিলেন না। আমৃত্যু তাঁকে একটি বিরাট, অকর্মণ্য যৌথ পরিবারের ভার বহন করতে হয়েছে। স্বীয় জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে জীবনপণ করেছেন। উৎপীড়ন, তিক্ততা ও সহস্র বিরক্তির মধ্যেও ধর্মবিশ্বাস অটুট রেখেছেন।

লিওনার্দোর সঙ্গে প্রতিভার তুলনায় সাধারণত চিত্রশিল্পী মিকেলানজেলোর কথা ভাবা হয়। কিন্তু মিকেলানজেলোর প্রথম পরিচয় হচ্ছে যে, তিনি জগতের শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর। যতবার তিনি তুলি ধরেছেন, প্রায় ততবারই তা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জবর-দস্তিতে বাধ্য হয়ে। অন্ততপক্ষে তাঁর শ্রেষ্ঠ-তম চিত্রশিল্প সম্পর্কে তা প্রযোজ্য। একবার তিনি বলেছিলেন, "লিওনার্দো ভিন্‌চি লিখেছেন যে, চিত্রশিল্প ভাস্কর্যের চেয়ে মহত্তর। তিনি ভাবেন যে, অন্য যত বিষয় তিনি লিখেছেন, সেই সব বিষয়ের মত চিত্রশিল্প সম্পর্কেও তিনি পারদর্শী। আরে আমার দাসীও যে ওর চেয়ে ভালো লিখতে পারে।" আরেকবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে-ছিলেন, "যতক্ষণ না হাতে ছেনী থাকে, ততক্ষণ আর কিছুই ভালো লাগে না।" প্রকাশ মাধ্যমের ঐ অগ্রাধিকার দানের ঐকান্তিকতার পরিণতিতে ঐ দুই শিল্প-নায়কের চিত্রসৃষ্টিতেও একটা প্রকৃতিগত প্রভেদ বর্তমান। লিওনার্দোর কল্পনাপ্রসূত নরনারীরা সুস্মিত, ললিত, রহস্যালোকচারী, মায়াপরিবেশবিহারী। আর মিকেলানজেলোর সবল তুলির টানে যারা মূর্ত হয়েছে, তারা প্রবল—সুঠাম, পেশীহিল্লোলিত। বস্তুত-পক্ষে, তিনি তুলি দিয়ে ভাস্কর্যমনকে বিকশিত করে তুলেছেন এবং বলে গেছেন, "চিত্রশিল্পে যদি ভাস্কর্যের গড়নকৌশল ও নিটোলতা আসে, তবে তা হয় অপরূপ। কিন্তু ভাস্কর্য যদি চিত্রাংকনের কৌশল অনু-করণ করে, তবে তা হয় কদর্য।" লিওনার্দো যে মহাবিশ্বের রহস্যোদ্ঘাটনে তন্ময় ছিলেন সেখানে মানুষ শুধু প্রাসঙ্গিক আর রেনেসাঁসের যুগবিশ্বাসে প্রবল প্রত্যয়ী মিকেলানজেলোর কাছে মানুষ বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্র। কিন্তু তবু মিকেলানজেলোর সৃষ্ট মানুষ কোন বিশেষ গ্রহলোকবাসী নয়। তাদের কোন পরিবেশ নেই। তাদের ঘিরে কোন আবহাওয়া নেই। তাদের ওপর কোন বিচিত্র আলো প্রতিফলিত হয় না। তারা অসংবৃত, স্বয়ংপ্রকাশ, পুরুষপ্রধান।

দুই মহাশিল্পীই জানতেন যে, তাঁরা যতবড় প্রতিভাধরই হোন না কেন, তাঁদের সৃষ্টি কখনোই তাঁদের কল্পনাকে প্রমূর্ত করতে পারবে না। লিওনার্দো মনে করতেন যে, চিত্রশিল্প হচ্ছে শিল্পীর অন্বীষ্টের অতিনির্দিষ্ট, অতি নির্ধারিত বিবৃতি। তাই কোন চিত্র সম্পূর্ণ করতে তাঁর ছিল অত দ্বিধা। অপরদিকে মিকেলান্‌জেলো চিত্র-শিল্পকে কোনদিন তাঁর প্রধানতম প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেননি। তার কারণ লিওনার্দোর ধারণার বিপরীতভাবে তিনি চিত্রশিল্পের দ্বারা কোন কিছুকে অতি-নির্ধারিত ও অতিনির্দিষ্ট করা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন না।

দুই শিল্পীরই আরেক ব্যসন ছিল লেখা। লিওনার্দো অবিশ্রান্তভাবে তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সিদ্ধান্ত ও অনুমান যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মিকেলান্‌জেলো লিখেছেন কবিতা। মৃত্যুর বহু পরে প্রকাশিত তাঁর কবিতাগুলি আবেগে গভীর ও মর্মস্পর্শী।

সুতরাং এ-অনুমান দুরূহ নয় যে, মহামানবের পদরেণুপূত পুষ্পনগরী ফ্লোরেন্‌সের পথে পথে, কাজে কিম্বা অবসরে যখন সেই দুই বিপরীত চরিত্র শিল্পনায়কের দেখা হয়েছে, তখন সে-মিলন খুব প্রীতিমধুর হয়নি। একবার ফ্লোরেন্‌-সের পথে যেতে মিকেলান্‌জেলো দেখলেন যে, লিওনার্দো একদল নাগরিকের সঙ্গে দান্তের কাব্যপ্রসঙ্গে আলোচনা করছেন। তাঁকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে লিওনার্দো বলে উঠলেন, "আপনারা যে-বিষয়টি আলোচনা করছেন মিকেলান্‌জেলো তা আপনাদের ব্যাখ্যা করে দেবেন।" লিওনার্দোর বক্তব্যের মধ্যে সম্ভবত আন্তরিকতা ও সম্প্রীতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু সন্দেহ-

পরায়ণ ও ক্ষুব্ধচিত্ত মিকেলানজেলো হঠাৎ অপমানিত বোধ করলেন। তিনি তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, "আপনিই ব্যাখ্যা করে দিন। আপনি—যিনি একটি ঘোড়ার ব্রনজের মডেল তৈরী করে তাকে সম্পূর্ণ না করেই চলে এসেছেন। আপনাকে ধিক!"—মিলানের ডিউকের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে লিওনার্দোর অসম্পূর্ণ রণঅশ্বের প্রতিই মিকেলানজেলোর ঐ ইঙ্গিত।

দুই

গিয়ারলান্দোয়ার কাছে শিক্ষানবীশীর প্রারম্ভেই মিকেলানজেলো তাঁর উদীয়মান প্রতিভার দ্যুতিতে সকলকে এমনি চমৎকৃত করলেন যে বছর ঘোরবার আগেই ফ্লোরেন্সের ডিউক পরিবারের প্রধান লরেনজো দি ম্যাগনিফিসেনটের কাছে পনের বছর বয়সে একটি বৃত্তি পেয়ে গেলেন। বৃত্তির শর্ত ছিল তদানীন্তন ইতালীর তরুণ কলাশিল্পীদের কাছে স্বপ্নের মত। তাঁরা ডিউকের প্রাসাদে থেকে ডিউকের সংগৃহীত গ্রীক ও রোমান যুগের অমর শিল্প-নিদর্শনগুলি সমীক্ষণ এবং তাঁর পাঠাগার ও মিউজিয়ামের অবাধ ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। তাঁদের শিক্ষাগুরু হবেন ডিউক দরবারের কোন অভিজ্ঞ শিল্পী। প্রতিদানে ডিউক তরুণ শিক্ষার্থীর অভিনিবেশ ছাড়া আর কিছু চান না।

সেই নতুন শিক্ষার্থীর কাছে ডিউক প্রত্যাশার এত অধিক পেয়েছিলেন যে, তাঁকে তিনি সাগ্রহে পরিবারের একজন করে নিয়েছিলেন। তাই প্রাসাদের ভোজনাগারে তরুণ মিকেলানজেলো প্রতিদিন ফ্লোরেন্সের শ্রেষ্ঠ মানুষদের দেখা পেতেন। শুনতেন গ্রীক দর্শন, রোমান শিল্প ও লাতিন কাব্যের আলোচনা। দেখতেন, তদানীন্তন চিন্তানায়ক ও রাষ্ট্রচালকদের আচার-আচরণ। কিন্তু সেই পরিবেশ তাঁর মৌল চরিত্রকে এতটুকুও প্রভাবান্বিত করেনি। বস্তুত আমৃত্যু বাইরের কোন প্রভাবই তাঁর জেদ, অনুসন্ধিৎসা স্পর্শকাতরতা এবং সেই সঙ্গে এক আশ্চর্য, অনন্য সাবলীল মহত্বকে পরিবর্তিত ও ক্ষুণ্ণ করেনি। শুধু একটি ঘটনাই তার ব্যতিক্রম।

মেডিসি প্রাসাদে থাকাকালেই মানুষের শরীর-সংস্থান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানে লিওনার্দোর সমকক্ষ হবার প্রতিজ্ঞায় তিনি শবব্যবচ্ছেদ শুরু করলেন। জনৈক যাজককে কাঠের ক্রুশ সরবরাহ করার বিনিময়ে তিনি মৃতদেহ সংগ্রহ করতেন। তারপর এক গীর্জার ছোট কুঠিতে বসে তিনি সারারাত্রি সেই দেহগুলি ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনমত স্কেচ করে নিতেন। সেই পূতিগন্ধময় কাজে শীঘ্রই তাঁর শরীর ভেঙে পড়লো। পানাহারে অরুচি ধরে গেল।

সেই সময় একটি বেদনাদায়ক ঘটনা তাঁর মুখকে চিরদিনের জন্যে বিকৃত করে দিল। একদিন তিনি ও তাঁর সমবয়সী শিল্পশিক্ষার্থীরা সদলে চার্চ অব দি কারমাইনে মসাচ্চোর ফ্রেসকো অঙ্কন-পদ্ধতি দেখতে গিয়েছিলেন। সম্ভবত স্বভাবসুলভ অসহিষ্ণুতার জন্যে তিনি তাঁর সহপাঠী টরিজিয়ানো নামে এক উদ্ধত ও বেপরোয়া চরিত্রের বালককে কিছু বলেছিলেন। টরিজিয়ানো আচম্বিতে তাঁর নাকের ওপর এক ঘুষি বসিয়ে দিলেন। টরিজিয়ানো নিজেই সে-সম্পর্কে লিখে গেছেন, "বাল্যে আমি ও মিকেলানজেলো বুয়োনারতি কারমাইনের গীর্জায় মসাচ্চোর অঙ্কন-পদ্ধতি শিক্ষা করতে যেতাম। মিকেলানজেলোর স্বভাব ছিল সতীর্থদের নিয়ে পরিহাস করা। একদিন সে যখন আমাকে বিরক্ত করছিল, তখন হঠাৎ আমার মেজাজ বিগড়ে গেল এবং আমি তার নাকে এক ঘুঁসি বসিয়ে দিলাম। মনে হলো বিস্কুটের মত তার নাকের হাড়টা আমার মুঠোর নীচে ভেঙে গেল। আমার সেই মারের দাগ সে কবর পর্যন্ত বয়ে বেড়াবে।"—এই একটি ঘটনাই মিকেলানজেলোর চরিত্রের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বয়সের তুলনায় অনেক বেশি পক্ক অভিজ্ঞ ও চিন্তাগম্ভীর হয়ে মিকেলানজেলো বয়োবৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলেন। মাত্র আঠার বছর বয়সে শ্রেষ্ঠতম জীবিত ভাস্কর হিসেবে তাঁর খ্যাতি দূরপ্রসারী হয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু মর্মর পাথরের চাঙড় শুধু ছেনী ও হাতুড়ির আঘাতে মানবমনের হর্ষ বিষাদ, উল্লাস ও সতর্কতাকে যেভাবে তিনি মূর্ত করে গেছেন সে আলোচনা এখানে বিষয়বহির্ভূত। ইতিমধ্যে মিকেলানজেলোর উদার ও গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক লরেনজো মারা গেলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র। সেই নির্বুদ্ধি ব্যক্তিটি মিকেলানজেলোকে দিয়ে তুষারের প্রতিমূর্তি গড়াতে শুরু করেন। উত্যক্ত ও বিক্ষুব্ধ শিল্পী ফ্লোরেনস্ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে সিদ্ধান্ত করলেন। তদুপরি এক জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, মেডিসি পরিবারের পতন আসন্ন। মিকেলানজেলোর সংস্কারগ্রস্ত মন নিদারুণ সংশয়াপন্ন হয়ে উঠলো। তিনি বোলগনায় পালিয়ে গেলেন। কিন্তু বছর না ঘুরতেই তিনি আবার ফ্লোরেনসে ফিরে এসে মেডিসি পরিবারের আরেকটি শরিকের অধীনে কাজ নিলেন। সেই সময় ভোগবিলাসের বিরুদ্ধে রুদ্র সন্ন্যাসী সাভোনারোলার বাণী তাঁকে আকৃষ্ট করতে থাকে।

কয়েক বছরের মধ্যেই মিকেলানজেলোকে আবার ফ্লোরেন্স ছেড়ে রোমে যেতে হোল। এবার উদ্দেশ্য আয়ের পথ বাড়ানো। বুয়োনারোতি পরিবারে অর্থসংকট দেখা দিয়েছে। সেই সংকট সমাধানকল্পেই তিনি রোমে গেলেন। সেখানে কয়েকটি অবিনশ্বর ভাস্কর্যের দ্বারা তিনি দিগবিজয়ী খ্যাতির অধিকারী হলেন। কিছুকাল পরে যখন তিনি আবার ফ্লোরেন্সে ফিরে এলেন, তখন গীর্জা কর্তৃপক্ষ, সামন্তপ্রভু, নগরশাসক ও ধনপতিরা তাঁকে প্রভূত বায়না দিতে উন্মুখ। সব কাজই ভাস্কর্যের। অবশ্য এক একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম হয় যখন নগরীর গ্রানড কাউনসিল চেমবারের দেওয়াল চিত্রণে তাঁকে ও লিওনার্দো-দা-ভিনচিকে আহ্বান করা হলো। সারা ইতালী সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ দুই শিল্পীর প্রতিযোগিতা দেখবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁদের কেউ সে-কাজ শেষ করতে পারলেন না। রোম থেকে পোপ মিকেলানজেলোকে ডেকে পাঠালেন।

রোমে পোপের আসনে তখন যুদ্ধবাজ দ্বিতীয় জুলিয়াস। শিল্পীদেরও তিনি সৈনিকদের হুকুম দিয়ে কাজ করাতে অভ্যস্ত। কিন্তু মিকেলানজেলো তো হুকুম-তামিলে-কৃতার্থ সাধারণ শিল্পী নন। পোপ তাঁকে জানালেন যে, তিনি সেনট পীটার্স গীর্জার অভ্যন্তরে তাঁর উপযুক্ত একটি সমাধি নির্মাণ করাতে চান। মিকেলানজেলো পোপের অভিপ্রায় অনুযায়ী একটি পরিকল্পনা তৈরী করলেন। দেখা গেল, তদানীন্তন সেনট পীটার্সের পক্ষে সেই পরিকল্পিত সমাধি হবে অনেক বড়। নির্বিকার চিত্তে, যেন একটি বস্তি অপসারণের হুকুম দিচ্ছেন,—এইভাবে পোপ সেনট পীটার্স গীর্জাটি ভেঙে দেবার হুকুম দিলেন। পোপের সেই অবিশ্বাস্য অবিমৃষ্যকারিতায় শিল্পীর মনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া জানবার উপায় নেই। তবে শেষপর্যন্ত তিনি ভেবেছিলেন যে, সারাজীবন ধরে কাজ করবার মত কাজ তাঁর অবশেষে জুটে গেল। প্রয়োজনীয় মর্মর সংগ্রহের জন্যে তিনি কারারা যাত্রা করলেন।

ইতিমধ্যে পোপকে কে বোঝায় যে, জীবিত ব্যক্তির সমাধি নির্মাণ অমঙ্গলজনক। ফলে তিনি সমাধি নির্মাণ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করলেন। উদ্দিপ্ত উদ্যমের সেই আচম্বিত পরিণতিতে মিকেলানজেলো নিদারুণভাবে মর্মাহত হলেন। জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত সেই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলতেন, "সমাধিক্ষেত্রের ট্র্যাজেডি"। সে-বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা ছিল, "আমার ও পোপের মধ্যে সমস্ত মনোমালিন্যের মূলে আছেন স্থপতি ব্রামান্তে এবং তাঁর আদরের ভাইপো রাফাইল। তাঁরা আমার সর্বনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর। তার যথেষ্ট কারণও আছে। আমি ঐ স্থপতির লোক-ঠকানো অভ্যাস ও রাফাইলের শিল্পজ্ঞান যে আমার কাছে কতখানি ঋণী তা ফাঁস করে দিয়েছি। তাই ব্রামান্তে পোপকে বুঝিয়েছেন যে, সমাধি নির্মাণ অর্থের অপব্যয় মাত্র। ওদিকে পোপেরও বোলগনার যুদ্ধ চালানোর জন্যে অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, ছোট কিম্বা বড়, যেকোন রকমেরই হোক না কেন, শ্বেতপাথর কিনতে তিনি আর একটি পয়সাও দেবেন না। আমি ভাবলাম যে, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে এবং পোপকে জানিয়ে দিলাম যে আমি রোম ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

যতটা দ্রুত সম্ভব ঘোড়া ছুটিয়ে আমি ফ্লোরেনসে ফিরে এসে গ্রানড চেমবারের কাজটা শেষ করতে উদ্যোগী হলাম। ওদিকে পোপ উন্মাদের মত ক্রোধে চীৎকার করতে লাগলেন এবং আমাকে খবর পাঠালেন যে, ভালোভাবেই হোক কিম্বা জবরদস্তি করেই হোক, তিনি আমাকে ফেরৎ নিয়ে যাবেন। আমি সে-কথায় কান দিলাম না। কিন্তু

ফ্লোরেন্সবাসীরা ভয় পেয়ে গেল। তারা ভাবলো পোপ হয়তো নগর আক্রমণ করবেন। হয়তো তাদের অনুমান ঠিকই। তারা এসে আমায় রোমে ফিরে যেতে অনুরোধ করলো এবং বললো, পোপের অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে ফরাসী দেশের রাজারও সাহসে কুলোবে না। অতএব আমি পোপের সঙ্গে দেখা করতে বোলগনা যাত্রা করলাম।

বোলগনায় আমি যেন গলায় ফাঁস লাগিয়ে গেলুম। পোপ আমাকে দেখেই তাঁর বসা-অবস্থায় একটি চৌদ্দ ফিট উঁচু মূর্তি গড়তে আদেশ দিলেন। আমি সেই জঘন্য শহরে দু' বছর থেকে রাত্রিদিন কাজ করলাম। সেখানে গরম নরকের মত। চারিদিকে প্লেগ মহামারীর আকারে দেখা দিল। কারিগরেরা সব চোর। আমাকে এক বিছানায় তিনজন সহকারীর সঙ্গে রাত কাটাতে হতো। অবশেষে আমার কাজ শেষ হলো। পোপ আগের মতই পয়সা নেই অজুহাতে দেখিয়ে শুধু মূর্তিটি ছাঁচে ফেলার খরচ দিলেন। কিন্তু আমার পারিশ্রমিক হিসেবে একটি পয়সাও নয়। এর ওপর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়লো। পরে বোলগনা দখল করে মূর্তিটির ব্রোঞ্জ গলিয়ে একটি কামান তৈরী করে তার নাম দিল 'জুলিয়া'।

শিল্পী আবার রোমে এলেন। এবার পোপ তাঁকে ভ্যাটিকান প্রাসাদের সিস্টিন গীর্জার সিলিং চিত্রাচ্ছাদিত করতে দিলেন। মিকেলানজেলো ভাবলেন যে এর পেছনেও স্থপতি ব্রামান্তের কারসাজি আছে। কারণ, বিশ্বকর্মী স্থপতি-প্রতিভাকে চিত্রাঙ্কনে বাধ্য করিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চাইছেন যে অন্ততঃ ঐ বিষয়ে ক্ষেত্রে তিনি রাফাইলের চেয়ে ছোট। মিকেলানজেলোর নিজের ভাষায় "ওরা ষড়যন্ত্র করে এভাবে আমাকে কাবু করবে। আমি পোপকে বললাম যে, বাল্যকালের পর থেকে আমি কখনো ফ্রেসকো আঁকিনি। ও আমার পেশা নয়, ও মেয়েদের কাজ।" পোপ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "চুপ করো। তুমি কি পারো, আর না-পারো সে-বিচার করবো আমি!" ক্ষুব্ধ-হৃদয় শিল্পী একটা সাধারণ গোছের পরিকল্পনা তৈরী করে পোপের সামনে হাজির হলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত নিজেই লজ্জিত হয়ে সে-পরিকল্পনা ফেরৎ আনলেন। পোপ মনে মনে খুশি হয়ে ভাবলেন—এইবার ওষুধ ধরেছে।

এতোদিন পরে উৎপীড়িত, অপমানিত, আশাহত শিল্পী যেন জেগে উঠলেন। উদ্দীপনায় চঞ্চল হয়ে উঠলো তাঁর মন। কল্পনা মেললো পাখা। তিনি এসে দাঁড়ালেন সিস্টিন গীর্জার কেন্দ্রস্থলে। ওপরে চাঁদোয়ার উচ্চতা ৬৮ ফিট, প্রস্থ ৪৪ ফিট দৈর্ঘ্য ১৩২ ফিট। অর্থাৎ তাঁকে চিত্রাচ্ছাদিত করতে হবে প্রায় ১০ হাজার বর্গফিট। একক মানুষের পক্ষে প্রায় অসাধ্য এক মহাদায়িত্ব। শিল্পী কিন্তু এতটুকু নিরুদ্যম না হয়ে বললেন—"শিল্পীর কাজ মস্তিষ্ক দিয়ে। হাত দিয়ে নয়।" তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে ওলড টেসটামেন্টের কাহিনীকে নয় ভাগে রূপায়িত করবেন:

(১) ঈশ্বর আলো ও আঁধারকে বিভক্ত করছেন, (২) ঈশ্বর জ্যোতির্মণ্ডল সৃষ্টি করছেন, (৩) ঈশ্বর ধরিত্রীকে আশীর্বাদ করছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে মানুষের সৃষ্টি ও পতন। (৪) আদমের সৃষ্টি, (৫) ইভের সৃষ্টি, (৬) ইভ কর্তৃক আদমকে প্রলুব্ধ করা ও আদমের পতন, (৭) নোয়ার ত্যাগ, (৮) মহাপ্লাবন, (৯) নোয়ার প্রমত্ততা। —এছাড়া থাকবে কয়েকজন পয়গম্বরের একক চিত্র। শোভাবর্ধনের জন্যে বহু অপ্সর-কিন্নরী-দেবদূতে প্রমূর্তি।

স্থপতি ব্রামান্তের মনে যাই থাকুক মিকেলানজেলোকে প্রাথমিক সাহায্য দানে তিনি ত্রুটি করতেন না। স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করার মত ভারা বাঁধা হলো। আস্তর লাগানোর জন্যে মিস্ত্রী এবং শিল্পীকে সাহায্য করার জন্যে আর পাঁচজন দক্ষ শিল্পী সাকরেদ নিযুক্ত করা হলো। কিন্তু কিছুদিন পরেই মিকেলানজেলো সেই শিল্পীর দলকে বিদায় করে দিলেন। ক্রমাগত চার বছর ধরে প্রায় অহোরাত্র ধরে পরিশ্রম করে তিনি কাজ করে চললেন। আর সে কী কাজ! মিস্ত্রীরা খানিকটা করে আস্তর লাগাচ্ছে এবং তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে এক মহাবিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছেন। তাও কি মানসিক শান্তিতে? ওদিকে অপদার্থ পরিবারবর্গের চিরন্তন অভাবের তাগাদা আর এদিকে লড়াই-খ্যাপা পোপ শিল্পীকে একটি পয়সাও না দিয়ে বোলগনায় লড়াই করে বেড়াচ্ছেন। ঐ সময় একটি চিঠিতে শিল্পী তাঁর বাবাকে লেখেন "আজ এক বছর হতে চললো পোপ আমাকে একটি পয়সাও দেননি। আমি এখানে দারুণ দৈহিক কষ্টের মধ্যে আছি। আমাকে দেখবার পর্যন্ত কেউ নেই। রোমের লোকগুলো একেবারে হারামজাদী। আমার কোন বন্ধু নেই, আমি কারুর বন্ধুও চাইও না। আমার খাবার পর্যন্ত সময় নেই। আমার বোঝা তোমরা আর বাড়িও না। ভগবান আমার সহায় হোন।"

অবশ্য মনের ক্ষোভে মিকেলানজেলো নিজের অবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা বোধহয় যথার্থ নয়। প্রথমত তিনি ছিলেন স্বভাব-কৃচ্ছ্রসাধক। বহু বর্ষ পরে মৃত্যুকালে তিনি যে উইল করে যান, তাতে তিনি নিকট আত্মীয়দের নিজের শিল্পসামগ্রী ছাড়াও দিয়ে যান, ফ্লোরেন্সের ছ'খানি বাড়ী, সাতটি অন্য স্থাবর সম্পত্তি এবং নগদ টাকা,—বর্তমান মূল্যমানে যা প্রায় ১০০,০০০ ডলারের সমান। তাই ইতিপূর্বে (১৫০০ খৃঃ) পুত্রের রোম প্রবাসকালে তাঁকে লিখেছিলেন, "বুয়োনরত্তো আমাকে বলেছে যে, তুমি রোমে খুব পয়সা বাঁচিয়ে, এমনকি, কৃপণের মত থাকো। হিসেবী হওয়া ভালো। কিন্তু কৃপণতা পাপ। কৃপণ, মানুষ ও ভগবান—দুয়েরই কাছে অপ্রিয়। উপরন্তু তা দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। যৌবনে হয়তো তার ফল বুঝবে না, কিন্তু বুড়ো হয়ে বুঝবে।" আরেকবার লিখেছিলেন, "কখনো নোংরা হয়ে থেকো না। সর্বদাই স্বাচ্ছল্য ও পরিচ্ছন্নতার মধ্যে বাস করো এবং অত্যাবশ্যক কোন কিছুই বাদ দিও না।

...সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হচ্ছে মাথাটার যত্ন নিও, যাতে ঠাণ্ডা না লাগে। আর খবরদার স্নান করো না। গা রগড়াতে পারো,—কিন্তু স্নান কখনো করো না।" মিকেলানজেলোর যে তিরিক্ষে মেজাজের পরিচয় আমরা বারবার পাই, তাতে মনে হয় পিতৃদেবের শেষ আদেশটি তিনি আক্ষরিকভাবে মেনে চলতেন।

সিস্টিন গীর্জায় কাজ করবার সময় মিকেলানজেলোর আর এক উৎপাত ছিল পোপের তাগাদা। শোনা যায়, একদিন যখন পোপ এসে ঐভাবে তাগাদা দিয়ে হম্বি-তম্বি করছেন তখন শিল্পী তাঁর ভারা থেকে একটি হাতুড়ী এমনভাবে নীচে ফেলে দিলেন যাতে সেটি পোপকে ঘায়েল করলো না বটে, কিন্তু ঘাবড়ে দিল।

ক্ষোভ ও বিরক্তির দ্বিতীয় কারণ ছিল বয়োকনিষ্ঠ শিল্পী সানৎসিও রাফাইল। তাঁকে সিস্টিন গীর্জার চতুঃসীমানার মধ্যে দেখলেই মিকেলানজেলো ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে উঠতেন, "ঐ হামবড়া ছোকরা আমার গীর্জার চারধারে উঁকি-ঝুঁকি মারছে!" কারণ তাঁর ধারণা ছিল (যা বহুলাংশে সত্যও) যে রাফাইল তাঁর আঙ্গিকের অনেকখানি শিখে নিয়ে বেমালুম নিজের বলে চালিয়ে দেবেন। অনেক সময় নিতান্ত অকারণেও তিনি রাফাইলকে অপমানের চেষ্টা করতেন। একদিন সর্বজনপ্রিয় রাফাইল তাঁর অনুরাগীদের নিয়ে কোথাও চলেছিলেন। অমনি তাঁকে দেখেই ভারার ওপর থেকে শিল্পী দুর্বাশা চীৎকার করে উঠলেন, "ঐ উনি সেনাপতির মত পেছনে সৈন্যবাহিনী নিয়ে চলেছেন!" সেদিন পরমসহনশীল রাফাইলেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আর

আপনি জল্লাদের মত মাচায় উঠে একা-একা কাজ করে চলেছেন।" তবে সে শুধু একইবার। সিস্টিন গীর্জার কাজ শেষ হলে রাফাইল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন যে ঈশ্বরই তাঁকে অতবড় একজন শিল্পীর স্বজাতি হবার সুযোগ দিয়েছেন।

অবশেষে বাস্তবাগীশ পোপের তাগিদে ১৫১২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে মিকেলান্জেলো ঘোষণা করলেন যে তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। ভারা অপসারিত হলো। সারা রোম সিস্তিন গীর্জার সেই হতবাক শিল্পসৃষ্টি দেখতে ভেঙে পড়লো।

শিল্পীর ইচ্ছে ছিল সমস্ত চন্দ্রাতপটা শুকিয়ে যাবার পর তিনি স্থানবিশেষে দূরান্তরের নীলের এবং উজ্জ্বল সোনালীর ছোঁয়া দেবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠে নি। কিছুকাল পরে পোপ যখন শিল্পীকে ওই সমাপ্তি-ছোঁয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন তখন শিল্পী উত্তর দেন যে শুধু ঐ সামান্য কাজের জন্যে আবার ভারা বাঁধার প্রয়োজন নেই। উত্তরে পোপ বললেন যে সোনালী ছোঁয়ার অভাবে কেমন যেন একটা দীনতা থেকে যাচ্ছে। শিল্পী সেই আলোচনার সমাপ্তি টেনে বললেন, "যাঁদের আঁকা হয়েছে তাঁরা যে সবাই ছিলেন দরিদ্র।"

রেনেসাঁর সে যুগে মানুষের ধারণা ছিল, বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্র হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবী এবং মানুষ হচ্ছে তার অধিনায়ক। মিকেলান্জেলোর তুলিতে সেই মানুষেরই জয়গান। তিনি বলে গেছেন, "শিল্পের চরম আদর্শ হচ্ছে মানুষ।" আর সে কী মানুষই না তিনি সৃষ্টি করেছেন! সিস্তিন গীর্জার অতুল চন্দ্রাতপে ৩৪৩টি মানব-মানবী, অপ্সরা-কিন্নরী ও দেবদূতদের প্রতিমূর্তি। তার মধ্যে ২২৫টি দশ থেকে আঠারো ফিট দীর্ঘ। চার বছর ধরে মিকেলানজেলো যে তুলির টানে তাঁর ভাস্কর মনের রুদ্ধ আবেগকেই মূর্ত করে ছিলেন মূর্তিগুলি দেখলে তাতে আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু কতখানি দ্রুততার সঙ্গে তিনি ঐ মূর্তিগুলিকে মূর্ত করেছিলেন তা ভাবলে বিস্ময় আরো বেড়ে যায়। তের ফিট দীর্ঘ, বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ আদম মাত্র তিনদিনে আঁকা। মূর্তিগুলি মানুষের কল্পনাসম্ভব প্রায় প্রত্যেক ভঙ্গীতেই বিরাজিত। কেউ সুপ্তোত্থিত, কেউ বিস্মিত, কেউ চিন্তিত, কেউ বা পাঠরত। বেশীর ভাগই নগ্ন, নিটোল পেশী হিন্দোলিত! সেই মানবমূর্তির প্রভায় নন্দন কাননও নিষ্প্রভ। মিকালেনজেলোর নন্দন-কানন শিলাময়। সেখানে কেবল একটি গ্রন্থিবহুল গাছ ও কয়েক গুচ্ছ লোলিহান তৃণশিখা।

সিস্তিন গীর্জার কাজ যখন শেষ হয় তখন মিকেলানজেলোর বয়স মোটে সাঁয়ত্রিশ বছর। কিন্তু চার বছরের কঠিন শ্রমে তিনি অনেকখানি বুড়ো ও কুঁজো হয়ে গিয়েছিলেন। চোখের দৃষ্টি হয়েছিল ঝাপসা। তারপরেও যখন তিনি পোপের কাছে পারিশ্রমিকের টাকা চাইতে গেলেন তখন তিনি নির্বিকারভাবে বললেন, "যখন পারবো তখন দেবো।" তবুও সন্দেহ নেই যে নিরবধি কালজয়ী যে অতুল শিল্পৈশ্বর্য তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তার আনন্দ ও গর্বে দৈহিক যন্ত্রণা এবং স্বর্গস্বারী পোপের সেই নির্লজ্জ বঞ্চনা তিনি ভুলে যেতে পেরেছিলেন।

রোমের কাজ শেষ করে মিকেলানজেলো আবার ফ্লোরেন্সে ফিরে এসে মেডিসি পরিবারের সান্ লরেন্জো গীর্জা-সজ্জায় কয়েকটি নিরুপম ভাস্কর্য সৃষ্টি করলেন। ইতিমধ্যে পোপ জুলিয়াস মারা গেলে মেডিসি বংশের দশম লিও তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। ওদিকে দীর্ঘকাল মেডিসিদের স্বৈরতন্ত্রে অতিষ্ঠ হয়ে ফ্লোরেন্সবাসীরা ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পৃষ্ঠপোষক পরিবারের প্রতি আনুগত্য, না স্বদেশপ্রীতি, এই দুয়ের দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে মিকেলানজেলো শেষ পর্যন্ত স্বদেশের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর অদম্য উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে ফ্লোরেন্সবাসী এক দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তুললো। কিন্তু আত্মীয় মেডিসি পরিবারের সাহায্যে এগিয়ে এলেন সসৈন্যে স্বয়ং পোপ দশম লিও। ফলে দীর্ঘ বীর্যোদ্দীপ্ত প্রতিরোধের পর ফ্লোরেন্সের পতন ঘটলো। মিকেলানজেলো পোপের সামনে নীত হলে ক্রুদ্ধ পোপ তাঁকে বললেন যে তাঁর মত বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। কিন্তু শিল্পের প্রতি তাঁর আনুগত্যের জন্যে তিনি তা করবেন না।

জীবনের সায়াহ্নে আবার সিস্তিন গীর্জায় একটি দেওয়ালে 'শেষ বিচার' নামে একটি ছবির বায়না পেয়ে তিনি আরেকবার রোমে আসেন। সমস্ত জীবন ধরে তিনি মানুষের হাতে যে উৎপীড়ন ও অন্যায় সহ্য করেছিলেন, তার জ্বালা যেন তিনি ছবিটিতে ঢেলে দিয়েছিলেন। সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর ছবিটির মধ্যভাগে অনিল-বিহারী নিষ্পক্ষ দেবদূতেরা ভেরী বাজাচ্ছেন। ঊর্ধ্বে শ্মশ্রুবিহীন এপোলো-প্রতিম যিশু, সেণ্ট জন, সেণ্ট পীটার, সেণ্ট লরেনস ও সেণ্ট বার্থলোমিউ সমেত ছবিটিতে তিনশ চৌদ্দটি প্রতিমূর্তি। বামে পুণ্যাত্মারা স্বর্গোত্থিত এবং দক্ষিণে পাপীরা নরক নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। বিপর্যয় চরমে পৌঁচেছে।

ছবিটি শেষ করতে প্রায় আট বছর সময় লাগে। পূর্বাঙ্কিত চন্দ্রাতপে অঙ্কিত বিশ্বসৃষ্টির মহাচিত্রাবলীর তুলনায় এতে সেই সাবলীল তুলির টানের দার্ঢ্য নেই, প্রবল প্রাণশক্তির উচ্ছ্বাস নেই। তবু ছবিটি শেষ হতে রোমে মহা সোরগোল পড়ে গেল। কারণ মূর্তিগুলি সবই উলঙ্গ। সেই সমালোচনা পোপের (তৃতীয় পল) কানে যেতে তিনি শিল্পীকে মূর্তিগুলিকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করে দিতে অনুরোধ করলেন। ক্রুদ্ধ শিল্পী উত্তর দিলেন, "পোপ যেন তাঁর দুনিয়া উদ্ধারের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, শিল্পীদের দায়িত্ব নিয়ে মাথা না ঘামান।" পরবর্তী আরেক পোপ এসে আরেকজন শিল্পীর দ্বারা মূর্তিগুলিকে সত্যিই বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়ে দেন। তাতে সারা রোমে খোদার ওপর কারিগর সেই শিল্পীকে 'চোলিওয়ালা' নাম দিয়ে ক্ষেপিয়ে মারে।

মিকেলানজেলোর উৎপীড়িত ও উত্তাল জীবনের সায়াহ্নে ভিৎতোরিয়া কলোনা নামে এক সম্ভ্রান্ত বিধবা মহিলা সুখেদু শান্তি দিয়েছিলেন। মিকেলানজেলো তাঁকে উদ্দেশ্য করে কয়েকটি সুন্দর কবিতা লেখেন এবং তাঁকে কয়েকটি স্কেচ ও ছবি উপহার দেন। কিন্তু নিয়তি শিল্পীর সেটুকু শান্তিতেও বাদ সাধলেন। পরিচয়ের কিছুকাল পরেই সেই গুণগ্রাহিণী ও সুভাষিণী মহিলা মারা যান।

অবশেষে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ৮৯ বছর বয়সে সেই সিদ্ধার্থ মহাপুরুষের ক্ষুব্ধ, ক্লান্ত ও প্রবঞ্চিত দীর্ঘজীবনের অবসান হয়। সেই বছরেই মধ্য ইংল্যণ্ডের বাঁকা তলোয়ারের মত রজতদীপ্ত আভন নদীর বাঁকে স্ট্রাটফোর্ড গ্রামে এক পশম ব্যবসায়ীর ঘরে জন্ম নিলেন উইলিয়াম শেকসপীয়ার। মানবসভ্যতার আকাশে এক জ্যোতিষ্ক নিভে গেল, উদয় হলো আরেক জ্যোতিষ্কের।

(দশ)
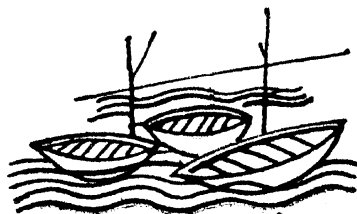
গোটা এলাকাই চঞ্চল। লোকের মুখে ঘুরছে তখন একটি বাইসনের কীর্তি-কলাপ। একের পর এক মানুষকে জখম করেই চলেছে এই জানোয়ারটা। কিন্তু কেউই আনতে পারছে না বাগে।

বেতলার রেঞ্জার সাহেব বাইসনটাকে 'রোগ' বলে ঘোষণা করে গেছেন। যে মারতে পারবে সে ৫০০ টাকা পুরস্কার পাবে বন-বিভাগ থেকে।

সেই ৫০০ টাকার লোভে স্থানীয় একজন ফরেস্ট গার্ড ওর একনলা বন্দুক নিয়ে কিছুদিন ধরে তাকে মারবার চেষ্টা করে বেড়াচ্ছিল। গতকাল ভরদুপুরে কোয়েলের পাশে সে লোকটিকেও একটি সেগুন গাছের গায়ে থেঁৎলে দিয়ে উধাও হয়ে গেছে বাইসনটা।

লোকটি কপাল লক্ষ্য করে গুলীও করেছিল, কিন্তু কোথায় লেগেছিল কেউ জানে না, গুলীতে নাকি মরে নি বাইসনটা। বাইসনের গায়ে বন্দুকের গুলী বেশিদূর অবধি সেঁধোয় এমন জাত কোনো বন্দুকের নেই। বড় রাইফেল হলে অন্য কথা ছিল। তাতেই এই বিপত্তি।

শুনেছি যশোয়ন্তকে খবর দেওয়া হয়েছে পাটনায়। যত শিগ্‌গির সম্ভব ফিরে আসতে কাজ সেরে। কারণ ঐ বাইসন গুলী খাওয়ার পরে আরো সাংঘাতিক হয়ে গেছে। কুলীদের ধাওড়া, ঠিকাদারের বাংলো সব ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। ঠিকাদারের একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর ছিল, সেটা ওকে ধাওয়া করাতে তাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। ও জঙ্গলে কাজ একেবারে বন্ধ। ঐ বাইসন যতক্ষণ মারা না পড়ে, বাগেচম্পার পথও খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। লোকে হাট করতে যেতে পারছে না। ডাক নিয়েও যেতে পারছে না ডাক-হরকরা।

এতদিন রুমান্ডির বাংলো থেকে সুহাগীর বর্ষাবিধুর চেহারা তেমন খেয়াল করে নজর করি নি। কিশোরী এখন যৌবনবতী হয়েছে। ঘনগোরে চলকে চলকে চলেছে লাল শাড়ীতে। একদিন ইচ্ছে হল যশোয়ন্তের সেই পাথরটায় গিয়ে বসি। গ্রীষ্মের ক্ষীণা শরীরে এখন কত প্রাণোচ্ছ্বাস, একবার দেখে আসি। কিন্তু টাবড় বলল— সে পাথর এখন ডুবে গেছে। জল তার আরো উপরে। তবে পাহাড়ী নদী, সব সময়ই যে বেশি জল রয়েছে তা নয়। পাহাড়ে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই গিয়ে দেখতে হয় জলের তোড়।

আমাদের সুহাগীতেও অনেক মাছ ধরা পড়েছে একদিন। আজকাল যে সব মাছ আমি খাচ্ছি তার অর্ধেক সুহাগীর। অর্ধেক কোয়েলের। পাহাড়ী পুঁটি, বাটা, আড়-টাংরা ইত্যাদি।

এ এক নতুন আবিষ্কার। শখ হয়, একদিন গিয়ে মাছ ধরি। কিন্তু ঐ ইচ্ছে পর্যন্তই। আমি বারান্দায় ইজীচেয়ারে বসে কল্পনা করতে পারি। কল্পনায় বাঘ মারি, মাছ ধরি; আরো অনেক কিছু করি। কিন্তু যতক্ষণ যশোয়ন্তের মত কেউ না এসে হাত ধরে আমাকে তোলে, ইজীচেয়ারেই বসে থাকি।

বসে বসে আর ভালো লাগে না। কাজকর্ম ছাড়া কাহাতক আর ভালো লাগতে পারে। অবশ্য আর মাসখানেই পরেই পুজো। পুজোর পরেই আবার জঙ্গলের পথঘাট ঠিক যাবার উপযুক্ত হবে। বাঁশ-কাটা, কাঠ-কাটা শুরু হবে। দলে দলে গয়া জেলার লোকেরা খয়ের বানাবে জঙ্গলে জঙ্গলে। মাঠে মাঠে পাহাড়ের ঢালে ঢালে যে সব ধানই শস্য সবুজ থেকে হলুদে হলুদে মুখগুলি ওদের শুকানো হবে। ধান, বাজরা, বুট, আরো কত শত ফসল। সমস্ত জঙ্গল, পাহাড় অপার্থিব নবান্ন উৎসবে ভেসে উঠবে। ভরন্ত ফসলের গন্ধে ম-ম করবে পাহাড়ী হাওয়া।

এ ফসল উঠে গেলে, ক্ষেতে ক্ষেতে কুর্থী লাগবে, গেহুঁ লাগবে, কাড়ুয়া লাগবে, সরগুজা লাগবে। হলুদে হলুদে ছেয়ে যাবে চষা-মাঠ আর থাক্ কাটা পাহাড়ের ঢাল। সন্ধ্যা হতে না হতেই চারিদিক থেকে মাদলের শব্দ আর গানের সুর ঝুম্ ঝুম করবে। শীতকালে প্রচণ্ড শীত হলে কি হয়, জঙ্গলে পাহাড়ে শীতকালটাই নাকি সব থেকে মজার সময়। বনবিভাগের বাংলোয় বাংলোয় শিকারির দল আসবেন কোলকাতা, পাটনা এবং আরো কত বড় বড় জায়গা থেকে। গ্রামের গরীব লোকেরা কুপ কাটার ফাঁকে ফাঁকে এক-দুদিন সাহেবদের জন্যে হুলোয় করে নেবে। আধুলিটা টাকাটা যা পাবে তা পাবে, তাছাড়া শিকার কিছু হলে তার অর্ধেক মাংসর ভাগ। সেটাই আসল লাভ। মাংসকে ওরা বলে 'শিকার'।

একদিন ভোরে যশোয়ন্ত এসে হাজির হল। অনেকদিন পর ভয়ংকরের চিঁ-হা-হু— চিঁহা—হু আওয়াজে রুমান্ডির বাংলো সরগরম হয়ে উঠল। কনসার্ভেটর সাহেবের চিঠিটা পেয়েছ লালসাহেব?

পেলাম ত। কেস্ উঠবে কবে?

কেস উঠবে হয়ত শিগ্‌গির, কিন্তু তুমি একটু সাবধানে থেকো।

শুধোলাম, একথা বলছ কেন?

বলছি, কারণ, জগদীশ পাণ্ডে সাংঘাতিক লোক। আমার চেয়েও সংঘাতিক। করতে পারে না এমন কাজ নেই। তুমি আমার একমাত্র সাক্ষী। হয়ত ও দিলে তোমাকে জঙ্গলে খুন করিয়ে, লাশ গুম করে দেওয়া ত এই জঙ্গলে পাহাড়ে কিছুই নয়। বাঁয়া হাত কা কাম্।

আমি চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে বললাম— তাহলে কি হবে?

যশোয়ন্ত হেসে বলল—আরে হবে আবার কি? ওরা আমাকেও চেনে। তোমার গায়ে একবার হাত দিয়ে দেখুকই না। তবে সাবধানের মার নেই। বাংলো থেকে যখনই বেরোবে, তখনই বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে বেরোবে। কোনো কিছু বেগতিক দেখলে, কোনো অচেনা লোককে অস্বাভাবিক ঘোরাফেরা করতে দেখলেই পাশ কাটাবে। আর সে রকম দেখলে, গুলী চালিয়ে খুলি উড়িয়ে দেবে।

আমি বললাম—বললে বেশ। গুলী চালিয়ে খুলি উড়িয়ে তারপর ফাঁসিতে লটকাবে কে?

তুমিও যেমন। গুলী চালালেই যদি ফাঁসিতে লটকাতে হত তাহলে ত ডেহুরী থেকে রুমান্ডি অবধি প্রতি গাছে আমি একবার করে ঝুলে থাকতাম। এসব তোমার কোলকাতা নয়। জোর যার মুলুক তার। এখন অবধি তাই আছে। পরে কি হবে জানি না। তাছাড়া দারোগা সাহেব ভি বড়া হরবকত্ ইমানদার লোক আছেন। উনি কিতাবী আইনের ধার ধারেন না। ঠাণ্ডা মাথায় গোঁফে পাক দিতে দিতে সবটা শোনেন। শুনে, যে সত্যি সত্যি অন্যায় করেছে বোঝেন, তাকে সঙ্গে সঙ্গে দো হান্টার লাগান। পইলে ডাণ্ডা: পিছে বাত্। দারোগাও মস্ত ইয়ার। শালেলোগোকো হাম্ শিখলায়েগা ঠিক্‌সে।

যশোয়ন্ত রাইফেলটা খুলে তেল লাগিয়ে আবার লক্-স্টক্-ব্যারেল জোড়া লাগিয়ে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখল। দাঁড় করিয়ে রাখবার আগে সাইট-

প্রটেকটরটা ফ্রন্ট সাইটে লাগিয়ে নিল। এই রাইফেলটাতে একটি পিপ্-সাইট ফিট্ করা আছে। এমনিতেই যশোয়ন্তের হাত সোনা দিয়ে বাঁধানো। তারপর পিপ্-সাইট ফিট করা থাকাতে এই রাইফেলটা দিয়ে যশোয়ন্ত মোক্ষম মার মারে। জানোয়ার তার চাঁদ বদন একবার দেখালে হয়। তারপর সে বাইসনই হোক আর বাঘই হোক পালায় কোথা দেখা যাবে। আর চোটও বসায় রাইফেলটা। ভীমের গদার মত। টাবড় নাম দিয়েছে গদ্দাম্। ওজনও সেরকম। কাঁধে নিয়ে মাইল দুয়েক হেঁটে এলে, কলার্-বোন্ কেরে? কেরে? করে ওঠে।

টাবরকেও খবর পাঠিয়েছিল যশোয়ন্ত। টাবড়ও এসে হাজির ওর টোপীওয়ালা বারুদী বন্দুক নিয়ে। টাবড়ের বন্দুকটা দেখলেই আমার গুপীযন্ত্রের কথা মনে পড়ে।

বন্দুক, রাইফেল থেকে একটা গন্ধ বেরোয়—তেলের গন্ধ—বারুদের গন্ধ—টোটার গন্ধ। সব মিলিয়ে গন্ধটাকে কেমন পুরুষালী-পুরুষালী বলে মনে হয়। কস্মেটিকসের গন্ধের সঙ্গে যেমন মেয়েদের ভাবনা জড়ানো থাকে, বন্দুক-রাইফেলের গন্ধের সঙ্গে তেমনি ছেলেদের ভাবনা জড়ানো থাকে। ভারী ভালো লাগে। এই গন্ধ নাকে গেলেই আমার কতগুলো উৎসারিত প্রাণ বেহিসাবী-যৌবনমত্ত পুরুষের কথা মনে হয়, যারা সবুজ বনে লাফাতে লাফাতে গান গায় নবযৌবনের দলের মত—"ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল সূর্য তারাকে। আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায়, ক্ষেপিয়ে বেড়ায়; ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে।"

আমরা জীপেই রওনা হলাম। যে জায়গায় গিয়ে নামলাম সেটা যেখানে হুইট্লী সাহেবরা বাঘ মেরেছিলেন তার কাছাকাছি।

সকালের রোদ্দুরে বনে পাহাড়ে ঝলমল করছে। প্রায় মাথা-সমান উঁচু সতেজ বর্ষার জল-পাওয়া ফিকে সবুজ ঘাসের বন, রোদে জেল্লা দিচ্ছে। তার মাঝ দিয়ে একটা পায়েচলা নুড়ি পথ গাড়ী যাওয়ার প্রধান সড়ক থেকে নেমে, কোয়েলের দিকে চলে গেছে। আমরা জীপটাকে বাঘ মারার সময় যেমন রেখেছিলাম, তেমনি প্রধান রাস্তার উপরেই একটা বড় গাছের নীচে বাঁদিক করে পার্ক করিয়ে রাখলাম।

যশোয়ন্ত সাইট্-প্রটেকটরটা খুলে পকেটে রাখলো। রাইফেলে গুলী ভরলো। আমাকে বন্দুকের দু ব্যারেলেই বুলেট ভরতে বলল। টাবড় তার গাদা বন্দুকে তিন-অঙ্গুলী বারুদ কষে ঠেসে এসেছে। সামনে একটি হুঁৎকো-মার্কা সীসার তাল। যে ভাগ্যবানের গায়ে ঠেকবে তিনি পরজন্মে গিয়েও আশীর্বাদ করবেন।

যশোয়ন্ত আগে রাস্তা ছেড়ে সুঁড়ি পথে ঢুকলো। আমাকে ওদের দুজনের মাঝখানে নিল। পেছনে টাবড়। টাবড়কে ফিস্ফিসিয়ে বলল পেছনে দেখতে। আমাকে বলল ডাইনে-বাঁয়ে দেখতে। আমরা নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম।

যেখানে ঘাসীবন সেখানে বড় গাছ বেশী নেই। এমনি জঙ্গলও নেই। তবে ঘাসী বনের ফালিটা সেখানে বোধহয় তিনশ গজ চওড়া ও এক হাজার গজ লম্বা হবে। তার দু-পাশেই গভীর বন। ডান দিক থেকে খুব ঘন ঘন ময়ূরের ডাক ভেসে আসছে। ওপাশে বেশ বড় এক ঝাঁক ময়ূর রয়েছে।

বেশ কিছুদূর সাবধানে এগোনোর পর আমরা কোয়েলের শব্দ শুনতে পেলাম। একটানা ঝরঝর শব্দ। ঘোলা জল বেগে বয়ে চলেছে। এ পর্যন্ত জলের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ছাড়া আর কিছুই কর্ণগোচর হল না। এগোতে এগোতে আমরা প্রায় নদীর ধার অবধি গিয়ে পেঁছিলাম। অথচ বাইসনের সাড়াশব্দ নেই। নদীর পারে পেঁছে যশোয়ন্ত টাবড়কে একটা গাছে উঠে চারদিক দেখতে বলল। টাবড় গাছে অর্ধেকটা উঠেছে, এমন সময় কুকুরের ডাকের মত একটা ডাক শুনতে পেলাম ঘাসী বনের ভেতরে আমাদের বাঁ-দিক থেকে। অমনি টাবড় তরতরিয়ে নেমে এসে বিস্ফারিত চোখে বলল—"মুন্নি কোঁয়া ইজোর, মুন্নি কোঁয়া উস্কো পিছে পড়া হ্যায়।"

আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। যশোয়ন্তকে খুব উত্তেজিত দেখাল। ও টাবড়কে বলল, আমার বন্দুকটা নিয়ে নিতে। টাবড়কে আরো চারটে গুলী দিতে বলল। গুলী দিলাম। তারপর ওদের পেছনে পেছনে অদৃষ্টপূর্ব, অভূতপূর্ব মুন্নি-কোঁয়ার দর্শনাভিলাষে দুরু দুরু বুকে এগোলাম। টাবড়ের প্রাগৈতিহাসিক বন্দুকের বাহক হয়ে।

ঘাস ঠেলে সাবধানে এগোতেই চোখে পড়ল ঘাসবনের মাঝখানে একটা একলা খয়ের গাছ। সেই গাছের নীচে একটা অতিকায় বাইসন দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দিকে মুখ করে। তার গলায় একটা দগদগে রক্তাক্ত ক্ষত। সেটা পোকায় থক্থক করছে। প্রকান্ড মাথাটা নীচু করে আছে, শিং দুটো পিঠের উপর শুয়ে আছে, মুখ উঁচু করা। কপালের মধ্যেটা সাদা। দু হাঁটুর কাছে মোজার মত সাদা লোম। আমার মনে হল, আমাদের আক্রমণ করার জন্যে বুঝি তৈরি হচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যে যশোয়ন্ত বাইসনটার দিকে রাইফেল তুললো, এবং আমাকে হতবাক করে দিয়ে টাবড়ও সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে বন্দুক তুললো। এবং রাইফেল ও বন্দুকের যুগপৎ বজ্র নির্ঘোষে সকালের কোয়েলের অববাহিকা গম্গম্ করে উঠলো। ঐ বড় রাইফেলের গুলী বাইসনের কপালের মধ্যে দিয়ে কুড়ুলের মতো ঢুকে গেল এবং বড় গাছ কেটে ফেলবার সময় যেমন শব্দ হয় তেমনি শব্দ করে বাইসনটা পড়ে গেল হুড়মুড় করে মাটিতে।

কিন্তু টাবড় যেদিকে গুলী করল সেদিকে কিছুই দেখতে পেলাম না। বাইসনটা পড়ে যেতেই টাবড় আর যশোয়ন্ত বাইসন যেদিকে পড়ে রইল সেদিকে না গিয়ে যেদিকে টাবড় গুলী করেছিল সেদিকে দৌড়ুল। ওদের পেছনে পেছনে আমিও বোকার মত দৌড়ে গেলাম। একটু যেতেই দেখি একটা অদ্ভুত জানোয়ার মরে পড়ে আছে। দেখতে কুকুরের মত, গায়ের রং ম্যাটমেটে লাল, মুখটা কালো, লেজটা কালো, লেজের ডগাটা বেশী কালো।

ততক্ষণে আরো তিন চারটি গুলীর আওয়াজ পেলাম। এবং হঠাৎ প্রায় আমার গায়ের উপর দিয়ে একটা ঐ রকম কুকুর পালাতে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে টাবড়ের বন্দুকটা তুলে যন্ত্রচালিতের মত সেদিকে ঘুরিয়ে ঘোড়া টিপে দিলাম। কুকুরটার গায়ে যেন কামানের গোলা লাগল। একটা বিরাশী সিক্কার থাপ্পড় খেয়ে পড়ে গেল যেন।

নিজেই নিজের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু যখন সম্বিত ফিরে এল তখন মনে হল আমার ডান হাতটা আমার নয়। মনে হল কাঁধ থেকে হাতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গাদা বন্দুকের সে যে কি ধাক্কা তা বলে বোঝানো যায় না।

ইতিমধ্যে দু-পাশ থেকে আরো দু' একটি গুলী হয়ে গেছে।

টাবড়ের বন্দুকটা গাছে হেলান দিয়ে রেখে কাঁধে হাত বোলাতে বোলাতে আমি বাইসন দেখতে লাগলাম। দেখবার মত জানোয়ার বটে। ঘাড়টা দেখলে ভক্তি হয়। এমন জানোয়ার থাকতে, লোকে বৃষস্কন্ধের প্রশংসা কেন করে জানি না। ঘাড়ের রং ময়ূরের পাখার মত ঘন। সারা গায়ে বড় বড় মোটা মোটা লোম। পায়ের খুরগুলো সাধারণ গৃহপালিত গরু-মোষের চেয়ে চার-গুণ বড়। আর শিং দুটোও দেখবার মত। শিং-এর গোড়ায় অনেক থেঁতলানো দাগ। জানি না গাছে গাছে ঘষেছে কিনা। ডান-দিকের শিংটার ডগাটার চল্টা ওঠা। পেটের কাছে আর একটা ক্ষত দেখলাম। আড়াআড়িভাবে যেন ছুরি দিয়ে কেউ চিরে দিয়েছে। অন্তত দু ইঞ্চি চওড়া ও এক ফুট লম্বা।

ততক্ষণে ওরা ফিরে এসেছে। আমার মারা কুকুরটা দেখে যশোয়ন্ত বলল—'আরে ইয়ার তুম্ ভি মার দিয়া একঠো। সাব্বাস্।'

কি যে ভাবে যশোয়ন্তটা আমাকে।

আমি শুধোলাম, ওগুলো কি জানোয়ার? যশোয়ন্ত বলল—জঙ্গলে এর চেয়ে সাংঘাতিক কোন জানোয়ার নেই। এরা জংলী কুকুর। এর চেয়ে বড়ও আছে এক-জাতের, তাদের এখানে বলে রাজকোঁয়া। এরা যে জঙ্গলে ঢোকে সে জঙ্গলে শম্বর, হরিণ, শুয়োর, কারো নিস্তার নেই। এমন কি বাঘও এদের এড়িয়ে চলে।

সচরাচর বাইসনের কাছে এরা ঘেঁসে না। কিন্তু যেই দেখেছে যে বাইসনটা ধুঁকছে, যে কোন মুহূর্তে মরতে পারে, অমনি ওর কাছে কাছে ঘুরছিল। উত্যক্ত করে মৃত্যুটা যাতে ত্বরান্বিত করা যায় সেই চেষ্টা করছিল।

শুধোলাম—একসঙ্গে ওরা দল বেঁধে থাকে কেন?

যশোয়ন্ত বলল—দল বেঁধে থাকে কারণ, এমনিতে ত একলা একলা ছোট জানোয়ারই। শম্বরের পেছনের পায়ের একটা চাঁট খেলে চিতাবাঘেরই মাথার খুলি ফেটে যায়, ত ওদের। সেই জন্যেই দল বেঁধে ঘোরে। এবং এক সঙ্গে কোন বড় জানোয়ারকে চারদিক থেকে আক্রমণ করে। জানোয়ার প্রাণভয়ে পালাতে থাকে আর ওরা সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করে চলে, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে গতিস্মান জানোয়ারের গা থেকে মাংস খুবলে খুবলে খায়। তারপর যখন সে জানোয়ারের চলবার মত আর শক্তি থাকে না তখন সে মুখ থুবড়ে পড়ে এবং মুন্নিকোঁয়া কি বাক্‌রোঁয়ারা তাকে তিলে তিলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। বনে জঙ্গলে এর চেয়ে বীভৎস মৃত্যু আর হয় না।

আমি বললাম, আশ্চর্য। বাইসনটা আমাদের দেখল অথচ তেড়ে এলো না কেন যশোয়ন্ত?

ওর তেড়ে আসার ক্ষমতা থাকলে আমরা ওকে দেখার অনেক আগেই স্টীম এঞ্জিনের মতো রে-রে-রে করে ঘাসবন ভেঙে তেড়ে এসে ঘাড়ে পড়ত। কখন তেড়ে এল তা বোঝবার সুযোগ পর্যন্ত দিতো না। আসলে ফরেস্ট গার্ডের গুলীটা বেশ জব্বর হয়েছিল। গুলী কপালে না লেগে গলাতে লেগেছিল। নেহাৎ বন্দুকের গুলী। বেশী দূর ভিতরে ঢুকতে পারে নি, কিন্তু ওর অবস্থা কাহিল হয়ে গেছিল। দেখলে না, নড়তে পর্যন্ত চাইল না আমাদের দেখে! মৃত্যুর আগে সবাই একটু শান্তি চায়। তাই ও এই নদীর পাড়ের নিরিবিলি খয়ের গাছের নীচে দেহরক্ষা করবে বলে এখানে দাঁড়িয়ে ধুঁকছিল আর কোথা থেকে মুন্নি-কোঁয়ারা খবর পেয়ে এসে হাজির।

(১১)

কিছু জিনিস কেনাকাটার ছিল। তার মধ্যে জামা-কাপড়ই প্রধান। এখানে আসার পর থেকে জামা-কাপড় বানানো হয় নি। তাছাড়া এই বনেজঙ্গলে যে রকম জামা-কাপড়ের প্রয়োজন তারও অভাব ছিল আমার। সামনে শীত আসছে। শীতের প্রলয়ংকরী রূপের যা বর্ণনা শুনেছি তাতে ত আগে থাকতেই দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। কিছু গরম কাপড়-চোপড় বানানো দরকার।

ডালটনগঞ্জ গেলাম একদিন। রুমান্ডি থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল পথ। কিছুদূর অবধি রাস্তা চেনা ছিল তারপর থেকে অচেনা রাস্তা। ঘোষদার বাড়িই দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করব ঠিক ছিল।

ডালটনগঞ্জ থেকে একটা রাস্তা সোজা চলে গেছে লাতেহার হয়ে চাঁদোয়া-টোরী, সেখান থেকে বাঁয়ে চলে গেছে চাতরার রাস্তা বাঘরা মোড় হয়ে। বাঘড়া মোড় থেকে ডাইনে ঘুরে গেলে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সীমারীয়া - টুটিলাওয়া হয়ে হাজারীবাগ শহর। যশোয়ন্ত এই পথেই হাজারীবাগ যায়। চাঁদোয়া - টোরী থেকে অন্য রাস্তাটা চলে গেছে আম্‌ঝরিয়া হয়ে কুরু, কুরু থেকে রাঁচী, লোহারডাগা রোড ধরে লোহারডাগা। সেখান থেকে বানারী হয়ে নেতারহাট। আর একটা রাস্তা উল্টোদিকে ডালটনগঞ্জ থেকে চলে গেছে ওরঙ্গাবাদ—গ্রান্ড ট্রাংক রোড হয়ে।

এই সমস্ত জায়গায়ই শুধু পাহাড় আর পাহাড়। জঙ্গল আর জঙ্গল। আদিগন্ত।

ডালটনগঞ্জ বেশ জমজমাট মফস্বল শহর। সিনেমা আছে, কোর্ট-কাছারি ইনকামট্যাক্স অফিস সবই আছে। বাঁশ, কাঠ, গালা ইত্যাদির বেশ বড় বড় ব্যবসাদার আছেন। আমাদের রামদেও সিংয়ের বাড়িও এখানে।

ঘোষদার বাড়ি ফেরার পথে ঘোষদার সঙ্গেই বাজারে বেরোলাম। দোকানপত্তর সব ঘোষদার জানাশুনো। কাপড় পছন্দ করে মাপ দিতে সময় লাগলো না বেশী। খাকী ট্রাউজার আর বুশসার্ট বানাতে দিলাম দুটি করে। টুইডের একটি কোট্। ফ্যানেলের শার্ট একটি—এইসব আর কি।

ডালটনগঞ্জ বাজারে হঠাৎ টাবড়ের ছেলের সঙ্গে দেখা। আমাদের দেখে সেলাম করে বলল—ওর বোন-ভগ্নিপতির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমি বললাম—আমি ত আজই বিকেলে ফিরছি—আমার সঙ্গে চল্। একাই ত ফিরব। টাবড়ের ছেলে আপত্তি জানাল। বলল—ওর নাকি আর একদিন থাকার ইচ্ছা।

স্টেশনারী দোকানে কিছু কেনাকাটার ছিল, জুম্মানের অর্ডার। চা-কফি-ভিনিগার চিলিসস - টোম্যাটোসস্ মাখন জেলি ইত্যাদি ইত্যাদি।

থলি বোঝাই করে দোকান থেকে বেরোচ্ছি, দেখি দোকানের সামনে একটি লাল অ্যাম্বাসাডর গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ির সামনের সীটে দুজন লোক, ড্রাইভার শুদ্ধ। টেরিলিনের জামা পরা। আমার দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে।

ব্যাপার বুঝলাম না।

ঘোষদার জীপ নিয়ে এসেছিলাম। জীপ ঘোষদাই চালাচ্ছিলেন। ডান দিকে ঘোষদার পাশে গিয়ে বসলাম। এমন সময় ঐ লাল গাড়িটা আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। হঠাৎ মনে হল, যে লোকটি ড্রাইভারের পাশে বসে আছে তাকে যেন কোথায় দেখেছি। ভাবলাম মনেরই ভুল হয়ত। কোথায়ই বা দেখব?

ঘোষদার বাড়ি ফেরার পথে রামদেও বাবুর ছেলের সঙ্গে দেখা। ভারী ভালো ছেলেটি। সে কিছুতেই ছাড়বে না। তাদের বাড়ি নিয়ে গেল। বিরাট বাড়ি। সারি সারি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। বহু লোক অফিসে গিস্‌গিস্ করছে। রামদেওবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। ভারী অমায়িক সাদাসিধে লোক। পরনে ধুতি ও টুইলের শাদা ফুল-হাতা শার্ট, কলার তোলা, মাথার চুল এলোমেলো, অনুক্ষণ সিগারেট খাচ্ছেন। বুকপকেটে একটি রুমাল বালের মত পাকিয়ে রেখেছেন। আমাদের দারুচিনি এলাচ্ দেওয়া চা খাওয়ালেন। বললেন—দুপুরে না খেয়ে গেলে খুব দুঃখিত হবেন। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ঘোষদা অনেক অনুনয়বিনয় করায় তারপর আমাদের ছাড়লেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘোষদা বললেন—একটু জিরিয়ে নাও তারপর তোমাকে এগিয়ে দেব এখন। কেচ্‌কীতে গিয়ে চা খাওয়া যাবে। সেখানে কিছুক্ষণ বসে, চা খেয়ে তুমি তোমার পথ ধরবে, আমি ফিরে আসব ডালটনগঞ্জে।

যেতে যেতে ত তোমার রাত হয়ে যাবে বেশ, প্রায় ন'টা বাজবে। এতখানি পাহাড়ী রাস্তা, তোমার এক চলাফেরা অভ্যেস নেই, এক কাজ কর, সঙ্গে আমার একজন খালাসী নিয়ে যাও। কথাটা আমারো মনে হচ্ছিল। কিন্তু কেন জানি পৌরুষে লাগল। যশোয়ন্তের সঙ্গে থেকে থেকে আমারও বোধহয় পুরুষ হবার ইচ্ছে জেগেছে। তাছাড়া বন্দুকটা ত সঙ্গেই আছে।

একমাত্র জীপ খারাপ হবার ভয় রয়েছে। কারণ এ সময়ে জঙ্গলে কাজ বন্ধ থাকে বলে জঙ্গলের পথে ট্রাক চলাচলও সম্পূর্ণ বন্ধ। জীপ পথে খারাপ হলে ওখানেই পড়ে থাকতে হবে। যো-হোগা, সো-হোগা। বললাম—না, না, কোনো দরকার নেই।

বিকেলে আমরা কেচ্‌কীতে গেলাম। যশোয়ন্ত ও সুমিতাবৌদির কাছে অনেক গল্প শুনেছিলাম। কেচ্‌কী আজ চাক্ষুষ দেখলাম। ছবির মত জায়গা। ন্যাশানাল পার্ক হয়ে গেছে এখন সে সমস্ত অঞ্চল।

ওরঙ্গা আর আমানত এসে মিশেছে এখানে। এখন বর্ষাকাল। বেশ অনেকটা জায়গায় জল চলেছে—বালির সীমানা বেদখল করে। নদীর উপরে রেলের ব্রিজ।

ঘোষদা সঙ্গে আছেন, অতএব জল খাবারের জন্যে দুজনের সঙ্গে যে পরিমাণ খাবার এসেছে তাতে এক প্লেটুন সৈন্য ডিনার সারতে পারে। মারিয়ানা বলে যে, ঘোষদা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, "The only way to the heart is through the stomach.'

সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল সে একটি সতরঞ্চি নিয়ে জলের ধারে পাতল। আমরা ইচ্ছে করলে বাংলোয় বসতে পারতাম! বাংলোটি বেশ উঁচু বলে সেখানে বসে চতুর্দিক ভারী সুন্দর দেখা যায়। বন-বিভাগের বাংলো এটি। কিন্তু জলের পাশেই পরিষ্কার দেখে একটি জায়গায় আমরা বসলাম। টিফিন ক্যারিয়ারের বাটি পর পর সামনে খোলা হল।

রোদ পড়ে গেলেই বেশ শীত শীত লাগে আজকাল। পুজোর আর দিন-কুড়ি বাকী।

এক ঝাঁক বুনোময়না কোলাকুলি উড়ে গেল ঔরঙ্গা আর আমানতের সঙ্গমস্থলের উপর দিয়ে। একটা মালগাড়ি গেল গুম-গুম-গুম-গুম করে ব্রিজ পেরিয়ে। নদীর বুকে এবং পাহাড়ে বনে প্রতিধ্বনি তুলে।

কাবাব খেতে খেতে ঘোষদা বললেন—তোমাকে একটা কথা বলব বলব বলছি বহু-দিন থেকে ভায়া, কিন্তু এতদিন সুযোগ-সুবিধা হয়নি। কথাটা হচ্ছে এই যে, যশোয়ন্তের সঙ্গে বন্ধুত্বটা একটু কমাও। ও এক ধরনের লোক এবং আমরা অন্য ধরনের। ওর শত্রুও অনেক। সংসারে থাকতে হলে যেসব নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়, সে-সবের তোয়াক্কা ত ও করে না। বিয়ে-থাও করেনি, করবেও না কোনোদিন, কাউকে কোনো ব্যাপারে পরোয়া করার প্রয়োজনও মনে করে না। বড়লোকের ছেলে, ও ত জানেই যে, চাকরি ওর সখের চাকরি। কিন্তু আমার তোমার ত তা নয়। আজ চাকরি গেলে কাল করবে কি? বুঝলাম, না হয় বলবে যে, মফস্বলের প্রফেসরী কি নিদেনপক্ষে একটা স্কুলমাস্টারিও কি জুটবে না? কিন্তু পাবে কত? এ-চাকরিতে যা প্রসপেক্ট তা কি সেখানে পাবে? ভদ্রঘরের ছেলে, বিয়ে-থা করবে, সংসারধর্ম করবে, সভ্যজীবন যাপন করবে, তা নয়; তুমি যেন নন্দী-ভৃঙ্গীর দলে দিনকে দিন নাম লেখাচ্ছ। ঐ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পার্চিং কেসে তোমাকে যে ওরা সাক্ষী করেছে, সে-খবর হুইটলী সাহেবের কানেও গেছে।

তারপর জাবর কাটতে কাটতে হঠাৎ বললেন—চুপ করে বসে কেন? খাও খাও বলে চাপাটীর বাটিটা এগিয়ে দিলেন। আবার একদলা কাবাব মুখে ফেলে বললেন, প্রাক্‌টিক্যাল হও বাবা প্রাক্‌টিক্যাল হও। ঐ হুইটলী সাহেবই বল আর যেই বল, তারা অবশ্য যশোয়ন্তকে ভালবাসেন। কিন্তু আসলে তারা বোঝে বিজনেস। টাকা কামাবার যন্ত্র হচ্ছি আমরা। আপাতদৃষ্টিতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হয়ে তুমি সাক্ষী দেবে এতে আমরা যে তাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী এটাই প্রমাণিত হবে। কিন্তু যতদূর পারো ঐসব ঝামেলা এড়িয়ে যাবে। বনে-জঙ্গলে বাস করতে হবে একা একা। লোকের সঙ্গে খামোকা ঝগড়া করলে চলবে কেন? কে বেশী টিম্বার ফেলিং করল, কোন্ রেঞ্জার কুপে মার্কা মারার সময় ঘুষ খেল, কে কোথায় মাদী সম্বর মারল, কে কাকে গাড়ীতে তুলে মজা লুঠল, এত সব খবরে তোমার আমার দরকার কি? এই জঙ্গল-পাহাড়ের লোকগুলো সব হাড়ে-হারামজাদা। আমরা শহুরে চিড়িয়া, আলগা আলগা থাকো। ধরি মাছ না-ছুঁই পানি এই পলিসি নিয়ে চল, দেখবে কোনদিন বিপদ হবে না।

ঘোষদা যা বললেন তার সবটুকুই মন দিয়ে শুনলাম। সুবোধ বালকের মত মুগ্ধ হয়েই শুনলাম। কারণ, যারা উপদেশের মাধ্যমে তাবৎ জাগতিক প্রশ্নের, টীকাসহকারে নিজেরাই উত্তর দিয়ে দেন, তাদের কাছে বলার কি থাকতে পারে? এবং উপদেশ হিসাবে খারাপ কিছুই বলেননি।

সূর্যের তেজ কমে আসছে। আগুনে, শুকনো-কাঠ গুঁজে ফুঁ দিয়ে ফুঁ দিয়ে ঘোষদার খিদমদগার চায়ের জল গরম করেছে। চাও হয়ে গেল। পর-পর দু' কাপ চা আরাম করে খেয়ে আমার জীপে উঠে বসলাম।

বন্দুকটা বাক্‌সে ভরে এনেছিলাম। বাক্‌স থেকে খুলে সামনের সীটে লম্বা-লম্বি করে পিঠের কাছে শুইয়ে রাখলাম। গুলির থলিটা সামনে পা-রাখার জায়গায় ডানদিকে রাখলাম। বলা যায় না, বাঘ, হাতী কি বাইসন পথরোধ করতে পারে।

ঘোষদা বললেন—সাবধানে যেও, আস্তে চালিয়ে যেও। এই বেতলার জঙ্গলে হাতীর বড় ভয়। হাতীর সামনে পড়লে হর্ন-টর্ন যেন বাজিও না, গুলীও করো না। চুপ করে হেড-লাইট জেলে দাঁড়িয়ে থেকো। নিজেরাই সরে যাবে।

ঘোষদাও তাঁর জীপে উঠলেন। কেচ্‌কী পেরিয়ে এসে লেভেল ক্রশিংটা পেরিয়ে ঘোষদা বাঁদিকে মোড় নিলেন আমি ডান-দিকে।

অন্ধকার বেশ দ্রুত নেমে আসছে। পশ্চিমাকাশের লাল-বেগুনে আভাটা মিলিয়ে গেল। তিরিশ-পঁইত্রিশ মাইলে জীপ চালাচ্ছি। এঞ্জিনের একটানা স্বাস্থ্যবান গোঁ-গোঁ আওয়াজে নিস্তব্ধ বনপথ চমকে চমকে উঠছে।

ছীপাদোহরের কাছে রাস্তাটা বড়ই আঁকাবাঁকা ও খারাপ। ছীপাদোহরের পর রাস্তাটা কাঁচা হলেও অপেক্ষাকৃত ভাল এবং প্রায় সোজা।

এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। হেড-লাইটটা জ্বললাম। ড্যাশবোর্ডের আলোটাও জ্বলল। 'ডিমারে' দিয়ে চলেছি। কারণ, এইখানে রাস্তায় প্রতি সেকেণ্ডে সেকেণ্ড বাঁক এবং ঘণ্টায় দশ-পনেরো মাইলের বেশী চালানো যায় না গাড়ি।

খারাপ রাস্তাটুকু পেরিয়ে এলাম। এবার একেবারে 'টিকিয়া-উড়ান' চালাব।

প্রায় আটটা বাজে রাত। ডালটনগঞ্জ থেকে প্রায় ২০ মাইল এসেছি। এইরকম জায়গায় মনে পড়ে, আসবার সময় যেন একটা ডাইভার্সন দেখেছিলাম, একটা ব্রিজ মেরামত হচ্ছে। কাঠের বোর্ডে লেখা, 'Caution ! Diversion Ahead !'

ডাইভার্সনের কাছে গতি একেবারে কমিয়ে দিয়ে বাঁয়ে রাস্তা ছেড়ে নেমে গেলাম। বড় বড় পাথর পড়ে রয়েছে লাল-মাটির পথটিতে। আসবার সময় এগুলো লক্ষ্য করেছি বলে মনে হলো না। সেগুলোকে কাটাতে গিয়ে, ব্রেক কষে স্পেশ্যাল গীয়ারে দিয়ে যেমনি উপরে উঠতে যাব, অমনি একেবারে আমার কানের কাছে গুড়ুম করে একটা বন্দুকের আওয়াজ হল। এবং একটা বুলেট প্রায় কান ঘেঁষে হিস্‌-স্‌ করে বেরিয়ে গেল। কি ভয় যে পেলাম, কি বলব। প্রাণপণ চেষ্টায় যত জোরে পারি এ্যাক্সিলিরেটরে চাপ দিলাম। গাড়ি এমনিতেই ফার্স্ট গীয়ারেই ছিল, তাতে স্পেশ্যাল গীয়ার চড়ানো, গাঁক গাঁক করে বড় রাস্তায় পড়ল জীপ, সেই অবস্থাতেই সেকেণ্ড গীয়ারে ফেললাম, তবু স্পেশ্যাল গীয়ার ছাড়িয়ে নিয়ে সেকেণ্ড গীয়ারে দিতে যত-টুকু সময় লেগেছিলো তার মধ্যেই আর একটি গুলী আমার পেছন থেকে এসে আমার সীট থেকে আট-দশ ইঞ্চি দূরে উইণ্ডস্ক্রিনে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝুর ঝুর করে কাচ ঝরে ছিটকে আমার গায়ে পড়ল।

তক্ষণে থর্‌থর করে কাঁপতে আরম্ভ করেছে পা-দুটো। মনে হচ্ছে পা-দুটো আমার নয়। ভাল করে ক্লাচ চাপব কি অ্যাক্‌সিলেরেটার চাপব তেমন জোরই যেন পায়ে নেই। কিন্তু কি করে হল জানি না, জীপটা মনে হল একটা জেট্ প্লেন, গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে করতে মুহূর্তের মধ্যে ছিটকে বেরিয়ে গেল। পলকে পলকে গীয়ার চেঞ্জ করলাম। মনে হলো গাড়ি থেকে একটা রবার পোড়া গন্ধ বেরোচ্ছে, ক্লাচ-প্লেট পুড়ে গেল কি ভগবান জানেন।

একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে বোধহয় মাইল-পাঁচেক এসে জীপটা রাস্তার বাঁদিক করে দাঁড় করালাম। একটা খরগোস দৌড়ে রাস্তা পার হল। কান পেতে শুনলাম কোন গাড়ি আমার জীপকে ধাওয়া করে আসছে কিনা, কিন্তু হাওয়ায় শালপাতার ঝুর্‌ঝুর্ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলাম না।

আকাশে একফালি চাঁদ। আমার আতঙ্কগ্রস্ত মুখের দিকে চেয়ে নিষ্প্রাণ হাসল। ওয়াটার বট্‌ল বের করে ঢক্‌ঢক্ করে জল খেলাম, প্রায় বোতল খালি করে ফেললাম, তারপর আর বেশী দেরী করা ঠিক নয় মনে করে তক্ষুনি স্টীয়ারিং-এ বসলাম।

যত জোরে পারি, তত জোরে চালিয়ে ছীপাদোহর পেরিয়ে যশোয়ন্তের নইহারে এসে পৌঁছলাম। আমার একা একা রুমাণ্ডিতে যেতে ভয় করছিল। পথে যদি আবার কোন বিপদ ওৎ পেতে থাকে?

নইহারে তখন গভীর ঘুম। রাত প্রায় নটা বাজে। চায়ের দোকানটা বন্ধ। ফরেস্ট অফিস বন্ধ। তবে দেখা গেল যশোয়ন্তের বাংলোর দোতলার ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে। একেবারে সোজা ওর বাংলোর হাতায় গাড়ি ঢুকিয়ে হর্ণের উপরই শুয়ে পড়লাম।

সঙ্গে সঙ্গে যশোয়ন্ত তর্‌তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে উৎকণ্ঠিত গলায় বলল ক্যা হুয়া? লালসাব্, ক্যা হুয়া? আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। আমার হাঁটুর সেই কাঁপুনিটা আবার ফিরে এল। থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগলাম। আমি যে মরিনি, আমি যে নইহারে যশোয়ন্তের কাছে জীপ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছি, এইটে ভেবেই আমার চোখে জল এসে গেল। যখন গুলী এসে কাচে লেগেছিলো, তখন-কার ভয়টা আমার শিরদাঁড়ায় শির্‌শির্ করে কাঁপতে লাগলো। আমি স্টীয়ারিং জড়িয়ে শুয়ে রইলাম। কিছু বলতে পারলাম না।

(ক্রমশঃ)

কী ভাবছিল কে জানে। মন কখন কী-ভাবে কেউ বলতে পারে কি। উপরন্তু যদি মন হয় চঞ্চল, মনে অশান্তি থাকে তাহলে বলা আরও কঠিন।

কখন গার্ড হুইশিল দিয়েছে ড্রাইভার সাবধানী সংকেত বাজিয়েছে এককড়ির কানে যায় নি। সে রেলের টি স্টলে গরম চায়ে চুমুক দিতেই ব্যস্ত। আরও ব্যস্ত, চিন্তার গভীরে ক্রমশই ডুবে যেতে।

বোধহয় এককড়ি ভাবছিল নিজের অতৃপ্তির কথা। জীবন প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি। সামান্য কিছু ভোগের বাসনা ছিল, সেই সামান্য ভোগবস্তুগুলিও কপালে জুটল না। এর পর যদি কখনো সেগুলো

অভিজিত মুখোপাধ্যায়

সংরক্ষিত আসন

জোটেও তো ভোগ করার মত শরীর সক্ষম থাকবে না।

ইদানিং তার মনে একটা বড় রকমের আফশোষ প্রায়শই জ্বালা ধরিয়ে চলেছে।

সামান্য ভোগের এমন অসামান্য অতৃপ্তি তাকে বাকী জীবন বয়ে চলতে হবে? মৃত্যুর পরেও তার অতৃপ্তি আকাশে বাতাসে প্রেতাত্মার মত ঘুরে বেড়াবে ক্ষুধার্ত ভিখারীর মত?

এর জন্য দায়ী কে। সে? নাকি তার বর্তমান কাল? তার অযোগ্যতা? নাকি দেশ।

দায়ী যেই হোক, তার অতৃপ্তির অস্তিত্বর কিছু ইতরবিশেষ হয় না। নিজের কাছে নিজেকে বড় ছোট মনে হয়। কোনো কৈফিয়ত পেশ করেও নিজেকে দায়মুক্ত করতে পারে না। তৃপ্ত করতে পারে না।

কখন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল, হুঁশ হল দোকানদারের কথায়।

সাব! ইয়ে ট্রেন সে আপ যাতে তো?

উঁঃ? আরে! ছেড়ে দিল নাকি!

পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে চায়ের দাম ছুঁড়ে দিয়েই ছুট। ছুটতে ছুটতে ট্রেনের কাছে গিয়ে পৌঁছল। ট্রেনের গতি তখন বেশ বেড়ে গেছে। চলন্ত ট্রেনে সে উঠবে কি না ভাবল মুহূর্তের মধ্যে। কী আর তার দামী লাগেজ আছে। সামান্য একটা চামড়ার ব্যাগ, তাতে খান কয় জামা-কাপড় আর কিছু কাগজপত্র। যেতে আসতে এককড়ি ভারী জিনিসপত্র বইতে চায় না কোনো দিন। খুবেই প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া দূরের যাত্রায় কিছু নিয়ে যায় না। জামাকাপড় গেলে আবার হবে। কিন্তু জরুরী কাগজগুলির জন্য তাকে দীর্ঘকাল অনুতাপ করতে হবে।

লাফ দিয়ে ফুটবোর্ডে পা দিয়ে এখন তাকে হাতলটি ধরতে হবে।

যদি পা পিছলে যায়? পড়ে একেবারে ট্রেনের তলায়?

ট্রেনের গতি ক্রমশই বাড়ছে, এককড়িকে ক্রমশই পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছে এগিয়ে। এককড়ি সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে নিজের কম্পার্টমেন্টের নম্বরটি খুঁজছে মাঝ মাঘের সন্ধ্যা। এটা কলকাতা নয়। গাছ-গাছালি বেশি, চতুর্দিকে ফাঁকা মাঠ, পাশেই একটি বড় নদী। জলীয় বাতাস আর ফরফরে মাঘ ঠাণ্ডা একঝলক হিম এককড়ির কানের পাশ দিয়ে ছুটেছে বিপরীত দিকে। পরমুহূর্তে সহসা হলো এককড়ি যেন হাঁপিয়ে উঠতে শীত-

কাল। তাই না দিয়েছে ঘাম, না উঠেছে হাঁপিয়ে।

যে কাগজপত্রগুলি ট্রেনে আছে, সেগুলি এককড়ির জীবনের ফসল।

সেগুলি চলে গেলে বিগত জীবনটাই মিথ্যে হয়ে যাবে।

বর্তমানের পেছনে যে সময়টুকু সে কাটিয়ে এসেছে, তার ফলস্বরূপ ঐ কাগজপত্রগুলি। অর্থাৎ তার আঁকা ছবি। নানা রঙের নানা ঢঙের ছবি। আজ পর্যন্ত এককড়ি একটি ছবিও কোথাও ছাপতে দেয় নি। একটি প্রদর্শনীও করে নি।

বরাবরই সে উগ্র প্রকৃতির।

কোথাও সে রফা করে চলেনি।

কুৎসিত অথচ কেরিয়ার তৈরি করার জন্য বিশেষ জরুরী সেই পথে সে কখনো পায়ের ধুলো পর্যন্ত দেয় নি।

আর, ছবি আঁকার জন্য সে দশটা-পাঁচটার চাকরি করে নি, টিউশনি করে নি... টিউশনিটা ওর কাছে বিশ্রী রকমের একঘেয়ে, চর্বিত চর্বণ করা। মাঝে মাঝে দু-একবার ব্যবসা করেছে। দায়ে পড়ে জীবনে একবার একটা চাকরি নিয়েছিল, কিন্তু যখন চাকরী মেলা মানে হাতে হাতে চাঁদ পাওয়া, তখনকার দিনেও সে একদিন চাকরি সহ্য করতে না পেরে ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে।

তার কাজ ছবি আঁকা... ছবি আঁকার জন্য যা দরকার—তা সে যত অসম্মানজনক কাজই হোক, করতে প্রস্তুত। কিন্তু যে কাজ তার ছবি আঁকার সামান্য পুষ্টিসাধন করতে পারে না সে কাজ সে একমুহূর্ত করবে না।

অবশ্যই সে জানে ছবি আঁকার জন্য শিল্পীকে নানান বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। সে কেবল অভিজ্ঞতার জন্য। অভিজ্ঞতা লাভের পর আর তার সেই বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকার কোনো যুক্তি নেই।

এককড়ি তার শিল্পজীবনে এত কঠিন যে সংসারে তাকে সবাই নিষ্ঠুর বলে ভুল করে। সংসারে সবাই যখন স্থূল বিষয়ের, স্থূলেতর ঐহিক আরামের গর্বে মশগুল তখন এককড়ি ছবি আঁকার চিন্তাতেই উদাসীন।

এককড়ির আত্মীয়স্বজনেরা, সবাই ওকে নিয়ে আলোচনা করে... এত বুদ্ধিমান ছেলে অথচ কিছুই করতে পারল না জীবনে। আর তার চাইতে কত কম উজ্জ্বল ছেলে আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

লোকে তাদের অনটন দারিদ্র্য এবং সুখভোগের জন্য দিনরাত আফশোষ করে চলেছে, সবাই যে যার কপালকে দায়ী করে রাতে ঘুমোতে চলে যাচ্ছে। এককড়ির কোনো অনুতাপ দেখতে না পেয়ে তার প্রতি সবাই হিংস্র হয়ে উঠছে। যারা তাকে ভালোবাসে যারা তার কাছে কোনো না কোনো সময়ে উপকৃত তারাও তাকে বিষাক্ত বাক্যবাণে জর্জরিত করছে।

এককড়ি জানে সে যদি ডুবেও যায়, তাহলেও তার কোনো অনুতাপ থাকবে না ...কারণ সে শিল্পচর্চা করতে করতেই ডুবেছে।

সুতরাং এককড়ির কাছে ঐ কাগজপত্রগুলির দাম অনেক।

অনেক সময় হারানো বস্তুও ফিরে পাওয়া যায়। এই স্টেশন থেকে পরবর্তী স্টেশনে ফোন করে দিলে হয়তো তার কামরার লোক তার জিনিসগুলি নামিয়ে দিয়ে চলে যেত।

না না। হয়তো কিন্তু...ইত্যাদির উপর ভরসা করে এককড়ি চোখের সামনে নিজের এমন আত্ম অবলুপ্তি দেখতে পারে না। লাফ দিল এককড়ি...এবং তখনই ঠিক তার কম্পার্টমেণ্টটাই সামনে। একটা পা পিছলে গেল। নিজের শরীরটা সে অনেক চেষ্টা করে সোজা করল। দুটো পাই ফুটবোর্ডে স্থাপন করল।

শীতের বাতাস হু হু শব্দে বইছে।

হঠাৎ অতিরিক্ত শ্রমের পর বাতাসটা বেশ মিঠে লাগল। তৃষ্ণার্ত গলা ঠাণ্ডা বাতাসে প্রবোধ মানল।

তালার হাতল ঘোরাতে গেল, কিন্তু হাতল ঘুরল না।

ভিতর থেকে লক করে দিয়েছে যাত্রীরা।

ঠাণ্ডা বাতাসের ভয়ে জানলায় কাঠের ও কাঁচের শার্সি ফেলা। বাঁ হাত দিয়ে এককড়ি শার্সিতে দমাদম ঘুষি মারতে লাগল।

কাকস্য পরিবেদনা।

ভিতর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার। কয়লার ট্রেন চলেছে দ্রুতবেগে। ক্রমশ তীব্র শীতার্ত বাতাস এককড়ির দেহে প্রবল ঝাপটা মেরে যাচ্ছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই এককড়ির হাত-পা জমে যেতে লাগল।

সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল।

এক্সপ্রেস ট্রেন। পরবর্তী স্টপেজ দেড়ঘণ্টা পরে।

এমন শীতে সে কতক্ষণ রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে।

ক্রমশই তার শরীর হিম হয়ে আসবে, তার শক্তি লুপ্ত হয়ে যাবে, তার মুষ্টি শিথিল হবে। সে...

না আর এককড়ি ভাবতে পারছে না।

যে ছবিগুলির জন্য সে দিগ্বিদিক চিন্তা না করে ট্রেনে ঝাঁপিয়ে উঠেছে, সেই রকম ছবি কি আর কখনো আঁকতে পারত না।

না বেঁচে থাকলে তো আর ভবিষ্যতের চিন্তা করা যায় না। বরং জীবনটা থাকলে এইরকম না হলেও, আরও কত ছবি, কত রকমের ছবি আঁকতে পারত।

যে অতৃপ্তি সে বয়ে বেড়াচ্ছে, তার চরিতার্থের সময় পেত।

এখন যে তার জীবন নিয়েই টানাটানি।

আবার এককড়ি দমাদ্দম ঘুষি মারল জানলার কপাটে।

তথৈবচ।

ভিতরটা নিঃসাড়।

লোকগুলো কি সন্ধ্যের মধ্যেই শুয়ে পড়ল? ঘুমিয়ে গেছে?

চীৎকার করে ডাকল এককড়ি। অন্ধকার প্রান্তরে সামান্যতম প্রতিধ্বনি তুলে তার ডাক মিলিয়ে গেল দিগন্তের কোলে।

অন্ধকারে গাছপালা ঝাপসা। আকাশে নক্ষত্রগুলো ঝকঝক করছে। কী বিস্তৃত নীলাকাশ। গাঢ়তম অন্ধকারেও গোপনতম সত্তার মত নীল রঙের আদর্শটা মহাকাশ বিসর্জন দেয় নি।

বিশাল বিশালতম ব্রহ্মাণ্ডের পরিসরটার রূপ কল্পনা করার চেষ্টা করল এককড়ি। এই বিশালতম পরিসরে মানুষের অস্তিত্ব বিন্দুর মত, তার পরমায়ু, অনন্তের পরমায়ুর তুলনায় হাস্যকর সংক্ষিপ্ত।

এই অনন্তের ছবি কি এককড়ি কোনোদিন তার ক্যানভাসে আঁকতে পারবে। তবে কেন ছবির গুণাবলী নিয়ে এত খুনোখুনি। তবে কেন ছবির জন্য আত্মবিসর্জন।

অনন্তের স্বাদ যাতে মানুষ পায় ছবির মাধ্যমে তারই বাতুল প্রয়াস করে চলেছে এককড়িরা।

অনন্তের স্বাদ? সে আবার কেমন সোনার পাথরবাটি।

অন্ত দিয়ে অনন্তের স্বাদ আবার কখনো গ্রহণ করা সম্ভব?

এককড়ি বলে: আমি যখন অনন্ত নই তখন অনন্তের জন্য মাথাব্যথা কেন। আমি যখন অন্ত, তখন অন্ত নিয়েই আমার চর্চা। অন্তের ছলাকলার রূপায়ণেই কি কম খরচ! তারই দাম দেয় কে। এই অনন্ত চিরকাল অনন্তই রয়ে যাবে, আমার আদাও আছে...যদি মানুষের আত্মার অমরত্ব থেকে থাকে তবে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু আত্মার অমরত্ব যখন বিজ্ঞানসম্মত নয়, তখন মানুষকে মরণশীল ধরতেই হবে। আর মানুষ যখন মরণশীল তখন যে বস্তুগুলি অমর তাদের দিকে তাকিয়ে বুক চাপড়ানোর কোনো মানে হয় না। থাক সে অনন্ত, অনন্তের জীবন নেই যৌবন নেই, ভোগ নেই নারী-সঙ্গলাভ নেই সে জরায় সর্বস্বান্ত হয় না। সে জড়ের চাইতেও অধম সে কৃপার পাত্র।

এককড়ির গলা থেকে দাসানুদাসের মত করুণ প্রার্থীর সুর বেরোলো—দাদা... ও দাদা... ও মশাই... দরজাটা একটু খুলবেন! মরে গেলাম যে...

হাতঘড়ির দিকে তাকাল এককড়ি পরবর্তী ছোট স্টেশনের আলোতে। সাতটা

যাচ্ছে। আধঘণ্টার ওপর ট্রেন ছুটছে...এক নাগাড়ে। এখনো একঘণ্টা বাকী।

অসম্ভব। একঘণ্টা সে লোহার রড ধরে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

বারবার সে হাত পাল্টাচ্ছে।

শরীরে কাঁপুনি ধরে গেছে। হাঁটু দুটো থরথর করে কাঁপছে।

এক হাতে রড ধরে আরেক হাতে শার্সিতে ঘুষি মারতে আর সাহস হচ্ছে না। আর এক হাত দিয়ে রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। দু হাত দিয়ে লোহার রডটা আঁকড়ে ধরে থাকতে হচ্ছে।

এককড়ির মনে পড়ল, আজ সে সারাদিনই প্রায় অভুক্ত। সেই সকালে কাপ দুয়েক চা ও একটি কোয়ার্টার পাউন্ড পাঁউরুটি খেয়েছিল। তারপর সারাদিন নানান কাজে ঘোরাঘুরি করেছে, তারপর তাকে ছোটাছুটি করে ট্রেন ধরতে হয়েছে। স্নানটাও করে নেবার সময় পায় নি।

তার উপর, ইদানিং তার বেশ টানাটানি চলছে।

পুষ্টিকর খাদ্য, বললে গেলে, মাসান্তেও জোটে কি না সন্দেহ।

রড ধরে যেতে যেতে মনে হচ্ছে সে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে।

হঠাৎ একটা শীর্ণ আলো এককড়ির গায়ে এসে পড়ল।

কাঠের খড়খড়ি খুলেছে কে কামরার ভিতর থেকে এবং সে খড়খড়িটা তারই পাশে। জানলার কাচ দিয়ে আলো ছিটকে এসেছে। জানলার পাশ ঘেঁষে নেমে এল এক তরুণীর মাথা।

এককড়ি মুখটা বাড়াল জানলার দিকে। এক পলকের জন্য কাচের শার্সিটা ইঞ্চি দুয়েক ফাঁক হয়েই ঝুপ করে যথাস্থানে পড়ে গেল। এক দলা কফমুক্ত থুথু এসে পড়ল এককড়ির চোখেমুখে।

হতচকিত এককড়ি হিংস্রতায় জ্বলে উঠল। কামরার ভিতরে যারা আছে, তারা কি মানুষ। সে শিথিল হাতের এক মুঠিতে জীবনপণ করে ঝুলতে ঝুলতে অপর হাত দিয়ে ক্ষিপ্তের মত চাপড় বসিয়ে চলল।

তরুণীটির কানে গেল বোধহয় শব্দটা। সে আবার মুখ ঝুঁকিয়ে দেখতে চেষ্টা করল। এককড়িকে দেখল কিছুক্ষণ...তার কানে মুক্তোখচিত দুল, নাকে নাকছাবি। ঘাড়কাটা ব্লাউজ। চুলগুলো প্রহরকাল ধরে কপাল জুড়ে বসিয়েছে। সুন্দর দুটি হাত নীলাকাশে ছায়াপথের মত ছড়িয়ে আছে নীল শাড়ির উপর। মাঝে মাঝেই আঁচল খসে পড়ছে বুক থেকে. স্বাস্থ্যবতী তরুণী। শীতের সিগন্যালের জন্য একফালি পশমের চাদর। কোলের কাছে লুটোচ্ছে।

জানলার কাছে মাথা নিয়ে যেতেই চোখে পড়ছে খোঁপায় রুপোর ফুল বসানো কাঁটাগুলির দিকে। মখমলের চাইতেও মসৃণ ঘাড়ের ও পিঠের দিকে।

তরুণীটি চাপা স্বরে আর্তনাদ করে উঠল।

দ্যাখ দ্যাখ কে? ডাকাত-ফাকাত নাকি? আর তার গলার স্বর ফুটল না।

ডাকাত? হোহো শব্দে দরাজ কণ্ঠে হেসে উঠল অভীক।

খাড়া নাক প্রশস্ত কপাল ছোট ছোট দুটি ধারালো চোখ। গায়ের রঙ কালচে, বয়স বড় জোর ত্রিশ, মুখের চামড়া এখনো কুড়ি একুশ বছর বয়সের যুবকের মত কাঁচ। দু-হাজারের বেশী মাইনে পায়, কোম্পানীর চাকরি। শীতকালটা বিহারের কোথাও স্বাস্থ্যকর স্থানে কাটাবে বলে চলেছে।

গতকাল তাদের দলের বড় অংশ চলে গেছে।

অভীক আজই ছুটি পেল...অর টুনটুন গোস্বামীর কথাই ছিল সে অভীকের সঙ্গে যাবে। অফিস থেকে পিওন পাঠিয়ে ফার্স্ট ক্লাসের একটা বার্থ রিজার্ভ করার চেষ্টা করেছিল অভীক। ফার্স্ট ক্লাসের সীট পাওয়া যায় নি অগত্যা এই লকড় সেকেন্ড ক্লাস। তাদের দখলে চারটি সীট।

টুনটুন খেপে গেল অভীকের ব্যঙ্গ-মেশানো হাসি দেখে।

নিজেকে ছাড়া পৃথিবীর আর সবাইকে তুমি বোকা ভাব, না?

না না...ভুল বললে, সবাইকে বোকা ভাবি ঠিকই, তবে তোমাকে বাদ দিয়ে। হাজার হোক তুমি একজন ডাকসাইটে কলেজের অধ্যাপিকা।

আবার জোরে হেসে উঠল অভীক।

হাসি থামিয়ে দিল হঠাৎ, কলের জলের মত...এক ফোঁটা হাসির রেশও লেগে রইল না ঠোঁটে।

অসম্ভব নয়, খবরের কাগজে নিশ্চয় দেখেছ, প্রায়ই রেল কামরায় চড়াও হয়ে 'রেড' করছে। ...অভীক বলল রাজকীয় কায়দায়, কী যে হচ্ছে, ধারণার বাইরে। শান্তি স্বস্তি বলে কোনো পদার্থ নেই। তোমার বুকের পাঁজরে প্রাণটুকু আঁকড়ে কেবল ভয়ে ভয়ে দিন কাটানো।

টুনটুন অভীকের কথা কানে নিচ্ছিল কি না বোঝা গেল না। সে আবার জানলায় চোখ ঠেকিয়ে কী দেখছিল।

ছোট কম্পার্টমেন্ট। সাকুল্যে আটটি 'বসিবার স্থান'। বাঙ্ক দুটিতে দুজন। পুরো কামরাটাই আগে থেকে রিজার্ভ করা যাত্রীদের জন্য। মাথার ওপর ঠুলি পরানো দুটি ডুম। একটিও অক্ষত নেই। দরজার দিকে একটা বাতি এখনো হলদে আলো দিচ্ছে, এ পাশটা ছায়া-ছায়া দেখা যাচ্ছে। এককড়ির গায়ের পাশ দিয়ে যে আলো পড়েছিল সেটা অভীকের টর্চের আলো। গ্রাম-দেশে যাচ্ছে বলে অভীক পাঁচসেলের টর্চটি কিনেছে। দূরে যাবার জন্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি জিনিস সঙ্গে নিয়েছে অভীক। টুনটুনও অভীকের মত সংসারী নয়।

ওরা দুজনে একটি গাঁট আঁটা বেঞ্চিতে পা ছড়িয়ে বসেছে।

সামনের চারজন যাত্রীদের দুজন ঢুলছে, একজন ধূমপান করছে, আরেকজন আকাশপাতাল চিন্তায় গাম্ভীর্য মগ্ন।

কামরায় কিছুক্ষণ আগে আলো নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা এক পশলা হয়ে গেছে। আলোর সঙ্গে রেল কোম্পানীর শ্রাদ্ধ থেকে শুরু করে বর্তমান কালের সর্বত্র অত্যাচার জল্পনা এই প্রসঙ্গে সবই পৌঁছে যাবার পর, আলোচনা নিজের থেকে নিভে গেছে। সবাই অপরিচিত এই কামরায়। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ সবারই অজ্ঞাত। তাই বাইরের প্রসঙ্গ ফুরিয়ে যাবার পর আর আলোচনা কেউই টেনে নিয়ে যেতে পারে নি।

অভীক ও টুনটুন একটার পর একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে যাচ্ছে, আর ওরা হাসাহাসি করছে।

যাত্রীরা এদের পরিচয়, পারস্পরিক সম্পর্ক জানার জন্য একটা কান ছেড়ে দিয়েছে...কিন্তু তাদের মুখ অতি নির্লিপ্ত।

বাঙ্কে এককড়ির আসন। তার বিপরীত দিকে যে যাচ্ছে, সেই লোকটি এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে, একমাত্র তারই খেয়াল ছিল, এককড়ি উঠছে কি উঠছে না...কিন্তু ট্রেন ছাড়ার আগেই নাক ডাকছে তার মৃদু মৃদু। সেই নিয়েও একবার অভীক ও টুনটুন মুখ টিপে হেসেছে। এককড়ি যখন নেমে গিয়েছিল তখন সবাই

দেখেছিল, কিন্তু মনে ছিল না কারুরই। এককড়িও সেই যে শেয়ালদ স্টেশনে বাঙ্কের উপর পা মেলে শুয়ে পড়েছিল, কেউই লক্ষ্য করে নি।

তাকে পাঁচবার দেখলে তবে তো কারুর পক্ষে তার মুখটা মনে রাখা সম্ভব।

সে নেমেছে বটে, কিন্তু ফিরে এসে উঠেছে কিনা কে আর মনে করে রেখে দিয়েছে।

এককড়ি বাঙ্ক থেকে অনেকবার টুনটুনের অবয়ব লক্ষ্য করেছিল, বেশ চেহারা মেয়েটির। যে কোনো পুরুষকে দীর্ঘকাল মজিয়ে রাখার, ডুবিয়ে রাখার ক্ষমতা ধরে। বেশ একটি বড় রকমের সুখের খনি আড়াল করে রেখেছে মেয়েটি। স্বভাবতই একজন শিল্পীর চোখ সুখের খনিতে বার বার সিঁদ কাটতে চাইবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে। বার বার ভাবতে চাইবে, অভীকের যায়গায় যদি নিজে বসতে পারা যেত। কী এমন সম্পদের মালিক ওই যুবা। তার চাইতে হাজারোগুণে সম্পদ এককড়ি মুহূর্তে খরচ করতে পারে। সম্পদের মানদন্ড কি মুদ্রায়? সম্পদের মানদন্ড কি মানুষের গুণ হতে পারে না?

টুনটুন অভীকের সঙ্গেই আলাপে মশগুল।

কম্পার্টমেন্টে আর কেউ আছে কি নেই, অথবা রইলেও তারা তাকে চোখ দিয়ে গিলছে কিনা, সে সব খেয়াল টুনটুনের মাথায়ও আসে নি।

সে এককড়িকে দেখেও দ্যাখে নি। মাথার উপর আলোর অভাব প্রথম কথা, দ্বিতীয়ত এককড়ি যখন নেমে যাচ্ছিল বাঙ্ক থেকে তখন অভীক এমন একটি আদিরসাত্মক চুটকি শেষ করেছিল, টুনটুন মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি রোধ করতে ব্যস্ত, এবং চোখে তখন জল গড়াচ্ছে।

টুনটুন ঝুপ করে কাঠের খড়খড়িটি ফেলে দিল নিজেই।

এককড়ির ঘুষির শব্দ শোনা গেল, চলন্ত চাকার শব্দের মাধ্যও।

এক ভদ্রলোক বললেন, দেখি দেখি... বলে ভদ্রলোক ঝুঁকে খড়খড়িটা তুলে দিতে ঝুঁকলেন। কিন্তু টুনটুন ও অভীকের সনির্বন্ধ অনুরোধে নিরস্ত হয়ে যথাস্থানে ভদ্রলোক বসে পড়লেন।

খড়খড়ি খুললেই কাচ ভেঙে ঢুকে পড়বে! আতঙ্কিত স্বরে বলল টুনটুন।

সব ছেড়ে দিয়ে এ কামরায় কেন!—অভীকও ভয় পেয়েছে এতক্ষণে, তার শরীরে হঠাৎ আতঙ্কের বিদ্যুৎ খেলে গেছে। কিন্তু নিজেকে সপ্রতিভ প্রমাণ করার জন্য চোখের ইঙ্গিতে অভীক জানাল এ কামরার আকর্ষণ টুনটুন।

ভদ্রলোক, যিনি ধূমপান করছিলেন, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, তিনি মুখ বাড়িয়ে এককড়ির বাঙ্কের দিকে চেয়ে নিলেন। তারপর বললেন, এই ভদ্রলোক কিন্তু নেমেছিলেন।

সে তো আমিও দেখেছি...ও বোধহয় চলে গেছে। চটপট জবাব দিল টুনটুন।

প্যান্ট পরা বয়স্ক একজন, যিনি এখনই তন্দ্রা ভাঙলেন, তার কথা শুনে বোঝা গেল তিনি ঘুমিয়ে জাগতে পারেন।

তিনি বললেন, জিনিসপত্র নিয়ে গেছেন?

অভীক ও টুনটুন দুজনেই দাঁড়াল। অভীক সামনের বাঙ্কে পাঁচসেলের টর্চের আলো ফেলল। একটি বিছানা, অতি সস্তাদামের, মাথার কাছে চামড়ার সুটকেশ, ঠেস দেওয়া বড় আকারের কয়েকটি পেস্টবোর্ড, সেলোফোনের বড় বড় খাম। সেলোফোনের স্বচ্ছতায় একটি বদখত আকারের মানুষের ছবি আঁকা। হাত বাড়িয়ে অভীক সেলোফোনের খামটি টেনে নিল।

সকলের সামনে খামটি ধরে টর্চের আলো ফেলল।

যেন ইস্পাতের তৈরি একটি মানুষ, বুক পর্যন্ত। তারাভরা আকাশ, লোকটির নাসিকাগ্র ঊর্ধ্বমুখী। যেন আকাশের বুক ভেদ করতে উদ্যত। নিচের শিল্পীর নাম লেখা : এককড়ি।

টুনটুন হেসে উঠল কলস্বরে, ও শিল্পী! আজকালকার ছবির কী যে মানে বুঝি না! বুঝতে পারছ কিছু?

অভীক মুখ গম্ভীর করে, কাছ থেকে, দূর থেকে ছবিটা বোঝার চেষ্টা করল, বুঝল না কিছুই, বলল, এ আর বোঝার কী আছে! অতি সহজ!

কী বল দেখি...

বলছি...

প্যান্ট পরা বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, এই ভদ্রলোকই বোধহয় নেমে গেছেন।

না মশাই, উনি আর ওঠেন নি...আমি হলপ করে বলতে পারি। তিনি এখন কোথায় কোন ভাবে ডুবে আছেন তাই দেখুন, টুনটুন বলল কাঁধে আঁচল সংস্থাপন করতে করতে।

ততক্ষণে অভীক আরও কতকগুলি ছবি দেখতে সুরু করেছে।

টুনটুন বলল, রেখে দাও। কী দেখছ! বলে সেও দেখতে লাগল। তার কৌতূহল কিছু কম মনে হল না।

ধুতি-পাঞ্জাবি বললেন, আপনারা ছবি দেখবেন, না লোকটাকে ভেতরে ঢুকতে দেবেন?

অভীক বলল, যান না মশাই, দরজাটা তো আপনিও খুলতে পারেন।

ধুতি-পাঞ্জাবি কিন্তু নড়লেন না।

প্যান্টপরা ভদ্রলোক বললেন, আজকাল কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। আমার ছেলের বন্ধুরো...মানে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র—দেশের সেরা কলেজ মশাই—সেই কলেজ ছেড়ে দিয়ে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে...তাদের একজন আবার ছবিও আঁকে।

অভীক বলল, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররাও কলেজ ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে...দেশের সেবা করবে। তারাও বন্দুকধারীদের দলে নাম লিখিয়েছে।

টুনটুন বলল, পাগলরাই দেশের সেবা করে চিরদিন...মুখ টিপে হাসতে লাগল টুনটুন।...এই লোকটাকে পাগল বলে মনে হয় নি! লোকটা পাগল হলে নিশ্চয় টুনটুনের মনে থাকত।

অভীক ছবিগুলি বাঙ্কের উপর রেখে দিয়ে বসল নিজের সীটে। টুনটুন পাশে ঝুপ করে বসে পড়ল, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। সে এখনো ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে নি। বাইরের কাচে ঘুষি মারার শব্দ আর পাওয়া যাচ্ছে না। এককড়ির চীৎকার একবারও এরা শুনতে পায় নি। কয়েক মিনিট কামরায় নিস্তব্ধতা। কামরার আবহাওয়াটা আর স্বাভাবিক হচ্ছে না। লোকগুলি ভাবছে। তাদের মানবিক কর্তব্য নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করছে। অভীকও আর আদিরসাত্মক চটুকি মনে করতে পারছে না! সকলের চোখ বার বার জানলার দিকে গিয়ে ফিরে আসছে।

মোটা ধুতি ও মোটা জামা পরা একজন একপাশে বসেছিল হাঁটু মুড়ে। গালভাঙা, মুখে অনেক দাগ, বয়সের, অভিজ্ঞতার। লোকটিকে দেখেই বোঝা যায় সে গ্রামে বাস করে। চাষীবাসী লোক। কী করে যে সে ছিটকে এই কামরায় উঠে বসেছে, কেউ ভেবে কূল কিনারা করতে পারে নি। চাষীবাসী হলেও লোকটি ভদ্র পরিবারের। জাতে সদ্গোপ। হৃষিকেশ প্রতিহার ওর নাম। কলকাতায় এই প্রথম গিয়েছিল জীবনে। বিয়েবাড়িতে। বাষট্টি বছর বয়সে প্রথম কলকাতা দেখার জন্যই যাওয়া। তাদের গ্রামের জোতদারদের ছেলের বিয়ে হল কলকাতায়। সে দীর্ঘকালের ভাগচাষী। বিশ্বস্ত, তাই জোতদার বিনোদ চক্রবর্তীর ছেলের বিয়েতে তাকে পথখরচ দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ফেরার সময় বিনোদ চক্রবর্তীর ছেলে নিজে এসে গাড়ীতে ভিড় দেখে এই সীট ভাড়া করে দিয়েছে। এই প্রথম ও হয়তো এই শেষবার কলকাতা আসা...যাক না বুড়ো মানুষ একটু আরাম করে।

হৃষিকেশ চাদরটি জড়িয়ে উঠে দাঁড়াল।

সে, কোথায় কোন কলেজের ছেলেরা কী করছে...বা ট্রেনে আজকাল ডাকাতি হচ্ছে কি হচ্ছে না কোনো খবরই রাখে না। তাদের গ্রামে খবরের কাগজই আসে না। ট্রানজিস্টারের কৃপায় ইদানিং কিছু খবর মেলে। তা-ও শোনার সময় কোথায় হৃষিকেশের। সে জানে জমি ধান লাঙল আর গরু-কাড়া।

হৃষিকেশ এককড়িকে নামতে দেখেছি ...আর এদের আলোচনায় বুঝতে পারল কেউ একজন বাইরে ঝুলছে। এবং তাকে এখুনি কামরায় তুলে না আনলে তার ভবলীলা সাংগ হবে।

হৃষিকেশ উঠে গেল দরজার কাছে। দরজা খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু একটা ছিটকিনি থাকায় সে জুত করতে পারল না।

ফিরে এল হৃষিকেশ।

তখন প্রায় সাতটা পাঁচ। আরও পনের কুড়ি মিনিট পরে পরবর্তী স্টপেজ।

এককড়ি রড ধরে বসে পড়েছে। তার সর্বশরীর নিঃসাড়। যে কোনো মুহূর্তে হাত শিথিল হয়ে যেতে পারে। সে আর কাচের জানলায় আঘাত করে দরজা খুলে দেবার চেষ্টা করতে সাহস পাচ্ছে না। তাতে তার শরীরের শক্তি তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে। পকেট থেকে দেশলাই ও সিগারেট বের করে কয়েকবার ধূমপান করেছে। দেশলাই জেলে আগুন পোয়াবার চেষ্টা করেছে। হয় নি। বার বার মুহূর্তে নিভে গেছে দেশলাইয়ের কাঠি।

তার মাথাটাও কাঁপতে সুরু করেছে অনেকক্ষণ আগে।

মনে হচ্ছে, সে চোখে ঝাপসা দেখছে। গাছপালা দিগন্ত আর সে দেখতে পাচ্ছে না। কোটি কোটি নক্ষত্র যেন এক হয়ে গেছে, একটা ঝাপসা আলোর আভাস মাথার উপর ভেসে চলেছে।

সে তার রিজার্ভ সীটের জন্য অনুতাপ করছে। সে তো একটা আসন দখল করার ক্ষমতা রাখে। আর সে আসনটা আরামে পরিপূর্ণ। যতটুকু হোক সে আরাম, তার কাছে ওরই মূল্য অনেক।

নিজেকেই সে, শেষ পর্যন্ত তিরস্কার করতে লাগল।

এতটুকু হুঁশ নেই তার। যেখানে সামান্য সতর্কতায় অনেক কিছু করা সম্ভব সেখানে সে সেটুকু সতর্কও হতে পারে না! সে কোনোদিনই মানুষের ঘরে ঠাঁই করে নিতে পারবে না! রেলের কামরায় তো দূরস্থান!

নিজের সীটে আঁকড়ে বসে থাকা তার খুবই উচিত ছিল। একটা আসনে সে যে বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারে না। আরেকটা আসনে বসার জন্য সে যে বড় উদগ্রীব হয়ে ওঠে কিছুকালের মধ্যেই। তার প্রকৃতিটাই চঞ্চল। কয়েকটা মানুষ, কোনো বিশেষ স্থান সে দীর্ঘকাল সহ্য করতে পারে না। এই চঞ্চলতাই তাকে বাঙ্ক থেকে টেনে নামিয়ে চায়ের স্টলে নিয়ে গিয়েছিল।

ওই মেয়েটার মুখ তাকে বার বার যাতে দেখতে না হয়!

হৃষিকেশ ফিরে গিয়ে বলল, আমি খুইলতে লারছি...টুকচা এসবে এদিক বাগে?

সকলে হাঁ হাঁ করে উঠল।

এবার সকলেই ভয় পেয়েছে। কেউই এগিয়ে আসতে চাইল না। টুনটুন তো ধমক দিয়ে উঠল।

হৃষিকেশ রেগে গেল।

রূঢ় স্বরে বলল, কারুকেও এগাতে হবেক নাই। টুকচা বুঝিয়ে দাও। আমি খুইলব। মারবে আমাকে? মারুক না! বুড়া তো হইচি।

হাতঘড়ি দেখে বলল অভীক, আর তো সতের মিনিট। থামেন না কর্তা। একটু চুপ দিয়ে বসেন না।

ইয়ার মদ্যি যদি মানুষটা মারাই যায়?

বড় গুরুতর প্রশ্ন।

সময়ে যে ওষুধ কাজ করে, সময় পার হয়ে গেলে কি আর সে ওষুধের কোনো গুণ থাকে।

ক্রমাগত মারাত্মক ঠান্ডা হাওয়ায় এককড়ি যখন নেতিয়ে পড়ল, তখন সে বুঝতে পারল, এভাবে আর সে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। তাকে অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

শীর্ণ একটি নদীর ব্রিজ পেরোচ্ছে তখন ট্রেনটা।

তারার আলোতে জলের ধারা দেখা যাচ্ছে। বালির উপর দিয়ে চলেছে ট্রেন।

ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি।

কিন্তু ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত এককড়ি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারল না।

অসম্ভব। তার বাঁচার কোনো উপায় নেই।

শেষ পর্যন্ত তাকে অপূর্ব অতৃপ্তিগুলি এই পৃথিবীতে কতকগুলি ক্ষুধার্ত প্রেতাত্মার মত ছড়িয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে!

আর, তার শেষ ছবিটিও এঁকে যেতে পারবে না!

বড় অসহায়, বড় করুণ মনে হল তার নিজেকে।

মানুষ সব সময় নিজের আয়ত্তাধীন নয়, এই ভাগ্যবাদে তাকে বিশ্বাস করে মরতে হবে।?

না।

এককড়ি পরনের পায়জামাটি খুলে ফেলতে লাগল কম্পিত হাতে। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে কোমরের ফাঁস গেরো হয়ে গেল। গেরো খুলতে খুলতে সে হাঁপিয়ে উঠল।

কোমরে বেড় দিয়ে লোহার রডের সংগে নিজের শরীরটা পায়জামা পেঁচিয়ে যথাসাধ্য শক্ত করে বাঁধল এককড়ি।

বাঁধা শেষ করে আবার হাঁপাতে লাগল। দাঁতে দাঁত লেগে ঠক ঠক করে কাঁপছিল অনেকক্ষণ আগে থেকে। এবারে সে একেবারে এলিয়ে পড়ল।

তার মনে হল, যাক সে বেঁচে থাকবে। পড়ে অন্তত যাবে না। সামান্য আশ্বাস তার শরীরের সঞ্চিত শেষ শক্তিটুকু শুষে নিল। ক্লান্তিতে চোখ জুড়ে এল।

না না। সে সোজা দাঁড়িয়ে থাকবে। দৃপ্ত দৃঢ়ভাবে। উদ্যত তলোয়ারের মত সে ট্রেনের দরজায় খাড়া থাকবে।

স্টেশন কাছিয়ে আসার জন্যেই হোক, অথবা কামরার বাইরে ঝুলন্ত ব্যক্তিটির প্রতি যাত্রীদের মানবিক সম্প্রীতির জন্যেই হোক, সবাই হৃষিকেশ প্রতিহারের পিছু পিছু করিডোরে এসে দাঁড়াল।

ভদ্রলোকেরা হৃষিকেশকে দরজা খোলার নির্দেশ দিতে লাগল হাত পা ছুঁড়ে।

বার কয় ভুল করার পর হৃষিকেশ দরজাটা খুলে ফেলল এক ঝটকায়।

বাইরের ঘন অন্ধকার বয়ে ঢুকে পড়ল এক ঝলক হিমার্ত বাতাস। আকাশের তারাগুলো ছুটতে লাগল, শীর্ণ এক ফালি চাঁদ মুখ টিপে হাসছে অনন্তের মাঝখানে।

কই। কেউ নেই তো!

যত সব বাজে ব্যাপার! অনেকের মুখে হাসি উঁকি মারল। বাবা! কী ঝুঁকি নিয়ে তাদের এগিয়ে আসতে হয়েছে। মৃত্যুর হাতে স্বেচ্ছায় নিজেকে তুলে দিতে চলে এসেছিল।

টুনটুনকে অভীক ঠাট্টা করতে যাবে এমন সময় হৃষিকেশ পা ঠুকে উঠল। পাঁচসেলের টর্চ এতক্ষণ কোমর পর্যন্ত নাড়াচড়া করছিল। দরজা, লোহার রড, অন্ধকার, টেলিগ্রাফের তার এমন কি আকাশ ছিল টর্চটির লক্ষ্যস্থল।

হৃষিকেশের পায়ের কাছে পড়ল টর্চের আলো।

ভাঙা হাতের মত একটি কাপড়ের টুকরো হাওয়ায় উড়ে এসে হৃষিকেশের পা বার বার জড়িয়ে ধরছে।

হৃষিকেশ কাপড়টা তুলে ধরল, একটি আধময়লা পায়জামা, লোহার রডের সংগে আটকানো।

সবাই গবেষণা করতে লাগল নিজ-নিজ বুদ্ধির দৌড় দেখিয়ে। টর্চের আলো সরতে সরতে দরজার একাংশে গিয়ে লেগে রইল কিছুক্ষণ। কয়লা অথবা দেশলাইয়ের দগ্ধ ডগা দিয়ে লেখা : দয়া করে আমার ছবিগুলো নষ্ট করবেন না। ওদের যা হোক একটা...করবেন—এককড়ি।

।। ৭ ।।

'নজরুলের সঙ্গে কারাগারে' এইখানেই শেষ করা সঙ্গত হত। কিন্তু আমাকে আর একটু এগিয়ে যেতেই হবে। কারাগারের বাইরে এসে আরো দুবার নজরুলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নজরুলের যে ছবি আমার মনে অক্ষয় হয়ে থাকল এবং পরবর্তীকালে যেভাবে নজরুলকে ভাবতে চেয়েছি, তা না বলে শেষ করলে আমার জানা ও চেনা নজরুল-কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

প্রায় দু বছর পর কাজীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কৃষ্ণনগরে। ১৯২৬-এর মে মাসে। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন বসেছিল কৃষ্ণনগরে। শাসমল সভাপতি। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। বিশ দশকের এক বিস্ময়কর চরিত্র। মেদিনীপুরের বাসিন্দা। পেশায় ছিলেন ব্যারিস্টার। গায়ের রঙ ছিল নিকষ কালো। বিশাল দেহ। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে দশাসই। কিন্তু ঐ কৃষ্ণবর্ণের অন্তরালে একটি সহজ, সরল ও রসাল প্রাণ ছিল। ধমনীর নিচে ছিল উষ্ণ লাল রক্ত। সেই উষ্ণতা হৃদপিন্ডের সঙ্গে সারা মনেও ছোপ লাগিয়েছিল। ওরই মানুষটানা দরদ এক আশ্চর্য সুন্দর আত্মীয়তার বন্ধন তৈরী করেছিল মেদিনীপুরবাসীর মনে তো বটেই,—সারা বাংলারও অন্তরে।

দেশবন্ধুর নিকটআত্মীয়দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁর জীবিতকালেই এই সম্পর্কের গায়ে ফাটল দেখা দিয়েছিল। সুভাষচন্দ্রকে কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে বসাবার পর নিকটআত্মীয়দের মধ্যে সব চাইতে যাঁদের মনে বিরূপতা দেখা দিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন শাসমল, অন্যজন হেমন্ত সরকার। হেমন্তবাবু দেশবন্ধুর নিকট সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে আস্তানা নিয়েছিলেন কলেজ স্ট্রীট বাজারের ওপরতলায়। শাসমল দূরে সরে গিয়েছিলেন অনেকখানি। দূরের শাসমলকে নিকটে টেনে আনতেই সেদিন শাসমলের মাথায় সভাপতির শিরোপা পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

হেমন্ত বই-এর দোকান করেছিলেন আর সেই সঙ্গে কৃষক আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। হেমন্তের আমন্ত্রণে কাজী কৃষক আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

কারামুক্তির বছর দেড়েক পর কাজী বিয়ে করেছিলেন প্রমীলাকে। প্রমীলার প্রতি কাজীর আকর্ষণ ও আসক্তির সবটা না হলেও কিছুটা আমার জানা ছিল। কিন্তু এ কথা জানতাম না, কাজী এমন অকস্মাৎ প্রমীলাকে বিয়ে করে বসবেন। এই বাউন্ডুলে মানুষটির গতিবিধি ছিল সেদিন আমার একান্তই অজানা। থাকতাম দূরে। মাঝে মাঝে কলকাতা আসতাম। ওরই এক ফাঁকে শুনেছিলাম বিয়ের কথা।

বীরেন,—প্রমীলার খুড়তুতো ভাই ও রাঙাদার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা ছিল। পথে একদিন দেখা হতেই বীরেন ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠেছিল। আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। কাঁদতে কাঁদতেই বীরেন বলেছিল—'সামাজিক সমস্যা শুধু নয়, দুলীর ভবিষ্যতের জন্যই আমাদের সব চাইতে বেশি দুশ্চিন্তা।'

হবারই কথা। চাল তো কোনদিনই ছিল না কিন্তু চুলো সংগ্রহ করবার সামর্থ্যই বা কাজীর কোথায়? দুলী আর দুলীর মাকে কাঁধে নিয়ে সাতঘাটের জল খেতে হয়েছিল কাজীকে। ঠিক এই সময়েই হেমন্তের আমন্ত্রণ এসেছিল। কাজী সপরিবারে যাত্রা করেছিলেন কৃষ্ণনগরের দিকে।

কৃষ্ণনগর সম্মেলন নানা দিক দিয়েই স্মরণীয়। যাঁর প্রবল ও প্রচন্ড ব্যক্তিত্ব শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মহলে এক গভীর বিস্ময়—তিনি হলেন দেশবন্ধু। সেই চিত্তরঞ্জন আর নেই। বাংলার প্রথম সারির উগ্রপন্থীরা অধিকাংশ কারাগারে। শাসমল মনমরা। কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত। এই আঁধার-ঘেরা পটভূমিতে বাংলার বুকে সেদিন দুরভিসন্ধি ও বিচারবিভ্রান্তির দুর্যোগের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক জুলুমবাজরা মাথা খাড়া করে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছিল। এবং খানিকটা তারা সফলও হয়েছিল। ১৯২৫-এ দেশবন্ধুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরই পাবনায় ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধেছিল।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরিসমাপ্তি আর ভারতবর্ষের বৃহত্তম মুক্তি আন্দোলন প্রায় সমসাময়িক। ১৯২১-এর আন্দোলনে হয়তো ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে তেমন কিছু লাভবান হয়নি, কিন্তু এর পরিণতি উপেক্ষা করবার মতো ছিল না। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে আর কিছু না হোক একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। জেগেছিল অনাগত ভবিষ্যতের আশা। সেই জাগরণোন্মুখ চেতনা অতি অকস্মাৎ স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ১৯২২-এ। স্তব্ধই হয়েছিল কিন্তু মরে যায়নি। ওরই ঝিমধরা বুকের ওপর নানা বেশে আর বিভিন্ন নামে গড়ে উঠেছিল নানা ধরনের সঙ্ঘ আর সমিতি। রাশিয়ার নব-জাগৃতির বন্যাবেগ ছড়িয়ে পড়েছিল নানা উপকূলে। ভারতের তটেও তার ঢেউ লেগেছিল। ফলে কম্যুনিজম, সোস্যালিজম, কৃষক ও মজদুর সমিতির হল আবির্ভাব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল প্রতিপক্ষও। মুশলিম লীগ ও হিন্দুসভাও নবকলেবরে দেখা দিয়েছিল রাজনীতির আসরে।

অলক্ষ্যে ভারতবর্ষের রাজনীতি ভাবালুতার গন্ডি পেরিয়ে বস্তুতন্ত্রের পথে পা বাড়াতে শুরু করেছিল। কংগ্রেসের পাশাপাশি জনসাধারণের মনে স্বাধিকারের প্রশ্নও স্থান করে নিতে চাইছিল। তখনো শুধুই চাওয়া। এর বেশি নয়। কিন্তু এই চাওয়া শুনেই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল বিরোধী পক্ষ। কায়েমী স্বার্থের মনে ঠিক সেই মুহূর্তে ভয় হয়তো জাগেনি, কিন্তু ভরসাও বেশি দিন থাকবে, এ নিশ্চিন্ততা ছিল না। এরাই গড়েছিল মুশলিম লীগ, হিন্দুসভা, জমিদার সমিতি, বণিক সঙ্ঘ।

প্রতি বছরই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন বসত এক এক জেলায়। কৃষ্ণনগরেও সেবার বসল। কিন্তু শুধু রাষ্ট্রীয় সম্মেলনই নয়, এর সঙ্গে বসল ছাত্র ও যুব সম্মেলন। বসল কৃষক সম্মেলন। বাংলায় একই সময়ে এবং একই স্থানে এই প্রথম রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের পাশাপাশি এই প্রকার সম্মেলন স্থান পেয়েছিল।

কিন্তু সম্মেলনের আগে থেকেই কাজীর কিছু প্রস্তুতি ছিল। কাজী নতুন কাগজ বের করেছিলেন। 'লাঙল'। এবার আর

ত্রাশবাদের জয়ধ্বনি নয়। কাজীর মনের গান্ধী-প্রীতিও উবে গেছে। কেউ টিকে থাকল না। ঝিমিয়ে গেল সবাই। কাজীর পক্ষে ত্রাশবাদ বা গান্ধীবাদকেই স্বাধীনতার পথ বলে ভাবা কঠিন হয়ে উঠেছিল।

কী গান্ধীবাদ, কী ত্রাশবাদ—ছাত্র ও যুবশক্তিই ছিল তাদের শক্তির উৎস। কেউ প্রাণ দিল। কেউ দিল জীবনের আশা ও ভরসা। বিনিময়ে পেল কী ওরা? পায়নি! পায়ও না কোনদিন। এ কথা ওদেরও অজানা নয়। তবুও ওরাই আসে সকলের পুরোভাগে।

সাবধানীর দল আঁতকে ওঠে। বলে হঠকারী। বলে ভুল পথ। হয়তো তাই। ভুলই। তবুও ওরা বুঝল কৈ? ভোলা পথের পথিক চিরদিন বেছে নিল এই কন্দরে আর কন্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ।

ভদ্রলোকের দেশপ্রেম কাজীর অজানা নয়। এরাও দেশের স্বাধীনতা চায়। এবং হয়তো সকলের আগেই চায়। স্বাধীনতা পেলে ওদের হাতের মুঠোয় থাকবে রাজকীয় ক্ষমতা। কবজায় থাকবে শাসন ও শোষণের যন্ত্র। স্তোকবাক্যে দেশের জনসাধারণকে ভুলিয়ে স্বাধীনতার মধু ভোগ করবে ওরাই। ঐ ভদ্রলোকেরা। এবং তাই সকলের অগ্রভাগে ওরা এগিয়ে আসে। এসেছে, কিন্তু যারা দেশের অধিকাংশ, যারা সর্বহারা, তাদের যে কথা বলবার কেউ নেই। প্রয়োজনও নেই। ওরা দাঁড়াবে ওদের নিজেদের পায়ের ওপর।

ওদের নাকি চেতনা নেই। নেই বোধ। ভদ্রলোকদেরই ছিল নাকি? ছিলই যদি হাজার বছর লাগল কেন চেতনা আর বোধ ফিরে পেতে? যেভাবে একদিকে মার খেতে খেতে, অন্যদিকে নিজের স্বার্থ-বোধের তাগাদায় ভদ্রলোকেরা জেগে উঠেছে, সেই ভাবেই ওরাও জেগে উঠবে। করুণার দানে নয়। অনুকম্পা ওরা চাইবে না। নিজের অধিকার নিজে ওরা ছিনিয়ে নেবে। কাজী "লাঙল" লিখলেন,—

গাহি তাহাদের গান—
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি
ফসলের ফরমান।
শ্রম কিনাঙ্ক কঠিন যাদের নির্দয় মুঠিতলে
ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয়
ডালি ভরে ফুলে ফলে।।

কিন্তু একথা কে কবে মনে ধরে রাখল? রাখেনি। রাখবেও না। তাই কাজী সম্পাদকীয় লিখলেন, — "জাগো জনশক্তি হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে মজুর ভাইরা। যারা তোমাদের পায়ের তলায় এনেছে, তাদের তোমরাও পায়ের তলায় আন।"

কৃষ্ণনগর সম্মেলন কাজীর জন্য অপেক্ষা করেছিল।

জাতীয় সঙ্গীতের পর কাজী রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে গান গেয়েছিলেন, সেই বিখ্যাত অভূতপূর্ব গান,—

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু,
দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে,
যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

দু'দিন পূর্বে কলকাতার দাঙ্গা শেষ হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান নয়,—মানুষের টাটকা তাজা লাল রক্তে ভিজে গেছে কলকাতার পথ। মরেছে বাঙালী। যে-রক্তে অনুরঞ্জিত করে স্বাধীনতার বেদী প্রতিষ্ঠা করতে হয়, জাতি সে-রক্ত দিতে পারেনি। উন্মাদের মতো তাই ভাই-এর রক্তে নিজেরা স্নান করল। শিউরে উঠেছিলেন কাজী। ভেঙেও পড়েছিলেন। চোখের সামনে জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্নের সমাধি দেখে চোখের জলে লিখলেন,—

"হিন্দু না ওরা মুস্লিম?"
ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ,
সন্তান মোর মা'র।।

আশাবাদী কাজী। নিরাশার ঘন অন্ধকারের ভেতরেও প্রাণে জাগে দুর্বার আশা। চোখে ভেসে ওঠে আগামীকাল। দুঃস্বপ্নের রাত্রির পর আবার অরুণোদয় হবে। পরাধীনতা আছে সত্য কথা, কিন্তু তার চাইতে বড় সত্য জাতির ভাগ্যে অপেক্ষা করছে,—জাতি স্বাধীন হবেই।

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা
ক্লাইবের খঞ্জর।
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি, আমাদেরই খুনে
রাঙিয়া পুনর্বার।।

কিন্তু কাজীর অমন গানের প্রভাব স্থায়ী হবার অবকাশ পেল না।

ত্রাশবাদীদের প্রভাবে দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রকে কর্পোরেশনের একজিকিউটিভ অফিসারের পদে বসিয়েছিলেন, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে শাসমল সভাপতির অভিভাষণে ত্রাশবাদ ও ত্রাশবাদীদের ওপর বক্রোক্তি করে ফেলেছিলেন। অভিভাষণ শেষ হবার পূর্বে এবং বিশেষ করে পরে ক্ষুব্ধ প্রতিনিধিরা গজরাতে লাগল।

বিশেষ আমন্ত্রণে সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন সরোজিনী নাইডু। তিনি অনেক চেষ্টাও করেছিলেন ক্ষুব্ধ প্রতিনিধিদের শান্ত করতে। ডঃ ভূপেন দত্ত তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন যে, বীরেন চট্টোপাধ্যায়কে (সরোজিনীর ভাই ও প্রখ্যাত বিপ্লবী) কিসের ক্ষমতায় সরোজিনী ভুলে যান ও ভুলে যেতে পারেন, অনুমান করা কঠিন নয়,—কিন্তু বাঙালী তাঁকে ভুলবে না। আর তাই বাঙালী এঁদের অপমানও সইবে না। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ডঃ দত্ত এবং অমর চট্টোপাধ্যায় উগ্রপন্থীদের ছিলেন মুখপাত্র। উগ্রপন্থীরাই ছিল দলে ভারী।

দ্বিতীয় দিন অধিবেশন বসল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভেঙেও গেল। অভিভাষণের অসৎ ও অপ্রিয় অংশ প্রত্যাহার করে নেবার দাবি উঠেছিল। শাসমল রাজী হন নি। সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটল।

পাশেই বসেছিল ছাত্র ও যুব সম্মেলন। মণ্ডপে ঢুকতেই কাজীর কণ্ঠ শুনলাম। সেই দরাজ, ভরাট, উদাত্ত কণ্ঠ মহানাদের মতো ধ্বনিত হয়ে চলেছে। মূর্তি পরিগ্রহ করে এক দৈববাণী ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে।

কাজী তন্ময়। কাজী উদ্দাম। গেয়ে চলেছেন—

সবাই যখন বুদ্ধি জোগায়
আমরা করি ভুল।
সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব
আমরা ভাঙি কূল।
দারুণ রাতে আমরা তরুণ
রক্তে করি পথ পিছল।
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল,
আমরা ছাত্রদল।

সম্মেলন শেষে পথের প্রান্তে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখা হল কাজীর সঙ্গে। নড়বড়ে ঝরঝরে একখানা ধুলোয় ঢাকা মোটরে বসে আছেন কাজী। সামনের সিটে। পিছনে দুজন মহিলা। হৈ হৈ করে কাজী নেমে এলেন। জড়িয়ে ধরলেন দুটি বাহু দিয়ে সজোরে। কৌতূহলি জনতা থমকে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে কাজী নামিয়ে আনলেন স্ত্রীকে। প্রমীলাকে।

পায়ে হাত রেখে প্রণাম করে প্রমীলা বলেছিল—আপনি তো দাদা। কত কথাই তো রাতদিন শুনি। আমাদের বাড়ি যাবেন না?

যাব। যেদিন তোমাদের নিজের বাড়ি হবে, সেই দিন যাব। বলেই কাজীর দিকে ফিরে দেখি তিনি মেতে উঠেছেন গল্পে। জনগণের কেউ কেউ কাজীকে ঘিরে ধরেছিল। তাদের সঙ্গেই চলছিল প্রেমালাপ।

গাড়ির ভেতর দৃষ্টি চালিয়ে প্রমীলা বলেছিল—মা।

গিরিবালা নিশ্চল। নিশ্চুপ। হিন্দু বিধবা।

আমি একটু এগিয়ে নমস্কার জানিয়েছিলাম।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত ছিলাম ইংরেজের বন্দী। স্থান হয়েছিল কিছুদিন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে, কিছুদিন প্রেসিডেন্সী জেলে, অনেক কটা দিন বীরভূমে, শেষ ছ মাস ছিলাম নিজ গৃহে। পাবনায়।

১৯৩৪-এ শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্ব পড়ি বীরভূমের মামুদবাজারে। এর আগে 'বিচিত্রায়' চতুর্থ পর্ব বেরিয়েছিল। এবং মাঝে মাঝে পড়বার সুযোগও পেয়েছিলাম। কিন্তু সবটা পড়িনি। আর তাই, ওর পুরো রসও গ্রহণ করতে পারিনি।

আমি যে আদৌ সাহিত্যিক নই, একথা আমার চাইতে বেশি করে এবং ভালো করে আর কেউ জানে না। সমালোচনার নামে আমি আঁৎকে উঠি। তাই, শরৎসাহিত্যের মূল্যায়ন কিম্বা বিচার-বিতর্ক আমার একেবারে বহির্ভূত। শুধু, বলতে পারি, শরৎবাবুর লেখা আমাকে নিবিড় করে টানে। ভালো লাগে। প্রথম যৌবনে 'বিন্দুর ছেলে' পড়ে কেঁদেছি। 'পরিণীতা' 'নিষ্কৃতি' মনে দোলা দিয়েছে। 'চরিত্রহীন' পড়ে থমকে দাঁড়িয়েছি আর প্রাচীনতম এক মহাকাব্যের রূপান্তর ওতে দেখে চিন্তায় ডুবে গেছি। কিন্তু প্রাণের সবখানি দিয়ে ভালোবেসেছি শ্রীকান্তকে।

শরৎবাবুর সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল। লোকমুখে শুনেছি তিনি আমাকে যৎকিঞ্চিৎ স্নেহও করতেন। সাক্ষাৎ আলোচনার অবকাশ সেদিন আমার ছিল না। কিন্তু সেই স্বল্প পরিসর পরিচিতের ফাঁকে শরৎচন্দ্রের যে উদার ও প্রসন্ন রূপ আমার মনে নিরন্তর উঁকি দিত, শ্রীকান্তের ভেতর তারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পেতাম।

বীরভূমের মামুদবাজার গ্রামে দীর্ঘদিন আটক বন্দী ছিলাম। ওখানেই নিবিষ্ট হয়ে চতুর্থ পর্ব বার বার পড়ে মুগ্ধ হই। ব্যাকুল হই। ধাক্কাও সেদিন কম খাইনি।

কাজীর বিদ্রোহ পর্ব তিরিশ দশকের প্রথম দিকেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। গায়ক ও গীতিকাররূপে তাঁর নাম লোকের মুখে মুখে। পল্লীর নিভৃত অঙ্গনে তাঁর গান পৌঁছে গেছে। পৌঁছে গেছে পথের জনতার মনে মনে। পথচারী পথিক আর ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানও সেদিন গাইত, 'ও বিদেশী, মন উদাসী' অথবা 'বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে'।

বিদ্রোহী কবির অপমৃত্যু একদিনে কিম্বা সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ঘটেনি। পতনের ছিল না বলেই পড়েছে। কাজী ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বা সুনিদ্রা কামনা করে হয়তো ঘর তিনি বাঁধতে চাননি। ভাগ্য বার বার বাদ সেধেছে। তাঁকে বিড়ম্বনা করেছে প্রতি পদে। তবু হার তিনি মানেন নি। পরাজয় স্বীকার না করে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে ছুটে গেছেন।

বিদ্রোহী কাজীর পরিবর্তে গীতিকার ও সুরকার কাজীকে আমরা পেলাম। সামাজিক ক্ষতির পরিমাণ হয়তো তুচ্ছ করবার মতো নয়, কিন্তু নিরঞ্জন বাংলা সাহিত্য যা কাজীর কাছে পেল তারও তুলনা নেই।

তবুও বিদ্রোহী কাজীকে যারা ভালোবাসত, তাদের প্রাণে ঘা লেগেছিল। তাদেরই একজন ছিলাম আমি।

'শ্রীকান্তের' চতুর্থ পর্ব পড়তে পড়তে তাই চমকে উঠেছিলাম। গহর কি কাজীর ছায়া?

কাজীর লেখনীর মুখে উপেক্ষিত জন নতুন সার্থকতায় ভরে উঠেছে। কালীনামে কাজী মাতোয়ারা। কাজীর কীর্তনে বাতাসের চোখেও অশ্রু ঝরে পড়ে। সবই সত্য। কিন্তু এর চাইতে বড় সত্য এই যে কাজী মুসলমান।

পরম উদার শরৎচন্দ্র তাই বলেছিলেন—'গহর ভক্ত, গহর কবি—কবির জাতের খোঁজ করতে নেই।'

অন্যের অগোচরে গহর হিন্দুর ভাঙা মন্দির সংস্কার করে দিয়েছে, নতুন করে রামায়ণ লেখবার দুর্বার বাসনায় দিনের পর দিন ধ্যান করেছে, বাঁশের বন অন্ধকারের আড়ালে নিবিষ্ট হয়ে একটানা লিখে গেছে। তারপর তার অসমাপ্ত জীবন-সাধনা হিন্দুর মঠে গচ্ছিত রেখে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছে। কীর্তন গেয়ে গেয়ে গহর চোখের জল ফেলেছে, গান রচনা করেছে নিজে—এ সবই সত্য। অনেক হিন্দুর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা গহর লাভ করেছে তাও সত্য। কিন্তু হিন্দুসমাজ তাকে আপনজন বলে গ্রহণ করেনি, এও প্রত্যক্ষ সত্য।

মরমী শরৎচন্দ্রের কাছে প্রশ্ন তুলেছিল [illegible] তিনি প্রশ্ন করেছিলেন [illegible] তোমাদের হেঁসেলে যেতে পারি না?

উত্তর এসেছিল—না।

শরৎচন্দ্রের বিস্ময় জেগেছিল মনে নিশ্চয়ই। কিন্তু ক্ষোভ ছিল অনেক বেশি। তাই শ্লেষভরে বলেছিলেন—'তোমাদের ঠাকুরের সঙ্গে তোমরাও কম তামাসা করনি। অপরাধ শুধু একটা দিকেই হয় না।'

গহর আর কাজীর ছবি একই সঙ্গে বিগত শতাব্দীর ইতিহাস সঙ্গে করে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। অপরাধ শুধু একটা দিকেই হয় না—ইতিহাসের প্রতি এই নিষ্ঠুর ও বাস্তব ইঙ্গিত আমরা বুঝিনি। বুঝিনি বলেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বার বার এই ইঙ্গিত আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে সজাগ হবার সাবধান বাণী শুনিয়েছে। আমরা অন্ধ। আমরা বধির। আমরা অজ্ঞ। শুনিনি।

(ক্রমশঃ)

জাতীয় বাস্কেটবল

সুদূরে গ্রাম নয় আবার শহরও নয়। তবু বিরাট শহরের লাগোয়া বলে আভিজাত্যে ডগমগ। এমনি স্কুলে আমি পড়তাম। স্কুল-সংলগ্ন মাঠে বেশ দূরত্বে দুপাশে দুটি পোস্ট পোঁতা ছিল। কেন তা জানতাম না। মাঝে মাঝে ও-দুটোকে নেহাতই অপ্রয়োজনীয় মনে হতো। দলে দলে ভাগ হয়ে ছুটোছুটি করতে অথবা হা-ডু-ডু খেলতে ওই দুটি পোস্টের অপ্রয়োজনীয় অবস্থান এবং জায়গা জুড়ে থাকা আমরা কেউই বরদাস্ত করতে পারতাম না। কিন্তু কোন উপায় ছিল না। তখনো আমরা প্রাথমিক শ্রেণী স্তর ডিঙোইনি।

তারপর বুঝেছি ও-দুটোও খেলার উপকরণ। আর সে খেলার নাম বাস্কেটবল। কিন্তু তখনো ওদের সমান অপ্রয়োজনীয় মনে হতো। সেই যে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, তা আর বদলায়নি। কারণ, ওরা শুধু মাঠের শোভা বৃদ্ধিই করতো। আমাদের ধারণায় অযথা জায়গা জুড়ে থাকতো। তার বেশি কিছু নয়। কোনদিন বাস্কেটবল খেলা স্কুলে হয়েছিল বলে মনেও পড়ে না।

স্কুল ছেড়ে কলেজে এসেছি। সেখানেও বিরাট খেলার মাঠে বাস্কেট দেখেছি। মাঠও ১০০ ফুট × ৮৫ ফুট ছিল। কিন্তু খেলা হতে কোনদিন দেখিনি। ক্রিকেট, ফুটবল, কলেজ স্পোর্টস সবই সেই মাঠে হতো। কিন্তু বাস্কেট থাকা সত্ত্বেও খেলার কোন আয়োজন ছিল না। এমনকি উৎসাহীও কেউ ছিল বলে মনে হয় না। আদতে খেলাটার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের সুযোগ কি স্কুল-জীবনে কি কলেজ-জীবনে কোথাও হয়নি। আমার মতো এমনিতরো ভাগ্যবানের সংখ্যা অনেক।

এতো কথা একসঙ্গে মনে পড়ে গেল সেদিন যুগান্তরের খেলার পাতায় চোখ বোলাতে গিয়ে। কলকাতায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল ২০তম জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা। এসম্পর্কে যুগান্তর লিখেছে, জাতীয় বাস্কেটবলে বাংলা মহিলা বিভাগে শীর্ষস্থান পেয়েছে এবং কিশোর বিভাগে লীগের গণ্ডী পেরিয়ে নক-আউট পর্যায়ে খেলার অধিকার অর্জন করেছে। মহিলা ও কিশোর বিভাগের সঙ্গে সিনিয়র গ্রুপে (পুরুষ) বাংলার ভূমিকার সম্পত্তি নেই। সিনিয়র বিভাগে বাংলার জয়ের নিদর্শন মাত্র একটি। উত্তরপ্রদেশকে ৮৮—৮৫ পয়েন্টে পরাজিত করা ছাড়া আর কোন জয়ের রেকর্ড নেই।
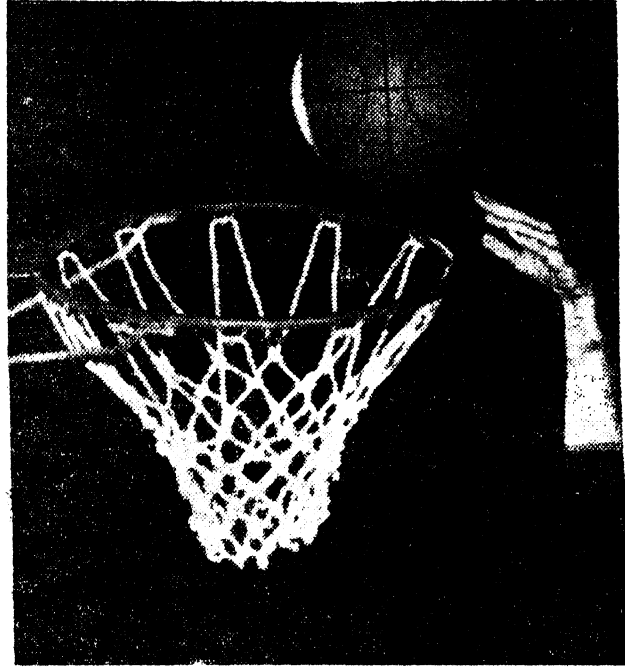
কলকাতায় জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার আসর বসেছে অথচ শহরে কোন হৈ-চৈ বা উত্তেজনা নেই। টিকিট-ঘরে ভিড়ও নেই। দর্শক-গ্যালারী প্রায় শূন্যে। অথচ কিছুদিন আগে ইডেনে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়ে ছজন শুধু মারা গেল পায়ের চাপে। আরো মজার ব্যাপার যে, বাস্কেটবলে আমাদের জাতীয় মান ঊর্ধমুখী আর জনপ্রিয় ক্রিকেট ও ফুটবলে ক্রমেই নিম্নগামী। আবার কলকাতা সকল খেলার কেন্দ্র। কিন্তু বাস্কেটবলের চর্চা এখানে তেমন নেই। আসলে পূর্ব ভারতেই বাস্কেটবল সম্পর্কে এই নিরুৎসাহ। এত বড়ো জাতীয় প্রতিযোগিতায় পূর্ব ভারত থেকে শুধুমাত্র যোগদান করেছে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা। এ থেকেই দৈন্যদশা বুঝতে পারা যায়। উল্টোদিকে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে এ-খেলার খুব রবরবা। সেখানে বাস্কেটবল অধিকাংশ রাজ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয় জনপ্রিয় খেলা। তামিলনাড়ুতে এখন বছরে ৫২টি বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট হয়। প্রতিটি জেলায় চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা হয়। হরিয়ানাতেও প্রতিটি স্কুলে বাস্কেটবল কোর্ট এবং খেলার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া এশিয়ার একমাত্র বাস্কেটবল সংক্রান্ত ম্যাগাজিন, যার নাম 'জাম্প', তাও প্রকাশিত হয় মাদ্রাজ থেকে। এর সম্পাদক শ্রীনিবাসন পদ্মনাভন এক সময়ে মহীশূরের পক্ষে বাস্কেটবল খেলতেন এবং দেশ-বিদেশের বাস্কেটবল খেলার অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে।

বলতে বসেছি ২০তম জাতীয় প্রতিযোগিতার কথা। কিন্তু আনুষঙ্গিক কথাই প্রাধান্য পাচ্ছে বেশি। তাই এবার প্রতিযোগিতার কথায় আসা যাক। ১৩টি রাজ্য থেকে মহিলা বাস্কেটবল দল এবারকার প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ৪ জানুয়ারী পর্যন্ত খেলা চলে। সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা এই তিন পর্যায়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত খেলা চলে।

প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ১৩টি দলকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। প্রথমে লীগ প্রথায় এবং গ্রুপ চ্যাম্পিয়নদের নক-আউট প্রথায় খেলার ব্যবস্থা ছিল। যোগদানকারী ১৩টি রাজ্য হলো—পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, মহীশূর, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, কেরালা, পাঞ্জাব, অন্ধ্র এবং ওড়িশা। তিনটি গ্রুপ থেকে সেমি-ফাইনালে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ, মহীশূর, হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্র। সেমি-ফাইনালে মহারাষ্ট্র সহজেই হরিয়ানাকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। কিন্তু গোলমাল বাধে অপর সেমি-ফাইনালকে কেন্দ্র করে সেখানে ছিল পশ্চিমবঙ্গ এবং মহীশূর। প্রথম দিনের খেলায় দুদলে তীব্র

প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ ৪৬—৪৪ পয়েণ্টে পরাজিত হয়। এই খেলায় মহীশূরের অধিনায়ক এ সি পুষ্পা দারুণ ক্রীড়া-দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি একাই গোটা মহীশূর দলকে বহন করে নিয়ে যান এবং দলের ৪৬ পয়েণ্টের মধ্যে ৩৩ পয়েণ্ট নিজে সংগ্রহ করেন। কিন্তু রেফারীজ বোর্ডের দোষে এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবাদে খেলাটি পুনরনুষ্ঠিত হয়। এবার মহীশূরের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গকে পরাজিত করা খুবই সহজ হয়।

তারপর ফাইনাল। এবার মুখোমুখি দাঁড়ালো মহারাষ্ট্র ও মহীশূর। এ প্রসঙ্গেবলে রাখা ভাল, মহারাষ্ট্রের অধিনায়ক দুর্দানা গিল এক সময়ে ছিলেন মহীশূরের অধিনায়ক। তাঁরই নেতৃত্বে মহীশূর জাতীয় চ্যাম্পিয়নও হয় দু'বার। ১৯৬৬-তে সিংগাপুর ও মালয়েশিয়া সফরকারী বোম্বাইয়ের স্টারলেটস দলের অধিনায়ক ছিলেন দুর্দানা। সেবার ও'দের কোন পরাজয়ের রেকর্ড নেই। হকিতেও দুর্দানার খুব নামডাক। হকিতে তিনি মহীশূর এবং ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কিন্তু বিবাহসূত্রে মহীশূরের মেয়ে দুর্দানা গিল হয়েছেন দুর্দানা নায়ার। এখন তিনি মহারাষ্ট্রের ঘরণী। আর সেই সুবাদে মহারাষ্ট্রের অধিনায়ক।

ভাল স্কোরার হিসাবে মহীশূরের অধিনায়ক পুষ্পার খেলাও এবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনালে তিনি টপ স্কোরার। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত এই সুনাম তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ১৯৬৮-তে তিনি ভারতীয় দলে নির্বাচিত হন। পুষ্পা মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। ও'র দিদিও এবার মহীশূরে খেলছেন।

দুর্দানা এবং পুষ্পা ভারতীয় মহিলা বাস্কেটবলের অনেক ভরসা।

এবার আসা যাক খেলার কথায়। মহারাষ্ট্র এবং মহীশূর ফাইনাল খেলতে নেমেছে। খেলা জমেছে মন্দ নয়। দু' পক্ষই ভাল খেলছিল। মহীশূর পরাজিত হয়। দুর্দানার নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র জাতীয় চ্যাম্পিয়নের সম্মান অর্জন করে। আর তৃতীয় স্থান অধিকার করে পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যের অন্তালিকা গুপ্তার খেলা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিশোর বিভাগেও পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল অনুরূপ।

এবারকার জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় কতগুলি ঘটনা নজরে পড়লো, যা বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

এই প্রথম একজন মহিলা রেফারী জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ খেলা পরিচালনায় অংশ নেন। এই মহিলা রেফারী হলেন রাজস্থানের শ্রীমতী সাপুড়িওয়ালা। তাঁর পরিচালন-পদ্ধতি আশানুরূপ না হলেও জাতীয় বাস্কেটবলের আসরে এই প্রথম জনৈকা মহিলাকে একাজে দেখা গেল। এটা রীতিমতো উৎসাহব্যঞ্জক। ২০তম জাতীয় প্রতিযোগিতা এদিক থেকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

কিন্তু কোন দলে মহিলা কোচ ছিলেন না। আগের ঘটনায় আমরা যতখানি এগিয়ে গেছি, এ-ব্যাপারে তার চেয়েও বেশি পিছিয়ে আছি। এ-ফাঁক পূরণ না করতে পারলে আমরা প্লানিমুক্ত হতে পারবো না।

আরেকটা কথা চুপিচুপি বলাই ভাল, ১৩টি দলে মোট ১৫৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন মাত্র বাঙালীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। তার চেয়েও বড়ো কথা, খোদ বাংলা দলেই কোন বাঙালী ছিল না।

—প্রমীলা

ক্যাঙ্গারুর দেশ

এখন থেকে দুশো বছর আগে ক্যাপ্টেন জেমস্ কুক যখন অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেন, প্রমাণ পাওয়া যায়, তার চৌদ্দ হাজার বছর আগেও এদেশে লোকের বসবাস ছিল। প্রধানত অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে ইন্দোনেশিয়ার আশপাশের দ্বীপপুঞ্জ ধরে নানা দেশ থেকে লোকেরা এসেছিল। পর্তুগীজরা হয়তো অস্ট্রেলিয়ার কিছু অংশ আবিষ্কার করেছিল। প্রচুর ডাচ্ নাবিক এসেছিল। ১৭৭০ সালে যখন ক্যাপ্টেন কুক এদেশে আসেন, এদেশের আদিবাসীরা তখন এখানে বাস করত। তারা সব ব্যাপারে ইংরেজদের থেকে আলাদা ছিল। বনে-জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার শিকার করে তারা দিন কাটাত। ক্যাপ্টেন কুক হয়তো দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন দক্ষিণ প্রান্তের এই বিরাট জমিতে কিছু কিছু করে ইংরেজ আনাতে পারলে, ইংরিজী, ভাষা, রীতিনীতি ও আইনের ফলে আদিম যুগের শেষ হতে পারে। সেই সময় ইংল্যাণ্ডের জেলে কয়েদীদের সংখ্যা বেশী থাকাতে স্থানাভাবও ছিল। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের বোটানী-বে (সিডনী) তাদের উপযুক্ত স্থান মনে করে, ক্যাপ্টেন কুক এগারটা জাহাজে, ১৪৮৭ জন ইংরেজের মধ্যে ৭৫৯ জন কয়েদীকে এদেশে আনান। তারাই অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সভ্য বসবাসকারী। পোর্টসমাউথ থেকে রওনা হয়ে ৮ মাসে তারা বোটানী-বে'তে এসে পৌঁছয়। তখন অস্ট্রেলিয়ার নামা মানে এখনকার চাঁদে যাওয়ার সমান ছিল। এদেশের কোনো পরিচিত ইতিহাস ছিল না, কোনো বন্দর ছিল না। ঠাণ্ডা দেশ থেকে এদেশের তখনকার গরমে, খাবার অভাবে অনেকেই মারা যায়। স্থানাভাবের জন্যে আদিবাসীদের মেরে তাড়িয়ে ইংরেজরা নিজেদের জায়গা করতে থাকে। আদিবাসীদের তাদের শিকারক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে ইংরেজরা নিজের ভেড়া চরাবার জায়গা করতে থাকে। ওই আদিবাসীদের হয়ে বলার কেউ ছিল না, বা কোন আইন ছিল না। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে তারা ইংরেজদের হাতে ধ্বংস হয়ে যেতে লাগল। যারা পালিয়ে বেঁচেছিল তাদের হতভাগ্য বংশধরদের এখন আমরা মাঝে মাঝে দেখতে পাই, বুমেরাং আর ক্যাঙ্গারু নিয়ে এখনও তারা পুরনো কালের মতই আছে।

এই দুশো বছরে অস্ট্রেলিয়া আজ পৃথিবীর ধনী ও উন্নত দেশের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির ঐশ্বর্য উপভোগ করতেও পরিশ্রম করতে হয়। অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে উন্নত হয়ে আজ এরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সারা পৃথিবীর নানা রকম চাহিদা জোগাচ্ছে। দিন দিন এদেশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় আমেরিকা হয়ে উঠবে বলে মনে হয়। ১৯৩০ সালের অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে ১৯৬০ সালের অস্ট্রেলিয়া প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কোয়ালা, আদিবাসী, ঘোড়ারগাড়ী চড়া মানুষ, এসব প্রায় রূপকথার মত হয়ে আসছে। এমন কোয়ালা দেখতে চিড়িয়াখানায় যেতে হয়। এদেশের আসল আদিবাসীরা দেশের এমন জায়গায় থাকে যেখানে কেউ যায় না। শহরের মধ্যে ক্বচিৎ কখনো ঘোড়ার গাড়ী এলে তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার বস্তু হয়ে ওঠে। ঘোড়ার গাড়ীর চালকদের এখন মোটরগাড়ী হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার লোকেরা সাধারণত শহরে থাকে। মেলবোর্ন ও সিডনী এখানকার সবচেয়ে বড় শহর। অস্ট্রেলিয়ার এক কোটি কুড়ি লক্ষ লোকের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ মেলবোর্ন ও সিডনীতে থাকে। মেলবোর্নের একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোর এত বড়, শোনা যায় সেটা পৃথিবীর চতুর্থ বড় দোকান, এবং ইউনাইটেড স্টেটসের পর প্রথম। মেলবোর্নে একটা আর্ট গ্যালারী চৌদ্দ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ১২ কোটি টাকা) দিয়ে তৈরী হয়েছে। সিডনীতে অপেরা হাউস তৈরী হচ্ছে, তাতে আশী মিলিয়ন ডলার খরচ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে (প্রায় ৬৫ কোটি টাকা)। ক্যাঙ্গারুর দেশে মানুষের উন্নতির এগুলো দুই একটি উদাহরণ।

এরোপ্লেন এ দেশকে অন্য দেশ থেকে ভিন্ন থাকার হাত থেকে অনেক সাহায্য কোরেছে সময়ের দূরত্ব কমিয়ে। অস্ট্রেলীয়রা অনায়াসে একদিনে একহাজার মাইল চলে যায় ব্যবসার জন্যে দুপুরের লাঞ্চে। সপ্তাহ শেষে হংকং বা সিঙ্গাপুরে ব্যবসার সফরে যাওয়া সাধারণ ব্যাপার।

ইংল্যাণ্ডের রানী অস্ট্রেলিয়ারও রানী। রাণীর মনোনীত গভর্ণর জেনারেল অস্ট্রেলিয়ায় রানীর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন। প্রতি স্টেটে একজন করে গভর্ণর থাকেন, তাঁরাও রানীর নির্বাচিত, এবং সব সময়ে না হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইংরেজ।

—গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

গত সপ্তাহে অঙ্গনা বিভাগে প্রকাশিত ভৌতিক সমাধির লেখিকা মীরা রায়।

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

গোয়েন্দা হিসাবে বিখ্যাত পরাশর বর্মার সব চেয়ে বড় নেশা হল রহস্য ভেদ নয়, কবিতা লেখা। নির্ঝঞ্ঝাটে কাব্য সৃষ্টির জন্যে নিজের বাড়ি ছেড়ে সাংবাদিক বন্ধু কৃত্তিবাস ভদ্রের বাসায় সেদিন ····
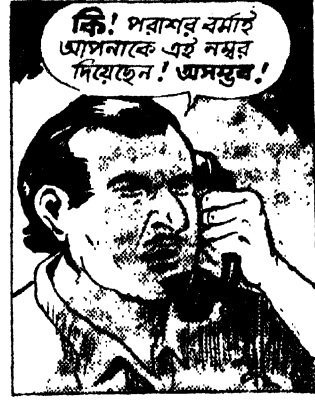
পার্ক স্ট্রীটের মোড়ের বাড়ীটি

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বহু ভাষাবিদ স্যর উইলিয়ম জোন্স সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় আসেন। এখানে এসে লণ্ডনের সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিরাট অভাব তাকে নিদারুণ আঘাত করে।

তিনি অনুভব করেন যে প্রগতির পথে অন্তরায় হোল—

"Want of an organised association in Calcutta." এবং এই অন্তরায় দূর করতে হলে প্রয়োজন

> "in the fluctuating, imperfect, and limited erudition in life, such enquiries and improvements could only be made by the united efforts of many, who are not easily brought, without some pressing inducement for strong impulse in a common point."

তাঁর মনের বাসনা ঘনিষ্ঠ বন্ধু মহল সমর্থন জানালেন।

১৭৮৪ সাল। ১৭ জানুয়ারী সন্ধ্যা লগ্নে জোন্সের মানস পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। সেই লগ্নে উপস্থিত ছিলেন প্রধান বিচারপতি স্যর রবার্ট চেম্বার্স প্রমুখ শহরের তিরিশজন বিশিষ্ট শ্বেতকায় ব্যক্তি। নব জাতকের নামকরণ হোল 'এশিয়াটিক সোসাইটি'। দিনে দিনে বেড়ে উঠতে থাকে এই প্রতিষ্ঠানটি। এর স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে রুদ্ধ করলেন না নিয়মের বেড়াজালে। তিনি বললেন:

> "...There should be one rule, namely to have norules at all, because in the infancy of any society, there ought to be no confinement, no trouble, no expense, no unnecessary formality."

তাঁরা কেবল সপ্তাহে একদিন সান্ধ্য বৈঠকে সুপ্রীম কোর্টের গ্রাণ্ড জুরিরুমে বসে মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ শুনতেন এবং তার উপর আলোচনা শুনতেন।

এশিয়ার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে মানুষের কীর্তি এবং প্রকৃতির দান বিষয়ে অনুসন্ধান এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। জোন্স উদার মতাবলম্বী ছিলেন। যাদের অতীত গৌরবের কাহিনী তিনি উদ্ধার কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন, তাদের কিন্তু তাঁর সৃষ্ট মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ ছিল। (১)

> "....whether you will enroll any member of learned natives you will here after decide, with many other questions as they happen to arise...."

কারণ নিশ্চয় ছিল। এই সংস্কারগত প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের মনে এক সময় উঠেছিল। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নিয়ম কুঞ্জলাল ঘোষকে এক পত্রে লিখেছিলেন 'ব্রাহ্মণ পরিবেশক না হইলে আপত্তিজনক হইতে পারে। অতএব সে সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থাই কর্তব্য হইবে।'

১৭৯৪ খৃঃ। সোসাইটির বয়স তখন এগার। তখনও এর নিজের কোন বাড়ী ছিল না। ঐ বৎসরেই জোন্সের মহাপ্রয়াণ হয়। এর পরে এক সমস্যার উদ্ভব হয়। বাস্তু ভিটার সমস্যা। ইতিমধ্যে বহু পুস্তক, নথিপত্র, ভূতাত্ত্বিক ও অন্যান্য নিদর্শন সোসাইটি দান হিসাবে গ্রহণ করেছে। এদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্ন বিকটরূপে দেখা দিল, দরকার এক ফালি জমি এবং একটি বাড়ি।

১৭৯৬ খৃঃ। ১৯ আগস্ট। সান্ধ্য অধিবেশনে সদস্যেরা গৃহ নির্মাণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন। ঐ প্রস্তাব কার্যকর

শিবদাস চৌধুরী

করার জন্য নয়জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠিত হোল। ঐ কমিটির সদস্য ছিলেন টমাস গ্রাহাম, স্যার জন মারে, জন ফ্লেমিং, জন হেরিংটন, জন বেব, মেজর কার্লিনস ক্যাপ্টেন কোলব্রুক, ডঃ দিন বিন্দি এবং ক্যাপ্টেন সাইমেস।

গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কমিটি কাজ শুরু করে। কিন্তু অর্থ কোথায়? সোসাইটির নিজস্ব কোন অর্থ ছিল না। কারণ তখনও পর্যন্ত সদস্যদের কোন চাঁদার হার নির্ধারিত হয়নি। তাই ২৯ সেপ্টেম্বরের সভাতে স্থির হয় প্রত্যেক সদস্যকে ভর্তি দক্ষিণা (২টি স্বর্ণ মোহর) এবং ত্রৈমাসিক চাঁদা (১টি স্বর্ণ মোহর) দিতে হবে। কিন্তু হিসাব করে দেখা গেল যে এইভাবে সংগৃহীত অর্থে দৈনিক খরচ চালিয়ে বাড়ী তৈরির টাকা থাকে খুবই অল্প। তাই সেই সভাতে একটি 'গৃহ-নির্মাণ ভাণ্ডার' গঠন করে সকলকে মুক্ত হস্তে দান করতে উদ্বুদ্ধ করা হোল এবং তদানীন্তন সরকারকে গৃহ-নির্মাণের জন্য এক ফালি জমি সুবিধাজনক স্থানে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে বলা হয়। সরকার অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। ইতিমধ্যে সোসাইটির কাজে নানান অসুবিধা দেখা দেয়।

১৭৯৮ সালের ২৯ মার্চের সদস্যদের এক সভাতে ডঃ গিলক্রাইস্টের প্রস্তাবক্রমে স্থির হয় যে, গ্রন্থাগার এবং মিউজিয়মের জন্যে একটি বাড়ি ভাড়া করা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাব কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

১৮০৫ সালের ১৫ মে'র সভাতে সেক্রেটারী সভ্যদের জানালেন যে সরকার চৌরঙ্গী ও পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে রাইডিং হাউসের যে জমি আছে তা সোসাইটিকে ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছেন। কেবল ঐ জমির সামান্য একটু অংশ কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেটের দখলে থাকবে। কারণ সেই জমিতে একটি পুলিশ থানা ও একটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বসান হবে। সোসাইটি ধন্যবাদের সঙ্গে প্রস্তাব গ্রহণ করে। সেই সভায় কোলব্রুকের প্রস্তাবক্রমে সোসাইটির কার্যোপযোগী গৃহনির্মাণের জন্য একটি নকশা রচনা করবার জন্য ব্যালট যোগে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে ছিলেন—স্যর জন আনস্ট্রুথার, স্যর আই রয়েডস, ক্যাপ্টেন প্রেস্টন, মিঃ হোম এবং কোলব্রুক। প্রেস্টন গৃহের নকশা অঙ্কনের ভার পেয়েছিলেন। সেই নকশা এক মাসিক সভাতে সামান্য রদ-বদল করে গৃহীত হয় এবং গৃহনির্মাণ কমিটিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রথমে স্থির হয়েছিল একতলা বাড়ি নির্মিত হবে। পরে (১৮০৫, ৬ নভেম্বর) আনুমানিক ২৪০০০ টাকাতে দ্বিতল গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহ নির্মাণকারক ছিলেন ফরাসী দেশীয় জাঁ জ্যাক পিচো। ১৮০৮ সালে গৃহ-নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। নির্মাণের ব্যয় বাজেটের অঙ্ক ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মোট খরচ হয় ২৮,৩৬৬ টাকা। সোসাইটির কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত ব্যয়-মঞ্জুর করেছিলেন।

১৮০৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী গৃহে প্রবেশ হয়। সোসাইটির নিজস্ব প্রয়োজনে নির্মিত হলেও এর দ্বার মুক্ত ছিল অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য। আজও তাই আছে। বহু ঘটনার স্মৃতি জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। কত মনীষীর আনাগোনা ছিল এখানে।

আধুনিক রুচির নিকটে ম্লান পুরোন স্নিগ্ধ এই বাড়িটি থেকে একদা ধ্বনিত

---

(১) ৪৫ বৎসর পরে (১৮২৯ খৃঃ) উ হোরেস উইলসনের প্রস্তাবক্রমে এবং ডঃ গ্রাণ্টের সমর্থনে সর্বপ্রথম প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকনাথ ঠাকুর, শিবচন্দ্র দাস, রসময় দত্ত এবং রামকমল সেন সর্বপ্রথম ভারতীয় সদস্য নির্বাচিত হন।

হয়েছিল তদানীন্তন সরকারের বিরুদ্ধে ধিক্কার। সরকারের প্রাচ্য গ্রন্থ প্রকাশের নীতিকে অভিহিত করা হয়—

"....So unjust, unpopular and unpolitic an act, which was not far undone by the destruction of the Alexandrine Library itself."

সার এডওয়ার্ড রায়ন ছিলেন তখন সোসাইটির সভাপতি। এই বাড়িটিতেই অনেকদিন পূর্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সভাপতিত্বে রাত্রির পর রাত্রি ভারতীয় শিক্ষার বাহন নিয়ে বিতর্ক ওঠে।

ভারতীয় প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথির সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে এখানে সর্বপ্রথম আলোচনা হয়। সরকারকে সোসাইটির পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত পুঁথির সমীক্ষার প্রস্তাবও এখান থেকেই প্রথম করা হয়।

১৮০৩ সালের ৫ অক্টোবর ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস ও তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ ডাঃ কারকুহার প্রস্তাব করেন—

"the Society immediately adopt some of effectual steps to procure a catalogue of all the most useful Indian works now in existence, with an abstract of their contents.

১৮০৭ সালের ১ জুলাই সোসাইটির তদানীন্তন সভাপতি কোলব্রুক এক পত্রে সরকারের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। ভারত সরকার সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টরস রাজী হলেন না।

ভারতীয় যাদুঘরে যে সমস্ত নিদর্শন রক্ষিত আছে, এর অনেকগুলিই সোসাইটি কর্তৃক সংগৃহীত। সোসাইটি পুরোনো বাড়িটিতে এদেশে প্রথম মিউজিয়ম স্থাপনা করে কলকাতায় একটি বিশেষ অভাব দূরীভূত করে এবং দেশের অমূল্য সম্পদ রক্ষা করে।

"There was at that time in this city no collection whatever available for the students. Individuals who were interested in special branches of enquiry, had provided themselves, at great cost, with series, such as were required for their own immediate researches. But these were, of course, not accessible to the public, or to other students".

সোসাইটি এই মিউজিয়ম খোলার কথা চিন্তা করে ১৭৯৬ খৃঃ। ১৮১৪ খৃঃ সেই প্রস্তাব কার্যকরী হয়। দিনে দিনে বেড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু শীঘ্রই অর্থাভাব দেখা দিল। এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাও ছিল বেশ কষ্টসাধ্য।

এই দায়িত্ব ভার থেকে আংশিক মুক্তি-দানের জন্য সোসাইটি সরকারকে কলকাতায় একটি পাবলিক মিউজিয়ম খোলবার প্রস্তাব দেয়। ১৮৩৮ খৃঃ সোসাইটির অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। স্থির হয় যে, মিউজিয়ম কথা প্রকাশনা বিভাগের কোন একটি বন্ধ করে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত সরকার দুই শত টাকা মাসিক অনুদান দেওয়াতে সাময়িকভাবে মুস্কিল দূর হোল। নতুন উদ্যমে মিউজিয়ম গড়ে উঠতে থাকে। এ সময়ে এডুয়ার্ড ব্লাইথ কিউরেটর নিযুক্ত হয়ে আসেন। তখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক মহলে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ডারউইন তাঁর সঙ্গে সব সময়ই পত্রালাপ করতেন।

কিছু দিনের মধ্যে অর্থাভাব আবার প্রকট হয়ে উঠল। পরিচালনার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে অবহেলার অভিযোগ আসছিল। কিন্তু সোসাইটি তখন নিরুপায়। প্রয়োজন মতো কর্মী নিয়োগ সম্ভব হোল না এবং প্রদর্শনীর স্থানেরও ছিল যথেষ্ট অপ্রতুলতা। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় সরকার মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা করলে শর্তাধীনে এর সংগ্রহ সেই মিউজিয়মে প্রদত্ত হবে। প্রস্তাব ১৮৫৭ খৃঃ প্রেরিত হয়। কিন্তু জানা ছিল এর অন্যতম প্রতিবন্ধক। দেশে অশান্তি সিপাহী বিদ্রোহ; সরকারের অর্থ ও চিন্তা সেই অশান্তি দমনে নিয়োজিত।

বহু লেখালেখির পরে ১৮৬২ খৃঃ সরকার ঘোষণা করেন কলকাতায় মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা করার সময় উপস্থিত হয়েছে। ১৮৬৯ খৃঃ সোসাইটি শর্তাধীনে নিজের সংগ্রহ ঐ মিউজিয়মে অর্পণ করে। সরকারী মিউজিয়মের গৃহ-নির্মাণ সাপেক্ষে সোসাইটির এই পুরোন বাড়িটিতে মিউজিয়মের কাজ-কর্ম আরম্ভ হয়। মিউজিয়মের আছির তেরজন সদস্যের মধ্যে চারজন সোসাইটি কর্তৃক আইনানুযায়ী মনোনীত হত। প্রথম চারজন সদস্য ছিলেন—ডঃ পার্ট্রিজ, ডঃ ফেবার, মিঃ অ্যাটকিনসন এবং এইচ এফ ব্লানফোর্ড।

ভারতীয় ভাষার সমীক্ষার মূলেও সোসাইটির বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এই সমীক্ষা পরিচালনা করেছিলেন ডঃ জি এ গ্রিয়ারসন। বহু খণ্ডে প্রকাশিত লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার পাতা উল্টালে দেখা যাবে কি পরিশ্রম ও নিষ্ঠা এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে।

লোক গণনার সূত্রপাতও বে-সরকারীভাবে এখানে আরম্ভ হয়। জেমস প্রিন্সেপের কাশীর লোক গণনার ফলাফল সোসাইটির মুখপত্র 'এশিয়াটিক রিসার্চ' প্রকাশিত হয়। সার অরেল স্টাইনের মধ্য এশিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের মূলেও ছিল সোসাইটি। সারা ভারতের জাতি ও উপজাতি তালিকা প্রণয়নে সরকার সোসাইটির সুপারিশেই উদ্যোগী হয়।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি নিম্ন বাংলার ভূগর্ভের গঠন নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়ম প্রভৃতি অঞ্চলে যে গভীর খনন কার্য চলে তার তত্ত্বাবধান করে সোসাইটি। এই সমস্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঐ পুরোন বাড়িটির ঐতিহাসিক হল ঘরটিতেই গৃহীত হয়েছে।

কোলব্রুক, উইলসন, প্রিন্সেপ, জোমা ডি করোসি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, গ্রিয়ারসন, অরেল স্টাইন, ব্লকম্যান, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাধানাথ শিকদার, শরৎচন্দ্র দাস, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জগদীশচন্দ্র বসু, অঘোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বহু বিশিষ্ট মানুষের স্মৃতি জড়ানো রয়েছে পুরোন বাড়িটির গায়ে। চারপাশের বাতাসে তাঁদের সাধনার বাণী ধ্বনিত হচ্ছে। কমলাকান্তের সহযোগে প্রিন্সেপের ব্রাহ্মী অক্ষরের পাঠোদ্ধার কথা মনে হলে এই বাড়িটির কথা ভুললে চলবে না। ব্রাহ্মী অক্ষরের অশোকের বিরাট শিলা খণ্ডটি সোসাইটিতে আজও শোভা পাচ্ছে। এটি সুদূর জয়পুরে এলাকা থেকে বার্ট সাহেবের সৌজন্যে প্রেরিত হয়েছিল। ভারতে তিব্বতী-চর্চার জনক জোমা ডি করোসি এই বাড়ির এক কোণে বাস করতেন। তাঁর আবক্ষ মূর্তি পুরাতন বাড়ির দ্বিতলে উঠবার সময়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারেনি।

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবও একদিন এখানে এসেছিলেন। তার উল্লেখ রামকৃষ্ণ কথামৃতে (আমেরিকার সংস্করন) আছে। স্বাধীন তিব্বতের দালাই-লামাও ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর এখানে এসেছিলেন। আরও কত গণ্যমান্য ব্যক্তি এই মন্দিরে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

জোন্স যে বীজটি একদিন গ্রান্ড জুরিরুমের স্বল্প পরিসরে বপণ করেছিলেন এবং সোসাইটির নিজস্ব জমিতে যা ১৮০৮ খৃঃ রোপণ করা হয়েছিল তাই কালক্রমে শিবপুরের উদ্ভিদ উদ্যানের বহুমূল বিশিষ্ট বট বৃক্ষটির রূপ গ্রহণ করে।

সম্প্রসারিত কার্যকলাপ ও বহুদিন সঞ্চিত সংগ্রহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন দেখা দিল নতুন ভবনের। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ। ১৯০২ সাল থেকে এই বিষয়ে সোসাইটি উদ্যোগী হয়। বহু নক্শা রচিত হোতে থাকে। আলোচনাও প্রচুর হল। স্থির হয় যে বাড়িটি আকাশ চুম্বি হবে এবং কলকাতার সমস্ত সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সংস্থাসমূহের এখানে আশ্রয় মিলবে। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৯ সালের ৭ নভেম্বর বাড়িটির ভিত্তি স্থাপন করেন তখনকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবির। এই ব্যাপারে সরকারকে উদ্যোগী করতে সংবাদপত্রের ভূমিকাও নগণ্য নয়।

কলকাতার বিশিষ্ট আর্কিটেক্ট ব্যালার্ডি, থম্পসন অ্যান্ড ম্যাথুজ নতুন বাড়িটির নকশা করেন ও নির্মাণ তত্ত্বাবধান করেন। পূর্বে স্থির হয়েছিল বাড়িটি নয়-তলা বিশিষ্ট হবে। কিন্তু অর্থের অনটনের জন্য চারতলা পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে। এর ব্যয় পড়েছে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা।

১৯৬৫ খৃঃ ২২ ফেব্রুয়ারী প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন নতুন ভবনটি বিশ্বমানবের সেবায় উৎসর্গ করেন।

বহির্বঙ্গে বাঙলা চর্চার সংকট

কুসুমবিহারী চৌধুরী

আজ ঘরে-বাইরে—সর্বত্র বাঙালীরা বাঙালীয়ানার সংকটের সম্মুখীন। এই সংকটের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি বাংলা বইয়ের প্রকাশনার ক্ষেত্রে। বাংলা বইয়ের প্রকাশন ও বাজার দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছে। স্বাধীনতার পূর্বে বাংলার বাইরে বাংলা চর্চার যে সুযোগ-সুবিধা ছিল, এখন তা ক্রমশ সংকুচিত হয়ে এসেছে বাঙালীর হিন্দীয়ানায়। বাংলার বাইরে সে-যুগে বাংলা চর্চার জন্য বাঙালীরা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলা ইস্কুলের। সে-সমস্ত ইস্কুলে বাঙালীর ছেলেমেয়েরা মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ পেত। তাদের ভিত রচনা হতো বাংলা ভাষায় হাতেখড়ি দিয়ে। পরে অবশ্য উচ্চতর শিক্ষার জন্য এদের হিন্দী কিম্বা ইংরেজি ইস্কুলে চলে যেতে হত। মধ্যপ্রদেশে এবং উত্তরপ্রদেশের বাঙালী পরিচালিত ইস্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা মাধ্যমে পড়ান হত। এর ফলে অন্তত বাংলা সাহিত্যের রস গ্রহণের চাবিকাঠি তাদের হাতে এসে যেত। ছোট হতেই তাদের গড়ে উঠতো বাংলা বই পড়ার অভ্যাস। বিয়ে-বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হলে সঙ্গে উপহার নিয়ে আসতো বাংলা বই—স্থানীয় রেল স্টেশনের হুইলারের দোকান কিম্বা খাস কলকাতা থেকে সংগ্রহ করা হত এসমস্ত বাংলা বই।

জীবিকার সন্ধানে এসে বহু বাঙালী আজ স্থায়ীভাবে বসতি করছেন বহির্বঙ্গে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিভিন্ন সমস্যার জন্যও বাঙালীরা বাংলাদেশের বাইরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পছন্দ করছেন। ফলে ধীরে ধীরে তাঁরা বাংলাদেশের ভাষা ও কৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন, বাংলাদেশের মাটির সঙ্গেও তাঁদের যোগসূত্র হারিয়ে যাচ্ছে। যে-বাঙালী ১৯৪২-এ চাকুরী নিয়ে এসেছিলেন জব্বলপুরে, কানপুরে এলাহাবাদে, মীরাটে, দিল্লীতে কিম্বা বাংলার বাইরে অন্যত্র দেশ-ভাগের ফলে ছিন্নমূল হয়ে বাধ্য হয়ে তাকে বাংলার বাইরেই থাকতে হচ্ছে। বহির্বঙ্গের সে-দেশের মাটির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে তার গড়ে উঠছে সখ্যতা, নাড়ির টান। তার ছেলেমেয়েদের জন্ম সে-দেশেরই মাটিতে। তাদের উত্তরপুরুষেরা সে-দেশের ভাবধারায় স্নাত, সে-দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির পরিবেশে তারা সমৃদ্ধ। বাংলাভাষার সঙ্গে যেন তাদের একটা সহজাত অপরিচয়ের দুস্তর ব্যবধান দিন দিন গড়ে উঠছে। এভাবে বাংলার বাইরে যে স্থায়ী নতুন বাঙালী-সমাজ গড়ে উঠছে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলা-ভাষা ও সংস্কৃতি তাদের কাছে শুধু অপাঙক্তেয় হয়েই উঠবে না, ডডোর মত বিস্মৃতির অতলে তলিয়েও যাবে।

বহির্বঙ্গে বাঙালীদের ক্লাবের লাইব্রেরীগুলোতে এখনও বাংলা চর্চার যে সুযোগটুকু আছে, ভবিষ্যতে তা হয়ত পড়ুয়ার অভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, বহির্বঙ্গের বাঙালী তরুণ-তরুণীরা যদি বাংলা চর্চার দিকে মনোযোগী না হয়, লাইব্রেরীর বাংলা বই কে পড়বে?

মধ্যপ্রদেশের ও উত্তরপ্রদেশের বহু শহরে বাঙালী পরিবারে দেখেছি, বাড়িতে ছেলেমেয়েরা কেউ বাংলাতে কথা বলে না। বাঙালীর বাড়িতে বাংলাভাষা যেন হরিজন। হিন্দী সেখানে সমাদৃত। হিন্দীই যেন তাদের মাতৃভাষা, বাড়িতে তারা অনর্গল হিন্দীতেই কথা বলে। উত্তরজীবনের জন্য মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের প্রস্তুত করছেন হিন্দীতে। আবার এর ব্যতিক্রমও দেখেছি। অনেক মা-বাবা ছেলেমেয়েদের মিশনারী কিম্বা হিন্দী ইস্কুলে পড়াচ্ছেন অথচ বাড়িতে বাঙালীয়ানার পরিবেশটি সম্পূর্ণ বজায় রেখেছেন। বাড়িতে বাংলা দৈনিক 'যুগান্তর' কিম্বা 'আনন্দবাজার', 'দেশ', 'অমৃত', 'ধরণী', 'শিশুসাথী' প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকা রেখেছেন। জন্মদিনে কিম্বা পুজোয় কচি-বয়সের উপযোগী ভালো ভালো বই কিনে এনে তুলে দিয়েছেন ছেলেমেয়েদের হাতে। প্রথমে ছড়া-ছবির বই দিয়ে, পরে উপেন্দ্রকিশোর ও হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি সেরা শিশু-সাহিত্যিকদের গল্পের বই দিয়ে এদের গল্প পড়ার নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন। এই গল্প পড়ার লোভে বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে এদের পরিচয় ঘটছে। বাংলা সাহিত্য ও ভাষার সঙ্গে গড়ে উঠেছে সখ্যতা, ভালোবাসা। বহির্বঙ্গে থাকলেও, হিন্দীয়ানার স্রোত এঁদের বাঙালীয়ানাকে নিমজ্জিত করতে সমর্থ হয়নি। পরিবেশ অনুকূল না হলেও ছেলেমেয়েদের এঁরা বাংলা চর্চার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেননি। এখানে এঁরা মনেপ্রাণে বাঙালী।

বাংলার বাইরে বাঙালী পরিচালিত ইস্কুলগুলি থেকে বাংলাভাষা বাঙালীদের সচেতনার অভাবে আস্তে আস্তে বিতাড়িত হচ্ছে। জব্বলপুরে বাঙালীর সংখ্যা নগণ্য নয়, অন্ততপক্ষে ৪৫।৫০ হাজারের কম নয় আর প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী বাঙালীর সংখ্যাও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। অথচ জব্বলপুরে বাঙালী পরিচালিত ইস্কুলগুলিতে বাংলা চর্চার অবস্থা শোচনীয়। জব্বলপুরে বাঙালীর সবচেয়ে প্রাচীন ইস্কুল মোক্ষদা দেবী বাঙালী বালিকা বিদ্যালয়। পূর্বে সেখানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা মাধ্যম ছিল। এখন প্রাইমারীতেও হিন্দী প্রবর্তনের কথা চলছে। অথচ ইস্কুলের নাম মোক্ষদা দেবী বাঙালী বালিকা বিদ্যালয়। বাংলাভাষা সেখানে মোক্ষম্ব পেলেও, সান্ত্বনা এই যে, এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত 'বাঙালী' শব্দটি অন্তত ডডোর মত গবেষণার বস্তু হয়ে থাকবে ভাবীকালের জব্বলপুরের বাঙালী-দের কাছে। বিহারের বাঙালীদের ক্ষেত্রে অবশ্য কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। সংবাদপত্রে দেখতে পাই বাঙালীদের বাংলা মাধ্যম রাখার জন্য তাঁরা সংগ্রাম করে চলেছেন। এলাহাবাদে 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে'র পক্ষ থেকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চার জন্য 'বাংলা সাহিত্যরত্ন' 'বাংলা প্রবেশিকা' ও 'বাংলা প্রারম্ভিক পরীক্ষা' প্রভৃতি পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন অধ্যাপক শ্রীকিরণচন্দ্র সিংহ। অধ্যাপক কিরণচন্দ্র সিংহের এই প্রচেষ্টাকেও ব্যতিক্রম বলা যায়।

বহির্বঙ্গে এমন বাঙালীর সন্ধানও পেয়েছি, তাঁদের পদবী না জানলে বুঝতেই পারা মুস্কিল তাঁরা বাঙালীবংশসম্ভূত। পুরুষানুক্রমে বাংলার বাইরে বসবাস করার ফলে শুধু কথাবার্তায় নয়, পোষাকে-আশাকে ও এঁরা সম্পূর্ণরূপে বাঙালীয়ানা-বিবর্জিত।

বাংলার বাইরের প্রতিষ্ঠিত এক বাঙালী ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে কলকাতায় কট্টর বাঙালী মেয়ের। হিন্দীর সঙ্গে তার পরিচয় নেই। বিয়ের পর ভাষা নিয়ে সংকট দেখা দেয় এই নবদম্পতির মধ্যে। মেয়েটি বাপের বাড়ি থেকে মনের মাধুরী মিশিয়ে চিঠি লেখে বাংলায় জব্বলপুরের বরকে যার কাছে বাংলা হরফ গ্রীক। পত্রের মর্মোদ্ধার করতে আর তার জবাব লিখতে তাকে ছুটে যেতে হয় বাংলায় পারঙ্গম কোন বন্ধুর কাছে। এ হলো বাংলার বাইরে বাঙালীর হাল আমলের বাংলা চর্চার নমুনা।

আর একটি ঘটনা জানি, ছেলেটির হাতেখড়ি হয়েছিল বাংলাভাষায়। বাংলা ইস্কুলে পড়তো মেয়েদের সঙ্গে। পরে পাড়া-পড়শির চেষ্টা হয় ওটার জন্য তাকে মেয়েদের বাংলা ইস্কুল ছেড়ে হিন্দী ইস্কুলে ভর্তি হতে হয়। ফলে বাংলা বর্ণমালা লেখার অভ্যেস তাকে ভুলতে হয়। হিন্দী হয়ে উঠলো তার প্রধান অবলম্বন। চাকুরী জীবনে বদলী হয়ে তাকে আসতে হয় বাংলাদেশের পানাগড়ে। সেখান থেকে তার জব্বলপুরের আত্মীয়কে হিন্দীতে চিঠি লিখে তার কুশল জানায়। যে আত্মীয়কে চিঠি লেখা হলো, সে-বাড়িতে কিন্তু বাংলা ভাষারই সমাদর। বাড়িতে কেউ বাংলায় ব্যতীত হিন্দীতে পরস্পর কথা বলেন না। আত্মীয়া চিন্তিত হলেন, একে দিয়ে কী করে বাংলা লেখানো যায়! তিনি চিঠির উত্তর দিলেন বাংলায়। জানালেন, 'তোমার চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি, তবে বাংলায় লিখলে আরো বেশী খুশী হতাম। একটু একটু বাংলা লিখতে চেষ্টা করলে, তোমার বাংলা হরফ লেখার অভ্যেস হতে বেশী সময় লাগবে না। তাছাড়া তুমি বাঙালীর ছেলে, এখন বাংলাদেশে আছো, যদি বাংলাদেশের মেয়ে বিয়ে করো, সে তো তোমার হিন্দী বুঝবে না, তোমার হিন্দী চিঠির জবাব দিতে পারবে না।' শেষের কথাটিতে বোধহয় কাজ হলো। তারপরের চিঠিগুলো বাংলাতে আসতে লাগল। ভদ্রমহিলার বাংলাভাষার প্রতি মমত্ববোধ প্রশংসনীয়। আমরা হিন্দী শিখব, ইংরেজি শিখব, দরকার হলে আরো কয়টি ভাষা শিখব, তা বলে মাতৃভাষা বাংলাভাষাকে ভুলবো কেন?

আর একটি বিশেষ শ্রোতৃবর্গ পল্লী অঞ্চলের শ্রোতারা। পল্লী অঞ্চলের শ্রোতাদের জন্য এখন প্রত্যেক কেন্দ্র থেকেই একটি করে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে।

ভারতের অনুন্নত অর্থনীতি, ব্যাপক নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য আর অনগ্রসরতার পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী অঞ্চলের শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ বাস করে ৬ লক্ষ গ্রামে, এই কথাটা চিন্তা করলে সমস্যার পরিমাণ ও তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পল্লী অঞ্চলের শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার ভারতের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। ১৯২৭ সালের ২৩শে জুলাই তারিখে বোম্বাইয়ে ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির প্রথম স্থায়ী বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধন করে ভারতের তদানীন্তন বড়োলাট লর্ড আরউইন বলেছিলেন :

"India offers special opportunities for the development of broadcasting. Its distances and wide spaces alone make it a promising field. In India's remote villages there are many who, after the day's work is done, find time hung heavily enough upon their hands."

লর্ড আরউইন যখন এই কথাগুলি বলেছিলেন, তারপর এখন জন-সংযোগের এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে বেতার সম্প্রসারণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রেডিও আর এখন কেবল অবসর সময়ে সারাদিনের ক্লান্তি অপনোদের জিনিস নয়, শিক্ষার প্রসারে বেশ শক্তিশালী এবং সম্ভাবনাপূর্ণ এক যন্ত্র। এবং যেহেতু পল্লী অঞ্চলেই অশিক্ষা, অজ্ঞানতা আর কুসংস্কারের অন্ধকার বেশি, এবং প্রায় সমস্ত দিক দিয়ে পল্লীই দেশের প্রাণকেন্দ্র, তাই পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার একান্ত প্রয়োজন। পল্লী অঞ্চলের শ্রোতাদের উদ্দেশে প্রচারিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানকে বলা হয় রুর‍্যাল ব্রডকাস্ট।

ভারতে রুর‍্যাল ব্রডকাস্ট প্রথম শুরু হয় পেশোয়ারে, ১৯৩৫ সালে। মার্কোনি কোম্পানি পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে বেতার সম্প্রচারকার্য প্রবর্তনের জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (এখন পাকিস্তানে) সরকারকে একটি ট্রান্সমিটার দিয়েছিলেন। এবং তখন পেশোয়ার জেলার গ্রামগুলোতে ১৪টি আর সীমান্ত অঞ্চলে ১৫টি রেডিও সেট স্থাপন করা হয়েছিল। মার্কোনি কোম্পানির কর্নেল হার্ডিঞ্জ এমন এক রকম রেডিও সেট উদ্ভাবন করেছিলেন যার লাউডস্পীকার খুব জোরাল এবং গ্রামবাসীরা তাঁদের বাড়ি থেকেই রেডিও অনুষ্ঠান শুনতে পান।

পল্লী অঞ্চলের শ্রোতাদের জন্য এলাহাবাদ থেকেও একটি অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে এলাহাবাদের অ্যাগ্রিকালচারাল ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ পরীক্ষামূলকভাবে যে বেতারকেন্দ্রটি স্থাপন করেছিলেন তাতে পল্লী অঞ্চলের শ্রোতাদের জন্য প্রত্যহ এক ঘন্টা করে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হত। এই কেন্দ্রটির শক্তি ছিল মাত্র ১০০ ওয়াট এবং কেবল ট্রান্সমিটারের ঠিক পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে ছাড়া শোনা যেত না। কিন্তু তাহলেও শিক্ষিত মহলে পল্লী অঞ্চলের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারের প্রয়োজনীয়তা যে অনুভূত হতে শুরু করেছিল তা এ থেকে বোঝা যায়।

১৯৩৫ সালেই পঞ্জাব সরকার দিল্লী কেন্দ্র থেকে পল্লী অনুষ্ঠান প্রচার আরম্ভ করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন (অনুষ্ঠান প্রচার অবশ্য শুরু হয়েছিল ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী), এবং দিল্লীর আশপাশে পঞ্জাব প্রদেশের আঞ্চলিক এক্তিয়ারভুক্ত গ্রামগুলিতে রেডিও সেট বসিয়েছিলেন। এই সেটগুলি সব দিল্লীর ১৮ থেকে ৬০ মাইলের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে বাংলা সরকারও এ বিষয়ে অগ্রণী হলেন এবং মেদিনীপুর অঞ্চলে ১৫টি গ্রামে রেডিও সেট বসালেন। কিন্তু বর্ষাকালে সেটগুলি যাতে নষ্ট হয়ে না যায় সে জন্য সেগুলি এক জায়গায় রেখে দেবার জন্য ৮ মাস পরে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হল। পরে সেগুলি মেদিনীপুরের কাছাকাছি সব গ্রামে বসানো হয়েছিল, যাতে আরও ভালোভাবে দেখাশোনা করা যায়। আরও পরে সেটগুলির স্থান কিছু পরিবর্তন করা হল, যাতে অন্য আরও কতকগুলি গ্রাম অনুষ্ঠান শুনতে পায়। এর পর ১৯৩৮ সালে মার্চ মাসে অল ইন্ডিয়া রেডিওর লাহোর কেন্দ্র খুলল এবং দিল্লীর চারপাশের গ্রামগুলিতে যে সব সেট বসানো হয়েছিল সেগুলি নিয়ে গিয়ে লাহোরের চারপাশের গ্রামগুলিতে বসানো হল। দিল্লী কেন্দ্র থেকে সমগ্র দিল্লী প্রদেশের জন্য পল্লী অনুষ্ঠানের প্রথম সুচিন্তিত পরিকল্পের উদ্বোধন হল ১৯৩৮ সালের ১৬ই অকটোবর।

বোম্বাই সরকার তাঁদের দুটি জেলায় ১৬টি সেট স্থাপন করলেন—থানা জেলায় ৭টি আর কোলাবা জেলায় ৯টি। মাদ্রাজ কেন্দ্র থেকে পল্লী অঞ্চলের জন্য নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হল ১৯৩৮ সালে, এবং মাদ্রাজ সরকার ১৬টি জেলার ৬২টি গ্রামে কমিউনিটি সেট স্থাপন করলেন। লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রে পল্লী অনুষ্ঠান প্রচারের পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ নিল ১৯৩৯ সালে।

গোড়ার দিকে বিভিন্ন কেন্দ্রে পল্লী অনুষ্ঠান প্রচার নিয়ে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল তা থেকে শিক্ষাও পাওয়া গেল অনেক। প্রথমেই বোঝা গেল, গ্রামের একটি জায়গায় রেডিও সেট থাকবে আর তার জোরাল লাউডস্পীকারের সাহায্যে গ্রামবাসীরা তাঁদের বাড়িতে বসেই বেতার অনুষ্ঠান শুনবেন—এ হয় না। যদি তাঁদের শুনতে হয় তাহলে তাঁদের ঐ কেন্দ্রস্থানেই আসতে হবে। অল ইন্ডিয়া রেডিও অনেক ভেবেচিন্তে শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন : 'গ্রামবাসীরা কখনই তাঁদের বাড়ি থেকে অনুষ্ঠান শোনেন না : হয় তাঁরা লাউডস্পীকারের কাছে এসে শোনেন, নয়তো শোনেনই না।'

তাছাড়া সেটের কাছে বসে শোনা আর লাউডস্পীকারে দূর থেকে শোনা এক কথা নয়—দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে অনেক।

পল্লী অঞ্চলের শ্রোতাদের উদ্দেশে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয় ১৯৩৫ সালে পেশোয়ারে। পেশোয়ার কেন্দ্রটি তখন অল ইন্ডিয়া রেডিওর অধীনে ছিল না। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত অল ইন্ডিয়া রেডিওর মাত্র তিনটি কেন্দ্র ছিল : কলকাতা, বোম্বাই আর দিল্লী।

অল ইন্ডিয়া রেডিও ১৯৩৭ সালে পেশোয়ার কেন্দ্রটি নিয়ে নিলেন এবং লাহোরে একটি কেন্দ্র খুললেন। লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রটি চালু হল ১৯৩৮ সালে, এবং ঐ বছরেই মাদ্রাজ কেন্দ্রটি অল ইন্ডিয়া রেডিও কর্তৃক গৃহীত হল। ১৯৩৯ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিওয় আরও দুটি কেন্দ্র যোগ হল : তিরুচিরাপল্লী ও ঢাকা। মোট সংখ্যা হল ৯। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আর কোনো কেন্দ্র যোগ হয়নি। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে অবশ্য ৫টি বেতারকেন্দ্র ছিল। কিন্তু বর্তমান আলোচনা থেকে সেগুলি বাদ দেওয়া যেতে পারে।

এলাহাবাদের অ্যাগ্রিকালচারাল ইন্সটিটিউট পরিচালিত ট্রান্সমিটারটি ছিল

একান্তই পরীক্ষামূলক এবং তার পক্ষে দূরাঞ্চলে অনুষ্ঠান পৌঁছে দেওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কম কেন্দ্রসংখ্যা, ট্রান্সমিটারগুলির সীমাবদ্ধ শক্তি, রেডিও সেটের অত্যধিক দাম, শোনার অসুবিধা, বেতারে কর্তৃপক্ষের অর্থাভাব, অধিকাংশ স্থানে বিদ্যুতের অভাব প্রভৃতি নানা কারণে পল্লী অঞ্চলের জন্য প্রচারিত বিশেষ অনুষ্ঠান গোড়ায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। তাছাড়া পল্লীবাসীদের কাছে তাদের নিজস্ব অঞ্চলের ভাষা-উপভাষাতেই অনুষ্ঠান প্রচার করা দরকার। সেটাও তখন সর্বক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে হয়ে ওঠেনি।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত অল ইণ্ডিয়া রেডিওর মাত্র ৯টি কেন্দ্র ছিল। দেশ বিভাগের পর ভারতের ভাগে পড়ল তার মাত্র ৬টি কেন্দ্র। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে তখন একটি কেন্দ্রও ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর সরকার বিভিন্ন অঞ্চলে ছোটো ছোটো 'পাইলট' কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন, কারণ তখন সরাসরি বড়ো বড়ো কেন্দ্র স্থাপনের সময় বা সংগতি কোনোটাই তাঁদের ছিল না। ১৯৫০ সালের মধ্যে কেন্দ্র সংখ্যা ৬ থেকে বেড়ে ২১ হল।

প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনাকালে (১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ) আরও ৫টি নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হ'ল এবং উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার বসিয়ে আগের অনেক কেন্দ্রের শক্তি বৃদ্ধি করা হল। প্রথম পরিকল্পনার শেষে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কেন্দ্র সংখ্যা দাঁড়াল ২৬। এবং তা সারা দেশের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চলের উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হল।

দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনাকালে (১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ) পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, বর্তমান কেন্দ্রগুলিতে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার বসিয়ে যত ব্যাপক অঞ্চলে সম্ভব, সমস্ত ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা। তবু দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার শেষে ভূপালে আর রাঁচীতে দুটি নতুন কেন্দ্র খোলা হল।

তৃতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য ছিল, কতকগুলি নতুন ট্রান্সমিটার বসিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান প্রধান কেন্দ্রের অনুষ্ঠান 'রিলে' করে মিডিয়ম-ওয়েভ সার্ভিস সম্প্রসারিত করা।

নতুন নতুন কেন্দ্র স্থাপন আর পল্লী অঞ্চলের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান প্রবর্তনের ফলে কমিউনিটি সেটের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পেল।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত সুসংগঠিতভাবে অনুষ্ঠান শোনার রাষ্ট্রভিত্তিক সঠিক কোনো পরিকল্পনা ছিল না। শ্রোতাদের সঙ্গে সংযোগ রাখার এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কে শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া ও সাড়া পরীক্ষা করে দেখার কোনো ব্যবস্থাও না। ক্রমে ক্রমে সেই পরিকল্পনা হ'ল, সেই ব্যবস্থাও। পল্লী অঞ্চলের অনুষ্ঠান প্রণয়নে পরামর্শ দেবার জন্য বেতার কেন্দ্রগুলিতে একটি করে উপদেষ্টা কমিটিও গঠিত হল। অনুষ্ঠান বলতে সাধারণতঃ কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা, কথিকা, কথাবার্তা, বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, প্রধানত পৌরাণিক ও সামাজিক বিষয়ে নাটক, হাসিঠাট্টা ও লোকগীতি। অধিকাংশ কেন্দ্রেই এই অনুষ্ঠান প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে,—সে তার স্বাভাবিক, প্রাণোচ্ছল, গ্রাম্য ভাষায়, একেবারে সাধাসিধাভাবে অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য। শহরাঞ্চলের শ্রোতারাও অনেকে এই স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গির জন্য অনুষ্ঠানটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু তবু এই অনুষ্ঠানটি যতখানি জনপ্রিয় হওয়া উচিত ছিল ততখানি হতে পারে নি।

১৯৪৯ সালে ভারত সরকার স্থির করলেন তাঁদের 'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযানে রেডিওকে কাজে লাগাবেন এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিও সাতটি কেন্দ্রে 'রেডিও ফার্ম ফোরাম' গঠন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯৪৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে রেডিও ফার্ম ফোরামের যথাবিধি উদ্বোধন হল। এগুলির আসল উদ্দেশ্য ছিল, শ্রোতারা সপ্তাহে একদিন এইসব ফোরামে মিলিত হবেন এবং রেডিওর একজন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে স্থানীয় এক নেতার অধীনে রেডিওয় প্রচারিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। আলোচনাকালে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ব্যাখ্যা করে দেবেন রেডিওর ঐ কর্মকর্তা।

কিন্তু গোড়ার উৎসাহ-উদ্দীপনার পর ফোরামগুলির কাজ বন্ধ হয়ে গেল, অনেক ক্ষেত্রে ফোরামই উঠে গেল। তার অনেক কারণ ছিল। প্রথম কারণ ফোরামগুলির পিছনে সুপরিকল্পনা ছিল না। দ্বিতীয় কারণ, পরিকল্পনাটা যেমন বড়ো ছিল, তা কার্যকর করার জন্য রেডিওর তেমন অর্থ-বল ও জনবল ছিল না। তৃতীয় কারণ, অল ইণ্ডিয়া রেডিও আর রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে কোনো রকম সমন্বয় ছিল না। চতুর্থ কারণ, পরিকল্পনাটির সাফল্য নির্ভরশীল ছিল, সম্প্রচারের পর দক্ষ নেতৃত্বাধীনের আলোচনার উপর, কিন্তু এই বিষয়টি ছিল সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। পঞ্চম কারণ, আলোচ্য বিষয়গুলির অনেকই ছিল পল্লী অঞ্চলের শ্রোতাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। ষষ্ঠ ও সর্ব-বৃহৎ কারণ, অল ইণ্ডিয়া রেডিও কর্তৃপক্ষ শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়ার কথা অনুষ্ঠান প্রণেতাদের জানাবার ব্যবস্থা করেন নি।

এর পর বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সমীক্ষা হয়। বোম্বাইয়ের 'টাটা ইনস্টি-টিউট অভ্ সোশ্যাল সায়েন্সেস' একটা ব্যাপক সমীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে :

১। জ্ঞানবৃদ্ধিতে ফোরামগুলি খুবই বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছে।

২। গোষ্ঠীগত আলোচনাপদ্ধতি খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

৩। রেডিও ফার্ম ফোরাম পল্লীজীবনে দুটি দিক দিয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে অথবা হতে পারে : (ক) সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা হিসাবে এবং (খ) সুপ্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত পল্লী গণতন্ত্রের সাধিত্র হিসাবে।

৪। ফোরামের সদস্যরা গভীরভাবে মনে করেন, পল্লীজীবনে এই রেডিও ফার্ম ফোরাম অতি মূল্যবান এক সংযোজন এবং এটিকে একটি স্থায়ী বিষয় করা উচিত।

৫। অধিকাংশ গ্রামের অধিকাংশ লোক অধিকাংশ অনুষ্ঠানই পছন্দ করেন।

১৯৫৯ সালে স্থির হ'ল, রেডিও রুর‍্যাল ফোরাম অথবা পল্লী বেতারগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান আকাশবাণীর সাধারণ পল্লী অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সারা দেশের বেতার কেন্দ্র থেকেই তা প্রচার করা হবে। আকাশবাণীর তদানীন্তন ডিরেকটর-জেনারেল শ্রীজে সি মাথুর প্রবল উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে এ কাজে অগ্রসর হলেন। এবং ১৯৫৯ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে রেডিও রুর‍্যাল ফোরাম শুরু হল। তখন সারা দেশে ৮০০টি ফোরাম চালু ছিল। এর পর ১৯৬০ সালে ফোরামের সংখ্যা দাঁড়াল ৯০০, ১৯৬১-৬২ সালে ২,০০০, এবং ১৯৬২-৬৩ সালে ৪,০০০। ১৯৬৪ সালের গোড়ায় আকাশবাণী থেকে বলা হ'ল, ফোরামের সংখ্যা উঠেছে ৭,৫০০। তৃতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনায় ফোরামের সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল ২৫,০০০।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও তাঁদের রুর‍্যাল ফোরাম অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ গর্ববোধ করতে পারেন। একটা অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাঁরা বেশ কিছু কাজ দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রাথমিক সাফল্যের আনন্দে মশগুল থাকলেই চলবে না, এখনও অনেক কিছু করার আছে। সেগুলির দিকে অবিলম্বে নজর দেওয়া দরকার। নইলে স্কুল ব্রডকাস্ট অর্থাৎ 'বিদ্যার্থীদের জন্য' অনুষ্ঠানটির মতো এই অনুষ্ঠানটিও হয়তো একটা অপচয় হয়ে দাঁড়াবে।

রেডিও রুর‍্যাল ফোরামের সাফল্য সম্পর্কে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর একজন ভূতপূর্ব ডিরেকটর-জেনারেল শ্রী বি পি ভাট বলেছিলেন :

> "I have seen the immense interest shown in our Radio Rural Forum Scheme at the Asian Broadcasters' Conference held in Japan and Malaya and the Commonwealth Broadcasting Conference held in Canada. UNESCO in its Bangkok and Paris meetings has recommended the scheme for adoption by all developing countries. It is gratifying that F.A.O. has also taken note of our work in this field."

—শ্রবণক

জনপ্রিয় অভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমান

ফটো : অমৃত

নিয়ম থেকে ছুটি :

শহরের দৈনন্দিন জীবনের বাঁধাধরা ছকের একঘেয়েমি থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়ে মানুষ যখন নির্জন প্রকৃতির মাঝে আত্ম-সমর্পণ করে, তখন অভ্যস্ত নিয়মের নিগড় ভাঙতেই তার ভালো লাগে—এই তথ্যটুকু প্রকাশ করবার জন্যে 'অরণ্যের দিন রাত্রি'র কাহিনীতে শহর-পালানো চার-বন্ধু—অসীম, সঞ্জয়, হরি ও শেখরের পালামৌ অঞ্চলের (সত্যজিৎ রায় কৃত ছবিতে স্পষ্টত ডালটনগঞ্জ) ফরেস্ট ডাকবাংলোয় কয়েকদিন অতিবাহিত করবার যে চিত্র লেখক অঙ্কিত করেছেন, তাকে যথেষ্ট বাস্তবধর্মী বলে অভিহিত করতে পারা যায় কি? অসীম হচ্ছে একজন তরুণ এক্জিকিউটিভ, সঞ্জয় কোনো পাটকলের লেবার অফিসার, হরি একজন চৌকোশ ক্রীড়াবিদ এবং শেখর বেকার হলেও নিশ্চয় ভদ্রসন্তান। অথচ চৌকিদারকে ঘুষ দিয়ে ফরেস্ট বাংলোতে আশ্রয় নেবার যুক্তি হিসেবে তরুণ এক্জিকিউটিভ অসীম সদ্যপরিচিতা অপর্ণার কাছে বলছে : নিয়ম-মাফিক আগে থেকে অনুমতিপত্র (পার-মিশান) নিতে কি পারতুম না? কিন্তু নিয়ম ভাঙতেই যে ভালো লাগে। বে-আইনীভাবে তাদের থাকতে দেবার অপরাধে চৌকিদারের চাকরী যাবে জেনেও ওদের নিয়ম ভাঙতে ভালো লাগে। আদিবাসীদের শরাব পান করবার পরে মত্ত হয়ে রাত্রির অন্ধকারে চলন্ত মোটরগাড়ীকে থামিয়ে তার সামনে টুইস্ট নাচের ব্যর্থ অনুকরণ করতে তাদের বাধে না, কিন্তু সেই মোটরে অপর্ণা ছিল এবং সে ওদের ওই অবস্থায় দেখেছে, এই কথা দিনের বেলায় অপর্ণার মুখ থেকে শুনে অসীম ধিক্কারে ছি-ছি করে ওঠে। রাত্রির অন্ধকারে হরি যখন আদিবাসী দুলির সঙ্গে যৌনবিহার করে, লখা অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে তা দেখে এবং প্রতিবাদ করে না। লখা কিন্তু পরমুহূর্তে হরিকে নির্মমভাবে আহত করে যে-টাকার ব্যাগ চুরির অপবাদে সে একদা হরি দ্বারা প্রহৃত হয়েছিল, সেই ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পূর্ব অপমানের প্রতি-শোধ নেয়। অপর দিকে আট বছরের সন্তানের বিধবা জননী জয়া যেভাবে সুসজ্জিতা হয়ে সঞ্জয়ের কাছে নিরুচ্চার-ভাবে প্রেম নিবেদন করতে আসে এবং এসে ব্যর্থ হয়, উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে তা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু লাগে। মোট কথা, অরণ্যের অন্ধকারে এবং নির্জন পরিবেশে শহুরে দৈনন্দিন জীবন থেকে মুক্তির আনন্দে চারটি ভদ্রসন্তানকে দিয়ে যে-সব উচ্ছৃঙ্খল আচরণ লেখক করিয়েছেন, তা আজকের দিনের সকল ভদ্রযুবজনের মনোবৃত্তির সঠিক পরিচায়ক কিনা, সে-বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কিন্তু চার বন্ধু ভদ্রযুবক পালামৌয়ের বন্য অঞ্চলে গিয়ে কটা দিন-রাত্রি কিভাবে কাটিয়ে এল, সেই কাহিনীকেই সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রের জন্যে নির্বাচন করেছেন। চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে তিনি মূল কাহিনীর বহু বাঞ্ছনীয় পরি-বর্তন করেছেন এবং এই পরিবর্তনের ফলেই তিনি অন্তত অসীম এবং অপর্ণার মধ্যে এমন কয়েকটি মুহূর্তের সৃষ্টি করেছেন, যা অনির্বচনীয় রসের খনি। বাস্তবিকই অপর্ণার (যার ডাকনাম লিলি) মতো মানসিক সুস্থতাবিশিষ্ট চরিত্রটি —, যার অনেকখানিই সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব সৃষ্টি

দিবারাত্রির কাব্য / অঞ্জনা ভৌমিক, মাধবী চক্রবর্তী এবং বসন্ত চৌধুরী

—প্রিয়া ফিল্মস নিবেদিত, পিয়ালী ফিল্মস পরিবেশিত নেপাল দত্ত এবং অসীম দত্ত প্রযোজিত 'অরণ্যের দিন-রাত্রি' ছবিটিকে যা-কিছু মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

চলচ্চিত্রস্রষ্টা হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় 'অরণ্যের দিন-রাত্রি' ছবিতেও আছে সুপ্রচুর। পেট্রল পাম্প ছাড়বার পরে 'ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গন্তব্যস্থানে পোঁছে যাব'—এই উক্তির পরে ছবির পরিচয়-লিপির সঙ্গে দ্রুত সঞ্চরমান আলো-ছায়ার মাধ্যমে মোটর-গাড়ীর বেগনির্দেশের যে বিচিত্র পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তা যেমন অভিনব, তেমনই ইঙ্গিতমূলক। কাহিনীর আরম্ভ হয় বাংলো প্রবেশপথের ডান দিকে স্থাপিত 'নোটীশ বোর্ড'টির সোচ্চার পঠনের মধ্যে; কারণ এরই মারফৎ চরিত্রগুলির দ্বারা নিয়মভঙ্গেরও সূচনা হচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে চিত্রকল্পগুলি সুপরি-কল্পিত। বিশেষ বিশেষ দৃশ্যের মুড অনুযায়ী ফোটোগ্রাফীতে আলো-আবছা এবং আলো-আঁধারির সৃষ্টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অভিনয়াংশে সদাশিব ত্রিপাঠীর কন্যা অপর্ণার ভূমিকায় শার্মিলা ঠাকুরের সুসংযত বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয় প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দলনেতা অসীমরূপে সৌমিত্র চট্টো-পাধ্যায় ভূমিকাটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন স্বাভাবিক অভিনয়ের মাধ্যমে। রবি ঘোষ তাঁর সহজাত সপ্রতিভ অভিনয় মারফৎ শেখর চরিত্রটিকে উপভোগ্যতার স্তরে পোঁছে দিয়েছেন। এঁদের দুজনের পাশে সঞ্জয় ও হরির ভূমিকায় যথাক্রমে শুভেন্দু চট্টো-পাধ্যায় ও শমিত ভঞ্জ কিছুটা নিষ্প্রভ। ছোট্ট এক দৃশ্যের অভিনয়ে হরির পূর্বতন প্রেমিকা অতসীরূপে অতিথি-শিল্পী অপর্ণা সেন তাঁর নাট্যনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। সদাশিব ত্রিপাঠীর চরিত্রটিকে মাধুর্যে ভরিয়ে তুলেছেন পাহাড়ী সান্যাল তাঁর সহৃদয় অভিনয়গুণে। তাঁর মুখের 'শুনে সে ডাকে আমারে' গানটি যোগ্য আবহের সৃষ্টি করতে পেরেছিল। আদিবাসী দুলির ভূমিকাকে বাস্তব করে তুলেছিলেন সিম্মী; আদিবাসী মেয়ের ভাষাকে আশ্চর্যভাবে তিনি আপনার করে নিতে পেরেছেন। বিধবা জয়ার চরিত্রটিতে কাবেরী বসুর অভিনয় সাধারণ। এছাড়া চৌকিদার, লখা, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের তোতলা বাবু, ফরেস্ট অফিসার, টাবলু প্রভৃতি ভূমিকা সুঅভিনীত।

বহির্দৃশ্যপ্রধান ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ যথেষ্ট প্রশংসনীয়। সম্পাদনার গুণে ছবির গতি কোথাও মন্থর হতে পায় নি। আবহসঙ্গীত সৃষ্টিতে বাদ্যভাণ্ডের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বিষণ্ণ পৃথিবীতে প্রেমের অপমৃত্যু

পৃথিবী আজ বিষণ্ণ। মানুষ আজ একা। শাশ্বতকালব্যাপী ভালোবাসা আজ অর্থ-হীন। জীবন এবং জীবনজাত শিল্পের ভিত্তি আলগা হয়ে গেছে। ব্যর্থতা এবং অনিশ্চয়তা আজ মানুষকে পেয়ে বসেছে। অন্তরাভি-মুখী ধর্ম ও দর্শনের সনাতন আদর্শের মাঝে আশ্রয় খুঁজছে ভারতের মানুষ পৃথিবীব্যাপী এই সংকটের মাঝে। কিন্তু এই অবিশ্বাসের জগতে মানুষ আজ কোন আশ্বাসে বেঁচে থাকবে? তার জীবনে প্রেম নেই, কিন্তু প্রেমের যন্ত্রণা আছে।

এই প্রেম এবং প্রেমের যন্ত্রণাকে উপজীব্য করেছেন মানিক বন্দোপাধ্যায় তাঁর **'দিনা-রাত্রির কাব্য'-এ**। এর নায়ক হেরম্ব হচ্ছে একজন অধ্যাপক। সে শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী। ভা লো বা সা র সর্বগ্রাসী উচ্ছ্বাসকে সে যুক্তিগ্রাহ্য মনে করে না। আবেগ তার কাছে বর্জনীয়। কিন্তু তার এই শিক্ষালব্ধ মানসিকতা সময়-সময় তার গভীর আকূতির কাছে পরাজিত হয়। সে ভালোবাসায় অক্ষম, এই জেনেই তার স্ত্রী উমা একদা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছিল। অথচ সুপ্রিয়া মনে করে, তার হেরম্বদা তাকে ঠকিয়েছে। তার এবং নিজের মাঝে একটি আপনগড়া ব্যবধান টেনে সে পুলিশ ইন্স-পেক্টর অশোকের সঙ্গে তার বিবাহকে সম্ভব করেছে। তাই দীর্ঘ কয়েক বছর স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করবার পরেও সে মনে-মনে হেরম্বকেই কামনা করে এবং যখন হেরম্ব সত্যি-সত্যিই তাদের সংসারে অতিথিরূপে উপস্থিত হয়, তখন সে বিবাহের পবিত্র বন্ধনকে অস্বীকার করে তার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে নিজের প্রেমকে বাঁচিয়ে তুলতে চাইল। কিন্তু হেরম্বর মধ্যে সে অনুভূতি কোথায়? সে ত প্রজ্জ্বলিত আগ্নেয়গিরির ভস্মাবশেষ! অতএব সে সুপ্রিয়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যেই যেন পালাল। কিন্তু পরিত্রাণ নেই। পুরীর প্রান্ত-সীমায় সে দেখা পেল তার অনাথ মাস্টারমশাইয়ের। একদা এই একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী তাঁর প্রতিবেশীকন্যা মালতীকে নিয়ে পলায়ন করে সমাজকে করেছিলেন স্তম্ভিত। আজ তাঁর জীর্ণাবস্থা। কিন্তু মালতীর ভোগলিপ্সা নিবৃত্ত হয় নি; তাই তিনি কারণসলিলে ভাসমান থেকে দেহের যন্ত্রণা ভোলবার চেষ্টা করেন। এঁদের কন্যা আনন্দ যৌবনে পদার্পণ করেও এতদিন কোনো পুরুষের সাহচর্য পায় নি। তাই তার পবিত্র সৌকুমার্য হেরম্বকে মুগ্ধ করল। আনন্দের আকর্ষণকে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। কিন্তু তার প্রেমে কোনো দায়িত্ব-বোধ ছিল না এবং এই বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনও ছিল না। তারা দুজনে দুজনের প্রেমে বিভোর। কিন্তু সহসা ধূমকেতুর মতো সেখানে সুপ্রিয়ার আবির্ভাব ঘটল। সে হেরম্বর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইল।

আনন্দ প্রমাদ গুনল। প্রশ্নের উত্তরে সে হেরম্বর কাছ থেকে শুনল : ভালোবাসা ক্ষণস্থায়ী; ভালোবাসা ঝরে পড়লেও মানুষ থাকে। কিন্তু না; সে ভালোবাসাকে ঝরে পড়তে দেবে না। ভালোবাসাকে প্রজ্বলিত রেখে তাই সে হেরম্বরই সামনে তার আহ্বানকে উপেক্ষা করে সমুদ্রগর্ভে মিলিয়ে গেল। হেরম্ব সমুদ্রবক্ষে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। যখন জ্ঞান হল, তখন তার চশমাটি ভেঙে গেছে; ঐ চশমাই যেন তার যুক্তির প্রতীক ছিল। সে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল সদ্য-বিধবা সুপ্রিয়ার সামনে। সুপ্রিয়া জানতে চাইল হেরম্বর কাছ থেকে তার ভবিষ্যৎ চলার পথের কথা। হেরম্ব নিরুত্তর—শুধু সমুদ্রের গর্জন শোনা যেতে থাকল।

নাবিক প্রোডাকসন্স বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তীর যুগ্ম পরিচালনাধীনে 'দিবারাত্রির কাব্য'-এর একটি মননসম্মত চিত্ররূপ দেবার প্রয়াস পেয়েছেন এবং এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে উচ্চপ্রশংসিত হবার যোগ্য। ছবির আরম্ভ ভাগেই নায়ক হেরম্বর স্বগতোক্তিকে প্রায় নেপথ্যভাষণ রূপে উপস্থাপিত করে যে বিচিত্র চিত্রপরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে, তা পরিচালকদ্বয়ের অভিনব কল্পনাশক্তির পরিচায়ক। পরে সুপ্রিয়ার সংসারে হেরম্বের আবির্ভাবের পর থেকে তার স্থান ত্যাগ পর্যন্ত বিভিন্ন দৃশ্যাবলীর উপস্থাপন ও শিল্পনৈপুণ্যের প্রকাশক। তবে পুরীর অংশে এসে ছবিটি কিছুটা দীর্ঘগতিসম্পন্ন বিক্ষিপ্ত এবং ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এই অংশটি আরও সুবিন্যস্ত ও সংক্ষিপ্ত সবার অবকাশ ছিল।

অভিনয়ে সুপ্রিয়া ও হেরম্ব রূপে মাধবী চক্রবর্তী ও বসন্ত চৌধুরী নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষী। পুলিশ ইনস্পেকটার অশোকের ভূমিকায় নবাগত স্বপন রায় যথেষ্ট প্রত্যয়ত অভিনয় করেছেন। প্রৌঢ় মাস্টারমশাইয়ের ভূমিকায় কানু বন্দ্যোপাধ্যায় সংবেদনশীল অভিনয়ের নিদর্শন রেখেছেন। সাঁওতাল বীরশারূপে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ভূমিকাটিকে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। আনন্দের ভূমিকায় অঞ্জনা ভৌমিকের অভিনয় সংযত ও প্রাণবন্ত। মালতী বৌরূপে অনুভা ঘোষ চরিত্রটির জ্বালাকে সার্থকভাবে প্রকাশিত করেছেন। ছবির কলাকৌশলের মধ্যে চিত্র গ্রহণ বিভাগটি অভিনবত্বপূর্ণ এবং উচ্চ-প্রশংসনীয়। কৃষ্ণ চক্রবর্তীর চিত্রগ্রহণ অভিনন্দনযোগ্য। সুরযোজনা অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচায়ক।

নাবিক প্রোডাকসন্স-এর 'দিবারাত্রির কাব্য' নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় চিত্র-সংযোজনা।

মঞ্চাভিনয়

বাংলাদেশে একসপেরিমেন্টাল নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে 'নক্ষত্র' একটি স্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত নাম। বিষয়বস্তু ও প্রয়োগ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যে এঁদের নাটক নিঃসন্দেহে নাট্যাভিনয়ে এনেছে একটি ভিন্ন অনুভব আর উপলব্ধির স্বাদ। 'মৃত্যু-সংবাদ', 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকান্ড,' 'বৃষ্টি বৃষ্টি'র মধ্য দিয়ে যে অভিনবত্ব ভাষা পেয়েছে তা শুধু দর্শকদের কৌতূহলকেই উদ্দাম করে তোলেনি, মনের গভীরতম স্পন্দনকেও দোলা দিয়েছে। এঁদের এবারের নাটক 'নয়ন কবিরের পালা'। পূর্বপ্রযোজনার রূপায়ণগত দ্যুতি এই নাটকে আছে, কিন্তু অভিনয়ের বলিষ্ঠতাই এবারের প্রযোজনার আসল সম্পদ।

তথাকথিত অর্থে নবেন্দু সেনের 'নয়ন কবিরের পালা'য় কোন উপভোগ্য কাহিনী নেই। বরঞ্চ বলা যেতে পারে অদ্ভুত মুহূর্ত নিয়ে নাট্যসৃষ্টির প্রয়াস প্রথাগত কৌশলকে আঘাতই করেছে। বোধহয় বিপ্রতীপ নাটক বা অ্যান্টি প্লে'র ধর্মও তাই। একটি নাটকের সমাপ্তির পর্দা নেমেছে। শিল্পীরা সবাই রয়েছেন গাড়ীর অপেক্ষায়। কিন্তু গাড়ী আসতে দেরী হোচ্ছে দেখে নাটকের দুটি ক্লাউনের তীব্র বাসনা হোল দর্শকদের আরো অতিরিক্ত কিছু শোনাবে। কিন্তু কি সেই অতিরিক্ত ব্যাপার? তা কি শুধু সংঘাত সংলাপে ঘেরা নাটক, না প্রাত্যহিক স্পষ্ট সূর্যোদয় সূর্যাস্তে ঘেরা জীবনের কথা?

কি তারা উপহার দেবে 'মাননীয়' দর্শকদের? ফেলে আসা দিন-রাত্রির অতলে ডুবে তারা কিছু ঘটনা খুঁজতে চাইলো। বিক্ষিপ্ত কিছু পেলো, এই কিছু পাওয়ার কথাই 'নয়ন কবিরের পালা'র পটভূমি। এই পটভূমিকায় সংলাপ আর উপলব্ধির নিবিড় সেতুবন্ধন করেছেন দুজন ক্লাউন—নয়নচাঁদ আর ধর্মদাস। নয়নচাঁদের একটি স্বপ্নকে কেন্দ্র করেই দুজনের একটি নাটক রচনার চেষ্টা। নয়নচাঁদ স্বপ্নে দেখেছে একটি লোক তাকে এসে বলছে যে তিনি তার বাবা। নয়ন যাকে তার বাবা বলে জানে তিনি তার বাবা নন। মূলত নয়নের এই সমস্যাকে ঘিরেই পালা রচনার চেষ্টা। অবশ্য এর মধ্যে আরো অন্য প্রসঙ্গও এসেছে।

দুটি মন / নায়িকা সুপর্ণা সেন / ফটো : অমৃত

শেষ পর্যন্ত ময়নচাঁদ আর ধর্মদাস বুঝলো এবং দর্শকদের বোঝাতে চাইলো যে একটি গল্প নিটোলভাবে সাজানো গেলো না, বোধহয় প্রতিটি মানুষই এলোমেলো অনেকগুলো ঘটনাকে একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প সাজিয়ে তুলতে চাইছে, কিন্তু হোচ্ছে না। বোধহয় এই জীবনের ছবি, ছুটে চলার ছবি।

ময়নচাঁদ আর ধর্মদাস যে সব কথা বলেছে, যে ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের সজীবতা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে তার সুস্পষ্ট কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া হয়তো যাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা যে উপলব্ধির সীমায় পৌঁছেছে তা কি সংগ্রামী মানুষের বাস্তব উপলব্ধি নয়? গল্প সাজানো গেলো না,

তবু ছুটে চলতে হবে একদিন অর্থময় মেলবন্ধন হবেই এই আশায়। শেষ মুহূর্তে নয়নচাঁদ আর ধর্মদাসের ছুটে চলার মধ্যে এই ইঙ্গিতই বোধহয় মুখর হয়ে উঠেছে।

নাটকের পরিকল্পনায় ও আঙ্গিকে যে নতুনত্ব আছে তাই দর্শককে আকৃষ্ট করেছে। সেই আকর্ষণের মধ্য দিয়েই রসসঞ্চারের আভাস স্পষ্টতা পেয়েছে। নাটকটির নির্দেশনায় শ্যামল ঘোষ অসাধারণ শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন, প্রতিটি মুহূর্তেই তাঁর অন্তর প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নয়নচাঁদের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় ভোলা যায় না, দর্শককে প্রতি মুহূর্তেই আপ্লুত করে রেখেছেন তিনি। তাঁর সহযোগী শ্যামলচরণ ঘোষ (ধর্মদাস) ও প্রাণবন্ত অভিনয়ের নজীর সৃষ্টি করেছেন। মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতে নাট্যকার নভেন্দু সেন ও স্বরূপ মুখার্জী প্রত্যাশিত পরিবেশনকে মূর্ত করে তুলতে পেরেছেন।

মাত্র দুটি পুরুষ চরিত্র আর অফুরন্ত সংলাপ দিয়েও যে সার্থক নাটক হয়, 'নয়ন কবিরের পালা' তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। নক্ষত্রের এই দুঃসাহসিক নাট্য-প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

●

রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' ও শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটক দুটি গত ৯ ও ১০ জানুয়ারী মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হোল বরাহনগরের নবনির্মিত রবীন্দ্রভবনে। এই নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন ও শিল্পী সমাবেশে ছিলেন বরাহনগর পৌরসংঘের কমিশনার, কর্মী ও রবীন্দ্রভবন কমিটির সদস্যারা।

শেষরক্ষা নাটকের প্রযোজনা দর্শকদের তৃপ্ত করেছে। তমাল লাহিড়ীর নির্দেশনায় কয়েকটি মুহূর্তে প্রাণের স্পর্শ সজীব হয়ে উঠেছে। অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই নাম করতে হয় নীলিমা চক্রবর্তী। তিনি ইন্দুমতী চরিত্রটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। 'গদাই' নির্দেশক তমাল লাহিড়ীর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র-চিত্রণ। বিমল রায়ের বিনোদ ও শিবশঙ্করের ঘোষালের চন্দ্রকান্ত সুন্দর ও স্বাভাবিক। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুলা ভট্টাচার্য, সমীর দাস, গোপাল দাঁ, শচীন কোলে, দ্বিজেন মান্না, জয়দেব ব্যানার্জি, শিশু ভট্টাচার্য ও হিরণ মৈত্র।

শেক্সপীয়রের বলিষ্ঠ নাটক 'ওথেলো'কে সার্থকভাবে মঞ্চের আলোয় পরিস্ফুট করে তোলা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ ব্যাপার। প্রথমেই বলি এই দুরূহ কাজ নির্দেশক কিরণ মৈত্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পেরেছেন। 'ওথেলো' চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন ভাবাবেগ চন্দ্র রায়ের অভিনয়ে ফুটে উঠেছে, এবং নির্দেশক কিরণ মৈত্র স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছেন 'ইয়াগো'র কুটিলতাকে। যূথিকা ভট্টাচার্যের 'ডেসডিমোনা' ও বিমল রায়ের 'কেমিও' দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে ছিলেন মঞ্জুলা ভট্টাচার্য, ছবি তালুকদার, শিবশঙ্কর ঘোষাল, গৌর ব্যানার্জী, শুভময় দত্ত, প্রমথ দেবনাথ, জলদবরণ পাল।

মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতে গভীর শিল্পবোধের পরিচয় রেখেছেন অমর ঘোষ।

●

সম্প্রতি কে সি থাপার রিক্রিয়েশন ক্লাবের, শিল্পী-সদস্যারা বিশ্বরূপা মঞ্চে সলিল সেনের নাটক 'স্বীকৃতি' সাফল্যের

নিশিপদ্মের চিত্রগ্রহণকালে নচিকেতা ঘোষ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র এবং চিত্রপরিচালক

সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। সমাজের ধনী-দরিদ্রের চাওয়া-পাওয়ার পটভূমিকায় রচিত এই নাটকটির নিখুঁত নির্দেশনায় ছিলেন বীরু মুখোপাধ্যায়। নির্দেশকের সূক্ষ্মতম শিল্পবোধ ও শিল্পীদের আন্তরিক অভিনয় গুণে নাটকটির কয়েকটি মুহূর্ত আশ্চর্য গতিবেগ লাভ করেছে। সমরেন্দ্র, অজিত ও সুভাষ চরিত্রে হেমলাল কর্মকার, সুশান্ত ভাদুড়ী, চঞ্চলকুমার ঘটক প্রাণবন্ত অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। পিয়ারীমোহন ঘোষ ও অভয়পদ ব্যানার্জীর চুংড়া ও নিধুকাকাও দুটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত চরিত্র-চিত্রণ। দীপিকা দাস, কল্যাণী অধিকারী ও তৃপ্তি দাসও নিজেদের চরিত্র রূপায়ণে নিষ্ঠার নজীর রাখতে পেরেছেন।

●

সন্তান সংঘের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অনিলবরণ দত্তের সময়োপযোগী নাটক 'এ কি হলো' সম্প্রতি মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হয়েছে। রথীন সিকদার নির্দেশিত এই নাটকের কয়েকটি চরিত্রে স্বাভাবিক অভিনয় করেন অনুপ ভট্টাচার্য, সুশীতল ব্রহ্মচারী, নারায়ণ দাস, সুনীল ঘোষ, অবীর বসু, রাধাজীবন দে, অরুণ দত্ত, সবিতা রায়।

'সায়ন্তনী' নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা তাঁদের মঞ্চসফল তিনটি একাংকিকার নিয়মত অভিনয় পরিবেশনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। নাটিকা তিনটি হোল সমরেশ বসুর 'আদাব', মানিক ব্যানার্জীর 'বাগদী-পাড়া দিয়ে'এর নাট্যরূপ এবং চেকভ অনুপ্রাণিত 'বিরহী'। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন মিহির চ্যাটার্জী।

●

দিল্লীর প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী 'সুরশ্রী'র শিল্পীরা সম্প্রতি আইফ্যাক্স্ হলে বিমল

স্থানীয় নাট্যামোদীদের স্বীকৃতি লাভ করেছেন। চরিত্র-চিত্রণে শিল্পীরা যে নিষ্ঠা ও সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তাতেই সমগ্র নাট্যপ্রযোজনাটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। কুন্তি, শৈল দুটি চরিত্রে গায়ত্রী রায় ও সেবা তালুকদারের প্রাণঢালা অভিনয় সত্যি ভোলা যায় না। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় অংশ নিয়েছেন তিলক চক্রবর্তী (নিরঞ্জন), কল্যাণ রায় (গেনলাল), বগলা বোস (মনমোহন), নীপেন তালুকদার (সদাব্রত) ও নির্দেশক রমেন ব্যানার্জী।

●

আগ্রা শহরে একটি নাট্যসংস্থা কিছু দিন আগে প্রথম প্রকাশের পথ পেলো। সংস্থার নাম 'অনামী'। যারা শুরুতে অভিনয় হোল কালো মাটির কান্না' নাটক। আগ্রা কলেজের গংগাধর শাস্ত্রীভবনে অভিনীত এই নাটকটির চরিত্রগুলো সাফল্যের সংগে রূপায়িত করেন আনন্দমোহন ভট্টাচার্য, চন্দন সান্যাল, প্রণব পাল, নিশীথমোহন ভট্টাচার্য, দিলীপ পাল, প্রশান্ত ঘোষ, তরুণ ঘোষদস্তিদার, রজত বোস, রবীন ভারমা। নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন আশীষ চ্যাটার্জী।

●

পান্ডুর একটি প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী 'যুবতীর্থ'। গোষ্ঠীর শিল্পীরা সম্প্রতি নাট্যোৎসব উপলক্ষে দুটি ছোট নাটক অভিনয় করেছেন। নাটক দুটির নাম হোল শেখর চ্যাটার্জীর 'প্রতিধ্বনি' ও রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'আমায় বাঁচতে দাও'। অভিনয়ে যাঁরা সফল হন তাঁরা হোলেন সমীর কানুনগো, জীবন রায়, শক্তি কাঞ্জিলাল, সমীর চক্রবর্তী, অনুপম মজুমদার, কাজল বিশ্বাস প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী, দুলাল ঘোষ,

সম্প্রতি শিলচরের আর্যপট্টি দুর্গাবাড়ী রংগমঞ্চে জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' পরিবেশিত হয়েছে। জ্যোতু ব্যানার্জীর দেওয়া নাট্যরূপটির অভিনয়ে শিল্পীরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। কয়েকটি চরিত্রে মন্টু দেশমুখ, শিবু গুপ্ত, রুমু দেব, পান্না নাগ ও মিঃ দাশগুপ্তের অভিনয় নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

●

পান্ডুর ল্যাবরেটরিজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের দ্বিতীয় বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি গংগাপদ বসুর 'সত্য মারা গেছে' নাটকটি সাফল্যের সংগে মঞ্চস্থ করেছে। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শম্ভু ব্যানার্জী। গৌরীশংকর ব্যানার্জী, ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র, ভুবন দে, প্রদীপ ভট্টাচার্য, নির্মল ঘোষ, বৈদ্যনাথ দে, শ্যামল বক্সী, অজিত দে মন্ডল, অমরেশ দাস, বিশ্বনাথ মুখার্জী, অভয় শীল, গীতা নাগ, যূথিকা ভট্টাচার্য বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয় করেন।

●

নয়াদিল্লী কালীবাড়ীর বেংগলী ক্লাব গত বছরের মতো এবারেও সর্বভারতীয় ভাষায় নাট্যাভিনয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। প্রতিযোগিতাটি আগামী ৮ থেকে ১৭ মে পর্যন্ত আইফ্যাকস হলে অনুষ্ঠিত

হবে। ভারতের যে কোন অঞ্চলের নাট্য-সংস্থাই এতে অংশ নিতে পারবে। যোগাযোগের ঠিকানা সম্পাদক, বেঙ্গলী ক্লাব, কালীবাড়ী মন্দির মার্গ, নয়াদিল্লী-১। আবেদনপত্র পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫ মার্চ।

●

সামগ্রিকভাবে নাটকের ক্ষেত্রে আজ যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তার ঢেউ এসে লেগেছে ধর্ম ও সংস্কৃতির পীঠস্থান বারাণসীতেও। নাটজগতের এই রূপান্তরকে আজ সুনির্দিষ্ট পথে চালনার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রাচীনতম বাঙালী প্রতিষ্ঠান হরিহর সমিতি। দীর্ঘ ৮৪ বছর ধরে এই সমিতির শিল্পীরা অসংখ্য ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক ও পালার অভিনয় করেছেন। আর আজ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ'রা সামাজিক নাটকের বিভিন্নমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। এ'দের প্রচেষ্টায় আন্তরিকতা সম্প্রতি 'বন্দর' ও 'আজকের নাটক দুটি পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। দুটি নাটকের প্রয়োগ পরিকল্পনায় শ্রীপ্রিয়গোপাল ভট্টাচার্য প্রত্যাশিত শিল্পবোধের পরিচয় রাখতে পেরেছেন।

কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় কুমুদেশ ভট্টাচার্য, প্রদীপ্ত চৌধুরী, অন্নপূর্ণা দত্ত, রীতা ভট্টাচার্য, দিলীপ ভট্টাচার্য, মায়া গুপ্ত, এম আর রায় ঘটক, মায়া রায়, অনিমেষ ভট্টাচার্যের অভিনয় দর্শকদের বিমুগ্ধ করে।

●

গত বছর কালীপুজোয় সফল্যের সঙ্গে 'উল্কা' নাটক মঞ্চস্থ করার পর গত ২৯ নভেম্বর টরেন্টোতে ইন্ডিয়া ড্রামা গ্রুপ তাঁদের দ্বিতীয় নাটক পৃথিবীশ সরকারের 'লবণাক্ত' রমেন গাঙ্গুলীর ব্যবস্থাপনায় ও সুখেন্দু রায়চৌধুরীর পরিচালনায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন মানিক রায়, প্রবীর চক্রবর্তী, রথীন ঘোষ, নীতিন মজুমদার ইলা রায়, সবিতা গুহ, সুব্রত দাশগুপ্ত, প্রাণেশ্বর কর্মকার, সত্যরঞ্জন ঘোষ প্রমুখ। নির্মল সিনহার আলোকসম্পাত ও পন্ডিত রণদেব ও দেবী ঘোষের সঙ্গীত সুপরিকল্পিত। বহির্ভারতে বাংলা নাটকের প্রসারে কানাডা প্রবাসী এ'দের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

২৪ জানুয়ারী ভারতী বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে (পূর্বে সিঁথি, দমদম) আর্ট থিয়েটার সুকুমার রায় রচিত 'চলচ্চিত্ত চঞ্চরী' তুলসী লাহিড়ীর 'গণনায়ক' সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় অভিনীত হবে।

আগামী ২৬ জানুয়ারী (সোমবার) সন্ধ্যা সাতটায় কাঁচড়াপাড়া স্পিনিং ইনস্টি-

সালখিয়া জটাধারী পার্কে ফ্রেন্ডস ক্লাবের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন দীপেন মুখোপাধ্যায়।

টিউট মঞ্চে তুলসী লাহিড়ীর 'গণনায়ক' ও 'মণিকাঞ্চন' এবং সুনীল দত্তের 'রক্তচিহ্ন' অভিনীত হবে।

লখনৌয়ে সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতা—গত ১৮ থেকে ২৮ ডিসেম্বর লখনৌ বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতি আয়োজিত সপ্তম বার্ষিক প্রকাশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী মোট দশটি দলের মধ্যে দিল্লীর 'শনিচক্র' গোষ্ঠীর প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথের 'জ্যেঠামশাই' শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার জন্য প্রকাশ স্মৃতি শীল্ড, নটরাজ ও নগদ ৫০১ টাকার সম্মান লাভ করেন। প্রযোজনা হিসাবে কাপ ও ২৫১ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন মুজফ্ফরপুরের 'চতুরঙ্গ' প্রযোজিত কিরণ মৈত্রের 'নাম নেই' নাটক। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পান দিল্লীর শনিচক্র প্রযোজিত 'জ্যেঠামশাই' নাটকের জন্য শ্রীঅমর হোড়। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান শ্রীজয়ন্ত দাশ 'জ্যেঠামশাই' নাটকে জ্যেঠামশাইয়ের ভূমিকা অভিনয়ের জন্য। অভিনয়ে দ্বিতীয় পুরস্কার পান বারাণসীর হরিহর সমিতির শ্রীঅনিমেষ ভট্টাচার্য 'বন্দর' নাটকে অভিনয়ের জন্য। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার পান বাদ্দকাটির সান্ধ্য সমিতির নাট্য সংস্থার শ্রীমতী রেণু বন্দ্যোপাধ্যায় 'কালের বিচার' নাটকে 'ভ্রমর' ও 'রমা'র ভূমিকা অভিনয়ের জন্য। অভিনেত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় পুরস্কার পান শ্রীমতী মায়া ঘোষ, 'কালের বিচারে' রোহিণী ও রাজলক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল ডাঃ বেণুগোপাল রেড্ডী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসমরেশ বসুর ভাষণ খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়।

নাট্যোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত দেশ-বিদেশের থিয়েটার প্রগতি ও বাংলা নবনাট্য আন্দোলন সম্বন্ধে চিত্র, পত্রপত্রিকা এবং পুস্তকের প্রদর্শনীটি উল্লেখযোগ্য হয়।

বাংলা নাট্য আন্দোলনের পটভূমির 'নবান্ন' নাটকের পঁচিশ বছরের স্মৃতিকে স্মরণ করে প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। পুরস্কার বিতরণী দিবসে গুণীজনরূপে সম্বর্ধনা জানান ও অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয় নবনাট্যের পুরোধা শ্রীবিজন ভট্টাচার্যকে। শ্রীবিজন ভট্টাচার্যের আবেগদীপ্ত দীর্ঘ ভাষণ বিপুল জনমন্ডলীকে আশা ও উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ করে। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শেষে বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতির প্রযোজনায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাক্ষস' নাটিকা মঞ্চস্থ হয়।

উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত বাংলা নাটক ও থিয়েটারের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সুষ্ঠু আলোচনায় সভাটিও উল্লেখযোগ্য হয়। আলোচনায় শ্রীবিজন ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও আঞ্চলিক নাট্যানুরাগীরা অংশগ্রহণ করেন।

নাট্যোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত 'স্মরণিকা' পত্রটি চিত্তাকর্ষক হয়। শ্রীশম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়, সুধীপ্রধান এবং শ্রীকিরণ মৈত্র ইত্যাদির রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে 'স্মরণিকা'টি প্রকাশিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

কলকাতা খ্যাতনামা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় শিল্পী পরিষদ প্রযোজিত নৃত্যনাট্য 'শ্রীচৈতন্য'র আগামী অভিনয় ৮ ফেব্রুয়ারী রবিবার সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে।

গত ৩ জানুয়ারী বাগবাজার তরুণ পাঠাগারের উদ্যোগে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। ঐদিন সবথেকে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল হরবোলা শৈলেন লাহার একঘন্টাব্যাপী "হরবোলা" পরিবেশন। অন্যান্য অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেনঃ—ভোলানাথ দাস, রীতা হালদার, দেবীদাস ঘোষাল, পারমিতা রায়, বেনু সেনগুপ্ত, রঞ্জিত বসুরায় ও শ্রীকাশীনাথ।

আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী বালিগঞ্জ ইয়ং মেনস অ্যাসোসিয়েশন (২২৭এ, রাসবিহারী অ্যাভেনু, কলকাতা—১৯) এর পরিচালনায় অষ্টাবিংশতি বার্ষিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা নিম্নলিখিত বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে।

(ক) সর্বসাধারণ—"সংশয়" — প্রেমেন্দ্র মিত্র (প্রথম), (খ) স্কুল ছাত্রছাত্রী—"নন্দলাল"—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (আবৃত্তি—মঞ্জুষা), (গ) বালক-বালিকা—"সামিয়ানা" সুনির্মল বসু (কিশলয়, ২য় ভাগ), (ঘ)

ইন্টারন্যাশনাল সার্কাস দেখতে গিয়েছিলেন সর্বশ্রী দক্ষিণারঞ্জন বসু, মন্মথ রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সময় বসু, সুমথনাথ ঘোষ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত এবং ভবানী মুখোপাধ্যায়

শিশু—"ছড়া"—ব্যাঙেদের সাতভাই—আশা দেবী (ছোটদের ছড়া সঞ্চয়ন), (ঙ) অবাঙালী বিভাগ "পণরক্ষা"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কথা ও কাহিনী)।

বাড়িশা সংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত আবৃত্তি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা (৪র্থ বর্ষ)র জন্য আগামী ৮ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার নাম এবং লিখিত প্রবন্ধ রতন বসুরায় চৌধুরী, সম্পাদক, বাড়িশা সংস্কৃতি পরিষদ, ৫নং মাতঙ্গিনী দেবী রোড, বাড়িশা, কলিকাতা—৮ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। আবৃত্তি প্রতিযোগিতার প্রাথমিক নির্বাচন আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী বেলা ১টায় উপরোক্ত ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই।

আবৃত্তির বিষয়সূচী:—'ক' বিভাগ : (১৮ বৎসরের ঊর্ধ্বে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য) 'লেনিন'—সুকান্ত ভট্টাঃ (ছাড়পত্র), 'খ' বিভাগ : (১৪ হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত বালক ও বালিকাদের জন্য) 'ঐতিহাসিক'—সুকান্ত ভট্টাঃ (ছাড়পত্র), 'গ' বিভাগ : (৯ হইতে ১৩ বৎসর পর্যন্ত বালক ও বালিকাদের জন্য) 'জাতের বজ্জাতি'—কাজী নজরুল ইসলাম (বিষের বাঁশী), 'ঘ' বিভাগ : (৮ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের জন্য 'দামোদর শেঠ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সঞ্চয়িতা), প্রবন্ধ : (সর্বসাধারণের জন্য)—'বর্তমান সাংস্কৃতিক জগতে নৈতিকতার সংকট ও তার সমাধান।'

বিশেষ কতকগুলো আদর্শ সামনে রেখে বিবেক যাত্রা সমাজ তাঁদের যাত্রা শুরু করলেন। সম্প্রতি যাত্রা পালা পরিবেশনের মধ্যে আধুনিক বিষয়বস্তু গ্রহণ ও দর্শকের কাছে আসার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। নবগঠিত এই বিবেক যাত্রা সমাজ এই মহান প্রয়াসকে আরও বাস্তব ও প্রাণময় করে তুলতে প্রয়াসী।

সাধারণ মানুষের সামাজিক সমস্যা ও সমাধানের ইংগিত দেবে এঁদের প্রতিটি পালা। অবশ্য সে কাজ তাঁরা প্রথাগত [illegible] মন। [illegible] যাত্রা সমাজের প্রথম নাট্যার্ঘ 'শোনরে মালিক' ও 'রাইফেল'। সুরসৃষ্টি ও সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য ও সঙ্গীতে অংশ নেবেন নির্মলেন্দু চৌধুরী। এবং শিল্পীদের মধ্যে আছেন শোভা সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ মাইতি, ইন্দিরা দে, অমর মুখোপাধ্যায়, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও উৎপল দত্ত প্রমুখ।

ছায়ারূপার প্রথম প্রয়াস প্রতিভা বসুর কাহিনী অবলম্বনে 'প্রথম বসন্ত'র চিত্রগ্রহণ নির্মল মিত্রের পরিচালনায় বর্তমানে শেষ হয়ে মুক্তির দিন গুনছে। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—মাধবী চক্রবর্তী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, অজয় গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, নিলি চক্রবর্তী, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতী দেবী প্রভৃতি।

রবীন চট্টোপাধ্যায় সুরারোপিত ছবিটির নেপথ্যে কণ্ঠ পরিবেশন করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মলা মিশ্র। ছবিটি পরিবেশনার দায়িত্বে আছেন—দাওয়ার ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স।

টালা পার্কে ইন্টারন্যাশনাল সার্কাসে একটি সাহিত্যিক সমাবেশ হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল সার্কাসের আমন্ত্রণে তাঁরা যখন একে একে আসছিলেন তখন দর্শকেরা কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা যে এইভাবে এক সঙ্গে এসে সার্কাসের আসরে মিলবেন, তা আগের থেকে যেমন ছিল অজানা, তেমনি বিস্ময়কর। প্রখ্যাত ব্যায়ামাচার্য শ্রীবিষ্টু ঘোষ সাহিত্যিকদের স্বাগত সম্ভাষণ জানান।

সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, শান্তিপদ রাজগুরু, ভবানী মুখোপাধ্যায়, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং শ্রীমতী বাণী রায়।

উত্তরপাড়া রাজা প্যারীমোহন কলেজের ছাত্ররা আন্তঃ কলেজ একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের অশান্ত-বিবর নাটকটি 'ইউনিভারসিটি ইনস্টিট্যুট' হলে মঞ্চস্থ করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

দলগত অভিনয়নৈপুণ্যে, প্রয়োগকৌশলে এবং উপস্থাপনার গুণে নাটকটি বিপুলভাবে দর্শক সম্বর্ধনা লাভ করে। নাটকে আবদুলের ভূমিকায় পার্থ ব্যানার্জির অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করে। এই নাটকের দুটি বিশেষ চরিত্রে বিনোদ সান্যাল ও আনন্দ সান্যালের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রচুর প্রশংসা ও অভিনন্দন কুড়িয়েছেন সুব্রত চট্টোপাধ্যায় ও শৈলপতি ঘোষ। এ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে পল্লব চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তপনকুমার ভৌমিক, অলোক চট্টোপাধ্যায়, বিজন মজুমদার প্রমুখেরা সুঅভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। নাটকটিতে শিল্প নির্দেশনায় ও সহকারী

পরিচালনায় ছিলেন শ্রীশৈলপতি ঘোষ। নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন অধ্যাপক রথীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গত ২২ ডিসেম্বর উত্তর কলকাতার সুপরিচিত নাট্য সংস্থা 'যাযাবর' বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত বিশ বছর আগে নাটকটির অভিনয় করেন স্টার মঞ্চে। নাটকটির সূচনায় এবং বিন্যাসে পরিচালক খুবই সুচিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। ছোটখাট ত্রুটিগুলি হয়তো ভালভাবে লক্ষ্য করলে তিনি এড়াতে পারতেন, যেগুলি এড়ান তাঁর পক্ষে উচিত ছিল। পরিচালক সুনীতকুমার দাস দুঃখদহনের ভূমিকায় কিন্তু প্রমাণ করেছেন যে তিনি একজন বলিষ্ঠ অভিনেতা। দীপকের সংলাপে এবং অভিব্যক্তিতে কিছু অসামঞ্জস্য ছিল তাছাড়া অরুণকুমার সেনগুপ্ত অভিনয় খুবই সাবলীল করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রদীপের ভূমিকায় মুকুল রায় একটু সংযত হলে চরিত্রটি সর্বাঙ্গসুন্দর হতো। মনোহরের ভূমিকায় দীপক ব্যানার্জির আধুনিক অভিনয় বেশ ভালোই লাগল। প্রকাশ চরিত্রে পূর্ণ শীল নিজেকে মানাতে পারেন নি। যদুপতি, সনাতন ও অটল যথাক্রমে জয়দেব ঘোষ, বাসুদেব দাস, কেষ্ট দে সুঅভিনয় করেছিলেন। মনীষার চরিত্রে প্রতিমা দাসগুপ্তের কাছ থেকে আরও কিছু আশা করার ছিল। তমসা ও তরলিকার ভূমিকায় শিপ্রা সাহা, চিত্রিতা মন্ডলের অভিনয় প্রশংসনীয়। অন্যান্য ভূমিকায় সুজয় চ্যাটার্জি, নীলু দাসগুপ্ত, গোপাল ভড়, গোবিন্দ দে, বিশ্বনাথ ঘোষ, শশাঙ্ক দে সরকার, অসিত দে, মঞ্জুশ্রী রায় চৌধুরী, নমিতা গাঙ্গুলী, সুনন্দা ঘোষ প্রভৃতি। সঙ্গীতের কাজ দৃশ্যপট ও আলোর কাজ প্রশংসার দাবী রাখে।

গেল ১১ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ দিনব্যাপী পূর্ণাঙ্গ নাট্যোৎসব। শিশিরকুমার একাংক নাট্য প্রতিযোগিতা। সংগীত জলসা ও চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ফিল্ম অ্যান্ড থিয়েটার আরকাইভস্ অব ইন্ডিয়ার নবম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান নোনা-জাফরপুর বারাকপুরেস্থিত বিধানসংগ্রহশালা ও সুভাষ-মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়।

১১ ডিসেম্বর উদ্বোধন দিবসে পৌরহিত্য করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য— ডক্টর রমা চৌধুরী। এদিন প্রদর্শনী ও শ্রীনাট্যম কর্তৃক পূর্ণাংগ নাট্যোৎসবের উদ্বোধন, পুরস্কার বিতরণ ও জ্ঞানী-গুণীদের অভিজ্ঞানপত্র দ্বারা ভূষিত করা হয়। আমেরিকা প্রত্যাগত বাউল হরেকৃষ্ণ দাসকে সম্মান জানানো হয় এবং তিনি বাউল সংগীত দ্বারা সকলকে তৃপ্ত করেন।

১৪ ডিসেম্বর শিশিরকুমার একাংক নাট্য প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং নাট্যকার মন্মথ রায়কে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সভাপতিত্ব করেন বারাকপুরের পৌর-প্রধান ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায়।

২২ ডিসেম্বর সমাপ্তি অধিবেশনে ভাগবত চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রদায় সহ-সংগীত পরিবেশন করেন। সভাপতিত্ব করেন শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ও সি পি এম নেতা তড়িৎ তোগদার প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দান করেন। উৎসব সময়ে বিধানসংগ্রহশালা জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। বিভিন্ন চিত্র ও নাট্য প্রতিষ্ঠান অন্যান্য বারের মত এবারও স্টীল, শোকার্ড, পোস্টার, বুকলেট, প্রচার নমুনা প্রভৃতি সম্পদ উপহার দেন। নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র ব্যবহৃত নাগরাই জুতা, চশমা ও দন্তপংক্তি উপহার দেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রাসবিহারী মিত্র।

নাট্য-প্রতিযোগিতার জন্য সলিলকুমার মিত্র ও সুধীর ব্যানার্জি একটি শীল্ড ও একটি কাপ উপহার দেন। অনুষ্ঠান সাফল্যের জন্য আরকাইভস্ কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলচ্চিত্র ও নাট্য-মঞ্চ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক সম্পদ বিধানসংগ্রহশালায় উপহার দেবার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন।

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের শিল্পীরা কিছুদিন আগে শ্রীশক্তিপদ রাজগুরুর 'প্রজাপতি' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। শ্রীদীনেন রায় নির্দেশিত এ নাটকের কয়েকটি ভূমিকায় রূপ দেন ধীরেন দত্ত, দুর্গেশ চক্রবর্তী, গোপাল পাত্র, শম্ভু বোস, প্রাণশংকর গোস্বামী, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, বেবী মুখোপাধ্যায় ও দীনেন রায়।

খুরদা রোডের বেঙ্গলি ক্লাবের শিল্পীরা গত ২১ ও ২২ ডিসেম্বর স্থানীয় রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হলে 'সাহেব বিবি গোলাম' ও 'ফেরারী ফৌজ' নাটক দুটি সার্থকভাবে মঞ্চস্থ করেন। দুটি নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন গোপাল দে ও দিলীপ পন্ডিত। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ে যাঁরা দর্শকমনে রেখাপাত করেন তাঁরা হোলেন দত্তা মুখোপাধ্যায়, সমর রায়, আর এন নন্দী, প্রতিমা পাল, গোপাল দে, দিলীপ পন্ডিত, অসিত চন্দ, অচিন্ত্য দাস, বি চট্টোপাধ্যায়, অনিল মজুমদার, শৈল ঘোষ, হিমাংশু রায়, শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য, শৈলেন সরকার, রাণু রায়, কাবেরী বসু।

শিমুরালির 'রঙ বেরঙ' নাট্যসংস্থা কিছুদিন আগে শ্রীজ্ঞানরঞ্জন ঘটকের 'কালরাত্রি' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। শ্রীঅমল হালদারের পরিচালনায় নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন শ্রীমতী চন্দনা, অংশুমান কুণ্ডু, মাঃ অরুণ, গোবিন্দ প্রামাণিক, অনিল দাস, অমল হালদার এবং শংকর শীল।

বাংলাদেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বোম্বাইতেও বাংলা নাটক পরিবেশের উদ্দীপনা সীমাহীন ব্যাপ্তি লাভ করেছে। সম্প্রতি সেখানকার 'রঙ্গম' সংস্থার শিল্পীরা বীরু মুখার্জীর মঞ্চসফল নাটক 'চারপ্রহর' পরিবেশন করলেন। মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাতে ও প্রাণবন্ত অভিনয়ের স্পর্শে প্রযোজনাটি সুন্দর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন—তরুণ ঘোষ (সমীরণ), জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায় (সুশান্ত), সুকৃতি রায়চৌধুরী (মিঃ ঘোষ), রুমা ভাদুড়ী (চিত্রিতা), রীতা ভাদুড়ী (মুংলা), সমর গুপ্ত, দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা মজুমদার, মাধব রায়, মানিক দত্ত। আবহসঙ্গীত প্রত্যাশিত সার্থকতায় পৌঁছতে পারেনি।

অনূদিত নাটকের অভিনয়ও আজ বোম্বাইয়ের নাট্যধারার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। কিছুদিন আগে 'সঙ্গম' নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা পিরানদেল্লোর 'হেনরি দি ফোর্থ' অবলম্বনে 'জাহাঙ্গীর' নাটক পরিবেশন করেন। আবার 'পথিকৃৎ' সংস্থা আলবেয়ার কামুর 'ক্যালিগুলা' অবলম্বনে 'তুঘলক' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। এই নাটকে মিলন মুখোপাধ্যায়, স্বপন গুপ্ত, সন্তোষ দত্তের অভিনয় দর্শকদের যথার্থ তৃপ্তি দিয়েছে।

গত ১৮ ডিসেম্বর রবীন্দ্রসদনের এক শিল্পশ্রীমণ্ডিত পরিবেশে নতুন এক সংস্থার উদ্বোধন করেন ডাঃ রমা চৌধুরী। সংস্থার নাম প্রেসিনিয়াম। শব্দটি এসেছে লাতিন ভাষা থেকে মর্মার্থ মঞ্চ। শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার 'চিত্রাঙ্গদা' সম্পর্কিত কয়েকটি তথ্যের প্রতি আলোকপাত করেন।

'চিত্রাঙ্গদা' মঞ্চস্থ হওয়ার পূর্বে এ সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের উল্লেখ খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। মঞ্চ ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই আবহসঙ্গীত সঙ্গতে নৃত্যনাট্যের নায়ক অর্জুনের (শান্তি বসু) আবির্ভাব ও বীরভাবান্বিত নৃত্য সত্যিই ব্যঞ্জনদীপ্ত। কুরূপা চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় সুনন্দা সেনগুপ্তের নৃত্যকুশলতা প্রশংসনীয়। শুধু তাঁর মুখ ও চোখের প্রকাশ ভঙ্গীতে যথাযথ ভাবের মিলন ঠিক ঘটে ওঠে নি।

সুরূপা চিত্রাঙ্গদা রূপায়ণে শ্রীমতী অলকানন্দা চাকলাদারের সার্থকতা সম্বন্ধে বলার কিছু নেই। তবে সাজ-পোশাকের উগ্রতায় মহাভারতীয় যুগের মর্যাদা গাম্ভীর্যের অভাব দর্শকচিত্তকে কিছু ক্ষুণ্ণ করেছে। আনন্দদেবের ভূমিকায় ধূর্জটি সেন মানানসই। সখীদের নৃত্যের পরিকল্পনা ভালই যদিও স্থানবিশেষে শংকরপদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

নেপথ্যসঙ্গীতে কুরূপা চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় কমলা বসুর গান তৃপ্তিদায়ক। সুরূপ চিত্রাঙ্গদারূপী পুরবী মুখোপাধ্যায় ভালই গেয়েছেন। অর্জুনের কণ্ঠ ও যশ যথাযোগ্যরূপে উপভোগ্য হয়েছে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গানে। সুবিনয় রায় পরিচালিত সমবেত সঙ্গীতগুলি শোনার মত।

নৃত্যপরিচালনা ও নৃত্যশিল্পীর যুগ্ম ভূমিকায় স-সম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন শান্তি বসু। তাপস সেনের মঞ্চ-পরিকল্পনা ও আলোকপাত—পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষের সংলাপ পাঠ, দীনেশচন্দ্র সেনের আবহসঙ্গীত পরিকল্পনা ও পরিচালনা, বিপ্লব মণ্ডলের সঙ্গতে অনুষ্ঠানটির সর্বাঙ্গীণ সার্থকতার জন্য সম্মিলিতভাবে দায়ী। সর্বাঙ্গীণ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কৃতিত্ব প্রাপ্য মুকুলেশ সেনের।

স্বগৃহে আমন্ত্রিত শিল্পীদের সঙ্গে বিলায়েৎ খাঁ। আলি আকবর, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুনাব্বর আলি খাঁ সঙ্গীত পরিবেশন করছেন।

জলসা

ওস্তাদ বিলায়েত ও ইমরাত খাঁ উপহৃত সংগীতোৎসব

পুত্র সুজাদ খাঁকে গুণীসমাজে পরিচিত করবার জন্য, পার্ক সার্কাসের মেহের আলি লেনস্থ ভবনে সারারাতব্যাপী এক উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের আসরের আয়োজন করেছিলেন ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ এবং ভ্রাতা ইমরাত খাঁ।

সঙ্গীতাসরে সরোদ বাজান বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত, কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেন 'বড়ে গোলাম আলির শিষ্য ও পুত্র মুণাব্বর আলি খাঁ এবং শিষ্যা মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রোতা ছিলেন স্বয়ং আলি আকবর খাঁ, বিলায়েৎ খাঁ, বাহাদুর খাঁ, হিমরাত খাঁ, বিমান ঘোষ, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, কেরামৎ খাঁ, শঙ্খ চট্টোপাধ্যায় এবং নাম মনে নেই এমন বহু খ্যাতনামা শিল্পী। তিনটি অনুষ্ঠানের শিল্পীদের সঙ্গে সংগত করেন শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও কেরামতুল্লা খাঁ এবং এই সঙ্গীত ও কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত তারিফ করেন আলি আকবর এবং বিলায়েৎ খাঁ স্বয়ং।

সর্বশেষ অনুষ্ঠানে সরোদ বাজিয়ে শোনান ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ সঙ্গে তবলাসংগত করেন শংকর ঘোষ। স্বরচিত রাগ চন্দ্রনন্দনের ভক্তি, প্রণয় ব্যাকুল বিনতির পর ভৈরবীর লালরঙা ছন্দের পথবেয়ে করুণ কোমলতায় বাজনার কাব্যসুন্দর পরিসমাপ্তি যখন ঘটল চমকে চেয়ে দেখি বিলায়েৎ খাঁর চোখে জল।

রাণা সংগীত সমিতি

রাণা সংগীত সমিতির উদ্যোগে হিন্দুস্থান রোডে প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতির সমাবর্তন উৎসবের ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন শ্রীটি এল রাণা। উৎসব উদ্বোধন করেন শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ। চিন্তাদীপ্ত ভাষণে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকবোধ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধারণের চোখে হাস্যকর দিক ও গুণীজনের ধ্যানের দিকটির প্রতি তিনি দরদভরে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন সঙ্গীত হচ্ছে একমাত্র বস্তু যা জাতিধর্মদেশনির্বিশেষে মানুষকে মিলিত করে। সঙ্গীতের আসরেই পন্ডিতজী ও খাঁ সাহেব গলা জড়াজড়ি করে বসতে পারেন, সংগতেই হচ্ছে সেই অঘটন ঘটনপটীয়সী শক্তি যার প্রসাদে মানুষ ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়ে মহত্তর ভাবজগতের বাসিন্দা হয়ে ওঠে। স্থায়ীত্বে হয়ত তা ক্ষণকালীন কিন্তু গভীরতায় অন্তহীন।

এরপর টি, এল রাণার পান্ডিত্য ও ধ্রুপদী ঐতিহ্যের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে এই প্রতিষ্ঠান ও রাণাজীর সঙ্গে আজীবন বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। শ্রীঘোষের বলার আবেগ ও আন্তরিকতা সকলে কত মুগ্ধ হয়েছিলেন, পরবর্তী বক্তাদের উচ্ছ্বাসই তার প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণকালী ভট্টাচার্যের স্বস্তিবাচন দিয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠান সুরু হয়। উপস্থিত সুধীবৃন্দের মধ্যে দেখা গেল কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চোধুরী, প্রহ্লাদ দাস, নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেককে।

সৌরভের প্রথম বার্ষিকী উৎসব

ল্যান্সডাউন রোডস্থিত 'সৌরভ' সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে এক পরিচ্ছন্ন, সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন প্রতিষ্ঠান সভ্যারা। এ উৎসবে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীমন্মথ ঘোষ প্রধান অতিথি রাইচাঁদ বড়াল।

এই দুই গুণীর সঙ্গীতজগতে উজ্জ্বল অবদানের পরিচয় কাব্যমধুর ভাষায় মেলে ধরলেন সুকোমলকান্তি ঘোষ।

সৌরভকে আশীর্বাদ জানালেন সভাপতি ও প্রধান অতিথি।

সঙ্গীতরসিক ও গুণীজনের এই মনোজ্ঞ আসরে সম্পাদিকা শ্রীমতী নমিতা চট্টোপাধ্যায় সৌরভের গত এক বছরের অগ্রগতির হিসেব-নিকেশ প্রসঙ্গে জানান, অর্থ ও তথাকথিত সুনামের পরিবর্তে প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষাদান ও সঙ্গীতরসিকের আশীর্বাদই সৌরভের প্রার্থনীয় বস্তু। পণ্ডিত ভি জি যোগ সৌরভকে আশীর্বাদ জানান।

অনুষ্ঠান সূচনা হয় শ্রীমতী রুচিরা মুখোপাধ্যায়ের ধ্রুপদাঙ্গ ও বাউলভাবের রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে। কণ্ঠমাধুর্যে ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরিবেশিত দুটি গানই উপস্থিত প্রাজ্ঞ গুণীজনের সপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করে।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে কণ্ঠসঙ্গীতে ও যন্ত্রসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন ওস্তাদ মুনাব্বর খাঁ ও বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত।

মুনাব্বরজীর স-বিশ্লেষণ 'রাগেশ্রী' তাঁর গুণপনা প্রকাশ পেয়েছে, তবে শ্রোতাদের মনে বেশী দাগ কেটেছে তাঁর ধুন ও "সঙে গোলাম আলির সেই সুবিখ্যাত ভজন 'হরি ওম্ তৎসৎ'। এই অনুষ্ঠানের উপরি-পাওনা হোল সহ-সভাপতি শ্রীঅদ্রিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরোধে বাজানো পণ্ডিত ভি জি যোগের বেহাল সঙ্গত।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বাজালেন 'ছায়ানট' আলাপ ও গৎ-এ রাগের পরিচ্ছন্ন সুন্দর ছবি সকলেই প্রাণভরে উপভোগ করেছেন। এর সঙ্গে তবলা সঙ্গতে ছিলেন মানিক দাস। এই ছোট কিন্তু আন্তরিকতা সমৃদ্ধ অনুষ্ঠানটি মনে রাখবার মত।

শ্যামা নৃত্যনাট্যানুষ্ঠান

হাওড়ার নতুন সংস্কৃতি সংস্থা 'দি হাউস অফ আর্ট' আসছে ছাব্বিশে জানুয়ারী মঞ্চস্থ করছে কবিগুরুর 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যটি। পরিচালনা করছেন পল্টুরাণী দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত।

সম্প্রতি তমলুকে "চিরন্তনী" সংগীত চক্রের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে তমলুক শহরে এই সর্বপ্রথম সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হ'ল। "চিরন্তনী" সংগীত চক্রের যে সমস্ত সভ্য এর পরিচালনার ভার নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন সম্পাদক কানু বসু (প্রেস ফটোগ্রাফার) ও কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়ংক রায় (আকাশবাণীর গীতিকার)। এতে শিক্ষক হয়ে আসছেন সুরকার ও সংগীত পরিচালক সত্যদেব চট্টোপাধ্যায়, প্রখ্যাত রেকর্ড শিল্পী নিতাই গোস্বামী ও অমল মিশ্র এবং নবকুমার পান্ডা (লোকভারতী)।

অপেশাদার সংগীত-শিল্পীদের প্রতিযোগিতা

সোদপুর (২৪ পরগণা)-এর সুখ্যাত শিল্পী সংস্থা আয়োজিত 'সারা বাংলা অপেশাদার সঙ্গীত প্রতিযোগিতা' বিপুল উদ্দীপনা ও অমিত উৎসাহের মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল ২৯ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারী অবধি সোদপুর হাইস্কুলে। বাংলার বহু শহর ও পল্লীর বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিযোগীরা আনন্দে সাড়া দিয়েছিলেন। এই প্রতিযোগিতার একমাত্র লক্ষ্য হল ঃ নতুন প্রতিভা আবিষ্কার এবং সঙ্গীত সম্পর্কে অপেশাদারদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার। এই প্রশংসনীয় কর্ম শিল্পী সংস্থা সাফল্যের সঙ্গেই করতে পেরেছেন তার প্রমাণ অপেশাদার শিল্পীদের বিপুল সংখ্যায় যোগদান এবং পেশাদার প্রথিতযশা শিল্পীদের 'বিচারক' হিসেবে সাগ্রহে অংশগ্রহণ। বিচারকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন ঃ সর্বশ্রী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কমলা বসু, সন্তোশ্বর মুখোপাধ্যায়, কুসুম গোস্বামী, দ্বিজেন চৌধুরী, সিদ্ধুরাণী দাস, মনোজ মুখোপাধ্যায়, সুনীল সরকার, অশোক রায়, বিশ্বনাথ ঘোষ, বিনয় গঙ্গোপাধ্যায়, সুহাস মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র দে, শংকর মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী প্রমুখ। খেয়াল, রাগপ্রধান, ভজন, রবীন্দ্রসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, আধুনিক, নজরুল গীতি, বাউল, পল্লীগীতি, গীটার ইত্যাদি বিষয়ে বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে বিভক্ত প্রতিযোগীদের মধ্যে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। সংক্ষিপ্তভাবে ফলাফল হল ঃ খেয়াল ঃ (ক) ১ম ঃ প্রিয়রঞ্জন চক্রবর্তী, (খ) ১ম ঃ বীথি ঘটক, (গ) ১ম ঃ অরুন্ধতী গঙ্গোপাধ্যায়, ২য় ঃ মিতা মুখোপাধ্যায়, (ঘ) ১ম ঃ মালবিকা দাস রায়, ২য় তৃপ্তি নাথ। 'রাগপ্রধান' ঃ (ক) ১ম ঃ প্রিয়রঞ্জন চক্রবর্তী, ২য় কাশীনাথ দাস, (খ) ১ম বীথি ঘটক, ২য় রুমা সিংহ ও কেয়া মুখোপাধ্যায়, (গ) ১ম ঃ অপর্ণা সেনগুপ্ত, (ঘ) ১ম ঃ মালবিকা দাশরায়। 'ভজন' ঃ (ক) ১ম ঃ অবনী দাস, ২য় ঃ শ্যামলাল গাড়োয়াল, (খ) ১ম ঃ বীথি ঘটক, ২য় ঃ দীপ্তি রায়, (গ) ১ম ঃ অরুন্ধতী গঙ্গোপাধ্যায়, ২য় ঃ কল্যাণী বসু, (ঘ) ১ম কৃষ্ণা দত্ত, ২য় ঃ মালবিকা দাসরায়। 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' ঃ (ক) ১ম ঃ কাশীনাথ দাস, (খ) ১ম ঃ কৃষ্ণা ঘোষ ও রেখা ঘোষ, ২য় ঃ কেয়া মুখোপাধ্যায়, (গ) ১ম ঃ মিতা চৌধুরী, ২য় ঃ পৌষালী ঘোষ, (ঘ) ১ম ঃ সঞ্জীবন ঘোষ, ২য় ঃ মালবিকা দাসরায়। 'শ্যামাসঙ্গীত' ঃ (ক) ১ম ঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, (খ) ১ম ঃ বীথি ঘটক, ২য় ঃ কেয়া মুখোপাধ্যায়, (গ) ১ম ঃ অপর্ণা সেনগুপ্ত, ২য় ঃ সুচ্ছন্দা মিত্র, (ঘ) ১ম ঃ কৃষ্ণা দত্ত ও মালবিকা দাসরায়, ২য় ঃ তপতী ঘোষ। 'নজরুল গীতি' (ক) ১ম ঃ সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, (খ) ১ম ঃ কৃষ্ণা ঘোষ, ২য় ঃ বীথি ঘটক, (গ) ১ম ঃ মহুয়া গুহ, ২য় ঃ অপর্ণা সেনগুপ্ত, (ঘ) ১ম ঃ শীলা সরকার, ২য় ঃ সুমিতা চৌধুরী। 'আধুনিক' ঃ (ক) ১ম ঃ প্রিয়রঞ্জন চক্রবর্তী, ২য় ঃ স্বপন ভট্টাচার্য, (খ) ১ম ঃ দীপ্তি রায় ও বীথি ঘটক, ২য় ঃ লতিকা কর, (গ) ১ম ঃ অপর্ণা রায়, ২য় ঃ মিতা চৌধুরী, (ঘ) ১ম ঃ কৃষ্ণা দত্ত, ২য় ঃ মালবিকা দাসরায়, 'পল্লীগীতি' (ক) ১ম ঃ জীবন সরকার, ২য় ঃ সুবোধ চক্রবর্তী, (খ) ১ম ঃ লতিকা কর, (গ) ১ম ঃ মিতা মুখোপাধ্যায়, ২য় মিতা চৌধুরী, (ঘ) ১ম ঃ তপতী ঘোষ, ২য় ঃ অলকা কর। 'বাউল' (ক) ১ম ঃ সুবোধ চক্রবর্তী, (খ) ১ম ঃ কৃষ্ণা দত্ত, ২য় ঃ মালবিকা দাসরায়। 'অন্যান্য বাংলা গান' ঃ (ক) ১ম ঃ কৃষ্ণা ঘোষ, (খ) ১ম ঃ অপর্ণা সেনগুপ্ত, (গ) ১ম ঃ মালবিকা দাসরায়। 'গীটার' রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ঃ (ক) ১ম ঃ বিলাস দাস, ২য় ঃ বাসনা রায়। 'নজরুল গীতি'র সুর (ক) ১ম ঃ আশিস ঘোষরায়, ২য় ঃ বিলাস দাস। আধুনিক গানের সুর ও লঘু সুর ঃ (ক) ১ম ঃ বিলাস দাস, ২য় ঃ আশিস ঘোষরায়।

হরিদাস স্মৃতি সংগীত সংসদের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

গত ৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ৬৬।১, পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীটস্থ "মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতি মন্দিরে" এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে হরিদাস স্মৃতি সংগীত সংসদের প্রতিষ্ঠা উৎসব এবং সঙ্গীতাচার্য হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের ৭৯তম জন্মতিথি উদযাপিত হোল। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সংগীতাচার্য শ্রীসত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুসাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সংসদ সম্পাদক শ্রীস্মৃতিকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতি, প্রধান অতিথি, সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী এবং মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতি মন্দির কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে সংসদের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী ব্যক্ত করেন। প্রধান অতিথি তাঁর সুললিত ভাষণে সংগীত, সাহিত্য ও চিত্রকলা সবকিছুর মধ্যেই যে সুর ও ছন্দের ঐক্য রয়েছে, অতি সুন্দরভাবে তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি এইরূপ সংসদ গঠনের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেন। স্বর্গত হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন এবং সংসদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। সভাপতি সংগীতাচার্য শ্রীসত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণের প্রথমে স্বর্গত সংগীতাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে শাস্ত্রীয় সংগীতের মধ্যে 'ধ্রুপদের' বিশুদ্ধতা ও সুপ্রাচীনতার কথা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং বর্তমানে 'খেয়াল' জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও বিশুদ্ধতা রক্ষা করছে না বলে অনুযোগ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এইরূপ সংসদ শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রসারের দিকে এবং বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রতিও দৃষ্টি রাখবে।

সংসদ-সভাপতি সঙ্গীতাচার্য শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল সংসদের পক্ষ থেকে স্বাগত

সঙ্গীতাচার্যের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন।

পরে সংসদ আয়োজিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন ধ্রুপদ ও ধামারে শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল এবং সেতারে শ্রীশ্যামল চট্টোপাধ্যায়। জয়কৃষ্ণবাবুর সেদিনের নির্বাচিত রাগ 'শুদ্ধ কল্যাণ' শ্রোতাদের বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। তাঁর সাথে মৃদঙ্গাচার্য শ্রীরাজীবলোচন দে'র পাখোয়াজ সঙ্গত বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। এই দুই প্রবীণ শিল্পীর পর শ্রীশ্যামল চট্টোপাধ্যায়ের সেতার সেদিনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সেদিনের 'বাগেশ্বরী' রাগ ধ্রুপদী আলাপ ভোলবার নয়। পরে তিনি 'রাগেশ্রী'তে গত ও পরে একটি ঠুংরী বাজিয়ে শোনান। দীর্ঘ দুই ঘন্টাধিককাল তাঁর সেতার বাদনের সঙ্গে তরুণ তবলিয়া শ্রীবনমালী দাসের তবলা সঙ্গত সমানেই শ্রোতাদের বিশেষভাবে আনন্দ বর্ধন করে এবং অনুষ্ঠানের ভাব-গাম্ভীর্য বাড়িয়ে তোলে। এই দুই তরুণ শিল্পীর বোঝাপড়া হাত বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে।

ইণ্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন

এবারের মধ্য ইণ্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন গত ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত হয়। বড় আসরে উদীয়মান তরুণ শিল্পীদের নাম সাজানো হয়েছিল। এ সম্মেলনের শিল্পী তালিকা নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্যের সন্ধান এনে দেয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় রাজীবলোচন দের পাখোয়াজ লহরা দিয়ে। সম্মেলনের সম্পাদক রমেন ঘোষ জানান সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে এ লহরার অনুষ্ঠান আমরা করেছি। এবং প্রতি বছর আমরা পাখোয়াজ লহরার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হবে। শ্রীদের পাখোয়াজ লহরায় কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এদিন খেয়াল গেয়ে শোনান শিবানী মুখার্জি রাগ 'মধুরবেহাগ'। প্রণব মুখার্জি বাঁশীতে 'রাগেশ্রী' রাগ বাজিয়ে শোনান। বেহালায় 'মালকোষ' রাগ পরিবেশন করেন নিভা দাস। আলাপ ও রাগ বিস্তারে দক্ষতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত সরোদে 'নায়কী-কানাড়া' বাজিয়ে শ্রোতাদের সুর মূর্ছনায় মন ভরিয়ে দেন। মঞ্জুষা ব্যানার্জি'র কথক নৃত্য প্রশংসনীয়।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান ছিল সারা-রাত্রব্যাপী। প্রথমে হিরণ্ময় মূকাভিনয়ে 'নুইসেন্স ইন ক্যালকাটা' ফিচারটি পরিবেশন করেন। অভিনয় ও অভিব্যক্তির প্রকাশ নিখুঁত। কখনো মনে হয় না কোন একজন শিল্পী একাই চরিত্রগুলির রূপ দিচ্ছেন। গানের আসরে 'ইমন' রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান শ্যামলী চক্রবর্তী। পরিবেশনার গুণে ভাল লেগেছে। পাশ্চাত্যের শিক্ষার্থীরা কিরূপ ভারতীয় রাগসঙ্গীত শিক্ষালাভ করছে তার নিদর্শন পাওয়া যায় এই সম্মেলনে। এখানে আলি আকবর খাঁর আমেরিকান ছাত্র মিঃ মলটিনো স্বরোদে 'দরবাড়ী কানাড়া' রাগে আলাপ ও 'চন্দ-নন্দন' রাগে গৎ বাজিয়ে শ্রোতাদের চমৎকৃত করে। অপূর্ব তাঁর হাতের স্ট্রোক। লয় ও মাত্রাজ্ঞান অত্যন্ত প্রখর। দিলীপ চক্রবর্তীর 'কৌশিকী-কানাড়া' রাগের খেয়াল অনুষ্ঠানটি অনবদ্য। রাগরূপ প্রকাশভঙ্গী ও সূক্ষ্ম গলার কাজগুলি মনে রাখার মত। 'সৌরাষ্ট্র ভৈরব' ও 'ভৈরবী' রাগে বেহালা বাজিয়ে শ্রোতাদের প্রশংসা পেয়েছেন ভি, এন, গোস্বামী। প্রদ্যোৎ ব্যানার্জি'র 'রাগেশ্রী' রাগে খেয়াল ও ঠুংরী প্রশংসনীয়। রামনরেশ মিশ্রর 'আহিরী ভৈরো' রাগে খেয়াল অনুষ্ঠানটি মনোগ্রাহী। রাগেশ্রীর শিল্পী-বৃন্দ যন্ত্রসঙ্গীতে পরিবেশন করেন 'রাগ-বাহার'। অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পাদমে মুদ্রা ও নাটকীয়তার সমাবেশ উপযুক্ত শিক্ষার নিদর্শন পাওয়া যায় মায়া চ্যাটার্জি'র কথক নৃত্যের মধ্যে। বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন পণ্ডিত নানকু মহারাজ, সলিল চ্যাটার্জি, সন্দীপ দেব, প্রকাশ মহারাজ, তিমিরবরণ গুপ্ত।

ইয়ুথ কয়ারের চিত্তগ্রাহী অনুষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গের ট্যুরিষ্ট বিভাগ আয়োজিত শীতকালীন উৎসব আসরের অন্যতম আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রসদনে ইয়ুথ কয়ারের দুই ঘন্টাব্যাপী এক নৃত্যগীতানুষ্ঠান। শ্রীমতী রুমা গুহঠাকুরতা পরিচালিত ইয়ুথ কয়ারের লোকসঙ্গীত ও নৃত্যশৈলি সুপ্রতিষ্ঠিত। এ সম্বন্ধে নতুন কোন পরিচয়দান নিষ্প্রয়োজন। সুপরিকল্পিত এবং সুনির্বাচিত শিল্পীদের সুপরিবেশিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের অনিবার্য আকর্ষণ যে কোন সন্ধ্যাকেই মনোরম করে তুলতে পারে। সেদিনের সন্ধ্যাও এর ব্যতিক্রম নয়।

বৈদিক স্তোত্র দিয়ে অনুষ্ঠান সূচনা হয় এবং তার সঙ্গে ভাবসাম্য রেখেই পরিবেশিত কবিগুরুর ধ্রুপদী অঙ্গের গান 'প্রথম আদি পরম সূর্য'।

এর পরই শিল্পীদের বিভিন্ন দেশের নৃত্য ও গীতের অনাড়ম্বর পথ বেয়ে দর্শক-চিত্তের পরিক্রমণ শুরু। উত্তর ও পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন পল্লী, আসাম, মৈমনসিংহ, পূর্ববঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িষ্যা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্রের পর বাংলার মৃত্তিকার সজল হাওয়ার স্পর্শ অনুভূত হয় কীর্তন ও বাউলের হৃদয়-উন্মুক্ত ধারায়। প্রতি প্রদেশের 'ম্যানারিজম' পরিবেশন গুণে এক মিনিটেই আমাদের পরিচিত হয়ে উঠল। কিন্তু বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে এবারের নতুন সংযোজনা—'ড্রামস অফ ইণ্ডিয়া'। সুরের মত প্রতি প্রদেশেরই তালে বা ছন্দেরও একটা নিজস্ব ভাষা আছে। মৃদঙ্গ, খোল, তবলা, ঢোল এবং অন্যান্য তালবাদ্যে শ্যামল বসুর পরিচালনায় চৌতাল, ধামার, ত্রিতালের বিভিন্ন ছন্দে প্রতিটি যন্ত্র যেন মুখর হয়ে ওঠে। প্রতিটি যন্ত্রশিল্পী নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও সকল যন্ত্রের একটি সমন্বয় ধারা প্রবহমান রেখে ছিলেন এবং প্রথম থেকে শেষ অবধি দর্শকচিত্তের কৌতূহল জাগ্রত ছিল। প্রায় দু বছর আগে ক্যালকাটা মিউজিক সার্কেল রবীন্দ্রসদনে পলঘাট মণি ও শিবন মহারাজের এক দৈত মৃদঙ্গম ও তবলাবাদনের অনুষ্ঠান করেছিলেন, আলোচ্য অনুষ্ঠান তারই এক পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ। ভবিষ্যতে দক্ষিণ ভারতীয় তালযন্ত্রও এই অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে রুমা গুহঠাকুরতা জানিয়েছেন। উপভোগ্যতা ছাড়াও শিক্ষামূলক দিকটি এ অনুষ্ঠানের উপরিপাওনা। এই ধরনের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা পরস্পরের কাছাকাছি আসবার সুযোগ পান।

—চিত্রাঙ্গদা

টেস্ট ক্রিকেটে বোলিং পরিক্রমা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং—প্রধানত এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে ক্রিকেট খেলা। ক্রিকেট খেলায় প্রাধান্য লাভ করতে হলে দলের প্রতি খেলোয়াড়কেই যে ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে সমান দক্ষতা দেখাতে হবে, এক কথায় তাদের চৌকস হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। কারণ সকল ক্রিকেট খেলোয়াড়ের পক্ষে খেলার এতগুলি বিষয়ে চরম উৎকর্ষতা লাভ সম্ভব নয়। তবে দলকে অবশ্যই চৌকস হতে হবে। দলে সকল রকমের ভাল খেলোয়াড় থাকবে—ব্যাটসম্যান, বোলার এবং উইকেট-কিপার। এবং দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই ফিল্ডিংয়ে দক্ষতা থাকবে। খেলার এই প্রধান তিনটি বিষয়ে সমান দৃষ্টি রেখে দল গঠন না করলে দল দুর্বল হবে এবং সেই দুর্বল দলের খেলা দেখতে কারও মন চাইবে না।

ক্রিকেট খেলার অনুরাগী মহলে এবং সংবাদ পত্রপত্রিকায় ব্যাটসম্যানরা যে পরিমাণ স্বীকৃতি পায়, বোলাররা সে তুলনায় কিছুই পায় না। রামায়ণে ঊর্মিলার মতই বোলাররা ক্রিকেট খেলায় উপেক্ষিত। অথচ ক্রিকেট খেলায় ব্যাটসম্যানদের তুলনায় বোলারদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আলোচ্য নিবন্ধে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় বোলারদের বিভিন্ন ধরনের সাফল্য পরিসংখ্যান মাধ্যমে পরিবেশিত হল।

টেস্টের বোলিংয়ে বিশ্ব রেকর্ড

টেস্ট খেলায় সর্বাধিক উইকেট : ৩০৭টি—ফ্রেডী ট্রুম্যান (ইংল্যান্ড)—খেলা ৬৭, বল ১৫১৭৮, মেডেন ৫২১, রান ৬৬২৫, গড় ২১·৫৪, এক ইনিংসে ৫টি উইকেট ১৭ বার এবং একটি খেলায় ১০টি উইকেট ৩ বার।

ফ্রেডী ট্রুম্যান (ইংল্যান্ড)

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

১০টি উইকেট (৫৩ রানে)—জিম লেকার (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৬

ব্রায়ান স্ট্যাথাম (ইংল্যান্ড)

একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট

১৯টি উইকেট (৯০ রানে)—জিম লেকার (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৬

এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট

(৪টি টেস্ট খেলা নিয়ে সিরিজ)

৪৯টি উইকেট (৫৩৬ রানে)—সিডনি বার্নেস (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯১৩-১৪ (খেলা ৪, বল ১৩৫৬, মেডেন ৫৬, রান ৫৩৬, গড় ১০·৯৩, এক ইনিংসে ৫টি উইকেট ৭ বার এবং একটি খেলায় ১০টি উইকেট ৩ বার)

(৫টি টেস্ট খেলা নিয়ে সিরিজ)

৪৬টি উইকেট (৪৪২ রানে) জিম লেকার (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৫৬ (খেলা ৫, বল ১৭০৩, মেডেন ১২৭, রান ৪৪২, গড় ৯·৬০, এক ইনিংসে ৫টি উইকেট ৪ বার এবং একটি খেলায় ১০টি উইকেট ২ বার)

এক ইনিংসে সর্বাধিক বল

৫৮৮টি বল (৯৮ ওভারে)—সনি রামাধীন (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, বার্মিংহাম, ১৯৫৭

একটি খেলায় সর্বাধিক বল

৭৭৪টি বল (১ম ইনিংসে ৩১ ওভার এবং ২য় ইনিংসে ৯৮ ওভার)—সনি রামাধীন (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, বার্মিংহাম, ১৯৫৭

খেলোয়াড়-জীবনে শ্রেষ্ঠ বোলিং

১৮৯টি উইকেট ৩১০৬ রানে (১৬·৪৩ রান প্রতি উইকেটে)—সিডনি বার্নেস (ইংল্যান্ড), ২৭টি টেস্ট খেলায়।

এক ইনিংসে শ্রেষ্ঠ বোলিং

(৫ উইকেট পাওয়ার ভিত্তিতে)

৫ উইকেট ২ রানে আর এইচ টোসাক (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ভারতবর্ষ, ব্রিসবেন, ১৯৪৭-৪৮

একটি খেলায় শ্রেষ্ঠ বোলিং

(১০ উইকেট পাওয়ার ভিত্তিতে)

১৫ উইকেট ২৮ রানে (প্রতি উইকেটে ১·৮৬ রান)—জনি ব্রিগস (ইংল্যান্ড) বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, কেপটাউন, ১৮৮৮-৮৯। এদের ১৪ জনকে বোল্ড এবং একজনকে এল বি ডবলিউ করেন।

এক সিরিজে শ্রেষ্ঠ বোলিং

৩৫ উইকেট ২০৩ রানে (প্রতি উইকেটে ৫·৮০ রান)—জি এ লোহম্যান (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৮৯৫-৯৬। খেলা ৩, বল ৫২০, মেডেন ৩৮, এক ইনিংসে ৫ উইকেট

রিচি বেনো (অস্ট্রেলিয়া)

রে লিন্ডওয়াল (অস্ট্রেলিয়া)

টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এ পর্যন্ত নীচের ৭ জন বোলার তাঁদের খেলোয়াড়-জীবনে ২০০ উইকেট পূর্ণ করার গৌরব লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন অস্ট্রেলিয়ার ৪ জন এবং ইংল্যান্ডের ৩ জন খেলোয়াড়। অস্ট্রেলিয়ার গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী দুটি বিষয়ে সকল বোলারদের টেক্কা দিয়েছেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে তিনিই সর্বাপেক্ষা কম বয়সে ১০০ এবং ২০০ উইকেট পূর্ণ

অ্যালেক বেডসার (ইংল্যান্ড)

করেন (২২ বছর বয়সে ১০০তম এবং ২৭ বছর বয়সে ২০০তম উইকেট পান)।

টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে ১০০ উইকেট পূর্ণ করেছেন মাত্র এই দুজন বোলার—ভিনু মানকাদ (৪৪টি খেলায় ৫২৩৫ রান দিয়ে ১৬৪ উইকেট এবং এরাপল্লী প্রসন্ন (২২টি খেলায় ৩০৫৭ রান দিয়ে ১১৩ উইকেট)।

গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী (অস্ট্রেলিয়া)

পান ৫ বার এবং একটি খেলায় ১০ উইকেট পান ২ বার)

সর্বাধিকবার এক ইনিংসে ৫ উইকেট লাভ

২৪ বার (২৭টি টেস্টে)—সিডনি বার্নেস (ইংল্যান্ড)

সর্বাধিকবার একটি খেলায় ১০ উইকেট লাভ

৭ বার (২৭টি টেস্টে)—সিডনি বার্নেস (ইংল্যান্ড)

৭ বার (৩৭টি টেস্টে)—সি ভি গ্রিমেট (অস্ট্রেলিয়া)

একটি টেস্ট সিরিজে ৪০ উইকেট

৪৯টি (টেস্ট ১৯১৩-১৪)—সিডনি বার্নেস (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯১৩-১৪

৪৬টি (টেস্ট ১৯৫৬)—জিম লেকার (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৫৬

৪৪টি (টেস্ট ১৯৩৫-৩৬)—সি ভি গ্রিমেট (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯৩৫-৩৬

একজন বোলার—অস্ট্রেলিয়ার টি জে ম্যাথুজ (বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯১২)।

টেস্ট খেলায় প্রথম

প্রথম বল : মেলবোর্নে ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলার সূত্রেই পৃথিবীর মাটিতে টেস্ট ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন। এই প্রথম টেস্ট খেলার সূচনা করেন অর্থাৎ প্রথম বল দেন ইংল্যান্ডের বোলার টি আর্মিটেজ।

প্রথম উইকেট লাভ : ইংল্যান্ডের হিল অস্ট্রেলিয়ার এন টমসনকে বোল্ড আউট করেন (মেলবোর্ন, ১৮৭৭)

প্রথম এক ইনিংসে ৫ উইকেট**:** ৫ উইকেট ৭৮ রানে—মিডউইন্টার (অস্ট্রেলিয়া) বিপক্ষে ইংল্যান্ড, মেলবোর্ন, ১৮৭৭

প্রথম একটি খেলায় ১০ উইকেট **:** ১৩ উইকেট (৪৮ রানে ৬ ও ৬২ রানে ৭) —এফ আর স্পফোর্থ (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, মেলবোর্ন, ১৮৭৯

প্রথম একটি সিরিজে ২০ উইকেট **:** ২৪ উইকেট ৫২২ রানে (৪টি টেস্টে) —জি ই পামার (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যান্ড ১৮৮১-৮২

প্রথম একটি সিরিজে ৩০ উইকেট **:** ৩২ উইকেট ৮৪৯ রানে (৫টি টেস্টে)

টেস্ট ক্রিকেটে ২০০ উইকেট

		খেলা	বল	মেডেন	রান	উইকেট
ফ্রেডী ট্রুম্যান	(ইং)	৬৭	১৫১৭৮	৫২১	৬৬২৫	৩০৭
ব্রায়ান স্ট্যাথাম	(ইং)	৭০	১৬০২৬	৫৯০	৬২৫৭	২৫২
রিচি বেনো	(অ)	৬৩	১৯০৯০	৮০৫	৬৭০৪	২৪৮
অ্যালেক বেডসার	(ইং)	৫১	১৫৯৪১	৫৭২	৫৮৭৬	২৩৬
রে লিন্ডওয়াল	(অ)	৬১	১৩৬৬৬	৪১৮	৫২৫৭	২২৮
ক্লারি গ্রিমেট	(অ)	৩৭	১৪৫৭৩	৭৩৪	৫২৩১	২১৬
গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি	(অ)	৫৪	১৬০৫২	৫১১	৬৬৪৫	২০৮

ভিনু মানকাদ (ভারতবর্ষ)

হ্যাটট্রিক

টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এপর্যন্ত ১৫ বার 'হ্যাটট্রিক' হয়েছে—ইংল্যান্ডের ৭ বার, অস্ট্রেলিয়ার ৬ বার, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১ বার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ১ বার। দু'বার করে 'হ্যাটট্রিক' করেছেন মাত্র এই দুজন খেলোয়াড়—অস্ট্রেলিয়ার এইচ ট্রাম্বল এবং টি জে ম্যাথুজ। একটি খেলার উভয় ইনিংসে 'হ্যাটট্রিক' করার গৌরব লাভ করেছেন মাত্র

এরাপল্লী প্রসন্ন (ভারতবর্ষ)

—টি রিচার্ডসন (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৮৯৪-৯৫

প্রথম একটি সিরিজে ৪০ উইকেট ঃ ৪৯ উইকেট ৫৩৬ রানে (৪টি টেস্টে) —সিডনি বার্নেস (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯১৩-১৪

প্রথম 'হ্যাটট্রিক' ঃ এফ আর স্পফোর্থ (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, মেলবোর্ন, ১৮৭৮-৭৯।

বোলিংয়ে ভারতীয় রেকর্ড

সর্বাধিক উইকেট লাভ

১৬৪টি ৫২৩৫ রানে (৪৪টি টেস্টে)—ভিনু মানকাদ

সর্বাধিক উইকেট একটি সিরিজে

৩৪টি (৫৭১ রানে)—ভিনু মানকাদ, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৫১-৫২

৩৪টি (৬৬৯ রানে) সুভাষ গুপ্তে, বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, ১৯৫৫-৫৬

সর্বাধিক উইকেট এক ইনিংসে

৯টি (৬৯ রানে)—জেসু প্যাটেল, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, কানপুর, ১৯৫৯-৬০

৯টি (১০২ রানে)—সুভাষ গুপ্তে, বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কানপুর, ১৯৫৮-৫৯

সর্বাধিক উইকেট একটি খেলায়

১৪টি (১২৪ রানে)—জেসু প্যাটেল, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, কানপুর, ১৯৫৯-৬০

টেস্টে ট্রুম্যানের সাফল্য

১৯৫২ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ট্রুম্যান তাঁর টেস্ট ক্রিকেট-খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দেন—৪টি টেস্ট খেলায় মোট ২৯টি উইকেট (গড় ১৩·৩১)। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ম্যাঞ্চেস্টারের ৩য় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৮·৪ ওভার বল দিয়ে ৩১ রানের বিনিময়ে ৮ উইকেট পেয়েছিলেন।

এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট ঃ ৩৪টি (৫টি টেস্টে), বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৬৩

বোলিংয়ে অসাধারণ নজির ঃ ১৯টি বল করে কোন রান না দিয়ে ৫টা উইকেট

জেসু প্যাটেল (ভারতবর্ষ)

পান (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ৩য় টেস্টের ১ম ইনিংস, এজবাস্টন, ১৯৬৩)

১০০তম উইকেট ঃ ১৯৫৮-৫৯ সালে ক্রাইস্টচার্চের প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ডের ই সি পেত্রীকে এল বি ডবলিউ করে তাঁর ২৫তম টেস্ট খেলায় তিনি তাঁর ১০০তম টেস্ট উইকেটটি পান।

২০০তম উইকেট ঃ ১৯৬২ সালে লর্ডস মাঠে পাকিস্তানের জাভেদ বার্কিকে আউট করে তাঁর ৪৭তম টেস্ট খেলায় ২০০ উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য, টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এ পর্যন্ত যে ৭ জন বোলার ২০০ উইকেট পূর্ণ করেছেন তাঁদের মধ্যে ট্রুম্যান সর্বাপেক্ষা কম বল দিয়ে ২০০তম উইকেট পান। টেস্ট খেলায় ২০০ উইকেট পূর্ণ করতে ট্রুম্যানকে

সুভাষ গুপ্তে (ভারতবর্ষ)

৯,৮৭৫টি বল দিতে হয়েছিল। অপরদিকে অন্য বোলাররা এক হাজারের বেশী বল দিয়ে তাঁদের ২০০ উইকেট পূর্ণ করেন।

৩০০তম উইকেট ঃ ১৯৬৪ সালে ওভালের ৫ম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার নীল হককে আউট করে তাঁর ৬৫তম টেস্ট খেলায় তিনি তাঁর ৩০০তম উইকেটটি পান। এখানে উল্লেখ্য, এপর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ট্রুম্যানই একমাত্র ৩০০ উইকেট পেয়েছেন।
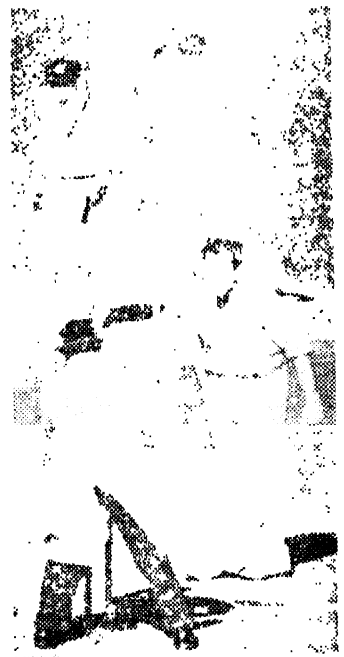
বিশ্ব রেকর্ডের দৃশ্য ঃ ১৯৫৬ সালে ম্যাঞ্চেস্টার মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ডের জিম লেকার এক ইনিংসের খেলায় দশটি উইকেট পাওয়ার সূত্রে টেস্ট খেলায় যে বিশ্বরেকর্ড করেন তার দৃশ্য।

একনজরে ট্রুম্যানের টেস্ট উইকেট

বিপক্ষে	খেলা	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
অস্ট্রেলিয়া	১৯	৬৪৫·১	৮৩	১৯৯৯	৭৯	২৫·৩০
দক্ষিণ আফ্রিকা	৬	২১৫·৩	৩৫	৬২০	২৭	২২·৯৬
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৮	৭৬৪	১৭৬	২০১৮	৮৬	২৩·৪৬
নিউজিল্যান্ড	১১	৩৬১·১	১১৩	৭৬২	৪০	১৯·০০
ভারতবর্ষ	৯	২৯৭·২	৭৮	৭৮৭	৫৩	১৪·৮৪
পাকিস্তান	৪	১৬৪·৫	৩৭	৪৩৯	২২	১৯·৯৫
মোট ঃ	৬৭	২৪৪৮	৫২২	৬৬২৫	৩০৭	২১·৫৭

দর্শক

ডুরাণ্ড কাপ

১৯৬৯ সালের ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলায় দেরদুনের গোর্খা ব্রিগেড ১—০ গোলে গত বছরের বিজয়ী বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দলকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হয়েছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র যায়। ১৯৬৬ সালের ফাইনালে ২—০ গোলে শিখ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারকে পরাজিত করে গোর্খা ব্রিগেড দল প্রথম ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হয়েছিল।

প্রতিযোগিতার এক দিকের সেমি-ফাইনালে গোর্খা ব্রিগেড দল ১—০ গোলে পাঞ্জাব পুলিশকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। অপর দিকে মোহনবাগান বনাম বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দলের সেমি-ফাইনাল খেলাটি দু' দিন ০—০ ও ২—২ গোলে ড্র যায়। শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয় এই কারণে যে, একাধিক খেলোয়াড় আহত হওয়ার ফলে তাদের পক্ষে দল গঠন করা সম্ভব হয় নি। ১৯৬৯ সালের রোভার্স কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে ০—১ গোলে জলন্ধর-এর পাঞ্জাব পুলিশ দলের কাছে হেরে যায়।

জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা

কলকাতার সাউথ ক্লাবের সুরমা টেনিস কোর্টে অনুষ্ঠিত জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ এবং রাশিয়ার খেলোয়াড়রা প্রধান চারটি খেতাব সমান ভাগ করে নিয়েছেন। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ভারতবর্ষের ১নং খেলোয়াড় প্রেমজিৎলাল বর্তমান সময়ের এশিয়ান সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান আলেকজান্ডার মেত্রেভেলীকে (রাশিয়া) পরাজিত করে ভারতবর্ষের মুখ রক্ষা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, গত মাসে প্রেমজিৎলাল এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে মেত্রেভেলীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। দুটি করে খেতাব পেয়েছেন রাশিয়ার কুমারী আইভানোভা এবং ভারতবর্ষের প্রেমজিৎলাল।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : প্রেমজিৎলাল (ভারতবর্ষ) ৯—৭, ৬—০, ৫—৭ ও ৬—৩ গেমে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান এবং এক নম্বর বাছাই আলেকজান্ডার মেত্রেভেলীকে (রাশিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : কুমারী আইভানোভা (রাশিয়া) ৬—২ ও ৬—৩ গেমে স্বদেশের নীনা টুখেরেলিকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলাল (ভারতবর্ষ) ৯—৭, ৬—০ ও ৬—৩ গেমে গৌরব মিশ্র এবং বলরাম সিংকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন। আট বছর পর পুনরায় এই জুটি ডাবলস খেতাব জয়ী হলেন।

মিকস্‌ড ডাবলস : এশিয়ান চ্যাম্পিয়াম জুটি কুমারী আইভানোভা এবং আলেকজান্ডার মেত্রেভেলী (রাশিয়া) ১—৫ ও ৬—৪ গেমে কুমারী নীনা টুখেরেলি এবং কাকুলিয়াকে (রাশিয়া) পরাজিত করেন।

রঞ্জি ট্রফি

বিহার : ৭৭ রান (তিলক রাজ ৪০। দোসী ১২ রানে ৪ এবং সুব্রত গুহ ৪৩ রানে ৫ উইকেট)

ও ৬৪ রান (ছত্রল পাল ১৮ রান। সুব্রত গুহ ৩০ রানে ৫ এবং দোসী ১০ রানে ৩ উইকেট)

বাংলা : ২৬৪ রান (অম্বর রায় ১৩৩, শ্যামসুন্দর মিত্র ৩২ এবং পি চেইল ৬৯ রান। শুক্লা ৭৬ রানে ৪ উইকেট)

পাটনার রাজেন্দ্রনগর স্টেডিয়ামে আয়োজিত রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের খেলায় বাংলা এক ইনিংস ও ১২৩ রানে বিহারকে পরাজিত করে পূর্বাঞ্চলের খেলায় চ্যাম্পিয়ান আখ্যা অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

প্রথম দিনে মধ্যাহ্নভোজের কিছু পরেই বিহার দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ৭৭ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলার বাকি সময়ে বাংলা ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১০৫ রান সংগ্রহ করে ২৮ রানে এগিয়ে যায়। হাতে জমা থাকে প্রথম ইনিংসের ৬টা উইকেট। বাংলা দলেরও খেলার সূচনা ভাল হয়নি; দলের ২৫ রানের মাথায় ৩য় এবং ৯৯ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়েছিল।

দ্বিতীয় দিনে বাংলার প্রথম ইনিংস ২৬৪ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ১৮৭ রানে অগ্রগামী হয়। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে অধিনায়ক অম্বর রায় এবং পি চেইল দলের ১২০ রান তুলে দেন। বিহার এইদিন দ্বিতীয় ইনিংসের ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ৫৯ রান তুলে দারুণ সঙ্কটে পড়ে যায়। ইনিংস পরাজয় থেকে ছাড়ান পেতে তখনও তাদের আরও ১২৮ রানের প্রয়োজন ছিল। এদিকে হাতে জমা ছিল মাত্র ৪টে উইকেট।

তৃতীয় দিনে বিহার দলের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১৫ মিনিট স্থায়ী ছিল। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ৬৪ রানের মাথায় শেষ হয়। ফলে বাংলা এক ইনিংস এবং ১২৩ রানে জয়ী হয়।

আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা

চুঁচুড়ায় আয়োজিত চব্বিশ পরগণা বনাম হাওড়া জেলার ফাইনাল খেলাটি অতিরিক্ত সময়েও গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হলে উভয় দলকে যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্যুটিং

আলীগড়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় রাইফেল স্যুটিং প্রতিযোগিতার মহিলা বিভাগে পাঞ্জাব চ্যাম্পিয়ান এবং কলকাতা রানার্স-আপ হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগদান এই প্রথম।

আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা

বোম্বাইয়ে আয়োজিত আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভারতবর্ষের দুই দলের কোনটিই উঠতে পারেনি। প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় যে সাতটি দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল তাতে ভারতবর্ষের দুটি দল ছিল—গাঢ় এবং ফিকে নীল দল। লীগ খেলার শেষে নকআউট পর্যায়ে (সেমি-ফাইনালে) উঠেছিল এই চারটি দল—ভারতবর্ষের দুটি, পশ্চিম জার্মানী এবং হল্যাণ্ড। ভারতবর্ষের গাঢ় নীল দল বনাম হল্যাণ্ডের প্রথম সেমি-ফাইনাল খেলাটি ১—১ গোলে ড্র যায়। টসে হল্যাণ্ড জয়ী হয়ে ফাইনালে ওঠে। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ১—০ গোলে ভারতবর্ষের ফিকে নীল দলকে পরাজিত করে। ভারতবর্ষের শক্তিশালী খেলোয়াড়রা গাঢ় নীল দলে খেলেছিলেন। টসে হল্যাণ্ডের কাছে তাদের পরাজয়কে দুর্ভাগ্য বললে মস্ত ভুল করা হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে অলিম্পিকের হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ এ পর্যন্ত ৮ বার স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে। হল্যাণ্ড স্বর্ণপদক পায়নি। কিন্তু ভারতবর্ষ আজ হল্যাণ্ডকে হারাতে পারছে না। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় এই দুই দেশের লীগের খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় এবং সেমি-ফাইনাল খেলাটি ১—১ গোলে ড্র গেছে।

ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ৩—০ গোলে হল্যাণ্ডকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য, গত ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় পশ্চিম জার্মানী ৪র্থ স্থান লাভ করেছিল এবং আলোচ্য আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার লীগ পর্যায়ের খেলায় হল্যাণ্ডের কাছে পশ্চিম জার্মানী ০—১ গোলে হেরেছিল।

চূড়ান্ত ফলাফল : ১ম পশ্চিম জার্মানী, ২য় হল্যাণ্ড, ৩য় ভারতবর্ষ (ফিকে নীল), ৪র্থ ভারতবর্ষ (গাঢ় নীল)।

দাবার আসর

এবারের প্রথম খেলাটিতে সাদা জিতবার সুযোগ পেয়েও সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে নি, যদিও সাদা বেশ সুন্দর-ভাবেই খেলছিল। কালো যিনি খেলেছিলেন, বিপজ্জনক খেলোয়াড় হিসেবে তার নাম আছে, কিন্তু এ খেলায় তিনি কিছুই করতে পারেন নি। সাদা—সুজিত সেন, কালো—পূর্ণেন্দু বোস; রাজ্যচ্যাম্পিয়নশীপ, ১৯৬৯। ইংলিশ ওপনিং।

(১) ব—ম গ ৪ : ব—ম গ ৪ (২) ঘ—ম গ ৩ : ব—রা ৩ (৩) ঘ—রা গ ৩ : ঘ—রা গ ৩ (৪) ব—রা ঘ ৩ : ঘ—ম গ ৩ (৫) গ—ঘ ২ : গ—রা ২ (৬) ০—০ : ০—০ (৭) ব—ম ৩ : ব—ম ৪ (৮) ব—রা ৩ : ব—রা ন ৩ (৯) গ—ম ২ : ব—ন ৩ (১০) ম—রা ২ : ন—ঘ ১ (১১) রা ন—গ ১ : ব—ম ঘ ৪ (১২) ঘ—রা ১ : ঘ ব×ব (১৩) ব×ব : ন×ব (১৪) ঘ—ন ৪ : ন—ঘ ১ (১৫) ব×ব : ঘ×ব (১৬) ঘ×ব : গ×ঘ (১৭) ন×গ : ম—গ ৩ (১৮) ম ন—গ ১ : ঘ—ন ২ (১৯) ব—রা ৪ : ঘ—ঘ ৫ (২০) গ—গ ৩ : ম—ম ১। চিত্র দেখুন।

[যদি (২০)...ম—রা ২, তাহলে (২১) গ—রা ৫ এবং পরের চালে নৌকা—গ ৭]
(২১) ম—গ ৪ : ব—ম ন ৪ (২২) ম—রা ২

[(২২) ব—ম ন ৩ : গ—ন ৩ (২৩) ম—ম ৪ : ম×ম (২৪) গ×ম : ঘ—ন ৭ (২৫) ন—ন ১ : ঘ—ঘ ৪ (২৬) ন×ঘ (৫) : ন×ন (২৭) ন×ঘ : ন—ঘ ৮ (২৮) ম গ—গ ৩ : ন : গ ১ (২৯) গ×ব : ন (১)—গ ৮ (৩০) ব—গ ৪ : ন×ঘ+ (৩১) গ×ন : ন×গ+ (৩২) রা—গ ২ এবং সাদার জিৎ। কিন্তু ওপরের ধারায় (২৪)...ঘ—ম ৬ চালটা ভাল নয়, কারণ (২৫) ঘ×ঘ : গ×ঘ (২৬) ন (৫)—গ ৩ এবং কালোর ১টি ঘুঁটি মার যায়।]

(২২)...গ—ন ৩ (২৩) ম—ঘ ৪ : ব—ঘ ৩ (২৪) ন—ন ৫

[একটি আপাতমধুর চাল। এখন যদি (২৪)...রা—ন ২ (২৫) ন×ব+ : রা×ন (২৬) ম—ন ৩+ : রা—ঘ ৪ (২৭) ম—ন ৪ মাৎ। কিন্তু এরপর খেলাটা যেভাবে এগুলো, তাতে ফলাফল হোল ড্র। (২৪) ন—ন ৫ চালের বদলে মন্ত্রীটা গজ ৪ ঘরে চাললে আরো ভালো হোত মনে হয়, কারণ এই চালে হয় কালোর রান—৩ বড়েটা মারা পড়ে না হয় পরের চালে গ—রা গ ৬ ঘরে মারাত্মকভাবে বসে যায়। সাদার মন্ত্রী—গজ ৪ চালের উত্তরে কালো বড়ে—ঘোড়া ৪ দিতে পারে না কারণ তাহলে সাদার মন্ত্রীটা রাজা—৫ ঘরে বসে যাবে।]

(২৪)...ন—গ ১ (২৫) ন×ব : ন×গ (২৬) ন×ব+ ??

[(২৬) ন×গ : ম—ম৭ (২৭) ন—রা ৩ এবং যদি এখন কালো (২৭)...ন—গ ১ চাল দিয়ে ভবিষ্যতে সাদার ঘোড়াটার ওপর দুই জোর করার চেষ্টা করে তাহলে সাদার জিত কারণ (২৮) ম—ন ৪ : ম—ম ৫ (২৯) ব—ঘ ৪ : ম—ঘ ২ (৩০) ন—ন ৩ এবং কালোর হার। ২৭নং চালে কালো নৌকাটি না চাললেও একই কায়দায় কালোর হার হোত।]
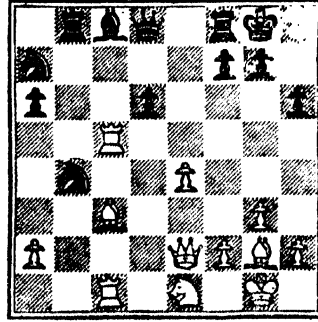
কালোর ২০ নং চাল ম-ম ১য়ের পরের অবস্থা

(২৬) ব×ন+ (২৭) ম×ঘ ব+ : রা—ন ১ (২৮) ম—ন ৬+ : রা—ঘ ১ খেলা ড্র।

এইবার গত রাজ্যচ্যাম্পিয়নশীপের হ্রস্বতম খেলাটি দেখুন। সাদা—অসীম রাহা, কালো—গোতম সেন। কুইন্স গ্যাম্বিট ডিক্লাইন্ড।

(১) ব—ম ৪ : ব—ম ৪ (২) ব—ম গ ৪

[সেন্টার থেকে কালোর ১টি বড়ে সরিয়ে নেবার জন্যে সাদা ম গ বড়েটিকে বিনা জোরে ঠেলে দিল। একে বলে কুইন্স গ্যাম্বিট।]

(২)...ব—রা ৩ (৩) ঘ—ম গ ৩ : ঘ—রা গ ৩ (৪) গ—ঘ ৫ : গ—রা ২ (৫) ঘ—গ ৩ : ম ঘ—ম ২ (৬) ব—রা ৩ : ০—০ (৭) গ—ম ৩ : ব—গ ৩ (৮) ব—গ ৫ : ব—রা ৪ (৯) ঘ×ব : ঘ×ঘ (১০) ব×ঘ : ঘ—ঘ ৫ (১১) গ×গ : ম×গ (১২) ব—ম ঘ ৪ : ম×রা ব (১৩) ঘ—রা ২ : ন—রা ১ (১৪) ব—রা ন ৩ : ঘ—গ ৩। পারস্পরিক সম্মতিতে খেলা ড্র যদিও এখন অনেক রকম খেলা হতে পারত।

তৃতীয় খেলা হিসেবে উপস্থিত করছি বিশ্ব জুনিয়ার দাবাচ্যাম্পিয়ন সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রীকারপভের ১টি খেলা। বিশ্ব জুনিয়ারশীপেই এই খেলাটি হয়েছিল। সাদা—ইয়ংক, কালো—কারপভ। রাই লোপেজ।

(১) ব—রা ৪ : ব—রা ৪ (২) ঘ—রা গ ৩ : ঘ—ম গ ৩ (৩) গ—ঘ ৫ : ব—ম ন ৩ (৪) গ—ন ৪ : ঘ—গ ৩ (৫) ব—ম ৪ : ব×ব (৬) ০—০ : গ—রা ২ (৭) ব—রা ৫ : ঘ—রা ৫ (৮) ঘ×ব : ০—০ (৯) ঘ—গ ৫ : ব—ম ৪ (১০) গ×ঘ : ব×গ (১১) ঘ×গ+ : ম×ঘ (১২) ন—রা ১ : ন—রা ১ (১৩) ব—রা গ ৩ : ঘ—ম ৩ (১৪) ব : ম ঘ ৩ : ঘ—গ ৪ (১৫) গ—ন ৩? —ম—ঘ ৪ (১৬) গ—ঘ ২ : ঘ—ন ৫ (১৭) ম—রা ২ : ব—গ ৩ (১৮) ম—গ ২ : গ—ন ৬ (১৯) ব—রা ঘ ৪ : ব×ব (২০) ঘ—ম ২ ? : ম×ঘ। সাদার হার স্বীকার।

• • •

অমৃতের ৯ই জানুয়ারী, ১৯৭০ সংখ্যার ৮৪৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে সাদা বড়ে পঞ্চম র‍্যাঙ্কে থাকলে এবং সাদা রাজা বড়েটির আগে থাকলে সাদার জিত হবে, সাদা রাজা এবং বড়েটির মধ্যে ১ ঘরের ব্যবধান না থাকলেও। কথাটি ঠিকই, তবে এর ব্যতিক্রম ঘটে নৌকার বড়ের বেলায়। ছকের একেবারে প্রান্তে অবস্থিত বলে অনুরূপ অবস্থায় নৌকার বড়েতে খেলা ড্র হয়ে যায়।

—গজানন্দ ঘোড়ে

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

এইচ এম ভি-র 'বসন্ত-বন্দনা'

৪৫ আর-পি-এম সিঙ্গল্‌স্

অক্ষয় মহান্তি
সোনার বাহুতে কাঁকন
কই গেল সেই দিনগুলি

অমল মুখোপাধ্যায়
টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্
মনে হয় আবার আমি

অরুণ দত্ত
ওরে ও চম্পাকলি
যারে ফিরে যা ফিরে যা

আরতি বসু
গুণ গুণ গুণ গুণ সুরেতে
এমনি করে আর কখনও

আরতি মুখোপাধ্যায়
না হলো চোখে দেখা
যেয়ো না যেয়ো না সখী

চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়
সেই শান্ত ছায়ায় ঘেরা
কিছু বোলো না

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়.
কে পরালো তোমায় রাধা
নাটক যেখানে শেষ

বনশ্রী সেনগুপ্ত
পরেছি চাঁপাডুরে শাড়ী
বাজেরে কাঁকন ছন্দে আনন্দে

ভূপেন হাজরিকা
বিস্তীর্ণ দু'পারের

মৃণাল চক্রবর্তী
হারিয়ে ফেলেছি মন
এক পা এগিয়ে এক পা পিছিয়ে

ললিতা ধর চৌধুরী
আকাশের সময়টা এখন কি
পলাশের কানে কানে

শ্যামল মিত্র
তোমাদের ভালোবাসা মরণের পার থেকে
দেখা হবে কি হবে না

শিপ্রা বসু
আমার বাদলদিন
আহা কে রঙ্গ ক'রে গেল

শৈলেন মুখোপাধ্যায়
চলে গেছে অনেক সময়
তোমাকে ভেবেছি আমি

সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়
শোন পড়োশিনি
তোমার মুখের কথা

সুবীর সেন
যদি ভুল কিছু করে থাকি
তুমি আমার প্রেম

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
সবাই চলে গেছে
এমন একটা ঝড় উঠুক

ই-পি রেকর্ড

উমা বসু (হাসি)
আজ ফাগুনের প্রথম দিনে
আকাশের চাঁদ মাটির ফুলেতে
চাঁদ কহে চামেলী গো
ঝরানো পাতার পথে

কনক দাস (রবীন্দ্র-সংগীত)
সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
আসা-যাওয়ার পথের ধারে
জীবনে পরম লগন
ডেকো না আমারে ডেকো না

দীপালি নাগ (উচ্চাঙ্গ-সংগীত)
চুড়িয়া বার বার করকন্— বেহাগ
জান সাজন আজন—বাগেশ্রী
এ মাগ জওয়ত—রামসখ
লগহি অবে—গৌরী

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য (শ্যামা-সংগীত)
মা মা বলে আর ডাকব না
এমন দিন কি হবে মা তারা
গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি
মুক্ত কর মা মুক্তকেশী

লং প্লেয়িং রেকর্ড
'দি বেস্ট অব্ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়'

দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব
ইণ্ডিয়া লিমিটেড
(ই. এম. আই. প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি)
কলিকাতা · বোম্বাই · দিল্লী · মাদ্রাজ · গৌহাটি · কানপুর

GC 5770 BEN

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃতের কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে অমৃতের কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

১ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৮শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 30th January, 1970 শুক্রবার, ১৬ই মাঘ, ১৩৭৬ 40 Paise

প্রচ্ছদ : শ্রীআর কিশোর যাদব

সাহিত্যিকের চোখে : সাংবাদিকতার রীতি

অমৃতের ৩৭শ সংখ্যায় আমার নামোল্লেখ করে দুর্গাপুরের প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে "সাহিত্যিকের চোখে: সাংবাদিকতার রীতি" শিরোনামায় একটি চিঠি বেরিয়েছে। "সাংবাদিকতার রীতি" অনুসারে পত্রান্তরের নামোল্লেখ না করে তিনি আমার একটি লেখার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : "সাংবাদিকতার রীতিবিরোধী এবং ফলত অনৈতিক আচরণও (আন-এথিকাল)"। পত্রান্তরে "সুদীর্ঘ" এক আলোচনা দেখে' তিনি "অবাক" হয়েছেন। পড়েছেন কিনা স্পষ্ট নয়, কেননা, "তার যৌক্তিকতা নিয়ে" তিনি কিছু বলতে চান নি। তাঁর "শুধু বক্তব্য" ওতে "অমৃতের ফিচার এবং (তার লেখকদেরও বটে) উপর কটাক্ষপাত করা" হয়েছে। ওটি সাংবাদিক-রীতিবিরোধী এবং আন-এথিকাল।

স্বীকার করব, আমার এথিকসের জ্ঞান বি-এ পাঠ অবধি। সেই সীমাবদ্ধ জ্ঞানে প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে একটি নিবেদন জানাই। অমৃতের ফিচার এবং লেখকদের ওপর কটাক্ষপাত একটা অভিযোগ। লেখার "যৌক্তিকতা" নিয়ে যেখানে কিছু বললেন না, সেখানে এই ইঙ্গিত কি লেখাটির "অযৌক্তিকতা" প্রতিপন্নে যথেষ্ট বলা হল না? অনেকেই যখন আমার লেখাটি পড়েন নি তখন এইরকম পত্রযোগে তাঁদের মন বিরূপ করা কি এথিকাল? না, এ তাঁর সাংবাদিকতার রীতিসম্মত? তিনি যেখানে অমৃত কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছেন আমি লেখাটি তাঁদের কাছে পাঠিয়েছিলাম কিনা এবং তাঁরা ছাপাবেন না জানিয়েছেন কি না সেখানে লেশমাত্র অসঙ্গতি নেই। কিন্তু অমৃত কর্তৃপক্ষের জবাবের অপেক্ষা না রেখেই তিনি যেখানে "তা যদি না হয়ে থাকে" বলে শেষ প্যারাটিতে যে রায় দিলেন তা কোন্ এথিকস-সম্মত জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। "কটাক্ষপাত" শব্দটা নিশ্চয়ই অর্থহীন নয়। আশা করি, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় তা থেকে মুক্ত।

আমার সীমাবদ্ধ বুদ্ধিমতো অমৃতকে আমি সাহিত্যপত্র বলেই বুঝি এবং আমিও তার নিয়মিত "কৌতূহলী" পাঠক। প্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিশ্চয়ই এমন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করেন নি যে, এর সঙ্গে আমার কোন বৈরী সম্পর্ক আছে। এমন আভাষও আমার পক্ষে দুঃসহ হবে। আমি পত্রান্তরে যে "সুদীর্ঘ আলোচনা" করেছি তা সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই। পত্রান্তরের ফিচারটির নাম "দৃষ্টি-পরিক্রমা"; প্রধানতঃ, বাংলাভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে কোথায় কি কথা বা আলোচনা হচ্ছে তার ওপর দৃষ্টিপাত করে বুঝে নেওয়াই "পরিক্রমার" উদ্দেশ্য। স্পর্শকাতরতামুক্ত প্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, সাহিত্য-আলোচনার কোনো কারা-প্রাচীর নেই, কোন একটি পত্রে কোন প্রসঙ্গের অবতারণা ও আলোচনা হতে থাকলে পত্রান্তরে সে আলোচনা হওয়ার পথে কোনো বাধা থাকতে পারে না; বরং তা হলেই বিষয়টির আলোচনা, সার্থক হয়ে ওঠে। সংবাদ সূত্রে যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ থাকে তবে এইটিই প্রত্যাশিত যে, তার প্রতিবাদ বা সমর্থন সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রে প্রথম দেওয়া হবে এবং এরই নাম প্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিয়েছেন "সাংবাদিক-রীতিসম্মত।" কিন্তু সেক্ষেত্রেও একই প্রসঙ্গ, ব্যক্তি বা সংস্থা, এমনকি বিবৃতি যখন ইমপার্সোনাল হয়ে ওঠে তখন তার আলোচনা বা সমালোচনা সাংবাদিক-রীতি-বিরুদ্ধ নয়। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় "পত্রান্তরে প্রকাশিত" সংবাদের সূত্র ধরে মন্তব্য করার দৃষ্টান্ত অগুণতি। প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি তা যদি এড়িয়ে গিয়ে থাকে সে অপরাধ আমার নয়।

আমার আশঙ্কা, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যপত্র ও সংবাদপত্র এবং প্রতিবাদ ও আলোচনা একাকার করে ফেলেছেন। আমি তো কোনো প্রতিবাদ করিনি, সাহিত্যক্ষেত্রে উত্থাপিত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা করেছি এবং যাঁদের নিয়ে করেছি তাঁরাও নিমিত্তমাত্র। তাঁরা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এবং সমগ্র বাংলা সাহিত্য বলতে তাঁরাই মাত্র নন; সেখানে তাঁরা ইমপার্সোনাল। অমৃতে যে বিষয়টির ওপর লেখা প্রকাশ করছেন ও করেছেন সে বিষয়টি অবতারণার কৃতিত্ব নিশ্চয়ই তাঁদের। কেননা, বলেছি, এ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কিন্তু যেইমাত্র তা সাধারণ্যে এল তক্ষুনি তা সকলের আলোচ্য বিষয় হয়ে গেল এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সর্বজনীনতা যতটা প্রযোজ্য এমন আর কোথাও নয়। "ভারতবর্ষে" শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বেরিয়েছে, "প্রবাসী"তে বেরোয়নি, "ভারতবর্ষ" যদি সেই সুবাদে দাবী করতেন, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বা শরৎসাহিত্য সম্পর্কে সবকিছু "ভারতবর্ষে" বের করাই "সাংবাদিক-রীতি-সম্মত" (সাহিত্যিক-রীতিসম্মত নয়) তবে তা এথিকাল হত, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিশ্চয়ই এমন কথা বলবেন না। সাহিত্যের এই বিস্তার স্বীকৃত না হলে শেকসপীয়র, গ্যায়টে, ভিকটর হুগো, টলস্টয় যাঁর যাঁর স্বদেশ ছেড়ে ভারত-ভূমিতে এবং ভারতীয়দের মনোভূমিতে আসন পাততে পারতেন না।

প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় না হলেও তাঁর রায়ের গাম্ভীর্য থেকে ধরে নিতে পারি, তিনি একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক এবং এথিকস-সচেতন সাহিত্যিক। তাই তাঁর কাছে আমার-সাফাই-সাক্ষী হিসেবে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক, অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখকে উপস্থিত করতে চাই। 'একাল-সেকাল' 'বাঙালীর বাহুবল' এবং 'হিন্দুত্ব' প্রভৃতি বিষয়ে শিশিরকুমার-বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের বিতর্ক একটু অল্প আয়াস করলেই প্রসাদ মুখোপাধ্যায় পড়তে পারেন। তালিকার মহাভারত রচনা বৃথা। অতএব আমার নিবেদন, অমৃতের সাহিত্যালোচনা যদি আমি পত্রান্তরে বিস্তারিত করে থাকি (প্রতিবাদ নয়) তবে তা অমৃতের সাহিত্যিক লক্ষ্যকেই, অর্থাৎ সকল সাহিত্যের লক্ষ্যকেই গুরুত্ব দিয়েছি। আমার অখণ্ড বিশ্বাস, আমাদের বাংলা-সাহিত্য এই বিতর্কের ব্যায়ামেই তার স্বাস্থ্যরক্ষা করে এসেছে। সাম্প্রতিক দৃষ্টান্তের মধ্যে "অশ্লীলতা" "নগ্নতা" সম্পর্কে সর্বজনীন বিতর্কের উল্লেখ করা যায়। বিশেষ একটি সাপ্তাহিক একজন বা এক গোষ্ঠীর লেখক অশ্লীলতা সম্পর্কে খ্যাতি বা কুখ্যাতি অর্জন করেছেন বলে ঐ সাপ্তাহিক যদি দাবী করে অশ্লীলতা সম্পর্কে লেখা প্রকাশের অধিকার একমাত্র তাদেরই, তা হলে তা মেনে নেবেন, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে না জানলেও, তাঁকে অত সঙ্কীর্ণমনা ভাবতে পারিনে। কেননা পত্রেই প্রকাশ, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি প্রসারিত এক পত্র থেকে পত্রান্তরে, হয়তো কোন সাহিত্যপত্র বা সংবাদপত্রই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না এবং আশ্চর্য তৎপরতার পরিচয়ও দিয়েছেন তিনি। "সাংবাদিকতার রীতি" মেনেই আমি কিন্তু পত্রান্তরে প্রকাশিত লেখায় "অমৃতের" নামোল্লেখ করিনি। প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই দুইয়ে দুইয়ে চার

করেছেন। আমার কথা হল, কেউ আমার নাম করলে, অমৃতই যে আমার ঐ লেখার প্রেরণাস্থল এ আমি অস্বীকার করব, এমন অপরাধবোধ আমার নেই।

পুলকেশ দেসরকার
কলকাতা

(২)

গত সংখ্যায় প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিঠি না পড়লে কোনদিনই জানতে পারতাম না যে পুলকেশ দে সরকার অমৃতের এই প্রিয় ফিচারটি সম্পর্কে পত্রান্তরে কটাক্ষ করেছেন। আর্থিক সঙ্গতির অভাবেই আমরা যারা অন্য পত্রিকা পড়তে পারি না সেই পাঠকদের দে সরকার কেন বঞ্চিত করলেন বুঝতে পারলাম না। আমাদের এই মনের মত ফিচারটি সম্পর্কে দে সরকার মশায় নিজস্ব কি বক্তব্য রেখেছেন সেটা জানার একমাত্র অধিকার অমৃতের পাঠকদেরই। সম্পাদকীয় মন্তব্যে দেখা যাচ্ছে যে অমৃত পত্রিকায় তিনি তাঁর রচনাটি পাঠাননি। পাঠালে পরে যদি ছাপা না হত তাহলে আমরা অবশ্যই দে সরকার মশায়ের পক্ষ নিতাম। কিন্তু এক্ষেত্রে শ্রীদে সরকার তার কোন চেষ্টা না করেই এমন একটি কাজ করেছেন যে তাঁকে কোনোমতেই সমর্থন করা যায় না। সাংবাদিকতার ন্যূনতম সৌজন্যবোধ তাঁর কাছে প্রত্যাশিত ছিল। জানি না দে সরকার মশায় এর পরে আর কি বলবেন? তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে দে সরকার মশায় তাঁর এই অন্যায় রীতির জন্য কারো সমর্থন পেতে পারেন না।

এই অবকাশে এই মনোজ্ঞ ফিচারটির জন্য আবার আপনাদের অভিনন্দন জানাই।

করুণ মুখোপাধ্যায়
বিবেকনগর, যাদবপুর।

মানুষ গড়ার ইতিকথা

অমৃতে প্রকাশিত 'মানুষ গড়ার ইতিকথা'র আমরা নিয়মিত পাঠক। এ প্রবন্ধগুলি রচনার বলিষ্ঠতায় যেমন চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে তেমনি অমৃতের অগণিত পাঠক মানুষ গড়ার সাধনায় ব্রতী বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন বা হচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা সন্ধিৎসু মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি, তিনি যেন তাঁর আলোচিত বিদ্যালয়গুলির মত বাংলাদেশের আর একটি প্রথম সারির বিদ্যালয়ের ইতিকথাও তাঁর অপূর্ব রচনাশৈলীর মাধ্যমে অমৃত পাঠক সমাজের নিকট উপস্থাপিত করেন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ আমাদের হয়েছিল। অল্প কথায় জানাই এই বিদ্যালয়ের নাম সাগর দত্ত অবৈতনিক উচ্চ-বিদ্যালয় (বর্তমানে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত)। কলকাতার উপকণ্ঠে ব্যারাকপুর ট্রাংক রোডের উপর কামারহাটি (কলকাতা থেকে মাত্র নয় মাইল উত্তরে) অঞ্চলে মহাত্মা সাগরলাল দত্তের অবদানে এই বিদ্যালয় ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত বিনা বেতনে উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ বাংলাদেশে আরও আছে কিনা আমাদের জানা নেই। বহু দরিদ্র মেধাবী ছাত্র এই বিদ্যালয়ের দ্বারা উপকৃত হয়ে দেশের নানা জায়গায় আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

অনুরোধ পূরণ হবে এই আশায় অমৃতের পরবর্তী সংখ্যাগুলির অপেক্ষায় রইলাম।

আলোক চট্টোপাধ্যায়
সনক চট্টোপাধ্যায়
পানিহাটী, ২৪ পরগণা

(২)

'অমৃতে'র 'মানুষ গড়ার ইতিকথা' এই পর্যায়ে লেখার প্রচেষ্টা এমন সুন্দরভাবে আপনারা চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে আপনারা এখন সব প্রশংসার ঊর্ধ্বে। আমি জানি সমস্ত গ্রামবাংলার বিদ্যালয়গুলির পরিচয় এমনিভাবে যদি আপনাদের উৎসাহে এবং লেখকের চেষ্টায় অমৃতের পাতায় প্রতিফলিত হয় তবে দীর্ঘ দিনের মধ্যে এই ফিচারটির সমাপ্তি টানার কোন প্রশ্নই থাকবে না। আমরাও বিদ্যালয়গুলির ইতিহাস জানা থেকে বঞ্চিত হবো না। এই পর্যায়ে লেখক এখন পর্যন্ত এগুলি বিদ্যালয়ের ইতিহাস জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন, তবু একই ধরনের বক্তব্য হলেও একটুও একঘেয়েমি আসে নি। বরং প্রতিটি লেখায় লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয় থেকে যাচ্ছে। লেখকের এই কৃতিত্বের জন্য আমার অজস্র ধন্যবাদ তাঁকে জানাচ্ছি।

আপনাদের 'অমৃতে'র গত ১লা আগষ্ট '৬৯ সংখ্যায় এ বিষয়ে আমার একটি ক্ষুদ্র পত্র আপনারা প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এখানে স্মরণ করা দরকার, আমি ঐ পত্রে উল্লেখ করেছিলাম 'তিনি (লেখক) বর্তমানে শুধু শহরের বিদ্যালয়গুলির কথাই তুলে ধরছেন। কিন্তু গ্রামবাংলায় এমন বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে সেগুলির অবদানও কম নয়। তাই লেখকের কাছে অনুরোধ তিনি যেন গ্রামবাংলার বিদ্যালয়গুলির পরিচয়ও জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন।' ঠিক এমনিই একটি গ্রামবাংলার অসাধারণ প্রতিষ্ঠানের বিবরণ জানতে পারলাম আপনার 'অমৃতে'র গত ২রা জানুয়ারী '৭০ সংখ্যায়। বিদ্যালয়টির নাম বৈঞ্চবচক মহেশচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়। সত্যি এ পর্যন্ত যতগুলি বিদ্যালয়ের ইতিহাস লেখক লিখে গিয়েছেন তার মধ্যে এই বিদ্যালয়টির কর্মপ্রচেষ্টা ও দৈনন্দিন কার্যতালিকা এক-কথায় অভিনব। সেই জনাই হয়ত লেখক এটিকে আজ বাংলাদেশের অন্যতম সেরা বিদ্যালয়ের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমিও লেখকের সঙ্গে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। আশা করি বিদ্যালয়টির ইতিহাস পড়লে অনেকেই এতে একমত হবেন। গ্রামবাংলার একটি অজ্ঞাত, অখ্যাত বিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করাও লেখকের পক্ষে কম সৎসাহস নয়। অবশ্য তিনি যাতে কোন সমালোচনার সম্মুখীন না হন এ জন্য এ বিষয়ে তাঁর খতিয়ানও সঙ্গে সঙ্গে পেশ করেছেন। এটুকু জানার পর আর কারও কোন কিছু বলার থাকতে পারে না।

বিদ্যালয়টির পরিবেশ এবং বিশেষ করে তার দৈনন্দিন কার্যতালিকায় যথেষ্ট নতুনত্ব রয়েছে। তা থেকে জানার এবং শেখার মত অনেক মৌলিক বিষয় পাওয়া যাবে। এসব অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের বিবরণে পাই নি। এই অভিনব কর্মপ্রচেষ্টা আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করেছে। নিজে শিক্ষক হয়ে এমন একটি প্রতিষ্ঠান দেখার ও জানার আশাও মনে জাগছে। এ থেকে কিছু জ্ঞান আহরণ করে হয়তো কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে সে আশা আমার হয়তো দুরাশাই হয়ে থাকবে। যাক্ ... এই অভিনব কর্মপ্রচেষ্টার জন্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে এবং জ্ঞানী, গুণী শিক্ষাদাতাগণকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পুনরায় সবশেষে এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্য 'অমৃত' সম্পাদক মহাশয়কে পুনরায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত, শিক্ষক,
কমলপুর, ত্রিপুরা

রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন উদ্বোধনের জন্য আনুষ্ঠানিক শোভা-যাত্রাসহকারে যাচ্ছেন। তাঁর সামনে রয়েছেন স্পীকার শ্রীবিজয় ব্যানার্জি।

ফি-বছর বাজেট অধিবেশন যখন শুরু হয় তখন রেওয়াজ-মাফিক রাজ্যপাল **একটি ভাষণ** দেন। এ ভাষণ মামুলী নয়। **এর মধ্যে রাজ্যের** সামাজিক, অর্থনৈতিক **ছবিই** শুধু প্রতিফলিত হয় না, সরকারের **কর্মপন্থার একটি** সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও বহন **করে।** অভাগা বাঙালী দীর্ঘদিন অর্থাৎ গোটা **দুটিবছর** তাদের ভাগ্যের প্রতিচ্ছবি **ও ভবিষ্যৎ** আশাসম্বলিত এ ভাষণ শুনতে **পায় নি।** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা কম **দুঃখের কথা** নয়। কিন্তু ১৯৭০ সালের **২১ জানুয়ারী** সেই বহুপ্রতীক্ষিত **ভাষণ** তাঁরা শুনলেন। এবং তাঁদের প্রিয় **যুক্তফ্রন্ট** সরকার তাঁদেরই দুঃখ-কষ্ট লাঘবে **গত দশ** মাসে কি-কি কল্যাণমূলক কাজ করেছেন তার একটি বিবরণ রাজ্যপালের মাধ্যমে তাঁদেরই প্রতিভূ সদস্যদের কাছে পেশ করেছেন।

এ 'ভাষণ' পড়ে মনে হচ্ছে এ শুধু একটি নিয়মমাফিক অভিভাষণ। এতে সেই সনাতন পন্থায় অছিলা দেখিয়ে সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার করুণ সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। অভিনবত্ব শুধু এখানে এই যে, বামপন্থী সরকারের বক্তব্য বলে কেন্দ্রের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করে কিছু বক্তব্য সংযোজিত হয়েছে; আর চৌদ্দ দলের যুক্তফ্রন্টের এগারটি দলের প্রতিনিধিপুষ্ট সরকার ফ্রন্টের মতানৈক্যকে ভাষার মার-প্যাঁচে লুকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে। তবে একটি সুখের বিষয় এই যে প্রত্যেক মন্ত্রী কী কাজ করেছেন (এবং করেন নি) তার একটি মিনি-ফিরিস্তি ভাষণে উল্লিখিত আছে। কারণ বোধ হয় কথায়-কথায় এঁরা জনগণকে স্মরণ করেন বলে সেই জনগণের কাছেই জবাবদিহি করার উদ্দেশ্যে এই অকপট স্বীকারোক্তি। ইচ্ছে করলেই জনগণ তখন কোনো কোনো কাজ না করার জন্যে মন্ত্রিসভাকে চার্জসীট দিতে পারবেন।

আদ্যন্ত ভাষণটি পাঠ করুন। দেখবেন দুজন মন্ত্রী কোনো কাজই করেন নি। তাঁরা হচ্ছেন বনমন্ত্রী শ্রীভবতোষ সরেন—আর আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীদেও-প্রকাশ রাই। এঁরা অকর্মণ্য কিনা জানি না তবে এঁরা যে দপ্তরগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের সব-চেয়ে নীচুস্তরের মানুষ, রাজনীতিক পরি-ভাষায় যাদের প্রোলিতেরিয়ততর বললে অত্যুক্তি হবে না, তাঁদের জীবনমান উন্নয়নের জন্যে কি করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন বক্তব্য রাখা হয় নি। বনমন্ত্রী বললে শুধু বন-উন্নয়নের কথই আশা করি কেউ ভাববেন না। এই বনের ওপর নির্ভর করে বেঁচে

আছেন অসংখ্য বনবাসী, যাঁরা এখনও আদিম যুগে রয়েছেন। সেই সঙ্গে আদিবাসী কল্যাণের জন্যে শপথ-নেওয়া মন্ত্রীও তাঁদের কল্যাণে কি করলেন তার হদিশ পাওয়া গেল না। এর পর যদি বনবাসী আর আদিবাসী সরোষে গর্জে ওঠেন, তবে কি তাঁরা বিভেদ-মূলক কাজে ব্রতী হয়েছেন বলে তাঁদের দোষারোপ করা যাবে? 'অমিশান না কমিশান' জানি না তবে প্রকৃতিজননীর এই সন্তানদের প্রতি যে কিঞ্চিৎ ঔদাসীন্য থেকে গেছে একথা গুণীরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।

গোটা ভাষণ থেকে অবশ্য যুক্তফ্রন্টের কয়েকটি কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণ হয়েছে একথা বলতে পারা যায়। যেমন পূর্ত-বিভাগের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্মারক অপসারণ, আর সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে বিধান পরিষদের বিলোপ সাধন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রেখে পুলিশকে যে নতুন পথে পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাও প্রশংসার্হ। কিন্তু পুলিশ আইন-শৃংখলা ও জনতার নিরাপত্তা বিধানে সমর্থ হয়েছে এরকম বক্তব্য প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে। সে প্রশ্ন 'সমদর্শী'র নয় —ফ্রন্টের শরিকদেরই। এছাড়া জমি উদ্ধার করা হয়েছে বেআইনীভাবে হেফাজতে রাখা মালিকদের কাছ থেকে একথাও সত্য। তবে তার সুষ্ঠু বন্টন হয়েছে কিনা তা আর একটি প্রশ্ন। উত্তর শরিকরাই দীর্ঘদিন ধরে বিবৃতি-প্রতিবিবৃতির মারফৎ প্রকাশ করে এসেছেন। অতএব বেশী বলা বাহুল্য।

গণ-উন্নতি একটি অবিচ্ছিন্ন প্রয়াস। কাজেই এর হিসেব-নিকেশ দিতে হলে যখন থেকে মঙ্গলোদ্যম শুরু হয়েছে সে সময় থেকেই সাধারণত বক্তব্য রাখতে হয়। কিন্তু কংগ্রেস আমলে যা হয়েছে তার জের টেনে এনে যদি কোনো বক্তব্য প্রকাশ করা হয় তা নিশ্চয়ই যুক্তফ্রন্টের মর্যাদা বৃদ্ধি করে না। যুক্তফ্রন্টের উচিত ছিল তাঁদের সরকার এই অল্প সময়ের মধ্যে কতটুকু কল্যাণমূলক কাজ করতে পেরেছেন, যতই অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন, তারই কেবল উল্লেখ করা।

অভিভাষণে বলা হয়েছে, সরকারের সেচ ব্যবস্থার ফলে এবছর ১৬-৬২ লক্ষ একর জমি থেকে ১৭-৬৩ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল পাওয়া যাবে। এ বক্তব্য থেকে জনগণ নিশ্চয়ই বুঝতে অক্ষম হবেন, ঠিক কতটুকু জমি যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে সেচের জল পাচ্ছে। এই অঙ্ক থেকে কেউ যদি মনে করেন কংগ্রেস আমলে খনন করা খালের জল ফ্রন্টমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি তাঁর দপ্তরে ঢুকিয়ে নিয়ে তারই কৃতিত্বের দাবী করছেন তবে কি খুব অসত্য ভাষণ হবে? আরও বলা হয়েছে, ডি ভি সি, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী থেকেও আরও সেচের জল পাওয়া যাবে যাতে করে ৯০ হাজার একর বাড়তি জমিতে সেচের সুবিধা হবে। মনে রাখবেন এই প্রকল্পগুলি কংগ্রেসের দ্বারা রূপায়িত। তারই ফল পাচ্ছেন এখন পশ্চিমবঙ্গবাসী।

রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বি-বার্ষিক এক ক্র্যাশ প্রোডাকশান পরি-কল্পনা গ্রহণের ফলে এ বছরের খাদ্যশস্য উৎপাদনের টারগেট—৬০ লক্ষ টন সাফল্য-লাভ করেছে। ওয়াকিবহাল মহল ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছেন, খাদ্যশস্য অত হয় নি। উৎপাদিত খাদ্যশস্যের হিসেবের উপর খাদ্য-মন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর যে তরজা শুরু হয়ে-ছিল সে থেকেও কিছুটা আঁচ করা যাবে। অতএব, রাজ্যপালের বক্তব্যের সত্যাসত্য আপনারাই নির্ধারন করুন।

দ্বিতীয় হাওড়া ব্রীজ করার কথা ডাঃ রায়ের আমল থেকেই শুরু হয়েছে। কিন্তু টানা-পোড়েনের পর এতদিনে পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। একথা সত্যি যে, কোনো প্রকল্প গ্রহণ করার সঙ্গে-সঙ্গেই তা বাস্তবে রূপায়িত হয় না। হয়ত উদ্যোক্তা বেঁচে থাকেন না, নয়তো কোনো ক্ষমতা থেকে অপসারিত হতে পারেন। তখন অন্য কেউ তা রূপায়িত করেন। কিন্তু রাতারাতি সব কৃতিত্ব শেষোক্ত ব্যক্তির উপর বর্তায় না।

যেমন ধানের বীজ বপন করলেন ধর্মবীরের সরকার। আর সে ধানগাছ যখন পরিণত রূপ ধারণ করে আশার প্রতীক হয়ে উঠল তখন সাংবাদিকদের নিয়ে গিয়ে তা দেখালেন যুক্তফ্রন্ট সরকার। একেও যদি পরের পুত্রে পুত্রবতী আখ্যা দেওয়া না যায় তবে আর কাকে দেওয়া যেতে পারে, গুণীরা বিচার করুন।

'সমদর্শী'র উদ্দেশ্য নয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃতিত্বকে খাটো প্রতিপন্ন করার জন্য অপপ্রচার চালানো। যাঁরা এহেন চিন্তা করবেন তাঁরা ভুল করবেন। সমদর্শীর বক্তব্য হচ্ছে, ফ্রন্ট সরকারের উচিত ছিল তাঁদের রাজত্বকালে কতটুকু কাজ হয়েছে তার সম্পূর্ণ আলাদা হিসেব পেশ করা। তাঁদের প্রতি জনতার আস্থা অপরিসীম। তাঁদের কর্মক্ষমতার প্রতিও জনসাধারণের বিশ্বাস অগাধ। নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁরা জনতাকে কংগ্রেস-বিরোধী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাজেই তাঁদের উচিত ছিল একেবারে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে তাঁদের কর্মদক্ষতার নজীর উপস্থাপিত করা, যাতে মানুষের সন্দেহের কোনো অবকাশ না থাকে। সহৃদয় পাঠকরাও জানেন, বৃটিশ আমলেও কিছু-কিছু কাজ এদেশে হয়েছিল। এমন কি কোম্পানী পরিচালিত রেলকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই ভারতীয়করণ বা বর্তমান পরিভাষায় জাতীয়করণ করে গিয়ে-ছিল। কংগ্রেস বৃটিশকৃত ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে কতটুকু উন্নতি করেছে তার হিসাব-নিকাশ পেশ করত। আর যুক্তফ্রন্টও কংগ্রেস কৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রেশ টেনে কল্যাণমূলক কাজের ফিরিস্তি পেশ করছেন। ট্র্যাডিশান ঠিকই আছে। সরকারের রঙ বদলিয়েছে শুধু! কিন্তু এ না করে যে রক্ষণশীলতার ঝোঁক মনের গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে তাকে চুরমার করে দিয়ে নতুন ভঙ্গীতে রাজ্যপালের প্রতিবেদন পেশ করা হত, তবে মনে হয় মানুষকে কিছু মোহ-মুক্তির সুযোগ দেওয়া যেত।

রাজ্যের অর্থভান্ডার সীমিত। এই রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের অবিচার আছে একথাও স্বীকৃত। কিন্তু এ রাজ্যে জনগণের ঐক্য আছে, যা সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করার জন্য সবচেয়ে বড় মূলধন। কিন্তু সেই জনতার মধ্যেও যে ক্রমে বিভেদ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে তার প্রমাণ দেখা গেল রাজ্যপালের ভাষণে। অর্থাৎ আমজনতা যে চৌদ্দটি দলের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ, সেই দলগুলিও যে আজ বহুধা-বিভক্ত সে সত্যই উদ্ঘাটিত করেছে রাজ্যপালের সযত্ন বিন্যস্ত ভাষণ। অথচ এটি এগারটি দলের মন্ত্রিসভা বহুবিতর্কের পর প্রস্তুত করেছেন। দেখা যাচ্ছে, ক্যাবিনেটে পাশ হলে ও বিধান-সভায় বক্তব্যের সমর্থনে ধন্যবাদজ্ঞাপন প্রস্তাব উত্থাপনের প্রশ্নে মতভেদ তীব্রতর হয়েছে। এমন কি ফ্রন্টের সন্ধি-বৈঠকেও তার প্রতিফলন হয়েছে। বাংলা কংগ্রেস ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবে অংশীদার হতে অস্বীকার করেছে; আর সন্ধি-বৈঠকে নির্মম ভাষায় শ্রীসুশীল ধাড়া (শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী ও বাংলা কংগ্রেস সম্পাদক) বলেছেন, বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তাঁদের নেতা শ্রীঅজয়-কুমার মুখোপাধ্যায় রাজ্যের আইন-শৃংখলার ভয়াবহ ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে এতদিন গণ-আদালতে যা পেশ করছিলেন সেই সত্য কথাই অকুতোভয়ে পুনরাবৃত্তি করবেন। আরও কয়েকটি দলের প্রতিনিধিরাও সেই সন্ধি-সভায় পরিষ্কারভাবে বলেছেন, তাঁদের দলের কর্মী ও নেতাদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে, এমন কি তাঁদের কমরেড-দের হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে, তাঁরা অবশ্যই তা বিধানসভায় উল্লেখ করবেন। রাজ্যপালের ভাষণে পশ্চিম বাংলায় অন্তর্দলীয় কলহের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে যে সব শহীদ প্রাণ দিয়েছেন তার কোন উল্লেখ নেই। তবু অস্পষ্ট ভাষায় এই অপরাধ কমেছে আর ঐ অপরাধ প্রায় একই প্রকার আছে—ইত্যা-কারের একটি নির্লিপ্ত ভাষণ পাঠ করে শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীর

রাজ্য বিধানসভায় ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা শ্রীসিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায় (মধ্যে) পরিষদ ভবনে বিধানসভার অপর দুজন সদস্য শ্রীবিজয়সিং নাহার ও শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের সঙ্গে আলোচনা করছেন।

মধ্যে যে শান্তি ও ঐক্য বিরাজ করছে তারই মনোজ্ঞ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণ পঠিত হওয়ার পরই এস এস পি নেতা শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র বলেছেন, বক্তব্যে পেশ করা সত্যের চেয়ে অসত্য গোপন করা হয়েছে বেশী। উল্লেখ্য, এস এস পি মন্ত্রিসভায় নেই। ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা অমর রায় প্রধানও বিরোধী কণ্ঠের প্রতিধ্বনি করেছেন।

যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ কোন্দলকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেও কিন্তু শেষপর্যন্ত তাতে সফল হওয়া যায় নি। বিধানসভা যেদিন খুলল সেদিনই কতিপয় নর-নারীর আচরণ আবার নতুন করে ইন্ধন যোগাল। বিধানসভার বারান্দায় যে নাটক শুরু হয়েছিল সে নাটক সন্ধি-বৈঠকের শিবিরের দ্বার-প্রান্তে আরও নাটকীয় ভাব ধারণ করেছিল। এমন কি 'কমরেড জ্যোতি বসু আপনি বলুন ফ্রন্টের কি অবস্থা'—এহেন আহ্বান জানিয়েও 'যে বিক্ষোভ-কারীরা' কমরেড জ্যোতি বসুর কথা অমান্য করে সুশীল ধাড়া, অজয় মুখার্জিকে এক হাত দেখে নেবার জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বয়ং জ্যোতিবাবুকেও তখন আক্ষেপ জানাতে শোনা যায়। যাই হোক বিধানসভা খোলার দিনের ঘটনা, যে বা যাঁরাই সংগঠিত করুন না কেন, অবস্থাকে যে গুরুতরভাবে জটিল করে তুলেছিল বিধানসভার অভ্যন্তরে বিস্ফোরণের মধ্যেই তার নজীর পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় সরকার পক্ষের কেউ কেউ ঘটনা সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখছিলেন তাতে যে সম্পূর্ণ চিত্র ছিল না মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব বর্ণনার মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকীয়তা আরও জমে উঠেছিল যখন বাংলা কংগ্রেসের মন্ত্রীরা তাঁদের নেতা ও মুখ্যমন্ত্রীকে বলে এলেন, তাঁদের এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে কাজ করা সম্ভব নয়। যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নেই সেখানে তাঁরা কোন ছার। অতএব, দায়িত্ব থেকে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হোক। আর বিধানসভার অভ্যন্তরে শাসক ফ্রন্টের চৌদ্দ দলের শরিক দ্বিধা-ত্রিধা বিভক্ত হয়ে এক ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করলেন।

শাসক ফ্রন্টের এই শরিকী বিবাদ সাংবিধানিক সংকটও সৃষ্টি করেছে। পরিষদীয় গণতন্ত্রের রীতি হচ্ছে রাজ্যপাল যে ভাষণ পাঠ করবেন তাকে দলীয় সমস্ত সদস্যই সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাতে শাসক ফ্রন্টের নিয়মতান্ত্রিক অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায়। ঘটনা গড়িয়ে যদি ধন্যবাদমূলক প্রস্তাব গ্রহণের দিন পর্যন্ত যায় তবে এমনও হতে পারে যে, ভোটে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবে। সে অবস্থায় সরকারের পদত্যাগ অথবা রাজ্যপাল কর্তৃক বরখাস্ত। গণতন্ত্র রক্ষার আর কোনো উপায় থাকবে না। কিম্বা এরকম সংঘাত যদি বিধানসভার অভ্যন্তরে চলে তবে সেই অশ্রুতপূর্ব ঘটনার পরিসমাপ্তির সুযোগ দেবার জন্যে অধিবেশন মুলতুবী করে দেওয়াও চলতে পারে। কিন্তু ঘটনার পরিবেশ দেখে মনে হয়, মাননীয় স্পীকার যে বিধানসভার তালা খুলে গণমিছিল করে ঐ শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন এক শুভ বসন্ত সমাগমের পূর্ব-লগ্নে, আবার হয়ত সেই লগ্নেই তালাবন্ধ করে তাঁকে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ঐতিহ্য স্থাপন করতে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে ঘটনাগুলো ছায়া-ছবির মত এসে যাচ্ছে তা রাজনৈতিক তাৎপর্য কী? —অর্থ অতীব পরিষ্কার। তথাকথিত মিনি-ফ্রন্ট গঠনের তলে তলে যে উদ্যোগ চলছিল বলে অভিযোগ হচ্ছিল, তাকে খণ্ডিত করে দিবালোকে বীরদর্পে কর্মপ্রণালীর সার্থক্যের উপর ভিত্তি করে শক্তিজোট সম্পন্ন করার মহড়া শুরু হয়েছে। বর্তমানে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে এটাকে চক্রান্ত বলে অভিহিত করা খুবই কঠিন হবে। সেই মুষ্টিমেয় লোকের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি অশালীন আচরণ সহজেই একটি পরি-কল্পিত প্রণালীর সার্থক পরিণতি বলে আখ্যাত করলে অন্য কিছু বলে তাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা তত সহজ হবে না। এবং এ ঘটনার প্রভাব যে প্রত্যেক ফ্রন্টভুক্ত দলের উপর পড়েছে তা শুধু বিধানসভার আচরণের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়নি, অধিকন্তু ইতিমধ্যেই অনেকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তেও উপস্থিত হয়েছেন। যদি সরকার ভেঙে যায় তবে তাঁরা কেউ কেউ কোনো শক্তিজোটে যোগ না দিয়ে কর্মপন্থা বিবেচনা করে সমর্থন জানাবেন হয়তো। আর এস-পি, লোকসেবক সংঘ ইত্যাদি দল এই মর্মে দলীয় কৌশলও ঠিক করে ফেলেছেন।

আর যদি বাংলা কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের বক্তব্যে কোন ইংগিত আছে বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলে বোঝা যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি এগিয়ে যাওয়ার সবুজ সংকেত দেওয়া। এতদিন ঐ দলের নেতারা অলিখিতভাবে নানারকম কথা বলেছেন। এবার পুরোপুরি কাগজে-কলমে ঐক্যবদ্ধভাবে যে কোনো অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়াবার কঠিন প্রতিশ্রুতি দিলেন।

অন্যদিকে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের স্বচ্ছ বিবৃতি: ভগ্নদশা ফ্রন্ট রেখে লাভ নেই। জনতার ক্ষতি হবে। শান্তি বৈঠক বসবার আগেও স্বার্থহীন ভাষায় শ্রীদাশগুপ্ত বলে-ছিলেন, সন্ধির কোন সুযোগ নেই। তাই শান্তি হবে না। কাজেই তাঁর বক্তব্যের সূত্র ধরে শ্রীসরোজ মুখার্জি সন্ধি-বৈঠকে মুখ্য-মন্ত্রী অজয় মুখার্জিকে 'বর্বর অসভ্য' সরকার বলার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে বলেন। এবং শুধু তাই নয় ফ্রন্টকে আগে এই বক্তব্য ফয়সালা করবার জন্য জোর দেন। কিন্তু শ্রীজ্যোতি বসু কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে জিনিসটাকে তরল করে ফেলেন। কিন্তু প্রমোদবাবু পার্টির সম্পাদক। তাঁর বক্তব্য দেখলে বোঝা যায়, দল কি চায়। বোঝা যাচ্ছে সেদিনকার সভায় জ্যোতিবাবু যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তার সঙ্গে প্রমোদবাবুর মতের সঙ্গতি নেই। আবার প্রমোদবাবুরে দলীয় আইন সভা সদস্যদের যে সভা ডেকেছিলেন তাতে দশজনও নাকি হাজির হননি। শোনা যায়, প্রমোদবাবুর লাইন তাঁরা মানতে পারছেন না। অতএব, তাঁরা কোন্ দিকে সেটা বলা মুস্কিল।

যাহোক, যে দ্রুত তালে সব ঘটনা এগিয়ে যাচ্ছে তাতে মনে হয় এই নিবন্ধ যখন আপনারা পড়বেন তখন বাংলা দেশের রঙ বদলিয়েছে আর যদি না বদলায়ও তবে এ তথ্য আগামী দিনের ইতিহাসের পট-ভূমিকার জন্য নিশ্চয় রক্ষিত থাকবে।

—সমদর্শী

জয়তু নেতাজী

দেশে ঐক্য ও শান্তির প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বের মধ্যে ভারত যাতে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেইভাবে দেশকে গড়ে তোলার মধ্যে দিয়েই আমরা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি সর্বোত্তম সম্মান প্রদর্শন করতে পারি। নেতাজী যে ঐক্য এবং ফলদায়ক কর্মের বাণী রেখে গেছেন, আজকের দিনে সেই বাণীর অনুসরণ সর্বাধিক প্রয়োজনীয়।

—রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি

শান্তির শ্বেত পারাবত!

মার্কিন
বৃটেন
ফ্রান্স
সোভিয়েৎ

২২.৭.৭০
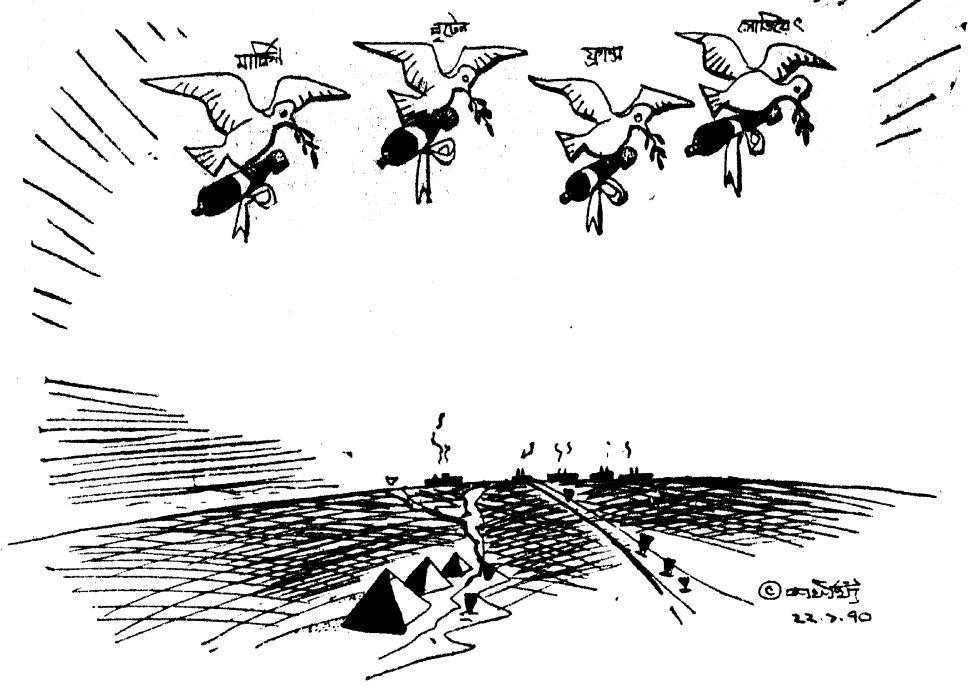
ভিতরে শান্তি ও বাইরে প্রচুর উত্তাপের মধ্যে এবার রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে এবং ঐ দিন সি পি আই অফিসে ফ্রন্টের যে বৈঠক হয় সেখানেও ভিতরকার শান্তি কোনভাবে ক্ষুন্ন হওয়ার আভাস না থাকলেও বাইরে 'মুর্দাবাদ' ও 'জিন্দাবাদী' জিগির প্রচুর উত্তাপ ও উত্তেজনার খোরাক জুগিয়েছিল। আসাম বিধানসভারও অধিবেশন শুরু হয়েছে এবং চালিহার সম্ভাব্য পদত্যাগের ক্ষেত্রে তাঁর সর্বসম্মত উত্তরাধিকারীর সন্ধান চলছে যদিও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভগবতী তেজপুর কেন্দ্র থেকে বিধানসভার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংকল্প করায় সেখানে দ্বৈরথ সমরের আশংকা প্রবল হয়ে উঠেছে। এদিকে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার ইন্দিরা-সমর্থক সদস্যরা এক সভায় সমবেত হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কমলাপতি ত্রিপাঠীকে দল নেতা নির্বাচিত করেছেন এবং তাঁদের দাবী অনুযায়ী বিধানসভার ২২৬ জন কংগ্রেস সদস্যের মধ্যে ১৯৫ জন ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন (উঃ প্রদেশ বিধানসভার মোট নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ৪২৬)। বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসন অবসানের আপাত কোন আভাস না থাকলেও বিধানসভার দলগুলোর নতুন জোটবিন্যাসের ফলে চিত্র এখন অনেক পরিস্কার হয়ে উঠেছে। গত সপ্তাহের আর একটা চমকপ্রদ খবর হচ্ছে কেরলের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ তাঁর তৎকালীন মন্ত্রিসভার আই-এস-পি দলভুক্ত সদস্য পি কে কুঞ্জুর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে যে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন কেরল হাইকোর্ট তা বাতিল করে দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান এবার যেরকম শান্ত পরিবেশের মধ্যে বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন করলেন তা '৬৪ সালের পর আর দেখা যায়নি ('৬৭-র বছরটায়ও ভাষণ নির্বিঘ্ন হয়েছিল)। কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য একদল ছাত্র-ছাত্রীর বিধানসভার লবীতে হানা, বিক্ষোভ এবং মুখ্যমন্ত্রীর গায়ে হস্তক্ষেপ সভাকক্ষের বাইরের আবহাওয়া প্রচুর তাপ সৃষ্টি করেছিল। পুলিশ যথারীতিই নিষ্ক্রিয় ছিলেন যদিও এর অনতিপরেই রাজ্যপালের ভাষণে পুলিশকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় আরো সক্রিয় করার পর্যাপ্ত আশ্বাস ছিলো। তবুও বিধানসভার এই ঘটনা পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে বিচলিত না করলেও কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক দলকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করেছে এবং বাংলা কংগ্রেসের তিনজন মন্ত্রীসহ কিছু এম-এল-এ নাকি ইতিমধ্যেই পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যে ফ্রন্টের বকেয়া অন্তর্বিরোধ নিয়ে আলোচনার জন্য ঐদিনই সন্ধ্যায় সি পি আই অফিসে চৌদ্দ দলের নেতাদের যে বৈঠক বসেছিল তাও সম্ভবত

নেতাজীর ৭৪তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ময়দানের বিরাট জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি ভাষণ দিচ্ছেন। নিঃ ভাঃ ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি শ্রীহেমন্তকুমার বসু পাশে রয়েছেন।

অসময়ে শেষ করতে হয় বাইরে একই ছাত্র-ছাত্রী দলের প্রচণ্ড বিক্ষোভের ফলে।

বিধানসভায় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের ভূমিকাকে আরো জোরদার করার আশ্বাস ছাড়া, বৈষয়িক ক্ষেত্রে রাজ্যের শ্লথ গতি, ভয়াবহ বেকারী, চতুর্থ যোজনার অর্থলগ্নী ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা এবং নগরী উন্নয়ন চেষ্টায় অচলতার উল্লেখ করেছেন। রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গে ১৪ দলের সম্মিলিত শাসন-প্রচেষ্টাকে অভিনব বলে প্রশংসা করেছেন এবং সমগ্র দেশে জনতার যে অগ্রগতির সূচনা হয়েছে তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের জন-প্রগতির সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছেন।

মোটের ওপর রাজ্যপালের ভাষণে রাজ্যের অগণিত সমস্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু তার সমাধান-প্রয়াসের কোনো আশ্বাস নেই। রাজ্যে ভয়াবহ বেকারীর তিনি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু লগ্নীবৃদ্ধির জন্য তাঁর সরকারের কোনো চেষ্টার আভাস দেননি। অথচ, ১৯৬৭ সালের মার্চ থেকে শুরু করে পর পর তিন বছর ধরে এই রাজ্যে সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে এবং কেন্দ্রীয় উন্নয়ন দপ্তরের সর্বশেষ হিসেবে এই রাজ্যে কর্মসংস্থান দু শতাংশেরও বেশী হ্রাস পেয়েছে। রাজ্য যোজনার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলে সরকারী খাতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও অত্যন্ত সীমিত। অপরপক্ষে বেসরকারী খাতে, মূল-ধন স্থানান্তরের গুজব বিতর্কের বিষয় হলেও নতুন লগ্নীতে অনিচ্ছাই যে অতি মাত্রায় প্রবল সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না।

বৈষয়িক ক্ষেত্রের দিক থেকে যদি রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যায় তা হলে সেখানেও কোনো আশার আভাস নেই। রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন ফ্রন্টের গরিষ্ঠ দল হিসেবে সি পি এম তার ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করলেও পরবর্তী গরিষ্ঠ দল হিসেবে বাংলা কংগ্রেস নাকি তা সমর্থনে রাজী হয়নি। ফলে সি পি আই সদস্যা শ্রীইলা মিত্রকে প্রস্তাব সমর্থন করতে হয়। ভাষণ নিয়ে বিতর্কের কালে তার বিরুদ্ধে যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হবে বাংলা কংগ্রেস এবং সম্ভবত ফ্রন্টভুক্ত অপর কোনো কোনো দল সেই সম্পর্কে কি ভাবগতি অবলম্বন করবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। ফলে বিতর্কের পরি-সমাপ্তি কিভাবে ঘটবে তা নিয়ে জন-সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট ঔৎসুক্য ও উদ্বেগ থাকবে।

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখো-পাধ্যায় শ্রীজ্যোতি বসুর পূর্বেকার তিনখানি পত্রের তিন হাজার শব্দবিশিষ্ট এক দীর্ঘ উত্তর দিয়েছেন এবং এতে তিনি দাবী করেছেন যে নীতি অথবা জরুরী জনস্বার্থের প্রয়োজনে সরকারী যে কোনো দপ্তরের কাজে হস্তক্ষেপের তাঁর অধিকার আছে। উভয়ের এই পত্র-বিতর্কের সূচনা হয়েছিল গাজোল থানার ও-সির বদলী এবং মালদহের ৮টি ফৌজদারী মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশকে কেন্দ্র করে। মালদহের মামলা-গুলো যে ভুলে প্রত্যাহার করা হয়েছিল জ্যোতিবাবু সে কথা স্বীকার করায় এবং পুনরায় রুজু করার নির্দেশ দেওয়ায় সেই প্রসঙ্গের যবনিকাপাত হয়। কিন্তু গাজোল থানার ও-সিকে বদলী করে জ্যোতিবাবু যে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তা রদ করার পর বুধবার আবার সেইপ্রসঙ্গ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখন জ্যোতিবাবু পূর্বনির্দেশ বাতিল করে ও-সির বদলী ছমাসের জন্য স্থগিত রাখার আদেশ জারী করেন।

রণাঙ্গনে ভগবতী

আসামে চালিহার উত্তরাধিকারী মনো-নয়নের চেষ্টায় যে তৎপরতা চলছে তাতে শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী দিল্লীতে গিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন এবং ইতিমধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীভগবতী তেজপুর থেকে বিধানসভার আসনে প্রতি-দ্বন্দ্বিতার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। মন্ত্রি-সভায় শ্রীমহেন্দ্র চৌধুরীর সমর্থক বেশী হলেও, প্রদেশ কংগ্রেস ও বিধানসভার গরিষ্ঠসংখ্যক সদস্যই নাকি ইন্দিরা-সমর্থক। অপরপক্ষে, শ্রীমহেন্দ্র চৌধুরী এখন পর্যন্ত বিভক্ত কংগ্রেসের কোনো পক্ষের প্রতিই তাঁর সমর্থন ঘোষণা করেননি। অবশ্য রাজ্যের কংগ্রেস কর্মীদের ধারণা যে মহেন্দ্র-মোহন যদি ভবিষ্যৎ মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য মনোনীত হন তাহলে তিনি বিরোধী কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকবেন না, কারণ তাহলে প্রদেশ কংগ্রেস এবং বিধানসভায় তাঁর বিরোধীরাই দলে ভারী হবেন। আসাম রাজ্যকে যাতে অবিলম্বে এই সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে না হয় তার জন্য চালিহাকে বর্তমানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকতে সম্মত করার জন্যও চেষ্টা চলছে। অবশ্য তাঁর এই চেষ্টার সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করবে তাঁর স্বাস্থ্যের ওপরে।

উত্তরপ্রদেশে ছায়া মন্ত্রিসভা

উত্তরপ্রদেশে ইন্দিরা-সমর্থক বিধান-সভা সদস্যদের নেতারূপে শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীর নির্বাচনের ফলে প্রকৃতপক্ষে এই রাজ্যে শ্রীসি বি গুপ্তের বিরুদ্ধে একটা পাল্টা মন্ত্রিসভার ছায়ারূপ খাড়া হলো।

নতুন দল দাবী করছেন যে কংগ্রেস দলের মোট ২২৬ জন সদস্যের মধ্যে ১১৫ জন সদস্য তাঁদের সভায় উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য কংগ্রেস দলের বাইরেও আরো ২২০ জন সদস্য থাকবেন যাঁদের ভবিষ্যৎ মতি-গতিই যুক্ত মন্ত্রিসভার ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

বিহারে জোট বাঁধা শেষ

বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসনের অবসান ঘটিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠার জন্য যে তোড়জোড় চলছে তাতে ইন্দিরা-সমর্থক শ্রীদারোগা রাই গোষ্ঠী নাকি তাদের দলে ১৬৯ জন সদস্য ভিড়াতে সমর্থ হয়েছেন। বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যা ৩১৫। এদিকে বিরোধী কংগ্রেস, এস-এস-পি, জনসংঘ ও স্বতন্ত্র প্রতিনিধিরাও সম্মিলিত হয়ে বিহার বিধানসভায় সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠন করেছেন যার লক্ষ্য রাজ্যে লোকপ্রিয় সরকার গঠন করা। শ্রীদারোগা রাই তাঁর সমর্থনে পেয়েছেন, সি-পি-আই, সি-পি-এম, পি-এস-পি, লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস, ঝাড়খণ্ড, হাল ঝাড়খণ্ড, শোষিত দল, ভারতীয় ক্রান্তি দল ও নির্দলদের একাংশ। এছাড়া, তাঁর নিজের দলের সদস্য আছেন ৭২ জন। এস-এস-পি বিরোধী কংগ্রেসে ভেড়াই বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন।

কেরলে দুর্নীতির তদন্ত নাকচ

কেরলে শ্রীকুঞ্জুর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তের নির্দেশই শুধু বাতিল হয়নি এই সম্পর্কে হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে যে নাম্বুদ্রিপাদ যে তাঁর দলের নির্দেশানুযায়ী কাজ করেছেন তা মনে করার মতো তাঁরা যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন। আদালত আরো স্থির করেছেন যে শ্রীকুঞ্জুকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়ার অভিসন্ধিতেই তদন্তের ব্যবস্থা করা হয় এবং শাসনব্যবস্থার পবিত্রতা রক্ষার জন্যই যে এই পন্থা অনুসৃত হয়েছিল এরকম বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

বিচারপতিরা এই প্রসঙ্গে মন্ত্রিসভায় মার্কসবাদীদের সমর্থিত প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীবি ওয়েলিংডন সম্পর্কে ভিন্নরূপ ব্যবস্থা অনুসরণে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, কারণ ওয়েলিংডনের বিরুদ্ধেও একই সময়ে একই রূপ অভিযোগ আনীত হয়েছিল। বিচার-পতিরা মামলার খরচ বাবদ কুঞ্জুকে আড়াইশ টাকা হিসাবে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার ও শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ উভয়ের ওপরই নির্দেশ দিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পট পরিবর্তন

রাশিয়ার আশংকা যুক্তরাষ্ট্র এখন ধীরে ধীরে কম্যুনিস্ট চীনের দিকে সরে যাচ্ছে এবং লোকচক্ষের অন্তরালে চীনের সংগে মার্কিন ও জাপানের সমঝোতার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠছে। বাস্তবক্ষেত্রে রাশিয়ার আশংকার সমর্থনে যে খবরগুলো দেওয়া যায় তা এই যে রাশিয়া চীনকে সীমান্তের কিছু অংশ ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করা সত্ত্বেও চীন সমগ্র সীমান্ত থেকে রুশ সৈন্য প্রত্যা-হারের দাবীতে বেঁকে দাঁড়িয়েছে। রুশ-চীন আলোচনায় এই সংকটের অপরপক্ষে ওয়ারসয় সম্প্রতি দীর্ঘ দু'বছর বিরতির পর ২০ জানুয়ারী আবার চীনের সংগে যুক্ত-রাষ্ট্রের মীমাংসালোচনা শুরু হয়েছে এবং এর পর আরো যে বৈঠক হবে তার আভাস আছে। অপরপক্ষে, জাপানের প্রধানমন্ত্রী সাতো যেমন চীনের সংগে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ আগ্রহী তেমনি কুরিল দ্বীপপুঞ্জ ফিরে পাওয়ার জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানে আন্দোলন আবার জোরদার হয়ে উঠেছে। সমগ্রভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই নতুন চিত্র সোভিয়েটের পক্ষে উদ্বেগজনক না হয়ে পারে না।

নেতাজীর ৭৪তম জন্মদিবস উপলক্ষে দিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি গিরি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন।

বিশ্ব খাদ্য পরিকল্পনায় সাহায্য

ভারতসহ পৃথিবীর ৪৭টি দেশ গত-কাল রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব খাদ্য-কর্মপরি-কল্পনার চতুর্থ প্রতিশ্রুতি সম্মেলনে মোট ২১৫,৪২৩,৫০০ ডলার সাহায্য দেবে বলে ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে ১৪৮,২০১,৪৪৮ ডলার সাহায্য হচ্ছে দ্রব্যসামগ্রীর, ৩৭,০০০,-০০০ ডলার কাজে আর ৩০,২১৪,০৯২ ডলার নগদে। ভারত ৭৫০,০০০ ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সবচেয়ে বেশি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—মোট সাড়ে ১২ কোটি ডলার। মার্কিন সাহায্যের দুটি উদ্দেশ্য ঃ উন্নতি-শীল দেশগুলিকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সারা পৃথিবীর বিপন্ন এলাকায় খাদ্য সর-বরাহ।

সাধারণতন্ত্রের কুড়ি বছর

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতবর্ষের সাধারণতন্ত্রী সংবিধান প্রবর্তিত হয়। তার কুড়ি বৎসর এবার পূর্ণ হল। দুই দশক একটি জাতির জীবনে সময়ের হিসাবে সংক্ষিপ্ত হলেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভারতবর্ষে এই কুড়ি বছরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরীক্ষা হয়েছে যা নতুন প্রজন্মের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বহু পরীক্ষার মধ্যে এই সময় অতিবাহিত হওয়ায় সত্তরের দশকে এসে আমাদের দেশ ও সমাজ একটি ঐতিহাসিক বাঁক পরিবর্তনের মুখে এসে উপস্থিত।

পৃথিবীর নানা দেশের সংবিধানের কাঠামো সামনে রেখে আমাদের সংবিধানরচয়িতারা ভারতের সংবিধান প্রস্তুত করেছিলেন। এই সংবিধান পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ভিত্তি। কিন্তু সংবিধানপ্রণেতারা এই সংকল্পবাক্যও উচ্চারণ করে গেছেন যে, আমাদের উদ্দেশ্য হবে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা কখনই একটি জাতির পক্ষে শেষ কথা নয়। একটি জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সুযোগ এনে দেয় স্বাধীনতা। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষের মানুষ সেই সুযোগ লাভ করেছিল। তিন বৎসরের পরিশ্রমে ও যত্নে গণতান্ত্রিক সংবিধান রচিত হবার পর ভারতবর্ষ নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে ঘোষণা করে। এই সাধারণতন্ত্রের ভিত্তি হল প্রাপ্তবয়স্কের সর্বজনীন ভোটাধিকার। তাঁরাই হলেন নির্বাচক। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সংসদই হল সমস্ত ক্ষমতার উৎস। গত কুড়ি বছর ধরে অব্যাহতভাবে ভারতবর্ষে সাধারণতন্ত্র সংবিধান প্রচলিত আছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশে যখন সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে তখন ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক পরীক্ষা চালিয়ে গেছে নির্বিঘ্নে, এখনও সেই পরীক্ষাই চলছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য সমস্যা যতই থাকুক, অন্তত এই বিষয়ে তার মনে কোনো দ্বিধা নেই যে, গণতান্ত্রিক পথেই তাকে চলতে হবে।

রাজনৈতিক ভাঙাগড়াও কম হয় নি দুই দশকে। গত বৎসরেই বৃহত্তম ভাঙন হল ভারতের বৃহত্তম শাসক পার্টি কংগ্রেসের মধ্যে। একাদিক্রমে এই দল গত ২৩ বছর ধরে ভারতের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসীন। এখনও কেন্দ্রীয় ক্ষমতা নূতন কংগ্রেস দলেরই করায়ত্ত। তার তুলনায় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কোনো বিরোধী দল সমান ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে নি। অর্থাৎ কেন্দ্রে বিকল্প সরকার গঠন করার মতো ক্ষমতা কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনো একক দলের নেই। এইটিই ভারতের গণতান্ত্রিক পরীক্ষার দুর্বলতা। সমাজবাদী, কমিউনিস্ট, স্বতন্ত্র কিংবা জনসংঘও সর্বভারতীয় দল। কিন্তু সংসদে এঁদের প্রতিনিধির সংখ্যা নগণ্য। স্বতন্ত্র ও জনসংঘ দলে কোনো ভাঙন ধরে নি। কিন্তু সমাজবাদী ও কমিউনিস্ট দলে আজ বহু ভাঙন এবং প্রতিদিনই বলতে গেলে এই বামপন্থী দলগুলোতে ভাঙন দেখা দিচ্ছে। তাছাড়া কতকগুলো আঞ্চলিক দল সংকীর্ণ রাজনৈতিক আবেদন দিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং তারা কোনো কোনো অঞ্চলে ক্ষমতাও দখল করেছে—যেমন তামিলনাড়ুতে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগম এবং পাঞ্জাবে অকালী দল।

কংগ্রেস দলের শক্তিহ্রাসের ফলে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে। কেরল, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষ্যা ও পাঞ্জাবে ফ্রন্ট সরকার আছে। তামিলনাড়ুতে আছে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগম সরকার। বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশেও ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু দল ভাঙাভাঙির ফলে তারা ক্ষমতায় টিঁকতে পারে নি। কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রন্ট সরকার ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি নূতন প্যাটার্ণ। কেন্দ্রে যদিও নূতন কংগ্রেস ক্ষমতাসীন তথাপি পাল্টা কংগ্রেসের নেতারা এই সরকারের পতন ঘটাবার চেষ্টা করছেন। কোনো দলই নিশ্চিন্তে ক্ষমতা রাখতে পারছে না। কংগ্রেসও না, কংগ্রেস-বিরোধীরাও না।

সাধারণতন্ত্রী ভারতে এই যুগসন্ধির ছায়া আজ লক্ষ্য করবার মতো। কারণ, এক পার্টির শাসনাধীনে দীর্ঘকাল থাকার পর বহু পার্টির মধ্যে সেই ক্ষমতার বিতরণ হচ্ছে। তার ফলে কেন্দ্রে নূতন কংগ্রেস ক্ষমতাসীন থাকলেও রাজ্যগুলোতে তার ক্ষমতা ও প্রভাব আজ বিক্ষিপ্ত।

হয়তো এত বড় একটি দেশে বহু পার্টির উদ্ভব ঘটেছে সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণেই। দুই পার্টিভিত্তিক গণতন্ত্র থাকলে একটি দেশে রাজনৈতিক সাম্য ও সুস্থিরতা রক্ষা সহজ হয়। কিন্তু এত বড় দেশে তা গড়ে ওঠা যে কত কঠিন তা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক পরীক্ষা থেকেই বোঝা যায়। তা সত্ত্বেও সংবিধানের চার দেয়ালের মাঝখানে থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংকল্প নিয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সংবিধানকে ভাঙবার চেষ্টাও কোনো কোনো তরফ থেকে হচ্ছে। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে এই রাজনীতি যে ভাবা যায় না তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহভাবে সত্য যে, ভারতবর্ষের মানুষ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই সমাজবাদী লক্ষ্যে উপনীত হতে চায়। সশস্ত্র বিপ্লব বা হিংসার দ্বারা নয়। এই আদর্শ রূপায়ণের জন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে আজ ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কারণ ভারতবর্ষের মানুষ বহুদিন অপেক্ষা করে আছে তাঁদের প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ সমাজের জন্য। গণতান্ত্রিক উপায়ে তা না হলে দেশে বিশৃংখলা দেখা দেবার সম্ভাবনা। সাধারণতন্ত্র দিবসের বার্ষিকী যখনই আমরা পালন করি তখন সংবিধানপ্রণেতাদের এই সংকল্প — সমাজবাদী শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা—আমাদের কর্মপ্রেরণাকে নূতনভাবে সঞ্জীবিত করে।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

যদি অথবা যখন কোনো একটি বিষয় নিয়ে বিশেষ আলোচনা ওঠে ধরে নেওয়া চলে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, এবং তা নিয়ে কিছু উদ্বেগের কারণ ঘটেছে। নিশ্চিন্ত শান্তির অবস্থা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন বড় হয় না।

কোনো একটি ধর্মসভায় গিয়ে বসলে দেখা যাবে, মানুষ উত্তরোত্তর ধর্মহীন হয়ে পড়ছে এবং ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে, আলোচনার সুর এই খাতেই প্রবাহিত হচ্ছে।

'শিক্ষা' নিয়ে আলোচনা হোক, সেও শেষ পর্যন্ত যথার্থ শিক্ষার অভাব ও কুশিক্ষার প্রভাব সম্পর্কেই আক্ষেপের সুরে গিয়ে পৌঁছবে। ...শিল্প সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি যাকে নিয়েই আলোচনা সভা বা আলোচনাচক্র বসুক, অধিকাংশক্ষেত্রেই শেষ অবধি ওই 'হায় হায়' ধ্বনিই প্রকট হয়ে ওঠে। যেন যা হচ্ছে তা ঠিক হচ্ছে না, যা হচ্ছে না আশু সেটাই হওয়া দরকার, নচেৎ ওই ধ্বংস। ভুলই প্রমাদ ডেকে আনে। আর প্রমাদই ধ্বংস ডেকে আনে, এটা তো শাস্ত্রবাক্য।

অতএব 'আজকের সমাজ' নিয়ে যে ভাবনা, সেটা যে দুর্ভাবনা তাতে আর সন্দেহ কি। সেই সমাজকে যদি যথার্থ বিশেষণে বিভূষিত করতে হয় তো, এক নিঃশ্বাসেই বলা যায়, সে সমাজ হচ্ছে ধর্মহীন মর্মহীন, নীতিহীন প্রীতিহীন, বিচারহীন বিবেকহীন, সভ্যতাহীন সততাহীন, লোভী স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক উদ্ধত, অশান্ত অসন্তুষ্ট, বিদ্রোহী বেপরোয়া, নির্লজ্জ নিষ্ঠুর।

এক নিঃশ্বাসেই এই, খুঁজলে তো আরো অনেকই মিলবে। অবশ্য একত্রে এই বিশেষণের মালাটি দেখলে হয়তো মনে হতে পারে একটু বাড়াবাড়ি, কিন্তু আজকের সমাজ সম্পর্কে প্রতিনিয়ত যে চিন্তা এবং যে মন্তব্য তাকে বিশ্লেষণ করলে ওই বিশেষণগুলোই স্পষ্ট পরিষ্কার নিশ্চিত হয়ে উঠবে। তবে? এই যদি আজকের সমাজের চেহারা হয়, তা হলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বস্তিটা কোথায়? যেন আজ আমাদের ঈশান কোণে ঘন মেঘ, যেন মাথার উপর উদ্যত বজ্র, যেন পায়ের নিচে অজগরের ফোঁস-ফোঁসানি।

অতএব?

অতএব ভবিষ্যতের মন্দিরে ধ্বংসের ঘন্টা বাজলো বলে। অতএব উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা।

আজকের সমাজ সম্পর্কে এই এক-নজরের ছবি। এবং অতিরঞ্জিত ছবি বলে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না।

একজন সাহিত্যিক যখন একজন সমাজ-বদ্ধ মানুষের সত্তার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, তখন তাঁকেও এই ছবি উদ্বিগ্ন করে বৈ কি। তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্যে সে উদ্বেগের ছাপও পড়ে। এটা সর্বকালে এবং সর্বদেশেই কিছু পরিমাণে ঘটে থাকে। মহাকালের মহল থেকে 'কাল'কে খন্ড খন্ড করে চিহ্নিত করে রাখতে পারে সাহিত্যই। ইতিহাসে যে কথা অনুক্ত থাকে, সাহিত্যে সেকথা প্রকাশিত হয়।

যদি ধরে নেওয়া যায় সাধারণ পাঁচজনের থেকে সাহিত্যিকের অনুভূতি বেশী, বেদনাবোধ অধিক, ব্যাকুলতা তীব্র, তা হলে এটাও ধরে নিতে হবে আমাদের ক্ষয় অবক্ষয় অনাচার অনিয়ম তাকে অধিক পীড়িত করে।

আজকের সমাজ দেখে আজকের সাহিত্যিকের অবশ্যই বেদনা গভীর, জ্বালা তীব্র।

আজকের সাহিত্যে সেই বেদনার, সেই জ্বালার প্রতিফলনও আছে।

তবু আরও গভীরে একটি কথা থেকে যায়। সেই কথাটি হচ্ছে সাহিত্যিকের দ্বিতীয় সত্তার অন্তর্নিহিত কথা। সেই দ্বিতীয় সত্তাটির নজর ওই 'একনজরের ছবিতেই' আবদ্ধ থাকে না। তার নজর ব্যাপক বিস্তৃত স্বচ্ছ।

তার নজর দূরে পাল্লায়।
পিছনে এবং সামনে।
অতীত এবং ভবিষ্যতে।

'কাল' তার কাছে কেবলমাত্র 'বর্তমানের ফ্রেমেই' বাঁধাই নয়, অতীত ভবিষ্যৎ দুই কালকে নিয়েই তার বর্তমান কাল। তাই সে ভীতির কারণ দেখলেও ভীত নিশ্বাস ফেলে 'ধ্বংসের' প্রহর গোনে না। অতীতের অভিজ্ঞতা আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তাকে অভয় জোগায়।

বর্তমান লেখক, এই ধারণায় বিশ্বাসী—বর্তমান কাল'কে নিয়ে কোনো 'কালই' নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে থাকে না। যা হচ্ছে, তা যে ঠিক হচ্ছে না এ চিন্তা চিরন্তনের।

সমাজের যে আদর্শ ছবিটি কল্পনা করা হয়ে থাকে, সমাজ কোনোদিনই সে ছাঁচে ঢালাই হয়ে যুগকে স্বস্তি দেয় না। নিজে ঢালাই না হয়ে ছাঁচটাকেই গালাই করে তাকে ইচ্ছে মতো চালায়।

আজকের সমাজের দিকে তাকিয়ে আজকের যুগের যে হতাশা, যে আতঙ্ক, যে শিহরণ, অতীতের সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে অতীতকালের যুগেরও সেই হতাশা সেই আতঙ্ক সেই শিহরণ ছিল।

'সমাজ' কোনোদিনই চিন্তাশীল বা বুদ্ধিমানদের করায়ত্ত নয়, চিরদিনই তাদের অনায়ত্ত।

আয়ত্তাধীন হলে নিত্য নতুন শাস্ত্র সংহিতা আইন কানুন নিয়ম শাসন প্রবর্তনের তো প্রয়োজনই হতো না।

সমাজের ভূমিকা চিরদিনই দুঃশাসনের ভূমিকা। যুগে যুগে শুধু শৃঙ্খল ভাঙার ভঙ্গীটার বদল হয়, কৌশলটা নতুন হয়, আর বিশেষ কিছু নয়।

যদি বলা হয় আজকের সমাজের মতো এমন বিভীষিকাময় সমাজ আর কখনো আসেনি, তা হলে এই আজকের সমাজটাকে একটু বেশী প্রাধান্য দিয়ে বসা হবে। আজকের সমাজকে যে যে বিশেষণে বিভূষিত করা হয়ে থাকে, অতীতের সমাজেও সেই সেই 'ভূষণ'গুলির অভাব ছিল না। তবুও মনুষ্য সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়নি, দিব্যি টিঁকে আছে, এবং আমার তো নিশ্চিত বিশ্বাস থাকবেও টিঁকে। একটুকরো অর্বাচীন কাল মহাকালের চলতি খাতাকে বন্ধ করে দেবে এমন আশঙ্কার হেতু নেই।

হয়তো কোনো এক সময় দেখা যাবে ঈশান কোণের সেই ঘন মেঘ প্রলয়-টলয় না ঘটিয়ে বরং এক পশলা বৃষ্টি দিয়ে জমিটাই সরস করে দিয়ে গেছে, হয়তো

হঠাৎ চোখে পড়বে মাথার উপরকার উদাত বজ্রখানা মাথার কোনো ক্ষতি না করে কোন ফাঁকে নেমে এসে রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সমাজের অংগের সংগে দিব্যি মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে, হয়তো সহসা চোখে পড়বে পায়ের নিচের সেই অজগরটাকে পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে যাতায়াত চলছে, জনমানস কোন অবকাশে তার বিষের থলিটি তুলে নিয়ে স্রেফ হজম করে বসে আছে।

জনমানসের হজমশক্তিটা অতুলনীয়।

কতো বিষকেই যে দিব্যি হজম করে নেয় সে। কতো ভয়ংকরকেই পার করে ফেলে। শেষ অবধি হয়তো বা সেই ভয়ংকরকেই 'শুভংকর' করে ছাড়ে সে। তা নইলে এই ভয়ংকর পৃথিবীতে এতোকাল ধরে টিঁকে থাকবার কথা মানুষের মতো ছোট একটা সাড়ে তিন হাত মাত্র মাপের জীবের? জল স্থল আকাশ অন্তরীক্ষ গ্রহ নক্ষত্র কেউ তার অনকূলে নাকি?

জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ, গ্রামে সাপ শহরে লরী, বাতাসে রোগের জার্ম, মাটিতে হুকওয়ার্ম, রাস্তায় রাজনীতি, সংসারে অপ্রীতি, কর্মক্ষেত্রে 'বস'-এর বিরাগ, কোষ্ঠিতে গ্রহ বৈগুণ্য, ভাগ্যের অনিশ্চয়তা, মৃত্যুর নিশ্চয়তা, এবং আরো অনেক ইত্যাদি প্রভৃতি নিয়েও মানুষ পৃথিবীর গাছ আঁকড়ে টিঁকে তো আছে এতোকাল। থাকবেও নিশ্চিত। শুধু 'স্বস্তি শান্তি' নামক কয়েকটা অলীক জিনিসের কল্পনায় রাতদিন ছটফট করবে, সোনার অতীতের দিকে চেয়ে নিশ্বাস ফেলবে, ভবিষ্যতের অন্ধকার ছবি দেখে আতংকিত হবে, আর বর্তমানকে নিয়ে হিমসিম খাবে।

ওদিকে গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্ম, বর্ষাকালে বর্ষা এবং শীতকালে শীত কিছুতেই মানব সমাজের ইচ্ছায় গঠিত তাপমান-যন্ত্রের নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না, অথচ বসন্তকালে কলেরা বসন্ত, আশ্বিনে বন্যা, চৈত্রে ঝড়, যে কোনো সময় ঘেরাও এবং শ্লোগান, এসব থাকবে। থাকবে যুদ্ধ, শত্রুভীতি, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প।

আবার তথাপি মানব সমাজও থাকবে।

আজকের সমাজের দুর্নীতি রাজনীতি কালোবাজার চোরাকারবার, রাহাজানি খুনোখুনি, ব্যাঙ্ক লুঠ, গুন্ডোমী বিমূর্ত শিল্প, অশ্লীল সাহিত্য, চলচ্চিত্রে প্রগতি, বাজারদরের অগ্নিমূর্তি, ড্রেনপাইপ প্যান্ট, টপলেশ ব্লাউস, কেউই তাকে পেড়ে ফেলতে পারবে না।

সে থাকবে।

এবং শুধুই যে থাকবে তা নয়, সে লিখবে, আঁকবে ভাববে, নাচবে, গাইবে, খেলবে এবং খেলার টিকিট কিনতে লাইন দেবে। সে পাহাড়ে চড়বে আকাশে উড়বে, মারণাস্ত্র বানাবে, চাঁদে ছুটি কাটাতে যাবে।

তবু তখনও এই 'আজকের সমাজ'টার দিকে তাকিয়ে একটু আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলে বলবে, 'আহা কী সোনার কালকেই হারিয়েছি, আর কী হতভাগা কালই এলো।'

আসলে এই হচ্ছে সমাজ প্রকৃতি এবং মনুষ্য প্রকৃতির ধারা। গ্রহণ আর বর্জনের মধ্যেই তার লীলা অব্যাহত। আর প্রতিক্ষণ প্রতিকূলতার মধ্যে লড়াই করতে করতেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাসনা তার অনির্বাণ, নির্ভুল হবার ইচ্ছাটা অটুট।

এই নির্ভুল হবার ইচ্ছেতেই সর্বদা ঠিক হচ্ছে না ঠিক হচ্ছে না, গেল গেল ধ্বনি, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাসনাতেই তার যতোসব উল্টো-পাল্টা বিদঘুটে কান্ড।

অতএব আজকের সমাজের দিকে তাকিয়ে খুব একটা হতাশ হবার কারণ দেখিনা আমি।

সমাজে একদা যা কিছু ছিল, তার সব কিছু আছে, হয়তো তার সব কিছুই থাকবে। যুগে যুগে সমাজের পোষাকটাই বদলায়, কাঠামোটা বদলায় না। পোষাকটা কখনো ভন্ডামীর পালকে ঢাকা, কখনো বেপরোয়া দুঃসাহসের ছাঁটে উন্মুক্ত। আজ হয়তো ওই দুঃসাহসিক সমাজটাকেই দেখতে পাচ্ছি আমরা।

পৃথিবী যুগে যুগে কালে কালে বহু অন্যায় বহু অনাচার, বহু পাপচক্র, বহু নির্লজ্জতা পার হয়ে হয়ে আজকের সমাজে এসে পৌঁছেছে, যে-সমাজকে দেখে আপাতত সবাই ভীত সন্ত্রস্ত আতংকিত।

শুধু এদেশ নয়, এদেশ সেদেশ সর্বদেশ পৃথিবীকে এই জ্বালাতনে জ্বালাচ্ছে। কোনোদিকে তাকিয়েই ঈর্ষা করবার নেই। যে জ্বালায় আপনি আমি জ্বলছি, সেই জ্বালায় এরা ওরা তারা এবং আরো অনেকেই জ্বলছে।

কিন্তু পৃথিবী এ সংকটও অবহেলায় পার হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নাস্তি।

ব্যাধিই সেই ব্যাধি প্রতিরোধের ক্ষমতা এনে দেয়, সমস্যাই সমাধানের পথ খুঁজে বার করে, প্রশ্নই উত্তর আবিষ্কার করে।

অতএব হতাশ হয়ে বসে ধ্বংসের পদধ্বনি গোনবার দিন এসে গেছে বলে মনে করবার কোনো হেতু আছে, একথা আমার তো অন্তত মনে হয় না।

একথা সত্যি আজকের সমাজ আমাদের চিন্তিত করছে, পীড়িত করছে, জ্বালাতন করছে, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।

পৃথিবীতে যথার্থ সংকট শুধু সেইদিনই আসতে পারে, যদি—সাহিত্যিকের নির্লিপ্ত দৃষ্টি দূরকালের পথ থেকে সরে এসে খণ্ডকালের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে পৃথিবীকে মমতার দৃষ্টিতে না দেখে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে শেখে। পৃথিবীর দুষ্কার্যের কারণ নির্ণয় করবার চেষ্টা না করে তাকে গাল পাড়তে বসে।

করণিকের মত যদি হিসেব করি, তাহলে দেখতে পাই, সরকারী চাকরি করেছি ঠিক পঁয়ত্রিশ বছর আট মাস চার দিন আর রিটায়ার করেছি আজ এক বছর পাঁচ মাস পঁচিশ দিন।

হিসেবে যাই হোক, আমার কিন্তু মনেই হচ্ছে না এত দীর্ঘকাল চাকরি করেছি আর আমার বয়স উনষাট পার হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে এই সেদিন চাকরিতে ঢুকেছিলাম আর এখনও আমি পুরোদস্তুর যুবকই রয়ে গেছি।

অফিসের সাবর্ডিনেটরাও তাই ভাবত। শুধু পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি দৈর্ঘ্যই নয়, অথবা একচল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতিই নয় অথবা উনসত্তরই কেজি ওজনের কথাও নয়, যারা পঁচিশ বছর আগে যেমনটি দেখেছে, কালো চুল, চওড়া কব্জি, গায়ের চামড়া টান-টান, চকচকে, সোজা হয়ে চলা, এখনও ঠিক তেমনটিই দেখছে। বিদায় সভার শেষে যাকে চার্জ বুঝিয়ে দিলাম, যার নাম সত্যপ্রসাদ পাল, ছাপ্পান্ন বছরেই সে যেন নুয়ে পড়েছে। মাথায় টাক, মোটা কাঁচের চশমা, চোখের দুপাশে কাকের পায়ের ছাপ, খ্যানখেনে গলার আওয়াজ। আটান্নতে লাঠি ভর করতে হবে হয়ত। ফিচেল ছোকরা ঠিকাদার নরসিংহ নন্দী একান্তে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, আটান্ন কার হল স্যার, আপনার, না সত্যবাবুর?

রিটায়ার করার মাসখানেক আগে মেডিকেল চেক আপ করিয়েছিলাম। প্রেসার, ইউরিন, স্পুটাম, হার্ট, এমন কি, বুকের একখানা এক্স-রে প্লেটও করিয়েছিলাম—

সব অলরাইট। অবশ্য, মাড়ির দাঁত চারটে পড়ে গেছে। আর চশমা পকেটে থাকে, কিছু পড়তে হলে দরকার হয় নইলে চোখও অলরাইট।

রোজ সামনের পার্কে বেড়াতে যেতাম সন্ধ্যের পর। যখন পার্কে দারুণ ভিড়, বেঞ্চিতে বেঞ্চিতে ঠাসাঠাসি লোক, সবুজ মাঠের এখানে ওখানে গোল হয়ে বসে বাদাম বা ডালমুট খাওয়া, আইসক্রিমের চক্রযানের ছড়াছড়ি, কোথাও কথকতা বা খোল-করতাল সহযোগে নাম-কীর্তনের আসর, রাস্তার বড় লাইটের নীচে বসে তাস খেলার জটলা, যখন চলতে হলে ভিড় ঠেলে এগোতে হয়, সন্ধেবেলার সেই অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে বেড়াতে কিন্তু ভাল লাগত আমার। ওদের মধ্যে ঘোরাফেরা করে বয়সটা যেন আরও কমে যেত। ভাল লাগত ভিড়ে ও গোলমালে হারিয়ে যেতে।

হঠাৎ গিন্নি উপদেশ দিলেন, 'সন্ধ্যায় নয়, ভোরবেলা পার্কে যাও। সে সময় ভিড় একেবারেই থাকে না, পাড়ার রিটায়ার-করা সব বৃদ্ধই ঐ সময় যায়।'

প্রশ্ন তুলেছিলাম, 'রিটায়ার করেছি বটে, কিন্তু আমি কি বৃদ্ধ?'

সোজা জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে গিন্নি জ্ঞানদান করলেন, পঁয়ত্রিশ বছর ভিড় ঠেলে ঠেলে আজ ঘাটে এসে পৌঁছেছ, এখন নিরালায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় সামান্য ঘোরাই বিধেয়। স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে।'

যা বিধেয়, তা মানা ছাড়া উপায় কি?

তাই আজকাল ভোরেই যাই। এখন গ্রীষ্মকাল, জ্যৈষ্ঠ মাস অথচ বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই। রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। ঘাড় ধরে চারটেতে উঠে পড়ি। বেরুতে সওয়া চারটের বেশী হয় না। যখন ফিরে আসি, তখন পাঁচটা পেরিয়ে যায়। সামনের টার্মিনাস থেকে পাঁচটার প্রথম বাস ছাড়তে দেখি।

এত ভোরে পার্ক একদম ফাঁকা বলা যায়।

দু-চারটে দুষ্টু ছেলেমেয়ে আর দুটো বুড়ী আসে। পার্কের বাগানে যেখানে যত ফুল ফুটেছে, সব তুলে নিয়ে যায়। আমি জানি আর একটু পর সামনেই যে বাজার বসবে, সেখানকার ফুলের দোকানে ওরা এই ফুলগুলি বিক্রী করে দেবে কিংবা নিজেরাই দোকান খুলে বসবে। কেউ হয়ত বাড়ীর জন্যও নিয়ে যায়। জানি না। অথচ পার্ক দেখাশোনা করার জন্য কর্পোরেশনের লোক আছে। ভোরে দেখতে পাই, ঝাঁটা নিয়ে ওরা বেরিয়ে আসে, বেশ যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে ঝাঁট দিয়ে পথঘাট মাঠ পরিষ্কার করে ফেলে। ফুল ছেঁড়ায় ওরা বাধা দিতে পারে না? আমারই মেজাজ গরম হয়ে ওঠে, ভাবি, দিই ধমক। আবার ভাবি, কি দরকার, যাদের দেখবার কথা, তারা যদি না দেখে, আমার কি দরকার যেচে নাক গলাবার? আমি পাবলিক সার্ভিস থেকে রিটায়ার করেছি, ভোরের ওজন-ভরা নির্মল হাওয়া খেতে পার্কে আসি, আমার ও নিয়ে বিচলিত হবার দরকার কি?

যে গুটিকতক বৃদ্ধ আসেন, তাঁদের দেখে আমার ষাট বছরের যৌবন অনুভব করি।

একজন আসেন সিল্কের লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে। যৌবনে হয়ত খুব সৌখিন ছিলেন আর যা লম্বা দেখছি, স্বাস্থ্যও হয়ত ভরাট ছিল। বয়স আমার চাইতে দু-চার বছর বেশীই হতে পারে। কিন্তু এখনকার স্বাস্থ্য? সিল্কের আড়ালে শুকনো নিতম্ব আর স্যান্ডোর বাইরেই যখন কণ্ঠার হাড় আর লিকলিকে হাত দেখা যায়, তখন নীচেও নিশ্চয়ই পাঁজরার হাড় গোনা যাবে; খাঁচাটা মন্দ নয়, কিন্তু ভেতরের বস্তু উবে গেছে।

একজন আবার বাতের রোগী কিংবা কি জানি, হয়ত সেরিব্রাল থ্রম্বসিসের একটা মৃদু রকমের ধাক্কা কোনরকমে সামলে উঠেছেন। একটি ছেলেকে নিয়ে আসেন আর একটা মোটা লাঠি ভর করে হাঁটেন। হাঁটেন ঠিক নয়, একখানা পা ফেলে কয়েক সেকেন্ড জিরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে আর একখানা পা ফেলেন। পুকুরটা ঘোরা ত দূরের কথা, খানিকটে গিয়েই আবার ফিরে এসে অপেক্ষমান রিকসায় ছেলেটির সাহায্যে বহু কষ্টে উঠে বসেন।

আর একজন বৃদ্ধ আসেন বেশ স্মার্ট পোশাক পরে। স্পোর্টস শু, সাদা হাফ মোজা, পাটভাঙা খাঁকি হাফপ্যান্ট, কোমরে বেল্ট, স্পোর্টস গেঞ্জি প্যান্টের ভেতর ঢোকানো আর হাতে সরু স্টিক। কোন কোন দিন মুখে পাইপও দেখতে পাই। দুধের মত সাদা বিরল কেশ পরিপাটি করে ব্যাকব্রাশ করা। পোশাক স্মার্ট ত বটেই, টান-টান হয়েই হাঁটতে চেষ্টা করেন, কিন্তু গতি কোথায়? আমি যখন পুকুরটা দু' পাক ঘোরা শেষ করে ফেলি, ভদ্রলোক তখন এক পাকও শেষ করতে পারেন না।

এমনি ধরনের আরও কজন আসেন।

আর এইসব ঝিমিয়ে-পড়া বুড়োদের মধ্যে আমি পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি উঁচু শরীর আর একচল্লিশ ইঞ্চি বুক নিয়ে দিব্যি গটগট করে পুকুরের চারদিক দিয়ে অন্ততঃ চারবার চক্কর মারি। দেখে ও'দের ঈর্ষা হয় কিনা জানি না।

পুকুরটা এমন কিছু ভাল নয়। জল কালো আর ভারী। নিশ্চয়ই নীচে প্রচুর পাঁক আছে। বর্ষাকালে পরিষ্কার করতে দেরী হলে জলদ জঙ্গলে ভরে ওঠে। মাঝখানে গাছপালায় ছাওয়া একটা দ্বীপ আছে, কিন্তু ওখানে যাবার কোন ঝোলানো পোল নেই। বাঁধানো ঘাটলা আর পাড়ে পাড়ে লোহার বেঞ্চি। চারদিকে লোহার খুঁটিতে পাইপ লাগিয়ে বেড়া দেয়া। আগে ছিল বাঁশের কেয়ারি, সুন্দর দেখাত। কিন্তু প্রতিবছরই স্নান করতে গিয়ে দু-একটা ছেলে মারা যেত। কাগজে অনেক লেখালেখি হল। তাই এই লোহার বেড়া দেয়া হয়েছে।

খুঁটির মাথায় কেরোসিন টিনে লেখা একটা নোটিশও দেখতে পাই, এই পুকুরের জলে নামা, স্নান ও বস্ত্রাদি ধৌত করা নিষিদ্ধ। লেখার রং ঝরে পড়ে হাতীমার্কা কেরোসিনের হাতীটাই বরং স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কিন্তু নোটিশ মানে কে? তবে ডুবে যাবার দুর্ঘটনা আর ঘটতে দেখছি না।

এমনি ডুবে যাবার একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল অনেক কাল আগে আমাদের দেশের বাড়ীতে। আমার বয়স তখন বাইশ বছর, ঢাকাতে বি-এ পড়ি। পূজোর ছুটিতে প্রতিবারের মত দেশের বাড়ীতে এসেছি। অনেক দিন পর রাঙাদাও এসেছেন বৌদি, ছেলেমেয়ে আর অল্পো ছোট শালীকে নিয়ে। রাঙাদাও চাকরি করেন ব্যাঙ্গালোরে। তাঁর

শ্বশুর বোম্বাইয়ের বাসিন্দা। প্রবাসী বাঙ্গালী। রুবি ত তার একুশ বছরের জীবনে বাংলা দেশই দেখেনি। সেই মেয়ে এল কিনা বিক্রমপুরের গ্রামে, তাও আবার বর্ষাকালে, যখন খাল, বিল, পুকুর, পথঘাট ডুবে গিয়ে জল একেবারে থৈ-থৈ করে। যখন নৌকো ছাড়া গতি নেই।

কিন্তু রুবি ভারী স্মার্ট মেয়ে। সাঁতার না জানলে কি হবে, নৌকোয় সে লাফিয়ে উঠত আর টাল সামলাতে না পেরে পাটাতনের ওপর পড়ে গিয়ে হি-হি করে হেসে উঠত।

একদিন আমায় ভীষণভাবে ধরে বসল তাকে নৌকো চালানো শেখাতে হবে। বৈঠা ডুবিয়ে জল টানবার ও জল কেটে বৈঠা তোলবার কৌশলটাও লক্ষ্য করেছে। ধরে বসল, শিখিয়ে দিন না, প্লিজ।'

কিন্তু শেখাব কাকে? মিষ্ঠা চাই ত। আমার হাটু, যেসে বসে আমার হাতের নীচে হাত গলিয়ে বৈঠাখানা দু'হাতে বেশ শক্ত করেই ধরেছে, তারপর যেই আমি ওটা ঘুরিয়ে চাড় দিলাম, অমনি শ্রীমতী গায়ের জোর দেখাতে গিয়ে একেবারে আমার গায়ের ওপর চিৎ হয়ে পড়ল আর হেসে উঠল হি-হি করে। বললাম, 'বৈঠা চালাতে হলে গায়ের জোর দরকার হয় না, দরকার হয় কৌশল।'

'সেই কৌশলটাই শিখিয়ে দিন না, প্লিজ।'

আর একদিন এমনি শেখাচ্ছি, এমন সময় ভুঁইমালী বাড়ীর পচা একটা গামলা বেয়ে আসছিল। গামলাটা মাটির, বেশ বড় সাইজের। ওতে একজন বসে ছোট্ট বৈঠা দিয়ে জল টানলে বেশ চলাফেরা করা যায় নৌকোর মত। আমাদের দেশে বলে, চাড়ী।

কিম্ভুত জলযান দেখেই রুবি বলে উঠল, 'আরেঃ, লোকটা কিসের ওপর বসে রয়েছে?' তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঠাওর করে দেখেই হাততালি দিয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল। নৌকো টাল খেল, টাল সামলাতে ওপাশে গেল, ওপাশেও টাল, তারপর এপাশ-ওপাশ করতে গিয়ে নৌকো কাৎ হয়ে জল উঠল, নৌকো ডুবে গেল। আর সেই সঙ্গে একখণ্ড ইটের মত রুবিও তলিয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লাম। শিভ্যালরি দেখাবার সুযোগ কি ছাড়া যায়?

নিমজ্জমানকে কিভাবে আলগা করে ধরে ধরে টেনে আনতে হয়, তা ভাল করেই জানা ছিল। কিন্তু রুবি আমায় কাছে পেয়ে একেবারে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরল আর চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। বললাম, 'আলগা দিন, নইলে আমিও যে ডুবে যাব।'

ও আরও টাইট করে ধরে আমার গায়ের সঙ্গে সেঁটে রইল।

ওকে বুকের ওপর ভাসিয়ে রেখে অনেক কষ্টে চিৎ সাঁতার কাটতে কাটতে যখন এসে মাটি পেলাম, তখন দেখি ওর হাত আলগা হয়ে আসছে, ও জ্ঞান হারিয়েছে। পাঁজাকোলা করে তুলে ওপরে এনে ওকে যখন মাটির ওপর শুইয়ে দিলাম, তখন জানাজানি হয়ে গেছে, বাড়ীর সবাই ছুটে বেরিয়ে এসেছেন। ভুঁইমালী পচা চাড়ী রেখে উঠে এসেছে। বাবা ওকেই ঘোড়াতাড়ি ডাক্তারের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন।

মা, বৌদিরা চীৎকার করে কান্না শুরু করলেন।

রাঙাদা নাড়ী ধরলেন, ভাল বুঝতে পারলেন না। আমায় বললেন, 'কান লাগিয়ে দ্যাখ্ ত।'

রুবির বুকের বাঁ-দিকটাতে কান পাতলাম। শোনা যায় না। কান চেপে দিলাম। তবু যেন বোঝা যায় না। এবার ঠেসে ধরলাম। হ্যাঁ, সামান্য আওয়াজ পাচ্ছি। টক-টক টক-টক।

যাক, রুবি বেঁচে আছে।

বাবা বললেন, 'অনেকখানি জল খেয়েছে মনে হচ্ছে। উঁচু লাগছে পেটটা। ওগো, শাড়ীর বাঁধনটা খুলে দাও।'

কাঁদতে কাঁদতে মা এগিয়ে এলেন। ব্লাউজের বোতাম খুলে ফেললেন, ব্রেসিয়ারের বাকলস খুলে দিলেন। বুকখানা একেবারে নগ্ন করে ভিজে আঁচল দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর সায়ার বাঁধন আলগা করে পেটের কাপড় অনেক নীচে নামিয়ে দিলেন। রাঙাদা বললেন, অনেকখানি জল খেয়েছে। উঁচু পেট।

কি করে জল বার করা যাবে?

একমাত্র উপায় ওর পেটটা ঠিক মাথার ওপর রেখে ঘোরানো। তাহলে চাপে মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসবে।

কিন্তু কে ঘোরাবে? কে তুলবে ওকে মাথার ওপর? শ্রীমতীর শরীরখানা কম নয়, তার ওপর জল খেয়ে ওজন আরও বেড়ে গেছে।

সবাই তাকালেন আমার দিকে। পাঁচ ফুট এগারো না হলেও তখনই আটে উঠে গেছি আমি আর ছাতিও আটত্রিশ ছুঁই-ছুঁই। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'পারবি তুই?'

নিশ্চয়ই পারব। কষ্ট করে হলেও পারতে হবে যে! শিভ্যালরি দেখাবার সুবর্ণ সুযোগ কি ছাড়তে আছে? একবার সুযোগ পেয়েছি জলের মধ্যে রুবি যখন দু'হাতে আমার গলা কঠিনভাবে জড়িয়ে ধরেছিল আর আমি ওকে বুকের ওপর তুলে নিয়ে চিৎ সাঁতার কেটে পাড়ে এসেছিলাম। আবার একটা সুযোগ: বললাম, 'পারব।'

মা শাড়ী খুলে নিলেন, সায়ার দড়িটা বেঁধে দিলেন, জামাটা আলগাই রইল।

মরতে বসেছে যে, তার আবার লজ্জা-সরমের বালাই রাখলে চলবে কেন?

মাথায় তুলে বার কয়েক ঘোরাতেই সত্যিই মুখ দিয়ে অনেকখানি জল বেরিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে ডাক্তারও এসে পড়লেন।

সে যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেল রুবি।

বাইশ বছর বয়সের কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। সেই প্রথম যুবতী নারীর নিবিড় স্পর্শ পেয়েছিলাম আর দেখেছিলাম নগ্ন বুক আর নগ্ন পেট। কি মসৃণ, কি সুডৌল আজও মনে করলে ব্লাডপ্রেসার বোধ হয় বেড়ে যায়!

সমস্ত ঘটনা শুনেও রুবির আচরণে কিন্তু বিন্দুমাত্র ভাবান্তর দেখিনি। আবারই মত সে প্লিজ প্লিজ করে শুধু নৌকো চালানো নয়, সাঁতারও শিখে ফেলল। আমার সঙ্গে প্রায়ই সাঁতার কাটত আর মাঝখানে গিয়ে এমনি সব মারাত্মক ভঙ্গি নিত যা দেখলে আর হাসত যে, আমার মন গরম হয়ে উঠত!

দেখেশুনে রাঙাবৌদি ত' প্রথমেই কথা বলেছিলেন, ঠিক না কাছাকাছি বয়স, দু'টিতে মানাবে ভাল।

রাঙাদা মত দেন নি।

যাবার সময় একান্তে রুবি কান্না করে বলেছিল, চলে যাচ্ছি, কিন্তু আমার মন পড়ে রইল তোমার কাছে।

আমিও তেমনি জবাব দিয়েছিলাম, আর আমার মন চলে যাবে তোমার সঙ্গে।

তারপর দীর্ঘ জীবনে আরও অনেক রুবি এসেছিল। পার্কটা ঘুরতে ঘুরতে তাদের কথা মনে পড়ে। ভালই লাগে মনে করতে। সেখানে ত' আর চাকরির মত আটান্ন বছরের সীমানা নেই।

ভালই চলছিল পার্কের প্রাতর্ভ্রমণ।

কিন্তু ক'দিন আগে একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে গেছে।

ক'দিন থেকেই লক্ষ করছিলাম। রিটা-য়ার-করা বুড়োদের মাঝে একটি অল্প-বয়সী, মানে যুবতী মেয়েও আসতে শুরু করেছে। কোন দিন আমি ওকে ক্রশ করে যাই, কোনও দিন ওভারটেক করি। ভারী মিষ্টি এক ঝলক গন্ধ পাই।

রীতিমত ফর্সা আর সুন্দরী। সিঁথিতে আর কপালে সিঁদুর। বেশ লাগে দেখতে। কিন্তু ঐ যে আজকালকার পোশাক, যাকে বলে আলট্রামডার্ণ, ওটা ভাল লাগে না। স্যান্ডোগেঞ্জির মত ব্লাউজের হাত, বুকের নীচেই শেষ আর শাড়ীর শুরু নাভির নীচে থেকে। শাড়ীখানাও সিল্কের, শুধু এক-একদিন এক-এক রকম ডিজাইন ও রং। খোলা পার্কের হাওয়ায় আঁচলখানা উড়ে উড়ে যায় কিংবা গায়ের সঙ্গে সেঁটে ধরে। ফলে শরীরের স্ট্যাটিসটিকস তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। আঁচল খসে পড়লে দেখেছি ব্লাউজের গলা মারাত্মক রকম ডিপ। ক্রশ করবার সময় প্রথম প্রথম মাথা নীচু করে শুধু খানিকটা মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পাশ কাটিয়ে যেত। পরে লক্ষ করেছিলাম, লজ্জা কেটে গেছে, টান টান হয়ে হাঁটে, চোখে চোখে চায়, দুষ্টু হাওয়া হঠাৎ এসে কখনও কখনও আঁচলটাও ছুঁইয়ে দেয় আমার শরীরে।

কিন্তু মেয়েটির খালি পা। ভোরে খালি-পায়ে হাঁটা নাকি স্বাস্থ্যপ্রদ।

তবু আর ত কাউকে দেখিনি।

অনেক কাল আগে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়ে দেখেছিলাম, সুবেশা মেয়েরা ঘাস-ঢাকা পথে ভোরবেলা দল বেঁধে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সবার খালি-পা। শুনে-ছিলাম, ওটাই ওখানকার নিয়ম, কারণ, ওটা স্বাস্থ্যপ্রদ।

কি জানি, হয়ত এই মেয়েটি শান্তি-নিকেতনের।

হঠাৎ একদিন দেখি, মেয়েটি ঘাসের ওপর বসে পড়ে পায়ের তলা চেপে ধরেছে, রক্ত দেখা যাচ্ছে।

আমি তখন লম্বা লম্বা পা ফেলে ওকে ক্রশ করছিলাম। বেদনাপাণ্ডুর চোখে যেভাবে তাকাচ্ছে আমার দিকে, না এগিয়ে পারলাম না। আর যে ক'জন মর্ণিং ওয়াক করছে, ওদের তুলনায় আমি যে ষাট বছরের যুবক।

'কি হয়েছে?'

কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, ঘাসের মধ্যে কোথায় কাঁচের টুকরো ছিল, দেখতে পাই নি, অনেকখানি কেটে গেছে।'

দেখলাম কাটাটা। না, খুব অনেকখানি নয়, তবে ডিপ হতে পারে।

ও আবার বলল, 'দাদু, কাঁচটা বোধ হয় ঢুকে রয়েছে, বড্ড জ্বালা করছে।'

টেনেটুনে দেখলাম, কোন টুকরো আছে কিনা বোঝা গেল না।

কেঁদেই ফেললো মেয়েটি, 'দাদু আমি বাড়ী যাব কি করে?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় থাক?'

'দুলাল মুখার্জী লেনে।—উঃ ব্যথাটা যেন ক্রমেই বাড়ছে।'

ইতিমধ্যে সেই বুড়োরা এসে গেছেন।

সিল্কের লুঙ্গি বললেন, দুলাল মুখার্জি লেন ত বেশ দূরে, রিকসায় যেতে হবে।'

এত ভোরে রিকসা কোথায় পাওয়া যাবে? পথের দিকে চাইলাম, থ্রম্বসিস ভদ্র-লোকের বাঁধা রিকসা ছাড়া একটিও নেই। দিনরাত খাটবার পর ওরাও ত একটু বিশ্রাম করবে। আমাদের মত রিটায়ার করেনি।

থ্রম্বসিস বুঝলেন ব্যাপারটা। নিজে থেকেই বললেন, 'তাহলে আমার রিকসাটাই যাক, নামিয়ে দিয়ে আসুক, আমি ততক্ষণ বেঞ্চিতে বসছি।'

স্পোর্টস গেঞ্জি বললেন, 'তাড়াতাড়ি এ টি এস দেয়া দরকার।'

মেয়েটি কেঁদে ফেলল, 'দাদু, আমি একা যেতে পারব না, হাঁটতেই পারব না। আপনি আমায় পেঁছে দিন দাদু!'

বললাম, 'আমি তোমায় তুলে দিচ্ছি, ওখানে কেউ নামিয়ে নেবে।'

'না, না, দাদু, আমার ভীষণ ব্যথা করছে, আমি উঠতেই পারছি না।'

বুড়োরা বলল, 'যান না সঙ্গে, আবার এই রিকসাতেই চলে আসবেন। আপনার মেয়ের বয়সী মেয়ে—যান না!'

'দাদু!' মেয়েটি ঘাসের ওপর প্রায় এলিয়ে পড়ল। সত্যিই ওর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ফর্সা মেয়ের গালে জল। হাতের ফাঁকে রক্ত। ফর্সা মেয়ের ফর্সা হাতে রক্ত। সেই সিল্কের শাড়ী, সেই মিষ্টি গন্ধ!

অগত্যা। অগত্যা আমি ওর কোমর বেড়িয়ে ধরলাম আর মেয়েটি ডান হাত আমার কাঁধে তুলে দিয়ে কোনরকমে এক পা তুলে লাফাতে লাফাতে উঠল রিকসায়। আমি ওর পাশে বসতেই ও যেন গা ছেড়ে দিল আমার গায়ে।

কিন্তু অতটুকু জায়গায় দুজনেই কি আলগা হয়ে বসা যায়? ঘেঁসাঘেঁসি নয়, একেবারে ঠাসাঠাসি হয়ে গেলাম।

খুব বকুনি দিলাম খালি পায়ে স্টাইল করে বেড়াবার জন্য। তারপর জিজ্ঞেস করলাম।

বলল, ওরা রিফিউজী, খুলনা থেকে এসেছে। কতদিন স্টেশনে, তারপর ফুট-পাথে না খেয়ে কেটেছে। বাবা ত' ফুট-পাথেই মারা গেছেন বিনা চিকিৎসায়। অনেক চেষ্টা করে দাদা একটা চাকরি জুটিয়ে এই দুলাল মুখার্জী লেনে বাসা করেছে। পান্নার বিয়ে দিয়েছে। স্বামী সরকারী অফিসে চাকরি করে। শেষ দিকে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল, 'আমাদের বড় কষ্টের সংসার দাদু।'

কষ্ট! মনে মনে প্রশ্ন করলাম, একেক দিন একেক রংয়ের সিল্কের শাড়ী কি কষ্টের চিহ্ন?

একটা টিনের বাড়ীর সামনে রিকসা থামাল পান্না। সেই বারো ঘর, এক উঠোন। রক্ষে যে উঠোনে ঢুকে প্রথম ঘরখানাই ওদের।

মা বোধহয় কলতলায় ছিলেন। গামছা পরে ঘরে আসতে পারলেন না, দরজার আড়ালে দাঁড়ালেন। বললাম সব ঘটনা। এখুনি যে ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে এ টি এস দেয়া দরকার, কাঁচের টুকরো ভেতরে রয়ে গেছে কিনা দেখা দরকার, তাও বললাম।

পান্না বলল, 'দাদুকে একটু চা করে দাও না মাসী।'

মাসী! তাহলে মা নয়। মা কোথায়? চমৎকার গদি-আঁটা পালঙ্কে বসে আমি। পাশে অর্ধশায়িত পান্না। ওদিকে ড্রেসিং-টেবিল। আলমারীতে কিউরিয়ো।। আলনায় দামী দামী শাড়ী। টিপয়ের ওপর ফুল-দানী। এই কি কষ্টের সংসারের নমুনা? ওর দাদাই বা কোথায়? আর স্বামী?

হঠাৎ দারুণ সন্দেহ হল। একচল্লিশ ইঞ্চি বুকটাও দারুণ কেঁপে উঠল। চোখে যেন অন্ধকার দেখলাম! 'উঠি' বলেই উঠে দাঁড়ালাম।

এলিয়ে পড়া পান্নার সিল্কের আঁচল তখন পড়ে গেছে। ডিপকাট ব্লাউজে ঢাকা বুকটা উঁচিয়ে তুলে হাত বাড়িয়ে ঠোঁট টিপে হেসে হেসে বলল, 'আপনি যেন কেমন দাদু। বসুন না। দাদু, ও দাদু—'

জবাব না দিয়ে বেরিয়ে এলাম। রিকসায় উঠেই বললাম, 'জলদি চল।'

উল্টো দিকের রকে হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তুলে বসে একটা লোক দাতন করছিল। বিশ্রি মুখভঙ্গী করে খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল।

আজ স্থির করেছি আর পার্কে যাব না। ওজোন-ভরা হাওয়া আমার দরকার নেই। গিন্নী বললেও যাব না।

মৃত্যুহীন প্রাণ

মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল থেকে ১৯২৫-এর ৭ জুলাই তারিখে সুভাষচন্দ্র বাসন্তী দেবীকে একটি পত্রে লিখেছিলেন—

'মা, এতদিন পত্র দিবার চেষ্টা করি নাই, কলমে ভাষা আসছিল না,—হাত অবশ হয়ে যাচ্ছিল। প্রথমে যখন খবরের কাগজ দেখি— তখন বিশ্বাস করিতে পারি নাই। তারপর যখন সমস্ত কাগজে একই কথা দেখলাম—তখন বাস্তবের কাছে মাথা নোয়াতে হল। তিনি নিজে আমাকে লিখেছিলেন যে ২।৩ মাসের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে আবার কর্মের মধ্যে ঝাঁপ দিবেন। সকলেই আশা করেছিল যে তাঁর অসমাপ্ত কাজ তিনি সমাপ্ত করবেনই। কিন্তু এর মধ্যেই বজ্রপাত! বজ্রপাতে লোকের শরীর-মন অল্পক্ষণের জন্য অবসন্ন থাকে কিন্তু এ হেন অশনিপাতে অবসন্নতা সহজে দূর হয় না।'

১৯২৫-এর ১৬ জুন দার্জিলিং-এ স্টেপ-এসাইড নামক ভবনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সেই মৃত্যু সেদিন সমগ্র দেশবাসীকে যে কিভাবে আকুল করেছিল তা সেদিন বয়সে বালক হলেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আসমুদ্র হিমাচল সেদিন চঞ্চল হয়েছিল, আর বাঙালীর এই মহাসর্বনাশে সমগ্র বাঙালী সমাজ মহামান হয়ে পড়েছিলেন। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ভাষায়—

'একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে—এ সেই। আজ আমরা যাহারা তাঁহার আশেপাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই, পরের কাছে জানাইতে ভালোও লাগে না।'

আর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন চার লাইন—

'এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।।

সেই মৃত্যুহীন মৃত্যুঞ্জয় চিত্তরঞ্জন দাশের এই বছর জন্ম শতবার্ষিকী—১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর তারিখে দেশবন্ধু ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, এই সংসারে ছিলেন মাত্র ৫৫ বৎসর, আর এই অল্পকালের মধ্যেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি এক মর্যাদার আসন লাভ করেছেন।

দেশবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবীণ সাহিত্যিক মণি বাগচী প্রচুর পরিশ্রম ও অনলস সাধনায় চিত্তরঞ্জন দাশের পূর্ণ জীবনকথা রচনা করেছেন এবং তাঁর জীবনীগ্রন্থ 'দেশবন্ধু' বাংলার জীবনী সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এই গ্রন্থের লেখক নীরবে একান্ত নিষ্ঠায় সারস্বত সাধনায় মগ্ন এবং সাহিত্যের যে বিভাগটিকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন তার লেখক সংখ্যাও যেমন পরিমিত পাঠকও তেমনই বিরল। এ তাবৎ তিনি স্বদেশের স্বনামখ্যাত মহাজনদের প্রায় অর্ধ-শতাধিক জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন যার মধ্যে অধুনাবিস্মৃত-প্রায় পূর্বসূরীদের মহাজীবনের কথা অসামান্য কৌশলে বিধৃত। তিনি জীবনী-সাহিত্য রচনায় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন, জাতীয় চরিত্র গঠনে তাঁর গ্রন্থাবলী বিশেষ সহায়ক, অথচ দুঃখের বিষয় কোনো রূপ রাষ্ট্রীয় বা অন্য প্রকারের সম্মানলাভ করা তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। তথ্যভূয়িষ্ঠ জীবনী-গ্রন্থ রচনায় মণি বাগচী একটি নিজস্ব ধারা প্রবর্তন করেছেন।

লেখকের এই গ্রন্থটি দেশবন্ধু-র জীবন-কথা শুধু নয়, এর মধ্যে আছে সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাস। তথ্যাদি সংগ্রহে তিনি অসংখ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং দলিলের উপর নির্ভর করেছেন। গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে সম্পূর্ণ এবং এই তিনটি খণ্ডই একত্রে সন্নিবেশিত। প্রথম খণ্ডে আছে ১৮৭০-১৯১৬, দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯১৭-১৯২২ এবং তৃতীয় খণ্ডে ১৯২২-২৫-এর কথা আছে। এই ৫৫ বৎসরের মধ্যে আছে বাঙালীর জাতীয় জাগরণের ক্রমবিকাশের ইতিহাস।

দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে আসমুদ্র হিমাচল সেদিন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল একথা বলেছি। বাংলার কবিকুল তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং কাজী নজরুল ইসলামের চিত্তনামা এই দিক থেকে একটি অবিস্মরণীয় শোকগাথা। যেদিন দেশবন্ধুর মরদেহ কেওড়াতলাঘাটে ভস্মীভূত করা হল সেদিন মহাত্মা গান্ধী অনেক আগে থেকেই শ্মশানে এসে একটি বেঞ্চ-এ বসেছিলেন, তিনি দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ফরোয়ার্ড দৈনিকের জন্য প্রবন্ধ লিখছিলেন আর কুমারটুলীর মৃৎশিল্পী গোপেশ্বর পাল একপাশে বসে তাঁর একটি মৃন্ময় মূর্তি গড়ছিলেন। গান্ধীজীকে আমরা এই অবস্থায় সেই বালক বয়সে প্রথম দেখেছিলাম। একথা মনে আছে যে, তিনি যে কতখানি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন সে তাঁর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে সেদিন বুঝেছিলাম। গান্ধীজীর সেই প্রবন্ধ ১৯ জুন ১৯২৫ তারিখে ফরোয়ার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধটি দিয়েই লেখক এই গ্রন্থটি সুরু করেছেন।

গান্ধীজী সেই প্রবন্ধে অনেক কথার মধ্যে লিখেছিলেন।

শুধু বাংলা দেশের উপর নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের উপর দেশবন্ধুর অসীম প্রভাব ছিল। ভারতের জনসাধারণের তিনি প্রিয় ছিলেন। তাঁর অসাধারণ ত্যাগ ছিল। তাঁর উদারতারও সীমা ছিল না। তাঁর প্রেমময় হস্ত সকলকে গ্রহণ করবার জন্যই প্রসারিত ছিল। তিনি যেরূপ মহান ছিলেন, তেমনি নির্ভীক ছিলেন। তাঁর জন্মভূমির প্রতি তাঁর অসীম অনুরক্তি ছিল। তিনি দেশের জন্য জীবন দান করেছিলেন। তিনি অপরিসীম শক্তিশালী দলগুলিকেও সংযত রেখেছিলেন। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও ধৈর্যের প্রভাবেই তিনি তাঁর দলকে শক্তিশালী করেছিলেন। এই অপরিসীম উদ্যমের জন্যই তাঁকে জীবনদান করতে হল। এই স্বেচ্ছায় ত্যাগ অতি মহান।"

গান্ধীজী এই প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান সমস্যায় দেশবন্ধুর অবিস্মরণীয় ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। দেশবন্ধু সকল প্রকার অনৈক্যকে দূরে রাখার জন্য সদা সচেষ্ট ছিলেন। গান্ধীজী লিখেছেন—

"দেশবন্ধু হিন্দু-মুসলমান মিলনের অনুরাগী ছিলেন এবং তাতে বিশ্বাস করতেন। তিনি নিতান্ত সংকট সময়েও হিন্দু ও মুসলমানকে সম্মিলিত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর চিতাগ্নি কি আমাদের অনৈক্যকে ভস্মীভূত করতে পারে না!"

এই প্রবন্ধেই তিনি সেই বিখ্যাত উক্তি করেন—"দেশবন্ধু মরেন নি—দেশবন্ধু চিরজীবী হোন।"

এই গ্রন্থের লেখক যথার্থই বলেছেন—"দেশবন্ধুর জীবন যেন একটি অসমাপ্ত কাব্য। তথাপি এমন মহোত্তম জীবন-বিন্যাস রাজনীতি ক্ষেত্রে আগে ত' নয়ই, পরেও আর দেখলাম না। তাঁর নেতৃত্বের পিছনে ছিল এক গভীর আদর্শবাদ। তাঁর সেই আদর্শের ভিত্তি ছিল নবীন জাতীয়তাবাদ যার প্রবক্তা ও প্রচারক ছিলেন টিলক-বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দ।' এই কারণেই দেশবন্ধু সমগ্র দেশে একটা আশ্চর্য ভাবগত সংহতি সাধন করতে পেরেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"অনেকে মনে করেন যে, স্বদেশ সেবাব্রতের উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার চরণে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করা। কিন্তু আমি জানি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর চেয়েও মহত্তর। তিনি তাঁর পরিবারকেও দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন এবং অনেকটা সফলও হয়েছেন।"

দেশবন্ধুর সমগ্র পরিবারই স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেন, পরিবারের প্রায় প্রত্যেকই ১৯২১-এর ধরপাকড়ে কারাবরণ করেন। রাজা হরিশচন্দ্রের মত দেশবন্ধুর দানব্রতের কথা কে না জানে। ১৯০৭-এ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের জীবনের দিক-পরিবর্তন সূচিত হয়। 'বন্দেমাতরম' ও 'সন্ধ্যা' নামক দুটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকার বিরুদ্ধে তদানীন্তন সরকার যে মামলা দায়ের করেন সেই মামলাকে কেন্দ্র করেই দেশবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন বিকশিত হয়ে ওঠে। এই মোকদ্দমায় শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিলাভে স্বদেশবাসী চিত্তরঞ্জনের প্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এরপর মানিকতলা বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দের সমর্থনে এগিয়ে এলেন সি আর দাশ আর শ্রীঅরবিন্দ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> He came unexpectedly, a friend of mine......You have all heard the name of the man who put away from him all other thoughts and abandoned all his practice, who sat up half the night day after day for months and broke his health to save me — Srijut Chittaranjan Das. When I saw him I was satisfied".

এই চিত্তরঞ্জন দাশ। এ শুধু তাঁর মহত্ত্ব বা নিষ্ঠার পরিচয় নয়, স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ না থাকলে সুদীর্ঘ দশমাস-কাল সব ছেড়ে এই একটি মোকদ্দমার পিছনে তিনি আত্মনিয়োগ করে ঋণগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের অসামান্য আইনজ্ঞান এবং নয়দিনব্যাপী বক্তৃতা আইনগত ভাষণের এক মহান নিদর্শন। কে আর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁর শ্রীঅরবিন্দ গ্রন্থে লিখেছেন—

> "Chittaranjan's speech for nine Days and it was an epic of forensic art, and the peroration with which he ended will rank among the classics of legal addresses".

চিত্তরঞ্জন দাশ এই ভাবেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন।

ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন—"যে সত্য আমার হৃদয়ে জ্বলিতেছে, যাহাকে আমার বক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইলে যে পাটোয়ারী বুদ্ধির আবশ্যক তাহা আমার নাই। আর নাই বলিয়া তার জন্য কোন অনুতাপও হয় না। ঐই আজ যে কথাগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই কথাগুলি প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, অম্লানবদনে অকুণ্ঠিত চিত্তে আপনাদের কাছে নিবেদন করিব।"

লর্ড রোনালডসে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি হার্ট অব আর্যাবর্ত' নামক গ্রন্থের একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদে এই ভাষণটি আলোচনা করেছেন এবং তার বিরূপ সমালোচনার সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে চিত্তরঞ্জনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনও করেছেন। চিত্তরঞ্জনের এই প্রথমতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভাষণ।

বলাবাহুল্য 'দেশবন্ধু' গ্রন্থের লেখক এই অধ্যায়টি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। চিত্তরঞ্জনের জীবনের গৌরবময় অধ্যায়ের এই সূচনা।

চিত্তরঞ্জনের কবিজীবন এবং 'নারায়ণ' পত্রিকার সম্পাদক চিত্তরঞ্জন সম্পর্কেও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। চিত্তরঞ্জনের জীবনের শুধু এই অধ্যায়টি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হতে পারে। করুণানিধান দেশবন্ধুর মৃত্যুতে লিখেছিলেন—"হিমগিরি কোণে দেবদারু-বনে পাগলা ঝোরার ধারার ন্যায়/ অশ্রুদরিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া মিলিত ভারত ভাসিয়া যায়/নাহি সে মরমী বাঙালীর কবি বাণীর পূজারী সে মৃগনাভি/জীবন-মন্ত্রেরে অমৃত বিলায়ে মিটায়ে দিয়েছে দেশের দাবী।"

দেশবন্ধুর মৃত্যু শুধু বাঙালীর জীবনে নয় ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক সুগভীর বেদনার ইতিহাস। দেশবন্ধুর বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ, পাটোয়ারী বুদ্ধির প্রতি প্রচণ্ড অনীহা এবং সেই সঙ্গে অসামান্য আত্মত্যাগই ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সাফল্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ। মণি বাগচীর এই গ্রন্থটি পাঠ করলে এই মহাজীবনের সংক্ষিপ্ত অথচ বিচিত্র জীবনের অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যাবে। দেশবন্ধুর জন্ম-শতবার্ষিকী মহালগ্নে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি এক অনন্য সংযোজন। গ্রন্থটিতে অনেকগুলি ছবি আছে।

—অভয়ঙ্কর

দেশবন্ধু (জীবন কথা) মণি বাগচী প্রণীত। প্রকাশক : মোহন লাইব্রেরী। ৩৫এ, নর্থ লেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম : পনের টাকা মাত্র।

সাহিত্যের খবর

গত শুক্রবার ১৬ জানুয়ারী শরৎ সমিতির উদ্যোগে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে কেওড়াতলা শ্মশানে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের দ্বাত্রিংশতম মৃত্যুদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন—'কেওড়াতলা শ্মশানে দীর্ঘদিন ধরে শরৎচন্দ্রের একটি স্থায়ী স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য এবং বালিগঞ্জ ত্রিকোণ পার্কে ১৩ কাঠা জমির জন্য শরৎ সমিতি কর্পোরেশনের কাছে আবেদন জানিয়ে আসছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই হয় নি। তিনি মেয়রকে বিষয় দুটি বিবেচনার জন্য আবেদন জানান। মেয়র প্রশান্ত শূর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিষয় দুটি বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন। বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে সেদিন শরৎ-স্মৃতি বেদীতে মালা অর্পণ করা হয়।

মাজি রসের একটি নতুন উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। বইটি নিয়ে আমেরিকায় বেশ হৈ-চৈও শুরু হয়েছে। অবশ্য উপন্যাস হিসেবে এর তেমন কোন অবদান নেই যাকে বলা যায় 'রিপোর্টাজ'—উপন্যাসটির রচনারীতি অনেকটা সেরকম।

সমস্ত উপন্যাসটি উত্তমপুরুষে লেখা। তাই জেমি, স্ত্রী তারোথির সঙ্গে উত্তমপুরুষে লেখা নায়কের দীর্ঘ ছাব্বিশ বছরের কাহিনী নিয়েই উপন্যাসটির পটভূমি গড়ে উঠেছে। আসলে লেখকের এই বর্ণনার মধ্যে এমন একটা চমৎকারিত্ব আছে, যা বইটিকে এত জনপ্রিয় করে তুলেছে।

নিগ্রো লেখক জাঁ টুমারের 'কেন' গ্রন্থটির পুনঃ প্রকাশ আমেরিকান সাহিত্যের আর একটি উল্লেখ্য ঘটনা। ১৯২৩ সালে যখন এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ব্যবসায়িক দিক থেকে প্রকাশক ক্ষতিগ্রস্ত হন। বর্তমানে 'পেপার ব্যাক'-এ 'হারপার এন্ড রো' কোম্পানী কর্তৃক বইটি পুনঃ মুদ্রিত হবার পর অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এবার বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন বর্তমান আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিগ্রো কবি আর্না বোঁতাপো। তিনি টুমারের জীবনী সম্বন্ধে যা উল্লেখ করেছেন—তা থেকে জানা যায়, ১৮৯৪ সালে তাঁর জন্ম হয়। কিছুদিন উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং নিউইয়র্কের সিটি কলেজে পড়াশুনো করেন। এক দশক সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করে তিনি শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে অবসরগ্রহণ করেন। তিনি দুইবার বিয়ে করেছিলেন এবং দুইবারই দুজন শ্বেতকায়াকে। ১৯৬৭ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রায় অজ্ঞাতবাসেই ছিলেন। টুমারের সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত হয় ১৯২০ থেকে কবিতা ও ছোট গল্প রচনার মাধ্যমে। বর্তমানে তাঁর প্রায় ৩০,০০০ হাজার গল্প, কবিতা অপ্রকাশিত অবস্থায় ফিস্ক ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে জমা রয়েছে।

'পাঞ্জাবি দরবার' হল পাঞ্জাবী লেখকদের কেন্দ্রীয় সংস্থা। এই সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে আছে প্রতি বছরের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নির্বাচন। ১৯৬৮-৬৯ সালে সাতটি গ্রন্থ বিভিন্ন শাখায় শ্রেষ্ঠ বলে নির্বাচিত হয়েছে। নির্বাচিত গ্রন্থগুলি হল—উপন্যাসে কৃপাল সিং কাসেলের 'ওয়ার্ড নম্বর ১০' এবং গুরুদয়াল সিংয়ের 'রাইতে দি ইক মুথি'। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, 'অমৃতে' গুরুদয়াল সিংয়ের ওপর একটি সাক্ষাৎকার কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল। যে নাটকটি শ্রেষ্ঠ বলে নির্বাচিত হয়েছে সেটি হল সুরজিৎ সিং সেঠীর 'ঘরে বিন ঘোর আন্ধার'। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে রবিন্দর রাভির 'শেহর তে জনগল'; কবিতার ক্ষেত্রে সুখ পাল্লাভির সিং হসরতের 'নূর দা সাগর'; সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রেম প্রকাশ সিংয়ের 'মোহন সিং দা কাভ লোক' গ্রন্থগুলিও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে।

ভারতীয় বিদ্যাভবনের উদ্যোগে পাঁচটি প্রয়োজনীয় গবেষণামূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলি হল কে গোপালস্বামীর 'গান্ধী ও বোম্বাই', কে শাস্থানাথের 'অ্যান অ্যানথোলজি অব ইন্ডিয়ান লিটারেচার', ভি বি কুলকার্ণির 'দি ইন্ডিয়ান ট্রিশুভারেট', সি রাজা গোপালাচারির 'মহাভারত' এবং কে শ্রীনিবাসনের 'থিরুক্কুরাল'। গত ২৯ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থগুলির প্রকাশ ঘোষণা করেন। প্রথম গ্রন্থটিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে গান্ধীজীর নেতৃত্বে বোম্বাইয়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার পরিচয় আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে রয়েছে ভারতীয় সাহিত্যের পরিচয়। ১৫টি প্রধান ভারতীয় ভাষার ইতিহাস ছাড়াও ভারতীয়দের দ্বারা লেখা ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'মহাভারত' হল রাজাগোপালাচারী লিখিত মহাভারতের দশম খণ্ড। গ্রন্থগুলি ভারতীয় সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে স্বীকৃতি পাবে।

'কবিতা' নামে গুজরাটি ভাষায় একটি ত্রৈমাসিক কবিতাপত্র প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংখ্যায় কয়েকজন বাঙালী কবির কবিতা অনূদিত হয়েছে। যাঁদের কবিতা অনূদিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীন্দ্র রায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, আশিস সান্যাল, গণেশ বসু, শিশির ভট্টাচার্য ও অমল ভৌমিক। কবিতাগুলি অনুবাদ করেছেন ভোলাভাই দেশাই। পত্রিকাটির সম্পাদক সুরেশ দালাল।

গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে উড়িয়া ভাষায় গান্ধীজীর উপর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গান্ধী স্মারকনিধির উৎকল শাখা প্রকাশ করেছেন ১৬ খণ্ডে গান্ধীজীর রচনার অনুবাদ। প্রথম খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন গোপবন্ধু চৌধুরী। গদাধর দত্ত, চন্দ্রশেখর মহাপাত্র এবং গোদাবরী দেবীও কয়েকটি গ্রন্থ গান্ধীজীর উপর রচনা করেছেন।

প্রখ্যাত কাশ্মীরী কবি আমিন কামিল একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। পত্রিকাটির নাম 'নায়েব'। কাশ্মীরী ভাষায় পত্র-পত্রিকার খুবই অভাব। সেই অভাব দূরীকরণের পথে এই পত্রিকাটি সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ খুব হৈ-চৈ তুলেছে। গ্রন্থটির নাম 'বিহে সুয়ে পান'। দুই বছর আগে তিনি সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার লাভ করেছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে তিনি আরও পরিণত।

১৮ জানুয়ারী কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউটের তৃতীয় সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হল। উদ্বোধনী সংগীতের পর শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সভাকার্য সূচনা করেন। এ বছরে বরণীয় মনীষী ও রবীন্দ্র সংস্কৃতির বাহক হিসেবে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী সাহানা দেবীকে 'রবীন্দ্র তত্ত্বাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শ্রীবিশী মন্তব্য করেন যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সুনীতিকুমারকে 'ভাষাচার্য' অভিধায় চিহ্নিত করেছিলেন এবং তাঁর অনলস প্রচেষ্টাতেই রবীন্দ্রনাথের ভাষাতাত্ত্বিক কর্মধারা পূর্ণতা পেয়েছে। সৌম্যেন্দ্রনাথও আজীবন রবীন্দ্র সংস্কৃতির ব্যাখ্যা প্রচারে ও সাংস্কৃতিক সংগঠন দক্ষতায় বর্তমান সমাজকে উজ্জীবিত করেছেন। সংগায়িকা সাহানা দেবী প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, রবীন্দ্র সংগীতকে ব্যাপক স্তরে প্রিয় করে তোলায় তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এঁরা বরণীয় ব্যক্তিত্ব। এছাড়া দু বছরের পাঠক্রমের সফল ছাত্র-ছাত্রীদের 'রবীন্দ্র জ্ঞানতীর্থ' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। এঁরা হলেন : অনুরাধা সেনগুপ্ত, কস্তুরী ঘোষ, চিত্রা মিত্র, জয়ন্তী ভট্টাচার্য, জয়ন্তী লাহিড়ী, দেবব্রত ঘোষ, পরেশ চক্রবর্তী, পূর্ণিমা মৈত্র, বাণীপ্রিয় পুরকায়স্থ, বুলবুল গঙ্গোপাধ্যায়, শাশ্বতী সেন ও হৃষিকেশ নায়ক।

ইন্সটিটিউটের সমাবর্তন উপলক্ষে সম্পাদকীয় বিবৃতিতে অধ্যাপক শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন। রবীন্দ্র প্রসঙ্গে গবেষণা গ্রন্থমালা, সুবিন্যস্ত গ্রন্থাগার ও আলোচনাসভার উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা বিশেষভাবেই উল্লেখিত হয়। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ সর্বোপরি কবি, তাঁর কবিমানস হচ্ছে যথার্থভাবে উত্তীর্ণতার দিশারী। সভাপতি শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সমাপ্তি-ভাষণে এই আশা ব্যক্ত করেন যে, বর্তমানের সফল ছাত্র-ছাত্রীরা আগামীকালে রবীন্দ্রনাথকে যথার্থভাবে জনগণের মানসে পৌঁছে দিতে চেষ্টিত হবেন। অনুষ্ঠান শেষে জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়।

নতুন বই

ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়

ননীমাধব চৌধুরী। প্রকাশক : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ; পি-২৩, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা ৬। দাম—পাঁচ টাকা।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞান বা 'অ্যানথ্রোপোলজী' নিয়ে লেখা পূর্ণাঙ্গ বাংলা বই-এর খুব অভাব আছে, এবং অভাবটা সম্প্রতি প্রকট হয়েছে এই কারণে যে, বিজ্ঞানসাহিত্যের আসরে নৃতত্ত্বের হাল হয়েছে 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র মতো। কী দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্র-পত্রিকায়, আবার কী বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থপ্রকাশের ক্ষেত্রে, কোথাও নৃতত্ত্বকে খুব একটা আমল দেয়া হচ্ছে না।

অবিশ্যি বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি চিরকালই অনাদৃত থাকেনি বাংলা সাহিত্যে। উনিশ শতকে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি নৃতত্ত্ব নিয়ে লিখেছেন। এখন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যে বাংলায় আর এ নিয়ে বিশেষ কিছু লিখছেন না, তার প্রধানতম কারণ বোধ করি এই যে, বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটির জৌলুসে পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদির কাছে কিছুটা নিষ্প্রভ।

সাম্প্রতিক এই আবহাওয়ার দিক থেকে বিচার করলে সন্দেহ থাকে না যে, আলোচ্য গ্রন্থের লেখক কিছুটা প্রথাবিরুদ্ধ এবং অনেকটা অবহেলিত এক পথ ধরে এগিয়ে যথেষ্ট দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এই দুঃসাহস এ-গ্রন্থটির একেবারে গোড়া থেকেই—উপক্রমণিকায় নৃতত্ত্বের সূত্রগুলোর আলোচনা থেকেই ধরা পড়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিদেশী নৃতাত্ত্বিকদের অনুসরণে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া, অন্যান্য অধ্যায়েও ভারতবর্ষের অধিবাসীদের পরিচয় যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচিত। এ-ধরনের সুন্দর, সুলিখিত ও অভিনব গ্রন্থ সুধীমহলে আদৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

●

বরাহনগর আলমবাজার মঠ—রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। ২১ বি রতনবাবু রোড। কলকাতা-২। প্রাপ্তিস্থান: মহেশ লাইব্রেরী ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা। দাম এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

আকারে ছোট হলেও বইখানির দাম অনেক। বরাহনগর আলমবাজারে মঠ নির্মাণের সুপ্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করেছেন শ্রীভট্টাচার্য। সেই সঙ্গে আছে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের তৃতীয় পর্ব, কাশীপুরে বরাহনগরে স্বামীজী, বরাহনগর কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ। এই বই পড়লে বিস্মৃত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের পরিষ্কার বিবরণ যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের অনেক অজানা খবরের সন্ধান মিলবে। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, আলমবাজার মঠ এবং বরাহনগর মঠের ছবি আছে।

●

ANTI-FACIST TRADITIONS IN BENGAL—Compiled by Indo-GDR Friendship Society, 27-G, College Street, Calcutta-12. Price Rs. 2.00.

ফ্যাসিবাদের মেয়াদকাল কুড়ি বছরের মতো। তিরিশ থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত মোটামুটি এই সময়টাকে বলা যায় তার পরমায়ুর পরিধি। সারা বিশ্বে তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ঐ সময়ে এবং তার পরবর্তী কয়েক বছর। বাংলাদেশের কবি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা রুখে দাঁড়ান নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে। জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের বিংশতিতম বার্ষিক উপলক্ষে সেই সব দিনের স্মৃতি স্মরণ করা হয়েছে। প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে প্রখ্যাত ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর তৈরী একটা বিখ্যাত মূর্তির প্রতিলিপি। ভেতরে অসংখ্য ফটোগ্রাফ, হাতে আঁকা ছবি, স্কেচ-এর মধ্য দিয়ে নাৎসী বিভীষিকার নগ্ন স্বরূপটি ফুটে উঠেছে। সে সময় লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ফ্যাসি-বিরোধী কবিতা, চিঠিপত্র ও রচনার অনুবাদ ছাপা হয়েছে প্রথমেই। তাছাড়া রয়েছে জহরলাল নেহরু, সুশোভন সরকার, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজিনী নাইডু, কে এম আশ্রফ, জি এম হুন্দার, আবুল কালাম আজাদ, মহাত্মা গান্ধী, হীরেন মুখোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকের রচনা ও ভাষণ। বাঙালি কবিদের কবিতার অনুবাদ ছাপা হয়েছে অনেকগুলি লিখেছেন বিনয় রায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, অমিয় চক্রবর্তী, নিবারণ পণ্ডিত, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন, সরোজকুমার দত্ত ও গোলাম কুদ্দুস। পুরো আর্ট পেপারে ছাপা এই সংকলনটি যে কোনো প্রগতিশীল পাঠকের কাছেই এক মূল্যবান দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

বিশ্ব ভারতী পত্রিকা (২৬ সংখ্যা : সংখ্যা ১)—সম্পাদক : সুশীল রায়। বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলকাতা—৭। দাম : দেড় টাকা।

বিশ্বভারতী পত্রিকা পঁচিশ বছর পেরিয়ে ছাব্বিশ বছরে পদার্পণ করেছে। প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুলিনবিহারী সেন, সুধীরঞ্জন দাস একসময় সম্পাদনা করেছেন পত্রিকাটি। পঁচিশ বছরের ইতিহাস নিঃসন্দেহে গৌরবজনক। কেবল রবীন্দ্রনাথ কিংবা রবীন্দ্রসাহিত্যের ওপর নয়, বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যের ওপর মননশীল, গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশে বিশ্বভারতীর খ্যাতি দুই যুগের। সময়োপযোগী ভাবনার সঙ্গে ঐতিহ্যাশ্রয়ী—অনুচিন্তনের গতিবেগে পত্রিকাটি বাংলা প্রবন্ধ পত্রিকার জগতে পাঠকের চাহিদাকে বরাবর পূর্ণ মর্যাদা দিতে পেরেছে। পত্রিকাটির সবথেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রথম থেকে অদ্য পর্যন্ত রচনার মান সম পর্যায়েই রয়েছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রসঙ্গে মূল্যবান প্রবন্ধ সমসাময়িক কালের বিদগ্ধজনরাই নিয়মিত লিখে আসছেন। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ক্ষিতিমোহন সেন, প্রবোধচন্দ্র সেন, পুলিনবিহারী সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জগদীশচন্দ্র বসু, নন্দলাল বসু, বুদ্ধদেব বসু, সুকুমার সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এঁদের লিখিত এবং সংকলিত বিভিন্ন রচনায় বিশ্বভারতীর পাতা সমৃদ্ধ। আরো অনেকে লিখেছেন। সে সম্পর্কে জানা যাবে ছাব্বিশ বর্ষ প্রথম সংখ্যায়। তাতে দীর্ঘ পঁচিশ বছরের লেখক ও তাঁদের রচনার সূচী সংকলিত হয়েছে। এই সংখ্যায় আছে মনোমোহন ঘোষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি ভাষণের অংশ, রথীন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি। অন্যান্য বিষয়ে লিখেছেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, শান্তিদেব ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ রায়, শৈলজারঞ্জন মজুমদার। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'পত্র পত্রিকায় বিভূতিভূষণ'। বিশ্বভারতী পত্রিকার ঐতিহ্য আশা করি দীর্ঘজীবী হবে।

●

সাহিত্য ও সংস্কৃতি (কার্তিক-পৌষ ১৩৭৬) সম্পাদক : সঞ্জীবকুমার বসু। ১০ হেস্টিংস স্ট্রীট। কলকাতা—১। দাম : দেড় টাকা।

শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু পাঁচ বছর ধরে এই প্রবন্ধের পত্রিকাটি সম্পাদনা করছেন। মননশীল গবেষণামূলক প্রবন্ধের এই পত্রিকাটিতে প্রবীণ ও নতুন লেখকরা সাহিত্য, শিল্প সংস্কৃতির ওপর আলোচনা করে থাকেন। সম্পাদক যোগ্যতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমান সংখ্যায়ও তার পরিচয় রয়েছে স্পষ্ট। সব থেকে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'আধুনিক নাটকের কয়েকটি সমস্যা'। অন্যান্য যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় (বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ চারখানি উপন্যাস), মলিনা রায় (মহাত্মা গান্ধী ও দীনবন্ধু এন্ডরুজ), কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় (রূপকল্প : রবীন্দ্রনাথ), তারকনাথ ঘোষ (কবি করুণানিধান), গোপাল ভৌমিক (স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা অনুবাদ সাহিত্য), গোবিন্দ মোদক (স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার চিত্রকলা), নরেন্দ্র দেব (স্বাধীনতা উত্তর বাংলা শিল্প সাহিত্য) এবং গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্য)। শেষের লেখাটি পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের সুন্দর আলোচনা।

●

আয়না (শারদ সংকলন)—সম্পাদক : অঞ্জন সেন। পি ২৩৯ লেক রোড। কলকাতা—২৯। দাম : দেড় টাকা।

লিখেছেন নরেন্দ্র দেব, জ্যোতির্ময়ী দেবী, জগদানন্দ বাজপেয়ী, শান্তশীল বসু, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, নচিকেতা ভরদ্বাজ, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, অঞ্জন সেন, রনজিৎকুমার সেন, মায়া বসু, দীপেন রাহা, অশোক কুণ্ডু এবং আ[...] কয়েকজন।

পূর্ব বাঙলায় রবীন্দ্র চর্চা

ভোরের কুয়াশা তখনও যায়নি মিলিয়ে। ঘুম ভেঙে এসে দাঁড়িয়েছি আঙিনায়। বাড়ীর প্রশস্ত উঠানের মাঝখান দিয়ে উঠেছে বিরাট পাঁচিল রাজবাড়ি। মা বললেন, ওধারে জ্যাঠামশায়ের ভিন্নসংসার।

এও যেন অনেকটা তাই।

একদিন আমাদের জমির মধ্যে কোন ভেদরেখা ছিল না। আমরা একখণ্ড জমির ওপর দাঁড়িয়েছিলাম। আমরা পরস্পরকে কোনদিন দুয়ারের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতে চাইনি। একে অপরকে ডেকেছি একই ভাষায়। আমাদের আনন্দ উৎসবে সকলেই ছিল সমান অংশীদার। কিন্তু আমরা আজ বিভক্ত। আমরা পরস্পর থেকে অনেক দূরে। কোনদিন ভাবিনি এমনভাবে বাঁচতে হবে আমাদের নিয়তিকে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু আজও আমাদের ইচ্ছা একই ভাষায় প্রকাশ করি। আজ পূর্ববাংলার সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সেখানকার সাহিত্যিকরা কিভাবে চিন্তা করেন, তার খবর রাখি না। কিন্তু ভুলে গেলে অন্যায় হবে সকলেই আমরা বাঙালী, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা।

ও বাঙলার সংস্কৃতিবান মানুষ খবর রাখেন এপারের বাঙলার। ও'রা জানেন বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল থেকে আধুনিককালের সাহিত্যসেবীরা ও'দের নিজের লোক। কিন্তু আমরা কি তা মনে করে আজও? ও'দের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের নিয়ে আলোচনা করি? দেশ-বিভাগ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে দুই বাংলার সীমান্ত হোল রুদ্ধ। আমরা এপারে নিজেদের নিয়ে খুশি। ও'রা কিন্তু তা নন। রাজনৈতিক বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করে এপারের মানুষকে ও'রা আজ আপনার জন মনে করেন।

কথাগুলো মনে পড়ছিল ঢাকা থেকে সদ্যপ্রকাশিত ছোট্ট একখানা বই পড়তে গিয়ে। দুশ একান্ন পাতার সুন্দর ছাপা বই 'রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা' লেখক আনোয়ার পাশা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক। রবীন্দ্রজন্মশত-বার্ষিকীতে প্রথম বেরিয়েছিল বইখানি ১৩৭০ কার্তিক তখন কিন্তু হাতে পৌঁছয়নি আমাদের। এখনকার এই বইটি দ্বিতীয় সংস্করণের, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত। ঢাকার স্টুডেন্ট ওয়েজ প্রকাশক।

আনোয়ার পাশার কাছে রবীন্দ্রনাথ অনেক কাছের মানুষ, আপনার জন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি রচনা তাঁর জানা। অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন বিশ্বকবির উদার মানবতাবোধ। হয়তো তা না হলে এমন সুন্দরভাবে একখানা বই লেখা সম্ভব হত না।

আনোয়ার পাশা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রথম স্রষ্টা। তিনি উপলব্ধি করেছেন, মানুষের হৃদয়-রহস্য রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোটগল্পের উপজীব্য বিষয়। নর-নারীর হৃদয়-পরিচয় এবং বাঙালী-জীবনের সহজ নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার সুরকে অতীতে কেউ এমনভাবে স্পর্শ করতে পারেননি। সমাজের নিম্নবর্ণের বাঙালীদের জীবনচিত্র রবীন্দ্রনাথের আগে এমনভাবে কেউ আঁকেন নি। বাইরের জগতের যতো আঘাত, প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের যতো সমস্যা সবেরই অংশ পেতে হয় জনসাধারণের একজন হিসেবে শিল্পীকেও। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন তেমনি একজন মহৎ শিল্পী। তাই তিনি অনেক গল্পে সমাজজীবনের যুগসঞ্চিত হীনতা ক্ষুদ্রতাকে প্রবলভাবে আঘাত হেনেছেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি যেমন সর্বব্যাপী এক পরমব্রহ্মের উপাসক ছিলেন তেমনি জীবনের প্রত্যেক স্তরেই তাঁর চিন্তা মহত্তের দিকে বৃহত্তের দিকে প্রসারিত ছিল। গল্পগুলিতে এই মহত্ত্বের সুরস্পন্দন শোনা যায়। তাছাড়া উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙলার চাল-চিত্রও রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে পাওয়া যায়। শহর কলকাতার সে সময়ের নতুন জীবন-বোধ এবং পল্লীবাঙলার কথা তাঁর গল্পের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পল্লীপ্রকৃতিতে মুগ্ধ যতখানি, গ্রামজীবনের অর্থনৈতিক ভাঙনের ছবি যেন ততখানি তাঁর চোখে পড়েনি—অন্তত ছোটগল্প লেখার পর্যায়ে নয়। হয়তো গ্রামের মানুষকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন খানিক দূরে থেকে। গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার গভীরে তিনি যেতে চাননি।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতি মানুষের আত্মীয়। 'অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালবাসার লোকের মত' প্রকৃতি মানুষের পরমাত্মীয়। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে আছে দ্বৈতসত্তা। প্রকৃতির ভূমিকার মধ্যে—একই সঙ্গে আছে সহানুভূতি এবং বিদ্রূপ, আগ্রহ এবং ঔদাসীন্য। যেখানে প্রয়োজন ছিল কোনো বাস্তব সামাজিক দৃষ্টির, অথবা কোনো মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে বাস্তব ঘটনা পরম্পরাকে চিত্রিত করার, সেখানে সবভাবে প্রকৃতির উপস্থাপনের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ গল্পের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিতে চেয়েছেন। কোথাও কোথাও এমন কি তিনি বাস্তব সংসার থেকে সরেও গেছেন। শিল্পীমনের কোনো এক অমর্তলোকের জীবনস্পন্দন অনুভব করার অভীপ্সাতেই হয়তো তা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ঐ ছবি বিভক্ত বাঙলার আধুনিক বাঙালীর চোখে ধরা পড়েছে। আনোয়ার পাশার মনের ভিতর রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি উঁচু স্থান অধিকার করে আছেন, তার পরিচয় রয়েছে বইখানির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। যে বাঙলায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রচার সীমিত সেই দেশে দাঁড়িয়ে এমন একখানি বই লেখা কি দুঃসাহসের পরিচয়, তা আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। এ বাঙলায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক বই। মূল্যবান উপাদান, এবং তথ্য এবং সারগর্ভ মন্তব্যে সে সব বই গবেষকের কাছে পরম উপাদেয়। কিন্তু আনোয়ার পাশার বইখানি ঠিক তেমন নয়। গল্পগুলির তিনি বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। আলোচনার প্রসঙ্গ হিসাবে কাহিনী বিচার করেছেন। পূর্বসূরীদের মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে কাজ সারেননি। নিজের বক্তব্য অতি সহজ গদ্যে লিখে গেছেন এবং নিজের বুদ্ধিতে বিচারের দায়িত্ব কিনেছেন।

বইখানি হয়ত এ বাঙলায় প্রচারিত হবে না। এইটাই সবথেকে দুঃখের কিন্তু মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক বিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা বাঙালীকে ধ্বংস করতে পারেনি। যাঁরা সবরকম বিদ্বেষ থেকে মুক্ত করে জাতিকে নতুনভাবে দাঁড়াবার প্রেরণা জোগাচ্ছেন, আনোয়ার পাশা তাঁদেরই একজন। সেজন্যে তাঁর কাছে বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞ বোধ করবে।

—সাংবাদিক

প্রথম কাহিনী-স্বপ্নচারিতা

মনের কথা বলার চিরাচরিত পদ্ধতি পরিহার করলে, অর্থাৎ সংবেদন ধারণা স্মৃতি চেতনা ইত্যাদির সংজ্ঞা বিবরণীতে কালক্ষেপ না করলে মনোলোকের কথা পাঠকদের কাছে বেশি চিত্তাকর্ষক হবে, এই অভিমত প্রকাশ করেছেন একজন প্রবীণ সাংবাদিক। তাঁর অভিমত শিরোধার্য করে ব্যক্তিমানসতার বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের পথে মনোলোকের কথা বলতে প্রবৃত্ত হচ্ছি। এই পর্যায়ে বিচিত্র ও বিভিন্ন প্রবণতার অনেক নরনারীকে আপনাদের সামনে হাজির করব, অনেক কাহিনী আপনাদের কাছে বিবৃত করব; মনোলোকের বহু সমস্যা, বহু সংকটের পরিচয় আপনাদের সামনে তুলে ধরব। কল্পিত কাহিনীর রসসৃষ্টি বাস্তব ও সত্য ঘটনাতে সম্ভব নয়, তবু মনে হয় আমার অতিপরিচিত এই সব নরনারী মনের জটিলতা সম্পর্কে আপনাদের আগ্রহ ও কৌতূহল জাগিয়ে মানস-বিজ্ঞানে অনুসন্ধিৎসু করে তুলবে। সত্য ঘটনা অনেক সময় অলীক কাহিনীর চেয়ে বেশি চমকপ্রদ হয়। তাই আশা করছি, এই সব কাহিনী ও চরিত্র আপনাদের খুব নীরস লাগবে না। এইসব চরিত্রের সুখদুঃখ, আশা-নিরাশা, ভাবনা-চিন্তার অংশীদার হতে হয়েছে, এঁদের সঙ্গে অন্তরের যোগসূত্র (র‍্যাপোর্ট) স্থাপনা করতে হয়েছে, ভালবাসার মাধ্যমে বিশ্বাস উৎপাদন করতে হয়েছে; তবেই এঁরা অকপটে মনের কথা খুলে বলেছেন, আত্মনিয়ন্ত্রণের পরামর্শ চেয়েছেন ও আমার নির্দেশমত পথ চলেছেন। এঁরা মনোবিদের পরমাত্মীয়। এঁদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় বা পারিবারিক সম্পর্কে ফাটল ধরে, এ আমি স্বভাবতই চাইব না। কাজেই কোনো সময়েই এঁদের সঠিক পরিচয় আমার লেখায় থাকবে না। আরো জানিয়ে রাখছি যে, যাঁদের সমস্যা-কাহিনী বিবৃত করতে যাচ্ছি, তাঁদের অনুমতি পূর্বাহ্নেই সংগ্রহ করেছি।
এবার ভূমিকা ছেড়ে কাহিনীপর্বে যাওয়া যাক।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং—টেলিফোনের ঘণ্টা বেজেই চলেছে। রিসিভার তুলতেই নারী-কণ্ঠের আকুল প্রশ্ন,—আমি কি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলছি?

—হ্যাঁ।

—আমি মিসেস্ ঘটক, আপনার একজন পুরোনো পেশেন্টের স্ত্রী। সেই রেসকোর্সের কেস। মনে পড়ছে কি? আপনার সঙ্গে দেখা হবে কি? আজই, এখনই হলে ভাল হয়।—হ্যাঁ, মিঃ ঘটকের সম্বন্ধে জরুরী আলোচনা দরকার।

—আচ্ছা সন্ধ্যার দিকে আসুন।

সন্ধ্যার পরেই মিসেস্ ঘটকের আবির্ভাব ঘটল। টেলিফোনে কণ্ঠস্বরে ভদ্রমহিলাকে চিনতে পারিনি, এখন চিনলাম। মিঃ ঘটকের কেস্‌টা এর মধ্যে পড়ে ফেলেছি। প্রায় বছর দশেক আগে চিকিৎসা করিয়েছিলেন। কেসটা একটু অদ্ভুত বলে ভুলতে পারিনি। চিকিৎসার সময় মহিলাটিও মাঝে মাঝে আসতেন। বিয়ের পরেই ঘটকের চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছিল। মিসেস্ ঘটক আসন গ্রহণ করেই বললেন—ও আবার রেসে যেতে শুরু করেছে।

এই ঘটক আমার কাছে এসেছিল উদ্বেগ উৎকণ্ঠার চিকিৎসা করতে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় সে অসুস্থ হয়ে পড়ত। শীত বসন্তে এই অসুস্থতা বৃদ্ধি পেত। বুকের কাছে অসহ্য যন্ত্রণা, বুক ধড়পড় ও বমনেচ্ছা, এই ছিল তার প্রধান উপসর্গ। হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মৃত্যু ঘটবে—এই ভয় তাকে পেয়ে বসেছিল। রক্তচাপ পরীক্ষা করাতো প্রতি সপ্তাহে, আর ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাম প্রায় তিন মাস অন্তর। ডাক্তাররা হৃদযন্ত্রের কোনো ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারেন নি। অনেক আশ্বাস ও অনেক ওষুধেও ঘটকের মৃত্যুভয় কাটে নি। তখন আমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। প্রথম দিকে আমি তাকে সম্মোহিত করে উপসর্গ নিরসনের সাধারণ অভিভাবন দিতে শুরু করি। কোনো বিশেষ ফল দেখা গেল না। একদিন শনিবার রাত বারোটায় তার স্ত্রী তাকে নিয়ে আমার বাড়িতে হাজির হলেন। শীতকালেও তার কপাল দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে, চোখেমুখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। রাত-দুপুরে তাকে নিয়ে খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। সেইদিন তার মৃত্যুভয়ের ও মনোবিকারের মূল কারণটা বুঝতে পারি। এবং মূল কারণ নির্ণয় করে চিকিৎসা করার ফলে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। সে অনেকদিন **ধরেই ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাচ্ছে ও বাজি** ধরছে। স্ত্রীর কাছে এই নেশার কথা সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিল। বিয়ের আগে এ নিয়ে কোনো সমস্যা আসে নি। বিয়ের পর তার মনে তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দিল। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে মদ্যপান, রেসে যাওয়া নিন্দনীয়। তাছাড়া রেসে লাভ যদি হয় একদিন, লোকসান হয় মাসের মধ্যে তিন দিন। অভাব অনটন প্রকট হয়ে ওঠে। স্ত্রীর কাছে লোকসানের টাকার একটা কাল্পনিক হিসাব দাখিল করতে হয়। স্ত্রীকে যেমন নিজের এই বদখেয়ালের কথা বলা যায় না, তেমনি আবার রেসের নেশাও ছাড়া যায় না। এই টানাপোড়েনের মধ্যে থেকে ঘটক অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার মৃত্যুভীতি ও অন্যান্য উপসর্গের মূলে ছিল এই দ্বন্দ্ব। ঐ রাত্রে তার স্ত্রী ও আমি এই বৃত্তান্ত জানলাম। এবং তারই অনুরোধে 'রেসের নেশা' দূর করার জন্য তাকে চিকিৎসা করলাম। নেশা কাটানোর প্রয়োজন বিয়ে না হলে ঘটক হয়ত অনুভব করত না। এই নেশা থেকে নিবৃত্ত হবার বাসনাটা ছিল একান্ত আন্তরিক, তাই আমি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সাফল্য লাভ করলাম। মনোচিকিৎসকের কাছে অনেকেই 'নেশা' ছাড়তে আসেন, কিন্তু ঘটকের মত আন্তরিক ইচ্ছে না থাকলে, চিকিৎসকের সকল চেষ্টাই পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হবার সম্ভাবনাই ষোলআনা। এ-আলোচনা অন্য রোগী-প্রসঙ্গে বিশদভাবে করব।

দশ বছর পরে ঘটক আবার রেসে যাচ্ছে। মনের বাধ্যকারী প্রবণতার পুনরাবৃত্তি বিরল নয় জানি, তবুও একটু হতাশ বোধ করলাম। নিজের পরাজয়ের জন্য ততটা নয়, যতটা ঘটক ও ঘটকপত্নীর ভবিষ্যতের জন্য। অনেকে নেশা করে রয়ে-সয়ে, আবার কেউ-কেউ নেশায় একেবারে বয়ে যায়। মদ্যপানের পর অনেকেই পানশালা থেকে স্খলিতচরণে হলেও নিজের পায়ে ভর দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেন, কিন্তু কিছুসংখ্যককে ধরাধরি করে ট্যাক্সিশায়ী করে দিতে হয়। অল্ আউট না হওয়া পর্যন্ত এরা থামতে পারে না। ঘটক 'অল আউটের' দলে। মাইনের দিনে শনিবার পড়লে মাসের সমস্ত রোজগারটি অশ্বচরণে নিবেদন করে আসাই ছিল তার অভ্যাস। তাই আমার হতাশাবোধ স্বাভাবিক।

যা হোক, উপস্থিত যেদিনের কথা বলছি

সেদিন ঘটকপত্নীর দিকে তাকিয়ে বললাম—ও'কে নিয়ে এলেই ত' পারতেন।

—ও আসবে না। রেসে যাবার কথা ও স্বীকারই করছে না। নভেম্বর মাস থেকেই টাকাপয়সার টানাটানি চলছে। মাইনের সব টাকার হিসেব দিতে পারছে না। পরশুদিন মাইনে পেয়েছে। ওর পকেটে কয়েকখানা এক টাকার নোট ও কিছু খুচরো পড়ে আছে। বাড়ীভাড়া, দুধের দাম সব আজ দেবার কথা, কিছুই দেওয়া হয় নি। আজ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলব, তবে সব ব্যবস্থা হবে।

উনি রেসে যাচ্ছেন আপনার সন্দেহ হল কেন?

ওর পকেটে 'জ্যাকপটপুলের' টিকিট পেয়েছি কাল, আর তখুনি আপনাকে ফোন করেছি।

—টিকিট ও'কে দেখান নি?

—ও অবাক হবার ভান করল। বলল, অন্য কেউ মজা করবার জন্য ওর পকেটে টিকিট পুরে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, টিকিটটা নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। যেন এই প্রথম দেখছে। আমার খুব ভয় করছে, ডাক্তারবাবু।

ভয়ের এতে কি আছে? মাইনে ত' ওর এতদিনে বেশ বেড়েছে; দু'পয়সা জমানোও আছে নিশ্চয়। তাছাড়া অভাবে পড়লে ও'র নিজেরই খেয়াল হবে নেশা ছাড়বার।

—অভাব-অনটনের ভয় নয়। অন্য ভয়। মনে হচ্ছে ও বোধ হয় কোনো বিপদে পড়েছে। শনিবার অফিসের পর ও কোথায় যায় ও কিছুতেই বলছে না কেন? রেসে নিশ্চয়ই। কিন্তু সে কথা আমার কাছে গোপন করছে কেন?

—রেসে যায় বলেই গোপন করছেন।

—কোনো কিছু বানিয়েও বলছে না কেন? সে সময় যেমন বলত। ও যা বলবে আমি তাই বিশ্বাস করব—এ ও জানে।

সত্যিই তো। এ রকম ক্ষেত্রে আর পাঁচ-জনের পক্ষে যে ব্যবহার স্বাভাবিক, ঘটক সেভাবে ব্যবহার করছে না। স্ত্রীকে খোলা-খুলি নিজের দুর্বলতার কথা জানাবেন অথবা মিথ্যে গল্প ফেঁদে তাঁকে ভোলাবেন, এইটেই ত' স্বাভাবিক। ধরা পড়ার পরও স্বীকার করতে চাইছেন না কেন?

—শনিবার বিকেলে কি করেন তিনি? কোথায় যান? কি বলেছেন?

—জিজ্ঞাসা করলে কি রকম যেন হয়ে যাচ্ছে। বলছে—মনে নেই। অফিসে বছর-শেষের বেশি কাজের ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে মনে করেছিলাম। ও বললে—না, অফিসে ত' ছিলাম না। পরশুদিন রেসের টিকিট দেখিয়ে যখন বললাম—আমার কাছে মিথ্যে বলে লাভ কি? স্বীকার কর—আজ অন্তত রেসে গিছলে। ও জোরগলায় অস্বীকার করল।

—পরশু দুপুরে উনি কোথায় ছিলেন?

—জানি না। ও ত' ঐ এক কথাই বলছে,—মনে নেই।

—অন্য দিন অফিস ফেরত বাড়ী আসেন?

—রাস্তায় আটকে পড়ে আধ ঘন্টা, প'য়তাল্লিশ মিনিট দেরি এক-আধদিন হলেও ঠিক সময়েই আসে। না আসতে পারলে ফোন করে জানিয়ে দেয়।

—শনিবারে আপনাকে কোনোদিন ফোন করেন নি?

—না!

ভদ্রমহিলার চোখ দিয়ে জল আসবার উপক্রম। সত্যিই ব্যাপারটা গোলমেলে। আমিও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। তবুও যতটা পারি আশ্বাস দিয়ে বললাম—ভয়ের কি আছে? ও'র এক-আধজন অফিসবন্ধুর কাছে খবরাখবর নিন। আর সম্ভব হলে ও'র এখনকার সব থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধুকে নিয়ে কাল আমার সঙ্গে দেখা করুন। ও'কে এসব কথা এখন জানাবার দরকার নেই।

মিসেস ঘটক চোখ মুছে বিদায় নিলেন।

নানা চিন্তা মনে আসতে লাগল। কিন্তু একথা সেদিন একবারও মনে আসে নি যে স্বপ্নচারিতার ঘোরে ঘটক রেসের ময়দানে ঘোড়ার উপর বাজি ধরে চলেছেন। শনিবার একটার পর থেকে সাতটা পর্যন্ত তাঁর দ্বিতীয় সত্তা তাঁকে চালিত করছে, আদি-সত্তার কাছে এই খবর পরিবাহিত হচ্ছে না। সত্যই বেচারা জানেন না তিনি ঐ সময়ে কি করছেন।

আগামী সপ্তাহে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছে রইল।

—মনোবিদ
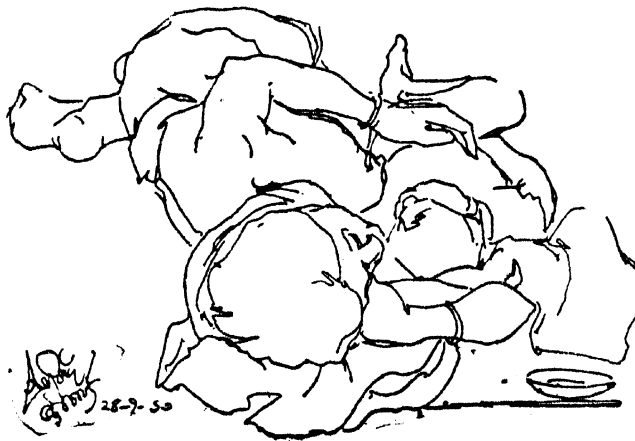
॥ ৮ ॥

বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জালের ওপর একদা এই বাংলার বুকে একটি সহস্রদল পদ্ম ফুটে উঠেছিল। বিবেকানন্দ। সেদিন তাঁকেও ঘিরে ধরেছিল চারদিক থেকে। প্রচলিত কুৎসিত সংস্কার, নিষ্ঠুর আচার, প্রাণহীন সমাজের অযৌক্তিক ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে এই বীর সৈনিক রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছিলেন শাণিত অসি নিয়ে। দাঁড়িয়েছিলেন একা। সহায় ছিল না। আর সম্বল? ছিল! অসীম বীরত্ব। এই আজন্ম সৈনিকের প্রবল ও প্রচণ্ড পৌরুষের আদর্শকে সৈনিক কবি জাতির জীবনযুদ্ধের নিয়ামক মনে করে লিখেছিলেন, "কিন্তু সেনাপতি কই? সৈনিক কোথায়? কোথায় আঘাতের দেবতা? প্রলয়ের মহারুদ্র? সে পুরুষ এসেছিলেন বিবেকানন্দ, সে সেনাপতির পৌরুষ-হুঙ্কার গর্জে উঠেছিল বিবেকানন্দের কণ্ঠে।"

একটি আদর্শ খাঁটি মানুষ দেখবার ও পাবার আকাঙ্ক্ষা ছিল কাজীর বরাবর। যেখানে বিদ্রোহ, যার ভেতর তেজ ও পৌরুষ দেখেছেন, তাকেই কাজী সমাদরে আবাহন জানিয়েছেন। গেয়েছেন স্তব। চেয়েছেন আশীর্বাদ।

প্রথম জীবনে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিলেন এমনি একটি মানুষ। পেলেন না। সুদূর তুরস্কে মিলল তাঁর দেখা। কাজী সমগ্র অন্তরের পূত অর্ঘ্য উজাড় করে তাঁর স্তব গাইলেন। কামাল। নব্যতুরস্কের মুক্তিদাতা। গ্রে উলফ্। ইয়োরোপ ও এশিয়ার চিররুগ্ন তুরস্কের নবজন্মের ললাট-পত্রিকা তিনি রচনা করেছিলেন। তুরস্কের বুকেও জন্মেছিল শতাব্দীর জঞ্জাল। বোরখা, ফেজ, হারেম, হাজারো কুসংস্কারে জাতির জীবন হয়ে গিয়েছিল পঙ্গু। মেঘমুক্ত সূর্যের মতো নিজের ভাস্বর প্রতিভায় কামাল প্রদীপ্ত করে তুলেছিলেন জাতিকে। দেশকে। ফেজ তাড়ালেন। বোরখা ছিঁড়ে ফেললেন। হারেমের রুদ্ধ অর্গল মুক্ত করে শতাব্দীর আঁধার নিমেষে দিলেন দূরে সরিয়ে। পরমুখাপেক্ষী পদানত দেশকে বিশ্বের দরবারে দাঁড় করালেন নিজের পায়ে। কাজী গেয়ে উঠলেন—
"কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই।"

কামালের মতোই তিনি সৈনিক হতে চেয়েছিলেন। কামালকে আদর্শ রেখে দেশ ও জাতির সর্ববন্ধনের দুঃসহ জ্বালা দূর করবার বাসনা নিয়ে ফিরে এসেছিলেন নিজের দেশে। বাংলার কোলে। বুকের দাবদাহ ছড়িয়ে দেবার বিপুল আকুতি নিয়ে বিদ্রোহের দাবাগ্নি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। লিখেছিলেন,—"ধর্ম সমাজ রাজা দেবতা কাউকে মেনো না। নিজের মনের শাসন মেনে চলো। গান্ধীমত যদি প্রাণ থেকে মানতে না পারো, বাস, লোকের নিন্দা-বদনামের ভয়ে তা মেনো না। রবীন্দ্র-নাথ-অরবিন্দের মত ঠিক মেনে নিতে পারছ না, বাস, মাথা উঁচু করে বলো, বুঝতে পারছি না।..."

এই নজরুল। অনাবৃত, স্পষ্ট, উজ্জ্বল। ধোঁয়া নেই। নেই ধোঁকা। ভাষার কারসাজি নেই। নিজেকে প্রচ্ছন্ন করবার চাহিদা নেই। ধর্মের কাঁদুনি নেই। নেই পীর-মোল্লা-পুরোহিতের মুখোশ। খাপ খোলা তরোয়ালের মতো ওর একটি মাত্র লক্ষ্য সংগ্রাম। অন্যায়, অসত্য, অত্যাচার, অবিচার, সংস্কার, সর্ববন্ধনের সংহার ওর ব্রত। নজরুল মূর্ত বিদ্রোহ।

"আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড়
অকাল বৈশাখীর—
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহীসুত
বিশ্ব বিধাত্রীর।"

এই বিদ্রোহীর কণ্ঠে সেদিন রাজদ্বারে যে অকুতোভয় অনাবৃত সত্য উচ্চারিত হয়েছিল, তা শুধু অনবদ্য নয়,— অসাধারণ। "আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করিনি, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধেও আমার সত্য তরবারি তীব্র আক্রমণে সমান বিদ্রোহ করেছে—তার জন্য ঘরে বাইরের বিদ্রূপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর অপর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু কোন কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করিনি, লাভ-লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম উপলব্ধিকে বিক্রয় করিনি, নিজের সাধনলব্ধ আত্মপ্রসাদকে খাটো করিনি, কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা, আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা......।"

সর্বজঞ্জালমুক্ত এক জ্যোতির্ময়ী মাতৃ-মূর্তির ছবি দেখেছিলেন কাজী দেশের ভেতর দিয়ে। ধ্বংসের বুকের ওপর নব-সৃষ্টির অপরূপ কল্পনা ঝলমল করে ফুটে উঠেছিল স্বাপ্নিকের চিত্ততলে। তাই গাইতে পেরেছিলেন,—

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?
প্রলয় নূতন সৃজন বেদন,
আসছে নবীন—জীবন-হারা
অ-সুন্দরে করতে ছেদন।
তাইসে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে—
মধুর হেসে!
ভেঙে আবার গড়তে জানে
সে চিরসুন্দর।

অন্তরের এক উদ্দাম কল্পনা ও মহৎ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কাজী প্রমীলাকে বিবাহ করেছিলেন। প্রচলিত ধর্মের অনু-শাসন বা সমাজের ভ্রূকুটি তিনি উপেক্ষা করেছিলেন জীবনভর। শুধু মুখের নয়,— আত্মার, দেহের, সমগ্র সত্তার ভেতর দিয়ে এক নতুন বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ সৃষ্টি সম্ভাবনা তাঁকে উন্মুখ করে তুলেছিল।

ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান কাজীকে আকর্ষণ করেনি। নির্দয় হয়ে বার বার বহিরঙ্গ আচার ও অর্থহীন অনুষ্ঠানের তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। হিন্দু সমাজের সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ লেখনীর কশাঘাত করতে দ্বিধা করেননি। মুসলমান সমাজের অযৌক্তিক মিথ্যাচারকে আঘাত করেছেন নিষ্ঠুর হয়ে। রক্ষণশীল হিন্দু ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে আঘাত করেছে। তাঁর রচনা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে। তাঁকে সাহিত্যের উদার ও সর্বজনীন ক্ষেত্র থেকে উৎখাত করবার ষড়যন্ত্র করেছে। আর মুসলমান সমাজ উন্মাদ রোষে তাঁকে কাফের বলে ঘোষণা করেছে।

কাজী টলেন নি। কাজী মুষড়ে পড়েন নি। প্রাণের অফুরন্ত প্রেরণার উদ্দীপনায় তিনি এগিয়েই গেছেন। অভিমন্যুর মতো শত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছেন অকুতোভয়ে।

এই আপনভোলা স্বাপ্নিক সমগ্র সত্তা দিয়ে ভালোবেসেছিলেন বাংলাকে। বাঙালীকে। দিগন্তছোঁয়া কল্পনার নতুন বাংলা ও বাঙালীর যে ছবি তাঁকে পথে দাঁড় করিয়েছিল, তার মূলে ছিল সর্ববন্ধনমুক্ত নবতম জ্যোতি, আশা ও আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎ জাতি গড়ে উঠবে ঐস্লামিক দেহ ও বৈদান্তিক মস্তিষ্ক দিয়ে।—বিবেকানন্দের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন দেখেছিলেন কাজীও। তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধরের অন্য কোন পরিচয় থাকবে না। সে হবে শুধুই বাঙালী। আচারে, ব্যবহারে, সজ্জায় আর মজ্জায়, নামে ও ধামে বহন করবে বাংলার ভুলে-যাওয়া ঐতিহ্য।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় কবির প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল বন্যার মতো। সাহিত্যের সকল বিভাগ ছাপিয়ে কবির সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল অগুনতি। কিন্তু সবাই মরে গেল। বেঁচে থাকলেন দুজন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আর নজরুল। দ্বিজেন্দ্রলাল ভাগ্যবান ব্যক্তি। জীবদ্দশায় তাঁর ভাগ্যে রূঢ় আঘাত জোটে নি। তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গও কেউ করে নি। স্বমহিমায় সাহিত্যের প্রসন্ন ও উদার আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। কিন্তু নজরুলের ভাগ্যে তা ঘটে নি। সমকালীন কবি গোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ তাঁকে সাহিত্যের পবিত্র অঙ্গন থেকে নির্বাসিত করবার চেষ্টা করেই ক্ষান্ত হয় নি, কুৎসিত ও অসত্য কলঙ্কের পাঁক ছিটিয়ে তাঁকে অপাঙক্তেয় করবার দুরভিসন্ধি দেখিয়েছে।

পারে নি। এই নির্ভীক সৈনিক প্রকৃত সৈনিকের মতোই সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু অনুদার নীচতা দেখা দেয় নি তাঁর আচরণে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করে বা অস্বীকার করে নয়,—পরন্তু তাঁকে অর্ঘ্য দিয়ে কাজীর নিজস্ব বলিষ্ঠ কল্পনা সৃষ্টি করেছে এক স্বতন্ত্র ও নবতম রূপ, যা কেবল অনন্য নয়,—অপরূপ।

রবীন্দ্র যুগে বহু কবি প্রথম বাঙালী বিদ্রোহীদের স্নেহের চক্ষে দেখেছিলেন। সেদিন তাদের জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করবার দুঃসাহস তাঁদের হয়ত মুগ্ধও করেছিল। তাদের অকাল মৃত্যুতে তাঁরা ব্যথা পেয়েছেন। অশ্রুও ফেলেছেন। কিন্তু তাদের বিদ্রোহ ও জীবনাহুতির ভেতর মহৎ ও বৃহৎ সম্ভাবনা তাঁদের দৃষ্টির অন্তরালেই থেকে গেছে। তাঁদের কবিতা অনবদ্য। ছন্দে, ভাবে, গভীর ব্যঞ্জনায় ভরাট। কিন্তু মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃত লাভ করবার আমন্ত্রণ তাতে নেই। আছে করুণার মমতা-মাখা গাম্ভীর্য। বৃহৎ বিস্তার। অশ্রুসিক্ত আক্ষেপ। তাতে নেই, 'ফাঁসির মঞ্চেও গেল-গেল যারা জীবনের জয়গান আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা,' — এবং তাদের দীপ্ত মহিমা। কাজীর কণ্ঠে ছিল তাদের অভ্যর্থনার আবেদন। 'মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে জীবনের আহ্বান' — এ কাজীর লেখনী মুখে যে প্যাশন ফুটে উঠেছে, বাংলা কবিতায় তা ছিল একান্তই দুর্লভ।

অবিচার ও অত্যাচারের আঘাতে জর্জরিত বাংলার কাঙাল মানবিকতা অনেকের প্রাণে অনুকম্পা জাগিয়েছে, অশ্রুও বের করে থাকবে, কিন্তু তারাও যে স্বাধিকারের স্বপ্নে উদ্দাম হয়ে একদিন কোদাল-শাবল-হাতুড়ি-লাঙল ভুলে দাঁড়াতে পারে, এ কল্পনা ও আশ্বাস-ধ্বনি হয়তো কারো-কারো প্রাণে জেগেছে, কিন্তু বাণী-রূপে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। উঠেছিল কাজীর প্রাণে। কাজীর গানে ও কবিতায়।

কাজীর কবিতায় ও গানে গাম্ভীর্য কম। আভিজাত্য ও সাবলিমিটিরও নাকি যথেষ্ট অভাব। বিজ্ঞজনের কথা। অবশ্য স্বীকার্য। তবুও কাজী স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। কাজী ওপরতলায় জন্মান নি। নীড়হীন যাযাবর। বাংলার মৈঠক ও পলি-মাটির নামাবলি তাঁর গায়ে। পেটে ক্ষুধার আহার্য কোন দিনই পর্যাপ্ত জোটে নি। জোটে নি উচ্চাঙ্গের বিলাসিতার উপকরণ। বাংলার পেলব কোমল ধান গাছের মতোই তাঁর জন্ম ঘটেছে বাংলার মাটির বুকে। তাঁর মায়ের কোলে।

বাংলার ধুলো ছিল তাঁর কুসুমশয্যা। গান গেয়েছেন, কবিতা লিখেছেন ওরই সন্তানদের জন্য। তাদের জন্য ব্যথা পেয়েছেন, বেদনার কষাঘাতে কেঁদেছেন। আর মৌনমূক ভাইদের মতোই তাঁর কণ্ঠ ভেদ করে রূঢ় সত্যের অমার্জিত আর্তনাদ ও রোষদীপ্ত ক্ষোভ বের হয়ে পড়েছে। 'এত ভালবাসায় ভেজা যাদের মাটি, এত বুকের খুনে উর্বর শস্যশ্যামল মাঠ — আপনারা, আমার কৃষাণ ভাইরা ছাড়া তাহার অন্য অধিকারী কেহ নাই। আমার কৃষাণ ভাইদের ডাকে বর্ষার আকাশ ভরিয়া বাদল নামে, তাদের বুকের স্নেহ ধারার মতই মাঠ-ঘাট পানিতে বন্যায় সয়লাব হইয়া যায়, আমার কৃষাণ ভাইদের আদর-সোহাগে মাঠ-ঘাট ফুলে-ফলে-ফসলে শ্যাম সবুজ হইয়া ওঠে, আমার কৃষাণ ভাইদের বধূদের প্রার্থনায় কাঁচা ধান সোনার রঙে রাঙিয়া ওঠে। এই মাঠকে জিজ্ঞাসা কর মাঠে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে—এ মাঠ চাষার, এ মাটি চাষার, এর ফুল-ফল কৃষক বধূর।

স্বপ্ন। সবই স্বপ্ন। বিশ্বজগৎ স্বপ্ন-ভরা। সেই স্বপ্নই একদিন রূপ নিয়ে দেখা দেয়। তার নাম হয় বাস্তব। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে (১৯২৬) একদিন এক পাগল বাউলের কণ্ঠ আশ্রয় করে স্বপ্ন কথা কয়ে উঠেছিল। পরিপূর্ণ কায়া আজো গড়ে ওঠে নি। কিন্তু 'ঐ রথ ঘর্ঘর রে' — স্বপ্ন পূর্ণাবয়ব হবার দেরীই-বা কত?

একদা বাংলা সাহিত্যের ভাগ্যাকাশে আর একটি জ্যোতিষ্ক নক্ষত্রের উদয় ঘটেছিল। মধুসূদন। মাইকেল মধুসূদন ও কাজী নজরুল। কেউই হিন্দু নন। কিন্তু দুজনেই বাঙালী। ধর্মে বাঙালী। আর বাঙালী—সব হারাবার সাধনায়।

দুলি। দোলন। প্রমীলা। ছোট ফুটফুটে মেয়েটি। ডাগর দুটি ভাসা চোখ। পদ্মের পাপড়ির মতো দিঘল। দিঘল দিঘির মতোই গভীর। সজল। ওরই বুকে একদিন বাসা বেঁধেছিল ভালোবাসা।

মুখ ফোটা কোন ভাষা তখনো ওর কণ্ঠে জাগে নি। ছোট্ট বুকখানার ভেতর-কার ফিসফিসানিও কি ও বুঝত? কাজীর কারাদণ্ড হয়তো ওকে বেশী করে সচেতন করে থাকবে। টেনেছিল প্রবলভাবে কাজীর দিকে। বীরের চিরন্তন প্রাপ্তি। বরমাল্য। দীর্ঘ অদর্শন এই চেতনাকে গাঢ় করেছে। বিরহ প্রিয়কে প্রিয়তম করেছে।

সম্বলের মধ্যে কণ্ঠ ও লেখনী। কাজীর বিত্ত ছিল না। ছিল না নিশ্চিন্ত আশ্রয়। প্রমীলা কি জানত না? জানত। সাবিত্রী কি নিশ্চিত মৃত্যুর কথা জেনেও সত্যবানকে অস্বীকার করেছিল? আর উমা?

কাজীকে নিয়ে সংসার পাতে নি প্রমীলা, পেতেছিল সীমাহীন নিঃস্বতা নিয়ে। কিন্তু সেই নিঃস্বতায় আঁধার বুকেও আলো ফুটিয়েছিল।

দেহ আর আত্মা। দুজনের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। কিন্তু ব্যবধানও দুস্তর। ব্যবধান অজানার। অচেনার। অজ্ঞতার।

আত্মা স্বভাব। দেহ পর ভাব। আত্মা দেহের স্বাতন্ত্র্য চায় না। চায় তার পূর্ণ গ্রাস। দেহ পাঁচিল তুলে দেয় মায়ার। মোহের। তারই আড়ালে থেকে দেহ আত্মার ঐশ্বর্য দেখে। তার ক্ষীণ ইসারায় শিউরে ওঠে। দুলে ওঠে। ফুলে ওঠে। সব আগল ভেঙ্গে মিশে যেতে চায় আত্মার আত্মায়।

স্বকীয়তায় আত্ম বিভোর। পরকীয় দেহ তাকে লুব্ধ করে। হাতছানি দেয়। ডাকে। সে ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকবে কেমন করে? ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘর নয়, সাথী নয়, ধর্ম নয়। কুল-শীল হয়ে ওঠে অর্থহীন। কুলে কালি দিয়ে অভিসারে ছুটে যায়। প্রিয়তমের মধু-সঙ্গ তাকে পেতে হবে না?

বাংলার বুকে একদিন এই সহজবাদ ফুটে উঠেছিল। বাইরের খোলসটা হয়তো কালধর্মের বিবর্তনে রূপ পরিবর্তন করেছে, কিন্তু সহজবাদের চিরন্তন তত্ত্ব অবিনশ্বর। বাংলার মেয়ে সহজিয়া প্রমীলার বুকেও তরঙ্গ তুলেছিল এই সহজবাদ। যে প্রিয়, তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগই না পরমধর্ম, স্বভাব ধর্ম। আর সবই পরধর্ম। স্বধর্মের ডাকে প্রমীলা ঘর ছেড়েছিল। কুল ভুলেছিল। বহিরঙ্গ আত্মীয়তার বন্ধন-বোধ তাকে বাঁধতে পারে নি।

দারিদ্র্যের রূঢ় আঘাতে কাজী জর্জরিত হয়ে ঢলে পড়েছেন। মায়ের মতো কল্যাণ-মমতার শান্তি-শয্যা বিছিয়ে দিয়েছে প্রমীলা। কাজী নিজেকে ফিরে পেয়েছেন। শ্রান্ত ক্লান্ত কাজী এটুকুর লোভে উন্মুখ। গদ-গদ।

'আমি শ্রান্ত হয়ে আসব যখন
পড়ব দে'রে টলে,
আমার লুটিয়ে পড়া দেহ তখন
ধরবে কি ঐ কোলে?'

প্রমীলা ধরেছিল।

কাজী ফিরে চান প্রমীলার দিকে। কি না-সে হতে পারত? এই রূপ, এই পারিবারিক পরিবেশ আর পরিচিতি, কোন কিছুই তো প্রমীলা ধরে রাখল না। অবহেলায় সব বিসর্জন দিল তাঁর জন্য। কিন্তু পেল কি? তিনি কি দিলেন প্রমীলাকে?

শুধু ভিখারীকে ভালোবেসে
সাজলে ভিখারিণী।
সব ত্যজি মোর হলে সাথী,
আমার অশায় জাগছ রাতি,
তোমার পূজা বাজে আমার,
হিয়ার কানায় কানায়!
তুমি সাধ করে ভিখারিণী,
সেই কথা সে জানায়।।

ক্ষত-বিক্ষত কাজী তবু রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন নি। প্রমীলার দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়েছে। আবার সান্ত্বনাও পেয়েছেন। বেড়াল ছানার মতো তাকে ধরে নিয়ে গেছেন স্থান থেকে স্থানান্তরে। আত্মীয় ভেবে, বন্ধু ভেবে

কত দোরে আশ্রয় চেয়েছেন। মেলে নি। মুখোস-পরা আত্মীয়তা দূরে সরে গেছে। কিন্তু প্রমীলা যায় নি।

অসহায় হয়ে দেখেছেন ছেলের মৃত্যু। দুধ জোটাতে পারেন নি। তবু সহস্র ক্লান্তির মধ্যেও স্থির শান্ত দুটি কালো আঁখির তারা তাঁর দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হেসেছে। অভয় দিয়েছে। প্রতিবাদহীন মৌন মমতার নিবিড় এই কথান-সামিপ্য তিনি অস্বীকার করবেন কেমন করে?

চারদিকে থৈ-থৈ করছে তাঁর নাম। অহরহ আসছে ডাক। তাঁর গানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে জনতা। তাঁর কথায় ভোজবাজির মেলা বসে। সভা ডাকে সভাপতি হতে। আসর ডাকে গানের বাটা নিয়ে বসতে। পত্র-পত্রিকা হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দেয় লেখা পেতে।

কিন্তু প্রমীলার দুঃখ ঘুচল না। ভাঁড়ে মা ভাবনী ছাড়া আর কমলা মুখ তুলে চাইলেন না। কাজীর অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাস লেখা নেই। কিন্তু বোঝা যায়। কত বড় আর মর্মান্তিক আঘাত বুকে নিয়ে কাজী আসন ঘুরিয়ে বসেছিলেন। তাঁর সারা জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সমাধি নিজের হাতে রচনা করে যাবেন? বিদ্রোহ, বিপ্লব, দেশ, দেশের স্বাধীনতা, সবই, থাকল পেছনে পড়ে? মিথ্যে হয়ে গেল সব?

গেল। কাজী চাকুরি নিলেন গ্রামোফোন কোম্পানীতে।

জীবনের এই প্রথম টাকার মুখ দেখে-ছিলেন কাজী। প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত না হলেও খুব কমও নয়। টাকা এল গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে, বই-এর প্রকাশকের কাছ থেকে, রেডিও থেকে। সিনেমার বই লিখেও টাকা এল। টাকা কিছু এল নাট্যশালা থেকেও। সংস্পর্শে এলেন কত নটের। সান্নিধ্য পেলেন নটীদের। কত কমলা, আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা আর বনবালাদের গান শেখালেন। কিন্তু যা পেতে টাকা চেয়েছিলেন, সব ভুলে বেছে নিয়ে-ছিলেন এই পিচ্ছিল ও সশঙ্ক পথ, তা কি পেয়েছিলেন? শান্তি? সোয়াস্তি? মনের স্থৈর্য? মনের অনেকখানি জুড়ে যে উদাসী বৈরাগ্য ছিল চিত্তজোড়া তা গেল কোথায়? অবাধ ও অগাধ উদ্দামতার বিস্ফারিতা কি তাঁর হারিয়ে গেল নিঃশেষে।

সংসারের অনেক পরিবর্তন এসেছিল সন্দেহ নেই। স্বাচ্ছন্দ্যও বেড়েছিল। কিন্তু তবুও চিত্ত ভরিল কৈ? অগুনতি ভক্ত ভিড় করে থাকে সর্বক্ষণ। সঙ্গীত আছে, তার মাধুর্যও মরে নি। শিল্পী, জ্ঞানী-গুণীরও অভাব নেই। তবু থেকে-থেকে দুর্বোধ্য বেদনা আর হারিয়ে-ফেলা এক অজ্ঞাত অস্থিরতা অন্তর খুঁড়ে খায়। ছটফটানি বাড়ে। মনে হয় এ জীবন তাঁর কোনদিনই কাম্য ছিল না।

কাজীর অস্থিরতা বাড়ে। যত অস্থিরতা বাড়ে, তত আরো বেশি জড়িয়ে পড়েন গানে, মজলিশে, আড্ডায়। ভুলে যেতে চান সব। ভুলে যেতে যান অতীত। তার দুরন্ত সেই মনোহর উল্লাস। চান কিন্তু পারেন কৈ? শতমুখী ঈপ্সার হাতছানি উপেক্ষা করবার সাধ্য কি তাঁর ছিল?

ছিল না। কিন্তু সহস্র উচ্ছল কোলাহল ও উচ্ছৃঙ্খলতা ছাপিয়ে মাঝে-মাঝে তিনি উন্মনা হয়ে পড়েন। নিজের অতীত খোঁজেন।

কাজী কোনদিনই মস্তিষ্কের পরিচালনা স্বীকার করে নেন নি। মস্তিষ্কের চাইতে হৃদয় ছিল তাঁর কাছে অনেক বড়। তারই আবেগ তাঁকে পরিচালিত করেছে চিরদিন। বার-বার জীবন-জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি খেই হারিয়ে ফেলেছেন। অস্থির, চঞ্চল, খেয়ালী, কাজী বার-বার তাই জীবনের গতি পরিবর্তন করেছেন। কখনো পথে, কখনো বিপথে ছুটে গেছেন। তবু এই আনন্দপিপাসু জীবনের মধ্যে এমন প্রাণ-প্রাচুর্য ছিল, বার-বার আপদ থেকে তাঁকে রক্ষাও করেছে।

প্রথম জীবনের লক্ষ্যহারা পথযাত্রা, আকস্মিক সৈনিক জীবনের বিপদসঙ্কুল ডাক, রোমান্টিক বিদ্রোহী জীবন, সাহিত্য ও কাব্যের প্রতি অতুল্য প্রীতি, অবাঞ্ছিত বিবাহ আসর থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা, কারাবাস, অপ্রচলিত বিবাহ,—সর্বশেষ এই পাঁচমিশেলি শিল্পীর জীবন,—সবই মনে হবে পরমার্থ-হীন, অসংলগ্ন এবং হয়তো খেয়ালধর্মীও।

অজস্র অভিনন্দন কাজী পেয়েছেন। কিন্তু এই কোলাহল ও সমারোহের অন্ত-রালে কাজীর নিজস্ব জীবন-ধারা কাজীর নিজের নিকটেই ছিল অজ্ঞাত। যখন যেদিকে ঝুঁকেছেন, সেই কাজই তাঁর কাছে প্রিয় ও প্রধান বলে মনে হয়েছে। ভাবপ্রধান ব্যক্তির হয়তো এই মনোভঙ্গীই বৈশিষ্ট্য। যেদিন বিদ্রোহের ভাববন্যা তাঁকে কূলহারা করে আকূলের পথে দাঁড় করিয়েছিল, সেদিনও তাঁর মনে হয়েছিল,— 'অনাগত অবশ্যম্ভাবী মহারুদ্রের তীব্র আহ্বান আমি শুনেছিলাম, তাঁর রক্ত-আঁখির হুকুম আমি ইঙ্গিতে বুঝে-ছিলাম। আমি তখনই বুঝেছিলাম, আমি সত্যরক্ষার, ন্যায় উদ্ধারের বিশ্ব প্রলয় বাহিনীর লালসৈনিক। বাংলার শ্যাম-শ্মশানের মায়া-নিদ্রিত ভূমিতে আমায় তিনি পাঠিয়েছেন অগ্রদূত তূর্যবাদক করে।'

বিদ্রোহের তূর্য হাত থেকে খসে পড়ল। হাতে তুলে নিলেন বীণা। সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল,—"আমার পনের আনা রয়েছে স্বপ্নে বিভোর, সৃষ্টির ব্যথায় ডগমগ, আর একআনা করছে পলিটিক্স।......আমার পনের আনা চলছে, আর চলছে সৃষ্টির দিন হতে, আমার সুন্দরের উদ্দেশ্যে।...সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তব গানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম।"

নিজেরও অলক্ষ্যে নতুন আর এক বিপুলতম বিস্ময় তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল, সেদিন সে কথা তিনি জানতেন না। যেদিন কাজী সেই হঠাৎ পাওয়া বিস্ময়ের মুখোমুখি দাঁড়ালেন, তাঁকে পরমাত্মীয় বলে গ্রহণ করতে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতেও রোমাঞ্চ আছে। কিন্তু তা অনেকটা প্রত্যক্ষ রোমাঞ্চ। এদের চাইতেও অনেক বেশি আকর্ষণীয় রোমাঞ্চ থাকে আধ্যাত্মিকতার পথে। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বলেই ওর আকর্ষণ তীব্রতর। যা যত দুর্বোধ্য, সুদূর,—তার প্রভাব তত বেশি, আর দুর্লঙ্ঘ্য। রূপহীন, নামহীন এক অনির্বচনীয় মহামাদির ঘোর। উন্মত্ততার কাছাকাছি ..র মোহ। মায়াহীন নিষ্ঠুরতা ও ছন্দহীন অনিশ্চয়তা ডেকে আনে জীবনের চক্রপথে। নিরুপায় মানুষ পেতে চায় আশা ও আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা ওকে অবলম্বন করে। সহজ-সিদ্ধির প্রলোভন জাগে প্রাণে। ছুটে যায় মানুষ।

প্রতিভা কোনদিন অল্পে তুষ্ট হয় না। তার চাওয়া অনেক বড়। গ্রাস করা ওর ধর্ম। কাছের ছোট ও অপ্রধানকে গ্রাস করে প্রতিভা সকলের মাথা ছাড়িয়ে ওঠে। ভাব-রাজ্যের ক্যাপিটালিষ্ট। সমকালীন সব সুন্দর ও মধুর উপাদান ও আত্মস্থ করে। বড় হয়। বিজয়ী বলে পুজো পায়। প্রতিভাধর কাজীর প্রাণেও কি এই কামনা জেগেছিল?

আধ্যাত্মিক সাধনার পথে শক্তি বাড়ে, রুদ্ধ অজানা জগতের দ্বার খুলে যায়, মনের অদম্য শক্তি ইচ্ছামাত্র অসাধ্য সাধন করতে পারে,—আরো কত কী করতে পারে এবং হতে পারে। তন্ত্রপ্রধান বাংলার এই মাটিতে এই সাধনা জাতিকে দিয়েছে রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণকে; অন্যদিকে এই তন্ত্রই তৈরী করেছে নানা বীভৎস মতবাদ ও তার আনু-ষঙ্গিক ক্রিয়াকাণ্ড।

একজন রামপ্রসাদ বা রামকৃষ্ণকে পেতে লক্ষ লক্ষ রামকৃষ্ণ ও রামপ্রসাদকে আমরা হারিয়েছি। হারিয়েছি মানুষকে। মানুষ তার স্বাভাবিক ধর্ম ও প্রেরণা ভুলে, ভুলে তার স্নেহ-মায়া-মমতা, হৃদয়ের শত সুকুমার বৃত্তি,—হয়তো খুবই মহৎ ও বৃহৎ কিছু লাভ করে থাকবে, কিন্তু হারিয়েছে নিজেকে। সহজ, সরল, দোষ-গুণে মেশানো মাটির মানুষকে।

কাজীর প্রাণে অকস্মাৎ সে ভাব প্রবাহ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তার মূলে এই শক্তিলাভের দুর্বার কামনা ছিল কিনা, বলবার উপায় নেই। কিন্তু কবি, সৈনিক, বিদ্রোহী এবং সংসারের একজন প্রেমিক, স্বামী, বাৎসল্য রসসিক্ত এক পিতা আর অগণিত গুণমুগ্ধ সাধারণ মানুষের আশা সেদিন অতি সহসা বিসর্জন দিতে হয়ে-ছিল,—তার প্রমাণ আছে।

(ক্রমশঃ)

তারাপুর আণবিক গবেষণা কেন্দ্রের দৃশ্য
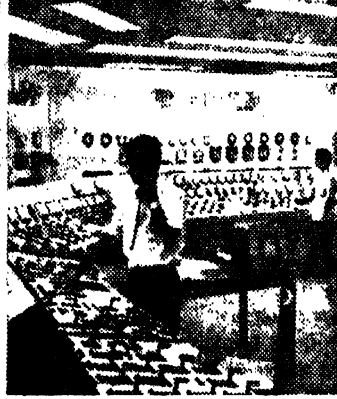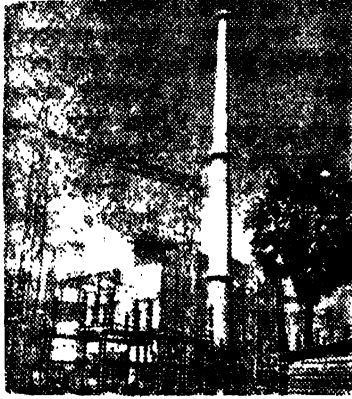
তারাপুর পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্র

মহারাষ্ট্রের বোম্বাই শহরের ৬৫ মাইল উত্তরে তারাপুরে ভারতের প্রথম পরমাণু থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের যে কারখানাটির নির্মাণকার্য সাত বছর আগে সূচনা হয়েছিল, গত ১৯ জানুয়ারি এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেই কেন্দ্রটিকে জাতির সেবায় উৎসর্গ করেছেন। এটি এশিয়ার বৃহত্তম পরমাণু-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। অনগ্রসর দেশগুলির মধ্যে ভারতই সর্বপ্রথম পরমাণু-বিদ্যুৎ ব্যবহারের দিকে অগ্রসর হল।

সভ্যতার আদি যুগে মানুষ শক্তির উৎসের সন্ধান পেয়েছিল আগুনের মধ্যে। রান্না ও তাপউৎপাদনের কাজ তখন আগুনের সাহায্যেই হত। ১৮৩১ সালে এক্ষেত্রে এলো এক যুগান্তর—যখন মাইকেল ফ্যারাডে আবিষ্কার করলেন ডায়নামো। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের হাতিয়ার মানুষ খুঁজে পেল এবং এক স্থান থেকে শত-শত মাইল দূরবর্তী অনাস্থানে তা সরবরাহ করাও সম্ভব হল। তারপরের শতাব্দীতে জল, কয়লা ও তেল থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পন্থা উদ্ভাবিত হল।

এর পর ১৯৪২ সালে মানুষের ইতিহাসে আর এক যুগান্তর ঘটল — যেদিন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী ডঃ এনরিকো ফের্মির নেতৃত্বাধীনে পরমাণু-শক্তির পৌনঃপুনিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের পন্থা উদ্ভাবিত হল। অসীম শক্তির উৎস পরমাণু-থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের সন্ধান দিলেন বিজ্ঞানীরা।

আজ আমরা জেনেছি, বিদ্যুৎশক্তির উৎস হল তিনটি : জল, কয়লা এবং সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক হল তেজস্ক্রিয় পরমাণু। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রসর হতে না পারলে কোন দেশই পরমাণুশক্তিকে নিজের কাজে লাগাতে পারে না।

ভারতে প্রচুর কয়লাসম্পদ আছে। আরও দীর্ঘকাল আমরা তাপ-বিদ্যুতের ব্যবহার চালিয়ে যেতে পারি। কিন্তু সে সব কয়লা রয়েছে পূর্ব ও মধ্য ভারতে। পশ্চিম ভারত বহুলাংশে জল-বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল। জল-বিদ্যুৎ আবার প্রচুর বর্ষণের ওপর নির্ভরশীল। যথেষ্ট বৃষ্টি না হলে স্বভাবতই জলবিদ্যুৎ শক্তির আধার নিঃশেষিত হয়ে যায়। আর অনিশ্চিত বর্ষণের ওপর নির্ভর করে শিল্প ও নাগরিক জীবন নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। অপর দিকে কয়লা পরিবহনের সমস্যা ও ব্যয় দুটিই পশ্চিম ভারতে শিল্প প্রসারের পক্ষে বাধাস্বরূপ। তাই এ অঞ্চলে পরমাণু থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

ভারতের পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রথম অধিকর্তা পরলোকগত ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা তাই বোম্বাই শহরের সন্নিকটে একটি পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তারই বাস্তব রূপায়ণ হচ্ছে আজকের তারাপুর পরমাণু-বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কারখানা। তারাপুরের এই কারখানা মুখ্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে ১৯৬৩ সালের ৭ ডিসেম্বর আমেরিকার সঙ্গে ভারতের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

তারাপুর পরমাণু-বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা চার লক্ষ কিলোওয়াট। এই কারখানায় প্রতিদিন ১৭০ পাউণ্ড ইউরেনিয়াম-সমৃদ্ধ পারমাণবিক জ্বালানী ব্যবহৃত হয়। ভারত সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত একটি দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ইন্ধন সরবরাহ করে আসছে। পরমাণুর বদলে কয়লার সাহায্যে বাষ্প উৎপাদন করে ঐ কারখানার দুটি জেনারেটর চালু করে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে হলে প্রতিদিন তিনটি ট্রেনভর্তি এক কোটি কুড়ি লক্ষ টন কয়লার যোগান দিতে হত।

আরব সাগরের তীরে এই কারখানাটি যে পৃথিবীর বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের অন্যতম বৃহত্তম কারখানা তা বাইরে থেকে দেখে বিশ্বাস করাই কঠিন। এর পরিবেশ শান্ত নির্জন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো এর আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন নয়। কারখানা ঘরে ১০০ ফুট উঁচু আধারে রয়েছে দুটি রি-অ্যাকটর বা পরমাণুচুল্লী। পাঁচ ইঞ্চি পুরু স্টেনলেস স্টীলে এটি মোড়া। এই চুল্লীতে ইউরেনিয়াম-পরমাণু ভাঙার ফলে যে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয় তারই সাহায্যে জলকে বাষ্পে পরিণত করা হয়। তারপর সেই বাষ্পের সাহায্যে ২ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনক্ষম দুটি টার্বো-জেনারেটর চালান হয়।

প্রায় সাড়ে ৬ হাজারেরও বেশী পুরুষ ও নারী সাত বছর দিন-রাত্রি খেটে এই কারখানাটি গড়ে তুলেছে। কিন্তু এটি চালায় ও রক্ষণাবেক্ষণ করে মাত্র কয়েক শো লোক। এই পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ভারতীয় বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশলীদের ওপরই ন্যস্ত হবে। এঁদের ৩০ জনেরও বেশী ক্যালিফোর্ণিয়ার সান জোসের আই জি আই-এর কারখানায় এবং ইতালীর সেন-এর রি-অ্যাকটরে শিক্ষালাভ করেছেন।

যে তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে পরমাণু-বোমা তৈরী করা হয়, পরমাণু-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সেই একই তত্ত্বের ভিত্তিতে। উভয়ের গঠনপদ্ধতি ও জ্বালানি সন্নিবেশ

স্বতন্ত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পরমাণুচুল্লী থেকে নিঃসৃত তেজস্ক্রিয় আবর্জনা'র একটা বিপদ থেকে যায়। যদিও এর পরিমাণ প্রতিদিন কয়েক পাউন্ড মাত্র, তবু তেজস্ক্রিয়তার দিক থেকে এই মাত্রা বিপজ্জনক। তাই পরমাণুচুল্লীর কাছাকাছি আর একটি ঘরে এই তেজস্ক্রিয় আবর্জনা রাখা হবে। কারখানা থেকে যে বাষ্প বা বাতাস বেরিয়ে আসবে, সেগুলিকেও বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেওয়ার আগে তাদের তেজস্ক্রিয়তা নষ্ট করে দেওয়া হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, তেজস্ক্রিয়তার বিপদ অতি-নগণ্যই।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তারাপুরে পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্র মুখ্যত আমেরিকার সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে। এর পর রাজস্থানের রাণা প্রতাপ সাগরে এবং তামিলনাড়ুর কাককুকুলামে আর দুটি পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হবে। রাজস্থান প্রকল্পে ভারতের মালমশলা থাকবে শতকরা ৬০ ভাগ এবং তামিলনাড়ু প্রকল্পে শতকরা ৮০ ভাগ। ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা তারাপুরের অভিজ্ঞতাকে পরবর্তী দুটি প্রকল্পে কাজে লাগাবেন। জ্বালানি সম্পর্কেও ভারত আত্মনির্ভরশীলতার পথ গ্রহণ করতে চাইছে। তাই কেরল উপকূলে সহজলভ্য থোরিয়ামের দিকেই ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এখন বিশেষ নজর পড়েছে।

বায়ুমণ্ডল নির্মল রাখা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন

শহরাঞ্চলের, বিশেষ শিল্পনগরীগুলির বায়ুমণ্ডল নানা দূষিত পদার্থে সবসময় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কলকারখানা, পরীক্ষাগার, মোটরগাড়ী ইত্যাদি থেকে নানারকম গ্যাস, ধোঁয়া ও অন্যান্য পদার্থ বায়ুমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে—যা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। একারণে শহরাঞ্চলে কলকারখানার গ্যাস ও ধোঁয়া যাতে ঊর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হয় সেজন্যে উঁচু চিমনি করার নির্দেশ আছে।

শিল্পসমৃদ্ধ শহরগুলিতে বায়ুমণ্ডল কি উপায়ে বিশুদ্ধ বা নির্মল রাখা যায় সে সম্পর্কে সম্প্রতি জার্মানীর ডুশেলডর্ফে একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী সম্মেলন হয়ে গেছে। সারা বিশ্ব থেকে প্রায় দু হাজার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী, পদার্থবিদ, যন্ত্রবিদ, আইনজ্ঞ এবং আবহবিজ্ঞানী এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। কয়েকদিনব্যাপী এই সম্মেলনে তাঁরা বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ রাখার উপযুক্ত উপায় সম্পর্কে নানা আলোচনা করেন। সম্মেলনে যোগদানকারী বিজ্ঞানীরা রুর অঞ্চলে অবলম্বিত নূতনতর উপায় সম্পর্কে জানার সুযোগ পান।

বায়ুমণ্ডলে দূষিত পদার্থের ধুলোবালি ও ধোঁয়া কি পরিমাণে আছে তা পরিমাপ করে সেগুলি দূরীকরণের নানা উপায় অবলম্বিত হয়ে থাকে। কিন্তু মেঘলা ও বৃষ্টির দিনে এই পরিমাপ করা কঠিন হয়ে

কলকারখানার দূষিত পদার্থ বায়ুমণ্ডলে উৎক্ষেপণের চিমনি (বামে) : সর্বাধুনিক কৌশিক শোধন যন্ত্র (ডাইনে)
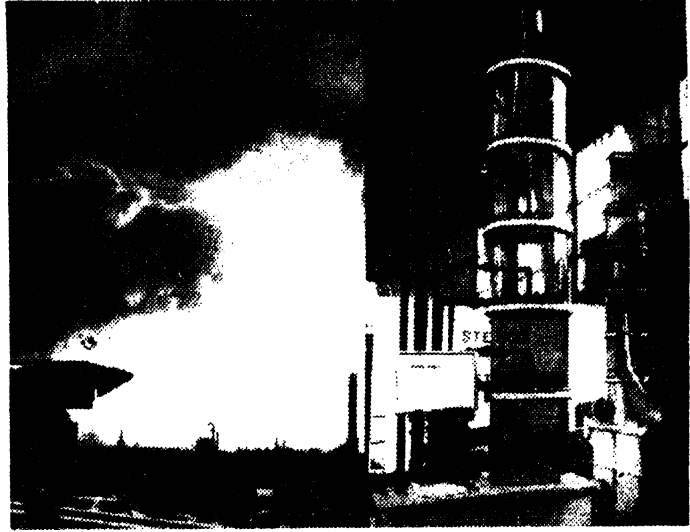
দাঁড়ায়। জার্মানীতে যে নূতনতর উপায় সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে, সেটি হচ্ছে টেলিভিশন ক্যামেরা ও রশ্মি কামানের সমন্বয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্ষণমুখর রাত্রেও এই উপায়ে দশ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত দূষিত পদার্থ সনাক্ত ও পরিমাপ করা যায়। এর ফলে গত পাঁচ বছরে জার্মানীর কয়লা অঞ্চলগুলিতে সালফিউরিক অ্যাসিড সংক্রান্ত দূষিত পদার্থগুলির পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ কমে গেছে। জার্মানীতে সম্প্রতি একরকম কৌশিক শোষণযন্ত্রও উদ্ভাবিত হয়েছে, যার সাহায্যে বায়ুমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত গ্যাসসমূহ থেকে বিষাক্ত গ্যাসগুলিকে পৃথক করা যায়। শব্দ ও গন্ধবিহীন এই বৈদ্যুতিক যন্ত্র অবশ্য এখন সাধারণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না, অর্থাৎ এখন পরীক্ষামূলক স্তরে আছে।

চন্দ্রের নতুন ধাতব পদার্থের সন্ধান

হিউস্টনে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক চান্দ্রবিজ্ঞান সম্মেলনে ১৪২ জন বিশিষ্ট মার্কিন ও বিদেশী বিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণা ও বিশ্লেষণের ফলাফল প্রকাশ করেছেন। গত জুলাই মাসে অ্যাপোলো—১১ অভিযানের মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠে থেকে যে সকল মৃত্তিকা, শিলা ইত্যাদি উপাদান সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলেন, গত তিন মাস ধরে এই সব বিজ্ঞানী বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বীক্ষণাগারে তার ১৩০০ নমুনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

এই চন্দ্রবিজ্ঞান সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার ফলাফল ও সে সম্পর্কে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃটিশ বিজ্ঞানী ডঃ জেসেফ স্মিথ চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে আনীত উপাদান পরীক্ষা করে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধাতব পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, এটি কেলাসিত পদার্থের মতো দানার আকারে পাওয়া গেছে। এটি লৌহসমৃদ্ধ পায়রক্সসিং গাইট জাতীয় একরকম হলদে রঙের পদার্থ।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক ডঃ স্মিথ নবাবিষ্কৃত এই নতুন পদার্থ সম্পর্কে আরও বলেছেন, তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা মিলিত হয়ে এই নতুন পদার্থটির কি নাম দেওয়া হবে তা স্থির করবেন। বিজ্ঞানের পুস্তকসমূহে এই নতুন পদার্থটির নাম মুদ্রিত হওয়ার আগে বিজ্ঞান বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক তা অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।

অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা পৃথকভাবে এ বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন তাঁরাও এই নতুন পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে এই পদার্থ তৈরী করা হলেও পৃথিবীতে প্রাকৃতিক উপাদান হিসাবে এটি পাওয়া যায় না। তবে খানিকটা এই ধরনের জিনিস স্কটল্যান্ড, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া গেছে। ঐ সকল পদার্থের রঙ লাল। কিন্তু ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে চান্দ্রশিলার নতুন উপাদানটির রঙ হলদে বলে দেখা গেছে। বিজ্ঞানীরা তাই মনে করেন, চান্দ্রশিলার এই উপাদানটি এক সম্পূর্ণ নতুন ধাতব পদার্থ।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

নেপথ্যের পথে

মেজর এইচ, এস্, ব্রেইলস্ফোর্ড
রয়েল আর্টিলারী

লণ্ডন,
১৫ই জুন, ১৯৬০

প্রিয় বন্ধু।

আজ সুদীর্ঘ পনেরো বছর পরে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এই চিঠিটা পেয়ে তুমি বিস্মিত হলেও অস্বাভাবিক মনে করবে না এ বিশ্বাস আমার আছে বলেই তোমাকে লিখতে পারছি।

তোমাকে শেষ চিঠিতে লিখেছিলাম হ্যারীর মৃত্যু আমাকে এক অদৃশ্য বাঁধনে বেঁধে রেখে গেছে। আইনত আমাদের বিয়ে না হলেও নিজেকে আমি বিধবা ছাড়া ভাবতে পারছি না—হ্যারীর স্মৃতি বুকে নিয়ে জীবনের বাকি অংশটুকু কাটিয়ে দেবো।

তুমি হ্যারীর ও আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু। আমাদের দুজনের সম্পর্কের কোন কথাই তোমার অজানা নয়। যে কথা কোনদিন কারো কাছে বলা যায় না—অথচ সে কথা শুধু একজনকেই বলা যায়—সে হচ্ছে বন্ধু। আমার জীবনে সেখানেই তোমার স্থান।

তাই আজ তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, পারলাম না কিছুতেই পারলাম না শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে. মনটাকে যদি বা সামলাতে পারি দেহটাকে পারি না। রক্তমাংসের শরীর মাঝে মাঝে এমন মর্মান্তিকভাবে জানান দেয়—ভয় হয় পাছে নিজের কাছেই না নিজে অসতী হয়ে পড়ি।

মন আর শরীরের এই দোটানার মাঝখানে আমার জীবনে আবির্ভাব হয়েছে নূতন একজনের। নিজেকে যদিবা বঞ্চিত করতে পারি কিন্তু তাঁকে ফেরাবো কিসের অজুহাতে। কি যে এক অসহ্য যন্ত্রণায় আমার দিন কাটছে তাকে প্রকাশ করবার মত ভাষা আমার নেই। হ্যারী মৃত—আমি জীবিত এটাই আজ সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তুমি হয়ত এতক্ষণে ভাবতে শুরু করেছ তোমাকে এত কথা জানাবার প্রয়োজন কি। বিশ্বাস কর। নিজের জীবনের সমস্যা আর তার সমাধান নিয়ে কারো কাছে কোন রকম জবাবদিহি বা সমর্থন ভিক্ষা করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজনও আমার নেই। কিন্তু

সত্যব্রত দে

মুস্কিল হয়েছে এই প্রতি পদে পদে, প্রতি মুহূর্তে মনে হয় সব কিছু ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকেও তার অশরীরি অস্তিত্ব দিয়ে হ্যারী যেন আমার জীবনের সবকটি দরজা আগলে বসে আছে। তার সম্মতি না নিয়ে কিছু করা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। অথচ নূতনের অধিকারও আর আমি দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না। ভাবছি তাকে বিয়ে করবো। কিন্তু হ্যারীর অনুমতি না নিয়ে তা করা শুধু ভুল নয়, অন্যায়ও বটে।

তাই তোমাকে আজ আমার বড় প্রয়োজন। তোমার কাছে একটা মিনতি আছে আমার। দয়া করে একটিবার হ্যারীর সমাধি-স্থলে গিয়ে একগুচ্ছ গোলাপ ফুল উৎসর্গ করে আমার হয়ে তুমি ওর কাছ থেকে বিয়ের অনুমতি চেয়ে নিও।

বল তুমি এটুকু করবে! তোমার কাছে এ শুধু আমার অনুরোধ নয় ভিক্ষাও বটে।

ইতি—
হতভাগিনী
ইরিস্।

চিঠিটা পেয়ে শুধু বিস্মিত বা হতচকিত নয়—মনে বেশ আঘাতও পেয়েছিলাম, মৃত প্রেমিকের স্মৃতি বুকে নিয়ে বাকি জীবনটা কৃচ্ছ্রসাধনার ভেতর দিয়ে কাটিয়ে দেবে এ সংকল্প যেদিন ইরিস্ আমাকে জানিয়েছিল সেদিন তাকে লিখেছিলাম—

"এই দুর্জয় সংকল্প ভাল কি মন্দ সে প্রশ্নের বিচার করবার ক্ষমতা এই পৃথিবীতে কারোর নেই। তবে একথা তোমাকে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি—মৃত্যুর পর ভাগ্যবিধাতা তোমার কি বিচার করবেন জানি না—তবে হ্যারীর সঙ্গে পরজীবনে তোমার মিলনের অন্তরায় তিনি কিছুতেই হবেন না এ কথা আমি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি ইরিস্।"

আর আজ।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অনুরোধটা আমাকে রাখতেই হলো। ইরিসের মিনতির চাইতে হ্যারীর স্মৃতির তাগাদা আমার কাছে অনেক ভাবাবেগপূর্ণ। দু' এক বছর অন্তর এসে হ্যারীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে যাওয়াটা আমার জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু জীবনের অনেক আবর্তন বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হ্যারীর প্রতি এই শ্রদ্ধা নিবেদনের কর্তব্যটুকুও ধীরে ধীরে চাপা পড়ে গিয়েছিল। এতদিন পরে

ইরিসের কাছ থেকে চিঠিটা পেয়ে শুধু লজ্জিত নয় নিজেকে অপরাধীও মনে হলো। তাই অনেক দ্বিধা অনেক অসুবিধাকে উপেক্ষা করে একদিন ডিমাপুর হয়ে কোহিমায় হাজির হলাম।

কোহিমা শহরের বাইরে একটু দূরে এই সমাধিস্থল। জানা-অজানা, চেনা-অচেনা, নিখোঁজ-নিরুদ্দেশ যে অগণিত মিত্র সৈন্য ভারত-বর্মা সীমান্ত যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল, তাদেরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই সমাধিক্ষেত্র। গাছ-পালা, ফল-ফুলের বাগান আর সুন্দর রাস্তা-ঘাট দিয়ে সাজানো এমন সমাধিক্ষেত্র খুব কমই ছিল।

কিন্তু না এলেই বোধহয় ভাল হত। চিনতে পারছিলাম না কিছুই। এ কি পরিণতি! সুন্দর রাস্তা-ঘাট ফল-ফুলের বাগান আজ নির্মম নিষ্ঠুর কাঁটালতা আগাছার অন্তরালে হারিয়ে গেছে। একদিন দেশ ও জাতির প্রয়োজনে যাঁরা নিজেদের প্রাণ দিতে এতটুকুও দ্বিধা করেন নি—কালের যাত্রায় আজ তাঁদের সামান্য স্মৃতি-টুকুও নিশ্চিহ্নপ্রায়। শৌর্যবীর্যের ইতিবৃত্ত আজ জনশ্রুতি ছাড়া কিছুই নয়। হয়ত এটাই কালের বিচার বিধির বিধান। একটা অব্যক্ত বেদনায় আমার দেহমন জর্জরিত হয়ে বোবাকান্নায় চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এলো।

তখন ভারতবর্ষের চারিদিকে আগুন জ্বলছে। গান্ধীজি পুণায় আগা খান প্যালেসে বন্দী, নেহরু ও অন্যান্য নেতারা জেলে। দেশের গণআন্দোলন বল্গাহীন নেতৃত্ববিহীন। জাতীয় জীবনের এমনি এক দুর্যোগপূর্ণ দিনে রয়েল আর্টিলারীর মেজর এইচ এস ব্রেইলসফোর্ডের সঙ্গে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে আমার আলাপ হয়।

বোম্বের ব্রীচ ক্যান্ডি সুইমিং পুলের অপরদিকে ৯ নম্বর ওয়ার্ডেন রোডে রাজকীয় ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি অফিসারস ক্যাম্প ছিল। বাড়ীটার নাম 'ফ্লাওয়ার মীড'। মাত্র কয়েকদিন আগে লাহোর থেকে এসেছি। এক শনিবারে ছুটির পর কয়েকটা বই কেনবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। লেমিংটন রোডে একটি দোকানের সুন্দর সাজানো বইয়ের সারি সহজেই মনকে আকৃষ্ট করলো। একদিকের কোণায় শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা থেকে শুরু করে ডঃ রাধাকৃষ্ণানের হাজারফল হিন্দুদর্শন ও ধর্মপুস্তকের সমাবেশ। একটু নেড়েচেড়ে দেখে ইংরাজী উপন্যাসের সারির দিকে এগিয়ে গেলাম। স্টাইন-ব্যাকের 'মুন ইজ ডাউন' বইটা সদ্য আমদানী। এটাই নেবার উদ্দেশ্যে দেখ-ছিলাম। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ নজরে পড়লো একজন ইংরাজ মিলিটারী অফিসার গভীর মনোযোগ দিয়ে হিন্দুধর্ম ও দর্শনের বই-গুলি দেখছেন। মুখেচোখে তাঁর একটা বিশেষ পরিতৃপ্তি আর আনন্দের চিহ্ন। মনে হলো বেশ কয়েকটা বই একপাশে বাছাই করে রেখেছেনও। বিস্ময় শেষ পর্যন্ত কৌতূহলে দাঁড়াল। না দেখার ভান করে বই খোঁজবার ছলে ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে দেখি অনুমান মিথ্যে নয়। বেশীর ভাগ বইই মনে হলো শ্রীঅরবিন্দের লেখা।

সংকেত পেয়ে দোকানদার এসে হাজির হল। বইগুলির দাম মিটিয়ে দিয়ে ডেলিভারী নেবার অপেক্ষায় আছেন। এমন সময়ে একটা বিরাট মিছিল নানা রকমের ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে আসতে লাগলো। মিছিলটাকে দেখবার জন্যে আমরা প্রায় সবাই দোকানের দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। মিছিলটার পুরোধায় জাতীয় পতাকা হাতে একটি তেরো চোদ্দ বছরের ছেলে। মিছিলটা দোকানের কাছ বরাবর এসে মাঝ রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে গেল। উঁকি মেরে দেখি রাস্তার অপরদিক থেকে এক গোরা পুলিশ সার্জেন্টের নেতৃত্বে এগিয়ে আসছে একদল সশস্ত্র পুলিশ।

সার্জেন্ট জনতাকে লক্ষ্য করে হুকুম জারী করলো—"বেজন্মার দল! যেখানে আছ সেখানে থেমে যাও। আর এক পাও এগিয়েছ কি গুলী চালিয়ে শেষ করে দোব!"

আদেশটা শুনেই মিছিলটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই দেখি তেরো-চোদ্দ বছরের সেই ছেলেটি জাতীয় পতাকা হাতে একলাই বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এক পা এক পা করে সার্জেন্টের দিকে এগিয়ে চলেছে। উদ্ধত বিদ্রোহভরে চীৎকার করে উঠলো—"ইনকিলাব জিন্দাবাদ! কুইট ইন্ডিয়া! বন্দেমাতরম!"

পশ্চাতে জনতার সম্মিলিত প্রতিধ্বনি তখন চারিদিকে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। ছেলেটি পতাকা হাতে এগিয়ে চলেছে। সার্জেন্টের হাতে কোষমুক্ত রিভলবার। হঠাৎ একটা আওয়াজ। তার পরের মুহূর্তে ছেলেটি একবার প্রাণপণ বন্দেমাতরম বলেই পতাকা হাতে রাস্তায় ঢলে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো পুলিশের চার্জ। জনতা ছত্রভঙ্গ। তারি মধ্যে দেখা গেল সেই সার্জেন্টটি পায়ের বুটের ডগা দিয়ে ভূলুন্ঠিত ছেলেটির মুখে মাথায় খোঁচা দিচ্ছে।

হঠাৎ আমার পাশ থেকে কে যেন বলে উঠলো—"মাই গড! মাই গড!" সেদিকে ফিরে তাকাবার আগেই দেখি সেই সামরিক অফিসারটি ছুটে গিয়ে এক ধাক্কায় সার্জেন্টকে সরিয়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠলেন—"ফর গডস্ সেইক্! লিভ দ্যাট বয় এলোন"।

আকস্মিক এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সার্জেন্টকে প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে দিলেও শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিল—"বেটার ইউ লিভ মি এলোন মেজর। দিস্ ইজ নান অফ ইউর বিজনেস। ইট ইজ মাই জব।" বলেই যেন ইচ্ছাকৃত অবহেলায় আবার ছেলেটির মুখে আঘাত করলো।

সঙ্গে সঙ্গে মেজর কোমর থেকে তাঁর রিভলবারটি বার করে সার্জেন্টকে লক্ষ্য করে বললেন—

—"গেট আউট অফ হিয়ার ইউ স্কাউন্ড্রেল। ইফ ইউ ট্রাই দ্যাট স্টাফ এগেইন, আই প্রমিস আই স্যাল পুট দা হোল ব্লাডি লীড ইনটু ইউর ব্লাডি হেড। গট দ্যাট ইউ রুকহেড?"

মেজরের চোখমুখের দিকে তাকিয়ে গতিক সুবিধের নয় অনুমান করে নিতে তার বেশী দেরী হলো না। তবুও খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে বললো—

—"অলরাইট! আই অ্যাম লিভিং। বাট্ ওয়াচ আউট মেজর—ইউ উইল হ্যাভ টু পে এ ভেরী হেভী প্রাইস ফর দিস্!"

তার কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে না করে মেজর তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে বসে রক্তাক্ত ছেলেটির মাথাটা নিজের কোলের উপর টেনে নিলেন। প্রায় মুমূর্ষু সেই ছেলেটি হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে এইভাবে লাফ দিয়ে উঠে পতাকা হাতে আবার চীৎকার করে উঠলে—'বন্দেমাতরম' আর তার পরের মুহূর্তেই শেষবারের মত ঢলে পড়লো মেজরের কোলের উপরেই।

চারদিকের দোকানপাটের দরজা জানালা সব বন্ধ। রক্তাপ্লুত অজ্ঞান ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে পাগলের মত এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলেন কাছে কোথাও ডাক্তার বা ডাক্তারখানা পাওয়া যায় কিনা। শেষ পর্যন্ত একটি দেখতে পেয়ে জোর করে তার দরজা খুলিয়ে ছেলেটিকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

পুলিশের অন্তর্ধানের পর ছত্রভঙ্গ জনতা বহুগুণে বর্ধিত হয়ে জমতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে কেমন করে জানি না একথা রটেও গেছে যে সার্জেন্টের গুলীতে সেই ছেলেটি মারা গেছে। জনতা উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত ও মারমুখী। উত্তেজনার এই চরম মুহূর্তে ছেলেটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করে রাস্তায় নেমে এলেন মেজর।

সাদা চামড়ার সাহেবকে দেখতে পেয়ে সেই উন্মত্ত জনতা তাঁকে খুন করবার জন্যে এগিয়ে আসতে লাগলো। শিলাবৃষ্টির মত হাজারে হাজারে ইঁট-পাটকেলের টুকরো তখন মেজরের সর্বাঙ্গে এসে লাগছে। কপাল মাথা ফেটে দরদর করে রক্তের ধারা বইতে শুরু করেছে। তবুও একটিবারের জন্যেও তাঁর হাত রিভলবারের দিকে এগিয়ে গেল না। আত্মরক্ষার এতটুকু চেষ্টাও করলেন না। নিশ্চল নিস্তব্ধ হয়ে হাসিমুখে সেই শিলাবৃষ্টি গ্রহণ করতে লাগলেন।

দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সব দেখছিলাম। কিন্তু এ দৃশ্য আর সহ্য করতে পারলাম না। নিজের বিপদকে অগ্রাহ্য করে সেই উন্মত্ত জনতাকে নিবৃত্ত করবার জন্যে চীৎকার করতে করতে ছুটে মেজরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। হঠাৎ এভাবে একজন

ভারতীয় সামরিক অফিসারকে ছুটে আসতে দেখে জনতা পলকের জন্যে থমকে দাঁড়াল। আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম এতবড় একটা ভুল—এত বড় অন্যায় অবিচার যেন তারা না করে। এই মেজর ভারতীয়দের শত্রু নয়—বন্ধু। কিন্তু আমার কথা শেষ হতে না হতেই জনতা গর্জে উঠলো—"রক্তের বদলে রক্ত! বজ্জা ছেলেটাকে গুলী করে মেরেছে তার বদলা চাই। মেরে ফেলো—সাবাড় কর—দেরী কিসের।"

সম্ভাব্য পরিণতির কথা কল্পনা করে ভয়ে, আতঙ্কে, গ্লানিতে আমার গলা শুকিয়ে কাট হয়ে গিয়েছে। তবুও শেষ-বারের মত আর একবার চীৎকার করে উঠলাম—"বন্ধুগণ। তোমরা একটিবার আমার কথা বোঝার চেষ্টা কর।" কিন্তু জনতার ক্রুদ্ধ আস্ফালনের কাছে আমার কণ্ঠ কোথায় হারিয়ে গেল। এমনি সময়ে হঠাৎ জনতার ভীড় ঠেলে গান্ধীটুপি পরা একটি যুবক আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তার দিকে তাকিয়েই আমি চমকে উঠলাম। আমার সহকর্মী অফিসার মারাঠি যুবক কেনী। মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এল "কেনী!"'। চোখের ইসারায় না চেনার ভান করে গুরুগম্ভীর স্বরে আমাকে প্রশ্ন করলো—"আপনি ভারতীয় হয়েও ভারতের শত্রু এই ইংরাজ দুশমনকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন কেন?"

আমি ঘটনার যথাযথ বিবরণ দিয়ে জানালাম যে ছেলেটিকে মেজর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন এবং নিজে কোলে করে নিয়ে ছেলেটিকে ঐ ডাক্তারখানায় পৌঁছে দিয়ে এসেছেন। মারাঠি ভাষায় কেনী সেই জনতাকে ঘটনাটি জানাতেই একদল লোক সেই ডাক্তারখানার দিকে ছুটে গেল আর একদল রইলো আমাদের ঘিরে। কয়েক মুহূর্ত পরেই সেই জনতা আনন্দে চীৎকার করে উঠলো। ছেলেটি গুরুতরভাবে আহত হলেও বাঁচবার সম্ভাবনা আছে। এবারে তাদের নজর পড়লো মেজর সাহেবের দিকে। হৈ হৈ করতে করতে সবাই মেজরকে আদর অভ্যর্থনায় ব্যতিব্যস্ত করে তুললো। নিজেদের ভুলের জন্যে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইতে লাগলো। মেজর সাহেবও দেখলাম সব কিছু ভুলে গিয়ে তাদের সংগে আনন্দে মেতে উঠেছেন। এতক্ষণ আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ভীড় ঠেলে সেই বইয়ের দোকানের দিকে কিছুটা এগিয়েছি এমন সময়ে শুনতে পেলাম বিদেশী কণ্ঠের আওয়াজ—"কুইট ইণ্ডিয়া! লং লিভ গান্ধীজী! ইনকিলাব জিন্দাবাদ!" ফিরে তাকিয়ে দেখি জনতার সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে দুহাত তুলে চীৎকার করছেন—মেজর সাহেব।

দোকানে ফিরে এসে নিজের বইটা নিয়ে বেরুতে যাব এমন সময়ে মেজরও এসে দোকানে ঢুকলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে হাতটা বাড়িয়ে হাসিমুখে বললেন—'থ্যাঙ্কস্।' তখনও কয়েকটা জায়গা থেকে রক্ত পড়ছে। আমি আমার দেশবাসীর হয়ে ক্ষমা চাইবার উপক্রম করতেই হাতের ইসারায় আমাকে থামিয়ে দিলেন। দোকানের লোকেরা ক্ষতস্থানগুলি মুছিয়ে দিয়ে ওষুধ দেবার প্রস্তাব করতেই মুখে চোখে প্রশান্ত আনন্দের হাসি ফুটিয়ে যেন গর্বের সংগে বললেন—"না-না। এর জন্যে আপনারা ব্যস্ত হবেন না। এগুলো আজ আমার কাছে আঘাতের চিহ্ন নয়। আমার স্বদেশবাসীর ঘৃণ্য অপরাধের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত অন্তত নিজের রক্ত দিয়ে করতে পেরেছি সেটা যে আমার কাছে কত বড় দুর্লভ জিনিস সে কথা বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই। এই আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত নাই বা করলেন।"

এর পর আর কারোর কিছু বলার রইলো না। আমি বিদায় নিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরবার আশায় ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে এসে দেখি একটাও ট্যাক্সি নেই। অপেক্ষা করছি এমন সময়ে মেজরও ট্যাক্সির জন্যে এসে হাজির। আমাকে দেখতে পেয়ে বেশ খানিকটা ব্যস্ত হয়েই এগিয়ে এসে বললেন—"এই ডামা-ডোলে আমার বিপদের বন্ধুর পরিচয় জানতেই ভুল হয়ে গিয়েছে—আমি অত্যান্ত দুঃখিত। আমার নাম হ্যারীস ব্রেইলস্‌ফোর্ড।"

নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইলাম তিনি কোনদিকে যাবেন। আমাদের দুজনের গন্তব্যপথ এক নয়। তবুও প্রস্তাব করলাম যদি তাঁর আপত্তি না থাকে তাহলে তাঁকে আমি লিফট্ দিতে চাই। কেননা শহরের যা অবস্থা তাতে কোন ট্যাক্সিওয়ালা কোন সাহেবকে সওয়ারী নিতে রাজী হবে কিনা সন্দেহ। আমাকে বিস্মিত করে উত্তর দিলেন—"নিতে রাজী হলেই বরঞ্চ আমি ক্ষুব্ধ হবো। ভারতীয়দের উচিত প্রতি ক্ষেত্রেই যেন তারা ইংরাজদের বয়কট করে।"

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই একটি বৃটিশ মিলিটারী পুলিশের জীপ সশব্দে ব্রেক কষে আমাদের সামনে এসে থামল। জীপ থেকে নেমে এলো একজন মিলিটারী পুলিশ অফিসার আর সেই সার্জেণ্টটি। অফিসারটি এগিয়ে এসে মেজরকে বললো—

"লেট মি সি ইওর আইডেণ্টিটি পাস্ প্লীজ।" মেজর এগিয়ে দিলেন। সেটির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে অফিসার বললো—

—"প্লীজ গেট ইনটু দা জীপ স্যার। আই হ্যাভবীন ইনস্ট্রাকটেড টু টেইক ইউ টু দা পুলিশ হেড কোয়ার্টার", বিস্মিত মেজর কি যেন জিগেস করবার উপক্রম করতেই সেই অফিসারটি বলে উঠলো—

—"নো কোশ্চেন প্লীজ।"

আর একটি কথাও না বলে চকিতে একবার আমার দিকে তাকিয়ে জীপে উঠে বসলেন।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফেরার পথে থেকে থেকে মেজরের কথা মনে পড়ছিল আর তার চাইতেও বেশী মনে পড়ছিল কেনীর কথা। শনিবার দিন দুপুরে ছুটির পর নিয়মমাফিক বিমানবাহিনীর পোশাক পরে অনেকেই একসংগেই বেরিয়েছিলাম—তার ভেতর কেনীও ছিল। নিশ্চয়ই কোন আত্মীয়স্বজন কিম্বা বন্ধুবান্ধবের বাড়ী গিয়ে সে সামরিক পোশাক ছেড়ে সিভিলিয়ান পোশাক পরে রাজনৈতিক আন্দোলনে মেতে উঠেছে। যদি ধরা পড়ে এমন কি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায় তাহলে অনিবার্য কোর্ট মার্শাল আর ততোধিক নিশ্চিত শাস্তি ফায়ারিং স্কোয়াডের গুলীতে মৃত্যু। আজ ও না থাকলে মেজরকে তো বাঁচান যেতোই না এমন কি আমারও যে কি হাল হতো ভাবতে পারছিলাম না। মেজরকে বাঁচাবার চাইতে আমাকে রক্ষা করার প্রয়োজনেই অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়েও সে এগিয়ে আসতে দ্বিধা করেনি।

অপেক্ষা করতে লাগলাম কেনীর ফিরে আসার। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। সমস্ত বাড়ীটা তন্দ্রামগ্ন। প্রায় রাত দেড়টার পর কেনী ফিরলো। তেমনি কেতাদুরস্তভাবে সামরিক পোশাক পরা। মুখে তার ইংরাজী গান—

—"ফলিং ইন লাভ এগেইন
উইথ এ গার্ল,
হোয়াট্ অ্যাম আই টু ডু।"

লাউঞ্জে এত রাত্রিতে একলা আমাকে বসে থাকতে দেখে তার চোখে মুখে বিস্ময়ের ভাব দেখে বুঝতে পেরেছিলাম সে অনুমান করতে পেরেছে আমি ওর জন্যেই বসে আছি। নিজেকে পলকে সামলে নিয়ে যেন কিছুই হয়নি ভাব করে রসিকতার সুরে প্রশ্ন করলো—

—"সে কি! এত রাত পর্যন্ত জেগে কোন সেই স্বপনচারিণীর পথ চেয়ে বসে আছ বন্ধু?"

আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই তাড়াতাড়ি গান ধরলো—

—"শি উইল বি কামিং
ডাউন দা মাউনটেইনস্
হোয়েন শি কামস্,
শি উইল বি ওয়েরিং দা ব্লু পাজামা
হোয়েন শি কামস্।"

আমি ওর রসিকতাকে আমল না দিয়ে বললাম—

—"আজ তুমি আমার জন্যে যা করেছ তার জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে আমি ছোট করবো না। কিন্তু যে আন্দোলনে মেতেছ ধরা পড়লে তার কি শাস্তি সে কথা তোমার অজানা নয়।"

আমার উৎকণ্ঠাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ডান হাত দিয়ে আমার মাথার চুল-গুলোকে এলোমেলো করে নেড়ে দিয়ে বললো—

—"ওঃ স্যানি ডিয়ার! ইউ ব্যাডলি রিকোয়ার এ হেয়ার কাট্। অনেক রাত হয়েছে এবার ঘুমুতে যাও।"

আমাকে আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে আবার গান ধরলো—

—"ইউ নেভার নো দ্যাট্ অ্যান্ অ্যাপেল
ইজ রাইপ,
আনটিল ইউ বাইট;
ইউ নেভার নো হোয়াট চার্ম
ইন কিসিং
আনটিল ইউ হোল্ড হার টাইট।"

কিছুদিন পরে এক রবিবার সকালে ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে গেলাম। তখনও বিশেষ ভীড় জমেনি। দু'চার জন সাঁতার কাটছেন আর কয়েকজন পাশে লনে বসে কফি কিম্বা বিয়ার খাওয়ায় ব্যস্ত। বার কয়েক এপার-ওপার করে আমিও একটা চেয়ার দখল করে বসে বেয়ারাকে বিয়ার আনতে হুকুম দিলাম। আসবার অপেক্ষায় আছি এমন সময়ে সুইমিং ট্রাঙ্ক পরা একজন সাহেব মৃদু মৃদু হেসে আমার কাছে এসে বললেন—

—"মাফ্ করবেন। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে আপনি নিশ্চয়ই আমার সেই পুরোন বন্ধু।"

লক্ষ্য করে দেখি—মেজর ব্রেইলসফোর্ড।

—"আপনার অনুমান এতটুকুও ভুল হয়নি। অনুগ্রহ করে বসুন। বারবার আপনার কথা মনে হয়েছে। কতবার মনেপ্রাণে আশা করেছি যেন আপনার সঙ্গে একবার দেখা হয়। আপনার সম্বন্ধে মনে একটা বিশেষ উৎকণ্ঠা ছিল।"

আমার আন্তরিকতা নিশ্চয়ই তাঁকে কিছুটা বিচলিত করেছিল। কেননা মনে হলো যেন নিজেকে সামলাবার জন্যেই তিনি চকিতে একবার অন্যদিকে তাকিয়ে নিলেন।

—"অনেক ধন্যবাদ। বিনা দ্বিধায় বলুন কি আপনাকে আমি জানাতে পারি।"

—"আচ্ছা! সেদিন মিলিটারী পুলিশ আপনাকে নিয়ে যাবার পর কি হলো?"

—"সেই সার্জেণ্টটি অভিযোগ এনেছিল আমি তার কর্তব্যকর্মে বাধা দিয়েছি আর সক্রিয়ভাবে ভারতীয়দের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজদ্রোহমূলক আচরণ করেছি। সেই অভিযোগকে ভিত্তি করে আমার সামরিক আদালতে বিচার করা হবে কিনা সে বিষয়ে সামরিক মহলে আলাপ-আলোচনা চলছে। আমি দু' দুবার আহত যুদ্ধক্ষেত্র ফেরত সৈনিক। আমার ট্যুর পিরিয়ড শেষ হয়ে গিয়েছে। এবারে ঘরে ফেরার পালা। ঘরমুখী জাহাজের অপেক্ষায় ছিলাম। আপাতত সে সুযোগ নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। তবে আহত-সৈনিকের বিশ্রাম নেবার ছুটিটা দয়া করে বাতিল করে দেয়নি।

কথায় কথায় কখন যে এতটা বেলা হয়ে গিয়েছে টের পাইনি। হঠাৎ বললেন—

—"আপনার লাঞ্চের কোন এনগেজমেণ্ট না থাকলে চলুন না দুজনে কোথাও খেয়ে নিই। অবিশ্যি আপনার আপত্তি না থাকলে।"

—"মোটেই নয় বরঞ্চ খুব খুশী হবো—চলুন।"

রাস্তায় বেরিয়ে এসে বললেন—"কেতাদুরস্ত কোন হোটেলে নয়। আপনার যদি কোন দেশী হোটেল জানা থাকে—বিশেষ করে বাঙালী হোটেল তাহলে সেখানেই যাওয়া যাক। কলকাতায় আমি আমার কয়েকজন বাঙালী বন্ধুদের বাড়ীতে মেয়েদের হাতের রান্না খেয়েছি—কি অপূর্ব! কি সুন্দর!"

স্মরণ করবার চেষ্টা করলাম বাঙালী খাবার কোথায় পাওয়া যেতে পারে। ক্রফোর্ড মার্কেটে 'বেঙ্গল লজে' বেশ কিছু বাঙালী থাকলেও খাওয়াটা ঠিক বাঙালী মাফিক নয়। শেষ পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভে একটি ছোট্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ইরাণী হোটেলে হাজির হলাম।

নানা ধরনের দেশী খাবার পরখ করে দেখার আনন্দে বোধকরি দুজনেরই খাওয়াটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় বেরিয়ে এসে বললেন—

—"খুব খাওয়া গেল যাহোক। এবারে একটা পান না খেলে চলছে না।"

আমি চমকে তাঁর দিকে তাকালাম। ভারতীয়দের এই দুর্বলতা নিয়ে রসিকতা করছেন কিনা বোঝবার আগেই দোকানের গায়ে লাগানো পানের দোকানে দুটো ভাল পান দেবার অর্ডার দিয়ে দিলেন। আমার বিস্ময়ের ভাব বোধকরি ইচ্ছে করেই লক্ষ্য করলেন না। বেশ ঘটা করে পানটা মুখে দিয়ে বললেন—'জানেন—মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় দেশে ফিরে গিয়ে যে জিনিসের অভাব সবচেয়ে বেশী অনুভব করব সেটা হচ্ছে এই পানের।'

—'এ অভ্যেস আপনার কোথা থেকে জন্মাল?'

—'সেও কলকাতায়। বন্ধুদের বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার পর মেয়েদের হাতে তৈরী পান আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় পরিতৃপ্তি। ঠিক করেছি দেশে ফিরে গিয়ে যুদ্ধের পর ভারতীয় পানের এজেন্সী নেবো। কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন দেবো—'ইংরাজ ভাই সব! দিনের পর দিন বয়েলড পটেটোজ আর বয়েলড ক্যাবেজ খেয়ে-খেয়ে জীবনে যে একঘেয়েমি এসেছে তার হাত থেকে বাঁচতে হলে খাবার পরে একটি করে হ্যারী'জ ভারতীয় পান খান। ব্যবসাটা খুব লাভজনক হবে নিশ্চয়ই কি বলেন?'

বলেই ছেলেমানুষের মত হো-হো করে উচ্চগ্রামে হাসতে লাগলেন।

হাঁটতে-হাঁটতে চার্চ গেট স্টেশন পেরিয়ে ইরস সিনেমার সামনে হাজির হলাম। রবার্ট টেলরের একটা বই হচ্ছিল, খুব সম্ভবত 'ওয়াটারলু ব্রীজ'। ছবি দেখবার চাইতে খানিকটা বিশ্রাম নেবার তাগিদেই টিকিট কিনে ঢুকে পড়া গেল। বিকেলে সামনেই একটি ছোট রেস্তোঁরায় চা খেয়ে দুজনে দুজনের কাছে বিদায় নিলাম আবার দেখা করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

এমনি করে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল।

সামরিক পদমর্যাদায় তিনি আমার চাইতে তিন ধাপ উঁচুতে। সে হিসেবে 'স্যর' বলেই সম্বোধন করাটা সামরিক রীতিনীতি। তাছাড়া আমার বয়েস আঠারো আর তাঁর তেইশ-চব্বিশ। কিন্তু সামরিক পর্যমর্যাদা বা বয়সের ব্যবধান সব কেটে গিয়ে আমাদের সম্পর্ক অতিসহজেই গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হল। আজ তিনি আমার কাছে শুধু 'হ্যারী'।

ইণ্ডিয়া গেটে এসে পালতোলা নৌকা ভাড়া করে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া আর মাছ ধরা সুতো-কাঁটা জলে ফেলে দিয়ে অলস মন্থরতায় গল্প করে যাওয়া আমাদের রুটিন হয়ে দাঁড়াল।

কথার প্রসঙ্গে যখনই কোন তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়ের অবতারণা হত তখনই দেখতাম কেমন যেন বিব্রত বোধ করছেন। নিজেকে গোপন রাখার এই প্রচেষ্টা স্বভাবতই আমাকেও বিব্রত করত। পাছে অসতর্ক মুহূর্তে কোন কথা তাঁকে অপ্রস্তুত করে সেই ভয়ে আমি নিজেও বিশেষ সাবধানে থাকতাম। তবুও টুকরো-টুকরো কথা আর ঘটনার ভেতর দিয়ে নিজের অজ্ঞানতেই ধীরে-ধীরে নিজেকে মেলে ধরেছেন। তাঁর মনের দিগন্তবিস্তৃত প্রসারতায় আমি বিস্মিত বিমুগ্ধ।

যুদ্ধে ডাক পড়ার আগে বেসামরিক জীবনে হ্যারী ছিলেন রিপোর্টার-সাংবাদিক। ছেলেবেলার খেলার সঙ্গিনী ইরিস ম্যাক-ডোনাল্ড আজ জীবনের ভাবী অধিষ্ঠাত্রী দেবী। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দুজনের বিয়ে হবে হ্যারী দেশে ফেরামাত্রই। প্রতি সপ্তাহেই ইরিস চিঠি লেখে। সে চিঠি কখনও পৌঁছায়, কখনও সমুদ্রে তলিয়ে যায়। ইরিসকে লিখেছিল আমার কথা। ইরিস আমার দিক থেকে কোন চিঠি পাওয়ার আগেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চিঠি লিখে জানিয়েছিল—'আজ থেকে আমিও তোমার বন্ধু'। উত্তরে লিখেছিলাম—'দেবী! তুমি আমাকে ধন্য করেছ।' ইরিসের সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হতে বেশী দেরী হল না।

ভারতবর্ষে রওনা হবার আগে ভারত সম্বন্ধে কতগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় হ্যারী ও তার সহযোগী সৈনিকদের জানাতে হয়েছিল। সেগুলি যে কত মিথ্যে, কত জঘন্য, কত আজগুবী কল্পনাও করা যায় না। ভয়ে ভয়ে ভারতের মাটিতে পা দিয়েছিলেন। চোখ মেলে দেখলেন। বুঝতে দেরী হল না যে এ অসত্য অপপ্রচারের আসল উদ্দেশ্য কি। বৃটিশ সৈনিকদের সঙ্গে ভারতীয়দের কোন প্রকার যোগাযোগ বৃটিশ সরকারের অভিপ্রেত নয়।

ভারতের প্রতি হ্যারীর গভীর অনুরাগ আর দুর্বলতার বিশেষ কোন গূঢ় রহস্য ছ কারণ আমি এত দিনের ভেতরও খুঁজে পাই নি। কেন জানি না আজকে যেন হ্যারীকে কথায় পেয়েছে। আর তারই ফলে তাঁর অজান্তেই জীবনের এক গভীর গোপন অধ্যায় উন্মোচিত হয়ে আমার মনের সকল প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়ে গেল।

একদিনের এক আকস্মিক ঘটনা তাঁর জীবনে এনে দেয় এক বিরাট পরিবর্তন। প্রথমবার যখন বর্মা সীমান্তে আহত হয়ে বেস হাসপাতালে স্থানান্তরিত হলেন, তখন পাশের বিছানায় গুরুতরভাবে জখম এক-জন ইংরেজ তরুণ সৈনিকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ছেলেটির নাম পল ব্রানসন্।

অন্যান্য আহত সৈনিকদের আর্তনাদে যখন হাসপাতাল নরককেও হার মানাচ্ছে তখন ঐ গুরুতরভাবে আহত পল পরম নিশ্চিন্ততায় নির্বিকারভাবে গভীর মন-যোগে বই পড়ায় নিমগ্ন। সংসারের বা তার চারিদিকের কিছুর সঙ্গেই যেন তার কোন যোগাযোগ নেই। ইংরাজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী পাশাপাশি একসঙ্গে থাকা সত্ত্বেও আলাপের মাত্রা বিশেষ অগ্রসর হয় নি। সময় আর কাটছে না দেখে পলের কাছে একটা বই চাইলেন। পল জানাল যে, তার কাছে কোন গল্প বা উপন্যাস নেই তবে ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে একটা বই আছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতে হল. প্রথমটায় কিছুই বুঝতে পারছিলেন না ধৈর্য ধরে কয়েক পৃষ্ঠা পড়বার পর কখন যে সকাল গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে বুঝতেও পারেন নি। বইটা যখন শেষ করলেন তখন এক অপার্থিব অনির্বচনীয় অনুভূতিতে তাঁর দেহ-মন অবশ প্রায়। বইটা শ্রীঅরবিন্দের লেখা।

পলের সঙ্গে গভীর আগ্রহে আলাপ জমালেন। পলের কাছ থেকেই শুনলেন শ্রীঅরবিন্দ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা রামাণা মহর্ষির কথা। আহত হবার দরুন বিশ্রাম নেবার সুযোগে যখন কলকাতায় এলেন তখন পলের কাছ থেকে ঠিকানা পাওয়া কয়েকজন বাঙালী বন্ধুর সঙ্গে পরিচিত হলেন। এঁদের সহায়তাই ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম সম্পর্কে নানা রকমের বই পড়া ও সংগ্রহ করার সুযোগ তাঁর হয়।

বলতে বলতে হঠাৎ বেশ কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইলেন। আমার মনে হল কিছু একটা কথা বলতে গিয়েও হয়ত ভাবছেন বলা ঠিক হবে কিনা। আমি ইচ্ছে করেই কোন অনুসন্ধিৎসা বা আগ্রহ প্রকাশ করলাম না। একটু পরে হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলেন—'তুমি অলৌকিক কিম্বা দৈবিক ঘটনায় বিশ্বাস কর?'

একটু বিব্রত হয়েই উত্তর দিলাম—'ঠিক সে ধরনের কোন ঘটনা বা প্রশ্ন আজও আমার জীবনে উদয় হয় নি তাই তোমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারছি না।'

একটুখানি নীরব থেকে আবার বলতে শুরু করলেন—'এ প্রশ্ন তোমাকে কেন করলাম জানো? কারণ এ প্রশ্নের উত্তর আমি নিজেও জানি না বা পাই নি বলে। আমি আজও ভাবি কোন সে এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তিরুচিতে রামাণা মহর্ষির পদতলে।'

স্মিতানন, শান্ত, সমাহিত সৌম্যদর্শন মহর্ষিকে দেখে তিনি আত্মচেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত কোন রকমে উচ্চারণ করেছিলেন—'মহর্ষি। আমাকে ভগবানের কাছে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিন। আমি মুক্তি চাই।'

মুক্তোধারার মত হেসে উঠেছিলেন মহর্ষি। তারপর স্নেহভরা কণ্ঠে বলে-ছিলেন—'বাছা! ভগবান তোমার নিজের মধ্যেই আছেন। তাঁকে খুঁজে পেতে হলে আগে তোমাকে তোমার নিজেকে খুঁজে পেতে হবে—জানতে হবে — চিনতে হবে। আত্মানং বিদ্ধি! নো দাই স্যালফ্! এই খোঁজা যেদিন তোমার শেষ হবে, সাথক হবে, সেদিন মুক্তি নিজেই এসে হাজির হবে তোমার কাছে।'

সেদিন মহর্ষির কথা শুনে তাঁর মনে হয়েছিল হয় তিনি কৌশলে ফিরিয়ে দিলেন আর না হয় তাঁর ধৈর্যের পরীক্ষা করছেন। যাই হোক। ফিরে এসে শুরু হল তাঁর জীবনের সাধনা—নিজেকে চেনার—নিজেকে জানার। প্রথমে মনে হয়েছিল কত না সহজ—কত না সরল। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে, নিজেকে এই জানার—এই চেনার বোধ-হয় শেষ নেই। অন্তবিহীন আমি পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে অন্তহীন আকাশের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়ে শুরু করলেন—'একদিন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। মনে হল যেন দিগ-দিগন্ত পেরিয়ে স্বর্গপুরে অমরাবতীতে এসে হাজির হয়েছি। সামনে এক বিরাট রুদ্ধ দুয়ার প্রাসাদ। সেটাই আমার গন্তব্যস্থল। দরজায় ঘা দিয়ে বললাম – 'দরজা খোল! আমি এসেছি।' ভেতর থেকে কে যেন পাল্টা প্রশ্ন করল—'আমি? আমি কে?' সে প্রশ্নের উত্তর দিতে কত না আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। আমার কণ্ঠ দিয়ে একটা কথাও বেরুচ্ছে না। আমার গলা জিহ্ব সব যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। লজ্জায়, হতাশায়, ব্যর্থতায় আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। ঘুম ভেঙে গেল। সে প্রশ্নের উত্তর আজও আমার মেলে নি। জানি না নিজেকে খোঁজা কোনদিন আমার শেষ হবে কিনা।'

আবার চুপ করে রইলেন, মনে হল যেন মনটা তাঁর কিসের অন্বেষণে ব্যস্ত।

একটু পরেই হো-হো করে হেসে উঠে বললেন—'খুব দুঃখিত। তোমার আজকের দিনটাই দিব্যি নষ্ট করে, এস একটু বিয়ার খাওয়া যাক।'

দূরে এলিফেন্টা কেইভের দিকে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল কি যে ভাবছিলাম মনে পড়ে না।

আমাকে অন্যমনস্ক দেখে হাল্কা সুরে প্রশ্ন করলেন—'কি এত ভাবছ বলত? শেষকালে তুমিও কি নিজেকে চিনতে শুরু করলে নাকি?'

আবহাওয়াকে আরও সহজ করে নেবার উদ্দেশ্যে আমি পাল্টা রসিকতা করে বললাম—'তোমার কথাই ভাবছিলাম। তুমি তো দেখছি পুরোদস্তুর হিন্দু হয়ে গেছ। ভাবছিলাম এবার থেকে তোমাকে হ্যারীস্ না ডেকে হরিশ্ ডাকলে কেমন হয়।'

কিন্তু আমার রসিকতা ব্যর্থ হল। গভীর কণ্ঠে ধীরে-ধীরে বললেন—'হিন্দু কতটা হয়েছি বা হতে পারব কিনা জানি না। তবে আমি যা ছিলাম তার চাইতে অনেক বেশী খাঁটি খৃশ্চান হতে পারার পথ আমি খুঁজে পেয়েছি এ বিশ্বাস আমি মনে-প্রাণে করি। ভগবানকে অসীম ধন্যবাদ।'

এমন সময়ে প্রায় আমাদের নৌকার গা ঘেঁষে একটা জাহাজের কনভয় চলেছে। তারই ভেতর একটি জাহাজ ঘরমুখী সৈন্যতে বোঝাই ঘরে ফেরার আনন্দে মুখরিত সৈন্য দল জাহাজের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে অপসৃয়মান বোম্বাইয়ের দিকে তাকিয়ে সম্মিলিত কণ্ঠে গান ধরেছে—

'দে সে দ্যাট্ এ স্ট্রুপশিপ লিভিং বোম্বে,
বাউন্ড ফর দা মাইটি ব্রাইটি শোর
হেভিলি ল্যাডেন উইথ টুরে
এক্সপায়ার্ড মেন্
বাউন্ড ফর দা লাভলি শোর দে এডোর'।

নীরবে সেদিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাহাজকে দেখা যাচ্ছিল। তারপর এক সময়ে করুণ হেসে বললেন—'জান! ঐ জাহাজেই আমার ফেরার কথা ছিল।'

ইণ্ডিয়া গেটের সামনে যখন আমাদের নৌকা ভিড়ল তখন অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভায় চারিদিক রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

জরুরী প্রয়োজনে হঠাৎ তার পরদিন আমাকে পুণায় যেতে হল কয়েক দিনের জন্যে। ফিরে এসে হ্যারীকে খুঁজে বার করার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম।

মাস তিনেক কেটে গেছে। আসান-সোলের নিঙ্গা-কালিপাহাড়ী অঞ্চল জুড়ে একটা বিরাট রয়েল এয়ার ফোর্স বেস ছিল। কিছু দিনের জন্যে আমাকে এখানে অ্যাটাচ থাকতে হয়।

আসাম-বর্মা সীমান্তে আমেরিকান সেনাপতি জেনারেল উইঙ্গেটের নেতৃত্বে বিখ্যাত 'চিণ্ডিট' বাহিনীর গেরিলা অভিযান চলছে। সামরিক প্রয়োজনে একদিন সকাল বেলায় ইম্ফল আসতে হল। বিকেলে আবার ফিরব। যে কয়েক ঘন্টা হাতে সময় আছে তার সদ্ব্যবহার করবার জন্যে ইম্ফল বাজারে বেড়াতে এলাম।

হঠাৎ কে যেন আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল। বিস্মিত হয়ে ঘুরে তাকিয়ে দেখি হ্যারী। এভাবে তার সঙ্গে দেখা হবে কল্পনাও করতে পারি নি। কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে এক রকম টানতে-টানতেই কাছে এক চীনা রেস্তোরাঁয় হাজির হলেন। গ্রীন-টি-এর অর্ডার দিয়ে জাঁকিয়ে বসে বললেন—

—'জান। কাল রাত্রেও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যাবার আগে তোমার সঙ্গে যেন একবার দেখা হয়। কয়েক মুহূর্তে আগে পর্যন্ত সে সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিলাম না। আর একটু দেরী হলেই আর তোমার সঙ্গে দেখা হত না। আমি ততক্ষণে চলতি।'

—'আজ সকালেই এসেছি আবার কয়েক ঘণ্টা পরেই ফিরব। আমিও যদি ইম্ফল বাজারে বেড়াতে না আসতাম তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা নাও হতে পারত। যাকগে সে সব কথা। আগে বল—বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ বোম্বে থেকে একদম উধাও হলে কেন?'

—'সেই সংবাদেই অনেক প্রয়োজন বলে তোমাকে মন-প্রাণ দিয়ে স্মরণ করছিলাম। সেদিন ক্যাম্পে ফিরে আসতেই কমান্ডার সাহেবের জরুরী আদেশ—আর দু ঘণ্টার ভেতর আমাকে রাওলপিণ্ডি যেতে হবে। সেখানে সামরিক আদালতে আমার বিচার। তাই তোমাকে খবর দেবার মত সময়টুকু পর্যন্ত পেলাম না। জার্বিশা গিয়ে তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম, নানা কারণেই হয়ত সে চিঠি তোমার কাছে পৌঁছায় নি মনে হচ্ছে। যাই হোক। বিচার শুরু হল। অভিযোগ তো জানই। সাধারণ বেসামরিক একজন ইংরাজের চাইতে আমার অপরাধের গুরুত্ব অনেক বেশী কারণ আমি সামরিক অফিসার। আমার কৌসুলী শেষ পর্যন্ত কোন উপায় না দেখে আমাকে উপদেশ দিলেন সব অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলে হয়ত প্রাণটা বাঁচান যাবে। আমি তাঁকে নিরাশ করলাম না। অপরাধটা সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়ে বললাম — 'ধর্মাবতার, আপনার বিচারে আমার কি শাস্তি হবে জানি না। সে যাই হোক না কেন—এ কথাটা আমি জানিয়ে দিতে চাই—যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে যতদিন ভারত পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি না পাচ্ছে ততদিন বার-বার ঐ অপরাধ করতে আমি এতটুকুও দ্বিধা করব না।' যে শাস্তি আমার হল সেটা একরকম মৃত্যুদণ্ডই বলা চলে। কারণ আমি দু-দুবার আহত যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিক। সম্মুখ যুদ্ধে মেয়াদ আমার শেষ হয়ে গেছে অনেক দিন। এখন দেশে ফেরার পালা। আমাকে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে পুনরায় সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়ার আদেশ হল। ইংরাজ সরকার 'লাঠিও ভাঙল না অথচ সাপও মারা গেল' এ নীতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার সুযোগ নিল। ফায়ারিং স্কোয়াডের গুলীতে মারা গিয়ে শহীদ হবার সুযোগও দেওয়া হল না অথচ আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরৎ পাঠিয়ে কৌশলে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে সরিয়েও ফেলা গেল।

—'দুবার তুমি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছ—এবারেও তাই হবে। এত বড় অবিচার ভগবান কিছুতেই সইবেন না।'

—'আমি সৈনিক। মৃত্যুভয় আমার নেই — তাই আফশোষও নেই। আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন বার-বার জানান দিচ্ছে—'তুমি মুক্তি চেয়েছিলে—সে মহা-লগ্নের আর দেরী নেই।' নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে নিয়েছি। শুধু একটি কারণে মনটা দুর্বল হয়ে আছে। তাই তোমাকে স্মরণ করছিলাম। অপ্রত্যাশিত এভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার ভেতর আমি আমার নিশ্চিত মুক্তির পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। তোমাকে আমার একটা কাজ করতেই হবে বন্ধু। এ দায়িত্ব নেবার অধিকার শুধু তোমাকেই দেওয়া যায়। আমি জানি আমার সেকথা তুমি রাখবে। তাই অনুরোধের মাত্রাটা বাড়িয়ে তোমাকে বিব্রত করতে চাই না।'

—'দয়া করে সে সুযোগ তুমি আমাকে দাও হ্যারী। আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।'

নিজের হাতের আঙুলের আংটিটার দিকে বেশ কয়েকটি মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে অতিসম্ভ্রমে সন্তর্পণে ধীরে-ধীরে সেটি খুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন—

—'এটা আমাদের এনগেজমেন্ট রিং। ইরিস নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছিল। এটা আপাতত তোমার কাছে রেখে দাও। ইরিসকে এত সব কথা কিছুই জানাই নি। যদি শেষ পর্যন্ত ফিরে আসি তাহলে তো ভালই, আর যদি না ফিরি, যুদ্ধশেষ হবার পর কিছুদিন অপেক্ষা করেও যদি আমার কোন খবর না পাও, তাহলে ইরিসকে এ আংটিটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে বল এই আংটির গুরুভার থেকে আমি তাকে মুক্তি দিয়ে গেছি।'

পুরুষ মানুষ তাই কাঁদতে পারি নি। অনেক কষ্টে ধীরে-ধীরে বলেছিলাম—'বেশ! তাই হবে হ্যারী।'

ককপিটে বসে সারাক্ষণ শুধু হ্যারীর কথাই ভেবেছি। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কত সৈনিকই তো ফিরে আসে—এই সান্ত্বনাটুকু পর্যন্ত জোর করে নিজের মনকে দিতে পারছিলাম না। কারণ হ্যারীকে যেতে হচ্ছে কাভা ভ্যালী যুদ্ধসীমান্তে। দেশী-বিদেশী সমস্ত সৈনিকদের কাছে যার অপর নাম—'ভ্যালী অব ডেথ' — 'মৃত্যু উপত্যকা।' কাবা ভ্যালীর মত নির্মম নিষ্ঠুর প্রাকৃতিক শত্রু বোধ করি মানুষের আর দ্বিতীয় নেই। এর প্রতিটি ইঞ্চিতে রয়েছে মৃত্যুর ফাঁদ। কোথাও এতটুকুও পানীয় জল নেই অথচ রয়েছে চারিদিকে বিষধর সাপের বিষের চাইতেও মারাত্মক দূষিত জল—হিংস্র জন্তুজানোয়ার গভীর অরণ্য মশা-মাছি, লতাপাতা আর তার চাইতে মারাত্মক সব চিকিৎসার অতীত এক ধরনের তীব্র কালাজ্বরের জীবাণু। জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধে যত না সৈন্য মারা গেছে তার দশগুণ বেশী সৈন্য মারা গেছে বিনা সংগ্রামে, বিনা চিকিৎসায় বিনা পরিচয়ে এই প্রাকৃতিক শত্রুর কাছে। হ্যারী সেই সম্ভাবনার কথাই ভেবেছিল।

তারপর সব কিছুর মত একদিন যুদ্ধেরও শেষ হলো। কেউ বা ফিরলো—কেউ বা ফিরলো না। যারা ফিরলো না তাদের ভেতর হ্যারীও একজন।

বছর খানেক অপেক্ষা করার পর সে আংটি ইরিসকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে হ্যারীর শেষ কথাগুলিও জানিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু ইরিস মানতে রাজী হলো না। জীবনব্যাপী বৈধব্যের সংকল্প নিয়েছিল। মায়াবিনী প্রকৃতিদেবী সেদিন নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে হেসেছিলেন।

ইরিসকে আমি এতটুকুও অপরাধী মনে করি না। তবুও কোহিমার এই সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে—এ না হলেই যেন ভাল ছিল।

এতদিন ধরে প্রেমের যে স্মৃতি বুকে নিয়ে ইরিস দিন কাটাচ্ছিল সে কি আজ অনাদৃত অবহেলায় বিস্মৃতির স্রোতে হারিয়ে যাবে না? স্মৃতির মর্যাদা কি তাহলে ধূলিকণার বেশী মূল্য পাবে না? এটাই কি প্রাকৃতিক নিয়ম? প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর পরিহাস কেন?

কোহিমায় আর হয়ত কোনদিন আমার আসা হবে না। কালের যাত্রায় এই সমাধিস্থলও হয়ত একদিন ধূলিকণার সঙ্গে মিশে মিশে একাকার হয়ে যাবে। একথাও হয়ত কেউ কোনদিন জানতে পারবে না যে এইখানে, এই দেশের মাটিতে মিশে আছে একজন সাধারণ বিদেশীর দেহাবশেষ—যাকে অন্তর দিয়ে ভারতবর্ষকে ভালবাসার মূল্য দিতে হয়েছিল নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে।

নাই বা জানলো কেউ—নাই বা মনে রাখলে কেউ—আমি তো জানি।

হ্যারী থাকবে চিরদিন আমার অন্তরের নিভৃত কোণে—আপন মহিমায় আপন গৌরবে।

ফেরার পথে কয়েক পা এগিয়ে এসে শেষবারের মত তাকাতে গিয়ে দেখি হঠাৎ এক দমকা হাওয়া এসে মোমবাতি দুটোকে নিভিয়ে দিয়ে গেল।

।। তেরো ।।

রাজীব চোরাদৃষ্টিতে দেখল সুব্রত মুখ টিপে হাসছে। চাঁদবদনেরও বিগলিত অবস্থা। এমন একটা রসালো সংবাদ পরিবেশন করতে পেরে সে আহ্লাদে আট-খানা। ব্যাপারটা মজাদার সন্দেহ নেই। ঘটনায় রহস্য আছে। কিন্তু সে রহস্য গোপন প্রেমের। তার স্বাদটুকু মধুর। গন্ধটি মনমাতানো এবং উত্তেজক। দুজনেই তারিয়ে-তারিয়ে রসটুকু উপভোগ করছে।

এতক্ষণে রহস্যটা পরিষ্কার। ঘরের মধ্যে চাঁদবদনকে দেখে মিসেস রায় তাই চমকে উঠেছিলেন। লোকটা তাঁকে একজন পরপুরুষের সঙ্গে ট্রেনে উঠতে দেখেছে। কামরাতে চতুর্থ ব্যক্তি ছিল না। সমস্ত পথ দুজনের মুখোমুখি ঘনিষ্ঠতা, অন্তরঙ্গ কথাবার্তা, ঠাট্টা-তামাসা কিছুই লোকটার দৃষ্টি এড়ায় নি। দুজনের সম্পর্কটা বুঝতে ওর বাকি নেই। লোকটা অবাঙালী। হয়ত বাংলা ভাষা ভাল বোঝে না। কিন্তু তাতে কি? প্রেমের সম্পর্ক আবিষ্কার করতে মুখের ভাষা জানতে হয় না। চোখের ভাষা বুঝলেই যথেষ্ট।

রাজীব একদৃষ্টিতে চাঁদবদনকে লক্ষ্য করল। মুখখানা চাঁদপানাই বটে। গালে, কপালে, নাকের উপর এবং অনেক স্থানেই বসন্তের ক্ষতের স্থায়ী চিহ্ন। অনায়াসে ওগুলিকে ছবিতে দেখা চন্দ্রপৃষ্ঠের নানা গহ্বর হিসাবে কল্পনা করা যায়। লোকটার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি কিম্বা তার চেয়ে কিছু কমও হতে পারে। মাথার চুল পাতলা। এবং ছোট করে ছাঁটা। কপাল প্রশস্ত নয়। মুখ শুকনো,—নিংড়ে রস বের করে নেওয়া একটা পান্তুয়ার মত। কিন্তু চোখ দুটি খুব উজ্জ্বল। বুদ্ধির যথেষ্ট ছাপ আছে। গম্ভীর মুখ করে রাজীব বলল,—'নরেশ-বাবুর সঙ্গে আপনার কত দিনের পরিচয়?'

—'পাঁচ-ছ বছর হোবে', চাঁদবদন জবাব দিল।

—'ট্রেনের কামরায় যে ছোকরাকে

দেখেছিলেন তাকে আবার দেখলে চিনতে পারবেন?'

—'জরুর হুজুর। কেনো পারব না?'

—'ছোকরাকে দেখতে কেমন? গায়ের রঙ ফর্সা? খুব সুন্দর?' রাজীব প্রশ্ন করল।

—'না হুজুর, ফর্সা নয়, কালাই আছে। লেকিন দেখতে খারাপ নয়। আচ্ছাই হ্যায়।'

—'লোকটা লম্বা না বেঁটে? চোখে চশমা ছিল?'

—'লম্বা নয়, থোড়া খাটোই আছে। হাঁ, আঁখেমে চশমা তো ছিল।' চাঁদবদন একটু চিন্তা করে বলল।'

—'হুম্', রাজীব কোনো মন্তব্য করল না। ইসারা করে সুব্রতকে কাছে ডাকল। তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে চাপা গলায় বলল, — 'পলাশপুর কলেজের বাংলার প্রফেসর নীলাদ্রি সেনকে চেন?'

সুব্রত একটুও না ভেবে জবাব দিল, —'কার কথা বলছেন? নীলাদ্রি সেন? তাঁকে বিলক্ষণ চিনি। পলাশপুরে তিনি তো ফেমাস ব্যক্তি?'

—'লোকটা ফর্সা না কালো?'

—'গায়ের রঙ কালোই। কিন্তু দেখতে সুন্দর। চোখ দুটি বড় বড়। কোঁকড়া, কোঁকড়া চুল। বেশ প্লীজিং পার্সো-ন্যালিটি।'

—'বুঝলাম'। রাজীব একটু হেসে বলল, 'কেষ্টঠাকুর মার্কা চেহারা। নিশ্চয় কিছুটা বেঁটে? চোখে চশমাও আছে?'

সুব্রত স্বীকার করল। নীলাদ্রি সেন দৈর্ঘ্যে একটু খাটো। চোখে চশমাও আছে। খয়েরী রঙের ফ্রেম, ডাটিগুলি মোটা।

রাজীব ফের চাঁদবদনকে নিয়ে পড়ল।

—'ট্রেনের কামরায় যা দেখেছিলেন, সেকথা কারো কাছে গল্প করেছেন?'

—'কারো কাছে মানে,—' চাঁদবদন কথা শেষ না করেই থামল।

—'কার কাছে গল্প করেছিলেন বলুন। খবরটা আমার জানা দরকার।'

—'সারাদিন কারো কাছে গল্প করলাম না হুজুর। লেকিন সন্ধ্যার পর নরেশ-বাবুকে সব কথা বলে ফেললাম। না বলে পারলাম না।'

রাজীব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, কিছুক্ষণ পরে সে বলল,—'না বলে থাকতে পারলেন না কেন? নরেশবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন?'

—'আজ্ঞে না হুজুর।' চাঁদবদন ভয়ে-ভয়ে বলল।

—'তাহলে?'

—'পরশু দিন সন্ধ্যার পরেই ডাগদার-বাবু হামার কাছে এসেছিল।'

—ডাক্তারবাবু মানে? মিঃ অম্বর রায়?'

—'জী, হাঁ। ও পুছল কি নীপা দেবীকে হামি চিনি কিনা। ওর সাথে হামার আগে মোলাকাৎ হয়েছে কিনা জানতে চাইল।'

—'আপনি কি বললেন?'

—'কুছু জানালাম না।' চাঁদবদন একটু হেসে বলল,—'হামি বললাম নীপা দেবীকে চিনব কেমন করে? কভি দেখাই নেহি।'

—'ডাক্তার আপনার কথা বিশ্বাস করল?'

—'বিলকুল নেহি হুজুর। হামাকে বলল কি, আপ ঝুটা বাত বলছেন। নীপাকে আপ জরুর চিনতেন। লেকিন সাচ বাত্ বলছেন না।'

রাজীব প্রশ্ন করল, — 'সত্যি কথাটা ডাক্তারের কাছে চেপে গেলেন কেন?'

—'বলছি হুজুর।' চাঁদবদন একবার সুব্রতের মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করল।

সাহস জুগিয়ে রাজীব বলল,—'ওর সামনে সংকোচ করবার কোনো কারণ নেই। আপনি নির্ভয়ে বলে যান।'

চাঁদবদন বলল,—'সাচ্ বাত বলব কেমন করে হুজুর? হামাকে নীপা দেবী যে মানা করে গেল।'

—'বলেন কি?' রাজীব সোজা হয়ে বসল। 'মিসেস রায় আপনার কাছে এসে-ছিলেন?'

—'এসেছিলেন বৈকি। তখন বেলা চারটা হোবে। নরেশবাবু বাথরুমে, হোটেলের একটা চাকর এসে বলল,—একঠো জেনানা আপকা সাথ ভেট করতে চায়। হামি নীচে গিয়ে দেখলাম নরেশবাবুর ভাতিজি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।'

—'তারপর?'

—'বহুৎ রিকোয়েস্ট করে উনি বলল কি ডাগদার এলে এসব কথা তাকে যেন না বলি।'

—'হুম্।' রাজীব একমুহূর্ত চিন্তা করল। পরে বলল,—'তাহলে নরেশবাবুর কাছে এ গল্প করলেন কেন?'

—'সাচ্ বলছি হুজুর। এ গল্প আমি করতাম না। কিন্তু নরেশবাবু যখন ওর ভাতিজির ঘর থেকে ফিরছিল তখন ডাগদার সাবকে হোটেল থেকে বেরোতে দেখেছিল। ও এসেই হামাকে পুছল কি, অম্বর কেনো এসেছিল। হামি ঝুট বলতে পারলাম না। সব কথা ওকে বলতে হল হুজুর।'

রাজীব এবার প্রসঙ্গান্তরে গেল।

—'বাড়ি বিক্রীর কথা নরেশবাবুই আপনাকে বলেছিলেন?'

—'হাঁ হুজুর। হামাকে বললেন কি যে ওর ভাতিজির একঠো মকান আছে। তিন-তলা বাড়ি,—অনেক ঘর আছে। লেকিন দাম বেশী হোবে না। হামি যদি কিনতে চাই তো উনি সব বেবোস্তা করে দেবেন। তখন হামি বললাম কি সুবিস্তামে হোলে সে কেনো কিনব না? জরুর কিনব।'

—'নরেশবাবু কত দাম চেয়েছিলেন?'

—'পঁচাশ হাজার রুপেয়া। দাম ঠিকই আছে। কিনলে হামার পোষাবে।'

রাজীব ভ্রূ কুঁচকে বলল,—'ব্যাপার কি মশায়? কলকাতার উপর তিনতলা বাড়ির দাম মোটে পঞ্চাশ হাজার টাকা? বাড়িটা কোথায়?'

—'হুজুর গোলদিঘির কাছে।'

—'অ্যাঁ! গোলদিঘির কাছে তিনতলা বাড়ি। বলছেন অনেক ঘর। আর তার দাম মোটে পঞ্চাশ হাজার টাকা।' মাথা নেড়ে রাজীব বলল,—'উঁহু, সমস্ত ব্যাপারটা কেমন সন্দেহজনক ঠেকছে আমার। এমন জলের দরে বাড়ি বিকোয় না।'

—'সন্দেহকা কোই বাত নেহি হুজুর। এ তো খালি বাড়ি নেই। খরিদ করব, কিন্তু দখল পাব না। সব ঘরে ভাড়াটে আছে। বাড়ি খালি করতে কম-সে-কম বিশ-পঁচিশ হাজার রুপেয়া খতম হোবে।' কথা শেষ করে চাঁদবদন রাজীবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু রাজীবের কোনো ভাবান্তর হল না। তার মুখ দেখেই মনে হল কথাটা সে আদৌ বিশ্বাস করে নি। ধমক দিয়ে রাজীব বলল,—'বাজে কথা রাখুন। গোলমেলে সম্পত্তি হলে লোকে দাঁও বুঝে কম দামে বিষয় কেনে। কিন্তু কলকাতার উপর তিন-তলা বাড়ির এমন জলের দর ইদানীং কালে শুনি নি। দাম শুনে মনে হয় আপনি ঠকিয়ে নাবালক কিম্বা বিধবার সম্পত্তি কিনছেন।'

পকেট থেকে সিগারেটটা বের করে রাজীব ধূমপানে উদ্যোগী হল। লাইটারের আগুনে সিগারেটের মুখ শুদ্ধ করল। পরে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—'চাঁদবদনবাবু, আপনাকে একটা কথা এখনও বলি নি। নরেশবাবুর ভাইঝি মানে যার বাড়ি আপনি কিনতে চেয়েছিলেন তিনি আর বেঁচে নেই। আত্মহত্যা করেছেন বলে শুনেছেন তো?'

—'হাঁ হুজুর।' চাঁদবদন ঘাড় হেলিয়ে জবাব দিল। বলল,—'শুনে দিলমে বহুৎ দুখ্ হল হামার। কিতনা খুবসুরৎ জেনানা। না জানে মনমে কি দুখ্ ছিল। লেকিন সবকো বহুৎ দুখ্ দিয়ে গেল। উসকি চচা নরেশবাবু তো একদম চুপ হয়ে গিয়েছে। কাল থেকে একঠো বাত্ ভি বলে নি।'

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে নিয়ে রাজীব বলল,—'কিন্তু ঠিক নয় চাঁদবদনবাবু। নীপা দেবী আত্মহত্যা করেন নি। তিনি খুন হয়েছেন। তাঁকে ইঞ্জেকশন দিয়ে মারা হয়েছে।'

চাঁদবদন চমকে উঠল। সে খুব ভয় পেয়েছে মনে হল। গোল গোল চোখ করে বলল,—'কি বললেন হুজুর? নরেশবাবুর ভাতিজি খুন হয়েছে? সুঁই দিয়ে খতম করেছে ওকে?'

—হ্যাঁ।' রাজীব স্পষ্ট জবাব দিল। 'এখন বলুন জলের দরে বাড়িটা পাবেন বলে নরেশবাবুকে কত টাকা দালালি কবুল করেছিলেন?'

—'দালালি? কি বলছেন হুজুর?—' চাঁদবদন আমতা-আমতা করল।

—'ঠিকই বলছি।' রাজীব ফের ধমক দিল, 'ভালো চান তো সব কথা স্বীকার করুন চাঁদবদনবাবু। নইলে আপনার কপালে দুঃখ আছে। বাড়ি কিনবার জন্য আপনারা দুজনে কলকাতা থেকে পলাশ-পুরে এলেন আর তারপরই মিসেস রায় খুন হলেন। এবং যে রাতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটল সেই রাতে আপনারা দুজনেই পলাশ-পুরে ছিলেন।'

—'হামি থাকতে চাই নি হুজুর। বিকালের ট্রেনে যাব বলেছিলাম। কিন্তু নরেশবাবু মানা করল।'

—'মানা করল কেন?'

চাঁদবদন খুব ভয় পেয়ে বলল,—'থোরা পানি—'

সুব্রতর নির্দেশে একজন সিপাই এসে এক গ্লাস জল রেখে গেল। চোঁ-চোঁ করে খানিকটা জল গিলে চাঁদবদন বলল,—'হামি সব বলছি হুজুর। পরশু সকালবেলায় বাড়ির দরদাম নিয়ে বার্তাচিত হল। নরেশবাবু বলল কি চাঁদবদন প'চাশ হাজার টাকা দাম দিবে। বাত্‌চিত হল, কিন্তু কুছু ফাইনাল হল না। ডাগদারবাবু বলল কি, ওরা পিছে জানাবে। কথা হল, সন্ধ্যাবেলা নরেশবাবু যাবে ওর ভাতিজির কাছে। ওই দামে বাড়ি বেচবে কিনা জেনে আসবে।'

—'তা, নরেশবাবু কখন ওর ভাইঝির কাছে গেলেন?'

—'বিকালবেলায় হুজুর। তখন সনধ্যা হতে দেরি আছে—'

—'ফিরে এসে তিনি কি বললেন?'

—'ভালো কথা বলল। ওরা বাড়ি বেচবে। প'চাশ হাজার টাকাতেই রাজি। হামাকে বলল কি, চাঁদবদনজী তোমার টাইম ভাল যাচ্ছে। সামনের হপ্তায় দলিল-টলিল তৈয়ার করতে হোবে। হামি বললাম, এসব ভগবান কি কিরপয়া। কিন্তু—'

—'কিন্তু কি আবার?' রাজীব ওকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করল।

চাঁদবদন ইতস্তত করে উত্তর দিল,—'রাত্তিরবেলায় নরেশবাবু তো উলটা কথা বাতাল।'

—'কি রকম?' রাজীব কৌতূহলী হল।

চাঁদবদন গলা নামিয়ে বলল,—'আট বাজনে কো বাদ নরেশবাবু ঔর একদফা বাহার গেলেন। যখন ফিরলেন, তখন রাত দশটা হয়েছে। ওতো পানি হুজুর। রিকশ করে ফিরলেন তো কী হোবে? একদম ভিজে কাদা—'

রাজীব আগ্রহসহকারে বলল,—'তারপর? নরেশবাবু কি বললেন?'

চাঁদবদনকে চিন্তিত দেখাল। সে বলল,—'নরেশবাবু রাত্তিরে কুছু খেল না হুজুর। বলল কি তবিয়ৎ আচ্ছা নেই। হামাকে বলল,—'চাঁদবদনবাবু, হামার ভাতিজি এখন বাড়ি বেচবে না বলেছে। লেকিন হামি তো সমঝতে পারল না। দো-তিন ঘণ্টাকা অন্দর মতলব কায়সে বদলে গেল।'

রাজীব বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তার প্রশস্ত কপালে ছোট-বড় কয়েকটি রেখা দেখা দিল। ভ্রূ কুঁচকে রাজীব প্রশ্ন করল,—'চাঁদবদনবাবু, আপনি আমার আসল কথাটার কিন্তু এখনও জবাব দেন নি।'

—'আসল কথা', চাঁদবদন বিস্ময় প্রকাশ করল, 'হামি তো সব কুছ বললাম।'

—'উহুঁ।' রাজীব বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করল। 'সস্তায় বাড়ি কিনতে যাচ্ছিলেন। কত টাকা দালালি দেবার কথা ছিল, তাতো কই ভাঙলেন না।'

চাঁদবদন ব্যাপারটা বুঝল। ইন্সপেক্টর ভোলবার নয়। তার মনের মধ্যে দ্বিধা আর সংশয় খাঁচার পাখির মত এদিক-ওদিক নাচানাচি করছিল। সুব্রতের মুখের দিকে তাকিয়ে সে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। পরে বলল,—'আপ ঠিক হি মালুম করিয়েছেন হুজুর। নরেশবাবু হামসে বিশ হাজার রুপেয়া মাগিয়েছিল। হামি বললাম কি দশ হাজার রুপেয়া দেব। লেকিন ও ছোড়নেকা আদমী নেহি হুজুর। কম হোনে কা বাদ ঔর এক-দো হাজার জরুর মাঙত।'

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিতেই সেটির আয়ু ফুরোল। শেষ টুকরো অংশটি অ্যাশট্রের মধ্যে ফেলে সুব্রতের দিকে তাকাল রাজীব। চোখ নাচিয়ে রহস্য করে হাসল। সুব্রত বুঝতে পারল চাঁদবদনের সঙ্গে রাজীবদার কথাবার্তা শেষ। এবার তাকে ছেড়ে দেওয়া যায়। এগিয়ে গিয়ে সে বলল, '—ঠিক আছে চাঁদবদনবাবু। আপনি এখন আসুন। আর আপনাকে প্রয়োজন নেই।'

মুখ তুলে রাজীব এবার কথা কইল। 'কোথায় ফিরে যাবেন এখন? হোটেলেই তো?'

—'ঔর কাঁহা যাব হুজুর? লেকিন আজ কলকাত্তা যেতে চাই। না গেলে বহুৎ লোকসান হোবে।'

অনুমতি দানের ভঙ্গিতে রাজীব বলল,—'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কলকাতা যাবেন বৈকি। আজ দুপুরের ট্রেনেই চলে যান। কিন্তু তার আগে নরেশবাবুর সঙ্গে আমার একটু কথা বলা দরকার। উনি এখন হোটেলেই আছেন তো?'

—'মালুম হচ্ছে কি হোটেলেই থাকবেন।' চাঁদবদন একটু ভেবে বলল।

হাত তুলে সে নমস্কার করল। প্রথমে রাজীবকে, পরে সুব্রতকেও। তারপর ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরোল।

চাঁদবদন চলে যেতেই রাজীব ফের একটা সিগারেট ধরাল। সুব্রতের দিকে তাকিয়ে বলল,—'একটু চা খাওয়া যাক সুব্রত। লোকটার সঙ্গে এতক্ষণ বকবক করে মগজের যন্ত্রপাতি বিগড়ে যাবার জোগাড় হয়েছে।'

মিনিট দুই-তিন পরেই চা এল। ধূমায়িত পেয়ালা। চায়ের কাপে ঠোঁট ডুবিয়ে এক ঢোক গরম চা গিলল রাজীব। বলল,—'কেসটা কি রকম মনে হচ্ছে সুব্রত?'

—'কি জান রাজীবদা। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে কেসটা খুব জটিল। ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে।'

—'খুড়ো আর জামাই। এদের দুজনের মধ্যে কাকে খুনী বলে মনে হয় তোমার?'

—'বলা মুস্কিল রাজীবদা। গোড়া থেকেই ডাক্তারকে খুনী বলে সন্দেহ হয়েছে আমার। লোকটা শয়তান। ইঞ্জেকশনের ছুঁচ ফুটিয়ে সুন্দরীকে ধীরে-ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। ওকে আপনি অ্যারেস্ট করলেন না দেখে আমি তো অবাক। কিন্তু এখন দেখছি শুধু জামাই নন,—বাঘের খেলা দেখাতে খুড়োও কিছু কম যান না। তিনিও একজন ওস্তাদ ব্যক্তি,—রিংমাস্টার। ওর গতিবিধিও তো রীতিমত সন্দেহজনক।'

রাজীব আর একটু চা খেল। বলল,—'গতিবিধি সন্দেহজনক তো বটেই। সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করে দেখ সুব্রত। খদ্দের জুটিয়ে দেবার নামে ভাইঝির বাড়িটা বিক্রী করে লোকটা কিছু কামাবে ভেবেছিল। চেয়েছিল বিশ হাজার, কিন্তু খরিদ্দার লোকটা দশ হাজারের বেশী দিতে রাজি হয় নি। বাড়ি বিক্রীর সব ঠিকঠাক। সামনের সপ্তাহে দলিল তৈরি হবার কথা ছিল। হঠাৎ রাত দশটার সময় কোথা থেকে জলে ভিজে নরেশবাবু হোটেলে ফিরল। আর তারপরই চাঁদবদনকে বলল, তার ভাইঝির মত পাল্টেছে। সে এখন বাড়ি বেচবে না।'

সুব্রত তাড়াতাড়ি বলল,—'ওকেই কি তাহলে আরেস্ট করবেন রাজীবদা?'

—'ক্ষেপেছ?' রাজীব চোখ পাকিয়ে বলল,—'অ্যারেস্ট করে কি হবে? তাছাড়া ভাইঝির শরীরে ওই যে ইঞ্জেকশনের ছুঁচ ফুটিয়েছে তার প্রমাণ কোথায়?'

সিগারেটে একটা টান দিয়ে রাজীব মুনি-ঋষির মতই ধ্যানস্থ হল। চুপ করে কি ভাবল। অনেকক্ষণ পরে তেমনি চোখ বুজেই সে কথা বলল, 'বাঘ শিকারের গল্প পড়েছ তো সুব্রত? মাচার উপর উঠে নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করাই হল শিকারীর পরীক্ষা। অন্ধকার রাত। মাথার উপর তারাজ্বলা আকাশ। কত জন্তু-জানোয়ার আসে, যায়। কিন্তু শিকারীর কি উতলা হলে চলে? একটা বড় হরিণ কিম্বা দাঁতাল শুয়োরকে দেখে যদি গুলি চালিয়ে বস, তাহলেই শিকারের দফা গয়া। মাচার উপর জেগে বসে রাত কাবার করাই সার হবে। বাঘের দেখা মিলবে না।'

সুব্রত একটু হেসে বলল,—'তাহলে কি করবেন?'

ওর কথা শুনেই রাজীব সোজা হয়ে বসল। কাপের বাকি চাটুকু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল। এক ঢোকে তা নিঃশেষ করে রাজীব উঠে দাঁড়াল। 'চল, একবার খুড়োর সঙ্গে দেখা করে আসা যাক।' সে হেসে বলল। বাঁ দিকের হোয়াট নট থেকে একটা চটি ফাইল তুলে নিয়ে রাজীব ধীরে-ধীরে এগোল।

●

বেলা প্রায় এগারোটার মত হবে। মাথা তুলে রাজীব দেখল সূর্য বেশ উপরে। দেহের ছায়া এখন হ্রস্ব হয়ে আসছে। আবার বেলা পড়লে, ছায়া দীর্ঘতর হবে। চারপাশে সবুজের বন। বর্ষার জল পেয়ে গাছ-গাছালি অবিশ্বাস্য রকম বেড়ে উঠেছে। এপাশে-ওপাশে কাল-কাসুন্দে, আরো কত আগাছার জঙ্গল।

জীপে উঠে রাজীব বলল,—'একটা কথা মনে রেখ সুব্রত। যিনি খুন হয়েছেন, তিনি শুধু রূপসী নন। অভিনয়পটিয়সীও। টাউন ক্লাবের নাটকের ফেমাস হিরোইন। এই পলাশপুর শহরেই তাঁর একাধিক প্রেমিক এবং স্তাবক আছে। সুতরাং আমাদের আরো অনেক গভীরে যেতে হবে। একটু হেসে সে মন্তব্য করল,—'রহস্যের অতল তলে।'

(চলবে)

পাহাড়ে মেয়েরা

কথা নেই, হাসি নেই। মনে শুধু অন্তহীন। বসে আছি আগুনের চারপাশে—অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে চেয়ে আছি—গোমুখের প্রান্তিক-গ্রাবরেখার ওপারে শিবলিঙ্গ শিখরের দিকে।

বিষণ্ণ বেলা। দিনের আলো মিলিয়ে যাচ্ছে। সেই তিনটেয় রাকি পিক থেকে নেমে এসেছি। টের পাইনি কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল।

কৃষ্ণপক্ষ। দৃঢ় পদক্ষেপে সন্ধ্যা নেমে আসছে।

এদিকে দ্রুতবেগে ছুটে আসছে খণ্ড খণ্ড মেঘদল। ওরা স্বাধীন। দিন-রাত্রির বিভেদ মানে না। যখন খুশী আসে যায়।

অপরিসীম ওদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি। অসীম আকাশকে প্রায় অদৃশ্য করে ফেলেছে। ঝরে পড়ছে ওদের পদরেণু—শুভ্র তুষারকণা। এই সুযোগে কৃষ্ণা রজনী দখল করে নেয় সুন্দরী ধরিত্রীকে। আকাশ-মাটির সব ব্যবধান মুছে যায়।

আলোকিত দিন প্রতিবাদ জানায়নি, বিবাদ করেনি। তার বিস্রস্ত বর্ণালী বসন গুছিয়ে নিয়েছে। বিদায়ক্ষণে দুয়ারের প্রান্তে কয়েকটি মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়েছে। সেই ব্যঞ্জনাময় মুহূর্তে রাঙা হয়ে উঠেছিল পশ্চিম দিগন্ত। তারই প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছিল মেঘে মেঘে আর শিখরে শিখরে। দেখেছি শিবলিঙ্গ ঘিরে মেঘের বলয়কে বর্ণাঢ্য হয়ে উঠতে—শোণিত রক্তিম, পলাশ রক্তিম, অগ্নি বরণ—কত রংয়ের মকরচুনীর কণ্ঠহার আর কর্ণকুণ্ডল। ওর শুভ্র কিরীটে ছড়িয়ে পড়েছিল আবীরের আভা।

শেষ রশ্মি নিঃশেষ হল। শিবলিঙ্গ খুলে ফেলে তার শৃঙ্গার সাজ, ধরণী খুলে ফেলে তার সোনালি সজ্জা। রাত্রি নেমে আসে। তার বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে হারিয়ে যায় বিশ্ব চরাচর।

'ঘুমুলে সুজয়াদি'? কমলা ওপাশ থেকে জিজ্ঞেস করে।

'না ঘুম আসছে না।' আগুন ছেড়ে কখন যে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকেছি মনে নেই। যথাসম্ভব কুণ্ডলী পাকাই। শীতের দাপটে

সুজয়া গুহ

প্রথম রাতে কোনদিনই ঘুমোতে পারি না। তার ওপরে আজ আবার নানান ভাবনা এসে ভিড় করছে মনে।

সাংঘাতিক বরফ পড়ছে। বরফের ভারে তাঁবু নাকের ওপর ঝুলে পড়েছে। দরজার ফাঁক দিয়ে সমানে ঝাপটা লাগছে। শুনতে পাচ্ছো না, তাঁবুর ফ্ল্যাপগুলো গলাকাটা মুরগীর মত ছটফট করছে?

'বুঝতে পারছি না কাল ওপরে ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভুল করলাম কিনা। এরকম আবহাওয়ায় বেসিকের নতুন মেয়েরা যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে? ইনস্ট্রাকটার তো বলেছিলেন, যেমন জিদ করে ওপরে ক্যাম্প করছ, কেউ অসুস্থ হলে কিন্তু আমরা কিছু জানি না।' 'সুদীপ্তারও দুশ্চিন্তায় ঘুম নেই।

ওদের বলেছিলাম—বেসিকের মেয়েরা যদি থেলু হিমবাহে না যেতে পারে, তাহলে এ্যাডভান্সের কজনই যাই। ওখান থেকে শিখর আরোহণের চেষ্টা করবো। মেজর সিং সেদিন এরকম নির্দেশ দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। কিন্তু ওদের তাতেও আপত্তি—দুটো আলাদা শিবির চালাবার মতো ইনস্ট্রাকটর, রাঁধুনী কিছু নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।

তপোবনের পথে আমরা ঘুরে এসেছি। এমন কিছু মারাত্মক নয়। ওখানে সবাই যেতে পারবে। এতেও দেখছি ওদের অমত।

'ওরা ভয় পাচ্ছে আবহাওয়ার জন্যে। চার-পাঁচদিন ধরে বরফ পড়ছে আর হাওয়া চলেছে। এতে শরীর আপসেট হবার সম্ভাবনা।' সুদীপ্তা আমাকে বোঝাতে চায়।

'আবহাওয়া ভাল হবার জন্যে আর কদিন অপেক্ষা করবো? আজ দশই অকটোবরের রাত। চোদ্দ তারিখ ভোরে এখান থেকে নামা শুরু করবো। এতো আয়োজন, এতো কষ্ট, এতো অর্থব্যয় করে এসে তেরো হাজার ফুট থেকে ফিরে যাওয়া যায় না। কীই বা দেখা হল? হিমের রাজ্যে কতো বৈচিত্র্য কতো সৌন্দর্য—কিছুই দেখা হল না।

পাহাড়ের পথে খারাপ আবহাওয়া তো নিত্যসঙ্গী। তার জন্যে কষ্ট হবে, কিন্তু ফিরে গেলে দুঃখ হবে আরও বেশী, আর

সেটা থেকে যাবে চিরকাল। মাত্র পনেরো হাজার ফুটে নূতন শিবির হবে। দেখো কারও শরীর খারাপ হবে না।'

ঘুম ভেঙে গেছে। আর দেরী নয়। কিছু গোছগাছ হয়নি। অনেক কষ্টে শ্লীপিং ব্যাগের ভেতর থেকে হাত বের করি। তাঁবুর দরজা খুলি। নীল আকাশ। কালো পাহাড়ের কোল থেকে লঘু মেঘদল ভেসে আসছে মধ্য আকাশে, মন্দাক্রান্তা ছন্দে চলেছে কোন সুদূরের পথে।

'কমলা, সুদীপ্তা ওঠো। দেখো কি সুন্দর দিন।' ওদিকে স্বপ্নার গলা শুনছি। ওর তাঁবু থেকে মুখ বাড়িয়ে দুই লেটু লতিফ অর্থাৎ সুজাতা ও কল্পনাকে তাড়া লাগাচ্ছে। তাঁবুতে তাঁবুতে ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি। কাজের চেয়ে বেশী গলাবাজী। পরিচ্ছন্ন দিনের আমেজ লেগেছে সবার মনে। সবাই আজ প্রফুল্ল।

এয়ার ম্যাট্রেসের ছিপি খুলি। শোঁ-শোঁ করে হাওয়া বেরুচ্ছে। হাতের কাছে যা পাচ্ছি, রুকস্যাকে ভরছি। হঠাৎ ছপ-ছপ শব্দ। সচকিত হই। এ কী। শ্লীপিং ব্যাগ জলের মধ্যে চুবুনি খাচ্ছে।

কাল জুতোর সঙ্গে তাল তাল বরফ ঢুকেছিল তাঁবুর মধ্যে। হাওয়ার দাপটে দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকেছে বরফের কুচি। সারারাত ধরে আমাদের নিঃশ্বাসে উত্তপ্ত হয়ে দ্রবীভূত হয়েছে। এখন আলোর আভাষে আনন্দে গলে জল। আমার দিকটায় ঢাল। সব জল জমা হয়েছিল এদিকে। হাওয়া-তোষক চুপসে যেতেই জলে পড়লাম। কাল থেকে উঁচু নজর। ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে আছি শুধু আকাশের মেজাজের হদিশ পাবার আশায়। তাই এই নাকানি চোবানি।

লাইন বেঁধে চলেছি। ডান পাশের গ্রাবরেখা পেরিয়ে এলাম। এখন সেই খাড়া চড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করেছি। সাবাস্। ওরা তিনজন—নিলু পারুল আর স্বপ্না এই দুর্ধর্ষ চড়াইয়ের প্রায় মাথায় পৌঁছে গেছে। আর দেখা যাচ্ছে না। ওরা তিনজনই আজ অসুস্থ। স্বপ্না কাল অনেকটা গড়িয়ে পড়ে দারুণ চোট পেয়েছে কোমরে আর কাঁধে। নিলুর মাথাব্যথা। আর পারুল আজ রওনা হবার মুখে কি বিপদেই না ফেলেছিল। বলে মাথা ব্যথা করছে, ওপরে যাবো না। কথাটা জামীতের কানে পৌঁছতেই রাগে ফেটে পড়েছে। আমি আর সুদীপ্তা নীরবে শুনে গেলাম অনেক কিছু।

তার জবাব দিচ্ছে ওরা। একই সঙ্গে রওনা হয়ে কতো তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেছে।

চড়াই শেষ হল। খানিকটা সমতল। কিছুটা এগিয়ে ঢালের কিনারায় দাঁড়াই। কতো নীচে গাঙ্গোত্রী হিমবাহ। হিমবাহের পূর্বে অগণিত শিখরের ঢেউ—কতো রং কতো ঢং—ছোট বড় পাহাড়ের মেলা। তারই ফাঁকে ফাঁকে স্তব্ধ হয়ে আছে দুগ্ধফেনানিভ তুষার প্রবাহ। ঐতো রক্তিম পাথরে ঢাকা রক্তবরণ হিমবাহের প্রান্তদেশ। আরও পূবে থেলু হিমবাহ। ঐতো চতুরঙ্গী হিমবাহ—চার রংয়ের পাথরের আবরণে মোড়া—অপরূপ রমণীয় বর্ণাঢ্য।

চতুরঙ্গী আর গঙ্গোত্রীর সঙ্গমে, পনেরো হাজার ফুট উঁচুতে একটি স্বর্গীয় তৃণোদ্যান। শিবির গড়ার জন্যে প্রকৃতিদেবী সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন। চতুরঙ্গী পেরিয়ে কালিন্দী খালের পথ। কলকাতার একজন প্রবীণ মহিলা শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাস তাঁর স্বামী ডাক্তার বিশ্বাস ও বিখ্যাত পর্যটক শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৯৬৩ সালে ঐ পথে বদ্রীনাথ গিয়েছিলেন। তারও আগে ১৯৬০ সালে, শ্রীরণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেশচন্দ্র চক্রবর্তী বোধকরি প্রথম বাঙালী যাঁরা ঐ পথে গিয়েছিলেন।

আবার চড়াই। বরফে ঢাকা হাম্পের ওপর ওঁদের তিনজনকে কালো পিঁপড়ের মতো দেখাচ্ছে। সেদিন ডেড়ু বাবাজী এই ঢাল বেয়ে বীরদর্পে নেমে এসে, জনতার ঘেরাও গুঁড়িয়ে দিয়ে পগার পার হয়েছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ পর্যন্ত তিনি নিশ্চয়ই পৌঁছুতে পারেননি। পারলে, এতদিনে ঘেরাও সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো।

পর পর তিনটি বরফাবৃত হাম্প পেরোলাম। বেশ পিচ্ছিল পথ। এবারে নামছি। নেমে এলাম একটি মাঠে। দুপাশে স্বল্প উচ্চ ধূসর পাহাড়। মধ্যিখানে শ্যামল সমতল প্রান্তর। তার মাঝে এখানে ওখানে দুয়েকটি নির্জন পাথরের বন্ধুর প্রতিবাদ।

আনন্দে গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে চলেছি। একি? একটি পাথরের স্তূপ—তার আবার অর্গলহীন দরজা। ভেতরে ঢুকে পড়ি। সুন্দর ঘর—পাথর আর মাটিতে গাঁথা বেশ উচু ঘর। গঙ্গোত্রীর এক সাধু তৈরি করেছিলেন, নিরিবিলিতে সাধনা করার জন্যে।

এই ঘরেই তো থাকতে পারি আমরা। তাঁবু খাটাবার হাঙ্গামা নেই। বাঁ দিকে তাকাই। বাবাঃ, এ যে অন্তহীন মাঠ। ধীরে ধীরে দক্ষিণে ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে। কিন্তু ত্রিমূর্তির যে কোন চিহ্ন নেই।

এ কি দেবলোক! কোথায় এলাম? ডানদিক জুড়ে বিপুলায়তন এক পর্বত। উন্নত শিরে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। তার দীপ্ত শুভ্র শিখর ছুঁয়ে নভোমণ্ডলের নীল চন্দ্রাতপ। এই তো উমাপতি গৌরাঙ্গসুন্দর শিবলিঙ্গ। তার পদপ্রান্তে ঘনশ্যাম দুর্বাদলে সাজানো সবুজ প্রাঙ্গণ। তারই মাঝে খেলা করছে একটি শিশু নদী—তিন ফুট গভীর তিন ফুট চওড়া। সমতল নদীখাত বালুতে ছাওয়া। তৃণে ঢাকা দুটি তটরেখা। টলটলে জল—মলিনতা নেই, খড়কুটো নেই, নেই এলোমেলো পাথরের রাশি। বয়ে চলেছে মৃদু হিল্লোলে, পূর্ণকুম্ভের গাম্ভীর্যে।

দেবলোকে এসেও সাধুর ঘরে ঠাঁই হল না। প্রান্তরের বাঁ দিকে আমাদের দুটি তাঁবু পড়েছে—লাল আর হলুদ। তার ওপর উপুড় হয়ে আছে ভাগীরথীর তিনটি তীক্ষ্ম শৃঙ্গ। ওরা যেন ওপার থেকে গলা বাড়িয়ে শিবলিঙ্গকে বলছে—দেখেছ হে ভোলানাথ আজকালকার মেয়েদের কাণ্ড! সে কালে এমন হলে......

থামো হে থামো, শিবলিঙ্গ মিটিমিটি হাসেন, কেন বাপু? লক্ষ বছর আগে দক্ষ রাজার মেয়ে উমারাণী একা আসেননি এখানে—আমার মন জয় করতে?

রোদ্দুর রোদ্দুর রোদ্দুর! আহা, মধ্যাহ্ন সূর্য দেখিনি কতদিন। সোনা গলা রোদ ছড়িয়ে পড়েছে শিবিরে আর প্রান্তরে, সবুজ ঘাসে আর ঐ ছোট্ট নদীর জলে। নদীখাতে বালুকাবেলায় আগুনের রং চিকমিক করছে।

রঙীন হয়ে উঠেছে আমাদের মন। সুগন্ধি ধূপের মতো শুচি সুবাসিত আবেগ ফেনিয়ে ওঠে শরীরের অণুতে অণুতে। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে অন্য সব ইন্দ্রিয়বোধ—ক্লান্তি, কষ্ট, রাগ খিদে। একটা নৈসর্গিক অনুভূতি, একটা সীমাহীন অন্তহীন ভাললাগা। অপার্থিব আনন্দে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে প্রাণ মন।

সুতপা ডাকছে। উঠে যাই ওর কাছে। রকমারী যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বসেছে বাইরে। ও বেচারার বিশ্রাম নেই। শারীরতত্ত্বে গবেষণা করছে চার বছর ধরে ব্যাংককে। কলকাতায় বিশ্রাম নিচ্ছিল। আমরা ওকে সময়মতো পাকড়াও করি। সুতপার নিজের আগ্রহও কিছু কম নয়। কারণ মেয়েদের শরীরে উচ্চতার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে হাতে-কলমে ভারতে কেউ তথ্য সংগ্রহ করেননি।

অবশ্য কাজ তেমন ভাল হচ্ছে না। আমরা তো ওকে কোন যন্ত্রপাতি কিনে দিতে পারিনি। অতো টাকা কোথায়? বাংলা সরকার কেন সাহায্যই করেননি। তাছাড়া ওকে সবার সঙ্গে নিয়মিত পর্বতারোহণ শিক্ষা নিতে হচ্ছে। বেচারা ক্লান্ত। তবু একে একে এগারোজন মেয়েকে ডাকে, নোট নেয়—রক্তের চাপ, শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি।

এ অঞ্চলের পাহাড়ের গড়ন, পাথরের শ্রেণীবিভাগ, ফাটলের আকৃতি, ইত্যাদি কতগুলি বিষয়ে গবেষণা করার পরিকল্পনা ছিল সুদীপ্তা, সুজাতা ও কল্পনার। ওরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্বে গবেষণা করছে। এখানে ওদের কাজও খুব একটা এগোচ্ছে না। কারণ ঐ একই। ওরা মুখে বলছে অবশ্য অন্য কথা—'অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় যা জানার সব জেনে গেছেন। আমরা আর কষ্ট করে গিলিত চর্বণ করি কেন?'

স্বপ্না ফোড়ন কাটে, 'উল্টোপাল্টা তথ্য যোগাড় করে ফ্যাসাদ বাধাতে চাস না, এই তো? গিয়ে তো হিমালয়ান ফেডারে-

শানে সব রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তখনই তো ধরা পড়ার ভয়। তাই না?'

ওরা বুদ্ধিমতী, উত্তর দেয় না।

মাসখানেক আগে শতোপন্থ অভিযানের সঙ্গে এ অঞ্চলে এসেছিলেন দুজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী—শারীরতত্ত্ববিদ ডাঃ অমিতাভ সেন ও ভূতত্ত্ববিদ ডাঃ ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, কলকাতার গঙ্গোত্রী হিমবাহ অনুসন্ধান সমিতি, শিখর অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়কে জানার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় পর্বতাভিযানের ইতিহাসে এ এক নবদিগন্ত।

সহস্র রহস্যের মণিময় খনি হিমালয়। এরই গায়ে লেখা আছে লক্ষ লক্ষ বছরের পৃথিবীর ইতিহাস—সৃষ্টির প্রায় আদি থেকে প্রাণীর বিবর্তন, মরুর ইতিকথা আর সাগরের ইতিহাস। আমি ইতিহাসের ছাত্রী, তাই আরও ভাল লাগে হিমালয়কে।

কয়েক লক্ষ বছর আগে হিমালয়ের সুদৃঢ় অস্তিত্ব ফুটে উঠেছিল সাগরের বুক চিরে।

ভারতবর্ষ আরও অনেক প্রাচীন। পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল সাড়ে চারশ কোটি বছর আগে। সেই জন্মলগ্ন থেকে ভারত আছে এই পৃথিবীতে। তখন সিংহল থেকে আরাবল্লী পর্যন্ত ছিল ভারত, আর তার অবস্থান ছিল দক্ষিণ মেরুতে। শুধু ভারত নয়, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া—সব মিলে ছিল এক বিরাট ভূখণ্ড—দক্ষিণ মেরু মহাদেশ বা গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড।

নর্মদার দক্ষিণে পৃথিবীর প্রাচীনতম রাজ্য, গণ্ড রাজ্য। এরই নামে সমগ্র ভূখণ্ডের নামকরণ করা হয়েছে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। আর বিষুবরেখা অঞ্চলে ছিল অঙ্গারাল্যাণ্ড—অর্থাৎ ইওরোপের কিছু অংশ ও সাইবেরিয়া। উত্তর আমেরিকাও ছিল তখন বিষুবরেখায়, অবশ্য স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে।

পৃথিবীর মানচিত্র এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। এই পরিবর্তন একবারে আসেনি। একাধিক আলোড়নের ফলে পৃথিবীর আজ এই চেহারা। আলোড়নের মূলে হল পৃথিবীর ত্বক। তিরিশ চল্লিশ মাইল পুরু এই ত্বকটি সরের মতো সঞ্চরণশীল—মাঝে মাঝে এটির এদিক ওদিক বিচরণ করার ফলেই হল ভূগোলের নবরূপ। কখনও ত্বকটি প্রতিহত হয়ে সংকুচিত হয়—জন্ম দেয় নতুন পর্বতমালার। কখনও আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি করে নতুন সাগর। ফাউ হিসেবে পৃথিবীর জঠর থেকে বেরিয়ে আসে অগ্ন্যুৎপাত আর বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তনের ফলে দেখা দেয় তুষারঝঞ্ঝা।

সৃষ্টির পর থেকে সম্ভবত তিনবার পৃথিবীর ত্বকের পুনর্বিন্যাস হয়েছে। দ্বিতীয় বিন্যাসের ফলে হিমালয়ের জন্ম।

সে প্রায় সাতাশ কোটি বছর আগের কথা। গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড দক্ষিণ মেরু থেকে সরে, সবে বিষুবরেখার কাছাকাছি এসেছে। অঙ্গারাল্যাণ্ড এগিয়ে গেছে কর্কটক্রান্তির দিকে। দুই মহাদেশের মধ্যে এক বিশাল সাগর—টিথীস্ সাগর।

সাগরের বক্ষে, মহাদেশ বিধৌত বৃষ্টির জল আর নদীর জল এসে আশ্রয় নেয়। তার সঙ্গে ভেসে আসে অবক্ষয়িত কাঁকর বালি মাটি। কতো বিগলিত হিমভূমি (আইস ক্যাপ) আর খণ্ডিত হিমযান (আইস বার্গ) সাগরে মিশে যায়। তাদের সঙ্গেও আসে পর্বত প্রমাণ পাথর ও নুড়ি। দুই মহাদেশের অপচয় অবক্ষয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সঞ্চিত হতে থাকে টিথীস সাগরের সুপ্রশস্ত তলদেশে।

ক্রমে তলদেশ ভরাট হয়ে ওঠে। সাগর ফুলে ওঠে। উদ্বৃত্ত জলরাশি মুক্তির পথ খোঁজে, নতুন খাতে নতুন পথে প্রবাহিত হতে চায়। গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অনেক জায়গায় ভাঙন ধরেছিল। সেই পথে উন্মত্ত জলরাশি বয়ে যায়, সৃষ্ট হয় আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর। ভারত তার বর্তমান রূপ নিতে শুরু করে। গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

টিথীস সাগর আপ্রাণ চেষ্টা করে তার ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে। পলির ভারে তলদেশ নেমে যায় আরও নীচে। সাগর গভীরতর হয়।

এদিকে দুকূলে দুই মহাদেশ ক্রমাগত কাছাকাছি আসার চেষ্টা করে। সাগর সংকুচিত হয়, আরও প্রচণ্ড চাপ পড়ে সাগরের মেঝেতে। এক সময় এই চাপ সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। শুরু হয় সাগরের বক্ষে অগ্ন্যুৎপাত, আলোড়ন, উৎক্ষেপ। সাগরের মেঝে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

পাঁচ কোটি বছর আগের কথা। ছিন্ন সাগরবক্ষ থেকে আবির্ভূত হয় নবীন ভূখণ্ড। বাইশ কোটি বছরের সঞ্চিত পলিরাশি মাতৃজঠর ত্যাগ করে মুক্ত আলো, মুক্ত বাতাস খোঁজে। শিশুভূমি সোচ্ছ্বাসে আকাশের দিকে হাত বাড়ায়।

এই হল হিমালয়ের সূচনা। এই সূচনার পরিসমাপ্তি ঘটে মাত্র পঁচিশ লক্ষ বছর আগে। ইতিমধ্যে বহুদিনের ব্যবধানে একের পর এক তিনটি প্রায় সমান্তরাল পর্বতমালা ভেসে ওঠে। ক্রমে তারা উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়। এরাই এখন বৃহত্তর হিমালয়, ক্ষুদ্রতর হিমালয় ও শিবালিক নামে পরিচিত।

ভূত্বকের গতিশীলতার জন্যে শুধু হিমালয় নয়, বহু পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে—ইওরোপের আল্‌পস ও পিরেনিজ, উত্তর আমেরিকার রকি মাউণ্টেস, ও অ্যাপালেশিয়ান, উত্তর আফ্রিকায় আটলাস ও দক্ষিণ আফ্রিকায় কেপ রেঞ্জেস। হিমালয়ের গঠন সম্পূর্ণ হয় সবার শেষে। হিমালয় পৃথিবীর বৃহত্তম, উচ্চতম কিন্তু কনিষ্ঠতম পর্বতমালা।

আর এদিকে, শীর্ণ টিথীস আদর্শ মায়ের মতন বহু সুসন্তানের জন্ম দিয়ে, নিজেকে সংকুচিত করে নিল ভূমধ্যসাগরের অতি সীমিত পরিসরে।
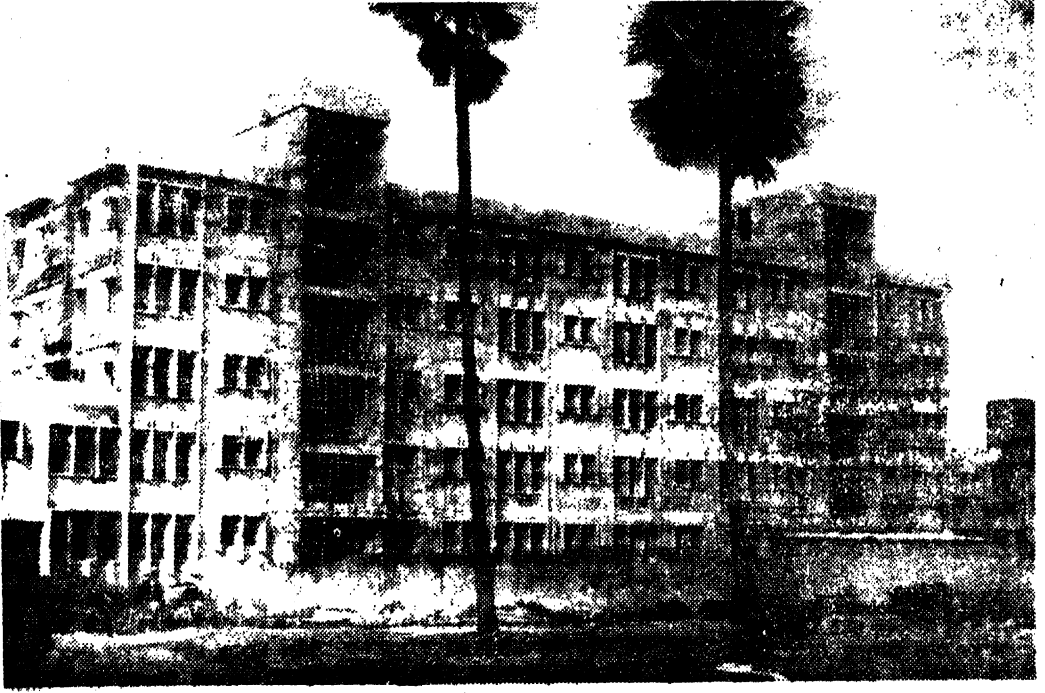
মানুষগড়ার ইতিকথা

পুনরাবৃত্তি ইতিহাসেরই ধর্ম। অতীত ইতিবৃত্তে এর বহু নজির মিলবে, মিলবে সাম্প্রতিক ইতিহাসেও। রাজা-বাদশা, বাদ-মতবাদের গোলকধাঁধায় প্রবেশের অধিকার বা ইচ্ছা কোনটাই নেই এই অভাজনের। শুধু কয়েকমাস ধরে কিছু স্কুলের ইতিহাস নাড়াচাড়া করে মোটামুটি গুটিকয়েক প্যাটার্নের হদিশ পেয়েছি—যে সব পথ ধরে স্কুলগুলি সাধারণত প্রতিষ্ঠিত হয়। এক একটা প্যাটার্ন এক একসময় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, সহ জনপন্থা অনুসৃত হয় বেশ কিছু-দিন ধরে। তারপর কালস্রোতে একদিন পুরোনো প্রবাহে পলির স্তূপ উঁচু হয়ে ওঠে, নদী বয়ে চলে ভিন্ন খাতে। মজার ব্যাপার, আজকের পরিত্যক্ত মজা খাত কালই আবার নতুন স্রোতে ফুলে ফেঁপে ওঠে, দেশ-বিদেশের চেনা-অচেনা পালে ছেয়ে যায় নতুন করে জেগে ওঠা পুরোনো খাত। সবাই তখন তরী ভাসায় পুরোনো প্যাটার্নের নবরূপায়ণের জোয়ারজলে।

সময় ও স্রোত চেনা বড় কঠিন কাজ। সবাই পারে না চিনতে। সবাই চায় আগে কেউ জলে নামুক, আত্মবিশ্বাসের কষ্টি-পাথরে যাচাই করে দিক জলের বেগ ও গভীরতা। তারপর চেনা স্রোতে পণ্যের পসরা নিয়ে দেশে, বিদেশে নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততায় ভেসে বেড়ানো যাবে। লাভের গুড় অনুকারী পিঁপড়ের দল মাথায় বয়ে গুহায় নিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু স্মরণের সরণি জুড়ে বড় বড় হরফে লেখা থাকে—এই পথের প্রদর্শক ইনিই। এ যুগের এরকম একজন 'ইনিই' হলেন শহর কলকাতার অন্যতম নামী স্কুল সাউথ পয়েন্টের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসতীকান্ত গুহ।

এদেশে তিন হাজারের ওপর হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে। আছে সহস্র সহস্র প্রাইমারী স্কুল। কিন্তু নার্সারী রাইমের গুনগুনানি এই সেদিন পর্যন্ত মিশনারী প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য কোথাও বড় বেশি শোনা যেত না। ছেলেকে মানুষ করার চিরাচরিত পদ্ধতি হিসাবে গুরুমশায়ের হাতের বেত ও মাস্টারমশাইদের কানমলা ও চড়চাপড়েই সন্তুষ্ট ছিলাম আমরা। কিণ্ডারগার্টেন, মণ্টেসরী ইত্যাদি পদ্ধতির কথা 'বি, টি' ক্লাসের পাঠ্যপুস্তকেই থাকত বেশির ভাগ সময় সীমাবদ্ধ। সেই স্রোত-হীন বদ্ধজলায় কতশত নিরুদ্ধ আবেগের অবসান হয়েছে কে তার খোঁজ নিয়েছে।

কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বাংলা-দেশের শিক্ষাজগতে সতীকান্তবাবু যে আলোড়ন এনেছেন তার অনুকরণে আজ গোটা দেশটাই ছেয়ে গেছে। আজ এদেশের যে কোন বড় শহরের যে কোন মোড়ে দাঁড়িয়ে যেদিকে ইচ্ছা চোখ ফেরান, একটা না একটা এরকম সাইনবোর্ড আপনার আমার চোখে পড়বেই—রোজহিউ নার্সারী স্কুল, মনিমেলা কে, জি, স্কুল ইত্যাদি ইত্যাদি। আজকের অনেক অমিশনারী শিক্ষা-ব্যবসায়ীই সতীকান্তবাবুর গবেষণার ফসলে নিজেদের গোলা ভরে তুলছেন। আর বিষণ্ণ সতীকান্তবাবু গভীর গভীরতর মনোবেদনার অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন। উনি ভাবতেও পারেন নি যে তাঁরই প্রদর্শিত পথে এদেশে শিশুমেধ যজ্ঞের নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা এত তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু সতীকান্তবাবু কি করবেন?

সতীকান্তবাবু কি করবেন জানার আগে জানা দরকার তিনি কি করেছেন। আমি বলব আজ থেকে একশ চল্লিশ বছর আগে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর প্রতিষ্ঠাতা যুবক গৌরমোহন আঢ্য আমাদের জন্য যে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, অথচ পরবর্তী যুগে অব্যবহারে যা আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলাম, সেই পথকেই খুঁজে বার করেছেন সতীকান্তবাবু। গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তিন থেকে ছ বছরের শিশু-দের মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মানোর জন্য গৌরমোহন তাঁর স্কুলে একটি নার্সারী সেকশন খুলেছিলেন। নাচ, গান, ছবি, খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে শিশুরা পরিচিত হত জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠের সঙ্গে।

সাউথ পয়েণ্ট স্কুল

কি বিচিত্র এই দেশ! কোন সৎপ্রচেষ্টাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না এখানে। তাই গৌর-মোহনের অকালমৃত্যুতে তাঁর সাধের চারাগাছটি অকালেই শুকিয়ে গেল। কেউ সেদিন বাঁচাতে চেষ্টা করেনি সেই শিশুতরুটিকে। তারপর কেটে গেছে প্রায় সোয়াশ বছর।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর অধ্যায়ে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দোহাই পেড়ে খেড়-বড়ি-খাড়ার বদলে খাড়া-বড়ি-থোড়ের সমূহ আয়োজন করলেন সরকার। আর না কি কেরানী তৈরী হবে না, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষে ভরে যাবে সারা দেশ। কিন্তু কি করে? ইউনিভার্সিটির বদলে একটা বোর্ডের হাতে পরীক্ষার দায়িত্ব তুলে দিলেই কি তা সম্ভব হবে? না কি মাটি-জল-হাওয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে গুটি কয়েক বিদেশী ফুলের চারা এদেশের মাটিতে পুঁতে দিলেই রাতারাতি উষরভূমি ফুলবাগানে পরিণত হবে? পুরো ব্যাপারটাই অসহনীয় মনে হয়েছিল প্রাক্তন ডিস্ট্রিক্ট জজ নিশিকান্ত গুহর ছেলে সতীকান্তবাবুরে। বরিশালের বানরীপাড়ার প্রখ্যাত গুহঠাকুরতা পরিবারের ছেলে সতীকান্তবাবু ছোটবেলা থেকেই প্রথাগত পদ্ধতির বিরোধী। নইলে বাবা যার জেলা জজ, সে কিনা কৈশোর পেরোনোর আগেই মেতে ওঠে ব্যবসা-বাণিজ্যে। না, লক্ষ্মীর আরাধনা করতে গিয়ে সরস্বতীকে কোনদিনই অবহেলা করেন নি। বরং তাঁর নিজস্ব রেজাল্ট রেকর্ডে একবার চোখ বুললেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তিনি সরস্বতীরও প্রসাদপুষ্ট।

চাকরীর সুবাদে বাবাকে প্রায়ই এ জেলা ও জেলা ঘুরে বেড়াতে হোত, ফলে কিশোর সতীকান্তকেও প্রায়ই এক স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুলে ভর্তি হতে হয়েছে। মালদার নবাবগঞ্জ স্কুল, ঢাকা কলেজিয়েট হাইস্কুল ও কলকাতার হেয়ার স্কুলে কেটেছে তাঁর শৈশব ও কৈশোরের মধুর দিনগুলি। হেয়ার স্কুল থেকেই ছাব্বিশ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন সতীকান্ত। সহপাঠী মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্রাকেটে ফার্স্ট হন বাংলায়। চার বছর বাদে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি, এ পাশ করলেন। ছ বছরের মধ্যে এম, এ, ও ল'র ডিগ্রী দুটিও সংগ্রহ করে নিলেন। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে গেছেন ব্যবসাপাতি। এ ব্যাপারে সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলেন সহপাঠী মোহনলালকে। আর বাবা নিশিকান্ত অকৃপণ আশীর্বাদের সঙ্গে ছেলেকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন—চাকরী যেমন করলে না গোলামীর ভয়ে, তেমনি দেখো ব্যবসা করতে গিয়ে যেন স্বার্থের দাস না ব'নে যাও।

অক্ষরে অক্ষরে পিতৃ-নির্দেশ পালন করেছেন সতীকান্তবাবু। আর তাই বার বার ঠকেছেনও জীবনে। অর্থ উপায় করেছেন, কিন্তু কখনো অর্থের দাসত্ব করেন নি। কতবার যে তাঁর বন্ধু-সাহিত্যিকরা তাঁকে ঠকিয়েছেন, ঠকিয়েছেন তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা তার কোন ইয়ত্তা নেই। যৌবন-শুরুতে পাবলিকেশনের দিকেই ঝুঁকেছিলেন তিনি। কিন্তু বারবার প্রতারিত হয়ে ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে কংগ্রেজের অনটনে পাবলিকেশন ছেড়ে ওষুধের ব্যবসায় ঝুঁকলেন। এখানেও কো-পার্টনারের কাছে প্রতারিত হয়ে ছেড়ে দিলেন ব্যবসা। এবার ঠিক করলেন আর ব্যবসা নয়, চাকরী একটা চাই। ইতিমধ্যে বিয়ে করেছেন সতীকান্তবাবু। তাই চাকরী একটা জোটানো খুবই জরুরী হয়ে পড়েছিল।

দরকার বলেই তো আর চাকরী জোটে না। খুব বড় একটা চাকরী চান নি সতীকান্তবাবু। ছেলেবেলায় ফরিদপুরে আর্যদত্তপাড়া গ্রামে জমিদার ঠাকুর্দা রাসবিহারী গুহকে দেখেছিলেন নিজের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে হেডমাস্টারী করতে। নিজেও কৈশোরে বড়ীতে পাঠশালা বসিয়ে পাড়ার ও স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াতেন সতীকান্তবাবু। তাই ব্যবসা ছেড়ে যখন চাকরী খুঁজতে বেরুলেন তখন সবার আগেই তাঁর মনে পড়েছিল শিক্ষকতার কথা। কিন্তু কি আশ্চর্য সেদিন ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ ডিগ্রী থাকা সত্ত্বেও এ যুগের শহর কলকাতার অন্যতম প্রধান স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও রেকটর সতীকান্ত গুহ একটি সহকারী শিক্ষকের পদও কোন স্কুলে জোটাতে পারেন নি। দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন, কিন্তু কোথাও কোন আশ্বাস পান নি। তাই নিরুপায় হয়েই শেষ পর্যন্ত ছুটলেন সওদাগরী অফিসে।

গোটা মহাযুদ্ধ ও পরবর্তী ন'টি বছর এ প্রতিষ্ঠানে সে প্রতিষ্ঠানে বড় বড় পদে কাজ করেছেন তিনি; প্রচুর মাইনে ও নানা সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বোধহয় ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। চাকরীর ধরাবাঁধা জীবনের গণ্ডী ছেড়ে বারবার বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন, কিন্তু নেহাৎ জীবিকার প্রয়োজনেই পারেন নি। শেষ পর্যন্ত সেই সুযোগ এল। তখন চল্লিশ সবে ছুঁয়েছেন সতীকান্তবাবু। কলকাতার একটি নামী সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে সেক্রেটারীর পদে কাজ করছেন। থাকেন ক্যামাক স্ট্রীটে কোম্পানীর কোয়ার্টারে। একমাত্র সন্তান ইন্দ্রনাথকে স্কুলে ভর্তি করবেন বলে বাড়ীর কাছে এক নামী বিদেশী স্কুলে অ্যাডমিশন টেস্ট দেওয়ালেন। পরীক্ষার খাতায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও প্রিফেকট জানালেন, সীট নেই, তাই ভর্তি করা সম্ভব নয়।

ভাল স্কুলে কে না চায় তাঁর ছেলেকে পড়াতে? তাই অনুরোধে ঢিড়ে ভেজানোর উদ্দেশ্যেই আবার গেলেন সেই স্কুলে সতীকান্তবাবু। ঢুকবার মুখে স্কুলের দেউড়িতে দেখা হোল কলেজ জীবনের এক কোটিপতি অবাঙালী ব্যবসায়ী বন্ধুর সঙ্গে। কি ব্যাপার তুমি এখানে? —যেন একটু অবাক হয়েই বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন সতীকান্তবাবু। জবাব এল—ছেলেকে ভর্তি করে দিয়ে গেলাম। উদ্‌গ্রীব সতীকান্তবাবু জিজ্ঞাসা করেন—কোন ক্লাসে? ফাইভে. উত্তর দেয় বন্ধু। বল কি, প্রিফেকট যে বললেন সীট নেই। গাড়ীর রিংটা তর্জনীর ডগায় সাদর্শন চক্রের মত ঘোরাতে ঘোরাতে বন্ধু মুচকি হাসলেন—টাকায় কি না হয়?

থেল্লায় সেদিন সেই স্কুলের দরজা থেকেই ফিরে আসেন সতীকান্তবাবু। ছেলের মেরিট নয়, বাবার টাকাই যেখানে ভর্তি হওয়ার প্রধান ছাড়পত্র, সেখানে যে ছেলেকে পড়াবেন না সতীকান্তবাবু এ কথা বলাই বাহুল্য। ছেলেকে অন্য স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। আর সেদিনই শপথ নিলেন শিক্ষার উচ্চ আদর্শের আড়ালে বিদেশীদের স্বার্থপর বেসাতির সমুচিত জবাব দিতে হবে। গড়ে তুলবেন এমন স্কুল যেখানে শিশুরা পাবে তাদের নিজস্ব একান্ত জগৎ, এবং ছেলের যোগ্যতাই হবে ভর্তির একমাত্র মাপকাঠি।

মনস্থির করতে বেশী সময় লাগে নি তাঁর। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার সমস্ত সুযোগ ছেড়ে নতুন পরীক্ষার পথে এগুনোর আগে একবার শুধু স্ত্রীর অনুমতি চেয়েছেন। শ্রীমতী প্রীতিলতা গুহ শুধু যে সম্মতি দিয়েছেন তাই নয়, নিজে থেকেই এগিয়ে এসেছেন স্বামীর সহযোগিতায়। ব্যস, তাঁকে আর পায় কে। হাজার-বারোশর মনসবদারী, বাড়ী, গাড়ী, ফ্রিজ, সোফাসেট, কার্পেট মোড়া মসৃণ জীবনের চাবিটি একটি চিঠির সঙ্গে কোম্পানীর সদর অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন সতীকান্তবাবু স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে।

স্ত্রীর সহযোগিতা সেদিন না পেলে হয়তো আজ যা কিছু সতীকান্তবাবু গড়েছেন, এর কোন কিছুই সম্ভব হত না। ...'আমি যে এতটা করতে পেরেছি তার জন্য যার কাছে আমি সবচেয়ে কৃতজ্ঞ তিনি আমার স্ত্রী—প্রীতিলতা।' বললেন সতীকান্তবাবু।

হাজার এগার টাকা জমিয়েছিলেন প্রীতিলতা দেবী সংসার খরচ থেকে। সেই সঙ্গে আরো কিছু জুটল সমস্ত গয়নাগাটি মায় বিয়ের বেনারসী পর্যন্ত বিক্রী করে। জনৈক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পনেরো হাজার টাকা ধার করলেন সতীকান্তবাবু। তারপর বালীগঞ্জ ম্যান্ডেভিল গার্ডেন্সের ষোল নম্বর বাড়ীটি পোদ্দার ট্রাস্টের কাছ থেকে ষোল বছরের জন্য লীজ নিলেন মাসিক ছ'শ টাকা ভাড়ায়। এক বিঘা এগারো কাঠা জায়গার ওপর বাংলো প্যাটার্নের ঐ একতলা বাড়ীটিতে ১৯৫৪ সালের ১ এপ্রিল তারিখে বারোজন শিক্ষক-শিক্ষিকা সমেত সাতাশটি ছেলেমেয়ে নিয়ে উন্মুক্ত হল সাউথ পয়েন্ট স্কুলের দরজা।

স্কুলের নামকরণের সময় দার্জিলিংয়ের বার্ণ পয়েন্টের কথা কি মনে পড়েছিল সতীকান্তবাবুর? সতীকান্তবাবু নিজে প্রশ্নটির জবাব দিয়েছেন অন্যভাবে। তাঁর স্কুল শহরের দক্ষিণে একটি কোণে প্রতিষ্ঠিত। বাংলা স্কুল হলে নিশ্চয়ই নাম রাখতেন—দক্ষিণ কোণ বিদ্যালয়। কিন্তু এখানে পঠনপাঠনের মাধ্যম ইংরেজী, তাই গোটা ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে নাম দিয়েছেন : সাউথ পয়েন্ট স্কুল।

পঠন-পাঠনের মাধ্যম থেকে শুরু করে স্কুলের নামকরণ সবেতেই ইংরেজী প্রধান স্থান জুড়ে আছে। কারণ সতীকান্তবাবু তাঁর স্কুলের আদর্শ হিসাবে ইংল্যাণ্ডের রাগবী, হ্যারো, ইটনের কথাই বার বার স্মরণ করেছেন। কেননা তিনিও চেয়েছিলেন যাতে ঐসব স্কুলের মতোই তাঁর স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সহজ স্বাভাবিক আবহাওয়ায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। কিন্তু পৃথিবীবিখ্যাত ওসব ইংরেজী স্কুল তো কো-এডুকেশনাল নয়। তবে কেন সাউথ পয়েন্টে সহশিক্ষার সুযোগ অবারিত করলেন তিনি? তার কারণ, সতীকান্তবাবুর নিজের কথাতেই বলি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এদেশের সামাজিক গঠনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। সুখী গৃহকোণের সুস্থ শোভা বিদায় নিয়েছে সেই সঙ্গে। মধ্যবিত্ত পরিবারে শুরু হয়েছে জীবনযাপনের জন্য স্বামী-স্ত্রীর উদয়াস্ত পরিশ্রম। শিশু একলা পড়ে থাকে বাড়ীতে। বাবা মা দুজনেই ছুটছেন অফিসে। বাড়ীতে শিশু পায় না মার সান্নিধ্য। একান্নবর্তী পরিবারও ভেঙে যাচ্ছে। ছোট ছোট সংসারে শিশু পায় না খুড়তুতো বা জ্যাঠতুতো দাদা-দিদি বা ভাই-বোনের সাহচর্য। সেই নিঃসঙ্গতার অন্তরাল থেকে সে যখন যায় প্রথাগত স্কুলে, সেখানে গোড়া থেকেই তার মনে গড়ে ওঠে শিক্ষার প্রতি তীব্র বীতরাগ। ধমক-ধামক, শাসন-শোষণ, চোখ রাঙানিতে হয়তো অক্ষর পরিচয় সম্ভব হয়, কিন্তু শিক্ষার প্রতি শিশুর মনে অনুরাগ জন্মানো যায় না। তা ছাড়া সেখানে সে পায় না তার মনের খোরাক। সে যেন সেই রূপকথার দৈত্যের বাগানে একলাটি দাঁড়িয়ে থাকে বিষণ্ণ মুখে, যেখানে স্পষ্ট লেখা আছে—ট্রেসপাসারস উইল বি প্রসিকিউটেড।

এই প্রসিকিউশনের হাত থেকেই শিশুদের মুক্তি দিতে চেয়েছেন সতীকান্তবাবু। যেখানে ছেলেমেয়ে দুজনেই মিলেমিশে গড়ে তুলবে তাদের শৈশবের গার্ডেন অব প্যারাডাইস—চির বসন্তের দেশ। তাদের একান্ত নিজস্ব জগৎ। তাই গোড়া থেকেই সতীকান্তবাবু সবচেয়ে জোর দিয়েছেন স্কুলের নার্সারী বিভাগে। মোট এগারোটি ক্লাস নিয়ে শুরু হল সাউথ পয়েণ্ট স্কুল। নার্সারীর দুটি ক্লাস—ওয়ান ও টু। তিন, চার বছরের শিশুর জন্য ওয়ান ও চার পাঁচ বছরের জন্য টু। পাঁচ বছর পূর্ণ হলে শিশু যাবে ট্রানজিশন ক্লাসে। পরের বছর অ্যাডভানসড ট্রানজিশনে। এইভাবে তিন থেকে সাত বছরের মধ্যে চারটি বছরে খেলা-ধূলো, আমোদপ্রমোদ, গানবাজনা, রঙ তুলির মধ্য দিয়ে শিক্ষিকারা তাঁদের মনে সকলের অজান্তে গোপনে বুনে চলেন শিক্ষার বীজ। শিশুর কাছে শিক্ষিকাই তার সব—মা, বোন, দিদি। শিক্ষিকার স্নেহে ও যত্নে স্কুলই হয়ে উঠবে শিশুর দ্বিতীয় গৃহ। এমন কি, বাড়ীতেও যে সুখ-স্বাদের সুযোগ তার নেই, স্কুলে সে যেন তাই পায়। আর সেই পাওয়াটুকুই সম্ভব করে তোলেন শিক্ষিকা। আর সম্ভব করে তোলেন বলেই শিশুর মনে ধীরে ধীরে নানা বিষয় সম্পর্কে জাগতে থাকে কৌতূহল।

এবার তার মনে জেগেছে কৌতূহল। তাই তাকে পাঠানো হল প্রেপ ওয়ানে (সাধারণ স্কুলের ক্লাস টু)। প্রিপারেটরীর দুটি স্টেজ, প্রেপ ওয়ান ও টু। এরপর স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ান (অর্থাৎ ক্লাস ফোর)। শিশুর দশ বছর পূর্ণ হয়েছে। এবার শুরু হবে তার মাধ্যমিক স্কুল জীবন। ক্লাস ফাইভ টু এইট, চারটি ক্লাসে স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক স্তর।

স্কুল শুরু হয়ে গেল। সতীকান্তবাবু ক্যামাক স্ট্রীট ছেড়ে ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনসে উঠে এলেন। দিনের বেলায় যে ঘর তিনি অফিস হিসাবে ব্যবহার করেন রাতে হয় সেটাই তাঁর শয়নকক্ষ। সেই প্রচণ্ড কৃচ্ছ্র-সাধনের আবেগময় সুন্দর বছরগুলিতে কত ঠাট্টা, কত বিদ্রূপ জুটেছে তাঁর কপালে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যে শুনেছে সেই বলেছে, ও তো একটা পাগল। এসব পাগলামি। সব নীরবে সহ্য করেছেন। একটা অসম্ভব জেদ চেপে গিয়েছিল মনে। সবাইকে দেখিয়ে দেবেন এসব পাগলামি নয়: গভীর বিশ্বাস ও অক্লান্ত অধ্যবসায় না থাকলে যে-কেউ এ পাগলামি করতে সাহসী হবে না। সবাই যেদিন তাঁকে ঠাট্টা করেছে সেদিনও কিন্তু বাবার আশীর্বাদ থেকে তিনি বঞ্চিত হন নি। বিচারক পিতার তীক্ষ্ন অনুশীলিত গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে ছেলের নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় নিশ্চয় সেদিন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ন মাসের মধ্যে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা সাতাশ থেকে বেড়ে হোল নব্বই। পরের বছরই জানুয়ারীতে এক লাফে তিনশোর কোঠায় উঠে গেল ছাত্রসংখ্যা। মার্চে পৌঁছল পাঁচশো। ইতিমধ্যে ছেলে ইন্দ্রনাথকে নিজের স্কুলে নিয়ে এসেছেন সতীকান্তবাবু। ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের আরো ঘর বাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দিল। এই প্রয়োজন থেকেই পঞ্চান্ন সালে শরৎ ব্যানার্জি রোডের [illegible] চৌদ্দ নম্বরের দোতালা বাড়ীটির এক-তালা ভাড়া নেওয়া হোল। এই এক-তালাটি টিচার্স রুম ও অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হতে লাগল। আর ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনসের [illegible] নম্বরে একটির পর একটি উইং বাড়তে লাগল। [illegible] সাতান্ন, এই তিন বছরে ওয়েস্টার্ন সাউদার্ন ইস্টার্ন ও [illegible] ওয়েস্টার্ন উইং. চার [illegible] একতলা কুটীর উঠল স্কুলের। সাতান্ন সালে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা দাঁড়াল প্রায় বারোশ ও নার্সারী প্রেপ, সেকেণ্ডারী সেকশন মিলিয়ে ততদিনে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা প্রায় ষাটের কোঠায় পৌঁছে গেছে। তখন মাসে শুধু শিক্ষকদের মাইনে বাবদই স্কুলের ব্যয় হত পঁচিশ হাজার টাকা, এ ছাড়া কি বছরই নতুন নতুন উইং গড়ে উঠছে স্কুলের।

যদিও ফ্ল্যাট রেটে সব ক্লাসের মাইনে ছিল কুড়ি টাকা তবু স্কুলের সেই আদি যুগের বিপুল খরচ আয় থেকে মেটানো ছিল একপ্রকার অসম্ভব। তাই চুয়ান্ন থেকে আটান্ন, এই পাঁচটি বছর স্কুলের প্রয়োজনে ক্রমাগত ধার করে গেছেন সতীকান্তবাবু। ধীরে ধীরে তলিয়ে গেলেও হাল তিনি ছাড়েন নি, বিশ্বাস ছিল তাঁর অটুট—স্কুল একদিন নিশ্চয়ই নিজের পায়ে দাঁড়াবে।

ইতিমধ্যে সাতান্ন সালে সাউথ পয়েন্ট বোর্ডের কাছ থেকে অ্যাফিলিয়েশন ও রেকগনিশন পেয়েছে। এর জন্য কম কাঠখড় পোড়াতে হয় নি সতীকান্তবাবুকে। কারণ কো-এডুকেশনাল স্কুলকে রেকগনিশন দিতে বিশেষ সম্মতি ছিল না বোর্ডের। একদিকে গার্জেনদের ক্রমাগত অনুরোধ ও অপরদিকে একটি ক্লাস এইট স্কুলের স্বাভাবিক পরিণতির কথা ভেবেই সতীকান্তবাবু বোর্ডের দ্বারস্থ হন ছাপ্পান্ন সালের মার্চ মাসে। আগস্ট মাসে ইনস্পেকশন হয়ে গেল। অবশেষে ডিসেম্বরে বোর্ডের অনুমোদন পাওয়া গেল।

সাতান্ন সালে স্কুল পেল অনুমোদন, পরের বছরই স্কুলের প্রথম ব্যাচ স্কুল ফাইন্যালে বসে। প্রথম বছরে পরীক্ষার্থী সতেরোজনের সকলেই পাশ করে ও একজন প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পেয়ে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করে। সেদিনের সেই বৃত্তিপ্রাপ্ত ছেলেটিই আজকের যাদবপুর ইউনি-ভার্সিটির অধ্যাপক ইন্দ্রনাথ গুহ।

শুরু থেকেই স্কুলের ফলাফল অতি উঁচু পর্দায় বাঁধা। স্কুল ফাইন্যাল ও হায়ার সেকেণ্ডারীর গত এগারটি পরীক্ষায় সাউথ পয়েন্টের পাশের হার গড়ে শতকরা আটানব্বইয়েরও বেশী। স্কলারসিপ পেয়েছে জনপঞ্চাশেক ছাত্র-ছাত্রী এ কবছরে। পঁয়ষট্টিতে এদেরই ছাত্রী নারায়ণস্বামী বাসন্তী হায়ার সেকেণ্ডারীর সব কটি স্ট্রীম মিলিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। প্রতি বছরই হয় সায়েন্স, নয় কমার্স, নয় হিউম্যানিটিজের প্রথম দশজনের তালিকায় সাউথ পয়েন্টের ছাত্রছাত্রীদের নাম থাকবেই।

এই ফলাফল ও স্কুলের পঠন-পাঠনের সুনামে আকৃষ্ট হয়ে হাজার হাজার গার্জেন ফি বছর ছুটে আসেন সাউথ পয়েন্টে। ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনসের ঠিকানায় জায়গাতে কুলোয় না বলে ষাট সালে ১০ হিন্দুস্থান রোডে এ, কে, সরকার ট্রাস্টের তিনতলা বাড়ীটি মাসিক বারোশ টাকা ভাড়ায় একুশ বছরের জন্য স্কুল লীজ নিয়েছেন। ঐ বছরই স্কুলের জুনিয়র সেকশন ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনস ছেড়ে এই বাড়ীতে উঠে আসে। পরের বছর নার্সারী বিভাগের জন্য ঐ

হিন্দুস্থান রোডেই সরকার গ্রান্টের আর একটি দোতালা বাড়ী মাসিক সতেরোশ টাকা ভাড়ায় একুশ বছরের জন্য লীজ নিয়েছে স্কুল। নতুন ভাড়া বাড়ী দুটিতেই একটি করে তলা স্কুল বাড়িয়ে নিয়েছে নিজের খরচে।

একষট্টিতে নার্সারী বিভাগ হিন্দুস্থান রোডে উঠে আসার মুখেই স্কুল হায়ার সেকেন্ডারীতে উন্নীত হল। প্রথমে সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজ দুটি স্ট্রীমের অনুমোদন জুটেছিল স্কুলের। চৌষট্টিতে কমার্স স্ট্রীমও খুলেছে স্কুল। ঐ বছরই ১১ ডোভার লেনে স্যার বি. বি. ঘোষ এস্টেটের দোতলা বাড়ীটি মাসিক দু হাজার টাকা ভাড়ায় পাঁচ বছরের জন্য লীজ নিয়েছে স্কুল। উনসত্তরে ১৬ হিন্দুস্থান রোডের তেতালা বাড়ীটি মাসিক তিন হাজার টাকায় ভাড়া নিয়েছে স্কুল পাঁচ বছরের জন্য। হিন্দুস্থান রোড ও ডোভার লেনের চারটি বাড়ীতে আজ স্কুলের নার্সারী ও জুনিয়র বিভাগের প্রায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রী পড়ছে। ম্যান্ডেভিল গার্ডেনসে রয়েছে শুধু উচ্চতর মাধ্যমিক বিভাগ। হায়ার সেকেন্ডারীর টোট্যাল স্ট্রেংথ দেড় হাজারেরও বেশী।

চুয়ান্ন সালে মাত্র সাতাশটি ছাত্রছাত্রী নিয়ে যে স্কুলের গোড়া পত্তন হয়েছিল আজ সেখানে পড়ছে সাড়ে চার হাজারেরও বেশী ছাত্রছাত্রী। শিক্ষক সংখ্যাও গত ষোল বছরে সমানে বেড়েছে। নার্সারী. জুনিয়র ও হায়ার সেকেন্ডারী মিলিয়ে প্রায় একশো ষাটজন শিক্ষক-শিক্ষিকা আজ পড়াচ্ছেন সাউথ পয়েন্টে। সাউথ পয়েন্টের এই বিশাল পরিবারের প্রধান শ্রীসতীকান্ত গুহর কাছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন কাঠামো জানতে চেয়েছিলাম। গুহমশাই বললেন, সরকারী বেসরকারী কোন স্কুলের সঙ্গেই আমার স্কুলের পে স্কেলের মিল খুঁজে পাবেন না। নার্সারী বা জুনিয়র সেকশনে একজন স্থায়ী শিক্ষিকা গড়ে তিনশো সাতচল্লিশের কম বেতন পান না। সেকেন্ডারীতে একজন স্থায়ী শিক্ষক শুরুতেই সব মিলিয়ে গড়ে বেতন পান চারশো পঁচিশ। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেতনের হারও বৃদ্ধি পায় সমভাবে। স্কুলে পাঁচশো টাকার বেশি মাইনে পান একত্রিশ জন। বিভিন্ন বিষয়ের প্রধান শিক্ষকগণ গড়ে পান প্রায় সাড়ে সাতশো টাকা। এঁদের সংখ্যা বারোজন। আর বিভাগীয় পরিচালকরা (সিনিয়র প্রিফেক্ট, ডিরেকট্রেস, সুপারিনটেনডেন্ট) গড়ে পান চার অঙ্কের মাইনে।

বেতনের পরিমাণ শুনে সত্যি সত্যি চমকে উঠেছিলাম। স্কুলে কেন, এদেশের কটি কলেজেই বা অধ্যাপকরা এই মাইনে পান? তাই গুহমশাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, স্কুলের এই বিপুল খরচ মেটান কি করে? সরকারী সাহায্য পান কি? এক পয়সাও না, সতীকান্তবাবু বললেন, সরকারী সাহায্য পাই না, কারণ চাইনি কখনো। টিউশনি ফি স্কুলের আয়ের একমাত্র সোর্স। নার্সারী সেকশনে ফ্ল্যাট রেটে সব ক্লাসের মাইনে বাইশ টাকা। জুনিয়র ও সেকেন্ডারী সেকশনে টিউশন ফির হার মাথা পিছু পঁচিশ টাকা। সায়েন্সের ছাত্রদের ল্যাবরেটরীর জন্যে দু টাকা বেশী দিতে হয়—সাতাশ টাকা।

এই টিউশন ফির আয় থেকেই শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য স্টাফের মাইনে ছাড়াও যাবতীয় বাড়ী ভাড়া ও গোটা দশেক স্কুল বাসের মেনটেনান্স ও বাড়ি রিপেয়ার ইত্যাদি অন্যান্য যাবতীয় খরচখরচা নির্বাহ হয়। সব খরচ মিটিয়েও সুপরিচালনার গুণে এক বিশাল রিজার্ভ ফান্ড গড়ে উঠেছে স্কুলের। আর ফান্ড আছে বলেই স্কুল আজ নিজস্ব পাঁচতলা বাড়ী বানাতে সক্ষম হয়েছে বালীগঞ্জ প্লেসে। এ বছর ফেব্রুয়ারীতে ম্যান্ডেভিল গার্ডেনসের লীজের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই আগামী মাসে স্কুলের হায়ার সেকেন্ডারী সেকশন নিজস্ব ভবনে উঠে যাবে। স্থানান্তরণের আয়োজন চলছে বিপুল উদ্যমে।

উদ্যোগে আয়োজনে কোথাও কোন পরিকল্পনাহীনতার ছাপ মিলবে না এ স্কুলে। টেবিলে ছড়ানো ব্লু প্রিন্টের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কতকগুলি অর্থহীন জ্যামিতিক নক্সার পরিচয় তুলে না ধরে সতীকান্তবাবু আমায় সেদিন নিয়ে গেলেন তাঁর স্কুলের সদ্যনির্মিত বাড়ীটি দেখাতে। টু-রুম ডীপ পাঁচতলা এই বাড়ী উঠেছে প্রায় উনিশ কাঠা জায়গার ওপর। সামনে পেছনে আরো প্রায় পঁচিশ কাঠা জায়গায় গড়ে উঠবে ফুলের বাগান। বাড়ীর ডিজাইন থেকে রং, ফার্নিচার থেকে ল্যাবরেটরীর সাজসরঞ্জাম প্রতিটি জিনিসেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি বিশেষ ভাবনা, বিশেষ উদ্দেশ্য। ছাত্রজীবন কঠোর সাধনার, সেখানে বিলাসিতার কোন স্থান নেই। শহর কলকাতার বোধকরি সবচেয়ে বড় স্কুল বিল্ডিংটির গোটা গাঁথুনী জুড়ে এই ভাবটিই বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখানে এখন কাজ চলছে। প্রায় সব শেষ। বাকী শুধু ফিনিশিং টাচ। সে কাজ শেষ হলেই হায়ার সেকেন্ডারীর ষোলশ ছাত্রছাত্রী চলে আসবে এই বাড়ীতে, সামনের মাসেই।

কি থেকে যে কি হয়ে যায় কে বলতে পারে। যদি সতীকান্তবাবু তাঁর ছেলেটিকে সেদিন বিদেশী স্কুলে ভর্তি করতে পারতেন তাহলে আজ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম নামী ও প্রধান স্কুল সাউথ পয়েন্ট আদৌ গড়ে উঠত কিনা তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাঁরা হয়তো বলবেন, পুরো ব্যাপারটাই বিধি নির্দিষ্ট। বস্তুতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণবাদে বিশ্বাসী যাঁরা তাঁরা হয়তো বলবেন পারিপার্শ্বিক বাস্তব জগতের নিয়ন্ত্রণে সতীকান্তবাবুকে ঐ কাজ করতেই হোত। আর ঐতিহাসিক বস্তুবাদীরা বলবেন সতীকান্তবাবুর সাংগঠনিক প্রতিভা ও পারিপার্শ্বিক বস্তুজগতের পরিবেশই একদিন নিশ্চয় বর্তমান পরিণতির দিকে ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করত। ব্যাখ্যা যাই হোক, ঘটনা ঘটেছে। সামান্য একটি ছোট্ট বীজ থেকে জন্ম নিয়েছে আধুনিক কলকাতার অন্যতম বৃহৎ শিক্ষাতরুটি। সেই তরুমূলের আশ্রয়ে এই তো কদিন আগে সকালে বসে শুনেছি সতীকান্তবাবুর নিজের মুখে সাউথ পয়েন্ট স্কুলের অতীত ও বর্তমানের কাহিনী। সেই প্রসঙ্গে এসেছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। নিউ আলীপুর মিন্ট থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে বজবজ রোডে মহেশতলায় শুরু হয়েছে এক নতুন কর্মযজ্ঞ। এখানে পঁচাত্তর বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠবে সাউথ পয়েন্ট ইন্টারন্যাশনাল। স্কুল-কলেজ সবই থাকবে এখানে। ছাত্রদের অধিকাংশই হবে আবাসিক। তবে স্থানীয় ডে-স্কলাররাও এখানে পড়বার সুযোগ পাবে। সতীকান্তবাবুর ধারণা, বাহাত্তর সাল নাগাদ সাউথ পয়েন্ট ইন্টারন্যাশনালে পঠন-পাঠনের কাজ শুরু হয়ে যাবে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা বলে চলেছিলেন সতীকান্তবাবু, আর আমি শুনতে-শুনতে ভাবছিলাম, এই সাধারণ মাঝারী গড়নের ছিমছাম মানুষটির ভেতরে কি অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা রয়েছে। শূন্য থেকে সৌধ রচনায় সতীকান্তবাবুর দক্ষতা চোখের সামনে দেখলাম। কিন্তু যেদিন সওদাগরী ফার্মের নিশ্চিত নিরাপত্তার সর্বসুযোগ হেলায় ছুঁড়ে ফেলে মধ্য বয়সে নতুন করে জীবন শুরু করেছিলেন সেদিন সবাই তাঁকে উপহাস করে বলেছিলেন—পাগল। কিন্তু সেই পাগলের পাগলামিই আজ নির্বাক করে দিয়েছে সবাইকে। সতীকান্তবাবু এদেশের শিশুদের জন্য যে রূপকথার রাজ্য তাঁর স্কুলে গড়ে তুলেছেন, তার জন্য আজ আমরা নিশ্চয়ই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সেদিনের সেই আলোচনার শেষে বিদায়মুহূর্তে মনে হয়েছে — সতীকান্তবাবু বিষন্ন। গভীর গভীরতম মনোবেদনার অতলে তিনি তলিয়ে যাচ্ছেন। কারণ অনেক শিক্ষা-ব্যবসায়ীই আজ তাঁরই অবলম্বিত পথে শিক্ষা বিতরণের ছলে লক্ষ লক্ষ শিশুর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এ থেকে বেরোবার পথ কী?

—সন্ধিৎসু

ঘুম ভেঙে ॥

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

যে উপাসনার মধ্যে ডেকে ওঠে পাখি,
বাতাসের গন্ধে দরগার আজানে, পূজারী ধারণায়
বহুবার নির্দিষ্ট পল্লব দুলে ওঠে—শুনি ঘুম ভেঙে
সূর্যের শ্লোগান।

জাগার সময় আজো চোখে পড়ে ফুলের অনুশীলন;
মনে পড়ে যায়
সমাপ্ত খেতের মধ্যে শুয়ে থাকা শিশির বিষণ্ণ খড়;
মনে পড়ে পেশী, চীৎ হয়ে থাকা জলকাঁচে
প্রত্যঙ্গ কুড়াতে আসা স্বচ্ছল কুমারী স্বাস্থ্য,
হঠাৎ চঞ্চল প্রতিচ্ছবি!

আজ ঘুম এসে বড় বেশী অধিকার করেছে শরীর,
প্রতি রজনীতে
স্বপ্নহীন গাঢ় ঘুম আমাকে মৃত্যুর কাছাকাছি
বিলুপ্তির রিহার্সেলে নিয়ে যায়। শুধু
ভুল অভিনয়ে পার্ট ভুলে যাওয়া নায়কের চোখে
বর্শা হয়ে লেগে থাকে আদিত্য সংকাশ।

আমি জাগি; ক্রি-কিকের মতো দুম্ করে লাথি মারি
মাথার বালিশ,
নরম তুলোর ঐ ঐহিক আজন্ম জড় কিছুই বলে না;

এখন সেও কি তবে স্বপ্নহীন।
মর মানুষের শরীকে ক্ষমা করতে শিখেছে!

শরীর নির্মাণের আয়োজন ॥

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

এই তো কাছেই আছো তুমি হাওয়ার মধ্যে ঝাউয়ের মর্মর হয়ে।
গাছ-গাছালির সজীবতায় ফুলের মতো হেসে ওঠো তুমি,
ফলের ভাস্কর্যে উদাসীন—
কখনো পাখি হও, কখনো নক্ষত্র—ঘননীল আকাশের বিস্তারে।
তোমার কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে শিশির বর্ষণের সময়।

আমি তোমার শরীর নির্মাণ করতে চেয়েছিলাম
সমস্ত উত্তাপ এবং ঐশ্বর্য দিয়ে উজ্জ্বল একটা শরীর।
স্বপ্নের চেয়েও দ্যুতিময় তোমাকে ছুঁতে চেয়েছিলাম
রৌদ্রের দুপুরে।
আজো উৎসের সংবাদ শুনি
তোমার চতুর্দিকে আবহমানের জাগরণ সঙ্গীত—
যেন রাত্রির শরীর ছিঁড়ে দিনের গান গাওয়া।

তুমি বললে : এই তো কাছেই আছি সারাক্ষণ।
তোমার চোখের মধ্যে দ্বিতীয় চোখ জ্বলতে থাকে—
অসম্ভব যন্ত্রণায় তোমার ভালোবাসা।
আমি দূরে থেকে শাঁখের শব্দ শুনতে পাই—
তোমার কণ্ঠস্বরে সমুদ্রের আহ্বান।
তুমি কি নদীর উৎসে একবার ঝর্ণা হয়ে উঠতে পারো না?
কিংবা জলপ্রপাতের গর্জন?

আমি রুপোলি ধারায় স্নান সেরে তোমার শরীর নির্মাণ করবো।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বলতে গেলে যশোয়ন্তই প্রায় আমাকে উপরে নিয়ে গেল। ওর বসবার ঘরের চৌপাইতে বসে ওকে সব বললাম। ফৌজদারী আদালতের উকিল যেমন করে সাক্ষীকে জেরা করে তেমনি করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ও সব আমার কাছে জিজ্ঞেস করল। কখন ডালটনগঞ্জে পৌঁছেছিলাম? আগে ঠিক ছিল কিনা সেখানে যাওয়া? সেখানে গিয়ে কার কার সঙ্গে কখন কখন দেখা হল? সব। সব বললাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

যশোয়ন্ত বলল—একটু ব্রাণ্ডি খাও লালসাহেব। তুমি খুব আপসেট হয়ে পড়েছ। তখন আমার যা অবস্থা তাতে আমার নিজের কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছা ছিল না। একটু গরম জলে বেশ খানিকটা ব্রাণ্ডি মিশিয়ে আমায় দিল যশোয়ান্ত। ঢক ঢক করে গিলে ফেললাম। তারপর যশোয়ন্তের খাটটায় পা-লম্বা করে শুলোম। একটু আরাম লাগলো। যশোয়ন্ত ওর চাকরকে ডেকে আমার জন্যে খিচুড়ি চাপাতে বলল। তারপর আমায় বলল তুমি একটু আরাম কর, আমি নীচে থেকে আসছি। এই বলে একটা টর্চ নিয়ে ও নীচে চলে গেল। বুঝলাম জীপটাকে ভাল করে পরীক্ষা করছে। দেখছে গুলি কোথায় লেগেছে। কিভাবে লেগেছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল ও। এসে টর্চটা জায়গায় রাখতে রাখতে বলল—আজ তুমি নতুন জীবন পেলে লালসাহেব। আজকের রাতটা সেলিব্রেট করতে হবে। এই বলে চাকরকে ডেকে বলল—মোরগা পাকাও। চাকর কাঁচুমাচু মুখ করে বলল—মোরগা শেষ হয়ে গেছে কাল। যশোয়ন্ত বলল, লেগ-হর্ণ কাটো। পোষা মুরগীর ঘর থেকে বের করো। আজ রাতে মোরগা চাই-ই—যে করে হোক।

আমি বললাম—তোমার এত আদরের পোষা মুরগী কাটবে কেন মিছিমিছি। ও ধমকে বলল—কথা বলো না কোনো। তোমার জানটাও আমার কাছে কম আদরের নয়। সেটা ত গেছিলই। ফিরে পেয়েছি তার জন্যে মুরগীর জান না হয় যাবেই।

আমার সামনে একটা চেয়ার টেনে চেয়ারের পিঠটা বুকের কাছে নিয়ে দুদিকে দুটি পা ছড়িয়ে বসে যশোয়ন্ত বলল—আচ্ছা, ডালটনগঞ্জে বিশেষ কিছু কি দেখেছিলে? এমন কিছু যা তোমার অস্বাভাবিক লেগেছিল? এমন কোনো লোক যাকে তুমি চেন অথচ চিনতে পারোনি?

হঠাৎ আমার মনিহারী দোকানের সামনের সেই লাল অ্যাম্বাসাডরটার কথা মনে হল। ওকে বললাম। সেই লোকটি, যে-গাড়িতে বসেছিল তার কথাও বললাম। যশোয়ন্ত লাফিয়ে উঠে বলল—লোকটির কি বড় বড় জুলফি ছিল। আমি চমকে উঠে বললাম, কি করে জানলে? হ্যাঁ ছিল। যশোয়ন্ত বাঁ হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে ঘুষি মেরে বলল—বুঝেছি।

আমি বললাম—তাত বুঝেছি, এখন চল পুলিশে একটা ডায়েরী করে আসি।

ও বলল—পাগল নাকি? এই রাত্তিরে আবার ডালটনগঞ্জে ফিরতে গিয়ে মরি আর কি? ডাইরি-ফাইরি করব না। ডাইরি করলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। বদলা নেওয়া যাবে না। তুমি কি মনে কর ওদের ছেড়ে দেব লালসাহেব? যারা একজন নির্দোষ লোককে কাপুরুষের মত আড়াল থেকে গুলী করে মারতে চায়, তাদের শিক্ষা যা হওয়া উচিত তা আমি দেব।

আমি বললাম—যশোয়ন্ত তা তুমি বলছ বটে, কিন্তু শিক্ষা দেওয়ার আগে তোমাকে ও ত ওরা এমনি করে মেরে ফেলতে পারে? যশোয়ন্ত কিছুক্ষণ ঠোঁট কামড়ে ভাবল। তারপর বলল—তা পারে। কিন্তু একবার চেণ্টা করেই দেখুক। আমি ত আর তোমার মত মাখনবাবু নই যে, ওদের ছেড়ে দিয়ে আসব।

যশোয়ন্তের লোক গরম জল করে এনে বাথরুমে দিয়ে গেল। যশোয়ন্ত দেওয়াল আলমারী খুলে একটা ধুতি বের করে দিল। বলল—যাও, স্নান করে এস। আরাম লাগবে। স্নান সেরে বেরিয়ে দেখি যশোয়ন্ত ওর পিস্তলটা পরিষ্কার করছে। তেল দিতে দিতে বলল—অনেকদিন ব্যবহার করা হয় না। শিকারেত আর পিস্তলের তেমন দরকার হয় না। মানুষ মারতেই বেশী কাজের। বুঝলে লালসাহেব, কাল ভোরে যে জায়গায় তোমার উপর গুলি চালিয়েছিল ওরা, সেখানে যাব। সে জায়গাটা আমি নিজে দেখব। তারপর ঠিক করব ডাইরী করব কি করব না। আমি বললাম—যা ভাল বোঝ। প্রাণ একবার গেলে আর তা ফেরৎ হবে না।

যশোয়ন্ত সে রাতে প্রচুর মদ গিললো। সেই হুইটলী সাহেবরা শিকারে আসার পর একসঙ্গে ওকে এত মদ কখনও খেতে দেখিনি। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে একটা হুইস্কির বোতল প্রায় শেষ করে আনল। তারপর আমার সঙ্গে আবার খিচুড়ি আর মুরগীর রোস্ট খেল।

ব্রাণ্ডি খাওয়ার জন্যেই হোক কি ভয়-জনিত ক্লান্তির জন্যেই হোক, ঘুমটা খুব ভাল হয়েছিল।

ঘুম ভেঙে উঠে এক কাপ করে চা খেয়ে আমরা জীপ নিয়ে সেই গুলির জায়গায় গিয়ে পৌঁছলাম। যশোয়ন্তের পেছনে পেছনে গিয়ে দেখলাম—যে একটা জীপ ডাইভার্সনে নেমে, বাঁদিকে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে এবং সেখান থেকে বেরিয়েছেও যে তার চাকার দাগ স্পষ্ট।

জীপটা জঙ্গলে ঢোকার দাগ ওখানকার ঝুরে ঝুরে শুকনো লাল মাটিতে কাল রাতেও নিশ্চয়ই ছিল। কাল চোখ খুলে গাড়ি চালালে আমার নজরে নিশ্চয়ই পড়ত। আমাকে গালাগালি করল যশোয়ন্ত, কালকে তা নজর করিনি বলে।

জীপের চাকার দাগ ধরে জঙ্গলের মধ্যে পঞ্চাশ-ষাট গজ গিয়ে বোঝা গেল যে, জীপটা যেখানে দাঁড় করানো ছিল সেই জায়গাটার ঘন ঝোপ থাকায় জীপটা সহজেই লুকিয়ে রাখা যায় সেখানে। পিটীস-ঝোপের পাশে একটি বড় কালো পাথর। সেই পাথরের পেছনের মাটি বেশ পরিষ্কার করা। পাতা, শুকনো ডালপালা, ইত্যাদি সাফ করা। যশোয়ন্ত ভাল করে লক্ষ্য করল জায়গাটা। এবং পরক্ষণেই একটি গোল্ডফ্লেক সিগারেটের প্যাকেট কুড়িয়ে পেল। আমায় বলল—ভাল করে খোঁজ ত, খালি কার্তুজ পাও কিনা। খালি কার্তুজ পেলাম না কিন্তু একটা ঠোঙা কুড়িয়ে পেলাম। ঠোঙাটা যশোয়ন্ত দেখেই বলল—ডালটনগঞ্জের বিখ্যাত চাটের দোকানের ঠোঙা। বাবুরা চাট কিনে এনে এখানে বসে মাল খেয়েছিলেন। ভাগ্যিস খেয়েছিলেন। নইলে কি আর কুড়ি হাত দূরে থেকে তোমার মাথায় তাক করা গুলি ফসকাত? তোমার খুপরী ফাঁক হয়ে যেত।

পর্যবেক্ষণ শেষ করে যশোয়ন্ত বলল—চলো লালসাহেব ডাইরি-ফাইরি করব না। আমি ওদের শিখলাম। অনেকদিন হয়ে গেল কাউকে রগড়াই না। হাতে-পায়ে মরচে ধরে গেল। আমার উপরই ছেড়ে দাও।

আমি ভয় পেয়ে বললাম—কি? তুমিও ওদের খুন করবে নাকি? যশোয়ন্ত হেসে বলল—প্রায় সেইরকমই। কি করি তা দেখতেই পাবে।

(১২)

রামদেও বাবুদের কর্মচারী সেই রমেনবাবু—বেঁটে-খাটো, গাট্টা-গোট্টা চেহারা, অনর্গল সিগারেট খান, সেদিন আমার বাংলোর সামনের পথ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যবটুলিয়াতে যাচ্ছিলেন। সেখানে নাকি বিঘা দশেক জমি কিনেছেন। ভাগে দেওয়া আছে। গেঁহু কেমন হল তাই তদারক করতে যাচ্ছিলেন।

বাঁশ কাটা কাজের সময় একসঙ্গে আমাদের দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে হয়েছে। ভারী মজার লোক। এই একধরনের মানুষ। এদের পিছুটান বলে যে কিছু আছে, তা বোঝার উপায় নেই এদের দেখলে। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও এদের অদ্ভুত। এই রকম লোকেই জঙ্গলে-পাহাড়ে এই ধরনের কাজ তদারক করতে সক্ষম। মুখে হাসি লেগেই আছে। পথচলতি দেহাতী ছেলেমেয়ে, বুড়োর সঙ্গে দেখা হলো ত দু-একটা হাসি-মস্করার কথা বলছেন, তারা দুলে দুলে হাসছে, রমেনবাবু আবার সাইকেল চালিয়ে চলেছেন। এঁদের তুলনায় সত্যিই আমরা মাখনবাবু। অসম্ভব কষ্টসহিষ্ণু এই রমেনবাবু।

রমেনবাবুকে বললাম—ফেরবার সময় দুপুরে আসবেন কিন্তু। খাওয়া-দাওয়া এখানেই করবেন। উনি বললেন—ভরপেট খেয়ে কি সাইকেল চালিয়ে এতদূর যেতে পারব মশাই। আমি বললাম—আজ যে যেতেই হবে এমন কথাও ত নেই। এসেছেন ত জমিদারী দেখতে। উনি হেসে বললেন, তা যা বলেছেন।

বেশ ভালো খেতে পারেন ভদ্রলোক। প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম, পাহাড়ের স্বাস্থ্য-প্রদায়িণী জলবায়ু এসব মিলে বেশী না খাবার কথা নয়। আমিই আজকাল যা খাই, শহরে লোকে দেখে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

আমার রামধানীয়া রমেনবাবুকে দেখেই দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে বলল—সেলাম পালোয়ানবাবু। মানে বুঝলাম না। শুধোলাম,—আপনার নাম আবার পালোয়ান হল কবে থেকে? রমেনবাবু মুখে ভাত দিয়েছিলেন, হাসতে হাসতে ভাত ছিটকে পড়ল। বললেন—সে আর বলবেন না মশাই—সে এক ইতিহাস।

তারপর উনি খেতে খেতে গল্প বলতে লাগলেন। ডালটনগঞ্জে প্রথম চাকরি নিয়ে এসেছি। মাইনে বেশী পাই না। টাকা-পয়সার বড়ই টানাটানি। টাকা-পয়সা রোজগারের শর্টকাট মেথডগুলো তখনও রপ্ত হয়নি। একটা লং মেথড মাথায় এলো।

বাঁশ কাটা কুলিদের দলে দুজন রংরুট ছিল। একজনের বাড়ী দ্বারভাঙ্গা জেলা, অন্যজনের ছাপরা। দুজনেরই চেহারা একেবারে দশাসই। দেখলেই মনে হয় প্রফেশনাল কুস্তিগীর। ওরা দুজনেই, রাম সিং আর দাশরথ, নতুন এসেছিল। বাইরের লোক দূরে থাকুক, আমাদের কুলিরাই ওদের ভালো করে চেনে না। একদিন ওদের দুজনকে পাঠিয়ে দিলাম ছীপাদোহর। সেখানে তখন মালদেও বাবুর কাজ হচ্ছিল। ছীপাদোহর হয়ে লাইনটা ডালটনগঞ্জে এসেছে। ছীপাদোহর থেকে সামানাই রাস্তা। তখন ফার্স্ট ক্লাসেরই ভাড়া ছিল বোধহয় এক টাকা।

দাশরথ আর রাম সিংকে ছীপাদোহরে পাঠিয়ে দিয়ে লাল নীল পেপারে প্যামপ্লেট ছাপিয়ে দিলাম দুজন পালোয়ানের ছবি দিয়ে। প্যামপ্লেটে বলা হল যে, পালোয়ান রামসিং ও পালোয়ান দাশরথ সিং, ভীষণ এক জীবন-মরণ কুস্তি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে। দশদিন পর বাজারের পাশের বড় মাঠে। টিকিট দু আনা মাত্র। কি বলব মশাই, প্রথম তিন দিনে দেড় হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয়ে গেল তারপরও যখন টিকিট বিক্রি হতে লাগল, তখন আমার ভয় করতে লাগলো।

এদিকে রামসিং আর দাশরথ সিং ছীপাদোহরের বাবুদের মোকামের কুয়োতলার পাশে নরম মাটি নিমপাতা আর হলুদের গুঁড়ো মেশানো আখড়ায় চটাচট ফটাফট করে মহড়া দিয়ে চলেছে। ওদের কাছে দশ টাকা করে প্রাইজ একটি করে নাগরা জুতো, একজোড়া ধুতি এবং এক হাঁড়ি করে হাঁড়িয়া কবুল করেছিলাম। তারা দিনরাত 'জয় বজরঙবলীকা জয়' বলে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে ধাই-ধপ্পর করে কুস্তি আখড়া সরগরম করে রাখল।

এদিকে প্রতিযোগিতার দিন আসন্ন। আখড়া তৈরি হয়েছে। চারপাশে বেড়া দেওয়া হয়েছে। বেড়ার গায়ে গায়ে কাঁচা শালপাতার ফেস্টুন লাগানো হয়েছে। নিশান ওড়ানো হয়েছে আখড়ায়, একটা লম্বা বাঁশের ডগায়। এখন পালোয়ানেরা এসে পড়লেই হয়।

ডালটনগঞ্জ স্টেশনে কি ভীড়। ফার্স্ট ক্লাসের দরজায় দাশরথ সিং আর রামসিং দাঁড়িয়ে মৃদু-মৃদু হাসছে। আসবার আগে ওদের দুজনের মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাতে এখানের লোকেরা চিনতে না পারে। সে হৈ-হৈ ব্যাপারে। কাঠ-বওয়া ট্রাকের মাথায় তাদের দুজনকে বসিয়ে 'জয় বজরঙবলীকা জয়' ধ্বনি দিতে দিতে পৃষ্ঠপোষকেরা ওদের নিয়ে সোজা আখড়ায়। আমি হলাম রেফারী। একটা নীল রঙা সুইমিং ট্রাঙ্ক ছিল অনেকদিনের পুরোনো। সেটা পরলাম আর রামলীলার মেক-আপ ম্যানের কাছে গিয়ে ভাল করে মেক-আপ নিলাম ভুষোকালি, শাদা রং ইত্যাদি মেখে, যাতে আমাকে বুড়ো কুস্তিগীর বলে মনে হয়।

দর্শক ত সবই বাঁশ-কাঠ-গালার কুলি। ভেবেছিলাম ধরতে পারবে না। কুস্তি খুব জোর জমে উঠেছে। মাঝে মাঝে আমি হুইসেল দিচ্ছি। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে ব্যাপার গুরুতর। রামসিং একটা গুণ্ডা। ও দাশরথকে ধরে এমন আছাড় মারতে আরম্ভ করল, যে কি বলব। দেখলাম দাশরথ হাত নেড়ে রামসিংকে কি বলল এবং আমাকেও যেন কি বলল। কিন্তু রামসিং ছাড়ছে না মোটে। ধপধপ করে আছড়ে চলেছে। মেরে ফেলে আর কি। এমন সময় দাশরথ আখড়া ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে বলল—'এ রমেনবাবু এ্যাইসি বাত থোড় যা। হামকো নাগড়া না চইয়ে, কুচ্ছু না চাইয়ে, আরে বাপ্পারে বাপ্পা', বলেই ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলো।

যেই না কথা বলা, আর রমেনবাবু বলে আমাকে ডাকা, আমার কুলিদের মধ্যে জগদ্দল বলে যে একটা কুলি ছিল (ভারী সেয়ানা), সে সঙ্গে সঙ্গে মাল ক্যাচ করে ফেলল। চেঁচিয়ে আর সবাইকে বলল—আরে ই ত রমেনবাবু বা। ঔর হামরা দাশরথ ওর রামসিং বা।

দৌড় দৌড় দৌড়। দৌড়ে গিয়ে ট্রাকে বসলাম, বসে, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে স্টেশান। ভাগ্যক্রমে ট্রেন তক্ষুনি ছাড়ছিলো, মানে ছেড়ে গেছিলই, সেই অবস্থায় দুই-জন অনুচর সঙ্গে নিয়ে লাফিয়ে উঠলাম গাড়ীতে। ঘামে ততক্ষণে সব রং গলে গেছে। দাশরথ রামসিংকে গালাগাল করছে আর রামসিং দাশরথকে গালাগল করছে।

গল্প শুনে হাসতে হাসতে মরি। শুধোলাম, ফিরলেন কি করে তারপর আবার? উনি বললেন, তক্ষুনি ফিরি? সাতদিন পরে অবস্থাটা শান্ত হলে ডালটনগঞ্জে ফিরলাম। ফিরেই মালদেওবাবুর পদতলে অনুচরদ্বয় সমেত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হলাম।

উনি খুব হাসতে লাগলেন। বললেন—এই রকম বুদ্ধি, ভাল দিকে লাগালে কি হত? সেইদিন থেকে পঞ্চাশ টাকা মাইনে বেড়ে গেল আমার। অনুচরেরাও চাকরিতে পুনর্বহাল হল। আমিও মোটা নীট প্রফিট করলাম। অবশ্য কুস্তিগীরদেরও ঠকাইনি। সকলে খেতে চাইল। একদিন কেচকীতে পিকনিক হল। সব খরচা আমি দিলাম।

এরকম গল্প-গুজব করতে করতে খাওয়া হল। রমেনবাবুর স্টকে আরো গল্প ছিল। তার প্রতিটি গল্প এমনি মজার। হাসতে হাসতে পেট ফাটে শুনে।

প্রায় দুপুর দুটো অবধি ছিলেন। তারপর আবার সাইকেলে উঠে পাহাড়ী পথে পাড়ি জমালেন।

মারিয়ানার কাছ থেকে গোটা চারেক বই আনিয়েছিলাম লোক মারফৎ। একটি বই নিয়ে বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে মোড়ায় পা তুলে দেখতে লাগলাম। আমি কোনো বিশেষ বই চাইনি। কারণ মারিয়ানার কাছে কোন বই আছে, কোন বই নেই তা আমার জানার কথা নয়। মারিয়ানা তিন লাইনের সুন্দর একটি চিঠি পাঠিয়েছে বই-

গুলির সঙ্গে। আমাকে শিরিনবুরু যাবার নেমন্তন্ন জানিয়ে।

একটি কবিতার বই। রিলকের 'সনেটস টু অরফিয়ুস'। খুলতে গিয়েই মারিয়ানার নাম লেখা দুটি সাদা খাম বইটি থেকে মাটিতে পড়ে গেল। খাম দুটিকে তুললাম। মারিয়ানাকে নিশ্চয়ই কেউ লিখেছিল। ও ভুল করে বইয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছে।

চিঠি দুটি রীতিমত ভারী-ভারী ঠেকল। পরের চিঠি। ভদ্রতার সবরকম মাপ-কাঠিতেই অন্যের চিঠি পড়া গর্হিত অপরাধ। চিঠি দুটি বেতের টেবলের উপর তুলে রাখলাম।

তার পর কবিতা পড়তে চেষ্টা করলাম। অন্য বইগুলো নাড়াচাড়া করলাম, কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যখন মন বসল না, তখন হঠাৎ মনে হল, আমার সমস্ত মন ঐ চিঠি দুটির মধ্যে কি আছে তা জানার অসভ্য আগ্রহে অধীর। সাধে কি বলি, যে জংলী হয়ে গেছি।

সব বুঝি, সব বুঝি, তবু, সুমিতা-বৌদি যেমন মুখ করে কুলের আচার খান, যশোবন্ত যেমন মুখ করে হুইস্কির বোতল খোলে, আমি বোধহয় তেমনি মুখ করে চিঠি দুটি খুললাম।

হাতের লেখাটি ভাল না। বড্ড জড়ান—খুব তাড়াতাড়ি লেখা। বড় প্যাডে লেখা পাঁচ পাতা চিঠি। মারিয়ানা-সোনা বলে সম্বোধন, সুগত বলে সমাপ্তি।

কলকাতা
২৭।৮

আমার মরিয়ানা সোনা,

গতকাল মেট্রোতে একটি ছবি দেখলাম The Sandpipers' এলিজাবেথ টেলর ও রিচার্ড বার্টনের। এডওয়ার্ড বলে একটি চরিত্রে বার্টন অভিনয় করেছেন। সেই চরিত্রটি ও লিজ টেলরের মিস রেনোল্ডস বড় ভাল লাগল। তোমায় গল্পটি বলছি।

পাহাড় ও জঙ্গল-ঘেরা সমুদ্রের পাশে একটি সুন্দর দু-কামরা-উঁচু বাড়ী। চার-দিকে কাচের জানালা। সারাদিন সী-গালেরা জলের উপর উড়ে বেড়ায়, ভেসে বেড়ায়, আর স্যান্ডপাইপার পাখিরা ঝাঁকে-ঝাঁকে বালু বেলায় ছড়িয়ে পড়ে আবার উড়ে যায়।

মিস রেনোল্ডস একা-একা থাকেন এই লোকালয়বর্জিত নির্জন স্থানে। একেবারে একা নয়। সঙ্গে বছর দশেকের ছেলে থাকে।

কৈশোরের শেষে, মানুষের কৌতূহল যখন অসীম থাকে, ঠিক সেই বয়সে, শারীরিক সম্পর্কে মজাটা কোথায় বুঝতে গিয়ে মিস রেনোল্ডস অন্তঃসত্ত্বা হয়। সমাজের মানুষ এবং বাবা-মা স্বাভাবিক কারণে তার শরীরে মুকুলিত অন্য শরীর-টিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু মিস রেনোল্ডস তা না শুনে এবং পাছে বাবা-মা'র কোন অসম্মানের কারণ ঘটায়, সেই জন্যে, নিজের দেশ ছেড়ে বহু দূরে এক অন্য রাজ্যে (আমেরিকাতেই) এসে এই পাহাড়-সমুদ্রের কোলে বাসা বাঁধে।

পুরুষ মানুষ সম্বন্ধে মিস রেনোল্ডসের অনেকানেক অভিযোগ ছিল। যেমন তোমাদের অনেকেরই আছে। ওর বারো বছর বয়স থেকেই, যেহেতু ও দেখতে সুন্দরী ছিল, পুরুষেরা ওর কাছ ঘেঁষে, কাছে আসে, অন্তরঙ্গতা করতে চায়। কিন্তু সত্যিকারের ভালোবাসা যাকে বলে তা ও কোনদিন কোন পুরুষের মধ্যে দেখে নি। ভালোবাসার সংজ্ঞাও জানত না। ওর অন্তরের অভিধানে পুরুষের ভালোবাসার অর্থবাহী হয়ে অন্য একটি জ্বলন্ত শব্দ লেখা হয়ে গিয়েছিল। যা কেবল দাহ বাড়ায়, দাহ নেবায় না।

প্রকৃতিকে সত্যি-সত্যিই ভালবাসত মিস রেনোল্ডস। ছবি আঁকত, সারাদিন ছবি আঁকত। ডানা-ভাঙা স্যান্ডপাইপার পাখিকে বুকে তুলে ঘরে এনে যত্ন করত। স্বার্থপর ও নোংরা পুরুষ মানুষের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র নিশ্চিন্ত স্থান যে প্রকৃতি, তা সে বুঝেছিল।

কিন্তু একদিন তার জীবনে এডওয়ার্ড এল। বিবাহিত এডওয়ার্ড। স্ত্রীর সঙ্গেই সে থাকে। বিশ্বস্তা স্ত্রী। সুন্দরী স্ত্রী। স্ত্রী তাকে ভালোবাসে, সেও স্ত্রীকে ভালো-বাসে। এডওয়ার্ড সুপুরুষ। বিখ্যাত মিশনারী স্কুলের কর্ণধার। নিষ্ঠায়, আদর্শে, পবিত্রতায় বিখ্যাত। মিস রেনোল্ডসের ছেলের স্কুলে ভর্তির ব্যাপার নিয়ে প্রথম দুজনের দেখা হল।

মিস রেনোল্ডস জীবনে এমন পুরুষ মানুষ দেখে নি এর আগে। সুপুরুষ ত বটেই, শিক্ষা আছে; কিন্তু দম্ভ নেই। চাওয়া আছে, নেই চাতুর্য। জ্বালা আছে কিন্তু সে জ্বালা বিকিরীত হয় না। নিজের বুকে ঝড় উঠলে যে নিজে নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে ঝড় প্রশমিত করে, সেই ঝড়কে কূল ছাপিয়ে অন্য মনে পাঠায় না।

এডওয়ার্ড বিবাহিত। অথচ সে নতুন করে ভালবাসল। সমাজের চোখে এ বিষম অপরাধ। নিজের বিবেকের কাছে সে সব সময় ছোট হতে থাকল। মাঝে-মাঝে এসে রাতে থাকত এডওয়ার্ড মিস রেনোল্ডস-এর স্বপ্নের মত ঘরে। স্যান্ডপাইপারের ডানার গন্ধবাহী হাওয়ার বাস নিত নাক ভরে। সমুদ্রের ফেনোচ্ছ্বাসে নিজের সমাহিত উচ্ছ্বাসকে দিত ডুবিয়ে।

ধীরে-ধীরে ওদের অন্তরঙ্গতা যখন ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতমতে এসে পৌঁছল তখন একদিন বিবেকসম্পন্ন মূর্খ পুরুষ এডওয়ার্ড তার স্ত্রীকে জানাল নতুন ভালো-বাসার কথা।

মিস রেনোল্ডস যখন শুনল যে এডওয়ার্ড তার স্ত্রীকে তাদের সম্পর্কের কথা বলেছে, সে ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে কাঁদতে লাগল। কারণ সে সত্যিই নিজেকে প্রকৃতির কন্যা বলে মনে করত। সে বলল, এতে বলার মত কি ছিল? পাপের কি ছিল? একজন পুরুষ ও নারীর মধ্যে গোপনীয় কোন মধুর সম্পর্ক থাকা কি পাপ? কোন স্বীকৃত গোপনীয়তা দিয়ে কি এই সম্পর্ক ঢেকে রাখা যেত না? তোমার এ কেমন পাপবোধ? তোমার এ কেমন বিবেক? ন্যায়-অন্যায় চেন নি?

কিন্তু মারিয়ানা, ন্যায় অন্যায়ের বিচার আমার মত, মিস রেনোল্ডসের মত, দু-একজন পাগল লোকের মত-সাপেক্ষ নয়। তোমাদের বদ্ধমূল সংস্কার, তোমাদের বিবেক, তোমাদের সমাজ কিন্তু এডওয়ার্ড যে শাস্তি পাবার যোগ্য নয় তাকে সেই শাস্তিই দিল। মিস রেনোল্ডসও শাস্তি পেল। এডওয়ার্ডের স্ত্রীও সেই শাস্তি পেল। শাস্তি কোন আদালতে হল না বটে, কিন্তু এডওয়ার্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিবেক দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তার স্ত্রী এবং রেনোল্ডস দুজনকেই ছেড়ে চলে গেল। একজন স্বেচ্ছারোপিতা বিচ্ছেদ পেল; অন্য-জন অনারোপিত বিচ্ছেদ। আর এডওয়ার্ড ধর্মপুস্তকের শুকনো পাতা খুঁড়ে-খুঁড়ে সোনা খুঁজতে-খুঁজতে তার কবরের দিকে এগিয়ে চলল।

বুঝলে মারিয়ানা, তোমরা বড় খারাপ, তোমরা বড় খারাপ। তোমরা যাই চাও না কেন তাই ব্যক্তিগত মালিকানায় চাও। মানুষের মনকে যে লখীন্দরের বাসর ঘরের মত ঘরে আটকে রাখা যায় না, এবং গেলেও যে তাতে সাপের মত সূক্ষ্ম শরীরে ভালো-বাসার প্রবেশ সম্ভব, তা তোমাদের বোঝন সম্ভব নয়।

এডওয়ার্ড চলে গিয়ে তাও এক রকম বাঁচল, আমি চলে না যেতে পেরে মরছি। অনুক্ষণ মরছি। তুমি, আমি মহুয়া, আমরা সবাই রেনোল্ডস, এডওয়ার্ড ও এডওয়ার্ডের স্ত্রীর ছায়া—অবিকল ছায়া নয়—বিকৃত ছায়া।

ছবিটি বড় ভাল লাগল। দেখতে-দেখতে তোমার কথা বড় মনে পড়ছিল। আমার এই একতরফা, পরিণতিহীন, ভবিষ্যৎহীন ভাল-বাসার সমাপ্তি হয়ত কেবলমাত্র আমার মৃত্যুতে। একটা পাগল, অবুঝ মন নিয়ে জন্মেছিলাম -- সেই অশান্ত অতৃপ্ত মন নিয়ে পৃথিবী থেকে ফিরে যাব।

ভয় নেই। প্রেতাত্মা হয়ে তোমাকে ভয় দেখাব না; বরং স্বর্গের দরজায় বসে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব — কবে তুমি জঙ্গলের গন্ধমেখে রাধাচূড়োর পুষ্পস্তবকে সেজে সেই দরজায় এসে পৌঁছবে — তার দিন গুনব।

আদর জেনো।
তোমার সুগত।

মনে-মনে এই আকস্মিকতার জন্যে তৈরী ছিলাম না। যা শুনেছি মারিয়ানার টুকরো-টুকরো কথায় তাতে ভদ্রলোকের আপাতদৃষ্টিতে দুঃখ পাবার মত কিছুই নেই। শিক্ষা আছে, স্বাস্থ্য আছে, অর্থ আছে, যশ আছে, বিশ্বস্তা ও সুন্দরী স্ত্রী আছে, তবুও কেন দুঃখ, এত দুঃখ? কে এর জবাব দেবে?

(ক্রমশ)

ভূতের ভয়

সেদিন চব্বিশ পরগণার এক গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। রাস্তায় এক জায়গায় একটি তেঁতুল গাছ দেখিয়ে বন্ধু বললেন, গাছটাতে আগে ভূত থাকত।

অন্যমনস্কভাবেই চলছিলাম। কিন্তু বন্ধুর কথায় আকৃষ্ট হলাম। বললাম, আগে থাকত মানে? এখন গেল কোথায়?

বন্ধু বললেন, বলা কঠিন, কিন্তু এখন আর এখানে কেউ ভূতের ভয় পায় না।

না, পায় না। মনে মনে ভেবে দেখলাম, কেবল সেখানেই নয়, বাংলাদেশের কোনো গ্রামেই আজ আর তেমন করে কেউ বোধকরি ভূতের ভয় পায় না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার, বিদ্যুতের আবির্ভাব ইত্যাদি হরেকরকম কারণে ভূতগুলো এখন হয়তো উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছে। ভূতের গল্পও ইদানীং তাই ক্রমক্ষীয়মাণ।

অবিশ্যি, 'গল্প' বলতে যা বোঝায়, অনেকের বিশ্বাস ভূত নামক বস্তুটি সেরকম আজগুবি ব্যাপার নয়। ভূত অতি বাস্তব জিনিস। শুধু সূক্ষ্ম শরীরে ঘুরে বেড়ায় বলে আমরা দেখতে পাই নে। কিন্তু মাঝে মাঝে তারা স্থূলে শরীরেও দেখা দিতে পারে। তখন—।

এই 'তখন'-এর কাহিনী আমরা সকলেই জানি—। পতন ও মূর্ছা! কেননা, ভূত দেখে ভয় পায়নি এমন লোক অকল্পনীয়। গাঁয়ের পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক রাত্তিরে হয়তো আপনার মনে হল, ওপাশের কুলগাছটার ওপর দিব্যি শাদা থান পরে একটি বিধবা ভূত বসে আছে। আপনার মনে ভয় জাগতে শুরু করল, কিন্তু আপনি তা দমন করে গাছটার দিকেই আরো কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, আসলে ঐ শাদা বস্তুটি একটি ছেঁড়া গামছা—হয়তো কোনো রাখাল দিনের বেলায় গরু চরাতে এসে ফেলে গেছে। বাস, ভয় পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখাও লোপাট। কিন্তু আপনি যদি গাছটার দিকে এগিকে যাবার সাহস না পেতেন, অর্থাৎ ভয় পেতেন, তাহলে গামছাকেই মনে হত ভূতের বিধবা, এবং ভয় পেতেন। অর্থাৎ, ভূত দেখার ভূমিকাতেও ভয়, পরিশিষ্টেও ভয়। কিম্বা, আমার এক বন্ধু জালের ডেফিনেশন দিতে গিয়ে যেমন বলেছিলেন জাল হল কতকগুলো ফুটো, সুতো দিয়ে বাঁধা, তেমনি ভূতও হল কতকগুলো ভয়, দেখা দিয়ে বাঁধা।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র একটি মন্তব্য।—'গ্রামের লোক ভয় করিতে ভালোবাসে। গ্রামের বাহিরে খালের এপারের ঘন জঙ্গল ও গভীর নির্জনতাকে তাহারা ওই কাজে লাগাইয়াছে।'

কিন্তু ভয় পেতে শুধু গাঁয়ের লোকেরাই ভালোবাসে, শহরে লোকেরা বাসে না তা বলা শক্ত। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের বিবরণী থেকে জানা যায়, খাস কলকাতা শহরেও একদা অনেকেই ভূত দেখতে পেত। এবং খোদ ঠাকুরবাড়িতেও কোনো কোনো পরিচারিকা বাদাম গাছে ভূত দেখেছে।

অবিশ্যি ভূতের ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে ভয় জয় করার চেষ্টাও যথেষ্টই হয়ে থাকে। সেসব গল্পও কম রোমাঞ্চকর নয়। ভুতুড়ে বাড়িতে কোনো এক দুঃসাহসী ইংরেজ সাহেবের গুলীভরা রাইফেল নিয়ে একা রাত কাটানোর প্রয়াস, এবং শেষপর্যন্ত হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় জানলা-দরজা খুলে গিয়ে আলো নিভে যাবার ভয়াবহ কাহিনী আমরা বাংলা দেশের নানা অঞ্চল থেকেই শুনেছি। এবং পড়েছি শ্রীকান্তের সেই শ্মশানে রাত কাটানোর রোমহর্ষক বিবরণ। শরৎচন্দ্র স্পষ্টই লিখেছেন, মনের ওপর যদি শ্রীকান্তের আরেকটু দখল কমে যেত, তাহলে তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারত। অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, ভূত আছে কিনা এ তর্কের সমাধান যাই হোক, 'ভূতের ভয়' বস্তুটি খুবই বাস্তব।

দুর্লভ চক্রবর্তী

আর এ ভয় আপন-পর মানে না। বরং পরের চেয়ে আপনের বেলাতেই যেন এ ভয় আরো ঘোরালো হয়ে ওঠে। মনে করুন শরৎচন্দ্রেরই আরেকটি গল্পের বিবরণ। এক আত্মীয়ের মৃত্যুর সময় লেখক উপস্থিত ছিলেন। গ্রামের বাড়ি। মৃতব্যক্তির স্ত্রী এবং লেখক ছাড়া আর কেউই সে রাতে উপস্থিত ছিলেন না সে বাড়িতে। স্বামীর মৃত্যুর পর ভদ্রমহিলা 'শোকের আবেগে দাপা-দাপি করিয়া এমন কান্ড করিয়া তুলিলেন যে, ভয় হইল তাঁহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বারবার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কি?'.....কিন্তু লেখক বলছেন, তাঁর তো এভাবে কান্না শুনলেই চলবে না, লোক ডাকা দরকার। জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করা দরকার।

'...কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, ভাই যা হবার সে ত হয়েছে, আর বাইরে গিয়ে কি হবে? রাতটা কাটুক না।' ...কিন্তু তাঁর সে কথা না শুনে লেখক বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই, 'তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওরে বাপ রে। আমি একলা থাকতে পারব না।' ...এবং এ ঘটনার পর লেখকের মন্তব্য—'তখন বুঝিলাম, যে-স্বামী জ্যান্ত থাকিতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি বা সহে, তাঁর মৃতদেহটা এই অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যেও সহিবে না।'

খুবই সত্যি কথা। কারণ আমার এক বন্ধু ক-বাবুর কাছেই শুনলাম সেদিন ঠিক এইরকমই আরেকটা কাহিনী। ক-বাবুর শাশুড়ি মারা গিয়েছিলেন কয়েক বছর আগে। ক-বাবুর স্ত্রী রোজ রাতে ঘুমোনোর আগে বেশ কিছুক্ষণ উপন্যাস পড়ে থাকেন—সম্ভবত ঘুমের ওষুধ হিসেবে। সে রাতেও উপন্যাস পড়ার পর নিদ্রাতুর হয়ে স্বামীকে ভদ্রমহিলা বললেন, আলো নিভিয়ে দিতে। স্বামী বেড সুইচ টিপে আলো নেভালেন। ইত্যবসরে স্ত্রী সুদীর্ঘ একটি হাই তুলতে চলতি জড়িতকণ্ঠে বলতে থাকলেন, 'মা—মাগো—।' ভদ্রলোকের কী মনে হল, রসিকতার সুরে বলতে লাগলেন, 'অমন কাতরভাবে ডেকো না মাকে, হঠাৎ এসেও পড়তে পারেন। বাস, মুহূর্তেই প্রলয় কান্ড। ক-বাবুর স্ত্রী মাঝপথে হাই বন্ধ করে চিৎকার করে উঠলেন, 'তুমি কী গো! আলো জ্বালো, আলো জ্বালো—! এসব কী অলক্ষুণে কথা। ওঃ—।' সটান উঠে বসে ভদ্রমহিলার সেকি আথালিপাতালি। ক-বাবু তো অপ্রস্তুতের একশেষ। তাড়াতাড়ি আলো জেলে জল-টল দিয়ে স্ত্রীকে শান্ত করে তবে সোয়াস্তি।

অবিশ্যি আমি আগেই বলেছি, ভূতের ভয় এখন ক্রম-ক্ষীয়মাণ। আর তার কতকগুলো কারণও আমি অনুমান করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এত কথা বললাম শুধু এইটে জানাতে যে, ভয় পাবার প্রবণতা রয়েছে আমাদের মনের মধ্যেই, এবং সেই ভয় পাওয়াটাই আমাদের ভয় দেখায়।

হ্যাঁ, 'দেখায়।'— 'দেখাতো' না বলে 'দেখায়' বলাটাই আমি পছন্দ করছি। হয়তো আজকের 'ভূত' আর নরকঙ্কালের চেহারা নিয়ে হাজির হয় না, আসে নানা রোগভীতি, অনিশ্চয়তা-ভীতি, উৎপীড়ন-ভীতি ইত্যাদির চেহারা নিয়ে। সারাদিনই আমরা কোনো না কোনো ভয়ের চাপে আধমরা হয়ে আছি। এবং এই ভয়গুলোই হল আজকের দিনের ভূত।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নানাকণ্ঠে একটি কথা—আমার ভবানন্দ ছাড়া তারা অন্যের অভিনয় দেখবে না। আমি ভবানন্দ না করলে টিকিটের দাম ফেরত দিতে হবে।

কতো করে বোঝালাম, যে আমি অসুস্থ—এমনকি ওষুধের শিশি পর্যন্ত দেখালাম, কিন্তু তাঁরা কোন কথা কানে নিলেন না। কথা তাঁদের একটাই, আমার ভবানন্দ ছাড়া দেখবে না।

অগত্যা আমাকেই অসুস্থ অবস্থায় স্টেজে নামতে হলো। হীরালালবাবু সমস্ত ব্যাপারটা দেখেছেন, তিনি কিছু মনে করলেন না।

অসুস্থ অবস্থায় সেদিন আমাকে স্টেজে নামতে হলো। একেই বলে খ্যাতির বিড়ম্বনা।

এর পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাস্যরসাত্মক নাটক 'কলির সমুদ্র মন্থন' মঞ্চস্থ হলো ১৯৩১ এর আগস্ট মাসে। সেদিন বাংলায় তারিখ ছিল ১৬ শ্রাবণ, ১৩৩৮। ভূমিকালিপি ছিল : তরুণ—আমি, মহাদেব—প্রভাত সিংহ, নন্দী—রঞ্জিৎ রায়, ভৃঙ্গী—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, ফরাসী—সুরেন্দ্রনাথ রায়, ইংরেজ—সুশীল ঘোষ, পার্বতী—আঙুরবালা, ভদ্রকালী — বেদানাবালা, পদ্মর পিসী—রাণীসুন্দরী।

নাটকের বিষয়বস্তুটি বেশ চিত্তাকর্ষক। বাঙলা দেশে তথা কলকাতায় এসে সব জাতি সব কিছু করে নিলে, কিছুই করতে পারল না বাঙালী—সংক্ষেপে নাটকের বক্তব্য ছিল এই। নাট্যকার এই নাটকের উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন, 'কলির নীলকণ্ঠ যাঁরা, জগতের সমস্ত হলাহল গণ্ডূষে যাঁরা পান করেছেন, আমার সেই কেরাণী ভায়েদের হাতে আমার এই নাটক উৎসর্গ করলাম।'

এই সময়ে চলতি নাটকের মধ্যে মনোমোহনে অভিনীত শচীন সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা' এবং মন্মথ রায়ের 'কারাগার' বিরাট সাফল্য লাভ করেছিল। দুটি নাটকেরই প্রধান ভূমিকায় ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। কিন্তু দুঃখের কথা, 'কারাগার' যখন পূর্ণোদ্যমে চলছে তখনই মনোমোহন থিয়েটারে ভাঙনের পালা শুরু হলো।

একটা থিয়েটার গড়তে দেখলে যে আনন্দ হয়, ভাঙলে দুঃখটা তার চেয়ে বেশি বাজে।

এর পর ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠা হলো নাট্য নিকেতনের। বর্তমানের বিশ্বরূপা থিয়েটারই হলো সেদিনের নাট্যনিকেতন।

১৯৩১-এর ১৪ মার্চ নাট্যনিকেতনের উদ্বোধন হলো। কিন্তু প্রথমে ঐ মঞ্চে নাটক নয়, নৃত্যগীত পরিবেশন করা হয়েছিল কিছুদিনের জন্যে। নাট্য-নিকেতনের প্রথম নাটক হেমেন্দ্রকুমার রায় কর্তৃক নাট্যরূপায়িত নিরুপমা দেবীর 'ধ্রুবতারা'। তার পর ঐ বছরের মে মাসে নাট্য-নিকেতনে মঞ্চস্থ হলো মন্মথ রায়ের সাবিত্রী। সাবিত্রীর পর নিরুপমা দেবীর দিদি।

ডাক্তার চিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী এবং মাঃ মিনু

এদিকে স্টার থিয়েটারে সৌরীন মুখোপাধ্যায়ের 'স্বয়ম্বরা' উদ্বোধন হলো ঐ বছরেই ২৭ জুন তারিখে। ঐ মঞ্চের পরবর্তী নাটকটি ছিল অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীগৌরাঙ্গ'। সেপ্টেম্বর মাসে এটির উদ্বোধন হয়েছিল। নাটকটির সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিল চাপাল গোপালের ভূমিকায় দানীবাবুর অভিনয়।

এই ১৯৩১ সালেই আর একটি নাটক-এর আসর বসলো কলকাতায়। নট রবি রায় এবং অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে দুজনে মিলে একটি দল গড়লেন। নাম দীপালি সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘে এসে যোগ দিলেন নরেশ মিত্র, মিস লাইট, নিভাননী প্রমুখেরা। এই দলের আস্তানা ছিল শ্যামবাজারে বাজারের ওপর। যে ঘরটিতে এক সময় শিশিরবাবুও রিহার্সালের আসর বসাতেন। এই দল বিভিন্ন জায়গায় পুরোনো নাটক অভিনয় করে বেড়াতেন।

ইতিমধ্যে শিশিরবাবু ফিরে এসেছেন আমেরিকা থেকে। ফিরে এসেই একটি স্টেজের সন্ধান করছিলেন। রঙমহল কর্তৃপক্ষ দশ হাজার টাকা অগ্রিম সম্মান-দক্ষিণা দিয়ে শিশিরবাবুকে টেনে নিলেন। শিশিরবাবু রঙমহলে প্রথমেই মঞ্চস্থ করলেন যোগেশ চৌধুরীর বিষ্ণুপ্রিয়া। নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীও এই নাটকে অংশ নিতেন।

কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া বেশীদিন চলল না। তাই শিশিরবাবুকে আবার পুরোনো নাটক অভিনয় করতে হলো। তাতেও কিছু হল না। শেষটা তাঁকে বেশ কিছু খেসারৎ দিয়ে চলে যেতে হল রঙমহল ছেড়ে।

এদিকে মিনার্ভায় অভিজাতের পরে আমরা আরম্ভ করলাম শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয় হয়েছিল ৯ অক্টোবর ১৯৩১। ভূমিকালিপি ছিল এই রকম : কৈলাশখুড়ো — অহীন্দ্র চৌধুরী, চন্দ্রনাথ—শরৎ চট্টোপাধ্যায়, সুলোচনা—চারুশীলা, সরযূ — আসমানতারা। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, চন্দ্রনাথের নাট্যরূপ দিয়েছিলাম আমি। নাটকটি সুখ্যাতিই পেয়েছিল।

এর মধ্যে মিনার্ভায় অন্য নাটকও মাঝে-মাঝে চলছিল। ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রহসন 'ধরপাকড়', ডাঃ সুরেন রায়-চৌধুরীর 'মানভঞ্জন' এবং সতীশ ঘটকের 'পদধূলি', 'হাটে হাঁড়ি', 'অগ্নিশিখা'ও অভিনীত হয়েছিল। এর কোনটাই তেমন চলে নি।

এই সময়ে আমার 'বেনিফিট নাইট'—হিসেবে আলমগীরের সম্মিলিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন মিনার্ভা। আমার ইচ্ছে ছিল নাটকে রাজসিংহ নয়, আমি অভিনয় করি আলমগীরের ভূমিকায়। এই চিন্তা নিয়ে রাধিকানন্দবাবুর কাছে গেলাম। যদি তিনি রাজসিংহ করেন।

রিক্তা চিত্রের নায়ক অহীন্দ্র চৌধুরী

আমার কথা শুনে রাধিকানন্দবাবু মৃদু হেসে বললেন, আমি তো কোনো বেনিফিট নাইটে অভিনয় করি না।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, আমি জানতাম না। কিছু মনে করবেন না।

কী করবো! কার কাছে যাবো রাজসিংহের জন্যে। প্রবোধবাবু বললেন নির্মলেন্দুবাবুর কথা। কিন্তু নির্মলেন্দুবাবুকে বলতে তিনি বললেন, আমি নামতে পারি, তবে রাজসিংহ নয়, আলমগীরের ভূমিকায়।

তাই হলো।

সেই থেকে আমি বরাবর 'রাজসিংহ'ই করে এসেছি। আলমগীর সেজে আর স্টেজে নামি নি।

এর পর মিনার্ভায় একটি নাটক খুব নাম করল। সেটি হল ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর লেখা বাসুকী। উদ্বোধন হয়েছিল ১৯৩১-এর ১৯ ডিসেম্বর। ঐ নাটকে মঞ্চমায়া ছিল ভালই। ইন্দ্রের সিংহাসন ধরে তক্ষকের স্বর্গে চলে যাওয়া, সর্পযজ্ঞের সময় সর্পকুলের আগুনে-পড়া, শূন্যে সিংহাসনসহ ইন্দ্র ও তক্ষক—এসব দৃশ্যে দর্শকরা মুগ্ধ হতেন। নামভূমিকায় অভিনয় করতাম আমি। এছাড়া শরৎ, হীরালাল চ্যাটার্জি, প্রভাত সিংহ, রেণুবালা, চারুশীলা, সুবাসিনী এরাও নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশ নিতেন। পরবর্তী কালের যশস্বিনী অভিনেত্রী উমাশশীও এই সময় কাঁড়বাবু অর্থাৎ নৃত্যশিক্ষক সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের থিয়েটারে যোগ দিলে। ,

যে সময়ের কথা বলছি, এই সময় চিত্রজগতে একটা পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছে। নির্বাক ছবির জায়গায় সবাক ছবির যুগের সূচনা হোল। ম্যাডান কোম্পানী সবাক ছবির তোড়জোড় আগে থেকেই শুরু করেছিলেন, এবারে তাঁদের সবাক চিত্র বেরোল। নাম জামাই ষষ্ঠী। প্রথম সবাক চিত্রের নির্মাণের গৌরব পেলেন অমর চৌধুরী। ম্যাডানের প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি হল 'ঋষির প্রেম'। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋষির প্রেমেই আমার প্রথম সবাক চিত্রে অভিনয়। কবি কৃষ্ণধন দে'র লেখা এই কাহিনী-চিত্রে নায়িকা ছিলেন কানন দেবী, নায়ক ছিলেন হীরেন বসু। এই বছরেই ম্যাডান কোম্পানী 'প্রহ্লাদ' নামে আর একটি ছবি উপহার দিয়েছিলেন। পরিচালক ছিলেন প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। এই চিত্রে আমি ছাড়া জয়নারায়ণ, মৃণালকান্তি, শান্তি গুপ্তা, নীহারবালা, জ্যোতি, ধীরেন দাস প্রমুখ শিল্পীরা অংশ নিয়েছিলাম। ক্রাউন সিনেমায় ছবিটি ২৯-১২-৩১ তারিখে মুক্তিলাভ করে। আরো একটি প্রতিষ্ঠান এই বছর সবাক চিত্র তৈরী করেছিলেন। সে প্রতিষ্ঠানটি হল নিউ থিয়েটার্স। তাঁদের প্রথম ছবি শরৎচন্দ্রের দেনা-পাওনা। পরিচালক ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। ভূমিকায় ছিলেন : দুর্গাদাস, নিভাননী, অমর মল্লিক প্রভৃতি। ৩০ ডিসেম্বর ছবিটি চিত্রায় মুক্তিলাভ করে।

বছরের কথা শেষ করার আগে আর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। এবারে সেই না বলা ঘটনার কথা বলছি।

একটা কথা তো আগেই জানিয়েছি যে, আমার মধ্যে একটা ঘূর্ণি আছে, এক জায়গায় বেশীদিন স্থির থাকা আমার অভ্যাসের বাইরে। নিজের মধ্যে একটা যাযাবর মন আছে, সে মনটা সময়ে-সময়ে দারুণ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

এবারে পুজোর আগে মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠল। এ চাঞ্চল্য কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাবার জন্যে। কিন্তু যাব বললেই তো যাওয়া যায় না। মিনার্ভার চুক্তিবদ্ধ শিল্পী শুধু নই, ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বও আমার, সুতরাং আমার পক্ষে এক কথায় কোথাও যাওয়া কি সম্ভব?

তবু শেষ পর্যন্ত উপেনবাবুকে বললাম, আমার বাইরে যাওয়ার ইচ্ছের কথা।

শুনে উপেনবাবু বললেন, কী করে এমন সময় ছুটি দিই বলুন! এখন পুজোর মরশুম, যেতে হয় পরে যাবেন। তাছাড়া আপনি বাইরে গেলে নাটকের অঙ্গহানি হবে।

আবার বললাম, আমি তো বেশী দিনের ছুটি চাইছি না, মাত্র আট-দশ দিন।

এবারে উপেনবাবু লাফিয়ে উঠলেন, অরে বাপরে — এ একেবারে অসম্ভব।

তবুও অনুরোধ জানালাম ছুটির জন্যে। কিন্তু উপেনবাবু কোনমতে রাজী হলেন না। জানালেন, পুজো কেটে যাক, তারপর আমিই আপনার বাইরে যাবার বন্দোবস্ত করে দেব।

এর পর আর কথা চলে না। হলো না এবারে বাইরে যাওয়া। কিন্তু মনটা তখনো ছটফট করছে বাইরে যাবার জন্যে।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর পর বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে রইল আমার প্রিয় ভৃত্য নীলু আর থিয়েটারের আরো দুজন অভিনেতা।

প্রথমে গেলাম অযোধ্যা। তখন সবে ভোর হচ্ছে, অযোধ্যায় পৌঁছেচি। এক ধর্মশালায় উঠলাম। চা-পানের পর একটা টাঙ্গা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ফৈজাবাদের দিকে। ফৈজাবাদের নবাব বাড়ি, বিশেষ করে ফুলের বাগিচা দেখবার মত। এখানকার শেষ নবাব সুজাউদ্দৌলা, তাঁরই পুত্র আসফউদ্দৌলা পরে লক্ষ্ণৌ শহর নির্মাণ করেন। আগে ফৈজাবাদই অযোধ্যার রাজধানী ছিল।

ফৈজাবাদের রাজপথ ধরে বেড়াতে-বেড়াতে লক্ষ্য করলাম, দলে-দলে ছেলে-মেয়েরা সেজেগুজে কোথায় যেন চলেছে। জিজ্ঞাসা করতে শুনলাম, সরযূ নদীর ধারে মেলা হচ্ছে, সেখানেই চলেছে ওরা।

ভালই হল। আমরাও চললাম মেলা দেখার বাসনা নিয়ে।

মেলা দেখলাম। বিরাট এলাকা জুড়ে মেলা বসেছে। মেলা দেখে হনুমানজীর মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের চারদিকে অজস্র হনুমান দেখলাম। যাদের উৎপাতে যাত্রীরা দস্তুরমত বিব্রত।

আবার ফিরে এসেছি ধর্মশালায়। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম শেষে টাঙ্গা নিয়ে এলাম স্টেশনে। এবারে আমরা যাব লক্ষ্ণৌ।

লক্ষ্ণৌ-এ উঠেছি হোটেলে। সুন্দর-পরিচ্ছন্ন হোটেল। হোটেলে জিনিস-পত্তর গুছিয়ে রেখে শহর দেখতে বেরোলাম। খানদানী শহর। সর্বত্র একটা আভিজাত্যের ছাপ জড়ান। শহর পরিক্রমা শেষে একটা দোকানে এসেছি কিছু কেনাকাটা করব বলে। এখানেই অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হল পাহাড়ী সান্যালের দাদা দ্বিজেন সান্যালের সঙ্গে।

আমাকে দেখেই দ্বিজেন সান্যাল বলে উঠলেন, আরে দাদা, আপনি এখানে?

সবচেয়ে মজার ব্যাপার, আমি কিন্তু তখনো দ্বিজেন সান্যালকে চিনি না। একজন অপরিচিত মানুষকে পরিচিতের মত কথা বলতে দেখে অবাক হলাম।

দ্বিজেনবাবু এতক্ষণে আপন পরিচয় দিলেন। বললেন, দাদা—আমার বাড়ি থাকতে আপনারা হোটেলে থাকবেন কেন? চলুন, আমার বাড়ি।

বললাম, হোটেলেই ভাল। বেশ নিজের মত থাকা যায়।

দ্বিজেনবাবু হেসে বললেন, আমার বাড়িতেও নিজের মত থাকবেন।

বললাম, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। এবারে যখন হোটেলে উঠেছি, তখন সেখানেই থাকি। আবার যখন আসব, তখন আপনার বাড়িতেই উঠব।

এর পর আরো দুদিন লক্ষ্ণৌ ছিলাম। তারপর এলাম কানপুরে।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন কানপুরে শহরে ট্রাম চলত। তার কয়েক বছর বাদেই শহর থেকে ট্রাম উঠে যায়।

গোটা দিনে কানপুর শহর দেখা শেষ করলাম। সারাটা দিন ঘুরেছি। তারপর আর কোথাও নয়, একেবারে সরাসরি স্টেশনে এলাম।

এবারে আবার কলকাতায় ফেরার পালা। ঝড়ের মত কদিন এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে আবার সেই পরিচিত শহর কলকাতায় ফিরে এলাম।

আবার শুরু হল পরিচিত নিয়মের আবর্তে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়া।

আবার সেই সিনেমা, থিয়েটার—আবার সেই অভিনেতার চলতি জীবন।

এইভাবে ১৯৩১ সাল শেষ হল—অনন্তকালের সমুদ্রে আর একটি বছর লীন হয়ে গেল।

১৯৩২ সাল শুরু হল। আমরা 'বাসুকী'কে সঙ্গে নিয়ে নববর্ষকে স্বাগত জানালাম। 'বাসুকী' বেশ কিছুদিন চলার পর আমরা মিনার্ভায় খুললাম সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার সম্প্রতি স্বর্গত ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদের পঞ্চাঙ্ক নাটক 'পুরোহিত' ২৫ আষাঢ় (১০ জুলাই ১৯৩২)। ফণীবাবু ছিলেন প্রধানত যাত্রার পালা লেখক—কিন্তু 'পুরোহিত' নাটক হিসাবে সত্যিই ভাল হয়েছিল, তবু লোকে তেমন নেয় নি। কয়েক সপ্তাহ মাত্র চলেছিল বোধহয় গানের সংখ্যা কম ছিল বলে, কিম্বা অন্য কোন কারণে ঠিক বলা মুস্কিল। অথচ অভিনয়ের দিকটা খারাপ হয় নি। দর্শক এবং সমালোচক সকলেই আমার (রাজপুরোহিত মতই মুগ্ন) এবং রাণী সন্ধ্যারূপে চারুবালার খুব সুখ্যাতি করেছিল। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন শরৎ চট্টোপাধ্যায়, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন সরকার, বঙ্কিম দত্ত, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, গণেশ গোস্বামী, আসমানতারা, নিরুপমা প্রভৃতি।

এর কিছুদিন পরেই মিনার্ভায় টিকিটের হার কমান হল এই রকম: আট আনা, ১৲, ২৲, ৩৲, স্পেশাল—৫৲ ও বক্স ১২৲ (৩ জনের), ৫ জনের ২৫৲ এবং ৬ জনের ৩০৲। মহিলাদের জন্য—আট আনা, ১৲ ও ২৲। বুধবার ১৩ শ্রাবণ থেকে এই নূতন হার চালু হল। এতে দর্শকসংখ্যা অবশ্য বাড়ল, কিন্তু থিয়েটারের আভিজাত্য গেল কমে। এর আগে কোন নাটক ভাল না লাগলে দর্শকরা তেমন চেঁচামেচি করতেন না, কিন্তু এখন হল কি কোন কিছু দর্শকদের মনঃপুত না হলে শেষ সারি থেকে নানা রকম অপ্রিয় (কোন কোন সময় অশ্লীলও) মন্তব্য হত—মাঝে-মাঝে হৈ-চৈ যে না হত তা নয়। অন্য কোন থিয়েটার অবশ্য টিকিটের দাম কমায় নি।

এর পর মিনার্ভার কর্মসচিব রমেন্দ্রনাথ ঘোষের (রামবাবু) সম্মান রজনী উপলক্ষ্যে ২রা আগস্ট দুখানি বড় নাটকের অভিনয় হয় বিশিষ্ট সব অভিনেতৃ সম্মেলনে। নাটক দুখানি হল 'প্রতাপাদিত্য' ও 'বাঙালী'। 'প্রতাপাদিত্য'র ভূমিকালিপি ছিল: প্রতাপ—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, কমল — দুর্গাদাস, ভবানন্দ—আমি, বসন্ত রায়—কার্তিক দে, গোবিন্দ দাস—কৃষ্ণচন্দ্র, সুন্দর—রবি রায়, বিজয়া—সরযূ, রডা—ভূমেন রায়, শঙ্কর—শরৎ চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ রায়—জয়নারায়ণ, কল্যাণী—চারুশীলা, কাত্যায়ণী—বেদানাবালা, বিন্দুমতী — রেণুবালা। 'বাঙালী'তে আমি—সুখদাস, নীহারবালা—ভিখারিণী, ছোট গিন্নী—প্রকাশমণি, ফ্লোরা—নিরুপমা।

পরবর্তী নতুন নাটক মিনার্ভায় খোলা হল সেই বড়দিনের সময়—১০ ডিসেম্বর, ১৯৩২। নাটকটি হলো 'মিশরকুমারী'র লেখক বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'দেবযানী'। বরদাবাবু নামকরা নাট্যকার, তিনি দর্শকদের নাড়ী টিপে বুঝতে পারতেন তারা কি চায়। সুতরাং 'দেবযানী'তে তিনি সেইসব উপাদান দেওয়ায় দর্শকরা তা সাদরে গ্রহণ করল। 'দেবযানী'র ভূমিকালিপি ছিল—আমি—শুক্রাচার্য, যযাতী—শরৎ চট্টো, ঘণ্টাকর্ণ—কুঞ্জবাবু, বৃষপর্ব—হীরালাল, চারুশীলা—দেবযানী, আসমানতারা—শর্মিষ্ঠা।

এই বছরটা অন্যান্য থিয়েটারে কি কি বই হলো তার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দই। রংমহলে হলো সৌরীন মুখোপাধ্যায়ের 'রুমেলা' (১৭-১-৩২), শিবরাত্রির সময় হল 'দেবদাসী'। দোলের সময় হল 'রংয়ের খেলা'। তারপর হলো নট ও নাট্যকার উৎপল সেনের 'সিন্ধুগৌরব' (২৫-৬-৩২)। সতু সেন ছিলেন মঞ্চাধ্যক্ষ। তারপর জুলাই মাসে হলো, জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'অসবর্ণা' এবং অকটোবর মাসে 'রাজশ্রী' বড়দিনের আগেই রংমহল বন্ধ হয়ে যায়। এর পর রংমহলের পরিচালনাভার গ্রহণ করেন শ্রীশিশির মল্লিক ও যামিনী মিত্র তখনও সতু সেন ছিলেন মঞ্চাধ্যক্ষ হয়ে।

'বনের পাখী' নাটকখানির রিহার্সাল আগেই শুরু হয়েছিল, সেখানি মঞ্চস্থ করে ওঁরা অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা' মঞ্চস্থ করলেন ১৭ এপ্রিল, ১৯৩৩—নাট্যরূপ দিয়েছিলেন যোগেশ চৌধুরী।

নাট্যনিকেতনে এ সময় কাজী নজরুলের 'আলেয়া' ও শিবরাম চক্রবর্তী কর্তৃক নাটকীকৃত নিরুপমা দেবীর 'দিদি' চলছিল। তারপর শচীন সেনগুপ্তের 'সতীতীর্থ' ২০ জুন, ১৯৩২ মঞ্চস্থ হয়। এই গল্পটিই আমি আমার প্রথম ছবির জন্য নির্বাচন করেছিলাম। তারপর জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'আধারে আলো', (৮-৭-৩২), তার এক মাস পরে হল সুধীন রাহার 'বিপ্লব'। নবেম্বর মাস থেকে আবার ভাদুড়ীমশায় পাকাপাকি-ভাবে এখানে এসে আসর জমালেন। তাঁর প্রথম প্রযোজিত নাটক হল 'মহাপ্রস্থান', সন্তোষ গুপ্তের লেখা। ২৫ নভেম্বর এই নাটক খোলা হয়। দুঃখের বিষয় নাটকখানি তেমন জমেনি, এবং ভাদুড়ীমশায়কে আবার এখান থেকে চলে যেতে হয়।

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী পরিক্রমা

বহু আলোচিত ও স্বল্প পরিচিত নাগাভূমির নিসর্গদৃশ্য এবং জীবনযাত্রার ওপর ছোট একটি পরিচ্ছন্ন ফটোগ্রাফিক প্রদর্শনী গত ৭ থেকে ১৫ জানুয়ারি অবধি কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় নাগাভূমির ইনফরমেশন অ্যাণ্ড পাবলিসিটির ডিরেক্টরেটের তরফ থেকে এবং ফটোগ্রাফগুলি তোলেন কলকাতার শিল্পী অজয় দে যাঁর আরেকটি ফটোগ্রাফ প্রদর্শনী এই তথ্যকেন্দ্রেই কয়েক বছর আগে দেখা গিয়েছিল।

শ্রীদে ফটোগ্রাফি শিক্ষার জন্যে বিভিন্ন দেশ ঘুরেছেন এবং বিদেশে বহু জায়গায় তাঁর ফটোগ্রাফির প্রদর্শনী হয়েছে। তাঁর মতে ঠিক মত পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন হলে নাগাভূমি সুইজারল্যাণ্ডের মতই ভ্রমণকারীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। পথঘাট এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা আশানুরূপ না হওয়ায় বর্তমানে এর পূর্ণ রূপ দেখার সুযোগ সকলের হয়ে ওঠে না। তবে ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় এই ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি হচ্ছে এবং দেশে ক্রমশ শান্তি ফিরে আসছে। নাগাভূমির বিভিন্ন উপজাতীয় এলাকায় ঘুরে শ্রীদে তাদের বর্ণাঢ্য সাজ-পোষাক ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অনেক ছবি তুলেছেন। এর মধ্যে চাকসাঙ-এর উপজাতীয় পোষাক এবং তিনটি নাগা রমণীর চাল কোটার দৃশ্য অতি চমৎকার। কয়েকটি বিভিন্ন উপজাতীয় টাইপ সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এক গুচ্ছ ও একটি ফুল হাতে নাগা তরুণীর ছবি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আধুনিকতার ছোঁয়াচ নাগাজীবনে কতদূর পৌঁছেছে তার নিদর্শন স্বরূপ গীটার হাতে ইয়োরোপীয় পোষাকে নাগা তরুণের ছবির উল্লেখ করা চলে। এছাড়া শস্যক্ষেত্রে কর্মরত নাগা নারী ও পুরুষ, চাসবাসের বিভিন্ন দৃশ্য, শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন ছবিতে নাগা জীবনযাত্রায় যে টুকরোটাক ধরা পড়েছে তার সংবাদ পরিবেশনের দিক ছাড়াও শিল্পগত দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়।

●

আধুনিক ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শিল্পী শ্রীমতী বারবারা হেপওয়ার্থ-এর দান আজ সর্বজনবিদিত। আধুনিক যুগে ক্লাসিক ফর্মের পবিত্র পরিচ্ছন্নতা যাঁরা এনেছেন তাঁদের মধ্যে তিনি একজন অগ্রগণ্য শিল্পী, অত্যন্ত অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং আপাতদৃষ্টিতে অতিমাত্রায় সরলীকৃত ফর্ম বলে মনে হলেও নিবিষ্ট মনে দর্শন করলে দুটি বিষয় প্রথমেই মনে হয়। একটি হল ভাস্কর্যটি স্পর্শ করে দেখার ইচ্ছা এবং অন্যটি হল এগুলির একটা মানবিক গুণ। হয়ত দুটি পরিচ্ছন্ন ফর্ম পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। প্রথমেই মনে হবে ফিগারের সঙ্গে আপাত সাদৃশ্য না থাকলেও এগুলির কোথায় যেন একটা ফিগারেটিভ গুণ রয়েছে। দর্শকের সঙ্গে তুহীন শীতলতা বা দূরত্ব রক্ষার চেষ্টা এদের নেই। আবার নিছক পুতুলের মত অতিমাত্রায় নৈকট্যবোধও নেই। সব মিলিয়ে একটা সংযত আবেগের প্রকাশটাই প্রধান। গত ৪ থেকে ১১ জানুয়ারী অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে তিনটি ছোট ভাস্কর্য পাঁচখানি ড্রয়িং এবং প্রায় গোটা ত্রিশেক ড্রয়িং ও ভাস্কর্যের সুদৃশ্য ফটোগ্রাফ প্রদর্শিত হল। তিনটি ছোট ব্রোঞ্জের ভাস্কর্যের মধ্যে মুক্ত এবং বদ্ধ ফর্মের নিদর্শন দেখা গেল এবং ছোট্ট 'পিয়ার্সড রাউণ্ড ফর্মটির' গঠনের সারল্য আকর্ষণীয়। ড্রয়িংগুলি অধিকাংশই পেন্সিল ও অয়েল বা পেন্সিল ও জলরঙে করা। তীক্ষ্ম পরিচ্ছন্ন রেখাপাত এবং জ্যামিতিক ধরনের নিখুঁত কাজ—বেশীর ভাগই খাড়াই ফিগার। ভাস্কর্যের ফটোগ্রাফ-এর মধ্যে কয়েকটি পূর্বেকার ব্রিটিশ ভাস্কর্যের প্রদর্শনীর মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

●

১৫ থেকে ২১ জানুয়ারী ক্যালকাটা আর্টিস্টস্ গোষ্ঠীর ৭ জন শিল্পী ৪১ খানি ছবি ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী করেন। অ্যাকাডেমির দক্ষিণের গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীটির ছবি টাঙানোর কাজটি যথাসম্ভব পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে করা হয়—তবে ফ্রেমিং-এর দিকে আরেকটু নজর দিলে ভালো হত। সনৎ কুমার রোহাতগী ৬ খানি ছবিতে অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মের মত রঙ চাপিয়েছেন এবং সূক্ষ্ম রেখার মাধ্যমে ফিগার উপস্থিত করেছেন। অমিতাভ ব্যানার্জির অ্যাক্রাইলিক পেন্টিংগুলি কোথাও কোথাও একটু কমার্শিয়াল ঘেঁষা হয়ে গেলেও ৯ নম্বরের ছবির দুটি ফিগার কম্পোজিশন রঙ রেখা ও গঠনে সার্থকতা লাভ করেছে। তাঁর গণেশ মূর্তিটিও উল্লেখযোগ্য।

শ্যামল দত্ত রায় নিম্নগ্রামের রঙে উচ্চগ্রামের আলোছায়ার খেলা এবং আপাতদৃষ্টিতে অ্যাবস্ট্রাক্ট ছাঁদে ফিগারেটিভ কাজগুলি তাঁর পূর্বেকার রীতি অনুযায়ী তৈরী
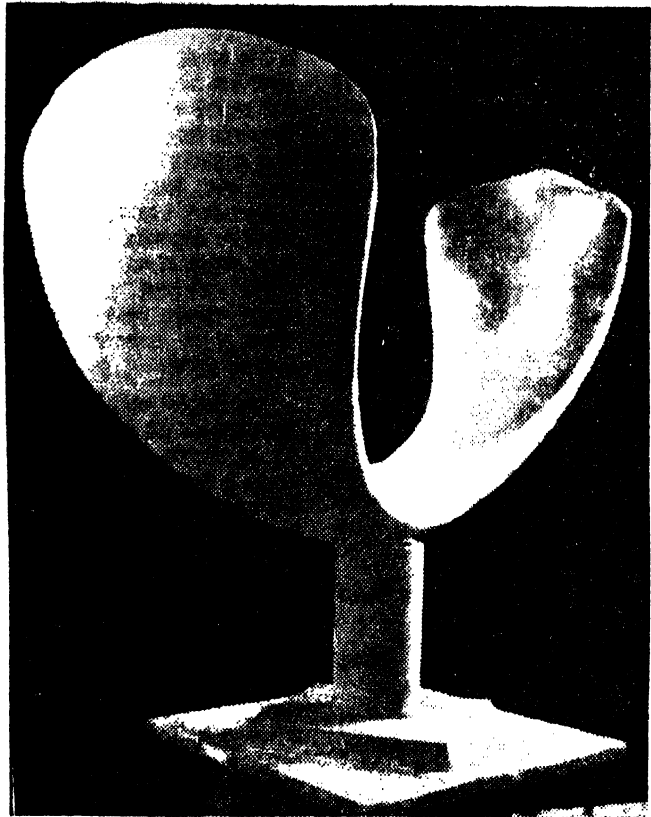
শিল্পী : শঙ্কর ঘোষ

হয়েছে। তাঁর 'দি ডে বিগিনস' এবং 'কুমার' ছবি দুটি একবাক্যে উল্লেখযোগ্য।

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী হরিদ্বারের দৃশ্যাবলী নিয়ে রঙের মোজাইক তৈরী করেছেন। মোজাইকের প্যাটার্ণটি একটু পুনরাবৃত্তি দোষে দুষ্ট। বেণু লাহিড়ী জলরঙের ছবিগুলি তাঁর পূর্বতন কাজের পুনরাবৃত্তি।

শংকর ঘোষের ৬ খানি ভাস্কর্য বিভিন্ন পরীক্ষার চেহারা সুস্পষ্ট যদিও এখনো কোন বিশেষ রীতির ছাপ এই প্রদর্শনীতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। তার ইর্সো এবং 'সিটিং ফিগার' দুটি বিভিন্ন রীতির দুরকম নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

●

কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে ১৭ থেকে ২৪ জানুয়ারী বিশ্বখ্যাপত্তনের চিত্রকলা পরিষদ ও ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর যৌথ প্রচেষ্টায় এক শতের মত জাপানী প্রিন্টের একটি চমৎকার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল।

জাপানী উডকাট প্রিন্টের সঙ্গে বহির্জগতের পরিচয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে। এই শিল্প এদেশে এগার শতক থেকে চালু থাকলেও আঠার উনিশ শতকের উকিয়ো-এ শিল্পআন্দোলন একে বিশেষ একটি রূপ দিয়েছে। ক্ষণস্থায়ী জগতের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনযাত্রার ক্ষণিকদৃষ্ট রূপ নিয়ে যে ছবি এঁরা সৃষ্টি করছিলেন তার প্রভাব গত শতাব্দীর ফ্রান্সে ইম্প্রেশনিস্ট ও পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট গোষ্ঠীকেও প্রভাবিত করেছিল। এই শতাব্দীর গোড়ায় নব্য-ভারতীয় শিল্প আন্দোলনেও জাপানী শিল্পের প্রভাব অল্প নয়।

প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ হকুসাই-এর 'উত্তাল তরঙ্গ' ও সাঙ্গা প্রিন্ট এবং হিরোশিগের তোকাইদো যাত্রাপথের পঞ্চাশটি দৃশ্য। এছাড়া এঁদের অনুসরণে অন্য শিল্পীদের করা অনেকগুলি প্রিন্ট। হিরোশিগের এই প্রিন্টগুলি বহুবর্ণ ছাপার কারুকর্ম এবং শিল্পীর কল্পনাশক্তির বৈচিত্র্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। কখনো নির্জন বনপথ কখনো পার্বত্য অঞ্চল কখনো বা বর্ষণমুখর দিনে নদী পার হওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে যাত্রা বর্ণন করা হয়েছে। যেসব জায়গার ছবি তিনি এঁকেছেন সেগুলি এখনো আছে এবং কৌতূহলী শিল্পরসিকের ছবির সঙ্গে আসল জায়গা মিলিয়ে দেখতে গিয়ে স্থানে স্থানে শিল্পীর আশ্চর্য স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করে অবাক হয়েছেন। ছবির প্রয়োজনে ডাইনের পাহাড় বাঁয়ে সরাতে বা গ্রীষ্ম-প্রধান জায়গায় বরফের দৃশ্য অবতরণ করতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। যেখানে পাহাড়ের কোন চিহ্ন নেই সেখানে পশ্চাৎপট পর্বতমালা বসিয়ে ছবিতে আশ্চর্য গাম্ভীর্য সৃষ্টি করা হয়েছে অথচ সব দৃশ্যেই একটা স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের আমদানী করতে শিল্পী সক্ষম হয়েছেন।

শিল্পী : বারিদ গোস্বামী

তাঁর অন্যতম জগদ্বিখ্যাত ছবি 'শোনোতে হঠাৎ বর্ষা'ও এই সিরিজের। ঝড়ের গতি বর্ষার ধারা এবং আকস্মিক বিপদগ্রস্ত মানুষের ভঙ্গী নিয়ে ছবিতে একটি অনবদ্য মুড সৃষ্টি হয়েছে।

●

১৬ থেকে ২৩ জানুয়ারী ইন্ডিয়ান কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ড্রাফটসম্যানশিপ-এ ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়ে গেল। চারু ও কারুশিল্পের নিদর্শন নিয়ে প্রায় আড়াইশোর কাছাকাছি শিল্পবস্তু প্রদর্শিত হয়েছিল।

এই শিল্পবিদ্যালয়টি বয়সে সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের চেয়ে সামান্য ছোট হলেও এই দীর্ঘকালের মধ্যে নানা বাধাবিপত্তির দরুন বর্তমানে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করতে পারেনি। পুরোন সংস্কারহীন বাড়ির অল্পালোকিত ঘরে প্রদর্শিত ছবি ও ভাস্কর্যগুলি দেখলে আশ্চর্য হতে হয় যে এই অবস্থায় শিল্পচর্চা কি করে সম্ভব। এবারে গত কয়েক বছর অপেক্ষা ছবির মান নিম্নতর হয়েছে। তেল রং বিভাগে সেন্টিমেন্টাল কাজের সংখ্যা অধিক। শুভপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের 'অরিজিন অব ডেথ' এবং জহরলাল সাহাপোদ্দারের 'হাঙ্গার' বিকাশ ভট্টাচার্যের প্রভাবান্বিত। পৃথ্বীশ শিকদারের 'অন দি রুফ টপ' এবং 'উইন্টার লাইট' মন্দ হয়নি। এঁর একটি জল রং-এর স্টিল লাইফও উল্লেখযোগ্য। নিসর্গদৃশ্যে ও স্টিল লাইফের দিকেও এবারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ চোখে পড়ল না। ড্রয়িং-এর নমুনাগুলি যথেষ্ট উৎসাহজনক নয়। রথীন মিদার "গনৎকার' এবং গোবিন্দচন্দ্র পালের লোকোমটিভ ইঞ্জিন জল রঙের বিভাগে বিভাগে উল্লেখযোগ্য কাজ। ভাস্কর্য বিভাগের ছটি কাজের মধ্যে দুটি পোর্ট্রেট চলনসই কাজ। কমার্শিয়াল বিভাগে প্রেস অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, ক্যালেন্ডার, রেকর্ড, কভার, ফোল্ডার ও বইয়ের কভারের মধ্যে রামেন্দু ব্যানার্জির টি বি পোস্টার অমিয় ব্যানার্জির 'গ্রো মোর ফুড' ও মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জির 'রিড মোর বুকস' পোস্টার মন্দ হয়নি। রথীন ভট্টাচার্যের বুক কভার উল্লেখযোগ্য। দু-একটি রেকর্ড কভার ছাড়া মোটামুটিভাবে এই বিভাগের কাজেও এবারে বিশেষ উন্নতি চোখে পড়ল না। আশা করি আগামীবারে এঁরা নতুন কিছু উপস্থিত করতে পারবেন।

●

ছবি আঁকার চর্চা আমাদের দেশে বেড়ে চলেছে কিন্তু তার সঙ্গে তাল রেখে চিত্রবিদ্যা চর্চার উপযোগী বইয়ের এখনো অনেক অভাব। বিদেশে কিন্তু এধরনের প্রকাশন প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে এবং হচ্ছে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ড্রয়িং বুক নামে যে বস্তু আছে তাতেও অনেক সময় ড্রয়িং-এর মূল বিষয় নিয়ে পরিষ্কার আলোচনা থাকে না। অন্ধের মত কপি করার দিকেই যেন বেশী জোর দেওয়া হয়। এছাড়া যাঁরা সম্পূর্ণ নিজে নিজে ছবি শিখতে চান তাঁরাও অনেক সময় ভাল বই-এর অভাব বোধ করেন। এই সব দিক চিন্তা করে শিল্পী প্রকাশ কর্মকার 'গাড আর্ট' সিরিজ নাম দিয়ে ছবি আঁকার মূল তত্ত্ব নিয়ে কয়েকটি সুন্দর বই বার করেছেন যা স্কুলের ছাত্র এবং পরিণত বয়সের শিক্ষার্থী এঁদের সকলেরই কাজে আসবে। বিভিন্ন রেখার গুণাগুণ ছবির কম্পোজিশন শাদা কালোর ভারসাম্য ইত্যাদি নানা বিষয় পরিষ্কার নকশার সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। আর সবসময়েই শিক্ষার্থীর মৌলিক সৃজনধর্মী কাজের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। স্বদেশে এবং বিদেশে শিল্পশিক্ষা লাভের পর শিল্পী প্রকাশ কর্মকার যে জনশিক্ষার দিকে নজর দিয়েছেন এটি প্রশংসনীয়।

—চিত্ররসিক

বাড়ির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে মাঠে নামল টিয়া। এখনো বুকের ধড়ফড়ানি যায় নি। পিছু-দুয়ারি পুকুরটার কোণের জোড়া তালগাছের নিচ দিয়ে আসার সময় হঠাৎ শকুনির বাচ্চাগুলো এমন চ্যাঁ-চ্যাঁ জুড়ে দিল যে, টিয়ার বুকটা ধড়াস্ করে উঠেছিল। ছোটোবেলায় ঠাকুমা বলত, ওই তালগাছে পেত্নী থাকে, রোজ শেষরাতে কাঁদে। পেত্নী না ছাই। মনে মনে সাহস আনার চেষ্টা করে টিয়া হন্-হন্ করে মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে। বর্ষার জল নেমে গেছে কয়েক হপ্তা। এখনো মাঠটা ভেজা-ভেজা, নরম। সারা মাঠ জুড়ে ফুটে রয়েছে ঈষৎ বেগুনে রঙের হাজার হাজার কচুরিফুল। ফুলগুলো দেখতে ভারি সুন্দর। যেতে যেতে হঠাৎ নিচু হয়ে পট্ করে একটা ফুল ছিঁড়ে নিল টিয়া। কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। পায়ের পাতা ভিজে ভিজে যাচ্ছে। টিয়ার হাঁটার শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।

গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে সন্তর্পণে পুঁটির ঘরের জানলায় এসে দাঁড়াল টিয়া। চাঁদ ডুবে গেছে। রাত ঈষৎ ফর্সা হতে শুরু করেছে। কেউ জাগে নি। চারিদিকে মৌনতা। শুধু গোয়াল থেকে গোরুদুটোর জাবর কাটার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। টুপ্ করে এক ফোঁটা শিশির টিয়ার মাথায় পড়ল। একটু ঘাড় ফিরিয়ে ওপর দিকে চেয়ে দেখল, পদ্মগাছটা ফুলে ফুলে ভরে গেছে। মৃদু বাতাস দিচ্ছে। হিমেল বাতাস। পদ্মের গন্ধমাখা বাতাসটা টিয়ার বড়ো ভালো লাগছিল। নৈবেদ্য সাজিয়ে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে পুজো করার সময় ঠাকুমার ঠাকুরঘরে যেমন মিষ্টি গন্ধ ওঠে, তেমনি। আলগোছে খড়খড়ি তুলে ফিসফিসিয়ে ডাকল টিয়া, 'এই পুঁটি—পুঁটি।' সাড়া না পেয়ে জানলাদিয়ে হাত গলিয়ে পুঁটির গায় ঠেলা দিল, 'ওঠ, ওঠ।'

'উঁ।' পুঁটির সাড়া পাওয়া গেল।

'ওঠ, ওঠ। চক্ষুদান দেখবি না। ভোর হয়ে গেল যে।' টিয়া তাড়া দেয়।

এবারে পুঁটির ফিসফিসানি আওয়াজ শোনা যায়, 'দাঁড়া, আসছি।'

একটু বাদেই শাড়িট ঠিক করে পরতে পরতে এসে দাঁড়াল পুঁটি। বলল 'চল্।'

নালার তালগাছের সাঁকোটা পেরিয়ে দুজনে ছুটতে শুরু করল। তখনও ভোর হয় নি। পূব আকাশে সবে আলোর ফিকে আভা দেখা দিয়েছে। পাখিরা বাসা ছেড়ে একে-একে আকাশে উড়ছে।

হাঁফাতে হাঁফাতে দুজনে এসে চণ্ডী-মণ্ডপের বাইরে বাঁশটায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

একটা উঁচু টুলের ওপর হাঁটু গেড়ে কড়ে আঙুলটা আলগোছে প্রতিমার গালে ঠেকিয়ে তিন আঙুলে সরু তুলিটা ধরে চক্ষুদান করছে হরিপদ। অন্যহাতে মুছিতে কালো রঙ। মেঝেতে ইতস্ততঃ ছড়ানো রঙের হাঁড়িকুড়ি। ঢাকদুটো পাশে রেখে নতুন হোগলা জুড়ে গায়ে কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে ঢাকিরা। দুই খুঁটে নারকেলের দড়ি বেঁধে প্রতিমার সামনে লটকিয়ে দিয়েছে একটা ধুতি, যাতে অপরে চক্ষুদান দেখতে না পায়। একটা বড়ো কুপি ধরে দাঁড়িয়ে আছে হরিপদর ভাগ্নে। অসুবিধা হচ্ছিল না কিছুই। পাতলা কাপড় ভেদ করে সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

রুদ্ধশ্বাসে চক্ষুদান দেখছে দুজনে। নিবিষ্ট মনে হরিপদ ভ্রু এঁকে চলেছে।

ওদের আসার আগেই মালিবাড়ির একটা মেয়ে এসে গেছে। ইজের পরা। খালি-গা। কী যেন নাম মেয়েটার। টিয়া একটু ভেবেও মনে করতে পারল না। বুকের ওপর আড়া-আড়িভাবে হাত রেখে বড়ো বড়ো চোখ করে সেও 'চক্ষুদান' দেখছে।

পুঁটি হঠাৎ বলে উঠল, 'সবই তো দেখা যাচ্ছে, কাপড় লটকানোর কী দরকার ছিল!'

টিয়া জবাব দিল না। একমনে দেখে চলেছে ধীরে ধীরে প্রতিমার প্রাণ ফুটে উঠছে।

একটু বাদে পুঁটি আবার বলল, 'এই শীত-শীত করছে।'

'হুঁ।' বলে দমভরে বাতাস টেনে নিল টিয়া ধীরে ধীরে দমটা ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'বাতাসে কী সুন্দর পুজো-পুজো গন্ধ! আজ বাদে কাল 'পুজো'। বলে নিজের শাড়ির আঁচলটা পুঁটির গায় দিয়ে ওকে দুহাতে জড়িয়ে কাছে টেনে বলল, 'এবার গরম লাগছে তো?' পুঁটি খুশি-খুশি মুখে লম্বা করে শুধু বলল, 'হুঁ—।'

ভোরের আলো ক্রমে ক্রমে ফিকে থেকে গাঢ় হতে শুরু করেছে। হরিপদর তুলির টানে টানে একটু একটু করে প্রতিমার প্রাণ আসছে। ভোরের মোলায়েম আলো ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিমার মুখে। টিয়ার মনে হচ্ছিল, মা হাসছেন।

টিয়ার সুপুষ্ট শরীরের চাপে পুঁটির শরীর গরম হয়ে উঠেছে। বেশ ভালো লাগছিল পুঁটির। টিয়ার শরীরে একটু চাপ দিয়ে ওর ফর্সা গালের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে পুঁটি বলল, 'তুই না ভা-রি মিষ্টি।'

'উঁঃ।' দুষ্টুমিতে টিয়ার চোখের তারা নেচে উঠল।

প্রতিমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে টিয়ার একটা কথা মনে পড়ল: ছোটোবেলায় ঠাকুরমার হাত ধরে ঠাকুর দেখতে গেছে। সবাই মা-দুর্গার উদ্দেশে প্রণাম করছে। ঠাকুমা বলল, কই দিদি, মার কাছে নমো কর, বর চাইয়্যা নে। টিয়া কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে চোখ বুজে বলল, মা-দুগ্গা, আমার যেন সুন্দর বর হয়। মণ্ডপে আশেপাশের সবাই দুর্গার কথা শুনে হেসে উঠল। ঠাকুমা বাড়ি এসে মাকে বলল, ও বৌমা, তোমার মেয়ে আইজ কী করছে জানো? বলে টিয়ার আধো-আধো বোল অনুকরণ করে কথাটা শোনায়। মা হাসতে হাসতে চলে গেল। বাবা সস্নেহে টিয়াকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, তা গৌরী-মার আমার একটা টুকটুকে বর না হলে চলবে কেন মা? একটু বড়ো হওয়ার পর ঠাকুমা যখন মাঝে মাঝে কথাটা মনে করিয়ে দিত টিয়া একটু কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলত, ধ্যেৎ। তুমি যেন কী?

ততক্ষণে মণ্ডপে এক-এক করে অনেকেই এসে জড়ো হয়েছেন।

টিয়া পুঁটির গায় ঠেলাদিয়ে বলল, 'এই টিয়া, কী ভাবছিস?'

'এ্যা!' সংবিত ফিরে ঘাড় ঘুরাতেই দেখল ডাক্তার-কাকা, মণিজ্যেঠা ওদের দুজনকে লক্ষ্য করছেন। লজ্জায় টিয়ার কান গরম হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি গায়ের আঁচলটা ছাড়িয়ে গাছকোমর করে জড়াতে জড়াতে মাঠের দিকে দৌড়তে শুরু করল।

'এই টিয়া, দাঁড়া, আমি যাব।' হক-চকানো ভাবটা কাটিয়ে কথাটা বলতে পুঁটির সময় লাগল।

টিয়া ততক্ষণে মাঠের মাঝখানে। দৌড়তে দৌড়তে ঘাড় না ঘুরিয়েই টিয়া চেঁচিয়ে বলল, 'বিকেলে বাড়ি যাস, চালতের আচার খাওয়াব।'

টিয়ার পায়ের চাপে নরম ঘাস নুয়ে-নুয়ে যাচ্ছিল। লাল, বেগুনে ঘাসফুল-গুলো নুয়ে নুয়ে আবার মাথা তুলছিল। খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে পিঠে। দুলছে। একরাশ ঘন কালো চুল। সাঁকোর কাছে এসে শাড়িটা আঁটোসাঁটো পরে নিল সে। সাদার ওপর কালো ডোরার শাড়ি। বাঁশের সাঁকোটা ধরে ধরে পার হচ্ছে টিয়া। নিচে খালের জলে তার ছায়া পড়েছে। খালে এ সময় বেশি জল থাকে না। শ্যাওলা আর ঘাস না থাকলে মাটি দেখা যেত। টিয়ার বয়স পনেরো-ষোলোর বেশি নয়। কিন্তু বাড়ন্ত শরীর। দীঘল দেহটা টসটস করছে। বড়ো বড়ো দুটো চোখ, টানা ভুরু। ভরাট মুখ। নতুন তালের মতো মুখের রং। দুর্গা-প্রতিমার মতো মুখের আদল। ওর বাবা-মার গৌরী নাম রাখাটা সত্যিই সার্থক। সাঁকো পেরিয়ে কালোদীঘির ধারে এসে ধপাস্ করে ঘাসের ওপর বসে পড়ল টিয়া। অনেকটা পথ দৌড়িয়েছে। ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত। বুক ওঠানামা করছে। মিঠোল আঙুলে শাড়ি থেকে চোরকাঁটা তুলতে তুলতে সর্-সর্ আওয়াজ শুনে মুখ তুলে দেখল, শুকনো পাতার ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটে গিয়ে একটা ধুমসো কাঠবেড়ালি তেঁতুলগাছটার গুঁড়ি বেয়ে তরতর করে কিছুটা উঠে থামল। ঘাড় ফিরিয়ে টিয়াকে একবার দেখল। 'দূ-রও!' বলে টিয়া ভেংচি কাটতেই কাঠবেড়ালিটা তীরের মতো ছুটে ওপরে উঠে কোথায় হারিয়ে গেল। টিয়ার অনাবৃত দুটো পায়ে আলতা লেপ্টে গেছে। জায়গাটা বেশ নির্জন। গাছে-গাছে পাখিদের আলাপ চলছে। চিক্-চিক্ চিড়িক-চিড়িক সবুজ পাতার আড়ালে একটা বসন্তগৌরী পাখি বলে চলেছে, 'কু-কি-অ।' টিয়ার কাছে মনে হয়, পাখিটা যেন বলছে, 'খুকি হ।' অনেক-দিন বসন্তগৌরী পাখি পোষার ইচ্ছে টিয়ার। বড়ো সুন্দর পাখি বসন্তগৌরী। সারাগায়ে হলুদ আর কালোর ছোপ। চোখ দুটো লাল। লাল ঠোঁট। যেন পান খেয়ে মুখ রাঙিয়েছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে জাফরিকাটা জাফরান আলো ছড়িয়ে পড়েছে ঘাসের ওপর, জলে, টিয়ার গায়। দীঘির জল কাক-চক্ষু কালো। পুকুরের কোণটায় অনেক জলপদ্ম। ফুলকাটা গোল পদ্মপাতা ছড়িয়ে আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। একটা বড়ো পাতার ওপর খড়কুটোর একটা বাসা, জলাকাপাখির বাসা। হঠাৎ খেয়াল হল, টিয়ার সামনে দিয়ে একটা প্রজাপতি ঘুর-ঘুর করছে। 'ওমা কী সুন্দর প্রজাপতি!' টিয়া স্বগতোক্তি করে প্রজাপতিটাকে ধরতে চেষ্টা করল। পারছে না। প্রজাপতিটা সুস্থির হয়ে কোথাও বসছে না। প্রজাপতি নাকি বিয়ের দেবতা। টিয়া ঝুনুদির বিয়ের কার্ডের ওপরে দেখেছে লেখা আছে প্রজাপতয়ে নমঃ। প্রজাপতিটা ধরার জন্য টিয়ার রোখ চেপে গেল। উড়ে-উড়ে জলের ওপর একটা পদ্মকলির ওপর গিয়ে বসল প্রজাপতিটা। বাতাসে সেটার পাখ্না দুটো তিরতির করে নড়ছে। জলে তার ছায়া পড়েছে। ঢালু পাড় বেয়ে নেমে গেছে দীঘল ঘাস। টিয়া মুঠো করে এক-গোছা ঘাস ধরে সন্তর্পণে জলে নামল। এঁটেল মাটি। পা হড়কে যায়। একটা মাটির ঢেলা ভেঙে পুকুরে গড়িয়ে পড়ল। শব্দ উঠল ঝুপ্। জলে দোলা লাগল। পদ্মকলি দুলছে। প্রজাপতিটা উড়ল। একটু ওপরে উড়ে উড়ে কলিটার ওপর আবার বসল। ঢেউটা গোল হয়ে ছড়াতে ছড়াতে এক সময় মিলিয়ে গেল। টিয়া শাড়ি গুটিয়েছে অনেকটা। হাঁটুর কাছে জল ছুঁই-ছুঁই করছে। একটু বুঝি-বা ছুঁয়েছেও। আর একটু এগোলেই প্রজাপতিটা নাগাল পাওয়া যায়। আঙুল দুই-তিন দূর। প্রজাপতিটা কিন্তু আশ্চর্য শান্ত হয়ে বসে আছে। আর একটু—আর একটু—এই নাগাল পেল বলে। পট্-পট্ করে ঘাস ছিঁড়ে ঝপাং করে জলে পড়ে গেল টিয়া। প্রজাপতিটা উড়ে পালাল।

পদ্মপাতার ছোট্ট খড়ের বাসা থেকে ফড়ুত করে একটা জানাকাপাখি বেরিয়ে উড়তে উড়তে গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল। সরু-সরু ঠ্যাং ফেলে বিদ্যুৎগতিতে জলপোকাগুলো দূরে পালাল। চি-চি চীৎকার জুড়ে গাছ থেকে এক ঝাঁক পাখি উড়ল বিশৃংখল-ভাবে।

আচমকা ছুতভাঁসির শব্দে ফিরে তাকায় টিয়া। মণিজেঠার ছেলে লাটু। শহরের কলেজে পড়ে। পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসেছে। টিয়ার থেকে বছর তিনেকের বড়ো। রোগাটে চেহারা গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে সবে। মা ওকে দাদা বলতে বলে। দাদা না গাধা। টিয়া ওকে একদম সহ্য করতে পারে না। ভীষণ হ্যাংলা। মেয়েদের পিছনে খালি ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ায়।

টিয়া কোমরজলে দাঁড়িয়ে। শাড়ি-ব্লাউজ আঁটোসাঁটো হয়ে শরীরের খাঁজে-খাঁজে সেঁটে গেছে। চুল বেয়ে টপ্-টপ্ করে জল ঝরছে। জুলজুল চোখে লাটুকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে পিত্তি জ্বলে উঠল। ফুঁসে উঠে বলল, 'অসভ্য কোথাকার।'

লাটু ভালো মানুষের মতো মুখ করে বলল, 'বারে আমি কী করলাম। আয়, হাত ধর, তুলে নিচ্ছি।' বলে লাটু এক হাতে একটা গাছের শিকড় ধরে ঝুঁকে অন্যহাতটা টিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিল।

ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে টিয়া একটা হাত বাড়িয়ে দিল। টিয়ার মতো ধুমসো মেয়েকে টেনে তুলতে লাটু একেবারে গলদঘর্ম। লাটুর হাতের চাপে টিয়ার আঙুলের আংটিটা বুঝি মাংস কেটে বসে যাচ্ছে। শেষে এক হ্যাঁচকা টানে ওকে তুলে ফেলল লাটু।

'উঃ! গুণ্ডা।' আঙুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলে টিয়া।

'যা বা-ব্বা, ভালো করতে গিয়ে উল্টো ফল!' লাটু ভালো মানুষের মতো বলে ওঠে।

'আঁ।' টিয়া জিব দেখিয়ে ছুট দিল।

লাটু পিছন পিছন ডাকতে লাগল, 'টিয়া শোন, টিয়া—।'

মেয়েকে এলোচুলে আর ভিজা কাপড়ে দেখে টিয়ার মা বকে একশেষ করল। চড়-চাপড়ও পড়ত। বরাত জোর টিয়ার ঠাকুমা এসে পড়ায় সে যাত্রায় রক্ষে পেল টিয়া। 'থাক বউমা, ষষ্ঠীর দিন আর মেয়েটাকে বকাঝকা কইরো না। আর দুইদিন পরেই তো পরের বাড়ি চইল্যা যাইব।' বলে বুড়ি একটা বড়ো নিশ্বাস ফেলল।

টিয়া তখনো ভিজে সপসপে কাপড়ে ঠায় উঠোনে দাঁড়িয়ে। মার তাড়া খেয়ে কাপড় ছাড়তে চলে গেল। 'দুদিন পরেই তো পরের বাড়ি যাইব'—কথাটার অর্থ টিয়া তখনো বোঝেনি। বুঝল, দুপুরে। বাবা আর মার আলোচনা থেকে। তন্দ্রার মতো এসেছিল। মা-বাবার কথাবার্তায় তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল।

'পাত্রপক্ষ নাকি কার্তিকেই কাজ সারতে ব্যগ্র।' মা বললেন।

বাবা জবাব দিল, 'দীপু তো তাই লিখেছে। আমার ইচ্ছে, অগ্রহায়ণে কাজ হোক। পাসপোর্ট করতেও সময় লাগবে তাছাড়া খোকনটাকে টিয়া বড়ো ভালো-বাসে। প্রতিবারেই ঘটা করে ফোঁটা দেয়। আর কবে আসা হয় না হয়, ভাইফোঁটা পার করেই যাক। আমি দীপুকে অগ্রহায়ণে বিয়ের তারিখ ঠিক করতে লিখে দিলাম।'

বাবার কথা শুনে টিয়ার বুকটা খুশিতে শিরশির করে উঠল। চোখের পাতা কেঁপে উঠল; বুঝিবা শরীরও। পাশ ফিরে শুলো ও।

'বেশি দেরি করা ঠিক নয়। এমন ছেলে হাতছাড়া হলে আর পাওয়া যাবে না। বয়স অল্প, দেখতে শুনতে ভালো। ইঞ্জিনীয়ার। ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করবে।' মা মুখে পান গুঁজতে গুঁজতে থেমে থেমে কথা-গুলো বলল।

'পাসপোর্টের জন্য তো লোক লাগিয়েছি। দেখি, পেলে হয়।' একটু চিন্তিতস্বরে কথাটা বলল টিয়ার বাবা।

'তুমি ভালো লোক লাগাও। টাকা দিয়ে হলেও, করাও।' মা ব্যগ্রকণ্ঠে বলে উঠল।

'হুঁ।' বলে বাবা চুপ করে গেল। বোধহয় চোখ বুজে কিছু ভাবছিল। মা ঘুমিয়ে পড়েছেন।

জানালা দিয়ে খোলা আকাশটা দেখা যাচ্ছিল। রোদের তেজ পড়ে আসছে। আলোর রঙ ফিকে কমলা দেখাচ্ছে। মৃদু বাতাসে বাঁশপাতাগুলো থির-থির করে কাঁপছে। বাঁশঝোপ থেকে একটা গিরীন-পাখি ফুড়ুৎ করে উড়ে ডানা চালনা করতে করতে হিজলগাছটার ওপারে কোথায় মিলিয়ে গেল।

বাইরের দিকে চেয়ে থাকলেও টিয়ার মন তখন সুখের জাল বুনে চলছিল। 'কী মজা হবে! কলকাতায় থাকা যাবে। ওকে একদিন বলবে, চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে। ভাববে, ছেলেমানুষ। ভাবুক।' দাদার মুখে চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, হাওড়া পুল প্রভৃতির নাম শুনে শুনে কতদিন থেকে যে সেগুলো দেখার ইচ্ছে টিয়ার।

রমলাবৌদির মতো সেও বেড-টী নিয়ে ওকে ফিস-ফিস করে ডাকবে, এই ওঠো। বেড-টী কী টিয়া ঠিক জানে না। টুনি-মাসির কাছে শুনেছে বড়ো বড়ো বাড়িতে নাকি বেড-টি খায়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মুখ-হাত না ধুয়েই খায়। টিয়া চা করতে পারে। কিন্তু বেড-টী করতে পারে না। টিয়া ভাবে, সেটা শিখে নেবে। কফি তৈরী করাটাও শিখবে। রমলাবৌদিরা নাকি কফিও খায়। রমলাবৌদিকে টিয়া দেখেনি। নিতুনদাকে দেখেছে। টুনিমাসির ছেলে নিতুনদা। ইঞ্জিনীয়ার। কলকাতায় যোধপুর না কী পার্কের কাছে থাকে। টুনিমাসি কলকাতা গিয়েছিল বছর দুই আগে ছেলের কাছে। গাঁয়ে ফিরে ছেলের বৌ-এর সে কী সুখ্যাতি। টুনিমাসির মুখে শুনে শুনে রমলাবৌদির পুরো চেহারাটা যেন টিয়ার মুখস্থ হয়ে গেছে। রমলাবৌদি নাকি ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে। টিয়া রবীন্দ্র-সংগীত জানে না। এ গাঁয়ে কেউ জানে না। বিয়ের পর ওকে বলে রবীন্দ্রসংগীতটাও শিখে নেবে। নিতুনদার মতো ও-ওতো ইঞ্জিনীয়ার। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এলে টাই খুলে দিতে দিতে একদিন জিব বের করে ভ্যাংচি কেটে দেবে। ও যদি ধরে ফেলে, বলব আঃ ছাড়ো! যদি না ছাড়ে মিথ্যে করে বলবে, এ-ই মা—। চমকে তখন ছেড়ে দেবে নিশ্চয়ই। টিয়া খিল-খিল করে হাসতে হাসতে চলে যাবে রান্নাঘরে। ওর জন্য চা-জলখাবার নিয়ে এসে যদি দেখে গম্ভীর হয়ে বসে আছে, বলবে, এই রাগ করেছো, লক্ষ্মীটি—। ও তখন হয়ত কাছে টেনে নিয়ে....। টিয়া আর ভাবতে পারে না। এক অভাবিত সুখের আবর্তে ওর হৃদয় মোচড় দিয়ে ওঠে।

সূর্যের আলো বাঁশঝাড়ের মাথায় পৌঁছে গেছে। ওই দূরে, ক্ষেতে একটা ছেলে ঘুড়ি ওড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে। টিয়া চোখ বুজল। বোধহয় সুখের ভাবনাগুলো রোমন্থন করতে।

তখনও ভোর হয়নি ভালো করে। আলোর আভা সবে দেখা দিয়েছে। টিয়া দরজা খুলে বাইরে এলো। কাপড়টা ঠিকঠাক করে পরে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিল। একটা প্যাঁচ দিয়ে আলুথালু চুলের গোছা খোঁপা বেঁধে নিল। সাজি নিয়ে তুলসীতলায় এসে দেখল, শেফালি গাছটা ফুলে ফুলে সাদা হয়ে গেছে। একটু তাকিয়ে গাছের নিচে এসে শেফালি গাছটা জোরে নাড়া দিল। টুপটাপ টুপটাপ করে ফুল পড়ে পড়ে উঠোনটা ফুলে ভরে গেল। সঙ্গে গায়ে জল ঝরেছে অনেক। টিয়া আঁচলটা খুলে গাটা মুছে নেয়। তারপর ফুল কুড়িয়ে, দুর্বা তুলে সাজিটা দাওয়ায় রাখল। রান্নাঘর থেকে ফুলকাটা পেতলের গ্লাস এনে দুর্বার ওপর জমে-থাকা শিশিরের গায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে শিশির তুলে গ্লাসে রাখল। ভাইফোঁটায় শিশিরও লাগে। শিশির তুলতে তুলতে টিয়া ভাবছিল, খোকনকে এই বোধহয় শেষবারের মতো ভাইফোঁটা দেওয়া। বিয়ে হয়ে গেলে আর এখানে আসা হবে না। খোকন কবে বড়ো

হবে, কবে কলকাতা যাবে—সেই তখন ভাইফোঁটা দিতে পারবে। খোকন দিদির বড়ো বাধ্য। ও যখন বড়ো বড়ো দুটো মায়া মাখানো চোখ মেলে টিয়াকে বলে, দিদি, আমায় একটা ঘুড়ি কিনে দিবি। টিয়া না দিয়ে পারে না। ঘটের মধ্যে বোধহয় অনেক পয়সা জমেছে। কলকাতা যাওয়ার আগে টিয়া খোকনকে সব দিয়ে যাবে।

স্নান সেরে কোঁচা ঝুলিয়ে ধুতি পরে পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে খোকন এসে চুপটি করে পিঁড়িতে বসল। টিয়া ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাতে জ্বালাতে বলে, 'এই তো হয়ে গেছে। একটু বোস লক্ষ্মী ভাইটি।'

বাইরে মা হেঁকে বললেন, 'টিয়া, তাড়াতাড়ি ফোঁটা দিয়ে একবার রান্নাঘরে আয় মা।' এবারে গলার স্বর নামিয়ে যেন নিজের মনে মনেই বললে, 'উনি সেই সাতসকালে বেরিয়েছেন, এখনও ফিরলেন না। কী যে হলো।'

টিয়া জবাব দিল, 'এই হয়ে গেছে মা।'

খোকনের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে একটু তাকাল টিয়া। ধুতি-পাঞ্জাবিতে খোকনকে ভারি ভালো লাগে ওর। বছরে ওই একবারই পরে। ভাইফোঁটা হয়ে গেলেই আবার বাক্সে তুলে রাখবে।

'যমুনা দেয় যমেরে ফোঁটা, আমি দেই আমার ভাইয়েরে ফোঁটা'—বলে খোকনের কপালে ফোঁটা দিতে গিয়ে টিয়ার দু চোখ জলে ভরে এলো। কান্নায় ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। বাকি কথাগুলো স্পষ্ট করে বলতে পারছে না। একটু সামলে নিয়ে বাকি কথা শেষ করল।

'কইগো, এক গ্লাস জল দাও দেখি।' বাইরে টিয়ার বাবার সাড়া পাওয়া গেল। খোকন একটা মিষ্টি হাতে নিয়ে ছুটে বাবার কাছে চলে গেল। ওদিকে একটু গোছগাছ করে রেখে টিয়াও ধীরে ধীরে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। দেখল, মাও দাঁড়িয়ে, ঠাকুমাও।

এক নিশ্বাসে জল খেয়ে জলের গ্লাসটা মার হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে টিয়ার বাবা বললে, না কোনো সম্ভাবনা নেই। পাসপোর্ট পাওয়া যাবে না। এদিকে দিনও তো বেশি নেই। ওদিকের কেনাকাটা দীপুই করে রেখেছে, সেজন্যে ভাবনা নেই। সময় মতো পৌঁছুতে হবে তো। পাত্রপক্ষ আর দিন পিছাতে নারাজ। কী যে করি।' বলে টিয়ার বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মা ধীরে ধীরে বলল, 'ও-পাড়ার অবনী বলছিল, বর্ডার দিয়ে অনেকেই না কি আজকাল যাচ্ছে। ভয়ের কিছু নেই। রাজী থাকলে সে নাকি লোক ধরে দিতে পারে।'

'হুঁ! তাছাড়া তো আর কোনোও পথও দেখছি না।' বাবার গলা গম্ভীর। মুখ চিন্তান্বিত।

'কোন্ অভাইগ্যা মিনসা যে দ্যাশটারে ভাগ করছিল, তারে পাইলে অখন চিবাইয়া খাই।' বলে ঠাকুমা গজগজ করতে করতে ঠাকুরঘরে গিয়ে ঢুকল।

টিয়ার হৃদয় তখন আশা-নিরাশার আবর্তে খাবি খাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত অবনীর সাহায্যই নিতে হল। ট্রেনে এসেছে আথাউড়া। ওরা এখন চলেছে রিকসায়। স্টেশন থেকে বর্ডার অনেকটা দূরে। রিকসা ছাড়া অন্য কোনো যান নেই। অবনী যাকে ধরে দিয়েছিল, সে রয়েছে আগের রিকসায়।

রিকসা ছুটে চলেছে। দু'পাশে শুধু ক্ষেত আর ক্ষেত। সূর্য ডুবে গেছে। আলোর আভাটা যাই-যাই করছে। পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে বাসায় ফিরে চলেছে। আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে এলো। উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে। শীত-শীত করছে। টিয়া ব্যাগ থেকে শালটা বের করে গায় জড়িয়ে নিল। ঠাকুমার শাল। অনেকদিনের পুরনো শাল। কিন্তু এখনো ভালো আছে। পথে শীতে কষ্ট পাবে বলে ঠাকুমা শালটা টিয়াকে দিয়ে বলেছে, দিদি তোর বিয়াটা দেখার বড়ো সাধ ছিল। কিন্তু......। বলে বুড়ি একবার চোখ মুছল কাপড়ের খুঁটে। তারপর বলল, এই শালটা দিলাম, তোর বিয়ার যৌতুক। বলে বুড়ি হাসতে চেষ্টা করল কিন্তু তা হাসি না কান্না বোঝা গেল না। খোকনটাও পিছু-পিছু অনেকদূর এসেছিল, পুঁটি জোর করে নিয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে আর পিছু তাকাতে তাকাতে ও ফিরে গেছে। পুঁটি কোনো কথা বলতে পারে নি। শুধু নীরবে টিয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা এসেছিল। ফেরার আগে শুধু একবার বলেছিল, টিয়া যাই।

টিয়া কোনোমতে বলল, মার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে চিঠি দিস।

টিয়াদের রিকসা তখন পাকা সড়ক ছেড়ে মাটির এবড়ো-খেবড়ো পথে ঝাঁকুনি দিতে দিতে চলেছে। মাঠে মাঠে কুয়াসা নেমেছে। কুয়াসায় পথ বেশিদূর দেখা যায় না। কোথাও মানুষের সাড়া নেই। শুধু ঝিঁঝির একটানা ডাক শোনা যাচ্ছে। অচেনা-অজানা জায়গা। টিয়ার কেমন জানি ভয়-ভয় করছিল।

রিকসা এসে থামল একটা কুঁড়ের সামনে। কুঁড়েবাড়িটা ঝোপঝাড়ে ঢাকা, হঠাৎ দেখা যায় না। সামনের রিকসা থেকে লোকটা নেমে হাঁক দিল, 'মতির মা, ও মতির মা।'

একটু বাদে কুপি হাতে এক মুসলমান বউ এগিয়ে এলো। তার পরনে সবুজ শাড়ি। হাতে রুপার দুইগাছ করে চুড়ি। গায়ে চাদর একটা আছে, তবে তার যে কী রং বোঝা দুরূহ। কাছে এসে বলল, 'আরে রজব মিয়া যে!'

বোঝা গেল টিয়াদের যে নিয়ে এসেছে তার নাম রজব। সে বলল, 'হ, লোক আছে। ঘরে নিয়া বসাও। রাইতে আসুম। ন'টায়।' বলে রজব মতির মার হাতে একটা দশ টাকার নোট দিতে দিতে বলে, 'এগো মুড়ি-টুড়ি আইন্যা দিও।'

লোকটি এবারে টিয়ার বাবার সামনে এসে বলল, 'যান ঘিরে গিয়া বসেন। আমি গয়নাগুলি পাঠানোর ব্যবস্থা কইরা আসি। দ্যান ওগুলো।'

বাবা একবার টিয়ার মুখের দিকে তাকাল। তারপর লোকটার হাতে গয়নার পুঁটলিটা দিতে দিতে বলল, 'দেখবেন যেন—'।

'ভয় নাই, ওপারে গিয়াই পাইবেন। গয়না লইয়া লোক আগেই ওইখানে দাঁড়াইয়া থাকব।' বলতে বলতে টিয়ার বাবার হাত থেকে প্রায় একরকম ছিনিয়েই পুঁটলিটা হাতে নেয় সে। 'মতি মা এগো ঘরে নিয়া বসাও। আমি ন'টার মধ্যে ফির্যা আমু।' বলে সে দ্রুত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মতিরমা বলল, 'আইয়েন'। যেতে যেতে আবার বলল, 'রজবটার সঙ্গে আইয়া ভালো করেন নাই।'

বাবা চমকে মতির মার দিকে তাকাল। 'কেন?'

মতিরমা যেতে যেতে বলল, 'না, এমনিই কইছিলাম।' মতির মা যেন কী একটা চেপে গেল।

ঘরে এনে বসাল ওদের মতির মা। ঘরে আসবাব সামান্যই। হাঁড়িকুড়িই বেশি। দারিদ্র্য তাতেই বোঝা যায়। তবে ঘরটা বেশ পরিষ্কার, ছিমছাম।

মতিরমা টিয়াদের বসিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু বাদে ডালাভরা মুড়ি আর পাটালি নিয়ে এলো। বলল, 'খান ঘরে আর কিছু নাই, দিতে পারলাম না।' তারপর টিয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'খাও, মা।'

মতিরমার কথায় এমন একটা স্নেহের সুর ছিল যা শুনে টিয়ার ভয় অনেকটা দূর হল। খিদেও পেয়েছিল খুব। সেই কখন খেয়েছে। টিয়া একটু পাটালি ভেঙে নিল। মুড়ি তুলে নিল মুঠো ভরে।

মতিরমা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'মাইয়ারে লইয়া ওইপারে যাইতাছেন। বিয়া দিবেন বুঝি!'

টিয়ার বাবা মাথা নাড়ল, হাঁ।

মতিরমা বলল, 'আচ্ছা, মাইয়া না য্যান সোনার পিতিমে। আপনারা এট্টু বসেন, আমি ভাতটা ফুটাইয়া আসি।' বলে মতির মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ক্রমে ক্রমে রাত বাড়ল। বাইরে কুয়াসা আরও ঘন হয়েছে। রজবের আসার সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। টিয়ার বাবার মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া গাঢ় হল। টিয়ার মুখ শুকনো। ভয়ে ভিতরটা গুড় গুড় করছে।

মতিরমা ঘরে ঢুকে বলল, 'আসে নাই তো, ফিরব না জানতাম। তাই কইছিলাম

রজবের সংগে আইস্যা ভালো করেন নাই।' রজবটা যে কত লোকের সর্বনাশ করছে হের ঠিক নাই।' একটু চুপ করে থেকে সে বলল, 'এখন রওনা না হইলে তো যাইতে পারবেন না।'

মতির মার কথায় টিয়ার বাবা মাথা তুলে তাকাল। 'কোন পথে কীভাবে যেতে হবে আমরা তো কিছুই জানি না মা। গয়নার কথা আর ভাবছিনে—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, টিয়ার মার বড়ো সাধের গয়না সব টিয়ার বিয়ার জন্য একটা একটা করে গড়িয়েছে। বলে যা হবার তাতো হয়েছেই। এখন ভালোয় ভালোয় বর্ডার পার হতে পারলেই হয়। চার হাত এক করতে পারলে বাঁচি।'

মতিরমা বলল, 'ওই সামনের ক্ষেতটা পার হইলেই একটা মাটির রাস্তা পাইবেন। ওই পথটা ধইরা উত্তরমুখী কিছুটা গেলেই একটা নালা দেখবেন। নালার ওপর বাঁশের সাঁকো আছে। সাঁকোটা পার হলেই হিন্দুস্থান। তবে এট্টু দেইখ্যা-শুইন্যা যাইয়েন। মিলিটারি আছে।

টিয়ার বাবা উঠতে উঠতে বলল, 'তা হলে আর দেরী করব না।'

টিয়াও উঠল পিছু-পিছু।

মতিরমা কুপি হাতে কিছুটা পথ এলো ওদের সংগে। তারপর বিদায় নিয়ে বলল, 'আরও যাওনের ইচ্ছা আছিল, ঘর খালি পইড়্যা রইছে। আমি যাই।'

টিয়া মুখ তুলে মতিরমার দিকে তাকাল। তার দু'চোখ দিয়ে এই অশিক্ষিত সাধারণ মুসলমান বউটির প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা উপচে পড়ছিল। যেন মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে এমনিভাবে বলল, 'যাই'।

মতিরমা টিয়ার চিবুক ছুঁয়ে বলল, 'আইও মা। সোয়ামী পুত নিয়া সুখী হও।'

ক্ষেতের ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে টিয়া বার বার হোঁচট খাচ্ছিল। পায়ে পায়ে শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছিল। ক্ষেত ভর্তি বড়ো বড়ো মাটির ঢেলা। টিয়ার নিশ্বাস ঘন হয়ে পড়ছে। শীতের রাতেও ওর কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিয়েছে। পিছন ফিরে তাকাল টিয়া। দেখল শুধুই কুয়াসা। মতির মার কুপির আলো আর দেখা যায় না।

এতক্ষণে ওরা রাস্তায় পড়ল। টিয়ার বাবা একটু দাঁড়াল। কোন দিকে এগুবে ঠিক করে নিয়ে বলল, 'পা চালিয়ে চল্। চারদিকে নজর রাখিস।'

রাস্তা ধরে হন হন করে হাঁটছে টিয়া আর টিয়ার বাবা। হাঁটার থপ্ থপ্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। কুয়াসা এত ঘন হয়ে পড়েছে যে, বেশিদূরে দেখা যায় না। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ওরা হাঁটছিল। টিয়ার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। হঠাৎ একটু দূরেই একটা সাঁকো নজরে এলো ওদের। টিয়ার বাবা দাঁড়িয়ে পড়ল। সংগে সংগে টিয়াও। মতির মার কথানুযায়ী সাঁকোর অবস্থানটা বোধ হয় একবার মিলিয়ে নিল টিয়ার বাবা। তারপর নিশ্চিত হল, ওই সাঁকোটাই খণ্ডিত বাংলার যোগসেতু। টিয়ার বাবা ফিসফিসিয়ে বলল, 'ওই সাঁকো পেরুলেই ইন্ডিয়া।'

সাঁকোর কাছে এলো দুজনে। দাঁড়াল একটু। রাস্তার ঢালে নেমে কয়েক হাত গেলেই সাঁকোটা। সাঁকো মানে, নালার ওপর বাঁশের ক্যাচা করে একটা সুপারি গাছ ফেলে দিয়েছে। নালায় জল আছে কি নেই বোঝা যায় না।

অনেক ভেবে ভেবেও এপার-ওপারের তফাৎটা বুঝে উঠতে পারছিল না টিয়া। সাঁকোর এপার ওপারের বাড়িঘর, গাছপালা, মাটি সবই তো এক। তবু সাঁকোর এপার এক দেশ, ওপার আর এক দেশ। ভাবতেও টিয়ার অবাক লাগে। আর এই ছোট্ট সাঁকোটা পেরোতেই এত হাঙ্গামা। টিয়া ভাবছিল, আর কয়েক মিনিট বাদেই তো সে ইন্ডিয়ায় পৌঁছাবে। শাঁখ বাজবে। টিয়া শুনেছে নাকি ওদের দেশের মতো বাজনা বাজিয়ে বিয়ে হয় না। শাঁখ বাজিয়ে হয়। ছোট্ট টিয়ার সেদিনের কথাটা 'মা দুর্গা আমার যেন সুন্দর বর'—বুঝি মা দুর্গা ভোলেন নি। টিয়ার অভিলাষ পূর্ণ হতে চলেছে। আর তো মাঝে একটা দিন। ভাবতে ভাবতে টিয়ার মনে এক অনাবিল খুশির জোয়ার বইতে থাকে।

টিয়ার একটা হাত ধরে রাস্তার ঢালে পা বাড়িয়ে দিয়ে টিয়ার বাবা বলল, 'আয়।'

সেই মুহূর্তে এক ঝলক জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল ওদের মুখে। সংগে সংগে হুংকার এলো—'হলট্।'

টিয়ার বুকটা হঠাৎ ধড়াস করে উঠল। টিয়ার বাবার হাত কেঁপে উঠল। শিথিল হয়ে গেল তার মুঠি।

সাঁকোটা বুঝি আরপার হওয়া গেল না।

সাধারণতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রীয় সম্মান

এ বছর সাধারণতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি ১১৬ জন ব্যক্তিকে বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন প্রশাসক, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিক, সমাজসেবী এবং ক্রীড়াবিদ। রাষ্ট্রপতি সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেশের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ খেতাব পদ্মবিভূষণে ভূষিত করেছেন। পদ্মবিভূষণ খেতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন—স্থলবাহিনীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ জেনারেল পি পি কুমারমঙ্গলম, ওয়েস্টার্ন কম্যাণ্ডের প্রাক্তন জি ও সি ইন চীফ জেনারেল হরবকস সিং, রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রাক্তন ডিরেক্টার জেনারেল শ্রী বি আর সেন, কলকাতার ইণ্ডিয়া স্টীমশিপ কোম্পানির চেয়ারম্যান শ্রী এ রামস্বামী মুদালিয়ার, শ্রী এ এল দিয়াস, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ডঃ তারা চাঁদ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন সুরঞ্জন দাশ। টেস্ট পাইলট সুরঞ্জন দাশ কয়েকদিন আগে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

এ বছর সর্বোচ্চ খেতাব ভারতরত্ন কেউই পাননি। এই নিয়ে চার বছর ভারতরত্ন খেতাবে কাউকে ভূষিত করা হলো না।

পদ্মভূষণে সম্মানিত ব্যক্তিরা—আহমদ জান থিরাকাওয়া, তবলিয়া; ডঃ অমিয় চক্রবর্তী, সাহিত্যিক; ডঃ বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, অর্থনীতিবিদ; শ্রীবুদ্ধদেব বসু, ঔপন্যাসিক; শ্রীশম্ভু মিত্র, নাট্যকার; শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক; শ্রীরতনলাল যোশী, সাংবাদিক; শ্রীমতী কমলা, ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পী; শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদেকর, শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী; শ্রীরামকিঙ্কর বেইজ, ভাস্কর, শান্তিনিকেতন; ডঃ এম এস কৃষ্ণান, ভূতত্ত্ববিদ; ডঃ পি এন ওয়াহি, ডিরেক্টর অফ দি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ; শ্রী জি এ নরসিংহ রাও, সেণ্ট্রাল ওয়াটার অ্যাণ্ড পাওয়ার কমিশনের চেয়ারম্যান; ডঃ ফেরামাইয়া, কৃষি-বিজ্ঞানী।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন সুরঞ্জন দাশ

পদ্মশ্রী খেতাবে সম্মানিত হয়েছেন—আবদুল হালিম জাফর খাঁ, সেতারশিল্পী; ডঃ অজিতকুমার বসু, ডিরেক্টর প্রফেসর, সার্জারী বিভাগ, এস এস কে এম হাসপাতাল, কলকাতা; শ্রীবিষেণসিং বেদী, টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়; শ্রীঋত্বিক ঘটক, চলচ্চিত্র-পরিচালক; শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক, সঙ্গীতশিল্পী; রাজেন্দ্রকুমার, চলচ্চিত্র অভিনেতা; শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সামন্ত, সমাজসেবী; শ্রী পি লাল, কবি; শ্রীসিকান্দার আলি ওয়াজদ, উর্দু কবি; শ্রীসোহনলাল দ্বিবেদী, হিন্দি কবি; শ্রীসুকুমার বসু, কিউরেটর অফ পেইন্টিংস, রাষ্ট্রপতি ভবন, নয়াদিল্লী; ডঃ সুনীলকুমার ভট্টাচার্য, চীফ হাইড্রলিক ইঞ্জিনীয়র ও ডিরেক্টর, ইনস্টিট্যুট অফ পোর্ট ম্যানেজমেণ্ট, পোর্ট কমিশনার্স, কলকাতা; শ্রীসৈয়দ মহম্মদ মৈনুল হক, ক্রীড়াবিদ; শ্রীবেদান্তম সত্যনারায়ণ শর্মা, নৃত্যশিল্পী; শ্রীটি আর মহালিঙ্গম, বংশীবাদক।

বুদ্ধদেব বসু

ডঃ অমিয় চক্রবর্তী

এ কে বসু

বি আর সেন

পঙ্কজকুমার মল্লিক

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
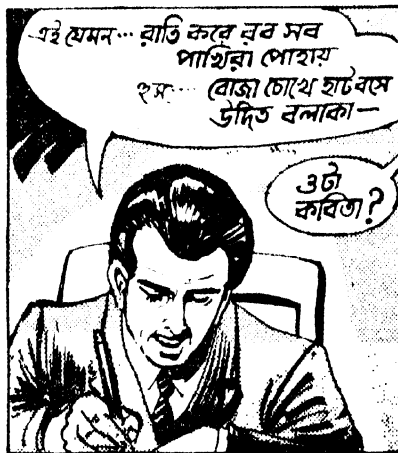
বিশেষ বিশেষ শ্রোতৃবর্গের উদ্দেশে প্রচারিত বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলি নিয়ে আলোচনা করছি। এবার শিশুদের উদ্দেশে প্রচারিত অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা। অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে চিলড্রেন্স প্রোগ্রাম, বাংলায় শিশুমহল।

এর আগে শিশুদের চেয়ে বড়ো—বিদ্যার্থীদের অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করেছি। অর্থাৎ স্কুল ব্রডকাস্ট নিয়ে।

স্কুল ব্রডকাস্ট নিয়ে আলোচনার সময় বলেছি যে, ১৯৩৮ সালের শেষ দিকে মাদ্রাজ, কলকাতা, দিল্লী ও বোম্বাইয়ে নিয়মিত স্কুল ব্রডকাস্ট শুরু হয়। তখন এই অনুষ্ঠানগুলি ছিল মিড্‌ল্ ও হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। এখন এগুলি প্রচারিত হয় সাধারণত হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য।

১৯৩৮ সালের অনেক আগেই—১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে মাদ্রাজ কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত মাদ্রাজ বেতার কেন্দ্র থেকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার সুরু হয়েছিল। এই অনুষ্ঠান প্রাইমারী ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের জন্য তামিল ভাষায় প্রচারিত হত। সুতরাং মাদ্রাজ কেন্দ্রের এই অনুষ্ঠানকেই শিশুদের উদ্দেশে প্রচারিত প্রথম অনুষ্ঠান বলা চলে। অর্থাৎ 'আর্লিয়েস্ট চিলড্রেন্স প্রোগ্রাম'।

পরে সমস্ত কেন্দ্র থেকেই রবিবার সকালে শিশুদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার শুধু হয়। এই অনুষ্ঠান এত জনপ্রিয় যে, স্বাধীনতা লাভের পর যখন দেশের বিভিন্ন অংশে একের পর এক বেতার কেন্দ্র খোলা হতে লাগল, তখন প্রতিটি কেন্দ্রে শিশুদের অনুষ্ঠান রইল অবধারিত।

সাধারণত এই অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় ভাইয়া বা দিদিদের দ্বারা (যেমন কলকাতা কেন্দ্রে ইন্দিরাদি)। কোনো কোনো জায়গায় পরিচালক বা পরিচালিকার সঙ্গে স্টক ক্যারাকটার হিসাবে দু-তিন জন শিশুও থাকে। (কলকাতা কেন্দ্রে এই স্টক ক্যারাকটার নেই)। স্টক ক্যারাকটার মানে বাঁধা চরিত্র, মানে এই চরিত্রগুলি প্রতিটি অনুষ্ঠানে একই রূপে অংশ গ্রহণ করে (যেমন কলকাতা কেন্দ্রের কৃষিকথার আসরে মোড়ল, মোহনলাল, সদাশিব, কাশীনাথ প্রভৃতি)। স্টক ক্যারাকটাররা অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে অনুষ্ঠানকে সজীব করে তুলতে পরিচালক বা পরিচালিকাকে সাহায্য করে। এই স্টক ক্যারাকটারদের লক্ষ্য করেই শ্রোতাদের উদ্দেশে সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়, সরাসরি শ্রোতাদের সম্বোধন করে নয়।

শিশুদের অনুষ্ঠানে এই রকম সব স্টক ক্যারাকটার থাকায় বেশ মজা হয়, অনুষ্ঠানটা বেশি প্রাণবন্ত হয়। কারণ, শিশুরা সহজেই সবকিছুর অন্তর থেকে সাড়া দেয়। আনন্দে তারা চিৎকার করে ওঠে, ভয়ে তাদের মুখ শুকিয়ে যায়, দুঃখে তাদের চোখ দিয়ে জল ঝরে। তারা ভালোর জয় চায়, মন্দের শাস্তি। তারা কিছুতেই মনের ভাব গোপন করতে পারে না; মনের ভিতরে যেমন প্রতিক্রিয়া হয়, অকপটে প্রকাশ করে ফেলে। (এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা গল্প বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। বিলেতে অভিনয় শেখাতেন একজন নামকরা মহিলা। অনেক ভালো ভালো লোক তাঁর কাছে অভিনয় শিখতে আসতেন। তিনি তাঁদের বলতেন : প্রথমে তোমরা শিশুদের কাছে অভিনয় শেখো। তারপর আমার কাছে এস। আগে শিশুদের অভিব্যক্তিগুলি ভালো করে লক্ষ্য করো, তারপর সেগুলো নকল করার চেষ্টা করো। আমরা বড়োরা মনের ভাব গোপন করতে পারি। মনের ভিতরে প্রচণ্ড দুঃখ হলে, কি আনন্দ হলে, কি রাগ হলে, কি বিরক্তি এলে আমরা অনেক সময়েই তা বাইরে প্রকাশ না করে থাকতে পারি। দেখাতে পারি, যেন কিছুই হয় নি। কিন্তু শিশুরা তা পারে না। মনের ভাব তারা প্রকাশ করবেই। সুতরাং মনের কোন্ ভাবে কেমন অভিব্যক্তি, শিশুদের কাছেই তা ভালো শেখা যায়। তাই আগে শিশুদের কাছে যাও, তারপরে আমার কাছে এস।)

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত স্টেশন ডিরেকটরদের সম্মেলনে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল : শিশুদের দুটি দলে ভাগ করে একটার বদলে দুটো অনুষ্ঠান করতে হবে—একটা ছোটো শিশুদের জন্য, আর একটা বড়ো শিশুদের জন্য। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এই ছোটো শিশু আর বড়ো শিশুদের বয়ঃসীমা (মানে 'এজ গ্রুপ') ঠিক করে দেওয়া হয়নি এই সিদ্ধান্তে। তা ঠিক করার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল বেতার কেন্দ্রগুলির উপর। ফলে সারা দেশে একটা একটা সমতা আনা সম্ভব হয় নি।

অন্যান্য উন্নত দেশে কিন্তু এমনটা হয় না। সেসব দেশে জিনিসটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় এবং যা কিছু হয়, রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতেই হয়। সেইসব দেশে এই বয়ঃসীমা নির্ধারণ ও সেই অনুসারে অনুষ্ঠান প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী।

যা-ই হোক, স্টেশন ডিরেকটরদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেতারকেন্দ্রগুলি খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজে লেগে গেল এবং শিগ্‌গিরই সপ্তাহে দুটি করে শিশুদের অনুষ্ঠান প্রচার করা হতে লাগল। কিন্তু সপ্তাহে তো দুটো রবিবার হতে পারে না, তাই একটা অনুষ্ঠান—সাধারণত বড়ো শিশুদের অনুষ্ঠান—সপ্তাহের অন্যদিনে সন্ধ্যায় প্রচার করা হতে লাগল। কিন্তু সারাদিন স্কুল করে সন্ধ্যায় শিশুদের পক্ষে বেতার কেন্দ্রের স্টুডিওয় প্রোগ্রাম করতে যাওয়া বেশ কষ্টকর মনে হ'ল। তাই শ্রোতৃসংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করল এবং অনুষ্ঠান-প্রযোজকরাও হতাশ হয়ে পড়লেন। কোনো কোনো কেন্দ্রে তখন রবিবারে অনুষ্ঠান রেকর্ড করে সপ্তাহের মাঝামাঝি তা প্রচার করার ব্যবস্থা হ'ল।

প্রযোজকদের উপর এর চেয়ে বড়ো আঘাত পড়ল ১৯৫৯ সালে, যখন বেতার দপ্তর স্থির করলেন, "শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান

শিশুদের দ্বারা অনুষ্ঠান" হওয়ার দরকার নেই— মানে শিশুদের অনুষ্ঠানে শিশুরা অংশ গ্রহণ না করলেও চলবে, বড়োরাই তা চালাবেন। বেতার কর্তৃপক্ষের নীতিতে এ একটা বড়ো পরিবর্তন— এবং মৌলিক পরিবর্তন। প্রযোজকরা যাতে অভ্যস্ত ছিলেন তা বদলে গেল, এবং অনুষ্ঠানের আকর্ষণ আর আগের মতো রইল না। আগে স্টুডিওর ভিতরে অনেক বাচ্চাকাচ্চা থাকত, এখন খালি স্টুডিওর বড়োরা প্রোগ্রাম করেন, আর শিশুরা তা বাড়িতে বসে শোনে।

কিন্তু স্টুডিওর ভিতরে অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে অনুষ্ঠান শোনা আর বাড়িতে বসে শোনা এক কথা নয়। এ দুয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। বেতার কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কখনও অনুসন্ধান করেন নি—অথচ বেতার দপ্তরে লিসনার্স রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট বলে একটা বিভাগ আছে। তাঁরা একবারও চিন্তা করেন নি : বাড়িতে কতগুলি শিশু এই অনুষ্ঠান শোনে? তারা কি এ থেকে উপকৃত হয়? তাদের উদ্দেশে যা বলা হয় তা কি তারা ঠিকমতো বুঝতে পারে?

বেতার দপ্তরের ভিতরে এমন লোকও আছেন, যাঁরা আট বছরের কম বয়েসের শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করে দিতে চান। ১৯৫২ সালে আকাশবাণীর বহির্ভারতীয় অনুষ্ঠান বিভাগ "রেডিও কলিং" নামে একটি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাতে আকাশবাণীর শীর্ষস্থানের দুজন প্রবীণ ব্যক্তি —শ্রীরমেশ চন্দ্র ও শ্রীপি সি চ্যাটার্জি শিশুদের অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। শ্রীরমেশচন্দ্র শিশুদের উপযুক্ত স্ক্রিপ্ট রচনার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে এই অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর আকর্ষণের সুস্পষ্ট আভাস দিয়েছিলেন। আর শ্রীপি সি চ্যাটার্জি এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, এই অনুষ্ঠান প্রচারের কোনোই সার্থকতা নেই, কারণ অনুষ্ঠান প্রচারের আগে শিশুদের ঠিকমতো তৈরি করে রাখা হয় না, ফলে তারা ঠিকমতো সব বুঝতে পারে না। যেগুলো তারা বুঝতে পারে না সেগুলো তাদের বুঝিয়ে দেবার মতো লোকও থাকে না তাদের কাছে।

শ্রীচ্যাটার্জির একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ একটা বড়ো সমস্যা। শিশুদের অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তোলার জন্য শিশুদের সঙ্গে বাড়ির বড়ো একজনের অন্তত থাকা দরকার। প্রয়োজনমতো তিনি অনুষ্ঠানের বিষয়গুলি তাদের কাছে ব্যাখ্যা করে দেবেন।

বেতার কর্তৃপক্ষেরও উচিত এই অনুষ্ঠানকে বিদ্যার্থীদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঠিকমতো জুড়ে দেওয়া। বিদ্যার্থীদের জন্য অনুষ্ঠানটি কেবল উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? বি-বি-সি'তে বয়েস অনুসারে পাঁচ রকম স্কুল ব্রডকাস্ট আছে : প্রাইমারি—১ (৫ থেকে ৭ বছর), প্রাইমারি—২ (৭ থেকে ১১ বছর), সেকেণ্ডারি—১ (১১ থেকে ১৩ বছর), সেকেণ্ডারি—২ (১৩ থেকে ১৫ বছর) এবং সেকেণ্ডারি—৩ (১৫ বছরের উপর)।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

৪ঠা জানুয়ারী সকাল সওয়া আটটায় শ্রীধীরেন বসুর কন্ঠে নজরুলগীতি ভালো লাগল। ......শিল্পীর কন্ঠে বেশ দরদ ছিল।

৬ই জানুয়ারী সকাল ৮টায় শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরীর কন্ঠে লোকগীতি কিছুটা একঘেয়েমি সৃষ্টি করেছিল।...... খুশি হওয়া গেল না। বরং সন্ধ্যা ৫টা ৪৫ মিনিটে শ্রীসুনীল দাশগুপ্তের লোকগীতি অনেকটা আশা বহন করেছে।

৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বিচিত্রানুষ্ঠানের ছিল যাত্রা—'পরশমণি'। দু-একজন ছাড়া শিল্পীদের সকলেই মনে হয় অনভিজ্ঞ। মহলাও বোধ হয় ভালো করে দেওয়া হয়নি। একে রেডিওতে যাত্রা জমানো কঠিন, তার উপর যদি মহলা ভালো না হয় তাহলে সে যাত্রার গঙ্গাযাত্রা করা ছাড়া গতি থাকে না।

পাট ও আলুর বাজার দর জানাটা কারও কারও কাছে বিশেষ দরকারী হলেও বিচিত্রানুষ্ঠানের মধ্যে যাত্রা-থিয়েটারের একেবারে পরে পরে সেটা সকলের ভালো না-ও লাগতে পারে। একটু কায়দা করে এই বাজার দর বলাটা বিচিত্রানুষ্ঠানের বাইরে রাখা যায় না?

৯ই জানুয়ারী রাত ৮টার নাটক "অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী সান্যাল।' রচনা— শ্রীননীমাধব চৌধুরী।

নাটকের কাহিনী দুর্বল, ঘটনাবিন্যাসও সুষ্ঠু নয়। নাটকের চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে কিছু কিছু করে গম্ভীর নীতিকথা শোনানো হয়েছে। তাতে নাটক আরও দুর্বল হয়েছে।

নীতিকথার এত বাড়াবাড়ি যে, হাসপাতালে শুয়ে সদ্য জ্ঞান ফিরে পাওয়া রুগীও অনেক নীতিকথা শুনিয়েছে। মোটকথা নাট্যকার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেই নাটক শেষ করেছেন। নাটকীয়তার দিকে তাকান নি।

অভিনয়ও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। যে নাটকে অ্যাকশন কম সে নাটক রেডিওয় দাঁড় করানো কঠিন। সুতরাং শিল্পীদের পুরো দোষ দেওয়া যায় না।

বেতারজগতের অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী ১৩ই জানুয়ারী রাত ৮টায় 'পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন পরিকল্পনা' বিষয়ে একটি বাংলা কথিকা প্রচারিত হবার কথা ছিল, কিন্তু প্রচারিত হয়েছে অরুণ দত্তর ভক্তিগীতি। উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক কথিকার সঙ্গে ভক্তিগীতি গুলিয়ে ফেলার কোনো স্পষ্ট কারণ দেখা যাচ্ছে না। ভক্তিগীতি কোনো এমার্জেন্সি প্রোগ্রামও নয় যে, ধরে নেওয়া যাবে জরুরী কারণে কথিকাটি বাদ দিয়ে সেই জায়গায় ভক্তিগীতি প্রচার করা হয়েছে। তাছাড়া আগের দিন, অর্থাৎ ১২ই জানুয়ারী রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে এক অরুণ দত্তর প্রোগ্রাম ছিল—অবশ্য আধুনিক গানের। ১২ই তারিখের অরুণ দত্ত আর ১৩ই তারিখের অরুণ দত্ত একই ব্যক্তি কিনা জানি না। যদি একই ব্যক্তি হন তাহলে বেতার কর্তৃপক্ষের প্রোগ্রাম প্ল্যানিংয়ের প্রশংসা করতে হবে। কে বলে তাঁরা শিল্পীদের ন মাসে ছ মাসে একবার মাত্র প্রোগ্রাম দেন?

১৮ই জানুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় গল্পদাদুর আসরে গল্প শোনালেন কলকাতা হাই কোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়। বেশ লাগল। আইনজ্ঞের গল্পজ্ঞ হওয়াটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। এই আসরে পরে ভজন শোনাল পাপিয়া সরকার। কিন্তু পুরোটা শোনাতে পারল না, শেষ হবার আগেই কেটে দেওয়া হ'ল। তারপরে নজরুলগীতি গাইল মন্দিরা দাশগুপ্ত। তার গানও শেষ পর্যন্ত শ্রোতাদের কানে পৌঁছুল না, কেটে দেওয়া হ'ল।

পরে সন্ধ্যা ৬টা ৫ মিনিটে অনুষ্ঠান পরিচিতিতে ঘোষক শ্রীভবনের অনুষ্ঠানসূচী ঘোষণা করতে গিয়ে বললেন, "সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শ্রীভবনে বাংলা সাহিত্যে নারীচরিত্র, এই পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের ভ্রমর চরিত্র সম্বন্ধে বলবেন—!" কে বলবেন তা আর তিনি বললেন না। অনেকক্ষণ থেমেও না। মনে হ'ল, লেখাটা তিনি পড়তে পারলেন না। কিন্তু কেন? ব্রডকাস্টের আগে লেখাগুলো সব পড়ে নেওয়া হয় না কেন?

—শ্রবণক

কনে সাজানো

তাই তো, কি হবে?

এ প্রশ্নের সদুত্তর নেই। নীরন্ধ্র সমস্যা। জমাজমাট অন্ধকার।

সমাজ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এক ভদ্র-মহিলাই প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন। দুজনের মধ্যে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরই অসীম নীরবতা। উনি ভাবেন তাই ভাবছেন আর আমি নতুন ভাবনায় বুঁদ। প্রাথমিক ঘোর কাটিয়ে আবার আলোচনায় আসর গরম করি।

তিনিই শুরু করেন, এই তো অবস্থা। ছেলেরা বিয়ে করতে চায় না। সবাই আর্থিক অসংগতির দোহাই পাড়ে। আর সত্যিও বটে। এর ফল যে কি মারাত্মক চিন্তাও করা যায় না। ইতিমধ্যেই কুফল ফলতে আরম্ভ করেছে। ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠতে হয়। বিশেষ করে ভাবনা মা-বাবার, যাদের মেয়ে আছে অথচ তেমন আর্থিক সামর্থ্য নেই।

আবার নীরবতা। কথা বলতে পারি না। চুপ করে থাকতে হয়। ওপক্ষ ভাবনার খোরাক দিয়েছেন।

প্রায় হঠাৎ জিগ্যেস করি, তবে মেয়েদের কি হবে?

এক চিলতে হাসলেন তিনি, ছেলেরা যদি বিয়ে না করে।

এখানেই সব কথার ছেদ টেনে সেদিন উঠে পড়েছিলাম। মনে মনে এই অসুন্দর আর্থিক জীবন থেকে অর্থবহুল নয় অথচ স্বচ্ছল জীবনে উত্তীর্ণ হওয়ার কামনা নিয়ে ফিরেছিলাম। একার নয়, সকলের জন্য।

কিন্তু বিয়ের মরশুমে বাংলাদেশের দিকে তাকালে অবস্থা এতটা হতাশাব্যঞ্জক মনে হয় না। বার মাসের সাত মাসেই বিয়ের লগ্ন। আর প্রতিটি লগ্নেই কি ভিড়। বাজারে গেলেই সেটি বেশ টের পাওয়া যায়। জিনিস-পত্রের দাম আকাশছোঁয়া। সাধারণের নাগালের বাইরে। সবাই তখন ভাবে, বিয়ের লগ্ন কেটে গেলেই আবার দাম কমবে।

সবচেয়ে মজা জমে শেষ লগনশা ধরার মজা নিয়ে। প্রতিযোগিতা পড়ে যায়। এটা 'মিস' হলেই কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে। আর শাস্ত্রবাক্য তো আছেই, শুভস্য শীঘ্রং। তাই হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

শুধু বাংলাদেশেরই নয়। সারা ভারত জুড়ে। এক-একটি লগ্নে বড়ো জাম। কোন কোন প্রদেশে আবার একসঙ্গে অনেক বিয়ে সেরে ফেলা হয়। আলাদা আলাদা করতে গিয়ে পুরুতমশাই হয়তো সময় পাবেন না তাই এই পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা। সকলেরই যাতে মান রক্ষা হয়।

প্রচ্ছদ যত নীরক্তই হোক, প্রাণস্পন্দন স্পষ্ট। তাই এত ধুমধাম। নতুন জীবনের জয়গান। এখনও চলছে বিয়ের মরশুম। প্রতিটি লগ্নেই কত চেনা-অচেনা, পরিচিত-অপরিচিত 'যদিদং হৃদয়ং মম, তদিদং হৃদয়ং তব' মন্ত্রে সঞ্জীবিত হচ্ছে।

এই মুহূর্তে, এই ভরা মরশুমে ঐ দুশ্চিন্তাটা সরিয়ে রেখে তাই একটু বিয়ের ভাবনায়ই মশগুল হওয়া যাক।

বিয়ে মানেই সাজ-সাজ রব। বাড়ি সাজে, ঘর সাজে। ছেলেবুড়ো সবাই সাজে। আসল সাজ বর-কনের। সবচেয়ে বড়ো সাজ কনের। তার আয়োজনেই এত আয়োজন, ঘটা। তাই সংক্ষে বলে, কনে সাজানো। দেখে সবাই। মনে মনে হিসেব করে। আর পাঁচটা দেখা কনের সঙ্গে তুলনা করে। খুঁত ধরিয়ে দিতে পারলে খুশিতে ফেটে পড়ে। সবাইকে ডেকে শোনায়। আর নতুন কিছু দেখলে শিখে নেয় চুপি-চুপি। কাউকে বলে না। কাজে লাগবে। বিয়েতে কনে সাজানো তাই এক মস্ত আকর্ষণ। বিরাট ব্যাপার।

কনে সাজানো আজ যেমন সেদিনও তেমনি ছিল। হুবহু এক নয়। প্রকরণ এক না হলেও প্রকার অভেদ। মূলে কোন তফাৎ নেই। সেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি একই জায়গায়।

আমাদের আদি মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত। সেখানেই আমাদের পুরুষ পরম্পরার পরিচয়। আদি কবি সীতার বিবাহ উপলক্ষ্যে কনে সাজানোর আয়োজন কতটা করেছিলেন জানা নেই। তবে কবি কৃত্তিবাস কিন্তু সীতার বিবাহে কনে সাজানোর আয়োজন করেছেন ব্যাপক : "চিরুণীতে কেশ আঁচড়িয়া সখীগণ। চুল বাঁধি পরাইল অঙ্গে আভরণ।। কপালে তিলক আর নির্মল সিন্দুর। বালসম সূর্যতেজ দেখিতে প্রচুর।। চঞ্চল নয়নে কিবা কজ্জলের রেখা। কামের সমান যেন গুনে যায় দেখা।। দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিত বিলক্ষণ। শঙ্খের উপর সাজে সোনার কঙ্কন।। বসন পরায়ে তারে সুন্দর প্রচুর। দুই পায়ে দিল তার বাজন নূপুর।।"

এমনিভাবে সীতাকে সাজানো হলো। তারপর বিবাহসভায় তাকে যখন হাজির করা হলো বন্ধু-বান্ধব এবং বয়স্যরা স্বাভাবিক রসিকতায় আসর মাতিয়ে তুললেন। এত কিছুর মধ্যেও সীতার কনে-সাজ কিন্তু সকলের নজর কেড়েছে। সবাই সপ্রশংস। কবি কৃত্তিবাস কনে সাজানোর বর্ণনায় সমকালে যে দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন তাতে সে যুগের একটি অকৃত্রিম ছবি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার কাব্যের অনেক কিছুর মতো এও যে খাঁটি বাঙালী কনে সাজানো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কবি কৃত্তিবাসের পর থেকে বিশ শতক। কনে সাজানোর সেই ট্রাডিশন এখনো চলেছে। কোথাও ছেদ পড়ে নি।

এখনো আমরা কনে সাজাই। এত সমস্যায় টালমাটাল হয়েও। এখানে আমরা সেই কেন্দ্রেই দাঁড়িয়ে আছি। অপরিবর্তিত। মোড় নিচ্ছে। কিন্তু আদতে অকৃত্রিম।

ইদানীং কনে সাজানোর অনেক সুযোগ। অনেক সময় নিজে এ দায়িত্ব না নিলেও চলে। উচ্চবিত্তেরা এখন তাই করেন। কলকাতায় এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা কনে সাজানোর দায়িত্ব বহন করে। চুল বাঁধা থেকে টয়লেট-অলঙ্করণ সবই এদের দায়িত্ব। কনে এঁরা সাজায় চমৎকার। কনে দেখার সার্বিক আনন্দ এখানে সুলভ। তাই এইসব প্রতিষ্ঠানের কদর খুব। বিয়ের মরশুমে এদের ব্যস্ততার সীমা নেই।

কিন্তু যাদের সে সামর্থ্য নেই। কলকাতা শহরের অভিজাত পল্লী থেকে ওদের নিয়ে কনে সাজানোর ক্ষমতায় অনেকেই নেনে। বিয়ে জোগাড় করতেই প্রাণান্ত। তারপর এদের আহ্বান করা পোষায় না। করলে হয়তো ভালো হতো, বাড়ির সবাই খুশিও হতো।

অগত্যা সব দায়িত্ব নিজেদেরই নিতে হয়। আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের বৌ-ঝিদের এ-ব্যাপারে দক্ষতাও খুব। তাঁদের ডাক পড়ে। তাঁরা মনের মতো কনে সাজান। একজনের অপূর্ণতা আরেকজন পূর্ণ করে দেন। এমনি করে চলে কনে সাজানোর পালা।

সীতার বিয়েতে তিলক ব্যবহৃত হয়েছিল। সে ব্যবহার আজো আছে। আর ব্যবহৃত হয় চন্দন। চন্দনে সাজানোই বাজিমাৎ। মাঝে সুন্দর সিঁদুরের টিপ। এখানেই কিন্তু শেষ হয় না। একজন সাজান চন্দন-তিলকে। আরেকজন নিযুক্ত কেশসজ্জায়। বিনুনী নয়, খোঁপা। এমন খোঁপা যেন সকলের নজরে পড়ে। টয়লেট তো আছেই। হালফিলে সে ফিরিস্তি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বিরাট।

কনে সাজানোর প্রাথমিক পর্ব সমাপ্ত। গয়নাগাটি সীতার বিয়েতে ছিল প্রচুর। সে রাজ-রাজড়ার ব্যাপার। এই দুর্মূল্যের দিনে অত গয়না কোথায়। তবুও কিছু থাকে। সাধ্যানুযায়ী। কিন্তু গয়নার অপূর্ণতা ঢেকে যায় ফুলসাজে। ফুলের গয়না সাজানোর অন্যতম প্রধান উপকরণ। সিঁথিমোড় থেকে বাজুবন্ধ সবই ফুলের। কনে সাজানো শেষ। শেষ বেশ দেখে নেওয়া। বিরাট পরিতৃপ্তি। তবু আশংকা। যতক্ষণ বিবাহবাসরে কনের সাজ সকলের প্রশংসা না কুড়োয়। সাজ পছন্দসই না হলে অনেকে প্রকাশ্যেই ঠোঁট ওল্টায়। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেই আর কথা নেই। সব পরিশ্রম সার্থক। আর ওড়নার আড়াল থেকে পরিমিত মুখচ্ছবি দেখে সপ্রশংস না হয়ে পারা যায় না।

যত বিয়ে হচ্ছে তার প্রায় শতকরা ৯৯·৯ ভাগই এইভাবে কনে সাজায়। নিজের সাধ-আহ্লাদ সবাই এখানে উজাড় করে দেয়। তিলে তিলে গড়ে ওঠে তিলোত্তমা। সেই তিলোত্তমাকে নিয়ে সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই নয়, সুখের সংসার।

চারদিকে বিয়ের হৈ-হট্টগোলে মন টই-টুম্বুর। সাজানো কনেরা চোখের সামনে সারি বেঁধে চলেছে। ওদের চোখেমুখে চাপা আনন্দে উজ্জ্বলে। সে আনন্দ আমাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে আর কোন সমস্যা নেই। সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলোচনালব্ধ সেই বিরাট সমস্যার ভূতটাও এখন সাময়িক ছুটি নিয়েছে।

—প্রমীলা
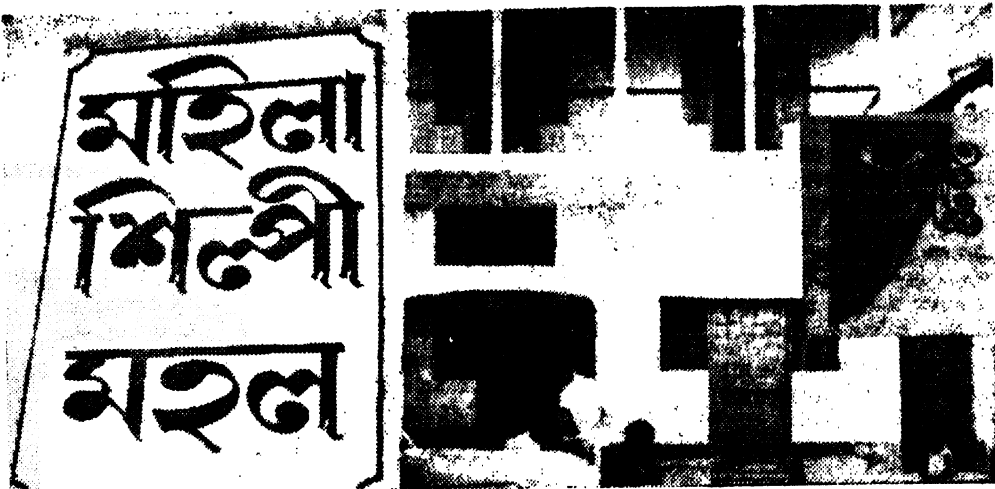
মহিলা শিল্পী মহলের নতুন ভবন। কিছুদিন আগে এই ভবনটির উদ্বোধন হয়। এখানে কয়েকজন দুঃস্থ অভিনেত্রী স্থান পেয়েছেন। কর্তৃপক্ষ নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজে হাত দিয়েছেন এবং এঁদের বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে।

অজিত লাহিড়ী পরিচালিত পদ্মগোলাপ-এর সেটে অনুভা ঘোষ এবং অপর্ণা সেন।
—ফটো : অমৃত

ভুলের খেসারত :

জানি না, প্রশান্ত চৌধুরীর মূল-কাহিনীটি কেমন ধারা ছিল। কিন্তু **শ্যাডো মুভীজ নিবেদিত এবং গুরু বাগচী পরিচালিত 'সমান্তরাল'**-এর চিত্ররূপ থেকে যে-কাহিনীটি আমরা পাচ্ছি, তা থেকে মনে হচ্ছে, আমাদের বাংলাদেশেও বোম্বাই বা মাদ্রাজের মতো যুক্তিনির্ভর কাহিনীর গুরুতর অভাব ঘটেছে। সম্প্রতি আমরা 'দো রাস্তে' বা 'আরাধনা' নামে হিন্দী ছবিগুলিতে যে-ধরণের অবাস্তব কাহিনীর (যদিও বলব, এইসব হিন্দী ছবির নির্মাতারা কিছুদিন আগেও যে-ধরনের হাস্যকর 'প্রেম-খল, নায়ক-হত্যা-রিভলভার-ছুরি-ঘুষোঘুষি-দলন্দ-নায়ক বা নায়িকার বিপদমুক্তিমূলক ফরমূলা কাহিনীর অবতারণা করতেন, বর্তমান হিন্দী ছবির কাহিনীদুটিকে তাদের তুলনায় অনেক অনেক ভালো বলতে হবে) সাক্ষাৎ পাই, 'সমান্তরাল'-এর কাহিনী তাদের থেকে কোনো অংশে পৃথক নয়। ধনীসন্তান রতন—যার পোশাকী নাম অশোক—যখন তার প্রতিবেশিনী তরুণী কমলাকে বিবাহ করল; তখন তার রক্ষণশীল পিতা যে রুষ্ট হয়ে সে-বিবাহকে অস্বীকার করতে চাইবেন, এর মধ্যে অবাক হবার কিছু নেই। ব্রজমোহন চৌধুরী যে কমলার অভাবী মামাকে অর্থ দিয়ে কিনতে চাইবেন, তাও বিচিত্র নয়। কিন্তু যে-পরিস্থিতিটি আজকের দিনে আদৌ বরদাস্ত করা কঠিন, সেটি হচ্ছে রতনের বাবা ও কমলার মামার মধ্যে আর্থিক লেনদেনের শিকার হয়ে পড়বে কমলা ও রতন। হাজার হাজার নোটের তাড়া পেয়ে কেদার বিশ্বাস সপরিবারে এমন কোন্ দূরে স্থানে চলে গিয়েছিলেন, যেখান থেকে কমলার পক্ষে নিজের অবস্থা জানিয়ে রতনকে একখানা চিঠি লেখাও সম্ভব হয়নি? এবং কমলাদের বাড়ীর সদর দরজায় তালা ঝুলতে দেখে রতন তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী সম্বন্ধে আর কোনো খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা করবে না এবং কিছু-দিনের মধ্যেই তাকে বেবাক ভুলে গিয়ে সুনন্দাকে বিবাহ করে বসবে, এ-ও বা কি করে সম্ভব? এই অসম্ভব বড়িগুলি গিলতে পারলেই ছবির অন্য ঘটনাকে স্বীকার এবং উপভোগ করা যায়। অবশ্য অত রাজ্য থাকতে পলাশপুর সরোজিনী মাতৃসদনেই অন্তঃসত্ত্বা সুনন্দকে এনে হাজির করার মধ্যেও কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না, অন্তত কোনো যুক্তি দেখানো হয়নি। সুনন্দা যে এই মাতৃসদনে আসতে চায়নি, বুড়ী মোক্ষদাকে দেখলে সে যে মনের মধ্যে আঁতকে ওঠে, এ-সব কথা 'সমান্তরাল'-এর বুকলেটে লেখা থাকলেও ছবির মধ্যে আদৌ স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

অভিনয়ে কমলার ভূমিকায় একটি প্রত্যয়যোগ্য রূপ ফুটিয়ে তোলবার প্রয়াস পেয়েছেন মাধবী চক্রবর্তী। পালিত পুত্র মিঠুকে অবলম্বন করে কমলা যে তার ভাগ্যবিতাড়িত জীবনকে ভরিয়ে তুলতে চেয়েছিল এবং সুনন্দার অতীতকে ভুলে গিয়ে তাকে জীবনে গ্রহণ করবার জন্যে সে অশোককে যে-পরামর্শ দিয়েছিল, তা প্রকৃত বাস্তব হয়ে উঠেছে তাঁর সংযত সংবেদনশীল অভিনয়গুণে। আধুনিকা সুনন্দার ভূমিকাটি-কেও জীবন্ত করে তুলেছেন ললিতা চট্টোপাধ্যায়; বন্দুকধারিণী এবং মাতৃসদনে শয্যাশায়িনী—উভয়বিধ সুনন্দাকেই তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। নায়ক রতন বা অশোকের চরিত্রটিকে রূপায়িত করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক অভিনয়ের মাধ্যমে। মিঠুরূপে মাস্টার বাপীও সুন্দর ও স্বাভাবিক। অপরাপর ভূমিকায় কমল মিত্র (ব্রজমোহন), কালী সরকার (কেদার বিশ্বাস), অনুপকুমার (গোবিন্দ), প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (গিরিজাশঙ্কর), বাণী গাঙ্গুলী (কেদারের স্ত্রী), পদ্মা দেবী (ব্রজমোহনের স্ত্রী) প্রভৃতি উল্লেখ্য সু-অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মোটের উপর প্রশংসনীয়। গানগুলি

সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত চৈতালী চিত্রে তনুজা। —ফটো : অমৃত

সুপ্রযুক্ত নয় বলে ছবির সঙ্গীতাংশ আদৌ রেখাপাত করতে পারে না।

শ্যাডো মুভীজ নিবেদিত 'সমান্তরাল'-এর প্রশংসনীয় হচ্ছে, এতে সামগ্রিক অভিনয়ের বলিষ্ঠতা।

বিচিত্ররূপিনী শর্মিলা

শক্তি সামন্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত 'আরাধনা' ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর প্রথমে প্রেমিকা, মধ্যে গোপন বিবাহের ফলে বধূ ও মাতৃসম্ভবা, পরে নিজে সন্তানেরই আয়া এবং সবশেষে কুড়ি বছরের ব্যবধানে প্রৌঢ়া দাইবেশে আপন পুত্রের মঙ্গলকামিনী। অভিনেত্রী শর্মিলাকে এত বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে এত রকম বিচিত্ররূপে আগে কখনও দেখা যায়নি। 'আরাধনা'র নায়িকা বন্দনার ভূমিকায় আমরা অভিনেত্রী শর্মিলাকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলুম। প্রযোজক-পরিচালক শক্তি সামন্তকে ধন্যবাদ, তিনি শর্মিলা ঠাকুরের নাট্যনৈপুণ্যের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন।

মনে হচ্ছে, হিন্দী ছবির কাহিনীর সেই অতি-সুপরিচিত রূপটির পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। 'আরাধনা' ছবির মধ্যে নেই কোনো খল-নায়ক, নেই কোনো নায়ক বা নায়িকার অজ্ঞাত স্থানে অবরোধ, নেই নায়ক ও খলনায়কের মধ্যে শক্তির দ্বন্দ্ব এবং ঘুষোঘুষি থেকে শুরু করে ছুরি ও রিভলবারের যথেচ্ছ ব্যবহার। যদিও হিন্দী ছবিসুলভ নায়ক-নায়িকার প্রেম-ভালোবাসার দৃশ্যগুলি গানের মাধ্যমে চিত্রিত করে ছবির আরম্ভ করা হয়েছে কিন্তু কাহিনী দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হয়ে নায়কের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়েছে এবং গোপন বিবাহের ফলস্বরূপে নায়িকার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সমস্যাকে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করেছে। নায়িকা সত্যের মুখোমুখী দাঁড়াতে ভয় পায়নি। যথাসময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে তাকে শিশুপালন আশ্রমে সে রেখে এসেছে এবং যে-নিঃসন্তান ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর কোলে ওই শিশুকে তুলে দিয়ে ওকে নিজেদের সন্তানের মতো পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁরই অনুকম্পা ভিক্ষা করে তাঁরই গৃহে সে নিজ সন্তানের 'আয়ী মা'র ভূমিকা গ্রহণ করেছে। স্বামী তার কাছে একদা যে-ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, সন্তানকে বায়ুসেনার একজন বিশিষ্ট পাইলটরূপে স্বীকৃতি পাওয়ার মাধ্যমে সেই ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেখে সে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। অবশ্য প্রশ্ন থেকে যায়, ভারতীয় এয়ার ফোর্সের পাইলট নির্জন মন্দিরে একক পুরোহিতের সামনে ডাক্তারের বিদুষী কন্যার সঙ্গে মালাবদল করে গোপন বিবাহ না করে সবচেয়ে সহজ আধুনিক পদ্ধতিতে 'রেজিস্টার্ড' বিবাহ করল না কেন? কিন্তু তাহলে হয়ত কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার শচীন ভৌমিককে কাহিনী রচনার জন্যে গুরুতর সমস্যায় পড়তে হত।

অভিনয়ে নায়িকা বন্দনারূপে শর্মিলা ঠাকুরের অভাবনীয় গুণপনার কথা আগেই বলা হয়েছে। বলা যেতে পারে, অভিনেয় চরিত্র সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ ধারণা করে নেওয়ার এবং যথোপযোগী নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শনের ব্যাপারে তিনি আজ সচেতনভাবে আত্মবিশ্বাসী। বন্দনার সন্তানের পালক মিঃ শকসেনার ভূমিকায় অভি ভট্টাচার্য একটি আতিশয্যবর্জিত সংবেদনশীল অভিনয় করেছেন। নায়ক অরুণ বর্মা এবং নায়কপুত্র —এই উভয় ভূমিকায় রাজেশ খান্না একটি বলিষ্ঠ যুবকের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন বাচনে ও ভঙ্গীতে; কিন্তু চরিত্রের অন্তরকে বিকশিত করবার জন্যে শিল্পীর যে-অনুভূতিপ্রবণতার প্রয়োজন, তা তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত। ডাক্তার গোপাল ত্রিপাঠীর স্নেহপ্রবণ ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যালের স্বচ্ছন্দ অভিনয় দর্শকচিত্তকে সহজেই আকর্ষণ করেছে। বহু দিন বাদে হিন্দী ছবিতে তাঁকে আমরা দেখতে পেলুম। মিসেস শকসেনারূপে অনীতা দত্ত চলনসই। ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলীর ছোট্ট ভূমিকায় অতিথি-শিল্পী অশোককুমার তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে সহজেই পরিস্ফুট করেছেন। নায়কপুত্রের প্রেমিকার ভূমিকাটিও সুঅভিনীত। কাহিনীর অপরাপর ভূমিকা গুরুত্বহীন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসনীয়। বিশেষ করে অলোক দাশগুপ্তের রঙীন চিত্রগ্রহণ বিশেষ দক্ষতার পরিচায়ক। ছবিটির একটি বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে এর গানগুলি। কিশোরকুমার, আশা, লতা ও রফীর গাওয়া প্রতিটি গান সুরের অভিনবত্বে দর্শকচিত্ত জয় করেছে। 'রূপ তেরা মস্তানা, প্যার মেরা দীওয়ানা', 'কোরা কাগজ থা ইয়ে মন মেরা', 'মেরে স্বপ্নে কী রাণী কব আয়েগী তু' প্রভৃতি গান বার-বার শোনবার মত। আনন্দ বক্সীর রচনা ও শচীন দেববর্মনের সুরের এমন অভাবনীয় সমন্বয় অকল্পনীয়।

শক্তি ফিল্মস নিবেদিত 'আরাধনা' শর্মিলা ঠাকুরের অভিনয় এবং শচীন দেববর্মনকৃত সুরজালে একটি মোহনীয় চলচ্চিত্রে পরিণত হয়েছে।

সৎ এবং অসতের পথ পরিচয়

জীবনের পথে চলতে গেলে ত্যাগধর্মই কাম্য, না স্বার্থপরতা দ্বারা চালিত হয়ে সুখসম্পদ ভোগের চেষ্টাই শ্রেয়—এই প্রশ্নের একটি সুষ্ঠু উত্তর দেবার চেষ্টা করেছে **রাজ খোসলা প্রযোজিত ও পরিচালিত রঙীন চিত্র 'দো রাস্তে'**। 'দো রাস্তে' নির্মিত হয়েছে চন্দ্রকান্ত কাকোদকর রচিত জনপ্রিয় উপন্যাস 'নীলাম্বরী' অবলম্বনে। মূল-কাহিনী থেকে জি আর কামাথ যে-চিত্রনাট্য রচনা করেছেন, তা থেকে দেখা যাচ্ছে, সৎ-অসতে যে দ্বন্দ্ব, তা একই পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ; ঠিক যেমন আছে শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি'তে সৎ-অসতের দ্বন্দ্ব। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। শরৎ-রচিত গিরিশ-সিদ্ধেশ্বরী-শৈলজার মধ্যে যে মানবমনের রহস্য উদ্ঘাটিত, যে-সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চারিত্রিক লীলা পাঠক বা দর্শকের অনুভূতিকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়, তা এখানে অনুপস্থিত। জ্যেষ্ঠ সৎভাই নবেন্দু এখানে সোজাসুজি কর্তব্যপরায়ণ ও সহিষ্ণুতার অবতার; জ্যেষ্ঠা বধূ মাধবী তাঁর অনুগামিনী মাত্র। ছোট ভাই সত্যেন প্রেমিক এবং দাদার সঙ্গে দুঃখভোগ করে। মেজভাই বিজু স্বার্থান্ধ ধনী কন্যাকে বিবাহ করে তারই দ্বারা চালিত হয়, যতক্ষণ না ছোট ভাইয়ের সঙ্গে রীতিমত দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবার পরে স্ত্রীর নিশ্ছিদ্র স্বার্থপরতা সম্বন্ধে তার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হয়। — এই কাহিনীকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিবৃত করতে গিয়ে অনেক অদ্ভুত পরিস্থিতি আমদানী করা হয়েছে, ছবি কারণে-অকারণে মোড় ঘুরতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে, গতি হয়ে পড়েছে শ্লথ; সময়ে-সময়ে কাহিনীকে স্থানে-স্থানে নীরসও বোধ হয়েছে। তবে আশার কথা এই যে, বোম্বাই চলচ্চিত্র-জগৎ কাহিনী সম্পর্কে তার বহু-

তরুণ মজুমদার পরিচালিত **কুহেলী** চিত্রের চারটি চরিত্রে বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, সুস্মিতা সান্যাল ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।
—ফটো : অমৃত

ব্যবহৃত ফর্মুলাকে ত্যাগ করেছে এবং সাংসারিক অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনদর্শনকে চিত্রায়িত করবার প্রয়াস পাচ্ছে।

ছবিটিতে নাট্যনৈপুণ্য প্রকাশের খুব বেশী সুযোগ আছে বলে মনে করতে পারছি না। তাই বলরাজ সাহনী (নরেন্দ্র), রাজেশ খন্না (সত্যেন), প্রেম চোপরা (বিজু), কামিনীকৌশল (মাধবী), মমতাজ (রীণা), উমা দত্ত (গীতা), জয়ন্ত (শুভকাঙ্ক্ষীবন্ধু), ছোট মেহমুদ প্রভৃতি শিল্পী স্ব-স্ব ভূমিকায় বহু চেষ্টা করেও অভিনয়কে 'যথারীতি' থেকে উন্নততর পর্যায়ে তুলতে সক্ষম হন নি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সাধারণভাবে প্রশংসনীয়। আনন্দ বক্সী লিখিত এবং লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল দ্বারা সুর যোজিত হওয়া সত্ত্বেও 'দো রাস্তে'র গানগুলি শ্রুতিসুখকর হয়ে ওঠে নি। রাজ খোসলার 'দো রাস্তে' হিন্দী চলচ্চিত্রজগতে নতুন পথের সন্ধান দিতে চেষ্টা করেছে একথা অবশ্যস্বীকার্য।

মঞ্চাভিনয়

রুমানীয় নাটকের বাঙলা রূপ

পঞ্চমিত্রম প্রযোজিত এবং অমিতা রায় রচিত 'ছুটির খেলা' নাটকটির মূল রচয়িতা হচ্ছেন বিখ্যাত রুমানীয় নাট্যকার মিহাইল সেবাস্তিয়ান। এ'র রচিত আরও অন্তত দুখানি নাটক—'শেষ সংবাদ' ও 'নাম-না জানা তারা' নামে বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পূর্বে অভিনীত হয়েছে। প্রথমটির বাংলা রূপ দিয়েছিলেন উমানাথ ভট্টাচার্য মূলের ইংরাজী অনুবাদ থেকে। কিন্তু দ্বিতীয় অনুবাদটি মূল রুমানীয় ভাষা থেকেই করেছিলেন অমিতা রায়। বর্তমানে আলোচ্য 'ছুটির খেলা' নাটকটিও শ্রীমতী রায় মূল রুমানীয় থেকেই বাঙলায় রূপান্তর করেছেন।

নাট্যকার প্রশ্ন তুলেছেন, মানুষ তার কর্মব্যস্ত জীবন থেকে ছুটি নিয়ে কোন নির্জন পরিবেশে অবসরযাপন করতে যায় কেন? নিশ্চয়ই প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমিকে ভুলে থাকবার জন্যে। তাই যদি হয়, তাহলে মানুষ অবসরযাপন করতে গিয়েও নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তে পাবার আশা করে কেন? শহরাঞ্চল থেকে দু দিন চিঠি না পেলেই ব্যাকুল হয়ে পড়ে কেন? আজ মাসের কোন্ তারিখ কিম্বা আজ কি বার না জানতে পারলে রীতিমত অস্থির হয়ে ওঠে কেন? নাট্যকারের প্রশ্ন, সব কিছু ভুলে মানুষ নিরবচ্ছিন্ন অবসরের স্বাদ গ্রহণের আনন্দকে উপলব্ধি করতে চায় না কেন?

'ছুটির খেলা'র নায়ক রঞ্জন এই অবসর-বিনোদনের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতেই চেয়েছিল যেন চন্দ্রপ্রভা গ্রামের মাস্টাররজীর বোর্ডিংয়ে এসে। এবং অন্য বোর্ডাররাও যাতে তাই করে, তার জন্যে সে চিঠি ও খবরের কাগজ আসা বন্ধ করেছিল, টেলিফোন ও রেডিওকে বিকল করেছিল এবং ব্ল্যাকবোর্ডে দিনের নাম, তারিখ ইত্যাদি লেখাকে মুছে দিত। কিন্তু যখন করুণা বলে মেয়েটি — যে-করুণার কোন আপনজন আন্দামান থেকে ট্রাঙ্ক করতে পারে, সেই করুণা বলে মেয়েটি নায়ক রঞ্জনের চিন্তা-ভাবনার শরিক হয়ে প'ড়ে তার চিত্তকে দিল সজোরে নাড়া, তখন সে কি আর পৃথিবীকে ভুলে থাকতে পেরেছিল? করুণার সঙ্গে সম্পর্ককে দৃঢ় করবার নিষ্ফল চেষ্টায় সে কি জানতে চায় নি, করুণা কে, কোথাকার মেয়ে, কি তার ঠিকানা? কিন্তু করুণা রঞ্জনের কাছ থেকে পাওয়া চিন্তাধারাকে আত্মস্থ করে কি অবলীলাক্রমেই না 'ছুটির খেলা'কে পুরোপুরি উপভোগ করে গেল! অবশ্য তার এই খেলায় বোর্ডার বরেনবাবুর সমস্ত জগৎকে একটি ভাসমান জাহাজরূপে কল্পনা করে কখনও এ-বন্দরে কখনও ও-বন্দরে ভ্রমণ করার আজব চিন্তা যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

এই নবআস্বাদপূর্ণ রোমান্টিক নাটক-টিকে এত সাবলীল ও সুন্দর ভাষায় মণ্ডিত করে বাঙলা রূপান্তর ঘটিয়েছেন অমিতা রায় যে, স্পষ্ট স্বীকৃতি না থাকলে 'ছুটির খেলা'কে একটি মৌলিক নাটক বলে অভিহিত করতে পারতুম। অবশ্য নাটকটিকে নিখুঁত মনে করতে পারছি না। তিনটি দৃশ্যের মধ্যে প্রথম দৃশ্যটি অত্যন্ত সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত। কিন্তু দ্বিতীয় দৃশ্যটির ধার অনেক কম — কেমন যেন অগোছালো, ঘটনাগুলি যেন ঠিক দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। তৃতীয় দৃশ্যটি এই অগোছালো ভাবটি কাটিয়ে উঠে যেন অনেকখানি বিন্যস্ত হ'তে পেরেছে, তবে প্রথম দৃশ্যের নিখুঁতিতে পৌঁছুতে পারে নি।

পঞ্চমিত্রম নাটকটিকে সাধ্যমত সুপ্রযোজিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। মুরারী ধর-কৃত একটি সুপরিকল্পিত দৃশ্যে প্রয়োজনমত আবহশব্দ ও সঙ্গীত এবং আলোক-প্রক্ষেপণের মাধ্যমে নাটকটিকে তাঁরা উপস্থাপিত করেছেন। তবে সবচেয়ে উল্লেখ্য হল, এ'দের অভিনয়কুশলতা। নায়িকা করুণার চরিত্রে মমতা চট্টোপাধ্যায়ের অ সা ধা র ণ অভিনয়নৈপুণ্য দর্শকদের সম্মোহিত রাখে। নায়ক রঞ্জনরূপে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় বাচনে ও সঙ্গীতে একটি ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয়ের নিদর্শন রেখেছেন।

ক্যাপ্টেন বরেনবাবুর ভূমিকায় দীপক সেনগুপ্ত প্রথমটা কিছুটা আড়ষ্ট হলেও পরে স্বচ্ছন্দভাবে অভিনয় করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। দুটি আগন্তুকরূপে সরিৎ ঘোষ এবং অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর টাইপের সৃষ্টি করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছেন। উকিলবাবু ও কুন্তলা বেশে যথাক্রমে তপন দে-ভৌমিক ও ছবি তালুকদার অনেকখানি উতরে গেলেও আরও স্বাভাবিক হতে পারতেন। শ্যামল সেনের 'বাবুল'র ভূমিকাভিনয়ে উন্নতির যথেষ্ট অবকাশ আছে। টেলিফোনমিস্ত্রী ও রামজির ভূমিকায় যথাক্রমে এন মাশ্চারক ও দীপক ভট্টাচার্য উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

পঞ্চমিত্রম প্রযোজিত এবং অমিতা রায় লিখিত 'ছুটির খেলা' একটি নতুন রসের রোমান্টিক নাটকরূপে দর্শকদের খুশী করবে।

●

কলকাতার কয়েকটি প্রখ্যাত নাট্য সংস্থার কিছু সভ্য নিয়ে ফ্লাশ থিয়েটার সংস্থার জন্ম। বর্তমান সমাজের বিশেষ দিকগুলো নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরাই এ সংস্থার উদ্দেশ্য। সর্বপ্রথম এ'রা গোপালকৃষ্ণ পাহাড়ী রচিত 'বিষাক্ত রজনী' নাটকটি নবগ্রামে অভিনয় করেছেন। নাটক-নির্দেশনা ও মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন গোপাল পাহাড়ী।

সম্প্রতি বি কে পাল এভিনিউয়ে শারদীয়া নাট্যসমাজ নামে একটি নাট্য সংস্থা গঠিত হয়েছে এ'দের উদ্দেশ্য যাত্রাভিনয়ের মাধ্যমে লোকসংস্কৃতির একটি বিশেষ দিকের সঙ্গে বাঙলা দেশের সাধারণ মানুষের একটা যোগাযোগ স্থাপন করা। মুখ্য সংগঠক শ্রীমৃত্তলাল চক্রবর্তী আজীবন এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছেন। এই সংস্থা সত্যকার সুন্দর নাটক যা বর্তমান জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও অতীতের ঐতিহ্যবাহী তা প্রচার করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবেন। নাচমহল, খুনী, দেশের ডাক প্রভৃতি নাটক এ'রা শহর ও মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করে সকলের প্রশংসাধন্য হয়েছেন। শিল্পী নির্বাচন অত্যন্ত দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করেছে। শঙ্কর রায় নাট্যনির্দেশনায় আছেন। আশা করা যায় এ'দের নাটকগুলি জনচিত্ত জয়ে সক্ষম হবে।

বিবিধ সংবাদ

কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত **পুণা ফিল্ম ইন্সটিটিউট অব ইণ্ডিয়ার ছাত্রছাত্রীরা তাদের** শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে প্রতি বছরই বেশ কয়েকটি করে স্বল্প দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র ও তথ্যচিত্র নির্মাণ করে থাকেন ১৯৬৮-৬৯ সালে 'ডিপ্লোমা ফিল্ম' হিসেবে এ'রা তৈরী করেছেন ১৩ খানি ছবি এবং তথ্যচিত্র করেছেন আরও ১৩ খানি। এছাড়া এবারে এ'রা দুটি বড় কাহিনীচিত্রও তৈরী করেছেন : একটি হচ্ছে ছ' রীল দীর্ঘ 'পিয়া কা ঘর' এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে বারো রীলে সম্পূর্ণ মহেশ কাউল লিখিত ও পরিচালিত একখানি ছবি। গেল ২৩ জানুয়ারী সকালে দক্ষিণ কলিকাতার প্রিয়া সিনেমায় আমন্ত্রিত চিত্রশিল্পী, কলাকুশলী এবং চিত্রসাংবাদিকদের সামনে 'পিয়া কা ঘর' সমেত খান-দশেক ছবি দেখান হয়। বোম্বাই শহরের গৃহসমস্যা একটি নবদম্পতির নিভৃত আলাপনে কি বেদনাদায়ক ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, তারই যে মনোরম ছবি মারাঠী লেখক বসন্ত কালে বইয়ের পাতায় এঁকেছেন, তাকেই ছাত্র-ছাত্রীরা চলচ্চিত্রের ভাষায় অত্যন্ত সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মজা এই, ছবিটিতে দশজনের ক্যামেরার কাজ, দশজনের শব্দযন্ত্রের কাজ, এগারোজনের সম্পাদনা আছে এবং পাঁচজন পরিচালনা করেছেন; তবু ছবিটিতে সুন্দর ঐক্য বজায় আছে। ছোট ছবিগুলির মধ্যে 'প্রিয়া', 'বার্ডস অ্যান্ড বীজ', 'দি এপিটাফ', 'ডিস্যাপয়েন্টমেন্ট', 'ইন সার্চ অব রিদম' (শান্তাপ্রসাদের তবলা), 'ভীমসেন যোশী', 'মিঃ কেলকার অ্যান্ড হিজ মিউজিয়েম', 'আওয়ার ইয়ুথ' দেখান হয়েছিল। ছবিগুলির মধ্যে ফোটোগ্রাফী, শব্দধারণ, সম্পাদনা প্রভৃতি বিষয়ে নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হলেও বিষয়বস্তু চিন্তায় বেশ কিছুটা দৈন্য দেখা যায়। মনে হয় ইয়োরোপীয় আধুনিক চলচ্চিত্রজগতের যৌনচিন্তা পুণা ফিল্ম ইন্সটিটিউটেও সংক্রমিত হয়েছে। মাত্র 'দি এপিটাফ' ছবিটি হচ্ছে এর ব্যতিক্রম। একটি রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদেহকে ঘিরে মানুষের বৈচিত্র্যময় মানসিকতার প্রকাশ করা হয়েছে সুন্দরভাবে। তথ্যচিত্র 'মিঃ কেলকার অ্যান্ড হিজ মিউজিয়েম', 'ইন সার্চ অব রিদম' ও 'ভীমসেন যোশী'র মধ্যে প্রথমটি বিশেষ আকর্ষণীয়।

বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিস্টস এসোসিয়েশনের সভাবৃন্দ সভাপতি অশোক সরকারের নেতৃত্বে ফিল্ম ইন্সটিটিউট অব ইণ্ডিয়ার অধ্যক্ষ জগৎমুরারীর সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনের সভাগৃহে একটি সুন্দর কথোপকথন আসরে মিলিত হয়েছিলেন ২৩ জানুয়ারী সন্ধ্যায়।

গত ২৩ জানুয়ারী '৭০ রামরাজাতলায় দক্ষিণ হাওড়া রবীন্দ্র সংস্কৃতি সম্মেলন, বাণীনিকেতন ইন্সটিটিউট ও সাঁত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরীর সম্মিলিত উদ্যোগে নেতাজী জন্মোৎসব পালিত হয়। শ্রীব সুদেব লাহিড়ী সকলকে স্বাগত জানান। শ্রীসুবোধকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। শ্রীতপনকান্তি দে নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীসনৎ মৈত্র নেতাজীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ভাষণ দেন। এবং ইহার পর ইউ এস আই এস ফিল্ম ডিভিসনের সৌজন্যে এ্যাপোলো — ১২ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

গত ১৯ জানুয়ারী সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় সোদপুরের (২৪ পরগণা) তরুণদের সুপরিচিত সংস্থা 'সবুজশিখা'র দ্বাদশ প্রতিষ্ঠা-দিবসের উৎসব-অনুষ্ঠান বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হল। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অমর দেওয়ান, অতিথি এবং উদ্বোধক যথাক্রমে সর্বশ্রী মানিক সরকার ও বিমল বসু। 'শুভেচ্ছা সব পেয়েছি আসর' (সোদপুর)-এর সভ্যরা সমবেতকণ্ঠে নজরুলের দেশপ্রেমের অগ্নিময়ী গান গেয়ে অনুষ্ঠান শুরুর সূচনা করেন। সংস্থার তরফ থেকে বক্তব্য রাখেন শ্রীদীপক সরকার। উদ্বোধক, অতিথি, সভাপতি এবং সংস্থা-সভাপতি ডাঃ এইচ ডি রাউথ প্রমুখের সময়োপযোগী ভাষণের পর বিচিত্র অনুষ্ঠানের আসর বসে। সোদপুরের স্টেশন রোডের ওপর নির্মিত সুবিস্তৃর্ণ আসরে সহস্রাধিক নরনারী মুগ্ধচিত্তে সুখ্যাত ও তরুণ শিল্পীদের নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি, কৌতুক-গান, কৌতুক-কথা, যন্ত্রসঙ্গীত

ইত্যাদি মধ্য রাত্রি পর্যন্ত উপভোগ করেন। শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : সর্বশ্রী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুবীর সেন, নির্মলেন্দু চৌধুরী, বাপী রায়, নিখিল গুপ্ত, বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, পার্থ বাগচী, মীরা বিশ্বাস, সোনালী রায়, পিনাকি চট্টোপাধ্যায়, পুষ্প রায়চৌধুরী, অমর ঘোষ, হীরক চৌধুরী, পিন্টু দত্ত, ভুলু চৌধুরী এবং 'দি ডার্ক আইজ'-এর অর্কেস্ট্রা। সম্মেলক গানে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী সুনন্দা রায়, রূপা মজুমদার, মহুয়া গুহ, পূরবী দে, শকুন্তলা সাহা, শিল্পী ভৌমিক, গোরী ঘোষ, অচিন চৌধুরী, সুপ্তি ভৌমিক, রীতা মজুমদার, পূর্ণিমা বর্ধন, অনিমা বর্ধন, কাজলী ঘোষদস্তিদার, মিতা গোস্বামী, সুরভি দে, শিবশঙ্কর ঘোষদস্তিদার, লিপি গোস্বামী, তবলা-সঙ্গত—রবিশঙ্কর ঘোষদস্তিদার। সর্বশ্রী মতিলাল পালচৌধুরী, দীপক সরকার, নির্মল ঘোষ ও বিমান চৌধুরী সুনিপুণ ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি সার্থক ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি সাঁত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরীর ৫৩তম বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে নবনির্বাচিত কমিটি গঠিত হয়েছে। সভাপতি — শ্রীসুবোধকুমার ভট্টাচার্য। সহ-সভাপতি—সর্বশ্রী ডঃ অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, রঘুদাস বাউল, ভোলানাথ সান্যাল ও জলধি চৌধুরী। কর্মসচিব—শ্রীবাসুদেব লাহিড়ী। সহ-কর্মসচিব—সর্বশ্রী আশীষ ভাদুড়ী ও সমীর পাল। গ্রন্থাগারিক—শ্রীতপনকান্তি দে। সহ-গ্রন্থাগারিক—সর্বশ্রী সুনীত মৈত্র ও মিহির গঙ্গোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসুশীলকুমার কুণ্ডু। হিঃ রক্ষক—শ্রীসুধাংশু চক্রবর্তী। সদস্য — সর্বশ্রী সুশীলকুমার চৌধুরী, শিশির লাহিড়ী, পরেশ মৈত্র, জয়দেব নন্দী ও শিবপ্রসাদ রায়।

ক্লাস থিয়েটারের সদস্যরা বিশ্বরূপা মঞ্চে প্রতি মাসে তাদের মঞ্চসফল 'শৃংখল' নাটকটির একটি অভিনয়সূচী গ্রহণ করে। কংগোর বৈপ্লবিক পট-ভূমিকায় রচিত উক্ত নাটকটি বেশ কয়েক রজনী সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় হয়। নতুন অভিনয়সূচী আগামী ৩১ জানুয়ারী শনিবার আড়াইটা থেকে আরম্ভ হবে। প্রয়োগ প্রধানে নিমাই ঘোষ।

ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউটের ছবি　　বার্ডস্ অ্যান্ড বীজ্

উত্তর বাংলার লোকগীতে নরনারীর প্রেম

উত্তর বাংলার লোকসংস্কৃতিতে ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা গান একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই গানগুলিতে চলমান সাংস্কৃতিক ভাবধারার প্রভাব নেই—এগুলি একান্তই মৌলিক এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। এর সুরের বেসাতি লোকমুখে, পল্লীর কোন গানের আসরে, কৃষিক্ষেত্রে অথবা নির্জন কুঁড়ে ঘরের চালের তলায়। এ গানে আধুনিকতার কোন পালিশ নেই—এগুলি টবে ফোটানো ফুল নয়, একান্তই অযত্নলালিত বনের ফুল। কিন্তু এতেও সুর আছে, আবেগ ও অনুভূতির নির্যাস আছে এবং সর্বোপরি এর প্রকাশভঙ্গীতে আছে অকৃত্রিম আবেদন। এই গান ছড়িয়ে আছে এখানকার আকাশে, বাতাসে, খেয়াঘাটের নৌকাতে, গাড়িয়াল ভাইটির কণ্ঠে এবং নারী হৃদয়ের সরব কান্নার ভেতরে।

ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা গানের প্রধান বিষয়বস্তু নরনারীর প্রেম। এই প্রেম সর্বত্র সাফল্যমণ্ডিত নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বিরহ বিচ্ছেদ ও ব্যর্থতায় ভারাক্রান্ত। কাছে আসবার এবং কাছে পাবার আগ্রহের ভেতরে একটা সর্বকালীন এবং সর্বজনীন রূপ আছে। তাই "চন্দন মাখা গোড়া গাও" কোন কন্যার সাথে দেখা হলে পল্লীর যুবক যখন প্রস্তাব করে—

"ও কন্যা চন্দন মাখা গোড়া গাও
করেন না করেন রাও
গাওখান ঘোচ্‌লেয়া যাও"

(ও চন্দন মাখা ফর্সা রং মেয়ে, কথা বল আর নাই বল গা ঘসে যাও অর্থাৎ দেহের স্পর্শ দিয়ে যাও)।

সে ডাকে কোন সংকোচ না রেখেই মেয়েটি সাড়া দেয় এবং বলেঃ

"মুই হনু রসের নারী
তোমরা হইলেন ভোমরা—
বগলোত বসিয়া বন্ধুধন বাজান দোতোরা।"

বন্ধুর কাছে বসে দোতোরা শোনার ইচ্ছের পেছনে যে মানসিকতা কাজ করে সেটা হচ্ছে যৌবনের সংগপ্রিয়তা, মিলনের আকাঙ্ক্ষা এবং একটা নতুন জীবনের সুন্দর স্বপ্ন। তাই তিস্তা, মানসাই, ধরলা নদীর মাঝি ভাইটির একাকীত্বের মাঝে হঠাৎ কোন সুন্দরীকে কাছে পেলে তাকে পার করে দেবার বিশেষ ইচ্ছে ঘাটিয়াল ভাইটির থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আর আগ্রহ সে নানাভাবে প্রকাশ করে। "শিমুলে খুটোর নাও" বলে মেয়েটি নৌকার ভার বইবার ক্ষমতায় সন্দেহ প্রকাশ করলে মাঝি ভাইটি উত্তর করে :—

"শিমুলে নোয়ায় সেগুনে নোয়ায়
মন পবনের নাও
রাজার হাতিক পার করিচং রে—
ও কন্যা, তোর বা কত ভরা।"

অর্থাৎ শিমুল নয়, সেগুন নয়, মন পবনের নৌকো। যে নৌকোতে মাঝি ভাই রাজার হাতিকে পার করে দিয়েছে। কন্যার ওজন আর কত বেশী হতে পারে। তাই নিরাপদে কন্যাটি তার শক্ত সবল বাহুর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে—যে বাহু দুটি নিরাপদে বৈঠা চালিয়ে নিয়ে যাবে মেয়েটিকে গন্তব্যস্থলে।

ঠিক তেমনি তিস্তাপারের নির্জনতায় মাহুত বন্ধুর সংগে দেখা হলে কোন পল্লী-বালা তাকে আপন করে ভাববে, তাকে তার ভাল লাগবে—এটাই স্বাভাবিক এবং একটি বিশেষ বয়সের স্বভাবসিদ্ধ চিন্তা। কিন্তু প্রথম দর্শনের এই ভালবাসা তার

ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউটের ছবি পিয়া কী ঘর

মনে অনেক সংশয়, অনেক প্রশ্ন এনে দেয়। জীবনে জীবন যোগ করার আগে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে নেয় বন্ধুটির বাড়ী কোথায়। বিশেষ করে সে জানতে চায়ঃ

" সত্য করিয়া কও হে বন্ধু
ঘরে কয়জন নারী।"

মাহুত বন্ধুর জীবনে এই মেয়েটি প্রথম প্রেমিকা কিনা এ প্রশ্নটি তার মনে থাকবেই। কারণ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে তার স্বার্থ, বিবাহিত জীবনের সুখ আর সুন্দর ভবিষ্যত। তাই মনে তার একটি প্রশ্ন থেকে যায়— সে বারবার জিজ্ঞেস করে—কথা আদায় করে নিতে চায়, বন্ধুর কাছ থেকে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেঃ

"গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত
বন্ধুরে।"

মাহুত বন্ধুকে ভাল লাগলেও কিন্তু তাকে বাড়ীতে আসার আমন্ত্রণ জানানো সলজ্জ সংকোচের তাড়নায় মেয়েটির পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু ওটুকু এগিয়ে যাবার মত মানসিক প্রস্তুতি তাদের আছে যারা জল আনতে যায় কদম ফুল হাতে নিয়ে। পথে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। ভাল লাগে। ভালবাসে। সেই একই প্রশ্ন করে—বাড়ী কোথায় বা ঘরে কে আছে। তার পরেই গুয়া পান খাবার নিমন্ত্রণ জানায় মনে কোন দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব না রেখে ঃ

টালার নাকান সুপারী বন্ধু
কুলার নাকান পান
বাটা ভরা সুপারী আছে
আমার বাড়ী যান।

(পালির মত সুপারী আর কুলোর মত পান। বাটা ভরা সুপারী আছে আমার বাড়ী যেও)।

যৌবনের এই হঠাৎ দেখা সংগীর সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ এবং তাকে আমন্ত্রণ জানানোর পেছনে একটা আবেদন আছে। এই উৎকণ্ঠা এখানকার অনেক গানেই পাওয়া যায়। যেমন ঃ

ও বন্ধু ছাড়িয়া না যান রে
বুকে শ্যাল দিয়া
হাটিয়া যাইতে কমর ঢোলে
তাহারে কাংকিনী গাছের গুয়া।

(হে প্রিয় বুকে শেল দিয়ে ছেড়ে যেও না, হেঁটে যেতে কোমর পুরোনো সুপারী গাছের মত দোলে।)

এ দোলা যৌবনের দোলা—উদ্বেলিত হৃদয়ের দোলা—অনাস্বাদিত আনন্দের দোলা। তাই প্রেমেতে বন্দী মনের জ্বালা ওরা সহজ-ভাবেই স্বীকার করে ঃ—

"ঘোড়শালে ঘুড়ি বন্দী
মৎস বন্দী জলে
আমি নারী হইলাম বন্দী
তোমার প্রেম জালে।

অর্থাৎ ঘোড়াশালে যেমন ঘোটকী বন্দী হয়ে থাকে, জলে যেমন মাছ বন্দী, ঠিক তেমনি তোমার প্রেমে আমিও বন্দী। এই বন্ধন থেকে মুক্তি নেই। একে ছিন্ন করা সহজসাধ্য নয়—এই আকর্ষণ থেকে অব্যা-হতি নেই। এবং পল্লীর নারীটি এই সত্য-টিকে স্বীকার করতে লজ্জা পায় না। সে বলে ঃ

আরে দোলাবাড়ীত্ যেন ডিটকা মাটি
তোমরা হইলেন তেমন মোর গালার কাটি।

অর্থাৎ নীচু জলাভূমির যেমন এ্টেল মাটি তেমনি তুমি আমার গলার কাটি।

কিন্তু গলার কাটি হয়ে থাকার ইচ্ছে অনেকক্ষেত্রেই পূর্ণ হয় না। যে চলে যায় সে আর ফিরে আসে না। তাই এই ভাবনা ছড়িয়ে আছে এদের গানে। বিশেষতঃ সেই মেয়েটির ভাবনায় যে কাজল ভোমরা বন্ধু কবে ফিরে আসবে সেই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য ব্যস্ত। ব্যগ্র। বন্ধুটি যদি না ফেরে, যদি মেয়েটির মায়া ত্যাগ করে—এই শংকা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য সে বন্ধুকে বলছে ঃ

"যদি বন্ধু যাবার চান
ঘাড়ের গামছা থুইয়া যান।"

বন্ধুর স্মৃতিচারণের জন্য এই ঘাড়ের গামছাটির মূল্য মেয়েটির কাছে কম নয়। তাছাড়া এই গামছার টান তার বন্ধুটিকে টেনে আনবে একদিন। বন্ধু চলে গেল। শুধু পথ চেয়ে আর কাল গুনে বসে থাকা। কিন্তু অপেক্ষা তাকে করতেই হবে। কারণ সে জানে ঃ

গাছের বল লতাপাতা নদীর বল পানি
মাইনষের বল টাকা পয়সা, নারীর বল
সোয়ামী।

মেয়েটি উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায় থাকে আর গান গায় ঃ

"ওকি গাড়িয়াল ভাই হাকাও গাড়ি তুই
চিলমারির বন্দরে।
যেদিন গাড়িয়াল উজান যায়
নারীর মন মোর ডুবিয়া রয়
ওকি গাড়িয়াল ভাই—
কত রব আমি পন্থের দিগে
চায়য়া রে।"

কিন্তু না। বন্ধুটি এল না কাছে। সব চাইতে কষ্টের ব্যাপার নায়িকার ঘরের পাশ দিয়েই নায়ক চলাফেরা করে। কিন্তু লেনদেন তো দূরের কথা দেখা পাওয়াই দুরূহ। অবাধ্য উদ্বেলিত যৌবন। তাই সঙ্গহীনতা মেয়েটিকে দিনরাত পীড়া দেয়। মনের আগুনে দিনরাত জ্বলছে। সে স্বীকার করে ঃ

নলের আগুন তলে তলে
খাগড়ার আগুনে জ্বলে।
মুই অভাগীর বুকের আগুন
দিনে রাইতে জ্বলে।"

প্রেমাস্পদের সঙ্গে দেখা এবং তার সঙ্গে মিলনের জন্য প্রতীক্ষার যন্ত্রণার ভেতরেও একটা আনন্দ আছে। কারণ, বিরহ প্রেমের সর্বোৎকৃষ্ট দিক। কিন্তু যে মেয়েটি উপেক্ষিত? যে মেয়েটি দেখছে তার বন্ধু তারই আঙিনা দিয়ে অন্য একজনের বাড়ীতে যাচ্ছে তার মনের অবস্থা কি?

বন্ধুটি নানাভাবে তাকে অবহেলা করে। বন্ধুটি গান গায় কিন্তু মাথা তুলেও তাকায় না। জলের ঘাটে যাবার পথে মেয়েটি থমকে থমকে দাঁড়ায়। চোখে ইসারা করে। কিন্তু বন্ধুর মনে তা কোন রেখাপাত করে না। মেয়েটি ভাবে ঃ

"কিসের মোর রান্দোন
কিসের মোর বারোন
কিসের মোর হলদিবাটা
মোর প্রাণনাথ অন্যের বাড়ী যায়
মোরে—আঙিনা দিয়া ঘাটা।"

এই উপেক্ষা মেয়েটির কাছে অসহ্যকর। তাই সে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ঃ

"এ হেন যৈবন সাগরে ভাসাব
পাষাণে ভাঙিব মাতা।"

এই প্রেম পীরিতির আনন্দ এবং আর্তি ছড়িয়ে আছে ভাওয়াইয়া ও চটকা গানগুলিতে। এই গানগুলিতে আছে উদ্বেলিত যৌবন এবং বসন্তের উচ্ছ্বাস—যা, এখানকার গানের ভাষায়, এড়াতে পারে না নদীর পাড়, বনের পাখী, জলের মাছ, গাছের পাতা আর সেই বন্ধুটি যে গোসা করে থাকে, ঠিক তেমনি আছে বিরহ-বিলাপ এবং উপেক্ষিত যৌবনের করুণ কান্না। হতাশা, ক্লান্তি আর হাহুতাশ। তবুও এরা হাসে, গান গায়, ধান কাটে, ধান ভানে আর নতুন বন্ধুর খোঁজ করে। কেউ পায়, কেউ পায় না। দিন গড়িয়ে চলে

—অরিজিৎ চক্রবর্তী

ফিল্ম ইন্স্টিটিউটের ছবি　:　ডিস্অ্যাপয়েন্মেন্ট
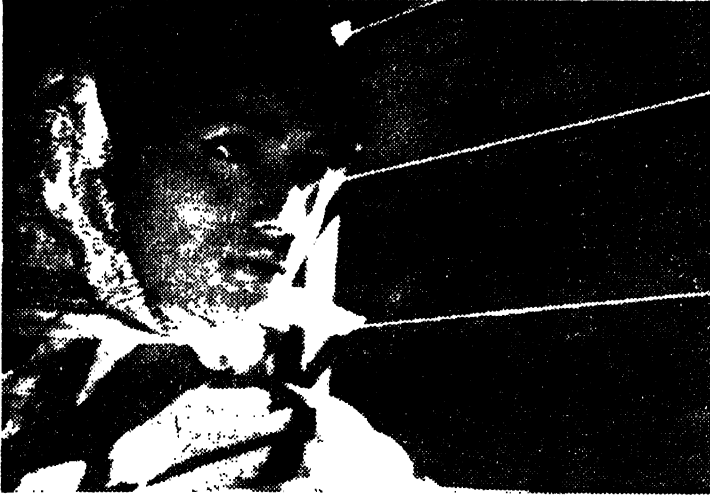
অন্য চিন্তা

নাটকের নাটকীয়তা আর সিনেমার নাটকীয়তার মধ্যে ফারাক কতটুকু? একজন চিত্র সমালোচককে এ প্রশ্ন করেছিলুম একবার; জবাবে তিনি শুধু বলেছিলেন—'নাটকের নাটকীয়তা বেশীর ভাগ সময়ই রসাশ্রয়ী, সিনেমার সেই একই বস্তু অতি নাটকীয়।'

উত্তরটা ঠিক পরিষ্কার হয় নি তখন। কিছু দিন বাদে যখন একটা একাঙ্কিকা পড়লাম কিছুটা বুঝলাম ব্যাপারটা। সেই একাঙ্কিকা আর নির্মীয়মান একখানা ছবির চিত্র-নাট্যের কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। ফারাকটা নিশ্চয়ই স্পষ্ট হবে।

সেন—(আবেগে) প্রিয়! তোমাকে আজ দেখা-মাত্র একটা কথাই আমার বার-বার মনে হচ্ছে চিত্রা!

মিত্রা—কিন্তু দিদির চিঠিতে জেনেছি আপনাকে জয় করার আশা সে ছাড়ে নি। আপনার জীবনের ঝড় যখন থেমে যাবে, তখনই সে আপনাকে পাবে, এই আশায় সে বসে আছে।

সেন—তবে তাকে ধৈর্য্যের জন্য অপেক্ষা করতে বলো চিত্রা। আর তুমি এসো আমার জীবনে। আমার জীবনের দ্বীপে উঠে পড়ো চিত্রা!

মিত্রা—কলঙ্কের ভয় করেন না আপনি?

সেন—কলঙ্ক আছে বলেই না ঐ চাঁদ এত সুন্দর। সেই যৌবনই যৌবন, যা কলঙ্কের ভয় রাখে না—যা বেপরোয়া।

মিত্রা—মানি। কিন্তু বেপরোয়া জীবনে আমাদের দুজনের বাঁধন যদি খসে যায়? যদি আমি ছুটে চলে যাই আর কোনোখানে? ভালো যদি লাগে আমার অন্য কোনো জীবন? সইতে পারবেন আপনি সেটা?

সেন—হুঁ বুঝেছি। তোমার দিদি বলেন একনিষ্ঠ প্রেমের কথা। কিন্তু চিত্রা, জীবনটা অনেক বড়ো। মানুষের মন বড় তার চেয়েও। কোনো বন্ধনে বাঁধা পড়া মানেই জীবনটাকে ছোটো করা। তাই নয় কি চিত্রা?

মিত্রা—হুঁ!

সেন—চলো, আমরা বেরিয়ে পড়ি।

বাহাদুর—চা।

সেন—থাক চা। বাইরে উঠেছে জোৎস্না। ঐ জানলা দিয়ে দেখ কাঞ্চনজঙ্ঘা। চলো বেরিয়ে পড়ি। তুমি ওভারকোটটা নাও। কি ভাবছো?

মিত্রা—ভাবছি অনেক কিছু। ভাবছি দিদি আপনাকে পেলো না—পেলাম কিনা আমি। মনে পড়ছে আজ 'চিত্রাঙ্গদা'র কথা।

এবারে দেখুন চিত্র-নাট্যের কিছু অংশ।

নীলা—(ব্যথিত সুরে) ছলনা?

অমল—হ্যাঁ। তাছাড়া আর কি? ঘরে-বাইরে সর্বত্র তো তাই করেছেন? এটা ভাবছেন না যে তাতে আপনার যা হবার তা তো হবেই! কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করে আরেকজন তার ফল ভোগ করবে!

নীলা—সে ভাবনাও তাদের।

অমল—সে ভাবনা ভাববার সুযোগ তাদের দিয়েছেন আপনি? বলেছেন কিছু সে ব্যাপারে?

নীলা—না, বলি নি; বলব না। ভাবব না। ওসব ভাববে সুখী লোকেরা। যারা খায়-দায় বড়-বড় কথা বলে। আপনার মত বড় লোকেরা। যারা দূরে থেকে অভাব দেখে। আমাদের চিন্তা শুধু খিদের চিন্তা। আমরা একঘরে।

অমল—বড়-বড় কথা বলে, দূরে থেকে অভাব দেখে, তারা কখনও কাঁধ মেলায় না। একঘরেদের সঙ্গে মেলামেশা করে না। লোক চিনতে হলে আপনার ব্যবসা চলবে কি করে?
(নীলার চোখ জ্বলে ওঠে এবার)

নীলা—ব্যবসা? কি বলতে চাইছেন আপনি?

অমল—যা বলছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন! আপনার কাজে বুদ্ধি ছাড়াও আরো একটা জিনিসের দরকার হয়। সেটা আপনার জানা আছে।

নীলা—আছে! সেটা জানা ছিল না। সেটা এই যে, আপনি একজন মেয়েকেও আওতায় পেয়ে অপমান করতে পারেন! এটা ভাবতে পারি নি।

অমল—কেন পারেন নি? সকালে রেস্তোরাঁয় তো আমার পরিচয় আপনার জানা হয়ে গিয়েছিল।

নীলা—ভুল তো হয় মানুষের! আর আমি তো সাধারণ মেয়ে!

অমল—সহানুভূতি চাইছেন? কোন্ অধিকারে? কখনও ভেবেছেন তার যোগ্য কিনা আপনি? কখনও ভেবেছেন তার দাম দিতে পারেন কিনা?
(নীলা কিছু সময় পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। চোখে জল। কান্নায় ভেঙে পড়ল। দু হাতে মুখ ঢাকল সে।)

অমল—নীলা! (নীলা মুখ ঢাকা অবস্থায় মাথা নাড়তে লাগল।)

নীলা—আমি কিছু চাই নি......আমি কিছু চাই নি। আমাকে......আমাকে দয়া করুন আপনি!
(নীলা কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে। তার দিকে চেয়ে অমলের দৃষ্টি কোমল হয়ে গেল। উঠে নীলার কাছে গেল। কাঁধে হাত রাখল তার। নীলা সঙ্কুচিত হয়ে গেল।)

দুটো দৃশ্যের চরিত্র, গঠন, পূর্ণ ঘটনা ইত্যাদির মধ্যে মিল কিছু নেই ঠিকই কিন্তু নাটকীয়তা বস্তুটি দু জায়গাতেই আছে স্বীকার করতে হবে। এ নাটকের ড্রামাটিসিজম নাটকের গতিকে এগিয়ে নিয়েছে বেশ দ্রুত তালে। কিন্তু চিত্রনাট্যে যে ড্রামাটিসিজম তা কি যথেষ্ট রসোত্তীর্ণ? তার ওপর আবার পর্দায় দেখার সময় ছোট-ছোট শর্টে বেশ কয়েকটা ক্লোজ-আপও থাকবে। তাতে নাটকীয়তা আরও বাড়বে নিশ্চয়ই!

সুতরাং মঞ্চ আর পর্দায় দর্শকের দূরত্ব যতটা নাটককেও সেই অনুপাতে দূরে সরিয়ে রাখা বুঝি যথেষ্ট শিল্পরসবোধেরই পরিচয় দেয়।

—চিত্রলেখক

খেলার কথা

ফাস্ট বোলিং—সেকাল ও একাল

কমল ভট্টাচার্য

এবারের কলকাতার টেস্ট ম্যাচের পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সিলেকসন কমিটির চেয়ারম্যান বিজয় মার্চেন্ট অবসর বিনোদনের জন্যে কলম্বোতে গিয়েছিলেন। সেখানকার ক্রিকেট রসিকরা সদ্যসমাপ্ত ভারত-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট সম্পর্কে কিছু জানতে চান। ফাস্ট বোলিংয়ের ব্যাপারে ভারতীয় দল তেমন গুছিয়ে নিতে পারছেন না কেন ?— সেখানকার ক্রিকেট রসিকদের এধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মার্চেন্ট ঘেমে ওঠেন। এক সময়ে যে বিজয় মার্চেন্ট বিশ্বের কোন ফাস্ট বোলারকেই আমল দেন নি, ব্যাটিংয়ের গোড়াপত্তন করতে গিয়ে সেঞ্চুরী, ডবল সেঞ্চুরীর আগে যাঁর কখনও কোন অস্থিরতা প্রকাশ পায়নি, সেই হেন মানুষ আজকের ফাস্ট বোলিং সম্পর্কে দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে লজ্জায় কুঁকড়ে রইলেন।

'কি লজ্জার কথা বলুন ত!' এক মাথা কোঁকড়ান সাদা-পাকা চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে মার্চেন্ট সেদিন ফ্যাকাশে চোখের চাউনি মেলে এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন, 'একটা একটা করে যদি দুটো ফাস্ট বোলার পাওয়া যেত! যদি মহম্মদ নিসার এবং অমর সিংয়ের মত দুটো জাঁদরেল ফাস্ট বোলার আজকের দলে ঢোকাতে পারতাম—তাহলে ?' একটু ঢোক গিলে হয়ত বলতে চেয়েছিলেন, 'অন্ততঃ যদি সুঁটে ব্যানার্জির মত ফাস্ট বোলার থাকত ?' মুহূর্তের মধ্যে সাদা তামাটে চেহারায় কে যেন লাল আবির ঢেলে দিল। উত্তেজনায় মার্চেন্ট বুঝি থরথর করে কেঁপে উঠলেন। দাঁত কামড়ে সামলে নিয়ে হয়ত বলতে চেয়েছিলেন, 'আজ যদি যৌবন থাকত, যদি সেই সোনার দিনগুলো একবার ফিরে পেতাম তাহলে দেখিয়ে দিতাম খেলা কাকে বলে! ফাস্ট বোলিং, বাম্পার-বীমার এগুলো কি কোন সমস্যা নাকি ?'

মার্চেন্টের এই পরিবর্তন সবাই লক্ষ্য করলেন। কিন্তু মুখে কিছু তাঁরা বললেন না। বেশ ভালই লাগল তাঁদের, ঠিক যেন যৌবনের বিজয় মার্চেন্ট। সোলার হ্যাটটি পরা, গলায় রুমাল বাঁধা, হাসিখুশী মুখ, ব্যাট হাতে ক্রিজে এগিয়ে চলেছেন। কখন ফিরবেন কে জানে ? বোলারদের কাছে মার্চেন্ট যেন দুর্ভেদ্য প্রাচীর। ভেদ করে কার সাধ্য। তাঁর যেমন স্কোয়ার কাট, তেমনি কভার ড্রাইভ দর্শনীয়। মন মাতান খেলা। সে খেলায় চঞ্চলতা নেই, কোন ফাঁকও নেই। 'কপি বুক' ক্রিকেট বলতে যা বোঝায় মার্চেন্টের খেলা ছিল ঠিক তাই।

এইসব ভাবতে ভাবতেই সবাই আনমনা হয়ে পড়েন। মার্চেন্ট গলা খাঁকারিয়ে তটস্থ হয়ে উঠলেন। যা ছিল তা আজ আর নেই! পুরোনো কথা ভেবে লাভ কি ? শ্রোতারা মার্চেন্টের দেখাদেখি সজাগ হলেন। তাইতো কি সব আবোল-তাবোল ভাবনা। সবাই নড়ে চড়ে আবার জেরায় বসলেন। মার্চেন্ট সেই সচকিত ক্রিকেট অনুরাগীদের কিন্তু খুশী করতে পারেননি। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বলে ওঠেন—'না ভাই, তামাম ভারত ঘুরেও একটা ফাস্ট বোলার খুঁজে পাইনি। একটিও না। দেখাই যাক কি হয়।'

ইডেনে টেস্ট ম্যাচের ঠিক দুদিন আগে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার প্র্যাকটিশ দেখতে অনেকেই গিয়েছিলেন। সেই অগণিত এক ক্রিকেটারকে দেখে বহু ক্রিকেট রসিকই হাঁ হাঁ করে উঠলেন। পরিচিত খেলোয়ার বন্ধুরা চেঁচিয়ে উঠলেন—'এসো বিমলদা এসো। একবার দেখে যাও ভারতীয় দলের প্র্যাকটিশ— ফাস্ট বোলিংয়ের মহড়া। ভারতীয় দলে বাংলার সুব্রত গুহকে দেখেছ কি ? বিমল মিত্তির, বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, চালচলনে পাকা ক্রিকেটার বলে মনে হয় না। পান চিবোতে চিবোতে এগিয়ে এলেন একগাল হাসি নিয়ে। লক্ষ্য করলে ধরা যায়, ভদ্রলোক একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। আজকের ছেলেরা সচকিত চাউনী মেললেন বিমল মিত্তিরের দিকে। নাক সিঁটকালেন প্রথম দেখা দেখেই। কি আনস্মার্ট চেহারা! যাঁরা বিমল মিত্তিরকে জানেন তাঁরা মুখ খুললেন। বিনা দ্বিধায় বলে উঠলেন—'আজও যা সেদিনেও তাই ছিল। বয়সের ভারে যা বেঁকে পড়েছে। যেন ভাজা মাছ উলটোতে জান না।' কিন্তু কি যে হয়, বল পেলেই বিমল অগ্নিমূর্তি। পা গুনে গুনে ঠিক চৌত্রিশ পা দৌড়ে বল করতেন। তবে ঐ জোরের সঙ্গে যদি বোলিংয়ের তাল আর নিশানা ঠিক থাকত তাহলে কাউকে আর ধরে খেঁষতে হত না। কোথায় লাগে সুঁটে ব্যানার্জি। বল করে যখন উইকেট ছিটকে যেত তা দেখে বুক ঢিপ ঢিপ করত। ধন্যি খেলোয়ার এই বিমল মিত্তির। এই ধরনের আলাপ আলোচনায় বিমল মিত্তির আর দাঁড়ায় কি করে। তখন সবাইয়ের দৃষ্টি তাঁর ওপর। অগত্যা তিনি মুখ খুললেন বন্ধুবর খোকন সেন এবং পণ্টু চৌধুরীর কাছে—'ভাইরে শুনলাম রঞ্জি ট্রফির খেলায় বাংলার হয়ে যারা এক সময় খেলেছিল তাদের নাকি একটা করে টেস্ট ম্যাচের টিকিট দেওয়া হবে। হ্যাঁরে পাব ত।' তাঁর কাকুতি-মিনতি দেখে বন্ধুরা মজা পেলেন। তাঁরা যেন সেই পুরোন দিনের বন্ধু বিমলদাকেই খুঁজে পেয়েছেন। গল্পে গল্পে সবাই তন্ময় হয়ে গেলেন।

'বিমলদা, ঐ সাহেব খেলোয়াড়টা তোমায় বড্ড মারছে যে। একটু সমঝে বল দাও দিকি।' ব্যাস আর রক্ষে নেই। দুম্ দাম বল ছুঁড়তে লাগলেন তিনি। মেজাজ তাঁর সপ্তমে যতক্ষণ না সেই সাহেবকে আউট করতে পারছেন। খেলেছেন এরিয়ান্স ক্লাবে। এক সময় তাঁর সহজুটি বোলার ছিলেন সুঁটে ব্যানার্জি।

সাহেবদের আমলে বাংলা দলে তাঁর স্থান হয়নি। সাহেবরা বলতেন, মিত্তির বড় 'ইর‍্যাটিক'। বাংলার হয়ে রণজি ট্রফিতে খেলেছেন বেশ কিছুকাল বাদে। তখন তাঁর

সুঁটে ব্যানার্জি

খেলার পদ্ধতি করুন। ১৯৪৫ সালে হোলকারের মুস্তাক আলী বিমলের বলে খেলতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেন। বাংলার এই অজানা ফাস্ট বোলারের এত তেজ! ভাবাই যায় না। চটপট ফিরলেন তাঁবুতে 'থাই প্যাড' লাগাতে। বিমল ভাবলেন, এবার মুস্তাকের মাথা গুঁড়িয়ে দেবেন। কিন্তু মুস্তাক বলে কথা। মারের ঠেলায় বিমলকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়লেন। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। এখন বল হাঁকিয়ে কেউ জোর বল দিতে চান না। শেষবেশ বন্ধুদের মধ্যস্থতায় বিমল মিত্তির টিকিট পেলেন। আর কথা নয়। মাঠে বড় হুড়ো-হুড়ি। হাসতে হাসতে বিদায় নিলেন সেকালের বাংলার জোর জবরদস্ত ফাস্ট বোলার বিমল মিত্তির।

'হ্যাঁরে, ম্যাটিনী শো-তে সিনেমা যাবি।' প্যাভিলিয়নের ড্রেসিংরুমে বসে কথাগুলো বললেন সেকালের ফাস্ট বোলার সুঁটে ব্যানার্জি। তেড়ে উঠে বললাম—'বলিস কি তুই, সাহেবদের সঙ্গে খেলা! তুই কি কোন-দিন 'সিরিয়স' হবি না।' মুচকি হাসি খেলে গেল সুঁটের ঠোঁটে। তাচ্ছিল্যের সুরে সুঁটে বলে উঠল—'দূর, বৃষ্টি-ভেজা মাঠে খেলবে কে? গোটা দলকে সাবাড় করতে কঘণ্টাই বা লাগবে। যাবি কিনা বল্!' চুপ করে থাকতে দেখে সুঁটে দাঁড়িয়ে উঠল। হাতের সিগারেট আঙুলের ডগা দিয়ে ছিটকে ফেলে দিয়ে হাতের আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে সুঁটে গলার স্বর একটু নামিয়ে বলে বসল—'সাহেবদের রক্ত দেখেছিস!' এবার রেগে উঠলাম। কিন্তু সুঁটে হেসে অস্থির। ভারি গলায় হো হো হাসি শুনে সেদিন পাশের ড্রেসিংরুমে সাহেবরা হত-বুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন।

বৃষ্টিভেজা মাঠে সুঁটে বোলিংয়ের মারাত্মক অস্ত্র যে ছুঁড়বে সে-কথা ভেবেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। একরোখা মানুষ, বলেও যা করেও তা।

ম্যাটিনী শো-তে আর যাওয়া হয়নি, তবে বেশ কয়েকজন সাহেব খেলোয়াড়দের খুঁখনী ফাটিয়েছিলেন। সেরকম ভয়ঙ্কর বোলিং খুব কম দেখেছি আমি।

মুরেসদয়ে কথা বলা, বনিয়ে-মানিয়ে চলা এ তার ধাতে সইত না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে নিজের আখের নষ্ট করেছে। বোলিংয়ে যার এত তেজ সেই হেন মানুষের ভাগ্যে একবারের বেশি অফি-শিয়াল টেস্ট খেলার সুযোগ ঘটেনি। তাও প্রবীণ বয়সে।

১৩ই জানুয়ারী, ১৯৪৯। এলাহাবাদে ইস্ট জোনের কাছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হার হয়েছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফলো অন করে ২য় ইনিংস খেলতে নেমে ১৮৪ রানে আউট হয়। ১ম ইনিংসে সুঁটে উইকেট পাননি; পেয়েছিলেন গিরিধারী ও হীরালাল গাই-কোয়াড়। তবে ম্যাচ জেতালেন সুঁটে একাই। তাঁর ২য় ইনিংসে বোলিং এ্যাভারেজ ছিল ২০—১—৬৭—৭। যে সাতজনকে তিনি আউট করেছিলেন, তাঁরা হলেন—ফেরু, স্টলমেয়র, ওয়ালকট, গডার্ড, গোমেজ, ম্যাকওয়াট এবং ক্যামেরণ।

এরপর শেষ টেস্ট ম্যাচ বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। খেলা ড্র হলেও ২য় ইনিংসে তিনি যে বোলিং এ্যাভারেজ দেখান, তা লক্ষ্য করার মত (২৪-৩—৫—৫৪—৪)।

ইদানী কালে ফাস্ট বোলার চোখে পড়ে না। টেস্ট পর্যায়ের খেলায় এমন কোন বোলার নেই যাকে দিয়ে ভারতীয় দলের গোড়াপত্তন করা যায়। অথচ এ-সমস্যা মেটাতে না পারলে ভবিষ্যতে টেস্ট খেলায় ভারতের সুনাম রাখা দায় হবে।

দেখা গেছে, খেলোয়াড়দের জোর করেও ফাস্ট বোলিংয়ের মহড়া দেওয়া যায় না। এঁদের অভিযোগ, প্রাণহীন উইকেটে বল জোরে ফেলার কোন সার্থকতা নেই। নিষ্প্রাণ উইকেটে ব্যাটসম্যানদের স্বর্গ তৈরী হয়ে রয়েছে। স্পিনাররাও এই ধরনের উইকেটে কিছু সুবিধে করতে পারে না। ইডেনে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ম্যাচে ভারতের স্পিনার বিষেণসিং বেদী যেমন একাই একশ' সেজে বসেছিলেন, অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ার গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি সম্পর্কেও সে-কথা বলা যায়। কিন্তু প্রসন্নর ভাল বোলিংয়ের কি কেউ মূল্য দিয়েছিলেন?

সে-কথা যাক। নিষ্প্রাণ উইকেটেও ফাস্ট বোলিং যে করা যায়, সে-প্রমাণ ত' গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জিই দিয়ে গেলেন। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই বোলারটি খুব জোরে বল দেন না, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি দেখে আমরা সবাই অবাক হয়েছি।

এবার শেষ করি। বিখ্যাত তবলচি হীরু গাঙ্গুলীর বাড়ি গিয়ে দেখি, তিনি তবলার মহড়ায় ব্যস্ত। ইসারায় বসতে বললেন। কথা বলবেন কি, মুখের বোল হাতের চাঁটিতে মেলাতে তিনি অস্থির। কিন্তু তবলা এত ঢিমে তালে চলছে কেন? মহড়ার ফাঁকে হীরুবাবু বুঝিয়ে বললেন—দ্যাখ, তবলা নামিয়ে ঢিমে লয়ে হাত চালাতে কষ্ট হয়। স্পিড বাড়াতে হবেই এই মনোভাব নিয়েই অভ্যাস করে চলি। হেসে বললেন—ফল পাওয়া যায় বৈকি! সময়ে চড়া সুরে যখন তবলায় হাত চালাব, তখন বোলের খৈ ফুটবে।
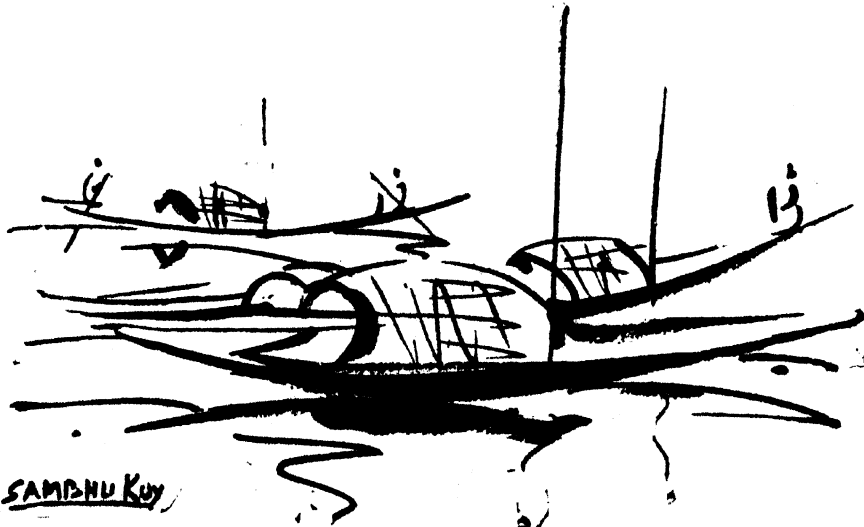
দাবার আসর

রাজ্য চ্যাম্পিয়নশীপ থেকে আরো কয়েকটি খেলা দেখুন। প্রথম খেলাটি বাংলার ২নং খেলোয়াড় নরেন মাজীর সংগে ৪নং খেলোয়াড় শ্রীদেবব্রত শেঠের সংগে। নরেন মাজীর ওপনিং বরাবরই দুর্বল, কিন্তু মাঝের এবং শেষের খেলায় ওস্তাদ। শ্রীশেঠ মাজীর দুর্বল ওপনিং-এর সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। সাদা—নরেন মাজী, কালো—দেবব্রত শেঠ। রাজ্য চ্যাম্পিয়নশীপ, ১৯৬৯।

(১) ব—রা ৪ : ব—ম গ ৪ : (২) গ—গ ৪ : ব—রা ৩ (৩) ঘ—ম গ ৩ : ব—ম ন ৩ (৪) ব—ম ন ৪ : ম—গ ২।

[৪......ঘ—ম গ ৩ চালটা বোধ হয় আরো ভালো, কারণ ঘোড়াটা কালোর রা ৪ এবং ম ৫ দুটি ঘরই দেখবে। মন্ত্রীটা নিজের ঘরে থাকলে কালো সহজেই ব—ম ৪ চাল দেবার ব্যবস্থা করতে পারত, যা সাদার রাজাগজকে আটকে রাখার জন্যে দরকার। সাদা যদি খেলাটাকে পরিষ্কার সিসিলিয়ান ডিফেন্সের দিকে নিয়ে যায়, তাহলে কালো কোন না কোন সময় ম—গ ২ চালটা দেয়, কিন্তু সাদা সিসিলিয়ান ডিফেন্সের দিকে এগুলোই না। কালোর উচিত নিজের রাজাগজকে ঘোড়া ২ ঘরে এবং রাজা-ঘোড়াকে রাজা ২ ঘরে তুলে খেলা। যখন কালোর ব—ম ৪ চালটা একটা মারাত্মক চাল হয়ে যাবে। তখন সাদার পক্ষে ঐ চালটা বাধা দেবার আর কোন উপায়ই থাকবে না।]

(৫) ব—ম ৩ : ঘ—রা গ ৩ (৬) ঘ—গ ৩ : ঘ—গ ৩ (৭) ০—০ : গ—রা ২ (৮) ব—ন ৩ : ০—০ (৯) ন—রা ১ : ব—ম ৩ (১০) গ—গ ৪ : ম—ম ১ (১১) ব—রা ৫ : ঘ—রা ১ (১২) ব×ব : ঘ×ব (১৩) গ×ঘ : ম×গ (১৪) ঘ—রা ৪ : ম—গ ৫

[ঘুটিগুলিকে খেলাবার ব্যবস্থা না করে মন্ত্রীটাকে খেলবার জন্যে ব্যস্ত হওয়া অনেক সময়ই খারাপ। এতে সাদার ঘুটি-গুলি মন্ত্রীকে আক্রমণ করে নিজেদের ভাল-ভাবে সমাবেশ করে নিতে পারে। অন্তত সেই কারণে কালোর (১৩)......গ×গ চালটা ভালো ছিল।]

(১৫) ব—গ ৩ : গ—ম ২ (১৬) ঘ—ঘ ৩ : ম ন—ম ১ (১৭) ন—রা ৪ : ম—ন ৩ (১৮) ব—ন ৫ : ব—গ ৪ [এই চালটার ফলে কালোর খেলা খানিকটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। এর পরের চালগুলি ঠিকমত দিতে পারলে এই চালটা ততটা খারাপ নয়।]

(১৯) ন—রা ২ : ন—গ ৩ [কিন্তু কালোর এই চালটা চলে না। কালো সাদার ২১ নং চালটা বোধ হয় ধরতে পারে নি। (১৯)......ব—গ ৫ চালটা দেয়া খুবই উচিত ছিল, তাতে অন্ততপক্ষে বড়েটা যায় না, এবং কিছু বিপরীত আক্র-মণ করা যায়।]

(২০) ম—ঘ ৩ : গ—ম গ ১। ১ নং চিত্র দেখুন। (২১) ঘ×ব! : ন×ঘ (২২)
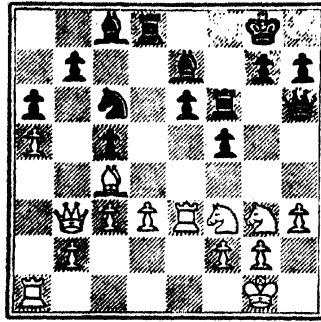
১নং চিত্র
কালোর ২০নং চাল গ — মগ ১-এর পরের অবস্থা

ন×ব : গ×ন (২৩) গ×গ+ : রা—ন ১ (২৪) গ×ন : গ—ম ৩ (২৫) ম—ন ৪ : গ—গ ২ (২৬) ন—রা ১ : ম—গ ৩ (২৭) গ—রা ৪ : ন—রা গ ১ (২৮) গ×ঘ : ব×গ (২৯) ম—রা ৪ : গ×ব (৩০) ম—রা ৭ : ব—ন ৩ (৩১) ম×ম : ন×ম (৩২) ন—রা ৭ : ন—ম ৩ (৩৩) ঘ—রা ৫ : রা—ন ২ (৩৪) ব—রা গ ৪ : গ—ঘ ৩ (৩৫) রা—গ ১ : গ—ম ১ (৩৬) ন—রা ৮ : গ—ন ৫ (৩৭) ব—গ ৫ : ন—গ ৩ (৩৮) ব—রা ঘ ৪ : ব—ঘ ৪ (৩৯) ন—রা ৭+ : রা—ঘ ১ (৪০) ঘ—ম ৭ : ন—গ ২ (৪১) ন—রা ৮+ : রা—ঘ ২ (৪২) ম×ব। কালোর হার স্বীকার।

এই খেলায় শ্রীশেঠের হার দেখে যদি কারও মনে অন্য রকম কোন ধারণা হয়, তাকে নীচের খেলাটি দেখতে অনুরোধ করি। এই খেলাটিতে বাংলার ১ নং খেলোয়াড় শ্রীআনন্দ ঘোষ পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। গত রাজ্য চ্যাম্পিয়ন-শীপে শ্রীঘোষ এই একটি মাত্র বাজীই হেরে-ছিলেন। সাদা—আনন্দ ঘোষ, কালো—দেবব্রত শেঠ। নিমজোইন্ডিয়ান ডিফেন্স।

(১) ব—ম ৪ : ঘ—রা গ ৩ (২) ব—ম গ ৪ : ব—রা ৩ (৩) ঘ—ম গ ৩ : গ—ঘ ৫ (৪) গ—ম ২ : ব—ম ৪ (৫) ব—রা ৩ : ০—০ (৬) ঘ—গ ৩ : ব—গ ৩ (৭)
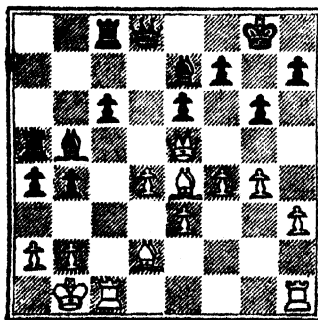
২নং চিত্র
কালোর ২৬নং চাল ন — ন ৪-এর পরের অবস্থা

গ—ম ৩ : ম ঘ—ম ২ (৮) ম—ঘ ৩ : গ—ম ৩ (৯) ব—রা ন ৩ : ন—রা ১ (১০) ০—০—০

[মন্ত্রীর বড়ের ওপনিংয়ে মন্ত্রীর দিকে রাজাকে দুর্গবন্ধ করায় অত্যন্ত বেশী ঝুঁকি নিতে হয়। এই জন্যে গ্র্যান্ড-মাস্টারদের খেলায় এই চালটা খুব কম দেখা যায়। সেন্টার একেবারে বন্ধ থাকলে হয়ত এই চাল দেয়া যেতে পারে, কিন্তু এখন তো সেন্টারে বেশ টেনসন বজায় রয়েছে। কালোর এই ত্রুটিকে সাদা বেশ সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছে।]

(১০)...ব×ব (১১) গ×ব : ব—ম—ঘ ৪ (১২) গ—ম ৩ : ব—ম ন ৪

[কালো সুন্দর পন্ - স্টর্ম করছে। দুই রাজা যখন ছকের একদিকে কোট না বেঁধে বিপরীত দিকে কোট বাঁধে, তখন যে পক্ষ আগে বিপক্ষকে এইভাবে বড়ের আক্র-মণ করতে পারে, সে পক্ষই সাধারণতঃ জয়ী হয়। সাদার পন - স্টর্ম এখনো সুরুই হয়নি।]

(১৩) ঘ—রা ৪ : গ—রা ২ (১৪) ঘ×ঘ : ঘ×ঘ (১৫) ঘ—রা ৫ : ম—ম ৩ (১৬) ম—গ ২ : গ—ঘ ২ (১৭) ঘ—ঘ ৪

[যে পক্ষ বেকায়দায় পড়েছে, সে পক্ষ সব সময় যত পারে ঘুটি বদল করতে চাইবে, দাবা খেলার এই সাধারণ নিয়ম অনুসারে।]

(১৭)......ব—ঘ ৩ [তা না হলে (১৮) ঘ×ঘ+ : গ×ঘ (১৯) গ×ব+]

(১৮) ঘ×ঘ : গ×ঘ (১৯) গ—রা ৪ : ব—ঘ ৫ (২০) ব—গ ৪ : গ—রা ২

(২১) রা—ঘ ১

[এই মুহূর্তে অপ্রয়োজনীয় চাল। এখনি ব—ঘ ৪ চালটা দেয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।]

(২১)......ব—ন ৫ (২২) ম—গ ৪ : রা ন—ম গ ১ (২৩) ন—ম গ ১ : গ—ন ৩ (২৪) ম—গ ৫ : ম—ম ১ (২৫) ম—রা ৫ : গ—ম ঘ ৪ [কালো ১টি সুন্দর ট্র্যাপ তৈরী করতে চলেছে। সাদার মন্ত্রী যে সেন্টারেই মারা পড়তে পারে সাদার সেদিকে খেয়াল নেই।]

(২৬) ব—রা ঘ ৪ : ন—ন ৪। ২ নং চিত্র দেখুন। (২৭) গ×ঘ ব চালটা দিল এই আশায় যে (২৭)......গ—ম ৬+ (২৮) গ×গ : ন×ম (২৯) গ ব×ন এবং মন্ত্রীর বদলে অন্ততপক্ষে ১টি নৌকা এবং একটি গজ পাওয়া যায়। কিন্তু কালোর একটি সহজ উত্তর রয়ে গেছে ন ব×গ এবং সাদার খেলা আর বাঁচানো যায় না।]

(২৭)......ন ব×গ (২৮) ম—রা ৪ : ম—ম ৪ (২৯) ম×ম : রা ব×ম (৩০) ব—ন ৩ : গ—ম ৬+ (৩১) রা—ন ১ : ন—ঘ ৪ (৩২) ব×ব : গ×ব (৩৩) গ—গ ৩ : ন (১) —ঘ ১ (৩৪) ন—ন ২ : গ×গ (৩৫) ন×গ : ন—ঘ ৬ (৩৬) ন×ব : ব—ন ৬ (৩৭) ন—গ ১

[যদি (৩৭) ব×ব তাহলে (৩৭)... ন×ব + (৩৮) ন—ন ২ : ন—ঘ ৮ মাৎ]

(৩৭)......ব×ব + (৩৮) ন×ব : ন×ন সাদার হার স্বীকার। —গজানন্দ বোড়ে

দর্শক

জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান

কটকের বারবাটি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ২৫তম জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান মহাসমারোহে শেষ হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য এসোসিয়েশন, সার্ভিসেস এবং রেলওয়ে দল—এই সমস্ত নিয়ে মোট ২২টি ক্রীড়া সংস্থার প্রায় ২,৫০০ জন প্রতিনিধি ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। উড়িষ্যার রাজ্যপাল ডঃ এস এস আনসারী জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। যোগদানকারী প্রতি-যোগিদের পক্ষ থেকে শপথ গ্রহণ করেছিলেন উড়িষ্যা রাজ্য দলের অধিনায়িকা কুমারী অলকা মিত্র। কোনারকের পবিত্র সূর্যমন্দির প্রাঙ্গণে সূর্যরশ্মির সাহায্যে যে পূতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয় তা দৌড়বীররা ৬০ মাইল দৌড়ে কটকের বারবাটি স্টেডিয়ামে বহন করে আনেন। স্টেডিয়ামের একটি আধারে এই অগ্নি ক্রীড়ানুষ্ঠানের সমাপ্তি সময় পর্যন্ত অনির্বাণ ছিল।

উড়িষ্যার বি সিংহ বালকদের (১৮ বছরের নীচে) ৮০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান পাওয়ার সূত্রে আলোচ্য ক্রীড়ানুষ্ঠানে প্রথম স্বর্ণ পদক জয়ের গৌরব লাভ করেন। অ্যাথলেটিক্স বিভাগে ১৮টি নতুন জাতীয় রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে—পুরুষ বিভাগে ২টি, মহিলা বিভাগে ১টি এবং বালক ও বালিকা বিভাগে ১৫টি। বড়দের বিভাগে বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা অ্যাথলীট অজ্ঞাত-কারণে ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করেননি এবং যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁরাও স্ব-প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড অথবা অপরের পূর্ব প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড ভাঙ্গতে পারেননি। বড়-দের বিভাগে নতুন রেকর্ড করেছেনঃ পুরুষ বিভাগে ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণে পাঞ্জাব দলের কিষেণ সিং (সময় ৪ ঘণ্টা ১৯ মিনিট ৪৬·৪ সেকেণ্ড) এবং সটপুটে সার্ভিসেস দলের যোগীন্দর সিং (দূরত্ব ১৭ মিটার); মহিলা বিভাগে ৪—১০০ মিটার রীলেতে মহীশূরের মহিলা দল (সময় ৪৯·৩ সেকেণ্ড)। পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড় ১০·৬ সেকেণ্ডে শেষ করে প্রথম হয়েছেন মহীশূরের ২৪ বছরের অ্যাথলীট এ এফ রামস্বামী। ১৯৬৫ সালে রেলওয়ের কেনেথ পাওয়েল ১০০ মিটার দৌড়ে যে ভারতীয় রেকর্ড (১০·৪ সেঃ) করেছিলেন তা আজও অক্ষুণ্ণ রয়ে গেল।

পুরুষদের ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণে স্বর্ণপদক বিজয়ী এবং নতুন রেকর্ড স্রষ্টা কিষেণ সিং (পাঞ্জাব)

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল

অ্যাথলেটিক্স বিভাগ

দলগত চ্যাম্পিয়ান ঃ

পুরুষ বিভাগঃ ১ম উত্তরপ্রদেশ (৪০ পয়েন্ট), **২য়** বিহার (৩৭ পয়েন্ট), ৩য় কেরালা (৩২ পয়েন্ট)।

অম্বালিকা মজুমদার (বাংলা) জিমন্যাস্টিকে মহিলা চ্যাম্পিয়ান

মহিলা বিভাগঃ ১ম মহীশূর (৩৭ পয়েন্ট), **২য়** মাদ্রাজ (২১ পয়েন্ট), **৩য়** বাংলা (১৯ পয়েন্ট)।

বালক বিভাগ (১৪ বছরের নীচে)ঃ ১ম উড়িষ্যা

বালক বিভাগ (১৮ বছরের নীচে)ঃ ১ম উড়িষ্যা

বালিকা বিভাগ (১৪ বছরের নীচে)ঃ ১ম উড়িষ্যা

বালিকা বিভাগ (১৬ বছরের নীচে)ঃ ১ম মহীশূর

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানঃ

পুরুষ বিভাগঃ লাব সিং (উত্তরপ্রদেশ)

মহিলা বিভাগঃ পি ভানোদকার (মধ্যপ্রদেশ)

জিমন্যাস্টিক

দলগত চ্যাম্পিয়ানঃ

পুরুষ 'ক' বিভাগঃ ১ম সার্ভিসেস

পুরুষ 'খ' বিভাগঃ ১ম বাংলা

মহিলা বিভাগঃ ১ম পাঞ্জাব

বালক বিভাগঃ ১ম ত্রিপুরা

বালিকা বিভাগঃ ১ম পাঞ্জাব

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানঃ

পুরুষ 'ক' বিভাগঃ রাম নিবাস (দিল্লী) এবং ভি কারাণ্ডা (সার্ভিসেস—যুগ্ম চ্যাম্পিয়ান

মহিলা বিভাগঃ অম্বালিকা মজুমদার (বাং)

বালক বিভাগঃ মন্টু দেবনাথ (ত্রিপুরা)

বালিকা বিভাগঃ অসীমা গল (বাংলা)

ভারোত্তোলন

চূড়ান্ত ফলাফলঃ ১ম সার্ভিসেস (৫২ পয়েন্ট), **২য়** রেলওয়ে (৩৫), **৩য়** তামিলনাদ (১৮)।

কুস্তি

ফ্রি-স্টাইল: ১ম রেলওয়ে (৪২-৫ পয়েন্ট), ২য় হরিয়ানা (২৬) এবং ৩য় উড়িষ্যা (১৪-৫)

ফ্রি-স্টাইল কুস্তি প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে ৬টি স্বর্ণ পদক জয়ী হয়। একটি করে স্বর্ণ পদক পেয়েছে হরিয়ানা, দিল্লী এবং উত্তরপ্রদেশ।

গ্রিকো-রোম্যান: ১ম সার্ভিসেস (৩৮ পয়েন্ট), ২য় রেলওয়ে (২৭) এবং ৩য় হরিয়ানা (২৪)।

সাইকেল প্রতিযোগিতা

দলগত চ্যাম্পিয়ান:

পুরুষ বিভাগঃ বিহার

মহিলা বিভাগঃ মধ্যপ্রদেশ

বালিকা বিভাগঃ বাংলা

মুষ্টিযুদ্ধ

চূড়ান্ত ফলাফল: ১ম সার্ভিসেস (৫১ পয়েন্ট), ২য় রেলওয়ে (১৬) এবং ৩য় মহীশূর (১৪)

'পদ্মশ্রী' খেতাব

১৯৭০ সালের সাধারণতন্ত্র দিবসে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি শ্রীভি ভি গিরি দেশের যে-সব জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিকে বিবিধ সরকারী খেতাবে ভূষিত করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন প্রবীণ ক্রীড়াবিদ সৈয়দ মৈনুল হক এবং এই দুই টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়—এরাপল্লী প্রসন্ন এবং বিষেণ সিং বেদী। এঁরা তিনজনেই 'পদ্মশ্রী' খেতাব পেয়েছেন। বিহারের প্রবীণ ক্রীড়া-সংগঠক সৈয়দ মৈনুল হক ভারতবর্ষে অলিম্পিক খেলার আদর্শ প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। এরাপল্লী প্রসন্ন এবং বিষেণ সিং বেদী বর্তমান সময়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জুটি স্পিন বোলার। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায়

এরাপল্লী প্রসন্ন
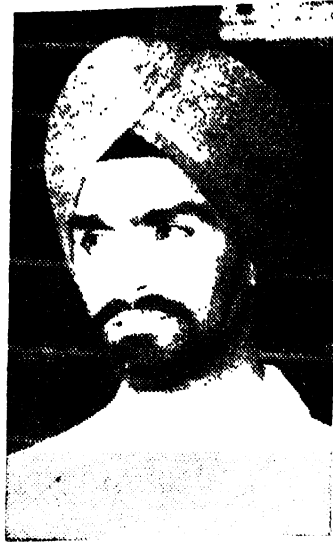
বিষেণ সিং বেদী

প্রসন্ন এ পর্যন্ত ২২টি টেস্ট ম্যাচ খেলে ৩০৫৭ রানে ১১৩টি উইকেট পেয়েছেন। বেদী ১৯টি সরকারী টেস্ট খেলার সূত্রে ১৭৯৪ রানে পেয়েছেন ৭০টি উইকেট।

রোহিন্টন বারিয়া ট্রফি

রায়পুরে আয়োজিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দল ৩ উইকেটে বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে রোহিন্টন বারিয়া ট্রফি জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় পশ্চিমাঞ্চলে বোম্বাই এবং দক্ষিণাঞ্চলে বাঙ্গালোর চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভের সূত্রে মূল প্রতিযোগিতার নকআউট পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল।

প্রথম দিনের খেলায় বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় দলের প্রথম ইনিংস ১২১ রানের মাথায় শেষ হলে বোম্বাই ৭ উইকেটের বিনিময়ে ৯২ রান সংগ্রহ করে। প্রথম দিনে ১৭টি উইকেটের পতন ঘটিয়ে বোলাররা প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে বোম্বাইয়ের প্রথম ইনিংস ১৭২ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৫১ রানে এগিয়ে যায়। বাঙ্গালোর দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ১৩ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় দিনে বাঙ্গালোরের দ্বিতীয় ইনিংস ২৩৬ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে বোম্বাই জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৮৬ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং এক উইকেট খুইয়ে ৬৭ রান সংগ্রহ করে।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের পর আধ ঘণ্টা খেলে বোম্বাই ৭ উইকেটের ... ১৮৬ রান তুলে ৩ উইকেটে জয়ী ...

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বাঙ্গালোর: ১২১ রান (রা... রান। নায়েক ৪৩ রানে ... কে শাহ ৫৩ রানে ৩ উই...

ও ২৩৬ রান (জয়প্রকাশ ৯৩ ... শাহ ৭২ রানে ৬ উইকে...)

বোম্বাই: ১৭২ রান (গাভাসক... ও ১৮৬ রান (৭ উইকেটে। ক... এবং দারাবি ৩১ রান। ... ৪৫ রানে ৩ এবং খোসে ... ৩ উইকেট)

স্কুল টেস্ট ক্রিকেট

কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে ... স্কুল বনাম সিংহল স্কুল দলের ... খেলাটি ড্র গেছে। ১৯৭০ সালে ... সিরিজে সিংহল বর্তমানে ১—০ খে... ৩) এগিয়ে আছে। মাদ্রাজের ... শেষ টেস্ট খেলা ড্র গেলেও সিংহল জয়ী হবে।

পরলোকে প্রবীর

প্রথম বাঙ্গালী টেস্ট ক্রিকেট... শ্রীপ্রবীর সেন গত ২৭শে জান... রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪৬ ... পরলোকগমন করেছেন। ক্রীড়া... পি সেন এবং খোকন সেন নামে ... ছিলেন। তিনি তাঁর খেলো... প্রথম সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলে...

প্রবীর সেন

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৪৮ ... জানুয়ারী, মেলবোর্ণ ম্যাচে (সি... টেস্ট)। শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলে... সালে। এই সময়ের মধ্যে ... সরকারী টেস্ট ম্যাচে উই... হিসাবে দলভুক্ত হন (বিপক্ষে ... ৩টি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫টি, ইং... এবং পাকিস্তান ২টি)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলি... হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।